

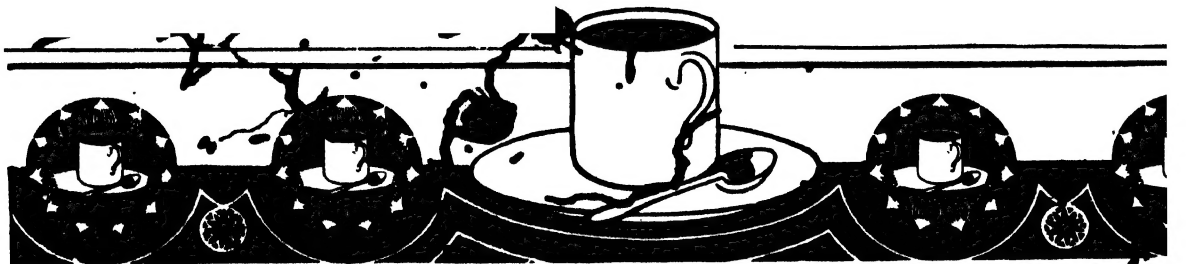


পূর্ব ও পশ্চিম

পূর্বে কি পশ্চিমে সকল স্থানে লোক কেবল চা-ই চায়। পশ্চাত্য দেশকে এই “আনন্দময় পাত্রের” রহস্যের সন্ধান দিয়েছিল গ্রীচী। তাই পূর্ব পশ্চিমের ভেতর স্থানের ব্যবধানটা যুঁজে গেছে; আঙ্গ সারা জগৎ এসে চায়ের পাত্রে মিলিত হচ্ছে। যে দেশেই চা পানের রীতি আছে সেই দেশেই লোকে একবাক্যে একে হৃদয়তার প্রতীক বলে স্বীকার করে নিয়েছে। জগতের বিভিন্ন জাতিকে চা-ই বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করেছে

চা-প্রস্তুত-প্রণালী

টাটকা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন চা জল ফোটানাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।



=হৈয়ালী=
মাসিক সংখ্যা



ছায়া দেবী

লালিতা ও মাধুর্যের সামঞ্জস্যে আধুনিক।
এই মেয়েটি কে? মেট্রোপলিটান
পিকচার্সের “হাল-বাউল”-র নায়িকা।
পরিচালক—ধীরেন গাঙ্গুলী।



=খেয়ালী= বার্ষিক সংখ্যা

নতুন ধরণের ভূমিকায় নামছে রেখা।
কলী প্রসাদ পোষ পরিচালিত রাধার
“পুরুষোত্তম” চিত্রের জায়গাটী ইনি।

প্রফুল্ল পিকচার্সের “মুখের ভূমিকে” কমল
ও দেববালা। ছবিখানার শীতাই আসছে।



বার্ষিক সংখ্যা ১৯৪৮

৩৩৬

মূল্য চার আনা
Price : ২/৪

মোটালিচ আন
Motussil : -/5

পরিচালক : ভাণনাল নিউজপেপার্স লি:

১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

টেলিগ্রাম : 'ভ্যারিটি'

টেলিফোন : সাউথ ৪৬৬

খেয়ালী

খেয়ালী

আশীর্বাদ

শ্রীযুক্ত "খেয়ালী"-সম্পাদক মহাশয় সমীপে

আজ হইতে সাত বৎসর পূর্বে এমনি এক পৌষের সন্ধ্যায় পরম-খেয়ালীর অচিন্ত্য খেয়ালের বশে যে "খেয়ালী" পত্রিকাটি ধরার আলোক প্রথম দেখিবার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইয়াছিলাম, এতদিনে তাহা ক্রোমল শিশুত্বের বয়ঃসীমা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে বাল্যের উপলভূমিতে পদার্পণ করিতেছেন যে দুর্ভাগ্য দেশের মুলিমলিন দরিদ্রকুটীরে শোচনীয় শিশুহত্যার তালিকা দেখিয়া সুসভ্য সুশীলসমাজ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন, সেই নিরন্ন কণ্ঠাগতপ্রাণ দেশের পক্ষে ইহা সুবিশেষ আশীর্বাদ-সংবাদ সন্দেহ নাই!

শ্রীযুক্ত মহাশয় হইলেও "খেয়ালী" বড় ক্ষীণপ্রায় হইয়া এ দীর্ঘ সাত বৎসর "খেয়ালী" কেবল অসহায় ভাবেই 'কোনরূপে পরাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছে'—এই আশীর্বাদ তাহার অতি বড় শত্রুতবে দিতে কুঠাবোধ হইবে। আশৈশব আপনার সগৌরব অস্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে "খেয়ালী" চিরদিনই পরমুখাপেক্ষে মুখতা প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে। পরামুগ্রহপূর্ণ আর্থিক অগতিতে তাই "খেয়ালী" নিরন্ত চক্ষুশূল—অভিশয় বর্ষাব্যস্ত

আজন্ম সুদীর্ঘ সপ্তবর্ষ কাল "খেয়ালী" সত্যাপ্রায়—ধন্যাবলম্বনে—ছায়ের পক্ষে—উন্নতশিরে অচল-অটল-পক্ষে একাকী দাঁড়াইয়া কত লত অসহ্য-অধ্যর্থ-অছায়ের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন কঠিন সংগ্রাম চালাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কতবার কত স্তরক্ষিত বিপক্ষ-পক্ষ দ্রোহকঠোর নিষ্পীড়নে তাহার স্বল্পপ্রসার স্বাস রুদ্ধ .. করিবার প্রবল প্রয়াস পাইয়াছে—কতবার কত না শিশুবাতি নৃশংস কংস প্রাণান্তকরী বধ্যশিলায় সবেগে নিক্ষেপ করিয়া এই ক্ষীণ শিশুশরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার উত্তোগ করিয়াছে! কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রতিবাহু, এই ক্ষুদ্রকায় পত্রিকাখানি করুণাময়ের কৃপাকণা-লাভে—অসি-সংকীর্ণ সুকৃতবলে বিনা আশ্রয়ে আপনাকে বিপক্ষ-কবল-মুক্ত করিয়া আত্মরক্ষায় সন্মত হইয়াছে! "খেয়ালী" বাঁচিবার যোগ্যতা ও শক্তির পরিচয় এই ধানেই। আর এই জন্যই "খেয়ালী" তাহার পরাক্রান্ত পরপক্ষের শিকটে চিরদিনই একটা বিরাট হেঁয়ালী—বিপুল বিন্যয়ে মুগ্ধ বিদ্বাক!

খেয়ালী ভয়লেশ-পরিশৃঙ্খ জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক। জাতীয়তার মহনীয় আদর্শ চির উন্নত

ও অবিকৃত রাশিয়ার সঙ্কটক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হওয়ার
কালে উহাকে একাধিকবার ভিন্নমতাবলম্বী যথচ
হিউমিবিগেরও অপ্রীতিভাজন হইতে হইয়াছে। এরূপ
ক্ষেত্রে “খেয়ালী” বরং বন্ধুবর্জন করিতেও সীকৃত
হইয়াছে তথাপি কোনদিন বন্ধুত্বের খাতিরে জাতীয়-
তার আদর্শ বিসর্জন দেয় নাই। এজ্জ “খেয়ালী”
চিরদিনই আদর্শবাদীগণের অভিনন্দনীয়!

খেয়ালী অজাতশত্রু নহে। এক নিকট
মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠায় ততো বলিয়াই উহা স্বার্থান্বে-
ষিত ব্যক্তিগণের সার্থে আঘাত দিয়া শত্রু
সৃষ্টি করে। দুর্গতের আকুল ক্রন্দন শ্রবণে “খেয়ালীর”
অন্তরতল চিরদিনই ব্যাধাতুর—আর্তের চিন্তে সহানু-
ভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রদানে “খেয়ালী” চিরদিনই অরূপ
—পথভ্রষ্ট বান্ধব-গোষ্ঠীকে রূঢ় সত্যভাষণের শাসন-
সহায়ে সুপথে পরিচালিত করিতে “খেয়ালী” চিরদিনই
ঐকান্তিক অগ্রণী—আদর্শ-পরিভ্রষ্টের বিরুদ্ধে উত্তোলিত
তাহার মর্শ্বেদী বেত্রদণ্ড চিরদিনই অতি অকরণ—
অত্যাচারী প্রবলের প্রতিপক্ষে অভিযানে “খেয়ালী”
চিরদিনই বন্ধুপরিকর—আবার কদাচিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়
পীড়িত হইলেও হীনতার কলঙ্ক-কালিমা ভ্রমণে

“খেয়ালী” চিরদিনই পরাভূত। “খেয়ালী”র এ আদর্শ
সাংবাদিক-সমাজের অনুকরণীয়।

সর্বনিম্নস্তা পুরুষোত্তমের শ্রীচরণাবিন্দের
উদ্দেশে সভক্তি নতি নিবেদনান্তে প্রার্থনা করি—সাত
বৎসর পূর্বে “খেয়ালীর” যে নবীন জীবনযাত্রার সূচনা
হইয়াছিল তাহা অটুতাবিনী জরযাত্রায় পর্যবসিত
হউক! —সকল বাধা-বিঘ্ন চরণে দলিয়া—শত বক্রা
বজ্রপাত অকাতরে শিরে বহিয়া—অকম্পিতপদে—
অচঞ্চলচিত্তে আমাদের চির-আদরের “খেয়ালী” তাহার
চিরস্থির লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকুক! —সর্ব-
মঙ্গলময়ী জগজ্জননীর • রিপুভয়বারিণী প্রহরণ-প্রভা
তাহার গন্তব্য পথ উদ্ভাসিত করিয়া তুলুক! —মহা-
শক্তির দিগন্ত-প্রসারিত বরাভয়-কর তাহার সরল শিশু-
চিত্তে নিরন্তর অকুণ্ঠিত শক্তিসঞ্চার করুক!

॥“শিবাস্তে সন্তোষস্থানঃ”॥

॥শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি—

নিত্যশুভার্থী

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

১৭ই পৌষ, ১৩৪৪

—: (X) :—

“খেয়ালী”র প্রতি-

শ্রীহিন্দুরা দেবী

সৌন্দর্য ও সত্যের লাগি যুগে যুগে তব অভিযান
ধ্বনিছে গভীর কণ্ঠে, নিপীড়িত মুখে তব জয়গান
দিক হতে দিকন্তরে তোমার সাস্ত্রনা বাণী
নিরাশার দিক আলো
মুকে দিক নব-স্তাষা
জীবনের উন্নয়ন দেই যেন আনি।

জীবনের আলো দাও শেষ হোক অপমান গ্লানি
কৃকারিণী পাকজল জীবনের জয়গান তুমি দাও আনি ॥

অজ্ঞতার অন্ধকারে ব্যাধিগ্রস্ত দেহে
জীবনে কালিমা আনে হীন-অপমান গেহে
দুঃখের রজনী আজো যাহাদের হয়নিক গ্লান
যারা মূরে অনাহারে
অবিচারে অত্যাচারে
তাহাদের দিতে হবে-নব আলো অমৃত সন্ধান।

আমাদের কথা

উপনিষদে আছে—“ন তপন্তুঃ। সর্বম্।

স্বকৃত যদ্বিষম্ বিধা।” বিশ্ববিধাতা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু তপস্তার দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। তপঃশক্তিই স্বজনীশক্তি। এবং যেহেতু man was made in the image of good সেই হেতু মানুষকেও কিছু সৃষ্টি করিতে হইলে তপস্তা করিতে হয়—জ্ঞানের তপস্তা, প্রেমের তপস্তা, কর্ণের তপস্তা এবং এই তিনের মধ্যেই ওতঃ-প্রোতভাবে বিজড়িত আছে ত্যাগের তপস্তা, দ্বন্দ্বের তপস্তা। বাঙ্গলাদেশে সাময়িক পত্রিকার গতিপথ নিত্যই সূক্ষ্ম নয়—বহু দ্বন্দ্ববাদের কণ্টকাকীর্ণ। আর্শের প্রতি নিষ্ঠা, অকুণ্ঠতা ভাবের নিতিক প্রয়োগ, দেশের নানা দ্বন্দ্ববাদের লম্ভা লম্বাধানের একমাত্র প্রচেষ্টা দ্বারা ‘খেরালী’ আপনাদের জীবনের সূত্রে একে একে লাভানী বংশের অকুমালা সংগ্রহ করিয়াছে। কোনও ধনিকের বা বনিকের আর্থিক বা মানসিক কণ্ডুগণ চরিতার্থ করিবার জন্য ‘খেরালী’র জন্ম হয় নাই। সেইজন্য কাহারও অসুখের লালনের দিকেও সে লোকদৃষ্টিতে চাহে নাই, কাহারও স্নিগ্ধের তাড়নাকেও সে ভয় করে নাই। এই নিরপেক্ষ নির্ভীকতার ফলে হয়তো :—

“কৃত বাজব হ’য়েছে দ্বন্দ্ব” মান হ’য়ে গেছে কৃত উৎসাহ উৎসাহ ভালবাসা।” নিত্যই দ্বন্দ্বের কথা বলেই নাই, কিন্তু ‘খেরালী’ এই লোকের তপস্তা, এই দ্বন্দ্বের তপস্তা করিতে কোনও দিন পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাই সাময়িক পত্রিকার জগতে “খেরালী”র দান ও স্থান আজ সর্বদা স্মরণীয়। তাই বীরত্ব, বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার অন্তরে কাহারও প্রীতির আশ্রয় আজ অস্বাভাবিক।

বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা কি দেখিতেছি? পশ্চিম দিগন্তে : লীয়ারমান অন্তরাগচ্ছত। কি পূর্বাধিগন্তে নবরূপরূপে দেখা দিতেছে? পাঠক-পাঠিকাদের এই কথা বলিতে পারিলে হয়তো আনন্দিত হইতাম, কিন্তু দ্বন্দ্বের বিষয়—তাহা পারিতেছি কই? ‘খেরালী’র খেরালে “মা ক্রয়ং লভ্যমপ্রিয়ম্” নীতি বদলাইয়া হইয়াছে “মা ক্রয়ং অসত্যমপ্রিয়ম্।” অর্থাৎ অপ্রিয় লভ্য বলিতে ‘খেরালী’ পশ্চাৎপদ নয়, কিন্তু বতাই প্রিয় ও সুখরোচক হউক অসত্য বলিতে সে সর্বদাই পশ্চাৎপদ। তাই দেশের রাজনৈতিক স্বকিপন্থী সুবন্ধেরা নূতন শশিনতন্ত্রের প্রশংসায় গব গব হউন না কেন ‘খেরালী’ তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য যে, শুধু কথার চিড়ে ভিজিবে না। ছই একজন এই নূতন শশিনতন্ত্রের রূপায় আবুহোসেনী লাভ করিয়া আনন্দে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত শক্তির জয়জ্ঞাপন প্রাপ্যপণে বাজাইতেছেন যে, দেশবাসীর কর্ণপটই বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সকল বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, যে যুগে ইম্পিরিয়ালিজমের লজ্জাবদ্ধ সাময়িক ও বেসাময়িক সমস্ত শক্তি মানুষের মনে ভিত্তিক স্বাধীনতার স্মরণকে দমাইয়া রাখিতে পারে নাই, সে-যুগে তুরেকজন পাগলের দাঁতখিচনী, তর্জনি গর্জন ও হুমকিতে ভীত হইবার মত শৈশব বাঙ্গালী বহুদিন অভিজ্ঞ করিয়াছে।

বাস্তবিক বাঙ্গলার ভাগ্য এইরূপ দ্বন্দ্ব-বেশ-লম্বাঙ্গর আর কতদিন থাকিবে, তাহাই

ভাবি। নূতন শশিনতন্ত্র কোর্টের আমনন বা উর্দার মধ্যে লতাই আমের কোনো লম্বা আছে, ভারতের আর ছোট প্রদেশ বংগের মজুমদারী কর্তৃক তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার বুকের উপর এক প্রতিক্রিয়া : শীল মজুমদারী চাপিয়া বলিয়া আছে। তাই এখনও বহু বন্দী ও রাজবন্দীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে বাঙ্গলার আকাশ-আতাল ভারাক্রান্ত, তাই শিক্ষালব্ধদের অন্তরে শিকা সংহারের জন্য স্মারকতন্ত্রের কাহারও লেখা লিখিত হইতেছে, তাই এখানেও দেশের কণ্ঠস্বয় করিবার জন্য লংবাণপ্রয় চলনের লজ্জাকর হুমকী মাঝে মাঝে, শোনা বাইতেছে। এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধের জন্য চাই দেশের সম্ভবতঃ শক্তি। আমরা সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, এইরূপ প্রতিক্রিয়াপন্থী ব্যক্তিমাত্রই দেশের স্বাধীনতার প্রগতি-বিরোধী। জাতি-ধর্মনির্কিশেবে এই প্রগতি-বিরোধীদের বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান।

ইউরোপের আকাশও আজ দুর্ব্যোগের ঘনঘটার লম্বাঙ্গর। শক্তি সম্বন্ধে ক্যানিজমের হুকুরে ইউরোপের রাজনৈতিক শাস্তি আজ ব্যাহত। এদিকে লাত্ভা-লিথুয়ানি-আপানের অভ্যন্তরে চীন বিধ্বস্ত। এখানে বিজ্ঞানের কল্যাণে সারাবিশ্ব একসূত্রে গ্রথিত। তাই এই প্রমত্ত তাণ্ডবের ঢেউ আমাদের দেশেও লাগিয়াছে বা লাগিবে। এই ‘স্বনামানু’ অন্ধকারের মধ্যে দিয়া আমাদের পথ চিনিয়া চলিতে হইবে। ইহার জন্যই, অবশ্য আশা, অবিলম্বে বিচার-সুত্র একাগ্র আর্দ্রনিষ্ঠা ও সংহত কর্মশক্তি। সেই বিশ্ব-দেবতা—স্বস্ত্য হারামুতম্ বস্তু মৃত্যুঃ—অমৃতও ইহার দ্বারা এবং মৃত্যুও ইহার দ্বারা—আমাদের অন্তরে সেই শক্তি ও কর্মপ্রেরণা দান করুন—আজিকার দিনে ইহাই প্রার্থনা।

আশ্রয়

(গল্প)

শ্রীকপিল প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

শিয়ালদহ স্টেশনখানা গম্গম করে
কাপিলে দাঁড়িলিৎ এলে দাঁড়াল,
প্রাটিকরম লোক লোকায় হয়ে গেল।
গাড়ী থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেন
হ'লো যেন হারিয়ে গেলাম, জলপ্রোতে যেমন
জলবিন্দু হারিয়ে যায়। সুহৃৎকেই জন্তু
মনটা পুলকিত হয়ে উঠল।

সার্কালের তাঁবুর মত উঁচু স্টেশনের ছাদ,
করগেট টিনে ছাওয়া—প্রকাণ্ড, উঃ কি
প্রকাণ্ডই! ওই ছাদের করগেট টিনের
খানচার যদি জলপাইগুড়িতে কেউ আমার
দিত, বলতবাড়ীর ঘরখানার ছাউনিটা ঘেরা-
মত করিয়ে দিত। আস্তে আস্তে পারতাম। বুড়ী
মা আমার, দারারাত ধরে এই জলপাইগুড়ীর
বর্ষার তাঁর কঁক নাকালই না এ বছর হচ্ছে।

যাক জলপাইগুড়ি—তাকে অনেকদূর
পিছনে ফেলে এসেছি। মহাজনের তাগাধার
হাত থেকে ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া
যাবে। এই কলকাতা শহরে ইতিপূর্বেও
বহুরার এসেছি, এবারে কিন্তু কলকাতা যেন
স্নেহশীলা মায়ের মত আমার বুকে তুলে নিল।
সুখের হাত বুঠিয়ে আশাল দিয়ে যেন বলতে
লাগল, “বাবারে! পরদার অভাবে কত
কষ্টই পোঁদেছিল; এখানে, আমার কোলে
যখন এয়ে পড়েছিল; ছিলে একটা হবেই।”

কলকাতায় কত লোক কত উপায় করে
থায়, আমারই কি একটা বাঁহা হবে না?

নাহলে বুক বেঁকে প্রাটিকরমের জল-
প্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আমিও টিকিট-কার্ড-
টারের গভী পার হয়ে বাইরে এলাম, পিছনে
তাকিয়ে দেখি, দাঁড়িলিৎ মেলের ইঞ্জিনটা এই

দূরপথ থেকে নিঃশ্বাসে ধোঁড়ে এসে দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে খোস খোস করে হাঁক ছাড়ছে।

কোথায় বাব, তা' তখনও তাবিনি, হাতে
একটি গাম্‌কাবাঁধা পরণের হুতিখানির
পোঁটলা। লটান হারিনন রোডের মোড়ের
দিকে চললাম।

রেল-চৌহদ্দির ফটকের বাইরে আস্তেই,
সামনে দেখি, একদল কাবুলীওয়াল, গোল-
রোটারি বোকারের সম্মুখে বেঁকিতে বলে
প্রাতিরাল সমাপন করছে।

ত্রাসে আঁতকে উঠলাম।

পরক্ষণেই মনে পড়ল, আমি ত কলকাতায়
পৌঁছেছি, জলপাইগুড়ির করিম এখানে নেই।
বিভীষিকা হমন করে বুক ফুলিয়ে লাকুলার
রোড পার হয়ে গেলাম, এখানে বুড়ী মায়ের
চোখের লামনে কাবুলীওয়াল করিম সূতের
তাগাধার এসে আর আমার হাত ধরে টানা-
টানি করতে পারছে না।

আমার বাবা ছিলেন রূপূর আদালতে
মোক্তার, সামান্য আয়ে কোনরূপে লংসার
চলে যেত। একমাত্র ছেলেটিকে উকিল
করাই ছিল তাঁর জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আমি
জলপাইগুড়ি থেকে অ্যাটিক পাশ করে যখন
রংপুর কলেজে আই-এ পড়তে এলাম, তিনি
লাফলোর পথে যেন অনেকখানি অগ্রসর হয়ে
গেলেন। সামান্য য' পুজি জমাতে পেরে-
ছিলেন, আর কিছু ধর করে বয়হা কস্তার
বিবাহ দিয়ে ফেললেন।

তারপরই এল অসহযোগ আন্দোলন।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে লম্বা

উত্তর বদ আর আশাম বিচলিত হয়ে উঠল
বিশেষত: চা-বাগান অঞ্চল।

কলেজের পড়া ছেড়ে জলপাইগুড়ির
চা-বাগানে দেশের কাজে যোগ দিলাম।
এদিকে আইন-আদালতের কাজের চাকা
যেন লইলা থেমে গেল।

বাবার পক্ষাশ বছর বয়স হ'য়েছিল,
এলব ধাক্কা তিন বিঘড় হ'য়ে পড়লেন।
কলেজ যখন ছাড়ি, একটাবার মাত্র তিনি
আমার মুখফুটে নিবেদন করেছিলেন, আমি
কর্ণপাত করিনি। একমাত্র পুত্র আমি,
স্নেহের ধূসরতার আমার আবাল্য প্রসন্ন
দিয়েছিলেন চের। তাঁর জীবনের একটা
মাত্র বাসনা ছিল আমি উকিল হই, আইন-
জীবির সমাজে মোক্তারের উপরে তাদের
মর্যাদা। দেশের কাজের ডাকে তাঁর সে
আশায় জলাঞ্জলি দিলাম।

সে বছর তাঁকে কালাজরে ধরল, কয়েক
মাস ভুগে আরও কিছু ঋণ বাড়িয়ে তিনি
মারা গেলেন। মরবার পূর্বে তাঁর মুখের
শেষ বাণী, স্নেহমুগ্ধ চক্ষে আমার পানে
তাকিয়ে, “চলো বাবা রমেন—”

দেশের কাজ ছেড়ে আমার ঘরের কাজে
মন দিতে হ'ল। নরীয়ে প্রয়োজন কিছু
উপার্জন করা।

পাওনাধারেরা মানে না। মাড়োরাত্তি
শেঠী স্বয়ং খাতাবগলে দ্বারের হাজির;
পিতৃধন, তার সুহ ত, কতক: বধা সময়ে
আমার বৈরা কতব্য।

শেঠীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়
ছিল। তিনিও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন,
মাণ্ডার রঙিন পাগড়ী ছেড়ে পায়ের টুপি
পরেছিলেন, আর বিলাতী লিগারেটের
ব্যবহার ছেড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালি গান্ধী-মার্ক
বিড়ি আমদানি করে তাঁর আড়ং ভরে
ফেলেছিলেন।

তিনি আমার সঙ্গে বললেন, “রংমণিবাহু
তুমি আমার মতই মহাত্মাজীর চেল

আহ—পিতার ঋণ কি উত্তল না করে' বিলম্ব করতে আছে? কিছু না হোক ত' বেড় শও রূপেরা সুখ এখন দিয়ে দাও।”

শেষ পর্যন্ত কাবুলীওয়ালা করিমের কাছ থেকে বেড়-ম' টাকা নিয়ে গাঙ্গীজীর চেল্য শেঠীকে দিয়ে পুত্রের কর্তব্য সম্পাদন করলাম।

উঠে পড়ে একটা চাকরী সংগ্রহে বন দিলাম। চা-এর বাগান সব বন্ধ হয়ে আসছে, তাছাড়া বাজার, পাটের বাজার সবই মন্দা, জলপাইগুড়িতে চাকরি মিলবে কোথা থেকে?

কয়েকটা টাকা সংগ্রহ করে' রংপুরে গেলাম, পিতৃবন্ধু প্রবীন মোক্তার বাবুদের ধরলাম। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বললেন, “আচ্ছা দেখছি, হাকিমদের বলে করে' বহি তোমার কিছু করতে পারি।”

আশুত্ব হ'লাম। তারপর আজ এর

বাড়ী কাল তাঁর বাড়ী আহাির করে' দিন কাটাতে লাগলাম। দিনের পর দিন কাটল, মণ্ডাহ কাটল, মাল কাটল। ক্রমে আমার পিতৃবন্ধুরা বিরক্ত হয়ে উঠলেন—এ হুদিনে পুরানো বন্ধুতার খাতিরে, বেকারকে বাড়ী বলিয়ে খাওয়াতে কেউ রাজি নন।

রংপুরে অপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কোথায় থাকি? এখিকে যা লিখলেন, করিম তাঁর সুইচের তাগাদা করতে, শেঠীও ঘোরাঘুরি করছেন? শেঠী বলেছেন, তিনি মোক্তার বাবুকে লাবুলোক বলেই জানতেন, তাঁর ছেলে কংগ্রেসে কাজ করেছে যে একরূপ জুরাচোর, রংপুরে পালিয়ে লুকিয়ে থাকবে, একথা তিনি কখনও ভাবতে পারেন নি।

জলপাইগুড়ি ফিরে বলত বাড়ীর লাগাও সামান্য যে করকাঠা জমি ছিল, তা, শেঠীকে

বিক্রয়/কাবালা করিয়ে গিয়া—নে কিস্তির সুখ তাঁর শোধ হ'ল।

করিমের জন্যে কিছু উপায় করতে পারলাম না। দিন কতক সে আমাছের বাড়ী এলে ফিরে গেল, তার সঙ্গে বেথা করলাম না। শেষে একদিন সে আমাছের ধরে ফেলল। বাড়ীর দরজার নুসুখে আমার হাত ধরে টানাটানি করল, মা কান্নাকাটি করতে লাগলেন। পাড়ার লোকজন জড়ো হ'ল, কোনরূপে শেঠী তার হাত থেকে মুক্যাহতি পেলাম।

হু'দিন পরেই মায়ের সাঁঘেরে দক্ষিণ পৈতৃক পিতল কাঁদার তৈজস কয়েকখানি বিক্রয় করে' কয়েক টাকা সংগ্রহ করলাম। সেই টাকা হ'ল কলকাতা আসবার পাবনা। এখানে যা'হোক একটা কিছু উপার্জনের উপায় হবেই।

জীবন বীমায়
সর্বশ্রেষ্ঠ

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স

এন্ড রিভেন্স প্রপার্টি কোং লিমিটেড

ব্যবসায় ক্ষেত্রে
বাস্তবিক
বিজয় বৈজয়ন্তী।

হেড্‌ আপিস—২নং চার্জ স্ট্রেন, কলিকাতা।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্বত্র শাখা আপিস ও এজেন্সী আছে *

আমাকে 'বু' করে' ছিল। মন-বাক্য-
আক্ষিপের সোকায়ে পিঁকেটিং, প্রাচ্যোপ-
কেশন অভ্যাস করে' যে চরিত্রের চিত্রতা
অর্জন করেছে, তার আবার চিত্রা কি ?

মোড়ে মোড়ে হকারেরা খবরের কাগজ
বিক্রী করছে, কাঁকা বুটের হল বাগের
আরোহী-বের মোট বয়ে' নিতে প্রস্তুত হয়ে'
কল' ব্যাছে, রিক্শ' ওয়ালা গাড়ী টান্চে,
কল্কাতার অর্থোপার্জনের কত উপায়ই না
রয়েছে।

মুনে পড়ে' গেল, জানবাজারে আমার
দূর সম্পর্কীয় এক পিতৃব্য আছেন। লেখাপড়া
তিনি বেশী শেখেন নি, তাই জাতিতে কারস্থ
হওয়া সত্ত্বেও এখানে একেখানি মিষ্টানের
দোকান খুলেছেন। ইতিপূর্বে বাবার সাথে
কল্কাতা বেড়াতে এসে তাঁর সঙ্গে ছ' একবার
বেথা করে গিয়েছি। বড়দিনের সময়
জলপাইগুড়ি থেকে বড় এক কাঁকা কল্যাণেশু
নিরে বাবা তাঁর ওখানে শেখবার উঠেছিলেন
—কাঁকা মহাশয় আমাদের খুবই যত্ন
করেছিলেন।

আমি সটান তাঁর দোকানে গিয়ে হাজির
হ'লাম।

দোকানের সমুখ অংশেই একটা প্রকাণ্ড
উনানে কাঁকা স্বয়ং 'ভিন্নান' 'চড়িয়েছিলেন,
ভাজমালের গুমোটো আর অরিতাণে তাঁর
বিশাল ভূড়ি বেয়ে ঘাম করতিল। 'মাল
কৈশের মধ্যে নানা জাতীয় মিষ্টান্ন সবকে
স্বত্বকে সাজানো রয়েছে। আহায্যের
মাচুয়োর দিকে নিরীক্ষণ করে' থাকলে মন
মাগুয়ে জ্ববে ব'হু।

ভক্তি ভরে পিতৃব্য মহাশয়ের পথচুলি গ্রহণ
করলাম, তিনি একগাল হেসে বললেন; "কিরে
রমণ এলেছিস ? বেশ, বেশ।"

এমন স্বাগত পেয়ে মনে বড় আনন্দ হ'ল,
জলপাইগুড়ির একল লাহনা ভুলে গেলাম।

কাঁকা মহাশয় জিজ্ঞেসা করলেন,
"তারপর ?"

পিতৃব্যেরোগের পর আমাদের দুর্দশার
কথা তাঁকে কথকিত নিবেদন করলাম, তিনি
ধৈর্য্য সহকারে শুনলেন। আমি বললাম
"তাই যদি বা' হোক কিছু একটা করব মনে
করে' কল্কাতা চলে এলাম।"

তাঁর দোকানটা থেকে কয়েকজন
হিন্দুস্থানী ফেরীওয়ালা, খাবার নিয়ে কল্কাতার
ও আশে পাশের পল্লীতে ফেরী করে' বেড়ায়।
তখন বেলা নয়টা, তারা সব দোকানে জড়ো
হয়েছিল, কাঁকা মহাশয় তাদের নিয়ে ব্যস্ত
হয়ে পড়লেন, আমি একমনে তাই দেখতে
লাগলাম।

বর্তমানে তাঁর আমার সঙ্গে অধিক
বাক্যলাপ করার অবসর নেই বুঝে,
দোকানের অভ্যন্তরে আমার গাম্ভী-ক'পড়ের
পুটুলিটা রেখে আমি একটু পথে পথে ঘুরে
আসতে বেরিয়ে পড়লাম।

কল্কাতার ব্যস্ত-সমস্ত ভাব কোন্ উচ্চা-
কাখাশীল স্ববকের প্রাণ আলোড়ন করে'
তাকে উজ্জ্বলী না করে দেবে ?

প্রায় ষণ্টা ছই' এদিকে ওদিকে ঘুরে
আবার কাঁকার দোকানে ফিরলাম, ততক্ষণে
মন আমার কর্তব্য-স্থির করে' ফেলেছে।

কাঁকার অস্ত্র মনস্ত ভাব কিন্তু তখনও
কাটেনি, তিনি আমার ফিরে আসতে দেখেও
কিছু বললেন না।

দোকান ছাড়া তাঁর পৃথক বাসা ছিল না,
"পিছনের' মিষ্টানের গুদাম বরীতেই তিনি
বিশ্রাম-শয়নাধি করতেন। রাত্তার কলে মনি

সেরে আমি কাঁকার সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজনের
জন্ত প্রস্তুত হ'লাম।

ভোজনের সময় তাঁকে একান্তে পেয়ে
বললাম, "কাঁকা, আমিও ওই হিন্দুস্থানীকে
মত এক কাঁকা খাবার নিয়ে পল্লিতে বিক্রী
করে আসব। তাতে ছ' পরশা বা' উপার্জন
করতে পারি।"—

তিনি শুধু বললেন, "হু"—

ম্যাটিক পাশ করেছি, কলেজেও পড়েছি,
অথচ আমার এই ফেরীওয়ালা বৃত্তি গ্রহণ
করবার সংসাহসের পরিচয় পেয়েও, কাঁকা
মহাশয়ের কোন উৎসাহ হ'লনা দেখে মনটা
আমার বিম্ব হয়ে' আসছিল। তবে কি,
আমি তাঁর কাছে অকস্মাৎ এসে পড়াতে
পিতৃব্য মহাশয় আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন ?
কিন্তু জলপাইগুড়িতে যে লাহনা পেরেছি; তার
তুলনায় এ লাহাত্ত অনাধর অতি তুচ্ছ—
কংগ্রেসের কাজ করে' মন আমার ক্ষমাশীলতা
শিফা করেছে, এ অনাধর আমি গ্রাহ্য
করব না।

শেষ পর্যন্ত ফেরীওয়ালার কাজই আরম্ভ
করলাম।

মাকে সঙ্গে অবিলম্বে জানালাম, উত্তরে
মা লিখলেন, 'বাড়ীর টানের ছাড়াটা মেরামত
না করলে আর চলে না। ভাঙ্গামালের
শেষেও এবার জলপাইগুড়িতে বর্ষা কাস্ত
হবার নাম নেই।

বিদবা মাগুধ তিনি, একবেলা ছ'টা
হবিয়ান আহা করেন, বা' চাল আমি কিনে
রেখে এসেছিলাম, অ' কুরিয়ে এসেছে।

কল্কাতারি আমি কাজকর্ম কয়ছি মনে
শেষী আল্লাহিত হয়েছেন;—করিম মোজই
গালাগালি করে যাচ্ছে।



ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

আমি প্রত্যুত্তরে থাকে লিখলাম 'নিশ্চিত থাকুন' সব ঠিক হয়ে' বাবে।'

পরম উৎসাহে আমি ফেরিওয়ালার কাছে লেগে গেলাম। বেশব সন্তে হিন্দুস্থানী ফেরী-ওয়ালারা খাবার বিক্রী করে, আমি ত্বর চেয়ে কোন বিশেষ সুবিধার অপেক্ষা রাখলাম না।

সারাদিন ছরলাত ক্রোশ পছন্দে ঘুরে আস্তাম, মাথায় খাবারের ডালা। দিনান্তে প্রায় একটাকা পাঁচ-সিকা লাভ হতে লাগল, কাকা মহাশয়ের হাতে এনে জমা দিয়ে দিতাম। তিনি আফ্লাহে তা' গ্রহণ করতেন। আমার ইচ্ছা ছিল, কিছু টাকা জমিয়ে পুঁজি করে' স্বতন্ত্র কোন একটা ব্যবসার আরম্ভ করি।

দিনান্তে হিন্দুস্থানী ফেরীওয়ালাদের চেয়ে বেশী একটা পরলাও ব্যয় করতাম না। যিনি তাহের মত সামান্য কিছু জলপান খেয়ে কাটাতাম, রাজে একটা হোটোলে চাঁরআনা ব্যয় করে উত্তর পূর্ণ করে' অন্নাহার করতাম। কাকামহাশয় অসুগ্রহ করে' তাঁর দোকান ঘরেই আমায় শয়ন করতে দিয়েছিলেন।

এমনি করে' কাকা মহাশয়ের কাছে আমার সত্তরো টাকা জমে গেল, মাঝে শুধু মাকে পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছিলাম।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে লক্ষ্যার পর কাকা মহাশয়ের হাতে টাকা তুলে দিলেই তিনি সম্মেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, 'আহা, বড়-বেহনং হচ্ছে তোর রে রমণ।'

আনন্দে আমার মন গলে' যেত। কল্লনার রঙিন কাপড় উড়িয়ে আকাশ-কুসুম কত কি যে ভাবতে আরম্ভ করলাম। এমনি ধারা ময়রার দোকানই যদি একখানা খোলা যায়। কাঁছেই ত' একটা দোকান ঘর খালি পড়েছে। আচ্ছা এতে কত টাকা পুঁজি লাগে? লাভ ত এতে টাকায় আটআনা। কাকামহাশয় আমার উন্নতি বিধানে কি একটু সাহায্য করতে পারেন না, এক-

টাকা পাঁচদিকা করে' জমিয়ে ত' বছরিন লাগবে? হু' একদিন তাঁকে বনের কথা খুলে বলেও কেললাম। শুনে তিনি শুধু মৃচকি-হেসেছিলেন, 'হবে রে হবে, সব হবে, বাসনা।'

ব্যবসার কীদতে কাকামহাশয়ের কাছে কোনরূপ অর্থ সাহায্য পাওয়া যে একেবারে

অসম্ভব, তা' বুঝে কেহুতে বেশী বিলম্ব হ'ল না। অর্থব্যয় সবক্ষে তাঁর হস্ত বেশ শক্ত ছিল, এমন কি আহাতিখির খরচেও।

খরচ না কমাতে পারলে কি পরলা করা যায়? ব্যবসায়ের এ মূলমন্ত্র আমিও কিছু দিনেই ধরে' কেললাম। আমার রাজের কোনরূপ অর্থ সাহায্য পাওয়া যে একেবারে 'আহা'রে রোজ চাঁর আনা খরচ কসবার প্রয়ো-

কাফে 'মেট্রোপোলের'

=রহস্য-উদ্ঘাটন=

জগদীশ্বর যখন আদাম ও ইভকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাদের দেহ ধারণের উপযোগি কোন জিনিষেরই অভাব রাখেন নি। তবু তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রহস্য প্রকট করার জন্ত আদাম ও ইভকে একটি গাছ দেখিয়ে বলেন এর ফল তোমাদের কাছে নিষিদ্ধ—কিন্তু বাসনা একমাত্র মানুষের মনেই বাসা বেঁধে আছে বা আর কোন চেতন পদার্থের নাই। এ বাসনার নিত্য নতুন রসা স্বাদনেও তৃপ্তি নাই—পরিপূর্ণ তৃপ্তির জন্ত মানুষের মন সদাই চটপট করছে। ভগবানের সৃজন বাসনার বোধ হয় এখানেই সমাপ্তি হ'ল, কিন্তু তিনি যে মনো বিজ্ঞানের সৃষ্টি কবে গেলেন সে নিজেই নিজের ক্ষমবর্ধমানভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল তবু তার সমাপ্তি নাই।

কবি তাই গেয়ে ওঠে অতৃপ্ত তৃপ্তির গান, শিল্পী জোটার অতৃপ্ত তৃপ্তির শিল্প সংস্কার আর এই মনোভাব নিয়েই আপনাদের বাসনার সৈনিক 'কাফে মেট্রোপোল' মানুষের চিরন্তন অতৃপ্ত তৃপ্তি লাভের বাসনার উপযোগী খাওয়া সস্তার প্রস্তুত করে আপনাদের মেহ দৃষ্টি প্রার্থনা করছেন, আপনি যদি আপনার তৃপ্তি দায়িনী সঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন তাহলেও বুঝতে পারবেন 'কাফে মেট্রোপোল' বাবস্থা কত তৃপ্তিদায়ক ও আরামদায়ক।

বিনীত কার্যাব্যক্ষ

“কাফে মেট্রোপোল”

৮৭ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (হাতিমুগান বজারের উপর)

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ବିକ ସଂସାର



ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ବିକ ସଂସାର
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ବିକ ସଂସାର



প্রকল্প পিকচার্সের "সমুদ্রের শমিকে"র নায়ক সমুদ্র
দেব। ছবিদর্শনার পরিচালক নিয়াল গোস্বামী।



"সমুদ্রের শমিকে" নিয়ে পিকচার্সের ভূমিকায় থাকার জন্য
কার কয়েক প্রযোজক রয়েছে।



শিক্ষার্থীদের প্রায়শঃ অয়েমবে আগন্তুক কলেজের
বন্ধুগণের বিপদায় অবস্থা।

গোন্ধালী বাসিন্দা সৎস্রা

রসিক মাফটারের রসিকতা

(বঙ্গ-রচনা)

শ্রীনবীগোগাল চক্রবর্তী

(১)

রসিকলাল শিক্ক এবং শিক্কতা কার্যে
তাঁহার আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

রসিক বাবু মফঃস্বল শহরে শিক্কতা
করেন। বিবাহ হইয়াছে। ছোট্ট একটু
বাসাও আছে সুতরাং বিরাট বৃহৎগতের
খবর রাখা তিনি বড় একটা দরকার মনে
করেন না।

কলিকাতা হইতে রসিকলালের খণ্ডর
মহাশয় পত্র দিলেন, তাঁহার কথা—অর্থাৎ
রসিকের প্রালিকা শ্রীনবী বিজুলতাকে
একটি পাত্র নিজে দেখিতে আনিবে।
তিনি অবগত হইয়াছেন পাত্রটি রসিকের
কোনও সহপাঠী বন্ধুর ভাই এবং রসিকের
বিশেষ পরিচিত। অতএব আলাপ পরিচয়ের
সুবিধার জন্ত তাঁহার মেদিন দেখুনে
উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তিনি ‘পুনশ্চ’
দ্বারা আরও লিখিয়াছেন কৃষ্ণনগরের সর-
তাজা, সর-পুরীয়া খুব বিখ্যাত সুতরাং
রসিকলাল বাইবার সময় ‘বাঁধ কিছু সর-
তাজা ও সর-পুরীয়া লইয়া যায় তাঁহা হইলে
ভালই হয়।

ভালই হয় তাহা রসিকলালও জানিতেন।
এজন্ত তিনি-জী নিরুপমাকে ডাকিয়া বলিলেন,
‘একথা আর লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল?
না লিখিলেও আমি লইতাম।’

নিরুপমা একগাল হাসিয়া বলিলেন,
‘নত্যা।’

বলা বাহুল্য বিবাহের পর বন্দন হইতে
রসিকলাল জামাই বজীর নিয়ন্ত্রণ পূত্র

খানিও পান না। বহুদিন শিক্কতা
করিয়া রসিকলাল অনেক লত্যা ও ভণ্ডা
লাভ করিয়াছিলেন। খণ্ডর বাড়ীর ব্যয়-
কুঠা বোধ তিনি তাঁহার ব্যয়-নিষ্ঠা দ্বারা
প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিলেন।

কিন্তু এথিকে একদিনের বেশী রসিক-
লালের কলিকাতার থাকিবারও উপায়
ছিল না।

রসিকলাল যথা সময়ে এক হাড়ি
সরতাজা ও সর-পুরীয়ার কথা বক্তব্যের সময়
ঘোকারে বলিয়া আনিলেন। তাঁহার
কলিকাতা বাইবার লংবাথ বিজ্ঞানসম্মত
ছেলেরা শুনি, লক্ষ্মীরা শুনি, ডাই-
ক্রিনিং এর লুণ্ঠীশ দাল শুনি, ‘পাড়া
প্রতিবাসীরা শুনি এবং ঘোড়ার গাড়ীর
কোচোয়ানেরা প্রায় সকলেই শুনি।

কিন্তু বুঝে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান-
দের কথার রেলের টাইম বিখ্যাত করা যায়
না। এইজন্য রসিককে তাঁহার উকিল
বন্ধু রঞ্জন মিত্রের বৈঠকখানার বাইতে
হইল।

‘কি মাষ্টার খবর কি?’

‘আর তাই ব’লো নু। আজকের
রাত্তিরের গাড়ীতে আমার কলিকাতার
ছুটেছে।’

রসিককে বলা হাড়া হইতে কেহ
কোনদিন বড় একটা দেখেন নাই; সুতরাং
উকিল বাবু নিশ্চয় কিছু বিপদ আপদ
কল্পনা করিয়াছিলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি
বলিলেন ‘ওড নিউজ। তা’ চ’লে যাও।’

কিন্তু শেখ মজের গাড়ীর টাইমটা
রঞ্জন কুমার টেবিলের উপরে টাইম টেবলটা
দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, ‘তিনটে বিয়ারিং
বোধহয়’। তারপর তিনি নিজের কাজে
মন দিলেন।

রসিক কাগজ পেঙ্গল লইয়া কলিকাতার
বাইবার এবং কলিকাতা হইতে ক্রিয়ার
গাড়ীর সময়গুলি খ্যাতি টুকিয়া
লইলেন।

ক্রিয়ার পথে গাড়োয়ান ইজরেইলকে
আর একবার স্মরণ করাইয়া দিয়া আদেশ,
—‘বেশ খানিক সময় হাটতে দেখে বাঁধি—
দেখিল যেন ঘুমিয়ে টুকিয়ে পড়িল নৈ।’

(২)

সমস্ত ঠিক ঠাক। উদ্বেগের ‘জন্ত
রসিকলালের ঘুম আনিতেছিল না। তাঁর
উপর পার্শ্ববর্তিনীর উদ্বেগ ততোধিক বেশী
হওয়ার আরও অনুবিধা হইতেছিল।

‘ওগো, শুনেছ?’

‘কি?’ পাত্রটি কি করে?’

‘আনিটারী ইনসপেক্টর,’

কি ব’লে?—ইনসপেক্টর?’

‘হু’

‘তোমাদের ইন্সপেক্টর যদি দেখতে আসে
তা’হ’লে ইন্সপেক্টর হ’বে একদিন।’

কোনও ইতিহাসের ছাত্র পরীক্ষার
খাতার এইরূপ লিখিলে রসিক মাষ্টার তাহাকে
কত নম্বর দিতেন বলা যায় না। কিন্তু
গৃহিনী ইন্সপেক্টর ছাত্র নয় সুতরাং তাহাকে
হু বলিয়াই চূপ করিতে হইল।

কিন্তু চূপ করিয়াও নিস্তার নাই।
রসিকের চেয়ে ছোট হইয়াও রসিকের
স্থল পরিদর্শন করিতে আনিবে—তাঁহার
উপর কৃষ্ণ করিবে ইহা নিরুপমার অসহ।

‘ঘুমলে?’

‘হু’

‘তোমার কি দায় রে তাঁদের জন্ত
সরতাজা সর-পুরীয়া নিয়ে ছুটেবে?—চিঠি
লিখে দাও যে তুমি যেনে পারবে না।’

সত্যিকারের রসিক মাঠের জীকে খুঁধাইতেছিলেন, স্কুল ইনসপেক্টর এবং সিনিয়র ইনসপেক্টর এক নহে। এমন সময় গাড়োয়ান আলিরা ডাকিল, 'বাবু'। সত্যিকারের তখন দুইটা হইবে। রসিক স্কুলের ছেলেদের 'লেট লতিকের' গল্প পড়াইতেন। একটু লোকাল লকাল ঠেশনে পৌছাইয়া থাকা মন্দ কি?

(৩)

গাড়োয়ান যখন রসিক লোককে ঠেশনে পৌছাইয়া দিল তখন সেখানে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই। গাড়োয়ান তাহাকে শুইয়া থাকিতে পরামর্শ দিল, আরও বলিল, সে আর একটা ভাড়া লইয়া আনিবে ইতিমধ্যে রসিক বহি ঘুমাইয়া পড়ে তবে সে তাহাকে ডাকিয়া দিবে।

রসিক দেখিলেন, প্রাইটফরমের বাহিরে একটা কেরোলিনের আলো টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে, একধারে কতকগুলি কুলী নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছে, তাহাদের পাশেই কতকগুলি ছাগল ও গরু নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটিতেছে। রসিকলাল সেই নিরীহ জীব-গুলিকে তাড়াইয়া কুলীদের পাশেই কবল বিছাইয়া লইলেন।

কিন্তু ঘুমাইবার উপায় নাই! অসম্ভব মশা। তার উপর নানাবিধ হইতে নানাবিধ গন্ধ আলিয়া স্থানটিকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। রসিকলাল নেহাৎ মাঠের মাছুষ হইয়াও নানারক্কে সেই তীব্র গন্ধ শ্রবেণ করায় ঘুমাইতে পারিলেন না। এ ছাড়া হাড়িটি উপরও তাহার দৃষ্টি রাখিতে হইতেছিল।

ট্রেণ আসিল। টিকিট কাটরা তত্ক্ষণাত্ চক্রে রসিক গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

যুম ফালিলে রসিক চাহিয়া দেখিলেন, গাড়ী শিয়ালসহ আলিরা পৌছিয়াছে।

রসিক রিফা করিয়া অনেক ঘ্রাঘ্রি-পর

খতরের বালায় আলিরা পৌছিলেন। এক ডজন ছেলে ধেরে আলিরা তাহাকে ধেরিয়া ধরিল।

শ্রালিকা হাড়ি খুলিয়া দেখিল, এক হাড়ি বাতাল। খাণ্ডী ভাল করিয়া কথা বলিলেন না—তাহার জোষ্ঠা বজ্রার জন্ত বোধ হয় গোপনে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিলেন।

ইহা-কেই বলে নিয়তি। রসিকলাল রাত্রে অন্ধকারে হাড়িটিকে নিজের বলিয়া ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিতে পারেন নাই। এখন বুঝিলেন, টিকিটের নম্বরটি নোট বুক টুকিয়া রাখিবার সময় বুদ্ধি করিয়া হাড়ির গায়ে তাহার নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখিলে ভাল হইত।

অগত্যা শরিকের দোকান হইতেই গোপনে এক হাড়ী সরভাজা ও সরপুরীয়া আনিতে হইল। লকলের মুখেই হাসি ফুটিল। খাণ্ডী বলিলেন, 'জামাই আমার বড় জামাই। এমনটি আর হয় না। শ্রালিকে নিয়ে কি ঠাট্টাই না ক'রলেন!'

পাত্র পত্রের ধেরে দেখিতে দেখিন আলি হয়নি। শ্রালকপত্নী একখানি সরপুরীয়া মুখের মধ্যে দিয়া বলিলেন, 'খেতে হয়ত কেউনগরের সরপুরীয়া। হা, যা' ব'লব। কলকাতার লাখি আছে এমনটি তৈরী করে?'

রসিকের কলিকাতা বাইবার কথা-শুনিয়া পাড়ার দুর্গামণীর পিল-খাণ্ডী (এবং রসিকের জীর লখী) বাবুবার করিয়া তাহাকে লখী মারফৎ একসের পাথুরে চুণ আনিবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন।

লক্ষ্যাবেলা বৈঠকখানা রোড হইতে উঠা ফিনিয়া রসিকলাল কলেজ স্ট্রীট দিয়া ফিরিতেছেন এমন সময় পশ্চাৎ হইতে মুছ ধরে কে বলিল, 'এ বাবু, 'ফ্রেন্স পিকচার লিজিরে'।

'ফ্রেন্স পিকচার' রসিকলাল কোনদিন উহা দেখেন নাই। শুনিয়াছিলেন উহা

অশ্লীল বরাদ্দী ছবি। রসিকলাল চতুর্দিক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে তাহার কোনও ছাত্র নাই, কোনও পরিচিত মাঠের মহাশয় নাই—সেখানে কেহই তাহাকে চিনে না। সেই বিরাট জন-সমুদ্রে সে তিন একা এবং স্বাধীন। রসিকলালের মনের মধ্যে একটা বন্ধন হীন স্বচ্ছাচারিতা জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিত হস্তে এক টাকা দিয়া খামে আটা সেই 'ফ্রেন্স পিকচার' কিনিয়া ফেলিলেন।

এদিকে গাড়ীর সময় ঠিক না থাকায় অর্থাৎ মৃতন টাইম টেবল না দেখিয়া পুরাতন টাইম টেবলের সময় টুকিয়া আনার পর পর দুইখানি গাড়ী ফেল করিয়া অবশেষে সত্যিকারের গাড়ীতে রসিক কলিকাতা হইতে ফিরিলেন।

টিকিট!

রসিকলাল গাড়ীর হইয়া পকেট হইতে টিকিটখানি বাহির করিয়া জুখানের হাতে দিলেন। ঘণ্টার তিনবার করিয়া রসিকলাল স্বীয় পকেটে হাত দিয়া টিকিটের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছিলেন; সুতরাং টিকিট যে তাহার আছে, হারান নাই সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না।

কিন্তু একটু গোলযোগ ঘটিল। কলিকাতায় বাইবার সময় ভাড়াভাড়িতে রসিক লাল তাহার রিটার্ন টিকিটের কলিকাতা হইতে কলকাতার অংশ গেটম্যানকে দিয়া অপর অংশ লইয়া গিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিয়াই হউক অথবা অজ্ঞাত লারেই হউক 'গেটম্যান তাহাতে আপত্তি করে নাই।

কিন্তু জুখান আপত্তি করিল।

'মহাশয়কে ত' বেশ রসিক লোক ব'লে মনে হ'চ্ছে!' গেটম্যানের এই ভুলের জন্ত রসিকের খুব রাগ হইতেছিল। 'আপনি বরং এই অংশটা গেটম্যানকে দিয়ে তার কাছ থেকে অপর অংশটা চেয়ে নেবেন

হুঁবেলাই ত' তার সঙ্গে আপনার দেখা
হচ্ছে !

রসিকলালের এই উক্তি পরিহাস মনে
করিয়া গাড়ীর অনেকেই হাসিয়া উঠিলেন।
ক্রম্যানও হাসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তুসি
লিখিয়া রসিকলালের নিকট হইতে কলিকাতা
হইতে ককনগরের পুরা ভাড়া এবং কিছু
অতিরিক্ত আকেল সেলামী আদায় করিয়া
তবে ছাড়িলেন।

গাড়ীটা প্যালেজার গাড়ী ; সুতরাং ছোট
বড় সকল ঠেশনেই থামিতেছিল। শিমুরালী
ঠেশনে আসিলে দেখা গেল গাড়ীতে আর
একটি লোকও নাই ! কি ভয়ানক ! এই
ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে একটা একা পথ
চলিতে হইবে নাকি ? যদি ডাকাত পড়ে ?
পায়খানার মধ্যে কেহ লুকাইয়া নহি ত !
সাবধান থাকা ভাল। রসিকলাল উঠিয়া
পায়খানার বরজার বাহিরের সিটকিনি শক্ত
করিয়া চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।
ঠেশনে গাড়ী থামিতেই দুর্গা বলিয়া অল্প
গাড়ীতে গিয়া উঠিবেন এই ইচ্ছা। পায়রা
ডাকা গাড়ী থামিলে নানিয়া ছেঁতিলেন সব
গাড়ীই ঝাঁক ! কেবল সন্মুখের একখানি
গাড়ীতে জামাজুতা পরা একটি ভদ্রলোক
বসিয়া আছেন। সন্মুখের গাড়ীতে উঠিবেন !
যদি এ্যাকসিডেন্ট হয় ! কিন্তু অতশত
আর ভাবিবার সময় তখন ছিল না। ভাড়া-
তাড়ি তিনি সেই গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িলেন।
পরক্ষণেই তাহার মনে হইল এই ভদ্রলোকই
যদি ডাকাত হয় ? ভদ্রবেশী ডাকাতের
আজকাল অভাব নাই। রেলওয়ের
'নোটশের' বিকে রসিকের দৃষ্টি পড়িল—
'চোর, জুরাচোর এবং গাঁটকাটা তোমার
নিকটেই আছে'। সর্বনাশ ! তাহা হইলে
নিকটের এই লোকটি যে গাঁটকাটা তাহাতে
আর সন্দেহ নাই ! লোকটির উপর মতর্ক
দৃষ্টি রাখিয়া রসিকলাল পেছনের বেকিতে

এ্যালাবিং চেনের নিকট গিয়া বসিলেন।
বিগবের কথা কিছু বলা যায় না।

গাড়ী রাণাঘাট আসিলে রসিক ভাড়া-
তাড়ি নানিয়া পড়িলেন ; কিন্তু তখন
ককনগর বাইবার গাড়ী নাই—রাত্রি আড়াইটা
পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে !

উকিল রণেন্দ্র মিত্রের উপর রসিকের
ভয়ানক রাগ হইল। 'নাঃ' এই কল্যাণী
জাতিটা'র এত ড্র ব্যাকি র'য়ে গেছে যে
এর উঠতে এখনও কমকে কম আট হাজার
বৎসর সময় লাগবে ! নূতন টাইক টেবল
কিবে পুরাতনটাকে এরা সরাবে না, নূতন
পঞ্জিকা কিনে পুরাতনটাকে এরা বিহার
কর্ষে না—এমন কনজারভেটিভ জাতির
কখনও উদ্ভূতি হয় ? 'মরুগণে' ! রসিক
ভাবিলেন এই সময়ে নিরিবিলি এক জায়গায়
বসিয়া ফ্রেজ পিকচারগুলি দেখিয়া লইলে
হয়। কিন্তু পুলিশটা বড় পায়চারি করি-
তেছে। যদি ধরিয়। কলে !—থাক, বাড়ী
গিয়া লুকাইয়া থুলিলেই হইবে।

ঠেশনের বাহিরে খাবারের কোকানে
তখনও কাজ চলিতেছে। ক্ষুধার্ত রসিক
লাল কিছু জলযোগ করিবার জন্ত সেই
কোকানে গিয়া বুলিলেন। নিকটে ড্রেনের
মধ্যে উচ্ছিষ্ট শালপাতার জুপের ভিতর
'একটি কীংকার ছোট কুকুর শাবক। আছ,
'বেচার। ক্ষুধার জালায় শালপাতা চাটিয়া
বেড়াইতেছে। ক্ষুধার জালা যে কি রসিক-
লাল তখনও তাহা উপলব্ধি করিতেছিলেন।
তাহার 'কি যতনা বিবে বুঝিবে সে কিসে'
কবিতাটি মনে পড়িল। রসিকলাল কুকুর
শব্দটিকেও খাইতে দিলেন।

গাড়ী আসিলে তখনও চোর' ঘেঁসী।
একজন কুলী তাহাকে গুইয়া পড়িতে পরা-
মর্শ দিল গাড়ী আসিলে 'সে রসিকলালকে'
ডাকিয়া দিবে।

ডাকিয়া সে দিয়াছিল ; তবে গাড়ী
আসিলে নয়, গাড়ী ছাড়িবার এক মিনিট

পূর্বে' রসিক ভাড়াটা কিছু কম দিয়া
জড়াইয়া ছুটিতে ছুটিতে একখানি গাড়ীতে
উঠিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এখানেও ক্রম্যান ! এটা ওটা নাড়িয়া
চাড়িয়া ক্রম্যানটি রসিকলালের নিকট কুকুর
ছানার টিকিট দাবী করিলেন। রসিকলাল
আকাশ হইতে পড়িলেন ! 'জামার মধ্যে
কোন কুকুরছানা ত' নেই !' ক্রম্যান
রসিকলালের কথনটি একপাশে লুকাইয়া
দেখাইয়া দিলেন যে কুকুরছানা আছে এবং
বে-আইন্দীভাবে রসিকলাল উঠা লুকাইয়া
লইয়া যাইতেছেন। রসিকলাল কুকুরছানা
দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন ! ছানাটি
ততক্ষণ ছাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল এবং
রসিকলালকে দেখিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল
রসিকলাল বুঝিলেন, করুণা প্রদর্শিত হইয়া
রায়ে খাবারের কোকানে তিনি বাহ্যে
লুচি, লন্দেখ খাওয়াইয়াছিলেন, ইনি সেই
তাহার বড় রাগ হইল। এই জন্ত বলে
'কুকুরকে নাই দিতে নাই' রসিকলাল কুকুর
ছানাটিকে বেকির স্তীচে নামাইয়া দিয়া
বসিলেন, এ কুকুর আমার নয়।

ক্রম্যানটি তাহার জুতা দিয়া কুকুর
শাবকটিকে একটা আঘাত করিতেই
করুণ আঁতরাহ করিতে করিতে রসিকলালে
পায়ের নীচে আসিয়া আশ্রয় লইল।

ক্রম্যান বলিলেন, 'এ কুকুর যদি আপনার
না হবে তা' হ'লে এত প্যালেজার থাকে
ওটা আপনার কাছে গিয়ে লুকাবে কেন ?'

তার এ বুদ্ধি বাতীরাও সীমর্শন করিলেন
কিন্তু ইতিমধ্যে কুকুরটি সবন্ধে আলোচন
আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কুকুর বলিলেন
ওটা পকেট ডগ, 'কেহ বলিলেন, ওটা
নিশ্চয় হলান্ড দেশীয় বুল ডগ—এখন দেখবে
অমন্নি, কিন্তু বখন বড় হবে আর গায়ে
লোম উঠবে তখন কার সাধ্য ওর ত্রি
'স্ট্যান্ডার্ড' দেখবে'।

রসিকলাল আর একবার কুকুরটির দিকে
তাকাইলেন। সেই কুকুরটিই কি ? তা

কি এমন ধারা কান ভালা ছিল?—না।
কোন লাফেব লোক তুচ্ছ করে রেখে গেল।

একটি ছোট ছেলে ছাতি দিয়া কুকুর
শাবকটিকে খোঁচা মারিতেই শাবকটি মরিয়া
হইয়া ছাতির বাট কামড়াইয়া বলিল।

‘বেশ চেন মশাই, এ বুলডগ না হ’লে
বার না—তারপর রনিকের দিকে চাহিয়া
বলিলেন, কোথেকে কিনলেন ‘বলুন ভ’!
এলপ্লাইন্ডের মোড়? না হগ, লাফেবের
মার্কিট?’

রনিকলাল গভীর হইয়া বলিলেন ‘হ’
তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, নিরুপমা বড্ড
কুকুর ছানা ভালবাসে। ঠেকবোঁগে বহি
জুটাই গেল লইয়া যাওয়া মন্দ কি—বিশেষ
কোন ‘বধন ভালা তখন ‘বিলাতী’ কুকুর
না হইয়াই পারে না।

এদিকে গাড়ী প্রায় ক্লক নগর আলিয়া
পৌছিল। ক্রম্যান বলিলেন, ‘বা হয় ব্যবস্থা
করুন।’

রনিক মাষ্টারী করিলেও এ ইজিভের
কর্ম হুঁশিলেন। তিনি ক্রম্যানটির হাতে
একটি টাকা দিয়া কবলের সহিত কুকুর
ছানাটিকে জড়াইয়া লইলেন।

গাড়ী ক্লকনগর থামিলে রনিক দেখিলেন,
চারের ঘোঁকানের হাবুল এক কোণের
বেকির তলা হইতে উঠিয়া গায়ের দূলা
ঝাড়িতেছে। রনিককে দেখিয়া সে একগাল
হাসিয়া বলিল, ‘বাবু কোথেকে তারপর
মাথার গামছা জড়াইতে জড়াইতে বলিল,
‘জিনিষ পড়ন্তে র’ক?’

তাই বুল, তাহার পাথুরে চূণ? বা।
চূণটা সেই রাণাঘাটে ‘গুট কাটার’
গাড়ীতেই পড়িয়া আছে। রনিকলাল দ্বি-
করিলেন, রেলের লাইন হইতে ততক্ষণ
পাথরের হুড়ি জুড়াইয়া লইয়া বাটবো।
ঝিহুক ও শাহুক পোড়াইলে ঝিহুক চূণ
হয় তিনি জানিতেন। রনিকলাল মনে

করিলেন, পাথরের হুড়ি পোড়াইয়া লইলেও
পাথরে চূণ হইবে।

গাড়ী থামিতেই রনিক দেখিলেন,
হাবুল আর এক বাবুর জিনিষ পত্র নামাইতে
ডরানক ব্যস্ত। তাবটা, যেন সে বাবুর
বাড়ীর চাকর তাঁহাকে নামাইয়া লইতে
এইমাত্র টেনে আনিয়াছে।

কুকুর শাবক দেখিয়া নিরুপমার মন
উত্তীর্ণিতেন না। রনিক তাহাকে বুঝাইলেন,
‘বেশ না কাণ ভালা! এ খাটি হলোণ্ডের
বুল ডগ। একটু বড় হ’লেই বুঝতে পারবে।’

রাত্রি প্রভাত হইলে নিরুপমা দেখিলেন,
—একটা অশ্বেত্ত ‘লুচিভালা’ কুকুরের ছা।
গায়ের শীর্ণ হাড় কথানির উপর ঢাকা
চামড়া চিলচিল করিতেছে—ছটি কাণ
এটুলীতে বোঝাই। কুকুর দেখিয়া পাড়ার
লোক হাসিয়াই খুন। নির্মলার মামী
বলিলেন, ‘এ নিশ্চয় রাস্তা থেকে হুড়িরে
আনা কুকুর—এত রঙ জানেন তাই
তোষের উনি’!

নিরুপমা তখনই কুকুরটিকে বিচার দিয়া
গলাজল দিয়া ধর হইয়া কেলিল।

কমাল দিয়া জড়ান পাথরের হুড়িগুলি
দেখিয়া হুর্গামিনীর ‘পিস’ খাত্তী গাল
হাত দিয়া বলিলেন, ‘ওমা! শুনে কথ!
পাথর পোড়া’লে আবার পাথুরে চূণ
হয় নাকি?’

অগত্যা রনিকলাল সমস্ত সকালটা টো
টো করিয়া ঘুরিয়া চতুর্দিক ঘুরে থানিকটা
পাথুরে চূণ আনিয়া হাজির করিলেন।

তাই বল ‘বাবা!’—তারপর হুর্গামিনী
একগাল হাসিয়া হুর্গামিনীর পিস-খাত্তী
তাহার দখীর নিকট মন্তব্য করিলেন,
‘আচ্ছা রনিক কিন্তু তাই তোর বর’

ইতিমধ্যে রনিকলাল ‘ক্রেঞ্চ পিকচারের
প্যাকেটটি পুলিশার জন্ত অনেকবার চেষ্টা
করিয়াছেন কিন্তু সুযোগ করিতে পারেন
নাই।

এই—খুলোনা, খুলোনা, ওটা একটা ইয়ে—
কি? বল, এটা কিলের চিঠি? অমন
করে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখ কেন?’

রনিকলাল ঢোক গিলিয়া বলিলেন, না,
এমন কিছুই না তবে কিনা—ওটা হুড়িরে
পেরেছি কিনা—

ততক্ষণে চিঠি খোলা হইয়া গিয়াছে।
‘লর্কনাম’ গৃহস্থ ঘরের কুল বসু, তার উপর
নিজের ক্তা! রনিকলাল দেখিলেন জাতি
ধর্ম নষ্ট হইতে বলিল। রনিকলাল তাড়াতাড়ি
বাধা দিয়া বলিলেন, যেখো না, যেখো
না, ওটা একটা অতি অঙ্গীল, জঘন্ত, অকথ্য—
কতকগুলি খরগোল, ইন্দুর এবং কাঠ-
বিড়ালীর জাপানী জল ছবি!—স্ত্রী হাসিয়া
গড়াইয়া পড়িলেন, ‘মাইরি তুমি এতও জান।

ইন্সুলের মাষ্টার হইয়াও বাপ পিতামহের
ঘেঁওরা আদরের রনিক নাম রনিকলালের
এতদিনে লার্থক হইয়াছে।



পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্ততাব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান, ডবলীপুর

মোহিনী

শ্রীমন্ত কুমার আচা

আমাদের সমুদ্র তীরবর্তী নহরের মধ্যে টামানের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। একবার দেখানে আমি অনাহারে মরতে বসেছিলাম, আর ভুবে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম।

অনেক রাতে একখানা ছাকরা গাড়ীতে দেখানে পৌঁছোলাম। নহরে ঢোকবার মুখে কীকা জায়গার মাত্র যে পাথরের বাড়ীখানা ছিল, তার সামনে গাড়োরান ক্রান্ত ঘোড়া ছোটকে দাঁড় করালে। ক্রান্তাগর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী যে ক্রান্তাট্টা পাহারায় ছিল, গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ শুনে, হঠাৎ জেগে ওঠা লোকের মত ধারালো গলার বস্ত্রে “কে যায়?”

মার্জেন্ট আর কর্পোরাল বেরিয়ে এলো। তাদের বহুদূর যে, আমি একজন সরকারী কর্মচারী, রাজার কাজে এখানে এসেছি আর কোন বাড়ীতে থাকবার জায়গা চাই। কর্পোরাল আমাদের নহরের ভেতর নিয়ে গেল। যেখানে যেখানে খোঁজ করলাম সে সব বাড়ীই ভর্তি ছিল। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, তার ওপর তিন রাত ঘুমোতে পাইনি। আমি একেই ক্রান্ত ছিলাম, তার ওপর নিফল চেষ্টার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল।

কর্পোরালকে বললাম “বন্ধু, যেখানে হোক, অন্ততঃ ঘুমোতে পাই এমন একটু জায়গা দেখে ঠিক করে দাও।”

কর্পোরাল বলে “কাছাকাছি খালী গোঁজবার মত একটা কুড়ে আছে; কিন্তু ভয় হচ্ছে, দেখানে থাকি আপনার পোষাবে কি?”

তার মন্তব্যে কান না দিয়ে বললাম “চলো দেখানেই। অনেকগুলো নোঙরা অলি-

গলি পার হয়ে শেষে নহরের ধারে একখানা কুড়ের কাছে এসুম। আমার জন্তে নির্দিষ্ট বাসার খোঁজা চালে আর চুনকাম করা দেওয়ালে পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়েছিল। কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠানের মাঝখানে বড় কুড়ে খানার চেয়ে পূর্ণাঙ্গো আঁত ভাঙা একখানা ঘর দেখলাম। ঘর থেকে খুব চালু উঠানের জমি জলের দিকে নেমে গেছে আর আমি পারের তলার চকল লাগরের চেউরের কেনা দেখতে পেলাম। যে অশান্ত লাগরের চাঞ্চল্যে শুভ্র রক্তনীর শান্তিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা ভঙ্গ হচ্ছিল, তাই যেন চিন্তিত দৃষ্টিতে তারই পানে চেয়েছিল। আকাশের রাতের রাণীর আলোর আমি তীর থেকে অনেকটা তফাতে যে ছাখানা জাহাজ দেখতে পেলুম তাদের কালো পাল, মাস্তুল আবছা আকাশের গায়ে মাকড়সার জালের মত দেখাচ্ছিল। মনে মনে বললাম “রাতটা কোন রকমে এখানে কাটিয়ে কাল ভোরে সেলেননিকের দিকে চলে যাবো।”

সৈন্তবলের একজন ক্রান্তা আমার চাকরের কাজ করছিল। কাপড়ের প্যাটরাট্টা নামিয়ে নিয়ে তাকে গাড়ী ছেড়ে দিতে বললাম। তারপর বাড়ীর কুঁড়কে ডাক দিলাম। কিন্তু কারো লাড়া পেলুম না। ঘরজার ধাক্কা দিলাম তবু কারো লাড়া শব্দ শেলুম না। এর মানে কি? আবার ঘরজার ধাক্কা দিলাম; এবার বহর চোদ্দর একটা ছেলে উঁকি মারলে।

“বাড়ীর কুঁড় কোথায়?”
রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে চলিত ভাষায় ছেলেটা জবাব দিয়ে “কুঁড় কেউ নেই।”
“কুঁড় দেই! তা হলে বাড়ীর গিঁদী কোথায়?”

“গায়ে গেছে।”
ঘরজার লাথি ঘেরে টেঁচিয়ে বললাম,
“তাহলে ঘরজা খুলে দেবে কে?”

ঘরজা আপনি খুলে গেল আর সঙ্গে এলো এক ঝলক স্নানোত্তে ধোয়া। দেখলামই জেলে দেখলুম আমার সামনে নিখর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাপা ছেলে। আগুই বলে রাখছি, কাপা, কালো, খোঁড়া, কুলো, তার মানে এক কথায়, বিকৃতাকৃতির লম্বকে আমার খুব খারাপ একটা ধারণা আছে। আমার মতে মানুষের দৈহিক আকৃতির সঙ্গে মনের একটা ঘনিষ্ঠ লম্বক আছে। যেন অজ্ঞানির সঙ্গে মানুষ মনের কতকগুলো শক্তি হারিয়ে ফেলে।

ছেলেটার সুখখানা বেশ কয়েক দেখলাম; কিন্তু চম্‌বিহীন দৈহিক আকৃতি থেকে কিই বা বোঝা সম্ভব? ছেলেটাকে দেখে মনে ধরা হোল। হঠাৎ তার চোটে পূর্তাঘর হাসি দেখে ছেলেটার লম্বকে একটা খারাপ ধারণা হয়ে গেল। মনে মনে বললাম “ছেলেটা কি তাহলে ক্রান্তিই কপা নয়?” তীরপর মনকে রোঝালুম যে হয়তো ছেলেটার চোখে ছানি পড়েছে আর ভাগ করে, তো আর কেউ ছানি পড়াতে পারে না। তাছাড়া কেনই বা কাপা হওয়ার ভয় করবে? মনকে এলব বোঝানো লম্বকে মনে লম্বকের কতকটা ধোয়া রয়েছেই গেল।

ছেলেটাকে বললাম “কাছলে বাড়ীর গিঁদী কি তোমার মা?”

“না।”
“তাহলে তুমি কে?”

“সে জবাব দিলে ঠাণ্ডা বাপু মরা গরীব হের্ণে।”

“গিঁদীর ছেলেপিলে আছে?”

“এক মনে আছে; সে একটা ‘ত’ তারের সঙ্গে লম্বু হয়ে গেছে।”

“কি রকম তাতার?”

“তা কি করে জানবো? ক্রিমিয়ার তাতার, লোকটা কার্টের (Kertch) মাকি।”

আমি কুড়ের ভেতর গেলুম। খান ছয়েক বুকি, একটা টেবিল, আর উনোনের কাছে বড় একটা খোখাক রাখা আলমারী, এই ছিল ঘরের আসবাব। বেওয়ালে যিগুর কোন মস্তি ছিল না—খারাপ চিহ্ন।

ভালো লাগি দিয়ে মড়ো শাভান আলমিলি। চামড়ার প্যাটরা থেকে একটা চর্কি বাতি বের করে আলিয়ে বখার ব্যবস্থা করলুম। ছোট বন্দুকটা আর তলোয়ার খানা একধারে রেখে টেবিলে পিস্তল রাখলুম; তারপর ক’র কোটটা গারে ঢাকা দিয়ে একখানা বেঁকিতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম।

আমার কতক অস্ত্রেরটা অস্ত্র বেঁকিখানা অধিকার করলে আর মিনিট দশেকের ভেতর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি জেগে পড়ে রইলুম; ছেলেটার কালো তারাবিহীন মাথা চোখ দুটো আমার মনে বে জাপ দিয়েছিল তার চিন্তা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলুম না।

বন্টা খানেক কেটে গেল। জানলা দিয়ে স্বপ্নের জড়িমাথাটা চাঁদের আলো মেঝের ওপর এলে পড়েছিল। যেখানে চাঁদের উজ্জল আলো পড়েছিল হঠাৎ সেখানে কার ছায়া পড়লো। আমি লাফিয়ে উঠে জানলার ধারে গেলুম। একটা মাহুকের ঝাঁকুড়ি একবার মাত্র জানলার সামনে থিরে গেল, তারপর—ভগবান! জানেন কোথায়—মিলিয়ে গেল। সে যে চালু জমি দিয়ে জলে নেমে গেল, একথা আমি বিশ্বাস করব পেরলুম না। তবু, তাহাড়া আর একাথাও বাবার জায়গাই ছিল না।

ওতার কোটটা চালিয়ে, তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে লামনেই দেখলুম কাণা ছেলেটাকে। তাড়াতাড়ি বেওয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দেখলুম, ছেলেটা লাববানে অথচ ঠিক ঠিক পা কলে চলে গেল। তার বগলে কি একটা ছিল আর সে চালু জমি বেয়ে জলের ধারে গেল। মনে মনে বললুম ‘এই তো সেই সময় যখন বোবার বাক ফোটে, কাণার চোখ খোলে।’

পাছে ছেলেটা চোখের আড় হয়ে বার তাই একটু তফাতে থেকে ছেলেটার পেছু নিলুম। ঠিক এই সময়ে চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়লো আর জলের ওপর কালো কুরানি ভাঙতে লাগলো। যে জাহাজ দুখানা নোঙর করা ছিল, অন্ধকারে তার একখানার মাস্তুলে একটা লঠন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। লাগরের ঢেউ বালির বুক আছড়ে পড়ছিল আর ভয় হোল আর—একটু এগোলেই আমাঘের-কাণাবীর লাগরের গ্রানে যাবেন। তখন সে জলের এত কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আর এক পা এগোলেই তার চিহ্নমাত্র পাওয়া যেতো না। কিন্তু এই তার প্রথম রাতে বের হওয়া নয়, কারণ যদিও তার পায়ের তলায় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল তবু তার পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে যাওয়ার তৎপরতা যেখে আমি অন্ততঃ এই আন্দাজ করলাম। হঠাৎ যেন কোন শব্দ শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর একখানা পাথরে বলে হাতের বোকাটা নিজের পাশে রাখলে। জলের ধার দিয়ে দিয়ে ল’বা একটা আকৃতি এল ছেলেটার পাশে দাঁড়ালো। একখানা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আমি তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলুম:

যেহে গদায় কে বলে “হাতাল বড় জোর বইছে; জ্যাংগো আর আসছে না।”

কানা ছেলেটা জবাব দিলে “জ্যাংগো? জ্যাংগো বড়কে ডরায় না।”

“কিন্তু যেহে যে বনিরে আদতে লাগলো।”

“অন্ধকারে জল-পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়াই তো নোজা।”

“কিন্তু যদি সে ডুব মরে?”

“তাহলে রবিবারে তোমার রেশমী কিতে ‘পরা বন্ধ হয়ে যাবে।’

কথাবার্তা থেকে বুঝলুম, যে কাণা ছেলেটা বন্ধিগ অঞ্চলের ভাষার কথা বলেছিল, সে খাঁটি রাশিয়ার ভাষার কথা বলতে পারে। হাত তালি দিয়ে ছেলেটা বলতে লাগলো “যেখো ঠিক বলেছিলুম কি না। জ্যাংগো লম্বু, বড়, কুরানি কি জল-পুলিশকে ডরায় না। শোন! যা শুনতে পাচ্ছি তা নিশ্চয়ই ঢেউয়ের শব্দ নয়। না, এ নিশ্চয়ই তার দাঁড়ের শব্দ।”

যেহেটা উঠে দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে অন্ধকার ভেদ করবার চেষ্টা করলে। একটু পরে বলে “তোমার ভুল হয়েছে, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি নে।” আমিও কোন ভিলি দেখবার জন্তে তাকালুম, কিন্তু দেখতে পেলুম না। একটু পরে, ঢেউয়ের মাঝখানে দেখা গেল, লালো বিদ্যুর মত কি একটা ঢেউয়ের তালি উঠছে, পড়ছে। শেবে দেখতে পেলুম, একখানা ভিলি ঢেউয়ের মাথার মাথার নাচতে নাচতে তীর বেগে কিনারার দিকে আসছে। যে মাঝি এমন রাতে চোদ মাইল চওড়া উপসাগর পাড়ি দেয় সে নিশ্চয়ই লাহনী নাবিক আর তার এমন বিপদে ঝাপিয়ে পড়বার নিশ্চয়ই লাভ-জনক কারণ আছে। আমি দেখতে পেলুম, হালকা ছোট ডিলখানা হাঁলের মত একবার মেনে জলে ডুব মেরে আবার তখনই ভেসে উঠছিল। মনে হোল, এইবার ডিলখানা ডাকার পাথরের গারে আছড়ে পড়ে খান-খান হয়ে যাবে। কিন্তু পাকা মাঝি, হাড়ের এক ঝাঁকুনিতে ভিলি ঘুরিয়ে একটু তফাতে কাঁকা জায়গায় নিরাপদে ফেঁড়ালে।

লোকটা দেখতে মাঝামাঝি লম্বা আর তার মাথার ছিল ভেড়ার চামড়ার কালো টুপি। সে হাতের কি একটা ইলারা করলে, আর যে ছজন, রহস্যময় লোক কথা বলছিল, তারা তার কাছে গেল। তারপর তিনজনে হাতাহাতি করে ডিঙ্গি থেকে এমন ভারী একটা বোম্বা নামালে যে, এত হালকা ডিঙ্গি কি করে এত ভারী বোম্বা আনতে পারলে, ভেবে আমি অবাক হয়ে গেলুম। তারপর মাল কাঁধে তুলে নিয়ে তিনজনে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখন কুড়েতে ফিরে যাওয়ারই ভাল বোধ করলুম। কিন্তু যে অতুত দৃশ্য দেখেছিলুম, তা আমার মনে এমন ছাপ বিরেছিল যে ভোরের প্রতীকার চকল হয়ে রাতটা জেগে কাটরে দিলুম।

সকালে চোখ চেয়ে, আমাকে পোষাক পরা অবস্থায় দেখে, কস্তাক অশ্রুচরটা অবাক হয়ে গেল। রাতের ব্যাপারটা তাকে আর কিছু জানলুম না। সকালে জানরা বিরে নীল আকাশ পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে খানিকক্ষণ কাটালুম; আকাশে মেঘের ফালিগুলো ভালছিল আর দুই তীর ভূমি ক্রিমিয়া, দিগন্তে বেগুনি রেখা, টেনে পাহাড়ের বৃকে গিয়ে মিশেছিল; তার মাথার যেখা বাচ্ছিল আলোকময়ের চূড়ো তখন বেলেনশিকে যেতে পারি জানবার জন্তে, বেরিয়ে পড়ে চানাগোর দুর্গের অধ্যক্ষের কাছে চলে গেলুম। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধ্যক্ষ আমাকে লুটিক কোন খবর দিতে পারলেন না। শুনলুম, যে জাহাজ দুখনি বন্দরে দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলো মালবাহী জাহাজ, আর তাতে তখনও মাল বোঝাই হয়নি। তবে বলেন যে, বিন-চারেকের মধ্যে একখানা ডাক্কর জাহাজ এলে পড়তে পারে আর তখন একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খারাপ মেজাজ নিয়ে কুড়েতে ফিরলুম। বরজার কস্তাক অশ্রুচরটা দাঁড়িয়েছিল; আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে এক রকম ভীত দৃষ্টিতে

আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে “সুবিধে হোল না?”

জবাব দিলুম “না।” তগবান জানেন, কবে এখান থেকে যেতে পারবো।” আমার জবাবে দৈনিকটার উৎকর্ষা যেন ঝেড়ে গেল। খুব কাছে এনে চাপা গলার বিড়-বিড় করে বলে “পথের মাঝে নামবার মত জায়গা এটা নয়। একটু আগে ঢেনা একজন কস্তাকবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—গত বছর আমরা একতলে ছিলাম। জারগাট কেমন শুধতে বলে গেল ‘খারাপ জায়গা লোক-গুলোও সুবিধের নয়।’ কাণা ছেলটাকে আগনার কেমন ঠেকে? কানাকে কেউ কোনদিন এখান থেকে ওখানে ছুটে যেতে দেখেছে? বাজার করত, কটি কিনতে, জল আনতে কি কাণারা যায়? এখানে কিন্তু কেউ ওসব জরুপ করে না।”

“গিন্নী কিরছে?”

“সকালে বখন আপনি বেরিয়েছিলেন তখন একটা বুড়ী একটা মেয়েকে নিয়ে ফিরলো।”

“মেয়ে ক্রিয়কম? মেয়ে না কোথায় গেছে?”

“তাহলে কে, তা বলতে পারিনে। কিন্তু যেখান না, ওই তো বুড়ী ঘরে বসে রয়েছে।” আমি ভেতরে গেলুম। উনোনে আগুন গনগন করছিল আর যে প্রান্তঃরানের ব্যবস্থা হচ্ছিল এটা এখের মত লোকের পক্ষে রীতিমত বিলানিত্য। বুড়ীকে কথা বলতেই বুড়ী বলে যে সে কালা। তারপর তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করি। বাতুলতামাত্র। তখন আমি কাণা ছেলটার দিকে ফিরে কান ধরে বলুম “এই কুঁদে ভেলকিবাজ, কাল রাতে বগলে কি বোড়ক নিয়ে বাচ্ছিল কোথায়?”

সঙ্গে সঙ্গে ছেলটা চোঁচিয়ে কেঁদে উঠলো; তারপর কৌপাতে কৌপাতে বলে

ভুলে যাও যত অপরাধ-মোর

ক্রিয়মুদন সুর

ভুলে যাও যত অপরাধ মোর
কমা কর' প্রিয় মোরে।

রাখ' এ মিনতি; এদ' কাছে এদ'
যেও নাক' দুই ন'রে।

অভিমান ভুলে ক' অজি কথা,
দিও মরুক' মোর পরাধেতে ব্যাখা,
নয়নের জলে ভানায়োনা স্মারক।

আমারে এমন ক'রে!
ভূমিত জাননা,—কত বে' ভোমার

ভালবাসি আমি রাপি,
তব প্রেম' লাগি উন্মুখ লম্বা

মোর এ জ্বরখানি;

ফিরায়োনা মুখ; আজি কাছে এলে,—
পুনঃ কও কথা মুহু হুসি হেলে,

মুকোমল তব বাহির পরশে
নারা ছিরা দাঁও ত'রে।

—:(.):—

“কাল রাতে বাচ্ছিলুম কোথায়? কোথাও ভৌ বাই ত্রি। বগলে কি বোড়ক নিয়ে? কিসের বোড়ক?”

“বুড়ী প্রশ্নাণ ছিলে যে বরকার হলে সে কাঁধে ভালই শুনতে পার। চোঁচিয়ে বলে ‘ওসব মিছে কথা। কেন গরীব বেঁচারীকে জালাচ্ছে? ওকে তুমি ঠাণ্ডাও কি? ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?’”

চোঁচাষেচি আমার অসহ মনে হোল।
বেদন করে হোক এ হৈয়ালীর মনে বুঝতেই
কবে ঠিক করে বেরিয়ে পড়লুম।

বরজার নামনে একখানা বেঞ্চে ওতার
কোঁটটা পরে বসেছিলুম। রাতের ঝড়ে

উতল লাগরের টেউঙলা তখনো আমার
নামনে লাগির বৃকে অছিড়ে পড়ছিল।
তাছের একঘেয়ে শব্দ, দুই থেকে শোনা,

সব্বরের কোলাহলের মত শোনাচ্ছিল। যে দিনগুলো আমার পরীক্ষার, স্কুলের, আলোকোচ্ছল প্রাঙ্গণনীতে কাটাচ্ছি। টেউরের শব্দে তার খুঁট মনে পড়তে লাগলো আর বেথতে বেথতে তার চিন্তার ভূবে গেলুম।

সন্ধ্যাবেলায় কী তারও বেশী সময় কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ গানের সুরে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। আমি শুনেতে লাগলুম, অদ্ভুত, সুর কখনো ধীর, কখনো করুণ, কখনো ক্ষুব্ধ, কখনো উদ্ভুলিত হয়ে উঠতে লাগলো। মনে হোল, সুরের ধারা যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে। মুখ ভুলে চাইতেই বেথলুম কুড়ের ভাঙে আঁটবাঁট পোষাক পরা আর অপরায়িত মত চুলের রাশি বাতালে এলিয়ে দিবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তরুণী। এক হাতে সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণ থেকে চোখ ঢেকে সুরে দিগন্তের পানে চেয়ে সে তখনো গান গেয়ে চলেছিল।

মনে হলো কাল রাতে লম্বা সন্ধ্যার এমু গলা শুনেছি। আমার গারিকার দিকে চাইলুম কিন্তু সে তখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে হাতের তালের সঙ্গে নতুন একটা গান গাইতে গাইতে সে আমার সামনে দিয়ে তীরের মত ছুটে গেল। বুড়ীর কাছে গিয়ে সে তাকে কী বললে। মনে হলো যেন বুড়ী বিরক্ত হোলো। তরুণী খুব হেসে উঠল, তার পর লাগিয়ে আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বিম্বিত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলো, তারপর তাক্কিলোর তল্লীতে মুখ ঘুরিয়ে সে আঙুলে লাগরের দিকে চলে গেল। কিন্তু তার রক্তলীলার তখনো শেষ হয়নি। সেদিন লম্বাকর্ণ বেথলুম, সে থেকে থেকে নেচে গেয়ে সুরে কিয়ে বাচ্ছে। কড়ক মেরে!

কিন্তু তার ভাব ভাঙিতে পাগলের মত কিছু ছিলনা। বরং তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুদ্ধি মস্তার

পরিচয়ই পাওয়া বাচ্ছিল। সে দৃষ্টি আমার উপর কতটা আকর্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল আর যেন আমার কাছ থেকে কোন প্রশ্ন প্রশাণ্য করছিল। কিন্তু যখনই আমি মুখ খুলতে উত্তর হচ্ছিলুম তখনই সে ছুটখার হাসি হেসে ছুটে পালাচ্ছিল।

এমন মেরে আগে আমি কখনো দেখিনি। তাকে ঠিক স্কুলেরী বলা যেতো না, কিন্তু লৌলবা দখল্লে আমার নিজস্ব মতামত ছিল: তাকে বেথে সজ্জাস্ত বংশের মেরে বলে মনে হচ্ছিল আর ঘোড়ার মত মেরে-দেয়ও সজ্জাস্ত বংশে জন্মের চৈয়ে বড় কিছু নেই। চলার ভল্লিতে, হাত পারের গড়নে এটা বেশ বোকা যায়। নাকও লক্ষ্য করবার মত জিনিষ। রাশিবার ছোট পারের চেয়ে নিখুঁ নাক আরো দৃষ্টপাণ্য। বাহুরী বয়েলে প্রার অষ্টাধনী।

কিন্তু বা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম সেটা ছিল তার বেহের নমনীয়ত, মাথা ঘোলানোর বিশিষ্ট ভঙ্গি, স্তম্ভিত কাথের উপর গাড়িয়ে পড়া লোণালী, কোকড়া, লম্বা চুলের রাশি আর তার নাকের নিখুঁ গড়ন।

তাঁর কটাক্ষে ছুট, বস্ত্র একটা ভাব লুকিয়েছিল আর নাকের গড়নের রেখার ছিল মনভোলানো ভঙ্গি। আপনভোলা গারিকা আমাকে জাখ্যাপ কবি গোটির রহস্যময় সৃষ্টি জিগনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এই ছজনের ভেতর একটা বিশিষ্ট মিল ছিল। সেই চাকল্য থেকে হঠাৎ শান্তি, সেই তুর্কোধ্য কথাবাস্তা, আর সেই গানের তরঙ্গ তোলা।

বৈকালের দিকে আমার বনবালাকে কুড়ের বরজার দাড় করিয়ে বসুম "স্কুলেরী! বলো লকানে ছাবে তুমি করছিলে কি?"

"বেথছিলুম বাতাল কোন দিক থেকে বইছিল।"

"তাতে তোমার প্রয়োজন কি?"

"যে দিক থেকে বাতাল আসে, সে দিক থেকে আসে সুর।"

"আর গান গেয়ে কি লোভাগাড়ক ডাকছিলে?"

"বেথানে গানের সুর সেখানেই আনন্দ।"

"কিন্তু যদি বলি তোমার সুর ছাখই এনেছে?"

"সে এলে তাকে লম্বা ছাড়া উপায় নেই। আর ছাখ থেকে আনন্দের ব্যবধান বেশী নয়।"

"এলব গান তোমাকে কে শিখিয়েছিল?"

"কেউ নয়। আমি স্বপ্নের জাল বুনি, আমি সুরের তরঙ্গ তুলি। আমার গান বাধের কানে পশে তাধের মর্ম্ম স্পর্শ করে, বারা শোনে না তারা বোঝেও না।"

"তোমার নাম কি?"

"বারা আমাকে দীক্ষিত করেছিল তারা জানে।"

"কে তোমাকে দীক্ষিত করেছিল?"

"তা জানি না।"

"আঃ—সত্যিই তুমি রহস্যময়ী! কিন্তু আমি তোমার লম্বকে কিছু জানি।"

তার মুখে ভাবাবেগের চাকল্য ফুটলো না, তার ঠোঁট কঁপে উঠলো না।

আমি বসুম "কাল রাতে তুমি লাগরের তীরে গিয়েছিলে।" তারপর যা বেথে-ছিলুম সব বসুম। ভেবেছিলুম, এইবার তার মুখে উৎকর্ষার চিহ্ন ফুটবে; কিন্তু তার কিছুই বেথতে পেলুম না।

সে হেসে আমাকে বলে "আমাদের গোপন লতার কিছু আপনি বেথেছেন। তবে তার কথা বেশী কিছু জানেন না, আর যে টুকু জানেন সে টুকু মূল্যবান স্বপ্নের মত মনের মণি কোঠার লুকিয়ে রাখাই ছিল ভাল।"

"কতকটা ভর-বেথানোর তল্লীতে গভীর ভাবে বসুম "কিন্তু আমি বা বেথেছি তা যদি হুর্গের অধ্যাক্ষকে জানাই?"

একথা কানে যেতেই সে গান গেয়ে উঠে তীরের মত সরে গেল, তারপর সুর-পাওয়া

পাখীর মত মিলিয়ে গেল। কিন্তু তাকে ভয়-দেখানো ঠিক হয়নি। তখন কিন্তু আমি নিজের ভুলের গভীরতা বুঝতে পারিনি।

রাত নেমে এলো। কতক অল্পচরকে চারের আল চড়াতে বলে একটা বাতি জালু-লুম; তারপর টেবিলের সামনে চেয়ারে বলে লম্বা পাইপটো টানতে লাগলুম। চারে চুপক' হিচ্ছি, দরজা খুলে গেল আর পোবাকের খশ খশ শব্দ কানে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে ছাড়াতেই আমার বাচ্চরীকে দেখতে পেলুম। সে নিঃশব্দে আমার সামনে এসে বসলো আর এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে লাগলো যে আমি ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলুম।... এমনি যাক্তরা এক দৃষ্টি আমার বিগত জীবনের অনেকগুলি দিনকে অন্তর্ভুক্ত করে তুলেছিল।... মনে হলো সে যেন আমার কোন কথা শোনবার প্রত্যাশা করছিল; কিন্তু অব্যক্ত কি এক আবেগে আমি বাকশক্তিহীন হয়ে গেলুম। তার মুখখানা মরম মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তাইলুম, এই বিবর্ণতার মধ্যে আমি তার মনের চঞ্চলতা দেখতে পেলুম। তার আঙ্গুলগুলো যন্ত্রের মত টেবিলে আ দিচ্ছিল, তারি দেখে কঁপে কঁপে উঠছিল, তার বুক বার কতক ঢলে পর হুহুর্ভেই লজ্জিত হয়ে গেল।

তার এই কৌতুকাভিনয়ে আমি বিরক্ত হয়ে উঠলুম আর আমার স্নানচী অতিথিকে এক পাড় চা নিবেদন করে, অত্যন্ত নিরসভাবে এই অভিনয়ের ববনিকা পাত করতে উজ্জত হয়েছি, এমন সময় সে হঠাৎ ছাড়িয়ে উঠে ছাড়াতে আমার মাথাটা তুলে ধরে কামনাধর কোমল দৃষ্টিতে আমার পানে চেরে রইলো।

যেন আমার চোখে মেঘ নেমে এলো, আমার ইচ্ছে হোল, তার এই আদরের বহলে তার মুখ চুম্বন করি। কিন্তু সে সাপের মত আমার উজ্জত বাহু এড়িয়ে চলে গেল আর যাবার সময় জড়িত হয়ে বলে গেল "আজ নিশ্চয় রাতে লাগন্নু তীরে" আমার দেখা পাবে।" তার

খাকার চারের অলপাত্র আর একটা মাত্র বাতি উল্টে পড়লো।

কতক অল্পচরটা তার চারের অংশ নিতে এসে বলে উঠলো "মেরেটা বেজার পাজী?" তারপর সে বেঞ্চে শুয়ে পড়লো আর আস্তে আস্তে আমার মনও শান্ত হয়ে এলো। অল্পচরটাকে বল্লুম "দেখ, যদি পিস্তলের শব্দ শোন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে মেত্র সবুজের ধারে।"

চোখ রগড়ে সে বলে "যে আক্ষে।"

পিস্তলটা কোমর বন্ধে শুজে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। যে পথটা জলের দিকে নেমে গিয়েছিল, তার ঢালুর মুখে বাহকদী আমার অপেক্ষার দাঁড়িয়েছিল। তার পরণে অলিগাতাবে ছিল হালকা পোবাক, যেটা তার কোমরে বাঁধা কমানের মত দেখাচ্ছিল।

আমার হাত ধরে সে বলে "আমার সঙ্গে এসো।"

পাথুরে পথে সে এমন করে, আমাকে নিয়ে টললো যে, আমি কেমন করে পড়ে যে ছাড় ভাজলুম না, তা বুঝতে পারলুম না। আগের দিন রাতে কাণা ছেলেটা যেখান থেকে মোড় নিয়েছিল সেখানে পৌঁছে, হঠাৎ মোর কিরে, আমরাও সে

রাস্তা ধরলুম। তখনে চাঁদ উঠেনি। ছুটি নক্ষত্র আলোকময় আর আমার মত অন্ধকারের বুক এসেই কিংব করেছিল। মাতাল চেউরের মাথার তালে তালে উঠতে উঠতে পড়তে পড়তে একখানা মাত্র ডিঙ্গি তীরে এসে লাগলো।

তরুণী বলে "উঠে পড়ো।" খেয়ালের বশে রাতে লাগর অভিবানে বেরোবার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তাই ইতস্ততঃ কড়তে লাগলুম। কিন্তু এ অল্পরোধ প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে অনস্ব্য ছিল। সে লাফ দিয়ে ডিঙ্গিতে উঠে পড়লো, তার পেছ পেছ আমিও উঠলুম আর সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গি লাগরের নুকে ভেসে পড়লো।

আমি রেগে উঠে বল্লুম "এ শবেবর মানে কি?"

আমাকে একখানা বেঞ্চে বসিয়ে, কোমরটি জড়িয়ে ধরে সে জবাব দিলে "এর মানে—এর মানে যে আমি তোমাকে ভাল-বালি।" তার নিরম গাল প্রায় আমার গালে ঠেকছিল, তার গরম নিঃশ্বাস আমার মুখে পড়ছিল। হঠাৎ জলে কি একটা পড়ার শব্দ পেলুম। বস্ত্রচালিতের মত হাত গিরে পড়লো কোমরবন্ধে। কোমরবন্ধে পিস্তল



পেলুম!—এইটা তরাবহ লেনেই বুক
কৈপে উঠলো। রক্ত মাথার উঠে গেল।
আমি তার পানে তাকালুম। আমার তীর
থেকে অনেক দূরে এনে পড়েছিলুম আর
আমি সাতার জানতুম না। তার বাহুবন্ধন
থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলুম।
কিন্তু হে বিভালীর মত আমাকে জড়িয়ে
ধরেছিল আর হঠাৎ একটা ঝাবুনি দিয়ে,
কাঁত হয়ে পড়া ডিজি থেকে আমাকে জলে
ফেলে দেবার জোগাড় করলে। যাই হোক
কোন রকমে ঠাল সামলালুম; তার পরই
আমায় বিশ্বাসঘাতিনী নদিনীর সঙ্গে মরণ
বাঁচনের খতাবাতি জ্বল হোল। সেই সূণ্য
নারী তৎপরকার বলে আমাকে পরাজিত
করলে বুঝতে পেরে আমিও বেহের লম্বত
প্ররোগ করতে লাগলুম। তার ছোট
হাত দুখানা এমনভাবে বুচড়ে ধরেছিলুম
যে তার আঙ্গুলগুলো মড়মড় করে উঠলো।
তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলুম “তোমার
মতলবটা কি?” কিন্তু এত বাতনায়ও সে
একটি কথা বলল না। বুঝলুম, নদিনীকে
এভাবে জর করা যাবে না।

শেষকালে সে বলল “তুমি আমাদের
দেখতে পেরেছিলে। তুমি আমাদের ধরিয়ে
দেবার মতলব কনোছিলে। তারপর হঠাৎ
খুব জোরের সঙ্গে ‘বিদ্রোহের মত একটা
কৌশল প্ররোগ করে সে আমাকে কাবু
করলে। হুজনের বেহের আধখানা ছিল
ডিজিতে, আর আধখানা জলের ওপর ঝুলে
পড়েছিল, তার চুল জলে ভাসছিল। নকুট
নকুল মুহুর্তে আমি হাটু গেড়ে বলে
এক হাতে তার চুলের মুঠি আর একহাতে
তার গলা টিপে ধরলুম। শেষে তার মুঠো
থেকে নিজের পোষাক হিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে
তাকে জলে ফেলে দিলুম।

কেনার সাধা ঢেউয়ের ওপর বার করেক
তার মাথাটা ডেলে উঠলো। তারপর আর
তাকে দেখা গেল না।

ডিজিতে একখানা দাঁড় পেলুম। দেখানা
চালিয়ে অনেক কষ্টে শেষকালে তীরে ডিজি
ভেড়ালুম। চালু পথ বেয়ে কুড়েতে ফেরবার
লম্ব, আগের রাতে কাণা হেলেটা যেখানে
মাঝির অপেক্ষা করছিল, দেখিকে চাইলুম।
এই লম্ব আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছিল।
মনে হোল যেন, চাঁদের আলোর জলের ধারে
কাঁর লাড়া মুঠি দেখলুম। কোঁচুহলের
বগবর্তী হয়ে একখানা পাথরের আড়ালে গা
ঢাকা দিয়ে, আমার সামনে কি হচ্ছিল,
দেখতে লাগলুম। যখন দেখলুম সেই লাড়া
মুঠি আমার অঙ্গার তখন বিষয় আর
অনিদে আমার বুক ভরে গেল। সে তার
লম্বা, হুল্লর চুলের রাশি নিঙড়ে জল ঝরাচ্ছিল
আর ভিজে পোষাক তার বেহের সঙ্গে
মিশে গিয়েছিল। দূরে একখানা ডিজি
দেখতে পেলুম। দেখানা আমাদের দিকেই
আলছিল। আগের রাতে তুর্কী টুপী-আঁটা
যে মাঝিটাকে ধেখেছিলুম, ডিজি থেকে সে
নাশলো। আজ দেখতে পেলুম, তার চুল
কম্বাক-ধাচে ছাঁটা আর কোমরবন্ধ থেকে
লম্বা একখানা ছুরি ঝুলছিল।

মেরেটা টেচিয়ে বলে উঠলো “জ্যাকো!
লব কৈপে গেছে!”

তারপর তারা কি বলাবলি করতে
লাগলো, কিন্তু এত আন্তে যে আমি কিছু
বুঝতে পারলুম না। শেষে জ্যাকো এঁটু
টেচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে “কাণা-হেলেটা গেল
কোথায়?”

কে জবাব দিলে “সে এখনই আলবে
এখানে।” বলতে বলতে পিঠে একটা
বোঝা নিয়ে হেলেটা দেখানে এসে পড়লো
আর বোঝাটা ডিজিতে নাশলো। জ্যাকো
বলে “শোন। এখানে পাহারার থাক।
তুই বা জানিস তা বাসী খবর। (জ্যাকো
কি একটা নাশ করলে)—কে বলবি যে
আমি আর তার চাকরী করবো না।

চারদিকে হুঙ্কার বেধে গেছে। সে আর আমার
দেখা পাবে না। অত্যা এমনি খারাপ
দাঁড়িয়েছে যে আমাকে অস্ত্র কোথাও কিছু
করতে হবে। তবে সে এত লম্বকে কিছু
জোটাতে পারবে না। তবে তুই তাকে
বলতে পারিস—তার যে শক্ত কাজ করে
‘বিয়তি, তার জন্তে যদি আরো ভাল মজুরী
দিতো, তাহলে তাকে এমন দশার ফেলে
যেতুম না। সে যদি জানতে চায় কোথায়
আমার দেখা পাবে, তাহলে বলিস—যেখানে
ঝড় গজ্জায়, চোট যেখানে ফেনা তোলে—
সেখানে আমার দেখা পাবে।”

একটু চুপ করে থেকে জ্যাকো বলতে
লাগলো “বলিস তাকে, ও চললো আমার
সঙ্গে। ওর এখানে থাকা চলবে না।
বুড়ীকে বলিস তার সঙ্গে আর আমাদের
দেখা হবে না।”

কাণা হেলেটা বিড় বিড় করে বলল
“আর আমি?”

“তোমার হাজিমা আমি পোহাতে পারবো
না।”

মেরেটা লাফ দিয়ে ডিজিতে উঠে পড়ে
তার ললীকে কি ইঙ্গিত করলে।

লোকটা কানা হেলেটাকে বলল “এই
নে, মিষ্টি পিঠে কিনে খাস।”

হেলেটা বলল আর কিছু নয়?”

“হ্যাঁ, এই নে।” বলে বাতির ওপর
আর একটু মুদ্রা ফেলে দিলে।

হেলেটা কুড়িয়ে নিল না। জ্যাকো
ডিজিতে উঠে নিজের জারগার বসলো।
হেলেটা কিনারায় বসে রইলো, মনে হোল
যেন সে কাঁদছিল। আহা যেচারা! তার
হুংখে আমারও হুংখ হোল। বারী নির্ঝাটে
বে-আইনী মাল চালানোর ব্যবসা করছিল,
তগবান কেন আমাকে তাহের মাঝখানে
এনে কেনেন? একটা পাথর যেমন জলের
বুকে চোট তোলে আমিও তেমনি এবেদ

মাঝখানে চেঁচিয়ে তুলেছি আর সেই পাথর
খণ্ডের মতই ভুবে মরছিলাম।

যখন আমি কুড়োতে ফিরলাম তখন কতক
অনুচরট। এমন ঘুমিয়ে পড়েছিল যে, তাবলুম
ওয়ে জাগালে ওর ওপর নিষ্ঠুরতা করা
হবে। বাতি জালিয়ে দেখলুম, যে ছোট
বাক্সটার দ্বারী জিনিস পত্র ছিল পেঁচা,
রূপোর হাতলওয়ালা তলোয়ার থানা, এক
বন্ধু যে সারকেশিয়ান ছোরা উপহার দিয়েছিল
লেখানা চুরি গেছে। এতকণে বুঝলুম, যে
বোঝাটা কাণা ছেলেটা ডিঙিতে নাধিয়েছিল,
তাতেকি ছিল। এক ঘুনি ঘেরে কতকটাকে
জাগিয়ে তার গাকিলির জন্তে খুব ধমকালুম।
রাগে তখন আমি প্রায় জানহারা হয়েছিলাম।
কিন্তু যা গেছে, রাগন্তে তো আরি দে সব
ফিরবে না।

কিন্তু • কি করে কর্তৃপক্ষের কাছে
অভিযোগ করি? একটা কানা ছেলে আমার
চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করেছে আর একটা
ঘেরে আমাকে ডুবিয়ে মারবার জোগাড়
করেছিল তখন তোরা কি ছেলে উঠবে না? *


* Michael Y. Lermoutoff থেকে।

—:—

দুর্ভিক্ষ এবং শীত
শিশুরা।

ডোঙ্গরের

বাল্যমৃত্যু
সেবনে
অবিলম্বে সুস্থ ও
সুখল হয়।



বড় বড় ওষুধালয়ে পাওয়া যায়।

বন্ধু!

শ্রীঅনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়

জীবনের চলতি পথে অকস্মাৎ হয়
তাঁদের প্রথম লাক্ষ্য। • গভীর রাত্রে কোন
পথে ধনী যখন শুভাকর্ষক আকর্ষণ হয়
তখন দরিদ্র নিজের বিপন্ন হলেও তার জীবন
রক্ষা করে। ধনী দরিদ্রকে বৃকে 'জড়িয়ে
ধরে বন্ধু—'তাই, আজ হ'তে আমরা বন্ধু!
অন্ত কোন পরিচয় কাজ নাই। যদি
কখনও পারি, তাহ'লে এ ঋণ শোধ ক'রবার
চেষ্টা করব।' তাঁদের এই বন্ধুত্ব দেখে
অনেকেই দরিদ্রকে বলেছিল যে,—এ হয়
না। তেল ও জলে কখনও মিশ খায় না।
এর জন্য তাকে একদিন অনুতাপ ক'রতেই
হবে! কিন্তু সে কোন কথা কানে
তোলে নাই।

কৃতজ্ঞ ধনী নিজেই বন্ধুকে এক চাকুরী
যোগাড় করে দেয় এবং তাকে নিজের
আশ্রয়ে রাখে। দিনে দিনে তাঁদের বন্ধুত্ব
হয়ে ওঠে গাঢ় হতে গাঢ়তর। তারা আর
নিজেদের পর ভাবে না। ধনীর সংসারে

আপন বলতে ছিল না কেউ। তাই সে
মেতে উঠল একজন দরিদ্র বন্ধু পেয়ে। ধনী
বন্ধুর এত ভালবাসা শব্দেও দরিদ্রের মুখে
পব সমর লেগে থাকে এক করুণ বিষাদের
ছায়া। মাঝে-মাঝে ধনীবন্ধু তা লক্ষ্য করে
মুনে কাণা পায়। শেষে একদিন বন্ধু বন্ধুকে
অনেক অক্লেশে করে জানিতে পারলে তার
মনের কথা। দুই পল্লীগ্রামের এক জীর্ণ
কুঠীরে পড়ে আছেন তার চির স্ত্রীধনী
বিধবা মাতা ও তরুণী বধূ। পূর্ণ এক বৃন্দার
আগে সে তাঁদের ছেড়ে চলে আসে
আসবার সময় তাঁদের হাতে তাঁর শেষ
স্বত্ব মাত্র পঞ্চাশটা টাকা-দ্বিগুণে বলেছিল
“আবার যদি কখনও তোমাদের কুণ্ডল ঘোঁচাতে
পারি, তবেই ফিরব।” • তারপর এই এ
বৎসর, সে আর তাঁদের কোন খবর পায়
নি। জানে না সে তাঁরা বেঁচে আছেন
কিনা। তাই, যখন এই লুপ্তের সময় তাঁদের
কথা তার মনে হয়, তখনই তার প্রাণ
আকুল হয়ে ওঠে।

দরিদ্র-বন্ধুর মাতা এবং বন্ধুকে দুই
পল্লীগ্রাম হতে আনিয়ে ধনী তাঁদের নিজের
গৃহে আশ্রয় দেয়। বন্ধুর মাতাকে সে
ডাকে 'মা' বলে আর বন্ধুপত্নী ডালিকে
বলে—'বৌঠান।' ডালি,—অপরূপ তাঁর
রূপ। পত্নীই বিধাতা যেন • জগতের সমস্ত
দৌন্দর্য্য দিয়ে সাজিয়েছেন এই ডালি।
তাঁর দে রূপ তীব্র নয় অথচ কোমলও নয়।
কদি পারে না তাঁর বর্ণনা করতে। এত
সুন্দর দে। ধনী-বন্ধু দিবসের কাজের মধ্যে
খোঁজে কেবলই অবসর। কখন দে ছুটে
মাঝে তার মার কাছে তার বৌঠানের

কাঁচের চামড়া খোঁজেন তাই।
হরিজ-বন্ধু এই সময় তার কণ্ঠের
জন্ত ঘুরে সেড়াত বেশ বেশান্তরে। তার
পরিবারবর্গের তার ধনী বন্ধুর উপর চাপিয়েই
সে নিশ্চিত ছিল। তাকে সে বিশ্বাস কর্ত
অগাধ। কিন্তু এ সংসারে একের মুখ
অন্তর সিঁধার উপাধান। তাই অনেকে
ব'লত;—“এত মাথামাথি ভাল নয়। কে
জানি কার মনে কি আছে?” সব কথাই
সে শুন্তে পেত কিন্তু তখনি আবার আপন
মানই হেসে বলত,—“যত সব পাগল! এও
কি লম্বা? তার বোঁঠানকে—না, না,
না।” সে শিউরে উঠত।

পাঁচ দিনের মিথ্যাও একদিন লভ্য
হয়। বোঁঠান লম্বা কথটা বতাই সে
মনে মনে ভাবে ততই সে হয়ে যায় কি
যেন এক রকম। সময় সময় সে ভাবে—
“লভ্যই তো! কেনই বা লোকে একথা
বলে? সে কি লভ্যই তার বোঁঠানকে
ভালবাসে? কে জানে? হয়ত লভ্য!”
এই রকম লাভ পাঁচ চিন্তাই ক্রমে ক্রমে
তাকে আকৃষ্ট করে তোলে তার বোঁঠানের
প্রতি। শরনে-স্বপনে, আহারে-বিহারে,
কেবলই তার চোপের সামনে ভেসে ওঠে
অপরূপ রূপ। কোন কালেই আর বলে
না মন। অবশেষে একদিন সে হৃৎতে
থাকে যে লভ্যই ডালির দৌলখ্য জুড়ে
রয়েছে তার সময় জ্বর, মন এবং সেই
লভ্য সে স্থির করে যে, যেমন কোরেই
ডালিকে তার চাই-ই! ভুলে যায় সে তার
কর্তব্য! ভুলে যায় কৃতজ্ঞতা, মানে না
সে বিবেকের নিষেধ বাণী, তুচ্ছ করে দে
সমাজ বন্ধন। ডালির অসামান্য দৌলখ্যের
পশরা তাকে করে তোলে—কিপ্ত—উন্মাদ।

লভ্য একদিন হরিজ-বন্ধু বিদেশে পারি
এক চিঠি—“বখা নীত্র লভ্যব চলে এস।

তোমার বন্ধু নিরুদ্দেশ!” সেই মুহূর্তেই সে
বিদেশ ত্যাগ করে বাহির হয়। সময় পথ
সে হারান হুস্তিয়ার কাটার। মনে মনে
আলোচনা করে,—কেন এমন হ'ল?
কোথার গেল তার অন্তরের বন্ধু? আর
কি সে পাবে না তার দেখা?—এই রকম
কত কি! নানা চিন্তায় তার মন হয়ে
ওঠে ভাবাক্রান্ত। গৃহে উপস্থিত হয়ে সে
চারিধিকে চেয়ে দেখে বাড়ীর সে শ্রী
আর নেই! সময় বাড়ীটা যেন প্রাণহীন
হেঁ। বতবার সে কিরে এলেছে বিদেশ
হ'তে, ততবার সে সামনের ঐ জানালার
তারই কজ অধীর প্রতীকার বলে থাকতে
যেথেকে তার বড় আহারের ডালিকে। আর
ঐ বারান্দার হালিঘুখে দাঁড়িয়ে থাকত তার
ধনী বন্ধু! আজ সব কোথায়? অস্থির
পথে গৃহে প্রবেশ করে সে দেখতে পার
লম্বাঘুখে দাঁড়িয়ে তার অশ্রুধ্বী মাতা।

মাতার পদগুলি গ্রহণ করেই অধীর
আগ্রহে সে প্রশ্ন করে—“একি মা! তুমি
কাঁচ কেন? এরা সব গেল কোথায়?”

তার হাতে একখানি চিঠি তুলে অশ্রু-
রুদ্ধকণ্ঠে মাতা বলেন,—“ওতেই সব বুঝতে
পাবে।” পত্রে তার বন্ধুর হস্তাক্ষর।
অত্যধিক ঔৎসুক্যে সে মুহূর্ত মধ্যে পুড়ে
জ্বলে সেই চিঠি। চিঠি পড়েই তার মাথা
ঘুরে ওঠে। চিঠির কথা সে পারে না
বিশ্বাস কর্তে। তাই সে আবার পড়ে।
সেই এক কথা! “একি স্বপ্ন না লভ্য?
চিঠিতে লেখা আছে—

হে বন্ধু!

বাগানে ফুল কোটে পূজার জন্ত কিবা
যে তার ব্যবহার জানে তার জন্ত। যে
তার ব্যবহার জানে না তার জন্ত নয়।
একথা অতি লভ্য। রূপদী নারীর সৃষ্টি
হয় ধনীর গৃহ আলোকিত করবার জন্ত।
হরিজের গৃহে অবজ্ঞে ফুলার পড়ে থাকবার
জন্ত নয়। যদি পড়ে থাকে, তাহ'লে সেই

সনেট

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি বাবা ভালবাস—তাই দিয়া গান।
লাগিব তোমার তুষ্টি। না করি' বিচা—
না 'তুনি' শ্রবণে কভু অথবা নিরবি';
ছুটে যাব আহরিতে সে দ্রব্য-সম্ভার।
ইচ্ছাশীল কণ্ঠ হ'তে পারিজাত-মালা
খলারে আনিতে যদি কভু বল যোরে,—
কিবা দিকু-ভল হ'তে তব শূণ্যডালা,
আনিবারে বল যদি মণিরত্নে ভ'রে—
তাও পারি অবহেলে। শুধু পারিবনা—
আমারে বিরহে তুমি যে প্রেম গভীর,
অলঙ্কারে 'নিজ হ'তে। তারি এককণা,
প্রতিধানে ফিরাইরা দিতে। শুধু শান্ত স্থির—
হ'রে থাক বকে মোর সে প্রেম-সুরভি;
অক্লিবে যে যুগে যুগে তারি মধু-হবি

হুলা হতে তাকে উদ্ধার করা অসম্ভব কর্তব্য।
তাই তোমার গৃহে ডালিকে অধরে পড়ে
থাকতে। বেগে আমি স্থির থাকতে পারি
নি। ডালির অপরূপ রূপ তোমার গৃহে
শোভা পায় না। তুমি বোধহয় স্বীকার
করবে যে, তোমার স্বন্ধ হতে এ বোঝা
নামিয়ে দিবে আমি যথার্থ বন্ধুরই কাজ
করেছি। ডালির বিনিময়ে তোমার দিবে
গেলাম আমার প্রাণাধতুল্য আবাদগৃহ।

বিহার!

তোমারই—

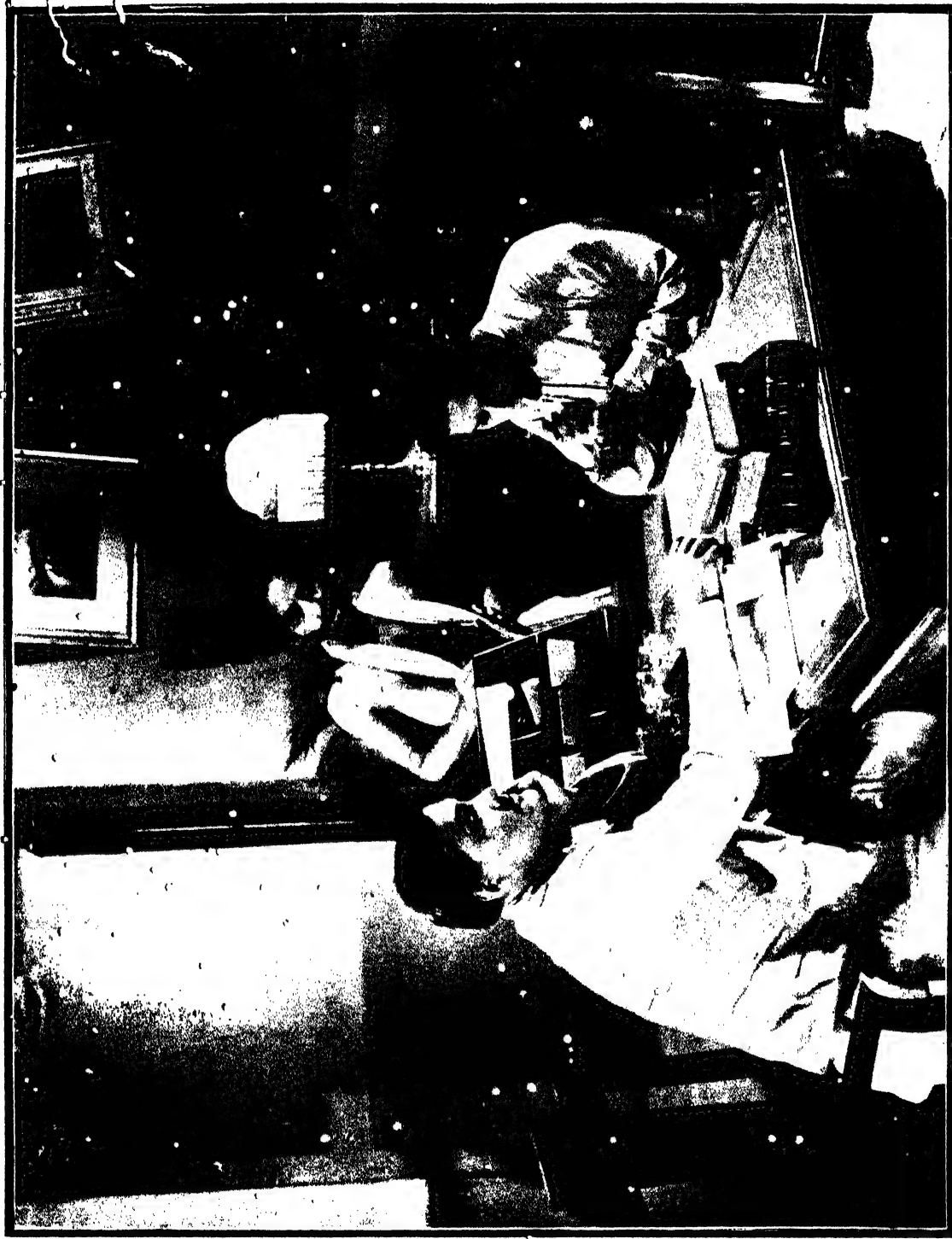
ধনীবন্ধু।

সমস্ত মানসিক বস্তুরা লভ্য কর্তে। না
পেরে হুহাতে বুক চেপে সে বলে পড়ে।
একটা মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাসের লগ্নে অশ্রু-
অর্জনায়ে তার মুখ হতে বার হয়ে আসে—
“উঃ!” বৃদ্ধ!!



নিউ থিয়েটার্সের আগতপ্রায় ছবি
“অভিজ্ঞানে”র একটি দৃশ্য মলিনা ও
দুর্দবাণী। পরিচালনা কোরিয়েন অকুল রায়।

খেয়ালী বাস্তবিক সংখ্যা



ওয়েস্টেক কিলিংটন আর্টসের “ক্যাপার
বুনাকার” আরেকটি দৃশ্যে বীরাজ, ~~সত্য~~
প্রভাষ—বীরাজ তই চাখা সিগারেট ধরাচ্ছেন।

ছাত্রাচিহ্নের ব্যবসায় বাংলা প্রভিউসার

শ্রীমতী বীরেন্দ্র সান্যাল

নামের প্রভিউসারের সংখ্যা
সাতলাহুশে ছাত্রা চিহ্নের ব্যবসারে,
পারশী বণিকের একাধিপত্য ভঙ্গ করিয়া
বিনি নিজস্ব শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার, দ্বারা
ভারতে বাঙালী ও বাঙালীর মান রক্ষা
করিয়াছেন, তিনি আজ জাতীয় নম্র ও
প্রজ্ঞার পাত্র।

নিউ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার ছাত্রা-চিহ্নের
ব্যবসারে আজ যে তারত-জোড়ার সুনাম ও
লাকল্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহার মূল্য
আছে। তাঁহার ঐকান্তিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা
এবং পরিচালনা শক্তি। যে কয়টি কর্ণীর
মহাবোগীতার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার
এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন,
কর্মজীবনে তাঁহারাও সকলেই সুনাম ও
লাকল্য অর্জন করিয়াছেন।

নিউ থিয়েটারের নোভাগো জঁধা
প্রকাশ করে এমন বাঙালী আমি দেখিয়াছি,
কিন্তু গৌরব বোধ করে না এমন বাঙালী
নাই।

ব্যক্তিগত ভাবে যখন আমি এই
প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত হিলাম না তখনও
বিনের পর দিন নিউ থিয়েটারের বিজয়-
বার্তা প্রকাশ করিয়া, লাকল্যের পরিচর
বিয়া, তাঁহাদের হবি ও শিল্পীর গুণাগুণ
বিশ্লেষণ করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছি।
আজ নিউ থিয়েটারের পতাকা-তলে
দাঁড়াইয়া সেই গৌরবই বোধ করি। পূর্বে
অবাঙালী প্রতিষ্ঠানে নগ্নিষ্ট থাকিয়াও যে
জাতীয়তার বোধ আমার অন্তর আশ্রয়
করিয়াছিল, আজও তেমনি করে। বাঙালী
বলিয়া নিউ থিয়েটারের জাল বাগিতাম,

বড়ো বলিয়া প্রজ্ঞা করিতাম। আজ তাঁহারই
লংগ্রে আলিয়াছি বলিয়া, একাধারে প্রজ্ঞা
ও ভালবাসার সমন্বয় ঘটিল।

আর একটি প্রতিষ্ঠান বাঙালীকে বড়ো
করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম—
কালী ক্রিয়াস্। বাঙলার মৃতিকায়, চিত্র-
শিল্পের বীজ রোপণ করিয়া যে পারশী বণিক
এই শিল্পের প্রতি বাঙালী বণিকের প্রথম
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—সেই চক্ৰবর্তী
যোতিভালায় শিক্ষাধীনে, পরবর্তী জীবনে
বিনি চিত্র পরিচালক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি
লাভ করেন, তিনিও আমাদের অশেষ
প্রজ্ঞার পাত্র—শ্রীযুক্ত শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়।
ম্যাডান কোম্পানীতে থাকা কালীন গান্ধী
মহাশয়ের সহিত আমার সংযোগ ঘটয়াছিল।
পরবর্তী জীবনে চেষ্টা, অধ্যবসায় ও আত্মিক-
তার জোরে তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান
গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

কুটির শিল্পের আবেশের সহিত কালী
ক্রিয়াস-এর আমি তুলনা করিয়া থাকি।
বীণে বীরে, বাঙলার জল-বাড়ীনে এই
প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে—তাই হঠাৎ
কিছু ঝাপ্টার পতনের সম্ভাবনা নাই। জিশ
বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া কিনি ইহার ভিত
পত্তন করিয়াছেন তাহার স্মৃতি বিচার বুদ্ধির
তারিফ করিতে আমরা বাধ্য।

হিন্দুস্থানী হবির বাঙালারে, কালী ক্রিয়াস্-
এর নাম নাই। এই বিকে আমরা গান্ধী
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রাধা ক্রিয়াস্ মূলতঃ মাদোয়ারীর টাকার
প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইলেও ভাগ্যচক্রে
আজ বাঙালীর হাতে পড়িয়া, বাঙালী
বনিয়াছে। স্মরণে 'মাদোয়ারী' বর্ণ-পঙ্ক-
করাইয়াছিলেন। শিল্পের শুক বন্ধিয়ার,

শুক তাঁহার বজাতীর দান রক্ষা করিয়াছেন।
তাই বাঙালী বহিঃস্থ বন্যোপাধ্যায়কে
আমি নমস্কার করি। এরূপ স্বার্থনিষ্ঠ,
আচার পরায়ণ ও লজ্জাবৎসল তত্ত্বলোক
এ রাজ্যে বিরল। কর্মজীবনে প্রায় দুই
বৎসর বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সান্নিধ্যে
আমি তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচর
পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ব্যবসা পরিচালনার
বহুদিন লিপ্ত থাকিয়া ইনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন।
ইহঁদের প্রৌঢ়াণিক চিত্তগুলি বিশেষ
সুনাম অর্জন করিয়াছে। বন্যোপাধ্যায়
মহাশয়ের মহাবোগী শ্রীযুক্ত চিত্ত রঞ্জন
বোম মহাশয় "Friend, Counsellor
and Guide" হিলেবে রাধা ক্রিয়াস-এর
উন্নতি সাধনে সর্বদাই যত্নবান। তাঁহাদের
মূল প্রচেষ্টা লাকল্য মণ্ডিত হোক, এই
প্রার্থনাই করি।

মাদোয়ারীর মধ্যে বজরংমূল খেমকা
(Mr. B. L. Khemka) শিক্ষিত এবং
পরিপক্ক ব্যবসায়ী। তাঁহার সান্নিধ্যে অগ্নিরা
কর্মজীবনে বিশেষ শৃঙ্খতি পাইয়াছি। খেমকা
বাবুর 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্রিয়াস' কোম্পানীর নাম
নিউ থিয়েটারের পরেই উল্লেখযোগ্য।
বহু উচ্চ শ্রেণীর হবি তুলিয়া এই প্রতিষ্ঠান
দ্বারা ভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন।

অন্তর দিলেবে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, খেমকা
বাবু আশ্রয় নব উত্তম চিত্রগঠনে উত্তমোগী

গভ নিরোধ বাটিকা
এই পরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নিরোধ ওষধমাত্র একবার
সেবনে এক বৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫ টাকা
ডাকিম এম.এস. ডায়ান
৪২, ধর্মভাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা

হইয়াছেন। তাঁহার আন্তরিকতা ও প্রচণ্ড কর্মশক্তি তাঁরিক করিতে আমরা বাধ্য। বাঙালী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লংপরামর্শে যেমতাবাবু কর্মজীবনে উপকৃত হইয়াছেন। আশাকরি ভবিষ্যতেও তিনি কর্মযুক্ত হইবেন।

অপর মাদোরারী প্রতিষ্ঠান—“প্রীতারত লক্ষী পিকচাল” পরিচালক বাবুলাল চৌধুরী। সম্প্রতি মধুবোন এখানে ছবি তুলিতেছেন। প্রথম শ্রেণীর চিত্র অভ্যাবধি তুলিতে না পারিলেও ইচ্ছা অর্জন করিতে ব্যবলাগত লাক্যলগিত করিয়াছেন। অল্প টাকার ভাড়া পাওয়া যায় বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে।

ম্যাডান কোম্পানীর ষ্টুডিও শোনা যায়, রায় বাহাদুর শুকলাল কারনানীর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে চলে। ইহারে লক্ষ্যে লক্ষিক ভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নহে কারণ লংবাধ-

পত্রের সঙ্গে ইহারে কোন যোগ নাই। হারা- চিত্রে Mortgagee হিলাবে ছাড়া এডিউটার হিলাবে কারনানীর কোন দাবী নাই।

দেবদত্ত ফিল্মস্‌এর শ্রীযুক্ত দেবদত্ত শীল বরেন্দ্র তরুণ ও এ-ব্যবসারে নবাগত। কয়েক-খানি ছবি তুলিলেও কোনখানি প্রথম শ্রেণীর হয় নাই। শীল মহাশয়ের ছবির ব্যবসারে হাত পার্কিতে এখনও বিলম্ব আছে। আশা-করি ভবিষ্যতে তাঁহার পরবর্তী প্রচেষ্টাগুলি আন্তরিকতার লাক্যলগিত হইবে।

বালিগঞ্জের “বহুলা পিকচাল” অনাদি বাবুর পরিচালনাবধি, বেশীর ভাগ ভাড়া খাটাইয়া চলিতেছিল—সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে বলিয়া শুনিরাছি। চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে অল্পতম প্রবর্তক (pioneer) হিলাবে অনাদি বাবুর নাম আছে।

ষ্টুডিও বিহীন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান, মাঝে মাঝে ভাড়া করা ষ্টুডিওতে ছবি তুলিয়া

থাকেন। হারী এডিউটার-এর তালিকার ভাহারের নাম উল্লেখ করা সমীচীন নহে। প্রসঙ্গতঃ কমলা টকীজের প্রতিষ্ঠাতা হিলাবে শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম করা চলে। ইহা হারা- চিত্রের ডিষ্ট্রীবিউশন্ ব্যবসারে নিজ লক্ষ্যতা ও ব্যবসা বুদ্ধির জোরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহারে প্রথম ছবি সম্প্রতি মুক্তি লাভ করিয়াছে।

এডিউটারের কোন এনোলিগেশন্ বাঙলাদেশে নাই। তাঁহারের ভিতর লক্ষ্যগোষ্ঠী এবং নিজ নিজ স্বার্থ লংরকণের সুবিধার জন্য এদেশে Producer's association হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। বাঙলার অধিকাংশ এডিউটারের মধ্যে মতের মিল নাই। একটি organization নির্দেশ্য ভাবে চালাইবার মত বিচার বুদ্ধি ও লক্ষ্যের নাই। অনেক ক্ষেত্রে, চিত্র-নির্মাতার

বি, মাম্মা এণ্ড সন্মের কন্সল্টাংগ ও গারান্টিষ্ট হোমস।

কিওরোজি-সালসা

বর্তমান যুগে ইহাই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট ওণ বিশিষ্ট মহোপকারী সালসা। রক্তপরিষ্কারক, বল, শক্তি ও সুখাবুদ্ধিকারক। পারদ ও উপদংশ বিবর্মানক। শুক্রতরল্য হারনিক ও বাতু দোষীলা রোগে, নষ্ট বাহ্যে, বাবতীর স্ত্রী রোগে এবং বহুপুরাতন ও জটিল রোগ সমূহের একমাত্র মহোপকারী। কোন

ইলেক্ট্রো-গোল্ড-কিওর

বীণাধরা নিয়ম নাই—সকল রক্তে সেবন করা যায়। মূল্য দেড় টাকা, মাণ্ডলাদি সহ ২০।

গগোরা-বাম

পিল (বটিকা) বা মিক্চার

নূতন ও পুরাতন সর্বপ্রকার লক্ষণযুক্ত গগোরিয়া, প্রমেহ, বাতুপীড়া ও মূত্রনালীর বাবতীর রোগের বিশেষ পরীক্ষিত আন্তকলপ্রদ মহৌষধ। ২১ মাত্রায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই রোগের অলঙ্ঘ জালা যন্ত্রণা লাঘব হয়।

এজুমা-সিরাগ

এবল টানের সময়ে বাস প্রবাসের সুস্থাসন যন্ত্রণার একদাপ মাত্র সেবনেই রোগ দূরীভূত হইয়া রোগী সুস্থ হয়। মূল্য দেড় টাকা; মাণ্ডলাদি সহ ২০।

এজেন্টস্ :-এন্, ডক্টার্স এণ্ড কোং

১০ নং, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

বি, মাম্মা এণ্ড সন্ম—মাম্মা মেডিকেল হল,

৪নং, গুলু ওজাগর লেন, (পোর্ট বক্স নং ১১৪০৯) কলিকাতা

চরিত্র—পুরুষ।

ডাঃ হরেন মুখার্জী—প্রাইভেট
ডিটেক্টিভ।

অবিনাশ—ঐ বন্ধু—শক্তিশালী
সহকারী।

রামদহিন—ঐ বিশ্বস্ত বেয়ারা।

অন্তান্ত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে
পাইবেন।

জ. ত্যাজিডি

শ্রীকৃষ্ণ নাথ যুথোপাধ্যায়

চরিত্র—স্ত্রী।

মনীষা—হরেন বানুের পত্নী।

বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের
বুড়ো বী।

অন্তান্ত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে
পাইবেন।

(১)

জুন মাস। দারুণ গরম। সমস্তদিন
আকাশ থেকে আগুন ঠিকরে পড়েছে।
প্রায় অর্ধেক রাত্রি চটকট করায় পর
আন্দাজ বারোটায় লম্বা এক পশলা বৃষ্টি
হ'য়ে বাওয়ার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম
জানি না। হঠাৎ কোনটা গুনগুন করে
বেজে উঠলো।

উঠে আলো জেলে কোন ধরলুম—
“হালো”—কে?”

কোনো—“হরেনবাবু।”

আমি—“কে আপনি? কোথা থেকে
কথা বলছেন?”

কোনো—“আমি বড় বিপন্ন। আপনাকে
এখনি বরকার। আপনাকে, আলতে বলতে
পারি না। যদি বলেন তো, আমি আপনার
লগ্নে দেখা করি।”

আমি—“কে আপনি?”

কোনো—“আমার পরিচয় দিলেই আপনি
স্বপ্নে পাবেন। কিন্তু বা বলা বরকার
তা আপনার সামনেই বলতে চাই। যদি
অস্বস্তি করেন—?”

আমি—“কাল সকালে হ'লে চলে না?”

আমার বলিয়া অনেক অযোগ্য ব্যক্তিকেও
টুঙির বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করা হইয়া
থাকে। অনেক প্রেডিউলারের আবার
'সবজাত্য' 'complex' আছে। এই ধোঁব
গুলির উচ্ছেদ নাথন প্রয়োজন।

কোনো—“না—না—না। আমি আপনার
পায়ে পড়ছি। একটু কষ্ট করে আমার
কথাটা শুুনুন। আপনার ঠিকানা আমি
'কোন-ডিরেক্টরী' থেকে পেয়েছি।”

একটু চিন্তা করে বলুম—“আচ্ছা—
আহুন। আমি আপনার জন্তে অপেক্ষা
করছি।”

কোনোর গুনগুনানিতে শুধু আমি আগি
নি, মনীষারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে
বলে—“এই অলম্বরে আবার কোন উৎপাত
এলে হাজির হ'লো?”

আমি বলুম—“একটা জীলোকের গলা
গুনলুম। সে বড় বিপন্ন বলছে।”

মনীষা বলে—“তা বলে” এই শেষ
রাত্রিতে? হুড়িটা দেখছো? রাত্রি প্রায়
তিনটে বাজে।”

আমি হেঁদে বলুম—“বিপন্ন কি লম্বা
ঘুঁই আলো, মনীষা? আমার মনে পড়ে,
আর একবার এই রকম কোনের ডাক
পেয়েছিলুম—আর, সেও এমনি অলম্বরে,
এমনি আর্ন্ত রমণীকণ্ঠে।”

মনীষা একটু চুপ করে থেকে বলে—
“খিঁকি বলেছে। সে লম্বা। তুমি ছুটে না
এলে আমার কি হ'তো? কি ভীষণ
অবস্থায় পড়ে, আকুল ভাবে আমি তোমাকে

কি ভীষণ অবস্থায় পড়ে মনীষা
হরেনবাবুকে ডেকেছিলেন তা জানতে হ'লে
৭৪ বর্ষের 'খেরালী'তে প্রকাশিত 'নিদাখের
ডাক' পড়ুন।

‘লেহিন ডেকেছিলুম তুমি’ আমি জানি আর
জানেন? অস্বস্তি। তুমি যাও—বিনি
তোমাকে ডেকেছেন তিনি নিশ্চয়ই একজন
পথে।”

তাড়াতাড়ি চাট কোড়াকটা পায়ে দিয়ে
নীচের বৈঠকখানার নেমে এলুম। অবিনাশ
আজ-কাল এইখানেই গোর। তারি নাক
ডাকার বাধা দিয়ে তাকে জাগিয়ে নব
কথা বলুম। রামদহিনকে ডেকে বাইরের
গেটের আলোটা জেলে দিতে বলুম।

অবিনাশ বিরক্তভরে বলে—“একটু
নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোবারও উপায় নেই।
যাছোক দেখা যাক। যা এলে পড়েছে
তা'তো আগবেই। তা—আমি বার্কো
না থাকবো?”

আমি হেঁদে বলুম—“যাবার কোন লজত
কারণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যখন, তখন
থাকলে কতি কি?”

অবিনাশ কোন কথা না বলে একটা
ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে পড়লো। আর
সে বেজেন্নে আছে তা জানবার জন্তে গুনগুন
করে তাল-লয়-বর্জিত এক অস্বস্তি
ভাজতে লাগলো।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। আমি
চুপ-চাপ বনে ‘দিগায়েরট’ টানচি, আর
অবিনাশ গুনগুন করতে করতে মাঝে মাঝে
খেঁদে বাজে, আবার যেন চমকে উঠে মৃতন
উত্তরে গুজনের খেঁদে ধরতে। হঠাৎ ‘কলিং
বেল’(calling bell) বেজে উঠলো।

অবিনাশ চোখ চেয়ে উঠে বসলো।

আফি উৎসাহে অপেক্ষা করতে লাগলুম। একটু পরেই বরজা বা পড়লো। অবিনাশ উঠে বরজা খুলে দিলে। একটা জীলোক ঘরে ঢুকলেন—সঙ্গে একটা বারো-ডেরো বহরের ছেলে।

মহিলাটির বয়স আন্দাজ ২৭/২৮ বছর হবে—অত্যন্ত সুন্দরী।

আমি একখানি চেয়ার এগিয়ে দিলুম। তিনি বসে বসেন—“আপনি করেন বাবু?”

আমি বলুম—“আজ্ঞে হ্যাঁ। বলুন আপনার কি বরজা?”

মহিলাটি কেঁদে কেঁদেন। কৌপাতে কৌপাতে বলেন—“আমার বড় বিপদ। আমার সঙ্গে এটা আমার ছেলে। আমার মারে-পোরে আপনার পায়ে ধরতে এসেছি। না-বাঁধের রক্ষা করুন।”

আমি—“বলুন—ব্যাপারটা খুলে। আমার বা ল্যাংডা’ আমি করবো।”

মহিলাটি বলেন—“আপনার বরজা কথা আমি অনেক শুনেছি। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।”

কামার উচ্ছ্বাস ও হৃদয়খালের মধ্য দিয়ে ঘটনাটির বিবৃতি যা তিনি দিলেন তা’ এই :—

সুদর্শন-অনগ্রহ-অভিনেতা মানবেন্দ্র চৌধুরী তাঁর স্বামী। হেলেনা থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেন এবং যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছেন। আজ ঐ থিয়েটারে স্বর্গীর বিশেষলালের ‘পরপারে’ নাটকের অভিনয় চলছিল। মানবেন্দ্র বাবু নায়ক মহিমের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, আর মহিমের রক্ষিতা ‘শান্তা’র ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, সুন্দরী নটা নতী বেবী। অভিনয় অত্যন্ত উজ্জ্বলই হচ্ছিল। ক্রমে সেই দৃশ্য এলো, যেখানে শান্তা বেস্তা ও মহিমের লাক্ষী জী লরবুর প্রথম পরিচয় হ’লো। মাতাল অবস্থার মহিম এলে উপস্থিত হ’লো

এবং টাকার জন্ত লরবুকে উৎপীড়ন করতে লাগলো। শান্তা মহিমকে বাধা দিলে। উভয়ের মধ্যে বচসা হ’লো। তারপর মহিম একটা ড্রয়ার থেকে পিস্তল বার করে শান্তাকে গুলি করবার ভয় দেখালে। শান্তা বুক পেতে দিলে—বেস্তার আশা কোথায়, আকাআই বা কি? ‘বেস্তা আজীবন বেস্তা’। মহিম বলে তবৈ মর। শুভ্রম’ করে’ পিস্তল ছুটলো—শান্তা লুটিয়ে পড়লো মাটির উপর—মহিম ছুটে পালিয়ে গেল—প্রতিবেশীরা ব্যস্ত লম্বা হয়ে ঘরে ঢুকলো—লরবু তখন সুচ্ছা গিয়েছে। লামনে পর্দা ফেলে দেওয়া হ’লো। বাইরে প্রেক্ষাগৃহে করতালির শব্দ কানে তাল দরিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু দুহুর্ভমধ্যে থিয়েটারের লকলের মুখ লাক্ষী হয়ে গেল। দেখা গেল একটা গুলি লতা লতাই শান্তার মাথা ভেদ করে গিয়েছে? ক্রমশঃ কানাকানি হ’তে কথাটা শ্রোতাদের মধ্যে পৌঁছিল। কখন কি রকমে যে প্রেক্ষাগার খালি হয়ে গেল তা বোঝা গেল না। পুলিশ এলো এবং মানবেন্দ্র বাবুকে হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার করলে। এখনও তদন্ত চলছে।

লম্বা শুনে একটু চিন্তা করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—“আপনার স্বামীর সঙ্গে এই অভিনেত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল কি?”

তিনি বলেন—“অভিনেতাদের বেশী ভাগই কি রকম চরিত্রের তা’ আপনাকে বলে দিতে হবে না বোধ হয়। তবে এই জীলো-টার সঙ্গে আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে আমি জানি না। যেখান, এই নাবালক ছেলেটিকে নিয়ে আমি যে ‘কি বিপদে পড়ি-রাছি তা’ আপনি বুঝতেই পারছেন। তাই আপনার শরণাপন্ন হ’য়েছি। অবস্থা আমা-দের বেশ স্বচ্ছ। কিন্তু যে রকম অবস্থার স্বামী আমার গ্রেপ্তার হ’য়েছেন, বিশেষ রকম তদ্বির না হ’লে তাঁকে বাঁচান শক্ত হ’বে। একবার বরজা করে তদন্তের সময় লাক্ষীর থেকে যাতে আমার স্বামী মুক্তি পান তাই আপ-

নাকে করতে হ’বে। মনে করুন আমি আপনার বোন। আমার রক্ষা করুন—আমার স্বামীকে রক্ষা করে। আমার স্বামী যে হত্যাকারী নন, সে কথা আমি খুব জোর করেই বলতে পারি।”

মনীষাকে সব কথা বলে’ অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরই গাড়ীতে থিয়েটারে এসে উপস্থিত হ’লুম। আলবার লম্বা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বহুবাজার স্ট্রীটে তার বাড়ীতে নাঘিরে দিয়ে এলুম।

থিয়েটারের ম্যানেজার আমার খুব পরিচিত। আমাকে দেখেই তিনি কি বলতে বাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে তাঁকে এক-পাশে নিয়ে এসে বলুম—আমার পরিচয় এখন কাউকে দিবে না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, বলবেন আমি আপনার একজন বন্ধু থিয়েটার দেখতে এলেছিলুম।”

তিনি বলেন—“আপনাকে দেখে লাক্ষী পাচ্ছি। কি বিপদ দেখুন তো! আপনি হঠাৎ এদিকে এলেন কি করে?”

আমি বলুম—মানবেন্দ্র বাবুর জী এই রাজিতে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে আমার টেনে এনেছেন। মোটাছুটা ব্যাপারটা শুনেছি। এইবার গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করি। খুব লংকপে জবাব দিন।”

তিনি বলেন—বলুন। ওদিকে আবার ইন্সপেক্টরের তদন্ত চলছে। তিনি কাউকে বাধা দিচ্ছেন না যেন লকলেই অপরাধী।”

আমি বলুম—“হ্যাঁ। নিয়ম ত্রাই বটে। তদন্ত করতে হ’লে কাউকে জোরার বাধা দিতে নেই। থাক সে কথা। বলুন তো এই মানবেন্দ্র বাবু লোকটা কেমন।”

তিনি বলেন—“অসাধারণ শক্তিশালী অভিনেতা। খুব উচ্চ প্রাণ—নেশা তাৎ করেন না। তাঁর চরিত্রের বিরুদ্ধে আমি কিছু জানি না। তবে, জানেন তো, আমা-দের দেশে অকারণ নিদ্রকের অভাব বই।”

আমি—“এই অভিনেত্রী য় সঙ্গে তাঁর কতকগুলি আলাপ ছিল।”

ম্যানেজার—“এই অভিনেত্রীটি অল্পদিন হ'লো টেজ এগেছে। কিন্তু এর মধ্যেই এর বেশ পশারি, হ'রে উঠেছে। মানবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে এই বিশেষ আলাপ ছিল না। বরং নাট্যলিঙ্গিক বশোদাহারাল বাজপেয়ীর সঙ্গে এর খুব পাকপাকি আলাপ লোকে লক্ষ্য করেছে।”

আমি—“বশোদা বাবুর সঙ্গে মানবেন্দ্র বাবুর ব্যবহার কি রকম?”

ম্যানেজার—“না। দৈনিক বিয়ে কোন লক্ষ্যের কারণ নেই বলেই আমার মনে হয়। উত্তরের মধ্যে বহুত্ব বোধই আছে।”

আমি—“এই রিতভক্তারের লাইসেন্স আছে অথবা? কিন্তু এটা রাখবার জরুর উপরে?”

ম্যানেজার—“এটা আমার নিজের কাছেই থাকে। এর চোঁটা চেয়ারে টোটা তরা ছিল। একটা ছোঁরা হ'রেছে—বাকী আছে পাঁচটা। সে পাঁচটাই খালি টোটা (Blank cartridge)। চলুন না। টোটার বাজ পুলিশের হেপাজতে আছে, আর লজ্জাকর (Property man) এখন ইন্সপেক্টরের জেরার জবাব দিচ্ছে।”

ম্যানেজারের সঙ্গে লজ্জাকরে গেলুম। সেখানে ইন্সপেক্টরের জেরা ও লজ্জাকরের উত্তর থেকে বুঝলুম যে, খালি টোটা ছাড়া অস্ত্র কোন টোটা তার কাছে ছিল না; এবং সে জানেও না কেমন করে একটা মাত্র গুলি তরা টোটা রিতভক্তারে গেল।

সকাল পর্য্যন্ত তব্বন্ত চলে। কিন্তু কোন বিক থেকেও এমন স্ত্রী পাওয়া গেলনা যাতে এই হত্যারহস্তের অঙ্গসন্ধান চালানো ব্যরণ রকমকের সমস্তলোক মায় গেটকীপার পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত ছিল—কাউকে যেতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু কেউ এই রহস্তের উপর একটুও আলোকপাত করতে পারলে না।

টেজের উপরেই লাল পড়েছিল। ইন্সপেক্টর বধন রিপোর্ট লিখছিলেন, সেই অবকাশে আমি লালটা একটু পরীক্ষা করলুম। কপালের ঠিক মাঝখানে গুলি লেগেছে। মানবেন্দ্রবাবু কোন জারগার বাড়িরে রিতভক্তার ছুড়েছিলেন তা জিজ্ঞাসা করার ম্যানেজার বলেন যে তিনি ঠিক বলতে পারেন না। তবে যেখানে ড্রয়ারটা ছিল তার পাশ থেকেই গুলি করেছেন বলে মনে হয়। মানবেন্দ্র বাবুও সেই কথাই বলেন; তবে বাতালের ভূমিকার সঙ্গে লজ্জিত রাখবার জন্তে একটু আধটু টলে গিয়েও থাকতে পারেন।

অস্ত্র কোন লোককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা লময়ের অপব্যয় করা হ'বে মনে হ'লো। একবার লালটা নেড়ে দেখলে ভাল হ'তো। তাড়পতাড়ি মেটাও পেরে নিলুম। কোন মৃতদেহ তথ্য আবিষ্কার করতে পারলুম না। এই সময় ইন্সপেক্টর এসে লাল মর্গে চালান দিলেন। তারপর মানবেন্দ্র বাবুও লজ্জাকরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে থানার চলে গেলেন।

ক্রমশঃ ভিড় কমে গেল—ম্যানেজার তখনও হ'রাতের উপর মাথা রেখে বসে আছেন। একটু পরে তিনি মাথা তুলে বলেন—“আমার সর্কনাশ হ'রে গেল, হরেন বাবু। কি করি এখন? আচম্কা এ কি বিপদে পড়া গেল?”

আমি বলুম—“বিপদ এই রকম আচম্কাই আসে—forewarning দিয়ে আসে না। আচ্ছা, আপনার ষ্টাফের (staff) মধ্যে লকলেই কি আজ উপস্থিত ছিল?”

ম্যানেজার—“হেড শিফটার (shifter) হরিদাস ছাড়া আর লকলেই ছিল। হরিদাস আজ ক'দিন আসছে না। তার জর হ'রেছে। চলুন—এ জারগাটার যেন বদল হ'রে যাচ্ছে। পাশের বাগানে একটু বস।

থিরেটারের মকের ডানবিকের বরজ বিয়ে বেরিয়ে একটা ছোট্ট কুন্দে বাগান মেটা রেলিং বিয়ে বেরা। সেইখানে গিয়ে আবার বসলুম। এতক্ষণ ওদিক চাইতো আমার নজর পড়লো মটির উপর খানিকটা মাটা খোঁড়া হ'রেছে—এখন বীজ পোতা হয় নি, নিশ্চয়। মাটা খুব নরম। সেই মটির উপর গোটকিতব পারের বাগ।

ম্যানেজারকে দেখাতেই, তিনি অগ্নিশর্মা হ'রে মালীকে ডাকেন আর কি! বলুম—“ধায়ুন। এই পারের বাগ টেজের বিকে গিয়েছে। বটনাটা হ'রেছে বটনাটা; হ'রে বাবার পর—কেমন?”

ম্যানেজার—“হ্যাঁ।”

আমি—“তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে, বটনার আগে কোন লোক এই বিক দিয়ে টেজের বিকে গিয়েছে। তার পারে জুতো ছিল না; কারণ, বাগগুলো খালি পারের। এখন দেখতে হ'বে এই লোকটা টেজের মধ্যে কোথায় গিয়েছিল—আর লোকটাই বা কে।”

পারের বাগ অনুসরণ করে' দেখা গেল, সে লোকটা প্রধানা অভিনেত্রী লতীবেদীর ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। সেখানে লতীবেদীর সঙ্গে তার দেখা হ'রেছিল কি না তা' বোঝা গেল না। লোকটা নিশ্চয়ই লকলের পরিচিত হ'বে; নইলে এত লোকের মধ্যে একটা অপরিচিত লোকের আশা-বাণী করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। ম্যানেজার বলেন—“ঐ বিককার ঘরলা প্রায়ই বন্ধ থাকে। নিত্যন্ত ঘরকার না হ'লে খোলা হয় না। সেদিনও, তাঁর যতদূর মনে আছে, ঘরলাটা বন্ধই ছিল। পরচুলওয়ালা মীর আলীকে জিজ্ঞাসা করা ঘরকার। কারণ দে-ই ওদিকটার থাকে।”

স্বীয় আদর্শকে প্রকাশ করার দৈব বস্তু—
“ও স্বর্গী বড়ই ছিল। আমি জোর গলায়
বলতে পারি—কউ ও স্বর্গী খোলে নি।”

যা হোক স্বর্গী আপাততঃ খোলাই
ছিল। আধারা আবার বাগানে এলুম।
একটু নিরীকণ করে দেখতে দেখতে নজরে
পড়লো আবার সেই পায়ের দাগ। এবার
সেগুলো রেলিং এর দিকে গিয়েছে, এক
— একটা ধাপের মধ্যে তফাৎ এবং দাগের
গভীরতা দেখে বুলুম হোকটা ফেরবার
সময় খুব তাড়াতাড়ি চলেছিল—খুব লম্বা
ছুটেছিল। দাগ লক্ষ্য করে রেলিং পর্যন্ত
এলুম।

চুঠাৎ অবিনাশ বলে উঠলো—“হরেন,
এখানে থাম।” ঠিক রেলিং এর তলার
একখানা থামে মোড়া চিঠি। থামখানা
খোলা হয় নি। উপরে শিরোনামা লেখা
—“নতী দেবী”। এক পাশে লেখা আছে
—“অক্ষরী”। তা’ হ’লে লোকটা এই
চিঠিখানা দেবার জন্তেই এনেছিল। খুব
লম্বা গোলযোগ দেখে সরে পড়েছে।
থামখানা আর থামস্থানে পৌছবার অবকাশ
পার নি। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে
জানলুম ঘটনাটা। ঘটনাকে একটা আন্দাজ
রাজিতে। তা’হ’লে, একটা আন্দাজ সময়ে
একটা লোক একখানা চিঠি নিয়ে লুকিয়ে
রেলিং টপকে সতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে
এনেছিল। থামখানা খুলে ফেলল তাতে
লেখা আছে—“গঙ্গাধীনকে পাঠাচ্ছি।
কথামত আমার সঙ্গে দেখা করো। যদি
কথার খেলাপ হয় তা’ হ’লে বা’ ঘটবে
তা’ জানি। তোমার যশোদা আর তুমি
হুজনেই জাহান্নামে বা’বে, তার ব্যবস্থা করে
রেখেছি। আমি যদি না পাই, তো
কাহাকেও হবে না—ভেঙ্গে ফেলবো—এ
নিশ্চয় জানবে।” তোমাকে সব বিতে রাজী
আছি। কিন্তু তেমন বুঝলে, কিছু হবে না,

নব নেব—এও জেনে রেখো। ইতি—
কালীমোহন।

ম্যানেজার সাগ্রহে আমার চিঠিপড়া
দেখছিলেন। আমার পড়া শেষ হ’লে
বলেন—“কি—কি—ও কার চিঠি?—
দেখি।”

আমি বললাম—“দেখতে আপনার হ’বে
না; আমি দেখলেই চলবে। আচ্ছা, একটা
খবর আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।”

ম্যানেজার—“বলুন।”

আমি—“কালীমোহন বাবু বলে কোন
লোককে আপনি জানেন?”

ম্যানেজার—“কালীমোহন পোদ্দার?
৪৮নং নালমণি সেন স্ট্রীটে থাকেন? খুব
চিনি তাঁকে। তিনি খুব বড়লোক। কেন
বলুন দেখি?”

আমি—“নতী দেবীর সঙ্গে এই ভ্রম-
লোকের পরিচয় ছিল?”

ম্যানেজার—“পরিচয় ছিল। কিন্তু
তাঁদের মধ্যে খুব লম্বা ছিল বলা মনে
হয় না! নানারকম দামি জিনিষ পত্র
নিরে তিনি নতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে
আসতেন! কখনো দেখা হ’তো কখনো
হ’তো না। শেষ দিকে একটু হঠাৎ
হ’য়েছিল বলে শুনেছি। বিয়েরটার
স্বামী বসন্ত সতী দেবীর বাড়ীতে থাকে। তার
মুখে শুনেছি, ইহাণীও নতী দেবী দ্বারা
কালীবাবুর বাড়ীতে চড়ে ইডেন গার্ডেনে
যেত। এ নিয়ে যশোদা বাবুর সঙ্গে তার
অনেকবার বচসাও হ’য়ে গেছে। যশোদা
বাবু তাকে অনেকবার অনেক রকমে
শালিয়েছেন। এমন কি শেষকালে একখানা
ঘটর গাড়ীও কিনে দিয়েছেন।”

আমি—“যশোদাবাবু কি বলে শালাতেন
তার একটা উদাহরণ দিতে পারেন?”

ম্যানেজার—“একবার বলতে শুনেছি—
‘আমি তোমার সব জানি। সব কীপ করে
দেব। আর একবার বলেছিলেন—‘আমি

যদি তীর ছুড়ি, তোমার কালীমোহনের
বাঁবাও তোমার রক্ষা করতে পারবে না।
প্রাণের চেয়ে প্রেমের দাম বেশী নয়।
বাঁচলে প্রেম করবার অবকাশ চের পাওয়া
যাবে। কেমন—নয় কি?”

আমি—“নতীদেবী কি জবাব দিয়েছিল?”

ম্যানেজার বলেন—“জবাব খুব
মিষ্টি। এত মিষ্টি যে যশোদাচন্দ্রাল জল—
আর কি?”

আমি—“পরম্পরে ঝগড়া হ’তো—নয়?”

ম্যানেজার—“একবার হ’য়েছিল—কিছু-
দিন আগে। তারপর সব মিটে গিয়েছিল
আবার।”

আমি—“কতদিন আগে?”

ম্যানেজার—“দিন পনেরো হ’বে।”

আমি—“কাল রাজিতে যশোদাবাবু
কোথায় ছিলেন?”

ম্যানেজার—“একটা বস্ত্র বন্দে অভিনয়
লক্ষ্য করছিলেন। ঘটনার পর আমি তাঁকে
ডেকে পাঠাই। তিনি অত্যন্ত shock (হৃদয়ে
আঘাত) পেয়েছেন। ইন্সপেক্টরের কাছে
প্রথমে এজেন্টের দ্বারা তিনি চলে যান।
আপনি তাই তাঁকে দেখতে পাননি।”

আমি—“পুলিশ যাবার আগে একবার
নতীদেবীর বাড়ীখানা দেখা দরকার।
আপনি আমার সাহায্য করতে পারেন?”

ম্যানেজার—“বসন্ত এখনো বোধহয়
আছে। যদি না থাকে তো আমি
‘চিড়িতন’কে পাঠাচ্ছি আপনার সঙ্গে। সে
সব ব্যবস্থা করে দেবেন।”

অবিনাশ বলে উঠলো—“দেখবেন—
‘ইকীবন’ পাঠাবেন না যেন। ‘ইকীবনের
নাম শুনে ভয় হয়।”

* ভীষণ “ইকীবনের টেকা” বলের
কার্য কলাপ জানতে হ’লে ‘খেরালী’তে
প্রকাশিত ‘বাবা কোথায়?’ উপস্থাপন।

‘মানোজার হেঁদে-রজেন—‘ওহু ‘চিড়িতন’ই বাবে। ‘চিড়িতন’ আমার বেরায়া।’

আমি দেখানে আর লম্ব নষ্ট করা ঠিক মনে করলুম না। বসন্তর খোঁজ করা হ’লো। শোনা গেল ‘দে চলে গিয়েছে। তখন ‘চিড়িতন’ বেরারাকে লড়ে করে সতী দেবীর লাড়ীতে এলে উপস্থিত হলুম। বেরায়া আমার পরিচয় দিলে বসন্তকে লড়ে নিয়ে আমি সতী দেবীর ঘরে গেলুম। দেখানে লব অল্পলক্ষ্য করে ছ’খানা চিঠি ছাড়া বরকারী কিছু পেলুম না।

একখানা চিঠিতে লেখা—‘গুত ১২ই তারিখে মিসেস ঘোষের পাঠী ছিল। ঐ দিনে আপনি ক্রতকার্য হ’রেজেন, আমরা জানি। আজ ১৪ই জুন। আজ পর্যন্ত সেটা আমাদের কাছে পৌঁছয় নি। কাণ্ড ১৫ তারিখ। কাল পর্যন্ত লম্ব দেওয়া গেল। বহি কাল না পাওয়া যায়, তাহ’লে এ্যাসোসিয়েশনের আইনের চরম দণ্ড আপনাকে দেওয়া হ’বে জানবেন। আই, পি, সি, এ।’

অন্য চিঠিখানি ঐ বাড়ীর ঠিকানাতেই ‘বর্ণলতা দেবী’ নামে কোন স্ত্রীলোককে লেখা হ’য়েছে। চিঠিখানি এই রকম—‘তোমার কি বলিয়া লেখান করিব স্থির করিতে না পারিয়া কোন রকম লেখানই করিলাম না। ইতোপূর্বে আমি তোমাকে জানাইয়াছি যে আজিও তোমার জন্ত আমার হৃদয়ের আলন শূন্য রহিয়াছে।’ কিনেমা অথবা থিয়েটারে যোগ দেওয়া তোমার মতন লজ্জাত বনীয়াসী ব্রাহ্মণ বংশের কন্ডা ও কুল-বধূর লাজে না, একথা বাঁরবার লিখিয়াও কোন ফল হয় নাই। অর্থলোভী পিতার পরামর্শে তুমি নিজের পারে কুঠারাবাত করিয়াছ। এখন সেই পিতাও তোমাকে আর লামলাইতে পারিল না। শিকল তুমি লব দিক, হইতেই কাটিয়া কেলিয়াছ। লখের

বাজারের রামজীবন বহুর ঠিকানায় তোমার যে শেষ পত্র পাইয়াছি, তাহাতে তুমি আমাকে তোমার আশা ত্যাগ করিতে লিখিয়াছ। তোমার আশা ত্যাগ করিলাম। কিন্তু, আজই হটক বা ছই মাস পরেই হটক, আমার পবিত্র বংশে তুমি যে কালীর দাগ লাগাইয়া দিয়াছ তাহা আমি নিশ্চয়ই মুছিয়া ফেলিব জানিবে।’ পত্রের কোন স্বাক্ষর নেই।

‘বর্ণলতা দেবী’ নামে কোন অভিনেত্রীকে চেনে কি না জিজ্ঞাসা করার বসন্ত রজেন—‘না মশাই। তবে সতী দেবী জানতেন কি না জানি না। আমি তো ঐ নামের কোন মেয়েমানুষ কোন থিয়েটারে আছে বা ছিল বলে শুনি নি।’

থিয়েটারে আসবার আগে সতী দেবীর কি পরিচয় ছিল বসন্ত তাও জানে না। এর আগে বারোতাপে ছ’একটা ছবিতে সে বেশ নাম করেছিল। তবে সে শুনেছে যে ‘সতী দেবী’ তার আলল নাম। সে কলকাতার খুব বনেদী ব্রাহ্মণবংশের ঘুয়ে আর তার স্বামী খুব লেখাপড়া জানা বড়লোক।

আমি—‘তবে এ লাইনে তার আসবার কারণ কি?’

‘বসন্ত—‘সত্য-চরিত্রের ভাঙন না ধরলে কি আর এদিকে কেউ আসে, বাবু? ওকথা জিজ্ঞাসা করাই তো আপনার ভুল। এই তো, সতী দেবী-নামের কতই না জাঁক! কিন্তু মানুষ তো কম আলতো না। আমরা গরীব-গুরুবো লোক, কাজেই নামটা বেজে যায়। হঃ! ‘বেস্তের আবার সতী আর অলসী!’

আমি—‘কে কে আলতো বলতে পার?’

বসন্ত—‘মশোদাবাবু, কালী পোন্ধর, জগাই শা, মনোরঞ্জন ভড়—এই কজন খুব আসতোন।’

আমি—‘হানবেস্তাবাবু?’

বসন্ত—‘রামঃ! কখনও না।’ তিনি কি সেই সীতের মানুষ?’

আমি—‘জগাই শা আর মনোরঞ্জন ভড়ের ঠিকানা আমার বিতে পার?’

বসন্ত—‘হ্যাঁ। জগাই শা থাকে নেবু-বাগান, আর মনোরঞ্জনবাবু থাকে আলম, বাজার।’

অবিনাশকে দিয়ে কার্জন কাগজ আমি নিয়ে চিঠি দুখানার লুহ নকল তুলে নিলুম। তারপর যে জিনিষটা দেখানে ছিল সেটা ঠিক দেখানে রেখে বাড়ীর দিকে রওনা হ’লুম। পুলিশের অফিসে গিয়ে মতন কিছু উধ্য আবিষ্কার করা ‘হর’ কি না জানবার, অন্য অবিনাশকে দেখানে রেখে এলুম।

(২)

বেলা আন্দাজ বারোটার লম্ব অবিনাশ ফিরে এলো। খাওয়ার বাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে, বেলা আন্দাজ তিনটের লম্ব আমরা বসলুম হত্যারহতটার লম্বকে আলোচনা করার জন্য।

পুলিশের অফিসে কোন মতন হত্ম আবিষ্কৃত হয় নি। পুলিশ লম্ব চিঠিপত্র এবং কাপড় চোপড় নিয়ে গিয়েছে শুনলুম। আমার মতলু মনে হয়, কাপড়চোপড়ের মধ্যে স্ত্রী স্বামী পোঁজার মত কোন চিহ্ন আমরা নজরে পড়ে নি। সুতরাং সে লম্বকে হত্যার কোন প্রয়োজন নেই। অবিনাশের লম্ব পরামর্শ করা আর বরের যে কোন একটা দেওয়ালের লম্ব পরামর্শ করার লম্ব ফল পাওয়া বাবে জেনেও অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করলুম—‘কি বুঝেছো, অবিনাশ?’

গভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে অবিনাশ বলল—‘তুমি কি বুঝেছো?’

তার গাভীয়া হেঁটে একটু হেঁদে আমি বললুম—‘এখনও ঠিক কিছু বোঝা যায় নি। এম, কেলটা একটু analyse (বিশ্লেষণ)

করা বাক্য। খুন একটা হ'য়েছে, অবশ্য। খুন হ'য়েছে একজন, অভিনেত্রী—রক্তাক্ত উপরে। "Propertyman (সজ্জাকর) গুলিভরা টোটার লক্ষ্য রাখা না। পুলিশের অনুসন্ধান জানা গিয়েছে, যে থিয়েটারের তরফ থেকে টাকা টোটা ছাড়া অন্য কোন টোটা কেনা হয় নি। যে রক্তাক্ততার বিষয়ে খুন হ'য়েছে বলে ধরে নেওয়া হ'চ্ছে, তাতে বাকী টোটাগুলো টাকা টোটাই বটে। একটা মাত্র গুলিভরা টোটা দেখানে এলো কি করে? আর, প্রথম-আগুয়াজ করবার সময়ই সেই টোটাটা ছুটে গেল—এও খুব, বিস্ময়কর ব্যাপার। বাকি খুনী বলে ধরে নেওয়া হ'চ্ছে, তার খুন করবার কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কটনাটা, যেমন আপাততঃ বোকা যাচ্ছে তাই হয়, তো এটা নিছক আকস্মিক দুর্ঘটনা। এই গেল এক কথা। তারপর আমরা অনুসন্ধানক্রমে যা জানতে পেরেছি, তা' থেকে বনে হয় আরও কয়েক জনের এই নতী দেবীকে খুন করবার সম্ভাবনা আছে। ১নং—যশোদা হুলাল, ২নং কালী পোদ্ধার, ৩নং আই, পি, সি, এ। জগাই শা ও মনোরঞ্জন ভড়ের বিরুদ্ধে কোন লঙ্ঘন আপাততঃ নেই।"

হঠাৎ অবিনাশ বলে উঠলো—"কিন্তু খুনটা যে টেবলের উপরে হাজার লোকের চক্ষুর সামনে হ'য়েছে! এদের মধ্যে কেউ এসে কি করে খুন করবে?"

আমি একটু অবাক হ'য়ে গেলুম সত্যি সত্যি। অবিনাশের মুখে এ রকমের প্রশ্ন আমি এ পর্যন্ত শুনি নি। বলুম—"প্রথমেই তোমার মতবাদ বিচ্ছিন্ন, যে এই প্রথমবার তুমি আমাকে কোন কোন লঙ্ঘন কিছু জিজ্ঞাসা করলে। এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই। আগেই বলেছি, যে সবকটা টাকা টোটার মধ্যে একটা মাত্র তার-টোটার অতিদ্রুত কোন লঙ্ঘনজনক। আর,

ঘোড়া টানবামাত্র সেই টোটাটিই ছুটে গেল—এও বেন কেমন কেমন লাগে। তার উপর, যে খুনী তার খুন করবার কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে এখনও ধরা যেতে পারে, যে প্রকৃত খুনী যে সে পাশেই কোন জায়গার লুকিয়েছিল। যখন মানবেন্দ্র বাবু "তবে ধর" বলে ঘোড়া টানলেন, ঠিক সেই সঙ্গে আর একটা মিত্রলবার থেকেও গুলি ছুটলো; লাইলেন্দ্রার দেওয়া থাকায় লক্ষ্য হ'লো না। তারপর সাধারণ উত্তেজনা ও গোল-মালের মহারত্নের সে সরে পড়লো। তবে সে থিয়েটারের লোকদের সকলের পরিচিত—এটাও ধরে নিতে হ'বে। এখন বুঝতে পারছি, যে, খুনটা অন্য কারো দ্বারাও ঘটে থাকতে পারে?"

অবিনাশ বলে—"তা'হলে কি তুমি বলতে চাও—"

বাধা দিবে আমি বলুম—"বলতে আমি এখন কিছুই চাই না। তবে, খুনটা যে অন্য কারও দ্বারা হয় নি এ কথাও বলা যায় না। সুতরাং দেখতে হ'বে আমি কারো নতী দেবীকে খুন করবার সম্ভাবনা আছে কি না। তা' হ'লেই আলো—যশোদা হুলাল, কালী পোদ্ধার, আই, পি-পি-এ। যশোদাহুলাল বলেছিলেন—তাকে বাধ দেওয়া গেল। গঙ্গাধীনীর মারফৎ কালী পোদ্ধার যে চিঠি পাঠিয়েছে তাতে লঙ্ঘনটা তার উপর পড়ে। কিন্তু সে যদি উদ্বুদ্ধ থাকবে, তো চিঠিখানা পাঠানোর উদ্দেশ্য কি? আরও চিঠিখানা থিয়েটারে যখন পাঠান হ'য়েছে, তখন অভিনয় শেষ না হ'লে যে নতী দেবী 'কথামত' তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না এ কথা তার অবশ্য জানা ছিল। সুতরাং অভিনয় শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতো নিশ্চয়। কাজেই কালী পোদ্ধারকে বাধা দিলেও চলে।

তারপর আলো 'আই-পি-পি-এ'। এটা একটা 'এ্যাসোসিয়েশন্' নিশ্চয়—চিঠি থেকেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। নতী দেবী এই এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যা। বিশেষ, ঘোড়ার পাটি ছিল ১২ই জুন। ঐ পাটিতে কোন কাজের তার নতী দেবীর উপর ছিল, এবং সে কাজে সে কতকর্মী হ'য়েছে। চিঠিতে আছে—"নেটা আশাঘেদ কাছে পৌঁছানি।" তা'হলে কোন জিনিষ নিয়ে যাওয়াই নতী দেবীর কাজ ছিল। হ'য়েছে, অবিনাশ, হ'য়েছে।"

অবিনাশ বলে—"কি?"

আমি—"১২ই জুন থিয়েটার রোডে বিশেষ, ঘোড়ার পাটি ছিল বটে। আমার শরীর অনুহ হওয়ার ঐ দিন দেখানে যেতে পারি নি। কিন্তু ধর পেরেছি বিশেষ, ঘোড়ার ১২০০ টাকা দামের হীরের নেকলেস চুরি হ'য়েছে। চিঠিখানার উল্লিখিত 'জিনিষ' সেইটাই হ'তে পারে। নতী দেবী এ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে চুরি করেছে; আর এ্যাসোসিয়েশনটা একটা চোরের এ্যাসোসিয়েশন। 'আই-পি-পি-এ'—পুরো নামটা কি হ'তে পারে? বাই হোক না কেন, এ্যাসোসিয়েশনের তহবিলে নেটা জমা পড়েনি বলে কাল পর্যন্ত নতী দেবীর সময় দেওয়া হ'য়েছিল—অর্থাৎ ইংরাজী মতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত সময় ছিল—তার পরেই চরম বড় দেওয়া হ'য়েছে। কেমন?—কি বল অবিনাশ?"

অবিনাশ গভীর ভাবে বলে—"হ'তে পারে—খুব। কিন্তু এ্যাসোসিয়েশনটার পুরো নামটা কি হ'লো? "ইন্ডিয়ান পেনাল কোড এ্যাসোসিয়েশন কি?"

আমি—"অর্থাৎ?"

অবিনাশ কল্পনার হালি হেলে বলে—"এও বুঝলে না? যদি বলা যায় "লোকটা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড," তা'হলে বুঝার কি? বোঝার এই যে, লোকটা ইন্ডিয়ান পেনাল

কোডের আমলে আঁধে এমন সব কটা অপ-
রাধে অপরাধী। সুতরাং এই 'এনালিসেশন'।
ভীষণ অপরাধীদের 'এনালিসেশন' হওয়ার
নামকরণ হয়েছে—'ইন্টার্ন পেনাল কোড
এনালিসেশন'।

আমি বল্লাম—“সমস্ত বটে, কিন্তু সঙ্গত
নয়। আচ্ছা নামটা যদি হয় 'ইন্টার-প্রো-
ভিয়ার্স ক্রুস্‌ এনালিসেশন', (Inter
Provincial Crooks' Association—
আন্তর্জাতিক তত্ত্ব-সভা) তা' হ'লে কেমন
হয়?”

অমিনাথ খানিকটা হাঁ করে আমার
দিকে চেয়ে রইল। তারপর লাফিয়ে উঠে
আমার হাতে একটা বিরাট আঁকানি দিয়ে
বলে উঠলো—“Thank you for the inter-
pretation. Oh, it fits to a nicely?”
(মানে করার জন্তে ধন্যবাদ। ওঃ!
চমৎকার খাপ খায়।)

আমি বল্লাম—“তা' যেন হ'ল। কিন্তু,
এই এনালিসেশন কোথায় তা আমরা জানি
না। তবে এটা ঠিক যে হারগাছা এখনও
তারের কবলে আছেন। পুলিশেও সে
হারের কোন সন্ধান লভী দেবীর ঘরে পার
নি। সুতরাং ঐ হার যে এখনও এই ঘরে
আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তুমি
কি বলতে চাও ঐ হার নেবার জন্তে এনালি-
সেশন চেষ্টা করবে না?—নিশ্চয় করবে;
আর, সে আজ রাত্তিরেই খুব সম্ভব। কেননা
দেবী হ'লে দেটা স্থানান্তরিত হ'তে পারে।”

অমিনাথ—“হ'লো। তারপর?”

আমি—“আজ সমস্ত দিনের মধ্যে যশোদা
বাবু, কালী পোদ্ধার প্রভৃতি সকলের সঙ্গে
বেশা করে তত্ত্ব করতে হ'বে। আর
একজন লোকের সঙ্গে আমাদের বেশা করা
উচিত। সে হ'চ্ছে শিকটার হরিদাস। সে
কোন নতুন খবর আমাদের দিলেও দিতে
পারে হ'লো। তারপর রাত্তিতে একবার

লভী দেবীর বাড়ীতে গিয়ে এনালিসেশনের
সভাগমনের প্রতীকার থাকতে হ'বে। সব
শেষে আগছেন 'স্বর্ণলতা'। স্বর্ণলতার নামের
চিঠি লভী দেবীর কাছে এলো কোথা থেকে?
এই 'স্বর্ণলতা' কে? আর স্বর্ণলতার চিঠি
লভী দেবী বন্ধ করে তুলে রেখেছিলই বা কেন?
কাজেই আমাদের একবার বড়িশা লখের
বাজারে রামজীবন বাবুর লুক্কানো দেখতে হ'বে।
লখের বাজারের রামজীবন বাবুর মারকং কোন
লোকের সঙ্গে এই স্বর্ণলতার চিঠিখান্নে বেওয়া-
নেওয়া চলতো। স্বর্ণলতাকে যে চিঠিখান্নি
লেখা হ'য়েছে, দেখানি এই বাড়ীর ঠিকানায়।
অথচ বলন্ত বল্লে 'স্বর্ণলতা' নামের কোন
স্ত্রীলোক এ বাড়ীতে কখনো ছিল না।
আমাদের এই স্বর্ণলতাকে খুঁজে বার করবার
চেষ্টা করতে হ'বে। চিঠি থেকে বোঝা যায়
যে সেও অভিনেত্রী এবং ভয়ংকর তার জন্ম।
কাজেই সে লভী দেবীর লম্বন্ধে এমন অনেক
কিছু জানতে পারে, যাতে আমাদের তত্ত্বের
সুবিধা হ'বে। এমনও হ'তে পারে যে এই
লভী দেবীরই আসল নাম 'স্বর্ণলতা'। আর
তা' যদি হয়, তা' চিঠিখান্না খুব দরকারী হ'য়ে
উঠবে আমাদের পক্ষে।”

অমিনাথ—“কেন?”

আমি—“চিঠিখান্না স্বর্ণলতার স্বামীর
লেখা; এটা বুঝে বোধ হয়? এমন কি
হ'তে পারে না, যে তাঁর পবিত্র বংশে যে
কালীর দাগ লেগেছে তা তিনি এতদিন পরে
কাল রাত্তিরে মুছে ফেলেছেন?”

অমিনাথ—“হ'লে, এখন আদেশ
হ'চ্ছে কি?”

আমি—“এক কাজ আমাদের করতে
হ'বে। চল, আপাততঃ কালী পোদ্ধার,
জগাই শা ও মনোরঞ্জন ভড়ের চেহারাগুলো
বেশে আলা যাক। পারিতো বড়িশা-বেহালাও
হ'য়ে আলা যাবে। তারপর রাত্তিতে
এনালিসেশনের মেসারের অপেক্ষা লভী

দেবীর বাড়ীর মধ্যে কোন জায়গায় লুকিয়ে
থাকলেই চলবে। কোন না কোন মেসার
যে আজ-কালের মধ্যে দেখানো সভাগমন
করবে সেটা নিশ্চিত।”

খানিক পরে প্রস্তুত হ'য়ে আমরা কালী-
পোদ্ধার প্রভৃতির সঙ্গে বেশা করতে বেরলুম।
কালী পোদ্ধার দাপ্তিক দৃষ্টিতে বড় লোক।
প্রথমে আমাদের সে আমল দিতেই চায় না।
শেষকালে অনেক কৌশলে প্রস্তুত করে তাঁর
কাছ থেকে যেটুকু জানলুম, তাতে আমার
বিশেষ কোন সুবিধা হ'বে বলে মনে হ'লো
না। সে বলে, লভী দেবী এখন হওয়ার কথা
সে জানে। কাল রাত্তিরে তার চাকর গলা-
দীনকে দিয়ে সে লভী দেবীকে একখানা চিঠি
পাঠিয়েছিল। গলাদীন লভী দেবীর ঘরে
অপেক্ষা করছিল, এমন সময় “লভীদেবী খুন
হ'য়েছে”—তখন সে ভয়ে পালিয়ে আসে।
বাগানের রেলিং টপকে সে ভিতরে ঢুকছিল
কেন জিজ্ঞাসা করার কালীপোদ্ধার বলে যে,
তার উপর হুকুম ছিল যাতে এই চিঠির কথা
কেউ না জানতে পারে।

জগাই শা কোমরে বাত হ'য়ে শয়ান।
আমাদের সঙ্গে বেশা করার মতন তার
অবস্থা নয়। তাকে যে ডাক্তার দেখেছেন তাঁর
কাছ থেকেও এ কথাটার সম্বন্ধ জানা
গেল।

মনোরঞ্জন ভড় তিন দিন যাবৎ বাড়ীতে
নেই। ঝরির তার একটা কল্লার খনি
আছে। সেইটা দেখবার জন্তে সে দেখাশোনা
গিয়েছে শুনলুম পাড়ার সন্ধান নিয়েও তাই
জানতে পারলুম বা হোক এই মনোরঞ্জন
বাবুর লম্বন্ধে খোজ নেবার ইচ্ছা রইলো।
কারণ, ঝরির বাড়ীর অজুহাতে এই দেশেই
লুকিয়ে থেকৈ ইচ্ছা করলে অনেক কুকালাই
তিনি করতে পারেন।

তারপর আমরা এলুম শিকটার হরিদাসের
সন্ধান। তার বাবার ঠিকানা আমি আগেই

ম্যানেকজার কেঁচে নিয়ে রেবেছিলুম। কার্কেই বাপা খুলে বার করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'লো না। দেখলুম, ঐ শ্রেণীর লোকেরা যেভাবে থাকে, হরিদাস ঠিক সে ভাবে থাকে না। বেশ একটা হোতালা বাড়ীতে সে থাকে। বাড়ীখানার অনেকগুলি ভাড়াটে আছে। একজনের কাছ থেকে তার ঘর কোনখানে খোঁজ নিয়ে, দরজার গিঁদে যা বিলুম। বার চাই বা দেবার পর আন্তে আন্তে দরজা খুলে গেল। একটা মধ্যবয়স্ক লোক দরজার কীকে মাথা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—“আপনারা কাকে চান?”

আমি বলুম—“আমরা ‘চাই হরিদাস শিকটারকে।’”

“লোকটা বলে—“আমুন ভিতরে।”

আমরা ভিতরে ঢুকলুম। লোকটা তক্তপোষের উপর বসে একখানা বেঞ্চি দেখিয়ে বলে—“বসুন আপনারা। আমিই হরিদাস শিকটার। আপনাদের আমার সঙ্গে কি দরকার?”

কোন কথা বলবার আগে আমি ঘরের চারিদিক ও লোকটাকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলুম। স্বরূপী বেশ কুচিন্দিতভাবে লাজান। আলবাবগুলি খুব দামী না হ'লেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মেঝেটা চমৎকার-রূপে স্বেচ্ছায় তক্তকে। এক পাশে একটা বুক কেস, তাতে অনেকগুলি বই। বুক-কেসের পাশে একটা ছোট টেবিল ও একখানি চেয়ার। টেবিলের উপর একটা আরনা, হোয়াট কলম ও প্যাড—সুন্দরভাবে সজ্জিত। তক্তপোষের উপর একখানা লেস-মোটা বই খোলা রয়েছে—যেন লেখানা পড়া হচ্ছিল। হরিদাস লোকটা বেশ লম্বা হোঁহারা গড়নের। মধ্যম চুল প্রায় সব পাকা—কাঁচার-তাগ খুব কম, রং খুব ফরলা না হ'লেও ‘ফরলা’ বলাই চলে, গায়ের

চামড়া ছিল না হওয়ার রংটা বেশ উজ্জল মনে হ'চ্ছিল, মোড়া ক্র ও চকু দু'টা বেশ কুচকুচে কালো, দাঁত একটাও পড়েনি উপরন্তু বেশ লাজান—যেন বাঁধানো দাঁত। উপর থেকে দেখলে তার বয়স যতটা মনে হয়, খুটিয়ে দেখলে চেহারার সঙ্গে বিশেষতঃ তার চুটির সঙ্গে—লেটা কেমন খাপ খায় না যেন। সুখানা বাড়ীগোঁফে ঢাকা।

তার প্রশ্নের উত্তরে বলুম—“আমাদের একটা লেখের থিরেটারের হল আছে। তোমাদের থিরেটারের ম্যানেকজারের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে; তাই ওখানকার লিঙ্গুলো ভাড়া নেব মনে কচ্ছি। তিনি বলেন তোমার সঙ্গে দেখা করে’ শিকটার জোগাড় করতে। আমাদের বেশ ভাল শিকটার দিতে হ'বে।”

একটু হেসে হরিদাস বলে—“ও! এই জন্তে এসেছেন? তা’ বেশ। শিকটার জোগাড় করে দেওয়া যাবে। তবে আমি একটু অসুস্থ। ক’দিন থিরেটারেই বেতে পারিনি। আপনাদের সঙ্গে (অভিনয়) কবে?”

আমি—“আলহে মশাহে।”

হরিদাস—“ও! তা’হলে হতে পারে। আমি সেরে উঠেছি—একটু ইন্সপেক্স গোটের হ’য়েছিল, তা’ সেরে গেছে। দ্রুততা কাটলেই কাজে বেরব।”

আমি এদিক-ওদিক চেয়ে মোটা বইখানা বিজানার উপর থেকে তুলে নিয়ে তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলুম—“হরিদাসের পড়াশুনোর অভ্যাস আছে দেখছি।”

হরিদাস হেসে বলে—“না, বাবু। ওসব ইংরেজী বই কি আমরা পড়তে পারি? শুধু থিরেটারের চাকরীতে কি চলে, বাবু? দেখছেন তো, আমি একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চাই। শুভলোকের ছেলে, লেখা পড়া শিখিনি, তাই এই ছোট কাজ কচ্ছি। ছোট লোকের মতন থাকা তো কখনো

অভ্যাস ছিল না। তাই পুরনো বইয়ের কারবার করি। এতেও কিছু আসে।”

আমি ইতিমধ্যে বইখানার পাতা ওলটাচ্ছিলুম। বইখানা শেক্সপীয়ারের (Shakespeare) একটা বেশ দামী সংস্করণ। গোড়াতেই একটা নাম লেখা দেখলুম—“এম, ব্যানার্জী—লিবারার প্রফেসর অব ইংলিশ লিটারেচার,—লন্ডন।” বলুম—“আমরাও বই কেনার খুব লখ আছে। তোমার বইগুলো একবার দেখবো, হরিদাস?”

হরিদাস ব্যগ্রভাবে বলে—নিশ্চয়-নিশ্চয়।

দেখবেন বই কি। আপনাদের দেখাবার জন্তেই তো কিনে রেখেছি।”

সে বুক কেসের ঢাঁবি খুলে দিলে। আমি বইগুলি দেখতে লাগলুম। শেক্সপীয়ার, মিল্টন, বাইরন, শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতি কবির কাব্য, হোমার, ভার্জিল, দাঁতে প্রভৃতির কয়েকটা অনুবাদের সংস্করণ—ওয়ার্ল্ডসওয়ার্থ, ডিকেন্স থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বৃথী, গার্ডিস, ওপেনহাম, ওয়ালেস, ওয়েলস প্রভৃতির নভেল—মার্ভাটিন, হিউগো, মপাস। প্রভৃতির অনুবাদ এই সব ঘিরে বুককেলটা ফরা। কাব্য, নাটক ও উপজ্ঞান ছাড়া ইতিহাস দর্শন প্রভৃতির সংখ্যাও তাতে বড় কম ছিল না। কিছু একটা লক্ষ্য করবার বিষয় তাতে এই ছিল, যে প্রায় সমস্ত বইতে “এম, ব্যানার্জী” নাম লেখা।

বইগুলো দেখতে দেখতে বলুম—কত দাম ঘিরে এই বইগুলো কিনেছে হরিদাস? এতো বেশ দামী collection দেখতে পাচ্ছি।”

হরিদাস বলে—“খুব সুবিধা ঘরে কিনেছি বাবু। বছরখানেক আগে লন্ডনে আমার এক ভগিনীপতির বাড়ীতে যাই। তাঁর বাড়ীর পাশেই একজন প্রফেসর থাকতেন। তিনি হঠাৎ একদিন রেলেরলে তাঁকাঠুকি হ’য়ে মারা যান। তাঁর ওয়ারিশ কেউ না থাকায় তাঁর জিনিষ পত্র বিক্রী হ’য়ে যায়। সেই সময় আমি বুককেল শুধু সমস্ত

বইগুলো একেবারে মাটির 'ঘরে' কিনে নিয়েছিলুম। কিন্তু এগুলো কাটাতে পারিনি আজও। যে সব বই পড়তে বিভ্রম বরকার হয়, সে সব বই তো আজকাল বাজারে বিকোর না বাবু।"

আমি বল্লাম—“এর দর কি?”

হরিদাস একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো; তারপর বল্লে—“আপনি কিনবেন?”

আমি—“ইচ্ছে হ’লে তো। দরটা শুনি।”

হরিদাস আমার খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বল্লে—“হাম, এক-হাজার টাকা।”

অবিশ্বাস বলে উঠলো—“লোকটা দেখছি কালই একখানা বাড়ী কিনবে।”

হারদাস তার দিকে চেয়ে একটু হাসলে মাত্র; কোন জবাব দিলে না। আমি চোখের ইজিতে অবিশ্বাসকে চূপ করে থাকতে বলে উত্তর করলুম—“বল কি! দামটা একটু বেশী হ’লো না? একটু বিবেচনা কর।”

হরিদাস বল্লে—“বিবেচনা করবার কিছু নেই বাবু। এর দাম হাজার টাকা, আপনিই বরং বিবেচনা করুন—আমি বেশী বলিনি কিছু। এই শেক্সপীর খানার এই একটা ভলিউম (Volume) ১০ দশ টাকা। দেখুন দশটা ভলিউম আছে—সব মরকো বাধাই। বইগুলো কি দেখছেন তো!”

আমি বেশে বল্লাম—“হরিদাস, তুমি তো দেখছি বেশ পাকা ‘জহরী’। তা’ ঐ ক্যান্টের (Cant.) ফিলজফিখান্যর দাম কত?”

হরিদাস আমার খানিকক্ষণ চূপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বল্লে—“কোনটা কান্তর ফিলজফি তা’ জানি না বাবু। এইটুকু জানি যে অতবড় বিদ্বান

লোক বাজে বই দিয়ে তো আর বুককে দরিয়ে রাখেন নি। সেই হিসাবে দর বলেছি।”

আমি বল্লাম—“না—এই

খানার দাম জান বেখে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। যাক; আমি ভেবে বেখে পরে খবর দেব। আপাততঃ উঠি। ভাল কথা—তোমাদের ছেলে একটা খুন হ’য়েছে শুনেছ বোধ হয়?”

হরিদাস মহজ স্বরে উত্তর দিলে—“হ্যাঁ। আহা, মেয়েটা বেশ ছিল। আমার উপর তার খুব অনুগ্রহ ছিল। সে যাওয়ার আমার একটা বুকবী চলে গেল।”

আমি—“সে তো শুনলুম এ থিয়েটারে নতুন এলেন।”

হরিদাস—“এ থিয়েটারে কেন—সে এর আগে কোন থিয়েটারই ছিল না। সে বায়োড্রোপে ছিল, আর দেখানোই নাম করেছিল। ভ্রমের মেরের ওখানে বেশ দর আছে তা’ সে কাণাই হোক আর খোঁড়াই হোক। এতো সুন্দরী ছিল—কাজেই বেশ, মোটা মাইনেই পাচ্ছিল। দেখানে যশোদাবাবুকে বাবর সঙ্গে এর স্নানিষ্ঠতা হয়। তারপর তাঁর টানে এখানে এসে পড়েছিল।”

আমি—“কি রকম?”

হরিদাস—“এ তখন স্ট্রাটচ ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ করছিল। সেই সময় একদিন এ যশোদাবাবুকে ফোনে বলে—‘আপনার স্ত্রী রইলো কি মলো সে খবরও আপুনি আর রাখেন না, অথচ সে আপনার জন্তে মরে, এ আপনি জানেন।’ যশোদাবাবু কি উত্তর দিলেন জানি না। কিন্তু ঠিক পরের দিনেই তিনি আদ্যে, আর ১৫ দিনের মধ্যে এইখানে এর কাজ হয়।”

আমি—“তুমিও সেখানে কাজ করতে নাকি?”

হরিদাস—“হ্যাঁ। খানার-বাগানের দেওয়া, দেখাশোনা করা—এই আমার কাজ গুলি। বড়ো মাস্তাব আমি—কাজটা ছিল মন্দ নয়। কিন্তু এ চলে আসতেই আমার বুকবীর অভাব হ’লো। যশোদাবাবুকে ঘরে এখানে এলুম। সেই থেকে এখানেই কাজ করছি।”

আমি—“এই স্ত্রী দেবীর অতীত জীবনের কিছু তোমার জানা আছে? এ কি সত্যি ভ্রমের মেরে?”

হরিদাস খুব অস্বস্তির সঙ্গে চূপ করে রইলো। তারপর বল্লে—“ভ্রমের মেরে শুনেছি। তার বেশী আমি কিছু জানি না।”

আমি—“এর বাপের নাম কি—কোথায় এদের বাড়ী ছিল, তা’ শুনেছ?”

হরিদাস মাথা নীচু করে বিদ্বান বাড়িতে বাড়িতে বল্লে—“আজ্ঞে না।”

“রাত হ’লে আসছে—আচ্ছা, তা’ হলে আজ উঠি। কাল-পরশু আমার দেখা করে” এ লম্বা লম্বা ঠিক করবো। এই বলে উঠে পড়লুম।

বাইরে এসে গাড়ীতে উঠে গাড়ী ছেড়ে দিলুম। অবিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলে—“এইবার কোথায়?”

আমি—“এইবার লোজা বাড়ীর দিকে।

তারপর একটু পরে স্ত্রী-দেবীর বাড়ীর দিকে ‘রওনা হ’তে হ’বে। তুমি হরিদাসকে কি রকম বুঝলে?”

অবিশ্বাস—“তুমি কি বুঝলে?”

আমি—“এই হরিদাস স্ত্রী-দেবী লম্বা অনেক কিছু জানে। সে ইচ্ছা করলে আরও অনেক খবর দিতে পারে। আর একটা কথা—সে লেখাপড়া বেশ জানে বলে মনে হ’চ্ছে; কিন্তু সে, সে কথা চেপে গেল। খুব বিদ্বান না হ’লেও, সে মোটাটুকু লেখাপড়া জানে। ‘ফিলজফি’কে ‘ফিলজ’ বলবার মতন কম বিভ্রম তার নয়। আরও, ‘ফিলজ’ বলে একটা বিষয় আছে—অন্ততঃ এটা না জানা থাকলে ঐ কথাটা অমন লম্বা তাবে

ওর মুখ দিয়ে বেরলো না। বাই হোক—
লতী দেবীর অতীত জীবন লক্ষ্যেও থবর নেও-
রাটা খুব বরকার। অর্থাৎ আর সে দিকে
কিছু করা বাবে বটল' মনে হ'চ্ছে না। কাল
বেশা যা'বে।”

অল্পকালের মধ্যেই আমরা কালীঘাট এসে
উপস্থিত হলাম। তাড়াতাড়ি খাওয়া খাওয়া
সেয়ে নিয়ে, একটু বিশ্রাম করে রাজি আন্দাজ
লাড়ে ন' টার সময় লতী দেবীর বাড়ীর দিকে
রওরানা হ'লুম। দেখানে পৌঁছে দেখলুম,
বাড়ীর সামনে ছ'জন পাহারাওয়াল। খাড়া
হ'য়ে রয়েছে। রাত্রিকালে বাড়ীতে ঢুকতে
ক'লে অনেক রকম কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে;
আবার কৈফিয়ৎ দেওয়া ল'গেও বাড়ীতে
যে ঢুকতে পারা যাবে, সে বিষয়েও কোন
দ্বিধা নেই। সুতরাং দ্বিধা করলুম, তাদের
অজান্তারাই বাড়ীতে ঢুকবে হ'বে।

বাড়ীর পিছনে দিয়ে একটা ছোট গলি
গিয়েছে। গলির দিকে নীচু পাঁচিল দিয়ে
ঘেরা একটা ছোট কুলের বাগান। আমরা
পাঁচিল টপুকে সেই বাগানে পড়লুম। বাগানে
চুকেই প্রথমে মনে হ'লো বসন্তের কথা।
এই খালি বাড়ীতে পুলিস পাহারার মধ্যে
বসন্ত নিশ্চয় বাস করছে না। সুতরাং সে
লক্ষ্যে এক রকম নিশ্চিন্ত হ'য়েই আমরা
খিড়কীর দরজার দিকে চলেছি।

দরজা খোলা পড়ে আছে। পুলিসের
চোখের উপর থেকে চুরি করার জন্তে যে
কেউ এ বাড়ীতে ঢুকবে সে লজ্জাবনা বলেই
বোধ হয়, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে
দেওয়া হয় নি। বা হোক, আমাদের ঢোক-
বার সুবিধা হ'লো; আরও 'আই, পি, সি,
এ'র এজেন্টের সুবিধার জন্তে লেটী বন্ধ করেও
দিলুম না। লোজা উপরে গিয়ে আমরা
লতীদেবীর ঘরে উপস্থিত হ'লোম। তারপর
জানালায় খড়খড়ি দেওয়া বেশ করে' বন্ধ করে
দিয়ে অল্পক্ষণ স্থির করলুম। ছ'টো

ইলেকট্রিক টর্চের আলোতে ঘরটা বেশ আলো
হ'য়ে উঠলো।

ঘরের জিনিষ পত্রগুলো বেগোছ হ'য়ে
গিয়েছে। বিছানা-বালিশগুলো খাটের উপর
থেকে মেঝেতে ফেলে দেওয়া হয়েছে দেখলুম।
তা' হ'লে বিছানার তলা পর্যন্ত খানা তন্নান
করা হ'য়েছে দেখা যাচ্ছে।

অবিনাশ বলে—“এমন ভয় ভয় করে'
তন্নান করার পরেও হারটা এখানে আছে
মনে করা।”

আমি—“খুব ভয় ভয় করে' লজ্জান করা
হ'য়েছে বটে, বন্ধ; কিন্তু তা বেশ সুস্থষ্টি
নিয়ন্ত্রণ করা হয় নি। অত ঘামের একটা হার
বিছানার তলার লুকিয়ে রাখবে—এমন বোঝা
কে আছে? ঘোরা আসলার প্রভৃতি আমি
নিজেই দেখে গিয়েছি। দেখানে কিছুই
নেই—এবং থাকবারও লজ্জাবনা নেই। তবে
একটা স্থান আছে, যেখানে লুকিয়ে রাখা
চলে; লেটা হচ্ছে বালিশের মধ্যে। এখন
সেইটা দেখা যাক।”

বালিশগুলো একে একে হিঁড়ে ফেলা
গেল। কিন্তু হারের কোন লজ্জান পাওয়া
গেল না।

অবিনাশ বলে—“বাড়ীর অন্ত জায়গাগুলো
এখনকার দেখলে হ'তো।

আমি বলুম—“হার যদি এ বাড়ীতে
থাকে, তাহলে এই ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তা
নেই। অত দাবী-জিনিস যে-কোন লোকের
খুঁজে পাবার লজ্জাবনা উপেক্ষা করে' বাইরে
রেখে দেবার পাণ্ডী লতী দেবী ছিল না।
এতগুলো লোককে নিয়ে মানিয়ে চলে যে,
তাকে তুমি লজ্জা-জীলোক ঠাওরাও? ভয়-
ঘরের কুলত্যাগিনী কুলবধু লাধারণ পতিতার
চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর জানবে।”

অবিনাশ—“কোথায় লুকিয়ে রাখা যেতে
পারে আর?”

এই সময় আমার চক্ষু ঘরে টাঙানো ঘোরা
ঘড়ীটার দিকে পড়লো। ঘড়ীটা বন্ধ হ'য়ে
রয়েছে। দিন বা রাত্রি যখনই হোক
এগারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় লেটী বন্ধ
হ'য়েছে। একটু ভেবে অবিনাশকে বললুম,
ঘড়ীটাকে চালিয়ে দিতে। অবিনাশ
পেন্ডুলামটা (Pendulum) নেয়ে দিলে বটে,
কিন্তু লেটী বেশীক্ষণ চললো না। খানিক
পরেই বন্ধ হয়ে গেল। বার বার তিনবার
চেষ্টা করে দেখা গেল, কিন্তু প্রত্যেকবারই
অল্পকণ দলেই পেন্ডুলামটা বন্ধ হ'য়ে যেতে
লাগলো। ঘড়ীটাকে নাশিয়ে আনতে বলার
অবিনাশ লেটীকে নাশিয়ে নিয়ে এলো।
তারপর তার সামনের দিকটা খুলে ফেলতে
বেশী ঘোরা হ'লো না। তার ভিতরে কলের
দুই জরানো একছড়া হীরার হার—মিস
ঘোষের হীরার হার।

অবিনাশ অবাক হ'য়ে আমার মুখের
দিকে চেয়ে রইলো। আমি বললুম—“এর
ভিতরে হার আছে ঠিক করলুম কি করে তা
বোধ হয় বুঝতে পারছ না?”

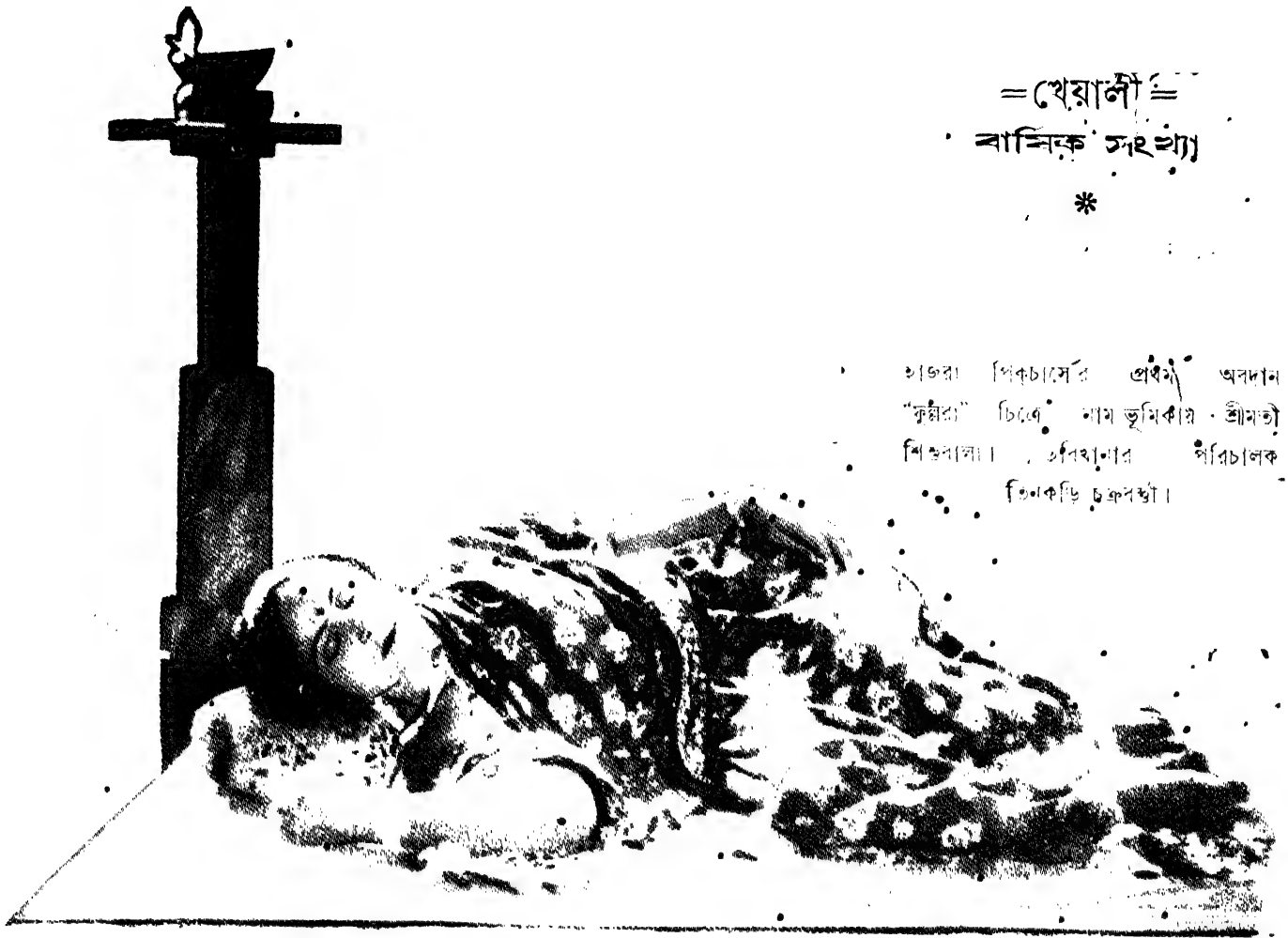
অবিনাশ—“কি করে পারবো?”

আমি—“তবে শোন। ঘড়ীটা দেখলুম
এগারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় বন্ধ
হ'য়েছে। সাতদিনের দম দেওয়া ঘড়ী।
এ লগ্নাহে যে দম দেওয়া হয় নি তা হ'তে
পারে না। কারণ, ঘড়ীর গায়ে বেশ স্পষ্ট
করে' লেখা রয়েছে 'রবিবার'। আজ
বৃহস্পতিবার—সুতরাং ঘরের অভাবে ঘড়ী
বন্ধ হয় নি। কল খারাপ হ'য়ে গিয়ে
যে ঘড়ীটা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে তাও নয়।
কারণ, অব্যবহৃত অবস্থায় ঘড়ী পড়ে থাকলে
এমন পরিষ্কার থাকে না। আরও, এমন
দাবী 'Ansonia' মেকারের 'ঘড়ী
বেমেরামতী অবস্থায় ফেলে রাখবার কোন
লজ্জা কারণ নেই। লতীদেবীর টাকার
অভাব ছিল না। তৃতীয়তঃ মিলেন বাবের

=খেরানী=
বান্ধিক সংখ্যা

*

হাজরা পিকচার্সের প্রথম অবদান
“কুন্নরা” চিত্রে নাম ভূমিকায় শ্রীমতী
শিখরাল। পরিচালক
তিলকডি চক্রবর্তী।



নাগেন বসু পরিচালিত মিউ
থিয়েটারের “দেশের মাটি”
চিত্রের একটি দৃশ্য।

वार्षिक सन्ध्या



১. বিদ্যমান পানির উৎস :
 ২. পানির উৎস :
 ৩. পানির উৎস :
 ৪. পানির উৎস :
 ৫. পানির উৎস :
 ৬. পানির উৎস :
 ৭. পানির উৎস :
 ৮. পানির উৎস :
 ৯. পানির উৎস :
 ১০. পানির উৎস :

পাটী শেষ হ'য়েছে লাড়ে বশটা আলাজ।
ধর এগারোটোর সময় সতীদেবী ফিরে
এলো। প্রথমেই হারটা কোথায় লুকিয়ে
রাখবে, তাই ভাবতে লাগলো। আরও
দশ মিনিট কেটে গেল। বড়ির মধ্যে
লুকিয়ে রাখবার সফল করে' বড়ীটা নামানো
হ'ল—ধর—ঐ টুনটার উপর উঠে।
বড়ীটা বন্ধ হ'য়ে গেল। কু-ড্রাইভার দ্বিঃ
ডায়াল (dial) খুলে ফেলে কলের সঙ্গে
হারটাকে জড়িয়ে রাখা হ'লো। ডায়ালটা
বলানো হ'লো বটে, কিন্তু আনাড়ীর হাতে
কাঁটাহুঁটো ঠিক বললো না—একটু লক্ষ্য
করলেই তা' বুঝতে পারতে। সুতরাং—
এই সময় নিবেচনা করে' আমার স্থির
করতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না যে,
হারটা ঐ বড়ীটার মধ্যেই আছে। ১২ই
তারিখে কি বার গিয়েছে 'মমে আছে?
রবিবার। 'মিমেন্স ঘোষের পাটি ছিল ঐ
দিন রাস্তিরে। তা' হ'লে পাটিতে বাবার
আগে বড়ীতে হুম বেওয়া হ'য়েছিল নিশ্চয়
বুঝেছ?"

অবিনাশ—“এইবার?”

আমি—“এইবার আমাদের অপেক্ষা
করতে হ'বে “আই-পি-সি-এর” এজেন্টের
অজ্ঞ। এই ঘরে সব আগে আমবার
সম্ভাবনা। সুতরাং আমাদের এ ঘর ছেড়ে
অজ্ঞ কোথাও গিয়ে থাকতে হ'বে!”

এই সময়ে দিড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া
গেল। আমরা টর্চ নিবিয়ে বাইরে যাব,
এমন সময়ে হালানের আলো জলে উঠলো।
পায়ের শব্দ হালানে—সুতরাং বাইরে
বেরুলেই আগন্তকের নজরে পড়বে।
তাড়াতাড়ি একটা বড় দেওয়াল
দিল্লীর পিছনে গিয়ে আমরা লুকিয়ে
পড়লুম। এত সপ্রতিভভাবে আলো জলে
এখিকে আসে কে!

ঘরের মধ্যে ভারী জুতার শব্দ হ'ল।

ঘোটা আগরাকে হিন্দুস্তান ভাষায় কে
বলে—“কোন হার হিরা?”

আহে, এ যে পাহারাওয়াল হুঁটো।
বড়ই লুকিলে পড়ে গেলুম। হঠাৎ এখানে
এদের আবির্ভাব হ'লো কি করে?

ফের প্রশ্ন হ'ল—“কোন হার হিরা?”
পরক্ষণেই আলো জলে উঠলো। কে
একজন বলে—“ইহার আর—বো. আদ্বী—
এ হি ঘরমে যুবা হোগা।”

শব্দে বুঝলুম Search (তল্লাশ) আরম্ভ
হ'য়েছে। অবিনাশ আমার কানে কানে

বলে—“বাইরে বেরিয়ে যেব নাকি কটরে?
তিনটে লোক বইতো নয়!”

আমি তার গা টিপে তাকে চুপ করতে
বললাম—পাহারাওয়ালটা দিল্লীটার দিকে
আদর্শে—পিছন দিকে উঁকি মারলেই
আমাদের দেখতে পাবে! সব গোলমাল
ই'য়ে গেল! কিন্তু তৃতীয় লোকটা কে?
তার কথা শুনে মনে হ'লো, সে যেন লুকানি
দ্বিঃ পাহারাওয়াল হুঁটোকে ডেকে এনেছে।
তবে কি 'আমরা এখানে ঢোকবার সময়
কারো নজরে পড়ে গেছি?

সাফল্যের পরিচয়

প্রথম ভ্যালুয়েসনের ফলাফল

—বোনাস—

আজীবন বীমায়

মেয়াদী বীমায়

১৫

১২

প্রতি হাজারের প্রতি বৎসর

ক্রমোন্নতি

সাল	প্রাপ্তি বীমাগ্রন্থ	প্রদত্ত বীমাগ্রন্থ	বীমা তহবিল
১৯৩৪	৩৮৭৫৫০	২৫৩৩৫০	৫১২৭
১৯৩৫	১৩২৮৭৫০	৮০৮২৫০	১৪৩১৫২
১৯৩৬	১৪৭২৭৫০	১২১০২৭৫০	২৩৭০৯১

জেনুইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

• হেড অফিস :—১০০নং ক্লাইভ স্ট্রিট কলিকাতা

ব্রাঞ্চ অফিস :—জনসন রোড, ঢাকা

“জুইতার! ইহুদি হার! হো! আদমী!
এই! নিবাল আও!”—পাহারাওয়াল
নাহেব উকি ঘেরছেন!

আন্তে আন্তে বাইরে এসু। অবিনাশও
বিতর্নাগর, মহাশয়ের ‘সুবোধ ও সুশীল’
‘বাগকের মতন আমার পিছন পিছন বেরিয়ে
এঁরা’।

দ্বিতীয় পাহারাওয়ালটি একটু দূরে
ছিল। আমাধের বেখে বলে উঠলো—
“আরে! এতো বাবুলোগে হার! ক্যা
করতে হো, জী?”

হরকার কাছে কোট-প্যান্টালুন পরা
একটি ভক্তলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। বুলুধ
তিনিই informant (সংবাদদাতা)। তিনি
বলে উঠলেন—“অমন ‘বাবুলোগ’ আমার
চের বেখা আছে। রাস্তার বেলা—খাশি
বাড়ীতে অন্ধকার ঘরে কেন এসেছেন এরা—
এ আবার জিজ্ঞাসা করে জানতে হ’বে না
কি? খানার নিয়ে চল, সেখানে জবাব
দেবেন এরা।”

দেখলুম অবিনাশের বুকখানা ফুলে
উঠছে। চোখ টিপে দিলুম। বলুম—“দেই
চাল। চলো খানামে—হুয়া বাঁকে হো
বালনা ও খোলগা।”

কোট-প্যান্ট-পর ভক্তলোকটি বলে
উঠলেন—“আরে পাহারাওয়াল নাহেব,
মাগে দেখ—বন্দুক-ছোরা-ছুরি, কি আছে
হাঁহে!”

পাহারাওয়ালারা ভক্তাল করতেই
আমাধের কাছ থেকে ছুটো রিভলভার
গাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল হারিডাটা।
মাল শুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার করে পাহারা-
ওয়ালারা মহাপুত্রী। অবিনাশ বলে—
গেরো দেখ। এ ডে নির্ভাত প্যাচ।”

আমি কোম জবাব না দিয়ে বলুম—

আমাধের খানার নিয়ে বাওয়ার
বন্দোবস্ত হ’তে লাগলো। একজন পাহারা-
ওয়াল বাড়ীতে পাহারায় রইলো। আর
একজন আমাধের নিয়ে চলো। ভক্তলোকটি
কেও লুপে নিয়ে চলো। তিনি প্রথমে
রাজী হ’ন নি। পাহারাওয়ালার পীড়া-
পীড়িতে তাঁকে রাজী হ’তে হ’ল। কারণ,
তাঁকে ‘গাওয়া’ দিতে হ’বে। আমি
পাহারাওয়ালটিকে জিজ্ঞাসা করলুম—
“ইনি কে?”

পাহারাওয়াল গভীরভাবে বলে—
“নগীজমে রহেনওয়াল হার! আওয়ার
কোন্?” কুহ অরুং হার জী মহারাজ?”

চার জনে বাড়ীর বাইরে এসু। রাস্তা
দ্বিধে একখানা ট্যাক্সী বাচ্ছিল। পাহারা-
ওয়াল ট্যাক্সীটাকে দাঁড় করিয়ে উঠে
বসলো, আমাধও উঠলুম। পাহারাওয়ালার
নির্দেশমত ট্যাক্সী খানার দিকে চলো।
খানিকপরে বাঁককে এক গলির মধ্যে
গাড়ীখানা ঢুকলো; এই গলির মোড়েই
খানা। কিছুদূর গিয়েই আমাধের গাড়ী
খানাকে থামতে হ’লো—সামনে আর
একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমাধের
ড্রাইভার সামনের গাড়ীর ড্রাইভারকে গাড়ী

দরাতে বলে। সে কানই ঘের না কোন
কথায়। পাহারাওয়াল থেকে বলে—
“এই! লড়ক ভোড়কে!” কে কার কথা
শোনে! তখন পাহারাওয়াল গাড়ী থেকে
নেনে পড়লো। ড্রাইভারকে ডেকে বলে—
“গাড়ী রাখকে হিয়া নিদ্ বাতে হো।
চালাও—পিছুমে পুলিশকা গাড়ী হার।”
ড্রাইভার বলে উঠলো—“ও! কল্পর
হো গিরা। হমারা ফেরার (Fare)
নগীজমে গিরা, উসলিরে ময় খাড়ে হ।”
সে গাড়ীতে উঠে দিলে।

কোটপ্যান্টপর ভক্তলোকটি বলে
উঠলেন—“হু! পাহারাওয়াল একটা
হুম্মীতে কাজ হ’য়ে গেছে। মনে করছিলুম
এখন আর বাবো না; হরকার হয় পরে
বাব। তা, আমার আর বাবার হরকার
হ’বে না। কাজ তো হ’য়ে গেল।
ড্রাইভার—এই ড্রাইভার, গাড়ী চালাও।
হু—পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ী, বাবা!
ঐ পাগড়ী বড় দামী!”

এই সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।
সামনের গাড়ীর ড্রাইভার হঠাৎ পাহারা-
ওয়ালার মাথা থেকে পাগড়ীটা হিনিয়ে
নিয়ে গাড়ী ভেড়ে দিলে। আমাধের

22 CT. রোড

গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!



ব্যবহারান্তে বিক্রয়কাণীন অর্ধেক মূল্য
পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত
আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা
পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী
লোপার দ্বারা চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড-সিঙ্কিট

৭০নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি.বি. ৪৮৮২

হাল - বাংলা

বিকৃতি ও অসঙ্গতি আধুনিক প্রত্যেক সমাজেই আছে—প্রতিদিনের অভ্যাস ও পরিচয়ের দরুণ সেগুলি আমাদের চোখে পড়ে না। হাল-বাংলায় আধুনিক বাঙালী সমাজের সেই বিকৃত ও অসঙ্গত রূপ অজস্র হাসির উপাদানের সঙ্গে পরিবেশন করা হইয়াছে। ছবি দেখিতে দেখিতে আপনি হাসিবেন, কিন্তু নির্জনে অবসরে সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে।

এই হিসাবে হাল-বাংলা উগ্র ব্যঙ্গ নয়, সমাজের অতি করুণ আলোচ্য মাত্র।

ইফ ইণ্ডিয়া ফিল্ম স্টুডিওতে গৃহীত—

মেটোপলিটান পিকচার্সের

প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র

সাব্কে সাথ বাৎচিং কয়কে আপ্কে লট্ট-
নেকো বৎৎ এইঠো আপ্কে বেনা।”

আমি—“ও চিঠি কাঁহা?”

পাহারাওরালা আমাকে একখানা চিঠি
ছিলে। তখনই লেটা খুলে কলে পড়লুম—
“হরেন বাবু, নমস্কার। আমরাও ঘরটা
জ্ঞান করেছিলুম—হারটার সন্ধান করতে
পারি নি। আপনি যুঁজে বার করে দেওয়ার
দরুন আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। লেটা
ছিনিয়ে নেবার ভাঙে আপনাকে একটু কষ্ট
হিতে হ’লো—মাক্ করবেন। আপনি শত্রু
হ’লেও আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা ক’রে’ থাকি।
তাই বলছি, লতীদেবীর মৃত্যুর জন্ত আমরা
মোটে হারী নই। তবে, হারছড়াটা আমরা
নিরেছি। এটা আমরা হরমাল ‘আমাদের
কাছে রাখবো—আপনাকে কণা দিচ্ছি।
তারপর সুইডেন (Sweden) চালান করবো।
পারেন তো উদ্ধার করবেন *। ইতি—প্রেনি-
ডেন্ট—আই-পি-পি এ।”

অবিনাশও আমার কাঁধের পাশ দিয়ে
উকি ঘেরে চিঠিখানা পড়েছিল। বলে
উঠলে—“বাহবা! Three cheers for—”

বাধা দিয়ে বল্লুম—“থাক্।”

(৩)

সেদিন রাত্ৰিতে অবিনাশ নিজেও
ঘুমোল না, আমাকেও ঘুমোতে দিলে না।

অনেক বাধ বিতর্কের পর স্থির হ’লো,
পরের দিন সকালে আমরা বাব বড়িলা-
বেহালার লখের বাজারে। লতীদেবীর পূর্ক-
জীবনের সন্ধান নেওয়া সকলের আগে
দরকার। বিশ্রামের ভাঙে উঠবো মনে করছি
এমন সময় অবিনাশ বল্লেন—“আচ্ছা হরেন,
পাহারাওরালার পাগড়ীর মধ্যে হার আছে,
একখা ছাইভারটা জানলে কি করে?”

* কি রকমে হারছড়াটা উদ্ধার হ’রেছিল
জানতে হ’লে “হীরের হার” গল্প পড়তে
অনুরোধ করি।

আমি—“কেন? কোট-প্যান্ট পরা
মহাপ্রভু তো তাকে hint (ইঙ্গিত) দিয়ে-
ছিলেন। খুব ধড়ীবাজ এই ‘আই-পি-পি এ’র
প্রেনিডেন্ট। তোমার মনে পড়ে?—লে
বলেছিল ‘এখন আর বাব না, দরকারে
হয় পড়ে বাব।...এ পাগড়ী বড় হারী।’
আর হার কোথা?—পাগড়ীর উপর আক্রমণ।
আর, আমাদের বিপদে কলে কাজ দারবার
মতলব খুব কলসময়ের মধ্যে স্থির হ’লেও
কেনন অনুরোধে ব্যবস্থা করা ‘হ’রেছিল,
তা’ আমরা বেশ বুঝেছি—কেনন? এখন
বল দেখি কত বড় ধড়ীবাজ এই প্রেনিডেন্ট
তবে সে যে বলেছে, যে লতীদেবীর হত্যা
লখের তার কোন হাত নেই—একখা আমি
ঠিক বিশ্বাস কর্তে প্রস্তুত নই। আপাততঃ
এখিকে অনুসন্ধান চলুক; তারপর ‘আই-পি-
পি-এ’র দিকটা উল্টে দেখবার চেষ্টা করবো।
লতীদেবীর পূর্কজীবনের সন্ধান না পেলে
তবস্তের সুবিধা হ’বে বলে মনে হয় না।”

পরের দিন সকাল বেলা বড়িলা-বেহালার
লখের বাজারে গিয়ে রামজীবন বল্লর সঙ্গে
লাক্কাৎ করলুম। তার কাছ থেকে বিশেষ
কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলুম না।
তিনি লতীদেবীকেও জানেন না অথবা
যে চিঠি-লেখে তাকেও চেনেন না। একটা
লোক তাঁর সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করে, যে
মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়ের নামে বত চিঠি
তাঁর কাছে জালবে, তিনি সেগুলি তাঁকে
অর্থাৎ সেই লোকটিকে দেবেন। আর
সেজন্ত মালিক ষ্টাটাকা করে’ তিনি
পাবেন। লোকটিকে তিনি চেনেন না,
অথবা সে কোথায় থাকে তাও তিনি
জানেন না।

অবিনাশ বড়ই বদে’ গেল। বল্লেন—
“তাইতো, হরেন, এখানে তো কোন
সুবিধাই হ’লো না।”

আমি বল্লুম—“সুবিধা কিছু হ’রেছে
বই কি, বন্ধু। মনোরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়

রামজীবনের ‘কাছ থেকে, চিঠি নিয়ে যায়
বখন, তখন এই ভাঙলো ‘কই’ লতীদেবীর
স্বামী। রামজীবনের দারকৎ চিঠির উল্লেখ
লতীদেবীর ঘরে যে চিঠি, পেরেছিলুম
তাঁতে আছে। কাজেই ‘মনোরঞ্জন’ নামে
কোন লোকের অস্তিত্ব আছে নিশ্চয়—এবং
সে এই দেশেই আছে। আর, এখন
বোধ হয় বেশ বুঝেছি, যে লতীদেবীর
আল নাম ‘স্বর্ণলতা’?”

রামজীবনকে জিজ্ঞাসা করে যে ভাঙলোক
চিঠি নিয়ে যায়, তাঁর মোটামুটি একটা
চোখার বর্ণনা পেলুম। লোকটা দোঁহার
উজ্জল শ্রাবণ, লম্বা; মাথার চুল কুচকুচে
কালো ও কোঁকড়া, চোখ ছাটা খুব কাঁচা,
বড় এবং উজ্জল। ভাঙলোকটা পানের
কিছু বেশী ভক্ত; অতরাং দাঁতগুলি তাঁর
বেশ সমানভাবে লাজান হ’লেও একটু
লালচে ধরণের। আরও জানতে পারলুম,
যে রামজীবনের সঙ্গে মনোরঞ্জনের পূর্কে
পরিচয় ছিল না। পুলিশ বস্ত চৌধুরী নামক
কোন ভাঙলোকের মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে
তার পরিচয় হয়। রামজীবন মনোরঞ্জনের
হ’রে যে কাজ করে’ থাকে পুলিশ তা’
জানে না বটে, কিন্তু মনোরঞ্জন যে সেখানে
আসে তা’ তাঁর জানা আছে। পুলিশের
জিকানা নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত
হ’লুম।

পুলিশ লোকটি খুব ভাঙ। সে বটে
মনোরঞ্জন তাঁর ডেলেবেলার * বন্ধু। এম,
এ, পাশ করে সে চাকরী নিয়ে লক্কা।
যায়; সঙ্গে নিয়ে যায় তার জুঁকে। সেখানে
তার সঙ্গে কি নিয়ে মনোমালিন্দ হওয়ার,
তাঁর অসুস্থতি না মিয়েই তাঁর জুঁ এখানে
চলে আসে। তারপর হুদু নাম নিয়ে
থিয়েটার, বারকোপ করতে থাকে। কিছুদিন
আগে হুঁতা মনোরঞ্জন আমার সঙ্গে এসে
বেথা করত। সেই থেকে সে ম’রে যাচ্ছে
এখনও এসে থাকে। তার বিবাহ কোথায়

হ'য়েছিল জিজ্ঞাসা করার, পুলিশ বলে কলকাতা বাগবাটারের নবগোপাল ঘোষালের ঘেরকে মনোরঞ্জন নিয়ে করেছিল। ঘোষালগর ওখানকার পুরানো বাসিন্দা—কাজেই তার নাম করলেই লকলে চেনে। আমরা উঠবো উঠবো মনে কচ্ছি, এমন সময় পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে—“আপনারা মনোরঞ্জনের লক্কে এত খোঁজ নিচ্ছেন কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?”

আমি হেসে বলুম—“খুব পারেন। আমার এক বছর একটা ঘেরে আছে। শুনলুম, মনোরঞ্জনবাবু আমার ঘেরে করবেন। এটা জন্মেই এত খোঁজ নেওয়া। অজ্ঞাত খোঁজ উদ্দেশ্য নেই। এখন, তত্ত্বলোকটা দেখতে কি রকম জানতে পারলে বড় সুবিধা হ'তো। তা' বাক, তার বাড়ীর ঠিকানাটা বটকের কাছে আছে—সুবিধা মত দেখলেই হ'বে।”

পুলিশ বলে উঠলো—“আপনাকে এখনই দেখাতে পারি। দাঁড়ান।” এই বলে সে একখানা ফটো নিয়ে এলো। ফটোখানা কিছুদিন আগেকার। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, লক্কো লহরে চাকরী নিয়ে যাবার ঠিক একমাস পরে এই ফটোখানা সে পুলিশকে পাঠিয়ে দেয়। ফটোর এককোণে লেখা আছে দেখলুম—“Ever yours M. Banerji”, ‘এম, ব্যানার্জী’—তখনই হরিদাসের বটরের কথা মনে পড়ে গেল। “লকে লকে মনে মনে মিলিয়ে দেখলুম—সেই ফটো বেশ চমৎকার মিলে যায়। অবিনাশ হঠাৎ এই সময়ে বলে উঠলো—“ঠিক হ'য়েছে।” কি যে তার ‘ঠিক হ'য়েছে’ তা' বুঝতে আমার একটুও ঘেরী হ'ল না। বুঝলুম, সেও লইফটোর সামঞ্জস্য ধরতে পেরেছে। কাজেই বাধা দিয়ে বলুম—“হ্যাঁ। খুব সুবিধা হ'লো। ফটোখানা পেরে। ঠিকই হ'য়েছে বটে। তা' হ'লে, অবিনাশ, আপাততঃ ওটা

বাক্ চল। ফটোখানা আমার সেই বকুটিকে দেখাতে পারলে বড় ভাল হ'তো। তা'—এখানি নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব হ'বে না।”

পুলিশ বলে—“কেন হ'বে না? আমার ও রকম ফটো আরও হ'খানা আছে। দেখছেন না—ওটা এতদিন বাধান হ'র নি? আপনি বকুটকে নিয়ে যেতে পারেন। তা'—ঘেরের বাপ কোথায় থাকেন?”

ঘেরের বাপ—অর্থাৎ মনোরঞ্জনের কাণী শক্তরের যথা-সম্ভব মনগড়া পরিচয় দি'য়ে আমরা পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলুম। পথে অবিনাশ বলে—“এইবার কি করতে চাও?”

আমি বলুম—“এম্ ব্যানার্জী একজন প্রফেসর—এবং বড় প্রফেসর। কাজেই একবার লক্কোএ খোঁজ নিতে হ'বে, এই ‘এম্, ব্যানার্জী’র খবর কি। আমাদের প্রাণকুমার দত্ত এখন ওখানকার অফিসার। আজই একটা তার করতে হ'বে তা'কে।”

কথামত তার করা হ'লো। যথাসময়ে তারের উত্তর এলো। প্রাণকুমার বলছে—“এম্, ব্যানার্জী গত বৎসরে ট্রেণ রুটিনার দ্বারা গেছে। লাস আবিষ্কৃত হয় নি। তার জিনিষ পত্র নিলামে বিক্রয় হ'য়ে যায়। সে জিনিষপত্রের মধ্যে কোন লুককেস্ ছিল না।”

অবিনাশ বলে—বুককেসটা তো হরিদাস কিনেছে—এ জেনেও বুককেসের খবর নিতে গেলে কেন?”

হেসে বলুম—“যে জিনিষগুলো বিক্রয় হয়েছে তার মধ্যে বুককেস্ ছিল না দেখ্ছ। তবে হরিদাস বইপুস্তক বুককেসটা গেলে কোথা থেকে?”

অবিনাশ অবাক হ'য়ে বলে—“তবে কি তুমি বলতে চাও, যে হরিদাস চোর?”

আমি ডুমার থেকে মনোরঞ্জনের ছবিখানা বার করলুম। তারপর বাথার চুলের উপর

শাখা রং পাগিয়ে দিয়ে এবং বুখে দাঁড়ি-গোফ্ একে দিয়ে বলুম—“বল দেখি এ কে?”

অবিনাশ খানিকটা অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো। তারপর বলে উঠলো—“অশ্চর্য! এতো হরিদাস!”

আমি বলুম—“হ্যাঁ। এই ‘হরিদাস’, আমার এই ‘মনোরঞ্জন’। সেদিন তার কথাবার্তার বুঝেছিলুম যে সে নিরঙ্কর শিকটার মাত্র নয়। শেকপীররের গ্রন্থাবলী সেদিন ষাড়বার জন্তে বার করা হয়নি, পড়বার জন্তেই বার করা হয়েছিল। এইবার আমাদের একবার হরিদাসের লক্কে খোঁজ করতে হ'বে। আর স্থির করতে হ'বে, যে হরিদাস ওরকে মনোরঞ্জন, তার পবিত্র বংশে যে-কালী লেগেছে তা এতদিন পরে বুঝে ফেলেছে কি না।”

সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিলো। খাওয়া দাওয়া সেরে বেলা লাড়ে বারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা আমার গাড়ীতে হরিদাসের বাড়ীর দিকে রওনা হ'লুম। দেখানো পৌঁছে খবর নিয়ে জানলুম, হরিদাস উপরে তার ঘরে আছে। সে বাইরে গিয়েছিল—বটোখানেক আগে সে কি'য়ে এগেছে। আর, সেই যে সে উপরে উঠেছে, আর নীচে নেমে আসে নি।

আন্তে আন্তে উপরে উঠে বরজার দাঁ দিলুম। কোন লাড়া পেলুম না। কিছুকণ অপেক্ষা করে আবার দাঁ দিলুম। তখনও কোন লাড়া নেই। বরজা ঠেলতে পুন্নে গেল। আমরা ভিতরে ঢুকলুম। দেখি—হরিদাস তক্তাপোষের উপরে শুয়ে আছে। একটা হাত নীচে বুলে পড়েছে, আর ঠিক তার তলার পড়ে রয়েছে একটা খালি শিশি। নাড়ী অসুস্থ করে বুঝলুম হরিদাস ইচ্ছাগতের অস্থ-স্থঃ, লম্বান-অসম্মান, লজ্জা, ভয় এসবের বাইরে চলে গেছে! তার বুকের উপরে একখানা ঘোড়া খাম রয়েছে,

বড়দিনের
বড় আসরে
নগরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ
দেবদত্ত ফিল্মসের
অতুলনীয় চিত্রকথা

মহা দাখান
মুখ হবার
মুখ বদলাবার
মত-হাতি

গ্রাহের ফের

গ্র
হে
র
ফে
র

গল্পের নূতনত্বে
অভিনয়ের উৎকর্ষে
পরিচালনার বৈশিষ্ট্যে
বর্তমানের
পরম উপভোগ্য
চিত্রসৃষ্টি

রূপবাণী
চিহ্নগ্রহে..
সগৌরবে চলিতেছে

—ঃ একমাত্র চিত্র-পরিবেশক :—
প্রাইমা ফিল্মস. লিঃ

তার উপরে শিরোনাম লেখা—“ডাঃ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।”

চিঠিখানা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তার মুখ পর্যন্ত একখানা লাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলুম। লোকটা বেন নিশ্চিন্ত হ’য়ে নিত্রা বাজছে। এবং আগে এই ঘরে বসে’ এর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছি। আজ এ একাধানে স্থল শরীরে উপস্থিত নেই—কিন্তু এর স্থল শরীরের লক্ষ্য বেশ অনুভব করছিলাম।

পুলিসে খবর পাঠিয়ে দিলুম। আর, পুলিস আসবার আগে ‘হরিদাস’ ওরফে নরেন্দ্রনাথ বাবুর চিঠিখানা পড়ে নিলুম। নরেন্দ্রনাথ লিখেছে—
“প্রিয় হরেন্দ্রবাবু,

‘আমার নমস্কার জানবেন। যখন এই চিঠিখানা আপনার নজরে পড়বে, তখন আমি করতে অনেক দূরে চলে যা’ব। তবে আমি জানি, আপনি আসবেন—আজই আসবেন। সেদিন আমার সঙ্গে কথা করে’ আপনার যে লন্ডনের উদয় হ’য়েছিল, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। আপনার অজান্তেই আপনার বাড়ীর উপরে একটু নজর রাখলাম। দেখলাম, আপনি পুলিস দস্ত চৌকুরীর লক্ষ্যন পর্য্যাপ্ত করেছেন। আপনারা লন্ডনের বাজার থেকে চলে’ আসবার পর আমি পুলিসের সঙ্গে দেখা করলাম। ‘তার কল’ে বসলাম, যে আপনারা ‘অগ্রহণ করে’ নিশ্চয় এভাবে আসবেন। কাজেই, আপনাদের সঙ্গে দেখা হ’বার অপেক্ষার না থেকে প্রিক্রিক এ্যান্ডার্সন সাহাব্যে লরে পড়লাম। জীবিত লরে যেতে পারতুম, কিন্তু লব হারিয়ে বেঁচে থাকবার কোন দরকারী মনে করলাম না। আর, আজ এই যে আমার মৃত্যু—এতো আমি তৃতীয়বার মরলাম। আমার মৃত্যু হ’য়েছে অনেকদিন আগে রেল-দুর্ঘটনায়—সেই আমার লোকতঃ মৃত্যু। আর ধর্মতঃ মৃত্যু হ’য়েছে আমার তারও

আগে সেদিন, যেদিন আমার ধর্মপত্নী ‘স্বর্ণলতা’ আমাকে ত্যাগ করে’ এলে পাপের পথ বেছে নিলে। তারপর জীবন্ত-মরা অবস্থায় এককাল ছিলুম শুধু একটা উদ্দেশ্য লিখির জন্য। সে উদ্দেশ্য লিখ হ’য়েছে,— আমি নিজের অস্তিত্ব একেবারে মুছে ফেলব।

স্বর্ণলতা অর্থাৎ লতা দেবীকে আমিই খুন করেছি। কেন করেছি তখন? আমার মতে তার বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই। কেন সে আমার সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল তা স্পষ্ট করে’ এখন বলে’ কোন লাভ নেই। তারপর সে যে পথে ছুটে গিয়েছিল, তাও আপনারা জানেন। আমি বার বার তাকে নিবেদন করেছিলাম, সে তুলো না। লম্বা ফেলে রেখে সে গোলমদের লক্ষ্যনে যে কেন গিয়েছিল, তা সে নিজেই জানতো। আমার মৃত্যুর খবর যখন এখানে পৌঁছলো, তখন এরা আমার মের নিখাল ফেলে বাঁচলো। আমি কিন্তু রেল-দুর্ঘটনায় মরিনি, তা’ বোধ হয় আপনাকে বলে দিতে হ’বে না। কিন্তু হারুন আখতারের মরার মত হ’য়ে পড়ার, আমাকে আরও অনেক মৃতদেহের সঙ্গে একটা খানার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। জান কিরে পাবার প’র নেই মড়ার গাছ থেকে কোন রকমে বেরিয়ে এক মল্যাদীর আশ্রমে আশ্রয় নিই। সেখান থেকে আরোগ্যলাভ করে’ যখন আফ্রিকা হাইয়ের জগতে এলাম, তখন আমার নিজের চেহারা দেখে নিজেই চিন্তে পারলাম না। আমার চুলগুলো লাদা ধবধব কটে। লক্ষ্যে আমার বালায় রামভজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। বালায় গিয়ে উপস্থিত হ’লাম। আর যারা দেখলে তারা চিন্তে না, কিন্তু রামভজনের চোখে ধুলো দিতে পারলাম না। সে চিনে ফেলে। আমার বেঁচে উঠবার লক্ষ্য আর ছিল না। ‘মরা’ অবস্থায় দেখতে ইচ্ছে হ’লো স্বর্ণলতা কেমন আছেন আছে। রাম ভজনকে

কিছু টাকাকরি দিবে, তাকে চূপ করে থাকতে বলে, শুধু আমার বড় আঁধরের বুককেস্টী নিয়ে আমি এখানে চলে এলাম। তারপর কেমন করে’ পথে পথে আমি স্বর্ণলতার অনুসরণ করেছি, কেমন করে’ আমার অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছি। সে বোধ হয় আপনারা বেশ বুঝতে পেরেছেন। আমি সেদিন কতকটা আপনাকে বলেছিলাম। আমার অস্তিত্বের পরিচয় পেয়ে স্বর্ণলতা একটু ভয় পেয়েছিল। আমি নিজকানে তার প্রণয়নস্বের সঙ্গে প্রেমালোপ শুনেছি। রাম-জীবন-বহুর সঙ্গে যে ব্যবস্থা করেছিলাম তাও আপনি জানেন। রামজীবনের কাছে লাহল করে’ সে লক্ষ্যন নিতে’ যায় নি। তার ঠিকানায় আমাকে চিঠি লিখতো মাত্র। শেষকালে তার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হ’য়ে উঠলো। অসহ্য লোকের সঙ্গে তার আলাপ হ’তে লাগলো।

আমি প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ অনুসন্ধান করতে লাগলাম। শেষে ‘পরপারে’ নাটকের অভিনয়ে আমি সুযোগ দেখতে পেলাম। হত্যার হারিস্টা মানবেজের উপরে লহজে চাপাতে পারা যাবে কিনে তা ঠিক করতে আমার দেরী হ’লো না। ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকে আমি অনুসৃতার অজুহাতে ছুটি নিলাম। তারপর ঘটনার দিন থিয়েটারে গিয়ে আস্তে আস্তে অস্ত্রের অলঙ্কিতে একগাছা সিনের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। ‘হাইম’ ড্রয়ার থেকে দস্তল বার করলে, আমার লাইলেক্সারে দেওয়া রিকলভারটিও আমি ট্রু করলাম। তারপর বাঁচলো তা’ আর আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হ’বে না। গোলমালের মধ্যে লরে পড়লাম—অনুসৃতার বোম্বাই দিয়ে’ বালায় বলে রইলাম আমার বুককেসের মধ্যে রিকলভারটি পাবেন। মানবেজ বাবুকে বোম্বাই লাহল করার প্রয়াসটা অতি হীন ও কাপুরুষোচিত বলে আমার অনেক আগেই মনে হ’য়েছিল। আপনি এর তদন্ত না



==খেয়ালী== বাস্তবিক সংস্থা

বিমলাবাণী পটচিত্রের নায়িকার ভূমিকায়
অভিনয় করে ইনি সুনাম অর্জন
করেছেন। ইনি সকল রকম নৃত্য
বিশেষ পারদর্শিনী ও স্তম্ভাদিকা হিসাবেও
এর যথেষ্ট নাম আছে।



নিউ থিয়েটারসের
“দেশের মাটি”র
একটি চমৎকার দৃশ্য।
পরিচালক নীতীন বসু

==পের্যালি==
 বাম্বিক সংস্থা



কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি
 কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি
 কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি
 কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি

চাতক

শ্রীভক্তি চট্টোপাধ্যায়

মরুভূমি বৃকে জাগে-তুমার বাণী
 শুনিয়া আকুলি কাঁদে সাগর রাণী,
 দল বেধে চলে মেঘ-পরিয়া লাগে
 লাহারার বৃকচিরা তুবা নিটাতে।
 আমি কবি বলে আছি বৃকে লাহারা
 এ পথ বাহিয়া আসে বৃকি কাহারো।
 চোখে হালে কালমেঘ বলে নীলাকাশ
 হাঁ করি কণিক থাকি হইতু নিরাশ।
 স্থূলি না কেহ মোর প্রাণের কথা
 লরমে লুকাল ধীরে মরম ব্যথা।

নাশলেও আমি মানবেন্দ্র বাবুর খালিদ পাবার
 ব্যবস্থা করে দিতুম। আমার জীবনের কোন
 দ্বাম নেই; বেচে থেকেও আমি চিরকাল
 মরেই থাকতুম। তার জন্তে একটা লংসারে
 আঙুন লাগিয়ে দেওয়া আমার মতন লোকের
 উপযুক্ত কাজ নয়। এই চিঠি ও রিভলভার
 মানবেন্দ্রবাবুর নির্দেশিতা প্রমাণের পক্ষে
 যথেষ্ট হবে নিশ্চয়। বইগুলি আপনি
 কিন্তে চেয়েছিলেন, সে গুলি আপনিই
 নেবেন। যোগ্যতার লোকের হাতে সেগুলিকে
 আমি দিতে পারতুম না। আমার নিজের
 বংশের মুখে কালীর ছাপ লেগেছিল, নিজ-
 হাতে যদি তা মুছে ফেলে থাকি, তার জন্ত
 নিজেকে আমি গোরবান্ধিত বলেই মনে
 করছি। হরেন বাবু, আমি কি হত্যাকারী?
 স্বাধীন ঘর স্বর্ণলতা যেদিন ত্যাগ করেছিল,
 সেইদিন সে আম্মহত্যা করেছে। এতদিন
 যে স্বর্ণলতা, লতীদেবী নাম নিয়ে ঘুরে বেড়া-
 ছিল, সে কারা নয়, সে ছায়াহুস্তি। ছায়া-
 হুস্তিকে অপসারিত করা হত্যা হ'তে
 পারে না।

আবার নমস্কার।

• ইতি—শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

খেলানীর নববর্ষ

শ্রীহিন্দুরা দেবী

বঁচর ঘুরিয়া আলিল, নগরীর এত
 আনন্দ কোলাহলে মন লাড়া দেয় না,
 মন গুহরিয়া মরে, এত দীপালোকের
 ভিতর, এত আলোর উজ্জলতার ভিতর
 আমাদের গৃহ আলোহান নিরুদ্ধ আধারে
 ভরা, আনন্দ কোলাহলের পরিবর্তে মৃত্যুর
 নিশ্চকতা চারিদিকে—মনে শক্তি নাই,
 দৌঁদে শক্তি নাই, চক্ষে উৎসাহ ও প্রেরণার
 প্রভাত সূর্যের কিরণ বলিয়া উঠে না—
 তবে কি আমরা মৃত! এ সমস্তই তো
 মৃতের লক্ষণ, লজ্জা আনন্দ আমাদের
 মনকে বাপ্ত করে নাই, বেহতক বর্ষের
 পথে চলিতে উৎসাহিত করে না—এ যে
 নিজীবতার চিহ্ন!

অত্যাচার, অনাচার, অত্যাচার, কুনাটন,
 দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা বেধনা, আশাত্তজ দ্বারিত্তা
 ও নিরস্ততা আমাদের জীবনের পরম ভূষণ!
 উৎপীড়িতের আর্তনাথ, দুর্দলের কাতর
 আহ্বান, অত্যাচার, অত্যাচারের, অনাচারের,
 নিরুদ্ধ আধারে আমাদের মন প্রাণ বেহকে
 ক্রীব করিয়াছে, কাপুরুষ করিয়াছে, লম্বা
 ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়াছে, জাতীর জীবনকে
 হীন করিয়াছে।

এই তো' আমাদের পরিচয়।

সাংসারিক ও অর্থনৈতিক ভ্রমস্ত
 অবিচারের ও কুবিচারের ভিতরও আমরা
 তেমনি নির্ভিকার চিন্তে হালিমুখে নগণ্য
 জীবন যাপন করিয়া চলিয়াছি, প্রত্যন্তর দিবস
 জন্ত কঠোর জড়তাকে ঘুর করিবার চেষ্টা
 করি নাই, প্রতিবাদের জন্ত একটিও অঙ্গুলী
 উল্টে উঠে না—এমনি আমরা আমাদের

মরণের পথে আপন ইচ্ছার চলিয়াছি,
 বাহ্যিকের, আমাদের পিছনে আলিবার সময়
 হইরাছে—তাহাদেরও এই ক্রীবতের ভিতর,
 এই জড়তার এই প্রাণহীনতার ভিতর এবং
 সর্বপ্রকার সামাজিক, কুনীতির মধ্যে
 টানিয়া আনিয়াছি।

আমরা মরিয়াছি, বাহারা অচ্ছ
 তাহারাও মরিবে, লম্বা মরিবে, বেশ
 মরিবে। আমাদের রক্ষা করিবে কে?

জীবন আমাদের দুর্দহ, প্রাণ আমাদের
 হরিজ ও অত্যাচারিত। যেদা নাই, শক্তি
 নাই লাহল নাই উৎসাহ ও প্রেরণা নাই,
 প্রাণের ও জীবনের স্পন্দন নাই, তাই
 লম্বাজে এত অবিচার, অনাচার, কুবিচার,
 তাই এত বন্ধন—এত আশাত্তজের করণ
 কাহিনী—তাই নারীর করণ আর্তনাথে
 পুরুষের কাল যুগ ভাঙ্গেনা, অবিচারের
 অত্যাচারের অবিচার প্রত্যন্তর বাহরা
 আমাদের পরিজ্ঞান দিবস জন্ত কেহ পাশে
 আসিয়া দাঁড়ায় না—নারী মরে অত্যাচারে
 ও লম্বাজের কুবিচারে, দুঃখী মরে দুঃখে,
 শিশু মরে অপ্রহীনতার ও অশিক্ষা ও কুশিক্ষার
 —পুরুষ মরে ক্রীবতার ও জড়তার! বেশ
 ও জাতি এভাবে দ্রুতগতিতে মরণের পথে
 চলিয়াছে—এ মরণ-তরঙ্গ রোধিবে কে?

এ মরণ বাস্তবতার ভিতর, এই আশা-
 আনন্দহীন অবিচার, কুবিচারের ভিতর
 মরণের তাণ্ডব নৃত্যের ভিতর যুগগত
 কুলংকারের ও অন্ধ অবিচারের ভিতর
 পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার ও কাতর ক্রন্দনের ভিতর
 এলো এলো হে মুরারী, কৃষ্ণ সূর্যশন ধারী—

আশ্বাসের পাঁকল ভাঙাইয়া এলো, এলো
শান্তির তৃপ্তির ও আশার উত্তরীর দিকে
দ্বিধা বিস্তার করিয়া এলো—এলো মুক্তির
মিলনের ও, জীবনের বাণী বহিরা—এলো
তুমি!

সমস্ত দেশ, সমগ্র জাতি তাহাদের-
নিমিত্ত আশি তোমার আলিঙ্গি পথে
বিছাইয়া লাগছে তোমার পথ চাহিয়া
আছে।

মরণের অন্ধকারের ভিতর, জ্যোতিহীন
জীবনের ভিতর, হৃদয়হীন প্রাণের ভিতর
এলো এলো জীবনের অমৃত, আলো ও
হৃদয়। তোমার মধুপরিণে আশ্বাসের
সুগন্ধ জড়তা, ক্লীবতা, প্রাণহীনতা দূর
হোক, মোহ দূরে থাক। মুক্তি দাও। মুক্তি
দাও—সমাজের কুবিচার ও অন্যাচার হতে,
দেশের কুসংস্কার ও পরাধীনতা থেকে,
ব্যক্তিগত জীবনের জড়তা থেকে।

অভিবাদন

মহিলা মহলের পক্ষ থেকে আমি সমস্ত
মা, বোনেরা—‘খেরালী’র নব বর্ষের শুভ-
অভিবাদন জানাচ্ছি। খেরালী যেন
অধিকতর ভাবে জাতির পথ প্রদর্শকের
কাজ করতে পারে এবং বিশেষ করে, নারী
সমাজের উপকারে আসে এ প্রার্থনাও
আমার রইল।

ইন্দ্রিমা ঘোষী।

অন্ধকার হইতে আলোকে তুমি লইয়া
চল, মরণ পথ হইতে লইয়া যাও পরম জীবনের
দিকে—পরাধীনতা হইতে লইয়া যাও চির
মুক্তির দিকে, জড়তা, ক্লীবতা ও প্রাণহীনতা
হইতে লইয়া যাও আনন্দের ও শৌর্য্যের
দিকে।

সমস্ত জাতি করুণ কণ্ঠে আন্তরিক
পরিজ্ঞানের জন্ত তোমার ডাকে—ডাকে—কান

মনতি

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্তী

পাশের বাড়ীর ছোট্ট মেয়ে নাম রেখেছি মন্টি
পাগল করে পাগল-করা স্নিগ্ধ নয়ন কোন্টি

ছোট্ট পায়ের স্পর্শে

হৃদয় কাঁপে হর্ষে,

দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপে ঘেন মদীর পারের বনটি।

সাগর বুকের তরঙ্গ সে পাগলা হাওয়ায় চমকে
দোল দিয়ে যায় সবার প্রাণে—ক্ষাণিক সে রয় ধমকে।

আবার নাচন চললো

কেশের বাঁধন চললো

হাওয়ার বুকে নাচন লাগে—প্রাণ ডেকে কয় কমকে।

বয়সটা তার ত্রয়োদশ ও চতুর্দশের মধ্যে

রঙ ধরেছে আধকোটা কাপনলাগা পদে

তার নয়নের সঙ্গি

পর্যায় করে বন্দী

মন ময়ুরী সে যেন রে—মোর এ হৃদয় সন্নে।

হাসলে পরে টোল খেয়ে ছোট্ট মধুর গণ্ডে

কনিক চোখে পড়লে পরেই অনেক ব্যথাই খণ্ডে।

ধন্য তুমি ধন্য

কোব স্বপ্নের কন্যা

ঐ বাহুরই বাধন তলে প্রাণ ছোট্টে এক দণ্ডে।

পাতিরা তাহাদের কাতর ক্রন্দন শোন, এলো, এলো।
রথচক্রের নিম্পেষণে যত আশি, ব্যথি, অপমান;
অত্যাচার, জড়তা, প্রাণহীনতা ও পরাধীনতা
গুলি হয়ে যাক—এলো বৈরাগ্যের গৈরিক পতাকা
তোমার রথচক্রের উড়াইয়া—এলো আনন্দের ও
তৃপ্তির ও পরিজ্ঞানের দ্বিধা চক্কু লইয়া—
লজীবতার আনন্দের ও জীবনের বাণী বহিরা
তুমি এলো—তোমার সূর্য্যদর্শন চক্রে
নব বিদ্যুত হোক, ক্লীবতা দূরে থাক, কাল
নিজা হইতে দেশ ও জাতিকে

জাগাও—প্রাণ দাও, জীবন দাও, শক্তি দাও,
উৎসাহ দাও, পরিজ্ঞানের চেষ্টা দাও।

এই অধঃপতিত, অবহেলিত জাতির
জীবনে তেমনি করিয়া এলো—রক্তরূপে ধ্বংস-
রূপে মরণের মাঝে এলো জীবনের বেহু
বাঁজাইয়া।

‘তুমি এলো যে শিবহৃদয়!’ তুমি এলো।

সমগ্র জাতি তোমার আশাপথে চাহিয়া
আছে।

বন্দেমাভ্যাস ॥

—(•):—

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
আনন্দোজ্জ্বল কাহিনী

সর্বজনীন বিবাহোৎসব

পরিচালক : সতু সেন
আলোক-চিত্রী : সুরেন্দ্রনাথ দাস
শব্দ-যন্ত্রী : জগদীশ বসু
সুন্দ-শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
ভূমিকায় : জীবন, মনোরঞ্জন,
দীপাঙ্ক, ডাঃ হরেন, জহর, মনি,
সত্য, বলিত নবরীণ, রাণীবালা,
কুমারী রেখা, গীতা, রেবা, পদ্মা।
অবিলম্বে আসিতেছে

কালী
ফিল্মসের



সর্বোচ্চ যুদ্ধর
চিত্রের প্রতীক

আগামী
চিত্রাবলী

বরবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ
সামাজিক কাহিনী

চোখের বালি

পরিচালক : সতু সেন
আলোক-চিত্রী : নন্দী সান্যাল
শব্দ-যন্ত্রী : মধু, নীল
ভূমিকায় : হুপ্রভা, হুথাজি,
ইন্দ্রিরা রায়, ডাঃ হরেন, হুথাজি,
হবি বিশ্বাস।

চোখের বালি
আশা ও নিরাশার এক
অপূর্ব প্রতিচ্ছবি!

বাঙালার
নব-নারীর চিত্র-আদর্শের
ভক্তি-রসাত্মক আলোচ্য

শ্রীকৃষ্ণ

বাঙলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীর
একত্র সমাবেশে

চিত্রগুলি চিত্র-
গৃহের সম্পদ
বাড়াইবে।

'রীতেনের'
নিকট হইতে
ছবিগুলি
সমৃদ্ধে অনু-
সন্ধান করুন।

বড়দিনের ও নব-বর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

কমলা টকিজের সামাজিক চিত্র-নিবেদন

রাজগী

শ্রেষ্ঠাংশে : মেনকা, ধীরাজ, শৈলেন, সত্য।

সকলের প্রশংসা-সম্মতিতে
সমগ্র, মগলী মন্ত্রমুগ্ধ!

শ্রী

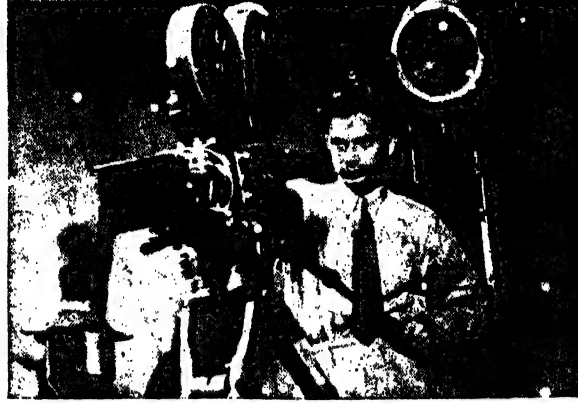
চলিতেছে

রীতেন এন্ড কোং
৬৮, বঙ্গভাষা স্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : কাল ১০২২-৩৬
গ্রাম : কলিকাতা

ও-বছর ও এ-বছর

(বিলাসী)

বাঙলার ফিল্ম-শিল্প আজ অগ্রগতির পথে। প্রত্যেক বছরের শেষে বিচার করে দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, ফিল্ম-শিল্প আমাদের দেশে প্রত্যেক বছরেই উন্নতির ধাপে ধাপে উঠছে। নিউ থিয়েটারের কথা বাহ দিলে অল্প ষ্টুডিও-গুলোর মধ্যে কালী ফিল্মস, ষ্টুডিও-ও অন্টারপ্রাইজের নাম যথাক্রমে উল্লেখযোগ্য। 'কোয়ালিটি'র দিক দিয়ে ছবির প্রভুত উন্নতি দেখা গেলেও 'কোমান্টি'র দিকে কারুরই ফোকাস নেই দেখা যাচ্ছে। গেল বছরে সবচেয়ে ভাল ছবি হ'য়েছে



বিমল রায়

ঘেরেঘের মধ্যে কমলেশ কুমারী (এন্টিডেন্ট) ও চন্দ্রাবতী (বিবি)। বহু বিজ্ঞাপিত ছবি হিলাবে "ইন্সপেক্টর" লক্সাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এবং পরেই নাম করা যায় "শশিনাথের" ও "রাজগীর"-র। নতুনদের অল্প কালী ফিল্মের নাম লক্সাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কারণ, নিউজরীলের



নীতীন বসু

—নিউ থিয়েটারের "বিবি" (বাঙলা) ও "এন্টিডেন্ট" (হিন্দি)। এরপরেই উল্লেখযোগ্য এন্টির "মুক্তি" কালী ফিল্মের "বস্ত্রমত টকী", কমলা টকীজের "রাজগী", কালী ফিল্মের "মুক্তিমান"। সবচেয়ে ভাল পরিচালক

হিলাবে সন্মান পেতে পারেন নীতীন বসু (এন্টি)। শব্দযন্ত্রী হিসাবে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তিনজন মধু শীল (কালী), সুকল বসু ও অতুল চ্যাটার্জি (এন্টি)। এরপরেই উল্লেখযোগ্য অগস্টীণ বসু (কালী) আলোকচিত্রী হিসাবে নীতীন বসু ও বিমল রায় অপ্রতিদ্বন্দী। এরপরেই উল্লেখযোগ্য যতীন দাস ও প্রবোধ দাস (রাধা) ও ননী দাত্তাল (কালী)। এ বছরে অভিনয়ে প্রথম সন্মান পেয়েছেন পুরুষদের মধ্যে শিশির ভাঙ্গড়ী (বস্ত্রমত টকী)



শিশির ভাঙ্গড়ী



চন্দ্রাবতী

এদেশে প্রযুক্তিক এরাই; ছবির শেষে বন্দেমাতরম; নলীতের পরিকল্পনা এদেরই; এদেশে পূর্ণ বৈধা ছাতির ছবি এরাই প্রথম তুলেছেন। এই ত' গেল এই বছরের মোটামুটি হিলাব নিকাশ। এখন আমরা আসছে বছরে কোন ষ্টুডিও থেকে শীগগিরই কী কী



কমলেশ কুমারী

ছবি 'মুক্তিলাভ' কোরবে তারই একটা
কিরিতি দিচ্ছি।

'নিউ থিয়েটার' থেকে প্রথমেই মুক্তি
পাবে ছেবকী বহু পরিচালিত বিভাগীপতি।



কানন

এরপরেই মুক্তি পাবে উপেন গাঙ্গুলীর
সমাজ-সমস্যা মূলক চিত্র অভিজ্ঞান।



জ্যোতি গাঙ্গুলী

শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন, বাড়ীলা
সংস্করণে মলিনা, মেনকা, ছেববালা



ছেবকী বোস

এই ছবির হিন্দি সংস্করণে বোম্বাইয়ে মুক্তিলাভ
করেছে। ছবিখানার ক্যামেরার কাজ
ও শব্দযন্ত্রের কাজ করেছেন যথাক্রমে
ইন্সফ 'মুল্লী ও লোকেন বহু। প্রধান
ভূমিকায় নেমেছেন—কাননবালা, হারা,
পাহাড়ী, দুর্গাধার, অমর মল্লিক, ছেববালা
প্রভৃতি।



পাহাড়ী সাতাল

ছবিখানা পরিচালনা করেছেন প্রফুল্ল রায়।
আলোক-চিত্রী হ'চ্ছেন, বিমল রায়।
শব্দযন্ত্রের কাজে আছেন বাণী বসু।



নাইগল

কানন গাঙ্গুলী, তম্বুর মল্লিক প্রভৃতি।
এরপরেই বোধহয় আমরা, ছেবতে



মলিনা



উষা



প্রমথেশ বড়ুয়া

পাঁচ নীতীন বছর দেশের মাটি।
এই ছবির আলোকচিত্রী পরিচালক স্বরূপ।
শব্দধর্মের কাজ করছেন সকল বহু।
ভূমিকার আছেন—সাইলাল, দুর্গাদাস,
তাহু* বানার্জি, উমা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি।
এ ছাড়া দু'নব্বয় ষ্টুডিওতে ছোটাইবাধু
তত্ত্বাবধানে প্রমথেশ বড়ুয়া অনতিবিলম্বে



হেমচন্দ্র

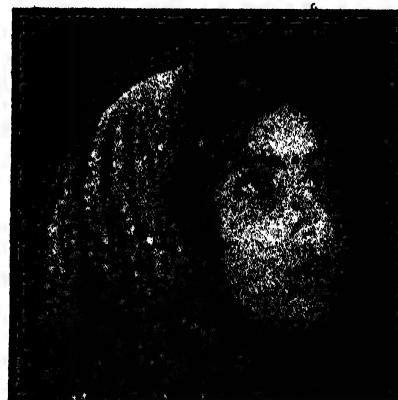
একখানা সামাজিক ছবি হিন্দি ও বাঙলাতে
তোলা আরম্ভ করবেন। এ ছাড়া হেম
চন্দ্রও একখানা ছবি তোলার আশুযজ্ঞিক
কাজে আপাততঃ ব্যস্ত।

কালী ফিল্মস্টুডিও থেকে প্রথমেই
আমরা দেখতে পাব শচীন সেনগুপ্তের
আনন্দোজ্জ্বল কাহিনী “সর্জজনীন
বিবাহোৎসব। এই ছবির পরিচালক
আলোক-চিত্র-শিল্পী, ও শব্দধর্মের কাজ
করছেন—বথাক্রমে লতু সেন, সুরেশ দাস,
জগদীশ বহু। ভূমিকার আছেন, জীবন
গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মণি সেন,



জহর গাঙ্গুলী

ডাঃ হরেন মুখার্জি, লতা মুখার্জি, জহর
গাঙ্গুলী, রাণীবালা, কুমারী রেখা, গীতা,
রেবা প্রভৃতি। এরপরই আসছে রঞ্জিত
মাথ ঠাকুরের চোৎখর আলি।
ছবিখানাতে ভ্রমরবরের মহিলারা অভিনয়



রাণীবালা

করছেন। মূল-ভূমিকা এই—সুপ্রভা
মুখার্জি, ইন্দিরা রায়, ডাঃ হরেন মুখার্জি,
ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি। পরিচালনা করছেন
লতু সেন, আলোক-চিত্রী ও শব্দধর্মী
বথাক্রমে ননী সাত্তাল ও মধু শীল। এ
ছাড়া “শ্রীকৃষ্ণ” নামে একখানা পৌরাণিক
চিত্রেরও কাজ প্রায়শঃ গাঙ্গুলীর নিজ
তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হয়েছে। ছবিখানার



দেববালা

শব্দধর্মী ও আলোকচিত্রের কাজ করছেন
জগদীশ বহু ও সুরেশ দাস। মূল ভূমিকার
আছেন—রাণীবালা, দেববালা, শিশুবালা,
সাবিত্রী, চিত্রা, জীবন গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন
ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। এদিকে ননী সাত্তাল
মহামান্না নামে একখানা সামাজিক
চিত্র পরিচালনা করবেন বলে জানা গেছে।



শিশুবালা

সাজান মশাই এখন এই ছবির আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যস্ত।

ঈষ্ট ইন্ডিয়া ষ্টুডিওতে মেট্রোপলিটান পিকচার নাম দিয়ে বি. বি. এল থেকার প্রযোজনায় হাল বাঙলা নামে এক-



বীরেন গাঙ্গুলী (ডি, জি)

খানা ছবি উঠছে। বীরেন গাঙ্গুলী এই ছবির পরিচালক। ভূমিকায় আছেন—মহাশেব পাল, হারা দেবী, প্রফুল্ল মুখার্জি, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতি। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কাহিনী চন্দ্রশেখর শীতাই তোলা শুরু হবে। নরেশ মিত্র গল্পটির চিত্রনাট্য রচনার আপাততঃ ব্যস্ত।

রাধা ফিল্মে কালীপ্রসাদ ঘোষ আত্মদেব নামে একখানা পৌরাণিক ছবি শীতাই তোলা আরম্ভ করবেন। যতীন দাস আলোক-চিত্র এবং ভূপেন ঘোষ ও নৃপেন পাল শব্দস্বরী হিসাবে কাজ করবেন। এ ছাড়া শোনা যাচ্ছে, অরুণ চৌধুরী নাকি এখানে অভিনয়ের ক্ষেত্রে পরিচালনা করবেন।

শ্রীভারতলক্ষী ষ্টুডিওতে মধু বোলের পরিচালনায় অভিনয় তোলা হচ্ছে।



অরুণ চৌধুরী

নাথানা বসু, অরুণ চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য প্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করছেন।

বেবদন্ত ষ্টুডিওর পরবর্তী আকর্ষণ হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গোরা। ছবিখানা পরিচালনা



সাধনা বোস

করবেন নরেশ মিত্র। ভূমিকা-লিপি এখনও সঠিক জানা যায় নি।

প্রফুল্ল পিকচারের নতুন ষ্টুডিওর নতুন অবদান হচ্ছে, কেশব শুক্লের হামির গল্প "লবের প্রমিৎ"। মূল ভূমিকায় অভিনয় করছেন—সমর ঘোষ, অরুণা, বেববালা ভাস্কর দেব, ভাসু রায় প্রভৃতি। এরপর এই ষ্টুডিওতে উঠবে প্রভাবতী দেবী নরস্বতীর দাদেন্দর স্মর্যাদা (বাঙলার) ও শচীন



অরুণা

চ্যাটার্জির ঐতিহাসিক কাহিনী মেঘমল্লা (বাঙলা ও হিন্দি)।

মিল্ম কর্পোরেশনের প্রথম ছবি হোপের কাজ আরম্ভ হবে আনুচ্ছে ক্ষেত্রগারী দাস থেকে। কর্তৃপক্ষ এখন ষ্টুডিও গঠনে ব্যস্ত।

এছাড়া ১৯৩৮ লালে আমরা অনেকগুলো ছবি পাব স্বাধীন প্রযোজকদের কাছ থেকে।

মতিমহল থিয়েটার জ্যোতিষ ব্যানার্জির পরিচালনায় রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে তুলবেন সান্ভিস সিকিওরিং এজেন্সী নামে একখানা পূর্ণ বৈধা ব্যঙ্গ-চিত্র।

হাজরা পিকচারের প্রথম অবদান 'কুঞ্জরা' কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। ছবিখানা পরিচালনা করছেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। আলোক-চিত্র ও শব্দ-লেখন করছেন বিভূতি লাহা ও যতীন দাস। ভূমিকায় আছেন—অরুণ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শিববালা।

ও-কে-এর প্রথম ছবি রূপোর কুমটকা জ্যোতিষ ব্যানার্জির পরিচালনায় রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আরম্ভ হবে এল। এতে অভিনয় করছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সত্য মুখার্জি, কমলা প্রভৃতি।

নিউ পপুলার পিকচারের আগামী আকর্ষণ হবে একখানা সাহাজিক ছবি।

চলচ্চিত্র এবং ভারতে তাহার প্রগতি

ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

বহুদিন হয় ভারতীয় জন সমাজ শিল্প বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে; দেশে শিল্প-উন্নতির বিষয়ে একটা লাড়া পড়িয়াছে। আধুনিক কলকর্জা ও মুরঞ্জাম লব্ধিমাধে ক্যাক্টরী বা শিল্পবেস্ত গঠিত হইয়াছে এবং পেশানে আধুনিক প্রচার শিল্প নামট্রী প্রস্তুত হইতেছে।

এই শিল্প-উন্নতির বিরাট স্রোতগণে ভারতে চলচ্চিত্রও যে তাহার বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইতি পূর্বেই উহা প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে 'অভীতে' এবং বর্তমানেও ভারত কতকটা চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষক এবং ইহাতে উহার (ভারতের) আদর্শের মানদণ্ডের নির্দেশ করিতেছে। ইহার উন্নতি বা পূর্ণতার জন্য ভারত অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং উহার চিত্র-লক্ষ্যগুলিও সেই আদর্শের অনুকরণেই লভ্য।

এর আনুসঙ্গিক কাজ নিয়ে এখন হারু চ্যাটার্জি বিশেষ ব্যস্ত।

কমলা টকিজের পরবর্তী চিত্র হবে সুফার দানপুণ্ডের লেখা রাজকুমারের নির্দ্বাসন।

এ ছাড়া আরও কতগুলো স্বাধীন প্রযোজকের ছবি ১৯৩৮ সালে উঠবে বল আমরা শুনি। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ না দেখে তাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলা এখন থেকে বৃজ্জবৃত্ত মনে করি না।

চিত্র-লক্ষ্যগুলির অবাধ প্রণয়নের অর্জবের কারণও উহার (ভারতের) আদর্শের দোহা বেটেনী। সাধারণ শ্রোতৃবর্গ বাহারা প্রশীক চিত্রগুলির বিষয়বস্তু উপভোগ করেন তাহাদের স্বার্থস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা অসম্ভব প্রয়োজন। বস্তুতঃ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতীয় চিত্র-শিল্পের এই প্রথমাবস্থাতেই বা শৈশুরাবস্থাতেই আমাদের মন মোহন করিতে পারে না এরূপ কুৎসিৎ চিত্র অতি বিরল বা পরিদৃষ্ট হয় না।

এখন আমরা দাবী করিতে পারি যে বত মনে করা হয়, চিত্র প্রণয়নের গতি তত মন্দ নয়। একদিকে, বিশেষতঃ কলিকাতা ও বম্বেতে বহু লংথক ছবিষর গড়িয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে দেশের সর্বত্র আরও অধিক লংথক ছবিষর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় প্রগতির বোঁড় অভিলষিত দিকে ধাবিত হইয়াছে।

ভারতে চলচ্চিত্রের উদ্বোধনের প্রেরণা উহার অন্তর-নিহিত বৈশিষ্ট্য হইতেই যে আলিয়াছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। চলচ্চিত্র নিজেই বা স্বভাবতঃই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান এবং উহার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহার তুলনায় যথেষ্ট মনোনিবেশের আনন্দ দান করিয়া থাকে, বস্তুতঃ এতই সন্তোষনা আনিয়া দেয় যে, উহা অতি সহজেই লব্ধা সর্বদা অনুভূত হইয়া থাকে এবং উহার সুবর্ণ সুযোগ চিত্রগৃহগুলি লানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকে। যেখান চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয় সেই দেশের নর নারীর জীবনী হইতে চিত্রের বিষয়-

বস্তুগুলি লংগৃহীত হইলে উহা আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। জনসাধারণের মনে ভারতীয় নর নারীর জীবন কাহিনী ও ভারতীয় বিষয়বস্তু বা চিন্তাধারালব্ধ চিত্র যেরূপ আনন্দ দান করিতে পারিবে নৈবেদ্যিক চিত্র, বৈদেশিক বিষয়বস্তু বা চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত কথাকথিত লেখ্যপারিবে না। ইহা হইতেই অনুমান করা যায়, কেন বৈদেশিক চিত্রগুলি ক্রমশঃ দৃশ্যপট ছইয়া বাইতেছে এবং দেশী চিত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বভাবে শৃঙ্খলান পরিপূর্ণ করিতেছে। তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, অনিন্দনীয় আনন্দ উৎস লক্ষ্যানে ছায়াচিত্রের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্যে লন্দেহের অবকাশ নাই। এছাড়া আরও একভাবে ইহার অনেক উপকারিতা আমাদের নিকট আছে। ইহা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার উৎকৃষ্ট বাহন। কারণ আর কোনও উপায়েই শিক্ষণীয় বিষয়কে এরূপ জীবন্ত বা প্রভাবশালী করা অসম্ভব। প্রধান প্রধান বিষয়, যাহা জগতে সর্বত্র ঘটতেছে তাহা যেতার বার্তার সাহায্যে প্রচার করাই ইহার শিক্ষার বাহন হিলাবে প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করার একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত।

সাধারণতঃ চিত্রদৃষ্টের সাহায্যে প্রদর্শিত শিক্ষা—অভিনীত উপাখ্যানের সাহায্যে আমাদের নিকট আসে। এই জন্যই বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সর (Board of Film Censors) প্রত্যেক চিত্রের প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিবার জন্য রয়েছে। তাহার দ্বিধিবে যে উহাতে জাতি বা সমাজের কোনও অনিষ্ট করে কিনা।

শ্যাক্কো কোম্পানীর খাঁটি সুবাসিত, মেডিকেটেড নারিকেল তৈল

ও
ইন্ডিনিং ফ্লোরা (হেয়ার অয়েল)

ব্যবহার করিয়া দেখুন কত হাতে ফল পান কিনা।
নিয়মিত ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল থাকে, মরামাষ উঠিয়া
যায়, কেশ বৃদ্ধি হয়, পাকা চুল কাঁচা হয়। বহু প্রশংসা
পত্র ও মেডেল প্রাপ্ত শ্যাক্কো কোম্পানীর তৈল ব্যবহার
করিতে ভুলিবেন না।

নূতন আবিষ্কার

কুইন মেরি (হেয়ার অয়েল)

সোনা ও ডোরা পাউডার

শ্যাক্কো কোম্পানী

২৬, বারানসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা

শনি ও রবিবার
৩টা, ৬-১৫ ও
৯-৩০ টায় :
অন্ত্যন্ত দিবস :
৬-১৫ ও ৯-৩০টা

পঞ্চম
সপ্তাহ

রাত্রিক মনোরমীর চোখে এখন গাঢ়
তন্দ্রা মিমিয়া আসিল অন্ধকারের
যবনিকের অন্তরালে যে নিদারুণ
নাটক শুরু হইয়াছিল :

দেবদত্ত ফিল্মসের

গ্রহের-ফের

তাহারই চমকপ্রদ চিত্রকাহিনী

কোন :

বি, বি, ৩৪১৩

রূপবানী

* নব বর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন *

আমাদের টকী মোসিন
তুলনায়
অন্ত্যন্তর চেয়ে
নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ হইবে।

নূতনভের কি.কি !

- ১। রোটোরীটাক সাউণ্ড গোট
- ২। বিম পাওয়ার এম্প্লিফায়ার
- ৩। হাই এণ্ড লো নোট স্পীকার

আপনি অতাই পুরাতনকে বাদ দিন এবং
“সিস্টোফোন” ক্রয় করুন
আপনার অর্থব্যয় সার্থক হইবে।

সিস্টোফোন লেবরেটরী লিমিটেড

ক্যাটরী ও ইন্ডিও : ১-৬৮, গোপাল দত্ত পার্কেস লেন (শুভ্রা) কোন : বি, বি, ১৬৬৪

অতঃপর, ছায়াচিত্র শিল্প বেকার লম্ভারও শুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ করিতে পারে। ইহার প্রসার যে খুব সীমাবদ্ধ নহে সেই ধারণা লইয়া ইহা লক্ষ্য লক্ষ্য লোকের জীবিকার বৃদ্ধি করিতে পারে। অস্ত্রাচার হস্ত তাহার হতাশ বৈষাণ্য জীবন-যাপন করিত। ইহাতে পরস্পর সজবন্ধ বহু বিষয় (operation) রহিয়াছে। চিত্র তৈরী হইতে চিত্রবিক্রেতার বাহিরের বহু রঞ্জিত চিত্র-প্রতিষ্ঠা (posters) পর্যন্ত ইহাতে পরস্পর সজবন্ধ বহু কর্ম কুশলতার (operations) অবকাশ রহিয়াছে। এই সমস্ত স্থানে (operation) নিয়োজিত লোক সংখ্যা লক্ষ্যে ধারণা করণ—তাহা হইলে স্বভাবতই মত প্রকাশ করিতে, ব্যাঘ্র হইতেন—যদিও আন্দোলনের কিছুই নাই যে, ছায়াচিত্র জগতে একটা শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে আমেরিকা মহাধেশে ইহা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সুতরাং এটা গৃহের বিষয় যে, ছায়াচিত্র শিল্প আমাদের দেশে দৃঢ়বদ্ধভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ইহাকে সংস্কার ও উন্নত করিবার অনেক কিছু রহিয়াছে। যে সমস্ত লোক ইহার নায়ক বা পরিচালক—গৃহাচার বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যাহাতে তাহার যেরূপ কোনও প্রকার উন্নত ধরণের সংস্কার করিতে পারেন। সম্ভবতঃ একদল স্থানে আমাদের দুই একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাওয়া ভুল হইবে না।

প্রথমতঃ ছায়াচিত্র গৃহে দৃষ্টি বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন। ইহাকে উৎকর্ষিত আনন্দ-উৎসর্গে লক্ষ্যগন মনে করিলে চলিবে না। চিত্রগৃহ হইল একটা কর্মক্ষেত্র, এখানে বিভিন্ন প্রতিভাশালী লোক সম্মিলিত হইয়া কলাবিজ্ঞান যে এক একটা নিপুণ নিদর্শন জনসমূহের নিকট ধরিয়া তোলে তাহাই হইল চিত্র। নিয়মাসুবিধা বা ব্যবহার

পদ্ধতি যদি ক্যান্টরী বা কর্মক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় হয় তবে চিত্রগৃহেই বা তাহার অভাব দৃষ্ট হইবে কেন?

এতদ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয় প্রকারের শিল্পীরাই তাহার উদ্বাসীনতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মধ্যে একত্রিত হইতে ইচ্ছুক হইবে না। তখন তাহারা দেখিতে পারিবে যে, এই সমস্ত সমিতির গতানুগতিক সংস্কার হইতে এখন দৃষ্ট।

ভারতের নিজস্ব ভাবধারা অনুযায়ী তাহার নীতিজ্ঞানের মানদণ্ড রহিয়াছে। তাহার চিত্রগুলির বিষয়বস্তু তাহার কেশাঙ্গ সজলিত হইবে না। এখানে এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকদের বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে, যখনই সমাজের কোন দোষ বা দুর্নীতিকে দূর সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয় তখনই সেখানে যথাসম্ভব তাহা দূর করণের লক্ষ্যে নির্দেশ করিতে হইবে। সময় সময় সমস্ত বিষয় উপস্থিত করা অপেক্ষা এইরূপ

বনকুসুমের উপকারিতা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া সহযোগে প্রস্তুত বনকুসুম কেশ তৈল নিত্য ব্যবহারে কেশ ও মস্তিষ্কের যাবতীয় দুর্বলতা সত্তা নিবারিত হয়। কেশের অকাল পকতা, কেশ ক্ষয়, কেশের স্রাবতা প্রভৃতি কেশ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাধি আরোগ্য হয়। অধিকন্তু রক্তচাপ (Blood Pressure) জনিত মাথাভার বোধ, চক্ষু জ্বালা করা, দৃষ্টি শক্তির অল্পতা, শিরঃপীড়া, শিরঃস্রাব প্রভৃতি মস্তিষ্ক ব্যাধি সত্তা প্রশমিত হয়। ইহা মরামাস, পুষ্কী প্রভৃতি চর্মরোগ দূরীভূত করিয়া কেশরাজিকে দৃঢ় ও সতেজ করে।

গোপন কথা!



আমি দেখেছি 'ওরা'

বনকুসুম

মাথায় মাখে
তাই অমন সুন্দর চুল



বিষয় নির্বাচনই অধিকতর কার্যকরী হয়।
যে সমস্ত দৃশ্য ইঙ্গিত শৈথিল্য বা
অবৈতিক কারণ সজ্জিত হইতে পারে
সে সমস্ত দৃশ্য বিশেষ সতর্কতার সহিত
জনসমাজের সমুখে উপস্থিত করিতে হইবে,
এবং কখনই ঐক্য দৃশ্য অসংজ্ঞিতভাবে
উপস্থিত করা সঙ্গত হইবে না।

শ্রম বণ্টন তথা বৈশিষ্ট্য রক্ষণটাই হটন
আধুনিক অর্থনীতির প্রগতি এবং ইহারই
উপর আজকাল শিল্প বাণিজ্য নির্ভর করে।
ইহা হইতে একজন সুনিপুণ কর্মীর সমস্ত
শক্তি বা যোগ্যতা একটা কর্মেরই নির্দিষ্ট
অংশ টুকুতে কেন্দ্রীভূত হয়। নিম্নতম মূল্যে
কিছুকষ্টে দ্রব্য সামগ্রী, প্রস্তুত হওয়ার ইচ্ছাই
ছিল কারণ। কিন্তু ভারতে চলচ্চিত্রে
অর্থনীতির এই নির্দেশ তথা যোগ্যতাসু-
সারে কর্ম বণ্টনের নীতি বিশেষ অগ্রদূত করা
হয় নাই। বস্তুতঃ আমাদের দেশেও নায়ক,

চিত্রকর, গায়ক, পরিচালক প্রভৃতি নারহিয়াই
এমন নহে কিন্তু তাহারের কর্মনীমা বহুধা
বিত্তক। নীতির দিক হইতে আমাদের
ব্যক্তিগত নির্দেশ অগ্রদূত করিলে প্রগতি-
রাই লাভবান হইবেন এবং আমাদের বিশ্বাস
তাহার তাহারের কর্মসমূহে ইহার মধ্যে
সম্প্রদায় করিবেন।

যে সকল ব্যক্তিরা তাহারের স্ব স্ব
পন্থাতেই যশোপার্জন করিয়াছেন কেবল মাত্র
তাহারেরই নিয়োগ করিবার বক্ষণশীল নীতির
লব্ধে এখন আমরা আলোচনা করিব।
আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাহারের
সন্ধান লইয়া উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে
প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হইতে পারে, তাহা
না করিয়া বরং অভিনেতা, অভিনেত্রীদের
নিয়োগ মনোনিয়ম। অনেক সময় ব্যক্তিগত
ইচ্ছা বা লক্ষ্যভূতি দ্বারা অথবা বাজারের
বড় বড় অর্থহীন, মূল্যবিক্রপনের প্রহসনের

দ্বারা পরিচালিত হয়। এই জন-
সমাজের মধ্যে হরত একরূপ লোক আছেন
যাহারা সুযোগ পাইলে Jackey
Coogans বা Shirley Temple হইতে
পারিতেন। আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য
দেশে যেভাবে অভিনেতা অভিনেত্রী
প্রভৃতির তত্ত্ব সংগ্রহ করা হয় আমাদের
দেশে কি ঐ রূপ পন্থা অবলম্বন করিবার
কোনও সুযোগ নাই? প্রগতি বা পরি-
চালকগণ এককুর ভাবিয়া দেখুন যদি তাহার
ঐ সমস্ত অজ্ঞাত প্রতিভার সন্ধান হইয়া
তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্যে নিয়োজিত করিতেন
তাহা হইলে তাহার কত প্রভূত অর্থ উপার্জন
করিতে পারিতেন।

পুনশ্চ বৈদেশিক বিষয় বস্তুও ভাবধারাকৈ
দেশীয় চিত্রে অগ্রদূত করিবার মত মূল্যমিও
লব্ধ সময় পরিদৃষ্ট হয়। ইহা হইতে
আমাদের অক্ষমতাই প্রমাণ হয়। ভারতীয়

আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা।

আপনাদের ব্যবসায়
শ্রীবৃদ্ধি হউক!
এবিষয়ে আমাদের আন্তরিক
সহায়তা পাইবেন

বি, নান

এডভার্টাইজিং কম্পানী

১৬৩এ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা।

কোন মং বড়বাজার ৩২০৪

*

নিম্নলিখিত সিনেমাগুলির প্লাইড বিজ্ঞাপনের
সোল-এজেন্ট এবং এজেন্টঃ

রূপবানী, শ্রী, উত্তরা,
পূর্ণবিজয়টার, ইটালী
টকীজ চিত্রপুরী
(গিদিরপুর) মায়াপুরী
(দ্বিধপুর) বজ্রবানী
(হাওড়া)

মফঃস্বলের অত্যন্ত
অনেক সিনেমা।
সমস্ত বাজালা ফিল্ম-
প্রোগ্রামের ঠিকিষ্ট।

পোষ্টার লাগাইবার কাজ বিশেষ
যত্নের সহিত করা হয়।
সিনেমার প্লাইড ও ডিজাইন
প্রস্তুত করিয়া থাকি।

কুটির ভাব ধারাতাই যথেষ্ট অভিনব বিষয়
বস্তুর সমাবেশ বিহীন এবং চলচ্চিত্রে
উদ্ভাবনই যথেষ্ট আদর হইতে পারে।
যাহাতে ভারতীয় জীবনকে সূক্ষ্ম করিয়া
উঠান হয় এইরূপ কোন চিত্রে 'ঐচ্ছন্দিক'
কোনও বিষয় বস্তুর স্থান দেওয়া বস্তুতঃই
সিদ্ধনীয়।

এই সমস্ত আলোচনার মূল কথা এই
যে, ভারতে চলচ্চিত্র তাহার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত
করিয়াছে। ইতিপূর্বেই ইহার বহুলাংশে
উন্নতি হইয়াছে এবং যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন
করিয়া বলিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উন্নতি,
জনপ্রিয়তার কারণ শিল্পের বহির্ভাগ হইতে
আলিয়াছে; সুতরাং ইহাকে এখনই বতস্বর
লম্বব সংস্কার করা উচিত এবং তাহা হইলেই
আমাদের অভিযান সার্থক হইবে।

শুনেছি এই চিরদিন

ত্রিভুজেন্দ্র নাথ ভাট্টা, কবিরত্ন

শুনেছি এই চিরদিন

ঐশ্বর্য কথায় প্রাচীন গাথায়

আকুল চির বিরহীর

প্রাণের ব্যথায় মিলবে তোমায়!

সকল দিনে সকল সাথে

বেদন ভরা কাঁদন মাঝে

তোমার বিগ্না মোহন বাজে;

মহিমায়

পুলক হলে খেল যার

সকল ছায়ায় সকল কথায়;

তখনি দূর করে দাও

সকল বিবাহ সকল বাধায়;

শুনেছি এই চিরদিন

ঐশ্বর্য কথায় প্রাচীন গাথায়! •

এই যে প্রাণ চরণে লীন

রইল বলে এত যে দিন

বাগ্ন আকুল ব্যথিত কণিণ

তবু হায়

নবীন পূর্ণ গরিমায়

কেন বা তোমায় আজিও না পায়!

বিচিত্র কত ভঙ্গিমায়

সুখই খেলাও জীবন খেলায়!

বলনা আর কতদিন

হলবে হেলার ব্যথায় আমায়!



প্রমুখ পিকচারসের নবতম হাসির নক্সা

'বিবাহ করিবনা', 'উপার্জনক্ষম না হইলে বিবাহ
করিবনা', 'বিবাহ পাপ' ইত্যাদি আধুনিক
যুবমণ্ডলীর 'আইবুডো' থাকার এই 'গ্লোগানগুলি'
কি প্রভুত প্রেম বর্জন না প্রেম পাত্রীর
অন্যরূপ মন বিকলন?

কাহিনী :—কেশব গুপ্ত এম-এ, বি-এল

পরিচালনা :—নির্মল গোস্বামী

আলোক-শিল্প :—মাস্টার্স ক্লারগেলুট

সঙ্গীতলেখন :—ডগলাম ওয়ালটার

ব্যবস্থাপনা :—হরি বন্দ্যোপাধ্যায়

স
খ
ে
র
শ্র
ম
িক

'বিবাহবারণ' সমিতির' অচলারতন তুর্গ
কোন পথে বর্ষা হইল? •

: ভূমিকায় :

ভাস্কর দেব (এঃ), কাহ্নু রায় (এঃ), সমর ঘোষ,
সত্য ঘোষাল, সান্ন গোসাই, বোকেন বোস (এঃ),
বিজলী মুখার্জী, পশু ব্যানার্জী, অমল গুহ,
দেববালা, অরুণা, কমলা, উমা প্রভৃতি

পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং

৬৮, বসন্তলা স্ট্রীট, কলিকাতা

শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের

মেমোরান্ডাম (ঐতিহাসিক)

(বাংলা ও হিন্দী)

* পরবর্তী *

* আকর্ষণ *

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

দানের অধ্যক্ষ (সামাজিক)

(বাংলা)

ইস্কান্দারী বার্ষিক সংখ্যা

শিবন গাঙ্গুলী ও মলিনা। নিউ থিয়েটার্সের
দ্বি “অভিজ্ঞান” এর অভিনয়
কারছেন প্রথম ও সঙ্গার ভূমিকায়।
• পরিচালক প্রফুল্ল রায়।



নিউ থিয়েটার্সের “বিজ্ঞাপতি” (বাংলা)
চিহ্নে অমর মল্লিক ও কাননদা
যথাক্রমে বিভূষক ও অন্তরঙ্গ ভূমিকায়।



মুক্তি প্রতীকায় ওরিয়েন্টাল কিনেটোন
আর্টসের সামাজিক ছবি “রূপোর
ঝুমকো”র একটি দৃশ্যে পারুল ও কমলা।

সিনেমার নব-পার্যায়

তিনির্মল বসু .

চিরকাল ধরিয়া যে ধরণের চিত্র দেখিয়া পরিবর্তন হয়। পরিণত আলিতেতি, তাহাতে আর মন লাড়ি দেয় বহুসে মানুষ যে-সব না, আনন্দ পায় না। প্রায় সকল দর্শকই উপভোগ পাঠ করে— এই কথা বলিতেছেন। চিত্র-নির্মাতা কিন্তু বিচার করিয়া পড়িয়াছেন মহা বিপদে। কাঁচা পরলা পাঠ করে। উপ-ধরচ করিয়া তিনি বহু আশা মনে লইয়া 'দেশের মাটি'র মধ্যেও সে



ক্যামেরার জিগল চোখে "দেশের মাটি"-র কর্মবৃন্দ

যে ছবি দর্শকদের সামনে ধরিলেন, তাহার আয়ু শেষ হইল অতি কমকাল মধ্যে। এই মহা বিপদ হইতে ত্রাণ লাভের পথ কি— এবং কেইবা তাহার নির্দেশ দিবে? বাহির হইতে নির্দেশ যদি না আসে তাহা হইলে চিত্র-নির্মাতাকে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের পথ নিজেকেই বাহির করিতে হইবে। মানুষের মন পরিবর্তন ভালবাসে একক পরিবর্তন চায়। কাজেই আমাদের চিত্র-শিল্পেও পরিবর্তন লবল দর্শকই আশা করে।

তুলে বহুসে মানুষ গল্প-উপভোগ—নিছক বাজে উপভোগ পাঠে, আনন্দ লাভ করে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ লগে লগেই তাহার রুচির

সমাজের, দেশের, জাতির, সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণকর বস্তুর সন্ধান করে, এবং যে উপভোগে মানুষ ঐ লবল না পায় তাহাকে বাজে বলিয়া ঘুরে নিক্ষেপ করে। চিত্রেরও প্রায় ঐ অবস্থা হইয়াছে।

দর্শকমন 'যখন শিশু ছিল, তখন যে কোন চিত্রেই



"দেশের মাটি"-র লোকেশনে মিঃ পি, এন্স রায় ও মিঃ বি, এন্স সরকার।

দর্শক প্রচুর আনন্দ লাভ করিত। কিন্তু এখন দর্শকচিত্ত তাহার শৈশবকাল কাটাইয়াছে, কাজেই বাজে বা একেজো জিনিষে তাহার মন উঠে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে— কেবল নিছক কাজের, কঠোর সত্য বস্তুতেও মানুষ লবল আনন্দ লাভ করে না। অথচ কঠোর সত্যকে যদি যথাযথ রসপূর্ণ করিয়া পরিবেশন করা যায়, তাহা হইলে মনও তাহা লানন্দে গ্রহণ করে।

বর্তমানে বাংলার একজন প্রডিউসার এই সত্যকে বোধ হয় মানিয়া লইয়াছেন। তাই তিনি আজ চিত্রশিল্পকে কেবল বাজে আনন্দের বা খেলার বস্তু বলিয়া মনে করেন না। পৃথিবীতে সকল বিষয়ের যেমন একটি আদর্শ থাকে—সিনেমারও সেই প্রকার আদর্শ থাকা উচিত এবং আছেও। অজ্ঞাত। দেশে



"দেশের মাটি"-র সঙ্গীত পরিচালক পঞ্চজ বসু ও জ্ঞানজ্যোতি নিউজপেপালের ম্যাজি ডিরেক্টর অক্ষয় সরকার "দেশের মাটি"-র শূটিং দেখছেন।

যেমন কল্যাণময় সিনেমার কথা আমরা শুনিতে পাই, সেই প্রকার কল্যাণময় সিনেমার রূপ বোধহয় এতদিন পরে স্নাতকবর্ষেও সার্থকভাবে দেখিতে পাইব।

“দেশের মাটি” চিত্রখানি যে কাহিনী, যেকোন সৌন্দর্য, যে আনন্দ—সে এবং আদর্শ লইয়া গঠিত হইতেছে, তাহা এতদিন আমাদের মানস লোকেই ছিল। এই চিত্রের কাহিনীর মধ্যে দুইজন যুবক দুইটি বিভিন্ন আদর্শ লামনে লইয়া জীবন যাত্রা

কর, কিন্তু কল্পিত মনে আছে দুইজন পণ, প্রাণে অফুরন্ত আশা। কাজের নেশায় তাহারা সকল প্রকার ভালস্ত বিলাস ত্যাগ করিয়াছে। যাত্রার সার্থক লক্ষ্যান্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের মা আছে বিশ্বাস, না আছে শাস্তি। প্রকৃতির সহিত বাহুবলের যোগসূত্র কোথায়, “দেশের মাটি” দেশের সন্তানের সকল দুঃখ হারিত্র দূর করিতে পারে কিনা, তাহাও এই দ্বিত্রে দেখিতে পাইব।

যে চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ কামনা সকল দেশবাসী প্রথম হইতে করিয়া আসিতেছেন সেট ভারত গৌরব চিত্র প্রতিষ্ঠান নিউ-ঘি য়ে টা সের কল্যাণ কামনা আবার এত নব-বৎসরের প্রথম দিনে আমরা নূতন করিয়া করিলাম। লোকচক্ষুর অন্তরালে

= গান =

ত্রীদেবানীষ সেনগুপ্ত

স্বপন আমার লক্ষ্য হগো
আদিলে কি প্রিয় পথ ভুলি
তোমার চরণ পরশ লভি
ধন্য পথের মলিন ধূলি।

যোছন সায়েতে গোবুলি লগনে
বুঝি বা কুসুম ফুটিল গগনে
কাননে কাননে বুঝি আনন্দনে
গাছি ওঠে বুলবুলি
স্বরণের ধারা—হলো দিশেছারা
ঝরি পরে তব মাণে
চাঁদ মুগ্ধ হেসে বধু ভালবেসে
পীরিত্তি বাধিল লাগে।

সোনার স্বপন লক্ষ্য করিতে
এলে কি গো প্রিয় আমাদের বরিতে
ফুলকোটা সনে মধুর লগনে
কনকদোলায় ছলি।

“দেশের মাটি”-র একটি বিশিষ্ট দৃশ্য

ভারস্ত করিল। দুইজন অভিন্নপ্রাণ বন্ধু— মনে প্রাণে তাহার এক। কিন্তু তাহাদের আদর্শ লইয়া বাধিল জীবনব্যাপী সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যে আমরা আমাদের দেশের বর্ধমান বহু অভাব-অভিযোগ, বৈজ্ঞানিক পরিচয় পাইব। যা দেখিতে পাইব, তাহা হয়ত প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনেই ঘটিতেছে, কিন্তু তাহা চোখে পড়িলেও মনের দুরারে কোন বা বা আঘাত তাহারা দেয় না।

“দেশের মাটি” চিত্রখানি চিত্রায়িত পথ ত্যাগ করিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন পথে যাত্রা করিয়াছে। এই পথে বাধা প্রচুর, বিপ্লব

যে ব্যক্তি এই মহান চিত্রপ্রতিষ্ঠানের সকল দুঃখ-বেদনা নিজ অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভারতে নিকামভাবে “চিত্র-লাধনা”র মগ্ন রাখিয়াছেন—সেই ব্যক্তিকেও আমরা নব বৎসরের নব-প্রভাতে আমাদের সকল শুভকামনা জানাইতেছি।



এন্টর “দেশের মাটি”-তে শ্রাম লাহা ও ভাহু ব্যানার্জি



পরলোকে পরিচালক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

আমরা গভীর ভ্রমের সহিত জানাটতেছি যে, পরিচালক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় গভীর সোমবার কয়েক ঘণ্টা রোগভোগের পর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন।

শৈশব হইতে কলাচর্চা লইয়া তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। কলিকাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাধা করিয়া তিনি 'ম্যাডান কোম্পানী'-তে ফিল্মশিপ শিক্ষাকল্পে প্রবেশ করেন—এবং বাঙলা ফিল্মশিপের প্রবীণতম শিক্ষাগুরু প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর অধিনে কাজ করিয়া চিত্ররাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তারপর কালী ফিল্মস্ আজ যে গৌরবের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, তাহার কিছু সময়ের দাবী জ্যোতিষবাবুর ছিল। কালী ফিল্মসের হইয়া বহু ছবি এবং 'উত্তরায় চলিতেছে', 'মালাবরণ' ও 'কচি-সংসদ' তিনিই পরিচালনা করিয়াছেন। এতদ্বির 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়াতে' তিনি 'পথের শেষে' ও 'পায়ের ধুলো' পরিচালনা করেন। যুত্মর পূর্বে জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে মেট্রোপলিটন পিকচার্সের একাধাণা এবং মতি মহলের একাধাণা ছবি পরিচালনা করিবার চুক্তি হয়। বাঙলার অগ্রতম শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্পাদক হিলাবেও জ্যোতিষবাবুর বখেষ্ট সুনাম ছিল। আমরা তাঁর আত্মায় সদাশ্রিত কাঁশনা করি।

নীলব দান

ত্রীগোপাল চন্দ্র দাস

তুমি ডাকনিক, এনেছি তব

নবার আগে

হে দাতা, তোমার গৃহ-উৎসবে,

কানের যাগে।

ছিল জনময় আত্মনা তব

মহারাতে;

আকাশের মারা ছিল ক্রীড়ারত

চন্দ্রিকাতে।

বিহার করিলে একে একে সব,

মুগ্ধপানে চেয়ে রহিত নীরব;

মনের কণাটি কহিতে পারিনি

তোমার মনে।

তুমিতো তখন ছিলে মাতোয়ারা,

আপন-আবেশে আপনাতে হারা,

কতই না কথা কহিলে হে প্রিয়,

আপন মনে।

শুধু দ্বিটি মোর বলেছিল, "হেই

অকিঞ্চনে।"

কি জন্মি আবার আশিরা না জানি

সমোপনে

ডাকিলে আমার মিনতি-কাতর

সম্বোধনে।

তাইতো তখন কিছুই না নিয়ে

ফিরিত ঘরে

শুধু তোমার ন্যূনে যা' ছিল

হরণ করে।

সে-চাহনি ভ'রে কী যে ছিলে ভাই,

তাঁহার হিলাব আজ্ঞে মেলেনা হই;

তবুও কেন যে সে-পাওয়া আমার

বন্ধে রাজে।

স্বপ্ন আজিকে কাণ্ডের কাণ্ড

ভরিয়া উঠেছে জান'-অজানায়,

তোমার সে ভাষা আজিকে আমার

নকল কাজে।

চেয়ে দেখ, তাই শোভিছে এ-শির

ভয়ের তাজে।

‘উৎকৃষ্ট চশমা’

খুব সুন্দর ন্যূনো

ক্রম করিতে হইলে

আমাদের দোকানে

অনুসন্ধান করুন

আমাদের বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা

সিনা পারিশ্রমিকে চক্ষু

দেখাইয়া চশমা ব্যবস্থা করিয়া

থাকি।

নুখাজী বাদাস
চশমা বিক্রোতা
৫৮, গ্রে ক্রীট, কলিকাতা
হাতীমগান বাজারের পূর্বদিক।

মুহূর্ত

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য

পৃথিবীতে অনেক সময়ে অজ্ঞানতার পক্ষে
বেঁচে থাকারাই সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার!
নীহারের এই কথাটিই এই বর্ণনামূলক লক্ষ্যের
মাঝে বিশেষ করে মনে পড়ে গেল। ঘোলাটে
আকাশের বৃষ্টি থেকে অবিশ্রান্ততার রুষ্টি
ঝরে—বিরামহীন বিশ্রামহীন গতিতে।
সেই বৃষ্টি আজ সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে
এখনও পর্যন্ত তার একটু ধারণা হোল না।
সারা বেহুতা সিন্ধু, ভাঙ্গা ছাতাটায় কোন
বাধাই মানে না, তবুও মনকে প্রবোধ দেবার
জন্তে এই ভাঙ্গা ছাতাটাকেই লম্বল করতে
হয়েছে আজকের রুষ্টির আক্রমণকে প্রতিরোধ
করবার জন্তে।

মাঝে মাঝে কড় কড় শব্দে বজ্রধ্বনি হচ্ছে,
জ্বরের তন্ত্রীগুলিকে কাঁপিয়ে দিয়ে। নীহার
চলেছে।

লম্বল দিনের পরিলক্ষণে মন তার ক্লান্ত-
শ্রান্ত। অফিসের গুরু কর্তব্যের, তারপর
আবার জ্বর অসুখ, উদ্বেগ ভাবনা অর্থহীনতা
মনকে তার বিধিয়ে তুলেছে। 'সত্যি এরকম
জীবনের কোনও মানে হয় না।' সামান্য
উদ্বেগের সংস্থানে এই অমাস্থিক অক্লান্ত
পরিশ্রম! সকাল না হতেই চা না খেয়ে দুই
মাষ্টাল রাস্তা ঠেলে ছাত্র পড়াতে যাওয়া মাসের
শেষে কয়েকখণ্ড রক্ত মুক্তার প্রলোভনে এবং
প্রয়োজনে। তারপর ফেরবার পথে বাজার করে
আন', কয়েক বালতি জল মাথায় ঢেলে কোন
রকমে দুইটি নাকেমুখে গুজে লফিলে ছোটা।
ফিরে এসে আবার সংসারের দাবী মেটানো,

দোপ'র খরচ থেকে আরম্ভ করে মুষ্টির বিল,
'গায়ালার হিসাব, কয়লার খরচ মাসে
কমাবার ব্যবস্থা করা', লক্ষ্যের আবার টিউশনি
করা—এরপরও আবার আজ ছেলের সদি
জর, মেয়েটার প্যানপেনানি কামা, অসহ্য!
ভেমানি হয়েছে জ্বর স্বাস্থ্য! বিয়ের বহর চারেক
পর থেকেই সেই যে অসুখ লেগেছে, আজ
পর্যন্ত আর তাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে দিচ্ছে
না। আজ হ'বহর জ্বর অসুখে তার
চিকিৎসার ব্যয় তার বহনে নীহার লক্ষ্যস্থান
হয়ে উঠেছে। অফিসের মাইনের কটি টাকা
দিয়ে কোনরকমে দিনের অন্ন সংগ্রহ করা
হোত, এখন আর ডাক্তার ক্রিতে এবং ঔষধ
পথের ব্যয়ে আর তা সম্ভবপর হয় না।
সকালে লক্ষ্যের তাই টিউশনি জোগাড় করে
নিতে হয়েছে। কিন্তু তবুও নিষ্ঠুর সংসারের
প্রয়োজনের দাবী মেটে না! এরই নাম
বেঁচে থাকা', এরই নাম সংসার!

নীহারের লম্বল অন্তর বিজোহী হয়ে
উঠে। রাস্তার মোটরগুলি চলেছে—সুসজ্জিত
চালের অধীশ্বর আরোহী আরোহিনীদের নিয়ে
লাক্ষ্য বিলাস ভ্রমণে—রাস্তার পথচারীদের
গায়ে কাছা ছিটিয়ে দিয়ে। ওই রিক্সাওয়ালাটা
ছুটে চলেছে টিং টিং আওয়াজ করতে করতে
তার ওপর অধিরূঢ় ভদ্রলোকটি ওয়াটার প্রপ
গায়ে তিনিও চলেছেন রুটিকে উপেক্ষা
জানিয়ে, লোকভক্তি বাসগুলিও লম্বল ছুটে
চলেছে তার মতন পথচারীর গায়ে কাছা জল
ছিটিয়ে দিয়ে, কী আশ্চর্য পৃথিবীতে সেই কী

সবচেয়ে হীন পিঁচড়ে হতভাগা! কটা
পরলা খরচ করে বাসে করে বাড়ী ফিরবারও
সার্থক্য তার নেই। সকাল বেলা অফিসের
দেয়ী হয়ে যাবার ভয়ে যেতে হয় বাসে চেপে,
ফেরবার সময় বাস খরচাও আর জোটে না।
এইতেই সংসার অচল। দিনের অন্ন সংগ্রহের
জন্তে এমনি অমাস্থিক জীবন যাত্রা, তাকে
নির্ব্বাহ করতে হয়। অথচ সে ভদ্রলোক,
সে শিক্ষিত, তার আছে বুদ্ধি-সংসার-স্বীপুল
পরিশ্রম। আদর্শ তাকে স্থাপন করে যেতে
হবে, লোক লৌকিকতা তাকে করতে হবে,
নিজেকে এমনি করে নিষ্ঠুর বাস্তবিক জীবন
যাপন করে, নিজের আত্মার বিলাসকে সুখ
স্বার্থকে তিলে তিলে হত্যা করে। তবুও
কবি গাইবেন সুখ-স্বপ্ন-আশা আনন্দের গান!

নীহারের অসহ্য বোধ হয়। লম্বল
অন্তরটা তার বিজোহের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত
হয়ে ওঠে—সে ফেটে বেরিয়ে পড়তে চায়
বিশুবিস্ময়ের মত!

মহানগরীর রাজপথের দোকান গুলিতে
জলে উঠেছে সুগভ্র বিজলীবাতি। কাপড়ের
দোকানের সো কেশগুলিতে স্তরে স্তরে
লাজানো রয়েছে মূল্যবান সুশ্রুত রঙ বেরঙ এর
শাড়ী। ক্রেতার হলেরও অভাব নেই।
এমনি রুষ্টির মাঝেও এসে দাঁড়াচ্ছে মোটর,
নামুছে তা থেকে শৌধীন স্ত্রী-পুরুষ ক্রেতার
দল। সো কেশের কাছে থানিকটে থমকে
দাঁড়িয়ে পড়লো নীহার। একখানি সুন্দর



ইন্দিবিমান চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ব্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

মেগাফোনের জানুয়ারী মাসের নতুন রেকর্ড

১৯৩৮

- J.N.G. { কান্তরা রাধিকা দেখিরা আধিকা (কীর্তন) Miss
5188 Kamala (Jharia)
সুন্দরী তৈ খনে কহিলাষ তোর (কীর্তন) —do—
J.N.G. { তোর আমার সুখ-মালকের ফুল (ভাটিয়ালী)
5189 Kumari Uma Das Gupta (Amateur)
বধু অমর গঙ্গি তোর বঁশীর (ভাটিয়ালী) —do—
J.N.G. { কোথায় রইলে আমার প্রাণ বন্ধু (পল্লীগীতি)
5190 Sm. Anantabala Vaishnabi.
তোমার জন্তে প্রাণটি আমার—(ভাটিয়ালী) —do—
J.N.G. { যেথায় অতীত দিন (আধুনিক) Sj. Niranjana
5191 Mukherjee.
তার আধিতে আছিল জল (আধুনিক) —do—
J.N.G. { বাণী বাজলো গো নখি (গ্রাম্য-সঙ্গীত)
5192 Swarupdas Vaishnab & Kamini Vaishnabi.
আমার মনের মাহুঘ (গ্রাম্য-সঙ্গীত) —do—

- J.N.G. { সুবল এনে দেখারে রাধা (গ্রাম্য-সঙ্গীত) Nabindas
5193 Babaji. & Nandarani Vaishnabi.
বুলে গো আমার প্রেম কহে (গ্রাম্য-সঙ্গীত) —do—
J.N.G. { 'মাল' এর ব্যবসা ১ম খণ্ড Sj. Tulsī Lahiri, B.L.
5194 'Mass' এর ব্যবসা ২য় খণ্ড —do—
J.N.G. { পর্বতর তলে দি ভরা নৈ (অলম্বীয়া)
5195 Labanya Prava Hazarika.
হালিছে ঐ বেলরে ডাল —do—
J.N.G. { হরির নামে একাকি (অলম্বীয়া) Sj. Surendra
5196 Ch. Nath.
কায়নো বাতরি আনিত ফাগুনী —do—

মেগাফোন

কলিকাতা



সাহিত্য-সূত্রাট শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ নাটক

* মোড়নী *

প্রযোজক :—ভূর্গাদাস : : সঙ্গীত :—ভজান দত্ত

J.N.G. 5148 to J.N.G. 5156

৯ খানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ

ইলেকট্রিকের

যাবতীয় জিনিষ আমরা বিক্রয় করি, সরবরাহ করি
ও মেরামত করিয়া থাকি।

আমাদের বিশেষত্ব

ক্যান মেরামত ও সরবরাহ। উৎসব ও বিবাহে
অস্থায়ীভাবে ইলেকট্রিক সংযোজনা। পাইপ ওয়ারিং,
ছাপাখানার মটর সরবরাহ ও মেরামত।

ইলেকট্রিক

সম্বন্ধে যা' কিছু দরকার আমাদের কাছে সর্বত্র
অনুসন্ধান করিবে।

এ, কে, মুখার্জি এণ্ড কোং

ইলেকট্রিসিয়ান ও কন্ট্রাক্টর

৫৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।



সুন্দর ছাপা যদি

ঠিক সময়ে চান

আসুন তবে

খেয়ালী প্রেসে

১১, চক্রবেড়িয়া রোড সাউথ

ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন : সাউথ ৪৬৬

ময়র আঁক দি কর শাড়ী তার দৃষ্টি আকর্ষণ
করলো—কব্য মধুর চমৎকার তার আবার
একটা নামও দেওয়া হয়েছে। নীহারের
বনের ভাবে খানিকটা পরিবর্তন ঘটলো।
নীহার ভাবলে শুভা! শুভাকে হয়ত
চমৎকার মানার এই কাপড় খানি পরলে।
দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে তার সুন্দরী বেসুন্দর
হলি হয়ে এদেঁচে, তিপটিপে পাতলা
গড়নিটা ভেঙ্গে পড়েছে অন্নরাগের নিদারুণ
আক্রমণে—লম্বা সুতী মুখখানি নীল শিরায়
সুখানিত—হাড়গুলি দেখা যায়। টামা টানা
ফেঁদে ছটির কোলে নেমেছে ক্রান্তি স্থানি
অবদার এবং অসহায়তার মনোবর্ণ রেখা—
কিন্তু তবুও আজ তাকে একেবারে অসুন্দরী
বলা যায় না। লক্ষ্যার অম্পট আধারে
গভীর রাত্রির প্রগার অন্ধকারে কিংবা ভোরের
পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজালু নয়ন-
পল্লবে জেগে থাকে সৌন্দর্য্যের ঝিকিঝিকি।

নীহার! শুভা এখনও তাকে আনন্দ হিতে
পারে! লাজ লজ্জা করলে শুভাকে আজিও
দেখার সুন্দরী! শাড়ীখানি শুভাকে কিনে
হিলে বেশ হয়। কিন্তু তার সঙ্গে লম্বুক
লাঙ্গা একখানি কার্ড—কাপড়খানির মূল্য
তালিকা বেখেই এবং নিজের পকেটের শূন্য-
তার কথা অসুভব করেই মনটি তার হু হু
করে উঠলো। আটশ টাকা—ও! তাকে
মালের প্রায় কুড়িদিন খাটতে হয় এই টাকা
উপার্জন করতে। অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব
তার পক্ষে এ বিলাসের স্বপ্ন দেখা। বিবেক
তার পুনর্ব্যার গর্জন করে উঠলো তার এই
মৃত্যুর জন্তে। হোকানের বাড়িটা নির্মম
ভাবে জানিয়ে দিলে তার কাছে প্রতিটি
মুহূর্তের মূল্য—এখন তাকে ফিরতে হবে
বাড়ী, তারপর আবার যেতে হবে টিউশনি
বজায় রাখতে।

নীহার দ্রুততর গতিতে বাড়ীর দিকে পা
চালিয়ে দিলে।

ভাঙ্গা ছাতাটি ধরে বুটির জল গড়িয়ে
পরে নীহারের বেসকে লিঙ্গ করে দিলে—
বুটির আক্রমণকে আর কিছুতেই প্রতিরোধ
করা যাচ্ছে না। নীহার নিরুপায়—নীহার
আকাশের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে একবার
তাকিয়ে বেঁধে নিলে। বোলাটে আকাশ—
গা বেয়ে তার অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণধারা
গড়িয়ে পড়ছে—নিরুত্তি তার অনতিবর্তীক্ষণের
মধ্যে নেই বলেই অসুভূত হচ্ছে—বাড়ীর পথও
বিশেষ নিকটবর্তী নয়। চোখের সামনে
দিয়ে একখানা রিক্সা চলেছে, রিক্সাওয়ালাকে
কী সে ডাকবে? রিক্সাওয়ালা বাড়ী বাবে?
এখানথেকে কমনে কম হরিষোষ ট্রাটের
জগদীশ রায়ের গলি যেতে রিক্সা ভাড়া নেবে
তিন চার আনা—বুটির দিনে চাইকি বেশীও
হাকতে পারে!

প্রোঃ সাতকড়ি পাল

বৈজ্ঞানিক
উপায়ে
শাল, আলোয়ান,
বেনারসী
শান্তিপুর ও
নানা প্রকার
সিল্ক এবং উলের
বস্ত্রাদি রং

রিপু ও ধৌত হয়। গরম সূট ড্রাই ওয়াশ হয়।
মফঃস্বলের কাজ যত্নপূর্ব্বক সরবরাহ করা হয়।

ন্যাশন্যাল টেলারিং

১৮০-১-২ প্রো স্ট্রীট। হাতিবাগান বাজারের পূর্বদিক।

আধুনিক

ফ্যাসানে

সুট, সার্ট, পাঞ্জাবী

ব্লাউজ, ফ্রক

ইত্যাদি

সুলভে ও অভিনব

উপায়ে

অল্প সময়ে

যত্ন সহ

প্রস্তুত হয়।

১ টিং টিং শব্দে শ্রাব্যজারের নতুন ট্রাম-গুলি চলেছে। কাঁচের আবরণ ভেদ করে অভ্যন্তরস্থ আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে—গরি জাঁটা নিউ গুলিতে পরম আরামে রুটিকে উল্লেখ করে চপেইচ, বড় যাত্রী—যুখে দিগন্তেট কিংবা চুরোট—নীহার ভাবেন, ওঠা যাক ট্রামে, তিনটেতো পয়সা! কিন্তু এতখানি পথ হেঁটে এসে আবার পয়সা খরচ—না অসম্ভব। তিনটে পয়সার মূল্য তার কাছে অকিঞ্চিৎকর নয়। নীহারের বিবেক গর্জন করে উঠলো।

মাসিকতলার ভেতর দিয়ে যেতে, যেতে নীহার পম্কে দাঁড়িয়ে গেল। একখানি সুল্লর বাড়ীর ঠিকার কক্ষ হতে ভেদে আসছে সুল্লিত নারীকণ্ঠের করুণ গানের রেশ। রবীন্দ্র নাথের গানের সে অন্ধ-ভক্ত ছিল এককালে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে গান খানি শুনে লাগলো।

আমার দিন কুরালো ব্যাকুল বাঁধল সাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে ॥

বনের ছায়ার জল ছল ছল সুরে,

হৃদয় আমার কানার কানার পূরে।

রুটির একটানা রেশের মাঝে প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে গায়িকার কণ্ঠস্বর এক অপকৃপ করুণ রশের সঞ্চার করেছে। গান-খানি নীহারের অতি প্রিয়। সেও সঙ্গে সঙ্গে গুণ-গুণ-করে গেয়ে উঠলো :—

কোন দূরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।
বুকে ছলে তার বিরহ-বাথার মালা,
গোপন মিলন অমৃত-গন্ধ ঢালা,
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তার অজানা জনের সাজে ॥

গান থেমে গেল। আরম্ভ হোল আবার আর একখানি। এবারেও সেই বর্ষার করুণ সুর। নীহার আত্মহারা হয়ে শুনে চলেছে গান—রবি ঠাকুরের গান মাহুকে ছিতে পারে হৃৎকের সাক্ষাৎ।

নীহার ভুলে গেল তার গৃহের কথা—রুটির কথা, প্রাইভেট টিউশনির কথা। সে এক স্বপ্নময় মুহূর্তের মাঝে এলে পড়েছে, বাস্তবের মালিঙ্গের প্রবেশাধিকার যেখানে নেই। কিন্তু চমক ভাঙতেও তার বেগী হোল না।

যেই বড়ি ঢং করে বেজে উঠে নীহারকে জাগ্রত করে দিয়ে গেল। নীহার চমক উঠলো। তাইত এরই মধ্যে বেজে গেল লাড়ে লাটটা।

ভরানক বেগী হয়ে গেছে—মর্কনাশ। বাড়ী গিবে এরপর আর টিউশনি করতে যাওয়া চলবে না। বাড়ী আজ আর যাওয়া হবে না। পড়িয়ে আবার যেতে হবে ডাক্তারের কাছে শুভার ঔষধের জন্তে।

নীহার আর পারে না—একা কোনকি লাখলাবে সে! নিজের নিবুদ্ধিতার স্বরূপ সে অনেকক্ষণ সময় বাজে অপব্যবহার করেছে—নিজের উপর দারুণ রাগ হোল তার!—

নিজের স্মৃশ শাড়ী—তরুণী কঠে রবি-ঠাকুরের গান—এবিলাপ তার জীবনের জন্ত নয়। তার জীবনে শুধু সংগ্রাম—বৈটে খাকার জন্ত কঠোর আপ্রাণ পরিশ্রম—বাস্তব—শুধু অর্থ শুধু সামর্থ—এখনি কাব্য নয়—গান নয়—বিলাস নয়—স্বপ্ন নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তাকে সংসারের সংগ্রামে নিয়োজিত করতে হবে।

নীহার চলার গতিকে আরও বাড়িয়ে দিলে। "গৌনে আটটার মধ্যে তাকে ছাত্রের বাড়ী পৌঁছাতেই হবে।

শুভা—শুভা হরত তার প্রতীকার সময় শুনেছে—কেন তার এত বেগী হচ্ছে? স্নান কাপড় সর্বদা তার রুটির জলে ভিজ়ে গেছে।

এসব চিন্তার সময় এখন আর নীহারের চিন্তে নেই, একটি মুহূর্তকেও সে আর অপব্যবহার করতে পারে না।

আকাশের বর্ষণ ধারা সমান তাঁলে তখনও বর্ষিত হয়ে চলেছে।

কুমারী রেণুকা সাহা।

ভারতের শ্রেষ্ঠ নেত্রী-প্রাকদার এনাথৎ খাঁর সুযোগ্য-শিষ্য কুমারী রেণুকা সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত সন্মিলনীতে নেত্রীর যে অপূর্ণ কলা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরী যেরের আশন সঙ্গীতের গুণিজন মণ্ডলীতে খুব উচ্চ স্থান পাইয়াছে। তাহার সুর প্রতিভার বিদগ্ধ হইয়া নেপালের শিনিয়ার কম্পোজ জেনারেল স্যার যোহন



সামসের অং বাঁহাজর রাণা স্রি, বি, ই; কে, সি, আই, ই; গোয়ালিয়র স্কুল অব মিউজিকের অধ্যাপক, এলাহাবাদ হাই কোর্টের মহামান্য বিচারপতি ইউ, এস, বাজপাই; মহোদয় মিদেন্, ডি, আর, স্ত্রীচাৰ্য্য এবং আরও অনেক গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ তাহাকে নানারূপ স্বর্ণগন্ধক বানে উৎসাহিত করিয়া প্রতিভার যথার্থ সন্মান দেখাইয়াছেন।

মুক্তধারা সন্মিলনী

গত ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তধারা সন্মিলনীর সভাপতি "ঈশ্বর কাম্বোজ" "পথের সাথী" ও "এল ইন্ডিয়া লাগাই এজেন্সি" নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

"এল ইন্ডিয়া লাগাই এজেন্সি" এই কৌতুক নাটকটি সন্মিলনীর সভাপতি শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত। নাটকটির গল্প চমৎকার কিন্তু বোধন আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

গল্পটি আজকালকার কিশোর কোম্পানীর উদ্দেশ্যে করিয়া লিখিত। এদের সভাপতি অভিনয় করেছিলেন ভালই। সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছিলেন ফুলবাসী ভৌমিকের ভূমিকার পক্ষানন বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের চিরঞ্জীব কোলে shooting time direction দেওয়াটা লভ্যই স্বাভাবিক। ত্রিশূল পাইনের মডার্ন রুক্ষ চমৎকার। নৃত্য-শিক্ষক বাশবিহারী চাকীর ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন বিমল ঘোষ তাঁর ১-২-৩-৩ ও আলিগাবার তাত্ত্বিক নৃত্যের নাচের pose বাস্তবিক দেখবার জিনিষ হয়েছিল।

তৎপরে এরা যোগেশ চন্দ্রের "পথের সাথী" অভিনয় করেন। "এই নাটকে লক্ষ্য লেন ও বসন্ত" লেনের ভূমিকার বিমল ঘোষ ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছিলেন। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের অমর মাহাত্ম্য সুন্দর। রমেশ মিত্রের শরৎকান্দো, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরেন্দ্র নারায়ণ, শোভার ভূমিকার গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় অতি চমৎকার। চরণ বাবুর রুবি সুন্দর। সুমিত্রের ভূমিকার প্রকৃত মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল তিনি যেন এই প্রথম অভিনয় করছেন। যাই হউক তাঁর অভিনয় মন্দ হয় নি।



শ্রীযুক্ত হরিপদ

লক্ষ্য লেনের নাম কারও জানা নেই। হিন্দুস্থান রেকর্ডের মধ্য দিয়ে তাঁর গান আজ বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে অনুকরণীয় বল হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ইনি নিউ থিয়েটার ও হিন্দুস্থান রেকর্ডের প্রথম ট্রেনার হিসাবে কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে রয়েছেন। আমরা বন্ধুত্বের সঙ্গীতীনে উন্নতি কামনা করি।

মুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন

মিলনের অগ্নিদূত

সুভাষচন্দ্র ও লর্ড লোথিয়ান?

আমাদের লগুনস্থিত সংবাদদাতা থাকিবেন সুভাষ তাঁহার লিখিত কথাবার্তা জানাইয়াছেন যে জননায়ক সুভাষচন্দ্র যখন বিলাতে আসিবেন তখন লর্ড জেটল্যান্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজনীতিকগণ তাঁহার লিখিত মুক্তরাষ্ট্র পত্রিকার (Federation) ও কংগ্রেসের সহযোগিতার বিষয় আলোচনা করিবেন। এ বিষয়ে নাকি মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার মতামত লিখে প্রেরণ করিয়াছেন এবং মুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের সময় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকিবেন সুভাষ তাঁহার লিখিত কথাবার্তা বা একটি বোঝাপড়া ইংরাজ রাজনীতিকদের পক্ষে লম্বীচীন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লর্ড লোথিয়ান বর্তমানে কংগ্রেস নেতৃবর্গের লিখিত আলোচনা মধ্যে আসন্ন মুক্তরাষ্ট্র পত্রিকার বিক্রেতা কংগ্রেসের বিরোধিতা দূর করিবার মানসে এক কর্মসূচী উদ্ভাবনে রত। অর্থাৎ আমাদের সংবাদদাতার মতে সুভাষচন্দ্র ও লর্ড লোথিয়ানকে বর্তমান মুহূর্তে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মিলন-দূত বলা যাইতে পারে।

রাশা ফিল্ম ইন্ডিও হাইতে

“রূপোর ঝুমকো”



পরিচালক : জ্যোতিষ বানার্জি

আলোক চিত্র-শিল্পী : বীরেন্দ্র দে

প্রধান শব্দ যন্ত্রা : নৃপেন পাল

ভূপেন ঘোষ

শব্দ পত্রী : অবনী চ্যাটার্জী

গোবিন্দ বানার্জী

বিশিষ্ট ভূমিকায় :

ধীরাজ

নালু রায় (এঃ)

সত্য মুখার্জি

কার্তিক দে

ফণি মুখো

পারুলবালা

কমলা

কমলকুমারী

রাজলক্ষ্মী

বেলা প্রভতি



— কে এ প্রোডাকসন —



লিলি বিস্কুট

রকমারিতায় অপরাঙ্কায়
সাদে গুণে অদ্বিতীয়

লিলি বালি

আদর্শ পথ্য ও পানীয়
বিশুদ্ধতায় শ্রেষ্ঠ স্থানীয়

বোম্বাই * লিলি বিস্কুট কোম্পানী * কলিকাতা

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১১ চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোডস্থ ভারাইটীজ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
নিউজপেপার্স লিমিটেডের পক্ষে ৯, রামময় রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

খেয়ালী চিত্রপট *



মেয়েটির নাম অরুণা। প্রফুল্ল পিকচার্সের
“সখের-শনিক”-এ আমরা একে দেখতে পাব।

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়



অষ্টম বর্ষ { রহমতিবার, ১২শে পৌষ ১৩৪৪, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৩৮ ২য় সংখ্যা

একোর আহ্বান ও পরিণতি.

ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশে সদাসর্বদাই যে কাল বৈশাখীর বাড় উগিত হয় তাহার সর্ব প্রধান কারণই হইতেছে সাম্প্রদায়িক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে একের আহ্বান করিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিলে সকলেই আশা করিয়াছিল রাষ্ট্রীয় আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘ হ্রত এতদিনে অপসারিত হইতে চলিল। পণ্ডিতজীর এই তথ্যপূর্ণ বিবৃতি, যাহারা এতাবৎ কাল হীন সাম্প্রদায়িক লার্ণের মোহে আচ্ছন্ন ছিল, তাহাদিগকে জাতীয় জীবনের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথকে সজ্জ করিয়া মিলনের পথকে সূগম করিয়া দিবে,—ইহাই সিকল ভাবিয়াছিল। তাই হস্তীর নবাব এই বিবৃতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন যে, জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিতে এ পর্যন্ত যে বাধা বিঘ্ন অনুভূত হইতেছিল এক্ষণে তাহা অপসারিত হইবে। এমন কি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকল হইয়া জমিয়ৎ উল্লেখ-

হিন্দুর সেক্রেটারী ও মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের ভূতপূর্ব সদস্য মোলানা আমেদ সয়ং মিঃ জিন্নার নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া পণ্ডিতজীর এই বিবৃতি সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু পণ্ডিতজীর এই বিবৃতির প্রত্যুত্তরে মুসলিম-লীগ সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না যে জবাব দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় পণ্ডিতজীর এই মিলন চেষ্টা 'হীন' সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদীগণ কর্তৃক আরও বিঘ্ন সঞ্চার করিয়া তুলিবে। মিঃ জিন্নার মতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহার উপর মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না, অধিকন্তু তিনি যে যে প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল রহিয়াছে তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, "সাধারণভাবে মুসলমানদের এবং বিশেষভাবে মুসলিমলীগের" বিরুদ্ধে ঐ সকল প্রদেশে অবিচারই চলিতেছে।

কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি যখন সাম্প্রদায়িক মিলনের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং যখন আশা

করিতেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদীগণের হয়ত এতদিনের ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করিবার সুমতি আসিয়াছে তখন এই সাম্প্রদায়িক দংশন চেফা ও মিঃ জিন্নার কংগ্রেস প্রীতি এই অবস্থা পূর্ণ বিবৃতি তাহাদিগকে ব্যথিতই করিবে।

গণতন্ত্রের আদর্শে পৃথক কোং রাজনীতিক অধিকারের দাবী থাকিতে পারে না। কারণ তাহাতে রাষ্ট্রের উন্নতিতে যথেষ্ট বাধা জন্মে ইতিপূর্বেও আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি যে যাহারা সর্বদাই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধূয়া ধরিয়া থাকে তাহাদের সহিত আপোষ চেফা কখনও কার্যকরী হয় না। রাষ্ট্রিক কল্যাণে তাহারা কখনও আগ্রসর হইবে না। তাহাদের অন্তায় ও যুক্তিহীন দাবী ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে। এবং এই সকল

দাবী পূরণ করিয়া চলিতে হইলে রাষ্ট্রের উন্নতি ত দূরের কথা, বরঞ্চ রাষ্ট্রের অর্থশক্তি ক্ষয় হইবে। সুতরাং এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার প্রতি কোন প্রকার মনযোগ প্রদর্শন না করিয়াই কংগ্রেসের কাজ করিয়া যাওয়া উচিত।

সম্প্রতি জিন্নার জবাব সম্পর্কে এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতে চলিয়াছে। মোলানা আবুল কালাম আজাদ পুনরায় এই মিলন চেফাকে ফলপ্রসূ করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি এতদ্ সম্পর্কে মিঃ জিন্নার সহিত বহু আলাপ করিয়া মহাত্মাজী সকাশে উপস্থিত হইয়াছেন। বর্তমানে এই ব্যাপারে মহাত্মাজী কি পস্থা অবলম্বন করেন সমগ্র দেশবাসী আজ তাহারই পরিণতি দেখিতে উন্মূখ।

রূ পো র বু ম কো

আলোকচিত্র-শিল্পী

বীরেন দে

প্রধান শব্দ-সম্বলী

নূপেন পাল

ভূপেন ঘোষ

শব্দ-সম্বলী

অবনী চ্যাটার্জি

গোবিন্দ ব্যানার্জি

পরিচালক :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকায়:

শীরাঙ্গ, নীলু রায় (এং), সভা
মুখো, কার্তিক দে, প্রভাস,
প্রফুল্ল (হাজু), কনি মুখো,
শান্তমীল, অতুল ভট্টা, মুরারী
মুখো, পাকুল, কমলা, কমল
সুয়ারী, রাজলক্ষী, বেলারানী,
নীলা, গীতা, প্রভৃতি।

ও, কে, এ

প্রোডাকসন

স্টুডিও

রাধা ফিল্মস



শ্রীমল্লিনাথ .

বরোদা হও বর-দা

বরোদার বর্তমান গুইকোয়াড় শ্রীর সন্ন্যাসী রাও নিজে স্থবিরপ্রায় হোলে কি হয়, তাঁর পদ্যপর্ণে বাঙালার রাজধানী যৌবনের পুলকচঞ্চল ছিলোলে টলটলায়মান হোয়ে উঠেছে। আনন্দের সে স্পন্দন মিয়াপুরী শ্রীগৌড়ীয় মঠ থেকে আরম্ভ কোরে দীর্ঘির পাড়ের সংস্কৃত কলেজকে পর্গাস্ত উতলা, আকুল কোরে তুলতে কল্পর করে নি। —যা'র ফলে সংস্কৃত কলেজের সর্বজ্ঞ অধ্যাপক প্রবর অভিনব উপাধির মালা গলায় পরিয়ে বুদ্ধ বরদাকে বরণ কোরে ঘরে তুলেছেন। আর গৌড়ীয়মঠের সভাপতি, বারানসী-প্রবাসী মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ ছিলেন এই অভিনন্দন মহোৎসবের প্রাণনি পুরোধ।

অভিনন্দন পণ্ডিতেরা করুন, তা'তে কারুর কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু সেদিন এই গোপনন্দন-বন্দনার মাত্রাটা বেজায় বিকট রকমের দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল। স্থাপনের গোপান-প্রতিপালিত যত্নন্দনকে একদিন এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল দেবতা ব'লে স্বীকার করতেই রাজী হন নি—এখনো হয়ত অনেকে একটু ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু বার্ককো বঞ্জীধারী, মধনমোহন-প্রমোভিধারী অমূল্য বায়বুশে মতপরিবর্তনকারী প্রমথনাথ যে যজ্ঞের হোতা, সেখানে শুধু নন্দনন্দন কেন নন্দের স্বজাতি যে কোন গোপের নন্দনই পূজার অর্ঘ্য লাভের অধিকারী হইবে—ইহাতে আর বিষয়ের কি আছে!

সেদিন যে দৃশ্য দেখলাম, তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু বলতে ইচ্ছা হয়—‘আহ! কি দেখিলাম! জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না!’ ‘সু-উচ্চ কুমুদগুচ্ছ পরিশোভিত সিংহাসনে পাটকা-সনাথ বরোদা বরদাক্রমে সমাসীন—এক পার্শ্বে ছুইখানি অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে দুইজন খেতদ্বয় পুরুষপূজব (তন্মধ্যে একজন টেটসম্যানের মিঃ ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ)—পদতলে কেন্দ্রস্থলে সর্বজ্ঞ অধ্যাপক প্রবর স্বয়ং—উঁচর চারিধারে কলিকাতার অগণিত গণা-মাত্র পণ্ডিতমণ্ডলী—কেবল কয়েকজন ইংরাজিনবীণ অধ্যাপক বোধহয় আত্মসম্মান নষ্ট হ'বার ভয়ে এই অপমানজনক আসন গ্রহণ করেন নি—বাহিরে বারান্দার চেয়ারে বসেছিলেন। আমরা এই সব দৃঢ়চেতা অধ্যাপকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘণা অপমানকর বলিবার ব্যবস্থায় প্রতিবাদ জানাবার সাহস হয়নি—একটিও তণাকথিত স্বাধীনচিঁঠি তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের। যা'রা সংস্কৃত কলেজের বেট্টনভুক্ত অধ্যাপক, তাঁদের কথা না হয় আমরা ছেড়েই দিলাম। কি করবেন তা'রা!—

‘অন্ত দ্বন্দ্বোদ্বারস্থার্থে কিমনাটি ন নাটকম্!’

কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত রাজকীয় বেতনভোগী ন'ন, তাঁরা কোন্ স্বার্থসিদ্ধির আশায় এই হীনতা স্বীকার কোরেছিলেন—

জানাবেন কি? সন্ন্যাসী রাওকে অভিনন্দন পত্রে “মহারাত্রিপতি” বোঝা লেখাধন করা হোয়েছিল। এর চেয়ে শব্দের মানি আর কি হোতে পারে, তা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীই জানেন। প্রকৃত মহারাত্রিপতি ছিলেন তিনি—যিনি নিজ বাহু বলে দেশ জয় কোরেও ক্ষত্রবলের দর্পে দর্পিত হ'ন নি—সম্মিত রাজকোষের উন্নয়ন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মণ্ডলীর নয়শিরোপরি আপনায় সপাদ্রুকা চরণ যুগল লাহকাবে স্থাপন কোরে তাঁ'দের অবোধা বিজাতীয় ভাষায় বাণী শুনিয়া কৃতার্থ কোরছেন ভেবে আত্মপ্রশংসা লাভ করেন নি—বরং এক সর্বভাগ্যী সন্ন্যাসীর বিরাগীর ছিন্ন কর্ছা বহন কোরে আপনাকেই ধন্ত বোধ কোরেছিলেন। কিন্তু সিংহাসন ত' চিরদিনই সিংহের আলন থাকে না—সিংহের অবর্তমানে শৃগালই তা'র উত্তরাধিকারী হোয়ে থাকে। অতএব সেগুণ অনুশোচনা করা বৃথা! কিন্তু আমরা অবাক হচ্ছি শুধু এই কথা ভেবে যে, কলিকাতার ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজ কি এতটা অপার্থ হোয়ে উঠেছেন যে—আত্মসর্বস্ব অধ্যাপক মহাপ্রভুর এই অপমানজনক ব্যবহারেও কোনো একজন পণ্ডিত মহাশয়েরও স্পৃহা ব্রাহ্মণ্য জাগ্রত হোয়ে উঠল না!!

“সন্ন্যাসী রাওএর পদতলে বসার দাপগুপ্ত লাহেবের যথেষ্টই স্বার্থ ছিল—তা'র কতকটার সিদ্ধিও হোয়েছে বোলে শুনেছি। জানী' গিয়েছে যে বরোদা তাঁ'র এই আত্মগুপ্তে শ্রীতিলাভ কোরে একটি ‘স্বরস্ত’ রুস্তির ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হোয়েছেন। আরও কতদূর কি রফা হোয়েছে জানি না। তবে বরোদার কিউরেটর ও শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার, ডক্টর দাপগুপ্তের গুরুপুত্র (মমঃ ৬৮রপ্রশংসা শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র) ডক্টর বিনয়তোষ-ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একটু সাবধান হোয়ে এসব বিষয়ে একটু চোখ-

কাপ খোলা রাখতে অনুরোধ করি, কারণ এসব প্রভুর শনির দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চ গণ্যত্বে আশ্রয় লাগতে হয়ত বেশী দেরী হবে না—অন্ততঃ এরূপ একটা ইজিভের আভাস আমরা পেয়েছি। যদি তা'লতি হয়, তবে অধ্যক্ষবরের গুরু দক্ষিণার বছর একলব্যকেও ছাপিয়ে উঠবে।

সেদিন সর্বজ্ঞ অধ্যক্ষবরের উচ্ছ্বাস ও উল্লাস একটা দর্শনীয় জিনিষ ছিল বটে। বাগফটের ভাষায় শ্রেষ্ঠ-অনুগ্রাহ-যমক-টমক দিয়ে একটি বক্তৃতা 'ক'বিন রিহাস্তাল' দিয়ে তৈরী কোরে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু মেধা-ত তাঁর কোন দিনই তেমন প্রবল নয়! তাঁর ওপর আবার উদয়াস্ত রিসার্চ আছে! অতএব, মাঝে মাঝে যে খেই হারিয়ে যাবে—তাঁর আর বিচিত্র কি! কাজেই এই সব মালাগাড়ী-প্রতিম লম্বা হইতে সুলভা বাক্যাবলীর মুখপাত তিনি কেঁদেই চলেছিলেন—অথচ কোনটা ঠিকমত শেষ হচ্ছিল না। পণ্ডিতমণ্ডলীও আপাত-দৃষ্টিতে বেশ নির্বিকারভাবে এই পুরুষোত্তমের বিকট প্রলাপ গলাধঃকরণ করছিলেন। আচ্ছা; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সন্নাজী রাওকে হঠাৎ তিনি কিরাতাজ্জ্বলিতের শ্লোক বোলে দ্রব্যোদনের বিশেষগুণিয়ারা বিশেষিত করলেন 'কেন? তা'হোলে কি তাঁর মতে সার সন্নাজী ও দ্রব্যোদন—একট পূর্য্যায়ের লোক? বলিহারি অভিনন্দন বটে!

সুনা গেল—তিনি সন্নাজী রাওকে তাঁর রিসার্চ ছাত্রীমন্দের সহিত পরিচিত কোরে দিয়েছিলেন। 'ছাত্রীমন্দের'—কথাটা বোধ হয় গোঁড়বে বহুবচনের মত! কারণ ছাত্রী-হিসাবে একজনই মাত্র উপস্থিত ছিলেন—অজ্ঞানেকাম। অপর তিনজন মহিলার মধ্যে একজন মিসেস দ্বাশগুপ্তা, অপর দুইজন তাঁহারই ছইটি ছইতি।

বরোদাকে সেদিন এক উপাধিও বেওয়া হয়েছিল! অধ্যক্ষবর যখন কবীজ্ঞ রবীজ্ঞ নাথকে "কবি সার্কভৌম" উপাধি দিয়েছিলেন, সেদিন একটু আনন্দিত হয়েছিলেন। এই ভেবে যে,—রবীজ্ঞনাথ চিরদিনই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবিধেযী—আজ তিনিও সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দেওয়া উপাধি নিতে বাধ্য হোলেন—দ্বাশগুপ্ত নাহেবের বাহাদুরি বটে! তাঁর পর সারত্রাঙ্গিন ইয়ং রাজব্যাক্তকে যখন "ক্রমকেশরী" উপাধি বেওয়া হোলো, তখন একটু অবাক হোলুম—যে কথাটার 'মানেই

বা কি!—আর ব্যাপারটার পিছনে গুঢ় উদ্দেশ্যই বা কি আছে! কিন্তু এবার আশাঘের তাক লাগাইয়া দিয়াছেন—শুইকোরাড়কে উপাধি দিয়া। আর দেখি যে-সে উপাধি—একেবারে—"ভূপতি চক্রবর্তী"! অধ্যক্ষবর ইংরাজীতে আবার ব্যাখ্যাও কোবে দিয়েছেন "King of Kings"!!! এরকম উপাধি ছিলে রাজজোহ বা সত্রাটজোহ হয় কি না—তা'লহযোগী "আজাদ" হয়ত ভাল বলতে পারবেন! কিন্তু দ্বাশগুপ্ত শ্রীভগবানের নিজস্ব এই উপাধিটি কেড়ে নিলেন কি

হাল - বাংলা

বিকৃতি ও অসঙ্গতি আধুনিক প্রত্যেক সমাজেই আছে—প্রতিদিনের অভ্যাস ও পরিচয়ের দরুণ সেগুলি আমাদের চোখে পড়ে না। হাল-বাংলায় আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের সেই বিকৃত ও অসঙ্গত রূপ অজস্র হাসির উপাদানের সঙ্গে পরিবেশন করা হইয়াছে। ছবি দেখিতে দেখিতে আপনি হাসিবেন, কিন্তু নির্জন অবসরে সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে।

এই হিসাবে হাল-বাংলা উগ্র ব্যঙ্গ নয়, সমাজের অতি করুণ আলেখ্য মাত্র।

ইফ ইণ্ডিয়া ফিল্ম ফুডিঙতে গৃহীত—

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের

প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র

জীবনমাত্র

(সি, বি)



বিজয় মার্কেট

ভূতীয় টেস্ট ম্যাচ:—গত ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ওর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টিম ভারতবর্ষে এসে হাজির হয়েছেন। ভারতে এরূপ যে ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছেন বা খেলবেন তার মধ্যে সব চেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে 'টেস্ট' ম্যাচগুলি। যদিও এই 'টেস্ট' ম্যাচগুলি আনুষ্ঠানিক্যাল বলে ঘোষিত হয়েছে তাহলেও এই খেলাগুলির গুরুত্ব ও আকর্ষণ 'অফিসিয়াল' টেস্ট ম্যাচগুলির চেয়ে বিশেষ কম নয় বলেই মনে হয়। এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে যদি ভবিষ্যতে কখনও ইংলও কিংবা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়া'র 'অফিসিয়াল টেস্ট' ম্যাচ খেলার সুযোগ ঘটে। 'অল ইণ্ডিয়া' দল এই বিলাতী ক্রিকেট টিমটির কাছে 'লাহোর' এবং 'বম্বে'র দুটি টেস্ট ম্যাচে যথাক্রমে ৯ উইকেট ও ৬ উইকেটে পরাজিত হবার পর বাকী কলিকাতা এবং মাদ্রাজের টেস্ট ম্যাচ দুটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

কোরে—কোন্ লাহলে? আমাদের কোন রলিকবদ্ধ বলছিলেন—দাশগুপ্ত 'সাহেবের উপাধি দেবার অধিকার খুঁটে আছে— কারণ, ছেলে-বেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল "খোকা ভগবান"!!!

এবার মহামাত্র মজিবর ফজলুল হক ও নলিনীরজন সরকার মহাশয়দের উপাধিধান লভায় নিমন্ত্রিত হবার আশায় ধৈর্য ধোরে রইলাম!!!

শৃঙ্খলা বজায় রেখে সন্তুষ্টভাবে ক্রিকেট খেলা পরিচালনা করবার জন্য ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই 'প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েশন' আছে। আবার এই সকল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'অল ইণ্ডিয়া ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড' গঠিত হয়েছে। এই কন্ট্রোল বোর্ড প্রাদেশিক



মস্তাক আলি

এসোসিয়েশনগুলি এবং 'নিখিল ভারতীয়' খেলাগুলি পরিচালনা করেন। কন্ট্রোল বোর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টিমের সঙ্গে এবারকার এই টেস্ট ম্যাচগুলি খেলবার জন্য বোম্বাইয়ের বিজয় মার্কেটকে 'অল ইণ্ডিয়া' দলের অধিনায়ক নির্বাচন করেছেন এবং মি: মার্কেট ও কলোনেল মজিবকে টিম নির্বাচন করার ভার দিয়েছেন। বোর্ড এই সঙ্গে এদের দুজনকে যথাসম্ভব তরুণ এবং উদীয়মান খেলোয়াড়দের নিয়ে অল ইণ্ডিয়া টিম গঠন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

সেই কারণে এখন অবধি যে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে সেগুলিতে তাঁরা সেই উপদেশ অনুসারেই টিম নির্বাচন করেছেন। লাহোর এবং বোম্বাইয়ের দুটি খেলার তাঁদের এই নীতি অনুযায়ী টিম নির্বাচন ঘোটেই কার্যকরী হয় নি তার প্রমাণ এই রকমের প্রতিনিধিমূলক খেলার 'অল ইণ্ডিয়া' দলের শোচনীয় পরাজয়। তাঁদের এই নীতি যে খুবই প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তবে এই নীতি পালন করার সঙ্গে টিমের শক্তি লব্ধকেও তাঁদের সজাগ থাকা উচিত। টিমের শক্তির লব্ধকে নিরাশ হয়ে লাহোর 'অল ইণ্ডিয়া' দলের নিম্ননীয় পরাজয়ের পর দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের টিম মনোনয়ন করার আগে তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে হুচারজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ও যে টিমকে শক্তিশালী করবার জন্য থাকা দরকার তা নির্বাচন কমিটি বুঝেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বিখ্যাত এবং অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড় মেজর সি, কে, নাইডুকে তাঁরা আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচক কমিটি ব্যক্তিগত কারণে মেজর নাইডুকে বোম্বায়ে উপস্থিত করিয়েও নিজেদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এবং এইরকম একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় 'অল রাউন্ডার ক্রিকেট



অমর সিংহ

খেলোয়াড়ের দ্বিতীয় টেষ্ট টীমে স্থান পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝেও তাঁকে নির্বাচন করতে পারেন নি। এই ব্যাপারে যে কোন মহৎ ব্যক্তির মহৎ উদ্দেশ্য সফল হক্, সাধারণের ভ্রূতে কিছু স্বার্থ নেই কিন্তু মিঃ মার্চেন্ট এবং কলোনেল মিল্লি এই বিষয়টির সমর্থন করে ষাণ্ডিত্তানতীনতার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে পরাজয়ের অলম্মান সামান্য একটু কমছিল কিন্তু মেলর নাইডুর হত একজন খেলোয়াড় টীমে থাকলে যে এই অলম্মানের একেবারে অবসান হত না তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। যাক্ ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি মনযোগী হয়ে 'নিখিল ভারতীয়' স্বার্থের প্রতি অবহেলা করে হরত তাঁরা সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। তবে এই সমস্ত গুঢ় ব্যাপারগুলি বিবেচনা করার পরই আশ্রয় লিখিখানি 'ইকোরে' পাঠালে এই ব্যাপারগুলির গুঢ়ত্বও অনেকটা বজায় থাকত এবং মেলর নাইডুরকেও এই অনিচ্ছাকৃত অলম্মান করার জন্ম সাধারণের কাছে তাঁদের দ্বারী হতে হত না।

কলিকাতার তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচটি খেলা আরম্ভ হবার দুইদিন আগেই অল ইণ্ডিয়া টীমের অধিনায়ক মিঃ মার্চেন্ট এবং কলোনেল মিল্লি এখানে এলে পৌঁছেছিলেন।

খেলার আগের দিনই মহম্মদ নৈরু ও পাতিয়ালায় সুব্রাজ বাতাত সমস্ত আশ্রিত খেলোয়াড়গণ কলিকাতার আশ্রয় এবং 'ইডেন গার্ডেনে' নেট প্র্যাক্টিস করেন। বিকালে খেলোয়াড়দের নেট প্র্যাক্টিস হওয়ার পর সন্ধ্যার সময় 'অল ইণ্ডিয়া টীমে', কে কে খেলবেন্ নঠিকভাবে ঘোষিত হবে বলে ক্রীড়ামোহীরা উৎসুক হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: খেলা আরম্ভ হবার আধঘণ্টা আগে নঠিক টীম মনোনয়ন শেষ হয়। কারণ কলিকাতার এই তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচটিতে 'বেঙ্গল ও আলাম্ ক্রিকেট এসোসিয়েশন' বাংলার দুইজন খেলোয়াড় কমল ভট্টাচার্য্য ও কান্তিক বসুকে তৃতীয় টেষ্ট টীমে স্থান দেবার



মহম্মদ নিশার

জন্ম নির্বাচন কমিটিকে অনুরোধ করেন, এবং তাঁরা নৈরু ও পাতিয়ালায় সুব্রাজের পরিবর্তে এদের দলভুক্ত করেন। সম্ভবত: কমল ভট্টাচার্য্যের নেট প্র্যাক্টিসে লম্বা না হতে পেরে, তাঁরা কেবল কান্তিক বসুকে নির্বাচন করেন। কিন্তু কান্তিক বসু খেলার দিন সকালে কলিকাতার পৌচান্ এবং তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্ম এই খেলার যোগদান করতে অসম্মতি জানানর পর নঠিকভাবে খেলোয়াড়দের নাম প্রচার করা হয়। কান্তিক বসুর অসম্মতি জানানর পর কমল ভট্টাচার্য্যকে টীমে স্থান না দেওয়ার জন্ম

বাংলার ক্রীড়ামোহীরা অনেকই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিঃ ভট্টাচার্য্য টেষ্ট ম্যাচ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাংলা দেশে অবশ্য ভাল বোলার এবং ব্যাটসম্যান্ হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন কিন্তু বিলাতী নামকরা খেলোয়াড়ের এই শক্তিশালী বলের সঙ্গে সমকক্ষতা করার উপযুক্ত খেলোয়াড় তিনি এখনও হ'ননি বলেই মনে হয়। কারণ এই বলের বিরুদ্ধে কুচবিহারের মহারাজার একাধশের পক্ষে খেল, তিনি তাঁর সমর্থকদের একেবারে হতাশ করেছেন। ভবিষ্যতে তিনি তাঁর খেলার উন্নতি করে যদি 'টেস্ট টীমে' নিজ স্থান নিজে কবে নিতে পারেন তাহলে বাংলাদেশ তার জন্ম গৌরব বোধ করবে। আমাদের মনে হয় এবিষয়ে ক্রীড়ামোহীদের অভিযোগ করা খুব বুদ্ধিসঙ্গত হবে না।

গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৭, ইডেন গার্ডেনে বেলা ১১টার সময় তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচটি খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ দুটিতে পরাজিত হবার পর 'অল ইণ্ডিয়া টীমের' খেলোয়াড়রা একটু নিরুৎসাহ হয়ে খেলা আরম্ভ করলেও ক্রমে ক্রমে তাঁরা নিজেদের শক্তির পরিচয় দেন। অল ইণ্ডিয়া দল প্রথমে ব্যাট করিতে আরম্ভ করেন।



এল, অমরনাথ

অনন্যাগম্ অনন্তঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় দিন 'টেস্ট' ম্যাচের উপযুক্তই হয়েছিল। কিছুদিন আগে কলিকাতার বিলাতী ক্রীড়া টিমের খেলা হওয়ার বরন অনেক অধিক দিক দিয়ে ক্রিকেট ম্যাচগুলি লাফল্য লাভ করবে না বলে আশঙ্কা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের সে মত পুরিবর্তন করতে হয়েছে। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে 'বল ইন্ডিয়া' হল ২৩ রাণে জয়লাভ করেছে। এই জয়ের জন্য মস্তাক আলি, অমর নাথ, এবং ভিক্টর মান্ধুদ নর্যাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব প্রদান করতে পারেন। এর প্রথম ইনিংসে যথাক্রমে ১০১, ১২৩ এবং ৫৫ রাণ করেন। মস্তাক এবং অমরনাথ প্রথম দিনের খেলাতেই একটি করে 'সেঞ্চুরী' করেন। এর আগে ভারতবর্ষে একদিনে দুটি সেঞ্চুরী কোন খেলার হয় নি। এবং তাহা ছাড়া কোন বিলাতী দল ভারতীয় দলের কাছে পরাজিত হননি। এই দুই কারণে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। বর্তমানে আমনগরের খেলোয়াড় এম ব্যানার্জি বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। নিশার, অমরনাথ ও আমীর ইলাহি বোলিংয়ে অ্যাতিলাভ করেছেন। মার্চেন্ট উপযুক্ত অধিনায়কত্বের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু ব্যাটিংয়ে সুবিধা করতে পারেন নি। লর্ড টেনিসনের দলে হার্ডষ্টাক ও ইয়ার্ডলে ব্যতীত আর কেউ ব্যাটিং লাফল্য দেখাতে পারেন নি। গোভার, পোপ, ওয়েলার্ড ও ল্যাংরিজ উল্লেখযোগ্য বোলিং করেছিলেন। প্রথম দিনে একটু খারাপ হলেও বিজিত দলের ফিল্ডিং প্রশংসনীয় হয়েছিল। এই চারদিন-বাপী খেলাটি গত ৩রা জানুয়ারী শেষ হয়। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এই খেলাটি একটি নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলো।

অল ইন্ডিয়া দল

প্রথম ইনিংস

মস্তাক আলি ক এডরিচ ব গোভার	১০১
ডি হিন্কেলকার ক এডরিচ ব গোভার	১০

ডি মান্ধুদ ক ওয়েলার্ড ব গোভার	৫৫
অমরনাথ এল বি ডবলু ব পোপ	১২৩
ডি মার্চেন্ট এল বি ডবলু ব ওয়াকিংটন	১১
কুমারদীন এল বি ডবলু ব গোভার	৪
আব্বাস খাঁ ক এডরিচ ব পোপ	২
অমর নাথ নট আউট	৯
এম ব্যানার্জি ব পোপ	২
আমীর এলাহি ক ম্যাকরকেল ব পোপ	০
মহম্মদ নিশার এল বি ডবলু ব পোপ	০

অতিরিক্ত ২৫ মোট ৩৫০

বোলিং—গোভার ২৩ রাণে ৪, ওয়েলার্ড ১০২ রাণে ০, পোপ ৭০ রাণে ৫, ল্যাংরিজ ২৫ রাণে ০ ও ওয়াকিংটন ২৮ রাণে ১ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংস

মস্তাক আলি ক ম্যাকরকেল ব ল্যাংরিজ	৫৫
ডি হিন্কেলকার ক ওয়েলার্ড ব ল্যাংরিজ	৬০
ডি মান্ধুদ ব ল্যাংরিজ	২৫
অমরনাথ ক ওয়াকিংটন ব ল্যাংরিজ	০
ডি মার্চেন্ট এল বি ডবলু ব ওয়েলার্ড	৯
কুমারদীন এল বি ডবলু ব ওয়েলার্ড	২
আব্বাস খাঁ ব ল্যাংরিজ	১৩
অমর নাথ ব ওয়েলার্ড	২
এম ব্যানার্জি ক ম্যাকরকেল ব ওয়েলার্ড	০
আমীর এলাহি নট আউট	১৫
মহম্মদ নিশার ব ল্যাংরিজ	১

অতিরিক্ত ১৬ মোট ১১২

বোলিং—গোভার ৯ রাণে ০, ওয়েলার্ড ৬৭ রাণে ৪, পোপ ৫৫ রাণে ০, ল্যাংরিজ ৪১ রাণে ৬ এবং ওয়াকিংটন ১০ রাণে ০ উইকেট।

লর্ড টেনিসনের দল

প্রথম ইনিংস

এডরিচ ক নিশার ব অমর নাথ	১২
ম্যাকরকেল ক নিশার ব আমীর ইলাহি	২৮
হার্ডষ্টাক ক হিন্কেলকার ব নিশার	৫২
ইয়ার্ডলে " " " "	৩৮
ল্যাংরিজ "এম ব্যানার্জি " " "	০
ওয়াকিংটন "এল বি ডবলু " " "	১
গিব " " " "	৬

ওয়েলার্ড ব আমীর ইলাহি	২২
লর্ড টেনিসন ব অমর নাথ	২৮
পোপ নট আউট	৪১
গোভার ক হিন্কেলকার ব অমর নাথ	৩
অতিরিক্ত ১২ মোট ২৫৭	
বোলিং—নিশার ৭৯ রাণে ৫, অমর নাথ ৬৫ রাণে ৩, এম ব্যানার্জি ৪০ রাণে ০, অমরনাথ ৮ রাণে ০, আমীর ইলাহি ৫১ রাণে ২ এবং মান্ধুদ ২ রাণে ০ উইকেট।	

দ্বিতীয় ইনিংস

এডরিচ ক মান্ধুদ ব অমর নাথ	৩
ম্যাকরকেল ব অমর নাথ	৩
হার্ডষ্টাক " " " "	৪২
ইয়ার্ডলে ক মস্তাক আলি ব অমর নাথ	১৫
ল্যাংরিজ ক এবং ব মান্ধুদ	৩০
ওয়াকিংটন ক আমীর ইলাহি ব মান্ধুদ	১১
গিব নট আউট	২৯
ওয়েলার্ড ক এম ব্যানার্জি ব আমীর ইলাহি	১৫
লর্ড টেনিসন ক মান্ধুদ ব " " "	৮
পোপ ক হিন্কেলকার ব মান্ধুদ	২
গোভার ক নিশার " " " "	১৩

অতিরিক্ত ১৪ মোট ১১২

বোলিং—নিশার ২২ রাণে ০, অমর নাথ ৭৬ রাণে ৪, অমরনাথ ৮ রাণে ০, আমীর ইলাহি ২৫ রাণে ২ এবং মান্ধুদ ৪৭ রাণে ৪ উইকেট।
--

প্রথম টেস্ট ম্যাচ

অল ইন্ডিয়া দল প্রথম ইনিংসে ১২১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১১২ রাণ করেন।
লর্ড টেনিসনের দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ২০৭ এবং ১০১ উইকেটে ১৪৪ রাণ করেন।

লর্ড টেনিসনের দল উইকেটে জয় হন

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

অল ইন্ডিয়া দল প্রথম ইনিংসে ১৫৩ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৮ রাণ করেন।
লর্ড টেনিসনের দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ১১১ এবং ৪ উইকেটে ১৭১ রাণ করেন।
লর্ড টেনিসনের দল ৬ উইকেটে



লিলি—রাণীবালা

রঙমহলে “স্বামী-স্ত্রী”

রঙমহলে শচীন্দ্রনাথের “স্বামী-স্ত্রী” দেখলাম। চমৎকার নাটক, “চমৎকার অভিনয়, নিখুঁত পরিচালনা, রুচি-মার্জিত দৃশ্যপট। এমন সামাজিক নাটকের অভিনয় আমরা বহুদিন দেখিনি। নাটক দেখে ও ভীড় বেধে মনে হ’ল—বাঙলার মরণোন্মুখ রঙ্গমঞ্চে এ যেন মৃতসঞ্জীবনীর প্রলেপ!

নতুন ধরণের গল্প “স্বামী-স্ত্রী,” নতুন টেকনিক, জোরালো ভাষা—এক কথায় শচীন্দ্রনাথ এতদিনকার সাধনা সবই যেন নিঃশেষিত করে রচনা করেছেন এই নাটক। চারিটি অঙ্কে, চারিটি দৃশ্বে নাটকের পরিণতি। প্রথম অঙ্ক ‘কলি’, দ্বিতীয় ‘কলির কল্পন’, তৃতীয় ‘কুঁড়ি কোটার স্পন্দন’ ও চতুর্থ অঙ্ক ‘কলিত শতমহলে প্রকাশ’। গল্পটির চূষক হচ্ছে ললিত ও লিলি স্বামী-স্ত্রী হ’লেও তাদের মধ্যে বনিবনা ছিল না। ললিত লিলিকে জীর মত পাবার জন্যে ছিল লম্বাই ব্যাকুল—কিন্তু তার এ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যখন কিছুতেই ফলপ্রসূ হ’ল না, তখন সে লিলির মাস্তুলতো বোন বুদ্ধিমতী মিনতির চাইল সাহায্য। মিনতি ভালবাসতো ললিতকে—ঘটনাচক্রে লিলির

নাট্য-তরঙ্গ

(ত্রীনটশেখর)

সঙ্গে বিয়ের পূর্বে ললিত ও মিনতি জানতো তারাই হবে স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু ছোট বোনের স্নেহের জন্তু মিনতি বিসর্জন দিল আত্মহুৎ এবং লিলি ও, ললিত যাতে সুখী হয় সেই চেষ্টাই ছিল তার। এমন কী একদিন যখন গহন অরণ্যে লিলি ধনী ও সুখী যুবা মোহনের কাছে বেহ বিলিয়ে দিতে চাইল—তখন মিনতিই মোহনকে শিকারী ছিল মাহুর্বা হ’তে।

তারপর ঘটনার ষাত-প্রতিষাতে “স্বামী-স্ত্রী”-র ভেতর প্রেমের জোয়ার বইল—কিন্তু সেই স্রোতের বুকে পড়ে ‘মিনতি’ দিল আত্মহুৎ। আর মোহন—যে তাকে মাহুর্বা হবার মন্ত্র শিখিয়েছিল তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিরুদ্দেশের পথের যাত্রী হ’ল।

নাটকখানির পরিচালনা বেশ ঝরঝরে, তক্তকে এবং পরিচালক দুর্গাধাল। যে একজন গুণী ব্যক্তি তা’ প্রকাশ পেয়েছে এই নাটক পরিচালনায়। শুধু নট হিসাবে



মোহন—অমর গাঙ্গুলী



ললিত—দুর্গাধাল

নয়, নাট্য-পরিচালক হিসাবেও তাঁর স্থান আজ বহু উর্দ্ধে তার প্রশ্রয় হ’য়েছে “স্বামী-স্ত্রী”-তে।

দৃশ্যপট খুব জম্জালো নয়; অথচ বেশ রুচি-মার্জিত ও স্বাভাবিক। বনের দৃশ্য ও কয়লার খনিতে আশ্রয় লাগার দৃশ্য মনোহর নাথ দ্বারের (নাহু বাবু) প্রশংসা করা যায়।

গানের সুরগুলি বেশ শ্রুতিমুগ্ধকর। আবাহ-সঙ্গীত ও সুর সংযোজনায় মিনেমার ‘ট্যাচ’ বিশেষ কার্যকরী হ’য়েছে।

ললিতের ভূমিকায় দুর্গাধাল চমৎকার অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনেতা জীবনের এ একটি অপরূপ দান। লিলির অংশে রাণীবালার অভিনয়ও সুন্দর—কিন্তু সামাজিক নাটকে তার ‘মেলোড্রামাটিক’ আবৃত্তি বিশেষ শ্রুতিকটু লাগল। তার গান বেশ লাগল। মিনতির ভূমিকায় উষা দেবীর অভিনয় এক কথায় ‘চমৎকার’। তাঁর সংযত অভিনয় লকলকে মুগ্ধ করেছে। মোহনের একটা সুন্দর ভূমিকায় অমর গাঙ্গুলী নিখুঁত অভিনয় করেছেন। মিঃ দাস রূপে সন্তোষ সিংহ চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। লিলির মার ভূমিকায় পদ্মাবতীর অভিনয় ভাল লাগল—কিন্তু যেক-আপের দিকে তাঁর একটু দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অজ্ঞাত সূত্র ভূমিকাগুলি সুঅভিনীত হ’য়েছে।



(বিলাসী)

“রাজগী”

কমলা টকীজের প্রথম নিবেদন

কাহিনী : ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত

চিত্র নাট্য ও
পরিচালনা : } হুমায়ূন দাশগুপ্ত

চিত্র-শিল্পী : ননী সাত্তাল

সঙ্গীত-পরিচালক : মধু শীল

সঙ্গীত-পরিচালক : ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি

হুমায়ূন দাশগুপ্ত : কুমার শচীন দেবদাস

শিল্প-নিবেদন : পরেশ বসু

ভূমিকায় : বিপ্লব—মেনকা, দ্বিজেন—গীরাঙ্গ ভট্টা,

সাবিত্রী—অরুণা, দেওয়ানজি—শৈলেন, চৌধুরী,

নরেন—মণি বসু, রাণীমা—দেববালা, বিপিন—

সত্য মুখার্জি প্রভৃতি।

কালী ক্রিয়াস ষ্টুডিওতে গৃহীত।

প্রথম মুক্তি : “কী”, শনিবার ১৮ই ডিসেম্বর '৩৭

চিত্র-পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং।

ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের বহু বিখ্যাত উপন্যাস “রাজগী”। উপন্যাস হিসাবে “রাজগী” যতই বিখ্যাত হ’ক, চলচ্চিত্রে যে এর গল্পের বিশেষ মূল্য নেই—এই ধারণাই আমাদের ছিল এতদিন। সেই যেদিন প্রথম চিত্র হিসাবে কমলা টকীজ “রাজগী” তুলবে বলে খবর পেলাম সেইদিন থেকে মুক্তির দিবস অবধি আমাদের বেশ ভয় ছিল! কিন্তু ছবি দেখে বুঝলাম, পরিচালকও যে আমাদের মত লস্কহ’না করেছেন, তা’ নয়! তাই তিনি বুদ্ধিমানের মত গল্পের কাঠামোটি খাড়া রেখে স্নেহশীলে গল্পটি অফল-বফল করে লোকের পছন্দ অসুখারী গড়ে তুলেছেন। এবং চিত্রনাট্য রচনার স্নেহশীলের জন্তই গল্পটি মনে লেগেছে সবায়েরই।

ছবিখানা লম্বন্ধে আলোচনা করবার আগেই আমরা বলে রাখতে চাই—ছবিখানা আমাদের ভাল লেগেছে খুব। এবং এবছরের তিনখানা ছবি বাছ দিলে তারই পরে স্থান দেওয়া যায় “রাজগী”-র। ছবিখানার পরিচালনা নির্বাহ না হ’লেও পরিচালকের মগজে যে যথেষ্ট কলাজ্ঞান আছে, একথা বেশ নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। আরও ভবিষ্যতাবলী করা যায়, যদি সুরোগ ও সুবিধা তিনি পান, তা’ হলে অবিলম্বে তিনি প্রথম শ্রেণীর পরিচালক হিসাবে পরিগণিত হবেন। “রাজগী”-র আলোকচিত্রের কাজে ননী সাত্তাল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির টোন, কম্পোজিশন প্রভৃতি দেখে তিনি যে লতাই একজন গুণী ব্যক্তি, একথা বলতে আমাদের মোটেই বিধা নেই! লক্ষ্যবস্তুর কাজ হ’য়েছে নির্বাহ। মধু শীল যে এরকম কাজ করবেন এ আর আশ্চর্য্য কী! ছবিখানার আর একটি অমূল্য সম্পদ এর সঙ্গীতাংশ। আবাহ-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত এত চমৎকার আমরা খুব কম ছবিতেই শুনেছি। সম্পাদনার কাজে লস্কোব গাঙ্গুলী ও পরিম্পূটনাগারের কাজ কৃষ্ণকিরণ মুখার্জি খুব বেশী কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও তাদের কাজ মোটের ওপর মন্দ নয়। ছবিখানার সেট ও আসবাব পত্রের প্রশংসা করা যায়।

অভিনয়ে লকলেই বেশ উৎসাহে গেছেন। এদের মধ্যে আবাহ মেনকা, গীরাঙ্গ ও সত্য-

মুখার্জির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাবিত্রীর ভূমিকায় অরুণার প্রাণহীন অভিনয় আমাদের খুবী কোরতে পারে নি। এত বড় একটি কঠিন অংশে অরুণাকে নামানো আমরা লম্বন্ধে কোরতে পারি না। দেববালা, চরিত্রোপযোগী গাঙ্গুলীরা রেখে সন্দেহ, অভিনয় করেছে। শৈলেন চৌধুরী মোটের ওপর মন্দ নয়—মণি বসুও তাই। কাম্বু বন্দ্যোপাধ্যায় হেম সেনের ক্ষুদ্র ভূমিকা হ’টি লকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুমার শচীন দেবদাস, ভাবানী দাস ও গিরীণ চক্রবর্তীর গানগুলো এককথায় চমৎকার! কিন্তু খেলকার গান অচল বললেও অতুক্তি হয় না।

মোটের ওপর ছবিখানা দেখে আমরা খুব খুশী হ’য়েছি এবং এই ছবির সমস্ত কর্মীদের লাকলোর আন্তরিক চেষ্টার জন্য আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(হিন্দী)

নিউ থিয়েটার্সের চিত্র

পরিচালক : প্রমোদ বড়ুয়া

আলোক-চিত্র : বিমল রায়

সঙ্গীত : অতুল চ্যাটার্জি

হুমায়ূন দাশগুপ্ত : পদ্মজা মল্লিক

প্রথম মুক্তি : “নিউ সিনেমা” ৩০ শে ডিসেম্বর '৩৭

ছবিখানার পরিচালনা, আলোক-চিত্র, সঙ্গ-সংযোজন, সঙ্গীত পরিচালনা প্রভৃতি সব বিভাগই বাঙলা “সুজি”-র জায় প্রাপ্তনীয় হ’য়েছে।

অভিনয়ে বড়ুয়ার প্রশান্ত পূর্ববর্তী চিত্তাকর্ষক হ’য়েছে, তবে হিন্দি উচ্চারণ ঠিক হয় নি নবাবের পাহাড়ী, প্রফুল্লরায়ের

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিপুল পানীয়

কুশলসদায়, জগদীশের মিঃ মল্লিক, কাপুরের বিপুল প্রশংসনীয়। কাননের চিত্রা ও মেনকার স্বর্ণা বাঙলার মত অনবস্তর রূপ পেয়েছে। পঙ্কজ মল্লিকের গান এক কথায় চমৎকার; কীশন ও কল্যাণীর গান প্রতি-সুখকর। মেনকার গান চলনলই।

ষাট কথা, হিন্দি "মুক্তি" একখানা বৈখ্যার মত ছবি—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ছনিয়া-না-মানেন

প্রভাতের এই সামাজিক ছবিপানি 'প্যারাইডাইজ' সিনেমায় বেশ ভালভাবেই চলছে। প্রসিদ্ধ ডাইরেক্টর শান্তারামের অপূর্ণ পরিচালনা এবং শ্রীমতী শান্তা আশ্রের অভিনয় ও সঙ্গীত লহরী যে এই বই খানিতে প্রাণবন্ত করে তুলেছে তা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

নিউ থিয়েটার্স

'নীতিন বহু পরিচালিত ছবি 'বেশের-মাতী'র কাজ এখন ষ্টুডিওর স্টেটর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। পল্লীগোমের কুঁড়ে ঘরে থাকে গৌরি (উমা)—সহরের দার ধারেনা। হঠাৎ সেই গৌরির লজ্জা দেখা হ'ল অক্ষপার (চন্দা)—সহরের ধনী শিক্ষিতা ঘরে। সে পল্লীর নৌলর্য্য দেখবার জন্তে এখানে বেড়াতে এসেছে। এই সিন্ধুলো এখন তোলা হচ্ছে চমৎকার স্টেটর মধ্যে।

এবং 'অভিজ্ঞান' চিত্রও খুব দ্রুত-গতিতে তোলা হচ্ছে। কলী মজুমদারের সাহায্যে পরিচালক প্রফুল্ল বাবুর নব উত্তম, বিমল রায়ের আলোছায়ার ব্যবস্থা এবং

জলু বড়ালের অতুত কর্মশক্তি যে এ ছবির লাক্ষ্য আনবে, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

দেবকী বাবু তাঁর 'বিজ্ঞাপতির' কাজ শেষ করে 'নিমাই মজুমদার'এর পেপার ওয়ার্ক আরম্ভ করেছেন। দেবকী বাবুকে সাহায্য করার জন্তে দীপালী সম্পাদক 'চন্দ্রশেখর' লুৎকারী পরিচালক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন।

এবং হ'নসর বাড়ীতে পরিচালক বড়ুয়া গল্প লেখার কাজ শেষ হয়ে গেছে। কেন্দ্রারী মালের প্রথম থেকেই শুটিং আরম্ভ হ'বে এও একরকম ঠিক। মজুয়া সাহেবের গল্প নাকি আজকালকার আধুনিক City life এর ওপর baso করেই তৈরি। এই ছবিতে নামবেন পাহাড়ী, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখুজ্যো, পঙ্কজ মল্লিক, বসুনা, মেনকা, পূর্ণিমা, ইন্দ্রাভা ও বড়ুয়া সাহেব নিজে।

মল্লিক মহাশয় তাঁর 'বড়ুয়া'র পেপার ওয়ার্ক প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। 'অভিজ্ঞান' শেষ হলেই মল্লিক মহাশয় তাঁর কাজ শুরু করে দেবেন।

কালী ফিল্মস

হাসিরাশির অফুরন্ত উৎসের ভিতর দিয়ে কালী ফিল্মসের প্রাণমাতানো হাসির ছবি "পরজ্ঞানীন বিবাহোৎসবে"-র শুটিং চলেছে। চার জোড়া নর-নারী কিতাবে মনোর ফুলশরে বিদ্ব হ'য়ে তাঁদের মনের মাহুয়ের কাঁছে আত্ম নিবেদন কোরল সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হাস্যরসের

ভিতর দিয়ে সেই কাহিনীকেই কোরে তুলেছেন মনোহর। সম্প্রতি একটি আধুনিক ভাবে লজ্জিত বন্ধে বনলতা, শেকলি ও মিঃ চৌধুরীর প্রেমের প্রথম আখ্যর টানা হচ্ছে। কিন্তু মিঃ চৌধুরী যে কী উদ্বেগ, জীবন সঙ্গিনীরূপে কাকে পাবার ইচ্ছা তা এখনও বোঝা যায় নি। ছবিখানাকে লবঙ্গিক থেকে সুন্দর কোরে তুলবার জন্ত প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, পরিচালক লতু সেন, চিত্র-শিল্পী সুরেন দাস, শব্দধর জগদীশ বসু, শিল্প-নির্দেশক পরেশ বসু, ব্যবস্থাপক লতীশ সরকার—সবাই চেষ্টার কসুর কোরছেন না। এছাড়া আবার রিহার্সেল ঘরে সুর-শিল্পী কমল দাশগুপ্ত সঙ্গীতের মন্থনা নিয়ে ষ্টুডিও দস্তরমত লরগরম কোরে তুলেছেন। ছবির কাজ সেভাবে দিনরাত চলছে, তাতে মনে হয় এই মালের শেষেই ছবিখানার 'উত্তরা'-র মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

এছাড়া আবার হ'নসর ষ্টুডিওতে অবসর সময় রবীন্দ্রনাথের সেই প্রেম-বিরহের অপকৃপ কাহিনী "চোখের বাসি"-র চিত্র গ্রহণ লতু সেনের পরিচালনায় এবং মিঃ বি, পি, মেহরার তত্ত্বাবধানে এগিয়ে চলেছে। আপাততঃ মহেন্দ্রের বাড়ীর একটি বৃহৎ 'সেটে' কাজ চলছে।

রবীন্দ্রনাথের যে কোনও বইতে অভিনয় কোরতে গোল চাই শিক্ষা ও কৃতি। সেই জন্তই প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী এই চিত্রে অভিনয় করার জন্ত যাদের মনোনীত কোরেছেন—এই ছ'টি গুণে তাঁরা সমুজ্জ্বল। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জি, শ্রীমতী ইন্দিরা রায়, ডাঃ হরেন মুখার্জি ও ছবি



GRAM: "ADNIVAG"

ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

বিশ্বাশের পরিচয় নিশ্চয়রোজন। আমরা প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর এই দূরবর্ষিতার জন্য তাঁকে প্রশংসা করি।

টক্কী অফ টক্কীজ

এই শনিবার থেকে 'উত্তরা'-র কাঙ্ক্ষী ফিল্মশের সর্বজন অভিনন্দিত 'টক্কী অফ টক্কীজ' লামারগের বিশেষ অনুরোধে দেখানো হবে। ধারা ছবিখানা এখনও দেখেন নি তাঁরা এ সুযোগে হারাবেন না।

হাজরা পিক্‌চাস

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র-নিবেশন 'দেবী - ফুল্লরা'-র শূটিং বেশ জোরজোবেট চলেছে। প্রধান পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তীর অধীনে গিরিডির পর্কত-সকল অর.ণ্য, অর.ণ্য-নদীর প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ভেতর বাইরের দৃশ্যগুলো এর মধ্যেই তোলা শেষ হয়েছে। তারপর আর কয়েকটি বিশিষ্ট দৃশ্য তোলার কাজ শেষ কোরেই তিনকড়িবাবু অভ্যন্তরীণ দৃশ্যের কাজ শুরু কোরবেন এবং এইজন্ত ইতিমধ্যেই পরেশ বসুর নির্দেশনায় কালী ফিল্মসে সেট তৈরি হয়েছে। এই ছবির আলোকচিত্রের কাজ ও শব্দযন্ত্রের কাজ কোরছেন 'যথাক্রমে' প্রজন উৎসাহী তরুণ শিল্পী বিভূতি লাহা ও যতীন বসু। সুর-সংযোজনা কোরবেন গোকুল মুখার্জি। আমরা এদের সমবেত চেষ্টা জয়যুক্ত হ'তে দেখলে বিশেষ খুশী হব।

মেট্রোপলিটান পিক্‌চাস

'ডি-জি'র পরিচালনার এদের 'হাল বাঙলা'র শূটিং বেশ খানিকটা এগিয়েছে। 'হাল বাঙলা'র গল্পটি আমরা যতদূর শুনেছি, তাতে মনে হয় কাহিনী বেশ জঘাটে। আর রস-পরিবেশনে ডি-জি নিরুদ্বিগ্ন দেহজন্ত রসধন-কাহিনী পর্দায় বেশ জমবে বলে মনে হয়।

ও, কে, এ

আধুনিক যুগের রোমান্স বহুল হাতরাস-

পূর্ণ চিত্রকথা 'রূপোর সুমকো' এদের প্রথম ছবি। এর শূটিং-এর কাজ সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। গত সপ্তাহে লেক অফলে কয়েকটি টাইপ চরিত্রের চিত্র অভিনয় দৃশ্যের শূটিং গ্রহণ করা হয়েছে। রাজপথে 'বাঙালে'র সঙ্গে ক্যালকেশিয়ান তরুণ যুবক স্তম্ভমূর বচনা, হাতাহাতির দৃশ্যে বেশ হাদির থোরাক যোগাবে। উপরোক্ত দুটি ভূমিকায় লতা মুখার্জী এবং নীলু রায় (এমেচার) খুবই নাকি স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

রাজবন্দী সাহায্য ভাণ্ডার

গত বুধবার পূর্ণ থিয়েটারে উক্ত ভাণ্ডারের সাহায্য করে একটি চ্যারিটি শো-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। এবং আগামী ১৭ই জানুয়ারী 'চিত্রা'র আর একটি চ্যারিটি শো-এর ব্যবস্থাও হয়েছে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে নিউ থিয়েটার ও পূর্ণ থিয়েটার কর্তৃপক্ষের বহাভূতা প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য সকল চিত্র-প্রতিষ্ঠানই নিজের কর্তব্য কর্ম পালন করিবেন।

চিত্রা

এখানে এখনও 'সুজিত' জনসমাগম যে ভাবে হচ্ছে তাতে মনে হয় আরও কয়েক সপ্তাহ বেশ ভাল ভাবেই চলেবে। 'বিদ্যাপতি' দেখাবার জন্তে হয়ত 'সুজিত'কে ফেরারী মানেই খুজি হিতে হ'বে।

নিউ সিনেমা

এখানে হিন্দি 'সুজিত' এখনও বেশ ভাল ভাবেই চলেছে।

পূর্ণ থিয়েটার

নিউ থিয়েটার-এর শ্রেষ্ঠ ছবি 'বিদ্য' এই সপ্তাহেই শেষ। আসছে শনিবার থেকে এখানে নিউ পপুলার পিক্‌চাস-এর 'ইম্পটার' বা 'বুমকেতু' দেখান হবে।

বিবিধ

উনপঞ্চাশী-দাদার ভবিষ্যত

আমাদের কেরামত 'উনপঞ্চাশী' বাবা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কর্পোরেশনের কাট রেজিষ্ট্রেশন অফিসারের কার্যকাল গত ৫ই জানুয়ারী সমাপ্ত হইবার কথা ছিল, কিন্তু বর্তমানে আমাদের বাবা মধ্য পথে সুদৃষ্টিভেদে। কাউন্সিলার যোগেশ চন্দ্র ঘোষ স্তাহার কার্যকাল এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধির নোটিশ দিয়া এক বিল্ডাট ঘটাইয়াছেন। অপরপক্ষে কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় নোটিশ দিয়াছেন যে এ্যানিষ্টাট সেক্রেটারী মিঃ এম. এন. রায়কে উপেন বাবুর পদে বাহাল করা হউক। ওয়াকিবা-হাল ব্যক্তিবিশেষ মনে করেন যে, স্বর্গীয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রঞ্জন মোহন সেনগুপ্তকে এ্যানিষ্টাট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করা হইবে। কারণ এবার এ্যানেশারের পদের মেয়াদ ফুরাইলে তিনি বেজারদ প্রাপ্ত হইবেন। সাতদিন কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ নিলীথ চন্দ্র সেন মহাশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার ফলে ব্যাপ্যারটা বর্তমানে ধামাচাপা পড়িয়া আছে এবং উপেন বাবা যথারীতি কুড়েরার মোড়ে নির্দিষ্টকালিত্তে কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় উপেনদাদার কার্য্যকাল এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি পাইলেও তিনি ১৯৩৮ সালের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করিবেন বা পদভ্যাগ করিবেন, কারণ ১৯৩৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি লিথির কেন্দ্র হইতে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইবেন। তবে প্রায়

হইতেছে অবলম্ব্য গ্রন্থাগারে বাবা নির্বাচন প্রার্থী হইলে বঙ্গবর বিশ্বনাথ ও শঙ্কর-ভ্রাতৃপুত্র শ্রীমান্ নিতাই চরণ পালের মধ্যে কে বাধ পড়িবেন তাহাই বিবেচ্য।

ভারতীয় নৃত্য

বর্তমান যুগে ভারতীয় প্রাচীন নৃত্য-কলা বিবেকে স্মৃতি লম্বাভের দৃষ্টি পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ভারতীয় নৃত্যকলার প্রাচীন আদর্শকে উজ্জীবিত কর্তে চেষ্টা করলেন। তারপর এলেন উৎকলেশ্বর। বিখ্যাত রাশিয়ান নর্তকী আনা পাভলোভার সাহচর্যে তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতীয় নৃত্যকে সজ্জ্বলের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার সাধনা ও উজ্জীবনের উদ্দেশ্যে গত বৎসর বালীগঞ্জ ৩২নং হিন্দুস্থান পার্কে দেশের কয়েকটি শিক্ষিত ও উদ্যোগী কলাবিদ্যের আগ্রহে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নাম The Institute of Indian Dances. অনেকদিনের প্রচেষ্টা ও সাধনার পর তারা শীঘ্রই কলকাতার একটি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য কলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত নৃত্যকলাবিদ ও গবেষক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ইহারের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন। তারই পরিচালনার এই নৃত্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কয়েকটি সজ্জাত ও শিক্ষিতা মহিলাও ইহাতে যোগদান করেছেন। তার ভেতর “কুমারী মঞ্জুলা ভাট্টা, কুমারী লতিকা রায়, কুমারী কণিকা রায়, কুমারী শেরিকা বেগম আমের, কুমারী মুরজাহান বেগম আমের ও কুমারী অমীমা লাল্মালের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রায় সকলেই ভারতীয় নৃত্য জগতে বহু পুর্বেই যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

এই নৃত্য উৎসবের অন্ততম প্রধান বিশেষত্ব হবে—এর সুরসংযোজনা বিখ্যাত সুরশিল্পী পণ্ডিত যুনেস্বর দয়াল প্রাচীন ভারতীয়

অবিমিশ্র রাগরাগিনীতে সকল নৃত্যের সুর দিয়েছেন। এবং বিখ্যাত ভারতীয় বজ্রীদেব সাহায্যে এই নৃত্যের বজ্রী সংসদ গঠিত হয়েছে।

বিখ্যাত সুরশিল্পীদের সমন্বয়ে ও বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীদের সাহায্যে রূপে, ভলিমায়, সুরে এই প্রদর্শন ভারতীয় প্রাচীন গৌরবকে আবার ফিরিয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

কোম্পানির পাঠ-চক্রের আর্থিক

সম্মেলন

সম্প্রতি ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কোম্পানির স্কুল প্রাঙ্গণে ৮শিবচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি উৎসব এবং ‘পাঠচক্র’র নবম বাবির সম্মেলন মহানন্দারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় প্রায় বেড় সত্তর নরনারীর সমাগম হইয়াছিল এবং ‘মাইক্রোফোন’ সাহায্যে সকলেরই ক্রটিগম্য করার ব্যবস্থা থাকায় অতি উচ্চাঙ্গরূপে সভার কার্য সম্পন্ন হয়।

শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল বসুর ছাত্রাগণ কর্তৃক ‘বন্দেমাতরম’ গানের সহিত সভা আরম্ভ হয়। কোম্পানির কয়েকটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান কর্তৃক ৮শিবচন্দ্র ঘোষের স্মৃতি তর্পণের পর পাঠচক্রের সম্পাদক শ্রীমতিজ্ঞাননাথ মিত্র সমিতির কার্যবিবরণী পাঠ করেন। বিমল ঘোষ একটি কবিতা এবং শ্রীশিশির ঘোষ “ভবিষ্যৎ ভারতে শিক্ষা” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করার পর শ্রীপ্রবোধ লাল্মাল রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। সভাপতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, জাতি মরিয়াছে বা মরিতে বসিয়াছে একরূপ বলিবার বা ভাবিবার কোন কারণ নাই। মরণ, সে ত আছেই। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সাথে সংগ্রাম করিয়া জীবন শ্রোতের জুগিবার গতিকে অব্যাহত রাখিয়া জীবনকে

পর্যাপ্ত হইতে দিব না। বর্তমানের তরুণেরা ভবিষ্যতের সজ্জ্বল দাঁড়াইয়া এই কথাই ত আশাঘের শুনাইতেছে।

পরিশেষে শ্রীযুক্তনাথ মিত্রের পরিচালনায় নিউ থিয়েটারের পাছাড়ী লাল্মাল, প্রভাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির উচ্চাঙ্গের নকীত ও তিমির বরণের ‘অর্কেষ্ট্রা’ এবং স্থানীয় কুমারী মীরা সরকার ও গীতা সেনের সুমধুর নকীতে সকলে পরিভূট হন। সম্মেলনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষর কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত দেব প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীর বসু, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্ত ললিত মোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দি জেমুইন ইস্টিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

দি জেমুইন ইস্টিওরেন্স কোম্পানী লিঃ জীবন বীমার কাজ মাত্র আড়াই বৎসর হইল আরম্ভ করিয়াছে। এই ক্ষর সময়ের মধ্যেই ইহা যেরূপ জীবন বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। জীবন বীমা তহবিল বিশেষ আশাশ্রব। মিতব্যয়িতা ও সন্তোষাবে কোম্পানীর পরিচালনাই এই কোম্পানীর উন্নতির মূল।

১৯৩৬ পর্য্যন্ত কোম্পানীর প্রথম ভ্যালু-রেশন একচুমারী লিঃ জে, সি, সেন দ্বারা করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, প্রথম ভ্যালু-রেশনেই কোম্পানী আঞ্জীবন বীমার ও মেরাদী বীমার যথাক্রমে প্রতি হাজার টাকার প্রতি বৎসর ১৫, এবং ১২ টাকা বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা বাস্তবিক কৃতিত্বের পরিচয়।

চারণ বিজয়লাল

শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়

“স্বাধীনতা-হীনতার কে বাঁচিতে চায় রে

কে বাঁচিতে চায় ?

হালধ-শুভল বল কে পরিবে পার হে

কে পরিবে পার ?”

প্রত্যেক চারণের কণ্ঠেই এই লজ্জিতের স্বাক্ষর! যুগে যুগে চারণের হল এই লজ্জিতের প্রেরণার পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে জাতিকে মুক্ত করেছে। চারণ-আন্দোলনকে উপেক্ষা করা চলে না মোটেই কারণ, সাহিত্য আর লজ্জিতের প্রভাব জাতীয় জীবনে চিরদিনই প্রচুর। শব্দের মধ্যে নিহিত থাকে অপরিমিত শক্তি, অক্ষুণ্ণ প্রেরণা, অদম্য উত্তেজনা। “সাহিত্য জাতিকে যেমন নবজীবনের মন্ত্র, লজ্জিত যেমন নবজীবনের উদ্বোধন।” রাজপুতানার উন্নয়নের আর প্রান্তরে চারণের হল মুক্তকণ্ঠে মুক্তির গান গেয়ে বেড়াত আর লক্ষ লক্ষ রাজপুত-তরবারি সূর্য্যকিরণে ঝলকুঝলকু করে সেই গানে লাড়া দিত। “Marseillaise-এর সুরের আশ্রয় করানী-বিপ্লবের মধ্যে লক্ষ্যাক্ষিত করেছিল একটা মূর্তনশক্তি। “বন্দে-মাতরম্” লজ্জিত বাঙ্গালী জাতীর বাহুতে শক্তি ও জ্বরে তক্তির লক্ষ্য করেছিল।

বিজয় বাবুকে চারণ নামে অভিহিত না করে পারি না যখন তাঁর “টারগী-নিরিকের” পুস্তিকাগুলি পাঠ করি। “ত্রয়ী” এবং “অভিশাপ না আশীর্বাদ”-এর প্রবন্ধগুলি মুক্ত, স্বাধীন, লতা। তাদের হজে, হজে পরাধীনতার বাধা মুক্ত হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য তাদের প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমাদের মনের

দরজার উৎসাহ আর অমুপ্রেরণা বহন করে আনছে। স্বাধীনতার প্রতি জ্বরের তীব্র অমুরাগে “ত্রয়ী” ও “অভিশাপ না আশীর্বাদ”-এর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা কি এবং জীবনে তাঁর প্রয়োজন কতখানি স্বীয় বিশেষ ভাষা ও সুবুদ্ধির সাহায্যে বিজয়বাবু তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ শুধু সাহিত্য হিসাবে নয়, জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাত-লজ্জিত, হিসাবে অমূল্য। তাঁর কাছ থেকে আমরা শুনতে পাই “স্বাধীনতার মধ্যেই” মনুষ্যত্বের গরিমা এবং হারিভোর অবসান। স্বাধীনতার মধ্যেই জীবনের প্রাচুর্য্য এবং আত্মপ্রকাশের আনন্দ। লজ্জিত হারিয়ে কোন নারীর বেঁচে থাকার যেমন মানে হয় না, মুক্তিকে হারিয়ে কোন জাতিরও তেমনি বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। “স্বাধীনতা হারিয়ে আমাদের যে অগৌরব তা অসতী নারীর অগৌরবের চেয়ে কম তিক্ত নয়। লতাই পরাধীন জাতীর পক্ষে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বলাভ মুকুটিন কারণ তাদের জীবনে অমের অতাব, বস্ত্রের অতাব, আশ্রয়ের অতাব! মুক্তির আনন্দ নেই যে জীবনে সে ত জড়! তারতবর্ষ শিল্পকলার জাপানের লমকর্ক হবে কি করে? জাপানীদের জীবনে যে মুক্ত প্রবাহ বহে বাছে তারত-বাসীর জীবনে তার বে একান্ত অভাব! সেই প্রবাহের অভাবেই হুনিয়ার বত জঞ্জাল এনে জমা হচ্ছে তারতীয় চরিত্রে। বিজয় বাবুর ভাষায় বলি, “যে জাতি স্বাধীনতা

হারিয়েছে তার মনের লবংখানি জুড়ে আছে হালধের বেধনা। আট বল, বিজ্ঞান বল, বর্ষ বল, সাহিত্য বল, বিশ্বশ্রেষ্ঠ বল—পরাধীন জাতির চিত্তে এদের কারও আপন নেই। স্বাধীনতা আত্মক—তারার তারতজননী তি বক্ষা নন, তারতের মুক্তিকা ত অমুর্কর নয়—এ সব আপনই জন্ম নেবে, বর্জিত হবে। যে দেশে কোটি কোটি নরনারী অনাহারে মরে, যে দেশের অলংঘ্য শিশু-নারায়ণ বস্ত্রাভাবে শীতের দিনে থরথর করে কাঁপতে থাকে, যে দেশের অগণিত মানুষের অন্তর্দেবতা প্রতি মুহূর্তে লালিত হয়, সে দেশে “লুপ্তিত্ব আর প্রপঞ্চ, দৈতবাধ এবং অধৈতবাধ নিয়ে আলোচনা করবার...কি কোন লার্থকতা আছে?” সে দেশে চাই স্বাধীনতা, চাই মুক্তি;—মহাজন ও জমিদারের রাহগ্রাস থেকে মুক্তি, শাস্ত্রের কারাগার থেকে মুক্তি, লমাজের নানাবিধ নিষ্ঠুর অমুশৃঙ্খল থেকে মুক্তি, মস্ত্রের আধিপত্য থেকে মুক্তি, অতীতের কুসংস্কার থেকে মুক্তি।” এই মুক্তির আনন্দ আনতে হবে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি নর ও প্রত্যেকটি নারীর জীবনে। মুক্তি আমরা চাইবই তাতে বত বিপদ আলে আত্মক—“কর-কতি-লাজ ডুগাইব আজ বিজয়ের তাগুবে”; “স্বাধীনতা আমরা চাইবই কারণ স্বাধীনতাই তারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের “সুধার্ত্ত মুখে বেবে। অম, তাদের অজ্ঞানতিমিরাজন মনে বেবে জ্ঞান, তাদের নিরানন্দ জ্বরে বেবে আত্মপ্রকাশের আনন্দ, তাদের লালিত জীবনে বেবে মনুষ্যত্বের গরিমা। চারণ বিজয়লাল উচ্ছলিত কণ্ঠে স্বাধীনতাকে আবাহন করেছেন তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধে।

স্বাধীনতার পথে জাতীয় পতাকা বহন করে চলবে—দৌবন। দৌবনের চাকলা আর উত্তেজনা, প্রতিভা আর উদারতাই

বহু বৎসরের পুঞ্জীভূত আবর্জনার পাহাড়টাকে
কর্কে ধ্বংস, এই কার্যে ঝাঁপে হ'বেন অগ্রণী
তাঁদের মধ্যে অসামান্য প্রতিভার আবশ্রুক,
তারা হবেন "সুখম শ্রেণীর" লোক—যেমন
গান্ধী, তিলক, নাইডু, জহরলাল। স্বাধীনতার
অভিযানে ঝাঁপে নেতৃত্বের গুরুত্ব নেবেন
স্বাধীন তুলে তাঁদের সংগ্রাম কর্তে হবে
দুঃখের সঙ্গে, তাঁদের দলিত কর্তে হবে
শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কারকে, তাঁদের অঙ্গ
টেকে যাবে পথের ধূলি আর কাঁদার।
"অভিলাপ" না "আশীর্বাদ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে
এই সত্য কথাটাই জোর করে বলা হয়েছে,
যে স্বাধীনতা যখন জীবনের লক্ষ্যপেক্ষা
মূল্যবান সম্পদ তখন স্বাধীনতা-আন্দোলনে
নেতৃত্ব গ্রহণ কর্তে যারা তাঁদের থাকা চাই
অসামান্য প্রতিভা, অসম্মান উত্তেজনা এবং
অনমণীয় সাহস, সেই আন্দোলনের সুত্থাধারার
যারা প্রতিটি গ্রাম ও নগর, প্রতিটি ক্ষুদ্র
কুটীর এবং প্রতিটি প্রাণ প্রাণিত করে যাবে
তারা হ'ল সুবকের দল—যাঁদের মধ্যে তর
ব'লে কিছু নেই, তুচ্ছ স্বার্থ ব'লে কিছু নেই,
ব্যক্তিগত আরাধ বা স্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছু
নেই।

স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রামই এখন আমাদের
শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য। চারপাশে বিজয়লাল দৃশ্যকণ্ঠে
এই সঙ্গীতই আমাদের শোনাচ্ছেন। চারপাশে
কবি হেমচন্দ্রের ছত্র ক'টি উদ্ধৃত করে
প্রবন্ধ শেষ করলাম;—

"একবার শুধু জাতি-ভেদ ভুলে,
ব্রাহ্মণ কব্রিয় বৈশ্য শূত্র বিলে,
কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডল

তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।"

কুটিরখানি বাঁধব সেখান

শ্রীমদীক্ষনানন্দ চক্রবর্তী

কুটির খানি বাঁধবো সেখান
ম'নের মত ক'রে,
পাহাড় খেঁচায় দাঁড়িয়ে আছে
ত্বার-মালা প'রে।

নদী যেখান চ'লছে বয়ে
মধুর কলসনে—
ছই তীরে তার ফুটছে কুহুম
নিভুঁই নিরঞ্জন।

লেখার আমি বাঁধব বাসা
বিজন নদী তীরে,
পাহাড়, নদী, বর্ষা বাতাল
রইবে ঘোরে ঘিরে।

ব'সবে সেখান নদীর চরে
চখা, চখির মেলা,
দল বেঁধে লব মরালগুলি
ক'রবে জলে খেলা।

ফাগুন রাতে ডাকবে কোকিল
নীপের ডালে ব'লে,
বকুল ফুলে ভ'রবে কানন
প্রতি শীতের শেষে।

এক ফালি সে র'ইবে উঠাণ
বৃষ্টির ঝড়ে ভরা,
প'ড়বে সেখান শুষ্কারাতের
স্নিগ্ধ কিরণ ধারা।

শ্রাবণ রাতে ক'রবে বাঁধল
ঘেঘের গুরু ডাকে,
হাসিমুহানার আসবে সুবাস
বাতায়নের ঝাঁকে।

নদীর জলে ক'রবে পিনান
নিত্য সকাল দাঁকে,
প্রাণ খুলে গান গাইব স্নেহে
কণ্ঠে যে সুর রাজে।



দুর্ধরম এবং শীর্ণ
শিশুরা

ডোঙ্গরের

বাল্যামৃত

সেবনে

অবিলম্বে সুস্থ ও

সবল হয়।

বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

চরিত্র—পুরুষ।

ডাঃ হরেন মুখার্জী—প্রাইভেট ডিটেক্টিভ
বাড়ী কালীঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিত শক্তিশালী বন্ধু ও
সহকারী।
সমর মিত্র—ভবানীপুর থানার কর্মচারী ও
হরেনবাবুর সহপাঠী।
রাসমহিন—হরেন বাবুর বিশ্বস্ত বোয়ারা।
অস্তান্ত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

বাড়ের রাতে

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

শ্রীভূষণ নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

চরিত্র—স্ত্রী।

মদীবা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—বাঁপের আমতলায়
বুড়ো বি।
অস্তান্ত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে
পাইবেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবিনাশ আমার কানে কানে ফিস-
ফিস করে বলে—“ঐ এ-বি-পি-ডি।”

আমি—“কে?”

অবিনাশ—“ঐ ফরসা, চোখ জল-জলে,
লম্বা জোয়ানটা।”

আমি—“চুপ!”

এই সময় গভীর স্বরে লোকটা বলতে
আরম্ভ করলেন—“রাণী জ্যোতিষ্মরি!”

বাধা বিরে লিংহালনারুড়া যুবতী বলে
উঠলেন—“আমি উষা—শুধু উষা! মা-
বাঁপের দেওয়া নাম ছাড়া আমি অস্ত্র নামে
পরিচিত হ’তে চাইনি।”

মাথা নিচু করে গভীরভাবে অভিযান
জানিয়ে সম্পূর্ণ আবেগহীন নিকল্লস্বরে
লোকটা বলতে লাগলেন—“রাণী জ্যোতি-
ষ্মরি! রাজা চন্দ্রকেতুর বংশে যে আপনার
জন্ম তা’ নিঃশংসে প্রমাণিত হ’য়ে যাবার
পর থেকেই নাগ-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের নেত্রী
আপনার হাতেই বেওয়া হ’য়েছে। মহারাজ
চন্দ্রকেতুর মহামন্ত্রী পশাঙ্কের বংশধর আমি
রাজবংশীর অঙ্গপন্থিতিতে যতদূর সম্ভব
বন্ধ লহকারে সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষা করে
এলেছি। আশ্রয় আশ্রয় আশা করিনি, যে
আপনার হাতে সে মর্যাদা ক্ষয় হ’বে।
আপনি যাকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি
রাজবংশীর ছিলেন না। সুতরাং আমাদের
নিয়ম মতে সে বিবাহ অমূল্য হ’লেও, ঐ
বিবাহের ফলস্বরূপ আপনার পুত্র উৎপন্ন
হওয়ার আশ্রয় সে বিবাহে লিঙ্ক বসে।

স্বীকার করে নিচ্ছে। কিন্তু আপনার
গর্ভজাত সন্তান হ’লেও আপনার পুত্র রাজ-
ঔরস-জাত নয়। অথচ চন্দ্রবংশের রাজবংশের
একমাত্র জীবিত পুরুষ উত্তরাধিকারী
হিসাবে এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব আপনার
পুত্রের উপর এসেছে। প্রাপ্তবয়স্ক হ’লেও
রাজপথে তাঁরই অতিবিক্ত হওয়া উচিত;
আপনি শুধু তাঁর অতিভাবিকারূপে মুকুট-
ধারণে অধিকারিনী। তিনি যখন রাজ-
ঔরস-জাত ন’ন তখন তাঁর লিংহালনে
আরোহণ ও এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ
নাগরাজের অভিপ্রেত কি না তা’ জানা
দরকার। তা’ জানতে হ’লে নাগরাজের
সম্মুখে আপনার পুত্রকে সমর্পণ করতে
হ’বে। যদি দেখা যায়, যে নাগরাজ তাঁর
সন্তকে ভ্রাতারূপে কল্লেন, আমরা বুঝবো যে
তিনি আপনার পুত্রের নেতৃত্ব অমুখোঁষ
করেন। আর যদি আপনার পুত্রের নেতৃত্ব
তাঁর অনুভিপ্রেত হয়, তা’ তাকে তিনি ভরণ
করে ফেলবেন। অনেক দিন আগেই এই
পরীক্ষা হ’তে পড়িতো। কিন্তু আপনার
হতভাগ্য মূর্খ স্বামী পরামর্শে আপনি
আপনার পুত্রকে দূরবেশে পাঠিয়ে দেন।
তার ফলে সেই মূর্খ অকালে মৃত্যুকে বরণ
করেছে, আর বার রক্ষণাবেক্ষণে আপনার
পুত্রকে সে রেখেছিল, সে ভ্রাতালোকও নানা
প্রকারের ঊৎসীড়ন ভোগ করে, শেষে
আমাদের নজরান এই দীপ পর্যন্ত এসে খুব
লম্বা কোন হিংস্র বস্ত্রভঙ্গ কবলে জীবন
বিয়েছেন। আপনার পুত্র ও ‘কলমল’ হীরা

ছটীটু এখন আমাদের হাতে। ‘কলমল’
হীরা উত্তরাধিকারী অবশ্য আপনার পুত্র,
কিন্তু তা’ পরীক্ষা-লাপেক। আশ্রয় সমাবস্থা
—পরীক্ষার দিন—আপনি পরীক্ষার অমু-
খোঁষ করুন। একটু ভেবে দেখুন, এই
পবিত্র সম্পদ ও সম্মানের প্রকৃত—অধিকারী
হ’য়েও যদি আপনার পুত্র তা’ থেকে বঞ্চিত
হ’য়ে থাকেন, তবে তাঁর জীবন অপেক্ষা
মৃত্যুই কি বাঞ্ছনীয় নয়?”

দীপে দীপে উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে যুবতী
বলতে লাগলেন—“আপনার আমাকে রাণী
করতেন। একটা লিংহালনে বসে, একটা
মুকুট মাথার বিরে আমি রাণী সেজে আছি।
আপনি বলছেন, আপনি আমার মহামন্ত্রী।
লিংহালন, রাজছত্র, রাজমুকুট—এবং
একদল লোক যদি রাজ্য হয়, তবে যে কোন
রজস্বলও তো একটা রাজ্য। যে মণিহস্তা
একটা জললে ভরা দীপে দীপের নিচে লুকানো
রইলো, তাতে আর কাচ ও বোম্বাই-মুকুট
তফাৎ কি? যে সোনার লিংহালন; এই
গুহার মধ্যেই চিরকাল থাকবে, সে লিংহালনে
বসাতে আর রজস্বলের রায়তামোড় লিংহা-
লনে বসার কি তফাৎ? “রজস্বলের” রাজার
মাথার সোনার মুকুটের মতই উজ্জল মুকুট
থাকে, সেখানেও ছদ্মশয়ন লোক ‘জয়
মহারাজ অমুকের জয়’ বলে গলাবাজী করে।
কই—রজস্বলকে রাজা হ’য়ে বসতে পেলুম না’
বলে মানিতে কাটকে তো প্রাণ-নিদর্শন
করতে শোনা যায় নি?—সেই আকশোবে
কারও কখনও জীবনে তো দিকার জন্মার

নি? তবে আমার পুত্রের এই লং লাজতে না পেলেই বা জীবন ও মরণে লম্বান হ'বে কেন? রূপে, বিভাগ, বংশধর্য্যাদায় গৌরবান্বিত স্বামীর সহবাসে সুখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। আপনারা, বিশেষতঃ আপনি, সন্তান আশ্রয়ের মত কেন আমার সে সুখের 'নৌড় পুড়িয়ে' দিলেন? হুঁপে আমাকে? আমার স্বামীকে কেন এখানে নিয়ে, এনে বন্দী করলেন? কি বন্দীকার ছিল, আমার এখানে এলে এক বিব্রত যুগের নাটকীয় অংশের অর্থহীন মুক অভিনয়ে? আপনাদেরই বা এতে স্বার্থ কি, তাও তো আমি বুঝতে পারি না। যতই আপনাদের কার্য্যাবলি আমি দেখছি, ততই আমার মনে হ'চ্ছে—আপনারা একটা পাগলের হল। একবার একটা লুপ্ত সম্প্রদায়ের গোঁড়াবী ভুলে গিয়ে, আমার মাতৃঘরে চোঁধ দিয়ে আপনাদের কাজের সমালোচনা করুন দেখি। দেখতে পাবেন, আপনারা কতবড় নিষ্ঠুর—আপনারা কতবড় অধার্মিক। জীর সর্বস্ব স্বামী—সেই স্বামীকে আপনারা হত্যা করেছেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, মায়ের নয়নের মণি, সারা জীবনের লম্বল সন্তান—আমার সেই সন্তানকে আপনারা আপনাদের একটা উন্মত্ত খেয়াস চরিতার্থ করার জন্তে লাক্ষ্য মৃত্যুর মুখে ঝুলে দিতে চান। আরও চান, যে 'মা' তাঁর সন্তানকে একটা অজগরের লামনে ফেলে দিতে সম্মতি দেবে। আপনারা কি! তবে ক্ষমুন। আমি আপনাদের 'রাণী'—আপনাদেরই বলছেন। যদি আপনাদের রাণীর অলম্বান আপনারা না করতে চান, তবে তাঁর আদেশ শুনুন। ঐ 'মায়ের বাছ'কে মায়ের কোলে ভুলে দেওয়া হোক। যে পরীক্ষা আপনারা করতে চান, তা হ'বে না। আমি কখনও তাতে মত দেবো না।

বাক্য উদ্দেশ্য করে' যুবতী কথা বলেছিলেন, সেই লোকটি রাখা মীচু করে

অভিবাধন জানিয়ে বলতে লাগলেন—
“আমার রাণীর ইচ্ছার লামনে আমি মাথা নত করছি। কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করা আমার মাধ্যমীত। আমার কিছা আর কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার হ'লে আমাদের কিছুই বলবার থাকতো না। যাবনতশিরে আমি আপনাদের আদেশ পালন করতুম। কিন্তু এই ব্যাপার সম্প্রদায়গত। এই নাগগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নেতা রাজপুত্র অথবা রাজকন্যা হওয়া চাই। আপনাদের পিতা রাজবংশীয়; সেইজন্ম আপনাকে ঐ সিংহাসনে বসতে দেওয়া হ'য়েছে। আমি এতকাল এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করে' আসছি বটে। কিন্তু ঐ সিংহাসন এ পর্য্যন্ত শূন্যই পড়েছিল। কাজেই আপনার পুত্রের ঐ সিংহাসনে বসে নাগরাজের অনুমতি লাগুক। ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে যান, রাণী! 'মাতৃঘ' অতি মহৎ—সেই 'মাতৃঘ' ও আপনাকে' বিচার করে' নিতে হ'বে। আপনি ধারণা করতে পারছেন না, যে সব রকম প্রবৃত্তির কত উচুতে এই বংশ-গৌরবের ষোড়শ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আপনি বলতে পাবেন, যে আপনার পুত্রের সিংহাসনে প্রয়োজন নেই, কাজেই পরীক্ষাও নিম্প্রয়োজন। কিন্তু আপনার পুত্রের সিংহাসনে প্রয়োজন না থাকলেও, জায়া নেতা থাকতে আমরা তাঁর নেতৃত্ব হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে থাকতে অস্বীকৃত। সুতরাং পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। এই সিংহাসন ও বিভবের সঙ্গে রাজমন্ডলের সিংহাসন ও মূল্যহীন হীরামুক্তার আপনি তুলনা করেছেন। সে 'জন্ম দারী এই সিংহাসনের' ও এই বিভবের পবিত্র গৌরবের লম্বকে আপনার অজ্ঞতা। মনে করে' দেখুন, কোন অতীতযুগের এক মহীয়নী মহিলা আপনি যে দুর্ভাগ্য ধারণা করে' আছেন, ঐ দুর্ভাগ্য মাথার দ্বিগুণ শোভা পেতেন। শত শত হাদ্যদারী, মন্ত্রী, সেনাপতি, লৈলবল,

—সেই গৌরবান্বিতার না ছিল কি? বীরপত্নী, বীরমাতা সেই বীরনারীর অঙ্গুলী চালনে একটা রাজা—একটা রাজ্য চলতো না কি? আবার তাঁরই করুণাধারায় পুট হ'য়ে হাজার হাজার যুজ্জ্বল নরনারী 'কৃতজ্ঞস্বরে' 'জয় মহারাণীর জয়' বলে' তাঁর জয় ঘোষণা করতো না কি? সে লম্বয়েও কি মাতৃঘের স্থান ছিল না? ছিল বই কি। তবে সে মাতৃঘ কোমলাঙ্গলময়ীর তরল দেহধারায় পুট ছিল না—সে ছিল বীরঘের রসে পুট। মা! আঁচল দিয়ে ঘিরে রাখলেই কি মায়ের কর্তব্যের শেষ হ'লো? জগন্মাতা কি ছরহাতে ছ'টা প্রহরণ দিয়ে কষ্টিককে বৈতাবধে পাঠিয়ে দেন নি? কি জন্ম 'তিনি তা' করেছিলেন? দেবকুলের গৌরবরক্ষার জন্মই নয় কি? জগন্মাতার মাতৃঘ কি জগতের লম্বত মায়ের অনুকরণীয় নয়? মা শুধু চোখের জলে সন্তানের অভিষেক করেন না। সন্তানের জীবন যেমন তাঁর কাছে কাম্য, সন্তানের গৌরবও তেমনি তাঁর কাছে বরনীয়। কোমলতার সঙ্গে কঠোরতাকে বরণ করে' নি'ন, মা! আজ রাজা চন্দ্রকেতুর স্মৃতিছাড়া কিছু আর নেই। কিন্তু সে স্মৃতি অতি পবিত্র। নাগগোষ্ঠী সম্প্রদায় সেই স্মৃতি আজও বজায় করে' রেখেছে, তাই এ সম্প্রদায় গৌরবান্বিত। যে পবিত্র বীররক্ত আপনাদের শরীরে প্রবাহিত হ'চ্ছে, তাইই গৌরবরক্ষার জন্ম আপনাদের সন্তানকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিয়ে, আমাদের নিজস্ব নেতাকে লাভ করার সুযোগ করে' দিল মা!”

যুবতী ছির স্বরে বলেন—“আপনি বংশ গৌরবের বোকাই দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন, যে অনির্দিষ্ট বার ফল, এমন বিপদের লামনে আমার সন্তানকে ফেলে দিলে আমার মাতৃঘের গৌরব ক্ষয় হ'বে না। বেশ কথা। কিন্তু কোন্ অজ্ঞাতে আমাকে

যুঝিয়ে দিতে পারবেন, যে আমার স্বামী
হত্যাও তার-লজত ?”

লোকটা উত্তর দিলেন—“আপনার
স্বামীর মৃত্যুর জন্ত তিনি নিজেই দায়ী।
আপনার পুত্র তাঁর কাছে ছিলেন না।
কিন্তু, তবু তিনি এমনভাবে ছুটছিলেন,
যাতে আমার ভ্রম হ’রেছিল, যে বোধ
হয় শিশুরাজা তাঁর কাছেই আছেন।
কিছুদূর যেতে না যেতে আমরা তাঁকে
ধরে ফেলি। তখন দেখলুম শিশু তাঁর
কাছে নেই। শিশুকে কোথায় রেখে
এসেছেন তিনি—এ কথা জিজ্ঞাস্য করায়,
তিনি কোন প্রকার সন্ধান দিতে অস্বীকৃত
হ’ন। আমরা তাঁকে আমার দলে
আনতে বলি। তিনি কোন উত্তর না
দিয়ে, আমরা বাধা দেবার পূর্বেই, আত্ম-
হত্যা করেন। তার কাছে যে রক্তলতার
ছিল, তা’ আমরা জানতুম না। যদি

জানতুম, তা’ হ’লে কখনই তাঁকে আমরা
আত্মহত্যা করবার অবকাশ দিতুম না।
রক্তলতারটা আমার কাছে লাগতে পারে
হির করে’ আমরা সেটা নিয়ে আসি।
মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল, সেই খানেই
পড়ে থাকে। পরে আমরা জানতে পারি,
যে ‘মলমল’ হীরার এক অংশ তাঁর কাছে
ছিল। অনেক কোণে সেই পবিত্র
হীরা আমরা উদ্ধার করেছি। এখন
শুনলেন আপনার স্বামীর মৃত্যুর ইতিহাস?
তবে এ কথাও নিশ্চিত, যে রাজা
চন্দ্রকেতুর বংশলন্তু না হ’রে যদি কেউ—
ঐ হীরা ধারণ করেন, তবে তাঁর মৃত্যু
অবধারিত। আপনার স্বামীর মৃত্যুর গোণ
কারণ ঐ ‘মলমল’ হীরা ধারণ করা।”

সুবতী ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।
‘মহামন্ত্রী’ বলে তিনি নিজের পরিচয়
দিয়েছিলেন, তিনি—বলতে লাগলেন—

“কান্নার কোন ফল হ’বে না, মা।
কান্নার কখনও কোন ফল হয় নি। ‘কাল’
অতি নিষ্ঠুর। কান্নার কালের মন গলে
না। তা’ হ’লে, আমার প্রাতি কি
আবেশ হয়?” পরীকার অসুস্থতি বিচ্ছেদ
কি?

সুবতী যেমন কাঁদছিলেন, তেমন
কাঁদতে লাগলেন। কোন উত্তর দিলেন
না।

‘মহামন্ত্রী’, বলেন—“লম্বা ক্রমশঃ
অভিক্রান্ত হ’চ্ছে, রাত্রি শেষ হ’রে এলো।
পরীক্ষা অবশ্যস্বার্থী। স্মরণে শিশুটিকে
এখানে আনা হোক।”

উপস্থিত লোকগুলোর মধ্যে হুঁজন
চলে গেল। সুবতী আকুলকণ্ঠে চিৎকার
করে বলে উঠলেন—“না—না।”

অবিনাশ চুপি চুপি বলে—“আমার
অসহ হ’চ্ছে। লাফিয়ে পড়বো, না কি?”

বি, মান্না এও সম্মের কল্লেকটা আশঙ্ক্য গুণাবিশিষ্ট মহৌষধ।

কিওলোডি-সালসা

বীধাধরা নিয়ম নাই—সকল রুগ্নে সেবন করা যায়। মূল্য দেড় টাকা, মাওলাদি সহ ২।০।

ইলেক্ট্রো-গোল্ড-কিওর

জীবনী শক্তিবর্দ্ধক ও নষ্টবাস্তব পুনরুদ্ধারক। যাবতীয় দুর্বলতা, অক্ষমতা, অবশ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রোগের
অব্যর্থ বলকারক ঔষধ। ছাত্রদিগের স্মৃতিশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিভিত্তি তীক্ষ্ণ হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধি, মানসিক

প্রকলতা, স্মারিক উত্তেজনা বৃদ্ধিকরে; ছাত্র ও ছাত্রী জীবনের একমাত্র পরম সহায়। মূল্য দেড় টাকা, মাওলাদি সহ ২।০।

গগোরা-বাম

পিল (বাটিকা) বা মিক্শার

এবং রোগ সমূলে নির্মূল করিতে ইহার স্মার আশঙ্ক্য আশুফলপ্রদ ওষধ অতীব বিবিধ। নাই ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।
এই ঔষধ মিক্শার ও পিল দুইরকমের পাওয়া যায়, উভয়েরই মূল্য প্রতি শিশি দুই টাকা; মাওলাদি সহ ২।০।

এজম্মা-সিরাপ

হাঁপানি ও শ্বাসকণ্ঠের অব্যর্থ মহৌষধ। এক ১০০টা হাঁপানি রোগ মৃত্যুসম যন্ত্রণা হইতে দলজীবন
লাভ করে। নুতন পুরাতন সর্কপ্রকার লক্ষণগুণ উপসর্গ বিশিষ্ট হাঁপানি, দুঃখ, শ্বাসরোগ এবং বাবতীর
হুসহুস ও শ্বাসনকীর প্রদাহ, ব্রঙ্কাইটিস, হৃদযন্ত্রের রোগ মিক্শার আরোগ্য হয়। হাঁপানির
প্রথম টালের সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের মৃত্যুসম যন্ত্রণার একদাপ মাত্র সেবনেই রোগ দূরীভূত হয়। মূল্য দেড় টাকা; মাওলাদি সহ ২।০।

এজেন্টস—এম, ভট্টাচার্য এও কোং

১০ নং, বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা

বি, মান্না এও সল—বারা মেডিকেল হল,

৪নং, গুলু ওস্তাগর লেন, (পোস্ট বক্স নং ১১৪০২) কলিকাতা

আমি তার গা টিপে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে, তার কানে কানে বলুন—
“দাঁড়াও, আগে ছেলেটিকে ওরা এখানে নিয়ে আসুক। ভুললে চলবে না, যে ছেলেটিকে উদ্ধার করবার জন্যই আমাদের এত বিপদের মধ্যে দিয়ে এখানে আলা। এখন আত্মপ্রকাশ করলে তাকে আমরা আর নাও পেতে পারি।”

স্বভীতি এক-দৃষ্টে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের দিকে চেয়ে আছেন। এই সময় ঐক্যলোক একরাশি ফুল ও চন্দনাদি নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হ’লো। মহামন্ত্রী নিজে পূজা আরম্ভ করলেন। নামাকবের ফল, অন্নভোগ, দুধ, প্রভৃতি যথারীতি নির্বেদন করে দেওয়ার পরে, আরতি লারা হ’লো। এই সময়ে ‘রানী’ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, হ’হাত প্রসারিত করে বলে, উঠলেন—“আমার অমনাথ! আমার অমর! কিরিয়ে দাঁড়, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যকে কিরিয়ে দাঁড়! তোমাদের পারে পড়ি, আমার কণি আশার আলো নিখিরে দিও না।”

‘মহামন্ত্রী’র ইঙ্গিতে জন লোক তার লক্ষ্যে যেন তাঁর অগ্রগতি রোধ করে দাঁড়ালো। স্বল্পম, ছেলেটিকে আনা হ’য়েছে। ‘রানী, লিংহালনের উপর বলে পড়লেন।” তাঁর মাথা একটু একটু করে নীচু হ’য়ে ওঠে।

‘মহামন্ত্রী’, আমার ‘রানী’কে, আশ্বাস দিয়ে বলেন—“কোন ভয় নেই, মা! আমাদের শিশু-রাজার জীবন অকারণ বিপন্ন করবার অভিলাষ আমাদের কারো নেই। পাছে ক্ষুধার তাড়নার, প্রকৃতি-পরিচালিত হ’য়ে ‘নাগরাজ’ শিশু রাজকে আক্রমণ করেন, সে জন্য আমরা পোষা বন্যজীবের হানাতিকে কাল-তাকে উপহার দিয়েছি। সুতরাং আমাদের লক্ষ্য আর নীমাংসা খুব নিরপেক্ষ হ’বে। একান্ত যদি

শিশু রাজপদে অভিষিক্ত হ’বার অল্পবয়স্ক হ’ল, তা’ হ’লেই ‘নাগরাজ’ তাঁকে ভক্ষণ করবেন, নতুবা নয়। আপনি আশ্বস্ত হোন।”

‘রানী’ কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করে মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

অবিনাশ চুপি চুপি বলে—“‘রানী’ ওরকম চুপ করে আছেন কেন? একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে যেন। উনি মজ্জিত হ’ল নি তো?”

আমি—“খুব সম্ভব।” প্রস্তুত হয়ে থাক। যে কোন মূহুর্তে আমাদের কাজ আরম্ভ হ’তে পারে।”

অবিনাশ বলে—“আমি সব সময়েই

এই সময়ে ‘মহামন্ত্রী’ বলেন—“ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এস।”

আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে ‘অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের ঠিক সামনে, একজন ছেলেটিকে নিয়ে এসে উপস্থিত করলে। ‘মহামন্ত্রী’ ছেলেটির মাথায় একটু মস্তপুত জল ছিটিয়ে দিয়ে, তার হাতে একটা ফুল দিলেন। ছেলেটি—তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠলো।

বেশ অল্পবয়স্ক, আমাদের পাশে ‘অবিনাশ একটু একটু করে’ যেন ফুলে উঠছে। খুব বেশীকণ তাকে লক্ষ্য করে রাখা যাবে না।

দেখলুম উপস্থিত লোকগুলো একে একে গিয়ে লিংহালনের পাশে দাঁড়ালো। ‘মহামন্ত্রী’ ও ‘গিমে’ তাদের সঙ্গে যোগ

দিলেন। মূর্তির সামনে রইলো শুধু সেই শিশু—হানিমাথা পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি। ‘মহামন্ত্রী’ চিংকার করে বলে উঠলেন—
“১২ নং নামাও—১১ নং তোলা।”

পরক্ষণেই একটা ‘ধর ধর’ করে শব্দ হ’তে লাগলো। দেখলুম উপর থেকে একটা লোহার গরাব বেওয়া বরজোড়া দরজা নেমে আসছে।

হঠাৎ ‘রানী’ স্তম্ভোখিতের মত লিংহালন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বিস্ফারিত চক্ষে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে তিনি চিংকার করে উঠলেন—“অমর—আমার অমর!” তারপর বৈদীর উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে এসে ছেলেটিকে তিনি বুকে তুলে নিলেন। কিন্তু মানসিক উত্তেজনার আধিক্যে তিনি মজ্জিত হ’য়ে পড়ে গেলেন, ছেলেটি কেঁবে উঠলো।

লোকগুলো ছুটে রানীর পিছনে পিছনে আসতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারি লোহার গরাব-বেওয়া দরজা নেমে এসে তাদের পথরোধ করলে। লোহার গরাবের উপরে লজোর পর্দাঘাত করতে করতে ‘মহামন্ত্রী’ চিংকার করে বলে উঠলেন—“১১নম্বর—১১নম্বর—১১নম্বর—”

ঠিক আমাদের পারের তলার ‘বর্ষর’ শব্দ হ’তে লাগলো—। নাগরাজের গর্জের আধরণ তোলা হ’চ্ছে নিশ্চয়। আর মূহুর্ত নষ্ট হ’লে লক্ষ্যনাশ হ’বে! কিন্তু এ কি! হঠাৎ সব দৃষ্ট হ’লে মনে হ’চ্ছে কেন?—ভূমিকম্প!

আমাদের পারের তলার যে ‘বর্ষর’ শব্দ হ’ছিল তাও খেমে গেছে। বাইরের দিক

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্তোব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ডবানীপুর

থেকে একটা শব্দ মন্দিরের মধ্যে এসে পৌঁছলো। সেটা জ্যাকের গভীর ডাক!

“নমো এলো”—বলেই লাকিয়ে পড়লুম। অবিনাশেরও আমার অমূল্য করণে বেরু-
-হ’লো না। টলতে টলতে ছুটে গিয়ে
অবিনাশ ‘স্বাগতিক’ তুলে নিলে, আমিও
হেলোটিকে তুলে নিলুম। পাশে একটা
খাম ভেঙ্গে পড়লো। খাঁচার মধ্যে বন্দী
‘মহামন্ত্রী’ ও তাঁর হল চিংকার করে
খাঁচার দরজা তুলে নিতে বলছে—কিন্তু
কেউ তা’ শুনেছে বলে’ মনে হ’চ্ছে না।
শেষে পরম্পরের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি
আরম্ভ হ’লো। আমরা বাইরে আলবার
জন্তু হুড়কের দিকে ছুটলুম। বেশ স্পষ্ট
শুনলুম ‘মহামন্ত্রী’র কণ্ঠস্বর—“হরেনবাবু,
আপনারই জুর! good night!

উত্তর ঘেবার অবকাশ নেই—দুরকারও
নেই। স্তূতরাং হুড়ক পার হ’য়ে আমরা
বাইরে ২নং হ’লঘরে এসে উপস্থিত হ’লুম।
তখনও পৃথিবী ছলছে। টর্ক বার করে
জ্যেলে দেখলুম, হুটো বড় বড় খাম ভেঙ্গে
পড়েছে। একটা খামের পাশে একটা লোক
পড়ে র’য়েছে জীবন্ত কি মরা তা’ দেখবার
সময় নেই। যে কোন মুহূর্তে আমাদের
জীবন্ত সমাধি হ’তে পারে। স্তূতরাং
টলতে টলতে প্রাণপণে বড় হুড়কের দিকে
ছুটলুম।

হুড়কপথে খানিকটা এগিয়ে যাবার
পরেই নামনে একটা ভীষণ শব্দ শুনে
আমরা থমকে দাঁড়ালুম। বন্ধু—“অবিনাশ
কিরে চল—কিরে চল। নামনে হুড়কের
ছাৎ ভেঙ্গে পড়েছে। আমাদের বাইরে
যাবার পথ বন্ধ।”

অবিনাশ বলে—“উপায়?”

(ক্রমশঃ)



শ্রীমদ্ভাসা

অনেকবারই বলা হয়েছে যে ডাকের
পর বিপ্লবের পক্ষ থেকে প্রথম যে
তালখানি খেলা হয় সেখানি ডাকদারকে
ক্রীড়কের হাতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যে অনেক
কিছুই জানিয়ে দেয় এবং তাতে ডাকদার
তার ডাক অনুযায়ী খেলা করার বেশ
সুবিধা পেয়ে যান। এইজন্যই প্রথম
তালখানি ফেলবার আগে বিশেষ চিন্তার
প্রয়োজন হয়। এ লক্ষ্যে বর্তমান বঙ্গের
গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতার একটি খেলার
প্রতিযোগীদের হাত দেখুন। উত্তরপক্ষ
তালনারেবল।

ইক্বান—নর, ×, ×, ×, ×

হরতন—নাহেব, গোলাম, ×।

কহিতন—×, ×, ×।

চিড়িতন—×, ×।



ইক্বান—টেকা, গোলাম, হল।

হরতন—×, ×।

কহিতন—টেকা, নাহেব, নর।

চিড়িতন—টেকা, নাহেব, গোলাম,

×, ×।

ডাক হয়েছিল,—

‘দ’

একটি চিড়িতন।

ছইটি কেরাই।

‘প’

পাশ।

পাশ।

‘দ’

পাঁচটি হরতন।

পাশ।

‘উ’

একটি ইক্বান।

তিনটি ইক্বান।

পাঁচটি ইক্বান।

পাশ।

‘প’

পাশ।

ডবল।

‘পু’

পাশ।

পাশ।

পাশ।

পাশ।

এখন ডাকের লক্ষ্যে আমরা প্রশ্ন করছি
পারি যে একটি চিড়িতন ডাকের পর এক
ইক্বান ডাক বৃদ্ধিবদ্ধ কি না। প্রথম
কথা হচ্ছে এই যে, যদি একটি চিড়িত
ডাক, ডাকগঠনকারী ডাক (Preparedness
bid) হয়, তাহলে একটি ইক্বান ডাক
অস্তায় নর; আবার যদি চিড়িতন ডাক
বৃদ্ধের ডাক হয় তাহলে একে এক
ইক্বান ডাক অস্তায় হতে পারে। কি
এই অস্তায় কার্যটি পরবর্তী ডাকগুলির দ্বারা
‘উ’ অনেকবার প্রতিকার করার চেষ্টা
করেছেন। কাজে কাজেই তাঁর পক্ষে
বিষয়ে কিছু অস্তায় হয় নাই। বাই, হো
প্রত্যেক খেলোয়াড়ের স্বরণ রাখা দরকার
যে তাঁর হাত যদি কাল আসে তাহলে
যে তাঁর খেঁড়ার হাতও ভাল হবে এমন
কোন নিয়ম নাই। অতঃপর ঐরূপ তা
নিরে কি তা’বে ডাকদার খেলা করে
নিলেন দেখুন।

১ম পিট—‘প’ হরতনের টেকা খেলা
লক্ষ্যেই হরতন দিয়ে গেলেন।

“এসোগো মোর হৃদয় রাণী”

শ্রীমুন্সীলা মিত্র

আমার শুধু বেঁধে রেখে তোমার মৃণাল বাহুর পরে—
মাধবী যেমন আঁকড়ে রাখে, তরুণ তরুণী বক্ষোপরে।

তখন কেশে পাশে তোমার
আলবে যবে আঁধার ঘিরে—
মিষ্ট প্রেমের কিরণ স্রাব
যুট্টে কিও তিমির ঘিরে।

দেখব লক্ষ্য দুখের হালি:
তব তব মধুর বাণী,
বিনিময়ে একটি চুমু অধরে মোর দ্বিও
আমার প্রাণের আবেগ যত তুমি যেতে নিও।
ওগো! আমার মানন রাণি, কোথা আজি তুমি,
আঁকব কত রঙ্গিন ছবি, স্মৃতি খানি চুমি।
কত নিশি গেল কেটে, কত মধুমাল,
মনেই কোণে রয়ে গেল শুধু তব আশ।

পিরানা নাহি দিটল আঁধা
কল্পনারি ছবি একে;
শুধায় না কেউ একটি কথা—
মৌন নিবিড় বর্ষা বেধে।

ভাগিয়েছি জীর্ণ তরী তোমার লাথে মিলন আনে—
কোন লেহনে নিবে শ্রিয়া মুছাতে নীর তোমার পাশে।
ভ্রমিতেছি আশায় যে গৌ পাব তব বেধা,
কোন হৃদয়ের লাগর তীরে আছি শ্রিয়া একা।
ওগো, আমার জীবন লাখী এমনি তাবে আর
কত যুগ আর রইবে, মানে মুখটি করে তার।
ছড়িয়ে তোমার অভিমানের কালো মেঘের আচল খানি
ছাড়িয়ে দাও হৃদয় মরু, শাস্তি বারির বস্তা আনি।

২য় পিট—‘প’ ছোট একখানি চিড়িতন
খেললেন, ডাকঘার খেঁড়ার হাতের টেকা
দিয়ে পিট ধরে ভাবতে লাগলেন। ডাকঘার
ভাবলেন যেহেতু ‘প’ পাঁচখানি ইক্বাবনে,
ডবল দিয়েছেন নাহেব বিবি লম্বত চারখানি
ক’ পাঁচখানি ইক্বাবন তাঁর হাতে আছেই।
যদি, পাঁচখানি ইক্বাবন হয় তাহলে খেলার
অবশ্যত্বাধী, কিন্তু চারখানি হলে খেলা করা
বোধহয় লম্বত হতে পারে। তবে এখানে
আরও ভাববার আছে যদি ‘হরতনের
টেকাখানি একক ভাল হয় তাহলেও
খেলার দিয়ে যেতে হবে। আবার যদি
হরতনে বৈত ভাল থাকে তাহলে খেলা
করা সহজসাধ্য। পাঠকবর্গ এইবার বুঝতে
পারবেন যে, এই হরতনের টেকা খেলার

ডাকঘার স্পষ্ট বুঝে নিলেন যে তাঁর হাতে
বিবি নাই। এটি জানবার পর কি তাবে
‘উ’ খেলা করে নিলেন দেখুন।

৩য় পিট—ডাকঘার এবার ছোট হরতন
খানি খেলে নিজের হাতের গোলাম দিয়ে
পিট নিলেন, আর লকলে হরতন দিয়ে
গেলেন।

৪র্থ পিট—ডাকঘার নিজের হাতের
ছোট একখানি ইক্বাবন খেললেন, ‘প’
দেখলেন যে যদি তিনি এখানে বিবি বা
নাহেব না রাখেন তাহলে ডাকঘার দশ
দিয়ে পিট নিচ্ছেন, সুতরাং তিনি নাহেব
কেলেন, আর ‘ডারি’ টেকা দিয়ে পিট
ধরলেন। এই নাহেবখানি কেলার দরুণ
ডাকঘারের খেলা স্নানিষ্ঠিত হবে গেল।

৫ম পিট—ডাকঘার ইক্বাবনের গোলাম
খেলার ‘প’ বাধ্য হয়ে বিবি দিয়ে পিট
ধরলেন, ‘পু’ পাশ দিয়ে গেলেন।

এইবার ‘প’ যে কোন ভাস খেলুন না
কেন ডাকঘার তাঁর খেলা করে নেবেন।
কারণ যদি তিনি চিড়িতন খেলেন তাহলে
ডাকঘার নাহেব দিয়ে পিট ধরে নিয়ে
ইক্বাবনের দশের পিট নিয়ে চিড়িতন
খেলবেন। এ পিট ডাকঘারের নিজের
হাতে তুরূপ করে নিয়ে বাকি ইক্বাবনখানি
ধরে নেবেন। হরতনের নাহেব খেলে
ছোট কহিতনখানি পাশ দিয়ে দেবার পর
বাকি দশ পিটই ডাকঘার অন্যরূপে নিতে
লম্বত হবেন।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যে আমরা এষাবৎকাল বহুতর আলোচনা করেছি, এর সমস্ত বিভাগটির প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেক suggestive hintও দিয়েছি। আমাদের আলোচনার ফলে কিছু কিছু লংস্কার, মাঝে মাঝে হয়েছে এ কথা অবিশ্যি আমরা স্বীকার করিনে—কিন্তু বেতারের কর্মকর্তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্যে আজ অবধি আমরা একটা নির্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করতে পারলুম না। এ বড় আশ্চর্যের কথা, যখন যে লক্ষ্যে তীব্রতর আলোচনা করা গেছে—কখনও কখনও হয়ত তার সাময়িক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে কিন্তু পরে আবার 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই'। বেতার কর্ম কর্তাদের বহুভাবে আমরা যে সকল suggestion দিই এবং যে সকল কার্যের প্রতিবাধ করি তার ভেতর বণ্ঠিত যুক্তি থাকে। আমরা প্রতি বিরুদ্ধ মস্তবোই আমাদের যুক্তিগুলি প্রকাশ করে থাকি—আমাদের যুক্তির যখন কোন প্রতিবাধ আসে না তখন আমরা অবশ্যই এ ধারণা পোষণ করতে পারি যে আমাদের মস্তব্য গ্রাহ্যযুক্ত।

আমাদের অভিযোগ, মস্তব্য সকল গ্রাহ্য-যুক্ত হলে বেতার কর্মকর্তাদের 'সেগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অংশ কর্তব্য বলে মনে করি। আমাদের মস্তব্য, অভিযোগ—তার ভিত্তি শ্রোতাদের মতের 'পরই প্রতিষ্ঠিত, আমরা বা বলি তা হচ্ছে জনমত। বেতার প্রতিষ্ঠান যখন Public institution তখন জনমতকে কখনই তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

বেতার জনশিক্ষাগার, এই প্রতিষ্ঠান হতে বহুবিধ জনশিক্ষা প্রচার করাই বেতারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। লোককে দিতে হবে আনন্দ-শিক্ষা, বিরামের ক্ষণকে ভরিয়ে তুলতে হবে মাণ্ড্য দিয়ে। যে দেশের জনশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত হতাশ-জনক সেখানে বেতারের কর্তব্য গভীরতর—বিরাট। এই মহান উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এর অগ্রদূত লিপি প্রস্তুত করতে হবে। 'সকলকে জানিয়ে দিতে হবে এ প্রতিষ্ঠান সর্বসাধারণের—তবেই শ্রোতাদের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের জাগবে বেতার প্রীতি।

আমরা বেতারকে এইভাবে দেখতে চাই। আমরা বেতারের হিতকামী বন্ধু তাই চাই এর সর্বজনীন উন্নতি—এর লংস্কার। দিনের পর দিন আমরা আমাদের লেখনী চালনা করে চলেছি এর পথকে বাধাহীন 'সংকীর্ণতা'হীন করে গড়ে তোলবার মহান পরিকল্পনার।

নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা জানাচ্ছি সকল বেতার বন্দী, শিল্পী ও শ্রোতাদের হৃদয়ের শুভেচ্ছা। আমরা আমাদের সাংবাদিক কর্তব্যকর্মে চাই সকলেরই সহযোগীতা স্বার্থহীন ঘেবহীন বন্ধুদের সহায়ত্ব এবং আশীর্বাদ।

বেঙ্গল রেডিও মার্কেলের জনৈক লেখক—আমাদের পাঠিকা একখানি কবিতাপত্র প্রকাশের অগ্ররোধ করেছিলেন। আমরা তাঁর অবগতির জন্তে জানাচ্ছি 'চিঠি' খানি

আমরা প্রকাশে অক্ষম। চিঠিখানিতে বেতার লক্ষ্যীয় বিশেষ কিছুই নেই এবং অত্যন্ত Personal. বেতার লক্ষ্যীয় কোন আলোচনা, মন্তব্য, অভিমতপূর্ণ চিঠি পেলে এবং তা প্রকাশ করবার জন্তে অগ্ররোধ জানালে আমরা লাঞ্ছিত পড়ব। চিঠিখানির লেখিকার অগ্ররোধ রাখতে পারলুম না বলে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

২৭শে ডিসেম্বর বিপ্রাহরিক অগ্রদূতনে হেবাশীষ সেনগুপ্তের ব্যবস্থাপনার একটি লজীতানুষ্ঠান হোল। কুমারী মনিতা গাঙ্গুলী শক্তি মুখার্জির গান ভালো হয়েছিল। কালোবরণ দাস, শুভা ব্যানার্জীর গান চলন লই। লক্ষ্মী মুখার্জীর ভাটিয়ালী গান মমালোচনার অযোগ্য। ধীরেন তট্টাচার্য্য তথৈবচ। মেতার বাজনা হোল চলন লই।

লাক্ষ্য অগ্রদূতনে কৌতুকনাট 'হার হাইনেল' সাধারণ শ্রেণীর। কনকলতা 'ষোষের কীর্তন সুন্দর। বেতার অর্কেষ্টার বাজনা এবারে উচ্চাদের নয়।

ঐদিন সাহিত্যিক অনিল কুমার তট্টাচার্য্য 'বাংলার লোক লজীত' লক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। একাধল শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত লৌকিক সাহিত্যের যে ক্রম-বিকাশ ঘটেছে তার সুন্দর বর্ণনা মাত্র ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে সকলের বোধগম্য করা বিশেষ প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বক্তৃতাটি আমরা উপভোগ করেছি।

২৮শে ডিসেম্বর বিপ্রাহরিক অগ্রদূতনে বীরেশ উকীল গান গাইলেন—অগ্ররোধযোগ্য। রঘুনাথ তট্টাচার্য্য বর্ণ বক্তৃতা দিলেন—মাঝে মাঝে গানের সুরে আবৃত্তি অত্যন্ত কর্ণপীড়া-হারক এবং এর বক্তব্য বিষয়ও শ্রোতাদের পক্ষে অগ্রহাবন করা কঠকর হয়ে ওঠে।

সরল ভাষায় সরল কণ্ঠে কণ্ঠতত্ত্ব আলোচনাই বাঞ্ছনীয়। গৌরমোহন সুখোপাধ্যায়ের পাঁচালী অনুষ্ঠান হোল।

৩০শে ডিসেম্বর বিজ্ঞানী মণ্ডলে সুলাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চণ্ডীদাস পর্য্যন্ত নিয়ে আলোচনা করলেন। সজনীবাবুর বক্তব্যে ভাষাতত্ত্বের দিকটা সত্যিই শিক্ষণীয়। বেতারে সাহিত্যের আলস্যের দূর্ভিক্ষ লক্ষিত হয়। এই ধরনের বক্তৃতার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে প্রফুল্লবালার গান ছাণি উপভোগ্য হয়েছিল। এ, আই, আর প্রেমারসু কর্তৃক অনুষ্ঠিত রায়চরণ রচনার দিক থেকে লঘু। মহিলা আলস্যে নারী প্রসঙ্গের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে সেদিক থেকে বেতারের প্রোগ্রাম যথেষ্ট স্বল্প এবং অপ্রশংসনীয়।

লাক্ষ্য অনুষ্ঠানে বাসন্তী বিজ্ঞানীধির “শেষ আরতির শিখা” অনুষ্ঠানটি কাব্যভাব সম্পন্ন। গানগুলি মন্দ গীত হয় নি।

* * *

৩১শে লাক্ষ্য অনুষ্ঠানে এ, আই, আর প্রেমারসু কর্তৃক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টের পরিচালনার শচীন সেনগুপ্তের “কালের দাবী” অভিনীত হলো। নাটক নির্বাচন ভালো। অভিনয় প্রসঙ্গ বীরেন্দ্রবাবু ছাড়া আর কেউই প্রশংসার দাবী করতে পারেন না। পরিচালক মশাই এতটুকু দৃষ্টি দিল।

* * *

২২শে জামুয়ারী প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে কমলাবালা ছাণি বাংলা গান গাইলেন। খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। পরে পঙ্কজবাবু শিক্ষাদান করলেন।

* * *

মঙ্গলবার ৪ঠা জামুয়ারী—লাক্ষ্য অনুষ্ঠান—ছোট্টের বৈঠক বসল। গানগুলি নিতান্ত নিকট শ্রেণীর। অনুষ্ঠানের একটি গান

বাজনা বা আবৃত্তি শোনবার উপযুক্ত হয়নি। এবং আমরা দেখছি দিন দিন এই ছোট্টের আলস্যে লক্ষিত অনুষ্ঠানের দিক থেকে অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেদিনকার আলস্যে আমরা দাস গান গাইলেন বিজ্ঞী। রেডিওতে গান গাইবার অনুপযুক্ত। অপর্ণা ব্যানার্জি সেতার বাজালেন—সমালোচনার বাঁহিরে। আমরা সেদিনকার আলস্য-পরিচালক মহাশয়কে নজর দিতে অনুরোধ করছি যে ‘এহেন বাজনা বেতারে সরবরাহ করে যেন হাতাম্পদ না যেন। জ্যোতিষ দেব বর্ধন বাউল গান গাইলেন কোন রকম চলন নই। গলার বৈশিষ্ট্য তাতে ঘোটেই নেই। ক্রুট ও পিয়ানো বাজনা হোল কোন রকম। বিশালেন্দ্রবাবু আবৃত্তি করলেন যেন রিডিং পড়া—জঘন্ত। পরে ছেলেদের মামীমা চিঠি পড়লেন। কণ্ঠস্বর যুগ্মে বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল।

সেইদিন পরে অনাদিবাবু এক রবীন্দ্র গীতি বাসর করলেন। শক্তিকান্ত ভট্টাচার্য্য “কালী হাতির হোল হোলানি” গান গাইলেন চলন নই। পরের গান মন্দ নয়।

মান্নরা গুপ্তার “মনে কি বিধা রেখে গেলে” গানখানি প্রতিমবুর বলতে পারি না। উচ্চারণ ভাল নয়। যমুনা দাঁপের “এলো যে শীতের বেলা” গান ভাল।

সাগর ঘোষের “আমার নয়ন তব নয়নে” চলন নই।

* * *

৬ই জামুয়ারী বুধবার লাক্ষ্য অনুষ্ঠানে পুলিন পাল সেতার বাজালেন। ঘোটেই ভাল নয়। হাত কড়া। পরে “বিশ্বত বৈশালী” অনুষ্ঠান হ’ল। আমরা উপভোগ করেছি। এ ধরনের প্রোগ্রামকে আমরা খুব প্রশংসা করি। পরিকল্পনাকার নতুনও ছিল।

৬ই জামুয়ারী। লাক্ষ্য অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানী মণ্ডল আলস্যে “রূপণের মহারাজ” অভিনয় হ’ল। চলন নই। হরিদাশ ব্যানার্জি হাতির গান গাইলেন। নিতান্ত মাসুলে ধরনের। পরে আশালতা কর ছাণি দেহতত্ত্ব গান গাইলেন। ভালই। ধীরেন দাসের গান ভাল বলতে পারি না।

পরে পঞ্চাননবাবুর ব্যবস্থাপনার সঙ্গীতানুষ্ঠান হ’ল।

ধীরেন ঘোষের গান চলন নই। বিমান ঘোষের গান ভাল। শিশিরবাবু চলনসই গান গাইলেন। আলি খাঁ লাহেবের সেতার ভালই হয়েছে। জীবন উপাধ্যায়ের খেয়াল চলন নই।

নব যুগের নব আবিষ্কার মন কস্তুরী

ছাত্রজীবনে মেধাশক্তি বৃদ্ধি করিতে
কর্ম-জীবনে শারিরীক দৌর্বল্য
অপনোদনে, বৃদ্ধ বয়সে শরীরকে
সর্বপ্রকারে সুস্থ রাখিতে

ও

ইন্ডিয়ান ষ্টেমথিলো

পরম সুস্থদের দ্বায় কাজ করিবে
৭ দিনের পুরিস্কা মাত্র ১২ টাকা
ভিঃ পি স্বতন্ত্র

অর্ডারের সহিত অর্দ্ধ মূল্য অগ্রিম দেয়

প্রাপ্তস্থান :-

ব্যানার্জী ফ্রেণ্ডস এণ্ড কোং
১০১ হালদারপাড়া রোড (কালীঘাট,)
কলিকাতা।

শ্রেনের সমাপ্তি

মসি আমেদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাগানের নানা রকম ফুলের গন্ধে ছায়াদেবীর কামরাটা ভরে উঠেছে—চাঁদের রূপালি আলোর খানিকটা জানলার ভেতোর থেকে এসে ছায়াদেবীর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে তাঁকে অন্ধ ও স্নান করে তুলেছে। তিনি আরম্ভ কোরলেন—“শোন বেবী! আমাদের সংসারটা ছিলো, খুব বড়ো, মোটামুটি বারোজন লোক কিন্তু আমরা ছিলুম বড়ো গম্বীর্ষী। আমার বাপের সামান্য একটা দরজীর দোকান ছিলো। সে অঞ্চলে আর কোনো দোকান তখনও হয়নি তাই সেগারের কাজটাজ টুকটাকু করে পাওয়া যেতো, কিন্তু তা থেকেও আমাদের সংসার চোলতো না। আমার দ্বিধা মায়, আর আমি বাবাকে কাজে বসে লাভ্য করতুম, আর মা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সামলে রাখতেন। মা কিন্তু একাও সামলে উঠতে পারতেন না কাজেই আমিও যতটা পারতুম মাকে লাভ্য করতুম। মায় কিন্তু আমাদের সংসারের কথা খুব বেশী ভাবতো না। সে যতোটা পারতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। আমার বয়স তখন মাত্র পনেরো। আমরা থাকতুম তখন হাটখোলায়। কিছুদিন পরে মায় এক বাড়ীতে একটা ঘরেক লেগে লেখাবার কাজ বোঁগাড় করলে, কিন্তু একমাস পরেই সেই ঘরের দ্বার নড়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলো, আজও তার কোন খবর পাইনি। মায় চোলে যাবার পর থেকে দোকানের কাজ নিজে আমার বড়ো

বেবী খাটতে হোতো। এইভাবে কষ্টে নিজে মাস তিনেক কাটবার পর তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হোয়ে গেলো। তোমার বাবারা ছিলেন খুব বড়লোক মটর ঘোড়া সবই ছিলো—আমার মা কিন্তু এই বিয়েতে লজ্জা মত দিতে রাজী হোলেন না, তিনি বোললেন যে বড়লোকের ঘরে মেয়ে দেবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবার মতোই মাকে মত দিতে হোলো। আমার বাবা ছিলেন খুব কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর কথার ওপোর কথা বোলতে কারুরই ভরসা হোত না। তোমার বাবার বয়স তখন সাতচল্লিশ বছর—আমার বয়স হোচ্ছে পনেরো মাত্র। যাক, উনি আমাকে বিয়ে করবার জন্য বাবাকে জেদাজেদী আরম্ভ কোরেছিলেন। তার কারণ আমি নাকি খুব স্নানরী, আমার মতো স্নানরী মেয়ে তিনি নাকি জীবনে দেখেন নি। তিনি আরও একটা বিয়ে কোরেছিলেন বটে, কিন্তু মেয়েটা নাকি আমার মতো অত স্নানরী ছিলো না। কিন্তু সে মেয়েটা মায় যাওয়ার পর তিনি পুনরায় আর একটা বিয়ে কোরতে চান। যাক আমাদের বিয়ে হোয়ে গেলো। তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মা মা দেবার কথা তা সবই তিনি আমার বাবা মাকে দিয়েছিলেন। আমাকে মা মা দেবার কথা ছিলো তাও তিনি দিয়েছিলেন, বুলে বেবী! কেবল একটা জিনিষ বাবে লেটা হোচ্ছে প্রেম—ভালোবাসা। তিনি চেষ্টা কোরেছিলেন শেষ পর্যন্ত আমি যেনো তাঁকে ভালোবাসি, কিন্তু বেবী! তাকে

লজ্জা কোরতে পারলুম না।—কি কোরেই বা পারি বুলো? বয়সের পার্থক্যটাও তো দেখা দরকার? তিনি তাঁর সাতচল্লিশ বছর বয়সে আমার যৌবনে ঘিরে যেতে চান—জীবনে রোমান্স করবার জন্যে! মাহুষের কি ভ্রান্ত ধারণা দেখে! বেবী! তিনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারলেন না—তিনি আমার মধ্যে কেবল যৌবনটাই দেখতে পেতেন—আমার মনের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত কৌরে দ্বিতেন কাম শিখা। কিন্তু এখন তাঁর মন থেকে সে ভাবটা চোলে গেলো তখন তাঁর রোমান্সও নিভে গেলো। লজ্জা কথা বোলতে কি বেবী, আমি যে তাঁকে ভালবাসতুম না, তা নয়—আমি তাঁকে ঠিক আমার বড়ো বাবার মতোই ভালোবাসতুম, সেহ কোরতুম। ছায়াদেবী খেমে গেলেন। লতিকার মুখে তাকিয়ে তার হাবভাবটা লক্ষ্য কোরে বোললেন—“বেবী আজ থাক মা—আর একদিন শুনো—অনেক রাত হোয়ে গেছে, শুতে যাও।”

লতিকা তার মাকে আরও ভালো কোরে জড়িয়ে ধরে বোললে—

“না মা! আজই সব বোলতে হবে বুলো তাঁরপর কি হোলো?” জিজ্ঞাসনেন্ত্রে সে তাঁর মার দিকে তাকিয়ে রইলো।

অগত্যা ছায়াদেবীকে আবার আরম্ভ কোরতে হোলো।

“এখন তুমি বুঝতে পারছো বেবী যে কেনো আমি সুবক ছেলেদের সঙ্গে তোমাদের মিশতে এতো অধিকার দিই। তোমাদের জীবনে ভালোবাসা জিনিষটা দরকার যেহেতু তোমাদের যৌবন রয়েছে। আমরা কিছুদিন হাটখোলাতেই একটা হোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস কোরতে লাগলুম। তারপর একদিন তোমার বাবা বোললেন, যে তিনি এখান থেকে অন্ত

কোথাও উঠে যেতে চান। কোলকাতার তাঁর নিজের কোন বাড়ীই ছিলো না। বংশের মধ্যে তিনিই একা। সুতরাং এখানে ওখানে বাড়ী ভাড়া নিয়েই দিন কাটাতে। যাক! শেষ পর্যন্ত হাটখালা থেকে বাবা মা ভাইবোন সবাইকে ছেড়ে আমরা বালীগঞ্জ গিয়ে উঠলুম। সেখানে থেকেও যখন তোমার বাবাকে আমি কিছুতেই ভালোবাসতে পারলুম না—তখন তিনি বেঙ্গার খিটখিটে হয়ে উঠলেন। তারপরই ধরলেন ময় আর বেঙ্গা, বড়ো লোহরের সাধারণত যা ঘটে থাকে। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ময় আর বেঙ্গা থেকে আলাদা করতে পারলুম না। বালীগঞ্জে থাকবার বছর বেড়ে ক পরেই আমি বুঝতে পারলুম যে তুমি আমার কাছে আসছো। ও, সেকি আমার আনন্দ দেবী! তাবলুম আমাকে একটু শাস্তি দেবার জন্যই ভগবান ঠিক সময় পাঠাচ্ছেন। আমার তখন মনে হতো আমার এমন একজনকে চাই; যাকে আমি লারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারবো। তারপর তুমি যখন সত্যি সত্যিই এলে বেবী, তখন তোমাকে প্রায় একলাই কেল্ল রাখতুম। তার ওপোর তুমি ছেলে না হোলে মেয়ে হোলেই বোলে তোমার বাবা ভীষণ কেপে গেলেন। তোমার স্নিকে নজর দেওয়া তিনি মোটেই দরকার মনে কোরলেন না। যাক! তুমি হবার পরে আমার একটু বায়ু পরিবর্তনের দরকার হোয়ে পড়লো—যেহেতু আমার শরীরটা সে সময় দুর্বল। তোমার বাবা আমাকে ঝি চাকর বলে দিয়ে দেওঘরে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে রইলেন বালীগঞ্জে একা। আমার পক্ষে সেই দেওঘরই একদিন বর্গ হোয়ে উঠলো। কিন্তু সে বর্গ সুখও তুমি আমার বেশী দিন ভোগ করতে দিলেনা বেবী! ছায়াদেবী একটু থামলেন।

“আমি! আমি কি করেছি মা! কিছুইতো বুঝতে পারিনি! বলে মা আমার সব ভেঙ্গে বোলে?” লতিকা বোললে। “বোলছি” ছায়াদেবী আরম্ভ কোরলেন “তখন তুমি খুব ছোট ছিলে কিন্তু, তোমার তখনকার ওট ছোট ছোট হাত দুটো দিয়েই তুমি আমাকে আমার প্রিয় পাত্রে কাছ থেকে দূর সরিয়ে দিচ্ছিলে। আমরা যে বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছিলুম দেওঘরে, ঠিক সেই বাড়ীর পাশের বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে থাকতো একজনে বৃক। বরল তার গোটা তিরিশ হব, খুব ফরসা দেখতে, লম্বা ছিপছিপে, চুলগুলো কঁকড়ানো, দেখতে অবিকল—“ছায়াদেবী” খেমে গেলেন। লতিকা হঠাৎ বলে উঠলো—“দিলীপের মতো বোধ হয়—” কারণ দিলীপের সঙ্গে ছায়াদেবীর বর্ণা একেবারে ঠিক মিলে যাচ্ছে। “হ্যাঁ—ঠিক তাই, সেই চোখ, সেই মুখ, সেই রকম ব্যবহার আর সেই রকম কথা বলার ভঙ্গি। ওঃ বেবী—আমি কাল মনে করেছিলুম সেই মুখি আবার কিরে এলো। “ছায়াদেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। “প্রথমে প্রদীপ ভেবেছিল যে আমি বোধ হয় তোমার নাস” কিন্তু পরে সে জানতে পেরেছিলো যে তুমি আমার মেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি বেবী! আমি প্রদীপকে প্রাণ দিয়ে ভালো বেলেছিলুম। আমার লাখে একটা বড়ো গোছের ঝি ছিলো, সে কিন্তু তোমাকে বড়ো ভালোবাসতো—আমর করতো তার লাখেই দিনের বেশীর ভাগ সময় তুমি কাটাতে। কাজেই—আমি আর প্রদীপ এক সঙ্গে গল্প করবার অনেকটা সুযোগ পেতুম। সে প্রত্যেকদিন লক্ষ্যবেলা প্রায় ওই গানটা গাইতো— “বুকের বন্ধ গেছে বোলে চোখে যে নিদ্ নাই।”

কিন্তু গানটা গাইতে গাইতে যখন সে আমার চোখে জল দেখতে পেতো তখনই সে গান থামিয়ে আমাকে লাফনা দিয়ে বোলতো, যে এইরকম কাঁচা বয়সে আমার নাকি কাঁচা লাফেনা। হঠাৎ একদিন তোমার বাবা গিয়ে বোললেন যে এবারে ফেরা যাক—নিজের একটা বাড়ী তৈরী কোরিয়েছেন জয়নগরে—ভাড়া বাড়ীতে থাকতে তাঁর আজ ইচ্ছা নেই। কাজে কাজেই আমার রাজী হোতে হোলো।” ছায়াদেবী একটু থামলেন। “তারপর”? লতিকা জিজ্ঞাসা কোরলে। “তারপর আমার বাবার খবরটা প্রদীপকে দিলুম—তখন প্রদীপ বোললে—“ছায়া চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।” জানো বেবী! তাকে আমি এতো ভালো বেলেছিলুম যে শেষ পর্যন্ত তাকে ছায়াবার ভয়ে তার সঙ্গে যেতে রাজী হোলুম। আমরা যেদিন চোলে যাবো সেদিন তোমাকে বেশ ভালো কোরে জামা কাপড় পড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলুম। কিন্তু বেবী! শেষ পর্যন্ত তুমিই লম্বা গুণ্ডগোল কোরে দিলে। বাবার সময় যখন তোমার সুস্থ মুখে চুখন একে দিচ্ছি, এমন সময় তুমি জেগে কেঁদে উঠে তোমার ছোট ছোট হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে। ভেবেছিলুম তোমাকে ঝির কাছেই রেখে চোলে যাবো কিন্তু যাওয়া আমার হোল না। চোখের জল বৃক ভালিয়ে প্রদীপকে বিদায় দিলুম। প্রদীপও শেষ পর্যন্ত চোখের জল লাফলাতে পারেনি। তবে আমার এইটুকু লাফনা ছিলো যে সে আমাকে চিঠি লিখবে! কিন্তু বেবী এতোদিন হোয়ে গেলো, আজ তার একখানা চিঠি আমি পেরেছিলুম সে আমার জানিয়েছিলো যে, সে বিয়ে কোরেছে বটে কিন্তু সুখী হোতে পারেনি।

সেই একটা চিঠি ছাড়া আর কোন চিঠিই পাইনি। আমি কতো চিঠি লিখেছি তাকে, কিন্তু কোনো উত্তরই আজ পর্যন্ত পাইনি।

আমার মনে হয় আমি তার সঙ্গে যেতে পারিনি বোলেই সে একটা। যিহে কোরে এর প্রতিশোধ নিলে, কিন্তু নিক, তবু তাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি, মনে মনে শ্রদ্ধা করি।

এমন সময় বারান্দার জুতার শব্দ পেয়ে ছায়াদেবী খেমে গেলেন। তিনি খড়ফড় কোরে বিড়ানা চেড়ে উঠে পড়লেন— ছেখবার জন্তে বারান্দা থেকে কে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দিলীপও কামরার সামনে এসে দাঁড়ালো।

“আরে আপনারা এখনও জগে জগেছেন কি রকম?” হালতে হালতে দিলীপ কামরার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

“আমার না হয় ঘুম আসছে না নতুন জায়গায় এসেছি বোলে, কিন্তু আপনাদের ত ঘুম আলা উচিত ছিলো।”

ছায়াদেবী হালতে হালতে উত্তর দিলেন “আমাদেরও ঘুম আসছিলো না বোলে দুজনে মিলে গল্প কোরছিলাম।”

“কি গল্প একটু শুনি”

“এই তোমাদেরই গল্পকে”

“আমাদের গল্পকে!” দিলীপ লাফিয়ে উঠলো।

“হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তোমাদের—বাক। আচ্ছা দিলীপ! এখন তোমরা দার্জিলিংই আছে ত?”

“দার্জিলিং! না তো—থাকি খুলনা!”

“ওঃ দার্জিলিং থেকে উঠে গেলে বুঝি?” ছায়াদেবী তিজ্ঞালা কোরলেন।

“না না উঠবো কেনো! আমাদের ত বাড়ীই খুলনার।”

“আচ্ছা বাক এখন তোমার বাবা কি করেন?”

“বাবা! কেনো আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?” দিলীপ যেনো আকাশ থেকে পড়লো। ছায়াদেবী হালতে হালতে মাথাটা নাড়লেন।

“বাঃ তবে তো আপনারা আমার পরমাত্মীয়। বাবার কথা তিজ্ঞালা কোরছিলেন না? তিনি এখনও খুলনা কোটে ডিষ্ট্রিক্ট জজ’ই আছেন এখনো তাঁর পেন্সন হয়নি। এইবার হবে।”

ছায়াদেবীর মুখটা কিন্তু ততোক্ষণে ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে। তিনি দ্রুত বকে কম্পিত স্বরে ভরে ভরে দিলীপকে তিজ্ঞালা কোরলেন—

“তুমি শ্রীপবাবুর ছেলে তো? তোমার বাবার নাম শ্রীপবাবু তো?”

দিলীপ কথাটা শুনে যেনো ভাষাচাকা খেয়ে গেলো। “আজ্ঞে না! আপনি বোধহয় ভুল কোরছেন আমার বাবার নাম ‘দীপক লাহিড়ী।’

ছায়াদেবীর মুখ থেকে অশ্রুট স্বর বেরিয়ে এলো—“দীপক লাহিড়ী!”

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অজান দেহটা লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

লতিকা কেঁদে উঠলো “মা—মা!” বাড়ীর লবাই জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ীর “ডাক্তার রায়”ও এদে পড়লেন। ছায়াদেবীর পাল্ল ধরে তিনি বিষন্ন মুখে বোলে উঠলেন—“মেন্টাল শক, হার্ট ফেলিওর।”



প্রথম ভ্যালুয়েসনের ফলাফল

= বোনাস =

অর্জীবন বীমা

১৫৮

প্রতি হাজার

মেয়াদী বীমা

১২৮

প্রতি বৎসর

জেনারেল ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস : ১০০নং ব্রাইড স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ১২০৭ কলি :

টেলিগ্রাম : “স্পিডি”

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

[খেলার নববর্ষে যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে ও শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম জানিয়ে—মহিলা মহলের "দ্বারোদ্ঘাটন" করছি। খেলার বিশেষ সংখ্যার জন্ম গতবার 'মহিলা মহলের' লেখা বন্ধ ছিল—এবং 'সেইজন্ম' শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের প্রবন্ধ গত সংখ্যায় স্থান পায়নি। এবার আমরা তাঁর সেই প্রবন্ধটী আরম্ভ করলাম। আমরা আশাকরি এটা অনেক মা বোনের উপকারে আসবে। সম্পাদিকা মহিলা মহল]

ছেলেমেয়েদের মানুষ করা

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিজ্ঞপ করা অনেক বয়স্কদের ভিতর দেখা যায়—এ বড় রকমের দোষ এবং এ দোষে দোষী আমাদের ভিতর অনেকেই। ছেলেমেয়েরা যখন কোন বিষয়ে গম্ভীর হয়ে এবং মনের সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে কোন কথা বলে তখন আমরা তাদের কথা শুনে ছেলে উড়িয়ে দিই—কিন্তু সে কথা নিয়ে ঠাট্টা বিজ্ঞপ করে থাকি। তারা ভেবে উঠতে পারে না, এভাবে তাদের নিগূহীত হবার কারণ কি? তারা ক্রমে আত্ম মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে এবং অধিকতর নিজেদের হাতাপাশ করে না। তোলবার জন্ত আপনাদের সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে ফেলে। ছোটদের প্রতি বয়স্কদের এই অপকৃপ ব্যবহার প্রতি-নিয়ত সংঘটিত হওয়ার ফলে ছেলেমেয়েরা

সতর্ক হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রকাশ পথে বাধা দেয়। তারা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ভয় পায় পাছে তাদের বোকা অথবা অজ্ঞ একথা অপরে ভাবে—এই ভয় এবং আমাদের অজ্ঞতা এবং অপকৃপ ব্যবহার তাদের জীবনের একটা বড় সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে—নিজেদের অন্তরের রূপকে বাইরে আনতে তারা ভয় পায়, লজ্জা বোধ করে—নিজেদের প্রকাশ করার ক্ষমতা তারা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। যারা আপন সন্তান সন্ততিদের ভাল দেখতে চান, ছোটদের চরিত্রে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চান—এ ছেলেদের কোন বিষয় নিয়ে কোন প্রশ্ন নিয়ে, কোন জিজ্ঞাসা নিয়ে বিজ্ঞপ করার পথ থেকে দূরে থাকাই তাঁদের উচিত। এতে করে পিতামাতার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধ আরো মধুর ও সুখের হয়ে উঠবে। ছেলেমেয়েরা দোষনীয় কাজ করে ফেললে অথবা যা আমরা চাইনা এমন কাজ যদি তারা করে—তাহলে তাদের সব সময় দোষীর চোখে না দেখাই ভালো—এ রকম কাজ থেকে যখন তারা আপনা থেকে দূরে থাকবে—প্রশংসার বাণী যেন তারা পায়। দোষনীয় কাজ থেকে তাদের দূরে রাখতে গেলে শুধু রক্তচক্ষু, বেত অথবা ভৎসনা বিশেষ কিছু কাজে আসবে না, বরং লহাভূতি দিয়ে মিষ্টি কথা দিয়ে অনেক বেশী উপকার পাওয়া যায়।

শান্তি দেওয়ার কথা এখানে কিছু বলা দরকার। শারিরীক শান্তি প্রদান করা

অতীত যুগের নিদর্শন। শারিরীক শান্তি ছেলেমেয়েদের ভীতি প্রদর্শন করতে পারে কিন্তু তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। শাস্তি বাঁধের দুর্বল—এমন ছেলেমেয়েদের শারিরীক শান্তিই তাদের মনে ভয় জাগাতে পারে কিন্তু নির্ভীক ছেলেমেয়েদের একগুয়ে ও জেদী করে তোলে। পুরান রীতি নীতি অবলম্বন করে ছেলেমেয়েদের শাসন করার রীতি আমাদের ঘরে ঘরে চলে আসছে।

Spare the rod and spoil the child অতীত যুগের অতি পরিচিত নীতি এ যুগে বর্তমানে অচল হয়ে পড়েছে। মিষ্টি কথা, লহাভূতি ভালবাসা প্রভৃতি অপকৃপ মোহময় কার্যাকরী মন্ত্রের কথা আমরা জানি—তখন শারিরীক বা অস্ত্র কোনও রকম শাস্তির কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। এর চেয়ে দোষনীয় আর কিছু নেই। আমার স্বপ্ন জ্ঞানের ভিতর এমন কোন ছেলেমেয়ে আমার চোখে পড়লো না যে কেবলমাত্র শাস্তির দ্বারা তার চারিত্রিক উন্নতি ঘটেছে। ছেলেমেয়েরা অনেক সময় অসহ্য হয়ে পড়ে। শান্তি দিয়ে উপকার পাওয়া গিরেছে এমন ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অতি কম—নগণ্য। কোন অবস্থাতেই ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানো উচিত নয়। অতি লাহসী বা নির্ভীক ছেলেমেয়েদের শাস্তিকে এই ভয় দুর্বল করে ফেলে এবং তাদের উত্তর জীবন ধরে অবচেতন অবস্থার ভিতর দিয়ে মনের শক্তিকে নষ্ট করে ফেলে।

ছেলেমেয়েদের "অবলোকন" করার শক্তিকে বর্ধিত করা উচিত এবং সব বিষয়ে যাতে ছেলেমেয়েদের জানবার বা দেখবার বা বোঝবার চেষ্টাকে লাহাঘ্য করা উচিত। জানবার ইচ্ছাই মানুষের জীবনের সাফল্যের পথে অনেক কাজে লাগে তার পাথের হয়ে থাকে। জগতের সমস্ত কিছু জানবার দেখবার বা বোঝবার পূর্বসূরী হওয়াই মানুষের

ব্যবহারিক জগতে লাফল্য নির্ভর করে থাকে। নানাবিধ বিষয়বস্তুর রাজস্ব বাণ করেও এমন লোক দেখা যায় যারা কোন কিছুতেই বিশেষ একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। তাঁরা চোখ থাকতে দেখেন না, কান থাকতে শোনেন না, মন থাকতে বোঝেন না। দেখার মত চোখ তাঁদের নেই, প্রশংসা করার মত শক্তি তাঁদের নেই। সব বিষয়ে কেমন একটা উদ্বাস ভাব, নির্জিকার ভাব, এ হোল পরিণত বয়স্কের কথা। তাঁদের এই নির্জিকার ও উদ্বাস মনোবৃত্তির পটভূমিতে আত্মগোপন করে আছে ছোট বেলাকার শিক্ষা—বোঝবার, দেখবার, জানবার একটা বিশেষ ইচ্ছার অধিকারী তাঁরা হতে পারেন নি। ছোটবেলার এ শিক্ষা তাঁরা পাননি। ছোটদের মন থাকে নমনীয়, মন থাকে সদা বাগা, উৎসুক এ বিষয়ে ‘অবলোকন’ করার শক্তিটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা খুব লজ্জ—পিতামাতাদের এদিকে একটু সাহায্যের ও দৃষ্টির প্রয়োজন। এ বিশেষ গুণটি মানুষের অনেক উপকারে আসে। আমাদের বৈচিত্র্যহীন সীমাবদ্ধ জীবনে এটা অনেক সময় লাভনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, অন্ততঃ এক ঘেরেমীর হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্ত নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেবার সময় এগেছে এই আমার মনে হয়। বর্তমানে যুবক যুবতীদের ভিতর যেভাবে বৈচিত্র্যহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বলবার নয়। এর কারণ, আমার মনে হয় সীমাবদ্ধ দৃষ্টি ছাড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে দৃষ্টি শক্তি নিয়োজিত করার মতো শিক্ষা তাঁরা পাননি। এক নির্দিষ্ট গণ্ডির পরপারে যে কত জিনিষ তাদের নিত্য নব

সৌন্দর্য নিয়ে অবস্থান করছে দেখা তাঁরা ভাববার সময় পান না। দৃষ্টিকোণ তাঁদের ছোট হয়ে আসার দরুণ জীবন যাত্রা তাঁদের বৈচিত্র্যহীন নিরস হয়ে পড়ে। পিতামাতার এ দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দিতে হতো। ছেলেমেয়েদের রহস্যর জীবনের ও রহস্য

বি, নান
কোন্ : বি, বি, ৩২৩৪
১৬১এ, বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা

বায়স্কোপে—
ক্লাইড . বিভূষণ ও
প্রোগ্রাম আইয়ের বিভূষণ
প্রচারের জন্ত—
দেওয়ালে—
পোষ্টার লাগাইবার জন্ত
ষড়দিনের সাজার
আমাদের সহায়তা লইলে
নিশ্চয়ই খুসী হইবেন।
—*—

জগতের সন্ধান দিতে হবে—গৃহের অল্পটু আলো থেকে তাদের আলোকের উৎসের সন্ধান দিতে হবে।

‘ছেলেমেয়েদের মানুষ করা’ এই প্রবন্ধটি অসমাপ্ত থাকবে যদি এখানে Sex education লব্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করা না হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রাথমিক চিকিৎসা

(পুড়ে গেলে)

রাগা করতে করতে হঠাৎ বহি পুড়ে যায়, (অন্ন পুড়িলে) তখন একটু মসিনার তৈল সেই পোড়া স্থানে লাগিয়ে দিলে তখনি জ্বালা কমে যায় এবং ক্ষতের আলকা থাকে না। যদি অনেকখানি পুড়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই জায়গায় স্পুট ঢেলে দিয়ে তার উপর খুব ঘন করে মোড়া বাইকার্কে ঢেলে দিতে হয়, তাহলে ফোঁসকা হয় না। পরে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া ভাল।

(কেটে গেলে)

হঠাৎ কোথাও কেটে গিয়ে যদি রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে ট্যানিক এসিড লাগিয়ে দিলে তখনই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং ব্যথা কম হবে। সুখের ব্যারেতে ট্যানিক এসিড দিলে খুব শিগগির সারে।

(হাজা হলে)

বর্ষাকালে অনেকের পায়ে হাজা হয়, এবং খুবই কষ্ট হয়। ওট হাজার উপর মসিনার তেল লাগাইলে ছ একদিনেই ব্যথা মরে যায়। একজিমা কিউর, নামে একটা ওষুধ পাওয়া যায়, সে ওষুধ একদিন লাগাইলে উপকার হয়। পাছে কেহ বিজ্ঞাপন মনে করেন বলে ও ওষুধের সবিশেষ কিছু বিখিলাষ না।

শ্রীমতী সুধিকারাগী ঈশ্বরী।



ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।



খ্রীসমীরেন সেন

মালিনকে মানবো না।

ক্লবে কলবার্ট বলেছে, মালিন দিয়ে-
ট্রিশের কথা মোটেই মানবায় মত নয়; যা
বলেছে তা নের্বাৎ বাজে; সুন্দরী
মীনাক্সী কলবার্টের নাম হলিউডে আজ
কোন তারকার চেয়ে কম নয়। ক্লবের
কথা আজ তাই মালিনের কথার মত বড় বড়
করে লবাইকে শোখানো হয়েছে।

মালিন বলেছে পুরুষ মানুষেরা জীলোকের
চেয়ে বুদ্ধিমান।

মালিনের একথায় প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওতে
রীতিমত আলোচনা শুরু হয়েছে। ক্লবে
বলেছে: কেন?—লজ্জা করেনা মালিনের
একথা বলতে! খবরের কাগজ মালিন
কি পড়ে না?—তাতে কি দেখতে পায় না
মেয়েরা দিনের পর দিন কি উন্নতি করছে?
অভিনয় করতে, ছবি আঁকতে, গান গাইতে
—বিজ্ঞানে, ডাক্তারিতে, ওকালতিতে মেয়েরা
কিনে কার চেয়ে কন স্ত্রী? দিনের পর
দিন মেয়েরা এগিয়ে চলছে! আর খেয়াল
রাখা উচিত আমরা অনেক পরে ষ্টুট
করেছি। মেয়েদের যে ভাবে পেছিয়ে
রাখা হয়েছিল আজ তারা তেমনি জোরেই
অগ্রগতির হচ্ছে।

লর্ডার্ড বলেছে

কার্ল লর্ডার্ড ক্লবে কলবার্টের কথা
মানেনি, সে বলে, মালিন বোধ হয় ঠিকই
বলেছে। পুরুষেরা নতি কথাই বলে,
আমরা তা ভাল লাগে। কারণ তারা যে

আমাদের চেয়ে বৈদিক শক্তি এবং দী
শক্তিতে অনেক বড় এ কথা না মানবার
মত কোন কারণ নেই। সময় সময় তাদের
ব্যবহার অসত্য এবং অভ্যর্থের মত হয় বটে
তবু তারা আমাদের চেয়ে অনেক বড়।
ক্ষমতা থাকলে মানুষ তার খানিকটা
দেখাবেই।

আইরিশের মতে

আইরিশ ডান ঠিক কার্ল লর্ডার্ডের
মত না বললেও সে বলেছে; মেয়েরা
পুরুষদের মতই দী শক্তিতে সমান কিন্তু
তাদের পুরুষদের মত দেখাবার সুযোগ ও
সুবিধা দেওয়া হয় না। আমাদের মনে হয়
পুরুষমানুষের স্ত্রী গুণাবলী যা আছে
জীলোকের ঠিক তাই আছে; কেবল
মেয়েদের ছোট বয়স থেকে ঠিক ভাবে শিক্ষা
না দেওয়ার দরুনই তা বাড়তে পায় না।
বিয়ে, মা হওয়া আর ঘরকন্না করা এ ছোট
বয়স হতেই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া
হয় তাই আমরা ছোট। পুরুষ মানুষেরা
তাই আমাদের দায়িত্বে রেখেছে এই কথাই
আমার মনে হয়।

গ্যারীর কথা

গ্যারীকুপারের কথার সহিত আইরিশের
কথার সঙ্গে মিল আছে। দুজনেই মেয়েদের
সম্বন্ধে একই মত দিয়েছে।

গ্যারী বলে, মেয়েরা ভেলেদের মত মূলতঃ
স্মার্ট, কিন্তু তাদের কতকগুলি অসুবিধা
আছে যার জন্য খুব সম্ভব পুরুষমানুষের মত
অগ্রগামী ও উন্নতশীল হয়ে উঠতে পারে না।

পুরুষমানুষের সহিত সমান তালে চলার পথে
অসুবিধার অসংখ্য কারণগুলির মধ্যে একটি
হচ্ছে, মেয়েদের সন্তান বহন করতে হয়।
বহন যদি না করে, তাহলেও সন্তান
সন্তানবানার আশঙ্কা সব সময়ই পোষণ করে
এখে দিতে হয়। আর এইটাই হচ্ছে সব
চেয়ে বড় কারণ যা মেয়েদের আমাদের
সমান হতে অনেক দূর পেছিয়ে রেখেছে।

র্যাপ্ট ও মার্শাল

জর্জ র্যাপ্ট ও হার্বার্ট মার্শাল দুজনেই
প্রকাশ করেছে মালিনের কথা সত্যসঙ্গত
বলে তারা মানে না।

হার্বার্ট মার্শাল সেদিন তার গলার
টাইয়ের বাঁধন স্তূড় করতে করতে বিশ্বের
নারী পক্ষ হতেই পরিস্কারভাবে কয়েকটি
কথা বলেছে—মালিনের সৌন্দর্য্যই তাকে
পুরুষ জনোচিত অভিমত প্রকাশ করতে বাধ্য
করেছে। পুরুষেরা জীলোকের বাহিরটাই
দেখে, জীলোকের বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখেই
তারা আকৃষ্ট হয়। সৌন্দর্য্যের কাছে সবই
হার মানেন। কাজেই মালিনের কথা প্রায়
সব পুরুষই মানবে।

অপরদিকে মেয়েরা সমালোচক। তারা
সব জিনিষই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করবার
চেষ্টা—করে। প্রত্যেক জীলোকই অপর
জীলোককে বিচারকের চোখে দেখে। বিশেষতঃ
সুন্দরী জীলোকের প্রতি। মালিনের কথা
কোন জীলোকই মানবে না। আমিও
মালিনের কথা মানি না। জীলোকের চেয়ে
পুরুষের স্ত্রী কলাজ্ঞান আছে ও তারা বড়
রসবেত্তা—একথা আমিও মানি না। আমার
মনে হয় জীলোকেরা পুরুষের চেয়েও
বুদ্ধিমত্তী।

—:(.)—

গর্ভ নিরোধ বাটিকা

বহুপরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ঔষধমাত্র একবার
সেবনে এক বৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫ টাকা
ডাক্তার এম.এস.জামান
৪২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা



খেয়ালী চিত্রপট

দ্যারনাভ-এর 'ওয়েল্‌স ফারগো' ১৩৫
জোয়েল ম্যাক্রীয়া ও ফ্রান্সেস্‌ জী—ছবিখানা
শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছে।

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৬ই মাঘ ১৩৪৪, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮ } . তথ্য • সংখ্যা :

সুভাষচন্দ্র

বৈদেশিক রাজদত্ত সম্মানের মিথ্যা মরীচিকা
তুচ্ছ করি লভিয়াছ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজতীকা

যে মহতী কল্পনায় হে বরেন্দ্র, অন্তরে তোমার
একদা আগেয় বীজ করেছিলে গোপনে রোপন,
গভীর দেশাত্মবোধে মুক্তি লাগি যুবক বাংলার
বন্দেমাতরন মন্ত্রে করেছিলে সর্বসমর্পণ—
দেশ মাতৃকার পদে একনিষ্ঠ সাধকের মত
তুচ্ছ করি বৈদেশিক রাজদত্ত বিপুল সম্মান,
পরাদীনতার দুঃখে ক্ষুব্ধ মনে হয়ে মর্শ্মাহত *
নির্যাতন বন্ধে পাতি করিতেছ দৃষ্ট অভিযান ।

তোমার তরুণ মনে দেশপ্রেমে ভীত উদ্ভাদনা
জাগে নিতি দুর্নিবার যৌবনের জয়যাত্রা পথে,
নবীন সাধনা সে যে ঘুচাইতে জাতির লাঞ্ছনা •
কণ্টক মুকুট পরি চলিয়াছ গৌরবের রথে ।
যুবকের কত স্বপ্ন ? কী বিলাস ? কিন্তু হে যুবক—
বিলাসীরা দেখে যদি কী স্বপন তোমার অন্তরে—
পাগল করেছে জালি' কর্ম যজ্ঞে জলন্ত পাবক,
মেহারিয়া লক্ষ ত্রুটি মানবাত্মা অপমানে রয়ে ।



সুভাষচন্দ্র

হে বিজয়ী বীর তব মর্শ্মাকাশে নব অরুণিমা,
রাজ্যেছে পূর্বাচল উদয়ের অপূর্ব আলোকে,
হে সুভাষচন্দ্র তব জয়ন্তীর প্রদীপ্ত গরিমা
সারা দেশ গাহে তাই বিজয়ের আনন্দ পুলকে
বৈদেশিক রাজদত্ত সম্মানের মিথ্যা মরীচিকা
তুচ্ছ করি লভিয়াছ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজতীকা । *

* [হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি মিকাচিৎ হইবার পর রচিত]

স্বাগত সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্র স্বাগত !

ক্যাপাই অমৃতত্বের নিদান। কেবল আধ্যাত্মিক জগতেই যে এ অভ্রান্ত সত্যটির পরিপূর্ণ স্বরূপ। আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা নহে; জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমরা ইহার যথার্থতা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারি। তাই দেখি যে, নবীন বাঙলার দুই ত্যাগবীর জননায়ক আজ যারা ভারতের রাজনীতির পঞ্চদয়ের কর্ণধাররূপে সমগ্র জগতের রাষ্ট্রনৈতিক বনোন্মেষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সর্বোত্তম অবস্থিত।

ই হাদিগেল একজন—আশৈশব পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ভাবধারার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও আজ প্রাচ্যভূমে দেশপ্রেমের মূর্ত আদর্শরূপে দেশবাসীগণ কর্তৃক অভিনন্দিত। ইহার মূলে বর্তমান এক অতি মহৎ আত্মবিসর্জনের প্রবৃত্তি। এই দেশপ্রাণ জনপ্রিয় তরুণ নেতৃবর কৈশোরে বিদ্যাধিজীবনেই তাঁহার সকল উচ্চাশা স্বেচ্ছায় অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিয়া বৈরাগ্যযোগ অভ্যাসে রত হইয়াছেন,—যৌবনের প্রারম্ভে অপরিমেয় শাসন-শক্তির নিদান রাজকীয় কর্মযোগের প্রলোভন দামত্বের সুবর্ণশৃঙ্খল-জ্ঞানে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়াছেন,—তার পর দীর্ঘ দিন শত অঞ্জনা সহস্র উৎপীড়ন হাঁসিমুখে বুক পাতিয়া লইয়াছেন,—সুদূর প্রবাসে নির্জন কারাবাসে অগণিত তনুতাপেও দৈহিক ক্লেশ-সহনে শরীর বারবার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নিদারুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটিলেও আত্মত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত বীরহৃদয়ে দেশপ্রেমের সহস্রধারা কোবদিন উৎসারিত হইতে ক্লান্ত হয় নাই। তাঁহার স্বার্থগন্ধহীন অচল-অটল-সুদৃঢ় অন্তর চিরদিনই কুসুমকোমল শরীরের সহিত আপনাকে সম্পর্শরুক্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রকৃৎ জননায়কের নিকাম সেবা-সাধনায় প্রীতিলাভ করিয়া দেশমাতৃকা আজ তাঁহার

সুচিরক্ষিত আশীর্বাদ-পরিপূত সুশ্রুত যশোমালা ইহার বরণ্য বরাজে স্বহস্তে সময়ে পরাইয়া দিয়াছেন। মুকুটহীন জননায়কের শিরঃস্থিত এ কীর্তি-কুসুমমালিকা বহু স্বাধীন রাষ্ট্রপতির রত্নখচিত কিরীট অপেক্ষাও মহামূল্য—কামনীয়।

আজ একজন—জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের সকল সুখ সকল শাস্তি চিরতরে বিসর্জন দিয়া দুঃখ-দৈন্ত-বিপদ তালিকেই মাথার মণিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন,—গৃহসুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধাতা যাহার অদৃষ্টে কোনদিন লিখেন নাই, অথচ সে কারণে তিনি ক্ষণেকের তরেও ব্যাকুল নছেন,—এমন দিন গিয়াছে যখন নিজ জন্মভূমি হইতে তিনি নির্বাসিত,—পাশ্চাত্যভূমে দেশ হইতে দেশান্তরে নিতান্ত অকরণভাবে বিতাড়িত,—এ বিশাল পৃথিবীতে এক মুহূর্তের তরেও শাস্তিতে বিশ্রামের অবসর মিলে নাই,—বিদেশে একাকী অসহায় অবস্থায় কতবার জীবন সংশয় পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার অদম্য হৃদয় ক্ষণিকের জগৎ বিচলিত হয় নাই—আত্মপ্রাণের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র মমতার উদ্রেক হয় নাই—বিপশুক্ত হইবার বাসনায় তিনি কখনও নিজ আদর্শ ধর্য করিয়া চির-উন্নত শির শক্তিমান শাসকের পাদমূলে অবনত করেন নাই। আবাল্য দেহ-প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এই কঠিন অবিরাম সংগ্রাম এ পুরুষকেশরীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে কেবল ত্যাগদীপ্ত মনের বলে। এই আজ-বিলোপ-স্পৃহা—সর্বৈষণা সম্যাস তাঁহার অন্তরকে পূত করিয়াছে বলিয়াই নরেন্দ্র আজ মানবেন্দ্র।

বিশ্ববন্ধু বিষয়—দক্ষিণ বাঙলার চব্বিশ পরগণার একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম এই দুই পুরুষপ্রবরেরই মাতৃভূমি। সুভাষচন্দ্র ও মানবেন্দ্রের পূর্বপুরুষগণের অতি প্রিয় নিবাস এই কোদালিয়া গ্রামকে বাঙলার

রাষ্ট্রনৈতিক মানচিত্রে আর গণগ্রামরূপে চিত্রিত করা উচিত হইবে না। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক-ভাবজাহ্নবীধারার গোমুখী-উৎসরূপে কোদালিয়ার নাম উল্লিখিত হুগোলের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। বাঙলার এই দুই রাষ্ট্রনায়ক সুদীর্ঘকাল পরে আবার নবজন্মে কর্মস্বোগে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা ইহাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি—স্বাগত সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্র স্বাগত!

আগামী সপ্তাহে বিষ্ণুপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে হরিপুরা কংগ্রেসের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র ও বরেন্দ্র বামপন্থী নেতা মানবেন্দ্রনাথের বাণী শ্রবণ করিবার জন্ত সমগ্র বাঙলা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। ইহাদিগের সম্মিলিত সুবিবেচিত নেতৃত্বে বাঙলার আবার এক অশ্রব কল্পপদ্ধতি প্রবর্তিত হইবে বলিয়া আমরা বিশেষ ভরসা করি।

রূ পো র বু ম কো

: পরিচালক :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়



ই.
ডি.
ও.

রাধা ফিল্ম



: আলোকচিত্র-শিল্পী :

বীর্জেন দে

: প্রধান শব্দযন্ত্রী :

নৃপেন পাল

ভূপেন ঘোষ ..

: শব্দযন্ত্রী :

অবনী চ্যাটার্জি
গোবিন্দ ব্যানার্জি

ও, কে, এ.
প্রোডাকশন

ব্যবস্থাপক :—বিজ্ঞান মন্ত্রিক

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে

সুশোভন রায়

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—‘The king is dead—Long live the king.’ আজ শোকবিলম্ব অন্তরে শরৎচন্দ্রের মহা-ক্লান্তির কথা ভাবিতেছি, আর বার বার এই কথারই প্রতিধ্বনি মনে জাগিতেছে। মন বলিতেছে—‘শরৎবাবু! মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু শরৎচন্দ্র অমর।’ নিঃসমঝোতাধানে সৃজিত মানব মনের নিরুপায় লাঞ্ছনা নড়ে,—‘শরৎচন্দ্র অমর’ একথা সত্য, প্রবল সত্য। পূর্ণিমা রজনীতে আদিগঙ্গার তীরে তাঁহার ইহলৌকিক দেহ ভস্মাৎ করিবার জন্ত যে চিত্তাশ্রমিমা জলিয়াছিল, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র নিরূপিত হয় নাই। সেইরূপ শরৎচন্দ্র বাহুবলি—যিনি সাধারণ আর পাঁচ জন বাঙ্গালীর মতই চলিতেন, ফিরিতেন, শোকে বিষম ও আনন্দে উল্লসিত হইতেন, তাঁহার কথা কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালী হয়তো ভুলিয়া যাইবে কিন্তু যে শরৎচন্দ্র অনন্তসাধারণ, যে দরদী শিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনালঙ্কার প্রতিভার অমোঘ শরঙ্গদ্বানে তুর্বার্ত শরশয্যাগত বাঙ্গালীর সামাজিক মনকে জাহ্নবীধারার অতিথিকিত করিয়া ছিড়েন, যিনি অতিসাধারণ, চিরপরিচিত এবং সেইজন্যই চিরঅবহেলিত লোক সমাজের স্নেহভ্রমের কাহিনী লইয়া লোকান্তর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই সাহিত্যস্রষ্টা প্রতিভাবান শরৎচন্দ্রের স্মৃতি বাঙ্গালার শিক্ষিত নরনারীর মন পূর্ণচন্দ্রের অমলিন জ্যোৎস্নার চিরপ্রাবল্য করিয়া রাখিবে।

বাঙ্গালী সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান লক্ষ্যে বহু মনীষী ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছেন,

ভবিষ্যতেও করিবেন। এই সামান্য প্রবন্ধে লোভ তাঁহাকে কোনোদিন স্পর্শও করে সেই অপরিমেয় স্থানের পরিমাপের ব্যর্থ নাই। তাঁহার প্রতিভার অসীমগৌরব প্রকাশ করিব না। আজ শুধু তাঁহার সাহিত্য সাধনায় ও ব্যক্তিত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশিত চিত্তে স্মরণ করিব মাত্র।



শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র ছিলেন সত্যকার সাহিত্য-সাধক; সাহিত্য-সাধক না বলিয়া সাহিত্য-তপস্বী বলিলেই যেন তাঁহাকে যোগ্যতরভাবে অভিহিত করা হয়। আর কোন দুর্বলতা না থাক—অন্ততঃ নামমাত্র লক্ষ্যে দুর্বলতা নাই এমন সাহিত্যিক তো চোখে পড়ে না। কিন্তু এই একটি লোক যেখানিচি যিনি সে লক্ষ্যে ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। নিঃস্বার্থ চরিত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ লোক-লোচনের অন্তরালে আত্মবিশ্বাসী এই সাধক সুদীর্ঘদিন ধরিয়া সাহিত্যসাধনা ও সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন, সাহিত্যকে হাটের পণ্য করিয়া অর্থ ও সম্মানের প্রত্যাশায় ঘারে ঘারে ফেরি করিয়া বেড়াইবার হীন

অবিচলিত অপেক্ষা কি সাধারণ মানুষে সম্ভব? তাঁহার পর যখন তিনি তাঁহার পূর্ণ দীপ্তিতে বাঙ্গালী সাহিত্য সমাজে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন সে কি উল্লাস, সে কি কোলাহল! এক সঙ্গে স্তুতি ও নিন্দার, অভিনন্দন ও নিন্দা-বাহের প্রবল প্রবাহের এমন ঝাঝ আর কোনো সাহিত্যিককেই বোধ করি সহিতে হয় নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অবিচলিত। ভক্তগণের অজস্র স্তুতিবাহে তাঁহাকে কখনও অথবা উল্লসিত হইতে

যেখি নাই, আবার অকারণ নিন্দাবাহ, এমন-কি হীন ব্যক্তিগত আক্রমণে ব্যথিত ও অধীর হইয়া কখনও তাঁহাকে আত্মসমর্পণে লেপনী ধারণ করিতে যেখি নাই। তাই বলিতে-ছিলাম যে, তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, মোহমুক্ত সাহিত্য-তপস্বী। তাঁহার বাহ্য দিবার ছিল, তিনি অক্লপনহস্তেই দিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানকে স্বীকার বা অস্বীকার করিবার ভার তিনি তাঁহার আরাধ্যা জননী বঙ্গভারতী এবং বঙ্গভারতীর অগণিত সন্তানদের উপর দিয়াই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাই তিনি চিরদিন ভিড়ের কোলাহল এড়াইয়া চলিতেন। তাই যখন তিনি যশের সুউচ্চ শিখরে

প্রতিষ্ঠিত তখনও সভাপতিত্বে বোগদানে একান্ত পরাধীন ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে বক্তৃতাকে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করার মধ্যে যে আত্মপ্রচারের ভাব আছে তাহাই বোধ করি তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পীড়িত করিত। আত্মপ্রচার নহে, আত্মপ্রকাশেই ছিল তাঁর আনন্দ। তাই আপনায় গৃহের নিভৃত কোণে বা অপরের গৃহে করেকজন পরিচিত বন্ধু বান্ধব বা অমুরাগীদের মধ্যেই ছিল তাহার প্রাণখোলা আত্মপ্রকাশ। তিনি যে বঙ্গভারতীয় নিকট হইতে কথাশিল্পীর জন্মগত পরোয়ানা লইয়া আলিরাভিলেন, এই লকল বৈঠকে শরৎচন্দ্রকে জানিবার দোভাগ্য বাহাধের হইয়াছিল, তাহাটাই তাহা স্বীকার করিবেন। কাহিনীর পর কাহিনী ছবির পর ছবি, প্রোতাধের লম্ফে উদ্ভাটিত হইয়া চলিয়াছে—লময় যে কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত কেহ বুঝিতেই পারিত না। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আত্মগোপনে সূচকুর। নিজের অভিজ্ঞতা-লব্ধ কাহিনীই হয়তো বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু বর্ণনার ভঙ্গীটি ছিল নিরপেক্ষ তৃতীয়-পক্ষের। তাঁহার সাহিত্যে ও জীবনে—নিজেকে অন্তরালে রাখিবার শিল্পী জনোচিত শক্তি ছিল তাঁহার অসাধারণ।

বর্তমান লেখক কতক বিশেষভাবে অমুরক্ত হইয়া একবার তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন—“লভ্যকার সাহিত্যসৃষ্টি করতে হ’লে নিজেকে হ’তে হ’বে একেবারে নিরপেক্ষ, নির্মম। অপরের লেখা পড়বার সময় আমাদের সমালোচক মন তার ঘোষ জটী ধরবার জন্তে যেমন লম্বাজাগ্রত থাকে, নিজের লেখাও সেই মন নিয়ে পড়তে হবে। এই নিরপেক্ষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ’লে তবে সে লেখা ছাপবে—নয়তো নষ্ট করে ফেলবে। নিজের লেখা বাচাই করবার এর চেয়ে ভাল কটিপাখর আমার অন্ততঃ জানা

নেই। আর এই নিরম অমুরারে ‘আমি আমার বত লেখা ছাপিয়েছি, তার চেয়ে বোধ হয় অনেক বেশী লেখাই নিজে ছিড়ে ফেলেছি বা পুড়িয়ে ফেলেছি।’

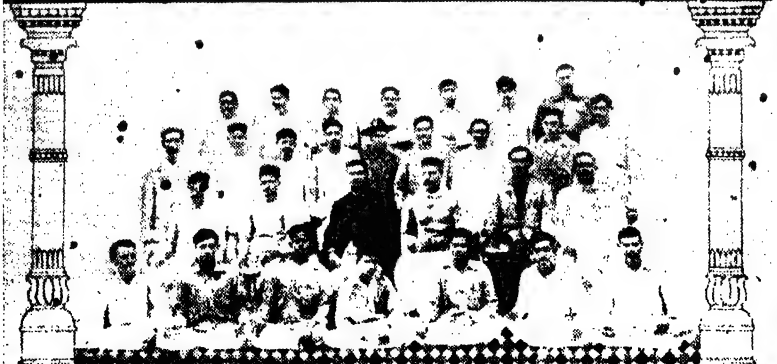
শরৎচন্দ্রের অমর প্রতিভার স্মৃতিতুর্পণ হিলাবে তাঁহার এই পুরোঁক উপদেশটি বহি বাঙ্গলার আধুনিক সাহিত্যিকগণ মনে রাখেন ও অমূল্য করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বঙ্গভারতীয় পুজাঙ্গন অনেক অব্যাহিত আবর্জনার তুপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শুচিস্থল হইতে পারে।

‘বিলর্জন আলিরা প্রতিষ্ঠার হাত ধরিল’ সেই শক্তিমান পুরুষ শক্তির পূর্ণতার মাঝেই আত্মসংহরণ করিলেন। মৃত্যুর লম্বুখীন হইয়াও অন্ত্রোপত্যার ব্যাপারে যে নির্ভীকতা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—সাহিত্যে ও জীবনে সেই অকুতোভয়তাই ছিল তাঁহার আদর্শ। অতএব তাঁহার তিরোধানে লগাটে করাঅত করিয়া বালকোচিত ক্রন্দন শোভা পায়না। সবই বুঝি, কিন্তু তবু অশ্রুজল বারণ মানে না। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তো আমাদের হৃদয় সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠ রহিলেন—কিন্তু সেই মামুষ শরৎচন্দ্র, সেই

পরিহাসনালিক লম্বাশ্রুত দেহভাঙ্গন বরদী শরৎচন্দ্র, সেই জাতি ধর্ম বরণ নির্বিশেষে অক্লান্ত প্রীতিদ্বানে অক্লপণ শরৎচন্দ্র, সেই আমাদের চিরপরিচিত অতিথিবৎসল, আভিজাত্যগর্ভলেশহীন বাঙ্গালী—আমাদের আত্মীয় শরৎচন্দ্র—তাঁহাকে আর কোথায় পাইব। এই অপরূপ মনের মামুষ শরৎচন্দ্রের তিরোধানে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও অন্তরঙ্গ-গণের মনের যে স্থান সৃষ্টি হইল, তাঁহার সাহিত্যের অমরত্ব বা অপর কোনও দার্শনিকতার দ্বারা আজ তাহা পূর্ণ করা সম্ভব নহে এবং কোনদিন তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।



ভারত অশ্বেল মিলের



খাঁচী পরিষদ তৈল ব্যবহার করুন।

মিল ও জমিস ২৪৩ আপারপারকুলারগোড় কলিকাতা ফোন বিবি ২৭৭৪

দরদী সাহিত্যিকের মহাপ্রয়াণে

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য

বাংলার সাহিত্যিকদের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-
অপরাজিত কথাসাহিত্য শরৎচন্দ্র মরমীলেখক
শরৎচন্দ্র এবং আমাদের চিরপ্রিয় শরৎচন্দ্র
মহাপ্রয়াণের সংবাদে ব্যথিত, অগণিত
নরনারী, অশ্রুশ্রবিত নয়নে, আলিয়া তাঁহার
শবদেহকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল।
চন্দন চর্চিত ললাটে পুষ্প স্তূপোদ্ভিত হইয়া
দুঃখকাতর অলংঘ্য ভক্তদের অশ্রুনেবেদ্য
লইয়া বাংলার শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন
চিরশান্তি ধামে।

তাঁহার শব শোভাবাত্রায় অমুগমনে
বেদনার যে, ঘনবাস্প ঢেকে ঘনাইয়া
আলিয়াছিল—বাংলার আকাশ বাতাস যে
দুঃখের কালো ছায়ার তরিয়া উঠিয়াছিল—
তাঁহা এখনও দিলায় নাই—কোনদিন
দিলাইবে কিনা তাঁহাও জানি না।
শোকাভিভূত চিত্তে শুধু স্মরণ করিতেছি
তাঁহার অবদানগুলির কথা—তাঁহার চির
প্রশাস্ত মহাত্মা স্বর্গচ্ছবি।

লেখনী আজ শুরু—কণ্ঠ আজ
রুদ্ধ—শুধু ‘মনে’ হইতেছে মরমী
লেখকের নখর বেহ ‘আজ আর
ইহজগতে নাই। আর আমরা কখনও
তাঁহার লাহচর্য্যে আলিতে পারিব না।
অভিশপ্ত জাতির ভাগ্যে নিষ্ঠুর বিধাতা
নির্দম হস্তে এক নিদারুণ দুলী-রেখা
টানিয়া দিলেন।

শরৎচন্দ্র কে ছিলেন—তাঁহার সাহিত্য
অবদানগুলির লভ্যকার পট্টিয় কি—কোন্সর
তাঁহার দান?—এ কাহিনী বলিবার কোন
প্রয়োজনই আজ আর নাই—আমরা শুধু

স্মৃতি চিত্তে স্মরণ করিতেছি আমাদের
জাতীয় দুর্ভাগ্যের কথা—একে একে নিভিছে
দেউটি।

ব্যক্তিগত জীবনে শরৎচন্দ্রের সহিত
বিশেষ ভাবে সম্পর্কে আলিবার শোভাগ্য
লাভ আমার হয় নাই। কৈশরের স্রপ্নে
সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে ভালোবাসিয়া-
ছিলাম—রাতের পর রাত জাগিয়া পড়ি-
ছিলাম—‘হতা’ ‘বিন্দুর ছেলে’ ‘শ্রীকান্ত’
‘পণ্ডিত মশাই’ ‘বড়দি’ ‘অরক্ষণীয়া’
‘মজদি’ প্রভৃতি তাঁহার অক্ষয় সৃষ্টি লম্ব হ।
‘লাবিন্দ্ৰী’ ‘রুমা’ ‘অচলা’ ‘অভাগিনী অন্নদার’
দুঃখে একান্ত নির্জনে যে অশ্রু নিসর্জন
করিয়াছিলাম—যৌবনেও সে অমুভূতির
কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। আজিও
কর্মীবলানে একান্ত লজাপণে, সন্মার মূদর
আলোকে পাঠ করি বাঙালীর মর্মের চির-
জাগ্রত কাহিনীগুলি আর বিশ্বয়ে অভিবৃত্ত
হইয়া যাই। সাহিত্যিক লব্ধকে যে স্বপ্ন-
মধুর একটি মনোভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল,
আমার পাঠক কৈশর চিত্তপটে যৌবনে
মাত্র কয়েকদিনের এবং কয়েক বারের
পরিচয়ের মধ্যে সে স্বপ্নটুকু ভাঙিয়া যায়
নাই। ব্যক্তিগত পরিচয় স্মৃত্তেও বাস্তব
শরৎচন্দ্রকে দেখিয়াছি খাঁটি লেখক-শিল্পী

শরৎচন্দ্র রূপে! শিশুর সরসতা—পল্লীর
স্নিগ্ধতা উপলব্ধি করিয়াছি বক্ষণ কলিকাতার
বৈজ্ঞানিক লভ্য আলোক প্রভাবে অবস্থিত
শরৎচন্দ্রের মধ্যে। লভা, লবিত্তিতে—উচ্চানে
বন্দনার ভরাইয়া তুলিতে গিয়া শুনিয়াছি
সুখনিঃসৃত শিল্পীর বাণী—“আমাকে জনতার
মধ্যে তোমরা টেনে নিয়ে যেওনা।”

আর একবার রেডিওতে তাঁহার গত
জন্মতিথিতে সন্মুখ হান কালে আমরা
তাঁহার স্বীয় কামনা করিয়াছিলাম—
প্রত্যুত্তরে ‘তিনি বলিয়াছিলেন “মামুষ
শরৎচন্দ্র অপেক্ষা লেখক শরৎচন্দ্রের স্বীয়
তোমরা কামনা কর—মামুষ শরৎচন্দ্র
থাকলো কি না থাকলো তাতে কিছু ক্ষতি
বৃদ্ধি নেই।” আমরা সে কথার স্মৃতি
হইয়াছিলাম—কারণ আমরা যে উত্তর শরৎ-
চন্দ্রকেই, ভালোবাসিতাম—কিন্তু আজ
বুঝিতেছি কেন তিনি একথা বলিয়াছিলেন।

• সেই শিল্পীপ্রাণ বরদী সাহিত্যিক আজ
আর মামুষ শরৎচন্দ্র রূপে নাই—কিন্তু
লেখক শরৎচন্দ্র আজিও রহিয়াছেন আমাদের
মধ্যে এবং যুগে যুগে থাকিবেন বাঙালী
হৃদয়ের অন্তরের চিরস্মরণের মণিকোঠার।

সাহিত্য ক্ষেত্র, রাজনীতি, সমাজনীতি,
থিয়েটার, লিনেম লর্দবিকেই ছিল তাঁহার
অবিস্মরণীয় দান।

স্মরণীয়

শরৎচন্দ্র

ত্রিশ্বশীরেন্দ্র সান্যাল

জগতের কর্মক্ষেত্রে বাজে যেথা কুর্মের বিঘাণ
সপ্তকোটি কণ্ঠে বা'রা তোমারে করিছে আহ্বান,
হে শিল্পী, দিবে না সাড়া? জীবনের আলো-ছায়া মাঝে
আজও ত' আসেনি কবি, ক্লান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধতম সাজে!
জলদ গন্তীর স্বরে, নেপথ্যের ভৈরব হুকারে—
অশ্রায় সমাজধ্বংসী, কাল-ধনু, বীভৎশ টঙ্কারে
আজও ত' দেয়নি সাড়া, স্তম্ভিত করিয়া দলদিক
সহসা দেখিছু চেয়ে, সে প্রাসাদে নাহি বৈতালিক!

একদা উছসি' উঠি জড়তাবিহীন শব্দ-রবে—
দিয়াছিলে আত্মবোধ বাঙালীয়ে অথগু গৌরবে!
বাঙালী শরৎচন্দ্র, আজি তুমি বাঙালী সন্তানে
আসিবেনা জাগাইতে, বাণীমন্ত্রে, নব কলতানে!
আর্ন্ত ধরনী তাঁই বেদনায়, কাঁদিয়া-লুটায়
চিরতরে মহাশূণ্ডে, শরৎের চাঁদ ডুবে যায়!
তবু আজো, মনো-রাজ্যে জেগে রয় তোমার বারত
নব-জীবনের মাঝে মৃত্যু যেথা লাভে অমরতা!

ব্যথিত আর্ন্ত-অনাদৃত চিরহুঃখী-জনগণের
লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার লেখণী তাঁহার অশ্রু লব্ধ-
মহন করিয়াছে, পাপীকে দিয়াছেন তিনি স্নেহ
কোল—লোক চক্ষে অশুচিকে তিনি দিয়াছেন
শুচিতার বস্ত্র সিংহাসন—সর্বোচ্চে 'তিনি
||হিরাছেন মানবতার জয়। তাই বৈষ্ণব
লখকের রচনায় শুনি বৈষ্ণব কবির সুর—
লবার উপরে মাহুদ লতা তাহার উপরে
||ই।"

বাংলার নারীহৃদয়কে তিনি যে ভাবে
প দিয়াছেন—স্নেহ, মমতা, প্রেম স্রীতি—
করণ্য আত্ম-বিগলিত বাঙালীর নারীর
কামল অহুভূতি—রন্ধন সেবা পরায়ণা বাংলার
গাপন অন্তঃপুরচারিণী 'মহিমনী মহিমাধরী
|হিলা'—তাঁহার আর তুলনা নাই। বাংলার
সুত পল্লীকে তিনি দিয়া গিয়াছেন নব-
জীবনের চেতনা!

শরৎচন্দ্রের পরলোক গমনে তাই আজ
নগরের জনারক্ত হইতে পল্লীর গৃহাঙ্গন এবং
রন্ধনশালা অবধি শোকে মুহমান!

দিনের শেষ রশ্মিতে সূর্যাস্তের করুণ
রক্তিম আভা—শীর্ণ জাহ্নবীকূলে চিতান্নির

শেষ শিখাটির করুণ ছবি আঁমাদের মন-
লোকে বিবাহ স্মৃতির রেখা টানিয়া দিল।

অসংখ্য ভক্ত সমাগমের একপার্শ্বে অতি
সজোপনে আমি আমার ভক্তি-অশ্রু-অর্ঘ্য
নিবেদন করিলাম।

হাজরা পিকচার্সের নিবেদন

হিন্দু-নর-নারীর প্রেম-ভক্তি-শৌর্ষ্যের অমর চিত্রগাঁথা
নীচতা ও মনুষ্যত্বের অপূর্ণ সমন্বয়ের প্রজ্জ্বলিত

দেবী ফুল্লরা

কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত

: ভূমিকায় :
অহীন্দ্র চৌধুরী
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শিশুবালা
=প্রভৃতি=

পরিচালক : তিনকড়ি চক্রবর্তী
চিত্র-শিল্পী : বিভূতি লাহা
শব্দ-শিল্পী : স্বতীন দত্ত
স্বর-শিল্পী : গোবিন্দ মুখার্জী
কারু-শিল্পী : পরেশ বসু

একমাত্র পরিবেশক : স্নীতেন এণ্ড কোং ফোন : ক্যাল ১০৯২



(খিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

স্বাভাভাবিক, হিন্দি বিজ্ঞাপিত-র অভাবনীয় লক্ষ্যে, আশাধের মত শিল্পাঙ্গুরাগী বাঙালী মাঝেই গুরুবোধ কোরবে। নিউ-থিয়েটার্সের পরিচালক ও অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে; তাঁদের পরিচালক, শিল্পী, টেকনি-শিয়ানদের কলা-নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব, বাঙালার বাইরের, লকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ও অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জন করেছে পেয়েছে— ছায়া-চিত্র শিল্পের ইতিহাসে, বাঙালার এ স্থান অমর হোয়ে থাকবে।

এখনও 'চিত্রা'র 'মুক্তি' যেভাবে আগের জুড়ে বসে আছে এবং বর্ষক আকর্ষণ করেছে, তাতে আগামী মার্চের পূর্বে 'বিজ্ঞাপিত'-র বাঙলা সংস্করণ সাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করার হাড়-পত্র পাবে বোলে মনে হয় না।

নিউথিয়েটার্সের ২নং ষ্টুডিওতে, পরি-চালক বড়ুয়া লাহেবের বাঙলা ও হিন্দি সাপ্তাহিক ছবির ইতিমধ্যেই মহলা সুরু হয়েছে। ছবিখানির নামকরণ এখনও হয় নি। এই মৌলিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে পরিচালক বড়ুয়া, একটি সমস্তার অবতারণা করেছেন, যা'র নাটকীয় পরিণতির মধ্যে লেই সমস্তাটি সুসীমাবদ্ধ হ'বে। আধুনিক সমাজ এবং বস্তী, জীবনের মধ্য দিয়ে, পরস্পর বিরোধী দুটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে, মূলতঃ এই বিচিত্র ঘটনাবল

বাহিনীটির নাট্যাংশ গঠিত হয়েছে। সমাজে পরস্পরের অধিকার বোধ স্রুতিগঠিত কোরতে, জীবন বুদ্ধে এই দুটি নারী, যে রোমাঞ্চের লন্ধান পেয়েছিল, তারই বিচিত্র পরিণতির কাহিনী এই ছবির মধ্য দিয়ে পরিষ্কৃত হ'বে।

সাপ্তাহিক চিত্র-গঠনের কৃতিত্ব পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার লক্ষ্যকতা কোরতে পারেন— সারা ভারতে এমন পরিচালক দু'টি একটির বেনী নেই। নিউথিয়েটার্সের দুই নম্বর ষ্টুডিওর কর্ম-লচীব ছোটাইবাবুর সঙ্গে সহযোগ ঘটায়, এই ছবিখানি যে লকল দিক দিচ্ছে লক্ষ্যসুন্দর, হোয়ে উঠবে— এ বিশ্বাস আশাধের আছে। কেন্দ্রারী মালের সুরু থেকে চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হবে।

মূলতঃ আগামী মার্চ মাসে 'রূপবাণী'তে নিউ থিয়েটার্সের "অভিজ্ঞান" মুক্তিলাভ কোরবে। লক্ষ্যসাধারণের চিত্তস্বয় করার উপযোগী ২৫ মালমশলা আছে এই চিত্রের গল্পাংশে। যে সমস্তা আজ সমাজকে চক্ৰল কোরে তুলেচে অথচ সমাজ রক্ষকদের মধ্যে মনের মিল বা সহযোগীতার অভাবে যা'র সুসীমাংসা আজ হয়নি—একটি অসংহত নারীর মর্মস্বয় ও জীবনের অশ্রমজল, কাহিনীকে কেন্দ্র করে, নিউথিয়েটার্সের বাছাই করা শিল্পী-লব্ধ, তাঁদের অভিনীত অংশের মধ্য দিয়ে, লেই সীমাংসার পথ-নির্দেশ কোরবেন। রাই বড়ালের সুর-

লংযোজনায়, প্রফুল্লবাবুর পরিচালনায় এবং বিমল রায়ের ক্যামেরা-নৈপুণ্যে "অভিজ্ঞান" যে এবছরের একখানি পরম উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য ছবি বোলে হাড়পত্র পাবে—এ বিশ্বাস আশাধের আছে।

কালী ফিল্মস

"লক্ষ্যজনীন বিবাহোৎসব" নামটার ভেতরই যেন কেমন একটা আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। নামটা যেমন এর চূষক—গল্পটিও তেমন রমধন মালমশলার অভিনব। বাঙলা দেশের বিয়ের বাজার কেমন জমাবার, শক্তিশালী লেখক শচীন্দ্রনাথ লেনগুপ্ত হালির ভেতর দিয়ে তাই নবরসে স্মৃত্ত কোরেছেন। বিয়ে হবে পাঁচ জোড়া মেয়ে পুরুষে। তাদের বর্ণনা হ'চ্ছে—প্রথম জোড়া একটি গৃহ-ব্রূহা, দ্বিতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী তৃতীয় ব্যারিষ্টার—বিজয়ী, চতুর্থ ডাক্তার—প্রেমিকা, পঞ্চম অভিনেতা—আলোক—প্রাপ্ত। এই বিয়ের ব্যাপারে এই পাঁচ জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার কত অভিনয়, কত রঙ্গরঙ্গ, কত হা-হতাশ কত 'রেক্‌মেশাশন' প্রভৃতি বিচিত্র সম্ভারে লক্ষ্যবিত হয়ে উঠেছে। ছবিখানার গল্প ও অভিনেতৃ-লম্বলন বিশেষ আকর্ষণীয়। এছাড়া প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ছবিখান। লবনিক থেকে লোকের মনে রেখাপাত কোরতে পারে সেইজন্য নাকি বিশেষ পরিচর্যা কোরছেন।

এই হুগার এই ছবির বনলতার বাড়ীর মৃত্যু ঘেব হ'য়ে গেছে এবং লক্ষ্যবিত শ্রীমতীর ড্রিংকমের কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। প্রথম লেটটিতে মিঃ চৌধুরী (ডাঃ হরেন মুখার্জি) কৃষ্ণালাল (মণি লেন) মিল বনলতা লেন (বীণা) ও মিল শৈলি (উষা দেবী) শোনা যাচ্ছে সুনন্দ অভিনয় কোরেছেন। আর শ্রীমতীর ড্রিংকমের মৃত্যুটি বটে এখন তোলা হ'চ্ছে, এই মৃত্যু শ্রীমতী (সাবিত্রী), মথুর (দীর্ঘজ তত্তাচার্য) বনলতা প্রভৃতির মধ্যে চলছে—প্রেমের উকিরুকি।

১৯ সপ্তাহ !!

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও

মুক্তি

চিত্রের গৌরব আজিও

অম্লান রহিয়াছে!

চিত্রা ফোন বি,বি, ১১৩৩

অষ্টম ও

শেষ সপ্তাহ !!

দেবদত্ত ফিল্মসের

এ হে র-ফে র

আর একবার নূতনতর আনন্দ
ও রোমাঞ্চিত - উত্তেজনায়
আত্মহারা হইবার সাধ অপূর্ণ
রাখিবেন না.....!

পরবর্তী আকর্ষণ.....!!

নিউ ইউনিভার্সালসের

হাস্য - রহস্যপূর্ণ চিত্র

“মাই ম্যান গড ফোর্স”

ফোন : বি, রি, ৩৪১৩

শনি ও রবি :

৩টা, ৬.১৫ ও ৯.৩০টায়

অন্ত্য দিন :

৬.১৫ ও ৯.৩০টার

রূপবাণী

নিউ সিনেমা

ধর্মতলা * ফোন : কলি: ৫৮১৯

মতিমহল থিয়েটার্সের

মি লা প

মনুষ্য জীবনের ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ
চিত্র। শিক্ষিত বেকার যুবক
সম্প্রদায়ের কারুণিক চিত্র-কথা।

মি লা প

ভূমিকার: পৃথিবীজ, বিমলাকুমারী,

মজুমদার, ইন্দিরা দেশী, দেশবালা,

রামপেরান্নী প্রভৃতি।

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড,

ফোন : সাউথ ৩৪

শনিবার ২২শে জানুয়ারী হইতে

জনাকীর্ত্তি দ্বিতীয় সপ্তাহ!!

নিউ পপুলাসের অভিনব ঝাঙলা সময়-চিত্র

ইম্পাট্রার

বা

ধূমকেতু

শ্রেষ্ঠাংশে : শান্তি, রথীন ও মমোরজন

বাগান লিজ

কলিকাতার উপকণ্ঠে পুঙ্করগীসহ একটি বাগান

লিজ লইতে ইচ্ছুক। বিররণাসিসহ বক্স নং অ C/০

“থ্রোব্রালী” ১১নং চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ)

ভবানীপুর, কলিকাতা লিখুন।

মোট কথা যেভাবে কাজ চলছে তা'তে মনে হয়, আগেরে ফেরারীর গোড়াতাই "নরকজনীন বিবাহোৎসব"র শানাইয়ের সুর উত্তরা'-র পর্দার ভেদে উঠবে।

এরিকে 'এ' ইউনিটে রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"-র মতের গৃহের অপরাধ তোলার-হ'চ্ছে। প্রেম-বিরহ, আশা-নৈরাশ্যের লেট বিশ্ববিখ্যাত কাহিনী "চোখের বালি"-র এই দৃশ্যটিই হ'চ্ছে একটি বিশিষ্ট দৃশ্য। সেইদৃশ্য দৃশ্যটির লক্ষ্যের জন্ত পরিচালক সত্য মেন, আলোক-চিত্র-শিল্পী ননী শাতাল ও শব্দধর মধু শীল বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করেছেন। এ ছাড়া বারা অভিনয় করেছেন—মহেন্দ্র (ডাঃ হরেন মুখার্জি), বেহারী (ছবি বিশ্বাস), বিনোদিনী (সুপ্রভা মুখার্জি) ও তার মা (মিলেস ঘোষ) নিজ নিজ ভূমিকাগুলো সুটিয়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

হাজরা পিক্চাস

এবার প্রথম ছবি "দেবী সুরমা"-র আর একটি বহির্দৃশ্যের কাজ বেহালার সমীপবর্তী এক জায়গার তোলা শেষ হ'য়েছে। এই দৃশ্যটি খুব চিত্ত-চাক্ষু্যকর। কারণ, বিশ্ব-ব্যাপক ভাঙুরামকে (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য) এখানে একটা গাছে বেঁধে লাওতালীরা পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা করেছিল। লাওতাল মেরপুকুরের নাচগান উৎসবটির পর, যখন কাঠখণ্ডে অগ্নিসংযোগ করা হবে, এমন সময় "দেবী সুরমা" আবির্ভূত হ'লেন "লোথানে। তাঁকে বেঁধেই ভাঙু মজলনেজে বলে উঠল—"মা, আমার রক্ষা কর—আমি এরূপ কাজ আর করবো না।" দেবী সুকিলে পড়লেন—তিনি সর্দারের বিকে চাইলেন। সর্দার তার মনোভাব বুঝতে পেরে ছিল ভাঙুকে ছেড়ে। প্রবীন পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী এই দৃশ্যটি বা'তে লোকের মনে চাক্ষু্য সৃষ্টি করতে পেরে

স্বাভাবিকতার ভেতর দিয়ে তিনি তাই চেষ্টা করেছেন।—আর তাকে সাহায্য করেছেন নবীন চিত্র-শিল্পী বিভূতি লাহা ও শব্দধর বতীন দত্ত। হাজরা পিক্চালের নব উদ্ভব লাক্ষ্য মণ্ডিত হ'ক এই আশাধের একমাত্র কামনা।

মেট্রোপলিটান পিক্চাস

'ডি-জি'র পরিচালনার এবার "হাল বাঙলা"র শূটিং বেশ খানিকটা এগিয়েছে। "হোল বাংলা"র গল্পটি আমরা যতদূর শুনেছি, তা'তে মনে হয় কাহিনী বেশ



কোন : বি, বি, ৩২৩৪

১৬১এ, সিডন স্ট্রীট

কলিকাতা

বায়স্কোপে—

প্লাইড বিজ্ঞাপন ও
প্রোগ্রাম বইয়ের বিজ্ঞাপন
প্রচারের জন্ত—

দেওয়ালে—

পোষ্টার লাগাইবার জন্ত.
আমাদের সহায়তা লইলে
নিশ্চয়ই খুসী হইবেন।

—*—

জমাটে। আর রূপ-পরিবেশনে 'ডি-জি' লিঙ্ক-হুত সেইজন্ত রসমণ-কাহিনী পর্দার বেশ জমবে বলে মনে হয়।

রাধা ফিল্মস

কালী প্রমথ ঘোষের পরিচালনার "পুরুষোত্তম" ভোলায় আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হ'য়ে এল। আমরা যতদূর শুনেছি না-ভূমিকার নাম্বেন বীরাঙ্গ ভট্টাচার্য আর

নারিকী লভ্যতায়া হ'চ্ছেন শীলা হালদার। এ ছাড়া মারা, বেণুকা, সুশীল রায় প্রভৃতিও বিভিন্ন ভূমিকার আনুষঙ্গিক কাজ করেন। ভাল কথা, কিন্তু "পুরুষোত্তম" নামটা কিন্তু আমাদের মনে লাগে না—এ যেন বিনোদী থিয়েটারের নাটকের নামের মত হ'য়েছে। এরচেয়ে "বাহুবল" নামটা মন্দ ছিল না।

মতিমহল থিয়েটারস

জ্যোতিষ বাঙাল্যের পরিচালনার এবার ব্যঙ্গ-চিত্র "বেকার নালন কোম্পানী" লিমিটেডের আনুষঙ্গিক কাজ আর শেষ হয়ে এল। ছবিখানা তোলা হলে রাধা ফিল্মস্টুডিওতে।

এছাড়া হরি ভজোর পরিচালনার এবার আর একখানা সামাজিক ছবি ওঠবে যেমন 'মায়ের যথের ধন'।

দেবদত্ত ষ্টুডিও

নরেশ মিত্রের পরিচালনাধীনে গোরার শূটিং শীঘ্রই শুরু হবে। চরিত্র নির্বাচন আর শেষ হয়েছে। যে কয়টি চরিত্র ঠিক হ'য়েছে তা' এই—গোরা—জীবন গাঙ্গুলী, বিনয়—মোহন ঘোষাল, গোরার দাছা—রবি রায়, পান্ডুবাবু—নরেশ মিত্র, ললিতা—রমলা, গোরার মা—বেববালা সুরারিতার মা—রাজলক্ষী। সূচিতার ভূমিকার জন্ত এরা একটি সুদর্শনা অভিনেত্রী খুঁজছেন। না পেলে হয় ত, চাকুবালাই এই ভূমিকার নাম্বেন। তা, যদি হয়, তা, হলেই সুকিলের কথা। নিবেদনপক্ষে শান্তিও ত, ছিল।

এরপরই এরা আরও দু'একখানা ছবি তুলবেন—"অন্তরালে," "অভিনেত্রী"।

প্রফুল্ল পিক্চাস

গেল হপ্তার বটব্যালের বৈঠকখানার দৃশ্য তোলা শেষ হ'য়েছে। এই দৃশ্য স্বাভাবিকতার মণ্ডিত করবার জন্ত প্রফুল্ল ঘোষ চেষ্টার কল্প করেন নি।

এই হস্তার 'নিউ মার্কেট'র দৃশ্যটি বিশেষ শাকল্যের সহিত চিত্রায়িত করা হয় এবং এই দৃশ্যে লক্ষ্য, তার পিতা ও 'গ্রাজুয়েট কৃষ্টি'রূপে যথাক্রমে অরুণা, তাস্কর দেব (এঃ) ও লক্ষ্মী বোম নাকি লবাইকে ছাপিয়েছেন খুব।

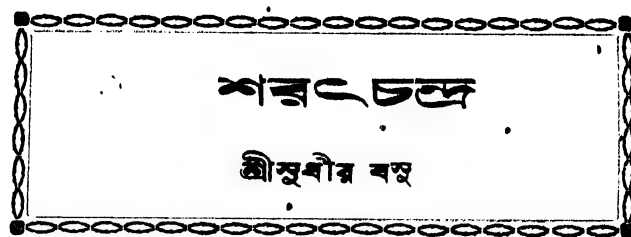
পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার থেকে এই চিত্রগৃহে নিউ পপুলার পিকচারের বাঙলা লক্ষ্মী-চিত্র "ইন্সটার" বা "হৃদকতু" দ্বিতীয় হস্তার পদার্পণ কোরবে। দক্ষিণ কলিকাতাবাসী যে ভবিষ্যৎ লাক্ষের গ্রহণ কোরবে, তার প্রমাণ অসম্ভব জনসমাগম।

রূপশালী

দেবদত্ত ফিল্মের "গ্রহের ফের" অষ্টম ও শেষ লপ্তাহে পড়ল। বাঙলা দেশে রোমাঞ্চকর হস্তারহস্ত বিজড়িত চিত্রকাহিনী হিসাবে "গ্রহের ফের" বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছে।

আগামী লপ্তাহে রূপশালীতে বহুদিন পরে ইংরাজী ভবি প্রদর্শিত হ'বে নিউ ইউনিভার্সালের হস্তারহস্তপূর্ণ কথাচিত্র "মাই ম্যান গডফ্রে" শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরবেন উইলিয়াম পাওয়েল এবং ক্যারল লবার্ড।



শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নথর বেহের অবসান ঘটুক, তাই শরৎচন্দ্রের মৃত্যু লংবাঘে আহার মনে স্বতঃই এই প্রায় জেগেছে যে, এত শীঘ্র কী শরৎচন্দ্রের বাঙলা সাহিত্যকে দান করার ঐশ্বর্য নিঃশেষ হয়ে গেল? শরৎচন্দ্রের লেখনী, তাঁর ভাষা ও ঠাইল আশাদের মনে চিরদিনই যুগপৎ বিস্তার ও আনন্দের লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু তবু এখানে আশারা তাঁর কাছে নিয়মিত অভিযোগ করেছি তাঁকে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে—তাঁর সৃজন প্রতিভার প্রতি আশাদের প্রকাজ্ঞাপনে। যেদিন বাঙলা উপত্যকায় তিনি চিরাচরিত প্রাণ বর্জন করে নারিক নারিকরূপে হাজির করলেন তাৎপর্য, বাহের লক্ষ্মী অহেতুক ভয়, লজ্জা ও কোতূহল আশাদের শিক্ষা ও লক্ষ্যের মজাগত হয়েছিল, বাঙালী পাঠক পাঠিকা শরৎচন্দ্রকে রূপকথার পসারী বলে ভালবাসলেন। শরৎচন্দ্রের এই যে বিজ্ঞোহ লকলে মাথা পেতে গ্রহণ করেছিল তা লভ্য নয়। কিন্তু শরৎ সাহিত্যে তারা অপরকোন বিজ্ঞোহের সুর শুনতে পেল না—শুধু শুনল সেই মহাকালের বিভিন্ন বরোশকিতে যে সুর বেজে উঠেছিল তাঁরই প্রতিধ্বনি, প্রেমের জয়গান। বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীর লখন-রূপ, বিরাট্রিচের পরিকল্পনা

সবই একাকার হয়ে উঠে উঠল কাল ও দূরত্বের ব্যবধান ভেঙ্গে শরৎসাহিত্যে প্রেমের সীমাহানে। প্রেম তিনি স্বীকার করলেন, প্রেমের ঐশ্বর্য তিনি ব্যঙালেন কবির কল্পনার—বাস্তব প্রথিবীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞা করে। তাঁর প্রেমের কড়া অমুশাননে চাপা পড়ল নরনারীর অবচেতন কামনা, মামুষ হ'ল দেবতা, মানবী হ'ল দেবী। প্রেমের ঐশ্বর্য শরৎচন্দ্র কমা করেন নি, তাঁর নবলংহিতার পাপ-পুণ্য এই ভাবে প্রকাশ পেল। শরৎচন্দ্র চরিত্রের লক্ষ্যে বস্তুতাত্ত্বিক, কিন্তু প্রেমের পরিকল্পনার ই'য়ে উঠলেন বোর আদর্শবাদী—তাই তাঁর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বেড়ে গেল। কিন্তু মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন বেথতে পেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্ট প্রেম—উপদেবতা তাঁরই উপর ভর করেছে, তাই 'গৃহঘাৎ' নরনারীর জীবনে নতুন কিছু অমুশান করলেন কিন্তু প্রেমের যুগার্ঠে সুরেশচন্দ্রকে আশ্বহান করাতে বাধ্য হ'লেন। হিন্দু লমাজপতির লক্ষ্মীর মধ্য দ্বিবে বৈধব্যরূপে নিবারণের জন্ত বিধানের মত। 'শ্রীকান্ত'র বিভিন্ন চরিত্রের শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে তাঁর দুর্দাহ-মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লবশেষে আমরা পাই 'শেষপ্রদ্বের' কমলকে। 'শেষপ্রদ্ব' শরৎচন্দ্রের ব্যর্থ কি লার্থক প্রয়াস সে বিষয়ের



ইন্দিরিয়াল চা

GRAM: "ADNIVAG"

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

বিবিধ

ভবানীপুর এথলেটিক ক্লাব

ভবানীপুর এথলেটিক ক্লাবের উনবিংশ বার্ষিক ব্যারাজ ক্রীড়া প্রদর্শনী ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে হইয়া গিয়াছে। বর্ধমানের মহারাজ কুমার, ইউ.পি.-মহাত্মা এম. এল. এ.—মহাশয় সভাপতির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ফনিন্দ্র নাথ বসুর ‘বন্ধুসংসদ’ সভাপতি হবার পর কার্যবিবরণী পাঠ হয়। পরে প্রোঃ জ্যোতিষ চন্দ্র বসুতর তত্ত্বাবধানে ব্যারাজ ক্রীড়া আরম্ভ হয়। ক্রীড়াগুলি সবই ভাল হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মাস্টার জুলাল, অধির, ও অনিলের বার, সুধীরের রোলার ব্যালেন্স, শিশির ও শচীনের ব্রাক ল্যাডার, নরেশ ও সুধীরের জাগলিং, আশুতাবুর, জুলাল ও পূর্ণের রোম্যান রিড, লতা ও কানাইয়ের কিট অন কিট, টুংম্যান সুধীরের নেলবেডের উপর শারিত অবস্থার

অবতারণা না করে শুধু বলতে চাই যে শেষপ্রান্তে শরৎচন্দ্র তাঁর লংহিতার বিভিন্ন অঙ্গশাসনে অল্পপ্রাণিত হননি। তাঁর অলমাপ্ত ‘শেখের পরিচয়’ একটা নারীর রূপপরিকল্পনারও তাই। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা ‘কোন বেড়ালালে আবদ্ধ না হইবে’ স্বতঃই উৎসারিত হোক—মানবের জীবনের দুর্কোথা ও দুঃস্বপ্নের রূপ, নর-নারীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিকল্পনা শরৎচন্দ্রের লিপিকুশলতার অপর হোক এই কামনা যাত্রা করতেন তাঁরা শরৎচন্দ্রের শেষ রচনাগুলিতে যতই লামাত্র হোক তারই কিছু লক্ষ্যন পেরেছিলেন— তাই শরৎচন্দ্রের মৃত্যু তাঁদের কাছে একান্ত কোতের ও অলময়ের।

বৃকের উপর লৌহপাত্র কর্তৃক বেথিয়া লকলেই আশ্রয় হইয়া গিয়াছিলেন, ইহাছাড়াও মাঃ প্রতুলের লোর্ড, কিশোরী, নিতিশ, সুনীল ও নিকাইয়ের লাঠি বৃ-বৃন্দ—লকলেই মুখ করিয়াছিল।

বালীগঞ্জ সংসদে শোক সভা—

গত ১৮ই জানুয়ারী লক্ষ্য্য লাভ ‘বাটকার বালীগঞ্জ সংসদে বাংলার মরমী লেখক অজের কথামিত্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবীন অধ্যাপক হেরম্ব চন্দ্র বৈজয়ের পরলোক গমনে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর সভাপতির আদর্শ গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কীর্তির কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, সাহিত্যিক ননী মাধব চৌধুরী এম-এ, সাহিত্যিক অনিল কুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি বক্তৃতা দি প্রদান করেন।

অধ্যাপক হেরম্ব চন্দ্রের চরিত্র বাণ্য্য লক্ষ্য্য অধ্যাপক তারক চন্দ্র বাশ এম-এ, শ্রীযুক্ত সভাপতি লিঙ্ক বি-এল, বিজ্ঞততর আলোচনা করেন।

সভাপতি রায়বাহাদুর খগেন্দ্র মিত্র মহাশয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা এবং হেরম্ব চন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য লক্ষ্য্যে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করিয়া বাংলার মনীষীদের পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

সভার বহুজন লমাগম হইয়াছিল। অধ্যাপক লক্ষ্য্যদানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত বীজেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, এম-এ বি-এল, এ, ডি, জোয়াদার; আর, এল, মুখার্জী; জে, সি, বসু; ডাঃ আর, কে, মুখার্জী; এন, পাণ্ডাশী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন

তরুণ সম্প্রদায়

গত রবিবার তরুণ সম্প্রদায়ের প্রাঙ্গণে (ভবানীপুর) সভ্যগণের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত লক্ষ্য্যদানন্দ

মহাশয় সভাপতির আদর্শ গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে লক্ষ্য্যদানন্দ মহাশয় কার্যবিবরণী পাঠ করেন। প্রাঙ্গণাগার স্থাপন আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ বসু বলেন যে বস্তা পচা পুতক তর্জি হইলেই প্রাঙ্গণাগার হয় না। এরূপ করাও বুদ্ধিদলিত নহে। ইহা একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। লম্বিতর ভাল খেলোয়াড়-দের যথাক্রমে তিনটি রোপা পদক প্রদান করা হয়। লম্বিতর উপভোগ্য করেকটি বিষয়ে আলোচনার পর ১৯৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-৫৫৪-৫৫৫-৫৫৬-৫৫৭-৫৫৮-৫৫৯-৫৬০-৫৬১-৫৬২-৫৬৩-৫৬৪-৫৬৫-৫৬৬-৫৬৭-৫৬৮-৫৬৯-৫৭০-৫৭১-৫৭২-৫৭৩-৫৭৪-৫৭৫-৫৭৬-৫৭৭-৫৭৮-৫৭৯-৫৮০-৫৮১-৫৮২-৫৮৩-৫৮৪-৫৮৫-৫৮৬-৫৮৭-৫৮৮-৫৮৯-৫৯০-৫৯১-৫৯২-৫৯৩-৫৯৪-৫৯৫-৫৯৬-৫৯৭-৫৯৮-৫৯৯-৬০০-৬০১-৬০২-৬০৩-৬০৪-৬০৫-৬০৬-৬০৭-৬০৮-৬০৯-৬১০-৬১১-৬১২-৬১৩-৬১৪-৬১৫-৬১৬-৬১৭-৬১৮-৬১৯-৬২০-৬২১-৬২২-৬২৩-৬২৪-৬২৫-৬২৬-৬২৭-৬২৮-৬২৯-৬৩০-৬৩১-৬৩২-৬৩৩-৬৩৪-৬৩৫-৬৩৬-৬৩৭-৬৩৮-৬৩৯-৬৪০-৬৪১-৬৪২-৬৪৩-৬৪৪-৬৪৫-৬৪৬-৬৪৭-৬৪৮-৬৪৯-৬৫০-৬৫১-৬৫২-৬৫৩-৬৫৪-৬৫৫-৬৫৬-৬৫৭-৬৫৮-৬৫৯-৬৬০-৬৬১-৬৬২-৬৬৩-৬৬৪-৬৬৫-৬৬৬-৬৬৭-৬৬৮-৬৬৯-৬৭০-৬৭১-৬৭২-৬৭৩-৬৭৪-৬৭৫-৬৭৬-৬৭৭-৬৭৮-৬৭৯-৬৮০-৬৮১-৬৮২-৬৮৩-৬৮৪-৬৮৫-৬৮৬-৬৮৭-৬৮৮-৬৮৯-৬৯০-৬৯১-৬৯২-৬৯৩-৬৯৪-৬৯৫-৬৯৬-৬৯৭-৬৯৮-৬৯৯-৭০০-৭০১-৭০২-৭০৩-৭০৪-৭০৫-৭০৬-৭০৭-৭০৮-৭০৯-৭১০-৭১১-৭১২-৭১৩-৭১৪-৭১৫-৭১৬-৭১৭-৭১৮-৭১৯-৭২০-৭২১-৭২২-৭২৩-৭২৪-৭২৫-৭২৬-৭২৭-৭২৮-৭২৯-৭৩০-৭৩১-৭৩২-৭৩৩-৭৩৪-৭৩৫-৭৩৬-৭৩৭-৭৩৮-৭৩৯-৭৪০-৭৪১-৭৪২-৭৪৩-৭৪৪-৭৪৫-৭৪৬-৭৪৭-৭৪৮-৭৪৯-৭৫০-৭৫১-৭৫২-৭৫৩-৭৫৪-৭৫৫-৭৫৬-৭৫৭-৭৫৮-৭৫৯-৭৬০-৭৬১-৭৬২-৭৬৩-৭৬৪-৭৬৫-৭৬৬-৭৬৭-৭৬৮-৭৬৯-৭৭০-৭৭১-৭৭২-৭৭৩-৭৭৪-৭৭৫-৭৭৬-৭৭৭-৭৭৮-৭৭৯-৭৮০-৭৮১-৭৮২-৭৮৩-৭৮৪-৭৮৫-৭৮৬-৭৮৭-৭৮৮-৭৮৯-৭৯০-৭৯১-৭৯২-৭৯৩-৭৯৪-৭৯৫-৭৯৬-৭৯৭-৭৯৮-৭৯৯-৮০০-৮০১-৮০২-৮০৩-৮০৪-৮০৫-৮০৬-৮০৭-৮০৮-৮০৯-৮১০-৮১১-৮১২-৮১৩-৮১৪-৮১৫-৮১৬-৮১৭-৮১৮-৮১৯-৮২০-৮২১-৮২২-৮২৩-৮২৪-৮২৫-৮২৬-৮২৭-৮২৮-৮২৯-৮৩০-৮৩১-৮৩২-৮৩৩-৮৩৪-৮৩৫-৮৩৬-৮৩৭-৮৩৮-৮৩৯-৮৪০-৮৪১-৮৪২-৮৪৩-৮৪৪-৮৪৫-৮৪৬-৮৪৭-৮৪৮-৮৪৯-৮৫০-৮৫১-৮৫২-৮৫৩-৮৫৪-৮৫৫-৮৫৬-৮৫৭-৮৫৮-৮৫৯-৮৬০-৮৬১-৮৬২-৮৬৩-৮৬৪-৮৬৫-৮৬৬-৮৬৭-৮৬৮-৮৬৯-৮৭০-৮৭১-৮৭২-৮৭৩-৮৭৪-৮৭৫-৮৭৬-৮৭৭-৮৭৮-৮৭৯-৮৮০-৮৮১-৮৮২-৮৮৩-৮৮৪-৮৮৫-৮৮৬-৮৮৭-৮৮৮-৮৮৯-৮৯০-৮৯১-৮৯২-৮৯৩-৮৯৪-৮৯৫-৮৯৬-৮৯৭-৮৯৮-৮৯৯-৯০০-৯০১-৯০২-৯০৩-৯০৪-৯০৫-৯০৬-৯০৭-৯০৮-৯০৯-৯১০-৯১১-৯১২-৯১৩-৯১৪-৯১৫-৯১৬-৯১৭-৯১৮-৯১৯-৯২০-৯২১-৯২২-৯২৩-৯২৪-৯২৫-৯২৬-৯২৭-৯২৮-৯২৯-৯৩০-৯৩১-৯৩২-৯৩৩-৯৩৪-৯৩৫-৯৩৬-৯৩৭-৯৩৮-৯৩৯-৯৪০-৯৪১-৯৪২-৯৪৩-৯৪৪-৯৪৫-৯৪৬-৯৪৭-৯৪৮-৯৪৯-৯৫০-৯৫১-৯৫২-৯৫৩-৯৫৪-৯৫৫-৯৫৬-৯৫৭-৯৫৮-৯৫৯-৯৬০-৯৬১-৯৬২-৯৬৩-৯৬৪-৯৬৫-৯৬৬-৯৬৭-৯৬৮-৯৬৯-৯৭০-৯৭১-৯৭২-৯৭৩-৯৭৪-৯৭৫-৯৭৬-৯৭৭-৯৭৮-৯৭৯-৯৮০-৯৮১-৯৮২-৯৮৩-৯৮৪-৯৮৫-৯৮৬-৯৮৭-৯৮৮-৯৮৯-৯৯০-৯৯১-৯৯২-৯৯৩-৯৯৪-৯৯৫-৯৯৬-৯৯৭-৯৯৮-৯৯৯-১০০০-১০০১-১০০২-১০০৩-১০০৪-১০০৫-১০০৬-১০০৭-১০০৮-১০০৯-১০১০-১০১১-১০১২-১০১৩-১০১৪-১০১৫-১০১৬-১০১৭-১০১৮-১০১৯-১০২০-১০২১-১০২২-১০২৩-১০২৪-১০২৫-১০২৬-১০২৭-১০২৮-১০২৯-১০৩০-১০৩১-১০৩২-১০৩৩-১০৩৪-১০৩৫-১০৩৬-১০৩৭-১০৩৮-১০৩৯-১০৪০-১০৪১-১০৪২-১০৪৩-১০৪৪-১০৪৫-১০৪৬-১০৪৭-১০৪৮-১০৪৯-১০৫০-১০৫১-১০৫২-১০৫৩-১০৫৪-১০৫৫-১০৫৬-১০৫৭-১০৫৮-১০৫৯-১০৬০-১০৬১-১০৬২-১০৬৩-১০৬৪-১০৬৫-১০৬৬-১০৬৭-১০৬৮-১০৬৯-১০৭০-১০৭১-১০৭২-১০৭৩-১০৭৪-১০৭৫-১০৭৬-১০৭৭-১০৭৮-১০৭৯-১০৮০-১০৮১-১০৮২-১০৮৩-১০৮৪-১০৮৫-১০৮৬-১০৮৭-১০৮৮-১০৮৯-১০৯০-১০৯১-১০৯২-১০৯৩-১০৯৪-১০৯৫-১০৯৬-১০৯৭-১০৯৮-১০৯৯-১১০০-১১০১-১১০২-১১০৩-১১০৪-১১০৫-১১০৬-১১০৭-১১০৮-১১০৯-১১১০-১১১১-১১১২-১১১৩-১১১৪-১১১৫-১১১৬-১১১৭-১১১৮-১১১৯-১১২০-১১২১-১১২২-১১২৩-১১২৪-১১২৫-১১২৬-১১২৭-১১২৮-১১২৯-১১৩০-১১৩১-১১৩২-১১৩৩-১১৩৪-১১৩৫-১১৩৬-১১৩৭-১১৩৮-১১৩৯-১১৪০-১১৪১-১১৪২-১১৪৩-১১৪৪-১১৪৫-১১৪৬-১১৪৭-১১৪৮-১১৪৯-১১৫০-১১৫১-১১৫২-১১৫৩-১১৫৪-১১৫৫-১১৫৬-১১৫৭-১১৫৮-১১৫৯-১১৬০-১১৬১-১১৬২-১১৬৩-১১৬৪-১১৬৫-১১৬৬-১১৬৭-১১৬৮-১১৬৯-১১৭০-১১৭১-১১৭২-১১৭৩-১১৭৪-১১৭৫-১১৭৬-১১৭৭-১১৭৮-১১৭৯-১১৮০-১১৮১-১১৮২-১১৮৩-১১৮৪-১১৮৫-১১৮৬-১১৮৭-১১৮৮-১১৮৯-১১৯০-১১৯১-১১৯২-১১৯৩-১১৯৪-১১৯৫-১১৯৬-১১৯৭-১১৯৮-১১৯৯-১২০০-১২০১-১২০২-১২০৩-১২০৪-১২০৫-১২০৬-১২০৭-১২০৮-১২০৯-১২১০-১২১১-১২১২-১২১৩-১২১৪-১২১৫-১২১৬-১২১৭-১২১৮-১২১৯-১২২০-১২২১-১২২২-১২২৩-১২২৪-১২২৫-১২২৬-১২২৭-১২২৮-১২২৯-১২৩০-১২৩১-১২৩২-১২৩৩-১২৩৪-১২৩৫-১২৩৬-১২৩৭-১২৩৮-১২৩৯-১২৪০-১২৪১-১২৪২-১২৪৩-১২৪৪-১২৪৫-১২৪৬-১২৪৭-১২৪৮-১২৪৯-১২৫০-১২৫১-১২৫২-১২৫৩-১২৫৪-১২৫৫-১২৫৬-১২৫৭-১২৫৮-১২৫৯-১২৬০-১২৬১-১২৬২-১২৬৩-১২৬৪-১২৬৫-১২৬৬-১২৬৭-১২৬৮-১২৬৯-১২৭০-১২৭১-১২৭২-১২৭৩-১২৭৪-১২৭৫-১২৭৬-১২৭৭-১২৭৮-১২৭৯-১২৮০-১২৮১-১২৮২-১২৮৩-১২৮৪-১২৮৫-১২৮৬-১২৮৭-১২৮৮-১২৮৯-১২৯০-১২৯১-১২৯২-১২৯৩-১২৯৪-১২৯৫-১২৯৬-১২৯৭-১২৯৮-১২৯৯-১৩০০-১৩০১-১৩০২-১৩০৩-১৩০৪-১৩০৫-১৩০৬-১৩০৭-১৩০৮-১৩০৯-১৩১০-১৩১১-১৩১২-১৩১৩-১৩১৪-১৩১৫-১৩১৬-১৩১৭-১৩১৮-১৩১৯-১৩২০-১৩২১-১৩২২-১৩২৩-১৩২৪-১৩২৫-১৩২৬-১৩২৭-১৩২৮-১৩২৯-১৩৩০-১৩৩১-১৩৩২-১৩৩৩-১৩৩৪-১৩৩৫-১৩৩৬-১৩৩৭-১৩৩৮-১৩৩৯-১৩৪০-১৩৪১-১৩৪২-১৩৪৩-১৩৪৪-১৩৪৫-১৩৪৬-১৩৪৭-১৩৪৮-১৩৪৯-১৩৫০-১৩৫১-১৩৫২-১৩৫৩-১৩৫৪-১৩৫৫-১৩৫৬-১৩৫৭-১৩৫৮-১৩৫৯-১৩৬০-১৩৬১-১৩৬২-১৩৬৩-১৩৬৪-১৩৬৫-১৩৬৬-১৩৬৭-১৩৬৮-১৩৬৯-১৩৭০-১৩৭১-১৩৭২-১৩৭৩-১৩৭৪-১৩৭৫-১৩৭৬-১৩৭৭-১৩৭৮-১৩৭৯-১৩৮০-১৩৮১-১৩৮২-১৩৮৩-১৩৮৪-১৩৮৫-১৩৮৬-১৩৮৭-১৩৮৮-১৩৮৯-১৩৯০-১৩৯১-১৩৯২-১৩৯৩-১৩৯৪-১৩৯৫-১৩৯৬-১৩৯৭-১৩৯৮-১৩৯৯-১৪০০-১৪০১-১৪০২-১৪০৩-১৪০৪-১৪০৫-১৪০৬-১৪০৭-১৪০৮-১৪০৯-১৪১০-১৪১১-১৪১২-১৪১৩-১৪১৪-১৪১৫-১৪১৬-১৪১৭-১৪১৮-১৪১৯-১৪২০-১৪২১-১

চরিত্র—পুরুষ।

জাঃ হরেন মুখার্জী—আইডেট ডিটেক্টিভ
বাড়ী কালীঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিত শক্তিশালী বন্ধু ও
সহকারী।
সমর মিত্র—ভবানীপুর থানার কর্মচারী ও
হরেনবাবুর সহপাঠী।
রামদহিন—হরেন বাবুর বিশ্বস্ত বোয়ারা।
অজ্ঞাত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বল্লম—“জানিনা। আপাততঃ
তো ফিরে চল। অজ্ঞ কোন পথ নিশ্চয়
আছে। নইলে ‘মহামন্ত্রী’ হল এখানে
এলো কোন পথে?”

পুনরায় ২নং হলঘরে ফিরে এলুম।
দেখলুম, আরও একটা বড় খাম ভেঙ্গে
পড়েছে। কোন দিকে বাবু তাবছি
পাথর তলার মাটি ঢুলছে, মাতালের মত
টলছি—লঙ্গে লঙ্গে ঘূর্ণী-হাওয়ার বেগে
মস্তকের ক্রিয়া চলছে। অজ্ঞ কোন একটা
পথে মহামন্ত্রী হল এখানে এসেছে—
কিন্তু সে পথ কোথায়—কোন দিকে?

পৃথিবীর হোলন যেন একটু বেড়ে
উঠলো। উপর থেকে বড় বড় কুখানা
পাথর ও খানিকটা মাটি ঝরে পড়লো,
একটা খামও চূরমার হয়ে গেল।

হঠাৎ লাকাতে লাকাতে বিজ্ঞবেগে
ছুটে এলো জ্যাক! ডাকলুম—“জ্যাকি!”

জ্যাক ‘বেউ-বেউ করে ডেকে উঠলো।
তারপরেই ছুটে চলে গেল। খানিক দূর
গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে, সে পিছন ফিরে
আবার ডেকে উঠলো।

বল্লম—“অবিনাশ, চল—চল। জ্যাকি
আমাদের অনুসরণ করতে বলছে।”

হুজনে জ্যাকির অনুসরণ করলাম।
হড়হড় করে আরও খানিকটা ছাব ভেঙ্গে
পড়লো। প্রাণপণে ছুটে আমরা একপ্রহ
নিড়ির সামনে এসে উপস্থিত হ’লুম।
জ্যাক নিড়ির দিকে চেয়ে যেন ইজিতে

বাড়ের রাতে

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

শ্রীকৃষ্ণ নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

চরিত্র—স্ত্রী।

মলীবা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের
বুড়ো বি।

অজ্ঞাত চরিত্রের পরিচয় বেসঙ্গক্রমে
পাইবেন।

আমাদের নিড়িতে উঠতে বলতে লাগলো।
টর্কের আলোটাও যেন ক্রমশঃ নিশ্চয়
হ’য়ে আসছে। তাড়াতাড়ি নিড়িতে উঠতে
লাগলাম। খানিকটা ওঠে গভীর নৈরাশ্যে
বলে উঠলুম—“অবিনাশ,—hopeless (কান
আশা নেই)!”

অবিনাশ উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—
“কি ব্যাপার?”

আমি বল্লম—“মাথার উপর নিড়ির মুখ
বন্ধ!”

অবিনাশ বললে—“মুখ যখন আছে,
তখন বন্ধ থাকবেনা কিছুতেই। হাড়িও
হেঁথি। তুমি একটু নীচে এসে ‘রাণীর’
ভারটা নিতে পারবে?”

তাই করলুম। হুঁপাপ নীচে নেমে এসে
রাণীর ভার নিলুম। অবিনাশ ‘রাণীকে’
একটা নিড়ির উপর নামিয়ে রেখে উপরে
উঠে গেল। হঠাৎ আবার একটা উৎকট
শব্দ কানে এলো, লঙ্গে লঙ্গে সমস্ত নিড়িটা
কঁপে উঠলো। বল্লম—“অবিনাশ, লীগগীর
—লীগগীর—বা কর্তৃত্ব চাও এখনি কর।
উপরের খুব বড় একটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছে।
যে কোন মুহূর্তে—নিড়িটাও চূর্ণ হ’য়ে যেতে
পারে।”

অবিনাশ কোন উত্তর দিলে না।
উপরের দিকে টর্কের আলো কেলে দেখলুম,
লক্ষ্যেচ বাপের উপর বুলে হাড়িরে অবিনাশ
নিড়ির মুখের আবরণটাকে পিঠ দিবে
ঠেলছে। আমি অবাক হ’য়ে দেখতে

লাগলুম। আমার মনে পড়লো, বৈভ্য
এ্যাটলাপের, পৃথিবী পিঠে করে দাঁড়িয়ে
থাকার হবির কথা।

পৃথিবী-ঢুলছে, মস্তকের মধ্যেও যেন
একটা বিরাট জ্বালোড়ন চলছে, আশে-
পাশে—নিকটে দূরে—উপরের ছাব লম্বকে
ভেঙ্গে পড়ছে, আমি রুদ্ধনিশ্বাসে দেখছি,
শরীর ও মনের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত
করে অবিনাশ উপরের বাধা ঠেলে ফেলে
দিয়ে এই ভূগর্ভের অন্ধকারাশ্রয়ে বাইরের
মুক্ত হাওয়ার বেরোবার পথ করবার চেষ্টা
করছে।

নিজের অজ্ঞাতসারে মনে মনে সমর
গুণতে লাগলুম—এক—ছই—তিন—চার...।
দেখলুম—একটু একটু করে অবিনাশের দেহ
লোকা হ’ছে। বাইরের খোলা ঠাণ্ডা
জ্যোতঃকণ্টকটা যেন ভিতরে আগছে বলে
মনে হ’লো। ক্রমশঃ অবিনাশ লোকা হ’য়ে
দাঁড়াল, আর লঙ্গে লঙ্গে লম্বকে একটা বড়
পাথর নিড়ির মুখ থেকে সরে গিয়ে বাইরে
ঠিকরে পড়লো।

হাঁকতে হাঁকতে অবিনাশ বললে—
“হরেন, খোকাকে নিয়ে উপরে বাও। আমি
‘রাণীকে’ নিয়ে যাচ্ছি।”

আমিও জ্যাক উপরে উঠে এলুম।
একটু পরেই অবিনাশ রাণীকে নিয়ে উপরে
উঠে এলো। তখনও পৃথিবীর হোলন
ধামেনি।

অবিনাশ বললে—“তারপর?”

আমি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। বন নবনের মাঝে-মাঝে খড়ের ঢালা—সংখ্যায় প্রায় ৫০ খানা হবে। বল্লম—“অবিনাশ, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এটা নাগ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের একটি ঘাটি। এখানে আরও অনেক লোক আছে। নীচে এঁদের বর্তী কাজে ব্যস্ত আছেন জেবে এরা নিশ্চিন্ত আছেন। যদি যুগাকরে জানতে পারি, যে তাদের কাজে বাধা পড়েছে, তা’ হ’লে আমাদের বিপদের সীমা থাকবে না। তা’ ছাড়া, যে কোন মুহূর্তে উপরের আবারণ তলায় ভেঙ্গে পড়তে পারে। তা’ হ’লে আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হ’ব নিশ্চয়।”

কোন কথা মা বলে আমরা ক্রান্ত বনের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলুম। পৃথিবীর ঝোলন তখন বন্ধ হ’য়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মনে হ’চ্ছে যেন এখনও সমান জোরেই ভূমিকম্প চলছে। হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে আমরা চমকে উঠলুম। কিরে ডেরে দেখি আমাদের পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত বনের অস্তিত্ব লুপ্ত হ’য়ে গিয়েছে। যেখানে বড় বড় গাছ ছিল, ভূগর্ভস্থ প্রাণীদের উপরের আবারণ ভেঙ্গে পড়ায় সে স্থানটা একটা বিরাট খায়ে পরিণত হ’য়েছে।

তখন একটু একটু করে চারিদিক ক্ষয়শূন্য হ’তে আরম্ভ হ’য়েছে। গত রাত্রিতেই বনের অস্তিত্ব আমাদের যথেষ্ট হ’য়েছিল। সুতরাং আর এগিয়ে না গিয়ে আমরা সেইখানেই অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার টর্কটা একটু একটু করে নিবে গেল। অবিনাশের টর্কটা আললুম। পক্ষ বালের আবারণের উপরে অবিনাশ ‘রাণী’কে শুইয়ে দিলে। অদূর লক্ষ্যের জলদিক ঠাণ্ডা বাতাস ফুফুস করে বয়ে যাচ্ছিল—হুতর ও নিকটে চ’একটা পাখীর ডাকও শোনা যাচ্ছিল—সে যেন প্রান্তারের আগমনী!

হেলেনীও আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি তা’কে কোলে করে নিয়ে বললুম। অবিনাশও আমার পাশে বললো। জ্যাক একটু দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো—যেন সে এক মিনিটের জন্তুও আমার সঙ্গছাড়া হয়নি, অথবা লজ্জিত বা অপ্রতিভ হ’বার মত কাজ সে কিছুই করেনি।

অবিনাশ বলে—“হরেন, এই ব্যাপারটা যদি কেউ আমাদের আগাগোড়া বলতে বলে, তো আমি নিশ্চয়ই খেঁই হারিয়ে ফেলবো। রাজা চন্দ্রকেতুর বংশীড়া ‘রাণী’ জ্যোতিষদ্বারা ওরফে উষাবতী ও তাঁর ছেলে অমরনাথ ওরফে দেবদত্তের উদ্ধার সাধন হ’লো, ‘এ-বি-লি-ডি’ ওরফে ‘মহামন্ত্রী’ এবং নাগ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জীবন্ত কবর হ’লো, আমাদের জঙ্গলের অভিজ্ঞতা বাড়লো, আর বিশ্বাসঘাতক কুকুর ফিরে এসে প্রভুর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুলো—যেন কিছুই ঘটে নি! কেমন, এই কি মোটামুটি গল্পটার চমক নয়?”

হেসে বল্লম—“কুকুর বিশ্বাসঘাতক তোমায় কে বলে? এই জ্যাকের শিক্ষা কোথায় তা’ স্থান তো? ওর মাথায় মামুষের মত বুদ্ধি আছে। ও বেশ বুঝেছিল, যে যেখানে বলপ্রয়োগ নিষ্ফল, সেখানে চতুরতার আশ্রয় নেওয়াই বিধেয়। কাজেই আমাদের ছেড়ে ও শত্রুর ঘরে এসেছিল, আমাদেরই সুবিধার জন্ত। যদি আমরা এঁদের সন্ধান করতে না পারতুম, তা’ হ’লে নিশ্চয় জেনো, অবিনাশ, এই জ্যাকই আমাদের সেরা সন্ধান দিতো। আরও, অধীকার করতে পারো না, যে জ্যাকের সাহায্যেই আমরা নিষ্কৃতি পেয়েছি। নতুবা, ঐ খায়ের মধ্যে নাগ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদেরও থেকে যেতে হ’তো। ‘মহামন্ত্রী’ জীবন্ত কবরের কথায় আমার একটা খুব বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ইচ্ছা হ’চ্ছে। কেন

জান? একটা অতীত গৌরবের নষ্টপ্রাক্ত ধারাকে সজীবিত করে রাখবার এই যে প্রচেষ্টা—এ অতুলনীয়। যতদূর জানতে পারা গিয়েছে, এই ‘মহামন্ত্রী’ পূর্বপুরুষ সত্য সত্যই রাজা চন্দ্রকেতুর ‘মহামন্ত্রী’ ছিলেন। মনে করে দেখে দেখি, অবিনাশ, কি ‘নিম্পূহ’ এই ‘মহামন্ত্রী’! যে ঐশ্বর্য্য রাজা চন্দ্রকেতুর প্রকৃত বংশধরের আবির্ভাবের প্রতীকায় ইনি আগলে বসেছিলেন, ইচ্ছা করলে তা’ দিয়ে তিনি একটা রাজ্য কিনতে পারতেন। কিন্তু, সে ঐশ্বর্য্যের অতি ক্ষুদ্র অংশও তিনি আত্মসাৎ করেন নি। ‘মহামন্ত্রী’ একজন প্রকৃত বীর—অশেষ শক্তিমান নিম্পূহ মহাপুরুষ। অবিনাশ, আমি তাঁর মৃত্যু আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি। যদি বল, শিশুকে সাপের মুখে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করবার কথা। সে ক্ষেত্রেও ‘মহামন্ত্রী’ দিক থেকে দেখলে, তাঁকে ধোঁষী করতে পারবেনা। তিনি একটা সম্পত্তির রক্ষক। সে সম্পত্তির অধিকারী সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু, তাঁর উত্তরাধিকারিণে সন্দেহ আছে। সুতরাং যদি নাগগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নিয়মামুগত পরীক্ষা করতে তিনি প্রস্তুত হ’য়ে থাকেন, তো সেজন্তু আমরা তাঁকে ধোঁষী সাব্যস্ত করতে পারি কি? না অবিনাশ, ‘মহামন্ত্রী’ নমস্ত—আমি আবার তাঁর আত্মাকে প্রণাম করি।”

অবিনাশ বলে—“ও! কতগুলো লোক আজ ঐ খাতের মধ্যে লুকিয়ে গেল!”

আমি বল্লম—“কত লোক? না, অবিনাশ। আরও চিরকালের জন্তে লুকিয়ে গেল, বাংলার শিল্প গৌরবের একটা অমূল্য নিদর্শন। সেটা হচ্ছে কটক নির্মিত সেই নাগরাজ-মূর্তি। ঐ খাত হ’য়ে রইলো একটা মণির খনি—তার দেরা মণি সেই নাগরাজ মূর্তি! আরও একটা জিনিষ লুকিয়ে গেল। সেটা—ঐতিহাসিক হীরা ‘স্বপ্নমণি’।”

এই সময় স্বামীরাই কেলে 'রাণী' কীপসরে
বলেন—“আমি কোথায়? আমার অমর!”

তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম—“আপনি ও
আপনার সন্তান নিরাপদ, মা! তাববেন
না—নিশ্চিন্ত হ'ন!”

আন্তে আন্তে উঠে বসে, তিনি জিজ্ঞাসী
করলেন—“আপনারা কে?”

আমি—“আমার নাম ডাক্তার হরেন মুখোপাধ্যায়।
আর, ইনি আমার বন্ধু অবিনাশবাবু।”

একটু চুপ করে থেকে 'রাণী' বললেন—
“আপনাকে ধন্যবাদ।”

আমি বললুম—“আপনি আমার হাতে
যে ভার দিয়েছিলেন—”

বাধা দিয়ে 'রাণী' বললেন—“না, না।
আমি ঠিক আপনার হাতে ভার দিইনি।
আমার স্বামীর কাছে আপনার অকৃত
কর্মতার কথা শুনে আপনার উপর আমার
একটা বিশ্বাস জন্মেছিল। আপনার সঙ্গে
চাক্ষুস পরিচয় না থাকলেও আমার স্বামী
আপনার অনেক খবর রাখতেন। আমি ও
আমার স্বামী এখানে একরকম বন্দী
হ'য়েই ছিলুম। যখন আমাদের সন্তানের
জীবন বিপন্ন হ'ল, তখন আর কোন উপায়
না পেয়ে স্বামীর হাতে ছেলেকে অস্ত্র
পাঠাবার সঙ্কল্প করলুম। কিন্তু আমাদের
শত্রু কতখানি শক্তিশালী তা' আমাদের
জানা ছিল। স্ত্রীরাও এরকম শক্তিশালী
শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে
এমন লোক আপনি ছাড়া আর কাউকে
না দেখে, স্বামীর পরামর্শে আপনার কাছেই
তাকে পাঠাতে মনস্থ করলুম। তাঁরই হাতে
ছেলেকে আপনার কাছে পাঠালুম। কিন্তু
যায়ের মন তাতেও সন্দেহ হ'ল না। তাই
আপনাকে আমি একখানা পত্র লিখেছিলুম।
পত্রখানা শেষ করবারও অবকাশ পাইনি।
তাড়াতাড়ি দেখানাকে পছন্দের মধ্যে রেখে
ছেলেকে স্বামীর হাতে দিলুম। তিনিও

এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে বাধ্য হ'য়েছিলেন,
যে জুতাজোড়োও পরবার অবকাশ পাননি।
পরামর্শ যখন তাঁর, ইচ্ছা যখন তাঁর, তিনি
নিজে যখন আপনার হাতে ছেলেকে তুলে
দিয়েছেন, তখন তাঁর যেওনা ভারই আপনি
বয়েছেন, আমার যেওনা ভার ঠিক নয়।
যাই হোক, আপনি আমার বা করেছেন,
তার সন্তান ধন্যবাদ ছাড়া আমার আর কিছু
ধেবার নেই। শুধু—যদি তাঁকে রক্ষা
করতে পারতেন—তাকে যদি ফিরে পেতুম!
কি নিদারুণ অত্যাচারই না তার উপরে
হ'য়েছিল! যেদিন আপনার সন্ধানে যান,
তার একদিন আগে একটা খামের গিয়ে
বৈধে তাঁকে চোরের মত চাবুক মারা
হ'য়েছিল—অকারণ! যদি তাকে—”
চাপা কান্নার আবেগে তাঁর স্বর বন্ধ হ'য়ে
গেল।

আমি কোমল উত্তর করতে পারলুম না।
কি উত্তর দেব ভেবেও পেলুম না। শুধু
বললুম—“কি করবো, মা। আপনার স্বামীকে
আমার বাড়ীতে থাকতে অনুরোধ করবারও
অবকাশ পেলুম না। খুব সম্ভব সন্তানের
শুণ্ড আশ্রয় পাচ্ছে শত্রুর জানতে পারে,

সেই জন্ত তিনি স্বেচ্ছায় প্রাণ-বিসর্জন
দিয়েছেন।”

'রাণী' কুপিয়ে কুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।
আমি তাঁর সন্তানকে তাঁর কোলে তুলে
দিলুম। তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।
কান্নার বেগ আরও বেড়ে উঠলো।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।
খানিক পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—“মা,
আপনাকে কোথায় রেখে আসতে হ'বে?”

'রাণী' বললেন—“আমার বাবার নাম
বোধ হয় শুনে থাকবেন। আমার বাবা,
রায়বাহাদুর লক্ষ্মীকান্ত রায়।”

সমস্তমুখে বললুম—“ঐচ্ছানিক লক্ষ্মীকান্ত
বাবু?—রাজা সূর্য্যকান্তের বংশধর?”

'রাণী'—“হ্যাঁ তাঁকে জানেন বোধহয়।”

আমি—“শুধু জানি” বলল তাঁর অপমান
করা হয়। তিনি আমার গুরু। আমি
বিজ্ঞানের বা কিছু আরস্ত করেছি তা' শুধু
তাঁরই কৃপায়। তা' হলে, আপনার সাহায্য
করে আমি তাইয়ের কর্তব্য পালন করেছি
মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে
কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা
হ'য়েছিল। কই, তাঁকে তো মোটেই
উদ্ভিগ্ধ দেখি নি।”

২২ CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারাণ্টি চিরস্থায়ী!

গ্যারাণ্টি চিরস্থায়ী!!



ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য
পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোহর
আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা
পাওয়া যায়। স্থায়ী ও পঠন নৈপুণ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ। রং-পালিশ
শোণার স্তায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জ্ঞানপত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিণ্ডিকেট

৭০নং কটলজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি, বি, ৪৮২২

‘রাণী’—“কেমন করে দেখবেন? তিনি এখনও জানেননা, যে আমার মাথার উপর দিয়ে এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেল। আমি মগপুয়ে সমীর কাছেই আছি, এই তিনি জানেন। তবে, প্রায় মালখানেক কোন খবর না পেয়ে এতদিনে বোধ হয় তিনি যথেষ্ট উদ্বেগ হয়েছেন। আমাকে বাধার কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেনই হ’বে। কিন্তু কোন মুখ নিয়ে আমি তাঁর কাছে যাবো জানিনা। রূপেণ্ডে অতুলনীর সেই জামাই তার কিরকম ভাবে জীবন ‘বিয়েরে, তা’ যখন তিনি শুনবেন, তার অবশ্যই মেরের কপাল কিরকম ভাবে পুড়েছে তা’ যখন তিনি জানবেন, তখন তার মুখ একেবারে ভেঙ্গে যাবে।”

আবার তিনি কুপিয়ে কুপিয়ে কাঁধে লাগলেন।

পাশে শ্রব্যার নিশ্চিন্ত অবিনাশের নাকের আগুয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। উষাও রজন আলো গাছের পাতা রঞ্জিরে পৃথিবীর বুকের উপর এসে পড়ছিল। অবিনাশকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলুম। খড়মড় করে উঠে বলে ‘অবিনাশ বলে উঠলো—“খবরদার! আহরে মেরে ফেলবো—”

পরক্ষণেই ‘রাণীকে’ বেঁথে অপ্রতিভ হ’য়ে বসে—“ভেঁঙার বলের মধ্যে পড়েছি স্বপ্ন বেঁধেছিলাম। তুমি বড় ‘ইরে’, করেন। এরকমভাবে আমাকে ‘ইরে’ করে দিলে! হি!”

আমি বলুম—“এখন, এই বনের ভিতর থাকবে, না এখন থেকে বাবার মতলব আছে?”

অবিনাশ কাঠের পুতুলের মতন পোজা লামনের দিকে চেয়ে বসে—“নাঃ—যেতে হ’বে বই কি। উঠে পড়া যাক্ চল।” এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

সেখান থেকে হুড়লের মুখে নক্ষত্র করে করে আমরা জঙ্গলের বাইরে জ্বরীয়া তীরে পৌঁছবার অভিপ্রায়ে চলুম। আলবার পথে ‘পিউ-কিং’এর ঘর পড়লো। অবিনাশ পিউ-কিং’কে খোঁজা করে ছিল। সে তিন লাক দিয়ে বানরের মতন গাছের উপর উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিকটা দূর এসে আমি পথের খেঁই হারিয়ে কেলেম। কারণ সেখানে কোন চিহ্ন হওয়া ছিল না।

অবিনাশ বলে—“উপায়?”

আমি বলুম—“উপায়—জ্যাকি। জ্যাকি নিশ্চয় নদীরতীরে গিয়ে পৌঁছবো। সুতরাং জ্যাকি যে পথে যাবে, চল আমরাও সেই পথে যাই।”

অবিনাশ জ্যাকিকে লম্বাধন করে বলে—“জ্যাকি, চল। আমাদের তীরে পৌঁছে দে।”

জ্যাকি একবার অবিনাশের মুখের দিকে চাইলে, তারপর আমার মুখের দিকে চাইলে। তারপর খানিকটা মাটি শুকে ও বাতালে নাক উচু করে কিসের বেন আশ্রয় নিয়ে, সে চলতে আরম্ভ করলে।

বনের ভিতর দিয়ে যেতে ‘রাণীর’ খুবই কষ্ট হ’চ্ছিল। আমি তাঁর কোল থেকে দেবদত্ত ওরফে অমরনাথকে নিতে চাইলাম তিনি ছিলেন না। বসেন—“সকল তার কত বড় ফল খোলে। লোকের মনে হয় এই বুঝি ছিড়ে পড়লো। বিত্ত লতার তাতে কোন কষ্ট হয় কি? ফল পেকে উঠা পর্যন্ত ঠিক লমান তাইবই সেখানে সে খোলে।”

নীরবে কিছুকাল চলবার পর আমরা তীরে এসে উপস্থিত হ’লাম। বিশাল জ্বরীয়া নদীর বুকের উপর তরলগুলি নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে। প্রকৃতির পবনহিলোল বেন আবেগতরে ছুটে যাচ্ছে নদীর শীতল বক্ষ স্পর্শ করে’ ধস্ত হ’বার জন্ত। চারিদারে

শুধু পাখীর গান, হাঙরার ‘দো-দো’ শব্দ আর তীরের গায়ে আহত তরল মালার ঘুমপাড়ানী গানের মত মুহু ‘হল্‌হল্‌’ শুজন।

তীরে এসে দেখলাম একখানা নৌকো বাঁধা রয়েছে। এই নৌকোখানাতেই আমরা এপারে এনেছিলাম। কারণ, যে স্থানটার আমরা নেমে ছিলাম, একটু ভাল করে’ দেখতেই বুঝলাম, এটা সেই স্থানই বটে।

আমরা নৌকোতে উঠে বসলাম। তারপর ‘হুর্গা বলে’ নৌকো ছেড়ে ছিলাম। তখন সমত নদীর উপর আবার ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের একপ্রান্তে হুবিরাট রক্তগোলকের মত সূর্য্য উঠছে।

(পরিশিষ্ট)

মালখানেক পরে—আমার বাড়ীর ছা। কাল—লক্ষ্য।

মনীষা—হেলে কার? মা’য়ের না মালীর?

উষা—মা’য়ের হলও, সে চিরকালই মালীর।

[২৪ পরগণার অন্তর্গত বেগলা নামক স্থানের একটা অতীত ইতিহাস আছে। তনিত্তে পাণ্ডুরা বার বেলেশর লক্ষণ মেনের এক পুত্র পুরন্দর মেন বেগলা নামক স্থানে রাজত্ব করিতে থাকেন। রাজা চন্দ্রকেতু ঐ পুরন্দরের বংশের শেষ রাজা। গল্পের লংমিশ্রণে তাঁহার ইতিহাস বিকৃত হইয়া আছে। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে রাজা চন্দ্রকেতুর বংশের এক শাখা আজিও বর্তমান আছেন। তাহার বর্তমান কর্তা এখনও, ‘মহারাজ’ উপাধি ধারণ করেন। তনিত্তে পাণ্ডুরা বার ভবানীপুর চক্রবেড়ে ‘রেড্’ নিবানী মেন-গোপীও রাজা চন্দ্রকেতুর বংশীয়। ঘটনাটিকে রহস্যবহুল করিবার জন্ত বেগলার পরিবর্তে কর্ণাট ‘চন্দ্রবীপে’র অবতারণা করিয়াছি। ইতি—লেখক]

(সমাপ্ত)

অতীত ভবিষ্য নাই আছে শুধু দীপ্ত বর্তমান

শ্রীশ্রীমল চন্দ্র ঘোষ

ধেবধেব, গর্ক কর, গর্ক কর শাস্ত্রের ধর্মের ?
পাঠ করেছ কি কভু ইতিহাস মানব মর্জের,
শাখত লাহিত্য খানি,
তুনেছ কি ধৈববাণী ?

যে ঋষি জীবাত্মা রূপে নিত্য করে মন্ত্র উচ্চারণ,
বহিঃস্থ চিত্ত বৃত্তি ধ্যান মাঝে করি সংহরণ।

পৃথিবীর জরাজীর্ণ শাস্ত্র আর ধর্মের শালনে,
ব্যক্তিত্ব মরেছে আজ ধ্যানচ্যুত চিত্তের আলনে
অতীতের ভগবানে
আজো তাই বর্তমানে—

অশ্রাপ্য অর্থ্যের ডালি ধিয়ে যাও রে মূর্খ অজ্ঞান,
যে মণি ঢেকেছ পকে রাখিলে না তাহার লক্ষ্যন।
জন্ম আর মৃত্যু হেরি জাগেনাকি অশেষ স্নিগ্ধালা ?
কবে কোন ধর্মশাস্ত্র মিটায়েছে অতৃপ্ত পিপাসা ?
কবে কোন ব্রহ্মলোক
ইরিসাড়ে মৃত্যু শোক—

কোন ঋষি দার্শনিক করে গেছে তব আবিষ্কার ?
স্পর্ধাশালী কে সে জ্ঞানী লজ্জবরাছে হুঃখ পারাবার ?
দেশ ও কালের গভী মনের বিচার কক্ষ মাঝে
স্বাপ্নিক মননযন্ত্রে দর্শনের সূক্ষ্মত্ব বাজে,
জীবের জীবন্ত দৃষ্টি—
আত্মক তপের সৃষ্টি—

মূহুর্তে সাধন করে বুদ্ধিজীবী মানব সমাজে,
মারাবীর ভোজবাজী বহুলোক ব্যাপিরা বিরাজে।

বিজ্ঞানের প্রেক্ষাগারে কাল-পরিমাপকের কাঁটা,
ভূতাবিষ্ট বৈজ্ঞানিক গতিশ্রোতে জৌয়ার ও ভাটা
নিরন্ত নির্যয় করে
বুদ্ধি মার্গে বস্তুর

লাগর মছন লাগি' তুচ্ছ ভ্রমে মহাপদ খাটো,
আয়ুর বিলাস ছাড়া জীবনের নাই পুজি পাটো।

মানব মনের সৃষ্টি জৈব আর অজৈব জগত,
অদৃশ্য বিচ্যুত গতি স্রজন ও প্রলয়ের রথ
গভীর রহস্য তলে
কল্পনার নিত্য চলে

মনোময় বিশ্বলোকে জন্মে আর মরে বহু 'মত',
অজ্ঞের ভীতির রাজ্যে তৃপ্তিশূণ্য করে মনোরথ।

হৃকের কম্পনে জাত বস্তৃপিত্ব লচল এ বেহ,
আবার হৃদয়ে লীন' হার মূর্খ আছে কি লনেহ ?
মস্তিস্কের, প্রতিক্রিয়া
দার্শনিক বুদ্ধি নিরা

কোন 'বর্গে বা'বি তুই, বিচারক নাই যেরে কেহ,
'মানস-বিধাতা' গুড়ি পুণ চাসু তারি অহুলেখ ?
মানব রচিত ধর্ম নাহি মানি পুণ্ডি ও পঞ্জিকা,
অতীত সমাজ তব্বে জলে নিতি স্বার্থ-বহি-শিখা ?
গতকাল যা'ক মরে,
মৃত্যু জ্যোতি এ অন্তরে,

অলুক চিতার মত প্রেতভূমি করি দীপ্যমান,
অতীত ভবিষ্য নাই আছে শুধু দীপ্ত বর্তমান।

জাগো দীপ্ত বর্তমানে মানুষের অভিশপ্ত হিরা
ভরস্করী বহি শিখা মর্মতলে উঠুক জলিরা,
জাগো ব্যক্তি-স্বাধীনতা
অতীতের অধীনতা,

অনহু লাগিছে বড় শাস্ত্রের ধর্মের অত্যাচারে,
পোরহিত্য গুরুগিরি, বর্করের বমন উলগারে।

ক্রুর অভিলক্ষি ময় হুর্নীতির নৈতিক অজ্ঞালে—
শালকদ্ব স্ববেশাত্মা রক্তশূন্য নিশ্রাণ ককালে,—
লমাজ শালন মানি,
মৃত্যুরে এনেছে টানি

অন্তঃকার যুগ-কণ্ঠে, ধর্মতরে ভীত 'মেঘপাল'
বুদ্ধকাজের তব্বে অন্ধকারে রয়ে চিরকাল।

হে সমাপ্তি গ্রাণ কর হতভাগ্য কবির জীবন,
'এ' বড় হুঃখ লাগে শূণ্যতার কাঁবিবে কি মন ?
মানি না জৈব কভু
কেই মোর নাই প্রভু

জন্মেছি মানুষ—বেহে মৃত্যু জানি মানুষের জ্ঞান,
অনহু লাগিছে' বড় পড়ে খবে আত্ম অনমান।
হরতো বিচার মম নহে ঋষি, গোতমের মত
লাংখ্যকার কপিল ও ব্যাস লম মন্ত্র শত শত

রচিনাই কোনো দিন,
বুঝি মোর নহে কণ,

তবুও মানুষ আমি আমারও তো স্বাধীন বিচার,
কারো চেয়ে ছোট নয় এ আমার নহে অহংকার।

আমারে করিয়া কেন্দ্র ঘূর্ণমান কালচক্র ঘোরে—

বল্লভ বিশ্বলোক বাধিয়া রেখেছি চিত্ত ভোরে—

আমি আছি তাই তুমি

তাই জাগে কিম্বদন্তি,

কল্পনার কাব্য রচি নিখাদে উত্থান পতনে,

অশান্ত প্রেম-আতি ভাবময়, সুপ্ন—নিকেতনে।

হাসরে মানবমন ব্যক্তিগত কাব্য'লে যে যায়?

উদ্ভাস দর্শন বেস্তা নিত্য-লেখা ফেলে আস্র ছায়া,

কত কবি অহংকারে,—

রূপক ও অলঙ্কারে—

• যুগে যুগে সভ্যতারে করে গেছে কুট প্রবেশনা,

সে কাব্য শাস্তভাবিকোটি আত্মা লহিছে লাহনা।

কল্পিত দেবতা সৃষ্টি' মৃতিকায় যতো কল্পকার—

দেবত্বের ধর্মধ্বজা উড়াইয়া করিছে চিংকার

মন্দির—গীর্জায় মঠে—

উদ্ভট চিত্রের পটে,

পাকীতে—পুথীতে আর—পুরাণ ও পাঁচালীর স্তপে।

• মানবপুত্র আত্মা নিমজ্জিত করে—অন্ধকূপে।

বাইবেলাদি ধর্মগ্রন্থ গীতা জেন্দাবস্তা বেদ ত্রিপিটকে,

লেখায় সৃষ্টির পথ, না মানিলে পচিবে নরকে,

লম্বা মানব যতো—

প্রচারিল ধর্ম কতো।

• দুঃখের শালন হতে তবু জীব পেলনা নিস্তার,

অনিবার্য মৃত্যু আজো জুর মৃষ্টি ছুটিছে হৃদয় ॥

যতোকণ বেঁচে আছি ততক্ষণ সভ্য এ জগত

আমার মৃত্যুর পরে কোথায় চলিবে বিশ্বরথ?

চাহিনা সে তবু কথা,

তৃপ্তিহীন ব্যাকুলতা

কি লাভ জাগারে মর্মে অবহেলা করি বর্তমান?

পর জন্মে কিছু নাই দেহ ভঙ্গ শেষ পবিধাম।

দেখেছি কি কোনোদিন স্নানার্থের লক্ষ কোটি তারা?

অনংখ্য জগত যেনা অলীক রহস্তে আত্মহারা,

সৌর জগৎ বিতীষিকা,

কাঁপে লক্ষ নীহারিকা,

লেখায় কি ধর্ম আছে, আছে শাস্ত্র, আছে কি ঈশ্বর?

ব্যর্থ অনুমান রাশি লেখা কভু—পায়েনা উত্তর।

মানুষ মর্ত্যের পুত্র, মানুষ তো মর্ত্যের বীজাণু,

শূণ্যের স্পন্দন মাঝে স্থান তার ক্ষুদ্র পরমাণু,

নীচাবদ্ধ জ্ঞান তার

তবু করে অহংকার—

• তবু করে মূখ লম্ব ধর্ম আর ঈশ্বর ভজন,

মনের স্বাধীন শক্তি পর বাক্যে করিয়া নিধন।

কে পারে অমৃত তবু স্বাধীতে মৃত্যুধর্মী হ'রে?

মর্ত্যের—বীজাণু তুই স্পর্ধিতরে ধর্মশাস্ত্র লয়ে,—

মানুষের সত্যনাশি,

অর্থহীন মন্ত্র রাশি—

পারিবি কি দ্বিগে যেতে কাম্পনিক অমর্ত্য নিবাসে?

যখন লকল লতা লুপ্ত হবে শাস্ত্র বিনাশে?

দেখেছি কি অন্তর্ভেদী দৈব চক্ৰ মন-মানবের?

ভুলে যাও ধর্মবস্তুর চিত্ত বা' স্বার্থ দানবের,

অন্তর্মুখী মর্ম হ'তে—

বহে যা'ক খর স্রোতে—

জাগতিক অনুভূতি সভ্য বাহা মানব মনের—

লেখায় ছলনা নাই তবু কথা অনিত্য ক্ষণের।

আজিকার সভ্য বাহা মিথ্যা হয় আগামী প্রভাতে—

শূন্য লুটায় কাঁধে বলন্ত কালের অস্রাবাতে—

লক্ষ-লিঙ্গ প্রেম কূলে,

জন্মলয় নানা ভূলে—

• পরম আত্মীয় বন্ধে জেগে উঠে তীব্র হলহল,

হিংসার কলুষ রক্তে ধর্মনীতি করিয়া বিকল।

বিশ্বাল ও অবিশ্বাল একই লাখে পাশাপাশি চলে,

স্বনীতি ঘনীতি আর পাপ পুণ্য এই ধরাতলে,

প্রয়োজন লিঙ্গি তয়ে—

মানুষ সৃজন করে—

ধর্মের দোহাই পাড়ি ভগ্নাধীতে করে খেচ্ছাচার

শাস্ত্রের শাসনে' খোলে নরক ও স্বর্গের দুয়ার।

এইরূপে চলে শ্রীক লম্বা জাতির পিণ্ডমান,

মর্ত্যের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ি পাবণ্ডেরা করে রক্তপান।

নারীয়ে বক্ষণা করি

পৈশাচিক মৃষ্টি ধরি—

নিত্য করে—ভিখারী ও নপুংসক পুত্র উৎপাদন;

লম্বাজের চুষ্ট্রণ লক্ষকোটি—নিজ্জীব জীবন।

দেখেছ কি অভাগিনী রমণীর বৈধব্য যন্ত্রণা,

দেখেছ কি নিরক্ষর—শ্রমিকের অশেষ লাহুনা ?

ভিখারীর—দুঃখরাশি

ধনিকের—ব্যাক হাসি

নেহারিয়া রে পাবণ জাগেনা কি অন্তরে উন্নয় ?

মুহূৰ্ঘ জননী তোর চেয়ে দেখ করে আর্ন্তনাথ ।

কি হ'বে লমাজ নীতি—স্বার্থপর রঘুনন্দনের ?—

যুক্তি হীন ধর্ম ব্যাখ্যা পড়ে পড়ে শত বন্ধনের,—

শাস্ত্রমেধ যজ্ঞানলে—

ভস্ম কর সে সকলে,

দূর করে ফেলে ছাও মানুষের সৃষ্ট ভগবান,

অজ্ঞতার নির্ঘাতীত উৎপীড়িতে কর পূজিত্রাণ ।

যৌথ ভাবে কোনো দিন করেছ কি কোনো শুভকাজ ?

কোলিজের শিবে তোর পড়ক অনল ভরা বাজ,

চাতুর্ক্য ধর্মপ্রায়ে—

পাঠ্যেই বহালয়ে—

দরিত্র দুর্বল ধৈর্যে হীন হীন মানুষের প্রাণ,

ধর্মের বাণিজ্য খেজো মনুষ্যে দ্বিগা বলিধান ।

যে পিতা মনের মত শিক্ষা দের আপন সন্তানে

ভ্রূণ হত্যাকারী সে যে স্বার্থপর আত্ম অভিমানে

স্বচ্ছাচারে মত্ত হয়ে,

মানব জীবন লয়ে,

প্রতিষ্ঠা করিতে চায় শিশুমনে ভ্রান্ত মতবাদ,

সন্তানে শাসিতে চায় নিষ্পেয়িয়া ক্রীণ আর্ন্তনাথ ।

পূর্ব পুরুষের ধর্ম মানুষের উত্তরাধিকার—

ধ্বংস করে শৈশবের স্বতস্কৃতি স্বাধীন বিচার—

রাহগ্রস্ত স্বচ্ছ মনে

পর ধর্ম আক্রমণে—

অতীত আদর্শ আমি জীবাত্মার করে সর্বনাশ ;

কুশিক্ষার জর্জরিত মুখ জীব হারায় বিধান ।

অনন্ত বিপ্লবধরী প্রকৃতির বিরূপ জঠরে

শিক্ষার নির্দেশ নাই আদর্শ জন্মের আর মবে,—

কালচক্র তলে ভাই—

লভ্যতার রক্ষা নাই—

পুরাতনে চূর্ণ করে অনাগত যাত্রা পথে ধার,—

জৈব করিবে রক্ষা ? হার মুখ জৈব কোথায় ?

জৈব যদি বা থাকে দেশকালভীত লতা তাঁর—

ধর্ম শাস্ত্রাধীন নহে, নাই তার লঙ্ঘ্য প্রণয়,—

মৃত্যুস্থির, মহালিঙ্গ—

লংখ্যাহীন জীববিন্দু—

সে বিরূপ ব্যাপ্তি বৃকে অনর্থক করে কোলাহল,

অনিবার্য মৃত্যু শ্রম অসহায় ফেলে অশ্রুজল ।

সৃষ্টির প্রথম রাত্রি আসে নাই কভু কোনদিন,

চিরকাল সবই আছে চিরকাল সবই হয় নীল

অলস একের বৃক

সাময়িক দুঃখে স্নেহ

চঞ্চল মানব চিত্ত ক্ষণস্থায়ী ফেলে দীর্ঘশ্বাস ;

মূল্যহীন আত্মনাতে উর্দ্ধ কাশে জানার উচ্ছ্বাস

মানুষ যে মরে গেল নির্মম ধর্মের আত্যাচারে—

শাস্ত্রাক কলুষআত্মা দাঁড়ায়েছে মৃত্যুর হুয়ারে—

স্বার্থপূর্ণ অর্থনীতি—

সৃজিয়াছে লক্ষ ভীতি—

জীবাত্মারে পুষ্ট কর নিত্য কর চিন্তের ব্যায়াম,

বাস্তব জীবনে নাই, স্বপ্ন আর স্নেহের আশ্রম ।

একটি মানব বন্ধে-জাগে যদি শ্রম বিমুখতা,

ধনোন্মত্ত চিন্তে তার জাগিবেই স্বার্থ কলুষতা

রচিবে নূতন শাস্ত্র

অত্যাচারে, দ্বিবারাত্র

বঞ্চিত ও প্রবঞ্চকে লাগিবেই বিপুল সংঘাত—

বীধিবে ভয়াল বৃদ্ধ দিকে দিকে হ'বে রক্তপাত ।

বৃদ্ধ বৃদ্ধ এস বৃদ্ধ, অগ্নিধর অলস বিপ্লব,

বীভৎস দুর্গন্ধময় দগ্ধ কর লভ্যতার শব,

দেবদেব রক্ত স্রোতে

এস ক্রয় জিহ্বা হ'তে

শোণিত পিপাসু বৃষ্টি জিহ্বাংগায় ছাঁড়িয়া ছুড়িয়া

সে রক্ত সর্বাঙ্গে মাখি কর আজ ধর্মের লংকার ।

শাস্ত্র ধর্ম রাজনীতি বুদ্ধকার প্রচণ্ড সংগ্রামে

নিমেষে ভাঙিয়া পড়ে ব্যক্তিস্বের দক্ষিণে ও বামে

জাগে ধর্ম দুঃশাসন,

বিপ্লবের প্রস্তানন

ভয়াল ভ্রূকুটা করে মৃত্যু ধর্মী জীর্ণতার পানে

বৃথা দেহস্বের গর্ভে ধর্মশাস্ত্র লুটায় অশানে ।

• কোরগর পাঠচক্রের নবম বার্ষিক সাহিত্য

সম্মিলনীতে পঠিত ॥

স্বেডিত প্রসঙ্গ

সভ্যভাষী

বেতারে অভিনয় প্রসঙ্গে আমরা অনেক কথাই বলেছি, এ বিভাগটির জনপ্রিয়তা দিনে দিনে আর্দ্র হচ্ছে কমে। এবারের প্রোগ্রামে বেতার জগতে দুখানি বাত্মার বই নির্দ্বিগ্ধিত হয়েছ দেখলুম। আমাধের একাধিক আলোচনার কলে নাটক নির্দ্বিগ্ধিতনে একটু রসজ্ঞানের পুরিচয় আমরা এবিভাগের পরিচালকের কাছ হতে পেরেছিলাম কিন্তু অভিনয় অংশ এমন নীরল প্রাণহীন হোল যে, নাটকগুলির আললরুপই প্রোভাধের কাছ প্রকাশ পেল না। এ, আই, আর প্রেরালধের অভিনয়ের ষ্ট্যাণ্ডার্ড দিনে দিনে অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কোন intellectual part এর কোন সুষ্ট অভিনয় রুপ আমরা পাইনে। সেই গভাভুগতিক—পূর্ক একধেরে পথের অন্ধ অহুসরণ! সাধারল রজালয়ের পাঠপীঠে বা আজ যুগধর্ষ প্রবাহে অচল হয়ে এসেছে—বেতারে তারই লমারোহ।

এ বিভাগের পরিচালক মিঃ ভজ্ঞ কোনরুপ নতুনধের পরিচয় দিতে পারছেন না। যুগধর্ষের প্রবাহে যাত্মধের রসবোধ কুচির যে পরিবর্তন ঘটছে, সাহিত্যের দিক থেকে, art এর দিক থেকে, রলের দিক থেকে নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত করেই আমরা তা অহুতব করতে পারি। মিঃ ভজ্ঞকে আমরা রসজ্ঞ বলেই জানি অথচ তিনি কেন যে এদিক থেকে উদাহীন তা আমরা ভেবে পাইনে।

সাহিত্য প্রসঙ্গের তেমন বিশল আলোচনা বেতারে আর পূর্কের মত পাওয়া বাজ্ঞে

না। বাংলা সাহিত্যের সুষ্বিত্ত আলোচনা বেতারে বাহুনীয়। জাতির জীবনে, লমাজে জাতীয় সাহিত্যের লক্ষ্য কত যে ধনিষ্ঠতর তা আজ আর কারুরই অবিদিত নয়। জাতির উন্নতির মূলে—জাতির শিকা, দীক, কৃষ্টির মূলে জাতীয় সাহিত্য। “বিজ্ঞার্থী মণ্ডল” এদিক উপলক্ষি করেছেন তাই লৈথানে সাহিত্য প্রসঙ্গ আজ দেখছি সুষ্প্রতিষ্ঠিত। পরিচালক সাহিত্যিক নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এর জন্তে আমরা প্রশংসাবাহ জানাছি। বেতারে অপরদিকে মহিলা মজলি, জেনারেল প্রোগ্রামে এ প্রসঙ্গ তেমন বিস্তৃততর গতি বিস্তার করতে পারছে না—এ বড় পরিভাপের বিষয়। বেতারে প্রকৃত সাহিত্য, রসমূলক আলোচনার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বক্তৃতা বিভাগের কর্তার এদিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বেতারে ছোটধের আলরে আমরা দেখলুম “মাদীমার” আবির্ভাব। শিশুশিকা মাতৃশিকার অধিক পরিপুষ্ট হয় আমরা তা বিশ্বাস করি। আমরা এবিভাগটির মন্তব্য পরে প্রকাশ করবো।

শুক্রবার ৭ই জাহুয়ারী সাক্ষ্য অহুঠানে রবীন্দ্রনাথের “গোরা” বেতারে অতিনীত হোল। বিশ্বকবির এই অপরূক অবধান রজালয়ের পাঠপীঠে ছিল বেঁচে—রজালয়ে এই লক্ষজন প্রশংলিত নাটকখানি কতখানি নিকৃষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হতে পারে বেতার নাটকে হল তারই একটুকরা পরিচয় দিলেন। মাঝে মাঝে বেতার অর্কেষ্ট্রাও

সেই অহুয়ারী বাত্মা প্যাটাগের ঐক্যতান ধ্বনি লরবরাহ করে জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে এটা বাত্মা—থিরেটার নয়। আমাধের লবিশেষ হুঃখ এটা রবীন্দ্রনাথের নাটক বলে।

রবিবার ৯ই প্রাতঃকালীন অহুঠানে আলি হোদেন এবং তাঁর লম্প্রদায় লানাই বাজালেন। শীতের লকালের বাত্মানে হোদেন সাহেবের বাজনার দুচ্চনা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভবতোষ ভট্টাচার্যের “বাং কোবে অলি” এবং “আর কত না করবি হেলা” দুখানি গান হোল। গায়ক রামপ্রসাদী সুরের সুল্লর রুপ দিলেন। পারুল চৌধুরী দুখানি গান হোল—খুবই উপভোগ করেছি। আমরা এই শিরোটির ক্রমোন্নতি কামনা করি। পরে ভীষ্মদেব চ্যাটার্জী খেরাল আশাবরী গাইলেন। তানপুরার শব্দে কণ্ঠস্বর চাপা পরে গিয়েছিল। আমরা ভীষ্মদেব বাবুর কাছ হতে আরও উচ্চাদের কিছু আশা করেছিলাম।

ঐদিন সাক্ষ্য অহুঠানে—লতিকা মুখার্জীর গান ভালো হয়নি। গলা কেঁপে অনভ্যহতার পরিচয় দিচ্ছিল। হিন্দি গানখানিও তজ্ঞপ। কুমারী অনিমা দাস লেতার বাজালেন—চলনলই। মাদুরী বেবীর “নিতি এসে কে ডাকে আমায়” এবং “এলে তুমি মন চেয়ে” গান দুখানি বিশেষ ভালো নয়।

লোমবার ১০ই সাক্ষ্য অহুঠানে পূর্ণ চক্রবর্তীর গান চলন লই। ডাঃ বিনয় লেন পি-এইচ ডি মহালয়ের বক্তৃতা “বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা” আমাধের মনে কোন impression আনে নি। তাবাটি ঘোটেই মিষ্ট নয়।

মঙ্গলবার ১১ই ছোটধের আলরে ইন্দিরা বেবী লিখিত “রুণর খেলাধর” অহুষ্ঠিত হোল। ছেলেধের খেলাধরে চাই লরলতা—অভিনয়

এসঙ্গে যে রূপ প্রকাশ পায় নি—acting ও থার্ড ক্লাস। পারিপার্শ্বিক সঙ্গীত নিকট শ্রেণীর। ‘মালোয়া’ চিঠি পড়লেন জুবোধ্য—অত্যন্ত উচ্চারণহুট। বাগদী দেবী হিন্দী খান গাইলেন বিশিষ্ট। সত্যেন বাগচীর আবৃত্তি সমালোচনার বাইরে।

মিলেগ কানিংহাম সরকার ‘নাওতালি ও মালো’ জাতীয় সঙ্গীত লব্ধে একটি পরিচয় দিলেন। অত্যন্ত জুবোধ্য বাংলা এবং গানগুলিও নাওতালি গানের কোন রূপ দিতে পারে নি। মিলেগ সরকারের বিকৃত বাংলা উচ্চারণ করণ রসাত্মক না হয়ে হাস্য রসের উদ্রেক করেছিল। Subject matter টি ছিল ভালো। অপর কাউকে দিয়ে বললে উপভোগ্য হোত।

শিউলি সরকারের ‘মঞ্জুল মাধবী বনে’ গানখানি চলনমই।

১২ই বুধবার পল্লীমঙ্গল আদরে সবা-লাচী মেতার বাজালেন—চলনমই। প্রফুল্ল মিজের গান মন্দ নয়। পঞ্চাননবাবুর গান ‘যদি মরবে লুকারে রবে’—ভালো না।

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে ‘লীলা, দেবী “ভারতের মহীয়সী নারী লীলা” লব্ধে বক্তৃতা দিলেন। রামাংগ কাব্যের সীতা—আদর্শ হিন্দু রমণী সীতার স্তম্ভর পরিচয়—ভাষা বেশ ঝরঝরে, বলবার কাঁছাও ভালো। মহিলা মজলিশে লেখিকার স্থান হওয়া উচিত।

বিদ্যার্থী মণ্ডলে সুসাহিত্যিক লুজনীকান্ত দাস চণ্ডীদাস হইতে চৈতন্য যুগ পর্যন্ত একটি স্তম্ভর মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। সাহিত্য রসের দিক থেকে বক্তৃতাটি খুবই তথ্যপূর্ণ ছিল।

১৩ই জানুয়ারী সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে কতকগুলি রেকর্ড বাজানো হোল। সব পুরানো এবং বাজে। যেতার অর্কেস্ট্রা concert

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীমুদ্রেন্দ্রনাথ নিস্কোদী

বড়দিনের ছুটিতে পাটনার ‘প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের’ পঞ্চদশ অধিবেশন মহাপ্রসারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বাংলায় বাহিরে যে সকল লব্ধে বাঙ্গালী প্রভাব প্রতিপত্তি লব্ধকরে বহুদিন বলবাল করিয়া আসিয়াছে এবং আজও আসিতেছে তন্মধ্যে পাটনাই লক্ষ্যপ্রধান। আজও পাটনার হাইকোর্টে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার, বাঙ্গালী হাকিম; শিক্ষারতনে বাঙ্গালী অধ্যাপক, বাঙ্গালী অধ্যাপক তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বলিয়াই এই সম্মেলনের অধিবেশন পাটনার ‘লেনেট হলে’ এবং প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ‘ক্যাভের্ডিস হট্টেলে’ হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

প্রায় আড়াই শতের অধিক প্রতিনিধি এবং সহস্রাধিক পাটনাবাসী বাঙ্গালীর এই সম্মেলন লক্ষ্যবিন্দু দ্বিপ্রাহরিক লক্ষ্যবিন্দু হইয়াছে। ইহাতে ভিজগাপটম, রাওরাল পিণ্ডি, ব্রহ্মবেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদূর প্রবাস হইতে বাঙ্গালীর লম্বাগম্ব হইয়াছিল। চারদিন ব্যাপী নানা সভা সমিতিতে ও আদর আপ্যায়নে বিভিন্ন মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

অবশিষ্ট বাঙ্গালীজাতির যে লম্বা ক্রুটি-বিচ্যুতি আছে, পাটনার বাঙ্গালী কিম্বা partyর band এর মত বাজালেন। ইংলিশ গানের ব্যর্থ অনুকরণ! পশুপতি চ্যাটার্জী “স্বন্দর বন লব্ধে বক্তৃতা দিলেন—আমাদের মোটেই ভালো লাগে নি। শিশুদের আলরে উপবৃত্ত—বলবার কাঁছাও ভালো নয়।

অস্ত্র প্রবাসী বাঙ্গালী তাহা হইতে মুক্ত নহেন। ব্যক্তিগত মতবৈতন্য হেতু অনেক লম্বে দক্ষ যজ্ঞের সৃষ্টি হয়, পাটনা অধিবেশনে লক্ষ্য কিছু অনুষ্ঠিত না হইলেও পাটনার করেকজন। বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতি অনেকে মনে লক্ষ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীমুদ্রেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় “অল্প করেকদিন হইল পাটনার আইন-ব্যবসার আরম্ভ করিয়া তথ্য নিষ্কর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে লক্ষ্য হইয়াছেন—তাহার প্রমাণ, যে এই সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বৃত্ত হইয়াছেন। সম্মেলনকে লক্ষ্যবিন্দু করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা লব্ধেই অনুষ্ঠিত হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদা কুমার ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ লম্বাকারের অক্লান্ত পরিশ্রম ইহার লক্ষ্যের স্পষ্টীভূত কারণ। সম্মেলনের বহুদিন পূর্বে হইতে আহ্বার নিজা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা এই কাজে তাহাদের দিবস ও বাসিনী অতিবাহিত করিয়াছেন। সম্মেলনের মূল ও শাখা সভাগুলির ব্যবস্থা ও পরিচালনার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। অধ্যাপক ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার। বিভিন্ন কার্যের দায়িত্ব লইয়া তাহারা তাঁহাদের কর্তব্যমতা ও আন্তরিকতার প্রতিনিধি মণ্ডলীকে বিশ্বস্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরলাল দাশগুপ্ত (গৃহলজ্জা ও আদর প্রমোদ), শ্রীযুক্ত কিশোর চন্দ্র মিত্র (নিম্ন বাবু), শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (আহার

বাসস্থানের ব্যবস্থার) শ্রীযুক্ত বলন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অবনী চট্টোপাধ্যায়।
স্বচ্ছা লেবক ও স্বচ্ছা লেবিকাগণ তাহাদের
কর্তব্য সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিপালন করিয়াছেন।

সহজ ও চিরন্তন ব্যাকুলতা কোথায়ও পরিলক্ষিত
হইল না। গত কয়েক বৎসর ভারতবর্ষের
পশ্চিম ও মধ্য প্রদেশগুলিতে যে লম্বত
কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে তাহার বহু

কথা উল্লেখ করেন। বিহারে কিছুদিন
হইল বাঙ্গালী বহিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা
চলিতেছে। সরকারী কার্যে বাঙ্গালীদের
নিয়োগ এবং অস্ত্রাস্ত্র বেলসরকারী প্রতিষ্ঠানে
বাঙ্গালীদের গ্রহণ এক রকম বন্ধ হইয়াছে।
এইরূপ নীতির ফলেও পাটনার বাঙ্গালী
সমাজের নিকট বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁদের
শ্রদ্ধা হারাণ নাই। রাজেন্দ্র বাবুর আগমনে
লকলেই দণ্ডায়মান হইরা তাহার জয়
ঘোষণা করেন। সার পি, সি, রায়ের
অভিভাষণে তাহার সেই পুরাতন সুর ছাড়া
আর কিছু ছিল না।

বিকলে লজ্জিত শাখার অধিবেশনে শ্রীযুক্তা
অপর্ণা দেবী তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ
করেন। ধৈর্য্যসহকারে লকলেই তাহার
অভিভাষণ শ্রবণ করেন, কিন্তু দীর্ঘতার জন্য
অনেকেই অভিযোগ করিয়াছিলেন। রাজি
আটটার তাহার কীর্তন হয়। তাহার
কীর্তন শুনিবার জন্য লোক সমাগম খুবই
হইয়াছিল কিন্তু লকলেই আশায়রূপ খুন্সী
হইতে পারিয়াছিলেন কিনা বলা বড়ই দুস্থিল।
দীর্ঘ অভিভাষণের পর তাঁহারও স্বভাবজাত
ক্রান্তি আসিয়াছিল এবং প্রোতাহের লম্বত
দিন ব্যাপী উৎসবে মন ও বেহ ক্রান্ত
হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই কীর্তন বেশীকণ
হয় নাই। পশ্চিমে বাঙ্গালী মহলে এই
কীর্তনের যথেষ্ট সূখ্যাতি আছে, জীবনে এই
চলিত গান শ্রবণ সম্ভব হইবে কিনা—এইরূপ
খেদোক্তি অনেককেই করিতে শুনিয়াছি।
অনেক সময় মনে এই কীর্তন লজ্জিতে লেইরূপ
আশায়রূপ কিছু না পাইরা অনেককেই
নিরাশ হন।

পরদিন সাহিত্য শাখার অধিবেশন।
সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি শ্রীযুক্ত
মোহিত লাল মজুমদার। বহু উচ্চবয়সের
সাহিত্যিক বাঙ্গালার বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বে এই
সমালোচক সাহিত্যিকের কেন ডাক পড়িল
তাহা আমরা জানি না। তবে তাঁহার

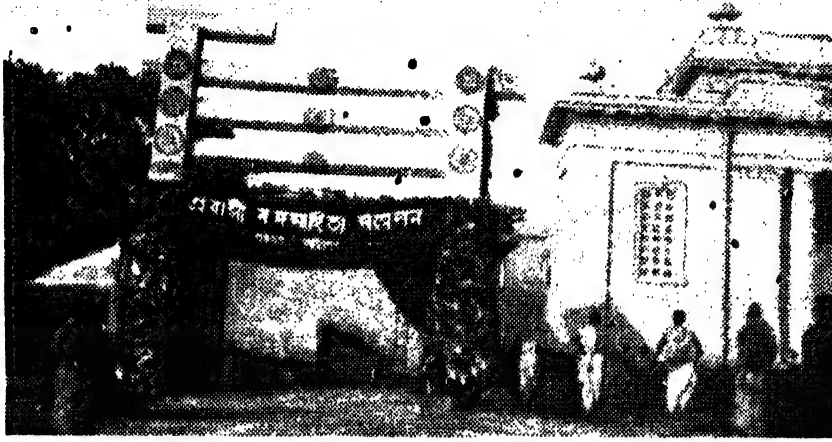


প্রতিনিধি আবারে পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ

গত বৎসর রাঁচিতে মে-অভাবটুকু খুবই
পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এবারের সম্মেলনীতেও
তাহাই দেখিলাম। উত্তর সম্মেলনেই বহু
মহিলা বর্ষকের সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু
একমাত্র প্রবর্ধনী ও লজ্জিত পরিচালনা
ছাড়া কোথায়ও মহিলাদের কর্তব্য-প্রচেষ্টা
দেখিতে পাইলাম না। প্রতিনিধিদের
আহারাদির ব্যবস্থার বাঙ্গালী মহিলাদের
কোন সাহায্য ছিল বলিয়া মনে হইল না।
প্রবালের ও দেশের বাঙ্গালী ভাইবোনের
আহারাদিতে আদর আপ্যায়ন করিবার

শুরু হারিড মহিলা লেবিকাগণই গ্রহণ
করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী সর্ক প্রকার
আন্দোলনের স্রষ্টা হইরা আজ এই সব
ক্ষেত্রে কেন পশ্চাতপ হইতেছেন তাহা
খুবই ভাবিবার বিষয়।

২৭শে বেলা ১টার সম্মেলনের প্রথম
অধিবেশন হয়। বিহারের তথা লম্বা
ভারতের নেতা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্মেলনীর
উদ্বোধন-কার্য সম্পাদন করেন। তাঁহার
অভিভাষণে তিনি বাঙ্গালী ও বিহার
বাঙ্গালী কৃষ্টিগত সাধনা ও শিক্ষা বিকার



প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তোরণ ও পাটনা সেনেট হল

অভিভাষণ আদায়ের আনন্দ হান করিতে পারে নাই। তিনি এত বড় সভায় সভাপতিত্ব করিবার নৌভাগ্য বোধহয় ইহার পূর্বে কোথাও পান নাই। তাঁহার বীর্ঘ অভিভাষণটি 'শনিবারের চিঠির' পাতায় ছাপা হইলে হয়ত কাহারও কোন আপত্তির কারণ হইত না কিন্তু ছোট বড়, সাহিত্যিক অনাসহিত্যিকের মিলন কেন্দ্রে এইরূপ বীরোদ কোমলের অবতারণা বড়ই অশোভন হইয়াছে। সাহিত্য সৃষ্টির পুজারী হিসাবে তিনি যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই যে বাঙ্গালী সাহিত্যের অনেক সেবকের নামোল্লেখ করেন নাই তাহা স্পষ্টই মনে হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির নিয়োগ ব্যাপারে তিনি যে সমস্ত সমালোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হইল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথনাথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, বীণেশ সেন, জলধর সেন, প্রমোদ বিজ্ঞ, প্রবোধ লাল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকদের হান বীকার

করিবার মত মনোবৃত্তি তিনি লাভ করেন নাই। ইহা হুৎথের বিষয় লক্ষ্য নাই। যাহা হউক গঠনবাদের সাহিত্য সভায় ডাঃ বীণেশচন্দ্র সেন মহাশয় তরুণ সাহিত্যিকদের কটাক্ষ করার সাহিত্য অধিবেশনেই বেরূপ আন্দোলন হইয়াছিল পাটনার তাহা হয় নাই। হয়ত তাহা হইতও, কিন্তু ব্যাপার বৃদ্ধিরা মোহিত-বাসু শারীরিক অসুস্থতা ঘোষণা করিয়া

সকলোবাসু ঐমুখ পার্শ্বের নলে, নভা ত্যাগ করেন এবং তাহার পর আর সম্মেলনের অধিবেশনে তাঁহাকে বেধিতে পাওয়া যায় নাই।

বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল কিন্তু ঘটনার বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। তবে শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত ক্রিতিমোহন সেনের বক্তৃতা খুবই স্বয়ংগ্রাহী হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিরাট লিখিত অভিভাষণ পাঠ না করিয়া সহজ সরল ভাষায় তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া যান। তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে কাহারও বৈয়াক্যুতি ঘটে নাই বরং মনে হইতেছিল মঞ্চের উপর বলিয়া দেকালের ঋষি পুরুষ যেন তাঁহার আত্মবর্ণনের ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন।

সম্মেলন ও আলোচনা ছাড়াও সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ পরম্পরের ঘোলাঘোলা করিবার বহু প্রকারের সুযোগ হান করিয়াছেন। পাটনার বাঙ্গালী সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গকে তাঁহাদের নাট্য-প্রতিভা বর্শন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন—পৌরাণিক নাটক 'ধন্যর' অভিনয় করিয়া। এইরূপ সর্বাত্মক সুন্দর অভিনয় বেধিবার নৌভাগ্য আদায়ের খুব কমই হইয়াছে।

দুর্ভাগ্য জনক শীর্ণ
শিশুজা.

ডোঙ্গরের

বাল্যস্মৃত
সেবনে
অবিলম্বে সুস্থ ও
সবল হয়।

বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।



খ্রীসমীচরন সেন

গ্রেটার প্রেমাম্পদ

গ্রেটারগার্কো প্রেম পড়েছে একথা আমরা শুনিছি বহুদিন ধরে বহুবার, অর্ধচলিত্য সত্যই সে যে আজ পর্যন্ত কারোর প্রেম পড়েছে একথা মনেই হয় না। কাজেই মত্যাগত্য স্বাক্ষর— পাঠকদের ওপর তার দ্বিলাস্য তাঁরা বিচার করুন। আমার বলার কথা, আমি বলছি।

গার্কো গর্বিতা কিনা বলতে পারি না— তবে সে যে অপরের সঙ্গে মিশতে চায় না এটাও সত্য কথা। লোকের না মিশতে পারাটা শুধু গার্কোর কারণ নয়, লজ্জারও তো বটে।

গ্রেটারগার্কো পর্দায় অভিনয় করা ছেড়ে দেবে এটাও নতুন আমরা শুনিছি না। অভিনয় ছাড়তে সে ইচ্ছুক কি-অনিচ্ছুক একথা সেই বেশী জানে। সে নামতে চায় ও পাঁচ জনে তাকে অভিনয় করতে বাধ্য করে কিনা একথা ঠুড়িও বলতে পারে। আমরা বুঝি, পাবলিনিটির জন্ত ঠুড়িওকে এমন কথা বোষণা করতে হয়। এতে ছবিখানার নাম ও আর্টিষ্টের নাম বাজারে গরম থাকে।

গ্রেটারগার্কোর নতুন যে কোন ছবির কোন খবর যখন সাধারণকে জানান হয় তখনই তার মধ্যে বড় করে একটি খবর লোককে জানান হয়, 'গার্কো'। প্রেম পড়েছে। গার্কোর প্রেমাম্পদের নাম শুনি

হু তিন জন নয়। বড় ছোট অনেক লোক।

গ্রেটারগার্কোর নাম জন গিলবার্টের নামের সঙ্গে জড়িয়ে বলার পূর্বেও আমরা জন্ত লোকের নামের সঙ্গে বলেছি। তারপর লেখনিও 'কুইন ক্রিশ্চিনা' তোলার সময়ে আমরা শুনেছি তার নামের সঙ্গে রুবেন ম্যাথুলিয়ের নাম। সে ছবি তোলা শেষ হোলে। পরের ছবি উঠল 'বি পেটেড ডেল'। শুভবের কথা বিশ্বাস করে কে না ভেবেছিল জর্জ ব্রেন্টের নাম গ্রেটার সঙ্গে কিছুতেই মিশে হবে না। তাও তো হোলো। তারপর এলো 'ক্যামিলি' ছবি। কতদিনের আগের ছবি। 'ক্যামিলি'র কথা আজো লোকের চোখে জল জল করে ভালছে। তখন শব্দই তো ভেবেছিল রবার্ট টেলরের নাম আমাদের ঠকাতে পারবে না। জন গিলবার্টকে ভুলতে পারে, রুবেন ম্যাথুলিয়ানকে ঠকাতে পারে, জর্জ ব্রেন্টকে উত্তর না দিতে পারে। অসম্ভবতম পুরুষ ম্যাটিনি আইডল রবার্ট টেলরকে কিছুতেই গ্রেটা নারীর সাধনার ঘন না ভেবে থাকতে পারবে না। ছবি শেষ হয়ে গেছে। যারা

সত্যিকার দেখবার, তারা প্রায় সবাই দেখে কলেছে। কই আজ গ্রেটার সঙ্গে টেলরের নাম কেউ তো শুনেতে পারি না। কোন প্রচার কর্তাই তো গল্পছলে কাগজে লেখে না।

গ্রেটার পরের ছবি 'মেরী ওয়ালিউক'। গত সপ্তাহে বা কলকাতার 'মেট্রো' দিনেয়ার হয়ে গেল। এই গার্কোর প্রথম ছবি—যে ছবি দেখে লোকে গালে হাত দিয়ে ভাবছে বলে ছিরো ভাল অভিনয় করল, না, ছিরোয়িন অভিনয় ভাল করল—নেপোলিয়ন ভাল হয়েছে না মেরী ওয়ালিউক ভাল হয়েছে—চালস বয়্যারের পার্ট ভাল না গ্রেটা গার্কোর পার্ট ভাল। চালস বয়্যার এই একটি মাত্র অভিনেতা—যে গ্রেটার ছবিতে নায়ক রেজে গ্রেটার প্রেমাম্পদ বলে নাম কিনতে পারল না। প্রচারকর্তা চালস বয়্যারকে বোধ হয় রেহাই দিয়েছে।

গ্রেটার সঙ্গে চালস বয়্যারের নাম যোগ করে প্রচার করলে সাধারণের কাছে খবরটা খুব ভাল লাগত না। বয়্যার বিবাহিত লোক। হলিউডে বিবাহিত লোক হওয়া না হওয়ার বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ বিয়েটা তাদের কিছু নয় এবং যে কোন মুহূর্তেই চুকিয়ে ফেলা বা বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে। তাতে কোন দিক থেকেই কিছু আসে যায় না। হলিউডে এমনও দেখা যায় যে, কোন স্বামী বা কোন স্ত্রী বিবাহিত অবস্থাতেই অপরের সঙ্গে প্রেম পড়ে ও বিবাহে অঙ্গীকৃত হচ্ছে এবং

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্ততোধ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ডবানীপুর

ক্লান্ত-তটিনীর তটে নিভে গেল উৎসাহ-আলোক শ্রীপ্রভাত কিরণ স্বপ্ন

শীর্ণ আধিগঙ্গা কূলে দেখিলাম লক্ষ্যার হারার
নাহিত্যের ভাবী আশা চিত্তান্তে নির্দোষিত প্রায়।
প্রতিপদ চন্দ্র হালে দেশবন্ধুস্মৃতিমোহ পাপে;
শরৎচন্দ্রের চিহ্ন অবলুপ্ত দক্ষিণ বাতাসে।

তাহারে দেখেনি কেহ নবীন কবির পরিচয়ে,
বৈশ্যের ঘোবনের ধীর পদক্ষেপের বিনয়ে।
গোপন সাধনা শেষে, অকস্মৎ বিজয় মালিকা
গ্রহণ করেছে কণ্ঠে, ললাটে নিয়েছে জয়টাকা।

মানের আসন লভি রাখিয়াছে তেজস্বিতাননে
দৃঢ়করতলগত। কৃতজ্ঞলিপুট-নিবেদনে
হারিজ্যের—সাহিত্যের মধ্যাধা সে করেনি স্তুতি,
বাণীর অক্ষমথানি ঘের নি সে হাতে ভুলুপ্তি।

বঞ্চিত লেখকবলী তারে চাহি চলিয়াছে পথ।
দীন ব্রাহ্মণের সৃষ্টি—লাঞ্ছিতের নব-ভবিষ্যৎ।
ছিলনা হুরভিগম, অনায়াসে আত্মীয় পরম।
ইয়েছে সে বাক্যজালে। মিলালো সে হাসি মনোরম
আমরা, যাহারা লিপি, অতিবড় তাহাদেরি শোক।
ক্লান্ত তটিনীর তটে নিভে গেল উৎসাহ আলোক।
হৃদয়ের কাছাকাছি, অন্তরের এতটা নিকট,—
এত বড় প্রতিভার তুলনা পায়না স্মৃতিপট।

পেরেছে যতটুকু, সেই তাই বেখেছে দক্ষিণ।
যে বেখেছে যতটুকু তাই নিয়ে থাক বিমোহিত।
তবু যতদূর চাই,—রবি-অন্তরাগ করি পার,
বিস্মৃত সাহিত্যভূমি,—অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।

কোট থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সঙ্গে
সঙ্গেই অপসরকে স্ত্রী বা স্বামী বলে গ্রহণ
করছে। এতে কেহই কিছু ধোঁবের ধরে
না। চাল-ল বয়সের ক্ষেত্রে একরূপ হবার
উপায় নেই। ওর স্ত্রীর নাম প্যাট প্যাটারলন।
ওদের মধ্যে প্রেম প্রগাঢ়।

গ্রেটার নতুন খবর আমি দিচ্ছি। আমার
পাঠকেরা যাদের ইচ্ছা হয় বিব্রাণ করণ।
কেউ কেউ বলছে গার্কোর মধ্যে প্রেমের
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কে সেই ভাগ্যবান
পুরুষটি, এই নিয়েই ছিল হলিউড জগতের
বড় আলোচনা। সেদিন জানা গেল
গ্রেটার হৃদয়জয়ী ভদ্র মহোদয়ের নাম।
হচ্ছে লিওকোল্ড টেকোফি। মিউজিক
কণ্ঠস্বর—যার একটি তর্জনি লঞ্চলনে
একশতাব্দী বাজনা ঝনঝনির বাক্যর তোলে
তাকেই বিজয়িনী বোধহয় বরমালা দিলে।

তবে কি গ্রেটা হার মানল?

এলেন ব্যারীর ছবি

এলেন ব্যারী যে ছবিতে নেমেছে তার
নাম 'হাউটু আনড্রেস ইন ফ্রন্ট অব ইয়ের
হালবেণ্ড'। ইংল্যাণ্ডে ছবিখানি দেখান
হয়নি হয়ত এদেশেও হবে না। ছবিখানির
নাম শুনে অনেক নীতি-বাগীশ নালিকা
কুঞ্চিত করবে এও আমরা বলতে পারি।

মালিগ ডিয়েট্রিশ নামে 'ফ্রেন্ড উইথআউট
টিয়ারস'এ। এলেন ব্যারী ও জন ব্যারীমুরও
নামে এই ছবিতেই।

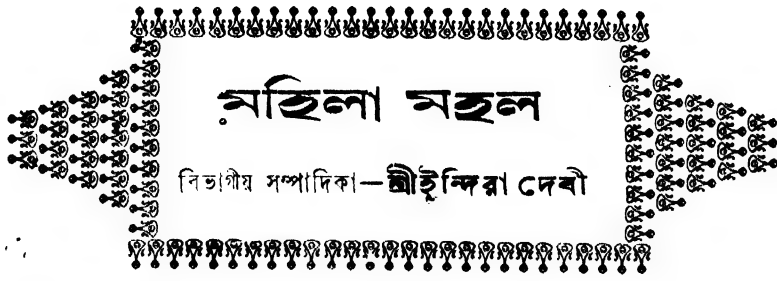
কিছুকাল পূর্বে শুভব রটেছিল এলেন
ব্যারী ও জন ব্যারীমুর 'দ্য টেম্পেট' ছবিতে
নামে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। খবর নিয়ে
জানা গেল কোন ষ্টুডিওই ওদের দুজনকে
নিরে 'দ্য টেম্পেট' ছবি তোলা ঠিক করেন
নি। তবে কিছু কাল পূর্বে তাঁরা দুজনে
স্টুডিওতে 'দ্য টেম্পেট' নাটকে নেমেছিলেন।
ক্যালিফোর্নিয়া ও এরিয়েল ওয়াই দুজনে
সেজেছিল।

টারজনের ছবি

সেদিন চতুর্দিকে প্রচারিত হোল যে
অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মেন মরিস ও 'বেশ
বল' খেলোয়াড় লু গেহরিস 'টারজন রিভেনজ'
নামে ছবিতে অভিনয় করতে অবতীর্ণ হচ্ছে
সেদিন হতেই রাশি রাশি দরখাস্ত ষ্টুডিও
অফিসে উপস্থিত হচ্ছে।

প্রডিউসার লল লিয়ার বলেছেন তাঁর
চিঠির বাস্তব রোজ বোঝাই হয়ে যাচ্ছে, যত
সব নাম করা অ্যাথলেটদের আবেদন।
জেনি ওয়েল, নিগ্রোটার—মেও নাকি
ওখানে দরখাস্ত পাঠিয়েছে।

হাকিম এম.এস. জামানের
কস্টার গিল
খাদুসৌন্দর্য ও শক্তিহীনতা চিরতরে
আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ টাকা
৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা



মহিলা মহল

নিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী দেবী

পরলোকে স্বরূপরাণী নেহেরু—

[১০ই জানুয়ারী প্রাতে আনন্দ ভবনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মর্ত্য স্বরূপরাণী নেহেরু পরলোক গমন করিয়াছেন। ৯ই জানুয়ারী রাত্রি ৯টায় পক্ষাঘাত রোগে তিনি একেবারে অসাড় হইয়া পড়েন এবং ১০ই জানুয়ারী সকাল ৫টার তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্ত স্বরূপরাণী নেহেরু ৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যা পর্যন্ত সুস্থই ছিলেন এবং ডাঃ আনন্দের পরিবারবর্গের সহিত চা পান ও কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত শরনের পূর্বে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন যে, মাতার সংজ্ঞা নাই—পক্ষাঘাতের আক্রমণে অসাড় হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরুর আর জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই—ভোরে ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। আগামী মার্চ মাসে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইত।

৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় চীনা সাহায্য ভাণ্ডারের জন্ত তিনি ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়াকে ১০টাকা দিয়াছিলেন। ইহাই তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য কার্য।

পরলোকগতা স্বরূপরাণী নেহেরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান জন্ত অতি প্রচুর হইতেই সর্বশ্রেণীর লোক হলে হলে আসিতে থাকেন। নহরের ব্যবসায় কেন্দ্র সমূহে হরতাল পালিত হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও তাঁর দুই তিনী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত 'ও' শ্রীযুক্তা কৃষ্ণা হাতী লিং মাতার অস্তিম-কালে মৃত্যুশয্যা পাশে উপস্থিত ছিলেন। রোনা ১১টার সময় মৃতদেহ শোভা যাত্রা সহকারে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ও হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী তথায় শেষ কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কর্তব্যনিষ্ঠ ও মাতৃভক্ত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সহরবাসীরাও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই মহিলায় স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে কোনরূপ কাপণ্য প্রকাশ করেন নাই। সর্বজাতির ও সর্বশ্রেণীর প্রায় ৫০ হাজার লোক তাঁহার শবের অনুগমন করে। বেলা ১১টার সময় শোকযাত্রা আনন্দ ভবন হইতে যাত্রা করে ও বেলা দুই ঘটিকার সময় উহা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে।

স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহধর্মিণী স্বরূপরাণী নেহেরু কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ সেবিকা ছিলেন। সমস্ত দেশ ও জাতি নেহেরু পরিবারের নিকট বিশেষ ভাবে খুণী। দেশের জন্ত যে সব তেজস্বিনী মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রদ্ধা লোকান্তরিতা স্বরূপরাণী নেহেরু তাঁদের ভিতর অগ্রগণ্য। তিনি বীরজায়া ও বীরমাতা। অমর মতিলাল নেহেরুকে অমানবধনে তিনি অগ্রগতির পথ দেখিয়েছিলেন এবং সংগ্রামের সময় স্বামী

পাশে এসে দাঁড়িয়ে সংগ্রামে নেতৃত্ব করে যোগ্যা সহধর্মিণী বলে নিজেকে দেশের কাছে সারা জগতের কাছে পরিচিতা করেছিলেন। স্বামীর পরলোক গমনের পর সাধারণ মানুষের মতো বানগ্রহ অবলম্বন করে দেশের ও দেশের কাছে নিজেকে অমুপস্থিত না রেখে পরিপূর্ণভাবে স্বামীর আদর্শে ও আরক্ত কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন—এবং হানিমুখে কারাবরণ করেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মাননীয়া শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, পিতা মাতার আদর্শে অমুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের জন সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা জগতের কাছে এ সংবাদ অজানা নয়।

স্বরূপরাণী যে সৌভাগ্য ও বশ নিয়ে গেলেন তা অনেক যোগ্য ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটে না। বীরমাতা ও বীরজায়ার স্মরণে আমরা বাংলার নারী সমাজের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে বলি বাংলার ঘরে ঘরে স্বরূপরাণীর আবির্ভাব ঘটুক।

ছেলেমেয়েদের মানুষ করা—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা গত কয়েক সংখ্যায়—শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উক্তির সারাংশ প্রদান করেছি, এবং শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের প্রবন্ধ এখানেই শেষ হ'য়ে গেল।

ছেলেমেয়েদের কিভাবে প্রকৃত মানুষ করা যায়—এ নিয়ে তিনি আমাদের পিতামাতাদের ও ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিকোন হতে সুবিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আমাদের অজ্ঞতা কি ভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন নষ্ট করে দেয়, পিতামাতার অজ্ঞতা ও ছেলেমেয়েদের প্রতি অসজ্ঞা, অনাচার তাদের কি করে পঙ্গু করে ফেলে। উপযুক্ত লক্ষ্যভুক্তির অভাবে, সাহায্যের অভাবে উৎসাহের অভাবে তারা হামাগুল

বাউল গান

শ্রীনিত্যানন্দ দাস

বা কিছু তোর বিলিয়ে দিয়ে হ'লি আপনহারি।

পথের ধূলায় সঙ্গে আজি একলা কেঁদে লারা ॥

আপন ভেবে ছিল থাকে,

পড়'লি তারই ঘোর বিপাকে,

শুভ ঘরে রইলো পুঁজি কেবল অশ্রু-ধারা ॥

ভুল করে ফুল তুলতে গিয়ে ফুটল কাঁটা হাতে;

ভেবেছিলি উঠবে শী গভীর আধার রাতে।

আশার-স্বপন-মায়ার ছিলে

ডুবলি রে তুই অতল জলে

চায়না ফিরে তোর পানে কেউ আপন ছিল যারা।

—*

মনোরত্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। পিতা

মাতার ব্যবহার পারিপাশ্বিক আবহাওয়া

প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের জীবনকে গঠিত

ক'রে—এ কথা সবটুকু জানি না যেটুকু

জানি তাও পরিণত করবার মত সুযোগ

আমাদের আসে না আর এলেও তার

সুব্যবহার আমরা করি না—এভাবে

নিজেদের অবজ্ঞায়, অজ্ঞতায়, অলসতায় ও

পারিপাশ্বিক উপযুক্ত আবহাওয়া না পাওয়ার

ফলে আমরা আমাদের জীবনকে নানাবিধ

দীনতায় ভরিয়ে তুলেছি এবং যারা আমাদের

চার পাশে তাদের কলহাশ্রু আনন্দ

উৎসবের সূচনা করে তাদেরও অতি শৈশব

থেকে আমাদের দীনতায় ভরিয়ে তুলি দাঁত

করে তুলি—ভাঙ্গ কাপুক্ষ্য করি—এ ঘোষ

এ পাপ আমাদের। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত খুব

সহানুভূতি দিয়ে “ছেলেমেয়েদের মানুষ করা”

নানা দিক থেকে আলোচনা করেছেন—

আশাকরি বাংলার মায়েরা ও মেয়েরা

এ থেকে উপকৃত হ'তে পারবেন। আমরা

সুবিভূত ভাবে এ সমস্ত আলোচনা

করবো বারাস্তরে—আপনার মতামতের

আশা রাখি ॥ —দল্লপাটক, মহিলা মহল]



(দ্বি, দ্বি)

লর্ড টেনিসনের দলের

কলিকাতায় দ্বিতীয় খেলা

কলিকাতায় লর্ড টেনিসনের দলের

দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক টেস্ট ম্যাচটি ছাড়াও

আরও একটি খেলার বন্দোবস্ত আগে থেকেই

হয়েছিল। এই খেলাটি কুচবিহারের

মহারাজার একাধিপত্যের সঙ্গে। কুচবিহারের

মহারাজার এই দলটি বাংলার বাছাই করা

বাকালী ও ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়দের

নিম্নে গঠিত হয়েছিল। সুতরাং এই

খেলাটিতে প্রকৃতপক্ষে বাংলা প্রদেশের

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের শক্তি পরীক্ষা হয়েছে

বলা চলে। মহারাজার দলে যে সকল

খেলোয়াড়েরা খেলার জন্য নিৰ্বাচিত হয়ে-

ছিলেন তাঁদের মধ্যে স্টুটে ব্যানার্জি ইচ্ছা

থাকা সত্ত্বেও যোগদান করতে পারেন নি

এবং তাঁর পরিবর্তে কলিকাতা টাউন ক্লাবের

আলেকজেন্ডারকে মনোনীত করা হয়।

কিন্তু শেষ অবধি খেলার দিনে তিনি যোগদান

করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বালীগঞ্জ

ক্রিকেট ক্লাবের স্টুটকে দলভুক্ত করা হয়।

স্টুটে ব্যানার্জির এই দলের পক্ষে না খেলার

কারণ তাঁকে তাঁর মম্বি নওয়ানগরের

জামলাহেবের আবেশ অনুযায়ী নওয়ানগর

দলের পক্ষে ‘রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার’

খেলার জন্য এই খেলাটি আরম্ভ হবার আগেই

বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

তাছাড়া বাংলার শ্রেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ বাকালী

ব্যাটসম্যান কার্তিক বসু অসুস্থতা বশতঃ

খেলার প্রথমদিন লম্বাঘু করেক ঘট

ফিল্ডিং করার পর মাঠ পরিত্যাগ করে

চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি এই খেলাটিতে

আর যোগদান করতে পারেন নি। ক্রিকেট

খেলার আইন অনুযায়ী মহারাজার দলের

বাকী দশজনকে ব্যাট করতে হয়। তবে

কার্তিক বসুর বদলে দ্বাদশ ব্যক্তি খাসাটা

ফিল্ডিং করেছিলেন। এই খেলোয়াড়টি

কলিকাতা পার্শ্ব দলের লতা।

• যদিও টেস্ট ম্যাচটি খেলা হবার দুদিন

পরে এই তিনদিনব্যাপী খেলাটি আরম্ভ

হয়েছিল তা হলেও লর্ড টেনিসনের দলের

নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে দুচরজন

শারীরিক আঘাত ও অসুস্থতার জন্য এই

খেলাটিকে যোগদান করতে পারেন নি।

অসুপস্থিত এই খেলোয়াড়গুলির মধ্যে

বিখ্যাত, শক্তিশালী দুইজন বোলার গোভার

এবং ওয়েলার্ডের জন্য এই দলের অধিনায়ক

লর্ড টেনিসনকে প্রথমে একটু চিন্তিত হতে

হয়েছিল। তবে খেলার শেষে অনেক

মন্তব্য করেছিলেন যে কুচবিহার দলের

নিভাস্ত ভাগ্য বলতে হবে যে গোভার ও

ওয়েলার্ড এই খেলার অংশ গ্রহণ করেন

নি। কারণ তাঁরা দুজনে থাকলে কুচবিহার

দলের পরাজয়ের প্রাণি হয়ত আরও অনেক-

খানি বেড়ে যেত। গোভার টেস্ট ম্যাচটি

খেলার সময়ই হাঁটুতে আঘাত পান এবং

দ্বিতীয় ইনিংসে রান করার জন্য ‘সাবস্টিউট’

নিতে বাধ্য হন। খেলোয়াড়দের এই

খেলাটিতে অংশ গ্রহণে অক্ষমতার জন্য লর্ড

টেনিসনকে নিয়মিত খেলোয়াড়ের সংখ্যা

পুরণ করার জন্য বাংলা ও আশাম দলের অধিনায়ক ও নামকরা খেলোয়াড় এ এল হোলির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। টেস্টে যে এগারজন লর্ড টেনিসনের দলের পক্ষে খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে এডরিচ, গোভার ওয়েলার্ড এবং ইয়ার্ডলে দ্বিতীয় খেলাটিতে যোগদান করতে না পারায় তাঁদের স্থলে এ এল হোলী, পিওলস, ভিম্ পার্কস ও ক্যাপ্টেন জেমিন্স খেলেছিলেন। বহিঃ এদের মধ্যেও লকলেরই ক্রিকেট খেলার বেশ সুনাম আছে তাহলেও লর্ড টেনিসন্ টেস্ট ম্যাচটিতে পরাজিত হবার দরুণ এই খেলাটি শেষ হওয়ার আগে অবধি তাঁর নিজ দলের জয় লক্ষ্যে সন্দিহান ছিলেন।

বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেনে এই তিন দিন ব্যাপী খেলাটি আরম্ভ হয়। এই খেলাটিতে জন সমাগম বিশেষ হয় নি, তার কারণ গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ম্যাচটি হয়ে যাবার পর এই খেলাটির ফলাফলের জন্য ক্রীড়ামোহীদের আগ্রহ অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। বিলাতী দল টেসে জয়লাভ করে, প্রথমে ব্যাট করতে আরম্ভ করেন এবং সারাদিন ব্যাট করে সাত উইকেটে মোট ২৪৮ রান করেন, দ্বিতীয় দিনে বেলা বারোটা পর্যন্ত খেল লকলে আউট হয়ে যান এবং মোট ৩১৬ রান হয়। এই ইনিংসে পার্কস, ল্যাংরিজ ও পোপ খুব ভালভাবে ব্যাট করে যথাক্রমে ৮৯, ৮৩ এবং ৪৪ রান করেন। জে, এন্ ব্যানার্জি ৮৩ রানে তিনটি উইকেট পান। তারপর কুচবিহার দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন এবং বিকাল ৪-১৫ মিঃ অবধি

খেলে লকলে আউট হয়ে যান এবং মোট ১৬৭ রান করেন। যাত্রা এক রান বেশী করার জন্য মহারাজার দল 'কলো অন্' করবার অসম্মান থেকে অব্যাহতি পান। ঐ দিনেই ৪-৩৫ মিনিটের সময় লর্ড টেনিসনের দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করেন এবং খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত হার্ডটাক ও ওয়াক্টিংটন নট আউট থেকে যথাক্রমে ৩১ ও ১৭ রান করেন। তৃতীয় দিনে আশ্চর্য্য খেলবার পর ওয়াক্টিংটন ৪৩ রান করে আউট হয়ে যান। তারপর পোপ ব্যাট করতে আসেন এবং বেলা পৌঁছে বারোটা অবধি খেলে হার্ডটাক ৬৪ ও পোপ ১৩ রান করে নট আউট থাকেন। মোট এক উইকেটে ১২১ রান হবার পর লর্ড টেনিসন ডিক্লেয়ার করেন এবং কুচবিহার দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলা আরম্ভ করেন। মহারাজার দল বেলা বারোটার সময় খেলা আরম্ভ করে বেলা আড়াইটার সময়ে লকলে আউট হয়ে মোট ৮৩ রান করেন। এই ইনিংসে কুচবিহার দলের খেলোয়াড়েরা খুব নিশ্চিন্তভাবে খেলেন এবং লক্ষিত ২২ রান করে লকলের চেয়ে বেশী রান করেন। 'পোপ ও ল্যাংরিজের বোলিং উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁরা যথাক্রমে ৩৫ রানে ৫টি এবং ২২ রানে ৪টি উইকেট পান। কুচবিহারের দল ১৮৭ রানে পরাজয় স্বীকার করেন।

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচঃ—

আগামী ১২ই ও ১৩ই এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী লর্ড টেনিসনের দলের সঙ্গে 'লিওল দল' এবং 'আপ কানট্রি একাদশের' সঙ্গে বলদ্বোভে দুটি ম্যাচ খেলার বন্দোবস্ত

হয়েছিল। কিন্তু সিংহলের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করতে অক্ষমতা জানানোর জন্য এই খেলা দুটি লর্ড টেনিসনের ভ্রাম্যমান খেলার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং ঐ কটা দিন লর্ড টেনিসনকে লন্ডনবলে অকেজো হয়ে দিন কাটাতে হয় বলে ভারতের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষেরা ঐ কদিন পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করেছেন। এই চারদিনব্যাপী টেস্ট ম্যাচটি আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই নগরে খেলা আরম্ভ হবে। লক্ষ্যবৃত্তঃ এই খেলাটি শেষ করেই পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই বন্দর থেকে 'ঘরের হেলেরা' ঘরে ফেরার জন্য লম্বুয়াত্যা করবেন। কলিকাতায় তৃতীয় টেস্ট ম্যাচটি হারবার পর লর্ড টেনিসনের আর একটি বেশী অর্থৎ পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য খুব আগ্রহ হয়েছিল এবং ঘটনাচক্রে তা সম্ভবও হয়েছে। মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্টে যদি নিখিল ভারতীয় দল তৃতীয় টেস্টের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাহলে বোম্বাইয়ের পঞ্চম টেস্ট ম্যাচটির গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যাবে। কারণ এই খেলাটির জয় পরাজয়ের উপর 'রাধার' জয়লাভ নির্ভর করবে। তবে যদি চতুর্থ টেস্টে নিখিল ভারতীয় দল পরাজিত হয় তাহলে বোম্বাইয়ের খেলাটির তত আকর্ষণ থাকবে না। বাক বোম্বাই নগরই শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা করল। বোম্বাইয়ের অধিবাসীরাই লর্ড টেনিসনের দলকে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে আলাতে অভ্যর্থনা করে জাহাজ থেকে নামিয়ে আনেন আবার তাঁরাই বিদেশ ছেড়ে স্বদেশে যাবার সময় বিদায় অভিনন্দন জাখবেন।



GRAM: "ADNIVAG"

ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

খেয়ালী চিত্রপট



প্যারামাউন্টের রঙীন ছবি “এব্ টাইড”-এর
একটি দৃশ্য। ছবিখানা রিগ্যালো দেখান হচ্ছে।



টেলিগ্রাম
'ভ্যারিটি'

পরিচালক
আশুনাথ নিউজপেপার্স লি:

টেলিফোন
সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই মার্চ ১৩৪৪, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫৮

বাংলার কংগ্রেসী মিশ্র মন্ত্রী-মণ্ডল

সুভাষচন্দ্রের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিকে সাদর সম্বর্ধনা করিতে বাঙ্গালী মাত্রেই তৎপর—ইহা স্বভাবিক। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিপুল জনতাকে উদ্ভূত করিয়া সুভাষচন্দ্র আবেগময়ী বক্তৃতায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করেন।

চলিত বৎসর বাংলার বাহিরে উদ্দীপক জীবন বাপন করিয়া ভূতপূর্ব অখ্যাত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য অধুনা প্রখ্যাত মানবেন্দ্রনাথ রায় রূপে কলিকাতায় আগমন করিয়া বামপন্থীমতবর্গের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় তাঁহার সম্বর্ধনায় বিরোধিতা করিয়া যে শোচনীয় মনোবৃত্তির পরিচয়

দিয়াছেন তাহা অশেষ মিন্দনীয়। শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রজনী মুখোপাধ্যায় সোৎসাহে রায়-পন্থী বনিয়া গিয়াছেন। অন্তর আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক কর্ম্মীবৃন্দ কোনরূপ স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করিতেছেন না। সুতরাং মানবেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলার শ্রমিকনেতৃ ও কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে যে আতঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে তাহার পরিণতি কী হইবে তাহা প্রাধিকারযোগ্য। মানবেন্দ্রনাথের কিরাট ব্যক্তিত্বের চাপে সহজ-প্রস্তুতি শ্রমিকনেতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও বিলোপ সাধনে বিন্মিত হইবার কারণ নাই

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নিখিল ভারতের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে অপসারিত হওয়ার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদে কে আসীন হইবেন তাহা লইয়া এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। নবগঠিত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কোন দল প্রাধান্য লাভ করিবে তাহা এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না। শ্রমিকদল, খাদি-দল ও মজুমদার দলের মধ্যে কে কোন পক্ষে রূপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন তাহা এখনও অনিশ্চিত।

অপন্থ পক্ষে লোকচন্দ্রের অন্তরালে এক কুহেলী সন্ধ্যায় বিরলা পার্কে গুপ্ত-মন্ত্রণার বৈঠক বসে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই মাননীয় অর্থসচিব সরকার মহাশয়, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ও বিরলা মহাশয়কে সাথী করিয়া ত্রীপাঠ ওয়ার্ডায় মহাত্মাজীকে সকাশে বাংলার “খরোয়া রাজনীতি” সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বান। নাগপুরের “হিতবাদ” সংবাদপত্রে প্রকাশ যে হরিপুরা কংগ্রেসের পর মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিবেন এবং কংগ্রেস-পন্থী একদল লোক বিশ্বাস করেন যে বাংলার

কংগ্রেসী মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে তাঁহারা মহাত্মাজীর সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবেন। বিস্ময়ের বিষয় যে ‘বাংলার ঘরোয়া রাজনীতি’ সম্বন্ধে মহাত্মাজীকে ওয়াকিবাহাল করিবার যোগ্যতর ব্যক্তি হইতেছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিরোধীদের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এরূপভাবে উপেক্ষিত হইবার কারণ কি? কংগ্রেসী মিশ্র মন্ত্রী মণ্ডল গঠিত হইলে তিনি কি পরিষদের সভ্যপদরূপে বিরাজ করিবেন? যদি এ আশঙ্কা সত্য হয় তবে তাঁহার স্থলে নেতা হইবেন কে? ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তা’ পরিষদেরও সভ্য নহেন তবুও দেখিতেছি তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিখিল ভারতীয় দরবারে অটুট। ডাঃ রায় মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধান মন্ত্রী হইবেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইবেন সে সম্বন্ধেও মতবৈকল্য আছে। মিশ্র মন্ত্রী মণ্ডল হইলে মন্ত্রীবর্গের বেতন কোন হারে নির্দ্ধারিত

হইবে? এ সব প্রশ্ন স্বতঃস্ফূর্ত হইলেও এখন অমিমাংসিত—তবে মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত হইতেছে যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মাননীয় অর্থসচিব মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে দণ্ডাদেশ বাহাল আছে তাহা বাতিল করিতে হইবে এবং তাঁহাকে পবিত্র গঙ্গাজল সিঞ্ঝনে পূত করিয়া শুদ্ধি করিয়া লইলে তাঁহার ও বিরলা মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী চূর্ণ করিয়া মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠন দুরূহ হইবে না। সহযোগী ‘আনন্দ-বাজার পত্রিকা’ মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠন সম্ভাবনায় ‘বিষময় পরিণামের’ কথা ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের নেতা শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এই ‘বিষময় পরিণামের’ বিরোধিতা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? আমরা শুধু শরৎচন্দ্রের স্থায় শক্তিশ্বর পুরুষের এই শোচনীয় ক্রৈব্য ও নিরপেক্ষতায় ব্যথিত।

<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">কু</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">পো</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">র</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">ঝ</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">ম</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">কো</p> </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">কু</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">পো</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">র</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">ঝ</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">ম</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">কো</p> </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">কু</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">পো</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">র</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">ঝ</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">ম</p> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">কো</p> </div>
---	---	---

পরিচালক
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভিও
লালমণি রায়

ব্যবস্থাপক—
বিজ্ঞান মল্লিক
নীলমণি রায়



শ্রীমঙ্গিনাথ

মঠ বলিতে এখন বাঙ্গালা দেশে একটি মাত্র স্থানকেই বুঝায়—তাহা বর্তমান বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মানব স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মক্ষেত্র বেলুড় মঠ। স্বামীজি একদল ত্যাগী সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিয়া যে সেবা ও ত্যাগ ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার গতি আজ ভিন্নমুখী হইলেও তাহার তেজ এখনও একটুও ম্লান হয় নাই। সম্প্রতি এই মঠে দুইটি স্মরণীয় মহোৎসব হইয়া গিয়াছে—একটি গত পৌষ সক্রান্তির দিন—দেহিন মঠের কেন্দ্রস্থলে এক বিরাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়া গিয়াছে— সেই মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি খেত পাথরের মূর্তিও স্থাপিত হইয়া তৎক্ষণি পূজিত হইতেছে। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল, তাহার গুরুদেবের চিত্তভঙ্গ রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মঠের বর্তমান সভাপতি, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একজন এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, স্বামীজি বিজ্ঞানানন্দের দ্বারা তখন মন্দিরের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, সেই পরিকল্পনা অনুসারে এই নূতন মন্দির নির্মিত হইল। এতদিন অর্থাভাবে মন্দির নির্মাণ কার্য সম্ভব হয় নাই; সম্প্রতি স্বামীজির

দুইজন মার্কিন মহিলা-শিষ্যা প্রায় ৭ লক্ষ টাকা দান করায় সেই অর্থের মন্দির হইয়াছে। মন্দিরটি আগাগোড়া চুনায়ের পাথরে ঢাকা মার্টিন কোম্পানী মন্দির নির্মাণের ভার লইয়াছিলেন। নাইট মন্দির নির্মাণ এখনও শেষ হয় নাই। বাহিরের অংশ সম্পূর্ণ হইলেও ভিতরের কাজ বাকী আছে। মূল মন্দিরের ভিতরটি মর্ম্মর পাথর মণ্ডিত। তথায় শ্রীযুত নন্দলাল বসুর পরিকল্পিত বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাণ্ড মূর্তি বসান হইয়াছে। মূর্তিটি সাধারণ মানব দেহ অনুপ্ৰাণিত রূপে। বেলুড়ে যে স্মরণীয় মন্দির নির্মিত হইল, সেরূপ বড় মন্দির বাঙ্গালা দেশে বোধহয় আর কোথাও নাই।

বেলুড় বর্তমান যুগে বাঙ্গালার অগ্রতম তীর্থক্ষেত্র। তথায় ইতিপূর্বে রাখাল মহারাজের, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ও স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে এতগুলি মন্দির দূর হইতে দর্শনের যোগ্য বটে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিন মঠে প্রায় ৫০ হাজার লোকসমাগম হইয়াছিল। দেহিন তথায় প্রায় ৩০ হাজার ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। কালী হইতে পণ্ডিত আনাইয়া হোম, যজ্ঞ প্রভৃতির

আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু দেহিনকার একটি দৃষ্টান্ত সকলের সমালোচনার বিষয় ছিল। তীর্থক্ষেত্রে সকল যাত্রীই সমান আদরের পাত্র—কিন্তু মঠের কর্মচারী দেহিন মঠের দক্ষিণাংশে একটি কীক? মাঠে চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া তাহার তলার টেবিলে চোয়ারে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য, শুধু ধনী ব্যক্তি-দ্বিগকেই ঐ সকল চোয়ারে বসাইয়া টেবিলে থাবার দেওয়া হইতেছিল। সে সময়ে মন্দির সংলগ্ন প্রসাদ বিতরণের স্থান হইতে দূরে দূরে ভক্তগণ প্রসাদান্তাবে ফিরিয়া যাইতেছিল। (তাহাদিগকে সাধারণভাবে খেঁচুরায়ই দেওয়া হইতেছিল)। সেই সময়েই অপর পার্শ্বে একদল কোট প্যান্টধারী বাঙ্গালীকে চোয়ারে বসাইয়া পাওয়ার সত্যট দৃষ্টিকটু নহে কি? স্বামীজি সাধারণ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—সেই স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত মঠেই যদি এইরূপ ব্যবহার বৈষম্য দেখা যায়, তবে তাহা দুঃখের বিষয় নহে কি? যাহা হউক, দেহিন মঠের কর্মচারী সমাগত ভক্তগণের সুখ সুবিধা বিধানের সকল ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় উৎসব হইয়াছে—৮ই মাঘ। সে দিন স্বামীজির (বিবেকানন্দ) ৭৬তম জন্মতিথি। সে দিনও মঠে বহু লক্ষ ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। পূর্বদিন মাত্র ৪০ মণ চাল ডাল দ্বিত্ব করার পরে প্রসাদের অভাব পড়িয়াছিল—দ্বিতীয় দিন কিছু সেরূপ হয় নাই। লক্ষ্য পূর্ণ্যকালে সমাগত ভক্তদ্বিগকে খেঁচুরায় প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। প্রথম



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

দিনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্তের কীর্তন শ্রুত হইয়াছিল—দ্বিতীয় দিনে কিশোরী বাবুর কীর্তন হাড়াও হই বল লোক কালীকীর্তন গান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে মঠের পুরাতন গৃহের পূর্বদিকস্থ গঙ্গাতীরের মাঠে স্বামীজির এক স্মৃতি স্তম্ভের অধিবেশন হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি-লি (বিজয়চন্দ্র) চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রথমে আমেরিকা প্রত্যাগত স্বামী অখিলানন্দ ও বোম্বাইস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি, স্বামী বিশ্বানন্দ ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উভয়েই বাঙ্গালী, “কাজেই বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতাই শোভন হইত। উভয়েই বেশ ভাল ইংরেজি বলিতে পারেন। স্বামী বিশ্বানন্দের বক্তৃতার তীক্ষ্ণ ধার ছিল—তাহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইতেছিল, তাহার মত লোক রাজনীতি ক্ষেত্রে নাথিলে একদিন হয় ত কংগ্রেসের সভাপতি হইতে পারিতেন। বাহা হউক, তৃতীয় বক্তা অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমারধরকার বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বক্তৃতা শুনিবার সময় মনে হইতেছিল, তিনি বক্তৃতা না করিলেই ভাল করিতেন। এরূপ মাত্রাজ্ঞান-হীন লোক খুব কমই দেখা যায়। তাহার ভাষায় ত মাথায়ও নাই—তাহার উপর তিনি এক এক সময়ে এরূপ অশ্লিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিতেছিলেন যে, তাহা লোকের কর্ণেই কিম্বৎ শ্রুত হইতেছিল। বিনয়বাবু মঠে শিষ্য কি না জানি না—কিন্তু তাহার অশ্লিষ্ট উক্ত শুলি বোধ হয় মঠের বন্দী সন্ন্যাসীরাও বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। কারণ স্তম্ভের পর তাহার মধ্যম ও এ বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। সভা সম্পর্কে আর একটি কথা আছে। সভাপতি মহাশয় চেয়ারে বসিয়া সভা পরিচালনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি একটি ‘মাত্র’ কথা না বলিয়াই বিনয়বাবুর বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ

করিয়া যেন। আমরা যুবক বিজয়চন্দ্রকে ধৈর্যশ্রী, তিনি তখন কংগ্রেসের নেতৃক ছিলেন, বহু স্তম্ভের তাহার ইংরেজি ও বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনিয়াছি, বহু কর্মক্ষেত্রে বন্দীরূপে তাহাকে দেখিয়াছি। তখন অবশ্য তিনি এত বড় ব্যারিষ্টার হন নাই। সে দিন স্তম্ভের সভাপতির আগমন গ্রহণ করিয়াও তিনি বক্তৃতা না করার আশ্রয় হত্যাশ হইয়াছি। ব্যারিষ্টারী ব্যাপদেশে তাহাকে এখন অনেক বক্তৃতা করিতে হয় যদিও তিনি আর লাভারণ স্তম্ভের বক্তৃতা করিতে চাহেন না। তিনি স্বামী রিবেকানন্দের ভক্ত, মঠের একজন শুভার্থী বহু। সেই জন্যই সেদিন ঐ স্তম্ভের মঠের কর্তৃপক্ষ তাহার সভাপতি করিয়াছিলেন। কাজেই তাহার পক্ষে বক্তৃতা না করা সেদিন সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

মঠকে আমরা তীর্থক্ষেত্ররূপেই দেখি—সেজন্য ব্যক্তি যত্নসহ মঠ সম্বন্ধে ক্ষিপ্ত লম্বালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। দ্বিতীয় উৎসবের দিনেও মঠের কর্তৃপক্ষের আশ্রয় আপ্যায়নের অভাব ছিল না। নব নির্মিত মন্দির দর্শনের জন্য শুনিলাম, প্রত্যহ ৩৪ হাজার ভক্ত তথায় গমন করিতেছেন।

গান (আধুনিক) শ্রীমুখীল মুখোপাধ্যায়

প্রাণের স্রব যবে বেজে যায়
অবিরল ধারে
বাতায়ন পাশে বসি খুঁজি মোর
হারানো প্রিয়ারে।
বাঘল রিমি রিমি—
রিমি রিমি রিমি রিমি
খুঁজিয়া পাইবু ওগো তারে
বাতাল কাঁদিয়া করে
অবিরল আঁখি লোরে
হারারে কলিঙ্গ তারে—
বাঘল বিরহ স্রব কহিল সে—
গেছে বহু দূরে।

মন্দিরের নির্মাণ কার্য এখন ও শেষ হয় নাই। শেষ হইলে উহা যে আরও কত বিরাট ও সুন্দর হইবে তাহা বলা যায় না। আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই বাঙ্গালার এই গৌরব—নূতন মন্দির দেখিতে অনুরোধ করি। স্বামীজির এক ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া মন্দিরে রূপধারণ করিয়াছে তাহার অপর ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া কেব বাঙ্গালী জাতি আত্ম-নির্ভর হইবে—তাহার প্রতীকার আমরা দিন গণনা করিব।



খ্রীষ্টা সন্নিহার তৈল

মিল ও অফিস ২৪০ আপার মারফেলার রোড কর্ণওয়ালিস ফোর্স বিল্ডিং ১৭৪



(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

বাঙলার বাহিরের প্রতি প্রদেশে হিন্দী 'বিভাপতি'-র অভাবিত লাকলোর কথা আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছি। ছবিখানির জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লক্ষ্যই সমানভাবে দর্শক আকর্ষণ করেছে জেনে আমরা গৌরব বোধ করছি।

সম্প্রতি দেবকীবাবু তাঁর পরবর্তী চিত্র 'নিমাই লক্ষ্মী'-এর চিত্র-নাট্য রচনার তাঁর লক্ষ্যমুখের নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন। লক্ষ্যমুখের পরিচালক হিসেবে দেবকীবাবুর সঙ্গে এবার কাজ করেছেন শ্রীযুক্ত মহুজেন্দ্র নাথ তাল (চন্দ্রশেখর), শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মিত্র এবং শ্রীমান অপরূপ মিত্র।

বাঙলা বিভাপতি সম্বন্ধে: মার্চমাসে 'চিত্রায়' মুক্তিলাভ করবে।

নারিক লক্ষ্মী তার শেষ আশ্রয় হারিয়ে একদিন পথের বার হতে বাধ্য হোল। হারিয়ে জীবন! কোথায় স্বামী, কোথায় তার ভগ্নির আশ্রয়! দুর্জয় লাহলে ভর করে, জমশেদপুর বাঙলো ছেড়ে, এক ছুঁয়োগের রাতে লক্ষ্মী একাকিনী পথের বার হোল। সেই বাত্মা পথে, অন্তর্কিতে বার লক্ষে দেখা সে লক্ষ্যের লক্ষ্য পরিচিত প্রস্থ। তারপর কেমন করে প্রথম তার জীবনের লক্ষে জড়িয়ে গেল—কী তার পরিণাম, অভি-জ্ঞান এর পরবর্তী অংশে তাই সূচিত হবে।

সম্প্রতি একদমর ষ্টিভির নব নির্মিত

'লাউণ্ড-ক্লার'-এ, যে দৃশ্যটি তোলা হচ্ছে, তাতে দেখতে পাই—নারিক লক্ষ্মী প্রমথের সঙ্গে তার কাশীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভাগ্য বিঘ্নিত লক্ষ্যের জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘুরো হোল, তার উৎস এখানেই।

শ্রীমতী মলিনা ও শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়—লক্ষ্মীও প্রমথের ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

আপাততঃ পরিচালক বজ্জা তাঁর আগামী চিত্রের নামকরণ করেছেন—'লাখী'। হয় ত শেষ পর্যন্ত এ নামটিও পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু যে নামেই ছবিখানি সাধারণের কাছে মুক্তিলাভ করুক না কেন। ছবির কাহিনীটিই আমাদের আলোচনার বস্তু।

ধনীও নিধন—লম্বাজের বৃকে প্লাশাপাশি বাস করে। একদিকে বিলাস এবং একদিকে তার দৈন্য। এরই অন্তরালে, লম্বাজের বিভিন্নস্তরের ছিট নারীর জীবনে সে সংঘাতের সূচনা হোল—ছবির শেষে তারই পরিণাম আমাদের ভাবিয়ে তুলবে।

যে লম্বাজকে অবলম্বন করে, তারতর অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ শিল্পী, এই কাহিনীটিকে নিপুণ ভাবে স্নায়াকারে লাগিয়ে তুলেছেন, তার দীর্ঘাংলার ইঙ্গিত ছবির মধ্যেই পরিচ্ছন্ন হবে। আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত যোদ্ধাটুকু যাতে আধুনিক নরনারীর অন্তর স্পর্শ করে, ছবির মধ্যে সে শ্রেণীর মাল মশলারও অভাব

হবেনা। মুক্তি চিত্র যে লক্ষীভের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মন আকর্ষণ করেছে—বর্তমান চিত্রে সে মাধ্যম যে পুরোমাত্রায় অনুন্নত থাকবে, পরিচালক বজ্জার কাছে এটা আমরা অবশ্য আশা করতে পারি।

নীতিন বহু পরিচালিত 'দেশের মাটির' কাজ বেশ ক্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ষ্টিভির ভেতর যে ভাবে একটা পেট তৈরী হয়েছে তা বাস্তবিকই দুন্দর। শিল্পী অর্জুন রায়ের পরিকল্পনা এই চমৎকার পেটটি তৈরি হয়েছে। গেল রক্তমবার এই অতি আধুনিক পেটে অর্থাৎ অরণ্যের বাড়ীর মাধ্যম করে কীট নেওয়া হয়েছে। এটি দৃশ্য অরণ্য (চন্দ্র ও কমলেশ্বরী) তার ভাইএর কাছ থেকে অশোক (লাইগাল) আর গৌরি (উমা)র বিয়ের কথা প্রথম সূত্রে পেল। ব্যাথাটা পাড়ে ভাইএর কাছে ধরা পড়ে যায় এই যে ভয়—সে অধঃস্থটাকে কুটিয়ে তুলতে একমাত্র চন্দ্রার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

কালী ফিল্মস

এদের রঙ্গরঙ্গের অবদান শচীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের লক্ষ্মীনাথ বিবাহোৎসবের বনলতা ও শ্রীমতীর ড্রিংকমের পেট গেল হস্তার তোলা শেষ হয়ে গেছে। এই দু'টি পেট আধুনিক ভাবে লজ্জিত করা হয়। এখানে তরুণ-তরুণীদের হাস্যরসে এবং প্রেমের, নানারকম আদর্শ প্রদানে এই দু'টি

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চ

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বস্তু পানীয়

স্থর হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ভূমিকায়
জীবন গাজুলী, যীরাজ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ হরেন
মুখার্জী, বীনা, উর্বাদেবী, নাবিজী প্রভৃতি—
শোনা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন রূপলঙ্কার ও কথা-
বার্তার তাঁরা এই দৃশ্য বিশেষ চমকপ্রদ করে
তুলেছেন।

সর্বজনীন বিবাহোৎসব আধুনিক সমাজের
হালচালের এক অভিনব কাহিনী। সুপ্রসিদ্ধ
লেখক সেই তথ্যগুলি একত্রীভূত করে রূপ ও
রসের ভেতর দিয়ে সজীবিত করে
তুলেছেন। শুধু নিছক হাস্য হাসিই এই
ছবির উপস্থান নয়—হাসির ভেতরই সেখান
প্রচ্ছন্নভাবে সমাজের প্রগতিক যে কটাক্ষ
পাত করেছেন—তাও ভাববার ও শিখবার।
গল্পের দ্রুত ছবিখানাও যাতে প্রথম শ্রেণীর
হয় তার জন্য প্রয়োজক প্রিয়নাথ গাজুলী,

পরিচালক লতু মেন, চিত্রশিল্পী সুরেশ দাস,
শব্দ-শিল্পী জগদীশ বসু, কান্ন শিল্পী পরেশ বসু,
সুর-শিল্পী কমল দাশগুপ্ত এবং ব্যবস্থাপক
লতীশ লরকার প্রভৃতি চেষ্টার কন্ঠর কোরুছেন
না। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়াতেই
আগ্রহান্বিত দর্শকবৃন্দগণকে নব রস পরিবেশন
কোরবে “সর্বজনীন বিবাহোৎসব”।

“এ’ ইউনাইটেড রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক
গল্প “চোখের বাগি”র চিত্রগ্রহণ কার্য্য ধীরে-
ধীরে এগিয়ে চলেছে। গল্পটি মনস্তত্ত্বমূলক—
এর প্রতিটি কথার ভেতরই অন্তর্নিহিত, মানে
আছে। সেই জন্য পরিচালক লতু মেন
ছবিখানা যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিস্মার
না করে তার জন্য চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে
ধীরে ধীরে কাজ করছেন এবং সেইজন্যই

যাতে অভিনয়ের দিকেও চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব
অভিনেতৃত্বকে লম্বাক উল্লসিত কোরতে পারেন
—তার জন্য এই ছবির শিল্পী মনোমগ্ন করা
হ’য়েছে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতা লক্ষ্যবাহী
থেকে। মিঃ বি, পি, মেহরা এই ছবির
তত্ত্বাবধানা করছেন।

ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স

স্ব-সাধনার অভিনয়ের পালা এতদিন
চলছিল মহৎগতিতে। এখন শুদ্ধি “অভিনয়”
চলছে দ্রুতগতিতে। জীবন-নাট্যের এ
“অভিনয়ের” পরিণতি কোথায়? কে বলতে
পারে।

‘দেবদত্ত ফিল্মস্’

রবীন্দ্র নাথের “গোরা”র স্টুডিং এ হল।
থেকে আরম্ভ হল। “গোরা”র ভূমিকালিপি
আমরা পূর্বেই জানিয়েছি। কেবল সূচ-



“বেশের বাটা”-র একটি দৃশ্য

রিতার ভূমিকার ঠিক কে নাশবেন তা জানা যায়নি এ হস্তায়েও জানাতে পারব না—কারণ উক্ত চরিত্রোপযোগী অভিনেত্রী এরা এখনও মনোনিয়ন কোরতে পারেননি। তবে শোনা যাচ্ছে, এরা এই ভূমিকার উপযুক্ত অভিনেত্রী খুঁজছেন। কর্তৃপক্ষের এই লং লক্স বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

মেট্রোপলিটান পিক্চাস

ডি-জি "হাল বাঙলা"র শূটিং নিয়ে এখন মশগুল। নতুন ধরণের 'কমেডি' হিসেবে "হাল বাঙলা" ডি-জিকে চিত্রযাজ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত কোরতে পারে তা' হলেই আমরা সুখী হব।

রাশা ফিল্মস

কালী প্রসাদ ঘোষের পরিচালনার পৌরাণিক চিত্র "শুকসোত্তমের-আমুস্মিক কাজ শেষ হয়েছে। এর বেশী কোন খবর আমাদের পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়।—কারণ, এখানকার কোন খবরই এদের প্রচার বিভাগ থেকে অতুনা আমরা পাই না।

হাজরা পিক্চাস

বাঙলা নরনারীর চির আধরের পুণোজ্জ্বল কাহিনী "দেবী ফুলরা"র চিত্রগ্রহণ কার্য প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হয়ে এল। "দেবী ফুলরা"-র যে কাহিনী যুগ যুগান্তর ধরে ভারতবাসীর মনোমন্দিরে জাগরুক রয়েছে। চিত্রশটে সেই বিচিত্র কাহিনী যে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রাণে এক নতুন আবেশন তুলবে, একথা বলই বাহুলা। ছবির পরিচালক হচ্ছেন তিনকড়ি চক্রবর্তী—এই ছবিখানা তাঁর মত প্রবীনের হাতে বিশেষভাবে রূপান্তরিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা শুনলাম অভিনয় থেকে আরম্ভ কোরে দৃশ্যপট, লাজলজ্জা, আনবাব পত্র, কোন বিষয়ে যাতে লোকে নিন্দা কোরতে না পারে, চক্রবর্তী মশাই। সেই দুটিকেই বিশেষ] লক্ষ্য রেখে কাজ কোরছেন। অতদ্বিক, সুবিকৃতি

লাহা, বতীন মত ও পরেশ বহু বথাক্রমে আলোকচিত্র, শব্দময় ও শিল্প নির্দেশনার বাতে তাঁদের সুনাম আরও বর্দ্ধিত হয় সেই চেষ্টাই কোরছেন। আমরা এই নবজাত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যজীন উন্নতি কামনা করি।



"লক্ষ্মীমণী বিজ্ঞানোৎসবে"
অরুণ গাঙ্গুলী

ও, কে, এ,

একটি তরুণীর জীবন পথে ছটি তরুণের আবির্ভাব। একজন এলো তার অর্থ, মন লম্বুনি নিয়ে আর একজন প্রমিক কাব্যতরঙ্গ উৎসাহ দৃষ্টিতে কবিতার সুললিত হৃদ অর্থ্য নিয়ে—দয়ী হল কে?

তারই পরিচিতি বিচিত্র রঙ্গমঞ্চস্থলের মধ্যে সূক্ষ্মক এদের "রূপোর কুম্ভকে।"

ছবিখানির কাজ অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। অবশিষ্ট 'কয়েকটি সেক্টর' কাজ কেবল বাকি।

নিউ পপুলার পিক্চাস

• মার্চের গোড়া থেকেই কালী ফিল্মস্ টুডিওতে এদের একখানা নতুন ছবির শূটিং আরম্ভ হবে। ছবিখানির গল্পটি আমরা শুনেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত গল্পটির নামাকরণ না হওয়ার আমরা পাঠকবর্গকে জানাতে পারলুম না। ছবিখানা পরিচালনা কোরবেন দিনেমার লজ্জা বহুদিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 'সুধীর দাস' ও হারু চ্যাটার্জি। • ছবিখানার তত্ত্বাবধায়করূপে তৃতী হয়েছেন সুকুমার রায় ও বলন্ত মিত্র। আমরা এদের নতুন প্রয়াসকে অভিনন্দিত কোরছি।

চিত্রা

মুক্তি এখানে ২০শ সপ্তাহে পড়ল। জনসমাগম যেভাবে চলচে তাতে শেষ অবধি অনেকেই হতাশ হ'তে হ'বে। শোনা যাচ্ছে যে আর চার পাঁচ সপ্তাহ পরেই 'মুক্তি'কে মুক্তি দিয়ে—বিজ্ঞাপতির পুথি চিত্রায় পড়া শুরু হ'য়ে যাবে।

নিউ-সিনেমা

মিলাপি ২য় সপ্তাহে পড়ল। এখন পরই এখানে ভারতের প্রথম রঙ্গিন ছবি 'কিশাণ কস্তা' দেখান হ'বে। এর প্রধান অংশ অভিনয় করেছে একটা বাঙলার ঘরে—শ্রীমতী পদ্মাবতী।

পূর্ণ থিয়েটার

আগছে শনিবার থেকে 'ইম্পিটার' এখানে ৩য় সপ্তাহে পড়বে। ইম্পিটারের পরই এখানে রাধা ফিল্মের 'প্রভাস মিলন' দেখান হ'বে।

বিবিধ

শ্রীশ্রী বাসন্তের

গত ২রা মাঘ রবিবার ৮ পরমৈক্যব
অন্নবাকুয়ার শুভ মহাশয়ের আত্মশ্রদ্ধ ভবানী-
পুত্র ৬২নং বেংলু বোম রোডস্থিত ভবনে
ঊহার পুত্রগণ দ্বারা বিহিত শাস্ত্রীয় মতে
সমুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধ বাসন্তের
নিমন্ত্রিত বহু আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণ



অন্নবাকুয়ার শুভ

উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ কীর্তনানন্দ ব্রজেন্দ্র
লাল গাঙ্গুলি মহাশয়ের স্মরণীয় বিরহ মাধুর্য
কীর্তনে উপস্থিত ভক্তগণুলি সকলেই মুগ্ধ
হইয়াছিলেন।

* * *

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব
শ্রীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে
পরলোক গমন করিয়াছেন। গত বুধবার
প্রভু আত্মশ্রদ্ধ ও শ্রাদ্ধোৎসব শাস্ত্রীয় বিধি
অনুসারে সমুষ্ঠিত হয় শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র বসু,
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি
শ্রদ্ধবাসন্তের যোগদান করেন। আমরা
পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

দি পিয়ারলেন্স ইন্সটিটিউশন

পিয়ারলেন্স একটি নির্ভরযোগ্য এবং লক্ষ
প্রতিষ্ঠা বীমা প্রতিষ্ঠান। কোম্পানী খোঁচ

২৮০০০ টাকার উপর দাবী মিটাইয়াছেন।
দেয়ার ক্রেডিটগকেও বার্ষিক শতকরা ২৫
টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া আলিভেছেন।
এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবনী বস্ত্র কীম।

দক্ষিণ কলিকাতার মানবেন্দ্র নাথ

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির
উদ্যোগে গত রবিবার অপরাহ্নে ৯৮নং
বেলতলা রোডে দক্ষিণ শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ
রায় চা-চক্রে সম্বর্ধিত হন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র
বসু, শ্রীযুক্ত ভুলসী চরণ গোস্বামী প্রভৃতি বহু
বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও কর্মী যোগদান
করেন।

মানবেন্দ্র নাথ রিজার্ভ বেঙ্কের ডিরেক্টর
শ্রীযুক্ত অমর কৃষ্ণ ঘোষের গৃহে অবস্থান
করিতেছেন।

সঙ্গীত আসর

গত শনিবার ২২শে জানুয়ারী '৩৮ রাত্রে
“সঙ্গীত আসরের” ৮ম বার্ষিক অধিবেশন
উক্ত সভা শ্রীঅমিয়কুমার সিংহ মহাশয়ের
১৫নং কালিঘাট সিংহ লেনস্থ বাটিতে
সমুষ্ঠিত হয়। অঙ্গদায়ক শ্রীদীননাথ ধর
খেরাল ও চুংরী গান করেন। পরে শ্রীমুণীল
চন্দ্র দাস স্মরণীয় হারমোনিয়াম (সোলো)
বাহনে সকলকে মুগ্ধ করেন। ইহাধের
সহিত শ্রীবাধাশ্রাম ব্রজ অতি সুলভ তবলা
সঙ্গত করেন।

বনকুসুম

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় রাসায়নিক
প্রক্রিয়া সহযোগে প্রস্তুত বনকুসুম তৈল
নিত্য ব্যবহারে কেশ ও মস্তিষ্কে যাবতীয়
চর্কলতা সত্তা নিবারিত হয়। তৈলের মধ্যে
বনকুসুম যে একটি উৎকৃষ্ট তৈল তাহা
নিঃসন্দেহেই বলী যায়।

শরৎচন্দ্রের গৃহে সাংবাদিক

সন্মেলন

গত শনিবার অপরাহ্নে প্রস্তাবিত
মাধ্যমিক বিল ও ‘গদ্য শ্রী’ সম্পর্কীয়
প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত
শ্রীমান প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের
সেক্রেটারি বিশিষ্ট লভ্য শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় ব্যবস্থা পরিষদের
বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর
ভবনে কলিকাতার বৈনিক সংবাদপত্র সমূহের
প্রতিনিধিদের সম্মিলিত আলোচনা
করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বসুর আমন্ত্রণে
শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত মৃণাল
কান্তি বসু ও শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী
(অমৃত বাজার পত্রিকা) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ
সেন, শ্রীযুক্ত মাধব লাল সেন (হিন্দুস্থান
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দ বাজার পত্রিকা) শ্রীযুক্ত
হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ (বসুমতী) শ্রীযুক্ত জে সি
শুভ্র (এডভান্স) ও সম্প্রতি কর্পোরেশনের
গাউন্স হইতে যুক্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলন সভার আলোচিত বিষয়গুলি
সম্বন্ধে আশাধের সমাপ্ত ভবিষ্যতে প্রকাশ
করিব।

উপেনদার নব সম্বন্ধ

কর্পোরেশনের সচিব কমিটির গত
অধিবেশনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কার্যকাল বৃদ্ধির প্রস্তাব নাকচ করার গত
শুক্রবার হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায় কর্পোরেশনের চাকরী হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবনে
পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রথম
যৌবন আত্মাধানে অতিবাহিত করিয়া,
কেশোর বন্দীশিবিরে যাপন করিয়া শ্রোতৃদ্বের
প্রারম্ভে কর্পোরেশনের গো—বিভাগ চালনা
করিয়া বর্তমানে অবসর যাপনের অন্তরালে
গিহি। কেন্দ্রের করতাতারুন্দের দেবা
করিবার লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত
সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ১৯৩৯ সালের
সাধারণ নির্বাচনে তিনি নিখিঁর কেন্দ্র হইতে
কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার
নির্বাচনে অবতীর্ণ হইবেন। ইহার এ লক্ষ্য
অটল রহিলে তিনি যে লক্ষ্যেই কাউন্সিলার
নির্বাচিত হইতে পারিবেন তাহা একপ্রকার
অনিশ্চিত।

জীবন মার্গ

(সিঃ বিঃ)

লর্ড টেনিসনের দল

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টিম কলিকাতার খেলা শেষ করে পাতিয়ালা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। গত ১০ই জানুয়ারী পাতিয়ালায় পৌঁছবার পর, ১১ই জানুয়ারী থেকে পাতিয়ালায় মহারাজার একাধেশের লিখিত একটি তিনাধিন ব্যাপী ম্যাচ খেলেন। পাতিয়ালা হল প্রথমে ব্যাট করে ১৪২ রান করার পর তাঁদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। একমাত্র আমীর ইলাহী ছাড়া আর কেউ ব্যাটিং-এ সাফল্য দেখাতে পারেন নি। ইলাহী ৪৩ রান করে নট আউট থাকেন। ঐ দিনেই শেষের দিকে লর্ড টেনিসনের দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এক উইকেটে ৮৪ রান করেন। প্রথম ইনিংসে ওয়েলার্ড এবং একরিন্চ বোলিংয়ে খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে ৪৬ রাণে ৬টি, এবং ১৯ রাণে ২টি উইকেট পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনে লক্ষ্যমূল্য ব্যাট করে লর্ড টেনিসনের দল ৯ উইকেটে ৪৪৫ রান করে ডিক্লোর করেন। এই রানসংখ্যার মধ্যে ওয়েলার্ড ল্যাংগ্রিজ ও পার্কস যথাক্রমে ৭৮, ৭৭ এবং ৬৪ রান করেন। ওয়েলার্ড পাঁচটি ওভার বাউন্ডারী এবং সাতটি বাউন্ডারী হিট করেছিলেন। পাতিয়ালা দলের লাহাবুদ্দিন ও অমরনাথের বোলিং কার্যকরী হয়েছিল। তৃতীয় দিনে পাতিয়ালা দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করেন এবং লাহাবুদ্দিন ব্যাট করে ৫ উইকেটে ২৬৪ রান করার

পর খেলাটি অসমাপ্তিভাবে শেষ হয়। এই ইনিংসে অমরনাথ ১০৯ রানে নট আউট থাকেন এবং হাভেল্ডালা ১০৬ রান করেন। পাতিয়ালা দলে নিম্ন লিখিত খেলোয়াড়েরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন

যোগীশ্বর সিং, ওয়ার্নে, অমরনাথ, হাভেল্ডালা, পাতিয়ালায় সুব্রাহ্মণ্য সৈয়দ, পাতিয়ালায় মহারাজা, সুরায়্য হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার, আমীর ইলাহী এবং লাহাবুদ্দিন।

পাতিয়ালা ত্যাগ করে লর্ড টেনিসন লঙ্কাবে দিল্লী রওনা হন এবং গত ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী স্থানীয় প্রতিনিধিমূলক দলের সঙ্গে একটি দুইদিনব্যাপী ম্যাচ খেলেন। লর্ড টেনিসনের দল প্রথম দিনে ছয় উইকেটে ৩৫৩ রান করে ডিক্লোর করেন। দ্বিতীয় দিনে খেলার শেষ অবধি ব্যাট করে দিল্লী দল আট উইকেটে ৩০৫ রান করেন। এই খেলাটিতেও স্কোন দল পরাজয় স্বীকার করেন নি। লর্ড টেনিসনের দলের গিব ১১৭, ল্যাংগ্রিজ ৮০ এবং ওয়ার্লিংটনের নট আউট থেকে ৬২ রান করেন। দিল্লী দলের ফ্রিল্যান্ড, তাজমহল এবং ক্যামেলস্ যথাক্রমে ৭৪, ৭৩ এবং ৫০ রান করেন।

দিল্লী দল

সুরজ নারায়ণ, মানুজ, বীন, ফ্রিল্যান্ড, তাজমহল, ক্যামেলস, মক্‌সুদ, রবার্টস, কে বাহাদুর, এড্রিস, বেগ্ এবং লক্ষম্।

দিল্লীর খেলা শেষ হবার পর লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টিম গত ১৯শে ও ২০শে

জানুয়ারী মধ্যপ্রদেশ দলের সঙ্গে একটি দুইদিন ব্যাপী ম্যাচ খেলার জন্য নাগপুরে উপস্থিত হন। মধ্যপ্রদেশ দল প্রথমে খেলেন এবং খুব নৈরাশ্রজনকভাবে ব্যাটিং করে মাত্র ৭৬ রান করে লকলে আউট হয়ে যান। পি আর নাইডুর ৩২ রান ছাড়া আর কোন খেলোয়াড়ই বেশী রান করতে পারেন নি। পোপের দুর্দর্ষ বোলিংই স্থানীয় দলের ব্যাটিংয়ের শোচনীয় পরিণামের জন্ম দানী। পোপ মাত্র ২১ রাণে পাঁচটি উইকেট লাভ করেন। ডাছাড়া এড্রিসের ৮ রাণে ২টি উইকেট লাভ। উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। প্রথম দিনেই, লর্ড টেনিসনের দল ব্যাট করতে আরম্ভ করেন এবং দিনের শেষে ৯ উইকেটে ১৫১ রান করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হবার আগেই লর্ড টেনিসন দলের অধিনায়ক আগের দিনের রান সংখ্যার ডিক্লোর করে দেন এবং মধ্য প্রদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। এই ইনিংসের খেলাটিতেও মধ্যপ্রদেশ দল বিশেষ সুরিধা করতে না পেরে ১১২ রান করার পর লকলে আউট হয়ে যান। বিলাতী দলের পোপ, স্মিথ ও ওয়ার্লিংটনের বোলিং উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এরা যথাক্রমে ৪৩ রাণে ৪টি, ৩২ রাণে ৩টি এবং ২১ রাণে ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন। লাকের পর লর্ড টেনিসনের দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন এবং খেলার সময় উত্তীর্ণ হবার দুঘণ্টা আগেই দুই উইকেটে ৩৯ করেন। লর্ড টেনিসনের দল আট উইকেটে জয়লাভ করেন।

এই খেলাটিতে মধ্যপ্রদেশ দলকে এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হত না যদি মেকর পি কে নাইডুরকে এই খেলার বোগদান করতে বেঁওয়া হত। তিনি মধ্যপ্রদেশ দলের পক্ষে খেলার জন্য মধ্য-

প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্বাচিত হলেও 'ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড' তাঁর নির্বাচন খাতিল করে দিয়েছেন। 'কন্ট্রোল বোর্ড' এই লম্পর্কে কারণ দেখিয়েছেন যে মেজর নাইডু ইতিপূর্বে মধ্যপ্রদেশ দলের পক্ষে খেলেছিলেন সুতরাং আবার তাঁকে মধ্যপ্রদেশ দলের পক্ষে খেলতে দেওয়া চলে না। 'কন্ট্রোলবোর্ডের' এইরূপ আচরণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না তা নিয়ে সমালোচনা না করাই ভাল। তবে এর থেকে কন্ট্রোল বোর্ডের স্বৈচ্ছাচারিতা এবং মেজর নাইডুর ক্রিকেট প্রতিভাকে ধর্ম্য করার যে একটা গুণ চোখে চলে তা নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে। তবে 'ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের' ঘোষাই দিয়ে ছ একজন রাজা মহারাজা মেজর নাইডুকে যতই দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করুন না কেন ভারতের ক্রীড়ামোদীরা তাঁর উপযুক্ত সম্মান দিতে কার্পণ্য করবে না। বুধা হীন চেষ্টা করে মেজর নাইডুর জনপ্রিয়তা দূর করতে কিছুদিন সময় লাগবে। তার উপর হর্ড টেনিসনের দলের বিপক্ষে মেজর নাইডু যত বেশী না খেলেন ততই বেশী বিলাতী ধর্ম্যাদা রক্ষা পাবার সম্ভাবনা থাকবে। এই খেলাটিতে স্থানীয় দলে মেজর নাইডুকে যোগদান করতে না দেওয়ার জন্য ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে অনন্তোষের তাব দেখা গিয়েছিল। এবং এইরূপ আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ এই খেলাটিতে খুব অল্পসংখ্যক দর্শকগণ মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মধ্যপ্রদেশ দল

পি আর নাইডু, ডিমোরভাত, ইরানী, জয়ন্ত, টি এস নাইডু, জহর আমেদ, রেজাক, লেন, পাশা এবং বাটলিওয়াল।

ইংলণ্ড অভিযুখে ভারতীয় দল

আগামী এপ্রিল মাসে একটি আন-

অফিসিয়াল ভারতীয় ক্রিকেট টিম ইংলণ্ডে যাত্রা করবে। রাজপুতানা ক্রিকেট ক্লাব এই টিমটি নিয়ে বাবার উত্তোগী হয়েছেন। কিছুপ্রদেশের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং অজ্ঞাত প্রদেশের তরুণ, উদীরমান খেলোয়াড়দের নিয়ে এই টিম গঠন করা হয়েছে। ডুকারপুরের মহারাজা এই দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছেন। সম্ভবতঃ আগামী ১০ই এপ্রিল এই ভারতীয় দলটি জাহাজে চড়বেন। এখন অবধি নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ নির্বাচিত হয়েছেন। ডুকারপুরের মহারাজা (ক্যাপ্টেন), এম এ গোপালদাস, আব্বাস খাঁ, বি ডি শঙ্কর, ও দীপচাঁদ (নিম্নপ্রদেশ), হাজারী ও নরসিংহ রাও কেশরী (পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য), কপুরিয়া, বাটলিওয়াল ও নাথোদা (বোম্বাই), কার্তিক বহু (বেঙ্গল), হাবিবুল্লা ও রোসানলাল (পাঞ্জাব) এবং এস ব্যানার্জি (জামনগর)

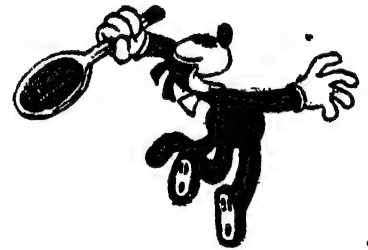
আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

প্রতিযোগিতা

'রহিনটন বারিয়া' আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডের খেলাটি গত সপ্তাহে টালা পার্কে হয়ে গেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় এই খেলাটিতে প্রতিযোগিতা করেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক ইনিংস এবং ১৩৮ রানে পরাজিত করেছে। ঢাকা দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৯৯ ও ১২৬ রান করেন। বিজয়ী দল প্রথম ইনিংসেই ছয় উইকেটে ৩৬৩ রান করে ডিক্লার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের মির্খল চ্যাটার্জি একাই নিজস্ব ২১৬ রান করে এই প্রতিযোগিতার আগের ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন।

গত সোমবার থেকে টালাপার্ক জঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছে।



প্রমো-ভক্তি-শৌর্য
সিমন্তিত জ্যেষ্ঠ
পৌরানিক চিত্র
হাজরা পিকচার্সের
নিবেদন
তিনকড়ি চক্রবর্তী
পরিচালিত

দেবী ফুল্লরা

আলোক-চিত্র-শিল্পী :

বিশুভিতা লাহা

সুর-শিল্পী :

গোকুল

ভূমিকায় : তিনকড়ি চক্র-

বর্তী, অহীজ চৌধুরী, মনো-

রঞ্জন ভট্টাচার্য, শিশুবালা।

শব্দ-ধর :

যতীন দত্ত

কারু-শিল্পী :

পরেশ বসু

কালী ফিল্মস, ষ্টুডিওতে গৃহীত হইতেছে

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী



কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শ্রোতাদের কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত নিরাশার কথা শুনে থাকি। কোন এক বিশিষ্ট শ্রোতা লেখিন আমাদের অভিযোগ জানানেন—“আপনারা এত আলোচনা করছেন খুব ভালো—কিন্তু এতে কি কিছু কাজ হবে? আমরা তো আজ কাল আর এ নিয়ে আলোচনাই করি না, প্রোগ্রামও কোন মন দিয়ে শুনি না।” ভক্তলোককে আমরা অরসিকের কোঠার ফেলেছিলাম। তাঁর “যুক্তিগুলির কোন বিশেষ গ্রাঘা অর্থ নেই, কিন্তু কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যে এই রকম জনমতে আমরা হুঃখ অনুভব করি। তিনি বললেন “রেডিও একটা রাখতে হয় রেখেছি লক্ষ্যে বেলা দিল্লীর প্রোগ্রাম শুনি—তা ভিন্ন হয়ত রেডিও বেজেই থাকে—লক্ষ্য নেই বড় বিরক্তি বোধ হলে সেটটা বন্ধ করে রাখি।” আমরা প্রতিবাহ জানিয়ে বললুম “কর্তৃপক্ষের কাছে আপনারা অভিযোগ জানান না কেন?”

প্রত্যুত্তর এলো “কোন কাজ হয়না—করেছি, কোন প্রতিকার না পেয়ে ভেড়ে দিয়েছি ওই দিল্লীর প্রোগ্রামই ভালো।”

আমরা বললুম—“আমাদের জাতীয় অবস্থানকে সবদিক দিয়েই আমরা তুলনামূলক চক্ষে ছোট করে দেখি, এ আমাদের জাতীয় মনোবৃত্তি।

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন—“জীবনের সকল দিকেই দেখুন বাঙালীর আদর অবাঙালার, রেডিওতেও তার ব্যতিক্রম হবেনা, দিল্লী বেতার প্রতিষ্ঠানে বাঙালী শিল্পী সম্মান পাচ্ছে।”

বেতার গ্রাহক ভক্তলোকটির সঙ্গে আমরা অনেক আলোচনা তর্ক করলুম বটে, কিন্তু শ্রোতাদের এই ধরণের impression—কলিকাতা বেতার প্রোগ্রাম লক্ষ্যে উদ্দেশ্যী তাই সত্যিই আজ জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

এক সময়ে কলিকাতা বেতারের অতি ভক্তদিনে আমরা কর্তৃপক্ষকে দেখেছিলুম প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর মিঃ মজুমদারের। আমি তিনি কি ঘুমিয়ে আছেন? তিনি কি বোধ করছেন না বেতারে রাশি রাশি অযোগ্য নভিসদের আমদানিতে গুণী শিল্পীর স্থান অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শ্রোতাদের বিরক্তি কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, অভিযোগের প্রতিকার নেই।

আটটুরা বলে—বেতারে তাদের আদর নেই, অভ্যর্থনা নেই। কাগজে কাগজে এই নিয়ে প্রতিবাদ—কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার—বেতার কর্তৃপক্ষ এ লক্ষ্যে উদ্দেশ্যী। বেতার জগতের পৃষ্ঠায় কেবল দেখছি বেতার জন-প্রতিষ্ঠান এবং তার জয়গান। আমরা সমালোচনার পর সমালোচনা করে থাকি, অশ্লিষ হবার আশঙ্কা না রেখেই, কোন স্বার্থ লক্ষ্য না নিয়ে, কিন্তু মর্ষের কথা শুনে কে?

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর মিঃ মজুমদারকে আমরা তাঁর পূর্ণশক্তির আবার পরিচয় দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি। বেতারের বিরাট কর্তৃপক্ষে এখন চাই একজন শক্তিশালী পুরুষের মুল্লর কর্তৃত্ব।

এবার একজন শ্রোতার নিকট হতে

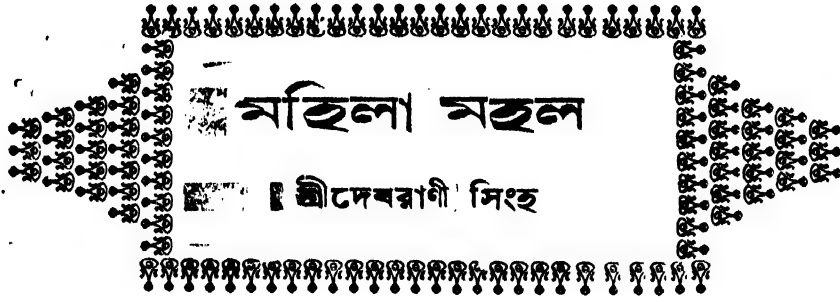
একখানি অত্যন্ত অভিযোগপূর্ণ পত্র পেরেছি। নিয়ে লেখানি আমরা প্রকাশিত করলুম। এবিষয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্থানান্তাবে এবারে আর কোন প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা আলোচনা করলুম না।

১৩ই জানুয়ারী। কলিকাতা। মানিনীর খেরালী সম্পাদক মহাশয় লম্বীপেয়—মহাশয়,

অনুগ্রহে পূর্বক এই পত্রখানিকে আপনার পত্রিকায় স্থান দিলে বাধিত হইব। গত ১৩ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেতার অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ব্যবস্থাপনার একটি সন্ধ্যাসমুষ্ঠান হইবার কথা ছিল। শ্রীযুক্ত অমিতা লেনের গানের পর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন “যে বেতনার কোলে” শীর্ষক একটি মিলিত সন্ধ্যা হইবে কিন্তু তৎপরিবর্তে হঠাৎ গ্রামোফোন রেকর্ড যো কেন বাজান হইতে লাগিল তাহা জানা গেলনা। এই সন্ধ্যাসমুষ্ঠানটি অলমাপ্ত থাকার ফলে ঐ দিন সন্ধ্যা অনুষ্ঠানটি একেবারেই নীরল হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানবাহু যে হঠাৎ তাঁহার অনুষ্ঠান বন্ধ করিলেন কেন, আশা করি তিনি এবং বেতার কর্তৃপক্ষ সাধারণে তাহার কারণ প্রকাশ করিয়া শ্রোতাবর্গের কৌতুহল পরিভূপ্ত করিবেন। কোন একটি জন প্রতিষ্ঠানে একুণ হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আশাকরি কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে সাহায্যে একুণ না হয় সে লক্ষ্যে অবহিত হইবেন।

ইতি—
জনৈক শ্রোতা—





বাংলার নারীর স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যই সকল সম্পদের মূল 'Health is Wealth' এ নীতিবাক্য সকলেরই জানা আছে। হেলেবেলার পাঠ্যপুস্তকে এরকম অনেক নীতিবাক্যই আমরা পড়ে থাকি। স্বাস্থ্য না থাকলে কোন কিছুতেই কোন অবস্থাতেই যে মানুষ সুখী হতে পারেনা একথা যে আমরা বুঝি না বা বিদ্যমান করি না এমন নয়—কিন্তু এর স্তরভেদ আমরা মনেপ্রাণে অনুভব করিনা। তোতা পাখীর মত জীবনে আমরা অনেক নীতি, আদর্শবাণী কণ্ঠস্থ করে রাখি—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই! ব্যবহারিক জীবনে আমরা সেগুলি কোনদিনই কাজে লাগাই না।

আমাদের অস্বাস্থ্যের জন্তে আমরা যে বহু পরিশ্রমে দায়ী একথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলার নারী সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাদের শীর্ণ অলঙ্কার মুখ এবং দৃষ্টি তাদের অকাল বার্দ্ধক্য লভ্যই আমাদের জাতির অনিষ্ট এবং স্বাস্থ্য ঔদ্যানিক্তের চরম প্রমাণই হয়।

বাংলার আধুনিক মেয়েদের কণ্ঠে আজ প্রগতিবাদের জঙ্ঘবনি শোনা যাচ্ছে। বাংলার আধুনিক মেয়ের হল সমাজের সকল রকম আচার, বিচার এবং কুপ্রথা বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে—কিন্তু ভারী জুখের বিষয় শক্তি এবং স্বাস্থ্যের চিন্তা কারুর মস্তিষ্কে নেই। অস্বাস্থ্যে অনিয়মিত জীবনের বাংলার নারী সমাজ আজ কোন আলোকের পথে ছুটে

চলেছে? কচির দিক থেকে আমরা বহু অগ্রসর হয়েছি। শিক্ষার আজ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব উচ্চ ধাপে সমাজীন, মতা-সমিতিতে আমাদের আর ঘরের কোণের কণ্ঠ নেই—আজ পুরুষদের আমরা চোখ রাঙিয়ে বলছি আমরা চাই সাম্যবাদ। নারী সমাজের অন্ধকারার বন্ধ হাওয়ার আমরা আনতে চাই স্বাধীনতার উজ্জল আলোকরশ্মি, দক্ষিণ সমীরণের প্রাচুর্য, কিন্তু জীবনের ভিত্তি আমাদের আলগা শিথিল। শীর্ণ ঋক্সদেহবস্ত্রী মদীলিঙ্গ কোঠরাগত চক্ষু কীর্ণ দৃষ্টিশক্তি পাণ্ডুর আনন, শক্তিহীন রুগ্ন স্বাস্থ্য। তবে কোথায় আমাদের প্রগতিবাদ? কোথায় আমাদের গর্ব—অহঙ্কার?

নারী হচ্ছে মাতৃভাষা। আমাদের 'পুই' নির্ভর করেছে দেশের আশ-তরলা দেশের ভবিষ্যত দেশের যা কিছু মঙ্গল! আমাদের সন্তানরাই হবে ভবিষ্যত বাংলার মেরুদণ্ড! রুগ্ন মাতার শীর্ণ-সন্তান কোন্ আলোকের সন্ধান হবে ভবিষ্যত বাংলার নিরঙ্কু অন্ধকারে?

বাংলার নারী সমাজের স্বাস্থ্য দিনে দিনে পড়ছে ভেঙে অন্ন-অজীর্ণতার শতকোটি রোগের করালগ্রাসে বাংলার নারীসমাজ আজ ক্রিষ্ট। সমাজে নারী যদি স্বাস্থ্যহীন হর তবে সেখানে কোন সুখই নেই। প্রায় প্রত্যেকটি আধুনিক মেয়েকে দেখা যায় অস্বাস্থ্যের তারে অবনত। এর প্রতিকার কী?

বাংলার প্রত্যেক মেয়েরই প্রয়োজন হবে পড়ছে এর প্রতিকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা। পাঠ্যপুস্তকের স্বাস্থ্য-নীতি বাণীগুলি শুধু তোতাপাখীর মত কণ্ঠস্থ না করে বাস্তব জীবনে তাদের কাজে লাগানো।

বাংলার নারী যদি স্বাস্থ্যবতী মায়ের চির গৌরবোজ্জ্বল আসন গ্রহণ করতে না পারলে দেশকে যদি না দিতে পারলে স্বাস্থ্যবান সন্তান, সৎসারকে যদি না দিতে পারলে সুখশান্তি তৃপ্তির প্রাচুর্য, গৃহশিক্ষার না আনতে পারলে স্বাস্থ্যনীতি অস্বাস্থ্যকে দূর করে যদি সৎসারে না আনবে স্বাস্থ্যের উজ্জল দীপ্তি তবে কিসের প্রগতিবাদ? কিসের সাম্যবাদ? কিসের জী-শিক্ষা? জী-স্বাধীনতা?

বাংলার বর্তমান নারীসমাজকে—আমার প্রজন্মের মা বোনের আমার এই ছোট আলোচনার এইদিকে গভীর দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। আমি আবার বলি—স্বাস্থ্যহীন বাংলার নারী সমাজের প্রথমে চাই সুস্বাস্থ্য—গৃহশান্তি মায়ের সুউচ্চ গৌরব আসন—দেশকে স্বাস্থ্যবান সন্তান দান করা। জাতির দৌত্য্য নির্ভর করে তার স্বাস্থ্যে।



অপন

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

সারটা শরীর অলস ব্যাখার আড়ষ্ট। কিছু কিছু করছে মাথাটা, চোখের পাতাগুলো ভারী হয়ে আলছে। পাশের ঘরের নবাগত তত্ত্বলোকটি কপাল ছুয়ে বলে গেলেন— ‘অয়ের পূর্ব লক্ষণ’, হবে। সুবর্ণন অক্ষুট আর্জনাৎ করে পাশ ফিরে শু’ল। হঠাৎ চোখে পড়ল টেবিলের ওপরকার ছোট খাম খানির দিকে। সার্কজনীন বেরারা সুগ্রীব কোনলময়ে রেখে গেছে। আশ্চর্য্য! এতোক্ষণ সে দেখতে পারনি।

হু-হাতে ভর দিয়ে উঠে সুবর্ণন ঠাকুরাটা ঠেপ দিয়ে বলল। হাত বাড়িয়ে খামখানি টেনে নিয়ে ঠিকানার হরফগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর মাথার বালিশের তলার গুঞ্জে রাখল সেটা। সে জানে প্রেরকের নাম এবং খাম। লেখার হাঁচ দেখে সে বুঝে নিচ্ছে।

চিঠি লিখেছে মাধুরী—একটি মেয়ে—বাকে সে ভালবাসত একদিন। বহুদিন পর তার এই প্রবৃত্তি। থাক, পড়বে সে নিশীত রাতে নিরবে মনে মনে নিঃশব্দে—একবার-দুবার-হু’-শবার। এখন তার অনেক কাজ। নতুন ধরা উপস্থাপ খানার উপসং-হারটা লিখে ফেলতে হবে। প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে হবে শীগগির। মালিক পত্রিকার কয়েক পাতা তার জগৎমাংশের জ্ঞা খালি আছে। এই লংঘ্যতেই সমাপ্ত করবেন সম্পাদক।

সুবর্ণন সাহিত্যিক এবং সর্জনপ্রিয়। সাধারণ ও লেখার তুট। সুভাষা তত্ত্ব—লংঘ্য পুট হয়েও উঠেছে। বাজার ওর

বইয়ের চাহিদা আছে। অতি বড়ো কঠোর সমালোচক ওর সৃষ্টির সুখ্যাতি করেন। প্রকাশক তাকে সূচকে দেখে। অগুনা উপস্থাপখানি হবে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

কোন অদভুততার ফাঁকে হাতে ধরা কলমটা কুখ খুঁড়ে পড়ল খাতার পাতার ওপর। সুবর্ণনের হুটা চোখ ভাবাবেশ, আনত মস্তক। চোখের সামনে ভেলে উঠল উপস্থাপনের প্রথম অধ্যায়, ওর নিজের জীবনের জলন্ত পরিচ্ছেদ।—সত্যি কিরণের লজ্জা ভাঙের বাড়ীতে আলা যাওয়া। মাধুরীর লজ্জা তার পরিচয়—আলগোচা কথাবার্তা। অতঃপর ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে উঠল পরিচয়। পরিচয় রূপান্তরিত হ’ল প্রেম। হু-দিকে হু-কুল নবী বয়েগেল মাঝখান দিয়ে। একের বন্ধন অপরের হাতে। একটা দুর্বীর আকর্ষণ—গ্রহের লজ্জা যেমন তারকার। কণিকের অবশর্নে ব্যাকুল করে তুলত, স্নায়ুতে উঠত অশ্রান্ত কোলাহল আর শিরা উপশিরায় আগন্ত অলস চাকলা।

• আর মাধুরী! আশ্চর্য্য মেয়ে কিন্তু সে। অমন শাস্ত, নিজীব মেয়ে সুবর্ণন কখনো দেখেনি। ‘আতে আতে চাপা গলার নীচুসুরে কথা কর। প্রতিবৃদ্ধ বোধ হয় জীবনে কোনোদিন কারো বিকৃত্ত করেনি। স্বাতন্ত্র্যসম্বন্ধে সে ছিল একবারে উদ্বাসীন। উদ্বাসীন মানে অজ্ঞান নয়। সে বৃথত সবই। তবু, ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করবার স্পৃহা তার আদৌ ছিল না। ব্যাখার সে ব্যাকুল হ’ত না, হুঃখেও কাতর নয়। বৈমল্লিক জীবনযাত্রার ওলট পালট এতোটুকু

হয় না, তবু আরও চৌখুটি হুলহুল করত, পুরস্কৃতি টোট খর খর করে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠত।

মাধুরী যেন দূরগত বাশার সুরের মূচ্ছনা। তেমনি নম্র উদ্বাস, তেমনি ক্রাবেগে অধীর।

• মাধুরী রূপলী। হ্যা, সে রূপবতী। লে-রূপ অশ্রুত ধরার না, আলো করে। মাধুরীকে দেখে মুগ্ধ হবে—যে কেউ। কিন্তু লেহের লক্ষ্য হবেনা মনে। সূর্য্যাস্তে পশ্চিমকাশের ঐগরিক আভা ওর চোখে-মুখে—লক্ষ্য দে।

তারপর? তারপর একবার মাধুরীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এক অজানা পুরুষ। তার লজ্জা মাধুরীর পরিচয়ের বন্ধন ছিল না কোনকালে। সম্পূর্ণ অপরিচিত। উদ্ধার মত ছুটে এল সে। মাধুরী বেনারসী বেটনী। স্নান আনত দৃষ্টি। দৃষ্ট্য নিয়েছে তাকে বিজয় রথে তুলে। টোঁটের ওপর অয়ের চাঁপা উজ্জালের সুস্পষ্ট রেখা। পৌরষ উজ্জল দৃষ্টি তার হৃ-নয়নে।

সে পারলনা গতিরোধ করতে। রথের কঠিন চাকা ঘনড়ে চলে গেল তার বৃকের ওপর দিয়ে। সারটা বুক হ’ল ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত। পরাজয়ের অবরুদ্ধ বেধনা গলে পড়ল তার হু-চোখের কোল ছাপিয়ে।

আহত মনে খাতা কলম নিয়ে সে সুর করল বেধনার বেধরচনা। দুর্বল দেহ-মনের সুলভ লক্ষ্য। তার সাহিত্য্য প্রতিভার চরম পরিস্ফুটন ঘটবে নবরচিত উপস্থাপে। মালিক পত্রিকার পাতার তুলে সে বুঝতে পেরেছে যে, তার ধারণা এতোটুকু অমূলক নয়।

আজো ভোলেনি মাধুরী তার মত একটা ছীন কাপুরুষকে। চিঠি লিখে খবর নেয়। তার স্বাস্থ্য, লক্ষ্য নিয়ে মাথা ঘামায়। প্রশ্ন করে নতুন কোনো উপস্থাপ লিখলে কি—

না, কোথায় পড়ছে হবে এবং বেরবে কোন্
সংখ্যায়? সর্বশেষে ছোট্ট করে লেখে—

‘ভালোবাসা নিও’। ওর নিজের ঘর-
সংলারের ইতিমধ্যে দিয়ে ইতি টানে। পরে
পুনশ্চ জানায়—তার নিজের স্বাস্থ্য ভালো নয়
খোঁটে। প্রায়ই হয় জ্বর, তার সঙ্গে আছে
বিবিধ উপসর্গ!’

স্বর্ধর্শন ফেনিয়ে লিখেছে, অতীতের
ইতিহাস। প্রতি দিনকার ক্রটি বিচ্যুতি,
মান অভিমান খুঁতিনাটী লে কিছুই বাদ দেয়
না। ভাষায় তার অসাধারণ খবল, প্রয়োগ
কৌশল তার প্রশংসনীয় আর চরিত্র চিত্রনের
দক্ষতা অসামান্য—সাধারণে স্বল্পক্ষেত্র স্বীকার
করে এই কথা।

উপজ্ঞানের পরিণতি পরিকল্পনায় সে মেতে
উঠল। ভেবে কুল পায়না লেখার গতি কোন্
মুখো করবে। মিলনাস্তক না বিরোগাস্ত?
হালি কিংবা অশ্রু? বিরোগাস্ত—অশ্রু?
শিউরে উঠল ‘মাস্তুরিক’। ধর ধর করে কঁপে
কলমটা স্তরে পড়ল—সে নিজেও। চোখের
ছ’কোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল বালিশের
ওপর। চেতনা অতীত মন।

মাধুরী এলে ঘরে ঢুকল। তেমনি সংযত
চলন, সেই আগেকার মত ঠোঁটের ওপর
অম্পট হালির রেখা। অনেকখানি রোগা
হয়ে গেছে ঘন। চোখের কোলে কালি
পড়েছে, দৃষ্টি অধিকতরো উজ্জ্বল। চিলে করে
বাধা খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়েছে, কঁধের ওপর
মুখখানি শুকনো, একটু ঘন ক্যাকাশে।
কিন্তু ম্লান নয়। আধো বাকা ভুরু ছটীর
মাঝখানে ওর সমস্ত আঁকা কুসুমের টিপটি
বিশেষ করে তুলেছে মুখখানি। কী মিষ্টি
চেহারা মাধুরীর!

অতি সন্তর্পনে পা টিপে টিপে কাছে
এসে জিজ্ঞাসা করল—‘কেমন আছেন?’

স্বর্ধর্শন ফিকে হলে জবাব দিল—‘জ্বর
ছেড়ে গেছে। বোল।’

মাধুরী বিজ্ঞানার ওপর তার মাথার
কাছে বলল। নীরবে কপালে হাত রেখে
হেসে বলল—‘কোন্ ডাক্তারে বোলেচে যে
জ্বর নেই? তুমি নিশ্চয়!’

‘হ্যাঁ’—স্বর্ধর্শন উন্টো দিকে পাশ ফিরল।

মাধুরীর পাতলা ঠোঁটের ওপর নিঃশব্দ
হালির রেখা ফুটে উঠল। স্বর্ধর্শনের গায়ে
হাত রেখে নীচুগলার ডাকল—‘এই শুনচো
সু!’

‘কী বলো!’—তেমনি ভাবে থেকেই
উত্তর দিলে স্বর্ধর্শন।

‘অমন করে মুখ ফিরিয়ে শুলে কেন?
তোমার সঙ্গে দুটো কথা বোলতেও পাবনা।
বাবা:—কী কঠিন লোক তুমি!’

স্বর্ধর্শন মুখ ফিরিয়ে নিরে বলল—‘আমি
ভাবছি একটা কথা!’

‘কী কথা? কেন তোমার আজো বিয়ে
হোলে না, এইত?’

‘না—না ওসব নয়।’ আচ্ছা—মাধুরী
তোমার ঝামী কিছু মনে কোরবেন না তো?
মানে আমি বোলছিলাম—’

‘মানেত আমি জিজ্ঞাসা করিনি, কিন্তু
কারণ?’

‘এই এতো রাতে এখানে’রয়েচো!’

মাধুরী লেখায় কোনো উত্তর দিলো
না। স্বর্ধর্শনের চুলের ওপর হাত বুলাতে
বুলাতে বলল—‘আঃ কী নয়ম তোমার চুল!
মাথায় কী মাথো?’

‘কই কিছু না তো!’

‘নেটেড তেলের গন্ধ তোমার চুলে!’

স্বর্ধর্শন নিরন্তর নিরুদ্ধেগ! মাধুরী
সেইভাবে নীরবে চুলে হাত বুলাতে লাগল।
হঠাৎ ও উঠে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে
ওপরকার বই খাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে
লাগল। ঘরের ভিতরকার টেবিল ল্যাম্পটা
টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। আবছা আলোতে
মাধুরীর মুখখানা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।
স্বর্ধর্শন মাথা উচু করে হেসে জিজ্ঞাসা
করল—‘ওসব ঘরে টানাটানি কোরচো
কেন?’

‘ঘরটার কী হাল হোয়েচে। টেবিলের
ওপর বই খাতার ছড়া ছড়ি। একমাসের
পোড়া লিগারেট জমা করে রেখেচে’, কলে
দেবার সময় পাওনা। কী করে যে থাকো
এমন ভাবে? শরীরেরদিকে কোনোদিন
একটুও নজর দেবে না। আমি শুধু মিছে
বকে মরি। কোনোদিন আমার কোনো



দুঃখের এবং শীর্ণ
শিশুরা

ডাক্তারের

বাল্যমৃত

সেবনে

অবিলম্বে সুস্থ ও

সবল হয়।

বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

অহরোধ কানে তুললে না!—কথার আড়ালে
একটা প্রচুর কারা যেন প্রকাশ পাচ্ছে।

সুধর্শন আবার মুখ ঘুরিয়ে তুল। শারীরা
ঘর থম থম করছে। খানিক পরে মাধুরী
এলে পাশে বলল। গা-নাড়া দিয়ে বলল—
আমার দিকে মুখ ফেরাও। বাঃ—মুখ না
দেখতে গেলে কী করে কথা কইবো, তোমার
দিকে।

সুধর্শন নীরবে পাশ ফিরল। মাধুরী
একখানি হাত মুঠোর ভেতর নিয়ে ডাকল—
‘মাধুরী!’

‘উ’—মাধুরী নিশ্চল।

‘তুমি কী সুন্দর। কী শান্ত তুমি! কী
মিষ্টি করে তুমি কথা বলো! কী—

মাধুরী হাত চাপা দিল ওর মুখে।
রাগত সুরে বলল—‘থাক ক্ষান্ত যাও!
সেকেন্দ্রে উচ্ছ্বাসের মায়া কাটাতে পারলেন।

আজো! তুমি আধুনিক সাহিত্যিক?
উচ্ছ্বাস না তোমাদের কাছে দোষনীয়?’

‘তবে কী বলবো মাধুরী?’

‘কিছুনা! ঘোঁহাই তোমার, রূপ-শুণের
ব্যাখ্যা তুমি কোরোনা। ওকাজ করবার লোক
আমার আছে।’

একটু থেকে পরিকার গলার বলল—‘একটি
মেরে আছে।’

‘হুঁটা নেই, মাধুরী?’—মুচকি হেসে
জিজ্ঞাসা করল সুধর্শন।

যাও—নব কথা হালকা কোরে নিওনা।
শোন, মেয়েটা আমার বিশেষ জানাশোনা।
বেশ দেখতে। চলচলে মুখখানি দেখলে কী
জানি কেন, তাকে যেচে ভালবাসতে ইচ্ছে
হয়। কলেজে কার্ট ইয়ার পর্যন্ত পড়েছে।
ভারী বুদ্ধিমতী! লংবার চালাতে যে যে
শুণের দরকার তার মধ্যে সব আছে।’

সুধর্শন গভীর ভাবে বলল—‘আরো
আছে, তুমি জানো না। সে একজন
বিখ্যাত নাতার, ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি
দেবে শীগগির। নৃত্যে বাহবা পেয়েচে
উৎসাহের কাছ থেকে।’

মাধুরী ধমক দিয়ে ওঠে—‘আবার সেই!
সত্যি বোল্‌চি আমি একটা মেরে ঠিক
কোরে রেখেচি। তোমার সঙ্গে তার নিশ্চয়
খুব মিল হবে। দুজনে সুখী হবে—
আমিও।’

‘তুমিও?’

হ্যাঁ আমিও! তোমাকে সুখী দেখলে
আমি সুখী হবো! এমন ছরছড়া হয়ে
আর কতকাল থাকবে! অহুঁহ হোলে
এক গ্রাম জল এগিয়ে দেবে; এমন দ্বিতীয়
একটা লোক নেই। আগামী জন্মে
শ্রীমতীর আগমনের দিন ঠিক করি,
কী বলো?’

১. মান্না এণ্ড সন্দের কন্সক্টি ড্রাস্টার্স গুণাবলি মনোমগ্ন

কিওলিউ:সালসা

বর্তমান যুগে একবার মনোমগ্নতা গুণ বিশিষ্ট মহোপকারী মান্দা। রক্তপরিষ্কারক, বল, শক্তি ও
কৃষাবুদ্ধিকারক। পারদ ও উপবংশ বিবরণক। শুকতারগা মায়বিক ও খাত দোঁকিলা রোগে, নষ্ট
স্বাস্থ্য, যাবতীয় স্ত্রী রোগে এবং বহুপুতান ও জটিল রোগ সমূহের একমাত্র মহোপকারী। কোন

ইলেক্ট্রো'গোল্ড'কিওর

জীবনী শক্তিবর্ধক ও নষ্টবার পুনরুদ্ধারক। যাবতীয় দুর্বলতা, অক্ষমতা, অবশ্য ইলিয়ার প্রভৃতি রোগের
অব্যর্থ বলকারক ওষধ। ছাত্রদিগের স্মৃতিশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়। কৃষাবুদ্ধি, মানসিক
প্রকল্পতা, মায়বিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে; ছাত্র ও ছাত্রী জীবনের একমাত্র পরম সুখ। মূল্য দেড় টাকা, মাণ্ডলাদি সহ ২০।

'গগোরা-বাম'

পিল (বটিকা) বা পিস্টিয়ার

জীলোকদিগের শ্বेत ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অল্প সময়ে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা লাঘব করিতে
এবং রোগ সমূলে নির্মূল করিতে ইহার স্মার্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্যপ্রদ এবং অগাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।
এই ওষধ মিস্টিয়ার ও পিল দুইরকমের পাওয়া যায়, উভয়েরই মূল্য প্রতি বিশি দুই টাকা; মাণ্ডলাদি সহ ২০।

ইপানি এজমা-সিরাপ

ইপানি ও হাসকাশের অব্যর্থ মনোমগ্ন। এক ঘটায় ইপানি রোগে মৃত্যুসম যন্ত্রণা হইতে নবজীবন
লাভ করে। নতন পুতান সর্বপ্রকার লক্ষণ ও উপসর্গ বিশিষ্ট ইপানি, দমা, হাসরোগ এবং যাবতীয়
ফুসফুস ও হাসনলীর প্রদাহ, ব্রুকাইটিস, হপিকক প্রভৃতি রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইপানির
প্রবল টানের সময়ে হাস প্রকাশের মৃত্যুসম যন্ত্রণায় একদা মাত্র মনোমগ্নই রোগ দূরীভূত হইয়া রোগী সুস্থ হয়। মূল্য দেড় টাকা; মাণ্ডলাদি সহ ২০।

এজেন্টস্ :—এম্. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১০ নং, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

নি, মান্না এণ্ড সন্দের—মান্না মেডিকেল হল,

৫নং, গুলু ওস্তাগর লেন, (পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৯) কলিকাতা

—‘বা খুলী তোমার!’ সুবর্ণন উত্তর দিল।

—‘দূর! জড়িতে হয় না! তুমি যে আবার বা বাপের ব’ড়ো ছেলে। তাহলে আবারেই হবে।’

উভয়েই নীরব। সারাটা ঘরে নেমে এলো একটা অলম্বনীয় শুকতা। আবহাওয়া হয়ে উঠল ভারী।

ফরেকমুহূর্ত্তপর শুকতা ভঙ্গ করে মাধুরী বলল—‘তোমার নতুন উপস্থাপনা মাণিকের পাতায় পড়লুম। সুন্দর হয়েছে, তোমার দেয়া সৃষ্টি হবে এখানে—আমি বোললুম যেখানে নিও। কিন্তু শেষটা যে কী হবে ভেবে পাচ্চিনে। কী গতি কোরবে মেরেটার?’

সুবর্ণন স্পষ্ট স্বরতে পারল উপস্থানের বিষয়বস্তুতে মাধুরীর মনে কোনো সন্দেহের রেখাপাত করেনি। স্নান হেসে বলল—‘এখনো ভেবে উঠতে পারিনি। তোমার অভিমতটা শুনি।’

‘আমার আবার অভিমত!’ ললজ্বরে বললে মাধুরী।

—‘তবু—’

‘আমি বোলি মেরেটার—আচ্ছা—ধরো, মেরেটার যদি মৃত্যু হয়!’

আপাতমতক নিউরে উঠল সুবর্ণনের। মাধুরীর একখানা হাত লজোরে আঁকড়ে ধরল।

ওকি! অমন কোরে কেঁপে উঠলে যে? গল্প তো!’

‘গল্প! ই্যা, গল্প বই কি! কিন্তু, তবু মেরেটা বেঁচে থাকুক—বেঁচে থাকুক সে নীরোগ হোয়ে,—সুখে-শান্তিতে।’

‘কিন্তু ট্রেজিডীতেই মাধুরী বেনী, কমেডির চেয়ে একথা তুমিই তো বলো! পড়ুরার মন টপ কোরে আটকে পড়বে।’

—‘দরকার নেই। ছেলেটা বরং বিবাহ কোরুক। হ’ল লেকলে কাণ্ড, তবু খেপেটা যেন বেঁচে থাকে, সুখে থাকে। বিচ্ছেদের বেধনা যেন ওর সুন্দর জীবনকে বিধিয়ে না তোলে। শুনচো মাধুরী! কথা কইচো ন? মাধুরী—মাধুরী!’—

সুবর্ণন চমকে ধড়কড় করে উঠে বলল বিছানার ওপর। টেবল ল্যাম্পটা হুস্ হুস্ জ্বলছে মশালের মত। বিম্রিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগল। কই মাধুরী? একুনি বলেছিল যে তারি পাশে—গায়ে গাঠেকিয়ে। স্বপ্ন! মাধুরী কী স্বপ্ন পকারিনী? নাঃ—মাধুরী নিশ্চয় বাইরে—লামনের বারান্ডার বেহে ঝুকিরে আছে! চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে, টলতে এগিরে গেল দরজার দিকে। বন্ধ দরজার গায়ে মাথাটা গেল ঠুকে। চোখের লামনে সব কিছু আপসা ঠেকছে তো-ভো করছে—মাধুরী এলেছিল এখানে—মেনে—পুরুষ পল্লীতে?

আবার খাটের কাছে কিরে গেল সে। বালিশের তলা থেকে বাঁর করল মাধুরীর লেখা চিঠিখানি। একটানে খামখানা ছিঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে এলো এক টুকরো চিরকুট। এই কী মাধুরীর হস্তাকর! একনিঃখালে পড়ল—
বন্ধবরেশু

ভাই সুবর্ণন, কাল ভোরে মাধুরী আমাঘের ছেড়ে চলে গেছে। শেষ লম্বরে

“স্মৃতি-লেখা”

শ্রীতড়িৎ কুমার ঘোষ

গাঁরের পথে লক্ষ্যে বেলার—

চলতে ছিলেম... একা...!

একটা বাক তারলেন ঘোর

হঠাৎ... “চল-লেখা”...!!—

লজ্জা-রঙীন মুখখানী তার

ছলিয়ে গেলো হৃদয় আমার—

নেই ছলোনের সবজি পাতায়—

পড়লো বাধন-লেখা!—

—চলছিল সে একা!!—

বিহার যখন ঘনিরে এলো

আকাশে মেঘ ছড়িয়ে গেলো

ঝড় বাতলের পাগল ধারায়

উদাসী ঘোর গানবে হারায়;—

এই বিরহীর বক্ষে কাঁদে—

—তার সে স্মৃতি লেখা!—

—চলছিল সে একা!!—

তোমার বেখবায় জন্ত বড়ো অধীর—
হয়েছিল। খামখানা তারি। তোমাকে
চিঠি বেবে বলে ঠিকানা লিখে রেখেছিল।—

ইতি—‘কিরণ’

মাধুরী নেই! উঃ এ কী মর্মান্বাহী
উপলংহার। মাধুরী মরে গেল? টেবল-
ল্যাম্পটা যেন বারকতোক হপ হপ করে
জলে উঠে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলল সারাটা
ঘর! গাঁরের তলার ছলে উঠল পৃথিবীটা।
একটা অসুট আর্জনাৎ করে সুবর্ণন লুটরে
পড়ল বিছানার ওপর। কাগজের টুকরোটা
লজোরে হুটো করে ঝুপিয়ে কেঁবে উঠল
বালিশে হুখ ঝুজে।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বস্তুক পানীয়

কবিওয়ালা হরঠাকুর

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

বাংলা একাদশ শতাব্দীতে এক জাতীয় স্বতাব কবির আবির্ভাব হয়। বাংলা সাহিত্যে ইহাদের অবদান তুচ্ছ নয়। ইহাদের স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একদিককে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। এই স্বতাব কবির দলকে কবিওয়ালা বলা হইত। ইহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের রাজা-মহারাজাগণ। কবিওয়ালারা বহু রাজসভা আয়োজিত করিতেন। বঙ্গলিঙ্গ, বৈঠকে এই স্বতাব কবিদের ছিল স্থান—ইহারা বিরাটমণ্ডপে আনন্দ সুগমিত করিয়া রাখিতেন। শতাব্দী বর্ষ পূর্বেও এই কবিওয়ালাদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এখন যেমন গ্রামে, গ্রামে, সহরে সহরে, লখের এবং পেশাদারী বাজা, থিয়েটারের দল দেখা যায় তখন ছিল এমন কবিওয়ালায় দল। তবে এই কবিওয়ালাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মধ্যে ছিল কাব্য প্রতিভা যাহা সাহিত্য দৃষ্টিতে উপেক্ষণীয় নহে। বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে তাই এই কবিওয়ালায় দল সঙ্গমে স্থান পাইয়াছেন।

এই জাতীয় কবিগণ প্রথমে “বাড় কবি” বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আলরে দাঁড়াইয়া ইহারা মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতেন—সেই জন্তই বোধহয় তাঁহারা ‘কবিওয়ালা’ আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহাদের রচনার অঙ্গীলতার স্পর্শ ছিল বলিয়া অনেকে অংজ্ঞা প্রকাশ করেন এবং ইহাদের আকরিক প্রতিভা বিশেষ না থাকায় অস্বীকৃত বলিতেও কুঠা প্রকাশ করেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের গীতিকাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে আধ্যাত্মিকতা, দার্শনিকতা এবং কাব্য প্রতিভার বিশেষ পরিচিতি লাভ করা

যায়। অধিকাংশ গীতিকাব্য ইহাদের ধর্মতত্ত্বমূলক।

কবিওয়ালাদের এক একটি সম্প্রদায় ছিল। সভা সমিতি, আলরে উৎসবে ইহাদের ডাক পড়িত এবং তখন ‘কবিগান’ হইত। এক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত, এবং সেইখানেই কাব্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। দর্শকগণ বাস্তব

রাম বস্তুর লবসাময়িক কবিওয়ালা, হরঠাকুর। হরঠাকুরের আসল নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাদী। ইনি বাংলা ১১৪৫ লালে কুলি-কাতা শিল্পলিঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। বামুন-কাল হইতেই ইহার কাব্য প্রতিভার পরিচয় লাভ করা যায়। ইহার পিতার নাম ছিল কালী চন্দ্র দীর্ঘাদী।

হরঠাকুর শীঘ্রই কবিওয়ালা রূপে জনসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন। পূর্বেই বঙ্গলিঙ্গ তখন দেশের রাজা মহারাজারা কবিদের সম্মান করিতেন—ভরণ পোষণের ব্যয় তাঁর বহন করিয়া কাব্য প্রতিভার পরিষ্করণের লক্ষ্যতায় করিতেন—তাই হরঠাকুরের ডাক আসিতে লাগিল বহু রাজসভা হইতে। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি রাজসভায় হরঠাকুর বিশেষরূপে আদৃত এবং পূজিত হন। প্রথমে তিনি লখের কবির দল গড়েন, পরে তিনি সে দলটিকে পেশাদারী দলে পরিণত করেন। পরিশেষে দল ছাড়িয়া তিনি মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

হরঠাকুরের স্বাভাবিক কবি প্রতিভা লব্ধে একটি চমকপ্রদ গল্প আছে।

“একদা মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় নান্দ্র দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ হয়। মহারাজ সভাস্থ পণ্ডিতগণকে একটি সমস্যা পূরণ করিতে দেন। সে সমস্যার শেষ চরণে থাকিবে, “বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে।” কিন্তু কোন পণ্ডিতেরই সমস্যা-পূরণ মহারাজের মনোমত হইলনা; তিনি হরঠাকুরকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। হরঠাকুর তখন গামছা কাঁধে গজানান করিয়া

বি, নার্ন

ফোন : বি, বি, ৩২৩৪

১৬১এ, বিডন স্ট্রীট

কলিকাতা

বায়স্কোপে—

প্লাইড বিজ্ঞাপন ও

প্রোগ্রাম হাইলার বিজ্ঞাপন

প্রচারের জন্য—

দেওয়ালে—

পোস্টার লাগাইবার জন্য

আমাদের সহায়তা লইলে

নিশ্চয়ই খুসী হইবেন।

—*—

সম্মত কবিওয়ালাদের গান শুনিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে রঘু, মতে, নন্দ এই তিনজনই—প্রথম কবিওয়ালা। ইহাদের পর প্রতিভাসম্পন্ন কবিওয়ালা রাম বস্ত্র। রাম বস্ত্রের কাব্য প্রতিভার সহিত আধুনিক বহু পাঠক পাঠিকা সুপরিচিত।

আসিতে ছিলেন। সেই বেশেই, মহারাজের সভার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে পুরস্কৃত সমস্তাটি পূরণ করিতে বলিলেন। হরঠাকুর তৎক্ষণাৎ কবিতায় সে সমস্তার পূরণ করিলেন;—

“একদিন শ্রীহরি, মুক্তিকা ভোজন করি,
বুলায় পড়িয়া বকু কাঁদে।

রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মুক্তিকা বাহির
করৈ, বঁড়শী গিলেছেন যেন চাঁদে।”

তিনিয়া সভায় সকলেই লজ্জিত হন; এবং মহারাজ একহাজার টাকার পুরস্কার প্রদান করেন। ১২১৫ সালে হরঠাকুর পরলোক গমন করেন।

হরঠাকুরের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলিই প্রশংসনীয়। ব্রিঙ্ক ও মদুর কথা রচনার তিনি দক্ষতা দেখাইয়াছেন। প্রকৃতির সহিত মানুষের মনের যে একটি অতি সুন্দর harmony আছে তাহার সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্ধৃত ছন্দে। যমুনায় জলে কৃষ্ণের ছায়া—রাধার মনে কৃষ্ণের ছবি প্রকৃতির সহিত মনের অতি সুন্দর সৌন্দর্য্য :

“আচরিতে আলো কেন যমুনায় জল।
বেখ লখি কুলে থাকি কে করে কি ছল।
তীরের ছায়া নীরে লেগে হ’লো বা এমন।
স্থগিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটাঁ আঁখি।
নিতি নিতি আলি সব জল আনিতে।
না দেখি এমন রূপো বারি মাঝেতে।”
আর একস্থানে :—

“আজু লখি একি রূপ নিরখিলাম হার।
নীল মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়।
টেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে, কিশোরী।
দরশনে যাঁগা হিলে হইবে লখি পাতকী।”

হরয়ের একাগ্রতা—বঙ্গপঞ্জী-রচয়িতা হরয়ের এক কল্পন অতিব্যক্তি কাব্যের সুরে রূপায়িত।

হন্দ যেখানে গভীর ভাব ও লেখানে

গভীরতর—প্রাচীন বাংলা কাব্যে sound এবং sense যেমন এক মাত্রায় চলিয়াছে!

“হার, কি হবে লজনি, যার যে রজনী
কেন চক্রপাণি এখনো।

না এলো একুজে, কোথা সুখ ভুজে
রহিল না জানি কারণে॥

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে,
ছোতেছে স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এলো দুর্ভাগি, পাই বাতনা॥

মই, রবি কিরণের প্রায় হিমকর,
এ তমু আমারো দহিতে।

শিবিপিক-রব অঙ্গে ঘোর সব
বজ্রপাত লম্ব বাজিতে॥”

বঙ্গ প্রকৃতির শ্রাম শোভায় অশোভিত
ব্রিঙ্ক শ্রামরূপ বর্ণনায় কবির কি সুন্দর
রূপ দৃষ্টি :—

“অঙ্গে অগোর চন্দন চর্চিত, বনমালা গলার।
গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া,
ভ্রমরা গুঞ্জরে তার॥”

কিন্তু বিরহ বর্ণনায়ই হরঠাকুর সর্বাধিক
প্রসিদ্ধ। করুণ কাব্যের সুরে তাঁহার
বর্ণিত রাধার বিরহ নিপীড়িত, দুঃখ, বেদনা
অতি সুনিপুণ।

“সুধীর ধীর বহিছে এই বোরতরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণ লখীরে কোথায় গুণমণি,
যন গরজে যন তনি॥

ঐ ময়ূব ময়ূরী হরবিত, হেরি চাতক চাতকিনী,
এ বহুধ কেতকী চম্পক জাতি পেউতি
সেকালিকে,

ব্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মার প্রাণনাথে
গৃহে না দেখে,
বিছাৎ খড়োত দিবাভ্যাতি মত প্রকাশে
দিনমণি,

প্রিয় সুখে সুখ দিয়ে শারীতক থাকে
দ্বিবল রজনী॥”

এইরূপ বহু পদই হরঠাকুরের কাব্যে
বিদ্যমান। বৈষ্ণব কবিগণের বাঁশীর মরমী
সুর লহরে কাব্যধারায় খাঁটি বাংলা সুরে
কবিগণার গানে ফুটিয়া উঠিয়াছিল
আধাস্মিক কাব্যরূপে, করুণ সুরের মাধ্যমে।

কবিগণালাহলের শাক্য আজিকার
দিনে আর পাওয়া যায় না—কিন্তু সন্ধান
করিলে আজিও হয়ত আবিষ্কার করা যায়—
উৎসাহ দিলে আজিও হয়ত কবিগণার
কবিগান সৃষ্টি হইয়া বাংলা সাহিত্যের
পূর্ব গৌরবের একটি অধ্যায়কে বাড়াইয়া
রাখিতে পারে।

প্রথম ভ্যালুয়েসনের ফলাফল

= বোনাস =

আজীবন বীমায়

১৫৮

প্রতি হাজার

||

মেয়াদী বীমায়

১২৮

প্রতি বৎসর

ডেনহাইন ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস : ১০০নং ক্রাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ১২০৭ কলি :

টেলিগ্রাম : “স্পিডি”

নৃত্যকলা ও বাঙ্গালা দেশ

শ্রীসমরেন্দ্র নাহিড়ী

যে কটি কলার দ্বারা জীবনের চিত্র-স্বন্দর রূপকে মানুষ প্রকাশ করতে পারে, নৃত্যকলা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

রূপায়িত দেহ-ভঙ্গিমার মাঝে জীবনের যে সত্য-স্বন্দর রূপের প্রকাশ—তারই নাম নৃত্যকলা।

সাধনার পথে পরম সত্যের উপলব্ধিই ভারতের চিরকাব্য। তাই তার নৃত্যকলার সাধনার দ্বারা সে চেরেছিল সত্য-স্বন্দরের স্বরূপ প্রকাশ করতে—হয়ত বা পেরেওছিল।

নৃত্য চর্চা ভারতে কোনদিনও উপেক্ষিত হয়নি, হারানো দিনের ইতিহাস তার সাক্ষ্য। রাজ্যের আনন্দ সভ্যমহল থেকে মন্দিরের অন্তরমহল পর্যন্ত তার গতি ছিল অপ্রতিহত—রাজা, প্রজা, স্ত্রী, পুত্রী একই সাথে পেরেছিল তার বন্দনা গান।

তারপর এলো সেইদিন, যেদিন ভারতের নৌভাগ্য-গগন সমাচ্ছন্ন করে দেখা দিলে রাজনৈতিক হুমকি। ভাঙ্গা গড়ার খেলা শুরু হোল। একে একে ভারত হারালো অনেককিছু, পেলেও বা অনেককিছু—আরম্ভ হোল নৃত্য-স্বন্দরের অভিব্যক্তি।

এরপর ভারতের নৃত্যকলার ইতিহাস ছিল অজ্ঞাত, অধ্যাত। কিন্তু এখানেই তার সমাপ্তি হোল না, আবার নৃত্য-স্বন্দরে

শুরু হোল তার নব-অভিব্যক্তি। নৃত্য-স্বন্দরে ভারতের এই অভিব্যক্তি যথেষ্ট অতি অল্পদিন মাত্র আরম্ভ হয়েছে, তবু ইতিমধ্যেই সে রাজ্যে তার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরকম অবস্থা সম্পূর্ণ সম্মানই সেই সমস্ত কৃতি শিল্পীদের প্রাপ্য—যাদের অপূর্ণ সাধনার গতি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সফলতার পথে ভারতের নৃত্যকলাকে তার দূত বশ-যুক্ত পুনরায় সাজিয়ে তুলেছেন। এবার শুধু ভারতের অন্তর মহলে নয়—সমগ্র জগতের সভাগৃহে হয়েছে ভারতীয় নৃত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

নৃত্যকলার এই নব-অভিব্যক্তিতে বাঙ্গালা দেশকে বলা যেতে পারে কর্ণধার। এক্ষেত্রে তার স্থান—অক্ষরহীন, অপরিমেয়, অপরূপ। তার শিল্পী শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট সাধকের অপূর্ণ সাধনার সামনে, স্তম্ভীত বিষয়ে, প্রজ্ঞার সারা জগত মগ্ন নত করেছে।...কিন্তু এর পরিচয় দেওয়া আজ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আর সে পরিচয় কে-ই বা না জানে।

গুপ্তীর সমাধারে বাঙ্গালা কোনদিনই বিমূখ নয়—কি আপন, কি পর। ভারতের নানাস্থানের, আর শুধু ভারতেরই বা কেন—সমগ্র জগতের নৃত্য শিল্পীরা (অবশ্য যাদের সাথে বাঙ্গালা পরিচিত হয়েছে) বাঙ্গালার

কাছে সম্বন্ধিত হয়েছেন। বাঙ্গালার এই পরিচয়ই সকল গুপ্তীর কাছে তার চিহ্ন—নিমিত্ত। কাজেই তার সভাগৃহ কোনদিনই শূণ্য নয়, আশঙ্কিতের স্তম্ভাগমনে নিত্য পরিপূর্ণ। আপন সঞ্চয় সে পেরে, কাছে বিশিয়ে দিতেও সে কুণ্ঠিত নয়, আবার অশয়ের, সঞ্চয়ে আপন রিক্ততা ভরিয়ে তুলতে সে অসমর্থ নয়।

এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে যেমন আপন স্তম্ভের কিছুমাত্র অশচয় ঘটে না, তেমনি নব নব সংগ্রহে সঞ্চয়ের পাত্রটা গুণে পূরে। বাঁহুয়ের মনের গতি-চিহ্ন প্রবাহমান, সে চার নিত্য-নৃতন; আর এই নিত্য-নৃতনের আচ্ছাদনে, স্তম্ভের সাথে মিলনের প্রয়োজন হোলে গোড়ার আঁচের পক্ষে একান্ত অশরিকার। পরস্পর মিলনের সহায়তারই এক দিন অপরিপূর্ণতার পথ পার হোলে এনে, আমরা সম্পূর্ণতার দ্বারে পৌঁছতে পারি।

কাজেই দেখা যায় অপরের সাথে মিলনের দ্বারা বাঙ্গালা কিছুমাত্র কতিপয় হয়নি, বরঞ্চ তার উন্নতির, তার বৈশিষ্ট্যের গোড়ার কথাই—তার মিলনের কথা। এ কথাই আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শুধু আপনার ভালটা আঁকড়ে ধরে চরম ভালটা পাওয়া যায় না।

অপরের ভালটার সাথে নিজের ভালটাকে বিশিয়ে নিতে পারলে—তবে পাওয়া যায় পরম ভালটা, সম্পূর্ণ ভালটা। শিল্পী শ্রেষ্ঠ উদয়লকরের পানে চাইলে, অতি সহজেই একবার মর্ম উপলব্ধি করা যায়।



ইন্ডিয়ামাইল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১ ক্লাইড স্ট্রিট কলিকাতা।

কথাসিল্পী

শরৎচন্দ্রের

মহাপ্রয়াণে

দরদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

প্রিয়াল দাস



শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে

শ্রীমোহনিনী সুখোপাধ্যায়

বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ও কথাসিল্পী শরৎচন্দ্রের দ্বায়ে বাংলা সাহিত্য তার আসন সুপ্রতিষ্ঠ করেছে, বাংলা সাহিত্যের খ্যাতির মূলেই ছিলেন এই দুজন, কথা উঠলেই এই দুজনকে লোকে আগুন দিয়ে বেঁধিয়ে দিত। কিন্তু তাঁদের একজন আজ নাই। অগনিত ভক্তের আশা অপূর্ণ রেখে অসময়ে তিনি চলে গেছেন। ভাষাতে কষ্ট হয়, চক্ষু আজ হুঁপে আসে। শরৎচন্দ্রের তিরোধানে বাংলার সাহিত্যাকাশে আজ চন্দ্রদেব অন্তহিত। নক্ষত্র অনেক আছে। জলছেও সকলে মিট মিট করে। কিন্তু তাঁদের ক্ষীণ আলোকে অন্ধকার দূর হয় না। লোকে চলার পথ খুঁজে পায়না। সাহিত্যের পথ নির্দেশ এমন করে আর কেউ করে নি। তাঁর অর্থ ও উদ্দেশ্য এমন করে আর কেউ বুঝায় নি। পশু, আড়ন্ত লম্বাজের অসংখ্য গলদ চোখে আগুন দিয়ে এমন করে আর কেউ দেখায় নি। কোন রকমে টিকে থাকাটাই চরম লক্ষ্যকতা নয়, একথা এমন ভীষণ, এমন ভীষণ ভাবে আর কেউ কোন দিন বলেনি। “এমন অনেক জাতিই ত টিকে আছে। সুকিয়া আছে, কোল ভিল লাভতালেরা আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক ছোট খাট দ্বীপের অনেক ছোট খাট জাতি মানুষ সৃষ্টির মূক হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায়ও আছে। তাঁদের এমন সব কড়া সামাজিক আইন কাহুন আছে যে শুনে গেয়ে রক্ত জল হয়ে যায়।

বরষের হিসাবে তারা ইউরোপের অনেক জাতির অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন। কিন্তু তাই বলিয়া যে এরা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ এমন লংশর বোধ করি কারো মনে উঠে না। লম্বাজের এই দুর্দশায়, এই হৃদয়হীন ব্যবস্থায় তিনি যে বেদনা অনুভব করতেন তাথেকেই তাঁর ভাষা যেন অগ্নিময়ী জালা উদ্গীরণ করতো। তাঁর “পথ নির্দেশ”—“পল্লী লম্বাজ” তাঁর শেষ প্রাণ এই জালাময় বেদনাই অভিযুক্তি। দরদী কবি অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়ে বাংলার সুখ দুঃখ, হাসি ক্রন্দার চবি নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করেছেন। যে অগুণিত নরনারীর অন্তরে পুঞ্জীভূত বেদনা অহরহঃ স্তম্ভে স্তম্ভে উঠছে, নিষ্ঠুর অজ্ঞার হাণি ছাড়া যারা লম্বাজের নিকট আর কিছুই পেল না, শরৎচন্দ্র তাঁদেরই বুকে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দুঃখ বেদনাকে দিয়েছেন

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

যে মায়াবিনীর ধোঁয়ার কাটি হোঁসানোতে এক জলন্ত প্রতিভার স্মৃতি জগত হোতে বিলুপ্ত হোলো, তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবার মাধ্যমানব লোকের নেই। তাই যখনই এক একটি কথা হৃদয়ের মণিকোঠায় গিয়ে ধাক্কা লাগায় তখনই বেঁধিয়ে আসে আমাদের দুঃখ-রূপ অনুভূতির টুকরো। এই যে মরণ—এই চরণে নিবেদন কোরেছেন জগতের শ্রেষ্ঠ মনিষীরা তাঁদের ভাবের খেলা দিয়ে;—তাঁদের প্রতিটি তন্ত্রীতে বদ্ধ হোয়েছে এক একটি বিভিন্ন সুর,—Kants গেরেছেন, মরণ আঁচল বিচুলে তাঁর অনুভূতি শ্রেষ্ঠ চন্দ্রে প্রকাশিত হোতে পারবে না। Shakespeare বোলেছেন ‘Come away, Come away death,’ রবীন্দ্রনাথ সুর তুলেছেন ‘মরণ রে তুহু মম শ্রাধ লম্বান;—’ কিন্তু এই যে মৃত্যুর দর্শন (Deaths Philosophy) আমরা প্রতি জনের ভেতর দিয়ে পেলাম, তার মাঝেও স্বাতন্ত্র্য আছে শরৎচন্দ্রের উক্তিতে। শরৎচন্দ্র মরণকে বেথুঁছেন আরেক স্বপ্নে,—এর ভেতর আছে মাধকতা। আছে ‘রূপহীন মরণকে ‘অপরূপ লাজে’ লজ্জিত কোরবার অপূর্ণ কৌশল। মরণ যেন তাঁর কাছে জীবনের একটি অবলম্বন;—একে যেন ছাড়তে পারেনা কেউ; তাই শরৎচন্দ্রের বইতে নেই বেশী কিছু মৃত্যুর ছাপ, আছে শুধু নৌলম্বানস্রীর নিকাম দেবা। ‘দেবদাল’ মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য

হোরেছিলো এবং তাই-ই সে অগত হোতে নিরেছিলো চিরবিদায় : কিন্তু অশ্রুধিক Thomas Hardyর নারিকার (A Pair of blue eyes) মৃত্যুর কোনও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তবুও সে মরলো, কারণ Hardy ভালবাসেন Pessimism এর প্রেশর।

যাহোক, আজ এই দুঃখের দিনে যে গভীর সমবেদনার ভেতর দিয়ে আমরা অগ্রণর হোচ্ছি, তাতে কোরে মনে হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের জলন্ত প্রদীপগুলির মধ্যে এক একটি নিঃশব্দে নির্ধাপিত হোয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে বিদায় নিয়েছেন জগদীশচন্দ্র আর এখন গেলেন শরচ্চন্দ্র—এই দুই শোফ এতদূর গুণপ্রোতভাবে জড়িত রইল যে তা' এ জীবনের স্মৃতির পট থেকে আর মুছে যাবে না। জীবনের পাখী মানবজন্মে বদ্ধ ছিলো এতদিন, কিন্তু ধরণকে লাখী কোরে চল্লো সে অজানার সুরে, দু' হোতে দু'—আর রেখে গেলো আমাদের জন্তে এককোটা অশ্রু, ছন্দে গাঁথা।

"So past the strong heroic soul away"

দরদী সাহিত্যিক শরচ্চন্দ্র . (পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ভাষা। "সংসারে যারা শুধু দিকে, পেলো না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্কল, উৎপীড়িত, মায়াব্ব হয়েও মায়াব্ব যাদের চোখের জলের কখনও ছিলাব্ব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলো না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঞ্জ আমাদের কম?" এরাই ছিল তাঁর মুখ খুলে। এরাই পাঠালো তাকে মানুষের কাছে মানুষের নারিশ জানাতে। এদের মহামুত্তিতও তিনি হৈয়ে উঠেছিলেন বিজোহী। এই বিজোহী তাঁর

সাহিত্যকে দিয়েছে এক অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তাঁর অনাবিষ্ট দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সুগভীর উপলব্ধি শক্তি নারীচিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করেছিলেন। তাদের আনন্দ বেদনা, সুখ দুঃখের অমুত্তিতিকৈ নিবিড় মহামুত্তিতির পরম রসরাগে তিনি সাহিত্যে বাস্তবরূপে সভ্য করে তুলেছিলেন। তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি যে ভাবে তিনি ফুটিয়েছেন তা লিখিই বিশ্বকর। বোধহয় এমনটি আর কখনও হবে না।

রসসৃষ্টির ঘোহাই দিয়ে রুগ্ন বিকৃত মনের পরিচয় তিনি দেন নি। তাঁর অন্নদা দিদি, বিরাজ বো, বিন্দু, নরেন, মলিম প্রভৃতির তুলনা নেই। আর ছোট ছোট চরিত্রগুলি তাঁর সমগ্র সাহিত্যের পাতায় পাতায় যেন মনিমুক্তার স্তায় ছড়িয়ে আছে। পরেশ, রতন নাপিত, "পোড়া কাঠ" কাকে রেখে কার নাম করবে? চরিত্রাঙ্কনে এতখানি দক্ষতা বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। সর্বোপরি তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী কবি। বাঙ্গালীর চরিত্রাঙ্কনে অবাকালীর রং মিশিয়ে তিনি continental সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি। তাঁর মানস পুত্রকত্তাগণ বাংলা দেশের গুলোর কাদার মানুষ, বাংলা দেশের জল হাওয়ার পরিপুষ্ট, বাঙ্গালীর দোষগুণ স্বভাব সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি।

প্রাচীনবঙ্গ কীত্তিমত্তিত, শিক্ষা, শিল্প, ধর্ম, সংস্কৃতির গৌরবে উজ্জল। কিন্তু আজিকার এই বর্ধমান যখন অতীতের কোলে আশ্রয় নেবে, যখন এর ইতিহাস রচিত হবে তখন আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের কোন কীত্তি ইতিহাস ঘোষণা করবে? তার ভাষা ও সাহিত্য। এয়ুগের বাঙ্গালী জাতি এই জিনিষটাই কেবল গড়ে তুলেছে। অতি

চলার পথ

শ্রীভক্তি চট্টোপাধ্যায়

হাট্ট চোখে ব্যক্ত করা অন্তরের সন্তপিত প্রেম কামনার মুখ শান্তি উৎসাহের তীব্রময়ী জালা হতভাগ্য নিরাশার স্বকল্পিত ব্যর্থ উপদেশ—সঙ্কোচ সন্দেহে ঘেরা বিশ্বস্তির আশায় মলিন আমার চলার পথ দিয়ে রবে বিরাট আধার দীর্ঘদিন রজনীর উচ্ছ্বসিত মৌন হাহাকার। অশান্ত চরণক্ষেপে উপেক্ষিয়া ক্ষুদ্র মূলিকণা মানুষের রক্তে রাঙা কণ্টকের তীক্ষ্ণ পরিহাল নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়া বাস্তুত্ব তটে মরিচীকা মারা বৃকে স্পর্শমণি খানি—প্রিয় প্রভাতে জাগা রুদ্ধগাণী সম অতীতের স্বপ্নে কীর্ণ আলোর নিঃশ্বাস দুই হাতে ছিন্ন করি উচ্ছ্বজ হাজার বাঁধন আমার চলার পথ পড়ে রবে গর্কে অমুকণ।

সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের অকিঞ্চিংকর উপকরণ নিয়ে শরচ্চন্দ্র যে অনাস্বাদিতপূর্ব কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন স্বকীর মৌলিকতার জোরে অনাগত কালের সেই ইতিহাসের পাতায় তাঁর প্রতিভার মহিমা গগনের পূর্ণচন্দ্রের স্তায়ই চির লক্ষ্যল থাকবে।

গর্ভ নিরোধ বাটিকা
বহু পরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ঔষধমাত্র একবার সেবনে এক বৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫ টাকা
হাকিম এম. এ. স. জামান
৪২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

শরণ সাহিত্যে দরদ *

শ্রীঅনিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গৃহ ও সমাজ জীবনে স্নেহ ও ভালবাসা স্বাভাবিক আধার হইতে বঞ্চিত অথবা বিক্লিষ্ট বা সমাজের বিধি নিষেধের জন্ত অধিকৃত হইয়া অহরহঃ যে কত গভীর বেদনার, কত দুঃখ মানির সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে শরণচন্দ্র সেই ক্ষুদ্র, ব্যথিত ও ব্যর্থশ্রমে বেদনার পুরোহিত। তাঁহার মর্মস্পর্শী লেখার ছত্রে ছত্রে এই গভীর বেদনা গুহরিয়া গুহরিয়া উঠিতেছে। Pathos সুরে তিনি বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়।

হেতু যত বড়ই হোক, মানুষকে তিনি কখন ঘৃণা করেন নাই। ক্রটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়, মাঝখানে তার যে বস্তু আগল, সেই দনটিকে তিনি দেখিয়াছেন তার সকল অভাব অপরাধের চেয়েও বড় করিয়া। মানুষের বোঁকলোর প্রতি তাঁর দরদেব সীমা নেই। অথচ অনেকে এইটাই তাঁর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, এবং যে অপরাধে তাঁকে সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছে, সে তাঁর এই অপরাধ। পাণীর চিত্র তাঁর তুলিতে হইয়া উঠিয়াছে মনোহর, তাঁর বিরুদ্ধে এই তাঁদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ।

বাংলা সাহিত্যে মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসিতে শিখাইয়াছেন . শ্রীঅনিল। তিনি দেখাইয়াছেন কাবুলীওয়ালার অর্থের জন্ত মানুষ খুন করিয়া থাকিতে পারে

এতবুও তার অন্তরে তার মেয়েটির জন্ত যে স্নেহ লুক্কিত ছিল তাহা জগতের কোনও স্নেহশীল পিতার অপেক্ষা . কম নহে। শরণ বাবুও দেখাইয়াছেন, হৃদয়ন্তরালের চরিত্রেও একটি রমণীর দিক আছে, উচ্ছ্বল মাতালের দৃষ্টির কোণেও হয়ত এমন ভালবাসা লুক্কিত হইয়া রহিয়াছে . যাঁহাকে তুচ্ছ করা যায় না, যাঁহা ভ্রমোপবনের হোমানুলের মতই পবিত্র। হের ও অজ্ঞাত জীবনেরও একটি উজ্জ্বল দিক আছে। মনুষ্য-জীবন কখনই অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ নহে। প্রত্যেক জীবনই ভাল ও মন্দের সমষ্টি। আমাদের ঘরের ছোট পাট তুচ্ছ বিষয়গুলিও তিনি মহামুহূর্ত্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন। কিরণময়ীর গৃহত্যাগ, বেবদালের নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক দৃষ্টিতে মোটেই মহামুহূর্ত্তির উদ্রেক করে না। কিন্তু শরণচন্দ্র দেখাইয়াছেন কি দারুণ তৃষ্ণায় হতভাগা হতভাগিনীরা নন্দামাত্র হর্গন্ধ জল অঞ্জলি পুরিয়া পান করে।

মানুষের ভ্রান্তি দুর্লভতার জন্ত তাঁহার অপূর্ণ মমতা, অদুরন্ত দরদ। তাই বেবদালের মৃত্যুর পর তিনি পাঠককে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন—“তোমরা যে কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও বেবদালের মত, এমন হতভাগ্য অদম্বনীয় পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্ত একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও আর যাঁহাটাই হউক, যেন তাহার

মত এমন করিয়া মৃত্যু কোঁচাও না ঘটে। মরণে কতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটা স্নেহকরম্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে, যেন একটাও করুণাজ্ঞা স্নেহময়, মৃদু দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময়ে যেন কাহারও এক কোঁটা চোখের জল, দেখিয়া সে মরিতে পারে।”

তিনি দেখাইয়াছেন, যখন মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রা উদ্ভাসভাবে বিভিন্ন দিকে ছুটিয়া সমাজ-বিদ্রোহ, এমন কি হয়ত আত্মবিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন তাহাদের মূলে থাকে প্রেমের বা স্নেহের সরল ও স্বাধীন প্রকাশে বাধা। এইজন্য শ্রীকান্ত ভবঘুরে, . দেবদাস, উচ্ছ্বল। এই জন্তই দ্বিচারী চরিত্রে নারীত্ব ও মাতৃত্বের সংঘর্ষ। এই জন্তই অন্ডা বঙ্গনারীর স্বাভাবিক সহিত্যতাকে ছাপাইয়া স্তম্ভীকৃত ও সত্যদৃষ্টিতে অসঙ্কোচে তাকাইয়া চলিয়াছে। এইজন্য সত্যলক্ষী স্মরণবিধি লোকচক্ষুর অন্তরালে সাপুড়িয়ার গৌরব হীন জীবন যাপন করিয়া কলকিনী নাম কিনিয়াছেন। এই জন্তই কিরণময়ী মানুষের সহজ ভালবাসাকে এলু করিয়া তুলিয়াছে।

ভালবাসা অপরাধ নয়। সে সমস্ত অন্তর-নিংড়ান অভিমান, বেতনা ও মাধুর্যের সমন্বয়। . মানুষের অন্তরতম অন্তহলে যে আকাঙ্ক্ষা নীড় বাঁধিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা মৃত্যু। মানুষের মন “এজিকের” নীতিতে বাধা . নয়—তার মধ্যে সৃষ্টিভাড়া খেয়ালের প্রভাবই বেশী। “Love is an anarchic force which will not remain within any bounds set by law or custom,” বাহা মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি, তাহার আবৃত্তিতে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। ইহা পার্শ্ববর্ত্তী জিনিস। ইহাতে স্বর্গের স্রবসা নাই, নরকের পুতিগন্ধও নাই। প্রেম

শ্রেমাই। তাহাকে স্মৃতি, অঐশ্বর্য ও কুৎসিৎ বলিলেও তাহার দাবী অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। ইহাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। মস্ত পড়িলেই যে ইহা পবিত্র হইবে তাহা নয়। আবার মস্ত না পড়িলেও ইহা গহিত না হইতেও পারে। “পৃথিবীতে অনেক বর বধু অনেক মালা বহল করেছে তাহের প্রেমে জগত পবিত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু কুলটা রাজলক্ষ্মী তার নব্বদর বয়সের কিশোর বরটিকে বইতির মালা দিয়ে একমুহুরে যত ভাল বেলেছে, এ সংসারে তত ভাল কেউ কোনদিন কাউকে বাসে নি।”

সমাজ সাহায্যের পুতিতা বলিয়া গালি দিয়াছে, চরিত্রহীন বলিয়া ঘুরে ঠেলিয়াছে, তাহাদের জন্ম এমন মধুর, যে সমাজের তথাকথিত নেতারা তাহাদের কাছে নতশির হইতে পারেন। বেশী ঘোষাল হুমাকে কলঙ্কিনী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল; কিন্তু কাহার চরিত্র মহত্তর—বেণীয় না রমার?

শরৎচন্দ্র বুদ্ধি দিয়া কাহাকেও বিচার না করিয়া, লহাভূতি দিয়া লবাইকে বিচার করিবার চেষ্টা করেন। মানব-জীবনের সমস্ত লক্ষ্য, আশা-সংঘাতের বেদনাকে তিনি তাহার বিস্তীর্ণ লহাভূতি দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সুরেশ ও কিরণময়ীর জীবনে সত্যিকার মার্ঘ্য্য খুব কম। কিন্তু তাহাদের জীবনও তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার সহজ সমবেদনা দিয়া। তিনি দেখাইয়াছেন তাহাদের অপরাধ শুধু সুখিয়ার ভুল—পাপ নহে। তিনি তাহাদিগকে পাপী বলিয়া স্মৃণা করেন নাই—ব্রাস্ত বলিয়া বক্রণা করিয়াছেন।

কিরণময়ী ধর্ম মানেন না, শাস্ত্র মানেনা, ভগবান পর্য্যন্ত মানে না। আচার বা

লংস্কারে তাহার আস্থা নাই। পরকালের মূল্য তাহার কাছে কিছু নয়। তাই সে বৃত্তিত কেবল ইহকালের সুখ। উপেক্ষা কিরণময়ীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল হীন প্রতিহিংসাবৃত্তি। আর যে উপায়ে সে প্রতিহিংসা লইল, তাহা যেমন নীচ, তেমনই বিভৎস। পুত্র, স্থানীয় বাগকের হৃদয়ে বিরংলাবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়া সে লইল প্রতিহিংসা। বিবাকর কিরণময়ীর চুবনে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। অচলারও ঠোঁট দুটা বিহার শ্রায় জলিয়া উঠিত। সে নিজের বৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই। অদৃষ্টের পরিহালে সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা করিতে গিয়াই সে কলঙ্কের কুপে অবগাহন করিয়াছিল। কিন্তু সেই যে একটা কুৎসিৎ ঘটনা, তাহাই কি শুধু লভ্য? আর সে নিষ্ঠার লহিত এতকাল যে তাহার রূপ স্বামীর ধ্যান করিয়া আসিয়াছে, তাহার ভালবাসাকেই লক্ষ্য করিতে সমস্ত বিরোধ, সমস্ত প্রলোভন পায়ে দলিয়া একদিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কি লভ্য? ভুল বেশী করিয়াছিল কে, সুরেশ না মহিম? কিসে বেশী গোঁল বাধাইয়াছে? সুরেশের উচ্ছ্বাস প্রবৃত্তি না মহিমের নিশ্চল নীরবতা? তা’ছাড়া তিনি আরও দেখি-রাছেন—বাহিরে যা ঘটে, তা সব নয়। একদিন দ্বারুণ অভিযানে, সাময়িক উত্তেজনার হিতাহিত—জ্ঞান—বিবর্জিত হইয়া বিরাজ-বৌ রজনীর অন্ধকারে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গোঁড়া সমাজপতির। এই কাজটুকু দেখিয়াই তাহার দণ্ডাঘোষ করিবেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন যে, এইযে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এইটুকু কি লম্বা লভ্য? ঘরের বাহিরে দাঁড়াইলেই কি ঘরের ও অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট হয়? বিরাজ-বৌ-এর অন্তরেত সুহৃদের জন্ত স্বামী প্রেম স্নান হয় নাই—তবে কেন তাহার প্রতি এই শাস্তি?

বিধবা লাবিত্রী ঘটনাবশে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সমাজের বিচারে তাহার কার্য্য অত্যন্ত গহিত। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও এইযে অলহারা নারী এমন করিয়া নিজের লক্ষ্যাত্মক পবিত্রতা রক্ষা করিল, ইহার কি কোনই পুরস্কার নাই?

কেবল অন্তর্য্যাত্তে হিন্দুনারীর লভী-ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ বিজ্ঞোহের বাণী সুধিমতী হইয়াছে। শ্রীকান্তকে অন্তরা বলিয়াছিল, “আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এলেও উপায় ছিল না, আর এলেও উপায় হোল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবু তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকতেই কি আমার জীবন ফলেফুলে ফুটে উঠে লাবক হত, শ্রীকান্ত বাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারাজীবন বয়ে বেড়ানুই কি আমার নারী জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিনী বাবুকেও আপনি দেখে গেছেন, তাঁর ভাল-বাসাত আপনার আগোটর নেই। এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পসু করে দিয়ে আর আমি লভী-নাম কিনতে চাইনে, শ্রীকান্তবাবু!”

কিন্তু অন্তর্য্যাত্ত চরিত্রেও সুধীর্ঘ্য দিনের লংস্কার লজ্জাত লঙ্ঘ্যচ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্তরা লক্ষ্যাত্ত:করণে রোহিনীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল স্বামীর সংসার করিবার জন্ত এবং যদি সেই স্বামী তাহাকে অনুমাত্র দয়া বা শ্রীতি দেখাইত, তাহা হইলে রোহিনী বাবুর প্রেমের মর্য্যাদা থাকিত কোথায়? কাজেই রোহিনী বাবুর সঙ্গে তাহার যে মিলন—ইহার মলে রহিয়াছে ‘ব্যর্থতা’।

পরজীতে আলক্ত রোহিনীকে বেশ দু’কথা শুনাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়া, লুজ ঘরের পুঞ্জীভূত বেদনা দেখিয়া তিনি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন ‘লম্বা সমাজ,’ লম্বা ধর্ম্মাধর্ম্ম, লম্বা পাপপুণ্যের অতীত একটা

উৎকট 'বেদনাবদ্ধ রোমন'। সব ক্রোধ তাঁহার ভালিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "এতবড় ভালবালাকে অপমান করিতে পারি—নীতিশাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশী পড়ি নাই।"

বাস্তবিক, পুথির লেখার উপরেই তিনি কাঁধকেও বিচার করেন নাই। তাই সমাজ-ক্রোধী অন্তরাকেও বিচার করিবার সময়ে তিনি বলিয়াছেন—“কি ভাল, কি মন্দ, এ সকল প্রশ্ন পারি বহি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া, তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব। না পারিত, শুধু পুথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই; তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই।”

অন্তরার কাছে কিছুই কঠিন নয়, মৃত্যু—সেও তার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা, এই সব প্রাচীন মানুষের বুলি দিয়া সেই অন্তরার ভাবাব হয় না। পুথিবীতে কেবল মাত্র বাহিরের ঘটনা পাশ-পাশি লম্বা করিয়া লাজাইয়া সকল জন্মের জল মাপা যায় না।

অথচ অন্নদা দ্বিবি, বাহার সম্বন্ধে শ্রীকান্ত সবচেয়ে শ্রদ্ধা দিয়া লিখিয়াছেন, তিনি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ত করেন নাই; বরং সমাজ তাঁহাকে যে স্বামী দিয়াছিল, সেই বর্ষের পশুকে অন্নান বধনে গ্রহণ করিয়া আজন্ম লতীধর্ম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন সমাজের আদর্শকে অটুট রাখিবার জন্য—তাঁহার নামটাই ছিল শুধু কলিকনী—প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন হিন্দু রমনীর শিরোমণি। একেত্রে তিনি প্রশ্ন তুলেন নাই—শাহজীর মত বর্ষরকে বরণ করায় সত্যিকার কি মহত্ত্ব আছে! তিনি দেখিয়াছেন অন্নদা দ্বিবির দেবার মহত্ত্ব, ত্যাগের গৌরব। তাই তিনি বলেন, “লম্বা বিধি নিষেধই সকলকে এক হৃদিতে বাঁধিতে পারে না। যে অপরাধ

একজনকে ভুলিয়া করে’ ঘের, সেই অপরাধই হয়ত আর একজন সম্বন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। যে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একজন ৩০ বছরের লোককে মারতে না পারে ত বোধ হবে কাকে? যাঁদের ভেতর আশ্রয় জলেছে, আর যাঁদের শুধু চাই জমা হয়ে আছে,—তাঁদের কর্মের ওজন এক তুলাঘণ্ডে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।”

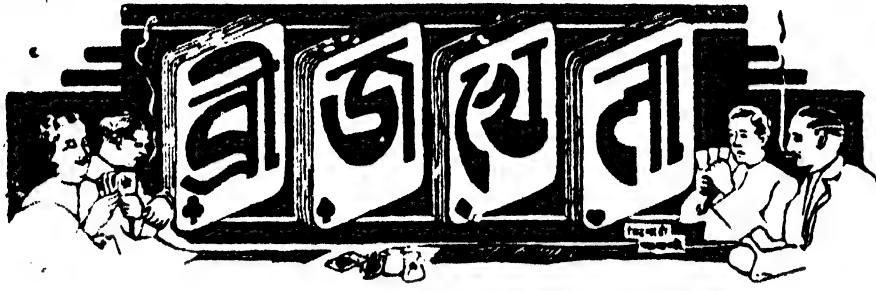
মৃণালের সতী-ধর্মের চিত্র তিনি নিষ্ঠুরভাবে আঁকিয়াছেন। ব্রাহ্ম কেঁদার বাবুও মুগ্ধ হইয়াছেন, পরজীলুক সুরেশ পর্যন্ত তাহার কাছে নতশির হইয়াছে। কিন্তু এই সতী-ধর্ম ইহা কি শুধু দেহকে আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করে নাই? অচল্যকে লতীন বলিয়া সে যে লঘু পরিহাস করিয়াছে, তাহার অন্তরালে রহিয়াছে একটা গভীর ব্যথার করুণ সুর। সামান্ত সামাজিক কারণে তাহার প্রেমাম্পদ মহিম তাহাকে বিবাহ করে নাই এবং বৃদ্ধ স্বামীও ততোধিক বৃদ্ধা শান্ততীর দেবা করিয়াই তাহার জীবন কাটাইতে হইয়াছে—এই দেবার মধ্যে রহিয়াছে চরম ব্যর্থতা এবং তাহার লম্বা আচরণ ও কথার মধ্যে এই ব্যর্থতার বেদনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

পার্সীরা বড় বাড়ীর গিন্নী হইয়া লবারই মন পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার নিজের মন বাঁধা রহিল দেবদালের কাছে। সে ধর্ম করিত, সাধু লম্বানীর সেবা করিত, অন্ধ খজের পরিচর্যা করিয়া তাহার দিন কাটিত—কিন্তু ইহার মধ্যে ছিল একটা চরম ঈর্ষা। তাহাকে অলতী বলা যায় না। কিন্তু তাহার সত্যিকার বা মূল্য কতটুকু? যে ভালবালার উৎস দেবদালকে প্রাণিত করিয়া দিতে পারিত, ভুবন চৌধুরী মহাশয় তাহার কতটুকু পাইয়াছিলেন? কমল একজারগার বলিয়াছে,—“অন্যমনে লত্যা নেই বলে অতি লম্বাধর্মের লত্যা বলে

ভুল করবেন না। সে এত বড়ই মিথ্যা।” মানব-জীবনে প্রেমের স্থান সম্বন্ধে বলিতে গিয়া Bertrand Russellও তাঁর “Marriage & Morals” পুস্তকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—“It would be foolish, though in some cases it might be tragically heroic, to sacrifice career completely for love but it is equally foolish and in no degree heroic to sacrifice love completely for career. Nevertheless this happens, and happens inevitably, in society organized on the basis of a universal scramble for money” বাস্তবিক আমাদের জীবন-যাত্রার পথে দুইয়েরই লামজন্তু দরকার।

পাপ চিরকাল সমাজে আছে এবং থাকিবেও। ইহাকে দূর করা যদি সমাজের অদাধ্য হয় ত পাপকে লম্বা করিবার ক্ষমতা থাকা দরকার। যদি অগ্রাধ, ভুল, ভ্রান্তি আসে, তাকে ক্ষমা করিতে হইবে। নতুবা সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় নিরপরাধ ব্যক্তিকে—তাহা আরও দুঃখকর। কমলিতার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিল যতীন আত্মহত্যা করিয়া।

নর ও নারী যদি আপনাদের জীবনের ত্যাগ ও দুঃখের ভিত্তর দিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ লার্থক করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে কোন বিধি-নিষেধের দাবী থাকে না। অবশ্য এরূপ ত্যাগ ও দুঃখ বরণ যে সকলে করিতে পারে তাহা নহে,—ইহা অসাধারণ। কিন্তু যে স্থানে ইহার প্রভাব দেখা যায়, সেইখানে সমাজের বিধিকে তাহার নিকট ঘাট মানিতে হইবে। গৃহধর্ম, সমাজধর্ম, ও জ্ঞানধর্ম—এই ত্যাগের কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। বাহার ভিত্তর লত্যাই ত্যাগের শিখা জলিয়াছে, তাহাকে সাধারণ বিধি নিষেধের মাপ কাটিতে বিচার করা উচিত নয়।



ক্রীড়াসা

দেখলার নানানিধ

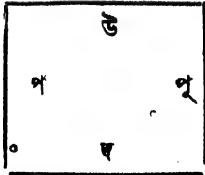
সমস্যা:—ক্রীড়া খেলার ডাক দিতে হলে যেমন সময়তার উদ্ভব হয় খেলার সময়ও তদুপা নানাবিধ সময়তার আবির্ভাব ঘটে। বিশেষ করে যদি কোন সময় ভাবতে হয় যে; এ ক্ষেত্রে 'কিনাল' নেওয়া বিশেষ কি না, বেশীর ভাগ ক্রীড়কই তখনকার একটা ধারণা নিয়ে যা হয় করে বলেন। অনেক সময় দেখা যায় বেশ স্পষ্ট ক্ষেত্রেও 'কিনাল' নিয়ে ক্রীড়কেরা খুব স্কিলে পড়েন। বিশেষতঃ একজন ক্রীড়কের চালবদ্ধ করতে হলে, নিয়ন্ত্রিতরূপে বিবেচনার পর 'কিনাল' নেওয়া আবশ্যিক।

ইস্কাবন—আটা, হুকা, তিরি।

হরতন—শাতা, পজা।

কুহিতন—টেকা, গোলাম, দশ, হুকা।

চিড়িতন—টেকা, বিবি, গোলাম, দশ



ইস্কাবন—লাহেব, পজা।

হরতন—টেকা, লাহেব, চৌকা, হুরি।

কুহিতন—লাহেব, নয়, আটা, চৌকা।

চিড়িতন—লাহেব, শাতা, তিরি।

ডাক হয়েছিল,

'দ'

'প'

একটি হরতন।

পাশ।

দুইটি কেরাই।

পাশ।

তিনটি কেরাই।

পাশ।

'উ'

'পু'

দুইটি কুহিতন।

পাশ।

তিনটি চিড়িতন।

পাশ।

পাশ।

পাশ।

রঙকর্ড, হরতনে ডাক দেওয়া লেবেও 'প' হরতনের বিবি খেলে প্রাথমিক চাল ছিলেন। 'দ' লাহেব দিয়ে পিটখানি ধরে বড় পিটগুলি শুণে দেখলেন, হরতনে, দুইখানি, কুহিতনে দুইখানি ও চিড়িতনে চারখানি,—ষোট লাভখানি পিট পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাঁর নবম পিটখানি নির্ভর করছে কুহিতনে 'কিনাল' নেওয়ার লাকলোর উপর। এমন কি দশম পিটখানিও নির্ভর করছে তার উপর। অনেকে ভাবতে পারেন বটে যে এই লম্বাখান সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এখন রঙকর্ডার প্রথম চাল হবে নিজের

ইস্কাবন—আটা, হুকা, তিরি।

হরতন—শাতা, পজা।

কুহিতন—টেকা, গোলাম, দশ, হুকা।

চিড়িতন—টেকা, বিবি, গোলাম, দশ।

ইস্কাবন—টেকা, বিবি, দশ, চৌকা।

হরতন—বিবি, গোলাম, তিরি।

কুহিতন—শাতা, তিরি, হুরি।

চিড়িতন—আটা, হুকা, পজা।



ইস্কাবন—লাহেব, পজা।

হরতন—টেকা, লাহেব, চৌকা, হুরি।

কুহিতন—লাহেব, নয়, আটা, চৌকা।

চিড়িতন—লাহেব, শাতা, তিরি।

হাত থেকে টেকার দিকে এক ভাল ছোট কুহিতন খেলা এবং তৎপরে গোলাম খেলা। কেননা 'কিনাল' যদি লকল নাও হয় তখন ৯ খানি পিট পাওয়া যাবে। কিন্তু 'কিনাল' যদি অস্বাভাবিক হ'তে নেওয়া হত, 'পু' নিশ্চয়ই ইস্কাবনে চাল দিতেন আর সুবিধাজনক অবস্থায় টেকাটি 'না' থাকলে সেই রঙে চারখানি পিট বিপক্ষ দলকে দিয়ে যেতে হত। কলে অনান্য-লাভ্য খেলাটিতে এক পিটের খেঁসারও দিতে হত। সম্পূর্ণ হাতখানি—[নিম্নে দেখুন]

প্রকৃত খেলার ডাকদার উল্লিখিতরূপে খেলেছিলেন। দশম পিটখানি নেবার পর 'দ' হরতনের গোলামে 'প'কে পিট ধরালেন। তাতে তাঁর দিকে ইস্কাবনে চাল পাওয়ার লাহেব দিয়ে পিট নিয়ে পাঁচখানি ফেরাই-এর খেলা করলেন। টেকার দ' হরতনের গোলামখানি পাশ দিয়ে যেতেন তাহলে অবশ্য 'প' ইস্কাবন পেড়ে খেলার হাত থেকে রক্ষা পেতেন।

'ডামির' হাত তৈয়ারী করা নিয়েও বহু ক্রীড়কের ধারণা প্রমাদ লঙ্ঘন। লাধারণ খেলোয়াড়ের মনে ইহা বদ্ধমূল যে, তার নিজের হাত সব সময়ে আলল এবং "ডামির" হাত মাত্র সাহায্যকারী। কিন্তু

ইস্কাবন—গোলাম, নয়, শাতা, হুরি।

হরতন—দশ, নয়, আটা, হুকা।

কুহিতন—বিবি, পজা।

চিড়িতন—নয়, চৌকা, হুরি।

রক্তমাখা [সামাজিক উপন্যাস] শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য

—প্রথম পরিচ্ছেদ—

ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া, ললিতা কাক্সণ মালের দ্বিধা হাওয়াটুকু মাথার লইতে-ছিল। এমন সময়ে নীরবজন ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আজ কেমন আছ ?

—ভাল আছি।

—ভাল আছি মানে ? আজ আর জর হয়নি ?

—না।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখেচো ?

—থার্মোমিটার দিয়ে দেখতে হবে না। আমি নিজে বুঝি, জর হয়নি।

—নিজেই বুঝেছ ?

ললিতা একথা কখনও উত্তর করিল না। সে খাট হইতে উঠিল : উঠিয়া ঘরজার দিকে অগ্রসর হইল।

নীরব তারিকে হুয়ে জিজ্ঞাসা করিল : “তুমি যে বড় বিছানা থেকে উঠলে ?”

ললিতা এ কথাও কখনও উত্তর করিল না ; ঘরের কাছে আলিয়া অপেক্ষাকৃত উঁচু গলায় ঝিকে ডাকিল।

—আচ্ছা, ডাক্তার তোমার বারণ করে গেছে, বিছানা ছাড়তে। তুমি যে দ্বিবি বিছানা থেকে উঠে ঘরজা পর্যন্ত গেলে ?

কাজটা যে বিশেষ অজ্ঞান হইয়াছে, ললিতার ভাবভঙ্গিতে তখন কোনও স্বীকার প্রকৃতপক্ষে অনেক সময় “ডাখির” হাতই হয় আল, তখন সে ক্ষেত্রে রক্তকর্তার উচিত নিজের হাতের তেরোখানি ভালক লাহাযাকারী হিলাবে পরিগণিত করা। আগামীবারে এ বিষয়ে বলবার ইচ্ছা রছিল।

লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে স্বামীর মুহুরিত্বটুকু গারে না মাখিয়াই—ঝি আলিলে বলিল : ‘বাবুর জল খারারের বারগা ঠিক করে দে।’

—‘আচ্ছা, দেখতে তোমার মাথা মাখিতে হবে ন্যু। তুমি নিজের পরিচর্যাটা নিজে নিজে করে দেখি।’

ললিতা ঘরজা হইতে ঠলিতে টলিতে আলিয়া আবার খাটে বলিল। নীরব তাঁহাকে ধরিয়া আলি বিছানার শুয়ে পড় দেখি।

—আর লম্বুত্বিন বিছানার শুয়ে থাকতে পারিনে। বিছানার শুয়ে থাকুটাই, এখন আমাক লবলের চেয়ে বড় রোগ হ’য়ে দাঁড়িয়েছে।

—তা হোক রোগ। তুমি শুয়ে পড়ো। ডাক্তারের কথাগুলো একটু শুনে দেখো। সে তোমার ভালো’র জন্তেই বলেছে, মন্দে জন্ত বলেনি। শুয়ে থাকলে, যুষুষে জরটা চলে যেতে পারে। এটা বুঝতে পারো না ?

—আমার জর ছেড়ে গেছে, আজ আর হয়নি।

—থার্মোমিটারটা দেখি।

—কি অনবরত থার্মোমিটার লাগানো, ভাল লাগেনা। আমার নিজের অমৃতবের চেয়ে থার্মোমিটার ? বিলিতে শীতপ্রধান বেশে থার্মোমিটার তৈরি হয়,—আমাদের গরম বেশে, বগলে ধিলেই জর ওঠে। আমাদের বেশে ও বয়ে ঠিক জর ওঠে না। ওলব ঘরকার নেই,—আমার আজ জর হয়নি।

নীরব দার্শনিকের মত বেশ গভী

বলিল : দেখো ললিতা ! বাবুঘের, রোগ জিনিষটা যদি অতো ডাক্তারের ওপর সেরে যেতো,—তা’লে আজ ডাক্তার কবিরাজ বেশে ছেয়ে যেতো না, বাবুঘ রোজ রোজ এতো পটু পটু ক’রে মারা পড়তো না !

—‘না। বাবুঘ তা’লে আজ অমর হয়ে থাকতো। ডাক্তারখানার ঐ তেতো ওষুধ রীতিমত খেলে, আর লম্বুত্বিনে দুশপটা অন্তর থার্মোমিটার লাগালে, বাবুঘ এতদিন মার্কণ্ডের অমু পেয়ে যেতো !... নাশ ! তুমি ওঠো দেখি ! ইজেরটা ছাড়ো দেখি ! ঐ কোঁচান কাপড় সরেছে, পরো !..... ও রামদীন ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনছিস ? বাবুর আদালতের পোষাকগুলো ছাড়িয়ে নে না ! ঐ কালাপেড়ে কাপড়খানা কাছে এনে দে !’

ঝি আলিয়া ললিতার দিকে চাহিয়া বলিল : “মা ! বাবুর প্লাবার বারগা হয়েছে !”

ললিতা বলিল : ‘আচ্ছা চল ; আমি যাচ্ছি ! বলিয়াই ললিতা খাট হইতে নামিয়া গেল।

নীরব শেষে হাল ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল : “আচ্ছা, শোনো শোনো ! একবার এবিকে আমার কাছে এসো ! তোমার একটা কথা বলি, তারপর দেখো !”

ললিতা মুখ ফিরাইয়া বলিল : জলখাবারটা আগে ঠিক ক’রে লাগিয়ে, আলি, তারপর শুনচি !”

“না, না, তার আগেই শুনে, যাও ! বিশেষ জরুরি কথা !”

“জরুরি কথা তোমার সবই ! কেবল ডাক্তার আর রোগের কথা !”

বলিতে বলিতে ললিতা ঘরের বাহির হইয়া গেল। নীরব নিরাশার একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লম্বারের ভবিষ্যত

অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ললিতা যে ইচ্ছা করিয়া এইরূপে তাহার নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, তাহা তাবিয়া নীরব মুহূর্ত্তান হইয়া পড়িল।

বৈকালিক খাইয়া আলিয়া নীরব পুনরায় ললিতার কাছে বলিল। ললিতার শ্বাস হাতখানি মুঠোর মধ্যে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল: ‘আচ্ছা ললিতা! তুমি আমাকে এখানে জলখাবার খেতে দাওনা কেন?’

ললিতা বলিল: সে তুমি বুঝবে না। ডাক্তার বাবু এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখো! আমার বিশ্বাস তিনি এটা অনুমোদন করবেন!’

‘বুঝেছি! কিন্তু তোমার এত সাবধানতা বত কি পরের ওপর চালাতে হয়! নিজের ওপর কি তার ছিটে ফোটাও চলে না! নিজে একটু সাবধান হ’লে যে অতি অল্পে লেগে যাও! দিন কতক,—দিন পনেরো,—পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে দেখো দেখি!’

‘পূর্ণ বিশ্রাম!’ বলিয়াই—একটা গভীর শ্বাস ললিতা ত্যাগ করিল।

—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—

সেদিন রবিবার। আদালত বন্ধ। নীরব বাবু ঘরে বসিয়াই সামলার রায় লিখিতেছিল, তিনি স্থানীয় আদালতের মুনশেক।

ললিতার শুইবার ঘরখানি বেশ প্রশস্ত। তাহারই একধারে একখানি চেয়ার ও একখানি টেবিল রাখা করিয়া নীরব।

চৈত্রমাসের দুপুর বেলা। গরম যে পড়ে নাই, এমন কথা বলা যায় না। তবে বাড়াবাড়ি কিছুই নাই। মাঝে মাঝে একটা আশুপের ঝলকা খোলা জানালার ভিতর দিয়া আলিয়া ললিতার কুস্তল জাম শুলিকে নাড়া দিয়া বাইতেছিল। কিন্তু সেজন্য ললিতা জানালা বন্ধ করে নাই।

ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে, লম্বা দিনরাত জানালা খুলিয়া রাখিতে। হাওয়া ও রৌদ্র নাকি তাহার রোগের একমাত্র ঔষধ।

ললিতা কাল একখানি চিঠি পাইয়াছিল, তাহার মায়ের নিকট হইতে। তিনি লিখিয়াছেন, আজ তিনি আলিবেন। তিনি থাকেন কালীতে। বিধবা মামু, লংলারের প্রায় সব বাধনগুলিই আলগা করিয়া দিয়াছেন। বড়ছেলে কাছে রাখিবার জন্ত কত চেষ্টা করিয়াছিল, পারে নাই। স্বামী নিয়োগের পর তিনি যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছেন।

ললিতা অনেকদিন ধরে লিখিতেছে তাঁহাকে আলিবার জন্ত। নীরবও ললিতার অনুরোধে খবর অনেকবার লিখিয়া পাঠাইয়াছে। কিন্তু তিনি কেবলই ওজর করেন লংলারের মায়ের আর জড়াইবেন না বলিয়া। শেষে দুইমাসের পর তিনি লিখিয়াছেন রবিবারে আলিবেন ললিতাকে দেখিতে।

ললিতা বারবার খবর লইতেছে, বাহিরের দরজায় কোনও গাড়ী আলিয়া দাঁড়াইল কিনা। আজ সকাল হইতেই মনটা তাহার প্রকুল। অনেক দিনের পর মা’কে দেখিবে, কাজেই আনন্দ সে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

নীরব তাহার এই অসম্ভব চঞ্চলতা ও উৎসাহ দেখিয়া প্রথমে একটু প্রতিবাদ করিয়াছিল, তারপর কি তাবিয়া চূপ করিয়া গেল। তাহার নিজের মা কাছে থাকিতেন না, থাকিতেন তাঁহের জন্মভূমিতে,—সেই বর্জমানের কোন এক নিভৃত পল্লীগায়ে। মা কাছে না থাকিলেও, মায়ের স্নেহ তাহার স্মৃতির পুঁজি পাটায় গজ গজ করিত। তাহাও একটু একটু লোভ ছিল এই দুস্ত্রাপ্য মিঠে জিনিষটার ওপর। কিন্তু কর্তৃক্বে পড়িয়া সে স্মৃষ্টকু বড় উপভোগ করিতে পার না। ললিতা আজ অনেক দিন পরে সেই লোভনীয় জিনিষটুকু অন্তত:

দিনকতকের জন্তও পাইতে বসিয়াছে এই তাবিয়া নীরব লম্বাভূমিতে চূপ করিয়া গেল!

ললিতা অনবরত ঘড়ির দিকে তাকাইতে লাগিল। ঘড়ি কিন্তু তাহার নিজের নিয়মেই চলিতে লাগিল; ললিতার আগ্রহের জন্ত এতটুকুও বেশী তাড়াতাড়ি আগাইল না। কিছুক্ষণ পরে, উপরকার বেয়ারা হঠাৎ ঘরে আলিয়া বলিল: মা! দ্বিধিমায়া এসেছেন।

ললিতা ছিল বিছানায় শুইয়া একেবারে উঠিয়া বলিল! বেয়ারাকে বলিল:

‘দ্বিধিমা’র বাক্স পৌঁটয়াগেলো ব’য়ে ওপরে নিয়ে আর!’ বেয়ারা চলিয়া গেল।

নীরবের চঞ্চল কলম হঠাৎ বন্ধ হইল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, ললিতার দিকে কিরিয়া বলিল: বেশী নড়া-চড়া করো না ললিতা! মা এসেছেন ব’লে বেশী ওঠা-নাশা করলে আজ তোমার জরটা বোধহয় বেড়ে যাবে!’

ললিতা সে কথার কাণ দিল না; দরজার দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন তাহার মাতা, শ্রোতবশেষের শুভ্রতা লইয়া। খান কাপড়ের অবশুষ্ঠান মাখার লীমন্ত আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। চক্ষের নিক্ত চাঞ্চল্যহীন দৃষ্টি বক্রণা বিতরণ করিতেছে।

শুধু তিনি একা ন’ন; আর একজন রমণী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে ঢুকিল। সেটি অন্নবয়সী! পরিধানে একখানি লাল-পাফ শাড়ি। গায়ে অলঙ্কার আছে, তবে খুব সামান্য। ‘লীমন্তে দিল্লুর জন্ম জন্ম করিতেছে। চক্ষু দুইটি চঞ্চল, কিন্তু তখন মাটির দিকে অবনত!

(ক্রমশ:)

শয়ালী চিত্রপট



“সর্কজনীন বিবাহোৎসবে”-র একটি দৃশ্যে
ডাঃ হরেন মুখার্জী ও উষা দেবী—
ছবিখানা, শীত্ৰই উত্তরায় মুক্তি পাবে।



টেলিগ্রাম
‘ভ্যারিটি’

পরিচালক
জ্ঞানদাস নিউজপেপার্স লিঃ

টেলিফোন
সাইদ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাইদ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, বুধসপ্তাহ, ২০শে মার্চ ১৩৪৪, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

বঙ্গলার কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্র

গত সপ্তাহে বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক, রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে যে কয়টা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেসে এবং কর্পোরেশনে কলহ ও দলাদলি দূর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করিয়া যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা বঙ্গলার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির দিক হইতে বিচার করিলে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস ও কর্পোরেশন পরিচালনায় গত কয় বৎসর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাবে কংগ্রেসী কর্তৃমহলে যে শৈথিল্য দেখা গিয়াছিল তাহার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমানে বহু আবর্জনা জুগীত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অপসারণ আশু প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু অন্তরীণ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর উপরোক্ত দুই ক্ষেত্রে হইতে আবর্জনা অপসারণ করিতে বহু আয়াস স্রীকার করিয়াছিলেন এবং আংশিক সাফল্যও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতিক্রেত্রে যে সকল ধূর্ত ও শঠ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের বিরোধিতায় তিনি পূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

শরৎচন্দ্রের পক্ষে, পূর্ণ সাফল্যলাভ করিবার কারণ তিনি দলাদলি মিটাইতে যাইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সকল দলের মতামত লইয়া তিনি সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তব জগতে, বিশেষ করিয়া রাজনীতিক্রেত্রে সকল সময় সকলকে যে সন্তুষ্ট করিয়া চলা যায় না তাহা তিনি একটু বিলম্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বর্তমানে বঙ্গলার কংগ্রেসে দলাদলি যে বিষদূষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহার যথোপযুক্ত প্রতীকার করিতে হইলে দৃঢ়ভাবে কংগ্রেসের শাসন-রজ্জু ধরিবার একান্ত প্রয়োজন। যে সকল উৎকট গ্রন্থি কংগ্রেস শাসনযন্ত্রকে বিকল করিয়া রাখিয়াছে সে গুলিকে নিশ্চয়, হস্তে বিদূরিত করা প্রয়োজন—এবং সেই কার্য সম্পাদন করিতে নির্বাকমানুষ এবং সকল দলের ও সকল মতের বিশ্লেষণভাজন ব্যক্তির প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ব্যতীত বঙ্গলায় এমন কেহ নাই যিনি সকলের আস্থা দাবী করিতে পারেন। তাহার আদর্শবাদ ও কর্মনিষ্ঠা তাঁহাকে বঙ্গলার রাজনীতি অঙ্গনকে কলুষ মুক্ত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

বঙ্গলার রাজনীতিক্রেত্রে বিশেষ করিয়া কর্পোরেশনে যে সকল চতুর সুবিধাবাদী আত্মসার্থ সাধন করিতে কংগ্রেসের ভেতর ধারণ করিয়া অহরহ ঘুরিয়া ফিরিতেছে সর্বপ্রথমেই তাহাদিগের আবরণ উন্মোচন করা প্রয়োজন। কর্পোরেশন প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র যে বিরতি প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কর্পোরেশনে কংগ্রেসী কাউন্সিলারদিগের আন্তরিকতা পরীক্ষা করিতে সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। পৌরসভা পরিচালনায় এই সকল সুবিধাবাদীর দল কংগ্রেসের নামে যে কাল্জিমালপন করিয়াছে তাহাতে সহরের করদাতাবৃন্দ বঙ্গলার কংগ্রেসের বর্তমান পরিচালকগণের উপর যে কিছু পরিমাণে আস্থা হারাইয়াছেন তাহা সম্প্রতি কর্পোরেশনের ১৯নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনে নিঃসংশয় প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঙ্গলার কংগ্রেসকে তাহার পূর্ব-গৌরবে ফিরাইয়া লইতে যে যথেষ্ট বেগ ও বাধা পাইতে হইবে তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। তিনি যে তাঁহার এই মহান ত্রুটে সকল আদর্শবাদী কর্মীর সাহায্য ও সম্মতি পাইবেন—ইহা বলা বাহুল্য।

বিবিসি

স্বাধীনতা পাড়ায় যজ্ঞানুষ্ঠান

গত ১৩ই মার্চ রবিবার ২৫ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত সরসীমোহন রায় মহাশয়ের উদ্যোগে এক যজ্ঞানুষ্ঠান ও মহতী সত্যের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বৈদিক বিধানে বর্তমান ধর্ম-পরিস্থিতির সমাধান জন্য উপস্থিত অনেকেই বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক ডাঃ কালীদাস নাগ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমলতা দেবী যজ্ঞীয় উদ্দেশন কার্য ও প্রস্তুতকরণে শ্রীযুক্ত হারিহরকৃষ্ণ দেব স্বস্তিক মূলক প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

কবিতার্থ সাগরী বন্দনা

উক্ত সমিতির সভাপতি অশ্রুত বৎসরের জ্ঞান এবং সর্বত্র বাস্তবিক অর্জন করিয়াছেন। ঐদিন বেলা ৪ ঘটিকায় হেমচন্দ্র পাঠাগার ভবনে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত সজনী কান্ত দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিহিরপুরবাগী অধর কবি—মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও রজনালয়ের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে একটি সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান হইবে। বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক এই উৎসবে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক, শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়,

বীরেন বসু, কুমারী সুনীলা দাসগুপ্ত, যুগিক দাসগুপ্ত, কুমারী শিউলী সরকার, কুমারী রেখা কুমার, প্রভৃতি কলাবিদগণ তাঁহাদের সঙ্গীতের দ্বারা অতিথিবৃন্দকে আত্মগোষ্ঠিত করিবেন। শ্রীযুক্ত ননী দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অজিত চট্টোপাধ্যায় হস্ত কৌতুকের দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

টমের চা

ক্রান্তি দূর করিতে অন্ন খরচে উপকারী একমাত্র টমিক চা কেই বলা চলে, কিন্তু চাটা হওয়া চাই স্বাদে বর্ণে ও গন্ধে বিশুদ্ধ। টমের চাতে এ সমস্ত গুণই বিদ্যমান আছে। সারাদিন খাটুনির পর এক পেয়াল টমের চা নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

আগামী ২৯এ মার্চ, ১লা ও ২রা ফাল্গুন (১২ই, ১৩ই ১৪ই ফেব্রুয়ারী) শনিবার হইতে সোমবার দিবসত্রয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন কলকাতায় (নবীয়া) হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বঙ্গদেশের সাহিত্যিক ও সুধীরদের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র। বঙ্গভাষা-ভাষী মাত্রেই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এই অনুষ্ঠানে মিলিত হইবার প্রধান সুযোগ সমুপস্থিত। এই সম্মিলনকে সাফল্যমণ্ডিত

করিবার নিমিত্ত ইহাতে যোগদান করা লোকের উচিত।

লীলা মাদুরী সঙ্গীত

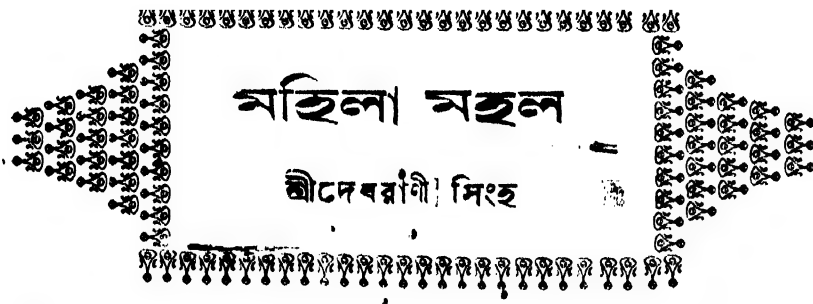
শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রসাদ লক্ষ্য উৎসব উৎসব গত রবিবার ৩০শে জানুয়ারী মুক্তারাম বহু স্ট্রীটে এক বিরাট কৌতুহল আনয়ন হয়। বিখ্যাত সুগায়ক শ্রীযুক্ত রমেশ্বর মুখার্জির পরিচালনায় তাঁহার ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক এই অনুষ্ঠানটি হইয়াছিল, শ্রীমতী অনিমা দাস গুপ্তা মূল গায়িকা ছিলেন। শ্রীমতী মনিভা গাঙ্গুলী, শ্রীমতী যুগিক চট্টোপাধ্যায় (বেণু) শ্রীমতী লাবণ্য বিশ্বাস, শ্রীমতী উষা মুখার্জি, শ্রীমতী গীতা চক্রবর্তী সহ গায়িকা ছিলেন। আসরে বিরাট জনসমাগম হয়। শ্রীমতী অনিমার এবং শ্রীমতী যুগিকার সুরের তানের মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল—সঙ্গে খোলদারা সঙ্গত করিয়াছিলেন, আমাদের শ্রীযুক্ত বিজয় লেন, তাঁহার হাতের সুমধুর বোলে গানগুলি যেন মুগ্ধ হইয়াছিল।

জাতিস্ব বিজয় কুমারের মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অমিয়কুমারের পরিচালনায় সেন্টপলস্ কলেজের ছাত্রেরা রবিবার সন্ধ্যা অনুষ্ঠানটিকে সজ্জা করিয়াছিলেন। সুকুমার বন্দোপাধ্যায়ের আধুনিক গানটি মন্দ হয়নি। বিজয় দেবের রবীন্দ্র সঙ্গীত বেশ ভালো-ই; অমিয় মুখোপাধ্যায়ের গানটি অতি উচ্চাঙ্গের ছোঁয়াছিল—সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য। হুর্গা দাসের হস্তরস আর একেবারে মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রগীতি চলনশই। নিবেদনর ভট্টাচার্য্যের “অভিযান” আরম্ভে পুরস্কার প্রাপ্ত।



ইন্দ্রবিমাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।



বাংলা নারীর স্বাস্থ্য

গত লংঘ্যায় আমরা আধুনিক নারীর স্বাস্থ্য-উপেক্ষা লক্ষ্যে লামারগভাবে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারের আলোচনায় আরও কয়েকটি কথা এ লক্ষ্যে উল্লেখ করছি। যাদের উপর জাতির ভাগ্য নির্ভর করে সেই আধুনিক মেয়েদের স্বাস্থ্য লক্ষ্যে নিশ্চেষ্ট ভাব দেখলে লতিই দ্রঃ হয়।

কল্কার জনপথে ও জনতার ভীড়ে আধুনিক যে মেয়েদের রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেখানে স্বাস্থ্যের দীপ্তি নেই, আছে শুধু শাড়ীর উজ্জ্বল, বেশ ভূষার চাক্চিক্য! সুল কলেজের মেয়েদের দিকে তাকালে দেখা যায় কেবল অস্বাস্থ্যের শীর্ণ কঙ্কাল সূঁচি, কষ্ট হয় ভাবতে যে এরাই হবে ভবিষ্যতে বাংলার মাতৃজাতি—এদেরই রূপ সন্তানদের কণ্ঠে গীত হবে, ‘হুত্রিশ কোটি’ মোরা নহি কভু কীন—এরাই বলবে—‘আমরা আনিব নব জগত!’

যুগ ধর্মের প্রবাহকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, একথা স্বীকার করি। কিন্তু তা বলে শুধু আবিলতার মধ্যে পর্যাবসিত হয়ে বাস করার অধিকারও আমাদের নেই। আজ আমাদের নারী-সমাজ বিলাসিতার শ্রোতে অশ্রুক্ষণ অবগাহন করার ধরুণ স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করার লক্ষ্য নেই। পুস্তকভারে অবনত বক্ষিষ বেহতার কণ্ঠে নিটে টেনে নিয়ে

মেয়েরা চলে যায়, তখন ভবিষ্যতের প্রগাঢ় অন্ধকারময় দিনগুলার নিদারুণ ছবি আমাদের চক্ষের লক্ষ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আজকের মেয়েরা মন দিয়েছে লেখা পড়ায়। মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্যে শারীরিক পরিশ্রমের অবকাশ কোথায়? যেটুকু সময় তাদের স্বাস্থ্য উন্নতিকল্পে দেওয়া দরকার সে লমচটুকু হয়ত তারা প্রসাধনে জর্জরিত হয়ে কৃত্রিমতায় বেহ-স্বাস্থ্যকে পরিপূর্ণ করে ট্রামে, বাসে থানিকটা ভ্রমণ করে অথবা অগোবাতাস-হীন বন্ধ প্রেক্ষাগৃহে বলে থাকাকেই অধিক উপভোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। স্বাস্থ্য বিলাসিতায় সুরক্ষিত হয় না। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবার অবকাশ তাদের থাকে না।

পূর্বে বাংলা দেশের মেয়েরা—আমাদের দ্বিবিমা, ঠাকুরার দল নিজেদের সাংসারিক, কাজ নিজেরাই করতেন—গৃহকর্মে তাঁদের কোন লজ্জা ছিল না। স্বহস্তের রন্ধন সন্তান-সন্ততি-নাতি-নাতনীকে না খাওয়ালে তাঁদের তৃপ্তি হোত না। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সংসারে, তাঁরা নিজেদের হাতে জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি শারীরিক শ্রমজনক কাজ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। তখনকার দিনে সুডোল কর্মক্ষম বেহবল্লরী, উদ্ভাসিত প্রাণ খোলা হাসি-সরল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা প্রকৃতই জানিয়ে দিত তাঁরা স্বাস্থ্যবতী। আজ আমাদের অন্দর-মহলে উড়ে আর

খোঁটা ঠাকুর চাকরের, ভীড় সে স্থলে। লক্ষা গোলা পাঁচনগিছে জীবনের প্রভাতেই আসছে অন্ন-অজীর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ।

আজ আমরা চাই চাকর, বেয়ারা, বয়! জলের কলনী থেকে জল গড়িয়ে নিতেও দাঁহায্য নিতে হয় চাকর-বেয়ারার। আজকের নারীর জীবনে শারীরিক পরিশ্রম ঘোটেই নেই। আজকের নারীর ধারণা intellectual geniusই হচ্ছে তাদের জীবনের প্রধান কাহা। কিন্তু একথা জানা একান্ত দরকার যে intellectual faculty কখনই লক্ষ্য নয় যদি স্বাস্থ্য ‘অটুট’ না থাকে। বংশানুক্রমে ভবিষ্যতে দেখা যাবে তাদের বুদ্ধিবন্ত, দিনে দিনে ধীরে ধীরে আসছে কমে।

পাহাড়ীঘের কথা বলি—সেখানে আজও যান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক এবং নাগরীক বিলাসিতা আসে নি। লারাদিন মেয়েরা অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবন অতিবাহিত করে—রাত্রি শান্তি, সুখ-নিদ্রার কোলে গা এলিয়ে দেয়। তাই তাদের জীবনের যৌবন আমাদের লহরে মেয়েদের থেকে অধিক দিন স্থায়ী। নিটোল বেহ লতিই সুখের উপাধান যোগায়, আমাদের দেশে মেয়েরা চায়ের কাপে, পিয়ানোর টুলে, ড্রিং কন্ডের শোফার, পড়ার টেবিলে সিনেমার বন্ধবরে সেই জায়গায় নিয়ে আসে অকাল-বাক্য। জীবন তাদের বেশীদিন আর টলে না। আমি অবশিষ্ট এ হুঁটি তুলনা করে বলছি না পাহাড়ী জীবনই আমাদের কাহা।

আমাদের শিক্ষা চাই, কৃষ্টি চাই, সভ্যতা চাই, স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে কৃত্রিমতা, বিলাসপ্রাচুর্য এবং লক্ষ্যোপরি অস্বাস্থ্য—আমাদের কিছুতেই কাহা হতে পারে না। পরাগ্রামে এখনও স্বাস্থ্যের দীপ্তি কিছু কিছু দেখা যায়, কিন্তু দেখানেও আধুনিক নাগরীক নারীর জীবন

যাত্রার অস্বাস্থ্যের কলুষিত হাওয়া প্রবেশ
লাজ করছে।

আধুনিক নারীর জীবন যাত্রার মানসিক
পরিপ্রসারের প্রাচুর্যের অবকাশে স্বাস্থ্য কেমন
ভাবে বজায় রাখতে হবে সে লক্ষ্যে চিন্তা
করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

“Mr. Muller এর “My System for
ladies” বইখানি পড়লে মেয়েরা স্বাস্থ্য
রক্ষা লক্ষ্যে অনেক কথা জানতে পারবেন।

ব্যায়াম করলে আজকালকার মেয়েদের
ধারণা তাদের শরীরের কর্মনিয়তা কমে
যায়, তারা হয়ে পড়ে পুরুষ ভাবাপন্ন,
এ ধারণা ভুল। মেয়েদের ব্যায়াম করতে
বলাই মানে’ যুগের ভাঙ্গা বা ডায়েল করা
নয় এটা বোঝা উচিত।

Free hand exercise করাই হচ্ছে
মেয়েদের পক্ষে প্রশস্ত। skating করা
(অল্প বয়সী মেয়েদের) এবং Muller এর
“My System”—এ যে সমস্ত exercise এর
কথা, উল্লেখ করা আছে সেগুলো অনুশীলন
করলে আজকাল মেয়েরা ভয় স্বাস্থ্য এবং
শারীরিক পরিশ্রমহীনতা থেকে উদ্ধার
পাবেন।

পাশ্চাত্যদেশের মেয়েরা বিলাসিতা যতই
করুক না কেন দেহ গঠন, স্বাস্থ্য রক্ষার
দিকে তাদের দৃষ্টি খুবই প্রবল।

পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে আমাদের
দেশের ‘মেয়েরা বিলাসিতা শিখে, কিন্তু
তাঁদের কার্যক্ষমতা, তাঁদের স্বাস্থ্য—
তাঁদের শক্তি—সেদিকে লক্ষ্য দিতে ভুলে
যায়।



(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

লাহোর, বোম্বাই, দিল্লী, করাচি এবং
ভারতের অপরাপর বহু শহরে হিন্দি
“বিদ্যাপতি” লক্ষ্যসাধনের প্রশংসা অর্জন
করে লগ্নাহের পর লগ্নাহ ধরে চলছে।
ইংরাজী, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, মারাঠি,
ইত্যাদি প্রায় শতাধিক সাময়িক-পত্রে
“বিদ্যাপতি”র বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত
হ’য়েছে। লংবাৎপত্রের তরফ থেকে এরকম
সার্বজনীন অভিনন্দন লাভ খুব কম ছবির
অনুষ্ঠেই ঘটেছে। বাঙলার চিত্র প্রতিষ্ঠান-
গুলিকে যারা বিশ্বদৃষ্টিতে দেখেন এমন সব
সমালোচকও উচ্ছ্বলিত প্রশংসার নিউ-
থিয়েটার্সের কৃতিত্ব স্বীকার কোরতে বাধ্য
হোয়েছেন। কাব্য সম্পদে, লগ্নাহের মাধুর্য্যে
এবং টেকনিকের উৎকর্ষে বইখানি যে লতাই
উপাদেয় হোয়েছে—শক্তি-মিত্র নির্বিশেষে
সকলেই যে এট লক্ষ্য সত্যটুকু আজ খোলা
মনে স্বীকার কোরতে হয়েছেন—এটা জেনে
আমরা বিশেষ আনন্দবোধ করছি।

চিত্রায় “বিদ্যাপতি”র বাঙলা-সংস্করণ মুক্তি
লাভের আর বিশেষ বিত্ব নেই।

ভাগ্য বিড়ম্বিতা, আশ্রয়হারা
লক্ষ্য—প্রকাশের জমশেবপুরের আবাল ছেড়ে
পথের বার হোয়েছিল। সমাজে তার স্থান
নেই, তাই সমাজের বিরুদ্ধে তার নাগালও
নেই। কিন্তু সে অনির্দেশ যাত্রা-পথে
প্রথম তার জীবনে কেন এসে অতিক্রান্ত

জুড়ে বসলো? প্রথমত সে প্রত্যাখ্যান
করবার প্রাণপণ চেষ্টা কোরেছিল। কিন্তু
অনুষ্ঠের কাছে তাকে আবার পরাজয় স্বীকার
কোরতে বাধ্য হোল।

এলো বেনারসে—প্রমথের প্রবাস-ভবনে।
লবাই জানলে, লক্ষ্য প্রমথের নব-বিবাহিতা
পত্নী। কারণ অল্প কোন পরিচয়ে, একজন
পরপুরুষের কাছে কোন ভক্তমহিলার সঙ্গে
সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে বলবাল করার সম্ভাবনা
ছিল না।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, লক্ষ্যার জীবনে
আজ একী মন্বাস্তিক গ্রহসনের অভিনয়
সুরু হোল।

সম্রাতি ১নং ষ্টুডিওতে, বেনারসের লেট,
যে দৃশ্যগুলি তোলা হচ্ছে, তার মধ্যে উপরে
বর্ণিত অংশটি প্রতিফলিত হবে।

২নং ষ্টুডিও

প্রমথের বড়ুরা তাঁর নবতম চিত্রের
সুটিং আরম্ভ করবেন আর কয়েকদিন
পরেই। লগ্নাহর কাজ সব শেষ হয়ে গেছে।
মহলা চলেছে পুরোহমে, বাংলার ছাত্রাচিত্রে
এই একটি মাত্র ছবি যাতে নাহিছে শ্রীমতী
যমুনা ও শ্রীমতী মেনকা। সুলক্ষী যমুনা—
তাঁর রহস্যময় চোখ দুটির মধুর মারা-
দীপ্তিতে—দুটা রঞ্জিত ক্রীণ ওঠে, কর্মনিয়
চারু কণ্ঠে, স্তম্ভময় দেহের দীপ্ত ভঙ্গিতে—
অচঞ্চল রূপ গরিমায় যে মহলা দিচ্ছেন
তাতে বাংলার চলচ্চিত্র রস পিপাসুরা
হয়ত কালে একখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের

রদ গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন, আর শ্রীমতী মেনকা যার ছানি, যার চোখের দৃষ্টি, যার অভিনয় সবায়ের মনোহরণ করেছে তিনি বলছেন : “আমি এই রকম একটা পাট বজাধীন হতেই খুঁজছিলাম।”

অতএব ‘মায়ী’ ও ‘সুজিত’র পর হু অক্ষরের আর একটি নামের ছবি দেখবার আশায় পরিচালক প্রমথেশের পানে আমরা তাকিয়ে রইলাম।

জীবনে চলার পথে মানুষ চায় অর্থ— তাই অশোক আর তার বন্ধুরা চলল গ্রামের পথে দেশের মাটির উৎকর্ষ লাভনে। তারা বুঝেছিল দেশের পরমা “দেশের মাটি”র বৃক্কেই রয়েছে লুকিয়ে। কিন্তু এতবড় মহৎ কাজে চাই অর্থ ও সহানুভূতি—অশোককে এ দুটো জিনিষের তত্ত্বই পড়তে হ’ল পিছিয়ে। কিন্তু ভাগবানের বোঝা বয় ভগবানে—তাই সহানুভূতি ও অর্থ দুইই পেল যে নারীর কাছ থেকে। এই দৃশ্যটি শোনা যাচ্ছে স্ত্রীকৌশলী পরিচালক নীতীন বসু খুব দক্ষতার সঙ্গে তুলেছেন এবং এই দৃশ্যে হিন্দিতে কমলেশ-কুমারী ও নেমা, বাজলায় চন্দ্রা ও ইন্দু এবং উভয় সংস্করণে লাইগাল চমৎকার অভিনয় করেছেন।

কালী ফিল্মস্

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নতুন ধরণের ‘কমেডি’ সর্বজনীন বিবাহোৎসব-র শ্রুতি আর ছ’ এক দিনের মধ্যেই’ শেষ হবে। গেল হপ্তায় এই ছবির একটি মজার দৃশ্য তোলা হয়। এই দৃশ্যটিতে প্রাণধন ডাক্তারকে (জীবন গাঙ্গুলী) জীলোকের রূপলজ্জায় দেখা যায়। ব্যাপারটি হচ্ছে এই—পুলিশের ভাড়া খেয়ে প্রাণধন ও মথুর (ধীরাজ ভট্টাচার্য্য) গতাস্তর না বেখে পাঁচিল উপকিরে একটি বাড়ীর ভেতর লাফিয়ে পড়ে; সেখানে বেখে দুইটি তরুণী বনলতা (বীণাপাণি) ও শেফালি (উষা দেবী) আর একটি

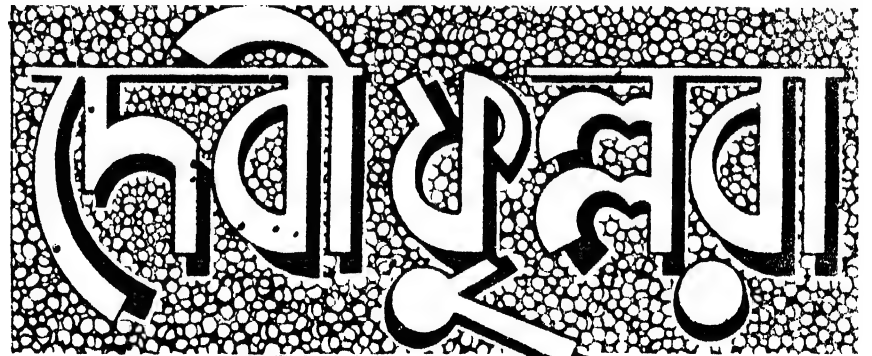
ইঙ্গ-বেশধারী নব্য-যুবক—তাদের মধ্যে চলেছে প্রেম-যুদ্ধ। প্রাণধন এই বেখে খুব ঘাবড়ে গেল কিন্তু মথুর খানিকটা সামলে নিয়ে প্রাণধনকে ঠাণ্ডা কোরল এবং আড়ালে থেকে ছ’জনে তাদের প্রেমাত্মিনয় দেখতে লাগল এবং অনেক কিছু তথ্য অবগত হ’ল। তারপর তারা চলে গেল। মথুর ও প্রাণধন দেখল ‘তারা যেখানে এসে পড়েছে—এই বাড়ীটি কুমারী ডাক্তার বনলতা সেনের। তারা এইবার বাড়ী থেকে, মানে, মানে পালাবার চেষ্টা কোরল—কিন্তু রাস্তায় দেখল বামাপদ পুলিশের দলবল নিয়ে আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাপার বৈগতিক! মথুর ও প্রাণধন ভাবে এখন আত্মরক্ষার উপায় কী? এমন সময় একখানা গাড়ী এসে থামল বনলতাকে রুগী দেখতে নিয়ে যাবার জন্তে। মথুরের মাথায় বুদ্ধি গজিয়ে উঠল। সে প্রাণধনকে বললে ‘সীগ’গির তুমি বনলতা, লাজ—ঐ আলমারিতে কাপড়, গহনা সব রয়েছে—দেখী কোরলে একেবারে শ্রীঘরে বাস।’ প্রাণধন কী আর করে—প্রাণের ভয়ে—অগত্যা কোট প্যান্ট লুন ছেড়ে দ্বিবি বনলতা

লেজে গাড়ী কোরে রুগী দেখতে গেল। সেখানে গিয়ে বেখে রোগ যার হ’য়েছে সে তরুণী সুন্দরী। সে তার কাছে বুক খুলে দেয়—মন খুলে প্রাণের কথা কয়—ছ’জনে ছ’জনের পরশ পেয়ে যেন শিউরে শিউরে ওঠে! এমন সময় সেখানে পর্দা নরিয়ে প্রবেশ কোরল আলল বনলতা। তারপর কী হ’ল তা’ এ হপ্তায় তোলা হ’চ্ছে। আসছে হপ্তায় আপনারা জানিতে পারবেন।

‘মি: বি, পি, মেরোর তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিরহের অমর অবস্থান “চোখের বালি”-র ‘বিনোদিনী’র ঘরের লম্বা স্টেটের কাজ গেল হপ্তায় শেষ হয়ে গেছে। এই দৃশ্যে সুপ্রভা মুখার্জি, ডা: হরেন মুখার্জি, ছবি বিশ্বাস বিভিন্ন চরিত্রে আশাহুরূপ স্নাত্তিনয় কোরেছেন শোনা যাচ্ছে।

দৃশ্যের গঠন সৌন্দর্য্য ও শিল্প-কলায় রূপায়িত করবার তত্ত্ব কারুশিল্পী পরেশ বহু বিশেষ যত্ন নিয়ে কাজ কোরছেন। “চোখের বালি”র

হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন



—শ্রেষ্ঠাংশ—
তিনকড়ি চক্রবর্তী
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

—পরিচালক—
তিনকড়ি চক্রবর্তী

—শ্রেষ্ঠাংশ—
অমীল চৌধুরী
শিশুবালা

প্রগতি-পঞ্চমী

শ্রীম্মহীশ্যেস্ত সান্মাল

অঞ্জলি ভরি' আনিয়াছে যা'রা মন্দির-দ্বারে কুসুম-রাশি
নাহি তাহাধের পূজা অধিকার, জানেন জননী সে ফুল বাসী !
নৃত্য-শিবের পূজারীর দল, একে একে সব মরিয়া ফতুর
সুযোগ বুঝিয়া আলর জমায় সেই অবলরে যত না চতুর।
গলিত শবের গন্ধে যেথায় প্রাণবায়ু ঘুরে যায়—
মাগের বোধন হয় না সেখানে; প্রাণ সেথা খাবি খায় !

শুনি বস্তী-তীর্থে উৎসব আজি, সেই পথে হলে হলে
তৃপ্তি আশা চলিয়াছে কত, হেল-থেলে কুতুহলে !
নারী ও সুরার পূজা-পার্বনে, চেনা মুখগুলি দেখি
নরক বেথায় গুলজার সেথা সকল দেবতা মেকী !
দেবীরা আজিকে খুলিয়াছে বেনী ; বলবল লাগে এলো কী লজনী
মৌক লাভের আর কত বাকী—আমি শুধু ঘিন গণি !
অ-সুরের হাতে সুরের নাকাল, রাগিনীতে নাল করে—
খোল-কর্তালে ধরেছে গজল—বল দেখি কা'র বরে ?

খাল বিল থেকে যত চুনো-পুটি জমা হয় হেতা রাতে
নিশা শেষে নারী—পাছুকা-প্রহারে বর দেয় হাতে হাতে !
ইকরা ভাষার জুয়াড়ী বজ্র ! লেখনী-বুদ্ধে দবালাচী
এদের আলরে নাই স্থান যা'র—অতি নীচ তা'রা মুখ পাচী !
রিয়ালিজিমের এই ত' উৎস, এই ত' জীবের গতি
এইখান হ'তে শুরু হয় নাকী ভাষার অগ্রগতি !
প্রগতিবাহীর নৃত্য-বাসরে, বীণা নয়—ভারোণী
মৌন রহেনা ধৌন-বেদনা—ছড়ায় সে প্রতিদিন !
নটর-পূজায় তাই রিণি-রিণি, বোতলে গেলালে তাল
মহা-লজীত রচনার লাগি, স্রষ্টারা বোলামালা !

প্রগতি-পঞ্জী দিয়াছে বিধান, গাহ বস্তীর গান—
মিছে দেবী পূজা, মিছে আয়োজন, কেন শুধু হররান !

বিদায় নিয়াছে লাভকের দল—আনিয়াছে নাকী নূতন দিবা
তাই আজ শুনি দেবীর বোধনে—মহা উল্লাসে ডাকিছে শিবা !

মত একটি কাহিনী যাতে রূপ, রস, গন্ধে
লজীবিত হয়ে উঠে তার জন্ত পরিচালক লতু
সেন, লক্ষ্যবস্ত্রী মধু শীল ও আলোক-চিত্রী ননী
লাজাল ও অজ্ঞাত কর্মবিশ্ব চেষ্টার কসুর
কোরছেন না। আশাধের মনে হয়, এই
লক্ষ্যজনপ্রিয় কাহিনীটি এই লক্ষ্য বিশেষজ্ঞদের
চেষ্টার সাফল্যমণ্ডিত হ'রে বাংলার চিত্রাঙ্ক-
রাগীদের নূতন আনন্দে অভিভূত করবে।

প্রকল্প পিক্চাস

এদের "লথের শ্রমিক"র শূটিং প্রায় শেষ
হ'য়ে এল। 'শ্রী' চিত্রগৃহে ছবিখানা শীঘ্রই
মুক্তিলাভ করবে।

মেট্রোপলিটান পিক্চাস

ডি-জির "হাল বাঙলা"র শূটিং চলেছে
ক্রতগতিতে। মি: থেম্কা ছবিখানা শীঘ্রই

শেষ কোরে "জেন্দেখের" কাজ আরম্ভ
করবার মতলব কোরেছেন।

ফিল্ম কর্পোরেশন

এদের ইন্ডিও এখনও তৈরি হ'চ্ছে।
"আশা" নামে একখানা ছবি আরম্ভ হবে,
এই কথাই জানি এবং তার তোড়জাড়ও
চলেছে। কিন্তু শুন্লাম বাজারে ভাল শিল্পী
পাওয়া যাচ্ছেনা বলে এদের প্রস্তাবিত কর্ম-
সূচীও পিছিয়ে চলেছে।

হাজরা পিক্চাস

এই প্রতিষ্ঠানের প্রেম-ভক্তি-শৌর্য
বিষণ্ডিত অভিনব পৌরাণিক কাহিনী
"দেবী ফুল্লরা"-র শূটিং কালী ফিল্মস্
ইন্ডিওতে ক্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে।
যে কাহিনী যুগ-যুগান্তর ধরে ভারতের
নর-নারীর মনে চির-নূতনরূপে বিরাজ

কোরছে, তারই চিত্ররূপ পর্দায় রূপায়িত
করণার বাবস্থা কোরে পরিচালক তিনকড়ি
চক্রবর্তী বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।
চরিত্র-নির্দাচনও "দেবী ফুল্লরা"-র হ'য়েছে
আশানুরূপ। কালকেতু ও ভাভুরামের
ভূমিকায় অসীম চৌধুরী ও মনোরঞ্জন
ভট্টাচার্য্য যথেষ্ট এই দু'টি ভূমিকায় বিশেষ
সুনার অর্জন করেন। পর্দায়ের চরিত্রে
নাম্ছেন পরিচালক মশাই স্বয়ং—তার
নতুন পরিচয় নিশ্চয়োজন। সুব্রাহ্মণ্যের
ভূমিকায় নাম্ছেন "দীপাস্তরের" নায়ক সূর্যন
মোহন রায়। চোকার দিক থেকে তিনি
হবেন অনিন্দ্যনীয়—আর বিশ্বাস তিনকড়ি
বাবুর শিক্ষার তার অভিনয়ও হবে আশাপ্রদ।
নাম ভূমিকায় শিশুবালা নাম্ছেন। এই
ধরনের ভূমিকায় শ্রীমতীকে মানাবে বেশ।

তিনকড়ি বাবু তাঁকে এই ভূমিকায় নির্দোষিত
করে ভালই করেছেন। ছবিখানির
টেকনিসিয়ানরা সবাই প্রায় নবীন। প্রবীন-
দের চেয়ে নবীনদের ওপর আমাদের আস্থা
আছে বেশী। এদের মধ্যে আলোকচিত্রী
বিভূতি লাহা ও শঙ্কর বতীন হস্ত স্বাধীনভাবে
কাজ করে সবাইয়ের কাছ থেকেই,
পেরেছেন অভিনন্দন। এই সব বিচার করে
আমাদের মনে হচ্ছে, “হেবী ফুল্লা” হাজিরা
পিক্চাসকে কোরবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

সম্প্রতি অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ঠিক
করেছে যে এখন থেকে এরা “নিউজ রীল”
ছবি বিভিন্ন হাউসে যাতে রীতিমত দেখান
হয় সে বন্দোবস্ত করবেন। এ লক্ষ্যে তোড়-
জোড় খুবই চলছে—এবং এরা মকস্মে ও
অত্যাশ্চর্য হাউসের মালিকগণের নিকটও চিঠি
ও মত চেয়ে পাঠিয়েছেন। “নিউজ রীল” ছবি
বিভিন্ন ভাষায় তোলা হবে। অরোরা
ফিল্মের এ প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় এবং এর
লাফলো ফিল্মজগতের একটা বহুদিনের
অভাব দূরীভূত হবে।

রূপসাগী

প্যারামাউন্ট পিক্চাসের ‘প্লেনস্‌ম্যান’
ছবিতে বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারী কুপার
এবং সুঅভিনেত্রী জিনু আর্থার একটা চমৎকার
প্রণয়োপাখ্যানের গভীরতা, আবেগ এবং
রহস্যের সুন্দরতম রূপ দিয়েছেন! উত্তেজনা-
পূর্ণ ঘটনাজগতের পশ্চাত্যপটে এই গভীর
প্রণয়ের অপূর্ণ কাহিনীটি সিলিল, বি, ডি,
মিলের প্রযোজনায় অবিস্মরণীয় ভাবে
বিকশিত হয়ে উঠেছে।

পূর্ণ থিওরটার

এ লগ্নাহে পূর্ণ থিওরটারের আকর্ষণ কম
নয়। প্রথম তিন দিন “মহাশক্তি” তারপর
ছদ্দিন “পণ্ডিত মশাই” এবং শেষের ছদ্দিন
“আবর্তন”—দেখানো হবে। “এরকম চেঞ্জ
প্রোগ্রাম খুবই উপভোগ্য—আরও উপভোগ্য
হবে আমরা এই প্রথম লভু পেন লগ্নাহ
দেখতে পাব বলে।



বিচার শেষ

শ্রীসমীর কুমার ঘোষ

শিল্প থেকে ফিরে এসে হেবেশ দেখলে,
তার টেবিলের উপর একতাপা চিঠি জমা
হয়ে উঠেছে। এক মাসের জন্তে, সে বাবু
পরিবর্তনে গিয়েছিল আর সেই কীকে
চিঠির পর চিঠি এসে টেবিলটাকে করেছে
চিঠিমণ্ডিত; তাও হেবেশকে শিল্পে বঁধি
চিঠি লই করার হাত থেকে সেক্রেটারী
অবহতি প্রধান করতো, তাহলে না হয় সে
এই চিঠির রাস্তা কমা করত পারতো।
হেবেশের মেজাজ এই চিঠির তাড়ার দিকে
চেয়ে চেয়ে অপ্রশন্ন হয়ে উঠলো।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে শিখিল
হস্তে একখানি চিঠি পড়ে হয় ছিড়ে
ফেলতে লাগলো, না হয় সেক্রেটারীর জন্তে
পাশে লিখে রাখলো। হঠাৎ একখানা
খামের উপরকার হস্তাক্ষর তার অলসতাকে
নাড়া দিল। যে খামখানা তুলে নিয়ে
মেয়েলী হস্তাক্ষরের দিকে চেয়ে অস্পষ্টভাবে
বলে উঠলো, “আমি এ লেখা চিনি!”

খামখানা ছিড়ে সে চিঠির উপরে
ক্রতচোখ বুঝিয়ে গেল। পড়া শেষ হয়ে
গেলে চিঠিখানা সে পুপার ওয়েস্টের তলার
রেখে, দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরলো।
কিছুক্ষণ পরে সে আন্তে আন্তে চাঁরের
পেয়লা নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়ালো : তার
সুন্দর গৌরবর্ণের মুখমণ্ডল বিক্রপের চাপা
হাসিতে চক্‌চক্‌ করছে। দেয়াল আলমারী
খুলে হেবেশ মরোক্কোবাসিনো একখানা
ডায়েরী বের করে তার বিবরণ পাতা
উল্টাতে লাগলে :

“আমার ছাত্রের এক দ্বিধির লগ্নে
আলাপ, হয়েছে। শিখা সঁরকার’ লরল
লগ্নে সুন্দরী এই যেটি লক্ষ্যই হাতধরী! ...
“শিখার লগ্নে আমি শেষ পর্যন্ত ভাল-
বাসার পড়ে গেছি। আর শিখা আমাকে
ভালবাসে।

“শিখা আমার হবে না। আমি
হ’তে পারি বিদ্বান, হ’তে পারি
চরিত্রবান, থাকতে পারি আমার উচ্চবংশ
পরিচর তবুও আমি অগাধ অর্থের মালিক
নই যার দ্বারা আমি নিজেকে শিখার উপযুক্ত

ভাবতে পারি, সেই কথা শিখার মা আমাকে
স্পষ্ট করেছে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

“শিখার বিয়ে হ’বে সুরেশ দত্তর লগ্নে।
সুরেশ দত্তর আছে যথেষ্ট অর্থ—আর তার
উপর সে বার-এ্যাট-ল—হোক না সে
কিছু বিলাসী!”

“নিয়তির পরিপন সবাই কঠোর নির্ধন,
জীবনভাতী। আজ আমি স্পষ্ট বুঝতে
পারছি মানুষ কিসের জালায়, কোন নিষ্ঠুর
বেদনার তাড়নায়, কোন আশুনের নীরব
অথচ দ্রুত-দহনে করে আত্মহত্যা—যুছে
ফেলতে চায় নিজের আন্তিত বস্তুধার বুক
হতে—মানুষের চোখ থেকে আলোর
অনিসন্ধিৎসুক প্রস্রাবতার কবল থেকে।

“টেবিলের উপর পড়ে আছে আমার
প্রোফেসরির দরখাস্তের উত্তর—আমি কবে
কাজে যোগদান করছি?”

“আমার কী যোগদানের কোন প্রয়োজন
আছে? না! আমার অর্থউপার্জনের
আজ কোন প্রয়োজন নাই। শিখার
অনুরোধে আমারও দরখাস্ত গিয়েছিল
চাকরি পাবার আশায়; সেই শিখাই যখন
আমার কাছ থেকে বহুদূরে, তখন দূরেই
থাক ও লক্ষ্যে বা কিছু আছে।

“কাল রাত্রিতে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ
ব্যবসায়ী বিবেকধর বোশ পরলোকের পথে
যাত্রা করেছেন। তিনি পেছনে ফেলে রেখে
গেছেন বিস্তীর্ণ জমিদারী, আর “নগদ” কর
কোটা টাকা ব্যাঙ্কে। সেই লবের উত্তরাধি-
কারী আমি!

“আমি নাকি তার নিজের ভাগ্যে,
আমাকে একথা তিনি জানতে দেন নি পাছে
আমি স্বাবলম্বী হতে পারি না—পাছে আমি
শিখি না কেমন করে নিজের পায়ে ভর দিয়ে
দাঁড়াতে হয়। তাই তিনি আমাকে দূর
আত্মীয় হিসেবে টাকা দিবে বোর্ডিং এ রেখে
প্রতিপালন কর্তব্যে গেলেন। তার ধনী জীবনের
কোনখানো আমাকে যেসতে দেন নি।

“আজ তাঁর মৃত্যু আমাকে করেছে একজন
শ্রেষ্ঠ ধনী—আর কাল হয়ে গেছে শিখার লগ্নে
সুরেশের সন্মিলন। সুন্দরী পৃথিবী আর

আরও স্মরণ এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষের জীবন যাত্রার পথ—আর সেই পথের পথিক আমি আজ করবো আত্মহত্যা—না হয়ে যাবো উন্মাদ?—কিছুই ভেবে পাইনা। চারিপাশ ফাঁকা!

ডায়েরী থানা দেবেশ সজোরে ছুড়ে দিলে শিলিং-এর দিকে। সেটা দেখানে ব্যাহত হয়ে কিরে এলে পড়লো একটা চায়না ফুলদানীর উপর—ফুলদানীটা য়ন্ য়ন্ শব্দে টুকুরো বিটুকুরো হয়ে পড়লো। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে দেবেশ চিঠিখানা ভারি গলায় পড়ে যেতে লাগলো:

বরানগর
২৭শে জুলাই।

“দেবেশ,

তোমাকে আর কী বলে সন্ধানন করবো ভেবে পেলাম না। তাই দেবেশ বলেই আরম্ভ করলাম। তোমার সঙ্গে আমার যে পরিচয় ছিল, সেই পরিচয়েরই জোরে আমি তোমাকে আমার বন্ধু হিসেবে ধরে নিয়েছি—আর সেই বন্ধুরই কাছে একটি জিনিষ দাবী করছি। আশা করি তুমি আমার অনুরোধ রাখবে।

আজ মাস দুই হলো আমার স্বামী মৃত। তুমি ভাল রকমই জানো, তিনি মাতাল আর চরিত্রহীন ছুই ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাকে তাই পথের ভিখারিনী করে গেছে। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে আমি পেয়েছি বালিগঞ্জের বাড়ী থানা—তাও বলাক এও মঙ্গ কোম্পানীর কাছেবাধা আছে। খোঁজ নিয়ে জানিতে পারলাম তুমি ও ফার্মের প্রেসিডেন্ট। আমার টাকা শোধের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বোধ হয় আর দিন পনেরোর মধ্যে ৭ বাড়ী জাড়বার নোটিশ আসবে। তোমার কাছে আমার অনুরোধ তুমি একটু চেষ্টা করে আমাকে মান হয়েকের সময় পাইয়ে দাও। এই সময় পেলে আমি আমার শেষ আশ্রয় ও বাড়ীখানা বোধ হয় বাঁচাতে পারবো। তোমার এই সাহায্য না পেলে আমি যে কী করবো তা নিজেই জানি না। হয়তো আমাকে এমন পথে চলতে হবে যা আমার আত্মহত্যার সাহায্য। আমার ভায়ের কাছে কোন সাহায্য পাওয়া অসম্ভব সে বোধ কিছু দিনের মধ্যেই ইনসলভেবলি নেবে।

আশাকরি দেবেশ তুমি আমাকে এই সাহায্যটুকু করবে। আজ তোমার এই

সাহায্য ছাড়া আমার আর বাঁচবার কোন উপায় নেই। তিন দিনের মধ্যে আমার চিঠির উত্তর না পেলে বুঝবো তুমি আমার প্রার্থনা বা দাবী রাখলেনা। তোমার কাছে আমার এ মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে না বলেই এ চিঠি লিখলাম।

ইতি—

শিখা।

ক্যালেন্ডার হিসেব করে দেবেশ দেখলে যেদিন যে শিলিং গেছে, তার পরেরদিন রাত্রে এ চিঠি পোষ্ট করা হয়েছে। শিখা এ চিঠির উত্তর না পেয়ে ধরে নিয়েছে দেবেশ তাকে সাহায্য করলো না। আচ্ছা দেবেশ ঠিক সময়ে চিঠি পেলেও শিখাকে কি সাহায্য করতো?

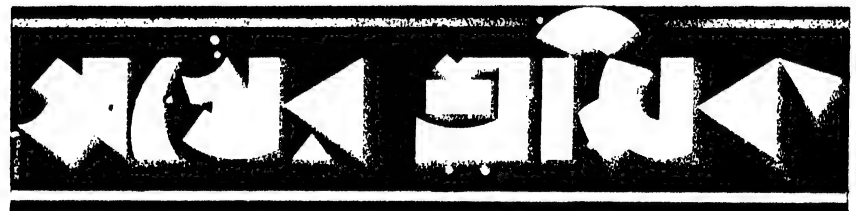
না দেবেশ তাকে সাহায্য করতো না। ইয়া করতো না। কেন করতো না? শিখা সুরেশের বহলে তাকে, দেবেশকে বিয়ে করে নি বলে? ইয়া ঠিক সেই কারণে দেবেশ তাকে, শিখাকে সাহায্য করতো না। যাকে শিখা একদিন ‘ভালবালি’ বলেছিল কি জন্তে সে সেই ভালবালার দাবী নিয়ে বাড়ীর নির্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি, কেন সে একটা অশিক্ষিতা উনবিংশ শতাব্দীর পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত নিজের আত্মহত্যার পথে নিজেকে বিনা বাধায় এগিয়ে দিয়েছিল? দেবেশের মুখ কঠিন হয়ে উঠলো—শিখা না নিজেকে শিক্ষিতা, আধুনিক, স্বাধীন মেয়ে বলে গর্ব করতো? সে আজ দেবেশের কাছে সাহায্য পেতে পারে না। কারণ সে সেদিন যে চাপতানি দেবেশের

হাতে তার গর্ববজায় রেখে লম্বর্ধন করতে পারেনি, সেই হাত আজ দেবেশের লাঞ্ছিত হাতের কাছ থেকে কি করে সাহায্য নেবে? সাহায্য নিলে যে তার লম্বর্ধন গর্ব বুলিমাং হয়ে যাবে। না, না দেবেশ শিখাকে এই গর্ব অটুট রাখতে সাহায্য করবে—ইয়া শিখা এট সাহায্য দেবেশের কাছ থেকে আশা করতে পারে—দেবেশ হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে “ইয়ালো...ইয়েল pk. 4721...অ’ময় বাবু আপনি...দেখুন ব্রাউন রোডের 47/5 বাড়ীখানা আমাদের কোম্পানীর দখলে এসেছে?...এসেছে ভাড়া পর্যাস্ত বলে গেছে...থাক ইউ...

দেবেশ রিসিভার রেখে দিলে। কপালের ঘাম মুচতে মুচতে তার লম্বর্ধন মনটা এক অতি জ্বালাময়ী আনন্দে ভরে গেল।

নিজের অজান্তে দেবেশের বুক চিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। এমন সময় ভারীক্লীণ ঠেলে খবরের কাগজ হাতে লাংবা ঘরে ঢুকলো, “ওগো শুন্ছো—শিখা সরকার বি-এ, ফিল্ম-এ নামলো—কী মেয়ে গো! এট ছ মাস হয়নি বার স্বামী মারা গেছে সে কি এর মধ্যে নাচ গান করতে ফিল্ম এ...লাংবা আরও কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কঠাৎ অস্ট্রট অগচ বেদনাবাজক শব্দে সে দেবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে, “তোমার কী হয়েছে?—বলে” তাড়াতারি তার পতনোন্মুখ দেহটাকে জাপটে ধরলে। ততক্ষণে দেবেশের মুখ হয়ে গেছে বিবর্ণ নিশ্বাস হয়ে এসেছে অতি ক্লীণ।

প্রফুল্ল পিকচার্সের নবতম নিবেদন—



নির্ম্মল রসিকতার ফাঁড়ীতে সমৃদ্ধ, নবীন যুগের

জটিল সমস্যার সরল সমাধান

প্রযোজনা: প্রফুল্ল ঘোষ * পরিচালনা: নির্ম্মল গোস্বামী

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের
প্রথম বাঙলা বাণী-চিত্র

‘হাল-বাঙলা’

শীঘ্রই

উত্তর কলিকাতার

শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহে

মুক্তিলাভ

করিবে

ইহার নায়িকা

ছায়া দেবী

বিশিষ্ট একটি ভূমিকায়
অবতীর্ণ হইয়াছেন
অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্জন
পরিচিত
হাস্যরসভিনেতা
ধীরেন গাঙ্গুলী

নিত্য গরিচয়ের ফলে সমাজের যে
সকল বিকৃতি ও অসঙ্গতি আমাদের আর
চোখে পড়েনা—সেইগুলিকে উপলক্ষ
করিয়া যে হাসির প্রবল বন্যা সৃষ্টি করা
যায়, আবার তাহাতে ভাসাইয়া কিরূপে
আপনাকে চিন্তাসমুদ্রের উপকূলে আনিয়া
ফেলা যায়—

“হাল-বাঙলা”

সেই রস ও রহস্যের অপরূপ

চিত্র-কথা

চিত্রটিকে গীতমুখর
করিয়া তুলিয়াছেন
সুকণ্ঠ-গায়ক
মৃণাল ঘোষ

*

অন্ধ-গায়ক

গোপাল সেন
ভাটিয়ালী গানের মঞ্চ-শিল্পী
গিরীন চক্রবর্তী

*

সুগায়িকা : বীণা বোস
সুগায়ক : মহাদেব পাল

আর আছেন
চিত্র-জগতে নবাগতা
চন্দ্রিকা দেবী
এবং তুলসী লাহিড়ী,
প্রফুল্ল মুখো, সত্য মুখো,
প্রভাত সিংহ, সম্ভাষ
সিংহ, হরিদাস চট্টো,
নবদীপ হালদার প্রভৃতি

জীবন মাই

(সি, বি)

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—

বেঙ্গল ও আসাম দল বিহার দলকে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউন্ডে মধ্যভারত দলের সঙ্গে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। গত শনিবার থেকে ইডেন্ উদ্যানে বেঙ্গল ও আসাম দলের সঙ্গে মধ্যভারত দলের এই প্রতিযোগিতার পূর্ব অঞ্চলের তিনদিন ব্যাপী কাইন্সাল খেলাটি ইডেন উদ্যানে আরম্ভ হয়। বেঙ্গল দল প্রথম ইনিংসে খুব নিশ্চল খেললেও দ্বিতীয় ইনিংসে জি, এফ, কার্টার এবং এই দলের ক্যাপ্টেন ভ্যাণ্ডারভুডের প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ে মধ্যভারত দলকে ২৮ রাণে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। বেঙ্গল ও আসাম দলটি নির্ধারিত হবার আগে এবং পরে অনেকেই বেশী ভাগ বাঙ্গালী খেলোয়াড় নির্ধারিত করা হয়নি বলে অভিযোগ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের যে প্রকৃতপক্ষে অভিযোগ হওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয় নি তা এই খেলাটিতে তাঁরা বেশ সফলভাবে করেছেন। খুবই আকর্ষণীয় বিষয় যে বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র মোট ১৫ রাণ করেন। তাঁর উপর বেঙ্গল দলের কিংস খুবই নৈরাশ্র জনক হয়েছিল। তরুণ এবং উদীয়মান খেলোয়াড় নির্মল চ্যাটার্জি নির্ধারিতদের এবং তাঁর সহচরীদের নিরাশ করেছেন। তিনি যে একজন ভাল ব্যাটসম্যান তা লো কোন ইনিংসের খেলায় প্রকাশ পায় নেবে তিনি প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫ রাণ করে আউট হন : এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র সাহায্যটু

১ রাণ করে বোল্ড আউট হন। তিনি যে এখন এই প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বী মূলক খেলায় যোগদান করবার যোগ্যতা অর্জন করেন নি তা এই খেলা থেকে প্রমাণ হয়েছে। 'ভবিষ্যতে তিনি যদি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে এই রকমের দায়িত্বমূলক খেলায় যোগদান করেন তাহলে সুবিবেচনার কাজ করবেন—তাঁহার পরেই কমল ভট্টাচার্য্যের বিষয় আলোচনা করা চলে। তৃতীয় টেস্টম্যাচে ভারতীয় দলের চৌদ্দটি নামের মধ্যে তাঁহার নাম প্রথমে প্রচারিত হয়েছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর টেস্টম্যাচ খেলার ছ একদিন আগে ঘাটশ বাক্তিতে এসে পৌঁছায়। এই ব্যাপারে অনেকেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁকে হয়ত তৃতীয় ভারতীয় টেস্ট টীমে নির্ধারিত করে তাঁর উপযুক্ত দাবী স্বীকার করা হবে। কিন্তু তৃতীয় টেস্টম্যাচের পর তাঁর যোগ্যতা ক্রীড়ামোহিগণ কুচবিহার দলের খেলার পর মর্মে মর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তবুও অনেকের মনে আশা ছিল যে উক্ত খেলাটিতে তিনি তাঁর ক্রীকেট নৈপুণ্যের উপযুক্ত পরিচয় না দিতে পারলেও বেঙ্গলের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর স্থান অনেক উচু। কিন্তু রঞ্জি প্রতিযোগিতার গত সপ্তাহের এই খেলাটির পর তাঁর বিষয়ে এ ধারণা পোষণ করতেও ইতস্তত করতে হচ্ছে। পূর্ব এক বছরের তুলনায় এবছরে তাঁর ব্যাটিংয়ের ক্ষমতা অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। তিনি মধ্য ভারত দলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১ রাণ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে কোন রাণ করে

নিজস্বলকে সাহায্য করতে পারেন না। তবে তাঁর বোলিং নিজস্বাতি অমুঘারী হয়েছিল। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৩৮ রাণে তিনটি এবং ২৩ রাণে একটি উইকেট লাভ করেছিলেন। একমাত্র তিনিই বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল খেলেছিলেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ ও ৮ রাণ করে দলের অধিনায়ক কে একেবারে হতাশ করেন নি। কার্তিক বহু নির্ধারিত হয়েও অগ্রহতাবলতঃ এই খেলায় যোগদান করতে পারেন নি। তাঁর জায়গার সম্ভাব্য গান্ধী খেলেছিলেন। তিনি প্রথম ইনিংসে ১১ রাণ করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ০ রাণ করে অত্যন্ত বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের ষ্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে লামজন্ত বজায় রেখেছিলেন তবে তাঁর খেলার আরও উন্নতি না হলে হয়ত এইরকমের দায়িত্ব পূর্ণ খেলায় স্থান পাওয়া শক্ত হতো। আগেকের মতো বেঙ্গল প্রাদেশিক দলে নির্ধারিত হয়ে বোলার হিলাবে তাঁর নিজস্ব নাম অক্ষুণ্ন রেখে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বেঙ্গল ও আসাম ক্রিকেট এনোসিয়েশন এতদিন তাঁর উপর অবিস্তার করে এসেছেন। তাঁর পূর্ণ বোলিং বেঙ্গল দলের জয়লাভের অনেকখানি সাহায্য করেছিল। তিনি প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩৯ রাণে ৩টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২ রাণে ৪টি উইকেট গ্রহণ করেছিলেন। তাঁহার পরেই বোলারদের মধ্যে 'সি' ই ইন্ডারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি প্রথম ইনিংসে ৩৬ রাণে একটি মাত্র উইকেট পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ রাণে ৩টি উইকেট লাভ করতে সক্ষম হন। বেঙ্গল দলের এই জয়লাভে গৌরব করা চলে। কারণ প্রমাণতঃ এই দলে অভিজ্ঞ অধিনায়ক এ, এল, হোদী, বোলার এবং ব্যাটসম্যান টি, সি, লংফিল্ড ও বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান কার্তিক

বহু এই খেলাটিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তার উপর বেঙ্গল দলের বিপক্ষে মেজর সি, কে, নাইডু, হুস্তাক আলি, জে, এন, ভায়া এবং হাজারীর মত চারজন নাথ করা নিখিল-ভারতীয় টেষ্ট খেলোয়াড়গণ, খেলেছিলেন। বেঙ্গল দল এই খেলাটিতে জয়ী হয়ে এই প্রতিযোগিতায় পর পর তিন বছর মধ্যভারত দলকে পরাজিত করলেন। অষ্টাভ বছরের তুলনায় এ বছর মধ্যভারত দল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ছিল। বিজিত দলে মেজর নাইডুর প্রথম ইনিংসে ১৪৩ মিনিট খেলে ৭৬ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ভাণ্ডারকার ও ভায়ার যথাক্রমে ৫০ ও ৩৯ রান উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। হুস্তাক আলি একমাত্র আগে ইডেন উত্তানে একটি লেগুয়ার চেয়ে বেশী রান করে গেলেও এই খেলাটিতে বেঙ্গল দলের নোভাগোর জোরে প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৬ ও ৪ রান করেন। তিনি ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলার সুবিধা না পাওয়ার সত্ত্বেও নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। মেজর নাইডুর পারে আঘাত লাগার জন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত ব্যাটিং ও বোলিং করতে পারেন নি। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র তিন মিনিট খেলে মাত্র ১ রান করে তাঁকে লস্টে থাকতে হয়। এই শারীরিক অসুবিধা লঙ্ঘ্যে তাঁর বোলিং খুব কার্য্যকরী হয়েছিল। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৫০ রাণে ৩টি ও ২৬ রাণে ৩টি উইকেট পান। হুস্তাক আলি প্রথম ইনিংসে ২৫ রাণে ৩টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬ রাণে ৫টি উইকেট পেয়েছেন। বেঙ্গল ও আলমদ দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ১১০ ২১৭ রান করেন। মধ্যভারত দল প্রথম ইনিংসে ১৫৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৫ রান করে ২৮ রাণে পরাজয় স্বীকার করেন।

বিজয়ী দল এই মাসের মাঝামাঝি নওয়া-নগর দলের সঙ্গে বোম্বেতে সেমিফাইনাল খেলবেন।

বেঙ্গল ও আসাম দল

পি আই ভাণ্ডারগুচ (ক্যাপ্টেন), জি এস কাটার, সি ই ইণ্ডার, ডবলিউ স্কট, পি এন মিলার, নির্মল চ্যাটার্জি, কমল ভট্টাচার্য্য, জে ই আলেকজেন্ডার, জে এন ব্যানার্জি, সন্তোষ গাঙ্গুলী এবং এ কামাল দ্বাদশ ব্যক্তি কে খাড়াই।

মধ্যভারত দল

মেজর সি কে নাইডু (ক্যাপ্টেন), হুস্তাক আলি, জে এন ভায়া ত্রি হাজারী, ইস্তাক আলি, সরিফুদ্দীন, ভাণ্ডারকার, টাটারিও, ইউনুস খাঁ, সর্দার মহম্মদ খাঁ এবং শজুসিং আম্পারায়দর—সেমাস বেচু দত্ত রায় এবং পাটু মুখার্জি।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

প্রতিযোগিতা

‘রহিনটন বারিয়া’ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলাটি মঙ্গলবার শেষ হয়ে গেছে। এই খেলাটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগীতা করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক ইনিংস এবং ২৫ রাণে জয়লাভ করেছে। অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৪৬ ও ১১২ রান করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ইনিংসে ১৮৩ রান করে। বিজয়ী দলের এইচু. সাবুর অনিষ্টকারী বোলিংয়ের জন্ত আগস্টক দলের এইরূপ শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। বিজিত দলের পটুনারক এবং ভেঙ্কটচালমের বোলিং অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বোম্বেতে পাজাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ফাইনাল খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

রেডিওতে শ্রীযুত জ্ঞানপ্রকাশ বোম্বের ঐবস্থাপনার লক্ষ্যে আসরের অষ্টোনটি অকস্মাৎ বন্ধ করে দেওয়া লক্ষ্যে একখানি অভিযোগ পত্র গত লংখার আমরা প্রেরণ করেছি। পত্র লেখক এর কারণ লক্ষ্যে প্রশ্ন করেছিলেন। “আনন্দবাজার পত্রিকায়” এ লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত পত্র প্রকাশিত হয়েছে। যেখান কমল বহু এবং মিঃ মুখার্জীর অসঙ্গত ব্যবহারের, ভিত্তি বহি সত্য হই, তবে এ লক্ষ্যে তীব্র প্রতিবাদ দেওয়া উচিত এবং রেডিও কর্তৃপক্ষেরও এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

এ ব্যাপারে মিঃ ভদ্র এবং এ্যানিষ্টেন্ট ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ সেন আর্টিষ্টের প্রতি হুঁয়বহারের হুঃ প্রকাশ করে এবং এবং লহাশুভুতি প্রদর্শন করে নিজেদের সৌজন্য প্রকাশ করেছেন সন্দেহ নেই— আমরা তার জন্তে তাঁদের প্রশংসাবাদ জানাচ্ছি কিন্তু আমাদের বক্তব্য, মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করেই যেন ব্যাধারটা ধাধা চাপা না পড়ে। সাধারণের প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি বিশেষের চোখ রঙানি ভবিষ্যতে যেন প্রকাশ না পায় তার জন্তে কঠোর নীতি অবলম্বন করা উচিত।

সবচেয়ে হুঃখের বিষয় ষ্টেশন ডাইরেক্টর, মিঃ ষ্টেপলটন এবিষয়ে মৌখিক সন্ততঃ কোন লহাশুভুতি দেখান নি। আর্টিষ্টের প্রতি হুঁয়বহারের কথা প্রায়ই আমরা শুনে থাকি। আদর অভ্যর্থনা হুঃ থাক মৌখিক ভদ্রতা—সুব্যবহার পর্য্যন্ত অনেকের তাগো জোহট না—কেন?

এ প্রোগ্রাম আমরা বহুবার করেছি। শিল্পীদের অনাহার, অবজ্ঞা বাংলা দেশেই শুধু সম্ভব! আমরা কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে ভেবে-দেখতে অনুরোধ করি এবং এ বিষয়ে প্রতিকার কাশনা করি।

প্রোগ্রাম নির্বাচনে অক্ষমতার পরিচয় বার বার পাওয়া যাচ্ছে। বেতার নাটকে চল যাাত্রার আলস—বিচিত্র অনুষ্ঠান রস শুনে বিচিহ্নই (?) বটে। পল্লীমঙ্গল আলসে কেবলই জোড়াতাড়া লাগানো হচ্ছে। লাক্ষ্য অনুষ্ঠানে কোন standard নেই—রাস শ্রামাধী ভীড়। বক্তৃতা বিভাগে আজকাল সাহিত্য রসের একান্ত অভাব। মর্ধ্য খানিকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল এখন অবসর 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই!' দ্বিপ্রাঙ্গণিক অনুষ্ঠানে বিলেস হালদারের অনুপস্থিতি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাহিত্য প্রসঙ্গগুলি উপেক্ষিত! বরংসারের খুঁটিনাটি মহিলা প্রসঙ্গ অনেক পরিমাণে ব্যহত। তবে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত আলসে অধুনা খানিকটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় আদর্শ নারী লক্ষ্যেও চরিত্রটি আলোচনা শোনা যাচ্ছে—আমাদের বক্তব্য কিন্তু এ যথেষ্ট নয়। নারী-শিক্ষা, কৃষ্টি, সাহিত্য, লম্বাজ, ধর্ম, গৃহধর্ম এ নিয়ে বিজ্ঞততর আলোচনা চাই এ আলসে। তবে একাধী স্বীকার্য রেডিও কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে খানিকটা লক্ষ্য দিচ্ছেন ইহানিৎ।

ছোটদের বৈঠকে মালিমা কিছু কিছু কীতিদ্ব দেখাচ্ছেন। এ আলসে বয়সের গাভীয়া সরিয়ে ফেলে শিশুমন নিয়ে মাতৃ শিক্ষায় সন্তান পালনের আদর্শ আনতে হবে। ছোটদের আলসে সবচেয়ে প্রয়োজন সরসতা। মালিমা সেই পথ অবলম্বন করলে জনপ্রিয়তা অর্জন করবেন। শিশু সাহিত্যের সরস আলোচনা ও যোগ্য ব্যক্তিদ্বারা বাহানীয়।

মালিয়ার ভাষা ভাষা বাংলা ইংরাজী মিশ্রিত উচ্চারণ ভঙ্গী কিন্তু লক্ষ্য বোধগম্য নয়।

প্রোগ্রাম সমালোচনা কালে কোন কোন স্থলে শিল্পীদের নামে ভুল হয়ে থাকে। ঘোষকের বর্ধ উচ্চারণ অনেক সময়ে আমাদের অনুধাবন করতে কষ্ট হয়। গত ৬ই জামুয়ারীর খেরালীতে বিমানবায়ু গান গেয়ে ছিলেন পকানিন মুখোপাধ্যায়ের আলসে বলে প্রকাশিত হয়েছিল। সে স্থলে হবে বিমল বায়ু।

২৩শে জামুয়ারী প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে কমলা করিয়া দুখানি বাংলা গান গাইলেন ভাল। দক্ষিণা মোহন ঠাকুরের এসরাজ বাজনা মোটা মূটি ভালই। আটিষ্টের অনুপস্থিতির দরুণ রেকর্ড বাজনা হ'ল।

শোভা কুণ্ডু মেতার বাজালেন চলন সই। ইন্দুবালা গান গাইলেন উপভোগ্য হয়েছিল। পরে পঙ্কজ বায়ু সঙ্গীত শিক্ষাদান দান করলেন।

ঐদিন লাক্ষ্য অনুষ্ঠানে কিত্তি মোহন সেন মহাশয়ের বক্তৃতা (সঙ্গীত লক্ষ্যযোগে) খুব ভালই লাগল। এধরণের programme এর জন্য আমরা বেতার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরে সুশীল দাস হারমোনিয়ম solo বাজালেন। আমাদের খুব ভাল লেগেছে। সুশীল বায়ুর হাত দিষ্টি এবং বাজনাও বেশ উজ্জ্বল।

হরেন নন্দীর দুখানি গান চলনসই।

মঙ্গলবার, ২০শে লাক্ষ্য অনুষ্ঠানে—

বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংলগ্নের Membersদের দ্বারা একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হ'ল। এত নিকট শ্রেণীর প্রোগ্রাম সরবরাহ কি করে যে বেতার কর্তৃপক্ষ লক্ষ্যন করলেন বুঝতে পারলাম না। আশাকরি ভবিষ্যতে বেতার কর্তৃপক্ষ এরূপ programme নির্বাচনে লক্ষ্যত হবেন।

দেবীরাণী লিংহ "আলো যলমল পূর্ণিমারি" গান গাইলেন অত্যন্ত বাজে এবং নিকট reproduction। কঠিক দ্বাদ চলন সই রকমের গান গাইলেন। পরে রাধিকা বায়ু স্বরোধ বাজালেন ভালই।

২৫শে বুধবার লাক্ষ্য অনুষ্ঠান

যম্মী সত্য বাজনা বাজালেন ভালই। পরে বেতার বিচিত্রা অনুষ্ঠিত হল। "চিত্রমুখি" কোন নতুন আবহওয়া পেলাম না। পরে এইচ কে সান্যাল বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান কে? লক্ষ্যে একটি বক্তৃতা ছিলেন। বাংলার ক্রক লক্ষ্যের নিয়ে আলোচনা করলেন। এ ধরণের বক্তৃতা জনসাধারণের লাভজনক।

বৃহস্পতিবার লাক্ষ্য অনুষ্ঠান—

রঞ্জিত বায়ু হালির গান গাইলেন। রঞ্জিত বায়ু এধরণের গানের উপযুক্ত শিল্পী। গানখানিও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। বীরেশ উকীল "হরার খুলিয়া রাধি" গাইলেন—গানের উচ্চারণ ভাল নয়। আটিষ্টের অনুপস্থিতি পুরণ করবার জন্য রেকর্ড বাজনা হ'ল। পরে বাগন্তী বিজ্ঞাবিধী কর্তৃক "দেবীজুতি" অনুষ্ঠিত হ'ল। নজরুল ইসলাম ব্যাখ্যা করলেন। ব্যাখ্যাকারের বলবার কারদা মোটেই ভাল নয়। Nonstop performance ঠিক করে উঠতে পারেন নি মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল। গানও ভাল নয়। programme এককথায় বলা উচিত অত্যন্ত বাজে এবং নিকট।



স্বপ্নসার

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ললিতা উঠিয়া আলিয়া মায়ের পায়েয় ধুলা লইল। নীরবও আলিয়া ঠক করিয়া একটা প্রণাম করিল।

ললিতার মা ললিতার চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া বলিলেন :

“এ্যাঃ! চোখে যে কালি পড়ে গেছে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্!”

ললিতা মুখ ছাড়াইয়া লইয়া বলিল : “কোথায় রোগা? তোমরা পাঁচজনেই তো রোগা রোগা ক’রে আমাকে সত্যি সত্যি শুকিয়ে দিচ্চ। রোগা টোগা আমি হইনি বাপু!”

বলিয়া সে দ্বিবি গিয়া খাটের বিছানায় উপবেশন করিল। যেন তাহার কোনই রোগ নাই!

নীরব বলিবার চেয়ারখানার মুখ ফিরাইয়া বলিল : না! ও রোগা টোগা হয় নি! আমাদের চোখ সব খারাপ হয়ে গেছে। আর ডাক্তারেরা ও ভুল ক’রে ওর শরীরে অম্লথ খুঁজে পেয়েছে! সকলেরই ভুল, ঠিক কেবল ও নিজে! বুঝলেন মা! আপনি কাশী ফিরে যান পালাটা গাড়িতে, ... আপনার কত্না ললিতা’র কোনও অম্লথ করে নি!

বলিতে বলিতে নীরব তাহার বলিবার বিষয়ের স্মৃতি হঠাৎ হারাইয়া ফেলিল; সে গভীর হইয়া গেল। সঙ্গে নবাগত ঘেরেটিও মুখ নত করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

ললিতার মাতা বলিয়া উঠিলেন। দাঁড়িয়ে রইলি কেন লবঙ্গ। যা, কাপড় চোপড় কেচে আস। আর এই অবলায় চান টান করিস্

তো তাও করে আর! এবাড়ীতে তোর লজ্জা করবার কেউ নেই! এখানে শুধু জামাই থাকে, আর ঘেয়ে থাকে! আর বাহিরের লোক কেউ নেই! সব চাকর চাকরানী... তাহেরই সংসার! তুই যা মা, ... সকাল সকাল কাপড় চোপড় কেচে আর! আমি তৎক্ষণ একটু জিরিয়ে নিই!

ললিতা বলিয়া উঠিল : তা তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা? এই বিছানাতেই বসোনা! তোমার ত এখন কাঁচা কাপড় নয়।

হাঁ, তা বস্চি! আগে লবঙ্গকে বলে দিই, কোথায় আমার গজরজল, কোশাকুলি, কুশালন এসব আছে! ঐ পোটলাটার ভেতরই আছে! ‘বুঝি লবঙ্গ! পোটলাটার ভেতরে খুঁজে দেখ! সেটা বুঝি এখনও আসে নি!’

লবঙ্গ এতক্ষণে একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। ঘোমটার ভেতর থেকেই সে ঘাড় নাড়িয়া অক্ষুটস্বরে বলিল : না, পোটলাটা আসে নি!

বলিতে বলিতেই বেরারা বাক্স, পেটরা, পোটলা লইয়া আসিল! ঘরের ঘেঁষায় সে গুলি নামাইয়া দিয়া সে বলিল : গাড়োয়ান ভাড়া চাচ্ছে!

—ও! ভাড়া বুঝি এখনও বেওয়া হয় নি! ও লবঙ্গ! এখনও ভাড়া বিস্মি?

—হুই দিই! বলিয়া লবঙ্গ তাহার জাঁচলের খুঁট হইতে একটি টাকা আর কিছু পরমা বাহির করিয়া সে বেরারার হাতে দিল।

বেরারা ভাড়া লইয়া চলিয়া গেল। লবঙ্গ পোটলাটি টানিয়া আনিয়া, নীরবের দিকে পেছন করিয়া খুলিতে বলিল।

—এ ঘেরেটি কে মা? ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার মাকে।

—ওমা, ওকে চিনিস্নি? কি করেই বা তুই চিনবি! তোর বিষের পর ও এনেছে আমাদের বাড়ীতে! ও আমাদেরই স্বঘর! আমাদের বাড়ীর পাশে যে রাম দস্তরা ছিল না? সেই তাহেরই বাড়ীর দৌহিত্রী! আহা, ঘেরেটার বড় কষ্ট! স্বামীর ঘরে ঘেরেটারেই মোটে খেতে দেখনা! তাই আমি আনিয়ে রেখেছি, আমার কাঁছে!”

ইত্যবসরে লবঙ্গ কোশাকুলি দুখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

নীরব চেয়ারখানি বাঁকাইয়া লইয়া তখন রায় লিখিতে ছিলেন।

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—

অপরাক্ষে ডাক্তার বাবু আসিলেন, ললিতাকে দেখিতে।

নীরব তাহাকে সঙ্গে করিয়া ললিতার ঘরে লইয়া আসিল।

ললিতার ঘর তখন বেশ গুল্জার। তাহার মা খাওয়া দাওয়া সারিয়া বসিয়াছেন, তাহার লহিত গল্প করিতে। পাশে আছে লবঙ্গ, ললিতার মার সঙ্গে যে এখানে আসিয়াছে। ললিতা খাটের উপর বলিয়া তাহার লহিত গল্প করিতেছিল।

ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন শুনিয়া ললিতার মাও লবঙ্গ সঁরিয়া গেল। ললিতা স্বেরন বসিয়াছিল, তেমনি বলিয়া রহিল।

ডাক্তার বাবু ঘরে ঢুকিয়া, ললিতাকে বলিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন : কই, আমার কথাতো আপনি শুনছেন না! আপনাকে শুয়ে থাকতে বলে গেলাম,—

ললিতা এ পুরাতন ভিন্নস্বরের কোনও উত্তর করিল না। সে গভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

ডাক্তার বাবু একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া খাটের পাশে বসিলেন।

—আজ কত জ্বর হয়েছে ?

ললিতা তাহারও কোন উত্তর করিল না।

এই শীতল অভ্যর্থনা ডাক্তার বাবুর কাছে যেন কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল।

‘নীরব দাঁড়াইয়াছিল; বলিল : আজ একবার ওকে ভাল ক’রে একজামিন করে দেখুন।’

—হাঁ, দেখি।

বলিয়া ডাক্তার বাবু পকেট হইতে বুক দেখিবার যন্ত্র বাহির করিলেন। ললিতা কিন্তু বলিল : ‘আজ থাক। রোজই তো ভাল ক’রে একজামিন করে দেখছেন। খারাপ একজামিন উনি কবে করেন ?’

নীরব উচ্চকণ্ঠে আপত্তি তুলিয়া বলিল : না, না। আজ তোমার মা এসেছেন; আজ একবার ডাক্তার বাবু ভাল ক’রে একজামিন করে দেখুন। যদি অসুখ কমে থাকে, ভালই। আর যদি বেড়ে থাকে, তাহ’লে না হয় মার সঙ্গে তোমাকে পাঠিয়ে দেই।

—‘কোথায় ?’ ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

—‘মা থাকেন কান্নিতে! এ রোগের পক্ষে কান্নি কি সুবিধাকর জায়গা হবে না, ডাক্তার বাবু ?’

—কান্নি! লোকজনের বড়ো ভিড়। খুব সুবিধাকর হবে বলে মনে হয় না।

—তবে কোথায় পাঠিয়ে দেবো ?

—এমন জায়গায় পাঠাতে হবে, যেখানে লোকজনের ভিড় মোটে নেই, কাজেই হাওয়া একেবারেই বিশুদ্ধ, এই ধরুন, শিমুলতলা কি রীতি কি হাজারিবাগ।

ললিতার দিকে তাকাইয়া নীরব খলিল : ‘মা বলছিলেন কি শুনেছো ?’

—কি ?

—বলছিলেন, উনি তোমাকে কান্নি নিয়ে গিয়ে বেনারশ লিটর বাহিরে একখানা বাড়ী ভাড়া ক’রে রাখবেন, সে দিকটা নাকি খুব ঠীকা আছে।

বাহীর এ প্রস্তাব কোন উত্তর না করিয়া, ডাক্তার বাবুর দিকে তাকাইয়া ললিতা বলিল : ‘ডাক্তার বাবু! আপনার যা ওষুধ পত্র লেখবার তা লিখে দিয়ে যান। আজই তো আর আমি হাওয়া খেতে বাইরে যাচ্ছি না! যখন যাবো, তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করেই যাবো।’

ডাক্তার বাবু কথাটার লায় দিয়া বলিলেন : ‘হাঁ, তাতো বটেই! আগে দেখি, যদি এইখান থেকেই জ্বর সেরে যায়, তবে আর বাহিরে পাঠানো কেন ? আর সে যখন আপনারা যাবেন, তখন সে সব কথা হবে! আজতো দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে যাই! আপনার সে থুত্থুকে কান্নিটা কেমন ?’

—ঐ একটু আধটু আছে, খুব কম পড়ে গেছে!

নীরব মাঝ থেকে বলিল : ‘কিছু কম পড়ে নি ডাক্তার বাবু! কাল রাতে ভয়ানক কেশেছে!’

ললিতার মাতা পাশের ধর হইতে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা সবই শুনিতেছেন,—

ললিতা চায়; তাহার মাতাকে বুঝাইতে, যে তাহার অসুখ বিষয় বিশেষ কিছুই নাই; যেটুকু ভিল, তাহা মারিয়া গিয়াছে।

তাই ললিতা তাড়াতাড়ি বলিল, ডাক্তার বাবু যা হয় করুন! ওষুধ পত্র লিখে আমার পরিত্রাণ হেন! আর ভাল লাগচেনা আমি শুয়ে পড়ি।

—হাঁ, হাঁ, শুয়ে পড়ুন না। বলে থাকলে তো কষ্ট হবেই! আমিতো বলেছি,—


লবঙ্গ এই নতুন বাড়ীতে আলিয়া বড় বিপত্তিতে পড়িয়াছে। বাড়ীর যিনি প্রকৃত গৃহিণী, তিনিতো রুগ্ন শয্যায় শায়িতা। তাহার উঠবার ক্ষমতা যে নাই, তাহা নহে! অগচ তাঁহাকে ডাক্তারে ও বাড়ীর লোকে উঠিতে দেয় না। কাজেই ডাক্তার ঘর ও রুমহইবার একরকম মগের মূলুক বলিলেই হয়। সেখানে একটা উড়ে পুরুষমানুষ কোমরে গামছা বাধিয়া গৃহিণীর কাজ করে।

বাড়ীতে মানুষ বলিতেতো তিনটি! বাড়ীর বাবু তাহার গৃহিণী আর একটি ছোট ভেলে। ভেলেটির বয়স হইবে তিন কি চার। কিন্তু তাহার জননীর সহিত তাহার ততো ভালবাসা নাই, যতটা আছে তার ধাইয়ের

• দুর্দমল এবং শীর্ণ শিশুরা •

ডোঙ্গরের

বাল্যমৃত সেবনে অবিলম্বে সুস্থ ও সবল হয়।



বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

লভে। আবার ধাই বখন তাহার ঘরের
দেখার পড়িয়া নাক ডাকে, তখন ছেলেটি
বাড়ীর বাহিরের ঘরে গিয়া দরওয়ানের
লহিত বন্ধু পাভায়! তাহার পিতার
লাগানো এইগুলি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া
পড়িতে বলে, এবং পড়ার সাক্ষী স্বরূপ
রাখিয়া যায় দোরাত কলমের কতকগুলি অর্থাৎ
কলাবিজ্ঞা! শেষে আপনার মুখমণ্ডল, বর্ণ
বিপর্যয়ে চিত্রিত করিয়া হাজির হয় মা'এর
কাছে—যেখানে তিরস্কারের পরিবর্তে পুর-
স্কারের মাত্রাটাই কিছু বেশী!

কিন্তু পুরস্কার ছেলেটি তত পছন্দ করে
না, যতো পছন্দ করে দরওয়ানজীর সুর
করিয়া তুলনী দানের রামায়ণ পড়া! কাজেই
বাড়ীর ভিতর সে তত থাকিতে চায় না, যত
থাকিতে চায় বাড়ীর দেউরিতে।

বাপ ছেলেটিকে আদর করিবার তঁত
সময় পান না, কেননা আদালতের কাজে
তাঁহাকে ডুবিয়া থাকিতে হয়। সমস্ত
দুপুর বেলা এবং বৈকালের প্রথমার্ধটা তো
আদালতের ঘরের মধ্যেই কাটিয়া যায়;
আবার বাকি সময়েরও কিয়দংশ দিতে
হয় ঐ আদালতেরই লেখাপড়ার কাজে।
সন্ধ্যাবেলা বন্ধুবান্ধব আসিয়া হাজির হয়,
তাঁহাদের সঙ্গে খেলাধুলা ও গল্প শুদ্ধ
করিতে রাত্রি অনেক হইয়া যায়।

যাহা হউক, লবঙ্গ আসিয়া দেখে, এ
বাড়ীটি কি চাকরেরই বাড়ী। কি আছে
একজন, কিন্তু চাকর অনেকগুলি। একজন
বাহিরের কাজ করে, আর বাকি সব অন্তরের
জন্ত। একজন বাঘুর ঘরের জন্ত; একজন
রসুই ঘরের জন্ত; একজন ভাড়ারের জন্ত;
একজন খোকর জন্ত। এতস্ত্রি একজন
ধাই ও একজন রাবুনী বাহুন বর্তমান।

লবঙ্গ ইহার আগে কখনও রাবুনী বাহুন
দেখে নাই, এই প্রথম দেখিল। তাহার
বাপের বাড়ী পল্লীগ্রামে, ষণ্ডুর বাড়ীও তাহাই।

এই দুই স্থানে সে কখনও দেখে নাই, পুরুষ
মামুষ কাঁছাকাঁচা আঁচিয়া রান্না করে, আর
বাড়ীর জীলোকেরা বলিয়া বলিয়া খায়।
—কিন্তু নিত্য দুই বেলা পুরুষ মামুষ ছেলের
ঠেলে, লবঙ্গ এই প্রথম দেখিল।

লবঙ্গ প্রথম দিন রাবুনী বাহুনের সম্মুখে
ঘোমটা দিল, কেননা সে পুরুষ মামুষ।
পুরুষমামুষ দেখিলেই ঘোমটা দিতে হয়,
ইহাই সে বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছে।
ললিতার মাতা সন্ধ্যাবেলা বলিলেন:

“কাকে দেখে ঘোমটা দিচ্ছিস্ লবঙ্গ?”
লবঙ্গ হাসিয়া একটু অমুচ্চস্বরে বলিল: অত
বড় মিন্সেকে দেখে কি ঘোমটা নাড়িয়ে থাকে
যায়?

—কে? ঐ ঠাকুরকে দেখে? আঃ!
আমার পোড়াকপাল ওষে রাবুনী বাহুন,
উড়ে। ওকে দেখে ঘোমটা দিবি কিরে!
ওতো সমস্ত দিনই থাকবে রান্নাঘরে, রান্না
কর্তে! তোমাকেও হয়তো সমস্ত দিন রান্না
ঘরে আসতে হবে, এটা ওটা পেটা কর্তে!
তাহলে, কথা না কইলে কি চলে? আরও
রাবুনী বাহুন, ভিন্নদেশী লোক,—ওর সঙ্গে
কথা কইতে দোবই বা কি?

—তা, পুরুষ মামুষ রাখে কেন? মেয়ে
মামুষ তো রাখেতে পারে মা!

—তা কি হবে বলে! ললিতা তো
আর হাড়ি ঠেলেতে পারে না। ও বিয়ের
পর থেকেই কখনও হাড়ি ঠেলে নি। একবার
বুঝি রাখেতে গিয়েছিলো, তা, জামাই বঁকে
ঝঁকে একেবারে কাণ্ড করেছে!

—কেন মা? জামাই বাহু বকলেন
কেন?

—আরে, ওর কি আর রান্না বাস্না করলে
চলে? কোলে ছেলে রয়েছে, তার ওপর
জামাইবাহুর কাপড় চোপড় ঠিক করে দেওয়া
আছে! তার ওপর নাকি, নীরব এক
মৃষ্টার ঠিক করে দিয়ে ছিলো, পড়ন্তনা
করবে বলে! ললিতা যে ছোটো পাশ দিয়েছে,
তা বুঝি জানিস্ না?

—পাশ দিয়েছেন? কি, ইংরিজি?

—হাঁ, ইংরিজি! ললিতার দেখিকেও
খুব মাথা আছে।

লবঙ্গ শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িল।
মেয়েমামুষ ছোটো ইংরেজি পাশ করিয়াছে,
একথা সে এই নূতন শুনি।

লবঙ্গ অনেকধা ধরিয়া কি ভাবিল। হঠাৎ
জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল “আচ্ছা, পুরুষ মামুষ
রাবুনী না রেখে মেয়ে মামুষ রাবুনী রাখলে
তো হয়।

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!



গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!

ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য
পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত
আধুনিক ধরণের লকল রকম গহনা
পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ
লোণার স্থায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিলিকো

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি. বি. ৪৮২

লবঙ্গ যতক্ষণ নির্বাক হইয়াছিল, ললিতার মা ততক্ষণে তাঁহার তুলসীর মালা বাহির করিয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সেই মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটা হাই তুলিয়া বলিলেন : মেয়ে মানুষ রাগুনি পাওয়া যাচ্ছে কোথায় বলা ?

—কেন মা ? পুরুষমানুষ রাগুনি পাওয়া যায়, আর মেয়েমানুষ রাগুনি পাওয়া যায় না ?

—কই আর পাওয়া যায় ? মেয়েমানুষ জাত ত আর স্বাধীন নয় ! তার স্বামী আছে, পুত্রর আছে, ঘরের পাঁচটা বঁধন আছে। সে সব বঁধন কেটে, পরের বাড়ী চাকরি করতে আসা, মেয়েমানুষের ঘটে ওঠে কই ? পুরুষমানুষ স্বাধীন জাত, এক কাপড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাবের চাকরি করা লাঞ্জে ! কাজেই পুরুষমানুষ রাগুনিই বেশী পাওয়া যায়।

—তাহ'লে মেয়ে মানুষ কি এত বেশী পাওয়া যায় কেন ?

—তারা ছোট ঘরের লোক ! এককথাঃ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। বামুনের ঘরের মেয়েরা, কি ভাল কায়েতের ঘরের মেয়েরাত তা পারে না !

—না খেতে পেরে, ঘরের ভেতর পচে মরবে, লেও ভাল ! তবু ঘর থেকে বাইরে এসে, পরের বাড়ীতে চাকরি করে আপনার পেটটা চালাবে, লেটা ভাল নয় ?

—সে কথাটা কটা লোক বুঝে বলা ! নিজের বংশের মর্যাদা সকলেই ঠিক রাখতে চায় !

—আমি সেটা ভাল বুঝিনে মা ! এই ধরুন আমারই কথা ! আমি যদি আমার স্বামীর ঘরের মর্যাদা রাখতে গিয়ে তাঁর উঠোনেই পড়ে থাকতুম, তাহলে 'এতদিন সেইখানেই হাড় ক'খানা রাখতে হতো ! আপনার পারের তলায় একটু ঠাই পেলাম বলেইতো এখনও বেঁচে আছি !

—তোর স্বামী কি তোকে দুটি খেতেও দিতে পারতো না ?

—'দিতে পারতেন নাও বটে, দিতেনও না' বটে ! বলিয়া মুখখানি নত করিয়া, লবঙ্গ পারের বৃড়া আঙ্গুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

আমি যে তোমারে বেলেছি ভালো

শ্রীঅমিত্র মোহন বসু

ভালোবালো আর নাই ভালবালো

আমি যে তোমারে বেলেছি ভালো
আল বা না আল মোর পাশে কভু

প্রতীকান্তে মোর যাবে যে কাল।

একদা যখন নিরেছিলে টানি,

দিয়েছিলে মোরে নতুন আলো

আজি ভুলে যাবে—যাও, ক্ষতি নেই মোর—

আমি ভুলে যাবো কেমনে বলা ?

আহরণ করি' মম প্রাণ মধু

(এখন) ভ্রমর লম যাও চঞ্চল

তবে হেনেছিলে কেন রঙিন অধর নাড়ি'

কেন বলেছিলে বাণিগো ভালো ?

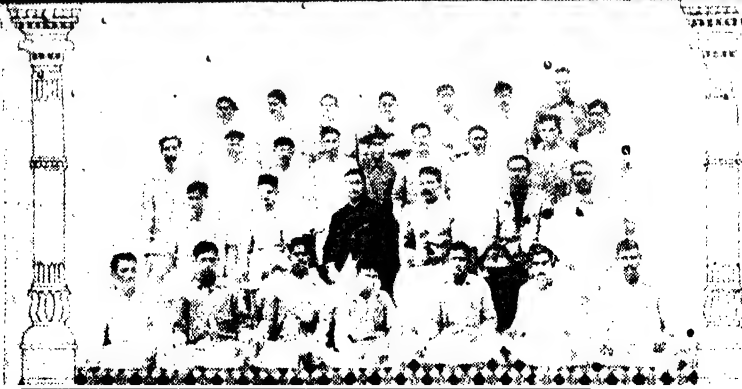
কেন মোহন সুরে গেরেছিলে গান

করেছিলে কেন আঁখি লজ্জল

কেন এসেছিলে শাস্ত মূর্তি নিয়ে

প্রেম যদি মোর হবে নিষ্ফল ?

ভারত অয়েল মিলের



খাঁটি সরিষার তৈল ব্যবহার

মিল ও ডাম্পিং ২৪৩, অপারসার কলার রোড, কলিকাতা। ফোন: বিবি ২৭৭৪

ললিতার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন :
দিতেন না কথাটার মানে ? ঘরে ভাল
থাকতে, কে নিজের বটকে খেতে দেয় না ?

লবঙ্গ একথার কোনও উত্তর দিল না ;
তবু আরক্তিম ঠোঁট হইখানি উল্টাইল।

(ক্রমশঃ)



মরণ-আশিস

ত্রিদেশাশীষ সেনগুপ্ত

জনবিরল পথে কিছুকাল বিচরণ করিয়া আত্মি সিন নদীর তীরে আলিয়া বসিল; , বেথিল পাহাড়ের গায়ে প্রতিষ্ঠিত নদীর জল বিরূপ চিক্‌চিক্‌ করিতেছে—ঐখানে লুপ্ত—তাহার প্রিয়া আশা আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করিত।

বহুদিন তাহাকে এরূপ শান্ত দেখা যায় নাই। ৮টার সময় সে স্নান করিয়াছে। তারপর আহ্বারার্থ 'রয়েল প্যালেস'র ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়াছে, আর খাওয়া শামগ্রীর অপেক্ষাকালে লংবাৎপত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিরূপণ করিয়াছে। 'করবির ছ লা জে গোলাইটী'তে ২৪শে ফ্রান্সিসেল এ সে 'গ্রেস ছ লা রিভলিউশন'এ বধ্য অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা পাঠ করিল।

বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়াছে। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পোষাক পরিচ্ছদে সৌষ্ঠব ও স্বচ্ছন্দে ছায়া আছে কিনা দেখিতে একটি আরনার দৃষ্টিপাত করিল। পরে সিন্‌ নদী ও মাজারাইন্‌ ইটের কোণসংলগ্ন একখানি গৃহাভিমুখে যুগপাতে প্রস্থান করিল। ওখানে বাস করেন নাগরিক লাদিলো—রাষ্ট্রবিপ্লবীর বিচারসভার জনসাধারণের প্রতিনিধি অভি-যোক্তা। আত্মি তাকে জানে—অমারিক ডব্রলোক!—এ্যাভারগে খুদীর সম্মান্য বিশেষ প্যারীতে সাধারণতঃ অমুরাগী গোড়া নাগরিক।

ও ঘণ্টাখানি করিল। কয়েকমিনিট নিতরুতার পর গর্জের তক্তার পিছনে একখানি যুথ দেখা দিল;—নাগরিক লাদিলো তাঁর বর্শনপ্রার্থীর নাম ধাম লম্বন্ধে লম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া অবশেষে বরজা খুলিয়া

বিলেন। যুথ তাঁর মাংসল, অত্যাঙ্গন বর্ণ, বকবকে চক্ষু, শ্রাৎলাতে যুথ ও লাল, লাল কাণ। তার আকৃতি ক্ষুণ্ণবাক লোকের মত—কিন্তু লম্বয়-হিনাবী লোকটি। তিনি, আত্মিকে গৃহের প্রথম কক্ষে লইয়া গেলেন।

ছোট্ট একটি গোল টেবিলের উপর দুজনৈর আহার প্রস্তুত। আত্মি লক্ষ্য করিল—একটি যোরগ, একখণ্ড ঝলসান মাংস, বানিকট। শূকরমাংস একপাত্রে ক'গ্রাস পনীর ও একডিস ঠাণ্ডা কচি গোমাংস।

কক্ষভূমে ছ'টা মেষের বোতল একটি বুড়িতে ঠাণ্ডা হইতেছিল। একটি আনারল, পনীর ও সুরক্ষিত ফল ইত্যাদি ঢাকনার আবৃত। 'অসংখ্য কাগজে জড়ান মেষের ফ্রাক ডেস্কের উপর স্থাপিত। পাশ্চাত্যী কক্ষের অর্দ্ধেক বরজা দিয়া একটি অনাবৃত বিছানা দেখা বাইতেছে।

"নাগরিক লাদিলো"—আত্মি বলিল— "আমি আপনার কাছে একটি অমুরগ হইব।

নাগরিক! যদি তার দ্বারা জনসাধারণের বিপদগ্রস্ত হবার আশঙ্কা না থাকে তবে আমি মজুর করতে প্রস্তুত।"

"বে অমুরগ আমি আপনার নিকট প্রত্যাশী"—যুথ হাস্তলহকারে আত্মি বলিল— "লম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের ও আপনার নিজের নিরুপস্থার সঙ্গে মিলে যাবে।"

লাদিলোর নিকট হইতে লম্বন্ধে পাইয়া আত্মি বলিল "নাগরিক প্রতিনিধি। আপনি জানেন ছ'বৎসর যাবৎ আমি আপনার বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে বড়বন্ধে লিপ্ত আছি আর আমি—আমিই 'আতঙ্কের বোঁ' নামক

প্রবন্ধের প্রণেতা। আপনি 'আমার প্রেমের করলে আমার কোনও দ্বারা দেখানো হবে না। তাতে আপনি আপনার কর্তব্যসম্পাদন করবেন মাত্র। লেখক অমুরগ আমি প্রার্থনা করি না। কিন্তু শুধুন! আমি প্রেমোদিত! আর আমার প্রণয়িনী কারাগারে আবদ্ধ।"

লাদিলো শির নত করিয়া দেখাইলেন , যে এরূপ মনোভাব তিনি অমুরগদমন করেন।

"আমি জানি আপনি লহানুভূতিসম্পন্ন ডব্রলোক, নাগরিক লাদিলো—আপনার কাছে আমার এই ভিক্ষা—আমি বাক্যে ভালবাসি তার সঙ্গে আমার মিলন ঘটিলে দিন—এখুনি আমাকে 'লাইব্র'এ পাঠিয়ে দিন।

"হাঃ! হাঃ! হাঃ!"—চতুর লুচুহাতে অধর রঞ্জিত করিয়া লাদিলো বলিলেন— "জীবনের চেয়েও বেশী কিছু তুমি চাইছো নাগরিক! এবে যুথ!" তারপর লম্বয় কক্ষের দিকে বাহ প্রসারিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে যেন কাহাকে আহ্বান করিলেন—"এপি-ক্যারিস! এপি-ক্যারিস!"

ঘনকক্ষ বেশদ্বার—নগ্ন বাহ ও গ্রীবা মাথায় একগোছা কৃত্রিম ফুলদল প্রবেশ করিল একটি মেয়ে।

"আমার প্রেমদী!" জামুর 'পরে আকর্ষণ করিতে করিতে লাদিলো, তাহাকে বলিলেন—এই নাগরিকের যুথপানে চেয়ে যুথ!—কোনওদিন ভুলবে না। আমাদেবরই মত এপি-ক্যারিস! ওর অন্তর স্তম্ভহান-তাবপরিপূর্ণ। আমাদেবর মত ও'ও জানে বিরহ অস্ত্র অকল হৃৎকের চেয়েও বড়। ও ওর প্রণয়িনীর সঙ্গে কারাগারে—হ্যাঁ গিলেটিনেও যেতে চায়। এপি-ক্যারিস!—আমরা কি ওর এই প্রার্থনা না মঞ্জুর করে থাকতে পারি?

"না—" রাষ্ট্রবিপ্লবীর নেতার গণ্ডে

কল্ল হতে আঘাত দিতে দিতে ঘেরটা বলিল।

“তুমি বলেছ আরাধ্যা দেবী আমার। এই দু’জন বিখ্যাত প্রেমিকপ্রেমিকাকে নিশ্চাই আমাদের সাহায্য করা উচিত। নাগরিক আজি! তোমার ঠিকানা যাও, আজ রাতেই তুমি সুখে নিদ্রা যাবে—করাগারে!”

“তাই ঠিক রইলো”—আজি বলিল।

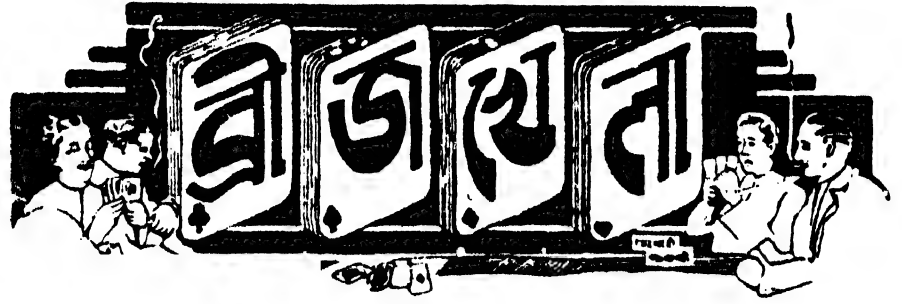
“তাই ঠিক রইলো” হস্তপ্রদায়ণ করিয়া লাঙ্গিলো বলিলেন—“যাও, তোমার প্রিয়াকে আবার খুঁজে বের কর। আর তাকে বলে লাঙ্গিলোর বাহুমাধ্য তুমি দেখেছো এপিক্যারিয়কে! এই দৃষ্ট তোমাদের অন্তরে বেন বহু বহু উজ্জ্বল ভাবধারার সৃষ্টি করে।”

আজি, উত্তর দিলো লজ্জবতঃ তাদের ভাগ্যে আরও হৃদয়স্পর্শী সূক্তির বর্ণনামাত ঘটিতে পারে...কিন্তু সে কৃতজ্ঞও কম নয়। প্রতিধানে সে কোনও কিছু করতে পারিবে. এমন আশা নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল।

“মহুয্য পুরস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে না” লাঙ্গিলো বলিলেন। তিনি উঠিলেন এবং এপিক্যারিয়কে বঁকে চাপিরা ধরিয়া “আরও বলিলেন “কে জানে কখন আমাদের পালা আসবে? এখন—এল—পান করা যাক! নাগরিক! এ তোমাদের অংশ তুমি নেবে কি?”

“কি চমৎকার হবে!” বলিয়া এপিক্যারিয় বাহুপাশে আবদ্ধ করিল আজিকে। কিন্তু আজি নিশ্চয়ই সরিয়া গেল—ওহু বহন করিয়া লইয়া চলিল প্রতিনিধি অভিযোক্তার প্রতিভাটা!*

* আনাতোল ফ্রান্স।



শ্রীহরীস

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

শ্রীজ খেলার নানাবিধ সমস্যা

নিম্নের হাতখানি ও তার ডাক দেখুন,—
ইস্কাবন—পজা।

হরতন—সাহেব, আটা, চোকা।

কহিতন—বিবি, গোলাম, দশ, নয়, ছরি।

চিড়িতন—সাহেব, দশ, নয়, লাটা।

	উ	
প		পু
	দ	

ইস্কাবন—টেকা, বিবি, চক্কা, চোকা, তিরি

হরতন—টেকা, বিবি, পজা।

কহিতন—পজা।

চিড়িতন—টেকা, বিবি, পজা, তিরি।

ডাক হয়েছিল,—

‘দ’	‘উ’
একটি ইস্কাবন।	দুইটি কহিতন।
তিনটি চিড়িতন।	চারটি চিড়িতন।
চারটি ইস্কাবন।	পাঁচটি চিড়িতন।
পাশ।	

কহিতনের সাহেব পেড়ে প্রাথমিক চাল দিয়ে পিটু নিজে ‘প’ হরতনের দশ পেড়ে

খেলেন। হরতনের টেকা দিয়ে পিটখানি গরে রঙবস্তা ইস্কাবনের টেকার পিট নিলেন। অতঃপর ইস্কাবন খেলে ‘ডামি’কে দিয়ে তুরূপ করালেন। তৎপরে কহিতন খেলে নিজের হাতে তুরূপ করলেন এবং ইস্কাবন খেলে ‘ডামি’কে দিয়ে তুরূপ করালেন। এ স্থলে যদি ইস্কাবনের সাহেবখানি পড়ে যেত এবং ৩—২ হিসাবে যদি চিড়িতন বিভক্ত হত তাহলে হরতানি পিট অবশ্যস্তাবী ছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে শেষবারে ‘পু’ গোলাম দিয়ে ডামির তুরূপের উপর তুরূপ করলেন এবং একতাল রঙ খেলে দিলেন। এই খেলার পর ডাকবার একখানি ইস্কাবনের পিট প্রতিপক্ষকে দিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

তৃতীয়বার চাল দেবার পূর্বে ডাকবার যদি এক মুহূর্ত ভেবে দেখতেন, তাহলে তাঁকে এ অবস্থায় পড়তে হত না। এ হাতে ইস্কাবনে খেলা ঠিক নয়, কহিতনে খেলাই যুক্তি মঙ্গত। তিনবার রঙ খেলে নিজে, ‘ডামি’র হাতে সাহেব দিয়ে পিট ধরানোর পর ‘প’কে কহিতনে একখানি পিট দেওয়া ভাল তাহলে এ খেলার

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্ততৌষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর.

কোনরূপ খেলার হিতে হত না। এই ভাবে খেলা ব্যর্থ হত যদি প্রতিপক্ষের হাতে রঙের বিভাগ হত ৪-১ ধরনের; আর সে ক্ষেত্রে কোন উপায়ে খেলা করা সম্ভবপর কি না লক্ষ্যে। সম্পূর্ণ হাতখানি এইরূপ,—(নিয়ে দেখুন)

The Salikha Bandhab Samity :—
এই সমিতির পরিচালনার একমুখে দুইটি প্রতিযোগিতা বাহির হচ্ছে; সেগুলি যথাক্রমে, auction (single) এবং contract (Duplicate)। contract (Duplicate) প্রতিযোগিতা এদের সমিতির এই প্রথম। এই দুতন ধারার ত্রীজ প্রতিযোগিতা প্রবর্তনে আগ্রহের হয়েছেন বলে ত্রীজ প্রেমিকদের দত্তবাহারী। তবে একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে মন গড়া আইন না করে এরা প্রচলিত নিয়মামুত্রে contract Duplicate এর খেলাগুলি সম্পূর্ণ করেন।

ইক্বান—পজা।

হরতন—সাহেব, আটা, চোকা।

রুহিতন—বিবি, গোলাম, দশ, নয়, ছুরি।

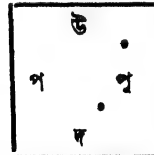
চিড়িতন—সাহেব, দশ, নয়, সাতা।

ইক্বান—সাহেব, গোলাম, দশ, নয়, আটা।

হরতন—দশ, তিরি।

রুহিতন—টেকা, সাহেব, আটা, ছকা।

চিড়িতন—আটা, চোকা।



ইক্বান—টেকা, বিবি, ছকা, চোকা, তিরি।

হরতন—টেকা, বিবি, পজা।

রুহিতন—পজা।

চিড়িতন—টেকা, বিবি, পজা, তিরি।

মিলন

শ্রীহিন্দোল কুমার বিনী

সেই মেহিনের স্পর্শ তোমার

সেই মেহিনের বাণী—

সেই মেহিনের মধুর হাসি

আমায় যে নৈর টানি—

আবেশ তরা স্বপন মাঝে

মন—উড়াল করে লকল কাজে

বিনের আলোর খুঁজে কিরি

রাতের অন্ধকারে—

তোমার লাগে মিলন যে মোর

হয়গো বায়ে বায়ে!

বাস্তবের ওই কঠিন পাতে

চোখের স্বপন কী ধারাতে

অঙ্কিত হয় বুকে নাহি

মনের দিকে চেয়ে—

চন্দ্রারা কল্পনাতেই

হৃদয় আছে ছেয়ে!

ওগো প্রিয়া ওগো লখী

পালিয়ে বেড়াও দূরে থাকি

পাইনে পরশ আরেক দেখা

আবেশ জানাজানি—

আবেশ তোমার স্পর্শ রাশি!

আবেশ চক্ষু জানি!

সমুখেতে হঠাৎ এসে

পালিয়ে যাও মিষ্টি হেসে

লকল তাতেই পরশ রেখে

হরব ভরে যাও—

অলক হোলে হাওয়া তরে

আবেশে গান গাও!

তব-করুণাত গোলাপগুলি

বায়ু ভরে বেনী খুলি

ঝরে যে ফুল লইগো তুলি

বৃক্ষিত প্রায়—

তেশ গন্ধ স্নায়ু মাঝে

স্বপ্ন একে বায়!

বকুল ঝরে গাছের তলে

বাঁধের জল চল চল—

প্রতীকিতে

রজনী



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

শরৎচন্দ্র ও নারী

শ্রীযতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙলায়—যাহা তুমি করিয়াছ দান,
পৃথিবীতে—নাহি কিছু তাহার সমান।
কুশীরার টলটল, গর্কী যেমন যা ঘেরে
—জাগিয়েছেন জাতিকে, চেতনা এনেছেন
লক্ষ্যকারী লক্ষ্যধারের অন্তরে; প্রেরণা
দিয়েছেন প্রতিষ্ঠার। শরৎচন্দ্রের তেমনি
দেখিয়েছেন আমাদের বাঙলার সত্যিকারের
সমস্তকে, লক্ষ্যের দৃষ্টান্তের পঙ্কিলতাকে;
নারীর প্রতি অমামূলিক অবিচারের
দৃষ্টকে।

শুণ সমস্তার চিত্র একে কিহা তার
প্রতি দরদ দেখিয়ে তিনি চুপ ক'রে ব'লে
থাকেন নি; লংগ্রাম ক'রেছেন অক্লান্ত
ভাবে। এজন্ত তাকে কত কটুক্তি, কত
গল্পনাই না ক'রতে হ'য়েছে লক্ষ।

তখনকার আবহাওয়া আর আজকের
অবস্থা এক নয়; 'চরিত্রহীন' প্রকাশ ক'রতে
কত বেগই না তাকে পেতে হয়েছে।
সর্গীর সুরেশ সমাজপতি ছিলেন সে দিনের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমাজদার। শ্রীযুত উপেন্দ্র
নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে চরিত্রহীনের
পাণ্ডুলিপি পড়ে বুঝলেন পৃথিবীতে দ্বিতীয়
মুঠ হামমুনের উদ্ভব সূনিশ্চিত। তিনি
নাগ্রহে উপেন'বাবুকে অনুরোধ জানালেন:
শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ চাই; যে ক'রেই হোক
তাকে নিয়ে আলোচনা হবে আমার কাছে।
কিন্তু লোভনীর রচনা হ'লেও তাঁর 'সাহিত্য'
প্রকাশ ক'রবার মত সাহস লংগ্রাম ক'রতে
পারেন নি।

এর আগেই 'ভারতী'তে প্রকাশিত
হ'য়েছিল শরৎবাবুর 'বড় দ্বিধা'। যে
রচনাকে অনেকেই মনে একে নিয়েছিলেন
রবীন্দ্রনাথের ব'লে, এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে

শীলার এবং গোটে'র কথা। অবশ্য গতির
দিক দিয়ে শীলার ও শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ
বিভিন্ন। শরৎচন্দ্র চাইতেন নিজেকে লুকিয়ে
রাখতে; ছিলনা কোন প্রকার লোভ।
শীলারের অভিপ্রায় অন্য প্রকার।

গোটে ডখন জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক
তাঁর উচ্চতার নিচে লবাই অন্ধকার; যেমন
এখন বাঙলার কবিগুলোর অবস্থা, শীলারের
আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচুর; তিনি গোটে'র
নামে লিখলেন এক গ্রন্থ। লবাই লুকে
নিল তাকে। গোটে ব'ললেন: 'এ বই
আমার লেখা নয়; যার ভাষার রেখার
এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে তিনি
সামান্য নন। এই দিনই হ'য়েছিল শীলারের
প্রতিষ্ঠা।'

বড় দ্বিধা ভারতীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত
হ'য়েছিল। প্রথম লংখায় কারো নাম না
থাকার, প্রত্যেকের ধারণায় এরূপ একটা
কল্পনা আসে,—রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত কে এমন
স্বচ্ছন্দ গল্প লিখতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ
ছিলেন তখন বঙ্গদর্শন সম্পাদক; পরিচালক
শ্রীযুত শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথকে
অনুরোধ ক'রলেন: 'এ আপনার বড় অন্তর,
নিজের কাগজে রচনা না ছাপিয়ে অপর
স্থানে প্রকাশ করা।' রবীন্দ্রনাথ 'প্রথমে
বুঝতে পারলেন না, পরে বুঝলেন, জানলেন,
ভারতীর বড় দ্বিধির কথা হ'চ্ছে; তখন
উত্তর দেন: 'ওই গল্পটা আমার লেখা নয়;
আমি প'ড়ে দেখেছি, শক্তিশালী রচনা।
খুব লোভ হয়, কিন্তু ও এখন আমার করনা
প্রস্তুত নয় এবং ভাষার রূপ পারিনি, তাতে
কি করে বলি উহা আমার?'

'ভারতবর্ষ' তখন শিশু। 'জি-ডি-
চ্যাটার্জী' এও লালের পক্ষ হ'তে শরৎ

বাবুর কাছে প্রায়ই তাগিদ যেতো লেখার
অন্ত; প্রথমে বিষয় চরিত্রহীনের বেলায়
তারাও বুকে বল পাননি তখন। পরে
উহা বহুবার ক্রমে প্রকাশিত হ'য়েছিল।

এ থেকে লক্ষ্যেই অনুমান করা চলে
কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে
শরৎচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে হ'য়েছিল।
এর পরে এলো সমালোচনা এবং মেহের
স্বাপটা; কুলদার' ব'লেতেও তাকে কেউ
কেউ কার্পণ্য করেন নি। আমার স্পষ্ট
মনে আছে ১৯২৮ সালে শরৎ বাবুর এক
মেট বই ক্রয় করায় আমার একজন বন্ধুর
পিতা তার ছেলেকে ব'লেছিলেন:
হতভাগা শরৎচন্দ্রের মত কুলদারের বই
পড়ে তার সাথে তুমি মিশতে পারবে না।'
শরৎ বাবুর প্রতি রক্ষণশীলদের মনোভাব
এ সব ব্যাপার হ'তেই অনুমান করা
চলে!

শরৎচন্দ্রের উপস্থান লক্ষ্যেতে রূপ পেয়েছে
বাঙলার নারীর সত্যিকারের অবস্থা, তাদের
গতি এবং অভাব অভিযোগ। বিন্দুর ছেলে,
রামের সুরমী এবং নিষ্কৃতিতে নারীর
বাৎসল্যভার চরম অভিযুক্তি প্রকাশ
পেয়েছে, চরিত্রহীনের কিরণমণীর চরিত্রে
লক্ষ্য পাই আমরা নারী কেন পরপুরুষের
সাথে বন্ধুত্ব করে এবং এজন্ত দ্বাণী কে।
গৃহদাহ দেখিয়েছে পদস্থালনের কারণ;
দেবদাস এবং বড়দ্বিধা প্রেমের অমর চিত্র;
শেষ প্রান্তের কমল দীপ্ত উন্নত মস্তকে চার
অবিচারের প্রতিকার।

শরৎচন্দ্র 'Art for Art sake' বাণী
ছিলেন না, তিনি চেয়েছেন ক্রম সাহিত্যিক-
দের মত দেশের এবং জাতির লক্ষ্য।

‘স্বদেশ ও সাহিত্য’ নামক তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে
‘স্পষ্ট ভাবের তিনি স্বীকার করেছেন;
‘আমি আটের জন্ম আট—বাঁধীঘের ধলে
নই; ততদিন না আমাঘের সাহিত্য
রুশীয়ার ধারায় চলে ততদিন উন্নতির
আশা নিষ্ফল।’



‘নারীর মূল্য’ অধ্যয়ন করলে দেখা যায়
নির্যাচিতা এবং চির বঞ্চিতা নারী জাতির
প্রতি তাঁর দরদ কত ছিল। উপস্থাপকে
কল্পনার ফুল ব’লে সমাজ উড়িয়ে দিতে
পারে, কিন্তু নারীর মূল্যের ঐতিহাসিক
মত বিক্রমে স্বীকার করা যায়; নতি-
কারের এ চিত্রকে তো মিথ্যা বলা চলে না।
প্রায় ঐতিহাসিক যুগ হ’তে এ পর্যন্ত নারী
হ’য়ে এলেছে কেবলই উপেক্ষিত; তার
কোন সম্মান নেই, অধিকার নেই—মুখের
সামগ্রী মাত্র। সে যেন মানুষ নয়; তার
যেন আত্মা নেই, বাসনা থাকা অস্তর;
ভোগ তার পক্ষে পাপ। পুরুষের আশ্রয়ে তাকে
দিন কাটাতে হবে; পুরুষ বর্জক যেকোন
প্রকার নির্যাতন নীরবে সহ্য ক’রে চ’লতে
হবে; প্রতিবাদ চলবে না। শতাব্দী
চেয়েছেন এর প্রতিকার।

সোপেনহারের পৈশাচিক শাসন নীতি
শতাব্দী বরষান্ত করতে পারেন নি; জন
ষ্ট্রাট মিলের মত মানবতার দিক দিয়ে
বিচার ক’রে তিনি চেয়েছেন নারীর জন্ম
পুরুষের সমান অধিকার। পুরুষ য’ ক’রে
পারবে নারীরও সে অধিকার থাকবে; তার
জন্ম নাক সেটকানো চ’লবে না। ‘স্বদেশ
ও সাহিত্যে তাই অনেক ব্যাখ্যা ব’লেছেন:
‘নারীর ঘোষ-শুণ বিচার করবার আগে
আমাঘের দেখা উচিত তাকে আমরা কি
দিয়েছি।’ যে নতিকারের অধিকারী
হ’য়ে রিস্ত, তার বিচার করা নিতান্ত
অসঙ্গত। আগে দিয়ে দেখ, তারপর বিচার
কর সে সম্ভব না উশ্বল।

শ্রীমঙ্গিনাথ

কাঁথিতে বঙ্কিম শতবার্ষিকী

জন্মশতবর্ষ

বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্ঘাতা আশি বঙ্কিম
চন্দ্রের শত বার্ষিকী জন্মশতবর্ষ কাঁথিতে
মহাপ্রসঙ্গেরে অনুষ্ঠিত হ’য়েছে। নব
ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে কাঁথির
একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট আছে। তাই
ভারতের জাতীয় জীবন যাত্রার বিশিষ্ট
পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী জন্মশতবর্ষ
কাঁথিতেই সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হোল—বঙ্গীয়
সাহিত্য সন্মেলনের বিগত বৎসরের সভাপতি
মনিষী হীরেন্দ্রনাথ বোম্ভাটকে প্রধান
অতিথি নিৰ্দ্ধাৰিত করে কাঁথিবাগে
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে এই
সুপরিষদ যজ্ঞ সমাধা করেছেন। কাঁথির
এই বট দিন ব্যাপী মঙ্গল—উৎসবের সংক্ষিপ্ত
বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হোল।—

নারীর প্রতি শতাব্দীর মত এমন
অকুপণ উদারতা, মতের জন্ম কঠোর সংগ্রাম
পৃথিবীতে খুব কম ব্যক্তিই ক’রেছেন।
বাঙলার রাধামোহন, কেশব চন্দ্র, বিভাগার,
বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নারী জাতির
উপর বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন, কিন্তু
শতাব্দীর মত একান্ত পূজারী কিনা তা
অপ্রকাশ্য। তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে
বাঙলার যে সংস্কার সাধন ক’রেছেন, সে
অকল্পিত। একমাত্র রূপ সাহিত্য ব্যতীত
শতাব্দী সাহিত্যের মাঝে কোন সাহিত্যের
তুলনা আনা চলে না; এ এক অভিনব।

বিগত ২০শে জামুয়ারী প্রভাতে কাঁথিতে
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত
হয়। এই সভায় সভাপতি হয়েছিলেন
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ বসু বেদান্তরত্ন।

ঐ দিন অপরাহ্নে নব নির্মিত বঙ্কিম
ভারতের দ্বার হীরেন্দ্রনাথ বর্জক উদ্বাটিত
হয়। এতদুপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত কৃষি ও শিল্প
মেলায় ঐ সময়ে উদ্বোধন হয়। পরে
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাঁথির
প্রতিভাশীল ঐতিহাসিক ‘মেদিনীপুরের
ইতিহাস’ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থলেখক শ্রীযুক্ত
যোগেশ চন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ তাঁহার
সুচিন্তিত অভিভাষণটি পাঠ করেন। তারপর
মূল সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সহিত
মেদিনীপুরের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সন্মত,
বক্তৃতা প্রদান করেন।

২১শে জামুয়ারী অপরাহ্নে ডাক্তার
কালীদাস নাগ এম, এ, ডি, লিট, ‘বঙ্কিমচন্দ্র’
সম্বন্ধে কাঁথিবাগীকে অনেক কুতন কথা
শোনান। এবং তৎপরে হীরেন্দ্রনাথ
‘দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র’ নামে একটি অতি
মূল্যবান সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সভার দশ
হাজারের বেশী লোক হওয়ার পাউড,
স্পীকারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

২২শে জামুয়ারী প্রভাতে কাঁথি হইতে
দাদুল মাইল দূরবর্তী দারিদ্রপুর গ্রাম
পর্যন্ত (এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা
পরিচালিত হ’য়েছিল) একটি বিরাট শোভা-
যাত্রার বন্দোবস্ত করা হয়। বহুসংখ্যক
সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

ত্রিদিন শোভাযাত্রার অগ্রণী হ'য়ে দারিদ্র্যপুরে
গমন ক'রে দেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি
বেদীমূলে লমবেত কাঁথিবাসীর ভক্তি অর্থা
নিবেদন করেন।—

ত্রিদিন অপরাহ্নে কাঁথিতে ললিত
প্রতিযোগিতা হয়।

পরদিন ২৩শে জামুয়ারী কাঁথির বিবিধ
ধানার বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজা প্রচুর
আড়ম্বরের সহিত সুলক্ষ্য হয়। এরা
ধানার (এখানে রাসকার্য উপলক্ষে
বঙ্কিমচন্দ্র অনেক দিন ছিলেন—তখন এর
নাশ ছিল নেগুয়া) বঙ্কিম পূজা অতি প্রকার
সহিত লক্ষ্য হ'য়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদের বিশিষ্ট প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আনন্দ
লাল মুখোপাধ্যায় এই সভায় পৌরহিত্য
করেছিলেন। আমাদের ইণ্ডিয়ান ব্রীজ
এসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতি সুব্রত
শ্রীযুক্ত নতীশ চন্দ্র বসু এতদুপলক্ষে
এখানে একটি বক্তৃতা করেছিলেন।
অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার অনিবার্য
কারণে এই সভায় উপস্থিত হ'তে না পেরে
দুঃখ প্রকাশ ক'রে পত্র লিখেছিলেন।

২৪শে জামুয়ারী পূর্বাঙ্কে বঙ্কিম নগরে
কাঁথি মহকুমার দশটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের
ছাত্রগণের মধ্যে একটি তর্ক প্রতিযোগিতা
(Debating) ও পাঠ প্রতিযোগিতা
(Reading) হয়। অপরাহ্নে হয় শিশু
প্রদর্শনী (Baby Show)।

২৫শে জামুয়ারী অপরাহ্নে ক্রীড়া
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সকল
প্রকার প্রতিযোগিতার বিজয়ীগণকে ও শিল্পী
কৃষিক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট জব্য নির্যাতাগণকে
পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্থানীয়
মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়ের সহধর্মিণী
শ্রীযুক্তা অমিয়া রাও সকলকে পুরস্কার
প্রদান করেন। একটি শীত, ২টা কাপ,
৪০টা বেডেল এবং অনাবিধ স্মারক ক্রীড়া-
জব্য এই উপলক্ষে পুরস্কার প্রদত্ত হয়েছিল।—



মাষ্টার সাহেব—ইহা একখানি
উপস্থাপন—শ্রীকণ্ঠভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত,
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত
ও গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

মাষ্টার সাহেব বাঙ্গালী। পশ্চিমবঙ্গের
কোন এক গ্রাম্যস্থলে ছেড মাষ্টারী করিতে
আসেন। স্ত্রী আবুনিকা। মেম সাহেব
বলিয়া না ডাকিলে তিনি চটিয়া যান।
কত্না মিনতি অবিবাহিত। তাহার
বিবাহের ভবিতব্যকে কেন্দ্র করিয়াই এই
উপস্থাপন। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী পানিপার্থী।
একজন সব ডেপুটি, অপর জন উক্তগ্রামের
প্রতিপত্তিশালী যুবক জমিদার। কত্নার
মাতা জমিদারের পক্ষপাতী, পিতা
ডেপুটির। পাত্রী মুখ ফুটিয়া কিছু বলে
না। তবে হাবভাবে বোঝা যায় যে,
সে ডেপুটিরই অনুচরিনী। ডেপুটি কত্নার
মাতাকে স্পষ্ট করিয়া একথা জাহায়েত
আসিয়া অপমানিত হইয়া ফিরে। পরে

এক ভিখারীর মুখে জমিদারের গুণগণা
কীর্ণিত হয়। চরিত্রহীন মাতাল
জমিদারের সহিত কত্নার বিবাহ দিতে
পারেন না—একথা মাষ্টার সাহেব
গৃহিণীকে শেষবার জানাইয়া দেন। ইহা
জমিদারেরও কর্ণগোচর হয়। গহিতকর্ম্মা
জমিদার চল-কৌশলে মাষ্টার সাহেবকে
জেলে ধের ও তাঁহার বাড়ীতে আগুন
ধিয়া মিনতিকে পোড়াইয়া মারে। ইহাই
হইল গল্পের মোটামুটি বর্ণিত ঘটনা।
ছোট হইলেও ভিখারীর কারুণ্যের
প্রতীকটি ভালো ফুটিয়াছে। আদর্শ
হইতে হইলে মানুষের কি কি গুণ
থাকা উচিত—গ্রন্থকার গল্পের ভিতর
দিয়া তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। আবুনিক
চরিত্র স্পষ্ট হইলেও ভাষা ও তাহার প্রকাশ
ভঙ্গী আবুনিক হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাই
গ্রন্থকারের প্রথম প্রচেষ্টা। ছাপা ও বাঁধাই
উত্তম। ১৬০ পৃষ্ঠার বই—মূল্য বেড়টাকা।

কাঁথির জনপ্রিয় ম্যাজিস্ট্রেট মি: বি,
জি, রাও আই, সি, এস এবং তাঁহার বিজয়ী
সহধর্মিণী মহোদয়ার চেষ্টায় ও যত্নে এবং
কাঁথির অক্লান্তকর্ম্মা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত
মোগেশ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী
মুখোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন জর্জপদ বন্দোপাধ্যায়
প্রভৃতির প্রাণপাত পরিশ্রমে এই উৎসব
সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের
স্মৃতিপূজার জন্ত এরা যে ভাবে ভক্তিপূর্ণ
জবরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা প্রশংসনীয়।



ছন্নছাড়া

শ্রীমুখাংশু কুমার মুখোপাধ্যায়



সেদিন দুপুর বেলা—একটা বই শেষ ক'রে, লক্ষ্মী আর কিছু করবার কাজ হাতে না পেয়ে, গান ধরে অর্গ্যানের সঙ্গে,—“তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছারে—” মাঝ পথে সে বাঁধা পেলে, সেই ঘরে অজয় শেনের আকস্মিক আবির্ভাব। অর্গ্যানের চাবিগুলো এলোমেলো ভাবে টিপে, লক্ষ্মী অজয়ের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে বলে, ‘এ সময় হঠাৎ কি মনে ক’রে? অজয়বাবু?’ অজয় একটি লোকের একধারে বলে পড়ে, আনন্দনা ভাবে বলে, ‘এক বিদেশ, তার ওপর হাতে কোন কাজ নেই ঘরের কোণে একা চুপচাপ বসে থেকে কি করবো বলুন? তাই—’ বাহিরে থেকে এক বলক শীতের কন্কনে ঠাণ্ডা হাওয়া জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। লক্ষ্মী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ‘উঃ—কি ঠাণ্ডা হাওয়া হচ্ছে আজ—দানীটা বন্ধ করে দি, কি বলেন?’ “হিন্—আপনারেও ঠাণ্ডা লাগে? দার্জিলিং এর বাগিন্দা হয়েও? আমারেও ঠাণ্ডা লাগাটা স্বাভাবিক, আমরা আসি বৎসরে একবার, অস্ত্র দেশের গরমটাকে কীকি হেবার জ্ঞান।” লক্ষ্মী দানীটা বন্ধ করে ফিরে এসে হেসে বলে, যখন শীত কম থাকে, সেই সময়েই আমরা ঠাণ্ডাটা একটু অনুভব করি।” অজয় হাললে, “সেইটাই হওয়া সম্ভব,—দেখুন না, আপনার কাছে যা কম, সেই শীতে আমার পরতে হয়েছে ওয়েস্ট কোট, কোট,—অথচ আপনি দ্বিবি প’রে আছেন, শিকের ব্লাউজ আর নীলাবরি। বেশী ঠাণ্ডা পড়লে, তখন আপনার এ

পোষাক আর চলনা নিশ্চয়?—তখন যা পরেন, তাতে একটুও ঠাণ্ডা গারে লাগতে পার না আর কি—তাই খুব শীতে আপনাদের শীত করে না, অথচ অল্প ঠাণ্ডা অনুভব করেন।” লক্ষ্মী অর্গ্যানের সামনে টুলটার ওপর বসলো, “তা ঠিক বলেছেন—” তার কথার বাধা দিয়ে অজয় বলে, “যাক্—যে গানটা গাইছিলেন, গান তু’ শুনি পুরানো, তা হলেও আপনার গলায় গানটা যেন নতুন লাগছিল।” অজয়ের অনুবোধে লক্ষ্মী আবার গান ধলে। গান শেষ হওয়ার সঙ্গেই হঠাৎ অজয় বলে উঠলো, “দেখুন,—প্রথম দিন থেকেই যেদিন আপনাদের সঙ্গে আলাপ হ’ল,—আমার আপনাকে মনে হচ্ছে, যেন কত কালের চেনা, কতবার আপনাকে দেখেছি। আচ্ছা, আপনারা দার্জিলিংএ আসবার আগে কোথায় ছিলেন বলুন ত’? আশোকবাসুর সঙ্গে আপনার ইয়ে—মানে আপনি মিলেস্ চ্যাটার্জি হয়েছেন কতদিন?” অজয়ের কথার বলার ভঙ্গিমায় লক্ষ্মী অস্তবিকে মুখ ফিরিয়ে হাললো মাত্র। কিছু বলে না। অজয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো এই কথাগুলো বলে বিনীতভাবে সে লক্ষ্মীকে বলে, “রাগ করেন দ্বাক্ষি? দয়া করে কিছু মনে করবেন না,—আমি একটু গরল ভাবে কথা বোলতে ভাল বাসি, কেন না হুনিয়ার আমার আপনার কেউ নেই—যার সঙ্গে মিশি, তাকেই আপনার ভাবি, অতি সহজ, সরলভাবে তার সঙ্গে কথা বলি।” একটু থেমে অজয় আবার বলে, “আমার জীবনের ইতিহাস,—আচ্ছা,

আপনাকে বলব, তাহ’লে আর কোনদিন আমার ওপর আপনি রাগ কর্তে পারবেন না। লক্ষ্মী ভাবলে, মক কি, বলে বলে কতকগুলো আজো বাজে কথা বলা বা শোনার চেয়ে, একজনের জীবন ইতিহাস শোনা ঢের ভাল। লক্ষ্মী একটি লোকের গিয়ে বসলো, ‘না আদিত’ রাগ করিনি—বলুন আপনার জীবনের ইতিহাস আমি শুনি।” অপুরে পাহাড়ের গায়ে জড়ানো, মেঘের স্তরের দিকে চেয়ে, অজয় বলতে-শুরু কলে—“আজ আঠারো বৎসর আগে একটি মেয়েকে আমি ভাল বেলেছিলুম, সেও আমাকে ভালবাসত—প্রাপ্ত হয়ে। সে ছিল খ্রীষ্টান, তবে বাঙালী আর আমি হিন্দু। আমার বাবা, তিনি ছিলেন গৌড়া হিন্দু। আমার আর কবির এই মেলামেশার কথা কোন এক কুকণে বাবার কানে ওঠে, তিনি বছর আশার নিবেদন করেছিলেন, কবির সঙ্গে মিশতে, আমি তাঁর কথা অনুযায়ী চলতে পারলুম না, তার ফলে—চার বৎসরের একটি ছোট কুটকুটে বোন তাকে আমি খুব ভালবাসতুম, সেই বোন, আর আর তাই বোন ও বাপ, যা ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াতে হ’ল একা—বাবারই শুকুমে। এত তিনি যোগে ছিলেন আমার ওপর যে, সেদিন তিনি আমার একথাও বলেছিলেন, আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও—এ বাড়ীর কেউ নও, কোন দিন যেন তোমার মুখ না দেখতে পাই—তোমার কোন চিহ্ন এখানে না থাকে। ভবিষ্যতে কারো কাছে আমার পরিচয় দিও না, তাতে আমার মাথা নীচু হবে। বাবায় সেই কথাগুলো, আজও আমি অক্ষরে অক্ষরে মনে চলেছি,—বড় ব্যথায় বড় অভিমানে। যাক্—কবি যখন শুনেলো আমার এই অবস্থার কথা,—আমার স্থান দিলে তাদের বাড়ীতে, অবশ্য তার বাপ’মার মতে। পরে, তাদের ঐ চেষ্টায় মাল খানেকের মধ্যে আমি একটি চাকুরী পেলাম—রেজুনে। যখন আমি আর

রুবি রেজুন যাত্রা করলুম তখন আমরা বিবাহিত। আত্মীয় স্বজন, লম্বাজ, বন্ধু বান্ধব সব ছেড়ে সেই সুদূর রেজুনে—মনে কর্চেন আমার খুব কষ্ট হত ঘোটেই নয়,—সবার মন নিয়ে আমার ভালবাসিত রুবি, খুব শান্তিতে ছিলুম, শুধু মাঝে মাঝে কষ্ট পেতুম, মার কথা মনে করে, আর সেই ছোট বোনটির কথা, যখন নিজেই বসে কিছু ভাবতুম, মনে হ'ত তার কচি হাত ছাণা, আমার মথার কোঁড়া চুলগুলোকে লোজা করবার নিফল চেষ্টা পাচ্ছে, আমি চমকে পিছন ফিরে চাইতুম। রুবি আমাকে চুপচাপ বলে থাকতে দেখলেই বুঝতো, আমি ভাবছি আমার বড়ীর কথা; সে আমার মাথাটা তার বুকের ওপর চেপে ধরে বলতো, 'সত্যি আমার জন্তে সব ছেড়ে এলে তুমি খুব কষ্ট পাও না ডালি? আমি তাকে হুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতুম, 'না সুইট! এ অশান্তির জগতে তুমি আমার একমাত্র শান্তি। কয়েক বৎসরের মধ্যে, আমি আমার বাড়ীর কথা প্রায় ভুলে গেলুম। সেই সময়টুকু ছিল আমার জীবনের প্রথম শান্তি। কিন্তু এ শান্তিটুকু লম্বা হ'ল না বিধাতার, একদিন রুবিও বিদায় নিলে, আমার কাছ থেকে, হুনিয়ার কাছথেকে। আমার জীবনের একমাত্র শান্তি একটি অবলম্বন, তাকেও হারালুম। তারপর একটি বৎসর যে কি ভাবে কেটে গেছে, তা' আমি জানিনা। লক্ষ্যার মুহূর্ত হাওয়ার, পাতার মর্মেতে শুনে পেতুম রুবির কথা, সেই মুহূর্তের ডাক, আর রাতের বাতালে জেগে উঠতো কার দীর্ঘশ্বাস, হয়তো আমার বাবার। আমার মায়ের। একদিন মনে হ'ল ফিরে বাই আমার ঘরে। আমার বাবা, মায়ের কোলে। আজ ত' রুবি নেই, স্বর্গের দেবী সে, আমার সব কিছু পাপ সেত মুক্ত করে দিয়ে, মুক্তি নিয়েছে। শেষে সত্যি ফিরে এলুম, আমার বাবার হরজার—কিছু যে আশা নিয়ে এলোছিলুম, তা বিফল হ'ল, শুনলুম

তারা এ বাড়ী ছেড়ে চলেগেছেন অল্প বেশ। আমার ছোটবেলা থেকে একটা বদ্ অভ্যাস যে, কাজের প্রথম দফায় আমি নিফল হব, আর সে কাজে অগ্রগর হই না,—সুতরাং বাপ মার সঙ্গে আর দেখা করা হোল না। জানিনা কিলের খেলালে আমি আবার আমার নাম বদলালুম এই নিয়ে তিনবার, প্রথমে বাপ-মার দেওয়া নাম বহলিয়েছিলুম; খ্রীষ্টান হয়ে, আমি খ্রীষ্টান—নাম ছিল লব্ধ মুখার্জি, এবারে শুধু নাম নয় উপাধিও—আমার নাম নিলুম, অজয় সেন। জীবনের গতি হ'ল চরম। আজ এখানে, কাল সেখানে,—কোথাও এতটুকু শান্তি নেই মিলেস্ চ্যাটার্জি। আজ আমার কেউ নেই, এতবড় হুনিয়ার আমি একা। জানিনা আমার এ চরম জীবনের শেষ কোথায়? 'বুক উজাব করে' অজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তার চোখের কোমে দু ফোটা জল আলোর চিক্ চিক্ করে উঠলো। সে চেয়ে দৈল দূর শূন্যে। তখন লক্ষ্মী অজয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল, সে ভাবছিল তার দ্বারার কথা। যাকে সে তার জ্ঞানে কোন-দিন দেখেনি,—শোনা কথা। সেও কি একটা কারণে, বাপ-মায়ের সঙ্গে যগরা করে চলে যার। আর ফিরে আসেনি, তবে সে শুনেছে তার সেই দ্বারা বেঁচে আছে। মায়ের জীবনের ঘটনা অনেক সময় এক হয়ে যায়। এতে কি আছে বিচিত্রতা কি আছে ভাবার, তবু লক্ষ্মী ভাবতে লাগলো। তার না-দেখা দ্বারার কথা; সেও নাকি ভারী ভালবাসিত তাকে,—সে যেন আজ কত কালের কথা। লক্ষ্মীর চিন্তাশ্রোতে বাধা দিয়ে অজয় উঠে দাঁড়ালো, না : আমার ফিরতেই হবে মিলস্ চ্যাটার্জি, যেমন করে হোক।" লক্ষ্মী সবিস্ময়ে বলে, "কোথায়?" "আমার বাপ-মার কাছে, আমার ভাই বোনের কাছে,—আর আমি পারি না।" অজয় আবার বলে পড়লো লোকের ওপর—বুকটার

কি যন্ত্রণা, অথচ এতটুকু স্বাস্থ্যনা দেবার আমার কেউ নেই। কোথায়ই বা বাব? আমার বাপ-মা তাঁরা আছেন কি নেই। তাই বা কে জানে? ওঃ—দবাই আমার একলঙ্গে ফাঁকি দিয়েছে মিলেস্ চ্যাটার্জি! আমি আর ভাবতে পারি না—আমি আজই চলে যাব হার্জিলিং ছেড়ে। জারগা বহল না কলে' আমার চিন্তার ধারা বহলার না, শেষে কি পাগল হয়ে যাব, তাই আমি ঘুরে বেড়াই দেশ বিদেশে চরম ছাড়ার মত। তবু আজ একবার বাবার খোঁজ নেব,—তাঁরা কোথায় আছেন? কেমন আছেন? তাঁর কথাগুলো আজও মনে চলেছি। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আজও কেউ আমার দেখা পারনি, দেখা দেবেও না, পরিচয়ত দূরের কথা। তবু আজ একবার বাবার খোঁজ নেব, অজয় উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীকে নমস্কার জানালে, চলি, মিলেস্ চ্যাটার্জি, নমস্কার। লক্ষ্মী তখন একমনে কি ভাবছিল,—সে অজয়কে প্রতি-নমস্কার দিতে পালেনা, তার যখন খেলা হ'ল, অজয় তখন ঘরে নেই। লক্ষ্যাবেলা,—লক্ষ্মীর স্বামী অশোক ফিরে এসে দেখে, সে শুয়ে পড়ে আছে লোকের ওপর মুখটা স্তূজে, অশোক তাবলে নভেল পড়ে তার ভাবের ঝোঁকটা এখনও বুঝি লক্ষ্মী সামলাতে পারে নি—পাশে বইখানা পড়ে আছে। অশোক হেসে জিজ্ঞাসা কলে; "কি হ'ল? শুয়ে পড়ে যে? লক্ষ্মী উঠে বললো, "না" কিছু না, এমনই।" অশোক কোটটা খুলতে খুলতে বলে, "টেশনে, অজয়বাবু সঙ্গে এইমাত্র দেখা হ'ল, তাঁর পিছনে মালপত্রের লম্বা একটা কুলী, তিনি আজ হার্জিলিং ছেড়ে

হাকিম এম.এস. জামানের
কসুরীগিল
খাদ্যদৌর্যব্য ও শক্তিশীনতা চিরন্তন
আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ টাকার
৪২ নং ধর্মভালা স্ট্রীট কলিকাতা

চলেন। লোকটি ভয়ানক খেয়ালী একটুও
 • মতিস্থির নেই।” কোটটা বখাস্থানে রেখে,
 অশোক ফিরে এলে, একটা চেয়ারে
 বসলো,—“অজয়বাবু হঠাৎ তোমার বাবার
 খোঁজ করেন,—নাম জানলেন কি ক’লে
 • কে জানে? লোকটার কিছু ত’ বোঝাবার
 • যো নেই—”লক্ষী চমকে উঠলো,—“আমার
 বাবার কথা! কি?—কি জিজ্ঞাসা
 করলেন?” অশোক একটা লিগারেট
 ধরিয়ে বসে, “আমার বলেন,—‘আপনি ত’
 এখানকার ‘পোষ্ট-মাস্টার’ বলতে পারেন,
 মি: অচিন্ত্য মুখার্জি এখন কোথায় আছেন?
 তিনি ছিলেন জবলপুরে ‘পোষ্টাল-সুপারিন্-
 টেণ্ডেন্ট’—অবশ্য বহুদিন আগে? আমি
 বললুম, কেন বলুন ত’? অজ্ঞ কেউ হলে
 হয়ত’ টপ করে বলতে পারত না, তাকে
 আমি বলতে পারি’—তখন আমার হাত
 দুখানা চেপে ধরে অজয়বাবু বলেন, বলুন
 • না বরা করে আমি আপনার কাছে চিরদিন
 কৃতজ্ঞ থাকব, তাঁর সঙ্গে বৃষ্টি আপনার
 আলাপ আছে? জানেন তিনি কেমন
 • আছেন? আমি বলুম, ‘তিনি আমার
 খুঁতর,—বেশ সুস্থ আছেন এখন তাঁর
 ঠিকানা—আমার কথায় বাধা দিবে
 অজয়বাবু বললেন, ‘তিনি আপনার কে?’
 আমি বলুম, ‘আমার খুঁতর।’ লোকটা
 পাগল না কি জানি না—এই কথা শুনে
 আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।
 সেই সময় একটা ট্রেন লবে ইশন ছাড়ছে,
 তিনি তাড়াতাড়ি সেইদিকে ‘প্রায় ছুটে
 চলেন, আমাকে আর কোন কথা না
 বোলে—আর তাঁর পিছনে ছুটেছে কুলীটা
 ট্রেন ছেড়ে দিলে আর তাঁকে ধরতে
 পেলুম না।’ লক্ষী হঠাৎ লোকটির লুটিয়ে
 পড়ে কুপিয়ে কাঁধে লাগলো, বৃষ্টি তার
 দুখানা কেটে যাবে, এমনই ক্রলে উঠছে
 পৌজরগুলো,—অশোক তার পাশে বসে,
 তার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করে,

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দুই একটি কথা

শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ যাহার
 নিকট হইতে যতটা সম্ভব পূর্ণরূপে কাণ্ড্য
 আহার করিবার উপায় লক্ষ্য উদ্ভাবন
 করিতেছে। কলে পরিত্যক্ত কাগজের টুকরা
 হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতি, দেবী পর্যন্ত
 কাহারও আজ মানুষের হাত হইতে নিকৃতি
 নাই। বিজ্ঞানের বলে, মানুষ সকল চেতন
 ও অচেতন পদার্থ এবং শক্তিকে সামান্য
 মাত্র অপচয়ের হাত হইতেও বাঁচাইয়া
 তাহার ব্যবহারের প্রয়োজনের বৃদ্ধি
 করিতেছে। গ্রন্থাগার গুলিও এই যুগধর্মের
 প্রভাব হইতে মুক্ত নহে।

গ্রন্থাগার সভ্যতার নিদর্শন এবং সভ্য
 জগতের এক অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য
 প্রতিষ্ঠান। ‘মানব সভ্যতার ইতিহাস
 আলোচনা করিলে দেখা যায় পৃথিবীর
 যেখানে যখন সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে
 সেখানে সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারেরও আবির্ভাব
 “কি হ’ল তোমার? একি!” অশোকের
 কথার ঊত্তর দেবার শক্তি তখন লক্ষীর
 ছিল না। তখনু তার কোমল বুকটাকে
 ক্ষত বিক্ষত করে, ছুটে চলেছে হৃদয়
 শব্দ সেই ট্রেনের ‘নির্মম চাকা, আর
 একটা কেবিনে বসে আছে, তার অপরিচিত
 অনাদৃত, হতভাগ্য লোকটির,—সেই হর-
 ছাড়া—পাহাড়ের আঁকা বাঁকা ভাঙা-চোরা
 পথের পানে শূন্য-দৃষ্টে চেয়ে তার জীবনের
 গতি মিলিয়ে নিচ্ছে।

হইয়াছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন যুগের অসংখ্য
 বৈশিষ্ট্যের জন্ত গ্রন্থাগারগুলির বাহ্যরূপ
 এবং পরিচালন ও ব্যবহারের প্রণালী ও
 প্রকৃতি সব সময়ে একরূপ হয় নাই।
 বর্তমানকালে নানা কারণে গ্রন্থাগারের
 ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা বহুক্ষেত্রে ও বহু
 প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ব্যবহার
 ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
 যাহাতে বহু অর্থ, শক্তি ও সময় ব্যয়ে
 গ্রন্থাগারের নিকট হইতে অধিক কাণ্ড্য
 আহার করা যায় সভ্যদেশগুলিতে তাহার
 জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা ও আন্দোলন হইতেছে।
 এবং ইহার ফলেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের
 স্রষ্টি হইয়াছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে একটা বিচিত্র
 বিষয় বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ
 নাই। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় বাণ্যতীর বিষয়ে
 সুচিন্তিত ও সুনিরূপিত নীতি ও কর্মপন্থার
 সংগ্রহের মধ্যেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অস্তিত্ব
 সুচিন্তিত নীতি ও প্রণালীর সাহায্যে গৃহীত
 ও স্বকভাবে পরিচালন দ্বারা গ্রন্থাগারগুলির
 কার্যকারিতার বিরূপে বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ
 সাধন করা বাইতে পারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
 অনুশীলনে তাহাই জানা যায়। গ্রন্থাগারের
 লক্ষ্যের হিলাবে একমাত্র বয়োদা রাজ্য
 ব্যতীত বাংলা দেশের স্থান ভারতবর্ষের
 অন্যান্য যে কোন অংশের অনেক উচ্চ
 বলিয়া ধরিয়া লওয়া বাইতে পারে। কিন্তু
 গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যথোচিত অনুশীলনের
 অভাবে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির

পরিচালন ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। কাজেই সংক্ষেপে হইলেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটি কথার অবতারণা করা একেবারে নিরর্থক হইবে না বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

পূর্বকালে পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল না এবং মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবনের প্রথম অবস্থায় পুস্তক মুদ্রণ খুব সহজ সাধ্য অথবা স্বল্প ব্যয় সাধ্য ব্যাপার ছিল না। কাজেই সে সময়ে পুস্তকের ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার পরিবর্তে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহ করিবার প্ররুতিই অধিকতর প্রবল ছিল। বর্তমানকালে এই ধারণা ও প্ররুতির পরিবর্তন হইয়াছে। আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল সূত্রই হইতেছে ব্যবহারের জ্ঞানই পুস্তকের অস্তিত্ব। ফলে এখন আর মাত্র পুস্তকের সংখ্যাধিক্যই গ্রন্থাগার জগতে গ্রন্থাগারের কৌলীজ ঘোষণা করে না, সংখ্যার সহিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রসারতা ও গভীরতা ও বিবেচনা করা আবশ্যক হয়। গ্রন্থাগার ব্যবহারের হ্রাস বৃদ্ধি গ্রন্থাগারিকের কার্য ক্ষমতার উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। লেজন্ড গ্রন্থাগার বিজ্ঞান গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা ও গ্রন্থাগারিক নির্বাচন বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে।

অনেকের ধারণা গ্রন্থাগারিকের কার্য খুবই সহজ এবং গ্রন্থাগারিক নির্বাচনের সহিত গ্রন্থাগারের কার্যের সঙ্গতি অথবা বিচ্ছিন্নতার বিষয় কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের মতে যে কোন ব্যক্তিকেই গ্রন্থাগারিকের কার্য চালাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে অপর এক শ্রেণীর লোকের ধারণা যে গ্রন্থাগারিকের পাণ্ডিত্যের বৃহদই গ্রন্থাগারিক নির্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি—যেন নিজের বিভীষিকাশীলন করাই গ্রন্থাগারিকের একমাত্র

ও প্রধান কার্য। বিদ্বান ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি গ্রন্থাগারিক হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু কার্য পরিচালন বিষয়ে বিশেষ দক্ষ হওয়া তাঁহার পক্ষে অপরিহার্যরূপে আবশ্যক। সুপণ্ডিত, চরিত্রবান, উদার মতাবলম্বী, জনসেবাভিলাষী, কার্যদক্ষ, কৌশলী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই আদর্শ গ্রন্থাগারিক হইবার উপযুক্ত পাত্র। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থার এরূপ আদর্শ গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা কার্যাত্যঃ। অধিকাংশ গ্রন্থাগারের পক্ষেই সাধাভীত ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞায়তন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার এবং অস্ত্রাভ্যুতর ও সঙ্গতিপন্ন গ্রন্থাগার-গুলির জ্ঞাত গ্রন্থাগারিক নির্বাচন কালে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করাই সঙ্গত। এতদ্ব্যতীত স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির স্ব স্ব সীমার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার-গুলির উন্নতিকল্পে এবং তাহাদের সাহায্যের জ্ঞাত উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিলে ঐ সকল গ্রন্থাগার বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারে।

গ্রন্থাগার গৃহের স্থান ও গৃহনির্মাণের পরিকল্পনার উপরেও গ্রন্থাগার ব্যবহারের হ্রাসবৃদ্ধি বহু পরিমাণে নির্ভর করে। স্থানীয় লোকের সুবিধা অনুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেখানে গমনাগমন করা সকলের পক্ষে সহজ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যেস্থানে সকলকেই কার্য গতিকে স্বাভাবিক করিতে হয় সেইরূপ সাধারণের গমনাগমনের সুজীবনা যুক্ত স্থলে—যেমন বাজার অথবা ডাকঘর ইত্যাদির সান্নিধ্যে—গ্রন্থাগার গৃহের জ্ঞাত স্থান নির্বাচন করা কর্তব্য। এইরূপ স্থলে স্থান নির্বাচন করিলেও স্থানটি যতদূর সম্ভব কোলাহল বর্জিত এবং সহজবুদ্ধিতে বোধগম্য অস্ত্রাভ্যু অনুবিধা হইতে যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগার গৃহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার

সময়ে উহা বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ লভ করাই সঙ্গত। ঘোড়ের উপর গ্রন্থাগার গৃহের ভিতরে ও বাহিরে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাভাবিক আলোবাতাল চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন মত বাহাতে গৃহের বা কক্ষাদির আরতন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে সে বিষয়েও লক্ষ রাখা দরকার এবং গৃহের বহির্ভাগের গঠন প্রণালী এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে সহজেই সকলের দৃষ্টি ইহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

গ্রন্থাগারের ব্যবহার সাহায্যে বৃদ্ধি পায় লেজন্ড লেটেই হইতে হইলে ক্রয়ের পূর্বে গ্রন্থাগারের জ্ঞাত যথেষ্ট ভাবে পুস্তক নির্বাচন না করিয়া এ বিষয়ে সূচিস্তি নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুস্তক নির্বাচন করা কর্তব্য। গ্রন্থাগারের কোন বিভাগের পুস্তক কি হিসাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে প্রথম হইতেই একটি পরিবর্তন স্থির করিয়া লওয়া আবশ্যক। পুস্তক নির্বাচনকালে পুস্তকের গুণাগুণ বিশ্লেষণ ব্যতীত গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে উহাদের চাহিদা এবং গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। সান্নিধ্যে অস্ত্রাভ্যু গ্রন্থাগার থাকিলে তজ্জন্ম পুস্তক নির্বাচন নীতির কিছু পরিবর্তন আবশ্যক কিনা তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে নির্বাচকের পক্ষপাত সূত্র হইয়া সকল বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে কোন স্তরের বা সম্প্রদায়ের লোকেরাই যেম পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে তাহাদের রুচি বা দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের বৃক্তিসঙ্গত কোন অভিযোগ করিবার অবকাশ না পায় সে বিষয়ে লক্ষ রাখা আবশ্যক। গ্রন্থাগারে সমাচার জ্ঞাপক (books of information),

প্রেরণামূলক (books of inspiration) এবং ক্লাস্তিদূরকারক (books for recreation) সকল প্রকার পুস্তকেই প্রয়োজন মত অল্প বিস্তর সংগ্রহ করা আবশ্যিক। দৈনিক এবং সপ্তাহিক পত্রিকাদিও গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ইতিহাস, কৃষি, শিল্প, বানিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কীয় পুস্তক ও পত্রিকাটির সংগ্রহ থাকাও বাঞ্ছনীয়।

পুস্তক সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগারে বিশৃঙ্খলভাবে অথবা স্তূপাকারে রাখিয়া দিলে মাত্র যে কার্যের অসুবিধা হয় তাহা নহে পুস্তকের ব্যবহারের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়। কোনও বিশেষ নিয়মে পুস্তকগুলি তাকে সাজাইয়া না রাখিলে প্রয়োজন মত তাহাদের ব্যবহার করিবার পক্ষে এবং গ্রন্থাগার পরিচালন কার্যে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রায় সকল গ্রন্থাগারেই কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি পুস্তক সাজাইবার ব্যবস্থা আছে। যে সকল পদ্ধতির পুস্তক সাজান হয় তাহার মধ্যে যে পদ্ধতির দ্বারা সম বিষয়ের পুস্তকগুলির স্থান পরস্পরের সান্নিধ্যে হয় সেই পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট। বিষয়বস্তুর ঐক্যদ্বারা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করাকেই গ্রন্থাগারিকের ভাষায় সাধারণতঃ পুস্তকের শ্রেণী করণ বলে। শ্রেণীকরণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। পুস্তকের বিষয়বস্তুর ঐক্যদ্বারা শ্রেণী বিভাগ করিবার মত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আমেরিকার ডক্টর মেলভিল ডিউই (Dr. Melvil Dewey) প্রবর্তিত 'দশমিক শ্রেণী বিভাগ' পদ্ধতিই অত্যন্ত জনপ্রিয়।

পুস্তকে বাহা লেখা থাকে তাহা কখন যাহুরের জ্ঞানের সীমার বাহিরের বস্তু হইতে পারেনা। লেখক পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ করিবার জন্য ডিউই পুস্তকের বিষয় বস্তুর সাহায্যের ভিত্তিতে সমস্ত জ্ঞান রাজ্যকে

প্রথমে নয়টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের চিহ্নরূপ ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যা করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন; যথা (১) দর্শন শাস্ত্র, (২) ধর্মশাস্ত্র, (৩) সমাজ-তত্ত্ব, (৪) ভাষাতত্ত্ব, (৫) বিজ্ঞান, (৬) ব্যবহারিক শিল্প, (৭) কলাশিল্প, (৮) সাহিত্য এবং (৯) ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জীবনী। বিশ্ববোধ, সাধারণ সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদির বিষয় বস্তু এত ব্যাপক যে উপরোক্ত সকল বিষয় অথবা উহাদের অনেকগুলি ইহাদের



বি, নান

ফোন : বি, বি, ৩২৩৪

১৬১এ, সিডন স্ট্রীট
কলিকাতা

বায়স্কোপে—

স্লাইড বিজ্ঞাপন ও
প্রোগ্রাম বইয়ের বিজ্ঞাপন
প্রচারের জন্য—

দেওয়ালে—

পোষ্টার লাগাইবার জন্য
আমাদের সহায়তা লইলে
নিশ্চয়ই খুসী হইবেন।

—*—



বিষয় বস্তু হইতে পুরে। লেখক এইরূপ বিষয় বস্তুর জন্য (সাধারণ বিষয়) নাম দিয়া একটি দশম বিভাগের সৃষ্টি করিয়া ঐ বিভাগের নির্দেশনের জন্য (শৃঙ্খ) ব্যবহার করা হইয়াছে। শৃঙ্খ অর্থে কিছুই নহে এই প্রকার চিহ্ন বিশিষ্ট বিভাগের বিষয় বস্তুর নিজস্ব কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই। সংখ্যা দ্বারা বিষয়গুলি নির্দেশ করিবার জন্য ডিউই প্রথমে একটি মাত্র সংখ্যা ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেক

বিষয়ের ভিত্তি মূলক সংখ্যাকে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইলে এক্ষণে কোন সংখ্যা কোন বিষয়ের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয় দেখা যাইক :—

- ০০০ সাধারণ
- ১০০ দর্শন শাস্ত্র
- ২০০ ধর্ম শাস্ত্র
- ৩০০ সমাজ তত্ত্ব
- ৪০০ ভাষাতত্ত্ব
- ৫০০ বিজ্ঞান
- ৬০০ ব্যবহারিক শিল্প
- ৭০০ কলা শিল্প
- ৮০০ সাহিত্য
- ৯০০ ইতিহাস, ভূগোল ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত, এবং জীবনী।

উপরোক্ত বিভাগগুলির প্রত্যেকটিকে পুনরায় তাহাদের বিষয় বস্তুর সাদৃশ্যের ভারতম্য অনুসারে নয়টি উপবিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন ৫০০ বিজ্ঞান এই বিভাগের পরবর্তী উপবিভাগগুলি এইরূপ :—

- ৫০০ বিজ্ঞান
- ৫১০ গণিত শাস্ত্র
- ৫২০ জ্যোতিষ শাস্ত্র
- ৫৩০ পদার্থ বিজ্ঞান
- ৫৪০ রসায়ন শাস্ত্র
- ৫৫০ ভূতত্ত্ব
- ৫৬০ প্রকৃতত্ত্ব
- ৫৭০ জীবতত্ত্ব
- ৫৮০ উদ্ভিদ তত্ত্ব
- ৫৯০ প্রাণীবিজ্ঞান

প্রত্যেক উপবিভাগের আবার প্রয়োজন মত নয়টি করিয়া অধীন উপবিভাগ করা হইয়াছে। যেমন ৫১০ গণিত এই উপবিভাগের পরবর্তী বিভাগগুলি ৫১১ পাটিগণিত, ৫১২ বীজগণিত, ৫১৩ জ্যামিতি ইত্যাদি। এই সকল অধীন উপবিভাগগুলিকে প্রয়োজন-

যত যতদূর ইচ্ছা অধিকতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারগুলি অনাবশ্যক বিবেচনা করিলে পুস্তকগুলিকে মাত্র প্রথম দশভাগে ভাগ করিয়া রাখিতে পারে। অত্যন্ত গ্রন্থাগার উপবিভাগ অথবা অধীন উপবিভাগ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারে এবং অতি বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলি যতদূর ইচ্ছা যুগ্ম বিভাগ ব্যবহার করিতে পারে। ডিউই পুস্তকের বিষয়গুলি জ্ঞাপনের নিমিত্ত চারিটি কথবা ততোধিক সংখ্যা ব্যবহার করিবার আবশ্যক। যদ্যপি তিনটি সংখ্যার পর এক দশমিক বিন্দু ব্যবহার করিয়াছেন (যেমন ৫২৩.১) এবং সমগ্র সংখ্যাটিকে দশমিক হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। এই জন্মই এই পদ্ধতির নাম দশমিক পদ্ধতি।

পুস্তকের শ্রেণী বিভাগের জন্য এ পর্য্যন্ত নিঃখুত এবং সর্বাঙ্গমুদ্রণ কোন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে সেরূপ পদ্ধতি কখনও আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে। তবে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি লম্বুরের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ডিউইর দশমিক পদ্ধতি পৃথিবীর বহুস্থানে প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহাই সর্বাঙ্গপেক্ষা জনপ্রিয় পদ্ধতি বলিয়া অতি সংক্ষেপে ইহার বর্ণনা করা হইল।

গ্রন্থাগারের লিখিত বাহ্যিক কোন সম্পর্ক আছে তাঁহারা জানেন যে, যে প্রথারই হটক প্রায় সকল গ্রন্থাগারেই সেই গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের 'গ্রন্থস্থলী' বা 'ক্যাটালগ' রাখা হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার পক্ষে যথোচিতভাবে শ্রেণীত গ্রন্থস্থলীর লম্বায়ত্তর মূল্য অবর্ণনীয়। কোন পুস্তকের বিষয় স্থলী হইতে ঐ পুস্তকে কোন কোন আলোচনা করা হইয়াছে এবং ঐ সকল বিষয়ের লক্ষ্য কোন স্থানে লিখিবে তাহা যেমন অনায়াসে জানা যায় গ্রন্থাগারের 'গ্রন্থস্থলী' বা 'ক্যাটালগ' হইতে ও সেইরূপ কোন গ্রন্থাগারে কি কি পুস্তক

আছে এবং গ্রন্থাগারের কোন স্থানে ঐ পুস্তক রাখা হয় তাহা সহজেই জানা যায়। অর্থাৎ 'গ্রন্থস্থলী' গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক লম্বুরের চাবি কাঠি বিশেষ।

গ্রন্থস্থলী একপভাবে প্রস্তুত করা উচিত বাহাতে যে কেহ অন্ততঃপক্ষে নিম্নলিখিত অনুসন্ধানগুলির উত্তর গ্রন্থস্থলীর নিকট পাইতে পারে। (১) কোন গ্রন্থাগার লিখিত কোন কোন পুস্তক গ্রন্থাগারে আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অথবা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লিখিত কোন কোন পুস্তক আছে। (২) কোনও বিশেষ বিষয়ের কি কি পুস্তক ঐ গ্রন্থাগারে আছে। যথা বাংলাদেশের ইতিহাস, কৃষিবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কি কি পুস্তক আছে। এবং (৩) কোন কোন নামের পুস্তক (অন্ততঃপক্ষে উল্লেখযোগ্য নামের পুস্তকের মধ্যে কোনগুলি) গ্রন্থাগারে আছে। যেমন চলন্তিকা, হতা, পোকাশাকড়, যোগাযোগ ইত্যাদির মধ্যে কোন কোন পুস্তক গ্রন্থাগারে আছে।

সকল গ্রন্থাগারের 'জন্মই গ্রন্থস্থলী' আবশ্যক ইহা সর্বত্রই অনুমিত। কারণ স্রবণশক্তি যত প্রথরই হটক না কেন ক্রমবর্দ্ধিসু গ্রন্থাগারে কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষেই গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রত্যেক পুস্তকের কথা সর্জন্য স্রবণ রাখা সম্ভব নহে। আবার একই গ্রন্থাগারিক চিরকাল যে একই গ্রন্থাগারে কার্য্য করিবেন অথবা পুস্তক লম্বুরের জন্ম সকল সময়ই যে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে একরূপ আশা করা যায় রাখা। কাজেই তাঁহার অনুপস্থিতিতে, অবর্তমানে অথবা পুস্তক লম্বুরে লম্বুরভাবে গ্রন্থাগারে কি কি পুস্তক আছে তাহা পাঠক বা গ্রন্থাগারের অন্য কর্ম্মীদের বাহাতে জানিবার পক্ষে কিছু অনুবিধা না হয় সেজন্য গ্রন্থস্থলীর প্রয়োজন।

কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যে সকল গ্রন্থাগারে বিষয় হিসাবে পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করা আছে এবং যেখানে 'মুক্তধার পদ্ধতি' (Open access System) প্রবর্তিত আছে সেখানে গ্রন্থাগারে কোন কোন বিষয়ে কি কি পুস্তক আছে গ্রন্থস্থলীতে তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে গ্রন্থাগারের সকল পুস্তক সর্বত্রই গ্রন্থাগারে থাকে না। পাঠের জন্য অনেক পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। কাজেই তাকে কেবল রক্ষিত পুস্তক ধরিয়াই সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই জন্মই গ্রন্থস্থলীতে বিষয়মূলক সংবাদ প্রদান করাও আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক প্রথার পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ করা এবং গ্রন্থস্থলী প্রণয়ন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ এবং জ্ঞানার্জন না করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে সন্তোষজনক ফল লাভ করা সম্ভব নহে। সেজন্য সাধারণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে অধিকতর জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা যুক্তি যুক্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

* এই পদ্ধতিতে পাঠকগণকে বই-এর তাকে যাইরা পাঠের জন্য পুস্তক নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হয়।



খেয়াল। চতুপাচ



প্যারামিউটের : হাজারসায়ক ছবি "খিল
অব এ লাইফটাইম"-এর একটি দৃশ্য।
ছবিগান সিগারেট ১০০০০ ১০০০০



টেলিগ্রাম
'ভারিটি'

পরিচালক
জাশনাল নিউজপেপার লি:

টেলিফোন
সিউপ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সিউপ) রোড, কলিকাতা .

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭শে মার্চ ১৩৪৪, ১-ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

মধুচক্রে ক্রুদ্ধ-গুঞ্জন

কর্পোরেশন সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরে গৃহীত প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রস্তাব এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরূতি ও সর্বোপরি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে গোপন আলোচনা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলার মহলে বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বাঙ্গলার সরকারে রূহৎ মধুচক্রের মধুলোভী মক্ষিকাবৃন্দ এতদিন ধরিয়া বিশেষ সুখে ও পরম শাস্তিতে মধু আহরণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ তাহাতে বাদ সাধিতে যেভাবে মক্ষিকা বিভাড়নের আয়োজন হইতেছে তাহাতে যে চতুর্দিক হইতে ক্রুদ্ধ-গুঞ্জন শুনা যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু ব্যাধি যদি বিশেষ কটু হইয়া উঠে তাহার চিকিৎসাও ঠিক তদনুরূপ প্রয়োজন। সুভাষ-চন্দ্র অতি শীঘ্রই কর্পোরেশন সংস্কারে মনোনিবেশ

করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহাকে ইচ্ছানুসারে কয়েকটি ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

কর্পোরেশন পরিচালনায় কংগ্রেসী আদর্শ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রে এমন একটি আইন থাকা প্রয়োজন যে যাহারা কর্পোরেশনে চাকুরী করিবেন তাঁহারা কংগ্রেসের সাধারণ সভা থাকিলেও কলিকাতার কোন জিলা বা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কর্মকর্তা হিসাবে কোন পদ অধিকার করিতে পারিবেন না। কর্পোরেশনের বহু কর্মচারী বর্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কর্মকর্তার পদ অধিকার করিয়া আছেন। তাহার ফলে এই দেখা যায় যে যখন কর্পোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলার পদপ্রার্থীগণকে কংগ্রেসী মনোনয়ন দিবার সময় আসে তখন যাহারা কর্পোরেশনে কাউন্সিলারদিগের ভৃত্য হইয়া থাকিবেন তাঁহারা কাউন্সিলারদিগের প্রভু হইয়া থাকেন। ভাবী কাউন্সিলারগণ, যাহারা কংগ্রেসী আদর্শে পূর্ণ আস্থার সহিত কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ন তাঁহারা তাঁহাদিগের জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্তা কিন্তু কর্পোরেশনে ভৃত্যসম ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের নিষ্পেষণে, কংগ্রেসী আদর্শে আস্থা হারাইয়া অন্তায় কার্য সমর্থন করিতে বাধ্য হ'ন। এবং এই সকল কর্পোরেশন কর্মচারী সর্বদাই লচেষ্ট থাকেন এমন সকল ব্যক্তিকে কাউন্সিলার পদে অভিযুক্ত করিতে যাহাদিগকে তাঁহারা অতি সহজেই পরিচালিত করিতে পারিবেন। কর্পোরেশনে যখন কোন কর্মচারী-নিয়োগ বা কর্তৃত্ব গ্রহণের ব্যাপার আলোচনা চলে তখন কর্মচারী-পরিচালিত কাউন্সিলারগুলি কর্মচারী বিশেষের অঙ্গুলী হেলনে তাঁহাদের মতামত দিয়া থাকেন।

উপলব্ধ মতে কলিকাতায় বিভিন্ন জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্তৃমহল হইতে কর্পোরেশন কর্মচারীদিগকে বিভাড়ন করিলেই যে কর্পোরেশন

পরিচালনায় সকল গলদ দূরীভূত হইবে তাহা নহে। তবে আমাদের মনে হয় যে কর্পোরেশন ব্যাপারে কোন কর্মচারীর প্রভু না থাকাই উচিত। যাঁহারা কর্মচারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইবেন তাঁহারা যদি কর্মচারীদিগের অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হন তাহা হইলে কর্পোরেশন পরিচালনায় কোন আদর্শ পন্থাই অনুসরণ করা চলিতে পারে না।

এই সকল কর্মচারী এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত কাউন্সিলারবৃন্দ যে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধিতে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় বিশেষ বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া পড়িবেন তাহা ঠিকই। কিন্তু সুভাষচন্দ্র মধু আহরণকারী মক্ষিকাবৃন্দকে কর্পোরেশন হইতে বিভাডিত করিতে যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতার করদাতাবৃন্দ ভরসা করিতে পারেন যে সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের পরগাছাগুলি উৎপাটন করিতে সমর্থ হইবেন।

অথ্যা কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি কর্মকর্তাদের মধ্যে কে বা কাহারা কর্পোরেশনে চাকরী করেন সম্পাদক মহাশয় তাহা জানাইবেন কি? শ্রীঅমিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত মাঝেয় যে ব্যক্তিকে ১৯নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে দাঁড় করান হইয়াছিল তাঁহার বর্তমানে উপজীবিকা ও অভ্যন্তর কার্যাবলী ও শিক্ষা-দীক্ষার একটা ফিরিস্তি পাইলে দেশবাসী বুঝিতে পারিবেন কেন বিগত উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটিল। সুভাষচন্দ্র ও প্রাদেশিক কর্মকর্তাবৃন্দকে আমরা বিগত পরাজয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছি যে কলিকাতা কর্পোরেশন বা কোন সায়ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান যেন উপজীবিকাবিহীন ও অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কণ্ঠকেন্দ্রে পরিণত না হয়।



রূপোর ঝুমকো

পরিচালক :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী : রবি রায়

আলোক-চিত্রী : স্বীটমেন দে

প্রধান শব্দ-যন্ত্রী : নৃপেন পাল

ভূপেন ঘোষ

সঙ্গীত পরিচালক : এম, এন, দাস

রতন দাস

ব্যবস্থাপক : বিজ্ঞান মল্লিক

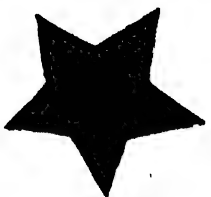
রূপোর ঝুমকো

সুচিত
রাধা ফিল্ম

ও,কে,এ,
প্রোডাকশন

—ভূমিকায়—

ধীরাজ, নীলু রায় (এঃ), সত্য
মুখার্জি, কণি মুখার্জি, কান্তিক দে,
প্রফুল্ল (হাজু), পারুল, কমলা,
কমল কুমারী, রাজলক্ষ্মী, বেলা,
গীতা, বীণা প্রভৃতি।



মাইকেল মধুসূদন

ত্রিবিমল চন্দ্র ঘোষ

‘পয়ার’, ‘লাচাড়ী’ চন্দ্র সুধরিত বাংলায় অজনে—

হে পুরুষলিংহ কবি হে ভৈরব হে রুদ্রচারণ,
আছি রণে আত্র হিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় স্পন্দনে
উদাত্ত গভীর সুরে মহাচ্ছন্দ করি উচ্চারণ—
পৌরুষ জাগারে দিলে। প্রগতির ওগো স্বীকা গুরু ;
প্রাণময় ছন্দ তব বন্ধনের নাশি মায়াজাল,
অবারিত মুক্ত গতি অব্যাহত যেন মহাকাল
দেখাল তাত্ত্বিক নৃত্য ; লচেতন যাত্রা হ’ল সুর
তব কাব্য সমুদ্রের উত্তাল গর্জনে শুনি বক্ষ তাই করে চক্ৰ চক্ৰ।

আদিম স্পন্দনে জাত অনাহত নাহিমন্ত্র বধা
অনাহি কালের বৃকে সৃজনের চির উৎস হ’তে—
বিচিত্র লীলার ছন্দে মোহধর্মী মুক্তিকার পথে
দেখায় মুক্তির পথ ; সেইমত তব কাব্য কথা
বিপুল বস্তার বেগে ভালাইয়া কূপ মন্তকতা
দীর্ণকরি চন্দ্রচূড় গলেশের রুদ্ধ জটাজাল
প্রবাহিল ভাবময়ী জাহ্নবীর মত ; মহাকাল,
তব প্রিয় কবিতত্ত্ব দেখাল যে বিশ্ব ভাবুকতা

অমর করিল তা’রে অমিত্র চন্দ্রের বৃকে বহাইয়া স্নিগ্ধ সুধরতা।

লক্ষ তারা বিমণ্ডিত আকাশের নীল চন্দ্রাতপে,
ছন্দের বন্ধন নাই আছে সুর গতি অব্যাহত,
উদাত্ত চলার বেগে কাল সেথা কীয়ে মন্ত্র জপে
শুনে নাই সে উদগীত বন্দীপ্রাণ মোহ-বন্ধাহত
কে বলে অমিত্র তারে ? মৈত্রী তার নিখিল ভুবনে
বহায় ভাবের বজ্রা রসিকের চিত্ত গুহা হ’তে,
অরূপের রূপ দেখ, জ্যোতির্ময় দীপ্ত ছায়াপথে
জালায় প্রাণের শিখা রসামৃত ঘের বিশ্ব মনে
হে মধুসূদন তুমি যে বিরাট ভাব বজ্রা প্রবাহিলে চিত্ত বৃন্দাবনে।

অভিশপ্ত যে বীরেন্দ্র একদিন স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,—
বিলজিল তুমু তা’র নিকুন্ডিলা বজ্র লভাতলে
বালব-বিজয়ী বীর হৃদয় রাবণি ; অস্ত্রজলে

• দিল্লি করি আত্মা তা’র তুমি কবি সেই শ্রেষ্ঠ পুরে,
• উদ্ধারিলে বালিকীর অবজার কারাবন্ধ হ’তে।
• হেরিষ অলিক চিত্ত ধীরে করি আঁধি উন্মোলন
মাতৃভক্ত বৈনভের করে বৃষ্টি অমৃত করণ,
স্বর্ণ পক্ষ আদ্যোপায়া উর্জগতি দূর স্বর্ণপথে
তুমি সেই বৈনভের স্মৃতিভাণ্ড হেরিছিলে রাশারণ রণ স্বর্ণ হতে।

রচিল লেখনী তব লংশোদিত মহারামায়ণ
লিখাছিলে বীরপূজা মেঘনাথ গজিল আকাশে
দেহজ শ্রেঘের ক্ষুধা পরিপূর্ণ নহে—কামারণ,
জন্মেছিল দৈত্যভাবা বীর্ঘাবান তোমার নিঃশ্বাসে ;
বৈশ্বিক কাব্য হেরি মুখ যতো বালখিল্য হল
সেহিন তোমারে ধরি অর্কচীচী বাণকের মত
প্রশ্ন বাণে জর্জরিতা চেয়েছিল করিতে বিব্রত,
গর্জিত গরুড় লম্ব তুমি শুধু হানি অচঞ্চল,
লক্ষ্মী-লীলার মত বিলাসীর অঙ্গরাখা জালাইলে স্বপ্নের অঞ্চল।

বজ্রায়ি জালায় পূর্ণ তুমি মেঘ বজ্রের আকাশে—
প্রতিভার আভিজাত্য করে গেলে যে গুরু ছকার,
জীর্ণ পত্রী পুঞ্জময় উড়ে গেল উন্মাদ বাতালে
পূরণ ও পাঁচালির ক্ষীণ কণ্ঠে রাগিনী বকীর,
বজ্রবাণী প্রবাহের কল্লোলিত কপোতাক্ষী জল
লাগর দাঁড়ির ছন্দ শুনি যেন অপরূপ অদ্ভুত,
শুধু নহে বীর রস, নব রস নব মেঘদূত—
• • • কী বিরাট অমুভূতি জেগেছিল তব চিত্ত তলে !
লোক লোকান্তরে তাই মৃত্যুহীন তব স্মৃতি উজ্জল জ্যোতিষ্ক লম্বললে।

বিরচিয়া মধুচক্র ভূষাতুর গৌড় জন চিতে—
রসমন্দাকিনী ধারা দিলে ঢালি’ হে মধুসূদন,
সুধস্বপ্নগীন তব মধুচ্ছন্দ কাব্যের ললীতে—
অমৃত ভাবিনী দেবী ভারতীর করিল পূজন ;
যার বরে লিখি লভি’ নরহস্তা বজ্রা রসায়ন

কবিশ্রুত আখ্যা পেল রচি' মহাকাব্য রামায়ণ;
স্বজিল মানস পুত্র রাঘবেন্দ্র নর নারায়ণ,
তুমি সেই বাগ্‌দেবীর যোগ্য পুত্র হে কবি ভাস্কর,
লাহিত্যের ইতিবৃত্তে অমর রচনা তব স্বর্ণাকরে রহিবে ভাস্কর।

উন্মাদ যৌবনে তব হারিজের ক্রুর মিল্পষণ,
স্বদেশে বিদেশে কবি করিয়াছে ঘোর অত্যাচার,—
তবু সেই ভয় স্তূপে জেলেছিলে দীপ্ত হতাশন
সতীহারী রক্ত রোধ সম। বীরেন্দ্র কেশরী তুমি—
হারিজ্য বিতংগ দিয়ে কা'র সাধ্য বাধিবে তোমারে—?
গঙ্গোত্রীর ভীম স্রোতে ঐরাবত কী করিতে পারে?
লজ্জার হারিজ্য তব লুটাইল পরভল চুমি,
প্রতিভার বরপুত্র উন্মাদ লীলায় তব বিশ্বয়ে নিক্ষেপ জন্মভূমি!

জনাত্ম্য রাজপথে আনমনে চলিতে চলিতে—
“দাঁড়াও পথিকবর বলভূমে জন্ম যদি তব—”
নহে কণিষ্ঠ অমরোদ, এ আদেশ কে পারে করিতে?
থমকি দাঁড়ানু মুখ, রক্তাদেশ শুনি অভিনব;
শোকাক্র রাবণ তুমি অনির্বাণ চিত্তাবলি হ'তে—
হা পুত্র, হা পুত্র, বলি বক্তৃ-স্বরে ডাকিছ সবার,—
মুচমতি আমি কবি, তব পূজা জানা'ব কোথায়?
স্বর্গের উদ্দেশে? কিবা গোরস্থান মলিন মরতে?
নেহারিছ কাব্যলোকে রাঘবারি-আত্মা ওগো দেখা দিলে স্বর্ণ হংসরথে

* কবিতীর্থে বাণী বন্দনা উপলক্ষে ষিদিপুর হেঘচন্দ্র
পাঠাগারে পঠিত।

মালবিকার হার

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

মালবিকা তর্কের শেষে উত্তেজিত হইয়া
উঠিয়াছিল, তাই মুক্তি হারাইয়া ব্যক্তিগত
আক্রমণ শুরু করিল,—যাই বলো, লোকটা
অভদ্র, কালচার বলে কোনো জিনিষ এর
মধ্যে নেই।

হিতেন বলিল—তা তুমি বলতে পারো
না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি, নির্মল
সেনের ট্রাডিশন আছে, এবং কৃষ্টির মধ্যেই
সে মানুষ। বরঞ্চ যে তোমার প্রবন্ধ সমর্থন
করেছে—নিত্যানন্দ হাল, জগদগত সংস্কার ত্যাগ
করবার মতন শিক্ষাদীক্ষা পাঠনি। যেহেতু
তুমি নারী, এইজন্তেই হয়ত সে তোমার পক্ষ
নির্দেশে! তা নইলে লেখা প্রকাশ হবার
পরেই সম্পাদকের কাছে তোমার ঠিকানার
খোঁজ করতনা, আর আলাপ করবার জন্তে
সুকতওনা।

মালবিকা বলিল—আলাপ করতে চেয়ে-
ছিল, তা' তুমি জানাওনি? তার সঙ্গে
আলোচনা করে আমার লাভই হত, কারণ
নারীকে সে বলে দেবী, আর নির্মল সেন

বলে, মানুষ বললেও বেশী বলা হয়। দুজনের
ক-ত তফাৎ। নির্মলের সঙ্গেও আমার দেখা
করবার ইচ্ছে হয়েছিল। হয়ত তাকে শিকাও
দেওয়া যেত কিছু! বেরকম লজ্জা মন
তার! মেয়েদের দেখলেই যার অপমান
করবার প্রবৃত্তি জাগে, তাকে সায়েস্তা করা
নিশ্চয়ই দরকার।

হিতেন আর তর্ক বাড়াইলনা। নির্মল-
কেও সে দেখিয়াছে, নিত্যানন্দের সঙ্গেও
আলাপ করিয়াছে, তার নিজের ধারণার সঙ্গে
মালবিকার অনুমান মেলেনা।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সামনে জ্যোকে
লইয়া হিতেন ট্রামে উঠিল। লেডিজ সীট
ছুটাই ভর্তি, মালবিকা কতক্ষণ চূপ করিয়া
দাঁড়াইয়া রহিল, অল্প পুরুষগুলি নিঃশব্দে
বলিয়া রহিল—ভাবটা যেন, তোমাদের সীটে
ত বসিনাই? কেন উঠিব?

একটি যুবক হঠাৎ দেখিয়াই লম্বাযন্তে
উঠিয়া পড়িল, মালবিকার দিকে চাহিয়া
কহিল—বসুন।

মালবিকা তবুও বলিল না। তখনোও
পাশের লোকটি ওঠে নাই, তার গা বেশিরা
বসে কি করিয়া!

যুবকটি সঙ্কোচের কারণ বুঝিল, উপবিষ্ট
লোকটিকে বলিল—মশায় উঠুন, একে
বসতে দিন।

সে অস্বস্তিতে জবাব দিল—ইচ্ছে
হয়, এটখানেক বসতে পারেন, একজনের
বদলার মতন জায়গা রয়েছে!

—আপনার গায়ের ওপর বসবেন?

—না বসতে পারেন, আমি কি করব?

মেয়েদের নকল করতে যান, তারা এরকম
বসতে লজ্জাবোধ করে না।

—বাঙালী মেয়েরা তা কখনো পারেন?

—না পারেন, ত' ভিড় দেখে ওঠেন

কেন? খালি গাড়ী দেখে উঠলেই পারেন।

—আপনি উঠবেন কিনা? যুবকটি
রাগের সঙ্গে প্রশ্ন করিল।

—না। কিছুতেই না—বলিয়া লোকটি
আরো চাপিয়া বলিল।

যুবকটি তার গায়ে হাত দিতেই একটা
গোলমালের সৃষ্টি হইল, অল্প অনেকেই
তখন উঠিয়া পড়িয়া ‘বসুন এখানে বসুন,
এর সঙ্গে বচলা ক'রে কি হবে’ ইত্যাদি
রবে হৈ হৈ করিতে লাগিল।



নূতন আকর্ষণ্য চিত্র ! নূতন আকর্ষণ্য চিত্র !!

নূতন পরিকল্পনায়, নূতন ঘটনার বৈচিত্রে ও নূতন ভাবের
দ্যোতনায় সম্পূর্ণ অতুলনীয় ও অভাবনীয় সরল, হিন্দী
ভাষার সংলাপে—বুঝিতে: কোনই কষ্ট হয় না।

নিউ সিনেমায়

দেখান হইতেছে !

আমার অভিনেত্রী জীবনের কয়েকটী কথা

সীমন্তী চন্দ্রাবতী



চন্দ্রাবতী

লেখবার তাগিদ এখনেই। কিন্তু আমার মত সাধারণ নারীর পক্ষে কিছু লেখা যে কত কষ্টকর কাজ—তা আমার মত অবস্থায় যারা না পড়েছেন—তারা বুঝতে পারবেন না। বর্তমান সিনেমা লব্ধকে আমার কি ভাবি—কি চাই, তার বিষয় কিছু বলতে চেষ্টা করব।

সিনেমা লব্ধকে আমার এমন কোন জ্ঞান নেই যা পাচজনকে শোনাতে পারি। কিন্তু তবুও আমার মত একজন সাধারণ অভিনেত্রী সিনেমা লব্ধকে কি ভাবে বা কি করে তাই লব্ধকে জানাব। অনেকদিন থেকে সিনেমার অভিনয় আমি করছি, ফলাফল হয়ত আশানুরূপ হয়নি, কিন্তু লোকের দেখবার অযোগ্য অভিনয়ও হয়ত আজ পর্যন্ত করিনি। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। মীরাবতী চিত্রে নাম ভূমিকার ও দেবদাস চিত্রে চন্দ্রমুখার ভূমিকায় অভিনয় করে যে সম্মান আমি পেয়েছিলুম তাতে আমি গৌরবান্বিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না আর তার চেয়ে সন্দেহ নেই যে, নিউ থিয়েটার্স ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আমাকে এ সম্মান এনে দিতে পারত না।

এই প্রশ্নে একথাও বলতে হবে যে

হিতেন ও মালবিকা আমার করিয়া বলিল। সেই গোলমালে লোকটা পরের ষ্টেপেঞ্চেই মেডিকেল কলেজের সামনে নামিয়া গেল। যে পথটুকুর জন্ত সে এতটা কলহ করিল, ট্রামে সেটা পার হইতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। বুঝকি তখনো বলিবার জায়গার অভাবে বেশি ধরিয় ওপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

বিস্তৃকতা ভঙ্গ করিয়া হিতেন প্রথম

মীরাবতী চিত্রে অভিনয় করবার সময় আমি নিজের প্রাণে এক অপূর্ণ প্রেরণা অনুভব করতাম। মীরাবতী এর পূর্ণা চরিত্র তবু আমার কেন জগতের সকল নর নারীর মনকেই তজ্জিরনে প্রাবিত করেছে।

দেবদাসের পর আমি 'দ্বিধা' ছবিতে অভিনয় করি। 'দ্বিধা' ছবি যখন প্রথম তোলবার কথা স্থির হ'ল, তখন আমার শরীর ও মন নানা কারণে বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিচালক নীতিন বাবুর কথার প্রেরণা নিয়ে অভিনয় করতে লেগে গেলাম। 'দ্বিধা' চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পেরে-ছিলুম কিনা তা পরিচালক মশাই নিজেই জানেন। তবে এ ছবির জন্ত যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে আমাকে হয়েছিল তা বোধ-হয় একেবারে ব্যর্থ হয়নি এই আমার ধারণা। দ্বিধা চরিত্রে দ্বিধার অপকৃষ্ট দেহধারা, অপূর্ণ প্রেম ও অসাধারণ মনের বল, আমি নিজের জীবন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনে তা থেকে বিশেষ ভাবেই উপকৃত হয়েছি।

নিজের হাতে যদি নিজের ভূমিকা নির্দ্বন্দ্বিত করবার ক্ষমতা থাকত তা হ'লে সব কথা কহিল—যে লোকটি উঠছিল না, ঐ নিত্যানন্দ দাস যানে যে তোমাকে লম্বন করছিল, আর যে অন্য দিকে মুখ করে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ কুখ্যাত নির্মল সেন।

মালবিকার কিছু বলিবার ছিল না। এমন নিঃশব্দে সে তর্কে হারিয়া যাইবে কখনো ধারণা করিতে পারে নাই।

সময়েই মীরাবতী নারীর ভূমিকাই নির্দ্বন্দ্বিত করতাম। নারীর যে কলাগমর মুক্তি ছবি মনে আসে তাই পর্দার বৃকে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করতাম। এতে কনিকের জন্তেও নিজের শক্তিকার জীবনের কথা হয়ত তুলতে পারতাম। জীবনে যা পেলাম না—পাবার কোন পথই নেই—অভিনয়ের দ্বারা কিছু লাভনা লাভ করা কম পুণ্যের কথা নয়।

আমরা কপালদোষে বাহাই হইনা কেন, আমাদের মনের মধ্যে চিরন্তন এমন একটি নারী বাস কবে যার ভেতর কোন পাপ নেই—তা পবিত্র ও স্মরণ। মনে মনে সেই নারীকে পূজা না করে এমন প্রাণী বোধহয় জগতে খুঁবি বিরল।

সম্প্রতি 'দেশের মাতা' চিত্রে যে ভূমিকায় আমি অভিনয় করছি তা একটি শিক্ষিতা আধুনিক ভ্রমনারী চরিত্র। পরিচালক মশাই 'অরুণা' রূপে আমাকে বাহা বর্ণনা করেছেন—তা বাস্তব জীবনে লচরচর চোখে পড়েনা। পুরুষের মনে যে আদর্শ নারীর কথা জাগে—অরুণাও হয়ত তাই। এই নারী জীবনের সকল কিছু দিয়ে একজনকে ভালবাসলো, কিন্তু সেই পুরুষ যখন তার প্রেম অন্তকে দান করে নিজের অর্থ নিজেই বেছে নিল তখন এই 'অরুণা' নিজের সকল দুঃখ

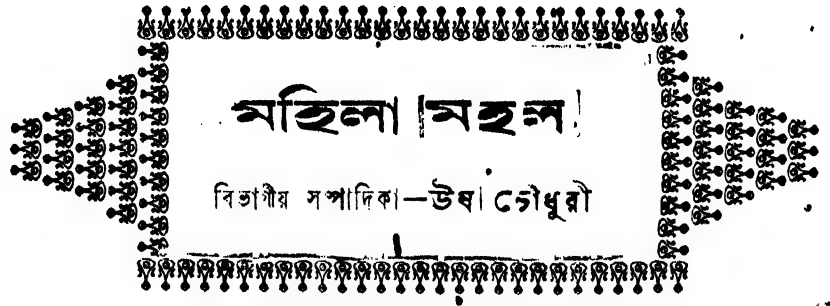
নিজের মনের মধ্যেই গোপন রেখে প্রেম-
স্নেহের কল্যাণ কাঁচনাই করল। যে স্বার্থ
গুরুত্বপূর্ণ প্রেমের কথা আমরা বইয়ে পড়ে
পাচ্ছি, তাকে কুটিলে তুলবার যে সাধনা ও
শিকার প্রয়োজন, তা হয়ত আমার নেই।
কিন্তু আমার প্রবল চেষ্টা হয়ত 'অরুণা'
চরিত্রকে অবিচার এর হাত থেকে রক্ষা করতে
পারবে।

লিনেন্সা ছবি বলতে আমি এমন একটা
জিনিষ এর বস্তুনা করি, বাস্তব জীবনে হয়ত
খুব কমই পাওয়া যায়। লিনেন্সার কাজ
যেমন আনন্দ দান করা। তেমনই মানুষের
জীবন যাত্রার নতুন পথ তৈরি করে দেওয়া।

'বেশের মাটি' ছবিখানার মধ্যে এমন
কতকগুলি জিনিষ আছে যা থেকে আমরা
অনেক কিছু শিখতে পারবো। বিদেশী ছবির
বিষয় আমরা যে সকল কথা কানজে পড়ে
পাচ্ছি আমার মনে হয় আমাদের সন্মিলিত
চেষ্টা হয়ত একদিকে তার কাছাকাছি নিয়ে
যেতে পারবে।

আমেরিকার ছবি প্রায়ই দেখে থাকি।
নিজেদের সঙ্গে তুলনা করে কষ্টই পাই বেশী।
কিন্তু ভেবে দেখলে এ কষ্টের কোন মানেই
থাকেনা—কেননা যাদের অর্থবল ও লোক-
বলের কোন সীমাই নেই তাদের পক্ষে ভাল
ছবি না করাই অসম্ভাবিক। কিন্তু আমাদের
সবকিছুই সীমাবদ্ধ। তাই আমার মনে হয়
আমরা বিদেশী ছবির গল্পের দিক থেকে
অনেক উন্নত। জানিনা সকলে একথা
মানবেন কিনা?

বিদেশে অভিনেত্রীদের শিক্ষা দেবার
শিক্ষালয় আছে। আমাদের দেশে এমন
কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা জানিনা? যদি
না থাকে তা' এইরকম শিক্ষালয় আমাদের
বিশেষ প্রয়োজন। এইপ্রকার প্রতিষ্ঠানের
দ্বারা যেমন বহু ভাল ভাল অভিনেত্রী পাওয়া
সম্ভব হবে তেমনই অনেক অভাগিনীর জীবন
যাত্রার পথও বদলে যাবে।



বাঙলা দেশ জুড়ে আজ অশান্তির ঢেউ
এগেছে, ঢেউ এসেছে বাইরে, জননমাজে,
ঢেউ এসেছে গৃহকোণে। আমাদের গায়ে
এসে লাগছে ঝড় ঝাপটা। চুপ করে বসে
থাকবার মন আজ নয়। কিছু না করতে
পারি, অন্ততঃ পথ কোন দিকে সে সবকিছু
আলোচনাও চলতে পারে। তাই খেরালীর
মহিলাসমূহের দায়িত্বগ্রহণের অনুরোধ আমি
উপেক্ষা করতে পারলুম না। আমি এগিয়ে
এলাম আরো আরো বোনেরদের ডাক দিতে।
নিজেদের গভীর মধ্যে আজ সকলে মুগ্ধ
হয়ে উঠুন, প্রকাশ করে বলুন যিনি যা
ভেবেছেন, বিশেষ থেকে আমরা যেন
আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে না যাই।

চায়ের দোকানে, বন্ধুদের আসরে, ট্রেনে,
ট্রামে, পথে বাটে, অফিসে, আদালতে
মেয়েদের সম্বন্ধে হাজারো অভিযোগ উঠছে,
কেউ আমাদের পক্ষে, কেউ বা বিপক্ষে।
পুরুষসমূহ আমাদের বস্তু্য শোনার জন্তে
উদগ্রীব, কিন্তু এখনো আমরা পরিষ্কার করে

অভিনেত্রী জীবন সম্বন্ধে আমার অনেক
কিছুই বলবার ছিল কিন্তু পাঁচ পাঠকবর্গের
বিরক্তি ভাজন হই এই ভয়ে এই খানেই
সমাপ্তির লাইন্ টেনে দিলুম। ভবিষ্যতে
আরও সৌখ্যবাহী ইচ্ছা রইল যদি অবশ্য সুময়
ও সামর্থ্যে কুলায়। আমার এই লেখাতে
অনেক ভুলচুক রইল আশাকরি সমস্ত পাঠক-
গণ আমার সামান্ত শিকার কথা ভেবে তা
স্বীকার করে নিতে পারবেন।

বোঝাতে পারিনি। বোঝাতে পারলে সমস্ত
কলগুণন এতদিনে শুরু হয়ে যেত।

এদিকে আমাদের সমাজেরও চোখের
অবধি নেই। অনেকগুলি নারী প্রতিষ্ঠানের
সঙ্গে দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট থেকে বহু পরিবারের
বহুবিধ অশান্তি অভিযোগ ও সুবিধা অসুবিধার
সম্বন্ধে আমরা একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েচে।
সে সব অভিজ্ঞতার কথা ক্রমশ আমি
প্রকাশ করব।

সংক্ষেপে বলতে গেলে,—সেই পরিবারই
সুখী, যেখানে পুরুষরা কৃতবিদ্য, লচরিত্র ও
উপার্জনশীল এবং নারীরা কিছু পদার কিছু
স্বাধীনতার আধুনিক আবহাওয়ার সঙ্গে
সামঞ্জস্য রেখে হাতগোস্তমসী ও সেবারতা এবং
অবশর সময়ের পরিশ্রমে প্রস্তুত শিরবিক্রয়লব্ধ
অর্থ লংসারে সচ্ছলতাবিধায়িনী। ধনী,
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নির্বিশেষে এই ধরনের
পারিবারিক জীবনেরই প্রয়োজন আছে।

এই প্যারাটির সমস্ত অন্তর্নিহিত অর্থ
এককথায় সকলের বোধগম্য করান সম্ভব নয়।
বিস্তারিত প্রয়োজন। প্রথমতঃ যেখানে
পুরুষরা মানুষ হলনা সেখানে নারীর
মনমেজাজ ঠিক রেখে কাজ করে যাওয়া
শক্ত। নারী সাহায্য করতে পারে মাত্র,
লংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিতে গেলে তার
নারীত্ব আহত হয়, সে নিজেও বঞ্চিত হয়।
কাজেই যে পরিবারে পুরুষ অমানুষ, সেখানে
নারীর পূর্ববিকাশ কি করে সম্ভব হয়?
যেখানে পুরুষ সবদিক থেকে লাফল্য অর্জন
করেছে, সেখানেই নারীর কণ্ঠক্ষেত্র

স্ববিশুদ্ধ। সেখানে তার গৃহধর্ম সে শেষ
করবে কড়া আত্মর অন্তরালে, কারণ রান্নাঘর,
খাবার ঘর, স্নানের ঘর এবং প্রসাধনের
স্থান—যেটুকু অন্দর—যেখানে লহজ-
ভাবে চলা ফেরা করবে, সেটুকুকে লোক-
চক্ষুর আড়ালেই সব জাতি লকল দেশেই
রাখে। অন্তঃপুরের শালীনতার প্রতি ধরুটি
রাখা সরকার। কিন্তু সেখানে চিরদিন বন্দী
থাকলে বহির্জগতের অভিজ্ঞতা থেকে জন্মের
মর্তন বঞ্চিত হ'তে হয়। কাজেই বাইরেও
বেরোতে হবে, কৃত্রিম গাভীরো বজ্জা-
লীলতাকে অচঞ্চল রেখে, আপন মহিমাকে
অব্যাহত রেখে—কর্মবাস্তু বিপুল পৃথিবীর
শতকোটি অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লঞ্চের
জন্তে। তারপর, স্বামী ও প্রিয়জনের আনন্দ
বিধানে মিষ্টহাসি, লঘু পরিহাস, মধুর বচনের
যে প্রয়োজন আছে সে কথা বলারও কি
সরকার আছে? সেবা,—যার মধ্যে শুষ্কতা
ও অতিথিপরাধতা পড়ে—তা না হলেও
গৃহধর্ম অসম্পূর্ণ। তারপর, অবসর সময়ে
আরামে বিলাসে যে শিরদ্ব্য প্রস্তুত হবে,
তা থেকে যে উপার্জন হবে, তাই নারীকে
মহিমময়ী ও আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলে।
পরগাছা শুধু শোভামাত্র, তার নিজের কোনো
দাম নেই। স্বর্ণলতিকা না হয়ে রজনীগন্ধার
মতন নিজের পায়ে ভর দিয়ে খুঁজু হ'য়ে
দাঁড়িয়ে ওঠা ভালো নয় কি? এবং এতগুলি
শুণ না থাকলে নারী ও যে সম্পূর্ণ নয়।
আমার আজকের বক্তব্য শেষ হ'ল। এবার
আপনাদের কার কি বলবার আছে জানান।
আলোচনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হোক—দেখা
যাক আলোর আভাষ পাওয়া যায় কিনা।



(বিলাসী)

নিউ থিয়েটারস

এই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিবৃতি
থেকে জানা যায়, "বিজ্ঞাপতি"র বাঙলা
সংস্করণ অতি দীর্ঘত চিত্রায় আত্মপ্রকাশ
কোরবে। বাঙলা "বিজ্ঞাপতি"-তে কানন-
বালার অনুপ্রাণা—তার অভিনয়, ভাবাভিব্যক্তি
এবং লজ্জিতের দিক দিয়ে সকলকে ছাড়িয়ে
গেছেন। সুতরাং চিত্রায় "বিজ্ঞাপতি"
মুক্তিলাভ কোরলে যে বাঙলা দেশেও একটি
নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি কোরতে পারবে—
এরূপ ধারণা করা যায়।

লভ্য-সমাজের আবর্জনার মত যে একদিন
দূরে সরেছিল—বস্তীর স্থগিত আবহাওয়ার
মধ্যে পিতৃ-পরিভ্রাতা বিপুল সম্পত্তি-
ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মোহ তাকে একদিন
পাগল কোরে তুললো। কিন্তু সে জানে
আইনের চোখে তার কোন দাবী 'নেই।
যে বিবাহ অবৈধ—তারই পরিণামে,
বাপ-মার নিষেধের ভুলে সে পৃথিবীতে
এলোচে। কিন্তু ধর্ম, ভগবানের বিচারেও
কী সে দণ্ডনীয়?

একটি অতি কীরুণ ও হৃদয়গ্রাহী
লামাজিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে পুরিচালক
প্রমথেশ বড়ুয়া এটো জটিল প্রশ্নটির সীমাংসা
কোরেছেন।

এই চিত্রের বাঙলা সংস্করণের ভূমিকা
লিপির পরিচয় দিলাম :

ইন্দিরা—যমুনা, রাধা—মেনকা, রেবা—

চিত্রলেখা, নিখিলেশ—বড়ুয়া, রতন—
পাহাড়ী, অধিকাংশাধ—শৈলেন চৌধুরী,
গণেশ—ইন্দু সুখোপাধ্যায়, বিহারী—পঙ্কজ
মল্লিক, ঐ বন্ধু—প্রতাপ সুখোপাধ্যায়,
হীরা—পুনিমা।

হিন্দিতে অভিনয় কোরছেন; যমুনা,
মেনকা, বড়ুয়া, পাহাড়ী, ইন্দিরা, আনন্দেরী,
নেমা, পঙ্কজ, প্রতাপ এবং পূর্ণিমা।

ডাইরেক্টর লাহেব যে সব অভিনেতা বা
অভিনেত্রী এই বইয়ের জন্ত মনোনিয়ন
করেছেন তা ভালই বলা চলে। তবে
একমাত্র 'ইন্দিরা'র ভূমিকায় যমুনার পরিবর্তে
অন্ত কোন অভিনেত্রীকে নেওয়া উচিত ছিল।
ইন্দিরা চরিত্রটি আমরা যতদূর জানিতে
পেরেছি তাতে যমুনা একেবারে অচল হ'বে
বলেই মনে হয়। কতৃপক্ষ যদি এ বই-
খানিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে চান তবে
ঐ রোলটি নিশ্চয়ই বদলাবার চেষ্টা করবেন।

ছবিখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর কোরে গঠন
করবার জন্ত ২৫০ টি ডিওর কর্মসচিব জোটায়ে

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চ

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

বাস্থ্য অক্লান্ত পরিশ্রম কোরেছেন। আমরা তাঁর সর্বাকীন লাফল্য কামনা করি।

* * *

প্রথমতঃ আশ্রয়ে এসেও লক্ষ্যায় জীবনে শান্তি কোথায়? অদৃষ্টের এ কী নিষাকরণ পরিহাস! স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়েও সে স্বামীর লবন্ত অন্তঃ-আত্ম তার দারিত্রের চিন্তায় সমাচ্ছন্ন হোয়ে আছে—তার জীবনে এ বর্ষাস্তিক গ্রহণ কেন? প্রিয়লাল তার স্বামী, অথচ লম্বাজের চোখে, তার লম্বান বাঁচাতে জাহির কোরতে হ'চ্ছে—সে প্রথম নাথের গৃহিনী!

এই নাটকীয় বাত-প্রতিবাতের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যায় জীবনে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত হোল—গত লপ্তাহে এক নম্বর টিভিওতে পরিচালক 'প্রফুল্ল রায়' তারই অংশগুলি নিপুণভাবে গ্রহণ কোরেছেন। এই দৃশ্যে প্রথমতঃ প্রভুভক্ত বুদ্ধ ভৃত্য লাহুচরণের ভূমিকায় জনপ্রিয় শিল্পী অহি সান্ম্যালের রূপ-সজ্জা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেবে।

সর্জনীন বিবাহোৎসব

গেল হপ্তায় সর্জনীন বিবাহোৎসবে—'র যে মজার দৃশ্য তোলা হ'য়েছিল, সে' খবর আমরা পাঠকবর্গকে যথাসময়ে জানিয়েছি। এ হপ্তায় তার পরের ঘটনা যা' সেলুলয়েডের ভেতর তোলা হ'য়েছে সেটি আরও বৌতুক-প্রাণ। বনলতা (বীণা) শ্রীমতীর (সাবিত্রী) ঘরে ঢুকেই দেখল তারই কাপড়-চোপড় গহণা ইত্যাদি পরে একটি পুরুষ বিদ্য মেয়ে লেজে তারই রুগিণী শ্রীমতীর বুক দেখছে; আর শ্রীমতী তাকে 'বনলতা ভেবে তার গলা জড়িয়ে ধরতে আর বেচাণী প্রাণধন নারীর পরশ পেয়ে উঠছে শিউরে শিউরে। এমন সময় দেখানে বনলতাকে দেখে প্রাণধনের প্রাণ খাঁচা ছাড়া হ'ল। সে অমনি বনলতাকে বলে "চলুন আপনার বাড়ী যাই, মিঃ চৌধুরী (হরেন মুখার্জি)

সবক্কে একটা খবর আছে। মিঃ চৌধুরী ও মিস্ শেকির (উষা দেবী) নাম শুনেই বনলতা একটু ঔৎসুক্য প্রকাশ কোরে বলল— "আচ্ছা চলুন"। যাবার সময় কেবল শ্রীমতীকে বনলতা বলে গেল—"কারবলিক এলিডে ঠোট জোড়া ওয়াস্ কোরে নিও—ও মেয়ে নয় পুরুষ!" শ্রীমতী তাই শুনে রাগল না হাসল, তা' বলা শুরু! শুধু সে বলল— "আহ, সুন্দর পুরুষের স্ত্রীমণি হেঁচের পরশ এখনও যে আমাকে মাতাল কোরে রেখেছে। বনলতা বললে—"চোরের পরশেই তুই হ'লি

পাগল। শ্রীমতী গদগদকণ্ঠে বললে "নাথ, শ্রীকৃষ্ণ যে চোবচুড়ামণি ছিলেন, তাই 'স্ত' তিনি পুরুষোত্তম—আর তাই ত' বৃন্দাবনের মেহেরা তারই পরশ পেয়ে হ'ত চকল।

এদিকে বনলতা প্রাণধনের "কাছে আত্মপাস্ত লব কথা শুনে বললে—"তোমার ঐচ্ছ আমাকে মিঃ চৌধুরীকে হারাতে হ'য়েছে। কতিপূরণ স্বরূপ আমাকেই তোমার জীবনের সঙ্গিনী কোরতে হ'বে।" প্রাণধন ত' মাথায় হাত দিয়ে বলল—এ আবার কী মু'ঙ্গল! শেষে প্রাণধন অনেক

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের প্রথম বাঙলা বাণী-চিত্র 'হাল-বাঙলা'

শীঘ্রই উত্তর কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে— নিত্য পরিচয়ের ফলে সমাজের যে সকল বিকৃতি ও অসঙ্গতি আমাদের আর চোখে পড়েনা—সেইগুলিকে উপলক্ষ করিয়া যে হাঁসির প্রবল বন্ধ্যা সৃষ্টি করা যায়, আবার তাহাতে ভাসা-ইয়া কিক্রমে আপনাকে চিন্তাসমুদ্রের উপকূলে আনিয়া ফেলা যায়—

'হাল-বাঙলা'

সেই রস ও রহস্যের অপরূপ চিত্র-কথা

নিশিষ্ট একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্জন পরিচিত হাস্যরসাতিনেতা

শ্রীরেন গাঙ্গুলী

• ইহার নায়িকা—ছান্সা দেবী

চিত্রটিকে গীতমুখর করিয়া তুলিয়াছেন—

• সুকণ্ঠ-গায়ক—মুন্সাল ঘোষ

অঙ্ক-গায়ক—গোপাল সেন

ভাটিয়ালী গানের মঞ্চ-শিল্পী—গিরীন চক্রবর্তী

সুগায়িকা : বীণা বোস সুগায়ক : মহাদেব পাল

আর আছেন

চিত্র-জগতে নবাগতা

চন্দ্রিকা দেবী

এবং তুলসী লাহিড়ী,

প্রফুল্ল মুখো, সত্য মুখো,

প্রভাত সিংহ, সন্তোষ

সিংহ, হরিদাস চট্টো,

নবদীপ হালদার প্রভৃতি

কষ্টে বনলতাকে রাজী করাল বে' শেকির কাছ থেকে চৌধুরীকে কেড়ে এনে তার সঙ্গেই মিলন ঘটাবে। এমন সময় সেখানে শ্রীমতী এল। তাকে দেখেই বনলতা গেল চটে। সে ভাবলে, শেকি মিঃ চৌধুরীকে কেড়ে নিয়েছে, আবার শ্রীমতীও হয় ক' প্রাণধনকে কাড়তে এসেছে। এদিকে মধুর শ্রীমতীকে দেখে মজল। শ্রীমতীকে তার চাই-ই। এরপর

বিমল+চাঁদেলি, মিঃ চৌধুরী+বনলতা,
মধু+শ্রীমতী, ডাঃ প্রাণধন+কমলা,
ক্যাসারাম+আম্বাকালি।

“সংস্করণীন বিবাহোৎসবে” পাত্র-পাত্রীরা মধনের ফুলশযের ক্রমপে বিদ্ধ হ'ল তাই ‘উত্তরা’র পক্ষীয় দেখবেন শনিবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচারস

‘মধু সাধনার “অভিনয়” শেষ করবার জন্তে কর্তৃপক্ষ হ'য়ে উঠেছেন ব্যস্ত। কিন্তু পাণ্ডুরূপের রঙীন আলোর মায়া মাঝে মাঝে তাদের মনকে কোরে তোলে উতলা— তাই কর্তৃপক্ষের ব্যস্ততা নীরবে উঁকি মাঝে তাদের রঙীন অভিনয়ের মাঝখানে। মধু-সাধনার “অভিনয়” কবে শেষ হবে—তা' হয়ত' লঠিক কেউ বলতে পারে না। কিন্তু “অভিনয়”-র যবনিকাপাতের জন্ত যেরাও মনে মনে ক্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন, এ ধারণা করা অসমীচীন নয়।

রাশা ফিল্মস

কালী প্রসাধি বোম্বের পরিচালনার “পুরুষোত্তম”-র শূটিং আরম্ভ হ'য়েছে। কালী প্রসাধির ওপর আমাধের আস্থা আছে। বহুদিন পরে তিনি বাঙলাদেশে ছবি পরিচালনা কোরছেন—সেইজন্ত তাকে আমাধা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—বাঙলা ও বোম্বাই সম্পূর্ণ বিপরীতগামী, এ কথা যেন তিনি ভুলে না যান। আর একটা বিষয়,



“টারজন-কি-বেটি” চিত্রের একটি দৃশ্য

তার আমাধা প্রশংসা কোরতে পারছি না—শেটি হ'চ্ছে, নারিকি নির্বাচন। কালী বাবুকে বন্ধুভাবেই এই অবাচিত উপদেশ দিলুম। কারণ, তিনি শুণী—সে শুণের তার যেন অমর্যাদা না হয়।

প্রফুল্ল পিকচারস

নিজের টুডিওতে প্রফুল্ল বোম্বের প্রথম বাঙলা ছবি “লথের স্মিক” প্রায় শেষ হ'য়ে এল। প্রফুল্ল বোম্ব নিজের স্বোপাঙ্কিত অর্থে আজ যে টুডিও গড়ে তুলেছেন—সে টুডিও সকলের শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে উন্নতিপথে অগ্রসর হ'য়ে . বাঙলাদেশে বাঙালীর অন্তিমকে সঙ্গমাণ করুক এই আমাধের একান্ত কামনা।

মেট্রোপলিটান পিকচারস

ডি-জির পরিচালনার “হাল বাঙলা”র

কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। হালির ছবি পরিচালনায় ধীরেনবাবুর বেশ সুনাম আছে—সেইজন্তই মনে হয় এই ছবিখানা মিঃ বেকার নব উত্তমকে জন্মদুক কোরবে। আমাধা যতদূর স্তনেতি নিচক হালিই ছবিখানার মূল প্রতিপাদ্য নয়। হালির ভেতর দিখে শিকার অনেক কিছুই লেখক এই গল্পের ভেতর সর্ববিশিত কোরছেন। এই ধরণের গল্পই অধুনা চিত্রের জন্ত মনোনীত করায় এই প্রুতিষ্ঠানের বর্ষকর্তাদের স্বল্প বিচক্ষিত্তির প্রশংসা করি।

টারজন-কি-বেটি

ভারতের জঙ্গল চিত্রের মধ্যে এই ছবির স্থান লীর্বে। ছবিখানা দেখতে দেখতে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শরীরের ভেতর



“টারজেন-কি-বেটি” চিত্রের একটি দৃশ্য

শির-উপশিরাগুলো হস্তমত চকস হ’য়ে ওঠে। গল্পটি হ’চ্ছে সংক্ষেপে এই—
জঙ্গলের ভেতর মণি-মাণিক্যের সংগ্রহের জন্তু ছ’টি বীর যুবক বেগ ও মজহু ও ছ’টি বদমায়েস দীননাথ ও শাস্তিলালের মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব। ইতিমধ্যে সেই জঙ্গলে পালিতা টারজনের মেয়ের সঙ্গে বেগ পড়ে প্রেমে আর মণিকার রূপে মজে মজহু। বহু চিন্তা-চাক্ষু্যকর ঘটনার বাত-প্রতিবাত শাস্তিলাল ও দীননাথ হয় নিহত এবং বেগ ও মজহু সেই মহামূল্য রত্নের হয় অধিকারী। মজহু মণিকাকে পাশ ও বেগ টারজনের কজাকে লাভ করে। মজহু দেশে ফেরে কিন্তু বেগ সেই জঙ্গলেই তার প্রিয়ভার সঙ্গে রয়ে যায়।

অতিনয়ে বেগের বেগ ও শ্রীমার টারজনের মেয়ে হ’য়েছে চমকপ্রদ। এ ছাড়া জি, এন, ভট্ট, মণ্ট, ও মেনকার যথাক্রমে দীননাথ, শাস্তিলাল ও মণিকা প্রাণেলনীয়। হেরল্ড লুইদের পেলী লকালন জীড়া প্রাণধানযোগ্য। পরিচালনা ভালই বলা যায়। শব্দছব্রীকরণ ও আণেওচিত্র

প্রাণেলনীয়। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই ছবির ‘লোকেশন সট’।

পরিশেষ আরো কিত্য ও কমলা মুভিটোনের কর্মকর্তাদের এই ছবির জন্তু যে অমানুষিক শ্রম স্বীকার করে লাফলা-মণ্ডিত করে তুলেছেন—তার জন্তু দত্তবাহ জ্ঞাপন কৌশল।

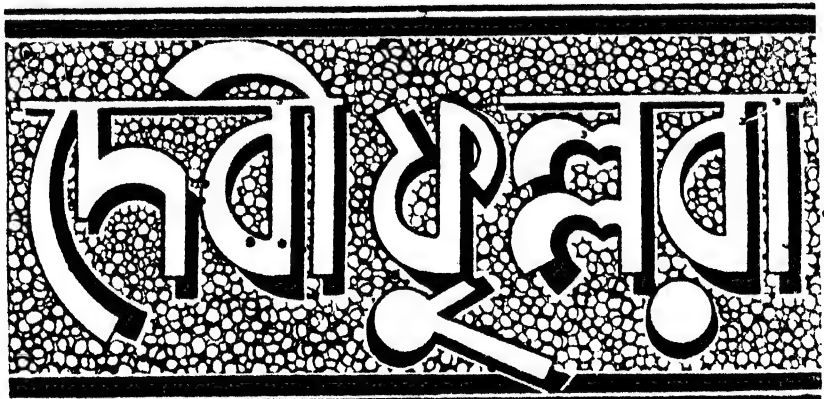
হাজরা পিকচারস্

তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনার “দেবী ফুলবার শূটিং আর্জেকের উপর শেষ হয়েছে। বহিদৃশ্য সমস্তই শেষ হয়েছে। সম্প্রতি রাজপ্রাসাদের দৃশ্যের সেট কারুশিল্পী পরেশ বসুর বহুনায্যাতী তৈরীকী হইতেছে। ছবি থানিকে সর্বোচ্চ মূল্য করিবার জন্তু এই নবজাত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অর্থ ও লামর্থ বায়ে কিছুমাত্র কাপিত্য করিতেছেন না, আমরা এই প্রতিষ্ঠানের লাফলা কামনা করি।

পূর্ণ থিয়েটার

এছের কর্তৃপক্ষরা এই রবিবার থেকে স্থায়ীভাবে সকাল ১১টার সময় এক একখানা কোরে ইংরেজি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। এই রবিবারে এখানে হবে “ক্যাপটেন ব্লাড।” এই ব্যবস্থা কোরে কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের যে বিশেষ দত্তবাহভাজন হ’য়েছেন—একথা বলাই বাহুল্য।

হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন



—শ্রেষ্ঠাংশে—
তিনকড়ি চক্রবর্তী
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

—পরিচালক—
তিনকড়ি চক্রবর্তী

—শ্রেষ্ঠাংশে—
মহীশূর চৌধুরী
শিবদালা

বি বি ধ

শ্রীপঞ্চমী উৎসব

আমরা নিম্নলিখিত স্থান সমূহ হইতে
এবং শ্রীশ্রীমন্তী পূজার নিমন্ত্রণ পত্র
পাইয়াছি।

তরুণ সম্প্রদায়—২১ রূপ নারায়ণ নন্দন
লেন, ভবানীপুর বালিকা শ্রী লজ্য—৪৪নং
মহিম হালদার ষ্ট্রীট, ভবানীপুর এথলেটিক ক্লাব
২০।১ বলরাম বসু ঘাট রোড—বিবেকানন্দ
ক্লাব—২ বি, কাস্টিক বসু লেন, হাতিবাগান
সার্কলন—৬৯ এ ষ্ট্রীট, সুবোধ স্মৃতি লজ্য—
১০২ এ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কালীঘাট
রোড শিল্পী লজ্য ভবন—১৩৩ কালীঘাট রোড,
বাণীমন্দির বালিকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—
২ উইলিয়ামস্ লেন, প্রবাসী বাঙ্গালী
লজ্য—কুপার বিল্ডিং (বোম্বাই), প্যারাডাইস
ক্লাব—১৬ বুদ্ধাবন মল্লিক লেন, ভবানীপুর
লম্বাজ—ভবানীপুর, রূপ বিকাশ ক্লাব
ও কোহিনুর ক্লাব—২৭।১ হরিশ মুখার্জি
রোড, চক্রবেড়িয়া ক্লাব—৩৭।১, চক্রবেড়িয়া
রোড (নর্থ), কিশোর লজ্য—৭নং জনক
রোড, বালক লজ্য—নন্দান পার্ক, ভবানীপুর,
বিদ্যাপুর উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়,
রামকৃষ্ণ মেমোরিয়াল স্পোর্টিং এসোসিয়েশন
সাধারণীপাড়া রোড ভবানীপুর, আনন্দ স্পোর্টিং
ক্লাব—৩নং মোহনচাঁদ রোড বিদ্যাপুর,
বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব—ভবানীপুর।
কবিতার্থে বাণী-বন্দনা সমিতি, বিদ্যাপুর।

স্বাস্থ্যশালা টেলারিং

লক্ষ্য প্রতি দিক ও পশ্চিমের জাতি ইত্যাদি
বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিষ্কার করিবার সুব্যবস্থা
করিয়াছেন। ইহাতে অসুস্থদের মধ্যেই উত্তর
কলিকাতায় এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয়তা
লাভ করিয়াছে।

“ল” কলেজ

আগামী রবিবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী বার্ষিক
অধিবেশন উপলক্ষে ৫ ঘটিকার সময় সেনেট
হলে “ল” কলেজের ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের
“গোরা” অভিনয় করিবেন। শ্রীনরেশজি
মিত্র ইহার পরিচালনা করিতেছেন। আমরা
তাঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

নৈহাটী সাহিত্য সভা

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী নৈহাটী মহাকালীতলা
লক্ষিম-মণ্ডপে মহাপ্রসাদে এক সাহিত্য-
সভার অধিবেশন হয়। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ
সাধক সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
আচার্য্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। শ্রীযুক্ত
শ্রীজীব স্মার্তীর্থ এম, এ মহাপ্রসাদ, পণ্ডিত
রামস্বায় বেদান্তশাস্ত্রী কর্তৃক আনীত সভাপতি-
পদ-প্রস্তাবের সমর্থন কালে শ্রীপঞ্চমীর দিনে
শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাপ্রসাদকে
সভাপতি পদে নিৰ্বাচিত করার উচ্ছ্রাসের
কার্য্যের প্রশংসা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির
সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্য চরণ দে তাঁহার
অভিভাষণটি পাঠ করিলে পর সভার সভাপতি
প্রতিশ্রুতি-বশা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়
মহাপ্রসাদ তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণটি পাঠ
করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীজীব স্মার্তীর্থ এম, এ,

শ্রীযুক্ত ভবতোষ ভট্টাচার্য্য সাংসদীর্থ এম, এ
শ্রীযুক্ত রামস্বায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত
হরিচরণ স্মার্তীর্থ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এতদুপলক্ষে এক
আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। কুমারী
তারার দেবী, শ্রীমান সুরারী বন্দ্যোপাধ্যায়
আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম ও
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কলিকাতার
শ্রীযুক্ত অমল কুমার সাত্তালের প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট
বিবেচিত হওয়ার তাঁহাকে ‘সুসম্মতি পদক’
প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত অতুল্য চরণ দে,
শ্রীযুক্ত অমল কুমার দে ও শ্রীযুক্ত অজিত
কুমার পাল প্রভৃতি মহাকালীতলা স্রাচ্-
সমাজের সভ্যবৃন্দের প্রাণপাত পরিশ্রমে এই
অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়।



প্রফুল্ল পিকচার্সের নবতম নিবেদন—



নির্ম্মল রসিকতার কোঁড়নে সমৃদ্ধ, নবীন যুগের

জটিল সমস্যার সরল সমাধান

প্রযোজনা : প্রফুল্ল ঘোষ * পরিচালনা : নির্ম্মল গোস্বামী

টেলিফোনে আশ্বষাণ

শ্রীমতী সরলা দেবী

তিনদিন ধরে অনবরত বৃষ্টির বিরাম নেই। সমস্ত আকাশটা আকাশে ঘেরের মত মুখ তার করে রয়েছে। কথায় কথায় কান্না ছাড়া সে যেন আর কিছুই জানে না। সামনের খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার বিপরীত দিকে যে লালরঙের তিনতলা বাড়ী, তার ঘোড়ার ঘরের প্রায় সবটাই দেখা যায়। ছোটখাটো জিনিষ পত্তর দিয়ে ঘরখানি অধুনিক কচিল্পন্নভাবে বেশ সাজানো। জানলার কাছে যে টেবিলটা যেথা যাচ্ছে সেটা আবশ্যকীয় এবং অনাবশ্যকীয় কসজ পত্তরে বোঝাই; এবং তার ভেতর থেকে যে ঘেরটিকে দেখা যাচ্ছে, আজ দুপুর থেকে তাকে আর চোরার ছাড়তে দেখা যায়নি। অনবরত সে লিখেই চলেছে। কি লিখছে কে জানে। সময়ের মনটা আজ মোটেই ভাল না। বাহুল্যের দিন। কোথাও বেরোতেও ভাল লাগে না; আর ঘরে বলে বসেই বা কি করা যায়। নাঃ—আজ সে বেরোবেই। কিন্তু, যাবেই বা কোথায়। চিত্রাতে কি একথানা যেন বই দিয়েছে। আজ আবার opening day, টিকিট পাবে তো?—তা বোধ হয় পাবে—ব'হি না পার! নাঃ—একটা কোন করা যাক।

ছালা—Burrabazar 1133—একি—এ আবার কে কথা বলছে—আরে বাঃ—Exchange আবার cross connection দিয়ে বলে আছে। নাঃ—রিসিভারটা রাখতে হোল। ভাইত—এরা এত হাদে কেন। টেলিফোনেই বা এত হাদির মুখ কিলের— কি?—অনেক রাজে বাড়ী

এসেছে— নাঃ—এরা কি বলছে শুনতে হোল। বাইরে তখন জুলাই বেশ জোরে এসেছে। সামনের বাড়ীর ঘেরটি table lampটি জালিয়ে ছিল। সময়ের অঙ্গ রিসিভার রাখা হোল না। ঘেরটি তখন টেলিফোনে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছে।

“নতি নেলি, আজকে এই বাহুল্যের দিনে কি ভাললাগে বলত—কি—যুমোতে?—মোটেই না—তার চেয়ে কাউকে কাছে এনে—কি—ঠাটা; বাঃ—কি সব বাজে বকিল। এই শোন—পরশুদিন prize distribution এর সময় যে গানটি গেরেছিলি, সেটা গানা ভাই। বর্ষার দিনে বর্ষার গান বেশ লাগবে—কি?—ভাল লাগছে না?—কি যে তোর ভাল লাগে!—লক্ষ্মীটি গা ভাই।”

অপরূপ থেকে গেয়ে উঠলো : “বাহুল্য বাউল বাজার বাজার বাজারয়ে।” পরিকার স্বরধরে সুর। সময়ের মনে হোলা লাগলো। সামনে বাড়ীর ঘেরটি টেবিলের ওপর থেকে মাথাটা তুলে বাইরের দিকে একবার চেয়ে দেখল। মুখের ওপর যেন চূর্ণকুস্তল এসে পড়েছে, সেগুলি ফুল ফুলে আজুল দিয়ে লরিয়ে ছিল। হুঁজুলের মাঝে ফাউন্টেন পেন গোঁজা। ওকে দেখতে তারী ভাল লাগে। বেশ মিষ্টি। লাইনের ওপারে যে ঘেরটি গান করছে, সেও হরত এরকমেরই হবে। বাঃ—কি চমৎকার গাইবার ভদী। দেখতে বোধ হয় ওর চেয়েও ভাল—টেলিফোনে গানটি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সময়ের মাথা হুটাই মুক্তি পজিরে উঠলো।

স্বপ্নায়ক বলে খ্যাতি তার একটা আছে। সে সুযোগ সে ছাড়বে কেন।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সময় গেয়ে উঠলো : “কণ্ঠে তোমার কি সুর বাজে কবি—” হুঁজুলি গেয়ে সে চূর্ণ করল। ওখার থেকে একজন বলে উঠলো :

এই ভলি আমার গানকে ভেজানো হল। লক্ষ্মীটি বল ভাই, তোর গুণ থেকে যে ভজলোক গাইলেন, তিনি কে—বলবি না? বেশ, কোনদিন ব্যি—

“আমাকে বাগ্না ফিল্মি নেলি। নতি করে বল, তুই গাইবার পর কাকে দিয়ে গান গাইয়েছিল। আমি না হয় তোর মত গাইতেই পারি না; বলে—

“তুই পাগল হলি নাকি? নতি বলছি আমার কাছে কেউ নেই এবং কেউ গায়নি।”

“তবে?—

সময়ের তখন বেকার হাদি পেরেছে। ও একচোট খুব হেনে নিল। ওখারে তখন কথা চলেছে :

“নতি ভাই, কি মিষ্টি গলা বলত। বাই বল, তোর গানের চেয়েও ভাল।”

অপরিস্কার মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে। সময় গেয়ে উঠলো : “বাহুল্য রানী, কওগো কথা, কওগো আমার মনে—” সময় চূর্ণ করল।

ওখারে তখন পূর্ণ উত্তম বাবুজি আরম্ভ হয়ে গেছে। হুজনে তখনও ভেবে পড়ে না কে গান গেরেছে।

হঠাৎ নেলি বলে উঠলো :

“ভাই, নিশ্চয় কেউ লাইনে আছে এবং আমাঘের বোকা পেরে মজা করছে। হ্যাঁ, তাহলে আমাঘের নেই কথাগুলিও বোধ হয় শুনেছে! হি—হি—বাই হোক, ভজলোক কথা বলছেন না কেন? Hallo—Hallo—নতি, আপনি বেই হন

কথা বলুন; আমরা মোটেই রাগ করব না। বলবেন না ত? আমরা দুজনে আপনাকে request করছি—please—”

তাইত, কি করা যায়। লম্বা একটু nervous হয়ে পড়ল। এর জন্তে সে মোটেই prepared ছিল না। উত্তর দেন নাকি! দিলেই বা; অজ্ঞারটাই বা এমন লে.কি করেছে। ওখানে তখন request এর হুড়োহুড়ি লেগে গেছে। লম্বা উত্তর দিল:

“হ্যাঁ, আপনারা যা ভেবেছেন, ঠিক। নত্যা,—পরের কথা শোনা অত্যন্ত অজ্ঞার; আমি তা জানি, কিন্তু—”

“এর মধ্যে কিছু নেই। যখন আপনি জানেন যে এটা অজ্ঞার, তখন সে অজ্ঞার—”

“কেন করেছিলার; এই ত বলবেন? আমি ত সেই কথাই বলছিলাম। কতবার চেষ্টা করলাম রিসিভারটি রেখে দেবার। কিছুতেই পারলাম না। নত্যা, কি লম্বা আপনি গান। এই বর্ষার দিনে সন্ধ্যাটি কবির গান সুরসঙ্গীতির কণ্ঠে—”

“তখন শুভুন—আপনার বাক্যোচ্চারণ পরে শুনবো। তার আগে দয়া করে আমার একটা কথা শুনবেন কি?”

“বলুন।”

“প্রথমত: জেনে রাখুন আমরা দুজনে খুব দুখী। আর—”

“দেখুন, আমরা ত মনে হয় না যে আমি আপনাদের বয়স নিয়ে কোন আলোচনা করেছি। আপনারা বুঝাই হোন আর বালিকাই হোন, তার সঙ্গে আমার ত কোন পরিচয়ও হয়নি এবং সে বিষয়ে কোন পর্যালোচনাও আমি করিনি।

আমার পরিচয় হয়েছে আপনাদের লম্বা এবং লাবলীল কথা কওয়ার সঙ্গে; আপনাদের ছোট ছোট হাসির সঙ্গে, আপনাদের কণ্ঠে সুবীজনাধের • যে সুর প্রাণলাভ করে কথা করে উঠেছে তার

সঙ্গে—“খাম্বুন খাম্বুন—যথেষ্ট হয়েছে। আপনি যে খুব কথার জাল বুঝতে পারেন তা আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন আমি যা জিজ্ঞেস করব, দয়া করে তার উত্তর দিবেন কি?”

অপর ঘেরটি বলে উঠলো:

“ডলি! তুই যেন কি; কলেজে প্রফেশনারদের লেকচার শুনে শুনে তোর কথা বলবার ভঙ্গীও প্রফেশনারি টাইপ হয়ে গেছে। তুই লাইন কাট। আমি শুধু সব information নিয়ে পরে তাকে জানাব।”

“তা বলে—”

“আর তা বলেতে” কাজ নেই। তাকে বা বলছি শোন, লাইন কেটে দে—লম্বাটি।”

বট্যাং—বোঝা গেল ডলি নাগ্নি ঘেরটি রক্তমঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন।

“এখন আমরা একা—Hallo—চলে গেলেন নাকি?”

“বাবার লাধ্য কি, লোভ মাছুষের পরম শত্রু। আপনি যা লোভ দেখিয়েছেন আর একখানা গান না শুনে কিছুতেই—”

“আমি যদি না গাই!”

“তাহলে জানবো আমার কপাল মন্দ, এবং শুধু তাই নয়; করবোড়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলব—দেবী, আমি দুখী। তথাকথিত এটিকেট বলে যে জিনিষটি আজকাল অনুরে বাহিরে প্রাধান্য লাভ করেছে, সেটি এখনও আমি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব লাভ করতে পারিনি। অতএব, এবারকার মত আমাকে ক্ষমা করে বিদায় দিন।”

কথার সুরে একটু লাইন ছেড়ে দেবার মত ভাবছিল। “Hallo—Hallo—চলে যাচ্ছেন?—শুভুন, বাজে কথা ছেড়ে দিন। বলুন ত আপনার নামটি কি। আপনার গান এবং কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে

গান শ্রীমতীজ্ঞান মণ্ডল

তোমার দুয়ার বহি বন্ধ হবে

আজ মিলনের রাতে,

কাদবে না কি ওগো প্রিয়

নিখিল বেহনাতে!

মোর পরাণের বেতস্মলতা

কইতে যদি না পার কথা,

মনের বীণা বাজবে তবে

কিশোর সুস্বনাতে!

তোমার পূজায় লাগবো কাজে

আপন মনে ভাবি,

প্রেম-দেউলে বাবার তরে

করেছিলেম দাবি;

ভুল যদি তার করে থাকি

তোমার ক্ষমা মিলবে নাকি?—

ভালবে না কি তোমার আলো

অন্ধ আঁখির পাতে !!

আপনি একজন অভিনেতা। রক্তমঞ্চেরও হতে পারে কিবা ছায়াচিত্রেরও হতে পারে। এখন নত্যা করে বলুনত আমি যা বললাম তা ঠিক কি না।

“কতক ঠিকও বটে এবং নাও বটে। ছায়াচিত্রের বাস্তবিক বা রক্তমঞ্চের নেশা আমার কম বেগী আছে সত্য, কিন্তু এখানে সে কথা আপনার মনে হয় কেন? আমার কথায় কি সেই রকম কোন ভাব ফুটে উঠেছে?”

• “একেবারে না-ই বা কি করে বলি।

আপনার সাধারণ কথা বলবার ভঙ্গী যদি এইট হয় তাহলে নত্যা আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনি একজন দুবক্তা। বাক্য—পরস্পর প্রশংসা আদান প্রদানের দিকে আমাদের আলস কথা হারিয়ে যাচ্ছে।

“আপনার কি নাম এবং কোথা থেকে কথা বলছেন আবারকে আগে বলুন।”

“বেথুন, আমার নাম এবং ধর্ম বলতে একটু nervousness আছে। কারণ, ধর্ম আপনাকে যদি এই ব্যাপারটি আপনার, যাঁরা কিংবা বাবার কাণে ভোলেন, তাহলে তাহুন ত আমার অবস্থাটা কি হবে।”

“আপনি অভ্যস্ত বোকা—sorry—কথাটা মুখ থেকে হঠাৎ slip করেছে—please—হাঁ, যা বলছিলেন—বেথুন, আমার কি খেয়ে ঘেয়ে কাজ নেই যে বাবাকে এই সব কথা বলতে যাব। আর যদিই বা বলি, তাহলে আপনি কি ভাবেন, বাবা লাঠি নিয়ে আপনার বাড়ী ছুটবেন।

খিল খিল করে হেসে উঠল। কি দৃষ্টি হালি; লোকে এমন সুন্দর হালতে পারে! সমরের বৃষ্টি রিংরিংগিয়ে উঠল।
উত্তর দিল :

“না না—তা নয়—তা অবশ্য না হতে পারে। তবে এটা ত দত্তব হতে পারে যে আপনার বাবা বা দাদা আমার একজন বন্ধু। যদি তাঁরা শোনেন এই সব কথা তাহলে তাঁরা আমাকে কি ভাববেন বলুন ত। তার চেয়ে আপনি কেন আপনার নাম আর কোন নম্বরটি আমার বলুন না। আমি তা হলে—”

“না না, সেটা হতে পারে না। কারণ, হাজার হোক আমি একজন মেরেমান্থব। যদি আপনি কোন দিন আমাকে ring করেন এবং অর্ন্ত কেউ ধরে, তাহলে তাহুন ত আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তগবানের নামে পথ করে বলছি, একথা কারও কাছে বলব না। আমি নাহর পরে আপনাকে ring করে—”

“না না ভুল করছেন। আমি ring

করে যদি আপনার গলা না পাই, আপনাকে কি ভাবেন আমি আপনার বাবাকে ডেকে বলব যে আমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি, আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। দত্তা, আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন—”

“না—আপনি নেহাত কথা কাটাবার চেষ্টা করছেন। আচ্ছা, আপনি ত আমার নামটি জেনেছেন। এখন, আমার কি উদ্দিষ্ট নয় আপনার নাম জানা? ঠিকানার কথা না হর পরে আলোচনা করা যাবে।”

“তা। অবশ্য আপনি বলতে পারেন। তবে বেথুন, আমার নাম বললেই আমার address বুঝে বার করতে মোটেই কষ্ট হবে না। লেইজন্ট—”

“কেন আমাকে এইরকম তাড়াচ্ছেন বলুন ত? দত্তা, বলুন না আপনার নামটি কি? বলুন—”

“ওহুন—”

বি, মাম্মা এণ্ড সন্মের কন্সল্টেড আশ্রম গুণাবিশিষ্ট মহোদয়।

কিওলিটঃসালপা

বর্তমান যুগে ইহাই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট মহোদয় সালপা। রক্তপরিষ্কারক, বল, শক্তি ও ক্ষমতাকারক। পারদ ও উপদংশ বিদ্যমান। শুষ্কতার দ্বারা সার্বিক ও বাত দোষের রোগে, নষ্ট খাব্যে, বাতীয় দ্রুতি রোগে এবং বহুপ্রায়ন ও গুল্মি রোগে সমূহের একমাত্র মহোদয়। কোন

ইলেঙ্কো গোড় কিওর

প্রেক্ষত, সার্বিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে; ছাত্র ও ছাত্রী জীবনের একমাত্র পরম সুপদ। মূল্য দেড় টাকা, মাসুলাদি সহ ২০।

গগোরা-বাম

পিল (বাটিকা) বা মিক্চার

এই রোগ সমূহে নির্দল করিতে ইহার আশ্রম আশ্রম প্রদ এই অগ্নাবি বিকৃত হয়। নাই ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

এই গুণ মিক্চার ও পিল দুইরকমের পাওয়া যায়, উভয়েরই মূল্য প্রতি পিণ্ড দুই টাকা; মাসুলাদি সহ ২০।

এজমা-সিরাপ

এই টালের সময়ে বাস প্রকাশের সূত্রসম বহুপ্রায় একদা মাত্র সেবেনই রোগ দূরীভূত হয়। রোগী সুস্থ হয়। মূল্য দেড় টাকা; মাসুলাদি সহ ২০।

এজেন্টস্ :—এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১০ নং, বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা

বি, মাম্মা এণ্ড সন্ম—বামা মেডিকেল হল,

৪নং, গুলু ওজাগর লেন, (পোস্ট বক্স নং ১১৪০২) কলিকাতা

“না, না, না। আমি কিছুতেই স্তনবো না। আপনার নাম না বললে আমি কোন কথাই স্তনব না।”

“আচ্ছা, নাম আমি বলছি, একমিনিট সময় দিন।”

একটা দীর্ঘনিশ্বাস কেলে সে বলতে আরম্ভ করল:

“দেখুন, নাম আমি বলব। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাদের জন্মের পরিচয় হল শুধু কথা এবং নামের মধ্য দিয়ে। আর কোন পরিচয়ই থাকে না। টেলিফোনের রিসি-ভারটি হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন আমাদের জীবন মরণ—কাঠি। হাত থেকে নামাবার সঙ্গে সঙ্গেই হবে আমাদের পরিচয়ের মৃত্যু। জীবনে হয়ত আর কোনদিনই আপনার সঙ্গে কথা বলবার বা আপনার গান শোনবার সুযোগ পাব না। শুধু এটুকু কথাই মনে হবে যদি জানতে পারতাম আপনার ঠিকানা যদি সুযোগ পেতাম আবার আপনার গান শোনবার। কতদিন বাঁচবো জানি না। হয়ত কোনদিন আপনার দেখাও পাব না। যদিও বা পাই কোনদিন কোনখানে, বুঝতেও পারব না যে ইনিই আমার টেলিফোনের পরিচিতা, এরই কণ্ঠের স্বর আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভেবে দেখুন ত’ এর চেয়ে বড় দুঃখ আর আছে? গান হয়ত গাইতে আমি ভাল পারিনি, কিন্তু গান আমি ভালবাসি। পৃথিবীর মধ্যে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অর্পণ হল গান। ইহেন্দ্রিন জীবনে অনেক ঘটনাই হয়ত

জ্বরে রেখাপাত করে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে; কিন্তু কোন কারণেই বধন মানুষের জ্বরে আঘাত করে, তখন মানুষ নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলবার মত হয়। যাক, আর কোন পরিচয়ই বধন আপনি যেবেন না, তখন আর কি হবে। জীবনে মানুষ অনেক কিছুই চায়; সবই কি সে পায়? আজ এই আশ্বিনটার বন্ধুত্বকেই আমি আমার জীবনের একটি চরম পণ্ডা বলে মনে করব; আর—”

“থানুন থানুন—please—উঃ—আপনি কি ভীষণভাবে কথা বলতে পারেন! আমাকে আপনি—যাক—হ্যাঁ—আমি আপনাকে বলব—বলব আমার নাম’ ঠিকানা, পরিচয়, যা কিছু। সত্যি আমি বলব। আমার কিশাল করুন, আমি বলব; তার আগে, দিন আপনার পরিচয়—হয় করে—please”—

বেশ বুঝতে পারা গেল, একনিশ্বাসে কথাগুলি বলে কেলে সে হাঁপাচ্ছে। সময় তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

“দেখুন, আমার ভুল বুঝবেন না—নাম আমি বলছি; আমার নাম—”

“হ্যাঁ আপনার নাম—?—বলুন—আঃ—হয় করে খামবেন না বলুন—”

“আমার নাম—”

হঠাৎ টেলিফোনে ঘটায় করে একটা শব্দ হল।

সময় টেঁচিয়ে উঠল:

Hallo—Hallo—তুমুন—তুমুন আমার নাম—আমার নাম সময় রায়—বলরাম বের ষ্ট্রাটে থাকি—Hallo—তুনছেন—উত্তর দিচ্ছেন না কেন—আমার ভুল বুঝবেন না—Hallo—।”

কোন উত্তর নেই। বোধহয় exchange লাইন কেটে দিয়েছে; কিম্বা—নাঃ—তা সম্ভব নয়। সময়ের চোখছোটো ভিলে উঠল। কেন—কে জানে!

বাইরের আকাশ তখন আরও কালো হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি আর ঝড়ের মাতামাতি যেন বেড়ে গেল। নামনে বাড়ীর মেরেটির হাত লেগে হঠাৎ table lampটি টেবিলের ধার থেকে মাটিতে পড়ে উল্টে গেল। ঘর অন্ধকারে ভরে উঠল।

মেরেটির মুখ আর এখন দেখা যাচ্ছে না।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টঙ্গের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিপুল পানীয়



দুর্ভিক্ষ এবং শীর্ণ শিশুদের

ডোঙ্গরের

বাল্যমৃত

সেবনে

অবিলম্বে সুস্থ ও

সবল হয়।

বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

কল্যাণ

[সামাজিক উপদ্রাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ধীরে ধীরে তাহার নাক দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। তাহার ইতিহাসের পশ্চাতে যে একটা গভীর রহস্য বর্তমান আছে তাহা বুঝিতে ললিতার মাতার বিলম্ব হইল না।

ললিতার মাতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন : “কি, তোকে কি তোর স্বামী দেখতে পারতো না !—”

লবঙ্গ হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিয়া বলিল :—আজ ভরা লক্ষ্যাবেলার ওলব কথা থাক্ মা ! আচ্ছা মা, তোমার ঘরের বাড়ীতে কি ক’রে থাকা যায় বলতো ? একটা শাখ নেই যে লক্ষ্যাবেলার বাজাই ! একটু গোবর তা পাবার যো নেই ! হিন্দুর বাড়ী এলব না হ’লে যে অবলাগ হয় !”

ললিতার মাতা হাঁসিয়া বলিলেন : কি জানিস্ লবঙ্গ ? ওরা অনেকদিন বিদেশ কাটিয়ে কাটিয়ে, হিন্দুর নিষ্ঠে কিস্তে সব ভুলে যেতে বসেছে। বেশেতো যেতে পারনা, আর পাঁচটা পাঁচরকম দেখতেও পারনা। জামাই চাকরি করে, বেশবিদেশেই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একটা স্থিতি স্থাপক তো আর নেই !

—কিন্তু আমি এসব দেখতে পারিনা মা, বাই বলো ! লক্ষ্যাবেলার শাখ আজাবো না, এই বা কি কথা ? ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবে কি করে মা ?

—তাত্ত্বিক কথা ! বিচাকরের ঘর কেউতো দেখেনা ! যে ঘর আগন, আগন ! ভুই মা যে ক’দিন আহিস্ একটু শুধিরে পাড়িয়ে যে !

—কি যে কোথার আছে, তাওতো বুঝতে পারিনে ! ঘর কত্বে যে সব জিনিষ বরকার, তার কোথার কিবে আছে, না পারে বলতে চাকর, না পারে ঝি ! ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলে সে এমন একটা উত্তর দেয় যে বুঝতে পারে কার সাধ্য ! এমন ক’রে কি করে কি হয়, বলতো মা !

—ওই দেখে শুনে নাও বাছা ! আর কি বলবো ! আমার মেয়েতো সুস্থ নয় ! অস্থখে অস্থখেই তাকে খেলে ! এবার আবার যে অস্থখ ধরছে, তাতে যে ও রেহাই পায় তাতো বলে মনে হয় না ! কাল ডাক্তার কি বললে, সব শুনলে না !

—দ্বিবি ভাল থাকলে কি আর লক্ষ্যের এমন অগোছালো হয় ! ঐখানেই তো গলব যা ! আচ্ছা ! দ্বিবি ভাল হন, তা’হলেই আবার সংসারের ছিরি ফিরে আসবে !

—তবু আমার ঘরে এই অস্থখের ওপরই জামাইএর খাওয়া বাওয়া, জলখাবার তৈরি সব তদারক করে ! হুপুরবেলা নিজে উঠে ঠাকুরকে দিয়ে সুচি, হুকা, মোহনভোগ সব তৈরি করায় ! ঐ জন্তেই তো ও দেরে উঠতে পাচ্ছে না !

—আচ্ছা, ওগুলো আমার ওপর তার বেওনা মা ! আমার জে এখানে কোনও বাধাধরা কাজকর্ম নেই ! দ্বিবির কাজটাই না হয় কিছু কিছু করি !

—সে তো ভাল কথা ! আচ্ছা আমি নলিকে বল্চি ! হুপুরবেলা তুমিই না হয় জলখাবার তৈরি তদারক করো !

—আমার তো আগন্তি নেই ! তবু দ্বিবির মত হলে হয় !

—পঞ্চম পরিচ্ছেদ—

লক্ষ্যাবেলার ঘটির উপায়ে ললিতা শরীরটা ভাল ঠেকিতেছিল না ! নীরব বাবুও বৈঠকখানার বলিয়া বদ্ধ বাকবধে সঙ্গে ভাল খেলার মতিরাহেন ! কাজেই ললিতাকে লক্ষী খুজিতে হইতেছিল !

ঝিকে দুহিরা ডাকাইয়া লবঙ্গের সহিত সে গল্প জুড়িয়া দিল !

• —চুড়ুড়া লহরটা তোমার কেমন লাগচে ?

—ও ! এ লহরটার নাম বুঝি চুড়ুড়ো ?

—হী ! কোথার এসেছো, তার নাম তুমি জানো না ?

—জানবার বরকার হয় নি ! মা ! সঙ্গে এসেছি ! মা যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই আসবো !

• —তোমার মাতৃভক্তি প্রশংসনীয় ! কি মাতৃভক্তির শ্রীচরণে কি মাতৃয়ের সাধার জানেছাটাও অঞ্জলি দিয়েছ ?

—এক রকম তাই বই কি ! সেখানে জান কোনও উপকারে আসে না, সেখানে জানটাকে বাড়িয়ে মনের বোঝা বাড়ান কেন ?

—“জান কখনও মনের বোঝা হ’তে পারে ?”

—তা জানিনে তাই ! তবে যাদের পৃথিবী—স্বামী পুত্র কন্যা নিরেই নীমাবদ্ধ, তাদের কাছে বেশী জান একটা যন্ত্রাট !

—স্বামী আছেন ?

—নিখের নিছর দেখেই বুঝতে পারছো !

তা বটে ! আমার ওটা ভুল হয়েছ ! কিছু মনে করো না তাই ! একলা একলা থেকে থেকে, কার কি থাকা উচিত তাও ভুলে যেতে বসেছি ! হেলে পূলে কিছু হয়েছে ?

—হ’লে লড়েই থাকতো !

তা বটে ! এটাও আমার আর একটা ভুল !

—এ রকম ছোটখাটো তুলে মহাত্মারত
অপেক্ষ হয় না। মাছুষ তো আর সব
সময় সব বিষয় বেখে শুনে কথা কহিতে
পারে না।

—কিন্তু তাই উচিত। নইলে অনেক
সময় লোকের কাছে অপ্রস্তুত হ'তে হয়।

—আচ্ছা আমার কাছে তোমার
অপ্রস্তুত হতে হবে না। আমি সেটুকু
অন্তর তোমার দিচ্ছি।

—তোমার স্বামী কি করেন, 'তাই'?

—আমার স্বামী খান দান বেড়িয়ে
বেড়ান।

—কিছু কাজ কর্তব্য করেন না?

—করেন বৈ কি! পাড়ার লখের
বাজার হল আছে তাইতে রাজা লাজেন,
আর বাড়ীতে এল অরক্ষণ করেন।

—জমিদারী আছে বুঝি?

—আছে বৈ কি! তবে লজীব
জমিদারী।

—তার মানে?

লবঙ্গ ওষ্ঠাধরের কোণে আর একটু
হাঁসিল। বলিল: "লোকের জমিদারী
থাকে বড় বড় পরগণা। যার খুব ছোট
জমিদারী, তারও থাকে ছ'পাঁচ বিঘে
জমি। কিন্তু আমার স্বামীর জমিদারী,—
বড়ই বুলো আর ছোটই বুলো,—মাঝ
লাড়ে তিন হাত লম্বা আর জোর এক
হাত চওড়া। লোকের জমিদারী কথা
কর না, আমার স্বামীর জমিদারী কথা
কর। লোকের জমিদারী নড়ে চড়ে
বেড়ায় না। আমার স্বামীর জমিদারী
পারে হেঁটে বেড়ায়।

—এ যে বেশ একটা হেঁরাণি দেখছি!

লবঙ্গ বেশ গভীর হইয়াই বলিল:
হা, হেরালি বই কি? তুমি ত দ্বিবি
ছোট। ইংরিজি পাশ দিয়েচো, অনেক
লেখা পড়া শিখেচো, একজন হাকিম
তোমার স্বামী...আচ্ছা আমার এই
হেরালিটার উত্তর দাও দিকিন।

ললিতা লবঙ্গর কথা শুনিয়া তাবিত
আরম্ভ করিল। চুপ করিয়া খানিকটা
সময় তাবিল; একটু পরে বলিল:

—"হয়েছে! তোমার হেরালির মানে
হচ্ছে এই যে তোমার স্বামীর জমিদারী
কিছুই নেই! আছে কেবল একটি লাড়ে
তিন হাত লম্বা ও একহাত চওড়া টাকার
খলে।

লবঙ্গ বলিল: টাকার খলে কি কথা
কর দ্বিবি?

—কিন্তু নড়ে চড়ে ত বেড়ায়।

—দবঙলো ত দিললো না। তবে
কি করে হেরালি ভাঙ্গা হলো?

ললিতা বলিল: আচ্ছা, আর একটু
ভেবে দেখি। হেরালিটা বেশ রকমারি
বটে!

ছইজনেই খানিকক্ষণ চুপ। শেষ নীরবতা
ভঙ্গ করিল ললিতাই। বলিল: ঠিক ধরতে
পারলুম না তাই?

লবঙ্গ বলিল "এটা আর ধরতে পালে
না। আমার স্বস্তর মশাই মরবার সময়
ছোট ছেলেকে হুচায়ে পরিমাণ জমিও দিয়ে
যেতে পারেন নি। তার কারণ আর
কিছুই নয়, তাঁর নিজের কিছুই ছিল না।
তার পরিবর্তে দিয়ে যান এক লাড়ে তিন

হাত লম্বা আর একহাত চওড়া মাছুষ
তাঁর বড় ছেলে। এই বড় ছেলেটিই আমার
স্বামীর জমিদারী। অর্থাৎ আমার তাম্র
কোদাল পেড়ে রোজগার করেন, আর
আমার স্বামী বলে বলে তাঁর আয়ের
ভাগ বানান।

—ও হরি! তাই বলেছিলে লজীব
জমিদারী?

—হাঁ! শুধু লজীব নয়, লবাক্ এবং
লচল।

ললিতা একটু হাঁসিয়া বলিল: জমিদারীই
বটে! আমার একটি বেগর আছে,
নেটিও এই রকম জমিদারী ভোগ করে।
তাকে বেখতে পাবে ছচারদিন পরেই।
গেছেন বুঝি কোথায়,—বলেও যান নি।
তা, সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে।
এয়া যদি কোনও কাজকর্ম করে যেন,
সেদিকে মোটে খেয়ালেন না।

লবঙ্গ বলিল: আমার স্বামীরও স্বাধীনতা
যথেষ্ট। যেখানে নিজের পোটের তাত
নিজে রোজগার কর্তে হয় না, সেখানে
স্বাধীনতাও চারটে ঠ্যাং তুলে লাকিয়ে
বেড়ায়।

—তুমি স্বস্তর বাড়ী যাও না?

—দ্বিবি। তুমি আমার এমন একটা
প্রশ্ন করে বললে, যার উত্তর দিতে গেলে,
বুকের রক্ত পর্যন্ত শুকিয়ে যাবে। বলছিলাম
না, আমার স্বামীর স্বাধীনতাটা খুব বেশী।
সেই স্বাধীনতার যতখানি উপচে পড়ে,
ততখানি দিয়ে দিয়েছেন আমাকে...জন্মের
মতো!



ইন্দিবিম্বাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শব্দচন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীমদ্বীক্ষনাত্ম চক্রবর্তী

হে বাণীর বরপুত্র! হে বজ্র-সন্তান!
হাসিমুখে আজি তুমি বাহি নিলে স্থান .
স্বর্গ-লোকে, হে মরমী! হে শিল্পি দরদি!
হে বজ্র জননীর অঞ্চলের নিধি—
চ'লে গেলে নিত্যধামে কাঁদিয়ে সব্বারে,
যাহা যায় যায়!! তারে কে ফিরাতে পারে।
নশ্বর দেহ সে তব হ'য়ে গেল লীন,
হে শিল্পি! কখনও যা' হয়না বিলীন
অমর করিয়া রাখে; সে যশঃসৌরভ
ছড়িয়ে পড়িবে দিকে দিকে, .গৌরব
হ'বেনাক স্নান, তোমার অমর দান
রহিবে অক্ষয় হ'য়ে, নারী সে যে তুচ্ছ নয়;
বিশ্বসাথে তাহারে করলে পরিচয়
অকুণ্ঠ দরদে, স্বার্থাক্ত মানব-চিতে
লিখাইলে অবহেলে স্বার্থ বলি দিতে,
অন্ধ সমাজের বুকে ছেলে দিলে আলো
সত্য তুমি স্বদেশেই বেসেছিলে ভাল'
অস্তুরে বাহিরে, সমাজের লক্ষপাত—

নির্যাতিতা রঙ্গীর তীব্র আর্তনাদ,
তুমিই শুনিয়াছিলে অন্তর ভরিয়া,
তাই তুমি বেদনার লেখনী তুলিয়া
আঘাত করিলে ভিক্র বাঙ্গালীর চিতে।
নারীত্বের অপমান পার'নি সহিতে
চুপে চুপে, সন্তানের তীব্র অভ্যাচার,
সমাজের বুকে বুকে শত ব্যভিচার,
প্রকাশে দেখা'লে আঁকি লেখনীর মুখে
হে বীর! নির্ভীকচিত্তে বিশ্বের লঙ্গুখে।
সত্যের গাহিতে জয় লিখা'লে সব্বারে;
তোমার অক্ষয় কীর্তি র'বে চিরতরে

*

চির হাস্যময় তব সৌম্য মূর্ত্তিধানি,
চিরদিন 'অমলিন' র'বে তাহা জানি;
অকাল-প্রয়াণে তবু, হে রক্ত-তাপস!
জদি উষেলিয়া উঠে নাহি মানে বশ।
ক্ষুদ্র অর্থ্য নিবেদিয়া ধন্য চিন্তা মম,
হে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রথী হে অন্তর-ভদ্র!!

—তা নেতো ভাল। পাড়ারগারের
লোক হয়ে জীকে দেখানে যতদিন ইচ্ছে
থাকতে বিরহেন।

—হাঁ, একরকম খুবই ভালো। বির
করা পরিবারকে তাত কাণ্ড দিয়ে পুতে
হয় না, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে
পারে? জী পরের দরজার ভিত্তি করে
খায়, এর চেয়ে লক্ষ্যনের সুবিধে স্বামীই
বা কি হতে পারে, আর জীই বা কি
হতে পারে?

যাকে নিজের উদর পুষ্টির জন্য নির্ভর কর্তে
হয় স্বামীর উপর, সে যে জীকে কতো
খেতে দেবে, বুঝতেই পারছে।

—তাহ'লে তোমার কি ক'রে চলে?
—বিধি? এ পৃথিবীতে কারুর চলে
না, এমন কোনও জীব দেখেছো? যে
অতি ক্ষুদ্র জীব, সে কোন দিন
উপবাসে থাকে?

—তোমার ইতিহাস বাস্তবিকই ঐতিহাসিক।
ললিতার রক্ত মুখখানির উপর লহু-
ভূতির ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ললিতা - খানিকটা খানিকটা জিজ্ঞাসা
করিল: তাই বুঝি তুমি' মায়ের কাছে
এলে পড়লে?

লবঙ্গ বলিল: আর কি করি? স্বামী
যখন তাড়িয়ে দিলেন...তাহারও যখন উচ্য-
বাচ্য করলেন না...তখন বাপের বাড়ী
এলাম। কিন্তু অনাধিনী যেখানে যায়,
সেখানেই হরদুট তার পিছন পিছন গিয়ে
হাজির হয়। বাপের বাড়ীতে আশার
পরই বাঁবাও গেলেন যায়। বা আগেই

যেদের দুর্দশা, বেখবার লৌভাগ্য এড়িয়েছেন।
কাল্পেই আমি হয়ে পড়লাম তাই এর
গলগ্রহ। তাই এর কোনও দোষ নাই,
সে তার অনন্তের অর্ধেকটা আমার হিতে
রাজি ছিল। কিন্তু আমার যুগা এলো
এই চিরভিক্ষুক জীবনধারার ওপর। পাড়ার
এক লম্বয়দীর কাছে শুনলাম, তোমার
মা কালীতে একজন রাবুনি বাসনী খুঁজছেন।
এলে লুটিয়ে পড়লাম তাঁর পার।”

—তা সেই ভাল। মায়ের কাছেই
থাকো। মা কাঁককেই অবর করেন না।

—আমার পূর্ব জন্মের বোধহয় এইটুকু
পুণ্যের জোর ছিল, তাই লবঙ্গুখে বঞ্চিত
হয়েও মায়ের স্নেহ আবার কুড়িয়ে পেলাম।
আমার নিজের মা নেই; কিন্তু নিজের
মাও বোধহয় এতো অভাবহীনতার মধ্যে
আমার রাখতে পারতেন না।

—মা'র কাছে তোমার কি কি কাজ
কর্তে হয়?

—কিছুই নয়। বামী পরিত্যক্তা মায়ের,
মায়ের কাছে থেকে বড়টা কাজ কর্তে
হয়, ততটাই। তার একটুও বেশী নয়।

—রায়াবান্না কর্তে হয় বৃষি?

—তাও লবটা নয়। মা'ই প্রায় সব
করেন। উনি নিজে রাখতে বড় ভাল-
বালেন। আমি ওই তত্ত্বাবধকের কাজ
করি আর কি।

—পুজার বোগাড়টাক্ত করে হিতে
হয়, বোধহয়?

—কিলেরই বা পুজোর বোগাড়! মা
গজাজান কর্তে গিয়ে নিজেই ফুল বিঘপজ
লব বোগাড় করে আনেন। উনি বড়
স্বাধীনচিত্ত লোক, পরের ওপর মোটেই
নির্ভর কর্তে চান না।

—কতদিন মায়ের কাছে আছো।

—অনেকদিন। প্রায় তিন বছর।

—এত দিনের ভেতর বামী কিছু নামটান
করেন নি?

—না; এতটা আত্ম-অবমাননা বোগা
লোক তিনি নন। বিয়ে করা পরিবারের
খবর নেওয়া, নেটা তিনি যুগার কাজ বলে
নেন করেন।

—তুমি লতিয়ে অভাগাবতী, লবঙ্গ।
আমার বহি এমন হতো, তাহলে,—”

—“গজার ললে কুবে মরতে! এইতো!
না, আমি নেটা পারিনি। ভগবান্ অনেক
লক্ষণকি দিয়েছেন, তাই তাড়িয়ে তাড়িয়ে
লংলার বাবা চালিয়ে যাচ্ছি। অভায় কর্তি?
তা হরতো কর্তি! কিন্তু তবু লোভ হয়, এই
হ্রস্বহার বোড় কতদূর পর্যন্ত চলতে পারে,
তাই বেখতে।

—এ বেখার কি স্ত্রুথ আছে?

—না নেই। কিন্তু কোতুলল আছে।
কোতুললও মৃতন একরকম অমৃতুতির স্রষ্টি
করে।

—তোমার মনের জোর আছে, তাই
পারছো। কিন্তু লকলেতো তা পারেনা।

—পারেন না; কিন্তু আমি পারছি।

বারান্না লংলয় গৃহ হইতে কাহার পদ
লক্ষ আলিল।

ললিতা চিনিতে পারিল কাহার পদশব্দ।
বাহিরের ঘরের তাশখেলা শেষ হইরাক্তে, বঙ্গ
বাকব উঠিয়া গিন্নাকে, নীরব বাবু উপরে
আসিরাছেন খাওয়া দাওয়া করিতে।
অলক্ষ্যে এত রাজি হইরা গিন্নাকে, ললিতা
কি লবঙ্গ কেহই জানিতে পারে নাই।

—বঠ পড়িচ্ছে—

এক লপ্তাহ বাইতে না বাইতেই ললিতার
মাতা ললিতাকে আসিয়া বলিলেন: ও
নলি! আমাকেতো বাছা এইবার বেতে
হয়। আর কতদিন থাকবো বলা।
তোমাদের এই নৈরেকার লংলারে কারেভের
ঘরে বিধবার কি বেশীদিন থাকা চলে?
আমার পুজা আচ্ছা আছে, মহাদেবের
মাথার দুটা বিধগুত্তর বেওরা আছে,—নে

লব এখানে ভাল শুদ্ধভাবে হয় না! তুমি
বাছা বলা, আমি না হয় জন্তবাহাকে লকে
করে আপনায় ডেরার গিয়ে উঠি।

—কোথার বাবে মা? কালী?

—তা আর পাপহুখে বলি কেনন করে?
বাবা বিখনাথ কি আবার দয়া করেন?

মাতার কথা শুনিয়া ললিতা আকাশ
হইতে পড়িল। বলিল: ওমা, সে কি
কথা!

—আর বাছা! তোমার অমৃতুখে দেবা
শুভ্রবা করি, নেটা কি আমার অনিচ্ছে?
কিন্তু কি কর্তো? লংলারে আর জড়াতে
চাইনে নলি। যে কটা দিন বেঁচে থাকি,
বিখনাথের পারেই থাকতে চাই।

—তারপর আমরা? আমরা কার কাছে
থাকবো মা?

ললিতার মাতা জগন্নারায়ী একটু
হালিলেন। বলিলেন “তুমি কি ভেবেছো
যুড়োমা চিরকাল তোমাদের আগলে আগলে
রাখবে? এমন লোন্সামী মরছেন, উনিই
বেখবেন। আমি যুড়ো হয়েছি, আমি আর
কতকাল কর্তো।”

ললিতা বলিল: “মা! তুমিও
আমাদের ছেড়েই দিয়েছো! বাবা মারা
যাওয়া অবধি তুমিতো একরকম সন্ন্যাসিনী
বললেই হয়! বাবা এত ডাকাডাকি করেন,
তুমি তা কাণ পেতেই শোনোনা! আমার
ওপর তবু তোমার একটু মায়াবরা বেশী বলে
হুদিনের জন্তে এখানে আমাকে বেখতে
এলেছো। এর ভেতরই ‘বাই বাই’ কলে
চলবে কেন মা?”

ঠিক এমনি সময় নীরব ঘরে চুকিল।
সে জিজ্ঞাসা করিল “কার বাওয়ার কথা
হচ্ছে।

ইহার উত্তর ললিতা বলিল। সে চুপ
করিয়া শুইরা রহিল। বনটা যেন তারি
ভারি।

(ক্রমঃ)

ভিতরের কথা

মাজুকের চোখে জল আসে কখন ?

হুঃখের আবেগে কিবা বিষম স্রুথের
লম্ব। অভিনয় কালে চোখের জল
বেখাইতে হইলে লাবারপতঃ কৃত্রিম চোখের
জলই বেখান হইয়া থাকে। কিন্তু যে
অভিনেত্রী অভিনয় করিবার লম্ব লতাকার
চোখের জল বেখাইতে পারেন—তাঁহার
ক্ষমতা আছে, ইহা স্বীকার না করিয়া
পথ নাই।

“বেশের মাটি”র একটি চিত্র গ্রহণ

দেখিতেছিলাম। সেটে ছিল চন্দ্রাবতী।
তাঁহার মুখ গম্ভীর—চিন্তাময়ী। পরিচালক
দ্বারা দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে
তাকাইয়া আছেন। এইভাবে প্রায় ১৫
মিনিট কাল থাকিবার পর—হঠাৎ অবাক
হইয়া দেখিলাম চন্দ্রাবতীর চোখ দিয়া জল
ঝরিতেছে! যে ঘটনাটি চিত্রে তোলা
হইতেছিল—তাহা অরুণার জীবনে হয়ত
এক মহা পরিবর্তন আনিবে। যে স্রুথের
কল্পনা সে আজীবন করিয়াছে, তাহা
হয়ত প্রবীণের আলোর মত স্বীকা হাওয়ার
নিভিন্না যাইবে! চিত্রের ভূমিকায় সকল
হুঃখ নিজের লতাকার জীবনের জিনিষ
বলিয়া, অন্তত সাময়িক ভাবে, গ্রহণ
করিতে পারিলে—অভিনয় আর অভিনয়
থাকে না। তাহা জীবন্ত হইয়া ওঠে।

* * *

চন্দ্রাবতীর অভিনয়ে এই জীবন্তরূপ
দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যে (অরুণার)
ভূমিকায় সে অভিনয় করিতেছে, সেই

অরুণার সকল হুঃখ সকল ব্যর্থতা, সকল
নিষ্ফলতা চন্দ্রাবতী নিজের বলিয়া একান্ত
ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাই তাঁহার
অভিনয়ে আজ সকল কৃত্রিমতা দূর হইয়া
তাঁহা অতী সহজ, সরল এবং সত্য হইয়া
উঠিয়াছে। তাই চন্দ্রাবতীর চোখ দিয়া
যখন অশ্রু ঝরিয়া পড়ে তখন আর তাঁহাকে
অভিনয় বলিয়া মনে করা যায় না। সত্যই
মনে হয় যেন চন্দ্রাবতীর জীবনের কোন
এক গোপন ব্যথা আজ অশ্রুর রূপে বিগলিত
হইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

বিশেষী যুবক লায়গল—আজ
কায়মনোবাক্যে বাঙালী হইয়া উঠিয়াছে।
তাঁহার সকল আশা, সকল ভালবাসা, সকল ত্যাগ
অশোকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে।
যে অশোকের ভূমিকায় লায়গল অভিনয়
করিতেছে, বেশের মাটি চিত্রের সেই
অশোক আমাদের কল্পলোকের। বাঙালী
যুবকের রূপ। পীড়িতের সেবার, হুঃখের
লাজাব্যে, শোকার্তের লাস্তনার আমরা
আমাদের বেশের, যাহাদের লম্বুখে দেখিতে
পাই অশোক তাহাদেরই একজন। তাঁহার
শিক্ষা আছে, কিন্তু শিক্ষার অভিমান নাই,
তাঁহার কৃষ্টি আছে, কিন্তু কৃষ্টি গর্ব নাই,

তাঁহার অন্তরে মহান সম্পদ আছে—কিন্তু
সেই সম্পদের গোরবে সে জনগন হইতে
দূরে থাকে না, জনগণের একজন হইয়াই
সে বাস করিতে চায়। এই অপূর্ণ মহান
ভূমিকায় অভিনয় করিতে করিতে লায়গলের
নিজের জীবনেও বহু স্থায়ী পরিবর্তন হওয়া
আশ্চর্য্য নহে।

* * *

দুর্গাধারকে আমরা দেখিতে পাইতেছি
ধনী যুবকের, শিক্ষিত যুবকের, কলকারখানার
বিশ্বাসী। এক যুবকের ভূমিকায়। তাঁহার
অন্তঃ পরিচয়, সে অরুণার দ্বারা। বিলাত
ফেরত। অজয় দেশকে ভালবাসে। বেশের
সকল অস্বাভাব সেও দূর করিতে চায়।
কিন্তু তাঁহার পথ ভিন্নতর। সে বিলাতী
আবহাওয়ার বিশ্বাস করে—এবং সেই মতে
দ্রোণ লেবা করিতে চায়। অজয় অশোকের
বন্ধু। অকৃত্রিম প্রাণ প্রিয় বন্ধু। কিন্তু
আত্মশ্রমের লগ্ন্যয়ে তাঁহার বেশের মাটি
চিত্রে লামনা লামনি দাঁড়াইয়াছে। এক
চায় অন্তকে পরাজিত করিয়া নিজের হাতে
আনিতে, নিজের কর্মপন্থায় নিয়োজিত
করিতে। বেথা যাক—শেষ পর্যন্ত কাহার
জয় হয়—অশোকের না অজয়ের ॥

* * *

উষাকে আজ আর সহজে চিনিবার
উপায় নাই। আজ সে আর চন্দ্রাবতীর
রামানন্দ, ভাগ্যচক্রের মীরা নয়—সে আজ
হুঃখের, অজয়ের বন্ধা। সকল গ্রামবাসীর
নির্যাতিত এক অতি গরীবের একমাত্র বন্ধা।

পাদুকাশিল্প প্রাতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

এ মোর প্রার্থনা

শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর

হে প্রাণেশ! জীবনেতে এ মোর প্রার্থনা—

নিষ্পেবিত হৃৎকের কাতর আর্তনা—

উজ্জ্বল আলোক দ্বিবে ক'রো শুভমর,

সত্যের স্বরূপ লাখে দ্রবয়ের হোক পরিচর।

যেটুকু আনন্দ-আলো দ্বিবে হে লাভনা,

তোমার স্মৃতির মোহে কতু যেন না কর বঞ্চনা।

উৎসবের আশুগত মধে,

বিলালের অলস লম্পাধে,

সঙ্গীর্ণ শীমানার অকৃতম আবেগ-বিরামে

হে দয়াল! জীবনের চঞ্চলতা নাহি যেন থামে।

তায় চেয়ে প্রিয়

স্মৃতি-লিঙ্গ হৃৎকের তপ বরণীর।

আনন্দের অর্থকী পরাণ

অমরতা করে নাকো দান

আনে শুধু মৃত্যু হলাহল

বাধি' সীমাহীন চলাচল।

তাই প্রভু, এ আকাজকা মোর—

হৃৎকে আনন্দ দিও—উৎসবে হৃৎক বিভোর।

ভাবে, বেশে, কথাবার্তায়, উষা আজ এক
লরল গ্রামের মেয়ে। কিন্তু গ্রামের একান্ত
আপন হইলেও তাহার মধ্যে যে তেজ,
যে ত্যাগের, প্রেমের অপূর্ণ এক মূর্তি
রহিয়াছে, তাহা সকলজনের মনের চোখে—
অন্ধকার গৃহের শান্ত প্রদীপের আলোর মত
উদ্ভাসিত হইবে।

* * *

কৃষ্ণচন্দ্রের "স্বপ্নাশ্রম" অভিনয় কোন
দিন ভুলিবার নয়। এই ভারত বিখ্যাত
গায়ককে, ভগবান এক 'অদ্বুত অন্তর্দৃষ্টি'
দিয়াছেন। 'আমরা যাহা চোখে দেখিতে
পাই না, কৃষ্ণচন্দ্র তাহাই তাহার অন্তরের
চোখ' দিয়া দেখিতে পায়। কৃষ্ণচন্দ্র অন্ধ
গ্রামবাসী কৃষ্ণ ভূমিকায় অভিনয় করিতে-
ছেন। যেটো প্রবেশ করিবার পূর্বে
পরিচালক মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রকে সমস্ত ব্যাপ্যারটি
কথার ভিতর দিয়া বুঝাইয়া দেন। এই
সময় কৃষ্ণচন্দ্রের চোখে মুখে যে একাগ্রতা
ফুটে ওঠে—তাহা দেখিলে অবাক হইতে
হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র অন্ধ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা
এই যে—সেটির কোথায় কি আছে—কোন
খানে চলিবার স্থান, কোথায় বা আলিবার,
বসিবার—যেন তাহার কাছে লজ্জা স্পষ্ট
হইয়া ওঠে। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্রকে অন্ধ
বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা শক্ত হইয়া
ওঠে।

* * *

প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী সুক পঞ্চম মল্লিক।
কিন্নর-কণ্ঠ পঞ্চম মল্লিক। যাহার মধু-কণ্ঠের
সঙ্গীত শ্রবণ করিতে এখনও চিত্রায় বিপুল
জনশ্রোত চলিতেছে, সেই সকল জনপ্রিয়
পঞ্চম "দেশের মাটি" চিত্রের সুর শিল্পী।
ইহা ছাড়া একুটি বিশিষ্ট ভূমিকাতেও পঞ্চম
অঙ্ক। দেশের মাটির গান হইবে এমন
যাহা মানুষের মনের লহিত কথা বলে,
মানুষের মনে যে সঙ্গীত এক অদৃশ্য
মনোহর জগতের দৃশ্যপট খুলিয়া দেয়।
চিত্রের কাহিনীর লহিত মিল রাখিয়া
সঙ্গীতের ভাবা এবং সুর নষ্ট হইতেছে।
যাহা-যেই এই অপূর্ণ সঙ্গীতের ধারার

কণামাত্র উপভোগ করিবার মৌভাগ্য
হইয়াছে তাহারাই আমার কথার সত্যতা
অসুভব করিবেন।

* * *

দেশের মাটির কাহিনীর কথা?

এমন কাহিনী লইয়া চিত্র রচিত হইতেছে,

যাহা সকল মানব হৃদয় স্পর্শ করিতে বাধ্য।

এমন এক প্রেম এই চিত্রে দেখিবেন—

যাহা মানুষকে ব্যর্থতার দিকে লইয়া না

গিয়া চরম সার্থকতার পথ-নির্দেশ করে।

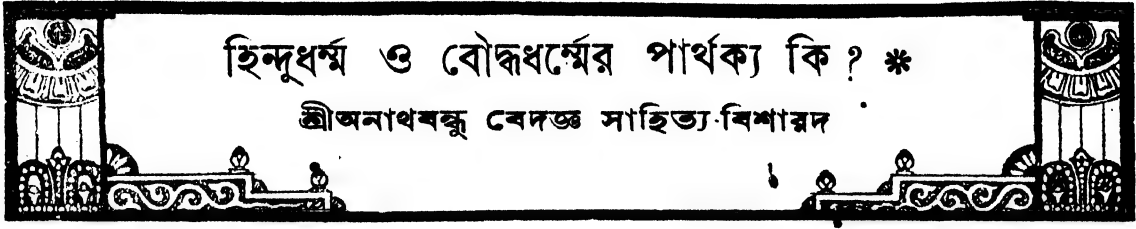
আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের সকল

মলিনতার মধ্যেও পবিত্র-মহান প্রেমের চিত্র

মনের গটে ভালিয়া ওঠে—সেই প্রেমের

ছবিই "দেশের মাটিতে" পাইবেন ॥

গভী নিরোধ বাটিকা
বহুপরিষ্কৃত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ও মধ্যমাত্র একবার
সেবনে এক বৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫ টাকা
ডাকিম এম.এস.জামান
৪২, ধর্মভালা স্ট্রীট, কলিকাতা



হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য কি? *

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদান্ত সাহিত্য-বিশারদ

হিন্দু সাংখ্য, বেদান্ত, উপনিষৎ যখন মানব উপলব্ধির চরম সীমার আলিয়া পৌছিয়াছিল, আর্য্যধর্মের ভগবদ্ভূতি যখন জগতের সমস্ত নত্যাশ্রয় দৃষ্টিতে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল, ভারতবর্ষ তখন সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব স্থান অধিকার করিতে সক্ষম। এমনি জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত যুগে সুদূর বাংলার উত্তরপ্রান্ত মানবের চিরন্তন দুঃখ ও বেদনার নিবৃত্তির জন্য ত্যাগত লক্ষ্য হইয়া যে ধর্ম চক্র প্রচার করিলেন, তাহা যে হিন্দুধর্মের কোন শাখা বিশেষ করিয়া সাংখ্যমত হইতে উদ্ভূত, এরকম ধারণা পাকা অসম্ভব না। বিশেষতঃ যখন কতকগুলি বিষয়ে পরস্পরের ঐক্য দেখা যায়। আমি আজ শুধু আপনাদের দেখাইতে চেষ্টা করিব যে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রধান অনৈক্য কি কি।

ঈশ্বরবাহু হিন্দুধর্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ তা সে দৈতই হউক অদৈতই হউক দৈতা-দৈতই আর বিশিষ্টাদৈতই হউক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম বলেন “আমি মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, জগতের মূল-কারণ ঈশ্বরও মিথ্যা। বেদান্ত ইশ্বন ও বৌদ্ধশাস্ত্র উভয়েরই মতে দুঃখের মূল কারণ অবিজ্ঞা। কিন্তু উভয়ের অবিজ্ঞার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। বেদান্ত বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই অবিজ্ঞাই ব্যবধান। এবং ইহা দূরীভূত হইলেই জীবের লোহৎ জ্ঞান হয়, জীব ব্রহ্মে একীকরণ লব্ধতি হয়। অবিজ্ঞা আচ্ছাদিত জীব; অবিজ্ঞা আবরণমুক্ত জীব—ব্রহ্ম। বুদ্ধের

অবিজ্ঞা জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব জীবের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখে এবং এই অবিজ্ঞার অপগমে আমরা দুঃখোৎপত্তির প্রকৃত কারণ জানিতে পারি। সেই কারণ কিনা বিষয় তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে অসক্তি, আসক্তি হইতে জন্ম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই রোগ, শোক, জরা।

অনেকের ধারণা কপিল সাংখ্যদর্শন হইতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। কারণ উভয়ের মতেই সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় এবং সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভই এই উভয় মতের মূলমন্ত্র। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবাস্ত। বৌদ্ধধর্মের এইরূপ এক উপাখ্যান আছে যে বুদ্ধ পূর্বজন্মে কপিল ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশানুযায়ী স্থানে শাক্যবংশীয় নৃপতির একটি নগর নির্মাণ করিয়া তাঁর নামানুসারে উহার নাম কপিলাবাস্ত রাখেন। কিন্তু উপাখ্যান যাছাই থাকুক এই দুই মতের পার্থক্য যথেষ্ট। কপিলমুনির দুইটা মূলতত্ত্ব—প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি লব্ধ অস্তম-গুণাত্মিক এবং পুরুষের সমুদ্রে সংসাররূপ মায়ার খেলা খেলিতেছেন যার প্রতিবিম্ব পুরুষ নিজ দর্পণে দেখিতেছেন। প্রকৃতির এই মায়াময়ী প্রতিচ্ছবি অপসারিত করিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন তখন মায়ার খেলা থামিয়া যায় এবং তিনি দুঃখ, ক্লেশ, জরা ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন। বুদ্ধের রাজ্যে পুরুষের অস্তিত্ব নাই। তিনি বলেন সকল ক্ষয়শীল, সকলি অনিত্য, সকলি দুঃখময়। এদের মূলে কোন লভ্যবস্তু নাই। বুদ্ধের গম্যস্থান নির্বান,

বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান ও নহে। সাংখ্যের আত্মতত্ত্ব ও নহে—কিন্তু নির্বান জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ। সে যে কি অবস্থা, সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তাহা লম্বুলে উৎপাটিত করিয়া শূন্যে মিশিয়া যাওয়া—শূন্য অন্ধকার। নিস্তরতা, শূন্যতা, বিনাশ অথবা আর কি তাহা জানি না।

আর একটি বিষয়ে ধর্মাত্মিক প্রভেদ দেখিতেছি। উপনিষদের আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মা আমি শরীর হইতে ভিন্ন। আমি চক্ষুও নহি, কর্ণও নহি, মনোবৃত্তিও নহি, তাহের কর্তা। আমার বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই, আরো কত কি! কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম বেহ মনের আড়ালে আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। কোন কোন বৌদ্ধমত বলেন বেহ ও আত্মা এক। বৌদ্ধ মতে যে সব উপকরণে জীবের জীবন গঠিত, তাহের নাম স্কন্ধ। এই স্কন্ধ পাচটা এবং ইহারানুসংগে মায়ার লবজীবে বিদ্যমান। ইহাদের সংযোগে জীবের জন্ম এবং বিরোগে মৃত্যু। এই সকল স্কন্ধ ছাড়িয়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মৃত্যুকাল বেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধ পুঞ্জের বিরোগ হইবা মাত্র অন্তত তাহাদের সংযোগ ঘটে, এইরূপে মৃতন মৃতন জীব সৃষ্ট হয়।

তারপর আর একটি পার্থক্য দেখিতে পাই অবতারবাদে। হিন্দু ধর্মে ভগবান স্বয়ং যুগে যুগে মানব বেহ ধারণ করিয়া ধর্মার্থে অবতীর্ণ হন এবং দুঃখের দমন ও সাধুদের গালনের জন্তই তাহের অবতরণ। কিন্তু বৌদ্ধমতে মহাযোগ সাধনা শুধু অর্থী,

বোধিদণ্ড, বুদ্ধ এইরূপ উত্তরোত্তর দেবদ্য প্রাপ্ত হন।

হিন্দুধর্ম কর্মফলের বিস্তারিত উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন। এই কর্মফল ও পরকালের উপরই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুধর্মের ভিত্তি স্থাপিত। যখনই দেখি পাপীর শাস্তি হইতেছে না। আজীবন কুক্রিয়াকর ব্যক্তি শাস্তিতে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে। যখনই দেখি জগতের নিদারুণ নিধর বৈষম্য রাজার প্রজার, ধনিকে শ্রমিকে, পণ্ডিতে মূর্খ, পার্থক্য, তখনই তার মীমাংসার জন্য পরকালকে উপস্থিত না করিলে আমাদের উপায় নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের কর্মফল ও পরকাল একটু অন্তরকর্মের। বৌদ্ধধর্মের বেহ ও আত্মার একত্বহেতু বেহের বিনাশে যখন আত্মার ও বিনাশ হইয়া যায় তখন স্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্ন উঠে যে ফল ভোগ করিবে কে? বেহের ধ্বংসে যখন আমার ধ্বংস তখন ফলভোগি অন্তর্কেই করিতে হয়। কিন্তু একের পাশে আত্মের শাস্তি, তাহাই বা কিরূপ ব্যবস্থা। বৌদ্ধশাস্ত্রে এর কোন লক্ষ্য নাই।

বিশ্বলংসার অকাঁচ নিয়মে বুদ্ধ অথচ তার কোন নিয়ন্তা নাই। ধর্মরাজ্যের কোন রাজা নাই, ফলাফলের ব্যবস্থা আছে কিন্তু কোন ব্যবস্থাপক নাই, পুস্ত্রের পুরুষ নাই, পাপের শাস্তিবাতা নাই, এইরূপ ধারণা আমাদের লজ্জা হয় না। বিশেষতঃ মনুষ্য আপন। অপেক্ষা উচ্চতর বৈষম্যের উপর নির্ভর না করিয়া ধর্মপথে চলিতে অক্ষম। আমরা এখন একজন মজলুম জ্ঞানময় পুরুষ চাই, যিনি আমাদের সংসারের সমুদ্র বিদ্রবিপত্তি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। আধ্যাত্মিক জগতে আত্মপ্রভাব অতীব প্রয়োজনীয় লক্ষ্য নাই, কিন্তু দেবপ্রলাষ ব্যতীত ধর্মের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। তাই আমার মনে হয় মনুষ্য সমাজের এবং মনুষ্য মনের সঙ্গে সহযোগিতা রাখিতে পারে নাই বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম

ভারতভূমি হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিল। এবং বুদ্ধধর্মের বিরোধানের চাই শতাব্দীর মধ্যেই নানা ব্যতিক্রম ও পাপ এর অনাবিলধারাকে কলুষিত করিয়া দিয়াছিল।

সামাজিক আচার ব্যবহার, আভিভেদ, ব্রাহ্মজাতিকর্ম্মানুষ্ঠান, পূজার বলিধা, প্রভৃতি প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে ভগবান বুদ্ধধর্ম তার মত প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের লোককে বৌদ্ধধর্ম আকৃষ্ট করার প্রধান কারণ হইয়াছিল বুদ্ধধর্মের প্রচারিত এই নীতিবাহ। কিন্তু ধর্মজগতে সাধন সর্বপ্রধান লক্ষ্যক হইলেও ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বলিয়া ভজনের কোনরূপ ব্যবস্থা বৌদ্ধধর্মের ছিলনা, অথচ হিন্দুধর্মের কোন কোন শাখায় এটাই অকমাত্র অবলম্বন। তাই বৌদ্ধধর্ম নীতিবাহ খুব উৎকৃষ্ট হইলেও লেনাপতিহীন অগণিত সৈন্তের জায়গীরবিহীন এই ধর্ম বেশীদিন আমাদের দেশে স্থিতিতে পারে নাই।

* শিল্প বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

তোমার মনের গানখানি খ্রীসত্বেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার মনের গান খানি নই

আমার বীণার তারে,

আজকে লম্বাই কেঁবে বেড়ায়

বেধন—ঝড়ারে।

চোখের জলে যেদিন রাতে

বিহার দিলে আপন হাতে

সেই ব্যথারি কাঁটা তবু

হাণে জ্বল-ঘারে।


তবু নিবিড় অমরাগে—

দোর বিরহী পরাণ মাগে

তোমার হিয়ার লজ খানি

কেবল বায়ে বায়ে।

ফোন ২৭৭৪



বড় বাজার

কাঠের জাট

কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তেল

ভারতের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিঃ

রাতের কুতব

(চিত্র)

শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লীর হিন্দু কলেজের বাঙালী-চেলে-
গুলো হঠাৎ সেদিন আমার ঘরে বসল
তাদের সঙ্গে জ্যোৎস্নালোকে কুতব যেতে
হ'বে। বলা বাহুল্য, প্রথমটা অস্বীকার
করলাম। কাজের দোহাই দিয়ে পাশ
কাটাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভূতের
দহত তারা আমার ঘাড়ে ভর করে বসল,
'না ভাই তোমাকে যেতেই হ'বে, আমাদের
কলেজের "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য লজ্জের"
সভাঘরের একান্ত ইচ্ছা তুমিও চল।'

তারা না বললেও ধরে নিলাম যে,
যেহেতু আমি সাহিত্যিক এবং উক্ত
কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, উপরন্তু আমার
রসকলের ভাঙটি নাকি তাদের কাছে
বরাবরই অতি উপাধের ও উপভোগ্য।
তার আশ্বাসন ইতিপূর্বে তারা অনেকবারই
ধেয়েছে। সুতরাং এস্থলে আমার হাত
ছাড়া করতে তারা রাজী হ'ল না। স্থির
হ'ল—ওদের ওপর ভার রইল আমার ভূরি
ভোজননের আপ্যায়িতট', পরিবর্তে আমার
করতে হ'বে হাশুরল পরিবেশন। যুক্তিটা
মন্দ নয়, হাসিমুখে মেনে নিলাম। ওরা
ছলোড় করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

লক্ষ্যার প্রাক্কালে সাতটার সময় কলেজে
গেলাম। গিয়ে দেখি প্রবেশ মুখের
ছ'পাশে ছ'খানি বাস দাঁড়িয়ে রইয়েছে।
ভিতরের কলেজ কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই
ছেলেগুলো সব সময়ে অভ্যর্থনা করে
ডেকে নিল, 'এল, এল!'

ইতিহাস অধ্যাপক মিত্র মশায়কে
এতক্ষণ দেখতে পারি নি। তিনিও দেখি
কখন ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বকমে যোগ
দিয়েছেন। ছাত্র-মিত্র অমন অস্বাভিক

অধ্যাপক খুব কমই নজরে পড়ে। গুরু
গভীর ব্যক্তিত্বকে ছেলেদের মধ্যে অমন
করে হারিয়ে দিয়ে এতটা আশুর্দে হ'তে
কোন অধ্যাপককে আজও দেখি নি।
মনটা আশ্বস্ত হ'ল, যাই হ'ক কুতবের
তলায় বসে নিশ্চয় কুতব লব্ধকে কিছু
একটা তথ্যপূর্ণ শুনতে পাব। মনে দৃঢ়
ধারণা জন্মাল যাত্রা আমাদের শুভ না
হ'য়ে যার না।

লক্ষ্য হতেই পাড়ী ছাড়ল। হুস্‌হুস্‌
'ক'রে লোজা পিচ রাস্তা ধরে চললাম।
রাস্তার ধারে ধারে বৈজ্ঞাতিক আলোগুলো
জলে উঠেছে। চারিদিক বেশ স্পষ্ট।
বাঁ দিকে 'কেলা' আর ডান দিকে 'জুস্মা
মলজিহ' ফেলে আমরা 'দিল্লী বরগাজ'প
অতিক্রম ক'রে শহরের বাইরে এসে
পড়তেই ঠাণ্ডা হাওয়ার তীব্রতা অনুভব
করলাম। গাড়ীর ভেতর ছেলেদের
গোলমাল, চেঁচামেচি, গান ও গল্পে
মাতোঝারা হ'য়ে হঠাৎ চক্ষু মেলে বাইরের
পানে তাকাতেই দেখি বাঁ দিকে 'ফিরোজ
শা কোটলাকে' ভেড়ে কখন আমরা পুরান
পাণ্ডব কেলায়' পথ ধরেছি। যতই এগিয়ে
চলি ততই দ্রুত হাওয়া জুড় হ'য়ে ওঠে।
কানের পাশ দিয়ে 'হাওয়ার' স্তর বাসের
ধাক্কা খেয়ে হুস্‌হুস্‌ শব্দে 'বেরিয়ে' যাচ্ছে।
বাসের হোলানির সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলের
আশুর্দে স্বরধ্বনি কেঁপে উঠল, 'ওই দেখা
যাচ্ছে কর্ণের বৈজ্ঞাত্যের ভায়েদের কেলা
বেখানে আকবর-পিতা হুমায়ুন প্রস্থাগারের
দিড়িতে পা পিছলে অকস্মাৎ অপমৃত্যু
ঘটিয়েছিল।'

কথা মনে লভলেই তারা ক'রে তেল

উঠল। শিশুরা যেমন সাধারণ অজ্ঞতা দ্বিধে
হেসে উঠে, এরাও দেখলাম তাই; লামন্ত
কথার সময়ে অসময়ে তারা হেসে গড়িয়ে
পড়ে। কলেজে এলেও বাস্তব জীবনের
নিষ্ঠুর ধাক্কা এখনও যায় নি; নির্ভাবনার
চিন্তে তাদের হাশুরল উৎসর্গা লক্ষ্যই
মজুত থাকে, একটুতেই ফুরুর করে। ওপর
পানে উৎসে উঠে। এত আশোষ শ্রিয়
তারা।

আমার বড় ভাল লাগছিল তাদের বীধন
হারি কথার স্রোতে ভেসে যেতে। নীতি
অনীতির কোনই গভী নেই তাদের দ্বিধে।
তারা যুক্ত ও স্বচ্ছ, দিল্লীরিয়া হ'য়ে তারা
অনর্গল বকে চলেছে, গেয়ে চলেছে ও হেসে
চলেছে। সময় সময় আমিও 'যোগ না' দিয়ে
থাকতে পারিনি।

যাই হ'ক রাস্তার বাঁ পাশে পুরান পাণ্ডব
কেলা ফেলে রেখে আরও খানিকদূর এগিয়ে
যেতেই পেলাম হুমায়ুনের মনোরম সমাধি
ভবন। এতক্ষণ বাস ছ'খানা আমাদের
সামনের দিকেই ছুটে যাচ্ছিল, এবার তাব,
গতিপথে কিছু বাধা পড়ল। 'হুমায়ুন কবর
পিছনে ফেলে মোড় ঘুরেই গাড়ী ছ'খানা
লোজা 'সবেহারজ' অভিমুখে রাস্তা খালি
পেয়ে তীরবেগে ছুটে চলল।

পূর্বে লক্ষ্য করি নি, এবার দেখি সামনের
পথটা আমাদের নিঃস্র অন্ধকারে সমাহিত।
রাস্তার পাশে এক কোটা বিজলী আলো ছিল
না। হেড লাইটের আলো অন্ধকারের বৃকে
অতি ক্ষীণ রশ্মি নিয়েই আমাদের যাত্রাপথ
নির্দেশ করছিল। ড্রাইভার ছিল সুদক্ষ।
কিছু যাত্র তার ভর ডর নেই। তীর বেগে

সে গাড়ী ছুটিয়ে চলেছে। আকাশ
খোঁজছে। তার জরাজপাতে পৃথিবীও কালো।
চারিদিকে কালোর কালোর একটা বড়বড়
পাকিয়ে উঠছিল। অতীতের কত রাজার
রাজধানীর ওপর দিয়ে চলছিল তার ঠিক
নেই। নীমাধীন নীরবতার মাঝে বালের
বড়বড়ানি অন্ধকারের বড়বড় চুরচার করে
ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে বড়ের শ্যাগে উড়ে
যাচ্ছিল।

আকাশের এইরূপ অবস্থা দেখে লকলেরই
মন হমে গেল। কত আশা তাহের যে,
আজকের মত মনেহারী একটি রাত পাবে।
আগের বিন পূর্ণিমা গেছে, সুতরাং প্রতিপদের
ওপরে লকলের খুবই ভরসা ছিল। কিন্তু
এখন জ্যোৎস্নাপ্রাপ্ত কুতবের সৌন্দর্য্য মহিমা
মাঠে মারা গেল বলে অনেকেই কবিত্রিয়া
চন্দ্রমার ওপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে গালাগালি
করতে শুরু করলে। বেরিয়ে যখন পড়েছি
তখন উপায় নেই। বাধ্য হ'য়ে কালো
রূপের মহিমা ও গরিমা কীর্তন করে
ওদের ভারাক্রান্ত মনে কিঞ্চিৎ আশ্বাসের
টেটে তুলে দিলাম: এই বলে যে, কাক
কালো, কোকিল কালো, কয়লা কালো,
ওপাড়ার পিসী কালো, নেই ছেলের চেয়ে
কালো ছেলে ভাল, সুতরাং চন্দ্রালোকের
চেয়ে অন্ধকারে ভুবনমোহিনীর ঠাণ্ডা
রূপই ভাল। শাজ্ঞ ঘেটে বার 'করলাম
বেহেতু মা কালি কালো'; প্রত্যক্ষ প্রমাণ
দ্বিলাষ চুলের কদর হ'ল কালো, চোখের
ভারা কালো—ভাল। সবার ওপরে
লভ্য হ'ল, আমরা কালো।

লক্ষ্য করিনি এতকণ এইসব কথাবার্তার।
গাড়ীর বেগ কমে আসতেই দেখি
'নিজামুদ্দিনকে' পিছনে কেলে 'লাবহার-
জলের' দুধোমুখি হ'য়ে চলেছি।
ড্রাইভার ছিল ওস্তাদ আর বরাত ছিল
আমাদের ভাল 'ভাই' 'লাবহারজলের'

হরজার চু না ঘেরে বা দিকে ঝোড়
ঘুরিয়ে কুতবের দিকে অগ্রসর হ'লাম।
ডান দিকে বায়ুপোতের আড্ডাটিকে
কাঁকা মাঠের অন্ধকারে টিমটিমে আলোর
মধ্যে কেলে সোজা কুতবমিনারের পথতলে
গিয়ে যখন পৌঁছলাম রাজি তখন ন'টা।
হড়হড় ক'রে সব নেমে পড়লাম হলোড়
করে।

অন্ধকার, অন্ধকার...বিশ্বব্যাপী অন্ধকার
নরম বালের ওপর দিয়ে হেঁটে
চললাম অতি মনোরম একটি আড্ডা খুঁজতে।
এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে ও নানা মন্তব্য
ও চীকা টিপ্পনীর অবশান করে ঠিক
কুতবমিনারের নীচেই ছোট একখণ্ড
বাগানের ওপর আমাদের আড্ডাটি গাড়া
হ'ল। করিংকর্যা বারা তারা ধরাধরি
করে জিনিষপত্রগুলো বাস থেকে
বাগানের মধ্যে নিয়ে এল। বাকী
অকেজো ছেলেরা কাঁচা ছলিয়ে কাচা
ঝুলিয়ে এদিক সেদিক চরতে লাগল।
ছাত্র বিশেষের হরকার পড়লে এক উচ্চকণ্ঠে
ডাকা ভিন্ন ঝুঁজে বার করা ভার।
কারুরই মুখ চেনা যায় না। পরণের
ময়লা কাপড় জামাগুলো পর্যন্ত ধোপ

দুরন্তের মত অন্ধকারে ধবধব করছে।
কিন্তু চামড়ার মুখগুলো যে তিমিরে
নেই তিমিরে।

রান্নাবান্নার কোনই ছাঁচা ছাঁচা ছিল না।
সুতরাং খুব খানিকক্ষণ রুস্তাকারে বলে
গান বাজনা চলল। তারপরেই আইনজীবী,
ভিমটো, লেমনেড, আম, লিচু, এদেশীয়
ফল আড়ু, আলুচা, মিষ্টানের মধ্যে
রসগোল্লা, দিলবাহার ও লিঙ্গাড়া
প্রভৃতির আত্মশ্রদ্ধ করে পরিতুষ্ট
মনে যখন বিশ্রাম ভ্রমণের
জন্তু সব হল পাকিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে
বেড়াবার মতলব করছে, এমন সময়
বড় বড় কাঁটা নিয়ে কড় কড় রবে শেষ
ডাকিয়ে চড়বড় করে রুষ্টি নেমে এল।
সামনেই কুতবের লাগোরা ভাঙ্গাচোরা
কাষরা গুলোর অলি গলিতে ছুটে গিয়ে
আশ্রয় নিলাম।

খানিক পরেই রুষ্টি গেল থেমে।

লঙ্গে লঙ্গে শুরু হ'ল গোমোকোনে
'মানমরা গাল'ল স্কুল'। সব মাত্র লাভ
নবর রেকর্ডখানা চাপিয়ে দিয়ে হাতল
খুঁরিয়ে দম বেওয়া হচ্ছে এমন সময় এল
এক নিদারুণ হুঃসংবাদ। প্রভাত নাকি

প্রথম ভ্যালুয়েসনের ফলাফল

= বোনাস =

আজীবন বীমায়

১৫

প্রতি হাজার

মেয়াদী বীমায়

১২

প্রতি বৎসর

ডেবুইন ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস: ১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: ১২০৭ কলি:

টেলিগ্রাম: "স্পিডি"

কোন এক কবরের তলে জান হারিয়ে
মাটিতে মুখ শুদ্ধার আঁর্জবরে গৌঁ গৌঁ
করছে। তবে লকলের আত্মারাম খাঁচা।
অতীতের বিজন ধ্বংস পুরীতে অবিখ্যাত
কিছুই নেই। ইতিপূর্বে এই ধরণের
হৃদয়টনা এখানে হ'বার হয়েছিল শুনেছি।
তবে বৈধবার সময় ছিল না। লকলেই
সেই কবর অভিযুখে ছুটে চললাম। গ্রেসে
যা দেখলাম তা না বলাই ভাল। B. Sc
পাশ করা আমাদের উৎসাহী প্রভাতের
মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে ফেনা পড়ছে।
মুখে জাই কোন কথা নেই। কবরের দিকে
হাত বাড়িয়ে অদ্ভুত গোড়ানীতে সে কি
তার কাকুতি মিনতি! উন্মাদের মত কাঁদার
লুটোপুটি খাচ্ছে। কোন কিছুতেই হ'ল
নেই। অবিজ্ঞ চুলগুলো মুখের ওপর
ঝুলে পড়ছে। চক্ষু ছুটি বোজা। কখনও
উঠে বসে দমাধম বুক চাপড়াচ্ছে...কখনও
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হরকোষ্য ভাষার
ছটফট করছে...যেন বুকখানা তার জলে
যাচ্ছে.....!

আমাদের মুখে কারুর রা' নেই।
নিশ্চল হয়ে বেচারী প্রভাতের পানে চেয়ে
আছি। করতেই কিছুই পারছি না।
লকলেরই চক্ষুস্থির! বেচু লাহলে কোমর
বেধে ওকে টেনে তুলতে গেল। কিন্তু
পারলে না, কবরের ভূত বার খাড়ে চেপেছে
তাকে টেনে তোলা সহজ ব্যাপার নয়।
বারে বারে প্রভাত যেন গর্জ্জে ওঠে। বেচু
ভয় পেয়ে কিছুক্ষণের জন্ত কান্ট দিয়ে ফের
চেষ্টা করলে কিন্তু এবারেও বিফল মনোরথ
হ'য়ে থ' হ'য়ে গেল। জ্বলতে গেলেই
স্বকালীনা উপবেশতা গর্জ্জে ওঠে, নয়'গৌ
গৌ রবে হাত ছাড়িয়া মাটির বুক চলে
পড়তে চেষ্টা করে নতুবা কাষড়ে দেয়।
অন্ধকার কবরের চারিপাশে আমরা যখন
নির্বোধ অলহায়ের মত নিম্পলকে চেয়ে

আছি এমন সময় লংবাধ পেয়ে মিত্র
মশার এলেন। মাত্র ক'বছর আগে
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন প্রথা ছেড়ে
এখন তিনি অধ্যাপনার কাজে ব্রতী
হয়েছেন। স্ততরাং ছাত্র লম্বাজের উপজব
ও দোরাশ্বের অভিজ্ঞতা তখনও তাঁর 'পূর্ণ'
মাত্রায় ছিল। ভীড় ঠেলে তিনি কবরের
দিকে এগিয়ে আলতেই একটি কাষ্ট ইয়ারের
ছেলে ভীত কান্টরস্বরে বললে, 'স্মার প্রভাতদা
কি রকম হ'য়ে গেছে।'।

—'কিছু হয়নি, সব ঠিক হয়ে যাবে—'
বলে তিনি তাকে লাফান দিয়ে টর্কের
আলো ফেললেন প্রভাতের মুখে। কিছুক্ষণ
নীরিক্ষণ করার পর ডাকলেন, 'প্রভাত।'।
বিস্ময়ের হেঁচকা টানে প্রভাত যখন দ্বারে
পড়ে দাঁড়িয়ে উঠে'হাসতে লাগল তখন আর
কারুর লক্ষ্যেই রইল না। হৃদ্যবনার মেঘ
কেটে গিয়ে তখন লকলের চোখে মুখে খুসার
আলো উদ্গীষ্ট হ'য়ে উঠেছে। লকলে নমস্কার
মেনে নিরে চোঁচিয়ে উঠল, ই্যা অভিনয় বটে,
যন্ত্র প্রভাত। থি চিরান'কর ইউ, হিপ্ হিপ্
হরয়ে!'।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ওর মধ্যে কেউই স্বীকার
করলে না যে সে ভয় পেরেছিল। প্রত্যেকেই
বলে—এ আমি জানতাম, তবে মজা
দেখছিলাম।

ওর মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রশানে যারা ভীত
বলে লাব্যন্ত হ'ল তারাও বলে—ভাই বিশ্বাস
নেই। অনেকবার এরকম হয়েছে।
প্রভাতের চালাকি আগেই অনুমান করে-
ছিলাম, তবে দেখছিলাম ব্যাপারটা কতদূর
গড়ার।

প্রভাতকে এই অভিনয় হৃদয়টনার গুঢ়
রহস্যের মূল কথা জিজ্ঞাসা করতেই সব জানা
গেল। প্রকৃতপক্ষে 'মানময়ী গাল'ল দুল'ই
নাকি এই কৃত্রিম হৃদয়টনার জন্ত দ্বারী।
কানন বালা আর মেঘ নগরে...ভজ মন নন্দ

সমাপ্তি

কুমারী বাণী নন্দর

কোন সে মাঝি আসবে খেরাপারে
জীবন প্রদীপ নিভবে যখন—

বিদায় অন্ধকারে।

লক্ষ্য বেলার পারের তেলার
অশ্রু স্বহারোহের—বেলার
পথ ভুলে সে কোন্ অতিথি
আসবে মরণ-দ্বারে।

এই জীবনের খেলার শেষে
মরণ-টেউয়ে চলবে ভেঙল
আসব লেখা কোন্ সে মাঝি
লোনার তরী বেয়ে—

বিস্ময়গীর আধার বৃকে
প্রেমের গীতি গেয়ে।

সেই সমাপ্তির পরম রাত্রে
সে কোন্ শ্রিয় বাহার লাখে
হ'বে আমার মনুর-মিলন
নীরব অশ্রুধারে—

জীবন প্রদীপ নিভবে যখন
বিদায় অন্ধকারে।

বোধের নন্দনে আর মেরী মাতার নন্দনের
প্যানপ্যানানি শুনে ওর কাণ তাকি পচে
গেছে। তাই এই পচা বেকুর্ডের
ঘ্যানঘ্যানানি ও লহ করতে না পেরেই
অধ্যাপক মিত্র মশার ও লাহিত্য লজ্জের
শেক্রেটারি কল্যাণের লঙ্গে বৃক্তি এটে কবর
মূলে আত্মাহুতি দিতে চেষ্টা করেছিল।
আত্মাহুতিতে লফলকাম না হলেও মূল
উদ্বেগ নিছ হওয়ার সে অতি আন্তরিকতার
সহিত এই কবরকে তার ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

(ক্রমঃ:)

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

রেডিও প্রোগ্রাম দিনে দিনে অবনতির-
পথে অগ্রণর হচ্ছে। রেডিও কর্তৃপক্ষের
তরফ হতে এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা
আমরা দেখতে পাচ্ছি না। প্রতিটি
বিভাগের সমালোচনা করে দেখা যাচ্ছে
অধিক স্থলে অকর্মজোর 'ভীড়'। বিভাগীয়
কর্মকর্তারা তবে কী যোগ্যতার পরিচয়
দিয়েছেন? প্রোগ্রামের অভিযোগ দিনে
দিনে বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু তবুও কোন উন্নতির
লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাশি রাশি
অযোগ্য আর্টিস্টের ভীড়ে রেডিও প্রোগ্রাম
কণ্টকিত।

আটিএ অনুপস্থিতির প্রতিকার আজও
হোল না। সেই আটিএ অনুপস্থিতিতে বাজে
পুরানো গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে অন্ধ
নাচারের অবস্থা। কোনদিন যদি দেখা
গেল ভালো আর্টিস্টের নাম প্রোগ্রাম
তালিকায়। অধিকাংশ স্থলেই শোনা যায়
অমনি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানকালীন ঘোষকের
নিরাশা বাণী 'অনিবার্য' কারণ বশতঃ
অনুপস্থিত—তার পরই অক্ষুণ্ণ হয় ত্রুটি
যুগের রেকর্ড বাজনা।

রেডিওতে যদি রিজার্ভ আর্টিস্টের ব্যবস্থা
করা হয় তাহলে প্রোগ্রামা অন্ততঃ কণ
পীড়াহারক রেকর্ডের হাত থেকে পরিব্রাজ

পায়। রেডিও কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি
আকর্ষণ করছি।

বেতার নাটকে হল লম্বা আমাদের
গিরাশ হয়ে গেছে। লেহিন আমাদের
জটনকা বিশিষ্টা পাঠিকা রেডিও গ্রাহিকা
বলছিলেন—'ও হচ্ছে চাকের বাস্তব' থামলে
মিষ্টি! থামলে মিষ্টি সে কথা আমরা
জানি না এবং উপমাটা ঠিক হয়েছে
বলেও আমাদের মনে হয় না! কিন্তু
চিন্তা বিরক্তিকর নাটকের ব্যাড়া প্যাটার্নের
চীৎকারের আশু প্রতিকার হওয়া উচিত।

গত ৩৭শে জানুয়ারী রবিবার প্রাতঃকালীন
অনুষ্ঠানে বেতার অর্কেস্ট্রা বাজনা বাজালেন
মন্দ নয়। লতাবাবু বাংলা গান গাইলেন
—ভালো নয়। হরিমতীর গান আমরা খুব
উপভোগ করেছি। আলিহোসেনের লানাই
বাজনা হোল—মন্দর। পরে পকোজবাবু
সঙ্গীত শিক্ষাদান করলেন।

৩১শে জানুয়ারী সোমবার লাক্ষা অনু-
ষ্ঠানে "kedari koyam" অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত
হোল। যজ্ঞীলজ্যৎ আবাহ সঙ্গীত বাজালেন
এবং কণ্ঠসঙ্গীতে তা রূপ পেল। অনুষ্ঠানটি
মন্দ হয়নি। ডাঃ মুকুমারী লেন Books of
the month এবং সমালোচনা করলেন।
অত্যন্ত লক্ষণীয় সমালোচনা তাতে বইগুলি
লম্বা লম্বা পরিচিতি দান অসম্ভব অবিধি

বক্তার সময় মাত্র ১৫ মিনিট নির্দিষ্ট এবং
বইও থাকে অনেকগুলি। সাহিত্য সমা-
লোচনা প্রসঙ্গের সময় বর্ধিত হওয়া উচিত।

১লা ফেব্রুয়ারী লাক্ষা অনুষ্ঠানে 'প্রথমে
ছোটদের বৈঠক হলো। 'মানিমা' এবং
'হাছমনি' চিঠি পড়লেন। পরে হাছমনি
মহাজারতের গল্প বললেন। লম্বা চৌধুরী
গান গাইলেন অতি বাজে। রক্তেশ্বর বাবুর
কীর্তন গান খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।
লম্বা বাবুর আর একখানি গান হোল
—ফোর্থ ক্লাশ। বেতার অর্কেস্ট্রা বাজনা
—ভালো। বেতার অর্কেস্ট্রা লম্বাশব্দের পথ
ধরেছেন আমরা প্রশংসাবাদ জানাচ্ছি।
প্রফেসর নির্মল ভট্টাচার্য্য প্রাদেশিক স্মারক
শালন লম্বা বক্তৃতা দিলেন আজকালকার
দিনে বক্তৃতাটির মূল্য যথেষ্ট। ভাষাটি আর
একটু লম্বা করলে আরও ভালো হোত।

২রা ফেব্রুয়ারী লাক্ষা অনুষ্ঠানে সুখীর
ব্যানাজীর গান ভালো নয়। অন্তরের রস-
কথার রসের খোঁজ ছিল। প্রোগ্রাম ব্রহ্ম-
চারীর বেহালা চলনসই। ভীষ্মবে চ্যাটার্জীর
গান গাইবার কথা ছিল—'অনিবার্য কারণ'
হেতু অনুপস্থিতি পূরণের জন্তে রেকর্ড বাজানো
হোল। এম-এল-রায় 'পুঞ্জা এবং ভক্তি'
লম্বা বক্তৃতা দিলেন অতি সাধারণ বাজে
রচনা কণ্ঠস্বরও দুট।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার লাক্ষা অনুষ্ঠানে
বেতার নাটকে হল 'জয়দেব' অভিনয় করলেন
এককথার যাত্রাগান তাও অমার্জিত।
Sublime sentimentকে এরকম ভাবে
বিরক্তিকর করে তোলা বেতার নাটকে হল
পক্ষেই সম্ভব।



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।



ফটো : প্যারামাউন্ট

ওপরের ছবিখানাতে মালিন, ডিয়েট্রিচ, হারবার্ট
মাসল, মেলভিন ডগলাসকে দেখা যাচ্ছে। ছবিখানার
নাম “এঞ্জেল” এক্ষণে রিগ্যালেনে দেখান হচ্ছে।



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'ভ্যারিট'

জালাল নিউজপেপার্স লি:

টেলিফোন
সাঁউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ ট ফারুন ১৩৩৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তিপ্রসঙ্গে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বলচক্রানির্নাদিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ ঘাঁহারী না বুঝিয়া বা বুঝিয়াও বুঝিতে না পারিয়া শাসনতন্ত্রে নবলব্ধ কল্পিত ক্ষমতার মোহে কংগ্রেসী আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের আজিকার শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটে জ্ঞানচক্র উন্মিলিত হইবে কিনা সঠিক বলিতে না পারিলেও, ইংরেজ রাজনীতিকের কূটনীতি-প্রসূত শাসন-সংস্কারের মাকাল ফলকে যে সকলেই এখন চিনিতে পারিবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। উপরোক্ত প্রদেশদ্বয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলে যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে তাহাতে অনেকেরই অনুমান করেন যে সারা ভারতব্যাপী অন্ততঃ যে কয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছে সেই প্রদেশগুলিতে অতি শীঘ্রই বিশেষ সঙ্কটাপন্ন শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতি উপস্থিত হইবে। ইহা ব্যতীত সর্বজন উপেক্ষিত

কেভারেসনের কাঠামো ভারতবর্ষের উপর দেশবাসীর একান্ত অনিচ্ছা ও ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও চালাইবার প্রয়াস হইতেছে। জাতীয় জীবনের এই মহা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে হরিপুরের রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশন সকল দিক হইতেই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

হরিপুরে কংগ্রেসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে একজন বাঙ্গালী সভাপতিত্ব করায় বাঙ্গালী নিজেকে সম্ভাবতঃই গৌরবান্বিত মনে করিতে পারে। ভারতের জনসাধারণ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে এই সন্ধিক্ষণে কর্ণধাররূপে বরণ করিয়া সর্বতোভাবে উপযুক্ত করিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের অসীম কর্মোদ্যমতা ও অটুট দেশপ্রেম জাতিকে এই সঙ্কটে যে যথোপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে পারিবে এ বিশ্বাস সকলেরই আছে। আমরা আশা করি যে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় মহাজাতিকে লক্ষ্যপথে পরিচালিত করিতে দৃঢ় হস্তেই জাতীয় তরঙ্গীর হাল ধরিয়া থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র গভর্নর-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বিবাদের পর শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটকালে যে সংসাহসের সহিত কংগ্রেসী কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন তাহা আমরা জানি। ঘটনাবলীর চমৎকার আলোড়নে ভারতের রাজনীতি যে সংঘর্ষের সম্মুখে সমুপস্থিত তাহাতে সুভাষচন্দ্রের হায় শক্তিমান ও তেজস্বী নেতার রাষ্ট্রপতি পদে বরণ সমরোপযোগী হইয়াছে।

জল্লিশ বৎসর পূর্বে উৎকলের রাজধানী কটকে অজ্ঞাতশত্রু বিশিষ্ট ব্যবহারাজীব জাম্বুকী নাথ বসু মহাশয়ের বর্ষ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বাণ্যে ও প্রথম যৌবনে খিলাস ও বৈদেশিক আবহাওয়ার আবেষ্টনে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুভাষচন্দ্র যে অপূর্ব চরিত্রবল্লীর পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ। একা সুভাষচন্দ্র বহু পরিবারের ভাবধারার পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন এবং তাঁহারই আদর্শের পীড়নে ও অনুপ্রাণিত সাধারণ ভ্রাতৃ-প্রেমের আকর্ষণে তদীয় মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্র কংগ্রেসী রাজনীতি বরণ করিয়া কারাবাসের অগ্নিশুকির মধ্য দিয়া আজ বাঙ্গলায় কংগ্রেসী নেতৃত্বের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত। জাতীয় মহাসভার সর্ব কমিষ্ঠ সভাপতির গৌরব লাভে আমরা সুভাষচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার কাধ্যকাল সাকল্যে ও ঘটনা বৈচিত্রে গৌরবময় হউক ইহা আমরা কামনা করি।

কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মিলনে

শ্রীমুখীর বস্তু

এবারে সাহিত্য সম্মিলনে যাওয়ার ইচ্ছা হওয়ার বেলার অবসর ও সুযোগ জুটে গেল। বন্ধু অক্ষয় সরকার করিওকর্মা—নবে বিষ্ণুপুর ফেরতা ও হরিপুরের ভাবী যাত্রী। পাছে বন্ধু শুধু বিষ্ণু ও হরিভক্ত বণে পরিচিত হ'ন এই ভয়ে কৃষ্ণ ভক্তি জানাতে তৎপর হ'লেন। গত শনিবার তিনি ভোর রাতে যে উৎসাহে আমাকে ও বন্ধু নির্মল বস্তুকে শয্যাভ্যাগ করিয়ে শিয়ালদহ টেশন অভিমুখে দৌড় করালেন তাতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ ছুঁপ বলে স্বীকার করতে ইচ্ছা হয়। ট্রেনের যাত্রাও সুখকর ও বৈচিত্রময়। বন্ধু নির্মল বস্তু কইরে বলিয়ে রলিক লহযাত্রী। ট্রেনে আরও অনেক সাহিত্যরথী—মনে হ'ল যেন কলকাতা উজাড় করে লোক চলেছে কৃষ্ণনগর অভিমুখে। বডিও পরে জানা গেল কলকাতার অধিকাংশ সাহিত্যিক ভোরের নিরবিচ্ছিন্ন শয়নস্থ ত্যাগ না করে বেলার ট্রেনে গিয়াছেন। আমরা মার্কিনা সাহিত্যিক নই তাই এবং বিশেষ করে বন্ধু নির্মলের প্ররোচনার সাহিত্যের রস-ভাণ্ডা ছাড়া অপর সরল ভাণ্ডের উপর লৌপ দৃষ্টি রেখেছিলাম।

কৃষ্ণনগরে শুধু নয়, সাহিত্য সম্মিলনেও প্রথম যাচ্ছি। কিন্তু কৃষ্ণনগরের সরভাঙ্গা, ডি, এল, রায় মাটির খেলনা সব মগজের প্রকোষ্ঠে একাকার হয়ে গিয়ে কৃষ্ণনগরকে বড় পরিচিত মনে হ'চ্ছিল, অবচেতন মনের পরিচয় না পূর্ব জন্মের সংস্কার? ডাঃ গিরিন্দ্রেশ্বর বাঁ বাঁবাঁবাবু মৃণালকান্তি জবাব দিতে পারেন।

মনে মনে ঠাউরে নিলাম এবারে অধিকাংশ সভাপতি বা সভানেত্রী সংবাদ পত্র বা মাসিক পত্রের সংশ্লিষ্ট লোক। ভাগ করলে এই দাঁড়ায়।

মূল সভাপতি ও সাহিত্যশাখা সভাপতি—অমুনালুপ্ত “স্বল্পপত্রের” গোষ্ঠীভূত।

কথা-সাহিত্য সভানেত্রী—“দলদলী” পত্রের সম্পাদিকা।

কাব্যসাহিত্য সভাপতি—“শনিবারের চিঠির” ও বর্তমানে “আনন্দবাজারের” গোষ্ঠীভূত।

সংবাদপত্র সাহিত্য সভাপতি—আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক।

প্রধান এই কচুটি শাখা ছেড়ে দিলে বাকী শাখাগুলির সভাপতি বা সভানেত্রী—অসাংবাদিক। আর তা ছাড়া সভাপতিদের মধ্যে অধিকাংশ নিজেরা প্রাণী নন, তাঁরা প্রধানতঃ—সৃষ্ট বস্তুর সুপরিচিত সমালোচক—যেমন শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীঅতুল গুপ্ত, শ্রীসজনী কান্ত দাস। বাজারে যে চিরদিন Creative Genius এর একচেটিয়া আধার থাকবে আমি তা নিজে চাই না। তাই appreciative genius এর কবর হওয়ার

আমি আনন্দিত। এবং আমার মনে হয় শ্রীঅতুল গুপ্ত ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সভাপতি হিসাবে যেকোন তথ্যপূর্ণ ও দারুণ অভিভাষণ পাঠ করেছেন তাতে সমালোচক সাহিত্যিকের পক্ষমর্ষা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাহিত্য সম্মিলনের অনেক বিভাগ—অধিকান্ধই কোন মূলনীতি অনুসরণ না করে ভাগ করা—যেমন সাহিত্যশাখা, কাব্যশাখা, কথাসাহিত্যশাখা, পদ্যবলী, সাহিত্যশাখা, সাংবাদিক সাহিত্যশাখা। এ ছাড়া চারুকলা শাখা ও লজ্জিত শাখা। আমার মনে হয় উদ্ভোক্তারা আরো বেশীদূর চালালে সাহিত্যকে ভাগ করতে পারতেন মহিলা সাহিত্যশাখা ও শিশু সাহিত্য শাখায় এবং যুগোপযোগী সাম্প্রদায়িকতার দ্বিধা হিন্দু সাহিত্যশাখা ও মুসলমান সাহিত্যশাখায়। গত চন্দননগর অধিবেশনে সমাজাত শিশুশাখা বাঙলাদেশে শিশু মৃত্যুর হারের সঙ্গে সমতা রেখে আতুড়ঘরে পরলোক গমন করেছেন (বন্ধু স্তোনাগিষ্ট-দের ভাষামুয়ারী পটল তুলেছেন) এবং চিকিৎসা শাখা লজ্জায় ও সমবেদনায় আত্মঘাতী হয়েছেন। তাই এদের বাৎসরিক প্রাক্কবালরে .কীর্তন পদ্যবলীর বিরাট আরোজন যাক আমাদের বলার আর বেশী কিছু থাকতে পারে না কারণ প্রজ্ঞান্তরে প্রকাশ এবারে সম্মিলনে স্থগীকৃত হয়েছে যে ভবিষ্যতে চারিটি শাখা যথা সাহিত্য, বিজ্ঞান; দর্শন ও ইতিহাস ছাড়া অপর



ন্যাশনাল টেনারি
৮-০১-২২ গ্রে ট্রিট, কলিকাতা
হাতিবাগান বাজারের পূর্বদিক

এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উল ও সিল্কের কাপড় রং রিপু ও ধোত করা হয়—
:~::~:

আধুনিক ফ্যাসানের সুট, সার্ট, ব্লাউজ ও ক্রক ইত্যাদি অল্প সময়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

[মফঃস্বলের কাজ যত্নপূর্বক সরবরাহ করা হয়]

কোন শাখার অধিবেশন হ'বে না। আমার মনে হয় এইটি স্বেচ্ছায় পরিচর। নইলে অনেক সময়ে এই অনুপরমায়ুতে বিভাগের কলে মূল সভাপতির বক্তব্য বিষয় অল্পই থাকে যেমন এবারের মূলসভাপতি শ্রী প্রমথ চৌধুরী কোন ভাষা শাখার অতিথি নেই নিঃসংশয়ে জেনে অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে ভাষা শাখার সভাপতির বক্তব্য তাঁর নিজের অভিভাষণে নিবেদন করলেন। তারপর আরও বিপদ হ'ল যখন সাহিত্য শাখার সভাপতি—শ্রীঅতুল গুপ্ত কাব্য ও কথাসাহিত্য শাখার অতিথি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে কাব্য ও কথা সাহিত্য লব্ধকে ছোট করে অনেক নতুন তথ্য শোনাগেল। তবে আমি স্বীকার করব কাব্য সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীলজনী কান্ত দাস কাব্য সাহিত্যের সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের রূপ, তার রূপান্তর লব্ধকে যে নির্ভীক আলোচনা করেছেন তাতে তিনি লকলের প্রজ্ঞা আকর্ষণ করেছেন। তাঁর অভিভাষণে বাঙলার গৌরব পদাবলী সাহিত্যের রূপ লব্ধকে যে বিশ্লেষণ পাই, দুঃখের সহিত স্বীকার করছি পদাবলী সাহিত্য শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী অর্ণপা দেবীর অভিভাষণে পদাবলী সাহিত্যের রূপ ও বৈশিষ্ট্য লব্ধকে সেই লামান্ত্র বিশ্লেষণেরও অভাব চোখে পড়ে। কিন্তু সাংবাদিক সাহিত্যসভার সভাপতি-রূপে শ্রীমতীজনাথ বসুসহায় তাঁর অভিভাষণে সাংবাদিক সাহিত্যের রূপ ফোটাতে চেয়েছেন। তাঁর সব মন্তব্যের সহিত আমরা একমত না হয়েও তাঁর চিন্তার মৌলিকত্বের প্রশংসা করি। আমাদের মনে হয় সাংবাদিক সাহিত্যের এর চেয়ে ব্যাপক রূপ সভ্যজনাথের চোখে পড়া উচিত ছিল। তর্জমার মধ্যে যে সাহিত্য গড়ে উঠে তা বিশেষজ্ঞের চেষ্টা প্রস্তুত নয় বলে লোকের সাহিত্যিক হবার

দাবী কি নেই। শাখা সভাপতিদের অভিভাষণের সমালোচনা করার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিনি তবে যেগুলি মূল দৃষ্টিতে চোখে পড়েছে তার উল্লেখ করলাম মাত্র।

যাক এখন আমার বিবরণের অসমাপ্ত হ'ল একটা কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। অভিযর্থনা সমিতি অনেক আদর আপ্যায়ন করেছেন—যদিও সরভাজা বা সরপুরিয়ার দাবী আমরা রেখে এসেছি অনাগত ভবিষ্যতি কালের জন্য। জানিনা সেই সুযোগ আবার ঘটবে কি না। কলিকাতা ফেরবার পথে বন্ধুর লংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক জুটয়ে-ছিলাম। উপরি পাওনা স্বরূপে পেয়েছিলাম এক অতি আনন্দজ্জ্বালী বাবাজী। ট্রেনের যাত্রা আবার লম্বা হয়ে উঠল রূপে, রসে ও গানে।

[পথে পাওয়া চোদ্দ আনা হিসাবে বন্ধুর হাথীর বহু মহাশয়ের আমাতা রত্ন লাভের সংবাদে আমরা উল্লসিত হইয়াছি। 'ধরে কুতে যদি ন সিদ্ধি'—তাহা হইলেও হাথীরবাহু হতাশ হইবার পাত্র মহেন সুতরাং আমরা শোভনা ও চকিত-চক্সা কঙ্গা-লাভের স্বীকারোক্তিতে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীমতী কমলের রোম-কিপ্ত প্রতিবাদ আসিবে না ত ?

সম্পাদক—“পেয়ালী”]



আমাদের প্রকাশিত ছোটদের বই!

পাতাল পাতাল সুদৃশ্য এক-
রঙ ও তিন রঙের ছবিতে

শিশু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাশ সম্পাদিত
ছোটদের আহরিকা

রায় জলধর সেন বাঁহাচরুর
আইসক্রীম সন্দেশ

শ্রীকীল্ল নাথ পালের
বাংলার জঙ্গলে

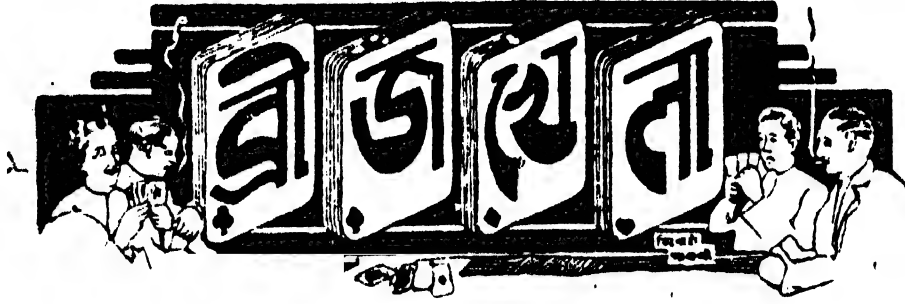
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
লে মিজারেবল

সুপ্রিয় সোমের
মাগরের নীচে ভয়ঙ্কর মানুষ

সভ্য প্রকাশিত
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রামধনু

কমলিনা সাহিত্য মান্দর

২২০, কর্ণওয়ালিস
কলিকাতা।



শ্রীচর্যাসা

প্রতিযোগিতার একটি হাত:—

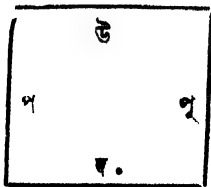
নিম্নলিখিত হাতখানি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে আপনারা অনারগর্ভে বুঝতে পারবেন যে, ডাকের কৌশলটি জানলেই শুধু ভাল খেলোয়াড় হওয়া যায়না, বরং ডাকের পর খেলানোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৌশলগুলি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সূত্রীড়কের একান্ত আবশ্যিক, অত্যা এ খেলার উন্নতিলাভের সম্ভাবনা একেবারে কম। যদিও প্রত্যেক ডাক ও তার জবাবগুলি খেলার অংশীভূত, তথাপি ভাল খেলতে হলে খেলানোর কতগুলি বিশেষ কৌশল জেনে রাখা বিশেষ করে দরকার। একটি ডুপ্লিকেট কন্ট্রোল প্রতিযোগিতার নিম্নের হাতখানি খেলা হয়েছিল। একঘরে একপক্ষ চরখানি কহিতন ডেকে খেলা করেছিলেন, অত্র ঘরে অপর পক্ষ পাঁচপানি কহিতন ডেকে একটি পিঠের খেঁদারং, দিয়ে দৈই প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিলেন। হাতখানি,—

ইস্কাবন— \times, \times ।

হরতন—লাহেব, বিবি, $\times, \times, \times, \times$ ।

কহিতন—গোলাম, \times, \times ।

চিড়িতন— \times ।



ইস্কাবন—টেকা, লাহেব, বিবি, \times

হরতন—নাই।

কহিতন—টেকা, বিবি, \times, \times, \times ।

চিড়িতন—টেকা, \times, \times ।

ডাক হয়েছিল,—

‘ব’
একটি কহিতন।

‘উ’
দুইটি ইস্কাবন।

‘উ’
দুইটি হরতন।

‘ব’
তিনটি কহিতন।

‘ব’
চারটি চিড়িতন।

‘পা’
পাঁচটি চিড়িতন।

‘উ’
চরখি কহিতন।

‘উ’
চারটি কহিতন।

‘পা’
পাঁচটি কহিতন।

‘পা’
পাঁচ।

‘প’
দুইটি চিড়িতন

‘পা’
পাঁচ।

‘পূ’
পাঁচ।

‘পা’
পাঁচ।

‘প’
পাঁচ।

‘পা’
পাঁচ।

‘উ’
ডবল।

‘পূ’
পাঁচ।

‘পা’
পাঁচ।

‘পা’
পাঁচ।

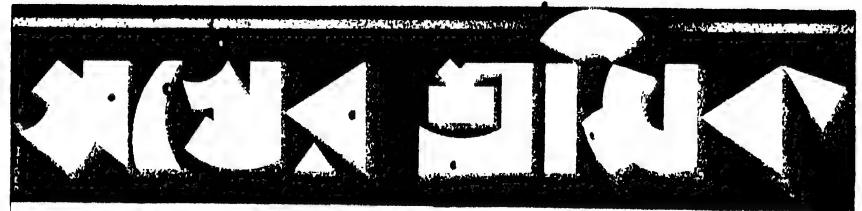
অত্র ঘরে অপর পক্ষ চারখানি চিড়িতনের পর খেঁদার উত্তরে চারখানি কহিতন পাঁচপানি পাঁচখানি কহিতনে ডাক দিয়েছিলেন। এইস্থলে ডাক লক্ষ্যে বিশ্লেষণ করতে গেলে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, চরখানি কহিতনে ডাক দেওয়া বিশেষ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ খেঁদার হাতে যদি কহিতনের গোলাম ও ছোট ছোট তিনখানি ভাল থাকত তাহলেও তিনি ঐরূপ জবাব দিতেন। তারপর খেলা চলল।

(১) ‘প’ চিড়িতনের লাহেব খেলায় ডাকবার টেকা দ্বারা পিঠ নিলেন।

(২) ‘ব’ ভেবে দেখলেন যে ডবলকারীর হাতে কহিতনের লাহেব এবং হরতনের টেকা তো আছে,—এখন যদি তিনি চিড়িতনে ও হরতনে তুরূপ করে খেলতে চান, তাহলে তাঁকে দুইখানি কহিতনের পিঠ দিতে হবে, যদি ডবলকারীর হাতে ঐ বঙের লাহেব ও নয় থাকে। সাধারণ ক্রীড়কেরা এইরূপ বিশেষভাবে চিন্তা করেন না বলেই ভাল ডাক দেওয়া লক্ষ্যে খেলা করতে তাঁরা অলমর্থ হন। সুতরাং ‘ব’ ইস্কাবনের টেকা ও লাহেব খেলে দুইখানি পিঠ নিলেন।

(৪) পুণরায় ‘ব’ ইস্কাবনের বিবি খেলার ‘প’ চিড়িতন পাশালেন।

প্রফুল্ল পিকচার্সের নবতম নিবেদন



নির্ম্মল কসিকতার কোঁড়নে সমৃদ্ধ, নবীন যুগের

জটিল সমস্যার সরল সমাধান

প্রযোজনা : প্রফুল্ল ঘোষ * পরিচালনা : নির্ম্মল গোস্বামী

(৫) এক্ষেপে চিড়িতন পাশানোর বরুণ 'ব' অনারানে যুঝতে পারলেন যে, "প"র হাতে, হরতন রঙ ছুইখানই নয় আরও বেশী আছে, কারণ ছুইখানি হরতন থাকলে তৎক্ষণাৎ তিনি উহাই আগে ফেলে দিতেন। এবার দেখুন, খেলানোর সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষদের পাশানো দেখে খেলা কি তাবে লোকা হয়ে যায়। ইহা বিশেষরূপে ক্রীড়কবর্গের লক্ষ্য করা উচিত, তা নাহলে তিনি কখনই ভালো খেলোয়ারী হতে পারবেন না। ধরুন যদি তিনি হরতন পাশিয়ে যেতেন তাহলে 'ব' এড়াইডি তুরূপ না করে হরতন রঙ দাঁড় করিয়ে নিয়ে নিজের খেলা করে নিতেন। অপর ঘরে একরূপ না

করার বরুণ দুজন খেলোয়াড় পাঁচটা কুহিতনের খেলার একখানি খেলারং দিতে বাধা হয়েছিলেন।

(৬) তারপর 'ব' হরতনে তুরূপ ও চিড়িতনে তুরূপ করে খেলে গেলেন। এট তুরূপ কার্য আগে থেকে আরম্ভ করলে কত অসুবিধা হয়, কিন্তু তালগুলি নিজের মনোমত তাবে দাঁড়িয়ে নিয়ে খেলতে পারলে কত ভাল খেলা হয় দেখা গেল। বিশেষ চিন্ত করে খেললে বিপক্ষদের হাতের অনেক কিছুই জানতে পারা যায়। সম্পূর্ণ চার হাত ছিল নিয়ন্ত্রণ,—

ইস্কাবন— \times, \times ।

হরতন—লাহেব, বিবি, $\times, \times, \times, \times$ ।

কুহিতন—গোলাম, দল, \times, \times ।

চিড়িতন— \times ।

ইস্কাবন— \times, \times ।

হরতন—টেকা, \times, \times, \times ।

কুহিতন—লাহেব, নয়, \times ।

চিড়িতন—লাহেব, বিবি, \times, \times, \times ।



ইস্কাবন—গোলাম, $\times, \times, \times, \times$ ।

হরতন—গোলাম, \times, \times, \times ।

কুহিতন— \times ।

চিড়িতন—গোলাম, \times, \times ।

ইস্কাবন—টেকা, লাহেব, বিবি, \times ।

হরতন—নাই।

কুহিতন—টেকা, বিবি, \times, \times, \times ।

চিড়িতন—টেকা, দল, \times, \times ।

হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন



—শ্রেষ্ঠাংশ—
তিমকড়ি চক্রবর্তী
মমোরঙ্গম ভট্টাচার্য

—পরিচালক—
তিমকড়ি চক্রবর্তী

—শ্রেষ্ঠাংশ—
অহীন্দ্র চৌধুরী
শিশুবালা

খেলার মাটে

(সি, বি)

চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে মাদ্রাজে লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টিমের সঙ্গে নিখিল ভারত দলের চতুর্থ ক্রীকেট টেস্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হয়েছিল খেলাটি চারদিনব্যাপী হবার বন্দোবস্ত থাকলেও তৃতীয় দিনে শেষ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। বিলম্বিত দলটি এই টেস্ট ম্যাচটিতে খুবই শোচনীয় ভাবে পরাজয় স্বীকার করেছে। এট খেলাটির একটি বিশেষত্ব যে, লর্ড টেনিসনের দলকে ফলোঅন্ করতে বাধা হতে হয়েছিল। এরা ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে এই অসম্মান এই প্রথম বরণ করলেন। নিখিল ভারত দল প্রথমে ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে ২৩৬ রান করেন। তার মধ্যে ভিন্ন মনকাঙ্ক্ষার অবস্থানই সর্বাপেক্ষা বেশী। তিনি নিজ ব্যাট নৈশুত্র দেখিয়ে নিজস্ব ১১৩ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট ছিলেন। তিনি টেস্ট ম্যাচে এই প্রথম শতাধিক রান করেন। তাঁর পরেই হ্যাভেওয়ার্ড ৪৪ রান উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এল ব্যানজি 'ওপেনিং' হিসাবে গিয়ে মাত্র ১১ রান করলেও দলের অধিনায়ককে হতাশ করেন নি। যুক্তাক এবং নিলার এই খেলাটিতে অনিবার্য কারণ বশতঃ যোগদান করতে পারেন নি। অমরনাথ মাত্র ৩২ রান করেছিলেন। বিপক্ষদলের শেপ উল্লেখযোগ্য বোলিং করেছিলেন। তিনি ৫১ রানে পাঁচটি উইকেট লাভ করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে লর্ড টেনিসনের দল মাত্র ৯৪ রান করে সকলে আউট হয়ে যান। হার্ভেটাক ২৯ রান করে ব্যক্তিগত সর্বাপেক্ষা বেশী রান করেন। অমর সিং এবং মনকাঙ্ক্ষা যথাক্রমে ৩৮ রানে পাঁচটি এবং ১৮ রানে তিনটি

উইকেট পাওয়ার বিলাতি বলটিকে স্বয়ংসংখ্যক রাণ করে লস্টে থাকতে হয়েছিল। লর্ড টেনিশনের বল ক্রিকেট খেলার আইনানুযায়ী 'ফলো অন' করতে বাধ্য হন এবং প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করেই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। এই ইনিংসে অপেক্ষাকৃত ভাল খেলে তাঁরা তৃতীয় দিনেই মোট ১৬০ রাণ করে এই খেলাটির পরিসমাপ্তি করেন। ওয়েল্ড, ল্যাংগ্রেজ এবং ওয়ার্ডিংটন যথাক্রমে ৪০, ২৭ এবং ২৪ রাণ করেন। হার্ডটাক মাত্র ১৪ রাণ করেছিলেন। কবর সিং ৫৮ রাণের বিনিময়ে

টেস্ট ম্যাচ খেলার ঠিক ছিল তাহলেও লর্ড টেনিশন বলের 'কলম্বো' লহরের খেলাটি বাতিল হওয়ার গত ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে বোম্বাইয়ের নবনির্মিত 'ব্র্যাবোর্ন' স্টেডিয়ামে পঞ্চম এবং শেষ টেস্ট ম্যাচটি খেলার ব্যবস্থা হয়। এই টেস্টম্যাচটি খেলা না হলে লর্ড টেনিশনের দশটি নিখিল ভারত হল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হত না। এই খেলাটির ফলাফলের উপর 'রাবার' বিজয় নির্ভর করেছিল। সেই কারণে এই খেলাটির গুরুত্ব অস্বাভাবিক। টেস্টম্যাচগুলি অপেক্ষা অনেকখানি বেশী হয়েছিল। নিখিল ভারত হল উপস্থাপিত



অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্ট

ছয়টি উইকেট লাভ করেন। মানব্দ ৫৫ রাণে তিনটি উইকেট পান। শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত হল এই প্রতিনিধিত্বমূলক খেলাটিতে এক ইনিংস এবং ছয় রাণে ক্রতিশ্রদ্ধের সহিত জয়লাভ করেন।

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ

যদিও পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী চারটি

তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ ছুটিতে ক্রতিশ্রদ্ধের সহিত জয়লাভ করে জগৎবাসীর মনে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার যে উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছিলেন এই শেষ টেস্ট ম্যাচটিতে নৈরাশ্রজনকভাবে খেলে তা পুনরায় নিশ্চিত করে দিয়েছেন। ভারতীয় বলের অধিনায়ক মার্চেন্ট গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যটি আশাহতরূপে



অধিনায়ক লর্ড টেনিশন

পালন করলেও তিনি তাঁর পূর্ব গৌরব অনুযায়ী ব্যাটিং লাকল্য দেখাতে পারেন নি। মুক্তাক আলি এবং অমরনাথ বারা পূর্বে একাদিকবার নিজস্ব একশো রাণের চেয়ে বেশী রাণ করেছেন তারা যে কি প্রকারে এইরূপ একটি নিখিল ভারতীয় লন্ডন এবং অসম্মানের দায়িত্বপূর্ণ খেলার নৈরাশ্রজনকভাবে খেলে অতি নগণ্য রাণ লংখ্যা করে নিজেদের যশ ও খ্যাতিকে প্রিয়মান করলেন তার কোন উপযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

হাল-বাউলা

হাল-বাউলা

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের
হাস্য-রহস্যবিচিত্র চিত্র-কথা

মশুর মিলন কাহিনীর
ফেনি লোচ্ছল হাসির
উৎসবের আশ্রমে আমাদের
জ্ঞানি ও অসজ্জতির, দুঃখ ও
লজ্জার আনন্দ ও বেদনার
মগ্নরিত অনুভূতি, আপনা-
দের উতলা করিয়া তুলিবে।

রূপবানীতে

আগতপ্রান্ত

কৌতুক প্রদীপ্ত.....

প্রণয় রহস্য মধুর.....

ছবি নয়

ভীরগতি

হাসির

তৃফান !!!

‘হাল-বাউলা’

বি, এল, খেমকার প্রযোজনায়
ইফ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ স্টুডিওএ
গৃহীত



“হাল-বাউলা”

ভূমিকায়

ছায়া দেবী

ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলী

তুলসী লাহিড়ী, চন্দ্রিকা দেবী,
মৃণাল ঘোষ, গোপাল সেন (অঙ্ক
গায়ক), গিরীন্দ্র চক্রবর্তী, মহাদেব
পাল, সত্য মুখোপাধ্যায়, বীণা
বোস, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়,
নবদীপ হালদার, সন্তোষ সিংহ,
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মনিবল প্রথম ইনিংসে অধিনায়ককে একে-
বারে হত্যা করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে যীর
৫৭ রান করে নিজ সুনাম বজায় রেখেছেন।
অমর লিং বোলিংয়ে তাঁর কৃতিত্বের
এতটুকুও স্মরণ করেন নি। তিনি
প্রথম ইনিংসে ৪৭ রানে পাঁচটি এবং দ্বিতীয়
ইনিংসে ২৫ রানে চারটি উইকেট পেয়ে-
ছিলেন। এম্‌ ব্যানার্জি মনোনীত হয়েও
হাতে আঘাত পাওয়ার জন্তু এই খেলাটিতে
যোগদান করতে পারেন নি। নিশার
আশামুরূপ বোলিং সাফল্য না দেখালেও
হত্যা করেন নি। রণবীর লিংজী নামে
একটি নতুন খেলোয়াড়কে এই টেষ্ট টীমে
স্থান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু খেলার শেষে
তাঁকে টীমে মনোনয়ন করবার কোন উপযুক্ত
কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে বর্ষকগণ
এই ভেবে মনকে লাঞ্ছনা দিয়েছেন যে
তিনি হস্ত প্রতিপত্তিশালী কোন বর্ষপক্ষের
নিকট আত্মীয়। লর্ড টেনিসনের দলের
বিখ্যাত এবং শক্তিশালী বোলার 'গোভার'
অসুস্থতাবশতঃ এই খেলাটিতে যোগদান করতে
পারেন নি। বিলাতী দলটি প্রথম ইনিংসে খুব
নিশ্চলভাবে খেলে মাত্র ১৩০ রান
করেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে খেলাটির
গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁরা তব্বমুহুরী
খেলেতে আরম্ভ করেন এবং মোট ২৮৮ রান
করেন। এই রানসংখ্যার মধ্যে ওয়াক্‌ফোর্ড
৩৮, এডরিচ ৫৬ এবং পোপ ৪৯ রান
করেন। নিখিল ভারত দল প্রথম ও
দ্বিতীয় প্রত্যেক ইনিংসে ১৩১ রান করেন।
পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে মাত্র এই শেষ
ম্যাচটিতে লর্ড টেনিশন টেসে জয়লাভ
করেন এবং প্রথমে ব্যাট করিতে নামেন।
অমর লিংয়ের দুর্ভাগ্য বোলিংয়ের
জন্তু মাত্র ৪৭ রানে লর্ড টেনিশনের দলের
পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়। প্রথম দিনেই
৩-১০ মিনিটের সময় লর্ড টেনিসনের দল
মোট ১৩০ রান করে প্রথম ইনিংসের খেলা

শেষ করেন। তার পর নিখিল ভারত
দল খুব নৈরাশ্রজনকভাবে খেলা শুরু
করেন এবং মাত্র ৩ রানে দুইটি উইকেট
পড়ে যায়। ৭৩ রানে পাঁচটি উইকেট পড়ার
পর ঐ দিনের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে
মাত্র একঘণ্টা খেলার পর নিখিল
ভারত দল সকলে আউট হয়ে ১৩১ রান
করেন এবং বিপক্ষদল ১ রানে অগ্রগামী
থাকেন। তারপর লর্ড টেনিসনের দল
দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন এবং
মাত্র উইকেটে ২০৯ রান করে ঐদিনের খেলা
শেষ করেন। তৃতীয় দিনে বেলা বারোটা
অবধি খেলে মোট ২৮৮ রান করারপর তাঁদের
দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ১২-২৫
মিনিটের সময় নিখিল ভারত দল দ্বিতীয়
ইনিংসের ব্যাটিং শুরু করেন এবং বিকাল ৩-
৪০ মিনিট পর্যন্ত খেলে মোট ১৩১ রান করার
পর এই খেলাটির শেষ সীমানা হয়ে যায়।
লর্ড টেনিসনের দল ভারতবর্ষের এই শেষ
খেলাটিতে ১৫৬ রানে জয়ী হয়ে 'রাবার'
জয়ের বিশেষ সম্মান অর্জন করেন। ভারতীয়
দলের এই পরাজয়ে পাতোদীর নবাবের
ভবিষ্যৎস্বামী লক্ষ্যতার কাণে বেশ বিফলতার
পরিণত হল। বোম্বাইয়ের হিন্দু জিহ্মাণার
লজে ক্রিকেট ক্লাব কক্ষ ইণ্ডিয়ার বর্ষপক্ষের
মনোমালিন্য হওয়ার বোম্বাইয়ের অধিকাংশ
হিন্দু অধিবাসী এই খেলাটির সময়ে অসুস্থিত
ছিলেন।

লর্ড টেনিসনের দলের প্রথম ইনিংস

পার্কস্‌ ক ম্যানকাড্‌ ব অমরনাথ	৮
এডরিচ ক মার্চেন্ট ব অমর লিং	২
হার্ডটাক ক মার্চেন্ট ব অমর লিং	২০
ইয়ার্ডলে ব নিশার	৩১
ল্যাংগ্রেজ এল বি ডবলিউ ব অমর লিং	৫
ওয়াক্‌ফোর্ড ক ম্যানকাড্‌ ব নিশার	১০
গিব এলবি ডবলিউ ব অমর লিং	২১
পোপ ব হাজারী	১৫

ওয়েলার্ড ক অমরনাথ ব আমীর ইলাহী	৫
লর্ড টেনিশন ক ম্যানকাড্‌ ব অমর লিং	০
স্বিথ নট আউট	৪
অতিরিক্ত	২

মোট	১৩০
-----	-----

দ্বিতীয় ইনিংস	
পার্কস্‌ ক হিন্দলেকার ব নিশার	২০
এডরিচ রান আউট	৫৬
হার্ডটাক ক মার্চেন্ট ব অমর লিং	৫
ইয়ার্ডলে ব অমর লিং	০
ল্যাংগ্রেজ ব অমর লিং	৫
ওয়াক্‌ফোর্ড ক ম্যানকাড্‌ ব অমর লিং	৬৮
গিব ক রণবীরলিংজী ব ম্যানকাড্‌	১৬
পোপ এল বি ডবলিউ ব ম্যানকাড্‌	৪৯
ওয়েলার্ড ব ম্যানকাড্‌	৩৩
লর্ড টেনিশন নট আউট	১২
স্বিথ রান আউট	২
অতিরিক্ত	২২

মোট	২৮৮
-----	-----

নিখিল ভারত দল প্রথম ইনিংস	
হিন্দলেকার ক পোপ ব ওয়েলার্ড	৯
বুস্তাক আলি ক ওয়েলার্ড ব পোপ	২
ম্যানকাড্‌ ব পোপ	০
অমরনাথ এল বি ডবলিউ ব পোপ	১৯
রণবীরলিংজী ক এডরিচ ব ওয়েলার্ড	৮
মার্চেন্ট ক ওয়াক্‌ফোর্ড ব পোপ	১৭
অমরলিং ক ওয়েলার্ড ব পোপ	১৬
হাভেওয়ার্ড ক গিব ব ওয়েলার্ড	২
হাজারী ক ওয়েলার্ড ব এডরিচ	১২
আমীর ইলাহী নট আউট	৩৮
নিশার ব ওয়েলার্ড	১

অতিরিক্ত	৭
মোট	১৩১



(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

প্রমথের আশ্রয়ে এল অভাগিনী সন্ধ্যা
একটা বাহ্যিক অবলম্বন পেলে। কিন্তু
অন্তরের বিরোধ তার দূর হোল না।

এই ভাবে সন্ধ্যার মনের অবস্থা যখন
চরমে উঠেচে, তার মন প্রকাশভাবে বিদ্রোহ
ঘোষণা করল। সে প্রমথকে বলে—“আর
এ লুকোচুরী নয়। আমার সত্য পরিচয়
আজ সবাই জেনে যাক; অসহ এ জীবন—
অসহ এ মিথ্যা প্রহসনের অভিনয়!”

প্রমথ বাধা দেরনি, কোন দিনই সন্ধ্যার
কোন কথায়। আজও সে নিশ্চপ রইল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঠিক যেন সন্ধ্যার ত্রণ

কর্তা রূপে নিত্যন্ত অন্তর্কিতে লেখানে
প্রকাশের আবির্ভাব ঘটলো—এবং তার কিছু
পরেই তার স্বামী প্রিয়লালকেও আলতে
হোল।

এর পর নায়কের গতি কোন দিকে
অগ্রসর হোল—কেনন তার পরিণতি—তাতে
সন্ধ্যার জীবনে শুভ হোল কী অন্তত হোল—
আপাততঃ সে কাহিনী আমরা গোপন
রাখলুম। কারণ তাঁতে ছবির পর্দায়,
অভাগিনী সন্ধ্যার জীবনের সে অশ্রু-সজল
কাহিনী আপনাদের সমবেদনা ও কোতূহল
জাগিয়ে তুলতে পারবে।

* * *

আগামী বৃহস্পতিবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী
থেকে শ্রীযুক্ত প্রমথের বড়ুয়ার পরিচালনায়,
তার নতুন সামাজিক ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু
হবে। এই ছবির বিভিন্ন শ্রেণী ইত্যাদির
পরিচয়না করেছেন সুবিখ্যাত শিল্পী অর্জুন
রায়। ছবির ভূমিকা লিপির পরিচয় আমরা
গত লগ্নীতে দিয়েছি।

যে শ্রেণীর কাহিনী নিয়ে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া
কাজ শুরু করলেন—সে শ্রেণীর গল্প চারপাটে
ইতিপূর্বে আর আত্মপ্রকাশ করেনি।
ছবিখানি যে বাংলার তরুণ-তরুণীর অন্তরে
নব-জাগরণের প্রেরণা আনতে পারবে—এ
বিশ্বাস আমাদের আছে। সমাজের বনিয়াদ
আলগা হয় কালে—কোথায় তার গলদ এবং
কোন পথে তার প্রতিকার—শ্রীযুক্ত বড়ুয়া
এই চিত্রে সেই পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমরা বারান্তরে ছবির বিষয় বস্তু লক্ষ্য
আরও বিশদভাবে আলোচনা করবো।

ছবিখানির লক্ষ্যাত্মকের পরিচালনা
করেছেন—সুবিখ্যাত সুর শিল্পী তিমিরবরণ।
ছবি তোলাবেন—ইউগ্ৰফ ফুলজী এবং শব্দগ্রহণ
করেবেন অভুল চট্টোপাধ্যায়।

* *

কবি বিভূষণের কথা চিন্তা করলে
ভারতবাসী মাঝেই গোরব বোধ করে। বাণী-
চিত্রাকারে তাঁর পুত-জীবনী ভারতের লক্ষ্যেই
সমগ্র লোকের কাছে কোরেচে।

শোনা যাচ্ছে, বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে
কবি বিভূষণের পুত-জীবনী ছায়া-চিত্রাকারে
মুগ্ধ পন্নিগ্রহ কোরেচে। নাট্যকাব্যের
রূপান্তরের ফলে, চরিত্রগুলি প্রাণরূপে মূর্ত
হোয়ে উঠেছে। গাড়া থেকে শেষ পর্যন্ত
নাট্য ভাবের আলোড়নে ও নাট্যকীর স্বাভা-
বিকভাবে বর্ণকের চিত্র উদ্ভেল হোয়ে ওঠে।
পরিচয়নার অভিনবত্ব, লক্ষ্যের মাধুর্য্য,
দৃশ্যপটটির নয়নাভিরাম শৌন্দর্য্য, “নিউ-
থিয়েটার্সের বিভূষণ”-ভারতীয় ছায়া-
চিত্রের ইতিহাসে যে নব-যুগের সূচনা
করেছে, একথা আজ অবিসংবাদীরূপে সত্য।

বাঙালী বর্ষকালের তৃপ্তি দিতে ছবিখানি
শীঘ্রই চিত্রায় আসচে। ছবির প্রারম্ভে আমরা
দেখতে পাব—মিথিলাধিপতির প্রবেশ উত্তানে
বসন্তোৎসব। এই উৎসব প্রাঙ্গণের এক
প্রান্তে অন্তর্কিতে রাজার সহিত কবির লাক্ষ্য
ঘটে। অনেকদিনের পর দুই বাল্য-সখার
মিলন! তারপর রাজা পরিচয় করিয়ে দেন
রাণীর সহিত বিভূষণের।

সেই পরিচয় থেকে নাটকের সূচনা।

রাজা বলেন—“কবি, তুমি হ’বে আমার
পুরোহিত এবং তোমার কাব্য হ’বে আমার
মন্ত্র।” সেই মন্ত্রে আজ আমার দেবী-পূজা
হ’বে।”

তারপর রাণীকে দেখিয়ে বললেন—কবি,
আমি মুগ্ধ পেরেছি, কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় ইনিংস

মুক্তাক আলি ক টেনিশন ব ওয়েলার্ড	০
হিন্দেলকার ক ল্যাংগ্রেজ ব ওয়েলার্ড	৩
মানকান ক গিব ব স্মিথ	৫৭
অমরনাথ ক প্রতিনিধি ব পোপ	১৫
মার্চেন্ট ক এডরিচ ব ওয়েলার্ড	৭
রণবীরসিংহী ব পোপ	২
অমরসিং ক প্রতিনিধি ব পোপ	০
হাভেলওয়ালা (আঘাত প্রাপ্ত)	৮
হাজারী ক গিব ব ওয়েলার্ড	১৬
আমীর ইলাহী ব ওয়েলার্ড	১৪
নিশার নট আউট	১

অতিরিক্ত ৮

স্ট্রাইট ১৩১

স্মারতে পারিনি—তুমি আমার লহর হবে—
তুমি হবে দিখিলার রাজ-কবি।

এমন কোরে বিশপীর কবি, তার সজীনী
অমুরাধাকে নিয়ে, রাজার অমুরোধ রাখতে
আর একদিন দিখিলার এলেন—

রাজসভায় কবি বরণ হোল।

তারপর ?.....

রানীর মৃত প্রাণে আবার চেতনার লক্ষ্য
হোল। ভক্ত যেমন কোরে তার অন্তরের
সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে দেবতার চরণে প্রাণ বিকিয়ে
দেয়—তেমনি কোরে রানী লক্ষ্মী তার সমস্ত
মন প্রাণ ঢেলে দিলেন—বিজ্ঞাপতির পারে।

রানীর এই চিত্তবিকারে রাজ্যময় বে
অশান্তি স্রোত বইতে শুরু হোল—কবির
সমাপ্তিতে তারই সর্বাঙ্গিক পরিণাম
আপনার ভাবিয়ে তুলবে।

সর্গজনীন বিবাহোৎসব

“সর্গজনীন বিবাহোৎসবে”-র শানাইয়ের
সুর আজ চারদিকে যেন এক আনন্দলহরী
তুলেছে। সর্গজনীন বিবাহোৎসবে”-র রহস্য
যে কী তাই জানবার জন্তে আজ যেন
সর্গজই একটা লাড়া পড়ে গেছে। গেল
সোমবার এই “সর্গজনীন বিবাহোৎসবে”-র
বিয়ের হুজু তোলা শেষ হ’য়েছে মহা-
সমারোহে—বর-কনের হুড়োভড়ির, লোক-
জনের ছুটোছুটি, গাড়ী ঘোড়ার ঠেলাঠেলি,
বামন পুরুতের হাতাহাতি ও বরযাত্রী
ঋতাবাত্রীর লুটোপুটির ভেতর দিয়ে। ছাদনা-
তলার পাঁচ জোড়া বর-কনে এসে সমবেত
হ’ল। কন্ডাক্তা হাঁকতে শুরু কোরলেন—
“ওগো, বাড়ীর মধ্যেরা তোমরা পাঁচ বাজাও,
উলু বাঁও আর কনেরের লব আলরে হাজির
কর।” বরের দল একে একে আলরে
চুকলে ‘টেলার’ (পক্ষু দান) এনে চৈচালো
হ’ নম্বর বর ? পাশেই বামাপন লিষ্ট নিয়ে
যলে ছিলেন। তিনি বললেন—হ’নম্বর মিঃ
চৌধুরী (হরেন মুখার্জি) ও বনলতা

(বীণা)। মিঃ চৌধুরী নাহেবী-কেতা-
ধোরন্ত তাই তিনি চেলি না পরে একেবারে
নাহেবী পোষাক পরে বিয়ে কোরতে হাজির।
এক নম্বরের ডাক পড়লো—বামাপন বিমল
(জহর গাঙ্গুলী) ও চামেলীকে (রাণীবালা)
দেখিয়ে ছিলেন। চার নম্বরের ডাক পড়লে
দাঁড়াল মধু (দীর্ঘজ তট্টাচার্য্য) ও শ্রীমতী
(শাবিত্রী) পাঁচ নম্বরকে দেখে সভাপুঙ্ক
লোক হেসেই লুটোপুটি। এরা হচ্ছে
বনলতার বেরারা ফ্যালারাম (মণি লেন)
ও তার রক্ষিতা আলাকালী (ব্রাকী)।
সর্বশেষে তিন নম্বর বর-কনের খোঁজ
পড়ল। বামাপন লিষ্ট দেখে বললেন—
“কনের নাম ত’ কমলা—কিন্তু বর কে ?”
এমন সময় এক নম্বর বর বিমল চৈচিয়ে
উঠে বলল—“তিন নম্বর কনে কমলার সঙ্গে
আমারই তো বিয়ে হবার কথা ছিল—হয়
তাকে আমি বিয়ে কোরব নয়তো এই সভা
ত্যাগ কোরে এখনি চলে যাব।” এই কথা
শুনে সভার একজন লোক (বিমল ঘোষ)
হাতে লাঠি নিয়ে ভিড় ঠেলে এসে বললেন—
তুমি এ সভা ত্যাগ কোরে যেতে পার
আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার
প্রাণটি এখানে রেখে যেতে হবে।” বিমল
বললেন—“জুলুম নাকি ?” সেই ভদ্রলোক
বললেন—“হ্যাঁ জুলুম। দেশের ও কুশের
দাবীর মতে ঐ এক নম্বরের মেয়েকেই
তোমার বিয়ে কোরতে হবে। এল তাই
লব এই এক নম্বরের বরকে আমরা এক
নম্বর কনের পাশে বসিয়ে দিই।” বিমল
অগত্যার বললেন—“তবে তাই হ’ক।” এমন
সময় তিন নম্বর বর দেখানে উপস্থিত
হলেন। পাঠকগণ বুঝতে পারছেন বোধ হয়
তিন নম্বর পাত্র হ’চ্ছেন ডাঃ প্রাণধন আইচ
(জীবন গাঙ্গুলী)। তারপর যথাসময়ে
যথারীতি পাঁচ জোড়া বর-কনের সঙ্গে
মহানন্দে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে গেল।

বানর জাগতে যারা এল তারা মনের আনন্দে
গাইল—

প্রেমিকের আছে শর আর প্রেমিকারফুল
মধুহিরা

তাই দিয়ে রচে মিলন বাসর প্রিয়তম
আর প্রিয়া।

—প্রাণধন+কমলা

হাতখানি নিয়ে বাঁধিয়া কুমুম রাধি
বলেতো হ’জনে সবটুকু দিহু কিছু নাই
বাকী।

—মিঃ চৌধুরী+বনলতা

চাঁদ হয়ে এলে চকোরের চোখে স্তম্বর
ঘোহ নিয়া

প্রণয়ের হারে রচিলে বাঁধন প্রিয়তম
আর প্রিয়া।

আজ তুমি এলে মাঠাল ভ্রমর গোলাপের
আঁখি চুমে

শত বসন্ত রাজালো পরাণ অমুরাগে
কুমুকুমে

—বিমল+চামেলি
প্রেমের ঘানিতে বোরাবে লোহাগ লাগাম
দিয়া

নথ নাড়া দিয়ে করিবে শাশন হাসিয়া
কাঁদিয়া

রাশা ফিল্মস্

কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় পৌরাণিক
ছবি “পুরুষোত্তম”-র শূটিং শুরু হ’য়েছে।
অঙ্ক-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এই ছবির সুর
সংযোজনা করবেন।

মতিমহল থিয়েটার্স

জ্যোতিষ বাবুঘোষের পরিচালনায় হাদির
ছবি “বেকার নাশনের আত্মবিক্রমিক কাজ
শেষ হ’য়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করবার
জন্তে আপাততঃ মনোনিীত হয়েছেন—সুশীল
রায়, ইন্দ্ৰ বাবু ও দেববালা।

প্রফুল্ল পিক্‌চার্স

এদের “লখের প্রমিকে”-র সম্পাদনা
চলছে। আসছে মাসের মাঝামাঝি ছবিখানা
শ্রীতে মুক্তি পাবে।

বিবিধ

কবি হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী

আগামী ১৩৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার (১৯শে এপ্রিল) হইতে কবি হেমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে “হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি” কবির স্মৃতিকরে (১) রাজবলহাট গুলটিয়া গ্রামে কবির জন্মগৃহে হেমচন্দ্র-মণ্ডপ নির্মাণ (২) বিদ্বিগুপ্তে কবির বাসভবনের সম্মুখে তাঁহার আবক্ষ মস্তুরমূর্তি প্রতিষ্ঠা (৩) কবির অপ্রকাশিত রচনাবলী সংগ্রহ ও প্রচার (৪) রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (৫) কবিলিখিত নাটক ও প্রহসনের অভিনয় এবং (৬) ললিতাধির জলসার অনুষ্ঠান প্রভৃতি করা আপাততঃ করিকল্পনা করিয়াছেন।

কবির তত্ত্ব দেশবাসীকে অনুষ্ঠান সমিতির লক্ষ্য হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। লক্ষ্যভঙ্গের টাঁহার হার প্রথম শ্রেণী ৫০ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ২০ টাকা মাত্র।

রচনা প্রতিযোগিতা (সুবর্ণপদক)

“বঙ্গলাহিত্যে হেমচন্দ্রের দান” শীর্ষক প্রবন্ধ ফুগুপ লাইজ কাগজের একশত পৃষ্ঠার অনধিক আকারে লিখিতে হইবে। ৬ই ৩০শে মার্চের পূর্বে শতবার্ষিকীর লাহিত্য বিভাগীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যো-

পূর্ণ বিচ্ছেদটার

এখানে এখনও রাখা কিংবদন্তির পৌরাণিক তত্ত্বমূলক ছবি প্রভাস মিলন চলছে, পূর্ণর কল্পনাক নিত্য নতুন ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত করে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করছে। আমরা আশা করি কল্পনাক তাঁদের এ সুনাম ভবিষ্যতে বজায় রাখবেন।

পাধ্যায়ের নামে বিদ্বিগুপ্ত হেমচন্দ্র লাইব্রেরীতে অথবা তদীয় আবাস ৩-এ হেমচন্দ্র স্ট্রীট বিদ্বিগুপ্ত ঠিকানার প্রেরিতব্য। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (সুবর্ণপদক) আবৃত্তির বিষয় “ভারতসঙ্গীত”

বহুমতী কার্যালয়ে মুদ্রিত হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলীতে কবিতাটি যেরূপ আছে তাহাই কেবল মাত্র ৬, ৭, ৮, ৪৭৯ নং এই কয়টি স্থানক (অর্থাৎ “এই কথা বলি মুখে শূদ্ধা তুলি” হইতে “বেধিরা নয়নে লেগেছে ধাধা” পর্যন্ত) বাছ যাইবে।

উপর লিখিত লাহিত্য সম্পাদকের নিকট ২০শে মার্চের মধ্যে আপোষন নাম ঠিকানা দিয়া প্রতিযোগী তালিকাভুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

অভিনয় এবং জলসাদির নিমিত্ত শিল্পী নির্বাচন—

হাঁহার ‘ব্রহ্মসংহার’ নাটক ও ‘নাকে খৎ’ প্রহসনের বিভিন্ন ভূমিকার অভিনয়াদির বা লভাসমূহের এবং জলসার নৃত্যগীতবাঙ্গাধি অনুষ্ঠানে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া শতবার্ষিকী উৎসবকে লাফলুমণ্ডিত করিতে ইচ্ছুক তাঁহার লক্ষ্য শতবার্ষিকীর নাট্য ও প্রহসন সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হেমচন্দ্র লাইব্রেরী বা লকাল ৮টার মধ্যে কিংবা লক্ষ্মী ৬টার পর অথবা ছুটির দিবস তদীয় আবাস “কবি রাজলাল কুটীর” ২নং রামকল স্ট্রীট বিদ্বিগুপ্ত ঠিকানায় লাক্ষ্য করিলে লবিশেষ অবগত হইয়া শতবার্ষিকীর নির্বাচিত শিল্পীশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। আগামী মাস হইতে অভিনয় ও ললিতাধির মহলারস্ত করা হইবে।

শ্রীযুক্ত ননী দাম্পশুপ্ত

বাংলা দেশে যে কয়জন শিল্পী মাউথ অর্গ্যানের লাহাখে ললিতজ মহলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের ভিতর শ্রীযুক্ত ননী দাম্পশুপ্ত অন্যতম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইনি যেরূপ সুনাম অর্জন



ননী দাম্পশুপ্ত

করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। যেতারে ইনি নিয়মিতভাবেই মাউথ অর্গ্যান বাজাইয়া থাকেন এবং তাঁর মাউথ অর্গ্যানের স্বক্যে বৃদ্ধ হ'ন নাই এমন রস-পিপাসুর সংখ্যা খুবই বিরল। তিনি উত্তরোত্তর লাফল্য লাভ করুন— ইহাই আমাদের কামনা।

স্বাস্থ্যবাদার এণ্ড কোং

সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠান ১৬নং বিবেকানন্দ রোড হইতে ১৪২ ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রীটে (১২২নং ক্রম) স্থান পরিবর্তন করিয়াছে।

সারস্বত মঞ্জরী

গত শ্রীশ্রীমহতী পুজার দিবস যেতারে কবি বাণীকুমার রচিত “সারস্বত মঞ্জরী” নামক একটি অপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়। রচনার প্রয়োগে, ললীতে ও গীত গানে এই “সারস্বত মঞ্জরী” যেন যেত পদ্মানন্দ বীণালাপির চরণ শতফলের মত। গন্ধ রসে মধুরিত হয়ে উঠেছিলো। এই অনুষ্ঠানের লকল শিল্পীই প্রশংসার পাত্র—কিন্তু সেদিন শ্রেষ্ঠ স্বামী করেছেন মধুকণ্ঠী শ্রীমতি আভাবতী। এই গীতি-শিল্পের মধুর সুরে আকৃষ্ট হয়ে সুপ্রসিদ্ধ পেণার মার্চেন্ট “বঙ্গ ব্রাহ্মণ” এ্যাণ্ড কোম্পানী ১৪২ ওল্ড চিনাবাজার—একটি সুবর্ণ পদক পুঙ্খার দিয়ে উৎসাহিত করেছেন।

হাকিম এম.এস. ডাহমানের

আদি ও
অকুণ্ঠিত
কস্তুরীপিল
বাজারে
গেট

ধাতুদৌর্ভল্য ও শুল্কহীনতা চিরতরে
আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ টাকার
৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা

‘ল’ কলেজ

গত রবিবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী ‘ল’ কলেজের ছাত্রগণ শ্রীনরেশ মিত্রের পরিচালনার শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের “গোরা” অভিনয় করেন।

পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে লক্ষ্মীপ্রসাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অমর ভট্টাচার্য্যের পান্ডুবাবু (হারান)। জগদীশ্বর বসুর মহিম ভাল—যদিও তিনি মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। বালক চন্দ্রনাথের লতীশ আমাধের ভালই লাগে। গোরা চলন নই। হরেন বাবুর কৈলাশ, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকুলেশ্বর ও শিশু বাবুর বিনয় লবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।—বিমান বাবু পথিকরূপে গান ভাল গেয়েছেন।

স্ত্রীচরিত্রগুলোর মধ্যে প্রভাত বে মরকারের সুরচিত্রা ও মিহির বাবুর ললিতা আমাধের বেশ ভাল লাগেছে। হীরেন বসুর আনন্দমণী ভাল হলও তিনি আড়ষ্ট ভাব কাটাতে

পারেন নাই।—জয়ন্তেশ্বরের বরদাহন্দরী, নিমীথ বাবুর লাবণ্য ও নির্মল বাবুর হরি-মোহিনী একবারে অচল।

ভারতী মন্দিরে জলসা

আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৩। ঘটিকার সময় ৩০নং এ্যাডলেনবি রোডস্থ বাণিকা ললিত শিক্ষা মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে বিখ্যাত গায়কগণের সঙ্গিনে একটি জলসা হইবে। প্রোফেসর কুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায়, প্রোফেসর কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ও প্রোফেসর শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমদ গান করিবেন। প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্তী (নাকুবাবু) খেয়াল গাহিবেন। প্রোফেসর জীতেন্দ্র মোহন দেন,—সেতার; প্রোফেসর রাধিকা মোহন মৈত্র,—‘শংখ’ এবং প্রোফেসর মণিপ্রসাদ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—হারমোনিয়াম বাজাইবেন। লভ্যগণ ও পৃষ্ঠপোষক গণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

চন্দ্রনাথ পরিষদে সারস্বত সম্মেলন

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী শনিবার, চন্দ্রনাথ পরিষদের সারস্বত সম্মেলনী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। অকুঠানে নগরীর বহু গণ্যমান্য ভক্তমহোদয় ও ভক্তমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের লভ্যগণ এই উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের ‘রক্ত কমল’ ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ডিটেকটিভ’ নাটক দ্বয়ের চিত্তাকর্ষক রূপ দান করেন। শ্রীযুক্ত পাইনের গান অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল।

পরিষদের তাইল প্রেন্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ কুণ্ডু ও ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লম্বপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে লাবণ্য অন্বেষণের ও জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।—

—

ও, কে, এর প্রথম অবদান

রূপোর বুমকে

রূপোর বুমকে

পরিচালক

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহ: পরিচালক

রনি রান্না

স্বালোক-চিত্রী

বীরেন দে

সহ: আলোক-চিত্রী

মুরারী ঘোষ

প্রধান শব্দ-যন্ত্রী

নৃপেন পাল

ভূপেন ঘোষ

শব্দ-যন্ত্রী

অবনী চ্যাটার্জি

গোবিন্দ ব্যানার্জি

ধীরাজ

নীলু রায় [এ:]

সত্য, প্রফুল্ল [বাজু]

কার্তিক দে, কনি, অতুল,

প্রভাস, মুরারী, শান্তশীল, পারুল,

কমলা, বীণা, কমল কুমারী

গীতা, রাজলক্ষী, বেলা

রা জ লক্ষী

(গায়িকা)

কাহিনী

গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত-পরিচালক

এস, এন, দাস

রতন দাস

ষ্টুডিও

রাধা ফিল্ম

ব্যবস্থাপক

মিত্রাধর মল্লিক



ত্রিমল্লিনাথ

জন্ম যাত্রার পথে স্মৃতিচক্র

কংগ্রেসের পতাকা বহন করিয়া যে সমস্ত দেশবন্দী স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন এবং কাজের প্রয়াস পাইতেছেন, গত ২৯শে ও ৩০শে জানুয়ারী বিষ্ণুপুর তাঁহাদেরই সম্মেলন হইয়াছে। অবশ্য নেতৃবৃন্দের দর্শন এবং তাঁহাদের অমৃতময় মুখ নিঃসৃত আশ্বাসবাণী শুনিবার আশায় বাকুড়া জেলার মুক ও চন্দ্র পঞ্চদশ সহস্রাদিক নবনারী প্রতিনিধি বর্গের পশ্চাতে বসিয়া সম্মেলনের বাগবিত্তার গৃহ অথ গ্রহণের ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিল। মোসলিম, কমিউনিস্ট, ফেডারেশন, দেশাধিকারী, জাঞ্জির, চীন ইত্যাদি যে সমস্ত গুরুতর সমস্তা আমাদের বেশবেবকদের মাথায় ঢুকিয়া তাঁহাদের প্রতি-নিয়ত উদ্যোগ করিতেছে—এই সম্মেলনে তাঁহারা তাঁহাদের সহকর্মীদের নিকট তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া অনেকটাই আশ্বস্ত হইয়াছেন এবং সম্ভাব্য বা ভাগ্য-বোঝে যাঁহাদের বক্তৃতা দিবার সুযোগ হয় নাই—তাঁহারা যে স্থানে কিংবা গিয়া জিলা সম্মেলন জাতীয় সভাসমিতি ডাকিয়া তাহা মিটাইয়া লইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রস্তাব গ্রহণে ও বক্তৃতা দানের প্রতি যে দারুণ উদ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও নিষ্ঠা একদল দেশবেবকদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম—প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে তাহাদের সে নিষ্ঠা লাভ্যরূপে দেখা যাবনা—শুধু মনে হইল এই নিষ্ঠা যদি কার্যে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে বাংলা এত পশ্চাতে পড়িয়া

থাকিত না। এটো কথাই কেহ যেন মনে না করেন যে বাংলা দেশে কোন কাজ হইতেছে না—যা যাঁহারা প্রস্তাবাদি উপস্থিত করেন বা বক্তৃতা দিয়া থাকেন তাঁহারা কোন কাজ করেন না। তবে একদল তথাকথিত নেতা দেখা যায় যাঁহারা সব ব্যাপারেই নিজেদের পুরোভাগে দাঁড়ি কড়াইয়া এমন একটা ঢকা নিন্দা শুরু করিয়া দেন যে সেই ছটগোলে আসল কর্মীর কর্মের সন্ধান মেলা ভার হইয়া পড়ে। বিষ্ণুপুরে এটা শ্রেণীর কয়েকজন মোড়লের আবির্ভাব হইয়াছিল।

সভাপতি ও অভিযন্তা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তাহাদের শুদ্ধ স্বদেশ প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু সভাপতি মহাশয় তাঁহার ছদ্মবেশে অভিভাষণে টমোটো বা কলার চাব হইতে আশঙ্ক করিয়া ফেডারেশন পূর্ণ স্বাধীনতা প্রকৃতি এতগুলি গুরুতর সমস্তা আমাদের মাথায় একসঙ্গে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—যে সমস্তটা গ্রহণ করিবার মত সামর্থ্য আমাদের অনেকেরই ছিল না।

সম্মেলনে বহু শ্রমিক ও কৃষক কর্মীর সমাগম হইয়াছিল এবং অধিবেশনে তাঁহাদের দলটি যে বেশ বড় তাহাও স্পষ্ট হইল। কিছুদিন হইল আমাদের দেশে কংগ্রেস হইতে পৃথকভাবে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কতকগুলি ব্যাপারে এই আন্দোলনের কর্মপন্থা কংগ্রেসের মূলনীতির সহিত কোথায়ও খাপ খায় না। তাহার ফলে কোথায়ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীদের

এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে যথেষ্ট বিবর্তিত হইতে হইয়াছে। কাজেই মহাত্মাজী প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বার বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেসই ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান গণ স্বার্থ রক্ষাই ইহার মূলগত উদ্দেশ্য—কাজেই শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসের পতাকাতল হইতেই করিতে হইবে—এবং এইরূপ বিভিন্ন কংগ্রেস বিবেচী প্রতিষ্ঠান বাহ্যতে গড়িয়া উঠিতে না পারে তৎক্ষণাত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্গেই থাকিতে বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায় স্পষ্টভাবে তাহাই ঘোষণা করিয়াছেন। বাংলাদেশে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে—এই সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক প্রতিষ্ঠানগুলি কংগ্রেসের পতাকা বহন না করিয়া ‘লালবাগু’ বা লাল-কান্তে অঙ্কিত পতাকা বহন করেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যে কংগ্রেসের একটা বড় সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে বিষ্ণুপুর সম্মেলনে তাহারই সূচনা পরিলক্ষিত হইল।

বাংলাদেশে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্ম ও পুষ্টিলাভ, বাংলার রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের দলগত আত্মকলহের সুযোগেই সম্ভব হইয়াছে। যখন বাংলার কংগ্রেস মহল কর্পোরেশন এবং বি, পি, সি, লিগ গণী দখল লইয়া কোমর বাধিয়া লাঠালাঠি করিতেছিলেন তখন ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া ‘একদল হুঃখব্রতী’ ত্যাগী কর্মী এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়েন এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। গোড়াতেই হরত তাহাদের কর্মপন্থার সঙ্গে কংগ্রেসের নীতির কিছু কিছু পার্থক্য ছিল কিন্তু তখন নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের বৃহত্তর কল্যাণের জন্ত ইহাদের পরিচালনা করিবার প্রয়াস করেন নাই—বরং দলগত স্বার্থের জন্ত তাঁহাদের নিজ প্রয়োজনানুসারে উৎসাহিত করিয়াছেন—আজও তাহার অভিনয় চলিতেছে—ফলে আজ প্রাদেশিক

কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব রক্ষা করা
একটা লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই লক্ষ্যটোয় অবস্থায় সুস্থ ও সবল মনে
সুভাষচন্দ্রের আগমন প্রকৃত স্বদেশ সেবকদের
মনে সাহসের সঞ্চার করিয়াছে। বাংলার
এই লক্ষ্য বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করিয়া
এক উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার
সাধা একমাত্র সুভাষচন্দ্রেরই আছে। জীবনের
লক্ষ্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যিনি দেশ সেবার
নিয়োজিত করিয়া লক্ষ্য ভারতের এমন কি
পৃথিবীর সর্বত্র পূজা লাভ করিয়াছেন—তাঁহার
নিকট দলগত স্বার্থ স্থান পাইবেনা—ইহা
তাঁহার বিষ্ণুপুরের কর্মপন্থা ও দৃঢ়তার মধ্যে
সহজেই অনুমিত হইল। তাঁহার সেই
তেজস্বীতা ও দৃঢ়তার নিকট লকলেই মস্তক
অবনত করিয়া তাঁহাকে বাংলার রাজনৈতিক
ক্ষেত্র পরিচালনার এক নায়ক স্বপ্ন
করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর লক্ষ্মণন সুভাষচন্দ্রের
জয়যাত্রার বিজয় মুকুট পরাইয়া দিয়াছে—
৫ কোটি বাঙ্গালীর আন্তরিক শুভাশীর্ষা
দিয়া লক্ষ্য ভারতের নায়কদের আসনে
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

পঞ্চ কন্যা

শ্রীমন্ত কুমার চৌধুরী

অলস বিবেকের দিকে তাকিয়ে পরমেশ
গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। উজ্জ্বল
করে আর কদিনই বা সংসার চলে। বেহে
আলস্তের ঢেউ তুলে পরমেশ পাশ ফিরলে।
বিছানার যা ছিঁরি হয়েছে। এই কটা দিন
খুবই অভাবে যাচ্ছে কি না! নইলে একটা
নতুন চাবুর কিনে আনতো—জীর্ণ ব্যাগেও
মাত্র আনা কয়েক পয়সা আছে। জাল
নোট দিয়ে ত যেখানে সেখানে কারবার করা
চলেনা! ধরা পড়লে লাটটি বছরের জে—
অবিদ্রি পেটের চিন্তা করতে হয় না।
আপাততঃ কিন্তু ছেনা, শ্রীলতা, চামেরী এদের
ডেডে জেলে যাবার ইচ্ছা নেই পরমেশের।
ঈশ্বরকে প্রস্তুত! বিড়িতে ও একটা আরাধ-
ন টান দিয়ে মনে মনে বললে—তাবপ্রবণ
মেয়েরা না থাকলে সে না খেতে পেয়ে মারা
যেত। ঈশ্বর শুধু পরম কারুণিক নন তিনি
পরম বুদ্ধিমানও। নইলে প্রেম বলে একটা

বিচুর সত্তা—যদি মেয়েদের মনে আবেগই
না থাকতো—।

বিড়িটা জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে পরমেশ
অর্দ্ধফুট দূরে উচ্চারণ করলে তাহলে সে
কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকতো? ঋণ করে
আর ক'দিনই বা সংসার চালাবো যায়!
লক্ষ্যার পর একবার লক্ষ্যে বেরুতে হবে।
পুরনো স্ট্রাকেশের ওপর একরাশ চিঠি
জমেছে। ছেনা, শ্রীলতা এদের চিঠিগুলোর
উত্তর দেবার খরচ সে কুলিয়ে উঠতে পারে
না! চিঠিগুলো অবিদ্রি বর্তমানের গলির
কোন বাসার ঠিকানায় আনেনি। ওরা
সবাই জানে বালাগঞ্জে পরমেশের মস্ত দালান-
বাড়ী—না খেতে পেয়ে মরলে কোন মেয়ের
কাছে মাথা খুঁড়লেও একটা পাই পয়সা
পর্যন্ত বের করা যাবেনা এর চাইতে পরমেশ
অনেক ভ্রূতভাবে জীবিকা সংস্থানের পন্থা
বেছে নিয়েছে। নিজেকে ভ্রূতভাবে ঢেকে
রাখাওঁত লভ্যতা। সুতরাং দুখোঁস পরাটা
পরমেশের পক্ষে দোষের নয় মোটেই।
ভালকথার যারা টাকা দিতে চায়না—তাঁদের
না ঠকিয়ে উপায় কি? এইত সেদিন প্রকাশ
বাবু মুরবিদ্যানা ভাবেই তার মুখের ওপর ছুড়ে
মারলেন লক্ষ্যের তুণ্ডী।

—একটা নতুন ইঞ্জিওয়েল কেন করতে
না বলে লোজা বৃকে ছুরি বলিয়েই দিলেই
পারেন। সব ছালামা একদিনে চুকে যায়।
আপনারেঁরত ছেলেমেয়ে নিয়ে বর সংসার
করতে হয় না! আছেন বেশ। মায়ের
শেষে পাওনাদারের মোটা বিল ত আপনারেঁর
ঘেঁটাতে হবেনা? হাওয়ার চড়ে বেড়াচ্ছেন,
না?”



দুর্লভ এবং মীর্ন
শিশুরা।

ডোঙ্গরের

বাল্যমৃত

সেবনে

অবিলম্বে সুস্থ ও

সবল হয়।

বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

এর উত্তরে পরমেশ্বর চুপ করে থাকা ভিন্ন উপায় নেই! প্রিমিয়ম্ বোগাবেন যখন ভক্তলোক তখন এজেন্টের ওপর একহাত নেবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে।...

‘দাড়িটা আজ কামাতে হবে। সাবান্ন হয়তো শুকিয়ে আছে। ব্লেডে ধার আছে’ কি না তাও দেখতে হয়। পরমেশ্বর উঠে বসলো। এক কাপ চা খেতে পেলেন মন্দ হয় না। দেশলাইতে ছোটোমাত্র শলা রয়েছে। আজ রাত্তির চলে যাবে এতেই। চা কর্তে বসলে আবার নতুন একটা দেশলাই কিনে রাখতে হয়। থাক্—হেনার ওখানে গিয়েই চা খাওয়া যাবে।

‘সেফটি রেজার’ নিয়ে পরমেশ্বর দাড়ি কামাতে বসলো।—পড়ন্ত বেগার স্নান আলোতে বড় অসুবিধা হচ্ছিল। পেভনের রঙটটা আগুনায় নিজের চেহারা দেখে পরমেশ্বর বেশ একটু গর্স বোধ করলে। ভগবান ‘কাউকে সবদিক দিয়ে বক্ষিত করেন না।... “মেরেলোক বলে একটা জাতি না থাকলে,” পরমেশ্বর মনে মনে বলে, পুরুষদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠতো।’ আর প্রেম! স্বপ্নবিলাসী কবিতা প্রেমকে মানুষের অমূল্য সম্পদ বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। ও জিনিষটার যে একটা কমার্শিয়াল ভ্যালু থাকতে পারে, পরমেশ্বরই লক্ষ্যপ্রথম তা, আবিষ্কার করেছে।... আচম্কা একটা কালো ইঁদুর পরমেশ্বরের কাঁধাবার বাটিকে ওলটপালট করে পালিয়ে গেল। পরমেশ্বর এই জীবটার আকস্মিক আক্রমণে চীৎকার করেই উঠেছিল আর কি! বেচারী ইঁদুর! এক জায়গায় ত ওদের থাকতে হবে এবং সুলেখা, চাম্‌চিকা-ছড়ানো কোঠাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান বলতে হয়। তবে অসুবিধে এই যে পরমেশ্বরের এখানে বসে থাকাবার পাওয়া যাবে না। “ওয়েলস্—” একটা বইয়ে লিখেছেন—our life is a fight for food. ইঁদুর বাবাজীও হাড়ে হাড়ে তা বুঝেন।

দাড়ি কাঁচিয়ে পরমেশ্বর স্ট্রটকেশের নীচে কাগজবিশ্রে জড়ানো ধোপার ধোরা কাপড় আর পাঞ্জাবী বের করলে। এই একসেট ভক্তগোছের কাপড়েই তার কাজ চলে। হেনা শ্রীলতা ওদের বাড়ীতে যাবার বেলাই এন্টলেন্সের দরকার কি না! অস্ত্রসময়ে খন্দরের মোটা কাপড় ও পাঞ্জাবীতেই কুলোয়। রোন্ড গোল্ডের বোতাম এটে ‘পরমেশ্বর পাঞ্জাবী পরলে। হেনা, শ্রীলতা, ওরা সবাই অবিশ্রিত খাঁটি শোনার বোতাম সেট বলেই জানে।...

গলিটার মোরে এসে পরমেশ্বর একটা স্ট্রাজিতে উঠে বসলো! হেনাকে বাড়ীতে না পাওয়া গেলে আবার নতুন ফ্যানা দ। তার চেয়ে ওর নামে একখানা চিঠি লিখে দিলেই চলতো।...

গাড়ীটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালে। পরমেশ্বর ড্রাইভারকে আটটার সময় আস্তে বলে ভিতরে ঢুকে পড়লো। লব্জ সেডের আলোতে হেনা কি একটা বই পড়ছিল। দরজার কাছে এসে পরমেশ্বর শুধালে—আসতে পারি?

হেনা বই থেকে মুখ তুলে তাকালে।

—এই যে তুমি! অহমতি নিয়ে কবে আবার ভিতরে এসেছ! অর্জুনসম্পদ বইটাকে পেন্সিল দিয়ে বন্ধ করে হেনা দরজার দিকে পা বাড়ালে।

—“আমি ভেবেছিলাম” শরীরে খুলীর মুচ্ছনা জাগিয়ে বললে হেনা, নেকলেসটার কথা নিয়ে তুমি বোধ হয় মন খারাপ করছ। তোমার বাবার টেলিফোন করোও হয়রান। কোচে দু’জন পাশপাশি বসলো।

নিঃশব্দ কণ্ঠে পরমেশ্বর বললে “নেকলেসের কথা কি বলছিলেন?...

—থাক্, ও নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাস্কেল স্তম্ভকে আমি দেখে নোব।”

—আহাঃ, স্তম্ভের হুণপাত না হয় পরেই করবে। কথাটা খুলেই বল না।”

—এরই মধ্যে তুলেগেলে বুঝি? খীক, সে কথা নিয়ে শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ নেই!

—কথাটা যখন তুললে, তখন শেৰ করেই ফেল না!

—আমার বার্থডে তে, ইতঃস্ততঃ করে বলে হেনা, “অনেকগুলো প্রজেক্ট এসেছিল না! তার মধ্যে ছোটো একরকমের নেকলেস ছিল। তুমি আর স্তম্ভ দু’জনেরই ছোটো প্রজেক্ট আর কি! তোমাকে সেদিন বলছিলাম না, একটা নেকলেস... এখন স্তম্ভ বলছে নেকলেসটা নাকি তোমার দেওয়া. সে থাকগে। ও নিয়ে কিন্তু তুমি মন খারাপ করোনা। স্তম্ভের জোচ্ছুরি আমি ধরে ফেলেছি। ছুঁচ হয়ে ঢুকে কিনা হাতির ডাক ডাকতে এসেছেন। রাস্কেল কোথাকার!”

—গালাগালি দিচ্ছ কেন! বেচারার পরশা নেই বলে কি ভালোবাসতে মানা আছে?

ছটমির হাসিতে পরমেশ্বর বলে। হেনা আঙুলের শিখার মতো লিঙ্কলিক করে উঠলো!

—ভালোবাসা না হাতি! কে বলেছিল ওকে নেকলেস কিনে. আনতে? জোচ্ছুর কোথাকার। প্রেম দেখাতে এসেছেন। টেবিলের “পর থেকে বাবার শোনার চেনটা ও নিয়েছে নিশ্চয়ই। ‘বার্থ-ডে তে’ সে ছোটো নেকলেস জেনে স্তম্ভ উপহার দিতে পারে সে পারে না কি? এ যে একেবারে বিনে ডাকাতি! আমার দেখাবার জায়গা পান নি।” ছ’পরশা রাজগার করবার কমতা নেই... ভালোবাসা দেখাতে এসেছেন...।”

—তুমি চুপ কর হেনা। কোথাকার স্তম্ভ একটা কাজ করে ফেলেছে, তাই বলে নিজের মন খারাপ করে লাভ আছে কিছু?

—নেই-ই ত। ওর কথা আমি ভাবতে
যাব কেন? 'টুট' বেগারের কথা নিয়ে
মন খারাপ করতে বয়ে যাচ্ছে কি না
আমার। একটু বস, আমি চা নিয়ে
আমি।

পরমেশ্বর বুক থেকে যেন পাষণ্ড ভাব
নেমে গেল। খুব বেঁচেছে যা হোক।
সুখস্ত হাজার বছর বেঁচে থাক।...

হেনা চাঁর সাথে খাবার নিয়ে এলো।
কাপে চা ঢেলে হেনা বললে—টেলিফোন
করে ত নাস্তানাবুহ...

হেঁদ দিয়ে পরমেশ্বর বললে—বাঃ, আমি
কোলকাতায় ছিলাম বুঝি! তোমার এখান
থেকে গিয়েই জামলেশপুরের কাকাবাবুর
জরুরী 'তার' পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই চলে
যেতে হলো।...

চাঁর কাপ এগিয়ে দিয়ে টানাসুরে
বলে হেনা—বাড়ীর ওরা টেলিফোনে বললে
যে তোমার নামে কোন লোক ওখানে
নেই! গভীর উৎসুক দৃষ্টিতে পরমেশ্বর
জিজ্ঞেস করলে—কার নাম বলেছিলে শুনি?
লঘু হাসিতে বললে উঠলো হেনা,—কার
নাম আবার? তোমার কথা জিজ্ঞেস
করতে গিয়ে আরেক জনের নাম বলতে
হয় বুঝি?...

কথা শেষ করবার আগেই প্রচণ্ড
হাসিতে পরমেশ্বর উঠলে পড়লো। হেনা
অপ্রস্তুত হয়ে শুধালে—এতে ঘোষের কিছু
আছে নাকি?

—ঘোষের মানে? থোকা নিশ্চয়ই
টেলিফোন ধরেছিল। ও বুঝি আমার
ভালো নাম জানে? তোমার ছোট
বোনকে শ্রীমতী হেনা মিত্র বললে ভড়কে
যাবে নিশ্চয়ই। বোকা মেয়ে!

লজ্জায় হেনা রাঙা হয়ে উঠেছে।—
বাড়ীর নাম আমার বলেছ কোনদিন?
আকাশ থেকে ত তোমার নাম 'দৈববাণী'
হতে পারে না।

—সে ত পারেই না। তোমার চুনী
নাম দৈববাণীতে আমি শুনিনি।

—বাট হয়েছে। এখন তোমার বাড়ীর
নামটা বলবে?

—এইবার মুন্সিলে ফেললে দেখছি।
আমার বাড়ীর নাম রেখেছিলেন ঠাকুর
মা। বড় মেকলে নাম। একটা নতুন
নাম ঠিক করে তখন বলবো না হয়।

তদ্রিল সুরে পিয়ানোর বন্ধার তুলে
হেনা বললে—লজ্জার আগে আসলে কি
পৃথিবী তাঁর আর্থিক গতি হারিয়ে
ফেলতো? একটা ইংলিশ ছবি দেখতে যাবার
ইচ্ছে ছিল—তা তোমার ত খোঁজ পাওয়া
যায় না। একটা লিগার জেলে পরমেশ্বর
বললে—ইচ্ছে করেই কি ঘেরীতে আসতে
হয়! লেডি বোস্ আজ ডিনার দিচ্ছেন।
তোমার এখানে আসবো বলে ওষেৎকে
শুধু নমস্কার জানিয়ে সরে পড়লাম। এই—
আটটার মধ্যে আমাকে ফিরতে হবে।
'ফ্র্যাঞ্চ' কার কোম্পানীর ম্যানেজারের সাপে
দেখা হওয়ার কথা। পুরনো গাড়ীতে আর
ক'দিন চলে!"

—এরই মধ্যে বাড়ী ফিরবে নাকি?
আহত সুরে হেনা বললে।

—আমি ত আর পালিয়ে যাচ্ছি না।
এটার গাড়ীটা কিনে ফেলে আমাদের
ছজনেরই লাভ। কী বোকা মেয়ে তুমি।
হেনা খুব কাছে সরে এলো পরমেশ্বরের।...

...লাল হয়ে উঠেছে হেনা, আপেলের
মতো লাল।

২

"পুরুষ মানুষের কথোঁতে", অনুযোজ্য করলে
শ্রীলতা, "কোন দিনই বিশ্বাস করতে নেই।
তোমরা সবই পার। পৃথিবীর বুক চিরে
যে মেয়েকে দৃষ্টির আলোতে ঝলসে তুলে",
শ্রীলতা চোখের নীলিমায় পরমেশ্বকে প্রশ্নাত
করে বললে, "তাকেই নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে
বিলজ্জন হিতে তোমাদের বাধে না।"

—একবারে কবিতার ভাষায় বক্তৃতা
করতে আরম্ভ করলে যে! 'আচ্ছ', তুমি
কবিতা লিখতে পার শ্রীলতা?"

অভিমানে শ্রীলতার কণ্ঠস্বর গাঢ়তর
হয়ে এলো। বলে—জীবনের কোন দিকই
তোমাদের স্পর্শ করে না। এমনি হালকা
তোমাদের মন।

অভিমানে শ্রীলতার জীবনে প্রথম
প্রেমের সুর যেন আজ অকস্মাৎ বেহুতো
বেজে উঠলো। তাঁর লালচে মুখের মাঝে
বুঝি ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্রণার
স্বাভাবিক অভিব্যক্তি... শ্রীলতা আজ
রাগ করেছে নিশ্চয়ই। নীল শিরাগুলো
পর্যন্ত ওর গালে ফুটে উঠেছে। পরমেশ্বরের
নিজের ওপর অনেক সময় ভাবগ্ন রাগ
হয়। অনেক স্থানেই তাকে বাধ্য হয়ে
অভিনয় করতে হয়, অথচ এই সব ছোট
খাটো বিষয়ে সে কী মারাত্মক ভুলই না
করে বসে। বলেই পারতো—তুমি এত
অল্পেতেই রাগ করো শ্রীলতা! এই বলে
ওকে একটু আদর করলেই ত সব ল্যাঠা
চুকে যেত। মেয়েরা যা চায়—না হয়
এও ত বলতে পারতো "লাল শাড়ীটায়
তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে লতা?"
বা এই ধরনের একটা কিছু। কী স্পর্শ-
কাতর মেয়ে এই শ্রীলতা। অল্পেতেই ভেঙে
পড়ে, অল্পেতেই চুপসে যায়। তবে শাড়ীটা
নিয়ে কিছু না বলটা অশোভন হয়েছে।
পুরুষের অজস্র প্রশংসার সমুদ্রে যে মেয়ে
সাতার কাটতে পারলে না, জীবনটা তাঁর
বক্ষ্য হয়ে গেল নিশ্চেষ্টের নির্জনতায়।
পরমেশ্বর এমন একজন মেয়ে দেখলে না,
নিজের রূপসজ্জাকে যে পুরুষের প্রশংসা
দৃষ্টির সমুদ্র থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইলে।
আর সত্যিই ত, এতো টাকা খরচ করে
নিত্য নতুন শাড়ী কেনবার কোন মানেই
হয় না, যদি লেটা মা দেখানোই চললো।
অন্তের বিশ্বাসের মুকুরেই ত নিজের বিলাসের

একমাত্র পার্থক্য।...কিন্তু পরমেশ্বর কি সব সময় সব কথা মনে থাকে? নেকুলেনের ব্যাপারটার দৈর্ঘ্যে ভাবে বেঁচে গেছে, ভগবানের দেখা পেলে সে পা ছুঁয়ে প্রণাম জানানো। হে ঈশ্বর, সুমন্ত আর হেনার মতো ছেলেমেয়েদের তুমি থাকে থাকে সৃষ্টি করো। কালিঘাটে সে একটা পূজা দিয়ে আসবে। জোচ্চুরি নয়। কোথাও না পেলে সে নিজের রোলগোল্ডের বোতাম বিক্রী করে পূজার জোগাড় করবে।

শ্রীলতার নরম, উষ্ণ হাতখানাকে আলঙছে টেনে তুলে পরমেশ্বর বললে “কেন মিছিমিছি রাগ করছো লতা? ক’বে আবার তোমার কথা মনে এসেছে না।”

আবহের উত্তাপে শ্রীলতা যেন বরফের মতো গলে গেল।

—কবে এলে তুমি? শব্দের স্বাক্ষর ফুললে শ্রীলতা, গত সোমবারে আসবার কথা ছিল না বুঝি?” তীক্ষ্ণ অশ্রুভূতিতে শ্রীলতার মাথনের মতো কোমল হাতখানা স্পন্দিত হয়ে উঠলো।

—তুমি যদি রাগ করেই বলে থাকিবে, পরমেশ্বর অন্ধকারে ঢিল ছুড়লে, “তাহলে আমি এই উঠলুম বলে। কতদিন পর দেখা, তা, তোমার গৌ নিরেই ব্যস্ত।”

—কতদিন? শ্রীলতা যেন লম্বাজের বুকে ঝাপ দিলে। “আমার মনে হচ্ছিল একটা বৃষ্টি, একটা অচল বৃষ্টি ধরে তোমার দেখা নেই।

শ্রীলতার ভীকু হাতে চাপ দিয়ে পরমেশ্বর বললে “গত সোমবারেই আমি লোকা চলে আসতাম। এরই মধ্যে বিকানীরের রাজার ছেলের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম।

—বাবার সময় একটা খবর দিয়ে গেলে কি আকাশ ভেঙে পড়তো। “কুরু কণ্ঠে বললে শ্রীলতা।”

—ইচ্ছে করে বুঝি না বলে পালিয়ে গেছলুম। একটা হৃদয়ই ঘূর্ণতে ঘুরেছে প্রজেক্ট কিনতে।” পরমেশ্বর মিষ্টি কথায় শ্রীলতাকে স্নান করিয়ে দিলে। হৃদিকে উড়ে আলা অবিস্মৃত চুলকে শুষ্ক করে দিতে পরমেশ্বর শুধালে—এইবার রাগ পড়েছে ত! জোরেই ঠুনকো দিলে পরমেশ্বর।

—ওমা, আজুল না লোহা। এতো জোরে মারতে হয়! লাগে না বুঝি।

হাসিতে পরমেশ্বর আবহাওয়ার কালকায় করে বলল—ময়েদের কখন সব চাইতে সুন্দরী মনে হয় জানো লতা? ওরা যখন অন্তরেই অভিমানের উত্তাপে লাল হয়ে উঠে।

শ্রীলতা প্রথম বারিবর্ষণের মতো স্পর্শের সুখানুভূতিতে পরমেশ্বকে আচ্ছন্ন করে বললে—মটর কেনা হয়ে গেছে তোমার? বেড়াতে নিয়ে বাবে যে বলছিল একদিন।

পরমেশ্বর উঠে দাঁড়ালো।

—ভাগ্যিণী মনে করিয়ে দিয়েছে। ন’টার সময় ফ্রান্স মটর কোম্পানীর ম্যানেজারের সাথে দেখা করার কথা—আমি এবার বাই।

—তুমি রাজি কি ঘোড়ার চড়ে আস না কি? যৌবন-মস্তক বেছে লাভের তরঙ্গ তুলে বললে শ্রীলতা।

“এখানে আসলেই তোমার সব ‘এন্-গেজমেন্ট’ ভিড় করে দাঁড়ায়।”

—মটর কিনলে যে হৃদয়েরই লাভ। তোমার সব কিছুতেই অন্ধ স্খাভাষ্য।

হরজার কাছে গিয়ে পরমেশ্বর জোগান দিলে—শেহিনের পাঁচ টাকা বাকী ছিল না? পকেট থেকে দশটাকার নোট বের করে পরমেশ্বর বললে—মনে না করলে শেখকালে কিনে ঠকতে হবে। এলব ছোটখাটো কথা কি কেউ বুঝতে পারে রাখে নাকি!

অসুচকণ্ঠে শ্রীলতা বললে—নোটের টাকা হবে না। পাঁচ টাকাই না ফিরিয়ে দিতে কে ভোম্বকে মাথার দিবি দিচ্ছে।

লালিধোর ঘনতর শ্রীলতার কথাগুলি পরমেশ্বের বেহে মুহূর্ত আঘাত করলে। রাত বাড়তির পথে। পরমেশ্বের আর বলে থাকা চলে না।

জান্নার আলো ভেদ করে রঙিন আলো কার্পেট মোড়া সিঁড়িটার ওপর এসে পড়েছে। গোটা বাড়ীটা গভীর ঘুমে স্তব্ধ। আধো-অন্ধকারে বুক চিরে প্রকাণ্ড হালান মাঝে মাঝে বিরাট বৈত্যের বেশে পথিকের চমক লাগিয়ে দেয়।

পরমেশ্বর চারিদিকে তাকিয়ে খুব সন্তুর্ণনে “গেট” খুলে ভিতরে প্রবেশ করলে। সিঁড়ির কাছে একটা ছায়ামূর্তি নড়ে উঠলো না?—নির্ভীক পদে পরমেশ্বর এগিয়ে গেল।

চামেলী কাছে লরে এসে মুহূর্তে বললে—ঠিক সময়েই এলে পড়েছে দেখছি। পা টিপে টিপে উপরে চলে এলো। বাবা কী পড়ছেন। জুতোর শব্দ কর না।

পাদুকাশিল্প প্রাতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্ততঃ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ডবানীপুর

হু'জনেই নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল।
গদিমোড়া চেয়ারটা দেখিয়ে অমুচ্চ কণ্ঠে
চামেলী পরমেশকে বসতে বলল।

—তোমার চিঠির মাথাখুঁতু কিছু
বুঝিনি আমি। লম্বীরণ আবার—

ইজিতে পরমেশকে চুপ করতে বলে
চামেলী কাছে এগিয়ে এলো।

—সুঁরটা নাশিয়ে বল। বাবা যে
এখনো ঘুমুতে যান নি।”

ফিস্‌ফিস্‌ করে পরমেশ বলে—লম্বীরণ
রাবুর কথা চিঠিতে লিখেছিলে না।”

—সে কথা বলবার জন্তেই ত তোমার
কাছে জরুরী চিঠি পাঠিয়েছিলুম। লম্বীরণ
বাবার এক বন্ধুর ছেলে। এবার এম, এ
হবে। বাবার ওকে খুবই মনে ধরেছে।

—আমাদের তা'তে কি?

—আমাদের তা'তে কি। ব্যাক কণ্ঠে
প্রতিধ্বনি করলে চামেলী।

—তোমার বোকাগি আমি নইতে পারি
না। সব সময় শুধু ফিলফি।

—ওঃ বুঝি। তোমাকে আর
বলতে হবে না। তবে এখন আমাকে কি
করতে হবে?—বললে পরমেশ।

—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু আছে
নাকি? এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে
না।

—জু'ত বুঝতেই পারছি। জোর
করে কি কারো বিয়ে দিতে পারা যায়
নাকি?

ওলব থিতুরি রাখ। বাজে কথা বাছ
বিষে প্র্যাক্‌টিকেল একটা কিছু বলো।

—প্র্যাক্‌টিকেল একটা কিছু করা ত
হরকারই। উদাহরীন ভাবে প্রতিধ্বনি
করলে পরমেশ।

—সারা রাত তরে আকাশ-পাতাল
ভাবলে ত চলে না। জ্যান্‌তিতর একটা
জটিল একদটা যেন এইমাত্র লম্বাধান করে
এনেছে চামেলী। “আমি বলি কিনা

মঠর হাঁকিয়ে জমলেন্দপুরে চলে যাই।
ওখানে তোমার কাকাবাবু থাকেন বলছিলে
না। তারপর বা বরাতে আছে।

প্রশ্নময় দৃষ্টিতে তাকালে চামেলী।
একটা পেলিল দ্বিধে পরমেশ অর্ধহীন দাগ
কাটছিলো। মাথা তুলে বলে—তাই
চলো। তবে শেষে যদি কোন ফ্যানায়ে
পড়তে হয়।

—এর মধ্যে আবার ফ্যানায়ে হবে
কেন? “কারো সম্পত্তি লুট করে ত নিয়ে
যাচ্ছি না। আর একটু আধটু হালাসা না
পোহালে পুরুষ মানুষের চলেবে কেন।
হেলেনের জন্তে ‘ট্রোজান’ বুদ্ধ হয়েছিল সে
খবর রাখো। শব্দহীন হালিতে প্রসারিত
হয়ে উঠলো চামেলী। ইন্টারমিডিয়েট
কোর্সে তোমার ইতিহাস ছিল না? লজিক
নিরেছিলে বুঝি?

—আমি ভাবছি জমলেন্দপুর না গিয়ে
অজ্ঞা কোথাও গেলে চলে না? ওখানে
আবার কাকাবাবু রয়েছেন।

—যেখানেই যেতে হয় চটপট ঠিক
করে নাও। এইসব জরুরী কাজে লজিক
মেশালে ঠকুতে হয়।

বেশ, আসছে বুধবারেই না হয়
বেরিয়ে পড়া যাক। শেষ কালে তোমাকে
নিরে যে একটা র্যাডভেঞ্চার করতে হবে,
কে জানতো।

—তুমি কবে নীরিয়ান হতে শিখবে?
শাড়ী আর চেহারা নিয়ে বতো খুণী ঠাট্টা
করো আপত্তি নেই কিন্তু... চামেলীর
দরব জমাট বেঁধে গেল।

—তোমার শাড়ী নিয়ে করেছি ঠাট্টা।
আমার গা ছুয়ে বলতে পারো! তোমাকে
আজ কি মনে হচ্ছে জানো? একটু থেমে
বললে পরেশ, দাঁড়াও বলছি, তোমার ঐ লাল
শাড়ীর দাঁড়িতে ভুবনে সুরের আশ্রন ছড়িয়ে
পড়লো। চেহারার নাটকিকেট নতুন করে

দ্বিধে হবে নাকি? তোমাকে দেখলে কি
মনে হয় জানো চামেলী? ফ্রেড্‌ পড়েছে?
ভয় পাবেনা ত! হাবলক এলিসের মতে
রায়ে মেয়েরা...—ইয়ার্কি দিতে হবে না।
একটা কিছু ছুতো পেলেই আর রকে নেই।

পাশের কোঠা থেকে বাবা হাঁকলেন—

কবি এখনও ঘুমুতে যাননি? কার লাখে
এতো রাত পর্যন্ত আড্ডা দেওয়া হচ্ছে!
মন্টুর লাখে ‘কেরম’ খেলছিল বুঝি! হতভাগা
ছেলের শুধু একই বৃত্তি। তুই ওকে আলকারা
দিয়ে মাথায় তুলেছিস। পমীকার আর
ক’দিন বাকী বিলব আছে? চামেলী জবাব
দিলে—এই ঘুমুতে যাচ্ছি বাবা।

পরমেশ চাপা সুরে বলে—বুধবারই ঠিক
রইলো কিছ!

জ্রতপদে পরমেশ সিঁড়ি ভেঙে বাইরের
রাস্তায় নেমে এসে ট্যান্সিতে উঠে বসলো।

...গলিটার ঘোড়ে এনে ট্যান্সি
থামলো। পরমেশ জিজ্ঞেস করলে—কত
উঠেছে ‘মটারে’?

ড্রাইবার বলে—চার টাকা দশ আনা।
পকেট থেকে নোট বের করে এগিয়ে
দিলে।

—খুচরো টাকা হবে না বাবু। বিনীত
কণ্ঠে ড্রাইভার জানালে।

—খুচরো টাকা লস্কো না নিয়ে ভাড়া
খাটতে যাও কেন? ধমকে উঠলো
পরমেশ।—এই রাত হুপুরে আকাশ ঝুঁড়ে
টাকা আসবে নাকি? কালকেই ভাড়াটা
নিরে যেও একবার লম্বা করে, বাড়ীটা
চিনে রাখলে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে পরমেশ
নিমেষে গলির অন্ধকারে মিলে গেলো।

* * *

—গুডমর্নিং

—গুডমর্নিং। “ছিলে কোথায় ভায়া।”
কলম রেখে বললে প্রবীর।

—আমি কোলকাতার ছিলাম না।
কোন চিঠিপত্র এলেনে নাকি?

—চিঠি আনে নি। তবে সে দিন
টেলিফোনে কে নাকি তোমাকে খুব
ডাকাডাকি করছিল। আমি বাড়ীতে ছিলাম
না। থোকা টেলিফোন ধরেছিল। সে
লাফ বলে এলেনে, পরমেশবাবু বলে এ
বাড়ীতে কেউ নেই।

—সত্যি নাকি? একদম জীবন্ত
মানুষকে শূন্যে উড়িয়ে দিলে!

—ওরই বা হোব কি। তোমার
পোষাকী নাম ত ওকে বটা করে বলা
হয় নি। তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন?
বল না।

—রশো। টেলিফোনে একবার জিজ্ঞেস
করে দেখি।

...হালো।

—কে, জ্যোতিকণা?

—দাঁড়ান, কণাকে ডেকে দিচ্ছি।

“...আজকে সন্ধ্যার পর আমরা এম্পায়ারে
যাচ্ছি। (উৎকল স্বরে জ্যোতিকণা বলে)

—তোমাকে না গেলে চলে না?”

—চলবে না কেন? তবে মিঃ
গান্ধীর অনুরোধ এড়ানো ভার।

—মিঃ গান্ধী! (বিস্ময়চকিত স্বর)

—মাইভাঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী ন'ন। ওর এক
ছেলে বিলেতে পড়তে গেছে।

—ফোনে দাঁড়িয়ে কাজলামী করতে
হবে না।

(একপল্লা হালির শব্দ)

—খুব হাসিছো যে। ফোনটা তোমার
জমিদারীতে নাকি?

—আর একমিনিট সময়। শীগগির
গেয়ে নাও।

—আসছে বৃষবারে আমি জামদেপুয়
যাচ্ছি। তোমার লাখে একটা জরুরী কাজ
ছিল।

সেদিনের সপ্নখানি

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য

সেদিনের সপ্নখানি আজো আমি বক্ষে লয়ে গেয়ে যাই গান,
সেদিনের স্মৃতিগুলি দোলাইয়া যায় মোর মর্মের বিতান।
আমার মূর্ত্তগুলি রুচে কোন্ কল্পনার নব নব আশা,
জীবন সপন নীড়ে উর্দ্ধলীন মহাকাশে বাঁধে যেন বাসা।
তারমাবে আছে রূপ—আছে গুরু—ঐশ্বর্যের বিচিত্র সম্ভার,
স্মরণের অনুরাগে-বিরহের ছন্দ-গান শব্দের বক্ষীর;
জীবনের অনুভূতি মরমের সুর আর কবিতার প্রাণ;
সে নহে বন্ধুর শুধু রৈদক্লিষ্ট চিত্তভারে ব্যর্থ অভিযান!

সেদিনের গানখানি সুরে সুরে আজো মোর কণ্ঠে ফুটে আছে।
সেদিনের স্মৃতি আজি রবি করে শুকাইয়া যায় যদি পাছে!
তাই তারে সযতনে দিবসের কোলাহল কর্ম অবসানে,
দিনান্তের শ্রান্ত ছায়ে গোখুলির ধূসরিত মর্ম গানে গানে
রচে 'যাই; স্তম্ভের রূপ দিই তারে—অসীম নীলিমা মাঝে।
তারকার ছন্দে ছন্দে সেধা মের উর্দ্ধমুখী-চন্দ্রবীণা বাজে।

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে নাকি?

—এই লিখে রাখি।

পেনাল কোডে “ইলোপুমেন্ট” বলে একটা
ধারা আছে জানো?

—ধন্যবাহ।

—ইয়ার্কি নয়। বাজে বক্ বক্
করতে তুমি বড় ভালোবাস।

—এই শোন, শোন। আমাদের
ক্লাশের তারামনি তোমার লব্ধে কি
বলজিরো জানো?...

—তোমার চেয়েও বেশী?

—যা খুলি কর। আমি চমুখ।

—আঃ চটো কেন। জরুরী কাজ
থাকলে চলে আসলেই হয় এখানে। কবে
আবার অনুমতি নিয়ে এলেছ? অনুমতি
কসলে আমিও আসতে পারি তোমার
ওখানে।

—আমিই সন্ধ্যার পর যাব। বাড়ীতে
থেকে কিন্তু।

—না থেকে উপায় কি।

—মনে থাকে যেন। যে আপন ভোলা
মেয়ে তুমি।

ট্যান্ডিকে অপেক্ষা করতে বলে কুস্তী
দ্রুতপদে নিজের কামরায় ঢুকে বরজা বন্ধ
করলে। ত্যানিটি ব্যাগ থেকে অনেকগুলো
টাকা এবং একছড়া নেকলেস বের করলে।
লোভে আর আনন্দে কুস্তীর চোখ ছুটি উজ্জল
হয়ে উঠলো। হেনা, শ্রীলতা, চামেলী,
জ্যোতিকণা এদের লাখে বটা করে
অভিনয় করেই সে এতগুলো টাকা রাজগার
করে ফেললে। এবার সে তার জঘন্য
ব্যবসা ছেড়ে আপনাকে বহুস্বপ্নের আদর্শে

অপরিচিত করবে। নৈতিক স্বপ্ন ত
মামুষেরই হয়, তাই বলে শুধুবার
অধিকারটুকুও কি তার নেই?...কুস্তী
নিজের- গলার ছাড়ফাটি বাজে তুলে
রাখলে। মার্কেটে গিয়ে নিজেলের
অনেকগুলো অলঙ্কার বিন্তে হবে।
নিজের হারছড়াটির অনুরূপ আর এক ছড়া
বিন্তে চাই। আর ঘেরি নয়। ট্যাঙ্কি
দাঁড়িয়ে আছে।...

... * ...

হরজার মুখ আঘাত।...
উদ্বেলিত চিত্তে পরমেশ বার বার
ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এতে সে হরজা
খুলে দিলো। ঘরে প্রবেশ করে কুস্তী
নিঃশব্দে হরজার ছিটকানি বন্ধ করে
পরমেশের পাশের টুলে এলে বসলে।

পরমেশের বুকটা আগ্রহে উচ্চকিত।
বললে—কত পেরেছ?

—দাঁড়াও, বলছি। অনেক টাকা
হবে। খুশীতে পরমেশ স্বর্ঘ্যের কিরণের
মতো ছড়িয়ে পড়লো।

—হেনা, শ্রীলতা, ওরা বিচ্ছেদ করলে
ত?—জিজ্ঞেস করলে পরমেশ।

—“করবে না আবার! যা নরম ওদের
মন। চামেলীত কেঁবেই ফেলে। হেনা জিজ্ঞেস
করলে “জাম্বেলপুয়ের কলেরায় মারা গেছেন।
কিন্তু কাগজে ত কিছু বেরায় নি। আমি
দীর্ঘনিঃস্বাস কলে বলুম—তিনি ত আর
‘পান্টিক ম্যান’ ছিলেন না যে ‘আনন্দবাজার’
একপৃষ্ঠা জুড়ে শোক প্রকাশ করবে।
এতে বেশলুম হেনার মন যেন আরও
তিজে গেল। বললে—ঘরের লোক না
করুক আমরা আছি কি করতে। নেক-

লেস্ট! হাতে তুলে দিয়ে বললে—হরকার
পড়লে পরে জানাবেন। কি ভাবে ওর
স্বতিরকার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি বললুম—
এখনো চূড়ান্ত ভাবে কিছু ঠিক হয় নি।
তবে মারা যাবার আগে তিনি শেষ ইচ্ছা
জানিয়ে গেছেন।” বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে হেনা
জিজ্ঞেস করলে—কি ইচ্ছা ছিল ওর!

—আপনাকে অবিশ্রি বলতে আপত্তি
নেই। ইচ্ছে করেই মাথা নীচু করে
বললুম—ওর স্বতিরকার যে ব্যবস্থাই হোক
না কেন, আপনার ছবিটাও তার পাশাপাশি
থাকবে।

কুস্তী কোতুক হাসিতে পরমেশের
দিকে তাকিয়ে বললে—একথা অবিশ্রি
শ্রীলতা, চামেলী, জ্যোতিকণা সবাইকে
বলেছি। এবং এর ফলটাও আশ্চর্য্য
রকমের। এক চামেলী শুধু ভীকু গলার
বলেছিল—অনুগ্রহ করে আমার ছবিটা
হেবেন না। ঘোহাই ভুল বুঝবেন না
আমাকে। বাবাকে ত আপনারা জানেন
না। বৈবাৎ বর্ষ তাঁর চোখে পড়ে।”
চামেলী মুক্কা বদানো ব্রোচটা এগিয়ে
দিলে।

—জ্যোতিকণা কিছু বললে না?—
পরমেশ প্রশ্ন করলে।

—বললে না আবার? ও-ই ত সব
চাইতে ঝামু মেয়ে। জিজ্ঞেস করলে—
আপনি বুঝি তার বোন হ’ন।

আমি বললুম—ঠিকই আন্দাজ করেছেন।

—আপন না সম্পর্কে?

—আপন।

—কতটাকা উঠেছে ওর ঘোমটারিয়েল
কাণ্ডে?

—সবার কাছে ত যাবার কথা নয়।
যারা খুবই নিকটতম শুধু তাদের কাছেই
যাচ্ছি। এ পর্য্যন্ত হাজার পাঁচেক হাতে
এলেছে।

—টাকার জন্তে আপনারা কাগজের
মারফতে আবেদন করুন না কেন?

—ওতে বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে
হয় না। এটা প্রাইভেট বিষয়।

একঘণ্টা বক্তৃতার পর কি না ও তিনি
থানা হাটাকার নোট তুলে দিলে। কী
রূপণ মেয়েটা। আবার বলে দিয়েছে—
জানাবেন কিন্তু কি করলেন আপনারা।”

নেক্লেস, ব্রোচ, শ্রীলতার বেওয়া ক্রোটো
হোরপিন্ আর আংটি গুলোকে কুস্তী
ট্যাবিল ল্যাম্পের শ্রিমিত আলোকে ঝললে
তুললে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরমেশ বললে—এগুলো
বিক্রী করে কতো পাওয়া যাবে বলে মনে
করো।

—এই হাজার খানেক টাকা। হর
কষাকষি করলে বেশিও পেতে পার।

—এলাহাবাধে গিয়েই বিক্রী করা যাবে
না হয়। এখানে আবার ক্যানাধ বীথতে
পারো।

কৃত্রিম আবেগে উচ্ছ্বলিত স্বরে পরমেশ
জুড়ে দিলে—এ সবই তোমার রইলো কুস্তী।
আজ থেকে আমি, হেনা, শ্রীলতা ওদের
কাছে অশরীরী একটা চারা। ওদের
প্রেমের লম্বাধির ‘পরে আটিন দেশে
আমরা গড়ে তুলবো নতুন স্বপ্নরাজ্য।
শ্রীলতা, জ্যোতিকণাওদের জীবন-মকে
আসবে নোতুন অভিনেতা, ওদের আকাশে
আবার জাগবে সাতরঙা রাশবহু।

All the world's a stage.



ইন্দিবিম্যাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

And all the men and women.....

—চুপ করো। কিরিলির ভাষা কপচাতে হবে না। ত্যানিটি ব্যাগটা তুলে রাখ হুইকেন। লাবধানের মার নেই।

—ঠোতে জল চড়িয়ে এক কাপ চা করে হাও না কুন্তী। আজকে আমার গলা ছেড়ে গান করতে ইচ্ছে করছেন I love thee, dear Kunti. পরমেশ্বর জ্বর ধরলে।

—হয়েছে, হয়েছে, সোহাগ করে আর চোঁচাতে হবে না।

—আজকে আমার কী আনন্দের দিন সে তুমি বুঝবে না কুন্তী! আমেরিকা আবিষ্কার করে কলকাতা যতো খানি খুশী হয়েছিল। প্রেমের একটা কমার্শিয়াল ভ্যালু...ঃ তুমি ত ইকনমিক পড় নি। ওসব বুঝতে পারবে না।

—ও সব ছাই ভস্ম আমি বুঝতে চাইনে। কাপড় চোপড় গুলো শুড়িয়ে রাখো না। খুব ভোরেই ত ট্রেন ধরতে হবে।

চা করতে করতে কুন্তী প্রসন্ন করলে —সত্যিই কি তুমি হেন', জীলতা ওদের ভালোবাসতে না?

পরমেশ্বর মুচকি হেসে বললে—বাবা ব্যাংক টাকা রেখে গেছেন কি না, বলে বলে প্রেম করবো। বিজ্ঞপের আঁচ পেয়ে কথাগুলো যেন অলে উঠলো।

এবার গভীরভাবে বললে পরমেশ্বর—মামুষ নিজেই ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না কুন্তী। আমরা যাকে প্রেম বলি, সে একটা সন্তা কৌশল মাত্র যা দিয়ে মেয়েদের আমরা মাতের মতো গর্বে তুলি। টাকা পরমায় মতো প্রেমও হচ্ছে একটা purchasing power ওঃ তুমি আবার ইংরেজী বুঝবে না।

কুন্তী বললে—আমি বাপু ওত শত বুঝিনে। আচ্ছা—ওদের ঠকাতে তোমার একটুও বাঁধলো না।

—ঠকানো? লামনে বাপ বেখে পরমেশ্বর যেন লাকিরে উঠলে। “এক ঠকানো বলে? জানো ঐ এয়ারিষ্ট্রোক্রোট মেয়েদের সাথে মেলামেশা করতে গিয়ে আমার কাপড় ধোয়াতে কত নিয়েচে খোপা। নগর বারো আনা পরলা খরচ করে এই রোল্ড গোল্ডের বোতাম কিনে আনতে হয়েছে—সে খবর রাখো। বাবার জমিদারী আছে কি না...

—তবু ত ওরা তোমার সত্যিই ভালোবাসতো।

ঐ আবার গোলে করিবোল দিচ্ছে। বলুম যে ‘ভালোবাসা’ বলে কিছু নেই। এ হচ্ছে অপরিণত মনের একটা আদিম সংস্কার। ফ্রেড না পড়ে তুমি প্রেম নিয়ে তর্ক করতে এসেছ। পাগল আর কি। মামুষ নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারে না কুন্তী! ওসকার ওয়াইল্ড পড়েছো?...

লাহেব ঠায়ের নাম করে ভড়কে দিতে চাও বুঝি?


চা তৈরী করে এনেছে কুন্তী! উক, গোলাপী হ'কাপ চা!

পা টিপে টিপে খাটের পাশে এসে পরমেশ্বর টর্চ জ্বাললে। রাত তখন ছোটোর উপরে। টর্চ ফেলে পরমেশ্বর দেখলে কুন্তী চরম নির্ভয়ে ঘুমুচ্ছে। যে মেয়ের চরিত্রের ভাবনা নেই—প্রেম নির্ভাবনার সে ঘুমুতে পারে—সিংসংয়ে নিশ্চিন্তে সে আপনাই যেহকে ছড়িয়ে দিতে পারে বিছানায়—শুভ্র মন্থনতায় পরমেশ্বর দেখলে—ঠোটের কোনে যেন ওর ফুটে উঠেছে মৃদুচর্চা হাসি। লামাত্র বেহ ব্যবসায়ীর স্তর থেকে কুন্তী উন্নীত হবে গৃহিনীর মর্যাদায়।

আর ওটা কবেক মেয়েটা আরামে ঘুমিয়ে নিক।—পরমেশ্বর ভাবলো। সন্তর্পণে সে কুন্তীর গলার হার ছড়াটি খুলে নিলো। এইবার ভালোই ভালোয় বেরিয়ে পড়া যাক। কুন্তী যদি আবার জেগে উঠে।

স্ট্রটেকসটা হাতে নিয়ে পরমেশ্বর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। একমাত্র স্থবির নির্বাক দালানগুলি ছাড়া তার কাজের কেউ লাকী রইলো না... হঠাৎ ভিতরে গিয়ে কি

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার



কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁতি সরিষার তৈল

ভারতের প্রথম মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪০. আপার সারকুলার রোড, কলিঃ

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বিদ্যার্থী মণ্ডলের প্রোগ্রামের উন্নতি ক্রমে দেখা যাচ্ছে। ছাত্রদের out knowledge-এর উপযোগী বক্তৃতা আমরা এই অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে পাচ্ছি। পাঠ্য পুস্তকের নীচের compulsory training-এর বাইরে বিপুল বিশ্বের সঙ্গে ছাত্র সম্প্রদায়ের পরিচয় বিশেষ থাকে না। রেডিও যদি এই বিভাগের অনুষ্ঠান লিপির দ্বারা সে অভাব খানিকটা অন্ততঃ মেটাতে পারেন তবে তাতেও অনেক লাভ সন্দেহ নেই। শিল্প-কলা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম বৃহত্তর জীবনের আদর্শ যদি সরল ভাষায় সহজ প্রণালীতে আলোচিত হয় তবে সেগুলি ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রকৃতই কল্যাণকর। আধুনিক প্রোগ্রামে এইগুলির কিছু কিছু অভাব আমরা পাচ্ছি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেগুলি সহজ বোধগম্য হয় না। বক্তার বিষয় বস্তুগুলিকে অত্যন্ত complex করে গড়ে তোলেন। শ্রোতা ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধিকে তাঁরা বড় একটা ভেবে দেখেন না। বিভাগীয় কর্ম-কর্তার এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

মনে করে পরমেশ কুস্তীর যুগ্মশ্লু মুখে টর্কের আলো ফেললে। ঠোঁটের কোণে কুস্তীর সেই চপল হাসি।...

ছ'মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে সে কী ভাবলে। তারপর হুটকেনটা হাতে নিয়ে পরমেশ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

কুস্তীর ঠোঁটের কোণে তখনো অশ্লিল হাসি জেগে ছিল কি না কে জানে? ঘন অন্ধকারে মানুষের দৃষ্টি চলে না।...

আর একটা কথা : যে শ্রোতা সম্প্রদায়ের জন্মে এই অনুষ্ঠানের সৃষ্টি—তার মধ্যে সেই বিপুল ছাত্রছাত্রী বিদ্যার্থী সম্প্রদায়ের ভেতর ক'জন এই অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনতে পার? কটা স্কুলে সেটের ব্যবস্থা আছে? এবং যে সময় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ঠিক সেই সময়টি উপযুক্ত কিনা? প্রোগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি ভেবে দেখা দরকার।

আমরা কয়েক মাস পূর্বে বেতার জগতের পৃষ্ঠায় দেখেছিলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন্স চ্যান্সেলার মহাশয়ের সঙ্গে রেডিও কর্তৃপক্ষের এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। রেডিও কর্তৃপক্ষ শ্রোতার আশ্বাস দিয়ে-ছিলেন এর সফল শ্রোতার শীঘ্রই জ্ঞানতে পারবেন। শ্রোতার এ সফল সত্যিই দেখতে চায়। আশা করি বেতার জগতের মারফৎ বিদ্যার্থী মণ্ডল সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃততর কিছু শুনতে পাবো।

পূর্বে দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠানে মিসেস হালদারের প্রোগ্রামে আমরা ভালো ভালো রস-রচনা ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্য প্রসঙ্গ শুনতে পেতাম। নীরী সমাজের মঙ্গলজনক নারী প্রশঙ্গের ত্রিস্তৃত আলোচনা বরং সংসারের খুঁটি নাটি প্রসঙ্গ আলোচিত হোত প্রায়ই—আজ অনেক পরিমাণে সেগুলি বেতার প্রোগ্রামে ব্যাহত। এ সম্বন্ধে জটনকা বেতার গ্রাহিকার একখানি পত্র আমরা নিয়ে পত্রস্থ করলাম। বেতার প্রোগ্রাম ডাইরেক্টরের দৃষ্টি আমরা এ বিষয়ে আকৃষ্ট করছি।

সাহিত্য অনুষ্ঠানের সঙ্গীত—কণ্ঠ-সঙ্গীতের আসর অনেকখানি নেমে গেছে। বেতার কর্তৃপক্ষের এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যিক। বক্তৃতার বিভাগেও সরল আলোচনা নেই—সাহিত্য প্রসঙ্গ যেমনি সামান্য তেমনি আড়ষ্ট। রসসাহিত্য নিকালিত! জাতি এবং সমাজের বিভিন্ন দিকে জীবনের বিচিত্র-তম অনুভূতি ইত্যাদির প্রকাশের চরম পথ রস-সাহিত্য মানুষের অবসর সময়কেও মধুরতায় ভরিয়ে তোলে বেতারে রসসাহিত্যের আসর একেবারে নেই বললেই চলে। বক্তৃতা বিভাগের কর্মকর্তা এদিক থেকে একেবারেই পেছিয়ে রয়েছেন। বহুদিন পূর্বে বেতারে সাহিত্যের আসর ছিল—সাহিত্যের আসর বলতো। এখন কি আর সেগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় না?

ছোটদের আসরের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে দেখছি। শিশু সাহিত্যের আলোচনা কোথায়? দাদুমনির কথা তবু মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের সাহিত্যের খোরাক কিছু দেয়। শিশু চিত্রের বিপুল অঙ্গনের বহু স্নায়ু পুষ্প কোরককে ফুটিয়ে তুলতে হবে! “মাসীমা” “দাদুমাণি” এ দিকের বিরাট ক্ষেত্র দিকে দৃষ্টি দিন! অত্যন্ত বাজে নিকুঞ্চে শ্রেণীর চিত্তবিরক্তিকর আড়ষ্ট প্রোগ্রাম আমরা ইদানীং এ আসরে শুনছি।

মাননীয় ‘খেরালী’ সম্পাদক মহাশয়
সমীপে
সবিনয় নিবেদন—

আমি বহুদিন হইতে রেডিওর প্রোগ্রাম শুনিয়া আসিতেছি। রেডিও সম্বন্ধে আপনাদের সুবিস্তৃত আলোচনা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। রেডিও প্রোগ্রামের দিন দিন অবনতি ঘটতেছে। মহিলা আসর সম্পর্কে আমরা মহিলা সমাজ বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। সংসারের কাজ কর্মের

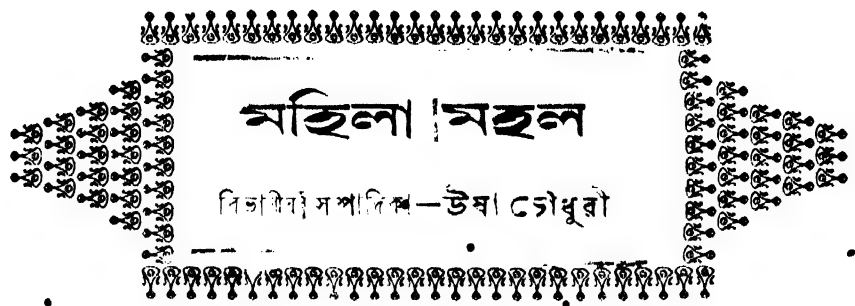
পর দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম সময়ের এই অমুঠানটি
হঠাৎ আমরা মহিলা শিক্ষাগ্রন্থ এবং
নির্দেশক আনন্দহারক বহু অমুঠানের
প্রত্যাশা করি। কিন্তু সে আশা আমাদের
ফলবতী হয় না—ইহাই আমার বিশ্বাস।
কিছুমান পূর্বেও মহিলা আলরে আমরা
অনেক শিক্ষাগ্রন্থ অমুঠান শুনিতে পাঠিতাম।
রায়াবান্না ঘর-সংসারের কাজকর্ম—সরল-
গল্প ছোটগল্প গোলকধাম—মিসেস হালবারের
বক্তৃতা প্রভৃতি সত্যই আমাদের আনন্দ
ধান করিত। আমরা ভাবিরাভিলাষ প্রকৃতই
মহিলা আলরের সার্থকতা খুজিয়া পাইব।
কিন্তু বড়ই চমকের বিষয় সেগুলি অধুনা
অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। উপর
বেলায় শুইয়া বিশ্রাম কালে ভালো গল্প
পাঠ শুনিতে ঘর সংসারের আলোচনা শুনিতে
আমাদের ভালো লাগে। মধ্যে “সাহিত্যিকের
পোর্টফোলিও” হঠাৎ গল্প শুনিতাম কিন্তু
অধিকাংশই অপটু রচনা। আজকাল আর
কিছুই নাই। মাঝে মাঝে দেখি অভিনয়
প্রণালীতে মহিলা সমাজের কিছু দিকের
অবতারণা করা হয়—কিন্তু তাহা যেমন লঘু
তেমমই বাজে রচনা—বাজে অভিনয়।
আপনাদের পত্রিকা মারফৎ এইগুলি লইয়া
যদি বিস্তৃত আলোচনা করেন তবে ইহার
পরিবর্তন হইতে পারে। আপনাদের
নির্ভীক মন্তব্যের আমরা সর্বধিক। আশা
করি আগামী সংখ্যায় আমার বক্তব্যগুলির
প্রদত্ত দ্বিগুণ আত্মকে বাধিতা করিবেন।

আমার শ্রদ্ধা-নমস্কার গ্রহণ করুন।

ইতি

বিনীতা

ত্রীনমিতা দেবী



আপনারা হয়ত মনে করতে পারেন
যে রহস্য কোনো সমস্তাই শুধু আমাদের
আলোচনার বস্তু। কিন্তু তা নয়, সংসারের
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার আমাদের
ভোঁটোখাটো সুবিধা অসুবিধার কথা
নিরেও আমাদের আলোচনা করা উচিত।
যেগুলোকে আমরা অতি তুচ্ছ ঘটনা
মনে করি তাও রহস্য হ'য়ে বিস্তৃত হ'য়ে
সারা দেশের উপকার বা অপকার করতে
পারে।

গেছন ধরুন, কোনো মায়ের ভেলে
সিনেমায় যায়, লেখাপড়ায় মন নেই, কথা
বললে শোনে না। মাগার ওপর আর
কোনো অভিভাবক নেই, সেখানে যদি
মায় অশুশাসনটি সে না মানে, তবে
ভবিষ্যতে সেই ভেলে স্কুলপ্রদীপ না হয়ে
যে কুলপাংগুল হ'য়ে উঠবে, সে লক্ষ্যে

ত' মনেহ নেই। তখন সমাজের পক্ষে
সে হ'য়ে উঠবে এক আবর্জনা, অল্প
অনেক ভেলের সর্জনশাস করবে, পাড়া-
প্রতিবেশী ও ক্রমশঃ জনসাধারণের মানা
অশাস্তির উপলক্ষ্য হ'য়ে উঠবে। সুতরাং
সেই ভেলের সমস্তা একা মায়ের নয়—
সারাদেশের সমস্তা।

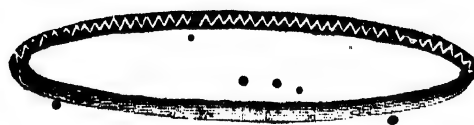
তেমনি জায়ে জায়ে, ননদ-ভাজে স্বাভাবিক
বৌ-এ যে মনাস্কর তাবও কুফল বিস্তৃত
হ'য়ে সমাজ জীবনে এসে আঘাত করে।

আমাদের গতকে যদি আমরা স্মরণ,
মধুব এবং শান্তিপূর্ণ ক'রে তুলতে পারি
তবে তার আবহাওয়ার আদর্শ অনেকের
কাছেই অনুসরণীয় হ'য়ে উঠবে এবং
ক্রমশঃ আমাদের বাঙালী সমাজে তার
প্রতিক্রিয়ার সুফল আমরা দেখতে পাব।

কাজে কাজেই কোনো মুখ এবং

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!



গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!

বাবহারাস্থে বিক্রয়কালীন অদ্বৈক মূল্য
পাওয়া যায়। প্রিয়জনদের মনোমত
আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা
পাওয়া যায়। স্থায়িত্বে ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ
সোনার স্মারক চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেন্ট গোল্ড সিল্ডিকো

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কংলেক্স স্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি, বি, ৪৮৮২

....

রাতের কুতব

(চিত্র)

শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লীলামণী মেঘমালার খেলা বোঝা ভার।
খেই খেই করে নাচতে নাচতে কখন দেখি
চাঁদ উঠেছে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের
কপলো কালো মুখগুলো পর্যন্ত জ্যোৎস্নাধারায়
পাউডার মাখা হ'ল উঠেছে।

রোহিণী ক্যামেরা এনেছিল। সারিওন্দী
হ'লে সব পোনে বাতটার সময় উজ্জ্বল তুল-
প্রাণে ফোটো তুলব বলে গোহুগাছ করে
দাঁড়ালাম। কিন্তু ক্যামেরাম্যানের যে
উপদেশ শুনলাম তাতে আমাদের চক্ষু চড়ক-
গাছ। একাধিক্রমে পাচ মিনিট নিখর হ'য়ে
একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে। চেষ্টায়
কান্নার ক্রটি নেই। প্রাণপণে অপেক্ষা করতে
লাগলাম, কোনপ্রকারে পাচ মিনিট কাল
অতিক্রম করে যেতে। কিন্তু দৈর্ঘ্যেরও একটা
সীমা আছে। নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে বলে
যদি কোন লোক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে নিঃশব্দে
দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে তবে রাজ্যের
চুলকানি আর মশা এলে ঘাড় পিঠে স্রস্ররি
কাটে।

হ'লও ঠিক তাই। বেচু মাথায় ক্যাটা
বৈধে লাঠি হাতে বাংলা দেশের শুভাঙ্গের মত
দাঁড়িয়েছিল। অবচলিত চিত্রে তার দেখি
গম্ভীর রক্ত এক পৌরষ চক্চকে চোখের
ভেতর দিয়ে অকথকে চাঁদের পানে ঠায় চেয়ে
আছে।

কোনো হুঃখ আমাদের ব্যক্তিগত নয়,
আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উন্নতির
ওপরে সারা দেশের ও সমাজের উন্নতি
নির্ভর করে।

মনি স্থির থাকতে পারেনা। অস্বস্তি
অনুভব করে। চুপিচুপি বেচুকে বললে, “কি
করি বলছি কি বেচু, বড্ড মশা কামড়াচ্ছে।
এত জলের জোর বাপের বাপ! বোধ হয়
বাদশাই মশা হবে।”

বেচু প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে অতি
কষ্টে হানিটা ধমন করে নিয়ে গাল ফোলা
গোবিন্দর মা হ'য়ে চাঁদের পানে তাকিয়ে
থাকে। মনি তবু খুশখুশ ক'রে, ‘উফ্’ এ
দেখছি জ্বালাতন! বলে ফটাস করে গর্দানের
ওপর একটা চড় মারলে।

বেচু সুপ্ত শুনতে পেলে বন্ করে মশাটা
মণির গর্দান থেকে লাফ খেয়েই ওর কানের
ডগায় একটা লাগি মেরে উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

ফের মনি উদ্বেগ করে, ‘বেচু, দেখত ঠিক
আমার নাকের ডগায় একটা মশা বসেছে
কি না—?’

কোনরকমে ‘ইয়া’ বলতে বলতে বেচু আর
নিজেকে রক্ষা করতে পারলে না। রাতের
প্রাচীর ভেদ ক'রে হাসির উচ্চারণ হুড়হুড় করে
মশকে বেরিয়ে এল।

মিত্র মশায় ধমকে উঠেন, ‘কি হচ্ছে
বেচু!’

আবার চুপচাপ।

পাঁচ মিনিট ব্যর্থ আর আজ রাতে শেষ
হ'বে না। মনি অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। আপন
মনেই বলে, ‘ইস্, এখনও মশাটা বসে রয়েছে
দেখছি। ভাল বিপদেই পড়েছি। স্রস্ররি
বিচ্ছে বটে। এত চুলকুচ্ছে যে তার ঠিক নেই।
পাঁচ মিনিটে পাঁচ ছটাক রক্ত না খেয়ে
ছাড়বেনা দেখছি। এত থাকতে গরীবকে
কেন বাবা?’

বেচু বরাবরই হানছিল কিন্তু এবার সেটা
উদ্দাম হয়ে উঠল। রুখতে পারলে না শত
চেষ্টা করেও; হৃদয়ঙ্গম বেগে শেষে থানিকটা
বেরিয়েই এল। উপায়সূত্র না দেখে হাতের
লাঠিটা উচিয়ে ধরে বলে উঠল, ‘দি ব্যাটাকে
এক ঘা বলিয়ে?’

সীতিমত মনি বাধা দিলে, ‘না থবরদার।
অক্ষুনি উড়ে যাবে। আচ্ছা বেচারী অনৈক্য
খেতে পারনি। আচ্ছা থাক। হাজার হ'ক
বাদশাই মশাত’ মেজাজটা যাবে কোথায়।’

বেচুত হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লই,
উপরন্ত বাকী যারা শুনতে পেয়েছিল তারাও
হো হো রবে হেসে উঠল। মিত্র মশায় চেষ্টা
করেছিলেন গম্ভীর থাকতে কিন্তু নির্ভর হাত-
দেবতা কাতুকুত্ব দিয়ে শেষ পর্যন্ত হাসিয়েই
ছাড়লে।

ফোটো যা তোলা হ'ল তা মা ভগাই
জানে। রোহিণী ক্যামেরা গুটিয়ে লুটিয়ে
নিয়ে রাগে কৌস কৌস করতে লাগল।
সকলে বেচুর ওপর হোষ চাপালে। সে
বেচাঙ্গী অনন্তোপায়ে মণিকে ঘোষী লাগাত
করে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে
বিচক্ষণ এর তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ও
তর্কাতর্কি চালাল। মণির একটি মাত্র যুক্তি
ছিল যেটা একেবারে অকাট্য যে সে ঘোটেই
হাসে নি।

সব কাজ আমাদের ফুরিয়ে এলেছিল।
মিনিট পনের তৃণতলে বসে গল্পগুজব করার
পর অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দেশে সব উঠে
গিয়ে বাসে চেপে বসলাম।

কুতবের সীমানা পার হয়ে যখন আমরা
গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এশে পড়েছি তখন

যেখি সকলেরই মন কেমন যেন ভাবাক্রান্ত ।
অতীতের স্মৃতির বৃকে আমোদ আল্লাহের
চেটে তুলে তারা আজ কিরে চলেছে । হৃদয়
পরে বর্ধন আবার আসবে তখন দেখে
রাতের কুতব তাহের স্মৃতিরূপে জেগে
রয়েছে । স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা
মাহুষের জীবনে মন্ত বড় এক ভোগ । স্মৃতিই
মাহুষকে অভিজ্ঞতা দেয়, তাকে উন্নত করে ।
আবার সেই স্মৃতিই মাহুষের গতি পথে পথে
পথে বাধা জন্মায়, তাকে ভয় খাওয়ায়, কখনও
আবার সাহসী করে তোলে ।

সকলকেই দেখলাম বিচ্ছেদ বেদনায় রাতের
কুতবের পানে চেয়ে রয়েছে । গাড়ী চলেছে
বেশ জোরেই । থানিক দূরেই যে যার দৃষ্টি
ফিরিয়ে নিয়েছে । অক্ষয় অতীত পড়ে
রয়েছে ।

চাঁদখানা মেঘে ঢাকা ছিল । ঈষৎ
আলো মেঘের ফাঁকে ফাকে পথ হারিয়ে
ফেলেছে ; নীচে এসে পৌঁছতে পারে নি ।

বাস যত এগিয়ে চলে ততই আমি পিছন
ফিরে অধিক আগ্রহে চেয়ে থাকি ; ঝোপ-
ঝোপের অন্তর্গালে অশীত ভারতের একটুকরো
কীর্তি জীর্ণশীর্ণ প্রেক্ষাগৃহ মত অন্ধকারে
আত্মগোপন করে রয়েছে ; মনে হ'ল কুতবের
চারিপাশে ধ্বংস প্রায় প্রাসাদের আনাচে
কানাচে সমাধি স্থপ ভেদ ক'রে কারা যেন
উঠে হাড়িয়েছে । আমরা চলে এসেছি,
এইবার তারা সমস্ত রাত অতীতের সন্সার
লাভিয়ে কানাকোঁচা করবে ।

শূন্তের আধার ঠেলে মহিমাময়রূপে
অতীতের কুতব আমাদের পিছনে আগ্রহ
উদ্ধতরোষে আকাশের পানে উন্মুখ হ'য়ে
চেয়ে রয়েছে—কি যেন সে অনন্তকাল ধরে
আকাশের কানে কানে বলতে চায় ।

অনেকদূর এগিয়ে চলে এলছি । তখনও
দেখছি কুতবের চূড়ায় আকাশ ঘানের স্তব্ধ
লাল আলো কণ্ঠে জ্বলছে আর নিবছে ।

আশা ও নিরাশা *

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

বন্ধু, তোমরা দেখোনাট চেয়ে
কখনো ফিরে

কাব্যলক্ষ্মী বুলিতে দুটায়
আকুল নৌদে !

বাংলা ভাষার মলিন আঙনে
শীতে, বসন্তে, শরতে, শাউনে
ক্রমে বিলীর্ণ দেহের আঙঠন
কবিতারাগী,

তোমরা না জানো, শেবক আমরা
শেখা জানি ।

হাচরে ভাগা, কাবা আকুল
কবির দেশে

ছন্দোময়ীরও হেন বিপিলিপি
ছিল কি শেষে !

হজিরা বাতালে তাহারি স্বপ্ন,
পূর্ণিমা রাতে তাহারি লগ্ন,
তবু লুপ্ত সতল রক্ত,
সজ্জা তাহি ।

তবু বিস্মৃত মূল্য তাহার
মর্যাদারি !

ভাবলাম আমরা ত বর্তমানের বৃকের ওপর
দ্বিগুণ চাকাচালিয়ে ভবিষ্যতকে বর্তমানরূপে
বরণ করতে পলে পলে ছুটে চলেছি । কিন্তু
অতীত ? শেত চিরদিন আমাদের পিছনে
অক্ষয় ভাঙার নিয়ে উপেক্ষিত হ'য়েই পড়ে
থাকবে । তার স্মৃতি নিয়ে পূব জোর এক
টুকরো হাসব আর হৃৎফোটা অক্ষ ফেলব ;
কিন্তু তার মুক ভাষা মুখর হ'য়ে কেমন করে
আমাদের শিরায় শিরায় আবেশের চেটে তুলে
নবজীবন লাভ করতে পারে—তার বিষয়
কোনদিন আমরা তলিয়ে দেখেছি কি ?

কথিকা, কাহিনী, উপস্থাপনের
প্রবল শোভে

নিরাসিতা কি কবিতা তোমার
মর্ম হ'তে ?

এখন কি শির ডাকেনা শিরায়
অধীর কণ্ঠে আকুল হিয়ার ?

কেহ কি স্রবের ভাব-মহিরায়
ভালেনা আজি ?

অলীকশরনে ফোটেনাতি মনে
ভাবনারাজি ?

পিকবলতান পশে নাকি কাণে
চৈত্ররাতে ?

নব মুকুলের লোভে নাহি
হৃদয় মাতে ?

অজানা মায়ার তরে নাকি মন ?
শিশুর হাসি ও নারীর নয়ন

প্রিয়জন মুখে মধুর বচন
ভাগে না লাগে ?

প্রথম প্রেমের পরশে কিশোরী
হিয়া না লাগে ?

ফুরায় কি গেছে স্রবের কামনা ?
আশার বাণী ?

জমে নাকি আর বাথার রাগিনী ?
কথার গানি ?

বিরাট বেদনা, বিপুল দঃখ
মর্ম কি কারো করেনা রক্ষ ?

যতনা রসিক, হ'ল কি মূর্খ
একথা কবে ?

তাই কবিতার প্রয়োজন শেষ
মহোৎসবে ।

তাই বহিছে সে পাখ পূরণের
অমর্যাদা !

তাই নহিছে সে প্রীতি উপহারে
গীতির বাধা।

বহু মানবের অবহেলা তার
লাকবিক্রমের যত অনাচার,
অনধিকারের বিপক্ষে আর
কি বলিবে সে ?

অনাদৃত্যর দোহ বঙ্গরী
ধূলিতে মেশে।

ফিরে যায় ঘরে দেবকের হল
ক্ষুধমনে,

কণ্ঠ তাদের ওঠেনা উলসি
পূণ্যক্ষেণে,

বরণীয় জনে করে না বরণ,
স্বত্বিকণা নাহি করে আচরণ,
মনোহরণের কোনো আয়োজন
করিবে না কো !

অকরণ করে দিতেছ বিদায়,
জানিয়া রাখো।

পুরাতন যায় চলিয়া, নবীন
আলেনা পথে;
মনোরথ কেবা উড়াবে মস্ত
মনের রণে ?

জাগাবে কে আর নিদ্রা নিশীথে ?
ভুলাবে কে আর মিলনের গীতে ?
ত্যাগে দিতে স্তব্ধ বিরহে দহিতে
আলিবে কারা ?

অশ্রিয় ফেলে, লক্ষ্য ভুলেছ,
হে পথহারী !

শুনিবে যে গান, সে শুধু লাজানো
কথার মালা,
জাগিবেনা মোহ, ভরিবেনা প্রেমে
মনের ডালা,
কণিকের সূখ হবেনা অসীম,
শরতের ফুল, হেমন্ত হিম,
বাৎসল্যধারার রিম্ রিম্ রিম্
হবে যে রুখা !

বেদনার চিতা সহজে কি হবে
নির্কাপিতা ?

কিন্তু বহু জলাকী জল
কলোচ্ছ্বাসে

হয়ত' এখনো সন্ধ্যাবেলার
স্বপন ভাসে !

হয়ত এখনো বিশ্রাম ক্ষণে
কামনা ঘনায় তোমারো নয়নে,
কবির ভাষায় দূর পিচ্ছজনে
এখনো সুরো,

হয়ত' এখনো পূর্ণাঙ্গো কাব্য
লুপ্তে পড়ে !

এখনো সময় রয়েছে, বহু
এখনো ফিরে,
ভুলিতে প্রয়াস করিতে কি চাও
গীত শ্রীরে ?

বাংলাভাষার বিস্তৃত ভূমি
হয়বে লগ্ন করিবে কি ভূমি ?
ডাকিবে শোভন অঞ্চল চুম্বি
মধুর ভাষে ?

কহিবে কি, দেবী কাব্যলক্ষ্মী
এলেছি পাশে ?

এখনো স্তম্ভিত পানিরাকর্ষে
হর্ষবাণী ?

এখনো চেরিত শ্রামল স্রুত
অরতানী ?

এখনো গোপন লিপির মালার
রূপালী কবিতা দীপালী আলার ?
এখনো তরুণী কাঁপে নিরালার
কাব্যগীতে ?

স্রের মোহ যে মিলায়নি তবে
বিস্মৃতিতে !

আবার আনুক কাব্য লোকের
কান্তন ফিরে !

আবার ভাসুক বাকুল জনতা
আকুল নীরে !

সোনালী আলোর সূর্য্য উঠুক,
সোনালী দলের পদ্ম ফুটুক,
সোনালী পাখার পাখীরা ছুটুক,
সোনার মেঘে,
কবিতারাবীর ললিত বাণীর
পরশে লেগে।

আবার মাতাল করিব আমরা
অমৃত দ্বিরা,
লাভ করিব জীবন মধুর
চন্দ দ্বিরা !

ঘরে ও বাহিরে, দূরে ও নিকটে,
প্রাসাদে কুটীরে, নদীতীর তটে,
আগবে আগরে স্রবণের পটে
আঁকিব চবি !
তোমার ডগারে দাঁড়াব নীরবে
তোমার কবি।

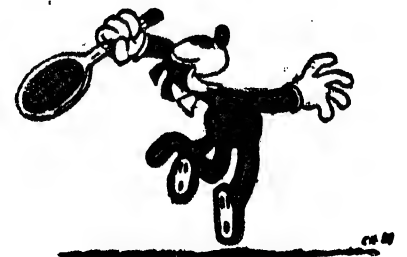
নূতন স্রবমা ছেরিব, তোমার
উপেক্ষাতে,

করণ! করণ সঁপিব আমার
স্তম্ভেচ্ছাতে !

তোমার কর্মে, তোমার খেলায়,
তোমার খুলিতে, তোমার মেলায়
হেলায় সন্ধ্যা প্রভাত বেলায়
কবিতা, মুখে—

স্রবিবে আমাবে, এ কথা জানিয়া
মরিব সুরে।

কৃষ্ণনগর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত





সম্পূর্ণ নূতন ধরনের আকর্ষণ্য চিত্র !

তুষারাবৃত পর্বত শিখরে জীবন সংশয় যুদ্ধ

কুম্ভীরের সহিত রোমাঞ্চকর সংগ্রাম

দেখিতে দেখিতে: আত্মহারা হইবেন

সবল হিন্দি বুরিতে মোটেই অসুবিধা হয় না

টা র জা ন - কী - বে টী

তৃতীয় সপ্তাহ

নিউ সিনেমা

তৃতীয় সপ্তাহ

বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের বাঙ্গালদেশে সঙ্গীতের উন্নতি সাধনকল্পে কয়েকজন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক সঙ্গীতের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু চাংখের বিষয় এই যে, তাঁরা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এর ব্যবস্থা করলেন শেষ পর্যন্ত সে আদর্শকে তাঁরা মেনে নিলেন না। বর্তমান বৎসরে শ্রীযুত কে এম নাহার বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা আশা করেছিলাম বাঙ্গলার তরুণ তরুণীরা যারা সত্যি সঙ্গীত কলার চর্চা করে থাকেন তাঁরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন, কিন্তু আমাদের চর্ভাগ্যের জুড়ট হোক বা জুড় কাংগেট হোক আমাদের এ বিষয়ে নিরাশ হতে হয়েছে। বাঙ্গালার সঙ্গীতের যে এত অধঃপতন হয়েছে তা দেখে সত্যি আমরা মর্মান্বিত হয়েছি। এর কারণ কি? কেন ভাল ভাল গায়করা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি? আমাদের বতদূর মনে হয় এর জুড় প্রতিযোগিতায় বর্ষকর্তারা ছাড়া। কারণ যে পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতাটা হয়েছে তাহা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। এত বড় একটা বিরাট প্রতিযোগিতায় যে সকল ব্যক্তিকে বিচারক করা হয়েছে তাঁরা কোন মতেই বিচারকের পদের উপযুক্ত নয়। তবে আমরা গোপেশ্বর বাবু কিম্বা ওস্তাদ মেহেদী ভোজেন, ভীষ্মদেব অথবা কাল বাবু কিম্বা নগেন

বাবুর কথা বলছি না। আমরা বলছি এমন কয়েকজনের কথা যাদের সঙ্গীত কলা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই হয়। এদের সঙ্গীত বিচারকের পদ দ্বিগ্ন এই ফল হয় যে এদের চাত্র ছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে, প্রতিযোগিতায় কোন না কোন স্থান তারা পাবেই। যে প্রতিযোগিতায় এরকম পক্ষপাতিত্ব অনায়াসে চলে আসে সে প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর সাধারণতঃ যে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই এবং এই কারণেই গত বৎসরের অনেক ভাল ভাল প্রতিযোগীগণ এ বৎসর প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি।

শ্রীযুত নাহারের উচিত ছিল বাঙ্গালার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের অর্থ দিয়ে অথবা বাঙ্গালার বাঙালিদের যে সকল সঙ্গীতবিদ্য আছেন তাঁদের অর্থ দিয়ে বাঙ্গালার আনিয়ে প্রতিযোগিতার বিচারক করা এবং তবেই প্রত্যেক প্রতিযোগীর অভিভাবক প্রতিযোগিতার উপর আস্থা রাখবেন এবং এই আস্থা সৃষ্টি না হ'লে প্রতিযোগিতার অথবা বাঙ্গালার সঙ্গীতের উন্নতি কোন দিনই হবে না।

এবারকার প্রতিযোগিতায় রণেন দাস ও কুমারী চিত্রলেখা গাঙ্গুলীর গানই

সর্বাপেক্ষা সুন্দর হয়েছিল। কুমারী চিত্রলেখা গাঙ্গুলীর খোল ও ভজন গানে উচ্চাঙ্গের বিস্তৃত পশ্চিমা চালের ঠাঠ, রাগের শুদ্ধতা, সুরের বিস্তার ও রকমারী তানের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রুতী ও গজল গানে বাণীর শুদ্ধতা এবং সুরে দরদ, ইছাই ছিল গানের বৈশিষ্ট্য। কুমারী শিউনী সরকারের গলায় মিষ্টতা আছে কিন্তু মনের মধ্যে তার অহমিকা ভাব অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ভবিষ্যতে তার পক্ষে উন্নতি করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। মনিকা বসু রায়, মায়া পাল, গীতারামী চাটার্জী, আর মাধুরী সরকারকে যদি নিয়মিত শেখান যায় তবে ভবিষ্যতে তারা ভাল গায়িকা হতে পারে।

আমরা আশা করি ভবিষ্যতে যে সকল সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হবে তাতে সত্যিকার প্রতিযোগিতা যেন হয়। সঙ্গীতের মহান আদর্শ নিয়ে প্রতিযোগিতা করলে বাঙ্গলার গায়ক গায়িকারা অচিরেই ভারতের অগ্রাগ্র গায়ক গায়িকাধ্বজ সজে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবেন আর বাঙ্গালার এই প্রতিযোগিতা অন্নহালের মধ্যে ভারতের সর্বত্রই আদৃত হবে।



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

খেয়ালী চিত্রপট ৫*



উপরে নিউ থিয়েটার্সের ছবি—“দেশের
মাটি”-র একটি দৃশ্যে অভিনয় করছেন
চন্দ্রাবতী। পরিচালক নীতিন বসু।

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১১ই ফাল্গুন ১৩৪৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ } ৮ম সংখ্যা

হরিপুরের পার

“বঙ্গজনের মানস পুত্র, এই তরুণ বীর তাঁহার ঐকান্তিকতা, অত্যাঙ্কল প্রতিভা ও অপারিসীম কন্ঠোন্মুখতা লইয়া দেশমাতৃকার পৃষ্ঠার পৌরহিত্য করিবেন—এই আমার অন্তরের বাসনা।” শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর এই অননুকূল্যীয় উক্তির প্রতিপলি করিয়া আমরা রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে ভারতের জাগ্রত জনমত্তের কণ্ঠক্ষেত্রের পথপ্রদর্শকরূপে মগোরবে অভিনন্দিত করিতেছি। ভারতের জনগণমন “অধিনায়ক” রূপে সুভাষচন্দ্র আগামী সপ্তাহের প্রারম্ভেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন। অশান্ত ও উপদ্রুত দেশের সমগ্র দেশবাসী আজ সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠদর্শের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। শতাব্দীর গৌরব, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীজীর আশীষ-ধন্য সুভাষচন্দ্রের নব কণ্ঠজীবনের প্রারম্ভেই তিনি সীম প্রদেশে রাষ্ট্রীয় সমিতির পুনর্গঠন ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন। বাংলার সুভাষচন্দ্র আজ সমগ্র ভারতের বৃহত্তর কণ্ঠক্ষেত্রে পরিবাণ্ড

হইলেও তিনি যে বাংলার সুখ দুঃখের কথা বিস্মৃত হন নাই তাহা পরম আনন্দের বিষয়।

বিস্মৃপুত্র রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে একা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ব্যতীত সমবেত সকলেই একবাক্যে সুভাষচন্দ্রকে বাংলার কংগ্রেসী কণ্ঠপন্থা নিয়ন্ত্রণের জগৎ সর্বময় কর্তৃত্ব বরণ করিয়াছেন। ‘হিন্দুস্থানের’-পক্ষ-বিচ্যুত অধুনা শরৎচন্দ্রের স্নেহপুষ্ট ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালকে বিষ্ণুপুর সম্মেলনে যে তীত্র ভ্রমণ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা হইতে বাংলার কংগ্রেসী কণ্ঠীরন্দের মনোভাব প্রকট হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব যে খণ্ডগুলের উর্দ্ধে তাহা বাংলার সকল উপদলের প্রধানগণ উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কণ্ঠক্ষম ও আদর্শবাদী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা সহজ হইবে। যে সমস্ত উপগ্রহ বাংলার কংগ্রেসী গগনের আশে পাশে বিভ্রান্তভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন তাঁহাদের কঠোর ও নির্গম হস্তে নিষ্পেষণ করিবার সময় কি আজও হয় নাই? সুভাষচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় সকলের আস্থা আছে।

কর্পোরেশনে মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের মধু-চক্র ভাঙ্গিয়া গড়িবার আশু প্রয়োজন। আদর্শ-বিহীন, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থসিদ্ধির কণ্ঠকেন্দ্ররূপে কংগ্রেসী মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন কংগ্রেসী আদর্শের বেসাতী করিয়া কংগ্রেসী আদর্শকে কাঞ্চন-মূল্যে বাজারের পণ্যে পরিণত করিয়াছে। চৌরঙ্গীর ‘কাসানোভা’ যাঁহাদের প্রমোদ-ক্ষেত্র, এটনি-পাড়ার অন্ধকূপ যাঁহাদের বড়খন্ড ক্ষেত্র, বাজারের বস্ত্রীস্তপে যাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ তাঁহাদের দৃষ্টি যে সুদূরপ্রসারী হইতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়।

যাঁহারা কংগ্রেসের অনুগ্রহে কর্পোরেশনে শ্রেষ্ঠতম পদগুলি অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারাও আজ কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বস্ত হইয়া পদ ও মর্যাদার আত্মস্থখে নিমজ্জিত। বিরাট কন্মোদীপনার পর যে গভীর অবসাদ কলিকাতার কণ্ঠ-কেন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহাকে ছিন্ন করিতে

হইবে। কলিকাতার কংগ্রেস কমিটিগুলিকে কর্পোরেশনের বেতনভুক কর্ত্তারীরন্দের বন্ধ-মুষ্টি হইতে মুক্ত করিতে হইবে—তাহা না হইলে শ্রীঅমিয়রঞ্জন দাশ গুপ্তের গ্রায় অস্ত্রাতকুলশীল ব্যক্তির মনোনিয়ন লাভ ঘটবে এবং সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও শ্রীমতী মেলী সেনগুপ্তার আবেদন সত্ত্বেও তাঁহাদের গ্রায় কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় ঘটবে। কলিকাতার জনমত যে কংগ্রেসের নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিবে না ১৯৩৭ ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীমুক্তা নাইডু কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলেন : “একদিন যিনি সৈনিক বেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি সমগ্র দেশের অধিনায়ক হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে নব গৌরবে অভিযান করিতে চলিলেন”—তাঁহার এই কন্মোদীপ্ত অভিযান সফল হউক ইহা আমরা প্রার্থনা করি।

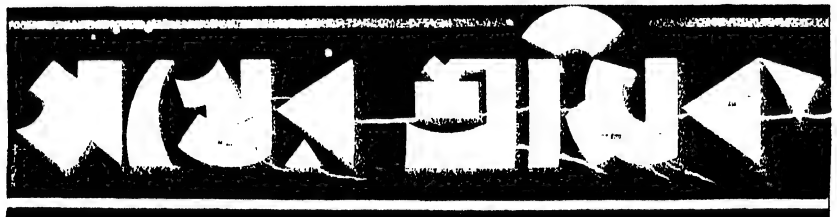
মুক্তি

সমস্যাগুলি খুবই দামি জিনিষ
একথা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু
সেগুলিকে নিংড়ে যদি একটু
হালকা রসের সৃষ্টি করা যায়,
নিশ্চয়ই সেগুলির মূল্য তাতে
কমে যায়না।

প্রভীক্ষাকার!

প্রফুল্ল পিকচার্সের অভিনব চিত্র-কথা—

কেশব গুপ্ত বিরচিত



তেমনি একটি বর্তমান কালের গুরুতর সমস্যার হাস্য-তরল
পারিপার্শ্বিকের রসমণ্ডিত চিত্র-রূপ

রূপ-তরঙ্গ

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

সারান্ধারে বিজ্ঞাপিত যে চাকল্যের সৃষ্টি করেছে, চিত্র-রসিক মহলে যে লংবাধ আজ আর কাছারও অজানা নেই। বিজ্ঞাপিতের পছন্দলা থেকে বাছাই করা ছয়খানি গান এবং নব রচিত ছয়খানি—মোট বারোখানি গান এই চিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতি নিরপেক্ষ সমালোচক এবং সঙ্গীত রসিক মাঝেই স্বীকার করেছেন—ইতিপূর্বে ভারতীয় জাতি-চিত্রের ইতিহাসে এত উৎকৃষ্ট সঙ্গীতাত্মকের নমুনা আর শোনা যায় নি।

বিজ্ঞাপিতের বাঙলা সংস্করণটি ঠিক কোন তারিখে যে চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে, একথা এখন বলা শক্ত। কারণ “মুক্তি” এখনও অসম্ভব দর্শক আকর্ষণ করেছে।

* * *

পরিচালক প্রকল্প রাধের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের অভিজ্ঞান ক্রমশঃ সমাপ্তি মুখে এগিয়ে আসছে।

যে গৃহ-বন্ধকে এক সমাজ রিনা অপরূপে গৃহ থেকে বহিস্কৃত করে দেয়, আর এক সমাজ সেই বহিস্কৃতগিনীকেই গৃহের বধূ করবার জন্ত প্রস্তাব করে! কেন?



নিউ থিয়েটার্সের “বিশেষ মাটি” চিত্রে—চন্দ্রাবতী

সমাজ নিরবশেষ হুঁচিলা এবং দুর্ভাবনার পথ দিয়ে ধীরে ধীরে সেই অবস্থার উপনীত হয়েছিল, যে অবস্থার মানুষ জীবনের কোন

আকর্ষণ অথবা সমাজের কোন প্ররোজন অনুভব করে না, যে অবস্থায় সে সুযোগ পেলে প্রাণত্যাগ করতে পারে, প্ররোচনা পেলে কুলত্যাগ পর্যন্ত করতে পারে।



জীবন গাঙ্গুলী



মেনকা



শৈলেন চৌধুরী



শৈলেন পাল



দেববালা



মলিনা

কিন্তু সন্ধ্যা আত্মহত্যা করে নি—সে কোরেছিল আত্মার হত্যা। প্রথম তাকে উদ্ধার কোরেছিল সত্যি। সমাজের কশাই খানা থেকে উদ্ধার কোরে তার মত একজন অসামাজিকের ঘরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষায়।

গত বৃহস্পতিবার ১৭ই ফ্রেব্রুয়ারী, প্রিন্স আনওয়ারশাহ বোডস্ট নিউথিয়েটারের চ'নস্বর ষ্টুডিওতে, শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়য়ার পরিচালনায় তাঁর নতুন সামাজিক কথা-চিত্রের চিত্র-গ্রহণ আরম্ভ হয়েচে। এই চিত্রের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে নিউথিয়েটারের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার এবং এই প্রতিষ্ঠানের অপর্যাপ্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি লেখিন চ'নস্বর ষ্টুডিওতে উপস্থিত থেকে পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের নতুন ছবির সাফল্য কামনা করেন।

সুন্দর একটি সেটে লেখিন ছবি তোলা হয়। সেটটিতে যেখানে হয় নায়ক নিখিলেশের শোবার ঘর। মার্জিত কচি, পুরো-হস্তর আধুনিক, সৌখীন একটি গনী সুবকের শয়ন প্রকোষ্ঠ যেমন হওয়া উচিত—তেমনি আধুনিক কারদ্বার লাজানো। এট সেটটির পরিকল্পনা কোরেছেন—শিল্পী অর্জুন রায়।

নিখিলেশের ভূমিকায় হিম্মি ও বাঙলা উভয় সংস্করণে অভিনয় কোরছেন শ্রীযুক্ত বড়ুয়া স্বয়ং। এই দৃশ্যে বস্ত্রবাসিনী একটি মেয়ের ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরতে—

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চ

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

শ্রীমতী মেনকা। এই চরিত্রটির নাম—'রাধা'।

নায়ক নিখিলেশের বাগবস্তা ইন্দিরার জীবনে এই মেয়েটি যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে, চিত্রিত নাটকে তারই পরিণতি আমরা দেখতে পাব। ইন্দিরা উচ্চশিক্ষিতা, অভিজাত সমাজের মেয়ে। এই চরিত্রে, উভয় সংস্করণে অভিনয় কোরছেন শ্রীমতী যমুনা।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার পরিচালনায় এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যবস্থাপনায় এই ছবিখানি যে সকল দিক দ্বিগুণেই চিত্র রসিকদের হৃদয় হরণ কোরতে পারবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

সর্বজনীন বিবাহোৎসব

এই শনিবার থেকে বালী ফিল্মসের বহু প্রতীক্ষিত ছবির ছবি শতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "সর্বজনীন বিবাহোৎসব" 'উত্তরা' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে। ছবির কাহিনীটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। ইতিপূর্বে এইধরণের রসচিত্র পর্দায় রূপান্তরিত হয়নি। পাঁচ জোড়া প্রেম-পাগল নর-নারী মননের দ্বাধানে চকল হয়ে উঠে ক্রীড়ে তাদের মনের-মাস্তুরের সঙ্গে মিলিত হ'ল রঙ্গরঙ্গের ভিতর দিয়ে তাই

রূপ পেয়েছে অভিনবরূপে। প্রথম জোড়া পাত্র-পাত্রী প্রেমের নাগণাশে বিয়ের কীল কোরে অভিনেত্রী অভিনেতাকে চিরদিনের জন্য আপন জীবনে জড়িয়ে রাখতে চায়। দ্বিতীয় জোড়া পাত্রপাত্রীর পরিচয়—কুমারী ডাক্তার ও তরুণী মিষ্টেলে চলে প্রেমের টাগ-অফ-ওয়ার। শেষে কুমারী ডাক্তারই হয় প্রেমযুদ্ধে জয়ী। তৃতীয় বর-কনে বস্তুরী যুগের মত আপন আপন গঞ্জেই হয়ে ওঠে মাতাল তাদের সেই প্রেম কল্লনার ভাগীদার জোটে আর একজন—কিন্তু শেষ অবধি সে হয় বঞ্চিত। চতুর্থ জোড়া কিশোর কিশোরী নিতান্ত অতর্কিতেই আত্মসমর্পণ করে পরস্পর পরস্পরের কাছে। পঞ্চজোড়া বিয়ের মন্ত্র পড়ে অবৈধ লবঙ্গকে বৈধ ও শুদ্ধ কোরে নেবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে জীবন সারাজে উপনীত শ্রোচ-শ্রোচ। এই পাঁচ জোড়া প্রেম পাগল সারাধিন পথে ঘুরে সন্ধ্যায় সন্ধান পায় "সর্বজনীন বিবাহোৎসব-র" সেই উৎসবে তারা মেতে ওঠে জীবন তাদের, মিলন তাদের সুন্দর হয়, সার্থক হয়।

এই নতুন ধরণের 'কমেডি' চিত্রখানি পরিচালনা কোরেছেন সর্বজনপরিচিত প্রিয়

হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন



—প্রযোজনা—

তিমকড়ি চক্রবর্তী
মনোহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য

—পরিচালক—

তিমকড়ি চক্রবর্তী

—প্রযোজনা—

অরীন্দ্র চৌধুরী
শিবদাস

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের প্রথম অবদান

হাল-বাউলা

পরিচালক :

ডি. জি.

ভূমিকায় :

চার্যা দেবী

শ্রীমতী গাঙ্গুলী, ফুলসী
লাহিড়ী, সত্য মুখোপাধ্যায়,
চন্দ্রিকা দেবী, মহাদেব
পাল, নবজীপ হালদার,
মণাল ঘোষ, প্রভাত সিংহ,
সন্তোষ সিংহ, হরিন্দাস
মন্ডোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ষ্টুডিও
বি. এল. খেমকার
প্রযোজনায় গৃহীত

চিত্র পরিবেশক

এম্পায়ার টকি ডিস্ট্রিবিউটাস

অনেকক্ষণ কাঁদিবার পর শান্ত
হইয়াও ছোট্ট ছেলেরা যেমন
থাকিয়া থাকিয়া কুপাইয়া উঠে,
তেমনি ছবি দেখিবার সময়
হাসির প্রবল বজায় বিপর্যস্ত
হইবার পরও আপনাদের
ওষ্ঠাধারে থাকিয়া থাকিয়া
হাসির রেখা কুটিয়া উঠিবে।

মানুষের

সহজ হইবার

অক্ষমতার মাঝে

যে প্রবল হাসির

উপাদান আছে,

সেই হাসির রূপে

যে প্রশ্ন গোপন থাকে

হাল-বাউলা

কথা-চিত্রটী

তাহারই

সুস্পষ্ট উত্তর

রূপবানীতে

আগতপ্রায়

পরিচালক সতুনেন। চিত্র-শিল্পী হিসেবে যিনি কাজ করেছেন তার তাল কাজের পরিচয় চিত্রাশোকারী সচিবাই পেয়েছেন। ছবির কথা ধরেছেন জনপ্রিয় তরুণ শব্দশ্রী জগদীশ বসু। শিল্প নির্দেশনা করেছেন পদার্থ বসু। চিত্রাশোকারী তত্ত্বাবধায়করূপে সত্যীশ সরকার কাজ করেছেন। চিত্রাশোকারী চরিত্র নির্মাচনও বিশেষ আকর্ষণীয়। আমরা চিত্রাশোকারী চরিত্র-লিপি সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে দিলাম—

প্রাণেশ—জীবন গাঙ্গুলী, মথুরা—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মিঃ চৌধুরী—ডাঃ হরেন মুখার্জি, ফেলারাম—মণি সেন, বিমল—জহর গাঙ্গুলী, বামপিক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, হারু—লতা মুখার্জি, মহেন্দ্র—ললিতা সিং, খগেন—নবদীপ হালদার, প্রমদ—ললিতা মিত্র, হাবুল—হরিশন মুখার্জি, যতীন—গঙ্গেশ মজুমদার, কানাই—সেচু সিংহ, বারেন—লতান বোয়াল, গোরু—দেবীতোষ রায়-চৌধুরী, জনার্দন—উপেন ভট্টাচার্য্য, রামা—যতীন দাস, চামেলী—রাণীবালা, মিস্ শেফালি—উষা দেবী, মিস্ বনলতা—বীণাপাণি, শ্রীমতী—সাবিত্রী, কমলা—লক্ষ্মী, আশা কালী—হরিশ্রবণী (ব্রাহ্মী) নৃত্যকালী—পদ্মাবতী, হেমাজিনী—সুহাসিনী।

প্রাইমা ফিল্মস লিমিটেড

বাঙলা দেশে চিত্র-পরিবেশকদের মধ্যে আজ প্রাইমা ফিল্মস-এর খ্যাতি অতি অল্প দিনের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নিউ থিয়েটারের সঙ্গে সহযোগ ঘটায়, চিত্র-প্রদর্শক মহলে প্রাইমা ফিল্মস-এর চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা বাঙলা দেশে নিউ থিয়েটারের অনেকগুলি ছবির পরিবেশনার ভার পেয়েছেন এ ছাড়া রামা ফিল্মস এবং দেবদত্ত ফিল্মস-এর অনেকগুলি বিখ্যাত ছবির ডিট্রিবিউশনের অধিকারও পেয়েছেন।

ছায়া-চিত্রের ডিট্রিবিউশনের ব্যবসায় এদের উত্তম, আন্তরিকতা ও সততা বিশেষ প্রশংসনীয়। এত অল্পদিনে, বাঙলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিবেশক নামে পরিচিত হ'বার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এরা এই সব গুণের জন্তেই। আমরা প্রাইমা ফিল্মস-এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। এই লাকলোর জন্য আমরা এই বিভাগের কর্মসচিব শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কৃপা স্বাক্ষর প্রার্থনা করি।

হাল-বাঙলা

সুপরিচিত পরিচালক ডি, জি, পূর্ণোত্তম "হাল-বাঙলা"র শূটিং চালাচ্ছেন। যেরূপ বিরাম-হীন প্রযত্নে ঘীরেনবাবু "হাল-বাঙলা" পরিচালনা করছেন তাতে মনে হয় মার্চ মাসের মাঝামাঝি "হাল-বাঙলা" রূপবাণীতে মুক্টিলাভ করবে। আধুনিক বাংলার আলেখ্য হাতে ও লাঠে পরিষ্কৃত করে যেরূপ ও রস পরিবেশন করতে ডি'জি যেরূপ উৎসাহী হয়েছেন তাতে মনে হয় তাঁর নবতম উত্তম সাফল্যমণ্ডিত হ'বে।

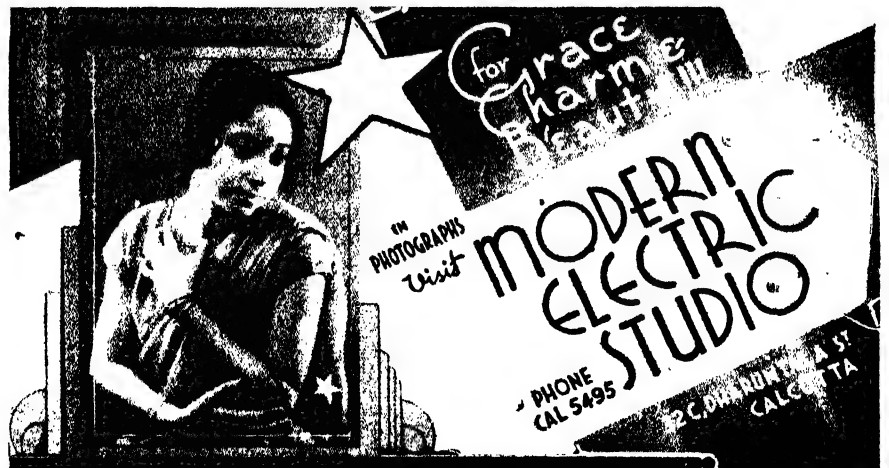
গত মঙ্গলবার বাংলার অর্থসচিব মাননীয় নলিনীকজেন সরকারের "রজনী"তে 'হাল-বাঙলা'র এক বিরাট চা-চক্রের শূটিং হয়। শ্রীমান সুধীর সরকারকে কেন্দ্র করে ছায়া

দেবী ও আশারাদী প্রভৃতি বহু মহিলা আর্টিষ্টদের সম্মেলনে চা-চক্রের আসর বসে সেলুলয়েডে রূপান্তরিত হয়। শ্রীমান সুধীর মধুর আবেষ্টনীর মধ্যে মনোরম অভিনয় করেছেন বলে প্রকাশ। তৎপরে লেক রোডে মিঃ পি, সি, গাঙ্গুলীর বাটীতে ব্রাহ্ম-সমাজের একটি দৃঢ় গ্রহণ করা হয়। পরিশ্রান্ত ডি, জি বেলা পাঁচটা পর্যন্ত শূটিং চালান।

'এক যুবতী এতক পতি ভাব কেমনে রাখে'—এই শাস্ত্র বাক্য একটু বিকৃত করে বন্ধুদের শ্রীমান সুধীর সরকারের লক্ষ্যেও প্রযোজ্য। পঙ্ক-কেশ ডি, জি খেতে আরম্ভ করে যৌবন-চঞ্চল বড়ুয়া ও স্বীর-বৃদ্ধি ও বন্ধ-মুষ্টি ছোটাই মিত্তির মশাইকে পর্যন্ত একই বন্ধুত্ব সূত্রে যিনি আবদ্ধ করতে লক্ষ্য সেই করিৎকর্মী। সুধীর সরকারের হাল-বাঙলার অভূতকর্মী পুরুষদের নলিনী-রজনীর 'রজনী'গৃহে অভিনয় লজ্জাই হয়েছে।

হাজরা পিকচার্স

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভক্তি মূলক বাণী-চিত্র 'দেবী ফুল্লরা'র শূটিং প্রায় অর্ধেক শেষ হইয়াছে। এই সপ্তাহ হইতে এই ছবির বাক পর্শাধের চিত্র গ্রহণ





সম্পূর্ণ নূতন ধরনের আকর্ষণ্য চিত্র !

তুষারাবৃত পর্বত শিখরে জীবন সংশয় যুদ্ধ

কুস্তীরের সহিত রোমাঞ্চকর সংগ্রাম

দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইবেন

সবল হিন্দি নুনাতে মোটেই অসুবিধা হইবে না

টা র জা ন - কী - বে টী

চতুর্থ সপ্তাহ

নিউ সিনেমা

চতুর্থ সপ্তাহ

কাগ্য চলিয়াছে। এই দৃশ্যটি
পূর্ব চাকলাতর কবিবার জন্ত প্রাণ
পরিচালক তিনকড়ি চক্রাভট্ট বিশেষ শ্রম
স্বীকার করিতেছেন।

মতিমহল থিয়েটারস

এদের রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে “বেকার
নাশনে-র” শূটিং শীঘ্রই শুরু হবে। এছাড়া
জ্যেষ্ঠ ইন্ডিয়া ষ্টুডিওতে এদের “খনা-র” কাজও
শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

প্রফুল্ল পিক্চাস’

এদের প্রথম বাংলা ছবি “লখের
শ্রমিক-র” এখন সম্পাদনা চলছে। আগামী
১৯শে মার্চ ছবিখানা ‘শ্রীতে’ মুক্তিলাভ
কোরবে আশা করা যায়।

পূর্ণথিয়েটার

রাধার পৌরাণিক চিত্র “প্রভাস-মিলন”
এখানে চলিতেছে। তাছাড়া, শিবরাত্রি
উপলক্ষে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে তাও খুবই
উপভোগ্য হবে বলা যেতে পারে। নিউ-
থিয়েটারের দ্বিধি, দেবদাস, মীরাবাঈ
ভাগ্যচক্র—ঐ বিন দেখান হবে।



নূতন কাগজ

আমরা শুনিয়া খুশি হইলাম যে
সামনের বৈশাখে কবি প্রভাত কিরণ বহুর
ছেলেমেয়েদের জন্ত একটা নূতন মাসিক
বাহির করিতেছেন। গল্প ও পদ্য করা
ও রচনায় আবার বুদ্ধবিনতার মনোজ্ঞানের
ক্ষমতা প্রভাতকিরণের লেখনীতে আছে,
এই কারণেই আমরা যথেষ্ট আশাবিত্ত
হইয়া তাবিত্তি যে অতঃপর ৭নং রাজ-
বাগান স্ট্রীটে ভাবী সম্পাদকের গৃহে শিশুদের
ভিড় ঠেকাইবে কে?

শ্রীযুক্ত অবনী চট্টোপাধ্যায়

রাধা ফিল্মের ভূতপূর্ব সঙ্গযন্ত্রী অবনী
চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি পাণিনিয়ার ষ্টুডিওতে
প্রধান সঙ্গযন্ত্রীরূপে যোগদান করিয়াছেন।

বসু ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানটি তাহাদের

অফিস গৃহ ১৪২ ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রীটে,
(১২২নং ক্রম) স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

সঙ্গীত প্রতিযোগীতার প্রহসন

মাননীয় “খেয়ালী” সম্পাদক মহাশয় সমীপে

আপনার গত সপ্তাহের খেয়ালীতে
“Bengal Music Association” লব্ধ
লিখিত বিষয়টি পড়িলাম। সত্য কথা—এ
বছর উক্ত সমিতির সঙ্গীত প্রতিযোগীতার
কলিকাতার বিশিষ্ট গায়ক গায়িকারা
যোগদান করেন নাই। তাহার কারণও
যথেষ্ট আছে। গত বৎসর যে কয়টি প্রতিষ্ঠান
উক্ত Association-এর প্রতিযোগীতার সন্মান
অর্জন করিয়াছিল “স্কটিশ চার্চ কলেজ
ফাইন্স আর্টস সোসাইটি” তাহাদের অন্ততম।
এখান হইতে যে কয়জন চাত্রাচারী গত
বৎসরের প্রতিযোগীতার যোগদান করিয়া-
ছিলেন তাহারা প্রত্যেকেই কোন না

কোন বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় উক্ত এ্যাসো-
সিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী সভায় তাহারা
কিছই নির্মুক্ত হইন নাই। ইহাদের
কৃতিত্বের পুরস্কারগুলি বহুদিন ধরিয়া
এ্যাসোসিয়েশনের আলমারীর শোভা বর্ধন
করিয়াছিল। এখনও কিছু কিছু করিতেছে।
কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াও সে-
গুলি কলেজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা
যায় নাই। অথচ কর্তৃপক্ষের নিজেদেরই
উচিত ছিল সেগুলি সময় মত prize
winners-দের পাঠাইয়া দেওয়া। এই সব
কারণে এ বছর এখানকার কাহারও

প্রথম ভ্যালুয়েসনের ফলাফল

= বোনাস =

আজীবন বীমায়		মেয়াদী বীমায়
১৫৮	:	১২২
প্রতি হাজার	:	প্রতি বৎসর

জেনুইন ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

হেড অফিস : ১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : ১২০৭ কলি : টেলিগ্রাম : “স্পিডি”

প্রতিযোগীতার নাম দেওয়া হয় নাই। অথচ Mr. K. S. Nahar অনেকের নিকটই বলিয়া বেড়াইয়াছেন যে ফাইন আর্টস্ সোসাইটি, বাসস্তা বিজ্ঞাবিখী ও আরও দুই একটি লজীত প্রতিষ্ঠানের entry তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অত্র প্রতিষ্ঠানগুলির কথা জানি না তবে স্কটিশ চার্লস কলেজ ফাইন আর্টস্ সোসাইটির ছাত্রছাত্রীরা গত বৎসরের ঐক্যপন্থী পুরস্কারের বেঙ্গল মিউজিক এ্যাসোসিয়েশনের সহিত লব্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন না। এ বৎসর নৃত্য প্রতিযোগীতার প্রথম দিন যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার জন্ত মূলতঃ দায়ীকে—তাঁহা Mr. K. S. Nahar নিজেই বোধহয় জানেন। সাধারণের ব্যাপারে যে, মতিভ্রষ্টাও রাখিয়া কাজ করা দরকার এবং এ্যাসোসিয়েশন কাহারও personal property নয় তাহা অরণ রাখা উচিত। ইতি—

নিশীথ ভট্টাচার্য্য বি. এ।

চেয়ারম্যান, স্কটিশ চার্লস কলেজ ফাইন

আর্টস্ সোসাইটি।

ভারতী মন্দিরে জলসা

গত শনিবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ভারতী মন্দিরের (ভবানীপুর লজীত শিক্ষায়তনের) শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। সভায় গুস্তাফ খাঁ সাহেব (বাবু খাঁ) প্রমুখ বহুস্তরীণের সমাবেশ হয়। প্রথমে ভারতী মন্দিরের সম্পাদক শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ উক্ত ভারতী মন্দিরের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং সভাস্থ লোককে ভবানীপুর অঞ্চলে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে উক্ত শিক্ষায়তনের অত্রাধ্যক্ষ ছাত্রী কুমারী অন্নপূর্ণা দেবী একখানি ভজন, একখানি ভট্টায়ালী ও আর একখানি আধুনিক বাজনা

গান গাহিয়া সভাস্থ লোককে মোহিত করেন তাঁহার গান সুরচিৎ সম্পন্ন ও উপভোগ্য হইয়াছিল। ইহার পর প্রফেসর শ্রীকুমারেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও কিশোরী বাবু প্রথম গান করেন এবং তাঁহাদের সহিত লজীত করেন প্রোঃ শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিত বাবু। শৈলেন বাবুর পাথোয়াজ লজীত প্রকৃত উল্লেখযোগ্য। তৎপরে প্রফেসর শ্রীরাধিকা মোহন মৈত্র মহাশয়ের শরৎ উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। এবং তাঁহার বাজনার সুরমিষ্ট রস লক্ষ্যের কথা রসিক লম্বাজে কাহারও অবিধিত নাই। সন্ধ্যায় মণ্ডবাবুর হারমোনিয়াম বাজনা হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে উক্ত সভা ভঙ্গ হয় এবং সম্পাদক মহাশয় সভাস্থ লোককে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কবিতা ও ছোটগল্প প্রতিযোগী-

তার ফলাফল

বহিরগাছি পল্লী মঙ্গল পাঠাগার হইতে কবিতা ও ছোটগল্প প্রতিযোগিতা শীর্ষক যে সংবাদ গত বর্ষের ৪৭ সংখ্যা সাপ্তাহিক খেলাপাতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বাংলা ও বাংলার বাহির দিল্লী, নাগপুর,

বেনারস, পাটন, গোহাটি, রেঙ্গুণ প্রভৃতি স্থান হইতে ১১৮টি কবিতা ও ৪৩টি ছোট গল্প প্রতিযোগীতার জন্ত পাইয়াছিল। আমাদের নির্বাচিত বিচারকের বিচারের ফলাফল নিয়ে প্রস্তুত হইল :—

কবিতা—১মঃ—শ্রীমতী অপরাধিতা দেবী।

২মঃ—শ্রীযুক্ত উদ্যাপদ ভট্টাচার্য্য

এম, এ।

ছোটগল্প—১মঃ—শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বসু

এম-এ, বি-এল।

২মঃ—শ্রীমতী পূর্ণা বসু।

যে সমস্ত প্রতিযোগী রচনার সহিত ডাক টিকিট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের রচনা মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাতে প্রেরিত হইবে।

শ্রীসারনাথ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক

সবেরে তোর খেলা সুরু

কেন মিছে তুই কাঁদিস—

সুখে তোর বিজন মরু

সেটা কিরে তুই ভাবিস?—

ন

ন্যাশন্যাল

টেলিগ্রাফ

(শাল রিপেয়ারিং ওয়ার্কস)

৮০১১২ গ্রে স্ট্রিট, কলিকাতা

(হাতিবাগান বাজারের পূর্বদিক)

বৈজ্ঞানিক উপায়ে উল ও সিল্কের কাপড় রং দিষ্ট ও দৌত হয়।

আধুনিক ফ্যাসানের সূট সাট, ব্লাউস ও ফ্রক ইত্যাদি সুলভ ও অল্পসময়ে প্রস্তুত হয়।

গরম সূট ড্রাই ওয়াশ হয়।

মফঃস্বলের কাজ বস্ত্রপূরক সরবরাহ করা হয়।



(সি, বি)

এ বৎসর হকি খেলার মরশুম খুবই উল্লেখনীয় মতো শুরু হইয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ পাদপাশ বজায় রাখিতে খুবই তৎপর। তাছাড়া প্রত্যেক দলেই খেলোয়াড় স্ক্রুন নতুন আমদানী করা হইয়াছে, এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খেলার বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল। কাষ্টমস, রেঞ্জার্স, মোহনবাগান এ কয়টি দলের মধ্যেই 'চ্যাম্পিয়নশীপ' হ'বার জন্য তোর প্রতি-যোগিতা চলিবে আশা করা যায়।

ইষ্টবেঙ্গল বনাম কালকাটা

গত মঙ্গলবার কালকাটা। মাঠে ইষ্টবেঙ্গল দলও কালকাটার সহিত যে খেলাটা সেটা অসমাপ্তিস্থিতিতে শেষ হইয়াছে।

এই খেলায় উভয় দলের জয় পরাজয় নিশ্চিত হয় নাই। তাহার কারণ স্বরূপ বল: যাইতে পারে যে, আক্রমণভাগে খেলোয়াড়দের দক্ষতার অভাব। গোল করিবার সুক্ক সুযোগ পাইয়াও তাহারা গোল করিতে পারে নাই।

এই দিনকার খেলায় উভয় দলের ব্যাকে যামিনী ব্যানার্জি ও হজেন্স দ্বায় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়-দের তাহাদের অভিক্রম করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রথমার্ধে লাফিক ও রশিদ উভ্যাব গোল করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পের জন্য বল গোলের পাশ দিয়া চলিয়া যায়। কালকাটা দলের স্ট্রাইকিং একটা গোল করিবার চেষ্টা যামিনী ব্যানার্জি ব্যর্থ করেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হইবার কিছু পূর্বে বিটি একটি গোল করিবার অপূর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশ মিনিট ইষ্টবেঙ্গল দল জীবন চাপিয়া ধরে। শেষের দিকে কালকাটা ভাল খেলিলেও তাহাদের পক্ষে গোল করা সম্ভবপর হয় নাই।

কালকাটা :—খেন্টন; হজেন্স এবং পেঞ্জারগাঠ; টজিকেল, লংফোর্ড এবং এনশুন; পেক, কনোলী, স্ট, বিটি এবং পিক।

ইষ্টবেঙ্গল :—এস বসু; এইচ কে এবং যামিনী ব্যানার্জি; জ্যোতিষ মহলানবিশ, এস চক্রবর্তী এবং এইচ সুর; আর ঘোষ, লাফিক, নিদিঃ হোসেন, রশিদ এবং নিতাট।

আম্পায়াররা :—এ জেমস এবং এন দাস।

সেন্ট জোসেফ বনাম পুলিশ

কাষ্টমস মাঠে গত মঙ্গলবার পুলিশ ওগলেটিক ক্লাব এবং সেন্ট জোসেফ দলের খেলা হয়। পুলিশ দল ১—০ গোলে জয়লাভ করে। খেলাটিকে কোন মতেই উচ্চাঙ্গের বলা যাইতে পারে না।

সেন্ট জোসেফ দলের খেলায় তাহাদের পূর্ণ ব্যক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুলিশ দল প্রথমার্ধে অসিকায়ন সময় আক্রমণ করিয়া খেলা এবং সেট কারণে হেট সময়ে তাহাদের এক গোলে অগ্রগামী পাকা অসম্ভব হয় নাই। কার্ডে বাণীক পুলিশ দলের আক্রমণ ভাগে কেহই ভাল খেলিতে পারেন নাই।

মিলিটারী মেডিকেল বনাম মহম্মেদান

গত মঙ্গলবার মোহনবাগান মাঠে

আপনার পণ্যের নামেই আপনার সুনাম

অতএন

অভিনব উপায়ে অসাধারণ প্রচারের জন্য

নিউ ইন্টার ন্যাশান্যাল পাবলিসিটির

সহায়তা ও পরামর্শ নিন

১১, চক্রবেড়ে রোড, (সাউথ) ভবানীপুর

ফোন সাউথ ৪৬৬



ADNIVAG

ইন্ডিয়ান চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

চিত্রা

ফোন বি.বি, ১১৩৩

২৪ সপ্তাহ চলিতেছে

মুক্তি

চিত্র-দর্পণে সমাজের যথার্থ প্রতিবিম্ব দেখুন

*

শিবরাত্রির প্রোগ্রাম, সোমবার,

২৪এ ফেব্রুয়ারী

(রাত্রি ৯।০টা হইতে আরম্ভ)

১। দিদি ২। ভাগ্যচক্র

২। চণ্ডীদাস ৪। শিবরাত্রি

প্রবেশ মূল্য দ্বিগুণ ॥ দুই দিন পূর্বে বুকিং খুলিবে

রূপবাণী

ফোন বি, বি, ৩৪১৩

সোমবার ২৮শে
ফেব্রুয়ারী

শিবরাত্রি উপলক্ষে সারা

রজনীবাপী প্রদর্শনী

১। কৃষ্ণসুন্দরী

২। মৌর্যাবাঈ

৩। দেবদাস

৪। বিনবিনিস্যার জের

৫। কেমন জুজ

প্রবেশ মূল্য দ্বিগুণ

“এঙ্গেল”

প্যারামাউন্ট

পিক্‌চােসর

অভিনব কথাচিত্র :

প্রযোজক ও পরিচালক

আর্নেষ্ট লুভিশ

প্রধান ভূমিকায় :

মালেন ডিয়েট্রিচ

হার্ভার্ট মার্শাল

মেলেভিন ডগলাস

শনি ও রবিবার

৩, ৬-১৫ ও ৯-১০টায়

অগাদিন

৬-১৫ ও ৯-১০টায়

নিউ সিনেমা

ধর্মতলা * ফোন : কলি: ৫৮১৯

চতুর্থ সপ্তাহ !!

টারজান-কি-বেটি

প্রত্যেক লোকেই অবশ্য দ্রষ্টব্য চিত্র

আগামী চিত্র : কাল-কি-বাত

সোমবার, ১৮শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রির সারারাত্রি

চিত্রোৎসব (রাত্রি ৯।০টা হইতে আরম্ভ)

১। প্রেসিডেন্ট ২। চণ্ডীদাস (হিন্দী)

৩। মিলিওনেয়ার

প্রবেশ মূল্য দ্বিগুণ !!

৮।০ আনার টিকিট ব্যতিত সকল শ্রেণীর টিকিট

শুক্রবার হইতে বিক্রয় আরম্ভ হইবে !!

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড,

ফোন : সাউথ ৩৪

শনিবার ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে

জনাকর্ষী তৃতীয় সপ্তাহ!

প্রভাস-মিলন

শিবরাত্রির আকর্ষণ

১। দিদি

৩। মৌর্যাবাঈ

২। দেবদাস

৪। ভাগ্যচক্র

আগমন—১০, ১।০ ও ১।০; সময়—১৪

আগামী শুক্রবারে বুকিং খুলিবে

বাগান লিজ

কলিকাতার উপকণ্ঠে পুষ্করিণীসহ একটি বাগান

লিজ লইতে ইচ্ছুক। বিবরণাদিসহ বক্স নং অ C/o

“শেফালী” ১১নং চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ)

ভবানীপুর, কলিকাতা—লিখুন।

মহমেদান স্পোর্টিং এবং মিলিটারী বেসিকেল দলের খেলাটি অসমাপ্তভাবে শেষ হইয়াছে। কোন দলই গোল করিতে পারে নাই। প্রথমার্ধে খেলাটি যুবট প্রতিযোগিতামূলক হইতে থাকে। দুই দলই আক্রমণ এবং প্রতি-আক্রমণ করিতে থাকে এবং উভয় পক্ষই গোল করিবার অনেকগুলি সুযোগ নষ্ট করে। দুই পক্ষের গোল রক্ষককে খুবই ব্যস্ত থাকিতে হয়, কারণ রক্ষণভাগ অপেক্ষা আক্রমণ ভাগই অধিকতর শক্তির এবং নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিল।

ডালহৌসী বনাম বি জি প্রেস

মঙ্গলবার ডালহৌসী দল নিজ মাঠে খেলিয়া বি জি প্রেসের নিকট ৪-০ গোলে পরাজিত হইয়াছে। বি জি প্রেস এই খেলার জয়লাভ করিলেও খেলাটি মোটেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই। প্রেস দল প্রথমার্ধে মোটেই একতাবদ্ধ হইয়া খেলিতে পারে নাই। তাহার দ্বিতীয়ার্ধে খেলার উন্নতি করে এবং ফলস্বরূপ তিনটি গোল করিতে সক্ষম হয়। ডালহৌসী কোন লক্ষ্যই ভাল খেলিতে পারে নাই।

রাজি ট্রফি প্রতিযোগিতা

ব্যাংকিং টেনিসের রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হারজিবাদ দলের লাহিত নবনগর দলের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। নবনগর দল প্রথমে ব্যাট করিয়া ১৫২ রানে ইনিংস শেষ করে। তিমু মানক, কোলা ও রণবীর সিং ব্যাটিংয়ে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। হারজিবাদ দলের হারদার আলী বোলিংএ সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন।

হারজিবাদ দল পরে ব্যাট করে ও ১১০ রানে সফল আউট হইয়া যান। স্টে বানার্জি ৩৪রাণে ৪টি উইকেট পাইয়াছেন।

নিম্নে খেলার ফলাফল দেওয়া হইল।

নবনগর প্রথম ইনিংস

রণবীর সিং ব ভাজুবা	২৮
মানক ক মাচি ব হারদার আলী	১
কোলা ক ও ব হারদার আলী	১
যাদবেন্দ্র সিং ক মেটা ব হারদার আলী	৭
ইন্দ্রবিজয় সিং ব মেটা	৫
ওয়েলস ক আসাছা ব মেটা	১৫
অমর সিং ব ইব্রাহিম খাঁ	২১
মার্শাল ব ইব্রাহিম খাঁ	৩৬
ব্যানার্জী নট আউট	২১
আজিজ ক আসাছা ব হারদার আলী	৫
অতিরিক্ত	৮
মোট	১৫২

হারদারাবাদ প্রথম ইনিংস

আসাছা ব ব্যানার্জি	১
মেটা ব ব্যানার্জি	০
টার্কী ব ব্যানার্জি	৬
ইলাক আমেদ ব সুবারক আলী	৫
হোসেন স্ট্যাম্পড আজিজ ব ওয়েলস	৩৬
হারদার আলী ব ওয়েলস	২৭
এস, হাফি এস, বি, ডবলিউ ব মানক	১
আইবরা ব ব্যানার্জি	৫
জুজুবা ব সুবারক আলী	১৬
ইব্রাহিম খাঁ নট আউট	০
মাচি এন আউট	০
অতিরিক্ত	৬

মোট ১১০

মিত্র ইনস্টিটিউশন-এর

বাৎসরিক স্পোর্টস

গত মঙ্গলবার সকালে টিবি আর ম্যানদন মাঠে মিত্র ইনস্টিটিউশনের বার্ষিক স্পোর্টস বিশেষ সাক্ষ্যের লাহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০০ ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

এইদিনকার অনুষ্ঠানে সর্কাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছিল শিক্ষক বনাম ছাত্রের হাড়ি টানা-টানি বিষয়টি। কিন্তু ছাত্রের দলকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। ছাত্রের দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি মহাশয় এবং শিক্ষকগণের পক্ষে নেতা ছিলেন উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। এইদিনকার প্রতিযোগিতাটি সাক্ষ্য-মণ্ডিত হইয়াছিল স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র-গণের সবেত চেষ্টায় এবং তাহার মধ্যে সর্কাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব ধাবী করিতে পারেন স্কুলের ক্রীড়ালক্ষিক মিঃ এন কে ঘোষ। প্রতিযোগিতার শেষে মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কৃতি প্রতিযোগীগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।

পাকা চুল ও ঢাক মাথা

কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে “কনক হেয়ার অয়েল” ও “কনক হেয়ার লোশন” অতীব কার্যকর। ইহ বাবচারে অচিরেই আপনার চুল মন্থ ও বৃদ্ধি পাইবে। এবং যে কোন পকার কেশ রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হইবেন। কিংবা ডাঃ ডিগোজ (হেয়ার ডিজিজ স্পেশালিষ্ট) (লন্ডন) চিকিৎসাদ্বীনে আনিয়া জটিল কেশ রোগ হইতে মুক্ত হউন। মূল্য আশাতীত মূল্যে ক্রয় করুন।

ম্যানুফ্যাকচারার :—

ডাঃ ডিগোজ কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

৪৯ বি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন বি, বি ৪৩৮৬

দি সিটি ব্যাঙ্কিং এন্ড লোন ডিপার্টমেন্ট হইতে ২৫% মূল্যের মাসিক

৥০ আনা সুদের বণ্ড পরিদ করিয়া মাসিক আয়ের সংস্থান করুন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন।

কল্যাণ

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উত্তর দিলেন জগত্তারিণী। তিনি জাহাইয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন “আমার বাবার কথা হচ্ছে, নীরব।”

—আপনার বাবার কথা? কোথায়?

—বলি, এলেনি হ’ল আজ সোমের সোমের আট দিন। এর ভেতরে ললিতার তো অসুখ দেখতে পাই সেই একই রকমের। আমি থেকেও তো তার কিছু করতে পারছি নে। তাই তাবচি, নাহয় এখনই যাই। এই বৃহস্পতিবার হলো শিবচতুর্দশী। সে দিনটা কাশীতে থাকবো না?”

—মা? আপনার যে কোন্‌দিন শিবচতুর্দশী নেই, তা বুঝতে পারিনে। আজ শিবচতুর্দশী, কাল অসুখ...এই নিয়েই ত আপনি আছেন। কিন্তু আমরা যে যাই! আপনার অবর্তমানে,—

—নীরব? কাকর জন্তেই কাকর আটকায় না। ওটা তুমি ভুল বলছো সবই ঠিক সমানভাবে চলে যাবে... মাস থেকে—

নীরব বাধা দিয়া বলিল : মা : সবই ঠিক সমান চলে যার লভ্য...কিন্তু জীবনটা ত শুধু কোনও রকমে চলে যাবার জন্তে নয়। এই যে আপনার এত আহুয়ে মেরে ললিতা আজ হ’ল হ’ল ভুগছে,— তা’তে চলে আমাদের ঠিকই আছে,— কিন্তু সেটা যে কিরকম চলা, এবং সে চলার যে কত মূল্য, এবং সে চলা যে আমাদের কোনখানে নিয়ে গিয়ে কেলবে,—

তা অন্ধ কবে ঠিক করে বলা বড়ই কঠিন! আপনি আছেন ব’লে তত ললিতা আজ-কাল ওষুধপত্রগুলো খাচ্ছে, আপনি চলে গেলে তো সে একেবারে হাঁপাতাল ফেরত রুগী হয়ে দাঁড়াবে।

• বলিয়াই নীরব বক্রদৃষ্টিতে একবার ললিতার দিকে চাহিয়া লইল। ললিতা কিন্তু স্থির নেত্র লম্বুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

জগত্তারিণী বলিলেন : তা তোমরা যা বলো!”

ললিতা বলিল : তুমি যখন গোঁ ধরেছো মা, তখন তো নিজের যাবেই! তুমি লংগারের সব মায়া কাটিয়েছে, আর জড়তে চাও না! আমি হাজার চেষ্টা করলেও তুমি আর ধরা হবে না। এটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তাই লেহিকে আর বেশী উঠে পড়ে লাগবো না। তার চেয়ে বরং এসো আমরা একটা সন্ধি করে নি। তুমি কাশী যাও, আমরা আপত্তি করবো না। কিন্তু লবঙ্গকে তুমি আমাদের কাছে রেখে যাও।”

—লবঙ্গকে রেখে যেতে বলছো? আমার সেখানে সেবা শুক্রবা কি করবে?

—তুমি একটা সেবা কর্তার লোক সেখানে রেখে নিও। কাশীর মত জায়গায় কিছুই অপ্রতুল নেই।

—তবে তাই করো! লবঙ্গ থাক!

—খোকাটা লবঙ্গর এত ভাঙটা হয়ে পড়েছে, তাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটা নিষ্ঠুরতার কাজ হবে। তার ওপর, আমাকেও তো ডাক্তার

এখনও ছাড়পত্র দেন নি। রোগের চেয়ে ডাক্তারই এখন আমার বড় রোগ। তার ওপর যে লিবিলা লার্জেন বাড়ীতে অনবরত আমার ওপর পাহারা দিচ্ছে,—

বলিয়াই ললিতা বক্রনেত্রে একবার নীরবের দিকে চাহিয়া, তাহাকে বাক্যবাণের শূল ফুটাইয়া দিল। নীরব কিন্তু চুপ করিয়া রহিল। সে দেখিতেছিল, ব্যাপারটা কতদূর দাঁড়ায়।

ললিতা বলিয়া যাইতে লাগিল : এই লিবিলা লার্জেন আর অ্যান্টিস্ট লার্জেনের ব্যবহার জোরে আমি লভ্য লভ্য এখন রুগী হয়ে দাঁড়িয়েছি—যদিও রোগের একবিন্দুও আর আমার শরীরে উপস্থিত নেই।

নীরব আর থাকিতে পারিল না; তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল :—না! রোগ ওর একবিন্দুও নেই, শুধু থার্মোমিটারটা শক্ততা ক’রে রোজ নিরানব্বই একশো ক’রে অসুখ দেখায়! আর খুৎখুৎ কাশীটা বাবার আর জায়গা নেই বলে ওর গলায় বালা বেঁধে আছে।

ললিতা ঠোট উলটাইয়া বলিল : তা যাই হোক! রোগ থাকুক আর না থাকুক, আমি এখন রুগী। বুঝলে মা! একথা অস্বীকার করলে আমার আর খুঁড়ে প্রাণ থাকবে না। এরা চটকে চটকে প্রাণটাকে বার করে নেবে। লম্বু দিনরাত এই খাটটিতে শুয়ে থাকি, এই হচ্ছে এখন এদের চিকিৎসা! কাজেই আমার সাংসার-টিকে আমার দেখবার আর কোনও উপায়ই নেই। চিকিৎসার জোরে আমাকে থাকতে হবে সেবা থাবার হলের ভেতর।

মা বলিলেন : তা বাপু অসুখ হ’লে সেবা থাবার তো কি আর কুস্তি ক’রে বেড়ায়?

নীরব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল : বলুন তো মা বলুন তো, এই নিয়ে আমার লজ্জা দিনরাত খুঁটিনাটি।

‘ললিতা বলিলঃ বেশ তো, শুয়ে শুয়ে খেতে পেলো কে আর খাটতে চার? বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম আমার,—এটুকু আর বুঝিনে! কিন্তু ভেগেটিকে দেখবারও একটি লোক চাই,—আর স্বামী নামক গৃহ দেবতাটিকেও ছুটবেলা পূজাচর্চনা করবার একজন বাঁধা পুরোহিত চাই!’ এ ছোটো কাঁধ করে কে বলো?

নীরব ললিতার প্রচ্ছন্ন-শ্লেষাত্মক কথা শুনিয়া একটা উত্তর দিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিল। কাজেই হালিয়া বলিলঃ তবু ভাল! তুমি যে স্বামীকে গৃহদেবতার লিখিত তুলনা করলে এতে নিজেকেই তুমি সম্মানিত করলে! স্বামীকে গৃহপালিত পুত্র লগ্নে তুলনা করে নিজেকে যে বাড়ীর গোয়ালিনী বলে জাহির করে নি, এতে তোমার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।”

জগত্তারিণী এ সবল কথায় কাণ না দিয়া বলিলেনঃ বেশ তো! লবঙ্গ না হয় থাক্। আমি কাশীতে একজন রাঁধুনি বামনি দেখে নোবো! তোমার অম্মথের সময় এটুকু উপকার আর আমি করতে পার্কো না?”

ললিতা ভাড়াভাড়ি বলিয়া উঠিলঃ “না মা! এটুকু তুলে যাও! আমার অম্মথের সময় তুমি উপকার কর এ কথাটা তুমি মনে করো না। বরং মনে করো তোমার জামাইএর উদ্দাহ লক্ষণের সময় এই চিকিৎসাটা তুমি করছো।”

জগত্তারিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেনঃ নে বাপু! তোর লগ্নে আমি কথায় পেরে উঠবো না! তাহ’লে ঐ কথা ঠিক রইলো নলি, কাল লকালের গাড়ীতে আমি জগদ্বাহুর লগ্নে কাশী চলে যাবো! আজ লব শুভিয়ে নি।”

—যা বোঝো করো! কিন্তু লবঙ্গকে রেখে যাওয়া চাই-ই! তা না হ’লে আমি

অমিত দেবের অপমৃত্যু

(গল্প)

শ্রীমদর্শন দেবশাস্ত্রী

রঙিন খামের ভিতর করে এল নিমন্ত্রণ পত্র। শুভ বিবাহ নয়, অন্নপ্রাশন ও নয়, সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশন।

আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্য-রসিক এবং নগণ্য। সাহিত্য-চর্চা আমার পেশা নয়, নিছক নেশা। সেই হুজুরের সর্বসত্ত্ব থেকে আসে উপস্থিতির অনুরোধ-পত্র। আজকের নিমন্ত্রণ পত্র যে দলের, বন্ধু-শ্রেষ্ঠে নিরাপদ লেখানকার প্রধান পাণ্ডা।

তাই, বামুলী প্রথা মত কার্ড ত.এসেছেই, উপরন্তু এসেছে একখানা চিরকুট। বন্ধুবর জানিয়েছেন—সেইদিনের অজ্ঞাতম আকর্ষণ হবে ‘সাহিত্যে সত্যের পরিমাপ’ লবঙ্গের অন্ন-বিস্তার আলোচনা। অতএব আমি যেন ওই-দিন যথালম্বত প্রস্তুত হয়ে আসি। বন্ধুবর তর্কিক-তালিকার আমাকে জুড়ে দিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যথাদিনে উৎসবে উপস্থিত হলুম। নিরাপদ ঘরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল।

হিনরাত কিছুতেই শুয়ে থাকতে পার্কো না। বাপরে! এই চৈত্র মাসের হুপুর বেলা! একা খাটে শুয়ে কখনও কাটানো যায়? ওর কি? উনি আদালতে গিয়ে কোম্পানির চেয়ারে ঠাং ধেলিয়ে বসে বেশ টানাপাখার হাওয়া খাবেন! আর করতে করতে আমি এইখানে, নীরব লম্বাধির মধ্যে।

আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলে নিচুগলায় জিজ্ঞাসা করলে—‘এনেছিস?’

—কী?—অপ্রতিভের মত বললুম।

—‘যা লিখে জানিয়েছিলুম, মনে নেই?’

এতোকণে বোধগম্য হল নিরাপদের কথার বিষয়বস্তু। বললুম—‘কিছু লিখেতো আনিনি, একটু দেখে শুনে এসেছি। এখন, বাগদেবীর ঘরায় বাক্যবস্ত্রটা যদি ঠিকমত চলে তবেই।

‘মাইকঃ’—নিরাপদ আমার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বললে ‘উৎসে যাবি। আর, ভেতরে আসবি আর’—বলে ঘরের ভিতর নিচে গেল।

লকাৎ হল। দূরে কার্পেট পাতা প্লাট-কর্ষের উপর সভাপতির নির্দিষ্ট আসন। নীচে সভা ও আগন্তুকদের জন্ত সারিভাবে চেয়ার লাজানো।

আমাকে কোণের দিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিরাপদ চলে গেল। তখনো সভাপতি আটপন নি। সভ্যদেরও অনেকের আসতে বাকী আছে। চূপটা করে বসে আছি। তাবতি, আসন্ন আলোচনা—ওরফে তর্কবুদ্ধির কথা—বক্তব্যের ভাষাটা যেন ভদ্রগত হয়।

এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলেন—আমারি লম্ববরনী। সুন্দর চেহার—হাবভাবে কবি বলেই মনে হ’ল। আজানুলম্বিত চিগাহাতা পাজাবী, একমাথা কালো ও কৌকড়ানো উকোখুঙ্কো চুল, রিমলেশ চশমা আর শান্ত-উদ্বাল দৃষ্টি যেন

(ক্রমশঃ)

ওর কবিজীবনের পুরোধতার লৌকিক নিদর্শন। হাতে একখানি বই। তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলুম, বইখানি রবীন্দ্রনাথের 'বাশরী'।

নিরাপদ এল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমাদের ছুজনের সামনে বসল। আমাকে বললে—'একে চিনতে পেরেছিল ষ'।

বললুম—'না, কক্ষণো দেখিনিতো কোন লভার!'।

'ইনি-ই অমিত দেব—যশস্বী সাহিত্যিক ষ'।
—'ওঃ'—তার দিকে ফিরে হাতজোড় করে—নমস্কারান্তে বললুম—'আপনিই—?'

—'আজ্ঞে, নমস্কার! আপনাকেতো—'
নিরাপদ আমার পরিচয় দিলে—'ইনি আমার পরম শুভ্রর সুদর্শন দেবশর্মা। সাহিত্যিক সমাজে সুরলিক বলে খ্যাতি আছে।'

'আপনার নাম ইতিপূর্বে শুনেছি'—
অমিত দেব স্মিতহাস্তে বললেন—'তবে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে ওঠেনি। সভা-সমিতিতে বড়ো একটা যোগ দিই না। অনেকে তার জ্ঞাত আত্মাভিমানী, অইকারী ইত্যাদি ভাবী ভাবী বিশেষণগুলো আমার ওপর প্রয়োগ করেন। কিন্তু আমি নাচাঁর। ঘরের বাইরে আসতে আমার ভালো লাগেনা।—' হঠাৎ কী মনে করে চুপ করলেন।

নতুন কথা—ঘরের বাইরে আসতে ভালো লাগেনা। আশ্চর্য্য মানুষ! আমি চুপটা করে বসে আছি। নিরাপদ 'আসছি' বলে উঠে চলে গেল। ওখানে অজ্ঞাত সভ্যরা পরস্পর পরিচয়-পরীক্ষা লেয়ে নিচ্ছে এই ফাকে। অমিত দেব নীরব। কী যেন ভাবছেন এবং গভীরভাবে।

এমন সময় নিরাপদ হস্তবস্ত হয়ে ছুটে এল। সঙ্গে জন পাঁচেক যুবক। লোজা

অমিত বাবুর কাছে গিয়ে তাঁর হাতছুটি ধরল বিনীত ভাবে বলল 'অমিত বাবু আসুন।'

আমরা ছুজনে চমকে উঠলুম। অমিত বাবু নিরাপদের মুখের দিকে চেয়ে লবিস্নরে বললেন—'কোথায় যাবো?'

নিরাপদ তাঁর হাতছুটো অধিকতরো জোরে চেপে ধরে বললে—সভাপতি আসবেন না, ফোনে জানিয়েছেন। তাঁর সাংসারিক সর্বনাশ উপস্থিত, তিনি আলতো পারবেন না। কী বিস্ময় বলানতো! একগলা জুগে নাঘিয়ে দ্বিগুণ পাশ কাটালেন। আপনাকেই আমরা উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করি। এখাতা উদ্ধার করণ।

অমিত দেব স্নান হেণে বললেন—'আমি হবো সভাপতি? কী লজ্জা আছে আমার! আর, আজকে কী একটা বিষয়ে তর্কবুদ্ধ হবে শুনিছলুম।

নিরাপদ ভাড়ুভাড়ি বললে—'সাহিত্যে সভ্যের পরিধান—'

—'ওঃ—তা' আমিতো মোটেই প্রস্তুত হয়ে আছি।'

আমি লজ্জান্তে বললুম—'তাতে কা আসে যায়! আপনি আঁগীর বড়পুল!'

একটু চুপ করে থেকে অমিত দেব বললেন—'বেশ, সকলের অনুরোধ' আবেশের

রূপান্তর। 'এবং আমি তা' আবেশের মতোই শিরোধার্য্য কোরে নিলুম। শুধু এই মিনতি—
জুটী হোলে গারে মেখে নেবেন না।'

পিছন থেকে তরুণের হল বলে উঠল—
'আপনার জুটী হবেনা কক্ষণো—এই বিদ্যাল আমাদের আছে।'

অমিত দেব উঠে দাঁড়ালেন। বাবার সময় বইখানি আমার হাতে দিয়ে গেলেন—
'বইখানি দয়াকোরে আপনার কাছে রাখুন, এলেন নেবো।'

প্রবল করতালির ভিতর সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। সভার কাজ শুরু হ'ল। প্রথমে চিরচলিত প্রণামত সভানায়ককে মালাদান তারপর উদ্বোধন লজ্জিত, মাঝখানে তর্কবুদ্ধ ও সর্বশেষে সভাপতির অভিভাষণ।


অমিত দেব উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। স্ত্রী সুলতার ভাষা, কী অভিনব প্রয়োগ-কৌশল, তেমনি কমনীয় কণ্ঠস্বর। সকলের সন্মিলিত প্রশংসার ভিতর সভাপতি নীরব হলেন। তাঁর কথার ছ'এক টুকরো আজো আমার মর্মে

লেগে আছে—'সত্যকে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অধুনিকতার উগ্রপন্থীরা এমন একটা বিভৎস কাণ্ড বাধিয়ে বলেন, যা সাহিত্যিক সমাজের পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর। এই বিভৎসতার

দুর্ভাগ্যজনক শীর্ণ শিশুরা

ডাক্তারের

বাল্যস্বাস্থ্য সেবনে অবিলম্বে সুস্থ ও সবল হয়।



বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

অন্ততঃ কারণ-অতিশয়োক্তি ও আন্তরিকতা
শূন্য। অতিশয়োক্তি অশিষ্ঠতার পরিচায়ক।
এই অশিষ্ঠতার ভেতর—সংযমকে অতিক্রম
করবার ভেতর আছে এক অপূর্ণ মাধবতা।
আমাদের ভেতর যেন এই মাধবতা না আসে,
আমরা যেন রক্তিগ্ন নেশায় মশগুল হয়ে না
পড়ি। কেননা, এই জিনিষটা সমানে বেড়ে
চলবে বিনের পর বিন-মাতালের মর্দের মাত্রার
মত। রচনাকে অচিরে করে তুলবে রুচি-
বিগর্হিত। তাই, সত্যকে বিকাশ করতে
যেমন প্রয়োজন আন্তরিকতা ও নির্ভীকতা, ঠিক
সেই পরিমানে প্রয়োজন ধীশক্তি ও প্রকাশ-
কৌশল।’—

সত্য ভঙ্গ হ’লে অমিত দেব বাইরে এসে
বাড়ালেন। পালে ও পিছনে প্রাণশ্বাসমুখর
জনতা। লামনে, রাস্তার ধার বেলে বাড়িরে
আছে প্রাকণ্ড মাস্টার-বুইক—তারি অপেক্ষায়।
আমার কাছ থেকে বইখানি নিয়ে তাঁটার
ওপর মুঠ হাণির রেখা টেনে বললেন—
‘আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তারি সুখী
হোলেন। আজকের মত আমার বিদায়
দিন। পরে সুযোগ হোলে আবার দেখা
হবে।’

আমি লোকজনের হাসি হেসে প্রতি নমস্কার
করলুম। সমবেত জনতার প্রতি হাততুলে
নমস্কারান্তে গাড়ীর ভিতরে গিয়ে বসলেন।

* * *

মহাকালের পাখার ভর করে পাঁচটা বছর
বয়ে গেল। চালশে ধরা স্মৃতির দৃষ্টিতে অমিত
দেব কাপ্লা হয়ে এলোছে। কর্মব্যস্ত মনের
কোণে যদিও বা কখনো তাঁর কথা উদয় হয়,
কিন্তু তার স্থানস্থ লোকজনের কোঠাতেই
নিঃশেষ হয়ে যায়, মিনিট পর্যন্ত এগোর না।

একদা শেষ রাত্রে আচম্ভা ঘুম ভেঙ্গে
গেল। মনে হল কে যেন আমাদের বাইরের
দরজার খাঁকা দিচ্ছে। বিদ্যাট কোঁতুল’ বুকে
নিরে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে মেঝে এলুম
নীচে। দরজা খুলতেই দেখি, লামনে দাঁড়িয়ে

নিরাপদ। মুখখানা শুকনো, চোখদুটো রাঙা
টকটকে করমচার মত, মাথার চুলগুলো
এলোমেলো। মাথার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে
গেলে মাসুকের যেমন চেছারা হয়, ঠিক
তেমনি। প্রথমেই বললে—‘যা, জামাটা
গায়ে দিয়ে আয়।’

লবিয়রে প্রাঙ্গ করলুম—‘কেন, কী হোলো
তোর?’

নিরাপদ শুকনো মুখখানা বিস্তী ভঙ্গি
করে বললে—‘আমার নয়, অমিত দেবের—
প্রখ্যাত সাহিত্যিকের স্ত্রী-বিয়োগ।’

লিউরে উঠে বললুম—‘এ্যা!’ অমিত
দেবের স্ত্রী—

সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—‘হ্যাঁ স্ত্রী এবং
তিনি বিয়োগ, তাই তোমাকে যোগদান
কোরতে হবে। যা, চট করে বাহোক একটা
গায়ে চড়িয়ে আয়। এখানে বোললুম
আমি।’—ব’লে লতিয়ে লিউর ওপর বসে
পড়ল।

আমি ছুটে ভিতরে চলে গেলুম। তখন
একটা জামা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এসে
বললুম—‘হয়েছে চল!’

দুজনে রাস্তা দিয়ে হন হন করে এগিয়ে
চললুম। তখনো রাস্তার লাইটগুলো জগন্ত
রয়েছে। লাড়টা লহর নিঃসাড়। মাঝে
মাঝে কাশে আসছে দুয়োগত রিম্মার ঠুং ঠাং
শব্দ, আর মোটরের অপষ্ট হর্ণ। জামাটা
পরতে পরতে সিজ্জামা করলুম—‘ওর স্ত্রীর কী
হোয়েছিল।’

‘ঘুমঘুমে জর, পরিণাম ফুলফুলের রোগ।
মুখ ফুটে বলতে নেই লোকের কাছে। ফুল-

ফুল গুলগুলোর ভেতর দিয়ে বেড়ে চলে
দিনকে দিন। অতঃপর লাহা লতা কথা—
ফুল কোরে একদিন প্রাণপাখিটা উড়ে যার
জীর্ণ দেহ-পিঞ্জরাটী ফেলে রেখে, ফুলি?’—
নিরাপদের কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাচ্ছে কেমন যেন
একটা অসহ্য রুগ্নতা।

বললুম—‘তোর মেজাজটা মিলিটারীর
মত, ব্যাপার কী বলতো?’

‘ব্যাপার সুবিধে নয়, শীগগির ব্যাপার
মুড়ি দিতে হবে।’

‘বুললুম না তোর কথাটা।’

নিরাপদ শ্রান্তস্বরে বললে—‘আজ পনেরো
দিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। রাতে এক মুহুর্তের
জন্তু দু-চাখের পাতা এক করিনি।’

‘কেন, তোর আবার কী কাজ পড়লো?’

‘সাহিত্যিকের স্ত্রী-বিয়োগ আর আমার
কর্মের ভোগ। one of the best rascals
he is! বুলি এমনি পাখণ্ড সেটা যে, রুগ্ন
মরণাপন্ন বউটাকে ফেলে উধাও হোলেন।
আমি ভেবে লারা। চারিধিকে খোজ
কোরলুম, কোথাও পাতা মিলল না। বউটা
কৈদে মরে, ও—সে কী কারা! মাসুকের
চোখে যে এতো জল থাকতে পারে এর আগে
জানতুম না।’

‘কোথার গিছলেন?’

—‘চলোয়! অর্থের লন্ধানে যাচ্ছি’
বোলে বেরিয়েছিলেন, পনেরো দিন বাদে
আজ লকালে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন।
নেছাৎ লতা সাবিত্রীর দেশের ঘরে, তাই
মরবার আগে দেব-বর্ষনটা ঘটে গেল। উঃ—
কী কুকণেই বন্ধুত্ব কোরেছিলুম! এরাই

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

‘আবার লভা সমিতিতে বড়ো বড়ো বুকনি
কাটেন—হোঃ।’

—‘কেন, তিনিতো খুব বড়োলোক।’

—‘তোমার মন্তক!—’ দাঁত খিঁচিয়ে
উঠল নিরাপথ।

‘শেবার সাহিত্য সমিতিতে—যে বছর
তিনি সভাপতি হয়েছিলেন, দেখলুম রাস্তার
ওপর মাষ্টার-বুইক দাঁড়িয়ে!’

‘ওঃ—আজ্ঞো তোমার মনে আছে দেখছি।
সে সব জনৈক ভক্তের। তখন ভক্তের মাথায়
কাঁঠাল ভেঙ্গে বাদশাহী চালে থাকতেন। সে
শুড়ে বালি পড়েচে। ভক্ত এখন শক্ত
হয়েছেন। অবশ্য চাকি চড়াতে তিনি আর
রাজী নন। তাই একদিন সরকারী রাস্তায়
দাঁড় করিয়ে দিয়ে মুখের সামনে ধোর বন্ধ
করেছিলেন। অতঃপর হাড়ির হাল।’

একটু থেমে জিভটা তালুতে ঠেকিয়ে
একটা শব্দ করে সঙ্কোভে বললে—‘উঃ কী
ভুলই কোরেছিলুম ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরে।
বুখি কক্ষণে সাহিত্যিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব
কোরিসনি। মেঠো বাজারের শুভ্রাঘের সঙ্গে
মিতে পাতাবি, কিন্তু ওদের সঙ্গে না। ওরা
এক একটা নরকের কীট।’

সারাটা রাস্তা নিরাপথ আপন মনে
বকতে বকতে চলল। মাঝে মাঝে থেমে
যায় গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত। আমি
উলকে দিই রেকর্ডের গায়ের পিন দেওয়ার মত,
আবার চলে। ঘুরের গীজ্জার টং টং করে
পাঁচটা শব্দ কানে এল।

আরো খানিকটা গিয়ে নিরাপথ ঢুকল
একটা লক্ষ এছো গলিতে। আমি তার
অনুগামী। রূপাশের মাটির নদীমা থেকে
পচা পাকের হুর্গন্ধ নাকে আসছে,
সাহিত্যিক আচ্ছা জায়গাতে আস্তানা
বৈধেছেন। একটু এগিয়ে গিয়ে সে ঢুকল
একটা পড়ো একতলা বাড়ীর ভিতর।
‘চারিদিকে আবছা অন্ধকার। পারিপার্শ্বিক

আবছাওয়া হুঃহু এবং হুঃহুহ। বী পাশে
ঘরবার বেড়ার ওপারে একখানা ঘর।

ঘরের বাইরে থেকে নিরাপথ ডাকল—
‘অমিত বাবু!’

ভিতর থেকে উত্তর এল—‘এই ঘ্রে
দাড়া, আসুন।’

নিরাপথ ঘরে গিয়ে ঢুকল—আমি তার
পিছনে। ঘরের এককোণে একখানা দড়ির
খাটির। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো
রয়েছে। যাক নিরাপথ কাজ লেই
রয়েছে। অদূরে নড়বড়ে জীর্ণ তক্তাপোষের
ওপর অমিত দেবের স্ত্রী শান্তি। মাথার
গোড়ায় অমিতবাবু ছ হাঁটুর মধ্যে মাথা
জুঁজে বসে আছেন। ভোরের স্নান আলো
এনে পড়েছে মেছটার মুত্থা স্নান চোখে
মুখে। সর্বাঙ্গ একখানা আশ্রয়লা লাড়ি
দিয়ে ঢাকা। শুধু মুখখানি নিরাবরণ।
পাংশু, বিবর্ণ মুখখানা! কোটর গত
ছটা চোখ আখো খোলা। কল বেয়ে
গড়িয়ে পড়া রক্ত জমাট বৈধেছে কানের
পাশে ও মাথার বালিশে। একরাশ রক্ত
অগোচালো চুল মেঝে স্পর্শ করেছে।
সিঁথির সিঁদুরের রেখা, অস্পষ্ট। ইনি-ই
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অমিত দেবের স্ত্রী—
ভাষান্তরে শ্রিয়া! মাত্র পাঁচ বছর আগে
যাঁর স্বামীর আভিজাত্য আড়ম্বর সারাটা
লহরে একটা চাকল্য সৃষ্টি করেছিল।

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে
দেখে, নিরাপথ সঙ্কোভে এক ঠেলা ঘের
বললে—‘হা কোরে কী দেখচিস? হাঁটুর
ওপর কাপড় তোলা। অমিতবাবু গা ঝাড়া
দিয়ে উঠুন। শেষ কাজটা সারা হোলে
তারপর পা ছড়িয়ে বোনে আশ মিটিয়ে
কাঁদা বাবে। উঠুন উঠুন বিলম্বেন অলম্!’

অমিতবাবু মাথা তুললেন। আমাকে
দেখে লক্তজন্তুরে বললেন—‘বাচাগেন!
আপনারা লহর না হোলে কী বিপদেই

যে পড়তে হোতো!—ক’টা বেজেরে
বোলতে পারেন?’

আমি জানালুম—‘সাড়ে পাঁচটার বেশী
হবে না।’

—‘এ্যা সাড়ে পাঁচটা!’—তিনি যেন
শিটরে উঠলেন—‘তা’লে আর ঘেরী নয়,
চলুন চলুন। পাঠান-পুরুষ আসবার সময়
হয়েচে।’

নিরাপথ ফুকুটা করল—‘পাঠান-পুরুষ!
সে আবার—ক’?’

—‘সীমান্তের সুরখোর দাড়া—চলন্ত
ভাষায় যাকে বলে কাবুলিওয়ালা! চলুন
দেখতে পেল আবার একটা কেলেকারীর
সৃষ্টি কোরবে।’—ঠাঁটের ওপর নিঃশব্দ
হালির রেখা ফুটে উঠল।

শ্রাণান কার্য শেষ হ’লে যে যার
বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। অমিত দেব
কথান্তরে জানালেন—‘তিনি আজই কলকাতার
বাইরে চলে যাবেন। এখানে থাকলে ওর
আত্মসম্মানের মূলোচ্ছেদ হবার বোলো
আনা সম্ভাবনা। মহানগরী ভক্তি ওর
মহাজন।’

তারপর ২৪দিন আর অমিত দেবের
কোন খোঁজ পবর পাই নি, সাময়িক
পত্রিকার পাতা উন্টে মনে হচ্ছে, সাহিত্য
সাধনা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। নিরাপথ
বলে—সাহিত্যিকের কোনো পরিচিত লোকের
মুখে সে শুনেছে, তিনি নাকি এখন

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

ঈদগিরের দ্বালী কাজে বেশ বিশেষ
প্রদর্শন করেন। অসম্ভব নয়!

হঠাৎ সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বেথা
হ'ল তাঁর সঙ্গে। চিত্তঃক্লেশ সেবানব্বনের
গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কী
বিস্ময় হয়ে গেছে চেহারা। পানচালা
ভোবড়ান গাল, বিবর্ণ-কুণ্ঠিত কপাল।
পরশে আধময়লা কাপড়, গায়ে লম্বাধরের
হাফমাট আর পায়ে গোড়ালি ফাটা বুট
জুতো। বুকের কাছে জামার কাপড়টা
পানের রসে রঞ্জিত। চোখের উপর ভেসে
উঠল—দশবছর আগেকার সাহিত্য সমিতির
সভাপতির শৌখিন্যুষ্টি! কী অভাবনীয়
পরিণতি!

আমাকে নিশ্চয় আগেই দেখেছিলেন।
সামনে এসে নমস্কারান্তে পানে ছোবানো
হু-পাটা দাঁত বার করে হেসে বললেন—
'ভালো আছেন?'

বললুম—'ভালো, আপনি এখানে?'

আমতা আমতা করে বললেন—'এই-
ইয়ে মানে কলেজে wife—'

বুঝতে পারা গেল তিন পুনঃ বিবাহ
করেছেন। পদ পূরণ করে বললুম—'ও—
near her confinement? ডেলিভারি
হোতে এয়েছেন বুঝি?'

—'হে: হে: ঠিকই অনুমান করেছেন।
কেল নিরিয়স শেষ পর্যন্ত ০টিকলে হয়।
দে থাক—নিরাপদবাবুর থবর ভালো?'

'একরকম মন্দ নয়। আজকাল কাগজে
তো আপনার লেখা নজরে পড়ে না।'

—'ছেড়ে দিয়েছি তো বহুদিন।
পেট ভরে না, পৈত্রিক গুঁজির দরকার।
সাহিত্যিকরা যে সংসারী, তাহের রাড়ী-
ওলাকে যে ভাড়া দিতে হয়, সুদী লাভ
সকালে এসে তাগীরা করে—একখাটা
সাধারণে বুঝতে চায় না। সাহিত্যিক

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—উষা চৌধুরী

আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে
বহু সমস্যার মধ্যে আজ প্রধান চিন্তার বস্তু হয়ে
দাঁড়িয়েছে—অর্থনৈতিক অর্থাৎ জীবিকা
নির্বাহ!!

একটি পুরুষের উশার্জনের উপর বহু নারী
ও শিশু নির্ভর করে থাকে, অকস্মাৎ সেটি
পুরুষের মৃত্যু হলে ১০।১২টি পোষ্য চিন্তা বা
তার কোন নিকটতম আত্মীয়বর্গই নিতে রাজী
হন না। কারণ সহজভাবে ধরতে গেলে
তাঁহেরও অর্থাত্ম, স্থানাত্ম। স্বামী হারিয়ে
বাংলার নিরাশ্রয় দুর্ভাগা মেয়েরা তবু উপা-
সন্তর না পেয়ে তাঁহেরই আশ্রয়ে এসে
শারীরিক মানসিক বহু লাহনাকে বরণ করে
গলগ্রহ জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চায়, বাংলার
প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ দৃষ্টের বা সংখ্যার শেষ নেই।
এভাবে জীবন কাটিয়েও তারা তাহের ছেলে
মেয়ের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পারেনা।
দুবেলা ভাতের উপায় ঘাঘের নেই তাহের

অমিত বেবের মৃত্যু হয়েচে দশবছর আগে।
a news of ten years ago!—
অকারণ জোর গলায় হেসে উঠলেন।'

—'এখন কী করছেন?'

—'কেরানীগুরি! স্মৃতিসে কলমপিষি
টেবু টু ফাইভ! আর মৌজ কোরে পান
ধোক্তার জাবর কাটি। মোটে মাথা
আমতে হয় না, খুব সোজা কলজ।'

ট্রাম এসে দাঁড়াল।

'আচ্ছা, আলি, নমস্কার!'

অমিত বেব গাড়ীতে উঠে পড়লেন।

লেখাপড়া বা শিল্প শিক্ষার জন্ত উদ্বিগ্ন হওয়া
শোভা পায় কি? নিতান্ত অত্যাচার বলেই
অসহ্যতা মনে করে থাকেন।

আমার মনে হয় এই মহানমস্তা আজ
বাংলার শহরে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়েছে।
বাংলার অসহায় মধ্যবিত্ত নারীর জীবন
ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে আরও
ভীষণতর হয়ে দাঁড়াবে। এই সব অসহায় নারীর
দুঃখে অনেক মহিলা মহিলার অন্তর কেঁদে
উঠে নানা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হলেও—অগণিত
দুঃস্থা নারীর সংখ্যার তাহা সৃষ্টিমের। পুরুষের
স্বাধীনতা এবং অকাল মৃত্যুই আজ বাংলার
অসহায় নিঃস্থা নারীর সংখ্যা এত দ্রুত
এগিয়ে যাচ্ছে। বহু প্রতিষ্ঠান বাংলার
মেয়েদের জন্ত অর্থকরী শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা
করে অত্যাগ্রহ। মেয়েদের বখেটে ধন্যবাদের
পাত্র হয়েছেন; কিন্তু দুর্ভাগা বাংলার অনেক
ঘরে এখনও এইরূপ অর্থহীন শিল্প শিক্ষালয়ের
কথা প্রবেশ করতে পারেনি। বাংলার
অশিক্ষিতা মেয়েরাই এর জন্ত দায়ী। এতদিন
আমরা বলে এসেছি আমাদের অজ্ঞান
অন্ধকারে রাখার জন্ত আমাদের পুরুষরাই
দায়ী, আজ প্রগতির যুগে সেই কথা পুনরাবৃত্তি
করতে আমি রাজী নই। কারণ, আমরা যদি
জেনে ঘুমাই। তাহা হলে আমাদের ঠেলে
কে জাগাবে? বিশ্বের, লম্বাকের, রাষ্ট্রের এত
থবর দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে বেরোচ্ছে,
অবসর লম্বরে আমরা যদি যে লম্ব না পড়ি
তার জন্ত দায়ী কি আমাদের পুরুষ না
আশ্রয়দাতা!!

নবীন যুগের রাসবেহারী

প্রথম প্রকাশ

আইন পড়েই অধীরচন্দ্র ভাবলে, লাইন্ ক্লিয়ার তারি!—
হ'লেও রোগা, আঁটলে চোঁগা হবেই সে স্তর রাসবেহারী!
নামে অধীর, কাণে বধির, নিত্য হাজির ঘের সে কোঁটে;
মামলা 'দেখে' শামলা এটে, শুন্তে কিছুই পারনা মোটে!
চাপ্ কানেরে বিদায় দিয়ে, প্যাণ্টালুনে সাহেব লেজে
লিগার মুখে গাছতলাতে রোঁদে পোড়ে, জলেই ভেজে
এক গাছা তার ফাইল হাতে, 'ত্রীক' মোটে নয়, সব যে লাগা!
এর কাছে যাম, ওকে শুধায়, 'কেমন ভায়া?' 'এই যে লাগা!'
সবাই আছে ভূমি ভ'রে, মক্কেলরি নেই ক' দেখা!
ভাবলে অধীর, রাসবেহারীর অন্তরকম ভাগ্যলুখা!

ওবিডিফেট পেয়াবা সেজে ঘুরল কত প্রজেক্ট ব'য়ে!
রিসীভারী কোথায়? শেষে ইন্সপেক্টরেজ এজেন্ট হ'য়ে
বধা খুঁজে বেড়ায় শহর। টিউশনীও জুটিয়ে নিলে;
ইংরেজী তার ভুল দেখে হায় ছাত্রী নিজেই ভাগিয়ে দিলে।

শ্রামল গানের নিক্ত চারায় কাঁটতে থাকে চুপুস তারি,
এম, এ, লয়ের ভুতের শ্রীকৃষ্ণ—নবীন যুগের রাসবেহারী!
মাথা থেকে নখাগ্রভাগ পূর্ণ যারি মিথ্যাচারে,
সেও ভাবে, স্তর রাসবেহারী হ'লেও বেন হ'তেও পারে!

কেবল জাকে ধরাটাকে লগাই দেখে, যতই বাড়ায়
দুর্দিশা থাক;—অলহ চান্ নিউ এডিশন রাসবেহারীর!
অবশেষে একটি ধোঁপা পড়ল তারি ফাঁকের মুখে,
কাপড় নাকি টারালো কার, সেই বিধেছে নাশিণ ঠেকে।
হাববে ধোঁপা, জানেই অধীর, তবুও একে 'বৌনী' যে তার!—
পরল, এবং বললে তাকে, "খালি পাবেই বুঝলে কেয়ার!"
কেয়ার ভাবে, যাক না দেখা জল কোথাকার কোথায় দাঁড়ায়।
অষ্ট আনায় নগর বিদায় নিতেই অধীর হস্ত বাড়ায়।

মামলাতে হায় হারল অধীর, রজক দিলে ফাইন গুণে!
উকীল বলে, 'করব আপীল, ব্যাপার বোঝ আইন শুনে!'
হাত লাফাইয়ে হাতিরে নিয়ে হারের সোণার মাজুলীটাই
পালায় কেয়ার! দেখলে অধীর অচল ছিল আত্মলীটাই!!

তাইতে অধীর রাগছে যত, প্রচার ক'রে দিচ্ছে তত—
কেয়ার ও নয়, কেয়ার ও নয়,—নাম হ'ল ওর 'মিথোপদ'!
অলকজ এ ব্যাকশালে ঘুরে ছাইকোট্টে আসবে যখন,
দেখবে নতুন রাসবেহারীর কাছা এবং এলেক তখন!
রাসবেহারী, রবীন্দ্রনাথ—একটা আনে, করি স্বীকার—
ক্ষুদে উকীল, ক্ষুদ্র কবি মায়ায় ভোলে মরীচীকার!

—*

এইরূপ অভাবগ্রস্তা মেয়েদের ক্ষমতা প্রতি
পাড়ায় সমিতি বা শিক্ষা সঙ্ঘের বিশেষ
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্কুল বা শিল্প
শিক্ষায় যদি আরো হাজার হাজার তৈরী
হয়; তবু সমিতি অর্থাৎ মহিলাসঙ্ঘের
প্রয়োজন কোনদিন কমবে না। সমিতির
উপকারিতা বলে এই সংখ্যাটা আমি শেষ
করব। পরম্পরের মেলামেশার একটা
সুবিধাজনক জায়গার নাম সমিতি দেওয়া
হয়। এই সমিতিতে পরস্পর আলোচনা
আলোচনা শিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়া বিনা

পরস্পর চলতে পারে। পরচর্চা, পরকুৎসা
বর্জন করে সমিতিতে খুব ভোটভাবে
সংস্কার আদর্শে গড়ে তুলতে পারলে
ভবিষ্যতে বহুস্তরের সম্ভাবনা সে আপনি দিতে
পারবে। ঐকান্তিক নিয়ম নিষ্ঠায় সমিতির
ভিত্তি স্থাপনা করলে প্রাচীর তৈরী হতে
দেরী লাগে না। এই সংস্কারের দ্বারা
বহু নারীর গ্রামাঞ্চলের উপায় হতে
পারে—একরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।
অভাব শিকার, অভাব নিরাময়গতায়, অভাব
সহযোগীতার।

পুরুষের সাহচর্য না নিয়েও একরূপ
ভোটবড় সমিতির সম্ভাবনা আমাদের জানা
আছে। কত অলসারা পথহারা শিল্পীনারী
এই সব সমিতির সাহচর্যে—মনে লাহল,
ঐকান্তিকতা, এবং সং আদর্শে শিল্প
প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে
ঘরে বলে সংসার প্রতিপালন করতে
সমর্থ হচ্ছে।

আজ "মহিলা শিল্পী সঙ্ঘ" বহুল প্রচার
খোয়ালীর মহিলাসঙ্ঘের তেতর দিয়ে
অভাবগ্রস্তা শিল্পী নারীকে সাহায্যে আহ্বান

ফরতি। যে কোন নারী তাঁহার শিল্প জ্ঞানের পরিচয় দিতে খেরালীর মহিলামহলে পত্রালাপ করতে পারেন। প্রত্যেক হুঃস্থ্য ভগিনীকে স্বাবলম্বিনী হবার জন্ত আমি উৎসাহ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিখ্যাত করি ভগবানের করুণায় বাংলার নারীর গলগ্রহ জীবন একদিন দূরে দূরান্তরে মিলিয়ে যাবে।

“মহিলা শিল্পী লজ্জ” জ্যাস, জেলী, চাটনি, আচার, বড়ি, পাপরু, কেয়াথরের, গোটা, ভাজা মশলা, টক মশলা, ইত্যাদি সজ্জাবাহার্য্য জিনিষ চাড়াও; অর্ডারী জামা, শেমিজ, সুতার কাজ, সস্তায় ছোট ছোট খেলনা শিল্প দেওয়া ও নেওয়া চলে। বিবাহ, বাড়ীর অর্ডারমত পান লাঙ্গা, ছানা মাথনের কারুকার্য্য “মহিলা শিল্পী লজ্জের” অভাবগ্রস্তা মেয়েরা তৈরী করার তিন দিনের খরচ চালিয়ে দিতে পারছে।

আশাকরি পরবর্ত্তী লংখ্যায় এ লম্বন্ধে আমার ভগিনীদের আলাপ আলোচনা মহিলামহলে এসে পৌঁছবে। এই লম্বন্ধে পূর্ব্বকের রন্ধন প্রণালী লম্বন্ধে ওদিককার মেয়েদের কিছু খবর দিতে অনুরোধ করছি।

বাকা পথে তোকে যেতে হবে
অনেক বাধা অনেক ঝায়ে,
অনেক কাঁটা ফুটে পায়—
তবুও তোকে যেতে হবে।

স

গর্ভ নিরোধবার্টিকা
বহুপরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নিরোদ্রোম ঔষধমাত্র একবার
সেবনে একবৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫০ টাকা
ডাকিম এম.এস.জামান
৪২, ধর্মভাট্টা টাউন, কলিকাতা

ছাইত্ব ছন্মিলন

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সন্মিলনে এবার গিরেছিলাম কাহিত্য-চর্চা কি রকম হয় দেখতে। ইতিপূর্বে কখনো কলকাতার বাইরে কোনো সাহিত্য সভায় যাই নি, ও লম্বন্ধে আমার বরাবরই একটা ‘স্বাভাবিক লকোট আছে এবং আশঙ্কাও আছে সাহিত্য-সন্মিলনের উদ্বোধনারা আমাদের না চিনতেও পারেন। বরাবরের মতন এবারেও অনেকে আমরা নিমন্ত্রণ পাইনি, অথচ যে কাগজে আমরা লিখি (যেমন ০/০ ভারতবর্ষ বিখ্য বিচিত্রা-কিছা খেরালো) সেখানে মিথলে আমাদের কাছে চিঠি পৌঁছে যেত। কর্তৃপক্ষের এসব খবর জানা উচিত।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন চাটগাঁ মেল ধরলাম, শিয়ালবা টেলনে কোনো সাহিত্যিক-কেই দেখতে পেলাম না। খানিকটা হ’মে গেলাম।

রাণাঘাটে দেখি আমাদের পুরাণে ‘মাস্টার মশায়’ রায় বাহাদুর—খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। ডাক দিলেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ও এসে পড়লেন। দুজনকে নিয়ে মাস্টারমশায় সোরাবজীতে চললেন, ব্রেফার্ট্ট করিয়ে দিয়ে গল্পগুজোব করতে লাগলেন। অনেকটা লম্বন্ধে চুমৎকার কেটে গেল।

কৃষ্ণনগরের ট্রেন এল, নবদ্বীপের মেলার যাত্রী বোঝাই নিয়ে। মন্দ লাগল—না ভক্তিমাতৃদের লজ্জা।

বেশীক্ষণ লাগল না। কৃষ্ণনগর টেলনের বাইরে দেখি বন্ধুর বিজয়লাল কবিত্ব চেড়ে’ গেফরা টুপিধারী স্বেচ্ছাধেবক নিয়ে ভীষণ ভাবে ওদারক করছেন। লম্বন্ধে লম্বন্ধেই

ভাড়া গাড়ী পেলাম যার ভাড়া দিতে হয়নি।

ক্যাম্পটি ৮মনোমোহন ঘোষের বাড়ী, বর্ত্তমানে ফুল। চমৎকার বন্দোবস্ত, কোনো রকম অসুবিধাই নেই। আতিথ্যেরও তুলনা হয় না। ভলাটিয়ারদের প্রশংসা একমুখে করবার ভাষা আমার নেই।

খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম, যার জন্তে কেউ পরশা চাইলেও না, দিলামও না। ওখান থেকে বন্ধুর সজ্জা দাস এবং আনন্দবাজারের সত্যেন্দ্র প্রভৃতি যেখানে থুটি গেড়েছেন সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। যে ভাষায় রসলাপ চলছিল তা দ্বারক উপভোগ্য কিন্তু সে উপভোগের ভাগ কাউকে দেওয়া যায় না যেহেতু ছাপার অক্ষরে সে লব বার করা অসম্ভব।

তারপর সন্মিলন মণ্ডপ। সেখানেও টিকিট কেউ চাইলে না। মোটকথা লবটাই আমার ফ্রী হ’য়ে গেছে, (ট্রেনভাড়া ভাড়া) আমি আপত্তিও করিনি কারণ বিনা নিমন্ত্রণে অনাহত ও বরাহিত যাওয়ার অপরাধ আমার। তার জন্তেই আগাগোড়া লজ্জিত ছিলাম। এবং এই অপরাধে বহু সাহিত্যিকই দ্বারী ছিলেন—ক্রমশ জানতে পারলাম।

লভা যা হ’ল, তাকে হাট বললেই হয়। দর্শকরা উঠছে বসছে চলছে ফিঃচে—একবার এখানে উকি মারছে একবার ওদারট। দেখে আসছে চলমান শ্রোতা ও বল-মান বক্তা নিয়ে সে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড! রাশি রাশি প্রেরিত রচনা ‘পঠিত বলিয়া গৃহীত’, অথচ ‘দ্বিত্তিত’

আভিভাষণ বিতরিত হওয়া লেবেও উচ্চারিত—
এর লামঞ্জ পাপরা গেল না।

হন্দ কবিশোভাধী—রাম গ্রাম যদু
মধুসূদন-বালখিল্যবৎ আচরণ, উন্মাদনা—
চীৎকার, লাইমলাইটে আসবার জন্তে
ঠেলাটেলি—অথচ যারা সাহিত্য লামনার
ইহ-পরকাল নষ্ট করেছে—করেছে অলুংখ্য
লোকের মনোহরণ, তারা গেল ভিড়ের মধ্যে
হারিয়ে—যেথো 'বৈটকখানা, বাজারের কথাই
মনে পড়ে।

তালতলা কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে
আমি এর চেয়ে discipline বেখেছি,
বেখেছি এর চেয়ে অনেক বেশী রনিক সমাগম
ও রলবোধের পরিচয়।

আরো একটা জিনিস বন্ধা বজা—
আমাদের এধিকার লোকরাই শ্রোতা এবং
বক্তা, ক্রফনগর সহর সাহিত্যিক সমাগমে
থুব বেশী চকল হরেছে বলে মনে হলনা।
সেচ্ছাসেবকও গুনলাম—স্থানীয় লোক কম।

“সাহিত্য লামলন” শ্রুতিতে বোধহয় এই-ই
হয়। লামনের ধারে কুমিল্লাতে ডাক পড়েছে,
যাবার উৎসাহ বোধ করছি।

চণ্ডীদাস লম্বন্ধে স্মরণীয় এক আলোচনা
হ’ল। দ্বিজ, বীন ও বড় চণ্ডীদাসকে নিয়ে রথী
মহারথী পঠাতিবরা পড়লেন—গত এগারো
বৎসর ধরে যে আলোচনা বহু বন্ধুবিচ্ছেদ
ঘটিরেছে—তাই এবারেও অমীমাংসিত ও
অসমাপ্ত র’য়ে গেল—কিন্তু যে চণ্ডীদাস
লবার উপরে মামুষ লতা

তাহার উপরে নাই—ব’লে-গেছেন
লম্বন্ধ বালালীর লুহয়ালনে তিনি অটলই
রইলেন।

এই স্মরণীয় লম্বন্ধ যদি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ
নিয়ে আলোচনা হত, তবে হরত’ দ্বিজ
সাহিত্যিকদের অলসংস্থানের কোন উপায়
আবিষ্কার করা যেত—বাম্বালাল ওরালা
ধনীরা যখন অনেকই উপস্থিত ছিলেন।

যত্নের পরলা ধরচ ক’রে কতকগুলো
বাজে বটুকটি শুন্তে যাবার মতন লম্বন্ধ ও
অর্থ অধিকাংশ লতাকার সাহিত্যিকের নেই,
হেঁদো কথা ও বাধাগুলির ধিন গেছে, ছাপার
অঙ্করে কাগজে নাম বেরোলেই অঙ্ক
সাহিত্যিকেরা হাতে স্বর্গ পায়না—একথা
কর্তারা জেনেও কেন যে এড়িয়ে যান পরিষ্কার
বুঝতে না পারলেও কিছু কিছু যেন বোঝা
যায়!

আজ সাহিত্য-লেনীরা আর্ন্তনাহ করছে
লম্বন্ধের—বড় ভুল হয়ে গেছে এ পথে এসে।
উকীল, অ্যাটর্নী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রোফে-
সর, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কেরানী, কুলী সবই
তারা হতে পারত, কিন্তু কাজ হয়ত চালাতে
পারতনা। এদের ধারা স্বতন্ত্র, এদের চিন্তা
স্বতন্ত্র। এদের আত্মদাম্মান-বোধ—এমনকি
আলস্তও স্বতন্ত্র। লিনেমায়, পাবলিশিটিতে
সাহিত্য অঙ্কুর থাকেনা, টাকা যতই কেননা
আলুক। উকীল প্রভৃতির পেশাও তাহের
চলতনা, ছাপাখানাও না, অলার্ লোকের লঙ্গে
লম্বন্ধ রাখা তাহের পোষাতনা। যারা আজো
out and out সাহিত্যিক হ’য়ে আছে, তারা
হুবেলা ঠক্কে, হুটিবেলা লহনাম কিন্ছে, কিন্তু
বাহলাহী নেশাত ছাড়তে পারছেননা! উপায়
কি? তাহের উপায় কি? কোনো মিয়া,
বলে দিতে পারে? গ্রামাচ্ছাধনের জন্তে বড়
জোর দৈনিকের সহকারী লম্পাধকতা করা
চলে, কিন্তু চলেনা যে তাতেও। এই অচল
অবস্থার মধ্যে আজ ধেশের যে নাম করা
লেখকরা—নাম ক’রে তাহের অপমান করতে
পারবন—তাহের লম্বন্ধে কর্তব্য ও দায়িত্ব
লম্বন্ধে কোনো সাহিত্য লামলন কখনো কি
চিন্তিত হরেছেন?

অনেকে মনে করতে পারেন আমি নিজের
জন্তে খানিকটা ওকালতী করে নিলাম।
ধন্যবাদ, বর্জমান আমায় একখানি মোটর
আছে এবং কুনগতিকে চলে যাবার মতন

লামাত্র কিছু সংস্থান আছে। স্মরণীয় আমি
unbiased এবং লম্বন্ধকহিলাবে bona-fide
যদিও কোনরকম সাহ্য ও উৎসাহ পেলে হাত
বাড়িয়ে নিতে দ্বিধা করবো না। অমুতে
নিশ্চয়ই অরুচি নেই এবং চিরদিন লমান
ধাবেনা, তাও জানি! কলিকাতা
সাহিত্যলম্বন্ধনীতে যে কথা বলেছিলাম তারই
পুনরোক্তি আজ করি :—

বুঝা সাহিত্য লামলনের অযথা আড়ম্বর।
প্রাণীপের নীচে অঙ্ককারেই যদি কবিল
কাঁধে!

বুঝা লম্বন্ধেরা বনন ভুবার, মোটরের স্বর্ঘ
কথাশিল্পীরা পড়ে যদি থাকে পাণ্ডাধারের
কাঁধে!

জিজি চেয়ারে অপ্র তোমার বাহার রচনা করে,
হুঃখের দিনে লাম্বন্ধা বাণী যারা দ্বিয়ে যায়
কাণে,

তাহের জীবন কুসুম নিয়ত ফুটিতে ফুটিতে য়ে,
ছুটিতে ছুটিতে গন্ধ তবুও বিলাইয়া যায় প্রাণে।

নাভীস্নেস, ব্রাড্‌প্রোসারেও ডায়াবিটিশেতে
ভোগে,

ধরিতে ধরিতে তবু দ্বিয়ে যায় শেধ স্রণের
ধান!

আর কতদিন চলিবে এমন অপূর্ণ
যোগাযোগে

অভুক্ত কবি চারণগণের বঞ্চিত অভিধান?
যদিও বেশটা এমনি callous হ’য়ে গেছে
যে, ঐ আবহুনের উত্তর কোনো সাহিত্যিকই
কোনোধিক থেকে পাননি।

বক্তৃতাটা লেগেছে ভালো
রয়েছে বেশ কাণে

কি যেন করা উচিত ছিল
কি করি তা কে জানে—

এই নীতিতেই কাজ হয়েছে!
চুলোর যাক সাহিত্য লামলন। পাণ্ডারা
আমায় চেয়ে কিছু কম বোঝেন না। ভবিষ্যতে
না বোঝবার ভাণ না করলেই খুশি হব।

“সন্ধ্যার দিকে ডিঙের ঠেলায় যন্ত্রচালিতবৎ রাজপ্রাসাদের একটা বিস্তৃত হল্‌এ ঢুকতে হ’ল—সে ঠেলাঠেলি চার আনার বুকিং অফিসকেও হার মানায়, কাজে কাজেই ল’রে প’ড়ে লম্বান রাখবার উপায় ছিল না, ‘আমার কার্ডও ছিল না, কাজেই খাওয়ার ব্যাপারে কে খাওয়াচ্ছে, কাকে খাওয়াচ্ছে, কেন খাওয়াচ্ছে, বোঝা গেল না। সামনে দেখলাম খাওয়াচ্ছেন বিজয়লাল, খাচ্ছেন সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। আমিও অংশে সরভাজা সরপুঁরিরার রসার্বাদন, যে করিনি তা নয়, কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিল না একটা মজা দেখতে গিয়ে—শাখা সভাপতিদের খোশামোদি করছিল যে-সে।

কিন্তু এই লম্বিলনে পরস্পরের আলাপ আলোচনাটা উপভোগ্য হয়েছিল। অখিল নিয়োগী, মনোজ বসু, অপূর্ণ ভট্টাচার্য্য, নির্মল ঘোষ, নিতানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস রায়চৌধুরী, বিমান মজুমদার এবং আরো অনেকের ব্যবহার কবি-জনোচিত লেগেছিল।

সভা-মণ্ডপ থেকে বেরিয়েই টেননের দিকে চললাম পায়ে চ’লেই, একটি বৃদ্ধের উত্তেজনায়—‘ইয়ংম্যান, হাঁটতে পারেন না? ঐত’ টেনন।’

আবছা চাঁদের আলোর পথ হারিয়ে এক পোড়ো বাড়ীর শূন্য বাগানে ক্রিক করে গিয়ে হাজির হলাম, সে ব্যাপার একটা গল্পের পট্টা। শকাল অবধি হয়ত আমাকে অপেক্ষা করতে হ’ত কৃষ্ণনগরের সেই পথ-চিহ্নহীন বসতিবিহীন অজানা জায়গায় যদি না—থাক।

জগতে তারাই শুধুরে স্থখী
যারা সচেতন—সদা কণ্ঠে রয়,
যারা পরের দুখে দুখী—
তারাই পূজ্য—সুন্দর, মহাশয়।

ম

বিশেষ কিছু নয়

ত্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দ্রুত পায়ে জয়শ্রী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

কিন্তু তার আগেই পিঠ দিয়ে পুরন্দর লম্বন্ত দরজাটাকে আড়াল ক’রে দাঁড়িয়েছে। একটা কী অজ্ঞাত অ’শঙ্কায় ‘কটকিত হয়ে প্রাণশূল শক্তিতে জয়শ্রী আর্জুনাদ করবার উদ্যোগ করতেই ডান হাত দিয়ে পুরন্দর তাকে মুখ চাপা দিয়ে পরল। তারপর তাকে ছেড়ে দিল। জয়শ্রী ততক্ষণে আবার পেছনে ফটে গেছে। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত লম্বন্ত শরীর ঝড়ো হাওয়ার আক্রান্ত নরম লতার মতো থর থর ক’রে কাঁপছে।

‘কোনরকম গোলমাল ক’রো না!’ শাস্ত গম্ভীর স্বরে পুরন্দর কথাগুলি বললে।

গোলযোগ করবার ‘শক্তি জয়শ্রীরও ছিল না অবশ্য। অস্বাভাবিক পরিবর্তন। আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় দিক থেকেই পুরন্দরের যে এতোটা পরিবর্তন এসেছে একথা আগে জানলে অতথানি উৎসাহ নিয়ে এরকম অসময়ে জয়শ্রী হয়তো আর এ-বাড়ীতে আসতে চাইতো না। কিন্তু যা হ’য়ে গেছে তীর আর চাড়া নেই, জয়শ্রী ক্রমশঃ এনিজেকে স্বাভাবিক ক’রে আনবার চেষ্টা ক’রল।

‘তুমি অনেকখানি বদলে গেছো!’ এই কথা বলে তাকে হালবার চেষ্টা করতে হ’লো।

‘মামুষ সব সময় ঠিক একই রকম থাকবে একখার কোন মানে হয় না।’ পুরন্দর যেন তর্ক করবার জন্ত প্রস্তুত

হ’য়েই ছিল। সে অনায়াসে বলতে লাগলো : ‘এক-একটা সময় এমন আসে যখন বাধা হ’য়ে মানুষকে অভ্যাসের বা স্বভাবের পুরাতন খোলসটা ঝেড়ে ফেলতে হয়। মামুষ তখন আরেকটা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। অবস্থা বিশেষে এই পরিবর্তন এতো বেশী আকস্মিক যে নিজের অবস্থা লক্ষ্য ক’রে নিজেকেই অতি মাত্রায় অবাক হ’তে হয়। অস্তুর তো কথাই নেই।’

‘তুমিও কি বর্তমানে সেই অবস্থায় এসে পৌঁছে ছো?’ জয়শ্রীর কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক।

‘ঠিক বলতে পারিনে। কেননা এখন পর্য্যন্ত এমন কিছু করিনি যে-কাজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমার পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করা যেতে পারে।’

‘একথা মেনে নেওয়া যায় না। এই একটু আগে তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলে সেটা কি অপ্রত্যাশিত নয়? তোমার কাছ থেকে কখন আমি এরকম আশা করেছি?’

পুরন্দর চুপ ক’রে রইলো।

‘তোমার গুটো পায়ে পড়ি—’ হঠাৎ অন্তরকম স্বরে কাতরভাবে জয়শ্রী বলে উঠলো : ‘লক্ষ্য্য ঘনিয়ে এলেছে, এবার আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে হাও।’

পুরন্দর চাপা হাসি ছেপে উঠলো।

‘তুমি ভুলে যাচ্ছ এখন আর আমি কুমারী নই, গৃহস্থের কুলবধু। এখন আমি সম্পূর্ণভাবে অস্ত্র এক জনের অধীন। আমাকে যেতে হাও।’

পুন্ডর তাকিয়ে দেখলো, জয়ন্তীর
সিঁথিতে লিহর অঙ্গুল করছে। মনে
হ'ল, লিহর তো নয়, হৃদপিণ্ড চিড়ে
ঝড়ে-পড়া রক্তের কীট। সে অস্বাভাবিক
হলে উঠলো। হরজা ছেড়ে লয়ে দাঁড়াবার
কোন লক্ষণ দেখা গেলো না তার।

তার হাণিকে দূরভি-দক্ষি-ধ্বনিত মনে
ক'রে জয়ন্তী আরো ভয় পেয়ে গেলো।
এই মুহূর্তে কী যে সে করবে ভেবে পেলো
না। জানলার ধারে লয়ে গিয়ে দেখলে
বাইরে রাজপথে ইলেক্ট্রিক বাতিগুলো
লারি-লারি জলে উঠেছে। কেন যে মতে
সে এখানে এসেছিলো, জয়ন্তী মনে-মনে
নিজের অন্ধ অদৃষ্টকে দিঙ্গার দিলে। তারপর
অস্থির চিত্তে আবার হরজার দিকে এগিয়ে
এলো।

‘আমার কথা শোন—’ আন্তে আন্তে
পুন্ডর বললে: ‘অতটা উত্তলা হয়ো না।
ফিরবার অস্ত্র ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কৈ,
বিয়ের আগতে তোমার এতোটা ব্যস্ত-মস্ত
ভাব লক্ষ্য করিনি কোন দিন! এদিক থেকে
রিবেচনা করলে তোমার স্বামীটিকে অত্যন্ত
সৌভাগ্যবানই বলতে হবে—কী বলো?’

‘কিন্তু আমাকে অনর্থক আটকিয়ে রাখছে।
কেন?’ যদিও অন্তরে লাহলের লেশমাত্র
ছিলনা, তবুও বাইরে খুব খানিকটা লাহল
দেখিয়ে রাগ হবার ভান ক'রে জয়ন্তী বললে:
‘কী চাও তুমি আমার কাছে?’

অত্যন্ত লোভা প্রের। কিন্তু লোভা জবাব
ছিলনা লম্বত।

ঘরের চকচকে মল্লপ দেবার তাকিয়ে
পুন্ডর আনমনে কী ভাবছে এমনি লময়ে
হরজার কার করাঘাত শোনা গেলো। পরিণত
বলিষ্ঠ হাতের খটাখট শব্দ। ছুটে এসে
পুন্ডর জয়ন্তীর হাত ধরে বেগে বললে:
‘তাড়াতাড়ি ঐ পর্দাটার পেছনে লুকোও।
লিগগির!’ কিছু না বুঝতে পেয়ে জয়ন্তী

বললে: ‘ওজ্ঞে আমার হাটার আওয়াজ।
তাকে দেখে লুকোবো কেন!’

তার চুটে হাতে প্রবল ঝাকনি দিয়ে
উত্তেজিত চাপা গলায় পুন্ডর বললে: ‘পরে
বলছি। লুকোও তো এখন। নইলে না
জানি কী কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে! তুমিও
ডুগবে আমিও ডুগবো। লিগগির কর!’

কথাগুলি এমন ভঙ্গীতে এমন সুরে বলা
যে জয়ন্তী অবিলম্বে অভিভূত হ'ল। এবং
বিশেষ কিছু না বুঝেই তাকে বাড়িতে হ'লো
ঘরের এককোনে আলমারীর কাছে নীলবর্ণ
পর্দার আড়ালে। তখন পুন্ডর নিশ্চিন্ত মনে
হরজা খুলে দিলে। অস্ত্র কিন্তু ঘরের ভিতরে
প্রবেশ ক'রলো না। বাইরে দাঁড়িয়েই

বি, মাম্মা এণ্ড সন্মের কলেক্ট আশ্চর্য্য গুণবিশিষ্ট মহোদয়।

কিওলোডি:সালসা

বর্তমান যুগে ইহাই একমাত্র সর্পোৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট
মহোপকারী সালসা। রক্তপরিষ্কারক, বল, শক্তি ও
ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। পারদ ও উপদংশ বিবনাশক।
জ্বরতরঙ্গা সারবিক ও খাত্ত পোর্সেলা রোগে, নষ্ট স্বাস্থ্য, যাবতীয় স্ত্রী রোগে এবং বহুপুরাতন
ও জটিল রোগ সমূহের একমাত্র মহোপকারী। কোন বাধাশ্রা নিয়ম নাই—সকল ক্রুতে সেবন
করা যায়। মূল্য দেড় টাকা, মাণ্ডলাদি সহ ২৫/০।

ইলেক্ট্রো'গোল্ড'কিওর

জীবনী শক্তিবর্দ্ধক ও নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারক। স্নায়ু
দুর্বলতা, অক্ষমতা, অবশ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রোগের
অব্যর্থ বলকারক ঔষধ। ছাত্রদিগের স্মৃতিশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধি, মানসিক
প্রসন্নতা, সারবিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে; ছাত্র ও ছাত্রী জীবনের একমাত্র পরম সুখদ। মূল্য দেড়
টাকা, মাণ্ডলাদি সহ ২৫/০।

‘গণোরা-নাম’

পিল (বটিকা) বা মিক্‌চার

নূতন ও পুরাতন সর্পপ্রকার লক্ষণবৃদ্ধ গণোরিয়া, প্রেমহ,
ধাতুপীড়া ও মূত্রনালীর যাবতীয় রোগের বিশেষ পরীক্ষিত
আশুফলপ্রদ মহৌষধ। ২১১ মাত্রায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই রোগের
অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা লাঘব হয়। স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অল্প সময়ে
অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা লাঘব করিতে এবং রোগ সমূলে নির্মূল করিতে ইহার স্নায়ু আশুফলপ্রদ
ঔষধ অজাববি আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই ঔষধ মিক্‌চার ও
পিল দুই রকমের পাওয়া যায়, উভয়েরই মূল্য প্রতি শিশি দুই টাকা; মাণ্ডলাদি সহ ২৫/০।

ইপানি এ্যাজমা-সিরাপ

বিশিষ্ট ইপানি, দমা, শ্বাসরোগ এবং যাবতীয় ফুসফুস ও শ্বাসনালীর প্রদাহ, ব্রঙ্কাইটিস, হপিংকফ
প্রভৃতি রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইপানির প্রবল টানের সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের সুভাসম যন্ত্রণায়
একদাপি মাত্র সেবনেই রোগ দূরীভূত হয়। রোগী সুস্থ হয়। মূল্য দেড় টাকা; মাণ্ডলাদি
সহ ২৫/০।

বি, মাম্মা এণ্ড সন্ম

এজেন্টস্—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১০ নং, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

(মাম্মা মেডিকেল হল)

৪নং, গুলু ওস্তাগর লেন,
(পোস্ট বক্স নং ১১৪০১) কলিকাতা

পুন্সরকে প্রশ্ন করলো : 'জয়ন্তী তোমার এখানে এসেছেনা ? কোথায় সে ?

'সেতো এখন এবাড়ীতে নেই, এই একটু আগে চলে গেছে—'পুন্সর অনার্সালে এই কথাগুলি বলতে পারলে : 'রজনী গুপ্ত রো-তে তার লছপাঠিনী বাকবী আছে না ? তার ওখানে গেছে। ফিরতে একটু রাত হ'তে পারে।'

'অথচ আমাদের কিছু বলে যায় নি। জয়ন্তী বিশ্বাসের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী করলো : 'তাকে ধরেই বা এলো কে ! তুমি !

'অগত্যা। তোমরা কেউতো আর ধারে কাছে ছিলেনা।'

'কিন্তু আজকে যে আমাদের, লিনেমার বাবার কথা ছিল।'

'সে লম্বা অনেজন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এখন ছয়টা বেজে ঘের ঘটা। লিনেমা না হয় আরেকদিন হবে। অবিনাশ বাবুকে বুঝিয়ে বলো সব কথা।'

অবিনাশ জয়ন্তীর বর। হতাশ হয়ে জয়ন্তী চলে গেলো।

জয়ন্তী চলে যাবার পর পুন্সর ঘরজাটা আবার তেজিয়ে দিলে। পক্ষীর আড়াল থেকে বার হ'য়ে জয়ন্তী ততক্ষণে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ কিরিয়ে মুখখুঁচী হ'তেই ব্যাঝালো সুরে বললে : 'অংশবের অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে এতগুলো নিচ্ছল মধ্যা বলতে তোমার এতোটুকু বাখলো না ? তুমি, কি বাহু না আর কিছু ?

'তাইতো, বাহু না আর কিছু ! পুন্সর প্রথমচোটে এর বেশী কিছু বলতে পারলে না।

'তোমার মতলবটা কী তান ?' জয়ন্তী প্রশ্ন চীৎকার করে উঠলো।

'বাঁধ বলি, তোমার এখন যেতে হবেনা।

'তত্ত্ব কালক্রমে কোথাকার।' অপমান বোধ জয়ন্তীকে উত্তপ্ত ক'রে তুললো নিমেষে। এখন যেন লজ্জা লরম লমানের আর কোন

বিশেষ ভয় নেই। জয়ন্তী একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে, আক্রোশে, উত্তেজনার কীতি মতো কাঁপছে। মুখমুখে আবিষ্টচিত্তে পুন্সর তা লক্ষ্য করতে লাগলো। এরকম অপরূপ কবছার এর আগে সে জয়ন্তীকে আর কোনদিন দেখেনি বোধ হয়। পুন্সর অভিভূত হ'লো।

কারো মুখে কথা নেই কিছুকণ। তারপর নিতুকতা তল করে পুন্সর জয়ন্তীকে বললে : 'যেখ আমাদের এঘটনাটা কিছু মোটেই নতুন কিছু নয়। হ'জনে হ'জনাকে ভালোবাসে অথচ অদৃষ্টের অভিলাপ এই দুইজনের মিলন সম্ভব হ'ল না এই নিয়ে পৃথিবীতে রাণী-রাণী কাব্য নাটক আর উপভাষা রচিত হয়েছে। এতো বেশী হয়েছে যে লন্দেহ হয়, এরকম ঘটনা বাস্তবিক ঘটতে পারে কিনা ! কিন্তু কথা তো তা' নয়, কথা এই যে তুমি আমাকে বিয়ে করলে না কেন ?


'একবার জয়ন্তী একটু চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে : 'ইচ্ছা করলেই আকাঙ্ক্ষিত

অভিধীকে বিয়ে করা যার বাজানী ঘেরেঘের এখনো দেখিন আলেনি। শতকরা লাভা-নব্বইজন আজও অতিভাবকের কথার ওপর নির্ভর ক'রেই নিজের বিলিয়ে দিতে লচরাচর বাধ্য হয়ে থাকে।'

'কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে অন্তত পালিয়ে গেলে না কেন ?

'তার ফল সম্ভবত আরো খারাপ হতো। লম্বাজের কথা নয় ভেড়েই ছিলুম ; তোমার অংগা এমন কিছু নয় যাতে আমাকে ভালোভাবে রাখতে পার। প্রথম করেকটা দিন বড়ো জোর স্বর্গসুখ আর রত্নীন স্বপ্নের ভেতর ঘিরে কাটতো। তারপর হাতের টাকা ফুরিয়ে এলে নিত্য নতুন অভাব-অনাটনের মাঝে শেষ পর্যন্ত আমি তোমার একটা বোকা হয়ে দাঁড়াই। এবং সে বোকা একে দুর্জিন্দা মনে করে তুমি অনার্সালে পলারন করতে পারতে। আমি হয়তো তখন বা হওয়ার পথে অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। দেবান্বনে না উঠে বাধ্য হয়ে আমাকে গলিকালয়ে আশ্রয় খুঁজতে হ'তো।'

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার



কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারতের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩ আ পার সারকুলার রোড, কলিঃ

‘তোমার কল্পনা শক্তি খুব প্রখর তো!’
অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে পুরন্দর উচ্চারণ করলে।

‘কেন, ওরকম তো প্রায়ই হয়।’
সাময়িক পত্রিকাটির প্রায় গল্পই তো এমনি
ধারা। শুধু তাই নয়,—আমি যখন ঘেঁহের
বেশাতি আরম্ভ করেছি এমনি সময়ে হয়তো
খবর পেতুম তুমি সুবোধ শাস্ত্র ছেলের মতো
ঘরে ফিরে গিয়ে এক বিবাহ করে দিবি।
নতুন এক লংসার পেতোছো! আমি তখন
কী করতুম বলতো?’

পুরন্দর হা করে তাকিয়ে রইলো জয়শ্রীর
পানে।

‘পেরকম একটা কিছু যে করিনি—’
জয়শ্রীর যেন আর আসতে চায় না। হঠকা
কাপুনির প্রচণ্ড ধমকে বরপার মুখের উৎস-
ব যেন আচমকা গুলে গেছে: ‘বস্তুত বেঁচে
গেছি বলতে হবে। এখন আমি যার অধীন
বয়স, বিদ্যা এবং রূপের দিক থেকে
তিনি হয়তো তোমার মতো গোভনীর
নন। কিন্তু এ তিনটি ছাড়া তার আর
লব কিছুই আছে। এবং সুখের চেয়ে স্বাস্থ্য
ভালো মনে ক’রেই আমিও তাকে লক্ষ্য
করতে পেরেছি।’

পুরন্দর এরপর আর কিছু বলবার
উৎসাহ বুঁজে পেলো না সহসা। জয়শ্রীর
মতো অসামান্য মেয়েকে আর শয়্যালঙ্গিনী
রূপে পাওয়া যাবে না একথা মনে হ’তেই
সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ ক’রলো;
তারী দুর্বল মনে হ’ল নিজেকে। জয়শ্রীর
দিকে তাকিয়ে তার আত্মা হাহাকার ক’রে
উঠলো। নিজের অগত্যা অনেকগুলি
খেমে উঠলো পুরন্দর।

‘আমাকে এখন বাড়ী যেতে দাও—’
জয়শ্রী বলতে লাগলো: ‘এখানে আমাকে
মিচিমিছি আটকিয়ে রেখে লাভ কি
বলো। এককালে তোমাকে আমি খুবই
ভালো বাগদুহ; এখনো যে বাগিনে এমনও

শব্দচন্দ্র

শ্রীসমীর কুমার ঘোষ

(১)

আকাশে যখন চাঁদিনী কেবল
ছড়ায় জ্যোছনা হানি,
চারুণ পথিক তোমারে তখন
ডাকিল পারের বাঁশি।
ওপার হইতে ভেসে এলো গান:
এলো, এলো ফিরে হে মহান প্রাণ,
হয়েছে সকল তব অভিবান
ফুটেছে কুসুম রাশি।
চাঁদিনী কেবল আকাশে ধবল
ছড়ায় জ্যোছনা হানি।

(২)

চলিলে চারুণ শেষ করি গান
থামারে দীপ্ত বীণা।
চলিলে যাত্রী সুর-ঝড়ারে
করি এ ধরায় লীলা—
বক্ষের তলে তুলে গেলে নীতি:
মহুয তোমার থাকে যদি প্রীতি,
দরদীর প্রাণে বুঝ শুধু নিতি
কেউ নয় হীন, হীন।
বাজে নির্ভীক চারুণ পথিক
দীপ্ত তোমার বীণা।

(৩)

হয়তো জীবনে জটিল পথেতে
হারিয়েছে পথ নারী।
সমাজ বলেছে, বিষ দাও তারে
তুমি বিলে তায় বারি।
জীবনে যাহাঁর জ্ঞানে হাহাকার,
যর ওঁ বাহির হ’লো একাকার,
তাহারে বিয়েছ লম্বা অধিকার
ধরিয়া অমৃত বারি।
বলেছ সমাজে, জীবনের মাঝে
মহীয়সী চির নারী।

(৪)

তুমি চলে গেলে থামাইয়া বীণা
রাখিয়া মোদের পিছে।
চলে গেলে কবি জানায়ে হিয়ার
জগতে কেউ না মিছে!
শরতের চাঁদ ছড়াইয়া আলো
লকলে তুমি বাগিনাছ ভালো।
স্নেহ নাই তুমি পাপে কেউ কালো,
কে গেছে নামিয়া নোচে।
উদার হিয়ার নিয়েছ লবার
কারেও রাখো নি পিছে।

নয়—, তবু তাঁর সুযোগ নিয়ে আমাকে
অপবিত্র ক’রবে না আশুকরি!’

অত্যন্ত নির্ভীক উক্তি। এবং পুরন্দরকে
অভিভূত করার পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট।

‘আর অপর পক্ষ?’ বিব্রত সুরে পুরন্দর
বললে: ‘আমার দিক থেকেও তো কিছু
বলবার আছে। তুমিও কি আমাকে খুঁসী
করবার জন্য কিছুই ক’রতে পার না?
আজকের রাতের স্থিতিটা যাতে চিরকাল

পরস্পরের মনের অনিচ্ছা জাগরণ থাকে
তারজন্তে আমাদের কি কিছুই ক’রবার নেই?’

জয়শ্রী আবার ঘাবড়ে গেলো। ভালো
ক’রে তাকালো পুরন্দরের পানে।

সাঁটটা গায়ে ওপর চড়াতে-চড়াতে
পুরন্দর বললে: ‘চলে, তোমাকে তোমার
বাড়ীতে রেখে আনি:—’

ৱেডিং প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

“বেতার জগৎ” মারফৎ আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে ষ্টেশন ডাইরেক্টরদের একটি ঘরোয়া মিটিং হচ্ছে। জনসাধারণের ভেতর বেতার প্রীতি জাগিয়ে তোলা কি ভাবে সম্ভব আমরা তার বহু ইঙ্গিত আমাদের একাধিক আলোচনায় প্রকাশ করেছি। প্রথমে জনসাধারণকে বুঝতে দিতে হবে বেতার প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের। প্রোতাহের অভাব অভিযোগগুলিকে সহায়ত্বভূমিত্বীল অন্তর দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। সংবাদ পত্রের মন্তব্যগুলিকে প্রোতাহিত দিতে হবে। জনশিক্ষাদায়ক এবং নির্দোষ আনন্দদায়ক প্রোগ্রাম প্রবর্তিত করতে হবে। শিল্পীদের সঙ্গে সব সময়ে co-operation রাখতে হবে।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে সব সময়ে এগুলি কার্যকরী হয় না। গুণী শিল্পীরা এখানে অমাদৃত। ষ্টেশন ডাইরেক্টরদের মিটিং-এ এগুলি বিবেচিত হবে বলে আমরা আশা করি। জনসাধারণ এবং শিল্পীদের মনে যদি এই ধারণা হয় যে বেতার প্রতিষ্ঠান তাদের তাহলে জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রোগ্রাম উন্নতিও অবশ্যস্বাবী।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের নাটক অভিনয় শুনে আমরা হতাশ হয়ে যাচ্ছি।

‘বেতার-বিচিত্রা’ অভিনয় প্রসঙ্গ না হলেও ছোট ছোট নাট্যকার সঙ্গে সঙ্গীত সহগামী সঙ্গীত পরিচালনাগুলি আমাদের বর্তমানি আনন্দ দেয় বেতার নাট্যকে হল সেখানে কোন আনন্দই দিতে পারে না। মনে হয় থামলে বাঁচি। এর কারণ কী? নাটক পরিচালক ভ্রমরমহাশয় তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ রসজ্ঞানের তবে কী পরিচয় দিচ্ছেন? আমরা বহুভাবে এই বিভাগটি নিয়ে আলোচনা করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোন প্রতিকার হোল না কেন?

গত শুক্রবারের অভিনয় “আলিবাবা” ব্যর্থ অনুকরণ। যে “আলিবাবা” টেজে আলিবাব বুদ্ধ বনিতাকে হাত চটল নৃত্য ভন্দে মাতিয়ে রেখেছিল তাকে টেনে নিয়ে এভাবে জবাই করার ভেতর কুচিঙ্গানের পরিচয় আমরা পাই কোথায়? এতেও কী আমরা বলবো না এ অভিনয়ের কোন সার্থকতাই নেই—প্রোতাহের শুধু বিরক্ত করা মাত্র।

আগামীবারের অভিনয় প্রোগ্রামে দেখলুম রত্ন-মহলের অভিনীত “স্বামী-স্ত্রী”। “স্বামী-স্ত্রী” মরা গাঙে জোয়ার এনেছে। বেতারে এর আমদানি দেখে মুগ্ধ হলাম। অভিনেতা ভুভিনেন্দ্রী অধিকাংশই ‘রত্ন-মহলের’ আমরা এ নাটকখানির সাক্ষ্য বেতারে কামনা করি।

গত শুক্রবার ১১ই ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে সন্তোষ শেনশুগের ব্যবস্থাপনায় একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোলো। অত্যন্ত নিকট শ্রেণীর আউট আদানি। একথানা গানও শোনবার উপযুক্ত হয়নি। সত্য চৌধুরীর গান কোন রকমে চলনসই। কুমারী অনিমা হাসপুত্র গান গাইলেন বাজে। গানের মাঝখানে গলা আটকে গেল। রঞ্জিত শেনের ডাটিরালী গান সমালোচনার অযোগ্য। পরিকুশারীর গান তথৈবচ! পরে লাক্ষা অনুষ্ঠানে ছোটদের আসরে দ্বাদশমণির চিঠি পড়ার পর নমিতা রায়চৌধুরী কাব্য সঙ্গীত গাইলেন “অচিন লায়ে”—সুন্দর। গায়িকার কণ্ঠস্বর বেশ মিষ্ট। বিমান ঘোষের গান দুখানি ভালো হয় নি।

রবিবার ১৩ই প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে নীলমণি সিংহের গান “দ্বিষ নিশি আখির তারায়” বেশ ভালো হয়েছিল। সত্যকিন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। আজুর বালার দুখানি “পূজার খালায় আছে আমার ব্যথার শতদল” এবং “ওই ঘর ভোলানো সুরে” আশামুরূপ হয় নি। আরও উচ্চাঙ্গের গান গায়িকার নিকট হতে আশা করেছিলাম। পরে পঙ্কজ মল্লিক সঙ্গীত শিক্ষাদান করলেন।

সোমবার ১৪ই লাক্ষা অনুষ্ঠানে গোপাল মিত্রের লক্ষ্মণায় কর্তৃক “রাস লীলা” কীর্তন অনুষ্ঠিত হোলো। বাংলা দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই কীর্তন গানের।



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

অমরাপী শ্রোতা বহু এবং কীর্তন গায়ক গায়িকার সংখ্যা যে নিতান্ত স্বল্প এরূপ আশা করি না। কিন্তু তবুও এই সব বাজে আর্টিষ্টদের কীর্তনের আসরে রেডিও কর্তৃপক্ষ কি করে আমদানি করেন তা আমাদের ধারণায় আসে না। এই লক্ষ্যবাহীর কীর্তন গান একেবারেই অচল। অতঃপর আমরা আশা করি বাংলা দেশে লভ্যই যারা কীর্তনে বিশেষ নাম করেছেন এবং যাদের সঙ্গীত রস ধারায় আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে বেতার কর্তৃপক্ষ তাদেরই এ আসরে স্থান দেবেন। পরে বীণাশানি দেবী (of Madhupur) প্রখ্যাত গান গাইলেন অতি চমৎকার। গায়িকার কণ্ঠস্বরে দরদর আছে। আমরা এটি শিল্পীর গান বেশী করে প্রোগ্রামে দেবার জন্যে বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রক্তন-বিদ্যা ও শিল্পকলা

ত্রীকমলা দেবী

গত ২০শে মার্চ সংখ্যার খেরালীর মহিলামহলে ত্রীদেবরাণী লিখি বাংলায় নারীর স্বাস্থ্য আলোচনা প্রসঙ্গে নারী জীবনের সমস্যার কয়েকটি দিকের প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দিয়েছেন। আধুনিক কালের নারীর চলার পথে প্রতিপদক্ষেপে যে কণ্টকগুলি বিচ্যনো রয়েছে—যাদের আঘাতে তার চলার পথ বিয় লক্ষ লক্ষ কণ্টকিত তাহের নিবৃত্তি করতে না পারলে ভাবীকালের স্বর্ঘ্যারম্ভি তমিস্রার গাঢ় অন্ধকারেই থাকবে ঢাকা।

বর্তমানের পাশ্চাত্য শিক্ষায়—কৃষ্টিতে লাবেক নারীর বহু অন্ধ লংস্কার লংস্কৃত হয়েছে সত্য, সভ্যতার নব আলোকে উদার্যো আজ আমরা অনেক উন্নত,

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পশ্চিমের স্রোতের বস্ত্রায় অনেক মলিনতা আমাদের সঙ্গীতট হতে ঘূরে ঘেঁছে বটে কিন্তু আমাদের ভারতীয় আদর্শের বঁহী ক্ষতি হয়েছে। সে ক্ষতিকে আমরা লাভের তুলাবণ্ডে ওজন করে, লাভবান বলে গর্ব প্রকাশ করতে পারি না। পশ্চিমের স্বর্ঘ্য পূর্বের স্বর্ঘ্যের খরদীপ্তিকে বহুদিক থেকে স্নান করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকে হয়ত আমার একথায় প্রতিবাদ জানিয়ে বলবেন আধুনিক জীবনে শুধু আদর্শ নিয়ে বাঁচা যায় না। আমাদের বাঁচতে হবে ঠিক মাত্রের মতন—তার জন্মে যদি নীতি-আদর্শ বাধ ক্ষুন্ন হয় তাতে বেশী ক্ষতি নেই।

রূপোর বুঝকো

স্টুডিও-রাজা ফিল্ম

আলোক-চিত্রী বীসেন দে

সঙ্গীত-পরিচালক

এস, এন, দাস; রতন দাস

প্রধান শব্দ-যন্ত্রী

নূপেন পাল, ভূপেন ঘোষ

ব্যবস্থাপক

বিজ্ঞান মল্লিক

রূপোর বুঝকো

কাহিনী
গোবিন্দ
বন্দ্যোপাধ্যায়

ও, কে, এ
প্রোডাকশন

পরিচালক
জ্যোতিষ
বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপোর বুঝকো

ভূমিকায়

ধীরাজ, নীলু রায় (এঃ), সত্য, কণি, অতুল, প্রভাস, প্রফুল্ল, কার্তিক, যুরারী, শান্তনু, পাকুল, কমলা, কমল কুমারী, বীণা বোস, গীতা, রাজলক্ষ্মী, বেলা, বীণা, রাজলক্ষ্মী (গায়িকা) প্রভৃতি।

রূপোর বুঝকো

কিন্তু এই নীতিবাহ-আদর্শবাদের যে বড় রকমের একটা যুক্তি এবং মানে আছে তা দীর্ঘ মন্তব্যে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যায়। সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা শুধু শৃঙ্খলা নয় অর্থনীতির দিক থেকেও এই আদর্শবাহ নারীর জীবনে মস্তবড় সমস্যাকে পূরণ করে। আমি আজ শুধু একটি দিকের খানিকটা আভাস দিচ্ছি—ভাঙেই জানা যাবে এক একটা দিক থেকে আমরা কত সম্পদ আজ হারিয়ে বসেছি। আমি রন্ধন বিজ্ঞার কথা বলছি।

রন্ধন বিজ্ঞা একটা শিল্প কলা বা art—বাংলার নারীর অন্দর মহলে রন্ধন কলা অতি গৌরবের সহিত স্থান পেয়ে এসেছে এতদিন। অত্যন্ত চুপে কথা আজ তা বজনারীর সুকোমল কর হতে সরে গেছে মলিন কঠোর ‘খইনি টেপা’ হিন্দুস্থানী এবং উৎকলবাসীর হাতে। মেয়েদের আজ রান্নাঘরে যেতে লজ্জা এবং অপমান বোধ হয়। শত অভাব-অনাটনের মাঝেও আজ সাধারণ গৃহস্থ পরিবারেও আজ পাচকের আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অন্নবস্ত্রের মতন পাচকও আজ গৃহস্থ পরিবারের অত্যাবশ্যকীয়। যে অর্থ এই পাচকের জন্ত ব্যয়িত হয় তার দ্বারা সংসারের অল্প প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে। সে অর্থ কিন্তু লহরে অন্ততঃ লক্ষা গোলা পাঁচন লিঙ্গর জন্তে গৃহ স্বামীকে রাখতেই হবে—না হলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন থাকে না। লহরে আজ এ ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে—পল্লীর পথেও আজ তার অভিযান।

মেয়েরা আজ রান্না ভুলে গেছে। রন্ধন শালার সেবাপরায়ণা আদর্শ হিন্দু রমণী যুক্তি আজ বিলাসের দাসী। জাপানী ছিটের ব্লাউসে, স্কাফ শাড়ীর আচ্ছাদনে চেয়ার টেবিলের মাঝে আজ তারা ‘কুকু’কে বিলাতিখানার ফরমাশ দেয়।

স্বল্প পরিমিত অপরিভূষিকর আহায়ে শুধু স্বাস্থ্য হীনতাময়, নিরানন্দ অনাহারকুচি নারী সমাজের প্রগতিবাহ জীবনকে কোন তৃপ্তিশিক্ষাভিমান এবং কৃষ্টির লক্ষ্যন দেয় তা নারী হয়েও অন্ধ আভিজাত্য বোধে আলস্তের মোহে আমরা বুঝতে চাইনা!

কিছুদিন পূর্বে আমার একজন ইংরাজ মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি ভারতীয় হিন্দুকে বিবাহ করে এখন ভারতীয় আদর্শকে অনেক দিক থেকে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁকে সবিস্ময়ে দেখলুম আমি, রন্ধনশালায় চেয়ারে উপবিষ্টা অথচ হাতে খুস্তি। আমার বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—হিন্দু নারীর এই রন্ধনশালা অতি পবিত্র অতি গৌরব, সম্মান এবং আদর্শের স্থান।

আমি অবাক বিস্ময়ে খেতাজিনীর সেই রন্ধনযুক্তি দেখলাম—গাউনের একপাশে মুচ একটু হলুদের ছাপ!

আলাপ আলোচনা শেষে তিনি রন্ধন শিল্প লক্ষ্যে অনেক কথা বললেন। একটি কথা আমার কর্ণে এখনও বাজছে—“নিজে হাতে রেঁধে স্বামীকে খাওয়ান ঐর মতন তৃপ্তি আশ্বাসলাভ জীবনে আমি ইতিপূর্বে অনুভব করিনি।”

আর আমাদের বেশে বর্তমানে যে অর্থ-নৈতিক অবস্থা তাতে করেও এ কোন-রকমে সমর্থন করা যেতে পারেনা যে আমরা বিলাসের দ্বারে বুধা অর্থ অপর প্রবেশবাসীর হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা আলস্তে অস্বাস্থ্যে false dignity ধরিয়া রাখবো।

রন্ধন শিল্পের দিক থেকেও আমাদের বহু ক্ষতি হয়েছে।

বাঙালী হিন্দুর অপরিভূষিকর আহারের বৈশিষ্ট্য আজ আর নেই। লাবেক কালের

বিরহ

ডাঃ শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তবু মনে রেখ—

যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়,

নব প্রেম জালে,

তবু মনে রেখ॥

যদি জল আসে আঁখি পাতে,

(একদিনও সে তোমারি ছিল ভেবে)

যদি জল আসে আঁখি পাতে

তবু চেয়ে থেক—ছবিখানি পানে

(ওগো) চেয়ে থেকো॥

—*

বিশ্ব বৎসর পূর্বেরকার নিরাশিষ্ আহার্যের দৌগন্ধী বাংলার বাতাস থেকে আজ মিশিয়ে গেছে। আজকালকার মেয়েরা ‘স্বকুনি’ ‘মোচারঘণ্ট’ ‘ইচরের ডালনা’র রন্ধন প্রণালী জানেনা কিন্তু চপ কাট্লেট ওমলেট বলতে বোঝে।

স্কুলে আজকাল মেয়েদের রন্ধন বিজ্ঞা শিখানো হয়, কিন্তু তাও বেশীরভাগ বিলিতি খানার আবহাওয়ায়। আগের দিনের আকাশই লোকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে চেয়ে চিন্তে আহার করেছে—আজ আর ‘ফ্রাইরোষ্ট এ’ ও তাহের সে পরিতৃপ্তি নেই।

পূর্বে বিবাহকালীন মেয়ে দেখার সময় বর পক্ষের অভিভাবকগণ কনেদের প্রশ্ন করতেন রন্ধনবিজ্ঞা লক্ষ্যে। আজ আর সে বালাই নেই।

রন্ধন-শিল্প বাঙালী নারীর হাত হতে বিতাড়িত, হওয়ায় বহু বিড়ম্বনা দুর্ভাগ্য আমাদের সমাজে এসেছে, তার বিস্তৃততর বিবরণে খুব বেশী পরিচিত আজ আর নাই বা বিলাহ।

যে কথাগুলির ইঙ্গিত সংক্ষেপে দিলাম তাই বোধ করি যথেষ্ট হবে।

—



পারমাউটের "ওয়েলফেয়ার" চিত্রের
একটি দৃশ্যে জোয়েল মাক্রিয়া ও ফ্রান্সেস ডি।
বর্তমানে ছবিখানি বিগালে চলিতেছে।



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'ভারিটি'

স্থাপনাল নিউজপেপার্স লি:

টেলিফোন
সাঁউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ২ম সংখ্যা, প্রতিষ্ঠিতবার, ১৯শে ফাল্গুন ১৩৪৪, খ্রীঃ মাসে ১৯৩৮

প্রহসন না প্রহেলিকা ?

কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেসের বামপন্থীদল কংগ্রেসী মন্ত্রীরাষ্ট্রীনে প্রদেশ সমূহে দমননীতি ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে অনুসৃতনীতির প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউ. পির প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ অবশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে মুক্তি দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তা সত্ত্বেও বামপন্থীদের অভিযোগ এইখানে পরিসমাপ্ত হ'ত না কারণ তাঁরা চেতনছিলেন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে শনৈঃপন্থার ও পৃথক আচরণের প্রতিবাদ করতে। কিন্তু সেদিনের সভায় সবচেয়ে চাকল্যের ও অসন্তোষের সঞ্চার করেছিল মাল্জায়ে সোস্ভালিষ্ট মিঃ বাটলীওয়ালার রাজপ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার। তাই রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে ও একযোগে মুক্তির দাবীর সম্বন্ধে সবচেয়ে জোর না দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীদের অনুসৃত নীতি সমূহ ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল এবং কেমন করে

কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীকে এমন কি খুটিনাটা বিষয়ে পর্যন্ত কংগ্রেসী কার্যকরী সমিতির পরিচালনামূল্যে আনা যায় তার সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল আমলাতন্ত্রকে বুঝিয়ে অবশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে মুক্তি সম্পর্কে কিছুতেই সম্মত করতে পারলেন না। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক বন্দীরা মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নিকট তাঁদের সন্ত্রাসবাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে বিরতি পাঠালেন। আর রাজনৈতিক বন্দীরা তাঁদের অভাব অভিযোগ দূর করার দাবী জানিয়ে জীবনপণ করে 'অনশনকৃত অবলম্বন করলেন।

• এমনি আবহাওয়ার মধ্যে কংগ্রেসের হরিপুরার অধিবেশন আসন্ন হ'ল। যে অসন্তোষ ও বিরোধ দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেন। এই দেশব্যাপী অসন্তোষকে শুধু বামপন্থীদের বিপক্ষতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিহার ও ইউ. পির কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে মুক্তি দাবী করলেন। বড়লাট বাহাদুর তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে এই দাবী অনভিপ্রেত জানালেন। ফলে দুইটি প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন।

তালপরের ঘটনা ছোট ও নিবিরোধের। দেশব্যাপী সন্তোষের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের জয়গান করে কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল। মহাত্মাজী তাঁর বিরতিতে বড়লাট বাহাদুরের এই ক্ষমতা প্রয়োগ অনুচিত জানিয়ে দিলেন, বিশেষ কংগ্রেসী দলের মন্ত্রিত্ব গ্রহণকালীন বড়লাট বাহাদুরের প্রতিশ্রুতিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তবে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক লাটবাহাদুর ও মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে কথাবার্তা করার প্রস্তাব করলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে এই পদত্যাগ বিষয়ক ব্যাপক করে সারা ভারতবর্ষে কোন আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না বা অপর প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলকে পদত্যাগ করার আহ্বান করা হ'ল না।

উত্তরে বড়লাট বাহাদুর বিরতিতে জানান যে তাঁর ক্ষমতাপ্রয়োগ আইনসম্মত তবে তিনি কংগ্রেসের ও মহাত্মাজীর সঙ্কল্পে গররাজী নন। কিন্তু মহাত্মাজী প্রত্যুত্তরে কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব সঙ্গত দাবী মেনে নানা লওয়ার জ্ঞা এবং বিশেষ করে কংগ্রেসী মন্ত্রীদেব নির্বাচন ইস্তাহার অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে নী দেওয়ার জ্ঞা আমলাতন্ত্রকে নিন্দা করেন। কংগ্রেসের মূলনীতিগুলি মন্ত্রীমণ্ডলের কার্যকলাপে অনুসৃত হোক—মহাত্মাজী তাহাই কামনা করেন।

কিন্তু তবু দুইটা প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রী-মণ্ডলের সহিত প্রাদেশিক লাটবাহাদুরের মিটমাট সম্ভবপর হ'ল। অনুরূপ বিরতি থেকে জানা যায় যত শীঘ্র সম্ভব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দান সম্পর্কে প্রাদেশিক লাটবাহাদুর সম্মত হয়েছেন তবে তার জ্ঞা প্রয়োজন রাজনৈতিক বন্দীদের বিষয়গুলি ব্যক্তিগত ও পৃথক ভাবে আলোচনা। ইতিমধ্যে ইউ, পি ও বিহারে কিছু সংখ্যক রাজ-

বন্দীরা মুক্তি পেয়েছে—আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠে সত্যই কী কংগ্রেসীমন্ত্রীমণ্ডল সম্মানজনক রকায় সম্মত হয়েছেন! সত্যই কী কংগ্রেসের নীতি জয়যুক্ত হয়েছে? অদূর ভবিষ্যতে শনৈঃপশ্চাৎ অবলম্বনের ফলে রাজনৈতিক বন্দীরা ক্রমশঃ মুক্ত হত। অকংগ্রেসী মন্ত্রীপরিচালিত বাঙলায়ও ত রাজবন্দীরা ক্রমশঃ মুক্তি পাচ্ছেন! কিন্তু কোথায় গেল সেই আদর্শবাদ যার বলে কংগ্রেসের প্রত্যেক সভ্যমণ্ডল হ'তে গুরুগম্ভীরসরে উচ্চারিত হয়েছিল 'আমরা চাই রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে ও একযোগে মুক্তিলাভ' 'আমরা চাই সকল দমন-নীতির প্রতিরোধ?' আপাতদৃষ্টিতে হলে ও কৌশলে কংগ্রেস অধিবেশনে বামপন্থীদের আক্রমণ থেকে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল রক্ষা পেলেও দেশের মুক্তি সংগ্রামে তাঁরা যে কলঙ্ক কংগ্রেস সৈনিকের ললাটে লেপন করলেন তা কে মোছাবে?

—:*(X)*:—

যুগ-প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র

ত্রিবিমলচন্দ্র ঘোষ

গভীর বেদনাময়ী ছায়াচ্ছন্ন অশ্রু অন্ধকারে—
একাকী পথিক চলে আর চলে অরণ্যের মায়া,
যুগান্তের অভিশপ্ত বুলিশয়া পরে
পথিকের পদম্পর্শে কণ্টকিত লতাগুল্মরাশি—
রহি রহি উঠে মর্ম্মরিয়া।
উৎপীড়িত মানবাত্মা, ছিয়াত্তরে মারীমন্মসুর—
দিকে দিকে শৃগাল ও সারমেয় দল
শবগন্ধে উল্লসিত করিতেছে বিকট চিৎকার।
অবোধ বিল্লীর দল অবিশ্রান্ত গান গেয়ে যায়
অরণ্যের অন্ধকারে কিকিমিকি জোনাকীরা
নেভে আর জ্বলে।

একাকী পথিক চলে—

বিদ্রোহ গভীর মূর্তি আজাসমাহিত,
অজাগরী কল্পনায় মৌনমুখে প্রতিভা—বিদ্যাৎ
বিচ্ছুরিছে জ্যোতির্ম্ময় আলো,
কেবা এ পথিকবর? কেনমৌনী? কোথা লক্ষ্য তার?
কি উদ্দেশ্যে ভয়াবহ ভীমারণ্যে একা—
চলে ক্ষুর যজ্ঞানল বহি মর্ম্মভলে?

সহসা নিঃশ্বাস পড়ে,

উন্মথিয়া অরণ্যের মৌন গন্তীরতা,
কণ্ঠ হ'তে শোনা যায় অগ্নিময় জলন্ত হুকার—

.. 'হায় মাগো জন্মভূমি একী তোর বেশ ?
শাশানে কেন মা তুই শবাসীনা ককালি মালিনী ?

সপ্ত কোটি কণ্ঠ আজ কেন মাগো মুকপঙ্কাঘাতে
কেন মা গাহেনা তাঁরা "বন্দেমাতরম্" ?

পথিকের দুঃনয়নে বরষা বরষা
বহে তপ্ত অশ্রুর প্লাবন ।

* * *

ব্যথার্ত্ত ব্রাহ্মণ গাহে—

হে সন্তান বল বল বন্দেমাতরম্ ?
প্রতিধ্বনি কিরে আসে পৃথিবীর দ্রুত আবর্তনে—
বল বল বন্দেমাতরম্ !

এহে এহে চেতনার স্পন্দনে স্পন্দনে—
বল বল বন্দেমাতরম্ !

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কাঁপে তরঙ্গিয়া—
যুক্তি মগ্ন বন্দেমাতরম্ !

দক্ষিণ সমুদ্র হ'তে হিমাদ্রীর কঠিন ভূষারে—
উঠে ধ্বনি বন্দেমাতরম্ !

* * *

আবার পথিক চলে—

শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত শান্ত বন পথে ;
অদূরে মন্দিরে যথা দশভূজা স্তূর্ণ প্রতিমা—
বিরাজেন মহামায়া সন্তানের ইষ্টদেবী রূপে—

দুর্গতিহারিণী দুর্গা দেশমাতৃকার মূর্ত্তি ধরি ।
পথিক চলিছে সেথা মাতৃপদে আত্মাহুতি দিতে—
হুকারিয়া বল বল বন্দেমাতরম্ !

* * *

পথিক এ ভারতের প্রথম সন্তান—

প্রথম যজ্ঞের হোতা প্রথম পূজারী ;
প্রথম গাছিয়া মাতৃবন্দনার গান.

প্রথম ঢালিয়াছিল অশ্রু অর্ঘ্য বারি ।

পথিক বক্ষিমচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট

প্রথম স্বদেশ ভক্ত ; "বন্দেমাতরম্"

বৈখানরী বীজমঞ্চে করি মান্দীপাঠ—

জ্যোতির্ময় শুভপদ্ম দেখাল পরম ॥

* * *

হে ভারত হৃৎভাগ্য, তবু কত সৌভাগ্য তোমার ?

বহু পুণ্যে তপস্যায় পেয়েছিলে এহেন সন্তানে ;

যে তোমার নির্যাতনে করেছিল প্রচণ্ড হুকার,

শুভকর দ্রষ্টা রূপে মাতি বন্দেমাতরম্ গানে ।

আজো সে প্রবল আত্মা ব্যোমপথে করে বিচরণ,

জলদ গন্তীর মন্ড্রে উচ্চাରିয়া রাগিনী অভুত,—

'ত্রিশ কোটি কণ্ঠ আজ বল বল বন্দেমাতরম্,

শুনি তাঁর প্রতিধ্বনি এহে এহে চমকে বিদ্যুত ?

—*—



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।



রাণীবালা

সর্গজনীন বিবাহোৎসব

চিত্র-নির্মাতা : কালী ফিল্মস

প্রযোজক : প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

কথা ও কাহিনী : শচীন সেনগুপ্ত

পরিচালনা : সত্য সেন

প্রধান যন্ত্র-শিল্পী : মধু দাস

চিত্র-শিল্পী : সুরেশ দাস

শব্দ-শিল্পী : জগদীশ বসু

কারু-শিল্পী : পরেশ বসু

স্বর-শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত

চিত্র-লিপি : ডাঃ প্রাণধন—জীবন গাঙ্গুলী,

মথুর—দীপক জট্টাচার্য্য, বিমল—জহর গাঙ্গুলী,

মিঃ চৌধুরী—ডাঃ হরেন মুখার্জি, ফালারাম—

মণি সেন, বামাপদ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, হারু

—সত্য মুখার্জি, জসদেব—ললিত মিত্র, মহেন্দ্র—

সন্তোষ সিংহ, চামেলী—রাণীবালা, শেফালি—

উষা দেবী, বনলতা—বীণাঙ্গণি, সীমতী—সাবিত্রী,

আনাকালী—ব্রাকী প্রভৃতি।

প্রথম মুক্তি : 'উত্তরা', ১৮শে ফেব্রুয়ারী '৪৮

নূতনত্বের দিক থেকে কালী ফিল্মসের উৎসাহ চিরদিনই সবাইয়ের অনুরণিত। বাঙলার চিত্রশিল্পীদের নতুন রঙ্গ সজ্জিত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর অধ্যক্ষ চেষ্টা—ত্রিরাজ্যে তাঁকে রেখেছে বরণীয় করে। বহুপ্রকার নতুনত্বের আশ্বাসের ভেতর বাঙলার চিত্ররাজ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ্য হাশির ছবির প্রবর্তনের জন্য গাঙ্গুলী মশাইয়ের নাম ছাড়াছবির ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে এবং আজ যে ছবি 'উত্তরা' চিত্রগৃহে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেছেন তা' দেখে লোকে তাঁকে

রূপ-তরঙ্গ

(বিলাসী)

লক্ষ্য অভিবাধন জানিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করেছেন। নিয়মানুযায় বাঙলার জন-সাধারণকে সর্বপ্রকার চিন্তা ও চঞ্চল থেকে বহুদূরে টেনে এনে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তিনি যে হাস্যরসের স্রোতে তাদের হাবুডু খাইয়েছেন—যারা লোকের আনন্দ বিস্তরণের জন্য তৃতী হ'য়েছেন, তাঁদের পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয়।

"সর্গজনীন বিবাহোৎসব" একখানি নতুন ধরনের 'কমেডি'। ফিল্মের আশুপ্ত হাস্যরস শুন শুন করে ছোট প্রেমের পঞ্চশর—বুক বেঁধে পাঁচ জোড়া নর-নারীর—মখন হচ্ছেন তারা হয় উতলা। পাঁচ জোড়া প্রেম-পাগল সারাদিন পথে পথে ঘুরে লক্ষ্যের লক্ষ্য পায় "সর্গজনীন বিবাহোৎসবে"—র—সেই উৎসবে তারা মেতে ওঠে—জীবন তাদের মিলন তাদের স্তন্য হয়, সার্থক হয়। এই ঘটনাটিকে শক্তিশালী লেখক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অভিনব উপায়ে সংগঠিত করে বাঙলার চিত্র-গল্প লেখার লোক এখনও যে আছে



জহর গাঙ্গুলী



পদ্মাবতী

তা' লক্ষ্যাপ করেছেন। কাহিনীটি যেমন সরস তেমন আরও রহস্যগ্রাহী হ'য়েছে শচীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মবুদ্ধি সংলাপের মধ্যে। কাহিনীটি অনেক জায়গায় অনেকের হয় তা' সামান্য অশ্লীল বলে মনে হবে—কিন্তু শচীন্দ্রনাথ পাত্র-পাত্রীদের মূখ দিয়ে এমন সব জায়গায় এই সব কথা প্রয়োগ করেছেন—যা'তে কারুর কিছু অভিযোগ করার থাকতে পারে না। সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক যে অশ্লীলতার অভিনয় চলেছে হালকা-রসের ভেতর দিয়েই সেই চক্ৰতি লোকের চোখের সামনে লেখক উপস্থিত করেছেন।

ছবিখানার পরিচালনা হ'য়েছে বেশ স্বরসে তত্ত্বকে। পরিচালনার ভেতর অনাবশ্যক কেরামতি দেখিয়ে ছবিকে গতিহীন করে তাকে পঙ্গু করে দর্শক-দের রসের ব্যাঘাত ঘটাবার চেষ্টা পরিচালক তত্ব সেন একেবারেই করেন 'নি'। সেই জন্যই তাঁর পরিচালনা সবাইকে করেছে খুশী।

আলোকচিত্রী সুরেশ দাসের ছবি তোলায় কাজ ভালই হ'য়েছে। ছবির ভেতর আগাগোড়া তিনি দাদা-কালোর সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন তা' সত্যই

প্রশংসনীয়। কিন্তু এট প্রসঙ্গে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ছবির রসায়নগার-শিল্পীদের কাজ অতি জঘন্য হ'য়েছে—যারা এ লব্ধকে জানেন না তাঁরা হয়ত' বেচারী • আলোকচিত্র-শিল্পীকেই দোষারোপ করবেন।

ছবিখানির গানের সুর ভালই লাগল। কিন্তু আবহাওয়া সঙ্গীত বিশেষত বর্জিত। আলোক-নিয়ন্ত্রণে সুরেন চ্যাটার্জি এবং সম্পাদনার বৈজ্ঞানিক ব্যানাজিকে প্রশংসা করার কিছু নেই।



উষা দেবী

তা' লভ্যই প্রাধান্যযোগ্য। "লক্ষ্মীনাথ বিবাহোৎসব" সাধারণে যেভাবে গ্রহণ করেছেন তা' দেখে মনে হয়, 'উত্তরা' চিত্র-গৃহ অন্ততঃ বেশ কিছুদিন এই উৎসবে মশগুল থাকবে।

জীবন প্রভাত

বোধে টকীয়ে নবতম অবদান "জীবন প্রভাত" ফিল্ম রবিবার সকালে প্যারাডাইস সিনেমায় একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে সহরের লংবাথপত্রের প্রতিনিধিদের দেখানো হয়েছে। আগামী ১২ই মার্চ শনিবার দিন থেকে প্যারাডাইসে লক্ষসামারণকে ছবিখানি দেখানো হবে।

সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনী গাঁথা হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের মেয়ে উষা ও সমাজের নিচু স্তরের ভেঁলে রামু ছোট বেলা থেকে পরপারের সান্নিধ্যে হেলে খেলে বড় হয়ে উঠেছে এবং সামাজিক ব্যবধান থাকা লম্বাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রামু উষাকে ভাল বেমেজিলো। কিন্তু উষার একদিন বিয়ে হোল তাহের স্বঘরেরই এক ছেলে, নন্দলালের সঙ্গে এবং সে গেল হাসিমুখেই স্বামীর ঘরে। কিন্তু রামু তার পুরানো দিনের স্মৃতি কিছুতেই ভুলে যেতে পারলো না। নাটকের মোড় একটু ঘুরলো এইখানে।

দিন যায়—নন্দলালের বাপ' শ্রামলাল নাতির মুখ দেখতে গেলেন না—তাঁর শেষ দিন বড় কষ্টেই কাটলো এবং ছেলে' তিনি প্রকারান্তরে অমরোহ জানিচ্ছে গেলেন আবার বিয়ে করতে। নন্দলাল অসন্ত ভাল বেমেজিলো উষাকে—তাই সে কিছুতেই আবার বিয়ে করতে রাজী হয় না। কিন্তু উষা তার স্বস্তরের শেষ দিনের কথাগুলো ভোলেনি। তাই সে নিজের একরকম জোর করে আবার বিয়ে দিলে সে তার নিজের স্বামীর।

তার পরে! এখানেই হোল নাটকের সুর। নানা ঘট প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে

লজ্জায় ও মিস বনলতায় বেশ দর্শকগণকে চমৎকৃত করেছে। গীতাজের মেমসাহেব বয়ারা ও বৈরাগীর হৃদ্যবেশ সবাইকে যেমনি হাসিয়েছে তেমনি মুগ্ধ করেছে। ওসমানরূপী জহর এক কণায় সুন্দর। কেক'-দোরস্ত মিঃ চৌধুরীকে ডাঃ হরেরের অভিনয় নিখুঁত বললেও অত্যন্তি হয় না। অভিনেত্রী চামেলীকে ফুটিয়ে তুলেছে রাণী চরিত্রোপযোগী করে। আধুনিক কুমারী শে'ফ প্রেমের-টাগ-মফ-ওয়ারে জরী না হ'লেও এই চরিত্রটির মর্যাদা উষা পূর্ণভাবে রক্ষা করেছে। সাবিত্রীর 'শ্রীমতী' লেখকের কথা চমকেই সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ললিত মিত্র, সন্তোষ সিংহ, শতর মুখার্জি, নবদীপ হালদার, পদ্মাবতী, সুহাসিনী প্রভৃতি যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন ততটুকুই সৌকর্য্যে সমর্থ হ'য়েছেন। আর একটি ভূমিকা সম্বন্ধে খুব হাসিয়েছে—সেটি হ'চ্ছে ব্ল্যাকীর 'আলোকালী'।

মোট কথা, ছবিখানা বেশে আমরা বিশেষভাবে প্রীত হ'য়েছি। ছবিখানা দেখে আমরা প্রাণভরে ছেলেছি—আর বাইরে এসে ভেবেছি লেখক তরুণ বাঙালি ছেলেমেয়েদের ও সমাজের চম্বেষণকারী মহাত্মাদের ওপর যে কবাবাত করেছে

ছবিখানিতে ছোটবড় অশ্লীলপক্ষে প্রায় চৌত্রিশটি চরিত্র আছে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা যে, মাত্র চ'টি ভূমিকা ছাড়া ছোট বড় সব ভূমিকার অভিনেতৃট বিশেষভাবে উৎসে গেলেন। যে চ'টি ভূমিকা সাধারণের মনস্ত্রুটি কোরতে পারে নি তার মধ্যে বিশেষভাবে আশাদের হতাশ করেছে মিস বনলতার ভূমিকা—অভিনেত্রী বাণপাণি। তার চেহারা, তার হাবভাব, তার আদ্যাদ্য কণাবাস্তা সব সময়েই দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। এই অভিনেত্রীটিকে ঐরূপ একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় মনোনয়ন করা আমরা কিছুতেই বড়পক্ষের দৃষ্টির প্রশংসা কোরতে পারছি না। ম'ণ সেনের 'ফ্যালারাম' অভিব্যক্তির দিক থেকে প্রশংসনীয়। কিন্তু বাচনের সম্প্রদায়ের ভ্রাতা চরিত্রটিকে কেউ ভালভাবে গ্রহণ কোরতে পারে নি। এইবার আমরা যে সকল চরিত্র বিশেষভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তারই উল্লেখ করব। জীবন গাজুলীর 'প্রাণধন', দীরাজ ভট্টাচার্য্যের 'মথুর', ডাঃ হরেন মুখার্জির 'মিঃ চৌধুরী', জহর গাজুলীর 'বিমল', রাণীবালার 'চামেলী', উষা দেবীর 'মিস শেফালী' ও সাবিত্রীর 'শ্রীমতী'। জীবন গাজুলীর পাদবীর রূপ

চারটি নরনারীর চারটি কেন; পাঁচটি,—
রামু, উমা, নন্দলাল, পদ্মা (নন্দলালের
দ্বিতীয় স্ত্রী) এবং শোনিয়া জীবনের যে কি
হোল তাই চবিত্তে বেশ কুটে উঠেছে।
শোনিয়া ভাল বাসতো রামুকে।

চবির টেকনিক্যাল শুনা শুনা লক্ষ্যে
বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই
তবু একটুকুই বললেই হবে যে তা' অনিন্দ্যীয়।
বিশেষ করে চবিত্তে ক্যামেরার কাজের
উচ্ছলিত প্রাণশক্তি করা যেতে পারে।

নাট্যিকার ভূমিকা দেবিকারণীর অভিনয়
হয়েছে অপূর্ণ। চিত্র জগতে নবাগত
কিশোর সাহু প্রথমবারেই বেশ ভাল উত্তরে
গেছেন। অত্যাশ্চর্য ভূমিকায় সমতাজ আলী
(রামু) ও মায়ী দেবীর (শোনিয়া) নাচ
ও অভিনয় সকলেরই তৃপ্তি সাধন করবে।
রেণুকা দেবী—যিনি পদ্মার অংশে আত্ম-
প্রকাশ করেছেন—এখনো আড়ষ্ট মনে
হোল। চোটখাটো ভূমিকাগুলি সুঅভিনীত।

চবিত্তে এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশ
সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। হোলির
গান হোলির দৃশ্য আমাষের ভাল লেগেছে।

হোলীর ঠিক আগেই ছবিখানিকে যুক্ত
করে প্যারাডাইসের কর্তৃপক্ষ এবং কাপুর্নটাই
লিঃ সহরের হোলী বিলাসী লোক সমাজের
আনন্দ বর্ধন করার সহায়তা করেছেন।

ছবিখানি বাঙ্গালী দর্শকদেরও যে বিশেষ
খুশী করবে—তা নিঃসন্দেহ।

নিউ থিয়েটার্স

চিত্রায় বিজ্ঞাপতি-র মুক্তি-প্রতিকার
অবলান হ'তে আর বিশেষ বিলম্ব নেই।
খুব লম্বা এই মাসের শেষ সপ্তাহে 'বিজ্ঞাপতি'
সাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করবে।

সারা ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর
একপ্রান্ত পর্যন্ত আজ শুধু শোনা যায়
বিজ্ঞাপতির কথা, বিজ্ঞাপতির গান, বিজ্ঞাপতির
পরিচালনার উৎকর্ষ, বিজ্ঞাপতির গঠন
প্রণালীর অভিনবত্ব। এমনভাবে ভারতের

সকল প্রদেশে, জাতিবর্ণ-নির্কির্শেবে সর্বশ্রেণীর
অভিনন্দন লাভ খুব কম চবির অদৃষ্টেই
ঘটেছে।

উৎকৃষ্ট অভিনয়, দৃশ্য পটভূমির সমাবেশ
এবং নৃত্য গীতের মাধুর্য্য—সকল শ্রুণের
লক্ষ্যে নিউ থিয়েটার্সের এই চিত্রখানি
বাঙলার আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তর যে লহজে
জয় কোরতে পারবে, একথা আজ নিঃসন্দেহে
বলা যায়।

কবি এনেছিলেন বুক ভরা পেম।
সে প্রেমে পঙ্কিলতা ছিল না। রাণী লক্ষ্মী
তা'তে আত্মসমর্পণ করেছেন। রাজা
চেরেছিলেন প্রেমের মন্ত্র—রাণীর অপরূপ
অন্তরে আলোকপাত করতে। রাজা ও
রাণী যা' পাননি—তাই পেয়েছিল
অমুরাধা। তার অঞ্চল'বিদ্যাস! রক্ত মধুসুধনু
তুলেছে।

দ্বাধা মেহ ও মমতার ঐশ্বর্য্যে অন্তরখানি
তার কানায় কানায় ভরা—তা'র সঙ্গে
মিশেছিল ক্রুফেল্লিয় প্রীতি ইচ্ছা! মূর্খরাজ
বিদুষক—অন্তরে তার শুধু অবিশ্বাস! তাই
সে সারা-জীবন শুধু মদীচকার' পিছনে
ছুটেই কাটালো! লবঙ্গলতা ও পিতাম্বর—
যথাক্রমে প্রভু-পত্নী ও পেরারের ভৃত্য!
ভেলে-খেলা কোরতে গিয়ে বিদুষকের অন্তরে
দিল সন্দেহের বিষ ঢেলে।

এমনি সব কত ঘটনা, নাটকীয় গতি-
বেগে বিজ্ঞাপতি কথা-চিত্রকে সুসোহন কোরে
তুলেছে। দেবকী বসুর পরিচালনা ও রাই
বড়ালের স্বর-সংযোজনায়—ছবিখানি নিউ
থিয়েটার্সের মর্যাদাকে বহুলাংশে বাড়িয়ে
তুলেছে। বাঙলা বিজ্ঞাপতি দেখলে আপনারা



নিউ থিয়েটার্সের "অভিজ্ঞান" চিত্রে মলিনা

যুগে পারবেন আমরা বিন্দুমাত্র অত্যাক্তি করিনি।

* * *

হিন্দু ও মুসলিম—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার এবং সংস্কারগত বহু অনৈক্য বর্তমান থাকলেও, মানবতার আদর্শে, অন্তরের দিক দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সে একটি প্রীতি-মণ্ডর সঙ্কট গোড় উঠতে পারে—অভিজ্ঞান চিত্রের গল্পাংশে আমরা তারই পরিচয় পাব।

হিন্দু নারী সফা, দুর্বল কর্তৃক অপহৃত হোয়েছিল। একটি মুসলিম তরুণী তা'কে উদ্ধার করে। এবং শুধু তাই নয়, ভগিনীর স্নেহ দিয়ে সফার বন্দিদা জীবনে সে আশার সঞ্চার কোরেছিল।

সুতরাং এই শ্রেণীর নারীর কাহিনী চারটিতে রূপান্তরিত হলে সমগ্রের পক্ষেও যে বিশেষ কল্যাণকর হবে, একথা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় নিউ থিয়েটারের এই ছবিখানি সমাপ্তির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

* * *

২ নম্বর ষ্টুডিওতে বজ্রহার পরিচালনায় নিয়মিতভাবে তাঁর সাপ্তাহিক ছবির চিত্রগ্রহণ চলছে। গত সপ্তাহ থেকে নারিকা ইন্দিরার বাড়ীর ড্রইং রুমের একটি দৃশ্য তোলা হচ্ছে। এর পরেই অপর একটি সেটে এটর্নী অধিকা প্রসাধের লাইব্রেরী কক্ষের দৃশ্যটি তোলা হবে। অধিকা প্রসাধের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী এবং তার পুত্রের ভূমিকায় ইন্দু মুনোপাধ্যায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন।

* * *

“বেশের ঘাটির কাজও খুব নিয়মিত-ভাবেই চলছে। গত সপ্তাহে কয়েকটি বাইরের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হয়। পরিচালক ও কন্ট্রোলার উৎসাহের অন্ত

নেই। সকলের মুখেই হাসি। তারই সঙ্গে হচ্ছে চিত্রগ্রহণ। নায়ক অশোকও তার কীম্বে পরিপূর্ণ হতে দেখে খুশী। গ্রাহকের লোকজন তার কণামত কাজ করে চলছে, কিন্তু এমন সময়ে এল কালবোশেখীর ঝড়, ভবিষ্যৎ ভেবে সকলেই আতঙ্কিত। অগ্রয়ণ পুনঃ তার বোনকে নিয়ে গ্রামে এল। সঙ্গে নিয়ে এল নতুন পরিকল্পনা। কী সেই পরিকল্পনা তা জানতে হলে আরও অপেক্ষা কর্তেই হবে। নইলে তা পূরণের কোনই উপায় নেই।

* * *

তরুণ পরিচালক ফণি মজুমদার এতাবৎ বজ্রহার সহকারীরূপে কাজ করে এসেছেন। দ্বিষ্টভাষী মজুমদার স্বীয় চরিত্র-মাধুর্য্যে ষ্টুডিও মহলে খুবই পরিচিত। এবং এ খবরে সকলেই আনন্দিত হবেন যে, শীঘ্রই তিনি স্বয়ং একখানা ছবি পরিচালনা করবেন। এ পর্য্যন্ত তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাতে তাঁর হাতে ছবির সফলতা সন্দেহে আমরা খুবই আশা কর্তে পারি। তাঁর প্রথম ছবি হবে হিন্দী।

কার্লী ফিল্মস

• “চোখের বালি”-র নিয়মিত শূটিং যাতে এই হপ্তা থেকে শুরু হয় কর্তৃপক্ষ সেই ব্যবস্থাই কোরছেন। ছবিখানার অঙ্কে প্রায় শেষ হ'য়েছে। অবশিষ্টাংশ মার্চের মধ্যেই শেষ হবে আশা করা যায়। ছবিখানা যাতে রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি” উপন্যাসের মতই সুনাম অর্জন কোরতে পারে তার জন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সুবিজ্ঞ কর্ণধার প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী চেষ্টার ক্রটি রাখছেন না। ছবিখানা সম্পূর্ণ ভরস্বরের নর-নারীর দ্বারা অভিনীত হচ্ছে—এ খবর আপনাদের পূর্বেই জানিয়েছি। সম্ভা-

বংশীয়া অভিনেত্রীদের মধ্যে যে তিনটি ঘরে চিত্ররাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা হ'য়েছেন তাঁদের মধ্যে দুটি সুপভা সুখার্জি ও ইন্দিরা রায় এই চিত্রে দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নামছেন। ছবিখানার পরিচালনা কোরছেন কল্যাণেশ্বরী পরিচালক সতু লেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী এই ছবির শব্দ-সংযোজনা কোরছেন। আশোকচিত্রের কাজে ব্রতী আছেন বাঙলার অভিজ্ঞ চিত্র-শিল্পী ননী শান্তাল। যিঃ বি পি মেহরা ছবিখানার স্তম্ভাধান কোরছেন। এই-সবের যোগাযোগে “চোখের বালি”-র সাফল্য সন্দেহে আমরা সন্নিহিত।

দীর্ঘ পিক্চাস

কালী ফিল্মসের উদ্যোগে এই টেটনিটের দ্বিতীয় অবদান “মহামায়া”-র শূটিং শীঘ্রই আরম্ভ হবে। “মহামায়া” ভক্তিমূলক গীত-বহুল কাহিনী। সুসাহিত্যিক আশুতোষ শান্তাল এই কাহিনীটি সংগ্রহিত কোরেছেন। বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ননী শান্তাল এই ছবিখানি পরিচালনা কোরবেন। মিনেমা-শিল্পের প্রারম্ভ থেকে শান্তাল মশাই এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছেন—তা'তে এই সময় তিনি পরিচালকের দায়িত্বপূর্ণ পদে ব্রতী হবার যোগ্য বলেই আমাদের মনে হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে তিনি উড়িষ্যা ছবি “সীতার বনবাস” পরিচালনা কোরেছিলেন এবং তা'তে তার শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া গেছে। শান্তাল মশাই সম্প্রতি ছবিখানার মহলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এই ছবির চরিত্র নির্বাচন এখনও সম্পূর্ণ না হলেও দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে আত্ম-প্রকাশ কোরবেন তৃণশী লাহিড়ী ও কমলা (বরিশা)। ছবিখানার শব্দগ্রহণ কোরবেন মনু শীল এবং পরিচালক স্বয়ং আলোকচিত্রের কাজ কোরবেন। আমরা ননী শান্তালের এই নতুন প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

মতিমহল থিয়েটার্স

এদের হালির ছবি “বেকার নাশনের”-র

দুটি জ্যোতিষ ব্যানার্জির পরিচালনায় আরম্ভ হয়েছে। চবিখানিতে রাণীবালা, নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, সুনীল রায় প্রভৃতি প্রধান ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন।

দেবদত্ত ফিল্মস্

‘রবীন্দ্র নাথের “গোরা” নরেশ মিত্রের পরিচালনায় তোলা শুরু হয়েছে। চবিখানার মূল ভূমিকায় কে কে নামছেন তা’ আমরা বহুপূর্বেই সকলকে জানিয়েছি। কেবল ‘মুচরিতা’ ভূমিকানেত্রীর নাম আমরা সঠিক ঐকমত্যে জানাতে পারিনি। এখন শুদ্ধি এই ভূমিকার জ্ঞাত মনোনীতা হয়েছেন বীণাপাণি। এর চেয়ে ‘ট্রাজেডি’ আর কী হ’তে পারে! লোকে ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে। নরেশ বাবু লিখবেন কিলে?

প্রফুল্ল পিক্চাস্

আগামী ১২ই মার্চ ‘ত্রি’ চিত্রগৃহে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র “লখের শ্রমিক” মুক্তিলাভ করবে। প্রফুল্ল ঘোষ একজন গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, তাঁর হুঁড়িঙের তোলা এই হালির চবিখানি সকলেরই সনকে কোরে তুলবে খুশী।

মেট্রোপলিটন পিক্চাস্

এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য কর্ণধার মিঃ বি, এল খেমকার তত্ত্বাবধানে এদের, প্রথম হালির চবি “হাল বাঙলা” আগামী শনিবার ১২ই মার্চ ‘রূপবাণী’ চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। হাতুয়াসাম্বক চবি তুলতে যে ডিজি ওস্তাদ একথা বোধ হয় তার শত্রুও স্বীকার করবেন। এ ছাড়া ছায়া ও ডিজি প্রভৃতি অভিনেত্রী সমাবেশও চবিখানার অন্ততম আকর্ষণ।

চারু রাত্নের পরবর্তী

শোনা যাচ্ছে চারু রায় ম্যাডান হুঁড়িঙে একখানা বাঙলা চবি তুলবেন। এর বেশী কোন খবর আপাততঃ আমাদের জ্ঞান নেই।

‘মুক্তি’ চিত্রের রজত-জয়ন্তী

শ্রীমুখীরেন্দ্র সামন্তাল

প্রতিযোগিতায় সর্বমুখ চিত্রকে পরাজিত করিয়া নিউ থিয়েটার্সের বহু-প্রশংসিত কথা-চিত্র “মুক্তি” আজ চিত্রায় পঞ্চবিংশ সপ্তাহে পূর্ণাঙ্গ করিল। একই চিত্রগৃহে একাধিক্রমে পঞ্চবিংশ সপ্তাহ চলিবার গৌরব লাভ করা, বাংলায় ছায়া-চিত্রের ইতিহাসে বড়ো কম কথা নহে। সেই গৌরবের স্মৃতি অক্ষয় করিয়া গিয়া রাখিবার জ্ঞাত এই সপ্তাহ হইতে চিত্রায় মুক্তির “রজত-জয়ন্তী” উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এ দেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মুক্তি-র এই বিজয় অভিযানের কাহিনী অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। ইতিপূর্বে মাত্র আর চারখানি ‘বাঙলা কথা-চিত্র’, ২৫ সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইবার ‘মোভাগ্য’ লাভ করিয়াছে। সে ক’খানির নাম :

নিউ থিয়েটার্সের	চণ্ডীদাস
ভারত লস্টার	চিত্রা : ২৭শ সপ্তাহ
রাধা ফিল্মস্‌এর	চাঁদসদাগর
	ক্রাউন : ২৮শ সপ্তাহ
	দক্ষ-যজ্ঞ
	বর্ণভাষালীল : ২৯ সপ্তাহ
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্‌এর	সোনার সংসার
	উত্তরা : ৩১ সপ্তাহ

১৯৩৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞাবধি, প্রতিযোগিতায় নিউ থিয়েটার্সের “মুক্তি” বহুচিত্রের দীপ্তিকে স্নান করিয়া নিজের একাধিপত্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে নানা কারণে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় “মুক্তি” চিত্রের এই অজাবিত সাফল্যের মূল কারণগুলি এই :—

১ চিত্রিত কাহিনীর মধ্যে সর্বশ্রেণীর দর্শকের চিত্তহরণ করিবার উপযোগী ‘মাল-



প্রযোজক—বীবেক নাথ সরকার

মালার’ প্রাচুর্য (super abundance of Entertaining elements)

২। পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অভিনবত্ব (আর্ট এবং টেকনিগের দিক দিয়া এই চিত্রখানি যে ছায়া-চিত্রের আদর্শ পুরা মাত্রায় অক্ষুর রাখিয়াছে একথা অতি নিম্নুকেও স্বীকার করিবে)

৩। চিত্রকাহী অভিনয় ও সঙ্গীতের মাদকতা (সুন্দর সংলাপ এবং সু-অভিনয় এবং অপর দিকে অপূর্ণ সুরের ইন্দ্রজালে ‘মুক্তি’র সঙ্গীতামল সর্বশ্রেণীর দর্শকের অন্তরে



কানিনবালা



“মুক্তি” চিত্রের একটি দৃশ্য

স্থায়ীভাবে রেখাপাত করিয়াছে। বেতারে, পারিবারিক বৈঠকে, গ্রামোফোনে এমন কি রাস্তাঘাটে চলিতে, পক্ষজ মল্লিক এবং কাননবালার সুরকণ্ঠের গানগুলি যেন রাতারাতি আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

৪। প্রচার কার্যের অভিনবত্ব (এই চিত্রের প্রচার কার্যে প্রচার-শিল্পী হেমন্ত বাবু স্কন্দ রসবোধ ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মুক্তি চিত্রের সাফল্যের মূলে প্রচার-নৈপুণ্য অনেকখানি সহায় হইয়াছে)।

এই চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া সারা ভারতে সর্বশ্রেণীর রসবেত্তার অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন। নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন, যে যে গুণ থাকিলে একজন প্রথম শ্রেণীর ফিল্ম-অভিনেতা হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই বড়ুয়া সাহেবের মধ্যে বর্তমান।

‘মুক্তি’র নায়িক—কানন দেবী। অভিনয়ে ও সঙ্গীতে তিনি যে আজ প্রাপ্তবয়স্ক-

বিহীন—মুক্তিতে তাহার প্রাধান্য পাওয়া গিয়াছে।

‘মুক্তি’ চিত্রের উপ-নায়িকা শ্রীমতী মেনকা এত উচ্চ স্তরের অভিনয় করিয়াছেন যাহার দ্বারা প্রমোদিত হইয়াছে—চিত্র-রাজ্যে তাহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।

মুক্তি-চিত্রের ছোট বড়ো সকল চরিত্রই সু-অভিনীত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

মঃ মল্লিক শৈলেন চৌধুরী
বিপ্লব গুপ্ত ইন্দু সুখোপাধ্যায়
বিপ্লবের জননী দেববালা
সরাইধানার মালিক পক্ষজ মল্লিক
সদার অমর মল্লিক
কুলি অহি সাজান

• মুক্তি-র প্রযোজক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার এই চিত্রের সাফল্যের জন্য আজ শিল্পরসিকমাত্রেই অভিনন্দন লাভ কোরেছেন। নিউ থিয়েটারের ছবিগুলি আজ ভারতের জায়া-চিত্রের দরবারে যে শ্রেষ্ঠ সম্মানের দাবী কোরিতে পেরেচে, এর মূলে



ডিরেক্টর—প্রমথেশ বড়ুয়া

আছে তাঁর আন্তরিকতা, স্কন্দরসবোধ এবং আধুনিক প্রণালীতে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা। তাঁর নিজস্ব আনন্দ পরিবেশন ছাড়াও, নিউ থিয়েটারের ছবিগুলির মধ্যে আমরা পাই আমাদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও গভীর রসবোধের পরিচয়।

আজ মুক্তি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত যাহাদের গৃহপোষকতা ও অভিনন্দন লাভ করিয়া “মুক্তি” আজ তাঁর জয়যাত্রাপথে “জুবিলী উৎসব সম্পন্ন করিতে অগ্রসর, আশাকরি তাহারও এই সুরণীয় সপ্তাহে, সপরিবারে আবার “মুক্তি” দেখিতে আদিবেন। আর যাহার এখনও “মুক্তি” দেখেন নাই, বা দেখিবার অবকাশ পান নাই—তাঁহাদের এই চিত্রখানি উপভোগ করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।

বাঙলায়, এই ছবিখানির পরিবেশনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন প্রাইমা ফিল্মস্



মেনকা

লিমিটেড এবং তাঁহার ব্যবসা পরিচালনার
গুণে “মুক্তি” চিত্র বাঙালার প্রতি সহরে,
প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সিনেমাতেই সপ্তাহের
পর সপ্তাহ ধরিয়া পূর্ণ উত্তম চলিয়াছে ও
অজাব ও মহাসমারোহে চলিতেছে। চিত্রা-
চিত্রের ডিষ্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমি তাঁহার
এই উত্তম ও কর্মশক্তির তারিফ করি।

“মুক্তির” গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস

অবশেষে “মুক্তি” চিত্রায় পঞ্চবংশ
সপ্তাহে পদার্পণ করিল। যেহেতু “মুক্তি”
২৪শ, সপ্তাহব্যাপী জনপ্রিয়, ‘চিত্রা’-
প্রেক্ষাগৃহ দর্শককে পরিপূর্ণ আনন্দ দান
করিয়াছে, সেই হেতু আজ হয়তো অনেক
বিক্রমবাহী সমালোচক অনেক কিছু গুন
গান বা প্রশংসার বজ্রা ছুটাইবেন।
কিন্তু একথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে
পারি না যে ১৮ই সেপ্টেম্বর চিত্রার রূপালী
পর্দায় ‘মুক্তি’ যে দিন তার জয় যাত্রার
প্রথম পদক্ষেপ শুরু করেছিলো, সেদিন
এই সব তথাকথিত সমালোচকের দল
মুখে কুর হালি, নিয়ে বিকল্প সমালোচনা
দিয়ে তার জয়যাত্রার পথকে কণ্টকাকীর্ণ

করতে সাধামত চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু
বিধির বিধানে সেটা বিরুদ্ধ সমালোচনা
তার পথকে করলে কুসুমাকীর্ণ। বাংলার
এবং তাহার বাহিরের বাঙালী দর্শক
সমাজ, বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজ, তাঁদের
মতামত সুপষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন
এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন যে বাঙালী দর্শক
সমাজ এইসব তথাকথিত সমালোচকের
অসুখী নির্দেশে ভবির ভালমন্দ বিচার
করেন না—প্রকৃত ভালকে ভাল বলে
গ্রহণ করার ক্ষমতা ও সংসাহস তাঁহারের
আছে।

এইখানে আমি একটা ব্যাপারের
উল্লেখ না করিয়া পারি না। কোনও
এক বিখ্যাত দৈনিকের সুবিখ্যাত
সমালোচকের সমালোচনার বিরুদ্ধে আমার
এক বন্ধুর একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিকার
কোনও সুপ্রচারিত পৃথক প্রণীত সাপ্তাহিকে
পাঠান। কিন্তু তাঁহার উভাগ্য প্রতিবাদটি
আত্মপকাশের গোবে থেকে এক্ষিত



পাবলিসিটি অফিসার—হেমন্ত চ্যাটার্জী

হয়। সেটা প্রতিবাদের শেষাংশ এখানে
উদ্ধৃত করিলুম—“আর একটা ক’
বলিচাই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব
চলচ্চিত্র যে লোক শিকার বাহন এক

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যবসায়ী জানেন
প্রচারের ভাল-মন্দের উপর
পণ্যের

ভাল-মন্দ নির্ভর করে !

অনিয়ন্ত্রিত এবং বিজ্ঞান-সম্মত

প্রচার কৌশলে—

কেমন করিয়া প্রথমদিকে ব্যবসায়ের শ্রীদ্বি সাধন
করা যায়, আমরা আপনাকে তাহার পছা
দিয়েই পারি।

পত্র লিখুন বা ফোন করুন :

নিউ ইন্টারন্যাশান্যাল পাবলিসিটি

১১, চক্রবেড়িয়া রোড সাউথ

ফোন—সাউথ : ৪৬৬

শুধুই সত্য—সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন মুক্তি চিত্রের মধ্যস্থতায় বাঙ্গালীরা বাহ্যতে পরিপূর্ণভাবে ফিরিঙ্গীরা না শিক্ষা করতে পারে নিউ থিয়েটার তাহারি চেষ্টা করিতেছেন। ইহার উত্তরে আমার অনেক কিছু বলিবার থাকিলেও, বলিব না, কিন্তু অতি আধুনিক সমাজের ভিতর গলদ কোথায়, প্রগতিবাহী মেয়েদের পরিচায় কি—বাংলার অর্থবান লোকেরা কি করিয়া সাহেবীয়ার মোহে পড়িয়া একটি স্বতন্ত্র



“মুক্তি” চিত্রের একটি দৃশ্য

শ্রেণীর জীবে পরিণতি হইতেছেন—এই কি পরিপূর্ণভাবে মুক্তি চিত্রে দেখান হয় যাহা হটক প্রতিকূলতা এড়াইয়া ‘মুক্তি’ সব আজ কালের অতি সত্য ব্যাপারগুলি নাই? পাশ্চাত্য সভ্যতার বার্থ অনুকরণে আর আত্মপতিষ্ঠা করিয়াই কাস্ত হয়

আমরা বিশেষারা হইয়া—
পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া
কি বেড়াইতেছি না? স্ত্রী
স্বাতন্ত্র্যের কি বিষয় ফল—
এই সব সত্যগুলিই মুক্তি
চিত্রে দেখান হইয়াছে,
ফিরিঙ্গীরা শিক্ষার জন্ত
নহে। এই সব ব্যাপারগুলি
ভাল করিয়া না বুঝিয়াই
সমালোচক মহাশয় তাহার
রায় দিয়াছেন।

কিনী ফিল্মসের নতুন ওষুধ!

উত্তরায়

প্রশংসা মুখরিত

দ্বিতীয় সপ্তাহ!

সকলের মুখেই এক কথা
“ছবিখানা দেখে সত্যই
অপার আনন্দ লাভ
কোরলাম!...”

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রত্যহ অসংখ্য দর্শক
স্থানভাবে ফিরিয়া যাইতেছেন।
সেইজন্য আমাদের সজ্জায় পৃষ্ঠপোষক-
দের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন
দুই দিন পূর্বে সিট রিজার্ভ করিয়া
আসেন।

বিবিধ

উইমেনস ইন্টার কলেজিয়েট স্পোর্টস

উইমেনস ইন্টার কলেজিয়েট স্পোর্টস এন্সেম্বলিশমেন্টের তৃতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান ১১ই মার্চ অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিযোগীগণ স্ব স্ব নাম ৮৬ কলেজ স্ট্রীট, ওয়াই, এম, সি, এ-তে মিস্ পুস্প মুখার্জির নিকট লিখুন।

ভবানীপুর ব্যাংকিং কর্পোরেশন

গত রবিবার অপরাহ্নে মাননীয় বিচার-পতি চারু চন্দ্র বিশ্বাস ভবানীপুর ব্যাংকের ভূতপূর্ব ডিরেক্টরদের স্বর্গীয় শ্রুতেন্দ্র নাথ মল্লিক ও রায় নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত উন্মোচন করেন। বর্তমান ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত শংকর রায় চৌধুরী মল্লিক ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্যকলাপ সংক্ষেপে আলোচনা করিলে পর সভাপতি বিচারপতি বিশ্বাস মহাশয় আবেগ-

নাই। নিউ থিয়েটারের গৌরবময় পতাকাংকে অধিকতর 'গৌরবোজ্জ্বল' করিয়াছে। তাই 'মুক্তির' রক্ত জরাজীর্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে—নিউ থিয়েটারের কর্ণধার মিঃ বি, এন, সরকারকে, পরিচালক কুমার প্রমথেন বজ্জুরাকে এবং নিউ থিয়েটারের কর্মচারীদেরকে এই গৌরবময় সাক্ষ্যের জন্ত আমি আমার লক্ষ্য অভিনন্দন জানাইতেছি।

ক্রিয়রেশ চন্দ্র ঘোষ
(প্রাইমা ফিল্মস লিমিটেড)

মহী বক্তৃতায় তাঁহাদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, মিঃ পি. ব্যানার্জি, কাউন্সিলার ধরনী কান্ত বসু, কাউন্সিলার কণীজ নাথ ব্রহ্ম, ডাঃ প্রবোধ বানার্জি প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ভক্তলোক উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংকের পক্ষে অন্ততম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু, মেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র চন্দ্র সেন ও তদীয় সহকারী শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্বের পরিতৃপ্তির ভক্ত বিশেষ তৎপর ছিলেন।

সালিখা সুরমঞ্জিল

গত ৮ই ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যায় সালিখা সুরমঞ্জিলের প্রথম বৈঠক শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাওড়া ৩নং দশানী বাগান কেন্দ্র "গনেশ কুটারে" বলিয়াছিল।

ন্যাশন্যাল টেলারিং

(শাল রিপেয়ারিং ওয়ার্কস)

৮০/১২ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা
(হাতিবাগান বাজারের পূর্বদিক)

প্রোফেসর লতীশ চন্দ্র অর্পণ (পাঁচুবাণু.)

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও পরিতোষ যে যথাক্রমে স্থলগিত কণ্ঠে উচ্চাঙ্গের রাগ রাগিনীর দ্বারা শ্রবণের চিত্তাকর্ষণ করেন।

ই, সি, রেলওয়ে

এবছরও ই, সি, রেলওয়ে ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে যাত্রাসভা কলোমন টিকিটের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অপরাপর রেলওয়ে ও ষ্ট্রীমার লম্বাঘের লম্বেও যোগ রাখিয়া সকল শ্রেণীর টিকিটই পাওয়া যাবে। আবার অবাধ ভ্রমণ টিকেটেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই টিকেট ১৫ দিন পর্যন্ত যাত্রাসভা চলবে। ৮ই এপ্রিল হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত এই টিকেটে পাওয়া যাবে—কিন্তু ২রা মে মধ্য-রাত্রির পর এই টিকেট আর চলবেনা।



বৈজ্ঞানিক উপায়ে উল ও সিল্কের কাপড় রং রিপু ও ধোত হয়।

গরম সূট ডাই ওয়াশ হয়।

আধুনিক ফ্যাসানের সূট, সার্ট, রাউন্ড ও ব্রক ইত্যাদি সুলভে ও অল্পসময়ে প্রস্তুত হয়।

মফঃস্বলের কাজ যত্নপূর্বক সরবরাহ করা হয়।

কল্পকাহিনী

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

‘জগদ্বা’ নামে যে লোকটির কথা জগ-
জ্ঞানীগণ বলিতে ছিলেন, এ লোকটি এখনকার
বাগিন্দা নহে। কালী হইতে জগজ্ঞানীগণ
যেয়েকে দেখিতে চুঁচুড়ার আলিয়াছেন শুনিয়া,
তিনি বেশ হইতে তাঁহাকে দেখিতে
আলিয়াছেন। জগদ্বা, অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর,
জগজ্ঞানীগণ স্বস্তর মহাশয়ের আমলের পুরাতন
কর্মচারী।

জগজ্ঞানীগণ স্বস্তর মহাশয় ছিলেন বঙ-
পুরের এক বিখ্যাত জমিদার। যজ্ঞেশ্বর
মিত্র যখন বালক কালে হাড়ের উপর একখানি
‘কৃষ্ণার্ণ চর্ম’ বুলাইয়া ও কাপের উপর শতচ্ছিন্ন
মলিন উত্তরিয় ফেলিয়া, প্রবল প্রতাপাবৃত্ত
জমিদারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,
তখন ভীতমুগ্ধ জমিদার তাঁহার অন্তর্ভূত
বুদ্ধির দীপ্তি ধরিতে পারিয়া তাঁহাকে জমিদারী
কার্য্যে বাকাল করিয়াছিলেন। সে আজ
অনেকদিনের কথা।

তাঁহার পর এই জমিদার গৃহস্থ সংসারে
কত গৃহস্থালী কার্য্য ঘটিয়া গিয়াছে, যজ্ঞেশ্বর
প্রত্যেকটির প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এই সংসারের
এত অন্তরঙ্গ একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,
যে জমিদার মহাশয়ের পুত্রপুত্র পর্য্যন্ত তাঁহার
সহিত কথা কহিতেন। জমিদারবংশের
গৃহকর্ত্তা স্বয়ং তাঁহাকে “দাঁদা” বলিয়া
ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সেই অবধি যজ্ঞেশ্বর—জগদ্বা। এখন তিনি
বৃদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু সম্মান হারান নাই।
এখনও তিনি—জগদ্বা।

জগদ্বা জমিদারী খাতাপত্রও যেমন
বুঝিতেন গোপাল ভায়ের গল্পও তেমন

আওড়াইয়া বাইতে পারিতেন। হাতরস
ছিল তাঁহার আটপোরে অভ্যাস, গান্ধীয়া
ছিল পোষাকী।

জগদ্বা যেদিন নীলব বাবুর বাড়ীতে
আলিলেন শ্রুতদ্বা জগজ্ঞানীগণ সহিত দেখা
করিতে, সেদিন আর ফিরিতে পারিলেন না।
দূরের রাস্তা, কাজেই তাঁহাকে সেদিন
থাকিতে হইল।

অপরাক্ষে লবঙ্গ আসিয়া তাঁহার চরণ
বক্ষণ করিল। জগদ্বা লবঙ্গকে দেখিয়া
আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ
আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, তাঁহার বিষয়ে
এক চুড়া মুখে মুখে রচনা করিয়া, আওড়াইয়া
ফেলিলেন। এ শব্দটি জগদ্বার অনেক
দিনের। মুখে মুখে পণ্ড রচনাই তাঁহার
রসিকতার বিশেষত্ব।

জগদ্বা আওড়াইলেন :

‘লবঙ্গ বজ্রাড়া একি রঙ্গ হেরি আজ !

কুরঞ্জিনী বন ছেড়ে ফিরে কেন পুরমায় ?’

লবঙ্গ হালিয়া বলিল : বজ্রাড়া আবার
কোথায় দেখলেন ? চুঁচুড়া কি বঙ্গের
বাইরে ?

জগদ্বা বলিলেন : না, চুঁচুড়া বঙ্গের
বাইরে নয় ! কিন্তু তুমি চুঁচুড়ায় ছিলেন,
ছিলে কলীতে ! কালী বঙ্গের বাইরে !

লবঙ্গ বলিল : কালী বঙ্গের বাইরে হলেও
ঠিক বাইরে নয়। কালীতে অনেক বাঙ্গালী
আছে। আপনার মত অনেক রসিক বুড়ো
বাঙ্গালী সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

—কবল আনাকেই পাওয়া যায়না ! দেখন্ত
নিশ্চয়ই তুমি বিরহ লস্তপ্তা !

লবঙ্গ পেছপাও নয় ! সে উত্তর করিল :
“বুড়ো বয়ের জন্তে তরুণীরা কি গিরহ
লস্তপ্তা হয় ? হে হতেন, আপনার যদি বুড়ী
গৃহিনী বেঁচে থাকতেন !”

জগদ্বা বলিলেন আচ্ছা শনিরে ! কি
কথাই শুনাতে ? বুড়ী গৃহিনী যে কি জিনিষ,
তুমি নব্যা তার কি মহিমা বুঝবে ?
“হৃদয়ের চেয়ে ক্ষীর ভাল, চালের চেয়ে ভাত !
ছুড়ীর চেয়ে বুড়ী ভাল দিতে কিস্তি মাত।”

তোমাদের দ্বারা কিস্তি মাতা আর হয়
না। জোর কিস্তিটা অবধি চলে ! কিন্তু
তাও ভরে ভরে, পাতে দাবা খোওয়া যায় !

—তোমার দাবা কি এখনও খোওয়া যায়
নি, ঠাকুন্দা ?

—কেন আমি কি তোমার মতন ? খেলা
আরম্ভ—কর্ত্তে না কর্ত্তেই দাবা হারাবো ?

কি রসিকতাই চলিতেছিল : কিন্তু তবু এই
রসিকতার মধ্য হইতে একটা নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য
ঘটনা, জগদ্বার শেষ কথা কহিতে আত্মপ্রকাশ
করিল। লবঙ্গ তাহাতে আপনাকে সামলাইয়া
রাখিতে পারিল না। মুখখানা তার হইয়া
গেল মলিন—তাঁহাকে ছুইতিনবার ঢোক
গিলিতে হইল।

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

জগদ্বা এই কতটুকু স্মরণীয় লইবার জন্ত
খানিকপরেই বলিয়া উঠিলেন : তা, বাবা
তোমার খোঁওয়া যাবার নয় ! একদিন সে
আবার তোমারই হবে ! তুই যে বুদ্ধিমত্তা মেয়ে,
—তোকে সে কিছুতেই ত্যাগ করতে
পারেনা !

লবঙ্গ বলিল :—সে আশা আমার নেই !
আমি আশিও তা চাইনা। সে এখন আমাকে
এসে খোঁষামোহ করলেও আমি আর কিরে
যাবোনা। এটুকু বুকের বল আমার আছে,
ঠাকুর্দা !

—হ্যাঁ, সে বেরকম কাণ্ড করেছে, তাতে
কি করে না যাওয়াই উচিত বটে ! কিন্তু তবু—
কি জানিস্—তুই মেয়ে মানুষ ! মেয়ে
মানুষের স্বামী ভেড়ে থাকা একটা লাজনা !

—মেয়েমানুষ স্বামী ভেড়ে থাকলে একটা
দোষের কথা হতে পারে বটে ! কিন্তু স্বামী
যদি বিনাধোঁষে আপনায় স্ত্রীকে ত্যাগ করে,
তাহলে স্ত্রীর পক্ষে সেটা অত্যন্ত কেমন ক'রে
হতে পারে ?

জগদ্বা লবঙ্গর কথা শুনিয়া একটু গম্ভীর
হইলেন। খানিকটা চুপ করিয়াও রহিলেন
তিনি। পরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে
বলিলেন : কি জানিস্ লবঙ্গ ! আমাদের
হিন্দু লম্বাজ বড় কঠিন লম্বাজ ! তারা ঢকল
নারীজাতির উপর তত লহানুভূতি প্রকাশ
করে না, যত করে পুরুষের উপর !

লবঙ্গ একটু উত্তপ্ত হয়ে বলিয়া উঠিল :
লম্বাজ কি করে না করে সে খবর আমার
নেবার দরকার নেই ! আমার প্রথম বোঝা-
পড়া আমার নিজের স্বামীর সঙ্গে ! সেইটাই
আগে ঠিক হয়ে যাক, তারপর লম্বাজের
খবর নেবো !

জগদ্বা ঠাৎ বলিয়া বলিলেন “তোমার
স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়াটাতে অনেক এগিয়ে
এলেছে লবঙ্গ।”

লবঙ্গ উত্তর করিল : অনেক এগিয়ে
এলেও একেবারে ত শেষ হয়নি।”

—শেষ কি হয়নি ? মাঝে যে কাণ্ডটা
তোমার স্বামী করলে, সেটাতেতো স্পষ্টই মনে
হয়, তোমার সঙ্গে তার শেষ সম্পর্কই ঘটে গেল !

—কি কাণ্ড করলে ঠাকুর্দা ?
—তুই শুনিস্ ? সে কথাতো গ্রামের
লোক লকলেই জানে !

—কি ? কই আমি তো কোন কথা
শুনিনি !

—শুনিস্ ? এতবড় ব্যাপার আমরা
লকলেই জানি, আর তোমার লকলের আগে
জানা উচিত, তুই শুনিস্ ? কুড়লগাছার
দীক্ষু মিস্তিরের মেয়েকে—

বলিতে বলিতে জগদ্বা খামিয়া গেলেন।
লম্বাজটা বলবার প্রয়োজন তিনি বিনেচনা
করিলেন না। লবঙ্গ দোষগ্রক নয়নে জগদ্বা'র
মুখের দিকে চাহিল—শেষ টুকু শুনিবার জন্ত !

—বিয়ের কথা তুই শুনিস্ ?
—বিয়ে ? বিয়ে ? তুমি কি বলচো ?
—হ্যারে বিয়ে ! তোমার স্বামী দীক্ষু
মিস্তিরের মেয়েকে যে বিয়ে করলে !

—বিয়ে কলে ? তুমি সত্যি বলচো ?
—তোকে মিথ্যা কথা বলে আমার
লাভ কি ? এই বোলেখ মাগে সে বিয়ে
হয়ে গলে !

—‘বিয়ে হয়ে গেলো, বিয়ে হয়ে গেলো !’
বলিতে বলিতে লবঙ্গ লেইখানে বলিয়া
পড়িল। এত বড় অপমানের খাঙ্কা যে লহনা
সহ্য করিতে পারিতে ছিলনা। সে মনে
করিতে টেঁচা করিতেছিল, হয়তো জগদ্বা
ত্রাহার সহিত এখনও রহস্য করিতেছেন।

—ঠাকুর্দা ! আমার সত্যি করে বলো,
একথা সত্যি কিনা ! আমার এটা জানা
দরকার।

—লবঙ্গ তুই এত কাতর হয়ে পড়বি
জানলে আমি তোকে বলতুমনা—
দেখচি তোকে বলা আমার অজ্ঞায় হয়েছে।

লবঙ্গর চক্ষু দুটি স্থির হইল। চক্ষুর দুই
কোণে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত টল টল
করিতে লাগিল, কিন্তু ঝরিলনা। অসামান্য
দৈর্ঘ্যো লবঙ্গ তাড়া ধরিয়া রাখিল।

জগদ্বা ক্রিজালা করিলেন, তোমার ভাইও
তোকে খবর দেয়নি ?

—না !
—খবর আরকি হবে ? সুখবর হোতো,
দিত। এতো আর সুখবর নয় !

লবঙ্গ কোন কথা কহিলনা।
—জামাইটার বুদ্ধি শুদ্ধি তো কোন
কালেই ভাল নয়। তার ওপর কুলীন কারন্তব

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা গ্যারান্টি চিরস্থায়ী !



ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য
পাওয়া যায়। প্রিয়জনদের মনোমত
আধুনিক ধরণের লকল রকম গহনা
পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ
লোপার জায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিক্রিক্টে

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি, বি, ৪৮৮০

ছেলে! বাপ পিতামহর ধারা যাবে কোথায়? যেমনি এক অরক্ষণীয়া কল্লার পিতা-গিরে হাজির হয়েছে, অমনি 'কাঙাল ভাত খাবি,—না, আচাবো কোথা' করলে।

লবঙ্গ একথা শুনিয়াও কোনও কথা কহিলনা, চুপ করিয়া বলিয়া রহিল। জগদ্বা আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন : স্তন্যম না কি, কিছু টাকা পেয়েছে! কেউ বলে পাঁচশো,—কেউ বলে হাজার খানেক! তা—যাই পাক, তাব'লে কি ফের আবার বিয়ে করা উচিত হয়েছে!

লবঙ্গ তবু কথা কহেনা! নিখর পাষাণের মত স্থির সে!

জগদ্বা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আরে একটা বউ রয়েছে, সেটাকেই তুই খেতে দিতে পারিস্নে! ছুটো ভাত দিতে হবে বলে সেটাকেই তুই বাড়ী থেকে দূর করে দিলি! নিজে একপয়সা রোজগার করিস্নে,—হাটার কাঁধের ওপর ঝুলে বেড়াচ্চিস্ন! আজ যদি তোর হাটা তোকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, কাল তোকে দাঁড়াতে হবে পথের মাঝে তোর এমন আক্কেল নেই,—তুই ছুটো বিয়ে করলি। কি বলবো বল লবঙ্গ! সব কুয়াণ্ডের দল! ওরা কি মানুষ!

ওরা মানুষ কিনা, তাহা গইয়া লবঙ্গ তখন মাথা ঝামাইতে ছিল না। লবঙ্গ তখন ভাবিতেছিল, কি ঘোষে, তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া আবার একটা বিবাহ করিল? এর লহস্তরটা সে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধির চারিধারে হাতড়াইয়া খুঁজিতে ছিল।

জগদ্বারিণী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন : জগদ্বা! আমার একটা উপকার তোমাকে কর্তে হবে!

জগদ্বা শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন : কি উপকার দিবি?

—তোমার তো দেখে আজকাল কোনও কাজকর্ম নেই! খাজনা পুস্তর আদায় উন্নল তো আজকাল তোমার ছেলেই করি! তবিলের কাজও তো স্তন্যতে পাই তার ওপরই চাপিয়েছো? তবেতো তোমার লম্বা ছুটি! তা চলনা আমার সঙ্গে,—আমাকে কাশীতে পৌঁছে দিবে আসবে।

—এ আর বৃশী কথা কি দিবি? তুমি বললেই যাবো।

—হ্যাঁ, তাই ভাবছিলাম, কাকে আবার ধরি! যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো,

সে এখন যেতে চাইছেন। বলে, তার এখনও পাঁচ লাভহিন দেরি হবে। তা আমি কি অভহিন দেরি করতে পারি? কাল বাধে পরন্তু শিবচতুর্দশী। এমন পুণাহটা কলকাতায় বলে কাটাযো?


—না, না দেকি একটা কথা হলো? আর আমি যখন এনে পড়েছি, তখন আর তোমার ভাবনা কি?

তা চলো, তোমার কাশী দিবে আমি। কবে যাবে?

—তাহ'লে আজই বিকালের গাড়ীতে চলো। নইলে পরন্তুর ভেতর পৌঁছতে পার্কোনা।

—আজই? তা চলো।
যাবার সব ঠিক ঠাক আজ সক্কোর গাড়ীতেই যাওয়া প্রায় ঠিক।

ফোন ২৭৭৬ বড় বাজার



কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারতের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আগার সারকুলার রোড, কলিঃ

জগন্নারীণী বর হইতে বাইবার ক্ষত্র যেমনি পা বাড়াইয়াছেন, অমনি নজর পড়িল লবঙ্গর উপর। লবঙ্গ ঘরের একপাশে, জানালার গরান ধরিয়, বাঁহরের বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘরের পাশেই ফুলবাগান।

জগন্নারীণী জিজ্ঞাসা করিলেন : লবঙ্গ এখানে চুপ্টি করে দাঁড়িয়ে রইলি যে !

লবঙ্গ মুখ ঘুরাইলনী ফুলবাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। জগন্নারীণী বুঝিলেন, কি একটা হইয়াছে। জগন্নারীণী দিকে জিজ্ঞাসা-নেত্র চাহিতেই জগন্নারীণী বলিলেন : লবঙ্গ যে অন্তবড়ে ঘটনার কথা কিছু জানেনা, তাতো আমি জানিনে। আমি ভেবেছি, ও সব শুনেছে। তাই একটু ছোট ঠাট্টা কত্রে গিয়ে একটা বড় রকমের আঘাত ওকে আমি দিইছি। এর জন্ত দায়ী আমি-ই।

—এমন কি ঘটনার কথা শুনিগেছো জগন্নারীণী, যার জন্তে লবঙ্গর মত ঘেমে অমন মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ?

—ঐ ওর অমূল্য আমি যে বে-আকলি কাণ্ডটা করলে, সেই কথাটাই ওকে বলে কেলছি। ওবে সে কথা মোটে জানেনা তা আমি কি করে জানবো !

জগন্নারীণীও উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : কেন, ওর আমি আবার কি নতুন কাণ্ড করেছে ?

—ও হরি ! তুমিও বুঝি তা জানেনা ? এই গেলো বোশেখ মাসে তিনি যে আবার একটা—অনাধিনীর সংখ্যা বাড়িয়েছেন !

—কী ?

অর্থাৎ আর কি ? ছোট মিষ্টির ঘেরেকে উনি কুমারী অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছেন।

—বিয়ে করেছে ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সে কথা আর বলো কেন ? শুণের ত' বাট নেই।

—সে কি কথা ?—আবার বিয়ে করেছে ? একটাকে খেতে দিতে পারেনা, আবার আর একটা ?

—খেতে দিতে পারেনা ব'লে তাকে জেলগে বেতে হয়না, বা সন্ন্যাসীঘের বেলগে নাম লেখাতে হয়না। খেতে দিতে পারিনা বলে যদি একটা দারিদ্র বাড় থেকে নামিয়ে দেওয়া যায়, ত মন্দ কি ?

—জামাইটা দেখছি তাহ'লে খুব কন্দিবাজ !

জগন্নারীণী বলিলেন : না ঠিক কন্দিবাজ নয়, দ্বিধা ! এরা বিবাহটাকে একটা দারিদ্রের চক্রে দেখেনা ! এটা বিবাহটাকে দেখে একটা রক্ত তামাসার আলবাব ব'লে !

—কিন্তু আমরা লেটা সহ্য করবো কেন ? ঐ কচি মেয়ে, ওকি এখন থেকে পৃথিবীর নির্যাতনগুলো ভোগ করতে থাকবে ? একজন মজা মারবে, আর একজন তার বখোছাচারিতা মাথা নত করে মেনে নেবে ? এ কোন্ দেশী বিচার ?

জগন্নারীণী বলিলেন : শ্রুতিই তো ! এ অরাজক ভাব ভগবানের রাজ্যে কেন চলবে ?

দেশের লোক য' নিয়েতো মাথা বাহার না ! পোষাকের নালিশ করলে হয়না ?

“তা—তা—অমনি একটা কিছু করা দরকার বৈ কি ! কিন্তু কথা হচ্ছে,—এত হালকা হজুত করে কে ?”

জগন্নারীণী হঠাৎ বলিয়া বলিলেন : প্রয়োজন হয়তো আমাকেই লব কত্রে হবে !

জগন্নারীণী বলিলেন : তুমিতো দ্বিধা আজ বিকালেই কানী চললে ! সেখানে গিয়ে একবার বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢুকলে, লংসারের কোন কথাই তোমার মনে ছায়া ফেলাত পারে না।

—তুমি ভুল বুঝচো আমার, জগন্নারীণী ! লংসারের মায়া কাটিয়েছি বলে কি লংসারের অবিচার গুলোকে প্রশ্রয় দিতে হবে ? তা হ'লে এরা যে সবাই মিলে আমার অভিলাপ হবে।

জগন্নারীণী বাধা দিয়া বলিলেন : কিন্তু আমিও যে তোমার সঙ্গে কানী যাচ্ছি দ্বিধা !

—তাহ'লে আমার কাশী যাওয়া হ'লনা। চলো, দেশে যাই। সেখানে গিয়ে নালিশ করিয়াছি জুড়ে দিই।

(ক্রমশঃ)

‘দুর্ভিক্ষ এবং শীর্ণ শিশু’


ডোঙ্গরের

বাল্যামৃত

সেবনে

অবিলম্বে সুস্থ ও

সবল হয়।



বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

মার্চ মাসের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে আমরা ঞানিকটে উন্নত ধরনের প্রোগ্রাম নির্মাচনের আভাষ পেয়েছি। তবে কম্পনিত ভূত আবার নির্মাচিত আর্টিষ্টের ঘাড়ে না চাপে তবেই মজল! দীর্ঘদিনের সমালোচনার পর একটু তার ফল পর্যবেক্ষণ করা গেল।

আমরা বেতারের উন্নতিকামী বন্ধু! আমরা চাই বেতারের স্ফুল প্রচার—বেতারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। অত্যা—অনাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লেখনী যেমন সুতীক্ষ্ণ তেমনি আবার ‘ভালোকে’ ভালোবাসতেও আমরা কুণ্ঠিত নই। অত্যাচারের শত্রু এবং জাতির মিত্র আমরা।

যেয ক্রটি সকল জিনিষেরই আছে এবং কিছু না কিছু থাকবেও। নিরাস্থ্য কেউই হতে পারে না—একথা আমরা জানি এবং মানি। কিন্তু লংশোধনীর ক্রটি বিচ্যুতিকে আঁকড়ে ধরে না থেকে লংশোধন করে নিতে হবে। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের কল্যাণের জন্তেই আমাদের লেখনী-কল্প ধারণ করা।

বেতার নাটকে বলের অভিনয় এবার সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। বহুদিন পরে আমরা প্রকৃত একখানি ভালো নাটকের অভিনয় শুনে পরিতুষ্ট হয়েছি, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বা যাত্রার আগরের বর্ণনীড়াধারক চীৎকার স্থিতি বা শীত্ৰই আমাদের কান ঞালাপালা করে তুলবে।

গত শনিবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রা-হরিক অনুষ্ঠানে মনোমোহন ঘোষ “জঃসাহসিক লম্বুপ্রযাত্রার ইতিহাস” বললেন। মহিলা আসরে এ ধরনের বক্তৃতার কী সার্থকতা আমরা তা স্থিতি না। বঞ্চে “বিত্তার্থী মীণ্ডলে” কিংবা “ছোটদের বৈঠকে” এ বক্তৃতাটির ব্যবস্থা করলে তার অর্থ খুজে পাওয়া যেত। বক্তার বক্তৃতা-ভক্তিটি ভালো।

ডি, এন, ঘোষের ব্যবস্থাপনার “হুপূর বেলার আলর” বললো। অত্যন্ত নিকট শ্রেণীর গান সব—সমালোচনার বাইরে! শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র কমলা সরকারের গান তবু ঞানিকটে শ্রবণযোগ্য হয়েছিল।

রবিবার ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে, বেহালা বাজাঙ্গলন প্রতাপ ব্রহ্মচারী—ভালোই হয়েছিল। সন্তোষ লেন বাংলা গান গাইলেন—বিশি! ধীরেন দালের গান খুব ভালো হয় নি! সত্যবানের গানও তেমন জমে নি। ধীরেন মিত্র কীর্তন গাইলেন ‘সুন্দর। পঙ্কোজ বাবু লজ্জীত লিঙ্গা দান করলেন।

সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে কুমারী গীতিকা সরকার গান গাইলেন “বেহালরের দার খুলে”—সুন্দর। গায়িকার বর্ধ বেশ সুমিষ্ট। ধীরা দেবীর গান চমৎকার! গায়িকাকে রেডিওতে নিয়মিত জাবে স্থান দেওয়া উচিত। শোভা কুণ্ডুর মেতার এবারে চলন লই।

সোমবার ২১শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে লীলা দেবীর ব্যবস্থাপনার বিচিত্র অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোল। জঘন্ড প্রোগ্রাম। অল্পজ মল্লিকের গান, বেতারে অচল। রবীন্দ্র নাথের “কর্ণকুন্তি লংবাধ” আবৃত্তি শুর্নপুষ—কবিতাটিকে যেন জবাই করা হোল। দীর্ঘ লম্বয়্যাপী এ কার্যের কী প্রয়োজন? একমাত্র সুপ্রভা মজুমদারের রবীন্দ্র লজ্জীত আমাদের ঞানিকটে আনন্দ দিয়েছিল।

মঙ্গলবার ২২শে ফেব্রুয়ারী সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে—নবেন্দু সুন্দর সুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনার একটি লজ্জীতানুষ্ঠান হোল—এটি বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। বাগমন্ত্রী দাশ গুপ্তের গান—ভালো। শৈলেশ গাঙ্গুলীর গান, চলন লই। মমতা লাহার গান ভালোই কিন্তু একটু একঘেয়ে হয়ে পড়ছিল। অঞ্জনা দালের গান মন্দ নয়। ইলা বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গান ভালো হয় নি। মজু দের কীর্তন—সুন্দর। পরে তারাপদ চক্রবর্তী খেয়াল গাইলেন খুবই উচ্চালের হয়েছিল। সাহিত্যিক ‘সজনী কান্ত দাশ জাঙ্গালী’-র বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন।

বুধবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনার একটি লজ্জীতানুষ্ঠান হোল—খার্ড ক্রাশ প্রোগ্রামের কোন গানই উল্লেখযোগ্য নয়। সুবোধ রায় চৌধুরী বক্তৃতা দিলেন—লজ্জাতার ধারা। বাস্তবিক লজ্জাতার, ধারা বিজ্ঞানের প্রকোপে কেমন রূপ আজ বিখে ধারণ করেছে তারই ঞানিকটে পরিচিতি লাভ করা গেল বক্তার বক্তৃতার মধ্য হতে।

ইকিম এম.এস. ডামানের

কস্তুরী গিল

ধাতুদৌর্ভল্য ও শক্তিশীনতা চিরতরে
আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ টাকার
৪২ নং ধর্মতলা ট্রাট কলিকাতা

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে—রাধচন্দ্র পাল গান
গাইলেন—অতি সুন্দর। কণকলতা ঘোষ
কীর্তন গাইলেন জয়দেবের বিখ্যাত পদ
“বহুনি বহি কঞ্চিহপি”—ভালো নয়।
জয়দেবের পদ লালিত্যের কোন পরিচয়
গায়িকার কণ্ঠে প্রকাশ পায় নি। যেতার
অর্কেষ্টা বাজনা মোটেই ভালো হয়নি।



বড়দি

১৪৩

রুহ্মপতিবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞানী-
মণ্ডলে ‘বিচিত্রা’ সম্পাদক উপেন্দ্র নাথ
গুপ্তাপাধ্যায় ‘রচনা’ কৌশল’ শেখালেন,
লক্ষ্য ভাবায় সুন্দর প্রণালী। বিজ্ঞানী মণ্ডলের
উপযুক্ত। দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে যাত্রী লক্ষ্য
দ্বিপ্রাহরিক রাগের পরিচয় দিলেন—অতি
সুন্দর বাজনা। পরে কণী গুপ্তের প্রবোধনার,
বিনয় ঘোষ রচিত ‘বড়’ নাটিকা অভিনীত
হোল, লংসারের ছুটি নারীকে কেন্দ্র করে,
দেখক ছুটি নারী চরিত্রের দুই আবেশের
দিক্ দেখাবার প্রচেষ্টা করেছেন—উদ্দেশ্য
ভালো। অভিনয় প্রলঙ্কে কুমারী উমা
বসু, অঞ্জলি রায় এবং বিমল গোস্বামী
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুশীল রায়ের অভিনয়ও
মন্দ নয়। প্রথম গানখানি আমাঘের ভালো
লাগে নি। লক্ষীত পরিচালনার রবি রায়
প্রাশংসা পাবার যোগ্য—তার গানখানিও
বেশ ক্রটিময় হয়েছিল।

২৫শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে
লতোরু রুম্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনার
লক্ষীতানুষ্ঠানটি আমরা খুবই উপভোগ
করেছি। কুমারী নমিতা রায় চৌধুরী,
পঞ্চানন হস্ত, বিমল হস্ত, দেবাংশু
মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ বৈজের প্রথম
গানখানি আমাঘের ভালো লাগেছে।

লাক্ষ্য অনুষ্ঠানে যেতার নাট্যকে ‘দল
কর্জুক’ ‘দ্বাদী-দ্বী’ অভিনীত হোল।
অভিনয়ে লক্ষীতের মুচ্ছনার ‘দ্বাদী-দ্বী’
এক কথার অপূর্ণ।

নির্মল তখন বর্ধমানের দুই সম্পর্কের এক
কাঁকার কাঁছে থাকিয়া রাজসুলে পড়িত। সে
আগিত ৮মঙ্গলবাড়ীর দক্ষিণ দিক হইতে
এবং তাহার সহপাঠী প্রেমেন্দ্র আগিত
উত্তর দিক হইতে কাঁকার পুল পার হইয়া পরে
কামানতলায় মিলিত হইয়া তাহার স্কুলে যাইয়া
প্রবেশ করিত। এবং খেলাধুলাতেও কেহ
কাঁহারো লজ ছাড়িত না। ইহার অগ্রথা
বহি হইয়া থাকে ত তেমন দিনের সংখ্যা
অত্যন্ত, ধর্মব্য নয়। তাই, তাহা দেখিয়া
অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিত, কেহ
বী মুখের উপরেই বলিয়া বসিত—‘মাণিক-
জোড়’—!

কিন্তু তাহার রাগিত নী, বরং হানির
কথা মনে করিয়া ‘হানিত এটে কথাটা
সুরিয়া ফিরিয়া, পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া
প্রেমেন্দ্রের বোধি পঙ্কজিনীর কানে গেল
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন, কথটা
ভিত্তিহীন নয়। তদবধি তাহারের ছুটিকে
একত্র দেখিলেই তিনিও হানিয়া বলিতেন,
‘মাণিকজোড়’?

অথচ এই দুই বলার মধ্যে কতই না
প্রভেদ। কোথায় প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞপ্তি—আর
কোথায় অভিলম্পনী স্নেহ!

(২)

পঙ্কজিনীর শিল্পতত্ত্ব বড় ভগ্নিপতির
বাড়ী এই জেলাতেই লহর হইতে অনেক
দূরে এক গ্রামে। তিনি মৈমনসিংগ অঞ্চলের
এক নায়েবীতে ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা

অঙ্কের কিছু জমাইবার পর, ভগ্নবাহ্য
পুনরুদ্ধারের জন্ত ছুটি চাহিয়াছিলেন। না
পাইয়া চাকরিতে জবাব দিয়া বাড়ী
ফেরেন। বৎসর না ঘুরিতেই তিনটি
পুত্রসন্তান মরিয়া যাওয়ার বুধন, পিতৃ-
পুরুষের ভিত্তির ঘোষ সম্পর্ক করিয়াছে।
তখন শেষ লম্বল সর্ককনিষ্ঠ সন্তান পাঁচ-ই’
বৎসরের কন্যা আশালতাকে বাঁচাইতে
ভিত্তির মারা ত্যাগ করিয়া নপরিবারে
বাহির হইয়া পড়েন। এদেশ সেদেশ
করিয়া গুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই
লম্ব বর্ধমানের আগিয়া হাজির হন। এবং
পঙ্কজিনীর অমুরোধ লেও লক্ষ্যটা
তেমন অনিষ্টভার নয় বুঝিয়া খোলবাগানে
বালা লইয়াছিলেন। তখন মাঝে মাঝে
পঙ্কজিনী নিজে গিয়া এবং প্রায়ই এই
‘মাণিকজোড়’ ছুটিকে পাঠাইয়া বড়দির
খোঁজ-খবর লইতেন। এই তত্ত্ব ভ্রমার
কারণ ঢাকা কিনা জানিনা, জানি সেই
সূত্রে বড়দির লিখিত নির্মলের পরিচয়
ঘটে এবং প্রেমেন্দ্র ও পঙ্কজিনীর দেখা দেখি
লেও তাঁহাকে বড়দি বলিয়া ডাকিতে
শিখিয়াছিল। ইহাই পূর্বকথা অর্থাৎ
নির্মলের বড়দি বলিয়া ডাকার ইতিহাস।
পরবর্তীকালে, লেখাপড়া শেষ করিয়া
কলিকাতায় আগিয়া নির্মলের চাকরী
গ্রহণের পূর্বে তাঁহার বর্ধমান হইতে
পশ্চিম মুলুকে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাই
বলিয়া মা-বাপ-মহা নির্মলের লিখিত তাঁহারের
পত্র বিনিময় বন্ধ হয় নাই। তাহা বরং

পূর্ববেগেই চলিয়া আনিয়াছিল, তাঁহাদের কলিকাতার আগমন ও আনন্দাতিশয্যে নির্মলের মহাকলরবপূর্ণ অভ্যর্থনার পূর্বদিন পর্য্যন্ত। বাহার বেগ ক্রমাবধি কমিয়া আনিয়া ইহানীং একেবারেই থামিয়া গিয়াছিল তাহা সেই মাণিকজোড়ের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদানটা।

সুতরাং কোন এক বছর বিবাহোপলক্ষে নির্মল পাঁচ-সাত দিন বাহিরে কাটানোর পর রাত্রি প্রায় দশটার সময় মেলে ফিরিয়া আসে। আলিতেই বড়দির ছইখানা চিঠি দেখিয়া যত না বিস্মিত হইল তার অনেক বেশী হইল প্রেমজের একখানার। প্রেমজ তাহাকে এতদিন পরে আপন গরজে চিঠি দিবেছে! ব্যাপার কি? খাম ছিড়িয়া দেখিল, গোড়ার দিকে যথালম্বব লক্ষ্যে কুশল-প্রশ্নাদি সারিয়া স্বীকার করিয়াছে নিজের দোষেই তাঁহাদের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারপর লিখিয়াছে,—

হরিদ্বার হইতে আনিয়া বড়দিহঁদের কলিকাতার পৌছানোর সংবাদ পাওয়ার পর হইতে বৌদি আমাকে বড়দির নিকট পাঠাইবার জন্ত কি যে না করিয়াছেন তাহা বলিবার নয়। তিনি যে এতকাল চূপচাপ ছিলেন তার একমাত্র কারণ বোধ হয়, এখান হইতে হরিদ্বারের দূরত্বটা। সে কথা যাক্।

প্রথম প্রথম ভাবিয়া পাইতাম না, বৌদির এত তাড়া কেন। জিজ্ঞাসা করিলে পরিহাস-ভলে একদিন উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহা আর কিছু নয়, আমার প্রতি বড়দির দৃষ্টি আকর্ষণের কৌশল। কি জানি যদি মনোমত হইয়া যাই, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাধে জমানো লক্ষী ও কল্যাণ স্বরস্বতী...এ ছই-ই লাভ করা নাকি আমার পক্ষে অসম্ভব

নয়। অমত করিবার মত কিছুই দেখিতে পাই নাই। একান্ত লজ্জাবশেই বৌদির আদেশ আরও চ'মাল ঠেলিয়া কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ পর্য্যন্ত আনিয়াছিলাম কিন্তু ছুটি হইলে আর পারা গেল না, যাইতে হইয়াছিল।

বড়দির মুখেই শুনা গেল, তুমি আমার বড়দিকে উঁচু হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে পিচন দ্বিবে নিঃশব্দে আগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ কাঁধ ধরিয়া মেঝেতে বসাইয়া দাও। কখনো বা সেই টাল সামলাইতে না পারিয়া বড়দি চিংপাত হইয়া সম্মুখে পড়িয়া যান এবং হাসিমুখে উঠিয়া বসিয়া—বঁহরমুখের আলার আর পারি নে, মুখপোড়ার এখেনা ছেলেমানুষী গেল না, ইত্যাদি প্রকারের মেহলিন্ত মিষ্টি-মধুর লজ্জাবলে মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। জামাইবাবুর মত গভীর মানুষ, বাহার লুহিত কথা বলিতে আমার ভয় হয়, ঝি-চাকর সর্বদা লক্ষ্য থাকে, তিনি নাকি তাহা দেখিয়া হালেন! আবার তাঁহারই সহিত তাঁহার বেগুনা বড়দির 'নয়নভারা' নাম লইয়া তুমি নাকি হালাহালি কর! দেখিয়া শুনিয়া বৃষ্টিতে কাকী রইল না যে,

তাঁহাদের এ লকল কথা যেমন লভ্য তেমন আনন্দের। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তুমি তাঁহাদের বৃকের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছ। সুতরাং আমি নিঃশব্দে হইয়াছি, অদূর ভবিষ্যতে তুমিই আশালতার স্বামী।

নারীর দৃষ্টিরিত্ততা সম্বন্ধে তিল-পরিমাণ কথা বৃহত্ত্বকের মধ্যে তাল হইয়া বিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তলে ভিজিয়া, ফুলিয়া কাপিয়া তীর্থপাক্তির হইয়া দাঁড়ায়। তাই তাহার সহিত আমার স্মৃতিত বাবহারের কথা তোমাকেই খুলিয়া বলা দরকার। তাহা এইবার লিখিতেছি,—

পৌছিয়াছিলাম অনেক 'রাত্রে। পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিলে আশালতাকে দেখিয়া চিনিতে পারি নাই। প্রায় চ'-নাত বৎসর পূর্বে যে, আশালতাকে এখানে খোঁসবাগানে দেখিয়াছিলাম সেই ঘরে যে এমন সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী হইতে পারে তাহা আমার ধারণার সম্পূর্ণ বাহিরে ছিল। তাই আশালতাকে পাড়ার অগ্র কোন ঘরে মনে করিয়া তাহার সহিত আমার প্রথম দর্শনটা পাচকে হইয়া গেল। সে

• হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন



—প্রোগ্রাম—
তিমকড়ি চক্রবর্তী
মমোরগন ভট্টাচার্য

—পরিচালক—
তিমকড়ি চক্রবর্তী

—প্রোগ্রাম—
অহীন্দ্র চৌধুরী
শিবাবালা

বারান্দার রেলিং বুঝিয়া নীচের দিকে এবং মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখপানে চাহিয়া হালিয়া ফেলিতেই সেও হালিল, হালিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল এবং তাহার সেই হালি দেখিয়া আমার চোখে পৃথিবীর রং হইয়া গেল অজ্ঞ একরকম।

অল্পক্ষণ পরে সে আবার বড়ঘর লহিত আসিল, দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। আমার বাঁকা হালির অর্থ বুঝিয়া বলিয়া ছিল নাকি? বড়ঘর আমার লহিত আবার তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়া, কথা কহিতে বলিয়া, আমাকে শয্যাভ্যাগের আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন বুঝিলাম এ-ই আশালতা, পাড়ার অজ্ঞকেহ নহে। বুঝিলাম বটে, কিন্তু মন মানিল না; মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম।

আশালতা কিন্তু এতটুকু অপ্রতিভ হইল না। সে মুখ তুলিয়া হালিমুখে বলিল, “তুমি মাঝা হও?” লম্বকটা স্বীকার করিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় সে চোখ পাকাইয়া মুখ টিপিয়া হালিয়া কহিল, “ইস্! মাঝা না আরো কিছু! হাধার বন্ধু—বাধী হয়?”

একবার উদ্বেগ বুঝিলাম। পাছে আমি বলিয়া বলি, “হাঁ, আমি তোমার মাঝা হই,” তাই আমার উত্তরের অপেক্ষা করিল না। আমার প্রথম দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া পথ পরিষ্কার রাখিতে চায়। নইলে মাঝা বলিয়া ডাকিয়া যারের আদেশ পালন করিয়া অজ্ঞ কোনো কথা কহিত। বলিয়া ফেলিলাম,

“যা বলেই ডাক না কেন মনের কথাই লার। ইচ্ছেটা কি বল দিকি?”

আশা মুখ টিপিয়া হালিয়া কহিল, “মনের কথা কি আবার।”

মনে পড়িয়া গেল, এক শ্রেণীর মানুষ আছে বাহ্যিক ভিতরে সুপক্ক হইয়া বাহিরে অপক্কের অভিনয় করে অর্থাৎ ছেলেমানুষী দেখাইয়া উদ্বেগ সাধনের অধিক সময় এবং সুযোগ খুঁজে। কাব্যিক ভাষার তাহারাই নাকি বর্ণচোরা আম। এই আশালতা সেই শ্রেণীর। আরো—

পড়িয়া নির্মল বুঝিতে পারিল, এইখানেই প্রেমেন্দ্রের মন্ত বড় ভুল। আশালতা মুখ টিপিয়া ছাড়া অত্যধিক আনন্দেও—হা হা করিয়া বড় একটা হাসেনা। যে মুখভঙ্গী দেখিয়া প্রেমেন্দ্র নিজেকে হারাইয়া ফেলিল, তাহা তাহার প্রকৃতিগত একটা স্বভাব। বালিকা মূলভ গিন্নীপনা দেখাইতে আশা কারণে অকারণে ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকে। বুঝিয়া নির্মল কোনরকমে হালি চাপিয়া পড়িতে লাগিল।—

আরো মনে হইল, আশালতার কথা এবং কথা বলার এই মুখভঙ্গী ছাড়া নারীর প্রণয় নিবেদনের কি অন্যলী তার থাকতে পারে? ইহাই তো তাহার অন্তরের ইচ্ছা প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ও প্রমাণ! আমার দেহ মুহু মুহু কাঁপিতেছিল,—জগৎসংসার তুলিয়া গেলাম। হারাইয়া ফেলিলাম নিজের কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান। মুহুচোখে চাহিয়া তাহাকে ধরিতে বাইতেই সে ঘরজার দিকে ছুটয়া গেল। সেই সময় বড়ঘর একহাতে জলভর্তি গ্লাস ও অজ্ঞহাতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া এই ঘরেই

আসিতেছিলেন। আশালতা ঘরজা পার হইয়া বারান্দার তাঁহার কোলের কাছে হুড়ি খাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড়ঘর যা কিছু লব ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়িয়া গেল। তিনি তাহার গিঠে শুন্ শুন্ করিয়া ছুইটা কীল কলাইয়া দিলেন, কহিলেন, “দিনরাতই কি ছোটোপাটা করতে হয়? দশ-বারো বছর বয়স হ’তে চলল এখনো যেন সেই কচি খুন্! বাঁধরের জালায়, রাজ্যের জিনিষ আমার ভেঙ্গে নষ্ট হচ্ছে বিন-বিন।” বলিয়া তিনি ঝিকে ডাকিয়া লেগুলা পরিষ্কার করিতে বলিয়া, চাকরকে ডাকিয়া আঁচল হইতে পরমা দিয়া আবার কি-কি আনিতে হইবে বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

ঘরজার ধার হইতে চক্কর পলকে সরিয়া গিয়া ঘরের এককোণে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমার দিক দিয়া কোন প্রকারের সন্দেহ আসিল না দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তখনো আমার মুখ ধোয়া হয় নাই মনে পড়িতেই ঘরের বাহিরে গিয়া বলিলাম, “কাথার মুখ ধোব বড়ঘর।” বলিয়া নিজেকে লকল সন্দেহের বাহিরে আনিয়া ফেলিলাম।

(৩)

তারপর লম্বা দিনটার মধ্যে আশাকে একবারও একা পাওয়া গেল না, রাত্রিটা গেল চুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়া। পরদিন সকালেই বড়ঘর আমাকে জলযোগ করাইয়া তোমার মেলে পাঠাইলেন, তুমি বন্ধু বিবাহ দিয়া ফিরিয়াছ কিনা খবর লইতে। হর্জিপাড়ার এমন গলি থাকিতে পারে, আমার জানা ছিল না। অনেক খোঁজা-



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

মেট্রোপলিটন থিয়েটার
হাস্যরহস্যচরিত্র



হাল-বাঙলা

হাল-বাঙলা শুধু
মানুষের অক্ষমতা
ও অসঙ্গতি লইয়া
কৌতুক বা ব্যঙ্গ নয়

কৌতুক...
রহস্য...
প্রণয়...
বিদ্বেষ...

দুরন্ত প্রবহমান আধুনিক জীবনের অকারণ
এবং অবাস্তব গতি ভঙ্গিমার একটি সরস বিবরণ;
আপনার, আমার এবং আরও অনেকের
আতিশয্যের শুধু সমালোচনা নয়...

রহস্য-চতুর্ন অভিব্যক্তি -

হাল-বাঙলার এই অভিনব চরিত্র চিত্রণে যাহাদের
সাহায্য চাইতে হইয়াছে,

ছান্না দেবী, শীরেন গাঙ্গুলী, চন্দ্রিকা, তুলসী লাহিড়ী,
মহাদেব পাল, মৃণাল ঘোষ, প্রভাত সিংহ, ফণি রায়,
সত্য মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, বীণা বসু,
পদ্মাশ্রী, শীরেন পাত্র, সম্ভাষ সিংহ, হরিন্দাস
বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন চক্রবর্তী, রঞ্জিত রায়, গোপাল
সেন গুপ্ত (অঙ্ক গায়ক) প্রভৃতি

বি, এল, থেমকার, প্রযোজনায়...

ইফ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ফু ডিওএ গৃহীত...

রূপবাণীতে

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার, ১২ই মার্চ

খুজির পর তোমার আস্তানা বাহির করিলাম। ভূমি নাই শুনিয়া খুলী হইতে আমার বাধিল না। কেন, আশা করি তাহা তোমার কল্পনাভীত নয়। কিন্তু লিখিতে আমার লজ্জা করে। প্রান্তবেহে ঠনঠনিয়ার বড়হির বাসার কিরিয়া ঘড়ার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বেলা বেড়টা। স্নানাহার শেষ করিতে আড়াইটা বাজিয়া গেল। আমার আজিকার এই অনিয়মের জন্ত বড়হি তার মত প্রকাশ করিলে, নানন্দে চাহিয়া দেখি আশা বিষয়। বুঝিলাম আমাকে একা না পাওয়াই হইবার একমাত্র কারণ। বুঝিয়া কি যে স্ত্রী হইলাখ তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার জানা নাই। আশাকে খুলী করিবার স্রবোগ বুঝিতে লাগিলাম, কিন্তু মিলিল না। একবার লন্দেহ হইল, আমার মনের গোপন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আমার ও আশার উপর কোজদারী চলে নাইত? কিন্তু আমার সেই আনন্দের কাছে এই লন্দেহটা সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়া গেল বলিয়া একথা একটাবারের জন্তও মনে পড়িল না, মেলে তোমার অনুপস্থিতির কথা শুনিয়াও আশা বিষয় হইলেও হইতে পারে।

বৈকালে জাহাইবার লহিত আশা বেড়াইতে গেল। আমি কিছুক্ষণ ভাবিয়া একরকম নিজের মান বাঁচাইতেই বেড়ানোর ছলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিরিলাম লক্ষ্যার পর। ফিরিয়া শুনিলাম আশা এখনো কিরে নাই, ফিরিল রাজি প্রায় লাড়ে নটায়। তখন আমি আহায়াহি লারিয়া শয়নকক্ষের আলো নিভাইয়া লবেমাত্র শুইয়াছি।

(ক্রমঃ)

বিশ্বাস করুন বা নাই করুন

দেশের মাটি চিত্রে অজয়ের ভূমিকার দুর্গাধাল বন্দোপাধ্যায়ের বয়স যেন ২০ বছর কমিয়া গিয়াছে। লজ্জা বিলাত ফেরত বাঙ্গালী যুবক দেখিয়াছেন? দুর্গাধালের লহিত তাহার কোনই তফাৎ নাই। কথার বার্তার হাবভাবে সে খাঁটি যুবকের মতই ব্যবহার করিতেছে।

চন্দ্রাবতী অজয়ের বোন। মানাইয়াছেও চমৎকার। চন্দ্রাবতীর শিক্ষা আছে, সে শিক্ষিতা। দেশের ভূমিকার যে অভিনয় করিতেছে, তাহা অজ্ঞ কাহারো দ্বারা সম্ভব হইত না। ভূমিকার লহিত মনের পরিচয় না থাকিলে তাহা পর্দার গায়ে লম্বাক প্রকাশ করা অসম্ভব। অরুণার ভূমিকা চন্দ্রাবতী যেভাবে করিতেছে, তাহাতে স্পষ্টভাবেই চন্দ্রাবতীর মনের শিক্ষা এবং কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

একমাস গ্রামে বাস করিয়া, চাবীঘের লহিত মাঠে কাজ করিয়া আজ সারগল হইয়া গিয়াছে একেবারে বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর মনের আশা, কল্পনা, সব কিছুই আজ সারগলের মনে চিরকালের জন্ত বাসা বাধিয়াছে। তাই আজ আমরা অশোকের ভূমিকার বাহাকে দেখিতে পাইবো, সে হইবে খাটি বাঙ্গালী। বেশ সেবাত্রতে নিযুক্ত বাঙ্গালী যুবকের প্রতীক।

উমা আজ যে ভূমিকার আমাদের “দেশের মাটি” চিত্রে দেখা দিবে—তাহা কল্যাণময়ী

গ্রামের বালিকার রূপ। বাংলার গ্রামে আমরা যে নারীকে দেখিতে পাই, যে নারী সেবার আত্মপর ভেদ করে না, যে নারী প্রয়োজন হইলে সমাজের লকলের বিকক্ষে একা দাঁড়াইতে পারে, উমা আজ সেই বাংলার মহীয়সী নারীর ভূমিকার আলিভেছে। মেহ মমতার পূর্ণ সেই বহুদিনকার ভুলিয়া যাওয়া বাঙ্গালার মেয়েকে আমরা আবার দেখিতে পাইব—অপরূপ এক মঙ্গলময়ী সেবাত্রতা নারীর রূপে।

অমর মল্লিককে চেনেন? নিশ্চয়ই চেনেন। তিনি আজ দেশের মাটি চিত্রে গ্রামের সমাজপতি যজ্ঞ চক্রবর্তীর রূপে দেখা দিবেন। গ্রামের সমাজপতিরা কি রকম লোক—তাঁহাদের স্বভাব কি প্রকার তাহা বাহারা গ্রামের দিকে একবার চোখ দিয়াছেন, তাঁহারা ই জানেন। অমর মল্লিক সেই সমাজপতির ভূমিকার অভিনয় করিতেছেন মাহুষের অন্তরে যথাস্থানে আঘাত করিতে পারিলে তাহার কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়, তাহা এই যজ্ঞ জীবনেই দেখিতে পাইবেন। অমর মল্লিক ছাড়া অজ্ঞ কেহ এই আশ্চর্য্য অভিনয় এমন লভ্যভাবে করিতে পারিতনা।

অন্ধ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পরিচালক নীতীন বসু আজ এক নতুন জগতের রূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। নীতীন বাবু এমন অদ্ভুতভাবে গ্রামের নির্ঘ্যাচিত কুঞ্জের কথা কৃষ্ণচন্দ্রকে বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছেন যে কৃষ্ণচন্দ্র নিজের জীবনে তাহা অতি অপরূপ ভাবে ফুটাইয়া

তুলিয়াছেন। যখন যে লেটে কাজ হয়, কৃকচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না। অক্ষও যে তাহার মনের চোখ দিয়া জগতের বহু কিছু দেখিতে পায়— কৃকচন্দ্রই তাহার নিদর্শন। অতি মনোহর নিদর্শন ॥



(সি, বি)

সঙ্গীতের মধ্যস্থিরা কেমন করিয়া চিত্রের গতি বৃদ্ধি করা যায়, তাহা দেশের মাটি চিত্রের সঙ্গীতে প্রকাশ পাইবে। ইতিপূর্বে আমরা বহু চিত্রে দেখিয়াছি যে, সঙ্গীত আরম্ভ হইবা মাত্র চিত্রের কাহিনীর গতি হয় বন্ধ হয়, নয় ত 'স্বাভাবিক পথ হারায়। কিন্তু দেশের মাটি চিত্রের সঙ্গীত সংস্থাপন এমন ভাবে হইতেছে, যাঁহাতে কাহিনী বিন্দুমাত্র থামবে না, বরং ইহার স্বাভাবিক গতি আরো থরতর হবে। উমা, লায়গল এবং কৃকচন্দ্র এবার এমন কতকগুলি গান গাহিবেন, যাঁহা "সুজির" সঙ্গীতকেও বহু পরিমানে ছাড়াইয়া যাইবে।

আমাদের মধ্যে এমন বহুজন আছেন যাঁহারা গ্রামের নাম শুনিলে ভয় পান। তাঁহারা মনে করেন যে, গ্রামে মানুষ বাস করিতে পারে না। দেশের মাটি চিত্রের বহু অংশ গ্রামের এবং গ্রামবাসীদের লইয়া। এই চিত্রে দেখা যাইবে যে গ্রামেও মানুষ বাস করিতে পারে, এবং শহরের অপেক্ষাও ভাল ভাবেই গ্রামে বাস করা যায়। কিন্তু বাস করিতে জানা চাই। গ্রামকে কি করিয়া সত্যকার প্রাণদান করা যায়, তাহা দেশের মাটি চিত্রে অন্তত কিছু পরিমাণে বুঝা যাইবে। গ্রামের মধ্যে কি শৌন্দর্য, কি প্রাণ এবং দেশের কি পরিমাণ আশা ভরসা আছে, তাহার বহু আভাসও এই চিত্রে পাওয়া যাইবে।

শহরে লোককে দিয়া গ্রামবাসী চাষীর

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম গত লাফে তিন মাস ধরে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ক্রিকেট খেলে দেখলিকে ভালপাড় করে বেড়িয়েছেন। তাঁরা এদেশে এলেন হাজারি হয়েছিলেন গত ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে এবং গত মাসের ১৮ই তারিখে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য জাহাজে চড়েছেন। তাঁদের এই ভারত ভ্রমণে এদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যে কতখানি খেলার উন্নতি করলেন কিংবা তাঁদের কাছ থেকে কি শিক্ষা লাভ করলেন তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও এখানকার ক্রিকেট প্রচারকের যে উপকার হয়েছে তা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে, কারণ অভিনয় করাইতে কি পরিমাণ কষ্ট এবং পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পরিচয় দেশের মাটি চিত্রে পাইবেন। শহরের মাঝখানে ষ্টুডিওতে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করার কার্যও যে কত ভয়ানক কষ্টকর তাহাও দেশের মাটির কুটীর দৃশ্যগুলিতে দেখিতে পাইবেন। এই সকল লেটগুলিতে শহরের সকল চিহ্ন একেবারে হুইয়া হুটিয়া কেলা হইরাছে। লেটের মধ্যে যাহারা অভিনয় করিতেছে, তাহাদের কথায়-বার্তায় পোষাকে পরিচ্ছদে তাহাদের শহরের লোক বলিয়া বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। এমন কি উমাকেও বর্তমানে আমাদের সেই বহু পরিচিতা উমা বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না।

ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলার কর্তারা তাঁদের সেই উদ্দেশ্যে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে এদেশে আনিয়াছেন। আর্থিক দৃষ্টি দিয়ে কারা যে বেশী লাভবান হল তা বলা শক্ত তবে ভারতের ক্রীড়াবোদীগণ হজুকে পড়ে যে বেশ কিছু খরচা করতে বাধ্য হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লর্ড টেনিসন ভারতের উপকূলে পাই দিয়েই বলেছিলেন যে এর আগে তাঁর টীমের মত শক্তিশালী ক্রিকেট টীম ভারতে আর কখনও আসেনি এবং সেই কারণে ভারতের ক্রিকেট-প্রিয় ব্যক্তিগণ এই ভেবে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের অর্থের বিনিময়ে জনকতক নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খেলা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং ভারতীয় ক্রিকেট খেলার উৎসাহিতার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

ভারতবাসীদের এই সুযোগ দেবার জন্য বোম্বাইয়ের 'ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া' উভোক্তা হওয়ার জন্য সকলদিক কাঁচ থেকে ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে 'রাবার' জ্বলাত করে লর্ড টেনিসনের পূর্ব ঘোষণা কতকংশে সাক্ষ্যলাভ করেছে। তাঁরা ১৯৩৭-৩৮ সালের এই ভারত ভ্রমণে ষোল ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছেন। আর তাঁরা আটটি খেলার জয়লাভ করেছেন, এগারটি খেলা অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে এবং পাঁচটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছেন। এই খেলাগুলির মধ্যে একটি খেলার তাঁদের এক ইনিংসে জয়লাভ এবং আর একটি

খেলায় এক ইনিংলে পরাজয়ও ঘটেছে।
সমস্ত খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হোল।

১। লর্ড টেনিসনের দল ৩৯৯ এবং ১
উইকেটে ৩৭—বরোহা দল ১৭৭ রাণ—
অমীমাংসীত ভাবে খেলা শেষ।

২। লর্ড টেনিসনের দল ৩০৩ এবং ০ উইকেটে
৮৮ রাণ—দিকুপ্রাধেশ ৩৪৮ এবং ৫ উইকেটে
৮৩ রাণ (ডিক্লোর্ড) অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

৩। লর্ড টেনিসনের দল ২২৫ এবং ২
উইকেটে ২৩ রাণ—উত্তর পশ্চিম লীমাস্ত
প্রাধেশ ৮০ এবং ১৬৭ রাণ। আগন্তুক দল
৮ উইকেটে বিজয়ী।

৪। লর্ড টেনিসনের দল ৮ উইকেটে ৩৭৬
রাণ (ডিক্লোর্ড) এবং ৩ উইকেটে ১০৮
রাণ—ভারতীয় ইউনিভার্সিটি দল ১৩৯ রাণ।
অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

প্রথম টেস্ট ম্যাচ

৫। লর্ড টেনিসনের দল ২০৭ এবং
১ উইকেটে ১১৪ রাণ—নিখিল ভারত
দল ১২১ ও ১৯৯ রাণ। আগন্তুক
দল ৯ উইকেটে বিজয়ী।

৬। লর্ড টেনিসনের দল ২১২ এবং ১১২
রাণ—রাজপুতানা দল ২৩৭ এবং ৮ উইকেটে
৮৯ রাণ। রাজপুতানা দল দুই উইকেটে
বিজয়ী।

৭। লর্ড টেনিসনের দল ৪২০ রাণ, শুজরাট
দল ২১১ এবং ৯ উইকেটে ২২৮ রাণ।
অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

৮। লর্ড টেনিসনের দল ১২৬ এবং ২৬৯
রাণ, নব নগর দল ২০৬ এবং ৭ উইকেটে
২২৩ রাণ (ডিক্লোর্ড) নবনগর দল ৩৪
রাণে বিজয়ী।

৯। লর্ড টেনিসনের দল ৩১৯ এবং ২
উইকেটে ৪২ রাণ—মহারাজা দল ২৭৩ রাণ।
অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

১০। লর্ড টেনিসনের দল ৩৭৬ রাণ—ক্রিকেট
ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া ১৮৯ এবং ৫ উইকেটে
২৯৭ রাণ অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

১১। লর্ড টেনিসনের দল ১৯১ এবং ৪
উইকেটে ১৭১ রাণ—নিখিল ভারতীয় দল

১৫৩ এবং ২০৮ রাণ। আগন্তুক দল হয়
উইকেটে বিজয়ী।

১২। লর্ড টেনিসনের দল ১৪৫ এবং ৭
উইকেটে ২০১ রাণ (ডিক্লোর্ড)—বুজুপ্রাধেশ
দল ১৫৪ এবং ১ উইকেটে ৬৭ রাণ।
অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

১৩। লর্ড টেনিসনের দল ১৯২ এবং ৪
উইকেটে ১২৬ রাণ—মধ্যভারত দল ১৯১
এবং ৯ উইকেটে ১৮২ রাণ (ডিক্লোর্ড)
অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

১৪। লর্ড টেনিসনের দল ৬ উইকেটে ২১১
রাণ—বিহার দল ৩৪ রাণ। আগন্তুক দল দল
উইকেটে বিজয়ী।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ

১৫। লর্ড টেনিসনের দল ২৫৭ এবং
১৯২ রাণ নিখিল ভারতীয় দল ৩৫০
এবং ১৯২ রাণ—নিখিল ভারতীয়
দল ৯৩ রাণে বিজয়ী।

১৬। লর্ড টেনিসনের দল ৩১৬ এবং ১
উইকেটে ১২১ রাণ (ডিক্লোর্ড)—
কুচবিহারের মহারাজার দল ১৬৭ এবং
৮৩ রাণ। আগন্তুক দল ১৮৭ রাণে বিজয়ী।

১৭। লর্ড টেনিসনের দল ৯ উইকেটে
৪৪৫ রাণ (ডিক্লোর্ড)—পাতিয়ালায়
মহারাজার দল ১৪২ এবং ৫ উইকেটে
২৬৪ রাণ। অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

১৮। লর্ড টেনিসনের দল ৬ উইকেটে
৩৫৩ রাণ (ডিক্লোর্ড)—হিম্মী দল ৭
উইকেটে ৩০৭ রাণ। অমীমাংসীত ভাবে
শেষ।

১৯। লর্ড টেনিসনের দল ৯ উইকেটে
১৫১ রাণ (ডিক্লোর্ড) এবং ২ উইকেটে
৩৯ রাণ—মধ্যপ্রাধেশ এবং বেরার দল ৭৬
এবং ১১২ রাণ। আগন্তুক দল আট
উইকেটে বিজয়ী।

২০। লর্ড টেনিসনের দল ৮ উইকেটে ৪৪৮
রাণ (ডিক্লোর্ড) এবং ৫ উইকেটে ৩২৪

রাণ—মাজাজ প্রাধেশ ৩০৫ রাণ।
অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

২১। লর্ড টেনিসনের দল ১৪৮ এবং ২৯৩
রাণ—নবাব মণিউদৌলার দল ৩১৭ এবং
৪ উইকেটে ১২৭ রাণ। নবাব
মণিউদৌলার দল হয় উইকেটে বিজয়ী।

২২। লর্ড টেনিসনের দল ৬ উইকেটে
৩০৫ রাণ (ডিক্লোর্ড)—মাইশোর দল
৮৩ এবং ১৪১ রাণ। আগন্তুক দল
এক ইনিংস এবং ৮১ রাণে বিজয়ী।

চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ

২৩। লর্ড টেনিসনের দল ৯৪ এবং ১৬৩
রাণ—নিখিল ভারতীয় দল এক ইনিংস
এবং ৬ রাণে বিজয়ী।

পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ

২৪। লর্ড টেনিসনের দল—১৩০ এবং ২৮৮
রাণ—নিখিল ভারতীয় দল ১৩১ এবং ১৩১
রাণ। আগন্তুক দল ১৫৬ রাণে বিজয়ী।

ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

ভারতীয় খেলোয়াড়গণ

ডি, বি বেত্তধর—১১৮ রাণ (মহারাষ্ট্র)
মৃত্যাক আলি—১০১ রাণ (নিখিল
ভারতীয় দল)
এল, অমরনাথ—১২৩ রাণ (নিখিল
ভারতীয় দল)
এল, অমরনাথ—১০৯ রাণ (নটআউট)
(পাতিয়ালায় মহারাজার দল)
এল, অমরনাথ—১২১ রাণ (নবাব
মণিউদৌলার দল)
ডি, আর হাতেওয়ারা—১০৬ রাণ
(পাতিয়ালায় মহারাজার দল)
ভিহু মানকাদ—১১৩ নটআউট (নিখিল
ভারত দল)

লর্ড টেনিসনের দলের

খেলোয়াড়গণ

পি, এ গিব—১০৫ রাণ বনাম বরোহা দল।
পি, এ গিব—১৩৬ রাণ (নটআউট)
বনাম শুজরাট দল।

পি, এ গিব—১১৭ রাণ বনাম দিল্লী হল।
এডরিচ ১৪০ রাণ (নট আউট) বনাম
সিদ্ধু প্রদেশ এবং ১৩০ রাণ (নট আউট)
বনাম মাজাজ প্রদেশ।

হার্ডটাক ১০০ রাণ বনাম ভারতীয়
ইউনিভার্সিটি হল।

হার্ডটাক ২১৩ রাণ বনাম মাজাজ প্রদেশ।
লর্ড টেনিসন ১১৮ রাণ বনাম সিদ্ধু-
প্রদেশ।

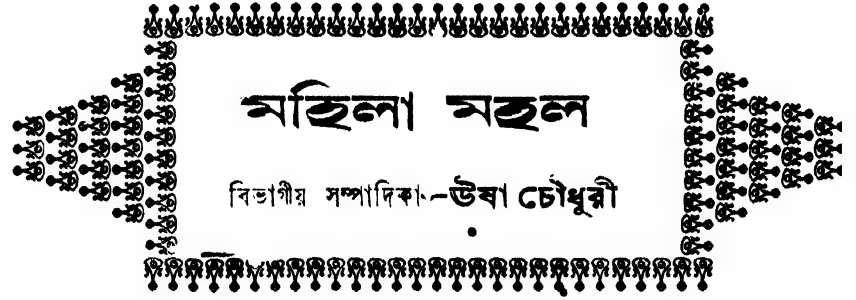
ল্যাংগ্রিজ ১০৮ রাণ বনাম ভারতীয়
ইউনিভার্সিটি হল।

ল্যাংগ্রিজ ১৪৪ রাণ বনাম ক্রিকেট
ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া।

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম ভারত
প্রদেশে আসার আগে আরও তিনবার
বিদেশী ক্রিকেট টীম ভারতবর্ষে খেলতে
আসেন। ১৯২৬-২৭ সালে আর্থার
গিলিগানের নেতৃত্বে মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট
ক্লাব এই আগমনের সূচনা করেন। তাঁরা
মোট ৩৪টি ম্যাচ খেলেন। তার এগারটি
ম্যাচে তাঁরা জয়লাভ করেন এবং তেইশটি
খেলা অসমীমানীতভাবে শেষ হয়।

১৯৩৩-৩৪ সালে বিখ্যাত ক্রিকেটার
ডি আর জার্ডিন্ একটি ক্রিকেট টীম
ভারতবর্ষে আনেন। তাঁরাও মোট চৌত্রিশটি
ম্যাচ খেলেন। তাঁরা খেলাটি খেলার
জয়ী হয়ে এবং সতেরোটি ম্যাচ অসমীমা-
নীতভাবে শেষ করে একটি খেলার পরাজয়
স্বীকার করতে বাধ্য হন।

১৯৩৫-৩৬ সালে আর একটি বেশরকারী
অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীম ভারতে আসে।
জে এস রাইডার এই টীমটির অধিনায়ক
ছিলেন। তাঁরা মোট তেইশটি খেলার
মধ্যে এগারটি খেলার জয়ী হন
এবং তিনটি ম্যাচে পরাজিত হন।
বাকী নয়টি খেলার কোন দলকেই অসম্মান
স্বীকার করতে হয়নি।



মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা-উষা চৌধুরী

গত সংখ্যায় অর্থসমস্যার সঙ্গে সমিতির
উপকারিতা লক্ষ্যে ব্যক্তিগত আলোচনা
করেছিলাম—যেটা কয়েকজন মহিলার কাছে
বিপুল আকর্ষণের মাঝখানে কীণ আলোক-
রশ্মি বলে মনে বিশ্বাস হয়ে থাকে। সেই
বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা শিল্পপ্রদার
এবং সেই শিল্প বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বস্ত্রবান।
টীকা মহিলা সমস্যার সমিতি তারমধ্যে
অন্তর্ভুক্ত।

দুঃখের বিষয় অর্থনৈতিক আবহাওয়া
প্রতিকূল থাকায় মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য পিছ
হতে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছে। আজকাল
ধনী নরনারীর লক্ষ্যভুক্ত আশামুরূপ না থাকায়
প্রতি সমিতির মধ্যে অভাবগ্রস্তা নারীর জীবন
এত দুঃস্বপ্নগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বেকার
পুরুষের সংখ্যাগিক হ্রাসেও বহু নারীর
সংসার-জীবন চরম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু
আজ কত নারী কত রকম বিস্তার দ্বারা স্বাধী-

১৯২৬—২৭ সালে নিখিল ভারতীয়
দলের সঙ্গে এম পি সি দলের খেলাটি
অসমীমানীতভাবে শেষ হয়।

১৯৩৩—৩৪ সালের তিনটি টেস্ট খেলার
মধ্যে বিলাতী দলটি দুইটি খেলার জয়ী
হন এবং একটি 'ড্র' হয়।

অস্ট্রেলিয়ান দলটি ১৯৩৫—৩৬ সালে
নিখিল ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে চারটি
ম্যাচ খেলেন। নিখিল ভারতীয় দল
দুইটিতে জয়লাভ করেন এবং জে, এস
রাইডারের দলটি দুইটি খেলার জয়ী হন।

পুত্র, সংসার প্রতিপালন করতে পারিছে,
কত বিধবা বেকার পিতা ও ভ্রাতার সংসারে
সাহায্য করতে।

নারীর নারীত্বকে শীলতা ও শালীনতার
আবরণে রেখে; কর্মপ্রেরণার নারী যদি
বহিঃপক্ষে বিশাল কর্মদৃষ্টিতে আপ বিতে
পারে; অর্থাৎ প্রোতসাধনা;—অসংখ্য ক্রীমি-
কীট, অসীম জলরাশি—অন্যন্ত জগৎব্যপ্ত
পিপিল-শৈবালরাশি; কোন কিছুই সেই
উদ্দেশ্যে কর্মদৃষ্টি নারীর গতিরোধ করতে লক্ষ্য
হবেনা—হতে পারেনা। বিধবাহীন পক্ষকে
নারীর সত্য পরিচয়ের লক্ষ্য দিয়ে থাকে।
অচঞ্চলচাহনী নারীর পথ নির্দেশে সত্যের
লক্ষ্য এনে দিতে পারে। অনাড়ম্বর বেশ-
ভূষা নারীর পথ বাজার প্রধান লক্ষ্য হয়ে
বস্ত্রের পথ সূচন করতে সাহায্য করে।

ভগবানে বিশ্বাস না হারিয়ে; নারীত্ববোধ
জাগ্রত রেখে নারী শিক্ষার লক্ষ্যে যতদূরই
যাক না, লক্ষ্যতা তার আনুবেই।

বিশাল জীবন স্রষ্টা এবং স্বামী যে নর,
প্রথমবারে সে আলোচনা করেছি। নৃতত্ত্বের
শিক্ষার প্রচলনে পূরণ ভাবধারা একেবারে
ছেটে কেটে বাধ দিলে গাছ যে উত্তম পরিপুষ্ট
ফল দিতে পারে না, বা পায়ছে না তার
উদাহরণ আমরা স্বীকার না করি—চোখে
দেখতে পাচ্ছি।

উচ্চতর শিক্ষার শিক্ষিতা, উন্নততর
"অন্তরঙ্গ", লক্ষ্যেই পিছনে ফেলা শুচীবাহী-
গ্রন্থ অশিক্ষিতা আত্মজ্ঞানকে পরিষ্কার
পরিচ্ছন্ন ও শোভনীয় সংসারে মার্জিত করে

তুলতে পারে। গড়ালিকা প্রগতির যুগে শিক্ষিতা বোনেদের কাছে এই আশা করার কি সম্ভব আসেনি?

এটা বোধহয় সকলেরই চোখে পড়ে থাকে, সংক্রামিত রোগে পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্যে অঙ্ক হয়ে কত অশিক্ষিতা বা মৃত্যুর যুগে একটির পর একটি শিশুকে তুলে দিচ্ছে। লগ্নে লগ্নে পাড়ার আশে পাশে ময়লা ইত্যাদি কেলে লেখানকার বাতাসকেও দূষিত করবার পক্ষে সাহায্য করছে। চিলেপুণ্ডের মৃত্যুহার প্রতি হপ্তায় কি পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে কাগজ থেকেই সেটা আমরা নিত্য জানতে পারি। সংক্রামক ব্যাধিতে লহর আচ্ছন্ন—তার উপর নারীর অঙ্ক-পরিচর্যা প্রতিবেশী বা আত্মীয় বন্ধুর জীবনে স্বাস্থ্যহীনতা ডেকে আনে।

এই অস্বাস্থ্যকর অঙ্কতা দূর করতে প্রতি নারীকেই লজাগ এবং লচেষ্ট হতে হবে। সংক্রামিত ব্যাধির ধ্বংসলীলা হতে বাঙলার ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে হলে নারীর দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে পরিচ্ছন্ন-সেবাস্থানই লকল কাজের আগে শেখা দরকার। এই লক্ষ্যে নারী বা লম্বিতের পরম্পর লহবোগীতা কত বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা পরে আলোচনা হবে।

লম্বিতের প্রলঙ্গ ডেড়ে এবার আমি আমার বোনেদের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি—তার তাঁদের শিরজ্ঞান লক্ষ্যে আলোচনা করে আলাপটাকে দূর থেকে কাছে নিয়ে আসুন। লকলেরই কিছু না কিছু লম্বতা হালকা হয়ে উঠুক।

রক্তনশির বিষয়ে কিছু জানবার জ্ঞা অনেকেই উদগ্রীব হয়ে আছেন। পূর্ববঙ্গীয় রক্তন কোশল লক্ষ্যে পশ্চিম বঙ্গীয় বোনেরা একেবারেই অঙ্ক। সেজ্ঞা পূর্ববঙ্গীয় বোনেদের এবং মা পিলিমার কাছে এই কোশল আমরা শিখতে চাই—আত্মাধ পেতে চাই। লহরের আবহাওয়ার পরিপুষ্ট ঘেহ

পূর্ববঙ্গীয় রক্তনশির চাতুর্ঘ্যে চিরবঙ্কিত। কালিকলমের ভেতর দিয়া ১৬০।১৬৫ পহের মধ্যে কিছু লনুনা যদি ভেলে উঠে, তাহা হলে অনেক দিনের লোলুপ-আশা কথাকিৎ তৃপ্ত হতে পারে—“হুধের বহলে ঘোলের বাধের মত”।

কিরে বেচু রামা, শ্যামা—কেন হাসি মুখ বলি-পেয়েছি সু না পাবি কোম লুখ নারে পচা, পতা, বামা ওটাই ত লিমুখ তা না হলে পাই কিরে দুখ

ন

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে

ইস্টার্নের ছুটি-১৯৩৮

যাতায়াতী
কনসেসন
টিকিট

আগামী ৮ই এপ্রিল হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত ৬৬ মাইল বা তদুর্দ্ধ দূরত্বের জ্ঞা নিম্নলিখিত হারে যাতায়াতী কনসেসন টিকিট বিক্রয় হইবে। এই টিকিটের ফিরিবার অংশের মরাদ ২রা মে মধ্যরাত্র পর্যন্ত।

১ম, ২য় ও মধ্যম শ্রেণী—১ ১/৩ ভাড়া

তৃতীয় শ্রেণী—(ক) ১ ২/৩ ভাড়া (২০০ মাইল পর্যন্ত)

(ক) ১ ১/২ ভাড়া (২০০ মাইলের অধিক দূরত্বের জ্ঞা)

২০০ মাইলের উপর এবার তৃতীয় শ্রেণীর কনসেসন ভাড়া

বিশেষ কম করা হইল।

অপর্যাপ্ত রেলওয়ে ও স্টামার লম্বের সহিত যোগ রাখিয়াও লকল শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যাইবে। এই টিকিট লইয়া যাতায়াতের পথে যে কোনও স্টেশনে যাত্রা বিরতি করা চলিবে, কিন্তু একটু দিকে একাধিকবার লম্বণ করা চলিবে না।

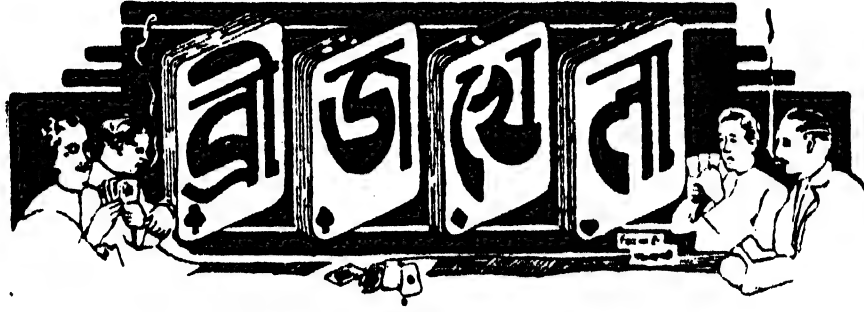
ঈ. বি. আর-এর ছুটির
বৈশিষ্ট্য
আবার সেই
“অবাধ-লম্বণ”
টিকিট

১ম শ্রেণী	৬০/-	টাকা
২য়	৪০/-	টাকা
মধ্যম	১৫/-	টাকা
৩য়	১০/-	টাকা

৮ই এপ্রিল হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত এই টিকিট বিক্রয় হইবে এবং বিক্রয়ের তারিখের পরের দিন হইতে ১৫ দিন পর্যন্ত এই রেলের যে কোন ট্রেনে, যে কোম-স্টেশনে ও রেলওয়ের নিজস্ব ফেরীতে যতদূর ইচ্ছা যাতায়াত ও যথানে যতদিন ইচ্ছা যাত্রা বিরতি করা চলিবে; কিন্তু ২রা মে মধ্যরাত্রির পর এই টিকিট আর চলিবে না।

সচিত্র মনোজ্ঞ পুস্তক
“বাঙলার লম্বণ”
মূল্য আট আনা মাত্র

ঘেহ লম্বণে বাহির হইবার লম্ব একখানি “বাঙলার লম্বণ” লগ্নে লইতে তুলিবেন না। ইহা আপনার লম্বণ-লঙ্গী হার কাজে লাগিবে। বাঙলা ঘেহের যথার্থ পরিচয় জানিতে হইলে “বাঙলার লম্বণ” আপনাকে পড়িতেই হইবে।



শ্রীহরীসংসা

অক্সন ডুপ্লিকেট প্রতি-
যোগীতার একটি হাত :-

কারণ বিপক্ষদের হাতে প্রবেশ করায়,
উপাযোগী তাল হাতে অনেক থাকায়

ইস্কাবন—দশ, চৌকা।

হরতন—গোলাম, আটা।

রুহিতন—টেকা, আটা, ছকা, তিরি।

চিড়িতন—বিবি, লাতা, পজা, চৌকা, তিরি।

ইস্কাবন—টেকা, বিবি, গোলাম, আটা।

হরতন—লাতা, ছকা, তিরি।

রুহিতন—সাহেব, পজা।

চিড়িতন—গোলাম, দশ, নয়।

উ	প	পু
দ		

ইস্কাবন—নয়, ছকা, তিরি।

হরতন—সাহেব, দশ, নয়, চৌকা।

রুহিতন—গোলাম, দশ, লাতা।

চিড়িতন—টেকা, ছকা, তিরি।

ইস্কাবন—সাহেব, লাতা, পজা।

হরতন—টেকা, বিবি, পজা, তিরি।

রুহিতন—বিবি, নয়, চৌকা, তিরি।

চিড়িতন—সাহেব, আটা।

ইস্কাবনে খেলা চলা 'প্রার' স্থানান্তিত
তবে তিনি নিজহলের চিড়িতন রঙটি দাঁড়
করাবার চেষ্টা করতেন, যদি 'ডারি'র
হাতে চোকার উপযুক্ত তাল তাঁর থাকত
অন্তর্ধায় তিনি রুহিতনে তিনটি পিট
করাবার চেষ্টাই করতে লাগলেন।

(৩) 'উ' রুহিতনের তিরি খেললে
'পু' দশ, 'দ' নয় ও 'প' সাহেব দিয়ে
পিট ধরলেন। এবার ডাক্তার খেললেন
যে যদি তিনি রুহিতনের দশের উপর
বিবি খেলেন এবং বিবিখানি যদি দার
বায়, তা'হলে তাঁর পিট পাবার আশা
সবলে নির্মূল হয়ে যাবে। কিন্তু এইখানে
যদি সাহেব পড়ে যায় তা'হলে তাঁর খেলা
হলেও হতে পারে, এরূপ চিন্তা করে তিনি
নয় দিয়ে পিটখানির আশা ছেড়ে দিয়ে
খোঁড়ীর হাতে যাবার উপায় রেখে দিলেন।

(৪ ও ৫) 'প' ইস্কাবনের টেকা ও
গোলাম খেললে 'উ'র চিড়িতনের তিরি
বাতীত আর লকলে ইস্কাবন দিয়ে
গেলেন।

উল্লিখিত হাতে 'দ' একটি ফেরাই ডাক
দেওয়ায় লকলে পাশ দিলেন।
অতঃপর এক ঘরে এক পক্ষ একটির খেলা
করতে সার্থক হয়েছিলেন, অত্র ঘরে অপর
পক্ষ খেলা করতে না পেরে খোঁলারং
দিয়েছিলেন। খেলা হয়েছিল নিম্নরূপ।

(১) 'প' ইস্কাবনের বিবি খেলায় 'উ'
ইস্কাবনের চৌকা, 'পু' ইস্কাবনের 'তিরি'
দিলে, 'দ' ইস্কাবনের সাহেব দিয়ে
পিটখানি ধরলেন।

(২) এবার 'দ' রুহিতনের তিরি
খেললেন; 'প' রুহিতনের পজা, 'উ'
রুহিতনের টেকা এবং 'পু' রুহিতনের লাতা
দিলেন। এ স্থলে ডাক্তার খেললেন
যে ডাক্তারখানী তাঁর খেলা করা বিশেষ শক্ত,

পাকা চুল ও টাক মাথা

• কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে “কনক হেম্মার অয়েল” ও “কনক হেম্মার
লোশন” অতীবী। ইহা ব্যবহারে অচিরেই আপনার চুল মন্থণ ও বৃদ্ধি হইবে। এবং
যে কোন প্রকার কেশ রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হইবেন। কিংবা ডাঃ ডিগোজ (হেম্মার
ডিজিঞ্জ স্পেশালিষ্ট) (লণ্ডন) চিকিৎসাধীনে আলিয়া জটিল কেশ রোগ হইতে মুক্ত হউন।
মূল্য আশাতীত সুলভ করা হইয়াছে।

• • ম্যানুয়াকচারার :-

ডাঃ ডিগোজ কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

৪২ বি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন বি, বি ৪৩৮৬

দি সিটি ব্যাঙ্কিং এণ্ড লোন ডিপার্টমেন্ট হইতে ২৫০ মূল্যের মালিক

৥• আনা সুদের বণ্ড থরিদ করিয়া মালিক আয়ের লংস্থান করুন।

• বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন।

০ (৬) এবার 'প' ইচ্ছাবনের আটা, 'উ' চিড়িতনের চৌকা, 'পু' চিড়িতনের ছরি, আর 'দ' হরতনের তিরি দিয়ে গেলেন।

(৭) অতঃপর 'প' ইচ্ছাবনের ছুরি, 'উ' হরতনের আটা, 'পু' হরতনের চৌকা, এবং 'দ' হরতনের পাঞ্জা হলেন।

(৮) তৎপরে 'প' চিড়িতনের গোলাম খেলেন, 'উ' চিড়িতনের পাঞ্জা, 'পু' চিড়িতনের ছর আর 'দ' চিড়িতনের লাহেব দিয়ে পিট নিলেন।

(৯) 'দ' এবার কহিতনের বিবি খেলেন 'প' হরতনের লাভ, 'উ' কহিতনের ছর ও 'পু' কহিতনের গোলাম দিয়ে গেলেন।

(১০) 'দ' কহিতনের চার খেলেন 'প' হরতনের ছুরি, 'উ' কহিতনের আটা আর 'পু' হরতনের নর হলেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন 'প' হরতনের লাভার পর হরতনের ছুরি দিয়ে 'দ'কে ভর দেখালেন যে, বাতে তিনি হরতনে 'কিনাল' না মেন, কিন্তু যারা ভাল খেলানোর কৌশলিতে অভিজ্ঞ তাঁদের ঠকানো সহজ নয়।

(১১) অতঃপর 'উ' হরতনের গোলাম

রজনীগন্ধা।

শ্রীপ্রিয়ব্রত ঘোষ

হলগুলি নিরুপম হচ্ছে
খুলে যায় নিখিলের স্পন্দে,
অনুদের মস্তে,
ছেড়ে দেয় বিশ্বের লক্ষ্যে
সুরতি যে লক্ষিত ছিল তা'র বকে।
এ অনীম অখিলের কুঞ্জে
প্রতি ছোট পরমাণু গুঞ্জে
অবিরাষ লমণীতিহ্নকে,
অনুপম রূপরস গঞ্জে;
কী মহা-আনন্দে

খেলেন, 'দ' বিবি দিয়ে 'কিনাল' করলেন।

(১২) অতঃপর তিনি টেকা খেল নিলেন।

(১৩) এবং চিড়িতনের লাহেব বা বিবি পিট নিয়ে তিনি লাভখানি পিট ঘেয়ে নিলেন।

কিন্তু অপর ধরে প্রথম থেকেই সুরচিন্তার অভাবে হরতনের 'কিনাল' নিতে গিয়ে ক্রীড়কষর লমণ খেলাটিকে একেবারে পণ্ড করে খেঁদারং দিয়ে গেলেন।

ওঠে সুর, অনাধি অনন্ত,
জীবন্ত বিশ্বের মন্ত্র।
দেই সুর লভিল যে পরাণে,
ভাবা ছিল তা'র প্রতি চরণে,—
বিশ্বজনীন হো'ক মানবের ধর্ম,—
সে বাণীর মর্ম
বা'র, হোলো ব্রতকর্ম
বিশ্বমনের সাথে মন তা'র মিলালো।
জীবনের বীপলিখা দেয় তা'র কী আলো!
প্রতিটি তারার গানে,
প্রতিটি তরুণ মনে
বিশ্ববাণীর বীণা যে বাজে
তা'র ভাবা বা'র মনে বিরাজে
মন তা'র হবে না'ক বুদ্ধ,
তরুণ মস্তে সে যে লিচ্ছ।



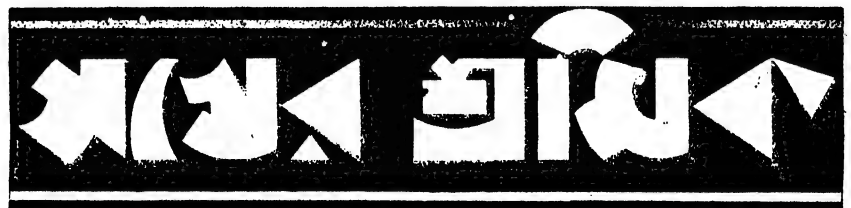
সুজি

সমস্তাগুলি খুবই দামি জিনিষ একথা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু সেগুলিকে নিংড়ে যদি একটু হালকা রসের সৃষ্টি করা যায়, নিশ্চয়ই সেগুলির মূল্য তাতে কমে যায়না।

প্রতীক্ষাকর !

প্রফুল্ল পিকচার্সের অভিনব চিত্র-কথা—

কেশব গুপ্ত বিরচিত



ভেমনি একটি বর্তমান কালের গুরুতর সমস্যার হাস্ত-ভরল পারিপার্শ্বিকের রসমণ্ডিত চিত্র-রূপ



শটে, গামাভিট

উপরে ক্যারল লর্ড ও জন ব্যারিস্টার "টু
কন্ফেসন" ছবি একটি বিশিষ্ট মুক্তি।
—বিখ্যাত বিগান জেফান জাফ

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্ৰবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৬শে ফাল্গুন ১৩৪৪, ১০ই মার্চ ১৯৩৮ } ১০ম সংখ্যা

‘তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করায় যে নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সু-সমাধান হওয়ায় কংগ্রেসমহল ও লাটমহল সন্ত্রস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। কিন্তু তাহার উত্তাপ সম্পূর্ণ নিক্বাপিত হইবার পূর্বেই কংগ্রেসী অনুশাসন ও লাটসাহেবী অনুশাসন মধ্যে পুনরায় এক সংঘর্ষ বাঁধিবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করিয়া পরাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে কায়ম করিবার জন্য যত আইন প্রবর্তিত হইয়াছে তন্মধ্যে ১২৪ (ক), ১৪৪ ধারা ইত্যাদিই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খ্যাত। এবং ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আমরা সেই রাজদ্রোহ আইনেরই অস্তিম নাশাঘ শুনিতেছি।

নিপাত কংগ্রেস আন্দোলনে বহু প্রদেশই দমন-নীতিমূলক আইনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বহু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সমূহকে ঐ সমস্ত আইনের বেড়াঙ্কালে ধরা পড়িতে হইয়াছে। প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রেমিককেই ১২৪ক

ধারা ও ১৪৪ ধারা ইত্যাদির প্যাচে আসিয়া শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে—তন্মধ্যে সীমান্তপ্রদেশের সহিত অন্যান্য প্রদেশের তুলনা খুবই কম। তাহার স্মৃতিই তথাকার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীকে দমন-নীতি দমনের জন্য উৎসাহিত করিয়াছে। কংগ্রেস পক্ষীয় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেব তাঁহার প্রচেষ্টায় সাকল্য অর্জন করিয়াছেন। অর্থাৎ আপাততঃ তথাকার আইন সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা জরুরী প্রেস আইন, এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৮ ও ১৪৪ ধারা সংশোধিত হইয়া উঠিয়া যাইবে।

কিন্তু ভারত গবর্নমেন্ট ও গবর্নরের অনুমোদন ব্যতীত কোন গৃহীত আইনের প্রস্তাব কার্যকরী ও কলপ্রসূ হইতে পারে না। বর্তমানে যে নীতিতে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইতেছে তাহাতে এই সকল দমনমূলক আইন গবর্নমেন্টের খুবই প্রয়োজন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত হয়ত ডাঃ সাহেবের প্রচেষ্টা নিফল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতীকার রহিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের ন্যায় অন্যান্য প্রদেশের আইন সভা সমূহও যদি অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ

করে এবং একযোগে যদি অনুরূপ দাবী করে তাহা হইলে ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে তাহার বিরোধিতা করা খুব সহজ হইবে না। সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত আরও ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বাংলা, আসাম, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে না হউক অন্ততঃ বাকী প্রদেশগুলির সীমান্ত প্রদেশের আদর্শ অনুসরণ করার পথে কোন অন্তরায়ই নাই।

সীমান্ত প্রদেশে রাজকোহ আইনের প্রতিবাদ হয়, বিহার ও যুক্ত প্রদেশে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অপরূপ রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইতেছে, মাদ্রাজে রাজবন্দী বলিয়া আর কেহ নাই তখন পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার অবস্থা অনুরূপ। বাঙ্গলায় এখনও প্রায় বহু শতাধিক রাজবন্দী কারা প্রাচীরের অন্তরালে তাহাদের দীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন দিন কাটাইতেছে। প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্র খুলিলে দেখা যায় কোন না কোন রাজবন্দী হয় অনিদ্রায়, না হয় অন্য কোন প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি নচেৎ যক্ষ্মায় ভুগিতেছে। প্রাচীরের বাহিরে আত্মীয় স্বজনদের দুঃখের অশ্রু চোখের কোনেই শুথায়।

এই সকল রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে মন্ত্রী মণ্ডলীর চিন্তা করিবার কিছুই নাই এবং ইহাদের সম্বন্ধে সামান্য মানবতার প্রদর্শনও করিবে কে? ঢাকা জেলে অনশনের কলে হরেন্দ্র মুন্সীর মৃত্যুতে জনসাধারণের মনে যে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হয় সে সম্বন্ধে বাঙ্গলার স্বরাষ্ট্র সচিব ষাজা স্মার সার নাজিমুদ্দিন মোজা জবাব দিয়াছেন যে এই সম্বন্ধে কোন তদন্ত করার ইচ্ছা সরকারের নাই। জনমত সম্বন্ধে সচেতন থাকার এখন কোনই প্রয়োজন নাই—নির্বাচন-পর্বের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়াছে। কিন্তু এই জনসাধারণের মনে এখন হইতেই যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে। হাওয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ ভবিষ্যতে দুঃখ ও ত্যাগের মূল্যেই নিজ নিজ প্রতিমিথি নির্বাচন করিবে।

কর্পোরেশন ও কংগ্রেস

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সভাপতিপদ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ প্রসঙ্গে শরৎ বাবুর প্রস্তাব ২৮।১৩ ভোটে পরিত্যক্ত হওয়ায় বর্তমান মেয়র শ্রীমত কুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ সভাপতিসহ ১৩ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

পদত্যাগ পত্রের উপসংহারে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে “কংগ্রেস এবং নির্বাচক মণ্ডলীর গ্রহণযোগ্য” কার্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য করা সম্ভবপর হইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা করা না হইলে, তাঁহারা এসোসিয়েসনের সদস্য থাকিতে পারেন না।

নিম্নলিখিত ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর নির্দেশ উপেক্ষা করিবার মত সাহস যে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের ২৮ জন সভ্যের হইতে পারে তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির বেনামীতে তাহারা কংগ্রেসের ছাপ বন্ধে ধারণ করিয়া কর্পোরেশনে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের যুথোস নিঃসমহন্তে বিদীর্ণ করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম যে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, কর্পোরেশনে কংগ্রেস কাউন্সিলার-বৃন্দের সম্বন্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন—বোম্বাইয়ের আজাদ ময়দানের বক্তৃতায় তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কর্পোরেশনে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় সুভাষচন্দ্র তাঁহার পুণার কার্যক্রম সংগিত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের নির্দেশ অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র কঠোর হস্তে এই সমস্ত চঞ্চল-মতি ও আদর্শচ্যুত কংগ্রেসী কাউন্সিলারবৃন্দকে সমুচিত শিক্ষা দিলে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিবে। আমরা এতৎসম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশঘোষণা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

চিত্রা

ফোন বি,বি, ১১৩৩

২৬ সপ্তাহ

মুক্তি

নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য স্ত্রী কতদিন অপেক্ষা
করিতে পারে? মুক্তি চিত্রে দেখুন!

মুক্তি'র সহিত—

রাক্ষপতি সুভাষচন্দ্রের

বোম্বাই-এ বিপুল সম্বন্ধনার

টপিক্যাল চিত্র দেখান হইবে।

বাক্সালী, অবাঙ্গালী সকলেই এই চিত্র
দেখিয়া সুভাসচন্দ্রকে সম্মানদান করুন।

কৌতুক

রহস্য

বিদ্রূপ

প্রণয়

রূপ
পা
বা
নী

শুভ উদ্বোধন

শনিবার ১২ই মার্চ

মেট্রোপলিটন পিকচার্সের

বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসচিত্র

হাল বাউলা

ভূমিকায় :

ছায়া দেবা

ডি, জি, তুলসী লাহিড়ী

সত্য, নবদীপ, রঞ্জিত

ললিত, যুগাল মহাদেব

শনি ও রবিবার

৩, ৬-১৫ ও ৯-৩০ টায়

অন্য দিন

৬-১৫ ও ৯-৩০ টায়

নিউ সিনেমা

ধর্ম্মতলা * ফোন : কলি: ৫৮১৯

২য় সপ্তাহ !!

সরোজ যুভীটোনের

এ টেল অব্ ইয়েস্টারডে

(কাল-কা-বাত)

ভূমিকায়—দুর্গা খোটে, জেজউল্লিসা, সুব্রহ্ম, রোজ প্রভৃতি।

অত্যাচার, অবিচার পরিপূর্ণ জনরাজ মিহিরঙলার
জলন্ত কাহিনী। প্রথম সপ্তাহে না দেখিয়া থাকিলে
এই সপ্তাহে নিশ্চয়ই দেখিবেন। আপনার জুড়ে
চাঞ্চল্য আনয়ন করিবে।

এ টেল অব্ ইয়েস্টারডে

পূর্ণ শিরেতার

২নং রসা রোড.

ফোন : সাউথ ৩৪

শনিবার ১২ই মার্চ হইতে

জনাকীর্ণ পঞ্চম সপ্তাহ!

প্রভাস-মিলন

ভূমিকায়—অহীন্দ্র, শান্তি, রেকা, ছায়া,

সুশীল রায়, যুগাল ঘোষ প্রভৃতি।

তৎসহ সতু সেনের অফুরন্ত হাসির কোয়ার্টা

কেমন জব্দ

বাগান লিজ

কলিকাতার উপকণ্ঠে পুষ্করিণীসহ একটি বাগান
লিজ লইতে ইচ্ছুক। বিবরণাদিসহ বক্স নং অ C/o
“থেক্সালী” ১১নং চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ)
ভবানীপুর, কলিকাতা—লিখুন।



বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

এই মাসের ২৬শে তারিখে "চিত্রায়" বিভাগটির বাঙলা সংস্করণ মুক্তি লাভ কোরবে।

এই ছবিখানিকে সুন্দর ও শোভন করে ছায়া-পটে তুলে ধরেছেন—নিউ থিয়েটার্স। বতখানি বহু, আন্তরিকতা ও অর্থব্যয় প্রয়োজন—তা সর্বাংশে প্রয়োগ করতে কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র কাপণ্য করেন নি। দেবকী বোসের পরিচালনার এবং রাই বড়ালের সুর সংযোজনায় 'বিভাগটি' যে তার নামের উপযুক্তই হ'য়েচে—একথা আজ সর্বস্বীকৃত। আমরা আশাকরি ভারতের অপরাপর প্রদেশের মত এর বাঙলা সংস্করণটি বাঙালী দর্শকের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

* * *

পূর্ণ উত্তরে ১২৭ ষ্টুডিওতে 'অভিজ্ঞান'-এর কাজ চলচে। ইতিমধ্যে কতকগুলি নৈশ দৃশ্য অতি নিপুণভাবে তোলা হ'য়েচে। লক্ষ্যটি কাজ চলচে যে সেটে—এই ছবির সেইটিই হ'বে শেষ সেট। এরপর পরিচালক প্রফুল্ল রায় বাকী লোকেশান-এর কাজ শেষ কোরতে যাবেন।

আশাকরি এই ঘটনাবল ও সমাজ সমস্যাগুলক কাহিনীটি নিউথিয়েটার্সের সর্বাংশে সর্বব্যাপার উপযোগী হ'বে।

* * *
বাঙলার অপরাধের কথা শিল্পী বর্গত:
শরৎচন্দ্রের প্রথম শ্রেষ্ঠ কাহিনী "বড়দি"

চিত্র-গ্রহণের প্রাথমিক কাজগুলি অতি নিপুণ ভাবে সম্পন্ন হোয়েচে। হিন্দি ও বাঙলার এই ছবিখানির পরিচালনা কোরবেন শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক। অভিনয় কার্য ছাড়াও মল্লিক মহাশয় প্রডাকশান বিভাগে



নিউ থিয়েটার্সের "অভিজ্ঞান"
চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় শৈলেন
চৌধুরী, দেববালা, মনোরঞ্জন
ও অহি সাত্তাল

বহুকাল ধরে হাতে-কলমে কাজ কোরে গভীর অভিজ্ঞতা লব্ধ কোরেছে। তাই পরিচালক হিসাবে মল্লিক মহাশয়কে নির্বাচন আমরা উৎসাহিত হ'য়েচি এবং কর্তৃপক্ষের নির্বাচন শক্তির তারিক করচি।

এই প্রডাকশানের আর একটি বিশেষত্ব—এর চিত্র-নাট্য রচনা কার্যের দায়িত্ব থেকে পরিচালককে অব্যাহতি হোওয়া হ'য়েচে। পরিচালনা সম্পর্কিত প্রাথমিক কাজগুলি যাতে আরও নিপুণভাবে সম্পন্ন করবার সুযোগ পান—এই উদ্দেশ্যেই কর্তৃপক্ষ এই পদ্ধতি অবলম্বন কোরেছেন। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালক স্বয়ং চিত্র-নাট্য রচনার দায়িত্ব গ্রহণ কোরলেও সাধারণতঃ মূরোপে ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হয়।

বড়দি-র চিত্র-নাট্য রচনা কোরেছেন সুনামধন্য পরিচালক দেবকী বহু। সুতরাং এই দিক দ্বিধে মল্লিক মহাশয়ও যে বিশেষ লাভবান হোলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

আশা করি পরিচালনা কার্যে নিজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ হাত-বশের পরিচয় দ্বিধে শ্রীযুক্ত মল্লিক এই চিত্রে পরিচালক হিসাবে নিজস্ব যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন। আমরা তাঁর নব উদ্ভবের সর্বদা সাক্ষ্য কামনা করি।

* * *

শ্রীযুক্ত বড়ার নিপুণ পরিচালনার এখের সামাজিক ছবির চিত্রগ্রহণ কার্য নিরামিত-ভাবে চলচে।

আধুনিক বাঙলার তরুণ-তরুণী মহলে এই ছবিখানি যে 'সুখ'র মতই সমাদর লাভ কোরবে, ছবির কাহিনীটি পড়ে আমরা সে কথা নিঃসন্দেহে বোলতে পারি।

ইন্দিরা ও রাধা—দুটি পরস্পর বিরোধী অপূর্ণ নারী চরিত্র। এখের হৃৎজনার সংঘাতের মাঝে অতিক্রান্ত এলে পড়লো নিখিলেশ। অপর দিকে বতীর কটি জীব—বাঁকে আশ্রয় কোরে একটু স্তব্ধের নীড়

এই ভারতের
মহামানবের সাগরতীরে

মানবতার যে প্ৰথম সত্য
মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে

গোরা

তাহারই মূৰ্ত্তরূপ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

সেই অতুলনীয় সৃষ্টির

চিত্রানুবাদ

কলিবার গৌরব

লাভ করিয়াছেন

দেবদত্ত ফিল্মস্

রচনা করবার কল্পনা কোরেছিল, একদিন
দে নীড় ভেঙ্গে দিয়ে ছুটে চললো, ঐশ্বর্য
মিলাদের ঘোরে চকল হোরে—ধনীর আলয়ে
একটু আশ্রয় পেতে।

কেমন কোরে সে আশ্রয় বিধিয়ে উঠলো,
কেমন কোরে সে বিজয়িনীর লকল গরু
চূর্ণ হোল—এই ছবি খানিতে আমরা তারই
পরিচয় পাই।

বিভিন্ন ভূমিকায় বজ্রা, যমুনা, মেনকা,
চিত্রলেখা, পুণিমা, পাহাড়ী, প্রতাপ, পঙ্কজ
মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জীর
অভিনয়ে—চিত্রিত কাহিনী যে একটা অখণ্ড
মাধুর্য নিয়ে সর্বশ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জন
কোরতে পারবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা
যায়।

এই চিত্রের সঙ্গীতাংশের পরিচালনা
কোরছেন সুনামময় সুর-শিল্পী ত্রিপুর বরণ—
এবং তাঁকে সর্বস্বভাবে সাহায্য করছে
সুগায়ক হরিপদ রায়।

* * *

গেল ৯ তারিখ থেকে ডাইরেক্টর ফনী
মজুমদারের বইএর স্ক্রিটিং আরম্ভ হয়ে
গেছে। উপস্থিত এ বইখানির হিন্দী
সংস্করণই হ'বে বলে স্থির হয়েছে। এর
প্রধান ভূমিকায় দেখা যাবে কানন ও
সাইগালকে। তাছাড়া জগদীশ, বিক্রম,
কাপুর, রাদিকুমারী প্রভৃতিকে বিভিন্ন ভূমিকায়
দেখা যাবে। এ ছবির আলোকচিত্রের
তার পেয়েছেন সুখীশ ঘটক ও দীপিক

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

গুপ্ত, শব্দ বস্তুর তার নিরেছেন লোকেন
বাবু। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন মি:
বড়াল। পরিচালক মজুমদারকে সাহায্য
করবেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ও মনী হস্ত।
মজুমদারের হাতে এ ছবিখানি যে একখানি
প্রথম শ্রেণীর ছবি হ'বে এ সবকিছু আমরা
নিশ্চিত।

কালী ফিল্মস

এদের অভিনব হস্তরশ্মিক্ত বাণী চিত্র
“সর্বজনীন বিবাহোৎসব” আগামী শনিবার
একে তৃতীয় হল্লার পড়বে। ছবিখানাতে
রোজই অসম্ভব জন-সমাগম হ'চ্ছে এবং
ভীড় দেখে মনে হয় ছবিখানা ‘উত্তরা’
চিত্রগৃহে বহুদিন চলবে।

হাজরা পিকচার্স

এদের পৌরাণিক ভক্তি-মূলক চিত্র
“দেবী কুল্লার”র স্ক্রিটিং কালী ফিল্মস
ষ্টুডিওতে বেশ জোরভাবে চলছে। পরিচালক
তিনকড়ি চক্রবর্তী এবং তাঁর সহকারী
কালীপদ রায় ছবিখানাকে সর্বজনস্বন্দর
করবার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা কোরছেন।
আমরা ছবিখানার সাফল্য কামনা করি।

প্রফুল্ল পিকচার্স

প্রফুল্ল ঘোষের প্রযোজনা। এদের

প্রথম বাঙলা ছাণির ছবি “লথের শ্রমিক”
আগামী ১৬ই মার্চ হোলপুর্বিদ্যা হিবলে
‘শ্রী’ চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে। বাঙলার
তরুণ তরুণীদের আধুনিক সমস্যার এই
চিত্রখানি অলঙ্কার নিদর্শন। আমরা প্রফুল্ল
ঘোষের “লথের শ্রমিকের”-র জনপ্রিয়তা
কামনা করি।

• ও, কে, এ,

“রূপোর বুধকোর” স্ক্রিটিং শেষ হওয়ার
পর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়ে বলে নেই।
তাঁরা আর একখানি ছোট্ট বই তোলার
প্রাথমিক তোড়জোড় কচ্ছেন। লক্ষ্যবস্ত:
ঐ ছোট্ট বইখানি আর “রূপোর বুধকো”
একসঙ্গে মুক্তি লাভ করুক। ওদিকে
রূপোর বুধকোর সম্পাদনা শেষ হতেও
আর খুব বেশী বিলম্ব নেই। ছবিখানি
শীঘ্রই ‘শ্রী’ চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে।

পূর্ণ থিয়েটার

রাধাকিষ্ণোর প্রভাশ মিলন এ চিত্রগৃহে
যে ভাবে চলছে তা বাস্তবিকই আনন্দের
কথা। পূর্ণ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এর পরট
অর্থাৎ শুক্রবার ২৫শে মার্চ হঠতে নিউ
থিয়েটারের ‘মুক্তি’ দেখাবেন ঠিক করেছেন।
চিত্রায় ‘মুক্তি’ চিত্রে যে ভাবে এখনও
লোক সমাগম করছে তাতে মনে হয় দক্ষিণ
কলিকাতায় এট ‘পপুলার’ হাউসেও তরুণ
জনসমাগমের অভাব হ'বে না।

হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন



—প্রযোজনা—

তিনকড়ি চক্রবর্তী
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

—পরিচালক—

তিনকড়ি চক্রবর্তী

—সহযোগী—

অরীক্ষ চৌধুরী
শিববালা

চিত্র-প্রচার না আত্ম-প্রচার ?

খেরালী সম্পাদক মহাশয় মহোদেয়
নবীন নিবেদন

খেরালীর গত সপ্তাহে “যুক্তি” নামকো
বিশ্বক প্রবন্ধে প্রচার লব্ধে কিছু লেখা ছাপা
হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আপনারা, কিম্বা
লেখক মহাশয়, দয়া করিয়া আবার একটি
ব্লকও ছাপিয়াছেন। চিত্রের লক্ষ্যের
প্রশংসা করা উচিত, কিন্তু ঐ সঙ্গে প্রচার
যিনি চালান তাঁহার প্রশংসা করার কোন
অর্থই হয় না। ছবিতে বহির্দৃষ্টির আনন্দ-
হারক এবং উপভোগ্য বস্তু না থাকে,
তাহা হইলে কোন প্রচারকার্য-কর্তার
এমন সাধা নাই যে চিত্রকে লক্ষ্যবিশিষ্ট
করিতে পারেন। কাজে কাজেই নিজের
কর্তব্য কাজ করার জন্য কেহ কোন প্রশংসার
অধিকারী হইতে পারেন না।

তাহা ছাড়া, একই প্রতিষ্ঠানের একজন
অজ্ঞানকে অনাবশ্যক প্রশংসা করিলে
বাহিরের লোকে তাহার নানা অর্থ করিতে
পারে—এই সুযোগ দান করাও কোন
লক্ষ্যকতা নাই। চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তারা
চিত্রের এবং কোম্পানির সুপ্রচার করিবার জন্য
প্রচার-কর্মী নিযুক্ত করেন। এই সকল
প্রচার-কর্মীর একমাত্র কাজ হওয়া উচিত

কোম্পানির এবং কোম্পানির নির্দিষ্ট
চিত্রাদির সুপ্রচার করা। কিন্তু এই সুযোগ
লইয়া নিজের প্রচার করা (বা কেহ কেহ
যেমন বলেন—চাক পিটান) কাহারও কর্তব্য
নহে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে
প্রচারকর্মীদের আত্মপ্রচার এই ভাবে
না হওয়াই ভাল। অন্ততঃ আমার নিজের
কোন প্রচার আমি ক্রেশ এবং লজ্জার কারণ
বলিয়া মনে করি। ইতি নিঃ—

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(‘যুক্তি’ রজত-জয়ন্তীকে উপলক্ষ করিয়া
নিউ থিয়েটারের অন্ততম প্রচার-সম্পাদক
শ্রীযুগেজ দাভাল স্বনাথে এক প্রবন্ধ
লিখিয়া গত সপ্তাহের খেরালীতে শ্রীযুক্ত
হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ও নিজের
আত্মপ্রচার সর্বোপলব্ধ করিয়াছেন। নিউ
থিয়েটারের চিত্রগুলির প্রচার এই দুই
কর্মীর উপর অর্পিত হয়। তাঁহারা যদি সেই
চিত্র-প্রচারের সুযোগে বা তাহার আবরণে
নিজের প্রচার আরম্ভ করেন তাহা হইলে
সম্পাদক-মহোদয়ের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।
আমরা প্রীত হইলাম যে অন্ততম কর্মী
হেমন্তবাবু অনুরূপ প্রচার ক্রেশ ও লজ্জার
কাজ বলিয়া মনে করেন। আশা করি
সুদূরবাবু তাঁহার আত্মপ্রচার লিপ্সা দমন
করিয়া আত্মদ্বিগত অব্যাহতি দিবেন।

—সম্পাদক (খেরালী)

আমাদের প্রকাশিক ছোটদের
বই!

পাতাল পাতাল সুদৃশ্য এক-
ব্রত ও তিন ব্রতের ছবিতে
সুসজ্জিত।

শিশু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

শ্রীযুক্তমোহন দাস সম্পাদিত
ছোটদের আহরিকা

রায় জলধর সেন বাহাদুরের
আইসক্রীম সন্দেশ

শ্রীকীন্দ্র নাথ পালের
বংলার জঙ্গলে

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
লে মিজারেবল

সুপ্রিয় সোমের

মাগরের নীচে ভয়ঙ্কর ঘানুস

সচা প্রকাশিত

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রামধনু

কমলিনী সাহিত্য মন্দির

২২০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,

কলিকাতা।

ন্যাশন্যাল টেলারিং

(শাল রিপেয়ারিং ওয়ার্কস)

৮০।১২ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা (হাতিবাগান বাজারের পূর্বদিকে)

বৈজ্ঞানিক উপায়

শাল, আলোরান, দেগাবসী, শান্তিপুর,
সিদ্ধ ও উলের কাপড়, রং প্রিন্ট
ও ধোত হয়

আধুনিক ফ্যাসাডনের

সুট, সাট, পাজাবী, ব্লাউজ,
ফ্রক, ইত্যাদি অল্প সময়ে
প্রস্তুত হয়।

গরম সুট ডাই ওয়াশ হার

মফঃস্বলের কার্খা যত্নপূর্বক সরবরাহ করা হয়।

প্রোঃ সাতকড়ি পাল।



শুভ-উদ্বোধন

শনিবার, ১২ই মার্চ

রূপবাণী



থেয়ালি
অতিবিক্ত
হাল-বাঙ
সংখ্যা

০০০০ ০০ ০০০০ ০০ ০০
 ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০
 ০০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০
 ০০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০
 ০০০০ ০০ ০০ ০০ ০০



হাল ঝাঙ

হাসির ছবি "১১"
 দাঃ লুঃ ডেঃ টলি
 দেবী, ডায়া দে
 মনোরমা, মহা
 পাল অতি বি
 নতন ধর
 ভূমিকায় অ
 প্রকাশ করেছে



ছায়ালোকে শ্রীমতী ছায়া দেবী নবাবতা।
বছরদেড়েক পূর্বে কে-ইবা জানত তার নাম?

বাংলার দর্শকের নিকট আজ তিনি পরিচিত।
শুধু পরিচিত নয়, আজ তারা তার অভিনয়-
নৈপুণ্যে মুগ্ধ, প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। অল্পদিনের
মধ্যে দর্শকের প্রিয় হওয়া অভিনেত্রীর পক্ষে যে
কতবড় প্রশংসার কথা, আর কত বড় শক্তির
পরিচায়কতা অভিনেত্রীরাই তা জানেন ভাল।
বাস্তবিক পক্ষে, এ সৌভাগ্য সকলের হয় না।
হয় শুধু তাদেরই যারা ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী
—যারা আসেন কক্ষশিল্পবোধ ও অভিনয় প্রতিভা
নিয়ে। ছায়া দেবী প্রতিভাসম্পন্ন। শিল্পী—তাই
যেদিন তিনি 'সোনার সংসার' চিত্রের মধ্য দিয়ে
ছায়া-শিল্পের মন্দিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন,
সেদিন মন্দিরের দ্বার খুলে গেল। অভিনেত্রী
জীবনের সত্যকার আগচাঁপী পুরা তার বাহ
হ'ল নত।

'সোনার সংসার' চিত্রে ছায়া দেবীর অভিনয়
দেখে দর্শকেরা বললেন—“চমৎকার”! ভক্তরা
বললেন—“অভিনব”! সমালোচকেরা বললেন—
“ওয়াগার-ফল”।

ছায়া দেবী উচ্চবংশজাত ভদ্রমহিলা। জাতিতে
তিনি ব্রাহ্মণ। অসীম রূপ লাভগোর অধিকারিণী
না হ'লেও তার রূপ ও লাভগোর অভাব নেই।
তিনি, সুশী—সুন্দর তার বাহ্য। তার পরে আছে
তার শিক্ষা, সূক্ষ্মচি, কলাক্ষান এবং মনঃশক্তি।

অভিনেত্রী জীবন গ্রহণ করবার পূর্বে তিনি
ভাবতেও পারেন নি যে একদিন ইংকে আসতে
হবে চিত্ররাজ্যে, অভিনয় করতে হবে ক্যামেরার
সামনে।

বয়স তখন তার কতট পঁ আর—মোট সাত
কি আট! ভাগলপুরে থাকেন, কেসে গেলে দিন
কাটান। দিনরাত ছিঃ ছিঃ, হেঃ হেঃ...মা
বলেন, ওরে শুভদ্রিস পাগলী! এমনি করেই
কি তুই খেলে বেড়াবি?

বেলবোনা? বারে! বেশ লোক ভো ভুমি!
মা বলেন: একটু পড়াশুনা কর মা। মেয়ে-
মাল্লখ, তাতে যদি আকার মূল্য হয়ে থাকিস...

ছড়োর পড়াশুনা!...পাগলী মেয়ে মার
সম্মুখ থেকে ছুটতে চলে যায়। বুড়ীর সামনের
রাস্তাটি একবার পাক দিয়ে ফিরে আসে।
রাস্তায় মার পাশটিতে এসে বসে থাপাতে থাপাতে
বলে—মা, মা, রাস্তায় ঐ খোঁড়া ভিকরিটা কি
রকম হর ক'রে ভিঞ্জে করছিল, দেখবে? এট
দেখ...

বালিকা খোঁড়া ভিগারীর কণ্ঠস্বরের শুধু
অনুকরণ করে ভিগারীর ভিগাভিনয় করে যায়।
মা মেয়ের পাগলামী দেখে বিস্মিত হয়ে যান,
কিন্তু মুখে বলেন—ছিঃ মা, কাউকে ভেৎসাতে
নেই...ওতে পাপ হয়!

এমনি ক'রে ভাগলপুরে ছায়া দেবীর বাল্য-
জীবন বেশ কাটছিল। হঠাৎ সেখানকার কুদ
সংসারটি উঠিয়ে আনবার চেষ্টা চলতে লাগল।

নটনটর ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া দেবী



মা তার সংসার নিয়ে এলেন দিল্লীতে। ছায়া
দেবীর পিতা দিল্লীতে চাকরী করতেন। স্থির
হ'ল দিল্লীতেই এখন থেকে কায়মীভায়ে সংসার
পাতা হবে। হ'লও তাই।

এমনি করেই দিন যায়—বছর ঘোরে। ছায়া
দেবীর পিতার শ্রবাসের দিন বুঝি ফুরিয়ে এল।
একদিন দিল্লীর সংসার গুটিয়ে তারা সকলে রতদিন
পরে ফিরে এলেন—কোলকাতায়।...

কোলকাতায় এসে ছায়া দেবীর ভবিষ্যতের
জগ পিতা মাতা যেন অতিমাতায় চিন্তিত হয়ে
উঠলেন। নানা জল্পনা-কল্পনা চলল। মা বলেন:
মেয়েটার জগ একটা ব্যবস্থা কর! বাবা
বলেন: ব্যবস্থা? কি ব্যবস্থা! মা ঠিক বলতেও
পারেন না। সরোজনলিনীর স্কুল, শাজী বিদ্যা
শিক্ষকতা...কত কি তাঁর মনে পড়ে!

হঠাৎ একদিন ছায়া দেবীর বাবা বললেন:
স্কেনেচ, ছায়া বায়স্কোপে অভিনয় করতে চায়,
কি বল?

মা প্রায় শিউরে উঠলেন: এঁা, অভিনয়? ও
করবে অভিনয়? তোমার কি মাথা খারাপ
হয়েছে? কিন্তু পিতা শুধু হাসলেন? কেন,
ভাষ্যরের মেয়েরা কি অভিনয় করতে পারে না।
কতি কি? তাছাড়া তিনি যখন মেয়ের সঙ্গে
তার কথোপকথন থাকবেন।

মা লগমট। তীব্রভাবেই আপত্তি জানালেন,
তারপর চুপ করে গেলেন।

হঠাৎ উত্তীর্ণা ফির কোম্পানীর চুক্তিপত্র স্বাক্ষর
করে এসে রাতে ছায়া দেবীর চোখের পাতা
আর পোজে না! কি ক'রলে সে? ভাল হ'ল
কি...কেন নয়! জগায় কোথায়? কেন, সে কী
এমনই দুপল! 'আচ্ছা ষ্টুডিওর লোকগুলি কেমন?
...দূর হোক, 'আমিত' ছি পাকব।

ছায়া দেবী চলচ্চিত্রে যোগদান করলেন, কাগজে
চলচ্চিত্রে ভদ্রমহিলার যোগদানের বিবৃতি বের
হল। ছায়া দেবীর অভিনয়ের হাতে-পাড়ি হ'ল
হঠাৎ উত্তীর্ণার 'পদের শেষে' চিত্রে, ছোট একটা
পার্ট—দৈনন্দিন ভূমিকায় তাকে অভিনয় করতে
হল—উপরন্তু পরিচালক তার কণ্ঠে সঙ্গীত যোজনায়ও
করে দিলেন। প্রথম অভিনয় চলনসই পয়সায়েরই
হ'ল—কিন্তু তার কণ্ঠের সঙ্গীত অসম্ভব 'সুন্দর'
গেল!

হঠাৎ উত্তীর্ণা কিং কোম্পানীতে তখন সুবিধাত
পরিচালক শ্রীদেবকী পত্নী তার অভিনয় চিত্র
'সোনার সংসার' তোলার তেড়াজড়ি করছেন,
সিনারিও লেখা হয়ে গেছে, ভূমিকা রচনও কিছু
কিছু করা হয়ে গেছে। কিন্তু আসল কাজটি
তার তখনও করা হয় নি—মানে নায়িকা নির্বাচন।
এই ছবিখানির জগ কোম্পানী লক্ষ টাকা
ব্যয় করতে প্রস্তুত...অদৃষ্ট মনের মত নায়িকা
ঠিক পাওয়া যাচ্ছিল না। মেয়ে পাওয়া যায়
কোথায়?

দেবকী বাবু সুঅভিজ্ঞ পরিচালক। বাংলার
নাম-করা চিত্র নট-নটীর মধ্যে কার কতটুকু শক্তি
আছে তা তিনি চোখ বুজই বলে যেতে পারেন।

•একটিপ কড়াপাকের মত নিয়ে পরিচালক মহাশয় চক্ষু মুগ্ধিত করলেন—কিন্তু না, হোপলেন্স...নতুন আর্টিষ্ট ক্রিয়েট করতে হবে..... অবশেষে নির্বাচন তালিকায় নাম ঠেল—ছায়া দেবীর।

ছায়া দেবী পরিচালকের সামনে উপস্থিত হলেন। • ছ'চারটি প্রশ্ন করেই দেবকীবাবু ব্যস্তে পারলেন, তিনি ভুল করেন নি।

পত ৩পুজার সময় 'সোনার সংসার' আয়-প্রকাশ করেছিল। ছবি দেখে দর্শকের প্রাণে আর পুসী ধরে না...বাঃ কি সুন্দর ছবি...কি অপূর্ণ অভিনয় এই ছায়া দেবীর। আশ্চর্য্য এই মেয়েটি। কেমন সহজ, সরল, স্বাভাবিক অভিনয়। গলার স্বরটি তার কি মিষ্ট।

'সোনার সংসারে' অভিনয় করে ছায়া দেবী সুনাম অর্জন করলেন।

এর পরেই এমন সময় হঠাৎ একদিন নব-নির্মিত মতিমহল থিয়েটার থেকে আহসান এল—'রাধাকী' চিত্রে নামভূমিকায় অভিনয় করার জ্ঞা। ছায়া দেবী আবার অভিনয়ে নামলেন।

এর পরেই ছায়ার ডাক পড়লো নিউ থিয়েটার থেকে 'বিজ্ঞাপতি' চিত্রে স্থানীয় লক্ষ্মীর ভূমিকা-ভিনয়ের জ্ঞা। এই ভূমিকা শেষ করেই তিনি পুনরায় মিঃ বি. এল. খেনকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন এবং নব-নির্মিত মেট্রোপলিটান পিকচার্সের 'হাল বাংলা'য় নায়িকার অংশে মনোনিবেশ করলেন। ছায়া দেবী এ খাবৎ বে ধরণের ভূমিকায় নেনে এসেছেন তা থেকে এই ভূমিকাটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। চট্টল প্রভৃতির ভেতর দিয়ে বিদ্যাপুর কন্যাগোষ্ঠ এই চরিত্রটি মুক্ত হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া শ্রীমতীকে গানরা গায়িকা হিসাবেও এই চিত্রে দেখতে পাব। 'অবজ্ঞা' এর পূর্বেও 'পাখির শেষে'তে তিনি গান গেয়েছেন কিন্তু এবার তার কণ্ঠ থেকে স্নেহে পান স্নানগণকে সাতখানা গান। এই সব কারণেই শ্রীমতী ছায়াকে নতুনরূপে দেখতে পাবার জ্ঞা চিত্রমোদীরা হয়ে উঠেছেন আগ্রহীত।

অভিনেত্রীর জীবন তার। কলন আছে, খেলাও আছে। কিন্তু তিনি সংসারেরই মানুষ। সংসারের নিত্যকার জীবন স্রোতে গা এলিয়ে দেবার মত স্থল নেই। তাই সংসার তাকে প্রচুর আনন্দ দেয়।

মানুষ হিসাবে ছায়া দেবী ভারী চমৎকার। এমন ভক্ত, বিনয়ী এবং অতিপরিচয়শীল শিল্পী বাংলার বড় কমই দেখা যায়।

সংসার একদিকে, 'তার' একদিকে কর্ণক্ষেত্র। আজ এই জগৎজের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন ছায়া দেবী। মাঝে মাঝে মনে ক্রান্তি, অবসাদ আসে। কিন্তু ছায়া দেবী অসীম ধৈর্য্য, শক্তি ও অধ্যবসায়ের বলে সমান ভালে আবার পূর্ণ উত্তমে এগিয়ে চলেন—সাধনার পূর্ণ সিঁড়ির উদ্দেশ্যে। সিঁড়ি কবে আসবে কে জানে—কিন্তু সাধনার আনন্দ তার সব চেয়ে বেশী। (বাণডট)।

হাসির রাজা ডি-জি



বাংলার চিত্র-শিল্পের আদি যুগ থেকে ধীরে ধীরে গাঙ্গুলী এই শিল্পের সঙ্গে ওস্তাদপ্রোভাবে জড়িত। বাংলাদেশে 'আজ চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে সিনেমা দেখবার যে অদম্য প্রাণ বলবতী হয়ে উঠেছে, ডি-জি তার জ্ঞা কিয়ৎপরিমাণে গৌরব অশুভব কোরতে পারেন। ডি-জির ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান আজ নেই সভ্য—কিন্তু নিজের অটুট মহিমতা ও কল্পশক্তির ওপর যে প্রতিষ্ঠানের ভিত গড়ে উঠেছিল—সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে আজ বাংলাদেশ অন্ততঃ একটি শিল্পেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ধীরেনবাবু হুঁশিঙ্গ হাকুর বাড়ীর সঙ্গে মঞ্চস্থজে আবদ্ধ। শৈশব থেকে শিল্পকলা চর্চার দিকে তার মন আকৃষ্ট হয়। তার পিতামাতা তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তারী বা ওকালতি করার জ্ঞা গাড়াপিড়ি করেন—কিন্তু ডি-জি তার মা-বাপকে সাক্ষ্য বসন্তে, বই মুখস্ত করা

আর খাতায় আঁচড় কাটা তার, দ্বারা হুঁশিঙ্গ হবে না। ছেলের এদিকে মন নেই দেখে তারী তাকে শিল্পবিজ্ঞানয়ে ভর্তি করে দিলেন। এ বিষয়ে অচিরে ধীরেনবাবুর মেধাও প্রকাশ পেল। এই থেকে উচ্ছ্বস হয়ে তিনি আজ অবধিও নিজেকে এই শিল্পকলার মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছেন। এর জ্ঞা জীবনে তার অনেক বড়-ঝাপটা গেছে কিন্তু তাতেও তিনি বুক গলিয়ে সেই কড়ো-হাওয়ার আক্রমণকে ঐতিরাধ কোরে নিজের অস্তিত্বকে হুঁশিঙ্গিত করেছেন।

ডি-জি আজ অবধি বড় ছবি পরিচালনা করেছেন এবং বহুচিত্রে অভিনয় করেছেন। কিন্তু হাসিরসায়ক চিত্র পরিচালনায় এবং হাসির চরিত্রে অভিনয়ে তার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই মেট্রোপলিটান পিকচার্সের বহুদর্শী কর্ণধার মিঃ বি. এল. খেনকা যেদিন ব্যস্তলেন যে লোকের এগন গুরুগম্ভীর ছবি দেখতে চায় না—তারা চায়, বায়োম্যাপ দেখে হেসে বাড়ী ফিরতে, সেইদিনই তার মনে উদয় হল, ডি-জির নাম। তিনি ডি-জেকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন—“হামি এবার 'কমেডি' ছবি তুলব—আপনি গল্প ত্রিক কবনা।” গল্প ত্রিক হল। মিঃ খেনকা ত গল্প পড়ে হেসেই লুটোপাট। শ্রুটি আরম্ভ হল। বাংলাদেশের খেলোয়াড় যে কয়জন হাস্যরসিক ছিল সবাই পেল আমন্ত্রণ। আর পরিচালক স্বয়ং একটি নতুন ধরণের ভূমিকা নিলেন। বহুকাল পরে আবার হাসির রাজা ডি-জি হাসির ছবি 'হাল-বাংলা' নিয়ে দর্শক-সাধারণের কাছে আয়প্রকাশ কোরছেন—তাই আজ 'হাল-বাংলা'র মুক্তির প্রতীকায় দর্শকগণ উদগীর্ণ।

ব্যক্তিগত জীবনে ধীরেনবাবু অতিশয় মিষ্টভাষী নর ও বিনয়ী। পদার ওপরে যেমন তিনি হাস্যরাজার লোককে হাসির বরণাধারায় সিক্ত করেন—ব্যক্তিগত জীবনেও যিনি তার সঙ্গে মিশেছেন, তিনিই জানেন ধীরেনবাবু কত বড় রসিক পুরুষ।





নূতন মেয়ে চল্লিকা দেবী

চল্লিকা দেবী ছায়াচিত্রে নবাগতা। ইনি অশিক্ষিতা, সিনেমার উপযোগী দেহ-সম্পদের অধিকারিণী। জাতিতে চল্লিকা বাঙালী ক্রিশ্চান। শৈশব থেকেই শ্রীমতী পরচংগকাতরা। সেই-জন্ম বাপ-মায়ের অশ্রুমতি নিয়ে ইনি ধাত্রীবিদ্যা শিখা কোরে জন-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বরাবরই সিনেমা দেখতে তিনি পুথি ভাল বাসতেন—কোলকাতর প্রদর্শিত পুস্তক কম ছবি আছে যা শ্রীমতী দেখেন নি। বায়োস্কোপ দেখে তার মনে মাসে মাসে অভিনেত্রী হবার আকাঙ্ক্ষাও বেজায়ে নি, এমন নয়। তার এই আকাঙ্ক্ষাকে আরও বলবতী কোরে তুলল, যখন রোজই প্রায় নানা ষ্টুডিও গৌক লোক আসতে লাগল তার বাড়ীতে। কোলকাতর ছ'একটি ষ্টুডিও তিনি পরলেন—কিন্তু কোন ষ্টুডিওই তার পছন্দ হ'ল না। অবশেষে একদিন সিং থেয়কার নূতন প্রতিষ্ঠান থেকে তার আমন্ত্রণ এল। সিং থেয়কার সঙ্গে আশ দত্তা কথা বলেই তিনি বুঝলেন, তিনি যেখানে কাজ কোরে মর্যাদা পাবেন, এই সেই ষ্টুডিও—চুক্তি-পত্রে সই হ'য়ে গেল, কিন্তু ঝুঁক তাঁর দ্রুত দ্রুত কোরিতে লাগল। এমন সময় সেখানে ডি-জি এসে হাজির। তিনি বললেন—“শ্রীমতী চল্লিকা আপনি ‘নার্ভাস’ হ'য়ে পড়লেন না কি ?

ভয় কি, আমি বম্ছি আপনার মাফলা স্থানান্তর। “হাল-বাংলা” ছবিতে আপনার মত যদি একটি মেয়ে আনি না পেতাম, তা' হ'লে আমাদের বেশ মুশ্কেলই পড়ত হ'ত।”

শ্রীমতী চল্লিকা যদি ছায়াচিত্রে যোগদান কোরেছেন তথাপি তিনি সে প্রস্ত নিয়ে দেশের ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ কোরেছেন তা'

এখনও ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন অভিনেত্রী হিসাবে যদি তার স্থান হয়, তা' হলেও তিনি হয়ত এই পরসেবারত তাগ কোরিতে পারবেন না।

বাসচরিত্র জীবনে চল্লিকা অতিথিপরাগণা, স্বচ্ছাশ্রী ও কঠোপরাগণা। চল্লিকা নিজের মটর চালিতে ভালবাসেন।



নূতন ধরনের হাজির গল্প

হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় ভগিনীপতির পরলায় বিলাত যুরিয়া আসিয়া মিঃ বোনার্জি বনিয়া গিয়াছেন এবং ভগিনী ও ভাগিনেরীকে অনেকখানি সাহেবিয়ানাতে রপ্ত করাইয়াছেন। ফলে তাঁহারা উত্তর কলিকাতার বাসিন্দা হইলেও দক্ষিণ কলিকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজেও যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এই প্রতিপত্তির অল্প কারণও ছিল। কেবল মোহনের ব্যাক-ব্যাংক লঙ্কানে অবস্থান ও জীব ও শেকালীর রূপ ও গুণ। শেকালীর রেটা ফেরতা, দিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত—ভাল নাচিতে ও গাহিতে পারে। তাকে জীবন-দলিনী করা লোভে বহু মোটরবিহারী সপ্তাহে একবার করিয়াও অন্ততঃ চাটুযো বাড়ীতে হাজির দিয়া বাইত।

কিন্তু ইহানীং শেকালীর মনের পরিবর্তন ঘটয়াছে। সাহেবিয়ানার উপর চটিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন ও আই, এ পাশ করিয়া সে স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এ. ডিগ্রিতে ও প্রসিদ্ধ রেকর্ড-গায়ক গোপাল

কলেজ প্রতিষ্ঠা-দ্বন্দ্ব উপলক্ষে ছাত্র ছাত্রীরা “বিসর্জন” নাটকের অভিনয়ে আয়োজন করে, এথলেট ও আর্টের নন্দলা রায় জয়লিং ও শেকালী অর্পণা সাজিয়াছিল। অভিনয়ের রাত্রে নন্দলাল শেকালী প্রেম পড়িয়া যায়। কিছুদিন পর কলিকাতার এক রাজপথে নন্দলাল বীর প্রকাশ করিতে দেখা। শেকালীও নন্দলালকে মনে মনে ভালবাসিত।

ফলে শেষ পর্যন্ত নন্দলাল শেকালীর বাড়ীর সামান্য-সামান্য এক মেলে ডেরা বাঁধে।

সামান্যের দ্বারা প্রেমটা হাউ হাউ করিয়া বাড়িয়া উঠার কথা, কিন্তু বাধা হইল নন্দলালের হারিজাত, দরিদ্র থাকিলে শেকালীকে পাইবেনা এ কথা মনে মনে স্থির জানিয়া সে বড়লোক হইবার জন্য কেপিয়া উঠিল। কলিকাতার বড়লোক হইবার সহজতম উপায় রেল খেলা। নন্দলাল করণী



ভূপেনের উৎসাহে রেল খেলিতে শুরু করি এবং ধাপে ধাপে অধঃপাতের পথে নাড়ি লাগিল।

গোপাল দাষ্টার মনে মনে ছাত্রীকে আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু শেকালী নন্দলালকে ভালবাসে গোপাল এ কথা জানিতে পারিয়াছে। সে নন্দলালের উপ হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল এবং শেকালী বাড়ীতে নন্দলালের বাতায়ন বন্ধ করিবার জ

কাছে লাগার। হরিজ্ঞ নন্দলালের সহিত শেকালীকে বিশিতে দিতে মিঃ বোনার্জির নিজেরই আপত্তি ছিল। তাঁহার নিজের Speculation এর ঝাঁক দিয়া শেকালীর পিতার দক্ষিত অর্থ অনেকখানি নিঃশেষ হইয়াছে। সরকার ভবভারগণের দাবধানতা সত্ত্বেও শেকালীকে বড়লোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া লেই পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান। সুতরাং শেকালীকে বাড়ীর দাওরান একদিন প্ৰত্যতিক নন্দলালকে জানাইয়া দিল—তাঁহার এ বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ। শেকালী ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিলনা। সুতরাং নন্দলালের অনুপস্থিতির অল্প কারণ করনা

করিয়া তাঁহার অভিমান হইল, নন্দলালের কলিত অপরাধের শাস্তি বিচার জন্য সে নন্দলালকে বাধ দিয়াই তাঁহার দক্ষিণ কলিকাতার বঙ্গ-বান্ধবীঘর লইয়া বাড়ীতে নাচ গানের জলসা বসাইল।

বাধা পাইয়া ইতিমধ্যে নন্দলাল আরও কেপিয়া গিয়াছে—বড়লোক তাহাকে হইতেই হইবে এবং বড়লোক হইয়াই সে শেকালীকে দাবী করিবে। রেল শুধু হার হর সুতরাং অল্প উপারও দেখিতে হইবে—ভূপেন সে

উপায়ও বাংলাইয়া ছিল, যুথিকা নারী এক-জন নবাগতা ধনী বন্যাকে বশ করিয়া তাহার টাকা বাগাইতে নন্দলাল একটু চেষ্টা করিলেই পারিবে। যুথিকার পূর্ব-পরিচয় অজ্ঞকারাচ্ছন্ন কিন্তু কলিকাতায় তাহার জীবক ও ভক্তের অভাব নাই। সে রীতিমত রেল কোলে যাত্রা, বাড়িতেও স্বাধীনভাবে সর্বলৈর সহিত মেলাবোলা করে। এক পত্রিকার সম্পাদক সেখানেও নন্দলালের ঘাটি আগলাইয়া বলিয়া আছে। নন্দলাল মরিয়া হইয়া উঠিল। ওষিকে শেফালীর মাথা ও মা তাহার দিবাহের আরোজন করিতেছেন, ঢাকার এক জমিদার তাহার পুত্রের জন্ত শেফালীকে বেধিতে আসিতেছেন।



বাড়িতে একমাত্র ভবতারগই শেফালীর মনের অবস্থা জানে, শেফালী জলসার রাত্রে হর্শনপ্রার্থী নন্দলালকে তাহার লাহায়ে উপরে নিজের ঘরে আনাইয়া তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতে যাইবে এমন সময় মা ও মা হাজির হইলেন সেখানে। সেইজন্য নন্দলালের সহিত বোঝাপড়া হইল না।

বাঙাল জমিদার শেফালীকে বেধিয়া তাহার লাহেবী চাল-চলন বেধিয়া চট্রা ফিরিয়া গেলেন। এষিকে গোপাল মাষ্টারও একদিন শেফালীকে প্রেম-নিবেদন করিয়া অপমান করিল। শেফালী কাহাকেও কিছু না বলিয়া মাষ্টারকে দূর করিয়া দিল। এবং নিজের ভাগ্যকে জানিয়া লইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল।

যুথিকাকে হাত করিতে গিয়া সম্পাদকের সহিত নন্দর বোরতর হাতিহাতি হইয়া গেল। নন্দলাল সম্পাদককে ধমালারী করিয়া শেষ পর্যন্ত পুলিশের ভয়ে পলাইয়া বাঁচিল ও মেলে ফিরিয়া ঘূষাইয়া পড়িল। নন্দলালের এক তীর্থ-প্রবাসী দ্বিবিমা ছিলেন, তিনি হঠাৎ মৃত্যু-

নিরুদ্দেশ। মাথা ও মারের হুংখের কথা, তাবিয়া সে বিবাহের জন্ত রাজি হয় মনে মনে। কিন্তু কঠিন একটা কিছু করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকে।

এই সময় কলিকাতা শহরে হঠাৎ কুমার ইন্দ্রকুমারের হয় আবির্ভাব। মফঃস্বল হইতে তিনি জীবন-সঙ্গিনী লংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছেন সঙ্গে আছে সেক্রেটারী। বিবাহযোগ্য্য কস্তারের অভিভাবকদের মধ্যে চাকল্য দেখা দিল। যথাসময়ে মিঃ বোনার্জিও এই পাত্রকে হাত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেক্রেটারী মারফৎ ফটো বেধিয়া কুমার শেফালীকে পছন্দ করিলেন এবং বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল। তাহার পর শেফালী এবং কুমার ইন্দ্রকুমার রায় ওরফে নন্দলালের কৌতুকপ্রমুদ প্রস্তর এবং চকিত ঘটনার গতির বাহা মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা 'হাল বাঙলা' চিত্রে বেধিবার সময় হানিতে হানিতে আপনাদের নিঃখাল রুজু হইয়া আসিবার উপক্রম হইবে।—



মুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুশব্দায় তিনি, তাহার স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নন্দলালকে উইল করিয়া দিলেন। সে দিন ঘুম ভাঙাইয়া উকিল সেই খবর দিতেই নন্দলাল মেল হইতে উধাও হইল।

শেফালীর জন্ত পাত্র খোঁজার বিরাম নাই, শেফালী কোশলে সকলকেই তাগার। সে নন্দলালের প্রতীকার থাকে। কিন্তু নন্দলাল

গৌড়গোবিন্দ পীঠ-লহরী

(১)

নন্দলাল (মহাদেব পাল)

তুমি আছ কিনা নাহি জানি
রহি লংশয় মাঝে একা
কাঁধে আধারে আলোর প্রাণী
হাও হাও হাও হেথা ।
দেবী, তিমির মহিষাসুরে
তোমার খড়্গে হনন কর ।
গলে যুগু মালিকা পরি •
মাগো, মাজো প্রলয়ঙ্কর ।
মহাপাপের কুধির ধারে
সব তব অপহৃত হোক
হেথা নিবিড় অন্ধকারে
জালো, জালো শশাক লেখা ।

সজনী হাস

(২)

শেকালী (ছায়া দেবী) •

আমি একলা চলেছি এ ভবে
আমায় পথের সন্ধান কে কবে ?
ভয় নেই, ভয় নেই, যাও আপন মনেই
যেমন, একলা মধুপ খেয়ে যায়
কেবল ফুলের লোরভে !!

রবীন্দ্রনাথ

(৩)

গোপাল (যুগল ঘোষ)

কোটে যদি পথের কাঁটা তোমার পায়ে
তুমি লখি, বসবে এসে বনের ছায়ে ।
বেলীখানি ছলবে তোমার পিঠের পরে
ধরবে আমার বাহুখানি শিথিল করে
আঁচল তোমার উড়বে মুহু বখিনবারে
কোটে যদি পথের কাঁটা তোমার পায়ে ।

সজনী হাস

(৪)

তৈল বিক্রেস্তা

চাই তেল, তেল চাই, চাই তেল
তিল তিনি মসনে রেড়ি সরষে নারিকেল •
এবাজারে নার তেল, লকলই তেলেরই খেল
একথা তুলেছ যদি লংসার হবে হেল ।
মাত্রা যদি হয় ঠিক বশ হয় কাবুলে শিখ
বাবু বশে (আর) মোশাহেবের এই লক্তিশেল
চাই তেল, তেল চাই, চাই তেল
(তেল চাই Sir)

সজনী হাস

(৫)

গাড়োয়ান (রঞ্জিত রায়)

নাম ধরইরা মোর সোনা বন্ধু কইরো তুমি রাও
তোয় লাগিল পরাণ কান্দেয়ে
বিক্রেণী বন্ধু !
বন্ধুরে আশা দিয়া গাঙেরে তুলে
রক্ত দেখে দূরে বঠমেরে
আমীরে কান্দালে বন্ধু
তোমার কান্দন পাড়েরে
বিক্রেণী বন্ধু !!

বন্ধুরে পশ্চিমতে আইলরে উইরা
দূরের পূবাল বাও
নাম ধরইরা মোর শোণা বন্ধু
কইরো তুমি রাও

বিক্রেণী বন্ধুরে !!

গ্রাম্য কবি

(৬)

শেকালী (ছায়া দেবী)

কুহুম কাঁধে হার
ভরসা নাহি পার

ফুল মালা শুকার

ফুল না করিতে ।

মনের খেলা ধর

সহেনা অতি ভর

নিখিল চরাচর

• আঁধার ঘরিতে !! •

সজনী হাস

(৭)

শেকালী (ছায়া দেবী)

ওগো আমার হৃদয় বনের নীড় হারাণো পাখী
উক আমার বন্ধপুটে আর চলে আর
তোরে রাখি ।
উদাল পরাণ কাঁপায়ে হায়
বইছে উতল পূবালী বায়
পুলক পাগল কবচ শাখার কাঁপছে থাকি
থাকি ।

সজনী হাস

(৮)

সুকুমার

এল দরদিয়া, আও নিচুর দিয়া
তুমি আও একেলা মেরা হৃদয়
গলিতে
বহুত লোক দেখো ওই হল্লা মচার
বহু বাহার বাহার সব লহরতলীতে ।
সজনী হাস

(৯)

শেকালী (ছায়া দেবী)

জলে আলোয়ার আলো, ধরিয়া না যায় ধরা,
লম্ব নাইবে যুমে জাগরণে স্রা
স্বপন ভাঙ্গিয়া যায়
মন করে হায় হায়
নিশীথ অন্ধকার—প্রতিভিত তারায় ভরা
দেবতা তোমার লাগি
কুহুম রয়েছে কাগি
কিরাবেনম মুখ জানি, তুমি ধূলার ধরা ।

সজনী হাস

(১০)

শান্তা

সকলি আমার ঘোষ, কে বন্ধু, সকলি আমার
ঘোষ।

না জানিয়া যদি করেছ পিরীত, কাহারে
করিব ঘোষ
সুধার লহু লহুপে দেখিয়া, আইতু আপন
সুখে

কে জানে থাকিলে, গরল হইবে পাইব এতেক
তুখে।

যাহার লাগিয়া যজ্ঞন মরয়ে দেই যদি করে
আনে
চণ্ডীদাল কহে এমন পিরীতি করয়ে সজ্ঞন
সনে।

সজ্ঞনী দ্বাল

(১১)

শান্তা

মৌমাছি তার ডাক ভুলেছে, মৌচাকে কে
বাধবে ঘর

পথ ভুলেছে রাজার ছেলে

রূপকথার এ তেপান্তর
সুধার সুখে, রাজার ঘরে
রূপার কাঠি পরশ পেয়ে
রাজার ছেলে সোণার কাঠি
পরশ তাহার স্বতন্ত্র।

সজ্ঞনী দ্বাল

(১২)

যুধিকা (চন্দ্রিকা দেবী)

বনের হরিণ আপনি এসে দেখ যে ধরা
শিকারী লাগলে চল, শিকারী লাগলে চলো
পথ যায়না দেখা, কালো কাজল রাত্তি
নীড়ে দিনের পাখী বেঁজে রাতের লাথী
দূরে জাগায় স্বপন কার বাজ কঁকন
ঝরনা ঝরনা কলকল কলসরা।

সজ্ঞনী দ্বাল

(১৩)

শেফালী (ছায়া দেবী)

আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বলে,

দ্বিবল গেলে করব নিবেদন

আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন

কখন বেলা শেষের ছায়ায়

পাখীরা যার আপন কুলার মাঝে

লক্ষ্য পূজার ঘণ্টা যখন বাজে

তখন আপন শেষ শিখাটি

জাগবে এ জীবন

ব্যথার পূজা হবে সমাপন।

রবীন্দ্রনাথ

(১৪)

গোপাল (মৃণাল ঘোষ)

খিলবে জানি কুল,

কাঁপিয়ে পড়ি মরণ সরোবরে

লেখা ফুটবে হয়ে কুল।

ভ্রমর হয়ে তোমরা এলো লখি

ফুটিওনাকো হল।

আবার যেন টানতে না হয়

এই জনমের ভুল।

সজ্ঞনী দ্বাল

(১৫)

নন্দলাল (মহাদেব পাল)

মনের গোপন লোকে, এল, গেল চলে,

আঁধার ধরাতল ভরিল কোলাহলে,

চমকি বেধি জেগে

আঁচল ছোঁয়া লেগে

রক্তের মালাখানি কণ্ঠে মধু ধোলে

সজ্ঞনী দ্বাল



শ্রেষ্ঠ সিনেমা

তুলসী লাহিড়ী : বাঙলা দেশের
শিল্পকলা বিভাগে যে কয়টি শিক্ষিত ব্যক্তি
আছেন তুলসীবাবু তাঁদের অন্যতম।

বি, এল পরীক্ষার
উত্তীর্ণ হয়ে ইনি
ওকালতি ব্যবসায়
আত্মনিয়োগ কোর-
বেন এই ছিল তাঁর



বরাবরের ইচ্ছা। কিন্তু ছোটবেলা থেকে
সঙ্গীতচর্চা নিয়ে তুলসীবাবু বিশেষ গবেষণা
করেন, যার ফলে পরবর্তী জীবনে ঘটনাচক্রে
ওকালতি ব্যবসায় মনোযোগ না দিয়ে
তিনি সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেই ক্রমশঃ জনগণের
দৃষ্টিপথে আসেন।

অল্পদিনের মধ্যেই রেকর্ড-গায়করূপে
তুলসীবাবু সুনাম অর্জন করার সিনেমা
কোম্পানী থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে
লাগল। “মণিকাকন”, “বিরহ”, “দোনার
লংসার”, “মায়া-কাজল” প্রভৃতি চিত্রে অভিনয়
কোরে তিনি বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্য-
রসিক অভিনেতা হিসাবে সম্বলিত হ’তে
লাগলেন। বায়োস্কোপের ভেতর বাঙলা
দেশের কণার ও হাবভাবের প্রবর্তন করেন
তুলসীবাবুই প্রথম। এ ছাড়া তুলসীবাবু
কয়েকখানা ছাপির ছবিও পরিচালনা করেন।
মঞ্চ, পর্দা ও রেকর্ডে সঙ্গীত পরিচালনা কোরে
ইনি বিশেষ চূনাম অর্জন করেন।

“হাল বাঙলা”র তুলসীবাবু একটি বিশিষ্ট
চরিত্রে আত্মপ্রকাশ কোরেছেন। এই
ভূমিকাটি তাঁকে যখন বেগুনা হয়, তিনি
নাকি বলেছিলেন, তিনি এই ভূমিকার সূতন
কিছু দেখাতে পারবেন।

• তুলসীবাবু বাঙালি থাকে বলে 'মাতী'র 'মহাব' তাই। এর সঙ্গে যারা মিশেছেন তাঁরা জীবনে একে কখনও রাগতে দেখেননি বা মিষ্টকথা ছাড়া কোনদিন চড়া কথা বলেন নি।

মহাদেশ পাশ: চিত্ররাজ্যে ইনি নবাগত। "হাল বাঙলা"র ইনি নায়ক নন্দলালের ভূমিকায় অভিনয় মনোনীত হয়েছেন। যে



সকল গুণ থাকলে সাধারণত: নায়কের ভূমিকায় নেমে সুনাম অর্জন করা যায়

মহাদেশবাবু সেই সেই গুণে অলঙ্কৃত। উৎসাহ ইনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ। অভিনয়-কলা নিয়ে মহাদেশবাবু চর্চা করেছেন শৈশব থেকে। সৌখীন নাট্য-হলে অভিনয় কোরে ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

• **মৃণাল ঘোষ:** সুরলোকের সুর 'সঙ্গীত' মৃণাল ঘোষের নাম বোধকরি কারও অজানা নেই। রেকর্ড-গায়ক হিসাবে ও



সিনেমায় গীতীবহুল ভূমিকায় মৃণালের সমকক্ষ শিল্পী বাঙলা দেশে জোড়া মেলা ভার। বহু-চিত্রে

অভিনয় কোরে মৃণাল সুনামের লোগলি শিখরে আরোহণ করেছেন। সম্প্রতি ইনি ঠার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অহুরোধে "বিজ্ঞাপতি"-তে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু লেখানকার আব-হাওয়া তার পক্ষে অসহন না হওয়ায় তিনি মঞ্চের দ্বারা ত্যাগ করেন।

মহাব হিসাবে মৃণাল নিরঙ্করী ও বজুবৎসল। গানের উৎকর্ষতাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

প্রভাত সিংহ: মঞ্চের একজন উদীয়মান অভিনেতা। কেতা-দোরস্ত নাহেবিয়ানা ধরণের ভূমিকায় প্রভাতবাবু বিশেষ পারদর্শী।

"হাল বাঙলা"

চিত্রে ব্যারিষ্টার মিঃ বোনার্জির ভূমিকায় পরিচালক যখন সু-



যোগ্য অভিনেতা খুঁজছিলেন, সেই সময় হঠাৎ প্রভাতবাবুর নাম তাঁর মনে পড়ায় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন।

ফনি রায়! ছায়াপটে আত্মপ্রকাশ কোরে যে চ' একটি অভিনেতা 'তারকা'-র সম্মানে ভূষিত হন ফনি রায় তাহের মধ্যে অগ্রতম। "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"র সেই বৃদ্ধকে আজও কেউ ভুলতে পারে নি। "হাল বাঙলা"র কণিবাবুকে একটি নূতন টাইপের চরিত্রে দেখা যাবে।

রঞ্জিত রায়: সুপ্রসিদ্ধ কৌতুক অভিনেতা হিসাবে ও হালির গান গাওয়ার রঞ্জিত বাবু সুনাম অর্জন করেছেন। বাঙলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় হুহু কথাবাস্তী বলতে ইনি বিশেষ পারদর্শী এবং এই ধরণের ভূমিকায় ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মঞ্চ ও চিত্রজগৎ ভিন্ন রেকর্ড-গায়করূপে রঞ্জিতবাবু অসাধারণ লাফল্য অর্জন করেছেন। রেকর্ডে এবং সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা কোরেও রঞ্জিত বাবু নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

"হাল বাঙলা" চিত্রে রঞ্জিত রায় হালির গান ও অভিনয়ে পর্দার ওপর হালির অরণ্য-ধারার প্রেক্ষাগৃহ মুগ্ধিত করেছেন।

• **সত্য মুখার্জি:** হান্তরসিক অভিনেতা হিসাবে সত্যবাবুর সুনাম আজ স্বর্গ-করোজলের দিকে দিকে উদ্ভাসিত। "লোণার-সংসার"-র সেই বাঙাল বেকার যুবক এত অল্পদিনের মধ্যেই যে লক্ষ্য রূপালাতে নিজের

বেকারত্ব ঘূঁটরে কেলেতে পারবেন—একথা তখন কেউ ভাবতেই পারেনি। বাঙলাদেশে যে টুডিওর যে ছবি হচ্ছে সত্যবাবুকে অভিনয় করার জন্য লেখান থেকেই আমন্ত্রণ আসছে।

"হাল বাঙলা"-র সত্যবাবু একটি হালির ভূমিকায় নেমেছেন সত্য; কিন্তু এতাবধি যে ধরণের ভূমিকা তিনি অভিনয় কোরে এগেছেন, এই ভূমিকাটি ঠিক সেই ধরণের নয়। নূতন-রূপে, নূতন রশে সত্যবাবু "হাল বাঙলা"-র আত্মপ্রকাশ কোরবেন তাঁর অগণিত ভক্ত-মণ্ডলীর লামনে।

ব্যক্তিগত জীবনে যারা তাঁর সান্নিধ্যে এগেছেন, তাঁরাই জানেন, তিনি মিষ্টভাষী হান্তরসিক এবং বজুবৎসল।

নবদীপ হালদার: সুপ্রসিদ্ধ কৌতুকভিনেতারূপে সাধারণের দৃষ্টিপথে আসেন "লোণার-সংসার" চিত্রে অভিনয় করার পর থেকে।

ইনি যে টাইপের হান্তরসাত্মক চরিত্রে

অভিনয় করেন তা' সম্পূর্ণ স্বাভাবিক

ধরণের। এ ছাড়া নবদীপবাবু গলার ভেতর থেকে, নানারকম আওয়াজ বের কোরতে বিশেষ পটু। ইনি কৌতুকভিনেতারূপেও সুনাম অর্জন করেন।

"হাল বাঙলা" চিত্রে নবদীপবাবু যে চরিত্রে অভিনয় কোরেছেন তা' তাঁর পূর্ব সুনামকে আরও উজ্জ্বল কোরবে বলে মনে হয়।

হরিদাস অ্যানার্জি: 'হরবোলা' রূপে ইনি সাধারণের কাছে সুপরিচিত। রেকর্ডে এই 'হরবোলা' রূপেই ইনি বিশেষ

খ্যাতি অর্জন করেছেন। ছায়া-চিত্রে ইনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন "বাল্যলী" চিত্রে।



মেট্রোপলিটন পিকচার্স
হাস্যরহস্যচ্ছন্দ



হাল-বাঙলা

হাল-বাঙলা শুধু
মানুষের অক্ষমতা
ও অসঙ্গতি লইয়া
কৌতুক বা ব্যঙ্গ নয়

কৌতুক...
রহস্য...
প্রণয়...
বিদ্রোহ...

চরিত্র প্রবহমান আধুনিক জীবনের অকারণ
এবং অবাস্তব গতি ভঙ্গিমার একটী সরস বিবরণ;
আপনার, আমার এবং আরও অনেকের
আতিশয্যের শুধু সমালোচনা নয়...

রহস্য-চট্টল অভিব্যক্তি -

* * * *

হাল-বাঙলার এই অভিনব চরিত্র চিত্রণে মহাদেব
সাহায্য লইতে হইয়াছে,

ছান্না দেবী, শ্রীরেন গাঙ্গুলী, চন্দ্রিকা, তুলসী লাহিড়ী,
মহাদেব পাল, যুগল ঘোষ, প্রভাত সিংহ, ফণি রায়,
সত্য যুগোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, বীণা বসু,
পদ্মাবতী, শ্রীরেন পাণ্ডে, সন্তোষ সিংহ, হরিদাস
বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন চক্রবর্তী, রঞ্জিত রায়, গোপাল
সেন গুপ্ত (অঙ্ক গায়ক) প্রভৃতি

* * * *

বি, এল, থেমকার, প্রযোজনায়...

ইফ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ স্টুডিওএ গৃহীত...

রূপবাণীতে

শ্রুত-উদ্বোধন

শনিবার, ১২ই মার্চ

“হাল বাঙলা” ছবিতে “হরবোলা”কে
বেধে ববাই যে খুব খুশী হবেন—একথা
বলাই বাহুল্য।

গোপাল সেনগুপ্ত : অঙ্গারক
গোপাল সেনগুপ্তের কণ্ঠ-সঙ্গীত রেকর্ড ও
দিনেবার বর্ষকগণকে এক অপূর্ণ পুলকে
অভিভূত করে।

“হালবাঙলা”র গোপাল বাবু একটি গানের
ভূমিকার নেবে তার সুরমালা বর্ষকগণকে
বিমোহিত করেছেন।

গিরীণ চক্রবর্তী : গায়ক হিসাবে
গিরীণবাবু আজ বাংলার জনসমাজে সুপরি-
চিত। রেকর্ড ও দিনেবার তিনি যে সকল
গানগুলি গেয়েছেন সেগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা
লাভ করেছে।

প্রফুল্ল মুখার্জি : অতি অল্পদিনের
মধ্যেই প্রফুল্লবাবু চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ
করেছেন। “পায়ের ধূলা” ও “দোণার
লংগারে” দু’টি ক্ষুদ্র ভূমিকার অভিনয় করেই
প্রফুল্লবাবু সকলের দৃষ্টিপথে আসেন।

“হাল বাঙলা”র প্রফুল্ল বাবু কাগজের
সম্পাদকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বীণা বসু : চিত্রজগতে ইনি
নবাগতা। বীণা বসু গান গাইতে পারেন
ভাল—চেহারাও ভাল। “হালবাঙলা”-র
গানের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকার শ্রীমতীকে দেখা
যাবে।

পদ্মাশ্রী : মঞ্চ ও পর্দার ইনি
জনপ্রিয় অভিনেত্রী। নানা ধরনের ভূমিকার
অভিনয় কোম্বতে শ্রীমতী বিশেষ পটু। স্টেট
ইন্ডিয়ান হ’লে “পথের শেষে” চিত্রে ইনি
একটি বিশিষ্ট ভূমিকার অভিনয় করে খ্যাতি
অর্জন করেন।

“হালবাঙলা”র শ্রীমতীর যে চরিত্রে আত্ম-
প্রকাশ পেতে ছোট্ট ছলেও এই ধরনের ভূমিকার
ইনি যে সুনাম অর্জন কোরবে পারবেন,
একথা বলাই বাহুল্য।



১৯৩২ সালের ১২শে ডিসেম্বর ছাত্রাচিত্র-
প্রদর্শনের একটি অরবীর্ণ দিন। সেদিন
পৃথিবীর প্রাঙ্গণে যখন লক্ষ্যার ছাত্রা নেমে
আসছিল—সেই শুভ-গোধূলি-লগ্নে কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথের দেওয়া পরিচর নিয়ে উত্তর-
কলিকাতার এই শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহটির অনুষ্ঠানসব
সম্পন্ন হয়েছিল। কবিগুরু নামধানের
লক্ষণেই সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন—
‘বেহমুক্ত রূপের সঙ্গে

বুগলমিলন হোলো

বেহমুক্ত বাণীর,

প্রাণতরঙ্গিতরী তীরে

বেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে’

তাই তিনি ছিলেন নাম ‘রূপবানী’—

‘রূপবানী’ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সেই নাম
দার্থক করে তুলেছে। মিঃ বি. এল. থেম্কার
প্রযোজিত “বমুনা পুলিনে” ছবি দেখানোর
সঙ্গে সঙ্গেই এই চিত্র-মন্দিরের জনপ্রিয়তা
বহু-প্রসারিত হয়। এই চিত্রগৃহেই মিঃ
থেম্কার “বিত্রোহী” ও “পায়ের ধূলা”
নগরীরে প্রদর্শিত হয়। এছাড়া শ্রীতারত-
লক্ষীর “আলিবাবা” রূপবানীতে নতুন রেকর্ড
সৃষ্টি করে। “আলিবাবা” এই চিত্রগৃহে
চৌদ্দ হপ্তা চলে এবং প্রায় ৭৫,০০০ ছাত্রার
টাকা মোট লাগু হইত হয়। বিলেতি ছবিও
এই চিত্রগৃহে দেখানো হ’লেই ভিল বারবার
হাস খাকে না—কিন্তু এখানে আর-
কে-ও যেতিয়া “কিছু কিছু” ছবি তিন হপ্তা
চলে, যে পরিমাণ টাকা দিরেছে ইতিপূর্বে

এবং পরে কোন বিলেতি ছবিতে সেই
পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়নি। “কিছু কিছু”
তিন হপ্তার মোট ১২,৫০০ টাকা দের।

এই চিত্রগৃহের এত জনপ্রিয়তার কারণ
এই চিত্রগৃহটির বহিরাবরণ রমণীয়। প্রথম
হইতে চতুর্থ শ্রেণী সকল বর্ষকদেরই সুখ-
সুবিধা এবং আরামের দিকে লক্ষ্য রেখে
এরা আপন প্রকৃতির ব্যবস্থা করেছেন।
বাইরের মত এই চিত্রগৃহটির ভেতরকার সজ্জা
আকর্ষণীয়।

এ ছাড়া ‘রূপবানী’র শব্দ প্রেক্ষণন বহুটি
অতুলনীয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহগুলিতে
আজকাল যে ‘আর, মি, এ’ শব্দব্যবহার
হ’চ্ছে এই বহুটি তাহদের অন্ততম।

তবে এই সব কারণেই নয়; এ ছাড়া
এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীমদারজন, যোগ্য, শ্রীপ্রকাশ
নান, শ্রীসুধীর নান, শ্রীরবীন্দ্র নাথ বসু
পরিচালক মণ্ডলীর ব্যবস্থা বুদ্ধি, অসাধারণতা
ও সকলের সঙ্গে সন্মান ব্যবহার এই চিত্র-
গৃহটিকে সাধারণের কাছে আরও জনপ্রিয়
করে তুলেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জেহাদেই যে
চিত্রগৃহের উদ্বোধন হ’য়েছিল, যে চিত্রগৃহ
আজ চর বহুর লোকের দেখা কোরে সুনামের
উজলিখরে আলীন; ধনী নিধনীর যে চিত্র-
গৃহে, আবাস-পতি সেই লক্ষ্যজনপ্রিয়
‘রূপবানী’তে আজ মিঃ থেম্কার নতুন
প্রদর্শন “হাল বাঙলা” দেখাবার ব্যবস্থা করে
তিনি সুখদীরই পরিচর দিয়েছেন।



মিঃ বি. এল. খেমকা

মিঃ বি. এল. খেমকা জাতিতে মাড়োয়ারী হইলেও তিনি বাঙ্গালী ও নিজ সম্প্রদায়ের কাছে সমভাবেই সম্বন্ধনা পান। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, তাঁর কর্তৃত্বশক্তি, তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি, তাঁর ভীষণদৃষ্টি প্রভৃতি আজ তাঁকে জন-সাধারণের কাছে বিশেষ প্রিয় কোরে তুলেছে। ব্যবসায় তাঁর মাড়োয়ারী বুদ্ধি ও ব্যবহারে তাঁর বাঙ্গালীর প্রেরণা তাঁকে সাহায্য কোরেছে বড় হ'তে। বাঙলাদেশে আজ পর্যন্ত যে কয়জন অ-বাঙ্গালী এসে ব্যবসায় কোরেছেন, মিঃ খেমকার মত জন-প্রিয়তা লাভ কেউ কোরতে পারেন নি।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর কর্ণধাররূপে চিত্রজগতে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। তাঁরই প্রযোজনায় তোলা 'সীতা' 'পথের শেষে', 'বিজোহী' 'পায়ের বুলা', 'সোনার সংসার', 'লমলা-মজমু', 'বাগে লিপাহী' প্রভৃতি

মিঃ খেমকার নতুন উদ্যম

চিত্রাবলী সারা ভারতে এক প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

সম্প্রতি মিঃ বি. এল. খেমকা 'মেট্রোপলিটান পিকচার্স' নামে যে চিত্র-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত কোরেছেন তা' এই অভ্যন্তরকালের মধ্যেই সর্ব-সাধারণের দৃষ্টিপথে এসেছে কেবল-মাত্র মিঃ খেমকার জনপ্রিয়তায় জন্ম। এদের প্রথম বাঙলা-চিত্র 'হাল বাঙলা' এখনও মুক্তি পায়নি; তথাপি চারি-দিকে এর মধ্যে যে সাড়া পড়ে গেছে তা' সত্যই প্রণিধানযোগ্য। 'হাল বাঙলা' নূতন ধরনের হাস্যরসাত্মক ছবি। এই সময়ে এই ধরনের ছবির বাজারে চাহিদা বুঝেই মিঃ খেমকা হাসির রাজা খোরেন গাঙ্গুলীকে দিয়ে 'হাল বাঙলা' তুলে কত বড় যে ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা যাঁরা এই ব্যবসায় সঙ্গে জড়িত আছেন তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার কোরবেন। আগামী শনিবার, ১২ই মার্চ উত্তর কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-গৃহ 'রূপবাণী'-তে 'হাল বাঙলা' মুক্তি লাভ কোরবে। তিনি বাঙলাদেশে হাস্যরসাত্মক



মিঃ এন. গোস্বামী,

অভিনেতা এবং বাঙলার জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকাদের সমাবেশে চিত্রখানি সংগৃহীত কোরেছেন। এ ছাড়া এই ছবির সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হ'চ্ছে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ছায়া দেবীর নায়িকার ভূমিকাভিনয়। এই সব দেখে মনে হয়, মিঃ খেমকার নূতন উদ্যম জয়যুক্ত হবে।

এরপরেও এই প্রতিষ্ঠানে যে সকল চিত্র গৃহীত হবে সেগুলিও সবদিক থেকে যে সাধারণের মনস্তৃষ্টি কোরবে একথা বলাই বাজল্য। এদের পর-বর্তী চিত্রগুলি হ'চ্ছে—

খানা (বাঙলা) — ছবিখানা পরিচালনা কোরবেন সুবিজ্ঞ পরি-চালক জ্যোতিষ ব্যানার্জি। মুখ্যাংশে অভিনয় কোরবেন ছায়া দেবী ও অহীন্দ্র চৌধুরী।

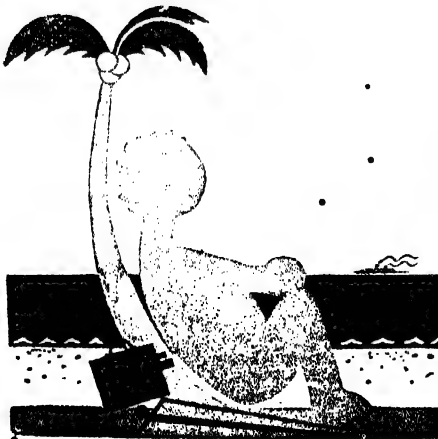
চন্দ্রশেখর (হিন্দি ও বাঙলা) — বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অমর কাহিনী। ছবিখানা মিঃ এলিস্ আর

জনকানকে দিয়ে পরিচালনা করবার
জন্ম তাঁকে ভারতবর্ষে আনা হ'য়েছে।

দিল্লি-কি-আগ ৪ আগা
হাসান কাশ্মিরীর শেষ দান। ছবি-
খানার মূল ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ
কোরবেন ছায়া দেবী ও ধীরেন
গাঙ্গুলী।

এই চিত্রগুলি মিঃ বি. এল.
থেম্কার নিজ ভবনস্থানে তোলা
হবে। এবং এই ছবির সাফল্যের
জন্ম এই প্রতিষ্ঠানের বিচক্ষণ কর্ণধার
মিঃ থেম্কা অর্থ ও সাধারণ ব্যয়ে
কিছুমাত্র কার্পণ্য কোরবেন না।

এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূলে
আর দু'জন আছেন; তাঁরা হ'চ্ছেন,
এই চিত্রের পরিবেশক এম্পায়ার
টকী ডিস্ট্রিবিউটারসের সুযোগ্য
ম্যানেজার মিঃ এস. আর. হেমাঙ্গ ও
এই প্রতিষ্ঠানের প্রবন্ধক শ্রীউপেন্দ্র-
নাথ গোস্বামী। এঁদের সকলের
যোগাযোগে মিঃ থেম্কার এই নব-
উদ্যম যে কুসুমারত হবে একথা
বলাই বাহুল্য।



হাল বাঙলার টেক্‌ নিসি স্মান্



“হাল বাঙলা” পরিচালনা কোরেছেন
ধীরেন গাঙ্গুলী। ছায়া দেবী পরিচালনার
তিনি যে সিদ্ধান্ত একথা কারও অজানা
নেই। তা' ছাড়া ছবির গল্পটিও চমৎকার।

“হাল বাঙলা”র আলোকচিত্র-শিল্পীরূপে
কাজ কোরেছেন জোশাচার্য। নিউ থিয়েটার
ও রাধা ফিল্মের বহুচিত্রে সহকারীরূপে
তিনি কাজ কোরে যে অভিজ্ঞতা লভ্য
কোরেছেন—স্বাধীনভাবে কাজ কোরে তার
বিশাল দৃষ্টিতে পাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য
নয়।

শব্দযন্ত্রী হিসাবে ইরানীর নূতন পরিচর
নিম্মরোজন। বহুচিত্রে শব্দযন্ত্রের কাজ
কোরে ইরানী সুনামের উচ্চশিখরে আনীন।
“হাল বাঙলা”র শব্দযন্ত্রের কাজ প্রথম
শ্রেণীর হবে বলেই ধারণা করা যায়।

“হাল বাঙলা”-র রূপসজ্জার কাজ
কোরেছেন সুপ্রসিদ্ধ রূপ-লজ্জাকর ইঁদু।
“সোণার সংসারে” বার কাজ যেখে লবাই
উজ্জ্বলিত প্রশংসা কোরেছিলেন “হাল
বাঙলা”-র সেই রূপ-শিল্পীর রূপসজ্জা
এবারও যে সবাইকে মুগ্ধ কোরবে—একথা
বলাই বাহুল্য।





স্বপ্নশালা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লক্ষ্যনাশ! কোথায় কাশী, আর কোথায় পাড়ারগারের আদালত ঘর! হুটো যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

জগন্তারিণী দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন : হোক তফাৎ! লবঙ্গর ওপর এই অত্যাচার ঘাড় পেতে সয়ে নিলে, আমার কাশীই হয়ে দাঁড়াবে পাড়ারগারের আদালত ঘর!

—নবম পরিচ্ছেদ—

যতক্ষণ জগন্তারিণী লবঙ্গর ওপর এই অবিতারের প্রতিশোধ লইবার জন্য জগদ্ধাকৈ উত্তেজিত করিতেছিলেন, ততক্ষণ লবঙ্গ নিজে জানালার গরদ ঘুরিয়া বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঠিক ভেমনি ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সে ভালমন্দ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

জগন্তারিণী আরও কিছুক্ষণ যজ্ঞস্থরের লহিত পরামর্শ করিয়া লটান গিয়া হাকির হইলেন একেবারে জামাইবাবুর ঘরে। সেদিন কি একটা উপলক্ষে আদালত বন্ধ ছিল। জামাইবাবু বৈঠকখানা ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া ললিতার খবরাখবর লইয়া লবে স্নানে বাইবার উত্তোগ করিতেছে। এমন সময়ে জগন্তারিণী আসিয়া বলিলেন : “হ্যাঁ বাবা নীরব! আমার সঙ্গে ঐ যে মেয়েটা এলেছে, ওর যে লক্ষ্যনাশ হ’ল।”

নীরব চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—
কি হয়েছে বাবা?

—আর বলো কেন বাবা, যত আমার ঘাড়ে! বাবা বিশ্বনাথ বুঝি এখনও আমার ছুটি ঘেন নি। ঐ যে মেয়েটা

এলেছেন আমার সঙ্গে, ওকে নিয়ে গিয়েছিলুম কাশী! ওর স্বামী ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়! বলে ‘আমি খেতে দিতে পারিনে, তাই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম’—কিন্তু তা নয়! আল কথ্য কি জানো? ঐ ব’লে বউটাকে সরিয়ে দিয়ে সে ছোঁড়া আবার একটা বিয়ে করেছে! আমি তো তা জানিনে! জানলে কি আর আমি মেয়েটাকে কাশী নিয়ে যাই! শুলো পায়ে একটা লোক সঙ্গে দিয়ে ফের স্বামীর বাড়ী পাঠিয়ে দিই। ওরতো বাপ নেই,—মাও যা আছে—তা না থাকারই মধ্যে! সে নিজেই খেতে পারনা, তা মেয়েকে কি খেতে দেবে! এখন এই অনাথা,—

নীরব বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘মা? এরকম অনাথা আপনার কতগুলি আছে?’

—এরকম অনাথা আর একটিও নাই। আর যারা আছে তাদের তবু একটা পিসি, মালী কি দূর সম্পর্কের দ্বাধা খড়ো এসব বেচরার! কিন্তু তোমার বাড়ী যেটিকে এনেছি, এটার হুনিয়ার আর কেউ নেই! স্বামী ছিল সেও ওকে পর ক’রে দিয়েছে!

নীরব জিজ্ঞাসা করিল : এখন আপনি কি করতে চান?

—কি করা উচিত, তাইতো তোমার জিজ্ঞাসা করতে এলুম।

নীরব খানিকটা চূপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল : ওর স্বামী কি ওকে একেবারে বাড়ীতে ঢুকতে দেয়না?

—মোটোতো খোজখবর নেয়না! ওঁ কি লাহলে লেখানে যাবে?

—সেটা আপনারা দেখুন! যদি বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়, তখন খোরাক পোষাকের জন্তে নালিশ করুন।

—তা’লে তুমি বলছো, একবার লেখানে ও যাক। গিয়ে দেখুক ওর স্বামী ঘরবলত করতে দেয় কিনা!

নীরব তৈল মাখিতে মাখিতে বলিল : সেইটেই ভাল হয়না কি মা?

জগন্তারিণী বলিলেন তা তুমি মন্দ বলনি। একবার দেখুকইনা কেন? কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়, জামাইটা যে গৌরায়, সে যে ওকে বাড়ীতে পা পাততে দেবে এমন বাপের বেটাই সে নয়।

ঘরের মধ্যেই পালকে শুইয়াছিল ললিতা। সে লক্ষ্যনাশ শুনিতেছিল। সে বলিল : ধরো, জামাই না হয় ওকে পা পাততেই দিলে, তা হলেই কি ওর যাওয়া উচিত? ওর নিজেরই কি একটা আত্মসম্মতি আর অভিমান হয়না?

জগন্তারিণী বলিলেন : হুতো উচিত। কিন্তু এমন অবস্থায় ওকে টেনে এনে ফেলোছে জামাইটা, যে আত্মসম্মতি ছেড়ে আত্মসম্মতি এখন দায় হয়ে পড়েছে ওর।

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, অশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

ললিতা একবার পালকের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল : 'মা ? তুমি ভুলে যাচ্ছ, স্বামীর কাছে আত্মসম্মান নাষ্ট করার চেয়েও, আত্মহত্যা শতগুণে শ্রেয়স্কর।'

জগত্তারিণী একবার চুপ রহিলেন দেখিয়া ললিতা আরও বলিয়া যাইতে লাগিল : 'যে মেয়েমানুষকে স্বামী অপমান করে, তার আর রইল কি মা ? তার গলার হাড়ি দিয়ে মরাই ভালো। তার আর বেঁচে মুখ কতটুকু বাকি রইলো ? মানুষ কি পৃথিবীতে এলেছে শুধু ভাত খেতে, আর সুন্দারের গাধা খাটুনি খাটতে ?

জগত্তারিণী বাধা দিয়া বলিলেন : 'সে টুকুনও যে তার আঁটকে যাচ্ছে নলি।

—যাক্ আঁটকে ! কিছু আসে যায় না। লংগারে আপনার লোক যদি ছুটো হলে কথা না কইলে, তাহ'লে সে লংগার থেকে তফাৎ থাকাই ভালো।কি বলিস্ লবঙ্গ ? ছুটো ভাত চেয়ে খাবার জন্তে তোর স্বামীর লাগি খেতে স্বত্তরবাড়ী ঘাবি ?

লবঙ্গ এই সময় সে ঘরে আসিয়াছিল, হাতে এক ডিবে পান লইয়া টেবিলের উপর রাখিবার জন্য। এ করবিন ধরিয়া এই গৃহস্থালীর কর্মটি তাহার প্রত্যাশিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগে ললিতাই পান আনিয়া নীরব বাবুর টেবিলে রাখিত, কিন্তু ললিতাত এখন তাহার পালকের মধ্যে বন্দী ! কাজেই, একালটা কিছুদিন করিতেছিল যি, কিন্তু সেটা অনবীচীন বোধে ললিতা লবঙ্গকেই এই ভারটা দিয়াছে এই দিনকতক।

লবঙ্গ এই প্রস্নে থতমত খাইয়া গেল। জগত্তারিণী ও নীরব বাবু ঘরে না থাকিলে হয়তো সে এ প্রশ্নের যাহোক্ একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিতে পারিত। কিন্তু তাহাঘের সম্মুখে কোনও অভিমত প্রকাশ করিবার নিলজ্জতা সে একেবারেই পছন্দ করিলনা।

লবঙ্গ পানের ডিবা রাখিয়া, ঘরের অজান্তে ছুটুকটি পোবাকী কাজে ঘুরিতে করিতে লাগিল। ললিতা যে প্রশ্ন তাহাকে করিয়াছিল, লবঙ্গ তাহার কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য নীরববাবু কাণ পাতিয়াছিল, কিন্তু যখন কোনও উত্তর আসিলনা, তখন সে একবার আড়চোখে লবঙ্গর দিকে তাকাইল। দেখিল সে একখানি সাধারণ লালপেড়ে সাড়ি পরিয়া ঘুরিতেছে, তাহাতেই তাহার গায়ে যেন আশুপ লাগিয়াছে। অল্প একটুকু ঘোমটার আড়ালে যে মুখখানি দেখা যাইতেছে, তাহাতে গাভীখ্য খুবই বেশী, কিন্তু সাময়িক লজ্জার উদারকৃত্তিম আভাটুকুও অস্পষ্ট নহে। কাণে ছুইটি ঢল আছে, এবং নাকও একটি নোলক ঝুলিতেছে, কিন্তু তাহারা যেন অনাবশ্যক, মুখের যৌবল্যোৎকল্ল গম্ভীর কাস্টিটুকু সৌন্দর্যের কোনও কীকই বাকি রাখেন নাই।

লবঙ্গ কোনও উত্তর করিলনা দেখিয়া ললিতা আপনাই বলিয়া যাইতে লাগিল : 'না বাপু ! স্বামীর কাছে এমন ভিক্ষকের মতন গিয়ে দাঁড়ানো যায়না ! যেখানে রাজস্ব করবে, সেখানে কি সামান্য দানী স্বামীর মত হ'য়ে অহুগ্রহ কুড়ানো যায়, স্বামী মেয়েমানুষের আপনার জিনিষ, সেটাই যদি অপরে

কেড়ে নেয়, কি সেটাই যদি অজগর লাপ হয়ে দাঁড়ায়,—তাহ'লে জীবনটা হয়ে দাঁড়ায় বেবেদের মত ! ঝুলি কাঁধেই তার একমাত্র সম্পদ হয়।

নীরব এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এবারে হালিরা বলিল : 'যে যেটা না চাইতেই অজস্র-ভাবে পেরেছে, সে সেটাই গোমর করে ! কিন্তু সেটার যে কত দাম, এবং কি মূল্য দিয়ে যে সেটা কিনতে হয়, তাতো আর তার জানা নেই ! এবং সকলে যে সেটা সহজে নাও পেতে পারে, এটাও তার গণনার মধ্যে আসেনা !

ললিতা নীরবের মুখ হইতে কথা লইয়া বলিয়া উঠিল : 'ওগো হজুর ! আসে আসে ! বরা কোন হিসেব নিকাশ করে, তারা লব গোণবার জিনিষই আঙুলের উপর গোণে।

নীরব এ হুকারে রণে ভঙ্গিল। বলিল : 'যাক্ ! অক্সাড্রটা আমার কোনদিনই আরতে আসেনা ! স্ততরাং ওটা নিয়ে আর তোমার লজ্জা কুড়ানো। বিশেষ যখন এর সঙ্গে নারী-ফিলজফি (philosophy) জড়ানো রয়েছে।'


জগত্তারিণী বলিলেন : 'নলি ! তুই একটু কাস্ত হে বাপু ! তোমের ও নভেলের

• দুর্ভিক্ষ এবং মীর্ণ শিশুরা •

ডোঙ্গরের

বাল্যমৃত সেবনে

অবিলম্বে সুস্থ ও সবল হয়।



বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

‘কথা আমি বুঝে উঠতে পারিনে! তা, হা নীরব! তাহলে আমি এখন কি করবো, তাই আমার বুঝিয়ে বলো!’

নীরব বলিল, কি আর করবেন না! আপনি যেমন কাশী যাচ্ছিলেন তেমন যান। আমি ওর স্বামীকে চিঠি লিখে দেখি, সে ওকে ঘরে ফিরিয়ে নেবে কিনা! যদি স্বীকার হয়, তাহলে কোনও লোক দিয়ে দেখানে, যেহেতু প্যাঠিয়ে দিলেই চলবে। কি বলো ললিতা?”

ললিতা কোন উত্তর দিলনা। জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন: যদি স্বীকার না হয়?

—স্বীকার না হয়,—যাহোক একটা কর্তে হবে বৈ কি!

জগত্তারিণী বলিলেন: “হ্যা? ওর যা’হক একটা গতি কর্তেই হবে! ও আমাকে যা বলে ডাকে! নিজের পেটের লস্কান না হ’লেও ওর ওপর কেমন একটা আমার মায়ী পড়ে গেছে! ওষে বিনাপরাধে রাস্তায় ভেলে ভেলে বেড়াবে, সেটা আমি কিছুতেই দেখতে পার্কোন। আমি মরবার আগেই, এটার একটা ছেঁতেনস্ত করে যেতে চাই!

নীরব আর কোনও উত্তর দিলনা।

জগত্তারিণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: তাহলে কি থাকবে না কাশী চলে যাবে!

নীরব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল: আপনি আর থেকে কি করবেন? সেই পাড়াগারে ভূতটার লগে কি হাতাহাতি লড়াই কর্তে থাকবেন?

—না! তার নামে নাশিণ করে একটা বন্দোবস্ত করে যেতুম।

—কে এগব নাশিণ করিয়াছি কর্তে?

—জগদ্বা এলোছে,—তাকে স্বীকার করিয়ে নিয়েছি!

—যুঝুন! আপনি যা ভালো বোঝেন। বলিয়া নীরব দানে চলিয়া গেল।

—চুশম পরিচ্ছেদ—

জগত্তারিণী কাশীই চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় নীরবকে পই-পই করিয়া বলিয়া গেলেন লবঙ্গর স্বামী যাহাতে তাহাকে লইয়া লংলার করে,—তাহারই বিশেষ করিয়া চেষ্টা করিতে। লালিতাকেও তিনি অনেক করিয়া বলিয়া গেলেন, যাহাতে জামাইকে

দিয়া লবঙ্গর একটা ব্যবস্থা করাইয়া লয়। ললিতা যাকে ঠাট্টা করিয়া উত্তর দিল: “আমরা তোমার পেটে জন্মে যে আবার না পেয়েছি, লবঙ্গ দেখিছি তার চেয়ে ঢের বেশী পেলে!”

জগত্তারিণী উত্তর দিয়াছিলেন: “তোমার

বি, মাম্মা এণ্ড সন্মের কন্সল্টা আশ্চর্য্য গুণবিশিষ্ট মহোদয়:

কিওলিট:সলিসা

বর্তমান যুগে ইহাই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট মহোপকারী ঔষধ। রক্তপরিষ্কারক, বল, শক্তি ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। পারদ ও উপদংশ বিষনাশক। গুস্তারল্যা আয়বিক ও যাতু দোকল্যা রোগে, নষ্ট, বাহ্যে, যাবতীয় স্ত্রী রোগে এবং বহুপুস্তান ও জটিল রোগ সমূহের একমাত্র মহোপকারী। কোন বাধাধরা নিয়ম নাই—সকল বয়সে সেবন করা যায়। মূল্য দেড় টাকা, মাণ্ডলাদি সহ ২।০।

ইলেক্ট্রো‘গোল্ড.কিওর’

জীবনী শক্তিবর্দ্ধক ও নষ্টবাহ্য পুনরুদ্ধারক। স্নায়ু ব্রহ্মলতা, অক্ষমতা, অবশ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ বলকারক ঔষধ। ছাত্রদিগের শ্রুতিশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধি, মানসিক প্রশান্ততা, স্নায়বিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে; ছাত্র ও ছাত্রী জীবনের একমাত্র পরম সুহৃদ। মূল্য দেড় টাকা, মাণ্ডলাদি সহ ২।০।

“গগোরা-বাম” পিল (বাটকা) বা মিক্শচার

নূতন ও পুরাতন সর্বপ্রকার লক্ষণযুক্ত গগোরিয়া, প্রমেহ, যাতুপীড়া ও মুত্রনালীর যাবতীয় রোগের বিশেষ পরীক্ষিত আশুফলপ্রদ মহোদয়। ২।২ মাত্রায় স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই রোগের অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা লাঘব হয়। স্ত্রীলোকদিগের বৈত ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অল্প সময়ে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা লাঘব করিতে এবং রোগ সমূলে নির্মূল করিতে ইহার স্মার্য আশুফলপ্রদ ওষধ অন্ত্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই ওষধ মিক্শচার ও পিল দুই রকমের পাওয়া যায়, উভয়েরই মূল্য প্রতি শিশি দুই টাকা; মাণ্ডলাদি সহ ২।০।

ইঁপানি এ্যাজমা-সিরাপ

ইঁপানি ও শ্বাসকাশের অব্যর্থ মহোদয়। এক ঘণ্টার ইঁপানি রোগী মুভাসম যন্ত্রণা হইতে অবজীবন লাভ করে। নূতন পুরাতন সর্বপ্রকার লক্ষণ ও উপসর্গ বিশিষ্ট ইঁপানি, দমা, শ্বাসরোগ এবং যাবতীয় ফুসফুস ও শ্বাসনালীর প্রদাহ, ব্রঙ্কাইটিস, হস্পিকক প্রভৃতি রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়। ইঁপানির প্রবল টানের সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের মুভাসম যন্ত্রণার একদাগ মাত্র সেবনেই রোগ দূরীভূত হইয়া রোগী সুস্থ হয়। মূল্য দেড় টাকা; মাণ্ডলাদি সহ ২।০।

বি, মাম্মা এণ্ড সন্ম

(মাম্মা মেডিকেল হল)

এজেন্টস:—এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১০ নং, বনফিল্ডস লেন, কলিকাতা

৪নং, গুলু ওস্তাগর লেন,

(পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৯) কলিকাতা

আমর কর্কার চের লোক আছে, কিন্তু ও
যেহেটার যে আর কেউ নেই।”

লবঙ্গ লম্বুখেই দাঁড়াইয়াছিল। বলিল :
মা ? আমি তোমার চেড়ে থাকতে পারকো-
না। তুমি আমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

মা বলিলেন : “লবঙ্গ ! অথবা হোস-
নে ! এইখানে থেকে জামাইবাবুকে দিয়ে
নিজের একটা ছিলে কর্কার চেষ্টা কর !
নইলে পরে তারি কষ্ট পাবি। তারপর
জামাইবাবু একটা হেজিপেরি লোকত নয় !
তার এলব বিষয়ে খুব ক্রমতা আছে ! ও যদি
মনে করে, তাহ’লে তোমার স্বামীর নাকে
ছড়ি দিয়ে, তোমাকে আবার ঘরে লওয়াতে
পারে !”

লবঙ্গ বিব্রভাবে বলিল : আমার মা,
সেখানে যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই !

—সেখানে যাবেনা তো, ছিছর ঘরের
ঘরে তুমি, তা না গিয়ে কি কর্কে ?

—কি আর কর্কে ? তোমরা যতদিন
পারে রাখবে, থাকবে। তারপর, যে দিকে
চোক যায়, চলে যাবো !

জগন্তারিণী বলিলেন : পরের বাড়ীতে
খাওয়াটাও খুব সুখের বলে মনে করিসনে।
আর আমিই বা আর কদিন ? আমি চোখ
বুজলে তোমার কি উপায় হবে, তাই ভেবেই
আমি অস্থির হচ্ছি।

* *

লবঙ্গ বলিয়া বলিয়া ভাবে, তার কি করা
উচিত। লবঙ্গ অপমান লহু করিবার জন্য
প্রস্তুত হইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে গিয়া লুটাইয়া
পড়া উচিত, না, ললিতা যেমন তাহাকে
বোম্বার ভেমনই করা উচিত ! ললিতা
তাহাকে বোম্বার “পৃথিবীর অস্ত্র সব জিনিষ

নিয়ে ঘেরমাছুয়ের ঝগড়া করা চলে, চলে না
কেবল স্বামী নিয়ে ! স্বামী যদি জলের মত
গড়াইয়া কাছে আসিল, তাহ’লেই তাতে
সুখ ! তা না হয়ে যদি শক্ত পাথরের মত
ভেঙ্গে বাটোরারা কর্তে হয়, তাহ’লে ওই
পাথরের মতই স্বামী হয় শক্ত, কঠিন আর
অমিল !”

ললিতা আরও বলে “স্বামী যদি নিজের
হতে ধরা দেয়, তবে সেই স্বামীকে নিয়ে
জীবনের যে কোনও সমারোহ সমাধান করা
চলে : কিন্তু তিনি যদি নিজের বৈকে হাড়ান,
তাহ’লে পৃথিবীর কোনও বিচারালয়ই তাকে
লোজা ক’রে আপনার ক’রে দিতে পারে না !
কাজেই সে চেষ্টা না করাই লবঙ্গের উচিত !”

* * *

জগন্তারিণী কানী চলিয়া যাইবার দুইদিন
পরেই নীরব একখানি চিঠি লিখিল লবঙ্গের
স্বামীকে ! তাহার ঠিকানা সে জানিয়া
লইল : “লবঙ্গর কাছেই ! লবঙ্গ এ চিঠিতে
কোন আগ্রহও প্রকাশ করিল না, প্রকাশে
কোনও প্রতিবাহও করিলনা।

কিন্তু উত্তরের অনিশ্চয়তা তাকে মনে মনে
একটু উৎকণ্ঠাপ্রিত করিয়া রাখিল।

চৈত্রের প্রারম্ভে বাহা কেহ কখনও আশা
করেনা এবংসর তাহাই ঘটিল। একদিন
অপরাজে আকাশ ক্রমবর্ণ হইয়া বারিধারা
বর্ষণ করিল। একটু দীতের আভাবও যেন
হেথা ছিল। ললিতা সেদিন জানালা খুলিয়া
সুইয়াছিল ; অতো বৃষ্টিতে পারে নাই, একটু
ঠাণ্ডা লাগিল।

তাহার পরদিন তাহার জ্বর বাড়িল।
ডাক্তার আসিয়া বলিল ‘খুব লাবধান ! বৃকে
লদি না বসে ! কিন্তু লাবধান হইতে না

হইতেই অলাবধানতার ফল আসিয়া হেথা
ছিল। জ্বর খুব কম্প দিয়া আসিল ও বৃকের
বাখার ললিতা অস্থির হইয়া উঠিল। ডাক্তার
আসিয়া বলিল : নিউমোনিয়া !

বাটীতে অনেক ঝি চাকর লম্বুও লবঙ্গ
হইয়া হাড়াইল তাহার প্রধান শুশ্রূষাকারিণী !

লবঙ্গ ললিতার বৃকে ডাক্তারি প্রলেপ
লাগাইয়া ফ্রান্সে দিয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিল।
রীতিমত তাপমান যন্ত্র দিয়া তাহার জ্বরের
পরিমাণ দেখিতে লাগিল। একাধা সে আগে
কখনও করে নাই, কিন্তু এখানে করিতে বাধ্য
হইয়া সে অল্পেই শিথিয়া ফেলিল। সে পল্লী-
গ্রামের বালিকা বিভ্রালয়ে কিছুদূর পড়িয়াছিল,
তাহাতে ইংরাজি অক্ষরগুলি শিখিয়াছিল,
কাজেই তাপমান যন্ত্রের রেখাগুলি শিখিতে
তাহার অধিক বিলম্ব হইলনা। রোগীর
সেবাসুশ্রূষা করিবার যে সকল ধারা আছে,
লবঙ্গ অন্নারালেই সেগুলি দখল করিয়া
ফেলিল। নীরব কিম্বা ডাক্তার বাবু তাহার
কোনও খুঁত ধরিতে পারিলনা।

নীরব আদালত হইতে কিরিয়া আসিয়া
হেছিল ললিতা পালকে শুইয়া আছে, এবং
তাহার মাথা অন্ধাবগুণ্ঠনবতী লবঙ্গের ক্রোড়-
বেশে ! তাহার ললাটে একখানি জলপটি
লাগানো, তাহাতে ও-ডি কলোনের জল
ভিজাইয়া দিতেছে ঐ শুশ্রূষাকারিণী ! ললিতা
চক্ষু বুজাইয়া শুইয়া আছে ; নীরবের ঘরে
আলার পদশব্দেও সে চক্ষু খুলিলনা ! বোধ-
হয় নিদ্রিত !

নীরব আসিয়া লবঙ্গের দিকে চাহিয়া
জিজ্ঞাসা করিল “জ্বর কতো ?”

লবঙ্গ মুখে কিছু না বলিয়া, পার্থোমিটারটি
বাহির করিয়া বিভ্রানার উপর রাখিল। নীরব



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

‘তাহা কুড়াইয়া লইয়া জানালার কাছে লইয়া গিয়া আলোর ধরিয়া দেখিল, একশো তিন !

নীরব্ব আরের তাপ দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। ‘তখনই বেরাটাকে ডাকিয়া বলিল ‘ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন। বলু জরুরি হয়কার। পরে পালাকের কাছে আসিয়া একখানা চেয়ার কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিল। হাত দিয়া একবার ললিতার কপাল অমুভব করিল। পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উচ্ছ্বাসের সুরে বলিয়া উঠিল : ‘না, আর বাঁচানো যায়না !’

এই উচ্ছ্বাসের অশাবধান উচ্চকণ্ঠে ললিতা আগিয়া উঠিল : চক্ষু মেলিয়া নীরব্বের দিকে চাহিল। নীরব্ব নিজের মাথাটিও ললিতার দিকে ঝুকাইয়া দিল। ললিতা প্রবল আরের উচ্চারণ কাতরস্বরে, নিঃশব্দে বিশলয়ের মত ওষ্ঠাধর দুইটি জীবৎ কম্পিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : তুমি কখন ফিরলে ?

নীরব্ব তাহার মাথায় হাত দিয়া কেশ-গুলির মধ্যে তাহার আঙ্গুল দুইটি জীবৎ লক্ষ্যলিত করিয়া উত্তর দিল : ‘এই অম্লসচি নলি’। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ?’

—‘না!’ বলিয়া আবার লে চক্ষু ঝুকাইল।

নীরব্ব আর কিছু বলিল না, ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আদালতের কাপড় এখনও ছাড়া হয় নাই, মুখ হাত পাও খোঁওয়া হয় নাই। লে বলিয়া রহিল একটা প্রবল বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া, যে আশঙ্কাটা বড় বড় ডীনা মেলিয়া আজ যেন আলো ও বাতাল বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

লবঙ্গ নীরব্বকে তব্ববহু দেখিয়া, রোগী ছাড়িয়া উঠিল। নীরব্ব জিজ্ঞাসা করিল ‘উঠলে কেন ?’

লবঙ্গ কোনও কথা কহিল না, ধীরে ধীরে আপনার বসনাঞ্চল লাফাইয়া সরিয়া গেল। নীরব্ব কিছুক্ষণ পরেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিবার স্থান ছাড়িয়া উঠিল। কিন্তু উঠিতে না উঠিতেই দেখিল, লবঙ্গ একখানি বেকাবিতে খানকতক লুচি, দুইটি নম্বেশ ও কিছু তরকারি লইয়া, ডানহাতে একটি জলপরিপূর্ণ গেলাশ বহিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। নীরব্ব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল :

‘এসবের ক্ষত্তে তুমি এত ব্যস্ত কেন ?’

লবঙ্গ টেবিলের উপরে খাবারের বেকাবি-খানি ও জলের গেলাশ রাখিয়া, খুব মুহূর্ত্তে অপরাধিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল : আপনি আদালতের কাপড় চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলুন। মুখে যা হয় একটু দ্বিয়ে নেন। ভয় নেই, দ্বিদি ভাল হয়ে যাবেন !

নীরব্ব একটা প্রবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল : ‘ই’, ভাল বা হবে, তা আজকের নমুনাতেই বুঝতে পারছি। না। লবঙ্গ! তুমি এগুলো রাখো। ওদব নিয়ে বাজে সময় নষ্ট হোয়ো না। ততক্ষণ বরং

শ্রমের সম্ভ্রম ষাড়ানই দেশে নূতন জীবন ও রস সঞ্চারণ



শুভ-উদ্বোধন : শ্রী : ১২ই মার্চ শনিবার

কপীর মাথায় একটু হাওয়া করে। কপী
অঁরেতে একেবারে খেঁচ হয়ে পড়েছে।”

লবঙ্গ উত্তর দিল : “সে আমি কচ্চি।
এতক্ষণতো করছিলাম। এখন আপনি
একটু জলটল খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা ক’রে
নেন।”

—“মাথা ঠাণ্ডা করো! হাঁ—মাথা
আর ঠাণ্ডা হয়েছে?”

—অমন অগীর হবেন না! একদিন
জ্বর হয়েছে ত কি হয়েছে?

—কি হয়েছে? শুনে নে না। কাল
ডাক্তারের বুথে! বলে গেলেন, নিউমোনিয়া।
তার ওপর আর এই জ্বর বেড়েছে! ব্যাপারটা
বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়াল—তুমি বুঝতে
পাচ্ছ না!

এমন সময়ে ললিতা আবার একবার
চোখ চাছিল। তাহার চক্ষু বেশ লাল হইয়া
উঠিয়াছে—অন্তকালীন সূঁচের মতো! নীরব
তাহার কপালে হাত দিল। ললিতা ক্রীণ
স্বরে জিজ্ঞাসা করিল : তুমি এখনও—
এখানে—বসে?

সে কথার উত্তর না দিয়া নীরব জিজ্ঞাসা
করিল : “বড় কষ্ট হচ্ছে কি নলি?”

ললিতা উচ্চ স্বাধ নিঃশ্বাসের স্বরে উত্তর
দিল : না!

এমন সময়ে ডাক্তারবাবু আসিলেন :
লবঙ্গ পাশের ঘরে সরিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের ঢা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিত্তপূর্ণ পানীয়

বড়দি

শ্রীমুখীল কুমার দত্ত

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

“দেখ গেমেন্দা, কত বড় আর বেশন
সুন্দর ঘোমের পুতুল বাবা কিনলেন।”
বলিতে বলিতে আশালতা একেবারে আশার
শয্যার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে
আলো নাট দিখিয়া সে ঠতস্ততঃ করিতেছিল
কিনা অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই।
আমাকে মাঝা বলিয়া ‘স্ব’কার না করার
ল্পষ্ট অর্থ বুঝিয়া ভাবিলাম, ইহাই অবা
সুযোগ। তাই তৎক্ষণাৎ তাহাকে
চুষনেচ্ছার লাগটিয়া ধরিতেই গোল বাধিল।
সে অত্যন্ত চটপট করিতে করিতে এক
বিকট চিংকারে বাড়ী কাঁপাইয়া ডাকিল
“মা”!

পাশের ঘর হঠাৎ সাড়া আসিল,
“কিরে কি হল? যাট।” বড়দির এবরে
আশার এবং দাস-দানীদের ‘কি হল—
কি হল?’ বলিয়া মিড়ি দিয়া উঠিয়া
আমার পদশব্দ শুনিয়া আশাকে চাড়িয়া,
লজ্জায় ভয়ে লম্বুখের লম্বাশর কথা মনে
করিয়া একবার শিহরিয়া উঠিয়াট কি
এক প্রকারের অচেতনায় আচ্ছন্ন হইয়া
সশব্দে পড়িয়া গেল। সে আচ্ছন্নতা
মাত্র মুহূর্তেকের।

ছাড়া পাইয়াই আশা দরজা পার হইয়া
বারান্দার দাঁড়াইয়া মহাকলরবে পুতুল
দেখাইতে আমার বিলুপ্ত বলিতে লাগিল।
বড়দি তাহার নিকট আসিলেন। ওখার
হইতে জামাইবাবুর হকার আসিল, “ঘর

তো অন্ধকার। আলো নিয়ে যেন, প্রেমেন্দ্র
না আর কেউ?”

সকলে চাঞ্চিয়া দেখি, জানালা দিয়া
আশা কোৎসংলালকে আমি ঘরের উপর
বলিয়া বহিয়াছি। সেখান হঠাৎ অন্ধকারের
হ্রিক্ত সরিন কিনা ভাবিতেছি, শুনিলাম,
বড়দি আশাকে দরজার স্রমুখ হঠাৎ
টানিয়া লইয়া বাটতে বাটতে আগত
খি-চাকরদের বলিলেন, “কিছু না, কিছু না।
তোরা যা। একটু কিছু হ’ল তো তোদের
অমনি ক’বছ-মতম শুরু হয় কেন বল
দিকি।”

আশালতা বলিয়া উঠিল, “কিছু হয়নি
কি মা। এটো যেন না, এমন সাপেট
ধাবছিল—আমার পুতুলটা একেবারে
তাল ভুগে—

“চুপ কর জামাইবাবু, চুপ কর।”
ললিতা বলিতে বড়দি খুব সন্তন আশার
মুগ চাপিয়া ধরিলেন। জামাইবাবু আসিয়া
আমার বহুর লম্বুখে ড’চরবার উকিঝুঁকি
মারিয়া চলিয়া গেল। সেট ঘরেট আমার
জামা-কাপড় ইত্যাদি যা কিছু ছিল লইয়া
নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে বাহির হইয়া
পড়িল।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে এখানে
আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বৌদি আশা
করিয়াছিলেন আমি পনের-কুড়ি দিন
কলিকাতার থাকিব বলিয়াই কলেজের ছুটি
পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ছুটি হইলে,

স্থিতিহীন। তাঁহার অদৃশ্য প্রেমে বিভ্রান্ত হইয়া বলিয়া বলিয়াছি, কলিকাতা আমার ভাল লাগে নাই। আমার উত্তরকে তিনি প্লেসে করিয়াছেন। তাঁহার একখানা চিঠি খুব লম্বা শীঘ্রই বড়দ্বির নিকট যাইবে। জগতে আমার একমাত্র বন্ধু তুমিই; এখানে বন্ধুদের আলায় তোমাকে পত্র দিতে সময় পাঠি না বলিয়া যে কৈফিয়ত তোমাকে ইতিপূর্বে বহুবার দিয়াছি তাহারা বন্ধু নয়, বন্ধুর বেশে এক-একটি শয়তান, লম্পট। অতএব তুমিই তার একটা ব্যবস্থা বড়দ্বির নিকট গিয়া করিবে বলিয়া এপত্র লেখার ক্ষমতা আমার এত বাস্তব। আশালতাঘটিত ঘটনা বোঝির কাণে গেলে, আমার আশ্বহত্যা অনিবার্য। বোঝিকে যুগ দেখাইতে না পারিয়া আশ্বহত্যা আমার প্রশংসার কিছু কি শয়তানী বুদ্ধি এই আশালতার! একটা শয়তানীর লম্পটশে আশিয়া আশ্বহত্যা করিতে কোথায় যেন ব্যপে।

তুমি হয়তো মনে করিবে, আশালতার উপর তোমার ঘৃণা আনা আমার এ পত্রের উদ্দেশ্য। এমন যদি হয় তাহা হইলে তুমি আমার উপর অত্যন্ত অবিচার করিবে, ঘাঁহা তোমার নিকট আমি মোটেই আশা করি না। তবে ইঁা, আশার মত শয়তানী মেয়ের উপর ঘৃণা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। তাই নয় কি? এর একটা লম্পট উত্তর চাই। ইতি—

পড়া শেষ হইলে, নির্মল দুচ্ছতার সহিত মনে মনে বলিল, সঙ্গহোষে সে প্রেমের আর নাই; তাহার মন অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। আশা মোটেই শয়তানী নয়। তাহাৎপেকা ছই এক বংশের বড় হইলেও প্রেমেরকে ছোটর মত দেখায়। ইহাই খুব লম্বা প্রেমেরকে আশার দাঁহা বলার একমাত্র কিংবা অন্ততম

কারণ। ইহা ছাড়া, আশার স্বভাবগুণ ব্যবহারের অস্বাভাবিকতা কোথাও নাই।

এ ব্যাপার কোন তারিখের? সময় ও তারিখ দেখিয়া নির্মল স্থিতে পারিল, গতকল্য এমন সময়ের কিছু পূর্বের। তোরে পৌঁছিয়া সকালের বেলে এ চিঠি পাইয়াছে এবং আজই সন্ধ্যায় এখানে বিলি হইয়াছে। আর একবার আগাগোড়া পড়িয়া নির্মল বড়দ্বির দিকে চাহিয়া দেখিল, বারটা! এতরাতে বড়দ্বির নিকট গিয়া বাড়ীপুত্র সকলের বিব্রত করা—নাঃ।

(৪)

এ বাড়ী হইতে প্রেমেরের অন্তর্ধান ঘটনার গুরুত্ব বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়দি ও নায়েববাবুর মধ্যে এই লম্বা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া দেখা দিয়াছিল যে, ৬ বিধে কোন কথা নির্মলকে বলা হইবে কি না। নির্মল সে এ বাড়ীর কে এবং কতখানি, নির্মলের নিকট এখন একথা গোপন করিলে পরে কখনো কোন সূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়ায় যে কতবেশী।

অপমান ও অন্তর্ধান, তাহা এ বাতীর একজন হইয়া অমৃতব না করিলে বুঝা কঠিন। তাই নায়েববাবু ও বড়দ্বির মধ্যে এ লম্বা আলাপ আলোচনা রহিয়া রহিয়া যখন তখন চলিতেছিল। এবং গতরাতে মেলে নির্মল যখন প্রেমেরের পত্রে ঘটনাটা জানিয়া লইল তখন এখানে অনেক প্রশ্নোত্তরের পর নায়েববাবু অনেক চিন্তা করিয়া তন্মোক্ষ হইয়া ওপাশে শায়িত। বড়দ্বিকে বলিয়াছিলেন, নির্মলের সহিত আশার বিবাহ যদি হওয়া হয়—এ ঘটনা নির্মলকে বলিতেই হইবে; অতথায় প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা। নতুবা না বলিলেও চলে। এই নতুবা তাঁহাঘের সকল চিন্তার বাহিরে, স্তব্ধতা তজাকথা। সেই কারণে বলিয়াই আরো বলিয়াছিলেন, নির্মলের সহিত প্রথম আলাপে একথা না বলিলে, বলিবার পল আর উন্নত থাকিবে না, রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কেননা, পরে বলিতে গেলে আপনা হইতেই একটা কথার্থ হইয়া পড়ে এবং কথার্থ হওয়ার পূর্বদৃষ্টে যদি

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার



কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারতের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিঃ

আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া যায় তাহা হইলে লজ্জার নিজেদের ব্যবহারের কথা মনে করিয়া মুখ দেখাইবার আর উপায় থাকিবে না।

সুনিয়া বড়দি বলিয়াছেন, এই ঘটনা সুনিয়া কেহ কি কখনো নারকে ভাল ভাবিতে পারে, না বিবাহ করিতে পারে? ইহার পূর্বে যাহার সরল উদার মনের কাছে আশাকে গছানোর কথা বলিতে গিয়া মনে মনে দুই পা অগ্রসর হইয়া প্রত্যাখ্যানের ভয়ে তিন পা পিছাইয়া আলিয়াছি তাহার কাছে এ কথা বলিয়া বিবাহের প্রস্তাব করা যায়ই বা কিরূপে?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নায়েববাবুকে মৌন হইতে হইয়াছিল। তারপর তাঁহাদের মধ্যে আর বাহামুবাধ হয় নাই, সুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সকালে মুখ ভাঙিলে দেখিলেন, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে—বড়দি সে ঘরে নাই, থাকিবার কথাও নয়। সুতরাং অনতি-বিলম্বে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া বলিবার ঘরে ফিরিলে বড়দি চা-মিষ্টি লইয়া দেখা দিলেন, স্বামীর লম্বুখে ধরিয়া দিতেই নীচে হইতে ডাক আসিল, “বড়দি!”

কণ্ঠস্বর সুনিয়া এতটাই যে যেখানে ছিল কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এডাক নির্মলের। এ তাহার নিত্যকার ডাক—যেমন উচ্চ তেমনই সরল; লজ্জামহীন কড়া পলা নয়।

ও ঘরে আশা লবেমাত্র পুতুলের ঘরকরা পাতিয়া বলিয়াছিল। সে নির্মলের কণ্ঠস্বর সুনিয়াই পুতুলের কাপড়জামা বিছানাপত্র তুলিয়া রাখিতে ব্যস্ত হইয়া থাকে জানাইতে ডাকিয়া কহিল, “মা; নির্মলহা এসেছে।” তাহার এই নির্মলহা বলিয়া ডাকায়ও একটা ইতিহাস আছে। বড়দি বর্ধমান হইতে লরানরি ব্রহ্মাবনে গিয়া এক বাঙ্গালী লজ্জাক

পরিবারের আবাদগৃহ লংলগ তিন চারখানি ঘর লইয়া বংলর দুই বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় মেলামেশা হইলে সেই লজ্জাক পরিবারের বৃদ্ধা গৃহিনী গল্প করিবার মাছুষ পাইয়া প্রায়ই বড়দীর কাছে আলিয়া বলিতেন এবং বড়দীকে প্রায়ই পত্র লিখিতে দেখিতেন। একদিন একথা লেকখার পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “স্বামী তো এখানে, অত চিঠি লেখ কাকে? বড়দি তাঁহাকে লেখা করিতেন। উপরন্তু আশা নিকটে কোথাও ছিল না। সুতরাং গোপন করিবার কারণ কিছু না থাকায় খোলাখুলিভাবে নির্মল-সহকে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে তিনি হালিয়া বলিয়াছিলেন “ও! আশার মুখে যে নির্মল আমার নাম শুনেতে পাই সে-ই বুঝি?” বলিয়া—তিনি উপদেশ দিয়া আরো বলিয়াছিলেন, “এই মায়া লক্ষটা ঝেড়ে ফেলে এখন থেকে হাধা ব’লে ডাকতে শিখিত আশাকে। নইলে এরপর বিয়ে হ’লে আশা লহসা স্বামীকে স্বামী ব’লে মানিতে পারবে না। এ আমার মুখের কথা নয়, নিজের জীবনে ঠিক এমনটাই

গান

শ্রীমুনীল কুমার দাশগুপ্ত

যুম্ যেন আজ ভাঙেনা মোর
তুমি এসো ধীর-চরণে,
গাঁথতে হিও স্বপ্নমালা
পর্যন্তে মুখ স্বপনে।
বন্ধ আমার আসবে জানি—
আধেক রাতের মাঝে,
তার মিলনের মিলন-বাঁধী—
বেহাগ সুরেই বাজে,
তাইতে পরাণ উঠছে মেতে
তার আগমনী-গানে।
গাইতে হিও গান আমার
লকল পরাণ ভ’রে,
উঠবে ভেসে গানখানি মোর
সুধুই নয়ন লোরে;
চোখের জলে ডিজিয়ে দেবো
বন্ধ আমার পথ,
সুকনো পথে চ’লতে গেলে
বাধা পাবে তার রথ,
(তাই) লকল ভাষা উঠছে কুটে
আমার কাঁদন লনে॥

পাকা চুল ও টাক মাথা

কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে “কনক হেয়ার অয়েল” ও “কনক হেয়ার স্যাম্পন” অধিতীয়। ইহা ব্যবহারে অচিরেই আপনার চুল মন্থ ও বৃদ্ধি হইবে। এবং যে কোন প্রকার কেশ রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হইবেন। কিংবা ডাঃ ডিগোজ (হেয়ার ডিজিজ স্পেশালিষ্ট) (লণ্ডন) চিকিৎসাধীনে আনিয়া জটিল কেশ রোগ হইতে মুক্ত হউন। মূল্য আশাতীত সুলভ করা হইয়াছে।

মাগুফাক্চারার :—

ডাঃ ডিগোজ কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

৪৯ শি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

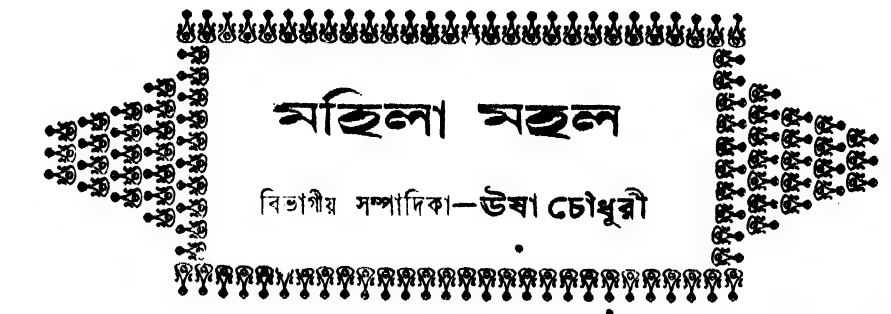
ফোন বি, বি ৪৩৮৬

দি সিটি ব্যাঙ্কিং এণ্ড লোন ডিপার্টমেন্ট হইতে ২৫৯ মূল্যের মাসিক

১০ আনা সুদের বণ্ড খরিদ করিয়া মাসিক আয়ের সংস্থান করুন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন।

ঘটেছিল। আর, এর ফলে আমি লজ্জার স্বামীকে স্বামী বলে স্বীকার করতে বহু চেষ্টার পর প্রায় হ'মান পরে পেরেছিলাম। ওঃ, সে যে কি লজ্জা তা' বলে বুঝানো যায় না।" বলিতে বলিতে তিনি সেই বুদ্ধবয়সেও কৈশোরের কথা স্মরণ করিয়া ললজ্জ হানিয়াছিলেন। বুদ্ধার কথাটা বড় দ্বিরকাণে লাগিয়াছিল। তাই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাঁগা এমন কখনো হয়? তোমার মতামত কি?" নায়েব বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কথাটা অমূলক নয় দেখিয়া অমত কিছু করেন নাই, মত দিয়া বলিয়াছিলেন, "আজকালকার নাটক-নভেলে ওই যে দ্বাদশ শব্দ যোগ করে ডাকে তা' একেবারে অযৌক্তিক নয়। অতঃপর বড় দ্বি একদিন আশাকে বলিয়াছিলেন "হ্যাঁবে, তোর হাতের লেখা কেমন হ'ল তা তোর নির্মলদ্বাকে একবার দেখাবিনে?" লিখিস তো যাঁহোক কিছু লিখে আমার দে, আজই একখানা চিঠি আমার যাবে।" শুনিয়া লানন্দে আশা হোয়াত কলম আনিয়া বড় দ্বির নির্দেশামুসারে লিখিতে বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছিল, "লেখবার সময় মামাকে দ্বাদশ লিখতে হয় নাকি?" বড় দ্বি হাসি চাপিয়া বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ।" মায়ের পত্র লেখানোর আগ্রহ অল্প নয় দেখিয়া কত্কা আদরে আকারে ঠোট ফুলাইয়া বলিয়াছিল "না, তাহ'লে আমি লিখিব না। নির্মলদ্বা ব'লে যদি লিখতে হয়, তাহ'লে এরপর কখনো দেখা হ'লে ওই ব'লেই আমি ডাকব।" এমন অভাবনীয়াত্বপে ইহার নিষ্পত্তি হইবে বড় দ্বি তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। বলিয়াছিলেন, "বেশ, তাই ব'লেই তুই ডাকিস।" বলিয়া তিনি কত্কার অলক্ষে স্বামীর সুখপানে চাহিয়া চাপাহানি হানিয়াছিলেন। পরে আশার সেই কাঁচা হাতের ছোটবড় অঙ্গের চিঠিখানা নিজের পত্রের সহিত তিনি



খেরালীর অষ্টম সংখ্যার 'ক'লো দেবী' লিখেছেন, "রজনী শিল্পকে বাংলার মেয়েরা আজ কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে? আলোচনা ভাল উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, নিত্য যা চোখে দেখি তাতে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বাংলার মেয়েরা নয়। প্রধান অপরাধ নৈতিক স্বাস্থ্যহীনতা, মেয়েরা যত বয়স্ক হোক স্বাস্থ্যহীনতার কমনীয় লাভণ্য-বতী কত্কার অভাব প্রতি ঘরে। ভীষণ চর্কিবুদ্ধি কুমারী কত্কা কোন ঘরে বিত্তমানা কোথাও কীণা—কোথাও নানা। আধি-ব্যাধিতে পূর্ণ, কোথাও ধনীকে ঘোঁহে লম্বাচর আলস্তবতী অবিবাহিতা কত্কা ঘরের শোভা বৃদ্ধি করছে। মধ্যবর্তী গৃহস্থ ঘরে এখনও রূপ না হোক স্বাস্থ্যবতী মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। আলস্তহীন কর্মময়ী মেয়ের নির্মলকে পাঠাইয়া দেন। সে পত্র পাঠিয়া নির্মল আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিল, বিস্মিত হয় নাই। কেননা, দ্বাদশ বয়সী তৃতীয় ব্যক্তি যে তাহাকে দ্বাদশ বলিয়া ডাকার আশ্চর্যের কি আছে! তাই সেই কাঁচা লগোদনটা তাঁহাদের, কলিকাতার আসার পর অসংখ্য ডাকাডাকির মধ্যে দ্বিরা পাকা হইয়া গিয়াছিল।

"এলো তাই, আমরা ওপরে—" বলিয়া নির্মলকে লারা দ্বিরা বড় দ্বি শুকনুখে অমুচ্চস্বরে নায়েববাবুকে কহিলেন, "তুমি যেমন ক'রে পার ব'লো, আমি পারব না।" শুনিয়া নায়েববাবু বিবর হইয়া কহিলেন, পুরুষের পক্ষে তা কি সম্ভব?" বলিয়া

অভাব—শুধু জননীর স্ফুটন্ত সুপরিচালনার ঔদাস্তে। মায়ের শিক্ষিতা সতর্ক দৃষ্টি আজ কীণ অল্পদূর প্রসারী। তাই মেয়েরা লহজ্জই কাঁচকে গলার পরতে চায় লগোরবে। মেহমতী জননীর হল লানন্দে লম্বতি দ্বিরা সুখী হতে চেষ্টা করেন। পুণ্ডিগত বিদ্যার ডিম্বোদার অভিলাষ মেয়েদের মন যত না আকর্ষণ করুক; লিনেমার বৈচিত্র্যমোহ, লাক্সলম্বনে, আধুনিক চিত্রনাট্য ক্যালানে তরুণীদের অন্তর এতবেশী মোহগ্রস্ত করে রেখেছে যে, যার জন্ত তারা ঘরে স্বাস্থ্যহীন ও বাহিরে অহেতুক অবহেলা লাভ করছে। নারীর সৌন্দর্য্য নমনীয় অটুট স্বাস্থ্য আধুনিক ক্যালানের আবর্তে পড়ে বাংলার অন্তঃপুর হতে বৃথি নির্বাহিত হতে চলে। প্রথম লস্তানের জননীরা লগোজাত লস্তানকে পবিত্র নিত্যন্ত একটা শুকহালি হানিয়া কহিলেন, তা'চাড়া তুমি লম্বয় বশ করতে জান; আমি তো আর তা জানিনে।"

অতদিন হইলে একথা লইয়া বড় দ্বি লুকুটি করিতেন, কিন্তু আজিকার আলস্য মুহূর্তের সহিত তাঁহার গতজীবনের যে কোন মুহূর্তের তুলনা হয় না। তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

নির্মল বারান্দা দ্বিরা এঘরে আলিতেছিল, আশাকে ওধারের ঘর হইতে এদিকে আলিতে দেখিয়াই লম্বকে হানিয়া বলিল, "কই দেখি তোর কোন্ পুতুলটা প্রেমেন্দ্র তুবড়ে দ্বিরা গেছে।"

পুষ্টিকর বাতুগুহ হতে বঞ্চিত করে; অস্বাস্থ্যকে সন্তানের শরীরের অসকোচে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে। ফলে সন্তানেরা ক্রীণ দুর্বল রিকটগ্রন্থ ইত্যাদি নানা অসুখে জন্মাবধি ভুগিতেছে। মূল বিচার করলে দেখা যায়, স্কুল কলেজে পাঠ্য বই মুখস্থ করার বরুণ শ্রান্ত নারীর মন গৃহকর্ম বিমুখ হওয়ার ক্ষমতা ব্যারাম জিনিষটা আরও বাহিরে চলে যায়। যৌবনের মাঝপথে সংসার রঙ্গমঞ্চে বিপুল কর্মরাশি দেখে; শিক্ষিতা আলোকপ্রাপ্তা মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে অস্বাভাবিক মনে হয়না। জীবনের সুদীর্ঘ ২২।২৪ বছরের হারিভূমীন বিমুখ অন্তর যদি নিত্য নূতন অভ্যন্ত হয়ে থাকে; তার হাতে হঠাৎ হাতা পুষ্টি দিয়ে বর শোভার অমূল্যরূপ করতে আবেশ দিলে নিত্যন্ত তার পক্ষে নেটা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

স্বাস্থ্য এবং সুমন দুইয়ের যখন অভাব, তখন উড়িয়া বা হিন্দুস্তানীর রায়াবর অধিকার করা ছাড়া গতাস্তর কি? এর জন্ত সম্পূর্ণ হারী বাংলার শিক্ষিতা বা স্বাস্থ্যহীন মেয়েরা নয়।

অপরানী বাংলার শিক্ষাভিমাত্রী উচ্চ-শিক্ষিত বিবাহযোগ্য তরুণের হল। পাত্র সরমের কুঠা শিকার তুলে অকুঠমনে অভি-ভাবককে জানিয়ে দেয়, বি এ, পাশ মেয়ে চাই, অন্ততপক্ষে মেট্রিক নইলে চলবেনা। কাজেই যুগের হাওয়া দেখে বাংলার হৃদয়গ্য মায়েরা রূপহীন মেয়েদের নিজেরা না খেয়েও তাদের বিদ্যালিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে যত্ন নিয়ে আলছেন। নাচ, গান ও বাজনা উপরন্তু আছেই।

প্রগতির যুগ হাওয়া যে পথে চলেছে; বাংলার তরলমতি মেলে মেয়ে ছুটেছে নেই ঘোড়ের পিছনে; উপার কি? পিতামাতার অনুশাসন আজ ব্যর্থ—পরাজিত!! অসুযোগ অতিযোগ আজ মূল্যহীন অলার। শুধনহীন

লজ্জা বুদ্ধি অলীকের মাঝে মিলিয়ে যায়। অর্জনর ক্যালান বুদ্ধি মহিমাবিত্তা নারীকে যুগান্তে আচ্ছন্ন করে আনল। কৃত্রিম স্বাস্থ্য তাই প্রতিচীর পরিচালনে ইন্ধন জোগাতে ব্যস্ত। বোধহয় এখনও তারা বোধেনি এভাবে এগিয়ে গেলে ভবিষ্যৎ জগৎ শুধু অস্বাস্থ্যকর মরুভূমিতে পরিণত হবে। মায়ের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সন্তানের স্বাস্থ্য অঙ্গানুভাবে বিজড়িত। পরবর্তী ধারাও সেইভাবে গঠিত হয়। ব্যারাম—নারীর ব্যারাম নারীর স্বাস্থ্যের প্রতীক বই দেখে ব্যারাম দেখা নারীর কাজ নয়। বর ঝাট—বিজানা পাড়াতোলা; বাটনা বাটা; বাসন মাজা ভাতের কেন গাল, মরহা মাথা ইত্যাদি প্রাত্যহিক উঠা বসা কাজের নাম বাংলার মেয়েদের ব্যারাম। এই ব্যারামের অভাব ধরা পড়ে যায় স্ত্রীকর্মাগারে, চিকিৎসকের হাতে। ফল কষ্টকর Delivery ও অপরিপুষ্ট সন্তান।

স্বাস্থ্য অমূল্য রত্ন!! নীলাশ্বর রত্নগর্ভে এমন কোন মনি মাণিক্য নাই;—খনির ভিমির গহবরে এমন কোন রত্নরাজী নাই; রাজাধিরাজের কোবাগারে এমন কোন ধনসম্পদ নাই; বাঁধের সঙ্গে স্বাস্থ্যের তুলনা চলতে পারে। এই অমূল্য স্বাস্থ্যাতাব আজ বাংলার আকাশে বাতালে হাটাকার এনেছে। তরুণী যদি সন্তানের পরিচর্যা নিজহাতে তুলে না নেয়, নারী যদি পুরুষের সেবা নিজ আরম্ভে না রাখে; বা যদি ভেলে মেয়ের দিকে প্রথম দৃষ্টি না দিতে পারে,—তাঁহা হলে দালদালীর হাতে শিশুর স্বাস্থ্য পাচকের হাতে গৃহকর্তার জীবন; এবং লিনেম ও সাপ্তাহিক লিনেমাপজির মধ্যে কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য অকালে লুপ্ত হবে; তার আর বিলম্ব নেই।

তাই বলি বাংলার বোনেদের; ভুলনা তোমরা সন্তানের মা হবে; ভুলনা তোমরা মহিমালী নারী; ভুলনা তোমরা বাজালী

মেলের বাজালী “মা” বাজালী পুরুষের বাজালী “দাদা”। বাংলার তেলজল যে লুপ্তা যে লালগ্য দিতে পারবে; প্রতিচীর বিজ্ঞানিত প্রশাধন, বৈজ্ঞানিকী সামরিক আরাধপ্রদ ওমুদ লে শক্তি লে স্বাস্থ্য দিতে পারবে না।

অসংগ মিলনের ফলে, প্রকৃতির অমূল্য সন্তানের সুপ্রকৃতির অভাব প্রায়শই দেখা যায়। অসংগ মিলন স্বেচ্ছাচারিতার দুল্লভ, অস্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তী দারুণ দুর্ভোগ ও অশান্তির সৃষ্টি করে থাকে। স্বেচ্ছাভ্রম রাজ্যমুখ কখনই বিদ্রোহী হতে পারেনা। দেখে এবং মনে প্রকৃত শক্তি চাই; যে শক্তি হতে স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে। যে শক্তি চেনন হারাকে জাগিয়ে তুলবে মহিমময়ী নারীর অমোঘ শক্তির বিনিময়ে; যে শক্তি বৈদেশিক মোহকে উপহলিত করে কর্মঠ, লক্ষ্মী ও বুদ্ধা করে সন্তানকে গড়ে তুলতে লক্ষ্য হবে। আশাকরি তরুণী মায়ের সতর্ক দৃষ্টি নিজের এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ মজল লাধনের দিকে নিবদ্ধ থাকতে চেষ্টা থাকবে। এই চেষ্টা দেখিন সফলতার জয়-গৌরবে গৌরবায়িত হবে; যেদিন সুস্বাস্থ্যবতী নারী রন্ধনশালার তার নিজের হাতে পূর্বকালের মত তুলে নিতে পারবে; সংসারের বার লকোচের জন্ত স্বাস্থ্যের জন্ত। বিনিময়ে গৃহকর্তার অপরিণীম পুরস্কার সুগৃহিনীকে মহিমাজ্জাল করে তুলবে। সাহিত্যিকের তীব্র লেখনী দেখিন নির্বাক হবে—বিস্ময়ে বিমুখে!!

গর্ভ নিরোধ বাটিকা
বহুপরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ওষুধ যাত্র একবার সেবনে একবৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫ টাকা
ডাকিম এম.এস.জামান
৪২, ধর্মভাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলার মেয়ে

প্রভাত কিরণ বসু

গৃহলক্ষ্মী—বাংলার মেয়ে, বাংলার মেয়ে, এখনো কি তুমি
• ঘুমিয়ে আছ ?
এখনো কি তুমি ছুঃখের কথা যাকে পাও তাকে
• শুনিয়ে বাচো !
এখনো কি নেই শান্তি তোমার, এখনো কি
• ঘরে অনেক জালা ?
বাংলার মেয়ে, বাংলার মেয়ে, তুচ্ছ কি
• হয়নি স্নেহের পালা ?
বাংলার মেয়ে—কেন কেন অত ডাক পাড়াপাড়ি !
• কে তুমি গা, তুমি কাছের বাছা ?
তপূর বেলাও ঘুমোতে পাবো না ?
• গলাখানি যেন হাঁড়িটি চাঁচা !
গৃহলক্ষ্মী—আমি তোমাদের ঘরের লক্ষ্মী, ঘর করো তবু
• জানো না ঘোরে !
• ঘুম ভেঙেছে কি ? শান্তি পেয়েছ—জানিতে
এলেছি আশ্রয় ক’রে !
বাংলার মেয়ে—কিসের নিদ্রা ? নব জাগরণ লারা দেশ ভ’রে
• জোরার আনে !
ঘুরিয়ে কাপড় পরতে শিখেছি, নাম করেছি
• নাচে ও গানে !
কো-এডুকেশনে পড়া শেষ করি, ট্রামে বাসে
• চলি বীরের মত ;
গাড়ীর জানলা তুলতে দিই না, কাঁচ পরি
• ঠিক বীরের মত !
নিমন্ত্রণে ও লিনেমার যাই নতুন গয়না
• দেখাবো ব’লে,—
মেয়ের মতন ঘোরাফেরা করি লক্ষ গলা
• আর হালির রোলে !
মোটরেই চলি, পায়ে হেঁটে যাই, টাইল কখনো
• বাইনা তুলে !
নতুন ক্যাশন ব্লাউজের হাত কজিতে টেনে
• কাঁধেতে তুলে !
হাজার রকম কানের গয়না, পায়ে
• পাহক কাঁধেতে শোকে !

ব্লোকেট, জাপানী জর্জেট চলে, যে বছর যেটা
• লাগিবে চোখে !
নিত্য মোহের রহস্যের মত, পৃথিবী আগনি
• ঘুরিয়া চলে !
পুরুষগুলোর চরম শান্তি নাকের জলে
• ও চোখের জলে !
আমরা এনেছি নব জাগরণ, জানিনা কোথায়
• ছুঃখ আছে !
প্রজাপতি ঘোরা, লারা ছুনিয়াটা লরা হ’রে
• প’ড়ে পায়ের কাছে !
গৃহলক্ষ্মী—এই কি তোমার নতুন স্বরূপ ? বলিতে কি
• চাও লকল লুখ,—
গয়না এবং শাড়ীতেই আছে ?
বাংলার মেয়ে—তাই বলি, যেবা যাই বলুক !
• রোগ আছে জানি, শোক আছে জানি—
• লিনেমা লকলি তুলিয়ে দেয় !
অস্তাব ত’ আলো—ভাবতে গেলেই মাথা
• যেন আরো ঘুলিয়ে দেয় !
তাই বলি অত ভেবে কিবা কাজ ?
• হেঁচ নিয়ে ভালোই থাকি !
টিউশনি ক’রে রোজগার করি—আমরা
• কি আছি তেমনি নাকি ?
কেউ বিয়ে করি, কেউ বা করি না,
• মোটের ওপর বাংলা দেশে—
বাঙালীর মেয়ে আগেকার চেয়ে পৌছল
• ঢের উঁচুতে এলে !
উন্নতি দেখো চারিবিধে আজ, উন্নত আজ
• সকল মেয়ে,
পুরুষের ঘোরা লমান হয়েছি—লজ্জা পালার
• লজ্জা পেরে !
গৃহলক্ষ্মী—একটা কথার জবাব কি হবে ? ছেলেরা তোমার
• বাহুব হ’ল !
হৃদয়ানের জননী কি তুমি ? নতুনবী কেন,
• সুখটি ভাল !

বিভাগাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ এসে,
 বরখানি কারো আলো কি করেছে? এলো গুরুদ্বান
 নবীন বেশে?
 নাম করবার মতন কি ছেলে, দ্বিরেছ জাতির
 দেবার তরে?
 মনুষ্যবনের প্রতিভা এনেছে, জানে হারিয়েছে
 দীপকরে?
 বায়বোপে কি ভিড় ঠেলে তারা? নাম করা
 বুঝি গুণাধিতে?
 পাশ ক'রে মাথা কিনে কি ফেলেকে? শোক
 হয়েছে ওস্তাধিতে!
 মিথ্যা কথাও আটকায় নাকো, প্রতারণা করা
 শিখেছে ভালো,
 লেই ছেলে দ্বিরে জন্মভূমির মুখখানি আরো
 করেছে কালো।
 যুগত' তোমার ভাঙেনি এখনো—তব্বা যে আলো
 রয়েছে চোখে

মানুষের মত মানুষ গড়ার, কাজ ভুলে গেছ
 কিসের বোকে?
 তোমাদের হাতে শাস্তির তার, কল্যাণ মালা লংলারেরি;
 সব দ্বারীত এড়িয়ে চলেছ, বর ভাঙিবার
 নাই ত' দ্বেরী!
 অন্যরে ৫৬ি স্বস্তি না থাকে, অন্তরে মুখ
 কেমনে হবে?
 সুনস্তানের জননী না হ'লে, নারী জন্ম যে ব্যর্থ হবে।
 কুলজারের বোঝা বাড়িয়ে না, নিজেরা হরো না
 আবর্জনা,
 মেকী সভ্যতা ছেরিরা, আঁচলে কাঁচ তুলিয়ে না
 কেলিরা সোনা।
 বাংলার মেরে—জননী, আমারে লজ্জা দ্বিরো না! পথ দেখিয়েছ,
 চলিব বুঝে।
 গৃহলক্ষ্মী—আমি চলিলাম, গৃহলক্ষ্মীরে সাধনার শেষে
 আনিয়ো খুঁজে।

ও, কে, এ

প্রোডাকশন

রূপোর

ঝুমকো

স্টুডিও

রাশা ফিল্ম



আলোর ছায়ার
 অন্তরালে—

“সুতসুত”
 অপূর্ব আত্মত্যাগই
 মর জগতে
 অমর প্রেমের
 অবিনশ্বর
 জয়মালা!



পরিচালক

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপোর

ঝুমকো

ব্যবস্থাপক

বিজ্ঞাপন মল্লিক
 নীলমণি রায়





কটো : প্যারামাউন্ট

“মুক্তি চাই” “মুক্তি চাই”—তাবাই মাঝে দাড়িয়ে আছে
শ্রেণিবিক্রম মাস। “বুদ্ধানীর” চিত্রের একটি উত্তমোত্তম

দৃশ্য। ছবিখানা বিষয়বস্তু দেখান হচ্ছে।



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'ভ্যারিটি'

জ্ঞানদাল নিউজপেপার্স লি:

টেলিকোন
সাঁউগ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, বুধসপ্তাহবার, ৩রা চৈত্র ১৩৪৪, ১০ই মার্চ ১৯৩৮

শোষণ

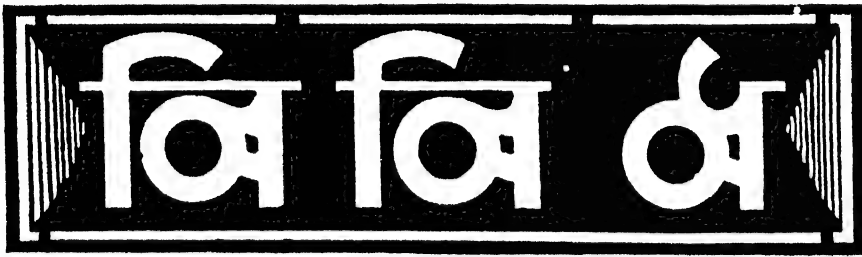
হরিশ পার্কেস সঙ্কল্পনা সভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পৌরসভায় অনাচার ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্মীরদের উপদলীয় মনোভাব সম্বন্ধে যে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ বিশ্লেষণ যোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গালীর চরিত্রে যে Inferiority Complex এর রোগ দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে শুল্লা ও নিয়মানু-গত্যের অভাবেই আজ সমগ্র ভারতের রহস্তর কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী পশ্চাদগমন হইয়া পড়িতেছে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বাঙ্গালীর অবদান অল্প কোম প্রদেশের অপেক্ষা কম না হইলেও বাঙ্গালী আজ উপেক্ষিত। সাড়ে ছয় বৎসরাধিক কাল বাংলার কর্মক্ষেত্রে হইতে সুভাষচন্দ্র বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি আগামী পাঁচ বৎসর বাংলার অবিসংবাদী নেতৃত্ব লাভ করিলে বাংলাকে পুনরায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারিবেন এ সঙ্কল্প তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।

কলিকাতা। কর্পোরেশনের গ্রায় সুবুদ্ধি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে বর্ণচোরা কংগ্রেসী কাউন্সিলারবৃন্দের উপদ্রবে কংগ্রেসী আদর্শ আজ ধূলিক্লেদ। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এই সমস্ত বর্ণচোরা কাউন্সিলারবৃন্দকে সংযত করিবার জন্য বহুপরিকর হইয়াছেন। প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির হৃদয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার সাহস সার্ভিস কমিটির চেয়ারম্যানের হয় কিরূপে? সার্ভিস কমিটির চেয়ারম্যান কি কর্পোরেশনের কংগ্রেসী দলের নেতা? মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেন কি বলিতে পারেন যে চোরজীর 'কাসানোভা' যাহার প্রমোদ-কেল্ল তাঁহাকে কংগ্রেসীদলের নেতৃত্বপদে আসীন রাখা সমীচিন কি না? হরিশ পার্কেস সঙ্কল্পনা সভায় মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেন ও মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দক্ষিণ কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতি ও দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির পক্ষে অভিযর্থনা-অভিভাষণ পাঠ করেন। যাহারা রাষ্ট্রপতির অনুজ্ঞা উপেক্ষা করিতে পারেন তাঁহারা কিরূপে অভিযর্থনা-অভিভাষণ পাঠ করিতে আসেন তাহা আমাদের অবোধগম্য। বিরাট জনতা সুভাষচন্দ্রের বর্ণচোরা কংগ্রেসী কাউন্সিলারবৃন্দকে সংযত করিবার সঙ্কল্প যে বিপুল উৎসাহে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে কী মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেনের গ্রায় বর্ণচোরা কাউন্সিলারবৃন্দের চৈতন্য উদয় হইবে না? আনন্দের বিষয় যে শ্রীমুরেশ চন্দ্র দাশের গ্রায় সর্ববিজ্ঞাবিশারদ বাক্যবীরের বীররসের উচ্ছাস সত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের অভিমতই সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু ডাঃ মলিনাক্ষ্য সাম্যালের সংশোধনী প্রস্তাব কেহ সমর্থনই করেন নাই। আগামী শুক্রবার কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েসনের হৃদয় সভার অধিবেশন রাষ্ট্রপতির এলগিন রোডের ভবনে হইবে এবং সেই সভায় প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত

হইলাম কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী প্রধান কর্মকর্তার যেতন সম্বন্ধে মহাত্মাজী ও জওহরলালজী যথাক্রমে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৫০০ ও ১০০০ টাকার অধিক হওয়া উচিত নহে।

পলিশেষে আমরা সুভাষচন্দ্রের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই যে পলিটিকে অভিমতের স্থান নাই। সুতরাং তিনি যেন কঠোর ও নির্মম হস্তে বিরুদ্ধবাদী উপদলগুলিকে চূর্ণ

করিয়া স্বীয়দল গঠন করিয়া বাংলার কংগ্রেসকে সম্মুখিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলেন। বিশ্ব আজ শক্তির উপাসক—ভারতে তাহার অন্তর্ধা হইতে পারে না। ডেমোক্রাসির নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে কলুষিত করিয়াছে তাহাকে শোধন করিতে হইলে যে শক্তিময় পুরুষের প্রয়োজন বর্তমান মুহূর্তে তজ্জ্ঞ সুভাষচন্দ্র যে সর্ববিষয়ে উপযুক্ত তাহাতে দ্বিমত নাই।



সঙ্গীত আসর

গত শনিবার ১৪ই ফাল্গুন ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী '৩৮ রাত্রে শ্রীশৈলেশ্বর মিত্র মহাশয়ের ২০নং কালীদাস লিংহ লেনস্থ ভবনে সঙ্গীত আসরের ৯ম মাসিক অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে কুমারী অন্নপূর্ণা বসু, কুমারী শান্তা বোস, কুমারী মহাশারা চক্রবর্তী বাংলা গান করেন। পরে শ্রীমতী বুলীরাণী খেয়াল গান করেন। সর্বশেষে কুমারী করুণা সেন অতি উচ্চাঙ্গের খেয়ালগানে উপস্থিত ভক্তগণকে অভিভূত করেন। সঙ্গীত আসরের সভ্য শ্রীযতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের প্রতীকৃত রোপ্য পঞ্চ কুমারী করুণা সেনকে দেওয়া হয়।

শোক সংবাদ

গত ৬ই মার্চ রাত্রিতে ৪২নং বালীগঞ্জ প্রেসস্থ ভবনে বড় বাজারের খ্যাত ব্যবসায়ী বলন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল এবং বহুদিন বাবত

তিনি অসুখে ভুগিতেছিলেন। তিনি স্ত্রী, চারিপুত্র, চারিকন্যা ও বিপুল আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যিক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য তাহার অন্ততম কনিষ্ঠ পুত্র। আমরা এই শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

গত শোমবার রাত্রিতে রাধাবাজারের প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ী শ্রীপূর্ণচন্দ্র বর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বল্পকাল রোগভোগের পর আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন। অগ্রজপ্রতিম বর মহাশয়ের এই নিদারুণ শোকে লাগুনা দিব্য তাবা আশ্বাসের নাই।

লিবারেল নেতা শ্রীযুক্ত বতীন্দ্র নাথ বসু, এম্. এল্. এ মহাশয়ের পত্নী মঙ্গলবার রাত্রে আগড়পাড়ায় ভবনে প্রায় বৎসর-ধিককাল রোগ ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার অন্ততম জামাতা

সুপরিচিত চিত্র-সমালোচক শ্রীচন্দ্রশেখর ও অত্যন্ত পরিজনবর্গকে আশ্বাসের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

বন-কুসুম তৈল

বাজারে বেশ তৈল বা প্রসাধন দ্রব্যাদির অভাব নাই। কিন্তু সচরাচর যে সব জিনিষ আশ্বাসের নজরে পড়ে বা ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করি—তাহার অধিকাংশই উল্লেখযোগ্য নহে।

“বন কুসুম” পারফিউমারী ওয়ার্কস্-এর “বন কুসুম” কেশ তৈলটি সম্বন্ধে কিন্তু এ অভিযোগ খাটে না। আমরা এই তৈলটি বিশেষরূপে ব্যবহার করিয়া দেখিলাম—ইহার গন্ধ চমৎকার এবং উহার স্থায়িত্বও আছে। তাহা ছাড়া কেশ বর্দ্ধন ও উহার স্বাভাবিক শ্রী ও মৃদুতা রক্ষার উপযোগী বহু উপাদান বর্তমান থাকায়—ইহার ব্যবহারে স্থায়ী উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

বসন্ত ওন্‌ লাইব্রেরী

আগামী ১৩৪৫ বৈশাখের প্রথম দশিয়ারে চূঁচড়া কনকশালীস্থ বসন্ত ওন্‌ লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন শ্রীযুক্ত কানাই লাল বসু মহাশয়ের ভবনে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অধিবেশনে নিখিল বঙ্গ স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধিগণী হিলাবে

আহ্বান করা হইতেছে। প্রতিযোগীতার
বিষয়—

১। প্রবন্ধ—গ্রন্থাগার ও তাহার প্রয়ো-
জনীয়তা (১২০০ শব্দের বেশী হইবে না)।

২। আবৃত্তি—অভিনয় (চরনিকা
হইতে)—১৪ বৎসর কম বয়স ছাত্রদের
জন্ত। নবীন (চরনিকা হইতে)—১৪ বৎসর
উর্দ্ধ। ৩। উপস্থিত মত বক্তৃতা—বক্তৃতার
বিষয় ৫ মিনিট পূর্বে জানান হইবে।
বক্তৃতার সময়কাল ৫ মিনিট। প্রত্যেক
প্রতিযোগীকে ৩১শে মার্চ ১৯৩৮ তারিখের

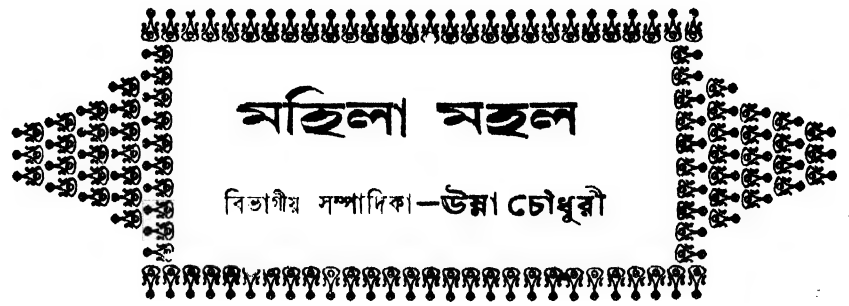
বাঙলা ভাষায় ভারতীয় নৃত্যের

অভিনব গুণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোক নাথ শাস্ত্রী বোদ্ধান্তার্থ
এম্-এ, পি-আর-এস্ মহাশয় সম্প্রতি
নন্দিকেশ্বরের “অভিনয়ধর্পণে”র সরল
বাঙলা ভাষান্তর করিয়া প্রকাশিত
করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন
বিশ্ববিশ্রুত শিল্পাচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়। বইখানিতে
শুদ্ধ “মুদ্রা”গুলির আলোকচিত্র দিয়া
গ্রন্থোক্ত বিষয়টি সুপরিষ্কৃত করা হইয়াছে।

চিত্রসংখ্যা প্রায় ৭০। ছাপা, বাঁধাই
অত্যন্তম। ভারতীয় নৃত্য শিক্ষার্থী
বা শিক্ষার্থিনী মাত্রেই এই গ্রন্থ একখানি
করিয়া সংগ্রহ করা অবশ্য কর্তব্য।
আমরা গ্রন্থখানির বিস্তৃত পরিচয় ও
সমালোচনা বারান্তরে প্রদত্ত করিব।
প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ
স্কয়ার।

মধ্যে নিজ নিজ নাম ঠিকানা স্কুলের বা
কলেজের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যাপকের স্বাক্ষর
সহকারে পাঠাইতে হইবে। ১। শ্রীবিভূতি
ভূষণ ভট্টাচার্য্য—চুচড়া কনকশালী, হুগলী।



জীবনের পথ সহজ সরল কুমারীর্ণ
যে নয়; সংসার পথে চলতে গিয়ে প্রতি
নিয়ত প্রতি পাশ্চক্ষেপে স্মৃতি ও ভ্রমে
প্রতি নরনারী অমৃত্যব করছে। যেখানে
স্বামী ও স্ত্রী স্বপ্ন আয়ের মধ্যে, নিজেদের
মর্যাদা বজায় রেখে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা
সমাধা করে চলেছে; যেখানে ধর্মের ভাণ
নয়, প্রকৃত জায়গা ধর্মের প্রত্যাশে মনে
ভেবে স্বপ্নতীরা সাংসারিক অশেষ লাঞ্ছনা
বরণ করে নিচ্ছে, সেখানেও অশান্তির ঢেউ
আগে ধীরে ধীরে চূপে চূপে, জনক-জননীর
নিভৃত অন্তরে, অরক্ষণীয় কল্পার বেহে
লীলাময়ী প্রকৃতির সহজাত অরূপণ দান-
সম্ভার দেখে। বাংলার শতকরা নিরানব্বই
কুটীরে কুমারী কল্পার জন্ত মধ্যবিত্ত পিতা-
মাতার কোথাও বা দ্বিগুণ বিধবা মাতার
এই অবর্ণনীয় চিন্তা প্রতি দিনের কুমার
মত বেড়েই চলেছে।

২। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বসু—চুচড়া কনকশালী
হুগলী। ৩। শ্রীমুখার চন্দ্র বসু এম, এ
(বেশবন্ধু স্কুল) ৪। শ্রীঅনিল বসু (রিপন
কলেজ, আইনের প্রথম বর্ষ ‘Y’ বিভাগ)
৫। শ্রীপ্রশান্ত বসু (হুগলী কলেজ, তৃতীয়
বার্ষিক শ্রেণী)।

শিবপুর মিশনারী স্কুলিকা

বিদ্যালয়

গত রবিবার ১৩ই মার্চ সময় ৫
ঘটিকার শিবপুর পাবলিক হলে উক্ত স্কুলের
ছাত্রীগণ কর্তৃক ৮মণিলাল গাঙ্গুলীর “কুমার
মুক্তি” নাটকের অভিনয় হয়। প্রবোধনা

মেরেদের জন্ত নানাবিধ শিকার পথ
বিস্তৃত করলেও সমাজ জীবনে যে ব্যাধি;
দেটা দৃষ্ট ক্রতের মত আজও বাংলার
যুকে দেখা পায়মান। কোন ব্যক্তি বিশেষ
এই দৃষিত ক্রতের জন্ত দায়ী না হলেও;
আংশিকভাবে প্রত্যেক নর-নারীই জড়িত।
সমষ্টিগত ব্যাধি দৃঢ় সমষ্টি প্রলেপ ভিন্ন
নিরাময় হওয়া অসম্ভব। প্রতিকারার্থে
কত মহা মহারথী বাঙালুতার বহুদুখী
প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন কত স্থলে,
কত সূরে কত চন্দ্রে কত বর্ণ বিভাগে।
কিন্তু আজও দুর্ভাগা বাংলার দুর্ভাগিনী
মায়েরের শোচনীয় দুরবস্থা—“যে তিমিরে
দেই তিমিরে।”

একে বেকার সমস্তা প্রতি করে হাহাকার
এনেছে; তার ওপর কুমারী কল্পার
সংখ্যাধীক্য বৃদ্ধি পাওয়ার, দিনের পরে
দিন বিবাহ সমস্তা জটিল হয়ে উঠছে।

করিয়াছিলেন নগেন বোঁদ। রাজার
ভূমিকায় মিস্ প্রতিমা বোনের অভিনয়
ও নাচন ভঙ্গি সর্বত্র সুলভ ও মর্মস্পর্শী
হইয়াছিল। “অঞ্জনা”র ভূমিকায় মিস্
অনিরা মুখার্জির অপূর্ব নাট্য নৈপুণ্য,
অভিব্যক্তি ও গানগুলি সমগ্র প্রেক্ষাগারকে
বিমুগ্ধ করিয়াছিল। অত্যাশ্চর্য ভূমিকায় মিলেন্স
ভারতী গাঙ্গুলী, আরতি গাঙ্গুলী, গীতা
গাঙ্গুলী, শিবরানী মিত্রের অভিনয়ও সুলভ
হইয়াছিল।

বাংলার ইতিহাসে পণপ্রথা আজও রেকর্ড রেখে চলেছে। হেলের মা বাবার অপ্রতিহত ক্ষমতার উত্থান শুধু পণ প্রথার সময়, কর্মক্ষেত্রেই তার সমাপ্তি ঘটে থাকে। উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত পাত্রের দল মাতৃবাক্য শিরোধার্য করে পূণ্য লক্ষ্যে আত্মদাখ্য লাভ করে থাকেন। দুর্ভাগা বাঙ্গালার ঘরে বিপন্নিকের পাত্রীর অভাব কোনদিন ঘটে না; দ্বিতীয় দফার নারী ও রূপিয়া অনার্যালে কুক্ষিগত হয়। উপায় কি? সমাজ জীবনের এই উৎপীড়িত ব্যাধির প্রতিকারার্থ কোন বৈদ্যী ইঞ্জেকশন কি ফল দিতে পারে না? শ্রোত্র পাত্র ও তরুণবলের কাছে জনস্বিকার চর্চা হলেও এই প্রশ্ন করার কি সময় আনেনি? এখনও শ্রোত্রের দল দ্বিতীয় লংগারে প্রবেশের সময় ৪০০ টাকা শুধু আদায় করতে উদ্যোগী হয়ে আনেন; ক্ষেত্রে কর্মও লম্পন্ন হয়।

তরুণ পাত্রের বৃকে এখনও কি দুর্ভাগিনী বিধবা জননীর আকুল আর্তনাদ প্রবেশ করতে পারেনা? মলিনমুখী জননীর ঘারে ঘারে ভিকার রূপ, কি তাঁদের বিদ্যুৎ প্রবাহিত সুরম্য গৃহঘারে চোখে পড়েনা?। দেশের এই দারুণ দুর্দিনে, জাতির এই মহাশঙ্কটের দিনে, পৃথিবীব্যাপী বেকারের চরম সমস্যার দুঃসময়ে, কর্মহীন, লাহনী, মেধাবী, তরুণের সাহায্য একান্ত ও একমাত্র আশ্রয়। একনিষ্ঠ কর্মচেতা, তরুণলজ্জের কাছে ধনিকের অসামান্য অর্থদান নিশ্চিত হয়ে পড়ে। কর্তব্য এবং চারিত্রিক বল যদি তরুণলজ্জের বৃকে জাগ্রত প্রহরীর কাজ করে যায়, তাহা হলে জাতির লক্ষ্যগত লক্ষ্য বাধা নিশীথ

অন্ধকারে দিশিয়ে যায়—অসীমের মাঝখানে। কর্তব্যনিষ্ঠ তরুণবলের কাছে আমরা বোনেরা ভিক্ষা চাই, “পণপ্রথার উচ্ছেদ”—“পথহারী প্রগতির শৃঙ্খলাহীন চলার শেষ”—“নিরম-তাত্ত্বিক সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা”। রহস্যময়ী প্রকৃতির পরিহাস প্রতিশোধ করে ফিরে আনেন। তরুণ তরুণীর উদ্বেগবিহীন পথে হারিয়েজানহীন যাত্রা একদিন শোচনীয় পরিণতি এনে যে ঝড়ের সৃষ্টি করে থাকে; তা থেকে বাংলার নবোন্মোচিত তরুণ তরুণীদের বাঁচতেই হবে। বাঁচার গৌরব যেন ভবিষ্যৎকে মহিমায়িত করে রাখতে পারে। এখনও আভিজাত্যের গৌরব অন্তর্মুখী নয়। এখনও বাংলার বৃকে বংশগরিমার, আভিজাত্যে, শিক্ষার স্বীকার, লাহনে, কর্মে, কষ্টলহিকৃত্য, ধরদ্বী মুকুটবিহীন তরুণ রাজা বেশক, জাতিকে, প্রজার দান হাত বাড়িয়ে দিয়ে যায়। ইতিপূর্বে বাংলার ইতিহাসে এতবড় খ্যাতি কোন তরুণের তাগে ঘটেনি। ভবিষ্যতের গর্ভে দ্বিতীয় আলবে কিনা জানা নেই। বাংলার দুলাল, বাংলার ভাই, বাংলার আশা,—সুভাষচন্দ্র যে ত্যাগ, যে ব্রত, যে আদর্শ আমাদের দেখিয়েছেন; তরুণলজ্জের কাছে সে ত্যাগ সে আদর্শ কি আশা করা যায়না? তারা কি পারেনা নিগৃহীত নারীকে রক্ষা করতে? তারা কি লজ্জবদ্ধ হয়ে বেকারের সমাধান করতে পারেনা? তারা কি বিধবা নারীর চোখের জলে পণপ্রথা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনা? তাই কি হয়? শিক্ষিত তরুণ যে জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষিত তরুণ যে ভবিষ্যতে নব যুগের সৃষ্টি ধরবে—লুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে শিক্ষিত তরুণের দল এগিয়ে আসবে অক্ষুন্ন

জ্ঞান ভাণ্ডার ও আশার দীপ্ত আলো নিয়ে। শিক্ষিত অশিক্ষিত লক্ষ্য তরুণ তরুণীকে যেন রাখতে হবে—আমরা দেশপ্রেমিক সুভাদ-চন্দ্রের ভাই ও বোন। এই দেশের মায়ের কোলে সুভাষচন্দ্রের জন্ম—এই দেশের মাটির বৃকে সুভাষচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা। যে শিক্ষা হরিরদ্রের ক্রন্দনে লাড়া দিয়েছে, যে শিক্ষা পথদ্বার্য্যাকে তুচ্ছ করে মাটির পথে ছোটবড় জাতির লক্ষ্য অবাধ দিলেন সাহায্য করেছে। এই শিক্ষাই শিক্ষা; এই শিক্ষাই লক্ষ্য ও মন্ত্র। অননুকারণীয় এই মহান ত্যাগ—বাংলার তলেমেয়েদের উদ্ধার গতির পথ রোধ করুক। দৃষ্টিকটু প্রগতির পথ থেকে তারা লার্কজিনী আদর্শ প্রচার করুক, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে কুটিরে কুটিরে। প্রতিচীর বিলাদ-মোহ দূরে যাবে লজ্জা পেরে। ফ্যানানের নয়রূপ দেশ থেকে বিতাড়িত হবে।

তরুণ তরুণীর আদর্শ কীষ্টি অনির্কচনীয় রূপে পরিবর্তিত হয়ে নব জাগরণের সৃষ্টি করুক এই প্রার্থনা।

পথ নির্দেশ

মাননীয় “মহিলা মহল সম্পাদিকা”

সমীপে—

কোন এক আত্মীয়ের টেবিলে একখানা খেরালী দেখে, তাতে দেখলুম; মহিলা সমিতি ও হুঃস্থা মহিলাদের অভাব এবং তার আংশিক প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। বিষয়টা পড়ে খুব আশাবিত্তা হলুম; কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বোধগম্য হোলনা, বোধ হয় সমিতি বা শিল্প-বিক্রয় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কোন ধারণা না থাকার। আজীবন অন্তঃপুরের অন্ধকারে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতেই অত্যন্ত, বাহিরে বিপুল কর্মকোলা-



ইন্ডিয়া বিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ব্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

হলে কোথায় কার অভাব অভিযোগ প্রতিকার কিছুই চিন্তা করে দেখবার অবসর আমার হয়নি। বংশগরিমা ও আভিজাত্য দ্বারিত্বকে উপেক্ষা করলেও, অভাবের তীব্র তাড়নায় ছোট ছোট নাবালক শিশুদের রক্ষার জন্ত আমার জীবন যখন হুর্কিশ হয়ে উঠে; তখন কোন উপায় না এসে আসে শুধু বাহিরের নির্যাতন উপহাস। পথহারা, অর্থহারা বাংলার কত নারী আমারই মত নীরবে মর্মান্তিক উপেক্ষা উপহাস সহ করে আসছে দিনের পর দিন।

আজ আপনার সৃষ্টিত ছোট্ট প্রবন্ধে পথ নির্দেশের ইঙ্গিত পেয়ে আশা হোল, হয়ত একদিন আমার ছোট শিশুগুলিকে ক্ষুধার আহার দিতে পারব; অমাস্বিক অত্যাচার হতে একদিন তারা বাঁচতে পারবে। তাদের শিক্ষার পথ হয়ত একদিন মুক্ত করতে পারব।

অনেক রকম শিল্প আমার জানা আছে। তারমধ্যে প্রধান এবং প্রয়োজনীয় একটি শিল্প লব্ধে জানাচ্ছি। যেটা মঙ্গলিক বিবাহ-কার্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি কোন লক্ষ্যবস্তী মহিলা দয়াপরবশ হয়ে বিবাহের সূচনায় অর্ডার দেন, তাহা হলে আমি ১০।১২ দিনের মধ্যে তৈয়ার করে দিতে পারি। জিনিষটা হচ্ছে একটা ডালার ওপর যাবতীয় পানের মশলা দিয়ে একটা সুন্দর বাগান বাড়ী রচনা— নারকেল গাছ ঝাউগাছ, ফোয়ারা ইত্যাদি সমস্তই পানের মশলা, দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে। বিবাহে পানের মশলা গায় হলুদ ও ফুলশস্যার দ্বিতৈ হয়। সেই জিনিষগুলিকে শিল্পে রূপান্তরিত করা চাড়া আর কিছু নয়। একটি ছোট সর্বনিম্ন ডালা সাজাতে মজুরী সমেত পরে ১০।১২।১৫২০ টিবার মধ্যে। আকার অমুযায়ী মশলার তারতম্যে খরচ কম বেশী হয়ে থাকে।

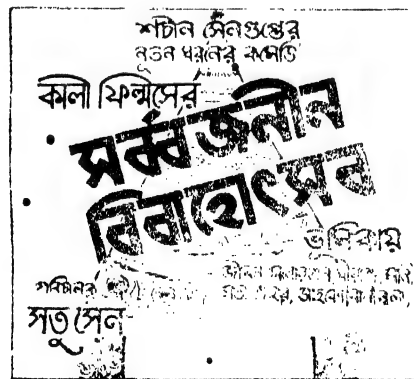
যদি আপনাদের মত লক্ষ্যবস্তী মহিলা ধনীরা বাড়ী হইতে এই মশলার বাগানের অর্ডার লংগ্রহ করিয়া দেন; তাহা হলে আমার অভাবগ্রহ সংসারে বিশেষ উপকার হয়। পরামুগ্রহ জীবন কি ভয়ানক কষ্টকর বর্ণনা নিম্নপ্রয়োজন। যদি প্রয়োজনীয় অর্থকরী শিল্পের দ্বারা গলগ্রহ জীবনের অবলান হতে পারে, অনুগ্রহ করে তার জন্ত একটু চেষ্টা করে বাসিত করিবেন।

বাংলার অন্তঃপুরে খেয়ালী, দীপালী ইত্যাদি সাপ্তাহিক কোনদিন প্রবেশের সুবিধা হয়না বোধহয়; নহিলে আমার মত বহু মহিলা এই আলোচনা দেখে আশান্বিতা হতেন। সম্ভব কিশোর ও যুবকরা শনিবার পড়ে কোথায় কেলে রাখে—মেয়ে মহলে আসবার সুবিধা হয়না। ইতিপূর্বে কত প্রয়োজনীয় লংবাছ নাজানি প্রকাশ হয়ে থাকবে।

নমস্কার ইতি—

—প্রনতা, প্রতিভা ঘোষ—

উ
ত্ত
রা
য়



চতুর্থ সপ্তাহ

জ
ন
ব
হ
ল



বিলাসী)

সংখ্যক প্রমিত

চিত্র-নির্মিতা : প্রফুল্ল পিট্টাস

প্রযোজক : প্রফুল্ল ঘোষ

কথা ও কাহিনী : কেশব গুপ্ত

সঙ্গীত—কেশব গুপ্ত

ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতাংশ

পরিচালক : নির্মল গোস্বামী

চিত্র-শিল্পী : ডব্লিউ মায়ার বার্গেস্ট

শব্দযন্ত্রী : ডগলাস ওয়ালটাস

নেপথ্য-সঙ্গীত—হুধামাধব সেনগুপ্ত

হুধেন্দু গোস্বামী

সম্পাদনা : অতুল নাথ

চরিত্র : মিঃ বটব্যাল—ভাস্কর দেব, মিসেস

বটব্যাল—দেববালা, সন্ধ্যা—অরুণা, ভূপতি চৌধুরী—

সত্যধন ঘোষাল, নন্দচন্দ্রাল—সমর ঘোষ।

প্রথম মুক্তি : 'শ্রী', বুধবার, ১৬ই মার্চ

হাসির ছবি তোলা বাড়লাঘেঁষে যেন একটা 'এপিডেমিক' লেগেছে। সম্প্রতি উত্তর কোলকাতার তিনটি চিত্রগৃহে উৎসরি উপরি মুক্তি পেল তিনখানা হাসির ছবি। আমাদের 'আলোচ্য' হাসির ছবিখানি "স্বপ্নের শ্রমিক"। নতুন ষ্টুডিওর নতুন 'ছবি হিলেবে "স্বপ্নের শ্রমিক"-কে যদি আমরা নিছক উচ্ছলিত প্রশংসা করি দোষ হবে লভ্যের অপলাপ। তবে একথা স্বীকার্য্য, এদের প্রথম প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার্য্য এবং এই ছবি যেখানে লজ্জাই অল্পমের যে, প্রফুল্ল ঘোষের তবিশ্রাস্ত পথ কুহুমাস্তীর্ণ।

"স্বপ্নের শ্রমিকের" গল্পটি সত্যিই বেশ উপভোগ্য। হলিউডে অল্পনা প্রচলিত 'Crazy comedy'-র এটি পর্যায়ভূক্ত। বিবাহ বারগ লম্বিতের অস্ত্রতম সত্য নন্দচন্দ্রাল নিউ মার্কেটে গিয়ে বটব্যাল পরিবারের রূপায় কল্পে যে প্রাক্কুরেট কুলি বনে গেল এবং

বটব্যাল-কস্তা সন্ধ্যার প্রেমে পড়ে হাসির ঘটনার মধ্য দিয়ে তাকে জীবন সজিনাক্রমে বরণ কোরল, চিত্রনাট্যকার অতি নিপুণভাবে এই কাহিনীটিই চিত্রান্তরিত করেছেন।

"স্বপ্নের শ্রমিক"কে শুধু হাসির ছবি বললে মন্তব্য ভুল করা হবে। হাসির ভেতর দিয়ে আজকালকার লব চেয়ে বড় যে 'Bread Problem' তারই লক্ষ্যে লেখক যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করেছেন তা' সত্যিই ভেবে হেঁদবার মত। এই গল্পটি, খুবই কম ছাত্র ছাত্রী আছেন যারা পড়েন নি। প্রফুল্ল ঘোষ হাসিয়ার লোক তাই তিনি যথাসময়ে এই শ্রমিক সমস্যাতে পর্দায় রূপ দিয়ে বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছেন।

ছবিখানির পরিচালক একেবারে নতুন। সে হিলেবে তাঁর কাজ আশাশ্রব বলা যায়।

"স্বপ্নের শ্রমিকের" আলোকচিত্রের কাজ সত্যিই চমৎকার। কিন্তু সে হিলেবে শব্দযন্ত্রের কাজ হয়নি। আবহ সঙ্গীত প্রশংসনীয়। দৃশ্যলজ্জা হ'য়েছে যথোপযুক্ত। সম্পাদক খুব নির্দয়ভাবে কাঁচি চালিয়েছেন—কিন্তু তবুও স্থানে স্থানে কিছুটা চালাতে তাঁর চোখ জড়িয়েছে।

অভিনয়ে ভাস্কর দেব, দেববালা, সমর ঘোষ প্রশংসনীয়। অরুণা ও ভাস্কর রায় চলন নই। অস্ত্রান্ত্র ভূমিকায় যারা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউই আমাদের একেবারে নিরাশ করেন নি। গানগুলি সুগীত।

পরিশেষে আমরা এইটুকু বলতে চাই, "স্বপ্নের শ্রমিক"কে সাধারণ সাধারণ বরণ কোরে নিয়েছে ছ'টি কারণে, একটিকে হাসি অস্ত্রটিকে শিক্ষা। প্রেক্ষাগৃহে যতক্ষণ তাঁরা ছবি দেখেন ততক্ষণ তাঁরা প্রাণপুলে হাসেন, প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরলেই তাঁদের সাধারণ চিন্তাভাবনা করে বিস্তার। সেইজন্যই মনে হয় 'শ্রী' চিত্রগৃহে 'স্বপ্নের শ্রমিক' চলবে ভালই।

নিউ থিয়েটার্স

ভারতবাসীর কাছে বিভাপতির আকর্ষণ চিরন্তন। তাই তাঁর চিত্রকারী জীবনী-কথা এবং কোমলকান্ত পদাবলীর মাধুর্য্য বাণী চিত্রাকারে রূপবস্তার অন্তর জয় কোরতে পেরেচে।

কল্পনা-প্রবণ বাঙালীর কাছে এই শ্রেণীর ভক্তিবলক এবং গীতি প্রধান চিত্র যে কী বিপুলভাবে সম্বলিত হয়—নিউ থিয়েটার্সের 'চণ্ডীদান', 'পূরণভবন', 'মীরাবাই' চিত্রাধিতে তাঁর একাধিক প্রমাণ আছে।

কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে—ভারতীয় ছাত্র-চিত্রের ইতিহাসে চরমোৎকর্ষের পরিচয় দিতে পেরেচে—'বিভাপতি'। বরষী প্রয়োগ শিল্পী তাঁর বৃক্কের দরদ বিশিয়ে এই কাহিনীটি রচনা করেছেন ও রূপ দিয়েছেন। এই শ্রেণীর ছবির পরিচালনার, ভারতীয় ছাত্র-চিত্রের দরবারে দেবকী বাবু যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, এ কথাও আমরা অনকোচে স্বীকার কোরতে বাধ্য। বিভাপতি-তে শিল্পী সম্বন্ধে যট্টে সত্যিই অকল্পিত।

আগামী ২রা এপ্রিল শনিবার চিত্রার-আপনারা তাঁর পরিচয় পাবেন।

এই চিত্রের কথা-বস্তু হ'চ্ছে তরুণী সন্ধ্যার অভিশপ্ত জীবন কাহিনী। সাহসার



କବିଂଶ୍ରବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥର

ସର୍ବଶ୍ରଷ୍ଠ ଓପିଆମ୍



କୋରା

চরম সীমায় উপনীত হোলে, শত সহস্র অভাগিনী যে পথে যায়—সন্ধ্যাও সেই পথে গিয়েছিল। এ অবস্থায় পড়লে অনেক আশ্চর্য্যভাৱ করে। কিন্তু সে কোরেছিল—আশ্চর্য্য হতা! তবু সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। জ্বরহীন, নিষ্ঠুর সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে সে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। নারীর নিষ্ঠা, নারীর দৃষ্টি, নারীর সত্যিক—সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে সে একজন অপরিচিতের পাথে পথের বার হোল। সমাজের কবাইথানা থেকে উদ্ধার কোরে আনলো তাকে এক যুবক। মুক্তিমতি উষার মত নব-জীবনের নতুন দীপ্তি নিয়ে সন্ধ্যা রাতিয়ে তুললো তার অন্তর—নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

প্রথমতর জীবনে এলো উষা। কিন্তু জীবন-ভোড়া বেদনা ও লাঞ্ছনার মধ্যে তরুণী সন্ধান পেলো সত্য পথের সন্ধান! কোন সে পথ? কেমন তার রূপ? কোথায় তার পরিণতি।

জায়া চিত্রাকারে তারই পরিচয় পেয়ে আপনি বিস্মিত হবেন। জীবনে একটা বড় সমস্যার সমাধানের চূড়ান্ত ইঙ্গিত আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে। আপনাকে বোলতে হবে—সে পথ হারিয়েছিল কিন্তু লক্ষ্য হারায়নি! এই ত' বাঙলার নারীর রূপ—তার সত্য পরিচয়! মৃত সমাজকে যে জাগিয়ে তুলতে পারে, বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে সে নারী ঐ লক্ষ্য—আমাদের নম্রতা! লক্ষ্য ও প্রথমতর ভূমিকার শ্রীমতী মলিনা ও জীবন গল্পোপাধ্যায় অপূর্ণ অভিনয় কুশলতার পরিচয় দিয়ে আপনাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কোরতে পারবেন। তা' ছাড়া অপর্যাপ্ত ভূমিকায় মনোঃজন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, শৈলেন পাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মেনকা, দেববালা, পঙ্কজ মল্লিক, বিনয় গোশ্বামী, অহি সাধ্যাল, বোকেন চট্টো ইত্যাদি যে নিজ নিজ

অনাম অক্ষর রাখতে পারবেন—এ বিখ্যাত আমাদের আছে।

পরিচালক রায় মহাশয় সম্প্রতি শেষ লেটটি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এরপর লোকেশানের কাজে আত্মনিয়োগ কোরবেন।

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার নতুন ছবিতে অনেক কিছু মৌলিকত্বের পরিচয় আমরা পাব। নবীন বাঙলার প্রাণের কথা তিনি জ্ঞানেন। তাই এমন একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মন স্পর্শ কোরতে চান—প্রাণ-ধর্ম্ম এবং মানবতার আঁহর্শে যা হবে সত্যই বরণীয়।

প্রেম যেখানে ঝাঁটি ও অচঞ্চল—সেখানে অবস্থা বিপর্য্যয়ে প্রেমের অমর্য্যাদা বটে না। নিখিলেশ ও ইন্দিরার জীবনে সেই সত্যটাই শেষ পর্য্যন্ত বড়ো হোয়ে উঠেছিল। সে বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে সর্ব্বস্ব হারিয়েও জীবনের চরম পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয় নি। কিন্তু ঝাড়া?—বিনিময়ে সর্ব্বস্ব পেয়েও অন্তরের দিক থেকে তার বড়ুকা, হাছাকার মিটল কৈ?

জীবন-যুদ্ধে চরম পরীক্ষা সঙ্গিকট হোয়ে এলে—নারী কৌণের জোরে তার পদমর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য-বিলাস তুচ্ছ কোরেও বিজয়িনী, হয়—শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার নতুন ছবিতে তারই পরিচয় আমরা পাব।

আমরা আশা করি সকল শিল্পীই এই চিত্রে তাঁদের নিজস্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিতে পারবেন।

শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু ধুবোপাধ্যায়—আবার সেই মাণিক-জোড়! হাসির খোরাক দিয়ে এই যুগল-শিল্পী যে আমাদের অন্তর রাঙ্গিয়ে তুলতে পারবেন—একথাও অব্যাহিত সত্য।

যিনি তাঁর অপূর্ণ লিপি-কুশলতার মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালী জাতির হৃদয় স্পর্শ

কোরতে পেরেছেন—সেই শরৎচন্দ্রের বড় আমদের 'বড়ুবি'। প্রথম প্রকাশের সময় লেখকের নাম গোপনের ফলে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ কোরেছিলেন—বড়ুবি রবীন্দ্রনাথের রচনা!

জায়া-চিত্রের জন্ম এই কাহিনীটিকে মনোনীত কোরে নিউ থিয়েটার তাঁদের রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ কোরে শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর এমন একটি কাহিনী জায়া-পটে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবার অবকাশ পাবে, যা'র মধ্যে আমরা দেখতে পাব প্রেম ও সেবার মধ্য দিয়ে জীবনের শেষ পরিণতিও কত মধুর হোতে পারে।

আমাদের দেশে এমন কোন শিক্ষিত বাঙালী নেই, যিনি এই কাহিনীটির সঙ্গে পরিচিত ন'ন। ছবিখানি যা'তে তার সত্যাকারের রূপ ও মার্য্যাদা নিয়ে, রসবস্তার চিত্রে স্থায়ী আনন্দ দান কোরতে পারে—পরিচালক মল্লিক মহাশয় তার জন্ম যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছেন। তার কর্ম্মশক্তি ও আন্তরিকতায় আমাদের বিশ্বাস আছে, তাই ছবিখানির সাফল্য সম্বন্ধে আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি। বারাস্তরে আমরা বড়ুবি'র ভূমিকালিপি প্রকাশ করবার আশা রাপি।

গেল হস্তার "দেশের মাটি"-তে উষা, সাইগাল ও পঙ্কজ মল্লিকের কয়েকখানি গানের 'প্লে ব্যাক্' করা হয়। সম্প্রতি এই ছবির একটি বহুৎ দৃশ্যের মহলা বেওয়া হ'চ্ছে। এই বৃশ্চ গোবীর ভূমিকায় উষা গ্রামবাসীদের একটি ভোজে পরিভূক্ত করেন কিন্তু সহরে ঘেরে চম্ভাবতী আরও ভাল রাখতে পারেন তাই তিনি অশোক ও বঙ্কবান্ধবের নিজের হাতে রেখে তৃপ্ত করেন। এই দৃশ্যের মহলা স্বভোজ্য একবার নয় চারবার হয়। কিন্তু পাচ-

বারের সময় যখন খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন সবাই বললেন ঠিক আছে—আমরা সব শূটিংয়ের জন্য প্রস্তুত।

* * *

পরিচালক প্রমথেন বড়ুয়ার সুযোগ্য সহকারী কপি মজুমদার স্বাধীনভাবে যে চিত্র গ্রহণ করছেন সেখানার নাম “স্ট্রীট লিফার”। গত ৯ই মার্চ এই ছবির সূদৃশ্য একটি থিয়েটারের সেটে প্রথম চিত্রগ্রহণ কার্য আরম্ভ হয়। কপি মজুমদার শূটিংয়ের সময় যেভাবে এই দৃশ্যটি পরিচালনা করলেন তা’ দেখে সবাইয়ের মনে হ’ল যেন তিনি কত ছবি পরিচালনা করে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। বড়ুয়া এইদিনে কপির সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন—তিনি যেন কেমন ভড়কে গিছিলেন। সহকারী পরিচালকরূপে উন্নতি করার তাঁর কোনও আশা ভরসা নেই।

দেবদত্ত ফিল্মস

‘গ্রামে এই পচা ডোবা ছাড়া আর একটা ভাল পুকুর নেই’—অনেক দূরত্বে, অনেক বেঘনায় বৃষ্টি ‘গোরা’র মুখ থেকে তৎপরতার সুরে এমন কথা বার হ’য়ে আসে।

ঘোষ পাড়ার দরিদ্র পল্লীতে অগ্নিদেবের কোপ দৃষ্টি পড়েছে, সে কোপ শাস্ত করার মত যথেষ্ট জলও নেই পচা ডোবার।

তবু কি জলই নেই। গ্রামে মানুষের স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নেই, উৎসাহ নেই, নেই লততা, নেই বিপদের দিনেও এক লগ্নে কাজ করার মত একতা, আছে শুধু এক দিকে ক্ষমতার লোভ, দস্ত, অত্যাচার, আর একদিকে ক্ষুদ্রতা-মূলত জঁর্ঘা, ঘেব, চৌতা।

দেশ বলতে যে গ্রামকেই বোঝায়, এবং গ্রাম বলতে বোঝায়, এই দৈহ্য, দরিদ্র, রোগ, অক্ষমতা, মানি—এ কথা আজ

হয়ত আমরা অনেকেই বুঝতে শিখেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মাননীয় ‘গোরা’র কাছে আমাদের শিক্ষা শুরু। ‘গোরা’ উপজাতিতেই গ্রামোন্নতি থেকে আরম্ভ করে অদৃশ্যতা বর্জন পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলনের সূত্রপাত। দেশব্যাপী অজ্ঞানতা, অক্ষমতা ও মানির বিরুদ্ধে ‘গোরা’ই প্রথম অভিযানের নায়ক।

শুধু দেশ জননীর সত্যকার রূপ, দেশ সেবার মহানতম আদর্শ সেখানে স্পাই বলে নয়, লকল দিক দিয়েই ‘গোরা’ এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপজাতি। সেই কাহিনীকে চিত্রে জীবন্ত করার দুরূহ ভার নিয়ে দেবদত্ত ফিল্মস লতাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

কালী ফিল্মস

এখানে “চোখের বালি”-র শূটিং নিরমিত চলছে। মিঃ টি-পি-মেহরা নিজের ভাবধানে ছবিখানা তুলছেন। সম্প্রতি মহেন্দ্রের বাড়ীর একটি সূদৃশ্য সেটে “চোখের বালি”-র শূটিং চলছে।

* * *

গেল হস্তার “শ্রীকৃষ্ণজন্মের” গোপগোপীগণ পরিবেষ্টিত শ্রীরাধার নৃত্যাগতের একটি দৃশ্য এবং হোলি উৎসবের দৃশ্য তোলা শেষ হ’য়েছে। এই ব্যাপারটির লজ্জিত পরিচালনা করেন রঞ্জিত রায়।

শ্রীভানুভক্তলক্ষ্মী ষ্টুডিও

মহু-সাধনার “অভিনয়” এখনও চলছে। কেবল যে যবনিকাপাত হবে, কে বলতে পারে?

* * *

জ্যোতির বাডুয়ার পরিচালনার এদের দ্বারা একখানা বাড়লা ছবির প্রাথমিক শূটিং হ’য়ে গেছে। ছবিখানার নাম “কলেজ কত্যা”। এতে অভিনয় করছেন অরীন্দ্র চৌধুরী, বীরাজ ভট্টাচার্য্য, লতায় লিংক, রাণীবালা, জোৎস্না গুপ্তা, শান্তি গুপ্তা, অরুণা প্রভৃতি।

হাজরা পিক্চাস

তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনার এদের প্রথম ভক্তি-মূলক চিত্র “দেবী কুমারী”-র রাজপ্রাণাঙ্কুরের কয়েকটি দৃশ্যের কাজ গেল হস্তার শেষ হ’য়ে গেছে। তিনকড়ি চক্রবর্তী ছবিখানা সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। আমাদের মনে হয়, “দেবী কুমারী” লতাই একখানি উপভোগ্য ছবি হবে।

ইউনাইটেড টেক্স

গুণময় বাডুয়ার পরিচালনার শ্রীভারত লক্ষ্মী ষ্টুডিওতে এদের প্রথম সামাজিক ছবি তোলার আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হ’য়েছে।

বড়ুয়া ষ্টুডিও

বড়ুয়া ষ্টুডিওতে জি-বোবের পুত্রদের নতুন ছবি “যমুনা পুলিনে তিথারিণী”-র শূটিং যথারীতি চলছে।

ম্যাডান থিয়েটার্স

এই প্রতিষ্ঠানে চারু রায় একখানা বাড়লা ছবি তুলছেন—এ খবর আমরা পূর্বেই জানিয়েছিলাম। ছবিখানার নাম এখনও আমরা জানিনা—তবে এই ছবিতে নায়কের জন্ত মনোনীত হ’য়েছেন বীরাজ ভট্টাচার্য্য।

পূর্ণ থিয়েটার

আগছে ২৬শে তারিখ থেকে এখানে নিউথিয়েটারের চিত্র ‘মুক্তি’ দেখান হ’বে। মুক্তির জনপ্রিয়তা লক্ষ্যে বাড়লাদেশের কোন লোকের মনেই একটুও সন্দেহ নেই। হৃদয় কলিকাতায় যে এ চিত্রখানি বেশ সুলভ্য তাই কয়েক সপ্তাহ ধরে চলবে তা জোর করেই বলা যায়।

চিত্রা

আগছে ২রা এপ্রিল থেকে এখানে ‘বিভাপতি’ দেখান হ’বে। চিত্রায় ‘মুক্তির’ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ থিয়েটারেও দেখান হ’বে।

বংশীর বিস্মে

শ্রীমন্তকুমার আচ্য

বন্ধুর বিজনবিহারীর লাইব্রেরীতে বসে আমরা কজন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে চালাচ্ছিলাম চলতি জগতের চমক লাগানো খবরগুলোর ওপর টিপ্সনী, এমন সময় কুষ্টিবাজ ফটিক ঝড় খেমে যাওয়ার পর খমখমে আকাশের মত ভারী মুখে ঘরে ঢুকে ক্যানের রেগুলেটরটা শেষ দাগে ঠেলে দিয়ে একটা শোফার ধপ্ করে বলে পড়লো। 'চায়ের চাকর চণ্ডী চট করে তার সামনে গরম এক কাপ চা রেখে দিলে। ফটিক গম্ভীর মুখে চায়ের কাপে হু'একটা চুমুক দিয়ে একটা হাত দিয়ে আর একটা হাত চেপে ধরে মাথাটা প্রায় বৃকে ঠেকিয়ে চুপ করে বলে রইলো। যে ফটিক এলে সবাই ডিনার আর খবরের জন্তে উৎসুক হয়ে ওঠে তার ভাব-খানা দেখে সবাই ওর পানে চেয়ে রইলুম। চায়ের কাপ থেকে ধোয়া বেরোচ্ছিল—তার কীক দিয়ে ফটিকের ভারী মুখের পানে চেয়ে, আন্তে আন্তে উঠে গিয়ে লোফটার হাতার বলে ফটিকের পিঠ চাপড়ে বিজন-বিহারী জিজ্ঞাসা করলে "ব্যাপার একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু কি রে ফটিক?"

দরদী বন্ধুর ঔৎসুক্যে ফটিকের কুষ্টিবাজ স্বভাব যেন নাড়া পেয়ে খানিকটা জেগে উঠলো। মাথাটা তুলতে আমরা সবাই দেখলুম ওর মুখখানা যেন অনেকটা হালকা হয়েছে।

সে বলে দেখ ভাই, নিজের ঘরোয়া কথা তুলে তোদের মাথা ব্যস্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। তবে যখন জানতে চাইছি

তখন বলিই কথাটা। ব্যাপারটা হয়েছে এই যে আমার মালতুতো ভাই সুকুমারদা' বিয়ে করেছে এই মাল ডয়েক হবে। কিন্তু বৌদ্বির সঙ্গে দ্বাদার বনিবনা হচ্ছে না। তবে খবর পেলাম সুকুমারদা' বাড়ী ছেড়ে মেলে এসে উঠেছে। শুনে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে।"

কতকটা ভুক্তভোগী হিসেবে আমি শুধোলুম "গোলমালের মূল কি বেকার সমস্যা, একজামিনে ফেল, না আর কিছু?"

ফটিক গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে কৌসু করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে "নায়ে ভাই, ব্যাপারটা তা নয়। তবে দাধা আমার বৌদ্বিকে যখন কোন কথা বলে তখনই বৌদ্বি চোখ বের করে দ্বাদার পানে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে বন্ধার তুলে বলে "কী?" দাধা বলে বিয়ের পর থেকেই এমনি চলছে। আর নইতে না পেরে শেষে বাড়ী ছেড়েছে। দ্বাদার মতে তার মত নইতে কাউকে হয়নি আর উপস্থিত এর একটা উপায় না করলেও চলছে না।" "ফটিক আমার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে থামলো। তারপর বলে "ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা ছেলের হল বিয়েটাকে নোজা বলে ঠাওরে নিয়ে, ভাড়াভাড়ি মেয়ে বাছাই করে ফেলি। তারপর বিয়েটা হয়ে গেলেই হু'পঙ্কের টান অনেকটা কমে যায়, নয় তো বেরোয় নানা ছুৎ। তখন খাধে যত গোল। কিন্তু আমার মতে বিয়েকরা জীবনে শান্তি, স্বস্তি পেতে হলে পূর্বরাগের সময়টায় প্রাণ খুলে হেলাদেমা করে মনের ভাব জানা দরকার। বিশেষ করে যদি এই সময়ে

বাইরের কোন বাধা এসে মাঝখানে দাঁড়ায় তাহলে বাচাইটা ভাল রকমই হয়। সে পরীক্ষায় পাশ করে যে বিয়ে দেই হয় সত্যি সুখের বিয়ে। মানে, সোনা পড়লেই ঠিক বোঝা যায় তার খাঁটিত্ব। এই যেমন আমাদের বংশীর হয়েছিল। তাইতো ওদের ছজনের মনের মিল এত বেশী। জানো তো কি কষ্ট করেই ওরা এসে ভিড়েছে ছজনে মনের মনের কুলে।" অমল বলে "তাহলে বৌকে নিজের ঠিক দাম বোঝাতে বংশীর সময় একটু বেশীই লেগেছিল ব'লো?" ফটিক টাটকা এক কাপ গরম চায়ে চুমুক দিয়ে হাঁটু চাপড়ে বেশ জোর গলায় বলে "মোটাই নয়। ওখানেই তোরা ভুল বুঝিস্। প্রেম তাদের প্রথম দর্শনেই হয়েছিল। কিন্তু প্রেমের বাধা বিনোদিনীর—মানে বংশীর বোয়ের—অনিচ্ছা কি অপতন্নের ভেতর ছিল না। সে বাধা ছিল অল্প ধরণের। যে ওদের জীবনে অগ্নী পরীক্ষা এনেছিল সে হচ্ছে শিকারী মহাধন শিকারী। আমাদের পরকারা খুড়ো। নামটা কি তোদের শোন' নেই?"

তাপস বলে "কই, মনে হচ্ছে না তো।"

ফটিক বলে "কিন্তু নামটা শুনে কি মনে হয় যে লোকটা বেজার হুধে?"

আমি বলুম "হোক না হোক। সেইটাই তো আমরা সুনতে চাই।"

ফটিক বলে "কিন্তু খুড়ো ছিল সত্যি বেজার হুধে আর কিচেল। তার ওপর খুড়ো ছিল জবরদস্ত শিকারী। সুন্দর বনে নিজের জমিদারীতে খুড়ো বহু শীকার করেছে। এমন কি সেখানকার কেঁদো কেঁদো বাগগুলো খুড়োর নামে খুড়োর জমিদারীর তলাটি ছেড়ে পালাতো আর খুড়ো যখন বন্ধু কাঁধে নিয়ে খালের ধারের লক্ষ পথ দিয়ে জুতো খস খসিয়ে যেতো

তখন ভীষণ কুমীরগুলো পর্যন্ত খুড়োর গন্ধ পেয়ে জলে ডুবে নিঃশেষ বন্ধ করে থাকতো। খুড়ো সরলে তবে তারা জলের ওপর মাথা জাগিয়ে নিঃশেষ নিয়ে বাঁচতো। এমন খুড়ো যখন এলে দাঁড়ালো বংশী বিনোদিনীর মাঝখানে তখন বংশী বাবু, কুমীরগুলোর বুদ্ধিতে বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ খুঁজে পেল।

“সহস্র খুড়োর আবির্ভাবের আগে ভাগ্যদেবী এক রকম সুবলধারে বংশীর ওপর রূপাদৃষ্টি করছিলেন। বংশীর নামটা একটু লেকেলে হলেও চেহারা, কথাবার্তায় সে ছিল একরকম আধুনিক, তার ওপর স্বাস্থ্যও ছিল ভাল আর আবার সঙ্গে তার যে এত মায়াবাধি সে তো তার আবার মত সুপ্রিয় স্বভাবের জন্মেই। আর তার ব্যাঞ্ছন্য এক বড় জানতে চাস্তা হলে এই কথাটা বলতে পারি যে তার বেওয়া

ইনকাম ট্যান্স এই অফিসটার আর্দেক লোকের ছ'মাসের মাইনে অন্ততঃ বেওয়া চলতে পারে। তার ওপর সে পড়লো উত্তর ডাটের মেয়ে বিনোদিনীর প্রেমে আর তার ভালবাসা সে পেয়ে গেল স্বরকারের অনেকটা কম চেষ্টাতেই।

“লপ্তা ছুরেক বেশ কাটলো। পরিচয় হওয়া থেকে গান, বাজনা, চায়ের আসর মিনেশা, পিকনিক এর মধ্য দিয়ে বংশীর প্রেম বেশ তরতর করে এগিয়ে চলছিল। এর মাঝে একদিন এলে পড়লো সহস্র—সমস্ত। খুড়ো আকাশ ফুড়ে পড়ার আগে কোনদিন বৈকালে চায়ের কাপে কোন তুফানই ওঠেনি। উত্তর ডাটের বাড়ীর খানসামার তৈরী বিলিতি খানা, বিনোদিনীর তৈরী চায়ের পর ব্রজ, বংশীর ব্যাজের সঙ্গে বিনোদিনীর গানের সুরে

তার মনের নদীতে প্রেমের তরী বেশ নাচতে নাচতে চলেছিল।

উত্তর ডাটের ছিল লামবাগো। ক'দিন তার দেবার পুরস্কার হিসেবে বিনোদিনী বংশীর সঙ্গে মিনেশার মাঝার হুকুম বাবার কাছ থেকে আদায় করে ছদ্মনে গিয়েছিল মেট্রোতে। ভবি চলছে ঝড়ের মত, লবাইকার নজর তখন রূপালী পর্দার গায়ে। সেই সুযোগে বংশী বিনোদিনীর নরম হাতখানা হাতে নিয়ে বেশ একটু চাপ দিয়ে তাকে নিজে দিকে একটু টেনেছে। বিনোদিনীও জানতো ও বিয়েতে তার বাবা, মা, দাদাদের কারো কোন আপত্তি নেই। তাই সেও বংশীর গায়ে একটু হেলতে এমন সময় পেছ দিক থেকে মাথার কার কুহুইয়ের বোঁচা খেয়ে বংশীর প্রথম প্রেমের আবেগ ফুলে ওঠা বুকখানা ফুটো হয়ে যাওয়া ফুটবলের

ও, কে, এ
প্রোডাকশন

রূপোর
ঝুমকো

ফুডিও
ব্রাশা ফিল্ম



নিভা নবীন ছন্দে
প্রেম
সিরহ
মিলন কথা
যুগে যুগে
‘ওগো প্রিয়’
হৃদয়বিকশিত
হাস্য
মধুর
ছন্দ!

কাহিনী
গোবিন্দ শ্যানাজী

পরিচালক
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপোর
ঝুমকো

ব্যবস্থাপক
বিজ্ঞাপন মল্লিক
নীলমণি রায়



মত চূপবে গেল। লোকা হয়ে বলে সে
তরে তরে পেছু দিকে তাকাতে আবছা-
আলোর প্রাথমিকই তার নভরে পড়লো
বাণের মত জলজলে প্রেক দুটি চোখ।
বংশী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেখে জলন্ত
ভাটার মত চোখ দুটোর পানে চেয়ে
রইলো। তারপর পকেট থেকে সেটে
জবজবে ক্রমালখানা বের করে চোখ দুটো
ভাল করে মুড়ে নিলে। কিন্তু ভাল করে
দেখবে কি, তার চোখ দুটো তখন সেটের
ঝাজে আলা করিতে শুরু হয়েছে। তবু
প্রাণের দ্বারে তাকে পেছু দিকের চেয়ে
থাকতে হোল। বিংশ শতাব্দীতে কোলকাতার
চৌরঙ্গী হেন জায়গার লহরের সেরা
লিনেমার বাঘ বেয়োল নাকি? কিন্তু
গৌর দাড়ীতে কণ্টকাকীর্ণ যে সুখানা
বংশীর চোখে পড়লো সেখানা বাণের নয়
বটে, তবে বাণের যম শিকারী লহরের
শিকারের। লহরের খুড়ো বলে “কে
হে, বংশীবদন নাকি?” সঙ্গে সঙ্গে ইন্টার
ভ্যালের আলো জলে উঠলো। বংশী
চেয়ে দেখে তার বড়মামা বীকবাবুর শালা
লরকারী লহরের খুড়ো। সে বলে “হ্যাঁ;
তারপর খুড়ো কি মনে করে? আমি
তো জানতুম তুমি লোহরবদন।”

খুড়ো গাঁক গাঁক করে হেসে উঠে
বলে “এলুম একবার তোদের কোলকাতা
লহরে। তারপর সঙ্গে ইটি?”

বংশী কৌৎসে পেড়ে বলে “ইটি আমার—
মামে ডক্টর ডাক্টর ধরে।” মিস্ ডাক্ট,
আমাদের লরকারী লহরের খুড়ো। কিন্তু
অব লোহরবদন।”

খুড়োর পরশে গলফ স্ট্রট। ওই হোল
খুড়োর আটপোরে আর শিকারের পোষাক।
বিচিত্রবংশী খুড়োকে লজ্জাবণ করবে কি,
বিনোদিনী হাঁ করে চেয়ে রইলো। তার
সুখানার পানে। খুড়ো বিনোদিনীর আপাধ
মস্তক দেখে নিয়ে, গৌর দাড়ীর জলনের কীক

দ্বিহ্নে ক্রান্তের দাড়ার মত সারি সারি
লাজানো লাধা দাঁতগুলো বের করে, গৌর
চাটা হালি হেলেন বলে “আও :—দেখেছিলুম
বটে ছেলেবেলার। বেশ বড়লড় হয়েছে।
তা তোমার সঙ্গে ডক্টর ডাক্টর এত বড় আইবুড়ো
মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন যে বড়ো?...
আও :—বুকেছি। হুম্!”

তখন বংশীর সারা শরীরের ভেতর কেমন
চুলবুল করতে শুরু করেছে। খুড়ো পানের
একখানা খালি চেয়ারে বলে পড়লো।
ইজেরের পা দুটো টেনে আগলা করে নিয়ে
পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে, তোমার পায়ের
মোটা বুটের খাবড়া ডগাটা প্রায় বংশীর
নাকের ডগার নাচাতে নাচাতে বলে “বলতে
তো বললিনে। গুরুজনের সঙ্গে সর্বোৎসাহ
একত্ব ভুলে মেরে দিয়েছিল। দেখা হোল
আজ তোর মামার সঙ্গে। বাপ তো মারা
গেছে। স্বাধীন হয়ে বেজার কুস্তিতে আছিল
শুনলুম।”

বংশী বলে “ভুল হয়ে গেছে খুড়ো। হ্যাঁ,
বলো। তারপর আজ কেমন?”

হা হা করে হেসে হাতটা তুলে হাসলো
ফুলিরে খুড়ো বলে “শরীর? আমা-
দের এই লোহার শরীর আবার থাকবে
কেমন? যেমন থাকবার ভেমনই
আছে। একি তোদের আজকালকার
ছেলেদের ফুঁরে উড়ে যাওয়া শরীর? হ
—বতলব” ভালপাতার দেপাই!” বলে
বংশীর পিঠে আস্তে একটা চাপড় ধরে
খুড়ো হা হা করে হেসে উঠলো।

চড়টা খুড়োর হিলেবে আস্তে বটে,
কিন্তু ওতেই বংশীর “কৌক” করে ওঠবার
মত অবস্থা, কিন্তু বিনোদিনীর সামনে,
বিশেষ করে খুড়োর হালির ধমক চমকে
আশ পাশ থেকে খেতাজিনীরা তাদের
এপটার পানে আড় চোখে তাকাচ্ছে
দেখে বংশী বলে “তা খুড়ো, তুমি যে

১৩

গান

শ্রীকণিষ্ঠাশ্রম টেম্‌জ

১৩

ছথের তরী ভাল এ'বার

চোখের জলের দরিরায়।

ঘোল দিতেছে, পাল তুলেছে

দীর্ঘশ্বাসের উদাল বার ॥

মায়ার ঘেরা গহন আঁধারে

গগন গায় কোথা' সেই

ঐব তারা রে।

নাই ঠিকানা, না পাই দিশা

বাইব কোথা, কোন্‌ কিনারায়।

ওগো কান্তারী, কোথা কুল, কত ঘুরে।

মরি ঘুরে;

নিরাশ্বাসের ব্যথার তরা,

অবিশ্বাসের আঁধারে;

হার হ্রাশার পারে আসা

অতল তলে জীবন বার ॥

বড়ো লিনেমার? বরাবর ডবির শ্রাদ্ধই
তো করে এসেছে?”

খুড়ো বলে “বলেছিল বটে কথাটা।
এসব কি আর আমাদের ভাল লাগে?
বাণের দেশের আদমি আমরা। এলে-
ছিলুম হগ লাহেবের বাজারে মোটা
মস্তমান কলার খোঁজে। কলার নেশা।
সোদর বনের লোক আমরা। কোলকাতার
হগের বাজার ছাড়া ও কলা আর মিলবে
কোথায় বল? যাচ্ছিলুম হুন্‌ হুন্‌ করে
বাজারের দিকে, দেখলুম তুই এই—হ্যাঁ,
—একে নিয়ে চুকছিলুম বায়স্কোপে।
আপনার জন রক্তের টান রে বংশী,
রক্তের টান—চুকলুম একখানা টিকিট কেটে।
কি বা অন্ধকার, তোকে কি খুজে পাই?”

(ক্রমশঃ)

স্বপ্নশাস্ত্র

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একাংশ পরিচ্ছেদ

রাজে রোগিনীর রোগ খুবই বৃদ্ধি পাইল। ললিতা আরও প্রকোপে ভুল বকিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, নীরব খুবই ভয় পাইল, তিন চার বার ডাক্তার ডাকিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রুগীর পাশে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে কখনও রোগীর মাথার হাত দেয়, কখনও কপালে হাত দেয়, থার্মোমিটারে জর দেখে, আর কেবলই হতাশার উচ্ছ্বাসে ঘর পরিপূর্ণ করে।

লবঙ্গ সে রাজে রুগীর শিয়রে বসিয়া পরিচর্যা করিতে লাগিল। সে স্থির, ধীর, গভীর। এত বড় রোগের সঙ্গে বুদ্ধ করিতে গেলে, যে সকল অস্ত্রের প্রয়োজন, সে সকল সে সংগ্রহ করিয়া লইয়া বসিয়াছিল। মাথার বরফ দ্বিবার খলিটি, ওড়িকলোনের শিপিটি, একটা পাথর বাটীতে খানিকটা জল, খানিকটা ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি সে তাহার পাশেই আনিয়া বসিয়াছিল। শয্যালগ্নয় পাশের টেবিলটিতে রাখিয়া দিয়াছিলেন ঔষধের শিশিটা, ঘড়ি দেখিয়া মাঝে মাঝে তাহা হইতে ঔষধ ঢালিয়া রোগিনীকে কত লাভদানে, কত আদর করিয়া ডাকিয়া, তোরালে দিয়া সুখ সুক্কাইয়া দিয়া, ঔষধ খাওয়াইয়া দিতেছিল সে! শুশ্রূষার মধ্যে নারীজনোচিত যে লালিত্যটুকু চিরদিনই বর্তমান থাকে, লবঙ্গর সেবার তাহার কোনই ব্যতিক্রম ঘটিতেছিল না।

ডাক্তার বসিয়া গিয়াছিল, মাথার দিকের জানালাটি সমস্ত রাত্রি খুলিয়া রাখিয়া দিতে। রুকের রোগে নাকি আজকাল এই নিয়মই

বাহাল হইয়াছে! বাহা হউক, যদিও তাহার বাল্যকাল হইতেই অল্প ধারণা বদ্ধমূল ছিল, তথাপি পল্লীগ্রামের ধারণাগুলিকে এইপাশে রাখিয়া সহরের এই নূতন চিকিৎসা প্রণালীকেই বরণ করিয়া লইয়া, সে যজ্ঞের মতই কার্য্য করিতে লাগিল, হুবহু ডাক্তার-বাবুর কথিত উপদেশ মতই। • অপরাহ্নে যখন ডাক্তারবাবু রুগী দেখিতে আলিয়াছিলেন, তখন সে পাশের ঘরে সরিয়া গিয়াছিল, একটা নারীজনোচিত সজ্জের বশে! কিন্তু যখন রোগীর রোগ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, এবং ডাক্তারবাবু রাত্রির মধ্যেই আরও তিন চারবার আলিয়া দেখিতে বাধ্য হইলেন, তখন লবঙ্গের চাহিদা লরাইয়া, দিয়া সে রোগীর ঘরেই বসিয়া রহিল।

কাকের বাসার প্রতিপালিত হইলেও কোকিল যেমন বড় হইলেই কোকিল হইয়া দাঁড়ায়,—লবঙ্গও তেমনি পল্লীগ্রামে প্রতিপালিত হইলেও, আপনার ঔষধ্যকে অক্ষত রাখিয়াছিল আপনার প্রকৃতির গুণেই! পল্লীগ্রামের শোকাগুলি সে কাঠখানিকে জর্জরিত করিতে পারে নাই, তাহার নিজের বানিশের গুণে!

সে নিজে পাঠশালার গিয়া লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছিল,—কিন্তু তাহার সেই শিখাভ্যাসের খড়্গডানো প্রতিমাখানি মাটি ও রংএ বাস্তবে পরিণত করিয়াছিল সে জগৎদ্রবীর কুস্তকার গৃহে! জগৎদ্রবীর নিকট অনেক পুঁথি, অনেক আধুনিক বইও থাকিত। সেইগুলিকে চর্কিত চর্কণ করিত, তাহার আশ্রিতা প্রেরণ সুক্লাম্পনা, লবঙ্গ।

ললিতার আচ্ছন্নভাবে দেখিয়া লবঙ্গ মনে মনে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে সে উদ্বেগের ছায়াছাড়াও প্রকাশ পেতে দিল না। এ করতলধিনেই সে বৃষ্টিতে পারিয়াছে বাড়ীর বর্ত্তাটি অস্থখ বিষয়ে বড়ই উত্তলা হইয়া ওঠেন। কাজেই সে যদি নিজের কোনও রকম চাকল্যের টানটুকুও প্রকাশ করেন, তাহা হইলে নীরববাবু যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, এটুকু বেশ বুঝিতে পারিল। কাজেই মনকে ত্রুণ হৃৎ করিয়া সে রোগীর সেবা করিয়া বাইতে লাগিল।

নীরববাবু একবার বলিলেন “ললিতা! এমন চোখ বুজিয়ে রয়েছে কেন?”

লবঙ্গ নিজের চম্পককোরকলম্পন অঙ্গুলি ওষ্ঠাধারে ঠেকাইয়া, খুব চাপাগলার বলিল; চুপ করুন! জোরে কথা কইবেন না! দিদির ঘুম ভেঙ্গে যাবে!

—ও কি ঘুমুচ্ছে, মনে হয়?

—হাঁ, ঘুমুচ্ছে। যুথের ভাব দেখে বুঝতে পাচ্ছেন না?

—তুমি কি মনে করো, বিকেল থেকে ও ঘুমুচ্ছে!

—হাঁ, হাঁ, মনে করি! ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, রোগী ঘুমুলে, কেউ যেন সে ঘরে গোলমাল না করে! আপনি দয়া করে ডাক্তারের কথাটা মেনে চলবেন!

একবার উপরে নীরব আর কি বলিলে? সে চুপ করিয়া গেল। লবঙ্গ যে তাহার চেয়েও এলকল বিষয় বেশ বুঝিতে জ্ঞানিতে পারে, তাহা দেখিয়া তাহার বুক যেন একটু বল আসিল। সে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া পাশে একটু সরিয়া বসিল।

লবঙ্গ পাখা করিতে লাগিল রোগীর মাথার। নীরব লক্ষ্য করিতেছে, সেই অপরাহ্ন হ'তে লবঙ্গ একটানে রোগীকে বাতাল করিতেছে; স্তব্ধতা তাহার হাত বাধা হইয়াছে নতব। নীরব ইহা অনু-

বিস্তারিত বিষয়গুলোর জন্য অনুসন্ধান করুন।

—ওঃ! অনেককণ—অনেককণ! এই
মাংসপেশাগুলোর উপরের প্রত্যেক লোমকূপ
যেন একএকটা রাজপুত-দুর্গের লৌহবার—
বড় শীত শত্রুকে প্রবেশ করতে দেবেনা!

—ভালইতো, লেটাতো আর খারাপ
কথা নয়! কিন্তু তবু আমার কথাটা রাখুন;
আপনি ওষরের খাটে শুতে যান! আমি
বিছানা পত্র পরিষ্কার করে রেখে দিইছি!

—সেজন্ত তোমার ধন্যবাদ দিচ্ছি লবঙ্গ!
কিন্তু ধন্যবাদ নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার
এটুকু আবদার তোমার রাখতে হবে লবঙ্গ,
আমি আজ ললিতার কাছ ছেড়ে কোথাও
যাবেনা! তার অমূল্য আমার মনে হচ্ছে,
আজ এত বেড়েছে, যে তাকে ছেড়ে থাকাটা
আজ অত্যন্ত অনাস্বাদ্যের কাজ হবে!—
জর কত উঠেছে থার্মোমিটারে?

লবঙ্গ এতক্ষণ ললিতার বগল হইতে তাপ
যন্ত্রটি তুলিয়া লইয়া আলোর ধরিত্রী দেখিতে-
ছিল! দেখিতে দেখিতে তারার লম্বা প্রসন্ন
মুখ একখানা কালো মেঘে ঢাকা পড়িয়া
গেল। সে নীরবের প্রস্রাব কোনও উত্তর
না করিয়া ধীরে ধীরে তাপযন্ত্রটি খাপের মধ্যে
ধাতিয়া, ঘরের নিকটে গেল। নীরব আবীর
জিজ্ঞাসা করিল: কত—কত বেথলে?

লবঙ্গ বলিল: আশ্চি,—এলে বল্চি!

বলিয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দেহ ও মন এই দুইয়ের মধ্যে একটা
(ক্রমশঃ) বসিষ্ট সম্পর্ক আছে। 'এবং তা' অপরিহার্য

সাহিত্য ও সত্য

শ্রীসুদর্শন দেবশর্মা

লভ্যকে প্রকাশ করবার অধিকার যেমন
আছে বিজ্ঞানের, ঠিক তেমনি আছে
সাহিত্যেরও।

কিন্তু, সূর্য্যোদয়েই একশ্রেণীর নীতিবাদী
লেখক আছেন, যারা সাহিত্য থেকে বেহকে
যতদূর সম্ভব তকাত্তে রেখে পরম নির্বিশেষে
কলম চালান। অনেকের কাছ থেকে তাঁরা
লভ্য বাহবা পান, একথা মিথ্যা নয়। তবে
কোনো রসজ্ঞ পাঠকই তাঁকে সাহিত্যিক
ব'লেবেন না। হ'তে পারে তাঁদের সৃষ্টি
বিশুদ্ধ, হ'তে পারে নিষ্কলুষ কিন্তু প্রাকৃতিক
নয়।

যে সাহিত্য লভ্যকে বিকাশের সহায়তা
করে না, তাকে আমরা সাহিত্য বলে মেনে
নিতে রাজী নই। যে সাহিত্যিক নরক-
বাসের আশঙ্কায় অন্তর্নিহিত চরম লভ্যকে
স্বচ্ছার চাপা দিয়ে নিছক নীতিকথা প্রচার
করেন, তাঁকে আর যা কিছুই বলা চলুক না
কেন, 'সাহিত্যিক' নামে অভিহিত করা
চলেনা। বললে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা হয়।
যারা বলেন, তাঁরা জ্ঞান পাপী।

দেহ ও মন এই দুইয়ের মধ্যে একটা

(ক্রমশঃ) বসিষ্ট সম্পর্ক আছে। 'এবং তা' অপরিহার্য

যেমন কাণের সঙ্গে মাথা। সকল সুপ
সকল লোকেই এই পারম্পরিক লবঙ্গটা
স্বীকার করে আসছেন।

'লবঙ্গের' সঙ্গে সাহিত্যিকের কথা একটু
স্বতন্ত্র। সাহিত্যিককে শুধু ষাড় নেড়ে
স্বীকার করলেই চলবেনা। এই দিকে
সুগভীর দৃষ্টি রাখতে হবে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ
করতে হবে উভার মন দিয়ে।

অনেকের মতে তা হয়ত বড়ো বেশী
বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হবে। নীতিবাদী
সমালোচক বারা, তাঁরা অলীলতা অপরাধে
অভিযুক্ত করতে বিধাবোধ করবেনা।

কিন্তু এই অপবন লভ্যিকারের সাহিত্যিক
যে, সে বুদ্ধিমানের মত গায়ে মেখে নেবে।
তা-ই ব'লে কেউ যেন একথা ভাববেন না যে,
আমরা সাহিত্যে নীতিকে স্থান দেওয়ার
বিপক্ষে, দূর্গতির পশরা টানতে বলছি। কিন্তু
গোড়ামী অমূল্য। এখানে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের
মত নীতিপরায়ণ লেখক বিরল। তিনি
মানব মনের সত্য কথাটাকে স্পষ্ট করে
বলেছিলেন ব'লে একশ্রেণীর সমালোচক
তাঁকে দূর্গতির সহায়ক ব'লে তুল করেন।
পল্লীমজা, চরিত্রহীন, শেষপ্রসন্ন ইত্যাদি
উপভাস রচনার তাঁকে কম নির্খ্যাভন ভোগ
করতে হয়নি। পল্লীমজার রচনা যে রক্ত-
মাংসে গড়া মানুষ, তারো বুকে যে ঘেরেঘেরের
আশা আকাঙ্ক্ষা বাসা বাঁধতে পারে—একথাটা
নীতিবাদীরা যেন নিতে রাজী নন—যেহেতু
সে বিধবা। তাই, শরৎচন্দ্রের এই লম্বা-
নিকতাকে অনেকে লম্বর্ধন করতে পারেন না,

পাদুকাশিল্প প্রাতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রাতিষ্ঠান ভবানীপুর

রূঢ় কথা শোনান। কিন্তু—তিনি ছিলেন সত্যপ্রিয় মহাপুরুষ। জনস্বার্থে মনস্তপস্বী নীলকণ্ঠের মত নির্বিবাহে পান করেছিলেন।

মৃত্যুকে স্পষ্ট করে চোখের লামনে তুলে ধরলে পাঠক বিচার করতে পারবেন নিজেকে, সন্ধান পাবেন কোথায় নিজের গলদ—যা লোকসমক্ষে প্রকাশ করতে আনে কুঠা।

মৃত্যুকে অনাবৃত দেখে যারা নালিকা-কুণ্ডিত করেন, জানতে হবে তাঁদের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে। তাঁদের যথার্থ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুকে পুনঃ পুনঃ চোখের লামনে তুলে ধরে জর্জরিত করে তোলা। সেই হবে উচিত হও আর তাতেই হবে নৈতিক সংস্কার সাধন। মৃত্যু—মেষযুক্ত আকাশে প্রথম ওঠা সূর্য্যের মত লম্বল, নিম্নল ও লক্ষ্যস্থান।

কিন্তু এর ভেতর একটা কথা আছে। সেটা হচ্ছে—মানব-মনের নিহিত মৃত্যুকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে। আমাদের লেখকের লক্ষ্য মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সৃষ্টিতে যেন কোনোমতে অহঙ্কারের স্পর্শ না লাগে। মৃত্যু হৃদয়ের এবং লক্ষ্যজ্ঞানপ্রিয় হয়, যদি তা' স্তম্ভীলোকের হাত থেকে বেরায়।

প্রকাশ করার ভলিয়ার ওপর এর বোলআন। ভালো মন্দ নির্ভর করছে। উপজ্ঞান অথবা ছোটগল্পে এমন অনেক জায়গার দেখতে পাওয়া যায় যে, একটা লক্ষ্যজনীন মৃত্যু, কাঁচা হাতে পড়ে বিকৃতরূপ ধারণ করেছে। আবার এও দেখি, সেই

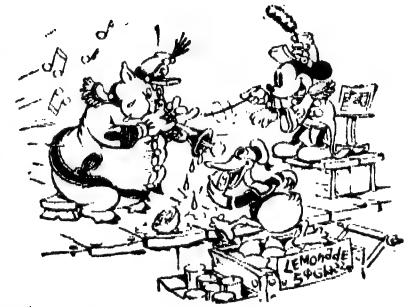
মৃত্যুই একজন সুবন্ধ শিল্পী চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। কাজেই এজিনিবট নির্ভর করছে সাহিত্যিকের হাতগুণের ওপর।

উগ্র আধুনিক পন্থি করেকটা সাময়িক পত্রিকার পাতা ওন্টালে প্রায়ই ছোটকটা এমন গল্প চোখে পড়ে যার প্রথমটা পড়লেই থিকার আসে। যেমন মীচু ভাষা, তেমনি ইতর মনোভাব। এই ধরনের লেখা পড়ে মনে হয়, লেখক মোটেই আত্মলচেতন নয়। এরা যেন সাহিত্যকে একরকম চিত্তবিলাসের সামিল করে নিয়েছেন। এদের কাণ্ড-কারখানা দেখে লংগর হয়, যেন সাহিত্য সাধনার অহিলায় কাগজ কলমের সাহায্যে এরা অধস্তন প্রবৃত্তির গারে হুড়হুড়ি দিচ্ছেন। মৃত্যুকে বিকাশ করার চেষ্টা করতে গিয়ে এমন একটা বিভৎস কাণ্ড বাধিয়া বলেন যা সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাস্বর।

এই বিভৎসতার বহুবিধ কারণের মধ্যে দুটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটা হচ্ছে অভিশ্রোক্তি, অপরটা আন্তরিকতাহীন। অভিশ্রোতি যেখানে যতো বেশী আন্তরিকতার লেখানে ততো অভাব।

অভিশ্রোতি ও আন্তরিকতাহীন অনিশ্চিত্যের পরিচায়ক। আটের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত্য অমার্জনীয়। এই অনিশ্চিত্য ভেতর, লংগমকে অতিক্রম করার মধ্যে আছে এক অপূর্ণ সাধকতা। এই সাধকতা যেন আমাদের ভেতর না আসে। আমরা যেন রঙিন নেশায় মশগুল হয়ে না পড়ি। কেননা এই কুঅভ্যাসটা সমানে দিনের পর দিন বেড়ে যাবে—মাতালের মতের মাত্রার মত। রচনাকে অচিরে করে তুলবে রুচি বিগহিত।

তাই, মৃত্যুকে প্রকাশ করতে হ'লে যেমন প্রয়োজন আন্তরিকতা ও নির্ভীকতা, ঠিক সেই পরিমাণে প্রয়োজন ধী-শক্তি ও প্রকাশ-কৌশল।



22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী !

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী !!



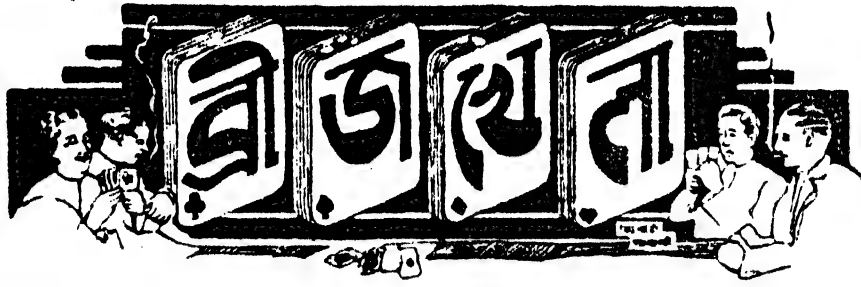
ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত আধুনিক ধরনের সকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিশেষ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ সোণার স্তার চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এন্ড ক্যারেট গোল্ড সিল্ডিকেট

৭০নং কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের লম্বাঘে)

কোন : বি, বি, ৪৮৭২

হাকিম এম.এস. ডাহমানের
কস্তুরীপিল
ধাতুদৌর্বল্য ও শক্তিহীনতা চিরতরে
আরোগ্য করিবে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ টাকা
৪২নং ধর্মভালা স্ট্রিট কলিকাতা



শ্রীছরীসা

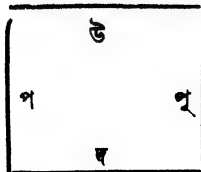
প্রতিযোগিতার একটি হাত : ফেরাইয়ের খেলা হলোই প্রথমে 'ফিনাল' মেওয়া যেন অবশ্য কর্তব্য সাধারণ খেলোয়াড়েরা এইরূপ মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কোনও অকাট্য নিয়ম যেনে ব্রজখেলা মোটেই চলে না, অথচ তাঁরা যদি একটু বিবেচনা করে খেলেন, তাহলে প্রত্যেক হাতের ভালগুলি ও তাহের বিভাগ সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেতে পারেন। কলিকাতার অনেক বড় বড় নামজাদা খেলোয়াড়ের দেখা গেছে তাঁরা ফেরাই-এর খেলা পেলেই তৎক্ষণাৎ হিসাব না করে 'ফিনাল' নিতে গিয়ে অনেক খেলাই পণ্ড করে ফেলেন। নিম্নের এই হাতখানি অনেককেই হেওয়া হয়েছিল, লকলেই 'ফিনাল' নিয়ে বা একটা রঙ দাঁড় করাতে গিয়ে গেম পর্যাঙ্ক খেলা করতে অপারগ হয়েছেন। হাতখানি ছিল।

ইস্কাবন—সাতা, পঞ্জা, চৌকা।

হরতন—হাশ, তিরি, ছুরি।

রুহিতন—নয়, সাতা, হুকা।

চিড়িতন—টেকা, হাশ, হুকা, তিরি।



ইস্কাবন—টেকা, বিবি, আটা।

হরতন—নাহেব, পঞ্জা।

রুহিতন—টেকা, নাহেব, বিবি, পঞ্জা।

চিড়িতন—নাহেব, গোলাম, X, X।

ডাক হয়েছিল তিনটি ফেরাইয়ের; 'প'

হরতনের বিবি খেলে প্রাথমিক চাল দিয়েছেন। এখন দেখুন কত সহজেই খেল করে নেওয়া যায়।

(১) নাহেব দ্বারা প্রথম পিঠখানি নিয়ে ডাকবার ভাবতে লাগলেন কি ভাবে তিনি তাঁর খেলাটি করে নেবেন। প্রথমে দেখলেন যদি রুহিতনে ৩-৩ ভাগ হয়ে থাকে তবে তিনি এ রঙে চারখানি পিট পেতে পারেন, নতুবা একটি পিট দিয়ে যেতে হবে। তারপর ইস্কাবনে বা চিড়িতনে 'ফিনাল' করতে হবে বটে, কিন্তু যদি ফিনালটি লাকলামণ্ডিত না হয়, তাহলে তাঁর গেম করা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং তিনি দেখলেন যে তাঁর হাতে দুইখানি ও তাঁর খেঁড়ীর হাতে তিনখানি হরতন আছে, যদি প্রথম হরতন চালকের হাতে পাঁচখানি বেশী হরতন না থাকে

তাহলে তাঁর গেম করা বোধ হয় শক্ত হবে না। কারণ শেষ দুইখানি হরতনে তাঁর খেঁড়ী কি পাশ যেন তা তিনি দেখতে পাবেন। এইরূপ ভাববার পর তিনি হরতনের ছোট তালখানি খেলে দিলেন।

(২) ডাকবার হরতনের পঞ্জা খেলার 'পু' আটা, 'উ' তিরি, আর 'প' টেকা যেরে পিট ধরলেন।

(৩) 'প' হরতনের গোলাম খেললে লকলেই হরতন দিলেন, শুধু 'দ' ইস্কাবনের আটা দিলেন।

(৪) 'প' এবার হরতনের সাতা খেললে 'দ' চিড়িতনের ছুরি; 'পু' রুহিতনের ছুরি ও 'উ' রুহিতনের হুকা দিলেন।

(৫) অভঃপর 'প' হরতনের চার খেলার 'দ' ইস্কাবনের বিবি, 'পু' রুহিতনের পঞ্জা ও 'উ' ইস্কাবনের চার দিয়ে গেলেন। এ স্থলে ডাকবার দেখলেন যে তাঁর রুহিতনের চারখানি পিট সুনিশ্চিত এবং চিড়িতনে 'ফিনাল' নিতে হবে সেটিও এক রকম নিশ্চিত হয়ে গেছে, সুতরাং ইস্কাবনের বিবি রাখার আর প্রয়োজন নাই।


(৬) 'প' ইস্কাবন খেলার 'পু' নাহেব মারলেন; 'দ' টেকা দিয়ে পিট নিলেন।

দুর্ভাগ্য এবং শীর্ণ শিশুরা

ডাকের

বাল্যমৃত সেবনে

অবিলম্বে সুস্থ ও সবল হয়।



বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

(৭ ও ৮) 'ব' এবার রুহিতনের টেকা ও নাহেব খেলার সকলেই রুহিতন দ্বিগে গেলেন।

(৯) তারপর 'ব' রুহিতনের বিবি খেললে 'প' ইচ্ছাবনের তিরি, 'উ' চিড়িতনের পজা ও 'পু' চিড়িতনের চার দ্বিগে গেলেন।

(১০) 'ব' রুহিতনের চার খেললেন। 'প' ইচ্ছাবনের নয়, 'উ' ইচ্ছাবনের সাতা ও 'পু' ইচ্ছাবনের দশ হলেন।

(১১) 'ব' চিড়িতনের তিরি খেলার 'প' সাতা, 'উ' টেকা আর 'পু' চিড়িতনের আটা হলেন। এইখানে বিপক্ষের যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের হাত গোপন রাখবার জন্য কিন্তু বৈধ ছুঁপিপাকে তাঁদের হাতগুলি আপনা আপনি প্রকাশিত হয়ে গেল। 'পু'র পাশানোর ধারা দেখে 'ব' অনায়াসে বুঝে নিলেন যে তাঁর হাতে ইচ্ছাবন কম আছে, তা না হলে তিনি প্রথমেই হরতনের খেলার বেলায় ইচ্ছাবনে পাশ দিতেন। তারপর যখন তিনি ইচ্ছাবনের দশ দ্বিগে গেলেন তখন তাঁর হাতে যে সাতা ছুঁখানি ইচ্ছাবন তা' প্রকাশ হয়ে গেল। এইরূপে গণনা করে ডাকবার পরে পাসুলেন যে 'প'র হাতে একখানি চিড়িতন; সুতরাং

ইচ্ছাবন—সাতা, পজা, চৌকা।

হরতন—দশ, তিরি, ছুরি।

রুহিতন—নয়, সাতা, হুকা।

চিড়িতন—টেকা, দশ, হুকা, তিরি।

ইচ্ছাবন—গোলাম, x, x, x, x।

হরতন—টেকা, বিবি, গোলাম, x, x

রুহিতন—গোলাম, x।

চিড়িতন—x।

ইচ্ছাবন—টেকা, বিবি, আটা।

হরতন—নাহেব, পজা।

রুহিতন—টেকা, নাহেব, বিবি, পজা।

চিড়িতন—নাহেব, গোলাম, x, x।

বড়দি

শ্রীমূলীল কুমার দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আশা কলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "দেখবে নির্মলতা; কতখানি ভেঙ্গে দ্বিগে গেছে?" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া কহিল, "এই পার্শ্বের বাড়ীর পুন্দরিতি জামা তৈরী করে দেবে বলে মাপ নিতে নিয়ে গেছে; একটু দাঁড়াওনা এখনি ঘামি নিয়ে আসছি" বলিয়া হালিমুখে সে পাশ কাটাইয়া পুতুল আনিতে চলিয়া গেল। বড়দি বলিবার সূত্র

তিনি অতি সহজেই চিড়িতনে 'ফিনাল' করে নিয়ে গেম করে নিলেন।

(১২ ও ১৩) 'উ'র হাত থেকে চিড়িতন খেলে গোলাম 'ফিনাল' করে নিলেন, আর তারপর সাহেব দ্বিগে পিট নিয়ে ডাক অনুযায়ী খেলা করে নিলেন। এইবার চারিটা হাত একত্রে দেখুন।

পাইয়া আগ্রহে আর ছুটরা দর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, কহিলেন, "কার কাছে শুনলে?"

—"প্রেমেন্দ্র যেয়েই চিঠি লিখে আমার জানিয়েছে।"

—"কি লিখেছে? দেখি না চিঠিখানা।"

—"তা' বিজ্ঞি।" বলিয়া পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিতে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা আছে, বড়দি। পুত্র সম্ভব আজই প্রেমেন্দ্রের বৌদ্বিগ একখানা চিঠি এখানে আসবে। লেই চিঠির উত্তরে আপনাকে লিখতে হবে,—প্রেমেন্দ্রের এখানে মন বলেনি। তাই সে চলে গেছে, নইলে যেত না।"

—"বেশ, বিলুপ্ত কথা।" বলিয়া নির্মলের হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া বড়দি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ হইলে মুখ ভুলিয়া দেখেন নির্মল নিকটে নাই। ঘরে গিয়া দেখিতে পাইলেন,—কাপ ডিস্ পাড়িয়া নারৈবাবুর চা'-মিষ্টির কতকাংশ লইয়া বজুর বিবাহ-কাহিনী সবিত্তারে বর্ণনা করিতে করিতে সে তাঁহার পানাহার চালাইয়াছে দেখিয়া এই তরুণ যুবক কুণ্ঠাহীন ব্যবহারে মনের প্রশস্ততার আজ আবার নতুন করিয়া বড়দ্বিগ বুক পূলকে তরিয়া গেল। হালিমুখে কহিলেন, "আমি তোমার কথা দ্বিগে ফেলছি তাই, নইলে এই চিঠি এখনি এর দ্বিগার কাছে পাঠিয়ে দিতুম। উঃ কী পরতান! দেখ-দেখ কি পরতানী হুঁকি।" বলিতে বলিতে তিনি চিঠি দমেজ হাতটা মাড়াইয়া ধরিলেন।

নায়েববাবুর পানাহার শেষ হইতেছিল। তিনি মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, “না,” বড়দি কহিলেন, “পরের চিঠি তুমি পড়না তা’ জানে, কিন্তু—ভারও সময় অপসর আছে। সে তার এই এতবড় চিঠিখানার কোথাও কিছু গোপন করার কথা লেখেনি।”

ইহার উপর নির্মল আবার বলিয়া উঠিল, “তা’ ছাড়া এ চিঠি যাকে লেখা তার বহিঃস্থানের সমস্ত না থাকে, তাহ’লে তার দেখতে বলা লম্বাও আপনার না দেখা অসম্ভব; আমিও আপনাকে পড়ে দেখতে বলি।”

নায়েববাবু পরান্ত হইলেন। কণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “আচ্ছা—পড় কি লিখেছে, আমি শুনি। বড়দি পড়িয়া শুনাইলে তিনি স্তব্ধ হইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

নির্মল কিন্তু সে ধার দিয়াও গেল না। পানাহার শেষ করিয়া সে লহাস্তে কহিল, “গোপন করতে না বলার কোন কারণ আছে কিনা জানিনা; তবে এটুকু বেশ বুঝা যায়, এই চিঠি লেখবার সময় তার মনের কোন স্থিরতা ছিলনা। যে মনোভাব নিয়ে সে লিখতে শুরু করেছিল শেষ পর্যন্ত তা’ বজার বাজতে পারেনি। এজন্তে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়?”

নায়েববাবু ও বড়দি সতরে মনে মনে বলিলেন, তবে কি দোষটা আশার? আশার এই ঘটনাটা তাঁহাদের গ্রামে হইলে প্রতীবেশীর মুখে মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া যে জঘন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিত, নির্মলের মনেও কি সেই রূপই দেখা দিল নাকি? অস্ত্র কেহ হইলে কথা ছিলনা কিন্তু নির্মলের নিকট এরূপ প্রত্যাশা করিতে কোথায় যেন বাধে, তাই তাঁহারা চকস হইয়া উঠিলেন।

নির্মল দেখিকেও জ্রুৎকপ করিল না। সে প্রশ্ন করিয়াছিল আশ্চর্যভাবে

—নিজের মনে ইহাকে একবার বাচাই করিয়া লইতে—উত্তর পাওয়ার প্রত্যাশায় নয়। প্রশ্ন করিয়া সে কণকাল ভাবিয়া লইতেছিল, পূর্বকথার ভের টানিয়া কহিল, “না” দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, সে এমন কাণ্ডটা ক’রে ব’লেছে কেবলমাত্র নাজানার ভুলে, বুঝবার দোষে। ভুল বুঝে কেউ যদি স্মৃতি কিছু ক’রে বলে তাহ’লে সেই ভুলটাকে খ’রে মানুষটাকে বিচার করা চলে না। এছাড়া অস্ত্রবিক বিয়ে দেখলেও, দেখা যায় এটা তার কণেকের দোষ। মানুষের দোষ নিয়েও মানুষকে বিচার করা চলে না। মানুষকে বিচার করতে হ’লে তার স্বাভাবিক জ্ঞান, মন,—

নায়েববাবু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি নির্মলকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, “না-না নির্মল, এ তোমার বঙ্গপ্রীতি। সঠিক সমালোচনা করতে হ’লে আমি বিধাসূত্র হ’রে এই কথাই বলব যে, প্রেমস্রুপ একটি মস্ত বড় লম্পট। মন তার জঘন্ত; তার মধ্যে মানুষ্য কিছু নেই, থাকলে আশাকে

পাশের বাড়ীর ঘরে মনে করবার কথা লিখত না। বলত, আশার রূপ ও বাহ্য দেখে তার উচ্ছ্বাস মন পাগল হয়েছিল; তাকে লম্বা করবার শক্তি তার নেই। সে স্থির করতে পারেনি বরনের অনুপাতে আশার মনটা। এখন কি বস্তু এবং যেমন ক’রে হোক পেতে চেয়েছিল আশালতাকে। এখনো সে তার সেই ইচ্ছাটাকে সমূলে ভুলে ফেলতে পারেনি তাই লিখেছে একটা পরতানীর লম্পটের একে আশ্চর্য্য করতে কোথায় যেন বাধে। দাঁ ভেবেছে—কি জানি, নির্মল যদি একথা পড়ে আশাকে পরতানী ব’লে বিশ্বাস ক’রে ফেলে, পথ ভেড়ে দাঁড়ায়, তাহ’লে আশাকে বিয়ে করবার জন্তে তাকেই গিয়ে লাথামাধি করতে হবে আশাঘের। মুখ একথাটা একবারও ভাবেনি, তার মত একটা অপদার্থ লম্পটের হাতে ঘেরে দেওয়ার চেয়ে ঘরের গলার পাঁচমন পাথর বেঁধে মাংসলাস ফেলে দেওয়া অনেক-শুণে ভাল।

(ক্রমশঃ)

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার

কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারত অয়েল মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩ আগার সারকুলার রোড, কলিঃ

বিদ্যাশাগর স্মৃতি তর্পণ

বঙ্গাব্দ ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন
বীরশিংহে লিংহশিশুর আবির্ভাব হইয়াছিল।
Wise men of the East হরত শিশুকে
ধেখিবার জন্য নক্ষত্রচালিত পথে আগমন
করেন নাই, কিন্তু মধ্যাহ্নের প্রাণীপু সূর্য্য সুখিবা
তার লম্বুখানি ভাস্বরতা ও উজ্জ্বল্য দিয়া
এই মহামানবের অনাগতকালকে প্রোজ্জ্বল
করিয়া তুলিয়া, তার প্রথম আগমনকে
অভিনন্দিত 'করিয়াছিল। বিদ্যাশাগরের
আবির্ভাব যে বাংলার কত বড় একটা
যুগান্তরের পূর্বাভাব, বাঙ্গালী জাতির কতখানি
মোভাগ্যের সূচনা, কী বিরাট একটা
পরিবর্তন দ্বারা যে তিনি জড় ও পঙ্খিল
বাঙ্গালী জীবনের রুদ্ধ প্রবাহকে মুক্তপ্রোতা
প্রোতস্থানীর সঙ্গে মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন,
তাহা ভাবিতে গেলেও মস্তক সন্ত্রমে
আপনি অবনমিত হয়।

বিদ্যাশাগরের জীবনের এতগুলি দিক
আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত আছে যে সবগুলি
আলোচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ
গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইবে। তাই আমি তার
জীবনের মাত্র দুই একটা দিক খুব সংক্ষেপে
আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করিব।

একদিকে শাস্ত্র ও আর একদিকে সমাজ
যখন জগদলপাথরের মত বাংলার বুকের
উপর চাপিয়া তার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় করিয়া
আনিয়াছিল, বাংলার সেই চরম ও পরম
হৃদয়ে অন্ত্যন্ত রক্তপীল পরিধারে জন্মগ্রহণ
করিয়া, সমাজের লম্বুত বিধিনিষম অবিচলিত-
চিত্তে পালন করিবার শিক্ষা শৈশবাবধি
পাইলেও যে মুক্ত ও স্বাধীন মন তার

ছিল, তারই জোরে তিনি সংস্কৃত ভাষার
পাণ্ডিত্যের সাহায্যে পণ্ডিতদের বহুদিন
প্রচলিত আচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া-
ছিলেন এমন কি শাস্ত্রীয় বিচারে নিজের
মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তখনকার
দিনে দেশের পণ্ডিতগণ এই বলিয়া গর্ক বোধ
করিতেন - যে পৃথিবীতে যা কিছু জ্ঞান
লম্বুতই সংস্কৃত গ্রন্থের অক্ষরের মধ্যে লোম্বাৎ
হইয়া আছে, তার বাহিরে জানিবারও
কিছু নাই। মনের এই যে জড়তা ব,
তখনকার দিনে লোকধিগকে তৃপ্তি দিত,
যার অহঙ্কারে তারা মনে মনে যথেষ্ট
আত্মপ্রশংসা লাভ করিতেন, তার প্রভাব
থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তার
জ্ঞানপিপাসু দৃষ্টি শুধু অতীতেই নিবদ্ধ
থাকিত না, বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া
ভবিষ্যতেও প্রসারিত হইত। বিদ্যাশাগর
মহাশয়ের সমাজ সংস্কারের চেষ্টার বিস্তৃত
আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নয় তাই, আমি
সংক্ষেপে তার একটুমাত্র উল্লেখ করিব।

বর্তমানযুগে সমাজ তত্ত্ববাদ বলিলে
বা ব্যাখ্যায়, বিদ্যাশাগর মহাশয়ের উনবিংশ
শতাব্দীর লোক হইলেও তার সম্পূর্ণ
পরিণোষক ছিলেন। সমাজ তত্ত্ববাদের
মূল কথা হইল সম্পত্তি কাহারও ব্যক্তিগত
নয়, উহা সাধারণের। বিদ্যাশাগর তার
স্বোপার্জিত অর্থ সম্পদের, এক কপর্দকও
নিজের মনে করেন নাই বা নিজের ভোগের
জন্য সঞ্চিত রাখেন নাই। লম্বু উপার্জন
সাধারণের ভোগে নিয়োজিত করিয়া-
ছিলেন। তাই বিংশ শতাব্দীর এই

গণতন্ত্রের যুগে যখন, সাম্যবাদ, সমাজ
তত্ত্ববাদ, গণতত্ত্ববাদ প্রভৃতি বড় বড় বাদ
বৈষম্যের প্রভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার
এক অপূর্ণরূপে আমাদের চক্ষুকে ঝলমিত
করে, তখন তারই একটা প্রধান পন্থাকে
উনবিংশ শতাব্দীর এক প্রাচ্য পণ্ডিতের
জীবনে রূপ পাইতে দেখিয়া চমকিত
হইতে হয়। তারপর তিনি ছিলেন
সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুগ্ধ এবং খাটী মহেশী।

প্রাচীন পরিচ্ছদের অন্তরালে এই যে
চিরনবীন হৃদয়, প্রাচ্য রুদ্ধপ্রোতের সঙ্গে
এই যে পাশ্চাত্য স্নাবনের সন্মিলন, প্রাচ্য
অতীত পন্থীর সঙ্গে এই যে পাশ্চাত্য
ভবিষ্যৎ পন্থীর সমন্বয়, এর মূলে ছিলেন
সেই অনাড়ম্বর লক্ষ্যপ্রকার বিলাসিতা
বর্জিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সম্পূর্ণ কৃতকার্য
হরত জীবনে তিনি হন নাই, জড়পন্থী
দেশ তখন হরত: তাকে লম্বাক্রমে উপলব্ধি
করিতে পারে নাই, তাই দেশবাসী
অধিকাংশই প্রতিবাদ দ্বারা তার সংস্কার
চেষ্টাকে ব্যাহত করিয়াছিল। কিন্তু সেটা
মানবধর্ম। প্রচলিত বিধির লম্বুতটুকু তার
মুগ্ধ হইয়া যখন শুধু মাত্র খোলসটা পড়িয়া
থাকে, তখন তাকে পরিত্যাগ করিবার
সাহস সাধারণের থাকে না। কিন্তু লম্বুতের
পক্ষে দাঁড়াইয়া একাকী লম্বুত জাতির সঙ্গে
সংগ্রামে জয়লাভ না করার গৌরব না
থাকিলে অভিমত্কার পরাজয় তাকে চির-
স্মরণীয় করিয়া রাখিত না। বিদ্যাশাগর
মহাশয়ের সাময়িক পরাজয় ও বিজয়ীর
জয় গর্ককে দ্বন্দ করিয়াছিল। আপন

সাধারণের মধ্যে যে করুণা অশ্রুধারার বিগলিত হইয়া লম্বাক লম্বাকের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাই হু' এককোটা ধর্মগীর বন্ধ আর্জ করিয়া কোমল করিয়াছিল, যার স্পর্শে মাঝে মাঝে লম্বাকের হু' একস্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা গল্প সাহিত্যে বিভাগাগর মহাশয়ের স্থান কতখানি তাহা বুঝিতে গেলে তাঁর পূর্বের গল্প সাহিত্য কতখানি দীন ও হীন ছিল তা বুঝিতে হইবে। বাংলা গল্প সাহিত্যের সৃষ্টিকাল নির্ণয় অবশ্য অত্যন্ত দুঃসহ। তবে মিশনরীরা যে বাংলা গল্প সাহিত্যের জন্মদাতা এটা অস্বীকার করার মত উপাধান আজকাল আমাদের হাতে আছে। 'নরোত্তম দাল নামক এক ব্যক্তির লিখিত আটপুঠার একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, যার জন্মকাল অন্ততঃ ৩০০ শত বৎসর পূর্বেরকার। তাহার ভাষা দেখিয়া মনে হয় যে অন্ততঃ আর ১৫০ বৎসর বাংলা গল্পসাহিত্যের জন্মকাল পিছাইয়া বাইবে। কাজেই মিশনরীদের অন্ততঃ আড়াইশত বৎসর পূর্বেরও বাংলা গল্পসাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল এটা অনুমান করা অসম্ভব হইবে না। তবে মিশনরীর

বিভাগাগর পূর্বের সুজাতের অভাবে বাংলা গল্পসাহিত্যের প্রায় ২১ খানা হস্তলিখিত পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, মিশনরীদের রূপার সুজাত এর অস্তিত্বে অনেক প্রসারিত করে। কাজেই তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ শুধু এইজন্য যে অবগুণ্ঠনবতী কীর্ণ বাংলা ভাষাকে লোক চক্ষুর অন্তরাল থেকে তারা প্রকাশ্য সূর্যালোককেও উন্মুক্ত

বাতালে কৃতবাহ্য উদ্ধারের ক্ষমতা আনিয়া- ছিলেন। 'বিভাগাগরের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ এই সময় বাংলা গল্প সাহিত্যকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ের কোরি, মাল'মান প্রভৃতি মিশনরী হাল্‌হেড, কস্টার প্রভৃতি লিভলিগান্‌ লাহেবদের ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃতিত্বালী রামায়ণের অনুবাদ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়—রামরাম বহুর লিপিমালা, রাজাবলী, রাজীবলোচন সুখোপাধ্যায়ের "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার বত্রিশ লিংহালন প্রভৃতি। তৃতীয় পর্যায়—রামজয় তর্কলঙ্কারের "লাল্য ভাষা লংগ্রহ", লক্ষ্মীনারায়ণ জায়লঙ্কারের বিভাগার বর্ণন। কামীনাথ তর্ক-পঞ্চাননের জায়, বর্ণন ও পুরুষপরীক্ষা হিতোপদেশ প্রভৃতি। মৃত্যুঞ্জয় বিভাগলঙ্কারের, প্রবোধ চন্দ্রিকা। বলা বাহুল্য যে, প্রথম পর্যায় হইতে দ্বিতীয় পর্যায় এবং দ্বিতীয় পর্যায় হইতে তৃতীয় পর্যায়—ভাষা ক্রমশঃই পুঁথির লিখিত পদ্ধতি বিস্তৃততর। এই তৃতীয়, পর্যায়ের সময় হইতেই ভাষার বিশেষ প্রসারতা লাভ করে।

বিভাগাগরের পূর্বের লেখকদের মধ্যে সর্কাপেকা উল্লেখযোগ্য রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাজেন্দ্র মিত্র এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের মধ্যে রামমোহন রায় বহিঃ প্রকৃতপক্ষে সার্জিত বাংলা গল্প সাহিত্যের প্রবর্তক ছিলেন শুধু, তার ভাষা সর্কাপেকা হুর্কোথ, তারপর রাজেন্দ্র লাল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্কাপেকা লহজ ও প্রাজ্ঞ। এদের পরেই প্রকাশিত

হইল বিভাগাগর মহাশয়ের বাহুবল চরিত্র। লংকৃত বহল হইলেও ভাষার প্রাজ্ঞতার ও সাবলীলতার রচনার মনোরমতা ও মনোহারিতার, তখনকার গল্প সাহিত্যকে উহা এক অপূর্ব সম্পদে বিভূষিত করিয়াছিল। এর কয়েক বৎসর পরেই বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা বাহুবল চরিত্র অপেক্ষাও প্রাজ্ঞ ও লহজ। তারপর ক্রমে ক্রমে বাকালী ইতিহাস, বোধোদয়, শকুন্তলা, বর্ণ পরিচর, চরিতাবলী, লীতার বনবাণ, প্রাজ্ঞবিলাস, রামের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া বাংলা গল্প সাহিত্যে এক যুগান্তরের সৃষ্টি করে। আর্জের পরিজ্ঞাতা, হুর্কোর লমবেবন্ধ, বিভাগাগরের এ লব শুণই সাধারণে প্রচারিত। তাতে হয়ত বহু অনাথ আতুরের প্রাণখোলা আশীর্বাদ তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু লম্বাকের নির্মমতার যে বেদনাশ্রতির তার চক্ষুকে লম্বা জীবন সজল করিয়া রাখিয়াছিল, তার আপাতব্যর্থ প্রয়াণ আজ চল্লিশ বৎসর পরে যখন আংশিকরূপে ফলবতী দেখিতে পাইতেছি, তখন কি মহাপুরুষের মহানুভবতার একবারও মন সজ্জমতরে শ্রদ্ধাবনত হয়? যে বাংলা গল্প সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে সুউচ্চ আলন পাইতে দেখিয়া গর্বে বুক দশহাত ফুলিয়া উঠে, তার ভাগ্য বিধাতাকে কি একবার ও কৃতজ্ঞতা ভক্তি স্মরণ করি? আজ এই মহাপুরুষের স্মৃতিবালয়ে শুধু এই কথাই আমার বারবার মনে হইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উপস্থিত সভ্যবৃন্দের প্রতিও আমার অনুরোধ, বিভাগাগর সৃষ্ট সাহিত্যের



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ব্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

কণ্ঠহারী

হোসনে আরা বেগম

আমার মনের বনের পাখী

সুর হারাল হার

তার জীবনে মলয় আজি

বুধাই বয়ে যায়।

আকাশে তারার মালা

জাগাল দ্বীন জালা

যতনে গাঁথা মালা

আজি করিল ধূলায় ॥

কালো ধরণীর বক্ষে আজি

বেদনার মেঘ ছায়

সেই বেদনা মোর বুকে এলে

খন খন মুরছায়।

প্রজাপতির মেলোনাকো পাখা

তারকারা ঘুম যায়

মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকি চাঁদে

নাথ হারা ভীকৃত্য ॥

মলয় এনে ছুরারে মোর

ডাক দিয়ে যে যায়

এমনি দিনে বিহগ আমার

সুর হারাল হার ॥

পরিপূর্ণ আলোচনা হইলে পরিষদের উদ্দেশ্য

অনেকাংশে সফল হইবে এবং সেই মহা-

পুরুষের প্রতি যথার্থ প্রজ্ঞাপন করা

হইবে। ইতি—

শ্রীঅনাথ বসু বেহুলা নাহিত্যবিহার

* (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে

বিভাগীয় স্থিতি লভায় পঠিত)



"Calcutta Music Association"-এর

মুখপত্র "Music of India"-র প্রথম সংখ্যাখানি আমাদের হস্তগত হোয়েছে। এই লজ্জিত সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র বসু বি, এ, লঙ্কারী সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত বিমলা কান্ত রায় চৌধুরী বি, এ, এম, সি, এল, ও শ্রীযুক্ত আমিরুল ইসলাম এম-এস-সি। ৮২/২৫ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত শৌকত আলি খাঁ সাহেব কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হোয়েছে। পত্রিকাখানি সম্বন্ধে একটা আশ্চর্যের বিষয় আমাদের নজরে পড়ল। পত্রিকাখানির নাম-ধাম-পরিচয় সবই ইংরাজীতে। এর ভূমিকা বা পরিচয়িকাও লিখেছেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোক শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে। কিন্তু ভিতরের সব প্রবন্ধই বাঙালী। এর রহস্য ঠিক বোঝা

গেলনা। বর্তমান সংখ্যায় যে লজ্জিত খ্যাতনামা লজ্জিতকলাবিৎ ও লজ্জিত রসিকগণের প্রবন্ধ বা স্বরলিপি প্রকাশিত হোয়েছে তাঁদের নাম—গৌরীপুরের স্বনামধন্য রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীযুক্ত শৌকত আলি খাঁ প্রভৃতি। আমরা এ পত্রিকাখানির সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

"প্রিয়বর্ষা"



হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন



—শ্রেষ্ঠাংশে—

ভিনকড়ি চক্রবর্তী
মমোরঙ্গম ভট্টাচার্য

—পরিচালক—

ভিনকড়ি চক্রবর্তী

—শ্রেষ্ঠাংশে—

অহীন্দ্র চৌধুরী
শিববালা

অলিম্পিক

(সি, বি)

আন্তর্জাতিক হকি

প্রতিযোগিতা

আগামী জুলাই মাসের শেষের দিকে 'প্যালেস্টাইনে' দ্বিতীয় ওয়েস্টার্ন এশিয়াটিক্ গেমসের অনুষ্ঠান হবে। পূর্বের অনুরূপ অনুষ্ঠানগুলিতে ভারতবর্ষ হকি খেলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দেশগুলির প্রতিযোগিতা করে নিজের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছে। এবারেও প্যালেস্টাইনে যাতে ভারতবর্ষের সেই গৌরব অনুরূপ থাকে সেই উদ্দেশ্যে 'ইন্ডিয়ান হকি ফেডারেশন' 'ওয়েস্টার্ন এশিয়াটিক্ গেমস' অংশ গ্রহণ করবার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদলকে ভারতীয় হকি টিম পাঠাবার লক্ষ্য করেছেন। পূর্বরীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের খেলা দেখবার পর এই দলটি গঠিত হবে। যাতে প্রত্যেক প্রবেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরা নিজের হকি খেলার নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পায় সেই অভিপ্রায়ে গত ১১ই মার্চ থেকে কলকাতায়, 'বেঙ্গল হকি এনোনিমেশনের' তত্ত্বাবধানে এবারকার 'আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা' শুরু হয়েছে। বড়ই চূড়ান্ত বিষয় এই প্রতিযোগিতাটির এই রকম গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারতের এতগুলি হকি খেলার উৎসাহী প্রদেশ থাকা সত্ত্বেও মাত্র তুপাল, গোয়ালিয়র, পাঞ্জাব এবং বাঙ্গালা প্রদেশ এই প্রতিযোগিতাটিতে যোগদান করেছেন। অত্যন্ত প্রদেশগুলি ব্যাং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও টিম পাঠাতে

পারে নি তাদের বিশেষ ঘোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাদের আর্থিক হকি এসোনিমেশনগুলির আর্থিক অবস্থার জটিল এই অখেলোয়াড় জনোচিত মনো-ভাবের পরিচয় দিতে হয়েছে। সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে পাঞ্জাব দলের অধিনায়ক দারা, এবং ধানচাঁদের মত ভারতের দুইটি অপ্রতিদ্বন্দ্বা হকি খেলোয়াড়ের খেলা দেখা থেকে বাঙ্গালার হকি ক্রীড়ামোদীরে বঞ্চিত হতে হয়েছে। মাত্রাজ প্রদেশ আর্থিক অনটনের জন্য কোন টিম পাঠাতে না পারলেও তাদের চারটি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে 'অল ইন্ডিয়া ট্রায়াল ম্যাচ' খেলার জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছে। পূর্ববন্দোবস্তমত এই আন্ত-প্রাঞ্চলিক হকি প্রতিযোগিতাটি নক'আউট' পদ্ধতিতে খেলা হবার ব্যবস্থা থাকলেও প্রতিযোগীদলগুলির সংখ্যা খুব কম হওয়ার ইচ্ছা লীগ প্রতিযোগিতা হিসাবে খেলা আরম্ভ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাটি শেষ হবার পর তিনটি অল ইন্ডিয়া ট্রায়াল ম্যাচ খেলা হবে। নির্বাচকগণ এই খেলাগুলির পর নিজের নির্ভর্য্য সম্পাদন করবেন।

বাংলা প্রদেশ গত ১৯৩৬ সালের আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার কাইম্বলে 'মানুভার' হকি দলকে হারিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছিল। এবারেও যাতে সেই সুনাম বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করার জন্য গত লগ্নাহে

বেঙ্গল হকি এনোনিমেশন তাঁদের অন্তর্গত দলগুলির মধ্যে থেকে ভাল খেলোয়াড়দের বাছাই করে দল গঠন করে তিনটি ট্রায়াল ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় ট্রায়াল ম্যাচ গুলিতে বাংলা দলের নির্বাচকদের অভীষ্ট সিদ্ধ হলেও তৃতীয় ট্রায়াল ম্যাচটি বিশেষ কার্য্যকরী হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত এই তিনটি ট্রায়াল ম্যাচ খেলার পর বাংলা দল এইরূপ ভাবে গঠিত হয়।

গোলরক্ষক :—এলেন (পোর্ট কমিশনার)

ব্যাকস :—সি ট্যাপেল (বি এন আর) এবং সি হজেস (কাষ্টমস্)

হাফব্যাকগণ :—আরিক (মোহন-বাগান), সি ডিকেন্স (কাষ্টমস্) এবং গালিবান্দী (বি, এন আর)

ফরওয়ার্ড :—এ মিত্র (গীয়ার), হেগারসন (কাষ্টমস্), আর কার (বি এন আর), রেন্টন (কাষ্টমস্) এবং জি নিব (জ্যোভেরিয়ানস্)

খুবই আক্ষেপের বিষয় যে কেবল মাত্র দুইটি বাঙ্গালী খেলোয়াড়গণ বাংলা দলে স্থান পেয়েছেন। অবশ্য একজন নির্বাচকদের একেবারেই দায়ী করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ তাঁরা যথাসম্ভব শক্তিশালী করেই টিম গঠন করেছেন। বাংলা দলটি মনোনীত হবার পর তারা বাছাই করা 'রেট' দলের সঙ্গে একটি প্র্যাকটিস্ ম্যাচ খেলে। কিন্তু এই খেলাটিতে তারা ৪-২ গোলে জয়লাভ করলেও তাদের খেলা খুব সন্তোষজনক হয় নি। তাদের সেদিনকার খেলা দেখে ক্রীড়ামোদীরা এবারে বাংলার সুনাম বজায় থাকা লক্ষ্যে লক্ষ্যহীন হয়ে উঠেছিলেন।

গত শনিবার ১২ই মার্চ থেকে আন্ত-প্রাঞ্চলিক হকি লীগ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে। এই দিনে বাংলা দলের

সঙ্গে গোল্ডালির হলের খেলা হয়। বাংলা হলটি মনোনীত হবার পর তারা যে প্র্যাকটিস ম্যাচটি খেলে সেটি দেখে অনেকেই তাহের ১৯৩৬ সালের অজিত গৌরব বজায় থাকবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহান হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু গোল্ডালির হলকে প্রথম ম্যাচটিতে ৪-১ গোলে পরাজিত করার পর তাঁরা সে ধারণা পরিবর্তন করতে সাহসী হয়েছেন। বিখ্যাত হকি খেলোয়াড় রূপসিং গোল্ডালির হলের অধিনায়ক হয়ে এলেছেন। তাছাড়া 'বালি হিরোজ' হলের মধুরাশ্রম এবং ছোটোবাবু এই হলের পক্ষে খেলেছিলেন। বাংলা হল নির্বাচিত প্রত্যেক খেলোয়াড়ই এই খেলাটিতে যোগদান করেছিলেন। খেলাটি যত উচ্চাঙ্গের হবে আশা করা গিয়েছিল একেবারেই সেরূপ হয় নি। প্রথম পাঁচ মিনিট আগন্তুক হল তীব্রভাবে আক্রমণ করলেও বাংলাহলের রক্ষণভাগকে পরাস্ত করতে পারেনি। প্রথমার্ধে উভয় দলই সমানে আক্রমণ করে খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দলই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছিল। গোল্ডালির হলের খেলোয়াড়দের মধ্যে গোলরক্ষক খলিল খুব কৃতিত্বপূর্ণ খেলা না দেখালেও অনেকগুলি অব্যর্থ গোল রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যাক হালিম্ এবং হাকবাক আবদুল হামিদের খেলা অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছিল। ফরওয়ার্ডদের মধ্যে রূপসিং নিজ সুনাম অমুহুরী খেলতে পারেন নি। অবশ্য লক্ষ্য তাঁকে সম্পূর্ণ ঘোষ হওয়ার বার না কারণ অল্প কিছুদিন আগে তাঁকে উপস্থাপি দুইবার মানসিক শোক লহু করবার দুর্ভাগ্যের লক্ষ্যবিন হতে হয়েছে। মধুরাশ্রম এবং ছোটোবাবুর আক্রমণগুলি খুবই প্রশংসনীয় হলেও বিশেষ কার্যকরী হয় নি। বাংলা হলের অধিনায়ক এবং গোলরক্ষক এলেনকে বিশেষ উদ্বিগ্ন না হতে হলেও তাঁর বিপক্ষে যে একটি মাত্র গোল হয়েছিল সেটি তাঁর

পক্ষে রক্ষা করা উচিত ছিল। ব্যাকের খেলাই ভাল হয়েছিল তবে হজের খেলা অপেক্ষাকৃত দর্শনীয় এবং কার্যকরী হয়েছিল। হাকবাকদের মধ্যে আরিক এবং গ্যালিবান্টী সন্তোষজনক খেলা দেখিয়েছেন। ফরওয়ার্ডের মধ্যে লকলের আগে আর কারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনিন্দ্যনীয় ক্রীড়া নৈপুণ্য বিপক্ষদের ভীতির কারণ হয়েছিল। হেগারলন নিজ খেলা দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। রেন্টন এবং নিস্ আশিষ্টরূপ খেলতে পারেন নি। এ মিত্র নিজ খেলা দেখাবার সম্পূর্ণ সুযোগ না পেলেও তাঁর সেন্টারগুলি দর্শনীয় হয়েছিল। বাংলা হলের 'কার' প্রথমে একটি গোল করার পর (১-০) ছোটোবাবু গোলটি পরিশোধ করেন ও (১-১)। তারপর বাংলা হলের রেন্টন আর একটি গোল করার পর (২-১) প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা হলের 'কার' এবং 'হেগারলন' প্রত্যেকে একটি করে গোল দেবার পর গোল্ডালির হল ৪-১ গোলে পরাজয় স্বীকার করে।

বাংলা দল

এলেন, ক্যাপ্টেন (পোর্টকমিশনার), সি ট্যাপলেস (বি, এন আর) এবং সি হজের (কাঠমল), আরিক (মোহনবাগান), সি ডিকোন্স (কাঠমল) এবং গ্যালিবান্টী (বি, এন আর), এ মিত্র (ত্রিয়ার), হেগারলন (কাঠমল), আর কার (বি, এন আর), রেন্টন (কাঠমল) এবং নিস্ (জ্যাভেরিয়ানল)।

গোল্ডালির দল

খলিল মহম্মদ, বি জুংসি এবং হালিম মাহুদ আলি, আবদুল হামিদ এবং লক খাঁ, এল জ্যাকেল ছোটোবাবু, মধুরাশ্রম, রূপসিং (ক্যাপ্টেন) এবং ব্রুজ

গত মোহবার ক্যালকাটা মাঠে এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলা হয়।

ভূপাল এবং গোল্ডালির দল দুটি এই খেলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই খেলাটি খুবই নৈরাশ্রজনক হয়েছিল কারণ কোন দলই নিজেদের খেলার কোন বিশেষত্ব দেখাতে পারে নি। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার খেলা হলেও খেলাটি খুবই সাধারণ স্তরের হয়েছিল। কোন দলই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারে নি সেই কারণে খেলাটি অসীমানসীতভাবে শেষ হওয়া উচিত ছিল। ভূপাল দলে ফারুক, আলান খাঁ, বাসি খাঁ, মুনির আমেদ, শাকুর ও আহম্মদ শেরের মত নামকরা খেলোয়াড়েরা যোগদান করার অনেকেই আশা করেছিলেন তারা বেশ আকর্ষণীয় খেলা দেখিয়ে বিপক্ষ দলকে অনেক গোলে হারাতে সক্ষম হবে। রূপসিং প্রথম দিনের তুলনায় উন্নত ধরনের খেলা দেখিয়ে প্রথমার্ধে একটি দর্শনীয় গোল করেন (১-০) প্রথমার্ধের শেষের দিকে ভূপাল হলের আমেদ শের পরাজয় সূচক গোলটি পরিশোধ করেন (১-১) খেলাটি শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে এই দলের ফারুক আলি খাঁ আর একটি গোল করার পর (২-১) ভূপাল দল ২-১ গোলে জয়লাভ করে। বিজয়ী হলের বাসি খাঁ এবং অর্গান খাঁ এবং বিজিত হলের খলিল এবং রূপসিংয়ের খেলা দর্শনযোগ্য হয়েছিল।

ভূপাল দল

মহদিন খাঁ সাগির ও ফারুক আলি খাঁ, আলান খাঁ বাসি খাঁ এবং কিকারেংমুসা, আমেদ শের, কজল-হোলেন, আকল শাকুর মুনির আমেদ এবং কেনেট।

গোল্ডালির দল

খলিল, বি জুংসি এবং হালিম, মাহুদ, হামিদ এবং শাকুর, জাকেল, ছোটোবাবু, মধুরাশ্রম, রূপসিং এবং মহম্মদ ইউসুফ।

প্রফুল পিকচার্সের
নবতম চিত্রাঙ্ক



কুমিকার :
অরুণা, দেববালা, সমর, ভাস্কর
দেব (এঃ), ভানু রায় (এঃ), সানু
গোসাই, সত্যধন ঘোষাল, রাস্ত
বোস, পশুপতি ব্যানার্জি প্রভৃতি



দূর :
ডাঃ সুধামাধব



প্রযোজনা :

কাহিনী :
কেশব গুপ্ত এম-এ বি-এল

চিত্র-শিল্পী :

প্রফুল ঘোষ
পরিচালনা :

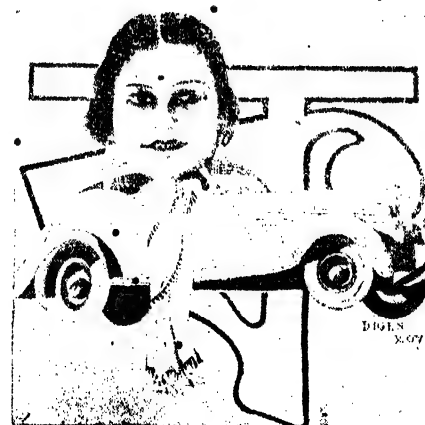
মারার-বার্গেল্ট
শব্দ-যন্ত্রী :

নির্মল গোস্বামী

ডগলাস ওয়ালটাস



শ্রী-তে
চলিতছে



প্রেম এবং পলায়ন

প্রভা দে, সরস্বতী

নিজের নির্জন ঘরের মাঝখানে বসে শেখর যা-তা ভাবছিল। ভাবছিল, প্রেম মানে কী, আরও ভাবছিল, আধুনিক মেয়েরা এই প্রেম দান করে প্রতিদানে কী চায়? একটা অবলম্বন? চিরদিনের জন্য একটা দাঁড়ি গ্রহণ? হয়তো তা-ই, হয়তো তা নয়—

সে তো বই-তে পড়েছে, রাশিয়ার মেয়েরা এই প্রেমের ব্যাপারে বিদ্ভূত। সেটিমেন্টের গন্ধ পায় না! তারা যেমন লহজে আলে, তেমন চলে যায় লহজে। আলাপ হ'ল, বন্ধুত্ব হ'ল, সব হ'ল—কিন্তু কবিতা নিয়ে মাতামাতি করবার সময় কোথায়? তাদের আছে রাজনীতি, আছে বিজ্ঞান, আছে সারা বিশ্বের অর্থহীন (?) বিরুদ্ধতাকে ঠেলে, ঝুঁড়ে, বেরিয়ে বাবার প্রচেষ্টা; প্রেম, প্রেম কোথায় লেগানে!

আজ শনিবার। এক রথীনবাবু ছাড়া লবাই উইক-এণ্ডে বাড়ী গেছেন। জায়গাটা কলকাতার খুব কাছাকাছি—এরা লবাই স্কুল মাস্টার। স্কুল—কম্পাউন্ডের পেছনেই তাঁদের ঘর।

...লক্ষ্য প্রায় হয়ে এসেছে। খোলা জানালা দিয়ে অন্তর্মুখী সূর্যের থানিকটা রক্তিম আভা ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। অদূরে, রেল স্টেশনের এন্জিন্ লেডে, কতগুলো এন্জিন্ একসাথে বিজীকর্মের আওয়াজ করছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শেখর বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

তার মনটা আজ চকল। অনেক মেয়ের সাথে সে বিশেষ—কিন্তু হৃদয়

প্রেম নিয়ে ছাকামীপনা তার খাতে কোনদিনই পোষায় নি। সাধারণ লোকে যা-কে 'ভালোবাসা' বলে, সে তা পেয়েচে—অপর্যাপ্তভাবে; শুধু মেয়েদের দিক থেকে নয়, পুরুষদের দিক থেকেও। এদিক দিয়ে সে ছিল (এখনও আছে) অজস্র রকমের সুখী—সে সুখ অর্ধ-বিস্মৃত সুখ, অচেতন।

এর কারণ ছিল। যদিও ইহানিং সে স্কুল-মাস্টারী নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে এসেচে, পূর্ববর্তী জীবনে সে নিজেকে অনেকপ্রকার কাজে ব্যাপ্ত রাখিত, এবং হয়তো এখনও রাখে। এটো বাস্তব জীবনের মধ্যে—অনেক মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে—জ্যোতি—তাকে—ইয়ে—বাকে বলে ভালোবেসেছিল? এবং পরে এটো মেয়েটি আর একটি লোকের সাথে চিটুকে গেল—এবং সেই দিনটো শেখর বুঝল প্রেম মানে কী! এটো পরাজয়-গ্রানি তার অন্তরকে মগিত করে ছিল, সে ভাবলে: এতদিন তার সুখের সূর্য্য লজ্জাস্বর অন্ধকারে মুখ ঢাকল।

ঐ পর্য্যন্ত। কলকাতার থাকতে জ্যোতিকে নতুন উপগ্রহের কথা জিজ্ঞেস করায় সে কথা বন্ধ করল। পাশাপাশি বাড়ীতে থেকেও জ্যোতি অনেকদিন কথা বলে নি, শেখরও গা করে নি।

শেখরের মনটা আজ চকল—কেননা, সেই মেয়ে আজ তাকে লম্বা এক চিঠি লিখেচে। লিখেচে অনেক কিছু—বা সে লিখতে পারে এবং পারে না। অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক বুক-কেটে-বাওয়া, অনেক অভিমান—এবং শেষ পর্য্যন্ত পারে ধরা!

শেখর একটা বিড়ি ধরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অবশ্য, এ পর্য্যন্ত আমি যা বলেছি—লবাই শেখরের সুখে শোনা: শেখরের মতামুখারী আমি ভাব এবং ভাষা প্রয়োগ করছি। শেখর বলে—অনেক মেয়ে তা-কে ভালোবেসেছে; কিন্তু, আমি তো জানি, মেয়েরা কোনদিনই ভালোবাসে না। 'ভালোবাসা' কথাটা পুরুষের তৈরী। আশ্চর্য্য, শেখর এই বলে বাহাজুরী নেয়, কোনদিন কারো কাছে সে ধরা দেয় নি।

এখানে এসে সে বিমল বলে একটি ছেলেকে পড়ানো শুরু করেছে। টাকা না নিয়েই সে পড়ায়—কোনদিন বিমল তার মেলে আলে, কোনদিন বা শেখর নিজেই বিমলের ওখানে যায়। আজ লক্ষ্যায় সে সেইখানেই বাবে মনে করল।

বিমলের বিধবা বোন শান্তা লক্ষ্যাজি জেল থেকে বেরিয়ে এসে লম্বা লম্বা নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। স্থানীয় স্কুলের (মেয়েদের) তিনি শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, জেল খাটার চকল চাকরি গেছে। এখন বেকার—সুদূর ভাষার বেকারিনী!

এ করদিন ধরে শেখর তার 'সিনিক্যাল' চোখ দিয়ে বিমলের দ্বিধিকে লক্ষ্য করেছে। মেয়েটির হাবভাবে, গতিতে, ভঙ্গি কোন রহস্যই উকি দেয় না—সাদা, লহজ। বিমলের সুখে সে শুনেছে, শান্তার স্বামী কোন বোমা কেসে ধরা পড়ে এবং বিচারে তার ফাঁদী হয়। শান্তার জেল এবং কিছুদিন পূর্বে তার স্বামীর ফাঁদী—এ ছ'টো বারাত্মক ঘটনার Govt-aided স্কুলের কর্মকর্তারা শান্তার চাকরিটা কিছুতেই বজায় রাখতে পারলেন না। এ করদিন শান্তা এবং বিমলের সাথে শেখর অনেক ঘোরাঘুরি করেছে—কিন্তু কোন কল হয়নি।

অথচ, শেখর তো জানে বিমলবের লংসারের অবস্থা। ছোট ছোট আরো গোটা দুই তিন তাই বোন আছে, বুদ্ধ পক্ষ বাবা আছেন, আর আছে শাস্তার এক বছরের ছোট একটা মেয়ে। অমরুজ করে বিমলকে পড়াতে গিয়ে শেখর তাদের লংসারের হাফাকারের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনেছে। শাস্তার মাইনের করটা টাকাই তাদের সম্বল ছিল—এ করমাল ভীষণ কষ্টে কেটেচে—ভবিষ্যতে আরো কী হবে কে জানে।

সময় সময় শেখরের রাগ হয়েছে : এতো যার অভাব—তার বেশ সেবা করাটা বাগিরিরই নাস্তুর। আরও সব চেয়ে সে ক্লিষ্ট হয়েছে এট ভেবে—শাস্তার চরিত্র নিয়ে পাড়াপ্রতিবেশীরা কানাযুলো করে কেন? তবে কি সত্যিই.....শেখর তা জানে না।

একর দিনেই শাস্তার লাগে সে যথেষ্ট পরিচিত হয়েছে। এক পরলার 'ডাউট' চা কিনে এনে বাড়ীর লকলে থেয়েচে। বিদীর লঙ্গে শেখরের এতো আলাপ দেখে বিমলের আনন্দ আর ধরে না।

আজ পথে বেরিয়ে শেখরের শ্রমবেই দেখা হল সুধীর মোক্তারের সাথে। স্থানীয় কোর্টে সুধীর মোক্তারী করে পরলা করেছে। শেখরের লাগে তার আলাপ আছে।

সুধীর বললে : কী মাষ্টার মশাই—চললেন নাকি 'ওখানে'?

হ্যাঁ।

আপনারা মাষ্টার—আপনারাও নীতি-জ্ঞান হারালো মশাই?

উপায় নেই। এ জায়গার বাতাসটা contagious।

ধস্তাব, শেখরবাবু।

ধস্তাব আপনাকেও, শেখরবাবু।

কেন?

বেহেতু, রাস্তাঘাটেও আপনি 'মোক্তারী' করেন। বলই শেখর পাশ কাটিয়ে চলে এল।

বিমলের পড়বার ঘরের লামনে এসে শেখর চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। জান্না দিয়ে লঠনের স্তিমিত আলোর সে স্পষ্ট দেখতে পেল তক্তাপোষের ওপর বিমলের বুদ্ধ পিতা এবং বিমল বসে আছে—আর অদূরে, হরজার কাছে, মাথা নীচু করে শাস্তা দাঁড়িয়ে।

বুদ্ধ বলছেন : সভা-দমিতি করে বেড়ালে হয়তো আবার জেল হতে পারে। লংসারের যা অবস্থা—এখন অস্ত্র কোথাও চাকরি বাকরির চেষ্টা করা যা...আর, তোমার বয়স অল্প...বুদ্ধ এইখানেই থামলেন।

বিমল বললে : শেখরবাবু বলছিলেন, কলকাতায় গিয়ে স্ত্রীস্বামীর বুলে হয়তো কর্পোরেশনে চাকরি হতে পারে। দিদি, তুমি যাবে?

মাথা নেড়ে শাস্তা বললে : না।

বিমল উলখুস করে উঠল : তা হলে চলবে কী করে তুমি? স্কুলের মাইনে দিতে পারছি না...আমার পড়াও তাহলে বন্ধ হবে?

তা যদি হয়, হবে।

কিন্তু দিদি, আর কয়েকমাস পরেই যে আমার ম্যাট্রিক একজামিন। তবু যা হক, বিনে পরলার শেখরবাবু পড়াচ্ছেন, মাইনে নিলে এ্যাক্টনে—বলতে বলতে বিমল যেন রেগে গেল—মাইনে নিলে আবার তো উপায়ই খঁকত না।

শাস্তা বললে : তা হ'লে মাষ্টার ছাড়িয়ে যাও।

ছাড়িয়ে দেব। পরীক্ষার খাতায় অকগুলো তুমি কবে দিবে আসবে নাকি?

আমি তা জানি না—বলে শাস্তা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুদ্ধ বললেন : ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিমল। নইলে, এমন মতিভ্রম হবে কেন? এতো কুৎসা, এতো নিন্দে—তা যেন ওর গায়েই লাগে না।

এমন সময় শাস্তা পুনরায় কিয়ে এলে মিজেন করল : কী গায়ে লাগে না বাবা?

উত্তরে বুদ্ধ কিছুই বললেন না। আজ একবার শাস্তার মুখের দিকে চেয়ে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। একটু পরে তাঁর চোখ দিয়ে টপ, টপ করে জল পড়তে লাগল।

তুমি কাঁচ বাবা?

বুদ্ধ কোন কথাই বললেন না। তেমনি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

শাস্তা এগিয়ে এল। বাবার পাশে বসে পড়ে, তাঁর হাত ধরে, আশ্চর্য হয়ে বললে : তুমি কাঁচ বাবা?

বুদ্ধ তাঁর দুই হাতের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে শাস্তাকে অবজার ঠেলে দিলেন। বললেন : কাঁচি...কাঁচি কেন জানো না? তোমার স্ট্রটকেলে ওলব চিঠি কে লিখেচে? তারপর বাথার একেবারে ভেঙ্গে পড়ে বললেন : জের মা যে খুব বড় লতী ছিল রে...

উঠে দাঁড়িয়ে শাস্তা বললে : তা হলে তুমি চুরি করে আমার সব চিঠি পড়েচ বাবা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—পড়েচি—বুদ্ধের মুখের প্রতিটি শিরা উপশিরা ভীষণ চুরির মতো ফণা তুলে উঠল—হ্যাঁ, পড়েচি। তোমার তারা যা খুলী লিখতে পারে, আর আমি তা পড়তে পারি না? বুদ্ধ হাঁপাতে লাগলেন।

না, পারো না।

বুদ্ধ আরো কিছু বলতে বাচ্ছিলেন—হঠাৎ, শাস্তার ছোট মেয়েটি কোথা থেকে এসে মা-র কোলে ঝাপিয়ে পড়ল। তাকে নিয়ে শাস্তা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেখর সব কথা শুনল।
তার আর ভেতরে যাবার প্ররুতি হল না।
ভাবতে ভাবতে সে পথ চলতে লাগল।

বিমলদেব রাস্তাঘরের পাশ দিয়ে পথটা
মোড় কিবোছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে পুনরায়
শেখর দেখতে পেল, শাস্তা তার মেয়েকে
কোলে করে দুখ খাওয়াচ্ছে আর গুণ গুণ
করে গান গাইছে :

শ্রোতের পাতা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাই,

ঠেকি বাই বহু বাক—

ওরে, তারা যে আমার ডাকে,

আমায় ডাকে।

ঝাউ বনের চাপা কারা,

নদীর বুকে ভরা বজা—

ওরে, আমার মন মানে না, মানে না—

শুধু কিরে চায় দূর থেকে।

আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।

লজ্জা লজ্জা তখন রাস্তাঘরের পিছন
দিকের ঝাউগাছগুলো সাঁ সাঁ করে দীর্ঘ
নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। বিমলদেব শেখর ভাড়াভাড়ি
পা চালালো।

আবার তাকে খামতে হ'ল। নিজের
খুকীকে লক্ষ্যে ধরে শাস্তা বলছে :

শুনলি তো খুকী, তোর দাছ আজ
আমায় কতো কথা বললে। রবিবাবুর ঘরে
বাইরে' পুড়েছিল তো? পড়িল নি?
বাইরে বেরলেই এইলব হয় রে—খুকী?
তারপর খুব ঘীরে ঘীরে, কতোকটা
আপন-জোলা অবস্থায় শাস্তা ফিস্ ফিস্
করে তার খুকীকে বলে যেতে লাগল।
কিন্তু, যারা আমার পথে এসেচে—তারা
যে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট লহ্য করেও
এখনও বেশকে স্বাধীন করতে পারল না
রে। এই সব ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়ার হল—
কারো কাছ থেকে কিছু পায় নি তারা,—
তারা যদি আমার একখিনু ভালোবাসা
চায়—আমি তা দেব না খুকী? নিশ্চয়

নাট্য-তরঙ্গ

(শ্রীনটশেখর)

হাতিবাগান সর্বজনীন সরস্বতী-পূজা
উপলক্ষে পল্লীর যুবকবৃন্দ গত ১৯শে ফাল্গুন
বৃহস্পতিবার ঠার রঙ্গমঞ্চে “রীতিমত নাটক”
ও “মানমহী গাল্‌স্‌ স্কুলের” অভিনয়ের
আয়োজন করেছিলেন। “দুঃখ পিবেৎ”
অভিনয় হ'বে ব'লে প্রথমে ঘোষণা করা
হোলো শেষ অবধি এই প্রহসন থানির
অভিনয় হোয়ে ওঠে নি। ‘রীতিমত
নাটকের’ নতুন কোরে পরিচয় দেবার কিছু
নেই। বর্তমান বাঙলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ
অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাট্টা
মহাশয় রীতিমত নাটকের রচয়িতা,
পরিচালক ও প্রধান ভূমিকার অভিনেতা।

দেব—তুই-ও দিস খুকী—তোর ভালোবাসা
দিয়ে লক্ষ্মীছাড়ার দুঃখ ঘোচাল। এই
কর্তব্যের কাছে মান, অপমান, লজ্জা—
সব তুচ্ছ হয়ে যায়.....

শেখর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। ভাবল :
এ কি সত্য? শাস্তা কি পাগল হয়ে
গেল?...কিন্তু, মনের ভিতরে শেখর এক
অপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করল। মেয়ে,
মেয়ে—এই তো মেয়ে—। রাশিরার?

সেই রাত্রি থেকে শেখর সুখে গেল।
স্পষ্ট সে অনুভব করল, এতোদিনে
—সে একটি মেয়েকে পেয়েচে—বাকি সে
ভালোবাসতে পারে।...

শেখরের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে
চলল। কিন্তু,—তার প্রতিজ্ঞা—সে কোন
মেয়ের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবে না—
তাই লে কিছুদিন পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে
চলে এল কলকাতায়।

অধ্যাপক দিগম্বর মজুমদারের ভূমিকায় তাঁর
যে অনবদ্য অভিনয় আমরা একাধিকবার
দেখেছি সে ছবি অবশ্য জীবনে ভুলবার
নয়, আর তাঁর তুলনা করতে বাওয়াও
বাতুলতা। তবু আমরা এ ক্ষেত্রে দিগম্বর
ভূমিকাতিনেতা শ্রীযুক্ত হরিধন মুখোপাধ্যায়ের
এই ব'লে প্রশংসা না কোরে থাকতে
পারছি নি যে, তিনি শিশিরবাবুর অঙ্ক
অনুকরণ করেন নি। একজন তরুণ
অভিনেতার পক্ষে শিশিরবাবুর ছায়া
অতিক্রম করা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।
তারপর লাক্ষনার শৌচনীর অপঘাত মৃত্যুর
দৃশ্যটি যবনিকার অন্তরালে রেখেও পরি-
চালক হরিধনবাবু রীতিমত নাটকের মূল
পরিচালক অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর বিবেচনা
বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পুরোহিতের
দৃশ্যে হরিধনবাবুর অভিনয় ভাল হোলোও
দৃশ্যটির পরিকল্পনা বিশেষ রসবোধের
পরিচয় দেয় নি। অত্যাভূত ভূমিকার মধ্যে
এক নবকৃষ্ণের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ
যোগ্য। প্রেমম্যানু পঙ্ক পেলোও অতি
অভিনয় কোরে কাতুকুতু দিয়ে লোক
হাসিয়েছেন মাত্র। স্বাগতের রূপমন্ডা
বড়ই বিকী দেখাচ্ছিল। মূলমূলটি একেবারে
অচল। “মানমহী” আমরা দেখি নি;
অতএব, সে লক্ষ্যে মত প্রকাশে বিরত
রইলুম।



খেয়ালা ভিজপটি



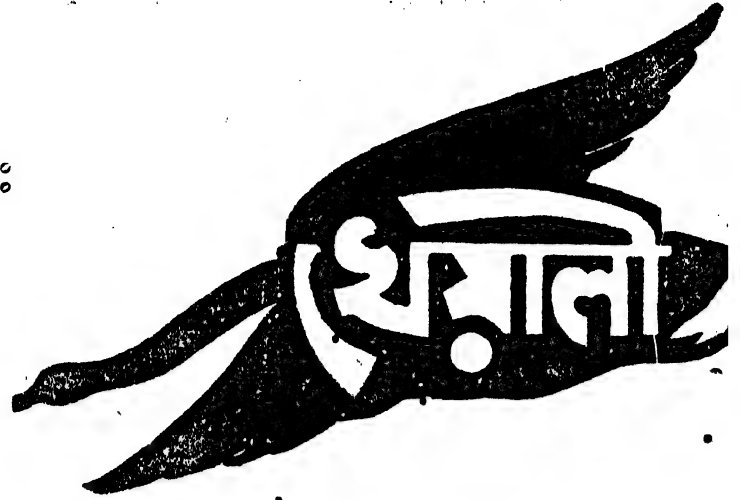
প্যারামডিটের "ব্যারি" -র ছবির একটি বিশিষ্ট
 দৃশ্যে নিও ক্যাবিনো ও জিন পাক্স। ছবিখানা
 "কিভাবে" নামের চলচ্চিত্র।

প্রিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কাৰ্যালয়—১১, চক্ৰবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সার্টাথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীমোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১০ই চৈত্র ১৩৪৪, ২৪শে মার্চ ১৯৩৮ } ১২শ সংখ্যা

জানকীনাথ কংগ্রেস ভবন

বাহুজান কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু অগায় জানকীনাথ বসুর কটকের সর্বোৎকৃষ্ট ভবনখানি উৎকল কংগ্রেস কমিটিকে দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অগায় জানকীনাথের সম্পত্তির যে ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়াছে তদনুযায়ী শরৎচন্দ্র উক্ত ভবনের বর্তমান অধিকারী এবং তাঁহার স্নানামধ্য পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি উহা উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎকল বিশেষতঃ কটক



জানকীনাথ বসু

জানকীনাথের কর্মস্থল এবং সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের স্থায় ভারতের দুই প্রতিষ্ঠাবান নেতার জন্মস্থান এবং তাঁহাদের বাল্যের ও প্রথম যৌবনের কর্মবহুল স্মৃতি-বিজড়িত স্মরণীয় কটকে তাঁহাদের পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ শরৎচন্দ্রের এই দান অতুলনীয় ও মহনীয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে দারিদ্র্য-দুঃখ-প্রসীড়িত যে যুবক ভাগ্য পরীক্ষার জ্ঞাত বাংলার বাহিরে রেলপথ-বিহীন উৎকলে খাইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অপূর্ব চরিত্রবলে ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের কলে তিনি উৎকলে সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিতে পরিণত হন।

“যশে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ” জানকীনাথের ভাগ্যে খেরূপ হইয়াছিল তাহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। অজ্ঞাত-শত্রু ব্যক্তি বলিতে যাহা বুঝায় জানকীনাথ তাহার মূর্ত প্রতীক। পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জ্ঞাত ও চরিত্রগঠনে জানকীনাথের চেষ্টা যে আশাতীতভাবে ফললাভ করিয়াছে তাহা রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, ওয়াকিং কমিটির সদস্য শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য পক্ষ ভ্রাতার চরিত্রে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বহু

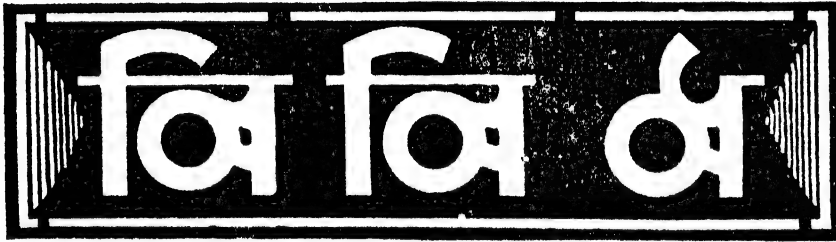
দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়া—এমন কি জয়নগর স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া—যিনি প্রথম যৌবনে শিক্ষালভ করিয়াছিলেন কটকের তদানীন্তন প্রতিভাশাঃ ব্যবহারাজীব ৮৮বর্ষীয় বসু মহাশয়ের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় জানকীনাথ কর্মজীবন শুরু করেন কটকেই। তৎপরে ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলে জানকীনাথ যখন সোঁতাগ্যের সুউচ্চ শিখরে আসীন হইলেন, তখন তিনি রিক্তহস্তে দান করিয়া বহুজনের দুঃখ কষ্ট লাঘব করিয়া উৎকলে ও বাহিরে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন ভাগ্যবান পুত্রবর্গের ভাগ্যবান পিতারূপে

গৌরবময় ও কর্মবল্ল জীবন যাপন করিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৯০ খ্রষ্টাব্দে কলিকাতায় টিভলী গার্ডেনে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তখন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে জাহাজে আসিতে হইত। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেই উড়িষ্যার প্রতিনিধি হিসাবে জানকীনাথ যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রষ্টাব্দে পিতা জানকীনাথ উড়িষ্যার প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন আর ১৯০৮ খ্রষ্টাব্দে পুত্র সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতির পদে ও মধ্যমপুত্র শরৎচন্দ্র ওয়ার্টিং কমিটির সভ্যরূপে বর্তমান কংগ্রেসের অধিনায়ক করিতেছেন।

মহাত্মাজী এপ্রিল মাসের প্রথমে জানকীনাথ কংগ্রেস ভবনের উদ্বোধন করিবেন এবং কটক মিউনিসিপালিটি জানকীনাথের স্মৃতি রক্ষার্থে বর্তমান “উড়িয়াবাজার” রোড “জানকীনাথ রোড” রূপে নামাকরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে দান করা শরৎচন্দ্রের পক্ষেই যে সম্ভব—যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার কোন সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। অর্থ উপার্জন ও অকুণ্ঠিতচিত্তে দান—শরৎচন্দ্রের চরিত্রে এই বিশেষত্ব পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ। গুণমুগ্ধ দেশবাসী ইহার জন্য শরৎচন্দ্রকে আন্তরিক অভিনন্দন করিতেছে।



ছত্রীর সজ্জা

গত ২০শে মার্চ রবিবার, ১০ নং রিচ রোডে, শ্রীযুক্ত সুধীরজ্ঞান মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে “ছত্রীর সজ্জা” তৃতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী রায় সভাপতিত্ব করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগত দ্বীপ গুপ্ত অধিবেশনের কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

সভার ফাল্গুনী রায়ের “বাজপাখী” নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “যাত্রী”, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের “যুদ্ধ” প্রভৃতি কবিতা এবং জগতদ্বীপের “শুভ্রহান”, সুধীরজ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের “গানের পাড়ার পর” ও সমীর ঘোষের “নীলতারা” প্রভৃতি গল্প পাঠিত হয়।

অন্তঃপর অধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সভার গভীর আলোচনা হয়। পরিমল বসু,

অমিয় রাহা, নিমাই দাস এবং কল্যাণ সজ্জার সমাক্ষর মৈত্র ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আলোচনার যোগদান করেন। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সভার কাজ শেষ হয়।

ইম্পিরিয়াল টি,

আজকাল বাজারে প্রচলিত চায়ের মধ্যে “ইম্পিরিয়াল চা” স্বাদে, বর্ণে ও গন্ধে একপ্রকার অতুলনীয় বলতেই হবে। ক্রান্তি অপনোদনে এক কাপ চা খুঁট ভাল। কিন্তু চাটি ভাল হওয়া চাই। ইম্পিরিয়াল টিতে এ সব গুণই আছে।

নিলিমা-রোহিণী

ছায়া-চিত্র জগতের প্রদর্শক মহলের সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ, এম-এ-বি-এল মহাশয়ের প্রথম কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নিলিমার সহিত, বিক্রমপুর

মালখানা নিবাসী ৮ কৃতাস্তকুমার বহুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রোহিণী কুমারের শুভ-উদ্বাহ গত পূর্ব লগ্নাহে কলিকাতায় অনুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষে মনোরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের টালোগঞ্জ ভবনে বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ হিসাবে শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মিলন ঘটয়াছিল। বাজলার বহু লংবাধপত্র সেনী, দিনেমা জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু ডিষ্ট্রিবিউটার, চিত্র-প্রদর্শক, চিত্র প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পী এবং বহু ব্যবসায়ী এই অমুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী হস্ত পরিহাস ও গল্প শুদ্ধবের মধ্যে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার মিটাইয়া, লক্ষ্যান্তঃকরণে বর কন্যাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন অন্তে, আমরা অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছি। এই শুভ অমুষ্ঠানে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মিঃ আর, এন, সরকার, মিঃ বি, এন, সরকার, শেঠ রাধাকিষণ চামারিয়া, মিঃ বি, এল, খেমকা, শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বভীজনাথ মিত্র, মিঃ এল, আর, হেমাদ, শ্রীযুক্ত অনাধিনাথ বসু, মিঃ ভাস্কর



রূপ-তরঙ্গ

(বিলাসী)



নিউ থিয়েটারের "অভিজ্ঞান" চিত্রে একটি দৃশ্য

নিউ থিয়েটারস

বিজ্ঞাপতি

"দিন আগত ঐ".....

তাই আজ লোকের মুখে মুখে বিজ্ঞাপতির নাম, তাঁর চিত্তহারী পদাঙ্গলীর আলোচনা, তাঁর অভিনব প্রেম-জীবনের মর্ম কথা!

মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বি, এন, বোষ, মিঃ চন্দ্রশেখর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র নান, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ নান, শ্রীযুক্ত পি, এন, রায়, শ্রীযুক্ত সুধীর গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দেবব্রত শীল, শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র শীল, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি বোষ, শ্রীযুক্ত বলন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বোষ, শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সাত্তাল, শ্রীযুক্ত হেমন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বোষ।

শনিবার, ২৩ এপ্রিল! এই শুভ-দিনটির প্রতীকায় কতজন তাকিয়ে আছে, কতজন অধীর আগ্রহে দিন গুণছে! এই দিন আসচে উত্তর কলিকাতার নয়নাভিরাম প্রমোদাগার—"চিত্রাঙ্গ," নিউ থিয়েটারের সর্বজন-আকর্ষিত এই বিচিত্র চিত্র কণা—"বিজ্ঞাপতি"!

বৈশ্বাসিক কাল আলোচনার অন্তে, এই চিত্রপাশি সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার মত পরিচয় আর আমাদের জানা নেই। তাই আজ অণু এইটুকু বোলেই শেষ কোরতে চাই যে—বিজ্ঞাপতি হোমচেটে নিউ থিয়েটারের এমন একটি সর্বজনপুষ্ট অভিজ্ঞান চিত্র, যা' পরিচালনায়, অভিনয়ে, নৃত্য গীতাবির উৎকর্ষে, এবং দৃশ্যপটাবির মাধুর্য্যে—ভারতীয় ছায়াচিত্রের গৌরব ও আভিজাত্যকে আরো বাড়িয়ে তুলবে।

দেবকী বোসের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি এই "বিজ্ঞাপতি", আমরা আশাকরি তাঁর

চতুর্দশের গৌরবকেও ছাড়িয়ে যাবে। বিজ্ঞাপতির আটটি সপ্তকেও নতুন কিছু পরিচয় দেবার মত প্রয়োজন আছে বোলে আর মনে হয় না। এই চিত্রের শিল্পী-লব্ধ, নিজ নিজ অভিনয় প্রতিভায় ভারতীয় ছায়া চিত্রের স্বরূপে তাদের স্থান করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা—বিজ্ঞাপতিকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছে। "আমরা" প্রার্থনা করি—এই সব শিল্পীদের শিল্প সাধনা অদিকতর শ্রীমণ্ডিত হোক।

অভিজ্ঞান

"আমিনা, আমিনা, আমিনা!"

বন্দিনী লক্ষ্মীর কাছে আজ এই নামটি কত মধুর!

সে তাঁদের সমাজের নয়। সে এক মুসলমানের গৃহবধূ। ব্রহ্ম, মমতা, করুণা ও সমবেদনায় তার অন্তঃকরণ ভরা। সুন্দরী সে নিশ্চয়ই—কিন্তু মনের লম্পাঘের কাছে তুচ্ছ তার বৈহিক লাবণ্য।

সন্ধ্যায় জীবনে আমিনার আবির্ভাব—যেন ভগবানের আশীর্বাদ। সন্ধ্যা-উজ্জ্বলতার ব্যাপারে আমিনা যে উপস্থিত বুদ্ধি ও হৃদয়বলী সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, চারু-চিত্রে তার প্রাধান্য পেয়ে আপনি মুগ্ধ হ'বেন। পাশাপাশি এই দুটি বিভিন্ন ধর্মী নারী-চরিত্রকে অবলম্বন করেই এই বিচিত্র ঘটনা-কল নামাজিক কাহিনীটি শাখাপল্লবিত হোয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোণায় বিরোধ এবং কেমন কোরে প্রীতি ও ঐক্যতার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে স্বামী বন্ধন সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব—“অভিজ্ঞান” চিত্রে তার ইঙ্গিত পাবেন।

স্বামী পরিত্যক্তা নারী, তার ভাগ্য হোয়ে অধিকার চ্যুত হোয়েও, কেমন কোরে তার মান মর্যাদা ও ধর্ম রক্ষা কোরেও নিজেকে স্বাধীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরতে পারে, সন্ধ্যায় ঘটনা-বহুল জীবনের মধ্য দিয়ে তারই সুসহান কাহিনী, বাজনার তরুণ তরুণীর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করবে ইতিপূর্বে এমন কাহিনী চরিত্রপটে খুব কমই প্রতিফলিত হোয়েছে, যা নিম্নক আনন্দ-দানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই সামাজিক জীবনের একটি বৃহত্তম সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতে স্পষ্ট কোরতে পেরেছে।

অভিজ্ঞান চিত্রটির পরিচালনা কোরেছেন অভিজ্ঞ পরিচালক শ্রদ্ধা রায় এবং গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, সর্ব বিষয়ে এর সহায়তা কোরেছেন—ভারতীয় চারু-চিত্র জগতের সর্জনপ্রিয়, তরুণ পরিচালক—সুনী মজুমদার। সুতরাং এদের যুগল প্রচেষ্টায়, ‘অভিজ্ঞান’ চিত্র-টি যে নিউ থিয়েটারের সুনাম ও মর্যাদার উপযোগী হোয়ে উঠবে—একথা নিশ্চিত বলা যায়। এই ছবির সঙ্গীতাংশ পরিচালনা কোরেছেন স্বনামধন্য সুর-শিল্পী রাইচাঁদ বড়াল। আর ১৪:১৫খানি গান এর সম্পূর্ণ বাড়িয়েছে।

শঙ্করলেখন ও কটোগ্রাফীর উৎকর্ষতার দিক দিয়েও আমরা নিঃসন্দেহ। এই দুই বিভাগে নিউ থিয়েটারের দুইজন অভিজ্ঞ কর্মীর হাত যশের তারিক করবার আমরা অবকাশ পাব। এদের আপনারা সকলেই জানেন—বণী হস্ত ও বিমল রায়।

আটিষ্ট নির্মাচনের দিক দিয়েও কর্তৃপক্ষ যে কোন ক্রটি রাখেন নি—তা’ এর ভূমিকা-লিপির দিকে চাইলেই বোঝা যায়। আমরা বাস্তবের এ সঙ্গকে বিস্তারিতভাবে আবার আলোচনা কোরব।

ছবিখানির বাঙলা সংস্করণের সম্পূর্ণ পরিবেশনার ভার পেয়েছেন বাঙলার সুবিখ্যাত ডিট্রীবিউটাস—প্রাইমা ফিল্মস লিমিটেড। কলিকাতায় “অভিজ্ঞান” প্রথম মুক্তিলাভ কোরবে—রূপবাণীতে।

অধিকার

এদের আনন্দদায়ক রোডের ত’ নম্বর টু ডিওতে প্রযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় যে সামাজিক চিত্রটি তোলা হচ্ছে, উভয় সংস্করণে তা’র নামকরণ করা হ’য়েছে—“অধিকার”।

জীবন-বুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। নারীকা ইন্দিরার জীবনেও পরাজয়ের স্থানি লটেতে হোয়েছিল। কিন্তু তা’র বিনিময়ে, ইন্দিরার নারী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত কোরতে পারে নি। এই দিক দিয়ে বিচার কোরলে এই নামকরণের স্বার্থকতা আমরা স্বীকার কোরতে বাধ্য।

ছবিখানির শিল্পী নির্মাচন হোয়েছে ভালই। নামক নির্মিলেশের ভূমিকায় বড়ু—একমেবাবিতীতম! এট শ্রেণীর ভূমিকাতিনয়ে বড়ুয়ার জুড়ি নেই।

উপ-নারীকা রাধার ভূমিকায় শ্রীমতী মেনকার অভিনয় যে তাঁর পূর্ববর্তী প্রতিভাকে স্নান কোরে দেবে—এর প্রমাণও আমরা পেরেছি।

বস্তীবাদীনের মধ্যে উপনায়ক রতনের ভূমিকায় পাহাড়ীর নির্মাচন যথাযথই হ’য়েছে। এ শ্রেণীর Boisterous lover বা ‘জবরহস্ত প্রেমিক’ বোলতে পাহাড়ী অভুলনীয়।

এ ছাড়া বস্তী বাসিন্দারূপে গান মাত কোরে দেবে—পঙ্কজ মল্লিক এবং প্রতাপ মুখুজ্জ্য।

শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখুজ্জ্য—দুটি মণিক-জোড়ের কথা আমরা গত হলুয় লিখেছি। হালির খোবাক জুগিয়ে এই যুগল অভিনেতা (লরেল ও হার্ডি?) এবার আমাদের কী হাল কোরবেন, আমরা আজ শুধু সেইটুকুই ভাবছি।

দ’ নম্বরের কর্ম-মচীব চোটাইবাবু, প্রভাকশান ব্যাপারের সর্ব বিষয়ে পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার সহযোগীতা কোরেছেন। তাঁদের যুগল প্রচেষ্টা জরযুক্ত হোক—আমরা আজ এই প্রার্থনাট করি।

বড়ুদিদি

নারীকা—মাদবী; আমাদের বড়ুদিদি। চোটেবোন—প্রমীলা; ছোট্ট মেয়েটি।

হিন্দু ও বাঙলা সংস্করণের সঙ্গ প্রমীলা’র ভূমিকাতিনয়ের উপযোগী, দুটি ছোট মেয়েকে সংগ্রহ কোরতে পরিচালক মল্লিক মহাশয়কে বিলক্ষণ বেগ পেতে হোয়েছে। কিন্তু আমরা সুখী হ’লাম—মল্লিক মহাশয় সফলকাম হোয়েছেন। যে দুটি নবাগতা এই চিত্রে প্রমীলারূপে হিন্দু ও বাঙলায় আত্মপ্রকাশ কোরবে—টু ডিওর চৈকনিকাল বিভাগের টেট পরীক্ষায় তা’রা সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর, পরিচালকের বিচারেও অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে, ছাড় পত্র পেয়েছে। প্রভাকশান বিভাগে বহুকাল ‘পোড়খেরে’ মল্লিক মহাশয় যে অভিজ্ঞতা লক্ষ কোরেছেন, আজ প্রাপ্ত বয়সে, স্বাধীন ভাবে পরিচালনার ভার লাভ কোরে, আশাকরি

তিনি তা' বোল আনা কাজে লাগাতে পারবেন। এই ছবিখানিকে সকল দিক দিয়ে, সর্বোচ্চমানের কোরে গোড়ে তুলতে যতখানি আন্তরিকতা, যত্ন ও পরিশ্রম করকার—তার সবখানি প্রয়োগ কোরতে, তিনি যে কার্পণ্য কোরতেন না—এর পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দ লাভ কোরলাম। লঙ্কারী হিলাবে মল্লিকমহাশয়ের লবযোগীতা কোরতেন আমাদের পরম শ্রদ্ধাজন, কৃতবিশ্বাস লঙ্কারী শ্রীপদ্মপতি চট্টোপাধ্যায়।

আশাকরি আগামী বারে 'বড়বুড়ি'-র সম্পূর্ণ ভূমিকা লিপি এবং টেকনিশিয়ানদের পরিচয় জানাতে পারব।

ট্রিট সিজার

ডাইরেক্টর কলী মজুমদারের নতুন বই 'ট্রিট সিজার'এর বাঙলা সংস্করণ হ'বে বলে স্থির হয়েছে। শুধু স্থির হয়েছে কেন জটিলও আরম্ভ হয়ে গেছে। এই বইখানিতে যে 'ট্রিট' গুলিকে নামান হ'চ্ছে তাতে মনে হয় যে এর বাঙলা সংস্করণ অদ্ভুত সাফল্য লাভ করবে। কানন ও লাইগাল ভারতের চিত্রাশোভীদের কাছে এরা যে কত প্রিয় তা বোধহয় কারও অজানা নেই। তাছাড়া মল্লিক মহাশয় এর বাঙলা সংস্করণে নামবেন।

দেশের মাটি

"দেশের মাটির" বহির্দৃষ্টির কাজ শেষ কোরে নীতীন বসু ট্রিডিং'র সেটে কাজ করবার জন্ত তৈরি হ'চ্ছেন। এই সেটটি খুব বৃহৎ বলে পরিচালক মল্লিক মজুমদার বাবু সঙ্গে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা কোরতেন।

লাইগাল, জগদীশ, দুর্গাশাল, উম্মা, কমলেশ, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি এই দৃশ্যে নামবেন বলে নিজ নিজ ভূমিকার উৎকর্ষের জন্ত বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

নিউ সিনেমা

এখানে গত শনিবার থেকে কৃষ্ণচীপক বা "পাহাড়ী ছোরা" দেখান হচ্ছে। ছবিখানা



নিউ থিয়েটারের "বিদ্যাপতি" চিত্রে পাহাড়ী লাজল ও কাননবালা

থিলে ভরা। মানুষ যতরূপ বলে দেখবে —তার সমস্তটাই পুরো আনন্দে ভোগ ক'রবে। দেশী ছবির মধ্যে—এরকম উত্তেজিত আবহাওয়া খুব কমই দেখা গেছে। —আমরা আশাকরি ছবিখানি এখানে ভাল-ভাবেই চলবে।

চিত্রা

এই সপ্তাহই মুক্তির শেষ সপ্তাহ। এর পর অর্থাৎ ২রা এপ্রিল থেকে এখানে বিদ্যাপতি দেখান শুরু হ'য়ে। —মুক্তি যেভাবে এখানে, এখনও চলছিল তাতে আমাদের ধারণা ছিল যে—আরও ১০ সপ্তাহ চলার মতই চলতে পারে। কিন্তু কতৃপক্ষ বিদ্যাপতিকো আর বাস্তব বন্দী করে রাখতে চান না। কেন না এখানে বিদ্যাপতি দেখান

শুরু না হ'লে বাঙলা সংস্করণ আর কোথাও দেখান হ'তে পারে না।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার ২৬শে থেকে মুক্তি এখানে দেখান হ'বে। যারা এখনও চিত্রার "মুক্তি" দেখে উঠতে পারেন নি—তারা দক্ষিণ কলিকাতার এই চিত্র গৃহে দেখে নিতে পারবেন—এই আশায় নিউ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এই রকম Continuous run এর ব্যবস্থা করেছেন। মুক্তি লম্বন্ধে সন্তান করে কিছু বলবার নেই। ছবির প্রধান সম্পদ পঙ্কজ বাবু ও কাননের গান যে দর্শকদের মোহিত করে দেবে, তা আমরা জোর করেই বলতে পারি।

কালী ফিল্মস্,

এদের রবিন্দ্রনাথের "চোখের বাজি"-র

শুটিং ক্রতগতিতে চলছে। দম্পতি পরিচালক লতু মেন বিনোদিনীকে নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও হওয়ার পরের দৃষ্টি একটি বৃহৎ লেটে তোলা আরম্ভ করেছেন। শোনা যাচ্ছে এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে সুপ্রভা মুখার্জি, ইন্দিরা রায়, ডাঃ, হরেশ মুখার্জি, জবি বিশ্বাস প্রভৃতি চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন। বি, পি, মেহরার তত্ত্বাবধানে ছবিখানা তোলা হচ্ছে।

“সর্বজনীন বিবাহউৎসব”

উত্তরায় “সর্বজনীন বিবাহউৎসব”—এই শনিবার থেকে পঞ্চম লগ্নাহে পড়বে। ছবিখানা সাধারণে সাধারণে গ্রহণ করেছে তার প্রমাণ “উত্তরায়” জনসমাগম। এখানি একখানি মূর্তন ধরনের কমেডি-চিত্র। শিক্কা ও আমোদ দু’দিক থেকেই এই ছবিখানির মূল্য সমভাবে বর্ণকরের আকৃষ্ট করে।

হাজরা পিক্চাস

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভক্তিমূলক বাণী চিত্রে “দেবী ফুল্লরা”-র শূটিং তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় অর্ধেকের উপর লম্বা হইয়াছে। গত লগ্নাহে একটি বৃহৎ লেটে রাজ-প্রাসাদের আংশিক দৃশ্য তোলা শেষ হইয়াছে। এতদ্বিধা কালকেতু দেবী আরাধনার যখন ব্রতী লেই দৃশ্যটিও অতি চমকপ্রবণ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এতাবধি এখানে যতগুলি পৌরাণিক ছবি তোলা হইয়াছে, কাহিনীর চমৎকারিবে “দেবী ফুল্লরা”-কে অপূর্ণ বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। ইহাতে আছে লতীতের তেজ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে অতুল্যতরের চাকলাকর অভিযান, পরতানের বিভীষিকাময় প্রতিচ্ছবি, প্রেম ও ভক্তির অপূর্ণ নিব্বাণন। তদুপরি বাঙালার অন্ততম যশস্বী পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী ছবিখানা পরিচালনা করিতেছেন, তরুণ

শিল্পীর বিত্তি লাহা ও বতীন দত্ত যথাক্রমে আলোক চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজে নিয়োজিত আছেন। ছবিখানির ভূমিকালিপিতে আছেন অরীন্দ্র চৌধুরী, শিববালা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রাধারণী, মোহন রায়, বাণী চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতি। এই লবের যোগাযোগে “দেবী ফুল্লরা” যে বাঙালার চিত্র জগতে এক অভিনব আকর্ষণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে এ ধারণা করা অপ্রামাণিক নয়।

রাধা ফিল্মস্

পরিচালক ফণি বর্মা “জনক নন্দিনী” নামে একখানি পৌরাণিক ছবির শূটিং আরম্ভ করেছেন। ছবিখানিতে বিভিন্ন ভূমিকায় নামছেন—সুশীল রায়, তৃণদী চক্রবর্তী, কুমার শিত্র, রবি রায়, ছায়া প্রভৃতি।

মতিমহল থিয়েটার্স

পরিচালক হরি ভক্তের পরিচালনায়

‘এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গ ভরা’

অতি আধুনিক

রঙ্গ সমাজের

আর একটা

‘অদেখা’

দিক—

প্রত্যক্ষদর্শী

বা

দেদেখও

দেদেখনা

তারই

উজ্জ্বল

রূপ-রস-মধু-গন্ধ-ভরা

রূপোর

স্বামকো

রু

পো

র

ঝু

ম

কো

রু

পো

র

ঝু

কো

রু

পো

ঝু

কো

পরিচালক :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔডিও

রাধা ফিল্ম

ব্যবস্থাপক

নীলমনি রায়

বিজ্ঞাধর মল্লিক



ও, কে, এ

প্রোডাকশন

এদের যেমন রায়ের “বনের বনের” শূটিং চলছে। জুলীল রায়, অহাজ চৌধুরী, হারা প্রভৃতি আগাতভ: ভূমিকালিপিতে নির্বাচিত হ’য়েছে।

জ্যোতিষ ব্যানার্জির পরিচালনার এরা “সুভদ্রা হরণ” নামে একথানা পৌরাণিক চিত্র তোলায় ব্যবস্থা করছেন। এতে রাণীবালা নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

প্রাইমা ফিক্সাস

অত্যন্তকালের মধ্যে এই চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠানটি চিত্রঙ্গগতে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে—জনপ্রিয় চিত্রের পরিবেশনা করে। এদের পরিবেশিত নিউ থিয়েটারের “মুক্তি” আজ বাংলার আবাংলয়ক বণিতাদের মনে এক নব উন্মেষণার রেখাপাত করেছে। লক্ষ্যে এরা নিউ থিয়েটারের “অধিকার” চিত্রের পরিবেশনার অধিকার লাভ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের লাকলোর মূলে আছেন মনোরঞ্জন ঘোষ, সুধীর নান, কণি নান ও এই প্রতিষ্ঠানের স্রবোগা কর্ম লচীব নরেশ ঘোষ। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর অীরজির কামনা করি।

প্রকুল পিকচাস

এদের পরবর্তী সামাজিক চিত্র প্রভাবতী দেবী লক্ষ্মীতীর “বানের মর্যাদা”-র শূটিং আরম্ভ হ’য়েছে। এদিকে প্রকুল ঘোষ পৌরাণিক কাহিনী “কমলে কামিনী” পূজার সময় দেখাবার জন্য তৈরি হ’চ্ছেন।

রাজমালা রচনা গল্প

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচরুচন্দ্র ঘোষ

ভারতের হিন্দু রাজত্ববর্গ লব্ধে অীষুত তত্ত্ব মোহন বহু মজুমদার মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ জানাইতেছি।

তিনি পৌরাণিক যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত যে রাজমালা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের লংগর উপস্থিত হইয়াছে। আপত্তিগুলি একে একে বেশের ঐতিহাসিক এবং সুধীলমাজের লক্ষ্যে যথাসক্তি আলোচনা করিতেছি।—

বহু মজুমদার মহাশয় রাজা যযাতির পৌত্র (পুরুষ পুত্র) জনমেজয় হইতে রাজমালার প্রথম সূচনা করিয়াছেন। তিনি জনমেজয়ের পৌত্র (প্রাচিযানের পুত্র) করিয়াছেন প্রবীরকে। প্রবীর প্রাচিযানের পুত্র নহেন, খুল্লতা। রাজা যযাতির পুত্র পুরুষ প্রথমা মহিষী কৌশলার গর্ভে জনমেজয় এবং দ্বিতীয়া মহিষী পৌষ্টীর গর্ভে প্রবীর, ত্রৈশ্বর ও রৌদ্রাখ এই চারিপুত্র জন্মে। (কালীপ্রসন্ন-অনুদিত মহাত্মারত আদিপর্ব)। প্রাচিযানের পুত্র লংঘাত।

পুরুষাজ-পুত্র রৌদ্রাখকে তিনি দেখাইয়াছেন অহম্পতির পুত্র। অহম্পতির লহিত রৌদ্রাখের কোন যোগাযোগ থুঁজিয়া পাই নাই। রৌদ্রাখের ঋচেয়ু, ঋকেয়ু (ককেয়ু), ককণেয়ু, স্থণ্ডি লয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, নভেয়ু, ধর্ষেয়ু, লয়তেয়ু নামক যে দশপুত্র জন্মিয়াছিল তাহা আমরা বিশ্রকেশীর গর্ভে, যুতাচির গর্ভে নয় (কালীপ্রসন্ন-অনুদিত মহাত্মারত—আদিপর্ব) —“বিশ্রকেশী গর্ভেতে জন্মিল

দশজন—” কালীপ্রসন্ন দাস। বহু মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—“ককেয়ু স্বতানর, চ’ক্ষুণ ওপরমহু নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। ককেয়ু পুত্রযথো তিনি স্বতানরকে কোথায় পাইলেন? তিনি কি জানেন না যে স্বতানর পুরুষাজের অগ্রজ যযাতি-তনয় অম্বর পুত্র?—“মনোঃ স্বতানরঃ পুত্রস্তস্মাৎ কালাজঃসাহতবৎ।” স্বতানরের পুত্র কালানল বা কালাজয়। তাঁহার পুত্র সৃঞ্জয়, পৌত্র পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয় (২য়), তৎপুত্র মহাশাল। মহাশালের পুত্র উলীনর বা মহামনা। মহামনার পুত্র তিতিক্ষু। তিনি (বহু মজুমদার মহাশয়) কিন্তু মহাশালের পুত্র মহামনা, মহামনার উলীনর ও তিতিক্ষু ছই পুত্র করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি করিয়া হয়! গরুড় পুরাণে আমরা পাইতেছি—“জনমেজয়স্ত তৎপুত্রো মহাশাল-স্তবাস্কজঃ। মহামনা মহাশালা তুলীনর ইহস্বতঃ।...মহামনোজাতিতিক্ষোঃ।”

তিতিক্ষু হইতে ধর্মরথ পর্য্যন্ত বহু মজুমদার মহাশয় কয় পুরুষ, যাহা হটক একপ্রকার টানিয়া আনিয়া আবার উল্লভ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—“ধর্মরথের পুত্র চিত্ররথ।...চিত্ররথের পুত্র দশরথ। দশরথ রোমপাখ নামে প্রসিদ্ধ।” আমরা তাঁহাকে অন্ততঃ মহাত্মারত খানি মনোযোগ লব্ধকারে পড়িবার জন্য লাক্তনর অম্বরোধ জানাইতেছি। তিনি মহাত্মারত উল্টাইয়া দেখুন, তাহাতে দেখিতে পাইবেন—“রোমপাখ রাজা দশরথের লখা। তিনি

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

খাদ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

অঙ্গদেশের অধিপতি।" অর্থাৎ নাথ বরাট অমুর্বাদিত রামায়ণ; আদিকাণ্ডের একস্থানে স্তম্ভ বলিতেছেন—“ইক্ষাকুবংশে দশরথ নামে নত্যাশ্রিতজ, শ্রীমান্ ও অতিশয় ধার্মিক একরাজা জন্মগ্রহণ কবিলেন। অঙ্গরাজ-পুত্র রোমপাণ্ডের সহিত রাজা দশরথের অতিশয় বন্ধুত্ব করিলেন।

ঐহার মতে—“রোমপাণ্ডের পিতা চিত্ররথ।” কিন্তু চিত্ররথ তো হইবে না, হইবে ধর্মরথ। —“রোমপাণ্ডো ধর্মরথাক্ত-তুরঙ্গবাহুঃ”—প্রাচীন গ্রন্থের উক্তি। বহুমুখমহার মহাশয় তারপর বাহাই লিখুন, তবু তাঁহাকে স্বীকার পাইতে হইবে যে, বৃহৎ-কর্মার পুত্র বৃহদ্ভা, পৌত্র বৃহদ্রথ, প্রপৌত্র জয়দ্রথ, বৃদ্ধ প্রপৌত্র বিজয় এবং অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ধৃতি। —“বৃহৎকর্মার স্তম্ভস্তন্য বৃহদ্ভাভ্যন্তোক্তবৎ ॥ বৃহদ্রথো বৃহদ্রথোভ্যন্ত পুত্রো জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথস্ত বিজয়ো বিজয়স্ত ধৃতিঃ স্তম্ভঃ ॥” —গরুড়পুরাণ। পরে ধৃতির পুত্র ধৃতরত্ন, পৌত্র নত্যাধর্মার, নত্যাধর্মার পুত্র অধিরথ, অধিরথ-স্তম্ভ মহাবল কর্ণ, কর্ণনন্দন বৃষকেন্দ্র বা বৃষলেন—ঠিকই লিখিয়া পরিশেষে বৃষকেন্দ্রের পুত্র পৃথুলেনকে তিনি কোথা হইতে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। গরুড় পুরাণে বৃষকেন্দ্রের একপ্রকার লম্বাধার্মিক এক পৃথুলেন আমরা পাই, তিনি —“কচিরাম সেনজিতঃ পৃথুলেনস্তদ্ব্যজ্ঞঃ।” বহুমুখমহার মহাশয় সম্ভবতঃ সেই পৃথুলেনকে গোজামিল দিয়া প্রকাশ্য একটি ছালামা দিাইয়াছেন।

ইতিহাসকে তিনি এতখানি সহজ ভাবিলেন কেন?

তাঁহার প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে বীর লেন বৃষকেন্দ্রের পৌত্র। স্বল্প পুরাণের লম্বাধার্মিক-বংশের পূর্বোক্তে কি আছে বহুমুখমহার মহাশয় একবার তাহা অভিনিবেশ লক্ষ্যে দেখুন—“শৌমিনী দেবতাভক্তঃ শান্তিল্যাপ্য ঋষে: কুলে। মহারাজ ইতিখ্যাতস্ততোভূতবশঙ্করঃ। তদ্বশয়ে চক্রবর্তী চমৎসেন ইতীরিত। তদ্বশয়ে বীরলেনঃ কান্তিমালী ততোহপিচ।” কালেকালেই বীরলেনকে লামন্ত লেনদেবের পিতার আসনে বসাইতে পারি না, তেমনি আবার পৃথুলেনকে বীরলেনের পিতা করাও চলে না। বিজয়লেনদেবের দেওপাড়া লিপিতে আছে—“দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রবংশে বীরলেন প্রভৃতি যে লকল কীর্তিমান নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, পরামর্শ নন্দন বেদব্যাসের লেখনীতে বাহাধের কীর্তি বিদ্যোবিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই ব্রহ্মকত্রির বংশে লামন্তলেন জন্মগ্রহণ করেন।” ইহার মানে কি হয় বীরলেন লামন্তলেনের পিতা? অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র তদ্বীর Indu Aryan নামক ইংরাজ গ্রন্থে মহারাজ লামন্তলেন দেবের উর্দ্ধ এবং অধস্তন পুরুষের তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বীরলেনের পুত্র লামন্ত লেন লিখিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে লক্ষ্মী নির্ণয়ের লেখক লালমোহন িত্তানিধি লিখিয়াছেন—“এই তালিকাধারা তিনি (রাজেন্দ্রলাল) লক্ষ্মী নির্ণয়ের প্রমাণকে অতি শ্রদ্ধা বলেন, বস্তুতঃ তাঁহারই প্রমাণ অতি ক্ষীণ।”

কর্ণ নন্দন বৃষলেন ভারত যুদ্ধে নিহত হন। মহাবীর কর্ণও নিহত হইয়াছিলেন। ভারত যুদ্ধের সময় হইতেছে খ্রীষ্টপূর্ব ১১৩৭ বঙ্গের পূর্বে। এবং লামন্তলেনদেব লিখালনারোহণ করেন ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে

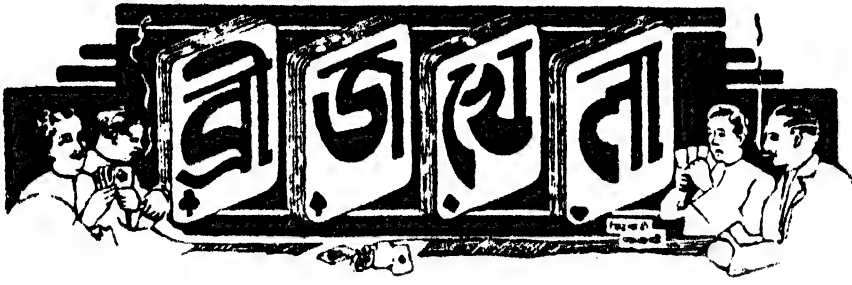
(নগেন বহুমুখ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজত্বকাণ্ড)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে লামন্তলেন দেবের লিখালনারোহণ বর্ষের ২১৫৮ বঙ্গের পূর্বে ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল। অর্থাৎ বৃষকেন্দ্র হইতে লামন্ত-লেনদেব পর্যন্ত সময় হইতেছে ২১৫৮ বঙ্গের। এই দীর্ঘাতিদীর্ঘতম ২১৫৮ বঙ্গের মধ্যে বহুমুখমহার মহাশয় মাত্র দুইটি পুরুষকে রাজত্ব করাইয়াছেন।—একটি পৃথুলেন অপরটি বীরলেন। ইতিহাস রচনা করিতে বলিলে অনেকখানি বিচার যুক্তি এবং বিবেচনা আবশ্যক হয়। তাঁহার এতখানি যথোচ্চারণ তাই লকলের মনে গভীর আঁচের পাত করিয়াছে।

গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণলেনদেবের তিন পুত্র ইহা আমরা চিরদিনই জানি। কোনো ইতিহাসেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই; বরং বহুতেই উক্ত হইয়াছে মাধব (বা বহুমুখ মাধব), কেশব এবং বিশ্বরূপ লক্ষ্মণলেন দেবের এই তিন পুত্রই। বহুমুখমহার মহাশয়ের পুরস্কর লেন লক্ষ্মণলেন দেবের “অন্ততম পুত্র” কিছুতেই হইতে পারেন না। পুরস্করলেন বাসুকীগোত্রীর লেন কুলোক্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ রমানাথ লেন নামক জনৈক ব্যক্তির পুত্র। আর লক্ষ্মণলেনদেব ছিলেন ব্রহ্ম বা কর্ণাট কত্রিয়। বিজয়লেনদেবের দেওপাড়া লিপিতে আছে—“ল ব্রহ্মকত্রিয়ানাম জানি কুলশিরো-দাম লামন্তলেনঃ।” দিরাঙ্গগঞ্জের তান্ত্রালান ও লক্ষ্মণলেনদেবের মাধাইনগরের তান্ত্র-লেখ তেও ঐ একই কথা উৎকর্ণ দেখিতে পাই। রমানাথ লেনের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মপ্রথম কাশ্যকুজ আগমন করেন। রমানাথ পরে কাশ্যকুজ হইতে গোঁড়ে আনিয়াছিলেন। মনোমোহন ঠাকুরের বাঙ্গালী কুলগাথার আছে—

(ক্রমঃ)

WANTED

Wanted a part time accountant Conversant with Company Laws and can prepare balance sheet independently Apply with copies of testimonials to the Manager, National Newspapers Ltd 11, Chackrabarti Road (south) Calcutta



ব্রজবাস

প্রতিযোগিতার একটি হাত

ইস্কাবন—টেকা, নাহেব, × ।
 হরতন—গোলাম, আটা, ছরি ।
 রুহিতন—দশ, চোকা ।
 চিড়িতন—বিবি, গোলাম, দশ,
 নাতা, চুকা ।

	উ	
প		পু
	দ	

ইস্কাবন—×, ×, × ।
 হরতন—টেকা, বিবি, দশ, ×, ×
 রুহিতন—টেকা, × ।
 চিড়িতন—নাহেব, ×, × ।

পূর্বোক্ত হাতে ডাক করেছিল এইরূপ,
 'দ' 'প'
 একটি হরতন । পাশ ।
 দুইটি হরতন । পাশ ।
 চারটি হরতন । পাশ ।
 'উ' 'পু'
 দুইটি চিড়িতন । দুইটি রুহিতন ।
 তিনটি হরতন । পাশ ।
 পাশ । পাশ ।

যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে এই হাতখানি
 দেখলে চাওটির খেলা করা অসম্ভব বলে
 মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই
 বুঝতে পারবেন যে কেমন অনায়াসে এই
 হাতটিতে গেম করে নেওয়া যায় ।

(১) 'প' রুহিতনের ছরি খেলায় 'উ'
 রুহিতনের চোকা, 'পু' রুহিতনের নাহেব
 ছিলেন । 'দ' টেকা ঘেরে পিট নিলেন ।

(২) 'দ' হরতনের টেকা খেড়ে খেলায়
 সকলেই ছোট ছোট হরতন দিয়ে গেলেন ।

(৩) 'দ' পুনরায় হরতনের ছোট তাল
 খেললেন, এবং 'উ' হরতনের আটার পিট
 নিয়ে গেলেন । এ ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের
 মনে সাধারণতঃ প্রশ্ন আসতে পারে যে
 'দ' এইভাবে খেললেন কেন? তার উত্তরে

বলা যায় যে, 'দ' দেখলেন যে লক্ষ্যবদ্ধ
 প্রতিপক্ষকে তাঁর ঘের পিট হচ্ছে চারখানি
 (একখানি ইস্কাবনে, একখানি হরতনে,
 একখানি রুহিতনে ও একখানি চিড়িতনে),
 অথচ একখানি পিট কম না ছিলে তাঁদের
 গেম হওয়া অসম্ভব । সুতরাং সাধারণ
 খেলোয়াড়গণ যা করে থাকেন তিনি তা
 করলেন না অর্থাৎ ইস্কাবনের টেকায় 'উ'র
 হাতে নিয়ে হরতনের গোলাম খেলে 'ফিনাল'
 নিলেন না । তার কারণ তিনি দেখলেন
 যে 'ফিনাল'টি যদি একবার ফেঁদে যায়,
 তাহলে তাঁর গেমটি একেবারে নষ্ট হয়ে
 যাবে । এই জন্য তিনি 'উ'র হাতে
 যাবার দুইটি পছন্দ বর্তমান তেখে দিয়ে
 প্রথমতঃ রঙের সাহেবের পিটখানি দিয়ে
 ঘেবার বন্দোবস্ত করলেন । এরূপ করার
 ফলে অতি অনায়াসেই তিনি গেম করে
 নিতে সক্ষম হলেন । বিপক্ষদল যাত্র পিট
 পেলেন একটি রুহিতনে, একটি চিড়িতনে
 ও একটি হরতনে,—বাকি ইস্কাবনের পিট-
 খানি তাঁরা আর পেলেন না । এই
 হাতখানি ঘেবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে
 অনেক সময় ডাক দেওয়ার ভুল হয়ে যায়
 বটে, কিন্তু সর্বশেষ চিন্তা করে খেললে

বাসস্তিকা

শ্রীসমীর কুমার ঘোষ

(১)

অলোক ফুলে ছয়ায় খুলে
 আনলে তুমি কে—
 আঁচল ভরা পলাশ-ঝরা
 চিনতে পারিনে ।

অরুণ রংয়ে সারা আকাশ
 রঙীন হোল—সারা বাতাল
 চাঁপার কলি লাজাজলি
 ছড়িয়ে গেল যে ।

(২)

লবঙ্গ-পাতা গায় কি গাঁথা
 কাহার বিজয়ে—
 আঁধার ডালে লাজ-লকালে
 সুকুল নিলয়ে
 মৌমাছিরা কিলের তরে
 গুণ্ গুণারে আমোদ ভরে,
 হঠাৎ আনি' উঠলো হা'দি
 কার মানসী এ !

অনেক ক্ষেত্রেই খেলা করা সহজসাধ্য হয়ে
 ওঠে । বিপক্ষদলের হাতখানি ছিল এইরূপ,

ইস্কাবন—গোলাম, নয়, × ।

হরতন—নাতা, চুকা ।

রুহিতন—নাহেব, বিবি, ×, ×, × ।

চিড়িতন—টেকা, ×, × ।

	উ	
প		পু
	দ	

ইস্কাবন—বিবি, দশ, আটা, ছরি ।

হরতন—নাহেব, ×, × ।

রুহিতন—গোলাম, পজা, চোকা, ছরি ।

চিড়িতন—×, × ।

খেলার ঘাট

(সি, বি)

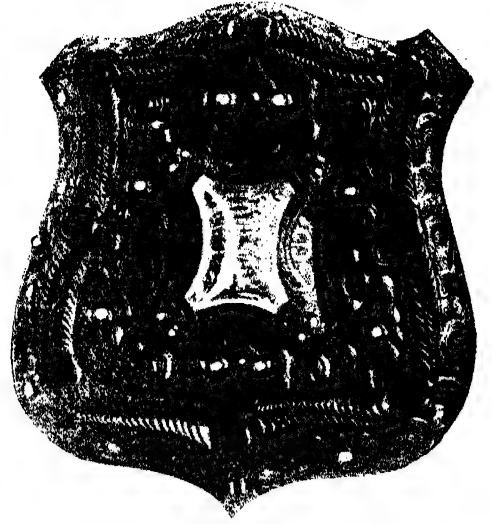
আন্তর্জাতিক হকি

প্রতিযোগিতা

গত মণ্ডাছে শনিবার বাংলা দলের সঙ্গে ভূপাল দলের খেলাটি কবার পর আন্তর্জাতিক হকি লীগ প্রতিযোগিতার পরিণামাশ্রি হয়েছিল। বাংলা দল এই প্রতিযোগিতার একটি খেলাতেও পরাজয় স্বীকার না করার লক্ষ্যপ্রণয় স্থান অধিকার করে বিজয়ী সম্মানে ভূষিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালের আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে 'মানভার' হকি টীমটিকে এক গোলে পরাজিত করে বাংলা দল এই প্রতিযোগিতার বিজয়লাভের স্বপ্নপাত করে। সেই বৎসর এই প্রতিযোগিতাটি 'নক্ আউট' পদ্ধতিতে খেলা হয়েছিল এবং এ বছর প্রতিযোগীদলগুলির সংখ্যা কম হওয়ায় কর্তৃপক্ষ 'লীগ' পদ্ধতিতে খেলাতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৩০ সালে লাহোরের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতাটিও প্রতিযোগীদলগুলির সংখ্যা অল্প হওয়ায় লীগ পদ্ধতিতে খেলা হয়েছিল। ১৯২৮ সালে আমস্টারডামে একটি ভারতীয় হকি টীম পাঠানোর উদ্দেশ্যে টীম মনোনয়ন করবার জন্য এই আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার প্রথম প্রবর্তন হয়। এইবার নিয়ে এই প্রতিযোগিতাটি পাঁচবার খেলা হয় তার মধ্যে চারবার কলিকাতাতে খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল, কেবলমাত্র ১৯৩০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের প্রতিযোগী প্রবেশগুলির মধ্যে বাংলা দল তার

শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এমনকি অবশিষ্ট তিনটি দলের বাড়াই করা খেলোয়াড়দের সম্মিলিত দলটিকেও বাংলাদল ৩—২ গোলে পরাভব স্বীকার করাতে বাধ্য করেছে। এই খেলাটির ফলাফল থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতের অন্যান্য প্রবেশগুলি যদি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করত তাহলেও বাংলা দলের এই গৌরব অর্জন সম্ভব হত। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় হকি টীম 'নিউ জিলাও' তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখাবার জন্য সেপানকার মেয়োরী অধিবাসীরা নিজেদের গচ্ছন্দত্ব একটি শীল্ড তৈরী করে ভারতীয় দলটিকে উপহার দেয়। সেই 'মেয়োরী' শীল্ডটি ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিজয়ী দলকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে বলে সাব্যস্ত হয়। এই বছর বাংলা দল এই শীল্ডটি প্রাপ্ত হয়েছে।

গত ১৫ই মার্চ পাকিস্তান এবং গোয়াতির দলের খেলাটি হয়। শেখোক্ত দলটি ২—০ গোলে পরাজিত হয়। এই খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও উভয় দলই সমান শক্তিশালী ছিল এবং খেলাটি অসমাপ্তিতাবে শেষ হওয়া উচিত ছিল। গোয়ালিয়র দলের গোল রক্ষক খলিল, ব্যাক হালিম, এবং করওয়ার্ডে মথুরাপ্রসাদ ও ছোটোবাবুর খেলা ভাল হয়েছিল। রূপলিং প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাচটির তুলনায় ভাল খেললেও তার খেলা আশাহরূপ হয় নি। পাকিস্তান দলের ব্যাক



মেয়োরী শীল্ড

রাজিন্দার লিং, হাকবাকদর গিরধারীলাল ও কালেব এবং ফরওয়ার্ডদের মধ্যে বলবন্ত লিং ব্যতীত অন্যান্য সকলেই নিজেদের কর্তব্য প্রয়োজনানুযায়ী পালন করেছিলেন। বিজয়ী দলের চূষণভজন এবং চিরঞ্জিৎ প্রমাদেই একটি করে গোল করেন। বাংলা ও পাকিস্তান দলের ম্যাচটি গত ১৬ই মার্চ তারিখে খেলা হয়েছিল। এই খেলাটি খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় এবং দুই দলকেই নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। পাকিস্তান দল ৩—২ গোলে পরাজিত হলেও তাদের খেলা বিজয়ী দল অপেক্ষা কতকংশে ভাল হয়েছিল। পাকিস্তান দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সমবেত শক্তির প্রয়োগ এবং জয়লাভের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলা দলের অধিনায়ক এলেন, গালিবান্দী, আর কার এবং অক্ষয় মিত্রের খেলা প্রশংসনীয় হয়েছিল। পাকিস্তান দলের মেহের লিং, রাজিন্দার লিং, কালেব, চিরঞ্জিৎ এবং গুরবচন লিং প্রশংসনীয় খেলা দেখিয়েছিলেন। প্রথমার্ধে বাংলা দলের রেন্টন এবং কার একটি করে গোল করার পর বিপক্ষ দলের চূষণভজন একটি গোল প্রতিশোধ করেন। দ্বিতীয়ার্ধে পাকিস্তান দলের

নালিব পরাজয় হুচক গোলটি প্রথমে প্রতিশোধ করেন। শেষ সময়ে আর কার একটি গোল করায় বাংলা হল ৩-২ গোলে জয়ী হয়।

১৭ই মার্চ তারিখে বাংলা হলের সঙ্গে বাকী তিনটি হলের বাড়াই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে 'রেষ্ট' নামে একটি টীম গঠন করে একটি ট্রান্সাল ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই খেলাটিতেও বাংলা হল ৩-২ গোলে জয়লাভ করে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। এই দিনের খেলাটি তীব্র প্রতিযোগিতা এবং উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। প্রথমার্ধে মহম্মদ সাকুর একটি গোল করলে রেন্টন কিছুক্ষণ পরে সে গোলটি শোধ দেন। শেষের দিকে কার আর 'চুট' গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে পাজাব হলের গিরধারীলাল একটি গোল প্রতিশোধ করেন। আর কোন গোল না হওয়ায় বাংলা হল ৩-২ গোলে জয়লাভ করে।

বাংলা হল :—এলেন, নি ট্যাগনেল এবং নি হজেন্স, স্ট, নি ডিকোলটল, এবং গ্যালি-বার্জী, এ মিত্র, হেঙারলন, আরকার, রেন্টন এবং জি নিস।

রেষ্ট হল :—খালিল আমেদ (গোয়ালিয়র) রাজিন্দার সিং (পাজাব) এবং হালিম (গোয়ালিয়র), আসান খাঁ (ভূপাল), বাসে খাঁ (ভূপাল) এবং গিরধারীলাল (পাজাব), আমেদ শের (ভূপাল), চিরঞ্জিৎ রায় (পাজাব), আব্দুল সাকুর (ভূপাল), মুগির আমেদ (ভূপাল) এবং বলবন্ত সিং (পাজাব)।

এই খেলাটি হবার পরের দিন পুনরায় আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পাজাব ও ভূপাল হলের খেলাটি হয়। এই খেলাটি খুব প্রতিযোগিতামূলক আশা করা গেল ও প্রকৃতপক্ষে খেলাটিতে উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব একেবারেই দৃষ্ট হয়

নি। প্রত্যেক হল একটি করে গোল করায় খেলাটি অসীমায়িত ভাবে শেষ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাটিতে এই একমাত্র খেলাটির শেষ মীমাংসা হয় নি। পাজাব হলের রাজিন্দার সিং এবং মেহের সিং গিরধারীলাল, চিরঞ্জিৎ, চুখন্তজন এবং মহম্মদ নালিব উল্লেখযোগ্য খেলা দেখিয়েছিলেন। ভূপাল হলের ব্যাক ফল্ফল, লেন্টার হাক্ বাসে খাঁ, আসান খাঁ, মুগির আমেদ এবং নাকুরী দৃশ্যনীয় খেলা দেখিয়েছিলেন। প্রথমার্ধের শেষের দিকে পাজাব হলের চুখন্তজন একটি গোল করলে দ্বিতীয়ার্ধে ভূপাল হলের মুগির আমেদ গোলটি প্রতিশোধ করেন। অবশেষে প্রতিযোগি হল দুটি একটি করে পয়েন্ট ভাগ করে নেন।

গত শনিবার ১৯শে মার্চ ক্যালকাটা মাঠে বাংলা হলের সহিত ভূপাল হলের খেলাটি হবার পর আন্তর্জাতিক হকি

আমরা নিজেদের ডক্ক নিজেরা বাজাই না।...
জনমতের অভিনন্দন ও সাময়িক-পত্রসমূহের অভিমতই
“সখের শ্রমিকে”র সাফল্য নির্দেশ করিয়াছে।

—প্রফুল্ল পিকচার্সের হাসির রূপকথা—

সখের শ্রমিক

বাঙলার সবচেয়ে যে বড় সমস্যা—সেই অল্প সমস্যার বিদ্রূপাত্মক, কৌতুকোচ্ছল ও শিক্ষামূলক অভিনব চিত্র-কাহিনী।

যে গল্প বাঙলার ছাত্র-ছাত্রীরা একাধিকবার পাড়য়াও পুনর্বার পড়িবার কৌতুহল নিবারণ করিতে পারেন নাই—আপনি সমগ্র পরিবারবর্গের সহিত তারই চিত্ররূপ দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করুন।

আনন্দোজ্জল

শ্রী

তৃতীয় সংস্করণ

প্রতিযোগিতার এবারকার সব খেলাগুলি শেষ হয়ে গেছে। এই খেলাটি এই প্রতিযোগিতার সব চেয়ে ভাল খেলা হবে আশা করা গিয়াছিল—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত ব্যাপার ঘটেছিল। ভূপাল হকি টীমটির ভারতের মধ্যে একটি শক্তিশালী দল বলে খ্যাতি আছে এবং সেই কারণে বাংলা দলের সঙ্গে তাহের খেলাটি খুবই প্রতিযোগিতামূলক হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু খেলাটি আরম্ভের পরই বাংলা দলের প্রাধান্য পরিস্ফুট হয় এবং ভূপাল দল খুব নিম্ননীর ভাবে খেলতে থাকে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ভীষণভাবে আক্রমণ করে যদিও বাংলা দল ৪-০ গোলে জয়লাভ করেছে তা হলেও তারা আরও বেশী গোলে জয়ী হলে অব্যাবহিক হত না। বাংলা দলের রক্ষণভাগকে লেহিন দর্শক হিসাবে লম্বা কাটাতে হয়েছে বলা চলে। এলেন লম্বা খেলাটির মধ্যে মাত্র একবার বল স্পর্শ করেছিলেন। ভূপাল দলের সুগির আমেদ এবং লাকুর মাঝে মাঝে যে আক্রমণগুলি করছিলেন তা হজেন এবং ট্যাপসেলের অননুক্রমণীয় খেলার জন্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। বাংলা দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড আর কার লেহিন যে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা লেহিনকার দর্শকেরা অনেকদিন স্মরণ রাখবে। খ্যান চাঁদের পরই যে তাঁকে স্থান দেওয়া চলতে পারে তা তাঁর শক্তিশালী লেহিনকার খেলার পর স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন না। তিনি লেহিন ভূপাল দলের বিভীষিকা স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। একমাত্র কারের অননুক্রমণীয় আক্রমণ করিবার কৌশলের জন্যই লেহিন বাংলা দল চারটি গোল করতে পেরেছিলেন। তবে রেন্টন এবং এ মিত্র তাঁকে উপযুক্ত ভাবে লাহায়া করেছিলেন। প্রথমার্ধেই কার দুটি গোল করেন এবং দ্বিতীয়ার্ধে রেন্টন তৃতীয় গোলটি করার পর খেলাটি শেষ হবার এক মিনিট

আগে কার চতুর্থ গোলটি করার পর ভূপাল দল ৪-০ গোলে পরাজিত হয় এবং বাংলা দল ১৯৩৮ সালের আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়ান প্রতিপন্ন হয়।

বাংলাদল :—এলেন (ক্যাপ্টেন), সি ট্যাপসেল এবং সি হজেন, আরিক, সি ডিকোলটস্ এবং গ্যালিবান্টী, এ মিত্র, হেগারসন, আর কার, রেন্টন, এবং জি নিম্।

পাক্সাব দল :—মহেশ সিং, রাজিন্দার সিং এবং হরভজন সিং, বলবীর কিশেণ, এ কালেক এবং গিরধারীলাল, গুরবচন সিং, চিরঞ্জিৎ রায় (ক্যাপ্টেন), মহম্মদ নাসিব, হুঃখভজন এবং বলবন্ত সিং।

ভূপাল দল :—মোহিন খাঁ, ইলমাইল (ক্যাপ্টেন) এবং ফারুক আলি খাঁ, আলান খাঁ, বাসে খাঁ, এবং কফিরাং উল্লা, আমেদ শের, বহরুদ্দীন, আব্দুল লাকুর, মুনির আমেদ এবং কেনেট্।

গোয়ালির দল :—খলিল মহম্মদ, বি জুতসি এবং হালিম, মামুদ আলি, আব্দুল হামিদ এবং লাকাত খাঁ, এল জ্যাকেল, হোটেবাবু, মমুরাশাদ, রূপ সিং (ক্যাপ্টেন) এবং কুঞ্জক।

আন্তর্জাতিক হকি লীগ টেবল

	খে	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
বাংলা	৩	৩	০	০	১১	৩	৬
পাক্সাব	৩	১	১	১	৫	৪	৩
ভূপাল	৩	১	১	১	৩	৬	৩
গোয়ালির	৩	০	০	৩	২	৮	০

মিঃ ডিমেলো

এতদিন বাধে মিঃ ডিমেলো ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড এবং ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক পদ ত্যাগ করেছেন।

আই এক্স এ

আই এক্স এর নবনির্বাচিত ইউরোপীয়ান সম্পাদক মিঃ ডেভিস্ পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন।

যু গ-যু গা স্তে র
অ তী ত গ রি মা র
প্রেম-ভক্তি-শৌর্য
বি ম শ্রি ত সে ই
পৌরাণিক কাহিনী

দেবী ফুল্লরা

হাজরা পিক্চাসের
প্রথম নিবেদন

দেবী ফুল্লরা

সত্যীভের গরিমার উদ্ভাসিত!
শরতানির কুটজালে আচ্ছন্ন!
রাজশক্তির অত্যাচারে জর্জরিত
প্রজাপুঞ্জের নিরাট অভিসান!
ভক্তের সহায় ভগবান!
এই চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশই

দেবী ফুল্লরা

পরিচালকঃ তিনকড়ি চক্রবর্তী
আলোক-চিত্রীঃ শঙ্করঃ
বিভূতি লাহা যতীন দত্ত

—ভূমিকায়—

অহীন্দ্র চৌধুরী
শিশুবালা

মনোরঞ্জন ভট্টা, রাধারানী,
মোহন রায়, রাণী চৌধুরী,
তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতি।
কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

বড়দি

শ্রীশ্রীমূল কুমার দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

নির্মল লম্বা আপত্তি করিতে গেল কিন্তু বলা আর হইল না। বড়দি আশার লম্বা আগমন টের পাইয়া চোখ টিপিতেই নির্মলকে মৌন হইতে হইল। এবং অনতি বিলম্বে আশা পুতুলসহ আসিয়া পড়িলে, তাহার পুতুল দেখানো, দেখানোর পুতুল দেখানোর বিলম্বিত বলা ও নির্মলের উচ্চহাস্যে কক্ষটা মুখরিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া নারেনবাবু ও বড়দির বৃক্কের চুঃসহ বোঝা অর্ধেক যেন নাহিয়া গেল। বাকীটা নাহিল না আশার প্রতি নির্মলের মনোভাব স্পষ্টভাবে জানিয়া লওয়ার অপেক্ষায়। অপেক্ষায় থাকিয়া দেখা পাওয়া লম্বা নিরাশ হইয়া তাঁহাদের বৃক্কের ভার পুনরায় চুঃসহ হইতে শুরু করিলে অকস্মাৎ একদিন অত্যন্ত নীরুপে ইহার মীমাংসা হইয়া গেল। সেদিন বৈকালিক চা পানের জন্ত প্রস্তুত হইয়া নারেনবাবু তাঁরা ঢালা বিছানার একাংশে বসিয়াছিলেন। অত্যাংশে নির্মল অত্যাশ্বিত্যের মত আসিয়া এইমাত্র বসিয়াছে, লম্বাখুঁই মেঝের আশা তার পুতুলের ঘর-লম্বার পাতিয়াছে এবং বড়দি চা-পানের অল্পপানাদি আনিয়া সেই ঘরের এক কোণে বসিয়া লাজাইতেছেন; এমন সময়—

ইদানীং নির্মল সেই হাততালি পুতুলের তালি হাতটা টিপিয়া দিলে আশা অত্যন্ত ঐতিহ্য। বলিত, তাহার পুতুল না হয়

কথাই বলিতে পারে না তাই বলিয়া কি ভাঙ্গা হাত টিপিয়া দিলে তাহার লাগিবেনা! এখন তারই পুনরাবিনয়ে আশা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের ছোট কাঁচের পুতুলটা নির্মলের দিকে ছুড়িয়া বসিল। এবং নির্মলের মাথায় তাহা আঘাত করিয়া বেশ একটু শব্দের সৃষ্টি করিলে বড়দির দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি চাঁয়ের লাজ সংগ্রহ ঠেলিয়া রাগিয়া লজ্জায় পা ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন।

পুতুলটা ক্রোধের বেশ ছুড়িয়াছিল। তাহা যে সত্যমতাই নির্মলের মাথায় আঘাত করিবে আশা এমন চিন্তার ধার দিয়াও যায় নাই। তাই সে ভয়ে কাঁঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এখন প্রহারের ভয়ে নির্মলের পিছনে সরিয়া যাইতেই নির্মল উঠিয়া বড়দিকে সবলে বাধা দিল। বাধা দেওয়ার অনেক বাকবিত্ততার পর বড়দি এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, আশাকে এখন শাস্তি দেওয়া দরকার।

নিজের ঘোষের কথা স্মরণ করিয়া নির্মল ব্যাকুল হইয়া বলিল, “আমি বলছি—এখনি শাস্তি না দিলে ক্ষতি কিছু নেই। আমার কথাটা আজকের মত রাখুন বড়দি।” বিলম্বে রাগ পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব।

• বড়দি পুনরায় কহিলেন, “না; এখনিই দরকার নইলে তিরস্কার করায় কোন লাভ নেই। পরন্তু পাশের বাড়ীর পুণ্ডালার লজ্জা বগড়া ক’রে এলো, কাল তার ছোট্ট বোনটাকে মিথি মিথি মেয়েকে, আজ তোমাকেও বাকী রাখলেন। শাসন না

করলে, এরপর, এই বগড়া বারবারি ওর একটা মন্ত বদ্ব্যভাবে দাঁড়িয়ে বাবে।

—“মিথোমিথি ‘ও’ মারেনি বা বগড়া করেনি এ আমি স্বচক্ষে না দেখেও বলতে পারি। কেননা সে শ্রেণীর মেয়ে ‘ও’ নয়। তা’হাড়া ছোট বেলার একটু মারহাটা বা কলহপ্রিয় লম্বালাই থাকে; থাকা ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তা’ বয়স বড় হলেও সে দেখা থাকে কিম্বা প্রত্যেকেরই বদ্ব্যভাবে দাঁড়িয়ে যায় এমন কোন নজীর নেই। আপনি হয়তো জোর করে বলবেন, হ্যাঁ আছে। থাকে ভাল নাথাকে নাভাল, দেখবার কথা ক’রে আমি তর্ক করতে চাইনা। আমি যে বড় গলায় জোর করে বললাম আমার কথাটা রাখুন, তা আপনি রাখবেন না?”

—“কে তুমি বলত? ওর নেমন্তন্ন তুমি একবারো রাখনি, আমিও তোমার অনেকবার বলেছি কিন্তু সবই হয়েছে ভয়ে খী ঢালা। আজ কিম্বা জোরে তোমার কথা মেনে চলতে আমার তুমি বল? যেখানে লজ্জাকারের লম্বা নেই সেখানে মান থাকেনা জোরও থাকেনা। তুমি ন’রে দাঁড়াও আমি ওকে মারবই।”

—“একহাতে তালি বাজেনা। আমি ওকে আগে ঠুকরেছি তবে ‘ও’ মেয়েকে নইলে আধাকে মারতনা। তা’হ’লেই বুঝুন, ওকে একঘা’ মারলে সেইটা পাঁচগুণ হ’য়ে আমারই বৃক্ক বাজবে।”

বড়দি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “তা’ বাজুক। অত কথার কাজ নেই, তুমি এখন ন’রে দাঁড়াও।”

—“তবু ন’রে দাঁড়াতে হবে?”

—“হ্যাঁ হবে।”

—“তার মানে ঘুরিয়ে নাক দেখানো। মেয়েলী কথার থাকে ব’লে যিকি মেয়ে বোকে দেখানো এ দেখছি তাই। স্পষ্টভাবে থুলে বললেই তো ভাল হয় যে, আমার বদ্ব্য এই

কাজ করেছে বলে আশাকেও আর বিশ্বাস করা চলে না। চক্ষুলাজ্ঞার খাতিরে আমার এখানে আনা লম্বকে কিছু বলতে না পেয়ে আজ একটা তর্কের ছলে জানিয়ে দিতে চান। 'কখন, তাই নয়?'

তিনিরা বড়দ্বির মুখ একেবারে ক্যাকাশে হইয়া গেল দেখে লম্বা কোন কথা ফুটিল না। তাঁহাকে যৌন বোধিয়াই নির্মল বরজার দিকে বাইতে উদ্ভত হইয়া পুনরায় কহিল, "আমার অনুমানই তাহলে ঠিক! বেশ—বাই তাহ'লে?"

বড়দি অপরূপ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মৎ যেন কাটিয়া পড়িলেন। নির্মলের গিঠেই গুমগুম করিয়া ছুই ভিনটা কীল বলাইয়া দিলেন, কহিলেন, "বেরো, দূর হ'। আর কোন দিন এবাড়ীতে মাথা গলালে মাথা কাটিয়ে তবে ছাড়ব, চাকর দিয়ে বের ক'রে দেব—ইত্যাদি। নির্মল চকিতে—তাঁহার মুখপানে একবার তীব্র কৃষ্টিতে চাহিয়াই চোখের জল মুষ্টিতে মুষ্টিতে ফোড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

নায়েববাবু এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহেন নাই। হালিমুখে ছুই পাতানো ভাই-বোনেরের ঝগড়া দেখিতেছিলেন। এখন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "ওকি! নির্মলকে ডাড়িয়ে দিলে? নির্মল চলে গেল যে কাঁদতে কাঁদতে—এবে আমি স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না!"

বড়দি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কাতরতা লক্ষ্য করিলেন। আশাশ দিয়া কহিলেন, "না গো না ওর চেখের জল 'ও' জল হুঃখের নয়, আনন্দের। 'ও' আমার আনবে।" বলিয়াই তিনিও খুব সম্ভব নিজের মুখ লুকাইতেই বাহিরে চলিয়া গেলেন। আশা অত্যন্ত মুগিল না, ইহাই অব্যর্থ প্রবোগ বোধিয়া পাশের ঘরে আত্মগোপন করিলে কিছুক্ষণ পরে বড়দি কিরীয়া আদিলেন,

যাণীকে চা মিষ্টি দিলেন; দিয়া চুপ করিয়া নতমুখে বলিয়া রহিলেন। বতই লম্ব কাটিতে লাগিল ততই নির্মলের প্রত্যাবর্তনে নিরাশ হইয়া আশঙ্কার তাঁহার মুক চিপ্চিপু করিতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন, নির্মল কি তাঁহাকে তুল মুগিল নাকি?

নির্মল তুল বোঝে নাই। আশ্বীর স্বজনহীন সে দূর সম্পর্কের কাকার কাছে চাকরের মত থাকিয়া আগাছার মত অবহেলার অবস্থে মাহু হওয়ার কথা ভাবিয়া মুগিরাছে, তাঁহার বড়দি মেহের তুলনা হয় না। সেই গভীর মেহে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল বলিয়া নিজেকে লংবরণ করিতে তাহার বিলম্ব হইতেছিল। আলিয়াই বড়দ্বির পায়ে প্রণাম করিয়া কহিল, "আপনি আমার বড়দি নয়, সেই ছোটবেলার মা!"

তিনিরা বড়দ্বির মুখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হালিমুখে বলিলেন, "আমি যখন বা বলব তখনবে তো? আর অবাধ্য হবে না?"

নির্মল ললজ্জ হালিয়া কহিল, "না। যদি কখনো ক্রোধের বশে অবাধ্যতা কিছু ক'রে বলি তাহ'লে আজকের মত শাসন করবেন।"

—"বেশ। আপনাকে মাদের প্রথম লগ্নাহেই আমার সঙ্গে বডি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি তাহ'লে—

এ প্রস্তাব নির্মল কখনো স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। তাই তাঁহার কথা শেব না হইতেই সে লম্বুখে যেন লাগ বোধিয়া বিস্ময়ে প্রায় চিংকার করিয়া উঠিল, "বিরে? আমার সঙ্গে?"


বড়দি লম্বাহতে কহিলেন, "ভয় নেই। মা তার ছোট্ট ছেলেকে কখনো লাগ নিয়ে খেলা করতে দেয় না, বরং দেখিকে খুব লাবধানই থাকে।"

নির্মল লম্পূর্ণরূপে পরান্ত হইয়া—হালিল। সে হালি জয়ের, কি লজ্জার বলিতে পারি না; জানি, তবু সে মুহু আপত্তি করিতে ছাড়ে নাই। বলিয়াছিল, একথা শুনে প্রেমেরে কিছ—বাধা দিয়া বড়দি বলিয়াছিলেন, "থাক। ওর নাম ক'রে এই সময়টাকে আর অপবিত্র ক'রো না। বলিয়া নির্মলের পুনঃ প্রণামের পূর্বেই তিনি তাহার প্রশস্ত লগ্নাতে একটি নির্মূল চুখন আঁকিয়া দিয়া নায়েববাবুর দিকে লম্বাহে ঠেলিয়া বলিয়াছিলেন, "ওকে প্রণাম করা।" মিনিট কয়েক পূর্বে নির্মলের

দুর্ভাগ্য এবং শীর্ণ
শিশুরা

ডাক্তারের

বাল্যাসুত
সেবনে
অবিলম্বে সুস্থ ও
সবল হয়।



বড় বড় ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ভীতিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে আশালতা পাশের কক্ষ হইতে বড় তরে তরে আনিয়াছিল। আনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছিল কিন্তু তখন কিছুই বুঝে নাই, বুঝিয়াছিল—নির্ধনের সহিত তাহার বিবাহের সময়।

তারপর আর দাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নারেনবাবুর টাকার এবং ফলজ্যা আবেশে নির্ধন ইউরোপ ঘুরিয়া বিদ্যান ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার উপাধি লইয়া ডাক্তার হইয়া ফিরিয়াছে। এ লংবাথ প্রেমের কানে গেল আরো তিন বৎসর পরে,—তাহার কোন এক বন্ধু কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কলিকাতার চিকিৎসার্থে আনিয়াছিল, নির্ধনকে দেখাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়া এলিতেই সে কাঙালের মত ছুটয়া আদিল নিজের হুরারোগ্য ব্যাধির অলঙ্ঘন বস্ত্রনা হইতে মুক্তিলাভের আশায়;—ডাক্তার নির্ধনের নাম তখন সহরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সে নিবিষ্টমনে বহুকণ পরীক্ষা করিয়া কহিল, “লজবোষ না ঘটিলে তো এমন রোগ হয় না! হ’ল কি ক’রে?” প্রেমের নতমুখে মৌন হইয়া রহিল দেখিয়া, নির্ধনের বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। কহিল, “এ রোগ ছই-এক দিনে লাগবার নয়। ছ’ তিন মাস এখানে থাকতে হবে।”

প্রেমের ব্যাকুল হইয়া হতাশকণ্ঠে কহিল, “থাকব কোথায়? এ রোগ যে বড় হোঁরাটে, থাকবার জায়গাই বা হবে কে?”

—“কেন আমার কাছে? অত কিছু হুজির কেন—এ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রে, নড়চড় হবার নয়।”

প্রেমের কৃতজ্ঞতা জানাইবার তাবা বুঝিয়া পাইল না। দুখ লুকাইতে সে তাহার নতমন্তক আরো একটু নামাইয়া ফেলিল। মাস দুই থাকিয়া আরোগ্যলাভ

করিলে অনাথ্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিল, “তুনাম তুই নাকি আমার মাকে আলও বড়দি বলে ডাকিস। একথা কি সত্যি?”

—“হ্যা। পূর্বের তুলনার বিরুদ্ধে সময় থেকে আজ পর্যন্ত বড়দির কাছে বা’ পেরেছি তা’ কিছুই নয়।”

প্রেমের শুভ বিষয়ে অবাধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পাইল না, কি? সেই বন্ধ (।) বার কাছে ফুল্লমী ত্রী ও অপব্যাপ্ত অর্থ—অর্থ্য কাশিনী এবং কাকন—ছই-ই মন হইয়া যায়।

(সমাপ্ত)

বি, মাসা এণ্ড সন্মের কলেকটর আশ্চর্য্য গুণনির্দেশিত মহোদয়ঃ

কিওলিটঃ সালসা

বর্তমান যুগে ইহাই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট ও গুণ বিশিষ্ট মহোপকারী সালসা। রক্তপরিষ্কারক, বল, শক্তি ও সুখাবুদ্ধিকারক। পারদ ও উপদংশ বিবদানক।

ইলেক্ট্রো-গোল্ড-কিওর

অসহ্য বলকারক ও নষ্টবাহ্য পুনরুদ্ধারক। দ্রাব্য দুর্বলতা, অক্ষমতা, অবশ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ বলকারক ঔষধ। হৃদয়দিগের দৃতিশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়। সুখাবুদ্ধি, মানসিক প্রযুক্ততা, দ্রাব্যিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে; হাত ও হাতী জীবনের একমাত্র পরম সহায়। মূল্য দেড় টাকা, মাস্তলাদি সহ ২।০।

“গগোরা-বাম” লিল (বটিকা) বা সিক্চার

নূতন ও পুরাতন সর্বপ্রকার লক্ষণযুক্ত গগোরি, প্রমেহ, বাতপীড়া ও মূত্রবালীর বাবতীর রোগের বিশেষ পরীক্ষিত আন্তকলপ্রদ মহোদয়। ২।১ মাত্রার ত্রী পূর্ব উত্তরেরই রোগের অসহ্য জ্বালা বস্ত্রণা লাঘব হয়। ত্রীলোকদিগের বেত ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অল্প সময়ে অসহ্য জ্বালা বস্ত্রণা লাঘব করিতে এবং রোগ সমূলে নির্মূল করিতে ইহার স্তার আশ্চর্য্য আন্তকলপ্রদ ঔষধ অগ্ন্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই ঔষধ সিক্চার ও পিল দুই রকমের পাওয়া যায়, উত্তরেরই মূল্য প্রতি শিশি দুই টাকা; মাস্তলাদি সহ ২।০।

ইপাসি এজ্জমা-সিরাপ

বিশিষ্ট ইপাসি, দমা, অসরোগ এবং বাবতীর ফুসফুস ও বাসনালীর প্রদাহ, ব্রতকাইটিস, হপিংক প্রভৃতি রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয় ইপাসির প্রবল টানের সময়ে বাস প্রবাসের মৃত্যুসম বস্ত্রণার একদাপ মাত্র সেবনেই রোগ দূরীভূত হইয়া রোগী সুস্থ হয়। মূল্য দেড় টাকা; মাস্তলাদি সহ ২।০।

বি, মাসা এণ্ড সন্ম
(মাসা বেডিকেল হল)

এজেন্টস্—এম্. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১০ নং, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা

৪নং, ওলু ওস্তাগর লেন,
(পোর্ট ব্লক নং ১১৪০২) কলিকাতা

নিয়তি

(গল্প)

শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ঘোড়াটা অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলার, হয়ত' কোন লক্ষপতি রেলের জন্তে আনিয়াছিল। নিয়তি তাকে বেঁধেছে দিল্লীর রাজপথে এক টাকার জোয়ালে। কে জানে কি খুঁৎ হয়েছিল, হয়ত' রেলকোলে তার জীবনের প্রথম রেলের ইটরের গর্তে পা পড়েছিল, কিংবা নালগুলো খুব বড়করে ঠোকা হয়নি, কিংবা হয়ত' জকিটাকে কেউ ঘুপই খাইয়েছিল, —মোটের মাথায় টারফে তার স্থান হয়নি। পরিবর্তে সে দিল্লী জংলন থেকে বরিশাগঞ্জের লড়ক ধরে' নিউ দিল্লী পর্যন্ত ছোট্টে, পিঠনে ওই ছ'চাকার টাকার, মাথায়গুলো বলেছে ঘোড়ার দিকে পিছন ফিরে। শুধু টাকার ওয়াল চাবুক হাতে তার দিকে ফিরে আছে।

হতভাগা ঘোড়া, টাকারওয়াল নিলামের ডাকে তাকে কিনে এনেছে, তার লায়ার কিংবা ডেমের খবর সে রাখেনা। অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলারই হোক আর আরবের টাট্টে হোক, টাকারওয়াল চায় কবচচালে তার টাকারওয়াল টানতে। বেলী তেলের দরকার নেই, একটু নিবিড় হওয়াই ভাল, কম কম খেতে দ্বিগুণে তাকে খাতে এনেছে। পাকারার হাড় তার বেড়িয়েছে, কুঁচিবাধা চোখে সে আশে পাশে দিল্লীর কল্লা, কুতব মিনার, হুমায়েনের পতন প্রসিদ্ধ দিড়ি কিছুই দেখতে পার না, বখন বাজীরের সেখানে পৌছাতে নিয়ে যায়।

এই হতভাগা ঘোটকেরই গ্রেট-গ্রাণ্ড-লায়ার, প্রপিতামহের পিঠে দাঁড়িয়ে অষ্ট্রেলিয়ার কোন আদিম অধিবাসী জোয়ান লবলে তার চুমেরাং ছুড়ত। বিশেষতঃ তেপান্তরের মাঠে তার উদ্ভাস বিজ্ঞাংগতি, সে গতির কলে বাতাল তার অঙ্গ বেয়ে ঝড়ে বেগে বহে যেত—

সেই জাতের ঘোড়া, চোখ দ্বিগুণে এর চন্দনা দেখা যায় না! কিন্তু উপায় কি? —নিয়তি।

টগ্‌বগ্‌, টগ্‌বগ্‌ কবচচালে ঘোড়া ছুটিয়ে টাকারওয়াল আমার দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলো ঘেঁষিয়ে নিয়ে বেড়াল, এক নাগাড়ে আধবেলার ঘোড়া প্রায় দশকোশ রাস্তা ছুটেছে, পাখর বাধানো রাস্তা। কুতব মিনার থেকে ফিরে চাঁদনি চকে এলে সে চার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে জল জল হাঁপাতে লাগল, এখুনি বৃষ্টি পড়ে'যায়। কনকনে শীতের হাওয়া বইছে, আমার হাড়ের ভিতর অবশিষ্টক' ঠক' করে কাঁপছিল, তাই ঘোড়ার গা বন্ধে' ঘাম ঝরছিল না বটে, কিন্তু তার ক্রান্তি দেখে মারা হ'ল! আমি টাকারওয়ালকে বললাম, "আর আমি তোমার টাকার চড়ে থাকব না, আরও একঘণ্টা অংশ ভাড়া হিসেবে বাকি আছে, কিন্তু তোমার ঘোড়া বড় হাঁপিয়ে গিয়েছে।"

টাকারওয়াল বললে, "নেহি সাআব! ঘোড়া হাঁপাতেই পারে না, ভালো জাতের ঘোড়া—হাঁপালেই হ'ল! কোথায় বাবেন আপনি বলুন, আপনাকে পৌছে দেব"—

আমি বললাম, "আমার বড় শীত করছে, একটা ওভার-কোট তৈরী করতে হবে। খুব লম্বায় করতে চাই,—আমাদের

কলকাতার শীতে' আর ওভারকোট লাগে না, ওটা পড়ে' থাকবে। তুমি কোন বোকান জান, যেখানে লম্বায় একটা ওভার-কোট তৈরী করে' দেবে?—কিন্তু তোমার টাকার আমি চড়ছি না, তোমার ঘোড়া খুব খুবড়ে পড়ে যাবে, প্রাণাহত্যার ভাগী আমি হ'তে পারব না।"—তাকে ভাড়া চুকিয়ে দিতেই সে আফ্রাৎ বিগলিত হয়ে আমার লম্বা লম্বা করলে, আর বললে, "ঠাহ'রিয়ে সাআব, আমি আপনাকে খুব ভালো দজির বোকানে নিয়ে যাবছি, খুব লম্বাও, আমার টাকারটাকে ওই গাড়ীর আড্ডায় রেখে আমি, ঘোড়াটার মুখে "লডুগোলার বালতিটা বুলিয়ে দিয়েই আমি আসছি।"—

টাকারওয়াল পথ বেধিয়ে আমার যেখানে নিয়ে চলল, সেখানেটা কলকাতার চীনাপাড়ার গলির মতই সঙ্কীর্ণ—অন্ধকারে আর জনাকীর্ণ-তার দিল্লীর চাঁদনিচকের এ গলি বোধকরি চীনাপড়াকেও হার মানায়। শীতের দ্বিপ্রহর হ'তে চলল, এখনও এখানে সূর্যালোক প্রবেশের কোন ভরশাই নেই। গলির পথের উপরে জল পড়ে যে সামান্য কন্দম রয়েছে, ঠাণ্ডায় তা' তুষারের মত জমে রয়েছে।

গলির হ'পাশে ছোট ছোট কুঠুরি—তাতে নানাপ্রকার কারখানা। কোন কুঠুরিই পাঁচ,

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্তোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

হ হাতের বেশী নয় আরতনে, তারই মধ্যে কোনটার ছোপান কাপড় ছাপা হচ্ছে নানা-নক্সার, কোনটার পনেরো বিশজন মেয়ে পুরুষ চক্রাকারে বসেছে আর একমনে চর্খ-পাছকা সেলাই করছে। অনেক মেয়ের ক্রোড়েই নবজাত শিশু! জুতার উপর জরির কাজের নক্সা সেলাই হচ্ছে, এতে তারা চিনাক্তে কর পরমা উপার্জন করে? বিনিময়ে যে আহার তারা পায় তাতে ব্যয়িত শোণিতের কতখানি আবার পাকস্থলির ভিতর দিয়ে ফিরিয়ে পায়? পায়ে আমার মোটা পশমের মোজা, তথাপি যেন, পায়ের জুতা জোড়া আমার হংশন করছিল! এমনিধারা কোন শ্রমিক কতাই হয়ত' এ ডার্কি সু জোড়াও সেলাই করেছে।

অবশেষে পৌছে গেলাম এক দজির বোফাকানে সেখানেই সস্তার আমার ওভারকোট তৈয়েরী করে দেবে। দেখে শুনে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল, এখানে লভ্যই খুব সস্তার কাজ পাওয়া যাবে, টাঙ্গাওয়ালা সেলাম করে' বিদায় নিলে।

দজি পাঞ্জাবী, বুদ্ধ আর তার পুত্র বোফাকানে কাজ করছে। পুত্রের বয়স বোধকরি বছর চল্লিশ হবে, সেই সেলাইএর কলটা পা দিয়ে চালিয়ে চলেছে, একটা শেয়ারারি জামা সেলাই করছে। বুদ্ধ 'মেয়ের একটা করলে বলে' একটা সন্তো বাধা চলবার সাহায্যে অভিনিবেশ লক্ষ্য করে হাতে সেলাই করছে। উত্তর পাঞ্জাবের পার্শ্বত্যা অধিবাসীর মত প্রকাণ্ড আরতন। পিতাপুত্র, বুদ্ধ অবশ্য জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু ছেলেকে দেখলেই বোঝা যায় যৌবনে সবল পুরুষই ছিল সে। দারিস্যোর কঠোর সংগ্রামও তাহের বেশী কাঙ্ক্ষ করতে পারে নি।

বুদ্ধ যেখানে বসে আছে, তারই পিছনে ঘর খানিতে শাধা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গানো, ওই পর্দার পিছনেই এদের

অন্দরমহল। সেলাইএর কল ছেড়ে খলিফা লাহেব বধন আবার শরীরের বাপ নিচ্ছিল, তখনই ওই পর্দা ঠেলে একটা দশ এগারো বৎসরের ছেলে বাইরে এল, সুখে তার উচ্চিষ্ট ডাল খানিকটা লেগে রয়েছে দেখেই বুঝতে পারলাম, সে ওই অন্দরমহলে বোধকরি, তার মায়ের কাছে ডাল রোটা খাচ্ছিল।

বালক তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, বুদ্ধ তাকে ডেকে বললে, "কোথা যাচ্ছিস রে বাচ্চা? কেবলই খেলা?"— বালক ছুটে বেরিয়ে গেল, তার ক্রীড়া সঙ্গীরা ওই দিকে কোথায় তার প্রতীক্ষার রয়েছে। বুদ্ধ আমার পানে চেয়ে লহাস্তে বললে, "যেমন বাপ ছিল, তার বেটাও হয়েছে তেমনি—কেবল খেলা, কেবল খেলা! কাজকর্ম শেখবার নাম নেই।"

বাচ্চার পিতা সুখখানা একটু আড়াল করে হাসল, তারপরে আমার বললে, "তা' হ'লে কাপড় কিনে নিয়ে আনুন! জামা আপনার কখন চাই?"—

আমি বললাম "আজ লঙ্কার মধ্যে দিতে পারবে না?" সে ততক্ষণে আবার তার

কলে বলেছিল, আমার বললে, "হাঁ, তা' পারবে বৈ কি! আপনি, লাআব 'লাক' করে কাপড় নিয়ে এসে এখানে বসুন ওই কুরদিটাতে আমরা তিন আদমি খেটে আপনার কোট শেষ করে দেব, লঙ্কার মধ্যেই।" তারপরে একটু থেমে বললে, "আপনি কলকাতার লোক—আপনার খাতির করব বৈ কি!" শুনে একটু গর্ব অনুভব করলাম, দিল্লীর লোক তাহ'লে কলকাতার লোকের খাতির করে।

আমি "লাক" করবার জন্তে তাহের কাছে বিদায় নিলাম, সারা সকাল ঘুরেছি, জঠরে ক্ষুধানল জ্বলতে শুরু করেছে, পিতাপুত্র দু'জনে উঠে আমার সেলাম করে' পথে নাথিয়ে দিল।

বেলা একটার পূর্বেই আমি ফিরে এলে পর্দার কাছটিতে হাতলভাঙ্গা কাঠের কুরলি-খানা টেনে নিয়ে বসলাম। চারগজ 'পটু' কাপড় কিনে এনেছিলাম। বুদ্ধ গজর গজর করছিল, লঙ্কার বাতির পূর্বে বাচ্চা খেলা-থেকে বাড়ী ফিরবেনা।

পিতাপুত্র দু'জনে মিলে চটপট কাপড়-টাকে কেটে ফেললে, তাহের হাতের কাজ

পাক

কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে "কনক হেয়ার অয়েল" ও "কনক হেয়ার লোশন" অধিষ্ঠিত। ইহা ব্যবহারে অচিরেই আপনার চুল মন্থণ ও বৃদ্ধি হইবে। এবং যে কোন প্রকার কেশ রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হইবেন। কিংবা ডাঃ ডিগোন্স (হেয়ার ডিভিজ স্পেশালিষ্ট) (লণ্ডন) চিকিৎসাধীনে আনিয়া জটিল কেশ রোগ হইতে মুক্ত হউন। মূল্য আশাতীত সুলভ করা হইয়াছে।

ম্যানুফ্যাকচারার :—

ডাঃ ডিগোন্স কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

৪৯ বি, হারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন বি, বি ৪৩৮৬

দি সিটি ব্যাঙ্কিং এণ্ড লোন ডিপার্টমেন্ট হইতে ২৫ মূল্যের মাসিক

৥০ আনা সুদের বণ্ড খরিদ করিয়া মাসিক আয়ের সংস্থান করুন।

শিক্ষারিত বিষয়বস্তু জন্ম অনুসন্ধান করুন।

পর্দার অন্তরালে তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দিয়ে
'বিলে, আমার কাজটাই হু'জনে মিলে করবে
বলে!

তারের কাজ করবার তৎপরতা নতিই
মনকে মুগ্ধ করে' হয়,—একটা জামা
তৈরীরিতে পরিশ্রম কি কম? ইতিপূর্বে
কখনও আমি বলে' বলে' দেখিনি। পটুটা
কাটা হ'ল, একে একে আঁতিন, গলা হাতে
সেগাই হ'ল—

সেটা আমার অঙ্গে ঢাপিয়ে টাই বেঁধে
হ'ল, পুরাণো আঁটটার একপ্তর মরলা জমে
গিয়েছে, তার মধ্যে আমি কিছুই বুঝতে
পারলামনা, জামাটা আমার বানান্ছে কিনা।
কিন্তু হজ্জি হুজনার উপর আমার বখেটে আস্থা
জন্মে গিয়েছিল, কাজেই এদিক ওদিক টেনে
টুনে, হু'টার জায়গায় লেপুটিপিন্ এটে বখন
তারো কোটটা আমার অঙ্গ থেকে নামিয়ে
নিলে, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।
বুঝ লহাশে বললে, "আমার ছেলে যে
কলকাতায়ে চৌরঙ্গীর বড় থলিকার কাছে
কাজ করত সে অবশ্য আজ বারো, তেরো
বছর আগে।—দেখুননা আপনার জন্তে
ইংলিস্ কাটু কোট বানিয়ে দিচ্ছি।

আমি পুনরায় কুরনিতে বলে পড়লাম,
প্রতীক্ষা এখানে অনেককণই করতে হবে,
খটু খটু, খটু, খটু, অতিদ্রুত লেলাইয়ের
কল চলেছে,—তার একটানা লজ্জিত স্তনুতে
স্তনুতে আমার মন কখন সুস্থ কলিকাতায়
চলে গিয়েছে! চৌরঙ্গীর পাশে ময়দানে
সেখানে এতকণ শীতের পড়ন্ত রৌদ্র শ্রাবল
ঝালের উপর একখানা ফিকে লোপালী রংয়ের
পাতলা মসলিন বিছিয়ে দিচ্ছিল।

একটা কীর্তনের সুর যেন কোথা থেকে
কানে ভেলে ভেলে আসছিল।

শতক বরষ পরে,

বহু আঁইল ঘরে

রাখিকার হৃদয়ে উদ্ভাস—

গুণগুণ ধ্বনি, কুরনিটাতে বলে বলে
আমার মন তজ্জাজ্বল হয়ে এগেছিল, তজ্জার
ঝোরে বাংলাদেশের কোন সুস্থ পল্লী থেকে
যেন কোন্ পার্বকপ্রতিকা বিরহিনীর আনন্দো-
জ্জল লজ্জিত আমার কানে ভেলে আসছিল।
বড় মিষ্টি লাগছিল, নামনে যে লেলাইয়ের
কলটা খটু, খটু, খটু, খটু অতিদ্রুত একটানা
বেজে চলেছে, তা' আমি ভুলেই গেলাম।

কিছুকণ পরে' কি জানি কেন, হঠাৎ
তজ্জাটা ভেঙ্গে গেল। তখনই মনে হয়,
লজ্জিতের গুণগুণ ধ্বনি ত' তজ্জার ঝোরে
স্বপ্ন নয়, এই পর্দার অপর পার হতে কে
যেন আনমনে মুহূর্তে গান গাইতেছে!
কিন্তু এবে একেবারে বাংলার নিজস্ব সুর,
বাংলার কীর্তন! তবে কি—

লক্ষ্য লাগাব নতি নতিই আমার
ওতারকোটটা তৈরীরী হয়ে গেল। তবু
আমার মন চাইছিলনা হজ্জির হোকানটা
হেড়ে আসি! পর্দার অপরপারে হজ্জির
পত্নীকে একবার আমি দেখতে পেরেছি,
বোধহয় সে ইচ্ছে করেই আমার দেখা
দিয়েছিল। ডাগর চোখ দুটা তার একবার
আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে দৃষ্টি
নত করে' নিরেছিল। ভুল হবার জো
নেই!—সে বাঙ্গালিনী। বাংলার রূপে রলে
গড়া বাঙ্গালীর মেয়ে, অদৃষ্টের কোন
পরিহালে উত্তর পাজ্রাবের এক দক্ষিণ সঙ্গে
পরিণীতা হয়ে' আজ পর্দার আড়ালে
পায়জামা আর ওড়নার ঢাকায় পাজ্রাবী বধু
হয়েছে, কোন্ কাগ্য-বিপর্যয়ের কলে কোন
অনাথা আশ্রম থেকে এই পাজ্রাবী দক্ষিণ
তাকে কিনে এনেছিল কে জানে?



আমাদের প্রকাশিত ছোটদের
বই!

পাতাল পাতাল সুদৃশ্য এক-
রঙ ও তিন রঙের ছবিতে
সুসজ্জিত।

শিশু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

শ্রীব্রজমোহন দাশ সম্পাদিত
ছোটদের আহরিকা

রায় জলধর সেন বাহাদুরের
আইসক্রীম সন্দেশ

শ্রীকপীন্দ্র নাথ পালের
বাংলার জঙ্গলে

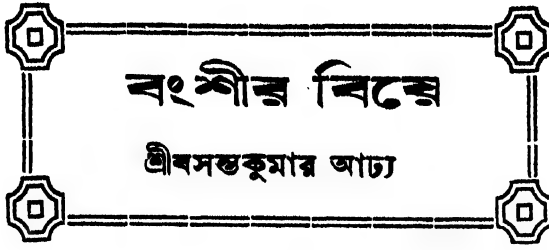
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
লে মিজারেবল

সুপ্রিয় সোমের
মাগরের নীচে ভয়ঙ্কর মানুষ

সহ প্রকাশিত
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রামধনু

কমলিনী সাহিত্য মন্দির

২২০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা।



বংশীর বিনোদ

শ্রীমন্তকুমার আচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বংশী তাড়াতাড়ি বলে "তা দেখা তো
দেখে। এইবার—"

খুড়ো বলে "হ্যাঁ, চল এইবার যাওয়া
থাক। পরের আইবুড়ো মেয়ে—কত
গায়ে ফিরবি রে বাঁধর?"

বলে আবার সেই মিঠে আদর।

বংশী দেখলে শেবে লিনেমার একটা
কলঙ্কারী হবে। খুড়োর বিলিপনগিরিতে
এখনই হয় তো কোন মেমলাহেব উঠে
গিয়ে জানাবে হারার অথরিটিকে। ফলে
হাস্তান্ধ এবং বিভাডিত। বংশী মনে
মনে "ভুর্গা" বলে ঝেড়ে উঠে পড়ে বলে
"তাই চলো। আগুন মিস্ ডাট।"

বংশী ও বিনোদিনি লিনেমার এসেছিল
স্টোর ডাটের কারে। বাইরে এলে বংশী
বিনোদিনীকে ট্রেনে লাগেজ তোলার মত
চাড়াতাড়ি করে তুলে দিবে বলে "আচ্ছা
মাগনি এখন আগুন মিস্ ডাট। রাম
সিং, মিসি বাবাকে লে যাও বাড়ী। মিস্
জাট কিছু তাববেন না। আমি ফিরবো
ট্যাক্সিতে।"

শক্তির ষাট পেরিয়ে যাবার মত লাই
করে মোটরখানা চলে গেল—বাকি বলে
langer zone এর বাইরে। বংশী
বিনোদিনীকে তো বাঁচালে, এখন নিজের
ঘরতে বাই থাক। বংশী খুড়োর দিকে

ডাকিয়ে দেখলে অন্ধকার জললে চটে।
বাঁধের চোখ যেন রক্তের গন্ধ পেয়ে বাঁই
বাঁই করে ঘুরছে। বংশীর বৃকের ভেতরটা
ইঁচোর পাঁচোর করতে লাগলো।

খুড়ো হাঁক দিলে—হালুম নয়—"বংশী!"
পড়া টিয়ার মত বংশী জবাব দিলে
"খুড়ো!"

খুড়ো কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর
হুত্যানুষ্ঠে গোবিন্দলালের মত বলে "একটা
কথা আছে।" একটু থেমে ফের বলে
"বুঝেছি কিছু কিছু।"

প্রায় আঁতকে উঠে বংশী বলে "বুঝেছি
কিছু কিছু?"

খুড়ো বংশীকে ধমক দিবে বলে "কিছু
কিছু নয়। সব জানতা হাম খুড়ো
যেন বংশীর ভুল শুধরে দিলে।

তারপর বলে "হুম প্রেম হয়েছে?"
বংশী বলে "হ্যাঁ, তা হয়েছে"

খুড়ো বলে উঠলো "আমারও।" বাজ
পড়লেও বংশী বোধ হয় এর চেয়ে বেশী
আঁতকে উঠতো না।

লে বলে "তোমারও?"

খুড়ো বলে "জানিনতো আমার শীকারের
principle? বাঘ মারি • কিন্তু বাঘিণী
খাঁচায় পুরি।"

বংশী আবার বলে "বাঘিণী?"

খুড়ো হাঁক ভেড়ে:
হ্যাঁ, বাঘিণী। বাঘিণী
এই ঠিক তোদের মিস্
আর আমার principle
নজর দেয় তার মাথা—

বংশী আবার আগুন
খুড়ো হ্যাঁ হ্যাঁ কবে
মাথা? এই বাতায় গা
বুঝলে কিছু বংশীবধন?
আচ্ছা, এখন আনি।"

বোকাই লরীর পিছু
পিঠের দিকে চেয়ে বংশী
ধাড়িয়ে রইলো। খা
শিখ ড্রাইভারের "বামুজি
উঠে বংশী দেখলে বাড়ী
নয়। ট্যাক্সি? ওঃ—
তার চাই। গাড়ীতে
ধপ করে বসে পড়ে বংশী
খানিকটা লামনের দিকে
বংশীর দিকে ফিরে শু
হোগা, বামু দাব তো
বংশী পেছু থেকে direct
আর শেবে ড্রাইভার ট্যা
বংশীর বাড়ীর লামনে।
চুটো টাকা তার হাতে
bell টা বাজালে আর সা
চন্দর দরজা খুলে দি
চুকে নিজের ঘরজাটা বে
তারপর চন্দরকে ওপরের
কাপ কফি দিতে বলে
রকমে উঠে গেল। E
ধপ করে spring খাটখা
খানা যেন আচমকা চা

গলে উঠলো "ইল, কে
র রূপতো দেখিনি
ডাটের মতন। হ্যাঁ,
ও, আমার শীকারে বে
"

গলে "তার মাথা?"
র হেলে বলে "তার
। ভালো দেখেছিল?
হ্যাঁ, খুব হলিয়ার।

দিকটার মত খুড়োর
খানিকখন হাঁ করে
লি একখানা ট্যাক্সির
ট্যাক্সি ডাকে চমকে
খুব বটে, তবে খুড়োর
হ্যাঁ! ট্যাক্সি তো
উঠে পেছুকার দীটে
তবু বলে "চালাও।"
এনে শিখ ড্রাইভার
খালে "কিথার বানে
বহি বোলা।" তখন
ion দিতে লাগলো
এনে হাড় করালে
মিটার না দেখেই
বয়ে বংশী calling
ক লম্বা ওর চাকর
।। বংশী বাড়ীতে
করে বন্ধ করলে।
বয়ে খুব গরম এক
গলে টলতে কোন
ed-room এ ঢুক
নার বলতেই খাট-
প পেরে কাপিয়ে



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা

উঠে বংশীকে ডিটকে ফেলে দেবার জোগাড় করলে। বংশী বিরক্ত হয়ে একখানা সোফার বললো আর তখনই চন্দর গরম ককি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সোফার সামনে একটা টিপয় টেনে এনে তার ওপর কাপটা রাখতেই বংশী কাপে কড়া জ্বা গোটা দ্রুত চুষক ছিলে। তারপর কয়েক চুষকে কাপটা খালি করে তার বৃকের ষড়ফড়ানি অনেকটা কমলো। একটা লিগারেট ধরাতে যেন তার ভাববার ক্ষমতা ফিরে এলো। সে চন্দরকে বলে দিলে “দেখ চন্দর, আজ রাতে কেউ ডাকলে দরজা খুলবি নে। যদি কেউ আমাকে ডাকে বলবি বাড়ীতে নেই। যদি বলে কোথায় গেছে, বলবি জানিনে। আচ্ছা, এখন যা। হ্যাঁ, দেখ, আজ রাত্তিরে জেগে জেগে ঘুমোবি, বুঝলি?”

চন্দর চোখ জুটো বড় বড় করে বলে “জেগে জেগে ঘুমোব কি? আপনার কি হয়েছে দাদাবাবু?” বংশী ব্যাকি ঘেরে বলে উঠলো “হবে আবার কি?...জেগে জেগে মানে বতটা জেগে জেগে পারবি, বুঝলি? আচ্ছা, এখন যা; হ্যাঁ দেখ খাবার ঢাকা দিয়ে রাখিস। পরে খাই খাবো, না খাই নেই নেই।”

চন্দর যেতে যেতে দরজার কাছে গেছে পেছ ফিরে একবার বংশীর পানে চেয়ে ঘরের বাইরে এলে বিড় বিড় করে বলে “ডাকারের ঘরের লগে আসনাই ছুটে গেছে।”

বংশী “ডাকারের ঘরে” কথাটা শুনে পেয়ে হাঁক দিলে “কি বলছিস রে বাবর?”

চন্দর ফিরে এলে দরজার একবার মুখটি বাড়িয়ে ষাড় নেড়ে শুধু “আহা” বলে চলে গেল। বংশী তখন আর একটা লিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসলো। পুরো ছটি ষটটা ভেবে শেষে একটা মতলব

এটে ফেলে। মনটা একটু হালকা হতে লে খাবার ঘরে গিয়ে কিছু খেয়ে এলে শোবার ঘরের দরজাটা বেশ করে বন্ধ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

যে মতলবটা এটে বংশী হালকা মনে যুখোল পেটা অবশ্য খুব বীরের যোগ্য নয়। তবু তাকে ভীড় বলতে পারিনে। কারণ, সব দিক বিচার করে তো রায় দিতে হবে। বিপদটা এমনি আচমকা তার ওপর এলে পড়েছিল যে হতবাক হয়ে যাওয়াই বংশীর মত ছেলের পক্ষে স্বাভাবিক। তার ওপর খুড়ো লোকটি তো বড় শোজা ছিলেননা। একে তো বংশীঘরের বংশের ছেলেরা সাধারণত: শিক্ষিত, ভদ্র, অসামরিক আর বলতে কি একটু আরেশী স্বভাবের ছিল আর খুড়োর জীবনটা কেটেছে বাঘ ভাল্লুকের পেছ পেছ ছুটে। কাজেই এরকম দুই different type এর পালোয়ানের challengeই বে-আইনী। সত্যি বলতে কি, কুটকুটে চেহারা, বি, এ, ডিগ্রী, বাপের পরশা, মিঠে গলা, ইংরিজি বুলি আর নিজের কার চালাবার ক্ষমতা নিয়ে তো আর শিকারী শিকারের সঙ্গে লড়া চলেনা। বিশেষ করে তার ক্ষমতা তো আর সুন্দর বনের বাঘ ভাল্লুকের চেয়ে বেশী নয়। ভেবে চিন্তে সে দেখলে বিপদ এড়াবার একটি মাত্র পথ তার সামনে খোলা আছে। বিনোদিনীকে ছাড়তে তার বুক ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু মাথাটাও তো আর বৃকের চেয়ে কম দামী জিনিস নয়। আর ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছে যে বর্তমানে মাথার পক্ষে ভোট দেওয়াই স্বাভাবিক আর বুদ্ধিমানের কাজ।

বংশী শুয়ে পড়লো বটে, কিন্তু ঘুম কি সে তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছিল? চোখ বুজে খানিকটা এপাশ ওপাশ করে সে ষেড়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে আলো আলিয়ে চিঠি লিখতে বলে গেল। সে বিনোদিনীকে লিখলে “বড় দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে কাল বৈকালে আপনার সঙ্গে

দেখা করার বৈ কথা দিইনিলাম তা রাখতে পারলুমনা। কারণ জরুরী দরকারে কালই আমাকে কানী যেতে হচ্ছে। আরো একটা কথা আপনাকে জানাচ্ছি। তার জন্তে আগে থেকে আপনার কাছ থেকে শতবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুব সুখী হয়েছি। কিন্তু একীবনে যদি আমাঘের আর দেখা না হয় তাহলে আরো সুখী হবো। জীবনে আপনাকে সুখী হতে দেখলে আমার চেয়ে বেশী সুখী কেউ হবে না জানবেন। সব সময়েই আপনার খবর পাবার চেষ্টা করবো। আচ্ছা, উপস্থিত বড় ব্যস্ত, হাতে মোটে সময় নেই। আবার ক্ষমা চেয়ে চিঠি শেষ করলুম।

ভাগ্যহীন

বংশী—

চিঠিখানা খামে ভরে ঠিকানা লিখে বংশী তাড়াতাড়ি চন্দরকে বিছানা থেকে তুলে বলে “চিঠিখানা এখনই ফেলে দিয়ে আর চন্দর।

চন্দর হাঁ করে বংশীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বংশী বলে উঠলো “বা বল্লম শুনেতে পেলি নে? ঘুম ছাড়েনি বুঝি? জরুরী চিঠি, এখনই গিয়ে ফেলে দিয়ে আর। দেবী হল—কি যে তার বরাতে আছে ভেবে বংশী নিজেই চুপ হয়ে গেল।

চন্দর বলে “কিন্তু আজ রাতে তো”—

বংশী বলে “হ্যাঁ, আজ রাত্তিরেই”—

চন্দর আর একবার হতাশভাবে মাথাটা নেড়ে “আহা” বলে চিঠিখানা নিয়ে চলে

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিপুল পানীয়

গেল। বংশী নেমে গেলো তার পিছু পিছু।
চন্দর বাড়ীর লামনে ডাকবাংলো চিঠিখানা
ফেলে দিয়ে এলো স্বচক্ষে দেখে বংশী আবার
গিরে বিছানার তুমে পড়লো। এবার আর
তাকে বেশীক্ষণ ছটফট করতে হোল না।
হতভাগ্য বংশীকে নিজাঘেবী অন্ততঃ একটু
কুপার চোখে দেখলেন।

পরদিন অনেক বেলাতে বিছানার পাশে
টেলিকোনের বন্থনানিতে বংশীর ঘুম
ভাঙলো। রিসিভারে হাত না দিয়ে বাড়
তুলে বাড়ি দেখলে লাড়ে দলটা বেজে গেছে।
সে বুঝলে তার চিঠি পেয়েই বিনোদিনী
কোনো তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। সে
উঠে পড়লো। ঘণ্টা বেজে থেমে গেল।
দাড়ী কামিয়ে, কাপড় ছেড়ে সব বংশী
চারের কাপটি খালি করেছে এমন সময় চন্দর
এলে বলে, “ডাক্তার সাহেবের দাখা দামোদর
হস্ত এলেছেন দাখাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।”

যেন মরা মানুষ দানোর পেয়ে বরফের
মত ঠাণ্ডা আঙ্গুল দিয়ে বংশীর শির দাঁড়াতে
সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করলে। তার মনে
হোল পা ছটো যেন বেহটার সঙ্গে অসহযোগ
করেছে। তবু মরি কি বাচি করে কোন
রকমে উঠে তালগাছের মত লতা, কবাতের মত
বুক, কবমুদ্রী হাঁটা চুল, জবরদস্ত সেই বৃদ্ধ
ভক্তলোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্তে বংশী
নীচে বৈঠকখানার নেমে এলো, বিনোদিনীর
ওই জ্যাঠা মশাইটির নাম বংশীর শোনা ছিল
বটে, কিন্তু দেখা কখন হয়নি আর এখনও
না হলেই সে স্মৃতি হোত। তবু বিনোদিনীর
জ্যাঠা মশাই, তার উপর অতিথি। বংশী
এগিরে গিরে মাথাটা প্রায় হাঁটুতে ঠেকিয়ে
প্রণাম করে বলে “নমস্কার। চা দিতে বলি?”

দামোদর হস্ত বল্লেন “না, না। চা
দিতে বলবেন। চা। ওঃ—চা দিতে
বলবেন। থাক।” ভক্তলোক চারের নামে
এমন মংক পেটকালেন যে অস্ত্র কেউ

উপস্থিত থাকলে অনায়াসে ভেবে নিতো
ভক্তলোক নিশ্চয়ই চা পান নিবারিণী সত্তার
সত্যাপতি হবেন। কিন্তু বংশীতো বুঝতেই
পেরেছিল বিশেষ করে ভক্তলোকের পরিচয়
পেয়ে আর তাঁর পিলে চমকানো গলার
আওয়াজ শুনে। ওই বাজখাঁই গলার
ধমকে দিল্লীর হরদমদাস বেহমরার
ব্যাকের কত কেরাণীর লাড়ে দলটার একটি
মিনিট পরে অফিসে এলে পেটের ভাত
চাল হয়ে গেছে তার হিসেব আছে কি?
তাই যখন দস্তমশাই মিনিট দুয়েক বংশীর
পানে কটমট করে তাকিয়ে একেবারে
চিঠির কথা তুললেন তখন বংশী মনে মনে
নিজের ভাগ্যকে আশীর্বাদ না করলেও
খুব বংশী অবাক হোল না।

“বংশী, আমাদের নেড়ী তোমার নেই
বেয়াব চিঠিখানা পেয়েছে, বুঝলে?”

হর কমাবার দুশাশয় বংশী বলে “ওঃ—
তাহলে ঠিক পেয়েছে?”

“হাঁ, আজ সকালে একটু আগে পেয়েছে।
তা ডাক টিকিট লাগাতে ভুলেছে কেন
হে? বেয়ারিং চার্জ দিতে হোল, বুঝলে?”

“লভি, আমি খুব দুঃখিত। ভুল হয়ে
গেছে। তাছাড়া রাতিরেই—আচ্ছা আমি—”

দস্তমশাই তার দুঃখ প্রকাশের চেষ্টাকে
দ্বিগিরে দ্বিগিরে বল্লেন “আরে—ও হু” চারটে
পরশা নেড়ীর কিছু নয়। কিন্তু চিঠিতে
বা লিখেছে তা একঘর অসহ। নেড়ী
বলছিল কাল দিনেমাতে তুমি ওকে—”

বংশী মাথা চুলক, কেশ, বাড় নীচু
করে বলে “হ্যা, কাল—তবে ঠিক তা নয়।
আমি—মানে, আপনি বুঝছেন—”

“হ্যা, খুব বুঝছি, বহুত বুঝছি, জলের
মত লাক বুঝছি। তুমি আমাদের
নেড়ীর মনে যা দিয়েছ, বুঝলে হে বংশী-
বদন? তাইবিরের আমি বেজার ভাল-

বাগি। তাহের মনে যা ছিলে পিঠের
হাল চামড়া—বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা?”
বেয়াব বাটপাড়ের নাম শুনেছ?”

“আজ্ঞে না।”

“বহুমায়েল, বেয়াব—বাটপাড়। চিনলে
ভাল করতে হে। লাবধান হতে পারতে
আগে থেকে। ইরা গালপাট্টা দাড়ী,
জোরা গাঁফ। সুষমাকে নিয়ে দেবার
পুজোর ছুটিতে শিবপুরের সরকারী বাগান
গিরেছিলুম। সফোর অন্ধকারে স্রবিধে পেয়ে
বাটপাড় সুষমার গলা থেকে হীরের
নেকলেসটা ভিনিয়ে নেবার জন্তে যেই না
ইরা বাহের মত নখওয়ালা হাতটি বাড়িয়েছে
অমনি কজ্জিটিতে কলে একটি প্যাচ—
শুনলে ভাল করতে হে। কোন খবরই
রাখো না দেখছি।”

বংশী দস্তকে খুশী করবার জন্তেই
বোধহয় বলে “আজ্ঞে, সবই তো জানলুম।
এইবার একটু চা আনতে বলি?”

দামোদর আর একবার বংশীর বাক্যকে
হালির বানে তালিরে দিয়ে বল্লেন “হ্যা!
হ্যা! হ্যা! হ্যা! চা আনতে বলি!
চা আনিরে নিজেই খাও হে, হরকার হয়ে
পড়েছে। আচ্ছা, আমি তাহলে চলুম
এখন। মনে থাকে যেন—”

(ক্রমশঃ)



অদূর ভবিষ্যতের ভাবনা

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এবং জাতির পরিবর্তন নানা ভাবেই হইয়া থাকে। হাজার বছর পূর্বে যে শিক্ষা এবং যে সভ্যতা মানুষকে বাঁচাইয়াছিল, কালের ইতিহাসে তাহার মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু বর্তমানে আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার পক্ষে তাহার মূল্য কতটুকু তাহার বিচার অবশ্য প্রয়োজন। একই সভ্যতা, একই পদ্ধতি যদি চিরকাল মানবের জীবন রক্ষার পক্ষে সত্য হইত, তাহা হইলে যুগে যুগে কালে কালে মানুষ নিত্য



সাইগল

তাঁহাও জানিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশিবার কথা, দেশের চারিদিকে বাহ্যিকের দেখিতেছি, হাজারে লইয়া আমাদের সকল স্তব্ধ হঃ, "তাঁহাদের জীবনধারাকে পরিবর্তন করিয়া শ্রেয়তর করা যায় কি না। দেশের মাটি চিত্রে নায়ক অশোক কে, তাহার অস্তিত্ব কোথাও আছে কি নাই, তাঁহাও আমাদের ভাবিবার কথা নহে। আমাদের দেখিতে হইবে অশোক যদি আজ দেশে না থাকে—তবে কাল তাঁহাকে সত্য করিয়া তোলা যায় কিনা। অশোক যে ভাবে নিজের এবং তাহার কয়েকজন নিকট বন্ধুর জীবনকে যে কণ্ঠে নিয়োগ করিল, ঠিক সেইভাবেই যে সকলের জীবনকে একই ধারায় নিযুক্ত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু ইহা আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে—অশোকের কর্ম-পদ্ধতি এবং চিন্তাধারা সত্য সত্যই দেশের কল্যাণে নিয়োগ করা যায় কিনা। যদি ইহা অপেক্ষা শ্রেয়তর পথ বর্তমানে আমরা না পাই, তাহা হইলে আমাদের কল্পলোকের

মানুষ অশোকের কর্মপদ্ধতিকে কাজে লাগাইতে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করিনা। অশোকের কালের পথে বাধা অনেক। প্রতি পদে, প্রতি মঙ্গলকাজে সে তাহারই দেশের লোকের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল—কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যে সকল লোক প্রথমে নিজেদের মঙ্গলকে বুঝিতে পারে নাই। তাহারাই একদিন অশোকের পরম লক্ষ্যরূপে তাহারই পাটে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সত্যটিকে আমাদের মনে রাখা দরকার। যে কোন ভাল কাজে,



চন্দ্রাবতী

নব পথের বা সত্যের সন্ধান কখনই করিত না। এই কথাই আজ আমাদের জীবনে বাঁচাই করিবার সময় আলিয়াছে।

দেশের মাটি চিত্রখানি ও এমনি ধারা একটি সত্য বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতেছে। এই চিত্রখানির চরিত্র বাহারা, তাঁহারা আছে কি নাই, তাঁহাদের আমরা জানি কি জানিনা, তাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় আছে কি পরিচয় নাই,



অমর মল্লিক

যে কোন নূতন পথে চলিবার সময় প্রথম পথ যাত্রীরা বহু প্রকার বাধার দ্বারা নানা-ভাবে আক্রান্ত হয়, কিন্তু যে জন বীরের মত সকল বাধাকে তুচ্ছ করিয়া আগে চলিয়া যায় সেই হয় জয়ী। পথ সত্য, পথের বাধা মিথ্যা অথবা মারা—বহু মহাজন বহুবার এই কথা বলিয়াছেন, কাজে কাজেই, আমাদের পথকে, সত্য পথকেই আলোর করিতে হইবে—বাধাকে যেমন করিয়াই হোক বিভাডিত করিতে হইবে। দেশের মাটি চিত্রেও এই কথাই হয়ত বলা হইয়াছে। দেশের সকল জনই পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিক

হুইতে পারেনা। সকলজনই কেবল কেতাবের পাতা মুখস্ত করিয়া জীবন যুদ্ধ চালাইতে পারেনা। আমাদের দেশে এমন একটি সময় আশিয়া পড়িয়াছে। যখন আমাদের দেশিতে হইবে যে শতকরা ৯০ জন লোক ভাল করিয়া এমন কি করিতে পারে? যাহাতে তাহাদের পেট ভরিয়া হুইবেলা খাবার জুটিতে পারে। স্বভাবতই আমাদের সেই চিরপুৰাতন সকল মহা মাটির কথাই মনে আসে, কিন্তু এট মাটির দানও গ্রহণ করিতে হইলে তাহার মূল্য দিতে হইবে।



উমা

মূল্য কি ভাবে দিতে হইবে, তাহা ভাবিবার কথা তাঁহাদের যাহারা দেশকে এবং জাতিকে—দেশের সময়, অন্ধকার রাজিতে আশার পথ দেখায়। অশোক যে ভাবে মাটিকে আশ্রয় করিল, যে ভাবে বা পদ্ধতিতে যে মাটিকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া, তাহার দান প্রার্থনা করিল, তার সত্য পথ এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কিনা আমাদের বাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। অশোক যাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিল—তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা কম বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

আমরা ইহাও মনে করি যে অশোকের প্রাণে যে বিশ্বাস এবং যে আশা আছে, আমাদের দেশের বহু জনের, বহু কর্মীর

প্রাণেই তাহা বর্তমান—কেবলমাত্র অতীব উপযুক্ত ক্ষেত্র বা প্রেরণার। দেশের অন্ধকেরও বেশী দৃষ্টি কষ্ট হুইবে সেইদিন যে দিন লোকে পেট ভরিয়া অন্তত একবেলাও খাইতে পাইবে। দেশের মাটি চিত্রের নায়কও এই কথা বিশ্বাস করিত। তাই সে প্রথমেই এই চেষ্টা করিল, যাহাতে গ্রামের লোক, চাষীর দল পেট পুরিয়া অন্নলাভ করিতে পারে। অশোক দেশের অত্যাচার মঙ্গল চেষ্টাকে ভুল বলে নাই, বা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে নাই। সে কেবল নিজের বিচার বুদ্ধিতে যাহা প্রের-মনে করিয়াছিল, অধিকতর মঙ্গলকর বলিয়া ব্রূহিতে পারিয়াছিল, সেট পথে নিজের কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিল। দেশের মাটি চিত্র লম্বকে যতদূর জানি বা শুনিয়াছি, তাহাতে অশোকের মত কর্মীর যে প্রয়োজন আছে, ইহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই।

=====

গান

ত্রীপূর্ণেন্দু রায়

=====

কুটির ঘিরে নিবিড় হ'লো

সাব্যের আশ্রয়ার;

আজ নিশাতে আশার হ'বে

• প্রথম অভিনয়।

সেরে নি' মোর কর্ম যতো,

লাজতে হ'বে মনের মতো,

গুলিয়া ফেলে শিশি বাদ—

মলিন মূলিকার ॥

কোন্ দূরে সে ডাকিয়া গেছে

আকুল ক'রে বাজিয়ে বীণা;

বিজন পানে চাঁদের রূপে

সরিং দেখা স্বপন-লীনা।

সেখায় বঁধু উচ্চকিয়া—

অধর-সুখা-পরশ নিয়া;


(আজি) রাডুবে দিয়া সকল ক'রে—

মিলন নিরালার ॥

—:—

ফোন ২৭৭৪

বড় বাজার



কাঠের জাট

কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তেল

ভারতের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আপনার সারকুলার রোড, কলিঃ

রক্তধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)

নীরব বায়ুর একটি ছোটভাই এই বাড়ীতে থাকিত তাহার নাম নিরাপদ। তাহার বয়স আঠারো কি উনিশ হইবে। — যৌবনের প্রথম রেখাপাত শুনি তাহার মুখে চোখে কারোম হইয়া বলিয়াছিল। ভ্রাতাধরে গুপ্ত-শস্ত্রের শ্রমল বর্ণ-বিভাল বর্ণাশেষে প্রান্তরের মত চারিদিক্কার শোভা বর্জিত করিত। নিরাপদ লেখাপড়া শিখিতে কলেজে যাইত, কিন্তু কলেজে যাইলেই যে লেখাপড়া হয়, এমন প্রমাণ সে নিজের উপর দেখাইতে পারিত না। তবে কলেজে যাইবার যে মানুষি প্রথটা তাহার দ্বাৰা বহাল করিয়া দিয়াছিল, সেইটাই সে মাত্র করিয়া চলিত মাত্র।

নিরাপদ থাকিত তাহার দ্বাৰার নিকট হইতে দূরে। সে নীচেকার এক-খানি খালি ঘর অধিকার করিয়া থাকিত। ঘরখানি তাহার দ্বাৰার বৈঠকখানা হইতে তকাত্বে, — একেবারে শেষ দিকে! তাহার ঘর পার হইলেই বাটার পশ্চাতের বাগান আসিয়া পড়ে। নিরাপদ এই ঘরে থাকিয়া লেখাপড়া করিত—আবার তাহার চেয়ে বেশী, ফুলের গন্ধ শুকিয়া যৌবনের পুষ্পে বাতাল দিত। এই ভাবেই তাহার দিন কাটিত।

দুহরে একটা বায়োডোপ কোম্পানি আসিয়াছিল, তাহারই মূলত আলনের একখানা টিকিট কিনিয়া সে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত বায়োডোপ দেখিয়া যে দিন বাটা করিয়াছিল। তাহার দ্বাৰা টের পান নাই,

কেননা তিনি তারিয়ার অস্থল লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। বৌদির অস্থল নিরাপদের পক্ষে সুখের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; নিরাপদ 'এ সুযোগের যথালম্ব্য লম্বাবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাত্রির প্রথমটা ভাল করিয়া ঘুম হইতে-ছিল না, বায়োডোপে দেখা নারকনারিকি গুলো মুদ্রিত চক্কের উপরে কলরব তুলিতে ছিল। কিন্তু শেষে একখানা বাস্তব মুখ ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। খাওয়া দাওয়া সারিতে কোনও গোলমাল হয় নাই, কেননা সেটা পরবরাহের ভার ছিল মাহিনা করা ঠাকুর চাকরের উপর। দ্বাদ্য কি বউদির সঙ্গে সেটার কোনও লোজাসুজি লব্ধ ছিল না।

নিরাপদ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কি একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল। সেই স্বপ্নটার মাক্সবানে তাহাদের বাড়ীতে নতুন আশা তরুণীটি জন্মকাইয়া আসিয়া দৃশ্যপট নামাইতেছিল তুলিতেছিল, নিরাপদ তাহা মুগ্ধ দৃষ্টিতে উপভোগ করিতেছিল। রঙ্গমঞ্চের ক্রম-পরিণতি কতদূর আগাইয়াছিল, বলিতে পারা যায় না, — এমন সময়ে একটা চিংকারে অভিনয় ব্যথিত হইয়া পড়িল। তাহার ঘুমটাও হঠাৎ থাকা খাইয়া একেবারে চুরমার হইয়া ভাঙিয়া গেল। সে চোখ খুলিতে বাধ্য হইল, এবং ঘরের দিক দিয়া একটা আলোর রশ্মি আলিতে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে শুনিতে পাইল, ঘরে কে কলহাত করিতেছে, এবং তাহারই নাম ধরিয়া কে ডাকিতেছে।

“নিরাপদ বাবু! নিরাপদ বাবু? একবার উঠুন! একটু দরকার আছে!”

গলাটা যেন চেনা-চেনা!

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করিল, কে ও?

দরজা খুলুন; তাহলেই বুঝতে পারবেন!

বিশেষ দরকার! একবার উঠুন।

নিরাপদ উঠিল! কোতুল তাহাকে পুরুষস্তর সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল। সে উঠিয়া ঘরের খিল খুলিয়া দিল। দরজা খুলিয়া যাইতেই সে বাহা দেখিল, তাহাতে সে বিস্ময়ে এবং আনন্দে আধুত হইয়া গেল। অগ্নের মধ্যে এই ছবিটিকেই সে এতক্ষণ দেখিতেছিল।

আপনি? আপনি?

“হাঁ আমি। আপনি একবার ডাক্তারবাবু বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনতে পারেন? দ্বিধার জর বড় বেড়েছে! আমরা ভর পাজি।”

—কার? বউদির?

—হাঁ! অর এখন ১০৬ ডিগ্রি! কি কর্ক, ভেবে পাজিনে!

—১০৬ ডিগ্রি? তবেই তো! তাহলে তো এখন যেতে হয়! কি বলেন?

—হাঁ, এখনই আর ঘেরি কর্কেন না! শীগ্গির যান।

—কোন ডাক্তার বাবুকে ডাকতে হবে?

—তাও জানেন না! যে ডাক্তারবাবু আমাদের বাড়ী যেখেন! নতীশ ডাক্তার! তিনিই তো দ্বিধকে দেখতেন!

—নতীশ ডাক্তার! আজ্ঞা বাচ্চি!

—নিরাপদ কারিগ লইবার জন্ত, ঘরের এককোণে যে পোষাকের আলনাটি ছিল, তাহারই নিকটে গেল। আলনা হইতে সেটা টানিতে টানিতে বলিল। নতীশ ডাক্তার! তার ঠিকানাটা কোথায়, বলতে পারেন?

এই ভারতের
মহামানবের সাগরতীরে
মানবতার যে পরম সত্য
মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে

কোরা

তাহারই মূর্তরূপ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

সেই অতুলনীয় সৃষ্টির
চিত্রানুবাদ
করিবার গৌরব
লাভ করিয়াছেন

দেবদত্ত ফিল্মস্

—তার ঠিকানাটাও আপনি জানেন না?

তবে, ভাল লোককে আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছি।

কথাটা নিন্দার। কেননা, বাড়ীর ডাক্তারের ঠিকানা বাড়ীর একজন বুৎপুরুষ যে চিনে না, ইহা কখনই সম্মানের কথা নয়। নিরাপত্তার বৃদ্ধি তত তীক্ষ্ণ না হইলেও, এটুকু বৃদ্ধিতে তাহার বিলম্ব হইল না। এই সুন্দরী প্রশরিতী স্বপ্নদেবীর নিকট একরূপ নিন্দানুচক মন্তব্য কুড়াইতে সে একেবারেই রাজি ছিল না। কাজেই সে সামগাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

না—না! আচ্ছা আমি ঠিকানা জেনে নিচ্ছি রামধীনের কাছে। হাঁ, বাড়ীর ডাক্তারের ঠিকানাটা জেনে রাখা উচিত ছিল বটে! কিন্তু কি জানেন, পড়ানুনা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, — আর এবারের মাথাধেটিক্স এর প্রেক্ষাপটটা এমন সব ভারি অঙ্ক করতে হয়েছে, — যে ডাক্তারের ঠিকানাভ' দূরের কথা, —নিজের ঠিকানা অবধি ভুলে যেতে বসেছি।

আগন্তুক কসু করিয়া একটু স্নেহের স্বরে বলিল।

দেখবেন সেটা বেন কর্কেন না! এই স্নাত্রে ডাক্তার ডেকে আনতে যদি আপনি নিজের ঠিকানা ভুলে যান,—তা'লে আমরা আবার 'আর' এক বিপদে পড়বো। বাড়ীর মধ্যে এই বিপদ,—আবার বাইরেও যদি,—

—না! না! তা নয়। নিজের ঠিকানাটা কি আর লভ্যি লভ্যি ভুলটি! তা নয়। তবে লেই রকম অবস্থা হবার মত হয়েছে!

—হয়েছে না কি? তবে আপনার

চেয়ে রামধীনের পাঠানই ভাল ছিল! সে হয়তো মাথা ঠিক ক'রে আপনার চেয়ে আরও তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডেকে আনতে পারতো!”

যাহাকে স্বপ্নে দেখিতে এত সুন্দর, সে যে বচনে এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারে, নিরাপত্তার তাহা জানা ছিল না। কিন্তু তবু এই অকারণ প্রচ্ছন্ন নিন্দাটুকু এমন একজোড়া বিফল রক্তিম ওষ্ঠাধর হইতে আশিরাছিল, যে নিরাপত্তা এই নিন্দার কাটান দেওয়া অপেক্ষা অল্প প্রকারের লম্বট করিবার উপায় বুদ্ধিবৃত্ত বলিয়া বিবেচনা করিল।

—আপনার শীগগির শীগগির ডেকে আনলেইত হোলো।

—আবার কি! এই তো—ঠিক আঠারো বছরের ছোঁকা বাবুদের কাজ! আঠারো বছরে যেমন আঙুল ছুঁবে, তেমন কি আর,—

ততক্ষণে নিরাপত্তার জামা ও জুতা পরা হইয়া গিয়াছে। এবং সে টপ করিয়া একটি ছড়ি ঘরের কোণ হইতে তুলিয়া লইয়াই ছুটিল।

বাইবার সময়ে একবার পিছন দিকে তাকাইয়া লবঙ্গর ছাত্তোজ্জল মুখখানি হইতে চকের ছাড়া দিয়া খানিকটা সুধা খাম্চা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। লবঙ্গর মুখখানি তাহাতে মেঘভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সুবকের চাহনিতে লবঙ্গর আলকা হইল, তাহার ভবিষ্যতের পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

পাড়ি

শ্রীসমীরকুমার ঘোষ

(১)

নাগর পথে চপল রথে

আজ প্রভাতে ছুটি

আত্মহারা বরণা ধারা

শিলার 'পরে লুটি।

উপল পরে উপল শিরে

নৃত্য বিভোল ফিরে ফিরে

বাউল এমন প্রাতিটি কল

বাধন ফেলে টুটি।

(২)

আকাশ তলে শুভ্র জলে

লাল মেঘের ছায়া

চলত গিয়ে লুটিয়ে দিয়ে

আসছে মেঘ-মায়া।

দেবদারু বন সারে সারে

ডাক দিয়ে যার বারে বারে

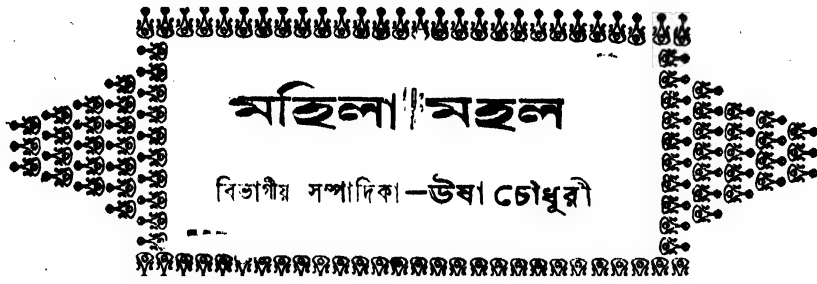
—মুক্ত আমি আর কি থামি

মিললো যবে ছুটি।

গর্ভ নিরোধ বাটিকা
বহুপরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ঔষধমাত্র একবার সেবনে এক বৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫ টাকা
ডাকিম এম.এস.জামান
৪২, ধর্মভালা স্ট্রিট, কলিকাতা



ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।



আনন্দ শব্দের মধ্যে যে লাবণীল স্বাক্ষর নিহিত আছে, তার অর্থ একের মধ্যে লহজে বোধগম্য হয় না। বহুর মধ্যে নানারূপে নানা রংএ তার প্রকাশ পায় মানুষের প্রকৃতিতে, মানুষের জীবনে। আনন্দ প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মানুষ এই নম্বর জগতে প্রকৃতির পরিবর্তনে আপনাকে উপভোগ করে থাকে। তারগের বিমল জ্যোতি যে লাম্বকের অন্তর আলোকিত করতে পেরেছে; শিশু, প্রাশান্ত, স্নানরূপে আনন্দ সেখানে বাসা বেঁধে থাকে। পরোপকার প্রবৃত্তি মানব-প্রকৃতির মধ্যে আত্মগোপন করে অপরিপূর্ণীয় আনন্দরূপে সজীবীত থাকে। স্বপ্ন, স্বাক্ষর, উদারতার ভেতর যে গভীর আনন্দরহস্য অপ্রকাশ থাকে; নম্বর সংসারে তার তুলনা চলে না। আধ্যাত্মিক আনন্দ কি মোহমুগ্ধকর—তার বর্ণনা দিতে অক্ষম।

সংসারে সংসারী জীব এই মানুষ, যে সুখ দুঃখ নিয়ে প্রতিদিন চলাফেরা করছে, তারই মধ্যে একটা দিকে একটা জিনিষ আছে, সেটা সত্যই আনন্দদায়ক। পতি-পত্নীর প্রেমে যে আনন্দ আছে—সে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ যে প্রতীক অর্থাৎ সন্তান, মা বাপের কাছে আসে, সত্যই সেটা আনন্দের। জীবনের প্রথম উদার প্রত্যাহার-অনুরণের মত তরুণ তরুণীর বুকে তারা যে আনন্দ, যে জেহ হিল্লোল জাগিয়ে তোলে; পরবর্তী চলার পথে সেই অনাবিল আনন্দের রেশটুকু কখনও স্মরণের কোণে জেগে ওঠে আনন্দে, হর্ষে, কখনও

মা বাপের বুকে অলহনীয় বিবাহের বিচ্ছেদ বাধার আকুল হয়ে ওঠে। পরিবর্তনশীল জগতে সুখ দুঃখ হাসি ও অশ্রু বৈশাখী ঝড়ের মত আসে আর যায়। স্মৃতির আনন্দ তখন জনক জননীর বাণিত অন্তর প্রাণিত করে লাস্তনার সুর ডেকে আনতে, চেষ্টা করে। কালের রূপান্তরে মানুষ দুঃখকে ভুলে আনন্দকে পেতে চায় নবরূপে নব নব লক্ষ্যে।

সংসার পথ চর্চম, বনপথের চেয়ে কত বন্ধুর, সেটা মানুষ প্রথম জীবনে সূতের স্রোতে চলার সময় বুঝি জ্বরজ্বল করতে পারে না। যদি সেটা মানুষ পারত তাহা হলে স্বেচ্ছাকৃত অশান্তি বা দুঃখকে ভোগ করতে হোত না। জন্ম মৃত্যু যখন সৃষ্টির নিয়মে আসে যায়; তখন মানুষ এই বাসাবাড়ীতে যে কটা দিন থাকতে পার সেইখানে আনন্দকে স্থায়ী ও সুন্দর করে বাঁধতে পারেনা কেন?

সংসার পথে চলতে গিয়ে হিম্মতীরা লাভ করে সন্তান জীবন, এক থেকে বহু। সন্তানের মা হওয়ার আনন্দ অবর্ণনীয়। আনন্দময়ী মায়ের হারিষ সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হয়। মায়ের হারিষ আজ কত শিশিল তারই কথক্সে আলোচনা করতে চাই। হয়ত কোন মায়ের ভাল লাগতে পারে। সংখ্যায় একক হলেও সার্থক। সন্তানের হারিষ যখন মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে তখন মাকে সত্যই লজাগ হতে হয়। আধুনিক তরুণীমায়েরা কি বুঝে চলতে চায়, সেটা বুঝতে পারা যায় না। যখন শিশু মায়ের কোল থেকে চলে যায় অলময়ে,

অবতনে, অনিয়মে তখন মায়ের বুকে যে ব্যাথা আসে সে ব্যাথাও অবর্ণনীয়।

মায়ের হারিষ শিশুপালন, শিশুপরিচর্যা জ্ঞানের মধ্যে কার্যকরী হওয়া একান্ত দরকার। শিশু প্রকৃত মানুষ হতে সময় লগ্নে ১৮ বৎসর। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষিকে লক্ষ্য রাখা মায়ের কর্তব্য। দাদাদাদার হাতে শিশুকে বাহিরে বেড়িয়ে আনা পুণ্যন্ত নির্ভর করা চলতে পারে। প্রথমাবধি স্তন্যদুগ্ধে শিশুর পরিপুষ্টি হচ্ছে কিনা; অর্থাৎ, পেট ভরছে কিনা সে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত। তারপর নিত্য স্নান, যুক্ত হাওয়ার মধ্যে শিশুসুলভ বেহ বাড়তে পারছে কিনা দেখতে হবে। লিভার ক্রমি, কোষ্ঠবদ্ধতা লিভার বাহাতে শিশুর শরীরে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, মায়ের খরচুটি সে দিকে থাকা দরকার। বিলাতী পেটেন্ট দুধ, বিলাতী অম্লকরণ ফিডিং-বোতল ও রবারচুবি একেবারে বর্জনীয়। যে ভাবে খোজলুম্বাক আপনাবের ছেলে মেয়ের অলমোঠবের শোভা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে থাকে; সেভাবে অম্ল অম্লকরণ আমরা করতে পারিনা; আধা-অম্লকরণ সন্তানের স্বাস্থ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকর সেটা না বুঝে চলে আমরা ঘরে বাইরে হালালপদ হয়ে থাকি। ১ ছটাক গরুর দুধে লমপরিমান জল দিয়ে ফুটিয়ে তালের মিহরি লব্ববোহগ শিশুকে, ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ালে; পেটেন্ট দুধের অপেক্ষা বেশী পুষ্টিকর হয়; অর্থের দিক দিয়াও লাভের হয়ে থাকে।

শিশুর বয়সের সঙ্গে তার খেলার ব্যবস্থা, তারপর শিশুর লেখাপড়ার সময় যখন আসে, তখন পিতার চেয়ে মায়ের হারিষ বেশী বলে প্রদর্শন হয়ে থাকে। মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্তানের প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। কৈশোরে সেই প্রাথমিক শিক্ষা কোন পথে, কি ভাবে, কি গতিতে চলেছে, একমাত্র গর্ভধারিণী

জননী সেইটা লক্ষ্য করতে পারে। মায়ের দ্বাৰা কিশোর চরিত্র যে ভাবে গঠিত হয়, মায়ের অনন্যোন্মোহের ফলে সেই কিশোরমনে পঙ্কিল ছায়ার রেখাপাত করতে পারে; ভবিষ্যৎ জীবনে তার বিষয় ফল একটা লংগারকে প্রজ্জ্বলিত করতে সাহায্য করে। মায়ের স্মৃতিষ্ক দৃষ্টির ওপর লস্কান চরিত্র উদ্ভব হয়ে লংগার, লম্বাজ ও বংশধরের কীৰ্ত্তি উজ্জ্বল-তর হতে পারে।

আমার মনে হয় আজকাল সম্বন্ধে, পল্লীতে কোন লস্কানই মায়ের বশীভূত নয়। সে ঘোষ কি ছেলেদের, সে ঘোষ কি স্কুলের? সে ঘোষ কি কালের? কখনই নয়, মায়ের স্পষ্টীকৃত মন ছেলে মেয়ের সঙ্গে ছায়ার মত অনুসরণ করা স্বভাব। চরিত্র গঠনই কিশোর জীবনের মূলভিত্তি স্থাপন স্বরূপ। চরিত্র যদি সাময়িক দুর্বলতার মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহা হলে ভবিষ্যৎ জীবনে বৈচিত্র্য কি? আনন্দ কোথায়? পুণ্ডিতবিদ্যায় যদি চরিত্রোপযোগী শিক্ষা দৃঢ়তর না হোতে পারল, সে শিক্ষা যদি বৈদেশিক বলুখ আবহাওয়ার পরিপুষ্ট হতে আগ্রহশীল হয়; সে শিক্ষা কি মায়ের অভিপায় স্বরূপ নয়?

আজকাল চোখের সামনে দেখা যায় প্রতি কিশোর প্রত্যেক দিনে মায়ের নূতন বইয়ের প্রকাশ দিনে জোর হতে ফটকের দ্বারে ধাক্কা দেয়। যদিও প্রবেশের সুবিধা না পায়; তাহা হলে গুপ্তার কাছ থেকে বেনী পরদা দিচ্ছেও সেদিনের টিকিট কিনে থাকে। দিনে মায়ের চিত্র ভাল কি মন্দ, স্কুলটি কিনা জানবার প্রয়োজন তাহের নেই বলে মনে হয়। এই ভাবেই কিশোর মনে অলংঘ্যের পরিচয় প্রকাশ পায়। নৈতিক স্বাস্থ্য তারাই অকালে হারায়। মায়ের স্পষ্টীকৃত যদি তীক্ষ্ণভাবে লস্কানের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলত, তাহা হলে এভাবে কিশোরের স্বাস্থ্য এবং লংঘ্য

হারাত না। কিশোর কিশোরীর আদর্শ-মূলক দিনে মায়ের আদর্শের বেশে তৈরী হওয়া সম্ভব নয় বলে পরিচালকবর্গ মনে করে থাকেন বোধহয়; নহিলে অনুকরণশীল দুর্ভাগা দেশে শিশুচিত্র লস্কাদানে এত অনন্যোন্মোহ কেন? কাজে কাজেই তরলমতী কিশোর কিশোরী বাংলা লবাক বেখেই বৈচিত্র্যহীন প্রেমের ত্রাকার-জনক চিত্রও মিষ্টায়ের মত গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে। প্রতিকার কোথায়? নূতন মায়েরা চায় যে ভাবে তাহের ভাইপো ভাইবোরা চলে আসছে সেই নূতন সাজে, নূতন খাজে ছেলেমেয়েদের লাজাতে। ধারণা,—শিক্ষা সে আপনি লম্বয় হলে হবে। এখন ১১-২ বছরের শিশু মেয়েরা কাপড় পরতে চায় ঘুরিয়ে আচল দিয়ে, লামাজ এদিক ওদিক হলেই রসাতল। জননী হালিরা হালিরা শিশুর মতামতে নির্ভর করে থাকে। শিশু মনে যে বিলাস যে প্রলাধন গোপনে নীড় বাঁধতে চায়, জননীর অনাগ্রহ স্পষ্টীকৃত তার মূল দৃঢ় হতে চলে কৃত্রিম চুপ বালীর লংঘ্যে। অপরিণামদর্শিতার ফল লামাজ কৃত্রিমকম্পেই ধ্বংসজুপের সৃষ্টি।

তরুণীরা আজ বিলাতী ক্যান্সানে নিজেদের জ্যাকেট, ব্লাউজ, বডি তৈরী কোরে জনবহুল রাস্তা দিয়ে পছন্দে চলে যায়; বিলাতী অনুকরণীয় চকলমুখর হালির স্রোত ছড়িয়ে। ক্যান্সানের এই নথরূপ মায়ের চোখ এড়িয়ে যায় বলে মনে হয় না। মনে হয় তরুণী মেয়েদের, বোনেদের প্রলাধন ও লংঘ্যে লম্ব চলার লম্বকে ইজিতে শিক্ষা দেওয়ার লাহের অভাব। লংঘ্যে স্পষ্টীকৃত ছেলেমেয়েকে জননী যদি বিতে কুণ্ঠিত বা ঔদাস্য প্রকাশ করে তার ফল লম্বাজ লংঘ্যে বিশৃঙ্খল আনতে ধেরী হয় না। গাছের স্মৃতি সুরমাণ ফল বা মনোহারী বৃহৎ গন্ধবহ মূল

বাগানের মালীর কৃতিত্বেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। বীজ বত উৎকৃষ্টই হোক—চারাকে লম্বকে না রাখলে, বীজের ভালমন্দর কোন মূল্যই থাকেনা। লংঘ্যে জনক জননী বত মহান হউক; লস্কান প্রতিপালনই তাহের কৃতিত্ব। কৃত্রিম আনন্দের পিছনে আলোর মত বাংলার ছেলেমেয়ে ছুটে চলেছে। আনন্দ! প্রকৃত আনন্দ আজ কোথায়? বিস্তার আনন্দ উৎসাহ আজ নেই। বিলাসে আনন্দ নেই; অশিক্ষাতেও আনন্দ নেই। গার্হস্থ্য জীবন স্মরণ আনন্দমুখর করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব জননীর স্পষ্টীকৃত ওপর নির্ভর করছে। কিশোর কিশোরী আনন্দের স্মৃতিস্মৃতি—তারাই একদিন চরিত্র মাধুর্য—শিক্ষার বিমল আলোকে, লক্ষ্যমুখর স্বাস্থ্যবীণ মনে দেশের বুকে প্রতিভা বিতরণ করতে পারবে এ আশা প্রত্যেকেই করে থাকে; লস্কানের জননী-গৌরব আদর্শের বোনেদের কর্তব্যকে জাগরিত করুক। ছেলেমেয়েকে শিক্ষার জ্ঞান লম্বাভাবে এগিয়ে দিতে হবে; মেয়ের শিক্ষাপথ যেন লম্ব স্মরণ লীলতা ও নারী জনোচিত মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে। অদূর ভবিষ্যতে তারা জননীর কর্তব্য স্মৃতিভাবে যেন পালন করতে পারে।

ছেলেদের লেখাপড়া, খেলা, ব্যায়াম, ভ্রমণ এবং স্কুলের দিকে দৃষ্টি যেন অব্যাহত থাকে। এইভাবে মায়ের চলা উচিত। অব্যাহত লস্কান অকুরেই পরিচয় দিয়ে থাকে। তখন যদি শালিনগণি লীলাবন্ধের মধ্যে না রাখা হয়; তাহা হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার অবশ্যম্ভাবী। অধিক শালিন আরও ভীতিগ্রহ। লম্ব, জ্ঞান এবং শালিনতাকে ছোট ছেলেমেয়ের মনের মধ্যে ছোট অবস্থা থেকেই বদ্ধমূল করান চাই। এই ধারণা একদিন লম্বাপথের লম্বী হতে পারে। শুধু মায়ের একাগ্রতার লস্কান লক্ষ্যপথে পৌঁছে অপরিণীত আনন্দ উপভোগ করতে লক্ষ্য হয়। নারী যে রকম প্রাণবিনী—একথা নারী যদি ভুলে না যায়, হয়ত একদিন আবার লম্ব লম্ব পুতচরিত্র মনিবীর অভাব হবে।

খেয়ালী চিত্রপট



নিউ থিয়েটার্সের "বিজ্ঞাপতি" চিত্রের একটি
দৃশ্যে বিজ্ঞাপতির ভূমিকায় পাহাড়ী সাম্রাট
ও অমরাধার ভূমিকায় কাননবালা। এই
সম্প্রদায়ে চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে।



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'ভ্যারিটি'

জাশনাল মিডজপেপার্স লি:

টেলিফোন
সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবর্তী (মাউণ্ট) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৪৯ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই চৈত্র ১৩৪৪, ৩১শে মার্চ ১৯৩৮

রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্বাচন

বাহ্যলান্ন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট রাজবন্দীদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যকরী সমিতির গঠন ও বাংলা কংগ্রেসে স্বেচ্ছা প্রাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীন সেন, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও ভূতপূর্ব 'করওয়ার্ড' ও 'জিবার্টি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু অত্যাধিক মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড'র সম্পাদকরূপে পুণরায় সাংবাদিক জীবন গ্রহণ করিবেন। তাঁহার এই সঙ্গী খুবই সুসঙ্গত ও সমীচিন হইয়াছে। বঙ্গ-ভাতৃদয়ের প্রতি তাঁহার আশুগত্যা সর্বজনবিদিত সুতরাং তাঁহার রাজনৈতিক মত বা ভাবধারা বিশ্লেষণ করা গাণ্ডল্যমাত্র।

অশ্রুপাক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ আমাদের বঙ্গবর কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নাথ বিশ্বাসের বাটীতে অস্থান করিতেছেন। তাঁহার শ্রায় পুতচরিত্র

সর্বজনপ্রিয় ত্যাগী কর্মী-নেতার পূর্ণআবির্ভাবে কর্মীরদের মধ্যে আশা ও উদ্বীপনার সঞ্চার হইয়াছে।

সুরেন্দ্র মোহন মোহনের যে ময়মনসিংহে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত জ্ঞান মজুমদারও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জিলায় তাঁহারও প্রতিপত্তি বিশেষ কম নহে। বন্দী হইবার পূর্বে সুরেন্দ্র বাবু বঙ্গভাতৃদয়ের বিশেষ অশুগত ছিলেন। তবে বর্তমান অবস্থায় নলিনীবাবুর প্রতি নিকরাসম দণ্ড বাহাল থাকায় তাঁহার আশুগত্যা সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইতেছে। নলিনীবাবুর প্রতি স্নেহাধিক্যাহেতু হয়ত বঙ্গভাতৃদয়ের প্রতি তাঁহার আশুগত্যা একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—কেহ কেহ এরূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন।

পট্টনামালা সত্যাগ্রহের অবিসংবাদী নেতা শ্রীযুক্ত সতীন সেন বঙ্গভাতৃদয়কে পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে স্মরসঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তা হেতু হয়ত যুগান্তর-দল দ্বিধাবিভক্ত নাও হইতে পারে। সতীনবাবুর দুর্দমনীয় কর্মশক্তি সুপ্রসিদ্ধ সুতরাং তাঁহার পূর্ণ সমর্থন লাভ করিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যকরী সমিতির আসন্ন নির্বাচনে বঙ্গ-দল সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে।

অশ্রু-কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাজবন্দী নেতা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী বার্ককা ও অসুস্থতা নিবন্ধন বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে 'সোৎসাহে' যোগদান এখনও করেন নাই। তবে আশা করা যায় তিনিও বঙ্গ-দলকেই সমর্থন করিবেন।

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ লাল পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন কিন্তু অত্যাধিক তিনি পক্ষভাষার কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। তিনি স্বাধীনভাবে বাংলার থাকিবেন কি না বা বাংলার রাজনীতিতে নিবিড়ভাবে যোগদান করিবেন কি না তাহা এখনও অজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর দাস গভীর জলে বিচরণ করেন। বিশিষ্ট রাজবন্দীদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কিরণবাবু একটু স্বতন্ত্র ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। বিগত এ্যাসেম্বলি নির্বাচনে শ্রীযুক্ত বীরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর বিরোধিতায় কিরণবাবুর রাজ-নীতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিতে বসিয়াছিল। ততরাং তিনি যে আর সহজে কোন ভুল চাল দিবেন তাহা বলিয়া মনে হয় না।

এপ্রিল মাসের বিত্তীয় সপ্তাহের প্রায়ভেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যকরী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন হইবে। আমরা আশা করি নির্বাচন সুসংযতভাবে সম্পন্ন হইবে এবং যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে লইয়া শক্তিশালী কার্যকরী সমিতি গঠিত হইবে।

কাহার ইজিতে ?

দ্বিতীয় "রায়স্ উইক্লি" (Roy's Weekly)র ২৮শে মার্চের সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতি সম্বন্ধে এক লক্ষ্যহীনক ইজিত পরিশ্রুত হইয়াছে। "And the inclusion of his brother Mr. Sarat Chandra Bose is found to be more a liability than an asset, in view of the recent developments in the Bengal Congress Politics. The desire to be in command has not been backed by an equal display of discipline and statesmanship." শুধু তাহাই নহে "রায়স্ উইক্লি"র সর্বজন সম্পাদক শরৎচন্দ্রের মৃত্যুপাত প্রার্থনা করিয়া আকুল আর্ন্তনাথ করিয়া বলিতেছেন : "A change in the leadership of the Congress Party in Bengal is the need of the hour. We suggest that the Congress Working Committee which is meeting in Calcutta next week will review the position and hand over the task of cleansing and toning up the politics of Bengal into the hands of some other leader." মাননীয় অর্থলচিব নলিনীকমলেনের বাণনার এই বরষা প্রতিধ্বনি দ্বিতীয় মরুভূমি হইতে বাংলার শ্রাবল ক্ষেত্রে তালিয়া আনিতেছে। মহাত্মাজীর বলিকাতায় অবস্থিতির সুরেংগ লইয়া উডবর্ণ পার্কে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল পূর্ণগঠন বিষয়ে নলিনী-প্রেমিক ব্যক্তিবর্গের গুঞ্জনধ্বনি সুধর হইয়া উঠিতেছে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে শিখড়ি খাড়া করিয়া নলিনীকমল বাংলা কংগ্রেসে পুনঃ প্রবেশের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু আমরা জানি মহাত্মাজী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বহুকে লিখিত পত্রে লিখে জানাইয়াছেন যে নলিনীকমল মন্ত্রীপদ পরিত্যাগ

করিয়া কৃতকর্মের জন্ত কমা প্রার্থনা না করিলে মিশ্র-মন্ত্রী-মণ্ডলে তাঁহার স্থান হইবে না।

শ্রী নাজিমুদ্দিনের বৈঠকখানার চা-চক্রে নলিনীকমলেনের হুঁকুপে লতমুক্ত কোন বিশিষ্ট রাজবন্দীর অভিনায় রহস্তাবৃত। 'অমূল্যগন', 'শ্রীমতী' ও 'সরস্বতী'-সম্প্রদায় ভুক্ত রাজবন্দীদের আগষ্ট মাসের পূর্বে অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মেম্বর হইবার শেষ তারিখের পূর্বে মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে কে বা কাহার মাননীয় অর্থলচিব তাহা লোক সমাজে প্রকাশ করিবেন কী? মহাত্মাজীর মধ্যস্থতা বাংলার রাজ-বন্দীগণ মানিতে রাজী নহেন—এইরূপ মতভেদাতাপূর্ণ উক্তির যথোচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন শ্রীযুক্ত লতীন দেন। কাহার ইজিতে বা কাহার প্ররোচনার একজন বিশিষ্ট লতমুক্ত রাজবন্দী মহাত্মাজীকে এইরূপ কথা বলিতে পারেন তাহা বাংলার কংগ্রেস রাজনীতিতে গুরুত্ববাহাল ব্যক্তিমাত্রেরই মুখেতে পারিয়াছেন। কাহার ইজিতে বা প্ররোচনার "রায়স্ উইক্লি"তে শরৎচন্দ্রের প্রতি বিবোধগার হইয়াছে তাহাও পরিশ্রুত।

"The depressed classes group has been swaying between the present Ministry and the Congress but neither * * * nor Mr. Sarat Chandra Bose with his membership of the Congress High Command has been able to shepherd them well." —"রায়স্ উইক্লি"র এই মন্তব্য যে কতদূর স্রাব্যক তাহা গত রবিবার "আনন্দবাজার পত্রিকার" কার্যালয়ে ব্যবস্থা পরিষদের তপশিল-ভুক্ত লতগণ ও বহু তাত্ত্বিকের চা-চক্রে মিলন বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার প্রকাশ পাইয়াছে। হক—নাজিম—নলিনী লচিব লত্ব বহুদিন পূর্বে চূর্ণ হইত যদি না বিধানচন্দ্রের দেহলিকিত খণ্ডল তলে তলে শরৎচন্দ্রের বিরোধিতা করিয়া তাঁহার প্রচেষ্টা পশুপ্রবনা করিতেন। শরৎচন্দ্রের

উদ্বারতার সুযোগ লইয়া কংগ্রেসীরা বিধান-নগিনী প্রেম-পুটে করেকজন লম্বা আশ্রয় লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারাই নিয়মভাঙ্গিয়া অস্বীকার হইয়া কংগ্রেসীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছেন। রাজনীতির রঙ্গক্ষেত্রে যাহার প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হইবার শক্তি ও সাহস নাই, রাজনীতিক গগন ঘন-কুহেলী-কুজাটিকার লম্বাঙ্গ হইলে যিনি শিল্পের শাস্তিকূজে পলায়ন করেন, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয় যাহার নেতৃত্বের একমাত্র কৃতিত্বের পরিচয়, কংগ্রেসের মনোনিয়নের ছাপ পাইয়াও শেষ মুহুর্তে নেতা শরৎচন্দ্রকে না জানাইয়া বা তাঁহার অনুমোদন না গ্রহণ

করিয়া যিনি নির্বাচন ঘন্ট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কংগ্রেসী নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার পরীক্ষা প্রদর্শন করেন সেই বিধানচন্দ্রের সচকুর হস্তিমানী কবাহি নহে। যে অপরাধে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত নেতা মিঃ জাহিরমান ওয়াকিং কমিটির ভৎসনা লাভ করিয়াছেন কর্পোরেশনের নির্বাচনে রায়—রূপী চুক্তি করিয়া ও ব্যবস্থা পরিবর্তনের নির্বাচনে শেষ মুহুর্তে শরৎচন্দ্রের বিনা অনুমতিতে নির্বাচন ঘন্ট হইতে অবলম্ব গ্রহণ করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কি তর্কপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করেন নাই? তবে মহাত্মাজীর চিকিৎসক হইলে যদি সব বোম্বাই ক্রীড়া মার্জিনীয় হয় তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

নিখিল-বঙ্গীয়-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন (আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রেরিত)

গত শনিবার, ২৬ মার্চ, সন্ধ্যা ৬টাের মাননীয় নাটোরাধিপ মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্র নাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার প্রারম্ভ হইয়াছে। সর্বপ্রথমেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোম্য-দর্শন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার স্বভাবলিঙ্গ উদ্বাক্তগীতীর কণ্ঠে লম্বুত মঙ্গলাচরণ ও বৈদিক স্তুতিবাচন দ্বারা প্রতিযোগিতার স্তম্ভ উদ্বোধন করেন। ইহার পর প্রতিযোগিতার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় একটি লিখিত বিবৃতিতে জানান যে, সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ স্মরণীয় সঙ্গীত কলারনিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বোম্ব মহাশয়ের দীর্ঘ দিনব্যাপী অমূল্যতার জন্তই এবার প্রতিযোগিতার কার্য্যারম্ভ হইতে বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এতদ্বিধি প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী লম্বা করেকটি বিশেষ বিশেষ আবশ্যকীয় পরিবর্তনের কথাও তিনি সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। তার পর আমাধিগের প্রদ্বের বহু শ্রীযুক্ত হামোদর দ্বাশ খান্না (লালা বাবু) প্রথমে পরিচয়

লাবু বাংলায় ও পরে, স্মরণীয় হিন্দী বক্তৃতায় সম্মেলন ও প্রতিযোগিতার কার্য্য পদ্ধতি লম্বা করেকটি স্তুতিবৃত্তি মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহার পর মহারাজ নাটোর একটি স্তুতি লম্বুত বক্তৃতা দ্বারা প্রতিযোগিতার কার্য্যারম্ভ করেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি বৈশিষ্ট আমাধিগের দৃষ্টিতে পড়িল। উদ্বাক্তগীতীর করেকটি উল্লেখ এখানে করিব। অপর করেকটির কথা পরে সমালোচনায় প্রকাশ করা যাইবে। প্রথমতঃ, এইরূপ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ মন্ত্রের পরেই সুশিক্ষিত গায়ক গায়িকা গণের সম্মিলিত কণ্ঠে বাঙলার নিজস্ব মাতৃভাষা মহামন্ত্র ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনিত হইল না কেন? আমরা কয় বৎসর হইতেই লক্ষ্য করিতেছি যে, “বালস্তী বিভাবোধী” নামক একটি তথাকথিত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের করেকজন বহু নায়ক মিলিত হইয়া সম্মেলনের উদ্বোধনে বালস্তীতে ছোবান কাপড়-পরা করেকটি শিশু বালিকা ও তরুণীর অধিলিত

কণ্ঠে উদ্বাক্তগীতের বহু প্রচারিত ও চির-সমালোচিত রাজবন্দনাগীত “জনগণমন অধিনায়ক” পেটেন্ট গীতটি গাওয়ারই থাকেন। গতবার তবু স্বনামধন্য সঙ্গীত মার্জিত ও গুরুনাথজী ঠাকুর গন্ধর্ব-নির্মিত কণ্ঠে এই বন্দে মাতরম্ গানটি গাহিয়া সম্মেলনের সকল ক্রটি নাশ করিয়াছিলেন। এবারও স্তুতিতেছি, পণ্ডিতজীর স্তুতাগমন হইবে। আমরা মাননীয় নাটোরাধিপ, ভূপেন্দ্র বাবু ও লাল বাবুকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, সম্মেলনের উদ্বোধনে এবার যেন গুরু নাথজীকে (অথবা তাঁহার অভাবে অন্ত যে কোন গায়ক বা গায়িকাকে) দিয়া “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীতটি অথগুভাবে গাওয়ার হয়। আর বালস্তী বিভাবোধীর পরিচালক-বৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দিই—যদি মাতৃভাষা কলঙ্কিত করিতে তাঁহাধিগের ইচ্ছা না থাকে, তবে তাঁহারা যেন তাঁহাধিগের ঐ পেটেন্ট সঙ্গীতটি পরিভাগ করিয়া বেশপ্রিয় শ্রেষ্ঠত্বকে অব্যাহতি দেন।

রাধা ক্রিস্টিয়ানার পরিচালনা
বিকার নাগর

, অধ্যাপক অশোক নাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায়
অভিনয় বর্ণন নামে যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত
হইয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপনও সভাস্থলে নজরে
পড়িল। এই বইখানি সভাই অতি উৎকৃষ্ট
হইয়াছে। শুধু বাঙালার নয়, ইংরাজী বা
অন্য কোন ভাষাতেই প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য-
কলা লব্ধে এজাতীয় আলোচনা এ পর্যন্ত
আমাদের চোখে ঠেকে নাই। শুদ্ধ সুদার
যে ৬৫ খানি আর্টপ্লেটে হাফটোন চিত্র ইহাতে
দেওয়া হইয়াছে, বই আললে না পড়িয়াও
কেবল এই চিত্রগুলির সাহায্যেই যে কোন
বালক বালিকাই উত্তমরূপে ও শুদ্ধভাবে
প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য শিখিতে পারিবে
বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। বর্তমান
নৃত্য প্রতিযোগিতায় যে সকল বালক বালিকা
নাশিবে, তাঁহারা এ গ্রন্থখানি একবার
করিয়া দেখিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।
এ লব্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা বারাস্তরে
করিব।

নিখিল-বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলনের সাধারণ
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের
অনুস্থতার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ
করিয়াছি। বাঙালার সঙ্গীত রসপিপাসুগণ
তাঁহার নিকট উচ্চ সঙ্গীত রসস্বাদনের সুযোগ
লাভের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। অতএব তিনি
যে নিরাময় হইয়া এবার প্রতিযোগিতায়
যোগদানে লম্বা হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া
আমরা বিশেষ প্রীত। আশা করি, তাঁহার
সম্মেলনও এবার পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে।

অন্তান্ত আলোচনা বারাস্তরে করিবার
ইচ্ছা রহিল।



রেডিও প্রসঙ্গ

সভ্যভাষী

দীর্ঘদিন পরে আমরা আবার রেডিও
নিরে আলোচনা করছি।

বেতারে পল্লীমঙ্গল আলরের কিছু কিছু
উন্নতি আমরা লক্ষ্য করছি। সাহিত্যিক
নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অধুনা এদিকে কিছু
লক্ষ্য দিয়েছেন। পল্লী-মঙ্গল আলরে তাঁর
আলোচনা গল্পগুলো বড়তাপুলি আজকাল
বেশ ভালোই হচ্ছে। কিন্তু তাঁর সাজপাকরা
এখনও অনেক দূরে পেছিয়ে রইয়েছেন।
ভালো আর্টস্ট বাইরের, ভালো বক্তা, পল্লী-
উন্নতি বিষয়ক আলোচনাটির এখনও অভাব
হয়েছে এই বিভাগে। বিভাগীয় কর্মকর্তা
শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এদিকে দৃষ্টি দিল!

* * *

বিজ্ঞানী মণ্ডলের বড়তাপুলি পূর্বের
তুলনায় কিছু পরিমাণে সহজ, সরল জাতব্য
তথ্যে পর্যাবসিত হয়েছে আজকাল। বাংলা-
দেশের প্রতি জিলার ভৌগোলিক বিবরণের
আলোচনা প্রশংসার্হ। বাংলাদেশের ছাত্র
সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল
প্রভৃতির লব্ধ আলোচনা Out Knowledge
এর জন্য বিশেষ পরিমাণে আবশ্যিক। আমরা
এই বিভাগের কর্মকর্তার প্রশংসাবাহ
জানি।

* * *

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের প্রোগ্রামগুলি
আশানুরূপ হচ্ছে না। আমরা বহুদিন ধরে
এই বিভাগটি লব্ধ আলোচনা করে আসছি;
কিন্তু বিশেষ উন্নতির দারা আমরা লক্ষ্য করছি
না। এ বিভাগটির প্রতি রেডিও কর্তৃপক্ষ
কেন যে উদাসীন তা আমাদের ধারণার
বাইরে। রেডিও জন শিক্ষার বাহন, বাংলা-

দেশে জ্ঞানীক্ষা অত্যন্ত হতাশাজনক।
দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান মহিলাদের জন্যেই বিশেষ
করে; অতএব এ বিভাগের প্রোগ্রাম নিঃস্বনে
রীতিমত কৃতিত্বের প্রয়োজন হয়। শুধু
কয়েকটি গান, বাজনা, ধর্ম বিষয়ক বড়তা
আর পাঁচালী দিলেই বর্তব্য শেষ হবে না।
মহিলা বিভাগে চাই মহিলাদের উপযুক্ত
আলর। মহিলা প্রশঙ্গ, সাহিত্য প্রশঙ্গের
সবিশেষ আলোচনাটির আবশ্যিক। আমরা
এ বিভাগটির প্রতি বিশেষ অবহেলা কয়েক-
দিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি। আমাদের
ধারণা রেডিও সেট বাড়ীর মহিলাদের জন্যেই
বিশেষ করে। এই বিভাগ লব্ধে বেতার-
গ্রাহিকা বহু মহিলা আমাদের অভিযোগ
জানান। আমরা এবারে শুধু দ্বিপ্রাহরিক
অনুষ্ঠানের কয়েকদিনের প্রোগ্রামের লম্বা-
লোচনা প্রসঙ্গ করলুম।

গত সোমবার ২১শে মার্চ নির্মল ভট্টা-
চার্যের ব্যবস্থাপনায় গানের আলর বসলো।
কুমারী দেবীরাণী সিংহ গান গাইলেন,
সমালোচনার বাইরে। সুসমা ভট্টাচার্যের
গান, চলন নই। অনিল ভট্টাচার্যের গান
ভালোই। নির্মল ভট্টাচার্যের গান সুন্দর।
এদিনে মহিলা-প্রসঙ্গ কিছুই নেই।

* * *

মঙ্গলবার ২২শে মার্চ দ্বিপ্রাহরিক
অনুষ্ঠানে পাঁচালী পাঠ করলেন গৌর মোহন
মুখোপাধ্যায়, সেই এক ধারা। পরে সাহি-
ত্যিক অনিল কুমার ভট্টাচার্যের প্রয়োজনায়
“জয়দেব” অনুষ্ঠিত হোল। অনিল বাবু
জয়দেবের জীবনী এবং জয়দেব কাব্য লব্ধে
আলোচনা করলেন। কুমারী লাবণ্য

কোরা

ভারতবর্ষের আত্মা
ভারতবর্ষের হৃদয়
ভারতবর্ষের তপস্যা
ভারতবর্ষের উপলব্ধি

সাহিত্যে

প্রতিফলিত

বর্তমান যুগের

মহাভারত স্বরূপ

সেই অদ্বিতীয় কাহিনীর

চিত্ররূপ দিতেছেন

দেবদত্ত ফিল্মস্

—পরিচালনা—

শ্রীনরেশ মিত্র

শ্রেষ্ঠাংশে

জীবন গাঙ্গুলী

রাণীবাল



বিশ্বাশের লংঘন পছন্দসী গান অপূর্ণ হয়েছিল। পঞ্চানন বাবুর গান “বহলি বহি কিকিধপি”-চলনশই। সমবেত বন্দনা গীত গাইলেন কুমারী উষা মুখার্জী, লাবণ্য বিশ্বাল, ভাসুদেব ভাট্টা, পঞ্চানন দে প্রভৃতি—সুন্দর হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন নির্মল সিংহ। আমরা মহিলা-আলয়ে এই ধরনের সাহিত্য আলোচনার পক্ষপাতী। নদীতে, কাব্যে “জয়দেব” প্রসঙ্গের দাবী রাখে।

* * *

বুধবার ২৩শে মার্চ “ভারতীয় নারীর আদর্শ” চতুর্থ পর্যায়ে ‘গার্গী’ লম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন শ্রীবিমল বসু। এ ধরনের বক্তৃতা মহিলা-আলয়ে প্রয়োজন আছে। বিমল বাবুর আলোচনা আরও ‘গার্গী’ লম্বন্ধে স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। পরে নমিতা চট্টোপাধ্যায় কণ্ঠলজ্জিত গাইলেন—সমালোচনার বাইরে। যত্নসহ অর্কেস্ট্রা বাজালেন, সুন্দর। শ্রীযুত ভট্টাচার্য্যের গান শুন্য নয়।

* * *

বৃহস্পতিবার, ২৪শে মার্চ বিশ্রাহরিক অনুষ্ঠানে তারাপদ চক্রবর্তী ‘খেরাল’ গাইলেন সুন্দর। পরে লজ্জাব লেনগুপ্তের প্রযোজনায়, শ্রীযুত পরিমল গোস্বামী রচিত গীতনাট্য ‘পদ্মরাগী’ অনুষ্ঠিত হোল। লেখক পরিমল বাবু নিশ্চয়ই এটি শিশুদের জন্তে রচনা করেছেন। বিশ্রাহরিক অনুষ্ঠানে এরকম প্রোগ্রাম নির্বাচনের কোন অর্থ আমরা খুজে পাইনে। এটি ছোটদের বৈঠকে অনুষ্ঠিত হলে লাম্বন্ধে থাকতো। অভিনয় প্রসঙ্গ অতি বাজে। গান ছ’খানি ভালো।

* * *

শুক্রবার ২৫শে মার্চ কোরাণ, পাঠ এবং ইলদামী লজ্জীভানুষ্ঠান হোল।

শনিবার ২৬শে মার্চ বিশ্রাহরিক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কল্যাণী বরিক “অলঙ্কার শিল্প” লম্বন্ধে

চিত্রায় বিদ্যাপতি

বর্তমান বৎসরের স্মরণীয় অবদান

এই শনিবার থেকে ‘চিত্রায়’ নিউ থিয়েটারের স্মরণীয় কথা-চিত্র ‘বিদ্যাপতির’ প্রদর্শন শুরু হ’বে। এই সর্বজন পরিচিত লাম্বক কবির পুত্র জীবনের চিত্রকারী কাহিনী, ছবির পর্দায় যে একটি নতুন মার্ঘ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ কোরবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

দরদী ও মরমী প্রয়োগ-শিল্পী—হেংকী বোশ, তাঁর বৃকের দরদ দিয়া এর চিত্রনাট্য রচনা কোরেছেন। পছন্দসীর বহু বিখ্যাত গান, অপূর্ণ স্মরের সূচনার, স্মর-শিল্পী রাই বড়ালের পরিচালনায়, বাণী-চিত্রে মুগ্ধ হোয়ে উঠেচে। আলোকচিত্র এবং শব্দ সংরক্ষণের দিক দিয়ে, স্রাবিক সঙ্গতি ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন নিউ থিয়েটারের চুই যুগল শিল্পী—ইউনফ মূলজী এবং লোকেন বসু।

লজ্জীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে লব শিল্পীর হল এটি চিত্রখানির উৎকর্ষ বাড়িয়ে তুলেছেন—বাঙলার চিত্র রলিকদের দরবারে বক্তৃতা দিলেন। বিভিন্ন যুগের অঙ্কার প্রচলন লম্বন্ধে আলোচনা মহিলা-আলয়ের মার্থ উপযোগী। বক্তৃতাটি আমরা বিশেষ উপভোগ করেছি, এধরনের বক্তৃতার প্রয়োজন বিশ্রাহরিক অনুষ্ঠানে। পরে ডি, এন, বোমের ব্যবস্থাপনার লজ্জীভানুষ্ঠান—ভালো নয়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিরক্তি-কর প্রোগ্রাম।

তাঁদের প্রতিষ্ঠার কথা আজ আর কান্ন অজানা নাই।

প্রধান ভূমিকাগুলি এই ভাবে বিতরিত হোয়েছে :

নাম ভূমিকায়...পাহাড়ী লাজ্জাল লজ্জীতের মার্ঘ্য ও অভিনয়ের উৎকর্ষ তিনি কবি বিদ্যাপতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কতখানি রাখতে পেরেছেন, আপনারা তার বিচার কোরবেন।

কবি লজ্জিনী অহুয়াস, চিত্র নাট্য-কারের একটি অপক্লপ সৃষ্টি। এই ভূমিকায়, গানে ও অভিনয়ে, প্রাণ লজ্জার কোরেছেন, —কানন দেবী।



কানন

রাজা শিবলিংহ ও রাণী লক্ষ্মীকর্ণে
আপনাঘের প্রভা আকর্ষণ কোরতে পারবেন
বাঙলার চিত্র-রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট—
কুর্গাধার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছায়া দেবী।

কবির পরিচর্যাচারী ও শুভানুধ্যায়ী,
'বুদ্ধ মনুষ্যবন দ্বাদা'-র ভূমিকায় মনুর
লজ্জিতের উৎসে লকলের অন্তর আলোকিত
কোরবেন লজ্জিতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র।

৫। রাজ বয়স, শৈশব বিদ্যুৎকর্ণে আত্ম-
প্রকাশ কোরবেন—অমর মল্লিক। বিদ্যুৎ-পত্নী
(দেববালা) এবং পেয়ারের ভৃত্য (আছি
লাতাল)—এদের সম্মিলিত অভিনয়, লম্বা
নাটকে যে আনন্দের লক্ষ্য দেবে, এখনটাই ও
আপনাঘের আজ গোপনে জানিয়ে রাখা
হরকার।

মহা-অমাত্য এবং সেনাপতিরূপে
স্বাভাবিক অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেবেন
বাঙলার অপর দুই জনপ্রিয় নট—প্রফুল্ল
মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন পাল।

শেষ দৃষ্টে দেবদাসী রূপে, অপূর্ণ
নৃত্য-কুশলতার পরিচয় দেবেন,—লীলা
বোশাই।

—নাট্যকার লক্ষ্মীপুত্র পরিচয়—

নাটকের সূত্র—মিথিলাধিপতির প্রমোদ
কাননে, বনস্তোত্রসবের সমারোহের মধ্যে।

এইখানে রাজা শিবলিংহের সহিত
তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিভাপতির অকস্মাৎ
দেখা হয়, বছরদিন পরে।

তারপর হয় কবির সহিত রাণী লক্ষ্মীর
পরিচয়।

বিস্মিত শুদ্ধ মহারাণী অপলক নেত্রে
চেরে রইলেন কবির দিকে। উৎসবের
প্রারম্ভ থেকে এক অপূর্ণ গরিমায় আকৃষ্ট
হোলে, যে বুঝকে তিনি স্বপ্নাবিষ্টের মত,
উদ্ভানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত
পর্যন্ত অনুসরণ কোরে ফিরেছেন—এই
সেই বুঝক, বিভাপতি।



কৃষ্ণচন্দ্র দে

রাজা পেয়েছিলেন প্রাণহীন প্রতিমাণ
তাতে প্রাণ সঞ্চার কোরতে ডাক ছিলেন
তার বালা লম্বা বিভাপতিক। বিভাপতি
হোলেন মিথিলার রাজ কবি। বিভাপতির
সঙ্গে বিশপী থেকে এসেছিলেন কবি সঙ্গিনী
অম্বরাদা।

তার পর সূত্র হোল গোপন বড়বস্ত্র।
বুদ্ধের লংবাঘ পেয়ে রাজা চলে গেলেন
সীমান্তে। রাণীকে দেখা শোনার ভার দিয়ে
গেলেন কবির উপর।

ততদিনে বিভাপতির, প্রভাবে রাণী
লক্ষ্মী দেবীর অন্তরের আলোক জলে উঠলো।
আলো যে জেলেচে—রাণীর মন পড়লো
তার উপর। রাজা লবই জানলেন। তার
বুকে ছিল বাণী, কিন্তু অবিস্মার ছিল না।

রাণী যে প্রেমের পূজাঞ্জলি কবির চরণে
অর্পণ কোরে আজ যত্ন, লম্বক তা' শুধু

দেবতার চরণেই অর্পণ করে। কিন্তু
মিথিলার জনসাধারণ তাঁর প্রেমের সে শুদ্ধ
স্মৃতিটি সাধারণ দৃষ্টিতে গ্রহণ কোরতে পারে
নি। তাই তাহের হীন কল্পনার ভেদে
উঠলো, এক জঘন্য লালসা-দ্বিপ্তি কামনার
চিত্র।

কিন্তু যে প্রেমের সাধনার অম্বরাদা
নিজিলাত কোরেছিল, সে প্রেম হিংসা-দেহ
বিবর্জিত। তাই অন্তর্দন্দে, রাজা ও রাণী
বধন কাতর, তখন অম্বরাদা সেই স্বপ্নের
সীমানা কোরেছিল, প্রেমের এই মহামন্ত্র
উচ্চারণ কোরে—

“আমার বাহির ছায়ারে

কপাট লেগেচে,

ভিতর ছায়ার খোলা”—

রাজা এদিকে হঠাৎ বুদ্ধ থেকে ফিরে
এলে অন্তরের আঘাতে লম্বাশায়ী হলেন।
তিনি ভাবলেন, তাঁর প্রেম কী এমন ব্যর্থ
হবে, এর কী কোনই দাম নেই?

কিন্তু অম্বরাদার বুকের বাণী প্রেমের
সেই মহা-মন্ত্র, রাজারও চক্ষু ফুটিয়ে তুললো।
কেমন কোরে, প্রেম সাধনার সেই পুত-
বেদীতে দাঁড়িয়ে, লকল বিরোধ, লকল
স্বপ্নের অবসান হোয়ে গেল—নাটকের
পরিসমাপ্তিতে তারই মর্মস্বত্ব কাহিনী আপনায়
চক্ষুকে অশ্রুপল্লব কোরে তুলবে।





(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স—অভিজ্ঞান

অভাগিনী সন্ধ্যা—আজ সকল দিকেই সর্কহারী।

আমিনা তাঁকে উদ্ধার করেছিল লতা। কিন্তু লাজনার হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। সমাজ তাকে আশ্রয় দিলে না। জবশেষপূরে, প্রকাশের আশ্রয়ে এলে, তার মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে, সন্ধ্যা প্রথমট্টা খানিকটা লাস্তনা পেয়েছিল। সন্ধ্যার প্রতি প্রকাশের স্নেহ, সন্ধ্যার বেধনার প্রকাশের দরহ—প্রকাশের স্ত্রী সবিতার অন্তরে সন্দেহ জাগিয়ে তুললো। সবিতার ধারণা, এত শুধু স্নেহ নয়, তার চেয়েও এমন কিছু ধারালো, জোরালো বস্তু, যার দ্বারা তার যোল আনা পত্নী স্বপ্নের খানিকটা কেটে বেরিয়ে, সন্ধ্যার এলাকায় গিয়ে ভীড়তে পারে! আর লতা কথা বোলতে কী, সন্ধ্যার মত এমন একটি অপরূপ পদার্থকে 'পাশে' রেখে, স্বামীর বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বাস কোরতে পারে, এমন মনের জোর করজন মেয়ে বাস্তবের আঙে? স্ত্রীলোক অবস্থা বিশেষে হয় ত' স্বামীর সবটা ভাঙতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই খানিকটা ভাঙতে পারে না।

সন্ধ্যাকে তাই প্রকাশের আশ্রয় ভাঙতে হোল।

এ পৃথিবীতে আশ্রয় যে কত বড় বস্তু তা' যার নেই সেই জানেনা। অনাহারে বেহ ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু সেই বেহটার

অবস্থিতির জন্ত, এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে একহাত ভূমি অধিকারে না থাকার মত বড়ো বিড়ম্বনা আর নেই।

সন্ধ্যার সেই বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী, 'অভিজ্ঞান' চিত্রের মর্মকথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, অনির্দেশের পথে পা বাড়িয়েও, এই পথের চরম চর্গতি থেকে ভগবান তাকে বাঁচিয়েছিলেন। তার বিবেক, তার ধর্ম, তার সত্যীত—অবাহিত রেখে, সন্ধ্যা তার জীবনের চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

• নিউ থিয়েটার্সের এই চবিধানিতে আপনারা তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হবেন। সন্ধ্যার ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন—স্রীমতী মলিনা। প্রকাশ ও সবিতার ভূমিকার সুবিখ্যাত শিল্পী শৈলেন চৌধুরী ও দেববালার অভিনয় আপনাদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারবে বোলে আমাদের বিশ্বাস।

কালী ফিল্মস—চোখের আলি

কালী ফিল্মসের 'চোখের আলি' সমাপ্তির পথে। কবিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের এই 'চোখের আলি' উপন্যাস বাঙলার আবালবৃদ্ধবণিতা এমন কেউ নেই যে একাধিকবার পড়েছেন! এই উপন্যাস খানির ঘটনার স্মৃতি-প্রতিষ্মাত এত চিত্তাকর্ষী যে এই গল্পটি লিনেমার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেই জন্ত কালী ফিল্মস বহু অর্থব্যয়ে এবং লজ্জাস্ত বংশীর শিল্পীদের সমাবেশে এই গল্পটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন।

সম্প্রতি ছবিখানার কাশীতে অল্পপূর্ণার বাড়ীর দৃশ্য তোলা হচ্ছে। মহেন্দ্রের মন প্রাণ অশান্তিতে তরে উঠেছে। একদিকে আশা অন্যদিকে বিনোদিনী। আশাকে সে ভুলতে পারে কিন্তু কই বিনোদিনী ত' এখনও তাকে ধরা দিচ্ছে না। বিনোদিনীর ভালবাসা পাবার জন্ত সে সব কোরতেই প্রস্তুত; কিন্তু বিনোদিনীর মনের ভাব যে সে এখনও বুঝতে পারছে না। কর্তব্য নির্ধারণের জন্ত কাশীতে এল বেড়াতে। মহেন্দ্রকে দেখে অল্পপূর্ণা

যুবকের আকৃতি বৃদ্ধের সদৃশ কেন হয়?

মানসিক উদ্বেগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে শরীরের মাংসপেশী শিথিল ও স্নেহহীন হইলে গাত্রচর্ম লোলিত ও সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং যুবাবস্থায় আকৃতি বৃদ্ধের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। আমাদের "বাস্টোন নং ৩" নিয়মিত ব্যবহারে মুখমণ্ডল বা শরীরের যে কোম স্থানের মাংসপেশী স্ফুট করিয়া শরীরের কাশ্টি বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। স্তনে মালিশ করিলে ললনাগণের বক্ষের শোভা বৃদ্ধি করে। খ্যাতনামা অভিনেত্রীগণ এই প্রসাধন দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করেন। ইহা হলিউডের বিখ্যাত কেমিকের করমুলা অনুযায়ী প্রস্তুত। ১।০ এক টাকা চারি আনার পোষ্টাল অর্ডার পাঠাইলে একশিশি ডাকযোগে পাঠান হইবে।

গিয়ার্স'ন কেমিকেল ওয়াক'স

পোষ্ট বক্স নং ২৩১৯ কলিকাতা

লকলের কুশল জিজ্ঞাসা কোরলেন পরে বেহারী লম্বকে বললেন—“দে কি আর বিয়ে করবে না?” মহেন্দ্র জবাব দিল—“কই কিছুমাত্র উদ্যোগ দেখি না।”

এর পরে মহেন্দ্র আবার কোলকাতায় ফিরে এল। ইতিমধ্যে বেহারী মহেন্দ্র আশা বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে নানা গুণ্ডগোলার বীজ রোপিত হ’ল। আশা বিনোদিনীর উপর মহেন্দ্রের তার দ্বিধে কানীতে গেল অন্নপূর্ণার কাছে। আশাকে দেখে অন্নপূর্ণা লকলের খবর জিজ্ঞাসা কোরলেন এবং বেহারীর ব্যাপার জানতে চাইলেন। আশা এই প্রশ্নের জবাবে বলল—“তার কথা আমার জিজ্ঞাসা করে না।” এমন সময় বাইরের দরজায় কে কড়া নাড়ল। আশা দরজা খুলেই দেখল বেহারী। আশা অমনি দরজা বন্ধ করে দিল এবং অন্নপূর্ণাকে এসে অনুরোধ কোরল—“ওকে এখুনি যেতে বলে দাও।” বেহারী এই কথা শুনে পেয়ে যাবার উপক্রম কোরছে এমন সময় অন্নপূর্ণা বাইরে আসতেই বেহারী গদগদ করে বলল—“আর নয়—আর একটি কথাও তুমি বলো না কাকীমা!”

এদিকে বিনোদিনীকে পাবার জন্য মহেন্দ্র পাগল হ’য়ে উঠল। হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হ’য়ে সে একদিন গভীর রাত্রে চোরের মত বিনোদিনীর ঘরে—যেখানে রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনী ঘুমাচ্ছিল সেখানে প্রবেশ কোরল। এই সময় হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার এবং মহেন্দ্রকে লাম্বে পেয়ে বিস্মিত হ’য়ে জিজ্ঞাসা কোরলেন—“মহীষ, তুই এত রাত্রে এখানে?” মহীষের

বাক্যে হ’ল। রাজলক্ষ্মীর আর বুঝতে কিছু বাকী রইল না। তিনি বিনোদিনীকে তার ব্যবহারের জন্য ঘোষারোপ কোরতে লাগলেন। কিন্তু বিনোদিনী হটবার মেরে নয়, সে রাজলক্ষ্মীকে বলল—“.....তুমিও কি তোমার বৌয়ের ওপর ছেলের মন ভোলাতে চাও নি.....?”—পিলিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত! কীদ আমিও কতকটা জেনে, কতকটা না জেনে পেতেছি—কীদ



কতকটা তুমিও পেতেছে! আমাদের জাতের ধর্ম এই—আমরা মায়াবিনী!”

উপরি উল্লিখিত এই দৃষ্টান্তগুলোতে বিভিন্ন ভূমিকার শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জি, ইন্দিরা রায়, রমা ব্যানার্জি, মিমেন্স ঘোষ, ডাঃ হরেন মুখার্জি, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকার চরিত্রোপযোগী অভিনয় কোরে রবীন্দ্রনাথের অমর চরিত্রগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা কোরছেন। মিঃ বি. পি. মহেন্দ্র এই ছবিখানির তত্ত্বাবধান কোরছেন। ছবিখানির খুটিনাটি সব ব্যাপারেই মিঃ মহেন্দ্রের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, লতু সেনের পরিচালনা, মধু শীলের শব্দগ্রহণে, ও ননী শাস্ত্রালের আলোক চিত্রে “চোখের বালি” যে নবশ্রীমণ্ডিত হ’বে—একথা বলাই বাহুল্য।

দেবী কল্পনা

বাঙলার অন্ততম প্রাচীন পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনার হাজরা পিকচারের প্রথম পৌরাণিক চিত্র নিবেদন

“দেবী কল্পনা”র তটিন লম্বাশ্রিত পথে। যুগ-যুগান্তর অতীত গরিমার চিত্রে আলোড়নকারী প্রেম ভক্তি ও শৌর্য্য বিমণ্ডিত এই অপূর্ণ কাহিনীটি কালী কিস্কদেয় স্ত্রীযোগ্য টেকনিশিয়ানদের সাহায্যে বাঙলার আবালবৃদ্ধবনিতার মনে এক পুলক-শিহরণ বাজে, জাগিয়ে তুলতে পারে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যধিকারী থেকে আরম্ভ করে সবাই আগ্রাণ চেষ্টা করতেন।

গেল হস্তার এই ছবিখানির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্ট দৌলা হয়েছ, যেখানে ভৌগলিক কর্তৃক কালকেতু ও কল্পনা, রাজা ও রানী বলে অভিহিত হন। বন কেটে নগর বলিয়ে দেখানে ভৌগলিক তাৎপর্য্য ও রানীকে নিয়ে মনের আনন্দে আছে দেখানে এলে ভীড়ল পাপাধ্যা ভাড়াহ। শিকিত ভাড়াহের বাকজালে ও মায়াজালে কালকেতু ক্রমশঃ নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে লাগল, মধু লক্ষীর রাজার এই অধঃপাতের কথা দেবী কল্পনার গোচরীভূত করল কিন্তু কল্পনা নিরুপায়—আজ বৎসরাদিকাল কল্পনা তার হৃদয়ের রাজার সঙ্গে লাক্ষ্য করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে। ভাড়াহের মায়াজালে কালকেতু মধু ও পরনারীতে হয় আনন্দ। বহু চেষ্টা করে কল্পনা একদিন তার লাক্ষ্য পেলে কিন্তু কালকেতু তখন এত মত্ত ছিল, যে সে কল্পনাকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিল। এই ব্যাপারের পর প্রজারা কেপে উঠল মায়াজালে ও ভাড়াহ জীবন হরণ করবার জন্যে। তারপরের ঘটনা আমরা পরবর্তী লেখ্যায় জানাব।

দেবদত্ত কিস্কদেয়

গোরা শু শু ভারতবর্ষের আদর্শ, ভারতবর্ষের লাম্বা, ভারতবর্ষের লম্বার রূপক-



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

কাহিনী শ্রী নর, তার চেয়ে বেশী কিছু। অতীতের কাছে বর্তমানের, অন্ধ লোকের লগ্নে হীরাবুদ্ধির, উদার আদর্শের লগ্নে লক্ষ্যার্থের লক্ষ্যে আলোড়িত, প্রেম ও ভাগ্যের মহিমায় উজ্জ্বল, এই বিশাল, বিচিত্র কাহিনীর তুলনা যে কোন যুগেই বিরল। নরেশ মিত্রের পরিচালনায় দেবব্রত ফিল্মসের চেষ্টায় ও যত্নে এই কাহিনীটি যে রকম তাড়াতাড়ি চিত্রে নিখুঁতভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে তাতে বাংলা দেশের দর্শকদের আর বেশী দিন উৎসুক হয়ে অপেক্ষা বোধ হয় করতে হবে না।

রবীন্দ্র নাথের এই অপূর্ণ কাহিনীটি দেবব্রত শীল প্রচুর অর্থব্যয়ে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করেছেন—তার এই বিপুল প্রচেষ্টাকে আমরা অন্তরের সহিত সমর্থন করি। কিন্তু “গোরার” ভূমিকা-লিপি যেভাবে বস্তুত হয়েছে তা’ দেখে আমরা

বিশেষ লক্ষ্যহীন হ’য়েছি। ‘গোরার’ ভূমিকার জীবন গাঙ্গুলীর মনোমনস্ক ভালই হয়েছে। তার বন্ধু মোহন ঘোষাল ও তার দ্বন্দ্বী রবি রায় লক্ষ্যেও কারুর কিছু অভিযোগ করার নেই। নরেশ মিত্রের পাশ্চাত্য হবে অপূর্ণ। পরেশ বাবুর অংশে অস্বাভাবিক চৌধুরী মঞ্চে অভিনয় করেছেন তা’ তার শিল্পী-জীবনের অনবদ্য দান। ঐ চরিত্রে আমাদের মনে হয় বাঙালীদেশে তার জুড়ী নেই। এই ভূমিকায় মনোমগ্ন ভট্টাচার্য্যের মনোমনস্ক আমাদের মনে লাগছে না। সুচরিতার ভূমিকার প্রথমে নির্বাচিত হয়েছিল বীণা এখন দেখছি উক্ত ভূমিকার নামবেন রাণীবালা। রাণী একজন সুঅভিনেত্রী তা’ অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আলোচ্য ভূমিকায় রাণীর মনোমনস্কও আমরা সমর্থন করিনা।

রবীন্দ্রনাথ তুলির পরশে ‘সুচরিতা’র যে

রূপ কৃষ্টিতে তুলেছেন—তার সঙ্গে পর্দার সুচরিতার লাদুশ্য নিয়ে পথে পথে বাধ্বে গন্ত-গোল। তবে যদি বয়োবৃদ্ধ নরেশ বাবু খোদার ওপর খোদাকারি করেন অর্থাৎ সুচরিতাকে একটি লং লাজান তা’ হ’লে আমাদের বলবার কিছু নেই। ললিতার ভূমিকায় একটি নতুন মেয়ে নাম্ছে—নাম জানিনা উপাধি দ্বন্দ্বী। এর লক্ষ্যে এখন আমরা কিছুই বলতে পারি না। এই ক্ষেত্রে আমরা দেবব্রতের কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করছি ভূমিকা লিপি বস্তুত কোরছেন কে? নরেশ মিত্র না দেবব্রত শীল?

শ্রীভারতলক্ষী পিক্চার্স’

“অভিনয়ে”র যবনিকা পড়বে কবে? আমরা বিশ্বস্তৃত্রে অবগত হ’লাম যে, “অভিনয়” এখনও অর্ধেক শেষ হয়নি—এই ছবির কোন প্রকার প্রচারণা এখনও আরম্ভ হয়নি অথচ এরই মধ্যে প্রায় নব্বই

আলোকচিত্রী
বীরেন দে

সঙ্গীত পরিচালক
এস, এন, দাস

শব্দযন্ত্রী
নূপেন পাল
ভূপেন ঘোষ



রু
পো
র
ঝু
ম
কো

আধুনিক যুগে
অতি আধুনিক
স্বমকোথানি
হারিয়ে যদি যায়
বন্ধু
চিন্তা নাহি তার
তোমার
মন কাননে জ্বলচে
প্রদীপ
ফুটচে হাসি
মুখে
এই আধুনিক
যুগে ॥

রু
পো
র
ঝু
ম
কো

পরিচালক :
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔ.ডিও
রাধা ফিল্ম

ব্যবস্থাপক
নীলমনি রায়
বিজ্ঞাপন মল্লিক



ও, কে, এ
প্রোডাকশন

হাজার টাকা এই ছবির জন্য খরচ হ'য়ে গেছে। আবুলাল চোখানি একজন খুনো ব্যবসায়ী হ'য়ে একি কোসছেন! “অভিনয়ে”র অভিনেত্রী ‘ক্যানানোভা’র ‘ককটেল’ পাটিতে যে সময়টা অতিবাহিত করেন তার অর্ধেক সময়ও যদি তাকে দিইয়ে শূটিং করানো যেত, তা’ হ’লে ত’ এতদিনে কবে ছবি শেষ হ’য়ে যেত। মধু সাধনার “অভিনয়” শেষ হ’তে যত দেরী হ’চ্ছে লোকে যে ততট লক্ষ্যসাকুল হ’য়ে উঠছে।

নিউ সিনেমায়

আসছে কাল ১লা এপ্রিল শুক্রবার থেকে প্রথম ভারতীয় রঙিন ছবি ‘কিবাণ কত্তা’ এখানে দেখান হ’বে। ভারতীয় রঙিন ছবির আদর আশাঘের দেশে আছে। এবং সেই হিসেবে মনে হয় নিউ সিনেমায় এ ছবিখানি বেশ কিছু দিন চলবে।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার ২রা এপ্রিল থেকে ‘মুক্তি’ দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়বে। প্রথম সপ্তাহের জনসমাগম দেখে মনে হয় যে ‘মুক্তি’ দ্বিগুণ কলিকাতা থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে না।

রূপবাণীতে হাল বাঙলা

এই শনিবার হইতে মেট্রোপলিটন পিকচারের হাল-বাঙলা রূপবাণীতে চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করিল। কোতুকরল, ব্যঙ্গ, প্রণয় ও লজ্জিত সময়ের হাল বাঙলার যে অভিনয় রূপ ছায়াচিত্রে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা দর্শকবৃন্দকে শুধু অপরিণীত আনন্দ বিস্তরণ করিতেছে।

রাজমালা রচনা গল্প

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচরুচন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

“বান্ধকী স্বর্ষি০ শিখ্য পৌলব হইল।
ঠেই সে বান্ধকী গোত্র পৌলব পাইল ॥
পৌলবের বংশে জন্ম নিল বিশ্বনাথ।
সেনাপতি কর্ণে তিনি ছিল বড় খ্যাত ॥
শত্রুকুল-রাজার হইল সেনাপতি।
বিশ্বনাথ বহু বুদ্ধে লভিল সুখ্যাতি ॥
তাঁহে তিনি হইলেন বিশ্বনাথ সেন।
তাঁর অংশে মহাপ্রতি সেন জন্মিলেন ॥
সেই বংশে রমানাথ উদ্ভব হইল।
কনোজ হইতে তিনি গোড়ে আইল ॥”
এই রমানাথ সেনই আদিশূরের নিকট
হইতে বালার্ঘ্য স্বর্ঘগঙ্গা গ্রাম পাইয়াছিলেন।
“ভাগীরথী নদীতীরে স্বর্ঘগঙ্গা গ্রাম,
লক্ষ্যহানে দ্বিগঙ্গা বলিয়া যুব নাম।
সুন্দর সে গ্রামখানি তি শোভা তাহাতে,
সেই গ্রাম আদিশূর দিল রমানাথে ॥”

—(বান্ধকী-কুলগাথা)

দ্বিগঙ্গা প্রাপ্ত হইবার পর তিনি (রমানাথ) তথায় গিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার ৭ম অশ্বস্তন পুরুষ শ্রীমান সেনের সময় দ্বিগঙ্গা বিখ্যাত শহর এবং সভ্যতার অত্যন্ত কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এখন সেখানে মাত্র কয়েকটি দীঘি ও চিবি ব্যতীত অন্য কোনও ভগ্নাবশেষ নাই।

বহুমুখ্যতার মহাশয়ের পুরন্দর সেন উল্লিখিত রমানাথ সেনেরই ঔরসজাত সন্তান। আমরা রমানাথ হইতে বরিশালের অন্তর্ভুক্ত রায়েরকাটির মূল কল্পনারায়ণ পর্যন্ত উনিশ পুরুষের বংশলতা দিতেছি। (১) রমানাথ—(২) . পুরন্দর—(৩) মাধব-

নারায়ণ—(৪) রামনারায়ণ—(৫) দিবাকর—(৬) ভাস্কর—(৭) শ্রীমান—(৮) মালাধর—(৯) হরিহর—(১০) রামগোপাল—(১১) দৈত্যারি—(১২) যজ্ঞেশ্বর—(১৩) শিবশঙ্কর—(১৪) রত্নেশ্বর—(১৫) বিষ্ণুর—(১৬) মহনমোহন—(১৭) রাজা শ্রীনাথ রায়—(১৮) রাজা শ্রীরাঘ রায়—(১৯) রাজা কল্পনারায়ণ রায়। ইনি রায়েরকাটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বলেশ্বরের পূর্ব তীরবর্তী এক বিস্তীর্ণ অরণ্যানী আবাদ করিয়া কল্পনারায়ণ রায়েরকাটি নামে রাজধানী স্থাপন করেন দ্বিগঙ্গা এবং হইতে পরিবারবর্গ ও আশ্রয়-স্বজন আনিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন।

‘পুরন্দর সেন ১২০২ খৃষ্টাব্দে বগড়ি প্রদেশে অধুনা ২৪ পরগনার দ্বিগঙ্গার নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া লগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন’—বলিয়া বহুমুখ্যতার মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন তাহারও কোন ভিত্তি নাই। বলের জাতীয় ইতিহাস—রাজত্বকাণ্ডে আছে—“শ্রীমল্লসেন সেনদেবের কনিষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুরূপ সেনদেব একপ্রকার স্বাধীন ভাবে স্মৃষ্টি বিক্রমপুরে শাসনভোগ পরিচালনা করিতে ছিলেন। বগড়ীর অন্তর্গত যশোহর, খুলনা তখন তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ছিল।”—এই বিষয়ে তিনি লাবধানে পুরন্দরের উপর সাজাইয়া ইতিহাস (?) লিখিয়াছেন; এমন কি পুরন্দর সেনকে ব্রহ্মকজির পাণ্ডুবংশীয় (!!) বলিয়া সূচতার প্রচার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। . ইতিহাস—৫৫৫৫ ইতিহাস। মনগড়া কথা ছড়া নহে।

তিনি তাঁরপর ছায়াচিত্রের মত বুদ্ধিতে শান্তিয়া গোত্রকে বান্ধকী গোত্রে পরিবর্তিত

দেবদাস
স্রাব্যোক্ত চিত্র শিল্পী যতীন দাস

বি বি ধ

বালক সত্ত্ব

বালক সত্ত্ব দক্ষিণ কলিকাতার একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসরের ত্রায় গত রবিবার এছের বাৎসরিক স্ট্রিমার লন্ডনগনের আয়োজন হয়েছিল। বেলা লাড়ে এগারটার চাঁদপাল ঘাট থেকে প্রায় ৩০০ শত বাজী নিয়ে 'হাওড়া' নামক স্ট্রিমার ডারমহাওয়ারবার অভিমুখে রওনা হয় এবং লক্ষ্য ৭ ঘটিকার পুনরায় চাঁদপাল ঘাটে প্রত্যাবর্তন করে। এই দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার প্রোগ্রামের মধ্যে সে সকল আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়ের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার-হিন্দুস্থান রেকর্ডের আর্টিষ্টদের লজীত ও লজ্জের লভ্যদের নানা প্রকার 'রূপসজ্জা' উল্লেখযোগ্য।

যে সকল লভ্য এই অনুষ্ঠানটিকে সর্ব-প্রকার সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ললিত দত্ত ও অমর রত্নের নাম উল্লেখযোগ্য।

বেহালা বাণীমন্দির

বিগত ২৮শে ফাস্তুন বাণী মন্দিরের সভাগণ ৮অপরেণ চক্রে 'চণ্ডীদান' নাটক অভিনয় করেন। শ্রীযুক্ত করালী চক্রবর্তী (চণ্ডীদান), গোবর্দ্ধন দান (হারাদন), ভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (জমিদার), নলিনী নাথ নন্দর (নন্দর মাঝা) এবং স্ত্রী ভূমিকায় পদ্মপতি মোহক (রামী), সুশীল কুমার (নিত্যা) কৃষ্ণদন দান (চাঁপা) প্রভৃতি ভূমিকাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শৌখিন লক্ষ্যহারের অভিনয় দর্শকদের চিত্ত বিনোদন করিয়াছে।

করিয়া দিয়াছেন এক রীতিমত টেকনিকের পরিচয়। তাঁহার এই ভাষা-চিত্র-গল্প প্রলয়ের একস্থানে লিখিত হইয়াছে—
‘এই রাজবংশধরগণ সেই হইতে পূজাপাৰ্জন, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্মের সময় শান্তিল্য গোত্র বলিয়া পশ্চাৎ বাস্তুকী গোত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।—ইহা শ্রেফ তিনি তাঁহারই শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিনা তিনিই হলপ করিয়া বলুন। শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুরের পিতামহ যশ্বেয় সেনের পিতামহী হরিমণি দানীর ও পিতা যজ্ঞনাথ সেনের শ্রাদ্ধক্রিয়া এবং যজ্ঞীযের হই কস্তার ও যজ্ঞনাথের তিন কস্তার বিবাহ—এই কষ্টটি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো কতিপয় ক্রিয়া-উপলক্ষ্যে যশোররাজবংশীয় পরম শ্রদ্ধাংশ রাজা শ্রীযুত মতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় তদীয় ব্যবস্থার এবং কর্তৃত্বে লকল সুসম্পন্ন করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রত্যেকবারে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ক্রিয়া গুলি সুসুখ্যলার সমাধা হইয়াছিল। তিনি বলেন—“উহাদের অনেক ক্রিয়া আমি করাইয়াছি; কিন্তু আজ অবধি বাস্তুকীগোত্র ব্যতীত শান্তিলাগোত্র ঘূনাকরে উচ্চারিত হইতে শুনিবাই।” খুলনা জেলার মারকা, নিবালী শ্রীযুত বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় ঐ বংশের বর্তমান পুরোহিত। তাঁহাকেও আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—
“আপনারা-ও কি ঐ লজ্জা কপিরাছেন?”

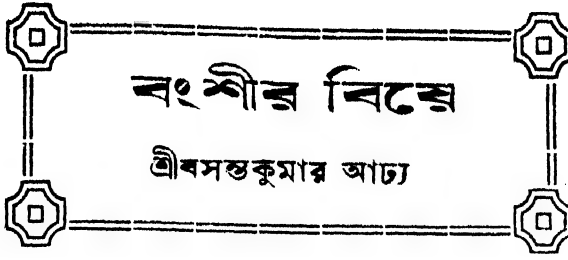
যেখানে একটা ইতিহাসকে টানিয়া আনিয়া যথনিকার অন্তরালে ইচ্ছানুযায়ী রূপ দিতে হইবে, অথচ প্রকৃত বিষয় যেখানে নিক্কাক, সেখানে একটি-মামুলী উপস্তানের অবতারণা করিয়া পাঠপূরণ যেন এ যুগের একটা বহুৎ ধর্ম।

রমানাথ সেনের প্রপৌত্র রামনারায়ণ সেন গোড়েশ্বর বিজয় সেনদেবের মন্ত্রী ছিলেন। বিজয় সেনদেবের রাজত্বকাল হইতেছে খৃষ্টীয় ১০৭২—১১১৮ পর্যন্ত। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে রামনারায়ণের পিতামহ পুরন্দর সেন কোন্ এবং কাহার আমলে গিয়া পড়েন। গোড়েশ্বর মহারাজ লামন্ত সেনদেবের প্রায় সমসাময়িক হন না কি তিনি? সুতরাং কি প্রকারে আমরা পুরন্দরকে শ্রীমল্লকর্ণ সেনদেবের পুত্রদ্বিগের সময়ে আনিতে পারি?

পুরন্দর সেনের পুত্র মাধব নারায়ণ সেন। এই মাধব নারায়ণের পর তাঁহারই পৌত্র দ্বিবাকর সেন পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মাধবের পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণ মহারাজ বিজয় সেনদেবের মন্ত্রী ছিলেন পূর্বে লিখিত হইয়াছে। এই রামনারায়ণকে যদি বসুমজুমদার মহাশয় মাধবনারায়ণের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন তাহা হইলে লভ্য ইতিহাসকে পঙ্গু করিতে পারিতেন না। সকল ব্যুত্থা তিনি ব্যুত্থির লহিত রামনারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুধু একটি নয়—অমন আরো দুইটি পুরুষকেও (ভাস্কর সেনের পুত্র শ্রীমান সেন ও তৎপুত্র মালাধর সেনকে) অবিচলিত চিত্তে পরিত্যাগ করিতে তিনি বিধা বোধ করেন নাই।

(ক্রমশঃ)





(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হস্তকা তো গেলেন। কিন্তু বংশীর বকে যে হাতুড়ির বা পড়া শুরু হোল তার তুলনায় আগের রাতের বা গুলো তো ফুলের বা। পুরো একটি ঘণ্টা ভাবনার জগদলভার বকে নিয়ে সে বলে রইলো। চন্দর কখন চা রেখে গিয়েছিল। কাপ থেকে খোয়া উঠে উঠে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বংশীঘের বংশটাই ছিল বুদ্ধি মানের বংশ, তবু বংশী হস্তশিল্পী হয়ে বলে রইলো। শেষে সে এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে Algebra কষে হস্ত শিল্পকার সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু তাতে সঠিক উত্তর না পেয়ে আবার মন নিয়ে তোলপাড় করতে বসলো; শেষে চন্দর এসে বলে “দাদাবাবু, অনেক বেলা হোল যে। নাওয়া খাওয়া করবেন না।”

চমকে উঠে বংশী বলে “ও—তাইতো বেলা যে শেষ হতে চললো রে।”

চন্দর গালভরা হাসি হেসে বলে “হ্যাঁ, উঠে পড়ুন, আর ভাবনা কি? হস্ত মশাই যাবার সময় আমাদের তো বলেই গেলেন ‘ওহে চন্দর, আমাদের নেড়ীর সঙ্গে তোমার দাদাবাবুর বিয়ের তো সব ঠিক। জোগাড়-যন্ত্র করো হে, এ বিয়ে দিয়ে তব আমি দিল্লী যাবো। ভাগ্যি হস্তমশাই কথটা আমাদের জানিয়ে গেলেন তাইতো ভুললো’কে বলে খবরটা জানাতে পারলুম।”

“ভুললোক! কে ভুললোক?”

“কে এক লক্ষ্যেব শিল্পকার, জমীদার।”

বংশী কতকটা আপনার মনে বলে “জমীদার, না বহ।” তারপর চন্দরকে বলে

“তা সে লোকটাকে তুই হস্ত মশাইয়ের কথা বলতে গেলি কেন?”

চন্দর মুখভার করে দুটো হাত নেড়ে বলে “তা আমি কি করবো? তিনি যে বলেন, আপনার বিয়ের খবর পেয়েছেন। খবরটা পাকা কিনা তিনি যে জানতে চাইলেন। তা লোকটি বেশ ভদ্র আর বিয়ের খবরে বেশ গুলী হয়েছেন বলে মনে হোল। হ্যাঁ, তিনি আবার জানতে চাইছিলেন, কখন তবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে?” বংশীর মনে হোল চেয়ারখানা তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ডাক দিলে “চন্দর!”

চন্দর জবাব দিলে “দাদাবাবু!”

আমাকে আজই একটু বাইরে যেতে হবে। কোথায় যে যাবো তা বলতে পারছি নে। কালী কি লক্ষা, গদা কি গোয়া যেখানে হোক। ফিরতেও একটু দেরী হবে। বাড়ী বন্ধ করে তোষেব সব জবাব দিয়ে যাবো। অবশ্য তিন-মাসের মাইনে বংশী পাবি, তিন মাস পরে যদি ইচ্ছে হয়তো ফিরে খবর নিস্ ফিরেছি কিনা।”

চন্দর হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বলে “আচ্ছা দাদাবাবু।”

“হ্যাঁ, আর দেখ চন্দর—”

“দাদাবাবু।”

“একটা ছবি তোলা—মানে ওই বায়স্কোপের দলে চাকরী পেরেছি। দেখ দেখি কোন লাজের দোকানে পরচুল, দাড়ী-গোঁফ, কল্যা নাকের মুখোশ আর কোথাও এক জোড়া নীল কাচের চশমা পাস্ কিনা।”

ঘণ্টা বেড়ে পেরে বংশী বাড়ীর খিরকির, হরজা খুলে দুখটা বাড়িরে লাবধানে লামনে, বায়ে, ডাইনে একবার দেখে নিলে। তারপর হরজার তালি দিয়ে পা টিপে টিপে ট্যান্ডিতে উঠে, ওই কড়েয়ার দিকে ট্যান্ডি চালাতে বলে চপ-করে গাড়ীতে বসে রইলো। সেখানে মাথা ঠোকা এক গলির ভেতর ছোট্ট একটা হোটেলের হোতালার একখানা খুশী গোছের ঘরে ঢুকে চুল, দাড়ী, মুখোশ লাগিয়ে নীল কাচের ঠুলি এটে হস্ত শিল্পকার কোম্পানীর বিরুদ্ধে Campaign চালাবার মতলব আটতে বসলো। সারাটা দিন সে আর ঘর থেকে বেরোল না। তারপর দিন ভোরেই একটু চা খেয়ে লেলামং মিঞার সন্তা লাজের দোকানে গেল টুরিষ্টের পোষাক কিনতে। শুনেছিল ওখানে খোদার স্ট্রট কোন বস্তুর সন্তা Editionএর অভাব হয় না। মতলবটা যত শীঘ্র পারে হস্ত শিল্পকার কোম্পানীর চোখে ধুলো দিয়ে হাঙড়ায় এসে এগারোটা প্লাটফর্মের যে কোন একটার টিকিট কিনে রেল চেপে পারে হেঁটে পৃথিবী চকর বেওয়ার পালা শুরু করবে। তারপর কালী কি লক্ষা, কাল্মীর কি কামস্কটকা যেখানে হোক গিয়ে গাঁট হয়ে বসবে।

লেলামং মিঞার দোকানের চৌকাট ডিকোডেই যত গুস্তাগর, নোকর, লেলামতের ভাইয়ের দল সব লেলাম’ চুকতে শুরু করলে। তারপর বংশীকে মস্ত খন্দের ঠাণ্ডের তাকে বিরে প্রশ্রয়ান ছাড়তে শুরু করলে। বংশী তাহের ছ’ একটা জবাব দিয়ে চারদিক চেয়ে দেখতে লাগলো লগ্নাতীর চিমটে, লোটা, কল থেকে শুরু করে ফকীরের আলখাল্লা টুপী, মালা কি বস্ত্র না লাজানো আছে। একবার দোকানের চৌকাট ডিকোলে লেলামং মিঞার পাঁচ ভাই আর যত গুস্তাগর, নোকরদের একতাহিতে কিছু সওয়া না করে বেরোবার

জো আছে? যেথতে যেথতে পাকা
লোকের তবিরে যে জিনিষগুলো বংশীর
সামনে এসে জড়ো হোল তা দিয়ে দল
শিক্কার কোম্পানী তো তুচ্ছ স্বয়ং যমরাজের
চোখে ধুলো দেওয়াও অতি সহজ কাজ।
লোকগুলো তাকে একদম ভুল বুঝেছে
যেথ বংশী বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠলো।
তারা ভেবেছে বংশী বোধহয় লম্বার সুরে
জলাঞ্জলি দিয়ে বৈরাগীর পথে পা বাড়াবে
বলে এসেছে সেলামং মিক্রার লম্বা সাজের
দোকানে। নিজের দরকারের কথা
সেলামং মিক্রাকে জানাতেই মিক্রা সাহেব
একমুখ হেসে বলে “ওঃ, তা এতক্ষণ বলতে
হয় বাবুসাহেব। আপনার ভাগি বহুত
ভালো যে আপনাকে পরামর্শ দেবার মত
লোক ঠিক সময়ে আমাদের দোকানে
পায়ের ধুলো দিচ্ছেন। ভদ্রলোক
শিকারের ঝোঁকে সব বেশই ঘুরেছেন।
শিকারী সহদেব শিকারের নাম শুনেছেন
নিশ্চয়।” দাঁড়ী কোঁকর জঙ্গল ভেদ
করে বংশীর মুখ বিশেষ দেখা যাচ্ছিল
না তবু যেটুকু দেখা যাচ্ছিল ততটুকু চাই
রঙের হয়ে গিরেছিল।

“শিকারী সহদেব শিক্কার?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ চজুর! জবরদস্ত শিকারী!”

“হাওয়া—বেজায় গরম—হাওয়া!”

হাওয়ার লম্বানে বংশী দোকান থেকে
হাওয়ার মত বেরোতে যাচ্ছে এমন সময় দরজা
জুড়ে দোকানে ঢুকলেন স্বয়ং দামোদর
হস্ত। চমকে পেছু হটতেই বংশী গিয়ে
পড়লো গাধা করা পায়জামার গর্তে।
সেলামং মিক্রার পল্টন দিকে দিকে ভিটকে
পড়ে জাববা, পায়জামা, টুপী, মালা, কঙ্গল
যা হাতের কাছে জুটে গেল এনে ছাজির
করলে দরজার সামনে। হাত নেড়ে
লবাইকে হটিয়ে দিয়ে দস্তজা ঠাক দিলেন
“খোড়ার চাবুক মিলবে?”

“খোঁদাবন্দ! হজুর! বহুত মিলবে!”

“বহুতে দরকার নেই। বেঁটে বাঁট

ওয়ারা বেজায় মজবুৎ চাই একগাছা।”

তখনই সেলামতের ভাই নেয়ামং নিয়ে
এলো সহদেব শিক্কারকে। যথেষ্ট সহবৎ
দেখিয়ে সহদেব শুধোলে “ওনার কথাই
বলছিলে নাকি হে? নমস্কার, শুনলুম
নাকি পায়ে হেঁটে পৃথিবী চকর দিতে
বেরোচ্ছেন? আপনার উপগার করতে
পারলে কেতান্ত হবো।”

দস্তজা লাফিয়ে উঠে বলেন “আরে কেও?
শিক্কার খুড়ো নাকি? যা অন্ধকার চিনতে
পারিনি। মাপ করবেন, মনে কিছু
করবেন না।”

সেলামং হাঁক দিলে “আরে কোন হায়?
ডিবিয়া লেগে।”

বংশী গলার সুর চেপে বলে উঠলো “না,
না ও ডিবেয় গন্ধে আমার বমি আসে,
ভূবায় চোখ জলে। চোখ বেজায় খারাপ
কিনা।”

সহদেব উপগার করবার উৎসাহে
তাড়াতাড়ি বলে “ওরকম আকারে স্বভাব,

খাটো বর্শন নিয়েতো চকর দিতে বেরোন
ঠিক নয়।”

দস্তজা বলেন “চেনা মানুষ নাকি হে
খুড়ো?”

“না, না। ঘুরতে বেরোচ্ছেন শুনলুম,
বদি সাহায্য করতে পারি। মানে পরের
উপগার পরম ধর্ম, বুঝলেন না দস্তজা?”

সেলামং বলে “উনি তো আগেই একঘফা
লোট, কঙ্গল, চিমটে, আলখাল্লা, টুপী, মালা
নিয়েছেন।”

সহদেব শিক্কার বলে “ত বেশ হয়েছে।
এখন হ’চারটে কুর্দার, শাপ, ব্যাঙ, বিছে,
বাঘের কামড়ের দাওয়াই, একখানা বাঘডাল
আর একটা ছাতি নিতে হবে।”

পরে যখন দেবে দাম তখন জিনিষ বাছাই
করতে আর দেরী হয়? খুড়ো ভবঘুরের
দরকারী যত রকম জিনিষ আছে বংশীর নামে
কিনে ফেলে। দস্তজা শুধোলেন “তা এখানে
কি মনে করে খুড়ো?”

“আমি? বাশের বেঁটে একগাছা
দরকার হয়ে পড়েছে। বেয়াহবের মাথা—”

পাকা চুল ও টাক মাথা

কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে “কনক হেম্মার অয়েল” ও “কনক হেম্মার
লোশান” অতিশয়। ইহা ব্যবহারে অচিরেই আপনার চুল মসৃণ ও বৃদ্ধি হইবে। এবং
যে কোন প্রকার কেশ রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হইবেন। কিংবা ডাঃ ডিগোজ (হেম্মার
ডিভিজ স্পেশালিষ্ট) (ব্রুসন) চিকিৎসাদ্বীনে আশিয়া জটিল কেশ রোগ হইতে মুক্ত হউন।
মূল্য আশাতীত সুলভ করা হইয়াছে।

মান্যক্যাক্চারার :—

ডাঃ ডিগোজ কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

৪৯ বি, হারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন বি, বি ৪৩৮৬

দি সিটি ব্যাঙ্কিং এণ্ড লোন ডিপার্টমেন্ট হইতে ২৫ মূল্যের মাসিক

৥০ আনা সুদের বণ্ড খরিদ করিয়া মাসিক আয়ের সংস্থান করুন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন।

বরং ভুজান কি মাদ্রাজ ঘেলের টিকিট কাটতে পারেন কিন্তু যেটে বুকজের বাসের টিকিট নিশ্চয়ই কাটবেন না। যেটে বুকজের বুকজই হোল দত্ত শিকদার কোম্পানীর ওপর লুকিয়ে কামান দাগবার ঠিক জায়গা। বংশী ঠিক করলে রাত বায়োটার বেরিয়ে চুপি চুপি বাড়ী গিয়ে দামী জিনিসগুলো, কোম্পানীর কাগজ পত্র নিয়ে চলে যাবে যেটে বুকজ অঞ্চলে তারপর একবার লেখানো গা ঢাকা দিয়ে গ্যাট হয়ে বসতে পারলে আর তারে পায় কে।

রাস্তির এগারোটার চারদিক নিরুন্ম হয়েছিল যেথো বংশী নবকান্ত নন্দীর ছোটেল থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে বাড়ীতে এলে দরজার তালার চাবী ঘোরালে। তার ভয় হয়েছিল শিকদার খুড়ো হয়তো চব্বিশ ঘণ্টা তার বাড়ী পাহারা দেবে। কিন্তু চারদিক তাকিয়ে খুড়োর দাড়ীর ডগা কি বাঘের চোক দেখতে না পেয়ে ভাবলে “ভর্গা ভর্গতি-নাশিনী!” বাড়ীতে ঢুকেই বংশী দরজার হুকো লাগালে।

পা টিপে টিপে ভেতরে এসে হঠাৎ দেখলে রাস্তাঘরের দিক থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে লম্বা দালানে। বাড়ীতে লোক ঢুকেছে ভেবে বংশীর বুক টিপ টিপ করতে লাগলো। তারপর ভয় করলে চলবে না ভেবে অনেক কষ্টে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে লাগলো ব্যাপারটা কি?

“হতভাগা চঁহরাটা কি ভাহলে তালার duplicate চাবী তৈরী করিয়ে রেখেছিল? মনিব বাড়ীতে নেই ভেবে হতভাগা বোম্ব হর পাশের রায়বাহাদুরের বাড়ীর চাকর নন্দাকে নিয়ে ফুর্তির জোগাড় করেছে। যোগে বংশী ছুটলো রাস্তাঘরের দিকে। খাবার ঘরে আলো জ্বালা, এক কোনে ঘোড়ের মকবুল মিক্রার হোকানর ডেকচী আর গোটা দুয়েক খেনো মধের বোতল কিন্তু লোকজন

কেউ নেই। ভাবলে মাল যখন রেখে গেছে তখন মালদার আসছে এখনই।

বংশীর মাথার পরচুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল। হাঁ! বামন ঘরে গেলেই লাজল ওঠে শিকের, বটে? খাবারমাথা আলমারীর পেছতে বংশী গা ঢাকা দিলে। মতলবটা ছিল, যখন চঁহরা হতভাগা জুং করে খেতে বসবে তখন বেরিয়ে এলে এমন তোড়া তুড়বে সেই বাঁদরাকে যে দত্ত শিকদার কোম্পানীর ওপর গায়ের ঝাল পর্যন্ত ঝেড়ে নেবে সেই গাখাটার ওপর। কণাটা ভেবে কেমন একটা ফুর্তিতে তার মন নাচতে লাগলো।

একটু পরেই বাইরে পায়ের ভারী শব্দ পেয়ে বংশী তাড়াতাড়ি পরচুল, চশমা, গৌফ দাড়ী সব খুলে চঁহরাকে নিজ মুক্তি দেখিয়ে ভড়কে দেবার জন্তে তৈরী হয়ে, লাফিয়ে পরবার জন্তে লুকিয়ে রইলো। কিন্তু লাফিয়ে আর বংশীকে পড়তে হোলনা। উলটে খোলার ভেতর কচ্ছপ ঢোকান মত লে পেতিয়ে গেল আর মতটা পায়ের চূপ করে থাকবার জন্তে কান দিয়ে নিঃশেষ ভাড়বার চেষ্টা করতে লাগলো। ঘরে ঢুকলো চঁহরাও নয়, নন্দাও নয়, ঢুকলো এমন দুই নরমুর্ন্তি যাদের নামনে হতভাগা কি শিকদার তো তৃণাধি তুচ্ছ।

বংশীর পা ছটো যেন মেঘের সঙ্গে এটে গেল। বংশী এর আগে লিফেল চোর কখনও দেখিনি। যদি দুরবীণটা হাতে থাকতো তা হলে ভাল করে ভগবানের আজব কৃষ্টি ছুটি এই জীবকে ভাল করে দেখে নিতো। তবু এটা তার দেখতে বাধলো না যে ভাটার মত চোখ ঘুরিয়ে ডেকচী বোতল নজরে পড়তেই ত্যাছাটা ডেকচীটা খুলে দেখে আফ্লাবে নেচে উঠে, তারপর আলমারী থেকে ছখানা প্রেট বের করে ভারী হাতা দিয়ে মাংস

চাললে। চঁহরা এনে রেখে, গেছে বোম্ব হর নন্দাকে ডাকতে, এমন ছটো দানা দভিয়ার মত আকাশ ফুড়ে পড়ে লাবার করতে লেগে গেল। তবু ভাল যে মিনিট বেড়েক বন্ধ করে রাখা নিঃশেষটা বংশী যখন হুস্ করে ছাড়লে তখন খোলার হাপুস্ হপুস্ শব্দে সে শব্দটা চাপা পড়ে গেল। তার পর এলো বোতল ছটো। হতভাগা চঁহরা তাহলে লুকিয়ে নেশাও করে? যদিও তার ওপর বংশীর রাগ হচ্ছিল তবু বেচারার পরমাগুলো মাঠে মারা গেল দেখে বংশীর কষ্টও হোল। কিন্তু দ্রুত প্রকাশ করবার মত জায়গা আর অবস্থা তো আর নয়।

প্রথম প্রথম ভুত ছটো মুখ বঁজে খেয়ে যাচ্ছিল কিন্তু খেনো মধ পেটে পড়তেই ব্যাটারের মুখ খুলে গেল।

“তোফা খাঁট জুটে গেল রে বেন্দা।”

“বা বলেচিস বাবা। কিন্তু আমার মতলব তো শুনছিলি নে। আজ বা দিলবে তার তিন ভাগ আমার এক ভাগ তোর।”

“কি রকম? আধাআধি বংরাই তো হয়ে আলছে এতদিন। নেশায় তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।”

“চূপ কর বাবা। আধছটাক মদে নেশা হবে বাবা, তুই আমাকে তেমনী পেঁচী মাতাল ঠাওরাস্ নাকি?”

“তা নোস্ বলেই তো জানতুম। কিন্তু আজ তোর বেরাড়া কথা শুনে তাই তো মনে হচ্ছে।”

“হাতের বোতলটা উচিয়ে বেন্দা বলে এই ছটাকে-বোতলে নেশা হয়েছে যদি বলবি তো মারবো তোর মাথায় এই বোতলের বাড়ি এক বা।”

“বোতল খুঁচি আমার হাতেও নেই? তবে শুঁচাই নি। পেঁচারাইতো কথায় কথায় বোতল শুঁচায়।”

আলমারীর আড়াল থেকে উকি ঘেরে বংশী দেখলে শুণ্ডা ছটো মধের নেশায় বগু

হয়ে উঠেছে। গলা জড়িয়ে আসছে আর লাল চোখ দুটো বন্ বন্ করে ঝুঁচে। বাবা বেন্দাকে পেঁচা মাভাল বলে গাল দিয়ে নিজে গলায় ঢক ঢক করে বোতলটা ঢালতে লাগলো আর সেই ফাকে বেন্দা হাতের বোতলটা তুলে দিলে বাবার মাথায় বসিয়ে। বংশী আলমারীর পাশ থেকে উকি মারা বন্ধ করলে। যদিও বিনা টিকিটে এমন একটা আজব মজা দেখা ফেলে গেল তবু উকি মেরে দেখতে তার ভরসা হোল না। তবু কানে যা আসছিল তাতেও কম মজা ছিল না। বংশী যা শুনে তাতে বুঝলে এক আলমারী আর দেওয়াল ছাড়া সব কিছু লড়াইয়ের সড়কি হয়ে উঠেছে। তারপর বাবা বেন্দার ঘেঁষে পড়ে ধস্তাধস্তি চললো আর হাতের কাছে যা জুটলো তাই দিয়ে ঘাড়ের পর ঘা চলতে লাগলো। যে সব অভিমানবিকৃত গাল বংশীর বংশের কেউ কখনো শোনেনি সে সবের চেউ এসে বংশীর কণপটকে ধাক্কা দিতে লাগলো আর যতই লড়াই কমে উঠতে লাগলো ততই বংশী ভাবতে লাগলো ব্যাপারটা গড়াবে কতদূর? হঠাৎ যেমন একটি শব্দ করে লড়াই শুরু হয়েছিল তেমনি একটি শব্দ করে লড়াই ফতে হয়ে গেল।

তবু মিনিট কতকের আগে বংশীর আর উকি মেরে দেখবার সাহস হোল না। যখন দেখলে তখন মনে হোল এমনি সব scene থাকলে লিনেনমা জমে কি চমৎকার! লিনেনমার সব সরঞ্জামই মজুত, থালি নেই বোতল বাহিনী সাকী একটি। আলমারীর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের অবস্থা দেখে বংশী বদনব্যাদন করে রইলো। বাবা বেন্দা জড়াজড়ি করে একদম বেছস হয়ে পড়ে আছে। দেখে কে বলবে যে একটু আগে এরাই শুভ নিশুভের লড়াই শুরু করেছিল। বাবা যেন আত্মমোড়া কল থেকে হিবড়ের মত বেরিয়ে এলেতে আর বেন্দাকে কে যেন তুলোধোনা করে ছেড়ে

দিয়েছে। শুভা জ্বাটা যদি পুলিশের চেনাও হয় তবু এখন তাদের চিনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। পুলিশের কথা মনে পড়তেই বংশী ভদ্রলোকের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে ফোনে পুলিশকে খবর জানাতে পাণ্টা জবাব এলো এখনই তারা আসছে শুভা ছটাকে গ্রেপ্তার করবার জন্তে। বংশী খাবার ঘরে গেল, বিস্ত গন্ধে আর বিকট দৃশ্যে তার গা বমি করতে লাগলো। ফাঁকা হাওয়ায় অভাবে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। সে সদর দরজা পূলে বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, ফাঁকা হাওয়া নাক দিয়ে টেনে টেনে বুকটা ছাপকা করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

এমন সময় অন্ধকারে পেছু থেকে বংশীর কাঁধে ভারী পাথরের মত একখানা হাত পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে বাজখাই গলায় লহলহেব খুড়ো বলে “বংশী নাকি হে? ছটো কথা ছিল তোমার সঙ্গে।” পেছু ফিরে খুড়োর গৌফ বাড়ীর জঙ্গলে অন্ধকারে বাঘের মত যে চোখদুটো জ্বলছিল তার পানে চেয়েও তখন কিন্তু বংশীর চোখের পাতা ঝড়লো না। কি জানি কেন, ও সময় তার মনে একটুও ভয় ছিল না। তার কেমন মনে হোল, তার আর খুড়োকে ভয় করবার দরকার নেই। এমন কি খুড়োকে তার অতি ভুচ্ছ লোক বলেই মনে হোল। বাবাবেজার লড়াই চোখে দেখার পর খুড়োকে তো ভুচ্ছ বলে মনে হবই।

এমন সময় এক কথার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একখানা থানার লরী থামলো আর তা থেকে লাল পিপড়ের সারির মত পুলিশ নামতে আরম্ভ করলে। দারোগা দয়াময়

হুত্থর এগিয়ে এসে ভাঙ্গা বাজলার শুধালে “কে? বংশীবাবু নাকি?”

বংশী যথেষ্ট লহলহে দেখিয়ে বলে “দারোগাবাবু নাকি? আছন, আছন। সোজা ভেতরে চলে যান। খাবার ঘরেই আপনার আসামীদের পাবেন। তবে শিক্কাটা বোধহয় একটু বেশী রকম বেওয়া হয়ে গেছে। ফোনে বহু গোবন্দি গয়রাধ গবাকান্তকে খবর পাঠান।”

“অবস্থা খারাপ নাকি?”

“খারাপ মানে? রীতিমত কাহিল। কি করি বলুন, রোগটা বেশী হয়ে গিয়েছিল আর হাতটাও বেপরোয়া চলেছিল।”

দারোগা দয়াময় বলে “তা ও যেমন কুকুর তেমনি খুশুরই হয়েছে।”

হঠাৎ বংশী হিলিতে বলে উঠলো “যান্তি বোলা।”

বংশীর কাণ্ড শুনে খুড়োর চোখ তো কপালে উঠে গেছে। ছাড়া গোফের জঙ্গলের ভেতর থেকে চোখ পিটপিটিয়ে খুড়ো বলে “ব্যাপার কি বংশী?”

প্রথমটা বংশী চমকে উঠলো। তখনই সামনে গিয়ে বলে “ভূমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ খুড়ো?”

খুড়ো বলে “হ্যাঁ।”

ওঃ—কি জরুরী কথা আছে আমার সঙ্গে, না?”

“হ্যাঁ, পাঁচ মিনিট আড়ালে ছটো কথা বলবো।”

“বংশী বলে “নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! একটু দাঁড়াও। ওরা আগে বিধায় নিন।”

হারিম এম.এস. ডামানের
জানি ও অসুস্থি
কস্তুরীপিল বাজারে
প্রস্তুত
ধাতুদৌর্যল্য ও শক্তিশীলতা চিরন্তনে
আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ টাকার
৪২ নং ধর্মভালা স্ট্রীট কলিকাতা

তারপর তোমার সঙ্গে—বাখাবেলা চুকেছিল আমার বাড়ী। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?”

খুড়ো বলে উঠলো “বাখা বেলা!” এমন সময় পুলিশের হল চাঞ্চল্যে করে নিয়ে বেরিয়ে এলো দৌড়ে গুপ্তা ছোটোকে। তাদের পেছু পেছু হাঁকডাক করতে করতে বেরিয়ে এলো দারোগা দয়াময়। বংশীর পানে তাকিয়ে গভীর ভাবে দারোগা দয়াময় বলে “আপনি দিন কতক একটু সাবধানে থাকবেন বংশীবাবু। বদমায়েল ছোটোকে আচ্ছা লাঞ্ছনা দিতেছেন। তবে একটু সাবধান হওয়া ভাল। কে জানে, কোনদিন—”

“হ্যাঁ, শিক্কাটা একটু বেশীই দেওয়া হয়ে গেছে। তবে সাবধান হবার দরকার বেশি। আচ্ছা, নমস্কার দারোগা বাবু, নমস্কার।” খুড়ো? তা বাইরে কেন? ভেতরে এসে। বেশ নিরিবিলা মৌলিকান্বে হবে। চাকর বাকরদের আজ সব ছুটি দিয়েছি। বেশ ছুতনে—”

খুড়ো আশ্বে আশ্বে বংশীর হাত থেকে হাত ছুটি ছাড়িয়ে নিয়ে বাঁচলো। খুড়ো তো আর খুড়োই ছিল না। রাস্তার আলোয় দেখা গেল তার মুখ ছাইয়ের মত হয়ে গেছে। চোক গিলে খুড়ো বলে “তুমি কি সত্যি— তুমিই কি ও ছোটোকে—”

“আমি কি? ওঃ—তুমি গুপ্তাছোটোর কথা বলছেন? হ্যাঁ, লিনেমায় গিয়েছিলুম বিনোদিনীকে—মানে মিস ডাটকে নিয়ে। ফিরে বেশি ভূতছোটো খাবার ঘরে দিবা চালিয়েছে। তাই একটু শিক্কা দিয়ে দিলুম। দারোগা মশাই ঠিক কথাই বলে গেলেন। সত্যি, রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না।” তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে গাট বিতে দিতে বলে “নাঃ—মেকাজটা ঠাণ্ডা করতে হবে। রাগ চণ্ডাল। ব্যাপারটা কি জানো খুড়ো, গারে যে আমার এত জোর, সব সময়ে লেটা নিজেই খেয়াল থাকে না।

হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কি দরকার ছিল ভাতো বলে না?”

সহদেব শিক্কার তাড়াতাড়ি দ্বার ঢোক গিললে। তারপর বংশীকে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে এলো।

“না না। এমন বিশেষ কিছু নয়।”

“কিন্তু খুড়ো এত রাতে দরকার না থাকলে এমন কি আর এসেছে আমার খোজে?” খুড়ো বার কতক কেশে নিলে।

“হ্যাঁ, ডাক্তারের ঘরের সঙ্গে তোমার বিব্রত কথা শুনলুম। তাই জানাতে এলুম সুখবরে আমি অস্বস্ত খুশী। আর—আচ্ছা— বিয়েরে কি উপহার দেওয়া যায় বলো বেশি?”

“শক্তবাহ খুড়ো! তুমি লোকটি খুব মাই ডিয়ার বলতে হবে। তা ভেতরে একটু আসবে না?”

“না ভেতরে আর যাবো না। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কাল ভোরেই আবার

লোদর বনে যেতে হচ্ছে। ডাকে বিয়ের নেমতন্ন পাঠাতে ভুলো না, বুঝলে তাই?”

বংশী বলে “দিলক্ষণ! তোমরাই তো করবে কন্সাবে। তা খুড়ো সেলামৎ মিঞার ওখান থেকে বাঁশের খেটে নিছো তো? কে জানে, শুনেছি লোদর বনের বাঘগুলো আজকাল বেজায় বেয়াহুদী আরম্ভ করেছে।”

শিকারী সহদেব শিক্কার বলে “শিকার টিকার সব ছেড়ে দোব ভাবছি। বয়েস তো হচ্ছে। আর ও বয়েসে জীব হত্যা—”

বংশী হাস করে একটা নিঃশেষ ছেড়ে বলে “তাইতো খুড়ো, বড়ই চুখের বিষয়।”

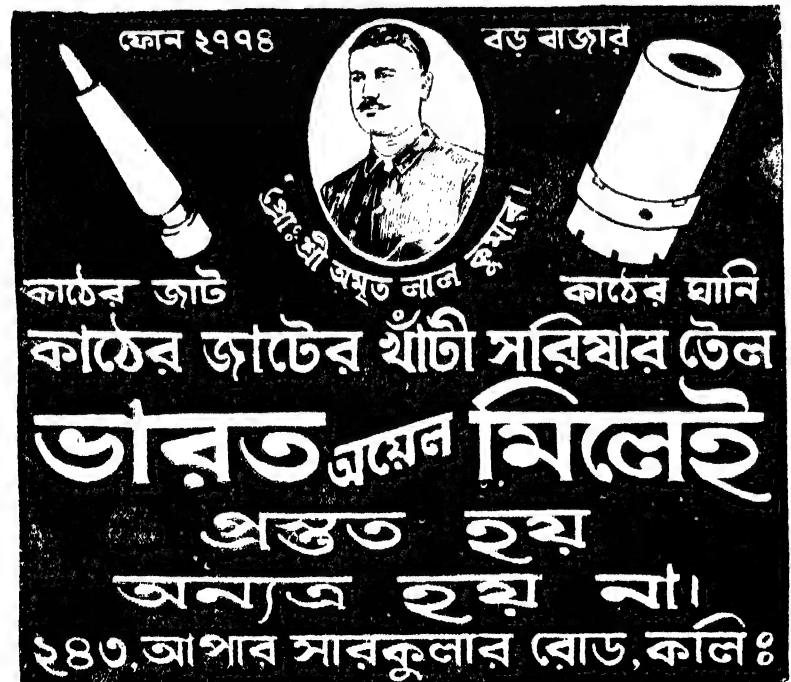
খুড়ো বলে “বড়ই চুখের বিষয়। আচ্ছা তাই, এখন আসি।”

বংশী বলে “হ্যাঁ, তবে এসো এখন।”

“বিদায়!”

“বিদায়!”

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার



খাটের জাতি খাটের জাতির খাঁটি সরিষার তৈল

ভারত এয়েল মিলেই প্রস্তুত হয় অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আপনার সারকুলার রোড, কলিঃ

শেষ পত্র

শ্রীদেবশীষ সেনগুপ্ত

গোরস্থান। বহু পদস্থ সামরিক কর্মচারী, পরিপূর্ণ হয়ে—দেখাচ্ছে ফুলের বাগানের মত। সালটুপী, পায়জামা, সোনালী ডোরা ও বোতাম, তরওয়াল, কর্মচারীদের ঘাড়ের পিট-গুলি, পদাতিক ও অশ্বারোহী নৈকত্বের সোনালী ফিতে—সমস্ত এমিক ওমিক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাঙ্গা কালো ক্রশগুলো লোহা, পাথর বা কাঠের শোকোক্ষীপ্ত বাহু বিস্তার করে শোভা পাচ্ছে।

ওরা গোর দিচ্ছে কর্নেল লিমোবির জীকে; হু'দিন পূর্বে স্নানকালে তিনি জলমগ্ন হন।

সব শেষ হলো। দর্শন্যাজক বিদায় নিলো। কিন্তু কর্নেল জুন কর্মচারীর, পর ভর দিয়ে সেই উজ্জ্বল কবরের সামনে দাঁড়িয়ে লইলেন,—ওর তলে তিনি এখনও দেখতে পাচ্ছেন সেই কৃষ্ণবর্ণ “কফিনটাকে”.....ওরই মধ্যে যে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর যুবতী স্ত্রীর বিকৃত শব্দেহ।

ওর বয়স যেন এগিয়ে গেছে—কত বছর! লম্বা পাতলা চেহারা..... সাধা গৌফ-জোড়া!..... তিনি বছর পূর্বে ওঁর এক লক্ষ্মী কর্নেল সর্টি'র কন্যা—পিতার মৃত্যুতে অনাথ হয়ে পড়ায়—উনি তাকে বিবাহ করেন।

যাদের 'পর উনি ভর দিয়েছিলেন—কাপ্টেন ও লেফটেন্যান্ট ওকে দু'রে নিয়ে যেতে চায়; উনি বাধা দেন। অশ্রুজলে চোপ ভরে আসে, জোর করে তা ফিরিয়ে দিতে হয়। “না! না!! আর একটু দাঁড়াও” চাপা গলায় মুহু জ্বলন করে লেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্তে তিনি বল প্রয়োগ করেন।

আর কবরের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি নেই। মনে হয় ওর গভীরতার আর সীমা নেই—অতল অসীম ও; যেন একটা সীমাহীন লাগর—তার অসুস্থ প্রেম, তার সপ্নময় জীবন—সব এ বিধে তার যা কিছু ছিল সমস্ত গ্রাস করে ফেলেছে।

লক্ষ্মী জেনারেল এরমো এসে উপস্থিত হলেন। সবলে কর্নেলের বাহু ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললেন। বললেন, “চলে এসো! চলে এসো বন্ধু! তুমি কিছুতেই ওখানে থাকতে পাবে না।”

কর্ণেল আত্মদম্পর্শ করে বাড়ী ফিরলেন। ঘরের দরজা খোলা মাত্র ওর লক্ষ্যপথে আসে একখানা চিঠি। তা' তুলে ধরে বিস্ময় ভাবাভিশযো উনি কাঁপতে লাগলেন; —স্ত্রীর হস্তাক্ষর তিনি চিনতে পেরেছিলেন। চিঠির উপর ডাকঘরের মোহর ছিলো সেইদিনের। খামখানা ভিড়ে ফেলে তিনি পড়লেন :—

বাবা, আশাকরি এখনও আপনাকে “বাবা” বলতে পারি, যেমন আমি চিরদিন বলে এসেছি। যখন আপনি এই চিঠি পাবেন তখন আমি থাকবো মৃত ও প্রোখিত। সুতরাং বোধ হয় আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন।

আমি আপনার করুণা উদ্ভেক করবার জন্তে ব্যস্ত নই। আত্মদোষস্থানন করতেও আমি চাই না। আর একঘণ্টার মধ্যে যে আত্মপ্রাণ বিসর্জন দেবে—সে তা'র স্ত্রী-জীবনের সমগ্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে আত্মপুষ্কিণ লতা ঘটনার যথাযথ বিবরণ আপনার নিকট প্রকাশ করতে উৎসুক।

লক্ষ্মীতা বশতঃ আপনি আমার বিবাহ করেন—প্রতিদানে আমিও আপনার হয়েছিলাম। একটা ছোট্ট মেয়ে যত খানি ভালবাসতে পারে আমিও আপনাকে ততখানি ভালবাসতাম। আপনাকে ভালবাসতাম যেমন আমি ভালবাসতাম আমার জন্মভাতা পিতাকে;—হ্যাঁ! প্রায় তেমনই। একদিন আমি যখন আপনার হাঁটুর উপর বসেছিলাম আপনি আমাকে আলিঙ্গন করছিলেন,—আমি নিজের অজ্ঞাতে ‘বাবা’ বলে চিংকার করে উঠি। সে ডাক শূন্য হয়েছিলো আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে। আপনি আমার কাছে আমার পিতাই, হ্যাঁ—আর কিছু নয়—শুধু পিতা! আপনি হেসে আমার বলেছিলেন, “সব লম্বরে ঐ নামেই আমার ডেকো খুকী—আমিও ভালবাসি।”

আমরা এলাম এই লম্বরে, এবং বাবাগো আমার মাজ্জনা করণ,—আমি—আমি প্রেমে পড়লাম। ওঃ কতদিন আমি সংগ্রাম করিলাম ওর বিরুদ্ধে, কতদিন—প্রায় দু'বছর। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন—প্রায় দু'বছর! ওঃ!! শেষে আত্মদম্পর্শ করলাম। তখন আমি দোবী ভট্টা স্ত্রীলোক।

সে কে? আপনি কাউকে লক্ষ্যে করতে পারবেন না। সেদিক দিয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কারণ যাদের আপনি আমার বারজন গ্রহ উপগ্রহ নামে অভিহিত করতেন সেই বারোজন পদস্থ কর্মচারী আমার ঘিরে থাকতো—আমার সঙ্গে থাকতো।

বাবা! তাঁকে বুঝে বার করবার চেষ্টা করবেন না। তার বিরুদ্ধে ক্রোধ পোষণ করবেন না। অতঃ কেউ হলে তার জায়গায় যা করতো সেও তাই করেছে। আর এও আমি জানি সে আমাকে ভালবাসতো তাঁর সম্পূর্ণ জীবনখানি দিয়ে।

কিন্তু—তুমি! একদিন আমরা 'বিক্যাসি' দীপে গিয়ে মিলিত হবার বন্দোবস্ত করলাম। আপনি চেনেন—সেই ছোট্ট দীপটিকে!—সই বায়ু চালিত কলের কাছে! কথা ছিলো আমি সাতার কাটতে কাটতে ভীরে উঠবো আর সে আমার অপেক্ষায় ঝোপের মধ্যে বসে থাকবে—হ্যাঁ!—তার পরেও, সে সেইখানে থাকবে লক্ষ্য পর্যন্ত,—যা'তে কেউ তাকে যেতে দেখতে না পারে!—আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবামাত্র একটা ঝোপের ডালপালা লয়ে গেল। চেয়ে দেখি—আপনার আঙ্গুলী 'ফিলিপ'। বিষয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। মনে হলো যেন আমরা স্তান হারিয়েছি;—আমি চিংকার করে কঁদে উঠলাম। কিন্তু সে...সে...বুঝেচেন...সে বললে কৈখন প্রিয়তমে যাও একটু সাতার দিয়ে এসো। আমাকে এই লোকটার সঙ্গে রেখে যাও।

আমি চলে এলাম। উদ্বেজনার জ্বলের তলে তুলিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর আপনার বাড়ীতে ফিরে এসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম—ভরানক একটা কিছু ঘটনার।

এক ঘণ্টা পরে বাইরের ঘরে পোষাক-পরিহিত ফিলিপের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। চাপাগলায় সে বললো, "আমি হজুরাইনের আঙ্গাধীন—যদি কোনও পত্র তাঁর ঘেবার থাকে তিনি আমার দিতে পারেন।" তখন আমি বুঝলাম—লোকটা আত্মবিক্রম করেছে এবং আমার প্রণয়ই ওর এই মৌনতার ক্রোড়।

হ্যাঁ! আমি তাকে অসুখই আমার

সব চিঠি দিতাম—সব চিঠি। সে দেগুলি পৌঁছে দিতো এবং আমার কাছে এনে দিতো তাহের উত্তর।

এমনি করে দু'মাস চললো। আমরা তাকে বিশ্বাস করতাম—আপনি স্বয়ং তাকে যেমন বিশ্বাস করতেন।

এখন—.....দেখুন!... বাবা!... কি ঘটলো!...একদিন সেই দীপেই আমি সাতারে গিয়ে উপস্থিত ছলাম; এবারে আমি একা; আপনার আঙ্গুলীর সঙ্গে আমার দেখা হলো। সে আমার প্রত্যাশাতেই ছিলো...

আমায় শাসালে যদি আমি তার কামা-নলের পরিভূপ্ত সাধন না করি তবে সে আপনার নিকট আমাদের ধরিয়ে দেবে। যে চিঠিগুলি সে চুরী করে রেখে দিয়েছিলো সেগুলিও সে আপনাকে দেবে।

ও: বাবাগো! ছনিয়ার ভয় আমাকে চেপে ধরলো—হীন নীচতাময় ভয়, সর্বোপরি আপনার ভয়—হায় এত লজ্জায় তবুও প্রভাবিত! ভয় তার জন্তেও—কারণ আপনি তার প্রাণ নাশ করতেন! বোধহয় ভয় আমার নিজের জন্তেও!—কি করে বলি! 'ডয়ে আমার লজ্জা যেন বিলুপ্ত হলো!—তাই স্থির করলাম আর একবার আমি ঐ ছুটির মৌনতা ক্রম করবো। ও আমাকে কামনা করে। ও: কি লজ্জা।

আমরা—আমরা স্ত্রীলোকেরা এত ঢাকল! আমরা আপনাদের চেয়ে লামাঠিতেই দিশে-হারা হয়ে পড়ি। আর তারপর? যে একবার পতিত হয়েচে—ক্রমশঃই সে নীচে তলিয়ে যায়। কি করে আমি বলি—আমি

কি করছিলাম! আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে মরতে হবে—এইই শুধু আমি জানতাম! তাই এই পুত্র নিকট আত্ম-সমর্পণ করলাম।

বাবা! দেখুন! আমি নিজেকে বাঁচাতে কোনও রকম সুযোগ অনুসন্ধান করছি না।

তারপর—আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম ভবিষ্যতে তাই হলো। বারবার আমার ভয় দেখিয়ে সে তার গুণীমত আমার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতো। অতীত মত সেও আমার প্রণয়ী হয়ে পড়লো। ঘৃণার কথা নয়? আর কি শান্তি তার জন্তে—বাবা!

অবশেষে আমি স্থির করলাম—আত্মহত্যা করবো। জীবিতাবস্থায় আমি কিছুতেই আপনার কাছে এ অপরাধ স্বীকার করতে পারতাম না। মৃত্যুর পর কিসের ভয়? এভিন্ন অস্ত্র উপায়েতো নেই। অস্ত্র কিছুই আমার এ কলঙ্কের চিহ্ন বুয়ে দিতে পারে না। আমি বুঝলাম আর কোনদিন আমি ভালবাসতে পারবো না—ভালবাসার পাত্রীও হতে পারিনা। এমন কি আমার হস্তকম্পনও মনে হতো কি কালিমাময়!

"অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ম্রান করতে যাবো—আর ফিরে আসবো না।

আপনার নামে এই চিঠি যাবে আমার প্রণয়ীর বাড়ীতে। আমার মৃত্যুর পর সে এটা পাবে এবং এর অস্তিত্ব কাহিনী লব্ধকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার আমার শেষ অনুরোধ পালনার্থে আপনার নিকট তা প্রেরণ করবে। আপনি স্বয়ং অস্ত্রে স্টিক্রিয়া অস্ত্রে ফিরে এসে এট চিঠি পড়বেন।



ইন্দিবিম্বাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ব্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিদায়! বাবা! আর আমার কিছু
বলবার নেই।
যা ইচ্ছা করুন—আর—আর, আমার
মার্জনা করুন। ইতি—

বাংলাদেশের শ্যামলা মেয়ে তুমি

শ্রীঅমিয় কুমার রায় চৌধুরী

কর্ণেল কপাল থেকে বাম মুচলেন।
তার আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধকাণীন স্থিরতা আবার
যেন ক্রিয়ে এলো।

তিনি ঘণ্টাধ্বনি করলেন—একটি ভূতা
প্রবেশ করলো।

“ফিলিপকে পাঠিয়ে দাও” বলে ড্রয়ারটি
টেনে অর্ধেক খুলে রাখলেন।

প্রায় সেইকণ্ঠেই লোকটি তার সামনে
এলে উপস্থিত হলো। লাল পাকান গোর্ফ,
সোমশ বেহা, বৃত্ত দৃষ্টি ও চাতুর্যপূর্ণ চক্ষু তার।

কর্ণেল তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ
করলেন।

“আমার জ্বর প্রণয়ীর নাম? বলা!...”

“কিন্তু...কিন্তু...হজুর.....”

লৈকাধাক্ষ হেরাজ থেকে পিত্তলটি উঠিয়ে
নিলেন।

“হঃ—তারপর? বলা! বলতি!!
তুমি জানো এ সামান্য কারণে সময় নষ্ট
করবার ইচ্ছা আমার নেই!”

“হ্যা—অ্যা—হজুর! তার নাম—...
ক্যাপ্টেন সেন্ট এ্যালবার্ট।”

লগ্নে লগ্নে একটা জলন্ত অগ্নিশিখা তার
চক্ষু স্পর্শ করলো.....কপালের মাঝখানে
গুলিবিদ্ধ হয়ে মুখ খুণ্ডে সে পড়ে গেলো। *

* গীত মৌপীসা

বাংলাদেশের শ্যামলা মেয়ে তুমি,
নহ তুমি স্বর্গের অপ্সা।
লভ্যি যদি করুনাকের পরী হতে তুমি—
হতে যদি পটে আঁকা ছবির মতন,
তোমার মাধুরী তাতে উঠতো নাকো ফুটে,
তার চেয়ে এই আভ বেশ।

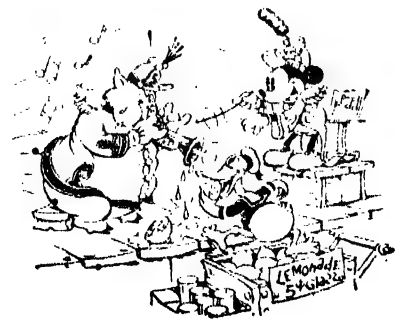
অজ্ঞ বেউ ছেপে যদি তোমা’
বলবে তুমি অতি সাধারণ।
আমি কিন্তু অস্বল্প ভাবি—
মোর চোখে তুমি,
—জীবনের পূর্ণতায় সর্বদা উজ্জল,
কবিতার স্তব্ধতার লম্ব।

হৃৎক মেষের মত স্বাভাবিক চন্দে,
তুমি কর যাওয়া আসা,
ছায়া বাতালের মত
স্বপ্ন শাস্ত্র ভাবে।
চরণের চাপে তব ফেটে নাকো ফুল,
মুক্তাও ঝরেনা কানিতে।

তুমি যবে ভেসে যাও কৃষ্টির স্রুত্রে,
জীবনের প্রাণের মত,
প্রাণে কোন উৎস হতে ভেসে আসে গান,
তোমার কান্ধেতে আছে জীবনের সুর।
প্রকৃতির ময়ে কিনা তুমি,
তাঁই তব নদী স্বাভাবিক

তাই তুমি করনা হৈয়ালী,
করনাকো মিছে অভিনয়।
মুক্ত তুমি আধোভিক হরিণীর মত,
ত্রিডাহীনা নও তুমি ঘোটে।
আপনার চণ্ডে তুমি অত স্বাভাবিক,
আধফোটা পাপড়ির মত
লাজন্তরা আভরণ দিয়ে
পরানের পরাগে ঢেকে রেখেছ।
তাঁলেও চঞ্চল মধুপের লম্ব,
আমার এই তৃষিত হৃৎকের কাছে,
আধফোটা পাপড়ির বিকাশের মাঝে
দিয়েছ যে মধুর আভাব—
মর্ষের স্তব্ধমল রেণুর লক্ষ্যন।
বৈশ্যের কর হতে, যৌবনের উজ্জ্বলের
সাথে,

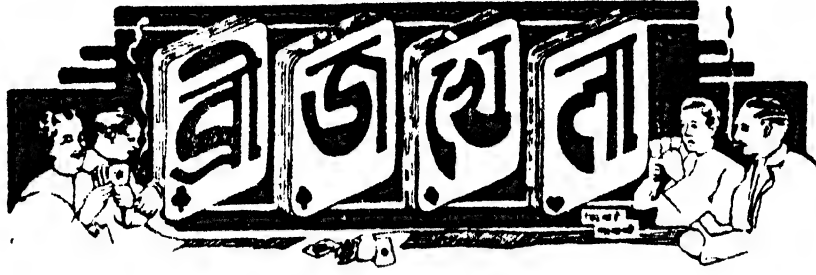
যে রূপসাধনার করেছি লক্ষ্যন,
আধারের পথছায়া মুসাফির আমি—
আজ ভাবি তারে আর নাহি প্রয়োজন!
তোমার ঐ স্নগ্ধতার স্পর্শটুকু দিয়ে,—
দুখিয়েছ তুমি, তোমারেই চায় মোর মন,
বলনায় বাস্তবের বিকাশের তরে।
তাঁই বলি বেশ মেয়ে তুমি,
তুমি মোকে, দুবে থেকে, বরেন্দ আপন,
তাই তোমায় ভাল লাগে অত।



পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

* ১৩৬এ, আন্ততাব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

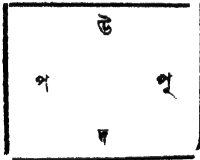


ব্রজযাত্রা

ফিনাস গ্রহণঃ—ফিনাস নিয়ে খেলোয়াড়ের মধ্যে অনেক সময় মতবৈধ হতে দেখা যায়। এট ব্যাপার নিয়ে এই জ্ঞান কয়েকজন পাঠক আমাদের কয়েকটি হাত পাঠিয়ে দিয়ে মতামত জানতে চেয়েছেন। তাঁদের অবগতির জ্ঞান আমরা এবার কয়েকটি অবস্থা নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ও তার সমাধানগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।

(১)

উ। চিড়িতন—বিবি, লাতা, তিরি।



পু। চিড়িতন—টেকা, দশ, ছরি।

আপনার একটি ফেরাইএর ডাক বিপক্ষ 'প' চিড়িতনের টেকা খেলেছেন, ডাকি চিড়িতনের লাতা দিয়েছেন। 'পু' কি দেবেন বলুন তো ?

'পু' চিড়িতনের দশ মারবেন, কারণ যদি 'প'র হাতে লাহেব ও গোলাম থাকে, তবে ডাকহারেরা ঐ রঙে একটিও পিট পাবেন না। অথচ যদি 'প'র হাতে একটি মাত্র বড় তাল থাকে, তাহলে ডাকহারেরা মাত্র একটি পিট পাবেন।

(২)

উ। চিড়িতন—লাহেব, বিবি, দশ।



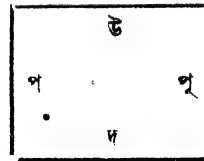
পু। চিড়িতন—টেকা, লাতা, পজা।

এ ক্ষেত্রেও ডাকহার ফেরাইএর খেলা খেলেছেন। 'প' চিড়িতনের তিরি খেলেছেন, 'উ' বিবি দিয়েছেন। 'পু' কি ভাবে খেলবেন বলুন তো ?

'পু' এ ক্ষেত্রে টেকা না মেরে ছেড়ে দেবেন, কারণ দ্বিতীয়বার এই রঙে খেলা হলে টেকা কার হাতে আছে ডাকহারের পক্ষে বুঝে ওঠা কষ্টকর হবে। ডাকহার যদি ভুল করে লাহেব মেরে ফেলেন, তাহলে 'পু' টেকা দিয়ে পিট ধরে বাকি কয়খানি চিড়িতনের পিট অনারালে নিয়ে নিতে পারবেন।

(৩)

উ। চিড়িতন—টেকা, আটা, ছরি।



পু। চিড়িতন—লাহেব, পজা, চৌকা।

ডাকহার এবার ইচ্ছাবন রঙের খেলা খেলেছেন। প্রথম পিটখানি নিয়ে তিনি চিড়িতনের বিবি খেলেছেন। বলুন তো 'প'র কি করা কর্তব্য।

অ-ধরা

—সনেট—

এম-সিরাজউদ্দীন চৌধুরী

দূরে আর হবে কত ওহে প্রিয় মন—

দিয়ে নাকি ধরা আজ জ্বরে আবার ?

লজ্জা আসে আনমনে খুল খুল দার ;

ফিরে কিগো যাব আমি অজানার লম ?

বিশ্ব ভরে আজ তুমি ছাড়াপথ লম—

পথ শ্রান্ত ক্লান্ত আমি পাই নাই তবু ;

নিরাশায় ক্ষণে ক্ষণে কাঁধি বলি কতু ;

বলে দাঁও কোথা তুমি ওগো নিরপম।

মাটির মানুষ আমি...নিরাকার নছি;—

নিরাকারে আজি তাই নাছি বলে মন।

আজ কিনা নাছি আজ জানিবারে চাহি ;

দেখী নহে মানবীতে দাঁও দরশন।

অ-ধরার পিছু ছুটে, পরে আঁখি বাধি,

শ্রাব পর বারি ধারা...পা'রার স্বপন।

'প' এখানে লাহেব না মেরে ছেড়ে দেবেন, কারণ বিবি খেলার বোকা যাচ্ছে যে তাঁর হাতে গোলাম আছে। প্রথম-বারে লাহেব মারলে বিশেষ কোন লাভই হচ্ছে না, কিন্তু যদি ডাকহারের হাতে বিবি, গোলাম, নয় থাকে তাহলে বরং ক্ষতিই হচ্ছে। কেন না তিনি অনারালে 'উ'র হাতে গিয়ে চিড়িতনের নংটি ফিনাস করে নিতে পারবেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারে গোলাম খেললেই তিনি তৎক্ষণাৎ লাহেব মেরে খেঁড়ার হাতের দশখানি বড় করবার চেষ্টা করবেন।

এইবার এই তিনটি অবস্থা দেখানো হল অবশ্যন্তে যত রকমের অবস্থা হয় দেখাবার চেষ্টা করব।

রক্তমাখা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-পি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অরোহণ পরিচ্ছেদ ।

নিরাপদ চলিয়া গেলে, লবঙ্গ ও উপরে আলিবার জন্ত সিঁড়ির নিকটে আসিল। সিঁড়ির পাশেই শৈঠকখানার ঘর। শৈঠকখানা ঘরে নিরাপদ ও রামদীনে কথা কহিতেছে, লবঙ্গ শুনিতে পাইল। সে সিঁড়ি দিয়া উপরে আলিবার মুখে দাঁড়াইয়া সে কথা শুনি শুনি।

নিরাপদ বলিতেছে, হাঁরা রামদীন ? ডাক্তারবাবুর ঠিকানা কি বলতে পারিস ?

—ডাঃদার বাবু ? যা ডাঃদারবাবু হামলোক্কা বাড়ীমে আস্তা হ্যায়, উসকো ? হাঁ, হাঁ—উসকো ।

—এতো একদম সিধা রাস্তা ! বাড়ীমে বাহার হোগা, ত ডাহিনা চলিয়ে। একদম সিধা চলা যাউয়ে। পরলা, বায়েমে একঠো গলি মিল জাগা ! উসকো ছোড়কে ফিন্ যে গলি মিলেগা, উস্কে ঘুস যাউয়ে। এই গলিমে বরাবর চলা যাউয়ে। যাতে যাতে যাহা একঠো মন্দির মিলেগা, ওই মন্দিরকা বগলমে লতীশ ডাঃদার বাবুকো খোজ করিয়ে,—মিল্ যাগা ।

—নিরাপদ রামদীনের সিধা রাস্তার বিস্তারিত ভৌগোলিক বিবরণ শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল : আরে ও গলির নাম কি বল্ না ! বায়ে যাও, ডাহিনা যাও, ও হাম লম্বেগা নেহি !

—গলিকা নামত বাবু হাম্ নেহি জান্তা হ্যায় !

—ডাক্তার কোথায় থাকে, সে গলির

নাম তুমি জানেনা ! বেটা, বিশ বছর এখানে চাকরি কচ্চিস, এটুকু উপকার তোর দারার হয়না !

—আরে বাবু হাম্ মেডুয়া হ্যায়, উসকো নাম হাম্ কারসে জানেগা !

—কেবল রহড় ডাল আর রোটি বানানে জানেগা, আউর কুছ জানেগা নেহি !

—আরে বাবু ! এতো সিধা রাস্তা হ্যায়, চলা বাউয়ে না ! আজ্ঞা লোকবিত যানে শুক্তা হ্যায় !

—তোর মাথা হ্যায় ! তোর গুস্তিকা পিণ্ডি হ্যায় ! বেটা ভূত কোথাকার ! বাড়ীর ডাক্তার, তার ঠিকানাটা অবধি তুই জানবিনে ?

একটু গামিয়া, নিরাপদ কি ভাবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল বাড়ীর নম্বর কত জানিস ?

—বাড়ীকা নম্বর কই বারো কি পনেরো তোগা !

—তাও তোম্ জান্তা নেই ! কেবল বৈঠকে বৈঠকে তুলসীদাল পড়তা হ্যায় ! দাদাকে বলে এমাসে তোর মাইনে কমিয়ে দেবো ! দেবি, তুই জঙ্গ হ'স কিনা !

আরও কি লিড বিড করিয়া বকিতে বকিতে বোম্বের রামদীনের পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে করিতে, নিরাপদ বাহির হইয়া গেল।

লবঙ্গ এতক্ষণ সিঁড়ির নীচেকার ধাপে দাঁড়াইয়া অতি কষ্টে, মুখে কাপড় দিয়া হাত লম্বরণ করিতেছিল ; বপন বুকিল, নিরাপদ গিয়াছে, তখন রামদীনকে ডাকিয়া বলিল : রামদীন ! তুমিও একবার

ডাক্তারের বাড়ী যাও। ছোটবাবু ঠিকানা জানেন না, কোথায় যেতে কোথায় যাবে,—শেষে তাঁকে নিয়েও হয়তো আমরা বিপদে পড়বো। তার চেয়ে তুমি একবার পেছন পেছন যাও। ডাক্তারের বড় বরকার।

রামদীন একটা বিকট হাই তুলিয়া, তাহার শনি নিবারণের জন্ত আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল : কাহে মাশিমা ! বাড়ীমে কিয়া হয় ?

লবঙ্গ বলিল : দিহির যে বড় অসুখ, তুমি শোনুনি ? যাও শীগগির যাও !

—কিনো ? বহু-মাইজীকো ? আরে, হাম উস্কো ওয়াস্তে এতনা পূজা হোম, বাগ কিয়া, তব্ বি আরাম নেহি হয় ! আজ্ঞা, কাল হাম্ একঠো ভূত ঝাউনেওয়ারাকো হিয়া বোলায়গা ! ও বড় ওস্তাধ হ্যায় ! ও মস্তরতন্তর আওড়ায়কে বহু-মাইজীকো জরুর আরাম কর দেগা !

—আজ্ঞা সে পরে হবেখুনি ! এখন তুমিত ডাক্তারকে ডেকে আনো !

—হামারা বি যানে হোগা ? আজ্ঞা যাই ! কিয়া করি ! নক্রি করতা হ্যায় ! জরুর যানে হগা !

বলিয়া সেই গয়া জিলা নিবাসী বীরপুত্রবংশের একটা খেঁটে কোথা হইতে বাহির করিয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে বাহির হইল। যাউবার সময়ে লবঙ্গ তাহার অঙ্গল হইতে একটি আঙুলি বাহির করিয়া, রামদীনের হাতে দিয়া বলিয়া দিল !

কিরে আসবার সময়ে পাঁচলের বরফ অমনি নিয়ে আসবে। যা বরফ আছে, লম্বন্ত রাত কুলোবেনা।

রামদীন আঙুলিটি লইয়া ঝাড় নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বলিল : এতনা বরফ মাত্ দেও মাশিমা ! উস্কে বেমার আউর বাড় যাগা ! হামলোক বুঢ়া হ্যায়, হামলোক বহুত বেখা। এইলান মাত করে !

লবঙ্গ বলিল: আচ্ছা, তুমি এনে রাখোতো! তারপর ডাক্তার যা বলে, তাই করবো!

রামধীন সে কথাই লম্বট হইলনা। বলিল: ডাক্তার লোক কেয়া জানতা হায়! করবম বেমার বাড়ার হেতা হায়!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

লবঙ্গ হোগীর ঘরে ঢুকিতেই নীরদ বলিয়া উঠিল; “লবঙ্গ! হোগীকে যদি বাঁচাতে চাও, শীগগির মাথায় বরফ দাও! জর ভয়ানক বেড়েছে। আমি থার্মোমিটার তুলে দেখেছি। তুমি আর বেদী করোনা! শীগগির বরফ দাও। আমি রামধীনকে বলি, একবার ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনুক।”

লবঙ্গ তাড়াতাড়ি বরফের ব্যাগটি তুলিয়া লইয়া বারান্দায় গিয়া কতকগুলি বরফের চাপ কুচা করিয়া ভাঙ্গিয়া, জল দিয়া বুইয়া তাহাতে ভর্তি করিল, এবং দ্রুতবেগে ঘরের মধ্যে আসিয়া লগিতার মাথায় ব্যাগটি ধরিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নীরদ বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল! “বাবু! আপনি ব্যস্ত হবেন না! আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।

—পাঠিয়েছে? বাঃ! এই না হ’লে হোগীর তদারক! লবঙ্গ? তোমার বুদ্ধি দেখছি পাশ করা নালদেহরও হার মানার!

প্রশংসা শুনিয়া লবঙ্গর মুখ খানির উপর একটু রক্তের ঝলক খেলিয়া গেল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। উদ্বিগ্নতার মধ্যেও তাহার মুখখানি দেখিয়া নীরদ একটু অশ্রুমনস্ক হইয়া পড়িল।

ঘরে স্বানিকরণ নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। দেওয়ালে যে বড় ঘড়িটা ঝুলিতে ছিল, শুধু সেই নিজীব যন্ত্রটিই টিক টিক করিয়া মুহূর্ত গণনা করিতেছিল। বাহিরে একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল, তাহার স্বর বড় বীতংস।

নীরদ এতটা নীরবতা লক্ষ্য করিতে

পারিতেছিল না। তাহার মনে আশঙ্কা হইতেছিল, বৃষ্টি নীরবতা রোগকে সুযোগ দিবে তাহার অন্তিম জয়লাভ সূচক করিয়া আনিতে। এত বড় রোগে এত নীরবতা সে পছন্দ করিল না। লবঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিল: লবঙ্গ? তুমি যদি মা’র সঙ্গে এখানে এসে না পড়তে, তাহ’লে আমাদের কি দশা হতো?

—কাকুর অভাবে কাকুর আটকায় না বাবু! আটকায় শুধু তখন, যখন মনকে বাঁধতে পারা যায় না।

—কিন্তু মন বাঁধতেও ত একটা খঁটি চাই!

লবঙ্গ উত্তর করিল: খঁটি মানুষের নিজের বুদ্ধি। বুদ্ধি থেকে জ্ঞান আসে,— জ্ঞান মানুষকে সহস্র দুঃখের মাঝেও আঁটা করে রেখে দেয়!

—আমার সে বুদ্ধিও নেই, জ্ঞানও নেই! কাজেই বুদ্ধি ধার কর্তে হবে। কিন্তু কে ধার হবে? একজন পাকা লোক কাছে না থাকলে, কোথা থেকে সে বুদ্ধি ধার পাবে?

—তবেই হয়েছে! আমাকে বৃষ্টি সেই বুদ্ধির উত্তমর্ণ পেয়েছেন! যার নিজের এককড়া কাণাকড়িও পুঞ্জি নেই, সে অপরকে ধার হবে কি করে?

নীন্দবাবু একটু হাঁসিয়া বলিল: তোমার কড়ির বহর কত, তা আমার নতুন করে জানাতে হবে না, লবঙ্গ! এ কয়দিনেই বাড়ীর সকলেই জানতে পেরেছে, তোমার বুদ্ধির দৌলত কত বেশী!

—সে দৌলতে যদি আপনার ধার নেওয়া চলে, তা পাবেন। কিন্তু শেষে বেনাধার আর মহাজন দুজনেই না গনেশ উল্টে বসে!

—বেনাধারের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, যে তার মহাজনটি একটি টাকার কুমীর! তবে কাবুলীওয়ালাদের মত সুবধোর না হয়, সেইটেই ভয়!

—সুদ, কিছু দিতে হ’বে বৈকি বাবু! নইলে মহাজনের চলে কি করে! তা, আপনি এর মধ্যেইতো দাবন দিতে আরম্ভ করেছেন!

—কাণে জল ঢুকিয়ে জল বার কর্তে হয়, লবঙ্গ; এ কথাটাতো মিথ্যে নয়!

—কিন্তু কাণ যে এদিকে কাল হতে বসেছে, জলের ভারে। সে দিকেও একটু লক্ষ্য রাখবেন! আপনার উপকার কি আর আমি জীবনে পরিশোধ কর্তে পার্কো! আমি অনাথা জীলোক, নিরাশ্রয়! আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনার শুধু পুণ্য সঞ্চয়ই হচ্ছে, প্রত্যাশকার কিছুই আশা করতে পার্কেন না!

যেটা কর্তে, সেটা প্রত্যাশকার নয়, নিজের নিঃস্বার্থ উপকার! রোগের সময়ে রাত জেগে, উপবাস করে শুশ্রূষা করা শুধু পুণ্য সঞ্চয় নয়, মানুষের চরম মনুষ্যত্ব! এর মধ্যে স্বার্থের কীট মোটেই থাকে না, প্রত্যাশকার পাবার বালনা মোটেই কাকুর ফোটার না। সেবা মানুষের সত্যিকারের বিপুল ধর্ম,— পুষ্প বিধ বলে দেবতাপুজার চেয়ে তার পবিত্রতা আরও অধিক, তীর্থভ্রমণের চেয়ে তার আনন্দ ও স্মৃতি সর্কতোব্যাপী!

—হাঁ, যদি সত্যিকারের শুশ্রূষা করা হয়? যদি আপনাকে ভুলে হোগীকে বাঁচাবার জেজ্ঞে ও আরাম দেবার জেজ্ঞে উঠে লাগা হয়, তাহ’লে। এখানে শুশ্রূষার প্রধান অঙ্গ আত্ম বলিধান। কিন্তু আমি কি তা কর্তে পার্কি? শরীরে হয়তো কিছু কিছু কর্কি; কিন্তু মন যে আমার বিকিপ্ত হয়ে রয়েছে।

নীরদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল: কেন, মন বিকিপ্ত হয়ে রয়েছে কেন?

লবঙ্গ মাথা নীচু করিয়া, ফিক করিয়া একটু হাঁসিয়া উত্তর দিল! থাকবে না? আমরা কি স্বাধীন? ভগবান নারীকে গড়েছেন সহস্র বন্ধনের বাঁধন দিয়ে জড়িয়ে। প্রথমত: তার শরীরেই একটা মস্ত বাঁধন!

ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক, নারীর শরীরটার ওপর প্রতিবিলের শনিদৃষ্টি যেন লম্বাই হাঁ ক'রে চেয়ে আছে। তারপর তার মন! সেটাকেও ভগবান কাঁটা দিয়ে ভক্তি কর্তে ভোলেননি বাবলাগাছেরও গায়ে যত কাঁটা থাকে, মেয়ে মানুষের মনে বোধহয় তার চেয়ে বেশী কাঁটা লুকানো থাকে।

নীরব বাধা দিয়া বলিল : সেটাতো নারীর নিজের ইচ্ছার রচা।

লবঙ্গ বলিল : নিজের ইচ্ছায় রচাও কতকগুলি আছে! আবার ভগবানের দেওয়া, সমাজের দেওয়া কাঁটা সকলের চেয়ে বেশী? নারীর মনে ভগবান এত দুরাকাজা সৃষ্টি করেছিলেন কেন? সমাজের নিরহের জন্তই হোক, —আর ভগবানের দেওয়াই হোক —তার মনে এত লজ্জার ডোহাডোহি কেন? তার লজ্জা, তার প্রচণ্ডতা, সমস্তই কি তার জীবনগতির ভয়ানক অন্তরায় নয়?

নীরব বাধা একটু ভাবিয়া বলিলেন : হাঁ, সবগুলো অন্তরায় বটে! কিন্তু অন্তরায়ের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো অমুকুল বৃত্তিওতো তোমাধের আছে! সেগুলোর কথা ধরচো না কেন?

লবঙ্গ চোখ তুলিয়া অমুসন্ধিৎসু নেত্র জিজ্ঞাসা করিল : কোনটা অমুকুল?

নীরব তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : অমুকুল কিছুট নেই? তোমাধের মনের ও দেহের যে একটা সহজ সূত্রীকতা আছে; সেটা কি তোমাধের জীবনযাত্রার অমুকুল নয়?

তর্ক ও বিশ্লেষণ আরও কতদূর অগ্রসর হইতে পারিত বলা কঠিন, কেননা ঠিক এই সময়ে নিরাপদ ঘরে ঢুকিয়া বলিল : ডাক্তার বাবু এসেছেন।

নীরব বড় বড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন : এসেছেন? নিয়ে এসো ঘরে।

লবঙ্গ রোগীর মাথার কাছে বসিয়াছিল, ডাক্তার বাবুর আগমন লংবাধ পাইয়া মাথার



(সি, বি)

আই, এক, এঃ—

হকি খেলার মধ্যম পুরোধমে চললেও ফুটবল খেলার আয়োজনও আরম্ভ হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের ইতিমধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গভর্নিং বডির সভা হয়ে গেছে। তার মধ্যে প্রথমটিতে এ বছরের জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত কনফেডারেশন নির্বাচিত হয়েছেন।

• সভাপতি :—শ্রী মনোজ নাথ রায় চৌধুরী, (লস্টোয়ের মহারাজা)

সহ-সভাপতি—মিঃ নিকলস

সম্পাদক—মেন্সাল এম দত্ত রায় এবং ডেপুটি

কোষাধ্যক্ষ—মিঃ মুকন্দীন

দ্বিতীয় সভাটিতে পূর্ব প্রথমত নিয়ন্ত্রিত লাবকমিটিগুলি গঠিত হয়েছে।

কাপড়টুকু টানিয়া ধিল, এবং সেখান হইতে উঠিয়া বহুবার জ্ঞান প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নীরব বলিলেন “তুমি উঠতে চাইচ কেন? তুমি আকাল ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা কও?”

লবঙ্গ মাথা নাড়িয়া খুব মৃদুস্বরে বলিল : কথা কইনে। তবে তিনি এলে, আর উঠে যাবার সুবিধে হয়না! সব কথাতো আমার শুনে নেওয়া চাই!”

—তবে, এখানেই থাকোনা!

লবঙ্গ আর উঠিলনা, শুধু অঙ্গের বদন-খানি আরও টানিয়া টানিয়া একটু লজ্জিত হইয়া বলিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ :—

মেন্সাল ইম্পাছানি, পেপার এবং এল এম বসু।

রেফারীস কমিটি :—

লেঃ উইলসন, কলোনেল তাইনিং এবং ইনস্পেক্টর জিনস

মাইনর টুর্নামেন্ট কমিটি :—

ডাঃ মিত্র, মেন্সাল রোলেট এবং এল।

টুর সাব কমিটি :—

মেন্সাল এল এন কর, পি সি মিত্র এবং বি সি ঘোষ।

চারিটার টাকা ব্যরের কমিটি :—

মেন্সাল ট্রাটফোর্ড, পিক, প্রেটন, বি সি ঘোষ, এল সি তালুকদার এবং এল সি সেন।

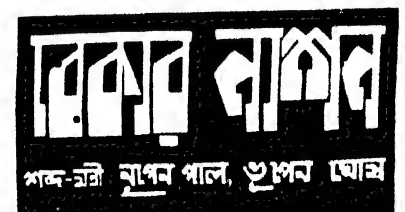
প্রাদেশিক কমিটি :—

আই, এক এর প্রতিনিধিগণ :—মেন্সাল এস এন ব্যানার্জি, এস সি সেন, পি শুভ, এ কে সেন, এল সি তালুকদার, ডি এইচ পিক এবং জে এন ই নেগেল।

আই এক এ টিম নির্বাচন

কমিটি :—

মেন্সাল পি সি মিত্র, ইম্পাছানি, এল



সি তালুকদার, জে এন ই নেগেল, লে: উইলসন এবং বি এইচ পিক।

খেলোয়াড়দের টিম পরিবর্তন কমিটি:—

মেশাল এল সি তালুকদার, ফিট্জেরাল্ড এবং প্রেন্স।

আই এফ এ টুর্নামেন্ট:—

মেশাল এল এন ব্যানার্জি, এন আর ট্রাট্‌ফোর্ড এবং পি শুভ্র।

অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে আই এফ এর প্রতিনিধিত্ব

মেশাল এল এন এর এবং জে এন ই নেগেল।

ফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন আইনসমূহ না হওয়ার জন্য মি: পি শুভ্র আপত্তি উত্থাপন করায় রেজাল্ট ক্লাবে আই এফ এর গভর্নিং বডির তৃতীয় সভাটি হয়। অনেক বাক্য বিতর্ক এবং মনো-মালিন্যের পর মি: শুভ্রের আপত্তি বাতিল হয়ে যায় এবং মেশাল কর এবং নেগেলের নির্বাচন বহাল থাকে। এমন কি গত ২৭শে মার্চ তারিখে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভায় যোগদান করার জন্য উপরোক্ত প্রতিনিধিত্ব দ্বিগুণ চলে গেছেন। মি: শুভ্র আই এফ এর প্রতিনিধি নির্বাচিত না হওয়ার সম্ভবত: ঢাকা স্পোর্টস এলোমিয়েশনের তরফ থেকে ফেডারেশনের সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন।

দ্বিতীয় সভাটিতে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয়। লন্ডন বাহাদুরের 'যক্ষা নিবারণী ভাণ্ডারের' সাহায্যকরে 'নারী সমিতি' এবং 'পুরুষ সমিতি' প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি করে চ্যারিটি ব্যাচের ব্যবস্থা করার জন্য 'আই এফ এ-কে' অনুরোধ করা হয়। আই এফ এ দুইটি সমিতির পক্ষ থেকে একটি সম্মিলিত চিঠি পাঠাইবার জন্য এই দুইটি সমিতি

জানিয়েছেন। এই চিঠি পাবার পর 'আই এফ এ' এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা করেন।

আই এফ এর একটি মনোনীত হলকে 'অস্ট্রেলিয়াতে' খেলতে পাঠাবার জন্য লেখানকার কর্তৃপক্ষেরা আই. এফ এর নিকট আহ্বান পাঠিয়েছেন। আই এফ এর নিজের এ বিষয়ে স্থির করার সম্পূর্ণ অধিকার না থাকায় তারা 'অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের' অন্তর্ভুক্তি জ্ঞাত আবেদন করেছেন। ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্তি পাবার পর আই এফ এ এই আহ্বানের বিষয় পুনরায় আলোচনা করেন।

খেলোয়াড়দের খেলার:—

খেলোয়াড়দের মধ্যে টিম পরিবর্তন করার একটি অস্বাভাবিক প্রতি বছরেই চলে হয়। সেই কারণে আই এফ এ-কে ক্যালকাটা ফুটবল লিগ-ক্লাউন্সের অধিনায়কের সঙ্গে সঙ্গে একটি আইনও প্রস্তুত করতে হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী থেকে ২৫শে মার্চ তারিখের মধ্যে টিম পরিবর্তনের ফুটবল খেলোয়াড়দের আই এফ এর সম্পাদকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নির্দিষ্ট 'ফর্ম' লই করে নিজের অভিপ্রায় জানাতে হয়।

যে সকল খেলোয়াড়দের কোন অনিবার্য কারণে কিংবা নিজের খেলার উন্নতি করার জন্য টিম পরিবর্তন করতে হয় তারা হয়ত ক্রীড়াঙ্গণের আন্তরিক সমর্থন দাবী করতে পারেন। কিন্তু প্রতি বছর খেলোয়াড়দের টিম পরিবর্তনের তালিকা প্রকাশিত হবার পর তার সংখ্যার আধিক্য দেখে মনে হয় যে উপরি উক্ত কারণগুলির জন্য যে সমস্ত খেলোয়াড়দের সূতনের সন্ধান করতে হয় তাঁদের সংখ্যা অতি নগণ্য। আমলে এই টিম পরিবর্তনের ব্যাপারে কোন শুভ

আকর্ষণ আছে যার জন্য অনেক খেলোয়াড়দের পক্ষে লোভ লব্ধ করা শক্ত হয়ে উঠে। এবং সেই কারণে বর্তমানে যে ক্লাবের খেলোয়াড় আকর্ষণ করার ক্ষমতা যত বেশী সেই ক্লাবের পক্ষে ভাল খেলোয়াড় পাওয়াও তত সহজ হয়। এই সকল সাময়িক আকর্ষণের প্রভাব যে সকল খেলোয়াড়দের কোন রকমে টলাতে পারে না তাই প্রকৃতপক্ষে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্পোর্টসম্যান পদব্যাচ এবং তাঁদের খেলার মধ্যে বিশিষ্টতার লক্ষণ দেখা যায়। তাছাড়া অন্যান্য 'ডবল' খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন খুব শুণী খেলোয়াড় হলেও তাঁর খেলার তারিফ হতে পারে তবে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা বা সম্মান কোন ক্রমেই পাবার যোগ্য নয়।

খেলার মধ্যে 'ব্যবসার' ভাব ঢুকিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের মধ্যে আনন্দ এবং ছুঃখের আদান প্রদান হয় বটে, কিন্তু এই ব্যাপারটিকে কোন প্রকারেই উৎসাহ প্রদান করা চলে না। ক্লাব কর্তৃপক্ষেরাও খেলা আরম্ভ হবার পর আন্তরিকতা এবং ব্যবসায়ী খেলোয়াড়দের খেলায় কত পার্থক্য তা বেশ স্পষ্ট করতে পারেন। অনেকেই এবছর কালীঘাট ক্লাবের শোচনীয় অবস্থার জন্য বিচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ক্লাবের কর্তৃপক্ষেরা যে এবছর ব্যবসায়ী খেলোয়াড়দের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে প্রকৃত খেলোয়াড়দের সাহায্য বরণ করে নিয়েছেন—এতে করে তাঁদের ক্লাবের যশ কতকংশে ঝুঁকি হবার সম্ভাবনা থাকলেও এই নব প্রচেষ্টা প্রবর্তনের তৃপ্তি তাঁদের অনেকখানি সন্তোষ দেবে। অবশ্য কালীঘাট ক্লাব এতদিন এবিধে সম্পূর্ণ অবহিত হন নি, কিন্তু সেই কারণে অতীতের বোঝাই দিয়ে বর্তমানকে অনাধার করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

গত বছরের তুলনায় এবছরে খেলোয়াড়দের 'ছাড়পত্র' নেবার লংখ্যা অল্প হলেও গত ২৫শে মার্চ তারিখে ৮নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্রেসন্থিত আই, এফ এ আফিলে খুব চাকলা এবং উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। অধিকাংশ ক্লাবেরই বিশেষ করে প্রথম ডিভিশন ফুটবল টীমগুলির কর্তৃপক্ষের কঠোর প্রমস্বীকার করে উৎকর্ষ এবং প্রায় অনশনে দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁদের চেয়েও আই এফ এ আফিলের 'লিফটম্যানটিকে' সেদিন সর্বা-পেক্ষা বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ যদি সেই তারিখের পর এই কতভাগ্য জীবটিকে দু'একদিনের বিশ্রাম দিয়ে থাকেন তাহলে তার প্রতি সুবিচারই করা হয়েছে। এবছরে মোট ২৮২ জন খেলোয়াড় ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন। দু'একজন খেলোয়াড়কে সই করবার পরই শৈলশিখরে পাঠারার ব্যবস্থাও কোন কোন ক্লাব কর্তৃপক্ষকে করতে হয়েছে বলে শোনা গেছে। এই 'ছাড়পত্রের' জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষদের লাভ কিংবা ক্ষতি যাই হোক আই এফ এর তহবিল প্রতি বছরেই সম্ভাব্যজনক ভাবে পূর্ণ হয়।

এবছরে যতগুলি খেলোয়াড় টীম পরিবর্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে এরিয়ান্স ক্লাবের বিখ্যাত খেলোয়াড় সন্তোষ কুমার মজুমদার ওরফে চেনে মজুমদারের পরিবর্তনটিই খুব চাকল্যের সৃষ্টি করেছে। এমন কি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হবার পূর্বে পর্যন্ত এই খবরটি অনেকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নি। বিশ বৎসর পূর্বে তাঁর খুল্লতাতে পরলোকগত দুঃখী রাম মজুমদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এরিয়ান্স ক্লাব পরিত্যাগ করে তিনি যে তাঁর, খেলোয়াড় জীবনের শেষ সময়ে ভবানীপুর ক্লাবে এসে যোগদান করবেন একথা তিনি নিজেও কোনদিন ভাবতে পারেন নি। তাছাড়া আরও কয়েকটি নামকরা প্রথম ডিভিশন খেলোয়াড়ের পুরাতন ক্লাবের মায়া ত্যাগ

করে নতুন ক্লাবের আশ্রয় লাভ উল্লেখযোগ্য হয়েছে। মোহন বাগান ক্লাবের নামকরা গোলরক্ষক কে দস্ত অনেক 'গড়িমসি' করার পর পালেশের তাঁবুতে নিজের দেশের ক্লাব 'ইষ্টবেঙ্গলে' চলে গেছেন। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় 'বেবি বোব' গত বছরে মোহন বাগান ক্লাবে সুবিধা করতে না পেরে তাঁর নিজ পুরানো ক্লাব হাওড়া ইউনিয়নে প্রত্যাগমন করেছেন। পূর্বে হাওড়া ইউনিয়ন এবং গত বছরের ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের গোলরক্ষক পি বানার্জি এবছর মোহনবাগান ক্লাবকে নিজের 'মরা খেলা' নিয়ে সাহায্য করবেন। উদীয়মান খেলোয়াড়দ্বয় গনেশ বোব এবং সৌরেন দে যথাক্রমে কালীঘাট ক্লাব এবং এরিয়ান্স ক্লাব ত্যাগ করে ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান করেছেন। যামিনী বানার্জি অনেক ঘোরাঘুরির পর শেষ পর্যন্ত এবছরে মোহন বাগান ক্লাব ত্যাগ করে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে গিয়ে জুটছেন। কলকাতার নামকরা রাইট আউট নির্মল বোব এরিয়ান্স ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে কতশাণ করে মোহনবাগান ক্লাবের মানা স্ট্রিটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য এই ক্লাবের শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু শেখোক্ত খেলোয়াড়টি মিঃ দোষের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা করে—মানে মানে চলে এসে তাঁর পূর্বকার লীগক্ষেত্র ভবানীপুর ক্লাবের

কর্তৃপক্ষকে আনন্দদান করেছেন। কালীঘাট ক্লাবের ক্যাপ্টেন সুবোধ বানার্জি এবং ভাইল ক্যাপ্টেন এস লিংহে যথাক্রমে মোহন বাগান এবং ভবানীপুর ক্লাবের সভাপ্রতীভূক্ত হয়ে 'মরা হাতী লাথটাকা' এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে দেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। বঙ্গির আশেপাশ গত বছর দ্বিতী থেকে এসে কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে অজ্ঞাতে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে 'হিন্দুস্থান' একতরফা সমর্থন যোগ্য নয় বিবেচনা করে এবছর নিজেদের মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। রেঙ্গুনের বিখ্যাত বৈটে বৃষ্টির খেলোয়াড় 'ডেলাটেট' গত বছরে কালীঘাট ক্লাবের শোভা বর্দ্ধন করলেও এবছরে জাহাজ থেকে নেমেই ভবানীপুর ক্লাবের গাইড নিয়ে আই এফ এ আফিলে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভবানীপুর ক্লাব তাঁকে যতটা কড়া পাহারায় কলকাতার এনে ছাড়ির করেছেন অতটা না করলেও চলত কারণ শোনা গেল যে কালীঘাট ক্লাব তাঁর জন্য বিশেষ আগ্রহাশিত ছিল না। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ছোট রসিদ এবছর তাঁর পুরানো কালীঘাট ক্লাবে খেলাই সমীচীন মনে করেছেন। আগেকার মোহন-বাগানের যশস্বী গোলরক্ষক সন্তোষ দস্ত এবার হঠাৎ স্পোর্টিং ইউনিয়নের ফেরতা

ভূমিকা—

বিকার রাণীবালা, দেববালা, ছায়া,
নরেশ মিত্র, জহর গান্ধী,
— সুশীল রায় (এ) —

মামান

ময়নাথ গাল (বীরজ), কুমার
মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী,
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রভৃতি

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে হাজির হয়েছেন। রবিন্
নীল কাঠমলে চাকরী করা সবেও কালীঘাট
ক্লাবে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ড্যাল-
হাউসি ক্লাব এবছর 'বি' ডিভিশনে খেলতে
হবে বলে দু'চোরজন পাশী খেলোয়াড় নিতে
বাধ্য হয়েছেন। এর পুরে তাঁরা ইউরোপীয়ান
কিংবা এংলোইণ্ডিয়ান জাড়া অস্ত্র নত্যকে
ভলিকাতুক করা মর্যাদা হাবিবর মনে
করতেন। এই সুবিবেচনাটা আগে হলে
হয়ত তাঁরা আরও দু'এক বছর প্রথম ডিভিশনে
খেলতে পেতেন। প্রথম এবং দ্বিতীয়
ডিভিশনের কয়েকটি খেলোয়াড়ের টিম
পরিবর্তনের ভালিকা নিয়ে বেওয়া হইল।

খেলোয়াড়ের নাম পুরাতন ক্লাব নতুন ক্লাব

১। বামিনী ব্যানাজি

মোহন বাগান ইষ্ট বেঙ্গল

২। জিতেন চক্রবর্তী

মোহন বাগান মাদোয়ারী

৩। সৌরেন্দ্র বে এরিয়ান্স মোহন বাগান

৪। বোগজীবন দত্ত স্পোর্টিং মোহন বাগান

৫। রবি ধর ঐ এরিয়ান্স

৬। কালীপদ দত্ত মোহন বাগান ইষ্ট বেঙ্গল

৭। দেবী ঘোষ মোহন বাগান হাওড়া ইউ:

৮। গনেশ ঘোষ কালিঘাট ইষ্ট বেঙ্গল

৯। নির্মল ঘোষ এরিয়ান্স মোহন বাগান

১০। ফরেন্স ঐ ভবানীপুর ঐ

১১। আকতার হোসেন

ইষ্ট বেঙ্গল মহামেডান স্পোর্টিং

১২। এন, এইচ, মিলস ডালহৌসি পুলিশ

১৩। গোপীনাথ মুখার্জি কালীঘাট এরিয়ান্স

১৪। এ মজিদ ইষ্ট বেঙ্গল ম: স্পোর্টিং

১৫। এইচ, বি, মার্শাল

ওয়ারি, এম, সি, এ ডালহৌসি

১৬। নারায় নেপিয়র রবার্ট হার্সাল

১৭। রবিন মিল কাঠমস কালীঘাট

১৮। ডব্লিউ পেরিস সেন্ট জোন্স রোজান

১৯। এল, এইচ, পিক

জর্জ টেলিগ্রাফ হাওড়া ইউ:

২০। জে, এ রেটন জাতেরিয়ান্স কাঠমস

২১। এ, রহমান কালীঘাট মেহামেডান

২২। এ, এ, টোমি স্পোর্টিং ইউ: ভবানীপুর

২৩। এইচ, মেকডোনাল্ড

সেন্ট জোন্স জর্জ টেলি:

২৪। সুবোধ ব্যানাজি

কালিঘাট মোহনবাগান

২৫। মহম্মদ ওসমান জর্জ টেলিগ্রাফ ব্রাউন

২৬। জুমান জর্জ টেলিগ্রাফ ভবানীপুর

২৭। লিও জর্জ ক্যামেরোনিয়ান্স ডালহৌসি

২৮। বীরেন্দ্র মুখার্জি

জর্জ টেলিগ্রাফ কালিঘাট

২৯। এ, সি, জোন্স কাঠমস রোজান

৩০। ই, এ, ক্লার্ক সেন্ট জোন্স ঐ

৩১। এ, ট, এ্যাথলি

আর্সেনিয়ান্স ডালহৌসি

৩২। এ, জোহানিস ঐ ঐ

৩৩। গীরাঙ্গ হান ইষ্ট বেঙ্গল মোহন বাগান

৩৪। এম, রাও

ক্যা: জিমখানা জর্জ টেলিগ্রাফ

৩৫। লিও, ম্যাডনম্ আর্সেনিয়ান্স ডালহৌসি

৩৬। রঞ্জিৎ নারায়ন হাওড়া ইউ: কালিঘাট

৩৭। টি ভট্টাচার্য মোহন বাগান মাদোয়ারী

৩৮। বলির আমের কালিঘাট মহামেডান

৩৯। এন, মজুমদার ইষ্ট বেঙ্গল কালিঘাট

৪০। জে, আডি বোবাজার এরিয়ান্স

৪১। এস্ ডিলাটেট কালিঘাট ভবানীপুর

৪২। সন্তোষ সিংহ ঐ ঐ

৪৩। বিনয় শেন ভবানীপুর এরিয়ান্স

৪৪। ডি ব্যানাজি ইষ্ট বেঙ্গল জর্জ টেলিগ্রাফ

৪৫। এ কালেক ঐ ভবানীপুর

৪৬। এস্, শুই মোহন বাগান ঐ

৪৭। সারওয়ার হোসেন কুমারটুলি কালিঘাট

৪৮। ডোনাল্ড ইয়ং ঐ অরোরা

৪৯। টি, সি, ককস্ ঐ ঐ

৫০। মহম্মদ নাইল ভবানীপুর মেহামেডান

আমার অভিযানে

শ্রীশ্রীমানন্দ ঠাকুর

আমি কোন বাধাই মান্বনাকে

চলবো সুস্থ পানে,

ডালিয়ে ধোবো হালির হাওয়ার

সুন্দের তরী গানে।

ঐ যে যেথা দূর গগনে,

তপন চলে কার স্বপনে,

দূরের মায়া সোণার হরিণ

ধ'রবো আমি প্রাণে।

চলবো আমি লেই যে যেথা

হারায় সকল পথ,

হারিয়ে যাবে মিলিয়ে যাবে

শূন্য আমার রথ।

দূর আকাশে গ্রহে তারায়

ফুলের ভাবায় গানের মায়ায়

চিহ্ন হবে লবল ঠায়ে

আমার অভিযানে।

৫১। পি কজর কুমারটুলি হাওড়া ইউ:

৫২। কে নাজিম মেহামেডান এরিয়ান্স

৫৩। ডি, জি, ক্যানেল সেন্টজোন্স রোজান

৫৪। সন্তোষ দত্ত স্পোর্টিং ইউ: ইষ্ট বেঙ্গল

৫৫। জিতেন ঘোষ মোহন বাগান এরিয়ান্স

৫৬। কে প্রসাদ ইষ্ট বেঙ্গল এরিয়ান্স

৫৭। সন্তোষ মজুমদার এরিয়ান্স ভবানীপুর

৫৮। খগেন বেরা বোবাজার কুমারটুলি

৫৯। রনিব আমের মেহামেডান কালিঘাট

৬০। পি, ব্যানাজি ইষ্ট বেঙ্গল মোহন বাগান

৬১। এস্ ব্রাউন ডালহাউসি ক্যালকাটা

মেজর সি, কে, নাইডু:—

বোম্বাই হিন্দু জিমখানার ব্যবস্থাপক পতার

এবংপর মেলার সি কে নাইডুকে ভারতের

সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় বিবেচিত করে

'এল আর তারারনী' স্বর্ণ পদকটি তাঁকে

পুরস্কার দিয়েছেন। হিন্দু জিমখানা প্রতি

বৎসরই এই পুরস্কারটি প্রদান করেন।

খেয়ালী চিত্রপট



প্যারামাউন্টের "ভটার অক সংহাই" চিত্রের একটি
বিশিষ্ট দৃশ্য। ছবিখানা এসকিনটোনে দেখান হচ্ছে।



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'ভ্যারিটি'

জাশনাল মিউজিপ্যাল লি:

টেলিফোন
সানিগ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সানিগ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৪ম বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭শে টি.সি. ১৩৪৪, ৭ই এপ্রিল ১৯৩৮

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ ছয়দিনের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতার অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। মহাজান্জী ও পণ্ডিত জগদ্বরলাল নেহেরু শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করার দরুন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সম্প্রতি সুভাষচন্দ্রের ও শরৎ বাবুর গৃহে বিভিন্ন সময়ে হইয়াছিল। আসামে ও বাংলার মিশ্র-মন্ত্রিমণ্ডল গঠন ও মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রি-মণ্ডল সঙ্কট ও মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ডাঃ সান্ধমুস্তির বিলাতে গমন ওয়ার্কিং কমিটিতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। আসামে মিঃ বরদলই মিশ্র-মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে পুরাপুরি সম্মতি লাভই পাইয়াছেন। তবে বাংলার ও অগ্ন্যাগ্ন অ-কংগ্রেসী প্রদেশ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। অ-কংগ্রেসীদল সমূহ যদি কংগ্রেসী আদর্শে আস্থাবান হইয়া মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সম্মত হন তাহা হইলে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সমূহ স্থান কাল ও পাত্র অনুযায়ী সমিচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন এইরূপ নির্দেশ ওয়ার্কিং কমিটি দিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনকালে বাংলার কংগ্রেসী এসেম্বলী দলের চাক হইপ. মিঃ জে. সি. দত্তের ভবনে এক ভোজসভায় কংগ্রেস

আদর্শানুযায়ী বঙ্গদল সমূহের সহিত মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্বন্ধে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইয়াছিল এবং সেই আলোচনায় কলিকতা বাংলার কংগ্রেসী-দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটিতে জ্ঞাপন করেন। সর্বদিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করা যাইতে পারে যে অচির ভবিষ্যতে বাংলার মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডল শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

অন্য প্রদেশে, বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সরিকের আচরণ সম্পর্কে বহু সমস্ত প্রশ্ন মন্ত্রী ডাঃ খারের মতামত সমর্থন করিলেও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অহেতুকী জিদ বশতঃ ওয়ার্কিং কমিটি আপাততঃ ব্যাপারটি থামাচাপা দিয়া রাখিয়া মধ্য প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলকে আরো কিছুদিন বিকল আন্দোলনের চাপে বিব্রত করিয়া রাখিলেন। মিঃ সরিক যখন তাঁহার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, এমনকি পদত্যাগ পর্যন্ত করিয়াছেন তখন এই প্রসঙ্গের যবনিকা বিগত অধিবেশনেই টানিয়া দিলে শোভন ও সঙ্গত হইত।

মাদ্রাজ পরিষদের সভাপতি ডাঃ সান্ধমুস্তি প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাজাগোপালাচায়ায়ার ও সর্বদলের পূর্ণ সম্মতি লাভ করিয়া বিলাত বাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। শেষ মুহূর্তে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নির্দেশ অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি মিঃ সান্ধমুস্তির বিলাত যাত্রা প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বিহারের বিহারী—বাজালী প্রসঙ্গের বিবেচনার ভার বাবু. রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। শ্রীযুনালাল বাজাজের রাঁচির বক্তৃতা ও কলিকাতায় তাহার বক্তৃত্তাবে সমর্থন যে জাতীয়-তার আদর্শের পরিপন্থী ও কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী মিঃ শ্রীকৃষ্ণ দিগ্‌হের সার্কুলার সমূহ যে বাজালী বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ মে বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি প্রায় একরূপ ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া গিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মাদ্রাজ ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় আভাষ পাইয়াছেন তাহার এ কথাই স্বীকার করিবেন যে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জায় জবরদস্ত দক্ষিণপন্থী নেতার ব্যক্তিত্বের চাপে ও শ্রীযুনালাল বাজাজের অর্থানুকূলে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিবাদী বামপন্থীদল একেবারে কোণঠালা হইয়া পড়িয়াছেন।

স্রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

মিঃ এ, কে, সেন কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের স্টেশন ডাইরেক্টরের কায্যভার গ্রহণ করার আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করছি। মিঃ সেন বাঙালী, বাংলাদেশের অভাব অভিযোগের লিখিত পরিচিত। সুতরাং আমরা আশা করি বাঙালী সমাজের কল্যাণকর অঙ্গুষ্ঠান মিঃ সেনের কর্মসম্বন্ধে বিবেচিত হবে।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান আজ তার শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে এসেছে। বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে আজ শুধু আমরা ছোটো ভালো গান বাজনা শুনেই খুশি থাকি না; পরন্তু আমরা চাই এর বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দেশের জাতি ও সমাজের গঠনমূলক অঙ্গুষ্ঠান সমূহ। এবং এই আদর্শের দিক থেকে বিচার করতে গেলে একথা বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা লাগে না যে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান আজও বহু পশ্চাতে পড়ে আছে।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র “বেতার জগৎ” যতই আত্মপ্রশংসার ভেদী নিনাদিত ‘হোক না কেন, প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে আমরা বিশেষ কিছুই কৃতিত্ব খুঁজে পাইনে। “বেতার জগৎ” লগরে বলেছেন “বেতারের অঙ্গুষ্ঠানগুলি যে প্রীতিপ্রবাহ হয়েই থাকে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই” একবার বিবেচনা আমাদের শুধু এই বক্তব্য এবং আশাকরি এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে না কখনও তাঁর সম্মানকে অঙ্গুষ্ঠান থেকে না, তাহোক না সে বিকলাক।

আমরা আমাদের একাধিক আলোচনার প্রোগ্রাম সমালোচনার একথা বহুবারই প্রমাণিত করেছি যে বেতারের অধিকাংশ অঙ্গুষ্ঠানই নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং বেতার প্রোগ্রামের কোন একটা standard নেই। এর প্রকৃত কারণের কথা যদি উল্লেখ করা যায় তবে অনেক অপ্রিয় সত্যের কথা বলতে হয়।

এই অপ্রিয় সত্যের কথা আমরা বহু বারই বলেছি। আজও আবার বলছি বেতারে গুণগ্রাহিতার অভাব। গুণী আর্টিষ্টের স্থান এখানে অধিক দিন হয় না। জনসাধারণের দাবীকে কর্মকর্তা উপেক্ষা করেন। বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ধারণা তাঁরা সকলেই এক একজন ‘কেটে বিটু’। রাশি রাশি অযোগ্য আর্টিষ্টের নিয়মিত দর্শন পাওয়া যায় প্রোগ্রামের মাঝে অথচ প্রকৃত যারা গুণী তাঁদের ‘কালে ভদ্রে’ ডাকা হয়।

বিভাগীয় অঙ্গুষ্ঠানগুলিতে, বিভাগীয় পরিচালকদের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত অযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ বুদ্ধিতে, দৃষ্টিতে যা সাধারণের কাছে অসমর্থরূপে প্রতিপন্ন হয় বেতারের বিভাগীয় পরিচালকদের সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকে না কেন? দ্বিপ্রাহরিক ‘অঙ্গুষ্ঠান’ মহিলা আদ্যে দেখি মহিলা প্রসঙ্গ উপেক্ষিত। “বিশ্বের বার্তার” স্থান আছে—বৈদেশিক সামাজিক অভিধান আছে ‘শিশু প্রসঙ্গের নাটিকা’ আছে অথচ ‘যুগ সংসারের খুটি

নাটি’ ‘রক্তন শিল্প’ ‘শিশু প্রতিপালন’ বাহ্য, সাহিত্য ‘শিল্প কলা’ প্রভৃতি এগুনের পর্যাপ্ত আলোচনা নেই। “ছোট্টদের আদ্যে” রক্তনশীলার প্রসঙ্গ আছে অথচ শিশু সাহিত্যের লিখিত প্রচার নেই জেমারেল প্রোগ্রামে ‘অদার বক্তৃতা’ কর্পোরাটোর একঘেয়ে আনাড়ী আর্টিষ্টের চাঁৎকার দিনে দিনে চলতে বেড়ে। ছোট নাটিকার অত্যাচারে শ্রোতার তে অতিষ্ঠ! থিয়েটারের নামে রাবিশ যাত্রা প্যাটানের ত্রোভাগের বই-এর আধাবানি। এর প্রতিকার প্রতিবাদ উত্থাপিত হলেই বেতার কর্তৃপক্ষ ধামা চাপা দেবার চেষ্টার বলে ওঠেন—এক শ্রেণীর শ্রোতা আছেন যাঁদের এসব ভালো লাগে।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের নতুন বাঙালী স্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ সেনের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই আশা করি। আমাদের দৃঢ় ধারণা মিঃ সেন আমাদের বন্ধু বলেই গ্রহণ করবেন এবং আমাদের সমালোচনাকেও নিরপেক্ষজ্ঞানে বেতারের গলদ সংশোধনে যত্নশীল হবেন। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণ, শিল্পীরা যেন মনে করতে পারে এটা তাঁদেরই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

স্থানভাবে আমরা যাত্রা করেছি প্রোগ্রামের সমালোচনা পত্র লেখার।

মঙ্গলবার ২৯শে মার্চ দ্বিপ্রাহরিক অঙ্গুষ্ঠানে বীরেশ উকীল ছদ্মানি গান গাইলেন বিদ্রী। শ্রীযুত অমূল্যকৃষ্ণ তট্টাচার্য্য ‘কথকতা’ করলেন গীতার বাধ্যভাব লক্ষ্যে বক্তা বললেন—কর্তব্যের অত্যন্ত কর্তব্য বাধ্যভাবে বক্তার রক্তকণ্ঠে বক্তৃতা কর্পোরাটোর। পরে লীলা দেবীর ব্যবস্থাপনার একটি বিচিত্র অঙ্গুষ্ঠান হোল। কুমারী আভা বলাক

কীৰ্ত্তন গাইলেন—বাজে। জগদীশ বন্দ্যো-
পাধ্যায় গাইলেন ‘অভিমান তবু ভোল’—
বন্দনর। সুপ্রভা বজ্রবহার গাইলেন—
“আমার গান শুনে কি-” সুন্দর। গীতা
বজ্র “নাইবা বুঝলে প্রিয়”—কাব্য ভাব মধুর।
তাপন হস্তের পিরানো অতি নাধারণ।
হেম লোম রবীন্দ্রনাথের ‘অভিনায়’ আবৃত্তি
করলেন বেন—রিডিং পড়ে গেলেন। আবৃত্তি-
কারকের না আছে কবিতার চন্দ্র জ্ঞান,
না আছে ভাব প্রকাশের অভিব্যক্তি,
একধার লম্বালোচনার অযোগ্য।

বুধবার ৩০শে মার্চ দ্বিপ্রাহরিক অমুষ্ঠানে
শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক বর্ণকুমারী দেবী
সবকে আলোচনা করলেন। পরে নতেন্দ্র
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনার লজীতামু-
ষ্ঠান হোল—অতি বাজে প্রোগ্রাম।

লক্ষ্য অমুষ্ঠানে ‘বেতার বিচিত্রায়’
বানী কুমার রচিত ‘বাকুণী মেলা’ অমুষ্ঠিত
হোল। মেলার একটি সুন্দর চিত্রের আভাব
আমরা পেলুম।

বৃহস্পতিবার ৩১শে মার্চ দ্বিপ্রাহরিক
অমুষ্ঠানে হেনা বন্দ্যোপাধ্যায় গান গাইলেন,
কোথাকালি। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী
শ্রীমন্তগবদগীতা পাঠ করলেন। অশোক
বাবুর সুমিষ্ট কণ্ঠে ভাগবৎ ব্যাখ্যা দ্বিপ্রাহরিক
অমুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অংগ।

শুক্রবার ১লা এপ্রিল দ্বিপ্রাহরিক অমুষ্ঠানে
ইসলামী লজীত অমুষ্ঠিত হোল। চোটের
বৈঠকে লীলাধেবীর ব্যবস্থাপনার “এপ্রিল
ফুল”—কাষ্ট-রসিকতা। রচনায় কোন
মৌলিকতা নেই, অভিনয় প্রসঙ্গ বাজে।

লক্ষ্য অমুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র সুখোপাধ্যায়
প্রণীত এ, আই, আর, প্রেরাণ কণ্ঠক “বজ্র”
অভিনীত। হুর্গাধাল বাবু এবং রতীন বাবু
ছাড়া আর কারুর অভিনয়ই প্রাণেশ্বর দাবী
করতে পারে না, গানগুলিও নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

বিবিধ

বিদায় সম্বন্ধিনা

ফাষ্টরী একাউন্টল আফিলের জনপ্রিয়
ডেপুটি এলিট্যান্ট কন্ট্রোলার রায় লাহেব
উপেন্দ্রনাথ ঘোষের অবসর-গ্রহণ উপলক্ষে
ঐ আফিলের কর্মচারীবৃন্দ বিগত ২২রা এপ্রিল
শনিবার এক বিদায়-লতার অধিবেশন
করেন। বথারীতি লজীত লহ লতার কার্য
আরম্ভ হইলে আফিলের পক্ষ হইতে
রায়লাহেবকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান
করা হয়। অভিনন্দন পত্রটির স্থানে স্থানে
অনুলগ্নতা ও মধ্যে মধ্যে ভাব্য বৈজ্ঞ বড়ই
পীড়াদায়ক মনে হইতছিল। ব্যক্তিগত-
ভাবে আমরা জানি এই ডিপার্টমেন্টে অনেক
সুলেখক আছেন কিন্তু তৎসঙ্গেও অভিনন্দন
পত্রটির একরূপ দুর্দশা কেন হইল তাহা
বুঝিলাম না। ইহাকেই বলে “অনেক
লম্বাসীতে গাজন নষ্ট”। লতার পঠিত প্রবন্ধ-
গুলির মধ্যে বজ্রবর যতীশবাবুর “পাখানের
স্নেহাশীষ” নামক সুদ্রিত প্রবন্ধটি বেশ
স্বয়ংপ্রাণী হইয়াছিল। কল্পনার বৈচিত্র্য,
ভাবের মাধুর্য্য ও ভাব্যর স্বক্যারে
প্রবন্ধটি হইয়াছিল অনবদ্য। শ্রীযুক্ত
শীতলচন্দ্র সুখোপাধ্যায়ের “একক অভিনয়”ও
অভিনবদের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। পরে
সমবেত তত্ত্বমহোদয়গণকে ভূরিভোজন করান
হইলে ‘এস্প্রানেড ইন্সটিটুটের’ লভ্যগণ কর্তৃক
বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়। অভিনয়টি
লক্ষ্যসুন্দর হইয়াছিল বলা চলে।

পরলোকে নারায়ণী দেবী

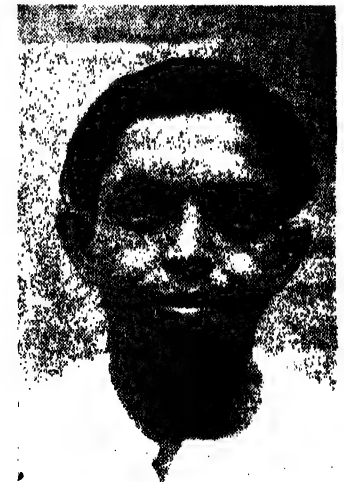
গত শুক্রবার রাত্রি ২ ঘটিকার সময়
৮ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী

নারায়ণী দেবী ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার হৃগলী
জেলোহ বাগাটী গ্রামের নিজ বাসভবনে
পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম-
ভাবাপন্ন, পরহৃৎখ্যাতরা এবং দানশীলা
মহিলা ছিলেন। তিনি ছয়পুত্র, এক কন্যা
দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ রাখিয়া গিয়াছেন।
তাঁহার চতুর্থ পুত্র শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাকশন্ কোম্পানীর জেনারেল
ম্যানেজার এবং পঞ্চম পুত্র ডাঃ শ্যামচরণ
বন্দ্যোপাধ্যায় জিবেনী হাঁসপাতালের
মেডিক্যাল অফিসার।

প্রাচ্য নৃত্যশিল্পী বিভূতি

মজুমদার (এমেচার)

উন্নয়ন শব্দের পর থেকে ধারা নৃত্যজগতে
নেবেছেন তাঁদের মধ্যে বিভূতি বজ্রবহার



বিভূতি বজ্রবহার

অন্ততঃ। ইনি একজন এমেচার
নৃত্যশিল্পী। চাকুরীর অবসর সময়ে নৃত্যচর্চা

করে যেরূপ কৃতিত্ব দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

তার নৃত্যগুলির মধ্যে, ইন্দ্র, অসি, আরতি, শিব শিকারী, লাগুড়ে, উড়িয়া ও রাক্ষস নৃত্য-গুলির পরিকল্পনা ও নৃত্য অতীব সুন্দর। ইহঁদের সঙ্গে বহুজনীত পরিচালনা করতেন বিখ্যাত খগেন বে। আমরা তাঁহার উত্তরসূর উন্নতি কামনা করি।

শুভসিঁদ্বাহ

গোপিবোধন বস্তু লেন নিবানী শ্রীকানাই লাল বহুর কন্যা শ্রীমতী লাস্তনা বহুর ললিত এটনি স্বর্গীয় গোপাল কৃষ্ণ



অমল কৃষ্ণ-লাস্তনা

বোবের পুত্র আশাধের পরম সুহৃদবর শ্রীযুক্ত অমল কৃষ্ণ বোবের শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হইরাছে। স্বকিণেশ্বর গুরুগৃহে ভাগ্যবান স্বস্তুর লাভ ও তৎসহ ভাগ্যবতী পত্নী লাভ করিয়া বহুবর অমলকৃষ্ণ অটুট কোমার্যাব্রত উদযাপন করিয়াছেন। চক্ষুলাঙ্কার প্রাবল্য হেতু বহুজন ও 'ইতর' জনের লজ্জা মিষ্টার বিভরণে বিরত হইয়া অমলকৃষ্ণ বহু বহুর বিরাগ ভাজন হইরাছেন! আমরা তাঁহাদের শান্তিধর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।



(বিলাসী)

বিজ্ঞাপতি

চিত্র-নিম্নাতা—নিউ থিয়েটার লি:
চিত্র-পরিবেশক—অরোরা ফিল্ম কোং
পরিচালনা }
চিত্রনাট্য } —দেবকী কুমার বসু
সংলাপ }
সঙ্গীত পরিচালক—রাষ্ট্রচন্দ্র বড়াল
আলোক-চিত্র-শিল্পী—ইউনিক মুন্ডলী
শব্দযন্ত্রী—লোকেন বসু
ব্যবস্থাপক—পি, এন, রায়
সম্পাদক—সুবোধ মিত্র
শিল্প নির্দেশক—পি, এন, রায় ও মেরেন সেন
ইউনিট ব্যবস্থাপক—জলু বড়াল
চরিত্রালিপি : বিজ্ঞাপতি—পাভাড়ী, শিবসিংহ—
চুর্গাদাস, বিদ্যুৎক—অমর মল্লিক, মদনমোহন—
কুমার দে, মহামন্ত্রী—প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, পিতৃস্বর—
অহি সাম্রাট, অমরনাথ—কানন, লজিমা—জয়া,
বিদ্যুৎকপত্রী—দেববালা প্রভৃতি।
প্রথম মুক্তিলাভ 'চিত্রায়' বরা এপ্রিল, শনিবার
৩ ঘটিকায়।

নিউ থিয়েটারের বহু বিজ্ঞাপিত ছবি বিজ্ঞাপতি প্রায় এক বছর পরে গত শনিবার চিত্রায় মুক্তিলাভ করেছে। বাঙাল্যে শ্রদ্ধা ভাব প্রবণের যারগা। সেই হিসেবে কবি বিজ্ঞাপতির কাহিনী বাঙালার ঘরে ঘরে পরিচিত। এমন একটি প্রিয় ও পরিচিত কাহিনী নিয়ে নিউথিয়েটারের তরফ থেকে দেবকী বাবু তার যে রূপ পর্দায় প্রতিকলিত করতে চেষ্টা করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

প্রায় পাঁচশত বছর আগে একদিন এক বসন্তোৎসবে মিথিলার রাজা শিবসিংহের প্রমোদ উত্তানে অকস্মাৎ কবি বিজ্ঞাপতির সঙ্গে রাজা ও রানী লজ্জার দেখা। রাজার অন্তরোধে কবি বিজ্ঞাপতি মিথিলার

এলেন রাজকবি হয়ে। কবির সঙ্গে এলেন এক সুন্দরী যুবতী অমরনাথ। কবির প্রভাবে রানী লজ্জার অন্তরের আলোক জ্বলে উঠল। কিন্তু আলো যে জ্বলেছে রানীর মন প'ড়ল তাঁরই ওপর। রাজাও বুঝলেন। মনে তিনি ব্যথাও পেলেন কিন্তু অবিখ্যদ করলেন না।

এদিকে রাজ্যের মধ্যে রানীর এই প্রেম নিয়ে নানারকম আলোচনা শুরু হ'ল। রাজ্যের মন্ত্রী এই সুযোগ নিয়ে রানীর হাতে তুলে দিলেন বিষের পাত্র। রানী সেই বিষ হালি মুখে পান করলেন—মিথিলার প্রজা ও রাজাকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধার করবার আশায়।

এই হচ্ছে মোটামুটি আশাধের আলোচ্য 'বিজ্ঞাপতি'র কাহিনী। পরিচালক মহাশয় এই কাহিনীটা ফুটিয়ে তোলবার জন্তে নানারকম ঘটনার সমাবেশ করলেও বেশ ভালভাবে জমিয়ে তুলতে পারেন নি। সব সময়ই যেন কেমন খাপছাড়া ভাব। এবং তারই জন্তে ছবির 'টেক্সট' নষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে boring হয়ে পড়েছে। দেবকী বাবু যদি দর্শকদের ভালভাবে কাঁধাতে পারতেন তাহলে আশাধের মনে হয় এতবড় চাকা পড়ে যেত। তিনি এবারে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে না গিয়ে একটা বিরাট grandeur এর ভেতর দিয়ে ছবিটি present করতে চেয়েছেন কিন্তু সে দিকেও তিনি বিশেষ exploit করতে পারেন নি। তা না হ'লে,



৯ই এপ্রিল হইতে

সপ্তাহের দ্বিতীয় সপ্তাহ



নিউ থিয়েটারসে র

বহু প্রশংসিত

অপরূপ চিত্রকথা

বিদ্যাপতি



পরিচালক : দেবকী বসু

: চিত্র-পরিবেশক :

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

১২৫ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

বলভোগ্যবের এ ছবির লগ্নে লক্ষ্য কোথায় ? এ ছাড়াও ছবির finishing touchটা হয়েছে অত্যন্ত weak. রাণী লভিমা বিষ খেলেন বটে কিন্তু এমন কি বিশেষ কারণ ঘটল—তা ঠিক বোঝা গেলনা। যদি বর্ষকরের মনে রেখাপাত করবার জন্তেই ওরকম করা হয়ে থাকে—তাহলে আসল বলব যে idea তাই তবে execution ঠিক হয় নি।

অভিনয়ের দিক থেকে ধরতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে কানন এর অজুরাধা। এক কথায় এটাকে কানন এর ছবিই বলা যেতে পারে। যদিও এই চরিত্রটির পেছনে Director এর যথেষ্ট backing আছে। তবুও আশাহের মনে হয় কানন ছাড়া আর কেউ এ চরিত্রটি—অন্ততঃ lighter দিকটা ফুটিয়ে তুলতে পারত না। গান শুনিও কানন গেয়েছে চমৎকার। এর পরেই নাম করতে হয় দুর্গাধার এর রাজা শিবলিংহ। সুন্দর সুলভ অভিনয় করে দুর্গাবাসু প্রমাণ করেছেন যে, চিত্ররাজ্যে তার স্থান আজও শীর্ষে। তবে শেষদিকে তার অত বেশী close up না হিলেই ভাল হ'ত।

বিভাপতির ভূমিকায় পাহাড়ীর অভিনয় প্রথম দিকে চলনলই হ'লেও শেষের দিকে ভালই বলা যেতে পারে। এরপর কৃষ্ণবাসু, ছায়া প্রভৃতির অভিনয় চলনলই। ম'ল্লিক মশাইএর বিদুষক ও অহি লাভাল এর পীতাম্বর যে বর্ষকরের হালাতে পারবে তা জোর কঠিনই বলা যায়।

মহাশত্রুর কুট চরিত্রাভিনয়ে প্রফুল্ল মুখার্জি বিশেষ দক্ষতা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এর ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

সঙ্গীত পরিচালনার রাইবাসু বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আলোক চিত্রে ইউরুফ মূলকী মন্দ কাজ করেন নি। কোন রকম প্যাঁচ এর মধ্যে না গিয়ে নিত্যন্ত সাধারণভাবে সব

লম্বাই একটা standard maintain করে গেছেন।

লক্ষ্য বস্তুর কাজ আশাহরূপ হয়নি। লোকেনবাসু N. T.র standard রাখতে যে কেন পারলেন না—তা আমরা বুঝলাম না।

সম্পাদনার সুবোধবাসু বেশ চমৎকার কাঁচি চালিয়েছেন। কোন রকম বাজে জিনিষ রাখেন নি। তিনি তাঁহর সুনাম রাখতে পেরেছেন।

শিল্প-নির্দেশকবর্ষর এর পরিকল্পনার যে বিরাট মেটের ব্যবস্থা হয়েছিল তা সত্যিই সুন্দর। কিন্তু হুঃখের বিষয় এগুলি fully exploited হয় নি। Makeup ও বেশভূষার যে ব্যবস্থা হয়েছিল—তা ভালই। কেবল দেববালার অঙ্গে এ প্রকার বেশভূষা যাজ্জিত কটির পরিচয় হয় নি।

কিশাণ কল্যাণ

ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোংর প্রথম ভারতীয় রঞ্জিন ছবি কিশাণ কল্যাণ গত শুক্রবার ১লা থেকে নিউ শিনেমার দেখান আরম্ভ হয়েছে। রঞ্জিন ছবি হিলেবে ভারতীয় বর্ষকেরা এ ছবিকে লাঘরে বরণ করে নিয়েছে।

অভিনয়ের দিক থেকে আশাহের সবচেয়ে ভাল লেগেছে গোলাম মহম্মদ ও জিন্নুর অভিনয়। গোলামের রমনীর বাস্তবিকই চমৎকার হয়েছে।

অভিজ্ঞান

লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশের আশ্রয় ছেড়ে প্রথমথর লগ্নে যেতেই রাজী হোল।

লম্বাজের চোখে, এ বহু নিম্নিত কুলত্যাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু এ ছাড়া জীবনে যে আর তার কোন পথই খোলা রইল না।

লম্বা আজ তার মনে পড়লো—গকণ্ডী নিবাসিনী জানকীর কথা। তাঁকেও একদিন লক্ষ্মণর রাবণ অপহরণ ক'রে এমনি কোরে

লক্ষ্যভিত্তে প্রহান কোরেছিলেন। কিন্তু তাঁকে উদ্ধার কোরবে কে ? উদ্ধার ত'বুরের কথা, রাঘবের গ্রহণ করতেও জানেন না, বোঝেন শুধু বর্জন করার হুঁকি !

তাই আজ প্রথমথর প্রত্যাবে লক্ষ্য বাধা দেবার মত ভাষা খুঁজে পেলেনা। লম্বাজের কবাইখানা থেকে উদ্ধার কোরে একজন অসামাজিকের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবার আশায় সে অনির্দেশের পথে পা বাড়িয়ে দিলে !

তাই, জমশেদপুর থেকে তাঁর শেষ আশ্রয় ছেড়ে বাবার পূর্বে, লক্ষ্যার চোখ থেকে অবরুদ্ধ আশ্রয় রাশি ঝর ঝর কোরে ঝরে পড়লো—এর মধ্যে যে কত হুঃখ কত বেদনা কত মানি লক্ষিত, তা একমাত্র তার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেউ জানেনা। কিন্তু আজ নতুন কোরে তার গাণে যে মর্ষভদ্ বস্ত্রণা উঘেল হয়ে উঠে—তা'র হেতু কী ? উৎপত্তি কোথায় ? যে লম্বাজের শেষ লীলা আজ সে অতিক্রম কোরে যাচ্ছে বোলে মনে করছে, সে লম্বাজের কাছথেকে ত' নির্কালন-পত্র করেকদিন পূর্বেই সে পেয়েচে—সে লম্বাজের মধ্যে এ করেকদিনের বাল ত' অধিকারের বাসনার, অহুগ্রহের বাল।

তবু, আশ্রয় যে কত বড় বস্তু তা যার নেই সেই জানে। অনাহারে বেহত্যাগ করা সহজ, সেই বেহটার অবস্থিতির জন্ত এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে একহাত মাত্র ভূমি অধিকারে না প্রাকীর মতো বিড়ম্বনা আর নেই।

তাই লক্ষ্য, শেষ পর্যন্ত প্রথমথকে আশ্রয় কোরে অনির্দেশের পথে পা বাড়িয়ে দিলে।

ছায়া-চিত্রে, লক্ষ্যার জীবনের এই করুণ অংশটি, তার অন্তরের দয়ব দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী মলিনা।

শ্রীকান্ত রায় এবং কণী মজুমদার—উভয়ে মিলে এই কাহিনীর চিত্রনাট্য (সিনারিও) রচনা করেছেন এবং পরিচালনা ব্যাপারেও এদের যুগ্ম-শক্তির বিকাশ দেখতে পাব।

অভিজ্ঞান চিত্রে অনেকগুলি গান সংযোজিত হয়েছে। এগুলির রচয়িতা সুবিখ্যাত গীতকার শ্রীযুক্ত অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য। গানগুলির সুর দিয়েছেন—রাইচাঁদ বড়াল। সুবিখ্যাত গায়ক বিনয় গোস্বামী একটি চরিত্রে অনেকগুলি গান গাইবেন।

অভিজ্ঞান-এর বিভিন্ন চরিত্রে নট-নটীর সমন্বয় ঘটবে অপূর্ণ। শ্রীমতী মলিনা চ্যাডাও, একটি মুসলিম বধূর ভূমিকায় শ্রীমতী মেনকা তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেবেন। এই চরিত্রটি লম্বন্ধে গত হস্তায় আমরা লিখেছি। আদর্শ নারী চরিত্রে হিসাবে এই মুসলিম বধূটি সর্বশ্রেণীর, সর্ব-সম্প্রদায়ের বরণীয়া।

আপন ভোলা, উদার প্রকৃতি, আশ্রিত-বৎসল প্রকাশ এই কাহিনীতে অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। এই ভূমিকাটিতে শৈলেন চৌধুরী যে উচ্চতর অভিনয় নৈপুণ্যের চাপ দিতে পারবেন—একথাও আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাঙলায় নারী-নির্যাতন ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে অভিজ্ঞান-এর মত ছবি অভিযান চালিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা-পথকে অনেক বেশী লহনশীল ও সুগম করে তুলতে পারবে এ থেকেই ছবিখানির স্বার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।

স্ট্রীট সিন্ডার

একটা ছেলে ও একটা মেয়ে। দুজনে তারা মানুষ হয়েছিল একই লঙ্গে। ছেলেটা অর্থাৎ তুলুয়া (সাইগল) ছোট বেলা থেকেই থিয়েটারে অভিনয় করবার ইচ্ছা ছিল। প্রথম বথন সে থিয়েটারে চাকরী পেল তখন মেয়েটা অর্থাৎ মজু (কানন) তাতে রাজি

হ'ল না। বরং তুলুয়াকে অনুরোধ করলে যাতে তারা এবেশ ডেডে চ'লে যেতে পারে কিন্তু তুলুয়া (ছেলেটা) রাজি হ'ল না পরে ঘটনাচক্রে মেয়েটা একটা চাকরী পেল কিন্তু ছেলেটা পেল না। একদিন ছেলেটা থিয়েটারে গিয়ে দেখলে সে মেয়েটি তারই তৈরি একটা গান নেহাৎ বেহুয় করে গাইছে। মেয়েটা নিতান্ত ছেলেমানুষী করে এরকম করেছিল কিন্তু ছেলেটা তা বুঝিতে না পেরে অত্যন্ত হট্টাগোল করে গানটা বন্ধ করে দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে অত্ন বেশে চলে যেতে চাইল। মেয়েটা রাজি হ'ল না। ছেলেটা চলে গেল অনেক দূরে—তারপর অনেক ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তাহাদের কি ক'রে মিলন সম্ভব হ'ল—এই নিয়েই ডাইরেক্টর ফণী মজুমদার তাঁর বই তুলতে আরম্ভ করেছেন। পরিচালক মশা'ট এট সুন্দর 'প্লট'টা কে কোটাবার জন্তে যে সব অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মেলন করেছেন—তা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।

অধিকার,

শ্রীমতী মেনকার অনুসৃত্যতার জন্ত কয়েকদিন শুটিং বন্ধ ছিল। সম্প্রতি পরিচালক বড়ুয়া আবার চিত্র-গ্রহণ শুরু করেছেন।

এই চিত্রে বস্তি-বাসিনী রাখার ভূমিকায় শ্রীমতী মেনকা তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেবেন। জীবন-যুদ্ধের রুহন্তর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে, ধনীর ছালাই ইন্দ্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী। ইন্দ্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমতী বসুনা।

অপর আর একটা নারী চরিত্রে আশ্রয়প্রকাশ করেছেন—নবাগতা চিত্র-লেখা। এই সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়েটির নির্বীচনে পরিচালক যে ভুল করেননি, কয়েকটি নৃত্যের অভিনয় দেখে আমরা তা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

ইতিমধ্যে 'প্রেক্ষাক' পদ্ধতিতে পাহাড়ীর একটি গান গৃহীত হয়েছে। বস্তিবাশী যুবক রতনের ভূমিকায় পাহাড়া অভিনয় করেছেন।

"চোখের বালি"

বিনোদিনীর রূপের আশুনে মহেন্দ্র দিন-রাত্তির গুড়ে চারখার হ'চ্ছে। সে বিবাহিত আর বিনোদিনী বিধবা। তবুও তার বিনোদিনীকে চাই। সেই রাজ্জে চোরের মত সে বিনোদিনীর শোবার ঘরে ঢুকে বিনোদিনীর রূপসুখা পান করবার জন্ত .হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ সে বিনোদিনীর কাছ থেকে পেল তিরস্কার। বিনোদিনী বললে—"...ভীক, কাপুক! না জানো ভালবাস্তে না জানো কর্তব্য করতে। মার থেকে আমার কেন নষ্ট করছ?" এই কথায় মহেন্দ্র ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে বিনোদিনীকে জোর করে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলল—"...আমি সব ডেডে চলে যাবো—বলো তুমি যাবে?" এর উত্তরে বিনোদিনী ঘৃণাভরে বলল—"...তুমি আমার সর্বনাশের মুখে টেনে এনেছ।...আজ তোমার ঘৃণাও আমার ফেরাতে পারবে না।—তোমায় যেতে হবে।" এই লম্বয় রাজলক্ষ্মী দেখানে ঢুকেই এই লৃপ্ত দেখে লজ্জা পেলেন। কিন্তু মহেন্দ্র আজ লজ্জা ঘৃণার বাইরে। আর বিনোদিনী সে রাজ-লক্ষ্মীকে দেখে জলে উঠল, তাই বলল—

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

“বাবো,” এই কথায় মহেন্দ্র উৎক্ল হ’য়ে বলে উঠল—“তবে আজকের মত অপেক্ষা কর। কাল থেকে তুমি ছাড়া কেউ থাকবে না।”

উপরোক্ত দৃশ্যটি গেল হস্তায় ষ্টুডিওর ভেতর তোলা শেষ হ’য়েছে। এই দৃশ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় ডাঃ হরেন মুখার্জি, সুপ্রভা মুখার্জি ও মিসেস ঘোষ চরিত্রোপযোগী অভিনয় করে এই তিনটি চরিত্রের প্রাণ-স্পন্দন করে তুলেছেন।

এরপর মহেন্দ্র বিনোদিনী উধাও। নানা বেশ ঘুরে ঘুরে তারা বেড়াচ্ছে। কিন্তু বিনোদিনী ছ’বিনের বেশী কোথায়ও থাকতে চায় না। এত করে মহেন্দ্র বিনোদিনীর মন পেল না। সে তাকে প্রাকৃতিক দৌন্দর্যের মধ্যে টেনে এনে তার মনের পরিবর্তন আনতে চায়—কিন্তু কিছুতেই তার মনোবিকারের পরিবর্তন ঘটে না। মহেন্দ্র কীদ পেতে চলেছে—সে কীদে বিনোদিনী ধরা দেয় না। কেমন করে তা’ সম্ভব হয়—বিধবা স্বপ্ন কামনার আশ্বনে পুড়েছে তখন তার লক্ষ্যত্রষ্ট করা মহেন্দ্রের সাধ্য কী? সে চায় বেহারীকে—সেই তার ধ্যান, জ্ঞান। মহেন্দ্র যে একথা বোঝেনি তা’ নয়—তবুও সে মরিয়া হ’য়ে উঠল। শেষ পর্যায়ে সে বীরের মত লড়াই কোরবে—যেবে সে বিনোদিনীকে পায় কিনা!

উপরোক্ত এই দৃশ্যটি তোলার জন্য গেল হস্তায় মিঃ বি, পি, মেহেরার তত্ত্বাবধানে এই ছবির পরিচালক লতু সেন, শঙ্করী শর্মা শীল, আলোকচিত্রী ননী শাহাণ, তাঁর সহকারী গোবিন্দ গাঙ্গুলী, শিল্পীদের মধ্যে ডাঃ হরেন মুখার্জি ও শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জি ওয়ালটিয়ার গিচ্ছলেন এবং সেখান থেকে এই দৃশ্যটি সুচারুভাবে গ্রহণ করে লক্ষ্যতি কোলকাতার ফিরেছেন। আমরা শুদ্ধাশ, ওয়ালটিয়ারে শাহাণ মশাই, তিনটি

চারটি যে প্রাকৃতিক দৌন্দর্যের দৃশ্য ক্যামেরার ধরে এনেছেন তা’ সত্যিই “চোখের বাণী”কে নব-রূপে রূপায়িত কোরবে। আমরা কালী ফিল্মের এই বিপুল চেষ্টাকে সাফল্য হ’তে দেখলেই খুশী হব।

দেবদত্ত ফিল্মস

দেবদত্ত ফিল্মের সুচরিতার ভূমিকা বণ্টন নিয়ে গেল হস্তায় আমরা যে আলোচনা করেছিলাম তা’ পড়ে অনেকেই আমাদের এই আলোচনার পক্ষ সমর্থন করে এবিষয়ে আমাদের আরও মন্তব্য প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে পূর্বে থেকে আমরা আর বিশেষ কিছু আলোচনা কোরতে চাই না। শুধু নরেশ মিস্ত্রিকে বলছি, তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের এই অমর উপজ্ঞাস “গোরা” আর একবার পড়ে দেখেন—বিশেষতঃ সুচরিতার চরিত্রটি। আমাদের মনে হয়, নরেশ বাবু ভাল করে পড়লেই নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।

ম্যাডানে নিরঞ্জন পাল

নিরঞ্জন পাল ম্যাডান ষ্টুডিও ভাড়া নিয়ে একখানা হিন্দী ও বাংলা ছবি তোলার ভোডজোড় কোরছেন। এর সঙ্গে জড়িত আছেন বাম্বাইয়ের ত’ একটি সনী ব্যবসায়ী।

“হাল-বাঙলা”

মেন্টোপলিটান পিকচার্সের প্রথম হাত-রসায়ক বাণী-চিত্র “হাল-বাঙলা” আসছে শনিবার থেকে ‘রূপবাণী’-তে পঞ্চম সপ্তাহে পড়বে। ছবির ছবি হিসাবে “হাল-বাঙলা” সবাইকে হাসাচ্ছে খুব। ছবিখানির গল্পটি ভাল কিন্তু বর্ণনা কৌশলের অক্ষমতা হেতু ছবিখানির রস সব জায়গায় দানা বাঁধতে পারেনি। পরিচালনার ডি-জি আফা মরি কিছু না দেখালেও—তিনি তাঁর কাজ মোটা-মুটি চালিয়ে দিয়েছেন। আলোক-চিত্রে দ্রোণাচার্যের কাজ ও শব্দগ্রহণে ইরানীর কাজ আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল।

সম্পাদক বডি “হাল বাঙলা”-র ওপর আরও হল-বর্ষণ কোরতেন তা’ হ’লে ছবিখানি আরও জমে উঠ’বার অবকাশ পেত।

অভিনয়ে যীরেন গাঙ্গুলীর ভূপেন নরীগ্রো উল্লেখযোগ্য। ছায়াদেবীর শেকালি মোটের ওপর মন্দ নয়। নায়ক মহাশেব পালের নির্দোষ আমরা সমর্থন করিনা। মৃণাল ঘোষের অভিনয় ভাড়াটির নামান্তর মাত্র। তুলসী লাহিড়ীর বাজাল জমিদার নরীজগন্নাথ হ’য়েছে। চন্দ্রিকা দেবীর ভবিষ্যৎ আশাশ্রম নয়। প্রভাত লিংহ, পদ্মাবতী চলনশই।

মোট কথা, ছোবলগুণে মিশ্রিত “হাল-বাঙলা” ‘রূপবাণী’তে যে বেশ কিছুদিন ছাণির বস্তা বহাবে—এ ধারণা করা অসম্ভব-চীন নয়।

রাশা ফিল্ম

প্রায়োগ-শিল্পী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, রাশা ফিল্মের কারখানায়, মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেডের হাত-রসায়ক চিত্র-নিবেদন “বেকার নাশন কোম্পানীর” চিত্র-গ্রহণ কার্যে দ্রুতগতিতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। “বেকার নাশন কোম্পানী” নামটি সমস্তাশূলক এবং বর্তমান কালোপযোগী হ’লেও ছবিখানির “মধ্যে একমাত্র হাতরস বিতরণ করা ছাড়া আর কোন সমস্তার লেশমাত্র নেই।

জনক নন্দিনী—ফণী বন্দ্যোপাধ্যায় তার পরবর্তী পৌরাণিক চিত্র-কাহিনী জনক নন্দিনীর চিত্র গ্রহণ কার্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ‘বিষ্ণু শম্ভার’ কুটীর দৃশ্য তোলা শেষ হয়েছে।

পূর্ণ থিয়েটার

মুক্তি প্রথম সপ্তাহের চেয়েও দ্বিতীয় সপ্তাহে এখানে বেশী জনসমাগম করতে লক্ষ্য হয়েছে। ‘মুক্তি’র গান, ‘মুক্তি’র কটোয়াকী, ‘মুক্তি’র শব্দবস্তুর কাজ যে এ ছবির হত বড় সম্পদ—তা যারা না দেখেছেন তাঁরা বুঝবেন না।

খেলার ঘাট

(সি, বি)

হকি :—

গত দু'মাস ধরে 'বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন' কর্তৃক পরিচালিত লীগ প্রতিযোগিতাগুলির খেলা চলছে এবং আর এক সপ্তাহ বাধে এই প্রতিযোগিতাগুলির সমস্ত খেলা শেষ হয়ে যাবে। ঠিক এর পরেই বিখ্যাত "বাইটন কাপ" হকি প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবে এবং এই প্রতিযোগিতার শেষ খেলাটি হবার পরই কলকাতার গড়ের মাঠ আবার ফুটবল খেলার উত্তেজনায় ও চাকল্যে ভরে উঠবে। প্রথম ডিভিশন হকি লীগ প্রতিযোগিতাটিতে প্রত্যেক বছরের মত এবারেরও 'লীগ বিজয়' এবং 'দ্বিতীয় ডিভিশনে' অবনতির সমস্ত উপস্থিত হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে কাষ্টমস ক্লাব এবং রেঞ্জার্স ক্লাবের মধ্যে লীগ বিজয়ের জুড় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছে এবং এবারেরও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। গত সোমবার পর্যন্ত কাষ্টমস হল মোট ১৬টি ম্যাচ খেলে ৩০ পয়েন্ট লাভ করে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। তার পরেই রেঞ্জার্স হল ১৬টি খেলে ২৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে এবং তাদের অগ্রগতি হলটিকে তীব্রভাবে অনুসরণ করছে। প্রত্যেক হলটির এখন দুটি করে খেলা বাকি আছে। দুটি ক্লাবেরই একটি খেলার প্রতিপক্ষ হচ্ছে লীগ টেবলের সর্বনিম্ন টাউন ক্লাব। সুতরাং এই খেলাটিতে তাহারা অনায়াসে জয়লাভ করে আরও দুটি করে পয়েন্ট সংগ্রহ করতে

পারবে এবং তখনও এই হল দুটির মধ্যে দুই পয়েন্টের পার্থক্য থাকবে। কাষ্টমস এবং রেঞ্জার্স হলের শেষ খেলাটি হবে তাদের পরস্পরের মধ্যে। এই খেলাটির শুরু হবে খুব বেশী কারণ রেঞ্জার্স হল যদি তাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলটিকে পরাজিত করতে পারে তাহলে লম্বান পয়েন্ট হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ আগামী ১৩ই এপ্রিল এই শুরুস্বপূর্ণ খেলাটির শেষ মীমাংসা হবে এবং তারপর লীগ বিজয়ী নির্ধারণ হবে। অবশ্য লম্বান পয়েন্ট হলেও কাষ্টমস হলই লীগ বিজয়ের অধিকারী হবে কারণ কাষ্টমস হলের 'গোল্ড এটারেজ' তাদের এ বিষয়ে সাহায্য করবে। এই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী টীমগুলির পরেই 'মোহনবাগান' ক্লাব তৃতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। তারা গত সোমবার পর্যন্ত মোট ২৪টি ম্যাচ খেলে ২২ পয়েন্ট পেয়েছে। এট ক্লাবটি শেষ খেলাগুলি বেশ সন্তোষজনকভাবে খেলেও প্রথম থেকে চেষ্টা করলে তারাও হয়ত রেঞ্জার্স এবং কাষ্টমস হলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত।

লীগ টেবলের উপর দিকে এইরূপ প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হলেও নীচের দিকেও তার বিশেষ অভাব হয় নি। টাউন ক্লাব এ বছরেই প্রথম ডিভিশনে উন্নত হয়ে আবার এবছরেই বিহার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। গত সোমবার পর্যন্ত তারা মোট ১৬টি ম্যাচ খেলে মাত্র ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বাকি দুটি ম্যাচ

খেলেতে হবে রেঞ্জার্স এবং কাষ্টমস হলের সঙ্গে। সুতরাং তারা যে পয়েন্ট লাভ করতে পারবে তা মনে হয় না। তাদের ঠিক উপরে পাঞ্জাব ৭ পয়েন্টের অধিকারী হলেও তারা দৈনিক হল বলে অবনতির কবল থেকে রেহাই পাবে। তার উপরেই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবং সেন্ট-জোসেফ হল, দুটির স্থান। এরা ১৫টি করে ম্যাচ খেলে যথাক্রমে ৮ এবং ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। এই দুটি হলের মধ্যেই একটি হলকে আগামী বৎসরে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলেতে হবে বলে মনে হয়। তবে প্রত্যেকটি হলেরই এখন তিনটি করে খেলা বাকী সেই কারণে আপাততঃ কিছুই নিশ্চয় করে বলা বুদ্ধিযুক্ত নয়।

গত সোমবার পর্যন্ত শেষ সাতটি টীমের লীগ টেবল নিম্নে দেওয়া হল।

খে:	জয়	ড্র	পরাজ:	স্ব:	বি:	প:
আর্দেনিয়ানস্	১৫	৩	৪	৮	১০	১৬
তবানীপুর	১৪	৩	৪	৭	৭	২৫
ড্যালহাউগি	১৪	৩	৪	৭	১০	২৮
সেন্ট জোসেফস্	১৫	৩	৩	২	১০	২৩
ইষ্টবেঙ্গল	১৫	২	৪	৯	৭	২২
পাঞ্জাব রেজি:	১৬	৩	১	১২	১৩	৩৬
টাউন ক্লাব	১৬	০	৬	১০	৮	২৮

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা গত ৫ই এপ্রিল বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ধার্য হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সেখানকার শক্তিশালী হকি হলগুলি এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অভিপ্রায় জানিয়েছে। অংশ বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন কর্তৃক সন্তোষজনকভাবে আর্থিক সাহায্য

হাকিম এম.এস. জামানার

কস্তুরীপিল

ধাতুদৌর্যল্য ও শক্তিশীনতা চিরতরে
আরোগ্য করিতে আদিতীয়। মূল্য ২ টাকার
৪২ নং ধর্মতলা ট্রাট কলিকাতা

না পেলে তাহের ইচ্ছা কার্যে পরিণত হবে না।

গত ১লা এপ্রিলের সভার দ্বিঃ হবার পর বেঙ্গল হকি এনোনিরেশন নিয়ন্ত্রিত লাতটি বিখ্যাত হকি টীমকে এই প্রতি-
যোগিতায় যোগদান করবার জন্য বিশেষ আহ্বান পাঠিয়েছেন।

- | | |
|---------------------------|-----------|
| (১) লুন্টানিয়ানস্ | (বোম্বাই) |
| (২) বঙ্গ কষ্টমল | (বোম্বাই) |
| (৩) বাসি হিরোজ | (বাসি) |
| (৪) এন ডবলিউ হেল | (লাহোর) |
| (৫) ভূপাল হকি টীম | (ভূপাল) |
| (৬) ডিক্রিষ্ট স্পোর্টস্ | (মীরট) |
| (৭) মাদ্রাজ হকি এনোনিরেশন | (মাদ্রাজ) |

নিয়ন্ত্রিত দলগুলি ইতিমধ্যে যোগদান করেছে :—

স্থানীয় দল

- (১) পোর্ট কমিশনারস্
- (২) বি, এন, আর,
- (৩) ক্যালকাটা
- (৪) ক্যালকাটা কষ্টমল

আগন্তুক দল

- | | |
|-------------------|-----------|
| ওয়ারাই এম ক্লাব | (রংপুর) |
| লালেগো ইউনিয়ন | (করিমপুর) |
| করিমপুর ডিক্রিষ্ট | (করিমপুর) |
| এলবার্ট ইউনিয়ন | (রাজশাহী) |

হকি প্রদর্শনী খেলা :—

আগামী ১০ই এপ্রিল চুচুড়ার ভারতীয় বাছাই করা দলের সঙ্গে ইউরোপীয়ান বাছাই করা দলের একটি প্রদর্শনী হকি খেলা হবে বলে বেঙ্গল হকি এনোনিরেশন সমিতি জানিয়েছেন।

অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন

গত ২৭শে মার্চ তারিখে দিল্লিতে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বাৎসরিক সভা হয়ে গেছে। গত বৎসরে ফেডারেশনের গঠনমূলক সভার আই এক এর দুজন

প্রতিনিধি ঢাকা ঢাকা ফুটবল এনোনিরেশন-
নের একজন প্রতিনিধিকে ফেডারেশন কাউন্সিলে আসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বৎসর ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার ম্যাজেস্তি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অশ্রদ্ধ সভ্যতা ঢাকা এনোনিরেশনকে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাখতে রাজি হন নি এবং সেই কারণে ঢাকা এনোনিরেশনকে আই এক এর অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সভ্যদের মধ্যে অনেকে মত প্রকাশ করেন যে 'ঢাকা দহর' বাংলা প্রবেশের অন্তর্গত তা তাহের জানা ছিল না সেই জন্য তাঁরা গত বৎসর ঢাকা এনোনিরেশনকে পৃথক আসন দিতে রাজী হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার ম্যাজেস্তি এই সভার সভাপতিত্ব করেন এবং বর্তমান বৎসরে সভাপতি পদের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত না হওয়ার ব্রিগেডিয়ার ম্যাজেস্তি বিদ্যাত প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সভাপতি থাকবেন বলে সাব্যস্ত হয় এবং তাঁহার কার্যভার বিনি গ্রহণ করবেন তাঁকেই ফেডারেশনের পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত করা হবে। এবং বৎসরের জন্য কোন ভবিষ্যতে অন্ততঃ দু বৎসরের জন্য কোন

দ্রাঘ্যমান ফুটবল টীম ভারতে আমন্ত্রণ করে আনা হবে না কিংবা ভারতের বাহিরে পাঠান হবে না বলে ঠিক হয়। পূর্ববর্তী সম্পাদক মেজর উইলসনের জায়গায় ক্যাপ্টেন জে, বি ডোনার্ডসন আগামী বৎসরের জন্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। মিঃ পি গুপ্ত এ বৎসরের জন্য পুনর্বার কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন।

আই এক এর অন্তর্গত সমস্ত ক্লাবগুলির মধ্যে থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে—আই, এক, এ' দল নাম দিয়ে একটি ফুটবল টীম অষ্ট্রেলিয়ার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে পারে এইরূপ অভিমত ফেডারেশন আই এক একে জানিয়েছেন।

আই এক এ এই অনুমতি পাবার পর এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা এখনও করেন নি।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ :—

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের সকল ডিভিশন গুলিতে খেলোয়াড় করে টীম নেবার যে একটি গুপ্ত প্রচেষ্টা চলছিল তা অন্ততঃ এবৎসরের মত ব্যর্থ হয়েছে। আগামী বরা মতাবিধ থেকে ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ

=চতুর্থ বার্ষিক=

নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

স্থানীয় কৃতি শিল্পীরূপে ও ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণ যোগদান করিবেন—
পণ্ডিত গুপ্তারনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী কেশর বাঈ কেরকার, শ্রীমতী পিরোজ
কে দস্তুর, শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোজকর, প্রোঃ সুরেশ বাবুমান,
শ্রীহরি নারায়ণ মুখার্জি (বারানসী), ইত্যাদি।

ম্যাডান থিয়েটার

১৫ই ১৬ই ১৭ই ১৮ই এপ্রিল
(প্রত্যহ দুইটি করিয়া বৈঠক)

দর্শনী হার—২০ (সম্বর্জনা সমিতির সভ্য), সিজেন ১৫ ও ১০ টাকা।
প্রতি বৈঠক ২০, ৩, ১০ (একতলা) এবং ১ (ত্রিতলে)।

মহিলাদিগের জন্য দ্বিভল সম্পূর্ণ পৃথক।

অগ্রিম টিকিট :—৪৬নং পাখুরিয়াঘাটা স্ট্রীট

হয়ে আগামী ১৫ জুলাই শেষ হবে এই
রকমের তালিকা প্রস্তুত হয়েছে।

পাওয়ার মেমোরিয়াল ফুটবল লীগ :-

এই মাসের ২০শে তারিখ থেকে পাওয়ার
মেমোরিয়াল ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হবে।

অমরনাথ ও অমর সিং :-

ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ের
অমরনাথ ও অমর সিং গত ৩১শে মার্চ
তারিখে বোম্বাই থেকে 'কটি বাই আন্
কামানো' জাহাজে যোগে খেলার উদ্দেশ্যে
বিলাত যাত্রা করেছেন। অমরনাথ 'নেলসন'
ক্লাব এবং অমর সিং 'কলনি' ক্লাবের পক্ষে
ক্রিকেট খেলবার সম্মতি জানিয়েছেন।

ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড :-

আগামী ১৭ই এপ্রিল ভারতীয় ক্রিকেট
কনট্রোল বোর্ডের সভা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে।

এই সভায় নতুনগরের জামলাহেব এবং
মিঃ ডিমেলোর পৃষ্ঠপোষকতা পত্র আলোচনা
হবে। তা ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় এই সভায় আলোচনা হবে।

সিংহলে অস্ট্রেলিয়া দল

গত ৩০শে মার্চ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট
দলের সহিত সিংহল দলের একটি ক্রিকেট
ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়া দল প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে
৩৬৭ রান করার পর ডিক্লোর করে।
হাশেট ও ব্যাডক্ক প্রত্যেকে ১১৬ রান
করেন। সিংহল দলের প্যারেরা ১০৬ রানে
৫টি উইকেট লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়া দলে
ব্র্যাডম্যান, ওরিলি, ক্রিটউড স্মিথ, বার্ণেট
ও ম্যাককর্মিক এই খেলাটিতে যোগদান
করেন নি।

সিংহল দল ৭৫ মিনিট খেলার পর
লাভ উইকেটে ১৪৪ রান করার পর

অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি হওয়ার দরুন খেলাটি
বন্ধ করতে হয় এবং খেলাটি অমীমাংসিত-
ভাবে শেষ হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়া দলের
চিপারকিন্ড ২৪ রানে চারটি উইকেট লাভ
করে প্রশংসা অর্জন করেন।

অস্ট্রেলিয়া দল :- ব্রাউন, ফিলস্টন,
হাশেট, ব্যাডক্ক, ম্যাককব, বার্ণিগ,
চিপারকিন্ড, 'ওয়েট, হোয়াইট, ওয়াকার
এবং ওয়ার্ড।

সিংহল দল :- পুণী, হবার্ট, ডিমারাম,
ম্যাকার্থী, জয়কৃষ্ণ, কেলার্ট, গুণেশ্বর,
সরভানুমাত্ত, ব্যাকলীম্যান এবং জয়পারেরা।

মহম্মেদান স্পোর্টিং ক্লাব

আগামী ৭ই মে 'টিউবার কিউলিনিস'
নিবারণী ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে একটি ফুটবল
চ্যারিটি ম্যাচ খেলা হবার পর মহম্মেদান
স্পোর্টিং ক্লাবের নতুন মাঠের উদ্বোধন
উৎসব সম্পন্ন হবে।

—:—:—

কবি

চিত্রে
দেবদত্ত ফিল্মসের
শ্রেষ্ঠ নিবেদন

উপস্থাপনা
রবীন্দ্র প্রতিভার
শ্রেষ্ঠ দান

চিত্র পরিবেশক :
গ্রাইয়া ফিল্মস
লিমিটেড

ভূমিকায়
রানীবালা

প্রতিমা
রমলা

রাজলক্ষ্মী
দেববালা

মমোরমা

নরেশ মিত্র

রাধিকানন্দ

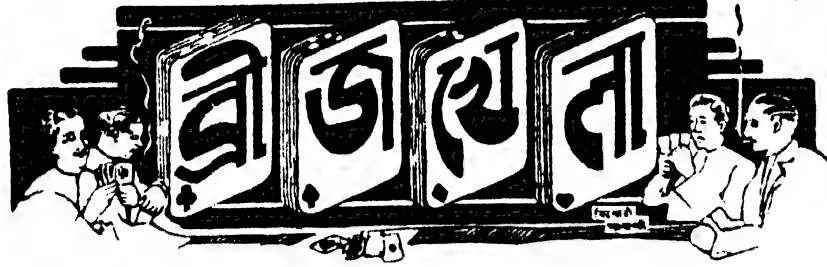
মমোরজন

রবি রায়

মোহন ঘোষাল

জীবন গাঙ্গুলী

পরিচালনা-
নরেশ মিত্র



শ্রীচরিত্রা

প্রতিযোগিতার একটি হাত :-

হাতে পিট ধরবার উপযুক্ত তাল না থাকলে
আহ্বানকারী ডবল বেগু বিধেয় নয়।
অনেক সময় খেলোয়াড়দের মধ্যে এই
প্রকার ডবল হিতে বেখা যায়, যার ফলে
অবিধার পরিবর্তে ডবলকারীদের অসুবিধাই
অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নের
হাতটি লক্ষ্য করলে আপনারা অনায়াসে
বুঝতে পারবেন যে ডাকঘরের বিপক্ষদল
যদি আহ্বানকারী ডবল না দিতেন তাহলে
ডাকঘরেরা বোধহয় গেম অবধি ডাক
ডুলতে পারতেন না। হাতখানি নিম্নে

এই ক্ষেত্রে ডাক হয়েছিল এইরূপ,

‘দ’	‘প’
পাশ।	একটি রুহিতন।
পাশ।	দুইটি রুহিতন।
পাশ।	চারটি রুহিতন।
পাশ।	পাশ।
‘উ’	‘পু’
ডবল।	একটি রুহিতন।
পাশ।	তিনটি রুহিতন।
ডবল।	পাশ।

এ ক্ষেত্রে ডাকের বিষয় বিশেষ কিছুই
বলবার নেই, শুধু এই বললেই চলবে যে
বিপক্ষদল ডবল না দিলে এই হাতে চারটি

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, ×, ×।

হরতন—সাহেব, গোলাম, ×, ×।

রুহিতন—সাহেব, ×, ×।

চিড়িতন—সাহেব, ×।

ইস্কাবন—×, ×, ×, ×।

হরতন—টেকা, দশ, ×।

রুহিতন—টেকা, বিবি, গোলাম

চিড়িতন—×, ×।

উ
প পু
দ

ইস্কাবন—টেকা।

হরতন—বিবি, নয়, আটা, লাতা, পঞ্জা।

রুহিতন—×, ×।

চিড়িতন—টেকা, বিবি, ×, ×, ×।

ইস্কাবন—গোলাম, দশ, ×, ×।

হরতন—×।

রুহিতন—গোলাম, ×, ×, ×।

চিড়িতন—গোলাম, দশ, ×, ×।

হরতনের ডাক বেগুয়া যেত না। নিম্নে
বেগুন ডাকঘার কত সহজে খেলাটি করে
নিয়ে গেলেন।

(১) ‘দ’ ইস্কাবন খেলার সকলেই
ইস্কাবন ছিলেন; ‘পু’ ইস্কাবনের টেকা যেরে
পিটখানি নিলেন।

(২) ‘পু’ রুহিতনের ছোট তাল খেলে
ডাকির হাতে ফিনাস নেওয়ার ‘উ’ সাহেব
যেরে পিট ধরলেন।

(৩) ‘উ’ ইস্কাবনের সাহেব খেললেন;
সকলেই ইস্কাবন ছিলেন, ‘পু’ তুরূপ করে
পিটখানি নিলেন।

(৪ ও ৫) ‘পু’ শেষ রুহিতন খানি
খেলে ডাকির বিবি যেরে পিট নিলেন এবং
রুহিতনের টেকার পিটও নিলেন। ‘পু’ এ
পিটে চিড়িতনের হরি যেরে গেলেন।

(৬ ও ৭) ডাকি ছোট চিড়িতন খেলার
‘পু’ বিবি ফিনাস করে পিট নিয়ে টেকা
পেড়ে খেলে আর একখানি পিট নিলেন।
আর সকলে চিড়িতন যেরে গেলেন।

(৮) ‘পু’ পুনরায় চিড়িতন খেলার
ডাকি দশ তুরূপ করলেন, ‘উ’ তার উপর
গোলাম যেরে পিট নিলেন।

(৯) এইবার ‘উ’ পুনরায় আর এক-
খানি ইস্কাবন খেলার ‘পু’ তুরূপ করে পিট
খানি ধরলেন।

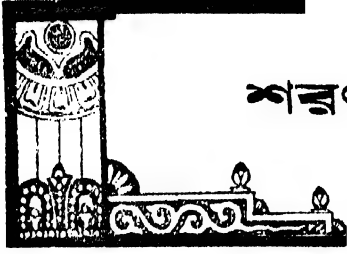
(১০) ‘পু’ আবার একখানি চিড়িতন
খেলার ‘দ’ চিড়িতনের শেষ তাল গোলাম
খেললেন, ডাকি টেকা তুরূপ করে পিটখানি
নিলেন।

(১১) ডাকির হাত থেকে এইবার রঙ
খেলাতে চারটির খেলা করা ঘোটেই
অসুবিধাজনক হলনা। অবিবেচনা প্রসূত
আহ্বানকারী ডবল যেরে ডবলকারীদের
কিরূপ ক্ষতি সাধিত হল বেগুন।



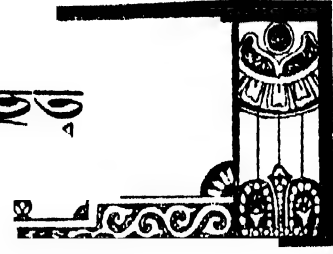
ইন্ডিয়ান চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।



শরৎ সাহিত্যে মাতৃভূমি

শ্রীসমীর ঘোষ



বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় আর কোন লেখক নারীকে লইয়া এতটা আলোচনা করেন নাই, যতটা করিয়াছেন শরৎচন্দ্র।

নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের এই যে পক্ষ-পাতিত্ব, সে সন্দেহে শ্রী প্রমথনাথ পাল মহাশয় তাঁহার, 'শরৎ সাহিত্যে নারী'তে বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের নিকট এত পক্ষপাতিত্বের কারণ অনেকাংশে ধরা পড়ে। ইহা ছাড়া সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'শরৎ প্রতিভা' ও 'শরৎচন্দ্র' পাঠকে শরৎ সাহিত্যে বৃত্তিতে অনেকখানি সাধারণ্য করে এবং পাঠকে বুঝাইয়া দেয় শরৎ সাহিত্যে নারী কেন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। সর্বোপরি শরৎ চন্দ্রের রচিত 'নারীর মূল্য' হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি, 'কেন শরৎ সাহিত্যে নারীর স্থান বেশী আর কেন পুরুষের স্থান নগন্য; অনেকের মতে লেখানে প্রকৃত পুরুষ নাই বলিলেও চলে।

যাহা হউক মোটের উপর শরৎ সাহিত্যে পাঠক দেখিতে পায়, এই সাহিত্যে নারীই প্রধানস্থান অধিকার করিয়া আছেন। আজ আমিও সেট শরৎ সাহিত্যের নারীকে লইয়া সামান্য আলোচনা করিব।

সুবিখ্যাত উপন্যাস 'দুইবোন'-এর গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে নারী দুই প্রকার; এক স্বভাবত মাতৃজাতীয়, আর অপর হইতেছেন প্রিয়া জাতীয়। যদিও শরৎ সাহিত্যে প্রিয়া জাতীয় নারীই অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছেন তথাপি মাতৃজাতীয় নারীর স্থান যে তথায়

নগন্য নয় সে সন্দেহে আজ যথোক্তিক্রমে আলোচনা করিব।

শরৎচন্দ্রের আশ্রিত মাতৃভূমি সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এক বিমাতার স্নেহ আর দ্বিতীয় হইতেছে নিসম্পর্কীয়া আত্মীয়ের স্নেহ।

আমাদের দেশে বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে, কোন নারী তাঁহার লপত্নীকে কখনও ভালোবাসিতে পারেন না বা তাহার (লপত্নীর) সম্পর্কিত কোন কিছু সহ্য করিতে পারেন না। এই যে না পারার চিত্র আমাদের মহাকাব্য 'রামায়ণে' অঙ্কিত হইয়াছেন 'কৈকেয়ী'রূপে।

কৈকেয়ীর নিকট পিতা দশরথ যে সত্যবদ্ধ ছিলেন, তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য বিমাতার অভিল্যব পূরণের নিমিত্ত লপত্নীপুত্র রামকে বনে বাইতে হইয়াছিল।

এই ঘটনায় বিমাতার লপত্নীর উপরে হিংসা ও লপত্নীপুত্রের উপরে সেই হিংসা চরিতার্থ করাতে কৈকেয়ীকে সকলে নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যদি ঘটনার মূলে ঘাই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই বস্তুত রামচন্দ্রের উপর কৈকেয়ীর কোনরূপ হিংসা ছিল না। বরং মহারা যখন কৈকেয়ীকে রামচন্দ্রের অভিযোজনার সৎবাৎ প্রদান করে, তখন তিনি মহারাজকে রত্নহারে বিভূষিতা করিতে গিয়াছিলেন। তারপরে মহারাজ কুট পরামর্শে ব্যাপার কতদূর গড়াইয়াছিল, তাহাতে আমাদের উপস্থিত কোন প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু বিচারে জানিতে

পারি মহারাজ উপদেশে ও তিরস্কারে কৈকেয়ীর মনে এই প্রদীপ জাগরিত হয়: রাম লপত্নীপুত্র, সে রাজা হইলে কৈকেয়ীর রাণীর সম্মান হয়তো বজায় থাকবে না। সেই ভীতিই তাঁহাকে কোথায় টানিয়াছিল তাহা রামায়ণ পাঠক মাত্রই জানেন। এই ভীতি উৎপাদিত হইবার আগে রামের প্রতি কৈকেয়ীর বিমাতা হিন্দাবে যে কোন বিদ্বেষ ছিল না, তাহা অতি সহজেই প্রমানিত হয়।

কিন্তু এই মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থ রামায়ণের ঘটনাবলী পড়িয়া বা শুনিয়া বিমাতা যে লপত্নীপুত্রের শত্রু, তাহা লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে এবং ঘেরঘের মনেও এমন দৃঢ়সংস্কার জন্মাইয়া গিয়াছে যে তাঁহারাও লপত্নীপুত্র বা কন্তার শত্রু মনে করেন আর লপত্নী পুত্র বা কন্তারা বিমাতাকে মহাশত্রু জ্ঞানে তাঁহার মূখ দর্শন পর্যন্ত করিতে ভয় পায় বা ঘৃণা করে।

এই কারণবশতঃ যখন 'দেবদাস'এর 'পার্বতী' স্বামীগৃহে উপস্থিত হয়, তখন বাড়ীর ছেলে 'মহেন্দ্র' নিরুপায় হইয়া গৃহে থাকিয়া যায় ও পরের বউ 'যশোদা' স্বপ্তর বাড়ী হইতে অতি আদরের বাপের বাড়ী আলিতে রাজী হয় নাই। ঠিক এই একই কারণে ও লংকারে ঐকৃষ্ণের উইল'এ 'গোকুল'কে পাঠশালা ছাড়ানো হইলে পাড়ার লোক বলিয়া বেড়াইয়াছিল যে লংকারের পরামর্শে বাপ ছেলেটাকে মামুষ হইতে দিলে না। শুধু তাহাই নয় পরবর্তী ঘটনায় যখন 'গোকুল' রাগ করিয়া 'বিনোদ' লক্ষ্যে বলিল, "আমার যে ভাই ছিল সে মরে গেছে, তখন 'জয়লাল বাড়ুয়ো' লপত্নীই বলিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন,” বেধে পুরাণে বা কল্পিত-কালে ঘটে নি, তাই হবে এই ঘোর কলিকালে,—অর্থাৎ মানুষ কখনও নৈমিত্ত্য তাইকে আপনার সহোদর ভাইরূপে ভাবিতে পারে না।

এই ধারণার প্রচলন থাকা যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা সকলেই স্বীকার করিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যে দেখাইয়াছেন যে এই ধারণা মিথ্যা, এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কাজ করাও স্নেহময়ী করুণারূপিনী জননী নারীর পক্ষে অসম্ভব।

বিমাতা ও লপ্তী সন্তান লইয়া শরৎচন্দ্র যতোগুলো চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্যে ‘বৈকুণ্ঠের উইল’ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিমাতা ‘ভবানী’র হাতে ‘গোকুল’ মনুষ্য হইয়াছিল। মাত্র লোকের মুখে সে শুনিতে ‘ভবানী’ তাহার বিমাতা। তাহার নিজের মনে কিন্তু এ লব্ধ কোন প্রশ্ন কোন দ্বিধা উঠে নাই।

মরণের পূর্বে ‘বৈকুণ্ঠ’ উইল করিলেন, আর পত্নীর স্মৃতিক্রমেই ‘ভবানী’র ছেলে ‘বিনোদ’কে তাহার জ্ঞাত্য প্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত করিলেন।

পিতার মৃত্যুর সময় ‘বিনোদ’ কলিকাতার পড়িতেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে পিতার মুক্তা লংঘন বা উইলের কথা জানিতে পারিল অনেক পরে। এইখান হইতেই প্রকৃত ঘটনা বা লংঘন আরম্ভ হইল ‘ভবানী’র লিখিত ‘গোকুলের’। এই ছোট্ট চরিত্রের গতি লক্ষ করিলেই চোখে পড়ে একজন স্বল্পভাষী, লহিয়ু। তাই তাঁহার জীবনের বেগ, স্নেহের গভীরতা বা চরিত্রের মার্ধ্য আমরা বুঝিতে পারি চপলমতি অপরজনের অভিমানপ্রসূত কথার বা কার্য্যে।

‘বিনোদ’ বাড়ী আলিয়াছে, উইলের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু ‘গোকুলের’ প্রসঙ্গ লিখকের চাবী লয় নাই এবং পিতার প্রাণে পণ্ডিত

বিদ্যারের তালিকা প্রস্তুত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। ‘গোকুল’ ক্ষুদ্র হইয়া উঠিল। ‘ভবানী’র কাছে সে নালিশ করিতে গেল। কিন্তু ‘ভবানী’ কোন কথা কহিলেন না। কারণ তিনি প্রথমতঃ স্বল্পভাষিনী, দ্বিতীয়তঃ গোকুলের অভিমানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই আর সর্বোপরি ‘মনোরমার’ ব্যবহার তাঁহাকে যে আঘাত দিয়াছিল তাহাতে তিনি মৰ্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

‘গোকুল’ রুগ্ন হইয়া উঠিল। চতুরা মনোরমা এতখানে এক চাপ চালিল। সে ‘গোকুলকে’ বুঝাইয়া দিল যে ‘ভবানী’র এই উপেক্ষা ও নীরবতা ‘বিনোদের’ বিষয় বঞ্চিত হওয়ার এবং লপ্তীপুত্র ‘গোকুলের’ যে সম্পত্তি লাভের সৌভাগ্য জাগিয়াছে। সরল ‘গোকুল’ অভিমানে ক্ষুদ্র হইয়া উঠিল, “সব কথা ছাপাইয়া এই একটি কথা তাহার কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল—বিষয় সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিষ! এবং শুধু সেই জগুই মা যেন রাগ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া বিনোদের কাছে চিরদিনের জগু চলিয়া যাইতেছেন।”

গোকুলের সেদিনের এই আশঙ্কা নিষাকরণ লতো পরিণত হইল যখন ‘ভবানী’ ‘বিনোদের’ বাসায় চলিয়া গেলেন। অভিমানী ‘গোকুল’ সবাইকে জানাইয়াছিল, তাহারতো আর নিজের মা নেই ‘ভবানী’ যে এখন সত্যিকারের লংঘা হইয়াছেন।

কিন্তু সেই সঙ্গে সে সবাইকে আরো জানাইয়া দিল যে ‘ভবানী’ লংঘা বা অগ্র যাহা কিছুই হউন না কেন, ‘গোকুল’ তাঁহার উপরে নিজের দাবী জাড়িতে পারেনা, তাঁহার সম্মান যে নষ্ট হইতে দিতে পারে না। সে ‘বিনোদের’ বাসায় গিয়া ‘হেবুর মার’ কাছে ছুখ করিল, “বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বল্লেন, “বাবা গোকুল এই নাও তোমার মা” আমি ভালো মানুষ—নইলে বেঙ্গার বাপের লাধা কি, সে

আমার মাকে জোড় করে নিয়ে আনে! কেন আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি এখনই জোর করে নিয়ে যেতে পারি নে?”

এই কটি কথার আমরা জানিতে পারি ‘গোকুলের’ বিমাতাকে নিজের বলিয়া দাবী করিবার মূলে ‘ভবানী’র কতখানি স্নেহ রদ ঢালা ছিল।

হতভাগিণী ‘পাবতীর’ জীবনও বিমাতার অভিনয়ে অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে। রুগ্ন ‘ভুবন চৌধুরী’র গৃহে সেই চলমানময়ী ‘ভুবন চৌধুরী’র গৃহলক্ষীর অংশ হইতে লয়ভ্রমে নিজেকে লয়াইয়া নিয়া ‘ভুবন চৌধুরী’র প্রথম পক্ষের সন্তানের মাতৃপদে নিজেকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে তাহাকে লেখান হইতে নিজের কাছে টানিয়া আনিতে ‘দেবদাস’ও লক্ষ্যচ্যুত হইত যদি সে নিজে কোন দিন ‘পার্বত্যকে’ এই আসনে স্বচক্ষে দেখিত। এই মাতৃস্বর মর্ম্মায় নিজেকে আবৃত ও সমাজের লবণপেক্ষা গোরবের স্থানে নিজেকে স্থাপিত করিয়াই সমাজের ও নারীস্বের প্রতি ‘পাবতা’ তার কর্তব্য লম্বা প্রদর্শন করিয়াছে। সত্যি ‘ভুবন চৌধুরী’র গৃহে যদি ‘মহেন্দ্র’ না থাকিত, আর তাহার মা হইবার সুযোগ যদি না ঘটিত তাহা হইলে ‘ভুবন চৌধুরী’র গৃহে আগুন জালাইয়া ‘পাবতী’ নিজেও বোধ হয় সেই আগুনে সমানে প্রত্যাশরূপে পুড়িয়া মরিত।

‘পাবতীর’ জীবনের এই অংশ সমালোচনা করিতে গিয়া শরৎ সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়াছেন, “পাবতী প্রকৃত পক্ষে স্বামীর স্বর করিতে আসে নাই। তাহার অন্তরের স্বামী ‘দেবদাস’। দেবদাসকে সে জব্বর হইতে বিদায় দিতে পারে নাই। অথচ অসুষ্ঠানিক বিবাহের দ্বারাই ‘ভুবন চৌধুরী’ তাহার স্বামী হইয়া দাঁড়াইয়াছে... সে ‘ভুবন চৌধুরী’র বাড়ীতে আপনাকে এমন ভাবে মানাইয়া লইয়া চলিয়াছে, যাহাতে

কেহই বুঝিতে পারেনা, যে, এ তাহার প্রকৃত স্বামীর গৃহ নয় বা তাহার স্বয়ং তলে প্রেমের আর এক কন্ড বহিরা বাইতেছে * * * *

এই চলনাময়ী নারী যাহাকে স্বামী বলিয়া মানিল না, অগত তাহারই সন্তানের বিমাতা হইয়া যে তাহাদের মধ্যে কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অপ্রমাপিত থাকে না, যখন জগৎ বালার নামে 'মহেন্দ্র' আনিয়া পাবতীর কাছে অভিযোগ উপস্থিত করে। এইস্থলে আমরা বেশি মাতৃ-স্ব 'ভবানী' ও 'পার্বতীর' মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং মাতৃস্বদের দ্বারা সকল সন্তানের নিকটেই উন্মুক্ত। সে কাহারও বিধি নিষেধ কিছুই মানে না, বিচার করে না কে স্বীয় মাতা কে সপত্নী সন্তান। সে প্রভাবজাত উদারতার সবাইকে সমান করিয়া লয় ও দেখে।

'নিকৃতি' গল্পেও দেখা যায় 'শৈলজা' তাহার সপত্নীপুত্রের প্রতি আপনায় গর্ভজাত পুত্রের জায় স্বাভাবিক ব্যবহার করিয়াছে ও প্রয়োজন বোধে কঠোর হইয়াছে। কিন্তু কথোপকথন বা বিবেচনায় অত্যাচার করে নাই।

বার্থ ও বুঝিত মাতৃস্বদের চরম চিত্র হইতেছে 'পণ্ডিত মশাই' এর 'কুসুম'—প্রথম জীবন তার সামাজিক কলঙ্কের মধ্যে কাটিয়াছে। তার মা কলঙ্ক সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরের সহিত এক আসল বৈরাগীর বস্ত্রি বদল করাইয়া জাত রাখিয়া গিয়াছেন। তাহারি যাত্রাপথের অনুসরণ করিয়া আসল বৈরাগীও একদিন চলিয়া গিয়াছেন। 'বন্দাবনের' সহিত 'কুসুমের' আর কোন সম্বন্ধ নাই, এমনকি 'কুসুম' তুলিয়া গিয়াছে তাহার 'বন্দাবনের' সহিত বিবাহ হইয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনার পর কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে; 'কুসুম'

বাহুন কায়েত প্রভৃতি ভদ্রবরের ঘেরেঘের লিখিত মিশিয়া লেখা পড়া শিখিয়া যোগেন আনিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু 'রাজলক্ষী'র (শ্রীকান্ত) কথায় "এ লোভ (অর্থাৎ জননী হওয়ার লোভ) আবার কোন ঘেরমাঝের নাই?" তাহা সে জানিতে পারে নাই। তাই ঘটনাচক্রে যখন 'বন্দাবন' সমস্ত বিবাহ বিবাহ মিটমাট করিয়া আবার তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে চাহিল, তখন তাহার শিক্ষিত সংস্কারিত মন বলিল যে তাহা হয় না। 'বন্দাবন' ফিরিয়া গেল। কিন্তু সে পিতৃস্বদের আশ্বাস পাইয়াছিল। তাই বোধ হয় সে 'চরণ'কে আনিয়া 'কুসুমের' কোলে তুলিয়া দিয়া 'কুসুম'কে 'চরণের' মা হইতে ডাকিল—বন্দাবনের গৃহিনী হইতে নয়।

'কুসুমের' মনে হোলা লাগিল। তাহার সমস্ত হৃদয় মাতিয়া, উঠিল: এমন ছেলের মা না হইলে যে চলে না। কিন্তু তাহার গর্ভিত মন সেই সঙ্গে বিরুদ্ধ আন্দোলন তুলিল: এমন ছেলের মা হইতে হইলে, তোমাকে যাইতে হইবে সেই 'বন্দাবনের' ঘরে, যাহার পিতা একদিন তোমার মায়ের নামে 'মণ্ডা' কলঙ্ক দিয়াছিল। তাহার শিক্ষিত মনও সেই আন্দোলনে যোগ দিল: আবার বিবাহ, আবার বস্ত্রিবদল, সে তো বিবাহ না ভিঃ! এই দ্বন্দ্ব পড়িয়া আর 'কলঙ্ক'কে কে ছেঁতিলে তাহারা 'কুসুম' 'চরণের' চিন্তা দূরে সরাইতে চেষ্টা করিল। এমন কি সেদিন যখন 'বন্দাবন' মহামারীর ভয়ে 'চরণ'কে 'কুসুমের' কাছে রাখিতে চাহিল, তখন কঠিন হইয়া সে 'চরণ'কে ফিরাইয়া দিল—নিজেও দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু 'কুসুমের' দৈহিক দূরে সরিয়া গেলেও, তাহার বুদ্ধিত নবোন্মোচিত মাতৃস্বদের অমঙ্গলের মধ্যে সন্তানকে ফেলিয়া দূরে সরিয়া থাকিতে পারিল না। সে

সমস্ত সংস্কার সকল দ্বন্দ্ব লব লজ্জা ঠেলিয়া 'চরণের' কাছে ছুটিয়া আনিল—'চরণ'কে, স্বকের ভিতর টানিয়া লইতে। কিন্তু 'চরণ' তখন সকল মাতৃস্ব বন্ধনের বাহিরে গিয়া 'কুসুমের' উপেক্ষার প্রতিশোধ লইয়াছে।

শরৎ সাহিত্য সমালোচনা করিতে গিয়া প্রমথনাথ পাল মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন, "অপরের সন্তানের প্রতি মেহ না জন্মান্তে তো স্বাভাবিক। সেই জন্যই বুদ্ধি সমাজে স্বর্ণধূজরী, দিগম্বরী, কাছিনী, রাণীবামনী শ্রেণীর রমণীই অধিক। কিন্তু যে সমাজে এই জাতীয় নারী সংখ্যায় যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, সেই সমাজে আবার ভামিনী, নারায়ণী, হেমাজিনী প্রভৃতিরও স্থান আছে এবং তাহারাই বোধ হয় এতদিন রমণীর রমণীয়তা বজায় রাখিয়াছে বলিয়া, অনাথ আল্পস্বামী ও অস্তাগাধের স্থান মরুভূমিতে না হইয়া এখনও সমাজেই আছে।"

শরৎ সাহিত্যের মাতৃস্বের মূলেও বোধ হয় এই তথ্যই নিহিত আছে। নিজের সন্তান যখন আসে নাই, সংসারে সে যখন সবে পুতুল খেলা ছাড়িয়াছে, এমন সময়ই 'নারায়ণী'র হাতে 'রাধলাল'কে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ছোট ছেলেটি সেদিন 'নারায়ণী'র অন্তরে ও সংসারে যে শান্তি ও সুখ ঢালিয়াছিল, সেই কথাও তাহার মাধুর্য্য 'গোবিন্দ'কে কোলে

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

পাইয়াও 'নারায়ণী' ভুলিতে পারে নাই। তাহ'র একটি চক্ষু ও কান সর্বদাই এই অতি সরল, অতি দৃঢ় অথচ অতি দৃষ্ট চোলেটির দিকে স্নেহসম সিক্ত হইয়া প্রসারিত থাকিত। সে কখন কাহার অনিষ্ট করে, সে কখন কাহার সঙ্কিত মারপিট করে এই ভয়ে। কাজেই 'বিগম্বী' যখন আলিলেন, তখন মেয়ে মাকে চিনিত বলিয়া তাহার সতর্কতার কাজ বাড়িয়া গেল। 'রামলালের' প্রতি 'বিগম্বী'র বিদ্বেষ যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই 'নারায়ণী'র স্নেহধারা গোপনে 'রামলালের' উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইতে লাগিল।

বড় প্রেম শুধু নিকটে টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়—মাতৃস্নেহ সশব্দে কিন্তু এটি নিয়ম থাকে না। সেই জন্তই সংঘর্ষ যখন চরমস্থানে আলিয়া উপস্থিত হইল, 'রামলাল' তারবেশের চলিয়া যাঁতে চাহিল, তখন সকল বীধান নিয়ম নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মাতৃস্নেহেরই ভয় হইল—সে সন্তানকে দূরে পাঠাইতে পারিল না, সেহ উদ্বেলিতা বক্ষে নির্যাতিত সন্তানকে সম্মুখে লজ্জার চাপিয়া ধরিল।

শুধু 'রামের স্মৃতি' নয়, 'রামলাল ফল' এতেও দেখিতে পাওয়া যায়, গল্পাঙ্গি গৃহত্যাগী 'গয়রামের' ভাত রাধিতেছে, সেইখানে গিয়া যেখানে কলের সাজ গঠিয়া 'গয়রাম' গৃহত্যাগী হইয়াছে।

মাতৃস্নেহের আর একখানি অতুল্য মনোরম চিত্র 'বিন্দুর' ছেলে'। গল্পের নামকরণ থেকেই বুঝিতে পারা যায় এখানকার যতো কিছু ঘটনা, যতো কিছু দৃশ্য সবই 'বিন্দুর' ছেলে অর্থাৎ 'অমূল্যধন'কে কেন্দ্র করিয়া।

বাহার ছেলে তাহারই লিখিত ছেলের দ্রুপ গরম, পাঠশালার পড়ানে, সুপারী কাটা ভাতি লাভধান ইত্যাদি লইয়া 'বিন্দু'

বড়জা 'অন্নপূর্ণা'র ছেলেকে মাহুয করিতেছিল নিজের সন্তানরূপে। তাহার আশা ছিল 'অমূল্যধন' দেশের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইবে। এই আশা যে 'বিন্দু'র কতখানি হৃদয় জুড়িয়াছিল তাহার একটা ক্ষণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় 'বিন্দু'র নিজেরই 'অন্নপূর্ণা'র কাছে অজ্ঞাতসারে উচ্চারিত কটি কথায়। "না দিদি, ও আশায় যদি কোন দিন বা পড়ে ত আমি পাগল হয়ে যাব।"

'বিন্দু'র সধা সর্বদা লস্কর মাতৃহৃদয়ের দিন যখন 'অমূল্যধন'কে লইয়া এমনভাবে কাটিতেছিল, সেই সময়ে 'নরেন্দ্র' আলিল দশ আনা বারো আনা চুল ছাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া যাত্রার বলে 'নীতা' সাজিবার গৌরব লইয়া। 'বিন্দু' 'অন্নপূর্ণা'র কাছে দাবী করিল, 'নরেন্দ্র'র এখানে অন্ততঃ 'অমূল্যধন'র কাছে থাকা চলিবে না। 'অন্নপূর্ণা' সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু যেদিন 'অমূল্যধন'র 'নরেন্দ্র'র মতো দশ আনা বারো আনা চুল ছাঁটিবার লখ চাপিল, সে দিন 'অন্নপূর্ণা'র উপহাসে 'বিন্দু' স্পষ্টই বলিল, "ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে—সব জিনিষের স্তর এমন করেই হয়।"—ছেলের বিলালিতা স্তর হইলে লেখাপড়া নষ্ট হইবে—'বিন্দু'র মাতৃহৃদয় সে দিন যে এত আশঙ্ক করিয়াছিল তাহা যে মিথ্যা নয়। তাহা প্রমাণ হইয়া গেল যখন ছদ্ম পয়ে 'অমূল্যধন'র পকেট হইতে আধপোড়া

দিগারেট বাহির হইল আর মাটির জানাইল, সে অপরের বাগানে চুরি করিয়া কুলে জরিমানা দিয়াছে।

তাহার পর এই অতি সুখের সংসারে যে বিপ্লব আলিয়া উপস্থিত হইল, তাহা ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইলেও, ছেলেকে ছাড়াইয়া তাহা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্যেও দেখা গেল 'অমূল্য' 'বিন্দু'র কতখানি, আর 'বিন্দু' 'অমূল্য'র ভালবাসা পাইবার দাবী কতখানি রাখিয়াছে, সেই সময়ে যখন নতুন বাড়ীতে বাসন ঠাকরণ বলিতেছে, তোমার মুচ্ছা হ'য়েছিল, এ সব কথা জান না! অমূল্য-দন কোথা থেকে ছুটে এসে তোমার বুকের উপর প'ড়ে যে কি কান্না! সে আর কখন দেখে নি, বলে ছোট মা মরে গেল..."

'মজদিদি' 'হেমাজিনী' ও অনাগ পিতৃ-মাতৃহীন 'কেটকে' দেখিয়া সন্ধ্যা নিজের জীবনের নিসঙ্গতা অনুভব করেন। তাই সকলকে উপেক্ষা করিয়া, সকলের উপেক্ষিত 'কেটকে' বুক চাপিয়া ধরেন।

শরৎ সাহিত্যে এই হ্রস্বকম মাতৃহৃদ ছাড়া আর এক প্রকার মাতৃহৃদ আছে 'বিশ্বেশ্বরী', 'ভুবনেশ্বরী', 'সিদ্ধেশ্বরী'র মধ্যে। ইহার সাধারণ বিবাহ কলহ, স্ত্রুণ তুণ হইতে অনেক দূরে বিরাজমান অথচ তাঁহাদের এক নিসৃত স্নেহপীযুষের ছোঁয়া পাইতে হৃদয় স্তম্ভিত মতিরা উঠে।

'রমেশ'র লিখিত 'বেণী'র যতই বিবাহ বিসম্বাদ মাথা কাটাকাটি হউক না কেন,

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতান্ন দোকান

১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

‘রমেশ’র পিতৃশ্রদ্ধ স্থলস্পর্শ করিতে ‘বিশ্বেশ্বরী’র আঁচলে ‘রমেশ’র ভাড়াবের চাবী উঠিবেই, এবং ‘বেণী’কে ‘বিশ্বেশ্বরী’র আঁকার ‘রমেশ’ জোষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ্য লক্ষ্যনে নিমন্ত্রণ করিবে। (পল্লীমাঝে)

আট নয় বছর হইতে ‘ললিতা’র মা হইলেন ‘ভুবনেশ্বরী’। কিন্তু সেই মাতের, চোখে কোন দিন মরা পড়িল না যে ছেলে ‘ললিতা’র প্রেমে পড়িয়াছে। আবার সে কথা বখন ‘শেখর’ প্রকাশিত করিল, তখন ‘ভুবনেশ্বরী’ খুব বিস্মিত হইলেন না। বরং খুব লজ্জাই তিনি তাহা মানিয়া লইলেন : তাঁহার এত ভালবাসা ছাড়িয়া ‘ললিতা’ কোথায় যাইবে। (পরিণীতা)

‘লিঙ্কেস্বরী’ ‘শৈলজা’র উপরে রাগ করিয়া তাহাকে ভাড়াটেরা দিলেন। অথচ রাগে তাঁহার ‘শৈলজা’র ছেলে ‘কানাই বলাই’এর কথা ভাবিয়া ঘুম আসিল না; তিনি ঠিক করিলেন পরের দিন মাছলা করিয়া তিনি ‘কানাই বলাই’কে ‘শৈলজার’ কাছ হইতে কাড়িয়া আনিবেন। (নিকৃতি)

শরৎচন্দ্রের অমর লেখনী এই সমস্ত ছাড়া অতি সামান্য, ছোট যে সকল চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও কেহ ভুলিতে পারে না। নিজের সন্তান মারা গিয়াছে। তাহার মৃত্যুকালে ‘বুদ্ধাবন’ পুকুর বাবুজীর করিতে না দিয়া অপমান করিয়াছে। তবুও ‘ঘোষালের পুত্ৰী’ ‘ঘোষাল’কে অনুরোধ করিতেছেন, ‘বুদ্ধাবন’কে আশ্বাস দিতেছেন—ডাক্তার ‘চরণকে’ দেখিতে যাইবে। এত সন্তোষোৎসাহ নারী যেন সমস্ত অন্তরের গোপন কথা এই অনুরোধে আশ্বাস প্রদান করিয়া গেলেন; আমি সন্তানের ম, সন্তানের মজলমজী জননী; আমি সন্তানের অমঙ্গল দেখিতে পারি না— সে সন্তান আমারই হউক বা অপরের হউক (গণিত মশাই)

‘অরুণায়া’ পাঠকের মনে যে সর্বপ্রাণে

কোন রেখা পাত করে সে হইতেছে ‘পোড়া-কাঠ’ ‘ভামিনী’। ভারতীয় চিত্রকর যেমন ভাবে বিভোর হইয়া শুদ্ধ রেখার টানে চিত্রের ভাব গভীরতা প্রকাশ করে, শরৎচন্দ্রের প্রতিভাশালিনী লেখনী ঠিক সেই ভাবে কটি কথার মধ্যে দিয়া যাহার রূপ হইতে যে ‘পোড়াকাঠের’ ভ্রায় তাহার অন্তর যে সুবর্ণে জ্বল তাহা দেখাইয়াছে ‘ভামিনী’র মধ্যে।

মা যদি সন্তানের প্রতি নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন এবং শক্তি করিয়া সংসারের হাল ধরিতে অক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সংসারের ও সন্তানের কি পরিণাম হয়, তাহাও শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন ‘দেবদাসে’। ‘দেবদাস’এর জননী যদি ‘পার্বতী’র সহিত ‘দেবদাসের’ বিবাহ দিতেন তাহা হইলে তিনি যথার্থ সন্তানের মঙ্গলা কাঁজিনী মাতৃহৃদয়ের কাজ করিতেন। এত প্রসঙ্গে আমাদের বঙ্গমহাশয়ের ‘কৃষ্ণকান্তের’ উইলের কথা মনে পড়ে। একদিন ঠিক এই রকম অবস্থায় সন্তানের উপর জননীর পরিমাণ ঠিক করিতে না পারিয়া ‘গোবিন্দ-

লাল’র জননী ‘দ্রবর’র সংসার ডুবাইয়া দিয়া কানী চলিয়া যান।

‘বড়হিঁদ’ ‘মাধবীতে’ আমরা আবার অতি লভ্য অথচ অতি পরিচিত মাতৃহৃদয়ের বিকাশ দেখিয়াছি। ছেলে মানুষ ‘সুরেন্দ্রনাথকে’ শাসিত ও প্রতিপালিত করিতে ‘মাধবী’র সময় নষ্ট ও কাজের ক্ষতি হইলেও সে কখন না বলিতে পারে নাই। ‘মাধবীকে’ নারীর স্বাভাবিক মাতৃহৃদয় এই না বলিতে অক্ষম করিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পী বিভূতি ভূষণের ‘অপরাজিতা’ একখানি অতুল্য রচনা। এই ‘অপরাজিতার’ যথার্থ নায়ক ‘অপুর’ জীবনেও যে ঘর ছাড়িয়া য়ের এই অকৃতম মিষ্ট আকর্ষণটি লক্ষ্য করিয়াছে, যে তাহার ছেলে মানুষের জীবনে বারবার ‘নিখুঁলা’, ‘নিরুপমা’, ‘লীলা’ প্রভৃতির দেখা পাঠিয়াছে,—যেমন ‘মাধবী’র দেখা পাঠিয়াছিল ‘সুরেন্দ্র নাথ’।

জগতের নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, জননী হওয়াই নারীর চরম আকাঙ্ক্ষা—নারীর প্রাণের মূলও এই তথ্য নিহিত আছে। এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ‘শ্রীকান্তর’

পাকা চুল ও টাক মাথা

কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে “কনক হেয়ার অয়েল” ও “কনক হেয়ার লোশন” অতীব উপকারী। ইহা ব্যবহারে অচিরেই আপনার চুল মন্থণ ও বৃদ্ধি হইবে। এবং যে কোন প্রকার কেশ রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হইবেন। কিংবা ডাঃ ডিগোর (হেয়ার ডিজিজ স্পেশালিষ্ট) (লন্ডন) চিকিৎসাধীনে আনিয়া জটিল কেশ রোগ হইতে মুক্ত হউন। মূল্য আশাশীত মূল্য করা হইয়াছে।

মাশুফাক্কারার :—

ডাঃ ডিগোর কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

৪৯ বি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ফোন বি, বি ৪৩৮৬

দি সিটি ব্যাঙ্কিং এণ্ড লোন ডিপার্টমেন্ট হইতে ২৫ মূল্যের মাসিক

৥ আনা সুদের বণ্ড গ্রহণ করিয়া মাসিক আয়ের সংস্থান করুন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন।

‘অভয়া’র মধ্যে। সংসার সমাজভ্যাগিনী রাজলক্ষীও এই আকাঙ্ক্ষার নাগপাশ হইতে ছাড়ান পায় নাই। ‘রাজলক্ষী’ নিজেকে বন্ধুর মাতার আসনে বসাইয়াছিল। তাই যখন সে ‘শ্রীকান্ত’র লঙ্কান পাইল, তখন মাতৃস্নেহ সহিত প্রেমের হৃদ্য বাধিয়া গেল। এই সমস্তার ‘দেবাপাওনার’ ‘অলকা’ বা ‘বাড়ী’কে পড়িতে দেখা যায়; ‘হৈম্বর কোলে সুন্দর ছেলে আর ‘জীবানন্দের’ ঘর বাধিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহাকে মোহস্তর গম্বী হইতে, চণ্ডীগঞ্জের পুজার আসন হইতে ভালাইয়া লইয়া গেল।

শরৎচন্দ্র নিজেকে কোনদিন সমাজ সংস্কারক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যে আমরা যে নীতিবুদ্ধ সংস্কারিত চিত্রগুলি দেখিতে পাই, তাহা সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, জানি না বটে, তবে তাহা যে, সাময়িক ও পরবর্তী সাহিত্যে যথেষ্ট রেখাপাত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবাসীতে সংগৃহীত একশত পুস্তকের মধ্যে গোকুল লালের ‘পথিক’ অন্ততম। এই বইটি ঘটনাবল। অনেক চরিত্রই এখানে ভীড় করিয়াছে; নিজেদের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ‘মনীষা’ ও ‘কল্যাণী’র কথা আমরা লম্বা ভুলিতে পারি না। ‘মনীষা’কে মনে হইত তিনি ‘কল্যাণী’র ছোট বোন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন তাহার বিমাতা। তাঁহার এই বিমাতা হইবার ইতিহাস ও পরে বিমাতার ব্যবহার বাহা পাওয়া যায়, তাহাতে অনেকাংশে আমাদের ‘ভবানী’কে (বৈকুণ্ঠের উইল) মনে পড়ে—যদিও উভয়ে বিভিন্ন সমাজ ও অবস্থারই অবস্থিত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে

অচিন্ত্যকুমার তাঁহাদের অন্ততম। তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ অবদান ‘আকস্মিক’এ আমরা ‘কুঞ্জ’ ও ‘রাখোহরি’র যে লম্বা ছেখি তাহাতে ‘হেমাজিনী’ ও ‘কেট’র কথা আমাদের স্মৃতিপথে আলিয়া উপস্থিত হয়। এই ‘কুঞ্জ’ খেতেটি সংসারের জটিল লোকাচরণে নিজেকে হারাওয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু নিরাশ্রয়, অনাথ ‘রাখোহরি’র মা হওয়ার অভিনায়ে সে আবার স্বর্গ্যালোকে উন্নীত মস্তকে পুনর্বার পাঁচজনের মতো টাড়াইতে চেষ্টা করিল। এমন কি যে পক্ষের প্রেম তাহার অতি লোভনীয় ছিল তাহাও সে ঘুরে চেলিয়া দিল। এই প্রসঙ্গে ‘প্রেমজ্ঞে মিত্রের’ ‘সাগর লজ্জের’ গল্পের ‘দাক্ষিণী’ ও বাতায়ী’ আমাদের চোখের নামনে ভালিয়া উঠে—নবোন্মোচিত মাতৃহ সমাজের কোন বাধন না মানিয়া অপরের কলুষিত সন্তানকে নিজের বলিয়া বুক টানিয়া নিয়া চাপিয়া ধরিল এবং প্রকাশ করিল নারীর চরমকথা, ‘অভয়া’র সমাজ বিদ্রোহের ইতিহাস।

‘নারীর মূল্য! একস্থানে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, সুমত্যা দেশেও বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার প্রথম পক্ষের সন্তান-গুলির উপরে অনেক লম্বাই নির্দিয় হইয়া উঠেন……’ পুরুষের এই কঠিন কঠোর হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত পরিচিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় শরৎচন্দ্রের মজলাকাছী মনটি ভবানী প্রভৃতির হাতে ‘গোকুলের ভার তুলিয়া দিয়াছে। আর পুরুষ চিরদিন সমাজ সমাজ করিয়া লাফাইয়াছে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে যে সমাজের প্রতিষ্ঠার মূলে কতখানি আত্মদান করিয়াছে তাহা বলা শক্ত। কিন্তু নারী যে তাহার স্বাভাবিক মঙ্গলময়ী মাতৃস্নেহ বলে এই সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, সমাজকে রক্ষা করিয়াছে ও রক্ষা করিতেছে তাহা শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন ‘নারায়ণী’, ‘হেমাজিনী’র মধ্যে। ইহারা না থাকিলে ভবিষ্যত সমাজের, ‘রামলাল’, ‘কেট’ কোথায় থাকিত তাহা কে বলিতে পারে।

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার



কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারত মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আগার সারকুলার রোড, কলিঃ

মৃত্যুর আগে

শ্রীকিরণ সেনগুপ্ত

অন্ধকারে এলো মৃত্যু দীর্ঘ অবরোধে।
নিশীথে নগরীগৃহে
শুভ্র শয্যা 'পরে প্রিয়াক্রোড়ে পুণ্য পুণিমা'য়
মহা সমারোহে চলে মৃত্যুর উৎসব।
এই লগ্নে আমার লক্ষ্যন
লমগ্র পৃথিবী খুঁজি' নভস্থল পর্বত-প্রান্তর
প্রিয়া ছাড়া পাবে নাকো কেহ :
মোর হাতে হাত রাখি অগীর আলসে
দীপ্তিময় বেহুলতা গ্রাস্ত করি' বক্ষোষায়ে মোর
কপট নিজায় লোনা প্রিয় প্রিয়তমা।

ওঠপ্রান্তে মধুকরা হানি
বলকিছে অন্ধ কক্ষ করি আলোকিত ;
সুরভিত অবিকৃত দীর্ঘ কেশদাম
স্বৈতশুভ্র শয্যা-পরে কুলশুভ্র বাহুগুণে বন্ধিম

স্তরে-স্তরে রাশি-রাশি রয়েছে ছড়িয়ে :
সমুদ্রত ভীকৃ বৃক স্তগঠিত উরুদেশ আরক্তিম
নন্দ পদ নগ
আলস লজ্জা মাগি' অতৃপ্তিতে গাঢ় মোহাবশে
শিহরি' উঠিছে বার-বার।
এরপর আর নাহি শোক :
কতি নাহি যদি বিনিশেষে
জীবনের যৌবনের যতো লেনা ছেনা,
চিরস্তন শোক-তাপ হানি-কান্না সব বলিবনা
শারদে মৃত্যু এসে মুছে নিয়ে যায়।

বাহিরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
তারামণী নীল নভে অন্ধকারে অস্তরীক্ষে বসি'
শুক মৃত্যু হানিছে : তুটি :
আমারো আত্মার তটে আছাড়িছে অনন্ত
ক্রন্দন।

অনন্দের ভীকৃ শর মর্ষ বিদ্ধ করি'
মহারবে চাফাকারে তুলিয়াছে অবিকৃত বড়।
হৃদয়ের বন হ'তে গন্ধ লয়ে ওরস্ত পবন
কারে যেন করে অব্যবণ,—
সন্তোজাত যুগী-যাতী'মুকুলিত মহালসা ছেনা
গর্জতরে গন্ধ-কাত্তে বিলাইছে আত্ম :
জীর্ণ কীট জোনাকীর অন্ধকারে স্নান আলো
জ্বলে'
ঝংক-ঝংক বরাভর করিছে ঘোষণা।

প্রিয়া হবে পাশ ফিরে শেষ—
চোখে চোখ রেখে মৃত্যুর তরে একবার
দর্পণের মতো ব্যক্তি দেখে লই নিজ প্রতিচ্ছবি,
তারপর অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে ধরে'
মধুস্র শাধা গ্রীবা স্নেহ বাহু নগ্ন বক্ষতল
অচঞ্চল ক'রে তুলি চঞ্চল চুম্বনে :
ক্ষণে-ক্ষণে স্তূপীকৃত কৃষ্ণ কেশদামে
অকপটে মুখ'ঢেকে অসহ সে সৌরভেতে
রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে
করি হাহাকার।
ক্রমে-ক্রমে বেড়ে যায় তীর বাকুলতা :

নিমেষে-নিমেষে
প্রস্ফুটিত যুগ্ম'স্তনে প্রলুক চুম্বনে
মৃত্যু-লত পান করি বেন।

এই প্রেম এতো শুষ্ক নয়নের নেশা,
কোনোদিন এতে কারো মেটেনি পিপাসা।
লতাপূর্ণ বক্ষোবেশে অবিরত ওঠের পীড়ণে
প্রিয়ারে কাতর ছেঁরি' তবু মনে যেন
অনুতাপে ক্রান্তি নাহি আসে।
অস্তরের স্বর্গপর লোভ
লোল জিহ্বা প্রসারিয়া মণিহারী ক্রুদ্ধ সর্পনম
লক্ষ হাতে পুটে লয় কামনা-সঞ্চয়।
কৌমার্যের স্পন্দনয় সতেজ কাননে
পিঙ্গা মোর প্রস্ফুটিত শুভ্র শেফালিকা :
হাসিটুকু আছাড়ুক নয়নের দৃষ্টিটুকু তার
আর মিষ্ট কথা শুটি ছুট তিন
কতু তাহা যথেষ্ট কি নয় মিটাতে

মিলন-ব্যাকুলতা ?

শ্রদ্ধা নাই শুধু বেহ ভরে'
সুচিহ্নিত অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ :
প্রেম গেছে শুধু আছে প্রাণপণ
অতৃপ্ত আত্মার লাগি' জ্যোতিছীন
বন্দনা-সঙ্গীত ॥



ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকতা।

পরম পিপাসা

(গল্প)

শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত

‘পিস্‌ম্যালিয়ন ও গ্যালেসিয়া’ গল্পের শেষ অংশটুকু আজ মাধুরীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। অনেকগুলি পাতা উল্টাইয়া পরিশেষে স্বপ্নবীর পুস্তকখানের ‘পেজমার্ক’ বাহির করিল। মাধুরী ততক্ষণে আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়াছে। তাহার আশ্রিত ঘন নীল চোখের বিষুগ্ন দৃষ্টি স্বপ্নবীরের মুখের উপর নিবদ্ধ। সবতনে পুস্তকখানি ধরিয়া মুম্বিষ্ট গলায়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে স্বপ্নবীর পড়িতে থাকে : ‘At first the sculptor could not believe that what he saw and heard was not a dream but all doubt vanished when his new-made wife laid her warm cheek against his and whispered, “Say, this is no dream, dearest. Wilt thou not speak to me as lovingly as thou didst when I stood lifeless in yonder niche ? Then, in overwhelming rapture, he kissed and gave her a glad welcome to his home”

এই অবশিষ্ট আসিয়া স্বপ্নবীর গাধিয়া যায়। পুস্তকের পৃষ্ঠা হঠাৎ চোপ তুলিয়া লইয়া মাধুরীর দিকে সাক্ষাৎকৈ নিদ্রাষ্ট তাহার লহিত একেবারে চোখাচোপি হইয়া যায়। লজ্জারক্ত অপ্রকৃষ্ট মুখে মাধুরী অমনি ভট চোখ নত করিয়া ঘরের মেঝের দৃষ্টি ফিরাইয়া নেয়। স্বপ্নবীরও আর আশ্চর্যবরণ করিতে পারে না। ঘরের গায়ে মাধুরী আকর্ষণ করিয়া নিজের কম্পান বিন্দল মুখের উপর টানিয়া লয়। তারপর তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া আন্তে আন্তে বলে : ‘Then, in overwhelming rapture, he kissed her, and

gave her a glad welcome to his home.

তাহার মুখের মাঝে মাধুরী নিম্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকে।

‘আচ্চা, যদি তোমার সামী আচমকা ফিরে আসে ?’ স্বপ্নবীর আবার বলে : ‘এখানে এসে যদি হাবী করে তার স্ত্রীকে ? মাধুরী যেমন ভুল করে, ভুল ভালাও তো স্বাভাবিক। বর্ষায় গিয়ে সেট বার্মিস বমনীর সাহচর্যে এতদিনে সে হয়তো লক্ষ্য করছে অজস্র তিক্ততা। সামসারিক শাস্তি লাভের জগে বাংলার বদর কাছে ফিরে আসা তার পক্ষে এখন সহজেই সম্ভবপর। তখন কী করবে ?’

মাধুরীর দেহ নড়িয়া উঠে। ‘পাগল’ ! সে ইহার বেশী কিছু বলিতে পারে না।

‘পাগল নয়’- স্বপ্নবীর বলে : ‘যদি তুমি ভাবতেই হয়, তার জগে এই ছয় মাসই যেনে। এরপর এখানে সে যদি আসে, আশাকরি তোমার দিক থেকে কোন ক্রটি হবে না।’

‘তুমি কী বলতে চাও শুনি ? বন্ধিমন্ড কুণ্ঠিত করিয়া মাধুরী বলে : ‘সে ফিরে এলেই আমি সাক্ষাৎ সত্যি সত্যি মতো তার পছন্দাঙ্গে পড়ে মাথা কুটতে থাকবো ? নিলজ্জ নাকি সুরে আর্ন্তনাথ করে বলবো, হানীকে পায়ে ঠাই দাও ?’

‘যদি তাতে ফল হয় তো তা-ও করবে বই কী !’ স্বপ্নবীর সংযত সুরে বলে।

‘তুমি আমাকে পড়িকা করছো নাকি ?’ মাধুরী নিমেষে উচ্চ হইয়া উঠে : ‘তার চরিত্র তো অজানা নয় তোমার ! যে ফিরিলো সেয়েটির সর্বনাশ করে সে বর্ষায়

পালিয়ে গেছে সন্তান লয়ে সে হতভাগিনী এখনো চোখের জলে বুক ভাঙাচ্ছে। লোক-টাকে ও নাকি সত্যি ভালো বলেছিলো !’

স্বপ্নবীর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে।

তারপর স্বপ্নবীরই ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম। ‘তুমি এতো অপরাধ !’ মাধুরীর চোখের উপর চোখ রাধিয়া সে বলে : ‘এরকম অসামান্য রূপলাবণ্যবতী অথচ, কেন সে অভিভূত হলো না ! কী করে সে এড়িয়ে গেল এই চরমতম শক্তি সম্পন্ন চুপককে !’

‘আমাকে তার কোনো কালেই প্রয়োজন ছিলোনা—’ চোখ বুজিয়া কম্পিত গলায় মাধুরী বলে : ‘তার একমাত্র প্রয়োজন ছিলো অর্থের। বাবার টাকা-পয়সা যথেষ্ট ছিলো—সবকিছু নিয়ে লোকটা উধাও হলো বিশ্বের পর বাবো সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই !’ একটু গাধিয়া একফালি সফ হানিয়া আবার বলে : ‘বিশ্ব আমার চুপককে তুমিও অস্বীকার করতে চাও নাকি ?’

‘অসম্ভব !’ স্বপ্নবীর বলে : ‘যার বিন্দুমাত্র দৌলার্য জ্ঞান আছে তার পক্ষেই অসম্ভব। নট অন্লি ইম্প্রোবেল, বাট অল্‌সো আবলার্ড !’

‘তুমি আজকাল ভাণ্ডী ভেলেমানুষ হয়ে গেছে’, মাধুরী এইবার শাসনের ভঙ্গীতে ক্রকুণ্ঠিত করে : ‘তুমি একজন শিল্পী। জবি আকা তোমার নেশা এবং পেশা। অধ্যবসায় আর সংযম তোমার লভায়। আমার মতো অনেক মডেল তুমি পাবে—তার জগে অতোটা উচ্ছাল শোভা পায়না। উচ্ছাল, উদ্ভাস্ততা এবং আড়ম্বর এ তিনটেই তোমাঘের পক্ষে মারাত্মক !’

তাই নাকি ? স্বপ্নবীর হো হো করিয়া হানিয়া উঠে। তাহার চোখে মাধুরী একটা জীবন্ত বিশ্বর, একটা মুর্ত্তিবতী বিজোহ ; উদ্ভাদিত অলৌকিক আলোচ্ছটা।

‘আজকে ছবি আঁকার কথা?’ স্বপ্নীর বলে: ‘মনে আছে? তুমি ঠিক হয়ে নাও, ঘণ্টা বেতকের ভেতরই রাত্বেচ্ হয়ে যাবে। ডিটেলস্ পরে দেবো এখন।’

‘এখনই?’ মাধুী ব্যস্ত হইয়া উঠে: ‘কতো বড় ছবি? কোন্ অবদা আঁকবে?’

নিজের কোমরের উপর হাত রাখিয়া, স্বপ্নীর দেখায়, এই অবদা। তারপর সু টুপেশ খুলিয়া ছবি আঁকার সমস্ত সংজ্ঞা বাহির করে। একাধিক বড়ের বাক্স তুলির বাড়িল পুঁক কাগজ, ইরেজার আর পেঙ্গিন—এই সব। কাষ্টকলকে কাগজ আঁটিয়া, বড় শুভিহা হাত মুড়িয়া ফেলে।

মাধুীও তাহার নির্দেশ মতো জল-চৌকিটার উপরে ঘাইয়া বসিয়াছে।

‘ওকি?’ অবাক হইয়া স্বপ্নীর মাধুীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসে: ‘এরকম আড়ট হয়ে বসে থাকবার কোনো মানে হয়? আমি তোমাকেই আঁকতে চাচ্ছি, তোমার ত্রিবেহের অবিহিত শাড়ী আর ব্রাউজকে নয়!’ বলিয়া আগলগাড়ে তাহাকে স্পর্শ করে। পিছন দিকে ছুটি হাতের তাগুতে ভর দিয়া হেলানো অবস্থায় মাধুীকে বলাইয়া দেয়। সুচিকণ বেশদামের বিট্রীহী শুভলিক কপালের উপর হইতে একদিকে সরাইয়া দেয়। তারপর ত্রিবেহের লম্বা শাড়ীটাকে শিথিল করিয়া বিরা লতর্কতার লবিত মাধুীর অনায়াসে আবরণ উন্মোচিত করে। বিচকণ বসনের আড়াল হইতে অনেকখানি অনাবৃত বুক জল জল করিতে থাকে বিস্তার চেষ্টা করিয়াও স্বপ্নীর সেই মুহূর্তে নিজের চোখটিকে অতথিকে ফিরাইয়া লইতে পারে না।

মাধুী বাধা দেয় নাই। চোখ মুড়িয়া পড়িয়া থাকে।

নিজের স্থানটিতে ফিরায়া গিয়া স্বপ্নীর কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহার নিঃসঙ্গ

নাগরীক জীবনে এই নারীই পড়িয়া মাধুীর দিকে ছুটিয়া আসে।

বন্ধন এবং বাক্যী।

অকস্মাৎ শীর্ণ শব্দ প্রহার!

কে যেন রুদ্ধ স্বজ্ঞার করাঘাত করিয়াছে: মাধুী নিমেষে নিম্নে ক্রান্ত করিয়া লয়। স্বপ্নীর ততকণে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। সাত আট বছরের একটি শ্রুতী ছোট্ট ছেলে কলরব করিয়া ঘরে ঢুকিয়া

পড়িয়া মাধুীর দিকে ছুটিয়া আসে। ‘এই চিঠিটা বাবা তোমাকে দিতে বললেন, দিদি’ বলিয়া মাধুীর কোলের কাছে একখানা খামে ভরা চিঠি ফেলিয়া দিয়া যেমন করিয়া আনিচ্ছিল, তেমনি ফেল পড়ে বেগে বাহির হইয়া যায়। বাহিরে তাহার থেলার লক্কীরা অপেক্ষা করিতেছে নিশ্চয়।

বি, মান্না এণ্ড সন্মের কন্সল্টা আশ্চর্য্য গুণনিশিষ্ট মহোদয়।

কিওরেন্সি সালসা

বর্তমান যুগে ইহাই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট মহোপকারী সালসা। রক্তস্রাবকারক, বল, শক্তি ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। পাতল ও উদ্ভাস বিলাসক। প্রকৃতরূপে স্বাভাবিক ও স্বাভাবিক রোগে, নষ্ট প্রায়, যাবতীয় স্ত্রী রোগে এবং বহুপ্রাণ ও জটিল রোগ সমূহের একমাত্র মহোপকারী। কোন বাধাধরা নিয়ম নাই—সকল ক্ষুণ্ণে সেবন করা যায়। মূল্য দেড় টাকা; মাটলাদি সহ ২/৬।

ইলেক্ট্রো-গোল্ড-কিওর

জীবনী শক্তিবর্ধক ও নষ্টপ্রায় পুনরুদ্ধারক। স্নায়ু দুর্বলতা, অস্বাস্থ্য, অগ্নি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রোগের অস্বাভাবিক বলকারক ঔষধ। ছাত্রদিগের শ্রুতিশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিপ্রতি তীক্ষ্ণ হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধি মানসিক প্রশ্রুতি, স্নায়বিক উত্তেজনা বৃদ্ধি করে; ছাত্র ও ছাত্রী জীবনের একমাত্র পরম সুখ। মূল্য দেড় টাকা; মাটলাদি সহ ২/৬।

‘গগোরা-নাম’

পিল (বটিকা) বা মিক্চার

অসুখ ঝালা যন্ত্রণা লাঘব হয়। স্ত্রীলোকদিগের যেত ও রক্তস্রাব প্রভৃতি আরোপ হয়। অল্প সময়ে অসুখ ঝালা রক্ষণা লাঘব করিতে এবং রোগ সমূহে নির্মল করিতে ইহার দ্বায় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্যপ্রদ উদ্ভব অসুখি আশ্রিত হয় নাই ইত্যাদি। মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই উদ্ভব মিক্চার ও পিল দুই রকমের পাওয়া যায়, উভয়ই মূল্য প্রতি শিশি দুই টাকা; মাটলাদি সহ ২/৬।

ইপানি এজুমা-সিরাপ

বিভিন্ন ইপানি, দমা, বাসরোগ এবং যাবতীয় ফুসফুস ও শ্বাসনালীর পদাংক, ব্রঙ্কাইটিস, ভ্রুণিক প্রভৃতি রোগে নিশ্চয় আরোপ হয়। ইপানির প্রবল টানের সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সুপ্রাথম যন্ত্রণায় একদাগ মাত্র সেবনেই রোগ দূরীভূত হইয়া রোগী সুস্থ হয়। মূল্য দেড় টাকা; মাটলাদি সহ ২/৬।

বি, মান্না এণ্ড সন্ম

এজেন্টস্ : এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

(মান্না মেডিকেল হল)

১০নং, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

৪নং, ওলু ওস্তাগর লেন,

(পোষ্ট বক্স নং ১২৪০২) কলিকাতা।

চিঠিটা অবিনাশের। আজিকার ডাকে আসিরাছে।

একঘণ্টা আগে স্বপ্নবীর এট আশঙ্কার প্রসঙ্গই তুলিয়াছিল। চিঠিটা মানুষের পিতা প্রকাশ বাবুর কাছে লিখিত। পাতায় পাতায় অশ্রুভিক্ষা আর কমা প্রার্থনা। পরিশেষে অবিনাশ জানাইরাছে, বাবা হইতে রক্তমান হইয়া আগামীকাল সে এখানে আসিয়া পৌঁছবে। তাহার ভ্রান্তি ভাগিয়াছে। পত্রা মানুষকে কইরা এধবার সে কর্মময় জীবনযাত্রার শাস্তিপ্রদ ছায়াপথে অগ্রসর হইতে চায়।

মানুষের মুখচোখ ফ্যাকাসে হইয়া গেছে। বিকলিত হাতে চিঠিখানা সে স্বপ্নবীরের দিকে বাড়াইয়া দেয়। 'ওতে কী লেখা আছে বাবা জানি।' স্বপ্নবীর চিঠিটা আর গ্রহণ করে না। একঘণ্টা আগে এঘরে তোমার বাবাই এনেছিলেন ও চিঠিটা হাতে করে। আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এটা তাঁর মেয়ের হাতে হিলে কোনো ফল হবে কিনা। আমি বলেছিলুম, হবে।'

'আমি বলেছিলুম হবে।' স্নানর মুখে শিশুর মতো অপরূপ ভেঁটী কাটিয়া মানুষী বলিল: 'তোমার মুখে এতোটুকু বাধলো না।' স্বপ্নবীর স্তম্ভিত হাসি হানিল। তারপর মানুষীর পাশে বলিয়া পড়িয়া বলিল: 'কিন্তু তোমার পট্টেট্টা আর একীধনে শেষ করে নিতে পারবেনা বোধহয়!'

বড়ো বড়ো চোখ করিয়া মানুষী তাকায় স্বপ্নবীরের দিকে।

পর মূর্ত্ত্তে কী প্রগৌড় হস্তে অবিনাশের চিঠিখানি টুকরা টুকরা করিয়া ভিড়িয়া ফেলে। বাধা জীবনের সময়ও স্বপ্নবীরের হইয়া উঠে না। অবাক হইয়া সে মুড়ের মতো বলিয়া থাকে।

'তুমি কী স্নানর!' অবস্মাৎ মানুষী হুটী নিটোল বাহু দিয়া তাহার গণ্ডা জড়াইয়া ধরে: 'তোমার ঠোঁটে একটা চুমা পাবো?' স্বপ্নবীর ক্রমশঃ অতলে ডুপিতেছে। কোণায় সেট মানুষী, যার ভিতরে একদিন ছিল ভীকু বধুর বিন্দুতা? বিস্মিতকার বাধা বাধকতা? আজিকার উচ্ছ্বাস অত্যাশ্রয়শে সে আলৌকিক হইয়া উঠিতে চায়।

'ছাব খোলা বয়েছে কেমনে?' স্বপ্নবীর উঠিয়া পড়ে। নিজের পরিত্যক্ত জাহাঙ্গীর ফিরিয়া ছবি আঁকিবাব সজ্জাম স্টাটমেশটাতে গুজাটমা তুলিতে থাকে। অমানসায় তাহার অন্তঃসঙ্গার।

'সেকি: চব্বিটে শেষ হবে নেবে না?' মানুষী নাকিনাকু হইয়া উঠে।

'টুংসাহের বড়ো অভাব।' বলিয়া স্বপ্নবীর স্টাটমেশের ডালা বন্ধ করিয়া দেয়।

পাশাপাশি বাড়ী নয়। এক বাড়ীতে দুট ভাড়াটে। স্বপ্নবীরের একটিমাত্র ঘর, বাকী কষ্টা মানুষীকেই। একটি বন্ধনজনীন বাবান্দার মাত্র ব্যবধান। কাতেটে যাওয়া-আসারও সময় লাগে না। স্টাটমেশের ডালা বন্ধ করিয়া দিয়া বাড়ি ফিরাইয়া স্বপ্নবীর ফেলে, সন্তর্পণে মানুষী কখন পশ্চান করিয়াছে।

অর্দ্ধরাতে অবস্মাৎ স্বপ্নবীরের ঘুম 'ভাঙ্গিয়া যায়।

তাহার শীতল স্পর্শে শরীরের সমগ্র অন্তঃরাজ্য দরফর করিয়া উঠে। দুই হাতে চোখ ডলিয়া চারিদিকে ভাল করিয়া তাকায়। একি! স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? দলদলে স্নানকোমল শয্যায় তাহার পাশেতে মানুষী শুইয়া রহিয়াছে। মানুষী নিদ্রিত নয়। ঘরের অস্পষ্ট কীখালোকে, স্পষ্ট দেখা যায়, বিশ্বর-বিশুদ্ধ স্বপ্নবীরের পানে চাহিয়া সে মুহমুহ হানিতেছে। তাহার হানিতে অপূর্ণ মাধকতা।

'তুমি এখানে কেন এনেছো? স্বপ্নবীরের অধর নড়িয়া ওঠে।

'কেন এনেছি। মানুষী চেঁচা করিয়া উচ্চ নিশ্বাস অবরোধ করে: 'কাল দেই শতানটা এখানে ফিরে আসবে। অথচ সে আমার স্বামী।' মানুষী পরিপূর্ণ ত্রুণ্ণেছের একটা অনন্য তঙ্গী করে।

'কিন্তু তোমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করেন, মানুষী! স্বপ্নবীরের বিষম কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া আসে: 'এবং আমিও যে তোমাকে বিশ্বাস করি। তোমার কী আর কোনো উপায় নেই?

মানুষীও ভাবিয়া দেখিয়াছে বই কী! কিন্তু উপায় বাস্তবিকই নাই তো।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া মূল তুলিয়া স্বপ্নবীর তাকাইয়া দেখে। কয়েক মূর্ত্ত্ত নিশ্চল থাকিয়া কী ভাবিয়া চাপা গলায় ফালিয়া উঠে। রাত্রির নিশ্চলতা তাহাতে ভঙ্গ হইবার কথা নয়। চিন্তাবল্লী মানুষীর কানের কাছে মুখ লইয়া বলে: 'I should have been cruel enough to bring you through the flame! মানুষী তথাপি কোন লাভাশঙ্ক দেখে না।

'তোমার কী এগো দুঃখ মানুষী—, স্বপ্নবীর বলিয়া চলে: 'আগামীকাল অবিনাশ ফিরে আসছে। আমার কাছে যা তোমার প্রত্যাশা তারচেয়ে অনেক বেশী কিছু পাবে তার কাছে। তোমাদের বাবহারীক যুগ্ম-জীবন নতুন সংসারে সাকল্যমণ্ডিত চোক এই কামনা।'

মানুষীর নিস্পন্দ দেহ এইবার নড়িয়া উঠে।

'গুণ্ডু প্রাণাপ শোনবার জেজু—' তাহার কণ্ঠস্বরে আস্তে আস্তে উচ্চারিত হয়: 'এতোরাতে এঘরে এসে তোমার শয্যালজ্জী হটনি! তুমি কী আসবে না হয় করে?' হাত দিয়া সে স্বপ্নবীরের

মুখটাকে চাপিয়া ধরে। আর নব্বুগীরের
 হঠাৎ খেলাল হয়, হাঙ্গীর বক্ষাবাসের
 বৃত্তামণ্ডলি একেবারে খুলিয়া গেছে।
 তাঁহার অনাবৃত বক্ষেদেহ অাবেগ
 এবং উত্তেজনায় থর থর করিয়া
 কাঁপিতেছে।

‘ঘরে ফিরে যাবে না?’ স্বপ্নাচারী প্রশ্নপণ
 শক্তিতে অত্মসংকলন কবিতার স্বেচ্ছা করে :
 তুমি এখান থেকে না গেলে কিন্তু আমার
 প্রশ্নাপ থাকবে না।’ তাহার কল্পিত
 কণ্ঠস্বরে অজস্র উত্তেকনার আভাস।

মাধবী বিকানার উপর উঠিয়া বসে।
 শ্রীধেহের শ্রব বসনকে সংযত করিতে যাইয়া
 আরোও অসংযত করিয়া ফেলে। নগ্নকান্তির
 মর্ষ-আলোক স্থপতির চোখ ছুটিটাকে যেন
 ঝলসাইয়া দেয়।

‘তুমি বাবে কিনা বলো!’ নিভাত্ত
কড় গলায় স্বপ্নীর শায় চীৎকার করিয়া
বলে : ‘আমাকে যুগ্মে দেবে না?’
‘যুগ্মেবেইতো!’ ধ্রুং স্নান কালিয়া মাগুণী
তাকার দেহের উপর বুকিয়া পড়ে : তার আগে
আমাকে মেরে ফেল গলা টিপে!’ চক্কে
চাক চোপের নেকি অসহ্য দৃষ্টি! স্বপ্নীরের
চোখের পাত ‘তাড়াতাড়ি বুরিয়া আনে।

তুমি একটি অতিমাত্রায় অদ্ভুত ছেলে,
 'অপন—'মামুরী বিড় বিড় করিতে থাকে :
 'একো'দিন তোমার লাগে রথেরি, অগচ্চ-
 একধিনের জন্তেও তুমি স্বেচ্ছাপণোঁদিত হয়ে
 আমাকে একটা চুমা পর্যন্ত আশ্রয়!

ସମ୍ପର୍କୀତ ଚୁପ କରିয়া ଭୁଲିତେ ଥାଏକ ।

সে জানিত, য'দুয়ার আরোও অনেক কথা
বলিবার আছে।

‘আর সবচেয়ে বিশ্বয়ের ব্যাপার এই—’
মধুশী বলে : আমাকে বুকের মাঝে
নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলে থাকবার
নেশ তোমার আজও কাটেনি ! অনেকবার
অনেক অল্পভাবে তুমি আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ
করেছো, আমি বাধা দেইনি ! ভাবতুম,
আমি যদি তোমার উপকারে আসি, ক্ষতি
নেই ।’

ম'বু'বী ক্রমশঃ পরিণত হইয়া উঠিতেছে।

তারপর বুলুহ, আমার এতাদৃশ
উদারতা নেহাৎ পরোপকারের ভগ্ন নয়।
লক্ষ্য করে নেহাৎ, তুমি ধরা দিতে ইচ্ছুক
নও। ভাংলুহ, তুমি কি আসবে না
তোমার অঙ্গণ ব্যবধান অতিক্রম করে ?



কিন্তু তোমার লজ্জানকে তো পেতে পারি, তারও তো উপায় আছে।’

অনন্তর, সে হয়নি ম’দুী।’ স্বপ্নীর একটুও খেয়ালনা : শক্তির অশচর্য সৃষ্টির উৎসাহ আমার নেই।’ একে তুমি অপচর বলছো। ম’দুীর আরক্তিম ঠোঁটের আগে কাঁপিয়া ওঠে।

স্বপ্নীর আর কিছু বলেন।

তুমি যে আমার জীবনে এসেছিলে—’ ম’দুীর লবকথা এমনও শেষ হয় নাই : তার কি কোনো প্রশ্নান থাকি উচিত নয়? আমাকে প্রত্যাকান করে তোমার লাভ কি?

স্বপ্নীর কোনো কথা বলেন না।

এটুকু জেনো—’ম’দুীর ইতিমধ্যে বুকের বসন বিস্তৃত করিয়া লইয়াছে : তোমার জন্তে আমি সব রকম কলঙ্ক আর শ্রমি মাধ্যম পেতে নিতে রাজি আছি। জীবন আর যৌবনের গুঢ় অর্থ তোমার কাছ থেকেই জেনেছি প্রশ্ন। পৃথিবীতে যে এতো আলো আছে অশ্রু তোমার সম্পর্কে না এলে হয় তো জানতেই পারতুম না কোনদিন।’

বাহিরের ঘরের বড়ো ঘড়িতে একটা শব্দ করিয়া লাড়ে তিনটা বাজে। সঙ্গে সঙ্গে ম’দুীর ঘেন ল’বৃত্ত ফিরিয়া আসে। ভাড়াভাড়ি সে বিজানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তারপর ত্র্যস্ত পছবিক্ষেপে ঘরের বাহির হইয়া যায়। আর ঘরের ভিতরে স্বপ্নীর বিজানা আকড়াইয়া ধরিয়া মৃতের জায় পড়িয়া থাকে।

সীতের দিন। লক্ষ্য।’ লাভটায় ট্রেন আনিবার কথা।

একেবারে হস্তবস্ত অবস্থায় প্রকাশবাসু স্বপ্নীর ঘরে প্রবেশ করেন। জামাকাপড় ঠিক নাই, মাথার চুল উকখুকা, চোখ-মুখ আশঙ্কার বিক্ষারিত। ‘প্রকাশ প্রতারণা আর জাপিসাতির দ্বায়ে—’ ক’ পিতে ক’ পিতে কোনো রকমে তিনি বলেন : ‘অবিনাশকে

নাকি পথেই প্রেরণ করা হয়েছে! এখন কী যে করি।’

হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তিনি ঘরঘর পায়চারি করিতে থাকেন। ‘তাকে কোণায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?’ স্বপ্নীরকে অগত্যা প্রশ্ন করিতে হয়।

‘পুলিশ তাকে বরাবর হাজতে নিয়ে গেছে।’ উৎসাহিত হইয়া প্রকাশবাসু বলেন : ‘তুমি বী একটবার যাবে দেখানে? জাথ, যদি কোনো উপায়ে কিছু করা যায়।’

স্বপ্নীর সার্টটা গায়ে চড়াইতে থাকে। মুখে কোনো কথা নাই।

‘তোমাকে আমি বিশ্বাস করি স্বপ্ন, আনন্দিত হইয়া প্রকাশবাসু সমগ্র তাহার পিঠে হাত রাখেন : ‘তুমি ফিরে না আসা অবধি এখানেই অপেক্ষা করবো—’ স্বপ্নীরের বিজানার উপরেই তিনি ভাসিয়া পড়েন। আর স্বপ্নীর? শুটবেল খুন্সিয়া কতকগুলি বী প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সে তাহার সার্টের ডট পকেটে পুরিয়া নেয়। মুদ্রাভরা মানিবাগটা বুকপকেটে রাখে। তারপর ঘরের বাহির হইয়া পড়ে।

এমন অদম্যে ম’দুী কোণায়?...

বাকান্দা পার হইয়া স্বপ্নীর ম’দুীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে। ঘরে আলো জলিতেছে। আতাম কেদারায় হেলান দিয়া ম’দুী চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে লব খবর তাহার কাছে পৌঁছিয়াছে কী? ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নীর দ্বার ভেঙাইয়া দেয়। তারপর কেদারার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বলিয়া দ্রুত চোখ ভরিয়া ম’দুীকে দেখিতে থাকে। প্রাণীপ্ত বীপালোকে চিস্তাক্রিষ্ট ম’দুীকে অপরূপ দেখাচ্ছে।

স্বপ্নীর হাত বাড়াইয়া ম’দুীর বকু স্পর্শ করে।

চমকিয়া উঠিয়া ম’দুী অমন চমু মেতিয়া দেখে। স্নান হালি ফুটিয়া উঠে মুখে। পুনরায় চোখ বুজিয়া বুকের বসনের বৃত্তাঙ্কলি খুন্সিয়া বী প্রডোল বকের অনেকখানি অনবৃত্ত করিয়া দেয়। আর স্বপ্নীর শিশুর মতো ম’দুী বুকে মুখ ঝুঁজিয়া দিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। ম’দুী তথাপি ঘরে নাই। কোলের লজ্জানের মতো স্বাভাবিক স্নেহ স্বপ্নীরের প্রাপ্ত কপালের উপর নিজের আতপ্ত ঠোঁটের চাপিকা ধরে।

ডাঃ দেব বাল্যমুখ

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ওষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ওষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। থাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

অনেককণ বাধে স্বপ্নবীর উঠে
দাঁড়ায়। সুর্জিতপ্রায় মাধুরীর এলায়িত
হাতের মাঝে কি একটা কাগজ খুঁজিয়া
দিয়া মাতালের মতো টলিতে টলিতে
প্রস্থান করে।

তারপর প্রহরের পর প্রহর কাটিতে
থাকে।

পরিশেষে রাত্রি—মধ্যরাত্রিতে আশিয়া
ঠেকে।

ওদিকে পিতাপুত্রী কাহারও চোখে ঘুম
নাই। স্বপ্নবীরের বিজ্ঞানায় বলিয়া প্রকাশবাবু
তখনও লাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন।
উদ্যীবতা থাকিলেও তাহার মনে নতুন
কোনো সংশয় নাই। তিনি যে স্বপ্নবীরকে
বিশ্বাস করেন! আর নিজের ঘরে বাতীর
আলোকে মন্ত্রমুগ্ধা মাধুরী তখন তৃতীয়বার
স্বপ্নবীরের বেওয়া কাগজখানা পড়িয়া
বেশিতেছে:

“প্রিয়তমা মাধুরী, অবিনাশ যে
অপরোধে অভিযুক্ত হয়েছে তাতে তাকে
এখন মুক্তি দেয়া অসম্ভব। আমি সেইজন্যেই
আর বাড়ী ফিরিলাম। কেননা, অবিনাশের
অভাবে তুমি যদি আমাকে আবার আমন্ত্রণ
কর, আমি আত্মরক্ষা করতে পারবো কিনা
সন্দেহ। তাই আমার এই মহাপ্রস্থান।
তোমার ইতিহাস আমার জীবন থেকে কখনো
মুছে যাবার নয়। সেজন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ।

ইতি—

তোমার স্বপন।”

মুহুর্তের লগ্ন বেধনাবিহীন মাধুরী চিঠিটা
চুইহাতে অক্ষ উত্তেজনার বৃক্কের মাঝে
চাপিয়া ধরে। তারপর টুকরা টুকরা করিয়া
ছিড়িয়া ফেলে। গতকাল ঠিক এখনই
ভাবেই তাহার হাতে প্রকাশের পত্রখানিও
শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

কল্কথানা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মতীশ ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন :
কি হল? জর নাকি খুব বেড়ে গেছে?

নীরব বাবু বলিলেন : ডাক্তার বাবু!
কুগীকে বোধহয় আর বাঁচানো যাবেনা,
আপনি একটু ভাল করে দেখুন!

ডাক্তার বাবু নাড়ী দেখিয়া ক্রুদ্ধিত
করিলেন। লবঙ্গর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন। বরাবর বরফ দেওয়া হচ্ছিল?

লবঙ্গ নিরাপদের দিকে তাকাইয়া মুহূর্তে
বলিল : বরাবর দেওয়া হয়নি! মাঝে জর
নেমে গিয়েছিল, তাই বন্ধ করে দিয়েছিলাম।
জর বাড়া অবধি আবার আরম্ভ করেছে।”

মতীশ ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন :
“না, আর বন্ধ করা চলবেনা : এখন বরাবর
দিয়ে যান।”

তারপর নিজের ডাক্তারি যন্ত্রটি বাহির
করিয়া রোগিনীর বুক পিঠ দেখিতে
লাগিলেন। দেখা হইলে বলিলেন :
তাইতো! রোগটা একটু বেশী—

লবঙ্গ অর্ধশুট ভাষায় ধীরে ধীরে বলিল :
ডাক্তার বাবু! আমাঘের বাবু বড়ো ভীতু
মাছুষ। আপনায় বা বলবার তা আড়ালে
বলে যান, বাবুর জুখুখে, বলবেন না।

কথাটা শুনিয়া ডাক্তার বাবু অপ্রতিভ
হইলেন; বলিলেন “আচ্ছা তাই করবো!
আমার ওটা বড় ভুল হয়েছে!”

ডাক্তার বাবু আরও খানিকক্ষণ ধরিয়া
কুগীকে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা হইয়া
গেলে, লবঙ্গ অস্ত্রের অশ্রুত স্বরে জিজ্ঞাসা
করিল : “এখন আপনি কি ব্যবস্থা করেন?

ডাক্তার বাবুও খুব মুহূর্তে বলিলেন :
বুকটা বড় দুর্বল বলে মনে হচ্ছে! যদি
হাটফেল হয়, সেই একটা ভয় আছে!”

কথাটা শুনিয়া লবঙ্গর মুখ কুয়াটিকা-
চ্ছন্ন হেমন্ত প্রকৃতির মত মলিন হইয়া
গেল। কিন্তু তবু অতি কষ্টে সে বলিল :
সেটা যাতে না হয়, তাই করুন ডাক্তার বাবু!
দ্বিধিকে আহার, কোনও রকমে বাঁচাতেই
হবে! দ্বিধি গেলে এ সংসারের আর
কিছুই থাকবে না!”

ডাক্তার বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন!
“অল্পজেন একটু দিতেই হবে।” নিরাপদ’র
দিকে ফিরিয়া বলিলেন নিরাপদ বাবু!
আপনি একটা অল্পজেন আনবার ব্যবস্থা
করুন!”

“অল্পজেন!” নীরব বাবু একেবারে
চিংকার করিয়া উঠিলেন। “অল্পজেন!
সে. কি? এমন অংশুয় এসে দাঁড়িয়েছে!
ওঃ! ললিতা! ললিতা!” বলিয়া একেবারে
আপাইয়া রোগীর বিজ্ঞানায় উপর পড়িলেন।

ডাক্তার বাবু উঠিয়া নীরব বাবুকে ধরিয়া
ভুলিলেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ লাঞ্ছনা
দিতে লাগিলেন। কিন্তু সেগুলিতে বিশেষ
কোন কাজ হইল না। সেগুলি যতো
ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল, নীরব বাবু ততোই
বালকের মত চিংকার করিয়া উঠিতে
লাগিলেন।

লবঙ্গ নিরাপদকে হাতছানি দিয়া কাছে
ডাকিয়া বলিল!

ঠাকুরপো! তুমি একটু কোষর বাধো!
নইলে, লবঙ্গকে ঠেকিয়ে রাখা যায় হবে।
ডাক্তার বাবু যে জিনিষটার কথা বলছেন,

তুমি দেই জিনিষটা আনিরে যাও! দ্বিধির
অবস্থাতো দেখতে পাচ্ছ!”

নিরাপদ ব্যস্ত লম্বের মত আকৃতি করিয়া
বলিল: আচ্ছা! আমি এনে দিচ্ছি!
ডাক্তারবাবু ওষুধটার নামটা কি লিখে
ছেন তো!”

ডাক্তারবাবু তখন নীরদবাবুকে নানা
সাস্তনা বাক্য বলিতে ব্যস্ত, তাহার মধ্যেই
তিনি বলিলেন: ওহে! ওটা ওষুধ নয়—
ওটা একটা গ্যাস! এতটা বড় লোহার
লিলিগারে বেঁধে—তোমরা সেটা নিয়ে
এলে, তার চাবি খুলে, তাই থেকে
গ্যাস হবে! তুমি তাড়াতাড়ি নিয়ে
এলে, আমি দেখিয়ে দিই যাবো! দত্ত
কোম্পানীর ঘোকানে যাও, এখনই গেলেই
পাবে! গোটা বাটেক টাকা নিয়ে যাও
চলিশ কি পঞ্চাশ টাকা জমা নেবে আর
বাকি টাকা থেকে গ্যাসের দাম শোধ
করে নেবে!”

নিরাপদ টাকার জন্ত লবঙ্গর মুখের
দিকে তাকাইল। লবঙ্গ তখন ললিতার
মাথার একটু অভিকোলন ভিজাইয়া দিতেছে,
এবং বামহস্তে হাওয়া করিতেছে। পাখা
করা আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া সে উঠিল,
এবং নীরদবাবুর কাছে গিয়া অর্দ্ধক্ষুণ্ণে
বলিল: “বাবু! গোটা বাটেক টাকা
দিতে হবে!”

‘নীরদবাবু বাম্পাকুলস্বরে’ বলিলেন:
ঐ ওরই আঁচলে চাবি বাঁধা আছে, খুলে
বার ক’রে নাও!”

লবঙ্গ ললিতার আঁচল হইতে চাবি
খুলিবার জন্ত গেল। এবং অনেক কষ্টে,
রোগীকে বেশী নাড়াচাড়া না করিয়া, অনেক
কোশলে আঁচল খুলিয়া তাহা হইতে
চাবি খুলিয়া লইল। নীরদবাবুর নিকট

পুনরায় গিয়া বলিল: এই চাবি নেন!
আপনি টাকাটা বার করে নেন!

নীরদবাবু বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন:
আর মড়ার উপর খাঁড়ার খা দিও না
লবঙ্গ! তুমি নিজেই বাস্তব খুলে টাকাটা
বার ক’রে এনে যাও। আর এখন থেকে
চাবিটা তোমার কাছেই রেখে যাও, যখন
যা দরকার হবে, বার ক’রে দেবে। আমাকে
আর ঐ হাতের ময়লার জন্তে বিরক্ত
করো না।

এ প্রস্তাবের ইতিকর্তব্যতা নিরূপণ
করিবার এখন সময় নয়। কাজেই লবঙ্গ
এ বিষয়ে আর বেশী মাথা খোঁড়াখুঁড়ি না
করিয়া চাবিটি লইয়া পাখের ঘরে গেল,
টাকা বাহির করিয়া আনিয়া দিতে।
ক্যাস বাস্তব ও লোহার লিন্দুক ছিল পাশের
ঘরে, লবঙ্গ তাহা দেখিয়াছিল।

নিরাপদ দাঁড়াইয়া দাঁড়ি, দাঁড়া ক্যাস
বাস্তব চাবি ছিল এই দিন কতকের জন্তে
আগত। তরুণী অতিথিটার হাতে!
নিরাপদ জানিত, কুটুবিতার লম্পর্কও
যে তাহার লঙ্গে খুব নিকট, তাহাও নহে!
একটা লামাজ হুজ মাঝখানে আছে মাত্র
কিন্তু দেটাও কত হুজ! বৌদ্বিধির বাপের
বাড়ীর কাছে লম্পর্কের গন্ধ একটু আছে
মাত্র! কিন্তু তার কাছে দাঁড়া ছিল চাবির
তোড়া! বিশ্বাসটা যেন একটু অতিরিক্ত
রকমের বলিয়া তাহার নিকট ঠেকিল।

টাকা আনিয়া পড়িল। চয়খানা দল
টাকার নোট গুনিয়া লবঙ্গ নিরাপদের
হাতে দিল। নিরাপদ যতটা উৎসাহ
লহকারে প্রথমটা ‘আরম্ভ’ করিয়াছিল,
যাইবার সময়ে তাহার সে উৎসাহে যেন
একটু ঠাণ্ডা জল পড়িয়াছে বলিয়া বোধ
হইল।

—বোড়শ পরিচ্ছেদ—

সমস্ত রাজি ধরিয়া অক্লিঞ্জন দেওয়া
হইল, ডাক্তারবাবু তিন চারিটি ইনজেকশন

করিলেন, তথাপি ভোর বেলায় নিশা শেষের
লঙ্গে লঙ্গে, ললিতার চক্ষু পলকহীন হইল,
হাতপা ঠাণ্ডা হইল, এবং তাহার শ্রণবায়ু
অজস্র অমুরোধ উপরোধের মাঝখানেও একান্ত
নিষ্ঠুর ও বধিরভাবে মহাপ্রাণ করিল।

নীরদবাবু ললিতার অঙ্গার বেহের উপর
একেবারে ঝাপাইয়া পড়িলেন, লবঙ্গ যত
তাঁহাকে ধরিতে যায়, তিনি তত শোকের বেগ
বাড়াইয়া তোলেন। নীরদের বাহিরের
ঘর হইতে অনেক গুলি বন্ধ বন্ধব আনিয়া
উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা অনেক করিয়া
নীরদ বাবুকে গৃহান্তরিত করিলেন।
নিরাপদ কি করিবে, তাহার নিজের কর্তব্য
স্থির করিতে পারিল না। লবঙ্গ খানিকক্ষণ
স্থির হইয়া বলিয়া রহিল, তাহার পর গুমরিয়া
কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে সাস্তনা দিবার
কেহই ছিল না, কাজেই তাহার শোকাবেগ
খুব উচ্চ আকার ধারণ করিতে পারিল না।
যে মেহমতী নারীটি তাহাকে ঐকান্তিক
বাৎসল্যে আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীটির মত
করিয়া লংসারের অজ্ঞাত বিপদে তাহাকে
আপনার কোমল ডানার মধ্যে সংরক্ষিত
করিয়া রাখিয়াছিল, সে যে এত শীঘ্র তাহার
ডানা গুটাইয়া লইয়া তাহাকে পৃথিবীর
মরুপ্রান্তরে একা ফেলিয়া যাইবে, ইহা সে
স্বপ্নেও ভাবে নাই। কাজেই প্রথমটা সে
ভাষাচাকা মারিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যখন
অবস্থাটা নিতান্তই কঠিনতার সহিত সত্য
আকারে তাহার নিকট দেখা দিল, তখন
সে হতাশ মর্ম্মবাতনায় নীরবে অশ্রুমোচন
করিতে লাগিল। ললিতা তাহার নিকট-
আত্মায়া ছিল না, কিন্তু এই কয়দিনের
সাহচর্য্যের মধুরতার ও অপ্রাণিত মেহবর্ষণে
সে এতই নিকট হইতে নিকটতর হইয়া
পড়িয়াছিল যে, লবঙ্গ এই প্রথম অনুভব করিল
যে তাহার মাথার উপর সত্যই আজ সে
সমস্ত আশ্রয় করিয়া গেল। এবং সে

শুধু তুমি নাই

শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, (কবিরত্ন)

শুধু তুমি নাই, আর সবই আছে নিখিল বিশ্ব মাঝে,
প্রতিক্ষেপে তাই ভুল করি আমি জীবনের প্রতি কাজে।
তেমনি র'য়েছে বিপুল বিত্তব
তোমা বিনে আজ গ্লিয়মান সব
আজিও তেমনি একটা প্রদীপ জ্বলে প্রতিদিন সন্ধ্যায়।
শুধু তুমি নাই, আর সবই আছে নিখিলবিশ্ব মাঝে।

২

তুমি নাই তবু পাণ্ডিত্য আজ গান গেয়ে কেয়ে বনে
রাখাল বালক প্রভাতী গাহিয়া মাঠে লয় ধেনুগণে;
এখনো ছপুরে বাবলা শাখায়
কোকিল পাণিয়া শিখ দিয়ে যায়,
এখনো তেমনি লাক্ষ্য লম্বীর বয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে,
বিশ্বের নানা বিকাশের মাঝে তোমারেই পড়ে মনে।

৩

সেই মনে পড়ে তোমার আমার প্রথম যেদিন দেখা :
পুকুরের ঘাটে কলসী ডুবায় চেরেছিলে একা একা ;

চাঁদ উঠেছিলো পূর্বব গগনে

বেজেছিলো বাণী যে মধু-লগনে,

তোমার নয়নে, পলক বিহীন আমার নয়নে রেখা,
প্রথম প্রেমের মিলন সেদিন ঘোর ভালো ছিল লেখা।

৪

তারপর এক মধু যামিনীর উৎসব কোলাহলে
কবরে তোমারে করিহু গ্রহণ জীবনের লাখী বলে' ;
শুভ-দৃষ্টির সেই চাহনিতে

পেড়েছিলে তুমি মোরে জেনে নিতে

মোর বাহা কিছু দিয়াছি বিলায়ে তোমার চরণ তলে,
জীবনের সেই প্রিয় লাগি মোর ! কোথা তুমি গেলে চলে

৫

দিবলে ছপুরে, নিশার স্বপনে যখন তোমারে স্মরি,
খুজে নাহি পাই কোন্ অপরাধে আমারে গিয়াছ ছাড়ি ?

কেন এসেছিলে কোথা গেলে চলে'

গেলে যদি কেন স্মৃতি রেখে গেলে ?

কোন কাজ আর পারিনা করিতে, ভুলে যাই যেন সবই,
তোমার তরেই জীবন-প্রভাতে হয়েছি উদ্বাদী কবি।

:-:(X):-

আকাঙ্ক্ষাটা বাহির হইয়া পড়িল, তাহা
একান্তই জলজন্তুরাক্রান্ত ও বজ্রবিদ্রাবের
চড়াহড়িতে পরিপূর্ণ।

যে করদিন ললিতার অন্তর বাড়িয়াছিল,
সে করদিন লবঙ্গর এমন অবকাশ ছিলনা যে
তাহার মনের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া
করিয়া লয়। নদীর গর্ভ ছাপাইয়া যেমন
করিয়া বর্ষাকালীন জলশ্রোত বহিয়া চলিয়া
যায়, এ করদিন লবঙ্গের শ্রোতও তেমনই
করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার শরীর ও
মনকে পরিপূর্ণভাবে ছাপাইয়া রাখিয়া।
কিন্তু আজ হঠাৎ লফাল হইতে

শ্রোতের জল শুকাইয়া গেল, এবং তাহার
শরীর ও মনের তটভূমি নিষাঘের নদীচরের
মত শীর্ণ উল্লসিত প্রকাশ হইয়া পড়িল।
তখন যেন লক্ষ্য বিপদের শকুনি আসিয়া
সেই তটভূমির উপর তাহারের লম্বা লম্বা
ঠ্যাং ঢালাইয়া হা হা রবে চিৎকার করিতে
লাগিল। হতাশার কুৎসিত জায়াগুলি
নিভিন্ন মরীচিকার মত তাহার চারিধারে
উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। একান্তই
লজ্জিত, আশ্রয়হীন বলিয়া তাহার
নিজেকে নিজে মনে হইতে লাগিল। সে
উজ্জ্বল চিৎকার করিয়া গৃহের ছাদ বিদীর্ণ

করিল না বটে, কিন্তু মন অবিরল অশ্রুট
আর্জনাৎ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।
যখন নীরবাব্যুহ হই চারিজন আত্মীয়
ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর হল আসিয়া নানা পুষ্প-
মালা সুশোভিত করিয়া শব্দেহ বহন
করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত
হইতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার মনে
পড়িল, এই অকারণ স্নেহময়ী রমণীর অন্তিম
লম্বায় তাহারও একটা কর্তব্য আছে।
সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটি আলমারি
হইতে এককোটা দিন্দুর ও একশিশি তরল
আলতা বাহির করিয়া, অতি বস্ত্রে অতি

প্রকার লহিত, অশ্রু লহিত মিলিত করিয়া
ললিতার লিখিতে ও তাহার চরণতলে
লাগাইয়া দিল। রক্তজবার কোরকগুলি
ফুটিয়া উঠিলে জবাগাছে যেমন লক্ষ্যরাগে
জলিয়া উঠে, শীতল বিবর্ণ মৃতদেহও
তেমনই লিঙ্গর ও অলঙ্কার রাগে অন্তায়মান
মুখ্য বিষের মত অশোভিত হইয়া উঠিল।
পাতিব্রতের রক্তনিশান যেন পরকাল ও
ইহকালের লক্ষণে দাঁড়াইয়া আন্দোলিত
হইতে লাগিল। লবঙ্গ তাহা দেখিয়া
অত্যন্ত দুঃখ হইল এবং বাস্তবতার তুহারায়িত
চক্ষে অনিমেষভাবে তাহাই দাঁড়াইয়া
দেখিতে লাগিল।

কখন যে নীরদবাবুর বন্ধু ও আত্মীয়গণ
আসিয়া দীর্ঘসমুদ্রের অশ্রুত পুষ্পমালাবৃত
শুষ্ক বৃন্তচ্যুত মনুষ্য কুসুমটিকে বহিয়া
লইয়া গেল, লবঙ্গর লেখিকে সজ্জা ছিল
না। যখন সে খাটের দিকে চাহিল, তখন
দেখিল, শুটকিত হলচ্যুত ফুলের পাপড়ি
সেখানে বিষম ঔষাভে গড়াগড়ি যাইতেছে,
মিষ্টভার যে অপরিণীম শৈলজুগুটি কিছুক্ষণ
আগেও সেখানে পূণ্যধারা বর্ষণ করিতেছিল,
তাহা কালের কঠিন নিয়মে সেখানে
হইতে অন্তহিত।

সময়ের গতি মানুষের শোকের স্বাক্ষরে
কখনও হোঁচট খায় না। মানুষ নিজে
হোঁচট খায়, কিন্তু যে বিশালকারা জননী
কোটি কোটি মানুষকে ও কোটি কোটি
জীবকে আপনার বক্ষ মধ্যে রাখিয়া স্তম্ভস্থানে
পরিপুষ্ট করিতেছেন, তিনি কোনও সন্তানের
রোদনেই আপনার কর্তব্য ভুলেন না,
সহায়ত্ব প্রকাশ করিয়া এককোঁটা চ'থের
জলও ফেলেন না, বরং ধমক দিয়া লজ্জান-
দ্বিগকে আবার তাহাঙ্গিরের নিতানৈমিত্তিক
কর্ণে নিয়োজিত করেন। ললিতার মৃত্যুতে
লবঙ্গই শোকে মুহমান হইয়া পড়িল,
গৃহের হাসদানীগুলি পর্যন্ত মর্মস্পর্শী
কাভরোক্তি করিতে লাগিল, নীরদবাবু ও

লবঙ্গ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল,
কিন্তু যে কর্তব্যদানী জগতের বাহিরে
ও ভিতরে আপনা আপনি সংঘটিত হইয়া
থাকে, সেগুলি নির্মম ঔষাভীতে আপনাদ্বিগের
চাকা ঘুরাইতে লাগিল, সেখানে একটি
কুদ্র সংসারের অপরিণীম বিপদায় কোনও
কলঙ্ক রেখা টানিতে পারিল না। সকাল
গড়াইয়া মধ্যাহ্ন আলিল; মধ্যাহ্ন গড়াইয়া
অপরাহ্নের নিম্ন শীতল ঔষাঙ্গুল রথখানি
আসিয়া দেখা দিল; পরে সন্ধ্যাহ্নের
বহুবর্ণবিশিষ্ট চিত্রাভিনয় আসিয়া সে
রথকেও সরাইয়া, তমিশ্রাময় অবশুষ্ঠানে
পথ, ঘাট, প্রাস্তর, নগর মণ্ডিত করিয়া
দিল; কিন্তু এই বিশাল গতিচক্রের কোনও
নিয়মই সেই একটি কুদ্র সংসারের আকস্মিক
চূর্ণটিনায় তাহার গতি শিথিল করিল
না,—একবার দাঁড়াইল না,—একবার পশ্চাৎ
ফিরিয়া তাকাইল না। সেখানে নিয়মতন্ত্র
এত কঠোর, এত উদ্যমী, এত আত্মজয়ি,—
সেখানে কোন্ আশায় যে মানুষ তাহার
বিপদের সময়ে প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য
প্রার্থনা করে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মধ্যাহ্নের সময়ে লবঙ্গ একবার উঠিয়া-
ছিল; উঠিয়া পাচক ব্রাহ্মণের নিকট লম্বা
লইয়া,—বাবুর জন্ত অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে
কিনা। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিল
“আশানে যারা গিয়েছেন, তারা ফিরে না
এলে উম্মুনে আগুন দিতে নাই।”
তখন লবঙ্গর হঠাৎ চমক ভাঙিল। যে
ওলট পালটটি আজ সকালে ঘটিয়া গিয়াছে,
তাহা যেন আকাশজোড়া বাঁহ বিস্তার
করিয়া আবার তাহার লম্বুখে আসিয়া
দাঁড়াইল।

তবু সে একবার বাবুর ঘোঁজে, তাহার
ঘরে আসিয়া হাজির হইল, নীরদবাবু তখন
একটা বালিশের উপর বুক রাখিয়া উপড়
হইয়া কুপাইয়া কুপাইয়া কাঁধিতেছেন।

লবঙ্গ কোনও কথা না বলিয়া একখানি
পাখা লইয়া তাহাকে ব্যজন করিতে বলিল।

(ক্রমশঃ)

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের
বই!

পাতাল পাতাল সুদৃশ্য এক-
রঙ ও তিন রঙের ছবিতে
সুসজ্জিত।

শিশু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

শ্রীব্রজমোহন দাস সম্পাদিত
ছোটদের আহরিক

রায় জলধর সেন বাহাদুরের
আইসক্রীম সন্দেশ

শ্রীকণীন্দ নাথ পালের
বাংলার জঙ্গলে

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
লে মিজারেবল

সুপ্রিয় সোমের
সাগরের নীচে ভয়ঙ্কর মানুষ

সমস্ত প্রকাশিত
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রামধনু

কমলিনী সাহিত্য মন্দির

২২০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা।

খেয়ালী চিত্রপট



কালী ফিল্মসের "চোখের বালী" চিত্রের একটি
বিশিষ্ট দৃশ্যে অমিতা ইন্দিয়া রায় ও মিসেস
মোহন। ছবিটির পরিচালক মহু বেন।



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'খ্যারিট'

গ্রামনালা নিউজপেপার্স লি:

টেলিফোন
সাইদ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীৱন বন্দ্যোপাধ্যায়

২২ইশ বধ, পঞ্চদশ সংখ্যা, বুধস্পতিবার, ১লা পৌষ ১৩৪৫, ১৪ই এপ্রিল ১৯৩৮

নববর্ষের প্রাক্কালে শুভ সূচনা

অসামান্য প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং কুমিল্লার সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কংগ্রেস-নেতা মোলভী আস্‌দাক্‌উদ্দিন চৌধুরী সম্পাদক পদে বৃত্ত হইয়াছেন। বাংলার কংগ্রেসী ইতিহাসে আস্‌দাক্‌উদ্দিন সাহেবের নির্বাচন এক নব যুগের শুভ সূচনা করিতেছে।

অসামান্য বংসরের ছায় এ বংসর বার্ষিক নির্বাচন বিশৃঙ্খলা বা বাকবিতণ্ডার ঘন্দের মধ্য দিয়া সমাধা হয় নাই। মুক্তির উপর হইতেই সুভাষচন্দ্র সর্বদলসম্মিত কার্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী এ বংসর কর্মকর্তা ও কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হইয়াছেন। সমুদ্রকৃত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, অভয় আশ্রমের নেতা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রমিক দলের নেতা শ্রীবক্রম মুখোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিবেন বলিয়া প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহারই যে সে প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। তবে বাংলার কংগ্রেসের

একদমলো যাহারা অনিচ্ছাপূর্ণে প্রতিভাত সুভাষ তাঁহাদের দ্বারা দুজের ব্যক্তির আখ্যাস-বাণীতে কেহ সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারেনা। নির্বাচন পর্ব সমাধা হইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কিরণবাবু যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ছত্রে ছত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ARMED NEUTRALITYর ভাব যুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনোভাব যে পরিবর্তন হয় নাই তাহা তিনি স্পষ্টভাবেই বর্ণিলেও প্রকারান্তরে জানাইয়া দিয়াছেন। কিরণবাবুর বিবৃতির গূঢ় অর্থ ও ইঙ্গিত এই যে: এ বংসর সুভাষচন্দ্র সসং রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার হস্তেই কংগ্রেসী শাসন-দণ্ড; ভ্রাতা শরৎচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে প্যাটেল ও জহরলাল প্রভৃতি সকলেই বঙ্গ-ভ্রাতৃত্বের প্রবল সমর্থক সুভাষ এ বংসর আর বিরোধিতা করিলাম না—আর অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়কে এখনও পর্যন্ত পূর্ণভাবে বরাদ্দত করা সম্ভবপর হয় নাই—সুভাষ এ বংসর বিরোধিতা করিলাম না—আগামী বংসর দেখিয়া লইব। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই এইরূপ বিবৃতি প্রকাশ করার অর্থ মফঃস্বলবাসী কর্ম্মী-বৃন্দকে ইঙ্গিতে জানান তাঁহারা যেমন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মনে করিয়া বর্তমান কর্ম্মকর্তা ও কার্যকরী সমিতির সহিত পূর্ণ সহযোগিতা না করেন। এই সকল চক্রৌগণকে যতদিন না বাংলা কংগ্রেস হইতে পিছায় করা সম্ভব হইবে ততদিন বাংলা কংগ্রেসে দলাদলি মিটিবে না। বিগত এ্যাসেম্‌ব্লি নির্বাচনে শরৎচন্দ্রের উদারতায় কিরণবাবুর রাজনীতিক জীবন পূর্ণজীৱিত হইয়াছে। বিগত কংগ্রেসের ও এ্যাসেম্‌ব্লি নির্বাচনে শরৎচন্দ্র নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন আজ তাহারই প্রাশ্লিতে তাঁহাকে ঝড়িতে হইতেছে। যাহারা তাঁহার উদারতার সুযোগ লইয়া কংগ্রেসের, এ্যাসেম্‌ব্লিতে ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ দায়-দায়িত্বের প্রতি স্নেহবশতঃ বঙ্গভ্রাতৃত্বের বিরোধিতা করিতেছেন। মুক্তির পর শরৎচন্দ্র সর্বমহাকর্ষ্য লাভ করিয়া যে সুযোগ পাইয়াছিলেন তিনি তাহার সদ্যবহার করিতে

পারেন নাই বলিয়া আজ তাঁহাকে বিরোধিতার এই চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। তিনি যদি সে সময়ে দৃঢ় হস্তে ও নির্ভর্যম্ভু হৃদয়ে বিধানী দলের ব্যক্তিবর্গের উচ্ছেদ সাধন করিতেন—সে সুযোগ তাঁহার তখন হইয়াছিল—তাহা হইলে আজ তাঁহাকে এই বিবাদময় পরিস্থিতিতে পড়িতে হইত না। ‘‘রায়স উইক্লি’’তে তাঁহার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে বিবাদগার ও এ্যাসেমব্লির নেতৃত্ব পদ হইতে অপসারণের যে ষড়যন্ত্র তাহা যে কাহার বা কাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে তাহা বোধহয় তিনি এখন বুঝিতে পারিতেছেন।

সেখানে আদর্শগত অসামঞ্জস্য বর্তমান সেখানে মিলন অসম্ভব ও সমীচিন নহে—আর রাজনীতিতে বিরুদ্ধবাদীকে স্নেহসিক্ত করা যে বুদ্ধিমানের কার্য নহে তীক্ষ্ণবী শরৎচন্দ্রকে যে সে

কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় তাহা দুঃখের বিষয়।

স্বাস্থ্য হটক, যখন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও বাংলার কংগ্রেসের উপদলীয় দ্বন্দ্ব থরক হইয়াছে তখন আগামী দ্বাদশ মাসের মধ্যে বিনা বাধায় ও প্রায় সর্বসম্মতি-ক্রমে নির্বাচিত কণ্ঠকর্ত্তামণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি বাংলার কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিলে সুভাষচন্দ্রের অনুষৃত নীতি সকল হইবে। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের প্রতিশ্রুতির যদি কিছু মূল্য থাকে তাহা হইলে বাংলার জনসাধারণকে নবগঠিত কার্য-করীসমিতির কার্য সম্পক্ষে যে হতাশ হইতে হইবে না তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। আমরা আশা করিতে পারি কি যে বাহ্যেকের তরফে কিরণশঙ্কর প্রতিশ্রুতির মূল্য রক্ষা করিবেন। দ্বিধাসঙ্কোচচিতে আমরা নববর্ষের প্রারম্ভে বাংলা কংগ্রেসের দলাদলির সমাপ্তির শুভ সূচনায় উৎফুল্ল হইয়াছি।

..(X)..

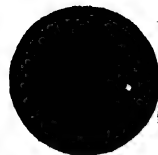
কালী ফিল্মস প্রযোজিত

চোখের বালি

পরিচালক : সতু সেন



আগামী
দুইখানি
স্মরণীয়
চিত্র



হাজরা পিকচাসের

দেবী ফুল্লরা

পরিচালক : তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

নাট্য-তরঙ্গ

(ত্রীনটনাথ)

স্বামী-স্ত্রীর রক্তত জয়ন্তী

ত্রীনটনাথ নাথ পেন্ডপ্তের সমস্তমূলক নাটক 'স্বামী-স্ত্রীর রক্তত-জয়ন্তী' উৎসব গত শনিবার 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রীনথির কুমার ভাঙ্কড়ী অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন।

গ্রন্থকার ও ত্রীনটনাথ ভদ্রের আবাহন-বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় টকির সভ্যত্রে রঙ্গমঞ্চের পরিণতি সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

রঙমহলের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থকার হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্পীবৃন্দকে যথাযোগ্য উপহারে তাঁহাদের সফল শ্রমের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

অভিনয়ে শ্রীকর্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও কোন কোন অংশে লঘু রপের মাত্রাধিক্য হেতু সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। লক্ষ্যক মিঃ দ্বালের জাঘাতা-গৃহ আতিথ্য গ্রহণের পর তাঁহার অপাঠন্যের সমগ্র চরিত্র যে হাত-বলের লক্ষ্য করেন তাহা বাহুল্য হোবে দৃষ্টে স্মরণ্য বর্জ্য। চরিত্র এত দৃঢ় একটু সম্বত অভিনয় করিলে তাঁহার অভিনয় সর্ব সঙ্গমের হইত।

স্ত্রী-ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালা ও শ্রীমতী উষার অভিনয় মনে বহু চটখাটিল। চঞ্চল-চপলা ইজ-জ-গৃহ প্রভৃতি পলনার চরিত্রের শিশুশ্রুতি ও ক্রম-বিকাশ রাণীবালা স্তরূপে দৃষ্টান্তে পাবিয়াছেন। প্রেম ও মনোরম আশ্রমের পৌষূল আশ্র তাগের চিত্রস্তন স্বন্দর স্বা-পতিষ্যতের অপকৃপ রূপ দৃষ্টাইয়াছেন শ্রীমতী উষা দেবী

তাঁহার বীর, স্থির ও স্নেহবত অভিনয়ে। লক্ষ ও লবল ভক্তিতে তিনি এই জটিল ভূমিকাটিকে প্রাণান্ত করিয়া তুলিয়া গ্রন্থকারের মধুর লেখনী নিঃসৃত চরিত্রটির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি রঙ্গমঞ্চে প্রতি-ফলিত করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে নবায়নের আঁড়টে পক্ষক্ষেপে ভাঙালোকে স্বাক্ষর শিল্পনবিনী সুরূ হয় পাছ-প্রাণের প্রেক্ষণ দাপ্তিতে তাঁহার অভাবনীয় বিকাশ তাঁহার অনাগত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। অজ্ঞাত ভূমিকায় শিল্পীদের অভিনয়-শৈলী অটুটই ছিল।

গ্রন্থকারের বাক্য-বিক্রাস ও চরিত্র গঠন চাতুর্য্য-স্বামী-স্ত্রীর লাকণ্যের যে অনেকখানি লক্ষ্যতা করিয়াছে তাহা স্বাক্ষর না করিলে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার করা হয়। আমরা পত্নী-ব-স্ত্রীর শচীজনাগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বামী ফিল্মলৈব

পরিচালনায়

স্বামী-স্ত্রীর রক্তত-জয়ন্তী

— কৃষিকায় —
রাণীবালা, দেববালা, ছায়া
নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী
সুনীল রায় (এ.), মনোহর পাল (ভদ্রলু)
কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিনয়

মতিমহল থিয়েটারের

সাল্যসমায়ক
কন্যা চিত্র

প্রযোজনা-শিল্পী জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্রাংগণী যতীন্দ্র দাস
সম্পাদক { হুমেন পাল ও
ডাঃ মন মোহ

“বড়দা”

শ্রীমতী ককণাশতী সিংহ

চাকার মত গ'ড়াতে গ'ড়াতে ডিক্শন লেনের মেলে এসে হাতির হ'লাম।—এ'টা নিয়ে আমার তিনটা ঘেঁল হ'ল কোন স্থানেই আমার হলবলের অভাব হয় নি, আগের ঘেলের পাশ দিয়ে এখনও নির্ঝিল্লি বাবার উপায় নেই, হেলেরা ত' আছোট, গিল্লারা, মেয়েরা এমন কি বৌত্ররাও ডেকে নিয়ে বলাচ, গল্প শুজবে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে দরকারী কাজ অল্প হয়েছে। কেং আসতে হয়। স্তনেচ্চিলাম, কলিকাতার বাসিন্দারা ঘেলের বাবুদের বিখাল করে না, ঘেরাও করে। কারণ ঘাই থাক, এইটাই প্রবল জনরব, ২।১ স্থানে তার প্রমাণও পোয়ছি। এই প্রমাণই ব'হ এক মাত্র অভক্তির কারণ হয় 'ত' আমি বলি তাহের নিজেদের বহু ঘন পরিষ্কার করার মত লংলাহল তারা লেখেনি এবং লেটা যেমন তাববার তেমনই হালবার।

আমার বর্তমান ঘেলের ছাধের উপর গজাজলের একটা খালি ট্যাঙ্ক আছে, রোজ ৬টা পর তার উপর বলি। আমার মনে হয়, বেশই হ'বে কিংবা বালাই হক এই লম্বাটা লকলেই ছাধ চায়, নইলে চলে কিনা, জানিনে, তবে অনুবিধা হয় খুব

বেশী! ঠিক এই কারণে নাকি পাশের ভট্টমক্যা ভদ্র মহিলা, আমার বিশিষ্ট বন্ধুর লেলির কাছে নালিশ ক'রে পাঠাইয়াছেন।

লে'হনও নিঃস্ব মত তখন আমি নিদ্রিষ্ট স্থানে বলে আছি, এমন সময় আমার বন্ধু লেলি হাসতে হাসতে এলে বললে হা হে লিং'হ তোমার যে ভয়ানক চরিত্র হোব, হ'য়েছে, এ'ত জানিতাম না।

হঠাৎ চরিত্র লংক্রান্ত ব্যাপাটী না বুঝতে পেরে খতমত খেয়ে গেলাম, তার পরই এবটু গভীর হ'রে উত্তর করলাম—জানা উচিত ছিল, এ'ত আর একদিনের নয় প্রায় ১০ বৎসর হ'ল।

আমার বন্ধু লতিয়াই চিন্ত'কুল হ'রে পড়লো, বেশ লক্ষ্য করলাম, হালি তাশালার ভাব মহর্ষ উপে গেল, আমার এই ল্পষ্ট লারার কি উত্তর হবে এবং কি প্রস্ন বিরে তার তথ্য তোলে নেবে, এ ভাবনার অস্থির হ'রে উঠলো।

তার ভাব যেথেন মনে মনে হাসতে লাগলাম। কৃত্রিম গাভীর্বা বজার রেখে পুনরায় বললাম—কি করবো তাই, বা হ'রে গেছে তার ত' আর হাত নেই, তবে তোমার মত বন্ধুরা বহি তখন মানা করতে তা'হলে হরত রক্ষে পেতে পারতাম।

মিনিট দুই খেবে তার মুখ চোখ একবার ভাল ক'রে খে'খে নিলাম। একেবারে কালি হোয়ে গে'ছে, ভাড়াভাড়ি মুখ কি'বিয়ে নিলাম, নইলে হরত হেল ফেলতাম, আশ্চর্য মনেই যেন বলছি, এইভাবে বললাম—যাক্ যা হ'বার হ'য়েছে, তবে লে মহিলা তোমারও পরিচিত।

একরকম চমকে উঠে বললে—আমার পরি'চিত!

সেইভাবেই বললাম—নিশ্চয়, কেন হাস্য মা।

দাঁত আমার ভেলের নাম, এবং তারও সুপরিচিত! তারপরই আমার পিঠে যে ভাল পড়লো, আমোদের হ'লেও লজ্জ করতে কষ্ট হ'ল।

তারপর ভদ্র মহিলার নালিশ বর্ণনা করতেই ভয়ানক চটে গেলাম, উক্ত মহিলার স্বামী নাকি আমার বন্ধুর সুপরিচিত এবং এক আফিসে চাকী করেন। কনিকের কজ আড় চোখে একবার তাহের জানালা পানে তা'বিয়ে দেখি, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, বোধহয় নালিশের ফলাফল জানবার জন্তে। তাই আরও রাগ বাড়িয়ে তাহের স্তনিয়ে স্তনিয়ে বলতে লাগলাম।—তুমি এদের কথা বলছো, ইনি ত' ফুলে পড়েন, অনেকদিন ট্র'বে, বাসেও দেখা হ'য়েছে, লেহিনও ঠিক আমায়ই পাশে বলে বারকোপ খে'খে এ'লেন, কই তাতে ত' এর কোন অনুবিধা মনে হয় না। এই যে ২ ঘণ্টা পত পত চোখের উপর বিরে ফুলে বাচ্চেন, তখন ইনি কার ঘোঁষে লোহার চপমা পড়ান, স্তনি। বহু অনুবিধা, বহু



ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

লজা, দেখা দেয় কি বাড়ীতে এলে। আমার কথা কর তাই। তোমার বন্ধুজীর লজা কিংবা পর্দানবিশ ভাবটা ঠিক অনুমান করতে পারছি নে, মেনে নিতেও কেমন খটকা লাগে।

আমার বন্ধু লেনি অমুকুল বাবু আমার ৮ বছর হ'তে জানে। চরিত্রের উপর কুৎসিত ইঙ্গিত করলে নৃত্যকার রাগি, এও তার অজানা নেই। তাই হালি তোমার ভাবটা কমিয়ে অনেকটা উপদেশ দেবার চলে বললে—তা হ'ক তাই তবুও উঁরা যখন বলছেন, তা ছাড়া অনেক সময় কি গারে কাপড় চোপড় থাকে তাই, তুমিই বলনা, তোমার স্ত্রীই কি বাড়ীতে তাই করেন।

বোধহয় তাঁর বন্ধুটিকে স্বস্তীক দাঁড়িয়ে থাকতে তিনিও বেখেঁচেন, তাই তাঁদের

হ'রে একটু ওকালতি করতে ইচ্ছে হয়েছে, অন্ততঃ তাঁদের তৃপ্তির জন্তে।

আমি কিন্তু সেই রকম রাজানো সুরে উত্তর করলাম—আমার মতে কলিকাতার মত মহুরে সকল স্ত্রীই উচিত আগে কাপড় চোপড় সাবধান করে তবে জানালা খোলা। এ যিনি না করেন, হয় তিনি জানেন না কিংবা ইচ্ছে করেই ভুল করেন। তাই বলে এরকম পরের নামে ঘোষ দিয়ে বেড়াতে কোন শিক্ষিতা মহিলাকে আজ পর্যন্ত দেখিনি। আপনার বন্ধুকে এবং বন্ধুস্বতীকে আমার নমস্কার দিয়ে বলবেন, এ পাড়ার একমাত্র আমি ছাড়া উঠিনে আরও লোক আছে, তিনি কখনের চোখ ঢেকে বেড়াবেন, সারাদিন আফিস করে আসার পর ভক্তলোকের পক্ষে কি সম্ভব হ'বে তাই, বাড়ী-বাড়ী সকলকে বলে বেড়াতে, যে আমার জানালা পানে চাইবেন না, না তাই কেও শুনবে! লোকে পাগল বলবে যে!

কখন যে জানালাটা বন্ধ হ'রে গেছে খেয়াল করিনি। উভয়েই তখন নীচে চলে এলাম। আশ্চর্যের বিষয় তারপর হ'তে আর কোন নালিশ আসেনি, বরং পাড়ার সব বাড়ীর ছেলেরা আমার ঘড়ে আড্ডা করলো। আর এই কলটা হ'ল তাঁদের সেক্রেটারী মেরেদের, স্বরস্বতী পূজা ক্লাবের জয়েন্ট ম্যানেজার মিস্ চকলা বোস, বেথুন কলেজের বঠ ক্লাবের ছাত্রী!

পাড়ার গয়া, টুঙ্গ, কেহু ছাড়াও আরও যে কত ছেলেরা আসতো তাঁদের বাড়ীও চিন্তামনা আর নামও জানতাম না! তবুও তাঁদের অব্যাহত দার ছিল! মেল ব'লে, অনুবিধা হ'রেছিল আমার নারী ক্লাবের। এইজন্য রাজ লক্ষ্যাকালে অন্ততঃ ২ মিনিটের জন্ত তাঁদের খাতাপত্র দেখে, আসতে হয়। আশ্চর্যের এবং ভাববার বিষয় যে, আমার মত একজন নিরক্ষর লোককে কেন এরা চায়।

এই পাড়ার ভেতর একজনদের সংসারে এমনভাবে জড়িয়ে পড়লাম যে, মনে হ'ল, হয়ত জীবনে আর কোনদিন এ বন্ধন কাটাতে পারবো না। এই বাড়ীর ছেলেরা আমার বেশী আলাতন করতো। এদের মাকে মা বলতাম এবং একটা বন্ধু বোন ছিল, তাকে ঠিক নিজের বোনের মত দেখতাম। তাকে আলাতনও করতাম সবচেয়ে বেশী। সকাল বিকাল সব সময়ে সেই আমার চা করে মেনে পাঠিয়ে দিত। মায়ের যে কি প্রাণভালা ছেহ, তার তারতম্য করতে গিয়ে অনেক সময়

ডাঃ প্রদ বালামুখ

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিশ্র ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে

মিউনিসিপ্যাল গেজেট
কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের
বর্তমান বৎসরের স্বাস্থ্য সংখ্যা রাষ্ট্রপতি
শ্রদ্ধাচন্দ্রের মুখবন্ধ সহ লক্ষ প্রকাশিত
হইয়াছে। রচনা সৌষ্ঠবে ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে
বর্তমান সংখ্যা বন্ধুর অমল ঘোষের পূর্ব পূর্ব
বৎসরের কৃতিত্বকেও পরিমিত করিয়াছে।
"I was also responsible, as Chief
Executive officer in 1924, for the
choice of the Editor, and it affords
me real pleasure to find it admitted
on all hands that my choice has
been justified."

সাংবাদিক হিসাবে অমল বাবু যে খ্যাতি
অর্জন করিয়াছেন এবং গত চৌদ্দবৎসর যাবৎ
যে রূপ কৃতিত্বের সহিত তিনি মিউনিসিপ্যাল
গেজেটের সম্পাদনা কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া
আনিতেছেন তাহাতে রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন-
উক্তি অত্যুক্তি হয় নাই।

স্বপ্ন ও বাস্তব

শ্রীপ্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের মাঝে যতেক স্বপ্নন মায়ী

ছায়া হয়ে ক্রমে মিলায় দিগন্তরে

কঠিন পৃথিবী খেলিয়া রুদ্ধ কারী

বিক্রম করে সকল অশ্রুভূরে ।

বলে ডেকে বসে স্বপ্নবিলাসী নরে

স্বপ্ননের হেথা নাহি কোনে অবকাশ

জীবনের স্রুধা গরলে হয়েছে ভরা

বিষের বাস্প ভরিতে প্রতিটি শ্বাস ।

আকাশের নীল ঢেকেছে হৃদয় মেঘে

পূর্ণিমা নাই আছে শুধু অমানিশা

মধু বসন্ত সুরারে গিয়াছে কবে

কালবৈশাখী ঘেরিছে সকল দিশা ।

জীবনের নীল নিছ শুকালো কবে

দূর বালুচরে কাঁধে মরণের পাখী

ছায়াহীন পথ একা উত্তরিতে হবে

মরু বালুকার নয়ন দ্বিতেছে ঢাকি ।

স্বার্থাঘেবী ধনিক লক্ষ্যধার

সুধার অন্ন লুপ্তন করে লবে

ভিখারী হৃদয় কক্ষণ ব্যথায় ভরা

কাঁদে বা জানাবে কোন দেই বাঁকবে ।

বিচারের আগে দাঁড়াইতে নাহি ঠাই

বস্তু পেতেছি কিলের সে অপরাধে

নাহি জানি তাহা—ঐতিহ্যের আগে জল

কুখিত অশ্রু কাঁধে কামনার ঝাঁবে ।

দ্রোহ মায়ীহীন জন অরণ্য মাঝে

পথ খুঁজ নিতে হবে তো আমারও লাগি

ভাবিলে সে কথা চোখে নাহি আসে ঘুম

একাকী বলিয়া বিচিত্র নিশা জাগি ।

ছিল মধুসূত ছিল হৃদয় বায়

দীপউজ্জল ছিলগো বাসর বাতি

বক্ষণে লবে হৃদয় লুটান হায়

দূরে চলে গেল জীবনের সব শাখা ।

কজ্জল দিয়া হরিণীর মত চোখে

প্রিয়া বেধেছিল বাহুর মালিকা দিয়া

আজি সব আছে নাহি সে স্বপ্নন মায়ী

রুদ্ধ বাস্তব বিদ্যোপ করে দিয়া ।

মহাকাল বৃকে অনীধ শূণ্য পরে

খেয়ালী বিঘাতা হালে নিষ্ঠুর ছাদি

নিপীড়িত আমি কামনার কারাগারে

স্বপ্ননবিলাসী নয়ন ললিলে ভাদি ।

হাঁপিয়ে যেতাম! কেবলই ভাবতাম মেঘে
এত উপযুক্ত ছেলেকে বাহু দিয়ে এই
অশিক্ষিত ছেলেটিকে তিনি বেচে নিলেন
কেন! তবুও এই অমূল্য দ্রোহ কেনন করে
কাটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলান দেই
কথাই"ত বলবো ।

আমার শত কাজ লক্ষ্যেও মায়ের লজ্জা
লক্ষ্যার পর একবার দেখা করতামই । এটা
আমার নিত্য কাজ, নইলে ঘুম হ'ত না,
শান্তিও পেতাম না ।

একদিন গল্প করতে করতে মা আমার

বললেন—হা বাবা "মণি" তোর বোনের
বিয়ের একটা ছেলে ভাখ, আর কতদিন ঘরে
রাখবি, ও বড় হয়নি !

হেসে ফেললাম, উত্তর করলাম—বাক না,
ওকে ভাড়াবার জন্তে এত ব্যস্ত হ'য়ে
পড়লেন, কেন, বলুনত? বিয়ে হ'লেই ত"
পরের বাড়ী চলে যাবে, তখন কি আর
আমার চা হ'ল কিনা, ফিরে দেখবে মনে
করছেন !

কমলা তখন আমার লম্বুখে বলে গান
করছিল, তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললাম

এই কমলি! তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হ'চ্ছে
নাকি রে! মাকে বলেছিস্ সুখি ।

লজ্জা করা দূরে থাক সে সুখ ভেঙছে
বললে না, তা হ'বে কেন! তুমি বিয়ে করে
ঠুটো বগ হ'য়ে বদে আহ কি না, তাই না !

তার বলার ভঙ্গিমা দেখে মা আর আমি
হ'জনেই হেসে ফেললাম ।

বা হাত দিয়ে তার খোঁপাটা ধরে হ'বা
কিন বলিয়ে দিয়ে বললাম আরে মার
লাফাতে নিজের বিয়ে নিয়ে ঝগড়া করতে
লজ্জা করে না, তোয় ।

বিভীষিকা !

?

আগামী সপ্তাহে এই পৃষ্ঠায়
বিশদ বিবরণ লক্ষ্য করুন।



হুঁচাত দিয়ে আমার হাত ধান। নজোরে চেপে ধরে চিংকার করে বললে ও'মা বেথতো, তোমার দলি ভেলেটা কি করছে।

মা তিরস্কার করে বললে ও'রে ছাড় ছাড়, লাগছে ওর। হুঁদিস বাদে যখন পরের বাড়ী বাবে তখন বেথিল কত মন কেমন করবে।

তারপর খপ করে বলে বললেন আর ত' হলে উড়িয়ে দিলে চলবে না বাবা! বেশ শুদ্ধ যদি তুই হতিস্ তা' হলে না হয় আরও কিছু দিন পরে হ'লেও চলতো। তা ত' হবার বো নেই, বাবা! তোর বন্ধ বাকবের ভেতর প্রথমে বেথিস্ বাবা! এ যদি হয় ত' আমি বলছি, ও নিশ্চয় সুখী হবে আমার ছাঁটার ভেতর মাত্র ১টী লিন্দুর নোয়া...

আর বলতে পারলেন না, ২৩ বার ঢোক গিলে আবার কি বলবার চেষ্টা করতেই তাঁর মুখ চেপে ধরে বললাম পানের ভাগী কেন করছেন, মা! আমি কমলার ভাল বরের চেষ্টা করবো।

ভাড়াভাড়ি নিজের চোখ মুছে বললেন না বাবা, মায়ের চোখের জল যে তোর আশীর্বাদ রে বোকা। আমি যে তোর মা! মা!

তারপর বললেন তোরা গল্প কর বাবা, বাই আচ্ছিক করিগে।

আমি নিজেও উঠলাম। কমলার উপর নজর পড়তেই মুখ তাকিয়ে গেল, চটুলতার ভরা কমলা তাবনা চিন্তায় মুচমান হ'য়ে একে বার আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে! সে যে কি ভাবছে, নিজের এত ব্যাকুলতা এ আমার অজানা নেই! মাকে সে কত ভালবাসে, ভক্তি করে এর তথ্য প্রতি পথে পথে বেথতে পাই! তার ছোট ছোট ভাইরা যখন মাকে বিরক্ত করে, যে কতখানি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে এ আমার চোখ এড়ায় না! তাই তার জন্ত মায়ের চোখে জল বেখে, সে যে পরিমাণে লজ্জিত হয়েছিল, ব্যাথাও অনুভব করছিল তাঁর তুলনায়

কালীঘাট হাইস্কুল প্রাক্তন ছাত্রদের প্রীতি সম্মেলন

বিগত রবিবার ৫০ নম্বর মহিম হালদার রোডস্থ কালীঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বাটীতে এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লণ্ডনের এল, আর, লি, পি এডিনবার্গ ও ইংলণ্ডের এফ, আর, লি, এম উপাধি প্রাপ্ত ও এই বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায় শতাব্দন বেনী! এই ভেবে যে তার সিন্দুর নোয়া অক্ষুর থাকবে কিনা, কিংবা কতদিন থাকবে, থাকলে ও তার জীবনটা ফলে ফলে চারিদিক আলো করবে কিনা, এই চিন্তা পর পায়ের যাত্রী, তার শোকাভরা জননীর অন্তর হ'তে হরত পরপারে গিয়ে ও হুঁ হুঁ হ'বে না। এ যে তার কত বড় দুঃখ কত বড় অশান্তি, জানেন তার অন্তরঙ্গামী! যে জানে, তার অকাল গত পাঁচটি ভগ্নপতির ভেতর কেউ বা ছিল মজুমদারী, আর কেউ বা ছিল অস্থির প্রকৃতি, অতীব চঞ্চল স্বভাব, লম্বাজের বণ্টক স্বরূপ! লিন্দুর নোয়া থেকেও তার মা কোন দিন শাস্তি পায়-নি, এখন কার "ত" কথাই নেই, আজ একজন অনাস্থ্য তার মায়ের স্নেহ যে ভাবে চিনে অমূল্যমান ব'লে মাথা পেতে নিচ্ছে, এর লিকি কোণা ও তার কোন ভগ্নপতি ভক্তিতরে নিতে পারে নি বা যে শিক্ষা তাহের কারও ছিল না, এমনি নিকটে ছিল তার।

স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, তারপর স্নেহভরে বললাম আমি আসি, তাই, কমলা!

কমলা কোন উত্তর করিল না, সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এ'ল, দরজা পার হ'য়ে পা ছই যেতেই, কমলা একটু চাপা গলায় বললে মায়ের আদেশ ফুলে যেওনা, বাবা! ঠিক তোনার বন্ধুর ভেতর।

(ক্রমঃ)

এই প্রীতিসম্মেলনের সভাপতির আদান গ্রহণ করেন। এই উৎসবে অনুদান চারিশত প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করেন। ইহাযের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বরোজ্যেষ্ঠ যিনি তাঁহার বয়স হইল ৭৩ বৎসর।

প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নীতিজ্ঞানাথ রায় অন্তান্ত অনেক কথার মধ্যে আই এক এ'র প্রথম বাঙ্গালী সম্পাদক ও এই স্কুলের অন্ততম শিক্ষক লম্বাজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্বোধনে তাঁহারা যে এলিগট শিল্প খেলিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করেন। কালীঘাট স্কুলের পূর্বে এই প্রতিযোগিতার অন্ত কোন স্কুল খেলেন নাই। শ্রীযুক্ত ফণী মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে; প্রাক্তন ছাত্রদেরকে বৎসরে একজানা চাষা ও ভূতপূর্ব ছাত্রদের মধ্যে হইতে বোলজন মতন লম্বাজ করিয়া দিতে হইবে। তিনি অনুরোধ করেন, প্রাক্তন ছাত্র মাত্রেই তাঁহাদের নাম ঠিকানা প্রভৃতি যেন তাহাকে পাঠান।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ বিশেষ চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে আহ্বান করিয়া তিনি বলেন— "দেশের ও দেশের উপকারে বাহাতে আসিতে পার তোমরা তাহাই করিবে। শুধু পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়াই তোমাদের ছাত্রজীবনের লবধানি নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছাত্রল সমাজ ও রাষ্ট্রের কতখানি— তাহাদের আশ্রয় করিয়া সহৎ বাহা কিছু তাহা কেমন করিয়া গড়িয়া উঠে, লেখিকে তোমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে— মনে রাখিতে হইবে, তোমাদেরই উপর বিশেষ করিয়া দেশের লম্বাজ আশা নির্ভর করিতেছে।"

পরিশেষে জল বোগাস্তে এই অনুষ্ঠানের অবদান হয়।

বিবিধ

ভবানীপুর ইয়ং মেনস্. এসোসিয়েশন:—

গত ১০ই এপ্রিল এসোসিয়েশন প্রাঙ্গনে ৫৮-১ নং কাঁশাণীপাড়া রোডে এসোসিয়েশনের ত্রয়োবিংশ বার্ষিকী অর্ঘ্য উপলক্ষে হয়। বি: এম, কে বোস সভাপতির আশন গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় আগমন করেন।

সঙ্গীত শিল্প পরিষদ

গত ৬ই এপ্রিল যুগ্ম পরিষদে স্বাক্ষরকারীগণ ১নং ওয়েলিংটন কোয়ার্টারে মিলিত হইয়া বঙ্গীয় শিল্প পরিষদ গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করিয়াছেন:

১। বিংশ শতাব্দী সত্যক হওয়ার যুগ। যখন দেশের সকল সম্প্রদায় সত্যক হইয়াছেন তখন বাঙালার শিল্পীগণের কোনো সত্য নাই এটা সত্যই সত্যের বিষয়। তাই অনতিবিলম্বে বঙ্গীয় শিল্প পরিষদ নামে শিল্পীদের একটি স্থায়ী সত্য গঠনের প্রস্তাব করা হইতেছে।

২। শিল্পীদের অভাব অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে এই সত্য গঠন যুগল কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন—এবং তাহাই হইবে সত্যের প্রধান এবং প্রথম কার্য।

৩। সমগ্র বাঙলা দেশে স্বাধারা চাক ও কার্শিল্প সাধনকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন স্বাধারা শিল্পমুগ্ধগণী তাহারা এই সত্যের সভ্য হইতে পারিবেন।

৪। বাঙলা দেশের প্রত্যেক শিল্পীর ঠিকানা জানা সম্ভব নয় বলিয়া দেশের সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রত্যেক শিল্পীকে বিশেষ

অনুরোধ জানানো হইতেছে যে, তাহারা যেন অনতিবিলম্বে অস্থায়ী সম্পাদকের নিকট পত্রযোগে নিজের নিজের ঠিকানা জানান এবং এই সত্যের সভাপ্রণী ভুক্ত হইবার লক্ষ্যে প্রকাশ করেন। কেননা অতি দীর্ঘ বাঙলাদেশের প্রত্যেক শিল্পীকে আহ্বান করিয়া কলিকাতায় একটি শক্তিশালী কার্য্য-করী সমিতি গঠিত হইবে।

৫। প্রতি বৎসর বঙ্গ সাহিত্য সন্মেলনের অনুরূপ 'বঙ্গ শিল্প সন্মেলনের' ব্যবস্থা এই পরিষদ বাহাতে করেন এবং চিত্র-শিল্পের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে প্রণীতবশা শিল্পী ও শিল্প সমালোচকগণ বাহাতে শিক্ষামূলক বক্তৃতা দান করেন সত্য যেন সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হন।

৬। এতদ্ব্যতীত শিল্পীগণ বাহাতে সতিমানে অন্ততঃ একবার 'মিলিত হইয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে গঠন যুগল কাজে আত্মনিয়োগ করেন পরিষদের সে বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করা উচিত।

(বা:) শ্রীযুক্ত অর্জুন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

শিল্পী হরেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

- হেমেন্দ্র নাথ মজুমদার।
- কিতিল চন্দ্র রায় (এ, আর, সি, এ)
- পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্তী।
- ফণীভূষণ গুপ্ত।
- প্রভুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- অবনীন্দ্রক বসু।
- বোগেন চন্দ্র রায়।
- জ্যোতিব চন্দ্র দাশ গুপ্ত।
- নরেন্দ্র নাথ দত্ত।
- অধিল নিয়োগী। (অস্থায়ী সম্পাদক)

সঙ্গীত আসর

• গত রবিবার ১৩ই জুলাই ২৮শে মার্চ রাতে সঙ্গীত আসরের সভাপতি শ্রীশ্রীমন্তে নারায়ন সিংহ মহাশয়ের ১৫নং কালীদাসী সিংহ লেনস্থ বাটীতে উক্ত আসরের ১০ম বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। শ্রীশ্রীমন্তে চন্দ্র চক্রবর্তী উচ্চাঙ্গের খেয়াল ও ঠুংগী গান করেন। পরে শ্রীশ্রীমন্তে নাথ ব্রুথোপাধ্যায় স্বরোধ বাজান। শ্রীশ্রীমন্তে নাথ ধর (অক্ষয়ী) ইত্যাদির লিখিত সঙ্গীত করেন।

ছোট গল্প ও আবৃত্তি

প্রতিযোগিতা
৫৩নং সারপেন্টাইন লেনের ইষ্ট লাইব্রেরীর উদ্যোগে আগামী এপ্রিল মাসে বাংলা "ছোট গল্প" ও "আবৃত্তি" প্রতিযোগিতা হইবে।

গল্প—ছোট গল্পের জন্য গুণগুণ্যে তিনটি পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। গল্প একসারসাইজ খাতার ১৬ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। প্রেরিত গল্পের উপর লাইব্রেরীর সকল স্বত্ব ও অধিকার থাকিবে। গল্পের শ্রেষ্ঠতা বিচারের জন্য নির্বাচিত কমিটির সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত বলিয়া ধার্য্য হইবে। আগামী ১৫ই মের মধ্যে লিখিত গল্প লাইব্রেরীতে পাঠাইতে হইবে।

আবৃত্তি—আবৃত্তি প্রতিযোগিতার গুণগুণ্যে তিনটি পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। আবৃত্তির বিষয় (প্রত্যেকের জন্য):—

(১) গল্প:—রবীন্দ্রনাথের দ্বীন ১৩৪৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বিতরণী সভায় পঠিত অভিভাবণ হইতে—"আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবী-ব্যাপী জন সমুদ্রে... স্বাপ দিয়া পড়াকেই গর্কের বিষয় না মনে করি।

(২) রবীন্দ্রনাথের কাহিনী হইতে "দ্বীন দ্বান"। কেবল-মাত্র দুগ ও কলেজের ছাত্র ও ছাত্রী আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

আগামী ৩১শে এপ্রিলের মধ্যে প্রতি-
যোগিতা নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা দিয়া
সম্মতিপত্র দিবেন। অতীত বৃত্তান্তের জ্ঞান
লাইব্রেরীতে অনুদান করুন।

ছত্রার সঙ্ঘ

গত ২৭শে চৈত্র রবিবার, ১৩নং রিচি রোডে,
শ্রীযুক্ত সুধীরজেন সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
ভবনে 'ছত্রার সঙ্ঘ' চতুর্থ অধিবেশন হয়।
সুখবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাগচী মহাশয়
সভাপতিত্ব করেন। অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত
সুধীরজেন সুখোপাধ্যায় গীত অধিবেশনের
কার্যাবিধরণী পাঠ করেন।

সভার ফাস্তনী রায়ের 'হাস', নারায়ণ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিরুদ্দেশ', সুভাষ সুখো-
পাধ্যায়ের 'রোমান্টিক' ও 'ভবটনার আগে'
প্রভৃতি কবিতা এবং সুধীরজেন সুখোপাধ্যায়ের
'সুখোপাধ্যায়' নির্মল হাসপাতালের 'দিনমজুর' এবং
সমীর ঘোষের 'জীবন, যৌবন ও যবনিকা
পতন' প্রভৃতি গল্প পঠিত হয়।

অতঃপর বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতা
ও গল্পের প্রভাব লক্ষ্যে সভার গভীর
আলোচনা হয়। পরিমল বসু, অনিল
বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং
'কল্যাণ সঙ্ঘের' সুশান্ত সেনগুপ্ত, হেমন্ত
সুখোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র আলোচনার
যোগদান করেন। রাত্রি লাড়ে আট
ঘটিকার সভার কার্য শেষ হয়।

জ্যোতিষ স্মৃতি গ্রন্থাগার

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার
সময় ভবানীপুর ৫১ এ সুবর্কন স্কুল রোডে
জ্যোতিষ স্মৃতি গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন
হয়। কুদার সুশীল দেব রায় মহাশয়
গ্রন্থাগারের উদ্বোধন ও সভাপতির আসন
গ্রহণ করেন।



(বিলাসী)

'বিজ্ঞাপতির' অপরাপর সকল আকর্ষণকে
ছাড়িয়ে, আজ বাংলার আকাশে বাতালে
ওষু একটি কথাই ভড়িয়ে পড়েছে—অমুরাধা
বেশিনী কাননের গান, কাননের অভিনয়।
সমগ্র নাটকের মধ্যে এই চরিত্রটি, অন্তরের
হরষ ও ঔদার্য্যো, আগাগোড়া আধারের
চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে। চিত্র-নাট্য-
কারের অপূর্ণ সৃষ্টি এই অমুরাধা। যেখানে
বিরোধ, যেখানে বেদনা, সেখানেই যেন
সকল জ্বালা জুড়িয়ে, দিতে—অমুরাধার
আবির্ভাব।

প্রেমের সাধনার চির বিজয়িনী এই
অমুরাধা—নর-নারীর অন্তরকে নিবিড় ভাবে
স্পর্শ করেছে। আজ অমুরাধার পরিচয়
দিতে গিয়ে ওষু এই কথা টুকুই বোলতে
পারি—

“অতপ্ত অনাধি প্রেম বিরহীরে করি সপ্রাত্তন
ধ্যানের সূর্য লেহু বামিরাজ সূর্য মস্তকের।”
তাই আজ অমুরাধার পরিচয় না হিলে,
বিজ্ঞাপতির পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

যে গান পঞ্চদশ শতক থেকে আরম্ভ
করে অতাপিও কণ্ঠে সুধাবর্ষণ করে, সেই
গীত লহরীকে সার্থক করেছে তুলেছেন—
কানন দেবী, কৃষ্ণজ্ঞ যে এবং পাহাড়ী।
আশাকরি বাংলার সজীত-পিপাসু নর-নারী
বিজ্ঞাপতির মধ্যে সে মধুর রসের আংশিক
লক্ষ্যনও পাবেন।

অভিজ্ঞান

হিন্দি 'অভিজ্ঞান', যাতে আগামী মাসের
গোড়ার বাঙলার বাইরে মুক্তিলাভ করেছে

পারে, কর্তৃপক্ষ তার জন্তে বিশেষ চেষ্টা
করেছেন। প্রফুল্ল রায় ও কনী মজুমদারের
সুগম পরিচালনায়, 'অভিজ্ঞান' উদ্ভাসটির
স্বর্ণকথা যে অবিকৃত ভাবে ছাত্রছাত্রীর মধ্য
দিয়ে নর-নারীর অন্তর স্পর্শ করেছে পারবে
এমনটা আশা করা অসম্ভব হবেনা।

এই নাটকের বিকাশ ও পরিণতির মধ্যে
স্বভাবতই একটা 'ট্রাজিডির' সুর ধরা পড়ে।
কিন্তু সেই সুরটাই যাতে ছাত্র ছাত্রীর কাহিনীকে
আচ্ছন্ন না করেছে ফলে, তার জন্তে পরিচালক
দ্বন্দ্ব এর মধ্যে রস-গৈচিরের আশ্বাসনি
করেছেন। স্থান কালোপযোগী, নাটকীয়
ঘটনাধারাকে অব্যাহত রেখে, সঙ্গীত এবং
হাস্য হাস্য রসাদির অবতারণার মধ্যেই,
পরিচালকের রসবোধ এবং বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।
আশাকরি অভিজ্ঞান-এর সুগল পরিচালক, এই
চিত্রের পরিচালনায় তারই পরিচয় দিতে
পারবেন।

বৈষ্ণবের ভূমিকায় বিনয় গোস্বামী এবং
বৈষ্ণবী ভূমিকায় শ্রীমতী কমলা (করিয়াল)
ভাঁহের মধুপুষ্টি নিঃসৃত সুর তরঙ্গে যে সকলকে
পাগল করেছে তুলবে, একথা আজ নিঃসন্দেহে
বলা যায়।

অধিকার

আশাধের জগলে, সাময়িক ভাবে শীকার
পূর্ণ চুকিয়ে পরিচালক প্রবেশে বজ্রা নবল-
বলে কিয়ে এসে, পূর্ণ উত্তমে আবার ছবির
কাজ শুরু করেছে।

বর্তমানের মার্জিতকৃষ্টি তরুণ তরুণীদের চিন্তাধারার সঙ্গে মিল রেখে এই আধুনিক কাহিনীটি রচিত। আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে চিন্তার খোরাক মেলে, এমন জিনিষ পরিবেশনের মধ্যেই পরিচালকের বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিক বজুয়া পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে আমরা তারই সন্ধান পাই। এই কাহিনীর কয়েক প্রধান চরিত্রে, বমুনা, বজুয়া, মেনকা, চিত্তলেখা, পাহাড়ী, প্রভাপ, পঙ্কজ মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী এবং ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আপনাকে অভিভূত করবে। অপূর্ণ আবহ-সঙ্গীত এবং কণ্ঠ-সঙ্গীতের পরিচালনার কৃতিত্ব দেখাবেন—ভিষ্মবরণ। দৃশ্যপটাদি গঠন করছেন অর্জুন রায়। সুতরাং ছবিখানি যে সকল দিক দিয়ে শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে—একথা একরকম ভোর করেই বলা যায়।

বড়দাদি

এ হস্তায় 'বড়দাদি'র ভূমিকা-লিপির পরিচয় দেবার সময় এসেছে। আটটি নির্দোষের দিক দিয়ে 'বড়দাদি' যে সত্যই বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়েছে, একথা নিম্নের

তালিকা দেখলেই অনুধাবন করা যায়। পরিচালক মল্লিক মহাশয় পূর্ণ-উদ্বেগে 'বড়দাদি'র মহলা সুর করছেন এবং যে বস্তু ও আস্তরিক-তার সঙ্গে তিনি কাজ করছেন তাতে ছবিখানি যে সত্যি তাঁকে ভায়া-চিত্রের একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে—এমন ধারণা করাও অসঙ্গত হবে না।

ভূমিকা লিপি :

সুরেন—পাহাড়ী

মাধবী—মলিনা

সুরেনের পিতা—শৈলেন চৌধুরী

শিব চন্দ্র—কেট দাশ

নিমু (ভুতা)—মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়

মথুর বাবু—ইন্দু মুখোপাধ্যায়

মনোরমার স্বামী—ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি—চন্দ্রাবতী

ম্যানেজারের সহকারী—অহি দাস্তাল

কালী ফিল্মস্

বি. পি. মেহেরার প্রযোজনায় এই প্রতিষ্ঠানের রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিবাহ, আশা-নিরাশার অপূর্ণ প্রতিচ্ছবি "চোখের বালি"-র

শুটং ফ্রটগতিতে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটির ভেতর দিনেবার উপযোগী মাল-মশলা প্রচুর পরিমাণে থাকায় এবং এই ছবির জন্য উৎকৃষ্ট শিল্পী নির্বাচিত হওয়ায় আমাদের মনে হয়, "চোখের বালি" রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা কিছুমাত্র হ্রাস করবে না।

শক্তিময়ী, কল-নিপুণা ভক্তবংশে ভূতা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জি ও ইন্দিরা রায় ইতিমধ্যেই চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই চিত্রে যথাক্রমে বিনোদিনী ও আশার ভূমিকায় এই দুই মেয়েকে মানাবে চমৎকার এবং সংস্কৃতির লৌকাভাবে তাঁদের অভিনয় বিশেষ মনোমগ্ন হবে আশা করা যায়। এ ছাড়া দুইটি পুরুষ চরিত্র মহেন্দ্র ও বেহারী রূপে ডাঃ হরেন মুখার্জি ও ছবি বিশ্বালের নির্দোষের তারিক করা রায়।

ছবিখানির টেকনিক্যাল বিভাগে যারা কাজ করছেন, তাঁরা সাধারণের কাছে এত বেশী পরিচিত যে, তাঁদের পরিচয় নিশ্চয়োজন। এই সব দেখে শুনে আমাদের মনে হয়, "চোখের বালি" সাধারণকে ভাল ভাবেই খুশী করতে পারবে।

হাজিরা পিক্চাস

এই প্রতিষ্ঠানের "দেবী ফুল্লরা"র আর একটি 'সেট'র কাজ শেষ হ'লেই ছবিখানি মুক্তি প্রতীকায় থাকবে।

গেল হস্তায় এই ছবির ফুল্লরা ও কালকেতুর দেবী আরাধনা দৃশ্যটি মহাপ্রসারোচ্চে তোলা হয়।

রাজা বর্জক দেবী বর্ষণে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ফুল্লরা ও কালকেতু নদীর জলে মাজলিক জ্বালাই ভালিয়ে দিয়ে বনে এলে নিম্ন উপপাদে দেবী আরাধনার মত হ'লেন—প্রতিজ্ঞা করলেন যতক্ষণ না দেবীর বর্ষন পাবেন, ততক্ষণ দেবীর পূজা থেকে বিরত হবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফুল্লরা ও



"অভিজ্ঞান" চিত্রের একটি দৃশ্যে মলিনা ও শৈলেন পাল

কালকেতুর অভিনয় ও ফুলবার মরন পন আরতি নৃত্য কৈলাসে ভগবতীর লিংহাপন টলে উঠল—তিনি তাঁদের নামনে উপস্থিত হ'য়ে ভক্তের মান রক্ষা কোরলেন।

উপরোক্ত এই দৃশ্যটি গেল হস্তায় কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে তিনকাড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় মহাপ্রয়াগে গৃহীত হয়েছে। নবীন চিত্র-শিল্পী বিভূতি লাহা এই দৃশ্যটিকে সুন্দরভাবে গ্রহণ কোরছেন। এই চিত্রের লক্ষ্যবস্ত্রী যতীন বসু নিজের সুনাম প্রচারের জন্য ষথালিয়া চেষ্টা কোরছেন। এদের লক্ষ্যবস্ত্র চেষ্টা জয়যুক্ত হ'ক।

নালান্দা ফিল্মস্

নিরঞ্জন পাল ও অরুণোপাল পিলের পরিচালনায় বাঙলাদেশে আর একটি প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেল, এ সংবাদ গেল হস্তায়েই জানানো হ'য়েছে। শোনা যাচ্ছে, এরা

লাধনা বোলকে এদের প্রথম ছবির নায়িকা করবার জন্য চেষ্টা কোরছেন এবং ব্যবস্থা কতকটা এগিয়েছে।

ইউনাইটেড টকীজ

আজ এদের শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হবে। এদের বইয়ের নামকরণ হ'ল "হন্দা"। এতে অভিনয় করবার জন্য মনোনীত হ'য়েছেন, অমীত চৌধুরী যোগেশ চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায়, শংক চ্যাটার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, জোৎস্না গুপ্তা।

সরমা পিক্‌চার্স

'অরোরার' ষ্টুডিওর এদের প্রথম ছবি "মায়ামুগের" শূটিং সম্পন্ন হ'য়েছে। এই ছবির পরিচালক থেকে আরম্ভ কোরে শিল্পীরা পর্যাপ্ত সবাই একেবারে আনুকোরা।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের প্রযোজনায়

ও শ্রীযুত মহেশ্বর পরিচালনায় "অভিনয়ের" চিত্রগ্রহণ ক্রমগতিতে লক্ষ্যপ্রাণে চলেছে। একটি বিরাট থিয়েটার ষ্টেজ ও অর্ড-টোহিরামের সেটিং তৈরী হচ্ছে, সেই ভক্ত ইনডোর শূটিং এখন বন্ধ আছে; তবে ইতিমধ্যে কতকগুলি ব'হঃদৃশ্য তোলা হচ্ছে। দেখিন ত্রিপুরার মহারাজার গৃহ ও রাজ্য প্রফুল্ল নাথ ঠাকুরের উদ্ভান বাটীতে কয়েকটি দৃশ্যর শূটিং চলেছিল।

প্রকাশ যে, কীংবন গঙ্গুলী এই প্রতিষ্ঠানে একটি Chance পাবার জন্য ষথায়ুর্ধ্ব কোরছেন। বাবুলাল চৌধুরীকে বই পড়িয়েও তনিষেছেন—তিনি এখনও রায় দেন নি। "অলৌক বায়ু" হ'লে বন্দ হয়না।

রূপস্বামী

এই শনিবার হঠাৎ মেট্রোপলিটন পিক্‌চার্সের কোতুক এবং বিজ্ঞাপন লরস চিত্রকাহিনী "হাল বাঙলা" ষষ্ঠ মস্তায়ে পদার্পণ কোরল।



চিত্রে
দেবদত্ত ফিল্মসের
শ্রেষ্ঠ নিবেদন

উপন্যাসে
রুবীন্দ্র প্রতিভার
শ্রেষ্ঠ দান

চিত্র পরিবেশক :
গ্রাইমা ফিল্মস্
লিমিটেড

ভূমিকায়
রাণীবালা

প্রতিমা

রমলা

রাজলক্ষ্মী

দেববালা

মনোহরমা

নরেশ মিত্র

রাধিকানন্দ

মনোরঞ্জন

রবি রায়

নোহন বোবাল

জীবন গাঙ্গুলী

পরিচালনা—
নরেশ মিত্র

সমাধি

(গল্প)

শ্রীজগত দাশ

ট্রামে গিজগিজের—ভর—পাশ ফেরবার উপায় নেই যেনো। উপরি উপরি ক'দিন শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। মনটাও নেতিয়ে আছে—একদম বাজে ছোয়ে গেছি আর কি!

বুড়ি ছিলনা, অনেকদিন কোলকাতাকে খুব লতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ সেদিন কোথা থেকে আকাশে বান ডাকলো, উপর থেকে অতল জলের কোয়ারা পড়লো! পৃথিবীর বুকে—পৃথিবীর রূপ গেলো বদলে বদলী, সাঁতল্যাতে হয়ে!

এস্প্যান্ড-গামী ট্রাম বিহিঃপুর ঘুরে যাবে। ভীষণ ভীড় আর এক ঘেরামী। সমস্ত কাটানো মুস্থল।

কদিন থেকে একটা গল্প লিখি-লিখি করে লেখা হচ্ছেনা। পুঞ্জের ছুটিতে বেশ গিয়েছিলাম। মেসেব অবস্থা এটা ক'দিনেই বর্ণনাভীত, শোচনীয়। হোরাতে যে কালি ছিল তা' শুকিয়ে গেছে। মরিচা ধরা নিব শুদ্ধ হাওেলটা গড়িয়ে আছে তক্তপোষের তলায়, কুৎসিৎ মেয়ের হালি পায় এমনি-তরো হালা হোড়েছে বিচানার। ঘরে পা দিতে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে—এর ভেতর সাঁহতা বদে কার সাধি।

বুড়িটা ধরেছে একটু, চারিদিকে বেশ একটু জম্বাট শীতালু আবহাওয়া। কলনা করতে ভারী আরাহ। হেহটা আলসেধির মরকিন-মায়া কাটিয়ে উঠেছে প্রায়, মনে লাগলো গল্পের নেশা।

বুদ্ধাবন চোখ খুলেই হাত বাড়ালো, ওপাশে পাশবালিশে হাত লাগলো। মুন্দরী নেই। উঠে গেছে মুন্দরী এই ভোরেই। মুন্দরীর আজ কত কাজ, ওর কি

অ'লসেধী করে বেলা ক'রে উঠলে চলে? কাল রাতে এটো বাসন মাজা হয়নি। আজ না মাজলে কাটকে একগাল জল দেবারও উপায় নেই। স্বাধীনভাবে কি তাই বাট পাবার জো আছে যে মুন্দরী চট্ট ক'রে মেজে আনবে? এ ব্যয়গার পাঁচ সাত কানো বাড়ী। সব'র ঐ মাচা বাধা একখানি বাট। এ সময় পৃথিবীর সব জল যেনো এটা বাটেই এসেছে। একটুখানি পরিশ্রম করলে সবাই একটী একটী আলাদা বাট বেঁধে নিতে পারে—কিন্তু চলে যখন যায়—

খুব ঘণ্টাও নিরপজবে চলেনা। বগড়া-কাটিতে লেগেই আছে। নূতন বৌ একগাল বাসন পত্র নিয়ে বাটে নেমেছে। সেই যে একটার পর একটা চাই আর বাস দিয়ে খসকে তো খসছেই—খোলা নেই কিছুই। আঙ্গুরের রসে ভরা টসটসে ওর যৌন। মাজায় জাজা করে কাপড় জড়ানো, গায়ে খাটো একটা জামা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই বুকের বোতাম খোলা। হ'খানা হাত আর হ'পায়ে হাটু উলঙ্গ। বুকের মাংসের উচ্চতাও সম্ভাব্যতা চাড়িয়ে গেছে। রূপ যৌন নিয়ে নূতন বৌ যেনো বাটে এসেছে লোক দেখানো বাসন-কোসন নিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে—নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে।

“আমরাও একদিন এগ্রেমে বৌ ছোয়ে এসেছিলাম” বুঝা গেলো নূতন বোয়ের উদ্ধৃত্য সরলার সহ হয়নি। সহ হবে কেনো সরলার? বলুক তো কেউ, সরলা গ্রামের পূজনীয় কারও সঙ্গে মুখ উঁচু ক'রে কথা বলেছে নাকী এপর্যন্ত? তিন চার বছর

অবধি মেয়েরা কেউ ঘোমটা না তুলে তার মুখ দেখতে পারনি। কেউ ঘোমটা তুলে ধরলে মুন্দরী যথালজ্বব চোখ বুজেই রয়েছে। অস্বীকার করুকতো কেউ?

হাগাতে হাপাতে এতক্ষণে সরলা কথা-শুলো বুঝতে পেরেছে।

“তা জাড়া চোখ তো আছে দেখতে তো পাচ্ছে অমুখ মানুষ!” নেতার মা চাই দিয়ে দাঁত বস্‌ছিল সরলাকে লহামুভূতি দেখানোর এ সুরোগ উপেক্ষা করলো না। সরলাকে যদি লজ্জা করা যায় লাভ বইকি! নিশ্চয়ই লাভ আছে নেতার মায়ের। রোগে ভুগে ভুগে মেজাজ-মাজা-ঘল না থাকলে কি হয়? মনটা সরলার খুব পরিচর তা' অতদিন রোগে ভুগলে মেজাজ থিট্থিটে একটু লবারই হয়। নিজের ঘরে না থাকলে তেল, মুন, মরিচ এমনকি চা'ল, ডা'ল অবধি নেতার মাকে দার দিতে কোনদিন না করেনি সরলা। কতদিন তো দার শোধ নিতেই তুলে গেছে সরলা। দিতে গলেও সে না করে' মাঝে মাঝে। নেতার মাকে পর তো তাবে না সরলা।

রূপসী ব'লেই একসময় খ্যাতি ছিল সরলার। পরপর একটা জেল, একটা ঘরে এবং অনেক দিনের স্মৃতিকা ভোগা চেহারার এক রকম ভেঙেই পড়েছে বলতে হ'বে। রংটাও আগের মত তত ডাকলাইটে নেই, অনেকখানি ফ্যাকালে ছোয়ে গ্যাছে।

সরলা নূতন বৌকে একেই সুনজরে দেখে না। যে রূপের যেমাক নূতন

বৌয়ের! রূপ তো একদিন তাইয়েরও
ছিলো।

এতকণে হাতের ওপর এটো বাসন
লাজিয়ে সুন্দরী এলো। “একটু তাড়াতাড়ি
করো মৃত্তন বৌ আমার আজ আবার
ম’রবার সময় নেই।” উপর থেকেই
তাড়া দেয়।

সরলা এতোকণ কলনীটো সামনে নিয়ে
বসেছিল। সরলা এবার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে
পড়লো—একটু ভীক্স হোয়েই দাঁড়ালো
সরলা।

মামুষের আঙুল ব’লে একটা কিছু
থাকা চাইতো! সেই ভোর থেকে ঘাটের
আশায় এরা বসে আছে; অথচ সুন্দরী
এসেই—অত নবাবী বাপু এখন চলবে
না। সে রকম হোলে নিজেদের একটা ঘাট
বৈধে নিতে হয়। কথাগুলো অবিশ্রি নরম
করেই বলে সরলা। সুন্দরীর সঙ্গে তো
আজ ঝগড়া করা চলে না। সুন্দরীর মনও
আজ বিবাহে বিমুগ্ধ। যে পথে এসেছিল
সুন্দরী বাসন রেখে আবার সেই পথেই
চ’লে গেলো।

দীর্ঘ ছ’ বছরের বর্ণনা কাটিয়ে তারা
আজ পৃথক হচ্ছে। ছ’বছর আগে এ
বাড়ীতে এসেছে সুন্দরী। চারিদিকে মাঠ
মাঝখানে কোঠা বাড়ীর মতো একখানি
গ্রাম। গাড়া নেই, বাড়ী নেই, সহরের
কোনো চিহ্নই নেই; আছে কতকগুলো
ছোট ছোট কুটীরে আর অর্ধ-সভ্য একগাছা
মাছ। সুন্দরীর হুম আটকে এসেছিল
প্রথমে। এরা না জানে কথা বলতে না
বা আচার, ব্যবহার। কি ছাই, অসভ্য
রসিকতা এরা যে করে। ঘেঁরা করে সুন্দরীর
এদের লাফচর্চো।

সুন্দরী ছোট বেলা থেকেই সহরেই
মাছ। ধরতে গেলে গ্রাম বিনা কারণে
সুন্দাবনের সঙ্গে তার বিয়ে হোয়ে গেলো।

সুন্দরী শুনেছিল সুন্দাবনের বাড়ী পাড়া-
গাঁয়ে। তাই বলে সুন্দাবন যে তাকে
নিরে সেই পাড়াগাঁয়েই হয় বাঁধবে সে
কথা ভাবেনি সুন্দরী। আর পাড়াগাঁ
লব্ধে এত কষ্টের ধারণাও ছিলনা সুন্দরীর—
কোনো ধারণা ছিলনা বসেই হয়।

সহরে ছোট খাটো একটা চাকুরী পেতে-
সুন্দাবন শুধু প্রাণ দিতে বাকী রেখেছে।
চাকুরী জোটেনি, তাইতো সহরে বৌ
সুন্দরীকে নিয়ে অবশেষে সুন্দাবনকে বাড়ীতেই
উঠতে হলো। কিন্তু বলে থাকলে বেশেও
বেশীদিন থাকা চলে না, মঙ্গল অচল
হোয়ে আসে, গ্রামের লোকে লামনে
নানারকম সুপারামর্শ দেয়। আড়ালে কেউ
হাণি ঠাট্টা করে কেউ বা গালাগালি করে,
গ্রামের হাওয়াটা যেনো নোংরা হোয়ে
গেছে। লবাই বলে পাটের ব্যবসারে নাকী
খুব লাভ। ছ’চারজন গ্রামের অন্তলোকও
যাবে সুন্দাবনের সঙ্গে ব্যবসায় করতে। এই
বর্ষার কটা মাস খুড়ে এলে, সাড়া বছর ঠিক
পায়ের উপর পা দিয়ে না কাটাতে পারলেও
ভাবতে যে বেশী হবেনা একথা ঠিক। গ্রামের
চার ধারে বর্ষার কালো জল টল টল করছে
—তার মাঝে এই ছোট গ্রামখানি যেনো টাল
সামলাতে পারছে না।

গাঁয়ের গৈরোমী এতোদিনে প্রায় স’রে
এসেছে সুন্দরীর। তবুও এই তেপান্তরের
মাঠে, বর্ষার ঘন-নীল নীরবতার মধ্যে
সুন্দরীকে রেখে যেতে সুন্দাবনের মন যায়
দেয় না। ছেলেমাছ সুন্দরী যদি কোনো
বিপদ আপদ কটকিত হোয়ে উঠে সুন্দাবন
একদিনও তো বাঁচতে পারবে না
সুন্দরীকে ছেড়ে। এই আত্মীয় পরিচয়হীন
পুরীর মধ্যে সুন্দাবনই, সুন্দরীর একমাত্র
বন্ধু—সহচর।

সুন্দাবনের আপনার বলতে কেউই নেই।
বুড়ীমা অনেকদিন বেঁচে ছিলেন ছেলের বৌ
দেখবেন বলে। কিন্তু সুন্দরী আসবার কিছু

আগেই তিনি চলে গেছেন। একে অন্তকে
ভালো চোখে দেখতে না পারা এ গ্রামের
স্বাভাবিক রীতি। যে অপেক্ষাকৃত সুখী
তাকে লবাই বিফোটকের মত বিদ্‌ঘুষ্টে মনে
করে। সুন্দাবনের অবস্থা এই নিয়মে
শোচনীয়। যেখানে গ্রামের প্রায় লবাইকে
মাসে ছ’চারদিন না খেয়ে থাকতে হয়,
সেখানে ছ’চারজন অন্ত লোককে খাইয়েও
সুন্দাবনকে না খেয়ে থাকতে হয় না।
সুন্দাবনের বাবা কিছু ধানের জমি রেখে
যান—ধান তাতে ভালই ফলতো—প্রচুর
বলা যায়। সুন্দাবন গ্রামের দশজনের
রান্না চোখ আর ভাড়া শ্রম উপেক্ষা কো’রে
লেখাপড়াও শিখেছিল কিছু। এমবও ততটা
মারাত্মক ছিল না। কিন্তু যখন সুন্দাবনের
সহরে বিয়ের খবর গ্রামে এলো, গ্রামের
মেয়ে পুরুষ সে দিন মরিয়া হোয়ে উঠলো,
কিছুতেই তাদের সমালোচনাকে সামলানো
গেলো না। এ গ্রামের এই ঘাট সর্বজনীন
বৈঠক।

নেতার মাই প্রথমে আরম্ভ করলে,
“শুনেছি সুন্দাবন যে বিয়ে করেছে
সে নাকী কারেতের মেয়ে নয়।”

“কারেত না ছাই! পাঁচু বিশ্বাস সব খবর
নিরে এসেছে, তাকে তো আর কীকী দেবার
উপায় নেই, সুন্দাবন নাকী বন্দি বিধবার মেয়ে
বিয়ে করেছে। কালে কালে আরও কত
দেখতে হবে,” সরলা উপলংহার টানলো।

রমা কথা কম বলে, হালে বেশী। এমন
একটা দুখরোচক আলাপে খিল খিল ক’রে
হেসে উঠলো রমা, তা’ছাড়া রমার মনও
আনন্দে ভরা—এইতো সেদিন বিয়ে হোয়েছে
রমার। ভাল বর-বরই-বিয়ে হোয়েছে
রমার।

শুধু মেয়েদের ঘাটেই নয়। মাঠে
রাখাল ছেলেদের ভেতরও এ নিয়ে আলোচন
হোয়েছিল সে দিন।

দেখিন যদিও আর নেই, বৃন্দাবন তারপর সুন্দরীকে নিয়ে এ গ্রামেও এসেছে, এ বাড়িতে বাসও সে করেছে হুবহু। সুন্দরী নিজের চেষ্টায় সে সব কুস্তি আবহাওয়া কাটায়ে উঠেছে, সবাই তাকে—বলা যায়—বেশ ভালোবাসে।

সে সব দিনের কথা বৃন্দাবন কিছুতে ভুলতে পারে না। সুন্দরীকে একা রেখে যেতে মন তার তাই যায় দেখে না। সেই সব লোকই তো আছে যারা সুন্দরীকে সব সময় আলিয়েছে একদিন। মন ওদের বদলেছে চেহারা ঠিকই আছে। পুণ্যে প্রবৃত্তি কিরে পেতে কতক্ষণ।

অনেক চেষ্টায় শেষে বৃন্দাবন নিজেকে রাজী করতে পেরেছে। তা'ছাড়া উপায়ই কোী? সারাজীবন ঘরে বসে থাকলে কি চলবে? এখন না হয় ছোটো শ্রাণা এক রকম চলে যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে—বলা তো কিছুটাই নয়। অবিশ্রিত হৃৎকরের মধ্যে সেরকম কিছু লক্ষণ দেখাতে না পারায় ছোটো খাটো একটা অখ্যাতি আছে সুন্দরীর।

টাকার অভাবে বৃন্দাবন অনেক দুঃখ নিজের ভেতরে পুঁবে বেখেছে। সন্তানের চাকচিক্য ছাড়িয়ে সুন্দরীকে আদর পাড়া-গায়ে নিয়ে এসেছে বৃন্দাবন, তবু প্রলোভনের সাধাত্ত রকম কিছুই এ পর্যন্ত সে হিতে পারেনি সুন্দরীকে—না বা একটা খোকা। কানে ছোটো হল পড়বার সুন্দরীর বড় কথা। এবার অনেক দিনের জন্ত বৃন্দাবন বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে। প্রথমে সে যদি হল ডাটী নিয়েই বাড়ী ফিরতে পারে কি আনন্দই না হবে সুন্দরীর। বাবলারে সেরকম লাভ হলে ওরা দু'জন না হয় একবার কোলকাতাটি হুড়ে এলো, টাকা পুঁজি ক'রে তো কিছু লাভ নেই।

সুন্দরী কোন ভোরে উঠে গেছে। বাটের অধটনের মধ্যেও কোন সময় সে

বালন বেজে এনেছে, ঘরদোর পরিষ্কার করেছে। মন দেবে নিয়ে খান দুর্কা তুলেছে। শোবার ঘরের ঘেঁষের উপর এক রকম পুজোর আয়োজন ক'রেছে পর্য্যন্ত।

বৃন্দাবনের বিহানা ছাড়বার নামও নেই, উঠলেই যেনো তাকে চলে যেতে হবে।

আর কতদিন সুন্দরীর সঙ্গে দেখা না হয় তার ঠিক কি? “ওঠো কত বেলা হলো।” বৃন্দাবনকে নাড়া দিল সুন্দরী। এতক্ষণে চোখের পাতা খুল বৃন্দাবন—টেনে খোলবার মত। বৃন্দাবন থাকা! এদব কী? বাবের চোখের মত একটা মাটির প্রাণীপ জাছে ঘেঁষতে। জানাঘর ফাঁকে ঘরে রোদ ঢুকেছে—চুরি ক'রে ঢোকবার মতো। তার যাত্রার আয়োজন। বৃন্দাবন কেঁপে উঠলো। তাকে চলে যেতে হবে। সুন্দরীকে ছেড়ে বহুদিনের জন্ত বহু দুঃখ আজ তাকে চলে যেতে হবে।

আকাশের আলতা কেটে বৃন্দাবনের ঘেঁষে এলো যাত্রিক জুখ। উৎসব কাহনা দিয়ে সুন্দরীকে ও বুকের উপর টেনে নিলো—প্রায় মাতালের মতো। বুকের মাংসপেশী হলো সুন্দরীর আবেক-কুঞ্চিত। ওরা তুলে গেলো পৃথিবীকে, এত সব আয়োজন কেন, উচ্চল রক্তবিন্দুগুলির দ্রুত পড়চালনা ওরা প্রাণভরে শুনলো—শরীরের সবটুকু শীতলতা হিরে।

নৌকাখানা বেশ বড়। ফুলপাতা ও তেল সিঁচরে পরিপাটি ক'রে লাজানো। অনেক লোকে এসে ভীড় করেছে, —এ গ্রামে এ বছর এই প্রথম নৌকা যাত্রা কি না। যে সব যাত্রা অসাবধানে অসমাপ্ত রয়েছে—হাড়ি ও ছুঁড়ি হাতে বসন্ত সে গুলি মেরামত করছে, লগিত অবৈজ্ঞানিক জিনিষ পত্র তুলছে আর হাক ডাক করছে।

“একখানা চাটাই আনতে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে। শিগির অকগোছা পাট

নিরে এলো—নৌকার আগুণে বাঁধতে হবে।”

“খুঁজে কি আর পাওয়া যায়, যে কোণে রেখেছিলো লগিত ছা।” বসন্ত আবার এক গোছা পাট আনতে যায়।

খোট চারিজন যাত্রী, বৃন্দাবন, বসন্ত, লগিত ও মখন। এদের ভেতর বৃন্দাবন বিভ্রান্ত জোঁধু আর মখন বরসে কনিষ্ট, কাজের লোক লগিত আর বসন্ত। এতক্ষণ বৃন্দাবন একবারও নৌকার কাছে এলো না। মখনতো কোনো কাজ করতে পারে না—ছেলেমানুষ তাই টুফটাক এগিয়ে দিচ্ছে মাত্র। লগিত আর বসন্ত কর্ম্মলোক কাজ কি আর প'ড়ে থাকবে? পঞ্জিকার মতে যাত্রার শুভ লগ চ'লে যায়। বৃন্দাবন আর ঘেরী করতে পারে না। বৃন্দাবনও লেজেছে কম না। ঠিক বিয়ের দিনের মতো। সুন্দরী আর বৃন্দাবন খাটের ওপর বসেছে পা ঝুলিয়ে, গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁরি ক'রে।

“আমার জন্ত কি খুব কষ্ট হবে মনি?” বৃন্দাবন প্রায় সুন্দরীর কানে কানে বলে। সুন্দরী কথা বলতে পারে না—আরও একটু ষণ হোয়ে যায় বৃন্দাবনের বুকের কাছে।

“আমি কত টাকা নিয়ে আসবো। তোমার অনেক দিনের লখ ছোটো হল পড়—এবার এলেই তোমার হল গড়িয়ে হবে।” আদর ক'রে সুন্দরীর গাল টিপে ঘের বৃন্দাবন। কে যেনো সুন্দরীর গলা টিপে ধরেছে—কথা সুন্দরী বলতে পারে না; বাবার মত চেয়ে থাকে বৃন্দাবনের বিকে।” মখন যে বন্দরে থাকি তোমার চিঠি লিখবো—উত্তর দিও কিন্তু। হাটবারে অক্ষরদ্বাকে দিয়ে বোঁকি ক'রে পোষ্ট কার্ড কিনে রেখো। বৃন্দাবন সুন্দরীর ঠোঁটে চুমু খায়।

সুন্দরী বৃন্দাবনকে প্রণাম ক'রে বলে “চিঠি দিতে ভুলো না যেনো।”

নবই তৈরী নৌকা ছাড়লেই হয়।
যথেষ্ট লোক জমেছে ঘাটে। ভীষণ ভীড়।
তারা যেনো ভীর্ণ করতে চলেছে। অকারণ
পুলকিত হোয়ে উঠে বুদ্ধাবন। নৌকা
ছেড়ে দিল। বুদ্ধাবন শেষ বারের ভক্ত
সুন্দরীর চোখের ওপর হাসলো।

• • •

ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে। নড়বার নামও
নেই। এতক্ষণে হাজড়ার মোড়। ভীড়ের
ওপর অলম্ব্য ভীড়—বোঝার ওপর শাকের
আটা—এক সঙ্গে অনেকগুলি লোক উঠছে,
পিপড়ের সাতীর মতো। উড়িষ্যাবাসী এক
পাল মেয়ে পুরুষ মিলে বাংলায় এসেছে
ভীর্ণ করতে। এতক্ষণে ওদের ঠা শেখ
হলো এবার বসবার পাল। সার্বক্ষী
মেকের ওপর ওরা বসে গেলো—বড়াক-
টারের টিকেট ছেবার পথ রাংলে না
পর্যন্ত বসলো তারা নীচে, নড়ে লড়ে
বসতে বসে ভয়ে মরে, টিকেট চাইলে
কাঁপে অশ্রু জীবের মতো তাঁদের
চাউনী

চিড়িয়াখানা দেখতে চলেছে।

এখিকে এক হিন্দুস্থানী পুলিশ আর
মৈমনসিংহবাসীতে আলাপ জমে উঠেছে।
আমার হাতে কোনো কাজ নেই মনোযোগ
হিলাম হিন্দুস্থানীটি কতদিন মৈমনসিংহ
কাটিয়েছে, বাংলার কোন জেলার জলবায়ু
কেমন, ম্যালেরিয়া পুলিশ আর বেঙ্গল
পুলিশে—এসু বি তে আর আই বি তে
কি পার্থক্য তার ক্রমিক বর্ণনা দিচ্ছে,
ভক্তলোকও চুপ করে শুনেছেন না। এখন
তার কতজন আত্মীয় পেন্সনভোগী সরকারী
বর্ষচরী,—তার মেজো মাঝার বড় ছেলে
ছাড়াগো—এখন কোথায় আছে এবং
আরও অনেক বিছু ধারাবাহিক ইতিহাস।

এখিকে পাণ্ডা ঠাকুর সাত্ত্বিদের ভক্ত
এক সঙ্গে আঠারোখানা টিকেট কাটে,

শুনে দেখা গেলো তারা যোলটি প্রাণী।
হুথানা টিকেট কেবল দেখা নিয়ে হিন্দুস্থানে
আর উড়িষ্যায় ছোটো খাটো একটা প্রায়
হোয়ে গ্যালো।

পুলিশটা বোধহয় এবার নেমে যাবে।

“আপনার বাড়ী কোথায়?” পুলিশটিকে
জিজ্ঞেস করলেন ভক্তলোক।

“বিহাগীর কাছে মোছি”

“Your Behani and Mauchi both
dead to me” ভক্তলোক লম্বা হেলে
উঠলেন।

চুপ চাপ

পদ্মার গভীর বুক লাগ কেটে বুদ্ধাবনের
নৌকা চলেছে। নৌকা বুঝাই পাট।
প্রথম প্রথম বুদ্ধাবনের ডর হয়েছিল।
বরেনিতো কোনোদিন বুদ্ধাবন একাক।
আসলে কাছটা তত কঠিন নয়—অন্ততঃ
যতটা ভাবা গেছিলো।

তিন চালান দিচ্ছে বুদ্ধাবন। এপারের
হাটে কিনে ওপারে মহাজনের ঘরে পৌছে
দিলেই বুদ্ধাবন খালাস। তিনবারের
একবারও মন পিছু আঁট আনার কম লাভ
হয়নি। বুদ্ধাবনের বড় ভ্রূণ তাঁর নৌকা-
খানা বড় ছোট। পঞ্চাশমিন পাটও ধরে না
ভালো করে। আগে কি জানত বুদ্ধাবন,
না হয় আর বিশ টাকা চালতো নৌকার
পিছনে।

বসন্ত আর ললিত প্রাণপণে দাঁড় টানছে।
মহান অত্বকাজ করে—ছেলেমানুষ তো সে।
বুদ্ধাবনের অভ্যাস নেই এ কাজ তবু হাল
ধরতে সে জানে। বসন্ত যখন ঠাট্টা করে
তাকে মাঝি মশায় বলে—মনে মনে পুলকিত
হয় বুদ্ধাবন।

রোহের আলো কমে চারিদিকে পাতলা
অন্ধকার নেমে আসছে জলের ওপর পড়েছে
তামাটে রং।

“সকাল সকাল পাড়ি জমানো ভালো—
কি বল ললিতমা।” বুদ্ধাবন মন্তব্য করে।

“সেই ভালো দক্ষিণ-পশ্চিম করে ধরো।”

বুদ্ধাবন নৌকা দক্ষিণ-পশ্চিম করে ধরে।

এ পর্যন্ত সুন্দরীকে একখানা চিঠিও
লিখবার সময় ক’রে উঠতে পারেনি বুদ্ধাবন।
সুন্দরী হয়তো কতকি ভাবছে, রাতে ভালো
করে ঘুমাতে পারছেন না। দান-খাওয়া-
দাওয়া হয়তো বন্ধ করে দিয়েছে। যে
ছেলেমানুষ সুন্দরী। আর ধরো না কালই
একটা চিঠি লিখবে বুদ্ধাবন। তার
লাফলোর কথা শুনে সুন্দরী না জানি
কত পুলকিত হোয়ে উঠবে।

চলান চল শব্দে জল কেটে নৌকা
চলেছে। কবিতা আসে বুদ্ধাবনের। ক’মাল
পর বুদ্ধাবন সুন্দরীকে দেখবে। এতোদিনে
আরও সুন্দর হ’বে সুন্দরী। এ ক’মালে
মৃত্যু প্রেমের মতো হয়তো ওদের ভেতর
মধুর অপরিচয় জমে উঠবে। প্রথম প্রথম
আবার হয়তো সুন্দরীর ঠোঁট কাঁপবে।

পদ্মার চেষ্টাগুলি ক্রমে যেনো বড় হচ্ছে
আকাশের গায়ে টুকরো টুকরো কালে
পাহাড়। মেঘ না তো? সর্বনাশ মেঘ
বহি ঝড় ওঠে। বুদ্ধাবনের বুক শুকিয়ে
যায়। আরও জোড়ে দাঁড় টানছে ওরা
সবার মনেই প্রতিভূত ডর। নৌকা আর
একটু কম বুঝাই করলেই পারতো বুদ্ধাবন।
প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আসছে। এবার বোঝা
হয় নৌকা আর বাঁচেনা।

এক সঙ্গে নবাই হার হার ক’রে উঠলুম।
একখানি প্রকাণ্ড ট্যাক্সী হুঁজন আরোহীন্দ
একটা রিক্সাকে গুড়িয়ে দিয়ে গেলো।

ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে।

—শেষ—

গভ নিরোধ বাটিকা
বহুপরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ও মধুমাত্র একবার
সেবনে এক বৎসর গভ হয় না। মূল্য ১১ টাকা
হাকিম এম.এস.জামান
৪২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

রাজমালা রচনা পত্রিকা

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচাক্রচন্দ্র ঘোষ

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

রমানাথ হইতে অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ
কিঙ্কর সেন বংশের সেনের পুত্র। কিঙ্কর
পাঠান আমলের শেষ ভাগে একজন পরাক্রান্ত
সম্রাট ছিলেন (তিনি সাধারণতঃ ভূঞা
খলিফা খ্যাত)। আমরা একেবারে স্তম্ভিত
যে, বঙ্গমুহুরার মহাশয়ের নিকট প্রাচীন
রাজ্য চন্দ্রকেতু এবং কিঙ্কর সেন অভিন্ন-
ব্যক্তি। একবার কোন মূল্যই কোনদিন
হিতে আমরা স্বীকৃত নহি। রাজ্য চন্দ্রকেতু
কিঙ্কর সেনের বহু পূর্ব আমলের। এতদ্ব্যতী-
ত্রে কিঙ্কর স্বর্ণিণ রাষ্ট্রীয় মৌলিক কায়স্থ,
এবং রাজ্য চন্দ্রকেতু 'মৌল' (অথবা মৌল)।
বংশোদ্ভূত। এক্ষণে সংক্ষেপে তাঁহার
(চন্দ্রকেতুর) কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলে
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি।

২৪ পরগণার হেউলিয়া নামক স্থানে
রাজ্য চন্দ্রকেতু রাজত্ব করিতেন। শেখ
জামুদ্দিন ও শেখলাল রচিত দুইশত বৎসর
পূর্বের প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায়।

“চন্দ্রকেতু নামে রাজ্য হেউলিয়া য়ার স্থান
যরা মাহুয ভীষণ রাজ্য বড় পুণাবান।”

তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বিখ্যাত সেন
রাজবংশের রাজত্বকালে এক বিস্তীর্ণ
ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন রাজ্য চন্দ্রকেতু
কান সময় জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহা
সম্পটরূপে অবগত হইবার উপায় নাই।
তবে তিনি যে বজ্রেশ্বর আলাউদ্দীনের (ইনি
সম্রাট আলতামশ বর্ত্তক বজের শাসনকর্তা
নিযুক্ত হন) সময় (১২৩০—১২৩৭ পর্য্যন্ত)
বিজয়মান ছিলেন, এবং সেই সময়েই তাঁহার

অবলান ঘটে সে লক্ষকে প্রমাণ পাওয়া যায়।
তখন পীর গোরাচাঁদ (গোরাই গাজী) নামে
একজন মুসলমান কবির তাঁহাকে মুসলমান
করিবার জন্য বর্ণে বর্ণে চেষ্টা করেন; কিন্তু
প্রতাপবিশিষ্ট নিষ্ঠাবান রাজাকে বশীভূত
করিতে পারেন নাই।

“ * * * তবু রাজ্য চন্দ্রকেতু আড়ি করে বয় ॥
নামানে গোরাই পীর, ঘেমাগ করিয়া * * * —

(শেখ জামুদ্দিন ও শেখলাল রচিত
প্রাচীন পুথি)। ফলে গোরাই
গাজী রাজ সরকারে তাঁহার নামে নালিশ
করেন। ঐ সময় বালাস্তায় পেয়ার
শাহ নামক এক ব্যক্তি পাঠান শাসন-
কর্তা ছিলেন। রাজ্য চন্দ্রকেতুর সর্বনাশ
সাধনের তার পেয়ার শাহের উপর তত্ত্ব হয়।
পেয়ার শাহ সাতন নামক দুতের দ্বারা
রাজাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। (পল্লীবাণী
— ১৩২৫)। অনেক ভাবিয়া রাজ্য চন্দ্রকেতু
তখন পেয়ার শাহের সহিত সন্ধি করিতে
মনস্ত করিয়া লক্ষ্য করিতে যান। তথায়
তাঁহার উপর নানাবিধ অত্যাচার হয়।
তাঁহার নিকট ঘিরণী পায়রা
(Carlix Pigeon) ছিল (Hunter's
Statistical Accounts Vol. 1)।
পেয়ার শাহ তাঁহাকে বন্দী করিলে পায়রা
উড়িয়া গিয়া সংবাদ দেয়, তাহাতে পরিবার-
বর্গ জলন্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। রাজ্য
চন্দ্রকেতু শেষে উদ্ধার পাইলেও স্বজনহীন
জীবন ধারণ করিতে স্বীকৃত না হইয়া,
পরিবারবর্গের পথানুসরণ করেন।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে একটি প্রধান,
বিষয় অবগত হইতে পারা যায় যে, রাজ্য
চন্দ্রকেতু যে সময়েই ভ্রমগ্রস্ত করুন না কেন
১২৩০—১২৩৭ মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে,
অর্থাৎ ১২৩৭ এর পর তিনি জীবিত ছিলেন
না। এবং বর্ত্তমান-তনয় কিঙ্কর সেনের
কাল হইতেই তাঁহার পর—পঞ্চদশ শতকের
শেষভাগ হইতে বোড়াল শতকের মাঝামাঝি
অবধি।

বঙ্গমুহুরার মহাশয় লিখিয়াছেন—

(১) হুসেন শাহ, মুসলমান কবরগাঁও এবং
হাউর খাঁকে রাজত্ব না দেওয়ার পাঠান
বিপ্লবের সহিত কিঙ্কর সেনকে বহুবৃদ্ধ লিপ্ত
হইতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই
তিনি নাকি পাঠানবিপ্লবকে পরাস্ত করিতে
লক্ষ্য হইয়াছিলেন। আরো পড়িলাম
(২) কিঙ্কর নাকি বাহাছর আকবরের
নিকট হইতে প্রধান ভূঞা, রায় রাইয়া,
রায় বাহাছর, পুরুষমুক্রমিক রাজ্য বাহাছর
উপাধি এবং মৌলানা-খতিব তরবারি
খেলাত প্রাপ্ত হন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়,
লক্ষ প্রমাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ চুনো-
পুটিটির পর্য্যন্ত বিবরণ আছে, সে লবে
কিঙ্করের সাম্রাজ্য নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।
রমানাথ বা তৎকালীন পুরন্দর সেন বাঙ্গালগণ
কেহই বাহাছর আকবরের নিকট কোন
উপাধি পান নাই। তবে রমানাথ হইতে
১৭শ পর্য্যায় অধস্তন স্রীনাথ দেন সম্রাট
শাহজাহানের সময় শুধু “রাজ্য” উপাধি
প্রথম লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে
“বাহাছর” লেখা ছিল না। তাঁহার ঘোষণা
আর একস্থানে উচ্চতর হইয়াছে—“বাহাছর
আকবরের কৃপায় দ্বিগুণ বিশাল রাজ্য
১৭০টি পরগণা নিয়া গঠিত হইয়াছিল। ঐ
রাজ্যের সমস্ত দ্বিগুণ সম্রাটকে বাঙ্গালিক
একটি ছাগল ও একখানি কবল মাত্র
রাজস্বস্বরূপ প্রদান করিতে হইত।”—এইরূপ

কথা তিনি বোধ হয় তাঁহারই শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুরের মনঃকল্পিত তত্ত্বাদান ও বলিল-পত্রাদি হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। বাহাদুরের লিখিত কি তবে ঐকর সেনের কিছু মিষ্ট কুটুবিভা ছিল? ঐতিহাসিকেরা এমন একটি মধুরতম বিষয়কে ইতিহাসে স্থান না দিয়া নিতান্ত শ্রম করিয়াছেন। 'মহারাজ ঐকর সেন কার্য দিগের নিষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ গৌষ্টিগতি আখ্যাপ্রাপ্ত হন—' ইহা তাঁহার অপর ঘোষণা। ঐকর সেনকে শ্রেষ্ঠ করিতে তিনি সব একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। সারাস্বক অন্তর! 'আদল কথা হইতেছে—ঐকর সেন দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় ১৮ পর্যা্যভুক্ত কুণীনদিগের একতাই করিয়া সমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

তিনি দ্বাষল ভৌমিকের তালিকা বাহা দিয়াছেন, তাহাতে কচি ঐতিহাসিকের মত-ও কোন বিচার বা শৃঙ্খলা নাই। এই এসঙ্গে মোগল পাঠানের লক্ষ্মিগের ইতিহাস কিছু আলোচনা না করিয়াই বহুমজ্জ্বলার মহাশয় দ্বাষল ভৌমিকের পরিচয় দিতে বা তাঁহারের লংখ্যা নানাতাবে পূরণ করিতে বিদ্যু পরোয়ার অবকাশ রাখেন নাই। আমরা লকল লন্দেহ নিরমনের নিষিদ্ধ নিয়ে দ্বাষলজন প্রধান ও প্রতাপী ভৌমিকের তালিকা দিতেছি।—(১) জৈশা খাঁ মনহ আলি—কজ্জা (২) প্রতাপাদিত্য গুহ—বশোর (৩) টাররার-কেদার রায়—শ্রীপুর (৪) কর্ণপনারায়ণ রায়—চন্দ্রখোপ (৫) লক্ষ্মণ দাপিকা—ভুলুরা (৬) মুকুন্দরাম রায়—ভূষণা (৭) কজল গাজী—তাওয়ারল (৮) হাখীর মল্ল—বিষ্ণুপুর (৯) কংল নারায়ণ—তাহিরপুর (১০) রামকৃষ্ণ—লান্তোল (১১) পীতাম্বর—পুটিরা (১২) জৈশা খাঁ লোহানী—হিজলী। এই দ্বাষলজন ভৌমিক ব্যতীত আরো কুয় কুয় ভৌমিক অনেক ছিল। তাঁহারের নামোন্মেষ নিঅরোজন।

ঐকর-পুত্র মনমোহন মহারাজ প্রতাপা-দিত্যের লম্বাশয়িক, এই মনমোহনের লিখিত প্রতাপের একবার লংখ্য হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঐকর সেন বাহসহ আওবর কর্তৃক পূর্ববঙ্গের ১৪টি পরগণার মনম পান। ঐকর-পুত্র তাহাই ভোগ করিতেছিলেন। মহারাজ প্রতাপা-দিত্য মনমোহনের নিষ্ঠ হইতে ১৪টির মধ্যে ১৩টি পরগণা—কাশেশপুর, শিবপুর, তাল্ল কজপুর, বনগ্রাম, মধুদ্বীপ, সুলতানপুর, লোকাংকুল, আবদুলপুর, ইব্রাহিমপুর, রাজোর, সেনিমাঝ, নাজিরপুর ও কাবেলী অধিকার করিয়া লন ("বঙ্গের মহারাজ প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পর সুবরাজ শাহজাহান যখন পিতৃস্রোহী হইরা বঙ্গ আসেন (১৬২২), তখন মনমোহন উপহার লভার সহ তাঁহার লিখিত লাক্ষ্য করেন। সুবরাজ লম্বই হইরা তাঁহাকে মোগল সরকারে কর্মে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ক্রমে তিনি কার্যদক্ষতাগুণে চাকর নবাবের স্রষ্ট্রিতে পড়েন এবং কৌরবার স্রবির্য লিখিত পূর্ববঙ্গের পরগণা লম্বের রাজস্ব আদায় করিতে আলিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। উহার ফলে মনমোহন নিজ পুত্র শ্রীনাথ সেনের নামে সেনিমাঝ পরগণার করমাণ প্রাপ্ত হন (Beveridge's History of Bakarganj)। পরে তিনি আরো কতিপয় পরগণা লাভ করিয়া লম্বাট শাহজাহানের সময় "রাজা" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। লম্বাণাবাহ তাঁহার

রাজ কাছারী, গড় ও বেংমন্দির ছিল (বশোর খুলনার ইতিহাস)।

তারপর বহুমজ্জ্বলার মহাশয়ের মতে রাজা 'শ্রীনাথ রায়ের (শ্রীনাথ সেনের) লম্ব বশোরের জায়গীরদার প্রতাপাদিত্য গুহ রায়ের অভ্যুদয় হয়।—ইহা কি কোন প্রামাণিক ইতিহাসে তিনি দেখাইতে পারেন? তদ্ব্যতীত মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে তিনি স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন? ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের জামুয়ারী মাসে মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রকাশ্যভাবে মোগলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার পরাক্রমে দিল্লীর প্রবল বিজিগীষু ভারত লম্বাটের লিংহানও কম্পিত হইয়াছিল। H. J. Rainey's Proceedings of the Asiatic Society-তে আছে—"Maharaja Pratapaditya became so powerful as to exercise away over all the Rajahs of Bengal, Behar and Orissa, including even Assam. His great successes induced him to refuse to pay his tribute, and to throw off his allegiance to the Great Mogul." রামরাম বহু লিখিয়া গিয়াছেন—"এখন বালা ও বেহার লম্বই প্রতাপাদিত্যের অধিকার। ইহাদের রাজচক্রবর্তী প্রতাপাদিত্য একতরী রাজা দিল্লীতে কর দেয় না।" ঐতিহাসিক লতীশচন্দ্র মিত্রের বশোর খুলনার ইতিহাসে পাই—"প্রতাপাদিত্য এই সময়ে নিজ নামে মুদ্রা (coin) প্রচারিত করেন। কোনও

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আন্তোব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

ফোন ২৭৭৪

বড় বাজার

শ্রী অমৃত লাল কুমার

কাঠের জাট

কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারত ত্রয়েন মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিঃ

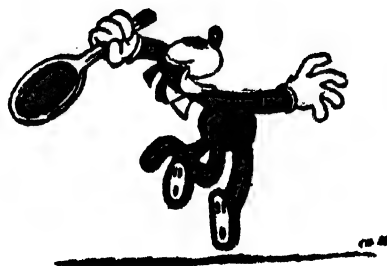
যে প্রতাপাদিত্য মানসিংহ কর্তৃক বন্দী
হইরাছিলেন ?

“সেখানে (ঢাকার) কারাবাসের সময়ই
তাহার (প্রতাপের) মৃত্যু ঘটে” — তাহার
এ কথাও সত্য নহে। — “অথ বঙ্গীয়
পরিগণিতঃ প্রতাপাদিত্যস্ত বারাগতঃ
পঞ্চদশ ভবৎ” — ক্রীতদাসবংশাবলী চরিত।
— “প্রতাপাদিত্য কালী পুত্র চরিত্ত্বা
হী কালবংশ জয়” — রামনাথ বাবুজীর
ইতিহাস রাজস্থান। — “The prisoner
(Pratap) however, died on the way,
at Benares” — Westland’s Report of
Jessore. — “He (Pratapaditya) died
at Banares on the way” — Rainoy’s
Proceedings of the Asiatic Society.
— “পথে ঘাইরা বানারস মোকামে
প্রতাপাদিত্যের কাল হইল” — রামরাম বহু।
আমাদের হৃদয় বিখ্যাত বহু মজুমদার মহাশয়
রাজা ক্রীনাথ রায়ের সহিত মহারাজা
প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ লম্বা—প্রতাপ পলায়ন
করেন—সংগ্রামপুরের যুদ্ধে সুবরাজ উদয়
নিহত এবং শত্রুর বন্দী হন—পরে মানসিংহ
কর্তৃক প্রতাপের বন্দীও ঢাকার কারাবাসের
সময় মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় লইয়া প্রবন্ধ
প্রেরণ কালে হয় সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিল না,
না-হয় তাহার পৃষ্ঠপোষিত ক্রীতদাস
বাহাদুরের অনুল্য উপদেশ প্রদেয়িত
হইয়া তিনি হুল ইতিহাসকে সম্মুখে
উৎপাটিত করিয়াছেন।

রাজা ক্রীনাথ রায়ের পুত্র রাজা ক্রীনাথ
রায় মগধস্থ গণের অত্যাচার নিবারণ
করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তৎপুত্র
রায়েরকাঠি বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ ক্রত-
নারায়ণ। তিনি আক্ষয়-পরিবার দ্বিগজা
হইতে রায়েরকাঠি আনিয়া ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে
রাজত্ব আরম্ভ করেন তাহা পূর্বেই লিখিত
হইরাছে। তাহার অপর কোন লেখকের

ব্রাতা ছিল কিনা আমরা তাহা পাই নাই।
বহিঃ থাকে রাজা ক্রতনারায়ণ যে তাহার
মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং রাজ্যের অধিকারী সে বিষয়ে
সন্দেহ নাই। কালীপায়ে ক্রতনারায়ণের
মৃত্যুর পর তাহার চারি পুত্রের মধ্যে বিবাহ
উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠ রায়েরকাঠি থাকেন;
মধ্যম বনগ্রামে, তৃতীয় চিৎড়িখালিতে এবং
কনিষ্ঠ মধুদাস উঠিয়া যান। এইভাবে এই
রাজ বংশের জ্যেষ্ঠ শাস্ত্র বরিশাল জেলার
থাকিলেন, এবং অপর তিনজন পুত্রের
আলিয়া বসতি করিতে লাগিলেন (রাজা
ক্রতনারায়ণের বিষয় মুখ্যতঃ আমাদের বর্ণনায়
না হইলেও, প্রসঙ্গতঃ বাহু বেগরী বার না
বলিয়া লিখিলাম)।

বহু মজুমদার মহাশয় কিন্তু তাহার প্রবন্ধে
ক্রতনারায়ণকে “কুমার” করিয়া “রামদয়াল”
নামক এক অজ্ঞাতকুললীল ব্যক্তিকে ক্রত-
নারায়ণের অগ্রজ এবং “রাজা” করিয়াছেন।
এই করাত, অর্থাৎ এই জোড়ে, অর্থাৎ
রামদয়ালের অন্তর্ভুক্ত আমাদের বিলম্বণ সন্দেহ
রহিয়াছে। যে যেতু সপ্তদশ শতকের
প্রাচীন ঐতিহ্যে আমরা রাজা ক্রতনারায়ণ
—সম্রাট পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাই; কিন্তু বহু
মজুমদার মহাশয় “রামদয়াল” সম্রাট প্রকৃত
ইতিহাস একেবারেই মুক। তবুও আমরা
আলোচনা চালাইবার জন্য সাময়িকভাবে
তাঁহার আধিকৃত রামদয়ালকে মানিয়া
লইলাম। (ক্রমঃ)



দুর্দিন

(ক্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

দুর্দিন বন্যেছে বোঝানি ?

আর কেন আছ তুমি দাঁড়িয়ে ?

মোর খেরা ডুবচে যে অতলে,

সংবাদ তুমি তার শোননি ?

সন্ধ্যার মোহনার দাঁড়িয়ে—

মিছে কেন ফিরে চাও আমারে ?

মোরে অমুদরনের মাঝারে

মৃত্যুর সিন্ধুখিনি শোননি ?

মন্দির দ্বার তব শুলিয়া—

ইজিতে আজ মোরে ডেকেছো ?

সীমাহীন নীলাকাশ ভরিয়া

দুর্দিন বন্যেছে বোঝানি ?

ওগো দুর্গম পথ চারিদিক

কেন এলেনিলে মোর জীবনে ?

কেন দ্বিগলিলে হোলা লহলা

মোর উদ্যান বন খানিরে ?

নাথল ছিলে নিশিধিন আমারই

করোনাই প্রতিবাদ অকাজে

যুরে মরেছিল যবে আধারে

তুমি এনেছিলে মোরে আলোকে।

তব রাণী ছেড়ে দাঁও আজিকে

আর কেন মিছে থাকো দাঁড়িয়ে

—দুর্দিন বন্যলো যে বোঝানি

বলো রাণী কবে আর বুঝিবে ?

বঙ্গীয়-সঙ্গীত সমিতি (দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন)

[আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত]

গতপূর্ব শনিবার ২রা এপ্রিল, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার শ্রীযুক্ত কেশদীপিংহ নাহার মহাশয়ের উদ্বোধন প্রাতিষ্ঠিত “বঙ্গীয়-সঙ্গীত সমিতির” উদ্বোধন বঙ্গীয়-সঙ্গীত-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ম্যাডান থিয়েটারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

একর চার সাড়ে চার আগে, পাথুরিয়া-ঘাটার স্বনামধন্য সঙ্গীতকলারমিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, তালতালার মিঃ কেশদীপিংহ নাহার ও অধ্যাতনামা শ্রীযুক্ত প্রণবেশ সিংহের পরিচালনায় কলিকাতা সংস্কৃত বসেজে একটি সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিনেট হল একটি সঙ্গীত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সে বৎসর সুপ্রসিদ্ধ খেরাবী কৈফাজ খাঁ সাহেব তাঁহার অনমুকরণীয় সঙ্গীতনৈপুণ্য প্রদর্শনে আমাদের চমৎকৃত করিয়াছিলেন। পর বৎসর এই সম্মেলনটির অনুষ্ঠান হয় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে। এবং বৎসর ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তবয়স্ক সঙ্গীতরত্নাকর নাসির উদ্দীন খাঁ সাহেব (লোকপ্রসিদ্ধ আগাবন্দে খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র) তাঁহার পাণ্ডিত্য, কণ্ঠ ও চরিত্র আদর্শে, ও অপরূপ কলাবোশলে আমাদের চিত্ত ভর করিয়া যান। কিন্তু এই বৎসরই সঙ্গীত-সম্মেলনে বিবাদের সূত্রপাত ঘটে, ও তাহার ফলে বঙ্গীয়-সঙ্গীত-সমিতির উদ্ভব হয়। তাই তৃতীয় বৎসর আমরা এইটি সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশনে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হইয়া-ছিলাম। আর এবার এই চতুর্থ বৎসরে দেখিতেছি কলিকাতার তিনটি সঙ্গীত-সম্মেলন হইতেছে। প্রণবেশ বাবুর কর্তৃত্ব পরিচালিত

একটি অনুষ্ঠান অত্যন্ত শোচনীয় বিশৃঙ্খলার লবিত প্রায় মাস আড়াই পূর্বে হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়টি মিঃ নাহারের পরিচালিত সঙ্গীত-সমিতির উদ্বোধন সঙ্গ অনুষ্ঠিত হইল। আর তৃতীয়টি ভূপেন্দ্র বাবুর তত্ত্বাবধানে আগামী কলা হইতে অনুষ্ঠিত হইবে। সুনিয়ন্ত্রিতাম যে মিঃ নাহারের প্রথম অধিবেশনে নানারূপ বিশৃঙ্খলাও ঘটিয়াছিল। এবার দ্বিতীয় বার্ষিক, অধিবেশনে নিম্নলিখিত কিছু বিলম্বিত হইলেও আমরা অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর পাইয়াছিলাম।

পূর্ব বৎসরের ত্রায় এবারও সম্মেলনের উদ্বোধনে নেতৃত্ব করেন সন্তোষের মহারাজা নারায়ণনাথ চৌধুরী মহাশয়। মহারাজার প্রস্তানের পর সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতি মাননীয় ত্রিপুরাদিগতি সভার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন, ও কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দের উপস্থিতিতে এই দিনত্রয়ব্যাপী অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলে পরিসমাপ্তি লাভ করে। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিয়দর্শন পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত স্মৃতিগীতিদ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন; ও তাঁহার মুখে উচ্চারিত “বন্দে মাতরম” স্বনির লক্ষে লক্ষ সভার কার্যারম্ভ হয়। কতিপয় বালিকা সুনীলচন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে “জনগণ-মন” গানটি গাহিবার পর মাননীয় সন্তো-বাদিপতি অতি সংক্ষেপেই তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। এই “জনগণমন” গানটি কি সঙ্গীত-সম্মেলন মাঝেই সংক্রান্ত হইয়া পড়িল। ভূপেন্দ্র বাবুর সম্মেলনে ত বাদন্তী

বিদ্যাবীথী ইহা একরূপ অপরিহার্য অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। প্রণবেশ সিংহের সম্মেলনেও এই গান শুনিয়াছি। আবার মিঃ নাহারের প্রতিষ্ঠানেও সেট একট গান! তাহার উপর আবার গানটির পরিসমাপ্তির মুখে কেবলই তাল কাটিয়া বাইতেছিল। ইহার পর সমিতির অন্ততম সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, শ্রীকৃত রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমিতির বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তাহার পর মিউনিসিপ্যালিটির প্রসিদ্ধ সুরকর্তা চিত্রাভিনেতা সাইগল একখানি গজল গান করেন। এই সকল চিত্রাভিনেতার গান চিত্রেই চলিতে পারে। উচ্চ সঙ্গীতের আলরে, বিশেষ করিয়া উদ্বোধনের সময়ে অন্য কোন বিশিষ্ট গায়কের উপর এতদার ত্রস্ত করিলেই ভাল হইত। ইহার পর প্রদ্যেয় শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু ইম্বন কল্যাণে একখানি পেদাল গান করেন। আমাদেরইগের মনে হয়, রমেশবাবু স্বয়ং উদ্বোধন-সঙ্গীতের



বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ গীতরানী—
শ্রীমতী গঙ্গাবাই গাঙ্গাঈ

ভার লইলেই পারিতেন। কারণ, স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ যে কয়জন এ আসরে দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক প্রবীণ সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা ছাড়িয়া দিলে রমেশ বাবুর আলাপ ও খেরাল গানই সঙ্গীত-অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ও স্বরগ্রাহী হইয়াছিল। ইহার পর কুমার লটাজ দেববর্ধন তাঁহার সেই পেটেন্ট তথাকথিত বাংলা ক্যাসিক্যাল গান (?) “কন কন মন্দিরা বাজে” গাহিয়া শ্রেতৃবর্গের কাণ কালা-পালা করিবার উপক্রম করেন।

ইহার পর আসরে অবতীর্ণ হইলেন পণ্ডিতচৌ-ফেরৎ আমাধের অতি আদরের “চিরপুস্তান অথচ চিরতরুণ মটুয়া” (ওরফে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত দ্বিলীপকুমার রায়)। দ্বিলীপ-কুমারের একটা বাহাদুরি আছে এই যে, তিনি ভারতের কোন সঙ্গীতের আসরে বড় একটা খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীত গাহেন না, গাহেন বিদেশী লোকসঙ্গীত (Folksong); আবার বিদেশি গিয়া যে সব দেশের সঙ্গীতজ্ঞদের সম্মুখে প্রাচীন ভারতীয় ক্যাসিক্যাল সঙ্গীতের নমুনা দেখাইতে কোমর বাঁধেন। বাহা হুটক, তাঁহার লেখিকা গানের মধ্যে ছিল একটি রাশিয়ান লোকসঙ্গীতের অতিবিকৃত অনুল্লরূপে রচিত (স্বরচিত?) একটি বাংলা লোকসঙ্গীতের ভ্রাকামীপূর্ণ আবৃত্তি। ইহাকে আবৃত্তি বলিলে আমাধের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ইহা যদি সঙ্গীত হয়, তবে যুক্তিতে হইবে সারা ভারতে এক দ্বিলীপ-কুমার ছাড়া আর কেহই গান জানেন না। দ্বিতীয় গানটি শ্রীরাম সুরবিখ্যাত তখন—“যে গিরিধারী গোপাল হুস্মান ন কোই”। শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিলাম, বোধ হয় এইরূপ গানের নমুনা নিত্য একাকী শুনিতে পাঠে লোকে তবে স্বার্থপর, এই আশঙ্কার পণ্ডিতচৌর শ্রীঅরবিন্দ দ্বিলীপকুমারকে সর্বসম্মতির মহাত্মার আশ্রমে ডেপুটেশনে

পাঠাইয়াছেন। আমাধের কোন রসিক বন্ধু লেখিন গান শুনিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন— একেবারে “তত্ত্বাবভাবিত” অবস্থা!—পূর্ণ শ্রীরাম ভাবে ওতপ্রোত—অনুপ্রাণিত—ডগদগারিত ইত্যাদি। Souvenir প্রোগ্রামে দ্বিলীপকুমারের যে উদ্বাস-ভক্ত-কবি-cum-লাখকভাবের চিত্র ছাপা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, তিনি শ্রীমুখি খেচড়ে লাভ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। শুধু ঘেঘরি নারদের মত একটি ঢেকির যা অভাব! সেইটি জুটিলেই এ দ্বিলীপলিন হের মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া তিনি এবার হইতে শূন্য-মার্গেই শুধু বিচরণ করিবেন! দ্বিলীপবাবুর এরূপ গীতিলতা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত আবহাওয়ার পরিপুষ্ট ও পুষ্টিত হইতে পারে; কিন্তু সঙ্গীত-আলয়ের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহাকে তুলিয়া রোপণ করিলে অকালে শুকাইয়া যাওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব, আমরা সঙ্গীত-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণকে স্মরণ করাইয়া দিই, যেন তাঁহারা অচিরে দ্বিলীপকুমারকে “গজ গজ পরং স্থানং স্বস্থানং” বলিয়া মুঠো মুঠো রাত্তা জবার অজলি দিয়া বিদায় দেন; নতুবা প্রত্যাবার্ত্ত হইতে হইবে।

ইহার পর বরোয়ার ওস্তাদ নিসার হোলেন খাঁ সাহেব একখানি বেহাগের আলাপ ও খেরাল গান আরম্ভ করেন। খাঁ সাহেবের গীতিপদ্ধতিতে ভারতের স্বনামধন্য খেরালিয়া ওস্তাদ কৈরাজ খাঁ সাহেবের প্রভাব স্পষ্ট প্রতিকলিত দেখা যায়। অথচ কৈরাজ খাঁর গানে যে প্রাণ, হৃদয় ও ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে—নিসার হোলেন খাঁ সাহেবের গানে তাহার একান্ত অভাব। কৈরাজ খাঁর তান-বাটের হুস্মান হুস্মান কাজগুলি অসঙ্গীতজ্ঞেরও চিত্তে চমৎকার জন্মাইয়া দেয়। তাঁহার সুরের বৈচিত্র্য ও কণ্ঠের ঐশ্বর্য্যও সকল গায়কেরই একান্ত কাব্য। পক্ষান্তরে নিসার হোলেন খাঁ সাহেবের সুরে সে সমৃদ্ধি বৈচিত্র্য বা হৃদয়ের আভাসও মিলিল না। বেহাগের

মত মনপ্রাণস্থূতর সুরও তাঁহার গলায় উঠিয়া নিত্য একঘেরে শুনাইতে লাগিল— ইহা অপেক্ষা ভাংঘের কথা আর কি থাকিতে পারে! ইহার পর আনিলেন বোম্বাইয়ের শ্রীমতী ভাংসেন্না কুন্তেকার। ইহার খেরাল গানখানি চলনলই। গাহিবার চণ্ডের ঘোরেই কোনরকমে উৎরাইয়া গিয়াছিল। শ্রীমতী খানি ইনি মন্দ আরম্ভ করেন নি। ইহার যেরূপ কণ্ঠ, তাহাতে খেরাল অপেক্ষা শ্রীমতী লাগে ভাল। কিন্তু হুঁচুগা এই যে লজের লগতীটি একেবারে অসামান্য হইয়া উঠিলেন। গায়িকা তাঁহার সুরমা-আঁকা



উস্তাদ ভারতের কথক নৃত্য সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নর্তক লক্ষ্মীনাথানী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শঙ্কুপ্রসাদ মিশ্র

আঁখিতে দুই চারিবার চোখ রাঙানি দিলেন—অবশেষে রসভঙ্গ হয় দেখিয়া মধ্যপথেই গান বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন।

এইবার আনিলেন বোম্বাইবাসিনী বাই গলাবাই গাঙ্গারী। ইহার অনাকর্ষক বর্ণনডালি ও হাবভাব দেখিয়া প্রথম মনে হইয়াছিল যে, ইনি আর কি

গার্বিবেন-তু লোকহালান শার হইবে
মাত্র! কিন্তু শ্রীমতী হির-বীর ভাবে
বলিয়া বীরে অতি বীরে বেরূপ অনবদ্য ভক্তিতে
মিঞা মল্লারের আলাপ আশ্রয় করিলেন,
তাহাতে প্রণমেই মনে পড়িল স্বর্গত লজ্জিত-
মন্ত্রাটীখী নাহেব আবদুল করিম খাঁ নাহেবের
কথা। লম্বলনের কোন একজন কর্তৃস্থানীয়
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসায় জানা গেল বাই গজাবাই
আবদুল করিমের পরিণতবয়সের ছাত্রী।
যখন লজ্জিতের সহিত পাল্লা দিয়া তিনি কঠে
বিভিন্ন সুরের সারগম তুলিতেছিলেন, তখন
প্রত্যেক শ্রোতাই প্রস্তুতপ্রতিভার মত নিশ্চল-
ভাবে বলিয়া যে অপরূপ লজ্জিতনৈপুণ্যের
তথ্যিক করিতেছিলেন। তাঁহার তান-বাট
প্রভৃতি খেলার বিভিন্ন প্রকার অঙ্কুরের
ভুলনা বিল। তাঁহার কঠ মধুর, সুরেলা ও
সংকল্প-সুউচ্চ। ঘোড়ের উপর এবারকার
লম্বলনে বাহির হইতে আগত শিল্পিরূপের
টনিট শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন, একথা বলা বাঙাল্য
মাত্র। প্রথম দিনে মিঞা মল্লার ও জয়-
জয়ন্তী, দ্বিতীয় দিনে হিন্দোল ও যোগিয়া ও
তৃতীয় দিনে লক্ষ্মী, তিলক ও বাহারের
লাহায্যে শ্রীমতী গজাবাই যে সুরের ত্রৈলোক্য
বুনিয়াদিলেন, তাহার মোট চিরদিন আমাদের
মনে অবিস্মরণীয় থাকিবে। লোমবারে লক্ষ্মী
তিলক ও বাহার গানগুলি লক্ষ্যসাধারণের
অন্ত "ব্রডকাষ্ট" করা হইয়াছিল।

ইহার পর উদীয়মান ঋণশী শ্রীযুক্ত
গণিতমোহন সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঋণশ
আলাপ আর তেমন জমে নাই। এই দিনের
অজ্ঞাত গায়ক-গায়িকাগণের প্রথম উল্লেখ-
যোগ্য নহে।

পরদিবসে (রবিবার) প্রাতে অধিকাংশ
গায়ক-গায়িকার উদ্ভবই অনুল্লেকযোগ্য।
বিশেষ করিয়া লাহোরের কুমারী শীলা শারদার
ভৈরবীর খেরাল নিহাত বাজে বলা চলে। নাক্সা
অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রমোহন বসুর ভজন ও আধুনিক
বাদলা গান একশ্রেণীর শ্রেতৃগণের শ্রীতিকর
হইয়াছিল। অনন্তর লজ্জিত-মহিতির অজ্ঞাত
সহযোগী সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ লজ্জিতশিল্পী
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম
শ্রেণীর শিল্পীর উপযুক্ত দরম দিয়া "মালকোষ"
গাহিয়া আসরের শ্রী ফিরাইয়া আনেন।
বাঙালার যুবক গায়কগণের পক্ষ হইতে একমাত্র
রমেশবাবুই অবাঙালীর মধ্যে বাঙালার মুখ
উজ্জ্বল রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিলে অতি-
শয়োক্তি করা হইবে না। আমরা আশা
করি, আরও কঠোর সাধনার দ্বারা রমেশবাবু
তাঁহার নিজ বংশগৌরব অটুট রাখিয়া বিষ্ণুপুর
সম্প্রদায়ের নাম বাঙাল্য লজ্জিতের ইতিহাসে
চির সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন।

ইহার পর কুমারী চিত্রলেখা গঙ্গুলীর
চুম্বী গান শিকাগিনী হিসাবে সুশ্রাব্য।
কুমারী অরুণা বাগ্‌চীর আধুনিক নৃত্য অচল।
অনন্তর বরোদার নিসার হোমেন খাঁ নাহেব
এদিনও একখানি কেদারা ও একখানি জয়-
জয়ন্তী রাগের মোট দুইখানি খেরাল গাহেন।
গান দুইখানি ব্রডকাষ্ট করা হইলেও পূর্বে
দিনের মতই নীরণ ও একঘেয়ে লাগিতেছিল।
কুমারী তুমারিকা সুখাজির আধুনিক নৃত্যটি
বিশেষস্ববর্জিত। কুমারী গীতিরায় ও
দীপ্তিরায়ের নৃত্যজলি একরূপ আসরের অনু-
পযোগী—প্রতিযোগিতায় স্থান পাইতে পারে।
লাহোরের রেখা শারদা মীরার ভূমিকায় যে

নৃত্য ও ভজনের নমুনা দেখাইলেন, লতাকার
মীরার ভজনকে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ভাল
বলিয়া কল্পনা করিলেও শ্রদ্ধা রাখিতে পারা
যায় না। এই শীলা ও রেখা শারদা দুইটিকে
লাহোর হইতে আমদানী করিয়া লম্বলন-
কর্তৃপক্ষ পাঞ্জাবের লজ্জিতকলা লম্বলন
আমাদের যেরূপ ধারণা জন্মাইয়া ছিলেন,
তাহা নিঃশেষে, মুছিয়া ফেলিতে বহু বৎসর
লাগিবে। শ্রীমতী তৎসম্পন্ন কুস্তকার
'মালকোষ' ও 'ভৈরবী (চুম্বী)' গাহেন।
প্রথম দিন অপেক্ষা এদিন তাঁহার কৃতিত্ব
বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার পর
লক্ষ্মীএর সুবিধাত কথকনৃত্যবিৎ পণ্ডিত
শম্ভুপসাদ মিশ্র তাঁহার অপরূপ নৃত্যকলা
দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে বিমোহিত করেন।
তাঁহার নৃত্যকলার সমালোচনা করিবার স্পর্ধা
আমরা রাখি না। অথবা আমাদের প্রবৃত্ত
প্রশংসাপত্রেরও কোন তোয়াক্কা তিনি না
রাখিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার নৈতিক
অবস্থা লম্বলন লামাত্র ছুই একটি ব্যাপার বাহ্য
আমাদের চোখে পড়িয়াছে বা কণে আদিয়া
পৌছিয়াছে, তাহাতে আমরা বিশেষ আশ্রয়
হইতে পারিতেছি না। তিনি যেন স্বর্ণ
রাধেন-যে, তাঁহার সুরিভাস্ত্র নৃত্যকলাজ্ঞান
অপেক্ষাও উগ্রবীর্য্য তরল পানীরের প্রভাব
অনেক অধিক কার্য্যকরী, এবং দ্বিতীয়ের
অধীন হইয়া পড়িলে প্রথমটির লোপ হইতে
বেশী দেরী লাগে না। স্বর্গত লজ্জিত মন্ত্রাট
বিশ্বনাথজী রাও হইতে বর্তমানযুগের গির-
দর্শন লজ্জিত পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বালী শাস্ত্রী
পর্য্যন্ত কেহই এ অসামান্য শক্তিময়ী বাক্য
দেবী ও তাঁহার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অভিজ্ঞে



ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

সমর্থ হন নাই—ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষদৃষ্ট। তাই এই সতর্কতার বাণী আমরা পূর্ব হইতে উল্লেখ করিতেছি। পণ্ডিত শত্ৰুপ্রসাদের নৃত্যের সহিত তুলনায় শ্রীমতী কমলেশ কুমারীর নৃত্যদৃষ্ট নিতান্তই ছেলেমানুষী বলিয়া বোধ হইতেছিল। এলব জিনিব ফিল্মফেটে লাগে ভাল। মফের উপর—বিশেষ করিয়া এইরূপ একটি স্তরুগভীর সঙ্গীতের আসরে এ সকল দৃষ্ট একেবারেই বর্জনীয়।

তৃতীয় দিবসে (৪ঠা এপ্রিল প্রাতঃকালে) সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুব্রতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরবাহার বড়ই সুরম্বর লাগিল। অত্যন্ত শিল্পিগণের প্রযত্ন অনুলেখযোগ্য। সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে ভারতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ফ্রপদিয়া সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভায়ানট রানের আলাপ ও ফ্রপদ গাফিয়াছিলেন। সঙ্গীতজগতে বাঙলার বৈশিষ্ট্য ফ্রপদে। আর এই ফ্রপদ গানের শিক্ষাব্যবস্থা বলিয়া বিষ্ণুপুরের নাম ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে চিরসমুজ্জ্বল রহিবে। বর্তমানে গোপেশ্বরবাবু এই বিষ্ণুপুর-সম্প্রদায়ের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক রূপে বাঙলার সঙ্গীতাকালে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বোধনের দীপ্তি এ পরিণত বয়সে কিঞ্চিৎ স্নান হইয়া পড়িলেও তরুণের দলে তাঁহার সমকক্ষতা করিবার মত একটিও গায়ক এ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিল না— ইহা একাধারে আমাদের আনন্দ ও চঞ্চলকে উদ্ভুদ্ধ করিয়া তুলে।

গঙ্গাবাই গাঙ্গারীর শঙ্করা, তিলজ ও বাহারের খেয়াল এই আসরের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণের বিষয়। প্রকৃতির ভীষণ স্নিগ্ধ রূপ গানের প্রতিটি ছত্রের মধ্যে দিয়া ক্রমে ক্রমে তুলিতে হয়, যে নৈপুণ্য গঙ্গাবাই গাঙ্গারীর সঙ্গীত যিনি শুনে নাই, তিনি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আমরা এই তরুণ গীতসাধিকার উজ্জল ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে নিঃসন্দেহ।

রামপুরের মেহেরী হোসেন খাঁ সাহেবের মালকোবের খেয়াল অন্তরে কোনরূপ দ্বাগ দিতে পারে নাই। এই দিনও নিম্নার হোসেন খাঁ সাহেব একসঙ্গে ফ্রপদ, খেয়াল ও তেলেনা গান করেন। বলস্তু রানের অতি বিখ্যাত গান “ফাঙ্গুরা বিহরে ঘন” গানটিও ইহার গাহিবার ঘোষে প্রায় মাঠে মারা গেল বলা চলে। সঙ্গীতের technique আয়ত্ব করিলেই যে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যায় না—খাঁ সাহেব তাহার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।

কুমারী সবল নাহারের নৃত্য দেখিয়া বোধ হইল—ইহার শিক্ষাদাতার এখনও বহু শিক্ষা ও সাধনা প্রয়োজন। দীপ্তি ও গীতি রায়ের নৃত্য প্রশংসার অযোগ্য হইলেও লাহোরের রেখা শায়খার নৃত্যের মত নিচক বাজে নহে।

এই দিনের আসরে চিত্রাভিনেতা সাইগলের গীতের ব্যবস্থা না থাকিলেই বোধ হয় ভাল হইত। তবে অধিক দৃষ্টিভোজনে অক্ষুণ্ণ হইলে কখন কখন তিস্তিভীতেই রুচি ফিরাইয়া আনে। বোধ হয়, এই হিসাবে কর্তৃপক্ষগণ মধ্যে মধ্যে এই জাতীয় কয়েকটি নৃত্য-গীতের সমাবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাধালাল মজুমদারের ঐক্যতান বাজনেও

এইরূপ নৃত্যদলের বৈচিত্র্য কিছু ছিল। তবে বিদেশী সুরের সহিত ভারতীয় সুরের মিশ্রণ করিবার জন্ত যতদূর মাত্রাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, ততটুকু প্রকাশ হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

অধিবেশনের সমাপ্তি হয় পণ্ডিত শত্ৰুপ্রসাদ ও তাঁহার ছাত্রী শ্রীমতী কমলেশ-কুমারীর যুগ্ম রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে। শ্রীমতী পণ্ডিতজীর ছাত্রী হউন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতজী তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান, পঞ্চমর্ষাধা, বংশগৌরব ও সাম্প্রদায়িক কল্যাণতার অভিজাত্য একেবারে অতলান্তিকের অতল তলে বিলম্বিত হইয়া তাঁহা অপেক্ষা সর্গ-বিষয়ে নিকটী এক অতি সাধারণ চিত্রাভিনেত্রীর সহিত যুগ্মনৃত্যে প্রযুক্ত হইতে বিদু-মাত্র কুণ্ঠা বোধ করিলেন না—ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। শ্রীমতীর নৃত্যে অকুশলতা পণ্ডিতজীর অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নৃত্যকল-কৌশলকে প্রতি পদেই বাহ্যত করিতেছিল—ইহা যে রক্তনীর রসিক বর্শকমাত্রেরই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমতীকে সুবিধা দিবার জন্ত শত্ৰুপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ আপনার শক্তিকে পর করায় নৃত্যের রস

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা গ্যারান্টি চিরস্থায়ী !



ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অল্পেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রায়জনের মনোমত আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা

পাওয়া যায়। স্থায়িত্বে ও গঠন নৈপুণ্যে বিশেষ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ সোণার ভায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড গ্রুপ ক্যারেট গোল্ড সিগ্নিফেট

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি. বি. ৪৮৮২

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন

[আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত]

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা-পূর্ব এয়ারের মত সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু নিত্যন্ত নির্কিয়ে কি না, সে বিষয়ে বহু মতান্তরের দৃষ্টি আকর্ষণিত হইছে। তবে বর্তমান লংঘার আমরা এ লক্ষ্যে কোনরূপ আলোচনা করিব না। অজ্ঞাত পত্রিকার সম্পাদকের মন্তব্য রূপেই প্রতিযোগিতার বিচার-প্রণালীর বিরুদ্ধে নানারূপ অপ্রিয় লংঘার প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে কোন কোন লংঘারিকের নামও জড়িত থাকার সন্দেহ ইঙ্গিত পাইয়া বিস্তৃত হইলাম। অবশ্য প্রতিযোগিতার শেষদিনে শ্রদ্ধেয় লালাবাহু বঙ্গ বক্তৃতার মধ্যে এ বিষয়ে অপকৃপাত অঙ্গুলীস্পর্শের স্তম্ভ অগ্রসর হইতে সাধারণকে সাধরে আহ্বান করিয়াছেন, ও সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয়ও সেই মর্মে একখানি পত্র দৈনিক পত্রিকার প্রকাশিত করিয়াছেন। এখন সাধারণের তরফ হইতে এ বিষয়ে একটি “অঙ্গুলীস্পর্শ-সমিতি” গঠিত করিয়া অঙ্গুলীস্পর্শের কলাকল লক্ষ্যে একটি টিভি প্রদান অবিলম্বে পরিপূর্ণ মাত্রায় ফুটিতে পারে নাই। তাই এ অধিবেশন বর্ষান্তর: “বঙ্গের লম্পার” হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তথাপি যি: নাহার ও তাঁহার লক্ষ্যসীমার এই প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে আরম্ভ ঘটাইয়া লক্ষ্যমণ্ডিত বলিয়াই স্বীকার করিব। এবং আশা করি যে, আগামী বৎসরে তৃতীয় অধিবেশন ইহা অপেক্ষাও উজ্জল-মধুর হইয়া উঠিবে।

আবশ্যিক বলিয়া মনে করি। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এইরূপ অঙ্গুলীস্পর্শের কোনরূপ বর্ষান্তর অধিবেশন পত্র দ্বারা অঙ্গুলীস্পর্শের জ্ঞান, তাহা হইলে আমরা সে পত্র লক্ষ্যে প্রকাশিত করিব। কিন্তু অধিবেশনের মূলে যদি কোন লক্ষ্য না থাকে, অথবা অধিবেশন পত্রগুলি যদি কেবল কুংলা বা পরিনকার পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে লক্ষ্য পত্র প্রকাশিত করা হইবে না। পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রতিযোগিতা-পূর্বের পর সম্মেলনের আসর। এবার সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট হয় ম্যাডান থিয়েটারে। স্থান নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। গত বৎসর ও তাহার পূর্ব বৎসর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট গৃহে সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে কোন বিশেষ গোলামাল হয় নাই। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে চিত্রজগতের পেশাদার অভিনেত্রী এগারো রম্যারও ইনস্টিটিউট রঙ্গমঞ্চ তাঁহার তথা কথিত তাজোর নৃত্য দ্বৈতাবতার পর শ্রীযুক্ত অশোক শাস্ত্রী মহাশয় এই ধরালীর পৃষ্ঠাতেই অতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের চেষ্টাশূন্য হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ মাল দুই আড়াই পূর্বের একটি সঙ্গীতের আসর উপলক্ষে এই ইনস্টিটিউটেই আর একজন আরও বিখ্যাত পেশাদার গায়িকা শ্রীমতী কেশরীমহাশয়ী একাধিক দিবস তাঁহার গীত সৈপুণ্য প্রদর্শন, করেন। তখনও কোন

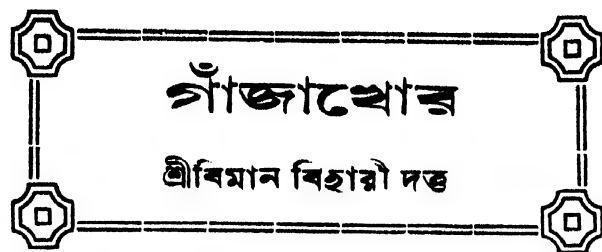
আপত্তি হয় নাই। হঠাৎ দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত কেশরীমহাশয়ী মহাশয়ের উদ্যোগে অঙ্গুলীস্পর্শ-সঙ্গীত-আসর ও নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলনের আসর ম্যাডানের রঙ্গমঞ্চে স্থানান্তরিত হইল। কারণ, উক্ত অঙ্গুলীস্পর্শে একাধিক পেশাদার চিত্রাভিনেত্রী, নর্তকী ও গায়িকার আমদানী হইতেছে। ইনস্টিটিউটের পবিত্রতা অবশ্য ইহাতে অটুট রহিল যেখানি আমরা সুখী। কিন্তু ম্যাডানে যে বাঙ্গালী পাড়ার মত গানের আসর জমিতে পারে না, ইহা আমরা নাহার-সঙ্গীত-সম্মেলনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার পরিবর্তে যদি উক্তর কলিকাতার কোন রঙ্গমঞ্চ বা চিত্রগৃহেই চারদিনের জন্ত ভাড়া লওয়া হইত, তাহা হইলে বেশী আবহাওয়ার বেশী গান জমিত বেশী। এত আর বক্তৃতা করেন ঘোষের পরিচালিত উৎসবের বেশী-বিবেশী কিছুড়ী নাচ নয়—যে বঙালী না দেখুক, লাহেবেরা দেখিয়া তারিক করিলেই হইল।

আর একটি কথা। সঙ্গীত সম্মেলন অর্থে কেবল নাচগান বাজনার কোয়ার্টা নহে। সঙ্গীত লক্ষ্যে প্রকৃত শিক্ষার্থী জনের নানা সমস্তা থাকা খুবই স্বাভাবিক। অতএব, এসকল সমস্তার লম্পাধনকরে একটি বিচার সভার আয়োজন হইলে বড় ভাল হয়। বিচারসভা বলিতে আমরা শুধু গতবৎসরের মত একটা কীকা বক্তৃতা-সভার গ্রহণন করিতে বলিতেছিলাম। উহাতে রীতিমত বিচার চলিবে। কেহ প্রশ্ন করিবেন, অপর উত্তর দিবেন—এইরূপে বাহাধুবাধ চলিবে—অবশেষে মধ্যাহ্নগণ একটা স্তার লক্ষ ও শাস্ত লক্ষ দীপাংলা করিয়া দিবেন। শুনা

বাইতেছে, কান্দীর সুবিখ্যাত শ্রবীণতম ঞ্ণদী
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সুখোপাধ্যায়
মহাশয় এবার সম্মেলনে আলিভেছেন।
সঙ্গীতমার্গও পণ্ডিত ওঙ্কারনাথী ঠাকুরও
আলিবেন। এখানেও বহু সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি
রহিয়াছেন। ইহাধের সম্বারে একটা
বিচারসভা বলিলে মন্দ দৃশ্য হইবে না।
অবশ্য এই বিচার সভাটি সম্মেলনের চারি দিন
ছাড়া অন্য একটি পৃথক্ দিনে ইউনিভার্সিটি
ইনষ্টিটিউটে আহুত হওয়াই উচিত। এদিন
যাহারা বর্ষক থাকিবেন, তাঁহাদের নিকট
হইতে বর্ষনী লওয়া হইবে না—এরূপ ব্যবস্থাও
করা উচিত। ইহাতে কোনরূপ গোলমালেরও
সম্ভাবনা নাই। কারণ, এরূপ সভার
সঙ্গীতজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাতীত অন্য
শ্রেণীর লোক যোগ দিবেন না—ইহা
নিঃসন্দেহ। আগামী কলা শুক্রবার ১৫ই
এপ্রিল হইতে সম্মেলনের প্রারম্ভ। সম্মেলনের
কর্তৃপক্ষগণকে সময় থাকিতে আমরা পুনরায়
স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এবার যেন বৈদিক
স্মৃতিবাচনের অব্যবহিত পরেই “শ্রদ্ধা মাতরম্”
গীতটি অখণ্ডভাবে গীত হইতে কোনরূপ তুল
না হয়।

এবার সম্মেলনে যোগ দিবেন—পণ্ডিত হরি-
নারায়ণজী সুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত ওঙ্কারনাথজী
ঠাকুর, শ্রীমতী কেশরবাই ও শ্রীমতী
হীরাবাই, শ্রীমতী কিরোজ বসু, ইত্যাদি বহু
প্রসিদ্ধ গায়ক ও গায়িকাবৃন্দ।

আমরা শ্রদ্ধের ভূপেন্দ্র বাবুর এই প্রচেষ্টার
সাক্ষ্য কামনা করি। এবিষয়ে আমাদের
নিজস্ব সমালোচনা বারাবাহিক ভাবে বাহির
হইতে থাকিবে।



ভিখন ও সুখলাল, ভিখারী তারা।
আমাদের পাড়ার লতলেই সেই দুই অন্তঃস্র
বন্ধকে বিখ্যাত গাঁজাড়ে বা গাঁজাখোর
ব'লে জানতো। ভিখন,—সে কথা কইত
আখ-ভাজা তীব্র স্বরে, একটা হাত তার
ছিল না; আর একমাথা চুল, চোয়ারে গাল
ও ভিখারীর উপযোগী শতচ্ছিন্ন তালি দেওয়া
কাপড় ছিল তার সম্বল। তবু ওই এক
হাতের পাঁচ আঙ্গুলের দ্বারাই সে বেরকম
ভাবে গাঁজা খেতো টেনে, সে নিজেই
ক'রত গরু অমৃত্যব,—কেননা ও অকলে
ওরকম ভাবে গাঁজা টানতে আর কেউ পারত
না। সুখলাল,—বয়সে কিছু কম। এর
আবার একটা পা ছিল না। চেহারায়,
পৃথিবীর সমস্ত নিয়ন্ত্রণের যা কিছু সমস্তই
ওতে প্রকাশ পেল। বহুদিন পূর্বে, অর্থাৎ
খোঁড়া হবার আগে, ও' একজন ওরই দ্বেলী
মেরেকে ক'লকাতায় কুসুমায় আনে। তার
কাছে নিজের পরিচয় দিরেছিল, একজন
প্রকাণ্ড জমীদার ব'লে। ব্যাপার প্রকাশ
হ'লে সে মেরেটাত ওর মুখে একরকম লাগি
মেরেই চলে গেল। ও' তাতে শুধু কল্পণ
হাপি হেলছিল। বাস্তবিক সুখলালের ওই
হস্তবিহীন বাড়ি পান খেলে দেখতে বেশ
মজা লাগত

ভিখন ও সুখলাল ও-ই ডাষ্টবিনটার
লামনে ব'লে একই লাখে ভিক্ষা ক'রত।
পাড়ার লোকের লাখে এমন আলাপ জমেছিল
যে, পরলা উপায় ওদের পক্ষে ছিল বেশ
সহজ। বাস্তবিক হুঁজনেই ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধ।
..... হঠাৎ একদিন রাজ্যে গোলমালে
যুদ্ধ ভেঙে গেল। চীৎকার শুনে' বাইরের

ফুটপাথে এসে দেখি আরও বহুলোক জমা
হ'রে গেছে এবং তার মধ্যে অশ্রাব্য
গালাগালির ভিতর দ্বিরে ভিখন ও সুখলালের
হাতাহাতি চ'লেছে। তাদের কোনরকমে
থামানোর পর, ভিখন এনে ব'ললে,—“বাবু,
ও শালা সুখলাল কালকের ছোঁড়া, ও বলে
কিনা আমার লাখে পাঞ্জাবিয়ে গাঁজা খাবে?
আমার মত কখন খেতে পারে? কিন্তু ও
শালা ব'লছিল, ও আমার চাইতে বেশী
গাঁজা খায়। ওই জন্তেই ত বাবু আচ্ছা
ক'রে চুকে দিজেছি।”

আমরা ত অবাক! তখনও সুখলালের
কপাল ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। বললাম—
“এখন পালা, তা'না হ'লে পুলিশে যেতে
হবে।”

রাজি তখন অনেক। যুদ্ধ আসছিল না;
উঠে আলো জ্বললাম। হঠাৎ চোখে পড়ল,
রাস্তার কল হ'তে জল এনে ভিখন সুখলালের
কপাল ধুইয়ে দিচ্ছে। রাস্তার তখন কেউই
নেই; নিশ্চয় রাজি।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু ফুটপাথের উপর
ভিখন বা সুখলাল—কাউকেই আর দেখতে
পেলাম না। মনে ভাবলুম, বেটা গাঁজা-
খোরেরা আবার হরত অন্য জায়গার গিরে
গাঁজাটানার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়েছে। দূর
হোকগে ছাই যত ভিখারীর হল।
..... পাড়ার লবাই ভুলে গিরেছিল ওদের
কথা; আমি-ও। মালখানেক পরে হঠাৎ
ভিখনের লাখে দেখা হ'লো আমাদের
পাড়াতেই। দেখলাম পোষাক পরিচ্ছদ
পূর্বের মতই আছে; তবে তাতে আরও
কয়েকটা তালি প'ড়েছে,—আর একটা ছোঁড়া



অলিম্পিক

(সি. বি)

বিলাতের পথে ভারতীয়

ক্রিকেট দল

আজমীরের 'রাজপুতানা ক্রিকেট ক্লাবের' উদ্যোগে এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় একটি 'ভারতীয় প্রাইভেট ক্রিকেট টীম' গত ১২ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই বন্দর থেকে 'এস এস কন্টি রেলো' জাহাজ যোগে বিলাতের পথে যাত্রা করেছে। গত কয়েক বৎসরের পরিত্যক্ত এই ক্রিকেট দলের বিলাত ভ্রমণের প্রচেষ্টাটি এতদিন বাদে কার্যো পরিণত করবার জন্য রাজপুতানা ক্রিকেট ক্লাবের সম্পাদক মিঃ ডবলিউ ডি বেগ ক্রীড়া-মোহীনের প্রশংসা এবং শুভেচ্ছা দাবী করতে পারেন। তা ছাড়া কলিকাতার, তৎকালীন রাজপুতানা ক্লাবের জনপ্রিয় সম্পাদক মিঃ এন এন হিট্র, আজমীরের মিঃ এইচ সি হাস্ এবং করাচীর মিঃ বি ডি শঙ্কর এই বিষয়ে মিঃ বেগকে অনেকাংশে সাহায্য না করলে হয়ত তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা সার্থক

কালো আলোটার কোথা হ'তে জোগাড় ক'রেছে। চোখছোটর মধ্যে একটার ত কিছুই বুঝলাম না; আর একটা লালে লাল। জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কিরে ভিখন, এতদিন কোথার ছিলি? তোর সুখলাল কোথার? তাকে দেখ'চিনা অথচ তুই একা একাই গাঁজা খেয়ে চোখ লাল ক'রে ব'সে আছিলি?"

ভিখন নিমন্ত্রণ তাবে খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল; পরে হঠাৎ রুদ্ধস্বরে কঁধে উঠলো, "বাবু, সুখলাল মরে গেছে.....কর লাখে

হতে পারত না। ডোন্নারপুরের হিল্ হাইনেস্ মহারওয়াল শ্রীশঙ্কর শিংজী বাহাদুরের (কে, সি, আই, ই) দান্ এবং উৎসাহ এই প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। এই ভ্রাম্য-মান দলটির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে ভারতের যে সকল ক্রিকেট খেলোয়াড় 'নিখিল ভারতীয় দলে' স্থান পাইবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সে সভাগালাভ করেন, নি কেবলমাত্র তাঁরাই এই দলে স্থান পেয়েছেন। বাঙ্গালা প্রদেশ থেকে এরিয়াল ক্লাবের উদীয়মান ক্রিকেটার শ্রীযুক্ত কমল ভট্টাচার্য্য এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের জনপ্রিয় ও অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত কার্তিক বহু এই ভ্রাম্যমান দলটিতে স্থান পেয়েছেন। কার্তিক বহুর যোগ্যতা সন্দেহে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইতিপূর্বে তিনি যে নিখিল ভারতীয় দলে কেন স্থান পান্ নি আর গাঁজা খাব.....?" টস্ টস্ ক'রে কয়েক ফৌচী চোখের জল তার চোরাড়ে গালের 'পর দিয়ে গড়িয়ে ছেড়া আলোষ্টারের ওপর গিয়ে প'ড়ল। তার কানো চোখটাও তখন জলে ভস্টি।

বাড়ী এলাম। শোবার সময় শুধু এই-ই মনে এলো, আজ ভিখন গাঁজা খেয়ে চোখ লাল করেনি। চোখের জলেই চোখ লাল ক'রেছে তার বহুর স্মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য।

তাঁহার কোন বৃত্তিবৃত্ত কারণ বুঝে পাওয়া যায় নি। কমল ভট্টাচার্য্য 'অল্ রাউন্ডার' হিনাবে এই দলের শক্তিবর্দ্ধন করে নিজ প্রবেশের গৌরব বজায় রাখতে পারবেন বলে আশা করা যেতে পারে। বাঙ্গালার এই দুটি তরুণ খেলোয়াড় গত ১০ই এপ্রিল তারিখে বি, এন, আর বোম্বাই মেলে বোম্বাই যাত্রা করেছেন। মেজর ই, ডবলিউ, সি রিক্রেটস্ বিলাতে এই ভ্রাম্যমান দলটির ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। মেজর রিক্রেটস্ এবং মিঃ বেগ এই প্রাইভেট ক্রিকেট টীমটির বিলাতে খেলা সম্বন্ধে যথাক্রমে এম সি সি এবং অল্ ইণ্ডিয়া ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সম্মতি লাভ করেছেন।

রাজপুতানা ক্রিকেট ক্লাব গত ১২৩০ সালে এই বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধে প্রথম কল্পনা করেন এবং পরলোকগত সুব্রাহ্মণ্য ভট্টের এন নারায়ণ ভূপ বাহাদুর একটি লম্বোবজনক খেলার তালিকাও প্রস্তুত করেন কিন্তু অনিবার্য্য কারণে সে বছর এই ভ্রমণ, কার্যো পরিণত হয় নি।

১৯৩৫ সালে পুনরায় বিলাত ভ্রমণের একটি খেলার তালিকা প্রস্তুত হবার পর ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড স্বতঃপ্রসূত হয়ে এই ভ্রমণ সম্বন্ধে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেও হঠাৎ কোন লম্বোবজনক কারণে না দেখিয়ে এই ভ্রমণের সমস্ত আয়োজন বিফল করে দেন। সেই কারণে এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও মিঃ বেগ ১৯৩৮ সালে তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যতায় পর্যাবসিত করার নিজের কার্যাক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের খ্যাতি ও বশ অম্লুর রেখে বিলাত থেকে লম্বোবজনে প্রত্যাবর্তন করলে মিঃ বেগই সর্বাপেক্ষা বেশী সুখী ও আনন্দিত হবেন।

নিম্নে নির্ধারিত খেলোয়াড়গণের নাম ও খেলার তালিকা দেওয়া হল।

নির্ধারিত খেলোয়াড়গণ—

- ১। এইউ বোটার্ডাল (বোবাই)
- ২। বাপুদ্রিয়া (বোবাই)
- ৩। এল রামজী (কাথিরায় ও হুকারপুর)
- ৪। এন্ পি বেশরী (হুকারপুর)
- ৫। ভি এল হাজারী (মধ্যভারত)
- ৬। গোপালদাস বেহেরান (করাচী)
- ৭। আন্তিক হোলেন (আলওয়ার এবং টঙ্ক)
- ৮। কার্তিক বহু (বাকাল)
- ৯। কমল ভট্টাচার্য (বাকাল)
- ১০। আসাদ ওয়াহাব (মুর্জ প্রদেশ এবং টঙ্ক)
- ১১। বি ডি শঙ্কর (করাচী এবং লিঙ্গ প্রদেশ)
- ১২। ভাকান্দল হোলেন (হিল্লী)
- ১৩। আজিম খাঁ (আলওয়ার ও জয়পুর)
- ১৪। দীপটাদ (করাচী)
- ১৫। রামপ্রকাশ (লাহোর)
- ১৬। আব্বাস খাঁ (করাচী)
- ১৭। মনীরাম চোপরা (কাশ্মীর এবং লাহোর)
- ১৮। সি এইচ ব্যাকার (আমেদাবাদ)
- ১৯। ডবলিউ ডি বেগ (আজমীর)
- ২০। গুলাব সিং (আজমীর)

খেলার তালিকা—

- ১০ই মে—বেকেন্‌হাম সি সি (বেকেন্‌হাম)
- ১১ই মে—ইণ্ডিয়ান জিমখানা ক্লাব (অষ্টারলি)
- ১৩ই মে—লারে একাধন (কনিংটন ওভাল)
- ১৬ই মে—কল্লকোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (কল্লকোর্ড)
- ১৭ই মে—
- ২০শে ও ২১শে মে—স্মার জুলিয়ান্‌কানের একাধন (নটিংহাম)
- ৩রা এবং ৪ঠা জুন আন্ডারলট্‌ কন্যাও (মাক্‌ডারলট্‌)
- ৬ই, ৭ই এবং ৮ই জুন—ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (ক্যামব্রিজ)
- ১০ই এবং ১১ই জুন—উইন্টনার সি সি (সুইংডন)
- ১৩ই এবং ১৪ই জুন—ইটনরক্‌ সি সি (কিংসলিন)

- ২০শে ও ২১শে জুন—কোকটোন সি সি, (কোকটোন)
- ২৪শে ও ২৫শে জুন—নর্থ মিডলসেক্স সি সি, (হর্পারী, নর্থ লণ্ডন)
- ২৯শে ও ৩০শে জুন—ডাংহাম কাউন্টি ক্লাব (লাণ্ডারল্যাণ্ড)
- ১লা ও ২রা জুলাই—নংদাম বারল্যাণ্ড কাউন্টি ক্লাব (নিউকাসল)
- ৮ই ও ৯ই জুলাই—বার্কনার সি সি (রিডিং)
- ১৩ই জুলাই—গ্রেভেন্ড একাধন (গ্রেভেন্ড)
- ১৪ই ও ১৫ই জুলাই—হাউসহোল্ড ব্রিগেড সি সি (চেলসিয়া, লাইথ লণ্ডন)
- ২০শে ও ২১শে জুলাই—ইণ্ডিয়ান জিমখানা ক্লাব (অষ্টারলি)
- ২২শে ও ২৩শে জুলাই—ল্যাকলার সি সি, (ম্যাঞ্চেস্টার)
- ২৫শে ও ২৬শে জুলাই—লিঙ্কনশায়ার (লিঙ্কন)
- ২৭শে ও ২৮শে জুলাই—ক্রিকেট ক্লাব কনফারেন্স (লণ্ডন)
- ৩০শে ও ৩১শে জুলাই—বেসিংট্রোক ও নর্থ হাম্পশায়ার লিমিটেড হল—(বেসিংট্রোক)

বাইটনকাপ হকি প্রতিযোগিতা

গত শুক্রবার বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত বিখ্যাত বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। আগামী ১৫ই এপ্রিল থেকে এই প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবে। এবছর মোট ৪৪টি হল যোগদান করেছে। এই প্রতিযোগিতায় এর আগে কখনও এত বেশী টীম যোগদান করে নি। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশিষ্ট হলগুলি কলিকাতার তাহের নৈলুয়া দেখাতে আসবে। বোম্বাই থেকে লুন্ডানিয়ানস্ এবং কাঠমন্ডল হল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। প্রথমবার হল অলিম্পিক স্টেডিয়ামে কাঠমন্ডল এবং কাঠমন্ডল হল অলিম্পিক খেলোয়াড় আসলাম, ফিরোজ

ও জুগ খেলতে আসবেন বলে জানা গেছে। গত বছরের বিজয়ী বি এন আর হল আর কার, ট্যাপদেল ও গালিবর্দী অংশ গ্রহণ করবেন। ব্রাহ্মান ক্লাবের পক্ষে পাঞ্জাব প্রাদেশিক হকি হলের অধিকাংশ খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা যাবে। বালি ফিরোজ হল জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ লেটার করওয়ার্ড ম্যানচাঁব ও তাঁর তাই রুপনিংহ খেলবেন। হানীর হলগুলির মধ্যে কাঠমন্ডল, রেজান, মোহনবাগান, পোর্ট কমিশনার ও মহামেডান স্পোর্টিং হল আগন্তুক হলগুলির সঙ্গে অনেক ভাবে প্রতিযোগিতা করবেন বলে আশা করা যায়। নিম্নে এই প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা দেওয়া হল।

প্রথম রাউন্ড

- (১) বি এন আর : মোহনবাগান
- (২) লেন্টজোসেক : পুলিশ
- (৩) ইউনিয়ন স্পোর্টিং : পোর্ট কমিশনার
- (৪) ইষ্ট বেঙ্গল : গিডিন ক্লাব
- (৫) মিউচুয়াল ফিউচ্যার : টাউন ক্লাব
- (৬) এলবার্ট ইউনিয়ন : রেজান
- (৭) শ্রামসেরপুর স্পোর্টিং : উগাড়ী
- (৮) ডালকৌলি : প্রায়ার স্পোর্টিং
- (৯) ভাবানীপুর : ই বি বেলডয়ে
- (১০) ব্যাটেলার ইউনিয়ন (চাক) :

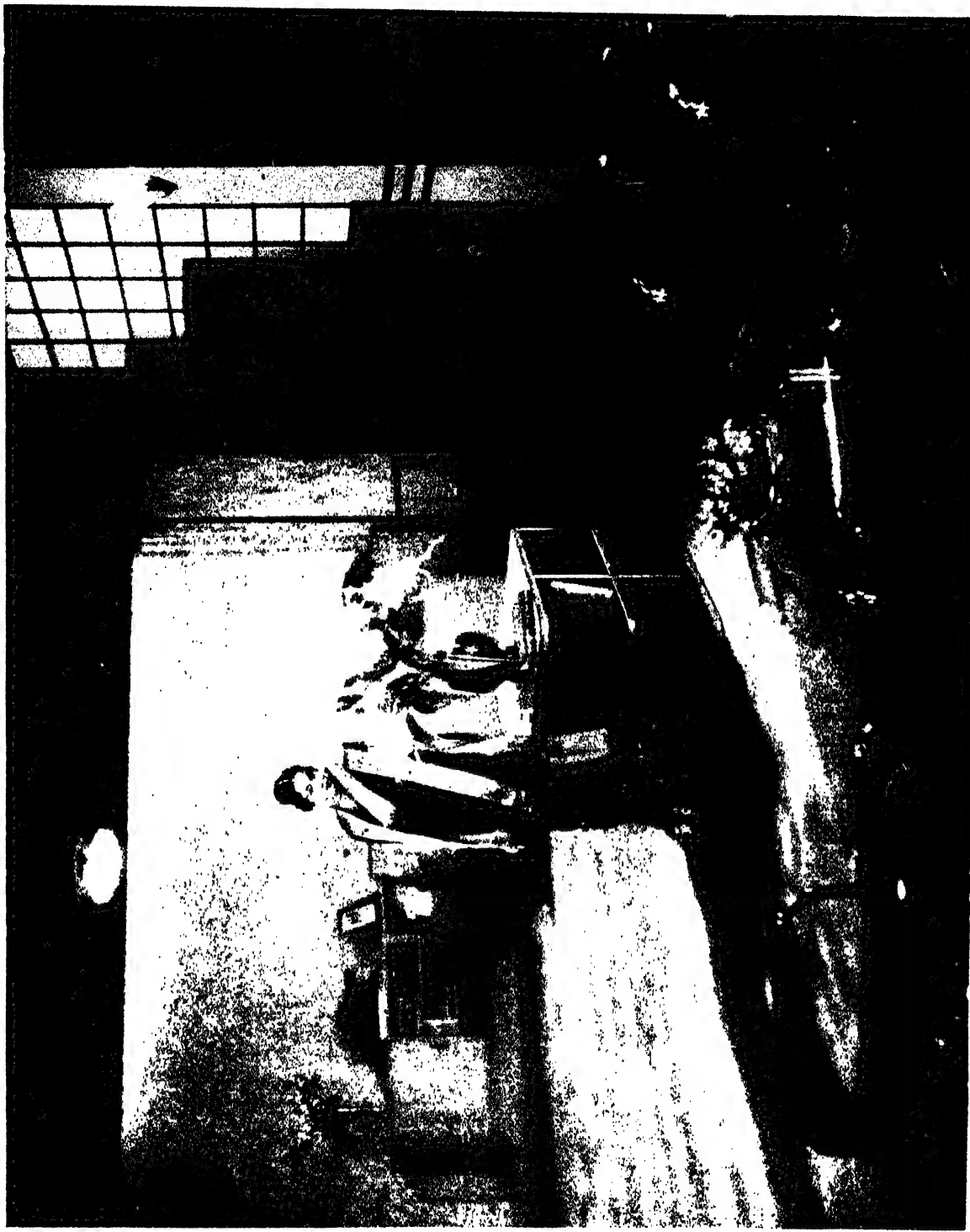
সি এক সি

- (১১) বি জি প্রেস : আর্দেনিয়াজ
- (১২) মহামেডান স্পোর্টিং : ক্যালকাটা কাঠমন্ডল

দ্বিতীয় রাউন্ড

- (ক) পিউ টাইগার : কে পি কলেজ (এলাহাবাদ)
- (গ) জুপাল : কমরেড ক্লাব লক্ষী
- (গ) মুলিম জিমখানা : ইয়ং মেন্স ক্লাব
- (ঘ) বেরিলী স্পোর্টিং : ব্রাহ্মান ক্লাব
- (ঙ) আলীগড় ইউনিভারসিটি : বোম্বাই কাঠমন্ডল
- (১) মীরট : জব্বলপুর স্পোর্টিং
- (১) কালি : অকেশনালস (হিল্লী)
- (১) লাহোর ডিস্ট্রিক্ট : মণিপুর ট্রেটস্
- (১) আর্দ্যানিটোলা (চাক) : নিউ টার (হিল্লী)
- (এ) করিমপুর ক্লাব : লুন্ডানিয়ানস্ (বজ্র)

খেয়ালী চিত্রপট



শ্রী তারতলক্ষী পিকচারেস্‌র “অভিনয়” চিত্রে
অভিনেত্রী শ্রীমতী সাধনা বসু ।



টেলিগ্রাম
'ভ্যারিট'

পরিচালক
গান্ধী মন্ডল নিউজপেপার লি:

টেলিফোন
সিউথ ৪৬৬

১১, চক্ৰবর্তী (মাড়) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, শোধন সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩১শে বৈশাখ ১৩৪৫, ১১শে এপ্রিল ১৯৩৮

মেয়র, ডেপুটী মেয়র ও

চব্বিশ পরগণার চেয়ারম্যান

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক
রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত নির্বাচনে মৌলভী
আসরাফুদ্দিন আহমদ চৌধুরীকে সম্পাদক রূপে
গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার কংগ্রেসে নূতন কর্ম পদ্ধতির
প্রবর্তন করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে
অনাচার দূরীকরণকল্পে যে কর্মসূচির আভাস
দিয়াছেন তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি
কলিকাতার বিভিন্ন জিলা কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন
আহ্বান করিয়াছেন। কর্পোরেশনের ১৯৩৯ সালের
সাধারণ নির্বাচনের প্রাথমিক বন্দোবস্ত করা এই
সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন পল্লীর জনমত
গঠন ও কংগ্রেস-আদর্শে একনিষ্ঠ, দলগত শৃঙ্খলায়
আহ্বান প্রার্থী মনোনয়ন কার্যে এখন হইতেই
মনোনিবেশ করিলে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের
সাকল্য যে সুনিশ্চিত তাহা বলাই বাহুল্য।

আসন্ন মেয়র ও ডেপুটী মেয়রের নির্বাচনের
দিন স্থির হইয়াছে ২৯শে এপ্রিল। সুভাষচন্দ্র এই
নির্বাচনে যে নীতির প্রবর্তন করিয়াছেন আমরা
তাহার পূর্ণ সমর্থন করি। তাঁহার অভিমত যে
এই বৎসর পৌরপতি (Mayor) একজন
মুসলমান হওয়া সমীচিন ও তাঁহার সহকারী হিসাবে
একজন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি
নির্বাচিত হইলে কংগ্রেসের মুসলিম গণ-সংযোগ ও
তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের
নীতির যথার্থতা প্রতিপন্ন হইবে।

মেয়রের পদের জন্য মুসলমানদের মধ্যে
শিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা বিখ্যাত টালিগঞ্জ
পরিবারের প্রতিনিধি প্রিন্স ইউনুস মির্জা এম.
এল. এ. প্রজ্ঞাদলের অন্তর্ভুক্ত মিঃ জালালুদ্দিন
হাসেমী ও বর্তমান কংগ্রেসী ডেপুটী মেয়র মিঃ
জ্যাকেরিয়া প্রার্থী হিসাবে সমুপস্থিত হইয়াছেন।
ঐক্য সম্মিলনে মুশিলাবাদের নবাব বাহাদুরের
নেতৃত্বে শিয়া সম্প্রদায় যে কংগ্রেসে যোগদান
করিবার মনস্ত করিয়াছে উক্ত শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত
মিঃ ইউনুস মির্জার মনোনয়ন বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেসী
ডেপুটী মেয়র হিসাবে মিঃ জ্যাকেরিয়ার দাবীও
উপেক্ষণীয় নহে। অবশিষ্ট প্রার্থী মিঃ হাসেমী
বহু বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং
ইহাদের মধ্যে যিনিই মনোনীত হউন তিনি যে
কংগ্রেসী আদর্শে আহ্বান রহিবেন তাহা মিঃসনেহে
বলা যাইতে পারে।

তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের ডেপুটী লিডার
হিসাবে শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র নস্কর বঙ্গীয় ব্যবস্থা
পরিষদে কংগ্রেসদলের সহিত একযোগে কাজ
করিতেছেন। সুভাষচন্দ্রের হেমবাবুকে তপশীলভুক্ত
জাতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম ডেপুটী মেয়র
নির্বাচনের মনোনয়নের সঙ্গত সর্বভোভাবে সমর্থন-
যোগ্য। কলিকাতা কর্পোরেশনে, ব্যবস্থা পরিষদে
ও চব্বিশ পরগণার জিলা বোর্ডে বহু বৎসর যাবৎ

জনসেবার একাগ্রতা প্রদর্শন করিয়া হেমচন্দ্র সর্বজন্মপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিও নাই।

রাস্তা বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র সেনের ২৪-পরগণা জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্মকাল সমাপ্ত প্রায়। বর্তমান ব্যবস্থা পরিষদে রায় বাহাদুর যে ভাবে সাম্প্রদায়িকতা-দোষচুক্তি হক মঞ্জীমণ্ডলীকে অবিচলিতচিত্তে সমর্থন করিতেছেন তাহাতে তিনি জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছেন। বাংলার জিলা বোর্ডের মধ্যে ২৪ পরগণার স্থায় বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে রায় বাহাদুরের কর্মহীনতা ও ক্রৈব্যা তাঁহার পূর্ণনির্বাচনের আশার দীপ নির্বাপিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নন্দর কলিকাতার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইলে তিনি রহস্তর কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হইবেন, সুতরাং ২৪

পরগণার চেয়ারম্যান নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আসন্ন চেয়ারম্যান নির্বাচনে শ্রীযুক্ত সুধাংশু মিত্র রায় বাহাদুরকে সহজেই পরাজিত করিতে পারিবেন। ২৪-পরগণার জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব সুপরিচিত চেয়ারম্যান শশিশেখর বসু মহাশয়ের পুত্র বজ্রবর শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর বসু সুধাংশু বাবুর সহকারীর পদ-প্রার্থী। কয়েক বৎসর যাবৎ জিলা বোর্ডে বিরুদ্ধ-বাদীদলের অগ্রভ্রম নেতা হিসাবে পূর্ণেন্দু বাবু যে কর্মদক্ষতা ও দল পরিচালনে বিচক্ষণতা দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি ও সুধাংশু বাবু একযোগে কর্ম করিলে ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের প্রভূত উন্নতি সাধন হইতে পারে। রহস্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ-পথে আমরা সুধাংশু বাবু ও পূর্ণেন্দু বাবুর সাফল্য কামনা করিতেছি।

মুসলিম লীগ

জাতীয় সংগ্রামের অগ্রগতিক কেহ করিয়া বাহাদুর চিত্ত বিদ্রম উপস্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগ অগ্রতম। তুচ্ছ সাম্প্রদায়িকতার দূরী ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান সকল সময়েই প্রচার করিয়া আসিতেছে, এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়াই মুসলিম সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করে, মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতীকই হইতেছে এই মুসলিম লীগ, সুতরাং মুসলিম সমাজের উন্নতি কল্পে মূলমানে মাজেই একমাত্র বর্তব্য এই লীগের পতাকা তলে সমবেত হওয়া।

লক্ষ্য কলিকাতায় এই লীগের যে অধিবেশন সমাপ্ত হইয়া গেল তাহাতেও আমরা অনুরূপ আশা লক্ষ্য করিয়াছি। মিঃ জিন্না তাঁহার অভিতাবনে যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াইয়াছেন তাহাতে প্রত্যেকেই বিস্মিত হইবেন। ইতিপূর্বে তিনি যে কয়টি দাবীকে ভিত্তি করিয়া

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করিয়া আসিতেছিলেন লেই দাবীর সংখ্যাও এবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। আকারে বালকের স্থায় ইহাদের আকার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে।

কিছুদিন পূর্বেও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু কলিকাতায় কোন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ও সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের অবলম্বন ঘটাইতে। বর্তমান রাজনৈতিক আকাশ স্বচ্ছ ও নিষ্কল। জাতীয় সংগ্রামের একমাত্র প্রতীক কংগ্রেস এবং এই সংগ্রামকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করুন। কিন্তু আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি, বর্তমান এপ্রিল মাসের শেষভাগে মহাত্মা গান্ধী ও লীগ-বাহন মিঃ জিন্নার সহিত সাম্প্রদায়িক লম্ভা লম্ভকে একটা চূড়ান্ত আলোচনা হইবে এবং মহাত্মাজী কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও মিঃ জিন্নার মধ্যে একটা আপোষ রক্ষা করিবার জন্ত মধ্যস্থতা করিবেন।

ইতিপূর্বে মিঃ জিন্না ও তাঁহার লীগের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে জিন্না-আন্দোলনের প্রায় অবলম্বন ঘটাইয়াছিল। তখনই কংগ্রেসের বর্তব্য ছিল, মিঃ জিন্না ও লীগকে বাহু দিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করা--শরীরের অমুস্থ অংশকে কাটিয়া একেবারে বাহু বেওয়ার নীতিই প্রধান চিকিৎসকগণ মানিয়া থাকেন। তাহাতে লজ্জা সাময়িক নিরাময় না হইলেও ফল লাভ হয় স্থায়ী, নচেৎ সারাজীবন বেহের লেই অমুস্থ অংশকে বহন করিয়া অশান্তিতে দিন কাটাইতে হয়।

বর্তমানে এই জিন্না-ভুট্টা-নীতির প্রতি-ফুলে মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস-সভাপতি ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি যদি অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন যে আরও শক্তিশালী হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘটনা-প্রবাহের গতি দেখিয়া মনে হয় জিন্না-ভুট্টার দ্রুতক্রিয়া মোহে মহাত্মাজী, কংগ্রেস-সভাপতি ও জহরলালজীও আকৃষ্ট!

বিবিধ

৩১নং ওয়ার্ড

ক্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্পোরেশনের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শুধু সাংবাদিকের জীবনে পরিতুষ্ট নহেন। আমরা জানিয়া খ্রীত হইলাম দ্বাধা কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী সাধারণ নির্বাচনে ৩১নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। গত সপ্তাহে কালীপুর অঞ্চলে রাষ্ট্রপতির লঙ্ঘনকার সময় বহু বিশিষ্ট অধিবাসী এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বাধা ও বিশ্বনাথবাবু এক যোগে নির্বাচনে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারা বিনা বাধায় নির্বাচিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বালক-সঙ্ঘ

আগামী ২৩শে এপ্রিল ভবানীপুর বালক-সঙ্ঘের নব্বাণ পার্কস্থ জ্রীড়া প্রাঙ্গণে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভা হইবে। মিঃ এস, সি, মিত্র (ডাইরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রীস, বেঙ্গল) সভাপতির আলম গ্রহণ করিবেন এবং মিসেস্ জে, সি মুখার্জী পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

আনন্দ পরিষদ

আগামী ২৬শে এপ্রিল 'রঙমহল' রঙ্গ-মঞ্চে আনন্দ পরিষদের আধুনিকতম সভ্য-বন্দ্য কর্তৃক শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' বা নাট্য-রূপান্তরিত 'লরু' অভিনীত হইবে। চিরপরিচিত লক্ষ্মীবাবু প্রযোজনার তার গ্রহণ করিয়াছেন।

নারায়ণী দেশীর আত্মজীৱক-ক্রিয়া

গত সোমবার ১১ই এপ্রিল হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাটা গ্রামে ৮শ্রীগোপাল

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী পরলোকগতা নারায়ণী দেবীর আত্মজীৱক ক্রিয়া তাঁহার ৩য় কৃতী পুত্রগণ শ্রীমতাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মহাআড়ম্বর এবং জাকজমকের সহিত তাঁহাদের নিজ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার বহু শ্রাবানী পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীগণ নিজগ্রামে সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হইয়া পরলোকগতা নারায়ণী দেবীর শোকাস্ত পুত্রগণ এবং আত্মীয় স্বজনকে লাক্ষনা দান করিয়াছিলেন। প্রায় একসহস্র উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করিবার পর দুইতাকার হরিজনসারায়ণকে বস্ত্র এবং খাদ্য বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি পরলোকগতার দৌভাগ্য এবং লক্ষণাবলীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

শ্যামল ভাণ্ডার

গত ১লা বৈশাখ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহালম্বারোহে নূতন খাতা মহরৎ হইয়া গিয়াছে সেট উপলক্ষ্যে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তির লমাগম হইয়াছিল, এবং তাহাদিগকে ভূরি-ভোজনে লব্ধে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

বালীগঞ্জ টু ডিও

গত ১লা বৈশাখ বালীগঞ্জ টু ডিওর

(গরিয়াহাটা রোড) স্তম্ভ-উদ্বোধনউৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত নাগরীক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। টু ডিও কর্তৃপক্ষ লমাগত অতিথিবর্গকে জলযোগেদ্বারা আপ্যায়িত করেন। এই উৎসবে সুরেশ্বরী ভাসুদেব ভট্টাচার্য কর্তৃক বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল।

পরলোকে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

গত ২২শে চৈত্র মঙ্গলবার জনষ্টন হফম্যানের ভূতপূর্ব হেড আর্টিষ্ট ৮যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার



৯০নং কাশ্মীরীপাড়া রোডস্থিত বাটাতে লক্ষ্যানে সর্গদোহণ করিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে তার আন্ততোধ ও জাষ্টিস গ্রীভনের, সিনেট হলে তার চন্দ্রমাধব ঘোষের এবং আন্ততোধ বি'ল্ডিংএ আন্ততোধের তৈল চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পোরট্রেট পেটিংএ বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার জী, বুদ্ধ দ্বািতা, এক পুত্র, তিন কন্যা এবং পৌত্র পৌত্রাধি বর্ধমান। গত ২রা

বৈশাখ তাঁহার আত্মকৃত্য প্রাক্কাষ সম্পন্ন
হইয়া গিয়াছে। প্রাদ বাসরে স্থানীয়
বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

ভবানীপুর বারোয়ারী সমিতির বিংশ বার্ষিক উৎসব

গত শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৪৫ হইতে এই
বৈশাখ সোমবার পর্য্যন্ত ভবানীপুর বারো-
য়ারীর উৎসব ষ্টেটন রোডস্থ প্রজনে সূচাক্রমে
সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমদিন “মল্লিকম্
হেলথ হোমের সভ্যগণ বিজয় মল্লিক ও বিষ্ণু
ষোণের পরিচালনায় তাঁহাদের অপরূপ ব্যায়াম
ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, বিশেষ করিয়া শ্রীমণি
রায়ের প্যারালাল বার খেলা সকলের দৃষ্টি
আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় দিবস শ্রীযুক্ত
বিলীপ কুমার রায়ের সভাপতিত্বে জলসা
হয়, শ্রীযুক্ত জ্ঞান গোস্বামীর বর্গ লজিত
সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, তৎপরে সভাপতি
মহাশয় ও বিখ্যাত টম্বা গায়ক শ্রীকালী
পাঠক মহাশয় গান করেন এবং প্রসিদ্ধ
অভিনেতা শ্রীনির্ঘোষেন্দ্র নাহেড়ী মহাশয়
বিশ্বকবি ‘বেণ্ডার গ্রান’ আবৃত্তি করেন।
তৃতীয় দিবস ৮০০কালী মাতার পূজা
উপলক্ষ্যে প্রসিদ্ধ-কীর্তনীয় ভূপেন বসুর কীর্তন
হয়। গত রবিবারে ‘মহামন্ত্র’ গীতাভিনয়
এবং সোমবারে ‘মুক্তি’ যাত্রাভিনয় হইবার
পর বারোয়ারীর এ বৎসরের উৎসব সমাপ্ত
হয়। প্রতি বৎসর বারোয়ারী সমিতির
আরুস্ত চেষ্টায় ভবানীপুর অঞ্চলের এই আনন্দ
উৎসব প্রতিবেশীগণকে যে আনন্দ দান করে
তাঁহার ভক্ত কন্মীবন্দ সকলের দৃষ্টবাদের পাত্র।



(বিলাসী)

বিজ্ঞাপতি

গত সপ্তাহে ষ্টেটারের ছুটি উপলক্ষে চিত্রায়
প্রতি প্রদর্শনীতে ‘বিজ্ঞাপতি’ দৈনিকের জ্ঞান
প্রচুর জনসমাগম হোয়েছিল। বিজ্ঞাপতি
বাঙলার প্রায় বারোটি শহরে সমান
সাকল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হ’চ্ছে। ঢাকা,
ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ডিঙ্গগড়, শ্রীহট,
বর্ধমান, আসানসোল, পুন্ডিয়া, পাবনা,
জমশেদপুর, কুচবিহার ও রংপুরের প্রধান
চিত্রগৃহ গুলিতে ‘বিজ্ঞাপতি’ জনপ্রিয়তা
অর্জন করেছে।

এই সপ্তাহে ‘বিজ্ঞাপতি’ চিত্রায় চতুর্থ
সপ্তাহে পড়লো। আশাকরি বহুসপ্তাহ ধরে
এই চবিথানি বাঙলার চিত্র-রসিকদের
অনন্দ দিতে পারবে।

অভিজ্ঞান

অভিজ্ঞান কাহিনীটিকে চিত্র-নাট্যে
রূপান্তরিত করেছেন—ফনী মজুমদার এবং
এর পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ
করেছেন—প্রফুল্ল রায়। চবিথানির পরি-
চালনা ব্যাপারে রায় মহাশয়ের সহকারী
হিসাবে কাজ করেছেন-ফনী বাবু। এই
বিবর্তিত মধ্যে ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ অনজ্ঞতা ধরা
পড়ায় কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে সন্তোষিত যে চূড়ান্ত
সীমংসা করেছেন, তার উপর নির্ভর করে

আমরা এই খবরটি এবার পত্রস্থ করলুম।
কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের উপর পরিচালনার
দায়িত্ব থাকলেও যে কোন ছবির সাকল্য
নির্ভর করে—এর Team work-এর উপর।
অভিজ্ঞান-চিত্রে নেই team-work এর সন্ধান
আমরা পূর্ণ মাত্রাতেই পা’ব। নিউ
থিয়েটারের অপরাপর চিত্রের মত এক
বিভাগীয় কার্যগুলি যোগ্যতম ব্যক্তির উপরেই
নিয়োজিত হোয়েছে। সুতরাং আমরা আশা
করি এই বিচিত্র ঘটনাবল, সমাজ সমস্যা-
মূলক সুন্দর কাহিনীটি, তার নিজস্ব মাধুর্য্য
নিষে, অধঃকারে ছাত্র-চিত্তাকারে ফুটে
উঠবে।

এই চিত্রের উপন্যাসিকা ‘আমিনা’র নামটি
ছাত্র চিত্রে পরিবর্তিত হোয়ে ‘নাজমা’রূপে
পরিচিত হ’বে। মুম্বই সমাজের এই গৃহ-
বধূর চরিত্রটি যে কোন সমাজের পক্ষেই আদর্শ
চরিত্র। জমিদারের অমানুষিক অত্যাচারের
প্রতিশোধ নিতে, জমিদারের পুত্র বধূ সন্ধানকে
হরণ করেছিল গফুর। নাজমা তাকে
উদ্ধার করে। হৃৎসহীন জমিদারের বিচারে
অপহৃত্য নারীর স্থান হোল না তাঁর অঞ্চলে।
তাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে শ্রোতের
জলে, শুকনো ফুলের মত ভেঙ্গে চলে
—সন্ধ্যা।



ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

এখান থেকেই অভাগিনী লক্ষ্মীর জীবনে
হোল এক ধর্মাত্মিক নাটকের সূচনা।

লক্ষ্মীর সেই বিচিত্র ঘটনা-বহুল জীবন-
নাটকের প্রতি অঙ্কে এক একটি নর-নারীর
আবির্ভাব হোতে লাগলো! এদের মধ্যে
আমরা উল্লেখ কোরতে পারি—লক্ষ্মীর দুই
সম্পর্কের তরী লবিতা ও তার স্বামী
প্রকাশকে। তারপর এলো, লক্ষ্মীর উদ্ধার
কর্তারূপে বৈব-প্রেরিত প্রমথ। প্রমথর বন্ধু
সুরেশটিও চিত্র-নাট্যকারের একটি মৌলিক
সৃষ্টি। এই সব ভূমিকায় বৈববালা, শৈলেন
চৌধুরী, জীবন গাঙ্গুলী ও তাহু বন্দ্যোপাধ্যায়
অতি অপূর্ণ অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয়
দিয়েছেন বোলে প্রকাশ।

নিত্যন্ত ঝোঁকের বশেই গল্পর বন্ধী
কোরেছিল লক্ষ্মীকে। তাঁর সর্বনাশ সাধন
করার উদ্দেশ্য ছিল না তার। কিন্তু বিরোধ
বাধলো গোবিন্দকে নিয়ে। গোবিন্দ জাত-
ডাকাত। মায়ী-মমতা বা ধর্মসাধনের ধার
ধারে না সে। সে চায় বিলাসের পণ্য
হিলাবে চড়া দ্বাধে এক তরুণীটিকে কোথাও
বিলিয়ে দিতে।

বৈববাং নাজমা পেরেছিল তারই লক্ষ্য
এবং সুকোণে সে তাকে উদ্ধার কোরে আনে
নিজের বাড়ীতে। নারীর জন্তে কেঁদেছিল
নারীর প্রাণ। তাই জাতে মূলমান হ'লেও
একটি হিন্দু নারীর লাঞ্ছনা ও বেহনা তাকে
কাতর কোরেছিল বোলেই তার ভেতর
হোরেছিল কর্তব্যের উদ্বোধ।



"অভিজ্ঞান" চিত্রে শৈলেন পাল, শৈলেন চৌধুরী ও মলিনা

মলিনা ও মেনকা—লক্ষ্মী ও নাজমা রূপে
সকলের অন্তরেই গভীর ভাবে রেখাপাত
কোরবে। ছুজনেই সুন্দরী, ছুজনেই তরী।
তবে একজন ভাগ্যদোষে পরিত্যক্ত,
লাহিতা। অপরটি লম্বা ফোটা বস্ত্রের ফুল।
আপনার গোরভে, অন্তরের মাধুর্য্যে, আপনি
ভরপুর। হৃদয়স্পর্শী সংলাপের মধ্যে দিয়ে
এই দুটি নারী চরিত্র পূর্ণ বিকশিত হোরে
উঠবে।

ভাগ্য বিড়ম্বিতা লক্ষ্মীর জীবন-নাট্যে
পর পর, ঘেঘের পর ঘেঘ জমে এলো।
একজন যে গৃহ-বধূকে গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হবে
বোলে পথের বার কোরে দিলে—তাকেই
আর একজন গৃহের বধূ করবার জন্তে পাগল
হোল। কিন্তু পতিপরায়ণা হিন্দু-দলনার
কাছে—স্বামীই তার ধ্যান জ্ঞান, স্বামীই
তার চিন্তা। একদিকে স্বামীর প্রতি কর্তব্য

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের
বই!

পাতার পাতার সুদৃশ্য এক-
রঙ ও তন রঙের ছবিতে
সুসজ্জিত।

শিশু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

শ্রীজ্ঞানমোহন দাস সম্পাদিত
ছোটদের আহরিকা

রায় জলধর সেন বাহাদুরের
আইসক্রীম সন্দেশ

শ্রীকীন্দ্র নাথ পালের
বাংলার জঙ্গলে

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
লে মিজারেবল

সুপ্রিয় সোমের
মাগরের নীচে ভয়ঙ্কর মানুষ

সহ প্রকাশিত
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রামধনু

কমলিনী সাহিত্য মন্দির
২২০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা।

এবং অপর দিকে, তার আশ্রয় দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা...

লক্ষ্য পড়েছিল জীবন-সমস্যার এক চরম লক্ষ্য সমাধানে। কেমন কোরে দে, দে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হোরেছিল—চিত্রিত কাহিনীর মধ্যে এই পরিচয় যদি ফুটে ওঠে ত' জনসাধারণ কৃষ্টি পাবে।

বড়দি

পরিচালক বল্লিক মশাই মোটামুটি ভূমিকা নির্বাচন শেষ কোরে, এই চিত্রের মহলা শুরু করেছেন। বহুকাল পরে নায়ক-নায়িকারূপে পাছাড়ী ও মলিনাকে একত্রে দেখা যাবে। এই যুগল-শিল্পী আর একবার 'মীরাবাদী' চিত্রে একত্রে আভির্ভূত হোয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আমাদের চমৎকৃত কোরেছিলেন। বহুকাল পরে মাধবীও সুজ্ঞে রূপে এদের একত্রে দেখা যাবে। সুজ্ঞের স্ত্রী 'শান্তির' ভূমিকায় বাঙলা ও হিন্দিতে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী চিত্রাবতরণ কোরবেন। ছায়া-চিত্র জগতে একজন প্রথম শ্রেণীর চরিত্রাভিনেত্রী হিসাবে চন্দ্রাবতীর খ্যাতি আজ সর্বত্র বিস্তৃত। প্রমীলার ভূমিকায় দুইটি নবাগতা মেয়েকে দেখা যাবে। চরিত্রের উপযোগী সূক্ষ্ম চোরা আছে এই মেয়ে দুটির। তা' ছাড়া মল্লিক মশায়ের শিক্ষাগুণে এরা উৎসাহ যাবে। এই চিত্রের অপর কয়েকটি প্রধান ভূমিকায় লৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মৃথোপাধ্যায় এবং ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অছি সাজ্জাল হ'বে অন্ততম আকর্ষণ। ছবিখানি সকল দিক দিয়ে যাতে নিউ থিয়েটারের অনামের উপযোগী হয়, তার জন্য পরিচালক মহাশয় আপাতত পরিশ্রম কোরছেন। বড়দ্বিধির লক্ষ্যত্যাগের পরিচালনা কোরবেন—রাই বড়াল এবং আলোক-চিত্রের কাজ কোরবেন সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী বিমল রায়। এই চিত্রের শব্দমূল্যক কোরবেন বাণী বসু।

অধিকার

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া হঠাৎ প্রবল হয়ে শব্দাশায়ী হওয়ার 'অধিকারের' শ্রুতি আপাততঃ বন্ধ আছে।

দেশের মাটি

সাইগলের অমৃততার জন্তে গন্ত নগ্নাছে দেশের মাটির শ্রুতি স্থগিত ছিল।

সারা ভারতে এর ট্রেনার প্রদর্শনের ব্যবস্থা

হয়েছে।

স্ট্রীট সিন্ডার

ফণি মজুমদার 'অভিজ্ঞানের' দ্বিতীয় থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 'স্ট্রীট সিন্ডার'-এর শ্রুতি জংগতিতে অগ্রসর হবেনা। গত নগ্নাছে 'চীপ থিয়েটারের' শ্রুতি হয়েচে।

বি, মান্না এণ্ড সন্মের কলেক্টি

আন্তর্জাতিক গুণনির্বাচিত মহোদয়ঃ

কিওরোডি-সালসা

বর্তমান যুগে ইহা একমাত্র সন্মোহন গুণ বিশিষ্ট মহোপকারী সালসা। রক্তপরিষ্কারক, বল, শক্তি ও জ্বালাময়িকারক। রোগ ও উদ্ভ্রাণ দিব্যশক্তি। উত্তরাল প্রায়িক ও ষাট দোকালা রোগে, নই স্বাস্থ্য, মাধবী স্ত্রী রোগে এবং বহুপুস্তন ও জটিল রোগ সমূহের একমাত্র মহোপকারী। কোন বাধাধর্য নিম্ন নই—সকল ক্ষুদ্রতে দেবন করা যায়। মলা দেউ টাকা; মাডলাদি সহ ১০/০।

ইলেক্ট্রো-গোল্ড-কিওর

অবনী শক্তির্ষক ও নষ্টহারা পুনরুদ্ধারক। রোগে প্রকলতা, অক্ষমতা, অংশ বিন্যাস প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ বলকারক। চর্মরোগের ক্ষুদ্রশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়। জ্বালাময়িক মানসিক প্রকলতা, মায়িক ক্ষুদ্রশক্তি করে। ছাড়া ও ছাত্রী জীবনের একমাত্র পরম সঙ্গী। মলা দেউ টাকা; মাডলাদি সহ ১০/০।

"গণোরা-নাম"

পিল (বটিকা) বা মিক্চারঃ

নতন ও প্রাচীন সন্মোহন লক্ষণযুক্ত গণোরাঃ প্রমোহন শ্রুতিপীড়া ও মুক্তনালীর দাবতীয় রোগের বিশেষ পরীক্ষিত আন্তর্জাতিক মহোদয়ঃ। ১০ মাত্রায় স্ত্রী পুরুষ উভয় রোগের রোগে জালা যন্ত্রণা লাঘব হয়। স্ত্রীলোকদিগের রোগে ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি আরোপ হয়। আর সময়ে রোগ জালা রক্তগা লাঘব করিতে এবং রোগ সমলে নিষ্কল করিতে ইহার গায় আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক রোগে অজ্ঞাপি অপ্রিত হয় নই, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই ইষধ, মিক্চার ও পিল দুই রকমের পাওয়া যায়, উভয়েরই মলা প্রতি শিশু দুই টাকা; মাডলাদি সহ ১০/০।

ইপানি

এজমা-সিরাপ

ইপানি ও ইপানি রোগের অব্যর্থ মহোদয়ঃ। এক ঘণ্টায় ইপানি রোগে মুক্তনালীর দাবতীয় রোগে নষ্টজীবন লাভ করে। নতন ও প্রাচীন সন্মোহন লক্ষণ ও উপসর্গ বিশিষ্ট ইপানি, দমা, বাসোরাগ এবং দাবতীয় রোগে ও বাসনালীর প্রদাহ, ব্রুইটস্, জ্বালাময়িক প্রভৃতি রোগে নিষ্কল আরোপ হয়। ইপানি ও ইপানি রোগের সময়ে বাসনালীর মুক্তনালীর একদাগ বাজ দেবনই রোগ দূরীভূত হয়। ইহা রোগে হয়। মলা দেউ টাকা; মাডলাদি সহ ১০/০।

বি, মান্না এণ্ড সন্ম

(মান্না মেডিকেল হল)

এজেন্টসঃ—এম, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

১০নং, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা।

৪নং, গুলু ওস্তাগর লেন,

(পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৯) কলিকাতা।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চাস

‘অভিনয়ের’ মত গতি ক্রান্ততর হয়েছে কিনা তার সঠিক সংবাদ আমরা এখনও পাইনি। কালানোভার কন্সটেল পাটির মারা না কাটলে বাহুল্যজৌর অর্থব্যয় অপব্যয়ে পরিণত না হয়—এই আশঙ্কা এখনও আমাদের পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় নি। “অভিনয়ে” আর একটা নারী চরিত্র—ব্রজার ভূমিকায় একটি নূতন মূন্দের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে—শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জি চিত্রজগতে নবাগতা হ’লেও তিনি প্রথম আবির্ভাবেই দর্শকদের মনে দাগ কাটতে পারবেন বলেই শুনছি।

“অভিনয়ে” অরীন্দ্র চৌধুরী, গীরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী মজুমদার, বিভূতি গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি অভিনয় করছেন।

ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও বেল সংগরম হয়ে উঠেছে। বাইরের অনেকগুলি কন্সট্রাক্ট এদের পাবার সম্ভাবনা ঘটেছে। নবপ্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড টকীজ “চন্দা” নামে একখানি সামাজিক ছবি এদের ষ্টুডিও থেকে তুলবেন। আর যামিনী মিত্র “কলেজ কন্স” নামে একখানি সামাজিক ছবি এদের হয়ে তোলবার ব্যবস্থা করছেন। ডি-জি এখানে খুব বোরাঘুরি করছেন, তবে এখনও কোন সুরাহা হয়ে উঠেনি।

“হাল সাওলা”

মোটোপনিস্টান পিক্‌চাসের জনপ্রিয় এই সম্পূর্ণ বৈধোয় হাস্যরসাত্মক কথা-চিত্রটি এই শনিবার থেকে সপ্তম ও শেষ সপ্তাহে পড়ল।

দেশদত্ত ফিল্মস্

“গোরার” কাজ যদিও ধীরে ধীরেই অগ্রসর হচ্ছে তথাপি কাজ যা হচ্ছে তাকে নির্ধৃত বলা যেতে পারে। নরেশ মিত্রের পরিচালনার ও আটিষ্টের সহযোগিতায় কাজের ভেতর সব সময়ই একটা সুশৃঙ্খলা রয়েছে। এই team-work তিন কবিবরের

ইঁহার কাহার ?

আসন্ন মেম্বর নির্বাচনে

কংগ্রেস সিদ্ধান্তের অন্তরালে

মেম্বর ও ডেপুটি মেম্বর মনোনয়ন ব্যাপারে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল গ্র্যামোনিয়রেনের যে অধিবেশন রাষ্ট্রপতির গৃহে হয় তাহাতে নিম্নলিখিত কংগ্রেস সভাগণ অনুমতি দিলেন।

হরিশঙ্কর পাল

মৃগেন্দ্র মজুমদার

নিতাই পাল

বিষ্ণু সরকার

নিশীথ সেন (দলপতি)

রুক্ষ চন্দ্র ঘোষ।

ধীরেন ঘোষ

দেব নারায়ণ ঘোষ

ও

ডাঃ ভূপেন বসু

প্রকাশ যে চক্ৰবর্তী জন মনোনীত ও ইউরোপীয় সংস্কারের সভাপতিতায় কতিপয় কংগ্রেস কাউন্সিলার দলপতি বলিয়া খ্যাত মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেনকে খাড়া করিয়া কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধিতা করিয়া মেম্বর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। জলপাইগুড়িতে পলায়ন, চিক্ নিয়োগ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ উপেক্ষা ‘কালানোভার’ সুপরিচিত মিঃ নিশীথ সেনের দলগত নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং তাঁহার এইরূপ সঙ্গর যদি কার্যে পরিণত হয় তাহা হইলে বিস্তৃত হইবার কিছু নাই। তবে আমরা এখনও আশাকরি মিঃ নিশীথ প্রমুখ মুষ্টিমেয় কংগ্রেস কাউন্সিলার শেষ মুহূর্ত্তেও দলগত শিকান্তের বিরুদ্ধাচরণে বিরত হইবেন।

“গোরাকে” পর্দায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে। গোরার ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলী ও সুচরিতার ভূমিকায় রাণীগালা নূতন ভাবে দর্শকদের আনন্দ দেখেন। তাছাড়া ললিতার ভূমিকায় প্রতিমা দাস গুপ্তা যদিও একেবারে আনন্দের তরুণ তার উপর অনেকটা আশা রাখা যায়।

ইউনাইটেড টকীজ

এ প্রতিষ্ঠানটি একেবারে নূতন। এবং এর বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত দ্বারা রয়েছে তাঁরাও নূতন। প্রযোজক শ্রীমদ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই লাইনে নূতন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে এদের প্রথম ছবি “চন্দা”র মুটিং আসছে শনিবার থেকে শুরু হবে। ইতিমধ্যেই আশ্চর্যকর কাজ প্রায় শেষ চলে এসেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় মনোজেন ভট্টাচার্য্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, তুলসী মজুমদার, বিভূতি গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, ধীরেন পাল, প্রফুল্ল দাস, রঞ্জিত রায়, রমেন চ্যাটার্জি, প্রভৃতিতে দেখা যাবে। তাছাড়া, “সুজিত-মান” চলিতে টাইপ-চরিত্র অভিনয়ে নৃপতিবাবু একটা নূতন বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গেও এদের চুক্তি হয়ে গেছে। এট বইতেও তিনি অল্পরূপ এক ভূমিকায় দেখা দিবেন। পরিচালনা করবেন গুণধর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকারী থাকবেন কুমার সেন।

স্বাধীন ফিল্মস্

জনকনন্দিনীর কাজ ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। পরিচালক কনি বর্মণ একত্রে খাট বাস্তব করেছেন।

বিশ্ববিত্তের ভূমিকায় অরীন্দ্র চৌধুরী, দর্শকের ভূমিকায় রবি রায় ও অজ্ঞাত ভূমিকায় সুশীল রায় (এঃ), জানকী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিতে দেখা যাবে।

পুরুষোত্তম এর মৃত্যু নাম হয়েছে
“নর-নারায়ণ”। খুব শীঘ্রই এর স্মৃতি
স্মৃক হবে।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস.

এই নামের প্রতিষ্ঠানটি আজ বছর
ছ’য়েক ধরে কোলকাতার বুক্‌শপ্‌সে বেশ ভিড়িং
বিড়িং স্মৃক করেছে। এরা প্রথমে
“রামকান্ত” নামে একখানা ছবি তোলেন
কিন্তু এবাবৎ অবধি সেই ছবির
কোনও পাক্সা নেই। ভেতরে বাবুদের মধ্যে
এই ছবি নিয়ে হস্তমত স্তম্ভ-নিষ্ঠের লড়াই
বৈধেছিল বলে কানাদুলা শুনা যায়।

তারপর এই প্রতিষ্ঠানই ওরিয়েন্টাল
কিনেটোন আর্টসকে স্টাট কাটু কোরে
‘ও-কে-এ’ নাম দিয়ে “রূপোর কুম্‌কো” ছবি
তুলেছেন। প্রতিষ্ঠানের নাম বদলের মধ্যে
অবশ্য একটু যে রহস্য নেই এমন নয়।
তবে সে রহস্য উদ্‌ঘাটনের সময়
এখনও আসে নি। “রূপোর
কুম্‌কো” চুঁচুঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বটে
কিন্তু সেই আওয়াজে কেউ তুলছেন না।
গম্বাইবাসু ও রঘুনাথ বাবু এদিকে একটু দৃষ্টি
দিলে ভাল হয়।

পূর্ণ থিয়েটার

এই শনিবার থেকে মুক্তি, পঞ্চম সপ্তাহে
পড়ল। বর্তমানে যেকোন জনসমাগম হচ্ছে
তাতে মনে হয়, ছবিখানা আরও কিছুদিন
চলবে।

—:—

কিরণবাবুর সশস্ত্র নিরপেক্ষতা

এবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির
সহায় ও কর্মকর্তা নিয়োগ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি
সুভাষচন্দ্র যে পছন্দবন্দন করিয়াছেন তাহা
যে অবস্থানরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অবশ্য
স্বীকার্য। সুভাষচন্দ্র নির্বাচনের অধ্যবহিত
পরে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতি যে
যোরতর সন্দেহজনক তাহা অনেকই অনুভব
করিতেছেন। সহযোগী ‘বহুমতী’ এই
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—


“কিরণশঙ্কর রায় দীর্ঘকাল হইতে বাঙ্গালার
কংগ্রেসী বলে কোন্‌ গ্রহ বলিয়া পরিচিত
তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিতে
হইবে না। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস
কমিটির কার্যনির্বাহক ও সহায়নির্বাহক
সম্বন্ধে তিনি যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন,
তাছাড়া সুভাষচন্দ্র যদি সতর্কতাবলম্বন করেন
তবে ভাল হয়। পূর্বে হইতে সতর্কতাবলম্বন
করিলে বিপদের ভয় সস্ত্র থাকে যায়।”

কিরণবাবু যে বর্তমান সচিব-সভ্যের কোন
সচিবের সহিত বন্ধুত্বস্বত্রে আবদ্ধ তাহাও
সন্দেহজনক। সুভাষচন্দ্র অসুস্থ বিবৃতি
অধিকতর সন্দেহজনক ও আশঙ্কাজনক।

পরিশেষে সহযোগী ‘বহুমতী’ বলিয়াছেন :—
“যাহারা কর্মকর্তা ও সহায়-নিয়োগ কর্ম-
সম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত তাঁহা-
দিগের নিকট সহযোগিতার আশা কিরূপ
সুদূরপর্যায়ত আমরা আশা করি, সুভাষচন্দ্র
তাঁহার এত দিনের অভিজ্ঞতার তাহা সহজেই
অনুমান করিতে পারিবেন।”

জানিনা রাষ্ট্রপতি যে অভিজ্ঞতা অর্জন
করিতে পারিয়াছেন কি না। তবে কিরণ
বাবুর ‘সশস্ত্র নিরপেক্ষতা’ (armed neutra-
lity) যে কোন মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা
মোটাই বিস্মিত হইব না।

ফোন ২৭৭৬ বড় বাজার



কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারত এয়ে মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪০, আপার সারকুলার রোড, কলিঃ

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

পুরুষ-পাশান

(গল্প)

শ্রীসুদর্শন দেবশর্মা

সামনে নয়। ছোটরা ওকে ভক্তি করে, বেশী করে ভয়, আর লম্বদরদীরা করে লম্বীহ।

হঠাৎ এল রঞ্জন—বউদির একমাত্র লেহাধর। দীর্ঘ পাঁচ বছর অজান্তাবাদের পর এই তার প্রথম প্রকাশ। রঞ্জন যখন এবাড়ীতে এল, বরুণা তখন নিজের ঘরে টেবিলের সামনে বসে লিখিত কাজ করছিল। দরজা ভেঙে থেকে ভেজানো। চেঁচিয়ে বদলেই দরজার স্বয়ং কীক ঘিরে নবাগতকে দেখবার চেষ্টা করল। ব্যর্থ হল। সে তখন পাশে বৌদির ঘরে। তখনতে পাওয়া গেল—বৌদি বলছেন—‘বেশ ছেলে বা ছোক তুই! নেই যে কাউকে না জানিয়ে উধাও হোলি সে আজ পাঁচ বছরের কথা, তারপর এই এ্যাঙ্কিন পরে দিহিকে মনে পড়লো। এক কলম লিখে খবর পর্যন্ত দিলি। আমরা হলুম তোর পর! বেশ!’ বৌদির কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুর।

বরুণা! হ্যাঁ, একটি মেয়ে। সাধারণ বিভিন্ন আধুনিক সাময়িক পত্রিকা। শুধু মেয়েদের পর্যায়ের ফেললে ওকে ভুল বুঝা হবে। আশালতা, শান্তিগতাগ্রন্থা লতা বিশেষিকা মুখে পড়া মেয়ে ও নয়। ওর চরিত্রে আছে দৃঢ়তা, মাধুর্য, শ্রী। বয়েস উনিশ থেকে বিশের মধ্যে—বেশী হওয়াই দৃষ্টি লজ্জ—স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘ বাড়ন্ত চেহারা। যৌবনের প্রাচুর্য সারাছেহে লীলায়িত। পিতা-মাতা স্বর্গার, দ্বাদশ ও বৌদি অভিভাবক।

কলেজে পড়ে বরুণা, খার্ড ইয়ার চলছে। স্বভাবের অত্যন্ত। ও নিজেকে কখনো হালকা করেনি—অন্ততঃ কোন পুরুষের

কালী ফিল্মস প্রযোজিত

চোখের বালি

পরিচালক : সতু সেন



আগামী
দুইখানি
স্মরণীয়
চিত্র



হাজরা পিকচার্সের

দেবী ফুল্লরা

পরিচালক : তিনকড়ি চক্রবর্তী

আগন্তুত হলে উঠল লম্বা। হাদি খামিয়ে বলল—‘কী কোরে বেবো বলা দিদি! তখন নিজেই নিয়ে এতো ব্যস্ত যে, আশে পাশে তাকাবার ক্ষমতা ছিল না। জানো-নাতো কী দারুণ বিপদে পড়েছিলুম!’

‘জানবো কী কোরে শুনি! আমরা কী এখান থেকে ছড়ি পেতে তোর খবর নেবো। ছেলের এমন কাজের চাপ যে ছোটো কথা লিখে জানাতে পারলে না। থাক থাক চের ছোয়েচে। বোনেছের ওপর ভাইয়ের দরদ যে কতোখানি তা জানতে আর বাকী নেই। আমরাই শুধু তোমাদের জন্তু কৈবে মরি নিষ্ঠুর কোথাকার।’

‘লভি বলচি দিদি, লিখলুম না এই ভয়ে পাছে তুমি আমার চিঠি পেয়ে কারাকারি মুক্কট করো। তোমাদের তো আর জানতে বাকী নেই! বাজালীর মেয়ে কল্লুরলের বজা—’

বৌদি ধমক দিয়ে উঠলেন—‘খাম চের ছোয়েচে, লেকচার দিয়ে বাছাইরী কোরতে হবে না। এই পাঁচ বছর ধরে কী কর্ণোটা কোরে এলে শুনি?’

‘বেশী কিছু নয়। সারাটা ইউরোপ প্রদক্ষিণ কোরে শেষকালে ঘরের পাশে এলিয়ার কোলে চীনে গিয়ে রংয়ের কাজ লিখে এলুম।’

‘খুব কর্ম করোচো—’ একটু থেমে বৌদি বললেন ‘হাঁরে এখন এখানে কিছুদিন থাকবিতো?’

‘কোথায়? এই বাড়ীতে? পাগল নাকি! তা’লে তোমাদের চরিত্র ঘণ্টার মধ্যে ঘর-বাড়ী ছেড়ে বানপ্রস্থ নিতে হবে। বন্ধ-বান্ধবদের যা অমানুষিক অত্যাচার, সে বাজালীর বাড়ীতে সহ্য হবে না। সেইজন্য লোজা গিয়ে আস্তানা পেতেচি এক ম্যানমেনে জিনিষপত্র সবই লেখানো।’

বৌদি টেঁচিয়ে উঠলেন—‘ওরে ছেলে! তুমি বুঝি একবার চোখের’ বেথা দেখতে এলে। কী দরকার ছিল আলবার! না

এলেই তো পারতিল, কে তোকে আলবার জন্তু দিবি দিইয়েছিলো!’—বৌদির—কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। বোঝা গেল চোখের কোনো জল এশে দাঁড়িয়েছে।

নবাগতর গলা ভারি ভারি, বলল—‘ওকি, রাগ হ’লো বুঝি? লভি দিদি তুমি, ভাই এমন দুখভার কোরে থেকোনা, আমার ভারি কষ্ট হয়। কদিন পরে এলুম, কোথায় একটু আদর বজ্র কোরবে, তা নয় কেবল চোখের জল ফেলচো। দুই ছাই আমি চন্দ্র কিন্তু বোলে দিচ্চি এই আমার অগন্ত্য যাত্রা।’

‘মা যেখানে থুদী—ওকি লভি চললি—’ বুঝতে পারা গেল যে, নবাগত গমনোদ্যত—‘ওরে পাগল শোন। এখনো সেই ছেলে মামুষটা আছিল। কিছুটা বদলারনি, শুধু মাথায় ঢালা ছোয়েছিল। তুই মাথা ঠাণ্ডা কোরে বুকে বেথ, আমরা এখানে থাকতে তুই পরের মত এক জায়গায় গিয়ে উঠলি, এটা কী ভালো কথা? উনি শুনেলো কী ভাববেন বলতো।’

‘সব বুঝি দিদি, কিন্তু উপায় নেই। ঠিক বোলে এই অর্থ শালাটিকে মাপ করতে। তুমি করনা কোরতেও পারবে না তাদের অত্যাচার! সেখানে “অতোটা সুবিধে কোরে উঠতে পারবে না। আর, এক আখটা জাত নয় সর্বজাতি সম্বন্ধ। বাজালী, মাজাজী, বোহেওয়ারী থেকে স্ক্রু কোরে গরার পাপ ট্যান্স পর্যন্ত! কোনো বাধ বিচার নেই, এলাহি কাণ্ড।—কথাস্তে হঠাৎ টেঁচিয়ে উঠল—“ওরে বাবা: পেটে আশ্বাস জগচে। স্বীগিরি তোমাদের যা-আছে সব নিয়ে এলো—ভীষণ ক্রিমে পেয়েচে, উঃ অমহ্য!”

বৌদি ধমক দিয়ে উঠলেন—‘ওরে পোড়ারমুখো খাম। তোর নামনে দাঁড়িতে বাপু ভয় হয়, যা হাত-পা ছোড়ার বাই।’

বোন দিকি চুপটা কোরে এক জায়গায়! আমি আলচি একুনি—’—আর লাড়া পাওয়া গেল না কারো। বোঝা গেল বৌদি অগ্নির নিবৃত্তির ব্যবস্থা করতে গেলেন।

তারপর জোরে জোরে কেলা জুতোর শব্দ কানে এল। ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে—একেবারে তার দোরের কাছে। অতঃপর ভেজানো দরজা ছোটো দমকা ঠেলা দিয়ে খুল ফেলে সে ঘরে ঢুকল।—দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ চেহারা। তার পরণে আভূষি লম্বা আমেরিকান প্যাট, গায়ে স্বামী শিকের হাফ সার্ট। একমাথা কালো কৌকড়ানো চুল, ঈষৎ উলটে বেওয়া। প্রসস্ত কপাল—মৃণ্ম, রেখাছীন। আয়ত চোখছটা অধীর, স্বভাবঃ চঞ্চল। সর্বোচ্চ একটা উত্তেজনার চেঁচি। কোথায় জড়তা নেই কিংবা একটু সঙ্কোচ। বরুণা ঝলসে গেল রগেনকে দেখে। ওর জীবনে প্রথম দেখা লভিকারের পুরুষ।

বরুণাকে সামনে রেখে রগেন চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি ছুপা পেতিয়ে গেল। লবিনয়ে বলল—‘এঃ too sorry! don’t take any offence, Please.’

বরুণা আড়ষ্ট গলায় বলল—‘no need. আমি আপনাকে চিনি, আসুন।’—ব’লে পালেশের চেয়ারটা এগিয়ে দিলে।

চেয়ারে বসে রগেন বলল—‘ধন্যবাদ!’—টেবিলের ওপর কাগজ খানা রেখে—বলল ‘লিখচেন? গল্প নিশ্চয়?’

বরুণা কাগজখানার ওপর দু-হাত চাপা দিয়ে লম্বা করে বলল—‘না, এমন একটা—’

* * *

নিরুদ্দেশ

ভাই প্রফুল্ল,

আর রাগ কোরোনা, কিরে এস। বাড়ীতে সকলে উৎকণ্ঠিত। তোমার পছন্দ মতন ব্যবস্থা হবে। বাবা মা অমত করবেন না।

মেজদা (স্বীয়)

পরে এক শনিবার লঙ্কার সময় বরুণা হিন্দু
ম্যানশনে গিয়ে উঠল। বরুণা বার করতে
কষ্ট হ'ল না। বেরায়া দেখিয়ে দিলে।
দোতলায় কোণের দিকে একখানা ঘরের
লামানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিলে।
বরুণা ঘরজার গায়ের কলিং বেলটা টিপে
দিলে। কয়েকমুহূর্ত পর ভেতর থেকে
অম্পট গলায় উত্তর এল—‘আমুন!’

দোর ঠেলে ও ঘরের ভেতর গিয়ে চুকল।
দেখল, অদূরে জানালার ধারে খাটের উপর
রগেন শুয়ে। গায়ে একখানা বিচিত্র রংয়ের
কমল। মাথার চুলগুলো কুম্ম, এলেমেলো।
ওকে দেখে রগেন শুয়ে থেকেই হাততুলে
নমস্কার করল। শুকনো ঠোঁটের ওপর
নিঃশব্দ হালির রেখা টেনে চেয়ার দেখিয়ে
বলল—‘বসুন!’

বরুণা বস্তুচালিতের মত চেয়ারে বসে

পড়ল, পরে জিজ্ঞাসা করল—আপনার অস্থখ
কোরেচে নিশ্চয়?’

‘ই্যা, অস্বাস্থ্য। পরন্তু শেষ রাত
থেকে জ্বর ছোঁয়েচে।

বলবার কথা খুঁজে না পেয়ে বরুণা
বলল—হঠাৎ! অত্যেচার করেছিলেন
নিশ্চয়!’

‘তা একটু করেছিলুম বটে। পরন্তু অনেক
রাত পর্যন্ত ঘোঁটার ঘুরে ব্যাধিটাকে লজ্জা নিয়ে
বাড়ী কিরেচি—’ বরুণার হাতের খাতার
দিকে চোক পড়তেই বলল—‘ওঃ আপনাদের
চাঁদাটা আজ বেবো বলেছিলুম, না?’

‘গাক না, শেরে উঠুন, যেদিন ছোক
দেবেন!’

‘তা কী হয়! Word is word!
আমার উঠতে কষ্ট হচ্ছে। আপনি দয়া
করে ওই আলমারি খুলানো কোটটার

বুক পকেট থেকে মনিব্যাগটা নিয়ে উচিত
মত চাঁদাটা কেটে নিন।’

‘না-না আপনি—’

‘লজ্জা! কোরচেন কেন? আপনি কী
আমার পর, না অবিদ্বানী! আর, আমার
কথা ভেড়ে দিল। আজ রাজা, কাল ককির!
ভালো চান তো এই সময় বুদ্ধিমতীর মতো
নিয়ে নিন।’

অগত্যা ও উঠে গিয়ে কোটের পকেট
থেকে মনিব্যাগটা বার করে একখানা
দশটাকার নোট তুলে ব্যাগটা যথাস্থানে
রেখে দিল।

রগেন জিজ্ঞাসা করল—‘আর ঘরকার
নেই?’

‘না’—নোটখানা ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে
বলল—‘এতেই হবে। আপনি হয়তো
আমায় heartless মনে কোরলেন।

(ক্রমশঃ)



চিত্রে
দেবদত্ত ফিল্মসের
শ্রেষ্ঠ নিবেদন

উপন্যাসে
রবীন্দ্র প্রতিভার
শ্রেষ্ঠ দান

চিত্র পরিবেশক :
প্রাইমা ফিল্মস
লিমিটেড

ভূমিকায়
রাজীবাল

প্রতিমা
রমলা

রাজলক্ষ্মী

দেববালা

মনোরমা

নরেশ মিত্র

রাধিকানন্দ

মনোরঞ্জন

রবি রায়

মোহন ঘোষাল

জীবন গাঙ্গুলী

পরিচালনা—
নরেশ মিত্র

পরলোকে ভবানীশঙ্কর

কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টস্কালের
প্রাথমিকশাঃ এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ
মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীভবানীশঙ্কর
মিত্র কিছুকাল যোগভোগের পর আকস্মিক-
ভাবে প্যারিসে মাত্র আটশ বৎসর বয়সে
মৃত্যুব্রূণে পতিত হয়েছিলেন। গত বৎসর



বাংলা অধ্যয়নব্যপদেশে শ্রীমান ভবানীশঙ্কর
প্যারিসে অবস্থান করিতেছিলেন এবং
প্যারিসে ভারতীয় ও অন্তর্ভুক্ত ভারতীয়
বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তিনি তথাকার
ভারতীয় ছাত্র সমাজের সম্পাদক ছিলেন।

ভবানীর চরিত্রে যে দৃঢ়তা বালে পরি-
লক্ষিত হইয়াছিল প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত সে
বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। গতানুগতিকের মোহ-
মুক্ত এই অমূল্যপ্রতিভা যুবকের অকাল
মৃত্যুতে আমরা প্রিয়জনবিরোগ ব্যাধাতুর-
চিত্তে মিত্র-পরিবারের পরিজনবর্গকে গভীর
লমবেদনা জানাইতেছি। শোকাক্ত পিতা-
মাতাকে লাভনা দিব্যর ভাষা আমাদের নাই
তবে কবির বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া
তাঁহাদের শোক-উপলক্ষার্থে বলি :—

Gods love those who die young.

পরলোকে ললিত মিত্র

সুপ্রসিদ্ধ চরিত্র-অভিনেতা ললিত মিত্র
গত রবিবার রাাত্রী ৩টার সময় মাত্র
শাত দিন অল্প ভোগান্তে পরলোকগমন
করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙালির রঙ্গ-
জগতের ও চিত্রজগতের যে বিশেষ ক্ষতি
হইল—একথা বলাই বাহুল্য।

গোয়ালটুলির প্রসিদ্ধ মিত্র বংশে জন্ম
গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মিত্র
প্রথমে কলিক্‌ নিম্নন কোম্পানীতে এ্যাংকা-
উণ্টান্ট হিসাবে বর্ষ জীবন আরম্ভ করেন।
১৯২৮ সালে ললিতবাবু ও লক্ষ্মীমহাশয়
কৃত্তি তত্ত্ব শিক্তি যুবককে লইয়া রাধিকা-
নন্দ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের দ্বিতীয়
নাটক “নিবেদিতা”র রতিকাঙ্কের ভূমিকায়
ললিতবাবু প্রথম রঙ্গাবতরণ করেন।
তাঁহার পর ১৯২৮ সালের শেষভাগে মনো-
মোহন রঙ্গমঞ্চে লাক্ষ্মীমহাশয় নাটকে দ্বিতীয়বারের
ভূমিকা গ্রহণ করেন। তৎপরে “গোপিকা
রমণ শ্রীকৃষ্ণ” যখন “গোপিনী রমণে” নামা-
ন্তরিত হয় তখন তিনি নাম ভূমিকায় যে
অনবদ্য অভিনয় করেন তাহা তাঁহাকে রঙ্গ-
জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

তৎপরে তিনি “গৈরিক পতাকা”র ভূমিকা
ভূমিকায় অভিনয় করেন। “ঝড়ের রাতে”
তাঁহার রঙ্গবাহাদুরের, “লতীতীরে” তর্কজ্ঞানের
তাঁহার তুলনাবিকীন অভিনয় চিরদিন
রঙ্গমোহিতের স্মরণে থাকিবে।

ইহার পর তিনি আর্ট থিয়েটারে যোগ-
দান করেন। “বড়বো” নাটকে পুরোহিতে,
“মন্দির প্রবেশ” লক্ষ্মীমহাশয়ের “মানমণী গাল-
স্কুল” কার্ণেণ্ডে, “চির কুমার লভায়” মৃত্যুঞ্জয়
তাঁহার কৃত্তিদের পরিচয় পাওয়া যায়।
পুনরায় নাট্য-নিকেতনে যোগদান করিয়া তিনি
‘মা’ নাটকে হরিপ্রসাদের ভূমিকায় অভিনয়
করিয়া, রঙ্গমঞ্চে যোগদান করিয়া “জহিরণ”

“আত্মহতি” ও “আবুল হোসেন” নাটকে
বিভিন্ন ভূমিকায় কৃত্তিদের ললিত অভিনয়
করিয়া পুনরায় কালকাটা থিয়েটারে
যোগদান করেন। এখানে ‘আলাদিন’ নাটকে
বাহলা ও “গোরার” শিরোমণি তাঁহার
রঙ্গমঞ্চে শেষ অভিনয়। ইহার পর একবৎসর



তিনি সিনেমায় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।
Excuse me Sir এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম
চিত্রাবতরণ। “তরুণীতে” কালাপাহাড়
“মুক্তিলাভে” দারোগা, “কচি লংঘে” নকুড়-
মায়া আজও আমাদের চক্ষু অশ্রু-লজ্জল করে।

চরিত্র-মাধুর্য্যে বিনয়-নম্র ব্যবহারে
খোলামন ললিত বাবু প্রত্যেক অভিনেতা ও
অভিনেত্রীর চিরপ্রিয় ছিলেন। অজ্ঞাতশত্রু
নষ্টের অকাল তিরোহানে রঙ্গ-জগতে আজি
নকলেই ব্যথিত। আমরা তাঁহার পুত্র
শ্রীমান কাজ ও তাঁহার পরিবারবর্গ ও তাঁহার
অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীমহাশয় কুমার হাসকে
আমাদের আন্তরিক লমবেদনা জ্ঞাপন
করিতেছি। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩
বৎসর হইয়াছিল।

“বড়না”

শ্রীমতী করুণাস্বামী সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গম্কে দাঁড়ালাম, মা ও মেয়ের উত্তেজনা দেখে সত্যিই বড় অল্প মনক হ'য়ে পড়েছিলাম তাই হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারলাম না। একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, তা ভাই, মায়ের আদেশের মূল্য কি ভুল দিয়ে শোধ করতে পারি। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি—নে কমলা, তুই ও মা কেন আমার বন্ধুদের ভেতর চাইচিস। অল্প স্থানে হঠাৎ ভালও পেতে পারি।

কমলা এবার বেশ জোড় দিয়ে তিক্তস্বরে বললে তুমি কি মায়ের চেয়ে বেশী বোঝা বড়না, না, তাঁর আদেশের বিচার কর্তা।

ভাড়াভাড়ি চলে এলাম, এবং জানিয়ে এলাম তাই হ'বে।

কমলাদের বাড়ী হ'তে এসে ঘরে ঢুকে চোয়ানে বসতেই রাজ্যের ভাবনা এসে ঘিরে ধরলো! আমি জোর করেও বলনা করতে পারলাম না যে, মা ও মেয়ে একযোগে কেন আমার বন্ধুদের ভেতর চান! কি এর কারণ থাকতে পারে। খুঁজে দেখবো ঠিক করে, চিন্তায় বোঝা জোর করে ঠেলে উপর তলায় থেলায় যোগ দিতে গেলাম।

ঘরে ঢুকতেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল একযোগে বলে উঠলো, এই যে কমলার দাদা এতক্ষণে ছুটি পেয়েছে। কমলার দাদা লকলের কাছে হ'টে গেলেও কুৎসিৎ ইঙ্গিত করতে কেও কশুর কয়তো না, নিছক হাঁপি দিয়ে উড়িয়ে দিতাম। এ ছাড়া উপায়ই বা কি। মনে

মনে ভাবতাম, ভগবান রক্ষে করেছেন যে কমলার “বড় কাকা” বলে না। তা হ'লে আমাকে ও পাড়া চাড়তে হ'ত কি না কে জানে।

তারপর ৭ দিন কমলাদের বাড়ী ঘাই নি। পাঁচ দশার অক্ষমতার চেতুও বটে, মেসের বন্ধুদের বিক্রপকমাবার ভক্তও বটে! ৮ দিনের দিন কমলার ছোট ভাইটী “পাপী” আমার ঘরে ঢুকলো। তাকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যালো, রিপোর্টার! কি সংবাদ।

এই ছেলেটিকে বেশী ভালবালি, যেমন দুষ্ট, তেমনই ড্যানপেটে! আমার মেলে যে যে কথা হয় তার প্রত্যেকটি কমলাকে গিয়ে বলে। আমার তাড়ের বাড়ীর সব কথাই আমাকে জানিয়ে যায়, এই জন্য তাকে রিপোর্টার বলি।

রিপোর্টার এক রকম জোড় কয়েই আমার কোঁচা ঘরে টানতে শুরু করে বললে শিঘির আশ্রন! মা, আপনাকে ডাকছেন।

সে যে পরিমাণে ব্যস্ততা দেখাল ততখানি জরুরী কিছু মনে হ'ল না, তাহ'লে অল্প কেউ আসতেন যাই হ'ক, বললাম—চান করে যাচ্ছি, তুমি যাও।

লক্ষ্যে তখন পটা! চান আমি হ'বেলাই করি এ তারা লকলেই জানে, তাই দিকজি না করে চলে গেল।

মান করে কমলাদের হুগড়ে যা দিতেই কমলা এলে হুগড় খুলে দিয়ে একমুখ হ'লেন

বললে—এই যে বড়না! বলি এতদিন কোথায় ছিলে, তুমি। আমার বর খুঁজে খুঁজে বুঝি হররাণ হ'য়ে মরচো, আহা একেবারে রোগা হয়ে গেছ।

তার বলার ত'জমা দেখে হ'লে ফেললাম, শুম্ শুম্ ক'রে হ'বা কিল বলিয়ে দিয়ে বললাম—হাঁ,, হঠাৎই ত, তুই কি কম কষ্ট দিচ্চিস। বললাম, বিয়ে করিস নে, তা হ'ল না, বিয়ের নাম শুনে জিব দিয়ে জল পড়ে গেল।

কমলা ভিরস্বার স্বরে বললে—আচ্ছা দাদা! তুমি বাড়ী ঢুকেই আমাকে নিয়ে অমন কর কেন বলত। কখনও খোঁপা ধরে টান, হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে থাক। লোমস্ত মেয়ের লজ্জা এমনি করতে, মনে কর তোমার মেস থেকেই যদি কেউ দেখে তখন কি হ'বে!

শেষের দিকে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেও চুষ্টমীতে তার মুখখানা ভরে গেল! সে যে লোমস্ত এক কথা বিক্রপস্থলে আমাকে মনে করিয়ে দেবার ন্যতিকার কোন কারণ ছিল কি না জানি নে। আমার কিন্তু কেমন খটকা লাগলো! এইটুকু কথাতেই চোখ হ'টো আপনা হ'তে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গর উপর বলিয়ে নিলাম। আজ দু'মাস তাকে নিয়ে মরদা মাখার মত চান্টি, এর মধ্যে এক মুহূর্তও আমার দেখবার সুযোগ হয় নি, কিংবা বরকার পড়ে নি, যে সে লোমস্ত কিংবা অলোমস্ত! বান,—তার রূপ যৌবন, ভাইএর কাছে তুগির হ'তে পারে, কিন্তু যেমন মূল্যহীন, তেমনি অকেজো, অদাহী, অথচ এই অকেজো জিনিষের ঘোহাই দিতে দেখে সত্যিই বড় লজ্জিত হ'লাম।

হাকিম এম.এস. জামানের

আদি ও
গ্রন্থাগার

কস্তুরী গিল

খাতুদৌরুল্য ও শক্তিহীনতা চিরন্তন
আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ টাকার
৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা

বাজারে
ভেঁট

মনে মনে স্বীকার করতেই হ'ল, শুধু সে লোমস্ত হয় নি, তার সারা দেহ রূপ যৌবন এক সঙ্গে চুট খেলে বেড়াচ্ছে।

হাঁসি মুখেই বললাম—না, রে ভাই! সত্যিই তুট দাঁত হ'য়ে উঠেছি, এবার তোমার বরের দরকার!

কমলা হাত তালি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলো—দাঁড়া এবার স্বীকার করেছে, কেমন ঠকিয়েছি।

এমন সময় ভেতর হ'তে মা ডেকে বললেন—হায়ে মনি এলেছে নাকি, কার সঙ্গে কথা বলছি।

আমি আর কমলা এক সঙ্গে মায়ের কাছে হাজির হ'লাম। দেখি আর একজন নূতন লোক রয়েছেন, পরিচয় জানবার জন্য কমলার পানে চাইলাম, সে আমার প্রতি নিকটে ছিল।

আমার উদ্দেশ্য বুঝতে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হ'ল না, হেঁসে ফেলে বললেন—ইনি আমার বিয়ের পাকা ঘটক গুণধর ভগ্নিপতি। তোমার দ্বারা "ত" কোন কাজ হ'বার যো নেই, খালি, কমলার পিটু বাথা করতেই জান!

হেঁসে ফেললাম, মাকে লক্ষ্য করে বললাম—দেখচেন, মা, কি দুঃখ, আমি যেন খালি ওকে কিল দিতেই আসি।

তারপর কমলাকে লক্ষ্য ক'রে বললাম—তুই যে, খোলা চাপিয়ে বসে আছিস, তা ত আর জানি-নে, ভাই!

আমাদের ঝগড়ার মাঝে, মা বলে উঠলেন আচ্ছা, যাক্ রে বাবা! আমার জামাই কি বলেন শোন, ইনি একটা ছেলে ঠিক করেছেন, গর্ভমেন্ট আপিসে চাকরী করে, দেখতে মন্দ নয়, আমি নিজেও দেখেছি। খুব কমেই হ'বে, তোমার কি মত বলত, বাবা! তাকে ছেড়ে ত কিছু করতে পারি নে। তোরাই বা আর কত ঝোঁজাঝুঁজি করবি, বল।

বয়স! মেয়ের বিয়ে এত সংক্ষেপে হ'লে মানুষ যে পরিমাণে খুশি হয় মায়ের সে ভাবের কোন লক্ষণই দেখলাম না। অবলাধ অনিচ্ছাকৃত মত দেওয়ার আভাষ তাঁর সারা মুখখানায় ফুটে উঠলো। কমলার মুখ পানে চেয়ে দেখি, সে একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে। তার যৌবন স্রীতে ভরা চটুপতায় মাখান মুখখানি কেন যে হঠাৎ এমন বাক্যকে পরিণত হ'ল, এর কোন তথ্য বুঝতে পারলাম না। মনে হ'ল তার ভেতর বাইরে একটা কিলের অবাক জালায় থা' থা' করছে, কিন্তু কিলের এই জালা পোড়া! মা ও মেয়ের ভাব দেখে মনে করলাম, স্পষ্ট বলে বাই, না, মা, থাক, এ বিয়েতে কাজ নেই, একটা জিজ্ঞাসা, অদেখার হাতে বোনটিকে আমার এমন করে দিতে পারবো না। কিন্তু তা আর পারলাম না, মায়ের অন্তরের বাই পাক, মুখে তিনি মত দিচ্ছেন, আর এর উদ্বোধনী হ'চ্ছেন, একমাত্র তাঁরই জামাতা। আমি কেন ধ্বংসের মত এর ভেতর উদ্বয় হ'য়ে একটা অনর্থক করে বসি।

কোনরূপ বিরুদ্ধি বা ইতস্ততঃ না করে বেশ জোর করেই বললাম বা: চমৎকার। এর মধ্যেই দিতে হ'বে, মা!

তারপর কমলার পিঠ চাপড়ে বললাম কি ভাই! বর এলে দাঁতকে মনে থাকবে ত।

সে কোন উত্তর করলো না, সেই রূপ আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইলো। আমি কোনও কথা বলবার ফুরসৎ না দিয়ে এক লাফে চলে এলাম।

নির্দিষ্ট দিনেই কমলার বিয়ে হ'য়ে গেল! পরের দিন রবিবার! অনেক দেশে প্রথা আছে, রবিবারে বর কনে বাড়ী হ'তে যেতে নেই। তাই কমলার বরকে রইতে হ'ল।

এই দিনটার অন্ততঃ ১০০ বার কমলাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, তাদের

পছন্দ হ'য়েছে কিনা, বাস্তবিক কমলার বর খুব ভাল! এই টুকুর ভেতর যে ব্যবহার পেয়েছি, তাতে সত্যিই বড় খুশি হ'য়ে গেছি। কমলারও মুখখানা হাঁসিতে ভরে গেছে। বিয়ের আগে তার মলিন মুখখানা দেখে যে পরিমাণে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তার পরিবর্তে এই হাঁসি ও তৃপ্তিতে ভরা মুখখানা যে আমার কাছে কতবড় স্বামী তা বুঝবেন তোরাই, বাবা আমার মত লক্ষী বোনের বড়দা! —কমলাদের মটরে তুলিয়ে দিতেই সে আমাকে হাত তুলে নমস্কার করলো! কি জানি কেন, আপনা হ'তে আমার চোখে জল দেখা দিল! তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে এলাম।

কমলার শশুর বাড়ী বরিশাল জেলায়। বিয়ের পরই কমলার স্বামী অনিল বাবু আমার আফিসের সন্নিকটে বাসা করলো। আমি প্রতিদিনই তাদের বাসায় যেতাম। কমলার স্বামী আস্তো আস্তো! আমার ঠটায় ছুটি। ৭টা হ'তে অনিল বাবু, আমি ও কমলা রাত ১০টা পর্যন্ত মাসিক পত্রিকার আলোচনা করে কাটাতাম। বাড়ীখানি মন্দ নয়। নীচের তলায় আরও কতকগুলি ভাড়াটে থাকতো! কমলা থাকতো দোতালায়! বেশ নিরিবিলা, আমার কোন অসুবিধা হ'ত না।

৮।১০ দিন পর বলেই মনে হয়। ঠিক করলাম আজ আর কমলাদের বাড়ী যাব না! তার বাড়ীর দোর দিয়ে যেতেই অনিল বাবুর সঙ্গে দেখা! ২।৪টা কথার পর মিথ্যে শওরের দোহাই দিয়ে যাবার উপক্রম করতেই অনিল বাবু অনেকটা অস্পষ্টভাবে বললে বড়দা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, রাগ করবেন না ত।

এতক্ষণ তার মুখপানে তাকিয়েছিলাম মনে হ'ল সত্য এবং মিথ্যার ভেতর দিয়ে লোকটা অনেক কিছু ভেবে দেখেছে। তা

না হয় হ'ল! কিন্তু এমন কি শক্ত কথা, আমার রাগের প্রসঙ্গ বা উঠে কেন! ভয়ে এবং বিস্ময়ে আমাকে এমন ভাবে ধোল দিলে যে ক্ষণিকের জন্য বাকশূন্য হয়ে গেলাম।

সাহস সঞ্চয় করে বললাম বলুন, না, রাগ করবো কেন!

সে একটু হতভুত: করে বলল আপনার নামটা জানতে পারি-ন, অথচ আপনার মত আমার আপন জন আর কেও নেই।

খুব লোজা প্রশ্ন! তবুও লহসা কোন উত্তর দিতে পারলাম না। তবে কি কমলা আমার পরিচয় দেরনি, কিংবা কি ভাবে দিয়েছে! অনিল বাবুর মুখপানে চেয়ে দেখি আমার উত্তরের জন্য উৎসুক হ'য়ে চেয়ে রয়েছে! কিসের এত ব্যগ্রতা আর কেনই বা এত ভণিতা।

বাই হ'ক আমি জোড় করে হেসে বললাম—ও এই, সত্যিই আমার নাম জানেন ন', কমলা বলেনি আমার নাম— "মণি মোহন বহু"।

কমলার স্বামী চম্কে উঠলো, কিছুক্ষণ আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে আপন মনে বলতে লাগলো—কমলার আপন স্বামী নয়, তা হ'লে ত ঠিকই বলেছে।

আর একটা কথাও না বলে হন্ হন্ করে বাড়ীর ভেতর চলে গেল! আমি হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি যে ব্যাপারটা অশুভব করতে না পেরে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলাম। হঠাৎ কমলাবের উপর হ'তে কনকন করে কিসের শব্দ কানে আসতেই এক লাঞ্চে দোতলায় কমলার ঘরের বাইরে নিড়ির পাশে লুকিয়ে যতদূর সম্ভব তার ঘরের ভেতর পানে দেখতে লাগলাম! চায়ের বাসনগুলি ঘরের চারিদিকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পরে আছে।

কমলার স্বামী কর্কশ স্বরে কমলাকে লক্ষ্য করে বলছে—কেন তুমি এতদিন

আমাকে বলনি, যে মণিবাবু তোমার আপন স্বামী নয়। আমাকে এতদিন লুকিয়ে এসেছে কেন! কি তোমার উদ্দেশ্য!

কমলা লজল চোখে অথচ জোড় দিয়ে বলছে—মণিবাবু আমার বড়দা, তার চেয়ে ভাইয়ের মত ভাই আর আমার একটাও নেই। তোমাকে আমি কিছু কীকি দিই-নি, তাঁর সম্বন্ধে কি তুমি শুনেছ ব'ল! আমাকে কি কোনদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে, তিনি আমার আপন ভাই কিনা? হ'ক তিনি কায়স্থ, তিনি আমার বড়দা! ভারী বাধুন গিরি দেখাতে এসেছে!

কমলার স্বামী বাজভরে বললে—খুব সত্যিগিরি ফলাচ্ছ, থাক, আমার বাড়ীতে এসব চলবেনা।

মুহুর্তের মধ্যে কমলার চোখ দুটো ধপ করে জলে উঠল। রাগে এবং অভিমানে কাঁপতে কাঁপতে বিকট চিংকার ক'রে ব'লে উঠলো—আমার নারীত্ব নিয়ে কখনও কুৎসিত ইঙ্গিত করোনা।

প্রবল উত্তেজনায় এত কটা কথা বলেই হাঁপিয়ে উঠলো, তারপরই আছাড় খেয়ে বিজানায় উপর হ'রে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

কমলার স্বামী হস্তত এরকম প্রস্তুত ছিল না, তাই ভয়ে থতমত খেয়ে পাশের চেয়ারটার বসে পড়লো, এবং অনেকটা শাস্ত্রযবে বললে—তা হ'ক তুমি একগুঁট মণিবাবুকে লিখে দাও, তিনি যেন কোনদিন আমার বাড়ী না আসেন।

কোনরকমে মাথাতুলে শাশুররনে কমলা জিদ করে বললে—লিখিতে হয় তুমি লেখ-গে। আমি কখনও তা পারবো না। তিনি আমার বড়দা, বড়দা! বড়দা।

আমার নিজের মাথাটা বৌ বৌ করে ঘুরছিল, কোনরকমে রেলিংটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভাবতে লাগলাম, হায়রে অলুই অনিল বাবু কেবল এটাই বড় করে দেখলেন যে সম্বন্ধটাই জগতে বড়, এ ছাড়া নিখিল স্নেহ পবিত্র ভালবাসা কি সম্ভব নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মণিবাবু! দেওর, বৌদি, শিশি, মাসি যে সব সম্বন্ধকে এত বড় করে মনে করছ, তাই তার অক্ষুর মর্যাদা কি রেখে চ'ল তোমরা! তবে ও স্মৃতোর বোধন বা একটা দু'হিলে উড়ে যায় তার এত বড়ই কিসের ভাই। মামুদের কাজ সুখবার, কিংবা অন্তর যাচাই করবার শক্তি যদি না পেয়ে পাক, ত জেনে রাখ সংসারে সম্বন্ধটাও একটা নিচক স্রাবের কীকি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাকে সত্য ব'লে দাঁড় করালে সত্যিকার জিনিষ হ'তে বাধ পড়েই রইবে তাই! কমলা আমার আপন বোন নয়, এই হ'ল আমার বড় অপরাধ। বেশ তাই।

ম'তালের মত চুপে চুপে যখন পালিয়ে আসি, অলুই ভাবে কাপে এল, আচ্ছা আমিই লিখে দিচ্ছি।

—শেষ—

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

স্মৃতিংএর কাট ছাট

দেশের মাটি চবিত্তে উমা যে সকল লাড়ো, জামা ইত্যাদি ব্যবহার করিতেছেন—তাহাতে গ্রামের চাপ শতকরা একশ ভাগ। নিকটস্থ কোন গ্রামের তাঁতী তাহা প্রস্তুত করিয়াছে।

চক্রাবর্তী শিক্ষিতা অরুণার ভূমিকায় যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা দেশীয় কোন মিল হইতে প্রস্তুত। মিলের লোক এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ফলে কতকগুলি নতুন ডিজাইন লাভ করিলেন।

সহরের ঘরামী দ্বারা গ্রাম্য কুটির তৈয়ার করা যায় না। সেই জন্য দেশের মাটির কুটির প্রস্তুত করিবার জন্য পাড়ারগা হইতে প্রায় ২০ জন ঘরামীকে “দেশের মাটি” চিত্রে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে খরচ বেশী হইলেও কাজ নিখুঁত হইতেছে।

এই চিত্রে সহরের শিক্ষিত ধনী লোকের যে প্রকার ঘর বাড়ীর নমুনা দেখানো হইতেছে, তাহাও বাস্তবিক অতি চমৎকার। ভবিষ্যতে আমাদের হয়ত বহু ধনীর গৃহ এবং গৃহ সজ্জা “দেশের মাটির” নমুনা মত দেখিতে পাইব।

কণী মজুমদারও তাঁহার প্রথম বাংলা এবং হিন্দি “The Street Singer” চিত্রে নানা প্রকার নতুন জিনিষ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষ করিয়া কানন এবং লায়গলের সাজ সজ্জায়।

কণী বাবু সেটের ডিজাইনেও কতকগুলি একেবারে নিজস্ব পরিবর্তন করিয়াছেন। পরিচালক ফণী মজুমদার বলেন সর্ব কনিষ্ঠ হইলেও—অভিজ্ঞতায় কাহারো অপেক্ষা কম নছেন। যে ভাবে তিনি তাঁহার ছবির কাজ চালাইতেছেন, তাহা বাস্তবিক পক্ষে আশ্চর্যজনক।

উমা-লায়গলকে এক সঙ্গে অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, এইবার কণী বাবুর চিত্রে লায়গল কাননকে এক সঙ্গে দেখিবেন। বহুজন এই দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে একসঙ্গে দেখিবার আশা করিয়াছেন, এতদিনে তাহাদের আশা পূর্ণ হইল। “দি স্ট্রীট সিঙ্গার” চিত্রে গানের মাত্রা এবং রকম কি প্রকার হইবে—তাহা কানন এবং লায়গল একসঙ্গে থাকতেই বুঝা যায়। সঙ্গীতে ইহাদের সমকক্ষ আর কে আছে—? অংশু আমরা উমা লায়গলের কথা বাঁধ দিই বলিতেছি।

চক্রাবর্তী দেশের মাটি চিত্রে যে ভূমিকায় নামিয়াছেন, তাহা তাঁহার “বিহঁর” ভূমিকা অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে বহু বিষয়ে মিল আছে। দেশের মাটি চিত্রে চক্রাকে তাঁহার অভিনয় শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইতেছে। প্রত্যেকটি দৃশ্যের জন্য তাঁহাকে প্রত্যাহ বেশ কয়েক ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হইতেছে। মানসিক পরিশ্রমও তাঁহাকে কম করিতে হইতেছে না।

লায়গলকে এইবার দেশের মাটি চিত্রে আমাদের আদর্শ বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রে দেখা যাইবে। যে মহৎ আদর্শ সামনে

রাখিয়া লায়গল এবং তাহার বন্ধুবর্গ গ্রামে কাজ করিতেছে—তাহা তাহাদের সত্যকার জীবনেও বহু পরিমাণে এবং ভাবে প্রতিফলিত হইবে।

‘মহৎ কিছু অভিনয় করাও ভাল’ এই বাক্য এইবার দেশের মাটি চিত্রে প্রমাণিত হইবে। মহৎ কোন কিছু অভিনয় করিতে করিতে তাহা বহু ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে সত্য সত্যই ফলিয়া যায়। দেশের মাটির চিত্রেও ইহা দেখা যাইবে।

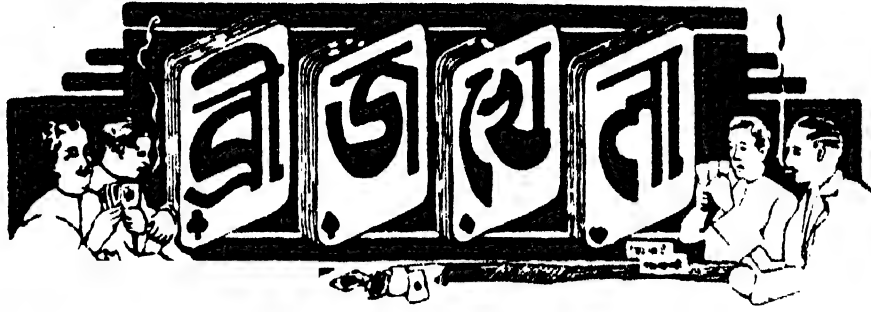
“দি স্ট্রীট সিঙ্গার” চিত্রে কানন যে ভূমিকায় নামিয়াছেন, তাহা অপূর্ণ এক আনন্দ পরিবেশনের চরিত্র। ইতিপূর্বে কানন যে সকল ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন—তাহাকে কমবেশী পরিমাণে ‘দ্রুৎস্বাস্ত’ বলা যায়। কিন্তু পথের গায়িকার ভূমিকায় এইবার কানন “স্বথাস্ত” চরিত্রে নামিয়াছেন।

সুখ দুখে দুইটি অসহায় জীবন কেনন করিয়া ভাগিতে ভাগিতে এক সঙ্গীতময় রাজ্যে গিয়া পড়িল—তাহাই কণী বাবুর চিত্রে দেখিতে পাইবেন। এই চিত্রে অমর মল্লিক এবং শৈলেন চৌধুরীও দুইটি ভূমিকায় নামিয়াছেন। “বড় বিহঁর” কাজ ছাড়া অমর বাবু কণী বাবুর চিত্রের কাজ লইয়া হুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আমরা জানি অমর মল্লিক হুঃসাহসী লোক এবং তাহার এ যোগ্যতাও আছে।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়



শ্রীচর্যাসা

ফিনাস নেশার কয়েকটি

(৩) ইঙ্গাবন—বিবি, X, X।

অবস্থা :—মনে করুন আপনি দক্ষিণে বসেছেন,—আপনার হাতে আছে।

ইঙ্গাবন—সাহেব, X।

	উ	
প		পু
	দ	

ইঙ্গাবন—গোলাম, সাতা, চৌকা।

আপনার ফেরাইএর খেলায় প্রতিপক্ষ ইঙ্গাবনের চক্কে খেলেছেন,—আপনি কি খেলেছেন বলুন তো? 'দ' 'উ'র হাত থেকে এ ক্ষেত্রে চোট একখানি ইঙ্গাবন দেবেন। এই ধরণের খেলায় ইঙ্গাবনে একবার মাত্র পিট আটকাতে পারা যায়, অন্য কোন প্রকার খেলায় কোনমতে ইঙ্গাবনে পিট আটকান অসম্ভব।

(২) ইঙ্গাবন—সাহেব, চক্কা, তিরি

	উ	
প		পু
	দ	

ইঙ্গাবন—বিবি, দশ, ছরি।

এক্ষেত্রে 'দ' ফেরাইএর খেলা খেলেছেন। ইঙ্গাবনের সাতা খেলার পর 'উ' তিরি দিয়েছেন, এখন বলুন তো 'পু' কি দেবেন?

'পু'র বিবি মারা উচিত; কারণ 'পু' দশ হিলে কোন ফল হচ্ছেনা, বরং ক্ষতিকর হয়, যেহেতু 'দ'র হাতে গোলামও থাকতে পারে।

	উ	
প		পু
	দ	

ইঙ্গাবন—টেকা, X, X।

'দ' ফেরাইএর খেলা খেলেছেন, 'প' চোট একতাল ইঙ্গাবন খেলেছেন। এখন 'দ' 'উ'র হাত থেকে দ্বি তাল দেবেন বলুনতো?

'উ'র হাত থেকে একতাল চোট ইঙ্গাবন দেওয়াই উচিত, কারণ 'পু'র হাত শুধু ইঙ্গাবনের সাহেব বা সাহেব X থাকলে তিনি ইঙ্গাবনের সাহেব ফেলতে বাধ্য হবেন; অতএব ডাককারীর এই রঙে দুইখানি পিটই হয়ে যাচ্ছে।

(৪) ইঙ্গাবন—পঞ্জ, চৌকা, তিরি।

	উ	
প		পু
	দ	

ইঙ্গাবন—বিবি, চক্কা, ছরি।

'দ'র ফেরাইএর খেলায় 'প' ইঙ্গাবনের সাহেব খেলেছেন, তাহলে 'পু' কি তাল দিয়ে যাবেন।

'পু'র বিবি দেওয়াই উচিত, কারণ হাতে টেকা সাহেব গোলাম সমেত তাল নিয়েই অথবা টেকা সাহেব সমেত ছরি বা সাতখানি তাল নিয়েই ইঙ্গাবনের সাহেব পেড়ে খেলেছেন। যে কোন অবস্থা ধরুন না কেন

'পু'র ইঙ্গাবনগুলি পর পর খেলবেন এবং দ্বিতীয়বারেই আপনাকে বিবি ফেলে দিতে বাধ্য করবেন। ইহা অপেক্ষা প্রথমবারেই বিবি ফেলে দিয়ে নি'রসে খেঁড়ীকে ঐ রঙে ফেলতে দেওয়া সুস্তিযুক্ত।

(৫) ইঙ্গাবন—সাহেব, দশ, তিরি, ছরি।

ইঙ্গাবন—টেকা, X

	উ	
প		পু
	দ	

'দ' ফেরাইএর খেলা খেলেছেন, উত্তরের হাত থেকে ছরি খেলা হয়েচে এবং 'দ' বিবি দিয়েছেন। 'প' এখন কোন্ তালখানি দেবেন।

'পু'র টেকা দেওয়া উচিত, কারণ টেকাটিকে এক্ষেত্রে ধরে রেখে কোন ফল হচ্ছেনা; অথচ যদি তাঁর খেঁড়ীর হাতে গোলাম, X, X সমেত তিনখানি তাল থাকে, তাহলে বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

ইছাপুর অর্ডজ্যান্স ক্লাব :—

বিগত রবিবার ৩রা এপ্রিল থেকে ইছাপুর অর্ডজ্যান্স ক্লাবের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। এবার এদের প্রতিযোগিতার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এরা আবার নতুন একটি কণ্ঠ্য ডুপ্লিকেট বিভাগে প্রতিযোগিতা বের করেছেন এবং কলিকাতার প্রত্যেক দলকেই প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান করেছেন। সুখের বিষয় এদের আহ্বান সানন্দে গৃহীত হওয়ায় কলিকাতার বহু ক্লাবই দলে দলে প্রতিযোগিতার আলয়ে পদার্পণ করছেন এবং মাঝে মাঝে কোন কোন দলবিশেষ unconventional ডাক দিয়ে প্রতিপক্ষের বিম্বর উৎপাদন করে আলয় সরগরম করে তুলছেন। তবে অর্ডজ্যান্স ক্লাবের সভ্যবৃন্দের সুরম্বর ভক্ত ব্যবহার ও উপভোগ্য আতিথেয়তা প্রত্যেকের মনেই যে বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে, ইহা আমরা স্বীকার করি।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—উষা চৌধুরী

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর এই ছোট আলোচনার মধ্যে নারী-ধর্মের কয়েকটি প্রয়োজনীয় দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। লাবেক কালের নারীর এবং আধুনিক নারীর জীবনের বিচিত্রতার দিক নিয়ে আজ বহুল আলোচনার প্রয়োজন।

আমরা এটো আলোচনামূলক প্রবন্ধ আমাদের পাঠিকা-স্বা-বান্ধবের কাছ থেকে আহ্বান করছি।

(সঃ মহিলা-মহল)

মাননীয়া "খেরালী মহিলা-মহল সম্পাদিকা" লম্বীপেয়—

বহুল প্রচারিত 'খেরালী'র পাতায় মহিলা-মহলের প্রয়োজনীয় আলোচনা পাঠে আমরা মহিলা সম্প্রদায় বিশেষ উপকৃত। গৃহশিল্প লব্ধকে আপনার ধারাবাহিক আলোচনা প্রকৃতই মহিলা সমাজের কল্যাণকর।

বাঙলার নব আলোকপ্রাপ্ত নারী-সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষালাভে আজ জীবনের গতিকে অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে। ভাগ্য ধর্ম আজকের নারীর আর লাবনা নয়—বিলাল আর আত্মহুধ আজকের নারীর অলান্তরণ। লাবেক কালের নারীর জীবন-ধারা আর আজকের নারীর জীবন ধারার

অনেকখানি প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। আজকের নারী সভ্য বলে গর্ব প্রকাশ করে থাকে—জীবন যাত্রায় পাশ্চাত্য শিক্ষালাভে লাবেক কালের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য কৃষ্টিতেই আধুনিক জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করে নিচ্ছে। নতুন ভাবে নারী আজ তার জীবনকে গড়ে তুলতে চাইছে এবং এরই ফলে সমাজে এক বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য একথা খুবই সত্যি—আধুনিক কালের নারী লাবেক কালের অনেক জড়তা-বীনতা-কুসংস্কার পরিত্যাগ করে জ্ঞানালোকে পরিশুদ্ধ হয়েছে অনেক অন্ধসংস্কার-কুনীতি আজ পশ্চিমের আলোকে সস্কৃত হয়েছে। জীবনের ক্ষেত্র আজ কয়েকদিকে বিভূর্ণিত। কিন্তু অনেক দিক থেকে আমরা আবার ক্ষতিগ্রস্ত। বহু দিক থেকে গৃহধর্ম—গৃহশান্তি আজ বাহত। উপকার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে—শিক্ষা, সংস্কার এবং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আজকের নারীর জীবনে বহু অপকার, অমঙ্গল, অন্তত সংস্কার এবং কুশিক্ষা নেমে এসেছে। গৃহস্থ আজ কতখানি বীন—গৃহস্থ আজ ডাক্তারের খরচে রিক্ত—রান্না ঘরের তার রক্ত—বিদেশীর হাতে তার চাবি—লাবেক কালের ছোট সম্পদ থেকে আজকের নারী রিক্ত, এসবকে ঠিকপূর্বে আপনাদের খুবই সুবিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

মাতৃস্বাক্ষরী নারী সম্মান প্রতিপালনে স্বভাবগত বস্তুশীলা—আজকের নারীর দে স্বভাবের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কথাটি খুবই অপ্রিয়—কিন্তু অন্তত নয়। অপেক্ষাকৃত অর্থহীন সংসারে কি, চাকরের কোলে প্রতিপালিত হলে মেয়ের মুখে মাতৃস্বাক্ষর "মামি" শুনলে সত্যিই হঃখ হয়। ছেলেরা "মা" বলে না—মায়েরাও "মা" নামের চেয়ে বিলাতি মায়ের "মামি" শুনতে চান। পার্কে বেড়াতে গেলে নিতাই দেখা যায় এই "মামি" সম্মানকারী এই শিশুসম্প্রদায় মাতৃ-অকবিত্য—এই সম্মান-দানের আরা-কি-চাকরের কাছে কি অশেষ-বিধ লাঞ্ছনা। জীবনের প্রভাতে যারা আরা-কি-চাকরকেই চিন্তা তাদের পরিচর্যাকারীরূপে-মাকে বললো 'মামি' এবং আরা 'কি' 'চাকরের' কোলেই পেলে মায়ের আদর তাদের মায়ের কৃতজ্ঞতা কতখানি থাকতে পারে মাকে তারা কতখানি চিন্তে পারে—সে কথা কি ভাববার মত নয় আজ আসেনি?

আজকের নারী নিজহস্তে সম্মান প্রতিপালন করে নিজেদের দরিদ্র বলে পরিচিত দানে গজ্জা অমুভব করে। এমনও এ মরাত্মক ব্যাধি আমাদের সমাজে খুব বিস্তারলাভ করেনি কিন্তু এর গতি এখন প্রতিহত না হলে অদূর ভবিষ্যতে বিস্তৃততর হতেও বেশী বিলম্ব হবে না।

আমরা এই ছোট আলোচনাটি পত্রস্থ করলে খুশি হব, নমস্কার। বিনীত—

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী।



ইন্দিরিমাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ—বিজ্ঞানী মণ্ডল, দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠান, ছোটদের বৈঠক, সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান তারই মধ্যে আবার পল্লীমঞ্চল আশ্রয় বেতার বিচিত্রা, থিয়েটার বক্তৃতা প্রভৃতি। এই বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার জন্তে আবার বিভিন্ন প্রোগ্রাম আনিয়েটে ডাইরেক্টরও নিযুক্ত আছেন। বাহুল্য বোধেও গুণী আর্টিষ্টের অভাব নেই। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্তে লোকেরও অভাব নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রোতাদের কাছ থেকে নিতাই শোনা যাচ্ছে অভিযোগ। শ্রোতাদের অভিযোগ আর্টিষ্টের অভিযোগ দিনে দিনে চলেছে বেড়ে।

সকলেরই মূখে প্রধান অভিযোগ প্রোগ্রাম ভালো হচ্ছে না, কোন বিভাগেরই কার্যদারী সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। কোন বিভাগের প্রোগ্রামেরই একটা নির্দিষ্ট standard নেই। প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনে আমরা মোটেই নতুনদের আস্থা থুজে পাচ্ছি নে।

ছোটদের বৈঠক দিনে দিনে অবনতির স্তরে নেমে যাচ্ছে। মালিমা এবং হাজমনি কোনই কৃতিত্ব দেখাতে পাচ্ছেন না। মধ্যে এ আশ্রয়টির বেশ খানিকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ লম্বালোচনার অযোগ্য হয়ে উঠছে এ আশ্রয়। যত বাজে আর্টিষ্টের ভীড় দেখছি এ আশ্রয়ে। নৃপেন-বাবুর স্বর্ণময়রব্যাপী চিঠি পাঠ আর ফোর্সক্লেশ নাটিকা অভিনয়—গান বাজনা! শিশু সাহিত্য শিশুদের আশ্রয়ে উপেক্ষিত।

দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠানও তর্কবচ! মহিলা-দের জন্তে এ আশ্রয় বেতারে চিরদিনই উপেক্ষিত। বেতার কর্তৃপক্ষকে এ আশ্রয়ের ক্ষুদ্র উপলব্ধি করতে দেখা যায় না। কোন রকমে ভোড়াতাড়ি দিয়ে রেকর্ড বাজিয়ে ফোর্সক্লেশ আর্টিষ্টদের দ্বারা দেড় ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেওয়া।—বেতার জগতে অপরাপর বিভাগের প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠান তথা মহিলা আশ্রয় উপেক্ষিত!

সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে তবু পাওয়া যায় কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় রাবিশের গাছায় শেলুলি চাপা পড়ে যেতেও দেয়ী হয় না। যে সব প্রোগ্রামে থাকে গৈচিহ্না—যে সব আর্টিষ্ট খানিকটা মৌলিকতা এবং স্বপ্নের পরিচয় প্রদান করেন—এই অনুষ্ঠানে কিছুদিন বাদে আর তাঁদের লক্ষ্য পাওয়া যায় না।

“গোপী চিত্র” “মাইকেল বধ কাব্য” বেতারে বিশিষ্ট অবদান। বহুদিন ধাবৎ আমরা এমন সুনিপুণ রসজ্ঞানের পরিচয় বেতারে পাইনি। কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতি অনুষ্ঠানও বেতারে প্রশংসনীয়। বাণীকুমার রচিত এবং প্রযোজিত বেতার-বিচিত্রা আজকাল বেশ ভালোই হচ্ছে।

বক্তৃতা বিভাগের আমরা কোন উন্নতিই দেখতে পাচ্ছি না। বেতারে মাঝে ভোট গল্পের প্রচলন দেখেছিলাম, কয়েকটি ভালো গল্পও শুনেছিলাম বহুদিন

পূর্বে। অধুনা প্রোগ্রামে আর রসসাহিত্যের আলোচনা বড় দেখি না। বেতারের প্রোগ্রাম পরিচালনার এইখানেই কৃতিত্ব দেখি। শ্রোতার যা চায় কর্তৃপক্ষ তা পরিবেশনে গররাজী।

মিসেস এস, এন, ঘোষ কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত গুণী শিল্পীদের চরখানি রোপ্যপত্র প্রস্তুত করেছেন।

(১) পল্লীমঞ্চল আশ্রয় সুপরিচালনার জন্তে সাহিত্যিক নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

ডাঃ প্রমোদ বালামুখ

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

বাউল সঙ্গীতের মূলকথা

দেবানীষ সেনগুপ্ত

‘বাউল’ শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই সুবিশেষ পরিচিত। ‘বাউল’ শব্দটির মূলমন্ত্র দুইটিতে মূর্ত্ত হয়না এমন লোক বিরল লোকসঙ্গীতের যে অপকৃষ্ণ রূপটি এই বাউল সুরে মূর্ত্ত হয়ে উঠে শ্রোতা-মণ্ডলীর অন্তর সুধার্সে প্রাবিত করে তা সত্যিই অনিন্দ্যসুন্দর। উদ্বাস’ শব্দ সুরে কোন ঘরচাড়া পাগলকরা বিবাগী যেন ডাক দিয়ে যায় সেই প্রান্তর পরে—কি হতে যিগড়রে, পাবীর কলকুজনের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে জেগে উঠে রাখালের বাঁশী—কুস্ত ভট্টানীর কলোচ্ছাসের তালে তালে তাল রেখে যেখানে আবেগ অনন্দে গান গেয়ে চলে যায় এপার ওপারের খেয়া মাঝির হল

বাউল গান আজকাল যেন বাজলার অজ্ঞাত লোক সঙ্গীতের সঙ্গে একটা অজানী সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই ধারণা বাউল ভাটিয়ালী ইত্যাদি শব্দশ্রেণীর সমীকৃত এবং এদের সকলেরই মূল এক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাউল গানের সঙ্গে ভাটিয়ালী শ্রেণীর গানের তেমন কোন সম্বন্ধই নেই। বাউল ও

ভাটিয়ালীর মিশ্র সুর বর্তমানে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত—শ্রোতাদের বিভ্রান্তির অন্ততম কারণ সমূহের মধ্যে এটাকেও একটা বিশেষ স্থান দেওয়া যেতে পারে।

বাউল সঙ্গীতের তথা বাউল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা বোধ করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

‘বাউল’ শব্দটির উৎপত্তি ‘বাড়ুল’ থেকে—যার অর্থ উন্মাদ বা পাগল। হরিনাম শ্রবণে আনন্দে অধীক হয়ে বাহুজগতের সকল বিস্মৃত হয়ে যারা উন্মাদ নৃত্য-হাসিকার্য্য সংমিশ্রণে নানাবিধ পাগলের মত আচরণ প্রকাশ করতো—জনসাধারণ তাদেরই ‘বাড়ুল’ আখ্যায় ভূষিত করে দিয়েছিলো। একদল লোক যেমন এদের ‘ভাকা’ বা প্রকৃত ‘বাড়ুল’ ইত্যাদি বলে এদের সম্পর্ক তাগ করে চলেতো, অন্ততম তেমনি এদের প্রকৃত শব্দ ‘প্রেম-বাড়ুল’ বলে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে ছায়ায় মত প্রতিনিয়ত অমসরণ করে বেড়াত। ইতিহাসে এমন কয়েকজন মহাবাউলের নামক পাওয়া যায় যারা ‘ঈশ্বরের অবতার’ রূপে বঙ্গদেশে সর্কসাধারণের পূজ্য আরাধ্য দেবতা বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। ৬গৌরাজ মহাপ্রভু তাদের মধ্যে অন্ততম।

বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব সমাজেরই কিয়দংশ বাউল সমাজে পরিণত হয়। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে—বৈষ্ণবেরা প্রশান্তভাবে হরিনাম গানের পক্ষপাতী এবং বাউলেরা হরিনামে উন্নততা প্রদর্শনের পক্ষপাতী।

আলোচ্য শতাব্দীতে সন্ন্যাসীরা প্রায়ই পরিব্রাজকের বেশে হল বেঁধে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষার চাল সংগ্রহ করতো। অবশ্য উৎসাহ সংস্থানের জন্তেই তাদের সন্ন্যাসগ্রহণ তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন ‘গোলাকী মাধব পুরী’—ইনি কখনও কারও কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন নি। স্বতঃপ্রসূত হয়ে কেউ কিছু দিলে তিনি তা খেতেন আবার কিছু না জুটলেও নির্দিকারভাবে উপবাস দিয়ে উপাসনার মন্ত থাকতেন।

শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত পুরী সম্প্রদায়ের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইনি সেই পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। পুরী সন্ন্যাসীরা অষ্টভাবাদী—ব্রহ্মই তাদের উপাস্ত, কিন্তু গোলাকী মাধব পুরী ছিলেন বিষ্ণুধর্মের উপাসক—বিষ্ণুধর্ম জপের দ্বারা আপন অন্তরে তিনি সেই লীলাময় দেবতার চিরপ্রসঙ্গ মুক্তিধারি প্রতিষ্ঠা করে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। অষ্টভাবাদসম্মত ব্রহ্মজ্ঞানকে তিনি নিরস বলে উপেক্ষা করতেন। ভগবান কৃষ্ণের লীলাকথা শুনবা মাত্র মাধবপুরী বাহুজ্ঞান বিরহিত হয়ে মাটিতে লুট্টির পড়ে অশ্রুপাত করতেন। আবার পর মুহূর্ত্তেই হয়ত বিকট হাসির সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদ নৃত্য আরম্ভ করে দিতেন। যথার্থ গুণ। গ্রাহীর-ভাবগ্রাহীর—তার এই ভাববিচলতা যেথেকে তাকে ভাবোন্মত্ত বৈষ্ণব আখ্যায় অঙ্কিত করেন কিন্তু অবোধ জনসাধারণের নিকট তিনি বাড়ুল রূপেই অবজ্ঞাত হয়ে রইলেন। এই ‘বাড়ুল’ আখ্যায় ক্রমশঃ মূখে মূখে বর্তমান ‘বাউল’রূপ প্রাপ্ত হয়।

গোলাকী মাধবপুরী যে কেবলমাত্র কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ ছিলেন তা নয়—সর্কসাজে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। মূখে মূখে তিনি এমন সুন্দর সুন্দর সংকৃত শ্লোক রচনা করতে পারতেন যে, তৎকালীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদেরও

(২) সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোচনার জন্তে সাহিত্যিক অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য।

(৩) স্তম্ভভিনয়ের জন্তে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভট্ট।

(৪) “আজু গোলাই বনাম রাধাপ্রসাদ” জীবনীময় পাঠক এবং

(৫) শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বোধ

(৬) সংবাদ দরবারের জন্তে শ্রীবিজয় বসু

হেমচন্দ্র

শ্রীশ্রীমল চন্দ্র ঘোষ

আকাশে নবুজ শৈল মেরু মেরু অগ্ন্য কান্তার
নবাই স্বাধীন আজো ভূচর খেচর জর্দচর,
হিংস্র স্বাধীন আর সুড়ঙ্গের নর্প বিবধর
আমরা স্বাধীন বলি লিখি স্বীপি ছাড়িছে ছকার।

ইরানী কাবুলী তুর্কী সুলজাপ চৈনিক মোজল
নবাই স্বাধীন আজো ফিরিতেছে উল্লসিত মনে
উন্মাদ স্বদেশ ভক্ত নহে বড় পরাধীন রণে
বাজার ভৈরব শিলা, পথভরে কিতি টলমল,
হে স্বদেশ ভক্ত কবি, শুধু তব মাতৃভূমি
পরাদীন ঘুমায় কেবল।

শতবর্ষ ক্ষুদ্রনদী নীমাধীন কালসিদ্ধ পানে,
কোথায় মিলায়ে গেছে তোমার জন্মের দিন হ'তে
কত রাজা লুপ্ত হ'ল বৃহৎদের মত তা'র স্রোতে,
উৎসান ও পতনের অশান্ত কল্লোলময়ী গানে।

তোমার কাব্যের বহি পুঙ্খ আজো হয়নি নির্কাণ
তব উদ্দীপনাময়ী বিশাল আত্মার বস্ত্রভেরী
স্পন্দিত গর্জনে কয় হে স্বদেশ আরো কত ধেরী ?
কবেরে মরণ ঘুম ভারতের হ'বে অবসান ?
তোমার বিদেহ আত্মা নিরালস্য তাই জাগে
সুনিবারে মুক্তি মন্ত্র গান।

কবে যে ভাজিবে ঘুম, এ ঘুম কি ভাজিবার নহে ?
আর্য্য বংশধর গণ শবাকার শ্মশান শব্যাস্ত,
পরাদীনতার ক্রোধে আজো ফেন হয়েনি লজ্জায় ?
ভাবিলে স্থগায় মরি অপমানে মর্ষতল বহে।

স্বদেশ জননী তব শোন কবি করিছে—ক্রন্দন
ভীকৃত্যর মহাপক্ষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি
ক্রমধ্বনী অধঃপাতে ডুবে যায় হেরি অন্ধরাতি,
জাতির কঙ্কালে আজ নাহি পাবে প্রাণের স্পন্দন !
তুমি নাই হৈমজ্যোতিঃ- বিচ্ছুরিয়া কে শুনাবে
জাগো জাগো স্তম্ভ জনগন।

আর তুমি আলিবেনা মুক্তি যজ্ঞে প্রার্থন উদ্গাতা
শতাব্দী কাটিয়া গেল স্তম্ভর আশ্রয়না হার
দ্বিধীর অস্থি আজ শীতল মাটিতে বিশেষ বার
হানব-বৃত্তের তপে তুই আজ স্বয়ং বিধাতা।

বজ্রের অঙ্গন তলে তব শত বাবিকী উৎসবে
যা'রা স্মৃতি পূজা করে, সে পূজা কি করিবে গ্রহণ ?
অসম্ভব ; মহাকবি, জানি তব কী দুরন্ত গণ ?
মিথ্যা স্মৃতি পূজা, জাতি যতকাল পরাদীন র'বে ?
নিরুদ্ধ শিঙায় তাই শঙ্কহীন বাণী কাঁড়ে
দ্বাতিহারী চাহি নীলনভে।

—:o(x):o:—

অবনত মস্তকে তাঁর প্রাধাত্য স্বীকার করে
নিতে হয়েছে। মধুর স্বভাবের শুণে তিনি
ব্যক্তিমাত্রেরই পূজনীয় ছিলেন—আপামর
সাধারণ লোক তাকে ভালোবাসতো—
ভক্তি করতো—প্রজা করতো।

বাক্সলাবেশ তখন শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
পুরী নন্দ্রহারের প্রভাবাচ্ছর। শঙ্করের
ভাষাই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র—শঙ্করের অধৈতবাবই
শ্রেষ্ঠ বচন। পুরী নন্দ্রহারের কোন লক্ষ্যানীই

এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।
মাধবপুরীই সর্বপ্রথম মুক্তিতর্ক দ্বারা তাহের
এই মত খণ্ডন করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি
বললেন—শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, কৃষ্ণপ্রেমই
শ্রেষ্ঠতম। ফলে তাঁর শিষ্যরা চ'লে
বিতর্ক হলেন। একদল—পূর্বের মত
শঙ্করভাষাকেই নার মনে করে অধৈতবাবকে
আঁকড়ে পড়ে রইলেন—অন্তদল গোলাঞী
মাধবের প্রকৃত দ্বিগ্ন লকলে 'বাউল বৈষ্ণব'

রূপে ঈশ্বর প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মেনে
নিলেন। ক্রমশঃ এরা 'বাউল' নন্দ্রহার
নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

স্ববিখ্যাত প্রাচীন পন্থী পুরী লক্ষ্যানী
রামচন্দ্র পুরী ছিলেন প্রথম দলের মধ্যে—
দ্বিতীয় দলের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা
লক্ষ্যানী ঈশ্বর পুরী।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই পুরী
মাধবেশই বাউল নন্দ্রহারের প্রতিষ্ঠাতা।

চন্দননগর সঙ্গীত সম্মেলন

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিনন্দন

চন্দননগরের নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার পালিত এম্-এ যে অভিনন্দন পাঠ করেন নিয়ে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইল। সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোক নাথ শাস্ত্রীর অভিনন্দন আগামী সপ্তাহের 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত হইবে।

অভ্যাগত বৃন্দকে আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত পালিত বলেন :—

ন বিজ্ঞা সঙ্গীতাং পরা। মানব মনের চিরন্তন অজ্ঞেরতার সঙ্গীত ফুটিয়ে তোলাবার চেষ্টা করে, বাস্তব এবং নৃত্য তার সহায়তা করে। রাগ রাগিণীর সাহায্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সৃষ্টি দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু সেই যে অনাবিকাল হ'তে মানব মনে কি যে

বাল্যের বহু বৈজ্ঞানিক বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গৌরাজ মহাপ্রভু স্বয়ং ছিলেন এক মহাবাউল—তার শিষ্যরা প্রায় সকলেই 'বাউল' আখ্যা প্রাপ্ত হন। অধৈর্য মহাপ্রভুও মাধব গোস্বামীর কাছে হীক নিয়ে বাউল সমাজে যোগদান করেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুও গোলাপী মাধবের ঈশ্বরোক্ত হয়ে 'মহাবাউল' রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

এই হলো বাউল সম্প্রদায়ের আদি ইতিহাস। কিন্তু বর্তমানে বাউল সঙ্গীতের সঙ্গে এই বাউল সম্প্রদায়ের কোনও সংঘর্ষ আছে কি?—বিলাসী বাবুদের ইয়ার মহলে আজকাল বাউল গানের আলস।—আর এর অধিকাংশেরই রচয়িতা বর্তমান যুগের তথাকথিত আধুনিক কবিরা হল।

ভাবের প্রবাহ চ'লেছে যা' ফুটিয়ে তোলাবার জন্তে কবি তার লেখনীপঞ্চাশনে আজ অবধি নিরন্তর হ'তে পারল না, বৈজ্ঞানিক তার যন্ত্র নির্মাণের কৌশলে যেতেই উঠল, শিল্পীর তুলির নিখুঁত ঘায়ে যা' ধরা দিল না,—গায়কের সঙ্গীতে গগন বিকম্পিত হয়ে উঠল তবু মূর্ত হ'য়ে উঠল না— কি সে ভাব যা চিরন্তন অখণ্ড চিরঅজ্ঞের—বার অমৃত্যুর ব্যাকুলতার মাহুস যুগ যুগান্তর ধরে ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ঘুরে মরছে তাকেই দার্শনিক বলেছে রসো বৈ লঃ—সেই unknown and unknowable সেই রমেরই অন্বেষণে ছুটেছে আমাদের সুরলিক সুরশিল্পিগণ এবং কলাবিদগণ! সেই রমের পরিকল্পনা তাঁরা ফুটিয়ে তুলতে চান রাগরাগিণীর মধ্যে, বাস্তব এবং নৃত্যে। সেই কোন সনাতন যুগে একবার দেবদেবী মহাদেব নাকি প্রলয়ের রাগিণী প্রকট করেছিলেন তাঁর তাণ্ডব নৃত্যে। মেনকা নাকি কত মহামুনির তপ ভঙ্গ করেছিলেন তাঁর লাঞ্চে। এমন কি তানসেনের সঙ্গীতে নাকি প্রকৃতিও বশ মেনেছিল। তাই বৃষ্টি কবি বলেছেন নবিজ্ঞা সঙ্গীতাং পরা—যে বিজ্ঞার মেহিনী সৃষ্টিতে জগৎ সৃষ্টিত—যে বিজ্ঞা যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা বলে পরিগণিত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

যে সঙ্গীতজ্ঞ সুরলিক শ্রোতৃবৃন্দ, যে শিল্পিগণ ভাগ্যদেবীর এতবড় নিষ্ঠুর পরিহাস—আজ সঙ্গীত সমাজে যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তারই উপর তার পড়েছে সেই অমৃতরস পরিবেশনের। তাই আজ উদ্ধাহরিব বামনঃ—আমার স্পর্ধা আপনারা ক্ষমা করবেন। যোগ্যের লব্ধনার আমার বাগ্যতা নাই সন্দেহ নাই, কিন্তু যে

শিল্পিবৃন্দ আমার অবজ্ঞা করবেন না—আমিও মাহুস আমিও অমৃতের অধিকারী—আপনাদের সঙ্গীত যদি আমার প্রাণের কোন তন্ত্রীতে আঘাত না দিতে পারে, হয়ত হ'তে পারে আমার গ্রহণ করবার শক্তি নেই—হয়ত হ'তে পারে আপনার তারের ঝড়ারে আমার অংশ মানব তন্ত্রীর কোনটাই লাড়া দিল না—তা'হলে যে অমৃতের প্রয়াসী শিল্পিবৃন্দ—আমি বলব আপনার তারের মধ্যে এমন ঝড়ার সৃষ্টি কখন যাতে অবশ তন্ত্রীও বেজে ওঠে, যাতে মৃতের মধ্যেও প্রাণ লক্ষ্য কর। কবি সেই গান গাও—যে গানে অলাড়ের মধ্যেও লাড় আনে—নির্জীবকেও সঙ্গীত করে তোলে—অরলিকও রলিক হয়। আজ ছনিয়ার মধ্যে যে প্রলয়ের সৃষ্টি হ'য়েছে তার মধ্যে কোন রাগিণী বেজে উঠেছে আমি প্রশ্ন করব আপনাদের। এ প্রলয়ের রাগিণী কোন দেবদেবী মহাদেব তাঁর তাণ্ডব নৃত্যে ফুটিয়ে তুলতে চান—কেন চান? হয়ত একটা অশ্রুতপূর্ণ রাগিণীর প্রবর্তন করতে চান—বার পরিকল্পনা মানবমনের বাহিরে। যে শিল্পিবৃন্দ যে কথাটা আমি আপনাদের প্রথমেই বলতে চাইছিলাম সেই অজ্ঞের ভাবের অভিব্যক্তি—সেই অশ্রুতপূর্ণ সঙ্গীতের অক্ষুট ধ্বনি—বার অমৃত্যুর জন্ত মাহুস মাত্রই পাগল হয়ে ছুটেছে—সেই মহা সঙ্গীত

অতএব যে শিল্পিবৃন্দ যদি আপনার রাগিণী আমার প্রাণের অবশ তন্ত্রীর মধ্যে কোন লাড়া না আনতে পারে তাহলে আমার ক্ষমা করবেন—কিন্তু যদি সেই অজ্ঞের (unknowable) ভাবের অন্বেষণে কোথাও কোন লাড়া পাই তাহলে নিজেকে সার্থক মনে করিব—মনে করব সেই অশ্রুত পূর্ণ রাগিণীর কোন অক্ষুটধ্বনি আমার কানে পৌঁছেছে—সেইদিনই আমার জীবন সার্থক হবে। সেইদিনই যুগের সঙ্গীত মূর্ত হ'য়ে আমার সেই অজ্ঞের আংশিক স্পর্শের

ফ্রেন্ডস ক্লাব

(সি, বি)

কলিকাতা হকি লীগ :—

গত বুধবার ১৩ই এপ্রিল প্রথম ডিভিশন হকি লীগ প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থানীয় কাষ্টমস্ এথলেটিক ক্লাবের সহিত দ্বিতীয় স্থানীয় রেঞ্জাল ক্লাবের খেলাটি হবার পর এবছরের মত কলিকাতা হকি লীগের খেলাগুলির পরিচয়ান্তি ঘটেছে। যদিও এই খেলাটির আগেই কাষ্টমস্ দল তাদের পরবর্তী রেঞ্জাল দল অপেক্ষা দুই পর্যায়ে অগ্রগামী ছিল তাহলেও এই খেলাটিতে রেঞ্জাল দলের নিকট পরাজিত হলেও গোল এভারেজে তারাই লীগ বিজয়ী হত। তবে রেঞ্জাল দল তাদের বিপক্ষে দুই গোলে হারাতে পারলে কাষ্টমস্ দলের গোল এভারেজের প্রাধান্যও খর্ব হত সেই কারণে এই খেলাটির গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। শেষ পর্যন্ত এই খেলাটিতে কোন দলই একটিও গোল করতে না পারায় এই দুইটি টিমের পূর্বের অবস্থাই বহাল থেকে গেছে।

অনুভূতি দিয়েছে। সেই দিনই বলব 'ন বিজ্ঞা লজীতাং পরা'। কিন্তু হে শিল্পিয়ন্ ত্বার মধ্যে হয়ত তোমার বাঁধাধরা ভাললয়ের সংযোগ না থাকতে পারে—সে রাগিনী হয়ত তোমার সুর লয় তানে বেজে না উঠতে পারে—তাহলেও আমি বলব সে লজীত—সে অজ্ঞের আশ্রয় এনে দেয়—সে প্রাণবান্।

হে কবি, হে শিল্পিন্ আমি লবিনর অনুরোধ করি, তোমার লজীতের মধ্যেও বেন আমি প্রাণের স্পর্শ অনুভব করতে পারি—

কেবলমাত্র দুইখেলেরই মোট পর্যায়ে সংখ্যায় আরও একটি করে পর্যায়ে যোগ হয়েছে। এই বছর লীগ বিজয় করার পর কাষ্টমস্ দল পর পর তিন বছর এই সম্মান অর্জন করলে এবং মোট সত্তেরো বার এই গৌরবের অধিকারী হল। ১৯০৫ সালে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার প্রথম বছরে 'বি ই কলেজ' (শিবপুর) জয়ী হবার দোভাগ্যলাভ করলেও কাষ্টমস্ দলের মত গৌরবময় রেকর্ড কোন স্থানীয় দল স্থাপন করতে পারেনি। যদিও শ্রীমদ্রা, গ্যালব্রেন ম্যাকরেডি, লোকত আলি এবং আলাদ আলির দ্বারা বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়েরা কাষ্টমস্ দলকে আর সাহায্য করতে পারেন না, তাহলেও তাঁদের পরবর্তী খেলোয়াড়েরা নিজ দলকে পূর্বের গৌরবময় স্থানে অঙ্গুর রাখতে পেরেছেন।

কলিকাতার হকি খেলা অনুষ্ঠিত হবার প্রারম্ভ থেকেই রেঞ্জাল দল কাষ্টমস্ দলের তোমার বাস্তব 'যেন আমি অজ্ঞের তালের অক্ষুট ধ্বনি শুনতে পাই—তোমার নৃত্যের মধ্যে যেন অনৈশগিকের রস উপভোগ করতে পারি।

আজ যে Friends Club এর প্রচেষ্টায় এই ছোট্ট নগরীর মধ্যে এত বড় বড় শিল্পী এবং গায়ক গায়িকার সমাবেশ সম্ভবপর হয়েছে তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করে থাকতে পারছি না চন্দননগর ধন্য—চন্দননগরবাসী ধন্য তাহাৎই জ্ঞাত।

মলে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আনছে এবং এখনও পর্যন্ত তা বর্তমান রয়েছে। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে এই দলটি পূর্বে 'নেভাল ডলফিন্স' নামে পরিচিত ছিল। সেই কারণে কলিকাতার গত ত্রিশ বছরের হকি খেলার ইতিহাসের এখন পর্যন্ত কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এই বছরে নব উন্নীত টাউন ক্লাব এবং বহুদিনের পুরণো প্রথম ডিভিশনের অন্তর্গত সেন্ট জোশ্বেক্স কলেজ দল সর্বনিম্ন স্থান দুইটি অধিকার করার আগামী বছরে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলতে বাধ্য হবে। এবং প্রথম ডিভিশনের শূন্য স্থান দুটি এবছরকার দ্বিতীয় ডিভিশনের শীর্ষস্থানীয় মেসারাল এবং হাওড়া ইনস্টিটিউট দল দুটি কর্তৃক পূর্ণ হবে। পূর্বগৌরব জড়িত বি ই কলেজ দল এবং শ্রামবাজার ইউনাইটেড দল দ্বিতীয় ডিভিশনে সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করার আগামী বছরে তৃতীয় ডিভিশনে যোগদান করবে এবং তাদের জায়গার তৃতীয় ডিভিশনের সেন্ট থমাস এবং কলেজিয়ানস্ তৃতীয় ডিভিশনের কৃতিদল দুটি দ্বিতীয় ডিভিশনে অংশ গ্রহণ করবার অধিকার পাবে। তৃতীয় ডিভিশনের সর্বনিম্ন নারিকেল-ডাঙ্গা ইনস্টিটিউট এবং বি ওয়াই এনোশিয়েশন দল দুইটি আগামী বৎসর এন্ট্রান্স ডিভিশন পর্যায়ভুক্ত হবে। তবে যদি এই ডিভিশনটি আগামী বছরে খেলান না হয় তাহলে এই হতভাগ্য দল দুটিকে লীগ প্রতিযোগিতার খেলার লোভ লম্বরণ করতে হবে।

এবছরের প্রথম ডিভিশনের ফাইনাল লীগ টেবল :—

খেলা জয় ড্র পরাজয় বঃ বিঃ পর্যায়ে					
কাষ্টমস্	১৮	১৫	৩	০	৪৪ ৫ ৩৩
রেঞ্জাল	১৮	১৩	৫	০	৪৯ ৭ ৩১
মোহনবাঃ	১৮	১২	৪	২	২৭ ৭ ২৮
পোর্ট কমিঃ	১৮	১০	৭	২০	২৭

মিলি: মেডি—

১৮ ১০ ৫ ৩ ২৬ ১১ ২৫

মহম্মেডান স্পোর্টিং—

১৮ ১০ ৫ ৩ ২৭ ১৪ ২৫

পুলিশ ১৮ ৮ ৪ ৬ ২০ ২০ ২০

ই বি আর ১৮ ৮ ৩ ৭ ২৫ ১৭ ১৯

বি জি প্রেস—

১৮ ৭ ২ ৯ ২১ ১৫ ১৬

ক্যালকাটা—

১৮ ৫ ৫ ৮ ২৫ ৩৩ ১৫

আর্দে নিয়ানস্—

১৮ ৫ ৪ ৯ ১৪ ১৮ ১৪

ভবানীপুর—

১৮ ৪ ৬ ৮ ১০ ২৯ ১৪

গ্রীয়ার স্পোর্টিং—

১৮ ২ ৯ ৭ ৩ ২৫ ১৩

ড্যালহাউসি—

১৮ ৪ ৫ ৯ ১৩ ৩২ ১৩

জ্যাক্কে রিয়ানস্—

১৮ ২ ৮ ৮ ১২ ২৫ ১২

ইউইনস্—

১৮ ৩ ৫ ১০ ১১ ২৪ ১১

লেন্ট জোলফ—

১৮ ৩ ৪ ১১ ১৩ ২৮ ১০

পাজাব রেভি:—

১৮ ৪ ১ ১৩ ১৫ ৩৮ ৯

টাইন ক্লাব—

১৮ ০ ৬ ১২ ৮ ৩৮ ৬

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা

গত বৃহস্পতিবার ১৪ই এপ্রিল তারিখ থেকে বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে। ভারতের অস্ত্রান্ত প্রবেশ থেকে যে সকল হকি টিম এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে তাদের মধ্যে একমাত্র 'আজি হিরোজ' হল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার অক্ষমতা জানিয়েছে। এই হলটি যোগদান না করার বশবী হকি 'খেলোয়াড়ের খ্যান্টা' এবং তাঁহার ভ্রাতা রূপলিংয়ের

সম্মিলিত ক্রীড়া মৈনপুণ্য দেখবার লোভাগ্য থেকে বাংলার ক্রীড়ামোহীগণকে বঞ্চিত হতে হবে এবং তাড়াড়া এই কারণে প্রতিযোগিতার আবর্ষণও অনেকখানি কমে যাবে।

প্রথম দিনে যে চারটি প্রথম রাউন্ডের খেলা হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতে স্থানীয় হলগুলি যোগদান করেছিলেন। নিম্নে লেখকের ফলাফল দেওয়া হল।

মিলিটারি মেডিকেল (২) টাইন ক্লাব (০)
পুলিশ (২) লেন্ট জোলফ (১)
পোর্ট কমিশনার (২) ইউনিয়ন স্পোর্টিং (০)
ই বি আর (৩) ভবানীপুর (০)

দ্বিতীয় দিনে মাত্র দুটি খেলা হয়। তার মধ্যে একটিতে লীগ বিজয়ী কাষ্টমস্ হলের লহিত স্থানীয় মহম্মেডন্ স্পোর্টিং হল প্রতিদ্বন্দিতা করে এবং অপরাটে মণিপুর রাজ্য হল ও করিমপুর হইতে আগত লালোগ্রো ইউনিয়ন হলের লহিত পরীক্ষা হয়। কাষ্টমস্ হল ও মণিপুর রাজ্য হল যথাক্রমে ৬-০ ৩২-০ গোলে জয়লাভ করে।

মণিপুর রাজ্য হল:—আই লিং, বীরেন লিং ও রবীন লিং, রেবতী লিং, ধনবীর লিং ও তুম্বী লিং, আর কে সেনাহাল্, কে সুখার্জি, ধীরেন লিং, মোহনবাবু লিং এবং মণিহর লিং। লালোগ্রো ইউনিয়ন:—এ খাঁ, পরেশ সেন ও পবিত্র সেন, ওয়াই খাঁ, খালেক খাঁ এবং এম কাহালী, বি দাস গুপ্ত, আর খাঁ, কে দাস গুপ্ত, লরেন্স এবং এম ঘোষ।

তৃতীয় দিনে মোট পাঁচটি প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ খেলা হয়। তাহার মধ্যে গত বছরের বাইটন কাপ বিজয়ী বি এন আর হলের লহিত মোহনবাগান হলের খেলাটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং আবর্ষণীয় হইত। মোহনবাগান হল নিজেদের সুনাম অমুঘারী খেলে হৃদ্বর্ষ বি এন আর হলের নিকট মাত্র এক গোলে (১-০) পরাজিত হয়েছে। ট্যাপ-লেম্ এবং গ্যালিবর্কার্স তার দুইজন অলিম্পিক খেলোয়াড় লংগ্লেট বি এন আর হলের নিকট

পরাজিত মোহনবাগানের খ্যাতি এবং যশ এতটুকু নান হয় নি। রেজাল্ ক্লাব রাজসাহী হইতে আগত এলবার্ট ইউনিয়ন ক্লাবকে ৯-০ গোলে পরাজিত করেছে। ম্যাক্সিম-গজ হইতে আগত গিড্‌নী ক্লাব স্থানীয় ইষ্ট বেঙ্গল হলকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। ১৯১৭ সালের বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার রণাল্ আপ্, ঢাকা হইতে আগত ব্যাচিলার ইউনিয়ন ক্লাব ক্যালকাটা ক্লাবের নিকট ৬ ২ গোলে পরাজয় স্বীকার করে নিজেদের পূর্ব গৌরব নান করেছে। ড্যালহাউসি এবং গ্রীয়ার হলের খেলাটি কোন পক্ষই গোল করতে না পারায় অসীমাবসীত ভাবে শেষ হয়েছে।

এলবার্ট ইউনিয়ন (রাজসাহী)—কে দস্ত, অমূল্য সরকার ও অমল সরকার, এ দাস, বি আচার্য ও জি দাসগুপ্ত, ডি সরকার, টি গান্ধী, এ আচার্য, এম রায় এবং বি রায়।

গিড্‌নী ক্লাব (ম্যাক্সিমগজ)—উড্, ট্রয়াট এবং ওকনোর, ডবলিউ কনোর, বাস্কাষ্টার এবং ব্যাথল্, পামার, লাভডে, ভিকনোর, কোটেস্ এবং ম্যাথিউস্।

ব্যাচিলার ইউনিয়ন ক্লাব (ঢাকা)—আজিজুদ্দীন লরিহুলা এবং বদরুদ্দীন, ওয়াহিহুলা, জহিরুদ্দীন এবং এ রেজা, রহমন্, কে রেজা, মুরমহম্মদ, যতীমুদ্দীন এবং ফজলুল হক্।

গত সোমবার যে পাঁচটি খেলা ছিল তার মধ্যে দুইটি দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা এবং একটি প্রথম রাউন্ডের খেলার শেষ দীর্ঘাংসা হয়ে গেছে। বাকী দুটি প্রথম রাউন্ডের খেলার শেষ নিষ্পত্তি হয় নি। নিম্নে খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল।

প্রথম রাউন্ড

মংলারপুর (৬) উয়ারী (০)
ড্যালহাউসি (১) গ্রীয়ার স্পোর্টিং (১)
বি জি প্রেস (০) আর্দে নিয়ানস্ (০)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

বি এন আর (৫) পুলিশ (০)
(রেলওয়ের আর কার এই খেলাটিতে
হ্যাট্টিট্রিক করেন)

পোর্ট কমিশনার (৩) গিড্‌নী ক্লাব (০)

লংসারপুর্ন স্পোর্টিং ক্লাব (জব্বার)—নর
লিং, লোহি লিং এবং হরজন্ লিং, মাস্তা লিং
নগিন্দল লিং এবং পেশম্ লিং, আস্তার লিং,
মোহন লিং, গুরপাল লিং, লাহু লিং এবং
মোহন লিং।

ওয়ারী ক্লাব (ঢাকা) :—পি গুপ্ত, এ হুত
এবং এস ঘোষ, আর সেন, পি ঘোষ, এবং
জে রায়, এস বলাক, এস দালগুপ্ত, এম
মহম্মদ, এ দালগুপ্ত এবং এন ঘোষ।

গত ১৭ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে মিঃ আর
ই গ্রান্ট গোভেনের সভাপতিত্বে অল ইণ্ডিয়া
কনট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সভা হয়ে গেছে।
সভার প্রারম্ভেই পাতিয়ালায় মহারাজার
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব
গৃহীত হয়। তাহার পরে বোর্ডের সভাপতি
নয়ানগরের জাম লাহেব এবং সম্পাদক ডি
মেলো পদভাগ করার তাহারের স্থলে মাজা-
জের মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ সুবরাওদ্যান এবং মিঃ
২৯ রাও যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক
নির্বাচিত হন। ১৯৪১ সালে ভারতীয়
দলকে ইংলণ্ডে পাঠান এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে
ইংলণ্ড দলকে ভারতে আনার তত্ত্ব এখন হইতে
সমস্ত ব্যবস্থা করার ঠিক হয়।

ইহা ছাড়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
থেকে দুইটি ক্রিকেট দল ভারতে আনার ব্যবস্থা
করার ঠিক হয়। আগামী অক্টোবর মাসে
মিঃ ফ্রাঙ্ক ট্যারান্ট যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট
দলকে ভারতে আনবেন বলে জানিয়েছেন
বোর্ড সেবিষয়ে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াকে
সমস্ত ব্যবস্থা করতে অনুমোদন করেছেন এবং
এরা সমস্ত আয়োজন করলে বোর্ড তাঁদের
সম্মতি দেবেন এবং পূর্ণ বিষয়ে সাহায্য

করবেন। মিঃ ট্যারান্ট ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত
খেলোয়াড়গণকে এই অস্ট্রেলিয়ান টীমে
আনবার ব্যবস্থা করছেন।

রিচার্ডসন, গ্রিম্‌স্ট, কিপ্পাক্স, ওল্ডফিল্ড,
ওয়েপেল্‌ বিল, মিডল, ফিল্ডটন, চিপার-
ফিল্ড, স্ট্যান্ড উন, লুন্, ট্যান্ন গ্রেগরী,
ম্যাকরমিক্‌, ব্রম্‌লে, ওব্রয়েন এবং বার্ণেট।
ব্রাডম্যানের আসার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি
এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানান নি। উক্ত
দলটি ১৫ই অক্টোবর তারিখে বোম্বাই পৌঁছে
আমেরাবাদ, রাজকোট, জামনগর, করাচী,
পেশোয়ার, লাহোর, অমৃতসর, পাতিয়ালা,
দিল্লী, আজমীর, ইন্দোর, বোম্বাই, নাগপুর,
এলাহাবাদ, কলিকাতা, সেবেস্তাবাদ,
মাজাজ, বাঙ্গালোর, পুণা এবং বোম্বেতে
খেলে ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলম্বো থেকে প্রত্যা-
বর্তন করবে। পাঁচটি প্রতিনিধিদলক খেলার
ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর মধ্যে দুটি বোম্বাইয়ে
এবং কলিকাতা, মাজাজ এবং লাহোর
প্রত্যেক জায়গায় একটি করে খেলা হবে।
প্রতিনিধিদলক খেলাগুলি ছাড়া অত্রান্ত
খেলাগুলি তিনদিনব্যাপী হবে বলে ঠিক
হয়েছে।

ভারতীয় অলিম্পিক ও বাংলা

এ বৎসর ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় অষ্টম
ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই
অলিম্পিকে বাঙ্গলা প্রবেশ কল ভাল
করিয়াছে। ২৯ বৎসর পূর্বে কলিকাতায়
যে ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল
তাহাতে বাঙ্গলা প্রবেশ সকল বিষয়ে বিজয়ী
না হইলেও বোম্বের বিভিন্ন বিষয় ও রিলে
য়েসে জয়ী হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার
করে। অনেকই আশা করিয়াছিলেন যে
বাঙ্গলা প্রবেশ এবার বিশেষ সুবিধা করিতে
পারিবে না। কিন্তু বাঙ্গলা রিলে-য়েসে
বিজয়ী না হইয়াও পাতিয়ালায় লগ্নে যুক্ত
ভাবে ৩৬ পরেন্টে পুরুষ বিভাগে ২য় স্থান

অধিকার করিয়াছে। মেহেদের বিষয়ে,
বাঙ্গলা ৩০ পরেন্টে পাতিয়ালা প্রথম হইয়াছে।
ইহা ব্যতীত বাঙ্গলা বোম্বাইর সচিত যুক্ত
ভাবে লাইকেল রেলে ৯য় পরেন্টে পাতিয়া
প্রথম হইয়াছে। এবং কুস্তি, বাস্কেট বল
কপাটিতে প্রথম এবং ডলিবলে দ্বিতীয় স্থান
অধিকার করিয়াছে। এবার অলিম্পিকে দুই
বিষয়ে নিখিল ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত ও
দুই বিষয়ে নিখিল ভারতীয় রেকর্ডের সমান
হয়। বাঙ্গলায় এফ, এইচ, প্রাইজার ৪০০
মিটার বোম্ব নিখিল ভারতীয় রেকর্ড
প্রতিষ্ঠা করেন ও ২০০ মিটার বোম্বে নিখিল
ভারতীয় রেকর্ডের সমান করেন।

বাঙ্গলায় এত লাফলোও দুঃখের বিষয় এই
যে আমরা বাঙ্গলার প্রতিযোগী হিসাবে
অধিক বাঙ্গালী প্রতিযোগীকে দেখিতে পাই
নাই অবশ্য এথলেটিক বিষয়ে। এথালিটিক
বিষয়গুলির অধিকাংশ বিষয়েই ইউরোপীয়ান
যুবক বাঙ্গলার হইরা প্রতিযোগীতা করিয়াছে।
যদি এথলেটিক বিষয়ে পোলভন্টে এ, কে,
মুখার্জি ও এইচ, কে, মুখার্জি এবং ২০০
মিটার বোম্বে জেড, এইচ, খাঁন এবং লাইকেল
রেলে আর, মেহেরা ও এস নন্দী ও লোথন
রেলে পি, বি, চন্দ্র ও হোয় প্রভৃতি প্রতি-
যোগী না থাকিতেন তবে আমরা উহাকে
বাঙ্গলার অলিম্পিক না বলিয়া ইউরোপীয়ান
যুবকের প্রতিযোগীতাই বলিতাম ও বাঙ্গলা-
বেশে বাঙ্গালী এথলেটদের অস্তিত্ব লক্ষ্যেও
সজ্জহান হইয়া পড়িতাম। অত্রান্ত সকল
প্রবেশ কিছু না কিছু ইউরোপীয় যুবকের
সাহায্য লইয়াছে, কিন্তু পাঞ্জাব এই বিষয়ে
সকলের উপরে। সে একটি ইউরোপীয়ানের
সাহায্য লয় নাই কেবল মেহেদের বিষয়ে
দুই একটা ইউরোপীয় মেয়ে ছিল। পাঞ্জাব
যে পুরুষ বিভাগে প্রথম হইয়াছে ইহা তাহার
সম্পূর্ণ প্রাদেশিক ও জাতীয় গৌরব। বাঙ্গলার
কুস্তিদল, কপাটী, ডলিবল, ও বাস্কেট বল
টীম বাঙ্গালী যুবক দ্বারা গঠিত ইহাই আনন্দের

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ
বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী যজ্ঞ
ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।
অজ্ঞাত চরিত্রের পরিচয় এসজ্ঞক্রমে
পাইবেন।

ইক্সাবনের টেকা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের
বুড়ো দি।
অজ্ঞাত চরিত্রের পরিচয় এসজ্ঞক্রমে
পাইবেন।

হলের ঘড়ীতে ১২টা বাজলো। মধ্য-
রাত্রির নীরবতা কয়েক মুহূর্তের জন্য বিক্ষুব্ধ
হয়ে উঠলো। তার পর আবার নিরবচ্ছিন্ন
ভাবে দায়র্য করলে।

অবিনাশ বলে—“আর কেন, হরেন?
বারোটা তো বেজে গেল। এখনও এই
এছো ঘরে বসে’ বালীগঞ্জের সুবিখ্যাত মশার
কামড় খাই কেন? চল, তোমার কাকার
সঙ্গে দেখা করে’ বিহার নেওয়া যাক।
‘ইক্সাবনের টেকা’ হলের তো কোন লাড়া-
শক পাওয়া যাচ্ছে না।”

আমি—“হাঁ, চল। ‘ইক্সাবনের টেকা’
দল-এর আগে যাকে যে সময়টা দিয়েছে, ঠিক
সেই সময়ে কাজ শেষ করেছে। অবশ্য, এর
আগে মাত্র ছ’বার এদের কাজের লক্ষ্যন
পেয়েছি। তারপর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এদের
সঙ্গে একবার বৃদ্ধির লড়াইও হয়ে গেছে।
সেই ব্যাপারের প্রতিশোধ নেবার জন্তেই
বোধ হয় আমার কাকা এই চিরঞ্জীব বাবুর
উপরে তাহের দৃষ্টি পড়েছে।”

আমরা বাইরে হলঘরে এসুম। ঘরটা
অন্ধকার। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল
—কে একজন উপর থেকে নীচে নেমে
আসছে। টর্কের আলোয়ে দেখলুম একজন

বিধর। এই সমস্ত হল বাজলার ও বাজালীর
গোরব অক্ষুর রাধিগাছে। আমরা আশা
করি বাজালী যুবকগণ এথলৈটিক বিষয়েও
অজ্ঞান মধ্যেই গোরবের সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত
হইবে।

পুলিশ-ইন্সপেক্টর। আমাকে দেখবামাত্র
তিনি বলে উঠলেন—“এই যে হরেনবাবু!
নমস্কার।” তাঁর হাতেও ইলেকট্রিক টর্ক।

একটু সন্ধিভ্রমে জিজ্ঞাসা করলুম—
“আপনি কে?”

ইন্সপেক্টর—“আমি এই থানার সাব-
ইন্সপেক্টর—পোষাকেই বুঝতে পারছেন।
ইন্সপেক্টর বাবুই এখানে থাকবার কথা ছিল।
কিন্তু আর একটা খুব জরুরী কেস থাকায়
আমাকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। এতক্ষণ
আমি চিরঞ্জীব বাবুর কাছেই ছিলাম। আপ-
নার সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হ’ছিল।
আমাকে আপনি না চিনলেও আমি
আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। আপনি যে
আসবেন, লেকখা চিরঞ্জীব বাবু আমাকে
বলেছিলেন। আসতে এত বিলম্ব হ’লো যে?”

আমি বলুম—“আমি লক্ষ্যার একটু পরেই
এসেছি। চাকরদের মধ্যে মাত্র সনাতন
তখন এখানে ছিল। কাকাবাবুকে না
জানিয়ে তার ঘরে ঢুকে ওৎ পেতে বসেছিলাম।
সব চাকর-বাকরদের ছুটি বেড়া হয়ে’ছে
সুন্দর। সেও চলে গেছে। ১২টা বাজলো
—এখনও ‘টেকা’ হলের কোন লাড়া-শক
পেলুম না। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে
বাড়ীর দিকে রওনা হই।”

ইন্সপেক্টর—“হাঁ। ‘টেকা’ হল খুব
punctual. ১২টার পর আর কোন ভয়
নেই—যখন তারা সেই সময় ঠিক করে’
দিয়েছে। আপনার কাকা তাই আমাকেও
যেতে বলেন। যা’হোক, আপনার সঙ্গে
পরিচয় হওয়ার বড়ই আনন্দিত হ’লুম। পরে

পরিচয় আও বনিষ্ঠ হ’বে। আচ্ছা—good
night!”

আমি—“Say—rather, good-
morning!”

ইন্সপেক্টর হেসে বলেন—“হাঁ, তা বটে।
আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় সূত্র
হ’ছে—সুতরাং good morning!”

হাসতে হাসতে তিনি চলে গেলেন।
আমরাও উপরে উঠতে লাগলুম।

হোতলায় উঠে কতবার ঘরের দরজায় ঘা
ধিলুম। ডাকলুম—“কাকাবাবু!” কোন
উত্তর পেলাম না। এর মানে কি? এর মধ্যে
তিনি ঘুমিয়েছেন? এই তো ইন্সপেক্টর
গেলেন! দরজা খুলে ফেললুম।

চিরঞ্জীব বাবু চেয়ারে বসে টেবিলের
উপরে বুকুে রয়েছেন। সামনে টেবিলের
উপরে একখানা বইখোলা। কানে কম
শুনেন—তাই বোধ হয় আমার ডাক শুনে
পাননি।

তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলুম—
“বারোটারো বেজে গেল। আমি আপনার
চিঠি পেয়ে আপনাকে না জানিয়েই এখানে
এতক্ষণ—”

হঠাৎ অবিনাশ চোঁচিয়ে বলে উঠলো—
“হরেন, দেখ, দেখ। দেয়ালের ঘড়ীটা ঠিক
১২টার সময় বন্ধ হয়েছে—আর তার সামনে
কাচের উপর আঁটা একখানা ইক্সাবনের
টেকা!”

চমকে সেই দিকে চাইলুম। তারপর
চিরঞ্জীব বাবুর গা-ঠেলে উচ্চকণ্ঠে ডাকলুম—
“কাকাবাবু!” দেহটা গড়িয়ে পড়লো মাটির

উপর—নিশ্চয়—অসাড়! পরীক্ষা করে দেখলুম—নিশ্চয়! অবিনাশ তাড়াতাড়ি তুলতে যাচ্ছিল। আমি বারণ করলুম। চাপা আগুয়াজে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে—“হরেন একি?”

আমি পরীক্ষা করে বল্লুম—“এ খুন—আর কি? ‘টেকা’ দল তাদের কথা রেখেছে। ঠিক বারোটোর সময় তারা কাজ করেছে, এবং তা’ বুঝাবার ক্ষেত্রে দৃষ্ট করে বড়টা ঠিক বারোটোর সময় বন্ধ করে দিয়েছে। খুনটা করেছে কোন তীব্র এ্যানিডের সাহায্যে—খুব লম্বা হাইড্রো-শিয়ানিক এ্যানিড। সেটা অবশ্য ঠিক বলা যাচ্ছেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দ-ব্যবচ্ছেদ না হয়।”

অবিনাশ বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে বলল—“কিন্তু বারোটোর পরে তো সাব-ইন্সপেক্টর এখান থেকে গেছেন।”

আমি বল্লুম—“সাব-ইন্সপেক্টর কে? ও—হু, ঠিক বলেছ। বারোটোর পরেই তিনি এখান থেকে গেছেন বটে।”

অবিনাশ বলল—“তবে?”

একটু চিন্তা করে কোনটা তুলে নিলুম। থানা এখান থেকে বেশীদূর নয়। সাব-ইন্সপেক্টর এতক্ষণ নিশ্চয় সেখানে গিয়ে পৌঁচেছেন। থানাকে ডেকে নিজের পরিচয় দিয়ে কোথায় আছি বল্লুম। সাব-ইন্সপেক্টর থানায় পৌঁচেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় যে উত্তর পেলুম, তাতে আমি চমকে উঠলুম।

কোনের উপর যুকে পড়ে বল্লুম—“কি বলেন? আপনি সাব-ইন্সপেক্টর? এখানে আপনি আসেননি? ইন্সপেক্টর নিজে এসেছেন, এবং এখনও এখানে আছেন?”

কোনে স্বর ভেলে এলো—“আজ্ঞে হাঁ। ইন্সপেক্টর এখানে মৃতদেহ এসেছেন বটে, কিন্তু আমি পুরানো লোক। হরিপদ রায়কে মনে আছে আপনার?”

আমি—“ও—খুব আছে। আপনি হরিপদ বাবু? ভালই হয়েছে। আপনি

এখন একবার এখানে আসুন। একটা বড় অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। শীগগির আসুন। চিরঞ্জীব বাবু বাড়ী। এখানে এলে লাফাতে লব কথা হবে।”

কোন রেখে অবিনাশকে বল্লুম—“অবিনাশ, আমাদের আসুলের কীক দিয়ে খুনি পালিয়েছে।”

অবিনাশ বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বলল—“সে কি?”

আমি বল্লুম—“‘টেকা’ দলের লোক লতাই আমার সঙ্গে আজ সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আলাপ করে গেল। যাক—আপাততঃ পুলিশ আসবার আগে মৃতদেহটা একটু ভাল করে দেখে নেওয়া যাক।”

দেহ পরীক্ষা করে বিশেষ কিছু দেখতে পেলুম না। শরীরে কোনপ্রকার মারাত্মক দাগ নেই। হৃৎক স্থানে একটু আঘাত চড়ে গিয়েছে মাত্র। একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির প্রমাণ ভিন্ন সেগুলো আর কিছুই নয়। মৃতের হাতের মুঠোয় একখানা কাগজ ভাঁজ করা পেলুম। তাতে লেখা আছে—“নং ৩—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি।”

অবিনাশ ঐহুকাবসে কাগজটা নিতে যাচ্ছিল—বাধা দিলুম। সেটা যেমন ঝিল সেট রকমখা পাকা উচিত। বল্লুম—“কাগজ-খানা নিয়ে কি করবে অবিনাশ? তার চেয়ে মৃতদেহটা একটু ভাল করে দেখ। আচ্ছা, চোখদুটো দেখুওঁ।

অবিনাশ দেখে বলল—“বুজে আছে।”

আমি—“হ্যাঁ।” তারপর চোখদুটো খুলে দিয়ে বল্লুম—“এইবার দেখ।”

অবিনাশ—“খুলে গেল।”

আমি—“Hopeless! আরে, বোজা-চোখ খুলে দিলে যে খুলে যায়, একথা লকলেই জানে। আমি এই চোখে কি দেখছি জান? আমি দেখছি, বিস্ময়-মেশানো ভয়!”

অবিনাশ—“কেন করে বুঝলে?”

আমি—“জুহুটো একটু উচু হ’য়ে র’য়েছে এখনও, চোখের তারা দুটো ঠিক মাঝখানে রয়েছে বলেও হয়। উপরের পাতাটা একটু খুলে পড়ে চোখ দুটোকে অর্ধেকটা ঢেকে ফেলেছে মাত্র, কিন্তু ভয় ও বিস্ময়ের ভাবটা এখনও চক্ষু থেকে অন্তহিত হয় নি। তার-পর ঠোঁট দুটো দেখে একটু কীক হ’য়ে রয়েছে, এটাও বিস্ময়ের চিহ্ন লক্ষ্য নেই। খানিক পরে দেহটা শক্ত হ’তে Rigor mortis আরম্ভ হ’লে এই চিহ্নগুলো একটু একটু করে’ লুপ্ত হ’য়ে যেতো। আর, থাকলেও, সেগুলো এক অন্নমাত্রাও থাকতো যে ধরা শক্ত হ’তো।”

অবিনাশ—“দোরাত-ধানীটা টেবিলের উপরে র’য়েছে, অথচ মেঝের কালি পড়লো কি করে?”

আমি—“Bravo! অবিনাশের Power of observation মানে পর্যবেক্ষণ শক্তি ক্রমশঃ develop করতে (বাড়তে) বলতে হ’বে। আচ্ছা, তা হ’লে দেখা যাচ্ছে, যে একটু ছোট খাট ধ্বস্তাধ্বস্তিও হ’য়ে গেছে। এই যে গালের এক পাশে একটা ছড়া-বাগ; নখ-দিয়ে চড়ে গেছে। তা’হলে বুঝ টিপে ধরা হ’য়েছিল।”

এই বলে’ এদিক ওদিক চাইতেই একটা ক্রমাল আমার নজরে পড়লো। লাবধানে সেটাকে তুলে নিয়ে পকেটে রাখলুম। তারপর আমি ও অবিনাশ দুজনে মিলে-ঘরের মধ্যে বেশ করে’ খোঁজ করলুম, লক্ষ্য-জনক আর কিছু নজরে পড়লো না।

এইবার টেবিলের উপরটা একটু ভাল করে’ দেখতে লাগলুম। হু’পেরালা চা খাওয়া হ’য়েছে—পেরালা দু’টো তখনো সেখানে। বেশ বোঝা গেল একটা কাপে “ইনস্পেক্টর” আর একটা কাপে কর্তা চা খেয়েছেন। কর্তার বিকের চায়ের পেরালাটা

তুলে নিয়ে শুকেৎবেৎলুম, কোনরকম আপত্তিকর গন্ধ পেলুম না। তবু এটাকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কবরের এক পাশে ব্রাকটের উপর একটা ছোট ছোমিওপ্যাথিকের বাক্স ছিল। সেটা খুলে তা'থেকে একটা খালিশি নিরে খানিকটা চা তাইতে চলে নিলুম।

অবিনাশ বলে— “আচ্ছা, হরেন, এই এ্যাংচেচার ডিটেকটিভগিরিতে লাভ কি? “কবর থেকে বনের মাঘ (মহিষ) তাড়ান” বইতো নয়? তার চেয়ে ভাল করে নিজের প্রাক্টিসটায় মনোযোগ দিলে হয় না? তোমার পেশেন্টের সংখ্যাওতো কম নয়; পোষার সংখ্যাও যথাসময়ে বাড়বে।”

আমি হেসে বলুম— “আরও কিছুদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর—বুঝবে এই ব্যাপারে আনন্দ কোথানে। কাল সকালে—”

এই সময়ে সিঁড়িতে অনেকগুলো পাড়ের শব্দ পেয়ে থেমে গেলুম। কবরের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'লেন পুলিশ সাব-ইন্স্পেক্টর, ছ'জন কন্টেবল, আর এক অর্জনগ মুক্তি।

সাব-ইন্স্পেক্টরের নাম প্রাপকুমার বাবু— তিনি আমার পরিচিত। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন— “এই যে হরেন বাবু ব্যাপার কি?” তারপর সেই অর্জনগ মুক্তির দিকে ফিরে বলেন— “এই হরেনবাবুই আমাকে এই খুনের কথা ফোনে জানান।”

অর্জনগ লোকটা প্রশ্ন করলেন— “ইনিই হরেন বাবু?” তারপর আমার দিকে ফিরে বলেন— “নমস্কার। আপনার নাম অনেকদিন থেকে শুনে আসছি। চাক্ষুষ পরিচয় কখনো হয় নি। বাই হোক বড়ই আনন্দিত হলাম। আমার পরিচয় দিতে লজ্জা পাচ্ছি। তবু শুভুন—আমি এ খানার মৃতদেহ এসেছি, ইন্স্পেক্টর হ'য়ে। এসেই এই কেস। একেবারে বিগধর করে দেড়ে দিয়েছে!” বলেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

তারপর বলতে লাগলেন— “সকালবেলা চিরঞ্জীব বাবু আমাকে ডেকে পাঠান, এবং একখানা চিঠি দেখান। তাতে লেখা ছিল “আজ ঠিক রাত্রি বারোটায় তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত হ'বে।” বেৎলুম তিনি বড়ই ভীত হ'য়েছেন। চিঠির সঙ্গে একটা ইঙ্কাবনের টেকা দেওয়া ছিল। এই ‘ইঙ্কাবনের টেকা’ বলের বিবরণ এর আগে আমি ছ'বার শুনেছি। ছ'টো ব্যাপারেই হতবাক্তির হাতে একটা কাগজ ভাজ করা ছিল। তাতে লেখা ছিল— ‘নং ১—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি,’ ‘নং ২—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি’।

অবিনাশ মুখ চুলকোচ্ছে দেখে চোখ টিপে ঠিকিতে বারণ করে দিলুম। যা' বলতে যাচ্ছিল অবিনাশ সেটা গিলে ফেলল। আমরা যে মৃতদেহ পরীক্ষা করছি তা' ইন্স্পেক্টরকে জানান দরকার বলে মনে হ'লো না।

ইন্স্পেক্টর সাহেব বলে যেতে লাগলেন— “কাজেই চিরঞ্জীব বাবুর ভীত হওয়ার অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিলনা। তিনি আমার শীলকরা একতারা কাগজ দিয়ে বলেন— ‘যদি আমি মরি, তো এই শীল ভেঙ্গে এটা পড়বেন। যদি কিছু না ঘটে, তো আমার ফেরত দিবেন। তার পরে এখানে আমার আসবার কথা ঠিক হোলো রাত্রি ৯টায়। তিনি আরও বলেছিলেন যে তাঁর এক ডাইপো Criminology নিয়ে মাথা ঘামায় এবং যথেষ্ট বিচক্ষণ হয়েও উঠেছে; তা'কেও কবর দেওয়া হয়েছে আসবার জন্তে। এখন বুঝছি তিনি আপনারই কথা বলছিলেন। ঠিক ৯টার সময় আমি এখানে আছি। তারপর বাগানের মধ্যে আসবামাত্র জনকতক লোক আমার উপর লাফিয়ে পড়ে। একজন আমার মুখ বেঁধে ফেলে, তারপর আমার পোষাক খুলে নিয়ে আর একজন পরে। শেষে এই অবস্থার আমার হাত পা বেঁধে একটা ঝোপের মধ্যে রেখে তারা চলে যায়। একটু আগে আমার এই এ্যানিষ্ট্যান্ট আমাকে

উদ্ধার করেছেন। ওঃ! কি মশার প্রতাপ এই অঞ্চলটায়!”

অবিনাশ বলে উঠলো— “ইস্। খুনেটা আমাদের হাঁতের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেছে। একটু আভাস পেলে এক আছাড়ে— যাক, সে কথা আর বলে কি হবে?”

ইন্স্পেক্টর বলেন— “হ্যাঁ, গত শু শোচনা নাস্তি। আপাততঃ, আমার পিঠে একটা কি ঘেরে দিয়েছে বেৎলুম তো”।

বেৎলুম, একখানা ইঙ্কাবনের টেকা।

বলুম— “আপনাকে টেকা দিয়ে বেগে দিয়েছে।”

ইন্স— “খুলে দিই—খুলে দিই। চিঃ— আমি একটা গাড়োয়াল।”

আমি— “কুঃখিত হবার কারণ নেই। কিন্তু এ এমন কারেম্বী করে আঁটা, যে এটা তুলতে সময় লাগবে। বোধ হচ্ছে রবার লিউলন দিয়ে জুড়ে দিয়েছে।”

ইন্স— “আচ্ছা থাক। ঐ ছাপ নিজেই তা'র প্রাক্কর যোগাড় করি। এখন একপ্রশ্ন কাপড়-জামা দরকার হচ্ছে।”

সাব-ইন্স্পেক্টর চাকরের সন্ধানে কন্টেবল পাঠাচ্ছিলেন,—ইন্স্পেক্টর বাবা দিয়ে বলেন— “সে বালাই নেই। চাকরদের আজ রাত্রিতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। নিকটে কোণায় এমেচার থিওটার হচ্ছে; তারা সব সেইখানে। অবশ্য, এটা আমারই পরামর্শে হয়েছে। আর, চিরঞ্জীব বাবুর লংগারে কেউ নেই—তিনি একাই বাস করছিলেন।”

“আচ্ছা আমি দেখছি”—বলে অবিনাশ বেড়িয়ে গেল।

একটু পরে সে কাপড়-জামা নিয়ে এলো। ‘ভদ্রবেশ ধারণ করে’ ইন্স্পেক্টরবাবু মোটামুটি তৎপর হ'লেন।

আমাদের জবানবন্দী নেওয়া হ'লে, আমরা ছাড়া পেলুম। বাইরে এসে আমাদের নিখাস ফেলে বাচলুম।

খেয়ালী চিত্রপট *



নিউ থিয়েটার্সের “অধিকার” চিত্রে
শ্রীমতী মেনকা। ছবিখানার পরিচালক
শ্রীযুক্ত প্রমথেন বড়ুয়া।

পারচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৫৬]

সম্পাদক :—শ্রীযোগজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্রোপাধ্যায়



অষ্টম বর্ষ { রহস্পতিবার, ১৫ই বৈশাখ ১৩৪৪, ২৮শে এপ্রিল ১৯৩৮ } সপ্তদশ সংখ্যা

আগামী মেয়র নির্বাচন

আগামী ২৯শে এপ্রিল কলিকাতার মেয়র নির্বাচন হইবে। বহুদিন পূর্ব হইতেই বিভিন্ন দলও বিভিন্ন ব্যক্তি মেয়র গদী অধিকার করিবার জ্ঞাতদ্বির করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে কংগ্রেস মিউনিসিপাল এসোসিয়েশন বর্তমান নির্বাচনে একজন মুসলমান প্রার্থীকে মেয়র পদে অভিযুক্ত করিতে মনস্থ করায় অনেকের আশা তরুর মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে।

কংগ্রেসের রহস্তর কক্ষক্ষেত্রে যে গণ-সহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাকে সাকল্যমণ্ডিত করিতে সুভাষচন্দ্রের এই নির্দেশ, অর্থাৎ মুসলমান মেয়র এবং তপসিল জাতিভূক্ত ডেপুটি মেয়র—সাতিশয় সমীচিন হইয়াছে। বাঙ্গলার রহস্তর রাজনীতিক্ষেত্রে এবং জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী প্রচারে কলিকাতার কর্পোরেশনে কংগ্রেসীদের কর্মধারা যে অনেক খানি রেখাপাত করে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুভাষচন্দ্র এইদিক বিচার বিবেচনা করিয়া সম্ভবতঃ মুসলমান মেয়র ও তপসিল জাতিভূক্ত ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া যে সকল কংগ্রেস ভেদকারী স্বার্থাশ্রয়ী তথা “কংগ্রেসী” কাউন্সিলার কংগ্রেসের অনুজ্ঞা অমান্য করিতে তৎপর হইয়াছেন তাহাদের আচরণ অত্যন্ত গণিত হইয়াছে। তবে এখনও সময় আছে এবং আশা করা যায় যে তাহাদের মেয়র নির্বাচনের পূর্বেই সুবুদ্ধির উদয় হইবে।

শেমান্ত কংগ্রেসদ্রোহীদল শ্রীযুক্ত নিশিধ-চন্দ্র সেনকে খাড়া করিয়া সুভাষচন্দ্র তথা কংগ্রেসের নির্দেশ উপেক্ষা করিতে কোমর বাঁধিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাদের বক্তব্য এই যে নিশিধ বাবু গত বৎসরের কংগ্রেসীদের নেতা হিসাবে এই বৎসরকার মেয়রপদের সম্মান নিশিধ বাবুর প্রাপ্য এবং গত বৎসর মেয়র নির্বাচনের প্রাকালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নাকি ১৯৩৮ সালে নিশিধ বাবুকে মেয়রের গদীতে বসাইতে কথা দিয়াছিলেন। স্বাভাবিক নিয়মে যিনি কংগ্রেসীদের নেতা থাকেন তিনিই পর বৎসরে মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেসীদের মনোনয়ন পান। সেই নীতি অনুসারে নিশিধ বাবুই এবৎসর মেয়র নির্বাচনে

কংগ্রেসীদের মনোনিয়ম লাভ করিতেন। কিন্তু গত বৎসরের কর্পোরেশনে কার্য পরিচালনায় দলের নেতা হিসাবে নিশিথ সেন মহাশয় যে ভাবে কংগ্রেসী আদর্শে পদাঘাত করিয়া বারবার স্বেচ্ছা-চরিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আর তাঁহাকে কংগ্রেসের লোক বলিয়া বিশ্বাস করা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই কিছু দিন পূর্বেও যখন কর্পোরেশনে প্রধান কন্সকর্তার নিয়োগের প্রশ্ন উঠে তখন তিনি যেভাবে লুকোচুরী খেলিয়া এবং গোপনে কংগ্রেসীদের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে এবং অগ্ৰাণু কংগ্রেসী কাউন্সিলারগণকে লঙ্ঘন করাইতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন তাহা জনসাধারণ এত নীত্ৰই ভুলিয়া যান নাই। দক্ষিণ কলিকাতার সুভাষ সম্বন্ধে সভায় নিশিথ বাবুর সম্বন্ধে দক্ষিণ কলিকাতা তথা সারা সহরের করদাতাগণ কিরূপ ধারণা পোষন করেন আশা করা যায় নিশিথ বাবু নিজেও তাহা বিস্মৃত হন নাট।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াও যে সকল কংগ্রেসী কাউন্সিলার আগামী ১৯শে এপ্রিল তারিখে মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেসীদের নির্দেশ অমান্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাদের চিনিয়া রাখা সহরবাসীর একান্ত কর্তব্য।

আমরা আশা করি সন্মত সুভাষচন্দ্র আগামী মেয়র নির্বাচনের দিন কর্পোরেশন সভায় উপস্থিত থাকিয়া দল পরিচালনা করিবেন এবং নির্বাচনে হাত ভুলিয়া ভোট দিবার ব্যবস্থা করিবেন। যাহারা কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোট দিবেন তাহাদের বিরুদ্ধে এখন হইতেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত এবং তাহারা যাহাতে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের ছাপ কোন মতেই না পান এবং কর্পোরেশনে না প্রবেশ করিতে পারেন সে বিষয়ে এখন হইতেই সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন।

--:(X):--

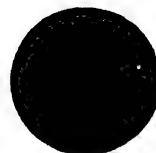
কালী ফিল্মস প্রযোজিত

চোখের বালি

পরিচালক : সতু সেন



আগামী
দুইখানি
স্মরণীয়
চিত্র



হাজরা পিকচার্সের

দেবী ফুল্লরা

পরিচালক : ভিনকড়ি চক্রবর্তী

খেলার ঘাট

(সি, বি)

বাইটন্ কাপ হকি প্রতিযোগিতা

বাইটন্ কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলাগুলি গত ১৪ই এপ্রিল থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত কোন কোন দিন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পর্যন্ত ম্যাচ খেলা হবার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে যদি আসছে শনিবার ফাইনাল খেলাটি কোনক্রমে অমৌলিকভাবে শেষ হয় তা হলেই হস্ত প্রথম দিনের ফুটবল লীগের খেলাগুলি বন্ধ রেখে হকিখেলার ওভারের বিদায়পর্ব করা যে তাড়িপে শেষ করতে হবে। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত খেলাগুলি হবার পর নিম্নলিখিত চারটি হল এই প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে উপনীত হয়েছে। সেমি ফাইনালের একটি খেলাতে গত বছরের বাইটন্ কাপ বিজয়ী 'বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে হল' বোম্বাই কাষ্টমস্ হলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। অপর খেলাটিতে ক্যালকাটা হকি লীগ বিজয়ী 'ক্যালকাটা কাষ্টমস্' হলের সঙ্গে বোম্বাই হইতে আগত 'লুসিটেনিয়ানস্' হলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। তদুপ আশা করা যায় ফাইনালে স্থানীয় স্টেট হলই কাপ বিজয়ের জন্য নিজেদের শক্তি প্রদীক্ষা করবে। বাংলার বাইরে থেকে যতগুলি হকি হল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তাদের মধ্যে 'পিণ্ডি টাইগারস্', 'ভূপাল টেট' (গত বছরের রাণাল আপ), এবং কম্বোডস ক্লাব অনিবার্য কারণে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের সম্পাদক বিঃ গুপ্তকে তাদের

অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। প্রথম ডিভিশন ক্যালকাটা হকি লীগের ওভরের রাণাল আপ 'ক্যালকাটা রেজাল ক্লাব' প্রথম রাউণ্ডে রাজশাহীর 'এলবার্ট ইউনিয়ন' ক্লাবকে ২-০ গোলে পরাজিত করে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বিতীয় রাউণ্ডে স্থানীয় 'মিলিটারী মেডিকেল' হলের নিকট এক গোলে পরাজিত হওয়ার এই প্রতিযোগিতার গোড়ার দিকে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। রেজালের ছায় শক্তিশালী হলটি এত শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করাতে বিশেষ করে কলকাতার ক্রীড়াবাদীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এলাহাবাদ হইতে আগত 'কায়স্থ পাঠশালা কলেজ' তৃতীয় রাউণ্ডে রেজাল বিজয়ী হলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে চতুর্থ রাউণ্ডে বি এন্ আর দলের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হওয়ার করেছে। নাগপুরের 'মুনসীম জিমখানা' রামপুরের 'ইয়ং মেনস্ ইউনিয়নকে' দ্বিতীয় রাউণ্ডে ২-১ গোলে পরাজিত করে চতুর্থ রাউণ্ডে বিখ্যাত বোম্বাই কাষ্টমস্ হলের নিকট শোচনীয়ভাবে ৫-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। 'বেরিগী স্পোর্টিং এসোসিয়েশন' দ্বিতীয় রাউণ্ডে লাহোরের 'ব্রাহ্মস' ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে 'বোম্বাই কাষ্টমস্' হলের কাছে ১-০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে এই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। নামকরা 'আলিগড় ইউনিভার্সিটি' হকি টীম প্রথম দিন খেলেই দ্বিতীয় রাউণ্ডে ২-০ গোলে বোম্বাই কাষ্টমস্ হলের নিকট পরাজিত

স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সেই কারণে বোম্বাই কাষ্টমস্ হল তিনটি আগন্তুক হলের অভিষেক বরণ করেছে : সুদূর জলন্ধরের গ্রামা হকি হল 'লানসেরপুর স্পোর্টিং ক্লাব' এই প্রতিযোগিতার ওভরের প্রথম যোগদান করেছে। এটি যে একটি শক্তিশালী হল তা এদের খেলাগুলিতে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে এদের আক্রমণভাগের মাঝখানের তিনটি খেলোয়াড় তাদের দলের খ্যাতি অবৈকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। লানসেরপুর স্পোর্টিং প্রথম রাউণ্ডে ঢাকার 'ওয়ারী ক্লাব', দ্বিতীয় রাউণ্ডে স্থানীয় ড্যালহাউসি ক্লাব এবং তৃতীয় রাউণ্ডে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে যথাক্রমে ৩-০, ৩-২ এবং ৪-২ গোলে পরাজিত করে চতুর্থ রাউণ্ডে ক্যালকাটা কাষ্টমস্ হলের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় খেলার পর ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। জব্বলপুর স্পোর্টিং দ্বিতীয় রাউণ্ডে মাদ্রাস ডিষ্ট্রিক্ট হকি টীমকে ১-০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে ক্যালকাটা কাষ্টমস্ হলের নিকট ৪-১ গোলে বশ্রতা স্বীকার করেছে। দিল্লী অক্সেনাল স্পোর্টিং ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডে মণিপুর রাজ্যহলকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে নিজেদের নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও চতুর্থ রাউণ্ডে বোম্বাই হইতে আগত লুসিটেনিয়ানস্ ক্লাবের কাছে ৪-০ গোলে পরাজিত হয়ে পূর্বাধিক্ত গৌরব হান্ন করেছে। দিল্লীর আর একটি নবাগত হকি হল 'নিউ টার ক্লাব' দ্বিতীয় রাউণ্ডে ঢাকার আর্ম্যানীটোলা ক্লাবকে ২-০ গোলে পরাজিত করে তৃতীয় রাউণ্ডের প্রথম দিনের খেলাটি লুসিটেনিয়ানস্ হলের সঙ্গে অমৌলিকভাবে শেষ করে দ্বিতীয় দিনে ২-০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। বোম্বাইয়ের লুসিটেনিয়ানস্ হল দ্বিতীয় রাউণ্ডে করিমপুর স্পোর্টিং এসোসিয়েশনকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে তৃতীয় ও চতুর্থ রাউণ্ডে

বধাক্রমে নিউষ্টার ক্লাব এবং অকেলনাল ক্লাবকে ২-০ এবং ৪-০ গোলে পরাজিত করে সেমিফাইনালে ক্যালকাটা কাষ্টমল দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার বোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্রদর্শনী হকি খেলা :—

গত শনিবার ক্যালকাটা মাঠে বাংলার মনোনীত দলের সঙ্গে 'রেট' দলের একটি প্রদর্শনী হকি খেলা হয়ে গেছে। দুই দলই তিনটি করে গোল প্রদান করার এই খেলা-টিতে প্রতিপক্ষ দল দুটি সমান ভাগ করে নেয়। খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড় 'রূপ সিং' এ বছর বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় কোন দলকে লাহায্য না করলেও রেট দলের পক্ষে খেলেছিলেন এবং এই দলের তিনটি গালের মধ্যে একটি তাঁর অবদান। বাংলা দলের মনোনীত খেলোয়াড়দের মধ্যে ট্যাপসেল, আর, কার এবং হেগারমেনের অমূল্যবাহিত বিশেষভাবে অমূল্য করেছিল। খেলাটি খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং প্রারম্ভ থেকেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দৃষ্ট হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত এবছরে কলকাতার যতগুলি হকি খেলা হয়েছে সেগুলির মধ্যে এ খেলাটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা বলা চলে। বিশেষ করে রেবেলো এবং রূপসিং এই খেলাটিতে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমার্ধে, বাংলা দলের রেটন এবং রেবেলো একটি করে গোল করেন (২-০) দ্বিতীয়ার্ধে লাকুর একটি গোল পরিশোধ করবার পর (২-১) হয়। বাংলা দলের রেবেলো আর একটি গোল করতে সক্ষম হন (৩-১) তারপর রেট দলের রূপ সিং এবং সুইনি প্রত্যেকে একটি করে গোল করার (৩-৩) খেলাটি অমিমাংসিতভাবে শেষ হয়। নিম্নে, উভয়দলের খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল।

বাংলা দল	রেট দল
এলেন (ক্যাপ্টেন)	গীন্ (বসে কাষ্টমল)
পি হাশ	মুস্তাক (নিউষ্টার)
এবং	এবং
হজেন্স	আললাম (বসে কাষ্টমল)
আরিক	লাগির আনী (আলিগড়)
সি ডিকোন্টন	ক্রইন্ (বসে কাষ্টমল)
এবং	এবং
মহম্মদ নাইম	আহির (আলিগড়)
অরুণ মিত্র	সুইনি (বসে কাষ্টমল)
রবিনস্	মোহন সিং (সাননেরপুর)
রেবেলো	লাকুর (আলিগড়)
রেটন	রূপ সিং (ক্যাপ্টেন)
	(অলংকৃষ্ট)
এবং	এবং
জি নিস্	পি পি ফার্মাণ্ডিজ
	(লুইটেনিয়ান্স)

আম্পায়ারদ্বয় :—মোহাম্মদ পি শুশু এবং

হাকিম

ভারতীয় বঃ ইউরোপীয়ান দল

গত রবিবার যমুনিবারণী ভাণ্ডারের লাহায্যার্থে চুচুড়ার বেঙ্গল হকি এলোমিয়েলন কড়ক মনোনীত ভারতীয় দলের সহিত ইউরোপীয়ান দলের একটি চ্যারিটি হকিম্যাচ খেলা হয়েছিল। ভারতীয় দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে পরাজিত হয়েছে।

ক্রিকেট মতানৈক্যের অবসান

ত্রাবোর্ণ টেডিয়ামে আদন সম্পর্কে বোম্বাইয়ের হিন্দুজিমখানার সঙ্গে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার যে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রীতিগ্রহ অবদান বটেছে। ক্রিকেট ক্লাব জিমখানাকে অতিদ্রুত ৫০০ আদন প্রদান এবং তাঁদের দুইজন প্রতিনিধিকে ক্রিকেট ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সভ্য করতে রাজী হয়েছেন।

কলিকাতায় নতুন চিত্র-গৃহ

“প্রভাত সিনেমা” শুভ-উদ্বোধন

আমরা লবিশেষ আনন্দের সহিত কলিকাতার নতুন চিত্রগৃহ ‘প্রভাত সিনেমা’র শুভ-উদ্বোধন ঘোষণা করিতেছি। আগামী বৃহস্পতিবার ‘ম্যাডান থিয়েটার’-এর চিত্র-গৃহে, নব রূপসজ্জায় সজ্জিত, নব নব রস-পরিবেশনে উন্মুখ, “প্রভাত সিনেমা” লাগর ফিল্মদের “জাগরীয়া” চিত্র লইয়া কলিকাতার জনসাধারণের অত্যর্থনায় অগ্রদর হইয়াছেন।

“ম্যাডান থিয়েটার” আজ সম্পূর্ণ নবমুখ পরিগ্রহ করিয়া, ‘প্রভাত সিনেমা’ রূপে সকলের বিশ্বাসের সৃষ্টি করিবে। চিত্রগৃহটিতে সম্পূর্ণ নতুন ধরণে, নতুন উপকরণে, নতুন রূপ-সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছে।

“প্রভাত” চিত্রগৃহ আজ কলিকাতার জনসাধারণের সম্মুখে কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রগুলি পরিবেশন করিবেন। ইহার দ্বারা কলিকাতাবাসীর বহুদিন সঞ্চিত এক অস্তাব বিদূরিত হইল। যাহারা এতদিন ‘চোরজি মহলে’ একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় চিত্রগৃহের অস্তাব অমূল্য করিতে ছিলেন, তাঁহাদের সে অস্তাব আজ বিদূরিত হইতে চলিয়াছে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস “প্রভাত” চিত্র গৃহটি, চিত্রাশোদি দর্শকগণের অন্তরে একান্ত প্রিয়স্থান অধিকার করিবে।

কলিকাতার জনসাধারণের সম্মুখে আজ এই নব রস পরিবেশনে অগ্রদর হইয়াছেন—“এম্পায়ার টকী ডিস্টিবিউটারস্” প্রতিষ্ঠানের সর্বজনপ্রিয় কর্মকর্তা মিঃ হেমাঙ্কে, আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

“প্রভাত” চিত্রগৃহ ‘লাগর ফিল্মদের’ অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা চিত্রে-“জাগরীয়া” লইয়া, আগামী বৃহস্পতিবার কলিকাতাবাসীগণকে অভিনন্দিত করিবে। চিত্রখানির অপূর্ণ জনপ্রিয়তার কথা আমরা পূর্বেই অবগত আছি।

শরৎচন্দ্র

শ্রীমেঘেন্দ্র লাল রায়

শরৎচন্দ্র ও রাজেন্দ্র

(শ্রীকান্তের "ইন্দ্রনাথ")

শরৎচন্দ্রের বিষয় অনেক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে অথচ যৌবনে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে য পরিবারের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব স্নেহে আবদ্ধ ছিলেন সেই মজুমদার পরিবারের কথা কোন লেখকই বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। এই মজুমদার পরিবার আমার মাতুল গোষ্ঠী। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু লিখিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

শরৎচন্দ্রের সহিত এই মজুমদার পরিবারের নিশ্চয়ই মূলতঃ কোন ঐক্য ছিল বাহার কারণে এই বন্ধুত্ব এত নিবিড় হইয়াছিল। তাহা নির্দেশ করিতে হইলে আমার মাতুল পরিবারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রয়োজন।

আমার মাতামহ ৮বামরতন মজুমদার সাহিত্য লম্বাট ৮বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বি-এ পাশের পরের বৎসর বি-এ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তৎপরে বি-লি-ই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন ও বেহারে একজিকিউটিভ ও ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার হইলেও তিনি ছিলেন এক অদ্বুত খাপছাড়া মানুষ। তিনি চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত পদ্মানদীর ধারে মাছ চুরী করিয়া, ডিঙ্গিতে ঘুরিয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, গাছে গাছে সময় কাটাইতেন। তাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। পিতা কতক বিষয় প্রকৃত হইয়া, শিশুপত্নী ও মাতাকে কাঁধাইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন। কলিকাতায় পথরাজে

আসিয়া অতি হীন অবস্থার মধ্যে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন।

পিতা সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি পিতার কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। পাঠ মাত্র করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। (পিতৃদেবের এই পরিবারে বিবাহ হওয়ার পর ৮বক্ষিমচন্দ্র লালের সহিত ৮বামরতন মজুমদার মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। দ্বিত্তেন্দ্র লাল আমাকে বলিতেন "তোমার মাতামহের ভ্রাতৃ ইংরাজী বলিতে আমি খুব কম বাঙ্গালীকে দেখিয়াছি") আমার মাতামহ যে "কলিযুগ" নামে বাঙলা কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সংবাদ শরৎচন্দ্রই আমার ঘেন।

আমার মাতুলগণ প্রায় সকলেই একটু অদ্বুত প্রকৃতির ও খাপছাড়া। এক এক জন এক এক type—তবে প্রত্যেকেই বিশেষ বুদ্ধিমান Artist ও Musician—ও abnormal—সর্বাপেক্ষা abnormal ছিলেন আমার রাজুমা—শ্রীরাভেন্দ্র নাথ মজুমদার (শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ)। তিনি পিতার মাতৃচরী ডিঙ্গিতে বেড়ান ইত্যাদি গুণ পৈতৃক উত্তরাধিকারস্বত্বে পান। এই রাজেন্দ্র নাথই শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। শরৎচন্দ্রও ছিলেন খাপছাড়া abnormal ও বড়ো Artist —। আমার বড় মাতুল ৮রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার সঙ্গীত, সাহিত্য জগতে বিশেষ সুপরিচিত।

আমার সেক মাতুল শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার ও কম abnormal ছিলেন না—তিনি 'কলিকাতা' বিশ্ববিদ্যালয়ের

কৃতী ছাত্র হইলেও, বি-এল পাশ করিয়া উকীল ও পরে ডাক্তারী করিলেও সে কালে অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেও, বি-এ পাশ করার পর পিলাচন্দ্র হটবার নিমিত্ত শবের উপর অমাবস্তা রাত্রিতে দশমানে কাশী পূজা করিতেন, ধ্যান করিতেন, মড়ার মাথার উপরে বলিতেন। শরৎচন্দ্র সেক মাতুলকে চিরদিনই "ছোড়বা" বলিতেন। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই সেক মাতুলের এই সব প্রক্রিয়ায় বোগ দিয়াছিলেন কারণ তিনিই আমাকে সেক মাতুলের এই সব শুনা-শুণ প্রকাশ করেন। পরে সংবাদ লইয়া জানি এ সব সত্য ঘটনা।

শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ মাতুলালয়ে—। রাজু মাঝা ও আমার মাতৃ-দেবী পিঠে পিঠি ভাই বোন—মা বড় ও রাজু মাঝা ছোট। রাজু মাঝা আমাকে অত্যন্ত প্রেম করিতেন। আমি নিজে ছেলে বেলায় অত্যন্ত চুটে থাকিলেও দেবদেবী, লালু-লম্বালাইর প্রতি কি জানি কেন বিশেষ ভক্তি-ছিল ও অতি কম বয়স হইতেই লজ্জিতের প্রতি আসক্তি ছিল। রাজুমাঝা ও মা আমাকে ছেলে বেলায় এই গানটী শিখাইয়াছিলেন ও শরৎ চন্দ্রও আমার নিকটে এই গান শুনিতেন ও আমায় নাচাইতেন। "তোমার নাম রেখেছি হরি বোল", মনের সাথে ও আমার মন, খেল না হরি নামের খেলা, প্রেমে মেলে ভক্তি মাটী, গড়না হরির চরণ চুটি, আয় হুজনে সেই চরণে, গড়িয়ে দি বোন ফুলের মালা।"

(ক্রমশঃ)

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলন চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন

অহোবল

বিগত ইষ্টাব্দের চুটীতে চারদিন দরিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন' আডান থিয়েটারে মহানগরোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী দ্বারা বাহিকরূপে আমরা আলোচনা করিয়া-ছিলাম—আমাদের আলোচনার নিরপেক্ষ-ভাবে অধিবেশনের গুণগোষ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের আশা ও বিশ্বাস ছিল যে কর্তৃপক্ষগণ আমাদের আলোচনার বিচার করিয়া বাহাতে বর্তমান অধিবেশনকে সর্বোত্তম করিতে পারেন যে বিষয়ে প্রশংসা হইবেন। কিন্তু চুঃপের বিষয় এই যে গত চুটী অধিবেশনে যে সকল দোষ ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছিল, বর্তমান অধিবেশনে তাহার সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই দেখা গিয়াছে। এই সকল দোষ ত্রুটির উল্লেখ আমরা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা মুখে করিতে থাকিব।

উদ্বোধনী

গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটার সময় নাটোরাদিপতির সভাপতিত্বে নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথমেই বোম্বাই-এর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, স্বর্গত পণ্ডিত বিষ্ণুদ্বিজস্বরজীর প্রধানতম ছাত্র, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বৈদিক স্তুতি-বাচন করেন। সঙ্গীতের আদরে সঙ্গীতজ-কর্তৃক স্তুতিবাচন বেশ শোভনীয় ও সমগ্র

বেথটিতে পারে যদি ইহা একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ ও লহাচারসম্পন্ন কোন সঙ্গী-তজ্ঞের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যদি শ্রেণ শাস্ত্রজ্ঞ ও লহাচারসম্পন্ন কোন সঙ্গীত-শিল্পীকে না পাওয়া

যায় তাহা হইলে বৈদিক স্তুতিবাচন কোন ধর্মবিশ্বাসী আচারনিষ্ঠ সুধীব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ বৈদিক স্তুতিবাচন কার্য্যে কেবল সঙ্গীতবিদ অপেক্ষা আচারবান্ ও শাস্ত্র-রহস্যজ্ঞ পণ্ডিতেরই অধিকার বেশী। আর বৈদিক স্তুতিবাচনের নামে যিনি পৌরাণিক স্তব স্তুতি পাঠ করেন তিনি যে বৈদিক স্তুতিবাচন কার্য্যে কিরূপ অভিজ্ঞ তাহার পরিচয় অনাবশ্যক। বৈদিক স্তুতিবাচনে স্তুতিমুক্তি পাঠ করিতে হয়; কিন্তু পণ্ডিতজী যে তিনটি শ্লোক—[(১) ব্রহ্মগ্রহি... (২) যন্ত্রেজ্ঞা... (৩) যা কুলেন্দু...] উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনটিই বৈদিক মন্ত্র নহে। সুতরাং শাস্ত্ররহস্যের বোধ দ্বাংহা অঙ্গ, তাহার দ্বারা শাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করাষ্টবার ব্যবস্থা নিমিত্ত বলিয়াই বোধ হয়। অধিকন্তু দেবদেবীর স্তুতি-করিবার সময়ে যে ব্যক্তি চর্ম্মপাছুকা পরিত্যাগ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন না, কর্তৃপক্ষগণ যে তাৎপল্য ব্যক্তির দ্বারা কিরূপে স্তুতিবাচন করাষ্টবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার রহস্য



পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

উদ্ঘাটন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আর তাহা ছাড়া আমাদের এই বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ সারা বাংলাদেশে এমন কি কোন লহাচারসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ অথবা কেবলমাত্র আচারবান্ সুধী সুপণ্ডিত ব্যক্তির সন্ধান পাইলেন না, বাহার দ্বারা এই শাস্ত্রিক বৈদিক স্তুতিবাচন সম্ভবপর হইত? কর্তৃপক্ষ-গণ যদি প্রয়োজন বোধ করিতেন তাহা হইলে পূর্বোক্ত উভয়বিধ সুধীব্যক্তির সন্ধানই ঐ দিনের সভায় বাহার উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যেই মিলিতে পারিত। আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে পণ্ডিতজীর দ্বারা স্তুতিবাচন করান মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল এবং এবিষয়ে তিনি সাধারণ সম্পাদকের নিকট অনুরোধ করেন; কিন্তু সাধারণ সম্পাদক কোন সঙ্গতরই দিতে পারেন নাই। স্বয়ং সভাপতির অনভিপ্রেত ব্যবস্থা অত্যন্ত কর্তৃপক্ষের প্রবর্তন করান কি রুচিনকত?

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিজয়ীরা
জাতীয়তাবাদী "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গীত
হয়। আমাদের অনুরোধে কর্তৃপক্ষেরা যে
রবীন্দ্রনাথের "জনগণমনে"র প্রস্তাব হঠাৎ
যুক্ত হইয়া "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতেব অনুষ্ঠান
করিতে পারিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমরা
অত্যন্ত আনন্দিত হইরাছি। তবে বড়ই
দুঃখের বিষয় এই যে বাঙালীর ঘরের ঘরে
হইয়া এবং বর্তমান স্বাধীনতার যুগে বাস
করিয়াও বিজয়ীরা জাতীগণ অধি বক্তৃতির
স্বদেশ-স্বাধীনতার মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতকেও
এখনও কণ্ঠস্থ করিতে পারেন না—কারণ
ইহা বেশ সুস্পষ্টভাবেই লক্ষিত হইয়াছিল যে
গানটি গাহিবার সময় প্রায় প্রত্যেক কুমারীর
করকমলে উক্ত সঙ্গীতটির আদর্শলিপি লেখা
করা হইতেছিল—ইহা হঠাৎ একদা অজ্ঞান
করা কি স্বাভাবিক নহে যে স্বাধীনতার মহান
গ্রন্থের ফেরে পড়িয়া যাত্রা অল্পদিন পূর্বে
হঠাৎই তাঁহার জাতীগণকে "বন্দে মাতরম্"
সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছিলেন। কারণ, আমরা
আরও বক্ষা করিয়াছি যে প্রথম হইতে শেষ
পর্যন্ত গানটি সমস্তের ও সমতালে সুগীত
হয় নাই। তবে গানটিকে গাহিবার সময়
যত ক্রটিই প্রকাশ পাইয়া থাকুক না কেন—
একাত্মিক সঙ্গীতের পরিবর্তে যাহারা "বন্দে-
মাতরম্" সঙ্গীতটি নিক্ষেপন করিয়া জাতীগণকে
অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহার
জনসাধারণের প্রীতির পাত্র।

"বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের পর স্বাগত-
কারিনী সভার সভাপতি রাজা প্রমুদনাথ
সাকুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।
যাযুদী রীতিতে লিখিত এইরূপ অভিভাষণ
কেবল বাংলাদেশের সঙ্গীত সম্মেলনের
আসরেই চলিতে পারে। সভাপতি তাঁহার
অভিভাষণে সঙ্গীত-জগতের এমন কোন
একটি বিষয়বস্তু লইয়াও আলোচনা করেন
নাই যাহাতে সঙ্গীততত্ত্বাবোধীর কুতূহল



বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীনতম
ঋষিচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ
মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠস্থ চরিতার্থ হইতে পারে। আর
কতদিন বাংলার সঙ্গীত সম্মেলনে অন্তঃসার-
মুগ্ধ কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসাবাদ-
বহুল অতি-দীর্ঘ ধৈর্য্যচ্যুতিকারণী রচনা
উপস্থিত হইতে থাকিবে!

রাজা বাহাদুরের বক্তৃতার পর সম্মেলনের
সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ
বোষ মহাশয় পারীক্ষিক অন্তঃস্থতাবশতঃ তৃতীয়
বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিতে না পারায়
সম্মেলনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বসু উহা
পাঠ করেন।

কার্য্যবিবরণী পাঠের পর শ্রীযুক্ত দামো-
দরদাস খান্না (লালাবাবু) তাঁহার স্বাভাবিক
সুপ্রসিদ্ধ ও সতেজ কণ্ঠে এক হৃদয়গ্রাহণী
বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাচনভঙ্গীতে
পরিচুপ্ত হইয়া বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রা-
পিতের জায় ঘীর-স্থির হইয়া বসিয়াছিল।
লালাবাবুর বক্তৃতার পর সম্মেলনের সভাপতি
মহারাজ শ্রীযোগীজনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার
লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। মহারাজের

ইচ্ছা ছিল যে তিনি মাতৃভাষার অভিভাষণ
পাঠ করিবেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করেন
যে তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা না করিলে উহা
নানান্যভাষাভাষী সমবেত শ্রোতার বোধগম্য
হইতে পারিবে না। সেক্ষেত্র মহারাজ পূর্বে
সফল ত্যাগ করিয়া ইংরাজীতে তাঁহার
অভিভাষণ পাঠ করেন। কিন্তু, পড়িবার
সময় মহারাজ অভিভাষণটিকে এতই সংক্ষিপ্ত
করিয়া লইলেন (বোধহয়, শ্রোতৃমণ্ডলীর ধৈর্য্য
চ্যুতির ভয়ে) যে তাহা হঠাৎ কোনরূপ
অর্থই আমাদের বোধগম্য হইল না।
আমরা প্রথমে শুনিলাম—মহারাজ কয়েকটি
মন্ত্রবাক্য জ্ঞাপন করিতেছেন। তাহার পর
দেখিলাম তিনি কতকগুলি পাতা উল্টাইয়া
গেলেন। তাহার পর হঠাৎ শুনিলাম তিনি
পড়িতেছেন—Dhrupad—Dhrupapada =
padas are fixed. তার পরেই দেখিলাম
তিনি বলিয়া পড়িলেন। আমরা মহারাজের
এরূপ বক্তৃতা ইহার পূর্বে আর কখনও
শুনি নাই।

মহারাজবাহাদুরের অভিভাষণপাঠ সমাপ্ত
হইলে প্রায় লাড়ু নরটার সময় সম্মেলনের
demonstration কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে
বর্তমান ভারতের অগ্রতম প্রসিদ্ধ বীণকার
দ্বির খাঁ সাহেব বীণে টোড়িরাগের আলাপ
করেন। কালক্রমে বীণের জায় যন্ত্রের
প্রয়োগ উত্তরভারতে প্রায় লুপ্ত হইতে
বলিয়াছে। যে কয়েকজন শিল্পী এখনও
এই হৃদয় যন্ত্রের সেবা করিতেছেন তাঁহাদের
মধ্যে খাঁ সাহেবের প্রয়োগ নৈপুণ্য বিশেষ
চিত্তাকর্ষক।

খাঁ সাহেবের বাজনার পর বারাণসীর
বিখ্যাত ঋষিচার্য্য মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরি-
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঋষি গান
করেন। তাঁহার লিখিত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত
চন্দ্রভদ্র চট্টাচার্য্য মহাশয় যুগল-সঙ্গত করেন।
এই হই প্রাধানতম শুণীয় সমাবেশে ঋষি

সঙ্গীতের যে অপূর্ণ গাভীরা প্রকাশ পাঠরাছিল তাহা সঙ্গীতরসিকগণের বিশেষ উপভোগ্য হইরাছিল। সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভায় প্রধান ভূমিকে যে কর্তৃপক্ষগণ সম্মেলনে আনিতে পারিয়াছিলেন তজ্জন্ত তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদভাজন। কিন্তু অন্ত্যস্ত শিল্পীর ভায় তাঁহাকে দিয়া কেবল গান গাও-রাইবার পরিচয়না বাহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের এইরূপ বুদ্ধির প্রশংসা কোনমতেই করা যায় না। কারণ, সম্মেলনের লক্ষ্যকতা বজায় রাখিতে হইলে কেবল নৃত্য, গীত ও বাজের অনুষ্ঠান করিলেই চলিবে না, সঙ্গীত জগতে বর্তমানের যে সকল সমস্যার উদয় হই-রাছে ও হইতেছে বিশিষ্ট গুণিগণের সাহায্যে সেগুলির সমাধানের জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করিয়া সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। হিন্দীভাষার গাভীর মত প্রবীণ শিল্পজ্ঞ সঙ্গীতশিল্পীকে



বাম হইতে অধ্যাপক গোবিন্দনাথ শাস্ত্রী, মুষ্টি-যোদ্ধা ও নৃত্যবিৎ রবিন্দ্র সরকার, আলোক-চিত্রশিল্পী নির্মল নিয়োগী, পণ্ডিত হরি নারায়ণ সুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ মিত্র, অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী ও তৈলাল নাথ ভট্টাচার্য আলোক-চিত্র-নির্মল নিয়োগী পাইয়াও সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ সে সুবর্ণ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন না দেখিয়া আমরা অন্ত্যস্ত বিস্মিত হইলাম। কর্তৃপক্ষ-গণের উদ্বাসীভ-প্রসূত এইরূপ ক্রটির কোন সম্ভব কারণ আছে কি? আজ প্রায় বোল

বৎসর পরে সুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় আনিয়াছিলেন এবং অল্প ভবিষ্যতে তিনি যে পুনরায় কলিকাতায় আনিবেন তাহা আমাদের মনে হয় না। সুতরাং এ সুযোগ নষ্ট করিয়া আলোচনা সভার আয়োজন না করা মোটেই দুঃখজনক হয় নাই।

প্রশংসার পর বাংলার প্রসিদ্ধ গুণী শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ললিত বাগের একটি খেয়াল "দ্বাদশ দিন ঘাওরে" ও আর একখানি চুঁরী "নয়না ছু নিধিরা আওরে শ্রাব" গান করেন। শ্রীমানের গান আমরা পূর্বে এই confer-enceএ এবং অন্ত্যস্ত গুনিয়াছি কিন্তু তাঁহাকে আর কখনও গান গাহিবার লম্বয় একরূপ nervous হইতে দেখি নাই। এর কারণ কি, তা' শ্রীমানই জানেন। ললিত

রাধা ফিল্মসের
পরিচালনা

জিতেন্দ্র বাসিন

— ক্রিয়াকার —
রাণিবালা, দেববালা, ছায়া
নরেশ মিত্র, জাহর গাঙ্গুলী
সুশীল রায় (এম), মনোজ পাল (এম)
কুমার মিত্র, জুনসী চক্রবর্তী
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
অভি

মতিমহল থিয়েটারের
হাল্যবসায়ক
কন্যা চিত্র

প্রযোজনা: জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোক-চিত্র-নির্মল: যতীন্দ্র দাস
গদ্য-যন্ত্র: { হৃদয় পাল ও
{ ভবেন ঘোষ

রাগের খেলালটিতে অনেক ঘোষ ক্রীড়া
পাওয়া গেল। স্বাধীনভাবে ধৈর্যের
প্রয়োগ করার এবং মধ্যমের মৌড়ের
সহিত উৎসাহকে ব্যবহার না করার
শ্রীমানের গানে রাগরূপ ফুটিয়া উঠিতে
পারে নাই। বাণীশ্রুতির দিকে
শ্রীমানকে আমরা পূর্বেও মনোযোগী হইতে
বলিয়াছিলাম কিন্তু সে বিষয়ে তিনি কোনও
মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হইল
না। ঠুরী গাহিবার সময় যখন তিনি
“বৎ” হইতে “হুনী ত্রিতালীতে” বাটকেছিলেন
তখন তাঁহার লম্বা ভ্রু হইয়াছিল।
Conferenceএ গাহিবার সময় এ জাতীয়
ক্রীড়া বিচ্যুতি মোটেই শোভা পায় না।

শ্রীমান রথীন্দ্রনাথের গানের পর স্বর্গত
তবলা-বাদক খলিফা আব্দেদ হোসেন খাঁ
সাহেবের বিশিষ্ট শিষ্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ
গঙ্গোপাধ্যায় এটর্নী অ্যাট-ল মচাশয়
তবলায় চিখা তিনতালে লহরী বাজান।
হীরেন্দ্রনাথের লহরী morning programmeএর
একটি বিশিষ্ট আঙ্গণ হইয়াছিল।
তাঁহার লহরীর চন্দ্র ঠেঁকার বন্দেশ
ও অঙ্গুরী ক্লেপন অতি উপভোগ্য হইয়াছিল,
Professional না হইয়াও তবলা-বাদনে
তাঁহার যে নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়
তিনি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে বর্তমানে
বাংলার শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক বলিলেও অত্যাুক্তি
হয় না। আশাকরি ভবিষ্যতে তিনি
ভারতের সঙ্গীত-সমাজে বাংলার মুখ উজ্জ্বল
করিয়া রাখিবেন।

তবলা বাজনার পর, স্বর্গত গুণিপ্রবর
আবদুল করিম খাঁ সাহেবের অন্ততম ছাত্র
প্রোঃ সুরেশ বাবুমান গুজরী টোড়ির
হটখানি খেলাল (একটি বিলম্বিত ও
অপরীত দুনি লয়ে) গান করেন। ইহার
গান মোটের উপর মন্দ নহে, তবে ইনি



(বিলাসী)

অধিকার

গত কয়েক হপ্তা ধরে আমরা এ বইয়ের
কোন খবর প্রচারবিভাগ থেকে পাচ্ছি
না। যদিও আমরা জানি দু নম্বর
ষ্টুডিওতে এর সুটিং জোর ভাবেই চলছে।
গেল সোমবার সকাল, লাভটা থেকে এটার্ণি
(শৈলেন চৌধুরী) Chamberএর দৃশ্য
তোলা হচ্ছে। এই Chamberএর জন্তে
যে চমৎকার সেটটি তৈরি হয়েছে তাকে
অন্যদলে বিলেতি সেটের সঙ্গে তুলনা
করা চলে। এ বইয়ের গতি যেভাবে
তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে তাতে প্রচার
বিভাগের আর একটু তৎপরতার সঙ্গে
কাজ করা উচিত। আমরা আশাকরি
সামনের বুলেটিনে এ বিষয়ে অনেক
খবর পাব।

ষিষ্টাপতি

কলিকাতার এটি প্রধান চিত্র-গৃহে
(নিউ সিনেমা ও চিত্রা) নিউ থিয়েটার্সের
‘ষিষ্টাপতি’—হিন্দী ও বাংলা, একাদিক্রমে
চলছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে, সকল শ্রেণীর
ও সকল সম্প্রদায়ের দর্শকদের সুবিধা
দেবার জন্ত। বর্তমানে একই সময়ে দুখানি

খাঁ সাহেবের সীতার অনেকগুলো বার্থ
অঙ্গুরণ করিয়া গানের মাধ্যমে নষ্ট
করিয়াছেন। ইহার গানের পর প্রথম দিনের
পূর্বাহ্নের সভা ভল হয়।

বিভিন্ন ভাষার ছবি দেখাবার ব্যবস্থা কোরে
সকলেরই মস্তবাহভাজন হোয়েছেন।

বাঙলার এগারোটি বিভিন্ন নহরে
‘ষিষ্টাপতি’ চলচে। চিত্রা-র এ হপ্তা থেকে
পঞ্চম সপ্তাহে পদার্পণ কোরল। আশাকরি
বহু সপ্তাহ ধরে ষিষ্টাপতি বাঙলার নম-
নারীকে আনন্দ পরিবেশন কোরতে,
চিত্রা-র ভরা আসর অধিকার কোরে
থাকবে।

নিউ থিয়েটার্স

ছায়া-চিত্রে সামাজিক কাহিনীর সমাধর
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। চিত্র-শিল্পের
প্রসার ও পুষ্টির জন্ত ইহার প্রয়োজনীয়তা
আছে।

আমাদের সুখ দুঃখ, হানিকার, ছোট-
খাটো অভাব-অভিযোগ এবং তাহার
নিরাশনের মধ্যেই আমরা আমাদের
জীবনটাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।
যে জীবনের সহিত আমরা প্রতিদিন পরিচিত,
যাহার সুখ দুঃখ, হালি কালি আমাদের
লম্বা চেননা ও অনুভূতিকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন
করিয়া আছে—ছায়া-চিত্রাকারে তাহারই
প্রতিচ্ছবি আমাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে।
নিজক আনন্দ দান ছাড়াও ইহারই মধ্যে
আমরা পাই জীবন-বুদ্ধি বাচিবার মত এবং
সংগ্রাম করিবার মত প্রেরণা। এইভাবে
জীবনের ছোট-খাটো এবং বৃহত্তর সমস্তাগুলির
সমাধানের পথও ছায়া-চিত্রের মধ্য দিয়া
প্রাপ্ত হইতে পারে।

ভারতীয় জাতি-চিত্রের ইতিহাসে, জাতি-চিত্রের মধ্য দিয়া, আমাদের সামাজিক জীবনকে প্রতিফলিত করিয়া, নিউ থিয়েটার লন্ডনের যে ভারত-জোড়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন—তাহার ইতিহাস আজ চিত্র-রঙ্গিক মহলে কাহারও অবদিত নাই। এই প্রতিষ্ঠানের ‘বেবদান’, ভাগ্যচক্র, বিবি, মুক্তি, অনাথ আশ্রম—ইত্যাদি চিত্রের অভাবিত সাফল্য এই উক্তির সাক্ষ্য দিবে। পরিকল্পনা, গঠন-নৈপুণ্য এবং অভিনয় উৎকর্ষ এই শ্রেণীর সামাজিক চরিত্রগুলি যে জাতিবর্ণ নির্দেশে, সকল শ্রেণীর বর্ণক মহলেই বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে, একথাও আজ কাহারও অজানা নহে। স্মরণ্য সামাজিক কাহিনীর প্রতি জনমত আকৃষ্ট করিয়া নিউ থিয়েটার যে এই শিল্পকে নব-জীবন দান করিয়াছেন, একথা স্মরণ করিয়া ভারতবাসী মাঝেই গর্ববোধ করিবে।

নিউ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের চাহিদার সন্ধান করিতে জানেন। তাই বর্তমান বৎসরে তাহারা মূলতঃ সামাজিক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া, বিভিন্ন টাইপের সমাজ-চিত্র গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে নিউ থিয়েটারের বিভিন্ন কৃতিপরিচালক যে সকল ছবি তুলিতেছেন তাহাদের নাম :—(১) অভিজ্ঞান (২) দেশের মাটি (৩) অধিকার এবং (৪) স্ট্রীট সিন্ডার।

অভিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত উপেন গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একখানি বহু আলোচিত এবং সুখ-পাঠ্য, সামাজিক উপজ্ঞান। নারীর প্রতি সমাজের দারিদ্র্য; এবং অবিচার করিলে তাহার পরিণাম ও প্রতিকারের প্রতি আশা-ব্রহ্মের কর্তব্য-বোধকে লক্ষ্য করিয়া বেওয়ার মতোই এই কাহিনীর লক্ষ্যকথা।

এই কাহিনীর নারিক লক্ষ্যার চরিত্র ও জীবনী লইয়া আমরা এই পত্রিকায় নানা



“দেশের মাটি”র একটি দৃশ্যে দুর্গাবাদ ও চন্দ্রাবতী

ভাবে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সমাজের বিচারে সে চরম নির্দোষন হও লাভ করিয়াও আত্মহত্যা করে নাই। ইহা এমন একটি দুর্ঘটনা, যাঁহা যে কোন নারীর জীবনে ঘটতে পারে। বাঙলা দেশের শত সহস্র দুর্ভাগিনী মেয়ে, সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া যে পথ অবলম্বন করে, লক্ষ্যও সেই অন্ধকার পথেই পা বাড়াইছিল। কিন্তু রক্ষা করিল তাহাকে তাহার বিবেক, তাহার ধর্মবুদ্ধি, তার অন্তরের দৃঢ়তা। যে আদর্শে বাঙলার মেয়েদের জীবন গঠিত হইলে তাহা লকলের নিকটেই বরণ্য হইতে পারে—সেই আদর্শের উপরেই লক্ষ্যার চরিত্রের ভিত্তি।

এই কাহিনীটিকে বাণী-চিত্রাকরের রূপ দিতে গিয়া, ইহার বিভিন্ন চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিতে নিউ থিয়েটারের যে সকল শিল্পীর সমাবেশ ঘটয়াছে, তাহারা লকলেই চিত্রাভিনয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বিমল রায়ের কটোগ্রাফী, বাণী হস্তের লক্ষ্যমূল্যে এবং রাই বড়ালের লক্ষ্যত পরিচালনার গুণে—অভিজ্ঞান যে লড়াই একখানি মনোময় এবং লোভনীয় চিত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

স্ট্রীট সিন্ডার

সুপরিচিত চিত্রনাট্যলেখক শ্রীযুক্ত কণি বসুদেবের যে চিত্রখানি পরিচালনা করছেন

তার বাংলা নাম সাধারণের জ্ঞাতার্থে কিছু আজও বেওয়া হয়নি, ইংরাজি নাম আমরা জেনেছি 'বিক্টরি লিয়ার'। এ ছবির গল্প আমরা শুনেছি। বাংলায় তথা ভারতে এ ধরনের গল্প নিয়ে ছবি প্রস্তুত করার কল্পনা আর কেউ করতে পারে নি। মজুমদার মহাই ছবির নাটক—পাকা লিথিয়ে কাজেই কাগজের পাতা হতে সেলুলয়েডের কিতের রূপান্তরিত ছবি ভালই হবে।

বাংলায় এই প্রথম ছবি—বাতে নামছেন শ্রীযুক্ত সায়গল ও শ্রীমতী কানন। টিম তৈরী করা নিউ থিয়েটার্সের এই প্রথম প্রচেষ্টা। স্কর্টের সুর বাজুর্ষো, সুরাভিনয়ে এরা দুজনেই চির-রসপিপাসুদের এত বেশী মুগ্ধ করেছেন যে কেউ বলতে পারে না কে বড়।

নাচ গানে সারা ছবিখানি ছেয়ে আছে। থবর পেলুম শ্রীযুক্ত সায়গল, শ্রীমতী কাননে ঝগড়া বেধেছিল কারণ দুজনেই বলতে চাই- ছিলেন যে তিনি গানের যে অংশটি গাইছেন সেটাই সুরে ভাল। অবশেষে রাইটার বড়াল ঝগড়া মেটালেন সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার লোকেন বসুকে ডেকে। তিনি চুলচেরা হিসেব করেও বলতে পারলেন না কার অংশটি ভাল। প্রমাণ হোলো দুজনেই ভাল।

দেশের মাটি

দেশের মাটির কাজ খুব ভালভাবেই চলেছে। মাঝে সাইগলের অনুপের জন্তে এর গতি একটু মন্থর হয়ে পড়েছে। ষ্টুডিওর সেটের মধ্যে যে বিরাট ধাতু ক্ষেত্রের ব্যবস্থা হয়েছে তা দেখে অনেকের মনে বাঙলা মায়ের শত শ্রামলা মাটির কথা স্রবণ করে যায়। নীতিন বাবুর মত এমন চমৎকার atmosphere তৈরি করতে সহজে কেউ পারে বলে বিশ্বাস হয় না। শোনা যাচ্ছে আর ঠিক দ্বি-দশেক স্কটিং করলেই এই শেষ হয়ে যাবে।

ইউনাইটেড টকীজ

গত শনিবার এক শ্রীতি লন্ডনগনের ভেতর এদের প্রথম অবদান 'ডল্লার' উদ্বোধন স্কটিং

হয়। কালিধ বাগবের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর নন্দী এই উৎসবের পৌরহিত্য করেন।

উৎসবের প্রারম্ভে পরিচালক শুনময় বন্দ্যোপাধ্যায় ইউনাইটেড টকীজের তরফ থেকে মহারাজাকে উৎসবের হোতারূপে বরণ করিলে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর তাহার সমর্থন করেন। অতঃপর মহারাজা তাহার অভিভাষণে বাংলার তথা ভারতের ফিল্ম-শিল্পের সুখ্য উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া এই নবজাত শিশু প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সাক্ষাৎ কামনা করেন।

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও যাবতীয় সাংবাদিক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবাস্তে নিমন্ত্রিত গণকে তুরি ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। প্রযোজক শ্রীঅমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এবিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন।

পূর্ণ থিয়েটার

'মুক্তি' এখানে আর মুক্তি নিতে চাইছে না। দু'এক সপ্তাহের মধ্যে যে নেবে তাও বোধ হয় না।

অভিনয়

অভিনয়ের কাজ এগিয়ে চলেছে। গেল শনিবার ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে 'অভিনয়ের' দুটি সেট আমরা দেখেছিলাম। চমৎকার এই সেট দুটি। বিশেষতঃ Hotel এর যে সেটটি সুখ্যাৎ বাবু এখনও তৈরী করছেন তা দেখে আমাদের American সেটের কথা মনে পড়ে গেল। মিঃ চোখানি সেটের জন্তে কি পরিশ্রম খরচ করেছেন। তাঁর খরচ ও চেষ্টা সফলতা লাভ করুক এই আমাদের ইচ্ছা।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে প্যারা-ম্যাট পিকচার্সের "বুকানিয়ান" দেখানো হইবে। এই বিপুল কথাচিত্রটি প্রযোজনা

বিবিধ

দুর্ভার সঙ্ঘ

গত ১৬ই বৈশাখ রবিবার লক্ষ্য গটার ১০নং রিচি রোডে শ্রীযুক্ত সুধীরজেন সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে দুর্ভার সঙ্ঘের পঞ্চম অধিবেশন হয়। কবি শ্রীযুক্ত সুখ্যাংগ লেন গুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় শ্রীযুক্ত নির্মল দাশগুপ্তের 'দুর্ভার', সুধীরজেন সুখোপাধ্যায়ের 'তাই তুমি মা', হেমন্ত সুখোপাধ্যায়ের 'একটি দিন' রমাকৃষ্ণ মৈত্রের 'প্রেমের গল্প' প্রভৃতি গল্প এবং লম্বীর ঘোষের 'যুদ্ধ' ও স্তম্ভাক্ত নামে দুইটি কবিতা পঠিত হয়।

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘের ৪র্থ বার্ষিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী শনিবার ২৬শে চৈত্র বৈকাল ৬-৩০ ঘটিকার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বার-এট-ল, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘের ২৫০ শত যুবক ও বালক সভ্য সঙ্ঘের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীধরীজনাথ সুখোপাধ্যায় এবং সহকারী ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীকানাই গাল নন্দী, ও শ্রীকৃষ্ণ

ও পরিচালনা করিয়াছেন সুবিখ্যাত মিলি বি ডি মিলি। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন ফ্রেড্রিক মার্চ, ফ্রান্সিস গল, একিম টমিরয় মর্গাট প্রোফার, এবং আরও লক্ষ্যাদিক অভিনেতা। এক দুর্ভার মহার প্রণয় শিহরিত জীবন এবং একটা জাতিকে বাঁচাবার জন্ত তাহার রোমাঞ্চিত হৃদয়সাহসিক কীর্তিকাহিনীর এই কথা চিত্রটি প্রত্যেক দর্শককেই প্রণয় করিবে।

মোহন দাসের পরিচালনায় নানাবিধ ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। প্রায় আড়াই হাজার নর-নারী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ফ্রাইং ফিসে, শ্রীমান কমল, সেভেন-ইন-ওয়ান এরিয়ারে বীনেশ, নারায়ণ, কমল, গোকুল, অমল, ললিত, অমিত, ফ্রাইং ট্রাপিকে, কালিপদ, বক্রিম, বীনেশ বরণ, এ্যাক্রোবটিকে মন্থন, কমল, বীকা দর্শকবৃন্দকে খেলার বোঝাইয়া বিমোহিত করেন।

কলিকাতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত ২১শে, ২২শে ও ২৩শে মার্চ ১৯৩৭ “কালীপুত্র সাহিত্য মিলন সমিতির” এবং উক্ত প্রতিযোগিতার সুযোগে সম্পাদক নীরেন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় উক্ত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বহু ছাত্র ছাত্রী উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। প্রতিযোগিতায় কুমারী অরুণা চক্রবর্তী, পুণিমা মুখার্জি, নিলীমা চক্রবর্তী ইত্যাদি এবং পুরুষ বিভাগে সুধানাথ রায়, লত্যাধেব চৌধুরী, জুলাল চন্দ্র পাত্র, বীপেন রায় চৌধুরী ইত্যাদি যথেষ্ট শ্রুতিমূলক অর্জন করেন।

তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবে ১৪ই মে ১৯৩৮ হইতে মধ্য কলিকাতায় এক বিশিষ্ট প্রাক্কানে। আগামী প্রতিযোগিতায় একটি For good best teacher's Cup ও Female 'B' group এর খেয়াল ও আধুনিক সঙ্গীত বিভাগে দুইখানি For good cup দেওয়া হইবে। প্রবেশিকা প্রতি বিভাগের মাত্র আট আন। বিষয়,—(১) খেয়াল, (২) চুঁরী, (৩) ভজন, (৪) কীর্তন, (৫) আধুনিক বাংলা গান, (৬) ভাটিয়ালী। আগামী অধিবেশনের কয়েকজন বিচারকের নাম নিয়ে দেওয়া হইল—সঙ্গীত নায়ক প্রফেশনার গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য্য প্রফেশনার গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী, রামকিশণ

মিশ্র, মিঃ যোগজীবন ব্যানার্জি, ভবানী লেবক মিশ্র, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, কে, লি, বড়াল, জ্ঞানেন্দ্র শর্মা গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উদয় চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, শীতল ঘোষ, জ্যোতিষ চন্দ্র মণ্ডল, কে, এল, মুখার্জি, হরিশাধন শুক্ল, বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, জীবন চন্দ্র উপাধ্যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর মুখার্জি, অনিল বাগচি, পাহাড়ী লাম্যাল, কে, এন্স. নাহার, সুদীপ্ত নাথ মজুমদার, রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজি নজরুল, কুমার শচীনদেব বর্মান, যামিনী গাঙ্গুলী, ভোলানাথ দে, ধীরেন দাস, কাশিনাথ চট্টোপাধ্যায়, গিরিন চক্রবর্তী, ননীগোপাল মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, খানসাহেব মেহেরি হোপেন ইত্যাদি।

আগামী ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত নিম্ন ঠিকানায় ফর্ম, বিবরণ ইত্যাদি লম্বস্ত পাওয়া যাইবে।

(১) নীরেন মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদক) ৭৮নং কালীপুর রোড। (২) বিনয় মুখোপাধ্যায়, ১২৪-৬ রসারোড, ভবানীপুর। (৩) ১৩নং হাঙ্গরা রোড কালীবাট। (৪) বিমল মুখোপাধ্যায়, ৮৪নং চৌরাজি রোড, ভবানীপুর।

বালক সঙ্ঘ

গত শনিবার ২৪শে এপ্রিল, ভবানীপুরের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বালক-সঙ্ঘের ত্রয়োদশ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মিঃ এন্স. লি, মিত্র, ডিরেক্টর অব ইনডাস্ট্রিস সভাপতির আনন গ্রহন করেন ও মিসেস জে. লি, মুখার্জী পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণের পরে সন্ধ্যার ৪০০ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা “মার্চ পাঠ” করিয়া সভাপতিকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং পরে নানাক্রম ক্রীড়া বোতুকে দর্শকদের বিমোহিত

করে। তৎপরে সন্ধ্যার অস্তান্ত লত্যাগণ কর্তৃক প্রদর্শিত ব্যায়াম কৌশলে লম্বস্ত ভক্তদেহ-বহুগণ অতীব প্রীত হন। মাঠের হেমানন্দের বোঝাই গরুর গাড়ী পিঠে করিয়া মোটরের গতিরোধ-সকলকে তৃপ্ত করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত ইন্দুভূষণ চন্দ্রের মস্তক দ্বারা লোহার কড়ি বক্রকরণও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরিশেষে শ্রীমান লম্বস্ত কন্ডের ক্রীড়া বিধীন উত্তোষ আয়োজনের জন্য আমরা তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং তিনি ও তাহার জায় অস্তান্ত অক্লান্ত কর্মীগণ “বালক সঙ্ঘ”কে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে লইয়া যান ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

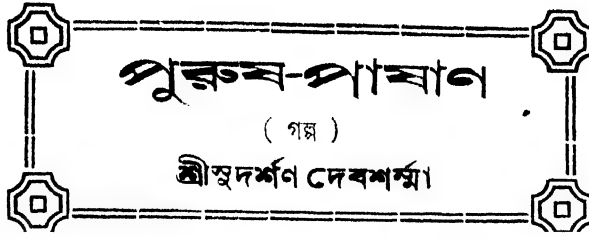
দীপ্তি গোস্বামী

শ্রীরাধপুর নিবানী জমিদার শ্রীলাই চন্দ্র গোস্বামীর অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা কুমারী দীপ্তি গোস্বামী চন্দ্রনগর সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়



দীপ্তি গোস্বামী

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীরাধপুরের সুগায়ক শ্রীহেমন্ত কুমার লাহিড়ী দীপ্তির শিক্ষক।



(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

‘মোটাই না, বরং heartfull বোলে
স্বীকার কোরে নিলুম।’
‘কারণ?’

‘বলা যায়না, হয়তো চ’দিন বাড়ে আমার
আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়বে। তখন
আপনাকে পুরোছত্তর ‘ফুল’ বনে ফিরে যেতে
হোতো।

উভয়ে নীরব। ঘরের ভেতরকার
আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠল।

হঠাৎ রণেন বলে উঠল—‘মিস্ রায়
বরুণা চমকে উঠল, বলল—‘বোলুন।’

‘টিপয়ের ওপর থেকে থার্মোমিটারটা
দিনতো, দেখা যাক জরটা কতো উঠলো।
বোধ হয় বেড়েছে। মাথাটা কিম্ কিম্
কোরচে!’—

টিপয়ের ওপর থেকে থার্মোমিটারটা
নিরে রণেনের হাতে দিয়ে বারকতক ঢোক
গিলে নীচু গলায় বলল—‘কপালটা টিপে
দিলে বোধ হয় যন্ত্রপার একটু স্বস্তি হবে।

‘না-না কোনো দরকার নেই। এতো-
টুকুতে আমার কারু কোরতে পারবে না।
মনে পড়ে, প্রবল জ্বর অবস্থায় জার্মানে
অনাহারে ছেঁড়া জুতো পরে খালি মাথায়
চরে বেড়িয়েছি। কই, কিছুই তো হয়নি।’
কথাস্তে থার্মোমিটার বগলে পুরে দিলে।

বরুণা অকারণে ড্যানিটা ব্যাগের
বোতামটা খুঁটতে লাগল। আনত দৃষ্টি।

খানিকপর থার্মোমিটার বরুণার হাতে
দিয়ে রণেন বলল—‘দেখুন তো কতো
উঠলো!’

বরুণা সেটাকে আলোর দিকে তুলে ধরে
দেখে বলল—‘একশ তিন।’

‘ওঃ এবার দয়া কোরে টিপয়ের ওপর
ওটা রেখে দ্বিন—’

এমন সময় কলিং বেলটা আর্জনাৎ করে
উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে লরু গলায়
কে যেন বলল—‘May I come in, Sir?
বরুণা রণেনের দিকে চেয়ে বলল—‘কে
যেন ডাকচেন!’

রণেন সে কথা কানে না তুলে, বলল—
‘Yes madam!’

দোর ঠেলে ঢুকল এক ফিরিজি মেয়ে।
একমাথা লোনালী চুল, পরণে বিচিত্র রংয়ের
বাগর’, পায়ে গোড়ালি উঁচু জুতো আর
ঠোঁট ছুটি লিপষ্টিকে রক্ত-রাঙা। কোনো
দিকে ক্রকেশন না করে সে সোজা গিয়ে
রণেনের বিছানার ওপর বলে পড়ল। তার
হাতছাটী বাঁকানি দিয়ে ইংরাজীতে বলল—
‘কেমন আছ বন্ধু?’

‘মোটাই ভাল নয়।’

বরুণা যেম উঠল, অস্বাভাবিক জোর-
গলায় বলল—‘রণেন বাবু, আমি চললুম।’

‘সে কী! এরি মধ্যে?’

‘হ্যাঁ কতোকগুলো-বিশেষ কাজ আছে।’

‘আচ্ছা একটু বহন, এর নাম লিলি
আর্থার, আমার বিশিষ্টা বন্ধু! জাহাজের
ডেকে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়।
কলকাতাতে এদের মত টুপির কারবার আছে।’

এর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই।

লিলির দিকে চেয়ে বললো—

‘ইনি মিল বরুণা রায়, আমার অন্তরঙ্গ
আত্মীয়া ও বন্ধু।’

লিলি বরুণার হাতখানা নেড়ে ধিরে*
বলল—‘গুডইভনিং!’

‘গুডইভনিং’—

রণেনের দিকে চেয়ে বরুণা বলল—
চললুম, লেরে উঠুন, বৌদি আপনাকে বিশেষ
কোরে যেতে বোলে দ্বিরেছেন। যাবেন
অতি অবিগ্রহ! নমস্কার।’

‘যাবো—নমস্কার।’—

* * *

দ্বিন পাঁচেক পর একদিন সন্ধ্যায়—বরুণা
তখন ‘শ্রামবাজারগামী ট্রামের প্রতীক্ষার
ষ্টেপেজে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় একখানা
মোটর এলে দাঁড়াল একেবারে ওর গা ঘেঁষে।
ভয়ে চকিতে ও দৃষ্টপাতে উঠে দাঁড়াল।

‘নমস্কার!’—

চমকে উঠে গাড়ীর ভেতর তাকাতেই
দেখে রণেনবাবু। মুখে মুহু হাসি!

বরুণা হু-হাত তুলে নমস্কারান্তে হেলে
বলল—‘মাহুষ খুন কোরতে বেরিয়েছেন
বুঝি?’

‘ভয় নেই—কন্দুর গন্তব্য?’

‘যাবো একবার সমিতিতে, জরুরি মিটিং
আছে।’

‘চলুন।’

‘কোথায় যাবো?’

‘আপনাকে সমিতিতে পৌছে দেবো,
তারপর লহর প্রদক্ষিণ কোরতে বেরবো।
উঠে পড়ুন, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে একটা
হেলে একটা মেয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ কোরচে
এই লুপ্ত এবেলের লোক এখনো লহ কোরতে
শেখেনি।’

বরুণা নীরবে গাড়ীতে উঠে গিয়ে বলল।
গাড়ী চলল।—

উভয়েই নিক্কাক। খানিকপর রণেন
বলল—‘আপনার attendanco কটায়?’

‘আটটায়।’

‘ওঃ—

‘কেন বোলুন তো?’

‘না, তাই জেনে নিলুম। এই সময়টা খানিকটা বেড়িয়ে নিতুম—অবিশ্রি আপনার আপত্তি না থাকে।’

‘বেশতো চলুন না।’

আবার পড়ল নীরবতার পালা। গাড়ী ছুটছে। রণেন ষ্টিয়ারিং ধরে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে চুপটি করে। বরুণার লাড়ীর কাঁধের কাপড়টা রণেনের জামার বার বার স্পর্শ করছে।

গ্র্যান্টট্রাক রোডে পড়ে গাড়ী ছুটল তীরবেগে। চোখে মুখে বাতাস লেগে বরুণাকে বিপর্যস্ত করে তুলল। ডাকল—
‘রণেন বাবু!’

‘বাবুন।’ ভেমনি লামনের দিকে চেয়ে সহজস্বরে বলল।

‘হ্যাঁ কোরে স্পিড্ কমিয়ে দিন।’

‘কেন?’ ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসির রেখা—

‘বিপদ হোতে পারে।’

‘হোক গে। আমি আন্তে চালাতে পারিনা। বলে কাঁটাটা ঘুরিয়ে দিবে আরো জোরে ছুটিয়ে দিলে। গাড়ী ঝড়ের মত এগিয়ে চলল। বরুণা শিউরে উঠল আতঙ্কে। রণেনের বাঁহাত খানা লবেগে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল—‘রণেনবাবু আন্তে চালান।’

রণেন নীরব।

‘দোহাই আপনার আন্তে চালান—’

‘ওপক্ষ তবুও নিরস্তর। বরুণা হতাশ হয়ে মু’চোখ মুজিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ওর কানের পাশের ও কপালে পড়া চুলগুলো রণেনের চোখে মুখে এসে পড়েছে। চেতনা অতীত হেহ-মন।

কতক্ষণ পর মনে নেই, রণেন বরুণার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ডাকল—
‘চোখ খুলে দেখুন, এবার আর ভয় নেই।’

বরুণা চমকে উঠে চোখ খুলে দেখে

গাড়ী এসে দাঁড়িয়েচে একেবারে লম্বিতির গেটের সামনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি চালিয়ে দেখলে গেটের লামনে কেউ নেই। রকে, এই অবস্থায় দেখলে কী মনে ভাবত। আঁচলটা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। তারপর রণেনের দিকে চেয়ে হাততুলে নীরবে নমস্কার করে তাড়াতাড়ি চুকে পড়ল গেটের ভেতর। আর রণেন একটা বিস্মী শব্দ করে গাড়ী চালিয়ে দিল।

বরুণা ভাবে রণেনের কথা। কী সুন্দর চেহারা, কী চরুজ সাফল্য, কথা বলবার কী ভঙ্গী, ওকে পেলে যে কোন মেয়ে তার নারী-জীবনকে স্বার্থকতার লিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারবে। স্বামীত্বের ওপর অভিযোগ করবার ঠাঁকটুকু সে সারাটা জীবনেও পাবে না, সে সোভাগ্যবতী।

বৌদি ভাবেন—মা-বাপ হারা বেড়টন ডাইটির কথা। বরুণার সঙ্গে ওকে মিলিয়ে দিতে পারলে ওর দুরন্তপনা যাবে গিতিয়ে। বরুণার বন্ধন ও কিছুতেই পারবেনা ছিড়তে—হ’ক ও যতোবড়ো জ্বরহীন। স্নেহের বন্ধন যে এড়িয়ে চলে, প্রেমের নাগপাশ তাকে বন্দী করুক।

লেনিন কলেজ থেকে বাড়ী চুকতেই বৌদি ছুটে এসে বরুণাকে জড়িয়ে ধরলেন। ও ত রীতিমত অবাক! হেসে বলল—‘তোমাকে আবার ভুতে পেলে নাকি?’

‘লোকের দেখে শুনে একটু একটু পাচ্ছে। একটা শুভ সংবাদ দেবো কী খাওয়াবে বলো?’

‘এক পরসার চিনে বাঁদাম।’

‘তা-ই লই, না বিলেও আপত্তি নেই।’

হুপ্তে একজন আমাদের বাড়ী এসেছিলো?’

‘কে সে?’

‘তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।’

‘কী নাম তার শুনি?’

‘রণেন দেন।’

‘দূর! ছাড়ো পেটে আগুন জ্বলচে।’

‘বিশ্বাস হোলো না বুঝি আমার কথাটা?’

‘কেন হবে না! দ্বিধির কাছে হোত তাই এসেচে, এতে অবিশ্বাসের কী আছে!’

‘আজ্ঞে না মশাই, দ্বিধির কাছে নে আসেনি, এসেছিলো তোমার কাছে!’

একটু চুপ করে থেকে বরুণা সহাত্তে বলল—‘অশেষ সোভাগ্য আমার! কিন্তু, আগমনের কারণটা শুনি?’

‘আমি শনিবার হাজারিবাগ যাবে, তাই তুমি যদি সঙ্গে যাও, তাই জানতে এসেছিলো। আমি তোমার মত না জেনেই

ডাঙ্গরের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিশ্র ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

লাফ বোলে দ্বিরেচি—হ্যাঁ, সে যাবে!
যাবে তো ?

‘আচ্ছা যাবো !’

বৌদি স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।

* * *

পরদিন বিকেলে—বৌদির ঘরে খাটের
ওপর রেলিংয়ে তর দিয়ে বসে বরুণা একথানা
সাপ্তাহিক খেলালীর গল্প পড়ছিল। বৌদি
এর কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে নিবিষ্ট
মনে শুনছিলেন। লেখক অধ্যাত হ’লেও
গরটা স্তব্ধ।

এমন সময় খাটের পাশে টেবিলের
ওপরকার টেলিফোনটা আর্ন্তন্য করে
উঠল। কাগজখানা ফেলে রেখে বরুণা
‘ভাড়াভাড়ি রিলিভার তুলে নিয়ে ডাকল—
‘জালো’! কে আপনি? ওঃ রণেনবাবু?
নমস্কার!’

বৌদি উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—
‘রণেন ডাকচে বুঝি?’

বরুণা সে কথার জবাব না দিয়ে ও-
পক্ষকে বলল—‘হম্বম্বম! এরোড্রাম থেকে?’

কেন? চলে যাচ্ছেন? কলকাতা?
আজই? মেকী! আর ফিরবেন না?
রণেনবাবু! রণেনবাবু! ওর হাত থেকে
রিলিভারটা পড়ে গেল বিছানার ওপর।

বৌদির শিউরে উঠল আপাতমস্তক।
আকুল উৎকর্ষায় ডাকলেন—ঠাকুর কি!
কি হ’ল? কাঁপচো কেন?

‘রণেনবাবু কলকাতা চলে গেলেন’—ব’লে
বৌদির কোলের ভেতর মুখ ঝুঁজে বরুণা
কুপিয়ে কেঁদে উঠল।

সে কী! চকিতে বিবর্ণ হয়ে গেল
বৌদির মুখখানা। কোনো বন্ধন মানলেনা
ও! পালিয়ে গেল? ছ-চোখের কোলে
কল উথলে উঠল, তিক্তকণ্ঠে বার বার আবৃত্তি
করলেন—নিচুঁর! নিচুঁর!! নিচুঁর!!

—:শেষ:—

তুমি ও আমি

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার ঘরে আজ যে আলো জ্বলে,

—সবুজ রং করা ‘শেডে’তে ঢাকা

আমার মন যেন তাহারি তলে,

উদ্ভিগ্না যাবে বলে মেলেছে পাখা!

বসিয়া আছ তুমি আপন মনে

সমুখে খোলা তব ‘জ্যামিতি’ থানা

বাহিরে কি কি ডাকে ঘন-রণ নে

শুনবে না যেন তারা কাহারো মানা!

আকাশে কালো রাত ঘনায় এলো

ফুটেছে সারি সারি তারকা কত,

এলান কালোচুল কী এলোমেলো

তোমার মুখে এসে প’ড়েছে যত

ঘড়িতে হেথ চেয়ে বারোটা বাজে

ভাগিবে আরো রাত? পড়িবে আরো?

—সারাটা দিন তব কেটেছে কাজে

—জানি না কী পড়াই পড়িতে পারো!

তোমার ঘরে আজ যে আলো জ্বলে

নীরবে ব’লে আমি সে আলো দেখি;

—উদার গগনের আঙিনা তলে

আজিকে মনে হয়, সকলই মেকী!

আজিকে মনে হয় তুমি ও আমি

চলিয়া যাব যেন দূরের দেশে;

আজিকে মনে হয় দিবা ও যামি

আমরা শুধু পথ চলিব হেসে!

সমুখে চেয়ে হেথ পনের ‘পরে

নেমেছে কালো রাত কী ঘন হ’য়ে

‘জ্যামিতি’ খুলে আর কী হবে প’রে

এমন ঘন রাত যায় যে ব’য়ে!

সকল কোলাহল পিছনে ফেলে

আজিকে চলো যাই বীধন হারা,

মিষ্টাভিষ্টি কেন আর ও আলো জ্বলে

হবে না—বা-হওয়াবার চেষ্টা করা?

চন্দননগর সঙ্গীত সম্মেলন

অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর অভিভাষণ

অখিল অমরমণ্ডলী অবিরাম ধিবা
মস্ত্রোচ্চারণে বাহার স্ততিগান করিঃ থাকেন,
সামগ্ন্য ঋষিবৃন্দ নিরন্তর বেদ-নিদান-সহযোগে
বাহার অর্চনার আয়োজন করেন, ও
তদুত্তীর্ণত যোগিগণ ধ্যানযোগে বাহার
হৃদয় দর্শন লাভের আশায় সত্য উন্মুখ,
সকল শুভাশুভানের প্রাকালে সেই অচিন্ত্য-
শক্তি সচ্চিদানন্দধনস্বরূপ পরমেশ্বরের
উদ্দেশে অগণিত নতি নিবেদনে আপনাকে
ধন্য জ্ঞান করিতেছি। তাঁহার কৃপাকটাক-
পাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিরন্তর শুভপথে
পরিচালিত হউক।

পিতামহ ব্রহ্মা তালধর, সুরং শ্রীহরি
পটহবাস্তে নিবিষ্টচিত্ত, বামেশ্বরী ভারতী
বীণাবাদনরতা, রবি-শশী বংশী অংশপনে
বিশোর, সিদ্ধ-কম্পরঃ-কিন্নরগণ স্ততিধর,
নন্দী-ভৃঙ্গী মর্দলবাহনে নিরত, আর দেবধি
নারদ গীতালপে বাহুজ্ঞানহারী;—এরূপ
অবস্থায় অর্চনারীশ্বরবিগ্রহ দেবধিধেব
নটরাজ রাজলানুভূত আত্মনিয়োগ করিয়া
থাকেন। তাঁহার এই লীলানর্তনেই
নিখিল বিশ্বের অভিযুক্তি। উহা আমাদের
অশেষ কল্যাণ বিধান করুক।

মানসসরসীর খেতকমলহল-বিহারিনী
সর্বভুজাং হংসবৃষ্টির মতই চতুর্ভুজের
মুখপদ্ম-বনচারিনী দেবী সরস্বতীর দিত-
সমুজ্জ্বল নখমণিচঙ্কিকা আমাদের মানস-
তিমির নিঃশেষে বিনাশ করুক।

বাহার। যাতামহ শৈলরাজ, কিন্তু
পিতামহের কোন সন্ধানই ছিল না। কঠোরপরি-
বারণ-বহন-শোভিত সেই ত্রিরাট্ট জ্যোতির্ময়
পুরুষের মঙ্গল-করাবলেণ আমাদের এই

অভিনব যাত্রাশথের সকল বাধা বিদূরিত
করিয়া দিক—ইহাই প্রার্থনা।

আজিকার এই সঙ্গীত-সম্মেলনে সমবেত
সুধীমণ্ডলীর মধ্যে বাহার। বর্ণে, বয়সে,
বিভাগ ও স্বকুমারকলাজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্বের
অধিকার অর্জন-পূর্বক লোকসমাজে
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা
সম্বন্ধমান অভিবাধন জ্ঞাপন করিতেছি।

অতি চর্যল আমি—এই সুলিঙ্গ-
সম্মেলন পরিচালনার গুরুভার বহন করিবার
মত শক্তি আমার নাই। পক্ষান্তরে, এ
অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিবার যোগ্য সুধী ব্যক্তি
একাধিকজন এ সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করিয়া
রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে অশোভন
প্রগলভতা প্রকাশ করিতে বাইরা অন্তর
আমার প্রতিপক্ষেই সজ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

বাহার। আজ আমাকে এই পৌরবষয়
অগ্র্যায়ণে বসাইয়াছেন, তাঁহার। হয়ত
ভাবিয়াছিলেন—“আমি যেতি দেবস্বয়ং
মহত্ত্বঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ”—মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত পাষণ-
প্রতিমাও দেবতার পদবীতে উন্নীত হইতে
পারে। তাঁহাদিগের বাহাতে আশাভঙ্গ না
হয়, এজন্য আপনাদিগের নিকট হইতে
সামুগ্রহ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।
আপনাদিগের সম্মিলিত শক্তি ও সহায়ত্ব
ব্যতীত আজিকার কার্যপরিচালনা আমার
ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতীত বলিয়াই মনে করি।

প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন
যে—গীত, বাস্তব ও নৃত্য এ তিনের মিলিত
নামই ‘সঙ্গীত’; তবে ইহাদিগের মধ্যে
গীতই প্রধান বলিয়া ‘সঙ্গীত’ নামে খ্যাত
হয়। প্রকারান্তরে বলিতে হয়—গীতই

মুখ্য সঙ্গীত, আর বাস্তব ও নৃত্য গৌণ সঙ্গীত।
এ দৃষ্টিতে দেখিলে অবশ্য অস্বীকার করা
চলে না যে, মুখ্যতঃ না হউক অন্ততঃ গৌণতঃ
সঙ্গীত শাস্ত্রের দুই একটি পৃষ্ঠা উল্টাইবার
সৌভাগ্য আমার জীবনে দেখা দিয়াছে।
কিন্তু পুস্তকহা বিস্তার উপর নির্ভর করিয়া
ব্যবহারিক জ্ঞানে অধিকার দাবী করা
চলিতে পারে না। তথাপি আমার প্রকাজ্ঞান
বন্ধুবর্গের নির্দেশ অনতিক্রমণীয় বোধে
কিঞ্চিৎ প্রগলভতা করা ব্যতীত গতান্তর
দেখিতেছি না। আর সে প্রসঙ্গে আমার
সকল অসুস্পৃহিত বাহাতে আপনারা নিজস্বপে
উপেক্ষা করেন, এজন্য প্রথমেই সনিকর্ষক
অমরোদ্যোগ জানাইয়া রাখিতেছি।

সঙ্গীতের স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার
অভাববশতঃ সঙ্গীতের তত্ত্ববিচারে অধিকার
না থাকিলেও সঙ্গীতের শিক্ষা ও প্রসার
সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা নিরপেক্ষ
শ্রোতা মাত্রেরই করিতে পারেন। আর
কেবল এই অধিকারটুকুর বলেই আমি এখানে
দুই চারিটি কথা বলিতে দুঃসাহস করিতেছি।

চতুঃষষ্টি ললিতকলার মধ্যে অগ্রতম শ্রেষ্ঠ
কলা এই সঙ্গীত। শাস্ত্র এই গীতকে ব্রহ্ম-
স্বরূপ বলিয়াছেন। এমন কি কোন কোন
স্থানে এতদূরও বলা হইয়াছে যে, ইহা নিশ্চর্যই
পরম ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টতর; অতথা
ব্রহ্মা-বিস্মৃ-মহেশ্বরাদি দেবরূপ ও দেবধি
নারদ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষিগণেরও চিত্ত
ইহাতে আকৃষ্ট হইত কি নিমিত্ত? সঙ্গীতের
এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার নিমিত্ত শাস্ত্র হইতে
প্রমাণ আভ্যন্তর্যের বিশেষ প্রয়োজন নাই—
উহা একরূপ স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব। অতএব,
আমাদিগের সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়বলীর
মধ্যে সঙ্গীতের অন্তর্ভাব যে বিশেষরূপে
কামনীয়, সে বিষয়েও সংশয় বা সন্দেহের
কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। সুখের
বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গুলগুণী

এদিকে পড়িয়াছে। বর্তমানে কার্য্য অতি ধীরমন্তর গতিতে অগ্রসর হইলেও অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কিছু সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে।

বাঙলা দেশ চিরদিনই উচ্চ-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নিকট প্রভূত সন্মান লাভ করিয়া আসিয়াছে। মগো কয়েক বৎসর হইল, আধুনিক সঙ্গীতের চাপে উচ্চ সঙ্গীতের স্থানচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু আজ চার পাঁচ বৎসর সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীত-সম্মেলনগুলির রূপায় বাঙলায় উচ্চসঙ্গীতের গতি আবার ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। এ কারণে এতাদৃশ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্ব্বাঙ্গে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের বহুল প্রচার সম্বন্ধে আধুনিকযুগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও উত্তম দেখাইয়াছে। বাঙলায় সেরূপ কোন প্রযত্ন আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের ও বজ্রার বিষয় হইলেও অতি কঠোর সত্য সন্দেহ নাই। বাঙলার বিভিন্ন নগরীতে ও গ্রামে—বিশেষ করিয়া রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে—শত শত অচিরোদ্গত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত লক্ষ্যে-এর সঙ্গীত কলেজের মত একটা সর্বজনমাত্রে সঙ্গীত-বিভাগের গড়িয়া উঠিল না কেন? ইহার উত্তর এই যে, বাঙলার জলবায়ুর এমনই গুণ যে, উহা কেবল পরম্পরবিরোধ তৃষ্টি করিতেই সমর্থ। অথচ এই সকল অবিরত ও অগণিত ক্ষুদ্র দলাদলির নিঃশেষ অবলান ঘটাইবার জন্য যেরূপ বিরূপ বাস্তবের প্রয়োজন, বাঙলার সঙ্গীতজগতে বর্তমানে সেরূপ লোকোত্তর প্রতিভাবিশিষ্ট পুরুষের একান্ত অভাব। বাঙলায় সুদীর্ঘ সঙ্গীতরসিক, বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিৎ, বরদী

সঙ্গীতশিক্ষক বা একপট সঙ্গীতশিক্ষার্থীর অভাব নাই; কিন্তু স্বভাবতঃ বিভিন্নমুখগামিনী সঙ্গীত-ধারাকে একমুখে প্রবাহিত করিবার মত শক্তিমান্ ধীমান্ শিক্ষাম-কর্ম্মী পুরুষের সন্ধান মিলিতেছে না। আর তাহার ফলে বাঙলায় উচ্চসঙ্গীত অমূল্য-শীলনের উৎসাহ অকুরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যাঁতেছে।

সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা আজ বাঙলায় বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমান বর্ষের যে কোন সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ প্রতিযোগীগণের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এষ্ট সকল প্রতিযোগিতার মধ্যে যাহারা আবার প্রথম শিক্ষার্থী, উৎসাহের আধিক্য ও তাহারিগণের মধ্যে সমৃদ্ধিক। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, পাঁচ ছয় হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বার বৎসর বয়সের প্রতিযোগীগণ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের প্রতিযোগীগণ অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা যখন ক্রমদুর্গমপণে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন আর পূর্ব্বের সে শিশু-মূলভ আগ্রহ বর্তমান থাকে না। অতএব, দুই তিন স্তর অগ্রসর হইতে না হইতেই শিশুর সঙ্গীতশিক্ষা চিরতরে সমাপ্ত হইয়া যায়।

বাঙলায় সঙ্গীতশিক্ষার অবনতির আর একটি প্রধান কারণ চারিদিকে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার ঘন ঘন আবির্ভাব। সঙ্গীত-প্রতিযোগিতাগুলি উচ্চসঙ্গীতের প্রতি

আমাদিগের সামুদ্রাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে সন্দেহ নাই। আর সে দিক দিয়া তাহারিগণের উপযোগিতাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আধিক্য সকল ক্ষেত্রেই একান্ত বর্জ্যনীয়। বর্তমানে বাঙলার সঙ্গীতরসপিপাসুগণ এই সকল সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার বাহুল্যজনিত উৎসাহে নিরতিশয় শঙ্কাকুল হইয়া উঠিতেছেন। এই সকল প্রতিযোগিতার উচ্ছলিত প্রাণশ্রী ও অত্যধিক পারিতোষিকের প্রলোভন নিত্যস্ত তরলমস্তিষ্ক শিশু প্রতিযোগীগণকে এরূপ উদ্ভ্রান্ত করিয়া দেয় যে, অল্প করত্বের মধ্যেই সঙ্গীতজগতে তাহারিগণের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। এ বৎসর দেখিলাম যে—আট নর বৎসরের একটি বালক বা বালিকা ক্রমশঃ খেয়াল-চুম্বী-টপ্পা ভজন-কীর্ত্তন-আধুনিক সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিভাগেই সমান মূল্যের গাহিয়া আসির মাত করিয়া ছিল, অথবা এরূপ কোন শিশু প্রতিযোগী কোন যন্ত্রের ঘোষন আলাপে প্রবীণ বিচারকগণেরও বিশ্বাস উৎপাদন করিল, কিংবা কোন সুদর্শন পাত্র মনোহর অঙ্গহার-বিলালে রুদ্ধশ্বাস বর্ষক-গোষ্ঠীর উচ্ছলিত করতালি-ধ্বনিক্রম মহার্ঘ পুরস্কার আহরণে আপনাকে আপনাই একজন কৃতী শিল্পীর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু এক বা দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই নিত্যস্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হয় যে—সেই শিশু শিল্পী তাহার সকল গুণপূর্ণা চিরতরে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এ অধঃপতনের মূল কারণ কি? অবশ্য অসাধারণ কারণ বহু থাকাই সম্ভব; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্তোব মুখাজী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

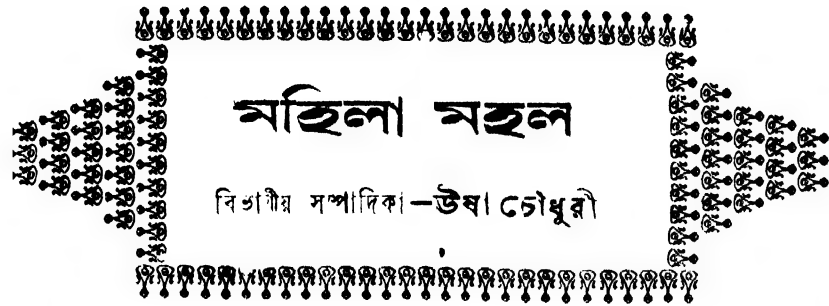
সাধারণ কারণ পরিদৃষ্ট হয়। অল্প অধিকশিক্ষিত ও পুরস্কার লাভের কলে শিত্তিক্তে অকালে যে আত্মপ্রতিষ্ঠাবোধের উদ্রেক হয়, সেই চিনিবার অহমিকাটী উচ্চতর শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তরুণ প্রতিযোগীর অধঃপাতের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। পাছে এই আত্মপ্রাণের উদয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া না উঠে—এই আশঙ্কায় অনেক প্রাচীনপন্থী সঙ্গীত-কলাবিৎ নিজ নিজ দৃষ্টিতে শিক্ষা-সমাপ্তির পূর্বে প্রোক্তসমাজে নিজ বিজ্ঞা প্রকাশ করিবার অসুখতি ভিতেন না। মনে হয়, শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে এইরূপ একটু দৃঢ় বন্ধন না হিলে উচ্চসঙ্গীতের যথার্থ পুনরুজ্জীবন সম্ভব হইবে না। প্রথমশিক্ষণী প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হইক, ক্ষতি নাই; কিন্তু এই সকল প্রতিযোগিতাকে প্রদর্শনীতে রূপান্তরিত না করিয়া কঠিন পরীক্ষাগারে পরিণত করাই মঙ্গল। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ দর্শক, প্রতিযোগীর অভিনাবক ও সঙ্গীতশিক্ষক বা সাংবাদিকগণের উপস্থিতির কোন ছেতুই দেখা যায় না। বাহারা বিচারক হইবেন, তাঁহাদিগের গুণবত্তা অবিসংবাদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর প্রতিযোগিতাস্থলে বিচারকগণের সহিত প্রতিযোগী, শিক্ষক বা পরীক্ষকের অনিষ্ট পরিচয় ঘটবার সুযোগ বাহাতে না হয়, সে বিষয়েও সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্তব্য। এজন্ত যদি প্রদেশান্তর হইতে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বিচারক আনিবার প্রয়োজন হয়, তাহাও উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। অর্থাৎ এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগৃহে যে সকল নিয়ম সাধারণভাবে অবলম্বিত হয়, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতাতেও সেই সকল নিয়ম যতদূর সম্ভব পালিত হওয়া উচিত। অধিকন্তু, সঙ্গীতের বৌদ্ধিক পরীক্ষা ব্যতীত একটি লিখিত পরীক্ষারও প্রবর্তন করিতে হইবে;

ও সম্ভব হইলে লিখিত পরীক্ষার উত্তর-পত্রগুলি গৃহক গৃহক ভাবে দেশী ও বিদেশী পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া লইতেও হইবে। অবশ্য কেহ কেহ হয়ত আপত্তি তুলিবেন যে, এরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা এক সর্বজনমানিত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ধীরে ধীরে এইরূপ একটি সর্বজনীন সঙ্গীতবিদ্যালয় বাঙলায় গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে বাঙলাদেশকেই অগ্রণী হইতে হইবে—ইহা আর এমন বিষয়ের বিষয় কি? ভারতে সাধারণশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ও ত এই বাঙলাতেই সর্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছিল। সঙ্গীত-বিশ্ববিদ্যালয়টী বা এখানে প্রথম প্রতিষ্ঠিত না হইবে কেন? যতদিন এইরূপ কোন সর্বজনমাজ প্রতিষ্ঠানের অখণ্ড-সত্ত্বের দেশের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দী সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান আপনাদিগের খণ্ডতা বিলুপ্ত করিয়া না দিবে, ততদিন এই সকল ভিন্নরূপে ব্যক্তি-পরিচালিত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে লজ্জাকর দল-হলি-রেহা-রেহি তিক্ততা পক্ষপাত প্রভৃতির অবস্থান ঘটিবে না। বাঙলার সঙ্গীতকলারসিক গুণিগণ এ বিষয়ে একটু অবহিত হইবেন কি?

এইবার সঙ্গীতসম্মেলন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াই বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। প্রায়ই দেখা যায়—ব্যক্তিগত খাতির বা সুপারিশের বলে অখ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সম্মেলনে বহু পক্ষপাত প্রদর্শন করা হয়। এই দুর্বলীয় পদ্ধতি চিহ্নিত গুণিগণের মনঃকোভ ও সঙ্গর-সমাজের দৈর্ঘ্যচ্যুতি জন্মাইয়া থাকে। সম্মেলনকে যথার্থতঃ সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হইলে এই প্রকার ব্যক্তিগত প্রাঙ্গ সর্বতোভাবে উপেক্ষণীয়। আর একটি

কথা—সঙ্গীতসম্মেলন বলিতে আজকাল কেবল একটি বিরাট জলশাই বুঝায়। কিন্তু সম্মেলনের যাহা মূখ্য অঙ্গ—সেই বিচারসভার আয়োজন বড় একটা হইতে দেখা যায় না। ইহার প্রধান কারণ, বিশিষ্ট শিল্পিস্বন্দের অধিকাংশেরই শাস্ত্রীয় নির্দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। অথচ সম্মেলন ত শুধু ব্যবহারিক গুণপণার প্রতিযোগিতা নহে! সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সকল চিরন্তন প্রশ্ন মানবের অন্তরে সত্যত জাগরুক রহিয়াছে, অথবা সাময়িকভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মনে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়া থাকে—সে সকলের যুক্তি ও শাস্ত্র সঙ্গত সমাধান পূর্বক সঙ্গীতের রাজ্যে নব নব গবেষণার পথনির্দেশ করাই সঙ্গীত-সম্মেলনের মূখ্য উদ্দেশ্য। অথচ বর্তমানে বাঙলার বাহারা সঙ্গীতরসিক বা সঙ্গীতজ্ঞসমাজের গোষ্ঠীশক্তি বলিয়া আত্মগৌরব অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। শ্রীশ্রীমুর-ভারতীর বীণার স্বকারে ইহাদিগের অন্তর-দ্বার খুলিবে আর কবে?

যাহা প্রকৃত সঙ্গীত-সম্মেলন তাহা কখনও বিরোধের পরিপোষক হইতে পারে না। অথচ ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সঙ্গীত-সম্মেলনকে নিষিদ্ধ করিয়া বাঙলার প্রায় প্রতি বর্ষেই নানা ভেদ, গৃহবিবাদ, অন্তঃকলহ প্রভৃতির সৃষ্টি হইতেছে। ইহাতেই অসুখান করিতে হয়, আবার সঙ্গীতসম্মেলনের মূখ্য স্বরূপ ও মূল উদ্দেশ্যে বিম্বৃত হইয়াছি। অজ্ঞতাজনিত বিম্বৃতির এই তিমির যতদিন আমাদিগের অন্তরকে গ্রাস করিয়া রাখিবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদিগের এই সকল ভেদ-ব্যবহার লোপ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই আপনাদিগের সম্বন্ধে সনির্বন্ধ অমুরোধ-সহকারে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করিতেছি যে,—বাঙলার বিভিন্ন কেন্দ্রের আত্মত্যাগী ও দিলনাকাঙ্ক্ষী সঙ্গীতপ্রেমিক,



বিভাগীয় সম্পাদিকা—উষা চৌধুরী

সন্তান পালন

গত সংখ্যায় খেয়ালী মহিলা-মহলে স্ত্রীক্ষরপূর্ণা দেবী লিখিত প্রবন্ধে শিশু প্রতিপালন সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই শিশু প্রতিপালন—অথচ বড়ই পরিচাপের বিষয় আমরা নারী সমাজ আজ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং গর্বিতা হইলেও এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বাণীনা। বাংলাদেশের শিশু মৃত্যু এবং অমানুষের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দেখিলে আমাদের মন অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠে।

নারী জীবনের সার্থকতা সাক্ষরতা-বিলাস অলঙ্কারে নয়—কারখানা দ্রুত হইয়া গরোটো ডায়োলেসন হইতে বাহির হইয়া প্রচারটা ইংরাজী বুকনি চড়াইয়াও নয়—আদর্শ গৃহিনীরূপে এবং সর্বাঙ্গের অধিক আদর্শ জননীরূপে। আদর্শ জননী হইবার সজ্জিতশিক্ষার্থী ও সজ্জিতকলাবিদগণ মিলিত হইয়া এমন একটি মহাসম্মেলনের আয়োজন করুন, তেজবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া যাঁহাতে যোগদান করার ফলে সকল কলহের চিরতরে অবসান ঘটিবে, পবিত্র সজ্জিত-সম্মতধারার অবগাহন করিয়া ক্রম-বৈজ্ঞানিক-ভেদ-ছেদ প্রদীড়িত শাস্তি-কামী বঙ্গবাণীগণ পরমা নিবৃত্তিলাভে ধৃত হইবেন, সজ্জিত-সম্মেলনের “লন্সেলন” নাম সার্থক হইয়া উঠিবে, উচ্চসজ্জিতের আলরে বাঙ্গালী আবার পূর্বগৌরবের আধন ফিরাইয়া পাইবেন। “বন্দোবস্ত” !!!

যোগ্যতা আমাদের কয়জনের আছে এবং আদর্শ জননী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা আমরা কয়জনে লাভ করিয়া থাকি ?

যে সমাজে আমরা বসবাস করি—যে সমাজের স্নেহভাষায় আমরা পরিপুষ্ট, সেই সমাজের প্রতি আমাদের নিশ্চয়ই একটা গুরু দায়িত্ব আছে—সে সমাজের যাহাতে অবনতি ঘটে এমন কাজ আমরা কিছুতেই করিতে পারি না। নারীর জীবনের প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য, হঠতেছে সমাজকে, দেশকে সুসন্তান দান করা। সুসন্তান দান করিতে হইলে স্ত্রীজননী হইতে হইবে এবং স্ত্রীজননী হইবার জন্য সেটরূপ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। আমরা নারীসমাজ এ গুরু দায়িত্বের বিষয় আন্তরিকতার সহিত কি গ্রহণ করি ?

সন্তানের শিক্ষা কৃষ্টি এবং সংস্কার মাতৃ-শিক্ষামুখ্য হইয়া থাকে। শিশু প্রতিপালন অতএব নারী-ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ।

নারীশিক্ষা আজ আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করিতেছে—আনন্দের কথা! অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোকের পথে আমাদের অভিযান শুরু হইয়াছে—ভাত-কাপড়ের দাসী হইয়া পুরুষের বোঝারূপে আমরা আর থাকিতে চাইনা—আমরা চাই প্রগতিবাদ আমরা চাই নারী-জাগরণ।

কিন্তু যে academic শিক্ষা আজ আমরা লইতেছি,—কলেজে Co-education এর মাঝে, টায়ে, বালে নির্বিকারে—অবাধ জ্বলনে—তাহার ভিতর Motherly

training কোথায় ?—শিক্ষাকে এবং স্কুল কলেজের শিক্ষাকে আমি নিশ্চিন্দা করিতেছি না—আমি বলিতেছি ইহার সহিত মাতৃ-শিক্ষার সংযোগ থাকা চাই।

যে সন্তানকে নারীর মাতৃরূপে শিক্ষিত এবং প্রতিপালিত করিতে হইবে সেই মাতাকে শিশু মনস্তত্ত্ব শিখিতে হইবে—শিশু সন্তানের অভাব-অভিযোগের সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে এবং বিরাট কর্তব্য এবং দায়িত্বের সহিত সমাজের, দেশের কল্যাণের না করিয়া রতরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

নারীকে শিখিতে হইবে—জানিতে হইবে ক্রমস্তানের জননী হইলে তাহা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নহে তাহা সমাজের ক্ষতি।

বর্তমান নারী-প্রগতির যুগে নারীর এই সকল দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

স্রীনির্মলা দেবী।

স্রীমতী নির্মলা দেবীর আলোচনাটি ক্ষুদ্র হলেও নারী-ধর্মের প্রয়োজনীয় একটি দিকের কিছু ইঙ্গিত এতে পরিস্ফুট হয়েছে। বর্তমানে এই ধরনের আলোচনার সবিশেষ প্রয়োজন আছে। খেয়ালী পাঠিকাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত “নারী-ধর্মের” যাবতীয় আলোচনাদি সাগ্রহে প্রকাশিত হবে।

স: মহিলা-মহল]

গর্ভ নিরোধ বাটিকা
বহু পরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ঔষধমাত্র একবার সেবনে এক বৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫ টাকা
ডাক্তার এম.এস.জামান
৪২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বেতারে এবার উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী। জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন প্রসংশনীয়। বাংলার অমর অবদানে বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট তাঁদের সাহিত্য আলোচনা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন কর্তব্য। রেডিওতে আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম বৃদ্ধি হতে দেখলে পুলি হব।

ছোটদের আসরের কিছু উন্নতি এবারে দেখেছি। 'হাডমনি' এদিকে একটু নজর দিয়েছেন। ছোটদের আসরের উপযুক্ত পরিচালক 'হাডমনি' তাঁর কাজের 'পর শক্তির' পর আমাদের আস্থা আছে, কিন্তু তাঁর কতকগুলি অকর্মণ্য লাভোপলব্ধ প্রোগ্রামকে নিকৃষ্টতার ভরিয়ে তোলে। চিঠিপাঠে অত্যন্ত দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়, চিঠির কাইল ছাড়া করে নেওয়া স্বরকার।

বেতার নাটক পরিচালক শ্রীযুক্ত ভদ্র এবার খানিকটা রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন বেতারে রবীন্দ্রনাথের "গৃহ প্রবেশ" অভিনয়ে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা অচিরেই আবার দেখবো যাত্রাগানের কলহং।

বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের "মহিলা-সংবাদ" বেতার বিচিত্রা "ঋতু-মলিকা" উপভোগ্য প্রয়োজনীয় এবং বৈচিত্র্য পূর্ণ। কিন্তু

নারীধর্মের সবিশেষ আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। এই অনুষ্ঠানে পূর্বে ভালো ছোট গল্প পঠিত হোত আমরা তার পুনঃপ্রবর্তন চাই।

মঙ্গলবার ১৯শে এপ্রিল গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় পাঠাণী পাঠ করলেন অত্যন্ত একধেয়ে। সুতোজ্ঞ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান হোল। সুনীল দাল, গীতা বহু, কল্যাণী মুখোপাধ্যায় গাইলেন চলনসই।

ছোটদের বৈঠকে 'হাডমনি' পরিচালনার অজিত বৈচিত্র্য গীতিনাট্য, "পুতুলের বিয়ে" অনুষ্ঠিত হোল, প্রয়োজনা করলেন ইন্দিরা দেবী। পুতুলের বিয়ে—ছোটদের উপযুক্ত রস রচনা আমরা খুবই উপভোগ করেছি, মেয়েদের পুতুল খেলার একটি সুন্দর রস-চিত্র। 'হাডমনি' চমৎকার Carry করে নিয়ে গেলেন। Beek ground music রুচি লম্পয়। মাঝে পল্লী সঙ্গীত রসহীনতার পরিচয় দিয়েছিল—গান রচনাও দুটো ছিল।

সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে "হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী" অনুষ্ঠান হোল—সাফল্যমণ্ডিত।

বুধবার ২০শে এপ্রিল সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে বেতার বিচিত্রা "ঋতু-মলিকা" উপভোগ্য হয়েছিল, ৩৩টি ঋতুর পরিচিত কাব্য গানে

ছন্দে গেঁথে তুলেছিলেন রচয়িতা বাণীকুমার। সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজকুমারের রস পরিবেশনে কোন ভ্রুটিই খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে উক্তর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার পরিচয় প্রদান করলেন।

বৃহস্পতিবার ২১শে এপ্রিল বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সঙ্গীত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। জ্ঞান দস্তের ব্যবস্থাপনায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোল। কুমারী মঞ্জুলিকা বস্তু ত্রুথানি গান গাইলেন বাজে। কুমারী করুণা মুখার্জীর ত্রুথানি গানও তথৈবচ। সুধীর সাহার ঠুংগী গান চলনসই। সত্য চৌধুরীর পিয়ানো বাজনা মন্দ নয়।

সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে পল্লীমঙ্গল আসরে আব্বাস উদ্দীনের পল্লী-সঙ্গীত অপূর্ণ। সমবায় ভাণ্ডারের উপকারিতা বোঝানো হোল।

শুক্রবার ২২শে এপ্রিল ছোটদের বৈঠকে 'হাডমনি' দীর্ঘসময়ব্যাপী চিঠি পড়লেন—অনাবশ্যক "বুঝলে" অত্যন্ত ভ্রুতিকটু লাগে। শিশিরকুমার ঘোষ গল্প বললেন মটির ডাকাত ধরা—গল্পটি জমেছিল মন্দ নয়। নির্মল বহু উপদেশমূলক একটি গল্প বললেন—চিত্তাবর্ষক হয়নি। পরে বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভজের পরিচালনায় এ, আই, আর প্রোগ্রাম কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'গৃহ প্রবেশ' অভিনীত হোল।



ইন্দিরিয়ালা চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ব্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন

চন্দননগর অধিবেশন

গত ১০ই, ১১ই, ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল চন্দননগর “নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে” ফ্রেণ্ডস্-ক্লাব পরিচালিত নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সুললিত হইয়া গিয়াছে। ১০ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় “বিচিত্রা”-সম্পাদক প্রদেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের প্রেরণিত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। পণ্ডিতের শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় মহাশয় এ দিন কয়খানি সুরচিত ও সম্পূর্ণ নিজস্ব সুরোচ্চারণ গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিম্বম্বাভিত্ত কহিয়াছিলেন। ঐ দিন প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—ঋণ, খেলা, টপ্পা ও চুঁমু। ১১ই এপ্রিল শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকায় প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। উহাতে বিষয় নির্দিষ্ট ছিল—আধুনিক সঙ্গীত, পল্লীসঙ্গীত ও ভজন। ১২ই এপ্রিল শনিবার ২ ঘটিকায় প্রতিযোগিতার তৃতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, কীর্তন ও নৃত্য (আধুনিক ও প্রাচ্য) সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা গৃহীত হয়।

রবিবার ১৩ই এপ্রিল অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাক্ষ্মীনাথপাঠক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোক নাথ শাস্ত্রী এম্-এ, পি-আর-এস মহাশয়ের নেতৃত্বে সম্মেলনের প্রারম্ভ হয়। প্রথমে সঙ্গীতাত্মক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতি বরণের প্রস্তাব করেন। পরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সভাস্থ সকলে বক্তব্যমান হইলে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আচা মহাশয় কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীত “বন্দে মাতরম্” পঠিত হইল। অনন্তর অধ্যক্ষনা-

সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র পাণ্ডিত মহাশয় তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন। (অভিভাষণটি খেলায় পূর্ববর্তী সংখ্যাতোই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে)

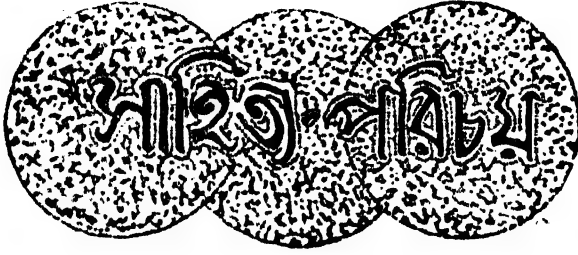
অনন্তর সভাপতি শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার সুরচিত্ত অভিভাষণটি সুললিত স্বরে পাঠ করেন। উক্ত অভিভাষণ ও তাহার উত্তর আশাধিগের মন্তব্য স্থানান্তরে স্মৃতি হইল।

সভাস্থলে বাঙালি কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিৎ গুণী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইহাধিগের মধ্যে ঋণাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (হানীবা) মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই বাঙালি গতযুগের স্বনামধন্য সঙ্গীত সত্রাট স্বর্গত বিখ্যাতপণ্ডিত রায় মহাশয়ের উপযুক্ত ছাত্র। অধিকন্তু অমরবাবু ভারতবর্ষের বাঙালী সঙ্গীতসার্কভৌম সিদ্ধ ঋণাচার্য্য স্বর্গত অধোনাগ চক্রবর্তী মহাশয়েরও অন্ততম প্রিয় ছাত্র। সভাপতি মহাশয় এই দুই প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যকে অতি মনোরমভাষায় শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পরিচিত করাইয়া দিয়া তাঁহার বক্তব্যের উপসংহারে বলেন যে, স্বর্গত পুণ্যপ্লাব অধোনাগ বাবু ও প্রদেয় অমরবাবু যে তাঁহাদের অশ্রৌতুষ্ক ইহা স্মরণ করিয়া তিনি বিশেষ গর্বান্বিত হইতেছেন। ইহার পর প্রদেয় হানীবাবু প্রস্তাবে অমরবাবুই প্রথম সঙ্গীতরস পরিবেশনে স্বীকৃত হন।

অমরবাবু পাঁচখানি ঋণ গান করেন—(১) তুম বিনা রহো না পারে (পূর্ববী), (২) নর রাজা ভইলোয়া (ইমন), (৩) আল্লা মোপর (ইমন), (৪) মালিনিয়া লারে (ভাষ)

ও (৫) আওরে পাওস (শ্রাবণ মল্লার)। পাঁচখানিই অমরবাবুর স্বরের গান। এই প্রৌঢ় বচনে কণ্ঠের সে পূর্ববৎ সতেজতাব না থাকিলেও অমরবাবু সে দিনের স্বরগীম সক্ষম যে অপরূপ কৃতিত্বের সহিত গান করখানি গাহিলেন তাহার স্মৃতি এ জীবনে তুলবার নহে। অথচ এই অমরবাবুই পূর্বদিন কলিকাতার নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলনের আদরে কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার উপযুক্ত মর্যাদা পান নাই ইহাই আশ্চর্য্য! ইহার পর হানীবাবুও তিন খানি ঋণ গাহিয়াছিলেন—(১) শঙ্কর বৃষধর চন্দ্রমা (কামোদ), (২) মান জিন করোয়ি (কেদার) ও ওড়ত বুলন (বসন্ত)। বলা বাহুল্য, হানীবাবুরও কলাকুশলতা সেদিন তাঁহার সঙ্গীতের গৌরব লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছিল। অমর বাবু ও হানীবাবুর ঋণ গানের সহিত অতি সুন্দরভাবে পাঞ্চোজ সঙ্গত করিয়া ছিলেন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ইহার পর শ্রীযুক্ত গীতেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ঋণ, শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে, ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষাল প্রভৃতি লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ গায়কগণের খেলা ও চুঁমু গানে শ্রোতৃবর্গ পতিত হইতে দেখা গেল।

সভাস্থলে চন্দননগরের ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে সুরাসিক পুণ্ডিতস্বরূপে, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ প্রভৃতি স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভজমহোদয় ও বহু ভজমহিলা উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখো-



“সাকী”

শ্রীমুনি কুমার দাশ গুপ্ত

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু—
অধ্যাপক চারুকলা ভট্টাচার্য্য প্রকাশক
পাঠশালা কার্যালয়, ৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রায় একশত পাতায় আচার্য্য জগদীশ-
চন্দ্রের বহুগুণী প্রতিভার যে অনবদ্য আলোখ্য
সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক চারুকলা ভট্টাচার্য্য
মহাশয় আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে
তুলেছেন তার জন্য তিনি সকলের সমুদয় হৃদয়।
জগদীশচন্দ্রের জীবনী লেখার জন্য এর
চেয়ে কোন যোগ্যতর ব্যক্তির কথা
আমাদের মনে হয় না। চারুকলা ভট্টাচার্য্যের
বিশিষ্ট ছাত্র ও ভক্ত। বইখানি বিজ্ঞানের
বহু দ্রুত তথা পরিপূর্ণ হ'লেও সাহিত্য-
রূপে এতই পরিপুষ্ট যে বইখানির পড়া
একবার শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া
যায় না। শুধু ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এর
প্রচার সীমাবদ্ধ থাকবে না, যে কোন জ্ঞান
ও রস পিপাসু এট পুস্তিকা থেকে চিত্ত
বৃত্তির উৎকর্ষ ও বিনোদন লাভ করবে।

পাধ্যায় প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণও কলিকাতা
হইতে সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শোমবার ১৮ই এপ্রিল চন্দ্রনগরের
এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ম'লিয়ে বার-এর সভাপতিত্বে
পুরস্কার বিতরণিত হয়। কলিকাতা হইতে
বহু বিশিষ্ট গায়ক এ দিনের অধিবেশনেও
যোগ দিয়াছিলেন।

ভাইবোন-:চলোমেঘের নচিত্র
মালিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীপ্রভাতকিরণ
বসু কার্যালয়—৭২৭ রাজাবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য—প্রতিসংখ্যা তিন আনা, বার্ষিক
ছ'টাকা।

সাহিত্য জগতে কবি প্রভাত কিরণের
বিশিষ্ট স্থান আছে। শিল্পের আসরে তিনি
সুপরিচিত “কাকাবাবু” কাকাবাবু সম্পাদিত
এবং পরিচালিত “ভাইবোন” শিশুসাহিত্যে
অদ্বিতীয়। আমরা “ভাইবোনের” হাত উজ্জ্বল
মুখ দেখে খুবই আশাব্যিত হলাম। এর
বৈশিষ্ট্য প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত
সরলভাষ্য পূর্ণ। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায়
প্রভাত কিরণ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস “রাজার-
চেলো”, তারিণী গঙ্গা “জগা পিসি”, খগেন্দ্র
মিত্রের উপন্যাস “অজানা দেশ”, শিবরাম
চক্রবর্তীর গল্প “বাগান বনাম বাগানে”
প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণীয়।

গেটুআপু আধুনিক কবিতাসমূহ—ছবিগুলি
চিত্রাকর্ষক।

অর্চনা ৩৫ বর্ষ—১ম সংখ্যা, সম্পাদক—
শ্রীমুনি কুমার চন্দ্র, ৪২১ বারানদী
ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা, অর্চনা প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্
হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা
তিন আনা,—বার্ষিক মডার্ক ছেড়টাকা।

দীর্ঘকাল যাবৎ অর্চনা মালিক সাহিত্যে
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পত্রিকা
মডকের বেশে সুদীর্ঘকাল আয়ু লক্ষ্য করে
বেঁচে থাকার মধ্যে বশেষ্ট গৌরব আছে।

আমার মনের গুল-বাগানে
গাইছে সাকী গান,
তাইতে, ওগো, ঘোর নয়নে
উল্লে ওঠে বান্।
মাতাল আজ টরান কবি
রূপ যদিরা পিয়ে,
আঁকেছে ছবি তুমি সাকীর
স্বপন-তুলি দ্বিধে;
বসন্ত তাই উঠলো গের
ভাসতে অভিমান।
দেখেছিলাম দাঁকের আলোয়
জোড়া-আঁখি কালো,
জীবনভোর প্রেমের নেশায়
তাইতে বাঁধি ভালো।
বলছে সাকী—“দেখায় আমি
গাইছি তব গান,”
উঠলো ছেয়ে আমার হিয়ার
সাকীর বর্ষ তান্;
তাইতে, ওগো, ঘোর নয়নে
উল্লে ওঠে বান্॥

—:০:—

অর্চনার বিশেষত্ব বর্তমান নববর্ষের সংখ্যায়
লবিশেষ দৃষ্ট হোল। শ্রীযুত কেশব চন্দ্র
গুপ্ত, মেঘেন্দ্র গাল রায়ের প্রবন্ধ, বি,
বড়ালের গল্প, প্রভাতকিরণ বসুর উপন্যাস,
প্রতুল রায়, অনিল কুমার ভট্টাচার্য্যের কবিতা,
সারদা রঞ্জন পণ্ডিতের মঞ্চদর্শনা-আলোচনা
সুখপাঠ্য।

নববর্ষের অর্চনার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ প্রভাত
কিরণ বসু, অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য এবং
প্রতুল রায়ের যুক্ত লেখনী লঙ্ঘিত অভিনব
উপন্যাস “জিবেণী”। জিবেণী আধুনিক
নাগরীক জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলি আলোখ্য।

নবযোগীর দীর্ঘ আয়ু লাভ করে বাংলা
সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুক এই আমাদের
আন্তরিক কামনা।

ভারতে সমাজতত্ত্ববাদ

শ্রীপঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায়

“সমাজতত্ত্ব” বলিতেই আত্মকের উদ্বেগ হওয়ার কোন কারণ নাই। গুপ্তচরের প্রাণেও আনন্দের হিল্লোল বওয়ার কোন প্রকৃষ্ট ঘটনা নাই। ঐ শব্দটী আধুনিক ভারতে দুই শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করিয়াছে, এক শ্রেণীর লোক শুনিলেই ভয়ে চার হাত সরিয়া পালান, আর এক শ্রেণীর লোক প্রাণীচোর আদর্শের অন্ধকার পবিত্রার জলট উৎকণ্ঠ হইয়া উঠেন। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তর নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি বক্ষা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে হেলিবেল প্রত্যেক মানুষই সমাজতত্ত্বের পক্ষপাতী। যার মধ্যে মনুষ্যত্ব কুটির উঠিয়াছে বা যে মানব সমাজের কার্যে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছে সেই “সমাজতত্ত্ববাদী”। সমাজ বিষয়ক কার্যে নিজেকে উৎসর্গ করাই সমাজতত্ত্ববাদের আদর্শ পরিপালন করা। ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্ব একেবারেই নূতন নয়—এর জন্ম যদি প্রথমে কোথাও হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতবর্ষেই হইয়াছে। যখন বিবেকানন্দের বাণী ভারত সন্তানকে বলিল “মায়ের জন্ত বলি প্রবৃত্ত হও” তখন ভারতের আকাশ ধ্বংসিত হইয়াছিল, সেই বাণীতে দ্বিগুণ সমাজতত্ত্বের আদর্শেই প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় যখন ভঙ্গুর সমাজকে নতুন করিয়া গড়িবার প্রয়াস করিয়াছিলেন তখন কে বলিবে যে তিনি সমাজতত্ত্বীয় কার্য করেন নাই? মানুষকে মানুষ হইতে দেওয়ার জন্ত যিনি চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই সমাজতত্ত্ববাদীর কার্য করিয়াছেন।

কণীর যখন হিন্দু মুসলমান নির্দিষ্টারে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন তখন কি তিনি নূতন সমাজের গঠন বিহার চেষ্টা করেন নাই। শিশু-স্কুল নানক যখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন জাতি নাই, ধর্ম হইল মনুষ্যত্ব আর ধর্ম হইল পূজা, তখন তিনি কোন আদর্শের প্রচার করিয়াছিলেন—ব্যক্তিত্ব না সমাজতত্ত্ব? অ'কবর যখন রাজপুতের সঙ্গে মুসলমানের বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যখন নব আদর্শ মুসলমান ধর্মের গঠন দিয়াছিলেন তখন কি তিনি রাজতন্ত্রের কার্য করিয়াছিলেন না সমাজতত্ত্বের কার্য করিয়াছিলেন? সমাজতত্ত্ব বা ব্যক্তিত্ব বা রাজতন্ত্র যে তন্ত্রট হউক না কেন, মানুষের কার্য-কলাপ বেখেই তাহাকে সেই তন্ত্রভুক্ত করা প্রয়োজন। আজ যদি “ক” সমাজতত্ত্ব হইয়া নিজের স্বার্থের জন্ত সাধারণের স্বার্থকে বলি দেন তাহা হইলে কি বলিবেন—তিনি সমাজতত্ত্বী না ব্যক্তিত্বী?

সমাজতত্ত্বের আদর্শ হইল ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগতস্বার্থে লুপ্ত করিয়া দেওয়া। নিজের চাওয়া'কে ছোট করিয়া পরের চাওয়া'কে বড় করিয়া ধরা। ব্যক্তিত্ব বলে “নিজে বাঁচলে বাপের নাম”। আমার স্বার্থ-মুখ বতটা, আমার ক্ষমতা থাকে আমি আহরণ করিয়া লইব। যদি কাহারও শক্তিতে কুলায় তবে সে আমার মুখের গ্রাণ কাড়িয়া লইতে পারে এবং এই কাড়াকাড়ির লংগ্রেছে কোন লোক বাধা দিতে পারিবে না। কারণ / ব্যক্তিত্বের ক্ষুধা হইবে লংগ্রেহের মধ্য দ্বি'—মনুষ্যত্বের দিক থেকে

তাহার দাম বাহাই হউক ব্যক্তিগত স্বার্থ যদি অটুট করিয়া ধরা যায় তাহা হইলে সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা আপনি অটুট হইয়া পড়িবে। তাহা'দের ধারণার মূলে রহিয়াছে একটা বিরাট ভ্রান্তি। —যে সমষ্টি ব্যক্তি লইয়া গঠিত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক এককের কোন'না কোন কার্য আছে এবং প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সমাজকে সাহায্য করিবারও আছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায় যে দুর্বলের বা পঙ্গুর সাহায্যে সমাজের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই অতএব তাহা'দের বাধ দেওয়া আবশ্যিক। তাহার উত্তরে সমাজতত্ত্বের কথা হইল মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে না দিলে তোমার অন্ধ খঞ্জ ভ্রাতাকে তুমি কেমন করিয়া সংসার হইতে মুক্তিয়া ফেলিতে চাও। ব্যক্তিত্ব বোধানে বলে “survival of the fittest” উপযুক্তেরই জয়জয়কার অবগুস্তাবী সেখানে সমাজতত্ত্বের কোমল অন্তর মনুষ্যত্বের তিক্তিতে কণ্ঠকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বলে “না, মানুষকে বাচতে দাও। তোমারই ভাই, আজ তাকে সংহার করার ক্ষমতা তোমার নাই। তার অন্তঃ লোপ করার অধিকার কাহারও নাই।” যেখানে লংগ্রেহের জন্ত ব্যক্তিত্ব প্রস্তুত সমাজতত্ত্ব বলে বিফলে শক্তি অপচয় করা অপেক্ষা সেই শক্তির প্রকৃত এবং সুষ্টু নিয়োগে সমাজের অনেক কল্যাণ হইবে। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তি'ও উন্নতি বেখে তাহাতে সমাজ থাক, আর যাক কিন্তু সমাজতত্ত্ব বেখে সমষ্টিকে ব্যক্তিগত কৌণ উদ্দেশ্য থাক আর যাক মিলের ব্যক্তিত্ববাদই অত্মরূপ ধারণ করিয়া আজ “মহাজননীবাদ” হইয়াছে। এখানেও সেই বিরাট যুদ্ধ। যে লবল সে তার শক্তি লঙ্কায়ের জন্ত লব ধ্বংস করিতে প্রস্তুত আর যে দুর্বল সে প্রবল শক্তির পথতলে নিশ্চেষ্ট হইতে বাচ্ছে, তখন কৌণ-কাতরস্বরে মনুষ্যত্বের কোলে আশ্রয় ভিক্ষার জন্তে

সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। সমাজ-
তন্ত্র দুর্বল, নিম্নশক্তির জন্ত ব্যক্তিত্ব
প্রবল অত্যাচারী জন্ত। যে মুহুর্তে “মিলের”
দেশে ‘ওয়ার্ক ম্যান কম্পেন্সেশনের আইন’
হইল, যে দিন “ফ্যাক্টরী আইনের” আবির্ভাব
হইল, যে সময় “পুয়ের হাউস” গঠিত হইল,
সেই দিন, সেই মুহুর্ত, সেই সময় হইতে ইংলণ্ড
সমাজতন্ত্রী ছাড়া আর কিছু নহে। মানুষকে
তাহার কার্য দেখিয়া, উদ্বেগ দেখিয়া, প্রবৃত্তি
দেখিয়া বিচার করাই শ্রেয়। আইনের পর
আইন যে ক্রমবিকাশের পথে চলিয়াছে
তাহার গতি পরিলক্ষিত করিলে
নিশ্চিত বোঝা যাইবে যে মানুষ মনুষ্যত্বের
বিকাশের দিকে চলিয়াছে বনাম সমাজ-
তন্ত্রের উপাসক হইতেছে। “মিলের”
ভারতবর্ষ প্রথমে “হান্সডের” বন্ধন মোচনের
জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করিয়া “হান্স” বিক্রয়
তুলিয়া দিয়াছে। তাহারাই ভারতে আলিয়া
“সতীদাহ” প্রথা উঠাইয়াছে, তাহারাই
“বিধবা বিবাহ” প্রচলনের আইন প্রবর্তন
করিয়াছে, তাহারাই রেলওয়ে এবং পোষ্টাল
টেলিগ্রাফ প্রভৃতিকে ব্যক্তিগত শাসন হইতে
মুক্ত করিয়া রাজকীয় শাসনের মধ্যে
আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারাই
জেলায় জেলায় হাঁদপাতালের প্রতিষ্ঠান
গড়িয়া তুলিয়াছে মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে।
কাজেই সমাজতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রবাদী বলিতেই
আংকে উঠিবার কোন কারণ নাই।

সমাজতন্ত্রের জন্ম প্রথম যদি কোথাও
হয় তবে ভারতবর্ষে, যদিও কালমাজের
মত ভারতে কেহ ইহার বিশিষ্ট আদর্শরূপে
প্রচার করে নাই তাহা হইলেও ইহার
আদর্শ ভারতের প্রতি রক্তে রক্তে রহিয়াছে।
মূলমানের সমাজদে যে কোথায় নবাব
কোথায় পথের ভিখারী সব একত্রে সমাজ
পড়িতেছে, অর্থের আভিজাত্যকে চূর্ণ করিয়া
দিয়াছে। জগন্নাথের মন্দিরে, বেথ চণ্ডাল
আর ব্রাহ্মণে একত্রে একই অঙ্গে পরিপূর্ণ

হইতেছে। বুদ্ধ কবীর, নানক, চৈতন্য
“মানব-কল্যাণের” জন্ত জতি-ধর্ম বিসর্জন
দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের দীক্ষা
ত্যাগ, তাঁহাদের শিক্ষা মনুষ্যত্ব। যে ব্রাহ্মণ
বহুশক্তিমান ছিল তাহারাই ছিল দরিদ্রের
সন্তান। যে ক্ষত্রীয় বাহুর শক্তিতে ধরিত্রীর
শান্তি রক্ষা করিত তাহারাই ছিল ভিখারী
ব্রাহ্মণের দাস। সমাজের গঠন হইয়াছিল
সত্য “ব্যবলায়” হিসাবে শ্রেণ্যভেদ ঠিক
আধুনিক “ইউনিয়ন” বা “মহিলা” প্রভৃতি
অমুষ্ঠানের মত। কিন্তু কালের গতিতে
সমাজ যে সংখ্যাভিত্তি চূর্ণোচ্য জাতিভেদে
বিভক্ত হইয়াছে তাহারই ফলে ব্যক্তিত্বের
উপাসক হইয়াছে ভারতবাসী, স্বার্থ হইয়াছে
লক্ষ্যীর্ণ, দৃষ্টি হইয়াছে ক্ষীণ। এই লক্ষ্যীর্ণতাকে
বর্জন না করিলে ভারত আপন ধর্ম
কখনও পাইবে না, এই ক্ষীণতাকে অসম্পন্নিত
না করিলে পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু সেই ক্ষীণতা আর লক্ষ্যীর্ণতাকে
উৎপাদিত করিতে হইলে সমাজতন্ত্রের আদর্শই
কি তাহার সম্মুখে হাজির হয় না?

আধুনিক ভারতীয় “কমিউনিষ্ট” বা
“সোশ্যালিস্ট” দলের যে সংগ্রাম চলিয়াছে
তাহা নিতান্ত অমূলক এবং ভ্রান্তিপূর্ণ। উভয়
দলই সংগ্রাম করিয়া, শক্তির অপচয় করিয়া,
আদর্শকে বলি দিয়া, মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়া
কোন কার্য সমাধান করিবে? আজ দেশ
নারক রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রে সমাজতন্ত্রবাদী,
দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান জহরলাল সমাজতন্ত্রবাদী,
গান্ধী মুখে না বলুন কার্যতঃ তাঁহার অপেক্ষা
বড় সমাজতন্ত্রী কেহ নাই। কারণ তাঁহার
“ধর্মই হইল মনুষ্যত্ব, কর্ম হইল ত্যাগ”।
এ ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজতন্ত্রীয় আদর্শ
পশ্চিমাদের নকল করা অপেক্ষা ঠিক ভারতের
উপযোগী নব সমাজতন্ত্রের গঠন করা উচিত।
ভারতীয় সমাজতন্ত্রীয় আদর্শ জহরলালের
কর্ম, গান্ধীর সত্য এবং সুভাষের নিষ্ঠা এই
ত্রিশক্তির মিশ্রণে উদ্ভূত হউক।

ফোন ২৭৭৪

বড় বাজার

কাঠের জাট

প্রোগ্রী অমৃত লাল কুমার

কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সবিস্মার তৈল

ভারতের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩. আপার সারকুলার রোড, কলিঃ

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জী—গ্রাইভেট ডিটেকটিভ
বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—এ অমিতশক্তিশালী বন্ধু
ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত দেয়াদা।
অসঙ্গ চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাঠাবেন।

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারী মা—এ বাপের আমলের
বুড়ো বি।
অসঙ্গ চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে
পাঠাবেন।

ইক্ষাবনের টেকা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর :)

(২)

পরদিন সকাল আটটা আন্দাজ
অবিনাশকে থানায় পাঠিয়ে দিলুম, চিরঞ্জীব
বাবুর পাণ্ডুলিপিকলার একটা নকল নিয়ে
আসবার জন্য। তাতে আমার তত্ত্বস্তেব
প্রবীণ হবে বলে মনে করলুম।

অবিনাশ চলে গেলে চায়ের শিলিটা
নিয়ে পরীক্ষা করলুম। পরীক্ষা করে
দেখলুম চ-টা নিদোষ। তারপর ক্রমাগত
নিয়ে বসলুম। এমন সময় অবিনাশ ফিরে
এলো।

আমি—“কি হ’ল?”

অবিনাশ—“ইন্সপেক্টর বাবু বয়েলন,
লেখাটার একটা true copy করে নীষ্রই
কাটকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। তুমি অত
মনোযোগ দিয়ে ক্রমালখানা দেখে কেন?
ক্রমালে কি আছে?”

আমি—“ক্রমাল আমার অনেক খবর
দিয়েছে।”

অবিনাশ—“কি রকম?”

আমি—“আমি যা বলি লিখে রাখ।
নাও লেখ।”

অবিনাশ—“সত্যি লিখবো?”

আমি—“আরে আমি কি ঠাট্টা করছি?”

অবিনাশ—কাগজ কলম নিয়ে বসলো।

আমি—“নাও—লেখ। ‘চিরঞ্জীববাবুর
হত্যাকারীর আকৃতি—খরস্কার, ৪৮ থেকে
৫ ফিট মাথা, ছিপছিপে শরীর কিন্তু
শক্তিশালী, খুব পান খাওয়া অভ্যাগ আছে,
কড়া-গন্ধুরালা এদেশ ব্যবহার করে,

হাতে সব সময়ে স্নান পাকে ও ডান হাতের
চেয়ে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করে।”

অবিনাশ—“লেখা তো ছোল, তারপর?”

আমি—“যদি কখনও ধরা পড়ে তো
মিলিয়ে নিও।”

অবিনাশ—“কিন্তু ইন্সপেক্টর-বেশী
লোকটাকে তো আমরা দেখেছি। তার
সঙ্গে—”

আমি—“কোন মিল নেই—সত্যি। কিন্তু
ও লোকটার সঙ্গে আর একটা লোক ছিল।
সে কোন-না-কোন স্রোযোগে চিরঞ্জীব বাবুর
ঘরের মধ্যে ঢুকে লুকিয়েছিল। ঠিক সময়ে
বেরিয়ে আক্রমণ করেছে। তোমার ঐ
পুলিশ বেশী খুণী নয়। খুণী অস্ত্র কেউ।”

অবিনাশ—“কিন্তু তুমি অত জানলে
কি করে?”

আমি—“চোখছটোর লম্বাবহার করে।
লোকটা খরস্কার কেন বল্লম—ঘড়ীটা যতটা
উঁচুতে ছিল তাতে একটা মাফিকলই লম্বা
লোক শুধু সোফাটার উপর উঠেই ঘড়ীটা
বন্ধ করে দিতে পারতো, লোকটার উপর
একটা চেয়ার দেওয়ার দরকার হ’তোনা।
ছিপছিপে শরীর—কারণ, ঐ ঘরের মধ্যে
সে লুকিয়েছিল। ওখানে লুকিয়ে থাকবার
আর কোন জায়গা নেই, শুধু একটা সোফার
তলা ছাড়া। লেখানো লুকুতে হ’লে ছিপছিপে
চেহারী হ’তেই হ’বে। ক্রমালটার খুব কড়া
গন্ধ আছে—যদিও কিছুদিন আগে এসেজটা
লাগানো হ’য়েছে। ক্রমালে ঠোঁট মোড়া
হয়েছে অনেকবার এবং অনেক জায়গায়
পানের ছাগ আছে। ক্রমালটা যখন পাই

তখন সেটা ভিজো। শুঁকে দেখলুম ঘামের
গন্ধ। বাঘের হাত অনবরত ঘামে, তারা
ঘাম মুছে মুছে ক্রমাল ঠিক ঐ রকম করে’
ভিজিয়ে রাখে। আর লোকটা বাঁ হাত
বেশী ব্যবহার করে বল্লম, তার কারণ,
সাদারণতঃ লোকে আক্রমণ করবার সময়
বাঁ হাতে ধরে এবং ডান হাতটা ব্যবহারের
জন্ত সাদীন রাখে। এ লোকটা ডান হাতে
চিরঞ্জীববাবুর মুখ চেপে ধরেছিল, কারণ
নথের ছাগ বলেছে বাঁ দিকের গালে—বাঁ
হাতটা তার ফ্রী (free) ছিল—তার অর্থ
বাঁ হাতটা সে ব্যবহার করে বেশী।”

অবিনাশ আমার মুখের দিকে চেয়ে
অবাক হয়ে বসে রইলো।

আমি—“কি? কি দেখছে?”

অবিনাশ—“লকলের চোখ সমান কাজ
দেয় না।”

আমি—“হয়। চোখকে কাজ করতে
লেখাতে হয়।”

এই সময়ে বাইরে বৈজ্ঞানিক ঘণ্টা বেজে
উঠল। অবিনাশ বাইরে বেরিয়ে গেল,
এবং একটু পরেই একতাপা কাগজ নিয়ে
এলো। বল্লম—“এই চিরঞ্জীববাবুর পাণ্ডু-
লিপির নকল।”

বল্লম—“পড়।”

অবিনাশ—“এখনই?”

আমি—“দেখী করে লাভ?”

অবিনাশ পড়তে আরম্ভ করলে।

বা স্তনলুম্বতা লক্ষ্যে এই :-

চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, দাক্ষিণ্যর ঘোষ,
হরিশোহন বটব্যাল, রমানাথ মিত্র ও নীলাধর

চক্রবর্তী এই কয়জন মিলে ঘোড়ার ব্যবসায় 'করেন। কারবারে ক্রমাগত উন্নতি হ'তে থাকে।

কারবারের অধিকাংশ মূলধন ছিল নীলাধর চক্রবর্তীর, যখন কারবারের আর মাসিক জিনহাজারে পৌঁছল, তখন নীলাধর তাঁর অংশের মূলধন বাদে বাকী টাকাটা ফিরে চাইলেন।

প্রতিবৎসর বিশেষ থেকে ঘোড়া এদেশে আমদানী করবার জন্তে অংশীদারদের মধ্যে একজন করে বাইরে যেতেন। সে বছর নীলাধরের পালা পড়েছিল। নীলাধর বর্ম্মার গেলেন, সেখান থেকে যেতে হ'লো অট্টেলিয়ায়। কিছুদিন পরেই হঠাৎ কারবারের অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে যেতে লাগল। এক দিন শোনা গেল কারবার ফেল হয়েছে। নীলাধর তখন বিশেষে।

খবর পেয়ে নীলাধর ফিরে এলেন। তখন কোম্পানী লিকুইডেশনে (liquidation) গেছে। ঘেনা পত্র চুকিয়ে দিয়ে একটা পয়সাও উদ্ধৃত হলো না। অংশীদাররা কিছুই পেলেন না। কিন্তু দেখা গেল, যে শুধু নীলাধরই পথে বসেছেন, বাকী চারজনের অবস্থা যেমন তেজি আছে। ছয়মাস যেতে যেতেই নীলাধর ভয়ঙ্কর মারা গেলেন। নীলাধরের একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা রাণী ভিক্ষাপাত্র হাতে লতা লতাই রাস্তায় বেরল। কিছুদিন পরে তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। সে কোথায় গেল বা তার কি হ'ল সে খবর কেউ রাখলে না। তখন রাণীর বয়স মাত্র বারো বৎসর।

এক ছই করে ক্রমশঃ দশ বৎসর কেটে গেল। একদিন হঠাৎ দারুণকেন্দ্র ঘোষ

একখানা চিঠি পেলেন। তাতে লেখা আছে —“দশ বৎসর আগে এক ভদ্রলোকের সর্বনাশ করেছিলে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই দশবৎসর তোমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৩ই জুলাই শুক্রবার, ঠিক রাত্রি ১২টার সময় ইচ্ছা-জগত থেকে বিদায় নেবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে থেকো।” চিঠির সঙ্গে একখানা ইচ্ছাবনের টেঙ্কা। দারুণকেন্দ্র গ্রাহ্যই করলে না। কিন্তু দেখা গেল, ঠিক সেই দিন—রাত্রি ১২টার সময় কে তাঁকে খুন করে গেছে, আর তাঁর কপালের উপর পেরেক দিয়ে মেরে দিয়ে গিয়েছে একখানা “ইচ্ছাবনের টেঙ্কা”। হাতের মধ্যে তাঁর একখানা চিরকুট; তাতে লেখা ছিল—“১ নং—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি।”

তারপর ঠিক ঐ রকম অবস্থায় মরেছেন রমানাথ মিত্র। তিনি খুব লাবধান হয়েই ছিলেন। একজন লোক চাকর সঙ্গে তাঁকে খুন করে পাঠিয়েছিল। এই জন্তেই ইন্সপেক্টরের পরামর্শে চিরঞ্জীব বাবু চাকরদের ‘ঐ রাজ্যে বিদায় করে’ দিয়েছিলেন।

৩ নং হ'চ্ছেন চিরঞ্জীব বাবু।

রাণী—উজ্জল গৌরবর্ণঃ ইছদী জীলোকের মত রঙ, কঁকড়া কালো চুল, টানাটানা চক্কু—তারি ঈষৎ কটা, জুহুটি ঘেন তুলি দিয়ে জঁকা, নাক একটু চাপা তবে বলা বলা যায় না, ঠোঁট পাতলা ও টুকটুকে লাল বেন রংমাখান, শরীরের গড়ন নিটোল' পাহুটি ছোট ছোট—পায়ের অনামিকাছ'টি অস্ত্রাঙ্গ আঙ্গুলের অনুরূপে খর্ব্ব—মাটিতে ঠেকে না।

এই ব্যাপারের সম্পূর্ণ খবর জানে একমাত্র রাণী আর নীলাধরের এক ছুর

সম্পর্কীয় ভাইপো নরেন ভট্টাচার্য্য। সে রাণীর চেয়ে মাত্র ৯১০' বৎসরের বড়। দারুণকেন্দ্র ও রমানাথের হত্যার মূলে হয় রাণী অথবা নরেন, কিংবা রাণী ও নরেন দুজনেই আছে এই চিরঞ্জীববাবুর বিশ্বাস।

নরেন লম্বা-চওড়া, জোয়ান, উজ্জল শ্রামবর্ণ, তীজদৃষ্টিযুক্ত বড় বড় চক্কু, জোড়া লোমশ জ্র, নাক সরল ও দীর্ঘ, ঠোঁটের ছোটোপাশ একটু চাপা, চুল কালো চেউখেলান, শরীর পেশীবহুল—পেশীগুলো বাইরের দিক থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। একটা অদ্ভুত স্বভাব তার এই, যে কোন লোক কাছ ঘেঁষে বসলেই, সে যেমন একটু চক্কল হ'য়ে ওঠে আর নাক দিয়ে একটা ঘোং ঘোং শব্দ করে—বিশেষতঃ যদি সে লোক একটু নোংরা হয় কিংবা তার গায়ে কোনরকম দুর্গন্ধ থাকে।

রাণী ও নরেন প্রায় একসঙ্গেই নিকরদেহ হয়।

এইখানেই চিরঞ্জীববাবুর পাতুলিপি শেষ হ'য়েছে।

* * *
ষড়ীতে দেখলুম বেলা প্রায় ন'টা। কাজেই উঠে পড়তে হ'লো। ডিম্পেন্সারী থেকে একটা লোক খবর দিলে অনেকগুলি রোগী অপেক্ষা করছে।

অবিশ্রামকে বাড়ীতে রেখে ঘোঁটার নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনোবাকে বলে গেলুম একেবারে ‘কল’ সেরে ফিরবো।

(৩)

বাড়ীতে ফিরলুম বখন, তখন বেলা প্রায় দুটো। খাওয়া খাওয়া সেরে



ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

একখানা বই নিয়ে পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। হঠাৎ অবিনাশের ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি প্রায় লক্ষ্য্য হুস-হুস।

বল্লম—“কি হে, কি খবর?”

অবিনাশ—“ওঃ! কি ঘুম! ভাবলুম—”

আমি—“অজানা পথে এগিয়ে গেছি?”

অবিনাশ—“God forbid ভাবলুম ডেকে দি’। এই ব্যাপারটার হাত দিয়ে পর্যাপ্ত আমার একলা থাকতেই যেন গা চম্ চম্ করছে। চোখ বুজলেই দেখছি—বেশ পরিষ্কার দেখছি একখানা ইজ্ঞাবনের টেকা। এর মধ্যে বউদিকে order (অর্ডার) দিয়ে আমি চার গেলস বেলের সরবৎ খেয়েছি—বরফ দিয়ে।”

বেরারা রামধহিন্ এসে একখানা কার্ড দিলে। তাতে লেখা—“মহম্মদ নবাবালী বেগ—নবাব বাহাদুর অব নাসিরাবাদ।”

অবিনাশকে বল্লম অভিযর্থনা করে বলাতে। অবিনাশ চলে’ গেল।

নবাব বাহাদুরের সঙ্গে কোথাও দেখাওনা। এ পরিচয় হ’য়েছিল বলে’ মনে পড়লো না। বোধ হয় এটা প্রোফেশনাল কল।

“হু ইজ হু”—বইখানা খুলে একবার দ্রুততা উঠে দেখে নিলুম। হ্যাঁ, আছে বটে। “নাসিরাবাদের নবাব বয়ল ৩২ বৎসর ৩ মাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ উপাধী ধারী—বিবাহিত—সন্তানাহি নাই—বহুৎকর্ণের অতৃষ্ঠাতা—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতিকামী। গোড়া মুসলমান হ’লেও হিন্দুদের অতি প্রীতির চক্রে দেখেন। মোক্তবে মাজলার যেমন তাঁর দান আছে—পাঠশালার টোলেও তাঁর নেইরকম দান আছে। প্রজালাধারগো তাঁর অশেষ খ্যাতি এবং সকলেই তাঁর উন্নতি ও স্বীর্ধজীবন কামনা করে।

নীচে নেমে এলুম। ঘরে ঢুকতেই

অবিনাশ আমাকে দেখিরা বলে—“ইনিই ডাক্তার হরেন মুখার্জী।”

একজন স্বীর্ধকার, লৌম্যহৃতি, সুন্দর, সুবক একখানি চেয়ারে বসে ছিলেন। বৃথলুম তিনিই নবাব বাহাদুর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে, আমার কর্মদর্শন করে, নবাব বাহাদুর বলেন—“আপনার নাম শুনেছি। আমার ভগিনী কয়েক মাস যাবৎ ছিঁ রোগে ভুগছেন। এখানে যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি, সেই আমাকে আপনার কাছে আসতে উপদেশ দিয়েছে। আপনাকে একবার অন্তর্গ্রহ করে’ আমার ওখানে আসতে হ’বে। কখন সুবিধা হ’বে? আমার ঠিকানা ৪৮নং টালিগঞ্জ সারকুলার রোড্।”

আমি বেশে বল্লম—“আপনার সঙ্গে পরিচিত হ’য়ে বড়ই আনন্দিত হ’লুম। আমরা ডাক্তার মাথ্য। সুবিধা অন্তর্বিধা দেখে কাজ করলে আমাদের চলে না। বরং রোগীর সুবিধা অন্তর্বিধার দিকে দৃষ্টি রাখা বেশী স্বরকার বলে আমাদের মনে হয়। যে সময় যেতে বলবেন, সেই সময়েই আমি যাবার জন্তে প্রস্তুত হ’ব। তবে রাত্রি ৮টা পর্যাপ্ত আমি ডিসপেন্সারীতে থাকবো।”

নবাব বাহাদুর বলেন—“বেশ। আমি তা’হলে ঠিক ৮টার সময়েই গাড়ী পাঠিয়ে দেব। ডাঃ, এম্, এন্, দাঁস দেখছেন; তিনিও উপস্থিত থাকবেন বলেছেন। ডাঃ এম্, এন্ দাঁসকে জানেন বোধ হয়?”

আমি—“কে? ভাবানীপুরের এম্, এন্, দাঁস?”

নবাব বাহাদুর—“হ্যাঁ। তিনিই আপনাকে ডাকবার কথা বলেন।”

আমি—“ওঃ! তাঁকে সকলেই চেনে। তিনি এ অঞ্চলের অতি বিখ্যাত চিকিৎসক। খুব বিচক্ষণ। আচ্ছা, আমি প্রস্তুত হ’য়েই থাকবো। আপনার গাড়ী এলেই হা’ব।”

নবাব বাহাদুর অভিবাচন করে’ চলে গেলেন।

সন্ধান

ক্রীডরব নাথ আচার্য্য

রাত্রির বিজনতায় নাহি কলরব,
নিজার অলসতায় সুপ্ত এবে লব,
শুধু আমি একা বলি’ বাতায়ন-পাশে,
ভাবি আর হাসি কত বিপুল উল্লাসে
উদিত গগনে আজি পূর্ণ শশধর
জ্যোৎস্নার আলোকিত সর্ব চরাচর।
কলকল তানে নদী চলিতে বহিরা
মিষ্ট তার সুরে ঘোর ভরি’ উঠে হিরা’
দূরে কোন নিশাচর পক্ষুটী ঘলি’
বহুদূরে খাঙতরে ছুটে যায় চলি’।
আমি শুধু বসে রহি জেগে একা একা
ভাবিতেছি কোথা গেলে পাব তার দেখা ॥
শনশন রবে বায়ু বহে নিজ মনে,
কি বারতা দেয় ঘোরে আজি কণে কণে।
মনে হয় কাঁদিতে কে একা বনমাঝে
ব্যাকুল অন্তর ঘোর ছোটে তারি খোঁজে ॥
বনমাঝে ব্যস্ত হয়ে ছেরি চারিত্রিতে।
কিরে আদি অবশেষে ক্ষুদ্র মনোরথে ॥
খুঁজিলাম কত করি’ হইলনা দেখা।
আনি শুধু রহিলাম ধরামাঝে একা ॥

তিনি চলে গেলে অবিনাশ বলে—
“হরেন, রাত্রির ‘কল’ মনে কর,—”
অবিনাশের ভাব দেখে আমি হেসে
কেল্লুম। বল্লম—“এইবার ঠিক হ’য়েছে।
বল্লম আমার এতদিন পরে detective
mentality (গোয়েন্দার মনোভাব)
পেরেছেন। নবাবের উপরেও সন্দেহ?”

অবিনাশ ইতস্ততঃ করে বলে—“কিন্তু—
মনে কর, সে যদি—যদি সে—”

আমি—“বল বল। যদি সে নবাব
নাই হয়”—এই তো? অবিনাশ, তুমি
শিকানবীণ হ’লেও তোমার প্রশংসা করছি।

কিন্তু সে যে নবাব সে সত্যকে নিঃসন্দেহ হ'য়েই আমি নেমে এসেছি। "হু ইজ হু" (Who is who) বইখানা দেখে তারপর আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তা' হ'লেও, আমি সাবধান হ'য়েই সেখানে বাব। তুমিও না হয় আমার সঙ্গে চল।"

অবিনাশ একগাল হেসে বলে—“আমিও সেই কথাই বলছিলাম।”

ঠিক হ'লো, আমি আর অবিনাশ দুজনেই বা'ব।

হেসে বল্লম—“ডাক্তার দাসও সশস্ত্র হ'য়ে আসবেন বোধ হয়—কি বল অবিনাশ?”

অবিনাশ—“ডাক্তার দাস? হ্যাঁ দেখা যাবে। তিনি আসন্ন আগে।”

আমি—“নাঃ—অবিনাশ, তুমি দস্তুরমতন ডিটেকটিভ হ'য়ে উঠেছে—হঠাৎ! My compliments.”

অবিনাশ—Thank you.

ডিসপেন্সারীতে যে সব রোগী এসে জমা হ'য়েছিল, তাদের পরীক্ষা করে' ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতে লাগে আটটা বেজে গেল। বাইরে এনে দেখলুম নবাব সাহেবের গাড়ী অপেক্ষা করছে। অবিনাশ ইতিপূর্বেই এসে উপস্থিত হইতাম। দুজনে নবাবসাহেবের গাড়ীতে রওনা হলুম।

ড্রাইভারকে চোখের কোণ দিয়ে একটু দেখে নিলুম। সন্দেহের তো কোন কারণই দেখলুম না।

গাড়ী ছেড়ে' যেনে অবিনাশকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলুম—“কি আছে সঙ্গে?”

অবিনাশ কানে কানে বলে—“একটা 'ঝোক' (রিভলভার)।”

আমি—নবাব যদি মনে করেন, তা'হ'লে আমাদের ডাকাত বলে চালান দিতেও পারবেন।”

আর কোন কথাবার্তা হ'ল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা গন্তব্যস্থানে এনে পৌঁছলুম।

নবাব-সাহেব নিজে এনে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন।

বাড়ীখানা খুব বড়। চারিপাশে আম কাঠাল প্রভৃতি ফলের বাগান। বাড়ী বাগানের ঠিক মাঝখানে, বড়রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে। চারিদিক নিস্তরঙ্গ। হ'চারজন চাকর-বেয়ারা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন রকম গোলমাল নেই। মোটের উপর জারগাটা এত নির্জন, যে সহরের গোলমালের মধ্যে সমস্ত বিন যাপন করার পর উপকণ্ঠের এই শাস্ত্রভাণটাকে যেন অত্যন্ত নিস্তরঙ্গ বলে মনে হ'তে লাগলো।

বৈঠকখানায় আমাদের বসতে দিয়ে, নবাবসাহেব বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। একটু পরেই একজন বেয়ারা ট্রেতে করে চ'পেরালা চা' নিয়ে এলো। টেবিলের উপর ট্রেটা রেখে দিয়ে সে বাইরে চলে গেল।

আমার চায়ের পেরালা যেমন তেমনি রইলো। অবিনাশকে বল্লম পেতে। অবিনাশ বলে—“দেখ করেন, তোমাকে একটা খুব সোজা কথা বলি। তুমি যাই বল না কেন, আমি এই অস্বাচিত আমন্ত্রণটা আদৌ পছন্দ করছি না।”

আমি হেসে বল্লম—“ডাক্তারের আমন্ত্রণ আবার কোন কালে 'স্বাচিত' হ'য়েছে বল।”

অবিনাশ—“বটে। কিন্তু আবার আপ্যায়নটা একটু অতিরিক্ত নয় কি?”

আমি—“না। আমি তো আদৌ তা দেখতে পাচ্ছি না। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এলে যদি এক পেরালা চা দেখা যায়, তো সেটা এমন অতিরিক্ত যত্ন করা কি হ'লো?”

অবিনাশ—“তবে খাও। এক পেরালা কেন হল পেরালা খাও, খেয়ে হাত-পা ঝেঁচে সুখ দিয়ে দেখা তুলে কেটকে জবাব দাও।”

আমি হেসে কেলাম। বল্লম—“ঃ! তুমি নবাবসাহেবকে বড়ই সন্দেহ করছো দেখছি। কিন্তু কেন? ভদ্রলোক—”

বাধা দিয়ে অবিনাশ বলে—“নাও, রাখ তোমার 'ভদ্রলোক'। আচ্ছা বাপু, তুমি ছাড়া কোন লিনিয়ার হাট-স্পেশালিষ্ট নেই কি? ডাক্তার দাস তোমার লিনিয়ার। লিনিয়ার ডাক্তার জুনিয়ারকে ডেকে পাঠালে পরামর্শের জন্ত। বিশেষতঃ ডাক্তার দাস—যে “স্পেশালিষ্ট” বলে কিছু মানতেই চায় না। না করেন, আমি ভাল বুঝি না।”

(ক্রমশঃ)

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!



গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!

ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ সোণার স্তর চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিল্ডিকেট

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি, বি, ৪৮৮২

খেয়ালী চিত্রপট **



বীরহের গদ্যমালা উদ্ভাসিত - হাজরা
 পিকচার্সের "দেবী কুলদা"তে কাল-
 কেতুপী অঙ্কিত চৌধুরী - ছবিখানির
 পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী।

2

.

1

1



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'জারিটি'

স্বাশ্রমাল নিউজপেপার লি:

টেলিফোন
সিউগ ৪৩৫

১১, চক্রবেড়িয়া (মাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক - শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, অষ্টাদশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১শে বৈশাখ ১৩৪০, ৫ই মে ১৯৩৮

বাংলা কংগ্রেসে শান্তিময় পরিস্থিতি

স্বাভাবিক সফরের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতির এক অধিবেশনে শান্তিমূলক দণ্ডে দণ্ডিত বাংলার কংগ্রেসকর্মীদের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা অপসারণ করিয়া এক প্রস্তাব স্বয়ং উত্থাপিত করেন। প্রস্তাব সভায় গৃহীত হওয়ায় ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীকামিনী কুমার দত্ত, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি নেতা ও কর্মীবৃন্দ যুক্ত হইয়াছেন। কেবলমাত্র মাননীয় অর্থসচিব শ্রীমলিনী রঞ্জন সরকার ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নিশিথ নাথ কুণ্ডুর উপর দণ্ডাজ্ঞা বাতাল রহিল। মলিনী বাবু এখনও অকংগ্রেসী মন্ত্রীপদে আসীন সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা বাতাল থাকাই স্বাভাবিক। প্রকাশ যে নিশিথবাবু কিছুদিন পূর্বেও স্থানীয় লোকাল বোর্ড নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধিতা করিয়াছেন সেই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করা সম্ভবপর হয় নাই। আশা করি নিশিথ

বাবু শীঘ্রই তাঁহার বর্তমান কৃতকর্মের জন্য হ্রস্ব প্রকাশ করিবেন এবং তাহা হইলে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা যে তুলিয়া লইবেন তাহা সুনিশ্চিত। যদি মিশ্র কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয় তাহা হইলে হয়ত তাঁহার পূর্বাঙ্কে মলিনী বাবুর বিরুদ্ধেও দণ্ডাজ্ঞা অপসারিত হইবে। ততদিন মলিনীবাবু বাংলার কংগ্রেসী মহলে প্রকাশ্যে অস্পৃশ্যই রহিবেন কারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে বিধানবাবু ও কিরণবাবুর সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ও সামাজিক ও রাজনৈতিক আদানপ্রদান অতীতেও যেমন ছিল বর্তমানেও তদ্রূপই আছে।

সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত প্রভাবে বাংলা কংগ্রেসে যে শান্তিময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কলানময় ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। ডাঃ সেনগুপ্তের শ্রায় প্রবীণ ও ত্যাগহিতব্রতী কর্মীর কংগ্রেসে পুনরাগমনে যে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্রের শ্রায় কর্মঠ অধ্যয়নশীল ও শক্তিমান যুবকের রাজনৈতিক জীবন পুনর্জীবিত করিয়া প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি শক্তি অর্জন করিয়াছেন। কুমিল্লার প্রাথমিকশাঃ ব্যবহারাজীবী শ্রীযুক্ত কামিনী দত্ত ও তদীয় ভ্রাতা ক্যাপ্টেন দত্ত যদি বর্তমান শান্তিময় আবহাওয়া অনুযায়ী আত্মশুদ্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে বাংলা কংগ্রেস বিশেষ লাভবান হইবে। তাঁহারা উভয়েই বিশেষতঃ ক্যাপ্টেন দত্ত উত্তমোগী পুরুষ সুতরাং তাঁহারা যদি পুনরায় বিভ্রান্ত না হন তাহা হইলে তাঁহারা বাংলা কংগ্রেসে পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।

স্বাভাবিক কংগ্রেসে এই শান্তিময় আবহাওয়ার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়ের উপর। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের সহিত সাক্ষ্য-ভ্রমণ যদি কিরণবাবুর সমস্ত নিরপেক্ষতাকে প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় পরিণত না করে তাহা হইলে চিরতরে বাংলা কংগ্রেসের ব্যক্তিগত দলাদলির অবসান হইবে। আদর্শগত দলাদলি দোষনীয় নহে কিন্তু বর্তমানে বাংলা কংগ্রেসে আদর্শের বৈষম্য কোথায়?

খেলাব মাঠ

(সি, বি)

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা

গত শনিবার ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভারত বিখ্যাত বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি হয়ে যাবার পর কলকাতার এ বছরের হকি খেলার বিহার পূর্ণ শেষ হয়েছে। গত বছরের বাইটন কাপ বিজয়ী বি এন আর হল অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে প্রতিপক্ষ কাষ্টমস হল অপেক্ষা উন্নত পরণের খেলা দেখিয়েও এক গোলে পরাজিত হয়েছে। এতে করে পূর্বে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কারণ এর আগে আরও তিনবার ১৯৩১, ১৯৩২ এবং ১৯৩৫ সালে এই হল দুটি এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কিন্তু প্রতি বারেই যথাক্রমে (২—০), (১—১, ২—০) এবং (০—০, ২—১) গোলে রেল দলকে কাষ্টমস দলের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। এ বছর বাইটন কাপ জয়ী হবার পর ক্যালকাটা কাষ্টমস হল এগারবার এই সম্মান লাভের অধিকারী হল। তাছাড়া এরা ১৯১৫ সালের পর থেকে আটবার রাগার্স আপ হবার সোভাগ্যও লাভ করেছে। এখন পর্যন্ত একুশ অতাবনীয়া সাফল্য অর্জন করা আর কোন দলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার উপর এ বছরে একটি খেলাতেও পরাজয় স্বীকার না করে লীগ বিজয় করতে এদের খ্যাতি আরও বেড়ে গেছে।

এ বছরের ফাইনাল খেলাটিতে রেল হল বিজয়ী হবার উপযুক্ত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তগোয়র জুটাই তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। বি এন আর হল খেলাটির প্রারম্ভ থেকেই তীব্রভাবে আক্রমণ করতে থাকে এবং অন্ততঃ তিনটি নিশ্চিত গোল করবার সুযোগের অসম্ভাবহার করে কিন্তু খেলাটি শেষ হবার দু-মিনিট আগে কাষ্টমস দলের ভিয়ার্স একটি সেন্টার করলে লিম্যান সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বিজয়সূচক গোলটি করে রেল দলের সমর্থকগণকে হতাশ করে দেন। কাষ্টমস দল জয়ের সম্মান লাভ করলেও গোলরক্ষক জার্ডিন, অলিম্পিক-ব্যাঙ্ক হজেন্স এবং হাফব্যাঙ্ক স্পির্ তাদের পরাজয়ের শ্রানি থেকে বাঁচিয়েছে। বিশেষ করে হজেন্স এবং জার্ডিন এত উচ্চতরের ক্রীড়া-নৈপুণ্য এবং কৌশল দেখান প্রদর্শন করেছিলেন যে কোনরূপ বর্ণনাই তার উপযুক্ত হবে না। সেই কারণে এই বিজয়ের গৌরব এরা দুজনে অনেক খানি দাবী করতে পারেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহই তাদের নিজের স্বাভাবিক খেলা দেখাবার সুযোগ পায় নি।

পরাজিত বি, এন, আর দলের গোলরক্ষক গিল্ কয়েকটি অব্যর্থ গোলরক্ষা করে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রথমেই অধ্যাতনায়া, অন্নবয়স্ক খেলোয়াড় মিডেন নাম উল্লেখযোগ্য।

এই খেলাটিতে হজেন্সের পরেই ইনি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মিড্ তাঁর নিজ ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখিয়ে বিশ্ববিখ্যাত ব্যাঙ্ক দি ট্যাপলেসের খেলাও শ্রান করে দিয়েছিলেন। হাফব্যাঙ্কের মধ্যে জো গ্যালিবান্দী এবং এডুনির খেলা প্রাণসংযোগ্য হয়েছিল। ফরওয়ার্ডদের মধ্যে নামকরা সেন্টার ফরওয়ার্ড রবার্ট ডিক্ কার সতর্ক পাহাড়ার কাজ নিজ হকি প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পান নি। তা ছাড়া তাঁর খেলাও দেখান আশানুরূপ হয় নি। হারবিন্, লেনন্ এবং হিল্ সন্মিলিত এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের দ্বারা বিপক্ষ দলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। বিশেষ করে হারবিন্ এবং লেনন্ প্রতিপক্ষদের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলেন।

কাষ্টমস :—জার্ডিন, হজেন্স এবং ব্রেজিস্, স্পির্, ক্রোয়ার এবং ডেভিস্, ভিয়ার্স, হেগ্ডার-লন্, রেবেলো, রেণ্টন্ এবং লিম্যান।

বি, এন, আর :—গিল্, দি ট্যাপলেস এবং মাড্, এডুনি, এম গ্যালিবান্দী, জে গ্যালিবান্দী, ডিফেন্ডেন্স্, এম্ হিল্, আর কার, হারবিন্ এবং লেনন্।

আম্পায়ার দ্বয় :—মেসাল সিধু দত্ত এবং বি, এন সোব (দিল্লী)

নিম্নলিখিতভাবে কাষ্টমস্ হল বাইটন্ কাপ বিজয়ী হয়েছে—

মহম্মেডান্ স্পোর্টিং ক্লাবকে—

৬—০ গোলে পরাজিত করে

বি, জি, প্রেস্ ক্লাবকে—

১—০ " " "

জবলপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে—

৪—১ " " "

লান্দেরপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে—

(জলদ্বার) ৩—০ " " "

লুইটেনিয়ানস্ ক্লাবকে—

(বোম্বাই) ১—১, ১—০

বি, এন, আর ক্লাবকে—

১—০ গোলে

পূর্ববর্তী ফাইট্‌নক্যাপ্ বিজয়ীগণ

১৮৯৫-৯৬ নেভাল ডেপুটিমান্ এ লি

১৮৯৭-৯৮ এল, পি, জি মিশন (রাচী)

১৮৯৯— ক্যালকাটা রেজাল্ ক্লাব

১৯০০— সেন্ট জেমস্ ক্লাব

১৯০১ ১৯০২ রয়াল আর্টিলারি রাইফেলস্

১৯০৩— এল পি জি মিশন (রাচী)

১৯০৪— হর্নেটস্ এ লি

১৯০৫— বি ই কলেজ (শিবপুর)

১৯০৬-১৯০৭ এল পি জি মিশন (রাচী)

১৯০৮-১০ কাষ্টমস্ এ লি

১৯১১— ক্যালকাটা রেজাল্ ক্লাব

১৯১২— কাষ্টমস্ এ লি

১৯১৩— ক্যালকাটা রেজাল্ ক্লাব

১৯১৪— এম এ ও কলেজ (আলীগড়)

১৯১৫— ক্যালকাটা রেজাল্ ক্লাব

১৯১৬— বি ওয়াই এলোনিয়ন (লক্ষ্মী)

১৯১৭— ক্যালকাটা রেজাল্ ক্লাব

১৯১৮— বি ওয়াই এলোনিয়ন (লক্ষ্মী)

১৯১৯— জ্যাভেরিয়ানস্ ক্লাব

১৯২০— আসানশোল রিক্রিয়েশন ক্লাব

১৯২১— বি ই কলেজ (শিবপুর)

১৯২২— ই বি আর স্পোর্টস্ ক্লাব

১৯২৩— ওয়াই এম এ (লক্ষ্মী)

১৯২৪— ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব

১৯২৫-২৬ কাষ্টমস্ এ লি

১৯২৭— জ্যাভেরিয়ানস্ ক্লাব

১৯২৮— টেলিগ্রাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব

১৯২৯— ই আই আর স্পোর্টস্ ক্লাব

১৯৩০-৩২ কাষ্টমস্ এ লি

১৯৩৩— বাজি হিরোজ

১৯৩৪— ক্যালকাটা রেজাল্ ক্লাব

১৯৩৫— কাষ্টমস্ এ লি

১৯৩৬— বোম্বাই কাষ্টমস্

১৯৩৭— বি এন আর

এবছরের বাট্টন কাপ প্রতিযোগিতার ছুটি সেমি ফাইনাল খেলার একটিতে বি এন আর দল বোম্বাই কাষ্টমস্ দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। খেলাটিতে প্রথম থেকেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে হয়েছিল এবং একদম একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার সমস্ত বিশিষ্ট-গুলিই বর্তমান ছিল। উভয় দল লক্ষ্যজ-লক্ষ্য থাকলেও রেল দল অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের খেলা দেখায়। খেলাটি শেষ হবার তিন মিনিট আগে রেল দলের এম ছিল একটি গোল করার সেমিফাইনাল খেলাটির শেষ নিশ্চিন্তি হয়ে যায়।

অপর সেমিফাইনাল খেলাটিতে ক্যালকাটা হকি লীগ বিজয়ী কাষ্টমস্ দল এবং বোম্বাই হকি লীগ বিজয়ী লুইটেনিয়ানস্ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রথমার্ধের শেষের দিকে কাষ্টমস্ দলের হেণ্ডারসন একটি গোল করার পর (১-০) দ্বিতীয়ার্ধের খেলা পুনরায় চার মিনিট অতিবাহিত হবার পরে লুইটেনিয়ানস্ দলের পি কার্ণাণ্ডিস্ গোলটি পরিশোধ করে। অতিরিক্ত পনেরো মিনিট সময় খেলেও কোন পক্ষই আর গোল করতে না পারায় প্রথম দিনে খেলাটি অসমাপ্তভাবে শেষ হয়। পরের দিন পুনরায় খেলাটি হয়—এবং কাষ্টমস্ দলের হেণ্ডারসন প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে একটি

গোল প্রদান করে (১-০) নিজ দলকে এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে উপনীত করেন।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ ফাইনাল

গত শনিবার বেলা চার ঘটিকার সময় ক্যালকাটা মাঠে লক্ষ্মীবিলাস কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি হয়। অলঙ্কার হইতে আগত সান্দেরপুর স্পোর্টিং ক্লাব এবং আলীগড় ইউনিভার্সিটি এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে উপনীত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আলীগড় দল বিপক্ষদলকে ৫-১ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে কাপটি জয় করেছিল।

কাইভান কাপ ফাইনাল

গত শুক্রবার মোহনবাগান মাঠে কাইভান কাপের ফাইনাল খেলার কলেজিয়ানস্ দলের লিফুতার একটিমাত্র গোল করে লিপুরাধলকে পরাজিত করেছে।

হকি চ্যারিটি ম্যাচ

গত রবিবার জামশেদপুর বকানিবারণী ডাঙারের মাঝামাঝি মোহন বাগান ক্লাবের সহিত লুইটেনিয়ানস্ দলের একটি প্রদর্শনী হকি ম্যাচ খেলা হয়। মোহনবাগান দল গোল করার অনেকগুলি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও শেষ অবধি ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছে।

এফ এ কাপ ফাইনাল

ওয়েস্টমতে এফ, এ, কাপ ফাইনাল মাঠে অতিরিক্ত সময় খেলে 'শ্রেইন্' 'হাকাস'ফিল্ড' দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে।

মানভাদার হকি দল

আগামী ১৪ই মে মানভাদার হকি টীম কলকাতা থেকে 'ওরগনে' জাহাজে যোগে



ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যান্ড ফটো এজেন্সি

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কথায় আছে 'অন্ধ জাগোরে'—না 'কিবা রাজ কিবা দিন!' কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ঠিক এই অন্ধের জাগরণের ভায়। সেই মাকাতা আমলের একই জিনিষ খোড়বড়ি খাড়া আর খাড়াবড়ি খোড়। প্রোগ্রামে না আছে কোন বৈচিত্র্য না আছে কোন নতুনত্ব! গান, বাজনা, রিয়েটর, বক্তৃতা তাও আবার বত নিকুঠ শ্রেণীর। দীর্ঘ দিনের লম্বালোচনার মাঝে আমরা নতুন জিনিষ খুব কমই পেয়েছি। প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে এমন জিনিষ অতি অল্পই পাওয়া যায় যাকে উচ্ছলিত প্রশংসার ভরিয়ে তোলা যেতে পারে। বিভিন্ন বিভাগে এতগুলি এ্যালিটেন্ট প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর থাকা সত্ত্বেও এ অভাব কেন এ প্রশ্নের কোন জবাব মেলে না।

আরও একটা কথা, বেতারে যে সব শিল্পী প্রথমে খানিকটা কৃতিত্বের পরিচয় দেন কিছুদিন বাড়ে প্রোগ্রামে তাঁদের নাম

নিউজিয়াণ্ড অভিযুক্ত যাত্রা করবে। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ এই দলের পক্ষে খেসবার জন্ত মনোনিীত হয়েছেন। গোল-রক্ষক—বি আত্রাহাম, ব্যাকগণ—শুকুনারায়ণ সিং, ফরাসৎ খাঁ এবং মহম্মদ হোসেন, হাফব্যাকগণ—মহম্মদ, সাহম্মদ খাঁ, লাকপৎ এবং এ কোয়াতি, ফরওয়ার্ডগণ—সাহাবুদ্দিন আহমেদ খাঁ, আব্দুল লতিক, মুলতান খাঁ, পি পি ফার্মেজিউজ, মুলেমান, নারায়ণ এবং মানভাষারের নবাব (অধিনায়ক)। প্রফেশার জগন্নাথ ম্যানেজার হরে চাঁমের সঙ্গে যাবেন।

খুব কমই দেখা যায়। বেতার প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বাসীন। প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণে তাঁরা এসব কথা ঘোটে ভেবেই দেখেন না, শ্রোতার কাঁদের চার কার যোগ্যতা কতদূর! কোন শিল্পী কিরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে। নতুন শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান কিংবা তাদের যোগ্যতা অনুধাবন বেতারে এসব কিছুই নেই।

শিল্পীরা এখানে ভাবতেই পারে না যে বেতার প্রতিষ্ঠান তাদের। শিল্পীদের আমরা কখনও কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের শগকীর্জন করতে শুনি না। তাদের অভাব, অভিযোগ লেগেই আছে তাদের প্রতি চর্যাবহারও চলে আসছে। বহুদিন ধরে আমরা এ নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছি এর কোন প্রতিকার হোল না।

এবারে বেতারের উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম হবে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে বেতারের লক্ষ্যনা দান কবিশুদ্ধকে প্রশংসনীয়। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাধানন্দ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী নিকেতনের কিত্তিমোহন সেন শাস্ত্রী অর্থ্য জানাবেন কবিশুদ্ধকে। রবীন্দ্র গীতি বাসর পরিচালনা করবেন সুরশিল্পী অনাবি কুমার দত্তদ্বার। অনাবিবাবু রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক হিমায়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর মূখে রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের খুবই ভালো লাগে কিন্তু তিনি কোনদিনই গান না। যে লক্ষ্য আর্টিষ্ট তিনি আমাদের

কলঙ্কিত প্রেম

শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

নিরমল তুমি ইন্দু চির জানা ধোর :
কলঙ্ক তোমার মাঝে থাকিতে যে পারে
কে বুঝিতে—তুমি যে একের প্রেমে ভোর
অমুখিন চলিয়াছো স্বপ্ন-অভিলাষে !
বিবশনা বসুধারে বাসিয়াছো ভালো,
পরকীয়া প্রেমে তুমি ভুলেছো আপনে ;
নিজের লক্ষ্যে দিরা কলঙ্কের কালো
হালিমুখে মাখিয়াছো অনিন্দ্য আননে।
অমৃত আধির তলে তব নির্ভীকতা
প্রাত্যহিক ব্রতখানি চলিয়াছে নিরা ;
প্রেমযুগ্মা পৃথী বুঝি তাই প্রেমরতা
সোনালী প্রেমের রঙে শ্রামলা লাজিয়া ?
সহস্র কলঙ্ক ঘিরে আছে সর্বদাই,
তোমার নীরব প্রেমে এতো মধু তাই।

করেন অনেকেই তার মধ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীতে
অন্ত এবং অসমর্থ।

দিলীপ কুমারের গান ও গান লব্ধে
আলোচনা আগামী ১০ই মে বেতারে
অনুষ্ঠিত হবে। বহুদিন ধরে দিলীপ
কুমারকে বেতারে পেয়ে আমরা আনন্দ
লাভ করছি।

বেতার নাটক পরিচালক মিঃ জহ্ন
যাত্রার আগর থেকে বহুদিন বাঁচে আমাদের
একখানি নতুন নাটক উপহার দিচ্ছেন
'লক্ষহীরা'। 'লক্ষহীরা' রচনা করেছেন
সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী। আমরা
প্রতীক্ষার রইলুম।

বিবিধ

দীনদস্যালের রোজনামচা

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদন্ত

মাষ্টার হেমানন্দ

স্বামী পূর্ণানন্দ বালক-লজ্জাব্য ব্যায়াম বিভাগের শিক্ষক, প্রথম লোক বোকাট গুরু গাড়ী পিঠে করিয়া মোটরের গতি বোধ করিবার কৌশল আবিষ্কার করেন। উপস্থিত তাঁহার পুত্র মাষ্টার হেমানন্দ এট বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়া সকলের স্নেহভাজন হইয়াছে।

সাহায্য অভিনয়

কলিকাতার রাজা বাজারস্থ স্ট্রীটস্থিত অশ্রুকা বালিকা বিদ্যালয়ের চাত্তীগণ বক্তৃতা উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে Y.W.C.A. এর হলে শনিবার ১৪ই মে, অপরাহ্ন ৬-৩০ টায় যগীয় দ্বিভাষী লালের মেবার-পতন অভিনীত হইবে। শ্রীযুক্ত দ্বিলীপ কুমার রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

রচনা প্রতিযোগিতা

আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে গুলীজেলাবালীগণের পক্ষ হইতে চুঁচুড়ায় গুপ্তচর বন্ধনচক্রের ওয়াশতাবিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী বিভাগে বাছাইয়ের রচনা সর্বোৎকৃষ্ট থানি মনোনীত হইবে তাঁহাদিগকে এক-খানি করিয়া স্মরণীয় পুস্তক প্রদানের হেতু হইবে। সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ-দান করিতে পারিবেন।

রচনার বিষয়-বস্তু—

রচনা প্রেরণের শেষ दिवস ১৫ই জুন

পুরুষ বিভাগ—

১। বন্ধন নাহিত্যে পাকতা প্রভাব।

স্ত্রী বিভাগ—

২। বন্ধন নাহিত্যে নারী

আগার তাত, চীনের প্রাচীর বা মিশরের পিরামিডের মতই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল দাক্ষায়নী ওরফে দ্বাখী বামনী তার অতি নিষ্ঠার জন্ত। রনিহপুরের এমন কেউ ছিল না যে, দ্বাখী বামনীকে চেনে না। স্নান বাসর চেয়েও অচিরস্থায় মর্যাদা তার কাছে যে অনেক বেশী ছিল তার পরিচয় গ্রামবাসী সকলেই কিছু কিছু পাটলেও তার স্বামী রামদস্যালের প্রাণবায়ু এতে যাট যাট করিত।

ঘটনাটা আরও বিশ বৎসর পূর্বের থেকে আরম্ভ করা যাক। রামদস্যালের পিতা দীনদস্যাল ছিলেন বিপত্তি-নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। উদারতা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নিবন্ধমানতা পুণ্ডিত দ্বারা গ্রামের সকলের শ্রদ্ধাটী তিনি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাটী ক্রিয়াশীল পণ্ডিত বিচার ও গ্রামের কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারে যাজন তার সরল জীবনযাত্রার পক্ষে এট পর্যাপ্ত ছিল। তার একমাত্র পুত্র দীন-

তুলী মেলাব স্কুল সমূহের চাত্র-চাত্রী-গণের জন্ত—

৩। ছোট্টোবুগাবীর চরিত্র

পুরস্কার—স্মরণীয় বোপাপদক

রচনাগুলি প্রদান শিক্ষক বা শিক্ষিত্রীর স্বাক্ষরিত হইয়া—২১শে জুনের মধ্যে পৌঁছান চাই।

রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পাল

চৌমাথা স্ট্রীট, চুঁচুড়া

অথবা—

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

লেন্টাল রোড, চুঁচুড়া।

দস্যালকে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা দিতেছিলেন— উদ্দেশ্য পিতার বৃত্তি অনুসরণ করিলে পুত্রের উদ্যোগে চিন্তা থাকিবে না। রামদস্যাল লেখাপড়ার খুব মেধাবী না হইলেও শৈশবাবধি তার উপস্থিত বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল।

রামদস্যাল একবার পিতার সঙ্গে দুঃখগ্রামে কোন এক ক্রমিদারের মাতৃশ্রদ্ধের নিমন্ত্রণে যায়। তখন তার বয়স দশ বৎসর। সেখানে বহু বিখ্যাত নৈরায়িক, স্মার্ত, বৈদান্তিক পণ্ডিতের কলরবে তার খুব আশোদ লাগিল। সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্ত প্রমাণে বাস্ত। কেউ বা মুক্তকণ্ঠে কারো বা উত্তরীয় লুণ্ঠাবলম্বিত, কারো বা শিখা মস্তকের ঘন ঘন আন্দোলনে বায়ুচাড়িত কহলী বুদ্ধের শীর্ষের মত দোতুলিত, কারো বা চলমা দড়িলাই একতানে ঝুলিতেছে। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল বায়ু। কুকণে কাবোর এক পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “কীদৃশী ব্যাধিতে রোগিনীর প্রাণবায়ু দেহের মায়া ভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে?” অমনি সমস্ত পণ্ডিত কজাবায়ু মত বায়ু কথাটার উপর ছড়মুড় করিয়া, পড়িল। বায়ু কয় প্রকার, পঞ্চভূতের বায়ু, উনপঞ্চাশ বায়ু, আকাশস্থ বায়ু—এর কোন বায়ু স্থান কোথায়, প্রাণবায়ু কি মস্তকে থাকে না হৃদয়ে থাকে, শরীরস্থ বায়ু স্বভাবতঃ উদগামী না অধোগামী ইত্যাদি। দশ বৎসরের বালক আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। পিতার কাছে আশিয়া বলিল “বাবা! আমি আরও একপ্রকার বায়ু নাম করিতে পারি।” ভোজনে উপবিষ্ট কলরব শ্রবণ বেগের ছাত্রদের পাতে ঘেন

ভাতের পর ডাল পড়িল। পণ্ডিত মহাশয়েরা একেবারে নিশ্চপ। বুদ্ধ নৈরাসিক কালীশ্বর তর্করত্ন পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন “বল বাবা! বল।” রামধরাল বলিল “শুচিবাসু।” চীৎকার করিতে গিয়া লাম্ণাইয়া দেখে যে সে তখন বুকের স্বক্ষে, পতীস্বক্ষে শিবের নৃত্যের ছন্দ তার পায়ে।

দেখিন কিন্তু রামধরাল বসনাও করিতে পারে নাই যে তার এই উত্তর তার ভবিষ্যৎ-দীর্ঘনের কতবড় পূর্বাভাস।

প্রসিদ্ধ নৈরাসিক কালীশ্বর তর্করত্নের পঞ্চমবর্ষীয়া কস্তা স্বাক্ষরশীল লজ্জিত অতঃপর রামধরালের বিবাহ দ্ব্যুত্থিত মালের মধ্যেই হইয়া গেল। রামধরাল এবার ব্যাকরণ ও তার একলজ্জিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

মাসুখ ভাবে এক আর হয় অন্তরকম। কি এক অন্তরকমণে কি শুভকণে দ্বাদশবর্ষীয় পালক রামধরালের উপর তাহের সব চেয়ে মর্থশালী বজ্রমান দ্বিগীন মিত্রের নজর পড়িল।

ব্যাপারটা কিছুই ন। দ্বীনধরালের ম্রীর অমুহু থাকার পুত্র রমধরালকে পাঠাইয়াছিলেন বজ্রমান দ্বিগীনবাসুর বাড়ীতে। স্নানীপূজা করিতে। দ্বাদশবর্ষীয় বালক হকচটে লক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্রী মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু অনেকবার পড়া লেখও ধ্যানটা আর কিছুতেই আরম্ভ করিতে পারিল না। আবার পূজাপদ্ধতি লজ্জিত নিতেও লক্ষ্য হইল না, পাছে বজ্রমান বাড়ীর লোক মনে করে যে ঠাকুর মশাই পূজা করিতে জানেন না।

পূজার আসনে রামধরাল খুব স্নাটলিই বলিল। এবং কারণে অকারণে—লজ্জার আওড়াইতে লাগিল “লক্ষ্মীহং লবভূতানাং বধা বলি নিত্যং। দ্বিরাভব লখা দেবী মম জন্মনি জন্মনি।” মাঝে মাঝে ফুল ও বিধিপত্র চন্দনলিঙ্গ করিয়া ষট্‌লীর্ঘ কলসী শুদ্ধের উপর দ্বিতে লাগিল। এইরূপে ষট্‌টারশ ছে, বৃণের ধ্যান, আর ঘন ঘন

প্রণামমন্ত্র আওড়াইয়া দ্বাদশবর্ষীয় বালক পূজাপ্রাঙ্গন লরগরম করিয়া তুলিল। বাড়ীর মহিলারা বিশেষতঃ বুদ্ধারা ত মুগ্ধ। পূজার শেষে দ্বিগীনবাসু নবীন পুরোহিতকে কোল দিলেন। রামধরাল মুটের মাথার নানাবিধ পূজোপকরণ লহ মন্ত একটা ধামা চাপাইয়া বিজয়গবেঁ বাড়ী পৌছিল।

তরুণ বালকের পূজার আড়ম্বরে দ্বিগীনবাসুও মুগ্ধ। তিনি ছুটিলেন পিতার কাছে পুত্রের প্রশংসা জানাইতে। ঠাকুরমহাশয়ের দরজার কাছে আসিয়া নিজের নাম শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বীনধরাল বলিতেছেন “দ্বিগীনবাসুর কাছে এখনই গিয়ে মাপ চ। প্রবঞ্চনা মানুষের লজ্জিত ঘোর অন্তর, তুই দেবীর লজ্জিত প্রবঞ্চনা করেছিস, বেটা অনজ্ঞান, ব্রাহ্মণ কুলধ্বংসকর।” দ্বিগীনবাসু আর দাঁড়াইলেন না।

৫৬ দিন পরে দ্বিগীনবাসু রামধরালকে কলিকাতায় নিয়া গেলেন ব্যবসা শিখাইতে। বুদ্ধ পুরোহিতও ভেলের মতিপতি দেখিয়া তন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। তাই লহজ্জিত অমুহুতি দিলেন।

(২)

দ্বিগীনবাসু বউবাজার স্ট্রীটে ‘মিত্র এণ্ড কোং’ ফার্মের লম্বাধিকারী। বাজের লোহার টাটা টেইটেড স্টীল নামে চলাইয়া কলিকাতার অনেক বাড়ীর ভিত্তির চেয়ে তার ব্যাঙ্ক ব্যালাঙ্কের ভিত্তি দৃঢ়তর করিতেছিলেন। কোন বাড়ীর লোহার কাজের কন্ট্রাক্ট নেবার পর অন্ততঃ ৬৭ দিন তাকে ঠনঠনিয়ার আশে পাশে, চালাতা বাগানে, আম্‌হাট স্ট্রীটের কোন কোন যায়গায় ঘুরিতে দেখা যাইত। দেখা হইলেই বলিতেন “মা, বেটীর এম্মি টান বে স্ত্রামবাংলার থেকে পার ছেটে বেটীকে একবার না দেখলে মনটা হটকট করতে থাকে। মাগো! করুণাময়ী!” বলিয়াই মুক্তকণ্ঠে আবার নমস্কার। অনেকে তার

ভক্তি পদগদ্যবৃথের বিবেক চাহিয়া ‘খ’ খাইয়া বাইত।

বিশ বৎসর পরের কথা। রামধরাল দ্বিগীন বাবুর ফার্মে কাজ করিতেছে। সে যে এহেন দ্বিগীন বাবুর উপযুক্ত শিষ্য তা দ্বিগীনবাসু যখন বুঝিতে পারিলেন তখন রামধরালের ব্যাঙ্ক ব্যালাঙ্ক দ্বিগীনবাসুর খুব বেশী নীচে ছিল না। তিনিও আস্তে আস্তে রামধরালের হাতেই সব চাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন টাটা টেইটেড স্টীল এবং খাঁটা বিলাতী চাপহারী স্টীল রামধরালই ঠনঠনিয়া হইতে ক্রয় করে। এবং থরচের টাকা কয়েকগুণ হইয়া ব্যাঙ্কে দ্বিগীনবাসুর একাউন্টে জমা হয়। শুধুমাত্র বাড়ীগুলির ভিত্তি ক্রয়-লই শিখিল হইয়া আসিতে থাকে, এবং ঠনঠনিয়ার মহাজেনেয়া রামধরালের কাছ থেকে বা পায় তার কয়েকগুণ দ্বিগীনবাসুর রাম ধরালকে দ্বিতে হয়।

একদিন আকস্মিক ভাবে সব ওলটপালট হইয়া গেল। বালীগঞ্জের মন্ত একটা বাড়ীর আরম্ভ কন্ট্রাক্টরসনের কন্ট্রাক্ট দ্বিগীনবাসু পাইয়াছেন। রামধরাল সব দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া বলিল “আমি বালীগঞ্জ থেকে লম্বা কাজটার মাপ নিয়ে এসেছি। কালীতলাঃ গিয়েছিলাম। অনেক দর মন্তুর করে একটা ফার্মের লজ্জিত চুক্তি করেচে, আমার লিষ্টমত সব মাল যে বেবে মাত্র ১৩৫০ টাকা। পাটির কাছে কোন্‌না আট নয় হাজার টাকা পাওয়া যাবে?”

দ্বিগীনবাসু বলিলেন “আচ্ছা! তুমি তবে আজই টাকাটা নিয়ে গিয়ে লম্বা মাল কাজের ওখানে রেখে এস। কাজটা খুব আর্জেন্ট।”

রামধরাল টাকা নিয়া প্রথম ব্যাঙ্কে গেল, নিজের একাউন্টে ১১৩০০ টাকা জমা করিয়া কালীতলা মার হন্দিরের লামনে খুব ভক্তিতরে প্রণাম করিল। তারপর তার পরিচিত লোহার দোকানে গিয়া হাজির। দর মন্তুর

আগেই ঠিক করা ছিল। নগর ২২০৭ টাকার
বিনিময়ে ১৩৫০৭ টাকার একটা ক্যালমেমো
ও লিষ্ট মত লম্বা মাল নিয়া সে বিদায় নিল।

তারপর দুইকতুর মত আলিল পিতার
অম্বলের খবর। রামধরাল এক মালের ছুটি
নিয়া বাড়ী গেল। ট্রেনে গুটিতিনেক সুন্দরী
সুখী দেখিয়াই তার দৃষ্টি প্রথর হইল, বছরিন
বিশ্বত শিশু জীর কথা মনে পড়িয়া।
ভাবিতে লাগিল গত বিশবৎসরে তার পঞ্চম
বর্ষীয়া জী হয়ত এত বড়ই হইয়াছে, নিজের
জীর রূপ অপরিচিতাঘের মুখে পাঠবার ব্যর্থ
চেষ্টার ঘন ঘন তাকাইয়া শেষে নিজেই লজ্জার
মুখ কিরাইয়া নিল। জীর লালিয়া বসনা
করিয়া তার লরীকে পুলক শিহরণ জাগিল।
কোন এক নিজিত অমুভূতি হঠাৎ চেতনা
পাইল।

বৃদ্ধ পিতাকে বধন কিছুতেই বাচান
গেল না, তখন রামধরাল জীর দিকে

মনোবোগ ছিল। হাকারনীর লবঙ্গ
এমন একটা কঠিন রূপতা ছিল যে বোনের
লম্বাখানি মধুরিমা এবং রহস্যও মাঝে
মাঝে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িত। সে যেন
প্রভাতসূর্য্য। দূর থেকে খুব মনোরম,
কত কবির লেখনী বিস্তার বিস্তার কাগজ
মলীকিত করিতে পারে তার নমনীয়তা
ও নমনীয়তার বর্ণনায়, কিন্তু মাঝনে গেলে
পবন নন্দনের মত দশা। বিশেষতঃ বেহের
লঙ্গে আত্মার যে লবঙ্গ, ভক্তের লঙ্গে
ভগবানের যে লবঙ্গ, পরীক্ষার্থীর লঙ্গে
নোটবুকের যে সম্পর্ক, জল ও গোবরের লঙ্গে
হাকারনীর যে সেইরূপ অচ্ছেদ্য লবঙ্গ ছিল
এটা রামধরাল অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল।
আরও বুঝিল হাকারনীকে পাইতে গেলে
তাঁহের বাহ দিয়া তাকে পাইবার
সম্ভাবনা নাই।

বৈক্য তক্ত বধন কঠে তুলসীর মালা
ও লবঙ্গ হরিনামের ছাপ দিয়া লবঙ্গ
বিষ্ণু লালিয়া অমুভব করেন, হাকারনীরও
শরীরের নানাস্থানে বঙ্গলবেহের রূপাঙ্ক
বর্তমান ছিল।

বিশ বৎসর পরে প্রথম মিলন ছিল
এইরূপ। •রাত্রে আহারান্তে হাকারনী
চৌকিতে নিজিতপ্রায়া। রামধরাল বৈদ্যিক
কাজে খাওয়ার পর একটু বাহিরে গিরেছিল।
পা টিপিয়া টিপিয়া শরনকে আনিয়া
বেধে পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া জী তার
লম্বায়—বলন অসংবত, কেশপাশ শ্রুত,
বঙ্গ অর্ধাবৃত। নারীকে এ বেশে এই
নিশীথে এত কাছে পাওয়া তার জীবনে
এই প্রথম। নারীকে দেখিয়াছে সে শুধু
কলেজের মেয়েরূপে, মেলের বিরূপে, আর
নটীরূপে। সে নারীকে যে এত কাছে
পাওয়া যায়, এরূপ সম্পূর্ণভাবে—যেখানে

ই উ না ই টে ড ট কী জে র

—: প্রথম চিত্র নিবেদন :—

—: ভূমিকায় :—
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
সুশীল মজুমদার
শীতেন পাত্র

ছ
ন্দা

—: ভূমিকায় :—
জ্যোৎস্না গুপ্তা
চিত্রা
মনোরঞ্জন লাহিড়ী
নৃপতি চ্যাটার্জ

পরিচালক : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজক : অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশ্চয় ভয় নাই; চারিভিকের জুড় দৃষ্টি নাই, এট প্রথমে মতা তার মনের যৌবনকে বহুর্ভে লজাগ করিয়া দিল। যৌবনের লম্বা উন্নততা ঠোটে মাথিয়া হাক্ষারনাকে স্পর্শ করিতে সে লক্ষ্যে ফাঁটিয়া পড়িল।

“বলি! আঁকলের মাথা কি একে-বারেই খেঁচে? বামুনের ঘরের ছেলে, আর এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও নেই তোমার! এমন খীষ্টেনি আমার চৌদ্দপুরুষও খেঁচেনি।”

রামদয়াল ত ‘থ’। এ যেন পুরস্কার প্রাপ্ত বালকের গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত। অনিন্দ্যহৃদয়ী রাজরাণী যেন বিরাট মূগ-ব্যাঘ্রান করিয়া একটা আস্ত বাঢ় গিলিয়া ফেলিল। বেচারী কিছুই বুঝিতে পারিল না।

হাক্ষারনী বলিয়াই চলিল—“বামুনের ছেলে হয়ে এটাও জান না যে এটোকাপড়ে বিজ্ঞানায় যেতে নেই। এই যে লম্বা বিজ্ঞান

আলো এটো হয়ে গেল মায়—লেপ, তোষক, বালিশ—এখন রাত্রে শোব কিসে?”

বলিয়াই উঠিয়া ছুঁ ছুঁ করিয়া লেপ, তাষক, বালিশ লম্বা বাহিরে ফেলিয়া দিল। রামদয়াল বলিতেই লক্ষ্য পাইল না যে পাপড়ী তার কখন এটো হইল। গৃহিনীর চিন্তাযুক্ত ও অতিরিক্ত মৃদুতা সে বাহা ভনিয়াছিল তাহা যে এক্ষণ রুঢ় লভ্যরূপে দখা দিবে এটা তার বঙ্গনার বাহিরে।

রাত্রে ছেঁড়া মাদুরের উপর তুলার বস্তা মাথায় দিয়া উভরের হাম্পতাজীবনের প্রথম নিশার অবসান হইল।

পরদিন বেলা আটটা। প্রচণ্ড ঝাকানি ধাইয়া রামদয়াল একলক্ষ্যে একেবারে উঠানে। বিচারের ভূমিকম্পের ভয় তখনও লোকে ভুলে নাই। চিংকার করিয়া ডাকিল “ওগো মনচ! শীগগীর বাইরে এসো। ঘর

পা পড়ে মরবে যে

দশ-বার-পাশ কাঁচার খালা এক লক্ষে মান ঝন ঝন শব্দে পড়িয়া গেল। রামদয়াল ভত্থের মত শুনিতে লাগিল—“বলি, পাটটা পর্যাস্ত শুয়ে থাকলে পিণ্ডি চটকাবো ব দ্বিয়ে। বাজার টাকার নেই। বিজ্ঞানায় স্তরের সুখেত কাল রাত্রে গুড়ো জেলে দিয়েচ ”

হায় কালিহাস! হায় চণ্ডিহাস! হায় বিজ্ঞান! স্বর্গীয় প্রেমের কি এটি পরিণতি! রামদয়াল জলের মত বুঝিয়া ফেলিল বিবাহিতা স্ত্রী কেন প্রেমগোজো অচল—কুণ্ডের কেন মাথা, চণ্ডীহাসের কেন বামী। আরও ফিলি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কেন পত্নীর স্থান নেই।

(ক্রমশঃ)

বার্ধা ফিল্মসের
পরিচালনায়

বিকার বাপ

— ক্রমিকায় —
রানীবালা, দেববালা, ছায়া
নারেন মিত্র, জহর গাঙ্গুলী
সুশীল রায় (এ.), মনোজ পাল (এ.এল.)
কুমার মিত্র, তুলসী চন্দ্র
জামল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজিত

প্রতিমহল থিয়েটারের
হাল্যবসায়ক
বন্যা চিত্র

প্রযোজক: জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র: মনোজ দাস
গায়ক: যশ
সঙ্গীত: মনোজ পাল ও
ভবেন ঘোষ



(বিলাসী)

বিজ্ঞাপতি

গত চার সপ্তাহ ধরে বিজ্ঞাপতি 'চিত্রা'-র সমানভাবে দর্শক আকর্ষণ করেছে এবং বাঙলা দেশের নর-নারীর অন্তরে বিজ্ঞাপতি যে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে পেয়েছে তার একাধিক প্রমাণ পেয়েছি। গত চার সপ্তাহ 'চিত্রা' বিজ্ঞাপতির টিকিট লেল হয়েছে, ২৬, ৬৪৭৮০ টাকা নেট। এ থেকে দর্শক মহলে নিউ থিয়েটার'-এর ছবির জন-প্রিয়তা লক্ষ্যে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ছোটখাটো ক্রটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, সর্ব-শ্রেণীর দর্শককে আনন্দ দেবার মত প্রচুর উপাদান এই চিত্রে বর্তমান। কানন, দুর্গাধাস, পাহাড়ী এবং অমর মল্লিকের প্রাণচালা অভিনয় এবং কানন ও কুকচন্দ্রের সুখ-কষ্টের অপূর্ণ গানগুলির আলোচনা আমরা ইতি পূর্বেই কোরেছি। এই গান-গুলি সঙ্গীত পিপাসুর অন্তর মগ্নিত করেছে তুলবে।

নর-নারী নির্বিশেষে, সকল সম্প্রদায়ের কাছেই অমুরাধা চরিত্রটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে। পরিত্যক্তার অভিনবত্ব এবং পরিস্ফুটন মাধুর্য্য, এই চরিত্রটি অপ-রাপর সকল চরিত্রটিকে ছাড়িয়ে, এই নাটকে নির্দ্বন্দ্বিতা অধিকার করেছে। যে বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা এবং আত্মস্থানের মধ্যে সাধনার লিঙ্গ—কবি-সঙ্গিনী অমুরাধা, প্রেমের সাধ-নাথ, তার-ই জোরে লিঙ্গলাভ করেছে। বস্তুতঃ কবি বিজ্ঞাপতির মহা-কাব্যের মত পরিচয় অন্ততঃ আংশিক ভাবেও, এই অপরূপ

নারী-চরিত্রটি অবলম্বন কোরে বিকাশ লাভ করবার অবদান পেয়েছে।

তাই, আমাদের মনে হয়, বিজ্ঞাপতি-র অপরাপর বহু আকর্ষণের কথা ছেড়ে দিলেও, অমুরাধার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বাঙলার নর-নারী বিজ্ঞাপতি থেকে জীবন সার্থক কোরে তুলবেন।

নিউ সিনেমার হিন্দি 'বিজ্ঞাপতি' তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করল এবং 'চিত্রা'-র বাঙলা বিজ্ঞাপতি এগিয়ে এলো—ষষ্ঠ সপ্তাহে।

অভিজ্ঞান

বাঙলা সংস্করণের মুক্তি লক্ষ্যে লটিক ভাবে এখনও কিছু বলা না গেলেও, এই মাসের শেষের দিকে ছবিখানি যে রূপবাহীতে আত্মপ্রকাশ কোরবে, একথা নিশ্চিত।

পরিচালক প্রফুল্ল রায় এর বাকী কাজটুকু শেষ কোরে আনবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা কোরছেন। ছবি খানির 'টেলার' এই সপ্তা-হের মধ্যেই মুক্তি পাবার কথা।

অভিজ্ঞানএর মত একখানি বিরাট উপস্থাপকে ছায়া-চিত্রের উপযোগী কোরে গঠন কোরতে, চিত্র-নাট্যকার ফণি মজুমদারকে অনেক কিছু রহ-বল কোরতে হয়েছে। লক্ষ্যার রক্ষা কর্তা প্রমথর বালা বন্ধু হিসাবে, চিত্রশিল্পী 'সুরেশ'-চরিত্রটির পরিবর্তনটিও নতুন। অভিজ্ঞান এর মত Heavy নাটকে, অনেকখানি 'রিলিফ' দিয়েছে এই সুরেশ। কালীর এক জনবহুল রাস্তায়, বৃক্কুলে বারি-শেচন রতা লক্ষ্যাকে প্রথম দেখেছিল এই সুরেশ। সুরেশের কবি মনে ভেদে উঠল



মাধুর্য্য বেশে—অমী সারাল

এক ছবি। পাশের এক রং এর ঘোঁকান থেকে রং ও তুলি ক্রয় কোরে, কলনা-বিলাসী, আপন ভোলা সে শিল্পী, স্থান কাল ভুলে গিয়ে, সেই দৃষ্টে আঁকতে বসলো লক্ষ্যার সেই বিশেষ পোজের ছবি।

—“ওকী, ওকী, নড়বেন না”

অলক্ষিতে বেরিয়ে এলো সুরেশের মুখ থেকে এই কটি কথা। উদ্বাসী লক্ষ্যার কানে সুরেশের কথা পৌঁছতেই, সে নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে অপরিণীত লজ্জা ও লক্ষ্যারের প্রাবল্যে, বিদ্রাং গতিতে সে স্থান ত্যাগ কোরল। কিন্তু সুরেশের হাতে বৃদ্ধে গেল সেই 'স্কচ'। পরবর্তী কালে, সুরেশ তাতে রং ফলিয়ে সম্পূর্ণ কোরে ভুলেছিল।

নিতান্ত দৈববশে লক্ষ্যা পড়েছিল সুরেশের চোখে—। সুরেশ জানতো না কে এই মেয়েটা। লক্ষ্যাও কলনা কোরতে পারে নি, এই চিত্রশিল্পীই তার আশ্রয়দাতার বালাবন্ধু! কিন্তু তাদের জীবনে পরিচয় বিনিময়ের সুযোগ বখন এলো—তখন সেই শিল্পী ও নারীর বিমিত দৃষ্টির সাধনে ভেদে উঠলো

প্রথম দিনের সে ছবি। পরিচয়ের কথা দিয়ে বিগত দিবসের সেই 'thrill' টুকু, আরও শ্রীকৃত্যাবে সন্ধ্যার মন স্পর্শ কোরল, যখন বীরে বীরে সুরেশ তাকে, সত্তা পরিচিত বন্ধু-পত্নী জানে, তার হাতে পৌঁছে দিলে, পথের ধারে আঁকা, বুকস্থলে বারি-লেন রতা, স্নানরী সন্ধ্যার সেই পটে আঁকা ছবি!

অভিনয়

বড়হিসর আংশিক ভূমিকা লিপি আমরা ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছি। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকার আর্টিষ্ট নির্বাচিত হয়েছে। নাসিকা মাধবীর ছোট্টবোন প্রমাণা একটি অপূর্ণ চরিত্র। এই চরিত্রের জন্য একটি অতি সুবর্ণনা মেথেকে মল্লিক মশাই নির্বাচিত করেছেন। দৈহিক রূপ ছাড়াও মেরেটির গুণগত অভিনয় প্রতিভা আছে। এই বালিকা অভিনেত্রীটির নাম—শ্রীমতী ছবি। এই মেরেটি নাট্য সন্ধ্যাজী ভারানুসারী বোঁহিত্রী। এ ছাড়া সুনচি 'ব্রজরাজ লাহিড়ী'র ভূমিকার চিত্রাবতরণ করেছেন সুবিখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং 'বিন্দু ঝি'র ভূমিকার অভিনয় করেছেন প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী নিতাননী।

বাঁজী 'এলোকেলী-র ভূমিকার অভিনয় করবার জন্য সুনন্দ মল্লিক মশাই এমন একটি মেরেকে মনোনীত করেছেন—যে নৃত্য গীত এবং অভিনয়ে—সকল দিকেই চোখ।

সুতরাং ভূমিকা নির্বাচনের দিক দিয়ে আর্টিষ্ট লম্বাবে যে পরম লোভনীয় হয়েছে এ কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য।

পরিচালক মল্লিক মশাই, লাভ্যমত অবসর লম্বয়ে মহলা পরিচালনা কোচ্ছেন। 'বেশের মাটি'র কাজ থেকে তিনি সম্পূর্ণ অবসর লাভ করলে মহলার কাজ আরও অধিক মনোনিবেশ করতে পারবেন।

অধিকার

নিউ থিয়েটার' এর হু' নুসর টিউতে বজ্রার পরিচালনার 'অধিকার' এর কাজ

খুব ক্রত এগিয়ে চলেছে। এটিপি অধিকা চরণের চেয়ারের দৃষ্টটি এখন তোলা হচ্ছে। এতে অভিনয় করছেন শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু সুখোপাধ্যায়। এরা দুজনা এর আগে জুটি বেঁধে 'হুজি'তে যে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন তা এখনও আশাধের মন থেকে মুছে যায় নি। অধিকার-এও ঠিক তেমনই জুটি বেঁধে আবার এরা সবাইকে হাঁলাবার ব্যবস্থা করছেন। সুটিং এর পর যে রকম শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এরা তাহের পূর্ব গোরব বজার রাখতে পেরেছেন।

'অধিকার' এর আর একটি জিনিষ বা সর্বাঙ্গ সুন্দর হচ্ছে তা হচ্ছে এ ছবির লক্ষ্যোৎসাহ সনামধন্য সুরশিল্পী তিমিরবরণ যে অপূর্ণ লক্ষ্যে হুজি'এ এই ছবিতে সংযোগ করছেন তা অবনগীর। তার ওপর আবার পঙ্কজ ও পাছাড়ীর গান। পঙ্কজ বাবুর একটি হিন্দি গান 'শোনবার মোভাগ্য আশাধের হয়েছিল। তা যে কি চমৎকার তা বলা যায় না। তিমিরবাবুর সুর আর তার ওপর পঙ্কজ বাবুর দরদ দিয়ে গাওয়া এ থেকেই সকলেই বুঝতে পারবেন আশা করি। বক্ত! তিমিরবরণ তোমার সাধনা, তোমার পরিশ্রম, সব স্বার্থক হউক এই আশাধের কামনা।

দেশের মাটি

লাইগল এর অন্তরের জন্তে এ বই এর সুটিং কয়েক দিন বন্ধ ছিল। লাইগল সম্প্রতি শিলং থেকে ফিরেছেন। আবার যথারীতি সুটিং আরম্ভ হয়েছে। আসছে হুটার আমরা এ ছবির আরও বিশদ বিবরণ জানাব।

স্ট্রীট সিঙ্গার

পরিচালক কলী মজুমদার অমরটাহের বাড়ীর আভ্যন্তরিক দৃষ্ট দেখ করলেন। এ মেটে অভিনয় করলেন শৈলেন চৌধুরী জগদীশ শেঠি ও শ্রীমতী কানন। এদের

প্রাণস্পর্শী অভিনয় পরিচালককে শ্রীত ও মুগ্ধ করেছে। 'স্ট্রীট সিঙ্গার' বা 'ভুলুয়া'র ও পজের পৃষ্ঠার উপরকার রূপটি বাস্তবে কাজের মধ্যে ও নির্ভূতভাবে ধরতে পেরেছেন।

সুন্দর লাজানো লব্ধ মেটের মধ্যে লোফার বলে শ্রীমতী কানন। গভীর রাতের আলো ভায়া বড় আলমারির গারে—টেবিলের পাশে বেওরালে লক লতার জড়িয়ে জড়িয়ে।

—যে একটি মেরে—এখনও জেগে। খোলা চোখে জল কখন শুকিয়ে গেছে। নিটোল রাঙা কপোলে একটি মুছিত কুন্তল—আঙুর অলকে লাগের মলিন মায়া। একটি নিভাজ যৌবনকে জড়িয়ে গোলাপি লাড়ীতে রক্ত-রঙীণ জামাতে লব্ধ বেগারনী চাধরে ইধারের কম্প। কানন কৈপে উঠল অর্থাৎ মজুমদার ভল হোল। বড়িতে পিরানোর সুর—টুং টাং টুং—রাত তিনটে। অন্তরের বেবাক আর্জনাধ বাবুর লকে মিলে গেল। মজু ডাকলে—ভুলুয়া! ভুলুয়া!—অমরবাবু অমরবাবু—রাই বড়ালের মেরে তখন পিরানোর ওপর থেকে লাটটি পোষা পাখী লন্তরখানি মেতারের ওপর লুটো-পোট খাচ্ছে।

ক্যাথেরার একটি চোখে চোখ মিলিয়ে যিনি এতকণ নিঃশব্দে সেলুলয়েডের ফিতের ওপর চিত্র গ্রহণ করছিলেন—তার ঠোঁটে উঠল চেটারফিল্ড লিগারেট। ক্রোরের বাহিরে এনে ফলিবাবুর গারে হাত দিয়ে বলেন, Really, it is wonderful—you have Conceived.....

ওপাশ থেকে একটি ছোট্ট লোক বলছেন: বলেছিলাম, ও বাহু ছেলে। বজ্রা, ভূমি বেখে নিও—কান কেটে বেবে।

পরিচালক কলী মজুমদার টিপটা জোর টান দিলেন—আমি বললাম হলবে গেঞ্জির ওপর ঠপ ওয়াটটা রাধখোকার গলার বাহুলির মত হলতে লাগল অধিক তথিক।

‘হুট নিকার’ বা ‘ভুলুয়ার’ চিত্রনাট্য মুদ্রণ করেছে ঠুড়িওয়ার লকলকে। ভারতের চলচ্চিত্রে হুট শ্রেষ্ঠ প্রতিভা স্বতঃপ্রসূত হয়েছে এই চব্বিতে একদিনের জন্তও কাজ করেছেন। পরিচালক ফণি প্রতি প্রীতির জন্তই পরিচালক প্রমথেশ একদিন লকলকারী পরিচালকের কাজ করেছেন। লেখিন অপর শ্রেষ্ঠ পরিচালক ত্রীনীতীন বসু দৃষ্ট পরিকল্পনায় মুদ্রণ ‘ভুলুয়ার’ প্রায় হাজার ফিট চিত্র গ্রহণ করলেন।

অবিখ্যাত মিউজিক ডিরেক্টর রাইচাঁদ বড়াল এই চব্বিতে মিউজিক দিচ্ছেন। নাচ গান ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক, একেই মিউজিক প্রভৃতি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে রাত হাটটার আগে মিউজিক বরের বাহিরে তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। ‘ভুলুয়ার’ চিত্রনাট্য তাঁর কাছে ভাল লেগেছে। পরিচালক ফণি তাঁর প্রিয়—অতি প্রিয়।

চোখের বালি

কালী কিশোরের নবতম আকর্ষণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সেই বহু-পঠিত লক্ষ্যজন প্রাণবন্ত অমর সামাজিক চিত্র-কাহিনী “চোখের বালি”। নর-নারীর প্রেমের প্রকৃত তাৎপর্য কী—রবীন্দ্রনাথ সেই প্রেমের স্বাভাবিক প্রতিঘাতের ভেতর চারটি চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এই কানীহিতে। ‘বিনোদিনী’ সে বাল-বিধবা। সমাজের নির্দেশ অনুযায়ী প্রেমের অধিকার থেকে সে বঞ্চিত। কিন্তু নারীর যৌবনে তার লক্ষ্যে যে প্রেমের স্বর্গে প্রবাহের স্রোত হয়—সে প্রেম-প্রবাহ থেকে সে অব্যাহতি পেল না। তাই সে বিজোহী হয়ে উঠল। ‘আশা’ স্বামীর স্বয়ংসিদ্ধতার পরিচয় পেল—কিন্তু তবুও সে সাধারণ মেয়ের মত আশায় মুগ্ধ বোধে নিজের কর্তব্যপথ হ’তে বিচ্ছিন্ন হ’ল না। ‘বিনোদিনী’ ও ‘আশা’ রবীন্দ্রনাথের

হুট সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের প্রেমিকা। ‘মহেন্দ্র’ সে বিবাহিত অথচ সে মজল একটি বিধবার রূপকালে। মহেন্দ্র বত তাকে ধরতে যায় সে তত মরীচিকার মত লগে যায়—অথচ তবুও সে মানসম্মত বিলম্বিত হয়ে তারই পেছনে চলল ছুটে। ‘বেহারী’ লাক্কু, বরভাবী। তার প্রাণের কামনা সে কারও কাছে ব্যক্ত করে নি; অথচ মাঝে মাঝে তার মন যেন চঞ্চল হ’য়ে উঠত, কিশোর জন্ত।

এই অপূর্ণ চারটি চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ তার তুলির পরশে যেমন অমরত্ব দান করেছেন—ছায়াচিত্রে বা’তে তা’ কিছুমাত্র স্নান না হয়, তার জন্ত এই চব্বির প্রযোজক মিঃ বি, পি, মেহরা চরিত্র নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে সব বিষয়েই বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কাজ করেছেন। অভিনেতা-বংশীয়া ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি মুখার্জি ও ইন্দিরা রায় ও মাজিত রচিতম্পন্ন ডাঃ হরেন মুখার্জি ও

রবীন্দ্রনাথের

শ্রেষ্ঠ সামাজিক

চিত্রনাট্য

চোখের বালি

নারীর কামনা

আর

পুরুষের বাসনা

এর মধ্য

সামাজিক শাসনের

ছক্কারের মূল্য কোথায়

?



*
অ বি ল শ্বে
আগতপ্রায়

*

—পরিবেশক—

রীতেন এণ্ড কোং

কলিকাতা

কোম : ক্যাল ১০৯২

গ্রাম : কল্যাণ

পরিচালক : সত্য সেন

সহলেখ : মধু শীল

আলোকচিত্র : ননী সান্দ্রাল

৮ ছবি বিশ্বাস উপরোক্ত চারটি চরিত্রের জন্ম নির্কাচনে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ও হুম বিচার-বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। “চোখের বালি”-র লাকল্য লক্ষ্যে এই সব কারণে বিশেষ আশাবিত্ত হ’য়েছি।

হাজরা পিক্‌চাস

তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানের পৌরাণিক উপাখ্যান “দেবী কুল্লরা”-র শূটিং প্রায় শেষ হ’য়ে এল। রাজ-প্রাণাধের সেটি সস্ত্রি তৈরি হ’চ্ছে। এই অপূর্ণ কাহিনীটি লতীত গরিমায় উদ্ভাসিত, লতা ও শিকিতের সঙ্গে অলম্ব্য ও অশিকিতের সংঘর্ষ, রাজার অত্যাচারে জর্জরিত প্রজাপুঞ্জের প্রতিহিংসা-পরায়ণা, তক্ত ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়তা ভগবান প্রভৃতি আবেদনপূর্ণ ঘটনাকে আশ্রয় করে গ্রথিত হ’য়েছে। কাহিনীর মাহকতার অহীজ চৌহুরী, শিশুবালা, মনোজ্ঞন ভট্টাচার্য্য, রাধাধাপী, সাবিত্রী, মোহন ঘোষাল, চিত্রা দেবী প্রভৃতি শিল্পগণের অভিনয় নৈপুণ্যে, তিনকড়ি চক্রবর্তী সুপরিচালনায় ও কালী ফিল্মের টেকনিশিয়ানদের লক্ষ্যতায় ‘দেবী কুল্লরা’ বাঙালার নর-নারীত্বের মনে যে এক অপূর্ণ পূলক শিহরণ তুলবে একথা বলাই বাহুল্য।

বেকার নাশন

রাধা ফিল্মের পরিচালনায়, মতিমহল থিয়েটারের হাদি কান্নার ভরা কথা চিত্র ‘বেকার নাশন কোম্পানী’র চিত্র গ্রহণ কার্য্য লম্বাশ্রিত পথে এসেছে। কর্তৃকর্তার আশা করেন ৪ঠা জুন ছবিখানিকে ‘উত্তরা’র পর্দায় প্রতিকলিত করতে পারবেন।

গত সপ্তাহে ছবিখানির একটি মনোরম দৃশ্য তোলা হ’য়েছে; এক শিক্ষিত অবৈতনিক নাট্য লম্বাশ্রয় গ্রামের জমিদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে ‘চন্দ্রশূন্য’ নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছে—তারই ‘প্রীন কম দৃশ্য’ তোলা হয়েছে

গত সপ্তাহে; এইবার বকের উপর মূল নাটকের অভিনয় দৃশ্য তোলা আরম্ভ হবে। উক্ত মঞ্চাভিনয়ে ‘হেলেন’ এর ভূমিকায় রবীন এর (ছবির নায়ক) অভিনয় তার রূপলজ্জা গ্রামের লোককে শুধু মুগ্ধই করেনি, বিস্মিতও করে তোলে: রবীন এর প্রশংসায় সারা গ্রাম যখন উল্লাসে মুগ্ধিত—রবীনের পিতা ভয় ক্রোধে অন্ধ হয়ে চটকট কচ্ছেন। সত্যই তো! কোন্ নীতিবাগিশ পিতা যার পুত্র বারবার তিন বার বিয়ে ফেল করে নটা লেজে বেড়াতে তা লহ করতে পারে? ফলে রবীনকে যথার্থীতি: ‘মা’! যদি কখন মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আসবো—নচেৎ এই শেষ বলে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। কলকাতার বেগে ভখন নাচ-গানের হুল্লাড় বয়ে লেছে। প্রয়াগ শিল্পী মশাই এই দৃশ্যটিকে যে ভাবে গ্রহণ করে তুলেছেন, তা দর্শক সাধারণ পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবেন আশা করা যায়। ...নায়ক রবীন এর হস্ত করণ ভূমিকায় শ্রীমশীল রায় (এং), নীতি-বাগিশ পিতার ভূমিকায় বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা শ্রীমদ্রথ পাল (হাঁহগাবু) এবং তৎ পত্নীর ভূমিকায় জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীমতী দেববালা অভিনয় কচ্ছেন।

পূর্ণ থিয়েটার

নিউ থিয়েটার এর ‘মুক্তি’ এর আগে চিত্রায় ২৮ সপ্তাহ চলে চিত্রায় রেবর্ড স্থাপন করেছিল। পূর্ণ থিয়েটারেও ‘মুক্তি’ আলিবাবার রেবর্ড ভেঙ্গে দিতে চলেছে। মুক্তির জনপ্রিয়তা লক্ষ্যে আমাধের কিছুই বলবার নেই। প্রতিঘরে ঘরে ছেলে বড়ো লকলের মুখে মুক্তির গান চলেছে। পরিবেশক প্রাইমা ফিল্মস লিঃএর কোন ছবিই এর আগে এত লাকল্য লাভ করতে পারে নি। এক কথায় এ ছবিকে তাধের ‘লক্ষী’ বলা যেতে পারে। আমাধের মনে হয় দক্ষিণ কলিকাতার এই জনপ্রিয় চিত্র গৃহে মুক্তির

এই অসাধারণ লাকল্যের জন্ত একটা উৎসবের আয়োজন করা উচিত।

নালান্দা ফিল্ম

ম্যাডান ষ্টুডিওতে এধের প্রথম ছবি ‘দেবদাস’র কাজ ছ’ একদিনের মধ্যেই আরম্ভ হ’বে। এ ছবির বাঙলা ও হিন্দি পরিচালনা করবেন নিরঞ্জন পাল ও জয় গোপাল পিলে। এতে অভিনয় করবেন সীতা দেবী, রেখা রায় ও এম্ এন্ রায়। শেষোক্ত দুজনই পাটনা থেকে এলেছেন।

রূপসাগী

উত্তরনা, রোমাঞ্চ এবং আগ্রহোদ্যোপক কথাচিত্র শুধু একটি অভিনেতার অভিব্যক্তিতে যে কি অভিনব রূপ গ্রহণ করিতে পারে তাহা বোরিল কালক প্রমাণ করিয়াছেন। আপনারা এতদিন এই রূপদক্ষ অস্বাভাবিক চরিত্রাভিনেতাটিকে নানা ভীতিপ্রদ এবং বিভিন্নীকায় ভূমিকায় দেখিয়া বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু নিউ ইউনিভার্সালসের ‘নাইট-কি’ চিত্রে কালককে আপনারা একটি নূতন ধরণের ভূমিকায় দেখিয়া অধিক বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইবেন।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ
বাড়া কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু
ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেরার।
অজ্ঞাত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

ইস্কাবনের টেকা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (স্ত্রী)

মলীয়া—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারী মা—ঐ বাপের আমলের
বুড়ো বি।
অজ্ঞাত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে
পাইবেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি স্নিতচক্ষে অবিনাশের দিকে চেয়ে
বলুম—“বাহবা—বাহবা! এই যে, শিশু
আমার deduction আরম্ভ করেছে! বেশ,
বেশ! আচ্ছা, তোমার কথাই রইলো—চা-
খাওয়া হ'বে না। আমার পেয়ালটা যেমন
আছে অমনি থাক, বলা বাবে আমি চা
খাই না; আর তোমার পেয়ালার চা জানালা
দ্বিগে বাগানে ঢেলে ছাড়া।”

তাই করা হ'লো। অবিনাশের আনন্দ
ধরে না।

একটু পরেই নবাব-বাহাদুর এলেন।
বলেন—“কই? চা খেলেন না?”

আমি—“Thanks. মাপ করবেন আমি
চা খাই না।”

নবাব-বাহাদুর বেরার। ডেকে চা'এর ট্রে
নিরে বেতে বলেন।

টেবিল পরিষ্কার হ'লে নবাব-সাহেব
বসলেন। বলেন—“ডাঃ দাস এখনও আস-
লেন না কেন ফোনে খবর নিরেছিলুম।
তিনি একটা ‘অর্জেন্ট’ কলে বাইরে গেছেন,
আপতে একটু দেরী হ'বে।”

তারপর নানা রকমের জল্পনা চলল।
বেথতে বেথতে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল।
বলুম—“কই? ডাক্তার দ্বারের খবর কি?
আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না।”

নবাব-বাহাদুর বলেন—“হ্যাঁ—দেখচি।
Excuse me please” এই বলে তিনি চলে
গেলেন।

আমি উঠে ক্রীন্ দরিরে বাইরে চেয়ে
বেখলুম। দেখলুম হলঘর পার হয়ে তিনি

সিড়িতে উঠছেন। উঠতে উঠতে থমকে
দাঁড়িয়ে তিনি একবার ফিরে দেখলেন, তার-
পর ইলাতার একজন বেরারকে ডেকে কি
বলে' উপরে উঠে গেলেন। বেরারটা
আপ্তে আপ্তে এসে নৈঠকখানার সামনে একটা
টুল নিয়ে বসলো। আমি ফিরে এসে নিজের
চেয়ারে বসলুম।

অবিনাশ একদৃষ্টে আমার চালচলন লক্ষ্য
করছিল। চাপা আঙুরাজে বলেন—“কিহে,
ব্যাপার কি?”

গম্ভীরভাবে বলুম—“না অবিনাশ, আর
চালাকী চলচে না। শোন। আমি ডিপ্লে-
জারী থেকে আগেই ডাক্তার দ্বারের কাছে
কোন করে' জেনেছি, এখানে তাঁর কোন
এনগেজমেন্ট নেই। সুতরাং আমি জানি
এটা নর্কীব মিথ্যা, এবং কোন একটা উদ্দেশ্যে
আমাকে এখানে আনা হ'য়েছে। তবে
তোমার আমার সঙ্গে আলাটা এদের অপ্র-
ত্যাশিত, কাজেই একটু গোলযোগ পড়েছে।
দেখ, শীঘ্রই আমাদের উপরে যাবার নিমন্ত্রণ
হ'বে। আমি যখন রোগী দেখব, তুমি খুব
সাবধানে লকলের উপর লক্ষ্য রাখবে। আর
আমি ‘অবিনাশ, এদিকে-এস তো’ বলবামাত্র
আলোটা বেঘন করে পার নিরিয়ে দেবে।
বুঝেছ? আর অংশো নিবলেই আমার পাশে
এসে দাঁড়াবে।”

অবিনাশ—“তবে নাকি তোমার লক্ষ্য
হয় নি?”

আমি—“একটা জিনিষ শেখ। লক্ষ্য
হ'লেই যে লক্ষ্য প্রকাশ করতে হ'বে তার
মানে কি? দেটাকে চেপে রাখতে হ'বে।

কাচপ, ঘুণাকরে লক্ষ্য প্রকাশ পেলেই লক্ষ্য
সাবধান হ'য়ে যাবে। চুপ, কার পারের
লক্ষ পাচ্ছি! বোধ হয় নবাব-সাহেব
আসছেন।”

অবিনাশ—“নবাব-সাহেব?”

আমি—“ধরে নেওয়া গেল আপাততঃ;
যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতে পারা যায় উনি
কোন ‘সাহেব’।”

অবিনাশ—“ইস্কাবনের সাহেব।”

আমি—“চুপ!”

নবাব-সাহেব ঘরে ঢুকলেন। ক্রীন্টা
দরিরে, একটু উঁচু করে ধরে তিনি বলেন—
‘আমুন ডাক্তারবাবু। ডাক্তার দ্বারের
আসবার তো কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।
তিনি এখনও ফেরেন নি। হয়ত বরাবর
এইখানেই আসবেন। রাত্রি প্রায় দশটা
হোলো। আপনি আর কতক্ষণ অপেক্ষা
করবেন?’

আমি উঠে পড়ে বলুম—“নাঃ, চলুন।”
তারপর অবিনাশের দিকে ফিরে বলুম—
‘অবিনাশ, তুমি আমার ব্যাগটা নিয়ে এস।’

নবাব-সাহেব—“ওকে আর কষ্ট দেবেন
কেন? আপনার ফিরতে আর কতক্ষণ
লাগবে? উনি এইখানেই বিশ্রাম করুন
একটু; আমার একজন বেরার। আপনার
ব্যাগ ওপরে পৌঁছে দেব’খন।”

অবিনাশ উঠে পড়ে বলেন—“না-না-তাতে
কি হ'য়েছে? আমিই নিরে যাচ্ছি। আর,
এমন কিছু পরিশ্রম করিনি, যে বিশ্রাম করা
দরকার হ'বে। বিশেষতঃ রোগীর পরীক্ষা
লক্ষ্য করবার জন্যই তো আমি মানে মানে
ওকে টাকা দিই থাকি।”

বলেই, অবিনাশ ব্যাগ তুলে নিয়ে আমার পিছু নিলে। আমরা উভয়েই নবাব-দাহেবের পিছনে পিছনে উপরে চতুর্থ। অবিনাশ extempore (প্রস্তুত না হয়েই) কথা কইতেও শিখছে যে।

উপরে একখানা ঘরের দামনে দাঁড়িয়ে নবাব-দাহেব বলেন—‘একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।’ এই বলে তিনি ঘরের মধ্যে চুকে গেলেন। এক মিনিট পরে দরজার খুঁচ বাড়িয়ে বলেন—‘আজ্ঞন।’

আমরা ঘরে প্রবেশ করলুম। আস্তে আস্তে বিছানার ধারে গিয়ে এক আপাধ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা মুষ্টিতে দেখিয়ে নবাব বলেন—‘ডাক্তারবাবু, এই আপনায় পেশেন্ট (Patient)।’

আমি বিছানার কাছে এগিয়ে গেলুম, অবিনাশ দরজার নিকটে রইলো। দেখলুম সে আলোর সুইচের কাছে দাঁড়িয়েছে।

রোগিণীকে লক্ষ্য করে হিন্দীতে বল্লুম—‘আপুকে হাত দেখলাইয়ে।’

আস্তে আস্তে একখানি হাত বেরিয়ে এলো—নিটোল, নখর, পরিপুষ্ট হাত, রং সুখ-আলতার মতন। ইলেকট্রিক আলোর চেয়ে তার জৌলুম বেশী। শুধু মনি বন্ধের নীচে একটা ছোট্ট লাল জ্বলল। বড়ীর দিকে চোখ রেখে আজুল দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলুম।

এক—ছই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—

হঠাৎ আলো ঝপ করে নিবে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া সবল হাত আমার হুঁটো হাতকে বেন শরীরের সঙ্গে বেঁধে ফেললে। মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপনে ধস্তাধস্তি করতে করতে বলে উঠলুম—‘অবিনাশ, ছাড়।’ তখনই আর এক হাত আমার মূখ চেপে ধরলে এবং সুহৃৎের মধ্যে অতি ক্রিপ্রভাবে কে বেন কামাল দিয়ে আমার হাত ও মূখ বেঁধে ফেললে। আমি মূক-হ’বার জন্তে প্রাণপনে চেষ্টা করতে লাগলুম। একজন

আমাকে পা ধরে টেনে মাটিতে কেলে ধিলে। পড়বার সময়ে হাতের বাঁধনটা খুলে বাওয়ার আমি সুবিধা পেয়ে যে লোকটা আমার পা ধরে টানছিল, তাকে জড়িয়ে ধরে’, এক ঝাপটার মাটিতে কেলে, বুকের উপর বলে তার গলাটা, টিপে ধরলুম। সুখের বাঁধনটা খুলে কেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলুম—‘অবিনাশ!’

কোন লাড়া-শব্দ নেই। আমার হাঁটুর নীচে লোকটা গৌ-গৌ করে উঠলো। আমার ডাকলুম—‘অবিনাশ!’

কোন উত্তর নেই।

আবার লোকটা ধস্তাধস্তি শুরু করলে। এক হাতে তার গলা টিপে ধরে, আর এক হাতে বিছানা হাতড়তে লাগলুম। তখন আমার একটা লক্ষ্য হ’লো। বিছানার উপর নিশ্চয়ই কেউ নেই। আমি একলা একটা লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি, ঘরে আর কেউ আছে বলেও তো মনে হ’চ্ছে না—তবে কি—তবে কি—!

ঠিক এই সময়ে আলো আবার অলে উঠলো। আর, একখানা ঘোঁটার লম্বকে বাগানের বাইরে চলে গেল।

আরে, এ কি! এ আমি কারে চেপে ধরেছি? এ যে অবিনাশ।’

তাড়াতাড়ি লাকিরে উঠে তাকে টেনে তুললুম। সে তখন হাঁকাতো।

হাঁকাতে হাঁকাতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—‘আমার পা ধরে কেলে ধিরেছিলে কেন?’

সেও হাঁকাতে হাঁকাতে বলে—‘তোমার মৃত্যু! ডিটেক্টিভগিরি করতে এগেছে! আমাকে তো তোমার পক্ষে এসে দাঁড়াতে বলেছিলে? আলো নিতে বাবাবাজ তাবলুম আমার কাজটা তগবান করে’ দিলেন। ছুটে তোমার কাছে আলবো, এমন সময়ে কার সঙ্গে আমার খাড়া লাগলো।

তারপর এদিকে ধস্তাধস্তির শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে তোমার সাহায্য করতে বাবো, এমন সময়ে তুমি বাঘের মত লাকিরে উঠে আমাকে কেলে ধিরে আমার গলা টিপে ধরলে। তারপর, তুমি ডাক, আমি আমি গৌ গৌ করি। এইবার আলো জ্বলে দিয়ে আমাদের বোকা বানিয়ে তারা নর পড়লো। আর আমাদের এমন শক্তি নেই যে আমরা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যাই। ওঃ! কি বিপদেই পড়েছিলাম! ইচ্ছা হ’চ্ছিল এক মুহুর্তে তোমার মাথাটা ঠুড়িয়ে দিই—কিন্তু উপায় নেই। এঃ! বেড়নের লক্ষ্যেশের খিঁচ পেয়ে গেছে।’

ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, সব তেরি আছে—কেবল লোকগুলো নেই।

অবিনাশ বলে—‘আচ্ছা, বেঁটারা যে মাল-পত্র কেলে পালাল? এই সমস্ত খাট বিছানা, টেবিল চেয়ার, আলবাবপত্র—এসবের দাম তো কম হ’বে না।’

আমি—‘হ্যাঁ—টাকার দারি খুব কমই দেখা যাচ্ছে। বাক, সময় নষ্ট করে’ আর কি হবে? এইবার একটু তবস্ত করে দেখা যাক কি ফলে।’

অবিনাশ—‘মিলবে একটা বেশ মোলারেম বগুচ্চু।’

আমি—‘বেশ তো, তাই তাগাতাগি করে খাওয়া বা’বে এখন। চল নীচে যাই। এ ঘরে কিছুই নেই দেখছি; শুধু কতকগুলো ছবি, একখানা খাট, মেঝেতে একটা কার্পেট, আর—’

অবিনাশ—‘আর একটা দেয়াল, দুটো আলমারী, একটা ড্রইংরুম সেট, একটা বুক-শেফ—তারপর?’

আমি হেলেনে কেঁদুম। অবিনাশ বড়ই রোগে গিরেছে। দার খেয়ে বেমালায় দার হজম করে অবিনাশ এই প্রথম।

বলু—“তারপর, কিছু না। চল নীচে বাই। কারণ, ওগুলোর মধ্যে বহি ধরা পড়বার মতন কিছু থাকতো, তা’ হ’লে এমন অবস্থার আশাওর এখানে কেলে রেখে নিশ্চিত হ’য়ে তারা নরে পড়তো না। আশাওর বাহোক কোনরকম একটা ব্যবস্থা করে যেত।”

অবিনাশ বলে—“ব্যবস্থা তো আশাওর খুব ভালই করে গিয়েছিল।” হুজনে নীচে নেমে এসুম।

বৈঠকখানার চুকেই প্রথম চক্ষু পড়লো টেবিলটার দিকে। সেখানে একখানা ‘ইন্সট্রাকশন’ আর একখানা চিঠি। চিঠিতে লেখা—“নিজের চরকার তেল দিতে কোন্ বহাপুরুষ প্রথম বলেছিলেন তিনি না, তবে ডাক্তারবাথুকে আমরা সেই পরামর্শ দিচ্ছি। এবারে শুধু সাবধান করে দিলুম মাত্র—এর পর এত সহজে না ছাড়তেও পারি। পরিচয় এবার একটু বনিষ্ট হ’লো না কি? আরও বনিষ্ট হবার আগে সাবধান হওয়াই সম্ভব।”

আমি ও অবিনাশ দু’খানা চেয়ারে বসে হাঁক ছাড়তে লাগলুম।

কিছুক্ষণ পরে অবিনাশ বলে—“কই হে, ওরকম আরও করলেনা?”

আমি—“না। কোন লাভ হ’বেনা। এই চিঠিখানা শুধু রেখে দাও।”

অবিনাশ—“তবু একবার দেখলে হ’ত। তুমি না দেখ, আমিই না হয় একটু দেখি। ঐ একটা রাইডিং হুইপ। কেউ নিশ্চয়ই ঘোড়ার চড়তো। ঐ দেখ একটা বর্ষাতি (Rain-coat) নিশ্চয় কেউ বুট হ’লে ওটা পার দিত। ঐ লোকটার তলার একজোড়া ময়লা এলবার্ট শু, নিশ্চয়—”

আমার চক্ষু জুতাভোড়াটার উপর পড়লো। তাইতো—দেখি।

উঠে গিয়ে জুতা ভোড়াটা তুলে নিভেই,

বলু—“তারপর, কিছু না। চল নীচে বাই। কারণ, ওগুলোর মধ্যে বহি ধরা পড়বার মতন কিছু থাকতো, তা’ হ’লে এমন অবস্থার আশাওর এখানে কেলে রেখে নিশ্চিত হ’য়ে তারা নরে পড়তো না। আশাওর বাহোক কোনরকম একটা ব্যবস্থা করে যেত।”

অবিনাশ—অবিনাশ—চিরজীব বায়ুর হত্যাকারী এবার আশাওর আত্মলেন কীক দিবে পালান।”

অবিনাশের শ্রেব বিজ্ঞপ করা যুয়ে গেল। প্রায় এক লােকে সে আশার পাশে এনে ছাড়ালো। জিজ্ঞাসা করে—“কি—কি দেখলে?”

আমি—“বলেছিলুম না, যে লাবইনস্পেটর-বেলী লোকটা ছাড়া আর একজন সেখানে কোথাও ছিল, আর সেই হত্যাকারী? এই জুতা ভোড়াটা ছেলেমানুষের পায়ের মাপের। সে লোকটাও মাথার ঠাণ্ডা থেকে একটের মধ্যে বলেছিলুম। যখন আমরা সেদিন উপরে উঠি, তখন লাবইনস্পেটর-বেলীকে আমরা দেখেছি। আর একজন লোক আগেই নীচে নেমে এসেছিল। আশাওর দেখতে পেরে, খুব লজ্জা লিড়ির নিচে করলা থাকবার জায়গায় লুকিয়ে পড়েছিল। তারপর, আমরা উপরে উঠে গেলে, সেও বেশ নিশ্চিত মনে নরে পড়েছিল।”

অবিনাশ—“এখানে কোন ছোট ছেলে—”

আমি—“থাকতে পারে; আর, এ জুতো হয়ত তারি’ এই বলতে চাইছ তো? না। তা’ যদি হ’ত তো এ জুতো ছাড়া-যোছা বুদ্ধশকরা বন্ধকে হ’য়ে থাকতো। আর এর হিল দেখু। অনেকটা ক্ষয়ে গেছে—একপাশে বন্ধে পড়েছে বললেই হয়। তাতে অনেক পথ হাটার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

যে বরদের ছেলের জুতো বলে মনে হয়, সে বরদের তত্ত্ববরদের ছেলে অত হাঁটে না—হাটতে পারে না। যদি বল, ছোকরা চাকরের জুতো, তাও নয়। কারণ, চাকরের জুতো বৈঠকখানার সোকার নীচে থাকতে পারে না। আমার মতন ভালমানুষের চাকরেরও সে সাহস হবেনা। না, অবিনাশ,

আশাওর দেখে চুপকালী দিবে হত্যাকারীই, নরে’ পরেছে।”

অবিনাশ—“তা হ’লে নবাব-নাহেব—”

আমি—“নবাব-নাহেব নয় নিশ্চয়। নবাব-নাহেব তো প্রায় হ’কিট মাথার। তবে নবাব-নাহেব বোধ হয় এই হলটার মস্তিষ্ক। লাবইনস্পেটর-বেলী লোকটাও নিশ্চয়ই এখানে ছিল। কিন্তু আশাওর দৃষ্টির বাইরে ছিল—কেন, তা বুঝতেই পারছ। আর এই নবাব নয়ন তট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ নয়। চিরজীববায়ুর পাণ্ডুলিপির বর্ণনাটা একবার মনে মনে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।”

এই সময়ে একটা লোক বৈঠকখানার চুকে। একগাল হেসে বলে—“মশাইরা ভাল আছেন?”

অবিনাশ তেড়ে আক্রমণ করে আর কি। ইজিতে বারণ করে বলু—“আজ্ঞে হ্যা। বহুন।”

লোকটার মাথার উকোকাছো চুলের রাশি, পান খেয়ে খেয়ে হাতে হোপ্ ধরে গেছে—ছুরি দিবে একটু চাচলে ময়লার ও পানের সঙ্গে বোধ হয় ছটাকখানেক উঠে আসে, গারে একটা ময়লা শাট—পিতলের মোতাম পরান, পরশে ধবধবে ধোপধত বৃত্ত, পায়ে একজোড়া অতি জীর্ণ জাপেল। মাথার সে একিট আলাজ হবে, শ্রামবর্ণ রঙ, বেহের গাঁটগুলো তার জামা ফুড়ে বাইরে আসতে চাইছে, চোখজুটো বেন তাড়ুখেয়ে তেড়ে পড়ছে।

লোকটি চেয়ারে বসে, আমার একগাল হেসে বলে—“বেশ ভাল ছিলেন? কোন অসুবিধা হয় নি? কর্তাবাবাকে দেখতে পাচ্ছি না যে? বা যদি বোধ হয় উপরে আছেন? তা’ থাকুন আপনারা। কাল গেলেও চলবে। আর, এখন গ্রীষ্মের ছুটি, আমার ইচ্ছা এখন বসবে না। তাড়া নেই

বিশেষ কিছু। থাকুন—একটা রাজি বইতো নয়? কাল গেলেই চলবে—কি বলেন?”

আমি—“আজ্ঞে হ্যাঁ; তাইতো ঠিক করেছি। তারপর আপনার খবর?”

লোক—“আমি ডায়মণ্ডহারবার থেকে কাল ফিরে আসবো ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘেরী হয়ে গেল। বন্ধুরা ভাঙলেনা, আর তাছাড়া মহিলা ছিলেন তিনজন। তাঁরা আমাকে কিছুতেই ভাঙতে চাইলেন না।” এই বলে একবার সে চুলটা শুষ্কিয়ে নেবার চেষ্টা করলে।

আবার সে আরম্ভ করে—“বাই হোক, আমার ঘোষেই আপনাদের এখানে একদিন বেশী থাকতে হ’ল যখন, তখন আর আজকের ভাড়া বাবদ ১০০ টাকা আপনাদের দিতে হ’বে না। চারদিনের দরুন ৪০০ টাকাতোই হ’বে। কি জানেন?—এখন গ্রীষ্মের ছুটি কিনা—বাড়ীটা খালি পড়ে থাকে। সুবিধা পেলে এই রকম বেশী চরার পাশের একটা ঘরে পুরে রেখে বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দি’। আমার মনিব লম্বোদর লাউ—ঐ যে লম্বোদর সুড়ি—সে এসব জানতেও পারে না। হিঃ—হিঃ—হিঃ! বুঝেছেন?”

আমি—“এসব কথা আমাদের বলছেন কেন?”

লোক—“না; বলবার আর কোন কারণ নেই। শুধু এইটুকু, যে আপনারা বহি আর কখনও, মনে করুন, আমোদ-অহ্লাস করবার জন্তে বাড়ী খোজেন, তো এখানে একবার ঘরা করে’ আগে খোঁজ করবেন; আর, আমার সঙ্গেই কথা কইলে চলবে। লম্বোদরকে বলবার কোন দরকার নেই—এই মাত্র। আর কি কারণ?—আর কিছুই নয়।”

আমি—“আপনার আর কি কি কারবার এখানে চলে? আমাদের সঙ্গেই করবেন না। বুঝতে পারছেন তো—মেরেমান্ন নিয়ে

এখানে এসে উঠেছি আমরা। আমরাই আপনার আশ্রিত।”

লোক—“না—না সন্দেহ কি? কেন হ’বে? আমার এখানে আর কিছুই হয় না—শ্রমচারী পর্য্যন্ত উঠি, তার উপরে খাই না। তা’ একবার বস্তাকে ডাকুন, তাঁর সঙ্গে একবার কথা করে’ নি। আঃ! আপনাদের অগ্রিম ৪০০ টাকা যে আমার কি উপকারে লেগেছে, তা বলতে পারি না। বিশেষতঃ তিনজন মহিলা ছিলেন আমাদের পার্শ্ববর্তী। মহিলার খরচা—বুঝতেই পারছেন তো—আমাদের আবার জল হ’লেই চলে—তাঁদের চাই শেয়ী। অবাক হচ্ছেন? হ’বার কথাই বটে—কিন্তু হবেন না।—আরে মশাই, আমি কি মাষ্টার? আমি লম্বোদরের আন্তঃপ্রাচীর পুরোহিত। আর এটা কি ইন্সুল? এটা লম্বোদরের আন্তঃপ্রাচীর সভামণ্ডপ। হেঃ—হেঃ—হেঃ—হেঃ! হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—আ—আ—আরে বসপরে!”

অবিনাশ চঞ্চল হ’য়ে উঠেছে দেখলুম। ব্যাপারটা বোঝা গেল। এটা লম্বোদর সুড়ির বাগান বাড়ী। লাজান গোছান লবই তার। এই লোকটার উপর বৈশ্যবৃত্তির ভার আছে; আর, এখানে লম্বোদরের একটা ইন্সুল আছে—এ লেই ইন্সুলের মাষ্টার। লম্বোদরের অজ্ঞাতসারে এ এখানে সবরকম কারবারই চালায়। আর, লম্বুর এত বিশ্বাস এই লোকটার উপরে, যে তার গলায় এ যখন ছুরি চালায়, তখন সে চুলকে ঘেঁষার আরাম পায়, আর বলে “বাহবা, তাই বাহবা—আর একটু জোরে।” ইন্সাবনের টেকা’ হল ৪ দিনের জন্তে এই বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ চিরঞ্জীববাবুর হস্তাধীনে তার এইখানে থেকেই সেজেছে।

কাজেই ঐ জুতো জোড়াটা ভাড়া আর কোন স্ত্রী এখান থেকে আবিষ্কৃত হ’বার

আশা নেই যেথৈ বন্ধু—“আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের আর আর সকলে চলে গেছেন, আমরা দু’জনে শুধু আপনার অনুপস্থিতিতে বাড়ী আগলে বসে আছি। তা’, আপনি যখন এসেছেন, তখন আর আমাদের থাকবার দরকার নেই। আমরা উঠি, আপনি একবার উপরে গিয়ে দেখে আসুন সব ঠিক আছে কি না।”

“যে আজ্ঞে। ও ঠিকই আছে—আপনারা মহাশয় ব্যক্তি—ও ঠিকই আছে নিশ্চয়”—বলতে বলতে লোকটা বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

তার পারের শব্দ যখন আর শোনা গেল না, তখন অবিনাশকে বললুম—“অবিনাশ, নাও নাও। জুতোটা একটা কিছুতে মুড়ে শুষ্কিয়ে নাও। ও এখন এসে পড়বে।”

অবিনাশ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ক্রমাল বার করে’ জুতা জোড়াটা বেঁধে নিলে। এদিকে লোকটাও এসে উপস্থিত হ’লো। বলল—“নাঃ—সব ঠিকই আছে। কেবল ওপরের ঘরটা একটু বেগোছ হ’য়ে গেছে। তা’ হোক। আমি সব ঠিক করে’ নেব’ যখন। আপনারা মহাশয় ব্যক্তি আবার বহি দরকার হয়—”

বাধাবিহীন আমি বললুম—“তা’ হ’লে আপনার খোঁজ আগে করবো। আচ্ছা, রাজি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে তা’ হ’লে আমরা উঠি। নমস্কার।

একটা মন্তব্য হাই তুলে লোকটা বলল—“যে আজ্ঞে। নমস্কার।” কিছু ডোনেশন (donation) রেখে গেলে পারতেন। তা’ বা’ক—আবার যখন পারের শব্দো শোনে তখন দিলেও চলবে। নমস্কার—নমস্কার।”

রাস্তার এদে একখানা ট্যান্ডী নিয়ে একেবারে থানার গেলুম। ইন্স্পেক্টর আমার চেনা। তাঁকে ঐ বাড়ীটার উপর একটু নজর রাখতে বলে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

(ক্রমশঃ)



স্ক্রীনটনাথ

“সরস্ব”

গত ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার সুবিখ্যাত আনন্দপরিষদের “সরস্ব” অভিনয় দেখে এলাম। অভিনেতৃগণ সমস্তই নূতন—পুরাতন প্রতিভা-মণ্ডিত অভিনেতৃবর্গের কাউকেই পাছ-প্রদীপের সামনে দেখা যায় নি।

ভূমিকালিপি দেখে তাই আশঙ্কা হয়েছিল, হয়তো নূতন অভিনেতৃগণ আমাদের অশক্তরূপে আনন্দ হান কোরতে পারবেন না, কিন্তু পরিষদের প্রতিভাশালী নাট্যাচার্য্য ত্রিলক্ষীনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের অসাধারণ প্রদোষ নৈপুণ্যে এই নূতন অভিনেতৃগণই “সরস্ব” অভিনয়ে একখানি অতি মিত্র, সুন্দর ও সম্বোধনীয় চিত্র আমাদের চোখের উপর উদ্ঘাটিত করে দিতে পেরেছিলেন। সে রাতে আমরা থিয়েটারের সঙ্গে উপলব্ধি করে এলাম যে সম্পূর্ণ এক নূতন অভিনেতৃসত্ত্ব নিয়েও নাট্যপরিচালনার বলে বর্ষকর্মগুলিকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মস্তমুগ্ধের মত শুদ্ধ করে রাখাও সম্ভব! এই অভিনয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দৃশ্যের কীকে কীকে, নেপথ্য-সঙ্গীত সংযোজিত করা হয়েছিল। ফলে নায়ক ও নায়িকার প্রীতি, উল্লাস, ব্যথা ও বেদনার সূক্ষ্ম সুরধারা এক অল্পপম রসধন মুহুর্তে মুহুর্ত হয়ে উঠেছিল বর্ষকদের চোখের উপর।

নেপথ্য সঙ্গীত অনেক অভিনয়েই শোনা গেছে। লচরচর সে সবকিছুই নায়ক বা নায়িকার মাত্র কল্পনাপ্রসূত একখানা বীণী বা বেহালা দিলে আবহাওয়া সৃষ্টির প্রচেষ্টা

করা হয়। কিন্তু মহাশয় কিন্তু Full orchestra বাজিয়ে প্রীতি-উল্লাস, ব্যথা-বেদনা, নায়ক ও নায়িকার মনের এই দুই aspect ই রঞ্জিত করে তুলে ধরেছিলেন। আমাদের মনে হয় এই experiment সার্থক হয়েছে।

নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পরিষদের আধুনিকতম সভা ত্রিহুধাংগু কুমার। এর অভিনয় হয়েছিল এক কথায় চমৎকার! এর সুন্দর লাবলীল গতি, নাট্যমূলক ভঙ্গিমা মুম্বিষ্ট বাচন, সুসংযত অভিব্যঞ্জনা আমাদের বিশেষভাবে আনন্দ হান কোরতে পেরেছে।

বিশেষ করে দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে আত্মহারা সরস্ব “একটা আশীর্বাদও কলে” ন” বলে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে অল্পট মর্মেভেদী ক্রন্দন।

পঞ্চম দৃশ্যে বিবাহের প্রাক্কালে, মঙ্গল চোপে “ডেকোনা, আমার নাম ধরে ডেকোনা” বলে মিনতি ভিক্ষা এই দু’টি জারগায় অভিনয় এমন ‘নিখুঁত ও প্রাণবন্ত’ হয়ে ফুটে উঠেছিল যে ত্রিহুধাংগু কুমারের অভিনয়কে একেবারে প্রথম শ্রেণীর অভিনয়

বলে অভিনয়িত কোরতে আমরা বিস্ময়াত্মকুর্থা বোধ করি না।

চন্দ্রনাথের অংশে অভিনয় করেছেন শ্রীহিন্দু প্রকাশ বোষ।

এর অভিনয়ও ভাল হ’য়েছে। কতকগুলি দৃশ্য বিশেষ মর্মস্পর্শীও হ’য়েছে, যথা; ১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য ও ৩য় অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য। কিন্তু হিন্দুবাবুর অভিনয়ে একটা বড়ো ত্রুটি লক্ষ্য করলাম, তা হচ্ছে—Personality’র অভাব। ফলে স্থানে স্থানে অভিনয়ের ভেতর এসে গেছে affectation. মন্তব্যটুকু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

এতদ্ব্যতীত সুলোচন, রাখাল ও ব্রজ-কিশোরের অংশে যথাক্রমে ফুটোবাঁধা, প্রণববাঁধা ও চাকবাঁধা অভিনয়ও অতিসুন্দর হয়েছে।

কৈলাস, দয়াল, মণিশঙ্কর, হরকালী প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সু অভিনীত হ’য়েছে।

ছোট ছোট চরিত্র গুলিও মন্দ হয়নি।

হরিবালার অংশে শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু আমাদের একেবারে নিরাশ করেছেন। সরস্বীর গান থানি আমাদের যথেষ্ট আনন্দ হান কোরেছে।

নাট্যরূপ-চমৎকার। এ জন্ত শ্রীতিনকড়ি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

অস্তরালে

(গল্প)

নীতীশ রায়

বেলা পড়িয়া আলিয়াছে। ‘রূপশী’ থিয়েটারের Matinee show-এর আর বড় দেরী নাট। সেখানে ‘ফুলশর’ না ‘রামধনু’ এমন কি একটা বই Play হইতেছে। কঙ্গদিন হইতে লহরে লোকের ভীড়ে থিয়েটার ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে; চায়ের ঘোকানে, খেলার মাঠে, আপিসে, কলেজে লরুজুই এই বইখানির নারিকা সুরূপা অভিনেত্রীটির লোককে হাসাইবার অদ্ভুত ক্ষমতার কথাটাই সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহাকে লইয়া লহরে এতখানি কলগুজন চলিয়াছে, সে তখন বৈকালিক প্রসাধন শেষ করিয়া সুস্থের বড় আয়নাটায়, আকাশখানির প্রতিকলিত ছায়ার দিকে অপলকচোখে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, সেই জানে। হঠাৎ বাহিরের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া লম্বত হইয়া বসিতেই, হাসিমুখে বি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পিওন ছোকরা চিঠি নিয়ে এল মা, ছোড়া বলে, একখানা পাশ দিয়ে ছাওনা কালাদিদি। বহুদূর, খুশীর খবর যদি থাকে চিঠিতে, দ্বিধামণিকে বলবখন। একগাল হাসিয়া বি চলিয়া গেল। থিয়েটারে নামিয়া পর্দাস্ত আর যে বস্তুরই অভাব থাক্, চিঠির অভাবতো ছিলই না বরং আতিশয্যের ছারার মন অহরহ পালাই পালাই করিতেছিল। কত না মিনতি কত না স্ততি, কত না গুজন। কেহ তাহার রূপ দেখিয়া মরিয়াছে, শুধু একটা দিন চোখ তরিয়া দেখিতে চায়, কেহ বা তাহার

যৌবনমত্তা স্তম্ভুটিকে শান্তরঙে চিরদিনের জন্য বাধিয়া রাখিতে উৎসুক, কেহবা তাহার অনবজ্ঞানির ভঙ্গীটির জীবন-নির্ধারণীর উৎসটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কৃতসঙ্কর, আর কেহবা তাহাকেই মানে, তাহার রূপ-যৌবন সম্পন্ন দেহটার জন্য অর্থ, যশ, মর্যাদা সবকিছুই জলাঞ্জলি দিতে মনে মনে পণ করিয়াছে। রক্তাধরুটী হাসিতে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল; অল্পমনস্কভাবে খামখানা ছিঁড়িতেই একদা অপরচিত একখানি হাতের এই কালো অক্ষরগুলি একপাল লাপের মত কিলবিল করিয়া উঠিল। যে পৃথিবীটার সঙ্গে পরিচয় সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, যেখানে ফিরিবার সব পদগুলিকেই চপারে মাড়াইয়া শেষ করিয়া দিয়াছে, সেখান হইতে বিবহ লগ্নে হারাইয়া ফেলা একটা লোক আজ তাহাকেই স্মরণ করিয়াছে। মাত্র একজু লেখা, ‘তোমাকে খুঁজিয়া পাইয়াছি, কিন্তু আমাকে আর তুমি খুঁজিয়া পাইবেনা।’

মস্তিস্কের কোষে কোষে যেন তুড়ির ফুলঝুরি ছুটিয়া গেল; বিস্তৃত বহুদূরগত বচ-দিন-রাত্রির কত না কথা, কত না ইশারা, সমস্ত চেতনা অবচেতনার মধ্যে হাপাহাপি করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, আজিকার এই পথচারিণী অভিনেত্রী এক-দিন পুরবালিনী নারীই ছিল; সে কবে, কোথায়, একথা হয়ত আর কেহই জানিবেনা, কিন্তু সেতো তাহা ভুলিতে পারে না। সে-দিন তাহার অর্থ ছিল না, না ছিল যশ, কিন্তু বাঁচা ছিল, সে বস্তুকে এ জীবনে আরতো

সে খুঁজিয়া পাইবে না, পরবর্তী জীবনেও সে পাইবে এমন তপস্বী তাহার কী বা আছে। বরং বরং করিয়া আরত চকুটী দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, ‘ওমা! দ্বিধামণি কাঁদতে বসেচো, এখুনি যে থিয়েটারের গাড়ী আসবে—’ অপ্রত্যাভিত মুখখানি তুলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিতেই, মুখের উপর মেঘ ও রৌদ্র খেলিয়া গেল। ধরা-গলায় বলিল, তাইই বটে! আমার বেছাই আবার হাসিরই পাট’ তুলিতরিয়া Powder তুলিয়া মুখে লাগাইয়া দাঁড়াইতেই, দরজায় গাড়ী আলিয়া থামিল। লম্বুদৃষ্টিতে গাড়ীতে উঠিয়া গুন্ গুন্ শব্দ করিতে করিতে থিয়েটারে আলিয়া পৌছলি, অপেক্ষমান Manager-এর সঙ্গে একটা কথা বলিতে না বলিতে, ঘণ্টা পড়িল।

শান্তসহস্র বর্ষকের দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইয়া সম্মিতমুখে অভিযান কুড়াইল। ঘটায় পর ঘণ্টা হাসি পরিবেশন করিয়া থিয়েটার শেষ করিয়া যখন পা বাড়াইল, তখন একজন গোলগাল, হাসিমুখ শ্রোতৃবর্গের ভক্তলোককে সঙ্গে লইয়া Manager নামনে দাঁড়াইলেন। ভক্তলোকটা বলিলেন, আপনার মত এরকম genuine Play, আমি খুব কমই দেখেছি—এইতো অভিনয়, এ হাসি ধার করা নয়, জোর করা নয়—

বোধকরিবা তিনি সমালোচক শ্রেণীর একজন হোম্‌গ-চাম্‌রাই হইবেন। মাথা হেলাইয়া লহাসুখে জবাব দিল, আমার অভিনয়, যে আপনাকে বিরক্ত করেনি, এতে আমি যথার্থই সুখী—

কি যে বলেন।

যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। কালই

হাকিম এম.এস. ডামানোর

কস্তুরীপিল

ধাতুদৌর্বল্য ও শক্তিরীক্ষা চিরন্তনে
আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ টাকায়
৪২ নং ধর্মতলা ট্রাট কলিকাতা

একটা তুলনামূলক সমালোচনা লিখব—'

—ধন্যবাদ—

Camera হাতে একজন সুসজ্জিত, ফিট-ফাট যুবক অগ্রসর হইয়া বলিল, আপনাকে বিরক্ত করছি—মাপ করবেন—আমি 'আলো-ছায়া' কাগজের ভরফ থেকে ছবি নেবো আপনার, খুব কি অসুবিধে হবে?

—অসুবিধে? কিছু না—

—এক মিনিট কষ্ট দেব—আচ্ছা একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না, Stage-এ প্রথম এলে যেমন ছাড়িয়েছিলেন—ম'নে যুখ থানা এখন একটু ভারী দেখাচ্ছে—

—ও হাসতে হবে!

—exactly... O. K. হয়ে গেছে—

গাড়ী বাড়ীর দরজায় আলিয়া পড়িল, পোষাক বদলাইয়া সাঁবা আটপৌরে একখানা সাড়ী পরিয়া, আলো নিভাইয়া বারান্দায় একেবারে আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল; রাত্রি প্রভাতের কুলে ক্রতগতিতে চলিয়াছে, শরতের নীলাভ আকাশ তারায় তারায় জলিয়া উঠিতেছে, কি জানি কেন অকারণে মন তাহার খারাপ হইয়া গেছে। এত আলো, এত সমারোহ, সহস্র প্রশংসার কলগুঞ্জন, সহস্র দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি, সহস্র নটনটীর শ্রদ্ধা কিছুই আজ তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিতেছে না; বহুদিন আগেকার যেন একটা পুণ্য বাধা আবার তাগিয়া উঠিয়া দীর্ঘকালে বুকখানাকে ভাসিয়া দিতেছে। চোখ দিয়া জল গড়াইতেছে, এমন সময় লম্বাধকপে কখন যে Manager তাপস সেন পিছনে আলিয়া দাঁড়াইয়াছে কিছুই সে জানিতে পারে নাই। "একি! তুমি...তুমি কাদছ?" চম্কাইয়া উঠিয়া চোখের জল না মুছিয়াই সে বলিল, 'আমাদের কি নিজেদের হাসিকারো কিছুই নেই?' থিয়েটারের জগতে একমাত্র এই তরুণ


ম্যানেজারটিকে লতালতাই সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কি জানি কেন এই লোকটার স্বপ্নাতুর চোখটীর দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইত, থিয়েটার তাহাকে মানায় না; তাহার উচিত ছিল কবিতা লেখা, না হয়তো লোকে যাকে বলে মহত্তর প্রতিষ্ঠান, সেবাশ্রম, শিশুসেবন এমন একটা কিছু করা। কোটা কোটা স্ত্রীর ভেঁড়ে এই একটা মাত্র লোকের মুখ হইতে কখনও একটা কামনার গুঞ্জন কেহ শোনে নাই। তাপস ব্যথিত চোখটী তুলিয়া কহিল, হাসি কান্নার হিসাবের খাতা সবাই আঁছে জানি, তবু তুমিও কাদতে পার, তোমারও কাদবার প্রয়োজন হয়, এমনটা আমি ভাবিনি।" মেয়েটা তাপসের একেবারে কাছে আসিয়া হাঁড়াইল, বলিল, 'তাপসবাবু আমাদের জীবনের সবগুলো দিনরাত্রি নিজেদের বাজ করেই কাট্টে, যখন চোখ দিয়ে জল গড়াইতেছে, তখনই হচ্ছে কাসতে, আবার যখন মন অকারণ খুশীতে রাজা খেলুনের

মত উঠছে কুলে, তখনই কেলতে হচ্ছে চোখের জল—কী বরাত!

—তাহাই বটে।

তবু ছুটি নরনারী নক্ষত্রজ্বলিত আকাশের নীচে যুক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল আর চন্দ্রনকারই মনে হইতে লাগিল, যে জীবনের বাত্মপথে নিজেকে তুলাইবার জন্ত, পৃথিবীর সকলের ভাল লাগাইবার জন্ত কত না খেলা, কত না ঝগ, কত না হাসি, আর কত না চোখের জলের ঢালাফেলার প্রয়োজন হয় জগতের সবাই যেন সুখোঁস পরিয়া চলিয়াছে... প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দের মধ্যে বেদনা বাসা বাধিয়া আছে। এমনই নিশ্চক্ৰনিশীথে তারাতারা আকাশের তলায় আত্মার একেবারে সাম্না সামনি দাঁড়াইতেই সকল আবরণ, সকল চম্পবেশ খুলিয়া পড়িয়া যায়, আর বাঁধাবর মন আত্মনির্ভর করিয়া উর্দ্ধ্বাসে ছুটিয়া চলে.....

ফোন ২৭৭৪



বড় বাজার

গোপী অমৃত লাল কুমার

কাঠের জাট

কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারত অয়েল মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩ আগার সারকুলার রোড, কলিঃ

শরৎচন্দ্র

ক্রীমেসেন্দ্র লাল রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই আমার প্রথম সঙ্গীত শেখা জীবনে। রাজ্জামা যখন যোগ করিতে আরম্ভ করেন তখন বাটাস্ত সকলের নিকটে “পাগল” বলিয়া না ডাকে কিন্তু তাও অব্যাহতি পান নাই—ভগবানে বিশ্বাস ছিল ডাক্তারীতে বিশ্বাস ছিল ন—অদ্ভুত খাপছাড়া’ মামুষ।

আমার মেজ মাতুল শরৎ চন্দ্রের “মেজদা” ৬নং নং মজুমদার এণ্টাঙ্গে ২০ টাকা বৃত্তি পাইয়া—T A পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় স্থান অধিকার করিয়া কেয়ার দান মহাশয়ের সহিত এম্-বি পাশ করেন। শুভিত্ মেডেলিষ্ট ছিলেন ডাঃ দীল রতন সরকার, ৬মুর্শে ভট্টাচার্য্য প্রকৃতি বিখ্যাত ডাক্তার তাঁহাকে (Genius) বলিয়া মনে করিতেন, তিনি পুন্সর ঞ্জপথ গাহিতেন। তিনি যে স্থানে বেঙ্গী প্র্যাক্টীশ হইত সেই স্থান হইতেই পালাইতেন। শেষকালে তবানীপুরে ডাক্তারী করেন বেঙ্গী ডাক্ হয় বলিয়া ৩২, ৬৪ টাকা Fees করিয়াছিলেন। বাহাতে লোকে নির্যাত্ত হইলেও আমার মাতৃদেবী ও আমার ৮ পিতৃদেব রাজ্জামাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। রাজ্জামার গ্রাম অতো মধুর বাংলা গান আমি তো শুনি নাই, আমার বড় মাতুল ৬মজীতচার্য্য রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, আমার মণি দাদা বিনি একজন অতি উচ্চাঙ্গের বেহালা-বাদক ও Painter ও সুকণ্ঠ এবং আমার কৃষ্ণ দাদা তিনিও এক জন অতি সুগায়ক সকলেই বলিয়াছেন যে, রাজ্জামার জ্ঞান অতো মধুর কণ্ঠ বড়ই কম শোনা যায়—। এই

বাটীতেই আদমপুর রাস্তার বৈঠক বলিত, এই ক্লাবের অভিনয়ে Helior পাঠ গ্রহণ করিতেন আমার মেজ মাতুল। শরৎচন্দ্র, রাজ্জামা ও মজুমদার বাবু মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করিতেন—। পৌরাণিক নাটকে যুগল মিলনের সময় শরৎচন্দ্র ও রাজ্জামা আমাকে অনেক ভূলাইয়া নাকে ন’লক্ পরাইয়া রাখা লাজাইয়া ধোলনার তুলিয়া দিতেন। শরৎচন্দ্রও রাজ্জামার গানের লব্ধে বলিয়াছিলেন “কী-গান—পাগলিনীর গান” “আমার পাগল বাবু, পাগলী আমার মা” তোমার মা মা যা গেয়েছিল মনে বৈরাগ্য এনে দেয়—তার নিজেরও বৈরাগ্য এলেছিল এই গান গাওয়ার পর থেকে—মামুষ ছিল না যেমন—দেবতা—দেবতা” ... !

রাজ্জামা যে সময়ে যোগ করিতে ছিলেন—সে সময়ে অনেক অদ্ভুত ইচ্ছা তাঁহার প্রকাশ পাইত। এই ইচ্ছা প্রকাশের নিমিত্ত বড়ই নির্যাত্ত হইতেন। রাজ্জামা এই অবস্থাতে আমাকে কাঁধে করিয়া (দৈহিক শক্তি তাঁর অদ্ভুত ছিল) লম্বা সড় বেড়াইতেন, ও জিলিপী খাইতে দিতেন। ব’দ ও আমার তখন কাঁধে চড়িবার বয়স অতিক্রম করিয়াছে লজ্জাও করিত, কি করিব কাঁধে চড়িতাম—ও গরম পশ্চিমে টাটকা জিলিপীর লোভও কম ছিলনা ও সে যে কী লোভ তাহা বাহার। পশ্চিমের জিলিপী না খাইয়াছেন অনুভব করিতে সক্ষম নহেন। আমি ব্যতীত সে তাঁহার স্রাতাঘের পুত্র বজ্রা ছিল না তাহা নহে। তবে কেহই এক “পাগলের” হাতে ৩, ৪ ঘণ্টা পুত্র বজ্রা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত

ছিলেন না। রাজ্জামার সহিত সেই সময়ে এক যুবককে প্রায়ই দেখিতাম রাস্তার। তিনি আমাদের বিশ্ব বরণ্য শরৎচন্দ্র।

ক্রীকান্তের “অখখ” গাহ আমাদের ডাঙ্গলপুরস্থ বাটীর পশ্চাতে গঙ্গার উপরে। এই গাছের তলা, ভীষণ পাড়, ও জটীর জায় গাছের শিকড় গঙ্গার মধ্যে নাবিয়া গিয়াছে এই সব দৃশ্য আমার নিকটে বিশেষ প্রিয় ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে আমি ছেলেবেলায় অসম্ভব ছুট্ট ডিলাম, গঙ্গার ধারে কাকড়ার গর্ত লাপের গর্ত এ সবের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল আমার রাজ্জামা সেই কারণেই বোধহয় আমার এতো ভাল বাসতেন।

এই অখখ গাছের ছুট্টো মোটা ডালের উপরে রাজ্জামার এক কাঠের ঘর ছিল একটা ছোট পাখীর জায়-ঘরের মেজে ছিল ঠিক পাখীর মতন খুব মোটা বেত দ্বিযে বোনা ও কিঞ্চিৎ নীচে ছুট্টো গাছের ডালের ব্যবধানের মধ্যে মোটা কাঠ ছিল। ঘরটি ঠিক গঙ্গার উপরে ডাল বাহিয়া বাইতে হইত। গঙ্গার গর্ভে বলিলেই হয় ঐ ঘর।

এই ঘরেতে কখন রাজ্জামা কখনও শরৎচন্দ্র আমাকে অতি সতর্কতার সহিত এক প্রকার কোলে করিয়াই লইয়া বাইতেন। এখানে রাজ্জামা ও শরৎচন্দ্রের দুই তক্ত শিয়াকেও দেখা বাইত—আমার আর দুই মামা মণীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার। আমি শরৎচন্দ্র ও রাজ্জামার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মস্বায়ের খাটিতাম। যথা শরৎচন্দ্র ও রাজ্জামার নিমিত্ত চা, কখনও বা লুটী, বেগুন তাজা, কখনও বা জিলিপী সব মাক্-হেবীর নিকট হইতে লইয়া বাইতাম। ঘরের

মধ্যে ছিল বাঁশী, Clarinet ছোট হারমনিয়াম, কিছু বই ও বন্দুক ও নীচে সবা সর্ব্বদা একটা ডিলী বা ছোট নৌকা বাধা থাকিত। যতদূর মনে আছে আমি এই ঘরে শরৎচন্দ্রকে মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতে দেখিয়াছি। বোধহয় এই স্থানেই শরৎচন্দ্রের লিখিত রাজুমাঝার মাছ চুরীর জলপনা রচনা চলিত। কখন কখন শরৎচন্দ্র একাকী ডিলী লইয়া বাহির হইতেন নদীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে।

সে দিন রাজুমাঝা নিজের বাড়িতেই “পাগল” বলিয়া বিশেষ নির্যাত্তিত হইয়া গীতার কথা বলিতে বলিতে গৃহ পরিত্যাগ করেন ও ভুট্টার ক্ষেত্রে দিকে পলায়ন করেন তখন আমি ব্যাকুল হইয়া লজল নেত্রে এই শরৎচন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরি—তখন তো আমার আর কেহ সহায় ছিলনা লকলের কাছেই সে রাজুমাঝা পাগল—। শরৎচন্দ্র আমার আশ্রয় দিয়া রাজুমাঝার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন। আমিও ছুটিলাম, ছেল-মাছ ভুট্টার ক্ষেত্রে গাঁজ ভুট্টার পড়িয়া গেলাম—আমার আর এক মাতুল লজোড়ে চণ্টোখাত করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন—মা হোতালার বারান্দার ছাড়াইয়া কাঁধিতে—হেন আমাকে জড়াইয়া কাঁধিতে লাগিলেন আরও একবার কেবল বলিলেন “ল্যাড়া” গিরেছে হয় তো কিরিয়ে আনতে পারবে—“ল্যাড়া” আর কেহই নহেন—শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র যে রাজুমাঝাকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই এর জন্ত তাঁহার হৃৎক যে কী গভীর ছিল তাহা তিনি বহুদিন পরে ভাগলপুরে এক দিন গঙ্গার ধারে আমার বলিয়াছিলেন। তাঁহার সেই করুণ মান মুখ সাক্ষ্য আকাশে আজও বিস্তৃত হইতে পারি নাই।

রাজুমাঝা হয় তো জীবনে কিরিয়েন না আর কখনও। হয় তো হিমালয়ে বা অন্ত

কোথাও আজ সাধনার ব্যাপ্ত আছেন বা পরলোকে গিয়াছেন।

যদি কোন দিন “ক্রীকান্ত” পাঠ করিবার তাঁহার সুযোগ ঘটয়া থাকে তাঁহার প্রিয় বরদী বালাবজুর অমর লেখনীকে তিনি নিশ্চই প্রকার লিখিত গ্রহণ করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল

তাঁহার পর বয়োবৃদ্ধির লিখিত ও ইঙ্গুল ও কলেজে পাঠের সময় শরৎচন্দ্রকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ নাই। কলেজে পাঠের সময় দ্বিজেন্দ্রলালের বাটীতে ৮শ্রমখ নাথ ভট্টাচার্য্যের (সুবিখ্যাত অভিনেতা, বিখ্যাত নাটক ক্রিয়োপাট্টার নাট্যকার) নিকটে শরৎ চন্দ্রের কথা শুনি। তিনি বলেন যে শরৎচন্দ্র আমাকে খুব চেনেন। শরৎচন্দ্রকে লাহিত্যে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত মূলতঃ দ্বারী প্রদেয় সুরেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ৮শ্রমখ নাথ ভট্টাচার্য্য। ভারতবর্ষের শরৎ-অমরাগী সম্পাদক ও প্রদেয় হরিদাস ও সুধাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বাটীতে শরৎচন্দ্রের কথা শুনি। দ্বিজেন্দ্রলাল বড় বরদী রসিক ছিলেন—তিনি “রামের স্মৃতি” পাঠ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। আমাকে বলিয়াছিলেন “এতো দিন পরে দেখছি এক সত্যিকারের Genius এলো—বৈচে থাকলে লাহিত্যে হস্তস্থল বাধাবে” “হলস্থল” সে বাধাইয়াছিলেন তাঁহার লক্ষ্য নাই। প্রলভ্যাত মহাশয়ের কথা শুনিয়া মাতৃদেবী বলেন—“ও আমাদের ভাগলপুরের ল্যাড়া—রাজুর বিশেষ বন্ধু” তখন সব মনে পড়িল।

প্রায় একশ কি বাইশ বৎসর পূর্বে ভাগলপুর লাহিত্য পরিষদে শরৎ লব্ধনা—।

পূর্ব্বোক্ত সময়ের পর ১৯১৩ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। আমরা তখন

ভাগলপুরে কিরিয়া গিয়াছি। পিতৃদেবের কলিকাতা হাইকোর্টে পশার হইলেও শরীর এমন ভাঙ্গিয়া যায় যে তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সেই সময়ের কিছু পরে আমি বি, এ, পাশ করিয়া ইঙ্গুলে শিক্ষকতা করি ও এম-এ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হই। পরে কর্পোরেশনে আমি। শরৎচন্দ্রের নিজের মাতুল পরিবারের লিখিত আত্মদেহের বিশেষ পরিচয় ছিল না—তবে “দূর” সম্পাদকীয় মাতামহ ও মাতুল সম্প্রদায়ের লিখিত ৮অধোদ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্রগণ ৮মনীন্দ্র নাথ, সুরেন্দ্র নাথ, ৮গিরীন্দ্র নাথ ও শরৎচন্দ্রের আর এক মাতুল লাহিত্য লম্বাজে বিশেষ পরিচিত প্রদেয় উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত আমার পিতৃদেবের ও আমার মাতুলদেহের ও আমাদের বিশেষ বনিষ্ট পরিচয় ছিল। পিতৃদেবের লিখিত গঙ্গুলী পরিবারের লাহিত্যিক যোগ ছিল। তাঁহার পিতৃদেবকেই অবলম্বন করিয়া ১৩১১ সালে ভাগলপুর লাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ের এই ভাগলপুর লাহিত্য পরিষদের যুগ্মসদ্যঃ সম্পাদক ছিলাম আমি ও ক্রীতচরণ ঘোষ—(এখন রায় সাহেব চণ্ডীচরণ ঘোষ-এম-এস-লি-বি-এল-উকীল) সুরেন্দ্র বাবু ছিলেন সম্পাদক ও পিতৃদেব...৮প্রদেয় লাল রায় ছিলেন সভাপতি।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

চন্দ্র

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের মুখে তুলিলাম যে শরৎচন্দ্র আসিতেছেন বহুদিন পরে। আমাদের কী আনন্দ। শরৎচন্দ্র আসিলেন। শরৎচন্দ্রকে ছায়ার জায় অনুসরণ করিলাম— তাঁহার লিখিত গল্প, নৌকার বেড়ান, গজার ওপারে বালুর তটে নগ্নপথে শরৎচন্দ্র ও আমরা অনেক বেড়াইলাম—পাখী শীকার লবই হইল। আমাদের ইচ্ছা শরৎচন্দ্রকে লক্ষ্যনা দি। পিতৃদেবকে বলিলাম। তিনি বলিলেন “নিশ্চয়ই—শরৎকে লক্ষ্যনা দেওয়া উচিত—আমিই তোমাকে বলবো তাবুছিলাম।” সুরেন্দ্রনাথের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন “লক্ষ্যনা দেওয়া তো উচিতই তবে আমি শরতের বামা আমার Position বড় delicate আমি তো একেত্রে কিছু করিতে পারি না। তুমি ও চণ্ডী বাহা হয় ক’রো।” উপেক্ষা নাগ গোলাপাখারও ঐ কথাই বলিলেন। লক্ষ্যার সময় ক্লাবে জন্ননা করনা করিতেছি। ক্লাবের অনেকেই কিছু interest লইতেছেন না আর জন কয়েক পরিবহের লভ্য (পছন্দ ব্যক্তি) বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন। সে প্রায় একশ বাইশ বৎসর পূর্বের কথা তখন শরৎচন্দ্রকে অনেকে হুচক্ষে দেখিতেন না। জন কয়েক লভ্য বলিলেন শরৎচন্দ্র মূল পরিবহের লভ্য নহেন শাখা পরিবহ লভ্যর এ বিষয় বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া লভ্য নহে, আমরা লুপ্ত প্রতিজ্ঞ লক্ষ্যনা দিবই—রাজে গিয়া পিতৃদেবকে বলিলাম। তিনি বলিলেন Notice issue করে যাও—when I am the President my order is final—”

Notice issue করিয়া দিলাম কিন্তু প্রবন্ধ কে পাঠ করিবে—আমি অবশ্য প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারিলাম কিন্তু আমি গান করিব আবৃত্তি করিব আবার প্রবন্ধ পাঠ করিব ইহা অশোভন হয়। প্রবন্ধ কেহই লিখিতে অগ্রসর হয় না। এলব লক্ষ্যে

সুরেন্দ্রনাথ অনেকবার আমাদের রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু এবারে তাঁহার “delicate position” বহা বিপদ, এক দিনের মধ্যে কেহই প্রবন্ধ লিখিতে চাহেন না—পিতৃদেব বলিলেন “বক্তৃতা করিব”—আমি বলিলাম “তবে কে প্রবন্ধ লিখিবে?” তখন প্রায় রাজি হইল। পিতৃদেব বলিলেন “বা সুরেনকে বল—সে লিখিতে পারবে।”

রাজি প্রায় লাড়ে হুশটার উপস্থিত হইলাম বড় মাতুল ৮য়ার বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার লজ্জাচার্য্যের নিকটে তাঁহাকে গানের কথা পূর্বে বলিয়াছিলাম এই শরৎ লক্ষ্যনাতে। তিনি বলিলেন “আচ্ছা লিখবো এই বসলাম লিখিতে—শরতের ওপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে অতো বড়ো genius”। তার পর দিন লভ্যালে

বি, মামা এও সন্মের কল্লেকটা আশ্চর্য্য গুণনিশিষ্ট মহোষধি :

কিওলিট-সালসা

বর্তমান যুগে ইহাই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট মহোপকারী সালসা। রক্তপরিষ্কারক, বল, শক্তি ও ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক। পারদ ও উশনংশ বিবনাশক। ক্ষুধারতা স্মারকিক ও বাতু দৌর্জল্য রোগে, নষ্ট স্বাস্থ্য, বাবতীয় জী রোগে এবং বহুপুতান ও জটিল রোগ সমূহে একমাত্র মহোপকারী। কোন বাধাধরা নিম্নম নাই—সকল ক্রতুতে সেবন করা যায়। মূল্য দেড় টাকা, মাণ্ডলাদি সহ ২।০।

ইলেক্ট্রো-গোল্ড-কিওর

জীবনী শক্তিবর্দ্ধক ও নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারক। শ্রায়ু দুর্বলতা, অক্ষমতা, অবশ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রোগের অবার্য বলকারক ঔষধ। ছাত্রদিগের স্মৃতিশক্তি, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধি মানসিক প্রকৃতি, স্মারকিক উত্তেজনা বৃদ্ধিকরে; ছাত্র ও ছাত্রী জীবনের একমাত্র পরম সহায়। মূল্য দেড় টাকা, মাণ্ডলাদি সহ ২।০।

“গগোরা-বাম”

পিল (বটিকা) বা মিক্চারঃ
অসহ্য জ্বালা হ্রস্বা লাঘব হয়। জীলোকদিগের শ্বেত ও রক্তশ্রদর প্রভৃতি আরোগ্য হয়। অল্প সময়ে অসহ্য জ্বালা হ্রস্বা লাঘব করিতে এবং রোগ সমূলে নির্মূল করিতে ইহার জায় আশ্চর্য্য আন্তঃকলপ্রদ ঔষধ অত্যাগি আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই ঔষধ, মিক্চার ও পিল দুই রকমের পাওয়া যায়, উভয়েরই মূল্য প্রতি শিশি দুই টাকা; মাণ্ডলাদি সহ ২।০।

ইপানি এজমা-সিরাপ

ইপানি ও ষাসরোগের অবার্য মহোষধি। এক হুটার ইপানি রোগী মৃত্যুসম বস্ত্রণা হইতে অবলীক লাভ করে। নূতন পুরাতন সর্বপ্রকার লক্ষণ ও উপসর্গ বিশিষ্ট ইপানি, দম, ষাসরোগ এবং বাবতীয় ফুসফুস ও ষাসনলীর প্রদাহ, ব্রকাইটিস, হপিকক প্রভৃতি রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইপানির প্রথম টানের সময়ে ষাসপ্রদাহের মৃত্যুসম বস্ত্রণার একদাগ মাত্র সেবনেই রোগ দূরীভূত হইয়া রোগী সুস্থ হয়। মূল্য দেড় টাকা; মাণ্ডলাদি সহ ২।০।

বি, মামা এও সন্ম

এজেন্টস্ :-এন্, ভট্টাচার্য্য এও কোং

(মামা মেডিকেল হল)

১০নং, বনকিডল লেন, কলিকাতা।

৪নং, গুলু ওস্তাগর লেন,

(পোষ্ট বক্স নং ১১৪০২) কলিকাতা।

বেশি প্রবন্ধটা হাতে করিয়া পিতৃদেবের নিকটে মাতুল আনিয়াছেন ও প্রবন্ধ মাতুল পাঠ করিতেছেন। আমি তখন মার কাছে ও দ্বীপ নিকটে একশো পেরালা চাতে কত চিনি লাগিবে তাহাই ঠিক করিতেছিলাম। মার কী উৎসাহ শরৎ-চন্দ্রকে লব্ধকনা করা হইবে। পিতৃদেবের ঘেঘ মস্তে ডাক আনিল “ঘেঘেন” ছুটীলাম নীচে পিতৃদেবের ঘরে। বড় মাতুল বলিলেন “ঘেঘো ঘেঘেন, আমি তো এ পড়তে পারবো না, এর পরেই গান ক’রতে হ’বে—তুমিই প’ড়ো—”। আমি বলিলাম “হা নে আর কি শক্ত কাজ”—পিতৃদেব হাসিয়া বলিলেন “শ্রেমসুন্দরকে ব’লো না ‘পড়তে’” তখনই ছুটীলাম মাঠার মশার ডাঃ শ্রেমসুন্দর বহু এম-এ-ডি-লিট্ পি-এইচ-ডিএর কাছে কলেজের সকলেরই শ্রদ্ধা-ভাজন ও দর্শনের বিশেষ নামজাদা অধ্যাপক। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্মত হইলেন। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্রের লিখিত রাস্তার বেধা তিনি বলিলেন “এ লব্ধকনা বেওয়া কেন ঘেঘেন—কি বরকার?—এটা বন্ধ ক’রলে ভাল হোত”। আমি অনেক তর্ক বিতর্ক করিলাম শরৎচন্দ্র শেষে হতাশ হইয়া বলিলেন “নেহাংই কথা শুনবে না বাও—ভালোবালো”। সাহিত্য পরিষদে তাঁহাকে লব্ধকনা বেওয়া লব্ধকে বিব্রত মতও বধন তাহা হরতো শরৎচন্দ্র জানিতেন লব্ধকনা বেশ হইল। প্রথমে আমি গাহিলাম দ্বিজেন্দ্রলালের গীত “জননী বঙ্গ ভাষা।” তৎপরে পিতৃদেব পরিষদের সভাপতি হিলাবে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন ও সুন্দর বক্তৃতা দেন। তাহার পর শ্রেমসুন্দরবাবু মার বাহাছর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ “শরৎ প্রতিভা” পাঠ করেন তাহার পর আমি এক আবৃত্তি করিলাম। শরৎচন্দ্র পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইলেন।

তৎপরে শ্রদ্ধের চাকচন্দ্র বহু এম-এ-বি-এল সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত শ্রীঅনাথনাথ বহুর পিতৃদেব ও তেজ নারায়ণ জুবিলী কলেজে পঠদণ্ডার শরৎচন্দ্রের অধ্যাপক, শরৎচন্দ্র লব্ধকে সুন্দর মারগর্ভ বক্তৃতা দেন। শরৎচন্দ্র বক্তৃতায় বলেন যে ভাগল-পুরে তাঁহার বিদ্যারম্ভ। পাঠও শেষ হইয়াছে এই স্থানেই। তিনি আজ বিশেষ আনন্দিত যে তাঁহার অধ্যাপক শিক্ষক সব শুক্ল স্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাকে এই সম্মান দিলেন। এই সভাতে যিনি আজ তাঁহার জন্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তিনি শুধু মজীতচাখী বা পব্ধ হাকিম নহেন তিনি বাংলার কথা সাহিত্যে হস্ত রদের গল্পের রাজা তাঁহাকে আজ বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন। শরৎচন্দ্র নিজের গলায় পুষ্পমাল্য সুরেন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া প্রণাম করিলেন। শেষে শরৎচন্দ্র বলিলেন সাহিত্য সেবার জন্ত আমি ভাগলপুরের কাছে বিশেষ ঋণী। সভার বেশ জন লম্বাগর হয় পরিষদের “পব্ধ” ব্যক্তি বাহারা পরিষদের সভ্যদিগের মধ্যে বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে আশিয়া সভার বোগদান করেন। তৎপরে মাতুলের গীত আরম্ভ তখন সভা মজলিলে পরিণত হয়।

(জমশঃ)



মাস্তা ও মোহ শ্রীহিম্মাল কুমার শিলী

‘পনের বছর বয়স তাহার—

বস্তী পাড়ের ঘরে—

বড়ো বড়ো কৌকড়া চুলে

মুখটা আছে ছেয়ে।

উদানী তার মুখের পরে

করুণাতার হাসি—

রোজ সকালে তিকা তরে

ঘারে দাঁড়ায় আলি।

বাংল্যা কোন মেহ আগে

চেয়ে তাহার পানে—

কোন মে মায়ার হৃদয় আমার

লিঙ্গ ক’রে আনে!

(তার) ঘন কালো আঁখির তলে—

জাগে গহীন ব্যথা—

কোকড়া কালো কেশের মাঝে—

চেউয়ের উজ্জ্বলতা!

তার—চেউখেলা ওই শাড়ীর তলে

শুভ্র তম্বুত—

লব্ধ রংয়ের চুষনেতে—

তানার ব্যাকুলতা!

তার—দীপারিত তজি খানি—

চরণের তলে—

মোহ আনে প্রাণে মোর—

কোন্ মে ইন্দ্র জালে।

স্বপন ভরা কিশোর বয়স—

একটু খানি ঘেয়ে—

তবুও কতো বলতে যে চাই—

ওর পানেতেই চেয়ে!

তিকা তরে ঘরের ঘারে

বধন আনে মোর—

গভীর ব্যথার চোখ ছাপিয়ে—

করতে থাকে লোর।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার লক্ষ্য ৬টার লম্বয় নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রথম দিবসের লক্ষ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে প্রতিযোগিতার demonstration হইয়া বাঁহবার পর শ্রীযুক্ত গিরিন চক্রবর্তী দুইখানি প্রাচ্য-সঙ্গীত গান করেন। গিরিনবাবুর মতে তাঁহার প্রথম গানখানি ছিল ভাটিয়ালী জাতীয় এবং দ্বিতীয়টি বৃহদ-জাতীয়। প্রাচ্য-সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “শ্রী” রাগের দুইখানি ফ্রপছ গাহিয়াছিলেন। ইহার সহিত যিনি মৃদঙ্গ ললত করেন, তিনি যদি মৃদঙ্গের সুরের দিকে একটু অবহিত হইতেন তাহা হইলে গানগুলি আরও উপভোগ্য হইত। যোগেনবাবুর গানের পর নাচের আলস বসিল। কুমারী হেনা বর্মণ ও প্রতিভা ঘোষক যথাক্রমে তাঁহাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করিলেন। আমরা গত বৎসর হইতে লক্ষ্য করিতেছি যে যোগেনবাবুর ফ্রপছ-গানের অব্যবহিত পরেই নাচের আলসের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এ বছরের ছাপা Programmeএ তো যোগেনবাবুর নাম নাচের কিছু পরে ছিল; কিন্তু Director মহাশয় নাচের ঠিক আগেই তাহার গানের ব্যবস্থা করিলেন কেন? আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে যোগেনবাবু ঐ সময়ে গাহিতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন—কিন্তু তথাপি Director মহাশয় গায়কের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং programmerের ক্রম নষ্ট করিয়াও তাঁহাকে এক প্রকার জোর করিয়াই গাওয়াইলেন—ইহা কি রায় বাহাদুর মহাশয়ের স্ব-ইচ্ছা-প্রমুত অথবা ইহার মধ্যে অন্য কোনও গুঢ় রহস্য নিহিত আছে? নাচের পর আবার ফ্রপছের আরোজন হইল। শ্রীযুক্ত

কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় “শ্রী” ও ধানেশ্রী “পুরিয়া” রাগের দুইখানি ফ্রপছ গান করিলেন। ফ্রপছের প্রকৃতি ও রীতি লক্ষ্যে এখনও যাহার কোনও ধারণা হয় নাই, তাঁহার জন্য সঙ্গীতের demonstrationএ গানের ব্যবস্থা করিয়া অনর্থক শ্রোতৃবর্গকে উদ্বেলিত করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ত আমরা দেখি না। কর্তৃপক্ষগণ কিরূপ সুপারিশের প্রস্তাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া একাত্তর গায়কদিগকে programmeএ স্থান দেন তাহা তাঁহারা হই ভাল বোঝেন।

বিগত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কে বারাগসীর বিখ্যাত ফ্রপছাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

ফ্রপছের পর প্রতিযোগিতার অন্ততম শ্রীমান মানবেন্দ্র মুখার্জী কীর্তন গান করেন। কীর্তনের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত পদ্মপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফ্রপছের demonstration আরম্ভ করেন। তিনি গোড়মুগ্ধার ‘ও পুন্ডিক’ রাগের দুইখানি ফ্রপছ গান করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের ছাত্রী কুমারী শান্তিলতা ব্যানার্জী “আড়ানা” রাগের একখানি খেরাল গান করেন। কুমারীর গান আশাভের মন্দ লাগে নাই তবে ইহার তানকর্তব্যের রীতি সূক্ষ্মর হারানল্লাতে খেরালের আভিজাত্যকে বিশেষ তাৎবেই সূর করিয়াছিল। কুমারী

এখনও শিক্ষার্থিনী; আমরা লেজন্ড গানের বাণীর স্পষ্টতা ও শুদ্ধির দিকে তাঁহাকে মনোযোগী হইতে বলি। কুমারীর খেরাল গানের পর বাংলার প্রখ্যাত ফ্রপছাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গান আরম্ভ হইল। গোপালবাবু প্রথমে চোতালে একখানি ছায়ানট রাগের ফ্রপছ গাহিয়া পরে ঝাঁপতালে আর একখানি ফ্রপছ আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি লবেমাত্র দ্বিতীয় গানটি আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময়ে আমরা লক্ষ্য করিলাম যে যিনি black-boardএ programme লিখিতে-ছিলেন, তিনি নিজের আলস হইতে উঠিয়া গিয়া গোপালবাবুকে একখানি জরজরন্তী গাহিতে অনুরোধ করেন। আরম্ভ গানটি শেষ করিয়া পরে অন্য গান গাহিবেন গোপালবাবু উত্তরস্বরূপে এইরূপ ঈর্ষিত করিয়া পুনরায় তাঁহার আরম্ভ গানটি গাহিতে সূর করিয়াছিলেন এমন সময় সম্মেলনের সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর স্বয়ং মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া গোপালবাবুকে জরজরন্তী গাহিতে অনুরোধ করেন। তখন গোপালবাবু বলেন—“মহারাজের নিকট আদ্যরও তো একটা অনুরোধ থাকতে পারে যে তিনি কিছুকণ বসে আদ্যর গান শুনতেন।” তাহাতে মহারাজ বলেন—“তাত বটেই; কিন্তু এদের Programmeএ লম্বয় সব বাঁধা আছে; বেশী লম্বয় তা’ আর পাওয়া বাবেনা।” তখন গোপালবাবু উত্তর করেন—“তা যদি বলেন, তা’ হলে আমি এখানেই গান বন্ধ করে দিচ্ছি; আমি লম্বয়ের চাকর নই।” কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মহারাজ লম্বয়ের ব্যবস্থা করিতে না পারায় গোপালবাবু গান বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়েন এবং অন্তান্ত কর্তৃপক্ষগণের তরফ হইতেও তখন তাঁহাকে পুনরায় গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করা হয় নাই।

সম্মেলন-সভাপতির সাময়িক অনবধানতায় ও অভ্যস্ত কর্তৃপক্ষগণের ঔদ্যোগিক কলে এই যে নিত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহাতে যে কেবল সাধারণ শ্রোতৃবর্গ ও স্থানীয় সুরশিল্পীগণ ব্যতিত হইয়াছেন তাহা নহে; প্রবেশান্তর হইতে অভ্যাগত যে সকল বিশিষ্ট শিল্পজ্ঞান সে সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও প্রত্যেকে অভ্যস্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আমরা পণ্ডিত ওকারনাথজীকে বলিতে শুনিয়াছি “প্রবীণ প্রদর্শনাচার্যের প্রতি এজাতীয় অসম্মান প্রদর্শন সঙ্গীত-সম্মেলনের পক্ষে অতি লজ্জাজনক ব্যাপার। কর্তৃপক্ষের একান্ত উচিত যে, তাঁহারা যেন আর একদিনের অগ্রহণে গোপালবাবুর গানের ব্যবস্থা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আচার্যের ও নিজের সম্মান রক্ষা করেন।” কর্তৃপক্ষগণ অবশ্য ইচ্ছা করিলে এরূপ ব্যবস্থা অনায়াসেই করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহারা তাহা করা সঙ্গীতীয় বোধ না করার তাঁহাদের কর্তব্য-বোধের প্রতি শ্রোতৃবর্গের লক্ষ্যহান হওয়া অসঙ্গত নহে। বাংলার সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে প্রকৃত শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বর্তমানে অল্প হইয়া আসিয়াছে সভা, কিন্তু প্রপঞ্চ-সঙ্গীতে এখনও অনেক বিশিষ্ট সুরশিল্পী বর্তমান রহিয়াছেন; আর এই সকল প্রপঞ্চগণের মধ্যে গোপালবাবুর স্থান যে সর্বোচ্চে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তাঁহার জ্ঞান সঙ্গীত-সেবীর অমর্যাদায় যে বাংলার সঙ্গীত-সমাজের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া কর্তৃপক্ষগণের ক্রটি স্বীকার করা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয় ছিল। সঙ্গীত-সম্মেলনে সঙ্গীতজ্ঞগণের যথোচিত সম্বাদর ও অন্তর্ধান হওয়াই স্বাভাবিক—বর্তমানে

সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ শ্রেণি কোন ব্যবস্থা করেন নাই না; উপরন্তু তাঁহারা অনেক সময় অসঙ্গত নির্দিষ্ট করিয়া বিশিষ্ট স্থানীয় শিল্পীগণেরও গাহিবার স্বাধীনত টুকু পর্যন্ত হরণ করিতে প্রয়াসী হন। অধ্যাতনামা ও সম্মেলনে demonstration এর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অসুপস্থিত ব্যক্তিগণকে অধারণে অথবা সুপারিশের প্রভাবে programme-এ স্থান দিয়া সময়ের অপব্যবহার বা করিয়া যদি বিশিষ্ট শিল্পীগণকে তাঁহাদের অপূর্ণ কলা-কৌশল দেখাইবার সুযোগ না দেওয়া হয় তাহা হইলে Conference আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য যে বার্থ হইয়া যায় সে কথা কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের কি স্বপ্নে করাইয়া দিতে হইবে?

গোপালবাবুর গানের পর লাহোরের কুমারী শীলা লইয়া হংসনারায়ণ রাগের একখানি খেরাল গান করিলেন। শাস্ত্রে হংসনারায়ণের উল্লেখ নাই—গানের মধ্যে পুরবীর ছায়া স্পষ্টভাবেই আসিয়া পড়িয়াছিল। আজকালকার দিনে নূতন কিছু না করিলে আর বাহাজুরী হয় না—কাজে কাজেই বোধ হয় কুমারী আশাভের হংস-নারায়ণ উপহার ছিলেন।

কিন্তু কুমারী নূতন রাগ সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তিনি আবার একটা গানকেই একবার বিলম্বিত একতালার ও আর একবার চিমায় গাহিয়া যে কৃত্তিকের পরিচয়ের দাবী করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহা সঙ্গীত-কলায় অনভিজ্ঞের নিকট চমকপ্রদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু রসিক-সমাজে ইহা নিত্যন্ত বালমূলত চপলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। কলিকাতার

আগরে কুমারী ইহার পূর্বেই নিজের বিভার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয় লেখানে সুবিধা করিতে না পারায় এবারে তিনি নূতন আবিষ্কারে শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু চেষ্টার বিষয় এত করিয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য লক্ষ্য হইল না। কুমারীর গানের পর ভারতবিখ্যাত প্রবীণ তবলিয়া খলিকা নাথু খাঁ লাহেব তবলার চিমা ত্রিতালে লক্ষ্য বাজাইলেন। খাঁ লাহেবের পরিচয় অনাবশ্যক—বাহ্যিক উপনীত হইয়াও তিনি তবলার যে অপূর্ণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। তবলার পর শ্রীযুক্ত পাহাড়ী লাতাল একখানি হোলির চুম্বী গাহেন। কোনও বৈচিত্র্য না থাকিলেও গানখানি শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। Black board অধ্যক্ষ মহাশয় স্পষ্টভাবে লিখিয়াছিলেন যে লাতাল মহাশয় চুম্বী গানের পর তজন গাহিবেন; কিন্তু পাহাড়ীবাবু চুম্বী গানের পর অধ্যক্ষ-মহাশয়ের পুনর্বার মৌখিক অনুরোধ সত্ত্বেও তজন গানটী না গাহিয়াই উঠিয়া গেলেন। Programme অফিসার পাহাড়ীবাবুর ত চুম্বী গাইবার কথা ছিল না—তবে এ ব্যবস্থা কি Black-board-অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিজের—না Programme Director মহাশয়েরও ইহাতে সম্মতি ছিল? গানের পর শ্রীমান রবিন্দ্র সরকার তাহার চির-পুস্তক ব্যাধ-নৃত্য দেখাইলেন। গত বছর প্রতিযোগিতার দিন ও Conference এর আসরে শ্রীমান এই একই নৃত্য দেখাইয়াছিলেন—কিন্তু এবৎসরেও আবার সে নৃত্য কেন? নূতন নৃত্যের



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ফ্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

করনা যদি তিনি না করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থে অর্থাৎ সৃষ্টিবুদ্ধিই আত্ম-নিয়োগ প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হয়। ইহার পর কুমারী রেখা লইবার কথক নৃত্য অনুষ্ঠিত হইল। কথক-নৃত্যের যে কয়েকটি item আমরা দেখিয়াছি তাহাতে জয়পুরের নৃত্যবিদ প্রোঃ লোহনলালের (যিনি ইহার পরেই নাচিয়াছিলেন) নৃত্য আমাদের মনে লাগে নাই। তবে প্রোফেসরের নৃত্যে grace র অভাব দর্শকবৃন্দকে বড়ই পীড়িত করিতেছিল। অন্তরালে প্রোফেসর হইবার বাসনা রাখাের থাকে, ললিত-কলায় প্রাণীয়া লাভ করা তাঁহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটিতে পারে না। ইহার পর শ্রীযুক্ত সুনন্দলাল দাসের পরিচালনায় আর্থী Orchestra'র আয়োজন হয়। রাজি অধিক হওয়ার শ্রোতৃবর্গের একদিকে ধৈর্য্য চ্যুতি ও অপর-দিকে শ্রীমতী হীরাবাই বরোদাকারের গান শুনিবার আগ্রহ—এই উভয়টানে পড়িয়া বেহাগরাগের development undeveloped রাখিয়া দিতে হয়।

আলোচ্য রাত্রের শেষ আকর্ষণ ছিল স্বর্গত শুণী আবহুল করিম খাঁ সাহেবের শিশুা শ্রীমতী হীরাবাই বরোদাকারের গান। শ্রীমতী প্রথমে শব্দরসের দুইখানি খেলাল (একটি বিলম্বিত ও অপরটি দ্রুত ত্রিতালীতে) গান করিয়া প্রশিক্কা কাকি-হোরির চুম্বী "হোলি খেলত নন্দকুমার" গানটি গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে অপরূপ রসমাহুর্ষ্য উপভোগের সুযোগ দেন। শ্রীমতীর সহিত তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত তবল-বাহক প্রোঃ লাম্হুদ্দিন হারহার। *

ভালু লিংহ।

* শ্রীমতীর গানের আলোচনা আমরা শেষ প্রবন্ধে করিব।

আমার কথা

উমা দেবী

লেখবার তাগিদ এসেছে—লিখতেই হবে। যদিও লিখতে পারিনা তবু চেষ্টা করতে হবে নচেৎ হয়ত বন্ধু বান্ধবদের বিরাগ ভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়াব।

আমি লামাত্তা অভিনেত্রী। আমার জীবনে এমন কি ঘটনা থাকতে পারে যা নিয়ে আমার নিজের বিষয়ে লিখব। আমাদের দেশে অভিনেত্রী জীবন যেন একটি অভিশপ্ত জীবন, লোকে ভাবতে পারে না যে অভিনয় ছাড়া আমাদের আর একটি



উমা দেবী

সাংসারিক জীবন আছে। এবং সেই জীবনেই আমাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার বেলায় অনেক সময় অভিনয়ের কথা ভুলিয়ে দিয়ে একেবারে সাধারণ স্তরে এনে পৌঁছে দেয়। অভিনয় কেন্দ্র ছাড়া আমরা যে সাধারণ নারী বই আর কিছুই নই, এ বোধ হয় আর আমাকে লিখে বোঝাতে হবে না।

যাক্ এদম কথা নিয়ে বেশী আলোচনা করার দরকার আছে বর্নে আমি মনে করি

না। আমার অভিনয় জীবনের ছ' একটি কথা বলব বলে আজ লিখতে বসেছি আর তা বলেই আজ লেখা শেষ করব।

এতদিন ধরে অনেক ছবিতে বহু বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছি। এবং সেই সকল বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ আমার বাস্তব জীবনের ওপর যে একটা বিশেষ ভাগ কেটে দিয়ে বসে আছে তার কোন সন্দেহই নেই। 'রানী', 'মুলেখা', 'মীরা', প্রভৃতি বিশিষ্ট "জী" চরিত্রগুলির ছাপ আমার মধ্যে বসে বাস করছে। মানুষের চোখে তা ধরা না পড়লেও আমার মনের চোখে তার জীবন্তরূপ সচারচরই ধরা পড়ে।

এর আগে যে সকল চরিত্রে আমি অভিনয় করেছি, দেশের মাটির "গৌরী" রূপ তাদের কাছে অচেনা—অজানা। কিন্তু এই "গৌরীর" রূপ আমার মনের গহণকোনে এতদিন যেন লুকিয়ে ছিল। আজ সেই "গৌরী"—গ্রামের মেয়ে "গৌরী"—নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে। গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামকে আমি সত্যি ভালবাসি। তাই আজ গ্রামের মেয়ের-ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজের সৌভাগ্য-বতী মনে করছি।

দেশের মাটি চিত্রের—পরিচালক মশাই যখন আমার তাঁর অসাধারণ বর্ণনার দ্বারা "গৌরী" চরিত্রটি বুলিয়ে দিলেন,—তখন সত্যি সত্যিই আমার মনে হয়েছিল যে নীতিন বাবু কেমন করে আমার মনের কথাটা জানতে পারলেন। কল্পিত চরিত্রের সঙ্গে যদি অভিনেতা বা অভিনেত্রী

মনের যোগ না থাকে তা হ'লে অভিনয় কেবল অভিনয়ই থাকে, তা জীবন্ত সত্য হয়ে উঠে না।

“বেশের মাটি” চিত্রে আমার আর একটি বিশেষ সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর স্তায় সুবিখ্যাতা অভিনেত্রীর সঙ্গে আমি অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছি। তাঁহার স্তায় শিক্ষিতা ও শক্তিশালী অভিনেত্রীর সঙ্গে একই চিত্রে অভিনয় করবার সৌভাগ্য অনেকদিন থেকেই ছিল। ভগবানের কৃপায় আমার সে আশা আজ ফলবতী হয়েছে। তাছাড়া এর হিন্দি সংস্করণে বিখ্যাতা নর্তকী শ্রীমতী কমলেশ কুমারীর সঙ্গে অভিনয় করবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হইনি।

প্রশংসাতে থুসী হয় না এমন লোক খুব কমই আছে। আমি লামাতা নারী, প্রশংসা পেলে সত্যিই আমার মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠে। আজ পর্যন্ত আমার ভাগ্যে অভিনয়ের নিন্দা কখন পাই নি। বেশের লোকের স্নেহ, প্রশংসা আমার কপালে খুব বেশী পড়িয়াছে। এই প্রশংসা স্নেহ-চন্দন এর অমূল্য সম্পদ নিয়েই আজ এই বাঙলা দেশের গ্রামের সম্পদ আপনাদের সামনে তুলে ধরবার জন্তে এগিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছি। জানিনা কতটা সফলতা লাভ ক'রব। তবে মনে আশা আছে শক্তি আছে আর তার চেয়ে বড় পরিচালক মশাই-এর যে অহম্য প্রেরণা আছে তার দ্বারা মনে হয় হয়ত' আপনাদের একেবারে নিরাশ ক'রব না।

লীগ-কংগ্রেস আপোষের স্বরূপ কি?

শ্রীসচী শীল

গত ২১শে এপ্রিল তারিখের ‘থেরালী’তে “মুসলিম লীগ” লম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে এবং মহাস্থানজীর বক্তৃদান আপোষ চেষ্টার বিরুদ্ধে যে কথা বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হবে—এর চেয়ে সত্যি কথা বলা যায় না।

আমার মনে হয় কংগ্রেস তার বৃহত্তর আদর্শকে তামিয়ে দিতে চলেছে। এখানে এখানে Patch-work করবার জন্ত ব্যস্ত। এটো অবনতি সূত্র হয়েছে সেইদিন থেকে, যে দিন কংগ্রেস Communal Award না-গ্রহণ-না-বর্জন করার Hybrid principle মেনে নিয়েছিল।

সুভাবাবাহু বুখে যা বলছেন, কংগ্রেস কাজে ঠিক তার বিপরীত করছে। পণ্ডিত নেহেরু এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিরুদ্ধি দিয়েছেন যাতে আছে খাটি আদর্শবাদ; কিন্তু কংগ্রেসের কার্যাবলীতে সে আদর্শের ছায়াও নেই।

গত জানুয়ারী মাসে পণ্ডিত নেহেরু লীগপতি জিন্নাকে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাতে বিশেষ করে বাংলার-জাতীয়তাবাদী মহলে বিশেষ চাকল্য জেগেছিল। তিনি বলেছিলেন—Communal Award রইল, যতদিন না একটা agreed formula-তে পৌঁছান যায়। এ যে British imperialist-এর কথার নিছক প্রতিধ্বনি! Sir Samuel Hoare-ত এর চেয়ে খারাপ কথা কিছু বলেন নি।

League-Congress rapprochement এর চেষ্টার আশঙ্কা প্রকাশ করে আমি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে এক পত্র লিখি।

আমি বলেছিলাম—“I am deeply pained to find you running off at a strange tangent. Previously you stood for a full-steam programme of mass-contract. * * * * You have blown much wind into the Jinnah sails by welcoming the recent re-orientation of League ideal and programme, just when people were beginning to see through the Jinnah game.”

আপনারাও বলেছেন—“ইতিপূর্বে মি: জিন্না ও লীগের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে জিন্না-আন্দোলনের প্রায় অবলান ঘটয়াছিল।” কংগ্রেস যেভাবে সুযোগ হারাচ্ছে ও বৃহত্তর আদর্শকে patch-work-এর বেহীতে বলি দিচ্ছে, তাতে অবস্থা এমন হবে যে কংগ্রেসে আদর্শবাহীদের আর স্থান হবে না।

মি: জিন্নার আদ্যক লম্বু করার কোন মানে হয় না। সংখ্যা-লঘিষ্ট-সম্প্রদায়কে অস্তর দিয়াছে কংগ্রেস আজকে নয়, ৭ বৎসর আগে Principles of responsible democracy বজায় রেখে minorityদের যে আশ্বাস দেওয়া যায় তা দেওয়া হয়েছে Karachi resolution-এ। তাই আমি পণ্ডিত নেহেরুকে উক্ত পত্রে বলেছিলাম—“The Karachi pledges to minorities should be the last word on the subjects.” তার কিছুদিন বাবেই Mr. M. S. Aney ঠিক এই কথারই উপর জোর দিয়েছিলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত নেহেরু উত্তরে লেখেন—

Dear Mr. Sil,

Some time back I received your letter. You must not be misled by erroneous statements in the press.

The Congress is not compromising on any question of principle, nor indeed is there any question of compromise, I have tried in my statements to remove erroneous impressions. We are always bound to do that.

Yours sincerely,

Sd. J. Nehru

Compromise-এর প্রশ্ন নেই ত মি:

জিন্নার বারম্ভ হওয়ার মানে কি? মহাত্মাজীৱ না কি একটা appellation আরে—the miracle man of India. মি: জিন্নাকে Nationalism-এ Convert করে তিনি আবার একটা miracle করবেন না কি? এ সম্ভব নয়; তাহলে Round Table Conference এ তা সম্ভব হতে পারতো!

আগে বলেছি, “Communal” Award must be replaced by an agreed settlement”—এ বড় dangerous proposition. মুসল্লী লীগ যদি agree না করে, জোর করে বুথ কিরিয়ে বসে থাকে ত Solution আসবে কোথা থেকে? Award এ মূলমন্ত্রের পেয়েছে সুবিধা বেশী। Equitable settlement আনতে গেলেই অনেক কিছু তাগের ছাড়তে হবে। এমন ক্ষেত্রে কি করে agreed solution-এর আশা পোষণ করা যায়। এতে আসবে agreed standstill. ব্রিটিশ ওস্তাদরা Devaleraয় সঙ্গে টিক এইরকম চতুর খেলা খেলেছিলেন। চেয়ারম্যান লাহেব বলেছিলেন “আলটার যদি বোম্বার Bire-এর সঙ্গে মিলতে চায় মিলুক, আবার কোন আপত্তি নেই। Re-union-এর ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাইনে।”

শান্তি আপোষের কথা তুললেই জিন্না-লাহেব আরও আকার করে বসবেন। ত্যাগের পর ত্যাগ করতে করতে হিন্দুদের আর কিছু থাকবে না। তার চেয়ে বড় ক্ষতি হবে ভারতের জাতীয় অগ্রগতির দিক থেকে।

মি: চিন্তামণি লাক্ষ্মণস্বামীক প্রসন্ন সম্পর্কে যা বলেছেন তাকে improve করা যায় না। তাঁর স্পষ্টবাহিতার আলোকে ঐ প্রশ্নের নিচক নত্যাটা ফুটে উঠেছে: “If, on the Communal issue there is a Community genuinely grieved, it is the Hindu Community. Having got the Communal Award, I suppose Mr. Jinnah wants now something more as the price of abandoning Hindu baiting. He goes on saying—‘Communal settlement first and everything else afterwards.’ My reply is that I am sick unto death of this interminable talk of Communal settlement. Every time a point of difference is made up, the call for a fresh concession springs up.”

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ মূল্যলিগিকে নষ্ট করতে ব্যগ্র হয়েছে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা। মূল্যলিগির policy of gangsterism and blackmail আজ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মি: জিন্নার কার্যাবলীতে স্পষ্ট ছায়াপাত করেছে। গান্ধীজী যদি থাকতেন চেয়ারম্যানের পক্ষে, তবে তিনিও Anglo-Italian pact-এর মত ঐরকম একটা কিছুই জন্ত নিশ্চয়ই ব্যগ্র হতেন।

অন্য কথায় বলবো—The basis of Communalist gangsterism is the knowledge that Congress is always willing for a compromise and wants peace at any cost.

হিন্দু মূল্যলিগ লম্বতার পথ এখিঁকে নয় এতে লম্বতা আরও জটিল হয়ে ওঠবার বিশেষ সম্ভাবনা। মূল্যলিগ লক্ষ্যবাহকে মি: জিন্না ও মূল্যলিগ লীগের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। করা কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়, অন্ততঃ জিন্না-ভূটীর চেয়ে সহজ। আদল কাজ ছেড়ে দিবে, এখানে-ওখানে হুঁকট। Cleverly engineered riot দেখে তার খেয়ে গিয়ে আপোষ করতে গেলে বিরোধী পক্ষ বুঝবে তাগের চতুর নীতি বেশ কাজ দিচ্ছে।

ডাঃ প্রবীণ বাল্যমুখ

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিশ্র ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধ শালসে
পাওয়া যায়।



কালী ফিল্মসের "চোখের বালি"-তে
শ্রীমতী ইন্দিরা রায় 'আশা'-র ভূমিকায়
আত্মপ্রকাশ কোরবেন। ছবিখানি
শীঘ্রই যুক্তিলাভ কোরবে।



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'ভ্যারিটি'

ফ্যাশনাল নিউজপেপার লি:

টেলিফোন
সাঁউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, উদযোজ্য সংখ্যা, পুণ্যস্মৃতিবার, ১০শে বৈশাখ ১৩৪৬, ১০ই মে ১৯৩৮

বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে

গত রবিবার বোম্বাই মেলে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতার মেয়র মিঃ জ্যাকেরিয়া প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির বিদায় সম্বন্ধনার জগু হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শোজা সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধি-স্থানীয় মুসলমান ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় তাঁহার সাংবাদিক মিলন-করমুলা সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে রাষ্ট্রপতির সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। বোম্বাইয়ে বস্তু-জিন্সা আলাপের পক্ষে এই আলোচনা হস্ত বিশেষ সহায়ক হইতে পারে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মধ্য প্রদেশের মন্ত্রী মিঃ শরীফের কার্য বিশেষভাবে বিচার করা হইবে। প্রকাশ যে স্থার মন্বদনাথ মুখোপাধ্যায় মিঃ শরীফের প্রতিকূলে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ শরীফ যখন তাঁহার কৃতকর্মের

জগু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন তখন আমাদের মনে হয় তাঁহাকে অব্যাহতিই দেওয়া সমীচিন।

এই হুগায় বোম্বাইয়ে ভারতের কংগ্রেসী প্রদেশ সমূহের মন্ত্রীবর্গ একত্রিত হইয়া তাঁহাদের অনুমত কর্মপন্থার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ও সর্দার প্যাটেল যে পন্থা প্রদর্শন করিবেন আশা করা যায় বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীগণ তাহার অনুমোদন করিবেন।

মহীশূন্রে কংগ্রেস পতাকা লইয়া যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সূচনা হইয়াছে সর্দার প্যাটেল তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়াছেন। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাহা অনুমোদিত হইবে।

সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাংলার সাময়িকভাবেও কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনেও কংগ্রেসী দলের মধ্যে দলগত শৃঙ্খলা কিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সমগ্র ভারতের কর্মসূচীর ব্যস্ততার মধ্যেও রাষ্ট্রপতি যে বাংলার সমস্যাগুলির সমাধানে বিশেষভাবে অবহিত তাহা নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এমনকি বোম্বাই যাত্রার সময়ে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক মৌলভী আসরাফ-উদ্দিন সাহেবকে বর্ধমান পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া যান— ট্রেনের কামরায় তাঁহাকে বাংলা কংগ্রেসের কার্যাবলী সম্বন্ধে যথোচিত নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রাক্তন তিন সপ্তাহ পর রাষ্ট্রপতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং তৎপরে উড়িষ্যা সফরে বাহির হইবেন। বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির সহিত বাংলার প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবের সহিত এক ঘণ্টাব্যাপী গভীর আলোচনা হইয়াছে। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর হস্ত রাষ্ট্রপতির সহিত হক সাহেবের আলাপ-আলোচনার কলাকলের আভাষ পাওয়া যাইবে। বর্তমানে খৈয়্য ধারণ করাই সম্ভব।

শ্রীঅশোকশাস্ত্রীর প্রতিশনির দৃষ্টি

শ্রীগ্রহাচার্য্য

রক্ত বৈশাখের রৌদ্রতেজে শনিমণ্ডলের উপগ্রহগুলি কিন্তু হ'তে হ'তে এবার নিজেদের কক্ষ থেকে প্রায় উৎক্লিষ্ট হোয়ে উঠেছেন। সচিৎ লবঙ্গাহুবাধ অভিনয়-দর্পণ প্রকাশ কোরে অশোকশাস্ত্রী ম'শায় এবার তাঁদের কোণদৃষ্টিতে প'ড়েছেন। 'প্রথমতঃ তাঁদের লন্দেহ জন্মেছে শাস্ত্রীম'শায়ের শাস্ত্রী উপাধিটি শাস্ত্রীয় কিনা। কলিকাতা লংকৃত-কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই এই লোভনীয় উপাধিটি অন্তরীণ আছে—এ অদ্ভুত লেকলে ধারণা তাঁ'দের মনে এ লন্দেহের অঙ্কুর জন্মাবার লাহায্য করেছে। তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে, বাইরের কথা ছেড়ে দিলেও এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই এমন একাধিক 'মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী' আছেন, যারা কোন দিন ঐ উপাধিটি লাভের প্রত্যাশায় লংকৃত কলেজের দারস্থ হ'ননি অথবা বা'দের হাতে 'কলম' থাকলেও পিছনে 'কাগজ' থাকার অপবাহও কেউ দেয় না। অথচ বা'দের 'শাস্ত্রী' উপাধির শাস্ত্রীয়তা লক্ষ্যে কোন অশাস্ত্রীয় লমালোচকও এ পর্য্যন্ত প্রশ্ন তোলাবার সাহস পান নি। আরও এক কথা, লংকৃত-কলেজের 'শাস্ত্রী' উপাধিটি বর্ত্তমানে উক্ত কলেজের ছাত্রদেরও হুজুপা হোয়ে উঠেছে; কারণ, ছাত্রীগণ উহা প্রায় একচেটিয়া করবার চেষ্টায় আছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শাস্ত্রী-ম'শায়ের গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তার পিতৃব্যের ছবির নিচে নিজের ছবি ছাপানটা নাকি বড়ই অশাস্ত্রীয় এবং "——" হোয়েছে। বা'রা নিজেরা নান্দ্র শ্রেণীর লংবাহপত্রে প্রবন্ধ বা গল্প-কবিতা ছাপাবার লক্ষে লক্ষে আপনাদের বয়সপূর কবিতার প্রতিলিপি পাঠকদের কাছে (তাঁ'দের

ঘোরতর অনিচ্ছা লক্ষ্যেও) উপহার দেবার শুরু উদ্দেশ্যে লম্পাদকীয় বিভাগের দ্বারায় ধর্না দিয়ে থাকেন তাঁ'দের পক্ষে অন্ততঃ এ জাতীয় সমালোচনা থেকে চক্ষুলজ্জার খাতিরও নিবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল।

তৃতীয় কথা—শাস্ত্রী-ম'শায়ের অকৃতজ্ঞতা। লমালোচক ম'শায় পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অন্ত্যাস ছেড়ে ব'দ নিজের চোখের ঠুলি খুলে লরল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতেন, তা'হোলে অবশ্য এ অভিযোগ আন'তে তাঁ'র লঙ্কোচ বোধ হ'ত। কারণ, গ্রন্থখানির যথাযোগ্য স্থল-গুলিতে কৃতজ্ঞতার স্বর্ণ স্বীকার করার কোন অভাব আশ্বাদের নজরে পড়ে না।

চতুর্থ কথা—মুদ্রাতত্ত্ব। বা'র' শুধুই গোলাকার মুদ্রা ও অবস্থা-বিশেষে তাজিক মুদ্রা-বিশেষের উপালক, তাঁ'রা অল্প সকল প্রকার মুদ্রাকেই অশাস্ত্রীয় বোলে অবজ্ঞা কোরে থাকেন। আর যেখানে উক্ত দুই প্রকার আত্মতৃপ্তিকর মুদ্রা চাড়া অল্প কোবরূপ মুদ্রার আবাহনীয় আবির্ভাব ঘটে, সেখানে নিজ অধিকারভুক্ত মুদ্রাদ্বয়ের তিরোভাবের আশঙ্কায় যে নানারূপ মুদ্রা-দোষ বাহির হোতে থাকবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি! এ যে স্বভাব-লিঙ্গ ব্যাপার!

পঞ্চম অভিযোগ—বাঙলা টিপ্পণীর মাঝে মাঝে কচিং ইংরাজী শব্দের ব্যবহার। এ ঘোষটি উল্লেখ্যকর করে গিয়ে লমালোচক-প্রবর নিজেই সেই ঘোষ কোরে ব'লেছেন। 'রতি' শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ হিতে গিয়ে এই লমালোচকই বাস্তব লাভ আট লাইন পরেই লিখেছেন—"রতি যে pure and simple—।" লমালোচনার আদর্শ বটে!

তারপর ষষ্ঠ অভিযোগ—ব্যাখ্যার ভুল। ভুল অবশ্য বাস্তবের হওয়াই স্বাভাবিক, আর শাস্ত্রী মশায়ও কিছু তা'র ব্যতিক্রম ন'ন। তবে 'জব' ও 'রতি'র যে ব্যাখ্যা উপগ্রহগণ কোরেছেন, তা'তে বোধ হয় ম'ল্লনাথও পরলোকে লজ্জায় মুখ চাক'তে পথ পাচ্ছেন না। এ অভিনব মল্লনাথের হল প্রথমতঃ ভুলে গিয়েছেন যে, শ্লোকটি নাট্যশাস্ত্র বা তৎসজাতীয় রসশাস্ত্রের শ্লোক, কামশাস্ত্রের নয়। রসশাস্ত্রে লন্তোগশৃঙ্গারের চূষনালিঙ্গনের যতই ছড়াছড়ি থাকুক না কেন—লংবেশনের ব্যাবহারিক পদ্ধতির উপদেশ তা'তে হোওয়া হয় না। তা'র পর অষ্টরস ও লন্তোগ-বিপ্রলম্ব শৃঙ্গারের কয়েকটি অবস্থার বর্ণনা যে প্রকরণে আছে, সে প্রকরণে যে লংবেশনের বিধান খোলাখুলি ভাবে হোওয়া হ'বে—এ একেবারেই অসম্ভব। আগের শ্লোক কয়টিতে যে চক্ষুঃপ্রীতি ও হংসজের কথা বলা হোয়েছে—এ শ্লোকটিতে তাই একটু ধাপে ধাপে পরিষ্কার কোরে বলা আছে মাত্র। কোন গ্রাম্য ব্যবহারের আভাসমাত্রও এতে নেই।

তা'র পর শেষ অভিযোগ—'চরণায়ুধ'। কুক্কট যে গ্রন্থাজের শ্রিয় বাঁহন ও শনি-মণ্ডলের অজ্ঞাতম অপরিহার্য্য উপাঙ্গ। এ হেন অবশ্যপাল্য কুক্কটকে নিজ গ্রন্থ থেকে অপাত্তক্কেয় কোরে শাস্ত্রী ম'শায় নিশ্চয়ই ঘোরতর অপরাধ কোরেছেন। "লজ্জাত্যাগ" অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে কুক্কটের চীৎকারে নায়ক-নারিকার নিদ্রাতলের লার্ঘকতা কতটুকু তা শাস্ত্রী ম'শায়ের বোঝবার কোন উপায় নেই। বা'রা কুক্কটলাহন পত্রিকার গোষ্ঠীভুক্ত, তাঁ'রা নিশ্চয়ই খণ্ডিতা মানিনী নারিকার চরণাঘাত অপেক্ষাও অণুপ্রদব-কারিণী কুক্কটীর ডাক-কেই অধিক লরল ও কাব্যনোন্দার্থে মগ্নিত বোলে ভাব'বেন।—তা' তা'তে বহি শ্লোকের ভাবার্থের আভ্যন্তরিক হয়, তাঁ'দের কি আসে যায়!

স্রোতটির বাধার উপর বিবরণ আছে—এটা “লজ্জাত্যাগের” দৃষ্টান্ত। নারক-নারিকা পরস্পর মিলিত অবস্থার নিমিত্ত ছিলেন, এমন সময় কুকুটরবে নারকের নিজাভঙ্গ হ’ল—এতে লজ্জাত্যাগের পার্থক্যতা রক্ষিত হোল কোথায়? বরং—প্রগলভা নারিকা নিজাভঙ্গে নারকের সঙ্গে যুক্ত লজ্জাগচ্ছ প্রত্যক্ষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সরজাত বিভ্রান্তিবশে সে গুলিকে প্রতিনায়িকাকৃত মনে কোরে ঈর্ষার সকল লজ্জাত্যাগপূর্বক নারকের দ্বিহে চরণার্ণব কোরলেন—এরূপ রোম্যান্টিক চিত্র সংকৃত কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে নিভান্ত বিরল নয়। অন্ততঃ লজ্জাত্যাগের পার্থক্যতা তাতে থাকে।

প্রতিপক্ষ হয়ত বলবেন—কুকুটরবের আঘাতানীতে অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত সরল অর্থ না হোতে পারে, কিন্তু বুঝ ত ভাদে! সম্ভব আর একাধিকার নিম্নে দত্ত ও অটল ঠিক

এই ভাবেই ব’লেছিল—ব্রাহ্মপানিতে মানে না হোক মজা ত হয়।

“যোগরূঢ়” শব্দও প্রকরণের সঙ্গে লজ্জিত রাখবার জন্তে কখন কখন “বৌগিক” অর্থে ব্যবহৃত হোতে পারে—এ নিয়ে আলঙ্কারিক ও স্বীমাংসক নৈয়্যায়িক প্রকৃতি প্রাচীন ভারতীয় বর্ণনশাস্ত্রজ্ঞগণ অনেক বিচার কোরেছেন। সে সব কথা এখানে—“মা লিখ মা লিখ।”

লজ্জিতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—বাহুল্যেও প্রকরণ-লজ্জিতের জন্তে যোগরূঢ় শব্দের বৌগিক অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “সাহিত্য-শিক্ষা” (অষ্টম খান) পুস্তকে তাঁহারই লিখিত “প্রাচীন গ্রীস” প্রবন্ধে (পৃঃ ৫২) পাওয়া যায়—

“এখনও এই দেশ তাহার সমস্ত নৌদর্ঘ্য সমস্ত নৌমনস্ত লইয়া তাহার সাহিত্য লগিত-

কলা বর্ণনের মধ্য দিয়া মানবের চিরন্তন চিন্তাধর্মের তাগুণ থলিয়া আছে।”

এখানে “নৌমনস্ত” মানে অবশ্য প্রাচ্যে পুস্তকানের মস্ত নয়—মস্তর মনের ভাব মাত্র। শকুন্তলাতেও কালিদাস “স্বমনো-মূল্য” শব্দে ঠিক এইভাবে যোগরূঢ় অর্থের অন্তরালে বৌগিক অর্থের ইঙ্গিত কোরেছেন।

যাই হোক! শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি আমাদের পরামর্শ এই যে, তিনি একদিন শনিমণ্ডলের উপগ্রহের ডেকে গ্রহরাজের পাঁচালি গাইবার বায়না দিল, তা’ হোলে গ্রহরিষ্টি হোতে মুক্তিলাভ করতে পারবেন। আর যদি বস্ত্র কুকুটে আপত্তি না থাকে, তা হোলে তা’কেই না হয় এক পাশে একটু স্থান দেবেন!!

ই উ না ই টে ড ট কী জে র

—: প্রথম চিত্র নিবেদন :—

—: ভূমিকায় :—

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
নির্ম্মলেস্কু লাহিড়ী
সুশীল মজুমদার
বীরেন পাত্র

ছ
ন্দা

—: ভূমিকায় :—

জ্যোৎস্না গুপ্তা
চিত্রা
মনোরঞ্জন লাহিড়ী
নৃপতি চ্যাটার্জি

কথা ও কাহিনী : মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত

পরিচালক : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজক : অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবিসি

উজ্জল করিতে বেদনা রাশি

চলচ্চিত্র বিষয়ক সমালোচনা-রচণায় মনোনিবেশ যাথে যাথে বিলাস্ত হয়ে যাচ্ছে—আর চল্ল মনের অক্ষুট গুঞ্জনধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে “আমার ঘরে লাক্ষ্য-প্রদীপ আজিকে জালিবে কে ?

উজ্জল করিতে বেদনারাশি আজিকে জালিবে কে !”

অনাগত ৭ই জ্যৈষ্ঠের শুভাগমন-প্রতীকায় উৎস্রীণ ‘পত্রিকার’ শ্রীযুক্ত নির্মল ঘোষের এই উজ্জ্বল সময় ও বয়স উপযোগীই বটে !

খিদিরপুর সুইমিং ক্লাব

গত ৩০শে এপ্রিল শনিবার উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন খিদিরপুর বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্ত কার্য্যকরী সমিতির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন—

পৃষ্ঠ-পোষকগণ মহামায়া মহারাজা বাহাদুর, কুচবিহার; মহারাজা বাহাদুর সন্তোষ, শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু এম-এল-এ, মিঃ জে, সি, মুখার্জি—প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কলিকাতা কর্পোরেশন; মিঃ টি, পি, ঘোষ; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ মুখার্জি কাউন্সিলার

কলিকাতা কর্পোরেশন, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এসসি, মিঃ এস, এন্, বসু; রায় ভাষ্করচন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষ।

সহঃ-সভাপতিগণ—ডাঃ সুধীর কুমার বসু, মিঃ বি, এন্, রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত বিজয় রতন বসু, বিনোদগোপাল মুখার্জি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ পাল, মহেন্দ্র এস, এম্, ইসরাইল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বক্রিম বিহারী সরকার।

সহঃ-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ইরীণবিহারী

মুখার্জি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ—বি-এ,

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিসাব-পত্রীক্ষক—শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মিত্র।

কেপ্টেনধর—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নাহা (সস্তরণ)

শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ মাইতি (রাইং)

সহঃ-কেপ্টেন—শ্রীযুক্ত হরিহর নাহা।

সস্তরণ-শিক্ষক—শ্রীযুক্ত সত্যীশ চন্দ্র মাইতি।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট—শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র মোহন চাটার্জী।

কার্য্যকরী সমিতির সভাগণ—শ্রীযুক্ত বৈভনাথ দাস বি-এল, শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত রাধাশ্রাম

ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার বর্দ্ধন, সুশীল কুমার চাটার্জী।

শুভ-বিশ্বাহ

শ্রীজ্যোৎস্না দেবীর লিখিত লভ-অন্তরীণ-মুক্ত বন্ধুর শ্রীযুক্ত কুমার ভট্টাচার্য্যের শুভ-বিবাহ গত মঙ্গলবার ৫০নং প্রতাপাঙ্কিত্য রোডে সুসম্পন্ন হইয়াছে। রাজরোষবন্ধন-মুক্ত কুমারদলের নব-বন্ধনে শুধু আমরাই আনন্দিত হইলাম না তাঁহার একান্ত শুভামুখ্যায়ী পুলিশ-বিভাগের বহুগণও উল্লসিত হইলেন। শ্রীমতী জ্যোৎস্নার লতকৃ দৃষ্টির হেপাজতে কুমারদল যে অন্তরীণে আবদ্ধ হইলেন তাহা চিরকাল অটুট থাকুক, ইহাই আমরা কামনা করি।

বরণ সাহিত্য সঙ্ঘ

বিভিন্ন স্থল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদ্বারা পরিচালিত ‘বরণ’ পত্রিকার কার্য্যকরী সমিতির গত বৃহস্পতিবার ৮ই বৈশাখ শ্রীঅরুণা দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে ৩৫-২ বিডন ষ্ট্রীট ‘বরণ’ কার্যালয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীহরিশাধন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক শোক সভা হয়। সভায় একটি শোক-স্মৃচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীশিশির বিশ্বাস (বিভাগাগর কলেজ পত্রিক—সেক্রেটারী) শ্রীতুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় (বরণ—সম্পাদক) শ্রীললিতা-নন্দ দাসগুপ্ত (স্টাফ-চার্জ কলেজ) প্রভৃতি বিভিন্ন কলেজের ছাত্রেরা এবং সভাপতি মহাশয় সাহিত্যিকের জীবনী এবং রচনা লব্ধে আলোচনা করেন। সভার প্রারম্ভে মৃতের প্রতি সম্মানার্থ এবং আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া সকলেই একমিনিটকাল দণ্ডায়মান ছিলেন।



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হে বিশ্ববরেণ্য কবি ! হে রবীন্দ্রনাথ !
তোমাতে প্রণাম করি আজি বিশ্বসাধ—
হে বাঙলার, ভারতের গৌরবের রবি ।
তোমার কাব্যের মাঝে আঁকিয়াছ ছবি
সারাটি বিশ্বের । বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি
অপূর্ব মুরতি লভি উঠেছে উন্মাদি
কাব্য-কুঞ্জবনে । আজি সারা বিশ্বমাঝে
একই সুরে তব নাম নানা কণ্ঠে বাজে ।
যে গান যে কাব্য তুমি করিলে রচনা
অপূর্ব তা ; তার সাথে নাহি ছিল চেনা
কারো, কোন কালে । কভু কেহ ভাবে নাই,
কোন স্বর্গ হ'তে তুমি এসে লবে ঠাঁই,
আমাদের মাঝখানে । মোরা ভাবি মনে
আমরা হ'য়েছি ধ্বংস তব আগমনে ।
হে কবি সম্রাট ! আজি তব দীপ্ত ভালে,
খ্যাতির হোমায়ি শিখা ধব্ধ ধব্ধ জ্বলে
অনিবার । যুগ প্রগী হে মহান কবি !

তোমার ব্যক্তিতে আজ ভেসে গেছে সবি ।
সারা বিশ্বে আছে আজি হেন সাধ্য কার
তোমাতে মনের কাছে করে না স্রীকার ।
কাব্যের লীলায় তব সারা প্রাণ মন
হে কবিন্দ্র ! ফুটিয়া র'য়েছে অমুক্ণ—
নানা ছন্দে গানে । হে বিশ্বপ্রেমিক কবি !
তোমার প্রিয়ার চোখে প্রেমের সে ছবি
নানা রূপে, রসে, তুমি দেখিয়াছ আঁকি
বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি সম্মুখেতে রাখি ।
তোমার “অন্তর হ'তে লইয়া বাসনা
তোমার গোপন প্রেম করেছে রচনা”
তব মানসীয়ে । তোমার প্রেমের নীরে
হে দরদি ! ভাসিয়েছ বিশ্ব সাহিত্যেরে ।
আজি তব জন্মদিনে কিবা দিব আর
হে মহান ! এ দীনের লহ নমস্কার ।
আজি মোর অন্তরের একান্ত বাসনা
হে কবি ! শতায়ু লভ করি এ কামনা ।

(কবির ৭৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে কোলকাতার ‘পাঠচক্রে’ পঠিত)

ইউনাইটেড ক্লাব

গত রবিবার ৮ই মে পাথুরিয়াঘাটস্থিত ইউনাইটেড ক্লাবের টেনিস শাখার পারিভোজিক বিভাগী সভা শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষএর সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে । এতে সভায় ক্লাবের প্রায় ৫০ জন সভ্য ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ।

প্রথমে ৬মকর কুমার ঘোষ মহাশয়ের বক্তা কুমারী স্মৃতি ঘোষ সভাপতি মহাশয়কে শাস্য প্রদান করেন । তারপর জীড়াকোটুক বিভাগের সম্পাদক রঘুনাথ ঘোষ একটা

ক্ষুদ্র বক্তৃতায় টেনিস শাখার কার্য বিবরণী পাঠ করেন । এবৎসর একটা Inter club Tennis League Tournament আরম্ভ হয় এই tournamentএর পুরস্কার স্বরূপ ৬ঘোষ মহাশয়ের স্টেটের একজিকিউটিভমহ-শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্ত হুলাল চন্দ্র আইচ সভ্যগণকে উৎসাহ দান করিবার জন্য “মকর কুমার Memorial Challenge Cup” উপহার দিয়াছেন । শ্রীমান বীরেন মিত্র এবৎসর অন্ত্যস্ত সভ্যকে পরাজিত করিয়া এই Cupটি অর্জন করিয়াছেন ।

জীড়াকোটুকের সম্পাদক শ্রীমদ্র নাথ ঘোষ মহাশয় ৬মকর কুমার ঘোষ মহাশয়ের পত্নী ৬মমীরারানী স্মৃতিরকার্থে “মমীরারানী মেমোরিয়াল রাণার আপ চ্যালেঞ্জ কাপ” ক্লাবকে দান করিয়াছেন । এবৎসর শ্রীমান বিভূতি বোস ও শ্রীমান জীতেন বসু উভয়েই ব্রাকেটে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া এই Cup অর্জন করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মল্লিক মহাশয় আরও দুইটা পঞ্চ উপহার দেন ।

বেতারের অগ্রগতি

এলা বসু

বেতারের যুগ এসেছে; এখন বেতার-যন্ত্র সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। নগর দশ বঙ্গর পূর্বেও আমাদের দেশে বেতারের ছরাবহা গেছে; কিন্তু বর্তমানে বেতার সব বাধা বিস্ম অতিক্রম করে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

জনসাধারণ এখন বেতারকে খুবই স্নানজরে দেখছে। জনসাধারণ এখন বুঝেছে বেতারের কাছ থেকে কী পাওয়া যায়।

বেতার শিক্ষা, আনন্দ, পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা বাণী বহন করে এনেছে। বেতারের মারফৎ আমরা শুনতে পাই দেশ বিদেশের বড় বড় ব্যক্তাদের বক্তৃতা, প্রদিক্ গায়ক গায়িকাদের গান, অভিনয়, গল্প, কত মজার খবর আরও অনেক কিছু।

সকলেই সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যার সময় একটু বিশ্রাম চায় এবং বিশ্রাম করতে গেলেই তার সঙ্গে একটু আমোদ প্রমোদের ব্যবহার হয়; সুতরাং বেতারের স্থিতি না হলে এই রকম আমোদ আমরা উপভোগ করতে পেতাম না। যার যত দুঃখ কষ্টই থাক না কেন বেতার যে তাকে তার গান, গল্প প্রভৃতি দ্বারা তার দুঃখ ভুলিয়ে তাকে আনন্দে রাখবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বেতারের মারফৎ আমরা সকল বিষয়েই অল্প বিস্তর জ্ঞান লাভ করছি; কারণ যে কোন বিষয়ে কোথাও কী হচ্ছে না হচ্ছে প্রভৃতির খবর আমরা বেতারের মারফৎই পাই এবং সকলের আগে পাই। সুতরাং আমরা যদি প্রত্যেক দিন সংবাদ পড় না পড়ি তা হলেও কোন বিষয় যে আমাদের অজানা থাকবে, তা নয়।

এ জায়গায় বেতারই আমাদের একমাত্র সাহায্য দাতা।

তবে বেতার সম্বন্ধে অনেকের মন থেকে কুসংস্কার এখনো যায়নি। তাঁদের ধারণা শুটো শুধু বিলাসীতার জিনিস—আর কিছু নয়। অনেক শিক্ষিত পরিবারেও এই ধারণা বদ্ধমূল। অল্প ভবিষ্যতে এ কুসংস্কার হয় তাঁদের মন থেকে চলে যাবে। তখন তারা বেতারকে শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই গ্রহণ করবেন।

বেতার জনসাধারণের—জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার মাহুয, জনসাধারণের উন্নতি করেছে সে তার জীবন উন্নয়ন করেছে ও করবে। দূর পল্লীতে শিক্ষা প্রচার করা একমাত্র বেতারের ভেতর দিয়েই সম্ভব এবং হচ্ছেও তাই।



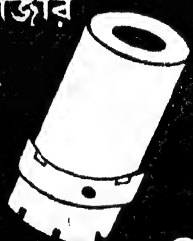
লগুনে আজকাল Television ব্রডকাষ্টিং হচ্ছে। আরো কয়েক বছর পরে দেখা যাবে আমাদের দেশেও Television ব্রডকাষ্টিং হচ্ছে; তখন বেতারের ভেতর দিয়ে জনশিক্ষা প্রচার করার কত সুবিধা হবে।

পাশ্চাত্য দেশে বেতারের খুবই উন্নতি সাধিত হয়েছে। বেতারের মারফৎ কী করে জনশিক্ষা প্রচার করা যায়; কী করে শিশুদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় তার ভিত্তি নীতি নতুন উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে ও হচ্ছে। জার্মানীতে কী করে বেতারের মারফৎ ছেলে-মেয়েদের জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয় তার একটু নমুনা এখানে দিচ্ছি।

বিকেলবেলা ছেলেমেয়েরা পার্কে খেলা করছে; তারপর বেই সন্ধ্যা হ'ল অন্ধকার আকাশের গায়ে একটা তীর ফুটে উঠল এবং সেই তীরটা একে বেকে ও লড়ে লড়ে কথা ব'লে সেই পার্কে উপস্থিত ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানে খেলা শেখাতে লাগল।

আমাদের দেশেও এই রকম দিন আসবে। তবে পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের দেশের

ফোন ২৭৭৬ বড় বাজার

কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারত অয়েল মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩ আগার সারকুলার রোড, কলিঃ



(বিলাসী)

বিজ্ঞাপতি

দেখতে দেখতে পাঁচটি সপ্তাহ কেটে গেল এবং প্রতি সপ্তাহেই দেখা গিয়েছে, 'চিত্রা'-র ভরা-আলর সরগরম কোরে রেখেছে "বিজ্ঞাপতি"। সর্বশ্রেণীর দর্শক-মহলে বিজ্ঞাপতি যে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করেছে, তা, চিত্রায়, গত পাঁচ সপ্তাহের Steady box-office receipt থেকে বিলক্ষণ বোঝা যায়।

চিত্র-পরিবেশকের রিপোর্ট থেকেও আমরা জানতে পেরেছি, বাঙলার মঞ্চ-মলে 'বিজ্ঞাপতি' সমানভাবেই সমাদৃত হয়েছে।

বিজ্ঞাপতির অভিনয় এবং তার চিত্রকারী সঙ্গীতের আকর্ষণের বিষয় আমরা বহুবার লিখেছি। নরনারী নির্বিশেষে, কানন-এর 'অমুরাধা' সকলের কাছেই চিরস্বপ্নীয় হয়ে থাকবে। অঙ্ক-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্রের গানগুলিও বিজ্ঞাপতির অত্যন্ত সুরশীল আকর্ষণ।

যারা এখনও এই চবিখানি দেখবার সুযোগ পাননি, তাঁদের অবিলম্বে চিত্রায় গিয়ে চবিখানি দেখতে বলি। চবিখানি

বেতার এখনো বালক। অনেক টাল সামলে তবে সে এখন দাঁড়াতে সক্ষম হ'য়েছে। তবে এইটুকু আশার বাণী যে সে এরই মধ্যে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

বেতারের এই অগ্রগতির মূলে রয়েছে পূর্ণ জন-সমাজের ঐকান্তিক স্তোত্র।

সপরিবারে উপভোগ করবার মত ছবি আশা করি বহু সপ্তাহ ধরে চিত্রায় আলর সমান ভাবে ভরিয়ে রাখবে।

অভিজ্ঞান

যে সমস্তকে অবলম্বন কোরে অভিজ্ঞান-এর নাট্যাংশ রচিত হয়েছে, ইতিপূর্বে সে সমস্তা সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

অভাগিনী লক্ষ্যার জীবন-নাট্যে পর পর এমন বিপর্যয় ঘটে গেল, যার কথা শ্রবণ কোরতে, প্রত্যেক হৃদয়বান নর-নারীর অন্তর সমবেদনায় ভ'রে উঠবে।

স্বামীর আশ্রয় হারিয়ে নে যখন বিপন্ন। তখন তার ভগ্নাঙ্গি প্রকাশ স্বেচ্ছায় তার ভার গ্রহণ কোরেছিল। কিন্তু প্রকাশের স্ত্রী সখীতা, স্বামীর এ অমুগ্রহকে অস্বীকারে দেখলে না।

লক্ষ্যার প্রসারিত দৃষ্টির সামনে সমস্ত পৃথিবী আধার হয়ে এলো। যে দিকে চায়, শুধুই অন্ধকার।

অনির্দেশ যাত্রা-পথে, লক্ষ্যার সেই প্রথম পদ বিক্ষেপ। দৈব প্রেরিত সহচররূপে, সেই পথে এসে দেখা দিল—প্রমথ।

সে হরহড়া, সে ভববুরে! ছুনিয়ার এক অর্থ ও পারিবার ঐশ্বর্য ছাড়া তার আর কোন অবলম্বন নেই। নারীর সেবা, নারীর মেহ বা প্রেম কি বস্তু, সে জানে না।

লক্ষ্যার সান্নিধ্যে এসে প্রমথের জীবনে আজ যেন নব অকণোদয়! তাই লক্ষ্যার নাম পাণ্টে, সে তার নূতন নামকরণ করলে—উবা!

বহুদিনের হরহড়া, গৃহহারি, ভববুরে—জীবনে আজ প্রথম উপলব্ধি কোরতে শুরু কোরল, 'যর বাঁধবার আনন্দ'!

জানি, সে গৃহ-বহুকে এক সমাজ গৃহের বার কোরে দেয় আর একজন তাকেই গৃহের বহু করবার জন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করে।

কিন্তু প্রমথ ও উবার জীবনে, দৈবাৎ যদি সে সুযোগ এলো, শেষ পর্যন্ত তা কী পার্থক্যের ভ'রে উঠেছিল?

প্রিয়লালের 'লক্ষ্মা' এবং প্রমথ—'উবা'!

একই নারী, অবস্থা বিপর্যয়ে তার দ্বৈত রূপ নিয়ে উদয় হয়েছিল, জীবন-নাট্যের দুটি বিভিন্ন অঙ্কে। নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তারই অথও চিত্র ফুটে উঠেছে 'অভিজ্ঞান'-এ।

চবিখানি শীঘ্রই 'রূপবাহী'তে মুক্তি লাভ কোরবে এবং এর বিভিন্ন ভূমিকার চিত্রাবতরণ কোরবেন,—মলিনা, মেনকা, জীবন গঙ্গো-পাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, শৈলেন পাল, মনোজ্ঞন ভট্টাচার্য, ভাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, বোকেন চট্টো, নির্মল বন্দ্যোঃ, কমলা (ঝরিনা) প্রভৃতি।

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আন্তোব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

স্বপ্নদ্বি

এই চিত্রের প্রধান দুটি নারী চরিত্র—
মাধবী ও শান্তি।

কুশলী কথা-শিল্পী আপনার বুকের দ্বারা
দিয়ে এই দুটি অপরূপ নারীচরিত্র সৃষ্টি
করেছেন।

বড়দ্বি 'মাধবী'—যেন আশাধের কত
পরিচিত, কত আপনার জন। বাস্তব
জীবনে, রক্ত-মাংসে গড়া নারীর মতট
এই মহিলা নারী, অতি নিখিট
ভাবে আশাধের অন্তর স্পর্শ করে।

সেবা, দাক্ষিণ্য, স্নেহ ও প্রেমের মধ্য দিয়ে
এই চরিত্রটি প্রাণরসে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।
স্বামী মৃত্যুর পর, সে ভাস্কর্য্যের ভরা-গঙ্গার
মত, রূপ, স্নেহ ও মমতা নিয়ে তার পিতৃভবনে
কিরে আসে। সেখানে সে স্নেহময়ী, সর্বময়ী।
বাড়ীর পোষা কুকুরটা পর্যন্ত যেন হিনাস্তে



"অভিজ্ঞান" চিত্রে জীবন গাঙ্গুলী

তাকে একবার দেখতে চায়। বাড়ীর প্রভু-
থেকে সরকার, গোমস্তা, দাস-দাসী, সবাই তাবে
বড়দ্বি কণা, লব্ধ তার উপর নির্ভর করে।

এই চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করে, ভাষাচিত্রে
ফুটিয়ে তোলবার ভার পেয়েছেন—সুন্দরী ও
বিশ্বিনী অভিনেত্রী, শ্রীমতী মলিনা।

এর পরেই আসে, সুব্রহ্মনাথের শান্তি শ্রী
শান্তি। সে তার স্বামীর বেহনা কোথায় তা
বুঝতে পেরেছিল। শান্তির অন্তরে অবিশ্বাস
ছিল না—ছিল তার স্বামীকে লাঞ্ছনা দেবার,
তার উৎসাহীন মনকে লচেনন কোরে
তোলবার প্রচেষ্টা।

শান্তির চরিত্রের মধ্যে যে 'স্পার্ক' আছে,
তাকে ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে না পারলে,
নায়ক সুব্রহ্মনাথের চরিত্রের পরিকল্পনা
পূর্ণতা লাভ কোরতে পারে না। তাই এই
সুকঠিন নারী চরিত্রটিকে প্রকাশ করবার
ভার পেয়েছেন, বাঙলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ
চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী।

ভাষা-চিত্রে আর একবার মলিনা ও
চন্দ্রাবতীর যোগাযোগ সম্ভব হোয়েছিল।



স্বপ্নদ্বি

শ্রেষ্ঠাংশে :

অশীষ,

শিশুবালা, মনোরঞ্জন,

রাধারাণী, চিত্রা, সাবিত্রী,

যোহন রায়, তিনকড়ি, দুর্গা বসু

পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী

উত্তরা

প্রথমারম্ভ

শনিবার

৪টা

জুন

রাবাকী এর পর আবার তাঁরা একজো
জীবতরণ কোরবেন বড়দ্বিধিতে—প্রধান
টি নারী-ভূমিকায়।

বিভিন্ন ভূমিকার অপরাপর গুণী-শিল্পীদের
শিল্পীকায় আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছি।
স্বল্প বহুদিন পর মলিনা ও চন্দ্রাবতীর
সঙ্গায়োগের কথা উল্লেখ কোরলুম, এই
পর্বে যে এদের teaming-এর ফলে,
শ্রমী ও শান্তি, দুটি ভূমিকাই তাদের চরিত্রগত
বিশিষ্টা নিয়ে, ছায়া-পটে ফুটে উঠবার
সম্ভাবনা পাবে। আশাকরি রঙ্গত্ব দর্শক
জ্যেই এ খবর শুনে আনন্দ প্রকাশ
কোরবেন।

টুট সিন্ধার

তপোঁ—পোঁ—তপোঁ—পোঁ—ডুম—ডুম
জি উঠিল সে দিন টাঙ্গিজে। মেচো,

মুখী, মুকুন্দরাম, ছুতোর, কামার, বিড়িওয়াল,
কাবলীওয়াল, কেউ বাকি ছিল না। হৈ
হৈ গোলমাল, গারে গারে তীড়। সবাই
চুকবে ওই 'দি গ্রেট জাশানাল থিয়েটার'র
মধ্যে।

নিউ থিয়েটার ষ্টেডিও আজ ফাঁকা।
পরিচালকের উঠে গেলে হাত।
প্রোডাকশন চিফ পি, এন, রায় বুয়েছেন এম্বিক
ওঁদিক।

'অভিজ্ঞান'এর সেটের বড় খামের
পেছনে একা প্রফুল্ল রায়, আপন মনেই বলে
আছেন, মাথাটা কেবল নড়ছে বাড়ির
পেড়ুলার মত।

জলু বড়াল চেঁচাচ্ছেন: খোঁজ! খোঁজ!
খুঁজে বার কর! কিন্তু কে খোঁজে, কাকে
খোঁজে!

হঠাৎ 'পেরেছি পেরেছি' হবে ছুটেছেন
শ্রীঅনাথ, পেছনে নৌগীন। চিফ-
থিয়েটারের দরজায় দেখা গেছে বুচেন পরে
দুর্গা বাজুজোকে।

থিয়েটারের তাঁবুর দরজায় এলেন রায়
সাহেব। টিউট না পাওয়া দর্শকরা তখন
ফিরছেন। সূর্যের ভিড়ের মধ্যে বেঁধে পূর্ব-
থিয়েটারের ম্যান্ডার লাহু বাবু, পেছনে
মুকবি অজয় ভট্টাচার্য (বেচারি গলার চাদর
দিয়ে ঘাম মুচছেন)। পালোয়ান জগদীশ
শেঠি পাশে ঠৈলেন চৌধুরী ও কোনে ম্যাডাম
চন্দ্রা (তাঁর কপাল হতে প্রকাণ্ড তেলা-
পোকায় টিপটা তখন খসে পড়ে গেছে),
গৈয়ো পোবাকে স্নান মুখে পকজ মল্লিক,
সবায়ের বেজায় কুখ চার পরলা টিকিটের
চিফ-থিয়েটার, তাও তাঁরা দেখতে পেলেন না।

বাধা ফিল্মসের
পরিচালনা

বিজয় বাপতি

— ক্রমিকায় —
প্রাণবান, দেববান, ছায়া
নরেন্দ্র মিত্র, জহর গাঙ্গুলী
মুশাল রায় (এ.), মনোজ পাল (এ.এ.এ.)
কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী
স্বয়ং বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিনয়

মতিমহল থিয়েটারের
হাস্যরসায়ক
কথা চিত্র

প্রযোজনা: শ্রী জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র: শ্রী যতীন্দ্র দাস
সঙ্গীত: শ্রী { রবীন্দ্র পাল ও
ডাঃ মনোজ

রায় নাহেব চৈয়চেন : আর সব
গেলো কোথায় ? পক্ষীর ফটক তখন বন্ধ।
নাচ শুরু হয়েছে। চিৎ থিয়েটারের স্তম্ভার
নাচ, স্তম্ভার গান—হাত-তালি—শিশু—আর
হৈ হৈ গোলমাল, তার পরেই গুণ্ডগোল।
লাত বছরের ছেলে সুবীর আলি টেকের ওপর
থেকে লাফিয়ে পড়ল। ‘ধর ধর! মার মার!
পাকড়ো পাকড়ো!’ চিংকার উঠল। হলো
সব ওলট পাগোটে। অ্যাকটর অ্যাকট্রেস,
পেট্টার লিফটার, ট্রেজ ম্যানেজার সবাই
বেরিয়ে পড়লেন ট্রেজ ছেড়ে, সুবীর পালাচ্ছে
তারের চেয়ারের ওপর দিয়ে, বেকির তলা
দিয়ে, মেয়েদের আঁচলে গা ঢেকে, তাঁবুর ধার
দিয়ে। আর দর্শক—লাইগলের মাথার বার্ণাড
শা’র চুল গলে গেল, পুথারাজের মুখের
গোঁপ ছিঁড়ে পড়ল, মেনকার মাথার পাঞ্জাবী
পাগড়ী খুলে দিলে সুবীর। সুবিখ্যাত
চিত্রশিল্পী বিমল রায় বলে রূপাপারে ঘোমটা
দিয়ে,—ছিলে খুলে। চাবীর বজরার পেছনে
লুকিয়ে অভিনয় দেখছিলেন শ্রীমতী কানন
—তাও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ডিপেক্টর ফণি বজ্রবাহার চৈচিয়ে উঠলেন
কাট! কাট! —এক আপনারা সব
এখানে।

বিশ্বের পরস্পর পরস্পরের পানে তাকিয়ে
রইলো। কে কখন কি ভাবে, কি সাজে
অভিনয় দেখতে বসেছিল কেউ তা জানত
না, ডিরেক্টরও না।

সুবীর আলি সেজেছে ভুলুয়া।
অভিনয় হচ্ছিল টুডিওর হু-নখর ক্রোরে, এই
বই খামার নাম ‘ভুলুয়া’ বা ‘টুট সিঙ্গার’।

দেশের মাটি

আকাশে ঘেঘ নেই। ধরণীর পিঠের
ওপর আশুপ ঝরছে। রাত্তা হুলোর শুভ
আকাশে গিয়ে বিশেষ। চারিদিকে
হাহাকার! জল! জল! আর জল!
এক কোটা জলের জন্তে পৃথিবী পাগল।
জল না পেলে এ পৃথিবীর প্রাণী, জীব জন্ত,

উদ্ভিদ, বাহুবল্লভ লম্বা নিশ্চয় হয়ে যাবে।
মাটি আজ কুটিকাটা।

আকাশের বুক চিরে গেলো। বিদ্রোহ
চমকালো। কোথা থেকে এলো বৈতোর
মত প্রকাশ রাশি রাশি মেঘ। সারা
আকাশ ভরে গেলো।

এলো ঝড়! এলো জল! সারা
পৃথিবী ধরে মাতন শুরু হলো। তৃপ্তি!
তৃপ্তি! বিরাট তৃপ্তি! আবার ফসল,
আবার ধান—থরে থরে কুটবে সোনা—
দেশের লোক বাঁচবে। গাঠিবে তারা
‘খন পাতে পুষ্পে ভরা, আমাদেবটে বসুন্ধরা।’

অপরূপ এই দৃশ্য পরিকল্পনা—প্রতিভাবান
পরিচালক নীতীন বসুর। আটখানা
প্রপেলার লাগান হয়েছে নীতীন বসুর সেট
গালন গালন জল উঠছে ওপরের ট্যাকে,
পাঠেপে।

ঝড় জল অন্ধকার বিদ্রোহ—তার মাঝখানে
এ সেটের আটখানা পূর্ণ তৃপ্তি নিশ্বাস নিয়ে
উর্ধ্বমুখে আকাশের পানে তাকিয়ে রইলো—
আমি অতি দূর থেকে কার ক্ষীণ কণ্ঠে যেন
সুনতে পেলুম—হে খোদা! হে ভগবান!
হে পৃথিবীস্বর! হাও হাও আরো হাও
লারা ছনিয়া করিয়ে হাও। আমাকে বাঁচতে
হাও! আমার সোনার পৃথিবীকে বাঁচতে
হাও।

“চোখের বালি”

মিঃ বি পি মেহেরার প্রযোজনায় কালী-
ফিল্মস্ টুডিওতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিন্দিত
সামাজিক কাহিনী “চোখের বালি” সমাপ্তির
পথে। নারীর কামনা আর পুরুষের বাগনা
—এরা যে কোন বন্ধনেরই বাঁধ মানে না।
বিশ্বকবি “চোখের বালি” সেই সমস্তাই
ওপর ভিত্তি কোরে প্রতিষ্ঠা। এই অব্যুত
কাহিনীটি বাস্তবে নবরূপে উদ্ভাবিত হয়ে
বাঙলার রস-পিপাসুদের চিত্ত-বিনোদনে
সমর্থ হয়—তার জন্য পরিচালক লক্ষ্মী দেব,

শব্দগোষ্ঠী মধু শীল, আলোক-চিত্র-শিল্পী ননী
সাহায্য ও কালী ফিল্মের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ
নিজ নিজ বিভাগে নিজেদের সুনাম অর্জনের
জন্য আগ্রাণ চেটে কোরছেন। “চোখের
বালি”-র চরিত্রগুলি মনস্তত্ত্বগত—সেইজন্য
এই কাহিনীর জন্য কর্তৃপক্ষ আভিজাত্য বংশীয়
বিদুষী মহিলা ও মাজিত-কুচিন্দ্রিয়
অভিনেতা নিয়োজিত কোরেছেন। এর
মধ্যে সুপ্রভ মুখার্জি, ইন্দিরা রায়, শান্তিগতা
বোম্ব, রমা ব্যানার্জি, ডাঃ হরেন মুখার্জি,
চবি বিশ্বাল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সবের যোগে-
যোগে আমাদের বিশ্বাস, “চোখের বালি”
সকলের মনোমগ্ননে সমর্থ হবে।

হাজরা পিকচার্স

আগামী ৪ঠা জুন উত্তর কলিকাতার
জনপ্রিয় চিত্রগৃহ “উত্তরা”-র হাজরা
পিকচার্সের প্রথম পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন
“দেবী ফুলরা” বহু প্রতীকার পর মুক্তিলাভ
কোরবে। হানি-কান্না, প্রেম-বিরহ, নৃশ-
গীত, শৌর্য-বীর্য, সারল্য ও কার্পট্য বিষণ্ণিত
ভক্তি-রস-লিঙ্গ চির-মুতন পৌরাণিক
উপাখ্যান এই “দেবী ফুলরা”। শুধু
পৌরাণিক চিত্র হিসাবেই নয়—নবীন ভারতের
নব-যুগের এক মহান আদর্শের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত
জন-সাধারণের মনের ওপর বিশেষভাবে রেখা
পাত কোরবে। “দেবী ফুলরা”-র কাহিনী
আজও বাঙলার প্রতি ঘরে ঘরে সুপ্রতিষ্ঠা।
—সেই জনাই আমাদের মনে হয়, কাহিনীর
বৈচিত্র্য, সুবিস্তারিত তিনকড়ি চক্রবর্তীর
পরিচালনায়, সর্বজন-প্রিয় মধু শীলের
শিল্পের নির্দেশনায়, তরুণ কর্মীবৃন্দ বিকৃতি
লাহা ও যতীন দত্তের আলোক-চিত্র

গর্ভ নিরোধ বাটিকা

বহুপরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ও মধুমাত্র প্রস্তুত
সেবনে এক বৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫ টাকা
ডাকিম এম.এস.ডোমান
৪২, ধর্মভাঙ্গা ট্রাট, কলিকাতা

শকাঙ্কুলেখনে, স্বায়োদীয়ী ধীরেন বহু ও
গোকুল সুখাঙ্কির লজ্জিত পরিচালনার,
আতিজাত্য লক্ষ্যায়ের সুপরিচিত বিভূতি
সুখস্বায়ের (ঃঃ) নৃত্য-পরিচয়না এবং
লক্ষ্যোপরি সুখভিনেতৃ সংযোগে জীবিতানা
বাঙলার আবালা-বুদ্ধ-বণিতার মনে এক নতুন
রস পরিবেশন কোরবে। “দেবী সুলক্ষণা” সম্পূর্ণ
চরিত্র-লিপি নিয়ে প্রস্তুত হ’ল।

মহাশায়া—সাবিত্রী, দেবী কুলদা—
শিশুবালা, সুরমা—রাধারানী, সুসমা—চিত্রা
দেবী, কালকোত—অছিন্দ্র চৌবুরী, ভাণ্ডু স্বপ্ত—
মনোহরজন ভট্টাচার্য্য, বৃন্দাবন—মোহন রায়,
বুনে। সর্দারস্বয়ং—তিনকড়ি চক্রবর্তী, হুর্গা প্রসন্ন
বসু ।

ইউনাইটেড টকীজ

এদের প্রাথমিক কাজ শ্রায় শেষ হয়ে
এল। শুটিং ভোলায় কাজ নিয়ে আপাততঃ
পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই ব্যস্ত

আছেন, ছবিখানি বাতে নকল রকমে প্রথম
শ্রেণীর হয় তজ্জন্ত তিনি ও তাঁহার
নহকস্মীরন আগ্রাণ খাটছেন ।

ষেকার নশন

গত সংখ্যায় আমরা জানিয়েছিলাম ;
'বেকার নাশন' জুন মাসের প্রথম ভাগে
'উত্তর'র দেখানো হবে। এখন সন্দি
তা' হবে না। কোথায় এবং কবে দেখানো
হবে তা' শীঘ্রই জানাতে পারবো আশা
করি।...এখন ঐতিহাসিক নাট্য সম্প্রদায়ের
'চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যকাভিনয় দৃশ্যের চিত্র গ্রহণ
চলছে। উক্ত মঞ্চাভিনয়ে, গত সংখ্যায়
একটি নতুন ধরনের 'ব্যাধ নৃত্য' দৃশ্য তোলা
হয়েছে। নেচেছেন : চিত্র-সঙ্গতে নবাগতা
শ্রীমতী বেলা এবং শ্রীরবীন সরকার।

নাচ হাড়া ও পুস্তক আর একটি প্রধান
আকর্ষণ হচ্ছে 'বাক্ গ্রাউণ্ড মিউজিক'।
এ মজাভরাটানের সমস্ত প্রশংসা ত্রিকুমার

মিত্র-র প্রাণ্য ! কুমারবাবু যে শুধু হালকা
ভূমিকাভিনেতা নন—সঙ্গীত শাস্ত্রেও যে ওর
বেশ দখল আছে—চবিথানি পর্দার গারে
দেখার সময় বর্ষকলাধারণ তা' উপলক্ষ
করবেন আশা করি ।

ନର-ନାରାୟଣ

‘বেকার নাশন’-এর কাজ শেষ ক’রেই
 প্রয়োগ-শিল্পী শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
 রাধা ফিল্মসের পূর্ববর্তী শৌমাণিক নিবেদন
 ‘নরনারায়ণ’ তোলার কাজে হাত দেবেন।

পূর্ণ থিয়েটার

আগেই শনিবার থেকে 'মুক্তি' এই চিত্র
 গৃহে অষ্টম সপ্তাহে পড়বে। কোলকাতার
 এর আগে কোন বাঙলা ছবিই একাধিকক্রমে
 ৩৫ সপ্তাহ ধরে চল্লার শোভাগ্য লাভ
 করে নি। মুক্তির এই অভূতপূর্ব সাকল্যের
 জন্যে আগের সকলেই বিশেষ আনন্দিত। এই
 ছবির মধ্যে সম্মিত ও কঠিন রসে ভাবে

রবীন্দ্রনাথের
শ্রেষ্ঠ সামাজিক
চরিত্রলেখ

সামাজিক
ত্রা লেখ্য

ডোথের বালি

নারীর কামনা
আর
বাসনা

নান্দীর কামনা
আর
মুকুয়ের বাসনা
এর মধ্যে
সামাজিক শাসনের
ভুক্তারের মূল্য কোথাক
?

বি পি মেহরার
প্রযোজনা

• পরিচালক : সত্ৰু সেন
 শব্দানুলেখ : মধু শীল
 আলোক চিত্রী : ননৌ সামন্তাল

*

অ বি ল ক্ষে
আ গ ত প্রা য়

শ্রেষ্ঠাংশঃ—
 সুপ্রভা মুখার্জি
 ইন্দিরা রায়
 শাস্তিলতা ঘোষ
 রমা ব্যানার্জি
 ডাঃ হরেন মুখার্জি
 মনোরঞ্জন ভট্টাঃ
 ছবি বিশ্বাস

প্রভাত সিনেমা

চৌরঙ্গী অঞ্চলে স্বর্ষ্যদিশ থেকে এমন একটা চিত্রগৃহের অভাব ছিল, যেখানে শুধু প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় চিত্রই দেখান হবে। সম্প্রতি সে অভাব আর নেই। সম্প্রতি পুরাতন ম্যাডান থিয়েটার নব পরিবর্তনায়, নতুন নাম নিয়ে, নতুন বন্দোবস্তে প্রভাত সিনেমা রূপে রূপান্তরিত হয়েছে, চিত্রাঙ্গদারী মাত্রেই যে এতে আনন্দিত হবেন তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। সাহেব পাড়ায় সম্পূর্ণ ভারতীয় বন্দোবস্তে ভারতীয় চিত্রগৃহে একমাত্র ভারতীয় চিত্র দেখার সুযোগ অভাবনীয়, অভূতপূর্ব বললে ও কোন অত্যুক্তি হবে না।

বর্ষাকগণ যাতে সকল রকম সুবিধা এখানে উপভোগ কর্তে পারেন কর্তৃপক্ষ তার কোন ক্রটিই রাখেন নাই। অতুল আলোক মালায় সুসজ্জিত এই চিত্রগৃহে বর্ষাকগণ প্রথম শ্রেণীর চিত্র দেখার যে বিশাল আনন্দ উপভোগ কর্তে পারবেন তা নিঃসন্দেহ।

পরিবেশন করা হয়েছে তাতে করে মনে হয় যে বাঙলা দেশের চিত্রাঙ্গদারী একে আরও কিছু দিন আঁকড়ে ধরে রাখবে।

রূপমাণী

পল্লবিনি পৃথিবীর ছায়া-চিত্রাভিনেতাধর মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা বলিয়া পরিচিত। আর কে ও রেডিও পিকচারের 'এক্সট্রা'—এ এই সুন্দর অভিনেতা পল্লবিনির ললিত নারিকা রূপে দেখা দিয়াছেন সুন্দরী ও কুশলী অভিনেত্রী মিরিয়ম হপকিন্স। বর্তমানে এই চিত্রগৃহে এ ছবিখানি দেখান হইতেছে।

এই চিত্রগৃহে নির্বাচিত হিন্দি ও উর্দু চিত্র দেখাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর পরিচালনা ও অস্ত্রা বন্দোবস্ত আপাততঃ মেসার্স এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটরস করিতেছেন কিন্তু নিউ থিয়েটারের মিঃ বি. এম সরকার, মেট্রোপলিটন পিকচারের মিঃ বি. এল কেম্বা এবং লাগর ফিল্ম কোম্পানিও এতে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন।

ফিল্ম জগতে মিঃ এস. আর হেমাধ আজ সর্বত্র পরিচিত। ফিল্ম ব্যবসা সম্পর্কে যাহাযের নাম প্রথমে উল্লিখিত হয় মিঃ হেমাধ তন্মধ্যে অগ্রতম। তাঁহার বিচক্ষণতার ও দূর্বর্ষিতার আজ এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটরস উন্নতির শীর্ষ স্থানে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার কোম্পানীর পরিচালনায় প্রভাত সিনেমা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে একথা জোর করিয়াই বলা যাঁতে পারে।

তামিল ছবি

তামিল ও তেলুগু ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা কলিকাতায় নাই বলিলেও চলে। মিঃ হেমাধ দক্ষিণ ভারতীয়দের এই অস্ত্রবিধা দূর করিবার মানসে স্থির করিয়াছেন 'অতঃপর প্রভাত সিনেমায় প্রত্যেক রবিবার সকাল ১১টার নির্বাচিত তামিল ও তেলুগু ছবি দেখান হবে, আসছে রবিবার মেট্রোপলিটন পিকচারের পৌরাণিক বাণী-চিত্র 'বক্ষয়জ্ঞ' প্রথম দেখান হবে, এই বন্দোবস্তে তামিল বাণীধর বহু দিনের একটা অভাব যে বিহীন হইবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

জানঙ্গীরদার

লাগর হুটিটোনের হিন্দি লামাজিক চিত্র

প্রভাত সিনেমায় গত ২৮শে এপ্রিল থেকে দেখান হচ্ছে। বর্ষাকের ভীড় বেধে মনে হয় ছবিখানি আরও কিছুদিন চলবে। ঘটনার সংঘাতে, গানের মাধুর্য্য ও বার্থ-প্রেমের রূপ কাহিনী ছবিখানিকে খুবই জনপ্রিয় করেছে, ধনী জায়গীরদার এক লামাজিক কৃষক কস্তার সঙ্গে ভালবাসার আবদ্ধ হয়। কিন্তু অদৃষ্ট-দেবতার ক্রুর ইচ্ছাতে তাহের মিলন হলনা। কার্য্য ব্যাপকভাবে জায়গীরদারকে বিবশে যেতে হয়। এদিকে লামাজিক কৃষক কস্তা ন'লাকে ঘরে ঠাঁই দিতে নারাজ—কেননা সে কলঙ্কিনী। অবশেষে এক কৃষক দ্বারা পরবশে তাকে বিবাহ করে। দিন কেটে যায়। অবশেষে থবর রটে যে জায়গীরদার—যাকে লোকে এতদিন মৃত ভেবে এলো—পুনরায় তাঁর বাগলুকে নিজ গ্রামে ফিরে আসছেন। গ্রামজুড় সকলেই জায়গীরদারকে অভ্যর্থনা করলে। কিন্তু জায়গীরদারের মনে শান্তি নেই। সর্ব্বদাই সে নীলার কথা চিন্তা করে। অসহ্য আবেগে সে নীলার নিকট চিঠি লেখে ও গোপনে লাক্ষ্য করে। নীলার স্বামী খুবই ক্রুদ্ধ হয়—কিন্তু ঘটনার বিপাকে মূঢ়্য তাকে টেনে নেয়। নীলার স্বাস্থ্য ও শরীর ক্রমশঃ ভেঙে যায় এবং একদিন সেও চিরতরে চক্ষু মূর্ত্তিত করে।

জায়গীরদারের জীবন হয়ে উঠে অসহ—কিন্তু অবশেষে রমেশ—তারই পুত্রের সঙ্গে তার মিলন হয়।

ঘটনার বৈচিত্র্যে চিত্রখানি যে প্রথম শ্রেণীর তাতে কোনই সন্দেহ নেই। ফটোগ্রাফীর কাজ হয়েছে অনবদ্য। সর্ব্বাপেক্ষা এই ছবিখানির প্রধান আকর্ষণ গান প্রত্যেক চিত্রাঙ্গদারীই এ ছবিখানা দেখা উচিত।

দীনদস্যালের সোজনাযচা

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদন্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহরপথে রামদয়াল বাজারে গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল যে, যে বাবলাবুদ্ধিতে দ্বিগুন শিক্তের মত ধুরন্ধর চোঁচাকা বলধের মত অন্ধ, একরাত্রের ছুঁকারে তা কি সবই লোপ পাইল! রাত্তার লে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিল। বাজার থেকে ফিরবার সময় বেধা গেল তার এক হাতে বাজারের খলে কত হাতে লাবানের বাস ও ঘোর শিশি। অত্যধিক চমকিত করিবার কত শোজা সান্নাঘরে গিয়া গিন্নীর পায়ের উপর নো ও লাবান রাখিল। তিন চারিটা ঘোঁটারে টারার বেন একলঙ্গে কাটিয়া গেল। সুহৃদের মধ্যে লাবানের বাস উঠানের মধ্যে খুলিয়া লাবান ছত্রাকার। অন্ধ শারিত অধমুগ্ধ এক কুকুরের মুখে স্নেহ খেত প্রলেপ।

রামদয়াল ভাবিতে লাগিল “শীতল বলিয়া ও চাঁদ লেবিলু, ডামুর কিরণ বেধি।”

মদে মজেই সামুদ্রিক গর্জন—“আমার কেন মরণ হয় না? হতচ্ছাড়া মিলে বাজারের কত জাতের ছোঁয়া তার ঠিক নেই, সান্নাঘরে ত এনেছেই, তা আবার একেবারে আমার পায়ের উপর। বলি, এতটুকু জ্ঞানও কি নেই যে বাজারের কোন জিনিষ না ধুয়ে ধরে তোলা যায় না? আর এই যে যেখানে সেখানে থেকে ঘুরে এসে হাতপা না ধুয়ে কাপড় না ছেড়ে হন হন করে সান্না ঘরে ঢোকা হয়, সেলেচ্ছাও এরকম অনাচার করে না। ১৫১৬ বছর এই বাড়ীতে আতি, এ রকম অনানুষ্ঠি—, একদিনও চোখে বেধিনি।”

রাম দয়াল স্তম্ভিত। একবার ভাবিল “হস্তোর এর চেয়ে কোলকাতার খাকাই ঢের ভাল। কালই চলে যাব।”

আবার ভাবে নারিকেলের উপরের অনেক কাঠি ও রুক্ষতা লম্ব করিতে না পারিলে ভিতরের মুষ্টি স্বাধ পাওয়া যায় না।

কিন্তু বাহিরের কাঠি রামদয়ালের কাছে প্রায় অজ্ঞেয় মনে হইল। সে এত চেষ্টা করিত গৃহিনীর স্ত্রীতা অধিকৃত রাখিতে, কিন্তু হমকা হাওয়ার মত হঠাৎ সব উলটপালট হইয়া বাইত। ইতর প্রাণীরাও এর হাত থেকে অব্যাহতি পাইত না।

প্রত্যেক ঘরের প্রবেশ মুখে দুর্গ পরিধার মত দুই হাত চওড়া একটা করিয়া পরিধা থাকিত। সেগুলি অবশ্য গোবর জলে ভরা। যে কেউ হোক না কেন—মানুষ, বিড়াল, ইন্দুর, পিপড়া গোবরজলে স্নান না হইয়া ঘরে ঢোকবার উপায় নাই।

বাড়ীতে রামদয়াল যে ভাত খাইত তাতে কি রকম একটা দুর্গন্ধ ছিল। রামদয়াল অনেকবার চাউলওয়ালাকে বলিয়া আদিয়াছে। সে ত অবাক্। বলে—“মশাই, একই চাল আরো দশ জনকে দিচ্ছি, নিজে থাকি, কোনদিন কোনরকম গন্ধ পাওয়ার কথা কেউ বলে না, আপনি কি যেতালপঞ্চবিংশতির ভোজন বিলাসীর আশ্রয়? দুর্গন্ধ যদি কিছু থাকে তবে এখানে তার কারণ না বুঝে বাড়ী গিরে খুজুন।” আরও ২৩ জনে অমনি হা হা করিয়া বলিয়া উঠিল—“হ্যাঁ মশাই! আমরাও এদের চাল নিয়ে খাই। কই, কোনরকম গন্ধ-টুঙ্গ আজ পর্যন্ত পেলুম না।” রামদয়াল অপ্রস্তুত।

কারণটা একদিন আপনিই বাহির হইয়া পড়িল। দ্বাক্ষারণী উঠানে আঁচ দিয়াছে। রামদয়াল উঠানে বলিয়া আলানি কাঠগুলি

গোবরের জালায় ভুঁইয়া রৌদ্রে রাখিতেছে। এরূপ না করিলে বাহিরের কোন জিনিষ ঘরে ঢুকিতে পার না। গোবরের স্ত্রীতা হইতে গন্ধকেও রেছাই দেওয়া হয় না। হঠাৎ বেধিল দ্বাক্ষারণী একটা বালুতীতে জলের মধ্যে গোবর গুলিতেছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না। কিন্তু এবার রামদয়াল বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইল যখন বেধিল যে, ঐ জলের মধ্যে দ্বাক্ষারণী সে বেলার সান্নাঘর চাউল চালিয়া ছিল। সুহৃদের মধ্যে ভাতের দুর্গন্ধ-মমতা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। দ্বাক্ষারণীর পঁচিল বৎসরের যৌবনও তার কাছে লম্বা মাথুরা হারাইয়া ফেলিল। রূপমুগ্ধ যুবক যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিল পথে পরিচিতা প্রেমিকা তার ঈশবেশী যুবক। মনে মনে মোহমুগ্ধর আঙড়াইয়া রামদয়াল মনটাকে খুব মূঢ় করিতে লাগিল। কি রকম একটা নৈর্ব্যক্তিক বিষ্ময়তা তার দর্শনে বেধা ছিল।

রামদয়াল লোজা কলিকাতা চলিয়া আনিল, ভাবিল বাকবাঃ! খুব বেঁচে গেছি। মনে হচ্ছে এক বছর গোসালায় ছিলুম।”

বটবাজারের নিকটেই ছোট একখানা বাড়ী ভাড়া নিল।

(৪)

কলিকাতার তখন খুব বেরিবেরি বেধা দিয়াছে। বাজারে টমাটো পাওয়া দুর্ঘট। বারম্বার ও ফুটবল ছাপাইয়া ভিটামিনের আলোচনার চাহের দোকান ও রেস্তোরাঁগুলি সরগরম। ডাক্তারেরা প্রত্যেকের মদে প্রত্যেকের ভিন্নমত। শুভব রটিল ফুলকপিতে বেরিবেরি হয়। আর বার কোথা! বড় বড় ফুলকপি পয়সার তিনটা, তবুও কিনিবার লোক নাই। হঠাৎ বেধা গেল রামদয়াল ১৩১৪টা খুব বড় বড় ফুলকপি মুঠের মাধ্যমে দিয়া চলিয়াছে।

বালায় আনিয়া রামদয়াল মনে মনে খুব হাসিল। বিদ্যাবত্তের মত তার মনে হইল এই বেরিবেরির ভয় লুপ্তন করিয়া ভাল ব্যবসা করা যায়। বিশেষতঃ দিগীন বায়ুর ওখানে যাওয়ার পথ এতদিন হরতঃ নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়াছে।

চটপট লব ঠিক হইয়া গেল। সেইদিনই লমগ্র কলিকাতায় এবং লহরতলীতে বত হৃদ্বতী অস্থিনী ছিল সকলের মালিকের সঙ্গে এঞ্জিনেন্ট হইয়া গেল, পরদিন থেকে টাকার ২ শের করিয়া ঘোড়ার হৃদ্ব দিবে। ব্যাক ব্যালাল কিছু কমাইয়া অগ্রিম দানও দেওয়া হইল। ভোরেই কলিকাতা সহরের লক্ষ্যে এক চাকল্যকর বিজ্ঞাপন দেয়া গেল।

বেরিবেরির অত্যন্তর্য্য

প্রতিবেদক !!

অভূতপূর্ব আবিষ্কার !!

বেরিবেরি হইলে হতাশ হইবেন না। ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া শরণাপন্ন হইতে হইবে না। রোগ লক্ষ্যার পরে এক পোয়া ঘোড়ার হৃদ্ব সেবনে ইহা লমুলে নির্মূল হইবে। ২৮ টাকা শের। একমাত্র প্রাপ্তি-স্থান—১৭ বটবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অস্থিনীর মালিকেরা ত অবাক। ঘোড়ার হৃদ্ব যে কেউ পরলা দিয়ে নেয়, এ তাহের জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। যে যা পারিল হৃদ্ব নিয়া আনিয়া হাজির। লমন্ত হৃদ্ব তার লমনি পরিমান জল মিশাইয়া জল দিয়া রামদয়াল একটা বড় জালায় রাখিল।

লক্ষ্যার বহু পূর্বেই রামদয়ালের বাড়ীর লামনে অলম্বত ভীড়। তিন ঘণ্টার মধ্যে লমন্ত হৃদ্ব নিঃশেষ।

দিন হশেকের মধ্যেই রামদয়াল প্রচুর টাকা রোজগার করিয়া ফেলিল। ভাবিল বহি অন্ততঃ মালখানেকও এই ভাবে যায়, তবে ভবিষ্যৎ জীবনের লমন্ত নিশ্চিত।

কিন্তু লব উন্টাইয়া গেল। একটু বেশী প্রচারের পর এলব কথা তার নীলরতন, তা:

বিধান প্রভৃতির কানে গেল। একদিন তার নীলরতন, ডক্টর বিধান রায়, নলিনী রজন প্রমুখ প্রায় জন কুড়ি চৌবটি ও বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার ১৭নং বটবাজারে আনিয়া উপস্থিত। খবর পাইয়া রামদয়াল হস্তহস্ত হইয়া ছুটিয়া আনি। এতগুলি চিকিৎসক হৃদ্বরকে তার কুজককে কোনমতে বলাইয়া লে যেন বিনয়ে গিয়া গেল।

নীলরতনই লক্ষ্যে জিজ্ঞাসা করিল “বেরিবেরির এ প্রতিবেদক আপনি কোথায় পেরেছেন? এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন লামার অন্তর্গত—এটা কি হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, হাইড্রোপ্যাথি, না ইউনিপ্যাথিক? এটা কি লমলক না লৈবলক।”

ডক্টর রায় বলিলেন “আমি ত লমজ ইয়ুরোপ প্রত্যাগত। লেখানে কোন ঔষধ-গারে বা ডাক্তারের লুখে ত ঘোড়ার হৃদ্বের কোন উপকারিতার কথা শুনি নি? ঘোড়ার হৃদ্বের উপকারিতা তবু বাংলা কংগ্রেসীলের কিছু কিছু লুিয়েতি।”

নলিনীরজন প্রভৃতিও বলিবার কিছু না পাইয়া চুপ করিয়া লামা নাড়িলেন। রামদয়াল খুব বিনীতভাবে লিবেদন করিল “দেখুন শ্রাবেরা! আমায় একটা লবিনয় লিবেদন আচে। প্রগল্ভতা লমা করবেন। বত্রিশ চৌবটি টাকা পকেটে পুরবার আগে ত চের রোগী লরে এ আমি লেখতি। আর লবিও না লরে, যেটুকু লমান রোগীর থাকে তাতে লবি লে লান্তে পারে, খুব লড় কোন ডাক্তার কয়েকবার এলে তাকে লেখেছে, তখন টাকার লক লিসেব করতেই তার রোগলক্ষণা চির-কালের লম্ত উপলমের লিকেই লায়।”

ডক্টর রায়ের লুখ লাল হইয়া উঠিল।

রামদয়াল বলিয়া চলিল “লমচ খুব লড় ডাক্তারের একবার লর্শনে বা লর্শনে লে কোন রোগীর রোগ উপলম লয়, এ আমায় চোখে লম লর্শান্ত পড়ে নি। এলমো লেখেছি

একজন চৌবটি, লমজন বত্রিশ, ৪ জন লোল টাকার পরামর্শ লমাপ্তির পূর্বেই রোগীর লরে কামার লোল উঠেছে। আপনায় কিছু লনে না করলে লিজ্ঞালা করি লেরিবেরির কোন লমোষ প্রতিবেদক কি আপনায় পেরেছেন?”

তার লরকার লম্তীর হইয়া গিয়াছিলেন। শুধু লমাস্তরালে লামা নাড়িলেন।

রামদয়াল লোৎলালে বলিল “তবেই লেখুন! আপনায়ের লত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও ত experiment কছেন, আমি আপনায়ের পলক লম্মলয়ন কছি লাত্র।”

নলিনীরজন লেন কি ললিতে লাইতে-ছিলেন। রামদয়াল লামা লিয়ে বলিল “হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক ত শুনেছি, একদিন ঔষধ লিয়ে ৭ দিন জল লের। লানিনা লব কয় দিনই লন লের কিনা! কিছু কই, ভিজিট নেওয়াটা লে অত্রায় লনে লরে না। লমিত লনে করণ জলের লত কোন ঔষধ লেরিবেরির প্রতিবেদক লিসেবে চালাছি। ওদের টাকা নেওয়া লবি লম্ত লয়, আমায় ললমতি কোথায়?”

এতলুনে তার নীলরতন লম্তীরভাবে বলিলেন “লেখুন! ডাক্তারেরা কি ঔষধ লের না লের লেটা লর্ভলেন্ট লেখেবে কারণ তার লর্ভলেন্ট-লুীকত। কিছু আপনি লে ঔষধের লামে ল ত চািলিয়ে লোকের লঙ্গে প্রলকনা কছেন তাহের লর্থের লিনিলয়, এর লল অপনায় পকে খুব লারাপ লবে।” এই বলিয়া তিনি ললল লিয়া চলিয়া গেলেন।

৪৫ দিন পরে ১৭নং বটবাজার ষ্ট্রীটের লরজার কোজদারির লমন লু পেরায়ার লহিত লুচিপাড়া লানায় লারোগার লেখা হইল। লারোগার লঙ্গে ৪ জন কন্টেবল।

লমনে দিগীন লিজ লাবী। রামদয়াল লিলালী। লতিলোগ প্রতারণা করিয়া লহ লর্ধ লামলয়।

শরৎচন্দ্র

শ্রীমৎশ্রী লাল রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত শ্রিত্তা

ইহার পরে শরৎচন্দ্র আর একবার ভাগলপুরে আসিলেন। সে দিন সকালে শরৎচন্দ্রকে তাঁহার শ্রিত্তা ছোড়া (আমার মেজ মাতুল শরৎচন্দ্র বজ্রমহার, নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রে বড় মাতুলের বাড়ীতে গানের আশ্রয় হইয়া মাতুলের বিরাট হল। যে হলে শরৎচন্দ্র যৌবনে বিশেষ দক্ষতার সহিত অনেকবার অভিনয় করিয়াছেন, যে হলে তাঁহার সময় কাটিয়াছে সেই হলে শরৎচন্দ্র আসিয়া বলিলেন আমারই পার্থে। আমি মাতুলের গানের সহিত হারমনিয়ায় বাজাইতে বসি, মণিমায়া শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু বেহালা বাজাইতে বলিলেন, ধরনী বাবু তবলা লইয়া বলিলেন ও বড় মামা তানপুরার সহিত গীত ধরিলেন। মাতুল যখন গাহিতে ছিলেন “বল মারে মনেবিয়া বা চামেলী বেলা চম্পে” শরৎচন্দ্র তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন।

যখন মাতুল গাহিতেছেন “নিবীড় আধারে মা চম্পকে তোর রূপরাশি”—শরৎচন্দ্র ধ্যানস্থ (এইরূপ সুখী কিছুদিন পূর্বে কবি সত্যীত রবীন্দ্রনাথের দেখিয়াছিলেন ৬ দ্বিজেন্দ্র লালের বাজিতে কামাপুত্র লেনে যখন মাতুল ঐ

ওয়ারেন্ট ও প্রবন্ধনার অভিযোগ : বাবী গবর্ণমেন্ট, বিবাহী রামদয়াল। অভিযোগ বেরিবেরির প্রতিবেদক বলিয়া ঘোড়ার দুখ চলাইয়া জনসাধারণকে ঠকান।

হরজার বাহিরে কিছু To let লটকান ছিল। ইতি

গীতটাই গাহিতে ছিলেন এবং ৬ দ্বিজেন্দ্রলালকে বহুবার “রবিবাবু রবিবাবু” বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র যেন কোন স্বপ্নমাজে চলিয়া গিয়াছেন। মাতুল গীত শেষ করিবার নিমিত্ত ধরিলেন “রামকলী” সুর ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত গীত “পিয়ালা সুখে ভরেছে”—শরৎচন্দ্রের কি আনন্দ—বলিলেন “বড় মামা তোর হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে”—তখন রাতি লাড়ে দশটা।

প্রাচীন সাহিত্যিকের রচনার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও রচনার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা

শরৎচন্দ্র এবারে আসিয়া দুইদিন কি তিনদিন পিতৃদেবের নিকটে আসিয়াছিলেন। পিতৃদেবের নবপ্রভা ও পতাকার লম্পাধক হিলাবে বহুপূর্বে যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও নব্যভারতে প্রবন্ধ শরৎচন্দ্র এতে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন যে পিতৃদেব অবাক—। আমার মনে আছে পিতৃদেবের নবপ্রভার লিখিত “বসন্তে” প্রবন্ধটী একাধিক পাঠ করিয়া শরৎচন্দ্র উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন “হরেন্দ্রবাবু লেখেন না কেন ?”—পিতৃদেব বলিলেন “হরিদ্বারের কাগজে একটা প্রবন্ধ ‘বিস্তারিত বনাম ধনবত্তা’—পিতৃদেব বলিলেন “যখন ভারতবর্ষ কিছু প্রতিষ্ঠা করে তার কিছুদিন আগে আমার বলেছিল যে একটা কাগজ রাজা বা start করতে হবে—তুমি একটু কুড়োই ছেড়ে লিখতে পারবে ?” শরৎবাবু বলিলেন “আহা এমন সুন্দর লেখা আপনার অথচ আপনি আর লেখেন না—লিখুন, আপনি প্রবন্ধ

বা সব লিখেছেন, কুড়ি পঁচিশ বছর আগে এখনও সে সব অতি সুন্দর ভাবে খাপ খায়। শরৎচন্দ্রকে চা ডিম লুচী ইত্যাদি আমি আনিয়া দিলাম। শরৎচন্দ্র লক্ষ্যের লক্ষ্য উঠিয়া সুরেন বাবুর বাড়ীতে গেলেন।

শরৎচন্দ্রের সাপ সত্তা

শরৎচন্দ্র একদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে আম বাগানের মধ্য দিয়া আনিতেন—মেজ মাতুলের বাগান হঠাৎ দেখিলেন এক আমগাছের নিকটে গর্ত হইতে গোখুরা লর্প বাহির হইয়াছে, তিনি বলিলেন “খানিকটা কাপড়—” কাপড় খানিকটা বেগুয়া হইলে তিনি তাহা হাতে জড়াইয়া গোখুরা লর্পের মুখ ধরিয়া এক হাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ করাইলেন হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন; লর্প হাঁড়ীর মধ্যে গর্জন করিতেছিল—কিরংকণ পরে হাঁড়ীর মুখ খুলিয়া দিলেন লর্প কণা বিস্তার করিয়া যেই দংশন করিতে বাহির হইল লাঠির অন্ন আঘাতেই লর্পকে মারিলেন। আমি বলিলাম “শরৎ বাবু যদি কামড়ে দিত।” শরৎ বাবু বলিলেন “তা কখন হয়—ও অভ্যাগ আমার—ছিল বেহুদেবের সঙ্গে কতোদিন ঘুরেছি জানো।”

শরৎচন্দ্রের দৈহিক শক্তি

শরৎচন্দ্র এবারে প্রায়ই গঙ্গার তীরে আসিতেন কোন কোন দিন বাড়ী হইতে তৈল মাখিয়া আসিতেন কোন দিন বা আমার পড়ার ঘরে আসিয়া তৈল মাখিতেন। আমিও দু’ এক দিন পাঠে তৈল মাখাইয়া দিয়াছি। তৈল মাখিয়া ঘরের দরজাটী বন্ধ করিয়া দিগারেট খাইতেন পিতৃদেবের লম্বুখে তাহাক

বা নিগারেট শরৎচন্দ্র কখন খাইতেন না।
মানের অগ্রে গঙ্গার ঘাটে বলিয়া বর্ষার
অনেক গল্প বলিতেন—কি করিয়া প্রেম
হইল, কি করিয়া নেপথ্যলিন খাইলেন
ইত্যাদি” আমি যত্নবৃত্ত হইয়া শুনিতাম—।

(এক দিন মাত্র বেড় বস্টা কি এক বস্টা
বর্ষার গল্প শুনিয়াও তাহা বিরতি করা যুক্তি
বৃদ্ধ নহে)

তিনি গঙ্গা মান করিতে নাথিয়া অব-
লীলা ক্রমে খর শ্রোতা নদীর শ্রোত কাটিয়া
লোকা অনেক ঘুরে চলিয়া যাইতেন, কখন
বা ডুব লাভার দিয়া বহুদূর গিয়া উঠিতেন।
শ্রোতকে উপেক্ষা করিয়া লোকা লাভার
দেওয়াতে যে কত খানি বৈদিক শক্তি ও
হৃদয়ের প্রয়োজন তাহা যাহারা লাভার জানেন
নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন। শরৎচন্দ্র আর
গঙ্গা হইতে উঠিতে চাহেন না, আমাদের
মান হইয়া গিয়াছে। আমরা ডাকিতাম
“শরৎ বাবু কিরে আসুন।” শরৎ বাবু নদীর
মধ্য হইতে হাঁসিতেন। হায় যদি এই ভাবে
জীবন কাটাইতেন দীর্ঘ কাল বাঁচিতেন
প্রচুর Soddy by carb খাইয়া ক্যান্সার
পেটে হইত না।

কলিকাতার শরৎচন্দ্র

শরৎ চন্দ্রের কলিকাতার বাটীতে আমি
বিশেষ ঘন ঘন উপস্থিত হইতাম না।
তাহার মে জন্ম যে আমার উপর অভিমান
ছিল না তাহা নহে। তবে পীড়ার সংবাদ
পাইলে প্রত্যহই যাইতাম ও সংবাদ লইতাম।
তবুও অনেকবার শরৎচন্দ্রের নিকটে গিয়াছি
লভা সম্বন্ধে লভাপতি হইতে অনুরোধ
করিবার নিমিত্ত, কখন বা সাহিত্য লব্ধকে
মতামত গ্রহণের নিমিত্ত অস্ত্রের অনুরোধে।
শরৎচন্দ্রের সহিত সাহিত্য লইয়া বিশেষ
আলোচনা হইত না। তবে তিনি আমাকে
দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিতেন “বিশ্রাম
কেনন লাগলো শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব লব্ধকে

তোমার কি মত, শেষ প্রায় কেন বস্টু
(দিলীপ কুমার) শ্রীঅরবিন্দকে পড়তে দিল
ইত্যাদি। অভিনয় ও শিল্পী কুমার তাত্ত্বিককে
লইয়াও অনেক আলোচনা হইয়াছে।

আমাকে তাঁহার স্মৃতি লব্ধকে জিজ্ঞাসা
করাতে মনে হয় শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য
লব্ধকে নির্ভীক সমালোচনা পছন্দ করিতেন—
ভাগলপুরে একবার শরৎচন্দ্রের সহিত ৬/৬/১৯০৮
লালের “পরপারে” নাটক লইয়া আমার
ঘোর তর্ক বিতর্ক হয় ও ঘরে বাইরের
নিখিলেশের চরিত্র লব্ধকে। “পরপারে” লব্ধকে
তিনি বলিয়াছিলেন “বাহাদুর শাহ দ্বিতীয়
এ সব আমার ভাল লাগে। শাস্তাও ভাল
লাগে কিন্তু চরিত্রটা unnatural বলিয়া মনে
হয়—বেশ্য কি অমন হয়?”—আমি বলিয়া-
ছিলাম “নাথিকী মেনের কি কি অমন হয়?”
নাথিকীর চরিত্রও তা হ’লে unnatural
হয়েছে।” তিনি বলিলেন “আমি অনেক
ভেবেছি মেনের, মেনের কি ছাড়া অন্য কিছু
হয় না” আমি বলিলাম “বিজ্ঞানমূলক জীবিত
থাকলে ঐ-কথাই ব’লতেন।” শরৎচন্দ্র
হাঁসিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র ঢাকা ইউনিভার্সিটি হইতে
ডিগ্রি পাইবার পর আমি লাক্ষ্য করিতে
গিয়াছি। বড়ই দুঃখিত হইয়া বলিয়া
আছেন। দুঃখ করিয়া বলিলেন “কাজ
ব’ল্লে আমি দেশের কাজ থেকে গা ঢাকা
দিয়েছি—দেশের কাজ কোন কালে ছাড়িনি
আজও ক’রো—মৃত্যুও নেই—কাজ করি
কর লজ্জ—সে আসুক—যখন বড় বাজারে
বসুক চ’ল্লেলো, লোকে শুনি খেয়ে প’ড়ে
বাচ্ছে আমি তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে আহত
লোকদের হাঁপপাতালে পাঠিয়েছি, কলকাতার
বড় বড় নামজাদা নেতাদের কাউকে দেখতে
পাই নি—দেখা পেরেছিলাম কেবল
ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে ঝাঁকে অবধা লোকে
বহু নিন্দা করেছে” কলিকাতার

শরৎচন্দ্রকে সাথে সাথে দেখিতে পাইলেও
ভাগলপুরের উন্মুক্ত আকাশের নিরে-
গঙ্গার তীরে বাসুভট্ট শরৎচন্দ্রকে
খুঁজিয়া পাইতাম না—। কলিকাতার
বাটীতে দুইদিন আমাকে এক রকম
টানিয়া তাঁহার মোটরে লইয়া গিয়াছিলেন।
এক দিন Popular stores-এ ভবানীপুরে
আমাকে লব্ধে করিয়া গড়গড়ার মোটা
রাবারের নল কিনিতে লইয়া যান। আমি
জিজ্ঞাসা করিলাম “কিনতে এলেন গড়গড়ার নল
এ গঙ্গা ওয়ুধ কেন—?”—বলিলেন “শরীর বড়
খারাপ ও না খেলে থাকতে পারি না—।
দুখ খাওয়ার কথা বলিলাম—দুখ যদি না লভ্য
হয় জানা খাইতে পারেন, জানা লভ্য না
হয় লক্ষ্য খাইতে পারেন শরৎচন্দ্র বলিলেন
“লোককে এতো বস্টু দেবো শরীরের জন্ত”
কেউ ব্যস্ত নয় আমার জন্ত—। তিনি সে
দিন আমার প্রতি এত দ্রুত হইয়াছিলেন ঠিক
শিশুকে যে রকম পিতা আদর করিয়া গাল
চাপড়ায় তাই করিলেন সেই ডিসপেনসারীর
মধ্যে ও তার পর ক্রমাগতঃ আমার দুটা হাত
ধরিয়া জোরে চাপিতে লাগিলেন—হায় মে
আদর মে মেহের ডাক আর জীবনে কখনও
পাইব না—।

তাহার পর আমাকে শরৎচন্দ্র বলিলেন
“চলোনা মোটরে একটু বেড়াই” আমি
বলিলাম “না—আমি এখন তিন মাইল
বেড়াবো গড়ের মাঠে—মোটরে বেড়ালে
চ’ল্বে না আমার”। দুঃখিত হইয়া বলিলেন
“তবে যাও”—হায় তখন জানিতাম না শরৎ-
চন্দ্রকে এতো দ্রুত জন্মের মতন হারাইব।

আমার বিদায়পুরে বাণেশ্বর লম্বা শরৎচন্দ্র
কয়েক বার আমার বাসাতে গিয়াছিলেন এবং
পারিবারিক ব্যাপারও কিছু আমার নিকটে
বলেন—তাহা হইতে জানিতে পারি যে শরৎ
চন্দ্রের বহুদূর জীবনের সুখি গ্রহণ করিয়া
অনেক অনাচারী অকারণ টাকা ঠকাইয়া

লইতেন এবং সেই জন্ত আত্মীয়ের সহিত বিরোধ ঘটত। সুখের বিষয় হু-এক ব্যাপারে আমার পরামর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে বিষয় বিবৃত করবার প্রয়োজন দেখি না।

শরৎচন্দ্রের মাতুল পরিবার

শরৎচন্দ্রের মাতামহ ও মাতুল সম্প্রদায়ের উপর অবধা কটুক্তি বর্ধিত হইতেছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। শরৎচন্দ্র নিজে ইহার জন্ত দায়ী। শরৎচন্দ্র আমাদের নিকটেও প্রায় সকলকেই বলিয়াছেন যে কুড়ী টাকা ফিস্‌এর নিমিত্ত তাঁহার F. A. পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। তিনি আর তাঁহার বন্ধু রাজেন্দ্র নাথ মজুমদার যে ভাবে গঙ্গার তীরে, অশ্বখ গাছের উপরে, ইন্সুল পালাইয়া লম্বা কাটাইতেন তাহাতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিলেও তাঁহার অতিভাবকগণ ইহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে শরৎচন্দ্র সত্যিকারের F. A. পরীক্ষা দিতে উৎসুক। ইহা যদি তর্কের খাতিরে গ্রহণ করা যায় যে তাহার মাতুল গোষ্ঠি ইচ্ছা করিয়া পরীক্ষার fees দেন নাই তাহা হইলেও তাঁহার বন্ধুবর্গ এতো স্নেহ করিতেন যে তাহারাই পরীক্ষার fees দিতেন। শরৎচন্দ্র আমার স্নেহ মাতুল ত্রিশরৎচন্দ্র মজুমদার ৬কুমার লতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৬ রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মাত্র পুত্র) নিকটে বহু রাত্রি তাহার রচনা পাঠ করিতেন—তাঁহার মন্তব্য হইয়া তাহা প্রণয় করিতেন—৬ কুমার লতীশ চন্দ্র সেই সময়েই নিজ অর্থ ব্যয়ে ঐ রচনা মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ও তিনি বিবেচনা করিতেন যে শরৎচন্দ্রের বিরাট প্রভিভা বর্ধমান।

শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি কখনও কাহারও নিকট অর্থ লাহায্য চাহেন নাই—কিন্তু না চাহিলেও তিনি লভ্যিকারের seriously পরীক্ষা দিবেন এমন মতামত প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশ করিলে ৬কুমার

লতীশ চন্দ্র সেই টাকা তৎক্ষণাৎ দিতেন। ৬কুমার লতীশ চন্দ্র এ কথা আমার বলিয়াছিলেন।

যাহারা যৌবনে শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের জীবনের সহিত পরিচিত তাঁহারা কেহই শরৎচন্দ্রকে নির্যাতন করিবার জন্ত বা কৌসু না দেওয়ার জন্ত মাতুল পরিবারকে দোষী করিতেন না।

শরৎচন্দ্র জীবদ্দশায় খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিবার পর যখন বহুবার তাঁহার মাতুলালয়ে শ্রদ্ধের সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবালা গিয়াছেন, ও দীর্ঘকাল থাকিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি বাল্যকালে বা যৌবনে মাতুল পরিবারের নিকট এমন কিছু নির্যাত্তি হন নাই বাহা বিস্মৃত হওয়া কঠিন ছিল। শ্রদ্ধের সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র পত্রে জানাইয়াছিলেন এবং সে পত্র আজও বর্তমান যে সাহিত্যে তাঁহাকে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি সুরেন্দ্র নাথের নিকট বিশেষ খণী।

এইরূপ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র লব্ধে লিখিতে হইলে তাহার মধ্যে মাতুলপরিবারকে বা সুরেন্দ্র নাথ বা উপেন্দ্র নাথকে বাহারা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত তাঁহাদের লোক চক্ষে হীন করিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়—আমরা আশা করি এ বিষয়ে যবনিকা টানিয়া দেওয়াই কর্তব্য।

এ আলোচনার মাত্র শরৎচন্দ্রকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। শিল্পী শরৎচন্দ্র লব্ধে এ প্রবন্ধে আলোচনা নাই। কিন্তু কোন এক সমালোচক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে শরৎচন্দ্রের “গভীরতা” ছিল কিন্তু হুম্মতা ও বিতৃষ্টি ছিল না—এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। ইহার অর্থ ঠিক উপলব্ধি করা কঠিন। গভীরতার কি অর্থ হুম্মতা ও বিতৃষ্টিরই বা কি অর্থ তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন—গভীরতা হুম্মতা বিতৃষ্টি

ব্যতীত থাকে। লব্ধ কি না তাহাও বিবেচ্য। গভীরতা ব্যতীত যে হুম্মতা ও বিতৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় অনেক ক্ষেত্রে তাহা লভ্যিকারের হুম্মতা ও বিতৃষ্টি কি না বা তাহা গভীরতা কিনা তাহাও বিবেচ্য। আমাদের মনে হয় গভীরতার সহিত হুম্মতা ও বিতৃষ্টি খনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট, গভীরতা হইতে হুম্মতা ও বিতৃষ্টিতে পরিহার করা কঠিন।

শরৎ সাহিত্য লব্ধে খেরালীতে ও লব্ধ মাসিক পত্রিকার বহু আলোচিত হইয়াছে সেই কারণে শরৎ সাহিত্যের বিতৃষ্টি আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

তবে এই প্রবন্ধে চরিত্র হীনের “লাবিত্তী” লইয়া কথঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে না করেন যে চরিত্রহীন লব্ধে লেখক হীন ধারনা পোষণ করেন। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন “tragedy of passion”। খবর টলষ্টয় লব্ধে Charles Sarolea বাহা “Anna Karenina” লব্ধে লিখিয়াছেন শরৎচন্দ্র লব্ধে আমরাও তাহা বলিতে পারি।

“Like every great novel of Balzac, and every great drama of Shakespeare, “Anna Karenina is pre-eminently a tragedy of passion. It shows the all consuming fire of one over-mastering feeling, which ignores every law and convention, until the individual is crushed by the relentless action of the very laws which he ignores or transgresses. And like Balzac or Shakespeare, Tolstoy refrains from superficial and cheap moralizing. He does not preach a sermon from a text. Yet, if ever writer was in danger of writing with a purpose and of making his heroes and heroines, the mouth pieces of his theories, Tolstoy was that writer” —Sarat Chandra too.

অতীত ও বর্তমানের সঙ্গীত সম্মেলন

প্রবীন ক্রপদাচার্যের নিভীক অভিমত

—:০:—

বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ক্রপদাচার্য ও দ্বিতীয় সঙ্গীত-সাধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণজী মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা-সঙ্গীত সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে সম্মুখে আসিয়া অতীত ও বর্তমান কালের সঙ্গীত সম্মেলনের প্রভেদ ও প্রার্থনা নির্ভীকভাবে সমালোচনা করিয়াছেন :

আমরা বালককালে দেখিয়াছি তখনকার মহারাজ, রাজা, জমিদার ও বড় বড় ধনীরাই তন্ত্রকার, শুণী-গায়ক-বাদকদিগকে পোষণ করিতেন; কোন কোন পর্ব উপলক্ষে শুণী-সম্মেলন আহ্বান করিয়া সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা ও উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। ৬ কাশীধামে রাজা দ্বিষাণতির বাড়ীতে প্রথম শুণী-সম্মেলন হয়। ইহাতে বাংলা হইতে ৬গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (মুলো গোপাল) মহাশয় (ফ্রপদী ও খেরালিয়া), পশ্চিম হইতে বন্দে আলি খাঁ (বীণকার) এবং স্থানীয় ৬মহেশচন্দ্র সরকার (বীণাচার্য), বামদান-বাবু (ফ্রপদী) প্রভৃতি গায়কগণ উপস্থিত ছিলেন এবং দুই-তিনদিন যাবৎ তাঁহাদের বিদ্যার আদান-প্রদান হইয়াছিল। আমরা তখন স্কুলে পড়ি; সঙ্গীত কি তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না। এখন বয়স হইয়াছে— এখন বুঝিতে পারিতেছি তাঁহারা কি করিয়া গিয়াছেন। সভার মধ্যে কোন অশান্তির দৃষ্টি বা অজ্ঞ কোন দুর্বৃত্তী উপস্থিত হয় নাই। ইহার অল্পদিন পরে—আমাদের



শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণজী মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাকালে—৬ কাশীধামে রায়বাহাদুর ৬গিরিশচন্দ্র লাহিড়ি (বাংলার একজন দক্ষিষ্ট জমিদার) মহাশয়ের বাড়ীতে শুণীসম্মেলন হয়। ইহাতেও অনেক বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ বোগদান করিয়াছিলেন। দুই দিন যাবৎ গান-বাজনা হইয়াছিল এবং উপস্থিত সঙ্গীত-সাধক সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন। তন্ত্রকারগণ, গায়ক, বাদক, শুণী সকলেই যথোচিতভাবে লক্ষ্যান্বিত ও পুঙ্খপূর্ণ হইয়া ছিলেন। এই সময়ে নেপালে সঙ্গীত-সম্মেলনের বৈঠক বসে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে বিশিষ্ট গায়ক, বাদক ও তন্ত্র-কারদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। লক্ষ্মী-বাবু তখন চাকুরী হইতে অবসর লইয়া

৬কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। লক্ষ্মীবাবু প্রসিদ্ধ কলাবিৎ নথি খাঁর শিষ্য। ফ্রপদী ও খেরালিয়া হিসাবে সে সময়ে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে গায়ক বাদক যাহারা নেপালে যাইবার জন্ত আসিয়াছিলেন তাঁহারা লক্ষ্মীবাবুর নিকট নিজ নিজ গুণের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে সন্তোষ প্রদান করিলে তাঁহার অনুমতিতে দরবার হইতে তাঁহাদের পাথর ও অস্ত্রাভরণ মজুর হইলে তাঁহারা দরবারে যাইতে পারিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে লক্ষ্মীবাবুর এক বন্ধু (বিশেষতঃ পাণ্ডা) নেপাল দরবারে চাকুরী করিতেন—লক্ষ্মীবাবু যে একজন বিশিষ্ট ফ্রপদী ও খেরালিয়া ইহা সে বন্ধু জ্ঞানিতেন। সেই নিমিত্ত লক্ষ্মীবাবুর মারফৎ পরীক্ষান্তে গায়ক-বাদকগণকে সম্মেলনে প্রেরণ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় এই যে, প্রসিদ্ধ ফ্রপদী তাজখাঁ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পঞ্চসহস্র রোপ্যমুদ্রা পুরস্কাররূপ পাইয়া-ছিলেন। অস্ত্রাভরণ শুণী গায়কগণও পুরস্কৃত ও লক্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। একপক্ষে খাঁ সাহেব পুঙ্খপূর্ণ হইলেও, অপরপক্ষে তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। কারণ নেপাল মহারাজের আদেশ হইল যে তাঁহাকে দরবারের চৌকিগণকে গানশিক্ষা দিতে হইবে। তাজ খাঁ তখন অগত্যা স্বীকৃত হন বটে, কিন্তু অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া দুইমাস

শরৎচন্দ্রের “শেষ প্রশ্ন” সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে “আমি” কিছু প্রবল আকারে দৃষ্ট তৎকাল পাঠক বর্গের মার্জনা আশা করি—তৎকালীন উপায় ছিল না। শরৎচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত হইল।

পরে লেখান হইতে লুকাইত ভাবে কলিকাতার রওনা হইয়াছিলেন। আদিবার পথে মুজফরপুর ঠেশনে আমাদের সহিত তাঁহার দেখাওনা হয়। আমরা তখন কর্ণোপলক্ষে মুজফরপুরে বাস করিতেছিলাম। খাঁলাহেব একদিন মাত্র সেখানে অবস্থান করেন এবং সেই সময়ে তিনিই আমাদের নিকট তাঁহার পলাইয়া আসার গল্প করেন। তাঁহারই মুখে তখন শুনিয়াছিলাম যে প্রকৃত কলাবিদগণ অশ্রদ্ধা কোনও সঙ্গীত-সম্মেলনে সম্মানে আহূত হইলে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিতে অস্বীকৃত হইতেন না এবং উপযুক্ত সঙ্গীতাত্মরূপী ছাত্র পাইলে তাঁহারিগকে শিক্ষা দিতেও কুষ্ঠাবোধ করিতেন না; কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তাঁহারা কোন ছাত্রকে শিক্ষা দিতে কোনমতেই রাজী হইতেন না। চাড়া অতাই প্রভৃতি একশ্রেণীর গুস্তাদগণ ছিলেন তাঁহারাই জী (তাওয়ারেক) শিক্ষাধিনী-বিগকে নাচ গান প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। ইহার সহিত কলাবিদগণের কোনও সম্বন্ধ বা সংঘর্ষ ছিল না।

ইহার কিছুদিন পরেই—আমাদের শিক্ষাকালে—শ্রুপলিদ্ধ ফ্রপদী উজীর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা মুন্সক খাঁ (ইহার জুড়িতে গান করিতেন) ঐরূপ জীলম্পর্কে আসিয়া রামপুর হইতে ৮কালীধামে পলাইয়া আসেন। তাঁহারের মুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি এইভাবে শুনিয়াছি। রামপুরে রাত্রিতেই দরবার হইত। একসময়ে প্রথম রাত্রে তাওয়ারেক বিগের গান হইয়া বাইবার পর শেষরাত্রে খাঁলাহেববিগের গান গাহিবার ডাক আসিল। অন্তোপায় হইয়া ছুই ভ্রাতা সলঙ্কোচে রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। গান করিবার আদেশ হইলে তাঁহারা নিজ নিজ নাক কাণ মোচড়াইয়া সরস্বতীবন্দনার পর গান ধরিলেন। তাঁহারা ছ'ঘণ্টা ধরিয়া এক্রপ

অপূর্ণ পান করিলেন যে নবাবলাহেব তাঁহারের গানে লম্বট হইয়া—তাঁহারিগকে সহস্র মুজার একটা তোড়া পূরকার ছিলেন। তখন খাঁলাহেবরা আদাব কুরনিস করিয়া দরবারে যাঁহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ এইরূপ :—ভগবান্ আমাদের লজ্জামান রক্ষা করিয়াছেন নচেৎ আজ পেশাদার বাইজীগণের সম্মুখে গান করিয়া মৃত্যুত্যাগ অপমান ভোগ করিতে হইত। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন কিন্তু আমরা এখানে আর ক্ষণমাত্রকাল থাকিব না। এই বলিয়া তাঁহারা পরদিন সকালের গাড়ীতেই রামপুর হইতে কাশী চলিয়া আসেন।

আমাদের শিক্ষাকালে আমরা মধ্যে মধ্যে রামদাস বাবুর সহিত শ্রীরামপুরে আসিতাম এবং নিতাই কলিকাতার আমাদের মাওয়া আসা হইত। স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে সেই সময়ে এক গুণসম্মেলন হয়। সেখানেও গোপালবাবু (মুলো গোপাল), আমার খুল্লপিতামহ মহেশবাবু (খেরালিয়া), একজন ভাল সেভারী (নাম স্মরণ নাই) ও কয়েকজন গুণী মুদঙ্গবাহক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমাদের গান এবং বিস্তারিত আদান প্রদান বেশ ভালভাবেই হইয়া-

ছিল। কিন্তু তথায় কোনরূপ পেশাদার জী-গারিকারের সমাগম দেখি নাই। তখনকার দিনে কলিকাতার প্রধান প্রধান বর্দ্ধিষ্ণু ধনী ও জমিদারবিগের মধ্যে অনেকের বাড়ীতে গানবাজনা (ফ্রপদ, খেরাল) হইত। কিন্তু সে সকল আসরে কোনওরূপ ঘোষাঘোষী বা ঝগড়া কলহ কিছুই হইত না। বসন্ত হাজরা (মুদঙ্গী) মহাশয়ের বাজনা একদিন মাত্র বোধহয় অন্নদাশ্রম ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াছিল। দীক্ষ হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে ছুই চারিবার আমাদের গান হইয়াছিল। কিন্তু কোনওরূপ ঝগড়া বিবাহ হয় নাই। তখনকার দিনে ফ্রপদী কেবল ফ্রপদগান করিতেন, খেরালিয়া খেরাল গান করিতেন, ঈশ্রাবাজ কেবল ঈশ্রা গান করিতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে গোপালবাবু (মুলো গোপাল) ফ্রপদ গাহিতেন, মহেশবাবু খেরাল গাহিতেন এবং গোঁদল-পাড়ার মধু বাবু ঈশ্রা গাহিতেন। পরবর্তী সময়ে গান বাজনা, বিশেষতঃ ফ্রপদ ও খেরাল রূপান্তরিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে যথেষ্ট-চারিতার ভাব বহুলপরিমাণে দেখা দিয়াছে। এখন সব রকম গান সকলেই করিয়া থাকেন।

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা গ্যারান্টি চিরস্থায়ী !



ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্দ্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিশেষ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ লোণার ত্রায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিগ্নিকেট

৭০নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি, বি, ৪৮২

এই বথেকাচারিতার প্রতিরোধকরে এবং নদীতের অস্ত্রাঙ্গ লুপ্ত বিষয়গুলির উদ্ধারের জন্য নদীত-সম্মেলনের বৈঠক বসিতোছে এবং প্রায় দশ পনরটা বৈঠকও হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে নদীতের স্থল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সব প্রতিষ্ঠান হইতে বছরে বছরে ছাত্রও বাহির হইতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য রুচি-অনুসারে এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। জী-পুরুষ লম্বান ভাবে গানবাজনা শিখিতেছে—নৃত্যকলার শিক্ষাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। কাশীতে যখন নদীত-সম্মেলনের ঠাইক বলে তখন সম্মেলনের অধ্যক্ষগণ পেশাবার জী-নর্তকী বা গায়িকাঙ্গিকে উক্ত বৈঠকে বোগদান করিতে হেন নাই। বোধ হয় এইরূপ নিষেধ অতি অল্পদিনে রক্ষিত হইয়াছিল। কারণ ইহার পরেই এলাহাবাদ সম্মেলনে দেখা গেল যে জী-গায়িকা ও নর্তকীগণের প্রবেশ অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে সম্মেলনের উদ্দেশ্যে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইতেছে তাহাতেও বালকঙ্গিগের অপেক্ষা বালিকাঙ্গিগের কলানৈপুণ্যের অতিমাত্রায় স্তুতি করিয়া তাহাঙ্গিকে অবধা উৎসাহিত করা হইতেছে।

লক্ষ্যতি কলিকাতার চারদিন ধরিয়। নদীতের যে বৈঠক বলিল উহা নামেই All Bengal Music Conference বটে কিন্তু কার্য্যতঃ উহা নাচগানের জলদা বা তাঁরালা ছাড়া আর কিছুই নহে। হিন্দু লজ্জান জুতা পরিয়া দেবদেবীর স্তুতি করিতেছেন—বেশ সুদৃশ্য বটে! বিনা আবাহনে বা স্তব-স্তুতিতে বীণাবাদন—সেও বেশ উত্তম আদর্শ, লন্দেহ নাই! কথাটা উল্লেখযোগ্য বলিয়াই লিখিলাম—বিনি বীণাবাদন করিলেন ইহার পূর্বপুরুষ উজির বা বীণাবাদনের পূর্বে স্তবস্তুতি করিয়া মিনতিপূর্বক নাক কান ধরিয়া পরম্বতী

দেবীকে স্মরণ করিতেন। বাক্ সে কথা। রঙ্গমঞ্চের উপরে একধারে নর্তকীগণ অপর দিকে গায়িকাঙ্গণ। তাছাড়া পেশাবার গায়ক-বাহকঙ্গিগের সহিত সৌখীন গায়ক-বাহকঙ্গিগের লম্বান আসনের ব্যবস্থা—সেও বেশ রুচিলক্ষ্য। এই কলিকাতাতেই পূর্বে দেখিয়াছি যে সৌখীন গায়কঙ্গিগের পৃথক আসনের ব্যবস্থা থাকিত। কাহারো বাড়ীতে লজ্জা হইলে সেখানে গৃহস্থামীর সহিত লম্বান আসনে তাঁহাদের বলিবার বন্দোবস্ত হইত। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে আমরা যে বাড়ীতে এবারে অতিথিরূপে ছিলাম পূর্বে সেখানেও এই ব্যবস্থা দেখিয়াছি। এবারে কিন্তু দেখিলাম—বাড়ীর ভিতরে ভিন্ন-জাতীয় গায়ক, পেশাবার ও সৌখীন সকলেরই বাসস্থানের আয়োজন হইয়াছে। বিজাতীয় ভাবাপন্ন নর্তকীরও থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে; হিন্দুর বাড়ীতে যেখানে বিশেষ করিয়া ঠাকুর আছেন ও পূজাঙ্গি হইয়া থাকে, সেখানে অমধ্য খাত্তাবির ব্যবস্থা ও স্নেহকটির পরিচয় আমাদের মত প্রাচীন-পন্থীদের নিকট অতীব অশোভন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বোধ করি, শূণ্য হইতে গৃহতর্ক্য পূর্বকগণ এ দৃশ্য দর্শন করিয়া আমাদেরই জায় লক্ষ্যুচিত হইয়া আছেন।

এই All Bengal Music Conference অবশ্য সাধারণের অর্থে অনুষ্ঠিত হইয়াছে—সাধারণের তৃপ্তির জন্যও উহা ব্যয়িত হইবে। কেহ নাচ চায়, তাহাকে নাচ দেখাইতে হইবে, কেহ চুম্বী চায়, তাহাকে তাহাই শুনাইতে হইবে; কেহ টপ্পা শুনিবে, তাহার জন্য টপ্পার আয়োজন করা আবশ্যক। অনেকে ক্রপদ চায় না, এটা ঠিক—অতএব তাহাঙ্গিকে ক্রপদ না দেওয়াই বিধেয়। আমার মনে হয় ক্রপদের জন্য পৃথক লজ্জা, এইরূপ অন্যান্য নদীতের জন্য পৃথক আসন ও নাচের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিনি যে জাতীয় নদীত পছন্দ করেন তিনি সে জাতীয় নদীতের আসনে আনিবেন। তাহাতে কোনরূপ গোলযোগ বা জঞ্জীতির কারণ ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অধিকন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করিলে শ্রোতৃবর্গের অর্থব্যয়ও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারিবে। বর্তমান অর্থক্লেশতার দিনে যখন লোকে অহাচারে বা অনাহারে আছে তখন যাহাতে সাধারণের অর্থ অলক্ষ্যভাবে ব্যয়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও কি কর্তৃপক্ষগণের কর্তব্য নহে?

ডাঙ্গারের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

চরিত্র (পুরুষ)

জা: হরেন মুখার্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ
বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—এ অমিতভক্তিশালী বন্ধু
ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বৈয়াক্ত।
অস্তান্ত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

ইকবনের টেকা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

উক্ত ঘটনার পর তিন দিন কেটে গেছে।
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নি।
মধ্যে একদিন ইন্সপেক্টর-বাবুর সঙ্গে দেখা
হ'য়েছিল। তাঁর মুখে শুনলুম খুনের
কিনারা হয়-হয় হ'য়ে এলেন। যে কোন
মহুর্তে তিনি খুনীকে ধরতে পারেন, তবে
একটু প্রমাণাভাব।

আমার হাসি এলো। একবার একজন
অভিনেতা অভিনয়ের শেষে লমালোচককে
জিজ্ঞাসা করলেন—“কেমন অভিনয় হ'লো,
মশাই?” লমালোচক বললেন—“চমৎকার
হ'য়েছে—সুখ নিশ্চয়।” আমার সেই কথা
মনে পড়ে গেল।

সেদিন বৈকালে খুব খানিকটা ঝড়-
বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—একটু
বেড়াতে যা'ব মনে করছি, এমন সময় ডাক-
পিওন এলে চিঠি দিয়ে গেল। মনে করলুম
চিঠিগুলো দেখে উঠ'বো। এক এক করে
চিঠি দেখতে দেখতে একখানা দেখে আমি
চমকে উঠলুম। লেখান্নেতে লেখা আছে—
“ডাক্তার, তোমাকে সাবধান করার পরেও
তুমি প্রমাণ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছো।
কেন অকালে মৃত্যুকে ডেকে আনবে?
পুলিশকে ভয় আমরা ততটা করি না; কিন্তু
তুমি অকারণে কেন আমাদের পথে এলে
দাঁড়াচ্ছ? এবারের তোমাকে সাবধান করে
দেওয়া হ'চ্ছে, এর পরে তোমার মৃত্যু
পরোক্ষাণী জারী করা হ'বে—সাবধান!”
সঙ্গে একখানা ইকবনের টেকা।

তা হ'লে আমি ঠিক পথেই যাচ্ছি।
নইলে টেকার ভরফ থেকে আমাকে ভয়
দেখিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা চলতো না।
এ হলটাকে বতটা খড়ীবাজ মনে করি
ততটা নয় দেখছি। তা' যদি হ'তো, তা'
হ'লে এরা আমাকে বারবার সাবধান করে'
নিজেদের দোঁরলা প্রকাশ করতো না।

অবিনাশ এলে বলল—“কি হে বেড়াতে
যাবার কি হ'লো?”

আমি উঠে পড়ে বললুম—“হ্যাঁ, চল।”
চিঠির কথা তা'কে কিছু বললুম না।

অবিনাশ—“কোথায় যাওয়া যা'বে?”

আমি—“তুমিই বল।”

অবিনাশ—“ইডেন গার্ডেনের দিকে চল।”

আমি—“বেশ।”

গাড়ী নিয়ে বেরলুম। একটু ঘুরে
চৌরঙ্গী দিয়ে চললুম। ধর্মতলার মোড়ে পুলিশ
গাড়ী কয়েক ছিলে; স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে
হ'ল। একে একে অনেকগুলো গাড়ী
দেখতে দেখতে জমে গেল। হঠাৎ আমার
চক্ষু পাশেই যে-গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল তার
উপর পড়লো। এক অপরাধ সন্দেহী, সঙ্গে
একটা ভক্তলোক। প্রথম দর্শনে স্ত্রীলোকটাকে
মেমলাহেব বলে' ভ্রম হ'য়েছিল।

আমার দৃষ্টির অনুসরণ করে অবিনাশ
বলে উঠলো—“কি হে? ব্যাপার কি?
বৌদিকে report (রিপোর্ট) করতে হ'বে
না কি?”

আমি—“চুপ।”

অবিনাশ—“একবারে ভয়।”

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।

বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের

বুড়ো বি।

অস্ফাচ্চ চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে
পাইবেন।

আমি—“আঃ!”

অবিনাশ চুপ করে গেল।

এই সময় হাতঘড়ির দিকে চেয়ে
যেহেটা বলে উঠলো—“নাড়ে ছ'টা বাজে।
আমরা বোধকর ঘেরীতে গিয়ে পৌছ'ব, দা'বা।”
পুরুষ—“এত ঘেরী হ'য়েছে? ঠিক
দেখেছিস?”

তাল করে দেখবার জন্তে বাইরে হাত
বাড়িয়ে নে বাড়ি দেখলে।

—ওকি!! আমি চমকে উঠলুম। বা-হাতের
মণিবন্ধে একটা ছোট্ট লাল জড়ুল চিহ্ন।

পুলিশ বাশী দিলে গাড়ীর স্রোত চললো।

আমার গাড়ী কিন্তু বাহিকে না বৈকে
লম্বান লেগেটাল এভেনিউ দিয়ে চলতে
লাগলো।

অবিনাশ অবাক হ'য়ে বলল—“কি হে
দ্বিগ্ভ্রান্ত হ'লে না কি?”

আমি লক্ষ্যপে জবাব দিলুম—“না।”

অবিনাশ—“তবে কি ঐ গাড়ীটার পিছু
নির্যেচ নাকি? এ রোগ তোমার আবার
কতদিন থেকে হ'লো?”

আমি—“অনেকদিন থেকে, লম্বে।
আপাততঃ চুপ কর। ঐ গাড়ীতে সন্দেহী
আছেন, উনি আমার তিন দিন আগেকার
রোগিনী।

অবিনাশ বিস্মিত হ'য়ে বলে উঠলো—
“তাই নাকি? খুব কড়া নার্ভ (nerve)
তোমার তো! আমি হলো' তো এতকণ
টেঁচিয়ে উঠলুম।”

আমি কোন কথা না বলে' সন্দেহী
গাড়ীর অনুসরণ করে' চললুম।

গান শ্রীঅমল চন্দ্র ঘোষ

দিমের শেষে কোন বিদেশী মন ভুলানো সুরে
এই পরাণের আঙ্গিনাতে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
কি নাম তাহার তাও না জানি হায়,
আমার কাছে সে জন এলে কী গান গেয়ে যায়
সেই কথাটি বলবে কে আমার
ওগো বলবে কে আমার

অনেক দিবস হ'তে সে যে করছে আনাগোনা
তবু যে হায় তার সাথে মোর হয় মি জানাশোনা
তবু যে গো এই কথাটি জানি
সকল জানার অগোচরে লয় সে আমার টানি
ওগো লয় সে আমার টানি।

গাড়ীখানা অনেক রাত্তা ঘুরে, অনেক
ছাকানের লামনে দাঁড়িয়ে শেষে চিংপুর
রাডে উপস্থিত হ'লো। আমি একমুহূর্তের
হস্তও তাকে চোখছাড়া করলুম না। লক্ষ্য
লো, পথে পথে আলো জলে উঠলো।
দামাধের গাড়ী তখনও চলেছে—চলার ব্যু
শব্দ নাই।

অবিনাশ বলে—‘ওরা বুঝেছে তুমি
ঘরলয়ন করছ।’

আমি বলুম—‘বুঝুক।’

অবিনাশ—‘কিছু আমরা নিরস্ত।’

আমি—‘তুমি বটে, আমি নই।’

অবিনাশ আর কিছু বলে না, আমাধের
গাড়ী যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগলো।

হঠাৎ নামনের গাড়ীখানা একটা গলির
ভিতর ঢুক পড়লো।

অবিনাশ বলে—‘কি করবে?’

আমি—‘বেধ।’

আমার গাড়ীও গলির মধ্যে ঢুকলো।

গলিটা লক্ষ্য; একখানার বেকী ছ'খানা
গাড়ী চলে না। একটা ঘোড়ের মুখে গিয়ে
দামাধকে বাধ্য হ'য়ে গাড়ী থামাতে হ'ল।
দামাধের গাড়ীখানা থেমেছে একখানা বাড়ীর
দুখে ঠিক বৈকের দামাধ। কি করবো

ভাবছি—এমন সময় ছ'পাশ থেকে ছ'টো
রিভলভারের নল আমাধের নাকের কাছে
এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে আবেশ হ'ল—
‘নেমে আসুন।’

আমি নামলুম। আমাকে নামতে
দেখে অবিনাশও ভাল ছেলেটার মতন নেমে
এলো। আহা, যেন শাস্ত্র, পোষমানা
হাতীটা!

আমাধের নিয়ে লামনে একটা বাড়ীতে
তারা ঢুকলো। অন্ধকার পথে কোন
বকমে আমরা এগুতে লাগলুম। অবিনাশ
আমার কানে কানে কি বলবার উপক্রম
করতেই তার হাত টিপে আমি বারণ করলুম।
কাজেই তার বক্তব্য তারই কাছে রয়ে'
গেল। আমরা নিড়িতে উঠতে লাগলুম।

ঘোতলার উঠতেই ইলেক্ট্রিক আলো
জলে উঠলো। আমাধের নিয়ে যাওয়া
হ'ল একটা সুসজ্জিত ঘরে। আমাধের
ঘরের মধ্যে রেখে তারা বাইরে চলে গেল।

অবিনাশ চুপি চুপি বলে—‘কই হে—
তোমার অস্ত্র কই?’

আমি—‘ঠিক সময়ে বেরবে’খন। চুপ
কর। তবু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক।’

অবিনাশ—‘দেখিনকার মতন নাকি?’

আমি—‘চুপ।’

বাইরে কার পদধ্বনি শোনা গেল। একটু
পরেই একজন লোক এনে বলে—‘আপনারা
আসুন।’

তার সঙ্গে আমরা বাইরে চললুম।
বারান্দা পার হ'য়ে একটা ঘরের লামনে
দাঁড়িয়ে সে দরজা খুললে। তারপর
আমাধের ঘরের ভিতর যেতে ইঙ্গিত করলে।
সুশীল ও সুবোধ বালকের মতন আমরা
তার আবেশ-অনুযায়ী কাজ করলুম। তাঁলা
বন্ধ করে সে চলে গেল।

অবিনাশ বলে—‘বাস! সব চুকে
গেল। কই হে তোমার অস্ত্র কই?’

আমি হেসে বললুম—‘আছে হে, আছে।
ঠিক সময়ে বার করবো। এখনও সময়
হয়নি।’

অবিনাশ—‘তুনে স্ত্রী হ'লুম। এখন
তোমার স্ত্রীরী যে তোমার বন্দী করলেন।’

আমি—‘স্ত্রীরীরা তো বন্দী করেই
থাকেন। তবে এ বাঁধনে বাঁধা থাকলে
আমার চলবে না।’

অবিনাশ—‘যেচে কীবে পড়ার উদ্দেশ্য?’

আমি—‘কিছু নিশ্চয়ই আছে। আজ
সুবোধ উপস্থিত হ'য়েছিল, কোন্ মুহূর্তে সে
সুবোধ পরিত্যাগ করে?’

বি

ভী

ষ

কা

সিরিজ

শীঘ্রই

প্রেমের গল্প
আর
নিছক হাসির গল্প
পড়ে
যখন মনটা হ'য়ে ওঠে
সঁগাৎসেতে তখন তাকে সতেজ
করবার জন্য দরকার হয়
ডিটেক্টিভ গল্প

ভৌতিক কাহিনী
তাই আজ এই
“বিভীষিকা”

সিরিজের
পরিকল্পনা

মূল্য

চার আনা

শীঘ্রই

বাহির
হইবে।

—প্রকাশক—

কথা সাহিত্য পরিষদ

১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), ভবানীপুর, কলিকাতা।

অবিনাশ—“আমার আশা ছিল লংসারী হ’ব একটা বিয়ে থা’ করে—”

বান্ধা দিয়ে বল্লম—“হবে যে হবে। বিয়ে হ’বে, লংসারী হ’বে, বরযাত্রী বা’ব—”

অবিনাশ—“হ্যাঁ, হরীর দেশে।”

আমি—“মন কি? রাখ তোমার ছায়ালালী—আমার একটু ভাবতে দাও।”

অবিনাশ—“ভাব। আমার বিধে পাচ্ছে।”

এই সময়ে একটা লোক ছুঁটো স্ট্রেট করে কিছু খাবার নিয়ে এলো। টেবিলের উপর সে ছুঁটো রেখে, দু’গেলাল জল দিয়ে, সে বেরিয়ে গেল। আবার হরজার তাল বন্ধ হ’লো। বাইরে কার নিষিদ্ধিত পায়ের শব্দ শুনেতে পেলুম। বুঝলুম একজন প্রহরী নিযুক্ত হ’য়েছে।

লতুক্ষদৃষ্টিতে খাবারগুলোর দিকে চেয়ে অবিনাশ বল্লম—“কি বল হে?—লতুক্ষদৃষ্টিতে করবো নাকি?”

আমি—“ওগুলি যদি অনন্যবহার করে?”

অবিনাশ লাগ্নহদৃষ্টিতে খাবারগুলোর দিকে চেয়ে বল্লম—“তবে থাক।”

আমি—“সেই ভাল।”

বল্লম বল্লম লিগারেটের পর লিগারেট কঁকুতে লাগলুম। ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হ’ল। ঘুরে একটা গীর্জার বাড়িতে ছুঁটো বেজে গেল। অবিনাশ বল্লম—“ওহে হরেন, কি করবে কর। ওদিকে বউদি খাবার নিয়ে হাঁ করে বসে আছেন নিশ্চয়।”

আমি—“হ্যাঁ, হচ্ছে। এখনও সময় হয়নি। ভালকরে’ শোন দেখি বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা? আমি তো পাচ্ছি না।”

অবিনাশ ভাল করে’ কান পেতে শুনে বল্লম—“না, কোন শব্দ নেই।”

আমি—“তা’ হলে আমাদের হরজার প্রহরী বোধ হয় ঘুমিয়েছে।”

হরজার একবার বা দিলুম। কোন লাড়া নেই। একবার যেন একটু নাক ডাকার শব্দও শুনলুম।

বল্লম—“এইবার হ’য়েছে। অবিনাশ, তুমি চিং হ’য়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়। আমি তোমার মাথায় আর মুখে হুঁগেলাল জল ঢেলে দি।” চোখ বুজিয়ে শুয়ে পড়ে থাক, মাঝে মাঝে যেন খেঁচুনি হয়। বুঝলে? তারপর যা’ করবার আমি করবো। আর তুমিও তারপর স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করো, কেবল দেখবে যেন শব্দ না হয় বেশী।”

অবিনাশ বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়লো, আমি জল ঢেলে দিলুম। একবার খেঁচুনির অভিনয় করে চোখ খুলে আমার দিকে চেয়ে অবিনাশ বল্লম—“চলবে?”

হেসে বল্লম—“splendid! চমৎকার! ডাক্তারেরও লাখ্য নেই যে ধরে।”

আবার অবিনাশের অভিনয় আরম্ভ হ’লো। আমি হরজার বা দিয়ে ডাকলুম—“কে আছে এখানে? কে আছে।”

কে যেন খড়মড় করে উঠে বসলো। বল্লম—“কি চান?”

আমি—“আমার বন্ধুটা মারা যায়, তাই। সাহায্য কর। একটু জল দাও।”

তাল্যাখোলা শব্দ পেলুম। একটু পরেই হরজা খুলে লোকটা ভিতরে এলো, তার হাতে একটা রিভলভার। বল্লম—“কি হ’য়েছে?”

আমি যেন উদ্ভয়ের মতন বলে উঠলুম—
জল—জল—একটু জল। বন্ধুটা মারা যায় অবিনাশ—অবিনাশ—তাই আমার! কি হ’বে, তাই, একটু জলের কি হ’বে?”

লোকটা একটু ভাবলে। তারপর বাইরে গিয়ে আবার তাল বন্ধ করলে। বিনিঃ হরেকের মধ্যেই আবার তাল খুলে সে ঘরে ঢুকলো। এক হাতে এক লোটা জল আর অজ্র হাতে রিভলভার।

ব্যস্তভাবে জলের লোটাটা নিয়ে, যে অবিনাশের দিকেই আসছি এই রকম ভাব করে ফিরলুম। লোকটাও পিছন ফিরলে বাইরে খাবার জন্তে। যা’ করে তার লাগে ঘুরে গিয়ে সেই একলোটা জল লজোতে তার মুখে ছুড়ে দিলুম। লোকটা হতভম্ব হ’য়ে যেমন মুখ মুচড়ে বাবে, আমি অমনি ঝাকরে’ তার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলুম। তারপর তার দিকে লক্ষ্য করে বল্লম—“খবরদার। চেষ্টায়েছ কি মরেছ।”

লোকটা একেবারে বিষয়ে নির্বাক অবিনাশ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বল্লম—“অবিনাশ, এই দেখ আমার অজ্র। এইবার হরজাটা বন্ধ করে দাও অবিনাশ তাই করলে।

লোকটাকে বল্লম—“বা’ বলি তার উত্তর দাও। নইলে মরেছ। আমার পাড়ী কোথায়? কোন উত্তর নেই।

তার মুকের উপর রিভলভারটা ছুঁইয়ে বল্লম—“কথা কও—উত্তর দাও। এক— দুই—” তাড়াতাড়ি লোকটা বল্লম—“গ্যারান্টি।”
আমি—“চল দেখানে। কিন্তু লাখ্যান। একটু চালাকি করেছ কি ঘোড়া টিপেছি।



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

তুমি ভো বা'বে, তারপর আশাধের বা' হয় হ'বে। বুঝেছ? এখন চল।"

লোকটা আগে আগে চলে, আর অবিনাশ রইলো তার হাত ধরে। আমি লোকটার পিঠে পিঁপুল দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে নিরে চলে। নীচে নেমে এলাম।

অন্ধকার পথটা খুব লজ্জাপূর্ণে পার হ'বার পর লম্বা দরজার এলাম। অবিনাশ হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুলতে লাগলো। পাশের ঘর থেকে কে জিজ্ঞাসা করলে—"কে?"

আমি পিঁপুলটা লোকটার পিঠে একটু চেপে ধরে চাপা স্বরে বললাম—"লাড়া বাও।"

লোকটা দাঁত কড়মড় করে উঠলো, কিন্তু বলল—"আমি রাশানীস্।"

আর কোন প্রশ্ন হ'লো না। এদিকে দরজাও খোলা হ'ল।

রাস্তায় এলাম। জনমানব নেই। বললাম—"কোথায় গ্যারাক?"

লোকটা কোন উত্তর না দিয়ে পথ বেধিয়ে নিরে চলল। গ্যারেজে তালো দেওয়া!

আমি—"অবিনাশ, ভেঙে ফেল তালো।"

অবিনাশ—"শব্দ হ'বে না?"

আমি—"তাই তো।"

লোকটা একটু নড়লো। পিঁপুল তার পিঠে চেপে ধরে বললাম—"ধবদধার! অবিনাশ, ভেঙে ফেল তালো। একটু শব্দ হয় হোক।"

অবিনাশ একবার মাচর দিলে। বলল—"হবে না, ভাই। একটু বেশী জোর দিতে হ'বে। দাঁড়াও।" খানিক পরেই অবিনাশের হারুণ মাচরের লম্বা তালোটা ভেঙে গেল।

(ক্রমঃ)

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

(চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন)

রস্কাবর

গত ১৬ই এপ্রিল শনিবার সকাল ৯টার সময় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের প্রাতঃসম্মেলন আরম্ভ হয়। কর্তৃপক্ষগণের ব্যবস্থা অনুসারে বেলা ৮টার সময় programme আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। আমরা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখি যে অনেক শ্রোতৃবল প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন কিন্তু তখনও programme আরম্ভ হইবার কোন সূচনাই নাই। বিন্ময়ের বিষয় এই যে কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেকেই এবং প্রবেশ-দ্বারের স্বেচ্ছালব্ধদের মধ্যে একজনও তখন আসিয়া উপস্থিত হন নাই—সে কারণেই সমবেত শ্রোতৃবর্গ বাহিরে Booking office এর আশে পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং ৮।৪০ মিনিটের পূর্বে auditorium প্রবেশ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমন্ত্রিত গায়ক-বাদকগণ উপস্থিত না হওয়ার স্বরূপ programme আরম্ভ করিতে না পারার কারণ খানিকটা ব্যক্তিগত পারা যায় কিন্তু কর্তৃপক্ষগণের এবং তাঁহাদের সহকর্মীদের অনুপস্থিতির জন্য প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ দ্বার বন্ধ হইয়া থাকার কোনও কঠিন কারণ ত দেখা যায় না। কর্তৃপক্ষগণ টিকিট বিক্রয় করিয়া একটা public function এর আয়োজন করিয়া ছিলেন; স্মরণীয় উপস্থিত লম্বায় শ্রোতৃবর্গ যাহাতে বথান সময়ে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ আলম গ্রহণ করিতে কোনও অসুবিধা ভোগ না করেন, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কি তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই?

যাহা হউক বেলা ৯টার সময় programme আরম্ভ হইলে প্রথমে চারিজন

প্রতিযোগির demonstration হইয়া যায়। তাহার পর শ্রীযুক্ত বিনোদলাল গোস্বামী মহাশয় প্রপদের demonstration আরম্ভ করেন। তিনি চোঁতালে রামকেশীরাগের প্রপদ গান করেন। গোস্বামী মহাশয় বলেন অর্ধাচীন নছেন—তাঁহারই কাছে আমরা শুনিয়াছি যে তিনি ভারতবিখ্যাত অনেক প্রপদীয় শিষ্য গ্রহণ করিয়াছেন—আলোচ্য দিবসে তিনি স্বর্গত গুণিপ্রবর আবদুল করিম খাঁ সাহেবের স্মরণিত স্বরের অনুকরণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে প্রপদ গান শুনাইবেন এইরূপ আভাস তাঁহারই মুখে আমরা পূর্বাভাসে পাইয়াছিলাম। তাঁহার বিশ্বাস যে সাধারণতঃ প্রপদীরা বড় অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া সুরের মাধুর্য্য নষ্ট করেন ও শ্রোতৃগণকে এইভাবে বড়ই পীড়িত করিয়া তোলেন; এইজন্য গোস্বামী মহাশয় স্মরণ্য সুরে প্রপদ শুনাইয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্ধন করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু, আমরা সেদিন যাহা শুনিলাম তাহা যদি তাঁহার মতে স্মরণ্য ও মোলারেম সুরের গান হয় তাহা হইলে তাঁহার ওজস্বিকণ্ঠের হৃদয় শ্রুতিবার মত লাহল জনসাধারণের কাছে বলিয়া তঁ মনে হয় না। কারণ তাঁহার স্মরণিত সুরলহরী মাত্র পাঁচ মিনিট কাল শ্রবণ করিতে না করিতেই প্রেক্ষাগৃহের তিন তলা হইতে একতলা পর্যন্ত লোক স্থান হইতেই শ্রোতৃবর্গ ঘন ঘন করতালি দিয়া তাঁহাকে গান বন্ধ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু, "উল্টা ব্যক্তিগত রাস"—গোস্বামী মহাশয় সেই করতালিধ্বনিকে তাঁহার গানের

ovation মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ও প্রোচুত হয়ে গান গাহিয়া চলিলেন। যত জোরে করতালি পড়িতে লাগিল, গোসাইজীও তত জোরে গলা চড়াইতে লাগিলেন। পনের মিনিট কাল এইভাবে উত্তরপক্ষের tug-of-war চলিল। পরে দ্বানীবাবুর ইজিতে গোসাইজী গান বন্ধ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আসন হইতে উঠিয়া গেলেন। এ দৃশ্য হইতে যাহারা বঞ্চিত হইয়াছেন, এদ্রপ কোনও ভাষা নাই বাহা দ্বারা তাঁহাদের নিকট বিশদভাবে আমরা ইহা বর্ণনা করিয়া দিতে পারি। যাহা হউক, গোসাইজীর রামকেলীর মধ্যে আমরা কেবলই ভৈরবের ছায়া স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। রামকেলী ও ভৈরবের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা তিনি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বজায় রাখিতে পারেন নাই। কারণ, রামকেলীতে কোমল ধৈর্যের ব্যবহার ভৈরব অপেক্ষা বহুল এবং রামকেলীর ধৈর্যত সর্বদা নিষাধাশ্রিত। গোসাইজী ধৈর্যের বহু প্রয়োগ ত করেনই নাই অধিকন্তু ধৈর্যতকে নিষাধাশ্রিত না করিয়া তিনি শুদ্ধভাবে কোমল-ধৈর্যত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়সের পক্ষে এ জাতীয় ক্রটি মোটেই শোভনীয় হইতে পারে না।

ক্রমবগানের পর কুমিল্লার মেতারিয়া আলি আহম্মদ ভৈরবী বাজাইলেন। কলিকাতায় যে লকল শ্রী মেতারিয়া আছেন তাঁহাদের বাজনার সহিত ইহার বাজনার কোনই তুলনা হয় না। এই শ্রেণীর বাজককে —যাহার নাম আবার প্রোথ্রামে ছিল না— বাহির হইতে আনা ইয়া demonstration দেওয়াইয়া অবধা সময় অপব্যবহারের কোন সম্ভবত্ব হেতু দেখা যায় না।

মেতার বাজনার পর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু) মাত্র পাচমিনিট-কাল টাঙ্গা গান করেন। বর্তমান বয়সে কালোবাবুর Conference-এ demonstra-

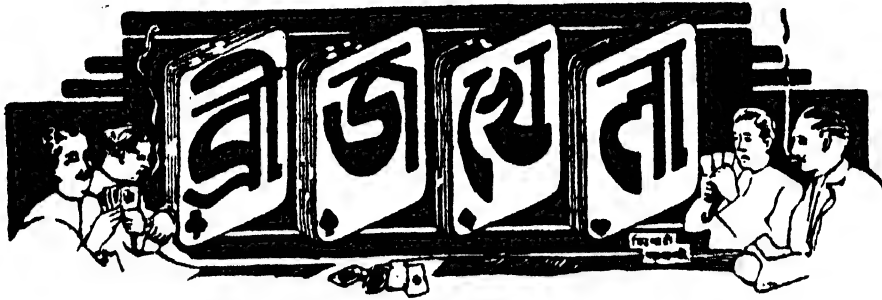
tion দ্বিবার মত শক্তি বখন নাই, তখন তাঁহার পক্ষে অন্তঃস্বরের জন্ত কেবল একবার শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করার প্রলোভন লংঘন করিলেই সুখীজনোচিত বলিয়া বিবেচিত হইত। টাঙ্গাগানের পর বোম্বাইয়ের বিখ্যাত তবলাবাদক প্রোঃ লাম্‌মুদ্দিন হারহার তবলার দুইটি বিভিন্ন তালে (চিৎতা তিনতালার ও ১৯ মাত্রার বাজিত্রাতালে) লইয়া বাজান। প্রোকেনর যে একজন বিশিষ্ট শ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই ; তবে তাঁহার লহর্য অপেক্ষা গানের সহিত সঙ্গত করিবার রীতি আরও উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে হয়। লহর্যর পর কুমারী গীতারায় দেশী রাগের একখানি খেরাল গাহিলেন। দেশীকে যথার্থ ভাবে রূপায়িত করিতে হইলে শ্রুতির নিপুণ ব্যবহার আবশ্যক। কেবল মাত্র কোমল নিষাদ বা কোমল ধৈর্যত প্রয়োগ করিলে দেশীর রূপ কখনই রীতিসঙ্গতভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীমতী তাহার গানে শ্রুতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু একই তানের পুনরাবৃত্তির জন্য গানটা বড়ই এক-ধেয়ে হইয়াছিল। কুমারী আরও বেশ কিছুদিন নিয়মিতভাবে শিক্ষানবীশী করিলে তবেই সাধারণ্যে গাহিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। গানের পর শ্রীযুক্ত মণ্ট, ব্যানার্জী টোড়িরাগে হারমোনিয়াম বাজাইলেন। মণ্টবাবুর বাজনার মধ্যে এমন কোনই বিশেষত্ব ছিল না বাহার জন্য তিনি Music Conference-এ demonstration পাইতে পারেন—তবে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ যদি তাঁহার ভাও বাতলানতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে programme এ স্থান দিয়া থাকেন তবে উহা স্বতন্ত্র কথা। সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক বড়ই আশ্রিতবৎসল—তিনি মুখ ফুটিয়া কাহারও আবদার অনুমত হইলেও উহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। আশাধের বিবেচনায় তিনি যদি নিজের বাড়ীতে এই

শ্রেণীর বাজক বা গায়কদ্বিগের লইয়া জলপা করেন তাহা হইলেই উহা বেশ শোভন হয়—শুণিলমাত্রে এ জাতীয় শিল্পীর বাজনা বা গান যে চলিতে পারে না তাহা সুবিধা ভবিষ্যতে তিনি ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষগণ যদি শিল্পী নির্বাচনে বিশেষ মনোযোগী হন তাহা হইলে জনসাধারণের তরফ হইতে বলিবার কিছু থাকে না। যে সম্মেলনে শ্রীযুক্ত মুনেশ্বর দয়াল হারমোনিয়াম বাজাইয়া শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন সেখানে মণ্টবাবুর বাজাইবার আগ্রহ যে খুঁটত মাত্র তাহাতে আর কোনও লংঘন থাকিতে পারে না। অধিকন্তু, যন্ত্র হিসাবে সঙ্গীত জগতে harmonium এর যে বিশেষ কোনও স্থান নাই তাহা সুখীগণ বিলক্ষণই জানেন। প্রাচীনপন্থীর গায়কগণ তাঁহাদের গানের সহিত harmoniumকে অনুগামী যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিতে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করেন। সেক্ষেত্রে conference-এ স্বতন্ত্রভাবে harmonium এর demonstration এর কোন আবশ্যকতাই নাই। তবে যদি অতি সূক্ষ্মণ কোন শিল্পী উহা বাজান তাহা হইলে তাঁহার বাজনা বেশ উপভোগ্য হইতে পারে—নচেৎ নিতান্ত সাধারণশ্রেণীর বাজকের হাতে এই যন্ত্রের বাজনা শ্রোতৃবর্গের বর্ণ পীড়াই জন্মাইয়া থাকে।

মণ্টবাবুর বাজনার পর ৮ কাশীধামের শুণিপ্রবর স্বর্গত পণ্ডিত শিবদেবক মিশ্রের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় পণ্ডিত শ্রীযামকৃষ্ণ মিশ্র ও পণ্ডিত শ্রীভবানীদেবক মিশ্র টোড়িরাগের দুইখানি খেরাল (একখানি বিলম্বিত এক-তালার ও অপরটি ছনীত্রিতালীতে) গান করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এটর্নী-এটল মহাশয় তবলা-সঙ্গত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণের খেরালে যে প্রয়োগনৈপুণ্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে মনে হয় যে বাংলার তরফ হইতে বর্তমান Conference-এ আমরা যে কর জন

* শ্রীমতীর গানের আলোচনা
আমাদের শেখ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

এই অমুঠানে সাহিত্যিক অনিলকুমার
তট্টাচার্য্য খানিকটা নতুনদের পরিচয়
দিয়েছিলেন। সাহিত্য বিষয়ক বৈকুণ্ঠধর
সাহিত্য লব্ধে লজ্জীভাট্টির মধ্য দিয়ে তাঁর
আলোচনাক্তি আবারের খুবই ভালো
লাগতো। শ্রীমতী লীলা দেবীও কৃতিত্বের
পরিচয় দিয়েছেন তাঁর প্রোগ্রামগুলিও বেশ
সুখশ্রাব্য হয়। নির্মল তট্টাচার্য্যের
ব্যবস্থাপনার লজ্জীভাট্টানও উপভোগ্য হয়।



শ্রীচর্যাসা

পাঠকবর্গের বোধস্বয় অরণ আছে যে হাতের বিভাগে অল্পখানি অনারের পিটের ভারতম্যে গেম বা স্নাম হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত হাতখানি লক্ষ্য করলে অনার্যালে বুঝতে পারবেন যে আপাতঃদৃষ্টিতে যে খেলায় গেম করা অসম্ভব বলে মনে হয়, সেই হাতে ডাকদার স্নাম পর্যন্ত ডেকে অনার্যালে স্নাম করে নিয়ে গেছেন। যদিও এই স্নামের ডাক দেওয়া ডাকদারের পক্ষে হঠকারিতা প্রকাশক, তথাপি তিনি লবিশেষ কারণ বশতঃই উক্তরূপ ডাক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। হাতটি এইরূপ

ইস্কাবন—গোলাম, \times , \times , \times , \times ।

হরতন—সাহেব, \times , \times , \times ।

কুহিতন—টোকা, সাতা।

চিড়িতন—হশ।

উ

ইস্কাবন—নাই।

হরতন—টোকা, \times ।

কুহিতন—সাহেব, গোলাম হশ, \times , \times ।

চিড়িতন—টোকা, সাহেব, গোলাম, \times , \times , \times ।

ডাক হয়েছিল,

হ	প
একটি চিড়িতন।	পাশ।
দুইটি কুহিতন।	পাশ।
তিনটি চিড়িতন।	পাশ।
চারটি কেরাই।	পাশ।
হরটি কুহিতন।	পাশ।

উ	পু
একটি ইস্কাবন।	পাশ।
দুইটি কেরাই।	পাশ।
তিনটি কুহিতন।	পাশ।
পাঁচটি চিড়িতন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।

(১) 'প' হরতনের বিবি খেলায় ডাকদার সাহেব মেরে পিটখানি নিলেন। ডাকদার সাহেব দ্বিগ্নে পিট নেবার পূর্বে এই ভেবে দেখলেন যে চিড়িতন রঙটিকে দাঁড় করাতে না পারলে খেলা করা একেবারে অসম্ভব, অতএব প্রথমে সাহেব দ্বিগ্নে পিটখানি নেওয়াই সুক্ৰিয়ুজ।

(২) 'উ'র হাত এবার চিড়িতনের হশ-খানি খেলে ডাকদার গোলাম দ্বিগ্নে কিনাল করে পিটখানি নিলেন। এইস্থলে সাধারণ খেলোয়াড়দের মধ্যে মতবৈধ হবে এই নিয়ে যে যখন পিট আপনা হইতেই পাওয়া যায়, হাতে যখন টোকা-সাহেব রয়েছে তখন গোলাম দ্বিগ্নে কিনাল করতে বাওয়া সুখের কাজ। কিন্তু এবিষয়ে ভাল করে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে যে এ ক্ষেত্রে এরূপভাবে খেলা বিশেষ প্রয়োজন।

ইস্কাবন—নয়, হুরি।

হরতন—বিবি, গোলাম, হকা,

পজা, হুরি।

কুহিতন—বিবি, নয়, পজা, হুরি।

চিড়িতন— \times , \times ।

উ	পু
প	হ

ইস্কাবন—নাই।

হরতন—টোকা, হুরি।

কুহিতন—সাহেব, গোলাম, হশ, হকা, তিরি।

চিড়িতন—টোকা, সাহেব, গোলাম, সাতা,

হকা, হুরি।

ডাকদারদের সন্মিলিত হাতে সাতখানি চিড়িতন, প্রতিপক্ষের হাতে ষোলু ছয়খানি। এখন এই ছয়খানির বিভাগ ২-৪, ৩-৩, ৫-১, বা ৬-০ হতে পারে; অতএব বেরূপ বিভাগ হওয়া বিশেষ লক্ষ্যবশত সেইটাই আন্দাজ করে নেওয়া উচিত। চিড়ের বিভাগ যদি ৫-১ বা ৬-০ হয় তো খেলা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কাজে কাজেই ৪-২ বা ৩-১ হিসাবে খেলা করতে বাওয়া উচিত। এ-স্থলে ৪-২ বিভাগ ধরেই খেলা সুক্ৰিয়ুজ, কারণ ৩-৩ বিভাগ ধরে খেলতে গেলে খেলা অতি সহজ হয়ে যায়। এখন যদি উক্ত কিনাল গ্রহণ কার্য্যাকরী না হয়, তাহলে স্নাম হওয়া একেবারে অসম্ভব।

(৩) 'হ' এবার চিড়িতনের হুরি খেলে ডাকদার হাতে তুরূপ করে নিলেন।

(৪) ডাকি 'উ' কুহিতনের টোকা খেলে পিট নিলেন।

(৫) 'উ' হরতনের ছোট একতাল খেলায় ডাকদার টোকা দ্বিগ্নে পিট ধরলেন।

(৬) তারপর ডাকদার কুহিতনের সাহেব খেলে পিট নিয়ে কুহিতনের গোলাম খেলে বিপক্ষের পিট দ্বিগ্নে বাকি সব কয়খানি পিট নিয়ে ডাকদার খেলা করে নিলেন। চারিটা হাত ছিল এইরূপ।

ইস্কাবন—গোলাম, আটা, সাতা, পজা,

চোকা, হুরি।

হরতন—সাহেব, আটা, চোকা, তিরি।

কুহিতন—টোকা, সাতা।

চিড়িতন—হশ।

ইস্কাবন—টোকা, সাহেব, বিবি,

হশ, হকা।

হরতন—হশ, সাতা।

কুহিতন—নয়, চোকা।

চিড়িতন—বিবি, নয়, পজা, চোকা।

খেয়ালী চিত্রপট



প্যারামাউন্ট-এর "হার-জল-স্নাত" চিত্রে
ভয়ি নামের ও রে মিলিও। ছবিখানা
গত বছরকার থেকে দিগন্ত-এ বোঝান হচ্ছে।



টেলিগ্রাম
'ভ্যারিটি'
পরিচালক
আশনাথ নিউজপেপার লি:
টেলিফোন
সাঁউথ ৪৬৬
১১, চকবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, বিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, ১৯শে মে ১৯৩৮

মিলন না আর কিছু?

বাংলার রাজনীতিক্রেত্র পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। রাজবন্দী ও আন্দামান-প্রত্যাগত বন্দীদের মুক্তি প্রসঙ্গে বাংলা সরকার এক বে-সরকারী সমিতি গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইবেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নাথ বসু, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ সদস্য পদে মনোনীত হইবেন। এই সমিতি যাঁহাদের মুক্তি সুপারিশ করিবেন বাংলা সরকার তাঁহাদের মুক্তির আদেশ দিবেন। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করা হইবে—আমাদের দার্জিলিং-স্থিত সংবাদদাতা এই মর্মে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। এই সংবাদ সত্য হইলে মন্দের ভাল হিসাবে বাংলার রাজবন্দী সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হইবে।

অপর পক্ষে বাংলা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত প্রাধান্য-প্রসূত দলাদলির এক মিমংসা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, নিখিল-ভারতের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ব্যাপ্ত থাকায়

তাঁহার পক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেসের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেওয়া সম্ভবপর নহে। সেই জগৎ নাকি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁহাকে বাংলার কংগ্রেস কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে কর্পোরেশনে ও এ্যাসেম্বলিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কর্পোরেশনে ডাঃ কৃষ্ণদ শঙ্কর রায় অন্ডারম্যানের পদ পরিত্যাগ করিবেন এবং ডাঃ বিধান চন্দ্র তাঁহার স্থলে অন্ডার-ম্যান নির্বাচিত হইবেন। আবার রায় হরেন্দ্র চৌধুরী পদত্যাগ করিলে ডাঃ রায় নির্বাচিত হইয়া এ্যাসেম্বলিতে প্রবেশ করিবেন এবং এ্যাসেম্বলিতে নাকি তিনি শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বেই কার্য করিতে সীকৃত হইয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা এই মিলনে বিশ্বাস করি না কারণ অর্থসচিব মহাশয়ের সহিত ডাঃ রায় যে প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ তাহাতে তিনি-বে কতদিন বসুভাতৃদ্বয়ের নেতৃত্ব অবিচলিতচিত্তে মানিয়া চলিতে পারিবেন তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে ডাঃ রায় তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন তিনি অবশ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তবে যতদিন না শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় “সশস্ত্র নিরপেক্ষতা” পরিহার করেন ততদিন ডাঃ রায়ের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই বলিয়া আমরা মনে করি কারণ নলিনী-কিরণের অচ্ছেদ্য বন্ধন অত্যাশিও অটুট। যাহা হউক রাষ্ট্রপতির অভিলাষ যদি বাংলার কংগ্রেসী মহলে সত্যই মিলন সাধন করিতে পারে তাহা বিশেষ আনন্দের বিষয়।

তবে রাষ্ট্রপতি একট ভাবিয়া দেখিবেন যে একবার ডাঃ রায়কে কর্পোরেশন ও এ্যাসেম্বলির মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিলে রাষ্ট্রপতি যখন বাংলার বাহিরে পরিভ্রমণে রত থাকিবেন এবং নষ্টপান্থ্য শরৎচন্দ্র পান্থ্য-উদ্ধারে কলিকাতার বাহিরে যাইবেন সেই সময়ে বিধানচন্দ্র কাউন্সিলার ও এ্যাসেম্বলির সদস্যদের মধ্যে বর্ণচোরাদের যেন একেবারে কুক্ষীগত করিয়া না কেলেন। শ্রীযুক্ত বিধু সরকার প্রভৃতির আনুগত্য কোন দিকে তাহা সর্বজনবিদিত। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে সে আনুগত্যকে ষড়যন্ত্রে পরিণত করিবার লোভ ডাঃ বিধানচন্দ্র সম্বরণ করিতে পারিবেন ত?



(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

আজও সমান ভাবে 'বিজ্ঞাপতি' চিত্রের স্মরণ আসার জন্মিয়ে রেখেছে। অর্থাগমের দিক দিয়ে বিজ্ঞাপতি যে বিশেষ ভাবে সাফল্য অর্জিত হ'য়েছে—একথা মনেতেই হ'বে।

বাঙলার নর-নারীদের মাতিয়ে রাখবার মত বহু উপাধান বিজ্ঞাপতি চিত্রে আছে। পর্দাবতীর গানগুলির এমন একটা মোহ আছে যা একবার শুনে বার বার শুনেতে ইচ্ছা করে। তা ছাড়া এতে আছে, পরিচালক দেবকী বাবুর সৃষ্টি—এর অনুরাধা চরিত্রটি। এই ভূমিকার গানে ও অভিনয়ে মাত করে দিয়েছেন কাননবালা।

আশাকরি 'বিজ্ঞাপতি' এখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চিত্রের দর্শক আকর্ষণ কোরতে থাকবে।

* * *

'অভিজ্ঞান'র শেষ দৃশ্যের একটি অংশ গত সপ্তাহে ১নং ষ্ট্রিডেতে তোলা হোল।

এটি প্রথমবার থেকে নারিকা সঙ্কার 'বিহার দৃশ্য'। একদিকে স্বামী এবং একদিকে তার ছদ্মবদনের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা প্রমথ। উভয়ের বন্ধু ও আত্মীয় প্রকাশ ও জামশেদপুর থেকে এসেছিল, সঙ্কার জীবনের চরম বিরোধের দিনে পরামর্শদাতারূপে। কিন্তু তর্কবুদ্ধি প্রকাশকে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার কোরতে হোল। স্বামীর সঙ্গে ফিরে যেতে সে সঙ্কারকে রাজী করাতে পারলে না।

একদিকে বিবেক ও মনুষ্যত্ব এবং অন্য দিকে তার স্বামী ও সমাজের প্রতি কর্তব্য

শেষ পর্যন্ত সঙ্কার জীবন দেবতা কোন পথে যায় ছিল, তা' এখন অনুমান করা শক্ত। তবু সে অনুমানের সুযোগ দিতে আমরা নিশ্চুপ রইলাম। সঙ্কার জীবনের শেষ পরিণতি আপনারা অবিলম্বেই ছবির পর্দায় দেখতে পাবেন।

প্রমথ ও প্রকাশের ভূমিকার চিত্রাবতরণ কোরবেন বাঙলার দুই জনপ্রিয় শিল্পী—জীবন গাঙ্গোপাধ্যায় ও শৈলেন চৌধুরী। সঙ্কার চরিত্রের রূপ দেবেন—শ্রীমতী মলিনা।

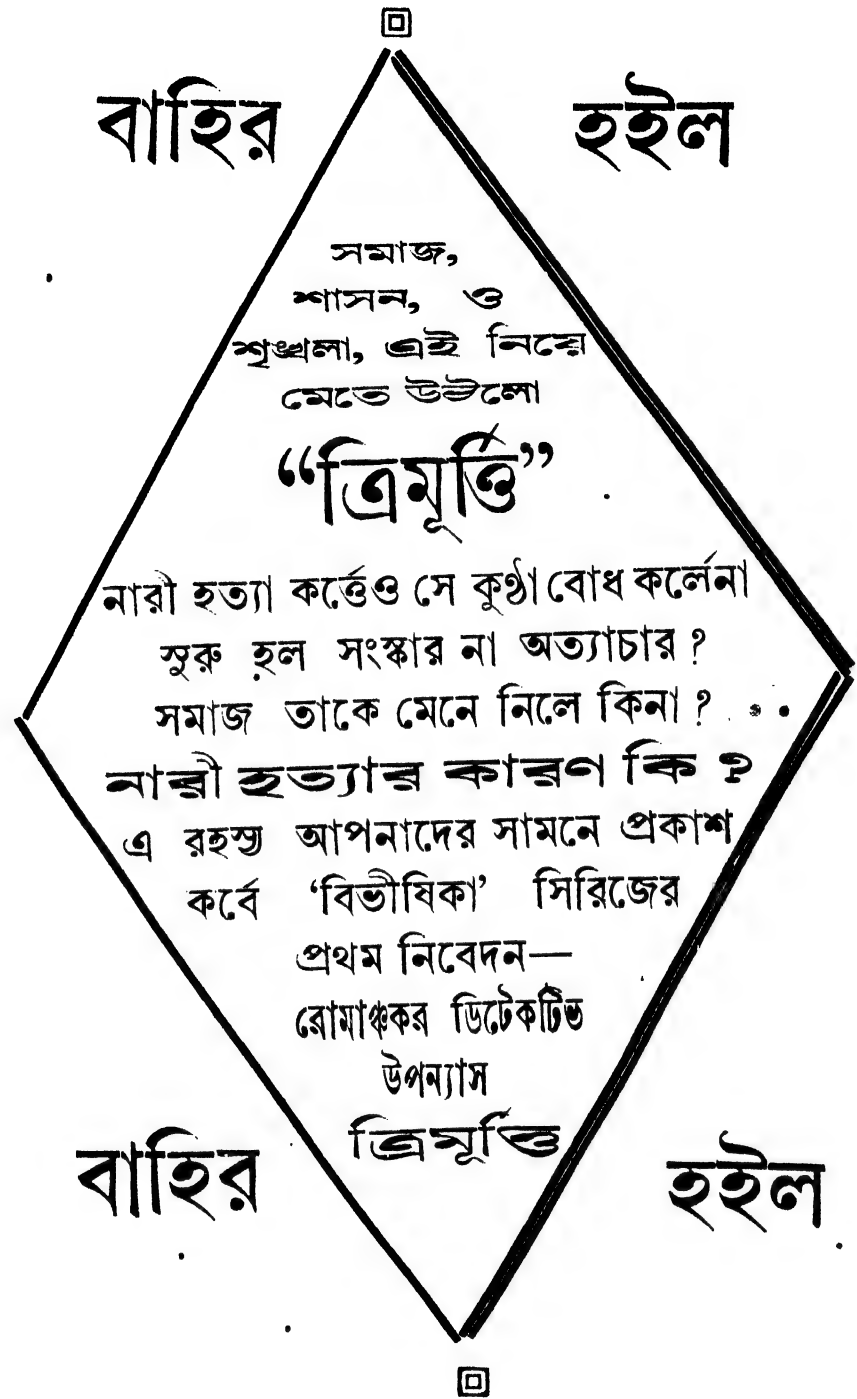
অভিজ্ঞান এর মত একখানি 'drama'কে সর্বশ্রেণীর দর্শকের রুচি অনুযায়ী বতখানি entertaining করা সম্ভব, তা' কোরতে এই চিত্রের চিত্র-নাট্যকার কার্পণ্য করেন নি। সঙ্গীত আকর্ষণ ছাড়াও, এই চিত্রের অপর কয়েকটি 'টাইপ চরিত্রে' হাফা রস পরিবেশন কোরবেন—পঙ্কজ মল্লিক, বিনয় গোস্বামী, অহি লান্যাল প্রভৃতি।

এই ছবির কয়েকটি 'Patch work' এখনও বাকী আছে। সম্পাদন কার্য



নিউথিয়েটার্সের "অভিজ্ঞান" চিত্রের একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে মলিনা, দেববালা ও শৈলেন চৌধুরী

বিভীষিকা সিরিজ



—প্রকাশক—

কথা সাহিত্য পরিষদ

১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), ভবানীপুর, কলিকাতা।

নির্দোষ ভাবে মুহূর্তের কোরতে হোলে—এই 'Patch'-গুলি প্রয়োজন। পরিচালক প্রকৃত বাস্তব সম্প্রতি যে কার্যে অবহিত আছেন। হিন্দি ছবির 'ট্রেনার' তৈরী হয়েছে। বাঙালী ট্রেনার খানি খুব সম্ভবতঃ এই হস্তাতেই রূপস্বামী ও চিত্রাতে মুক্ত লাভ কোরবে।

* * *

বড়দ্বিধি সম্বন্ধে ছোট্ট একটি খবর এ সম্বন্ধে জানিয়ে রাখি। শ্রীমতী চন্দ্রাবতী হিন্দি সংস্করণেও 'শান্তি'-র ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরবেন। এই বিশিষ্ট চরিত্রের অভিনয় কালে যাতে তাঁর হিন্দি উচ্চারণ নির্দোষ হয় এবং কোন রকম জড়তা না আসে, তার জন্যে পরিচালক মল্লিক মহাশয়, হিন্দি ভাষার বিশেষ অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা কোরেছেন। ষ্টুডিওর অপর একটি মহলা-ঘরে এই অভিনেত্রীটি নিয়মিত ভাবে, প্রতিদিন হিন্দি উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা কোরছেন।



নিউথিয়েটারের "অধিকার" চিত্রের একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য
যথাক্রমে বাধা ও নিখিলেশের ভূমিকায় মেনকা ও বড়ুয়া।

আমাদের মনে হয়, শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর মত একজন সুশিক্ষিতা অভিনেত্রীর পক্ষে, লাভাভ্য চেষ্টাতেই হিন্দি ভাষা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি আয়ত্ত করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না। তাছাড়া ইতিপূর্বে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী হিন্দি পুজারিন চিত্রে নান্দিকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরেছেন। আশা-করি এবার অতিরিক্ত বয়স, সতর্কতা ও সাধনার ফলে, তাঁর দ্বারা অভিনীত এনতুন ভূমিকাটি, বাংলার মতই লাভালী হোয়ে উঠবে।

* * *

পরিচালক কপি মজুমদার এ সম্বন্ধে বেশী ব্যস্ত ছিলেন 'ভুলুয়া' বা 'স্ট্রীট লিফার' অপেক্ষা 'অভিজ্ঞান'এর কাজে। এতাবৎ তিনি প্রতিদিন ছুখানি চব্বিটেই কাজ করে আসছিলেন কিন্তু এ সম্বন্ধে তা হয়নি।

একদিনের স্টুটিংএর খবর আমরা পেয়েছি। শ্রীমতী-বোবন-শ্রী-মণ্ডিতা-অভিনেত্রী মঞ্জু অর্থাৎ শ্রীমতী কাননের রূপস্বামীর বন্দী ও মুক্ত—শিক্ষিত, নৌখীন, বকাটে 'ডায়মণ্ড থিয়েটার' এর নটস্বরূপা অমর চাঁদ যানে গেলেন চৌধুরী মোটর গাড়ী চালিয়ে চলেছেন পাশে তাঁর প্রিয়তমা। অমর কত কথা বলে, মঞ্জু কি সে সব কথা বুঝতে পারে?.....

হাতের কামালটা তুলে বলেন: বলুনতো এটা কি?—সবাই হো হো করে হেসে উঠল। কামালটা যেন একটা কি জানোয়ার তৈরী হয়েছে।

অন্ধকার হতে আলোয় এগিয়ে এলে পরিচালক নীতীন বোস 'বুকে জড়িয়ে

ধরলেন পরিচালক কপিকে, প্রকাশ করলেন nice idea,—it is wonderful.

ক্যামেরাম্যান দিলীপ গুপ্তকে কাছে ডেকে বলেন বেশ ভাল লাইটিং হয়েছে।

হিন্দী ভাষাচর্চা জগদীশ শেঠির হাতে হাত মেলালেন।

ফ্রায়ের কটকে খোলা কবলের পাশ হতে বাহিরে এলেন বড়াল রাইচাঁদ। ঠোঁটের 'মার্কোভিচে' কাঠির আশ্রয় পড়ল। একরাশ পায়, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে এলো বেরিয়ে। মগজে তাঁর তখন নতুন স্মরণ আছে—পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা—

* * *

এটিনি অধিকাচরণের chamber এর দৃশ্যগুলি পরিচালক বড়ুয়া লাহেব গেল হস্তায়

শেষ করে কেলেছেন। এ হুগার বস্তীর কয়েকটা দৃশ্য তোলা হচ্ছে। এই দৃশ্য কয়টা তোলা হ'লে বইয়ের প্রারম্ভ আর আনা ভাগ শেষ হয়ে যাবে। বাকী চার আনা আর মাল খানেকের মধ্যেই শেষ হ'বে। সুতরাং মনে হয় জুনের মধ্যেই 'অধিকার' এর উত্তর সংস্করণই শেষ হ'বে। লাব'স্ বড়ুয়া। Speed এ তোমার সম্বন্ধ কেউ নেই।

* * *

দেশের মাটির কাজ প্রায় সমাপ্তির দিকে টেনে এনেছে। ষ্টুডিওর মধ্যে যে যে বিরাট বড়ের সিন্ তোলা হচ্ছে তা শেষ হ'তে বোধ হয় আর এক সপ্তাহ লাগবে। বড়ের দৃশ্যগুলির নেবার জন্তে যে বিরাট ব্যবস্থা করতে হয়েছে তা একমাত্র 'মিউ থিয়েটার' এর মত প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। গল্পের নতুনত্ব দৃশ্যের অভিনবত্ব, পঙ্কজ বাবুর অভিনব সঙ্গীত সৃষ্টি এবং সর্বোপরি নীতীন বাবুর নিখুঁত পরিচালনায় 'দেশের মাটি' যে আমাদের সিনেমা ঈশাদ্রিক অনেক দূর এগিয়ে যাবে তা আমরা জোর করেই সাধারণকে জানিয়ে দিচ্ছি।

“চোখের বালি”

কালী ফিল্ম্ ষ্টুডিওতে গৃহীত বি, পি, মেহেরা প্রযোজিত “চোখের বালি” সমাপ্তির পথে। যে গতিতে কাজ চলেছে তা'তে মনে হয়, এই মাসের মধ্যেই ছবিখানির শূটিং শেষ হ'য়ে যাবে। “চোখের বালি” যথাক্রমে নানা খবরই পূর্বে প্রকাশিত হ'য়েছে। এবারকার সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে, এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি অনাবাদিত সঙ্গীত সাধারণের শোনার সৌভাগ্য হবে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুর-সংযোগে যারা একমাত্র অধিকারী শান্তিনিকেতন থেকে তাঁরা এনেছেন কোলকাতার “চোখের

বালি”-র সুর-সংযোজনার জন্য। সুতরাং সব-দিক থেকেই ছবিখানাকে অভিজাত্য-গৌরবে বিভূষিত করার জন্তে এই ছবির প্রযোজক যে যোগাযোগ করছেন—তা'তে তাঁর রুচি-জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির প্রশংসা করা যায়। নতুন রূপে, নতুন রসে রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি” যদি চিত্রা'মো'দী'ধের সজ্জাধীন কোরতে পারে তা' হ'লে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী থাকতে পারে।

দীর্ঘ পিক্চাস

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছাত্রসম্মুখ চিত্র “রেশমী কমান” জুনের আরম্ভেই ‘শ্রী’ চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করিবে। মঞ্চ-সাক্ষ্য-নাটক হিসাবে “রেশমী কমান” যা'তে হাস্যরসের সজ্জারায় সবাইকে অগাহন করাতে পারে সৃষ্টি পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী সে চেষ্টাই কোরছেন। ছবিখানিতে যারা নেমেছেন জনপ্রিয়তার দিক থেকে ডাঃ হরেন মুখার্জি, প্রভা, উষা, সাবিত্রী, প্রকাশমণির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাজরা পিক্চাস

কত বছর আগে কে জানে—জুনে বুনোরা বাস কোরত—পেশা ছিল তা'দের পত্তন হত্যা করা। কিন্তু পত্তন অপেক্ষাও তারা ছিল ভয়ঙ্কর। একটা জাতির জীবনে এই বর্ষরতা তা'দের দিন টেনে নিয়ে চলে-ছিল যে পথে—সেই পথে আর কিছুদিন যদি তারা এগিয়ে চলত তা হ'লে জগদ্ব্যাপী উঠত এক হাঙ্গার। স্বর্গ থেকে মহামারা এই দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে না পেরে ইজের পুত্র নীলাশ্বর ও পুত্রবধূ ছায়াকে পাঠালেন মর্তে কালকেতু ও ফুল্লারূপে এই বুনোদের এক নির্ভীক ও সত্যবাদী জাতিতে গঠন করার জন্তে।... তারপর ফুল্লার ও কালকেতুর আরজ কার্য সূক্ষ হ'ল এবং নানা ঘটনা বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে তারা নিজেদের কাজ

শেষ করে স্বর্গে চলে গেলেন। পৌরাণিক ঘটগুলি ঘটনা এভাবে চিত্রে রূপান্তরিত হ'য়েছে, কাহিনী হিসাবে “দেবী ফুল্লার” সত্যই চমকপ্রব! বাঙালার অন্ততম অভিজ্ঞ জনপ্রিয় চিত্র-পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী এই কাহিনীটিকে সবদিক থেকেই সাধারণের মনোরঞ্জে যা'তে সমর্থ হয় সেট চেষ্টাই কোরছেন। তিনকড়ি চক্রবর্তী একজন কবি-কর্মী। লোক—এই বুদ্ধবরসেও তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাঁর নিজছাতে গঠিত প্রতিষ্ঠানকে যে সুনামের উচ্চশিখরে আনীন কোরবে—একথা বলাই বাহুল্য। তিনকড়ি বাবুর সহকারী হিসাবে কালীপদ রায়ও এই ছবির জন্ত বিশেষ শ্রম স্বীকার কোরছেন।

এই সপ্তাহে ছবিখানির শূটিং শেষ হ'য়ে গেল। রাজপ্রাসাদের একটি বিরাট সেটে অহঙ্ক চৌধুরী, শিশুবালা, তিনকড়ি চক্রবর্তী মনোরঞ্জন ডট'চার্জ প্রভৃতি নিজ নিজ ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় চাতুর্যের নিদর্শন দেখিয়ে সেদিন শূটিংয়ে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের চমকিত কোরছেন। ‘উত্তরা’র ছবি-খানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে।

পূর্ণ থিয়েটার

মুক্তির ‘জটম’ সপ্তাহ শেষ হয়ে এলো। সপ্তম সপ্তাহে প্রায় ছ'হাজার টাকা সেল হয়েছে। এই চিত্রগৃহে এর আগে কোন ছবিই এত অর্থাগম করতে পারেনি। এই সেল রিপোর্ট দেখে আমাদের মনে হয় যে এ ছবি বেশ ভাল ভাবেই বক সপ্তাহ

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চ

সাহ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

চলবে। অবশ্য এতদিন যে চলবে তা কেউ আগে ধারণা করতে পারেনি। ছবির মধ্যে ভাল মশলা থাকলে এই ভাবেই চলে।

রূপবাণী

এই শনিবার থেকে মঙ্গলবার অবধি এখানে নিউ থিয়েটারের বিজয়া পুনরায় প্রদর্শিত হবে। আধুনিক প্রণয় কাহিনী হিনাবে “বিজয়া” বাঙলা কথা-সাহিত্যে অনন্ত সাধারণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও হয়তো অত্যাঙ্ক হয় না। “বিজয়ার” এই পূর্ণরূপময় চিত্র-রসিকগণের নিকট আনন্দ আয়োজন লক্ষ্যই নেই। “বিজয়ার” পর বুধবার থেকে শুক্রবার অবধি রাধা ক্রিস্টিানের পৌরাসিক ছবি—কৃষ্ণ সুরমা প্রদর্শিত হবে। ডাক্তারমহোদয়গণের জন্য এই আয়োজন করে রূপবাণীর কর্তৃপক্ষ যত্নবাহী হলেন।

মোশন পিকচার—

এসোসিয়েশন্স

আগামী শনিবার ২১শে মে বঙ্গিন কলিকাতার আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে বাঙ্গলা দেশে একটি স্থায়ী মোশান পিকচার এসোসিয়েশন্স গঠন করবার উদ্দেশ্যে একটি সভা হবে। বাঙ্গলার প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের প্রাক্করিত একটি নিমন্ত্রণ পত্র-ও বিলি করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার জন্য উত্তোক্তা-দের আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিরিট আয়োজন

“হিন্দুস্থান ফিল্ম কোং” নামে শীঘ্রই একটি ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবে। নিজস্ব ষ্টুডিও নির্দিষ্ট সংখ্যক পার্টনার চাই। যাহারা পার্টনার হইতে চান তাঁহারা অবিলম্বেই বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদন করুন। Box No 901/A C/o “Kheyal” Calcutta.

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

(পত্র)

এবারকার সঙ্গীত সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ শ্রীমতী হীরাবাই বরোদকারের সঙ্গীত। তিনি বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত ওস্তাদ ওহারদ খাঁর শিষ্যা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেন যে শ্রীমতীকে খাঁলাহেব আবছুল করিম খাঁ লাহেবের শিষ্যা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমতীর গানের চর্চা পণ্ডিত বালগদ্বর্ ও পণ্ডিত কৃষ্ণরায়-এর style এর সহিত মেলে; তবে কোথাও কোথাও খাঁ লাহেব আবছুল করিম খাঁর ভাব বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বর্ষ মধুব, সুরেলা ও স্বীম। লহজ ও টুকরা টুকরা তানে শ্রীমতী কণ্ঠে সুরের ইচ্ছাকাল বুনিয়াদ ছিলেন। খেরালের গভীর ও ছুটুতান, গমক ও তানের বিস্তার না থাকিলেও স্তম্ভ স্তম্ভ সুরের কাজগুলি অলৌকিকেরও চিত্তে চমৎকার জন্মাইয়া দিয়াছিল। তিনি স্থির-দীরভাবে বসিয়া বীরে অতি ধীরে বক্রণ অনবধ্য-ভঙ্গিতে প্রকৃতির জীবন্ত স্খিগ্ররূপ গানের প্রতিটি চক্রের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন যে নৈলুণ্য শ্রীমতী হীরাবাই-এর সঙ্গীত যিনি শুনে নাই, তিনি লহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আমরা আশা করি, এই তরুণ গীত-নাট্যকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।

পণ্ডিত ওকার নাথ ঠাকুরের “শুদ্ধ কল্যাণ” রাগের খেরাল গানখানি, খাঁ লাহেব আবছুল করিম খাঁ লাহেবের “ওড়িসন” রেকর্ডের চারি বেশ স্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল। তাঁহার বিলম্বিত বিস্তার, দ্রুত তান, বাল বাট ইত্যাদির সম্বন্ধে একই রাগের রূপ ছিল না। প্রথমে “ভূপালি” ও “মালেশ্বরী”র চারি প্রকট হইয়াছিল। “ভৈরো-বাহার”ের খেরালটি “মেরে বলন্ত কি মোবারক” গান-খানি শত করা ৫০ ভাগ “আলীর-ভৈরবী”। গানের মুখ মধ্য সপ্তকে ছিল না। মন্সার-লপ্তকের কোমল নিখাৎ থেকে শুরু হয়েছিল, বাহা বাহারে সীতি-বিক্রম, বাহারের প্রধান স্থান মধ্য-লপ্তকের মধ্যম, তার-লপ্তকের যড়জ

(স) পর্যন্ত। অস্থায়ী মন্সার-লপ্তকের ধৈবত, মধ্য-লপ্তকের মধ্যে হইয়াছিল। অস্থায়ী আধেরি তান শুদ্ধ গাঙ্কার থেকে কোমল ধ্বজে আলিতেছিল। ইহা ভৈরোর চলে না। ভৈরো-বাহার হই লংযুক্ত রাগ, যড়জ থেকে মধ্য-লপ্তকের মধ্যম (লা, রে, গা, মা,) পর্যন্ত। পণ্ডিতজী বাহারে নি, ধা, নি, লা, রে রে লা, এই লরগম লাগাইতেছিলেন। কিন্তু ইহা অশুদ্ধ। বাহারে পা, মা, নি, ধা, নি, লা—এই লরগম লাগান উচিত। যেমন প্রাচীন সুবিখ্যাত “ডারিয়া ঝোক রে হি” গানখানি গোয়ালিয়ারের ওস্তাদেয়া গাহিয়া থাকেন।

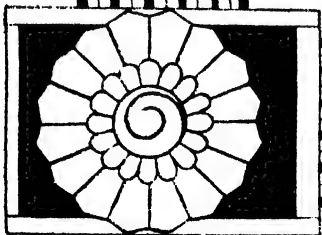
পণ্ডিতজীর ২য় দ্রুত তালের “বোবনা রে” গানখানি আগেরটির চেয়ে ভাল গেয়েছেন। তানবন্ধনে beauty ও link ছিল না, যেমন ওস্তাদ ফরেকখাঁর থাকে। দ্রুত লরগমের কিছু ওলট পালট হয়েছিল। “ধা, নি, ধা, লা,” “নি, লা, ধা, নি অনেকবার repeat করেছিলেন। এ লরগম বাহার-বিক্রম।

রাহু মিশ্রের দিয়া কি তোড়ী রাগের খেরাল গানখানি তান ও লর শুদ্ধ—নীল ও প্রাণহীন। সুরে কোন বৈচিত্র্য ছিল না।

শ্রীতীর্থদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার patent মালকোষ রাগের “পীর না জানে” খেরাল গানখানি গাইয়াছিলেন। আলাপের চার অংশের কোন অংশই রূপের বিকাশ দেখা যায় নাই। সুরের বা তানের কোন বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। তেলঙ্গ তেতালা গান-খানির বোল বাটের কোন নৌদর্য্য ছিল না। চুমুরী গানে style-এর অভাব। রাস্তা তুলিয়া পথ খুঁজিতেছিলেন, পথ পাওয়ার আগেই গান শেষ হইয়াছিল কণ্ঠ মিষ্ট, light technique শুদ্ধ, সুরে দরদ, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। ইতি

ত্রিবিম্বো বিহারী দাস

[এ লহজে বিভিন্ন মতামত পাইলে আমরা লাহরে তাহা পত্রক করিব। সঃ খঃ]

[illegible]

কলিকাতায় এনাক্ষী রমা রাও

এনাক্ষী রমা রাও শীঘ্রই কলিকাতায় আগন্তু হবেন। অতিরঞ্জিত কিম্বা ভিত্তিহীন লংবাধ নহে। প্রভাত সিনেমায় “জায়গীর-বারের” পরই ভাবনানীর ছবি “অমর প্রেম” দেখান হ’বে এবং উক্ত ছবির নায়িকা দেব-বালীর ভূমিকায় এনাক্ষী রমা রাওকে দেখা যাবে। ভাবনানীর ছবি এবং এনাক্ষী রমা রাও—উভয়েরই অদিক পরিচয় শ্রীশ্রী রাজন, যারা ছবি ভালবাসেন সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে যারা ছবি দেখে থাকেন তাঁরাই জানেন অভিনয় নৈপুণ্যে এনাক্ষী রমা রাও কতদূর পারদর্শিনী। সুতরাং বহুদিন পরে এনাক্ষী রমা রাওয়ের কলিকাতায় আগমনে চিত্রোন্মোহী শান্ত্রাই উৎফুল্ল হবেন।

মন্দির-পুজারিণী দেবদাসী এনাক্ষী রমা রাও নিজের খেয়ালে নিজেকে আত্মহারা। মনে মনে সে জানে মন্দির পুজারিণী মন্দির নর্তকী সে দেবতার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। তাই আপনার মনে সে মন্দির-দেবতার সম্মুখে নৃত্যে নিজের প্রেমকে ব্যক্ত করে।

মন্দিরে এল রাজা। নিজের পাপে জর্জরিত হয়ে রাজা এল মন্দিরে দেবতা অমরনাথের সম্মুখে নিজ পাপ ব্যক্ত করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কিন্তু দৈব প্রতিকূল। নৃত্যরতা দেবদাসীকে দেখে রাজার মনে পুনরায় লালসার বহিঃ প্রবাহ উঠে। প্রধান মন্ত্রীকে উৎসর্গ করে রাজা দেবদাসীকে নিজ প্রাণসম্পদ নিয়ে এল। রাজা দেবদাসীকে বিবাহ করবে। কিন্তু দেবদাসী এতে আপত্তি জানিয়ে বলে এ কোন প্রকারে হ’তে পারে না, এ যে

অসম্ভব। মন্দিরের দেবদাসী সে, দেবতা অমরনাথের চরণে সে উৎসর্গীকৃত। মন্দির মনবের সঙ্গে তার পরিণয় অসম্ভব।

মন্দিরেই থাকত বীরভদ্র। একজন উদ্বাসীন, যে ভালবেসেছিল দেবদাসীকে, কিন্তু মনের নিভৃত কোণে সে শেষ লুকান থাকত। রাজা যখন দেবদাসীকে প্রাণসম্পদ নিয়ে যায় বীজের চূপে চূপে তাদের অমূল্য করে এবং রাজকৃত্যের সাহায্যে দেবদাসীকে নিয়ে পলায়ন করে। কিন্তু রাজার শৈল্প তাত্ত্বিক প্রেমের করে। লাজিত বীজের পণের ধূলায় কটেকের অস্বস্তি পড়ে থাকে। কতিপয় লক্ষ বীরকৃত্যকে দিয়া জ্ঞান প্রদান করে ও তুষারভীর্ণ যোগানে দেবতা অমরনাথ অবস্থান করেন সেখানে নিয়ে যায়। ওদিকে দেবদাসীর অপমান দেবতার অপমান। দেবতা অমরনাথের রোষাণ জলে উঠে। চতুর্দিকে প্রাণের তান্ডব নীলা স্রব হই—তারপর...রাজার শোচনীয় পরিণতি—দেবদাসীর পরিণাম—বীরভদ্রের অবস্থা—আপনাকে বিস্মিত ও হতবাক করবে।

ছবিখানির বিশেষত্ব এই যে এর সম্পূর্ণ দৃশ্য নির্মাণ করা হয়েছে কাশ্মীর ও অন্তর্ভুক্ত বথানিদিষ্ট জায়গা থেকে। বিরাট হিমালয় পর্বত, অতুলনীয় তুষাররাজি ও ভূমিকম্পের দৃশ্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশেষতঃ কাশ্মীরের নয়ন-মনোহর দৃশ্যাদি ছবিখানির এক অপূর্ণ সম্পদ।

তামিল ছবির সাফল্য

গত রবিবার সকাল ১১টায় মেট্রোপলিটান পিকচার্সের পৌরাণিক তামিল ছবি

“দক্ষ-যজ্ঞ” প্রভাত সিনেমায় দেখান হয়। ছবিখানি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে। দর্শকের ভীড় হয়েছিল খুবই। দক্ষিণ ভারতীয়—যারা কলিকাতায় আছেন তাদের জন্য এ বন্দোবস্ত করে প্রভাত সিনেমার কর্তৃপক্ষ—বাবলায় দ্বিত থেকে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন বলতে হবে।

আগেই রবিবার বেলা ১১টায় শ্রীভারত লাক্সী পিকচার্সের তেলুগু ছবি “কুন্সী কল্যানম” দেখান হবে। ছবিখানির গল্পাংশ পৌরাণিক এবং ভারতের সকল অঞ্চলেই সুপরিচিত। “দক্ষযজ্ঞের” ত্রায় এ ছবিখানাও তামিলবাসীগণ বড়ক আদৃত হবে তাতে কোনই সন্দেহ নাই।

জায়গীরদার

প্রভাত সিনেমায় সাগর মুভিটোনের হিন্দি সামাজিক ছবি “জায়গীরদার” দর্শকগণ অভাবনীয়রূপে গ্রহণ করেছে। শনিবার থেকে ছবিখানা তৃতীয় সপ্তাহে পড়ল। ছবিখানা এখানে আরও কিছুদিন চলবে বলে মনে হয়, হিন্দি ছবি হলেও এর “হিন্দি” এত লজ্জা যে বাঙ্গালী মাত্রই তা বুঝতে লক্ষ্য হবে এবং এ জন্তে বাঙ্গালী দর্শক মহলেও এ ছবিখানার আদর আছে।

ছবিখানার গল্পাংশ খুবই লজ্জা ও সরল। এবং নিত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে পরিচালক মহাশয় গল্পের গতির দ্বারা বজায় রেখেছেন। আবহ গঙ্গীত, গান ছবিখানার অমূল্য সম্পদ। তাছাড়া কতিপয় দৃশ্য,—যথা

স্বাধীনতার অগ্নিকাণ্ড, মোটর বোড় ইত্যাদির
ফটোগ্রাফী হয়েছে অনবদ্য।

বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছে সুরেন্দ্রনাথ,
মতিলাল, ইয়াকুব, ও মায়ী ব্যানার্জী।
একখানা প্রথম শ্রেণীর ছবি দেখার আনন্দ
“জাগরিত্তার” বেথে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে
এ কথা জোর করেই বলা যেতে পারে।

উৎকৃষ্ট সিনেমা হাউস

খারাপ জাগরিত্তার ভাল জিনিষ খাওয়া
যেমন অসম্ভব তেমনি ভাল ছবি হলেই
হয় না। বসবার ভাল বন্দোবস্তটি চাই।
তবেই ভাল ছবি দেখার বিমল আনন্দ
উপভোগ করা যায়। এ গরমের দিনে
হাউসটি হবে ঠাণ্ডা, আসনটি হবে
আরামপ্রদ—চতুর্দিকের আবহাওয়া হবে
স্নিগ্ধকর এবং এর প্রত্যেকটি বন্দোবস্তই
“প্রভাত সিনেমায়” পাবেন। পুরাতন মাডান
পিটেরটরকে আমূল সংস্কার করে নতুন
বন্দোবস্তে নতুন নাম “প্রভাত সিনেমায়”
রূপান্তরিত করা হয়েছে।

যত্ন চক্রবর্তী

আপনারা যত্ন চক্রবর্তী নাম শুনিয়াছেন
কি? নামটি নতুন হইলেও ত পরিচিত।
এই যত্ন চক্রবর্তী অল্প কেহ নহে—‘বেশের
মাটি’ চিত্রের একটি বিশেষ চরিত্র। আশা-
দেব মধ্যে যাহারা গ্রামে বাস করিয়াছেন,
তাহারা অবশ্যই জানেন যে গ্রামের একজন
মোড়ল থাকে, সে গ্রামের ও লম্বাজের শাসন
কর্তা। আমাদের আলোচ্য যত্ন চক্রবর্তীও
সেই মোড়ল, কোন গ্রামের তাহা জানিবার
প্রয়োজন নাই। মোড়ল জাতীয় লোকেরা
অল্প লোকের মোড়লি লহু করিতে পারে না
—সেইজন্য একই গ্রামে দুইজন মোড়ল দেখা
যায় না, যদি এমন অবস্থা হয় তাহা হইলে

গ্রামের শান্তি নষ্ট হয়—গ্রামবাসীদেরও জীবন
অশান্ত হইয়া ওঠে।

আমাদের আলোচ্য যত্ন চক্রবর্তীর টাকা
ছিল, ক্ষমতা ছিল, আর ছিল তাহার কাছে
গ্রামের বহুজনের জমি জমা বাধা। এই
জোরে সে লকলকে লহুজেই নিজের শাসন
স্বীকার করাইতে বাধ্য করিত। কিন্তু
মামুষের দিন লম্বান যায় না।

যে গ্রামে যত্ন চক্রবর্তীর বাস—কোথা
হইতে সেই গ্রামে আগিল একবল লহু
বুবক—অশোক তাহাদের নৈতা। এই
বুবকলের অল্প কাজ নাই বোধহয়, তাই

হাজার পিকচারের প্রথম অর্ঘ্য
ভক্তি-রস-সিদ্ধ চির-নূতন চিত্র-কাহিনী

দেবী ফুল্লরা

ভূমিকায়: অহীন্দ্র চৌধুরী, ‘শিশুবালা’,
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মোহন রায়,
রাধারানী, সান্ধিত্রী, চিত্রা, বাণী চৌধুরী,
দুর্গাপ্রসন্ন বসু ও তিনকড়ি চক্রবর্তী

পরিচালক: তিনকড়ি চক্রবর্তী

যন্ত্র-শিল্পী: মধু শীল চিত্র-শিল্পী: নিভুতি লাহা

শব্দধর: মতীন দত্ত

‘উত্তরা’-র আগতপ্রাণ !



তাহারা গ্রামে বাস করিয়া চাষবাস করিতে চায়। যহ চক্রবর্তীর নিকট ব্যাপারটা ভাল ঠেকিল না। ডাক্তার, উকিল, ব্যবসাদার—এই সকল শিক্ষিত লোকের কখনও বিশ্বাস করা যায় না—তাহারা কি না করিতে পারে। গ্রামের লোক বোকা, তাহাদের দ্বারা সহজেই নিজের স্বার্থক্ষতি করাইয়া লইতে পারে।

কিন্তু আলল কথা তাহা নয়। যহ চক্রবর্তীর ভয় হইল তাহার নিজের মোড়লির কথা মনে করিয়া। লোক যতদিন মূর্খ থাকে, তাহার উপর বহু কিছু চালান যায়, কিন্তু একবার তাহার বুদ্ধি খুলিলে এবং আত্মপ্রত্যয় ঘটিলে সহজে আর তাহার উপর মোড়লি করা যায় না। বহু যহ চক্রবর্তী বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে রাজত্ব করিতেছে—লম্বাকের, দেশের কল্যাণ তাহারা দেখে না। তাহারা চায় কেবল নিজের শক্তি এবং অর্থ বৃদ্ধি।

নিউ থিয়েটারের 'দেশের মাটি' চিত্রে আমাদের আলোচ্য এই যহ চক্রবর্তীর দেখা পাইবেন। দেখিলেই চিনিতে পারিবেন যে অমর মল্লিক এই ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। যহর চরিত্র যেমন ভাবে চিত্রিত হইতেছে তাহাতে তাহাকে অভিনয় বলিয়া মনে করিবার অবকাশ খুব কমই আছে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন আলোচ্য বিষয় এই যহ চক্রবর্তীর জীবনকথা নহে। আমরা আলোচনা করিতে চাই কেমন করিয়া কোন পথে গ্রামের জীবনে সকল প্রকার ভেদ-বিবাদ ছুর করিয়া গ্রামবাসীদের একতাবদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্রুত কষ্টের অনেক অংশ লাঘব করা যায়। 'দেশের মাটি' চিত্রেও এই বিষয়ে নানা ভাবে নানা কথা বলা হইয়াছে, এবং

ইহার কাহিনীর অন্তরালে দেখানো হইয়াছে যে যহ চক্রবর্তীর মত ভীষণ লোকের মনের কুটিল গতির পরিবর্তন করা সম্ভব।

লোকে আজ গ্রামে বাস করিতে চায় না। গ্রামে আজ আর কোন মূল্য বা আনন্দ নাই। সামান্য নানা প্রকার ক্ষুদ্রতা লইয়া আজ তাহারা দিন কাটাতেছে। অথচ একথা মতা যে গ্রামের লোকেরা ১০ ভাগ দ্রুতকে যহ চক্রবর্তীর মত লোকেরাই ইচ্ছা



"দেশের মাটি" চিত্রে যহ চক্রবর্তীর ভূমিকায়—অমর মল্লিক

করিলে দূর করিতে পারে। যে লোক আজ চুরি, ডাকাতি এবং খুন খারাবি করিয়া কালাতিপাত করিতেছে, তাহার মনের ঘরজার ঠিক ভাবে এবং ঠিক সময়ে ষা দিতে পারিলে সেই ব্যক্তিই এক নিমিষে মানুষের পরম সেবকে পরিণত হইতে পারে। যে মানুষ কেবল হত্যা করিত, সেই মানুষই নিজের প্রাণ দিয়া পরকে বাচাইবে। যহ চক্রবর্তীর জীবনেও এই ঘটনা একদিন পরম সত্যের রূপে দেখা দিয়াছিল। কেমন ভাবে এবং কি করিয়া ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল, কোন অমৃত পরশ পাইয়া তাহার শুষ্ক প্রাণ লজল হইয়াছিল, তাহা আমাদের বক্তব্য বিষয় নহে, তাহা 'দেশের মাটি' চিত্রের কথা, এবং যথাসময়েই তাহা আপনারা দেখিতে পাইবেন। আমরা কেবল এই কথা মাত্র

বলিতে পারি যে, এমন দিন যেন দেশে অচিরে আসে যখন যহ চক্রবর্তীর হল আমাদের 'দেশের মাটি' যহ চক্রবর্তীতে পরিণত হইবে।

এই যহ চক্রবর্তীর জীবনে গৌরী নামক একটি গ্রাম্য বালিকার প্রভাব অতি অল্পত ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই গৌরীর নামেই যহ চক্রবর্তী একদিন কষ্টকর আয়োজন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিগা বোধ করে নাই। অথচ ভবিষ্যতে আর একদিন এই গৌরীকেই সে মা বলিয়া লম্বাধন করিতে কোন সন্দেহই বোধ করে নাই। যাহার নামের সহিত গৌরীর নাম যুক্ত করিয়া যহ চক্রবর্তী কুৎসা রটনা করিয়াছিল, পরে একদিন সেই অপোকে সেই যহ চক্রবর্তী বৃকে জড়াইয়া ধরিতেও লজ্জা বোধ করে নাই। মানুষের মনের গতি কোন ভাবে, কোন বিচিত্র পথে কোন সময় নিজের ব্যাপ্তাপথ বাছিয়া লয়, তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে সকল সময় আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু মানুষের মনে যে দেবতা অলঙ্কো বসিয়া অকটন ঘটাইতেছেন—সেই দেবতার স্তুত আশীর্বাদ সকল সময় আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে। আশীর্বাদ ইজিত বুলিয়া যে জন কাজ করিতে পারে, জীবন পথ চলিতে পারে—সেই জনই কেবলমাত্র মানুষের সেবাতে নিজেকে দান করে। 'দেশের মাটি' চিত্রে যহ চক্রবর্তীর জীবন লক্ষ করিবার বিষয় এবং যে ব্যক্তি এই চরিত্রটিকে বাস্তব-রূপ দিতেছে—তাহার অদ্বিতীয় কৃতিত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়।



ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা .৭৪/১, ক্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

*
তিনখানি
স্মরণীয়
চিত্র
অবিলম্বে
আসিতেছে
*

হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্রাঙ্ক...

দেবীকুমারী

ভূমিকায় : অহিন্দ্র, শিশুবালা, মনোরঞ্জন, রাধারাণী, মোহন, সাবিত্রী
দিনু পিকচার্সের হাসির ব্যরণ ধারা...

বিশ্বকামা

শ্রেষ্ঠাংশ : ডাঃ হরেন, প্রভা, উষা দেবী, সাবিত্রী, প্রকাশমণি, কমলা
রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় সামাজিক আলোচনা...

চোখের বালি

বুঝিয়ে জ্ঞান
আবেদন করুন
রীতেন
এণ্ড কোং
৬৮, ধর্মতলা স্ট্রীট
ফোন :

বিবিসি

তরুণ সম্প্রদায়

গত ১৫ই মে রবিবার অপরূহ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা সচিব শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বোস মহাশয়ের সভাপতিত্বে তরুণ সম্প্রদায়ের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

প্রথমে সম্পাদক শ্রীবিনয় ভূষণ বহু বার্ষিক বিবরণীতে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার জন্তে ড্রিল করান হয়। তৎপরে সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণবিশ্ব মিত্র মহাশয় একটি লক্ষ্যপূর্ণ বারগর্ভ কথার ভাষিতের ব্যায়াম চর্চায় লব্ধকে আলোচনা করেন। সম্প্রদায়ের সভাপতি নানারূপ শারীরিক ব্যায়াম কোণলের মধ্য দিয়া কিজিকাল ড্রিল, তরবারি, দোর্ড ড্রিল, হরাইজেন্টাল বার ও বালেন্ডিং বেশ চমকপ্রদ করিয়াছিল, এবং ফ্রাইং ট্রেনিংয়ের খেলার সাক্ষ্যের জন্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার নন্দীর কৃতিত্বের পরিচয় পাঁকরা গিয়াছে। মোটের উপর সর্বোচ্চ সন্মদ হইয়াছে।

স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বর্ধমানের অভিনব আয়োজন!

বাংলার বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা ও বাঁকগণের সমাবেশে বর্ধমান জেলা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও জলসা।

স্থান—“বিচিত্রা”, বর্ধমান।

তারিখ—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

বর্ধমান জেলাবাসী যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন, তাঁহারা প্রত্যেক শ্রেণীর জন্ত ১০ আনা ফি-সহ সঙ্গীত ও বাঁহীর শ্রেণী উল্লেখ ১০ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে “শ্রীপ্রমথনাথ দে, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, বর্ধমান” এই ঠিকানায় আবেদন করুন। এক বা একাধিক শ্রেণীতে যোগদান করা চলিবে।

কণ্ঠ সঙ্গীত—ক্রপদ, খেরাল, হুংগী, টপ্পা, তত্বন ও আবৃত্তিক বাংলা।

যন্ত্র সঙ্গীত—সেতার, এসরাজ ও ব্যজ।

মাননীয় মিঃ এস. সি. মিত্র

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র গত-সপ্তাহে হার্জিলিং যাঁত্রা করিয়াছেন, তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় মিঃ আজিজুল হক অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা অধিকার সমিতিতে যোগদান করিবেন। মিত্র মহাশয় আগামী ১লা জুন কলিকাতার প্রত্যাবর্তন করিবেন।

শরৎচন্দ্র বসু

কংগ্রেসী বিরোধীদলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বোম্বাইয়ের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন না। তিনি প্রায়ই হার্জিলিং ও কাশিগাঁও বাতায়ন করিতেছেন।

কবিরাজ গণনাথ সেন

মহাভোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় প্রায় বেড়মাল পুরে পুরী বাইবার

সময় ট্রেনের কাঁধরায় মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া আহত হন। এতদিন পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন বর্ধমানে তাঁহাকে কলিকাতার ভবনে আনি হইয়াছে। যদিও তিনি এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন তবে এখনও শয্যাগত এবং আরও মালাবধিকাল তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম হওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি শীঘ্র নিরাময় হইয়া উঠুন ইহাই আমরা কামনা করি।

শ্রীঅমিনাশ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীঅমিনাশ ভট্টাচার্য্য স্বগ্রামে পাণিগ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যার্থে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতার প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নের (বরানগর) উদ্যোগে, প্রথম বাৎসরিক “রচনা ও আবৃত্তি” প্রতিযোগিতা হইবে।

রচনার বিষয় বস্তু—

সর্বশ্রেণীর বালক বালিকাধিগের জন্ত :
“বর্ধমান যুগে কবির স্থান কোথায়?”

আবৃত্তির বিষয় বস্তু—

১। ৭ম হইতে ১০ম শ্রেণীর বালকধিগের জন্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—“সেবাল”

২। সর্বশ্রেণীর বালকধিগের জন্ত :

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—“অন্ধবহু”

৩। ৬ষ্ঠ হইতে নিম্ন শ্রেণীর বালক-বালিকাধিগের জন্য

হেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—“জাগরণ”

নাথ পাঠাইবার ঠিকানা—

সম্পাদক—“ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন”

১৩৩ নং হেজার রোড,

আলাহাবাদার পোঃ আঃ, ২৪ পরগণা।

চরিত্র (পুরুষ)

ভাঃ হরেন মুখার্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ
বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিলালী বন্ধু
ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেরার।
অস্ফাচ্চ চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

টেকা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আশ্রয়ের
বুড়ো বি।
অস্ফাচ্চ চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে
পাইবেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবিনাশ আমার গাড়ীখানা বার করে' নিয়ে এলো। পিত্তল দিয়ে ধাক্কা মেরে লোকটাকে বল্লুম—“ওঠ!”

সে করুণচক্রে আমার দিকে চাইলে। আবার ধাক্কা দিয়ে বল্লুম—“ওঠ!” সে উঠে বসলো; আমিও রিভলভারটা তার গায়ে ঠেকিয়ে রেখে তার পাশে বসলুম। অবিনাশ ঠোট দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে।

অবিনাশ—“কোথায় যা'ব? থানায়, না বাড়ীতে?”

আমি—“বাড়ীতে। কারণ, থানায় নিয়ে গেলে একে প্রশ্ন করবার আমার সুবিধা হ'বে না। শেষে তো থানায় নিয়ে যেতেই হ'বে।”

গাড়ী চলো। পথে লোকটা যেন পাথরে গড়া স্তম্ভের মতন নিশ্চল হ'য়ে বলে রইলো। সে বোধ হয় বুঝলে, যে গোলমাল ১৩৭লে আমাদের চেয়ে তার বিপদই বেশী।

বাড়ীর দরজায় যখন গাড়ী পৌঁছুলো তখন রাত্রি তিনটে। লোকটাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালুম। বল্লুম—“দেখ, তোমার কোন আশা নেই। তবু যদি সব কথা খুলে বল, তো অন্ততঃ তোমায় বাঁচাবার চেষ্টা করবো।”

লোক—“আমি যা'ব বল্বে, তা' যে সত্যি হ'বে তার ঠিক কি?”

আমি—“আমার কাছে মেকী চালাতে পারবে না। অনেক কিছু জানি—সুন্দে?”

এই বলে আমি হঠাৎ ও হত্যাকারীর অকৃত-প্রকৃতি লম্বন্ধে আমার যে বিগরি মেটা বেশ রঙ কলিয়ে বল্লুম। লোকটা যেন

অবাক হ'য়ে গেল। বল্লেন—“গুরুত কথা! এমন তো কখনো শুনি নি। যা' বল্লেন আপনি—সবটাই সত্যি। আমি দেখিনকার ব্যাপারে ভিলুম না। ছিলাম খুন করেছিল। ছিলাম চোরাগাট। আপনি হব বলছেন। তা'কে চিন্তেন কি করে?”

আমি—“অনেকদিন থেকে আমি তা'কে জানি। তা'কে খুঁজছিল অনেকদিন থেকে। এবার হল শুদ্ধ ধরবো।”

লোকটা হেঁদে বল্লেন—“অসম্ভব। মা-ঠাকরুণের বুদ্ধির কাছে আপনার বুদ্ধি খাটবে না। বাবাঠাকুর মারা গেছেন বটে, কিন্তু মা'বাবু আছেন। মা'যা কি আপনি তা'দের কিছু করেন! আমি? আমি তো কিছুই নয়। আমাকে ধরাও যা' না ধরাও তা'।”

মাথাটা ঘুরচে বলে মনে হোল—শরীরটাও বড়ই অবলম্বন বোধ হ'চ্ছিল। কিন্তু সময় নষ্ট করলে তো চলবে না। তারা যেইমাত্র জানবে যে আমরা পালিয়েছি—বিশেষতঃ তাদেরই একজন আমাদের সঙ্গে উধাও হ'য়েছে—তখনই তারা লরে' পড়বে।

লোকটাকে একটা ঘরে তালি বন্ধ করে, বেরার। রামদহিন ও অবিনাশকে পাহাড়ায় রেখে আমি আবার গাড়ী নিয়ে চল্লুম বালীগঞ্জ থানায় ইন্সপেক্টর বাবুর সঙ্গে দেখা করতে। বাবার লম্বয় এবার একটা রিভলভার নিয়ে বেরলুম।

সেখানে গিয়ে সব বল্লে, তিনি তখনই আমার গাড়ীতে চল্লেন চিংপুর থানায়। সেখানকার ইন্সপেক্টর ও আর দুজন পুলিশ

কন্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চল্লুম ইন্সপেক্টর টেকার আড্ডার দিকে। আমরা গলির কাঁচাকাছি হ'য়েছি, এমন সময় এক-খানা মোটর তীরবেগে বেরিয়ে এলো। স্পষ্ট দেখতে পেলুম তার মধ্যে সেই সুন্দরী নারীটাকে। বলে উঠলুম—“ঐ যার! ঐ যার!”

হাওয়ার বেগে আমাদের মোটরটা তাদের মোটরের অনুসরণ করলে।

তখনও রাত্রি শেষ হতে কিছু বাকী আছে! হুহ শব্দে ছুখানা গাড়ী ছুটেছে। খালি রাস্তা থাকার গাড়ী ছাড়বার খুব সুবিধা হয়েছে। ষ্ট্রয়ারিং ছইলের উপর কুকে পড়ে' লামনে চোখ রেখে আমি প্রাণপণে গাড়ী ছেড়ে দিই। লকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লামনের গাড়ীটাকে ধরবার অপেক্ষায় আছি। লামনের আরোহীরাও ঠিক সেইরকম প্রাণের মারা বিলম্বন দিয়ে গাড়ী ছেড়েছে। লোকা বাগবাজারের পোল পার হয়ে না গিয়ে, তারা ডানদিকে বেক্লে। তারপর শ্রামবাজারের মোড় ঘুরে লমান বেলগাতিয়ার দিকে ছুটলো। হ'একটা' পুলিশ প্রহরী তাদের ডেকে দাঁড়াতে বল্লেন—কে তাদের কথা শোনে!

বেলগাতিয়া অতিক্রম করে' পাতিপুকুরের ভিতর দিয়ে তারা যশোহর রোডে গিয়ে পড়লো। আমাদের গাড়ী তাদের পিছনে ছুটছে লমান বেগে। ক্রমশঃ অন্ধকার তেজ করে একটু একটু করে আলো ফুটে উঠে হলো। হঠাৎ লামনের গাড়ী থেকে শব্দ হ'লো “গুরুত”!

বালীগঞ্জ থানার ইন্স্পেক্টরবাবু বলে উঠলেন—“হরেনবাবু, লাবধান! ওরা গুলি চালাচ্ছে।”

“আমি—আপনারাও চালান।”

আমাদের মোটর থেকেও গুলি ছুটতে লাগলো। এদিকে আমার মোটর প্রায় তাদের কাছাকাছি গিয়ে পড়লো। হঠাৎ লামনের গাড়ীর পিছনে ধপ করে আগুন জলে উঠলো। গাড়ীখানা কিছু দূর গিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। আমার গাড়ীটা বেগ লামলাতে না পেয়ে প্রায় লামনের গাড়ীখানার ঘরের উপর গিয়ে পড়লো। পাশের একটা থানার ভিতর থেকে ঠাট্টা বন্দুকের আগুয়াজ হোলো।

ইন্স্পেক্টরবাবু বললেন—“নেমে পড়—নেমে পড়। গাড়ীতে থাকলে নিশ্চয়-মৃত্যু। ওরা গুলিঘেরে গাড়ীখানাকে ঝাঝরা করে’ কেলবে। ওরা ডানহিকের থানার আছে। বাহিকের থানার নেমে ছড়িয়ে পড়।”

তাই করা হ’লো। তারপর চলো জীবন-মরণ যুদ্ধ।

হহ করে গাড়ীখানা জলছে। তার আলোতে লক্ষ্য কতকটা স্থির হলো। ডান হিকের থানার ভিতর থেকে চারটে বন্দুক চলছিল। হঠাৎ তিনটে হয়ে গেল। বুলুম্ব একজন কমলো। আমাদের পক্ষে একজন পাহারাওরালা আহত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

হঠাৎ আমার গাড়ীতে ঠোট বেওয়ার শব্দে আমরা চমকে উঠলুম। এতক্ষণ শুধু থানার দিকে লক্ষ্য রাখতে বাধ্য হওয়ার আমরা গাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখতে অবকাশ পাইনি। দেখলুম স্টারিং ধরে একজন লোক বসেছে। সেই দিক লক্ষ্য করে গুলি ছাড়লুম। কিন্তু গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

থানার ডানহিক থেকে গুলি ছুটলো—‘গুড্’ ‘গুড্’। আবার সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হলো। ইতিমধ্যে

বিদ্যাবেগে গাড়ী ছেড়ে দিল। তখন বেশ আলো হুটে উঠেছে—কাজেই দু’জন ইন্স্পেক্টরের ডাকাত হুটোকে আহত করতে দেয়ী হোলো না। আমি একটু দূরে ছিলুম। গাড়ীটা আমার সামনে দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল। একটা স্ত্রীকর্ষ বাতানে ভেসে এলো।

শুনলুম—“স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া বাকী আছে। হরেনবাবু আবার দেখা হবে!”

‘ইন্সবনের টেকা’ দলের দু’জন হত ও তিনজন আহত হ’য়েছিল। একখানা ট্যাক্সী করে তাদের হাঁপপাতালে চালান দেওয়া হ’ল।

আহতদের মধ্যে ‘বেটে-ছিহাম’ নামে একজন ছিল। মৃত্যুকালীন অবানবন্দীতে—দে স্বীকার করেছিল যে সে হত্যাকারী। লাব-ইন্স্পেক্টর সঙ্গে চিরজীব বাবুর সঙ্গে যে দেখা করেছিলো, তার নাম ‘রাঙা নেপাল’। নেপাল ও ছিহাম একসঙ্গেই চিরজীববাবুর বাড়ী যায়। নেপাল চিরজীব-বাবুকে যখন কথায় ব্যস্ত রেখেছিল, সেই অবসরে সে ঘরে ঢুকে লোফার তলায় লুকিয়ে থাকে। ১২টা বাজবার একটু আগেই সে বেরিয়ে এসে পিছন থেকে চিরজীববাবুকে আক্রমণ করে। বাহাত দিয়ে হুথ চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে সে তাঁর লিভারের উপর চাপ দেয়। তিনি অজ্ঞান হ’য়ে মাটিতে পড়ে যান। তারপর লাব-ইন্স্পেক্টর-বেশী নেপাল একটা শিলি থেকে কি একটা আরক নিয়ে খুব লাবধানে ড্রপারে (droper) করে’ তাঁর চথের মধ্যে এক কৌটা ফেলে দেয়। একবার মাত্র চিরজীববাবুর দেহটা কঁপে উঠলো, তারপর একবারে স্থির। ভাড়াভাড়ি তার দেহটা চেয়ারে বলিয়ে দিয়ে এমনভাবে টেবিলের উপর হেলিয়ে রাখা হ’ল যে, দেখলে যেন মনে হয় তিনি ঘুমোচ্ছেন। কাজটা শেষ করতে অতি অল্প সময়ই লেগেছিল। খড়িটা ঠিক বারোটায় ঘরে বন্ধ করে’ দিয়ে

ছিহাম বাইরে বেরিয়ে আসে। হলঘরে নেপালের সঙ্গে কারা কথা কইছে শুনে সে দিড়ির ধারে একটা কমলার ঘরে লুকিয়ে থাকে। আদল ইন্স্পেক্টরকে বাগানের মধ্যে ধরে’ তাঁর পোষাক খুলে নেওয়ার মতলব নেপালের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। ‘টেকা’-দলের বর্তমান কর্তার নাম কি, দলের কেউ তা জানে না। তারা তাঁকে ‘মামাবাবু’ বলেই জানে। তাদের দলের বিনি ‘মা’—বর্তমান কর্তা তার ভাই।

রামাশীষকেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হ’ল। বিচারে সকলেই বোঝা লাভ্য হ’লো।

* *

দেহিন বিকালে মনীষা চা তৈরী কচ্ছে; অবিনাশ জলযোগে ব্যস্ত। হঠাৎ মনীষা বলে উঠলো—“জীলোকটা খুব সন্দরী—না ঠাকুরপো?”

অবিনাশ একটা রসগোল্লা চিবোতে চিবোতে বলে—“হ—খু-উ-ব! রং যেন মোজার চকের ক্ষীর।”

মনীষা হেসে বলে—“ঐ রকমের ‘ক্ষীর’ খানিকটা বাড়ীতে আনলে হয় না?”

অবিনাশ চকু বিস্ফারিত করে বলে—“মাপ কর, বউদি। ওতে লক্ষ্য ঝাল।”

আমি বলুম—“আবার দেখা হ’বে বলে’ গেছে।”

অবিনাশ আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে বলে—“শুনে খুব উজ্জ্বলিত হলুম না।”

আমি বলুম—“হুর্ভাগ্য।”

অবিনাশ কিছু না বলে’ রাবড়ীর পেরালায় চুপ্ দিলে মনীষা হো—হো করে’ হেসে উঠলো।

—শেষ—

কানীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

পাত্র-পাত্রী

কানীশ্বর—বড়লোক। দিলীপ—বড় ছেলে। দ্বিজেন—ছোট ছেলে। অজয়, রহমৎ—দিলীপ-দ্বিজেনের বন্ধুস্বরূপ। যোগদ্বারা—কানীশ্বরের স্ত্রী। মনীষা—ছোট মেয়ে। সুনীলা—কানীশ্বরের বন্ধুর মেয়ে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ডুইং রুম

কানীশ্বর ও যোগদ্বারা

কানীশ্বর—সুনীলার সঙ্গে দিলীপের বিয়ে হবেনা, ওদের বলে দিও।

যোগ—বলে ওদের কাউকে দিতে হবেনা, কারণ, এ বিয়ের জন্ত ওদের কারুর মাথাব্যথা নেই।

কানীশ্বর—তা যদি নেই, তবে তোমার এতোখানি সুপারিশের কারণ কি?

যোগ—আমি মনে করি এ বিয়ে হ'লে ওরা সুখীই হবে।

কানীশ্বর—তোমার মনে করবার কোন খুলা নেই। ওরা নিজেরা যদি মনে ক'রতো তা হ'লেও বা কথা ছিল।

যোগ—তা হলেই কি তুমি এ বিবাহে সম্মতি দিতে?

কানীশ্বর—তা ঠিক, তা হ'লেও সম্মতি দিতাম না। কিন্তু—কিন্তু দিলীপের উপর আমার যা প্রভা আছে তাও এক নিষেধে বিনিময় হ'য়ে যেত।

যোগ—কারণ?

কানীশ্বর—কারণ, দিলীপ তখন বাংলা-দেশের অতি লাভারূপ যুবকের পর্যায় নেবে

আসতো। নিখিলভারত থেকে যে সম্মান দেখিয়েছে আমি তখন বলতুম ও সে সম্মান পাবার যোগ্য নয়।

যোগ—তোমার মতে তাহ'লে যারা সম্মানিত লোক তারা বিয়ে করবেনা? সংসারে এতো যে লোক বিয়ে করছে—

কানীশ্বর—সংসারের লোকের কথা ছেড়ে দাও। দিলীপ যে ব্রত নিয়েছে তাতে তার বিয়ে করা চলেনা। হুদিন বাঘে ও হবে Indian National Congress এর President, সমস্ত ভারতবর্ষ ওর গতিবিধির উপর অপেক্ষা নৃষ্টি দিয়ে রেখেছে। জাতির ও একটা গৌরবের পরিচয়! ও চ্যাংড়ার মতো হ'ল'বে সুতো হাতে বেঁধে, মুখে একরাশ চন্দনের ফুটকি কেটে বরের আসনে বলে গেছে—এ আমার ভাবতেও কষ্ট হয়। হিঃ! ...

যোগ—কিন্তু একে যদি চ্যাংড়াই বলে, তুমিই বা বিয়ে কর্তে গেছলে কেন? তোমার নিজের বেলায় তো কোন অজুহাত হাজির কর্তে পারনি?

কানীশ্বর—আমি যে খাতুর লোক, আমার ছেলে ঠিক সেই খাতুর লোক নয় যোগদ্বারা! কিন্তু, যাক্ সে কথা। যা হবার নয় তার আলোচনা নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাইনা। সংসারে অজ্ঞ কোন কথা থাকে তো বলো।

যোগ—তাহ'লে সুনীলাকে ব'লে দিও আমাদের বাড়ীতে যেন আর না আসে।

কানীশ্বর—তা আমি কি করে বলতে পারি? তুমি বরং তাকে পরামর্শ দিও লোকের বাড়ী ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে বাড়ী বসে পড়াশোনা করা চের ভালো।

যোগ—পড়াশোনা তার অনেককাল শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া সে আমাদের বাড়ী আসে বেড়াতে নয়—সে আসে, বেশির কাজে দিলীপের সহকারিতা করবার জন্ত। দিলীপও তাকে ডাকে।

কানীশ্বর—দিলীপ যদি তাকে ডাকে আমি অবশ্য তাকে কেরাতে চাইনা, কিন্তু তার মাকি মেয়ের চলাফেরার উপর থেকে লাগাম একেবারে ছেড়ে দিয়েছে?

যোগ—লাগাম!

কানীশ্বর—হ্যা! লাগাম।

যোগ—তার যা কোন কালেই মেয়ের চলাফেরার উপর লাগাম দিবে রাখেনি, এখনও রাখেনা। উনি বলেন মেয়েকে আমি বৎপরনাস্তি স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছি এবং এই কারণেই মেয়েও এখনও স্বাধীনতার অপব্যবহার করেনি—বা কর্তে বলেও আশা করিনা। তা সে যাক্। বেশতো, সুনীলার আসা যদি তুমি পছন্দ না করো আমিই না হয় বলে দোবো। এতো হাদ্যমারই বা কি দরকার। (প্রস্থানোক্ত)

কানীশ্বর—না তুমি ব'লে দিও না।

যোগ—তার মানে?

কানীশ্বর—তার মানে সুনীলা যেমন আসে তেমন আদবে।

যোগ—ওদের সবকিছু তোমার যা মত তা জানিয়ে দিয়েও, তুমি কি করে ওকে আদতে বল?

কানীশ্বর—আমি আদতে নিমন্ত্রণ করিনা। কিন্তু ও আসে যদি, আমি বাধা দোবনা, কারণ দিলীপ ওকে চায়।

যোগ—দিলীপ চাইলেও দিলীপ ওকে পাবেনা।

কান্দি—রাগ করোনা, রাগের কথা নয়।
—তুমি ভাবছো, দিলীপ থাকে বিবাহ কর্তে
পারবেনা তাকে দিলীপ চাইবেনা ?

যোগ—হ্যাঁ—তাই ভাবছি।

কান্দি—তার মানে জী পুরুষের যে
অনিষ্টতার অন্তরালে বিবাহরূপ Safeguard
জেকে বলে নেই সেটা নিরাপদ নাও হতে
পারে—এই না তোমার লার কথা যা তুমি
বলতে চাও ?

যোগ—আমি কিছু বলতে চাইনা।
তোমার যা হচ্ছে হবে তাই তুমি করো।
(প্রস্থান)

(কান্দির মিনিটখানেক কিলের এক
চিন্তার আকৃষ্ট হইলেন দেখা গেল, কিন্তু সে
ভাব তিনি মজোর দূরে ঠেলিয়া দিয়া যেন
হাঁক ছাড়িয়া দাঁড়িলেন।

(প্রবেশ করিল বেহারী)

বেহারী—Tea sir ?

কান্দি—ওঃ, তুই আমার চা' খাইয়েই
মারবি !

বেহারী—No sir.

কান্দি—আচ্ছা নিয়ে আয়। ওরে
শোন, বড়োবাবুকে একবার ডেকে দাও।

বেহারী—Sorry sir, তিনিতো কাল
রাতির থেকে বাড়ী নেই। সকালে কিরবেন
ব'লে গেছেন।

কান্দি—কোথায় গেছেন ?

বেহারী—আজ্ঞে তিনি গেছেন আলন্-
মোটের কুণী Strike মেটাবার জন্য।

কান্দি—Strike ! সেখানে যে গুলি
চলছে শুনেছিলাম।—একলা গেছেন নাকি ?

বেহারী—No sir.

কান্দি—তবে ?

বেহারী—নীলারি' সঙ্গে আছেন।

কান্দি—হ; আচ্ছা তবে ছোট বাবুকে
একবার ডেকে দিবে যা।

বেহারী—Sorry sir, তাঁর দরজা
এখনও বন্ধ, খুলছেন।

কান্দি—তুলে দে, দরজা ভেঙ্গে গারে
জল ঢেলে দে। ৯টা পর্যন্ত ঘুমানো
চলবেনা। শীগ্গীর যা।

(বেহারীর প্রস্থান)

(যোগমারীর প্রবেশ)

আবার কি খবর ?

যোগ—একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্তে
এলুম।

কান্দি—বলো—

যোগ—তুমি জিজ্ঞাসা করিলে জী-পুরুষের
অনিষ্টতার অন্তরালে বিবাহ বস্তুটা না-থাকাকে
আমি নিরাপদ বলে মনে করি কিনা।
আচ্ছা আমি যদি বলি, না, আমি ও
অবস্থাটাকে নিরাপদ বলে মনে করিনা, তুমি
কি বলবে ?

কান্দি—আমি হাসতে হাসতে বলবো
যে দিলীপ সম্পর্কে তোমার এ আশঙ্কা
অনুলক। পুরুষ বলতে সাধারণতঃ যা
বোঝার ও তার উপরে। একটা কেন,
অমন যদি দশটা জীলোকের সঙ্গেও বিশেষ
অনিষ্টভাবে দিলীপ ঘুরে বেড়ায় আমি
বিচলিত হবনা, বা, তাদের একটিকে ঘরে
ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত
হয়ে উঠবো না।

যোগমারী—দিলীপকে তুমি এতো বড়ো
ভাবো ?

কান্দি—দিলীপকে এর চেয়ে ছোট ভাবা
অসম্ভব। আমি চেষ্টা করেছিলাম ওকে
অতি সাধারণ বলে ভাবতে, ওকে ছীন বলে
প্রতিপন্ন করতে, কিন্তু ও সবলে ওর নিজের
শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল ক'রে বলে আছে।
সেখান থেকে ওকে কেউ নাশাতে পারবেনা
যোগমারী !

যোগমারী—বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা,
আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি রাগ
করেনাতো ?

কান্দি—না।

(কিন্তু কথাটা বলিতে গিয়া যোগমারীর
আটকাইয়াছে, 'বলি বলি' করিয়াও যেন
বাহির হইতে চাহেনা)

কান্দি—বলো, কি কথা ?

যোগমারী—তুমি কি তবে স্ত্রীলোকে
সন্দেহ করো ? মানে, তাকে ভাল মেয়ে
মনে করনা ?

কান্দি—পরের মেয়ে, বন্ধুর মেয়ে—আমি
তাকে ভালো ছাড়া আর কি মনে করতে
পারি ! তবে—থাক্গে সে সব কথা।

(বলিয়াই কান্দির পাথরের মতো শুক হইয়া
গেলেন)

যোগমারী—বলোনা কি কথা ?

কান্দি—না, না, সে থাক্—সে কিছু নয়।

যোগমারী—আমার মাথা খাও যদি না
বলো ?

কান্দি—কি শুন্তে চাচ্ছ ?

যোগমারী—ঐ যে স্ত্রীলোকের বিষয়, যা
তুমি বলতে গিয়ে থেমে গেলে ?

কান্দি—ও স্ত্রীলোকের বিষয় নয়, কারণ,
তার লব্ধকে আমি কিছুই জানিনা। সে
ভালোও হতে পারে, সে মন্দও হতে পারে।

যোগ—তবে তুমি কি ব'লতে গিয়ে
ধামলে ?

কান্দি—আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলুম যে
স্ত্রীলোকে দেখে আমার মনে পড়ে তোমার
কুমারী জীবনের কথা।

যোগ—আমার কুমারী জীবন ! আমার
আইবুড়ো বয়েলের কথা ! আমার যখন ও
বয়স, তখন তুমি আমার দেখতে যেতে নাকি ?
(হালিরা ফেলিলেন)

কান্দি—তা যেহেতু না, কিন্তু তুমি আমার
সমস্ত গল্প করে বলেছ। ঠিক ঐ বয়সে
তোমার উপর একদিন যে ঝড় বয়ে
গিরেছিল, যে অসতর্ক বৃহত্তে তোমার কুমারী-
জীবনে—

যোগ—থাক্, আমি বুঝতে পেরেছি।

কাশী—তুমি কষ্ট পাও বলে আমি বলতে চাইনি, তুমিই আমার বলতে বাধ্য করলে।

যোগ—মনের মধ্যে যে জিনিষ রাত্রিদিন ভোলপাড় করে তা বলে কেলোই ভালো। ভালোই করেছ, খুব ভালো।

কাশী—মনের মধ্যে রাত্রিদিন ভোলপাড় করে। আজ এই ত্রিশ বৎসর পরে তুমি একথা বলতে পারলে!

(কিন্তু যোগমায়া সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেল; বোঝা গেল যে তিনি বিশেষ রূপে অপমানিত হইয়াছেন।)

কাশীশ্বর স্বরূপ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কাজটা ভালো হইল কিনা। চায়ের দ্রব্য লইয়া প্রবেশ করিল বেয়ারা।

বেয়ারা—Tea sir. Hot tea.

(কাশীশ্বর চিন্তিত, স্তব্ধ হইল।)

তৈরী করে দোব? নইলে সেই লিকারটা deep হয়ে যাবে, চালবে Sir?

কাশী—চা' আর এতোবেলায় খাবোনা। ও তুই নিয়ে যা।—

বেয়ারা—এই যে বললেন?

কাশী—মত বদলে ফেলেছি। তুই তো জানিস আমার মত কতো শীগ্গীর বদলায়।

বেয়ারা—কিন্তু—আপনিই বলেন যে, ভালো জিনিষ থেকে আপনার মত কখনো বদলায় না?

কাশী—আমি বলি একথা?

বেয়ারা—Yes sir.

কাশী—তা হলে অবশ্য ওটা খেতেই হবে। রাখো।

কাশী—কিন্তু ছোটবাবুকে যে আমি ডেকেছিলাম বলে মনে হচ্ছে?

বেয়ারা—তিনি এখুনি আসছেন।
Brushing his teeth.

কাশী—Brushing his teeth! বাপু! তুই তো থেকে থেকে অনেক ইংরাজী কথা শিখে ফেলছি বেথু!—

বেয়ারা—No sir.

কাশী—পেলিটি কিংবা ফিপোতে ব্রিচ, চাকরী খঁজচিস?

বেয়ারা—কে বললেন আপনাকে?
(একেবারে অবাক হইয়া গেল)

কাশী—আমার মনে হচ্ছে। নইলে এ বাড়ী বেয়ারাগিরি কর্তে তো ইংরাজির স্বরকার হয়না, হবেওনা। সত্যি ব্যাপারটা কি বল দিকিন?

বেয়ারা—ও কিছু নয় বাবু। আমি শুনে শুনে ছ'একটা কথা শিখে ফেলেছি—ও কিছু নয়।

কাশী—তা হ'লে তোমার এই চা' রইলো, ও নিয়ে যাও। ও আর আমি খাচ্চিনা।

(কাশীশ্বর গম্ভীর হইলেন এবং তাহা দেখিয়া বেয়ারা বেচারী সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইল।)

বেয়ারা—আজ্ঞে না বাবু আপনি চা'টা খান—আমি বলি না হয় সত্যি কথা—

কাশী—বলো শুনি।

(এই বলিয়া কাশীশ্বর কাপে চা ঢালিতে লাগিলেন।)

বেয়ারা—বড়োবাবুর ভাতী ইচ্ছে যে আমি ইংরাজি শিখি।

কাশী—অর্থাৎ দ্বিগুণবাবুর?

বেয়ারা—Yes sir.


কাশী—কেন সে তোকে কি ম্যাজিষ্ট্রেট করে দেবে?

বেয়ারা—Yes sir.

কাশীশ্বর এই কথা শুনিয়া প্রচণ্ড হালিতে স্বর ফাটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

বেয়ারা—No sir. সত্যি তিনি দেবেন। তিনি বলেন ওরে হতভাগা, ছোট স্বরে জন্মেছিল বলে কি চিরটাকাল তুই লোকের গোলামী কর্তে থাকবি। তুই লেখা পড়া শেখ—আমি চাই তুই ইংরাজি শিখবি, সব কিছু শিখবি। আমি তোকে মত্ত

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার



গোষ্ঠী অমৃত লাল কুমার

কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁতী সরিষার তৈল

ভারত প্রায়ের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আগার সারকুলার রোড, কলিঃ

লোক করে ছোব। বড়োবাহুতো মিথ্যা
কথা বলেন না বাবু?

কাশীশ্বর—চ, আচ্ছা তুই যা। ছোট-
বাহুকে শীগগীর করে আসতে বলগে।

(বেয়ারার প্রস্থান)

তুচ্ছ হইয়া কাশীশ্বর চাটুকু শেষ
করিলেন—

প্রবেশ করিল দ্বিজেন—

দ্বিজেন—বাবা আমার ডাকছিলে?

কাশী—হ্যাঁ, বসো—

(দ্বিজেন একখানা চেয়ারে বসিয়া কাশীশ্বরের
মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কারণ,
বক্তব্যটুকু বলিতে গিয়া তাঁহার মুখখানি
অথবা গন্তীর হইয়া উঠিয়াছে)

আমি বলছিলাম দ্বিজেন—ভালো কথা,
দিলীপ কোথায় গেছে তুমি বোধহয় জানো?

দ্বিজেন—জানি। দাদা আসানশোল
গেছে, কুলী strike মেটাবার জন্তে। লড়ে
গেছে সুনীলা।

কাশীশ্বর—কতবড়ো ব্যাপার তা বোধ
হয় বুঝতে পেরেছ?

দ্বিজেন—নিশ্চই লেখানে গুলি চলছে।
এ পর্যন্ত ১১৩ জন কুলী এবং ৩৩ জন কর্মী
হত বা আহত।

কাশীশ্বর—কালকের Statesman,
Amrita Bazar Patrika বোধ হয়
দিলীপের ছবিও বার করবে?

দ্বিজেন—সে আর নতুন কি। তার
ছবি কতো বেরিয়েছে।

কাশীশ্বর—কিন্তু তোমার ছবি একবারও
বেকলনা, ছবি ঘুরের কথা, কখন কেউ ভুলেও
বোধ হয় তোমার নাখোলেখ করে না।

দ্বিজেন—তার কারণ আমি অতি
সাধারণ, দ্বাদ্যর মত অসাধারণ নই।

কাশী—তা যে নও সে আমি জানি।
সে কথা আমি বলছিলাম, আমি বলছি তুমি
তোমার দ্বাদ্যর মতো হ'তে পারনা?

দ্বিজেন—না, অসম্ভব।

কাশী—কেন অসম্ভব? দেও মাহুদ,
তুমিও মাহুদ?

দ্বিজেন—সবাই কি ইচ্ছা করলেই সমস্ত
কমতা অর্জন কোরতে পারে? আমি কি
ইচ্ছা করলেই একটা রানবিহারী ঘোষ হ'য়ে
যেতে পারি?

কাশীশ্বর—পারেনা যে, তা আমি অত্যন্ত
দুঃখের সঙ্গেই অবগত আছি। তুমি পার
তবু ঘুমুতে আর দাদ্যর খোশামদীগিরি কর্তে।
আচ্ছা, তুমি যেতে পার।

(দ্বিজেন একুনি খাইয়া অল্পখন তুচ্ছ
রহিল পরে পুনরায় কথা বলিতে লাগিল)

দ্বিজেন—আচ্ছা আজ এ সমস্ত কথা
আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছ বলবে?

কাশী—গন্তীর ভাবে উত্তর করিলেন—‘না’
দ্বিজেন—কিন্তু আমি জানি কেন তুমি
আমায় এসব জিজ্ঞাসা করছ।

কাশী—কি রকম?

দ্বিজেন—তুমি আমার দাদ্যর বিরুদ্ধে
উত্তেজিত করতে চাও।

কাশী—বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন
‘আমি’!

দ্বিজেন—হ্যাঁ তুমি। তবু আজ নয়,
আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, অনেকদিন থেকেই
তুমি আমার এমন সব কথা বলে আসছো
যার ফলে আমি ইচ্ছা করলেই তার একটা
ভীষণ শত্রু হ'য়ে দাঁড়াতে পারি।

কাশী—শেষের লাইনটা বলতে পারলিনি
ঠিক করে।

দ্বিজেন—কেন?

কাশী—উত্তেজিত যদি তোকে আমি
করে থাকি—যদিও করেছি কিনা তা আমি
নিজেই জানিনা—তা হলে দিলীপ কুমারের
শত্রু করবার জন্ত তোমায় উত্তেজিত করিনি;
করেছি হয়তো, তোমাকে তার প্রতিভার
প্রতিদ্বন্দী করে তোলাবার জন্ত।

চিরসার্থী

ত্রিশিষপদ চক্রবর্তী

ও অজানা বন্ধুরে আমার

আধার রাতের সাথী।

আলোর লাগী রয়না লাগে,

এলে নিবিড় রাত্তি।

আধার যবে আসে, নেমে

আমার চলার পথে।

জালিয়ে আসো তুমিরে বন্ধু—

প্রেমের বাতি, লাগে।

সেই আধারের স্তনাও মোরে,

তোমার প্রেমের গীতি,

পুলক তখন, জাগে পরাগে

আনন্দে মন, মাতি।

তোমার সুরে সুর মিলায়ে

গাইতে প্রাণ চায়,

তোরেই, লাগে পেলে বন্ধু

(আমার) স্বপন ভেঙ্গে যায়।

তাই তোরে মোর মন লপেছি

ওরে চির লাগি!

আলোর লাগী রয় না লাগে,

এলে আধার রাত্তি ॥

—*

দ্বিজেন—তাই যদি হয়, তা হ'লে
সংসারে আমার যে সব advantage দাঁও
তাকে তা দাঁও না কেন?

কাশী—কারণ, সে advantage নেবার
প্রত্যাশাই করে না এবং তুমি ও জিনিষটি
না পেলে এগোতেই পার না।

দ্বিজেন—আচ্ছা স্বীকার করলাম তোমার
কথা। কিন্তু উইল করে সমস্ত সম্পত্তি থেকে
তাকে বঞ্চিত করে আমার নামে বিষয় লিখে
দেওয়াটাও কি মাত্র তবু আমার advantage
দেবার জন্তে বাবা?

কাশী—উইল! কে বললে এ কথা?

দ্বিজেন—আমি জানি।

কাশী—এতো বড়ো নিলজ্জ মিথ্যা কথা কে বলতে সাহস করে আমি শুনতে চাই?

(যোগমায়ার প্রবেশ)

যোগমায়া—দ্বিজেন!

দ্বিজেন—কি মা?

যোগমায়া—এ সব আলোচনা কি বন্ধ থাকতে পারে না?

দ্বিজেন—তুমি বললেই পারে মা।

যোগমায়া—তাহলে আমি বলি এ সব এখন থাক।

দ্বিজেন—কিন্তু, তুমি আমি নিজেই এ সংসার নয়,—সবাই যখন এই আলোচনা কর্তে থাকবে তখন তুমি তাদের কি দিয়ে মুখ বন্ধ কর্তে বলতো?

যোগমায়া—সবাই যখন সে আলোচনা কর্তে থাকবে, বিষয়ের মালিক যে, সেই তখন তার সমাধান কর্তে। তুমি আমি তো সে কাজ পারবো না! (এই বলিয়া কাশীশ্বরের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন)

কাশী—ঠিক তাই; এবং তারা তখনই জাস্তে পারবে যে কাশীশ্বর বহু মহাশয় যে রাজ করেন তাতে কখনও অবিবেচনার চাপা থাকে না।

দ্বিজেন—বেশ, তবে তাই—(প্রস্থান)

বৃহৎকাল শুরু থাকিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—তুমি একে বিবেচনা বলো?

কাশী—কি সম্পর্কে এই প্রশ্নতা হচ্ছে সেটা আগে শোনা উচিত।

যোগমায়া—উইল, উইল গো!...বুঝতে পেরেছ বোধ হয়?

কাশী—হ্যাঁ—বুঝলাম। তুমি কি একেবারে ঠিক ধরে নিরেছ যে, দ্বিজেনের অন্তরান একেবারে অপ্রান্ত সত্য?

যোগমায়া—অন্তরান হলে আমি বিশ্বাস

করিতাম না, কিন্তু, আজ তুমি সব পার বলে আমার মনে হয়। তাই আজ তোমার নিজের মুখ থেকে শুভে চাই—বলো এ একেবারে নিলজ্জ মিথ্যা কথা?

কাশীশ্বর কলকাল শুরু থাকিয়া তৃত্যেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

—এই পরেশ উকিলটাকে এখানে ডেকে দেও।

যোগমায়া—আমি এখানে যতক্ষণ আছি, পরেশ উকিল যেন না আসে; এই, কে ওখানে আছিল, শুনে রাখ।

কাশী—চাকরেরা তোমার কথা শুনবে, না, আমার কথা শুনবে?

যোগমায়া—তোমার কথাই শুনবে; কিন্তু আমি যাতে অপদস্থ হই এমন কথাও আমি ওদের শুনতে দোবনা!

কাশী—পরেশ উকিল এখানে এলে তুমি অপদস্থ হচ্ছ কেনম করে?

যোগমায়া—তুমি তাকে ডাকছো জবাব দিহি কর্তে কি করে তোমার এই অতি গোপনীয় উইলের খবরটি প্রকাশ হয়ে গেছে, যা তোমার স্ত্রী জানেনা, ছেলে জানেনা। তুমি কি ভাবো, দিলীপের মা হয়ে, দ্বিজেনের মা হয়ে, এ আমার হবে খুব গৌরবের জিনিষ তার সামনে দাঁড়িয়ে এই অপরাধের কৈফিয়ৎ শোনা?

নেপথ্যে ভৃত্য—বাবু, পরেশবাবু এসেছেন। ভিতরে যাবেন কি?

কাশী—ওকে এখন যেতে বলে দে, আমি পরে বলে পাঠাবো।

অলক্ষণ শুরু থাকিয়া বলিলেন:

—যাক, পরেশ চ'লে গেল। হ্যাঁ—তুমি কি বলছিলে এইবার বলো।

যোগমায়া—উইল তা হলে সত্য?

কাশী—যদি বলি সত্য?

যোগমায়া—আমি সে উইল নাকচ কর্তে বলবো।

কাশী—কি বিবেচনার বলে তুমি আমার দে কাজ কর্তে বলবে?

যোগমায়া—সে কি তোমার ছেলে নয়?

কাশী—আমি এই প্রশ্নের জবাব দিলে তোমার মনে আজ এই জিহ্ন বৎসর পরে আমার নূতন করে আঘাত লাগবেনা?

যোগমায়ার মুখ লহনা ক্যাকাশে হয়ে গেল। কোন কথাই তিনি আর বলতে পারলেন না: কাশীশ্বরের প্রতি অপলক দৃষ্টি দিয়ে মাএ যে ছুটি মর্মান্তিক কথা বেরিয়ে এল তাহা—ও! তাই বটে!

ডাঙরের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ওষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ওষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

অল্পকণ শুদ্ধ থাকিয়া কালীশ্বর প্রস্থানোত্ত
হইল যোগমায়ী 'আকুল স্বরে' কাঁদিয়া
উঠিয়া বলিল: হ্যা—তুমি ঠিক বলেছ।
দ্বিলীপ তোমার ছেলে নয়। কিন্তু তাকে
জাসিয়ে যদি হবে, তাকে বাঁচতে দিলে
কেন? পুণিবার আলো দেখবার সঙ্গে
সঙ্গে—তাকে মেরে ফেললে না কেন?
সমস্ত আপদ চুকে যেত।

কালীশ্বর—তা যেত, কিন্তু হত্যা আমার
ব্যবসা নয়। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি,
তাকে লালন-পালন করেছি, শিক্ষায় স্বীকার
জগতের সামনে রাখা উঁচু করে দাঁড়াবার
সুযোগ দিয়েছি। এর বেশী যদি আমি
না দিতে পারি, আশা করি আমার খুব
অপরাধ হবে না। (প্রস্থান)

যোগমায়ী লজল চোখে কণকাল শুদ্ধ
হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপথ্য হঠাতে
সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনি শোনা গেল:
'দ্বিলীপ কুমার কি জয়'! বন্দেমাতরম্!
—প্রবেশ করিল দ্বিলীপ)

দ্বিলীপ—মা!

যোগমায়ী—দ্বিলীপ! ওরে, ঐ জয়ধ্বনি
ধামতে বল। ও থাকবে না,—ও চুরি—
ও কলঙ্কিত। ধামতে বল। (প্রস্থান)

দ্বিলীপ যোগমায়ীর আচরণে বিস্মিত ও
শুদ্ধ। ডাকিল—“দ্বিজেন”!

(প্রবেশ করিল দ্বিজেন)

দ্বিলীপ—দ্বিজু, মায়ের কি হয়েছে জান?

দ্বিজেন—আমিও তোমায় এই প্রশ্ন
করব তাবডিলাম।

দ্বিলীপ—মায়ের চোখে দেখলাম জল—
মা কখনও দেখিনি। ওরা জয়ধ্বনি করলে
মা বলে গেল ও থাকবে না, ও চুরি, ও
কলঙ্কিত। ধামতে বল। মায়ের মুখ দিয়ে
আজ একথা কেন বেরুল দ্বিজেন?

দ্বিজেন—আমি তো কিছু বুঝতে
পারিতেছি না।

নারীর অশ্রু

নারীর দুঃখ, নারীর বেদনা, নারীর
চোখের জল—সমাজ কতক্ষণ উপেক্ষা কোরতে
পারে?

ধনীর দুলাল—প্রিয়লাল। সুবর্ণন ও
কৃতবিদ্য। স্ত্রীকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো।
স্ত্রী—সন্ধ্যা, স্বামীর অমুরাগিণী, স্বামী
লোহাগিনী। দেহ-মনে পরিপূর্ণ যুবতী সে
নারী; অপকণ সুন্দরী।

সুখে ও শান্তিতে তাদের জীবন চলে।
এমন দিনে সন্ধ্যার জীবনে অতর্কিতে ঘনিয়ে
এলো বিবাদের মেঘ।

এ এমন একটি দ্রব্ধটনা, যা যে কোন
নারীর জীবনে ঘটতে পারে। কিন্তু সমাজের
দৃষ্টিতে এটা গণ্য হোল—মহা অপরাধ
বোলে।

হৃদয়হীন নির্ধর সমাজ তাকে বিচার
কোরলে না—দিলে দণ্ড!

জীবনের সেই চরম পরীকার দিনে,
বিচার প্রার্থী হোয়ে সে অভাগিনী নারী
শরণ নিলে তার স্বামীর।

কিন্তু হারবে অদৃষ্ট! পিতার প্রতি অন্ধ
ভক্তি, তার কর্তব্য বোধকে জাগ্রত কোরতে
পারলে না।

স্ত্রী ভেঙ্গে গেল—জীবনের পথে শ্রোতের
কলের মত। স্বামীর কাছেও সে সুরিচার
পেল না।

দ্বিলীপ—আমিও না।

(দ্বিলীপ ভাবিতে লাগিল এবং পরে
বলিল) মাকে আমি জিজ্ঞাসা করি।
এর কারণ আমি জানতে চাই।

(প্রস্থান)
(ক্রমশঃ)

তারপর, সন্ধ্যার জীবন-নাট্যে যে অন্ধের
সুচনা হোল, বোধ করি অনেকের দৃষ্টিতেই
তা' ভয়াবহ বোলে বোধ হ'বে।

নিতান্ত দৈবপ্রেরিত হোয়ে, সন্ধ্যার
জীবনে এলো প্রমথ। সে তাকে দিলে
আশ্রয়। আর সেই সঙ্গে দিলে সন্ধ্যাকে
পরিচিত হবার সুযোগ—তার স্ত্রী বোলে!

কিন্তু সন্ধ্যার জীবনদেবতা তা'তে কী
সায় দিয়েছিল?

না। সন্ধ্যার জীবনে সে অধঃপতন
ঘটেনি। প্রমথের আশ্রয়ে এসে, সে পরিচয়ের
মানি তাকে হুর্দীনহ বৈদ্যনার সঙ্গে লজ্জ
কোরতে হয়েছিল সত্য—কিন্তু সে কতদিনের
জগত?

অস্তরের অবিচলিত নির্ভায় সে তার
নারীত্বের মর্যাদাকে কেমন কোরে শেষ
পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিল, ‘অভিজ্ঞান’-চিত্রে
তারই পরিণতি আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে।

চবিখানি সম্প্রতি নিউ থিয়েটার
তুলেছেন এবং শীঘ্রই ‘রূপবানী’তে আত্মপ্রকাশ
কোরবে।

বাঙলা ছায়-চিত্রের দ্বারা শ্রেষ্ঠ শিল্পী,
অভিজ্ঞান-এর বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁদেরই
দেখা পাবেন।

মলিনা ও মেনকা—এদের দু'জনকে
আপনারা নিশ্চয়ই ভোলেন নি। প্রধান
দুটি নারী চরিত্র—‘সন্ধ্যা’ ও ‘নাজমা’ রূপে,
এরা আপনাদের অভিবাধন কোরবেন।
এ ছাড়া প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলিতে দেখা
দেবেন জীবন গল্পোপাখ্যান, শৈলেন চৌধুরী,
পঙ্কজ মল্লিক, তাম্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়-
গোপালী, অহি লম্বা, বোকেন চট্টোপাধ্যায়
।।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

(সোমেশ্বর)

বিগত ১৬ই এপ্রিল শনিবার পৌনে সাতটায় সময় সম্মেলনের সাক্ষ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে দুইজন প্রতিযোগীর গান হইয়া যাইবার পর শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস কীৰ্ত্তনের demonstration আরম্ভ করেন। বড়ই চুৎপের বিষয় যে সাধারণ শ্রোতৃবর্গ দাস মহাশয়ের স্তায় শুণী কীৰ্ত্তনীয়ার গানের বৈশিষ্ট্য না বুঝিতে পারিয়া একটা অস্ব-ভাবিক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহার জন্ত তাঁহাকে গান প্রায় অঙ্গুলমাস্ত রাখিয়াই অঙ্গলময়ের মধ্যেই উঠিয়া পড়িতে হয়। বর্তমানে কলিকাতায় যে সকল কীৰ্ত্তনীয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় রাধারমণ দাস মহাশয় যে অগ্রণী তাহা কীৰ্ত্তন রসরসিক সামাজিক বোদ্ধা যাজেই জানেন। গত বৎসর এই Conference-এ তাঁহার কীৰ্ত্তন শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু এ বৎসর তাঁহার গানের

আশাকরি প্রফুল্ল রায়ের পারচালনাধীনে তোলা এই ছবিখান আপনাদের সকলকেই তৃপ্ত হিতে পারবে। গানের দিক থেকেও আপনারা নিরাশ হবেন না। বর্তমান বাঙলার জনপ্রিয় গীতকার অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য এর গানগুলি লিখেছেন এবং তাতে সুর দিয়াছেন—বিখ্যাত সুর-শিল্পী রাই বড়াল।

আলোক-চিত্র ও শব্দানুলেখনের কাজ-গুলিতেও আশাকরি বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী খিল রায় ও বাণীধন্তের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সময় সমাগত শ্রোতৃবর্গের ঐক্য অসঙ্গত অজ্ঞানতাগ্রস্ত অলম্ব্যের ভাব দেখিয়া আমরা অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি। দাস মহাশয়ের কীৰ্ত্তনের পর প্রতিযোগীগণের অজ্ঞতমা কুমারী শান্তিলতা সরৎ শর্মা নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। শুণজনের demonstration-এর মধ্যে প্রতিযোগীগণের নৃত্যগীতাবির ব্যবস্থা করা মোটেই শোভন দেখায় না Programme Director মহাশয়ও এদিন সকালেই জানাইয়াছিলেন যে, যদি কোনও প্রতিযোগী যথা সময়ে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রদর্শন বাতিল করা হইবে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্যাবিত হইলাম যে, তিনি শেধিনই লক্ষ্যায় তাঁহার নিজের নির্দেশ ভাঙ্গিয়া কীৰ্ত্তনের demonstration-এর পর একজন প্রতিযোগীর নৃত্যের ব্যবস্থা করিলেন—আইন ধিনি করেন তিনি নিশ্চই আইন ভাঙিতে পারেন। তবে Director মহাশয় সকল বিষয়েই তাঁহার এইরূপ স্বাতন্ত্র্যক্ষার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন কি? বাহা হউক, নৃত্যের পর গায়ার বিখ্যাত গায়ক প্রোঃ হুমায়ুন-প্রসাদের পৌত্র মাষ্টার গোপাল দিৎ প্রথমে harmonium-এ ধানী রাগের গৎ বাজাইয়া পরে কামোদ রাগের একখানি খেরাল (জিতালীতে) গান করেন। শ্রীমানের গানের পর স্বর্গত শুণিপ্রবর অধোর চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথজী মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ফ্রপছ গান আরম্ভ হয়। অমরবাবু যখন daiz-এর উপরে আলিয়া বলিলেন তখন তাঁহার গানের লহিত লজ্জত করিবার জন্ত মুহুদ বা কোনও মুহুদীর ব্যবস্থা করা হয় নাই। অনেকক্ষণ

পরে মুহুদ আলিল বটে, কিন্তু মুহুদীর কোনও লক্ষ্যান পাওয়া গেল না। কিন্তু অমরবাবুর ইহাই চরম দুর্গতি নহে। মুহুদী আলিয়া শেষ পর্য্যন্ত জুটিল বটে, কিন্তু মুহুদকে সুরে বাধিবার জন্ত হাতুড়ি পাওয়া গেল না। এদিকে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া (এবং কতকটা লাল বাতির ভয়ে) মুহুদী তখন অন্তোপায় হইয়া তাঁহার হাতের লাঠির সাহায্যে মুহুদের সুর বাধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মঞ্চের উপরে স্বেচ্ছা-সেবকের অভাব ছিল না—কিন্তু একজন স্বেচ্ছাসেবকও একটা হাতুড়ি আনিবার আশ্রুকতা আছে মনে না করিয়া নিব্বিকারচিত্তে পাথোয়াজ বাধার গ্রহণন দেখিতে লাগিল। সম্মেলন-সভাপতি মঞ্চের উপরেই বলিয়াছিলেন—সাধারণ সম্পাদক auditorium-এর সমুদ্রের আলনে এ লমালীন—অজ্ঞাত কর্তৃপক্ষ অনেকেই সেদিন আগিয়াছিলেন—কিন্তু একটা হাতুড়ীর ব্যবস্থা হইল না। কর্তৃ-পক্ষগণের অহমিকা আছে যে তাঁহাদের এই Conference নাকি অতি উচ্চাঙ্গের এবং ইহার ব্যবস্থাপনা নাকি লক্ষ্যজ্ঞান্দর। এদিনের রাত্রিতে আমরা তাঁহাদের লক্ষ্যজ-সুন্দর ব্যবস্থার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাইয়াছি। বাহা হউক, অনেক বলসৎ করিয়াও মুহুদকে যখন কিছুতেই সুরে আনা গেল না, তখন অমরবাবু ফ্রপছের আলাপাই আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ প্রায় দশ মিনিট পরে একটা হাতুড়ির আবির্ভাব হইল বটে, কিন্তু সুর বাধিতে না বাধিতেই বোধহয় কোনও অদৃষ্ট প্রয়োজন সাধিবার জন্ত সে মূল্যবান বস্তুটিকে অন্তহিত হইতে হইল। অমরবাবু প্রথমে একটা কল্যাণ রাগের ফ্রপছ গাহিয়া পরে আর একটা চৌতাল আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময়ে পূর্ব্বরাত্রে গোপাল-বাবুর গানের সময় যেরূপ গ্রহণন লংঘ্যিত হইয়াছিল তাহারই পুনরাবৃত্তির নুতনা দেখা

গেল। নাটোরাদিপতি আলন ত্যাগ করিয়া dais-এর উপর অমরবাবুর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন এবং তাঁহাকে বসন্ত রাগের আরম্ভ গান বন্ধ করিয়া “মাধব মাধব” গানটি গাহিতে অনুরোধ করিলেন। সভাপতির আদেশ অমান্য করা কঠিন নহে বিবেচনা করিয়াই বোধ হয়, অমরবাবু আরম্ভ গানটি বন্ধ করিয়া সভাপতির নির্দেশানুযায়ী “মাধব মাধব” গানটি গাহিলেন। বলা বাহুল্য, যে অমরবাবুর গানের techniques ও style-এর সৌন্দর্য্য, রাগের শুদ্ধতা ও কণ্ঠের সতেজতার সম্বন্ধে আমরা অপূর্ণ আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

অমরবাবুর ঋণদগানের পর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ শাল মহাশয় চাঁদনী কেছারা রাগে একখানি বাংলা খেয়াল গান করেন। খেয়াল গানের পর কুমারী গীতা হাস ও কুমারী আরতি হাস তাঁহাদের চিরপুরাতন ঠুমরীখানি “বাঁলম তোরি” গাহিয়া শ্রোতৃ-বর্গের তৃপ্তিবিধান করিতে নিখল প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ঠুমরী গানের পর মঞ্চ ও পর্দার জনপ্রিয় অঙ্গগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয় পুরিয়া রাগে একটি চৌতাল ও আর একখানি খামার গান করেন। এতদিন পরে কৃষ্ণবাবু যে নৃত্যন করিয়া ঋণদ সঙ্গীদের চর্চা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ঋণদের পর নৃত্যের আলস বলিল। বাঁলস্তী বিভাবীধীর ছাত্রীগণ শকুন্তলা নৃত্য দেখাইলেন। নৃত্যের পর শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত যামিনী গাঙ্গুলী বাহার রাগের একখানি খেয়াল ও একটি ঠুমরী গান করেন। যামিনীবাবুর গান

গাহিবার সময় যে সকল সূত্রাদ্য প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অতি দৃষ্টকটু। খেয়াল গানটি গাহিবার সময় তিনি নিজ কর্ণরুদ্ধ দুইটি দুইহস্ত দ্বারা একুণ সজোরে চাপিয়া ধরিয়া গান করিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে হইতেছিল যে তানপুরা ও হারমোনিয়ামের সুর তাঁহার কর্ণদীড়া জন্মাইতেছিল। গায়ক-দ্বিগের অবশ্য সূত্রাদ্য যে থাকে না তাহা আমরা বলি না—কোনও কোনও গায়ক মস্তক সঞ্চালন অথবা হস্তভঙ্গীর দ্বারা নিজেদের অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যামিনীবাবু হই কণ চাপিয়া গাহিবার যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে একান্তভাবেই মৌলিক। যাহা হউক, যামিনীবাবু বাহার রাগের খেয়ালটি আরম্ভ করিয়া যে ভাবে তান প্রয়োগ করিতে-ছিলেন, তাহাতে গানটি অতিশয় এক্ষেত্রে হইয়া উঠিয়াছিল। বাহারে বক্র-প্রকৃতিতে সম্যকরূপে ফুটাইতে হইলে যেরূপ নিপুণতার লহিত তানের প্রয়োগ করিতে হয় তাহার কোনও পরিঃই আমরা যামিনীবাবুর লেখিন-কার গানে পাইলাম না। সরল তান করিয়া তিনি কখনও বা আড়ান কখনও বা বাগেশীর রূপ প্রকাশ করিতেছিলেন। উপরন্তু যামিনীবাবুর গানের গায়কীও স্মন্দর নয় বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে কোনও তৃপ্তি দিতে পারেন নাই। পূর্ববৎসরের তায় এবংসরেরও তিনি ঠুমরী গানটি যে ভাবে গাহিলেন, তাহাতে সাধারণের পক্ষে তাঁহার গানের উপর অপ্রীতি জন্মানই স্বাভাবিক। গিরিজাবাবুর মত শুণী লোকের শিষ্য বলিয়াই যে শ্রোতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা পাইবেন ইহা ত আর সম্ভব নহে। প্রকৃত শুণের পরিচয় না

পাইলে লামা জকগণ কেমন করিয়া গৌরব দিতে সক্ষম হইবেন? যামিনীবাবুর গানের পর প্রোঃ লফিউল্লাহ সাহেব সেতারে কোশ বাজাইলেন। সাত্রে কোশরাগ বলিয়া কিছু পাওয়া যায় না; তবে খাঁসাহেব কৌশিক বা কোদা বাজাইয়াছিলেন। Black-Board-অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ রাগের নামগুলি গায়ক বা বাদকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিতে কষ্ট অনুভব করেন? সেতার বাজনার পর কুমারী আশা ওঝা কথকনৃত্য দেখাইলেন। দুইবৎসর পূর্বে এই Conference-এই কুমারীর যেরূপ শিক্ষার পরিচয় আমরা পাইয়া-ছিলাম—তাহার তুলনায় এবংসরের প্রয়োগ-বিধি উৎকৃষ্টত হয় নাই, বরং উহাতে যথেষ্ট অবনতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কারণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে নাচিবার সময় কয়েক বার বিশেষভাবে তিন স্থলে কুমারী লম্ভষ্ট হইয়াছিলেন। নৃত্যের পর স্বর্গত শুণিধর আমির খাঁ সাহেবের ছাত্র শ্রীমান রাধিকামোহন মৈত্র স্বরোহে বেহাগ আলাপ করিয়া তিলত্তের ঠুমরী বাজান। শ্রীমানের বাজনার আমরা গতবৎসর শিক্ষার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম; কিন্তু এবারে তিনি যেন সমস্তই লক্ষ্যে শেষ করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কেন তাহা তিনি নিজেই জানেন, অথবা অন্ত কোন রহস্যও থাকিতে পারে। ইহার বাজনার পর সঙ্গীত-মার্ভণ্ড পণ্ডিত ওফারনাথ ঠাকুর গান আরম্ভ করেন। পণ্ডিতজী শুদ্ধ কল্যাণের দুইখানি খেয়াল ও তাঁহার অতিপ্রিয় আনন্দ-ভৈরবীর ভজনটি “কান্টেয়া নাম কর ঘোরি পার” গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে চিত্রাপিত রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী প্রায় ২ ঘণ্টা কাল গান করেন।



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল ও নকল

(গল্প)

শ্রীশান্তি কুমার দাশ গুপ্ত

অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক মেয়ের মা-ই অতিমাত্রায় বাস্তব হয়ে উঠেন। অমল ভেলেটিই তাঁদের লক্ষ্য। কে যে কোন কীকে তার লবল স্বন্ধে নিজের কণ্ঠারদ্বকে বসিয়ে দিতে পারবেন তা নিয়েই উদ্বিগ্ন। কণ্ঠারদ্বারাও চঞ্চল, একটু বেশীকম সজ্জিত—হয়ত তা যুদ্ধ সাজাই। অমলের রূপ ত বটেই—তার কথা বলার ভঙ্গী, চলার দৃঢ়তা, িষ্ট হাসি তাঁদের মুগ্ধ করে। আলাপ তার সঙ্গে বড় একটা কারও হয়নি, যাঁদের হয়েছে তারা কিন্তু ভীত। ওর কথার মধ্যে এমন একটা সুর ভেলে ওঠে যা আর যারাই নহ কক্ষক অভিজাত মেয়েরা কিছুতেই করতে পারে না। আজ ষোড়শ সাহেবের বাড়িতে পাটি—ভয় তাকে এতটুকুও নয়—ভয় তাঁর মেয়ে রমাকে। চট্‌ক্‌বার, কোশলী, বুদ্ধিমতী রমা—মেয়েদের জঁর্ষা, মনে মনে দেওয়া অভিসম্পাতও তার রূপ এতটুকুও কঁমনি—হয়ত বা বেড়েইছে অন্ততঃ তারা তাই মনে করে।

মেয়েদের রূপের প্রতি পুরুষের একটা আকর্ষণ আছে, সৃষ্টির আদিতেও ছিল আজও আছে—নেই বলে সরিয়ে দেবার উপায় নেই। আর সেইটেই মস্ত ভয়ের কথা।

পণ্ডিতজীর গানের লহিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ্যাটর্নাই-এট-ল মহাশয় তবলা লগত করিয়াছিলেন। গানের পর ঐ রাত্রির অত্যান শেষ হয়। *

* পণ্ডিতজীর গানের আলোচনা আমাদের শেষ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

—:—:—

অমল পুরুষ, রমা নারী—যুবতী। বহি অমল—। মেয়েরা আর ভাবতে পারে না। যে যার সুন্দরতম পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হয়। হোক রমাদের বাড়ীতেই পাটি হরকার হলে এটাকেও যুদ্ধক্ষেত্র করে নিতে বিধা বোধ করবে না কেউ।

বিকেল বেলা ষোড়শ সাহেবের বাড়ীতে বহু বাঙ্গালী সাহেব ও মেম এবং মিসিবাবারা এসে উপস্থিত হয়। লনে টেনিস খেলা চলতে থাকে। অমল কিছুতেই খেলতে নামে না, বলে, খেলুন লবাই আমি না হয় দেখি একটু। রমাকে নামতেই হয় আর একটা মেয়েও নামে—মেয়ে পাটিনার না হ'লে পাটির কোন মানেই নেই। কারুকা বজায় রাখতে অনিচ্ছুক মেয়ে ছুইটিকে খেলতেই হয় তাই।

যুথীকা যেন সময় কাটাবার আর কোন উপায় না দেখে অমলের কাছে এসে বলে, চলুন একটু ওদিকে যাওয়া যাক, বড় ভীড় এদিকটার—কি করে যে এত লোক এক-জায়গায় থাকে! ওই ওদিকে চেয়ারগুলো আছে, চলুন।

ওরা দুজনে এগিয়ে গিয়ে ছোটো চেয়ারে বসে। যুথীকার মা মেয়ের বুদ্ধিকে মনে মনে তারিফ করে বাঙ্কবীহের সঙ্গে শোৎসাছে গল্প করতে লেগে যান। খেলতে খেলতে ওদের দু'জনে একজায়গায় দেখে রমার হাত কঁপে কঁপে উঠে—যুথীকা রমার লবচেয়ে বড় বড়।

অনিমা এসে বলে, তাইত, আপনি এখানে? অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি যে

আপনাকে। সেদিনকার কথা মনে আছে ত' আপনার, তাই নিয়েই আজ আবার কথা কইতে চাই।

অমল হাসে, বলে, সে-সব কথা আমি ভুলে গেছি ব'লেই বোধ হয় আমাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না নইলে আমার পাশ দিয়ে বার বার গিয়েও আমাকে খুঁজে না পাবার ত' কারণ দেখি না।

ভাড়াভাড়ি যুথীকা বলে, পুরনো কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। সে-সব থাকে অমল, কিন্তু দেখে এসেনা তাই ওদের খেলা শেষ হ'তে কত ধেরী আর।

একটা চেয়ারে বসে' পড়ে অনিমা বলে, ওসব খেলা ভাল লাগেনা আমার—তোমার জানতে ইচ্ছে হয়ত' জেনে আসতে পার।

অমল নিতান্ত লজ্জা ভাবেই বলে, তার চেয়ে দু'জনেই থাকুন, ক্ষতি কি।

কে আর একজন এসে বলে, লাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে খুবই ভাল লাগে আমার, কিন্তু অনেকেই ওসব নিয়ে কথা বলতে যেন ভয়ই পায়, কেন বলতে পারেন?

অমল বলে, জিনিবটা লজ্জা নয়, বিশেষ কিছু না জানা থাকলে ভয় পাবার কথাই ত' বটে। অনেকে মেয়েটির চোখ মুখ উজ্জল হ'য়ে ওঠে, বলে, লাহিত্যই তাই। কিন্তু আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা যায়। আচ্ছা সেক্সপিয়রের কোন বইটা আপনার লবচেয়ে ভাল লাগে?

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

টেনিস খেলা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে যায়।
ক্রম এগিয়ে এসে রমা বলে, আলুন এদিকে,
চা দওয়া হয়ে গেছে। চল তোমরাও।

ওরা এগিয়ে যায়।

ঘণ্টা দু'য়েক পর। লবাই বিদায় নেয়।

বাগানের একটা বেঞ্চে বসে রমা আর
অমল।

রমা বলে, আচ্ছা আপনি ত' এরোপ্লেন
চালাতে পারেন খুব জোরে, আমাকে একদিন
নিয়ে চলুন না—কত জোরে চালাতে পারেন
দেখব'। আচ্ছা অনেক উচুতে উঠে হঠাৎ
লম্বা কল বন্ধ ক'রে হু হু ক'রে নেমে
আসতেও পারেন ত'?

হালিধুখে অমল বলে, তা পারি কিন্তু
আপনি ভয় পাবেন তাতে।

'ভয়? জাই।' রমা হেসে ওঠে।

'হ্যাঁ ভয়ই, ভয় পেতেই হয়।
কেবলমাত্র—।' ও হঠাৎ থেমে যায়। ওর
চোখে মুখে একটা বিদ্রোহ খেলে যায় কিন্তু সেই
অন্ধকারে রমা তা' দেখতে পায় না'।

রমা বলে, কিন্তু সত্যি ভয় আমার পাবে
না।

অমল বলে, বেশত' আজই চলুন আমার
মটরে, একটু নমুনা দেখে আসি।

ওরা দু'জনেই উঠে পড়ে অমলের মোটরে।
গাড়ী চ'লেতে শুরু করে। হাওড়ার পোল
পার হ'য়ে গাড়ী এসে পড়ে গ্র্যাণ্ডট্রাক
রোডে। দে রাস্তা ধ'রে গাড়ী হু হু ক'রে
এগিয়ে চলে। একটা মোড় এমনি ভাবে
কাটিয়ে অমল এগিয়ে যায় যে রমার মনে হয়
বুঝিবা গাড়ী উল্টে যাবে। আরও, আরও
জোরে। নিঃশ্বাস ঘন বন্ধ হ'য়ে আসে।
লামনেই আর একটা মোড়—কাছেই একটা
গাড়ীর আলো এসে পড়ে। উল্টো দিক
থেকে আর একটা গাড়ী আসছে বোঝা
যায়—কিন্তু গতিবেগ কমাবার উপায় নেই,
আর লম্বাও নেই। বাকের মুখে আসা
মাজই ওদিককার গাড়ীটাও এসে পড়ে—

একটা বাঁকুনি দিয়ে পাশ কাটিয়ে অমলের
গাড়ী বেরিয়ে যায় কিন্তু রমার চোখের লামনে
থেকে লব কিছুই যেন স'রে যায়। ও ভয়ে
চীৎকার ক'রে অমলকে জড়িয়ে ধরে। আরও
খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে
গাড়ী থামিয়ে অমল বলে, এবার বাড়ী ফেরা
যাক, এরোপ্লেন থেকে হু হু ক'রে নামা বড়
লোজা কথা নয়।

অমল গাড়ী ঘুরিয়ে নেয়—ওই টুকু
জায়গায় গাড়ী ঘোরাতে দেখে রমা বিস্মিত
হ'য়ে যায় কিন্তু কিছুই বলে না।

বাড়ী ফিরে এসে অমল বলে, তাহ'লে
এরোপ্লেন এক'দিন চ'ড়বেনই?

অতক্ষণে রমা নিজেকে লামলিয়ে নিয়েছে,
বলে, হ্যাঁ, তা আমি চড়বই। আজকের
ব্যাপারেই লব কিছু প্রমাণ হয় না।
এরোপ্লেনের ভেতর ব'লে থেকে নামা আর
ছাড় থেকে লাফিয়ে পড়া এক নয় কিছুতেই।
জোরে চালালে ভয় কিছুই নেই—কিন্তু তাই
ব'লে খাড়া লাগলেও ভয় পাবনা তাত'
বলিনি।

অমল বলে, বেশ একদিন এসে আপনাকে
নিয়ে যাব।

দিন দশেক পর।

রমাদের ড্রয়িংরুমে এসে অমল দেখে
গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড চড়িয়ে দিয়ে রমা
ব'লে আছে চুপ করে।

ও লোজা এগিয়ে গিয়ে গ্রামোফোনের
হাতলটা তুলে দেয়—গান যায় থেমে।

রমা ব্যস্ত হ'য়ে বলে, হ'ল কি আপনার?
এর ওপর রাগের কারণ কি? আটের জ্ঞান

কি একটুও নেই আপনার? জানেন বুঝি
তুণ্ড মোটর আর এরোপ্লেন।

অমল বলে, না—আটও বুঝি কিছু কিছু
আর তাই বন্ধ ক'রে দিলুম এটা। গান যদি
নিজের জানা থাকে ত' বন্ধন আর সেটাই
হবে সত্যিকার আট—এত' ফাঁকী।

'কিন্তু এতে গান শেখা যায়।' রমা বলে।

অমল জবাব দেয়, শেখা যায় ভাল, কিন্তু
এমনি ভাবে শিখতে হ'লে ওপরে নিজের
ঘরে গিয়ে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে
বাজাতে হয়—ড্রয়িংরুমে এসবের পরিবেশন
চলে না। অনেক লোক দেখেছি
বিশেষ ক'রে মেয়ে লোক যারা প্রতিদিন
এক কোটা পিন খরচ করে—গান শুনবে,
কলের ভেতর দিয়ে চড়াও করতেই তারা
ব্যস্ত নিজেদের কথা একেবারেই ভুলে যায়।
একটা গান এমনি ক'রে কতদিন শোনা
যায়—এ যে আটের অপমান।

'বেশ আপনার লামনে আর বাজাব না
কোনদিন।' রমা বলে।

অমল ব'লে চলে, আর একটা জিনিষ
আছে—ওই পিক্টোগ্রাফ। আটকে ফাঁকী
দেবার কি লজ্জা পছন্দই না বের হ'চ্ছে।
যে কোন লোকও এমনি ক'রে আটের
লমজ'দার হ'য়ে ওঠে। আমি আশ্চর্য্য হই
তুণ্ড এই ভেবে যে, এই লব ছবিগুলোর
তলায় নাম লিখে বাঁধিয়ে মানুষকে বিশেষ
ক'রে মেয়েরা বাইরের ঘরে লাভিয়ে রাখে
কি ক'রে। এইত' দেখছি আপনার কয়েকটা।
বাঃ বেশ হ'য়েছে, তারিক্ ক'রতে হয়,
কি বলুন!

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

৩৬এ, আন্তোব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

রমার মাথা নীচু হ'য়ে আসে, বলে, কিন্তু আপনি কি খোঁচা না দিয়ে পারেন না? বোধ হয় তাই। কিন্তু চলুন আজ অপনাকে খানিক উড়িয়ে নিয়ে আসি।' অমল বলে 'কিন্তু তার আগে বলুন এতদিন আসেন নি কেন?' রমা ওর দিকে তাকায়। অমল হাসে বলে, আসবার চেষ্টা ক'রেছিলুম কিন্তু পারিনি। কারও সঙ্গে ক'বতে হ'ল লেক্সপীচরের আলোচনা, কারও সঙ্গে বা দর্শন নিয়েই মাততে হ'ল। বাড়ী থেকে বের হ'তেই পারিনি। উপর থেকেই যুগীকাকে অনিমেষে ঘুম নিয়ে গিয়ে হাজির—তর্কের মীমাংসা চাই যেন আমিই একমোহিত হয়ে—শঙ্করাচার্য্য থেকে ফ্রেড পর্য্যন্ত। কিন্তু থাক সে সব কথা, চলুন।—

ওরা বেরিয়ে যায় দমদমের পথে।—অনেক উঁচুতে উঠে অমল বলে, প্রস্তুত হ'ন। লেখনকার মত করবেন না যেন—বিপদ হ'তে পারে, আমার হাত পা আর চোখ খোলা থাকা চাই।

রমা বলে, ভয় নেই আমি ঠিকই আছি। হঠাৎ কল বজার শব্দ শেবে যায় যেন কোন এক যাক্স মস্তে লম্বা কিছুই শুক হ'য়ে গেছে—ওপর থেকে বিরাট পৃথিবীটাকে বেধে সমস্ত যাক্স যেন বিস্তরে অবাক হ'য়ে শুধু চেয়েই থাকে। প্লেন ছ ছ ক'রে নেমে আসে। মধ্যাহ্নের যে কি অসীম শক্তি। বাইরের দিকে নজর পড়া মাত্রই ভয়ে রমার চোখ বুঁজে আসে। জোরে চীৎকার ক'রে সে অমলকে প্রাণপন বলে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আজ অমল তাকে জোরে ঠেলে সরিয়ে দেয়, মাথার ওপর একটু আঘাত লাগে—ভয়ে রমা জ্ঞান হারিয়েই ফেলে হয়ত।

অমল তর্জনি ক'রে বলে, জানি সে ছাড়া প্রত্যেক ঘেরেই ভয় পাবে, ভয় পেতেই হবে তবু স্বীকার করা যেন মহাপাপ। স্পর্দ্ধা, বিদ্বেষ কেন। এত সহজেই কি ভোলান যায়?

ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে অমল বলে, নিজের ওপর বিশ্বাস থাকা ভাল কিন্তু নিজের শক্তির সহজে স্পষ্ট ধারণাও রাখিতে হয় নইলে যে বিপদ আসে পথে পথে ভয় তাকে দেয় আরও বাড়িয়ে।

গ্রীষ্মের সময় অভিজাত সম্প্রদায় হার্জিলিংয়ের শৈল শিখরে অভিযান করে। রমা, যুগীকাকে এবং আরও অনেকে, তাদের মায়েরা কারও কারও পিতাও বাহ যান না এ তাদের বাৎসরিক রীতি। তাদের দেখে ঠিক বোঝা যায় না যে হার্জিলিংয়ে গেছে তারা—না হার্জিলিং এসেছে কলকাতায়। অমলও বাহ যায় না। মেয়েরা আর তাদের মায়েরা তাকে নিজের নিজের আবাসে থাকতে বলেন সে কিন্তু গিয়ে ওঠে হোটেল। মেয়েদের সঙ্গে ঠিক তেমনি করেই কথা বলে সে কিন্তু ঠিক তেমনি ভাবেই মেলে না যেন। প্রত্যেকেই এক একটা কীকী বলেই মনে হয় তার। যা তারা নয় তাই তারা এমনি ভাব তাদের চোখে মুখে ফুটিয়ে তোলে। হাই হিল জুতো পরে দু'পাক ঘুরে বেড়িয়ে পুরুষদের মনে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করতেই যে মনে মনে ভালবাসে সেও মুখে চোখে বিজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে উজ্জ্বল, টুর্গেনিকের কথা বলে।

অমল কোন কথা বলে না মনে মনে শুধু হাসে। সেদিন বিকেলে যুগীকাদের 'ভিলা'র একটা পাটি। অমলকে আসতে হবে।

সকালে বিকেলে অমল বোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। বহু দুখ চলে যায় সে। যে সব পথে ধীরে ধীরে চলতেই ভয় পায় অনেকে সে সব পথেও সে জোরে ছুটিয়ে দেয় বোড়া।

বাড়ীতে আসতে হবে তাই সে লেখন একটু আগে আগেই ফেরে। একটা বাঁকের মোড় ঘুরতেই বিপরীত দিক থেকে আর একটা বোড়া প্রায় তার গায়ের ওপর এলেই পড়ে। কোন মতে দুজনই লামলিয়ে নেয়—বোড়া ছোটো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার টেঁচিয়ে লামনের পা ছোটো তুলেই খেঁষে যায়।

অমল সোজা চেয়েই আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়, বলে, তুমি? বিলেত থেকে কবে এলে কৃষ্ণা?

মিষ্টি হাসি হেসে কৃষ্ণা বলে, আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলে যে? আমি ছাড়া কোন ঘেরে এমনভাবে বোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে পারে নাকি! তবে বিলেত থেকে এলেছি কিনা তা তুমি জানতে না, সেকথা ঠিক।

'কিন্তু জানাও নি কেন বলত'?' অমল বলে।

'দেখা হবেই তা জানতুম যে। দুর্ভাগ্য অমল আর বেপরোয়া কৃষ্ণা মিলবেই এত সোজা কথা। তাই মাঝখানে এক আগে বিলেত থেকে ফিরেও তোমার কোন খোঁজ করিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য যোগাযোগ—কালট এখানে এসেছি আর আজ বিকেলেই লহর চ'বে বেড়াতে বেরিয়েছি।' কৃষ্ণার মুখে হাসি লেগেই থাকে।

হাত বাড়ির দিকে চেয়ে অমল বলে, চল একটা পাটি আছে দেখানে বাই।—ওখানে অনেক তরুণীই আমার মতো অপেক্ষা ক'রছে—তোমাকে নিয়ে গিয়ে তাদের পাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিই চল।

কৃষ্ণা হাসে, বলে, তাই নাকি, এতদিনেও তোমাকে তারা চিনতে পারেনি আশ্চর্য্য!

ও বোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ওর পাশে পাশে চলতে থাকে।



স্বপ্নদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

—এক—

কর্মকান্ত জীবনের ধারা পরিবর্তনের আশায় ডাক্তার অরুণ গুপ্ত ও সাহিত্যিক অমল সান্যাল আজ চন্দ্রনগরে হোটেল ডি প্যারিসে বলিয়া চা পান করিতেছিলেন। ডাঃ অরুণ ও সাহিত্যিক অমল উভয়েই বুঝা ও সুপুরুষ। ডাঃ অরুণের বেহে বখেটে শক্তি আছে এবং মনের দৃঢ়তারও অভাব নাই তাহা তাহাকে দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। অমলের আকৃতিতে বৌবনমূলত চকলতা পরিস্ফুট। ডাঃ অরুণ বিবাহিত, কিন্তু অমল অতাপি কোন নারীর পালিশ করিবার সুযোগ পায় নাই। বিশেষতঃ অমলের ধারণা ছিল যে নারীজাতি বাহ্যিক বতাই লৌক্যের অধিকারিণী হোক না কেন, তাহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহ পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং পুরুষের ত্রায় হস্তপদবিশিষ্ট হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব। অতএব এ যাবৎ কোন নারীকে সে জীবনের সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

সেদিন শ্রাবণ সন্ধ্যা। বেঘমালা ধীরে ধীরে পূজীভূত হইয়া নীল আকাশটিকে ঘনকক্ষ বন্দীকর করিয়া তুলিল। সেই বেঘমালার বধ্য হইতে বিজলীবধর অজবাসও দুই চারিবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এক বলক ঠাণ্ডা বাতাস হোটেল ডি প্যারিস গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া পর্দাগুলিকে বিলম্ব বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল।

চারের কাপটা মুখ হইতে নামাইয়া অরুণ বলিল, “লু বাওয়া যাক্, বড় উঠবে।”

বাটার রোল চিবাইতে চিবাইতে অমল উত্তর করিল, “ব্যস্ত কেন? দেবী হলে বৌদি তোকে ডাইভোস করবে এমন আশঙ্কা আছে নাকি?”

“না, সে ভয় আমার নেই অমল; কিন্তু জল বড় হলে গাড়ী চালান বড় কষ্টকর হয়ে উঠবে কিনা তাই বলছিলাম। আর—আর দেবী করে লাভই বা কি? শেষে কি পথ হারিয়ে ফ্রেক পুলিশের আতিথ্য গ্রহণ করবে?”

“সেও ভাল” বলিয়া অমল বাকী বাটার রোলটা মুখে পুরিল। সেটাকে গলাধঃকরণ করিয়া অমল আবার বলিল, “যাই বল অরুণ পেটের খান্দা না থাকলে আমি কলকাতার ফিরতামনা। যদি তোর মত আমার অবস্থা হতো তা হলে কোন নির্জন পল্লীতে বা পাহাড়ে গিয়ে একটা ছবির মত বাড়ী করে ইঞ্জিচেরারে বলে সাহিত্য সুখা পান করে জীবন কাটিয়ে দিতুম।”

আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অরুণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, “ওরে থাক্ তুই, আমি চললাম।”

অগত্যা অমল শাস্ত্র বালকের ত্রায় দোফারের লিটের পার্শ্বে বলিয়া পড়িল। অরুণ স্বয়ং ঘোটর ড্রাইভ করিতেছিল। সে যে স্পীডে ঘোটর চালাইবে স্থির করিয়া ছিল তাহা হইল না। সে ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিল। পার্শ্বে বলিয়া অমল লিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিল, অরুণকে ছই একটা প্রসন্ন করিল; অরুণ উত্তর দিল

না, অগত্যা সে গলা ছাড়িয়া গাহিয়া উঠিল,

“নিশীথ রাতের

বাদল ধারা।”

কয়েক মিনিট বাইতে না বাইতেই অরুণের গাড়ী লম্বা থামিয়া গেল—উত্তর বন্ধ বিস্তৃত নেত্রে দেখিল, গাড়ীর চাকার দুই ফুট তফাতে দাঁড়াইয়া লক্ষ্যাক্ষিত অষ্টদশী যুবতী।

অরুণ ও অমল গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল—হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোকে তাহার দেখিল যুবতী গৌরী, বারিধারার তাহার লক্ষ্যাক্ষিত, গুঠ দুইটা নীলাভ হইয়া উঠিয়াছে। বালিকা বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে। তাহাকে লক্ষ্যনা দিয়া অরুণ বলিল, “এত দূর্যোগে কি বেরুতে আছে?”

তরুণী কাঁদিয়া ফেলিল এবং ক্রমপরে বলিল, “ডাক্তারের বাড়ী, ডাক্তারের বাড়ী,—আমাদের বড় বিপদ—আমার হাদার অবস্থা বড় খারাপ—হারা করে বলে দিন এখান থেকে ডাক্তারের বাড়ী কতদূর?”

অরুণ বলিল “এখানের কোন থবর আমি জানি না, কারণ আমরা এদেশে আজই মৃত্যু এগেছি। তবে তুমি ডাক্তার চাচ্ছ—আমিও ডাক্তার। আমাকে ঘিরে বসি তোমার কাজ চলে, চল আমি যেতে প্রস্তুত আছি।”

তরুণী যেন হাতে স্বর্গ পাইল—সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, “তবে আর বেশী দেবী করবেন না। চলুন আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।”

অরুণের অমুরোধে সে গাড়ীতে উঠিয়া বলিল। তাহার শুধু মনে হইতেছিল পথ বুঝি আর কুয়ার না, যেন কত দেবী তাহাদের বাটী পৌছাইতে।

অমল অস্বাভাবিক রকমের গভীর হইয়া উঠিয়াছিল; সে একটাও কথা বলে নাই। একটা পল্লী গলির পাশে আনিয়া বালিকা বলিল, “খানুন, ঐ আমাদের বাড়ী দেখা

বাছে। গাড়ী থামিলে সে গাড়ী হইতে উঠাঘের জার নামিয়া পড়িল—অরুণ তাহার ব্যাগটা হাতে করিয়া তরুণীর পশ্চাতে চলিল। অমল সেই সুগভীর অন্ধকারে গাড়ীর ভিতর বলিয়া রহিল।

অরুণ জীর্ণকুটির প্রবেশ করিয়া দেখিল কুটিরের এক প্রান্তে মলিন শয্যায় এক অতি শীর্ণ ব্যক্তি শুইয়া আছে, ঘরের এক কোণে একটি নির্দীনোমুখ প্রাণী কণ আশোকে বিকর্ণ করিতেছে। অরুণ রোগীর শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রোগীর হেহ পরীক্ষা করিয়া স্থূল অস্ততঃ আঘবণ্টা পূর্বে বেচারীর প্রাণপাথী হেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্তলাভ করিয়া মহাশূন্যে মিশাইয়া গিয়াছে। মৃতের হিম-শীতল হাত ধানি ফ্রোড় হইতে নামাইয়া অক্ষুট কর্তে বলিল, “নব শেষ হয়ে গেছে।” তরুণীর কর্ণে এই কথাটা শত বজ্র-ধ্বনির ন্যায় প্রবেশ করিল—সে কাঁপিতে কাঁপিতে অরুণের পদতলে মুছিত হইয়া পড়িল।

—চুই—

মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহলোক ত্যাগ করিবার সময় পৃথিবীতে কেলিয়া গিয়াছিলেন তাহার ভগ্নপ্রায় বাস্তবিকটা আর একটি পুত্র ও একটি শিশু কন্যা। তাহার মৃত্যুকালে পুত্র অমর নাথের বয়ঃক্রম আত্মমানিক বিংশ বৎসর, সে বি, এ, পাশ করিয়া চাকুরীর চেষ্টা দেখিতেছিল এবং মাতৃহীনা চারিবৎসরের ভগ্নী কণাকে তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া লংলার লাগরে তেলা ভাসাইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুতে অমরনাথ শোকে মুহামান হইলেন বটে কিন্তু বধন কণা তাহার ছোট ছোট হাতছইটি লইয়া আধ আধ তাহার ‘দাদামনি’ বলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, তখন তিনি স্থূলিলেন পিতামাতার শেষ নিদর্শন কণার কল্যাণে তাহাকে বাঁচিতে হইবে এবং কণাকে মানুষ করিয়া তুলিয়া

তাহাকে সুপায়ে স্তত না করিতে পারিলে স্বর্গীয় পিতামাতার প্রতি কর্তব্যের হানি হইবে। সেইদিন হইতে অমরনাথ নিজের সুখ দুঃখ তুলিয়া কণাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ইহার পর সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ত্রাতার অনীম যত্নে কণা চন্দ্র-কলার জায় বজ্রিত হইয়া পূর্ণ যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। অমরনাথ যাহা কিছু যোজগার করিতেন তাহার অর্দ্ধেক ভগ্নীর বিবাহের জন্য লক্ষ্য করিতেন। এইরূপে গত কয়েক বৎসরে পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াও অমরনাথ

ভগ্নীর বিবাহের জন্য বাইশ শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিবাহ করিলে পাছে খরচ বাড়িয়া যায় এবং পাছে ব্যয়াদিক্য বশতঃ কণার বিবাহে বাধা পড়ে এই জন্য অমরনাথ চির কোমার্য্য ত্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। অমরনাথ নিজের জন্য অতি অল্প ব্যয় করিতেন কেবল যাহা না হইলেই নয় সেইটুকু তিনি নিজের জন্য ব্যয় করিতেন; কিন্তু ভগ্নীর কোন আবদার তিনি কোন দিনই অগ্রহ রাখেন নাই।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অমরনাথকে বক্ষা রোগ আক্রমণ করিল—তথাপি তিনি

২০,০০০ টাকা পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার ৫০০০ টাকা

আরও ১০০০টি বিভিন্ন পুরস্কার

বাহারী আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ১৮০ আনা পাঠাইয়া মাসিক অবস্থিকার বাধিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাহাদের মধ্যে উপরোক্ত পুরস্কার সকল লটারী করিয়া বিতরিত করা হইবে। অবস্থিকার ৪র্থ বর্ষ চলিতেছে। বহু গল্প, রঙ্গরস, উপন্যাস, কল্প্য অভিমেত্রীর ছবি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ প্রায় ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রিকা ১ বৎসর পর্য্যন্ত পাইবেন তদুপরি একটি পুরস্কারও পাইতে পারেন। এ সম্বন্ধে কোনও চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না বা ভিঃ পিঃ করা হইবে না। ক্রস্‌ড পোষ্টাল অর্ডারে বা মনিঅর্ডারযোগে ১৮০ আনা নাম ধাম সহ পাঠাইলেই চলিবে। কলাকল আমাদের আগামী আবার সংখ্যার প্রকাশিত হইবে। সমস্ত প্রকারের রসবদলের ক্ষমতা ম্যানেজারের রহিল।

ম্যানেজার—অবস্থিকা,
করিদাবাদ, ঢাকা।

তা যদি পারতো তা হলে বেতর
প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে এত রাবিশের আমদানি
কখনই হোত না। প্রোতাধের প্রোগ্রাম
নবকে অভিযোগ দিনের পর দিন বেড়ে
উঠতো না।

খেয়ালী চিত্রপট



নিউ থিয়েটার্সের “ষ্ট্রাট সিজার” চিত্রের বিশিষ্ট দণ্ডে
শ্রীমতী কানন, অমর নল্লিক, শৈলেন চৌধুরী। শ্রীযুক্ত
কবি মহম্মদের মহাশয় ছবিখানার পরিচালনা করছেন।



টেলিগ্রাম
'ভারিটি'

পরিচালক
স্বাধীনতা নিউজপেপার লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

টেলিফোন
সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, একবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ই জৈষ্ঠ ১৩৪৫, ২৬শে মে ১৯৩৮

চব্বিশ পরগণা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড

প্রায় বৎসরাধিক কাল হইল চব্বিশ পরগণা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য নির্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু অতাবধিও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত সভ্যদের নাম ঘোষণা করা হয় নাই। মনোনীত সভ্যদের নাম প্রকাশিত না হইলে নূতন বোর্ড গঠিত হইতে পারে না। প্রাদেশিক সরকারের এই বিচ্যুতির সুযোগ লইয়া বর্তমান চেয়ারম্যান রায় যোগেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ও ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অমুকুলচন্দ্র দাস তাঁহাদের পদে বাহাল আছেন। তাঁহাদের কার্যকাল সমাপ্ত হইলেও তাঁহারা যে অধিককাল তাঁহাদের পদে বাহাল আছেন তাহার জ্ঞাত দায়ী বিভাগীয় মন্ত্রীর দীর্ঘসূত্রতা। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেও বিভাগীয় মন্ত্রীর অনুরূপ দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া প্রকাশ।

অন্যদিকে মিউনিসিপ্যাল আইনে এমন কোন ধারা নাই যাহাতে সাধারণ নির্বাচনান্তে কোন সময় নির্দিষ্ট নাই যাহার মধ্যে মনোনীত সভ্যদের নাম ঘোষণা করিতে হইবে। আইনের ভুলের এই রূপে তদবিরোধ চেয়ারম্যান বা দয়ালু মন্ত্রীর

জনমভুক্ত উপেক্ষা করিয়া পুনর্নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে পারেন। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন-ধারা প্রবর্তনের জ্ঞাত আমরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চব্বিশ পরগণার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন দার্জিলিংয়ে যাইয়া সম্প্রতি যে তদ্বিরে রত ছিলেন তাহার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। রায় বাহাদুর হৃৎ-মাজিম-মন্ত্রী মণ্ডলের নির্লজ্জ সমর্থক সুতরাং তাঁহার আবদার মন্ত্রী-মণ্ডলের পক্ষে সহজে উপেক্ষা করা সম্ভবপর নহে। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান তাঁহাদের সুদীর্ঘ কার্যকালের মধ্যে এমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই যাহার জ্ঞাত তাঁহারা প্রাদেশিক সরকার বা জনসাধারণের নিকট কোনরূপ সহানুভূতি পাইতে পারেন। তন্নিম্ন নীতির দিক দিয়া বিচার করিলে আইনের ভুলের রূপে জনমতের অবজ্ঞা করা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। রায় বাহাদুর বা অমুকুলবাবুর পুণরায় নির্বাচন-প্রার্থী হইতে ত বাধা নাই—তবে কেন তাঁহাদিগকে ও বিদায়ী সভ্যবৃন্দকে অযৌক্তিকভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ত্রিশঙ্কর-অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

আমরা প্রাদেশিক সরকারের বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। তিনি যেন অবিলম্বে মনোনীত সভ্যদের নাম ঘোষণা করার আদেশ দেন এবং আমরা আশা করি তিনি মনোনয়ন ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবেন। তদ্বিরের চাপে বা আশ্রিত-বাৎসল্য হেতু পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট না হন—মন্ত্রীবরের নিকট এইরূপ আশা করা কি দুরাশা হইবে? যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া মন্ত্রীর চব্বিশ পরগণা জিলা বোর্ডকে মৌরশী-স্বত্বভোগী ব্যক্তিবর্গের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তিনি জিলার অধিবাসীবৃন্দের প্রজ্ঞা অর্জন করিতে পারিবেন।

আমরা বারান্তরে বর্তমান চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্যাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করিব।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদ

গত শনিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় দেবকী কুমার বসুর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদের শুভ উদ্বোধন সন্মিলন হইয়াছে। প্রাণিক পরিবেশক শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ বসু পৌরহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রমোদ বসু প্রথম হইতেই দেবকী বসুকে পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রম মার্ফক হইয়াছে।

কলিকাতার বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান লব্ধের সংশ্লিষ্ট বহু প্রধান, কন্ঠা ও টেকনি-শিয়ান উদ্বোধন সভায় লোংলাহে যোগদান করিয়া বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে এইরূপ প্রতিষ্ঠান বহুদিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলার এতাবৎকাল কোন চেষ্টাই হয় নাই।

কিন্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ান মি: কাপরা বে দারগত ও সুচিন্তিত বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে পরিষদের ভবিষ্যত উজ্জল বলিয়া মনে হয়। মি: বি এন সরকার, মি: হেমাদ, মি: ভোলানী ও খেমকার জায় সুপরিচিত ও প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা লাভে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদের প্রসারকগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

বিভিন্ন ষ্টুডিওর তরুণ কন্ঠারস্বরের উৎসাহ ও পূর্ণ সহযোগিতা পরিষদের বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের পক্ষে বিশেষ শুভ সূচনা বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত মধু শীল ও শ্রীযুক্ত সুধীশ বটক টেকনিসিয়ানদের পক্ষে বক্তৃতা করিয়া পরিষদের শুভ কামনা করেন।

শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ বসুর বিজ্ঞানোচিত পরিচালনায় বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদ বাংলার ক্রমবর্ধমান চলচ্চিত্র শিল্পের আশা, আকাঙ্ক্ষা পরিম্পূর্ণতায় ও বাধা বিপত্তির নিরাকরণের এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউক— ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা।



(বিলাসী)

বিজ্ঞাপতি

যারা এখনও এই ছবিখানি দেখবার অবকাশ পান নি, তাঁদের আশ্রয় এ লগ্নাহে চিত্রায় গিয়ে বেখে আলতে বলি

এ এমন একখানি ছবি যা লপরিবারে এবং সবাব্দবে উপভোগ্য কোরে স্বস্তি পাওয়া যায়।

যে সব আটটি দিনের পর দিন, নিউ থিয়েটারের নানা চিত্রে, নানা ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরে আপনাদের আনন্দবর্ধন কোরেছেন, তাঁদের অনেকেই এই চিত্রের প্রধান চরিত্রগুলি বিশ্লেষিত কোরেছেন।

এ ছাড়া, মুক্তি চিত্রের নায়িকা কানন— বিজ্ঞাপতি-র একটি স্মরণীয় আকর্ষণ। যেমন ভক্তকে বাধ দিলে দেবতার পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি হয় না, তেমনি কবি-সঙ্গিনী অমুরাধাকে বাধ দিলে, কবি বিজ্ঞাপতির জীবনের অনেক কিছুই পরিম্পূর্ণ হয় না। তাই নাটকীয় রস সৃষ্টির দিক দিয়ে এই মৌলিক চরিত্রটি, এই চিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার কোরেছে এবং অপূর্ণ গীতাবলী ও অভিনয় মাধুর্য্য এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোরেছেন স্নানামধুজ চিত্রাভিনেত্রী, কানন দেবী।

এ ছাড়া অপরাপর ভূমিকায় মধ্য চরিত্রাঙ্গ, কৃষ্ণচন্দ্র ও অমর মল্লিক, উল্লেখ-যোগ্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রায় গত সাত লগ্নাহে বিজ্ঞাপতির টিকিট বিক্রয় হোয়েছে চল্লিশ হাজার টাকার উপর। এখনও সমানভাবে বিজ্ঞাপতি দর্শক আকর্ষণ কোরে চলেছে।

অভিজ্ঞান

গত লগ্নাহে এই চিত্রের রেলওয়ে ষ্টেশনের দৃশ্যগুলি লারারাত ধরে শিরালবহ ষ্টেশনে তোলা হয়েছে। এই চাকসাকর দৃশ্যগ্রহণাধির বিস্তারিত বিবরণ এই লংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত ছাপা হোল। এই শ্রেণীর দৃশ্যগুলি নিপুণভাবে গ্রহণ কোরতে কর্তৃপক্ষকে কতখানি অর্থব্যয়, লতর্কতা ও পরিশ্রম কোরতে হয়—আশাকরি তা এই বিবরণ থেকে আপনারা খানিকটা উপলব্ধি কোরতে পারবেন।

রেলওয়ে ষ্টেশনের মত লক্ষ্যবাহী জনবহুল একটি public placeকে ছায়া-চিত্র গ্রহণের উপযোগী কোরে চুলতে যে কত রকমের বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধা ভোগ কোরতে হয়, এ ধারণা অনেকের নেই। আশাকরি এই লুশের চিত্র গ্রহণের বিবরণ আপনারা উপভোগ কোরবেন।

অভিদিদি

অভিজ্ঞান-এর 'ফ্লোর' খালি হওয়া বাজ বড়হিদির চিত্র গ্রহণে স্তব্ধ হ'বে। ইতিমধ্যে মল্লিক মহাশয় বড়হিদির চিত্র-নাট্যের অংশ বিশেষের লংশোধন-কার্যে আত্মনিরোগ কোরেছেন

এই শ্রেণীর মনত্বমূলক কাহিনীকে ছায়া-চিত্রের উপযোগী কোরে গোড়ে তোলা যে বিশেষ কঠিন ব্যাপার একখা অভিজ্ঞ ব্যক্তি নাহেই স্বীকার কোরবেন। সাহিত্যে যে পথ অবলম্বন কোরে রস-সৃষ্টি

করা সম্ভব, মিনেয়ার তা সম্ভব নয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রকাশের পথ (medium of presentation) ভিন্ন অথচ মূল গল্পের মাধ্যম অকুর রেখে পরিচালককে তার কার্য্য লম্বাধা কোরতে হয়। পরিচালক হিসাবে মল্লিক মশাইয়ের দায়িত্ব কম নয়। তাই চিত্র গ্রহণের পূর্বে এর টিউমেন্ট বাতে সর্ব্বরকমে জটিল বর্জিত হয়—দেখিকে মল্লিক মশাই বিশেষ অবহিত হয়েছেন নিশ্চয়ই। তাঁর মত অভিজ্ঞ কন্ঠীর হাত থেকে আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রডাকশনই কামনা করি। আশাকরি ভগবানের আশীর্বাদে তাঁর এই বিরাট প্রচেষ্টা লাফল্য সফল হবে।

দেশের মাটি

দেশের মাটির উত্তর সংস্করণই প্রায়ই শেষ হয়ে এলো। গেল সপ্তায় এক নম্বর সাউণ্ড ক্রোরে একটি বিরাট ‘ক্যাম্প’ সেটের কাজ শেষ হয়েছে। এই সেটের মধ্যে জগদীশ, দুর্গাদাস, কমলেশ, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি আর্টিষ্টরা অপূর্ণ অভিনয় কলা প্রদর্শন করেছেন।

অধিকার

‘রতন’-এর কুঁড়ে ঘরের দৃশ্যটি গেল সপ্তায় তোলা হয়েছে। এই দৃশ্যে পাহাড়ী, মেনকা, মট ও পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি ছিলেন। পাহাড়ী ও পঙ্কজ মল্লিকের তিনখানি গান ছাড়াও বস্তীর করেকটি স্তম্ভর দৃশ্যও তোলা হয়েছে। তাছাড়া এই দৃশ্যে যে সব লাজ পোষাকের ব্যবস্থা হয়েছিল তা নাকি খুবই স্তম্ভর। ভারতবর্ষের সবরকম জাতের লোকের লম্বাগমে এই বস্তী সীনটী একেবারে Cosmopolitan ভাবে গঠিত হয়েছিল।

টীট সিঙ্গার

Street Singer এর সেট—ভুল্লুরা ও র বড় বাড়ীর লীড়ি—। কখন দেখছি অমর মজুকে, কখন ভুল্লুরাকে, কখন তাবের টাকর-বাকরদের। কখন হানি মুখে, কখন কত পদবিক্ষেপে, কখন অতি বীরে।

নাংবাতিক কিছু বটেছে কি?—না।

মজার কিছু বটেছে কি?—না।

তবে?

না, কোন অঘটনই ঘটেনি। শুধু Street Singer এর যে সব ছবিগুলো লীড়িতে তোলায় কথা ছিল সে গুলো তোলা হয়ে গিয়েছে।

কোন sound recordist-কে যদি দেখা যায় সে একগাছা বই আর কলকজা নিয়ে যেতে আছে, তা হ’লে কি তাকে ঠাট্টা করে বলা যায় না—‘আপনার recordist না হয়ে Sound Engineer হওয়া উচিত ছিল।’

এতে শ্রীমান লোকে বস্তুর ক্ষেপণার কি কারণ থাকতে পারে? সে কেপে আমাদের হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল movista room-এ। তার লাক্রেজ গ্রাম-স্তম্ভরকে বল্ল—“Street Singer এর কত-গুলো shot শুনিতে যাও দেখি।”

Street Singer-এর রেকর্ডিং খুব ভাল হচ্ছে বলে কী অহঙ্কার লোকেন বাবুর।

চোখের বালি

মি: বি, পি, মেহেরার প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিরহের অমর কাহিনী “চোখের বালি”-র শূটিং যথারীতি কালী-কিনাস্ টুডিঙতে গৃহীত হ’চ্ছে। সম্প্রতি ছবিখানির গীতাংশ নিয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যস্ত আছেন। অনাদি দ্বিতীয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্তর সংযোজনা যা’তে অবিকৃত থাকে সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে তিনি একজন ‘অথরিটি’-এর আবহাওয়া সঙ্গীত নিয়ে স্মরেন দাশ একটা কিছু নতুন ছ দেখাবার জন্য চেষ্টার কল্পন করছেন না। মোট কথা “চোখের বালি” যা’তে রবীন্দ্র-নাথের লেখনীর স্বর্ঘ্যাবা রক্ষা কোরতে পারে তার জন্য লম্বাই উঠে পড়ে লেগেছেন।

হাজরা পিকচার্স

এই প্রতিষ্ঠানের “দেবী-ভুল্লুরা”র শূটিং গত সপ্তাহে লম্বাপ্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু





“চোখের বাণী”-র একটি দৃশ্য—শান্তিলতা ঘোষ ও সুপ্রভা মুখার্জী

বৃষ্টির জল শেষ হওয়া সম্ভবপর হয় না। এই লগ্নাহে টুডিওর সমস্ত কাজ শেষ করিয়া তিনকড়ি চক্রবর্তী লক্ষ্যবলে বাহিরে গিয়াছেন একটি বহির্দৃশ্য তুলিবার জন্ত এবং এই দৃশ্যটিব কাজ শেষ করিয়া আগামী লগ্নাহে লম্ববতঃ তিনি কলিকাতার প্রাত্যহিক করিবেন। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যানাজি ছবিখানির সম্পাদনা কার্য শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

“দেবী ফুল্লরা”-কে বাছাতে একখানি লক্ষ্যজন্মের চিত্রে রূপান্তরিত করা যায়, তাহার জন্ত জ্ঞানবুদ্ধ তিনকড়ি চক্রবর্তী চেষ্টার কসুর করিতেছেন না। অর্থ ও লামর্থ্য দুইয়ের ব্যয়ে তাহার নিজ হাতে গঠিত টুডিওর প্রথম অবদান যদি চিত্রাশোখী-ঘের স্নেহলাভে সমর্থ হয়, সেইজন্ত তিনি বিশিষ্ট টেকনিশিয়ান ও সুঅভিনেত্রী সংযোগে ছবিখানি তুলিয়াছেন। মধু শীল, বিভূতি লাহা, যতীন দত্ত প্রভৃতি যন্ত্রশিল্পী এবং অরুণা চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মোহন রায়, তিনকড়ি চক্রবর্তী, হর্গাপ্রসন্ন বসু, শিববালা, রাধারানী, শাবিত্রী, চিত্রা,

রানী চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পী সমন্বয়ে “দেবী ফুল্লরা” রূপ-রস-গন্ধে সজীবিত হইয়া উঠিলে। মধ্যে অরুণা ও মনোরঞ্জন যথাক্রমে ‘কালকৈত’ ও ‘ভাভুরামের’ ভূমিকায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। চিত্রেও তাঁহারা এই দুইটি ভূমিকাতেই নামিয়াছেন। সুসাজের অংশে মোহন রায়কে মানাইবে সুন্দর—ইহার উপর সামান্য অভিনয় করিতে পারিলেই তিনি চিত্রকগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন। তিনকড়ি চক্রবর্তী সর্দাররূপে দেখা দিবেন এবং তাহা যে এক অপূর্ণ সৃষ্টি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। নাম-ভূমিকায় শিববালার মনোনিয়নকে আমরা সমর্থন করি। তিনি শক্তিমতী অভিনেত্রী তাহার উপর ব্যাধ-কণ্ঠা রূপে তাহাকে মানাইবে চমৎকার। গীত-বহুল ভূমিকায় রাধারানী, মহামারা রূপে শাবিত্রী, সুসমা রূপে চিত্রা নিজেদের ভূমিকায় সুনাম অর্জন করিবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা চক্রবর্তী মহাশয়ের এই নব-উদ্ভব লক্ষ্যমণ্ডিত হইতে দেখিলে বিশেষ সুখী হইব। ছবিখানি ‘উত্তরা’র আলিতেছে শীঘ্রই।

দীক্ষা পিক্চাস

কালী ফিল্ম টুডিওতে গৃহীত এই প্রতিষ্ঠানের হালি-নক্সা “রেশমী-রুমাল” আগামী ১১ই জুন ‘শ্রী’ চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। হালি-র গল্প হিলাবে “রেশমী রুমালে”-র ভিতর যথেষ্ট পরিমাণেই হালি-র খোঁরাক আছে এবং সেই লগ্নেই এই নাটক-খানি মধ্যে বহুদিন ধরিয়া লামারণের মনস্তত্ত্বে সমর্থ হইয়াছিল। পর্দায়ও ছবি-খানিকে তৎপেক্ষা সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্ত পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী, লক্ষ্যমণী মণ্ডল, অলোক-চিত্র-শিল্পী ননী লাতাল প্রভৃতি চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। এই সকল শ্রমী শিল্পীর যোগাযোগে ছবিখানি ‘শ্রী’ চিত্র-গৃহে যে বেশ কিছুদিন চলিবে। একথা বলাই বাহুল্য।

মেট্রোপলিটন পিক্চাস

শ্রীযুক্ত বি. এল. খেমকার উদ্ভব ও উৎসাহের আমরা প্রশংসা না করে পারি না। নানা বাধা-বিশ্র তুচ্ছ করিয়া তিনি ইতিমধ্যেই শ্রীভারতলক্ষী পিক্চাস টুডিও-এ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে নাট্যকার সমন্বয় রায় রচিত ‘খনা’-র চিত্র-লক্ষ্যের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। জ্যোতিষলক্ষ্য-পারদর্শিনী ‘খনা’ শুধু গণনা-নিপুণতার জন্যই নয়—নারীত্বের গরিমায় তিনি আমাদের নমস্কার। নারীর মহিমায়িত নারীত্ব এবং পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার ছবিবার আকাঙ্ক্ষার হৃদে মহিমায়িত ‘খনা’ স্বয়ং নিজের জিহ্বা ছেদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ‘খনা’-র জীবনকাহিনী এই জন্যই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ‘খনা’ চিত্রে শ্রীমতী তারা দেবী, অরুণা, অরুণা চৌধুরী, সুশীল রায় (এ), অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গ অভিনয় করিতেছেন। তৎকালীন লালসজ্জা ও দৃশ্যশোভার বাছাতে ‘খনা’ লক্ষ্যমণী সুন্দর হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্ত খেমকার বিশিষ্ট লক্ষ্যমণী শ্রীউপের

ওরিজিনালের অপমৃত্যু

(রস রচনা)

ইফেলু চক্রান্ত

১

নির্ধাষের উত্তাপ তরঙ্গ যখন সারা গাঁথানি
পুড়িয়ে দিয়ে গেল, লক্ষ্যার প্রাকালে হু'
এক পসলা বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ
সমীরণ এসে তাকে লজ্জীবিত করে দিলে।
প্রকৃতির এই শাপন ও পালন দেখে কবি
ককরীনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন
না—খাতা কলম নিয়ে উঠলেন ছাচের উপর
হু' একটা ভাবপূর্ণ কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে।
কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা বার্থ হয়ে গেল
নিজ্জাদেবীর অভ্যাচারে। হাতের কলম

নাথ গোপালী 'খনা' চিত্রের নিঃসংশয়
শাকলোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।
রূপবাণী

এই শনিবার হুইতে রূপবাণীতে
শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচারের জনপ্রিয় নৃত্য-
গীতবহুল কথাচিত্র 'আলিবাবা' প্রদর্শিত
হইবে। 'আলিবাবার' রোমাঞ্চকর কাহিনী
চিরদিন আমাদের কাছে চিরমুতন রূপে
আনন্দিত করেছে, 'মজিনার' চরিত্রে নৃত্য-
গীত-পাটিরনী রূপময়ী শ্রীমতী সাধনা বোসের
অভিনয় আপনাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিবে।

আগামী শনিবার ৪ঠা জুন নিউ-
থিয়েটারের নূতনস্তম ছবি অভিজ্ঞান
আগিতেছে।

পূর্ণধিরোটার

হুক্ত নবম সপ্তাহ শেষ করে আসছে
শনিবার থেকে দশম সপ্তাহে পড়বে।
পূর্ণ-ধিরোটার 'হুক্ত' যে একটা রেকর্ড
স্থাপন করতে পারবে এ আমরা অনেক
আগেই জানিয়েছিলাম।

হাতেই রইল, অসংলগ্ন মধ্যে তিনি তজ্জাতিভূত
হয়ে পড়লেন।

সংসার বলতে তিনি নিজ, তাঁর স্ত্রী
ফান্তনী ও একটা ভৃত্য। তিনি একাধারে
গাঁয়ের ডাক্তার, কবি ও অবৈতনিক নাট্য
লক্ষ্যধারের শিক্ষক—এক কথায়, বেশ একজন
মাতৃগণ্য নামজাদা লোক। গাঁয়ের কোথাও
যদি কোন সভা, সমিতি হয়, ককরী
মণ্ডলকেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে
হয়। তিনি বক্তৃতা করেন গাঢ় নয়—
পুষ্ট। তিনি যখন অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের
মধ্যে তাঁর নিজ রচিত অসংলগ্ন কবিতা
আঙড়াইতে আরম্ভ করেন, বোধগম্য না
হ'লেও তাদের জোর গলায় স্বীকার করিতে
হয় যে, ককরীবাণী বাস্তবিকই একজন
উঁচুঘরের কবি। লেখিন গাঁয়ের পাঠশালার
পণ্ডিত মহাশয় চাকরী থেকে যখন অবসর
গ্রহণ করেন—তখন লেই সভায় তিনি
রাবীন্দ্রিক ছন্দে বলেছিলেন :—

“এ পারের খেলা লাগ করে,

চলিলে গো তুরি ওপারে।

জীবনের পার কোন পারে গিয়ে—

শুধুই কাঁধালে আমরাই॥”

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণটা ছাঁৎ করে

উঠলেও, গাঁয়ের লকলেই ত করতালি
দিয়েছিলো, বাহবা দিয়েছিলো, বলেছিলো
ককরীবাণী হুখে যেন যা পরম্বর্তী
বিরাজমান। এ ছেন প্রতিভালম্পন্ন জনপ্রিয়
ককরীনাথ যে গ্রামের নেতা বলে গণ্য
হবে, তাতে আর অশ্চর্য্য কি।

রাত্রি তখন অনেক হবে। সারা
গাঁথানি স্নহুপ্তির কোণে শায়িত। মাঝে
মাঝে পার্শ্ববর্তী বাগানের ঝাউ গাছের উপর
থেকে হু' একটা পেঁচক গ্রামের নিশ্চলতা
ভঙ্গ করে রাত্রির গভীরতা জ্ঞাপন করছে।
এমন সময় হঠাৎ বাহির হতে একজন ডাক
দিলে “ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু ডাক্তার-
বাবু বাড়ীতে আছেন।” হু' চার ডাকের
পর ডাক্তারের ঘুম ভেঙ্গে গেল ধড়মড়
করে উঠে সাড়া দিলেন “কে হে”।
কাঁধ কাঁধ করে আগন্তুক উত্তর দিলে “আমি,
আমি—বাহির দীঘি গ্রাম থেকে এসেছি,
বড় বিপদ, একবার দয়া করে আসতে হবে।
ছেলেটা আমার গাছ থেকে পড়ে গিয়ে
অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।” বিরক্তি লহকারে
ডাক্তার ককরীনাথ বলেন “এত রাত্রে পাঁচ
ক্রোশ পথ যাওয়া ত আর ছুটি খানি কথা
নয়, টাকা বেশী লাগবে, যদি রাজী হও, যেতে
পারি, নতুবা অস্ত্র দেখ”—

“আজ্ঞে অস্ত্র আর কোথায় দেখব বলুন,
আপনার মত বিচক্ষণ ডাক্তার আর কে আছে
বলুন, আপনি যা চান তাই দোব, দয়া করে
আমুন” আগন্তুক জবাব দিলে।

“আচ্ছা, তা হ'লে দাঁড়ান” বলিয়া
ডাক্তার বাবু তাঁর পুরাতন ভূতাটিকে ঘুম

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্তত্বেয় মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

থেকে তুলে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন
রোগী-চিকিৎসার। যাবার সময় ফাস্তুনীকে
বলে গেলেন লহর দরজা বন্ধ করে দিতে,
তিনি অচিরেই ফিরে আসবেন। চোখ
রগড়াইতে রগড়াইতে ফাস্তুনী উঠে দরজা
বন্ধ করে দিলে এ রকম একলা থাকা তার
অভ্যাস আছে কারণ স্বামীকে প্রায়ই রাতে
বাহিরে ঘাইতে হয়। কিন্তু ঘোষের মধ্যে এই
যে স্বামী বাহিরে থাকলে তার কেমন খুশি আসে
না। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত বিছানার
দুয়ে এ পাশ ও পাশ করে সময় কাটিয়ে
যেয়। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে লহর দরজার
করাঘাত শুনে ফাস্তুনী জিজ্ঞাসা করলে
“কে?” উত্তর এল “দরজা খুলে দাও, আমি
ফিরে এসেছি” ফাস্তুনী দরজা খুলে দিলে
উপরে উঠবার সময় জিজ্ঞাসা করলে “এত
শীঘ্র এলে পড়লে”—হ্যাঁ, বিশেষ কিছু নয়,
হাটটার একটু লেগেছে”—তারপর উপরে

উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিতেই তার নকল
স্বামী একখানি ছোরা বাহির করিয়া ফাস্তুনীর
সামনে ধরিয়া বলিল “বা আছে, লব বার
করে দাও নতুবা খুন করে ফেলব”—
ফাস্তুনী এক রকম অর্ধবুদ্ধিত হয়েই পড়েছিল।
আঁচল থেকে চাবিটা ফেলে দিয়ে বলে “খুন
কোরে না বাবা, ঐ ব্যাঙ্কে সব আছে।”
দুর্ভাগ্যবান খুলে ডাক্তার ও কবি ককরীর
লজ্জিত বা কিছু ছিল লব লুটে নিয়ে চলে
গেল—ফাস্তুনী বুদ্ধিত হয়ে পড়ে গেল।
এই ঘটনার অব্যবহিত পরে ককরীবাবু
ফিরে এলেন এবং লহর দরজা খোলা দেখে
একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি
উপরে উঠে ব্যাপারটা দেখে একেবারে
স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। গ্রীর মুখে চোখে
জল দিয়ে তার লজ্জা ফিরিয়ে এনে
লম্বা শুনে নিজের কপালে করাঘাত
ক’রতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে

ধারণা করলেন যে ফাস্তুনীর
নির্বুদ্ধিতার জন্যই আজ তাকে পর্ত্ত্বাস্ত
হ’তে হ’ল। কিছুক্ষণ পরে জীবৎ বিরক্ত-
লহকারে তিনি বললেন “তুমিই ডোবালে
ফাস্তুনী, তুমিই ডোবালে। তুমি ফুলে পড়া
মেয়ে বলেই না তোমাকে বিয়ে করেছিলাম—
তোমার এ উপস্থিত বুদ্ধিটা তত্ততঃ থাকা
উচিত ছিল যে একবার টেনে দেখি Original
কি false—আমার পর্ত্ত্বাস্ত লুটে নিয়ে চলে
গেল—সবল মাত্র রইল এই মাত্র পাওয়া
visit-এর এই কয়টা টাকা”—বলতে
বলতে ককরীবাবুর চোখ জলে ভেসে গেল,
তিনি উদ্ভ্রান্তের মত বলে পড়লেন।

কথাগুলো শুনে দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক
ফাস্তুনীর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। সে
চীৎকার করে বলে উঠল “বিয়ের আগে
আমার বাবার উচিত ছিল তোমাকে পরীক্ষা
ক’রে দেখা, বাস্তবিক তোমার কোন পদার্থ

ইউনাইটেড টকীজ

—ঃ প্রথম চিত্র নিবেদন :—

□ ছন্দা □

পরিচালক : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রযোজক : অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কথা ও কাহিনী : মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত

—ঃ ভূমিকায় :—

জ্যোৎস্না গুপ্তা

চিত্রা দেবী

সুশীল মজুমদার

মনোরঞ্জন লাহিড়ী

নৃপতি চ্যাটার্জি

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

প্রফুল্ল দাস

রঞ্জিত রায়

বিভূতি গাঙ্গুলী

শীতেন্দ্র পাত্র

আছে কি না—আমার মনে হয় তা হ'লে আজ আর আমার এ অপবাহ লজ্জা ক'রতে হোত না। তুমি বলছ কি—আমার লজ্জা ক'রবার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে? টেনে দেখবার আমার কোন কারণ থাকতে পারে? দুর্ভাগ্য, তোমার গলার স্বর পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় নকল করে ছিলো—তা জান? আচ্ছা ধর, আমি যদি টেনেই দেখতাম—কল কি হ'ত—আমাকে একলা পেয়ে সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তার উদ্দেশ্য লাভন ক'রত না? তুমি তোমার কেবল টাকটাই দেখছ। আমি ত আমি—যবরের কাগজে পড়ে দেখিছ কি—যে পাষাণেরা running train থেকে স্ত্রীর মন্থন মুখার্জীর ও লম্বা অপহরণ করেছে। যাক, তর্কে কাজ নেই, বাস্তবিক যদি আমি একটা আবর্জনা, একটা অপদার্থ, একটা বোকা, তুমি অনায়াসেই আমার লজ্জা লম্বা ত্যাগ

করতে পার" বলিয়া কাস্তুরী বিদ্যাৎ বেগে ঘর হ'তে বেড়িয়ে গেল।

"আ-হা-হা, রাগের কি কারণ আছে, শোন, শোন, আরে এ দিকে এস। আমি বুঝিতে পারছি, তোমার বিশেষ কোন ঘোষ নেই" বলিতে বলিতে ককরীবাণু তাহার অনুসরণ করলেন। কাস্তুরী ইতি মধ্যে তার ঘরে ঢুকে বিছানার মুখ শুক্রে কৌপাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সব হারানোর জন্য তার হৃৎথ নয়—হৃৎথ হয়েছে তার স্বামীর কথায়—সুগে পড়া ঘেয়ে সে—তাকে কি না বলে... ছি ছি ছি ছি লজ্জায় তার মাটির মধ্যে প্রবেশ ক'রতে ইচ্ছা ক'রছে। একটা অপদার্থ স্বামীর হাতে প'ড়ে তার কি লাঞ্ছনা—অপদার্থ নয়? নিশ্চয়ই—মনে মনে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হ'য়ে লম্বা দাড়ি রেখেছেন, লম্বা চুল রেখেছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লজ্জা কোন পরিচয়ই নেই

তার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে কে বুঝিয়ে দেয়—কাস্তুরী নিজে। কবিতা রচনা ক'রতে তাকে শিখিয়েছে কে—সে নিজে। সে সব কথা ভুলে গিয়ে, আজ কি না তাকে অপমান।

ব্যাপারটা একটু ঘনিষ্ঠ এনেছে দেখে ককরীবাণু কাস্তুরীকে বুকের মধ্যে টেনে এনে বলেন "আমার অন্তর হয়েছে তোমার ঘাড়ে ঘোষ চাপান—আমার কপালের ঘোষ। বাস্তবিক ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন—দুর্ভাগ্য তোমার উপর কোন অত্যাচার করে নি। তুমি রাগ ক'রো না আমার উপর, এল আমার হৃৎথনে একটা গোলেনাশা ক'রে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি ক'রে নি। দেখ পাষাণেরা যখন একবার কৃতকার্য হয়েছে, তখন আমার মনে হয়, তারা আবার আসবে হয়ত অন্য কোন উদ্দেশ্যে—তাই বলি এবার থেকে বিশেষ

মুক্তি প্রতিক্ষায়

কর্ম বীর

শ্রীসীতারাম সিনেটোনের অবদান—

—ঃ ভূমিকায় :—

মাষ্টার খলিল— মহম্মদ ইসাক— মাষ্টার জয় শঙ্কর—
চম্পা বাই— রাধারাণী— ললিতাদেবী— রহমৎ বাই—
পুটলি বাই ইত্যাদি—

নিউ আলফ্রেড . টেকী—চিত্রগ্রহে।

—ঃ একমাত্র পরিবেশক :—

এম্পায়ার টেকী ডিস্ট্রিবিউটস

বিঃ, ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা।

ভাবে সাবধান হতে হবে আমাদের।
দেখ, এবার থেকে তুমি এক কাজ করবে—
দরজা খোলবার আগে প্রত্যহ একবার
টেনে দেখবে সেটা original কি false.

ফাস্তনী স্বামীর কথার কতকটা আশ্রয়
হয়ে বলে “দরজা খোলবার আগে কি করে
টেনে দেখবে—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে
গেল”—?

ক্রটি কুক্ষিত করে ককরীনাথ উত্তর
দিলেন “কেন, বৈঠকখানা ঘরের জানালার
ধারে আমি এলে দাঁড়াব আর তুমি টেনে
দেখে তবে দরজা খুলে দেবে”—

হাস্তে হাস্তে ফাস্তনী বলে “বৈঠক-
খানার জানালার ধারে আসাটাই ত একটা
শুণ লঙ্ঘন আবার টেনে দেখতে হবে
কেন”?

বাড়িটি গভীরভাবে নেড়ে ককরী বাবু
বলেন “দেখ ফাস্তনী, মেরেয়া বতাই লেখাপড়া
শিখুক না কেন, পুরুষের চেয়ে তাদের বুদ্ধি
কখনই তীক্ষ্ণ হয় না। এই দেখ, তুমি রাগ
ক’রছিলে, অথচ এটা তোমার মাথায়
এল না যে সেই দুর্বৃত্তই হয়ত একদিন
ঐ লঙ্ঘনটা অন্তরাল থেকে দেখে অশুক্রণ
ক’রতে পারে এবং আমারই মত এলে
জানালার দাঁড়াতে পারে”—

লজ্জিত হয়ে ফাস্তনী হার স্বীকার করে
দুচক্রে হেলে বলে “আচ্ছা তাই হবে, প্রত্যহ
রাত্রে যখন তুমি ফিরবে, আমি টেনে দেখে
তবে পট্টলাকে দরজা খুলে দিতে বলব”—
বলা বাহুল্য তারপর থেকে প্রত্যহ লোলেনামার
লব্ধ অঙ্গুসারে কার্য আরম্ভ হয়ে গেল।

—হুই—

বহুকাল থেকে পুরাতন প্রাণ অঙ্গুসারী
অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে গ্রাম্য দেবতার নাট-
মন্দিরে মহালমারোহে বাত্রা, কীৰ্ত্তন. অভিনয়

ইত্যাদি হয়ে আসছে এবারেও গাঁয়ের
অবৈতনিক নাট্য-লম্পাদারের উদ্যোগে তথায়
এক বিরাট অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে।
কবি ককরীনাথই এই নাট্য লম্পাদারের
শিক্ষক। অভিনয় হবে ‘জয়দেব’—কিন্তু
গাঁয়ের মধ্যে ‘পরশরামের’ ভূমিকার অভিনয়
করবার উপযুক্ত লোক না থাকায় অন্তত
হ’তে একজন সুবর্ণ গায়ককে এনে অভিনয়টি
লক্ষ্য লক্ষ্য করবার প্রচেষ্টা হয়েছে।
গ্রামের পুরুষ-পুঙ্খবেরা তাদের লম্পত
শক্তি ও উৎসাহ প্রয়োগ করে আজ
অভিনয় ব্যাপারে মেতে আছে। পড়ে
আছে কেবল তাদের শিক্ষক ককরীনাথ
নিজের গৃহভূমিতে। তাঁর মানসিক অবস্থার
একটু ব্যতিক্রম ঘটেছে। ডাকতে লক্ষ্য
লুটে নিয়ে গেছে। ভিজিটের করেবটা
টাকার ভাণ্ডে এখন লম্পার চালাইতে হয়
অন্তরায় রাত্রে ডাক উপেক্ষা করা তার কোন
উপায় নেই। আর এমন গ্রহের ফের যে
এর পর হতেই প্রত্যহ রাত্রে ডাক আসে
কারণ গাঁয়ের চারিদিকে টাইফয়েড, নিউ-
মনিয়া ইত্যাদির প্রকোপ বেড়েছে। আর
ফিরিবার কালে প্রতাই পরিকার উত্তীর্ণ
হয়ে তবে গৃহে প্রবেশ করতে হয়। এই
পরিকার কলে, তাঁর বাড়ির বেশাণ্ডে কি
যে অলম্ব ব্যথার সৃষ্টি হয়েছে—তা কেবল
অন্তর্যামীই জানেন। এবং কতক কতক
কেশশূন্য উৎসাহীও হয়ে গেছে। তিনি
বেদনা ক্রিষ্ট অন্তরে কেবল রবীন্দ্রনাথকেই
বোঝা করেছেন “হে রবীন্দ্রনাথ, তোমার
অন্তই আজ আমার এই দশা আমি যদি
তোমার মস্তে বীক্ষিত না হয়ে বাড়ি না
রাখতাম তা হ’লে এ হেন যন্ত্রনা

আমার লম্ব ক’রতে হ’ত না।
লম্ব বাড়ি টাট্টে কোড়ার মত হয়ে
আছে, তার উপর ও আমার প্রত্যহ টেনে
দেখা—এই টানবার লম্ব আমার যে কি
যন্ত্রণা হয় তা কেবল তিনিই জানেন। ছেলে
বেলায় বাবার কাছে শুনেছিলাম, লামনার
লিঙ্কলাভ ক’রতে হ’লে অনেক বাধা বিঘ্ন,
অস্তরায় ও দুঃখ কষ্ট আছে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ
আমি এ কষ্টও লম্ব ক’রতে পারি যদি
আমার লামনা লিঙ্ক হয়”—বলতে ব’লতে
ভক্তিপূর্ণ আঁখি দুটি হতে দু’চার কঁটা
তলু অশ্রু নির্গত হয়ে বাড়ির কেশশূন্যের
মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এদিকে ঠাকুর তলার একটা হৈ চৈ
পড়ে গেছে—অভিনয় ব’লব ব’লব হোলো
অথচ মণ্ডল মশাইএর দেখা নেই। তাঁর
অল্পপ’হিত উপেক্ষা করে অভিনয় করবার
শক্তি ও ইচ্ছা তাদের নেই। তিনি লামনে
থাকলে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে অভিনয় করে
দর্শকবৃন্দের প্রীতি ভাজন হতে পারে। তাই
তারা দলবদ্ধ হয়ে ছুটে এল মণ্ডল
মশাইয়ের দরজায়। তাদের এ হেন কাতর
প্রার্থনা মণ্ডল মশাই বা কি করে উপেক্ষা
করেন। বাতের অন্তই তাঁর এত স্নান
—যারা তাঁকে শুকর স্তায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে
তাদের উৎসাহিত করতে মণ্ডল মশাই সকল
লম্বই স্বীকৃত ছিলেন, মাঝখান থেকে একটা
ঝোড়ো হাওয়া এসেই না লব গোলমাল
করে দিলে। বাহা হউক—তিনি তাঁর
লম্ব দুঃখ ঠেলে ফেলে দিয়ে নাট্য লম্পাদারের
সভ্যগণের উৎসাহ বর্জন বেতু চলে গেলেন
নাট মন্দিরে—বাড়ীর মধ্যে রইল কেবল
ফাস্তনী ও তাদের পুরাতন ভৃত্য।

(ক্রমশঃ)



ইন্দিবিমাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

রিত্তা

শ্রীশ্রীশ্রী কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাস। হুপুর বেলা, ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিলো, তার আর বিরাম নেই। রাত্তার লোক চলছিলো কম। বিজানার গুরে লামনের খোলা জানালা দিয়ে উষা চেয়ে ছিলো মেঘলা আকাশের পানে; বৃষ্টি উষাল। চিরদিন সে এই বর্ষাকে ভাল বাসতো, কিন্তু—আজ সেই বর্ষার স্মৃতি তার প্রাণে বিষাদ জাগিয়ে দিচ্ছে।

জীবনের চলা পথের কত স্মৃতি মনে পড়লো। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপের বাড়িতে সে যখন ছিল, ভোরের আলোর নির্মলা, শান্তি, কুসুম, মালতীর সঙ্গে বাগানে সে ফুল তুলতে যেত—তারপর মালা গাঁথার প্রতিযোগিতার হার--জিৎ—আড়ি--ভাব। বর্ষায় যখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তো—কাগজের নোকা করে সেই জলে ছাড়া আর তার জন্ম মা-বাপের তিকার ও লাহুনা। দিনের পর দিন কেটে গেল, সে পেলার স্মৃতি পিছনে ফেলে নির্মলা, শান্তি, কুসুম, মালতী, সকলেই শগুর বাড়ী চলে গেল।

বাপ-মায়ের এক মাত্র মেয়ে বলে তাড়া-তাড়ি উষার বিয়ে দিতে মা-বাপের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বলেন—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এতে কারো হাত নেই। কাজে কাজেই মা-বাপের অনিচ্ছা লঙ্ঘনও একমাত্র প্রজাপতির দ্বৈতচেতনায় বরেন্দ্রই উষার বিয়ে হয়ে গেল। মা বিক্রাংসিনী শগুর বাড়ী লঙ্ঘন তাকে অনেক উপদেশ দিলেন। বাপ রমেশবাবু বিদ্যায়কালে জামাই প্রভাতের হাতে উষার হাত খানি তুলে দিয়ে কান্ডর কর্তে বলেন,—“বাবা, আমার একমাত্র মেয়ে আজ তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি দেখো। ভগবানের

নিকট প্রার্থনা করি তোমারা দু'জনে সুখী হও।” তারপর উষা চোখের জল ফেলতে ফেলতে গাড়ীতে উঠলো। বাল্যের শগুর ও স্মৃতি-বিজড়িত বাসস্থান ছেড়ে চলে গেল সে দু'রে অনেক দু'রে।

শগুর বাড়ীর ঘরে এনে দাঁড়াল সে, নানা-লোকের মুখে নানা ভাবে রূপ-লম্বাচোচনার মধ্যে। শান্তুড়ী তাকে বরণ করে ঘরে তুললেন। শগুরের স্নেহ, শান্তুড়ীর বস্ত্রে, স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসার উষা কিয়ৎংশ বাপের বাড়ীর কথা ভুললো।

কিছুদিন পরে প্রভাত চলে এলো কলকাতার এম, এ পড়তে। স্বামীছাড়া নিঃসঙ্গ জীবন উষার কাছে ক্রমে একঘেয়ে হয়ে এলো; গোপনে বাপকে সে চিঠি লিখে দিলে তাকে নিয়ে বাবার জন্ম। শগুর, শান্তুড়ীর অনিচ্ছায় নানারূপ কাকুতি মিনতি করে রমেশবাবু উষাকে নিয়ে এলেন। উষা কিরে এলো আনন্দে তার বালা-স্মৃতি-বিজড়িত পুরাতন ঘরে। কিন্তু হায়! বাল্যের লীলাভূমি সে গ্রামকে বাল্যের বান্ধবীদের সে পূর্বের মত আর নিবিড় করে পেলে না। কিছুদিন পরে আবার তাকে ফিরে যেতে হ'ল তার স্বামীর ঘরে। মাঝে মাঝে প্রভাত কলকাতা থেকে বাড়ী যায়, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত একটা মধুর রজনী—তাই বিরহী আত্মার মিলন—মনে হয় এ সুখরজনী যেন ভোর না হয়। নানারূপ মান-অভিমান হালি-কান্নার মধ্যে রাত্রি তাড়ের কীকি দিয়ে চলে যেত। ভোরের বাতানে দু'জনে ঘুমে অচেতন। প্রভাতে নানা পাখীর কলরবে ঘুম ভেঙে স্বামীর বাঙ্গপাশ থেকে মুক্ত হ'রে

দিশিয়ে দিত আপনাকে লংগারের কাজে—নারীর বৈদগ্ধ্যের কর্তব্যে—ভবিষ্য-গৃহীণপাণ শিকানবিশীতে।

কিছুদিন পরে প্রভাত বাপকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে, সে এক ফিল্ম-কোম্পানীতে চাকরী পেয়েছে মাইনে বেশ ভাল। কাজেই তার পড়বার ইচ্ছা আর নেই। সে ফিল্ম কোম্পানীতে চাকরী করবে। এই পত্র পেয়ে তার পিতা অমরেশবাবু জীকে বলেন—“গিরি! বড় আশাকরে ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছিলুম, মাহুদ হবে, লেখাপড়া শিখবে। কিন্তু সে আমার লিখে জানিয়েছে—“এক ফিল্ম কোম্পানীতে চাকরী পেয়েছি, আমি পড়বো না।” রাগে গর-গর করতে করতে তিনি ফিল্মের অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনযাত্রা ও চরিত্র লক্ষ্যে হে সব মস্তব্য করেন, তা শুনে উষার বুক কেঁপে উঠলো। মনে মনে ভগবানকে ডেকে প্রার্থনা করে—“ঠাকুর তাঁর স্মৃতি দাও।” কিন্তু সে প্রার্থনা ফল হ'লো না।

অমরেশবাবু পত্র দ্বারা প্রভাতকে জানিয়ে দিলেন—“বহি তুমি আমার অমতে ফিল্ম-কোম্পানীতে চাকরী করে, তা হ'লে তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না এবং আমি তোমার মুখবর্শন করা পাপ বিবেচনা করবো।” অভিমান, রাগে প্রভাত তার উত্তর কিছুই দেননি। নামের মোহ প্রভাতকে উদ্বুদ্ধ করে দিলে, জীর ভালবাসা মাতা-পিতার স্নেহ সব উপেক্ষা করে ফিল্ম-কোম্পানীতেই সে কাজ নিলে।

এক বৎসরের মধ্যেই প্রভাত পরিচিত হয়ে উঠলো। কাগজ-পত্রে তার নাম দূর পল্লীতে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'লো। কিছুদিন পরে

প্রভাত নিজের ঘেঁষে ফিরে গেল। জীকে নিয়ে যাবে বলে সে ইচ্ছা জানালে। উত্তরে মা-বাপ বলেন—“তোমার ইচ্ছা।” বিছার কালে উষা কাঁদতে কাঁদতে বলেন—“মা আপনার ঘেঁষেকে ভুলবেন না।” উত্তরে অশ্রু উচ্ছলিত কর্তে শান্তী বলেছিলেন “তুমি আমার মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমার ভুলবো? আশীর্বাদ করি মা, যেন স্ত্রী হও।”

প্রভাত উষাকে নিয়ে চলে এ'লো বালীগঞ্জে এক তেতালা বাড়ীতে। চারিদিকে চাকর বাকর ছুটোছুটি করছে; সাহেবী কারখানার বাড়ীটা সাজানো। লম্বা বেঁচে শুনে উষা অবাক হয়ে গেল। আবার কোথায় এলো সে? কিছুদিনের মধ্যে লক্কোচের জড়তা কেটে গেল; স্বামী-স্ত্রীর মিলন মধুর হয়ে উঠলো। স্বামীর আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে উষা বুঝলে স্বামী তার চরিত্রহীন ও মাতালও নয়। স্বামী তার সেই স্বামীই আছে; কেবল বাহ্য চলে গেছে সে অজ্ঞান। বাক, তাতে উষার কিছুই এলো গেল না।

তারপর কালের পরিবর্তনে স্বস্তর শান্তী দ্বারা গেলেন। উষার জীবনে হাতুড় বেধা দিলে। তার নারী জীবন ধ্বংস করে স্বর্গের দেবশিশুর মত থোকা এ'লো এক নতুন অতিথি। তার পরিচর্যা উষা আশ্চর্য। কপট ক্রোধে প্রভাত প্রায়ই অভিযোগ করে “উষা তুমি আমার ভালবাসো না।” শঙ্কিত হয়ে উষা বলে—“আমি তোমার খুব—”... কথা শেষ হবার আগেই প্রভাত তাকে বুকে টেনে এনে লব শব্দ, কুষ্ঠার মীমাংসা করে ঘের একটামাত্র চুষনে।

সেদিন প্রভাতের শরীর ভাল নয়; তবু হুঁড়িতে সেদিন শূটিং থাকায় তাকে যেতে হলো। সেইটাই ছবির শেষ দৃশ্য। জল-ঝড়ের মধ্যে নায়ক নায়িকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে; সেই দৃষ্টে অভিনয় করে

প্রভাত বাড়ী ফিরে এলো অর নিয়ে। ক্রমশঃ অস্থির খুব কঠিন হ'য়ে উঠলো। খবর পেয়ে রমেশ বাবু বিজ্ঞানবানী সবাট এলেন। সূচিকেন্দ্রক ডাক্তার অনিল কৃষ্ণ চৌধুরী বথানাদ্য চিকিৎসা করেন কোন ফল হ'লো না। মাত্র পাঁচদিন রোগ ভোগের পর এম্মি এক বর্ষার হুপরে প্রভাত চলে গেল চিরদিনের তরে তার পোনার লংসার পিছনে ফেলে।

হাহাকারে শূণ্যতায়, শোকে উষার বুক ভেঙে গেল। রমেশবাবু, বিজ্ঞানবানী কঠোর চর্চাগো, শোকে মুহমান হয়ে পড়লেন। পত্রিকায় শোক-সংবাদ প্রকাশিত হ'লো লম্বা হয়ে লকলে শোক জ্ঞাপন করে নীরব হ'য়ে গেল। এই দুদিনে থোকাই উষার একমাত্র লক্ষ্য নইলো উষার চিন্তা স্তব্ধ হয়ে যায়, আর ভাবতে পারে না; শেষে কি সে পাগল হয়ে যাবে?

কত পূর্ণিমার রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরে ওঠে, কোকিল ডেকে ডেকে নীরব হয়, বাগানে ফুল ফুটে ঝরে যায়, কিন্তু যে তার বিরহিনী-প্রাণের শক্তি, সুখ ও আশা আজ সে কোথায়? উষার প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। চলার পথে কান্নাই তার সাথী! মুক্তি নেই—মুক্তি নেই। লোকে বলে এ জগতে বাক প্রয়োজন, পর জগতেও নাকি তাকে প্রয়োজন হয়। উষা থোকাকে বুকে আঁকড়ে রেখে ছিল, নিষ্ঠুর ভাগ্য দেবতার তাও লহ হ'লো না। যে থোকা ছিল উষার নয়নের তারা, আশার দীপ সেও তা'কে ফাঁকি দিলে। স্বর্গের দেবশিশু ফিরে গেল তার নিজের ঘেঁষে।

এ শোক উষা লহ করতে পারলে না, তিন দিন সে মুক্তি হয়ে পড়ে রইলো। যখন জান ফিরে এলো, তখন চর্চাগোর কোন নিরন্তর স্তরে সে' নেমেছে তা সে বুঝতে পারলে। স্বামী পুত্র-হারা রিক্ত। সে! অনেকদিন সে স্বপ্নের ঘোরে থোকা-স্রমে বালিলটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। কোথাও শিশু কর্তের কান্না শুনেই সে

অস্থির হয়ে ওঠে। মনে হয় থোকা “থোকা কাঁদছে।” স্বামীহারা পুত্র শোকাভার বিকল নারী ও মৃত্যু হাহাকার করে ওঠে; বিশ্বস্তির চরণে সে আবেদন জানায়—“প্রভু, আমার মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।” শ্রাবণের এই বাহুল-লজল হুপরে তার দুঃখের সৃতি তাকে বিমনা করে দি়রেছিলো। বাইরের জলের চাটু বিজ্ঞানার লাগতেই তার চিন্তা-সূত্র ভেঙে গেল। সেই শ্রাবণের রাত্রি যেন তারই মত প্রিয় হারার আকুল অশ্রু! জল-ভরা চোখে উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বিজ্ঞানায় লুটিয়ে পড়লো।

ডাঙরের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

বি বি ধ

জলসা

গত শনিবার রাত্ৰিতে সুলভের শ্রীমধীন্দ্র চন্দ্র সিংহের রামকান্ত বহু স্টীটস্থ ভবনে সম্মানী গায়ক শ্রীদিলীপ কুমার রায়, শ্রীযুক্ত ভীমসেব চট্টোপাধ্যায়, কুমারী হানি বহু, শ্রীনগিনীকান্ত সরকার প্রভৃতি গায়ক ও গায়িকাবর্গের সমাবেশে এক মধুর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলার ধরনী কুমার বহু, এডেয়ার ডট কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ জি, ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হারীত কৃষ্ণ দেব, অধ্যাপক নীরেন্দ্র নাথ রায়, অধ্যাপক প্রভাষ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রবোধ সাম্রাণ ও শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ভার সন্ধান

গত ২২শে মে রবিবার, ১০৭বি রাসবিহারী এ্যাভেন্যুতে মিঃ এস্ মুখার্জী মহাশয়ের ভবনে, দুর্ভার সন্ধানের বর্ষ অধিবেশন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সুরবি শ্রীযুক্ত শাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগত হানি গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি ঘোষ আধুনিক সাহিত্য লব্ধকে—প্রবন্ধ, অধ্যাপক সেনগুপ্ত, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সখীর ঘোষ—কবিতা, অধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছোট গল্প পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিভাষণের পর রাত্ৰি সাড়ে আট ঘটিকার সভার কাজ শেষ হয়।

বয়েজ ক্লাব

গত মাসে কালীঘাট বয়েজ ক্লাবের দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

হাইকোর্টের অত্রতম এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত বক্রিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতির আদান গ্রহণ করেন। প্রারম্ভে জাতীয়তার প্রতীক স্মৃতি বক্রিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম্” গানটি ক্লাবের সভ্য বিভূতি চট্টোপাধ্যায় গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের মনে এক অনুপ্রাণণা আনিয়াছিলেন তৎপক্ষে পঞ্চম বর্ষীয় বালক মাস্টার হিরণ সুলভিত ভাবে তবলার সঙ্গত করেন। ক্লাবের

কার্য্যাবলীর শেষে সমবেত ভক্তমণ্ডলীগণকে জনযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

‘রংমশাল’ বার্ষিক

গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে আশুতোষ হল ‘রংমশাল’ দলের বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্পাচার্য্য ডাঃ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতির আদান গ্রহণ করেন। সঙ্গীত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ পেন ও সম্পাদক



নূতন তারকা শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি

ছোট্ট একটি মেয়ে, তার প্রাণখোলা হাসি, সুমধুর সঙ্গীত ও অপক্লপ নৃত্য যে কিরূপ উজ্জল হয়ে উঠতে পারে চোখে তা না দেখলে বোঝা যায় না। অভিজ্ঞতা ও বয়সের দিক থেকেও কচি, অথচ যখন সুযোগ ও সুবিধা তাকে দেওয়া হল—যেখা গেল পূর্ণ মাত্রায়ই সে তার মধ্যবহার করেছে। এমনি ভাবেই যখন কেউ তার নিজস্ব প্রতিভা ও ক্ষমতার অপর সকলকে ডিজিয়ে যায় তখন যেম-যুক্ত সূর্যের জ্বালা তার বীণার দিকে সকলে অবাক হিম্মরে তাকিয়ে থাকে। “জায়গীরদার” ছবিখানা দেখলে ঠিক এই কথাই সর্বাঙ্গের মনে পড়ে।

এই ত’ কয়েকদিন পূর্বেও কেউ কি মায়া ব্যানার্জির নাম শুনেছিল? কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পারত, ঐ এক কোণে ছোট্ট একটি মেয়ে—তার ভেতর প্রতিভার অত প্রকাশ লুকান রয়েছে? অথচ সুযোগ যখন এল যেখা গেল অভিনয়ে, হাস্তে, গানে ও নাচে ঐ মেয়েটি হয়ে আছে প্রাণবন্ত। “জায়গীরদার” ছবিখানা দেখলে আগাগোড়া শুধু এ কথাই মনে আসে যে, একটি মেয়ের অভিনয়ে সমগ্র ছবিখানা কি করে অতি সুন্দর হয়ে উঠে।

শ্রীপ্রমোদ সিংহ উৎসবটিকে লাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য আশ্রয় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারই শ্রম আশাতীতভাবে সকল হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত অখিল নিরোগী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়ী। এক বাড়ীর একটি ছেলে ও অপর বাড়ীর একটি মেয়ে—সারাদিনরাত একই সঙ্গে খেলা করে বেড়ায় ও পাঠশালায় যায়। গুরু-মশাইকে কীকি দিয়ে অলপ মধ্যাহ্নে নদীর তীরে বলে থাকে—একটানা বর্ষার শ্রোতের কলকল শব্দে নিজেদের কণ্ঠ মিলিয়ে দেওয়া—এই ভাবেই ছেলেমেয়ে দুটি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। বৈশাখের এই প্রীতি বরষা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের পরিণত হয়। সে প্রেম স্বর্গীয় ও মর্ত্য। তারপর কত ঝড় কত বিপদ এল তাদের জীবনে—কিন্তু প্রেম তাদের আঁটুট রইল। ছেলেটি বলে, “উষা আমি তোমায় ভালবাসি, প্রাণ দিয়েও ভালবাসি, কিন্তু আমাদের এ মিলন হবে কী?”—মেয়েটি ত’ ছেলেই অস্থির তারপর বলে—“হেমশ, তোমার একথা মনে হয় কেন? মিলন ত আমাদের হয়েই রয়েছে। কেন অত ভয় পাও?”

‘না উষা, ভয় নয়, আমার মনে হয় তোমায় এত ভালবাসি, তুমি যদি আমার না হও নিশ্চয়ই আমি মরে যাব’।

এই উষার ভূমিকায় মায়া ব্যানার্জি অভিনয় করেছেন এবং এই একখানা ছবিতে অভিনয় করেই তিনি আজ সর্বত্র পরিচিত। অভিনয়ে গানে ও নৃত্যে সকল রকমেই তিনি দেখিয়েছেন সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করার পুংকার সভাই রয়েছে।

গত চার সপ্তাহ ধরে, প্রভাত দিনেয়ার লাগর সূতিটোনের হিম্ম-জি “জায়গীরদার” দেখান হচ্ছে, শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি উক্ত ছবিতে উষার ভূমিকায় যে নূতন রূপ দিয়েছেন তা প্রত্যেক চিত্রমোদীরই দেখা উচিত।

দম্পতি প্রভাত দিনেয়ার কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক রবিবার সকাল ১১ টায় তামিল ও তেলুগু ছবি প্রদর্শনীর যে বন্দোবস্ত করেছেন তা অত্যাবনীতরূপে লাফল্য লাভ করেছে। গত দু’ সপ্তাহে দুখানা ছবি দেখান হয়েছে, একখানা তামিল ছবি “বকযজ্ঞ” ও অপর খানা তেলুগু ছবি “কুঞ্জিনী কল্যানম্”। দুটিনই কলিকাতা প্রবাসী বহু মাত্রাজী এই ছবি দেখতে আসেন, ব্যবসায় দিক থেকে যে এ বন্দোবস্ত খুবই লাফল্য লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, তাছাড়া কলিকাতা প্রবাসী দক্ষিণ ভারতীয়দেরও এতদিনকার একটা বড় অভাব দূরীভূত হল।

আগছে রবিবার সকাল ১১ টায় তামিল ছবি “শুল বকাউলী” দেখান হবে, ছবিখানার আখ্যান ভাগ, নৃশাধি ও গান ইত্যাদি যে স্বর্নকরের ভাল লাগবে তার উল্লেখ নিম্নরোজন।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

আপনি কলিকাতার বসেই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ কর্তে পারেন। ভাবনানী ছবি “অমর প্রেম” শীঘ্রই প্রভাত দিনেয়ার দেখান হবে, এবং “অমর প্রেমের” অধিকাংশ নৃশাধিই কাশ্মীর হইতে নেওয়া। কাশ্মীরের নয়ন-সুন্দর নৃশাবলী, সুউচ্চ হিমালয় পর্বত শিখরে অপক্লপ সৌন্দর্য ও অবিশ্রান্ত তুষারপাত—যাবতীয় নৃশই স্বাভাবিকভাবে এই ছবিতে তোলা হয়েছে। তাছাড়া আয়োগিরির অনল বর্ষণের তরাবহ নৃশ ও ভূমিকম্পের তাণ্ডবলীলা, আপনাকে বিস্ময়ে হতবাক করবে, সকল রকমেই ছবিখানা প্রথম শ্রেণীর হবে বলে আশা করা যায়।

সুজাতার পরিচয়

শ্রীজ্ঞানময় সেনগুপ্ত

নিম্ন,

বাংলা ছাড়বার পর থেকে বাংলাদেশে আর যাই নি, তা'ড়া বা নিয়ে আছি তাতে সেখানকার কেউ আমার স্মৃতিতে এসে আমার বিরক্ত করতে পারে না, এমন কি ভুইও না। জানি তুই খুব Sentimental, ওসব সত্যিকথাগুলোই লিখে পাঠাচ্ছি।

যেদিন তোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সেদিন তুই জিজ্ঞেস করেছিলি কোথায় যাব, কেনই বা যাব। সে প্রশ্নের সমাধান জানা থাকলেও তখন বলতে পারিনি, বললে আমার এই অজ্ঞাতবাস, আমার এই নিকৃষ্ট যাত্রা বার্থ হ'ত। লোকসমাজের বাইরেই আমি থাকতে চাই, যেখানে সামান্য ক্রটির ভুলে লক্ষ প্রশ্নের উৎপত্তি হবে না, প্রায়-দ্বিষ্টের নাম করে, সমাজকে ব্যঙ্গ করে, স্বার্থ-হীন জন্তে সেখানে সমাজপতিরা এগিয়ে আসবেন না।

আমি কোথায় আছি জানিস—নাম বলব না, তবে বর্ণনাটা একটু দিয়ে দিচ্ছি। হয় মাইল লম্বা আর নাড়ে চার মাইল চওড়া জেট্টা একটু চর—চারিধিকে নীল-সমুদ্রের জল। বতসুর চোখ যায় শুষ্ক জল, আর যার বাইরে যেবার মত চোখের কামতা নাই সেখানে নীলাকাশের কোলে ওরা আপিয়ে পড়ছে। সমুদ্রকে কত ভাবেই যে দেখি! আজ প্রায় কুড়ি বছর ধরে দেখছি কিন্তু একঘেয়ে মোটেই লাগে না—তার নিত্য নতুন ভঙ্গি বৈচিত্র্য আনিয়ে দেয়। যখন হাওয়ার দাপে ধোলা

বিয়ে জলগুনে' নাচতে থাকে তখন মনে হয় পৃথিবীতে প্রায় ঘটলো ব্যর্থ! একশ গজ উঁচু হয়ে চেউগুলো যখন পাড়ের উপরে এসে আড়ফে পড়ে তখন মনে হয়না যে, ঐ বিশাল জলরাশির ধাক্কা এতটুকু দীপটা লইতে পারবে, কিন্তু বেশ লয়ে যাচ্ছে। এমনি হয় বোধ হয়, প্রথমে মনে হয় সওয়া মুকিল তারপর আপনি অভ্যাস হয়ে যায়। আবার যখন লম্বা স্থির হয়ে থাকে তখন এর চাইতে সুন্দর দৃশ্য আর হতেই পারেনা। Examination এর সময় যেখােচি Hall এ পাঁচল ছেলে বসেছে, একটু শব্দ নেই, সত্যতে যেখােচি কোন বক্তা এসে আলামতী বক্তৃতা দিচ্ছেন—দশ হাজার শ্রোতা শুনচে—টু শব্দটা পর্যন্ত নেই। তাও সুন্দর—কিন্তু এই সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা চলে না,—করতে গেলে হয়ত তা'দের নগ্নতার উল্লস প্রকাশ হবে যাত্রা!

দিনে দেখি সূর্যোদয়,—দিনের শেষে সূর্যাস্ত। এক, পক্ষে পর পর জলের সঙ্গে চাঁদের খেলা চোখে পড়ে। প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, আজও ভেমনটী, কিন্তু আশ্চর্য্য, এরা পুরানো হয় না। মজ পড়ে বিয়ে হবার মতই চিরপুরানো অথচ চিরনূতন।

হ্যাঁ, বা বলব। অনেক দিনের কথা, তোর মনে আছে কি না জানি না, তবে আমি এখনো ভুলিনি, ভোলবার কথাও নয়। সুজাতাকে জানিস ত! সেবারে ভারশেলন থেকে বি, এ পাশ করে সবে বেরল।

তোকেও ত একদিন দেখালাম—পাতলা গড়ন, রং কলা বলাই চলে; চুল হাতখোঁপায় বীধা, অথচ হুঁগাফা চুল একে বেকে বাড়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ত। মুখখানি নির্ভূত সুন্দর না হলেও attractive—যে দেখবে নিশ্চয় কিছুকণ তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু চোখদুটো বস্ত্রহরিনীর মতই চকল,—সুন্দর। সুখে যাত্রা ছাড়া ভাজ দিয়ে যখন পাতলা শাড়ীগুলো অক্টোপাদের বাঘনের মত গায়ে জড়িয়ে তুলত তখন সুজাতা ছিল uncomparable—অগন্ত আগুনের একটা ফুঁকি,—আকাশের গায়ে চমকানো একটা বিদ্যুৎ। মনে হ'ত চোখ ঝললে দিয়ে যাওয়াই তার কাজ, আলো বিতরণ করা নয়। তাকে আমি ভালবেলেছিলুম, সেও একদিন আমার বুকে মাথা রেখে বলেছিল,—

—তোমার ভালবেলে যা পেয়েছি, অনেক মেরের ভাগ্যেই তা জোটে না। ভাগ্যবতী আমি সন্দেহ নাই কিন্তু দেখো আবার কেড়ে নিয়ে না।

উত্তরে সেদিন কিছুই বলিনি শুধু তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলাম—ভরসা দেবার আশাতেই।

তুই জানিস আমি গরীবের ছেলে, সুজাতাকেও লুকাইনি। যেদিন বললুম 'হু', আমার ভালবেলে ঠকলে কিন্তু! আমি নেহাতই গরীব, বাড়ীতে ভাজা একটা খড়ের ঘর ব্যতীত পিতৃসম্পত্তি আমার কিছুই নেই। শিক্ষিতা মেরের মুখ সেখানে দেখবে না—

সে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, আমি শুনতে চাই না, ওসব শুনতেও আমার ভাল লাগে না! তোমরা যদি সেখানে থেকে বড় হতে পার তাহলে আমিও সেখানে আমার দিনগুলো অনায়াসেই কাটাতে পারব।

সেইটাই ত মুকিল হু, অভিযান ছিল বলেই আমাদের কষ্ট হয় না কিন্তু তোমার—

যেহেতু কষ্টকে বড় করে দেখলে লংলার করা চলে না। ‘দেবদাস’ে দেখনি পার্কে, দেবদাসকে অতটা ভালবাললেও স্বামীর ঘরে ছুঁতিনেই নাম কিনে ফেললে। দেবদাসকে হারাবার কষ্টটাই যদি সে ভাবত তা হলে তার স্তন্য কেনা হয়ে উঠত না।

—তা বটে, অচলা কিছু পারে নি।

—অচলার যে শক্তি ছিল—মৃণাল!

হেসে বললুম, এখানে যে মৃণাল নেই তাই বা তোমায় কে বলবে!

সুজাতাও হেসে ফেললে, বলল, এখানে মৃণাল থাকলেও ভয় আমার এতটুকু নেই। তার জন্তে আমি সুরেশের সাহায্য নিতে যাব না। নিজেরই বুঝিয়ে দিতে পারব।

—দুজনই হেসে ফেললাম।

সেবারে দিল্লীতে চাকরী পেলুম। সুজাতাকে জানাতেই সে বললে—তাই ভাল, বেশ হবে। শুধু হুঁজনার লংলার, বাইরের কেউ আসবে না বিরক্ত করতে।

ঠাট্টা করবার সুযোগ ছাড়তে পারলুম না, সুজাতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হেসে বললুম,—বাইরের না হয় কেউ নাই বা এল বিরক্ত করতে, কিন্তু ভিতরের কেউ এসে যদি বিরক্ত করে।

সুজাতার মুখ লজ্জার হাসিতে লাল হয়ে উঠল, অনেকক্ষণ আমার বুকে মুখ লুকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললুম,—

—আচ্ছা সু’, লংলার না হয় দুজনে করব, কিন্তু লংলারী হব কবে?

—বেশী দেরী নেই, মাঝে আর একটা মাল মাত্র বাকী, হেসে সুজাতা উত্তর দিল।

আনন্দে সুজাতাকে কাছে টেনে নিলাম, সেও এল আমার একান্ত লগ্নিকটে। মনে হ’ল, এমনকরে আত্মসমর্পণ কেউ কোনদিন করে নি।

দিল্লীতে appointment হয়ে গেল। দিন পনেরো পরের কথা, সুজাতার টেলিগ্রাম

পেলাম, আমার কলিকাতা যেতে হবে। চলে এলাম কলিকাতা, সুজাতা প্রায় কৈদে ফেলল, বলল, আমার তুমি নিয়ে যাও, এদের অত্যাচার আমি সহ্যে পারি না। আমার বাঁচতে দাও।

বললুম, এখন কোথায় নিয়ে যাব সু!

—যেখানে ছোক! না হয়, তোমার ভাড়া বাড়িতে।

তা হয় না সু।

তা হলে দিল্লী?

তাও হয় না!

—তা হ’লে, সুজাতা কৈদে ফেলল।

সুজাতাকে সাহসনা দিয়ে বললুম, দাঁড়াও, ভেবে দেখি। তুমি বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা ক’রো।

Eden Garden এ বসে আছি, অন্ধকার প্রায় ঘনিরে এসেছে। সুজাতা এসে আমার পাশটীতে বসল। অন্ধকারে তার মুখ ভাল করে দেখি নি কিন্তু উত্তেজনায় যে সে কাঁপছে তা বেশ বুঝতে পারলুম। তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলুম,—

—কি হয়েছে সু?

সুজাতা আরও কাছে সরে এল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আমার নিয়ে আজই তোমায় পালাতে হবে।

জিজ্ঞেস করলুম, কি হয়েছে খুলে বল!

—সে সব শোনবার সময় নেই। এ রাজ্যেই আমাদের পালাতে হবে। এমন জায়গায় যেখানে কেউ খোঁজ করবে না, থাকার মধ্যে থাকব শুধু আমি আর তুমি। আমাদের হুঁজনকে নিয়েই তৈরী হবে সমাজ; —আমাদের সংসার।

—কিন্তু দুজনকে নিয়ে ত বাস করা চলে না সু। বাঁচা, মরার উপর হাত কাউরও নেই, যদি—

সুজাতা বাধা দিয়ে বলল, কি বাজে বকছ! বল কোথায় যাবে!

—যেখি।

মাথায় কতগুলো বাজে চিন্তা এসে ভিড় করে দাঁড়াল। খুঁজে কিনারা পেলুম না, তাই গেলাম তোর কাছে। তুই যে জায়গায় কথা বললি সে জায়গা লোভনীর হলেও আমাদের অজ্ঞাতবালোপযোগী নয়। উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের যাত্রা নয়—নিরুদ্ধেশের পথেই আমাদের চলতে হবে। তারপর খুঁজে বের করলুম এই জায়গা,—সুজাতার brain আর আমার physical strength এর দরকার হ’লে আমাদের বালোপযোগী হয় গড়ে তুলতে। বাবুর উপর দর তুলতে হবে, সঙ্গে হাতিয়ার নেই, আছে শুধু সুজাতার এক বাস্তব গয়না আর হাজার পাঁচেক টাকা। বেচারী! ভাবতেও পারিনি যে, পৃথিবীতে এমন জায়গায় আছে যেখানে অর্থের মূল্য বোঝবার মতন লোক নেই। বলল, এ কোথায় নিয়ে এলে?

কেন? এই তোমার কল্পনার রাজ্য, এখানকার রাণী তুমি।

সুজাতা হেসে ফেলল, বলল, তা যেন হল, কিন্তু খাব কি! রাণী হলেই তো পেট ভরবে না! থাকব কোথায়?

—এলেই যখন পড়লাম তখন বাবুয়া যা ছোক একটা হবেই! ভগবান যাকে পৃথিবীতে পাঠান, তার জন্তে খাবারও সঙ্গে সঙ্গে মেপে রাখেন। আর যদি নেহাতই না খেয়ে মরতে হয় তবে বুঝতে হবে কপালে এই অপমৃত্যুই হয়ত লেখা ছিল।

আমাদের বিয়ে হ’ল ৩ মাস পড়ে নয়—চন্দ্র। সূর্য্য আর সমুদ্রকে লাক্ষী রেখে। অত বড় চরে দুটা প্রাণীর বেশ কাটিত—ছুটোছুটি, বেড়ান, লুকোচুরি খেলা, এই নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন চলে যেত। ঐ চরের বাইরে বিশাল জগৎটাকে আমরা ভুলে গেলুম। বাইরের কেউ দেখলে মনেই করতে পারত না যে, সুজাতা Graduali আর আমি M. A.; P. H. D.; —যেন খেলা ঘরের

অসীত আর অতসীর একটা সকাল

শ্রীলীলাময় দে

আর বুঝায়ো না আঁখি মেলি চাহ লজ্জা-জড়িত আঁখি
বেয়ারা কখন লকালের চা টেবিলেতে গেছে রাখি।
ওঠ ওঠ প্রিয়া এই নাও ধর ওঠের চুমা ষাও
অবলাধ বত দূরে চলে যাবে বেড-টিটা খেয়ে নাও।
তারপর ষাও, বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে
দহুটী তোমার নিপুন হস্তে সাজাও নিখুত বেশে।
মাঃ কী যে কর, লক্ষ্মীটি ছাড় আঁচল টেনো না, শোন,
পায়ের কিছু নেই, শাড়ীও অবশ—চাকর-বাকর কোন
পরে ঢুকে যদি দেখে ফেলে কিছু ম'রে যাবো লক্ষ্মারঃ
—ঠাণ্ডা যে হিম! ছুয়েই দেখ না? একি ছাই খাওয়া যায়
কাচে ব'সে ব'সে হাসছ' যে বড় হাসি পেল কিসে শুনি?
দীপ্গীর বল বলবে না? বেশ ত' চললুম একুনি।
মী যে লোক তুমি এখনত' কৈ বলনি বরকে ডেকে
এক কাপ চা, তাও আবার খেতে হবে নাকি মেগে?
পিলিতে বলিতে মুখ ভার ক'রে শব্দায় উঠে বলে
বসত করে দেহের বসন কোমরে আঁচল ক'বে
পুলের গোছাটা বাঁধিতে বাঁধিতে 'স্ট্রাণ্ডস' পায়ের দ্বিগে
পং-রজিনী অভিমান ভরে দাঁড়ালো লিড়িতে গিয়ে
"আরে কোথা যাও, রাগ হল নাকি?" অসীতে পুছিল হাসি
"বেয়ারাকে বলে চা আনিয়ে রাখ, বাথ-রুম থেকে আসি

"দেখি কটা বাজে? ওমা সাড়ে সাত! উঠিয়ে ষাওনি কেন?
'অটিন' থানা ফটকে এখুনি ঠিক করে রাখো যেন।"
"সে কি গো প্রিয়নী, অভিসারে যাবে অটিনে করে শেষে!"
"তাই যদি যাই, ভয় পেলে নাকি? দাঁড়াও বলছি এলে"
বলেই অতসী দ্বিগে ঝাঁকি হাসি, ঝাঁকি চাহনির তলে
চটির চটকে মুখর করিয়া সিঁড়ি বেয়ে গেল চলে...
অসীতকুমার লাকদিয়ে উঠে 'আল'গুলো ঝেড়ে কেলে
'সিগারেট' মুখে বলিল চেয়ারে সমুখে কাগজ মেলে।
কঠাৎ কি এক মধুর গন্ধ উঠলি উঠিল ঘরে
অসীত পুছিল—আললে কখন 'টয়লেট' শেষ করে?
"এই ত' এখুনি, চা কোথায় বল—পেরেকি, শুনবে তবে?
"নারী-জাগরণী সভার মিটিং 'প্রিভাইড' করতে হবে
"সাড়ে আটটায় মিটিং বলবে তুমিও চলনা সাথে?"
"যেতে পারি, শুনি ফিরবে কখন?—বেলা সেই বারটোতে!
"না না তবে আমি রইলাম ঘরে তুমি ঘেবী ষাও একা
আমায় আবার একটার আগে করতেই হবে দেখা।
ফোনেতে সাহসকে বারবার করে থাকতে বলেছি ঘরে
যদি বইখানা 'রূপবাণী' ঘরে ভালভাবে যায় তবে।
ব্যস বাজী মাং নামে ও টাকার নিমিষে হইব বড়...
"শেষ হ'ল বলা? কোচে গিয়ে বস যেতে ষাও মোরে—সর।"

খাী ছুটী ছোট্ট ছেলে-মেয়ে। আমাদের ছোট্ট, আমাদের লস্কান, ওদের বড় করে
একসাথে বেশ চলত,—একটুতে হত অভিমান
এর অতীতে যেতে হত তা ভালোতে।
শ্রায় দেখলে তার শান্তি ছিল,—চুপন।
মিমা তিলুম স্বর্গচূত ইভ আর আহম।
তারপর কেটে গেল কত বছর। আর
মই চপলতা আমাদের মধ্যে নেই। আমার
হিতে সজাতা হ'ল আরও বেশী মংঘনী।
যে যে ছুটী লস্কানের মা! কিছু বলতে
গলেই ছেলে বলত, চুপ, আগে মায়ের কর্তব্য
করতে ষাও, তারপর তোমারটা করব। ওমা

ছোট্ট, আমাদের লস্কান, ওদের বড় করে
ভুলতে হবে ত! আমরা যদি না দেখি তবে
মানুষ হবে কি করে! •
.....তারপর আজ বছর পাঁচেক হ'ল,
সজাতা নেই। কত চেষ্টা করলুম তাকে
আঁটকাতে কিন্তু পারলুম না। লস্কান হবার
আগে সে যে অত উচ্ছৃঙ্খল ছিল, তাও তাকে
যদি কোনদিন জড়িয়ে ধরেছি, সে নড়তে
পর্যন্ত পায়ের নি। সেদিন কত আঁকড়ে
ধরলুম, কিন্তু পারলুম না। সজাতা ঝাঁকি
দ্বিগে চলে গেল।

নাশি জানই, হু, এখানে ব'খন এলাম,
তখন তুমি ছিলে শাখী। কিন্তু যাবার বেলা
গেলে একা, আমি থাকি কি করে?

এ অভিযোগ তার কানে পৌছায় কি না
জানি না, তবে সেই দিনটার অপেক্ষাতেই
বলে আছি। জানি একদিন সে শুনতে
পাবেই। ছেলে ছোট্টোকে নিয়ে ভারী মুখিলে
পড়েছিলাম, তাই রেখে এলাম বসেতে এক
আশ্রয়ে আর বলে দ্বিগে এলাম তোর address.
আর্থিক কষ্ট ওদের কোনদিনই হবে না জানি,
তবু যদি মাড়পিতৃহীন হয় তাদের আশ্রয়
হিস।

সুজাতা যখন বার, জিজ্ঞেস করলুম, তুমি
ওদের যে আমার কাছে রেখে গেলে,
আমিও যদি তোমার মত একদিন হঠাৎ
চলে যাই।

উত্তরে সে হেসে বলেছিল, তোমার সেই
কথাটাই যে আমার একমাত্র ভয়না। জন্ম
যখন ওরা নিলই তখন ব্যবস্থাও একটা
হবেই। দিনরাত ভগবানকে ডেকে বলছি,
ভগবান, বার কেউ নেই, তার ভূমি আছে।
ওদের কেউ রইল না—ওদের ভূমি দেখ।
যিনি রইলেন, তাঁর উপরে ভরসা নেই—
নিজের খেয়ালই হস্ত তাঁর থাকবে না।

হু' চলে গেল। ভগবানের কানে তার
ডাক পৌঁছেছিল, ওরা আশ্রয় পেয়েছে।
তুমি আমিই রইলুম আশ্রয়হীন।

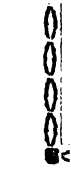
ছেলেরা বলেছিল ওদের সঙ্গে থাকতে,
উত্তরে হেসেছিলুম, বলব কি! ছেলেমানুষ
বইত নয়।

যে আমার জীবনে নিয়ে এল জগরণের
প্রেরণা,—বার কাছ থেকে পেলাম ফুল, ফল,
গন্ধের সৌরভ,—রূপ, রস মধুর স্বার্থকতা,
যে এককাল নিজে হাল ধরে আমার পারের
কাছে পৌঁছে দিলে, বাকীটুকু যদি বইতে
না পারি তবে আমার এ পারাপার মিথ্যে।
সুজাতা আমার জন্তে অপেক্ষা করে বসে
আছে।—যেখানে সুজাতার চিতা জালিয়ে-
ছিলুম, সেখানে রাজ বাই, বলি, সুজাতা
আমি অপেক্ষা করতে হবে না। ওরা আশ্রয়
পেয়েছে, আমার ডাকও পড়ল বলে। ভূমি
বাবার পর থেকে হাল বইছি আমি, দিক
ভুল হলে অশ্রু থেকেও জানিয়ে দিয়ে—
দেখো, পথ বেন না ভুল হয়।

আলা যখন লইতে পারি না, এত দূরেও
থেকেও যখন লংসারের কান্না আমার কাণে
ভেলে আসে তখন ছুটে যাই সুজাতার
চিতার উপরে, সেখানকার বাসু বুকে ভুলে
আকুল ভাবে বলি, হু' আমার রক্ষা করো,

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—তিন—

শ্রাবণের আকাশ যেন শতধা ছিন্ন
হইয়া গিয়াছে, অবিশ্রান্ত বারিধারার ফলে
রাজপথগুলি জলময় ও জনরহিত হইয়া
উঠিয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ বহুপাত, উন্নত বায়ুর
প্রচণ্ড কোলাহল নিশিথিনীর নীরবতা ভাঙ
করিয়া জনগণের হৃদয়ে ভীতির লক্ষ্য
করিয়াছে। এইরূপ প্রলয় রজনীতে
কলিকাতার কোন প্রকাশ্য রাজপথের একটা
অট্টালিকার সুজজ্বিত কক্ষে একটা অনিন্দ্য-
সুন্দরী তরুলী উন্মাদিনীর তায় পাছচারণা
করিতেছিল; এমন সময় ষড়িতে ঢং ঢং
করিয়া বারটা বাজিল। পরমুহূর্তেই প্রবল
ঝটিকা বেগে একটা গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইয়া
এ যে আর লইতে পারি না। তুমি নেই,
ওরাও নেই, তবু কেন লংসারের ডাক
এসে কাণে পৌঁছে!

—লব চুপ হয়ে যায়, শুধু দূর থেকে
ভেসে আসে হুঁচকারটা লাম্বজিক পাখীর
চিংকার। সারাজীবন যে আমার রক্ষা
করে এলো, আজও সেই আমার রক্ষা
করছে, তাকে ফেলে আমি যাই কি করে।
এখানকার আকাশ, বাতাল, জল, লবই
সুজাতার স্মৃতি মাথানো—আমার শেষ
নিঃশ্বাসটাও যেন এদের বেথতে দেখতে
বাতালের সঙ্গে মিলিয়ে যায়

ইতি;

তোমারই হস্তভাগ্য বন্ধ,

“লরিত”

গেল। তরুলী ছুটিয়া গিয়া রাজপথের বিকে
দৃষ্টিপাত করিল। তথার কোন ঘোটের বা
কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কি জানি
কোন এক অজ্ঞাত ভয়ে তাহার লম্বত শরীর
শিহরিয়া উঠিল। ক্যাবিনেটের উপর রাখা-
কক্ষের মুন্ডির কাছে গিয়া সে হাত জোড়
করিয়া বলিতে লাগিল, “হে ঠাকুর, যদি
কোন বিপদ হয় সে যেন আমার হয়;
আমার স্বামীকে রক্ষা কর, তাঁকে কিরিয়ে
এনে দাও।”

শুভ্রার বন্ধ-স্পন্দন যেন ক্রমেই বন্ধ হইয়া
বাইবার উপক্রম হইল; সে যে কি করিবে
কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সেই খানেই
বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, ষড়িতে একটা,
দুইটা করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। সে
নিজের অজ্ঞাতসারে মেঝের উপর শুইয়া
সুমাঁইয়া পড়িল।

এইখানে শুভ্রার কিছু পরিচয় দেওয়া
আবশ্যক।

শুভ্রা কোন ধনী জমিদারের একমাত্র
কন্যা; শুভ্রা দেখিতে অনিন্দ্যসুন্দরী।
তাহার পিতা দিলীপবাবু কন্যার শিক্ষার জন্ত
বায় করিতে কখনও কোন কপনতা করেন
নাই।

শুভ্রা ষোড়শ চড়া, লাঠি খেলা, ঘোটের
চালান প্রভৃতি লম্বত শিখিয়াছিল ও হিন্দু-
লংসারের যাবতীয় কাজ তাহার নিকট
অজানা ছিল না। দিলীপবাবু অকর্ণের সুন্দর
আকৃতি ও বিদ্যাবত্তার মুগ্ধ হইয়া একমাত্র
কন্যা শুভ্রাকে তাহার হস্তে নবৌতুক অর্পন
করিলেন। লভ্যই কোন শুভ মুহূর্তে
তাছাড়া দৃষ্টি বিনিময় হইরাছিল।

অরুণ ও শুভ্রা পরস্পর পরস্পরকে এতই ভালবাসিত যে কয়েক ঘণ্টা অবশ্রম ও তাহাঙ্গিরের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় উঠিত।

আজিকার এই আকস্মিক বিরহে শুভ্রা যে শুধু একটু ভীত হইয়াছিল তাহা নহে বিবিধ অলীক আশঙ্কা তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিত্যের লে স্বপ্নে দেখিল অরুণ যেন কাহার বাহুবন্ধনে বদ্ধ—তাহারই প্রাণপ্রিয় স্বামী অশ্রু নারীর বাহুল্যতায় বদ্ধ হইয়াও মুক্তিলাভের বিলম্বমাত্র চেষ্টা না করিয়া নিজেকে তাহার নিকট বিলাইয়া দিতেছেন। শুভ্রার যুম ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু তাহার মনে হইল কে যে তাহার বুকে বিশ মণ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। সে অতি কষ্টে উঠিয়া বলিল—দুই হাতে চোখ মুছিয়া চোখ খুলিতেই সে দেখিল তাহার বক্ষ হিবালাকে উদ্ভাষিত। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল পাঁচ মিনিট পূর্বে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ভূমিশয়া ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া দেখিল চাপরানী রামলাল অপরাধীর ভাষ্য দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রামলাল যুক্তকরে অর্দ্ধাংলার নিবেদন করিল—“মাইজী, বাবু কাল থেকে বাড়ী করেন নি। নীচে চার পাচটা রোগী তার জন্যে অপেক্ষা করছে তাহের কি বলা হবে?”

শুভ্রার বিগত রজনীর সব কথা মনে পড়িয়া গেল—সহসা তাহার বক্ষের ভিতর তুধূল আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইল। সে গুরু-কণ্ঠে বলিল, “তাইত রামলাল, কি হবে বলত।”

সহসা তাহার মনে পড়িল যে ত মোটর চালাইতে জানে, তাহার লাইসেন্সও আছে। বুদ্ধ রামলালকে সঙ্গে লইয়া সে স্বয়ং স্বামীর অব্যবধানে বাহির হইবে।

সে পরক্ষণে দ্বার কণ্ঠে বলিল, “রোগী-দের বিকেল বেলায় আস্তে বলে দাও।

আর মরিস গাড়ী খানা গ্যারান্টি থেকে বার করে বেউরীতে রাখ, আমি আসছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।”

মিনিট পনের পরে ডাক্তার অরুণের মরিস কার লম্বকে গ্র্যাণ্ড ট্রাক রোড অভিমুখে যাত্রা করিল।

—চার—

সমস্ত রাত্রি অরুণ ও অমল অমরনাথের মৃতদেহ লংকারে বিব্রত ছিল। তাহারা অশেষ চেষ্টা করিয়াও শবদাহের জন্য রাত্রিতে এমটি গাঁজাখোর ছোকরাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। বাহা হউক, সেই রাত্রিতে তিনজনে মিলিয়া ব্রাহ্মণের পারম্পরিক কার্য সমাধা করিয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কুটির দ্বারে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন বহু গ্রাম-বাসী লেখানে জড় হইয়া নানাবিধ কল্পনা জরুরা করিতেছেন। সেই বহুমূল্য মোটরটি কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল, কণার লহিত মোটর গাড়ীর অধিকারীর অবৈধ লম্বন্ধ আছে কিনা, আর বিরূপেই বা কণা এত বড় একটা বিরাট রোহিত মৎস্যকে টোপে ফেলিল ইহাই ছিল আলোচনার বিষয়।

বুদ্ধ লোচনঠাকুর বলিলেন, “বাহা, এত বড় হাওয়াগাড়ীটার যাতায়াত আমরা একটুও টের পেলুম না।” পঞ্চানন ঘোষাল লজ্জারো মাটিতে লাঠি ঠুকিয়া বলিলেন “টের পেলে কি রকম রাখতুম?” হাওয়া গাড়ী তো হাওয়া গাড়ী ও মনিবকে পর্যন্ত হাওয়া করে দিতাম—তবে আমার নাম পাঁচু ঘোষাল।”

হরিশ মোড়ল বলিল, “দেখ, ও মেয়েটার জাত গেছে, এই বাড়ীটা অপবিত্র হয়েছে। বাহ করে ফিরে এলে বলবো, দেখ বাপু, মাথাটা আর গাড়ীটা যদি ঠিক রাখতে চাও এই মুহূর্ত্তে তোমার ঠাকুরনটিকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে বাও, নইলে”—চার পাঁচজন মাতব্বর

একলঙ্গে গর্জন করে উঠলেন, “মাথা ভেলে ছাত্তু করে ফেলবো।”

ঠিক এই সময় অরুণ, অমল ও গাঁজাখোর ছোকরাটিকে সেইদিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গ্রাম্য মাতব্বরগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া স্তব্ধ হইলেন। তাহারা বৃষ্টিতে পারিলেন না অমল ও অরুণের কোনটা কণার ভাগ্য বিধাতা।

গ্রামবাসীদের নিকটে অরুণ আত্মপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিয়া তাহাদের লবলকে অনাথা বালিকাকে স্থান দিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন।

পঞ্চানন ঘোষাল গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, “কি বলে ইয়ে—আমরা তো কচি খোকা নই, আর ঘাসও খাইনা যে আপনারা। আমাদের কি বলে ইয়ে—যা বৃষ্টিয়ে দেবেন আমরা তাই বুঝবো।”

সাহস পাইয়া হরিশ মোড়ল বলিলেন, “দেখুন ডাক্তারবাবু, যখন বামুনের মেয়ের লক্ষ্যনাশ করেছিলেন তখন তো আর আমাদের জিগ্যেস করেন নি; আজ এই হেতুশ্রেষ্ঠাকে আমাদের ঘাড়ে চড়িয়ে দুই বদ্ধিতে লম্বা দেবেন’ তা হবে না। ওটাকে নিয়ে যেতে হবে আপনাদের।

লোচন ঠাকুর বলিলেন, “তা দেখুন বাবু, ঐ অতবড় খাড়ী মেয়েকে—এমন লাখ্য আমাদের নাই—আপনারা যেমন অপকর্ম্ম করেছেন তখন ওর ভার আপনাদেরই নিতে হবে।

অমল ক্রিপ্তপ্রায় হইয়া বলিল, “খবরদার, মিথো কণা বললে জিত হিড়ে দেব। গাজি, নছার কোথাকার।”

পাঁচু ঘোষাল সরোষে বলিল “ও : আমাদের গাঁয়ে এসে আমাদের চোখ রাজান, কি বলে ইয়ে—জান এটা ফরানী মূলুক—এমন মজা দেখিয়ে দেব যা জীবনে—কি বলে ইয়ে—ভুলবেনা।”

অরুণ অমলকে শাস্ত করিয়া বলিল “এই ভূতগুলোর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। কণা যদি যেতে চায় চল, সঙ্গেই নিয়ে যাই।”

“তা বেশ বাবাজী, সঙ্গেই নিয়ে যাও, তাতে ধর্ম হবে, একটা অনাথার আশ্রয় হবে—কি বল হে পাঁচু?”

পাঁচু ঘোষাল লোচনের সুরে সুর মিশাইয়া বলিল, “হ্যাঁ তা বটে তো, তা বটে তো, বাবাজীঘের আকৃতিতে ধর্মভাব কুটে রয়েছে। অর্থ্যাৎ করা কি তাঁদের পক্ষে সম্ভব?”

কে একজন নীচু গলায় ব্যঙ্গরূপে বলিয়া উঠিল, “হ্যাঁ, কণার মত সুলক্ষী তরুণীকে আশ্রয় দিতে ধর্ম কেন ধর্মরাজও রাজী হবেন।”

অমল বলিল, “কিন্তু এখানে যে ধর্ম-রাজের বাহনগুলি উপস্থিত আছেন তাঁরা কেউ রাজী হবেন না একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

হরিশ ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিল, “কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? জান, আমরা ইচ্ছে করলে তোমাঘের—”

অমল বুদ্ধাজুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া কহিল, “কচু করতে পার। বাবুনের পৈতে গলায় দ্বিগুণ ইতরামো করে যারা সমাজের মাথা হয়ে উঠতে চায়, আর যারা বিপন্ন ব্রাহ্মণ কস্তুর নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করে ধর্মের নাম করে লোক শালায়, তাঁদের আমরা কুকুর বেড়ালের চেয়ে ছোট ও নীচ মনে করি।

পাঁচু ঘোষাল আর লজ্জা করিতে পারিল না। সে তাহার যষ্টিটিকে উচু করিয়া বলিল, “বটে, বটে, কোলকাতার কোতো বাবু, বেথ আমরা মাছুষ কি কুকুর, বেড়াল। এই মার মার ছোটো বাঁদরকে, যে গাড়ীখানার আগুন ধরিয়ে। যুক্ক ওরা, আমরা মাছুষ না পশু।

জনতা মার মার শব্দ করিয়া উঠিল। অরুণ এক লম্ফে ছোটের গাড়ীর পাখানে উঠিয়া পড়িল ও চকের নিষেবে একখানি লৌহ নিশ্চিত টারার লিভার বাহির করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, “বেথ তোমরা যদি কেউ আমার বন্ধুর গায় হাত দাও, নতাই তোমাঘের রক্তশািত করতে এডটুকুও কুণ্ঠিত হব না, লাংখান।”

বাহিরের জনতার চীৎকারে কণার তল্লা-ভঙ্গ হইল। সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল এবং দেখিল দশ পনের জন লোক তাহার পরম হিতৈষী সাহায্যকারীদের প্রহার করিতে উদ্ভত হইয়াছে।

কয়েকদিনের অবাহারে ও অনিচ্ছায় কণার আকৃতির বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছিল। লক্ষ্য তাহাকে দেখিলে উদ্ভাটনীয় বলিয়াই ভ্রম হইত। সে অরুণ ও অমলকে বিপন্ন দেখিয়া পাগলের স্তায় জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, “ওগো, তোমাঘের পায় পড়ি, ওঁদের তোমরা কিছু বলোনা, ওরা নির্দোষী যত ঘোষ লব আমরা। আমাকে সাজা দাও, আমি মাথা পেতে নেব।”

জনতা লক্ষ্য তরু হইল। জনতা ঠেলিয়া পাঁচু ঘোষাল বলিল, “বেথ কণা, তুই এখুনি যদি ওঁদের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে রাজী হোস্, ওঁদের আমরা কিছু বলবোনা, আর যদি না কথা শুনিস্ তো দেখবি ছ’মিনিট পরে জন্মের মত হতভাগা ছোটো মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, বুঝিল?”

কণা মুহূর্তের জ্ঞাত কি ভাবিয়া লইল—পরে বলিল, “ঘোষাল কাকা, আমার ভার যদি তোমাঘের পক্ষে এত বেশী হয়ে থাকে তাহলে আমি এখুনি গ্রাম ছেড়ে চলে যাই। আজ যে অবস্থায় আমার তোমরা গ্রাম থেকে বিদেহ করে দিচ্ছ, অনার্থা, অনভ্য যারা তারাও এরকম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন কর্তে লক্ষ্য পেত। আমার কিছু বলবার নেই—যার

কঠোর বিধানে আমার আপনায় বলবার কেউ নেই আজকে তোমাঘের এই কঠোর শাসন আমি তাঁরই বিধান বলে মেনে নিচ্ছি। আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও। আমি এখুনি আসছি।” কণা কুটীরে প্রবেশ করিল, চার পাঁচটা শাড়ী ও লেম্বিজ লইয়া একটা পুঁটলী বাঁধিয়া লইল। ব্রাহ্মপ্রবৃত্ত পাশ বহিরা ও পত্রখানি সঙ্গে লইতে সে ভুলিল না। পরে সে বাহিরে আসিয়া বলিল, “আমার পৈতৃক বাস্তুটাও আমার জন্মে অপবিত্র হয়ে গেছে পাঁচুকাকা। আমার যাওয়ার পর সেটার আগুন লাগিয়ে দেবেন। মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কোন স্মৃতি আপনাঘের গ্রামে বেধে গ্রামটাকে অপবিত্র করলে আপনাঘের ধর্ম হানি হতে পারে।”

অরুণ তাহার গাড়ীর ধরজা খুলিয়া দিল। কণা মস্তমুগ্ধার ন্যায় গাড়ীতে উঠিয়া বলিল। অরুণ ও অমল গাড়ীতে উঠিয়া টাট দিলেন। ধীরে ধীরে গাড়ীর চাকা নড়িয়া উঠিল।

কৃত্রিম শোকের ভাণ করিয়া লোচন ঠাকুর বলিল, “আহা, মহেন্দ্রার শেষ চিহ্নও আজ গ্রাম থেকে শেষ বিদায় নিলে; হা ভগবান্।”

অরুণ, অমল ও কণা কেহ কিছু বলিলেন না। গাড়ী কুটার দ্বার পরিত্যাগ করিল। তখন বেলা দশটা।

চন্দ্রনগর পার হইয়া অরুণ ইংরাজীতে বলিল, “বেথ অমল, নিয়ে তো এলাম, কিন্তু একে রাখা যায় কোথা?”

অমলও গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, “তাইতো।” তিন চার মিনিট কেহ কোন কথা বলিল না। অমল পুনরায় রাজতাবায় বলিতে আরম্ভ করিল, “তাইতো জানিন অরুণ আমার বাপ মা একদম সে কালের লোক থাকে বলে অর্থভঙ্গ। একে যদি বাড়ী নিয়ে যাই, তা হলে আমার বিধান ও

লেখানে স্থান তো পাবেই না বরং আমাদের গৃহত্যাগ কর্তে হবে। জানিন তো আমাদের পাঁচজনের সংসার—একটা কথা উঠতেই বা কতক্ষণ। তার চেয়ে আমি বলছিলাম যে তুই—”

অরুণ গভীর মুখে বলিল, “না, আমার নিজের ওকে নিয়ে যেতে কোন আপত্তি নাই। তবে ভাবছি এই অতিথিকে কি শুভ্রা ভাল মনে গ্রহণ কর্তে পারবে? অবশ্য সে জীবনে আমার অবাধ্য হয়নি একথা সত্য; কিন্তু বড় গভীর সে—আর অভিমানিনী—যদি অন্য কিছু মনে করে।

“সে একটা ভাবনার বিষয় বটে” বলিয়া অমল একটা সিগারেট ধরাইয়া লইল। অরুণ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, “বক্রিমচন্দ্রের বিষয়কটা আমার গৃহে অভিনীত হোক এ ইচ্ছে আমার মোটেই নাই। সূর্য্যমুখীর মত শেষে শুভ্রা যদি আমার ছেড়ে যায় একটা অলীককে সত্য বনে মনে নিয়ে, তা হলে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার অগ্র উপায় থাকবে না, অমল।”

অমল বলিল, “কিন্তু বৌদি তো লেকলে পরাগায়ের মেরে নয়—যথেষ্ট এডুকেশন ও ইন্টেলিজেন্স তার আছে। ও রকম বৌ হওয়া একটা ভাগ্যের কথা। সত্যি কথা বলতে কি তোর ভাগ্যকে মাঝে মাঝে ঈর্ষা করি, অরুণ।

ঠাণ্ডা হালিয়া অরুণ উত্তর করিল, “অসাধারণ ইন্টেলিজেন্স আছে বলিয়া শুভ্রার কল্পনাশক্তিও অসঙ্গত। হয়তো কোনদিন সে কল্পনাটাকে সত্য বলে মনে নিয়ে আমার এমন কোন—”

কণা গাড়ীর ভিতর বলিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে সকল কথা শুনিতেছিল। অরুণ ও অমল ইংরাজীতে কথা বলিতেছিল যাহাতে কণা বুঝিতে না পারে। কিন্তু তাহার জানিত না যে অমরনাথের সঙ্গে কণা ইংরেজী ভাষাও

আয়ত্ত করিয়াছিল। অরুণ যখন অমলের নিকট নিজ অমুবিধার কথা বলিতেছিল সেই সময় কণা মুহু ও নিঃকণ্ঠে ডাকিল “ডাক্তারবাবু” তাহার কণ্ঠস্বরে অরুণ নিতান্ত বিব্রতের মত মুহূর্তকাল থামিয়া বলিল, “কি? বল।”

কণা বলিল, “কলকাতায় গিয়ে আমাদের কোন অবলা আশ্রমে বা অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দেবেন, ডাক্তারবাবু, আপনাদের কারো বাটিতে আমি থাকতে চাই না।”

অরুণ গাড়ী চালাইতেছিল, সে পনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমাদের সব কথা তুমি বুঝতে পেরেছ দেখছি। শোন, আমি পূর্বেই আমার অমুবিধার কথা আমার বন্ধুকে বলেছিলাম। সে কথার পুনরাবৃত্তি কর্তে চাই না। আমি স্থির করেছি ক্যালকাটা হোটেলে একটি কামরা ভাড়া নিয়ে তোমায় রাখবো। আমরা দুজনে তোমার দেখা-শুনো করবো, কোন অমুবিধা হবে না তোমার।”

নিঃকণ্ঠে কণা উত্তর করিল আমার অমুবিধা হবে না সত্য কিন্তু এতে আপনাদের যথেষ্ট অমুবিধা হবে নিশ্চয়। শুধু তাই নয়, এতে আপনাদের সুনাম নষ্ট হতে পারে। আমার ও আপনাদের বয়স বিবেচনা করে কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই আপনাদের এই অমুগ্রহকে নিস্বার্থ পরোপকার বলে ধরে নেবে না। বরং আমার জন্তে আপনাদের লাহিত ও অপদস্থ হতে হবে।”

অমল অক্ষুট ভাষায় বলিল, “তা সত্যি।” কণা বলিতে লাগিল, “আমার জন্তে কারও কোন কতি হয় তা আমি চাই না। আমাকে আপনারা বুঝ করে অনাথ আশ্রমেই ভর্তি করে দিল।

অরুণ লম্বুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহারই মরিচ গাড়ী তীর বেগে তাহারই দিকে ছুটিয়া আদিতেছে। সে কিংকর্তব্য-

বিস্মৃত হইয়া নিজের গাড়ী থানাইয়া ফেলিল।

শুভ্রা তাহার গাড়ীখানি আনিয়া অরুণের লম্বুখে থামিল। অরুণ ও অমল গাড়ী হইতে নামিয়া শুভ্রার নিকট ছুটিয়া গেল। অরুণ বলিল, “একি শুভ্রা তুমি?”

“হ্যাঁ আমি তোমারই স্ত্রী। দেবদর্শনের আশায় এত পথ এসেছি। তোমাদের ব্যাপার কি বলত? কাল সারারাত কি করে কেটেছে আমার বুঝতে পার কি? ও কে? গাড়ীর ভিতর?”

শুভ্রার স্বপ্ন মনে পড়িয়া গেল। মুহূর্তে বেহা ঘামিয়া উঠিল। তাহার নিশ্বাস অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত পড়িতে লাগিল।

অরুণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল “ও কে তা ওর কাছেই শুনো। তুমি এলেছ ভালই হয়েছে ওকে তোমার গাড়ীতেই নাও। চল আমরা তোমার গাড়ীর পেছুই যাচ্ছি।”

শুভ্রা কোন কথা না বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া কণার নিকটে গিয়া বলিল, “এস বোন, আমার গাড়ীতে।”

কণা বিস্মৃত হইয়া এই নবাগতা সুন্দরীর নিঃকণ্ঠে দুইটির দিকে নিনিমেষে চাহিয়াছিল। সে বিনা-বাক্য-ব্যয়ে শুভ্রার গাড়ীতে উঠিয়া বলিল।

শুভ্রার স্তম্ভুর সংযত ব্যবহারে কণা মুগ্ধ হইল এবং গাড়ীতে বাইতে . বাইতে তাহার জীবনের সমস্ত ঘটনা শুভ্রার নিকট বলিয়া ফেলিল। কণার প্রতি একান্ত লহাসুভূতিতে শুভ্রার শুভ্রা হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

বাড়ীতে পৌছিয়াই অরুণ শুভ্রাকে বলিল, “এবার ওকে ছেড়ে যাও আমি অবলা আশ্রমে যিরে আসি।”

মুহু হালিয়া গ্রীবা হেলাইয়া শুভ্রা বলিল, “তুমি থাকে অভয় দিয়ে আশ্রয় দিয়েছ

আমার নবজন্ম

শ্রীমতী কানন দেবী



কানন দেবী

আমি বহুকাল ধরে অভিনয় করছি—এবং আমার প্রথম থেকেই এই ইচ্ছে ছিল যে একদিন নিউ থিয়েটারের চিত্রে অভিনয় করার সৌভাগ্য আমার হবে। মনে মনে এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে অনেকবার আমি করেছি—এবং একদিন ভগবান আমার সেই প্রার্থনা শুনলেন। আমি অবশেষে নিউ থিয়েটারে যোগদান করার সুযোগ এবং সুবিধা পেলাম। এখানে আমার প্রথম ছবি মুক্তি, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপিত এবং তৃতীয় শ্রীযুক্ত ফণী বজ্রমহারের স্ট্রীট লিঙ্গার। এই ছবিখানি এখন তোলা হচ্ছে। সব কয়টি ছবিতে আমি হিন্দী এবং বাংলা দুই ভাষায়ই অভিনয় করেছি, এবং সব কয়টি চরিত্রেই আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন দর্শক মহোদয়দের ব্যয়কথানি করে গান শোনাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

নিউ থিয়েটারে যোগদান করার পর আমার অভিনয় জগতে যেন নবজন্ম লাভ হল। পূর্বে যা শিখেছিলাম—তার যেন—আমি তাকে গৃহে স্থান দিতে কুষ্ঠিত হব এত নীচ আমার মনে করো না। ওকে আমি কোথাও যেতে দেব না, ও থাকবে আমারই ছোট বোন হয়ে।

এই কথা বলিষ্ঠা বণার শীর্ণ দেহখানি নিজের বুক চাপিয়া ধরিল। পরমুহুর্তে অমলের দিকে চাহিল; একটু ঊর্ধ্বমুখী হালি হালিরা শুভ্রা বলিল, তোমার ত এগনো বিয়ে হয়নি ঠাকুরপো, না? বণা লজ্জায় যেন মাটিতে দিশাইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সব কিছু ভুলে গিয়ে আমাকে আমার নতুন করে শিখতে হল। এই শেখাতে আমার আনন্দ হয়েছে প্রচুর এই মনে করে যে—শ্রদ্ধেয় দর্শকগণ আমার কাছে যা আশা করেন, এতদিনে তা যেন পূর্ণ মাত্রায় দান করতে পারব। এই আশা আমার মুক্তি এবং বিজ্ঞাপিত চিত্রে কিছু পরিমাণে পূর্ণ হয়েছে। স্ট্রীট লিঙ্গার চিত্রে আমি আশা করি আমার অভিনয়কে আরো সুন্দর করে লোকের সামনে ধরতে পারব। এই চিত্রে যে চরিত্রে আমি অভিনয় করছি, তার সঙ্গে যেন আমি আমার জীবনের একটা মিল খুঁজে পাই। জীবনে আমার এমন একদিন গেছে যে আমাকে প্রায় আশ্রয় হীনার মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তখন মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলছি যে “ভগবান—আমি এমন কি করেছি, যার জন্য আমার এত শাস্তি এত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে।” কিন্তু এতদিন পরে বুঝি ভগবান আমাকে কষ্টের মধ্যে দিয়ে এই শিক্ষা দিয়েছেন যাতে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। হাজার বিপদের মধ্যেও যেন নিজেকে অলঙ্ঘন মনে না করি।

ফণী বাবুর ভবিতে যে মেয়েটির ভূমিকায় আমি অভিনয় করছি। সেই মেয়েটির জীবনে বহু বড়কাপটা এসেছিল। কিন্তু সে তার মনের জোরে এবং সত্যিকার প্রেমের ওপর ভর করেছিল বলে, সবল বিপদ কাটিয়ে শেষে সুখের মুখ দেখতে পার। এই চরিত্রটি আমার এত ভাল লেগেছে যে, আমি সত্যিই যেন নিজের জীবনে একে অনুভব করছি, এর লাড়া পাচ্ছি।

কাজের ফাকে যখন অবসর থাকে—রাত্রে যখন ঘুমুই, এই চরিত্র আমার সকল দেহ মন অধিকার করে থাকে। পৃথিবীতে সত্য, প্রেম এবং ভালবাসা যে অদ্বীপ ক্ষমতা আছে—তা আমি নিজের অন্তরে স্বীকার করি। মানুষ যে স্তরেই বাল করুক—সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতা বোধহয় কারুরই নেই। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। বড় বড় কথা বলা হয়ত আমার মুখে শোভা পায় না—কিন্তু বাংলার দর্শক এবং পাঠক যারা আমাকে স্নেহ করেন, তাঁদের কাছে আমি আমার মনের কথা বলবার দাবী জানাতে নিশ্চয়ই পারি। আমি জানি—তারা আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন।

ফণী বাবুর ছবির “বজ্র” চরিত্র সত্যিই বড় চমৎকার। এই ভূমিকায় অনেকগুলি গান আছে। এবং আমি আমার সাধ্যমত এই গান গেয়ে দর্শকদের মনে কিছু আনন্দ দিতে নিশ্চয়ই পারব। এই ভূমিকায় আর একটি জিনিষ আমার মনের মত আছে। আমার বহুদিনের ইচ্ছা—অভিনয়ের মধ্যে নাচের কিছু দেখান। আজ “স্ট্রীট লিঙ্গার” চিত্রে আমি দর্শককে আমার নাচ দেখাতে পারব। অনেকদিন থেকে আমি নাচ শিখেছি এবং শিখছি, এতদিন পরে আজ আমার

ভূমিকার নাচের পার্টও পেয়েছি। সুনাম এবং যশ লবাই চায়। আমিও চাই। তাছাড়া আমাদের যেমন কাজ তাতে লোকের প্রশংসা পেলে আমাদের কাজের উৎসাহ যেন শতগুণ বেড়ে যায়। সেই জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি, যাতে এই ছবিতে আমি যেন সব লোকের কাছে সমান এবং খুব বেশী প্রশংসার পাত্রী হতে পারি। কাজ ভাল করলে সুনাম এবং প্রশংসা আমি আমার ভায়া প্রোপা বলে মনে করি।

কণী বাবুও আমাকে সকল দিক থেকে সব রকমে সাহায্য করছেন। এঁখানে আর একটি কথা বলে আজকের মত শেষ করব। শ্রীযুক্ত সায়গলের সঙ্গে অভিনয় করার মৌভাগ্য ভারতে সকল অভিনেত্রী মনে মনে কাশনা করেন। আমার সেই মৌভাগ্য হয়েছে। আজ আমি নিজেকে সেই কারণে শ্রীমতী উমা, চন্দ্রাবতী এবং কমলেশ কুমারীর মত সমান মৌভাগ্যবতী বলে মনে করি। শ্রীযুক্ত সায়গল বিদেশী হলেন এখন মনে প্রাণে একেবারে বাঙালী। তাঁর কথা-গাঠান, আচারে ব্যবহারে আমি অবজ্ঞালীর মত কোন কিছু পাই না।

হাতত হাতত পরীক্ষা

দৈবলক্ষ্য অর্শনাশক মহৌষধ

যন্ত্রণাধারক অন্তর্বলি, বহির্বলি, ভগন্দর, হারিদ ও হালা যে কোন রকম ও বতদিনের পুরাতন ও যন্ত্রণাধারক হটক না কেন এই দৈবলক্ষ্য মহৌষধ যন্ত্রণাক্তির গ্রাম কার্য্য করিবে। এরূপ ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। ৮কালীমাতার পূজার খরচ ১/৫ এক টাকা পাঁচ পয়সা মাত্র। এই ঔষধ ধারণের কোন নিয়ম নাই। ইহা বহু পরীক্ষিত। ডাকমাস্তুল স্বতন্ত্র। বিকলে মূল্য কেয়ং।

শ্রীপ্রসাদ দাস মুদ্রাপাধ্যায়

১৭১সি, অপার লারকুগার রোড,

পোঃ আঃ শ্রীমহাজার, কলিকাতা।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

(সুদক্ষনানুসরণ)

বিগত ১৭ই এপ্রিল রবিবার বেলা ৮৪৫ মিনিটের সময় সম্মেলনের তৃতীয়-দিবসের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে চারিজন প্রাতিযোগীর demonstration হইয়া যাইবার পর বাংলার অন্ততম শ্রাবী প্রবীণ শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র দত্ত (হানীবাবু) টোড়ি ও আলাবতী রাগের দুইখানি চৌতাল গান করেন। প্রপঞ্চগানের পর শ্রীযুক্ত সঙ্গীত ভট্টাচার্য্য সেতারে পরোজ-বনস্তের গৎ বাজান। Demonstration-এর জন্য যে সকল শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করা হয় তাঁহাদের শিক্ষানৈশ্চল্য লক্ষ্যে যদি কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে কেবল নিজেদের মৌখিক তত্ত্বতা ও মৌলিক বৈখ্যইবার জন্য সেই সকল শিল্পীকে programme-এ স্থান দিয়া অথবা সময়ের অপব্যবহার ও শ্রোতৃবর্গের বৈখ্যচ্যুতি ঘটাইবার কোন মত কারণও দেখা যায় না। আলোচ্যক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গাল মহাশয়ের এখনও যন্ত্রে হাতই ভালভাবে set করে নাই—রাগরূপকে যথার্থভাবে কুটাইয়া তোলা ও সেতারের উপযোগী বাংলা মীট প্রভৃতি কাজ দেখান ত দূরের কথা! কিন্তু, আশ্চর্য্য বিষয় এই যে কর্তৃপক্ষগণের অবিবেচনার ফলে এ জাতীয় শিল্পীরা programme-এ স্থান পাইয়া বাজাইবার বা গাহিবার সুযোগ পাইলেন, অথচ সময়ভাবের অছিল। দেখাইয়া কর্তৃপক্ষগণ হানীর প্রকৃত গুণী গায়ক ও বাঙ্গালিগণের মধ্যে অনেককে ঘোটেই গাহিতে ও বাজাইতে দেন নাই;

এবং কৃপা করিয়া যাঁহাদেরও বা programme-এ স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও সময় সঙ্কোচ করিতে বিধাবোধ করেন নাই। যাঁহা হটক, সেতার বাজনার পর কুমার শচীন্দ্রকুমার বেববর্ষণ একখানি বাংলা গান (জাগো মম সহেলি গো) করেন। কুমারের গানের পর পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীমতী পিরোজ হস্তর মিত্রা-কি-টোড়ির দুইখানি খেতাল (একখানি বিলম্বিত একতালার ও অপরটী দুনি ত্রিতালিতে) গান করিয়া পরে ভৈরবীর চুম্বী গান করেন। শ্রীমতীর গানের সহিত প্রোঃ খেরাকুয়া তবলা সঙ্গত করেন। শ্রীমতী এই Conference-এই প্রকাশ্যভাবে প্রথম গান গাহেন। উপযুক্ত গুরুর শিক্ষার গুণে তাঁহার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যজন বলিয়া মনে হয়। শ্রীমতীর গানের পর বাংলার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় গোড়লারদের একখানি চৌতাল ও আর একখানি ধামার গান করেন। গত-বৎসর ললিতবাবু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর সহিত জুড়িতে প্রবন্ধ গাহিয়াছিলেন। এবছরের তাঁপা programme-এও উভয়ের জুড়িতে গাহিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় কোন অজ্ঞাত কারণে যে এবারের Conference-এ যোগদান করেন নাই, তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। পূর্বে রাজির programme-এ তাঁহার এককভাবে খেতাল গান করিবার কথা ছিল—সে রাজিতেও তিনি অমুপস্থিত ছিলেন—উদ্বোধন-

দ্বিবেশে তাঁহাকে একবারও মকের উপরে দেখা যায় নাই—এমন কি, চারদিন ধরিয়া ছুইবেলায় যে আটটি sitting বসিয়াছিল, তাহার একটাতেও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। অথচ আমরা বিশেষভাবে জানি যে তিনি অধিবেশনের সময় কলিকাতাতেই উপস্থিত ছিলেন। আর তাহা ছাড়া গত কয় বৎসর ধরিয়া তিনি conference-এর ও বিশেষতঃ conference-এর সাধারণ সম্পাদক মহাশয়ের সহিত যে বনিষ্ঠভাবেই আবদ্ধ ছিলেন তাহাও সাধারণের অবদিত নহে। সুতরাং এ বৎসর জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অনুপস্থিতিতে সাধারণের মনে লক্ষ্যের বীজ উগ্ৰ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যাহা হউক, লগিত-বাবুর গোড়সারদের প্রণব আধাঘেঁষ ভালই লাগিল। বর্তমান বাংলার নবীন প্রণবী-গণের মধ্যে ইঁহার গানে বেশ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রণবগানের পর শ্রীমতী হীরাবাই বরোদকার চিমা লয়ে শুদ্ধ সারদের একখানি খেয়াল গান করিয়া পরে ঐ রাগে ছনী ত্রিতালীতে তাঁহার প্রসিদ্ধ রেকর্ড-গানখানি “যা রে ভোরা ছুঁ” গান করেন। খেয়াল গান শেষ করিয়া শ্রীমতী প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ ভজন-সঙ্গীত “রাধে কৃষ্ণ বোল্ মুখমে” ও পরে স্বর্গত আবহুল করিম খাঁ সাহেবের অতিশ্রয় চুম্বী গানখানি “যবুনা কে তীর” গাহিয়া উপস্থিত সঙ্গীত-রসিকবৃন্দকে অতিশয় আনন্দ দিয়াছিলেন। শ্রীমতী আলোচ্য দ্বিবেশে প্রায় পৌনে ছই ঘণ্টা কাল গান করেন। শ্রীমতীর গানের পর বেলা বেড়টার সময় ভারতবিখ্যাত গুণিপ্রবর শ্রোঃ এনায়েৎ খাঁ সাহেব ও তাঁহার বালক পুত্র বিলারেৎ খাঁ লেতার

বাজান। খাঁ সাহেব প্রথমে সুরবাহারে তৈরবের আলাপ করিয়া পরে পুত্রের সহিত একযোগে তৈরবীর গৎ বাজান। ইঁহার সহিত শ্রোঃ থেরাকুরা তবলা লগত করেন। খাঁ সাহেব তাঁহার বাজনা আরম্ভ করিবার পূর্বে dais উপরে দাঁড়াইয়া উপস্থিত শ্রোতৃ-বর্গের নিকট বলেন—“এখন তৈরব বা তৈরবী বাজাইবার সময় নহে—কারণ সে সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী এই অসময়েও আমাকে ঐ দুইটা রাগই বাজাইতে হইবে।” খাঁ সাহেব এইরূপ নিবেদন করিলে গৌরী-পুত্রের কুমার বাহাদুর বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় (যিনি তখন President-এর চেয়ারে লম্বুখে উপবিষ্ট ছিলেন) নিজের আদান হইতে উঠিয়া খাঁ সাহেবকে জোনপুরী বাজাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খাঁ সাহেব প্রত্যুত্তরে বলেন—“আমাকে কর্তৃপক্ষ-গণ বাহা বাজাইতে বলিয়াছেন তাহা ছাড়া অস্ত্র রাগ কেমন করিয়া বাজাইব?” সুতরাং খাঁ সাহেব কুমার বাহাদুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া তৈরবের আলাপ শুরু করেন। কিন্তু জনসাধারণের তরফ হইতে প্রব্র উঠিতে পারে যে কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে কে বা কাঁহার খাঁ সাহেবকে এইরূপ অসঙ্গত ও রীতিবিরুদ্ধ অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের সহিত বাহাদের কোনও পরিচয় নাই এবং বিশেষতঃ কালানুসারে রাগের বিভাগ লক্ষ্যেও বাহাদের কোনই ধারণা নাই তাঁহাদের পক্ষেই বেলা বেড়টার সময় তৈরব বা তৈরবী বাজাইবার আদেশ দেওয়া লজ্জ হইতে পারে; কিন্তু সেই সকল

non-musical ব্যক্তিগণের উপর যদি সঙ্গীত-লক্ষ্যলনের programme নির্দেশ করিবার তার দ্বিরা কর্তৃপক্ষগণ নিজেদের দ্বারিষ বধা-বধ পালিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে তাঁহারা Music Conference-এর আয়োজন করিবার যোগ্যতা কতটুকু রাখেন তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন করে না। অদময়ের রাগ স্তনিবার লখ যদি কাহারও একান্তই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজের বাড়ীতে বা ক্লাবে তাহার ব্যবস্থা করিলে কোনও কথা উঠিতে পারে না—কিন্তু সঙ্গীতের demonstration-এর আলয়ে নিজেদের খামখেয়ালীর পরিচয় দিয়া অথবা নিজেদের আলস্য ও ঔদাসীন্তের লজ্জা অপর কোন ব্যক্তি-বিশেষকে খামখেয়ালী আচরণ করিবার সুযোগ দিয়া, শিল্পীকে তাঁহার ইচ্ছা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে অসমরোপযোগী রাগের আলাপ করিতে আদেশ করিয়া প্রকারান্তরে অপবিত্র করিবার প্রচেষ্টা বাঁহারা করেন, তাঁহাদের মত ব্যক্তির Music Conference-এর অনুষ্ঠানে উদ্বোধিত রূপে না থাকাই বাছনীয়। সাধারণ সম্পাদক মহাশয় ও একজন প্রকৃত সঙ্গীত-রস-রসিক সামাজিক। লতাপতি মহাশয়ও নিজে একজন শুণী শিল্পী ও স্ত্রী লক্ষ্যর। Programme-Director মহোদয়ও স্বয়ং একজন সুপ্রতিষ্ঠিত তবলা-বাদক। ইঁহারা ও অস্ত্রান্ত গুণগ্রাহী ব্যক্তি কর্ণধার থাকিতে খাঁ সাহেবকে অস্ত্রায় অনুরোধ করার লজ্জা দ্বিরা কে তাহা আমরা জানি না—কিন্তু এমন কেহ বা কয়েকজন না থাকিলেই বা খাঁ সাহেব যজ্ঞ বাজাইবার পূর্বে ঐরূপ অসঙ্গত নিবেশের উল্লেখ করিলেন কেন?



ইন্দ্রবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ব্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

আমরা এটুকু মাত্র জানি যে কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে বিশিষ্ট কোনও এক ব্যক্তি Conference-এ কয়েকবৎসর ধরিয়েই প্রসিদ্ধ গায়ক বা গায়িকাব্যক্তিকে প্রতি Sitting-এই ভজন গাহিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া আনিয়াছেন—এবংসরও তিনি তাঁহার অভ্যাগ ছাড়েন নাই।—ভজন যে উচ্চ সঙ্গীত নহে এবং উহা যে সাধারণের অপ্রিয় তাহা আমরা মোটেই বলিতেছি না, কিন্তু প্রত্যেক অধিবেশনেই গায়ক-গায়িকাগণকে ভজন গাহিতে অনুরোধ করা মোটেই শোভনীয় দেখায় না। হয়ত তিনি বা তাঁহারই মত অন্ত কোনও কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিই ঐদিন খাঁ লাহেবকে বেলা দেড়টার সময় ভৈরব ও ত্রয়বী বাজাইতে অনুরোধ বা আবেদন করিয়াছিলেন। খাঁ লাহেব অবশ্য নিজের স্বভাবোচিত দৌজন্তে সে আবদার বা হুকুম চুকা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, এ জাতীয় অন্তার আবদার বা হুকুম আর কতদিন Public-function-এ চলিতে থাকিবে? বাহা হউক, খাঁলাহেবের বাজনার পর বেলা প্রায় ২:১৫ মিনিটের সময় ঐ দিনের সকালের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রেলওয়ে ষ্টেশনে—বিদায়-দৃশ্য

দেদিনের সে দৃষ্টোৎসবের রাত প্রথম আজও তুলতে পারে নি! কিন্তু সেই রাত ও আজকের রাতের কত তফাৎ।

লাহানা ও অপমানের গ্লানিতে মরিয়া হ'য়ে যখন সে পথের বার হোয়েছিল তখন প্রথমই তাকে কুড়িয়ে এনেছিল, সেই পথের ধার থেকে। আশ্রয় বিয়েছিল তাকে নিজের ভবনে। গৃহবধূর সম্মান দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত কোরেছিল ঐশ্বর্য্য বিলাসের মাঝে! কিন্তু সেই হঠাৎ ভবনুয়ের জীবনে যে অতৃপ্তি, সেই অতৃপ্তিই থেকে গেল। তার জীবনে, যখন মেঘের আবরণ ভেদ কোরে, উঁকি দিয়েছিল পূর্ণিমার চাঁদ। অন্ধকারে জ্যোৎস্না ছড়াতো যদি বা সে এলো, কিন্তু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরা গেল না। যে মায়া রজ্জ, দিয়ে সে তাকে বেঁধেছিল, একদিন দেখলে তার ফাঁস ক্রমশঃ আলগা হোয়ে আসতে।

এতখানি অতৃপ্তির মধ্যে হয় ত' বা নারীর জীবন চলে। কিন্তু পুরুষের চলে না। তাই লহনা একদিন যখন তার সে তুল ভাললো, সে তখন মরিয়া হোয়ে ছুটে চললো রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে। প্রথমত মনে হোল, তার এ প্রাণ জীবনের বা কিছু মার্ব্ব্য ছিল—মায়াবিনী লক্ষ্য তার লবখানি নিঃশেষ কোরে নিয়েচে। সেই বেদনার স্বতিকে ভোলবার জন্তেই প্রথম আজ লকলের অলঙ্কিতে বেরিয়ে পড়েচে—অন্ততঃ আর কোথাও অনেক দূরে পালিয়ে গিয়ে খানিকটা স্বস্তির নিঃখান ফেলতে! লক্ষ্যার সঙ্গে তার বোঝাপড়া শেষ হোয়েচে, আজ শুধু নিষ্কৃতি নেবার পাল।

বহু ব্যতীর কলরবে জনবহুল ষ্টেশনটি পূর্ণ। ব্যাগ হাতে প্রথম এলে উঠলো একটি থার্ড ক্লাশ কামরার। পরিচিতির লতর্ক চক্কে বকনা করবার উদ্দেশ্যেই সে এই পথ অবলম্বন কোরেছিল। কিন্তু ট্রেন ছাড়বার কিছুক্ষণ আগে এক অঘটন ঘটে গেল।

সে দেখলে প্রাটফর্ম দিয়ে হেঁটে চলেচে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ট্রেনের লম্বা কামরাগুলিকে বিজ্ঞ কোরতে কোরতে—প্রকাশ, প্রিয়লাল।

আমরা শেষ পর্য্যন্ত সুনলুম, সে পলাতককে আবিষ্কার কোরতে এখের পরিশ্রম বার্থ হয় নি।

কিন্তু সে আজ সর্ব্ব্ব হান কোরে কতুর হোল—সে কী শেষ পর্য্যন্ত কিছুই পেল না লক্ষ্যার কাছ থেকে?

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!



ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্দ্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়িত্বে ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ সোণার স্তার চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিল্ডিকিটে

৭০নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

কোন : বি, বি, ৪৮২২

বিভীষিকা সিরিজ

বাহির

হইল

সমাজ,
শাসন, ও
শৃঙ্খলা, এই নিয়ে
মেতে উঠিলো

“ত্রিমূর্তি”

নারী হত্যা কর্তেও সে কুণ্ডা বোধ করেনা

শুরু হল সংস্কার না অত্যাচার?

সমাজ তাকে মেনে নিলে কিনা?

নারী হত্যার কারণ কি?

এ রহস্য আপনাদের সামনে প্রকাশ

কর্বে ‘বিভীষিকা’ সিরিজের

প্রথম নিবেদন—

রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ

উপন্যাস

ত্রিমূর্তি

বাহির

হইল

—প্রকাশক—

কথা সাহিত্য পরিষদ

১১, চক্রেবেড়িয়া রোড (সাউথ), ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রশ্নের জবাব আপনারা শীঘ্র পাবেন 'অভিজ্ঞান' চিত্রে। উপরের এই চাক্ষুণ্যকর দৃশ্যটি দেখিন তোলা হোল শিয়ালবহু ষ্টেশনের ৮ নং প্ল্যাটফর্মে। সারারাত ষ্টেশন ঠাক সমেত একখানি স্পেশাল ট্রেন এই দৃশ্য গ্রহণের জন্য প্ল্যাটফর্মে হাজির ছিল। ষ্টেশনের স্বাভাবিক জনতা ছাড়াও 'special passenger effect' হেবার জন্মে শতাবধি 'একটু' আটটিকে সময়োপযোগী লাজ পোষাকে স্তম্ভিত কোরে এই দৃশ্যের কাজে লাগানো হয়েছিল। আগাগোড়া প্ল্যাটফর্মটি cable করা হয়েছিল প্রয়োজনীয় আলোকপাতের জন্য। এই দৃশ্যগুলি গ্রহণের সময় ১নং টিভির প্রধান কর্মসচিব মিঃ পি, এন রায় সারাক্ষণ ষ্টেশনে উপস্থিত থেকে তদ্বির করেছিলেন। পরিচালক প্রফুল্ল রায়, ফনী মজুমদার ও এই ইউনিটের বিভিন্ন কর্মী ও টেকনি-শিয়ানের দল সমবেতভাবে এই দৃশ্যগুলি নিখুঁতভাবে গ্রহণ করার জন্যে তাঁদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। শব্দ-বস্ত্রা বানী বস্ত্র তাঁর বস্ত্রপাতির লাহাঘো, জনতার ও ট্রেনের স্বাভাবিক 'লাউণ্ড এফেক্ট' অতি নির্দোষভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন।

উপরের রেলওয়ে ষ্টেশনের দৃশ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় মলিনা, মেনকা, জীবন গাজুলী, গুণ্ডরাজ, শৈলেন চৌধুরী, বিক্রম কাপুর, শৈলেন পাল ও বিজয়কুমার স্বাভাবিক অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন বোলে মনে করি। আশাকরি এই sensational দৃশ্যটি আপনারা ছবির পর্দায় পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারবেন। এই দৃশ্য গ্রহণের সময় প্রডাকশান বিভাগের বর্মীদের মধ্যে অজিত লাহিড়ী, জলু বড়াল ও কৃষ্ণ হালদারের কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়।

কানীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারান্দা

পরেশ উকিল ও রামগতি সরকার মহাশয় কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল।

পরেশ—তিন কোয়ার্টার তো হ'য়ে গেল, আরও কতোকণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে! আপনি ঠিক শুনেছেন আমার ডেকেছিলেন ত' ?

রামগতি—আপনার না বিশ্বাস হয়, আপনি চলে যান না মশাই। কে আপনাকে মাথার দ্বিবি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে বলুন তো? কি বিপদ!

পরেশ—কানে যখন শুনেছি তখন দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। সরকারমশাই—তা সে তিন কোয়ার্টারই হোক আর তিন ঘণ্টাই হোক। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তাতো আমি বুঝতে পারছি না। আপনার কি মনে হয়? চাকরি যাবে, না, থাকবে?

রামগতি—চাকরি! সে যেতেও পারে, থাকতেও পারে, আমি কি করে বলবো বলুন। কি বিপদ! —ত.ব শুদ্ধি বা, তা বড়ো ভালো নয়।

পরেশ—কি রকম, কি রকম?

রামগতি—আপনি তো প্রশ্ন ক'রে বললেন সোজা, কিন্তু উত্তরটি দিতে গিয়ে ঐ দরজাটি খুলে বহি হঠাৎ বেরিয়ে পড়েন, তাহ'লে কি রকম ব্যাপারটা হবে তাহ'লে তো!

পরেশ—সে তাল আমি লামলাবো 'ধন! আপনি বলুন।

রামগতি—কিন্তু—আঃ! আমাকে নিয়েই বা এতো পীড়াপিড়ী কেন হ্যা? বড়ো-মামুষ, লাতেও নেই পাচেও নেই। আমি ও সব কিছু জানি না। কি বিপদ!

পরেশ—বিপদ তো আপনার নয়, বিপদ আমার। তাইতো এতো পীড়াপিড়ী করছি সরকার মশাই।

রামগতি—ওরে বাবা, সে ভীষণ ব্যাপার। কর্তার মুখ একেবারে এই চাকা-পানী হ'য়ে আছে। মা ঠাকুর কাল থেকে অরুজল পরিত্যাগ ক'রে আছেন। আমার কর্তা ডেকে ব'ললেন—এই, পরেশ উকিল। তখুনি বুঝি, পরেশ উকিল গেছে!

পরেশ—কিন্তু পরেশ উকিলের অপরাধটা হ'ল কি সেটা কিছু বুঝতে পারলেন?

রামগতি—আর অপরাধের বাকী কি রেল বল। মা ঠাকুর অরুজল পরিত্যাগ ক'রেছেন। বড় ছেলের অবস্থার তদ্রূপ, সে কতোয় দ্বিগেছে—মা যতোকণ না থাকেন, আমিও খাচ্ছি না। তার উপর কর্তার ঐ চাকামুখ—

পরেশ—কিন্তু আমার অপরাধটা কি বলুন?

রামগতি—আরে বাবা, সেটা আমি বলবো কি করে! কি বিপদ! —ঐরে, ঐ চটিকুতোর পটাপট শব্দ আদছেন এবার। বাস, থতম্!

পরেশ—আদছেন না কি?

রামগতি—ও আওয়ার তো আর ভুল হবার জো নেই বাবা, বিশ বৎসর খ'রে শুনে আছি।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—উকিলবাবু আসুন।

রামগতি—আরে ম'লো তুই! চটীকুতা পরা হ'য়েছে আবার! বিপদ আর বলে কাকে! —

পরেশ—বাবু কোন ঘরে?

বেহারা—লাইব্রেরী ঘরে র'য়েছেন।

পরেশ—আর কে আছেন লেখানে?

বেহারা—কেউ নেই, একলা। চলুন শীগপীর, জরুরি তলব। Urgent.

পরেশ—চলো।

(পরেশ ও বেহারার প্রস্থান)

রামগতি—হুর্গা শ্রীহরি। বাঃ, পরেশ উকিলের হ'রে গেল

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়—ওহে রামগতি, তুমি এখানে কি করছ?

রামগতি—কিছু না মশাই। এমনি এসেছিলাম, চলে যাচ্ছি। পরেশ উকিল বলে, কর্তার কাছে যেতে হবে, একলা পারব না—আপনি দাঁড়াবেন চলুন। তাই আশা, নইলে—

অজয়—বুঝতে পেরেছি। এখন আমার একটি কাজ কর্তে হবে। দিলীপকে আমার একবার চাই। এখুনি। ডেকে দিতে পারবে?

রামগতি—বেহারাপুলো ডেকে দিলে না?

অজয়—না, তারা বলে বাবুর কাছে যাবার আজ অর্ডার নেই।

রামগতি—ও! হ্যাঁ হ্যাঁ,—বলেছে ঠিক। কি বিপদ!—আমার নিজেরই মনে ছিল না ব'লেছে ঠিক।

অজয়—কিন্তু কি হ'য়েছে ব'লেতে পার? সকাল থেকে অক্লিণ ঘরে আদিনি। সমস্ত

কাজ পড়ে র'য়েছে। এক রাশ চিঠি এসে গেছে। কম ক'রে প্রায় ত্রিশজন লোক দেখা করবার জন্ত বলে আছে। —এখন ঘরের ভেতর চুপ ক'রে বলে রইল। আমি তো ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

রামগতি—ভীষণ ব্যাপার মশাই। চাকর বাকর সব থর থর ক'রে কাঁপছে। ছদ্মি থেকে ছুই কর্তা, হু'খানি ঘরে না বলে, সমস্ত বাড়ী খানি কে ওলোট-পালোট ক'রে দেবার মতলব। ডেকে দেওয়া তো দুরের কথা, তাঁর ঘরের সিঁড়ির ধারেই কেউ যাবে না। এদিকে কর্তামশাই লাইব্রেরী ঘরে পরেশ উকিলকে নিয়ে প'রেছেন, ওদিকে—

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—সরকারমশাই, বাবুর কাছে আসুন।

রামগতি—আমি!

বেহারা—হ্যাঁ—

রামগতি—আমার ডাকছেন!

বেহারা—হ্যাঁ—

রামগতি—আমার ডাকছেন কিরে! কি বিপদ!

বেহারা—আপনাকেই ডাকছেন।

রামগতি—আপনার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে আমার এই সর্বনাশ হ'ল। —চলো। —হুর্গা শ্রীহরি।

অজয়—এই, বড়োবাবুকে ডেকে দিতে পারিল?

বেহারা—No sir, তাঁর কাছে আজ কেউ যাবে না এই রকম order. কাল দেখা হবে। আপনুন লরকার মশাই।

(বেহারা ও রামগতির প্রস্থান)

অজয়—ডেকে যখন কেউ দেবেন, তখন টেচিয়েই ডাকবো। —দিলীপ, দ্বিজেন!

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

দ্বিজেন—কি অজয়?

অজয়—তোমরা কি সব ক্ষেপে গেছ?

দ্বিজেন—কেন বলতো?

অজয়—হাজার কাজ কেলে দ্বিগে দ্বিগে তো ঘরের ভেতর কোন নিয়ন্ত্রণে।

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার



কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারতের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আপাব সারকুলার রোড, কলিঃ

দিলীপ—বর্তমানে যা তুমি পেলে না,
 ভবিষ্যতেও যে তা পাবে না, এমন কথা
 তুমি বলতে পার না !

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বেতার প্রোগ্রামে, দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে দেখা গেল পরিবর্তন। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ লেন তাঁর আলোচনায় শ্রোতাদের অনুরোধ জানিয়েছেন এই পরিবর্তনের দ্বারা লক্ষ্য করার জন্তে। আমরা বিশ্বাস করি হতবাক হয়ে গেছি বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টরের এই অভিনব কৃতিত্বের (১) পরিচয় লাভ করে। এই অহেতুক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করে বহু শ্রোতা আমাদের পত্র দিয়েছেন।

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান মহিলাদের আসর। এ আসরের প্রোগ্রামে চিরদিনই উল্লানীততার পরিচয় পাওয়া গেছে। কোন রকমে জোড়া-তাড়া দিয়ে এ অনুষ্ঠানটিকে চালান হয়। বহু বাক্যে গ্রামোফোন রেকর্ড, আনাড়ী আর্টিষ্ট দিয়ে ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘেড়ঘণ্টা পরিপূর্ণ করা হোত। মধ্যে কিছুদিন দেখা গিয়েছিল এ আসরের উন্নতির দ্বারা কিন্তু শ্রোতাদের অজ্ঞাত কারণে গেল তা বন্ধ হয়ে। তারপরও ভালোয় মন্দায় মিলিয়ে

দ্বিজেন—আমরা সাধারণ মানুষ, বর্তমানটাই বুঝলাম। তুমি অসাধারণ, তুমি ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে বলে থেকে—উত্তরের আশায়।

দ্বিলীপ—থাকবে তাই। কিন্তু ওরে কিছু, অসাধারণ আমি মোটেই নই। তোদের লকলরই মত আমি অতি সাধারণ। বাবার বিষয়টার অর্ধেক ভাগ পেলে খুশী ছাড়া অখুশী হ'তাম না। তবে নাকি তুমি বিষয়টার সবটাই পেয়ে যাবে—এটা আমার

কোন রকমে চলছিল। এবারে বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টরের আমলে দেখা গেল যাত্রা এ আসরে স্বল্প নির্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা আবার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দু'টা থেকে তিনটে হচ্ছে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের জন্তে নির্দিষ্ট সময়। এর মধ্যে আছে আবার বিভাখী-মণ্ডল এবং অর্ধঘণ্টা ব্যাপী গ্রামোফোন রেকর্ড। সপ্তাহে একদিন নবাগতের আসর আর বিকুশর্মীর মহিলা-মজলিশ এই হচ্ছে পরিবর্তন।

আমরা বরাবর অভিযোগ প্রকাশ করে আসছি মহিলা আসরের নির্দিষ্ট সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত সময় মহিলা আসরের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। আবার এই সংক্ষিপ্ত সময়কে আরও সংক্ষিপ্ত করে তোলবার ভেতর কী যুক্তি থাকতে পারে?

বেতার কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত বেতারের দ্রুত প্রচার মহিলাদের জন্তে বিশেষতঃ বেড়ে চলেছে। সমস্তদিন সাং-

অর্ধেক পাওয়ার চেয়েও জ্বালো; কারণ, আমিও তাহলে সবটাই পাব।

(সুনির্মল হান্তসহকারে কথাগুলি বলিয়া দ্বিজেনের হস্তে প্রবল এক ঝাকানি দিয়া প্রস্থান করিল)

দ্বিজেন পুলকিত বিষয়ে শুরু রহিল কণকাল, পরে ধীরে ধীরে বলিল: একি লোক! —কিন্তু আমি এ কিছুতেই বরদাস্ত ক'রতে পারব না।

(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

দারিক গৃহখর্চের কাজে লিপ্ত থেকে মহিলাদের recreation এর জন্তেই অধিকাংশই বাড়ীতে গেল রাখা হয়।

তারপর এদেশের মহিলা শিক্ষা অত্যন্ত হতাশজনক। এখানে মহিলাদের জন্তে বেতারের বর্তব্য কত অধিক এবং শুকুতর তা অন্ততঃ বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টরের ভেবে দেখা উচিত।

এ, আই, আর প্রোগ্রামের অতিরিক্ত প্রোগ্রামে শ্রোতারা অতিষ্ঠ। সেই একঘেয়ে বিরক্তিকর কণ্ঠস্বরের যাত্রাগানের পাঁচ মহিলা আসরেরও প্রবেশ লাভ করছে। এদের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের বন্ধনুল ধারণার পরিবর্তন ঘটাই উচিত।

দ্বিপ্রাহরিক আসরে বে লব গুলী আর্টিষ্ট ছিল প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে কী তাঁদের পাওয়া যাবে? সুরশিল্পী সুখেন্দু গোস্বামী, নির্মল ভট্টাচার্য্য, অনিল ভট্টাচার্য্য, ভানুশেব ভানুজী, তারাপদ লাহিড়ী, প্রভৃতির কণ্ঠ সজীত—পকানন বে, কুমারী লাবণ্য বিশ্বাসের কীর্তন, লম্বরেঙ্গ দ্বান্ডেশ্বরের বঙ্গ সজীত—এমনি অনেক আর্টিষ্টই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে। নবাগতের আসরে আমরা কী তাঁদের দেখা পাবো?

গর্ভ নিরোধ বটিকা
বহু পরীক্ষিত ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ঔষধ, মাত্র একবার সেবনে এক বৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১৫ টাকা
ডাক্তার এম.এস.জামান
৪২, ধর্মভাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা

খেয়ালী চিত্রপট



নিউ থিয়েটার্সের—“অধিকার” চিত্রে
শ্রীমতী যমুনা। ছবিখানা পরিচালনা
কচ্ছেন শ্রীযুক্ত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া।



পরিচালক

টেলিগ্রাম
ভ্যারিটি

স্বাধীনতা মিউজপেপার লি:

টেলিফোন
সাঁউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাঁউথ) রোড, কলিকাতা

নষ্টম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২শে জৈষ্ঠ ১৩৪৫, ২রা জুন ১৯৩৮

মশোহরের দক্ষ যত্ন

মশোহর-খুলনা কর্মী সম্মেলনে সভাপতি পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন বোষ। সম্মেলনের অধিবেশনের প্রারম্ভে বহু বিশিষ্ট নেতা ও কর্মী সম্মেলনের সহিত অসহযোগিতা জ্ঞাপন করিয়া দূরে থাকিবার অভিপ্রায় প্রচার করেন। তাহাতেই যে ভাঙ্গনের সূচনা হয় পরে তাহা দক্ষযত্নে পরিণত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় প্রভৃতি প্রখ্যাত নেতৃবর্গের যোগদানেও কোন কল হয় নাই। বহু প্রচেষ্টা স্বত্রেও সম্মেলনের অধিবেশন পণ্ড হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন বোষ যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সম্মেলনের বিরুদ্ধে জনমত এতই প্রবল ছিল যে কোন মতেই সম্মেলনের অধিবেশন সম্ভব হয় নাই।

সর্বাপেক্ষা শোচনীয় বিষয় যে মতবিরোধ ও দলাদলি এতই প্রবল আকার ধারণ করে যে তাহার কলে কয়েকজন কর্মী গুরুতর ভাবে আহত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন কলিকাতায় আনীত হন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইলেও তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইহা বৈরুপ আকস্মিক তরুণ মর্মান্তিক। কয়েক বৎসর পূর্বের চট্টগ্রামে এই খণ্ড দলাদলির কলে আর একটা বালককে অকালে পরলোক গমন করিতে হয়। বাংলার আভ্যন্তরিক দলাদলির ইহা এক বীভৎস দিক।

রাষ্ট্রপতি স্ভাষচন্দ্রের মিলন-আহ্বানের কি ইহাই প্রত্যুত্তর? বিবদমান দলের মধ্যে একদল 'রাষ্ট্রপতির অবিসংবাদিত আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় পরিচালিত দলত' অন্ততঃ একবৎসরের জন্য "সশস্ত্র নিরপেক্ষতা" ঘোষণা করিয়াছেন। এই অবস্থায় দলাদলির এইরূপ শোচনীয় ও বীভৎস পরিণতি কেন? তবে কি বৃষ্টিতে হইবে যে রাষ্ট্রপতির প্রতি তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই? রাজনীতির নামে সচুমুক্ত "দাদা"-শ্রেণীভুক্ত মাতব্বর ব্যক্তিবর্গের যে তাণ্ডব লীলা সুরু হইয়াছে তাহার শেষ কোথায় তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? অতীত যুগের বীর-গরিমার বড়াই করিয়া তাঁহারা যে বেসাতী করিতে বসিয়াছেন তাহা ব্যক্তিগত ও উপদলগত প্রাধান্য-প্রচেষ্টার জন্য।

বাংলার তরুণবৃন্দ আর কতদিন তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক হইয়া থাকিবেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে কলুষ মুক্ত করিতে হইলে সর্বাপেক্ষে প্রয়োজন ব্যক্তিগত বা উপদলগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় আত্মহারা দাদা-শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে অপসারিত করা। 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলনের' চিরন্তন ঘন্দের কি শেষ নাই?

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান অস্থায়ী শিকাগোবী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বাৰা-জ্ঞানদীপনম্পন্ন ও নিৰ্বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। শিকাগোবী-ঘটিত ব্যাপারে অত্যন্ত বিবরণ বিস্তারিত না করিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে শৈলেন ঘোষ মহাশয় "প্রতিভা রায়"র কাহিনী অনুসন্ধান করিতে যে পরম্পর বিরোধী কার্য্য করিয়া ও উক্তি করিয়া বালমূল্য হস্তাধারের অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে "প্রতিভা রায়" প্রতিলিপিকাই হউন বা রক্তমাংসের মানবীই হউন শৈলেন ঘোষের তথাকথিত অনুসন্ধান-গ্রহণন তাঁহাকে কোনরূপ দ্বিধাশূন্য পদের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। সুতরাং কর্পোরেশন তাঁহার পদচ্যুতির নির্দেশ দিয়া যে

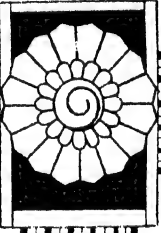
দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। কর্পোরেশন নিৰ্বোধ দাবালকদের বা মার্কিন-ভারবাহী ব্যক্তিবর্গের পিঁজারাপোল নহে।

শৈলেনবাবুর দৃষ্টিভঙ্গ সৰ্ব্বকল্প তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভাবনার আতঙ্কিত হইয়া তদ্বিতী স্তম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে কর্পোরেশন দাতব্য-প্রতিষ্ঠান নহে। বিশ বৎসর অ্যামেরিকায় যে ভাবে জীবিকা অর্জন করিয়াছেন শৈলেনবাবু প্রয়োজন বোধ করিলে পুণরায় অ্যামেরিকায় ফিরিয়া গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে পারেন! তাঁহার কর্ম্মশূন্যতার আশঙ্কার কয়েকটি ব্যক্তির অহেতুকী আতঙ্ক হুজুর।

শৈলেনবাবুর পদচ্যুতির প্রস্তাব পাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকাগোবীঘের পদের জন্ম

বর্তমান এ্যালেমার মিঃ আর, এম্. দেন্ডগু, ভূতপূৰ্ব্ব 'লিবার্টি'—লম্পাৰক শ্রীযুক্ত নতরঞ্জন বন্দী ও ডাঃ নলিনাক শায়্যালের নাম বিশেষভাবে শোনা বাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কাহার ভাগ্য সুপ্রদয় হয় তাহা বর্তমানে সঠিকভাবে বলা নহজসাধ্য নহে। তবে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে যে যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন তাহা অনিশ্চিত।

সন্ত আই, দি, এম্. পদপরিভাগকারী মিঃ বিষ্ণু কামাথ বর্তমানে কলিকাতার রাষ্ট্রপতির অতিথি। তাঁহাকে কলিকাতার কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করিবার পূর্বে কর্পোরেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী স্পেশাল অফিসার ভাবে বর্তমানে নিযুক্ত করিলে কর্পোরেশন-শাসন-বস্ত্রে দিভিল লাভিলের



দি
এসোসিয়েটেড প্রডিউসার্সের
নিবেদন

সুপ্রভা মুখার্জি
ইন্দিরা রায়
শান্তিলতা ঘোষ
রমা ব্যানার্জি
ডাঃ হরেন মুখার্জি
ছবি বিশ্বাস অভিনীত

বিশ্বনাথের চোখের বালি



(বিলাসী)

বিজ্ঞাপতি

যে সব শিল্পীদের সমবেত শক্তি প্রয়োগে, ছায়া-পটে “বিজ্ঞাপতি” বিশেষ সমাধার লাভ করেছে, তাঁদের মধ্যে অভিনয় ও গানের দিক দিয়ে সব চেয়ে উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন—অমুরাধারীণী কানন। বিশেষ করে নারী-মহলে এই চরিত্রটি যে বিশেষ চাকল্যের সৃষ্টি করেছে তার অনেকগুলি কারণ বর্তমান।

নারী তার জীবনের লক্ষ্যকতা খোঁজে—সেবা ও প্রেমের মধ্য দিয়ে। অমুরাধারী জীবনে, এই সেবা প্রেমটাই, তার চরিত্রগত অপরাপর গুণাবলীকে ছাপিয়ে উঠেছে। সেবার মধ্যে দিয়ে অমুরাধারী তার সাহচর্য পেয়েছিল আর প্রেমের সাধনায় সে বিজয়িনী হয়েছিল তার প্রবল নিষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের জোরে।

তাই অমুরাধারী জীবনের আদর্শ এত নিবিড়ভাবে নারীর হৃদয়স্পর্শ করে। ভারতীয় ছায়া-চিত্রের ইতিহাসে, তাই “বিজ্ঞাপতি”

কর্মের অভিজ্ঞতা প্রসূত স্বকতা ও ত্যাগ-ব্রতীর আদর্শ লব্ধিলিত হইয়া কলিকাতার পৌর-প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের বহু ফল্যাপ সাধন করিতে পারিবেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের শাশনবন্ধে কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিফলিত হইবে। রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ?

চরিত্রকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে—তবু এই চরিত্রটির জোরেই।

মাত্র গত ছ’মাসে, একমাত্র চিত্রাতে-ই প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছে। এথেকেই ছায়া চিত্রের দর্শক-মহলে এই চিত্রের অভাবিত সাফল্যের কারণ উপলব্ধি করা যায়।

তা ছাড়া বিজ্ঞাপতির মত ছবি একবার দেখে বিশেষ উপলব্ধি করা যায় না।

অন্ততঃ আর একবার না দেখলে এর dialogue গুলিকে সম্পূর্ণভাবে follow করা যায় না।

অভিজ্ঞান

অভিজ্ঞান-এর বিজ্ঞাপনী-চিত্র (trailer) গত হল। থেকে “চিত্রা” ও “রূপবালী”-তে প্রদর্শিত হচ্ছে। টেলার থেকে যতখানি অমুরাধারী কোরতে পারা যায়, তাতে ব্যবসায়, মূল চিত্রখানি লকল দিক থেকেই হৃদয়গ্রাহী হবে।

শিল্পী ও টেকনিশিয়ান সমাবেশের দিক থেকে এই ছবিখানি, নিউ থিয়েটারের অপরাপর ছবির মতই মনোজ্ঞ হবে বলেই আশা করা যায়।

বিচিত্র ঘটনা-বহুল এই কাহিনীটির মধ্যে আমাদের, চিন্তাধারাকে আলোড়িত করার মত বহু উপাধান বর্তমান। কুশলী চিত্র-নাট্যকার কণী মজুমদার যে দেখে সব বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে চিত্রনাট্যকারে গেঁথে ফুলে, ছবির পর্দায় তার একটি বিশিষ্ট রূপ

দ্বিতে পারবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। প্রয়োগ-শিল্পী প্রফুল্ল রায়ের কাছেও আমরা তাঁর নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পেতে চাই।

গেল মজলবার নিউ লিনেনবায় এই ছবির “লেন্সার শো” হয়ে গেছে। তা থেকে আমরা যা রিপোর্ট পেয়েছি তা খুবই আশাশ্রয়।

“রূপবালী”-তে ছবিখানির উদ্বোধন-দিবস আগামী শনিবার, ১১ই মে। আপাততঃ আমরা সেই শুভ-দিনটির প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইলুম।

ধরিত্রী মাতা

নীতীন বহুর ছ’ ভাবার ছবি “ধরিত্রী মাতা”র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। স্বপ্নের দৃশ্যের নানান জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলো পরিচালক সেরে নিচ্ছেন।

সেদিন সেটির মধ্যে অনেকগুলি তাঁবু খাটান হয়েছিল। মাঠে খান নেই, ঘরে খাবার নেই, হাতে পরশা নেই—ঘরে হাহাকার। দলে দলে লোক আলছে তাঁবুর মালিকের কাছে জমী বিক্রী করতে। এরাই খুঁজে পেয়েছেন মাটির তেতরে করলার খনি। অশোক এলো এদেরই তাঁবুতে। বিধাতার ইচ্ছায় তার জীবনে নতুন অধ্যায় গড়ে উঠল।

ট্রাট সিন্দার

শ্রীমতী মজুমদার তাঁর বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন……ফুল করবেন না—শ্রীমতী কানন নয়—শ্রীমতী কানন তাঁর বাড়ীও ছাড়েন নি—New Theatres-এর studioও ছাড়েন নি।

অমরচাঁদ মহা খুশী—ছইজনেই শৈলেন চৌধুরী আর জগদীশ শেঠী। মজুমদার বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে বলে নয়—ছোট্ট হলও কঠিন দৃশ্যগুলির মধ্যে একটা আঁজ ভাল ভাবে উৎসর্গে গেল বলে।

অধিকার

নিউ থিয়েটার- ২ নং ইন্ডিওতে কাজ চলছে দিনে রাতে। কর্মী বজ্রার কাজের কাবাই নেই। এরই মধ্যে তিনি ছবির অনেকখানি কাজই লেরে ফেলেছেন।

আনোয়ার শা রোডে পের্ট পড়েছে রেবার ঘর। বজ্রাকর্ষীয় রেবা, সেজেছেন বাংলার পাহাড়ী-প্রিয়তমা। তাঁর রুম্ম চোহারায়— পিরানী দৃষ্টিতে—অনবস্ত অভিনয়ে মুগ্ধ করছেন সবাইকে।

হিন্দীতে রেবার অংশে নামছেন শ্রীমতী রামকুমারী। হঠাৎ যে ইলরাত জাহান কেন বাধ পড়লেন, তা আমরা বুঝতে পারলাম না।

কটকের ধারে মিউজিক রুমে রিহাল্লাল বিচ্ছেদ তিমির বরণ। 'ক্যামেল' লিগারেটের খালি কোটোর জাহাজ তৈরী হয়েছে। গাইবে ও আটিষ্টের বিশ্রাম নেই। বজ্রার আর বরণ আবার মিলেছেন। দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা লম্বয়রে উনিশশো পঁয়ত্রিশ খুঁটাকে যে ছবি হয়েছিল তাঁর নাম ছিল 'বেবদাল (হিন্দী)' বর্তমানে পুনরায় চার অক্ষরে আর একখানি ছবি উঠছে। শারা ভারতের লোক আজ দর্শন আকাঙ্ক্ষার উন্মুখ, ব্যাকুল। অর্কেস্ট্রা জগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পী 'অধিকার' ছবিতে যে রকম সুর দিয়েছেন তা নাকি আর হয়নি।

বজ্রা বলেন—তিমির বরণের সুর আমার এত ভাল লাগছে যে ছবির অন্তান্ত অনেক অংশ বাধ দিয়ে আমি গানই রাখলাম।

এই ছবিতেই গাইছেন সুকণ্ঠ গায়কবৃন্দ—পঙ্কজ বসিক, পাহাড়ী সান্তাল ও প্রতাপ মুখোপাধ্যায়।

বজ্রবর পাহাড়ীর গান—“আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ”—এতে নব-রূপে জন্ম নিয়েছে।

এ ছাড়াও এ ছবির 'ট্রেলারের' যে পরিকল্পনা হয়েছে তা একেবারে স্তম্ভনকে

তরা। কোন প্রকার টাইটেল থাকবে না এতে।

হাজারা পিক্‌চাস

আগামী ১১ই জুন উত্তর কলিকাতার জনপ্রিয় চিত্রগৃহ 'উত্তরা'র হাজারা পিক্‌চার্সের প্রথম পৌরাণিক চিত্রাধ্য "দেবী ফুলরা" বহু প্রতীকার পর সূক্তীলাভ করিবে। "কালকেতু ও ফুলরা" রোমাঞ্চকর কাহিনী বাঙলার নর নারীর প্রাণে চিরদিনই এক নব উন্মেষণার সৃষ্টি করে। এমন এক সময় এই কাহিনী রচিত হয়, সে সময় মানুষ পশু অপেক্ষা হিংস্র ও বর্বর ছিল। মানুষের অবস্থার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া স্বর্ণে মহামারা হইয়া উঠিলেন বিচলিতা— তিনি কণ্ঠ এক জাতিকে নিষ্ঠুর ও লতাবাহীরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্ত ইহাদের অধিনায়করূপে মর্ত্যে পাঠাইলেন ইন্দের পুত্র ও পুত্রবধূকে কালকেতু ও ফুলরারূপে। এইখান হইতেই এই কাহিনীর সূত্রপাত এবং নানা অলৌকিক ঘটনার ভিত্তর দিয়া তাহার পরিলম্পিষ্ট ঘটনায়ে।

অভিনেত্রী নির্বাচন, দৃশ্যপট সংস্থাপন, অভিজ্ঞ যন্ত্র-শিল্পী যোগাযোগে ছবিখানি বাহাতে বাংলার আবালবৃদ্ধবর্ণতার প্রাণে নুতন আনন্দ ও নবরসের লঙ্কার করে তাহার জন্ত এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিয়াছেন। ছবিখানির মুক্তি প্রতিজ্ঞার বাঙলার নরনারীরা যেরূপ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন তাহাতে আমরা ছবিখানির সাক্ষ্য লব্ধে সুনিশ্চিত।

এসোসিয়েটেড প্রোডাক্‌শন্স

কালী কিস্মু ইন্ডিওতে গৃহীত এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অর্থ্য রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিরহের অমর আলেখ্য "চোখের বালি"-র বহিদৃশ্য অবিশ্রান্ত ধারিপাত হেতু তোলা হুগিত রহিয়াছে। ইতিমধ্যে ছবিখানির ললীতাংগের কাজ বাহাতে শেষ করা যার

বর্জপক্ষ নেই চেষ্টাই করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প ও গান বাহাতে রবীন্দ্র প্রতিভাকে স্মরণ না করে এই প্রতিষ্ঠানের হোতাররা যে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেছেন। মোট কথা সাহিত্যের দরবারে "চোখের বালি" আজ যে সম্মানে ভূষিত চিত্রাঙ্কো ও বাহাতে লেই গৌরবে গৌরবান্বিত হয় তাহার জন্ত বর্জপক্ষের চলিয়াছে ঐকান্তিক চেষ্টা।

দীনু পিক্‌চাস

শোনা যাচ্ছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই "ত্রি" চিত্রগৃহে এই প্রতিষ্ঠানের চিত্র-নিবেদন "রেশমী রুমাল" সূক্তীলাভ করিবে। এক-খানি "রেশমী রুমাল"-কে কেন্দ্রীভূত করিয়া দুই পরিবারের মধ্যে যে ভুলচূকের সৃষ্টি হয় তাহারই ধ্বনিকাপাত হয় অক্ষরন্ত হানির উৎসের ভিতর। এই হাস্যরসাত্মক চিত্রখানি পরিচালনা করিয়াছেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। অভিনয় করিয়াছেন বাহারী তাঁহারী ও চিত্রাঙ্কো সুপরিচিত। ইহাদের মধ্যে ডাঃ হরেন মুখাঙ্গি, প্রভ, ললিত মিত্র, উষাধেবী ও সাবিত্রী প্রভৃতির নাম লক্ষ্যগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই সবেয় যোগাযোগে "রেশমী রুমাল" সাধারণকে আনন্দদানে লক্ষ্য হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পূর্ণ থিয়েটার

এই সপ্তাহই মুক্তির শেষ সপ্তাহ। লম্বনের শনিবার থেকে এখানে 'কমলা

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিপুল পানীয়

টকীজের “রাজগী” দেখান আরম্ভ হ’বে।
ওরুণ পরিচালক সুরকুমার দাসগুপ্ত এই ছবির
পরিচালনা করেছেন। কুমার শচীন দেব-
বর্মান এর সঙ্গীত ও শ্রীমতী মেনকার অপূর্ণ
অভিনয় কলার সমন্বয়ে যে এ ছবি দক্ষিণ
কলিকাতার জনপ্রিয় চিত্রগৃহ পূর্ণ থিয়েটারে
বেশ কিছু দিন চলবে—তা আশা করা
যায়।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে নিউ-
থিয়েটারের তথা ভারতের দুইখানি অল্পতম
কথাচিত্র ‘দেবদাস’ এবং ‘ভাগ্যচক্র’
যথাক্রমে চারদিন ও তিনদিন করিয়া
প্রদর্শিত হইবে। যে ছবিগুলি বার বার
করিয়া দেখিয়াও দেখিবার আনন্দ ঘেটে না
সেই সর্বাঙ্গীন দুইটি চিত্র রূপবাণীর
আলোক ও শব্দ প্রক্ষেপন যন্ত্রের
নিঃস্রবনে দর্শকবৃন্দ যে বিশেষ করিয়া
উপভোগ করিবেন সে লক্ষ্যে বলা বাহুল্য।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদ

গত শনিবার “বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদের”
অষ্টমী সভাপতি শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু
মহাশয়ের আহ্বানে একটি সভার অধিবেশন
হইয়া গিয়াছে। সভায় নানাপ্রকার
মূলোচনার পর একটি ছোট কমিটি নির্বাচন
হইয়াছে। এই কমিটি পরিষদের Rules
and Regulations-এর খসড়া প্রস্তুত
করিয়া সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবেন।
কমিটির মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত অনাদি বসু,
যতীন্দ্রনাথ মিত্র, মধু বসু, চিত্ত বোষ,
মিঃ হেমচন্দ্র, মিঃ বাগডে ও মিঃ চন্দ্রশেখর।

পুত্র-স্নেহ

“নীলা! তোমার আমি কত ভালবাসি—
আমাদের বিবাহিত জীবন নিশ্চয়ই স্বর্গীয়
হবে”,—স্বস্তি জায়গীরদার সুরেন্দ্রনাথ যখন
এক কৃষক কন্যা নীলাকে এই কথা
বলিতেছিল তখন স্নেহেও কেহ ভাবিতে
পারে নাই যে এই প্রেমই তাহাদের ভবিষ্যৎ
জীবনে কতবড় দুর্ভিক্ষ হইবে।

অদৃষ্টের পরিচালনে—বিধাতার নির্দম
ইচ্ছায় এই প্রেমিক যুগলের মিলনে এক
বিয় উপস্থিত হয়। নীলা অল্প এক কৃষককে
বিবাহ করিয়া যখন বিনাভিপাত কবিত্তেছিল
তখন জায়গীরদার সুরেন্দ্রনাথ বিবেশে।

দীর্ঘ বার বৎসর পর। ইতিমধ্যে নীলার
এক ভেলে জন্মগ্রহণ করে, ভেলের নাম
রমেশ—কিন্তু এই রমেশ সুরেন্দ্রনাথেরই
ঔরসজাত। যখন রমেশের লক্ষ্য সুরেন্দ্র-
নাথের লাক্ষ্য হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়
পুত্র স্নেহে আশ্রুত হইয়া উঠে কিন্তু তাহার
পরিচয় সে দিতে পারে না। অথচ দিনের
পর দিন এই পুত্রস্নেহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া
উঠে। অতঃপর নানাপ্রকার অজুহাতে
সুরেন্দ্রনাথ প্রায়ই রমেশকে তাহার বাড়ীতে
আহ্বান করে।

এদিকে নারায়ণলাল নামক জনৈক ব্যক্তি
সুরেন্দ্রনাথের চির শত্রু ছিল এবং এই
সুরেন্দ্রনাথের জন্তই যে নীলাকে পায় নাই।

এইখান হইতেই গল্প আরম্ভ। রমেশ
এখন বৃদ্ধ। রমেশ তাহার শৈশবের
দাদিনী উষাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়

মনে করে, এবং উষাও রমেশকে
পূর্ণভাবে ভালবালে। শৈশবের প্রীতি
পরিণত বয়সে স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত
হইয়াছে।

স্টানার আবর্তনে নীলা নিজ প্রেমিকের
কোলেই ইহলীলা শেষ করে, এবং রমেশের
দেখা শুনার ভারও জায়গীরদারের উপর
সমর্পণ করিয়া যায়। কিন্তু রমেশের মর্যাদা
বোধ বেশী ছিল। জায়গীরদারের সুরেন্দ্রনাথ
অপেক্ষা গরিবই তাহার ভাল লাগিত।

নারায়ণলালও সুরোগ স্বীকার্য কোশলের
সহিত এমন উপায় করিল যাহাতে পুত্রই
পিতার অপরাধের শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইল।

রমেশের কি হইল—নারায়ণলালের দ্বারা
কাহার হত্যা হইল—জায়গীরদারকে কে
মারিল—নারায়ণলালের অন্য কর্মের কি
ফল মিলিবে এবং পুত্রস্নেহের স্বর্গীয় চিত্র
দেখিতে হইলে আপনি নিশ্চয়ই প্রত্যত
লিনেমার আলিয়া “জায়গীরদার” ছবিখানা
দেখিয়া যাইবেন।

মিঃ রেবাশঙ্কর পাঞ্চোলী

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটরের
স্বত্বাধিকারী মিঃ রেবাশঙ্কর পাঞ্চোলী গত
সপ্তাহে বিমানপোত যোগে ইউরোপ গমন
করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ প্যারিতে
গমন করিবেন পরে লন্ডন হইয়া হলিউড
প্রদর্শন করিবেন। হলিউডে আর, কে,
ও রেডিও পিকচার্সের বাৎসরিক সম্মিলনীতে



ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১. ফ্লাইড ক্রীট, কলিকাতা।

নারী কী শুধুই ভোগের বস্তু বা খেলার পুতুল !

আগামী শনিবার ১১ই জুন, রূপালীর রূপালী পর্দায়, নিউ থিয়েটার্স-এর বহু-আলোচিত এবং বহু-বিজ্ঞাপিত চিত্র-কথা ‘অভিজ্ঞান’ মুক্তিলাভ কোরবে।

অভিজ্ঞান-এর বিষয়-বস্তুর মধ্যে আমরা অনেক কিছু নতুনত্বের সন্ধান পাব বোলে আশা করি।

‘সন্ধ্যা’ চরিত্রটি এই কাহিনীর মেরুদণ্ড। এই মেরুটির বিচিত্র জীবন কাহিনী অবলম্বন কোরেই ছায়া-চিত্রে গল্পটি শাখা-পল্লবিত হয়েচে।

অপরাধ কোরলে অপরাধীকে দণ্ড ভোগ কোরতে হয়। কিন্তু দণ্ড দেবার পূর্বে মানুষ চায় সে অপরাধের বিচার। কিন্তু

যোগদান করিবার জন্তও তিনি আহত হয়েছেন।

মিঃ পাকোলীর কর্মজীবন প্রত্যেকেরই অমুকরণীয়। আজ তিনি প্রায় ত্রিশটি চিত্রগৃহের পরিচালনা করেন এবং করাচী, বোম্বাই লাহোর, দিল্লী, কলিকাতা, রেজুন, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে তাহার অফিস বর্তমান। কিন্তু একদিন ব্যাকের সামান্য কর্মচারী ছিলেন মাত্র, নিজ কর্মতা ও অধ্যবসায় শুনে আজ তিনি ফিল্ম ব্যবসায় মহলে সুপরিচিত।

আর, কে, ও রেডিও পিকচারের তারতম্য, বার্মা ও দিলোন প্রভৃতি স্থানের ডিট্রিবিউটর ব্যতীতও তাহার আর, নি, এ কটোকোনের এজেন্ট রহিয়াছে।

খুব লম্বা ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর মিঃ পাকোলী, স্বয়ং ছবি তোলায় ব্যবসারে লিপ্ত হইতে পারেন।

সমাজ যেখানে অপরাধের বিচার না কোরে শুধু অপরাধীকে দণ্ড দিতে চায়—সেখানে সমাজের সে নির্দেশ আমরা কতক্ষণ মাথা পেতে নিতে পারি?

অভাগিনী সন্ধ্যার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ তার বিচার করলে না। দিলে তাকে দণ্ড।

ছনিয়ার কারু কাছে সে প্রতীকার পেল না। অন্ধ পিতৃভক্তিতে মোহাচ্ছন্ন তার স্বামী, কেবল জানালে মৌখিক সমবেদনা। তেত্রিশ-কোটি দেবতার নামে শপথ গ্রহণ কোরে, অগ্নি-সাক্ষী কোরে তাকে বিবাহ কোরেছিল। সুখে বা দুঃখে, বিপদে বা সম্পদে তাকে আশ্রয় দেবে বোলে।

কিন্তু জীবনের সে চরম পরীক্ষার দিনে, স্বামী তার কর্তব্য, তার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল। অসহায় নারী জীবনের পথে ভেদে চললো, প্রাণের ফুলের মত।

এমন অবস্থায় পড়লে হয় নারী বিপথ গামিনী হয়, নয় সে করে আত্মহত্যা। কিন্তু সন্ধ্যার জীবন দেবতা তাতে সার দেয় নি।

কিন্তু জীবন-যুদ্ধে এগিয়ে যাবার মত লং-সাহসের তার অভাব হয় নি। তাই অবিচলিত নিষ্ঠার, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দুর্দমণীর সাহসের জোরে, সে সেই নিষ্ঠুর, ক্ষয়হীন সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা কোরতে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি।

এই বিজয়িনী নারীর কাছে একদিন মতিচ্ছন্ন স্বামীকে পরাজয় স্বীকার কোরতে হোয়েছিল। স্বামীকে সে কমা কোরেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তার নারীত্ব ও আত্মসম্মান

জলাঞ্জলি দিবে, সে তার স্বামীর স্বীকার করে নি।

নারী যে শুধু ভোগের বস্তু বা খেলার পুতুল নয়—পুরুষের মতই যে তার অধিকার বোধ, আত্মসম্মান বোধ, তাকে সচেতন কোরে তুলতে পারে—সন্ধ্যা-নর্তীর মর্মস্পর্শ জীবন-নাট্যের মধ্যদিয়ে, তারই অশ্রু সজল কাহিনী আপনাদের অন্তর স্পর্শ কোরবে।

নিউ থিয়েটার্সের অপরাপর ছবির মতই অভিজ্ঞান-চিত্রের প্রযোজনায়, এই প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, টেকনিশিয়ান এবং কর্মী-সভ্যের যোগাযোগ ঘটেচে। সুতরাং চব্বিশখানি যে লকলকিক দিয়ে রম্যবস্তার চিত্র জগৎ কোরতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অভিজ্ঞান-এর প্রধান চরিত্রগুলিতে চিত্রা-বস্তরণ কোরেছেন : মলিনা, মেনকা, দেববালা, কমলা (ঝররা), রাজলক্ষ্মী, জীবন গাজুগী শৈলেন চৌধুরী, শৈলেন পাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, অহি লাক্তাল, বিনয় গোস্বামী, বোকেন চট্টো, প্রভৃতি।

এই চিত্রে প্রায় আটখানি গান লগ্নি বেশিত হ’য়েচ। গানগুলি রচন কোরেছেন—সুবিখ্যাত গীতিকার, অজয়কুমার ভট্টাচার্য। এতে সুর-সংযোজনা কোরেছেন স্বনামধন্য সুর-শিল্পী : রাই বড়াল।

—:—

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় খেরালীতে প্রকাশিত “রিত্তা” গল্পের লেখকের নাম শ্রীহরিমাণ্ড কুমার সুখোপাধ্যায় হইবে।

খেঃ সঃ।

হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্রাঙ্কণ...

দেবী ফুল্লরা

*

ভূমিকার : অমীন্দ্র, শিশুবালা, মনোরঞ্জন, রাধারানী, মোহন, সাবিত্রী

তিনখানি
স্ব র গী য়
চিত্র
অবিলম্বে
মাসিতেছে

বুকিংয়ের জন্য

আবেদন করুন

রীতেন

এণ্ড কোং

৬৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট

ফোন :

ক্যাল ১০৯২

*

দীপ্ত পিকচার্সের হাসির ঝরণা-ধারা...

রেশমী কুমাল

শ্রেষ্ঠাংশে : ডাঃ হরেন, প্রভা, উষা দেবী, সাবিত্রী, প্রকাশমণি, কমলা

রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় সামাজিক আলেখ্য...

চোখের বাণী

ভূমিকার : সুপ্রভা মুখার্জি, ইন্দিরা রায়, ডাঃ হরেন মুখার্জি, ছবি বিশ্বাস

অলিম্পিক

(সি, বি)

বার্মা ফুটবল টীম

গত দু'শতাব্দী ধরে "বার্মা ফুটবল টীম" কলকাতার খেলতে আসবে কি না সে বিষয়ে নানারকমের ভ্রমনা করনা শুরু হয়েছিল। প্রত্যেক দিনই নতুন নতুন খবর প্রচারিত হচ্ছিল। কোনদিন খবর পাওয়া গেল বার্মা হল জাহাজে চড়েছে আবার পনের দিন খবর পাওয়া গেল যে তারা কবে রওনা হবে তা এখনও ঠিক হয় নি। এই রকমের বিপরীত নৈরাশ্রজনক খবর প্রচারের জন্য বার্মা হল ততটা হতাশ না হলেও কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা এরা যে এখানে এলে হাজির হবে এ আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই প্রকারের আশা ও নিরাশাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির জন্য ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনকে কতকাংশে দায়ী করা যেতে পারে। কারণ তাঁরা এই সম্পর্কে নিজেদের স্থানীয় ব্যবস্থাক্তি সম্পূর্ণ না করেই নিমন্ত্রিতদের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বার্মা হল আসবার জন্য প্রস্তুত হবার পর আই এফ এর সম্মতি জানতে চাইলে এদের 'ইয়া এন' বলতে দিন তিনেক সময় লেগেছিল। যাক শেষ পর্যন্ত আই এফ এর নবনির্বাচিত সম্পাদক মিঃ এম হুস্ত রায়ের আগ্রাণ চেষ্টায়—'বার্মা ফুটবল টীম' বি আই এন এন্ কোম্পানীর 'এরোও' জাহাজে গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় আউটরাম ঘাটে এসে পৌঁছেছে। তাঁহাদের অভির্থনা করবার জন্য আই এফ এর সম্পাদক মরগান এম হুস্ত রায় ও রবিনসন, মিঃ পি গুপ্ত,

মিঃ জি এন হুস্ত, মিঃ লাকি ইম্পাহানি, মিঃ মুকদ্দীন, মিঃ প্রেস্টন এবং লংবাৎপত্র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আই এফ এর সভাপতি মাননীয় লেফ্টেনেন্ট মহারাজা বাহাদুর ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে এই আগন্তুক দলটিকে অভ্যর্থনা করতে অক্ষম হওয়ায় তিনি একটি লিখিত অভির্থনাক্রাপক বাণী প্রেরণ করেন এবং মিঃ রবিনসন জাহাজের ডেকের উপর বার্মা দলটির সম্মুখে তাহা পাঠ করেন। আউটরাম ঘাট থেকে তাঁরা বরাবর 'কন্টিনেন্টাল হোটেলে' এসে অবস্থান করেন। ঐদিন্ বিকালে তাঁরা কালীঘাট ও মহম্মেডান্ স্পোর্টিং এবং ক্যালকাটা ও ই বি আরের খেলাটি আংশিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এর আগে কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের কালীঘাট ক্লাবের প্রচেষ্টায় বর্মী খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ উপস্থিত হলেও বার্মার কোন ফুটবল দলের ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখার লোভাগা হয় নি। কিন্তু হুস্তের বিষয় আগন্তুক দলটি যে দুটি ম্যাচ খেলেছেন সেগুলিতে দর্শক লমাগম্ বজ্রকাতার সুনাম অনুভবী হয় নি। এর একটা কারণ হচ্ছে মহম্মেডান্ স্পোর্টিং ক্লাব বার্মা দলের সঙ্গে খেলতে রাজী না হওয়ায় এই সম্প্রদায়ের দর্শকেরা ডুই খেলাগুলিতে উপস্থিত হন নি। তার উপর গত শনিবার বার্মা দল ও ক্যালকাটা এবং মোহন-বাগানের ল'ম্বলিত দলটির খেলা আরম্ভ হবার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে যুবলদ্বারে

বৃষ্টি শুরু হওয়ায় জল্প অনেক ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বার্মা দল গত জামুয়ারী মাসে লন্ডনের 'ইসলিংটন কন্টিনেন্টিয়ানস দলকে এবং রেঙ্গুনে কলকাতার স্টেভেন্সন ক্লাবকে পরাজিত করে ও চাইনীজ অলিম্পিক ফুটবল টীমের বিরুদ্ধে নৈপুণ্যপূর্ণ খেলা দেখিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। আমাদের প্রতিনিধি বার্মা দলের ম্যানেজার মিঃ ডি ক্রুজ এবং ক্যাপ্টেন মিঃ ল বেলীর কাছ থেকে বার্মার ফুটবল খেলা লম্বকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানতে পারেন। বার্মায় জুন মাস থেকে পাঁচ মাসব্যাপী ফুটবল খেলার মরসুম শুরু হয়। সেই কারণে তাঁদের দলের খেলোয়াড়েরা এখানে আসার আগে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পান নি। চাইনীজ দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড লী ওয়াই টংয়ের অনুক্রম খেলোয়াড় হতিপূর্বে তাঁরা আর দেখেন নি। বার্মার খেলোয়াড়দের মধ্যে পেশাদারী মনোবৃত্তি একেবারে নেই। বর্মীরা রাগবী খেলে না। কাষ্টমস্, রেলওয়ে মিউনিসিপ্যাল, সেকুয়িয়ারানস্, ইউরোপীয়ান জিমখানা, কয়াল, পু'লশ ইত্যাদি প্রায় দশটি ফুটবল ক্লাব বার্মায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রেঙ্গুন কাষ্টমস্ ওখানকার লবচেয়ে শক্তিসম্পন্ন দল। অনিবার্য কারণে তিনজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ম্যাংখান, লোন্ এবং ইয়াবা এই দলে আসতে পারেন নি। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ এই দলের পক্ষে খেলবার জন্য কলকাতায় এসেছেন। গোল—বালিন্ (মিউনিসিপ্যাল), ব্যাক—দীনা (পোষ্টালস্) ও লেফ্টেজ (কাষ্টমস্), হাফব্যাক—গালিং (রেলওয়ে), ল ভেলী (কাষ্টমস্) ও ফোগটি (সেকুয়িয়ারানস্), ফরওয়ার্ডস—উইলিন্ এবং কানিয়ান্ (বার্মা পুলিশ), বা বা (রেলওয়ে), পাগসলী (কাষ্টমস্) ও রবার্টস্ (বি আই এন এন্)।

রিজার্ভস—জোহানিস, পেস, বেটার ও
বেটল্যাণ্ড (এরা সকলেই রেলওয়ে দলের
খেলোয়াড়)

দপদ্বী মি: জুন্স এই দলের সম্পাদক
ও ম্যানেজার হিসাবে কাজে এসেছেন।

বার্মা দলের প্রথম খেলা

গত শুক্রবার কালকাটা মাঠে আই
এফ এর বাফাই দলের সহিত বার্মা দলের
প্রথম খেলাটি হয়। আগন্তুক হল প্রথমার্ধে
বিজয়সূচক ক্রীড়া প্রদর্শন করেও শেষ পর্যন্ত
এক গোলে পরাজয় স্বীকার করে। আই
এফ এ দলে গোলরক্ষক আর্নস্ট্রুং মনোনীত
হলেও তিনি বোগদান করতে অসমর্থ
হওয়ায় তাঁর দায়িত্ব ই. বি. আর দলের
গোলরক্ষক রোজারিওর উপর অর্পিত হয়।
বার্মা দল প্রথম দ্বিনের এই খেলাটিতে
পরাজিত হওয়ায় তাদের খ্যাতি অনেকাংশে

রান হয়। তাছাড়া বার্মা দল এই দ্বিনে
তাদের খ্যাতি অসুখারী উচ্চাঙ্গের খেলা
দেখাতে সক্ষম হয় নি। এই দলের
খেলোয়াড়েরা হেড করতে একবারেই
অভ্যস্ত নয় বলে প্রতীক্ষমান হল। এই
ক্রীড়া দ্বি তারের খেলায় না দেখা যেত
তাহলে হয়ত প্রথম দ্বিনে পরাজয় স্বীকার
করতে হত না। প্রথমার্ধে বার্মা দল
অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে খেলে। তবে
তাদের খেলার মধ্যে বিশেষ নৈপুণ্যের
পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু আই এক
এ দলের রক্ষণ ভাগের প্রাণলিনী খেলার
জন্ত তারা কোন গোল প্রদান করতে পারে
না। দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দলই সমানভাবে
আক্রমণ করবার সুযোগ পায়। পনেরো
মিনিট ব্যর্থ আক্রমণ চলাব পর আর
লামস্ ডেন্ গোলের সম্মুখে একটি পাশ
করলে রহিম বিজয়সূচক গোলটি করেন

১—০। আই এক এ দলের অধিকাংশ
আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়েরা নৈরাশ্রজনক-
ভাবে না খেলে এই দলটি আরও বেশী
গোলে জয়ী হতে পারত। বিজয়ী দলের
রক্ষণভাগে গোলরক্ষক রোজারিও, ব্যাবসর
পি দামগুপ্ত ও ই কার্ডে, এবং হাফব্যাক-
দ্বিগের মধ্যে জে লামস্ ডেন্ লক্ষ্যপেত্র
খেলে। আক্রমণভাগে রহিম এবং আব্বানের
খেলা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। বার্মা দলের
গোলরক্ষক বাসিন্ নিজ কৃতিত্বের পরিচয়
দেন। ব্যাকদ্বিগের মধ্যে হীনা, হাফ ব্যাক
সভেলী (ক্যাপ্টেন্) এবং ফরওয়ার্ডের মধ্যে
পাগস্লে, বা বা, কানিরান্ এবং উই লীন
বার্মার ক্রীড়া চাতুর্যের পরিচয় দেন।

আই এক এ দল—রোজারিও (ই, বি,
আর); পি, দাম গুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল) এবং
ই কার্ডে (পুলিশ); হেগুৱান (কে, ও,

স্মৃতি প্রতিষ্কার

কর্ম বীর

শ্রীসীতারাম সিনেটোনের অবদান—

—ঃ ভূমিকায় :—

মাষ্টার খলিল—

মহম্মদ ইমাক—

মাষ্টার জয় শঙ্কর—

চম্পা বাই—

রাধারানী—

ললিতাদেবী—

রহমৎ বাই—

পুটলি বাই ইত্যাদি—

নিউ আলফ্রেড টকী—চিত্রগ্রহে।

—ঃ একমাত্র পরিবেশক :—

এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটস্

বিঃ, ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা।

এল, বি); টেগর (ক্যালকাটা) ক্যাপ্টেন, এবং জে, লামসডেন (রেজার্শ); দেলি (মহমেডান); রহিম (মহমেডান), আর লামসডেন (রেজার্শ), ব্রাওয়ার (ক্যামেরো-নিরানল) এবং আবাস (মহমেডান)

বার্খা হল—বার্লিন, বীনা এবং লেট্টেজ, গালিং, লভেনী এবং কোগাটি, উইলীন, কানিয়ান, বা বা, পাগললে এবং রবার্টস,

রেকারী—জগদীশ চক্রবর্তী

লাইনলম্যানসন—সি বি চ্যাটার্জি ও এন্ লরকার।

বার্খা দলের দ্বিতীয় খেলা—

কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং শীর্ষ বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহিত বার্খা দলের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলা হবার লক্ষ্য বন্দোবস্ত ঠিক হয়। কিন্তু লক্ষ্য ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর অপ্রত্যাশিতভাবে মহমেডান হল আই এক এর নিকট ছুটি লক্ষ্য পেশ করে। আই এক এ সেগুলি অস্বীকার করার মহমেডান হল খেলতে অসম্মতি জানায়। সেই কারণে ক্যালকাটা ও মোহনবাগান দলের ব্যাটাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি টিম গঠন করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে গত শনিবার ক্যালকাটা মাঠে ক্যালকাটা মোহনবাগান লক্ষিত দলের সঙ্গে বার্খাদলের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলা হয়। এইদিনে খেলা আরম্ভ হবার আগে থেকেই মূলধারে বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ঝড় সুরু হয়। সেই কারণে খুব অল্প লংথক দর্শক এই খেলাটিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এইরূপ চূড়ান্ত দুর্যোগের মধ্যে খেলাটি হওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হবার পর শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখার

নানাপ্রকার অনুবিধা হওয়ার খেলাটি যথালম্বেরে আরম্ভ হয়। প্রথম থেকেই মাঠটিতে বৃষ্টির জল জমে যায়। স্থানীয়দের এইরূপ মাঠে খেলতে বিশেষ অনুবিধা হলেও আগন্তুক দলটি এইরূপ মাঠে প্রথম দিন অপেক্ষা উন্নত ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে এবং ৩-২ গোলে জয় হবার দৌড়াত্য লাভ করে। এই খেলাটিতে প্রমাণিত হয় যে বার্খার খেলোয়াড়েরা জল কাটার নিজেদের উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। বার্খা হল উন্নত ধরনের খেলা দেখিয়ে প্রথম পনেরো মিনিটের মধ্যে তিনটি গোল প্রদান করতে সক্ষম হলেও স্থানীয় হল আশাতিরিক্তভাবে উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াচাতুর্য প্রদর্শন করে। দ্বিতীয়ার্ধে ছুটি গোল পরিশোধ করে। তবে বার্খা দলের একটা গোল এবং লক্ষিত দলের দুটি গোল পেনাল্টি কিং থেকে হয়। আগন্তুক দলের বা বা এবং পাগললে যথাক্রমে একটি ও দুটি গোল প্রদান করেন। স্থানীয় দলের এল চৌধুরী দুটি গোল পরিশোধ করবার দৌড়াত্য লাভ করেন। বিজয় দলের রক্ষণভাগে বা লিন, বীনা, গালিং এবং আক্রমণ ভাগে রবার্টস ব্যতীত সকলেই দর্শকদের তৃপ্তি দান করেন। বিশেষ করিয়া বা বা তাঁহার নিজ সুনামের প্রশংসনার পরিচয় দেব। এই দিনের খেলার পর সকলেই স্বীকার করছেন যে, বা বা প্রকৃতই একজন গুণী খেলোয়াড়। বিজিত দলে আর্নল্ড গ্যালম্যান, বিল মুখার্জি, টেলর, বেনীপ্রদা, এল চৌধুরী এবং প্রেমলাল দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রক্ষণভাগে বেনীপ্রদা খেলা সর্কারপেকা উপভোগ্য হয়েছিল।

বার্খাদল—বার্লিন, বীনা এবং লেট্টেজ, গালিং, লভেনী এবং কোগাটি, উইলীন, কানিয়ান, বা বা, পাগললে এবং রবার্টস।
ক্যালকাটা ও মোহনবাগান হল—আর্নল্ড (ক্যালকাটা), রবার্টস (মোহনবাগান) এবং গ্রানম্যান (ক্যালকাটা), বিল মুখার্জি (মোহনবাগান), টেলর (ক্যালকাটা) এবং বেনীপ্রদা (মোহনবাগান), নির্মল ঘোষ (মোহনবাগান), ম্যাক (ক্যালকাটা), এ রায় চৌধুরী (মোহনবাগান), প্রেমলাল এবং এল চৌধুরী (মোহনবাগান)।

রেকারী—লর্ডেন্ট রবিনলন্

লাইনলম্যানসন—হীরালাল দত্ত এবং এম্ আমেদ।

বার্খা দলের অভ্যর্থনা—গত রবিবার বার্খা দলের কোন খেলা না থাকার জন্য অনেকগুলি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়েছিল। চন্দননগর সেন্ট্রাল ক্লাব কর্তৃক জলযোগে আপ্যায়িত হবার পর বার্খা ফুটবল টিম গ্রেট ইষ্টার্ন হোটলে আই এক এ কর্তৃক প্রদত্ত 'লানচু পাটিতে' যোগদান করেন।

এই দিনে বিকাল পাচটার সময় কালীঘাট ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এ কে সেন তাঁর ৩নং নিউ রোডস্থ ভবনে বার্খা টিমকে 'চা পানে' অভ্যর্থিত করেন। ক্লাবের সভাপতি মাননীয় মিঃ এল, কে লিংহ, মিঃ জ্ঞানাজুর দে আই-সি-এল, মিঃ সুশীল সেন ইত্যাদি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সম্মেলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।



ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ব্লাইভ ক্রীট, কলিকাতা।

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ
বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু
ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বোয়ারা।
অস্তান্ত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

হীরার হার

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাগের আমলের
বুড়ো ষি।
অস্তান্ত চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে
পাইবেন।

(এক)

“ভজ্রমহোৎসব ও মহিলাগণ!”

সকলে চমকিত হ’য়ে কিরে চাইলেন।
বাড়ীর অন্দরের দিকে হলঘরের যে দরজা
ছিল, তার সামনে গৃহস্বামী মিঃ ঘোষ
দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখে হাসি থাকলেও
চকুতে যেন কেমন একটা উদ্বেগের ভাব
রয়েছে। মিঃ ঘোষ বারাসত মহকুমার
অন্তর্গত গুপ্তিয়ার জমিদার। আজ মিলেস্
ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষে ভোজের ব্যবস্থা
হ’য়েছে। থিয়েটার রোডের বিরাট “বোম-
ম্যানশ্বা” সুসজ্জিত ও আলোকিত।
কলকাতার অসংখ্য গল্পমাত্র লজ্জাস্ত ব্যক্তি
সপরিবারে নিমন্ত্রিত হ’য়ে এলেছেন।
সামনের বিরাট হলঘরে সকলে সমবেত
হ’য়েছেন। ঐ উপলক্ষে অনেক খ্যাতনামা
গায়ক-গায়িকারও লেখানে লমাবেশ হ’য়েছে।
ঘরের একপ্রান্তে বিখ্যাত “লোটাস্
অরকেষ্ট্রা”র যন্ত্র-লজ্জীত চলছিল। এমন
মধ্যে হঠাৎ এইরকম বাধা উপস্থিত হওয়ার
সকলেই একটু বিস্মিত হ’য়ে গেলেন। যন্ত্র-
লজ্জীত থেমে গেল—সকলে শুরু হ’য়ে
গৃহস্বামীর দিকে চাইলেন।

মিঃ ঘোষ বলেন—“ভজ্রমহোৎসব ও
মহিলাগণ, হঠাৎ আনন্দের মাঝখানে বাধা
দিয়ে আমাদের আপনাদের বিরাগ-ভাজন
হ’তে হ’লো—শ্রদ্ধা করবেন। কিন্তু, আমার
এই বিরক্তিকর কাজটি একান্ত অনিচ্ছাকৃত
উপায়স্বরূপ না থাকায় আপনাকে এই রকম
স্বস্তে হ’লো। জন্মদিন-উপলক্ষে কাল
শামি আমার জীকে একটা হীরার হার উপহার

দিয়েছিলুম। হারটির দাম ২,০০০ বিল
হাজার টাকা। আজ আমার জী সেই
হার পরে’ নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করেছেন।
দশ মিনিট আগে আমার জী এই ঘর থেকে
বাইরে যান। আমি সেই সময়ে এইদিকে
আসছিলুম। পথে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা
হ’লো। তিনি খুব চকল হ’য়েছেন
দেখলুম। তাঁর চাকল্য লক্ষ্য করে, আমি
বল্লাম—“কি হ’য়েছে, হীরা? তোমাকে
বড়ই চকল দেখছি কেন?” আমার জী
বল্লেন—“আমার হারভাটা দেখতে পাচ্ছি
না। একটু আগে আমার গলায় ছিল—
বেশ মনে আছে। মিনিটখানেক আগে,
যখন আমি মিস্ গুপ্তার সঙ্গে কথা কইছিলুম,
তখন হঠাৎ আমার গলাটা খালি-খালি মনে
হ’লো। হাত দিয়ে দেখলুম গলায় হার
নেই। আমার পাশেই বিখ্যাত অভিনেত্রী
লতী দেবী দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমার
চকলতা লক্ষ্য করে’ ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা
করায় আমি তাঁর কানে কানে ঘটনাটা
বল্লাম। তিনি ও আমি দু’জনে একটুখানি
এদিক-ওদিক অহুসমান করবার পর হারের
কোন খোঁজ না পাওয়ার, তিনি তোমাকে
খবর দিতে বল্লেন।’ আমার জীর কথা
শুনে, আমি লতী দেবীকে ডেকে এ সম্বন্ধে
দু’একটা কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তারপর
আপনাদের জানান দরকার বিবেচনা করে
আপনাদের জানাচ্ছি। আপনাদের কারো
নজরে পড়লে অবশ্যই আপনারা আমাকে
জানাবেন। এমনও হ’তে পারে, যে
তবিস্মিতে যাতে আমার জী আরও লভর্ক

হ’ন, সেই জেজে আপনারা কেউ অলঙ্কারটি
লুকিয়ে রেখেছেন। তা’ যদি হয়, তো
তাঁর বিলক্ষণ শিক্কা হ’য়েছে। বিনি লুকিয়ে
রেখেছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দিতে
পারেন।”

মিঃ ঘোষ চুপ করলেন। ঘর একেবারে
নিস্তব্ধ—সকলেরই মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার
ছায়া। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে
লাগলেন। এক মিনিট কেটে গেল, কিন্তু
কেউ এগিয়ে গেলেন না।

মিঃ ঘোষের হাসি একটু স্নান হ’য়ে
গেল। তিনি আবার বল্লেন—“ওঃ!
আমার একটু ভুল হ’য়েছে। ঘরে আলো
জ্বলছে। সুতরাং আমি বুঝলেও অপরে
হয়তো বুঝবেন না, এই ভয়ে বিনি রেখে
দিয়েছেন, তিনি ফিরিয়ে দিতে লজ্জিত
হ’ছেন। আচ্ছা, আমি এই টেবিলের
কাছে দাঁড়াচ্ছি। দু’ মিনিট পরে সব
আলো নিবে যাবে। এক মিনিট ঘর
একেবারে অন্ধকার হ’য়ে থাকবে। সেই
অবকাশে হার আমার কাছে ফিরে আসবে
আশাকরি। কেউ জানতেও পারবেন না,
কে হার ভাটা রেখেছিলেন।”

এই বলে তিনি একজন লরকারকে ডেকে
কানে কানে কি বলে দিলেন। লরকার
চলে গেল। মিঃ ঘোষ অরকেষ্ট্রা পাটিকে
আবার বাজনা শুরু করতে অহুরোধ করলেন।
যন্ত্র-লজ্জীত আবার আরম্ভ হ’লো, কিন্তু যন্ত্রের
আলাপে আর সে লজ্জীবতা ছিল না।
সকলেই রুদ্ধ-নিশ্বাসে আলো নিবে যাবার
অপেক্ষা করে রইলেন। ঘোষ লাহেব

টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরেই আলো নিভে গেল—সব অন্ধকার। অর্কেষ্ট্রা থেমে গেল।

অতবড় বিরাট ঘরখানায় একটা অসুস্থমনীর শুকতা বিরাজ করছিল। “কিশ কিশ” করে কথাবার্তার চাপা শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। সকলেই প্রতীক্ষমান রুহরে প্রত্যেকটা সেকেন্ড যেন মনে মনে গুনতে লাগলেন। কেউ কি হার ঘোষ-লাহেবের হাতে ফিরিয়ে দেবে? হিলে কি কেউ হার ফিরিয়ে?

এক মিনিট খুব অল্প সময় বটে। কিন্তু, অন্ধকারের মধ্যে এই একটা মিনিট যেন আর কাটতে চায় না। হঠাৎ ঘোষ-লাহেবের স্বর শোনা গেল। তিনি বলেন—“মিনিট প্রায় শেষ হ’ল। আমি হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে আছি। আচ্ছা, আরও এক মিনিট সময় দেওয়া গেল।”

অন্ধকারের মধ্যে আরও একমিনিট কাটাতে হ’বে ভেবে অনেকেই একটু বিরক্ত হ’লেন। কিন্তু উপায় কি? ক্রমে লে মিনিটটাও কেটে এলো। খানিক পরেই সব আলো আবার জ্বলে উঠলো। ঘোষ লাহেব তখনও টেবিলের পাশে বাড়িয়ে রয়েছেন। গাঁফ ও দাড়ী থাকার তাঁর মুখে গাভীর্ষা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ফুটে উঠেছিল।

সেই শুক্ক নিমন্ত্রিতগণকে সন্ধান করে ঘোষ লাহেব বলেন—“দেখুন, এইবার পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যস্তর নেই। আপনাদের মধ্যে কেউ এ ঘর ত্যাগ করে যাবেন না, এই আমার অনুরোধ। গান বাজনা যেমন চলছিল চলুক।”

তিনি একজন নেপালী দরওয়ানকে দরজায় দাঁড়াতে আদেশ করে বাইরে চলে গেলেন। পাঁচ—ষোল—ক্রমে পনেরো মিনিট কেটে গেল, ঘোষ লাহেব বা পুলিশের আসবার কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল না।

অর্কেষ্ট্রা আবার আরম্ভ হ’য়েছে বটে, কিন্তু লেহিকে কারো লক্ষ্য নেই। সকলেই নিঃস্বরে কথা-বার্তা কইছেন।

হঠাৎ প্রোট ব্যারিটার মিঃ মুখার্জী বলে উঠলেন—“একি! আমার ঘড়ী ও চেন কোথায় গেল?” ইঞ্জিনিয়ার সুরেশ চ্যাটার্জীর স্ত্রী বলে উঠলেন—“তাইতো আমার হীরা-বদান ক্রুচটা কি হ’ল?” ডাঃ মুখার্জীর পত্নী বলেন—“তাইতো, আমার মুক্তোর কলার?” এই রকম অনেকগুলো—“কি হ’ল?” “কোথায় গেল?” প্রশ্ন অল্প সময়ের মধ্যেই শোনা গেল। দেখা গেল আরও প্রায় লাভ আটটা দামী জিনিস হারিয়ে গেছে। সকলেই চমকিত ও অস্বস্তিক উত্তেজিত হ’য়ে উঠলেন।

এই সময়ে অন্ধরের দিকের দরজা হঠাৎ লম্বা খুলে গেল ও মিসেস ঘোষ এবং সতী দেবী অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ঘরে ঢুকলেন। সকলেই “কি ব্যাপার?” কি হ’য়েছে?” বলে তাঁদের ঘিরে ফেলেন।

হাঁফাতে হাঁফাতে মিসেস ঘোষ বলেন—“আমার স্বামী কোথায় গেলেন?”

মিসেস চ্যাটার্জী বলেন—“তিনি মাত্র ১৫ মিনিট আন্ডাজ আগে পুলিশে খবর দিতে বাইরে গেছেন। কিন্তু, আপনি এত উত্তেজিত হ’য়েছেন কেন? ব্যাপার কি? আরও কোন জিনিস হারিয়েছে না কি? আমাদের কয়েক জনেরও কিছু কিছু গহনা পাওয়া যাচ্ছে না।”

মিসেস ঘোষ বলেন—“হার হারিয়ে গেছে বুঝতে পেরেই আমি সতীদেবীর পরামর্শে স্বামীকে খবর দিতে বাই। পথে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ায়, তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি সতীদেবীকে কয়েকটা প্রশ্ন করে এদিকে এলেন, আর আমাকে উপরে আমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে বলেন। আমরা তার কথা মত আমার ঘরে গিয়ে বসি। এই হার-হারানো সবকিছুই আমাদের

নটরাজ

শ্রীসুনীল কুমার দাশগুপ্ত

জাগো শিব-লঙ্কর মেঘ বরিষণে,
জলিছে বিজলী-শিখা দূর গগনে।
শুক্ক শুক্ক বাজে মেঘ নুপুরের ফলে,
গাহিছে মাঠে: বাণী পূলকে আনন্দে;
ধরণী উঠিছে ‘মাতি’ মৃদল ননে।
ববম্ ববম্ বাজে ডমকর তাল,
তাইে তাইে ওই নাচে মহাকাল;
“হর হর বম্ বম্”—মেঘ গরজনে॥

—*

কথা-বার্তা বলতে থাকে। হঠাৎ পাশের ঘরে কে যেন দরজায় লাথি মারছে বলে মনে হ’লো। আমরা ছুটে দরজার কাছে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—“কে ওখানে?” কোন লাড়া পেলুম না। দরজা ঠেলে দেখলুম—কড়ার শক্ত তাল দেওয়া। ঐ ঘরটার আমাদের কাপড়-চোপড় থাকে, আর বাইরে এই তালটাই আটকানো থাকে। কিন্তু, ভিতরে কে আছে? বাহাজর, আমার সঙ্গে এলো—যে ঘে চাকর দরওয়ান এখানে আছে! সকলে এলো।”

এই বলেই তিনি অন্ধরের দিকের দরজা দিয়ে ভিতরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাকর-বাকর ও দরওয়ানেরা তো গেলই, নিমন্ত্রিতেরাও সকলে হুড়-হুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। উপরের যে ঘরটার দরজায় তাল দেওয়া ছিল, তার সামনে একটা মস্ত-বড় ভীড় জমে গেল। সকলেই অসন্তুষ্ট উত্তেজিত হ’য়ে উঠেছিলেন।

তাল ভেঙে সকলে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। আলো জ্বলিছে হ’লো। আশ্চর্য—এ কি! হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ঘোষ-লাহেব দরজার কাছেই পড়ে আছেন।

কারও মুখে বাক্যস্মৃতি হ’লো না। একি ঘোষ-লাহেব এমন অবস্থায় এখানে কি করে এলেন?

(ক্রমশঃ)

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— পাঁচ —

গত তিনমাস যাবৎ কণা অরুণের গৃহেই রহিয়াছে। শুভ্রার যত্ন ও অরুণের অশ্রুগ্রহে কণা তাহার ভ্রাতার শ্রাদ্ধাধি স্মরণ করিয়াছে। তাহার ভ্রাতার প্রাপ্ত অর্থে অরুণ তাহাকে কয়েকখানি অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে ও বাকী টাকার তাহার জ্ঞাত গভর্ণমেন্ট পেপার ক্রয় করিয়া দিয়াছে। কণা এখানে সুখেই আছে বলিতে হইবে। শুভ্রা তাহাকে যত্ন করে আপনায় লহোদরার মত, তাহার বিছু প্রয়োজন হইবার আগেই তাহার লবল অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু সে যাহাতে অরুণের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিতে না পায় সে বিধিও সে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিত না। শুভ্রার ধারণা তাহার স্বামীর ছায় স্পৃহা পৃথিবীতে অল্পই আছে; এই জ্ঞাত যে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে তিনি লোভনীয় সামগ্রী।

যে নারী তাহার স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং স্বামীকে অধিক সুন্দর দেখে তাহারাই স্বামীকে লন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে ইহাই জগতের নিয়ম। শুভ্রাও স্বামীকে হারাইবার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত থাকিত।

অরুণ শুভ্রার মনের কথা বুঝিত এবং যতদূর সম্ভব কণার নিকট হইতে দূরেই থাকিবার চেষ্টা করিত। তাহার স্মৃষ্টির দাম্পত্য জীবনে কণার জ্ঞাত পাছে একটা ব্যবধান আলিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় সে নিজেকে লম্বত রাখিবার অশেষ চেষ্টা করিত।

আর কণা? সে সর্বদা এখানে সুখেই ছিল—শুভ্রাকে সে ভালবাসিয়াছিল মত, কিন্তু অরুণকে সে যেন হৃৎকের আরাধ্য দেবতার আদর্শে বসাইতে চাহে। পাছে দ্বিধা রাগ করেন তাই পারস্পরিক অরুণের সম্মুখে সে আলিত না কিন্তু সুবিধা পাইলে লুকাইয়া অরুণকে দেখিবার লোভ লম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিত। তাই চোরের মত সুবিধা পাইলেই সে অরুণকে দেখিয়া লইত। কণার চৌর্য্যবৃত্তি অরুণের দৃষ্টি অতিক্রম করেন নাই। সে বুঝিয়াছিল কণা তাহাকে ভালবাসে কিন্তু কণার এই অপরাধের জ্ঞাত শুভ্রার এজলাসে সে বিচার-প্রার্থী হইবার লাহল পাইত না। কারণ সে বুঝিয়াছিল আলমী দণ্ড পাইলে আলমী অপেক্ষা করিয়াছই অধিক মনঃকষ্ট পাইবে।

কণার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আর একজনের বিলম্বণ পরিবর্তন হইয়াছিল; সে আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু অমল। প্রথম মাসে নারী-জাতি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করা সে বন্ধু করিয়াছিল। দ্বিতীয় মাসে নারীর চরিত্রের মৃদুতা ও তাহাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিল। তৃতীয় মাসে নারীর ও পুরুষের ভগবৎদত্ত অটুট সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া সে প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। এই বন্ধক মাস সে প্রত্যাহই কণার লম্বাদ লইবার জন্য অরুণের বাটতে আলিয়াছে এবং শুভ্রার অনুমতি লইয়া কণার সহিত সাক্ষাৎও করিয়াছে। শুভ্রা আধুনিক যুগের স্নানিকতা তরুণী হইলেও অকারণে পুরুষ-দের সম্মুখীন হইতে চাহিত না। অতএব

অমল কণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আলিলে কণার হাতেই সে চা ও জলখাবার পাঠাইয়া দিত। উত্তরের অলঙ্কার থাকিয়া চতুরা শুভ্রা অমল ও কণার কথাবার্তা শুনিয়া লইত।

দেখিন লক্ষ্যায় অমল যখন কণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আলিল শুভ্রা তখন শিরঃ-পীড়ার অত্যন্ত কাতর হইয়া শুইয়াছিল।

চাপরানী অমলের আগমন লম্বাদ দিলে কণা মুহূর্ত্তের শুভ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, “অমল বাবু এসেছেন, দেখা করতে বাব কি দ্বিধা?” শুভ্রা চক্ষু বুজিয়াই বলিল, “আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে কণা তুই দেখা করে শীঘ্র চলে আয়।” কণা ‘আচ্ছা’ বলিয়া চলিয়া গেল।

শুভ্রা পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। প্রায় আধঘণ্টা পরে শুভ্রার তল্লা ভাজিল; চক্ষু মেলিয়া শুভ্রা ডাকিল, ‘কণা’।

দানী বলিল, “দ্বিধামণি, অমল বাবুর সঙ্গে বাইরের ঘরে গল্প করছেন বো’ঠান।” ছোট একটি ‘ওঃ’ শব্দ করিয়া শুভ্রা ঘড়ির দিকে চাহিল, ঘূর্ণিল অর্ধঘণ্টা পূর্বে কণা অমলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গিয়াছিল। এখনও সে ফেরে নাই। শুভ্রা কোতুলক মনন করিতে পারিল না। অসজ্জিত বৈঠকখানার ভারী পর্দার পাশে নিরবে আলিয়া দাঁড়াইল। তখন অমল আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলিতেছিল, “কণা, আমার কথা শোন, অরুণের আশা তুমি ছেড়ে দাও, তাকে তুমি পাবে না। তার স্ত্রীকে তো দেখেছ—কত সুন্দরী আর বিচরী তিনি।

কণা বিরক্ত হইয়া বলিল, “আপনাকে কে বলেছে অমলবাবু, আমি ডাক্তারবাবুর আশা করি? তিনি আমার আশ্রয়দাতা, বন্ধু—তাকে পাবার আশা করা, বাহন হয়ে চাঁদে হাত দেবার প্রচেষ্টা সে আমি জানি। আপনি ও সব কথা বলবেন না অমলবাবু। যদি দ্বিধা শুনতে পান তিনি আমার সম্বন্ধে কি ভাববেন বলুন তো?”

অমল কহিল, “কিন্তু অরুণ তোমায় ভাল-
বাসে তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার
কথা শোন কণা তার আশা ছাড়।”

কণা অত্যন্ত ভীত ও বিরক্তভাবে বলিল,
“হিঃ অমলবাবু, আপনি ও কণা বলবেন না।
আমার ন্যায় পথের ডিথারীকে কি তাঁর
পক্ষে ভালবাসা সম্ভব? হয়ত তিনি আমার
অমূল্যতার চোখে দেখেন, হয়ত আমার
অসহায় অবস্থা দেখে আমার প্রতি তাঁর
সহানুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু সেই
অমূল্যতা, দয়া ও সহানুভূতিকে আপনি
শ্রম বা ভালবাসা বলে ধরে নিলে
আপনি তাঁর ও আমার প্রতি অবিচারই
করবেন। কণা ছই মিনিট চুপ করিয়া
একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং পুনরায়
বলিল, “আমাকে নিঃসহায় ও বিপন্ন দেখেই
আজ আমাকে ফণমান কর্তে লাহল করলেন
অমলবাবু, কিন্তু একদিন ছিল যেদিন আমরাও
আপনারই মত সমাজের মাথাতে ছিলুম—
কণা আর বলিতে পারিল না। ছই হাতে মুখ
ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অমল নিতান্ত বিব্রত হইয়া বলিল, “তুমি
কেঁদনা কণা! তুমি বাথা পাবে জানলে
ওকথা তোমায় বলতাম না আমি। আমার
উদ্দেশ্য ছিল তোমায় বলা যে, আমি, আমি
তোমায় ভালবাসি—সত্যি কণা, বড়
ভালবাসি। ভাষায় প্রকাশ করার মত শক্তি
আমার নেই। তাই বুঝতে পারবো না কত
ভালবাসি তোমায়। তুমি আমার যুগা
করোনা। বল তুমি আমার বিয়ে করবে?”

“আমি জানিনা, আমার আশ্রয়ধাতা
বারা তাঁদের কাছেই আপনার আবেদন
বলবেন।” এই বলিয়া কণা দ্রুতপদে সেই
কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

শুভ্রা ধীরপদে গিয়া আপন শয্যার আশ্রয়
গ্রহণ করিল। তাহার ক্ষুব্ধকে তখন
প্রলয় ঝটিকা বহিতেছিল।

—ছয়—

শুভ্রা অনেক কাঁদিল। বোধহয় তাহার
জীবনে একরূপ অসহায় ভাবে সে আর কখনও
কাঁদে নাই। আজ তাহার মনে হইতেছিল
পৃথিবীতে সকলেই বিশ্বাসঘাতক—সকলেই
স্বার্থপর। সে যেন আজ নিতান্ত অসহায়।
আত্মীয় শূন্য আজ যেন পৃথিবীর সকল জিনিষ
তাহার সহিত বিজ্ঞোহ ঘোষণা করিয়াছে।
সে যে আজ তাহার চিরপ্রিয় সর্বস্বকে
হারাইতে বলিয়াছে। তাহার বারবার মনে
হইতেছিল তাহার যেন কেছই নাই, কিছু
নাই। এই বিশ্ব সংসারের বাজারে সে যেন
আজ হেউনিয়া হইয়া পড়িয়াছে। কণা
অরুণকে ভালবাসে, অরুণ কণাকে চাহে,
অমল একগা ল্পষ্টই বলিতেছিল—সে নিশ্চয়ই
তাহার স্বামীর নিকট হইতে এই সংবাদ
সংগ্রহ করিয়াছে নচেৎ কি নাহলে সে বলিল
“অরুণ তোমাকে ভালবাসে তা আমি বুঝতে
পেরেছি।” ওঃ কি বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর
এই পুরুষজাতি। যুগ্মা জীকে প্রাণকনা
করিতে তাহারের এতটুকুও বাধে না।
চক্ষুসজ্জা, ইয়া চক্ষুসজ্জা বৈ কি, তাহারই
খাতিরে এখনও পর্যন্ত কণার সহিত তাহার
প্রকাশ্য প্রণয় এখনও ছটিয়া উঠে নাই। সে
যদি একটুও বুঝিত তাহার দেবতুল্য স্বামী
এত কপটচারী এত দৃষ্ট ও বিশ্বাসঘাতক
তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অরুণকে শিকার
দিবার জন্ত কণাকে বিধায় করিয়া দিত।
আজ শুভ্রায় মনে হইল অরুণ এতদিন তাহার
চক্ষে বিরূপ ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সাধু সাজিয়া
আছে। আজ সে বুঝিল যখনই কণা তাহার
লক্ষ্যে আসে সে কেন বর ছাড়িয়া পালায়—
এই পালানটাই যে ভালবাসার লক্ষণ। সে
কণার কথা উঠাইলে কেন অরুণ অজ্ঞ প্রলজ
উত্থাপন করিয়া কণার কথা চাপা দেয়।
এই কথা চাপা দেওয়াও অরুণের দুর্বলতা।
কণার জন্ত বখনই কোন দ্রব্য আনিবার জন্ত
অরুণকে সে অনুরোধ করিয়াছে “দায়বানকে

দিয়ে আনিরে নাও” বলিয়া অরুণ যে উপেক্ষা
প্রকাশ করিত, আজ শুভ্রার চক্ষে সে উপেক্ষা
অনুরাগেরই রূপান্তর বলিয়া মনে হইল।
শুভ্রার স্মরণ হইল কয়েকদিন পূর্বে
তাহার পিতার অন্তিমতার সংবাদ আলিলে
অরুণ তাহাকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পাঠাইতে
চাহিয়াছিল—আজ সেই পাঠাইতে চাওয়া-
টাকে শুভ্রা প্রেমমালাপের সুযোগ অন্বেষণ
বলিয়াই স্থির করিয়া লইল। সে বুঝিল
অরুণ ও কণা তাহার বিরুদ্ধে দারুণ ষড়যন্ত্র
করিয়াছে। মনে মনে সে বলিল, “হায়
স্বার্থীক নারী, আমার হৃদয় বেওয়া ভালবাসার
কি এই পুরস্কার?” তাহার মনে হইল
কণা অরুণকে চায় অর্থাৎ কণা চায় তাহার
বক্ষপঙ্কটাকে ভাজিয়া ফেলিয়া হৃৎপিণ্ড-
টাকে ছিড়িয়া লইতে, অক্ষিকোটর হইতে
তাহার চক্ষুহট্টা উপড়াইয়া লইতে, তাহার
জীবন মরণের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তুটিকে
তাহার বাহশাশ হইতে হিনাইয়া লইতে।
ওঃ এত নিষ্ঠুর সে! একদিনও তাহার
সরল মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা কল্পনাও
করিতে পারে নাই। আজ সে বুঝিতে
পারিল সত্য, সময়ে সময়ে কর্তিত কাহিনী
অপেক্ষাও ভয়াবহ হইয়া থাকে। সে
কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল
সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

* * *

কণা শুভ্রার পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত
কণ্ঠে ডাকিল, “বিবি”। যুগ্মা ভাজিয়া গেল;
শুভ্রা উঠিয়া বলিল কিন্তু কোন কথা কহিল
না। কণা পুনরায় বলিল, “বিবি তুমি না
গেলে জামাইবাবু খাবেন না বলছেন।”
“কেন তুমি তো আছ” বলিয়া শুভ্রা মুহু
হালিল।

কণা কি বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে
পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া
আলিতেছিল।

বাহির হইতে অরুণ বলিল, “ওঁকে বিরক্ত
করোনা কণা, আজ আর আমি খাবনা।”

অরুণের কথার অভিমানের সুর ছিল।
শুভ্রা ও কণা উভয়েই তাহা বুঝিল। শুভ্রা
দিশ্ন না করিয়া শয্যাভ্যাগ করিল এবং
অরুণের জন্ত খাবার লাজাইয়া কয়েক
মিনিটের মধ্যেই উপস্থিত হইল।

“তোমার কি কোন অসুখ করেছে
শুভ্রা?”

“না” বলিয়া শুভ্রা মাটির দিকে চাহিয়া
রহিল।

“মুখখানা যেন বড় মেঘাচ্ছন্ন, কি হয়েছে
বলনা লক্ষীটি” বলিয়া অরুণ শুভ্রার হাত
ধরিল।

“কিছু না, খেতে চলো।”

অরুণ আহার করিতে করিতে বারবার
শুভ্রার দিকে চাহিল; শুভ্রা যেন মৰ্ম্মর মুক্তি,
শ্রাণহীন, পাৰাণী। অরুণ ভাবিতে লাগিল
তাহার কোন্ ব্যবহারে শুভ্রার মনে আঘাত
লাগিয়াছে।

আহারান্তে অরুণ লিঙ্গাশা করিল, “খাবে
না তুমি? যাও, খেয়ে এলো শুভ্রা।”

“আমি খাব না”

“কেন বলতো, কি হয়েছে তোমার,
অসুখ করেছে?”

“না।”

“তবে কি হলো—খাবেনা কেন?”

“ইচ্ছে নেই।”

এই সময় দ্বাদী আলিয়া উচ্চিষ্ট থালা-
খনি লইয়া আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া
চলিয়া গেল। দ্বাদী চলিয়া গেলে শুভ্রা
উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। অরুণও এই
অবকাশে একখানা মেডিক্যাল জার্নাল লইয়া
ইকিচেয়ারে শুইয়া পড়িল। শুভ্রা কণকাল
ঘরের নিকট দাঁড়াইল—পরে সে অরুণের
পশ্চাতে বলিয়া উলিত কর্তে বলিতে
লাগিল, “ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার

লগ্নে প্রবেশনা করো না—সত্যি করে বল
আর কাউকে তুমি ভালবাস কি না?”

অরুণ হালিয়া ফেলিল ও সমস্ত শুভ্রাকে
উঠাইয়া লইল ও বলিল, “কেন, বলতো?”

শুভ্রা বলিল, “তুমি হালচো। আমার
চোখের জল দেখে তুমি আজ হয়তো
হাসিতে পার, কিন্তু আমার মনের অবস্থা যদি
একটুও বুঝতে যদি একটুকুও জানতে, আজ
আমার কি হুদিন, কি—”

অরুণ গম্ভীর হইয়া বলিল, “তোমার
হুদিন কেন হবে শুভ্রা, কেউ তোমার বাধা
দিয়াছে কি? বল, আমার নিকট
চাকবার চেষ্টা করো না—কেন তুমি বললে
আমি আর কাহাকেও ভালবাসি কি না?”

আমি জানি, আমাকে লুকিয়ে তুমি
কণাকে ভালবাস, সেই আজ তোমার
চোখের মনি। আমি তোমার কেউ নই।”

হো-হো করিয়া অরুণ হালিয়া উঠিল,
পরে বলিল, “কলঙ্কের আবিষ্কারের চেয়ে
তোমার এই আবিষ্কার ছোট নয়, শুভ্রা,
একথা আমি লপথ করে বলতে পারি।”

“আমার চোখে তুমি ধুলো দেখার যতই
চেষ্টা করন কেন আমার নিকট যে তোমার
কিছুই চাপা থাকে না সে কথা তোমার
আগেই জানা উচিত ছিল।”

অরুণ বলিল, “একজন অসহায় অবলার
প্রতি করুণা করাকে যদি ভালবাসার চিহ্ন
বলে তুমি ধরে নাও তাহা হলে আমার
বলবার কিছুই নাই। তবে এইটুকু তোমার
স্পর্শ করে আমি বলতে পারি তুমি
ভিন্ন অপূর্ণ কোন স্ত্রীলোককে আমি
ভালবাসি না—বাসা সম্ভব নয়।”

“কেন নয় বলতো? কণা রূপদী,
চমৎকার তার স্বভাব, তা ছাড়া তুমি তাকে
ধরে এনেছ।” সত্যি বল না, আমি রাগ
করবো না, তুমি কণাকে ভালবাস কি না।
যদিই বাস আমি তাতে বাধা দেব না,
আপত্তি করবো না, তোমাদের মিলনের

পথ থেকে আমি নিঃশব্দে বিদায় নেব”
—শুভ্রা পুনরায় কাঁদিয়া ফেলিল।

অরুণ লম্বাহকর্তে বলিল, “শুভ্রা, তুমি
হয়তো কোন আরম্ভের নিজের মুখ খানা
দেখবার সুবিধে পাওনি, তা হ’লে কখনই
বলতে না আমি আর কাউকে ভালবাসি।
আমার জীবনের পূর্বাঙ্কে আমি যে রূপদীকে
ভালবেসেছি তাকে ছাড়া আর কাউকে
ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তা তুমি
বুঝতে পার না কেন শুভ্রা?”

শুভ্রা তখনও ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিত-
ছিল; এখনও তাহার মনে হইতেছিল
অরুণ বুঝি তাহার সহিত অভিনয় করিতেছে।
অরুণ পুনরায় তাহাকে বুঝাইল যে সে
তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভালবাসে না।
প্রধান সুরূপ সে আগামীকাল সকালেই
কণাকে কোন অবলাশ্রমে পাঠাইয়া দিবে
এবং কখনও তাহার সংবাদ লইবার চেষ্টা
করিবে না। কথাটা শুভ্রার বুকের ভিতর
যেন আঘাত করিল। সে বলিল, “না, না”
তাহা হইতেই পারে না। একটা সন্দেহের
বশে আমায় সুখী করিবার জন্ত তুমি
তাহাকে বিদায় করিয়া দিবে এরূপ কিছুতেই
হইতে দিব না।”

অরুণ বলিল, “তাহাকে আশ্রমে পাঠাতে
দিবে না অথচ নানারূপ করুণা করে
নিজকে কষ্ট দিবে।

শুভ্রা বলিল, “দেখ, আমি বলনা করে
কোন কথা বলি নাই—তোমারই বক্তৃতা আজ
কণাকে বলিতেছিল সে যেন তোমার
আশা ত্যাগ করে। যদিও তুমি তাকে
ভালবাস—কিন্তু তোমার স্ত্রী আছে এজন্য
তাকে তাকে গ্রহণ করা তোমার পক্ষে
সম্ভব নয়। এবং পরে সে নিজে কণাকে
ভালবাসে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়
এই কথা বলছে। আমি পক্ষীয় আড়াল
থেকে সব শুনেছি।”

অরুণ রাগতভাবে বলিল, ঠুপিডটা
নিজের কার্যালিঙ্গির মতলবে বেমালাম আমার
বাড়ি ঘোষ চাপাইল। আচ্ছা, কালই
তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিব।

তুলা বলিল, “খাক, বোঝাপড়ার কাজ
নেই, সত্যি তুমি যদি আমার ভলেবাল।
কালই তুমি যদি আমার পিতার কাছে
গিয়ে কণার সহিত আমার বিয়ের প্রস্তাব
করবে বুঝলে?”

অরুণ বিস্মিতভাবে বলিল, “শেষে কি
আমার ডাক্তারী হেডে ঘটকালী করতে
হবে?”

তুলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।
তুমি যদি এতে রাজি না হও তাহলে
বুঝবে তুমিই কণাকে চাও।”

অগত্যা সে তুলার প্রস্তাবে সম্মত
হইয়া সে তুলার সহিত সন্ধি স্থাপিত
করিল। এতক্ষণে তুলা বুলিল অরুণ
ভাছারই, আর কাছারও নহে।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যথা সময়ে অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল।
‘পরশরাম’ ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্ত
আনা হয়েছে নারান বাবুকে—ভিন্ন গ্রাম
থেকে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক বলিয়া
খ্যাত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গত ছয় মাস
পূর্বে তিনি বাবুরোগে আক্রান্ত হন এবং
ভিড়োল কালীর বালা হাতে ধারন করে
রোগমুক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে
এখনও এক একবার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে
আবার পরক্ষণেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে
পান। তাই তাঁর তত্ত্বাবধানের জন্ত নাট্য
সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখেছেন।

এ দিকে ককরী বাবু প্রেক্ষাগৃহের লম্বুখের


ওরিজিনালের অপমৃত্যু

(রস রচনা)

শ্রীক্ষেত্র চক্রবর্তী

আসন অধিকৃত করে মনগুলি হয়ে অভিনয়
দেখতে শুরু করেছেন। কিছুক্ষণ পরে লাজ
ঘরের ভিতর থেকে একটা ভীষণ কোলাহল
দর্শকবৃন্দের কণ কুহরে প্রবেশ করল। তাদের
মধ্যে দুই একজন ভিতরে প্রবেশ করে
জানলে যে ‘পরশরাম’ নকল বাড়ি পাওয়া
যাচ্ছে না। অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ার
তিনি বাড়িটা কোনখানে খুলে রেখেছিলেন
কিন্তু রক্তমাংসে নাম্বার সময় সেটা আর খুঁজে
পাচ্ছেন না এবং লজ্জাকর ও তার নির্বুদ্ধিতা
বশতঃ বেশী বাড়ি ও চুল আনে নি। কথা-
গুলো প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে হাসির রোলের
সঙ্গে সঙ্গে একটা গাউগালের সৃষ্টি করলে।
নারান বাবু এ দিকে ভীষণভাবে উত্তেজিত
হয়ে উঠেছেন এবং বিকারিত নরনে চারি-
দিকে তাঁর বাড়িটি অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন
আর মনে মনে বিড়বিড় করে কি সব
আঙড়াচ্ছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠঠাং তাঁর
নজর পড়ল ককরী বাবুর উপর এবং তিনি
লিংহের মত গর্জন করে তার দিকে অগ্রসর
হয়ে তাঁর বাড়িতে সজোরে একটা টান দিয়ে
বলে “এখানে লুকিয়ে বসে আছ nonsense,
খোল বাড়ি”—তার আচরণে সকলে স্তম্ভিত
হয়ে গেল। ককরীবাবু যন্ত্রনার প্রকোপে
চিৎকার করে উঠলেন “আরে মশাই, এ যে
Original, লাজ নম, তা দেখতে পাচ্ছেন
না। ও রে বাবা রে—হে রবিন্দ্রনাথ,
তোমার জন্তই আমার এত যন্ত্রণা, আমার
সাধনা আজ আমি জলাঞ্জলি দিচ্ছি; এ
বাড়ি আমি আর রাখবনা তোমার সঙ্গে
সকল লব্ধ ত্যাগ করে আমি বাড়ি খুঁজি

ফোন ২৭৭৬



বড় বাজার

ক্যাণ্টিন জাট

ক্যাণ্টিন ঘানি

কাঠের জাটের খাঁটি সরিষার তেল

ভারত অয়েল মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩. আপার সারকুলার রোড, কলিঃ

হরে কেলব"—ইতিমধ্যে বর্ষকবুদ্ধের মধ্যে হরেকজন এসে নারান বাবু ওরফে 'পরামরকে' বাছপাশে আবদ্ধ করে ফেলেছে আর তিনি হলিত ভুলকের মত গজরে গজরে ঠঠছেন "Rascal-টা এমন ভাবে gum দিয়ে মাটিকেছে যে টেনে খোলা যায় না"—তার স্ত্রী দেখে মনে হচ্ছে যে তার ব্যাধিটা আবার গার মাথার উপর চেপে বসেছে।

কথাটা শুনে তাহের মধ্যে একজন প্রতিবাদ করে বলে "মশাই আপনি ভুল করছেন, ও লালা নকল দাড়ি নয়, ওটা মাল অর্থাৎ আপনা আপনি গজার, বুঝেন"—সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ হুগুগু আরম্ভ হয়ে গেল, এমন কি হাতাহাতি হতেও থাকী রইল না। অভিনয়ের কাজ সেদিনকার মত স্থগিত রইল, কারণ ওরূপ অবস্থার পরামরকে' অভিনয় করান হুগুগু ব্যাপার গার উপর তার দাড়ির অভাব—

ককরীবাঘ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ক'রলেন এখনই দাড়ির শেষ ক'রে হবে বাড়ী ফিরবেন। গায়ের সকলেই লটা অমুসোহন ক'রলে কারণ ঐ দাড়ির সম্বন্ধে তাঁকে সর্বস্বান্ত হতে হ'য়েছে আর ঐ দাড়ির জন্যই তার এই উপস্থিত বিপদ।

অভিনয়ের পূর্বে কৌরকার্যের জন্য নিম্ন পরামর্শনিককে আনা হয়েছিল এবং সে গার কার্য লম্বাধা করে অভিনয় দেখছিলো। মণ্ডলমশায়ের এ অবস্থা দেখে তার চোখেও মল এল এবং সকলে অমুরোধ করার ও মণ্ডল মশাই স্বীকৃত হওয়ায়, সে তার বস্ত্র-পাতি বার ক'রে তার কার্য শেষ ক'রে নিলে। কৌর কার্যের পর মণ্ডলমশাই তার চ্যুত দাড়িগুলি নাড়তে নাড়তে বললেন "কতদিন, কতদিন তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে—আজ তোমার ত্যাগ ক'রতে আমার বুক কেটে যাচ্ছে—এ ত্যাগ করা শুধু তোমার ত্যাগ করা নয়—আমার পাথের কবিতাকে

ত্যাগ করা, আমার গুরুদেবকে ত্যাগ করা, আমার লাধন', আমার শিক্তি, আমার সমস্ত ত্যাগ করা। হে তগবান, তোমার মনে এও ছিল"—

পরক্ষণেই তাঁর Original এর উপকারীতার কথা স্মরণ পণে উদয় হয়ে উঠল এবং তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলে উঠলেন "কি লক্ষ্যনাশ, আমার যে বাড়ী প্রবেশের পথ আমি নিজেরই বন্ধ করে দিলাম—। ম্যানেকার, ম্যানেকার! শীঘ্র gum নিয়ে এস, আমার দাড়িগুলো gum দিয়ে জোড় ক'রে আটকে দাও, যাতে টানলে না উঠে আসে—বুঝলে"—। ম্যানেকার তার কথা মত লাজঘর থেকে gum নিয়ে সেই দাড়ি-গুলো আটকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "ব্যাপার কি মণ্ডলমশাই, দাড়ি কামিয়ে ফেলে আবার সে গুলো আটকালেন কেন?"—

"বারে ভায়া! শোলেনামার লজ্জা অমুযায়ী দাড়ি আমাকে রাখতেই হবে, নতুবা বাড়ী ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে। বাড়ীতে যখন নকল মণ্ডলমশাই প্রবেশ ক'রে সমস্ত লুটে নিয়ে গেল, সেই বিন থেকে এক পদ্ম আবিষ্কার করেছি যে বৈঠকখানার জানালা থেকে হাত বার ক'রে সেটা নকল কি আসল পরীক্ষা করে তবে তিনি দরজা খুলে যাবেন"—। ম্যানেকার মশাই, মণ্ডলমশায়ের বুদ্ধির তারিক না ক'রে থাকতে পারলেন না—এবং বলেন "আমি যে ভাবে আটকে দিয়েছি তাতে আমার মনে হয় টান দিলেও খুলবে না"—

তোমার ধন্যবাদ, তাই, ধন্যবাদ। দেখ আজকের রাতটা কোন গভিকে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালে সমস্ত ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললেই তিনি বুঝতে পারবেন যে ঐ দাড়িগুলোই সব অনর্থের মূল। দেখ তাই, তোমরা দু-চার জন আমার সঙ্গে এস, কি জানি যদি আবার কোন আকস্মিক বিপদ

হয়"—মণ্ডলমশাইয়ের কথা অমুযায়ী তাহের মধ্যে জন কতক তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হইল। যখন তারা বাড়ীর লম্বা-দরজার নিকট উপস্থিত হ'ল তখন রাতি ১২টা আন্দাজ হবে। ফাস্তনী তখনও জেগে। ডাকবামাত্র নেমে এসে বৈঠকখানার জানালার নিকট এল এবং টেনে দেখে পট্টপাকে দরজা খুলে দিতে বসে। স্বামীর কঠোর দিকে লক্ষ্য ক'রে করেকবিন হ'ল টানটা ফাস্তনী একটু অল্প ভাবেই দিচ্ছিলো। তাই আজকের টানটায় কোন বিভ্রাট ঘটল না। নিরীক্রে বাড়ী পৌঁছে সমস্ত কথা শ্রীকে বলবার পর ফাস্তনী বলে "ভালই হয়েছে, আপন গেচে, তোমারও Original-এর দরকার নেই, false-এর কাজ নেই। এ সমস্ত ম'নিরেছে। ও রকম বিপদ আছে বলেই ত আজকালকার ছেলেরা দাড়ি গোঁফ কিছুই রাখে না। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হইলেই যে দাড়ি রাখতে হবে তার কোন মানে নেই। রবীন্দ্রনাথের চাল চলন অমুকরণ না ক'রে তার প্রতিভা অমুকরণ করাই শ্রেয়। রবীন্দ্রনাথের কত শিষ্যই ত আছে, লবাই কি দাড়ি রেখেছে। তোমার এ Original-এর অপমুড়াতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। দেখ, এক দিন বলি নি, আজ বলি। ঐ আবর্জনা গুলো থাকার জন্য আমার জীবনের একটা লাখ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, আজ হতে তা সম্পূর্ণ হবে।" বলিয়া সেটা কার্যে পরিণত করে দিল।

—শেষ—

হাকিম এম.এস. জামানের

কস্তুরীগিল

ধাতুদৌর্য্য ও শক্তিহীনতা চিরতরে
আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ২ টাকার
৪২ নং ধর্ম্মভালা ষ্ট্রীট কলিকাতা

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

(হৃদয়নারায়ণ)

বিগত ১৭ই এপ্রিল রবিবার লক্ষ্য ৬-৪৫ মিনিটের সময় সম্মেলনের তৃতীয় দিবসের সাক্ষ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে দুইজন প্রতियোগীর demonstration হইবার পর শ্রীযুক্ত পবন বিশ্বাস কুমার তালে তোল বাজান। ইহার লিহিত প্রোঃ চন্দ্র মিশ্র লারেন্সী বাজাইয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীমতী কেশর বাই (কারকার) ললিতা গৌরী ও পটমঙ্গরীরাগের দুইখানি খেয়াল গান করিয়া পরে এক খানি ভজন “মধুরা যে মোহি” গান করেন। শ্রীমতী ৭-২৫ মিনিট হইতে ৯-২৫ মিনিট অবধি গান গাহিয়াছিলেন। শ্রীমতীর গানের পর পণ্ডিত সুব্রত্বর দয়াল পীলুরালে হারমোনিয়াম বাজান। ইহার লিহিত প্রোঃ সরযু মিশ্র তবলা-মজত করেন। পণ্ডিতজীর বাজনার পর প্রতियোগিগণের অন্ততম কুমারী ললিতা চ্যাটার্জী কালিদাসন নৃত্য প্রদর্শন করেন। কুমারীর নৃত্যের পর শ্রীযুক্ত রবিন্দ্র সরকার একটা লোকনৃত্য করেন। রবীন্দ্র-লজ্জিত-বিভালয়ের Orchestra party ইহার নৃত্যের লিহিত অনুগামী বাস্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রবিন্দ্রবাসু নৃতন পরিকল্পিত নৃত্যটি অনুগামী বাস্তের সহযোগে বেশ সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু, নৃত্যটি শেষ হইয়া গেলে রবিন্দ্রবাসু মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বর্গক-বৃন্দের নিকট নিবেদন করেন যে বহি অনুগামী বাস্তের মধ্যে কোনও ঘোষ-ক্রটি প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার। যেন উহা ক্ষমা করেন; কারণ ষাঁহার। অনুগামী বাস্তের আয়োজন করিয়াছিলেন

তাঁহার। রবিন্দ্রবাসু নৃত্যের লিহিত বাজাইতে অভ্যস্ত নহেন। আমরা অবশ্য এই Orchestra party-র বাজনার বিশেষ কোনও ঘোষ ক্রটি লক্ষ্য করি নাই। এক্ষেত্রে রবিন্দ্রবাসুর পক্ষে অনর্থক ঘোষ-ক্রটির উল্লেখ করিয়া প্রকাশ্য সভার উক্ত Orchestra party-র প্রতি অলৌকিক প্রকাশ করা চপলতার কার্য্য হইয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। নৃত্যের আশর কিন্তু এখানেই সমাপ্ত হইল না। এক রবিন্দ্রবাসু নাচ শেষ হইতেই আর এক রবিন্দ্রবাসু (রবিন্দ্র বধন) আবির্ভাব হইল। ইনি মণিপুরী নৃত্যকলা দেখাইলেন। নাচের আশর ভাঙ্গিবার পর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পটমঙ্গরীরাগের একখানি খেয়াল গান গাহিলেন। শৈলেন্দ্রবাসু যে কি গাহিলেন তাহা তিনিই, একমাত্র বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, বাণীর অস্পষ্টতা, তানের জড়তা ও স্বরের অসুচ্ছতা—এই সব কয়টির দূর্ভেদ্য বৃহত্তর করিয়া রসাহরণ করা শ্রোতৃবর্গের পক্ষে সহজ লভ্য ছিল না। বাণ্য-কৈশোরের লীলারূপে যে ইনি অতিক্রম করিয়াছেন তাহাতে লক্ষ্যের লেশমাত্র নাই। আলোচ্য রাত্রিতে তিনি যে ভাবে গান গাহিলেন তাহা তাঁহার বয়সের প্রাবীণ্যের পক্ষে নিতান্তই নৈরাস্তজনক। শৈলেন্দ্রবাসু গুণিপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের শিষ্য। গিরিজাবাসুর দুইজন প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বামিনী গাঙ্গুলী এই Conferenceএ গান গাহিবার

সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাদের দুইজনের গানের ঘোষক্রটি যথেষ্টই আছে, এবং আমরা এক্ষণে Conferenceএ ইহাদের একাতীত demonstration এর অনুবোধন করি না। কিন্তু ইহাদের গানের লিহিত বহি শৈলেন্দ্রবাসুর গানের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে শৈলেন্দ্রবাসুর গান যে সর্বতোভাবে নিকৃষ্ট, ইহা ষাঁহার। এই তিন জনের গান শুনিয়াছেন, তাঁহাদের বুদ্ধিই বলিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষগণ শৈলেন্দ্রবাসুর বিরূপ প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে demonstrationএ নিরীক্ষাচন করিলেন, তাহা বুদ্ধিরা ওঠা লক্ষ্য নহে। এবং পরে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, কর্তৃপক্ষগণ শির্শিনীকীচনে যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনুগ্রহপুষ্টগণের নিকট তাঁহাদের আশ্রিততা ও পৌত্তল্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে লক্ষ্য নাই; তবে লক্ষ্যের শ্রোতৃবর্গ যে পরমা দ্বিগাও নিরস্তর নিগ্রহ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার প্রতিবিধান হইবার কোনও আশা আছে কি? প্রোঃ লত্যা ব্যানার্জি, শ্রীযুক্ত কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রোঃ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ তট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রোঃ অনাথ নাথ বসু প্রভৃতি বাংলার প্রতিষ্ঠিত শির্শিবৃন্দের নাম Programmeএ থাকা লক্ষ্যেও তাঁহাদিগকে গাহিতে না দিয়া অতি লম্বা ও তথাকথিত গায়কদিগকে গান গাহিতে দেওয়ার কি All-Bengal Music Conferenceএর স্বার্থাধা বুদ্ধি পাইয়াছে? কিন্তু শৈলেন্দ্রবাসুকে গাহিতে দেওয়াই যে কর্তৃপক্ষগণের একমাত্র অসুচিত কার্য্য হইয়াছে তাহা নহে; আলোচনা যুখে আমাদের পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধেও বখানানে—অনৌচিত্যগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। শৈলেন্দ্রবাসুর গানের পর কুমারী দারা ব্যানার্জি

কৌশিক কানাড়া গাহিলেন। কুমারীর সঙ্গীত সাধনার কিছু পরিচয় এক্ষেত্রে আবশ্যক করে। গতবৎসর এই Conference-এর উদ্বোধনে যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কুমারী Group II. F.এ খেয়াল, ঠুমরী, গজল ও আধুনিক বাংলা সঙ্গীত—এই চারিটি বিভাগে পরীক্ষা হেন। ইহার মধ্যে খেয়াল, ঠুমরী ও বাংলা সঙ্গীতে তিনি কোন স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই এমন কি, certificateও পান নাই। কেবল গজলে তিনি প্রথম হইয়াছিলেন (অবশ্য তাহাও মাত্র ৩ জন প্রতিযোগিনীর মধ্যে) এবৎসর কুমারী, বোধ হয়, নিজে এতই অভিজ্ঞ হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন যাহাতে তিনি পুনরায় পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হন নাই। বিজ্ঞ, কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার শিক্ষার এমন কি উন্নতির পরিচয় পাইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার কুমারীকে demonstration এ স্থান দিগেন। আমরা গতবৎসর কুমারীর গান শুনিয়াছি এবং আলোচ্য রাজিতেও শুনিলাম—কিন্তু তাঁহার গানে এমন কোন অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বা তাহার সুনামও পাইলাম না, যাহাতে তিনি Conference-এর demonstration এ গান করিতে পারেন। যাহা হউক, অতঃপর কর্তৃপক্ষগণ Conference-এর আয়োজন বন্ধ করিয়া যদি একটা জলসার অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে আমাদের এ সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় না—সঙ্গীত Conference ও জলসার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার এইরূপ Conference-র আহ্বান বন্ধ করুন—ইহাই সম্মেলনের লক্ষ্য লভাপতি নাটোরাধিপতির নিকট রসপিপাসু সামাজিকবর্গের নিবেদন। Conference আয়োজনের পর যদি কর্তৃপক্ষগণ একটা

জলসার আয়োজন করিয়া অর্থলব্ধ করিতে চাহেন তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক, কুমারীর গানের পর শ্রীমান্ হুগারিমোহন মিশ্র বসন্ত রাগের একখানি খেয়াল গান করিলেন। ইহার পরিবর্তে যদি ইহার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মিশ্র মহাশয় গান করিতেন (তাঁহার নামও Programmes এ ছাপা ছিল এবং তিনি লভাস্থলে উপস্থিতও ছিলেন) তাহা হইলে সব দিক দ্বিগুণ ভালই হইত। ইহার গানের পর প্রোঃ সুনীল বোস বসন্ত-পঞ্চম রাগের খেয়াল গান করেন। তিনি যে শ্রেণীর গায়ক তাহাতে তাঁহাকে Conference-এর demonstration-এ স্থান না দেওয়াই লক্ষ্যভাৱে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। ইহার গানের পর বাংলার উদীয়মান নবীন গায়ক শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মালকোশ-রাগের একখানি খেয়াল ও ঠুমরী গান করিয়াছিলেন। পর পর কয়েকটা অতি সাধারণ শ্রেণীর গান শুনিবার পর আশা ছিল যে, ভীষ্মবাসুর গান শুনিয়া একটু স্বস্তি পাওয়া যাইবে কিন্তু লক্ষ্যভাৱেই বোধ হয় তাঁহার গান ঐ রাজিতে মোটেই জমে নাই। তাঁহার অন্তঃকরণ বলিতেছিলেন যে ভীষ্মবাসু নাকি অসুস্থ—তাই প্রথম যে দিন তাঁহার গাহিবার কথা ছিল, সেদিন তিনি গাহিতে পারেন নাই—আলোচ্য রাজিতেও তিনি বিশেষ স্নেহ ছিলেন না।—আমরা অবশ্য কয়দিনই প্রায় ছবেলাতেই ভীষ্মবাসুকে লভাস্থলে আনিতে দেখিয়াছি—সঙ্গীতপ্রেমিক বিনি, শরীরের অসুস্থতা কি তাহাকে ধরে আটকাইয়া রাখিতে পারে? তবে আমাদের বিবেচনার আলোচ্য রাজিতে তিনি অসুস্থ শরীরে গান না গাইলেই ভাল করিতেন। ভীষ্মবাসুর পর শ্রীযুক্ত সুরেশ বাসু বান শুদ্ধ-কল্যাণের খেয়াল ও একখানি ঠুমরী গান

করেন। ইহার পরে বর্ষকল্পন্য প্রেক্ষা-গৃহে স্বল্প নর্তক বণি বর্জন তাঁহার নিজস্ব নৃত্যকলা প্রদর্শন করিতে থাকেন। রাজি প্রায় দুইটার সময় ঐ রাজির অনুষ্ঠান শেষ হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই রাজির মত অতি নিকট programme আর কোনও sitting-এ ছিল না। এক রাজি শ্রীমতী কেশরবাই তাঁহার অপূর্ণ কলা-নৈপুণ্যে শ্রোতৃমণ্ডলকে বিশেষ পরিভূত করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর গান প্রথমরাতেই শেষ হওয়ার প্রেক্ষাগৃহ পরবর্তী সময়ে প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল।

ডাঙারের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত

ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় রাজনীতির চেকার বোর্ড

খ্রীস্টী শীল

গত নভেম্বর মাসে লর্ড হ্যাগিফাক্স
বালিনে গিয়েছিলেন হিটলারের সঙ্গে আলাপ
জমাতে। এর ফলে নাকি একটা গোপন
সন্ধি হয়েছিল এই মর্মে যে, জার্মানী মধ্য
ইউরোপে free hand পাবে আর ৬ বছরের
অস্ত্র কলোনি ফেরতের দাবী করবে না।
তখন এই রকম একটা চুক্তির বড় দরকার
হয়ে পড়েছিল, কারণ যুগোসলিনী ভূমধ্য-
সাগরে Italian hegemony সৃষ্টি করার
জন্য ইংরেজকে বড় জ্বালাতন করতে আরম্ভ
করেছিলেন। হিটলারের সঙ্গে আপোষ করে
যদি যুগোসলিনীকে কোণঠালা করা যায়,
তবে একা যুগোসলিনী ইংরেজের সঙ্গে কিছু
করে উঠতে পারবেন না—এইটাই ছিল
তখন ইংরেজী ডিপ্লোমেশির Key idea.

তারপর ফেব্রুয়ারী মাসে দেখা গেল
ইংরেজ ইটালীর দিকে ঝুকেছে! এ
ব্যাপারে Sir Robert Vansittart
সাহেবের হাত ছিল বলে মনে হয়। তাঁর
নাকি একটা Sounding নেবার মতলব
ছিল এই মর্মে যে—“How many pieces
of silver Mussolini would require
to betray the Rome-Berlin axis.”

২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দেখা গেল যে,
যুগোসলিনীর অনুরোধে বা হুমকীতে চেম্বারলেন
সাহেব ইডেন সাহেবকে Foreign Office
থেকে সরাসরে বাধ্য হলেন। তাই Lord
Cranborne কমন্স সভায় বলেছিলেন—
“This is not a contribution to peace,
but a surrender to Blackmail.”

এর পরে লন্ডন এবং রোমের মধ্যে যে
কথাবার্তা আরম্ভ হল, তারই ফলে Easter-

এর ছুটিতে সৃষ্টি হল Anglo-Italian
Pact. এই ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি ইউরোপীয়
রাজনীতিতে নতুন অধ্যায় প্রবর্তন করলো।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: চেম্বারলেন দিনের প্রথম
আলোয় Fascism-এর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ
হলেন, এবং ব্রিটেনের Pro-fascist diplo-
macy অনাহত ধারায় বইতে আরম্ভ
করলো। স্পেনের Democracy-র মহানঙ্কট
এই ডিপ্লোমেশির ফলে আরও ঘণীভূত হয়ে
উঠলো। ফ্রান্স হতবাক হয়ে বুড়ের মত
ব্রিটিশ পদাঙ্ক অনুসরণ করলো, কারণ স্পেনে
Gen. Franco-কে বাধা দিতে গেলে
ব্রিটিশ ফরাসীকে বাধা দেবে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনীতি অবশ্যই
এক জিনিষ নয়। যা দেখছি তাতে রয়েছে
মাত্র একটা forced parallelism, ফরাসী
চায় না যে তার নিজের লম্বা বেড়ে
যাক। কিন্তু So-called Non-inter-
vention এবং বিশেষ করে ইঙ্গ-ইটালীয়
চুক্তির ফলে ফ্রান্সে সাহেব দাঁড়াচ্ছে
Pyreness-এর অপর পাশে, অর্থাৎ ফ্রান্সকে
রাইন নদী ছাড়া আর একটা লীমাস্ত বেশ
ভাল করে সুরক্ষিত করতে হবে।
Gibraltar-এ ব্রিটেনের বিপদও একদিক
দিয়ে কম নয়; কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই
যে, ফরাসী বাক্যে ভয় করছে, ব্রিটিশ সন্ধি-
আপোষের মধ্য দিয়ে সেই বিপদকে এড়াবার
চেষ্টা করছে। এইরকম বিপদ এড়াবার চেষ্টা
কতটা সফল হবে সেইটাই একটা বড়
সরমেব লম্বা। এটা বেশ বোঝা যায়,
যদিও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ইটালীর সঙ্গে

আপোষের কথাবার্তা চালাচ্ছে তবু জেনারেল
ফ্রান্সের অগ্রগতিকে সে বড় ভয় ও
সন্দেহের চোখে দেখছে। এই দেখিন
খবর পাওয়া গেল যে ফ্রান্স নাকি স্পেন
গভর্নমেন্টকে যুদ্ধোপকরণ দিয়ে সাহায্য
করছে এবং তারই ফলে ইটালী ফরাসীর
আপোষ চেষ্টার dead-lock উপস্থিত হয়েছে।
সম্প্রতি যে ইঙ্গ-ফরাসীর আলাপ আলোচনা
লন্ডনে হয়ে গেল, তারপর এরকম dead-
lock একেবারেই আশঙ্কা করা যায় না;
কিন্তু তা লম্বাও ঘটনার গতি যে রকম
চাচ্ছে, তাতে মনে হয় British plan
বিশেষ কার্যকরী হবে না। স্পেন
বিজ্রোহীদের প্রতি ফরাসীদের বিশেষ করে
French Left circle-এর—attitude যদি
আরও কড়া হয়ে ওঠে তবে Anglo-Italian
Pact-এ ভাঙন ধরবার বিশেষ সম্ভাবনা।

চেম্বারলেন সাহেব যে মনে করতেন ইঙ্গ-
ইটালীয় চুক্তির ফলে London-Paris-Rome
axis তৈরী হবে as a bulwark against
German aggression, আর Russia হয়ে
যাবে out of the picture, আর তার
ফলে British Capitalismও বাঁচবে,

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

Empire ও বাচবে, এই Sinister Calculation বড়টা sound হতে পারে তা লিখিই ভাববার বিষয়। রাশিয়াকে নয় এইভাবে বাধ দেওয়া গেল। তারপর? য়ুলোলিনীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া কি এতই লোজা? আগবে কেন সে? এই প্রশ্নে Rome-Berlin axis-এর কথা উঠে পড়ে। নেটার আলল দর্শ্য কি? কোনখানে তার Reality? কোনখানেই বা তার weakness?

Rome-Berlin axis-এর weakness-এর কথা ভেবে যে ইংরেজ, লাত্বনা পাবে, সে রকম লাত্বনা উপস্থিত তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। য়ুলোলিনী বড় চতুর রাজনীতিক—এই কথাটা তাকে ভাল করেই মনে রাখতে হবে।

ইউরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্মানী এই চতুষ্কতির মধ্যে বোঝাপড়া আরম্ভ হয়, তবে London-Paris axis কখনোই Rome-Berlin axisকে আঘাত দিতে লাহস করতে না। এর কারণ, ফ্যালিস্টেরা এর মধ্যেই এমন গোটা-কতক strategic position পেয়ে গেছে, যার ফলে তারা লক্ষ্য কলহে জেতবার ভরসা রাখে। এমন ক্ষেত্রে, য়ুলোলিনীর মৈত্রী ইংরেজ ফরাসীর কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে পড়বে। এই রকম চাকল্যকর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে য়ুলোলিনী অতি লজ্জাই হয়ে পড়বেন Arbiter in Anglo-French affairs এবং নিজের বা কিছু দরকার লবই এইভাবে আদায় করে নিতে তাঁর একটুও বেগ পেতে হবে না। তখন ইংরেজ ফরাসীর কি রকম অবস্থা দাঁড়াবে? ইংলণ্ড, ফ্রান্সে তখন Democracy দাঁড়াবে কোথা? ইংরেজ-ফরাসীর সাম্রাজ্যই বা তখন নিরাপদ হবে বা অক্ষয় থাকবে কী করে? Rome-Berlin axisকে এক পকেটে আর

Anglo-Italian Pactকে আর এক পকেটে নিয়ে য়ুলোলিনী তাঁর Bargaining powerকে চরম সীমার তুলতে চান—এটা বোধ হয় এখন থেকেই অনেক ব্যুত পেরেছেন।

হিটলারের সঙ্গে লক্ষ্য চুকিয়ে দিলে য়ুলোলিনী এসে যান ইংরেজ-ফরাসীর কবলে, ইটালীয় সাম্রাজ্য বিস্তারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে য়ুলোলিনী কখনই এমন কথা বলবেন না যে ইংরেজ ফরাসীর মৈত্রী তাঁর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। জার্মান-ভীতি তাঁর মনে লক্ষ্যরিত হয়েছে—একথা প্রকাশ করবেন না তিনি, যতদিন তার প্রয়োজন হবে Rome-Berlin axis as an instrument of blackmail.

তাই Austro-German Anschluss তাঁকে বিব্রত করে নি। অগ্নিরা হিটলারের কবলে গেল এতে য়ুলোলিনীর এমন কিছু এসে যায় না। কখনও যদি লিখিই ভয়ের কারণ ঘটে, তখন ত পড়েই আছে London-Paris-Rome axis. এই ত্র্যক্ষিপের dominant element হবার আগে তিনি চান না যে এটার বিশেষ প্রয়োজন হোক। খুব শীঘ্র যদি হিটলারকে বাধা দিতে হয় তবে য়ুলোলিনীর তাতে সত্যিই অবস্থি হবার কথা, কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজ ফরাসীর কাছ থেকে প্রয়োজন মত সব কিছু আদায় করা অসম্ভব। কাজ বাকী রয়ে গেল অথচ Rome-Berlin axis ভেঙে গেল—এ তিনি মোটেই চান না। হিটলার যদি এখনই Adriatic Sea পর্যন্ত হাত

বাড়িতে চান তবে য়ুলোলিনীর পক্ষে neutral attitude নেওয়া সম্ভব নয়। চেকোস্লোভাকিয়াকে ভেতরে ভেতরে হাত করে হিটলারকে তখন তিনি বলবেন—“Avoid aggression, Oh! Fuehrer.” এখনই যদি চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপার নিয়ে লাদারণ যুদ্ধ বাধে তা জার্মানীর সঙ্গে একজোট হয়ে ডিমক্রেসিশনালের বিপক্ষে অস্ত্র ধরা য়ুলোলিনীর পক্ষে মোটেই লাভজনক হবে না। তাই লেহিন যখন Sudeten Germanদের ব্যাপার নিয়ে বিরাট রকমের কাণ্ড বাধবার উপক্রম হয়েছিল, তখন য়ুলোলিনী হিটলারকে যুদ্ধ এড়াবার জন্য লিখিত অস্ত্রোধ জানিয়েছিলেন; অস্ত্র চোখ রাঙান নি। যা নিয়ে যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা থাকবে, সে ব্যাপারে য়ুলোলিনী হিটলারকে উপদেশ দেবেন খুব হিনেবী হয়ে চলতে। এই হচ্ছে এখন ইটালীর লক্ষ্যময় প্রচুর চতুর রাজনৈতিক খেলা। য়ুলোলিনীর স্বপ্ন যদি বাস্তবে পরিণত হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতাপ ক্ষীণ হতে হতে কোন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছুবে তা বলা যায় না। ফ্রান্স যদি সময় থাকতে বেকে দাঁড়ায় তা ভাল; নইলে ধরে নিতে হবে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তির পর থেকে Mussolini's era আরম্ভ হয়ে গেছে।



পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্ততৌব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ডবানীপুর



কালকেতু
অশীষ চৌধুরী



কুল্লরা
শিশুবালা



যুবরাজ
মোহন রায়

পৌরাণিক চিত্র

কেন আদৃত হবেনা ?

প্রাচীন আড়ম্বরহীন বাঙালার আমাদের যে অন্তর সম্পর্ক ছিল, আজিকার বাহ্য-ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে তাহা লোপ পাইতে বলিয়াছে। সেদিন তাহার চতুর্মুখপে প্রতিফলিত মৃৎপ্রতীপের আলোকের সম্মুখে বলিয়া বাজালী যে কাহিনী শুনিত, যে কথা পড়িত, আজ বিংশ শতাব্দীর চোখ-ঝলসানো বিদ্যুতালোকের সম্মুখে তাহা নিতাস্তই ক্রীড়া বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেদিন ছিল—“দেবতা ভিখারী মানব ছয়ারে।” আর আজ মানব ভিখারী দানব ছয়ারে। তাই আজিকার এই নব-লভ্যতার দিনেও সব সময়ই নিছক প্রেমের গল্প না শুনিয়া মাঝে মাঝে প্রাচীন কথা, সেই দেব-দেবীর কাহিনী সকলেরই শোনা ভাল। তাহাতে ছদ্মবেশে শক্তি এবং মনে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে। গতদিনে আমাদের এই জাতি, ধর্ম ও লংঘ্যারে যে কত গরীমান ছিল, তাহা আজিকার ভূয়ো মানব সমাজের সহিত তুলনার কথা আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে-দের মধ্যে মুহূর্তের অন্তর যদি ভাবিয়া উঠে তাহা কম মজলজনক নয়।

মানব জীবন গঠন ও তাহাদের সুপথে চালনা করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রদ ব্যবস্থা চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়া বর্তমান সমাজে, তাহা বোধ হয় আর কিছুতেই সহজসাধ্য নয়। চুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের প্রযোজকদের লক্ষ্য সেদিকে একেবারে নাই। তাঁহারা প্রেমের গল্প ও হালকা রঙের পরিবেশনে এত ব্যস্ত যে পৌরাণিক কাহিনীর

নাম শুনিলেই নাক গিটকাইয়া উঠেন। তাঁহাদের এই অবিশ্রমিকারিতার জন্য বাঙালার ছেলেমেয়েদের মনও বিন বিন কলুষিত হইয়া উঠিতেছে। তবে একথাও সত্য যে, বাঙলাদেশের এই কলিকাতা ভিন্ন অল্প কেনও সহরে বা গ্রামে যেখানে



লর্দার
তিনকড়ি চক্রবর্তী

লিনেম্বা আছে সেখানকার লোকদের মধ্যে এখনও এ ছরারোগা ব্যাধি প্রবেশ করে নাই। আমরা জানি, সেই সব জায়গায় ভাল ভাল সামাজিক চিত্র যে অনাদর পাই নাই ধর্মপ্রবণ বাঙালীর কাছে পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক চিত্র তৎপেক্ষা শতগুণে সমাদর লাভ করিয়াছে। কলিকাতার সভ্যসমাজ আজ যে রসাস্বাদের জন্য সর্বকালে, সর্বস্থানে যে কাহিনীর আবেদন অগ্রাহ্য করিতেছে—অদ্বয়-তবিত্যুতে হয় তো সেই

কাহিনীই পর্দায় দেখিবার জন্ম তাহার হইবে ব্যাকুল। তবে একথা সত্য যে, পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক ছবি তুলিতে হইলে তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও রসমাহুর্য্য যদি যথাযথভাবে প্রকাশ না পায় তাহা হইলে সেই ছবির লার্থকতাও ক্ষুদ্র হয়।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনকড়ি চক্রবর্তী যেদিন “দেবী কুল্লরা” তুলিবেন স্থির করেন সেইদিন তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—“ওহে আশুতোষকালকার দিনে তুমি পৌরাণিক ছবি তুলছো?” তাহাতে তিনকড়ি বাবু হাসিয়া জবাব দেন—“কেন, পৌরাণিক ছবি কী তোমাদের অস্পৃশ্য নাকি?—আমি তোমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দেখ ভাই, আমি যদি ভাল কোরে ছবি তুলতে পারি তা হ’লে আমি যে গল্প নিয়ে ছবি তুলতে যাচ্ছি সে নিশ্চয়ই সাধারণে বরণ কোরে নেবে। তা’ ছাড়া “দেবী কুল্লরা”-কে তুমি যদি শুধু পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক কাহিনী হিসাবে গ্রহণ কর, তা’ হ’লে মত্ত বড় ভুল করা হবে। পৌরাণিক আবহাওয়ার ভেতর এই কাহিনীর ভেতর এমন কতকগুলি



সুবধা
রাধারানী



ভাবু-বসন্ত
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য



নন্দিনী
রাণী চৌধুরী

উত্তরায়

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার, ১১ই জুন



NISIT



কালীপ্রসন্ন

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

ঘর

কালীপ্রসন্ন ও যোগমায়া

কালী—তুমি ব্যাপারটার যে রকম কুশ্রী রূপ দিয়ে দিলে, এমন আর কেউ পারলে না। দিলীপও না! ...

(যোগমায়া চুপ করিয়া রহিল)

সে বেচারী যেই শুনলে যে, এ একটা লামাত্ত উইলের ব্যাপার, সে স্থির হয়ে গেল। স্থির হ'তে পারলে না তুমি। লোক জড় কোরে, একটা scene create ক'রে আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা কোরতে লাগলে।

লম্বা রূপ পেয়েছে যা' আজকালকার দিনের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে। খনী নিধনীর লম্বা, হরিজন লম্বা, কৃষিশ্রম প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচনা এই কাহিনীর কম বড় লম্বা নয়। তা' ছাড়া ছবি-খানাকে 'অভিনয়ের দিক থেকে উচ্চাঙ্গের করার জন্য যার যে ভূমিকা চরিত্রোপযোগী হবে সেই ব্যবস্থাই করেছে। এখন ফলাফল ভগবানের হাত।"

বাস্তবিকপক্ষে কথাপ্রসঙ্গে তিনকড়িবাসু যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য এবং আমরা জানি তিনি এই "দেবী সুলক্ষণ" চিত্রে রূপান্তরিত করিবার জন্য আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। তিনকড়িবাসুর এই প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবে না তাহার প্রমাণ আমরা বহুদিক হইতে পাইরাছি।

যোগমায়া—তোমাকে অপদস্থ কি ক'রে ক'রলাম?

কালী—করনি; চেষ্টা ক'রছিলাম।

লম্বারের মধ্যে এমন ভাবটা দেখালে যেন তোমার উপর কতো অত্যাচার হ'য়েছে। বড়ো ছেলের প্রতি কি ভীষণ অবিচার হ'য়েছে। আমি যেন নির্মমতার একটা প্রতিমূর্তি!

যোগমায়া—মাপ করে, আমি আর ৬ মবের জবাব দিতে পারবো না।

কালী—কিন্তু পাঁচ হ'ল ঐ খানেই। তুমি জবাব দিতে পারবে না—জবাব নেই ব'লে নয়। তুমি জবাব দিতে পারবে না—জবাব দেবেন' বোলে! তুমি ভেবেই নিচ্ছে তোমার যা কিছু জবাব, যা কিছু বক্তব্য, আমি খেলো ব'লে ফেলে দোব। মনের কোণেও ঠাই দোব না। অর্থাৎ তোমার কথার আর কোন মূল্যই আমার কাছে নেই। কেমন, এই না?

যোগমায়া—এরকম যদি ভেবেও নিয়ে থাকি, অত্যাচার বোধ হয় কিছু ক'রিনি?

কালী—তা হয়তো করনি। কিন্তু অত্যাচারটুকু না করলেই কি সব বক্তব্য শেষ হ'য়ে গেল?

যোগমায়া—তা হয়তো গেল না, কিন্তু করারও আমার শক্তি রইল কোথায়?

কালী—কেনই বা রইল না! এক-ছেলেকে যদি আমি উইল কোরে লক্ষ্য দান কোরে দিই, এই কি তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, আর এক ছেলেকে আমি—

যোগমায়া—বলো, কথাটা শেষ করো।
খেমে যেয়োনা।

কালী—হ্যাঁ, কথাটা ঠিক দাঁড়াচ্ছে না বটে! আমি শুধিরে ব'লতে পারছি না। আচ্ছা, এ কথা এখন থাক। ...

যোগমায়া—দেই ভালো। —আমিও বাঁচলাম। (প্রস্থান)

(মনীষার প্রবেশ)

মনীষা—বাবা, তুমি নাকি পরেশ উকিলকে তাড়িয়ে দিয়েছ?

কালী—হ্যাঁ—

মনীষা—কেন বাবা?

কালী—তোকে সে কথা ব'লতে হবে?

মনীষা—হ্যাঁ—

কালী—হ্যাঁ?—তুই আমার মুখের উপর এতো বড় উত্তর করতে পারনি!

মনীষা ভয় পাইয়া গেল, সে মুহূর্ত্ত কাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল: ও! আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, তবে থাক্গে।

(প্রস্থানোত্তত)

কালীপ্রসন্ন—এই শোন—

(মনীষা ফিরিয়া আসিল)

তোকে এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে কে ব'ললে রে?

মনীষা—তুমি তো আবার রেগে যাবে। কথা না কওয়াই ভালো।

কালীপ্রসন্ন—না, রেগে যাবো না। তুই বলতো?

মনীষা—পরেশ উকিল চ'লে যাচ্ছিল, আমার নমস্কার কোরতে এসে কেঁদে ফেললে। জিজ্ঞাসা করলাম, একি! আপনি যাচ্ছেন কোথা? বলে, মণিমা, বেশ চ'ললুম। তোমার বাবা আমার তাড়িয়ে দিয়েছেন।

কালীপ্রসন্ন—তুই জিজ্ঞাসা ক'রলিনি কেন, পরেশবাসু! আপনার অপরাধ হ'ল কি যে, বাবা আপনাকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন?

মনীষা—ঠিক এই কথাটা আমার বুকের
ডগার এলো, কিন্তু ব'লতে পারলাম না।
ভাবলুম একটা শক্ত প্রশ্ন কোরে বলবো,
আর যদি উত্তর না দিয়ে চ'লে যায়।
তোমাকে তাই জিজ্ঞাসা কোরতে এগেছি।
ব'লবে আমার, কেন তাকে তাড়িয়ে দিলে?

কাশীশ্বর—সে বেইমানী করেছে।

মনীষা—বেইমানী!

কাশীশ্বর—হ্যাঁ। একটা অতি গোপনীয়
সংবাদ—কেন, তুই তোর মা'র কাছ থেকে
কিছু শুনিসনি?

মনীষা—কিছুনা। মা আবার কোন
কথা ব'লবে। এমন চাপা মেয়ে নয়!
কিন্তু—

কাশীশ্বর—আর কিছু আমি কোন কথা
তোমার বলতে পারব না।

মনীষা—আর একটা কথা। তারপর
আর এক টুকরোও তোমার জিজ্ঞাসা
ক'রব না।

কাশীশ্বর—বলো তাহ'লে—

মনীষা—পরেণ উকিলকে গোপনীয়
সংবাদটি দিয়েছিল কে?

কাশীশ্বর—আমি।

মনীষা—সে সেই সংবাদটি বেইমানী
দ্বারা প্রকাশ কোরে দিলে!

কাশীশ্বর—হ্যাঁ—

মনীষা—কিন্তু—একি! তুমি উঠে যাচ্ছ?

কাশীশ্বর—তুই যদি আমার cross
examine ক'রিস কতোকণ আমি টিকতে
পারি।

মনীষা—এবার বেটা ব'লছিলাম সেটা
কিন্তু কোন প্রশ্ন নয়, সেটা আমার মন্তব্য।

কাশীশ্বর—মন্তব্য তুই যা করবি, তা আমি
বুকে নিয়েছি।

মনীষা—তা হ'লে ভালই হ'ল, আমার
আর গোছ করে ব'লতে হ'ল না। তা হ'লে
পরেণ উকিলকে ডেকে ব'লে দিতে হয়,
চাকরি তার বহাল রইলো।

কাশীশ্বর—না, তা আর হয় না।

মনীষা—কিন্তু আমার মন্তব্য মত তার
অপরাধটা খুব গুরুতর দাঁড়াচ্ছিল না বাবা।

কাশীশ্বর—এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আমি
আর কিছু করনা ক'রতে পারি না।
বিশেষতঃ, একটা উকিলের পক্ষে।

মনীষা—তুমি এখন ব'লছ, তখন হয়তো
তাই ঠিক। কিন্তু আমি যা ভাবছিলাম,
তা তোমার ভয়ে ব'লতে পারছিলাম।

কাশীশ্বর—বল শুনি, কোন' ভয় নেই।

মনীষা—তুমি হয়তো হালবে, কিংবা
ভাববে মেরেটা বোকা!

কাশীশ্বর—হালবোও না, বোকাও
ভাববো না। মন্তব্যটা শুধু শুনবো। আরন্ত
কর।

মনীষা—আমি ভাবছিলাম, যে, গোপনীয়
সংবাদটি পরেশ উকিলকে দেওয়াই উচিত
হয়নি!

কাশীশ্বর—এমন যদি হয়, যে, এ
সংবাদটি পরেশ উকিলকে না দেওয়া ছাড়া
আর উপায়ই ছিল না?

মনীষা—অর্থাৎ, মাকে দিলেও হ'তনা,
হাটাকে দিলেও হ'ত না, ছোট দাঁকে
দিলেও হ'ত না;—এই কথা ব'লছোত'?

কাশীশ্বর—দাঁড়া, তুই কোন দিকে আমার
ঠেলে নিয়ে যাচ্চিস, তা দেখি।

মনীষা—ঠেলবো কেন, আমি তো
দাঁড়িয়েই র'য়েছি।

কাশীশ্বর—আমি দাঁড়াতে পারছি না!...

মনীষা—দাঁড়াতে পারছ না। মানে কি,
আমি বুঝতে পারলাম না:—ও! কথার
ভেতর বোধ হয় আর একটা কথা আছে।

কাশীশ্বর—থাম্। আচ্ছা ধর, এমন যদিই
হয়, যে, গোপন সংবাদটি বাড়ীর আর
কাউকেই দেওয়া চলত না অথচ পরেশ
উকিলকে—

মনীষা—অথচ পরেশ উকিলকে সংবাদটি
দিতেই হবে! আমি তা হ'লে ব'লবো—

হালতে পাবে না কিন্তু—এমন কোন সংবাদই
হওয়া উচিত ছিল না! মা জানুবেনা, বাবা
জানবে না, অথচ পরেশ উকিল এসে টুক
কোরে জেনে যাবে!—উঃ!—বেশ হ'য়েছে,
তার চাকরি গেছে। আমি খুব খুশী হ'য়েছি।
(প্রস্থান)

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারী—পরেণবাবু একবার দেখা ক'রতে
চাচ্ছেন।

কাশীশ্বর—কেন?

বেহারী—ব'লছেন, বাড়ী ঘাবার আগে
বাবুর সঙ্গে একবার দেখা কোরে যেতে চাই।

কাশীশ্বর—আমার সময় হবে না। যা
বলবার ছোট বাবুকে ব'লে যেতে বল।

বেহারী—Thank you sir. (প্রস্থান)

(যোগমায়ার প্রবেশ)

যোগমায়ী—নীলা এসেছে। ভয়ে
তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারছে না।
তাকে ডাকবো এইখানে?

কাশীশ্বর—ভয় আবার তার কি লজ্জা
হ'ল?

যোগমায়ী—আমি তাকে এ বাড়ী আসতে
বারণ ক'রেছিলাম। ব'লেছিলাম তুমি এ
সব পছন্দ করো না। তাই বোধ হয় সে
ভয় পেয়েছে।

কাশীশ্বর—ও! কিন্তু আমি তো তাকে
এ বাড়ী আসতে বারণ ক'রিনি!

যোগমায়ী—করনি বটে, কিন্তু 'চেরেছিলে
তাই।

কাশীশ্বর—আমি চাইনি। বরং ওদের
বিবাহের সজ্জাবনা নেই শুনে তুমি তাই
চেরেছিলে। মনে ক'রে দেখা:—ভেবেছিলে
... .. থাক সে কথা। এক কথার
বারংবার উল্লেখ ক'রলে লোন্ধ্য হানি হয়।
তুমি নীলাকে ডাকো।

যোগমায়ী—বে কথা ব'লতে গিয়ে
সংবাদ প্রকাশ ক'রলে তা কিন্তু বলাই হ'ল।

মনে কোরোনা এটুকু বোঝবার বুজিও আমার নেই।

কাশীন্দর—বুজি তোমার নেই একথা আমি বলি না। অকারণ খোঁচা দিলেও তোমার মনে আঘাত দেবার চেষ্টা করি না—যার ইচ্ছা তুমি এই মাত্র করলে।... হুঃ আদি কাউকে দিতে চাইনা যোগদারী, হুঃ আদি কারুর কাছ থেকে পেতেও চাই না। আমার নিজের পাওনা গুণা শুধু আমি বুঝে নিতে চাই। শুধু এইটুকু।—

যোগদারী—হুঃ আদিও কাউকে দিতে চাই না। আজ এই ত্রিংশ বৎসরের ভেতর এমন একটা দিনও তুমি খুঁজে পাবেনা, যে দিন আমার লজ্জা তোমার কোন' কষ্ট, কোন হুঃ পেতে হ'য়েছে! শেষের কথা-গুলি বলিতে গিয়া অশ্রুতারাে যোগদারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় নৈপথ্য হইতে সুনীলা ডাকিল : জ্যাঠাইমা, আমি আসবো?

কাশীন্দর—নীলা! আর, তেতরে আর।

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীলা—আমি ভাবলুম, বুঝি জ্যাঠাইমা ডুলেই গেল।

(যোগদারীর প্রস্থান)

একি! জ্যাঠাইমার কি হ'ল।

কাশীন্দর ক'রেক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন :—হরতো কিছু হ'য়ে থাকবে। আজকাল ওদের ব্যাপারই অস্তরকম।—তা সে বাক।—তুই নাকি ভয়ে আমার সঙ্গে বেধা ক'রতে পারছিলি না?

সুনীলা (মুহূর্ত্ত হাসিয়া বলিল) হ্যাঁ, আপনি যে আমার আস্তে বারণ ক'রেছিলেন।

কাশীন্দর—তোমার জ্যাঠাইমা ব'লে-বিরেছিল বুঝি?

সুনীলা—হ্যাঁ—

কাশীন্দর—তা হ'লে অবশ্য আমি বারণ ক'রেইছিলাম।—কিন্তু তুই কেন আমার কাছে এলে কৈফিয়ৎ তলব ক'রলি?—

সুনীলা—আমি জানতাম এই নিবেদন আজ্ঞা আপনি নিজেই প্রত্যাহার ক'রবেন।

কাশীন্দর—ঠিক।

সুনীলা—তাহ'লে তো আমার এ বাড়ী আস্তে কোন বাধাই রইল না?

কাশীন্দর—নীলা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমার কিন্তু পুলিশের লোক ব'লে মনে হবে। (সুনীলা হাসিয়া উঠিল) স্বাধীন গতি যেখানে স্বাভাবিক, বাধার বালাই সেখানে কে নিয়ে আসবে?—সে কাজ করুক ওরা, আমাদের সে কাজ নয়।

সুনীলা—কিন্তু এ বাড়ীতে আমার স্বাধীন গতি তো স্বাভাবিক নয় জ্যাঠা মশায়?

কাশীন্দর—অর্থাৎ তুমি এ বাড়ীর ঘরে নও, এখানে তোমার স্বাধীন গতি কি কোরে হ'তে পারে—এই হ'য়েছে একটা মহাপ্রশ্ন—কেমন?

সুনীলা—কথাটা বলে ফেলেই বুঝতে পেরেছি, আমার ও কথা বলা উচিত হয়নি।—(অল্প স্তব্ধ থাকিয়া বলিল) থাক্ জ্যাঠা মশায়, আমি আর এ বিষয়ে কোন কথাই কইতে চাই না। কোন জিনিষ জানবারও আর আবশ্যক নেই।

কাশী—এ বাড়ী আস্তে কখনও রূপগতা কোরো না। বাধা যদি কারুর কাছ থেকে আসে,—আমার কাছ থেকেও যদি আসে, ঠেলে ফেলে দিও সে বাধা!—এ বাড়ী শুধু তোমার বাবার প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়ী ব'লে বিবেচনা করো না,—এ বাড়ী তোমার—

(এই পর্য্যন্ত বলিয়া কাশীন্দর লহনা স্তব্ধ হইয়া যাইলেন)

সুনীলা—আমার আর কিছু কি ব'লবেন?

কাশীন্দর—হ্যাঁ—কি ব'লছিলাম।—এ বাড়ী শুধু তোমার বাবার প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়ী ব'লে বিবেচনা করো না।—এ তোমারও বন্ধুর বাড়ী!—

সুনীলা—আমি তা জানি। এ আমার বাবার বন্ধুর বাড়ী, আমার মায়ের বন্ধুর বাড়ী, আর আমারও বন্ধুর বাড়ী—বহিঃ বন্ধ আমার সঙ্গে কখনই বেধা করে না।

কাশীন্দর—সে কি! দ্বিলীপ যে তুমি না হ'লে—

সুনীলা—ও তো আমার বন্ধু নয়। আমি মনোহার কথা ব'লছিলাম।—আচ্ছা—(প্রস্থানোত্তর)

কাশীন্দর—আর একটা কথা—

(সুনীলা দাঁড়াইল)

দ্বিলীপ তোমার বন্ধু নয়? তাকে তুমি বন্ধু ব'লে ভাবো না?—

সুনীলা—না জ্যাঠামশায় সে আমাদের বন্ধু নয়। সে আমাদের গুরু। তার চেয়ে যদি আরও কিছু বড়ো থাকে সে তাই।

কাশীন্দর—বেশ! কিন্তু আরও একটা কথা আমার আছে সুনীলা,—তার জবাবও আজ আমার দিবে যেতে হবে।

(সুনীলা অবাচ্ হইয়া কাশীন্দরের সুখের প্রতি চাহিয়া রহিল)

তোমার মায়ের ইচ্ছা দ্বিলীপের সঙ্গে তোমার এমন একটা লম্বন্ধ, এমন একটা গুরুতর সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি হয় বাকি আমরা চলিত কথায় বলি বিবাহ!—তুমি লজ্জা পাবে আমি জানতাম। আমারও এরূপ একটা রূঢ় প্রশ্ন তোমায় করা উচিত নয়, তাও আমি জানি : কিন্তু আমার দরকার হয়ে পড়ছে কথাটা জানবার। বলতো মা, তোমার এ বিষয়ে কোন মতামত আছে কি না?

(সুনীলা চুপ করিয়া রহিল)

বলো মা, লজ্জা কোরো না?

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

(পত্র)

মাননীয়

খেরালী সম্পাদক মহাশয় সমীপে

মহাশয়,

আপনার এই জ্যেষ্ঠ তারিখের পত্রিকায় শ্রীবিনোদবিহারী ষাল মহাশয় নিখিলবঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের বর্তমান বর্ষের অধিবেশনে ষাহারা গাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র চারজন গানের আলোচনা করেছেন যেখান অত্যন্ত বিম্বিত হইলাম। Conference-এ ত বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক গায়ক-গায়িকাই গান করিয়াছিলেন; কিন্তু সমালোচক মহাশয় অল্প লকলকে ছেড়ে দিবে মাত্র চারজন (যথা শ্রীমতী হীরাবাই, পণ্ডিত ওকারনাথ, রাধু মিশ্র ও ভীষ্মবাবু) গায়ক-গায়িকার উপর বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন কেন? তিনি কি মনে করেন

সুনীলা—আমার মা, আমার জ্যাঠা-মায়া যা ছকুম কোরবেন তাই আমি কারব।

(যোগদায়ার প্রবেশ)

কাশীধর—এলো—। আচ্ছা, ধরো, বহি মাছি বলি,—না, এ যোগাযোগটা ভালো হবে না, নীলা, তুমি তোমার মন প্রস্তুত করো?

সুনীলা—আমি প্রস্তুত ক'রেই নেব আমার মন।

কাশীধর—নীলা! আশীর্বাদ, আমি তাকে আশীর্বাদ করি।

(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

যে অজ্ঞাত ষাহারা গাহিয়াছিলেন (যথা শ্রীমতী কেশরবাই, শ্রীমতী দস্তুর, প্রোঃ সুরেশ বাবুমান ও স্থানীয় অজ্ঞাত গায়কগণ) তাঁহারা লকলেই হয় তাঁহারা সমালোচনার অযোগ্য না হয় বা তাঁহারা এত ভাল যে সমালোচক তাঁহাদের সমালোচনা করিতে নিজেই অসমর্থ। যে কারণেই হোক, তাঁহারা যে গ্রন্থের কোণে না পড়ে বেঁচে গেলেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য!

বিনোদ বাবু তাঁর সমালোচনার শ্রীমতী হীরাবাই, রাধু মিশ্র ও ভীষ্মবাবুর সম্বন্ধে যা লিখেছেন, গানের সমালোচনা হিসাবে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। ভীষ্মবাবুর গানে তিনি নাকি আলাপের চার অংশের কোন অংশেরই রূপের বিকাশ দেখেন নি—রাগরূপের বিকাশ কাণে শুনে ছবয়েই উপলব্ধি করা যায়—চোখে কেহ দেখেন ব'লে ত শোনা যায় নি। সমালোচক মহাশয় চোখে দেখবার চেষ্টা না ক'রে বহি কাণে শুন্তেন তা' হ'লে এরূপ অসঙ্গত প্রলাপ করতেন না। এছাড়া আর যা কিছু তিনি সমালোচনা করেছেন তাতে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যই প্রকাশ পেয়েছে। লেখক মহাশয় লিখেছেন যে ভীষ্মবাবু নাকি চুম্বী গানের সময় “রাত্তা ভুলিয়া পথ খুজিতেছিলেন, পথ পাওয়ার আগেই গান শেষ হইয়াছিল”—আমাদের কিন্তু কোতুল রহিয়াই গেল যে, ভীষ্মবাবু “পথ পাওয়ার আগেই” গান শেষ করিলেন বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পথ খুঁজে বাড়ী গিয়ে পৌঁছিলেন কি না?

লেখক মহাশয় রাধুমিশ্রের গানে কোন রস ও প্রাণের স্পন্দন দেখিতে পান নাই এবং সুরের নাকি কোন বৈচিত্র্য পান নাই। ভীষ্মবাবুর গানেও তিনি এরূপ “সুরে কোন বৈচিত্র্য” পান নি। বিনোদবাবু সুরের কি বৈচিত্র্য যে খুঁজিয়া বেড়াইতে-ছিলেন, তাহা তাঁহার সমালোচনা থেকে ত বোঝা যায় না।

শ্রীমতী হীরাবাইকে সমালোচক মহাশয় সুবিধাত ওস্তাদ ওয়াহেদ খাঁর শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন—তাছাড়া তিনি লিখেছেন যে, শ্রীমতীর গানের চতু পণ্ডিত বালগন্ধব ও কুমার-এর style-এর সহিত মেলে, তবে মাঝে মাঝে নাকি উহাতে আবহুল করিম খাঁ সাহেবের রীতির ছাপ স্পষ্ট পাওয়া যায়। একাধারে শ্রীমতীর গানে এতগুলি বিশিষ্ট গুণীর style ও রীতির ছাপ বর্তমান থাকা লক্ষ্যে এবং বিনোদবাবু শ্রীমতীর সুরের ইঙ্গিতালে জড়িয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁহার সমালোচনার বলিয়াছেন যে, শ্রীমতীর গানে খেরালের উপযোগী style বা technique নাই। তাঁহার এরূপ সামঞ্জস্যবিহীন সমালোচনার কোনও ভাবার্থ লজ্জিতরসিকগণ করিতে পারেন কি?

আর লকলের চেয়ে মজার হচ্ছে যে শ্রীমতীর গানের সমালোচনার তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা ঘোটেই তাঁর নিজস্ব নয়। খেরালী পত্রিকায় কিছুদিন পূর্বে শ্রীমতী গঙ্গাবাইয়ের গানের সমালোচনার যে ভাষা ব্যবহৃত হ'য়েছিল তার ছব্ব ছাপ এতে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত ওকারনাথের গানের সমালোচনার কিন্তু সমালোচক মহাশয় কেবল লাহানিধে মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্তু তিনি যে লজ্জিতশাস্ত্রের মত একজন মর্জিত তা প্রকাশ করবার লক্ষে বখেটে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর লকল

মস্তবাহি যে কীক। আওরাজ তা বুঝতে বেশী
দেয়ী থাকে না। পণ্ডিতজীর শুধু কল্যাণে
খাঁলাহেবের ওড়িয়ন record গানের ছায়া
কি ভাবে যে তিনি স্পষ্টরূপে বুঝেছিলেন
তা আলোচনায় যদি তিনি স্পষ্ট করে বলতেন
তা'লে তার একটা প্রতিবাদ করা যেত।
কারণ না দেখিয়ে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে
অথবা চুরীর দ্বায়ে লোপদ করা মোটেই
তত্ত্বতাজনক কাজ নয়। তা ছাড়া তিনি
লিখেছেন যে, পণ্ডিতজীর “শুধু কল্যাণ”
গানে একই রাগের রূপ ফুটে ওঠেনি—
তুপালী ও মালেশ্বরী (?)—র ছায়া নাকি
তার মতে প্রকট হয়েছিল। সমালোচক
মহাশয়ের মতে ওকারনাথজী খাঁলাহেবের
গানের অনুকরণ করেছেন। তা হ'লে
জিজ্ঞাস্য এই যে, খাঁলাহেবের record গানেও
কি তুপালী ও মালেশ্বরীর ছায়া প্রকট হয়ে
উঠেছে! এত গেল এক কথা। তা ছাড়া
ওকারনাথের গানে কেমন ক'রে যে তুপালী
ও মালেশ্বরীর ছায়া এসেছিল তাও তিনি
পরিষ্কার করে কিছুই লেখেন নি। শুধু
কল্যাণের প্রকৃতির সঙ্গে অবশ্য তুপালীর
অনেক সামঞ্জস্য আছে এবং সে পার্থক্য
বজার রাখা প্রকৃত গণিতজ্ঞ ছাড়া সাধারণ
শিল্পীর পক্ষে সহজসাধ্য নয়। কিন্তু,
সমালোচক মহাশয় জানেন কি যে শুধু
কল্যাণ ও তুপালীর স্বরূপ সাধারণতঃ সারগম
ও বাহীলদ্বাদীর উপর নির্ভর করে না—
পরন্তু এই রাগ দুইটির গানের “চুড়” ও
“ধরণের” উপরেই নির্ভর করে—সুতরাং এই
দুইটি রাগের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিতে
হইলে বিশিষ্ট ওস্তাদগণ যখন এই
রাগ দুইটির আলাপ ও বিস্তার করেন
তখন তাঁহাদের গান ধীরভাবে শ্রবণ
ও পর্যালোচনা করা আবশ্যিক। অন্তথা
সাধারণ শ্রোতার পক্ষে শুধু কল্যাণের মধ্যে
তুপালীর ছাপ প্রকটভাবে পাওয়াই স্বাভাবিক।

বা হো'ক সমালোচক মহাশয় যে শুধু
কল্যাণে তুপালীর ছাপ পেয়েছেন তাতে
আমরা ভত বিস্মিত হই নি, যত বিস্মিত
হইছি তাঁহার মালেশ্বরীর ছাপের উল্লেখ
দেখে। মালেশ্বরী ব'লে ত কোনও রাগ
শাস্ত্রে বা লোকে প্রসিদ্ধ নেই বা আছে
তার নাম “মালতী”। কিন্তু “মালতী”-র
প্রকৃতি থেকে শুধু কল্যাণের প্রকৃতি এত
ভিন্ন যে মস্তিষ্কের বিকৃতি ছাড়া একের
মধ্যে অপরের ছাপ পাওয়ার কল্পনা করা
লম্বন নহে।

এখন শুধু কল্যাণের কথা ছেড়ে দিই
তার ভৈরব-বাহারের সমালোচনার কথা
তোলা যাক। বিনোদবাসু আলোচনা
প্রসঙ্গে ভৈরব-বাহারের যে সরগম দিয়েছেন
তা'ত লম্বা কথায় বলতে গেলে একেবারেই
যেটুকু। ভৈরব-বাহারের ঠাট্টা হচ্ছে
ল র গা গ মা প ধা ধ না ন। এক্ষেত্রে
দুই প্রকার গাঙ্গার, দুই প্রকার ধৈবত ও
দুই প্রকার নিষাদের ব্যবহার করা হয়ে
থাকে; এবং ইহাতে মধ্যম মাত্র কোমল।
তাছাড়া বাহারের রূপ লম্বন্ধে তিনি যে মস্তব্য
করেছেন তাও একেবারেই অসঙ্গত। বাহার
রাগের আরোহী ও অবরোহীর লহিত যদি
তাঁহার কথকিং পরিচয়ও থাকিত, তাহা
হইলে তিনি কখনও মস্তলগ্নকের কোমল
নিষাদ থেকে বাহার শুরু করা রীতিবিরুদ্ধ
একথা লিখতে সাহস করতেন না। বাহারের
আরোহী ও অবরোহী এইরূপ হইয়া থাকে—
না ল গা মা ধ না ল, না ধ না প,
মা প গা মা র ল। এড়াই সমালোচক
মহাশয় যে পণ্ডিতজীর গানের মুখে
বাহারের ছাপ কি ক'রে পেলেন তা বোঝা
লম্ব, কারণ ভৈরব-বাহার গাহিতে হ'লে
লক্ষ্যক্ষেত্রেই ভৈরবকে পূর্বাঙ্গে গাহিয়া পরে
উত্তরাঙ্গে বাহার গাহিতে হয়—এবং
পণ্ডিতজীও সেদিন ঠিক এইরূপ

স্বক-রীতিতেই তাঁহার ভৈরব-বাহার
“যেরে বলন্ত” গানখানি গাহিয়াছিলেন।
লকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে যে
বিনোদবাসু নিজের ওজনে ভৌগ করে
পণ্ডিতজীর গানে শতকরা ৫০ ভাগ আহার-
ভৈরবী (?)—র রূপ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু
কেমন ক'রে তিনি ভৌগ করলেন তার
লম্বন্ধে তিনি আমাদের কোনও লক্ষ্যন দেন
নি। সুতরাং সে লম্বন্ধে আলোচনা
নিম্প্রয়োজন। পরিশেষে বিনোদবাসু
বলিয়াছেন যে ভৈরব-বাহার গাহিতে হইলেই
গোয়ালিররের ওস্তাদেরা যেমন ক'রে “ডারিরা
ঝোক রে হি” গানটা গাহিয়া থাকে
তেমনি করেই গাহিতে হবে। এর
যুক্তি কতটুকু, তা লজ্জীত-দেবীরা
অনার্য্যলেই বুঝতে পারেন। তবে
আমাদের মনে হয় যে তাঁর এই লম্বন্ত
সমালোচনা কেবল যে অজ্ঞানতা-প্রসূত তা
নয়—এর মধ্যে বিবেকের ভাবও যথেষ্ট
প্রকাশ পেয়েছে। পণ্ডিতজীর গান যে
কিরূপ উচ্চাঙ্গের ও কতটা শাস্ত্রসম্মত তা
লজ্জীত-রসিকেরা ভালই জানেন। প্রকাশ-
ভাবে প্রকৃত গণিতকে অপহৃত করার হীনচেতা
উপেক্ষা করা যায় না বলিয়াই এই প্রতিবাদ।

ইতি—

শ্রীমুনীতি সেন

বিবাহাদি শুভকার্য্যে
মূলভে উৎকৃষ্ট মৎস্য খরিদ
করিবার একমাত্র স্থান।
দত্ত গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
৬১মং দেবেস্তা ঘোর রোড, ডাবানীপুর

খেয়ালী চিত্রপট



এসোসিয়েটেড প্রডিউসার্সের “চোখের বালি”-র একটি
বিশিষ্ট দৃশ্যে শ্রীযুক্ত হরেন মুখার্জী ও ছবি বিশ্বাস।
ছবিখানার পরিচালক শ্রীযুক্ত সতু সেন।



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'খারিট'

স্বাস্থ্যাল নিউজপেপার লি:

টেলিফোন
সিউপ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্গ, জয়োবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, ৯ই জুন ১৯৩৮

চব্বিশ পরগণা জিলা বোর্ড

চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্যাবলী সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আয় সেইরূপ অর্থশালী বোর্ড চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের কর্মশৈলীলাভেতু ক্রমশঃ মন্দের পথে চলিতেছে।

১৯৩২ সালে বর্তমান বোর্ড গঠিত হয় কিন্তু নূতন নির্বাচন হইয়া গেলেও প্রায় বৎসরধিককাল হইতে চলিল এখনও প্রাদেশিক সরকার মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা না করার ফলে পূর্ব বোর্ডই বাহাল আছে। আর নূতন বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য স্থগিত আছে। এবং আরও কিছুদিন এইরূপভাবে চলিলে চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে শঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। আমরা বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

চব্বিশ পরগণা জিলা বোর্ডের তদাবস্থানে রাস্তা নির্মাণ বিষয়ে যে নিখিলতা ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়াছে আমরা বর্তমানে সেই সম্বন্ধে কিছু

আলোচনা করিব। বিভিন্ন হৃদয়বান ব্যক্তি রাস্তা নির্মাণকল্পে বোর্ডের হস্তে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন কিন্তু এতাবৎকাল দাতার পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই সমস্ত রাস্তা তৈয়ার হয় নাই অধিকন্তু আমরা সংবাদ পাইলাম সেই সমস্ত অর্থ বোর্ডের সাধারণ তহবিলে মিশ্রিত হইয়া অন্য কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে কি বলিবার আছে?

অপনুপক্ষে প্রকাশ যে ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র দাসের বাড়ীর সহিত সংযুক্ত মোটে দেড় মাইলব্যাপী গড়িয়াবাজার রোড প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে আর তাহারই সন্নিকটে মগরাহাট ধানার অন্তর্গত শিবপুর রোড নির্মাণের জন্য জনৈক ব্যক্তি পাঁচ হাজার টাকা দান করিলেও অত্യാপি সেই রাস্তার নির্মাণ কার্যে হস্তার্পণ করা হয় নাই। এই বৈষম্য যেরূপ দৃষ্টিকটু তদ্রূপ নিন্দনীয়। জিলা বোর্ড যে চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানের পৈত্রিক সম্পত্তি নহে ইহা সমঝাইয়া দিবার মতন তেজস্বী সদস্য কি জিলা বোর্ডে কেহই নাই?

এতদ্বিষয় জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানের অত্যাচার কার্যাবলীও মোটেই প্রশংসনীয় নহে। তাঁহার ভ্রমণ-ভাতা (T. A.) সম্বন্ধে নানারূপ কাণাঘুসা শুনা যায়। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত খগেন পাড়ুই মহাশয়ের পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় অনুকূল বাবু কাহার গাড়ীতে গিয়াছিলেন ও তিনি ভ্রমণ-ভাতা বিল করিয়াছিলেন কিনা শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দ্রশেখর বসু সে রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন কি? আমরা জানি পূর্ণেন্দুবাবুও অনুকূলবাবুর সঙ্গে গিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে সঠিক সংবাদ জানা স্বাভাবিক! বিগত এ্যাসেম্বলী নির্বাচনের সময় নারায়ণপুর দাতব্য চিকিৎসালয় পরিভ্রমণ অধিলায় কোন ভাতা বিল করা হইয়াছে কিনা জিলা বোর্ডের মেম্বর ও নারায়ণপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিক্কেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা আমাদের জানাইবেন

কি? এতৎসম্পর্কে রেকর্ডে সিক্রেটারবাঁবুর স্পষ্ট ও লিখিত মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও চেয়ারম্যান এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান বা অগ্রপ্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধানের জ্ঞাত আমরা জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রাস্তা নির্মাণ করে দামশীল ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত অর্থ এতদিন কেন ব্যয়িত হয় নাই এবং কেনই বা সেই অর্থ জেলা বোর্ডের অগ্র কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিভাগীয় মন্ত্রীর জবাবদাহি দাবী করা কর্তব্য কারণ জিলা বোর্ড এইরূপ অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে জনসাধারণ রাস্তা নির্মাণকালে জিলা বোর্ডের হস্তে অর্থ অর্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে এবং বিতর্কালী ব্যক্তিবর্গের অর্থানুকূল্য না পাইলে বাংলার বিভিন্ন জেলার রাস্তা নির্মাণ কার্যের বাপক পরিকল্পনা

ব্যাহত হইবে। জিলা বোর্ডের এইরূপ ওদাসীত্ব অমার্জনীয়। আমরা বাহান্তরে ক্যামিং, টাকি ও মগরাহাট চিকিৎসালয়ের পরিচালনা ও অগ্রাণু বিষয়ের আলোচনা করিব।

আমরা অবগত হইলাম বর্তমান চেয়ারম্যান রায় যোগেশচন্দ্র সেনের স্বাস্থ্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং গত ছয় মাস যাবৎ তিনি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই বৎসর চেয়ারম্যান নির্বাচন হইতে বিরত হওয়াই সম্ভব। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নন্দর মহাশয় অমায়িক ব্যক্তি তবে তিনি ভাগিনেয়-প্রীতির আধিক্য হেতু অনেক সময় স্বীয় মত-নিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারেন না। চব্বিশ পরগণা জিলা বোর্ড তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির নিকট হইতে অনেক কিছুই আশা করে।

•(X)•:-



বিবিসি

শুভ-স্বাগত

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীমান অমল চন্দ্রের সহিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পৌত্রী শ্রীমতী গৌরী দেবীর শুভ পরিণয় গত সোমবার সন্মঙ্গল হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের আশীষ-বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি :

“নাহুক দৌহার শুভদৃষ্টিতে বিধাতার শুভদৃষ্টি”

* * *

‘মিটার্স লিমিটেডের’ অল্পতম বিশিষ্ট কর্মচারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরীর সহিত হাওড়া নিবাসী শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী রমলার শুভ পরিণয় গত সোমবার সন্মঙ্গল হইয়াছে। পদ্মপুত্রের উপকণ্ঠে ‘চিরকুমার লতা’র শেষ লতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমারের কুমার-লতার লতাভাষ্য পরিত্যাগে যে বিকোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্লকুমার হয়ত তাঁহার বিগত-যুগের কাব্য-স্রোতার পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিবেন : বিচিত্র এ বিশ্ব মাঝে বৈচিত্র্যের লীলা বয়ে যায়।

স্বামীর সন্মুখ সজ্জিত

মাননীয় স্ত্রীর সন্মুখনাথ সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন-নচিব নিয়োগ উপলক্ষে আর্ধ্যাহ্ন ইন্সটিটিউশন কোম্পানীর পক্ষ হইতে গত শুক্রবার অপরাহ্নে গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলে এক প্রীতি-সন্মিলনের আয়োজন হয়। কলিকাতার দেবর

মিঃ জেকারিয়া, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূতপূর্ব দেবর শ্রীযুক্ত নন্দোব কুমার বসু, বাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিস মিঃ এস. সি. মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ লেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার। ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় সহকর্মীবৃন্দসহ অভ্যাগত বৃন্দের আদর আপ্যায়নের প্রতি লব্ধ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

নিজে বড় হয়ে বাঙ্গালী জাতিতে বড় করিয়াছে যারা

স্বদেশ-সেবারে ত্রুত বলে যারা শ্রদ্ধায় রাখে শিরে

মাতৃ পূজার অঙ্গনতলে নিত্য পূজারী তারা

মঙ্গল ঘট করিতে পূর্ণ লকল তীর্থ-নীরে।
আপনার হাতে নিভৃত বনিয়া লাজায় পূজার-বেদী

চাক বাজাইয়া করে না প্রচার পূজার
বিজ্ঞাপন,
নিষ্ঠায় তারা লভিছে লিঙ্গি লব লংগর
‘ডেবি’

জ্বর-অর্ধা-উপচারে করি আত্ম-সমর্পণ।

তারা লভ্যের চির-উপালক, জ্বারের
বিচারপতি

অজ্ঞানে কণ্ঠে কঠোর ঝুঁকুণ্ডে, জ্বারের
করে লম্বান,

অগ্রণী তুমি আজি তাহাদের তোমারে
জানাই নতি

হে বরপুত্র বঙ্গবাণীর, কীৰ্ত্তিতে
মহীমান।
মা’র মন্দিরে যে দীপলিখার আরতি
করিলে তুমি
সে আলোকে দেশ হ’ল উজ্জল, পুণা
জনম তুমি।

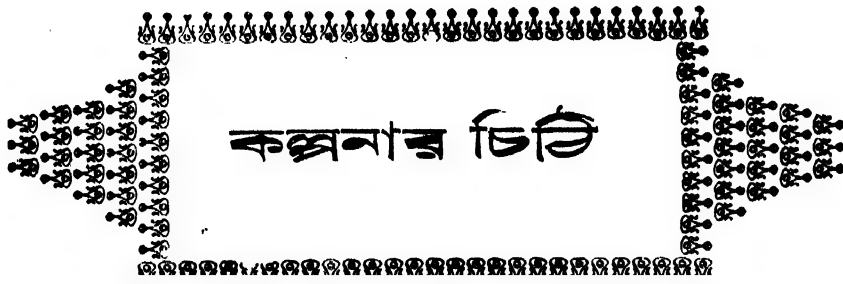
[গত শুক্রবার অপরাহ্নে আর্ধ্যাহ্ন ইন্সটিটিউশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ডিরেক্টর মাননীয় স্ত্রীর সন্মুখনাথ সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন নচিব নিয়োগ উপলক্ষে গ্রেট ইন্টার্ন হোটেলে প্রীতি-সন্মিলনে পঠিত। লঃ খেঃ]

কুমারী সন্ন্যাস বার

চট্টগ্রামে কুমারী লব্ধ রায় লজ্জিত জগতে ইতিমধ্যেই চর্চাজনক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন ঠেঠেকে, লজ্জিত সন্মেলনে এবং প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত বঙ্গীয় লজ্জিত সন্মেলনে তিনি তাঁহার



কুমারী লব্ধ রায়



স্নেহের বোন প্রতীমা—

তোমার বিয়ের রজনী চিঠি আজ আমাদের হাতে এসে পড়লো। তবু ভাল যে এতদিনে বিয়ের ফুল ফুটলো।

জীবনটা আজ তোমার চোখে নিশ্চয়ই স্বপ্নময়। নীল আকাশের মত শান্ত, সজ্জার রক্তমাংসের মত চকমক! কিন্তু বাস্তবে যদি স্বপ্নটা সত্য হয়, তবেই ত' জীবন মধুময় হয়।

কিন্তু, শুধু স্বপ্ন-বিলাসের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করা যায় না। সংসারের বৃহত্তম পরিধির মধ্যে, আমাদের ঘরোয়া জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন ও বিরোধের

স্বপ্নের সঙ্গীতের দ্বারা শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বিধান করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। কুমারী লক্ষ্মী রায় রেডিয়োতে ও নিউথিয়েটার-হিন্দুস্থান-রেকর্ডে গান দিয়া জনপ্রিয় হইয়াছেন। আমরা এই শিল্পীর আরো উন্নতি কামনা করি।

সঙ্গীত আসরে

“সঙ্গীত আসরে” দ্বাদশ মাসিক অনুষ্ঠান আলয়ের সভ্য শ্রীদীনেশ্বর নারায়ণ লিংহ মহাশয়ের ১৫নং কালীদাস লিংহ লেনস্থ বাটীতে হইয়া গিয়াছে। প্রথমে শ্রীনেশ্বর নাথ বস্তু মহাশয় উচ্চাঙ্গের অগচলিত রাগের খেয়াল ও টপ্পা গান করেন, পরে শ্রীবিজুতি বস্তু খেয়াল ও চুঁরী গানে উপস্থিত লভ্যরত্নকে তুষ্ট করেন। শ্রীরাধা-শ্রীম বস্তু ইহাঙ্গের সহিত সঙ্গত (তবলা) করেন।

অন্তরালে যে জীবন—সেই জীবনকে সহজ ভাবে গ্রহণ করার মধ্যেই আমাদের লক্ষ্যকতা। তুমি স্বকৃতি ও শিক্ষিত। জীবনের পথ বড় পিচ্ছিল। সেই পথে যাকে জীবন সঙ্গী কোরে তুমি আজ এগিয়ে যাবার জন্ত প্রস্তুত, আশাকরি তিনি তোমার অনুভূতের পথ-চলবার লাইন ও অবলম্বন হবেন।

আজ তোমার, এই নব-জীবনের সূতন পথে, যাত্রার প্রারম্ভে, আর একটি মেয়ের কথা কী মনে পড়ে?

সেই মেয়েটি, যার কথা আমরা দুজনে কতদিন নিভূতে আলোচনা কোরে গোপনে কত চোখের জল ফেলেছি।

অভাগিনী সন্ধ্যা—প্রিয়লাল চৌধুরীর গৃহ-বধু।

মনে পড়ে—সেই দুর্ঘটনা, যা' যে কোন নারীর জীবনে যখন তখন ঘটতে পারে—তার ফলে, স্বপ্তর তাকে ত্যাগ কোরেছিল এবং আজ বাপের বিধান অস্ত্রায় জেনেও তার মেরুদণ্ডহীন নির্বোধ পুত্র, বাপের বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে, জীকে সেই চরম দুর্দশার দিনে রক্ষণ কোরতে পারে নি?

মনে পড়ে—সজ্জার জীবন-নাট্যের সেই আকস্মিক পরিবর্তন?

স্বামীঠ যে জীলোকের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও অবলম্বন—সন্ধ্যা শেষ পর্যন্ত তা' মানতে পারে নি। কারণ স্বামীর স্বয়ং-হীনতাই তার বিশ্বাস ও নিষ্ঠাকে আলগা কোরে তুলেছিল।

মেয়েটি জীবনের পথে তুণের মত ভেদে চললো—কিন্তু শেষ পর্যন্ত অকুলে পড়ে নি। দুর্জয় লাইন ও অন্তরের অবিচলিত নিষ্ঠার, তার নারী-ধর্ম, নারীর দাম্পত্য, সম্পূর্ণ অটুট রেখে, সে তার জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ কোরেছিল।

অনুতপ্ত স্বামী একদিন তাকে গ্রহণ করবার জন্ত এগিয়ে এসেছিল সত্য। কিন্তু তার আত্মসম্মানে, তার অবহেলিত নারীত্বের গৌরবটুকু বিলজ্জন দিচ্ছে, সে কী আর স্বামীর অনুগমন কোরতে পেরেছিল।

তুমি আমি দুজনেই জানি, ঘটনাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। উপেন গাঙ্গুলীর বিখ্যাত উপজ্ঞান ‘অভিজ্ঞান’ থেকে ধার করা। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার অমিল কতটুকু? আমাদের লম্বাজে এমন ঘটনার সঙ্গে পরিচয় ত' নিতাই ঘটবে!

তুনে সুখী হবে, এই কাহিনীটি, যা আমরা বহুইয়ে পড়ে প্রচুর শাস্তি পেয়েছি—নিউ থিয়েটার তাকে টকী চিত্রাকারে রূপান্তরিত কোরেছেন।

এছাড়াই বেবদাস, তাগ্য-চক্র, মুক্তি বেধে আমরা তার কত তারিফ কোরেছি।

তোমার বিবাহ-অনুষ্ঠান লাজ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানি ‘রূপবাণী’-তে যেখানো সূক্ষ্ম হবে।

আমার অনুরোধ, অন্ততঃ একদিনের জন্তও তোমার জীবন সঙ্গীকে নিয়ে ছবিখানি লামনের সপ্তাহে রূপবাণী-তে গিয়ে দেখে আসবে।

লম্বাজের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের দ্বাবী সুনিয়ন্ত্রিত না হোলে আমাদের যে কল্যাণ নেই, এ কথাটি আজ প্রত্যেক বিবাহিত নর নারীর ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

তোমার ভাবী দাম্পত্য জীবন মধুময় হোক—আজ এই প্রার্থনাই করি। ইতি

তোমার বোন
কল্পনা



উ ত্ত রা

শ্যামবাজার • ফোন : বি, বি ২২০২

বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে
শনিবার, ১৮ই জুন মুক্তি-
দিবস ঘোষিত হইল।

হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্র

দেবী ফুল্ল রা

শ্রেষ্ঠাংশ : অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশুবালা
মনোরঞ্জন ভট্টা, সাবিত্রী, মোহন
রাম, রাধারাণী, তিনকড়ি চক্রবর্তী,
চিত্রা।

পরিচালক : তিনকড়ি চক্রবর্তী



(বিলাসী)

“বিজ্ঞাপতিঃ”

প্রাণম্পর্শী অভিনয় এবং চিত্রকার্যে নন্দীতের মধ্য দিয়ে, বাঙলার হাজার হাজার নর-নারীর অন্তর মগ্নিত করে, নিউ থিয়েটারের “বিজ্ঞাপতি”, এই শনিবার থেকে ‘চিত্রা’-র একাদশ সপ্তাহে পড়লো।

বিজ্ঞাপতির অগ্রগতি এখনও অনেকদিন ধরে সাবলীল থাকবে বোলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ ছবির মধ্যে লোকচিত্র-আকর্ষণ করবার উপযোগী বস্তু থাকলে, সংখ্যাধিক্যের জন্ত তার সমাধার কমে না। যে প্রেমের গান, ভারতের কাননে-কান্তারে,

গগনে-পবনে চির মুগ্ধিত—‘বিজ্ঞাপতি’-তে আছে সেই ভক্ত হৃদয়ের চিরধ্বনিত, অনুপম বাণী বিলাস।

সুতরাং নিউ থিয়েটারের এই অবিস্মরণীয় চিত্র-কথা ‘বিজ্ঞাপতি’, এখনও হাজার হাজার নর-নারীর অন্তরে আনন্দ বিতরণ করতে চিত্রার আসর যে অনেকদিন ধরে জ্বলিয়ে রাখতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

“অভিজ্ঞান”

স্বামীর আশ্রয়ে যে স্ত্রীর জীবনের এক-মাত্র অবলম্বন—এ বিশ্বাস লক্ষ্যার ভেঙ্গেছিল। যত্নের যেদিন তার অপরাধের বিচার না

করে লক্ষ্যাকে গৃহ থেকে বহিস্কৃত করে দেন, যেদিন সে প্রতিকার ও আশ্রয়ের আশায় তার স্বামী শরণাগত হয়েছিল। কিন্তু পিতার বিধান নিতান্ত অত্যন্ত জেনেও দে কৃতবীজ পুত্র, কেবল মাত্র পিতার বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে—স্বামীর কর্তব্য পালন করতে পারলে না।

লক্ষ্যার জীবনে তখন আর কোন্ অবলম্বন বাকি রইল?

জীবনে চলার পথে সে একটি লাধি পেয়েছিল লতিয়া। চরম দুর্দিনার দিনে সে যেন নিতান্তই দৈব প্রেরিত হয়ে এসেছিল লক্ষ্যাকে উদ্ধার করতে।

লাজনা ও অপমানের হাত থেকে লক্ষ্যাকে নিষ্কৃতি পেল বটে; কিন্তু এক অনাস্থ্যীয় পুরুষের সাহচর্যে, এত ঐশ্বর্য বিলাস ও সুখ-লাজনের মধ্যে বাস করেও, লাতিয়ার জীবনে এলো না। মন তার আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলে...

লক্ষ্যার জীবন নাটকের শেষ পরিণতি কোথায়—ছারা চিত্রের মধ্য দিয়ে তার



নিউ থিয়েটারের “অভিজ্ঞান” চিত্রে লক্ষ্যা অপহরণ দৃশ্য। ছবিখানা এই শনিবার থেকে রূপবাণীতে দেখান হবে।

পরিচয় পরিষ্কৃত হ'য়েচে। ছবিখানি এই শনিবার থেকে রূপবাণী-তে প্রদর্শিত হ'বে। আশাকরি কল্পনা-প্রবণ বাঙ্গালী মাঝেই এ ছবিখানি দেখে তৃপ্তি লাভ কোরবেন। নিউ থিয়েটারের নামজাড়া শিল্পীর হল, এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন। এদের মধ্যে মলিনা, মেনকা, শৈলেন চৌধুরি, ভানু বন্দ্যোঃ এবং পঙ্কজ মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্ট্রীট সিন্ডার

সেদিন ছিল রান্না ঘরের একটি ক্ষুদ্র লিন। মজুর রান্না ঘরে মজু বসে রাখতে। দিনের কাজ হিলাবে নিশ্চয়ই খুব অন্ন।

মজু অর্থাৎ শ্রীমতী কানন বসেন; রান্নাতেই যদি হয় আমাকে তো আমি ভাল করেই রাখব। লোককে খাওয়াতে শ্রীমতী কানন জোয়ান ক্র্যাফোর্ডের চেয়ে বেশী ভালবালেন। কাজেই ছবির জন্তে লতি-কারের রান্না ভাল ভাবেই প্রস্তুত হোল।

রান্না খুব ভালই হোল। যারা খেলেন তাঁরা সবাই বলেন: রূপসী কানন উত্তম রান্নাও বটে।

কঠিন নিরমনিষ্ঠ প্রবন্ধক প্রমোদ রায় পর্যন্ত এ রান্নার সুখ্যাতি না করে পারেন নি।

পরিচালক ফিলি মজুমদার ফ্রোরের ওপরের কাজ তিনি নিজেই লেতে নেন এর জন্তে তিনি কোন ফ্রোর ম্যানেজারের আবশ্রুক বোধ করেন না। নিজে হাতে সব করেন বলেই তাঁর সব জিনিষই হয় অতি নিখুঁত এবং অভ্যস্ত ভাল। এই জন্তেই তিনি মিঃ পি এন রায়ের অতি প্রিয় ব্যক্তি। অভ্যস্ত পরিশ্রম করে 'ভুল্লুর বাড়ী'র একটি দর্শক সন্মার সেট তিনি তৈরী করে দিয়ে-ছেন। সুটিং আরম্ভ হবে আজ কিবা কাল।

অধিকার

গত সপ্তাহে নায়ক নিখিলেশ-এর বোন রেবার রোগ শয্যার দৃশ্যগুলি তোলা হ'ল। এষ্ট খানেই বস্ত্রীর মেয়ে রাখা প্রথম নিখিলেশ ও টেন্ডারর সঙ্গে লাক্ষ্য করবার দোতাগ্য লাভ করলে।

গেল মঙ্গলবার শারারাত্র ধরে সুটিং চলেছিল। সেদিন যে দৃশ্য তোলা হ'ল তা সত্যই চমৎকার। ভীষণ বড় আদর লেই বড় বস্ত্রী ভেঙ্গে চুরে ছারখার হ'ল। 'প্রোপাইলেট'র এর সাহায্যে যে বড়ের আয়োজন হয়েছিল তা একমাত্র নিউ থিয়েটারের পক্ষেই সম্ভব।

দেশের মাটি

দেশের মাটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কয়েকটা সম্ভ্রান্ত 'রিটেক্' ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।

সম্পাদক সুবোধ বাবু—তাঁর সম্পাদনা গৃহে ফিল্ম এর বাঙালি নিয়ে কাজে লেগে-ছেন। সম্পাদনা কাজ নেহাৎ বাজে কাজ নয় তবে সুবোধ বাবুর ওপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে।

হাজরা পিকচার্স

এষ্ট শনিবার হাজরা পিকচার্সের "দেবী ফুল্লরা" 'উত্তর'-র সুক্তি পাবে বলে ঘোষিত হ'য়েছিল—কিন্তু বর্ষার জন্ত কলিকাতার বাইরে একটি জনতা-বৃষ্ণের কাজ শেষ না হওয়ায় ছবিখানির মুক্তিলাভে আরও এক সপ্তাহ বিলম্ব ঘটিল। বাঙালার জনসাধারণ "দেবী ফুল্লরা"-র সুক্তির জন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কোরছেন—তা' দেখে মনে হয় ছবিখানির ভবিষ্যৎ খুব ভাল। প্রেম-ভক্তি, কর্তব্য-নিষ্ঠার ভেতর দিয়ে যে কহিনীর পরিণতি ঘটেছে বাঙ্গালীর কাছে সে

আবেদন কোনদিকে অগ্রাহ্য হবার নয়। এতস্তির "দেবী ফুল্লরা"-র ধারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোরেছেন চিত্ররাজ্যে তাঁদের জনপ্রিয়তা কম নয়। তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনা, মধু শীলের বস্ত্রশিল্পের নির্দেশনা, তরুণ কর্ম্মীগণ বিতৃতি লাহা ও যতীন দস্তের যথাক্রমে আলোকচিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজে এবং আভিজাত্য লক্ষ্যধারের কলা-কুশলী নৃত্যশিল্পী বিতৃতি মজুমদার (ঃ) নৃত্য পরিচালনার বিশেষ পারদর্শিতা দেখাবেন বলেই মনে হয়। ছবিখানির ভূমিকা-লিপি বন্টনেও কর্তৃপক্ষের বুদ্ধি পরিক্ষা করা যায়।

ভূমিকা-লিপি এরূপ—

দেবী মহামায়া—সাবিত্রী

কালকেতু—অধীক্ষ চৌধুরী

ফুল্লরা—শিত্তবালা

ভাড়া বস্ত্র—মনোজ্ঞন ভট্টাচার্য্য

স্বরমা—রাধারাগী

সুবোধ—মোহন রায়

সুধমা—চিত্রা

দর্দার—চর্গা বস্ত্র

নর্তকী—রাণী চৌধুরী

দর্দার—তিনকড়ি চক্রবর্তী

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স

কালী ফিল্ম্ ট্রুডিংতে গৃহীত এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিখ্যাত উপন্যাস "চোখের বাসি"-র সুটিং মহুরগতিতে অথচ বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ মনীষীদের গল্প এতাবধি ছায়াপটে বিকৃত রূপেই আত্মপ্রকাশ কোরেছে। লেইজন্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্কতা নিয়ে ছবিখানির লাক্ষ্যের জন্ত বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন। এমন কী এরা রবীন্দ্রনাথের গান ও গল্প লম্বকে



ইন্দিবিম্যাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

যারা 'অথরিটি' তাঁদের হেড কোয়ার্টার থেকে আনিয়ে লক্ষপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। মোট কথা, আমরা যতদূর জানি তা'তে রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটিকে চিত্রে সুসমৃদ্ধ করে তোলায় জন্তু এরা চেষ্টার কছুর করেছেন না।

অভিনয়

গত লগ্নাহে শ্রীভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের "অভিনয়" চিত্রের থিয়েটার লবীর দৃশ্য তোলা হয়েছে। এই লেটুটোও শিল্পী সুধা'ন্ত চৌধুরীর সুন্দর কলাবোধের পরিচয় দেবে। অভিনয়সম্পন্ন থিয়েটার-লবীতে বিচিত্র নর-নারীর সমাবেশ দেখা গিয়েছিল। এই দৃশ্যে প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে থিয়েটার ম্যানেজার রূপে তুলসী লাহিড়ী, সহকারী লতা মুখার্জি এবং নায়ক যীরাজকে অভিনয় করতে হয়েছিল। এইবার থিয়েটার দৃশ্যের ঠেজের লেটু তৈরি আরম্ভ হয়েছে। ১০-১২ দিন পরে এই লেটে শূটিং আরম্ভ হবে।

এই লেট তৈরির মাঝখানে পরিচালক মহু বসু মনে করেছিলেন যে তাঁর সি-এ-পি হল নিয়ে বাইরে অভিনয় করতে যাবেন, কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি, বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে বলে তাঁর সে সব engagement cancel হয়ে গেছে।

এদের "কলেজ কন্ট্রা"র আর কোন খোঁজ খবর নেই। বোধহয় স্থল কলেজ খুললে নতুন করে Session আরম্ভ হবে। যামিনি বাবু কি বলেন?

স্বথের ধন

জ্যেষ্ঠ ইন্ডিরা কিম্বা কোম্পানির আংশিক কার্যভার আপাততঃ রাখা ফিল্মের কর্তৃপক্ষের উপর জ্ঞাত হইয়াছে। লেইজন্তু মতিমহলের নৃতন বাণীচিত্র "স্বথের ধন"-এর চিত্র ও শব্দগ্রহণ জ্যেষ্ঠ ইন্ডিরা কিম্বা ষ্টুডিওতে গৃহীত হইতেছে।

"স্বথের ধন" লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্র কুমার রায়ের লেখনিশ্রুত রহস্য জনক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী।

'বকার নাশন' এখন সম্পাদনা গৃহে। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় ও বাহারী চিত্রগ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই এ চিত্রের লক্ষণতা সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিত।

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় এখন "নরনারায়ণ" বা "পুরুষোত্তম"র কাজে ব্যস্ত। এর কাজ সাহায্যে দ্রুত গতিতে চলে লে ব্যস্ততা করা হইতেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি।

পরিচালক ফণী বর্মা দ্বন্দ্ববধ (দ্বি রাত) রাম (সুশীল রায়) ও লক্ষণ (পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়) সহ ঋষি বশিষ্ঠের (ধীরেন পাত্র) সহ গল্প লেখান হইতেছে।

পরামর্শের দৃশ্য তোলা শেষ করিয়াছেন। ক্রমপে বিশ্বামিত্রের কোপানল হইতে সুধা বংশ বংশ পায় তাহারই উপায় উদ্ভব এই পরামর্শের উদ্দেশ্য। অতি বৃষ্টির জন্তু রাম লক্ষণ ও বিশ্বামিত্রের (অহীজ চৌধুরী) লিখিত পরস্তরারের লাক্ষাতের বহির্দৃশ্য তুলিতে পারা যায় নাই। এ লগ্নাহে তাহাই তোলা হইবে।

অহীজ চৌধুরী

লক্ষপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীজ চৌধুরী রাখা ফিল্মে বাংলা ছবির পরিচালক রূপে যোগ দিয়াছেন। এতদিন কেবল মাত্রাজি ছবির পরিচালক রূপেই তিনি অল্প এক প্রতিষ্ঠানে লংগিষ্ট ছিলেন। অহীজ বাবুর নির্দেশ মত নিজের উপযুক্ত ভূমিকা- লহ গল্প লেখান হইতেছে।



সুখা ও নারী মোহ-মহিয়ার উন্নত কালেক্ট। "দেবী কুলরা"-র একটি বিশিষ্ট দৃশ্য চিত্রা, রাধারাণী ও অহীজ চৌধুরী।

৩০০শত দিবস পরে

মিঃ চিমনলাল দেশাই তাঁর টুডিওতে বলে আছেন, খুবই চিন্তামগ্ন এমন সময়ে এক ভক্তলোক এলে তাঁকে নমস্কার করে বলেন, আসতে পারি কি? মিঃ দেশাই খুবই লোভন্তু দেখিয়ে বলেন—নিশ্চয়, আসুন। তারপর উভয়ের ভেতর নানা বিষয়ের আলোচনা চলতে লাগল। ভক্তলোক কথার মাঝে হঠাৎ এক সময় বলেন,—আচ্ছা মিঃ দেশাই আপনি “৩০০ শত দিবস পর” ছবি খানার একটা নতুন জিনিষ দেখাবার চেষ্টা করেছেন সন্দেহ নেই—কিন্তু কখনও এর পরিণাম ভেবেছেন কী?

মিঃ দেশাই বলেন—“না, ছবিখানা তোলার সময় আমি শুধু একথাট ভেবেছি যে এ দেশের সিন্মা ব্যবসায় আমি নতুন এমন

ওরিয়েন্টাল কিনেন্টোন আর্টিস্

এছের “রূপোর ঝুঝকোর” পরিবেশনার স্বত পেয়েছে মতিমহল থিয়েটার। যাক্ এতদিন পর রূপোর ঝুঝকোর একটা চিত্রে হোল।

ইউ-ইণ্ডিয়া টুডিওতে এছের পৌরাণিক চিত্র—“একলব্য”র চিত্র গ্রহণ নাকি শীঘ্রই শুরু হবে। শোনাগেল নাস্তিকরূপে অবতীর্ণা হবেন—শ্রীমতী শীলা কান্দকার—ছবি খানি রূপোর ঝুঝকোর সঙ্গে মুক্তি লাভ করবে।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার থেকে “রাঙাঙ্গী” এখানে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়বে। প্রথম সপ্তাহের জনসমাগম দেখে মনে হয় যে এ ছবির ভবিষ্যৎ ভালই। কুমার শচীন দেব বর্মানের গান এ ছবির একটা প্রধান আকর্ষণ।

এক বিষয় উপস্থিত কর্ণ বা লোক হানি মুখেই গ্রহণ কর্ণে। ওছের দেশে—হলিউডে অলংঘ্য অপেরা ছবি তোলা হয়। নাচ ও গানের ছল্লোড় লেগেই আছে। প্রাণের খুলীতে ওছের জীবনটা যেন ঝক্ ঝক্ করছে। প্রাণ ভরে ওরা হাঁসতে জানে, কিন্তু আশাহের দেশের কথা স্মৃত্ত। অতাবের তাড়নায়, হারিসের কথামতো জীবন হয়ে ওঠে দুর্ভিক্ষহ। প্রাণকে পজু করে ফেলা হয় দুঃশ্চিন্তার করাল গ্রাসে। বেচে থাকাই যেন একটা বিড়ম্বনা। তাই এ ছবিতে আমি হানির খোঁরাক ঘোগোতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। কিন্তু জীবনে যেমন একটানা হানির শ্রোত কখনও থাকেনা তেমনি যেটা লতা চোখের জলের ভেতর তাও দেখিয়েছি।

মিঃ দেশাইয়ের উপরোক্ত কথার নিশ্চয়ই আনাহের ধরনা হয়েছে “৩০০ শত দিবস পর” ছবিখানা কিরূপ হবে। বিভিন্ন ভূমিকায় সবিতা দেবী, মতিলাল বিবু, প্রভৃতি রয়েছেন। ছবিখানা শীঘ্রই প্রভাত সিনেমায় দেখান হবে।

ভাষাচিত্র জগতে সবিতা দেবীর নাম খুবই পরিচিত। কিন্তু এ ছবিতে তার অভিনয় তার পূর্ন প্রতিভাকেও ক্ষুন্ন করেছে বলতে হবে। আবহাওয়ার পরিনতির সঙ্গে সম্মান ভালে পা রেখে তিনি যে ভাবে এ ছবিতে অভিনয় করেছেন তা হয়েছে অনবদ্য, অপূর্ণ।

নৃত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা

সঙ্গীত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু নৃত্য তাকে করে প্রাণবন্ত নৃত্য জীবনকে মুক্ত করে তোলে। নৃত্য এনে দেয় কর্মে প্রেরণা এবং জীবনের চুলার পথকে নৃত্য করে

লীলায়িত। এই নৃত্যকে বিনি নির্মূল-ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত শিল্পী, প্রকৃত গুণী। নচেৎ নৃত্যের কোনই মূল্য থাকে না এবং তা হয় সম্পূর্ণ অর্থহীন।

মন্দিরের নৃত্যরত্ন দেবদালীকে রাজা বলপূর্বক নিয়ে এলেন নিজের প্রাসাদে। কামনার যে অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে দেবদালীর স্পর্শে তা নিক্রাপিত হবে। কিন্তু মন্দিরের পুজারিণী, দেবতার উদ্দেশ্যে সে উৎসর্গীকৃত, মর্তের মানবের সঙ্গে তার প্রেম যেমন করে সম্ভব। রাজা বলেন দেবদালী তুমি আমার হও, আমি চিরদিন তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব। মন্দিরে তুমি যে নৃত্য কর আমার প্রাসাদও আজ তোমার ঐ অলঙ্কৃত রঞ্জিত পাদ, স্পর্শে ধস্ত হউক। দেবদালী তুমি নৃত্য কর। দেবদালীর প্রাণে তখন রক্ত জেগে উঠল। লগ্না সৃষ্টি বুঝি আজ ধ্বংস হবে।

দেবদালীর ভূমিকায় এনাঙ্কী রামা রাও এই নৃত্যের পরিকল্পনাটি অতি চমৎকার ভাবে ফুটিয়া তুলেছেন। ছবিখানার নাম ‘হিমালয় কী বেটী’ অথবা ‘অমর প্রেম’—প্রভাত সিনেমায় শীঘ্রই দেখান হবে।

গুল বকাওলী

স্বপ্নে অনেককেই অদ্ভুত অবস্থার উপনীত হন। কেউ বা রাজা হন, কেউ বা এমন এক দেশে চলে যান যেখানে চুংখ বৈজ্ঞ বলে কোন কিছুই উল্লেখই থাকে না। এ রকম এক স্বপ্নের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হকিং ভারতে “গুল বকাওলী” উপকথার সৃষ্টি হয়। প্যারামাউন্ট ইণ্ডিয়ান লিবাটি এই কথাকে চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন। ছবিখানা আসছে রবিবার বেলা ১১টায় প্রভাত সিনেমায় দেখান হইবে, এই তেলগু ছবিখানা ইতি মধ্যেই বহু স্থানে খুবই আদৃত হয়েছে।

সংস্কার

শ্রীমদ্বিষ্ণু চন্দ্র সেনগুপ্ত

ছোট্ট একটি পানের হোকানের পেছনে তবুসুপ শোবার একটি মাত্র ঘর। ছুটি প্রাণীর শোবার মত একটি তক্তপোষও আছে। তক্তপোষের ওপরে শতচ্ছিন্ন মনিন একটি বিছানা। বিছানার ত্তরে কঙ্কালসার রোগগ্লিষ্ট একজন প্রৌঢ় কিন্তু অচেনা লোক তাকে বৃদ্ধই বলবে এমনি তার চেহারা।

লংলারে মাত্র ছুটি প্রাণী সে আর তার ছেলে। ঐ পানের হোকানে ছন্ননের বেশ চলে যেত। কিন্তু ম্যালেরিয়া তাকে এমনি-ভাবে আক্রমণ করে বসল যে হোকান করা ত দূরের কথা উঠে বসবার মত ক্ষমতাও ক্রমে সে হারিয়ে ফেলল।

চলেচলির বরল মাত্র বার বছর। তার ভাবনাই সেবানন্দ্রের মনটিকে অস্থির করে তুললো। সে ত পরশারের বাড়ীই, মরবার তর বা ভাবনা তার নেই।

“তুপু!”

“বাবা!”

ভগবান পিতার নিকট এলে দাঁড়াল।

জায়গীরদার

সাগর’ বুদ্ধিটোনের হিন্দি চিত্র “জায়গীরদার” আসছে শনিবার থেকে প্রভাত দিনেবার ৭ম লপ্তাহে পড়বে। এতে ছবি-খানির জনপ্রিয়তা যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই বুঝা যাচ্ছে। মারা ব্যানার্জির গান মন্ডিলাল ও অরেন্দ্রনাথের অভিনয় মিস্ বিস্ময়র ভাবাভিব্যক্তি ও এড্‌ভানির হাত কৌতুক প্রভৃতিতে ছাবিখানা চেজামোদী মাজেরই ভাল লাগবে।

“এক টুকরা লাছ। কাগজ ও একটি লাছ। লেকাফা বোগাড় করে নিয়ে এসত বাবা।

বালক চলে গেল।

সেবানন্দ বৃদ্ধিতে পেরেছিল যে তার আর ছেরী নেই। চিরতরে চোখ বুজবার পূর্বে ভগবানকে ডেকে তার হাতে খামে বন্ধ চিঠিখানা দিয়ে বললো—“আমার আর ছেরী নেই বাবা, মারা বাঙরার পর শিরোনামা ছেখে চলে সেও হস্ত ঠাই ছিলবে—”

ভগবান পিতার বৃকে বৃথ লুকিয়ে কৈছে উঠলো। সেবানন্দ্রের চোখও জলে তরে উঠল। কিন্তু ইহা যে বিধাতার সৃষ্টি রহস্য। মাত্র তের বছর পূর্বেও ছিল এই সেবানন্দ্র মহাপ্রখী। বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না কোনকালেই। রূপে, গুণে, বিজ্ঞার সে কারো কম ছিল না। মনিব জমিধারের নজরে পড়ে গেল। জমিধার করল তাকে একমাত্র কত্রার গৃহ শিক্ষক।

বৃক ও কিশোরী। বাক্তবতা স্পষ্ট হতে কবিনইবা লাগে! কমাণ চলে গেল যেথতে না যেথতে। হঠাৎ সেবানন্দ্র সূর্যর পাঞ্জাব হতে ভাল একটি চাকুরীর খবর পেল। আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রচুর মনে। পেটের লংস্থান হলোই কামনার কামনা করতে পারে নির্ভরে। অনীম উৎসাহে কামনাকে আশ্বাস দিয়ে চলে গেল সূর্যর প্রদেপে।

বিধাতার বিচিত্র বিধান। পাঞ্জাবে পৌছেই সেবানন্দ্র পড়লো অরে। ছনিয়ার আপনার বলতে কেউ ত্রার নেই বটে, কিন্তু দেশে থাকলে ছিল বাক্তব—ছিল মনিব ছিল কামনা। কিন্তু বিবেশে.....।

অর নয় যেন লাক্ষাৎ বম। আক্রান্ত হওয়ার খণ্টা তিনেক পরেই সে জান হারিয়ে

ফেলেছিল। সে চক্রিণ খণ্টা পরে তাকেই ফিরে পেয়ে চারদিকে তাকিয়েই বৃদ্ধে যে সে হাঁদপাতালে।

কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছাও তার হল না। শুধু ভাবতে লাগলো কেমন করে এল সে হাঁদপাতালে। তারপর অনেক কথা। নানান দুর্ঘোণের ভিতর দিয়ে চার মাল কেটে গেল। একটু সূহ হয়ে ডাক্তারের নির্দেশ মত ফিরে এল ঘরে স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আশায়। গাঁয়ে পা দিয়েই জানতে পারলো যে কামনারা হাওয়া বহলাতে যাচ্ছে। কামনার সাথে দেখা করতে যেতেই লাক্ষাৎ হল মনিবের সাথে। মনিব তাকে গোপনে ডেকে রীতি-মত শাসিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিলেন। মনিবের আচরণে প্রথমে বিস্মিত হলেও অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তার সময় লাগলো না। বৃদ্ধে ছনিয়ার পাণ ঢাকা থাকে না সে মত গোপনেই অনুষ্ঠিত হ’ক না কেন। অনীম বেহনার মন ভরে উঠল। কলঙ্ক, ঘৃণা, লজ্জা ও অপমান মাথা পেতে নিয়ে সেবানন্দ্র বললো—“কামনাকে আমার হাতে—”

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড, কোন : সাউথ ৩৪

শনিবার, ১১ই জুন হইতে

কমলা টকীজের

সমস্তাশুলক সামাজিক
কথা-চিত্র!

রাজগী

দ্বিতীয় সপ্তাহ

ভূমিকায় : মেনকা, ধীরাজ, অরুণা, সত্য
মুখোঃ, কুমার শচীন দেববর্ধন
ও ভবানী দাস

চাপা গর্জনে মনিব বললেন—“চুপ।
নিশ্চয়ই গ্রাম পরিভ্রমণ করে চলে বাও
অপহার্য চরিত্রহীন।”

ভীকু একটি জবাব ঠোঠের কাছে এনে
থেকে গেল। শুধু কামনার ভবিষ্যৎ চিন্তা
করেই অবশ্যই মস্তকে সেবানন্দ তখনকার
মত ধীরে ধীরে চলে গেল। কিন্তু চতুর
মনিবের লজ পে ছাড়ল না। সেও চললো
বিবেশে তারার মত তারের পেছন পেছন
পাণের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

যথা সময়ে কামনার গর্ভজাত সন্তান
কালীর রাস্তা হতে কুড়িয়ে এনে সেবানন্দ
বঙ্গের কোন এক অধ্যাত নামা পল্লিতে
সংসার পেতে বললো। উপার্জুন পানের
দোকানে—সংসার ধর্মপালন ‘ভগবান’কে
বুকে নিয়ে—এই হল তার ত্রুত। এ সুখও

তার কপালগুণে বেশী দিন রইল না।
হাকরণ ম্যালেরিয়া দ্বিদের পর দিন ভিলে
ভিলে তাকে মৃত্যুর কোলে টেনে নিয়ে
চললো। সেই নাহোর কোলে মাথা রেখে
হিয়ে গেল তার বড় আঁহরের তত্ত্বকে
“খামখামা।”

২

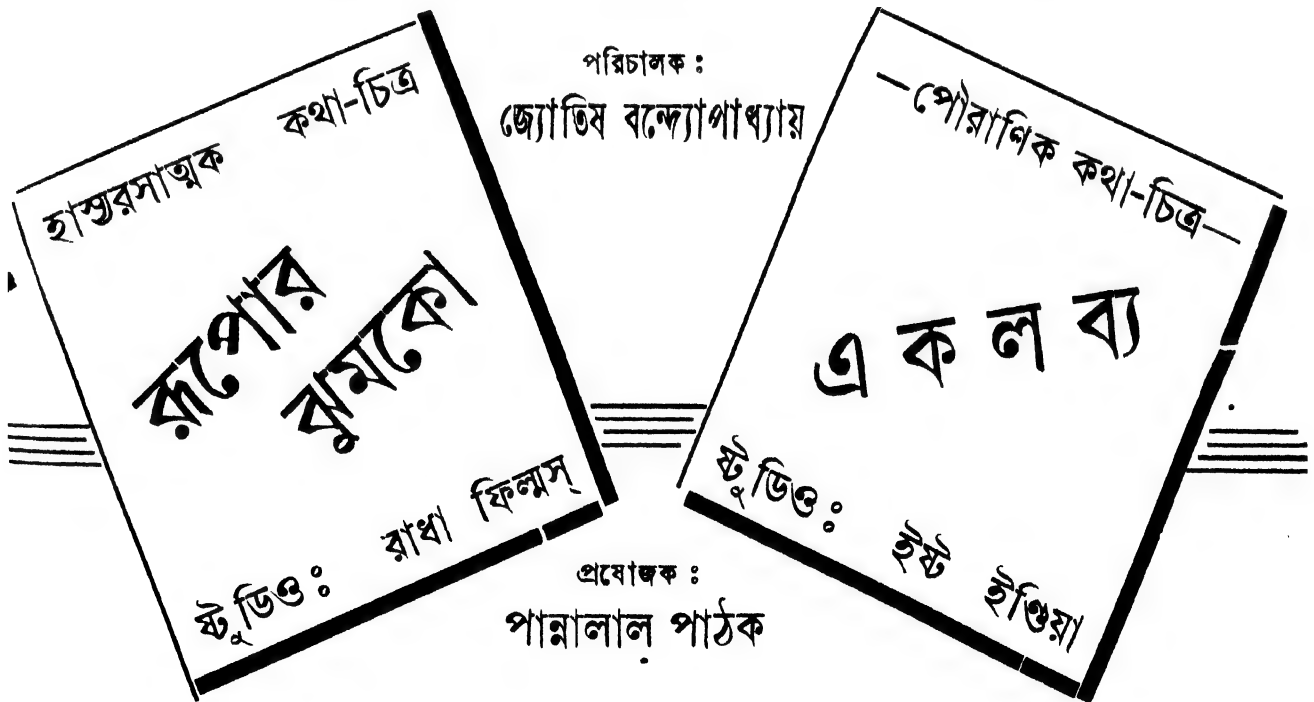
কলকাতার বৃক্কে জনাকীর্ণ পাথর মাঝে
ভগবান নির্ঝাঁক নিলুন্দ। বার বছরের
কোলে হুনিয়ার বৃক্কে এমন কেউ তার নেই
যে এক মুঠো ভাত ও দুধের কথা একটু
মাগার ও পিঠে হাত বুলিয়ে আঁহর করে।
চোখের জল শুধিয়েছে চোখের কোণে
বিশ্ব সংসারের কেউ ত মুছিয়ে দেয়নি।
তাঁই বড় আশা বৃক্কে নিয়ে খামখামা। লম্বা
কাপড়ের বুটে বেঁধে পেটের কাছে স্ত্রীকে

পথ চলে চলে এনে পৌঁছবে কলকাতার
বহি কার বেধা পার। বাবা ত তার
বলেছেন “হরত বা ঠাঁই মিলবে।”

টাকে ছিল লম্বা উত্তরাধিকারী শূক্রে
প্রাপ্ত আটগুণা পরল। কুখার আঁহার
অস্থির হয়ে এক পঙ্গুদার মুড়ি খেয়ে রাস্তার
কল থেকে পেট তরে জল খেয়ে নিল।
তারপর একটি পথিককে জিজ্ঞেস করে
আবার চলতে লাগলো।

হঠাৎ বাঁ পাশ দিয়ে একটি প্রকাণ্ড বাস
লো করে চলে গেল। ভগবান ভয়ে হোঁড়ে
দিয়ে লরে যেতেই একটি কলার খোঁসার
পা পড়ায় পড়লো পিছলে ফুটপাথের
ওপর। মাত্র একটি শব্দ শোনা গেল—
উঃ—“দুর্ঘটনা দেখে লোকজন ভয়ে গেল
বটে কিন্তু প্রথমে কেউ তেমন লাজাতিক

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টসের প্রথম অবদান



পরিবেশক : মতিমহল প্রিন্টার্স লিমিটেড

মনে করলো না। কিন্তু অচিরেই লমবেত জনতার বিশ্বাস হল যে ছেলেটা সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কলের জলের খাপসার জ্ঞান লকায়ের চেষ্টা সফলকাম না হওয়ার লবাই ছিলে ভগবানকে হাঁপপাতালে নিয়ে চললো বহিবা ছেলেটাকে বাঁচান যায়।

৩

“মনতু, তুমি ভয়ানক ছুই, হয়েছ। যাও পড়তে যাও, মাষ্টার এসে বলে রয়েছে।”—বলতে বলতে এক স্ত্রী বিধবা এসে মনতুর কাছে দাঁড়াল। এমন লম্বা বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য সরকারী শ্রামদা দেখানে এসে বললো—“এই নাও মা। একজন লোক এই চিঠিখানা নিয়ে এসে বলছে তোমাকে একুনি হাঁপপাতালে যেতে। এই চিঠির মালিক একটা ছেলে নাকি দেখানে মাথার আঘাত লাগায় মৃত্যুশয্যা।

মলিন হুমরান লেফাফাখানার উপর তার নাম বেখে ও শ্রামদার কথা শুনে কামনা বিস্মিত হল। পত্র খুলে মনে মনে পড়তে লাগলো।

—তোমাকে নাম ধরে ডাকবার বা লেখাধন করবার অধিকার আমার আর নেই। কাজেই লেখাধনহীন চিঠিই আমাকে লিখতে হলো। তোমার বাবার কাছে অজ্ঞান স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলুম ও তোমাকেও চেয়েছিলুম। কিন্তু তোমার পিতা আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন—জানি না তুমি এলব জানি কিনা। আজ আমি মৃত্যুশয্যা, তোমার প্রথম স্ত্রী আমার লম্বুখে মিথ্যা কি সত্য কি ভাবে

কোথায় ছিলুম, সে লম্বা কথা লিখিতারে না বললেও এরূপ লম্বা মিথ্যা যে বলবনা এ কথা দিনের আলোর মত সত্যি। পাজাব হাঁপপাতালে খোঁজ করলেই লিখিতার খবর পাবে। বাক্য বিভাঙ্কিত হয়ে ভাবলুম প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু কিতাবে তা কোনও রকমেই স্থির করতে পারছিলাম না। হঠাৎ কে যেন কানে কানে বলে দিল—“তোমার এ সন্তানের স্থান কি পথের ধূলোয়? তুমি তার জনক হয়ে নিম্পাপ শিশুকে অবহেলা করবে তাতে যে আরও পাপ হবে। তার চেয়ে ওকে পালন করে ছুনিয়ার বুকে মাস্থ্য করে ছেড়ে দাও।” চোখ খুলে গেল, কর্তব্য জ্ঞান হল, দিবাজ্ঞান পেয়ে তোমাদের পেছনে পেছনে ঘুরে ভগ্নকে কুড়িয়ে পেলুম কালীর এক অখ্যাতনামা গলির বুক। বুক করে মাস্থ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম সেদিন থেকে কিন্তু লাধ মিটলো না। অলমাপ্ত কর্তব্য রেখেই যেতে হচ্ছে, কারণ বেশ বুঝতে পাচ্ছি মরণ ঘণিয়ে এসেছে। তাই চোখের আলো নিভে যেতে না যেতে ছুলাইন লিখে থামে বন্ধ করে দিলুম আমাদের ছেলে ভগ্নর হাতে। যদি কোন ছেলে এ পত্রের বাহক হয়ে যায় বেখেই চিন্তে পাববে যে, সে কে? তারপর যা তোমার অভিযুক্তি। মাংসের আঘর পারিনি সে, অখচ নিরপরাধ—। তোমার কর্তব্য তোমার কাছে—যা হয় করো, আমি—।

কামনার মনে হ’ল যেন কে তাহার বুকখানার ভিতর অনবরত কি দিয়ে যা দিচ্ছে। চোখ দুটির জল ত দুই কণা লম্বু রক্ত যেন এক নিমিষে কোথায় অস্তিত্ব হয়ে গেল।

কতকাল—কতদিন পরে.....।

কালীর সেই মহাহৃদয়ের পরেই বেহ লবল হতে না হতেই পিতা বিয়ে দিয়ে দিলেন মাস্থ্য করে বড় করে। কলক রটেনি সূচতুরা মাতার চাকুর্যে কর্তব্য পিতার কার্যপদ্ধতিতে। লেবানন্দ ও অপমান হলম করেই নিকৃৎশের পথে চলে গেছে। কাজেই বেশ নিশ্চিত মনে সূখেই বিন কেটে যাচ্ছিল। মনতুর জন্মের পাঁচ বছর পরেই সে হল বিধবা। সেই মনতু এখন ন’বছরের ছেলে। চলমান লংসার কি চমৎকার। আবার ঘুরে এল বিশ্বস্তির কোলে চাপা বেগু প্রথম জীবনের প্রথম প্রতীক ঠিক হল বছর পরে। এ যে বড় কঠিন লম্বা—অভাবনীর ভয়ঙ্কর পরীক্ষা! উপায়! কিন্তু ছেলেটার ত কোনও অপরাধ নেই! লম্বানের চেয়ে লম্বা বড় হল! চোখ দুটা জলে ভরে উঠলো কিন্তু কামনার চোখের জল চোখেই চেপে রাখলো। ধরা গলায় বললে “শ্রাম, গাড়ী বার করতে বল হাঁপপাতালে যেতে হবে, দেখানে—”

“দেখানে কে মা!”

“একটা ছেলে—” বলে ধীরে ধীরে ভিতরে চলে গেল। তবু, যদি শ্রাম আরও কোন প্রশ্ন করে বলে “

দশ মাস দশদিন গর্ভে ধরেছিল বলেই পারলে না তাকে অবহেলা করতে কিন্তু সত্যিকার পরিচয় দিতেও তার লংসারে বাঁধলো। তাই অচিরেই দেখা গেল লেবানন্দের চিঠিখানা রান্নাঘরের উনোনের আগুনে দগ দগ করে জলে উঠতে। ছাই চাপা দিল ভগ্নর জন্ম বৃত্তান্ত কিন্তু কামনার বুকের মাঝে তাই বেঁচে রইল মৃত্যুর মত ভয়াবহ হয়ে।



ইন্দিবিমাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—সাত—

অমলের পিতা মহীতোষ শাস্ত্রী লোক-কালের লোক ঠিক একথা বলা যায় না। কলিকাতার শেয়ারের কার্য্য করিয়া তিনি দেশে বিলক্ষণ জমিজমা কিনিয়াছিলেন এবং ভবানীপুরে বালাবাটীও নির্মাণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার দুইটা পুত্র, একটা ছোট আদালতের উকীল, নাম কমল শাস্ত্রী, অন্যটা সাহিত্যিক, নাম পাঠকর্গ পুকেট অঙ্গত আছেন। মহীতোষবাবু অত্যন্ত রক্ষা-করুণের লোক। অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার টাকা ব্যয় দেওয়া কারবার ছিল একত্র অনেক কাতকটী তাঁহার নাম লকালে উঠিয়া করিত না এবং তাঁহার নাম স্মরণ করিলে নানাবিধ অনর্থ হইয়া থাকে। একদা প্রচারও করিত। মহীতোষবাবু পুত্র দুইটির বিবাহে বিলক্ষণ উপার্জন করিবেন বহুদিন হইতেই একদা ইচ্ছা পোষণ করিতেন এবং প্রায়ই বন্ধুবান্ধবদের নিকট বলিতেন, কমল অমল তো শুধু আমার ছেলে নয়, ওরা দুটো জমিদারী। কমলের বিবাহে তিনি আশাশুভকর অর্থ পাইয়া একটা হিপোপোটেমালের জায় সুন্দরী ও সুঠু বধু ঘরে আনিয়াছিলেন এবং অমলের জন্ম পাত্রী নিকট চেনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

লেদিন লক্ষ্যায় যখন অরুণ মহীতোষ বাবুর নিকট বিবাহ লক্ষ্য লইয়া উপস্থিত হইল তখন মহীতোষ নরকপ্রাণেই জিজ্ঞাসা করিলেন কণার জন্ম অরুণ কতটা খরচ করিতে পারে। অরুণ উত্তরে বিণীতভাবে নিবেদন করিল, “দেখুন, শাস্ত্রী মহাশয়, ওরা অত্যন্ত গরীব, আপনার বলতে যেরকম

কেউ নেই। ভাই মৃত্যুকালে হাজার দুই টাকা মাত্র রাখিয়া গিয়াছিল সেই টাকার উপর আমি বড়জোর একহাজার খরচ করিতে পারি।”

ক্রুদ্ধ শাস্ত্রী বলিলেন, “এই তিন-হাজার টাকার বাজী ধরে অমলের মত গ্রাজুয়েট সাহিত্যিক ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা কইতে তোমার বজ্জা হওয়া উচিত ছিল অরুণ। আজকাল ম্যাট্রিমনিয়াম ছেলের দাম পাঁচ-হাজার টাকা, তা জান?”

“আজ্ঞে, আপনি যে ছেলে নিক্রিয় বাৎসরিক শুরু করেছেন তা আমার জানা ছিল না, শাস্ত্রী মহাশয়। আজ্ঞা আরও ন’ পাঁচেক আমি দিতে পারি, আপনি দয়া করে মেয়েটাকে আপনার ঘরে স্থান দিন এই আমার অনুরোধ।”

গম্ভীর কণ্ঠে শাস্ত্রী উত্তর করিলেন, “তোমার অনুরোধ রাখতে গিয়ে তো আমি অমলের ভবিষ্যতটা নষ্ট করতে পারবো না বাপু। কোথাকার কে, চাল নেই চুলো নেই, একটা উল্লেখযোগ্য পরিচয় নেই, উপযুক্ত পাওনা নেই; এমন একটা মেয়েকে ঘরে আনবার জন্ম অনুরোধ করাটা একটা হুঁতু—লেখাপড়া জানা ছেলে তুমি তোমার জানা উচিত ছিল।”

অরুণ পুনরায় বিনতির কণ্ঠে বলিল, “দেখুন, মেয়েটা সুন্দরী, দেখলে আপনার পছন্দ হবে।”

অত্যন্ত বিরক্তভাবে মহীতোষবাবু বলিলেন, রেখে যাও তোমার সুন্দরী। সুন্দরী নিয়ে কি হয়ে থাকবে? আর এতই যদি সুন্দরী তো তুমি নিজেই তাকে বিয়ে করনা

বাপু—হিন্দু শরীতে তো দুটো তিনটে বিয়ে চলে। তাতে সুন্দরীটা আর টাকাগুলো তোমার বাড়ীতেই থাকবে।”

উত্তেজিত হইয়া অরুণ বলিল, “দুটো তিন-টে বিয়ে আপনাদের মত হিন্দুরই লাজে। আমাদের লাজে না। আমরা—অহিন্দু কিনা তাই দ্ব্যর্থার্থ এখনও পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে পারিনি শাস্ত্রী মহাশয়। আপনি টাকার বোঝা না পেলে বিয়ে দেবেন না, ভাল, তাই-ই স্পষ্ট করে বলুন, এত উদ্দেশ্য না দিলেও চলতো।”

—“বড় বাচাল তুমি কে অরুণ। হেঁথ আমি তোমার খাতক নই যে মেজাজ দেখাচ্ছি। ওই সামনে দরজা আছে ভাল চাও তো পেরিয়ে যান।”—বলিয়া মহীতোষবাবু ঘরটার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া দিলেন।

ক্রোধে ও অপমানে অরুণের লক্ষ্যশীল কাঁপিতেছিল। সে ক্রোধ দমন করিয়া ধীরপদে বাটার বাহিরে আসিল ও আপনার গাড়ীতে উঠিয়া আপনার গৃহে ফিরিল। সাগ্রহে শুভ্রা জিজ্ঞাসা করিল, “গিয়েছিলে অমলের বাড়ী, সব ঠিক করে এলে তো?”

“অমলের সঙ্গে কণার বিয়ে হবে না।” বলিয়া ধপ করিয়া অরুণ চেয়ারে বসিয়া পড়িল ও টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

বাপার কি বৃত্তিতে না পারিয়া শুভ্রা পুনরায় বলিল, “কেন গো, কি হয়েছে?”

“এখানে তো আমি বলতে পারবো না শুনে চাও তো আমার সঙ্গে গাড়ীতে এস।”

কিছুক্ষণ পরে অরুণ ও শুভ্রা বাহ্যস্থাপ দেখিতে যাইবার চল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

—আট—

কণা, অরুণের সহিত শুভ্রার কথাবার্তা দূরে থাকিয়া শুনিয়াছিল। সে বৃষ্টি অমলের পিতার লিখিত অরুণের যে কথা-বার্তা হইয়াছিল তাহা মোটেই আশাশ্রম

নয়। অমলের সহিত তাহার বিবাহ হইবে না। একথাও অরুণ শুভ্রাকে বলিয়াছিল। অথচ এদিকে অরুণ লম্বন্ধে শুভ্রা তাহাকে লম্বন্ধ করিতে সুরু করিয়াছে। অধিকদিন তার এখানে থাকা ঠিক নয় কণা তাহা বুদ্ধিত। তবে সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, এই বিশাল পৃথিবীতে জগদীশ্বর তাহার মাথা শুভ্রিবার স্থানও রাখেন নাই। সে নিরাশ্রয়, অবলম্বনহীন, তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। ইহারা অমুগ্রহ করিয়া আশ্রয় দিবেছেন তাই সে বাঁচিয়া আছে। নতুবা হয় তাহাকে আত্মহত্যা করিতে হইত নয়তো অনাহারে মরিতে হইত। সে তাহার ভাতা আলোচনা করিতে বলিল—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতা চিরবিদায় লইয়াছেন। চার বৎসর বয়সে তাহার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। লংলারের একমাত্র অবলম্বন অসীম স্নেহশীল ভ্রাতাও তিনমাস পূর্বে তাহাকে ফেলিয়া অমরাবতীতে আশ্রয় লইয়াছেন। এ পৃথিবীতে আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই! সে শুধু একা—নিভান্ত নিঃসঙ্গ ও অবলম্বনহীন। সে ভাবিল তাহার মরায় উচিত। কারণ ভগবান এক রূপ ভিন্ন তাহাকে আর কিছুই দেন নাই; বয়স তাহার বাহা কিছু ছিল তাহাও কাড়িয়া লইয়াছেন। এই হতভাগ্য জীবনটাকে বহন করা যে কত কষ্টকর কণা তাহা মর্মে মর্মে বুদ্ধিতে পারে কিন্তু তথাপি সে অরুণকে দেখিবার লোভ লংবরণ করিতে পারে না। এই প্রলোভন যে তাহার পক্ষে অস্ত্রায় তাহাও সে বুদ্ধিগা ছিল। আজ তিনমাস বাবু আপনার মনের সহিত বুদ্ধ করিয়াছিল এবং বারংবার পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। শুধু দেখা মাত্র—চোখের দেখা—এই দেখিবার আশা সে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

আজ কণা স্থির করিল সে পালাইয়া যাইবে। এমন কোথাও পালাইয়া যাইবে যেখানে হইতে চেষ্টা করিয়াও সে অরুণকে দেখিতে পাইবে না। শুভ্রার জীবনে কষ্টকল্পরূপ হইয়া সে আর এ বাটীতে থাকিতে চাহে না।

তাহার এই চিন্তাশ্রোতে বাধা দিয়া অমল ডাকিল, “কণা।”

কণা চমকিত হইল, দেখিল তাহার লম্বুখে দাঁড়াইয়া অমল তাহাকে ডাকিতেছে। কণা উদ্ভীয়া দাঁড়াইল; অত্যন্ত ভীত হইয়া সে বলিল, “ওরা সব বেরিয়ে গেছেন। আপনি বাড়ী যান অমলবাবু।”

আবেগের আতিশয্যে অমলের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল সে অক্ষুট কণ্ঠে বলিল, “তা আমি জানি কণা।”

“জেনেও আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন?—ভাল করেন নি অমল বাবু—আপনি বাড়ী যান।

অমল বলিল, “আজ তোমার হাতে আমার জীবন মরণ নির্ভর করছে কণা, তুমি আমার সঙ্গে কর।

কণা বিস্ময়িত নেত্রে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমল পূর্ণরায় বলিতে লাগিল, “তুমি শুনেছ বোধ হয় কণা, তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার বাবা মোটেই রাজী নন। কিন্তু আমি তোমায় না পেলে কিছুতেই বাঁচব না। আমার লম্বু জীবন বিফল হয়ে যাবে।”

সব শুনিয়া কণা বলিল, “দেখুন অমল-বাবু, আপনার পিতামাতার সম্মুখে আমার বিয়ে করা কিছুতেই উচিত নয়; আর আমার মত ভিত্তিহীন ওরফে আশা করাই বুধা। আপনি আর কোন কথা বলিবেন না অমলবাবু, আপনি বাড়ী যান। অমল পকেট হইতে একটি কাগজের পুরিয়া বাহির করিল ও কণাকে বলিল, “দেখ

কণা আমার কাছে এই তীব্র বিষ আছে; এর নাম পোট্যানিয়াম লাইনায়ড এ খেলে এখুনি আমার মৃত্যু হবে। তুমি যদি আমার কথায় রাজী না হও তাহলে আমি এই বিষ খেয়ে তোমার সামনে আমি আত্মহত্যা করব। আমি মান, লজ্জা, টাকা, পয়সা, সমাজ কিছু চাই না; আমি তোমায় ধর্ম্মমতে বিবাহ করে মৃত্যু করে জীবন গড়তে চাই। বল কণা তাতে তুমি রাজী আছ কিনা?”

কণা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ার মত কণকাল দাঁড়াইয়া রহিল পরে বলিল, “আপনি লভ্য বলছেন অমলবাবু আমার ধর্ম্মমতে বিবাহ করবেন! তা যদি করেন তাতে আমি রাজী আছি। আমিও আর এমন করে বেঁচে থাকতে পারছি না।”

অমল আর কোন কথা না বলে কণার হাত ধরে বাটের বাহির হইয়া আসিল ও বলিল, “চল কণা, একুনি চলে যাই আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।” কণা বলিল, “আপনি এতদূর বলে যাবেন না?” অমল বলিল, “না, অরুণ ও বৌদি তাতে রাজি হবেন না। আজই আমরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাব।” কণা মস্তমুগ্ধের ভায়ে অমলের সহিত গাড়ীতে বলিল। মার্কেটে গিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অমল কিনিয়া লইল পরে উভয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিল।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া দিয়া অমল কণাকে লইয়া একটি লেক্সে ক্লাস গাড়ীতে উঠিল। সে গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। কয়েক মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িল। হাওড়া ষ্টেশন পার হইয়া রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিল আপনার গন্তব্য পথে। কণা গাড়ীর এককোণে বলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিতেছিল ভগবান তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। আজিকার এই অভিনয়ের পরিণাম কি?

অমল কয়েক মিনিট মুখ দুটিতে কণার দিকে চাহিয়া রহিল ও পরে তাহার দৃঢ় বন্ধের উপর একরূপ জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া কণার আরক্ত ওষ্ঠে প্রেমচুম্বি নিবিড়ভাবে আঁকিয়া দিল।

—নয়—

শুভ্রার নিকট অরুণ তাহার অপমান কাহিনী বর্ণনা করিয়া বহুল পরিমানে স্বস্তি অনুভব করিল। পরে ট্রাণ্ড, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি স্মৃতিয়া যখন স্বাধীনভাবে বাটী ফিরিল তখন রাজি ১০।০টা বাজিয়াছে। বাটী ফিরিয়া অরুণ আপনার টেবিলে বসিয়া চিঠিপত্র খুলিতে বসিল; শুভ্রা স্বামীর আহারের আয়োজন করিতে ভিতরে গেল। কয়েকখানি পত্র উন্টাইয়া অরুণ দেখিল নিতান্ত পরিচিত হস্তাক্ষরের শিরোনামা লেখা একটা পত্র। পোষ্ট অফিসের ট্যাম্প দেখিয়া অরুণ মুগ্ধ অল্প বেলা ১২টার উহা জেনারেল পোষ্ট অফিসেই পোষ্ট করা চইয়াছে। সে পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল।

পত্রখানি এইরূপ :—

অভিন্নব্রত বন্ধ,

আমার পিতার মত লইয়া জানিলাম যে কণার সহিত তিনি আমার বিবাহ দিতে চানিচ্ছুক। এতএব তুমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিওনা।

কণাকে না পাইলে আমার জীবন ও মৃত্যু সমানই বোধ করি। এইজন্য আজ কণাকে লইয়া আমি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিব; কণা যদি আমার সহিত বাইতে রাজি না হয় তবে পৃথিবী ছাড়িয়া এমন দেশে আশ্রয় লইব যে আমাকে লত অবেষণেও খুজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। আমাকে ক্ষমা করিও।

ইতি—

পত্রখানি পাইয়া অরুণ যে শুধু বিস্মিত হইয়াছিল তাহা নহে একটা অজ্ঞাত ভয়ে

তাহার দৃঢ়চিত্ত বারংবার কাঁপিয়া উঠিল। সে কলিং বেলটা টিপিয়া ধরিল। ঠিক এই সময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুভ্রা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—

“ওগো, শুনু শুনু কণাকে পাওয়া যাচ্ছে না।”

রান হালি হালিয়া অরুণ বলিল, “তা আমি জানি।”

“তুমি জান? তুমি জানলে কি করে?” বলিয়া শুভ্রা বসিয়া পড়িল।

অরুণ দীর্ঘকণ্ঠে বলিল, “এই দেখ, তুমিও আমার মতই জানতে পারবে,” বলিয়া অরুণ শুভ্রার হস্তে পত্রখানি দিল। পত্র পাঠ করিয়া শুভ্রা বলিল, “তবে কি হবে? তাহের কি ফিরিয়ে আনা যায় না?”

“না, যেতে দাও। যারা গেছে তাদের কথার আর কাজ নেই। যেতে দাও।”

“তোমার কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না, এতদিন ছিল আমাদের এই বাড়ীতে।”

শুভ্রা তাহার আয়ত চক্ষু-ছইটি অরুণের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, “একটুও কষ্ট হচ্ছে না তোমার?”

“না শুভ্রা, একটুও নয়; বরং আজ আমি নারীচরিত্র জানবার সুযোগ পেয়েছি। আজ বুঝছি তাদের হৃদয়ে দয়া-মায়ী, প্রেম কৃতজ্ঞতা কিছুই নাই। তারা বোঝে নিজেদের সুখটাকে সবচেয়ে বেশী। যাও—বিরক্ত করো না। সে আমাদের কেউ ছিল না; আজও কেউ নয়।”

শুভ্রা ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল—হারের নিকট যাইতেছিল—কিন্তু অরুণ উঠিয়া আসিয়া ছই হস্তে তাহার হাত ছইটি দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বিত কণ্ঠে কহিল, “লভি বল শুভ্রা, তুমি তো আমাকে ছেড়ে যাবে না?”

দৃঢ় কণ্ঠে শুভ্রা বলিল, না গো না, এ দেখ থাকতে তোমার ছেড়ে যাব না—

যাব না। তুমি লরে গেলেও আমি যাব না—তুমি—তুমি ছাড়তে চাইলেও নয়। স্মৃণা করলেও নয়—অত্যাচার করলেও নয়—এমন কি চোখের লামনে যদি অস্ত্র নারীর বাহু-বন্ধনে বদ্ধ থাকতে দেখি তবুও নয়। তবু তোমার ছেড়ে যাব না।”

হস্তে ওষ্ঠ চাপিয়া অরুণ একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শুভ্রার মাথাটা নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিল। কণকাল পরে শুভ্রা আঁহরের সুরে বলিল,

“তুমি মন খারাপ করোনা লন্সট।”

* * *

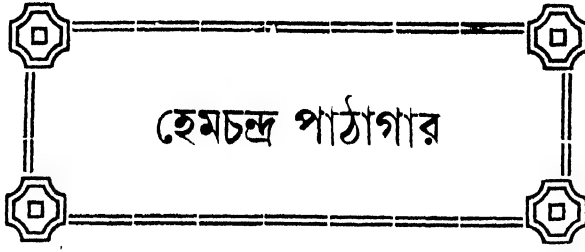
ইহার পর ছই তিন মাস কাটিয়া গেল। শুভ্রা লক্ষ্য করিল অরুণের দীপ্তমুখ যেন রান হইয়া আসিতেছে। অরুণ হালে, কাজ করে কিন্তু তাহাতে প্রাণের লাড়া নাই, যেন বিছাত চালিত যন্ত্র। তাহার প্রতি অরুণ কোনপ্রকার দুর্জীব্যহার করে না, তথাপি তাহার ব্যবহারে চিরদিনের উচ্ছ্বাস ও আগ্রহের অভাব শুভ্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। অরুণকে দেখিলেই শুভ্রা বুঝিতে পারে তাহার বেহ ও মন যেন অবশ্যই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শুভ্রা জিজ্ঞাসা করিলে অরুণ বলে, “পাগলামো করোনা আমি বেশ আছি শুভ্রা। বরং তুমিই দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।” একদিন সত্যই অরুণ অসুখে পড়িল এবং ডাক্তারের উপদেশ মত শুভ্রা অরুণকে লইয়া বায়ু পরিবর্তনের জন্য বেওঘর যাত্রা করিল। (ক্রমশঃ)

বিবাহাদি শুভকার্যে

সুলভে উৎকৃষ্ট মৎস্য খরিদ করিবার একমাত্র স্থান।

দত্ত গাঙ্গুলী এণ্ড কোং

৬২নং দেবেল্ল ঘোষ রোড, ভবানীপুর



এমন একদিন ছিল যখন বিদ্যাপুর বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তার কবিতার্থ নাম হয়েছিল। মাইকেল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল এখানেই বাস করে গেছেন। তাঁদের অনেক কাব্য ও কবিতা এখানেই রচিত হয়েছে। কিন্তু আজ সে নিশ্চয়। বাংলার আধুনিক সাহিত্যে বিদ্যাপুরের দান এতটুকুও নেই। কাব্যের পুত্র রঙ্গলাল আর এখানে প্রবাহিত হয় না। 'পদ্মপুত্রের' নির্মল জল এখনও টলমল করে কিন্তু ভাবের প্রেমা তার থেকে আর আসে না। আজকালের পরিবর্তন তার জীবনেও পরিবর্তন এনেছে। নির্ভীক শান্তির জীবন তার চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অরূপ রূপের স্বপ্নও তার ভেঙ্গে গেছে। যে অবিমিশ্র অবসরের পূর্বাঙ্গের মধ্যে সাহিত্যের সৃষ্টি তা তার ভাগ্যে আর জোটে না। সকাল থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রঙ্গলালের চিন্তাতেই তার কেটে যায়। মাথার ঘাম পায় ফেলে, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও উদ্বোধনের সংস্থান সে করতে পারে না। আগের মত সূর্য্য এখনও ওঠে, বাড়ী ঘর রাস্তা খাট নতুন আলোয় ভেমনই হাসে, কিন্তু তা দেখে মুখে কারও হাসি ফোটে না, সে শোভা দেখতে ঘর ছেড়ে কেউ ছুটে বারও হয় না। সকালে উঠে ঘরের জানালা খুলে দিলেই দেখা যায় অগণিত শ্রমিক ছুটে চলেছে কর্মের উদ্দেশ্যে। পরণে তাদের ময়লা জীর্ণ বস্ত্র, মুখে তাদের দারিদ্র্য ও ব্যস্ততার ছাপ। ইহাই কবিতার্থের আধুনিক রূপ, মনুষ্য

হেমচন্দ্রের বিদ্যাপুরের এই হল বর্তমান অবস্থা।

কিন্তু তাব লক্ষ্যে তারা আজ ছীন ছীন হলেও যে পরলোকগত মহাকবিগণ তাদের বাসভূমিকে তীর্থে পরিণত করে গেছেন তাঁদের তারা ভোলে নি। তাঁদের প্রতি ভক্তি একটুকুও ভুল পায় নি বং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের স্মৃতি রূপে ভাগ্যকর রাখবার, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার প্রত্যেক উপলক্ষটিকে আগ্রহের সহিত চেয়ে থাকে। রঙ্গলাল, মাইকেল হস্ত, হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট তৈরি হয়েছে তাঁদের স্মৃতি অক্ষয় রাখবার মানসে, লক্ষ্য যুক্ত লক্ষ্যায় মিলে বৎসর বৎসর "বাঁদী বন্দনা" ও "মণ্ডু মিলন" উৎসবের আয়োজন করে তাঁদের প্রতি ভক্তি অর্থা নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের চিন্তা তাঁদের ভাবে সর্বসামান্যরূপে অনুপ্রাণিত করবার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে মাইকেল ও হেমচন্দ্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মধ্যে। যে কেহ এখানে এলেই দেখতে পাবেন সমগ্র পল্লীটি যেন স্বর্গীয় কবিগণের পরিদ্র স্মৃতিচিহ্নে মণ্ডিত হয়ে আছে। রঙ্গলাল ভবন নিত্য নূতন রঙে রঞ্জিত হচ্ছে। হেমচন্দ্রের অতি পুরাতন বাটখানি লম্বা রক্ষা করা হচ্ছে। বাটার লম্বাংশে সুরভং পুষ্করী তটে শীঘ্রই কবির মর্ম্মর সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হবে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল জবি সর্বসামান্যরূপে লক্ষ্যে উন্মুক্ত রাখবার জন্তে।

হেমচন্দ্র পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি-কল্পে যুক্ত লক্ষ্যায় যে কবিদের পরিচয়

দিয়েছে তা লতাই প্রশংসনীয়। অসাধ্য-সাধন করেছে বলতে হবে। প্রথমে খোলার ঘরে, তারপর ভাড়া বাড়ী, তারপর নিজস্ব স্থিতল অট্টালিকায় সে স্থান পেয়েছে। একটি বক্তৃতা হলও তৈরি হয়েছে। তিল তালে পরিণত করা হয়েছে বলতে হবে। পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দশ-হাজার, সভা সংখ্যা প্রায় চারিশত। করপোরেশনের সর্বোচ্চ সাহায্য সে পেয়ে থাকে। এক কথা, সমগ্র দক্ষিণ কলিকাতার মধ্যে এইটি বৃহত্তম লাইব্রেরি।

একটা কথা আছে "যেখানে বাঙ্গালী, সেখানেই দলাদলি," বিদ্যাপুরেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। অনেক প্রতিষ্ঠান এখানে আছে এবং দলাদলিও আছে অনেক। কিন্তু একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এট যে, হেমচন্দ্র পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে ১৩১৪ সালে, স্বর্গীয় এই ৩২ বৎসরের মধ্যে পাঠাগারের কর্মকর্তা নির্বাচনে কখনও ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। যে বৎসর যে নামের তালিকা উপস্থিত করা হয়েছে এক-বাক্যে সবলে তাহাট মেনে নিয়েছেন। পরলোকগত কবি ও তাঁর স্মৃতিমন্দিরের প্রতি জনসামান্যরূপে শ্রদ্ধা কতখানি এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি।

শিক্ষার বিস্তার কল্পে লাইব্রেরীর সহায়তা কি রূপ তা বোধ হয় আজকালকার দিনে কাহারও অবিদিত নাই। লেখাপড়া চর্চার সুযোগে বঞ্চিত জনৈক পল্লী-বন্ধু একবার আমাকে বলেছিলেন "ভাই, একদিন যে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী নিয়ে বার হয়েছিলাম সে কথা যেন আজ আর বিশ্বাস করতেও প্রস্তুতি হয় না।" কথাটা যে কত দুঃখে তিনি বলেছিলেন তা বোধহয় অনুমান করতে পারা যায়। যে গ্রামে তিনি বাস করেন সেখানে লাইব্রেরির অভাবটা যে কতবড় অভাব তা তিনি নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব

করেছিলেন। বাস্তবিক লেখাপড়া চর্চার
বহিঃস্থ যোগ না থাকে যাহা লেখাপড়া
শিখেও নিরক্ষর হয়ে পড়ে। পল্লীগ్రামে
যারা উচ্চপ্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ে
অল্প কাজে যোগ দেন শেষ জীবনে তাদের
অনেকেরই এই অবস্থা ঘটে। শিক্ষার
বিস্তার কল্পে লাইব্রেরির সহায়তা তাই
অপরিস্রব। স্কুল, কলেজের বইমাড়ানি,
রাজ্যে বাড়ীতে কাজের অবসরে একটু
লিখতে পড়তে শিখে, পরে উত্তর জীবনে
লাইব্রেরির সাহায্য নিয়ে মহাপণ্ডিত হয়ে
গেছেন, কলেজের অধ্যাপক এবং আইন সভার
সদস্যপদে আপন যোগ্যতার জোরে লাভ
করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত জগতে অনেক মেলে।
পাঠাগার, স্কুল কলেজ ছাড়া ভেলেজের
স্কুল কলেজ বিশেষ। কিন্তু স্কুল কলেজের
মত এখানে কতকগুলি নির্দিষ্ট পুস্তকের
মধ্যে মন নিবিষ্ট করে থাকতে হয় না। যার
যে বিষয়ে অভিরুচি যত ইচ্ছা পড়াশুনা
করে পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারেন।
জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি কল্পে হেমচন্দ্র
লাইব্রেরি অপেক্ষাকৃত কতটুকু কাজ করেছে তার
হিসাব নেবার সময় এখনও আসেনি।
তবে এ আশা একেবারেই দ্রুশা নয় যে,
এই হেমচন্দ্র পাঠাগারকেই বেঙ্গল করে
ভবিষ্যতে কবিত্বার্থে আবার একটি লেখক
সম্মিলিত গড়ে উঠবে। এবং সেইদিনই আসবে
“হেমচন্দ্র পাঠাগার” নামের চরম সার্থকতা।

ত্ৰিপ্রিয়লাল দাস।

সহ: পুস্তকাধ্যক্ষ, হেমচন্দ্র পাঠাগার।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

ত্ৰিবাণভট্ট

বিগত ১৮ই এপ্রিল সোমবার সকাল
৯টায় সম্মেলনের চতুর্থ ও শেষবিবেশের অনুষ্ঠান
আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে প্রতিযোগিনীগণের
অন্ততমা কুমারী ইভারানী রায় একখানি
গজল গান করেন। কুমারীর গানের পর
Programme Director মহাশয় নিবেদন
করিলেন যে, কোনও শিল্পী উপস্থিত না
থাকায় Demonstration আরম্ভ হইতে
অন্ততঃ দশমিনিট দেরী হইবে। কিন্তু
দশ মিনিটের জায়গায় প্রায় আধঘণ্টা
সময় চলিয়া যাইবার পর কুমারী উমা মিত্র
ভৈরবীর একখানি চুম্বী গান আরম্ভ
করেন। Programme আরম্ভ হইবার
সময় নির্দিষ্ট ছিল ৮টায়, কিন্তু স্কন্ধ হইল
ত ৯টায়—তারপর একজন প্রতিযোগিনীর
গান হইতে না হইতেই পুনরায় আধঘণ্টা
ধরিয়া শ্রোতৃবর্গকে উদ্বেলিত করিয়া
তুলিয়া কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের management-
এর যে আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা
যে অতি অগৌরবের তাহাতে হিন্দুমাত্র
সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহারা হয়ত
এইরূপ অছিল তুলিবেন যে শিল্পীরা যথা-
সময়ে উপস্থিত না হইলে তাঁহারা কেমন
করিয়া programme এর নিয়মমত ব্যৱস্থা
করিলেন। কিন্তু, একরূপ অছিল যাহারা

দেখান তাঁহারা কেবল নিজেদের অক্ষমতা
চাকিবার জন্য যথা চেষ্টা করিয়া থাকেন।
কারণ, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে
যে, এলাহাবাদে গত কয়েক বৎসর যে
Music Conference চলিয়া আসিতেছে,
তাহাতে ত পূর্বোক্তরূপ Mismanagement
হইতে দেখা যায় না। দেখানকার কর্তৃ-
পক্ষগণের পক্ষে যদি বিভিন্ন শিল্পীকে নির্দিষ্ট
সময়ে আনাইয়া তাঁহাদের গানের বা
বাজনার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় তাহা
হইলে All Bengal Music Conference-
এর পক্ষেই বা তাহা অসম্ভব হইবে কেন?
নিজেদের আলস্য, ঔদাসীন্য ও অক্ষমতার
জন্য তাঁহারা যে বেড় ঘণ্টা সময় অথবা নষ্ট
করিয়া শ্রোতৃবর্গকে সেই স্বাক্ষর-গ্রীষ্মে
অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিলেন তাহার
কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে কি? তাহা
ছাড়া প্রথমদিকে এই ভাবে সময়ের অপ-
ব্যবহার করিলে অনর্থক বেলা ২১টা ৩টার
সময় অধিবেশন শেষ হওয়াই স্বাভাবিক এবং
ইহার পরে আবার ১১০টার সময় আলিয়া
রাত্রি ১১০২টা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া
programme শোনা যে কিরূপ কষ্টকর
তাহা কর্তৃপক্ষগণ যদি বিবেচনা করিয়া
দেখিতেন তাহা হইলে বোধহয় স্বাক্ষরে
অকারণ সময়ের অপব্যবহারে শ্রোতৃবর্গের
অসুবিধা না হয় সেদিকে তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি
বিস্তৃত হইত।

যাহা হউক, কুমারীর গজল গানের পর
ত্ৰিভুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রথমে
স্বর-বাহারে জোনপুরী আলোপ করিয়া পরে

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, বাণভোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

বলিয়া বিবেচনা না করেন তাহা হইলে তাঁহারা কি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্তই এরূপ একজন নিরস্ত্রমান ও non-interfering ব্যক্তিকে সভাপতিপদে নির্বাচিত করিয়াছেন? যাহা হউক, সুর-শৃঙ্গার বাজনার পর বারাণসীর অন্ততম প্রাতিষ্ঠিত খেলালিয়া প্রোঃ রামু মিশ্র বিলম্বিত একতালার ও দুণী ত্রিতালিতে দুইখানি টোড়ি গাহিয়া পরে ভৈরবীর একখানি ভজন গান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভজন গানটি আরম্ভ করিতে না করিতেই মিশ্র-মহাশয়ের ভাগ্যে Director মহাশয় নিয়ন্ত্রিত লালবাতির উদয় হইলে তিনি গানটি অসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। মিশ্র-মহাশয়ের খেলাল গানের রীতি ও চণ্ডী তাঁহার স্বরানা গোরবের উত্তম পরিচয় প্রদান করে এবং তিনি যে স্বল্পকাল ধরিয়া ভজনটী গাহিয়াছিলেন তাহাতে লহরয় চিত্ত যে উল্লসিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহহীনও নাই। মিশ্রমহাশয়ের গানের পর রামপুর-ষ্টেটের বিখ্যাত তবলিয়া প্রোঃ খেরাকুয়া লাহেব চিখা তিনতালে তবলার লহরা বাজান। ইহার বাজনঃ অতি উপভোগ্য হইয়াছিল। লহরা বাজনার পর পণ্ডিত ওকারনাথ ঠাকুর বেলা ১-২০ মিনিটের সময় গান আরম্ভ করেন। পণ্ডিতজী ভাবোজ্জল-উদাস্তকণ্ঠে প্রথমে ভৈরব-বাহার রাগের পরপর দুইখানি খেলাল গান (“মেরে বসন্ত কি মোবারক” ও “যৌবন রে”) গাহিয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ভৈরবী-ভজন (যোগি মতজা মতজা) গান করেন। পণ্ডিতজীর গানের পর বেলা প্রায় পৌনে-তিনটার সময় ঐ-ধিনের প্রান্তরস্থান শেষ হয়।



সাপালাভ
শ্রীহিঙ্গোল কুমার বিনী

যৌবনের ফুলবনে করিয়া প্রবেশ
 ধর্মিক' দাঁড়াই আমি ক্ষণকাল ভরে—
 চারিদিকে কতো ফুল ধরি কতো বেশ
 ফুটিয়াছে রাশি রাশি থরে থরে থরে।
 খাদিল নয়ন ঘোর কাঁপিল হৃদয়—
 চমকি উঠিল আমি দেখি শত রূপ—
 কতো আশা জেগে উঠি' হ'ল পুনঃ নয়
 উঃরলিত হৃদয়তে রহিলাম চূপ !
 হঠাৎ দেখিলু দূরে সরোবর মাঝে
 জাগিছে অলংখ্য বীচ পবন-হিলোলে
 গলিত রক্তত প্রায়, লেখানেতে রাজে
 রক্তিম কমল এক কেঁপে চলে চলে।
 ফুটন্ত পাঁপড়িগুলি উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায়
 আমার নয়ন কোণে উঠিতেছে জেগে—
 দ্বয়িতের বক্ষ রক্ত যেন মাখি গায়
 উঠিতেছে রক্তিম হয়ে, শিহরণ লেগে।
 বিকশিত নীরভেতে বিগন্ত প্রাবিত
 অবাক হইয়া আমি সেই দিক পানে
 চলিতে লাগিলু ধীরে; হইতে মিলিত
 বিকচ কমল লাগে, নীরব সে গানে!
 মমর সোপান পড়ে ললিলের পাশে
 আলিলাম ধীরে ধীরে, আপনার মনে—
 তুলিতে বাড়ায় হাত, মুছ মুছ হাসে—
 নিজেরে সে লপি ছিল, মম আলিঙ্গনে
 বুকেতে চাপিয়া ধড়ি লইলু আত্মাণ—
 কোমল সে দল পড়ে করিলু চুম্বন—
 পাগল হইল ঘোর বেহ মন প্রাণ
 আবেশে বিহবল ঘোর নাচিল এ মন!
 তখনও বুঝি নাই সেই সে কমল,
 চিরকাল মনে ঘোর শিহরণ আমি
 প্রেমের মধুর স্পর্শে করিবে অমল
 শীতল বক্ষেতে ঘোরে রাখিবগো টানি'

স্বপ্নভঙ্গ

শ্রীমসন্ত কুমার আচ্য

রেবা সবে ম্যাট্রিক আর রতীন বি, এ পরীক্ষা দিয়েছে এমন সময়, ওদের হয়ে গেল বিয়ে। রেবা যে স্কুলে পড়তো রেবার বাবা নীতিশবাবু ছিলেন সেখানকার শিক্ষক আর রতীনের বাবা মাধববাবু ছিলেন পলাশ-পুরের বিজ্ঞানসাহী তরুণ জমিদার রমেন-বাবুর নায়েব। স্কুলে রেবা শাস্তিশিষ্ট মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু বর্তমানযুগের চেউয়ের তালে এখন অতুলব মেয়ের বেহ নাচতে শুরু করেছিল তখন রেবার মনেও সে নাচের দোলা লেগেছিল। নীতিশবাবুর নামের সঙ্গে স্বভাবের বেশ মিল ছিল অথচ চাকুরী বজার রাখবার জন্তে মুখ বুজে মেয়েদের আধুনিক হবার প্রাণপন চেঁচা যেখে যেতেন কারণ স্কুলের কর্তাদের সবাই ছিলেন এই প্রচেষ্টার পক্ষপাতী। তাই নিজের সব নৈতিক মতামত খাটাতেন রেবার ওপর। এই চেউয়ে পড়ে রেবা যাতে তলিয়ে না যায় তার জন্তে বাড়ীতে তাকে নীতিশবাবুর উপদেশ দেওয়ার অন্ত ছিল না। কাজেই রেবার মনে নাচ, গানের চেঁচা লাগলেও বাইরে তা ফোটাবার উপায় ছিল না, স্কুলে সে সপ্রশংস, মুখ অথচ নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো এই নৃত্যগীত, হাস্য ক্রীড়াঞ্চল মেয়েদের পানে। যেখতে যেখতে তার মন ভেলে যেতো বাবার নিষেধের গণ্ডির বাইরে অনেক দূরে—সে কোন্ করলোকে। হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলে সে ফিরে আসতো বাবার বিধি নিষেধে—যেরা রক্তবিশীন বাস্তবরাজ্যে।

রতীনকে কাছাকাছি কোন মকঃবলের কলেজে না দিয়ে মাধববাবু যে তাকে

কোলকাতায় পাঠিয়েছিলেন তার মূলে ছিল বিজ্ঞানসাহী, তরুণ জমিদার মনিবের আন্তরিক আগ্রহ এবং অর্থ সাহায্য। অথচ আজকালকার লিনেম, সভ্যমিতি, স্বদেশ উদ্ধার, নাচ গানের জলসায় ভিড়ে ভবিষ্যৎ নষ্ট না করার উপদেশ, সুবিধে পেলে মুখে এবং নিয়ত চিঠিতে কোলকাতায় পাঠাতে কসুর করতেন না। রতীন কলেজে ছেলে-দের উৎসাহে উজ্জল মুখের পানে চেয়ে কি ভাবতো সেই জানে। ছোট্টলের ছোট্ট ঘরটিই তার জগত। সেখানে সে থাকতো, পড়াশুনো করতো আর মাঝে মাঝে ছোট্টলের সামনে ছোট্ট পার্কটিতে গিয়ে বসে থাকতো। মাঝে মাঝে তার মন ভেলে যেতো সুদূরের কোন্ মায়ারাজ্যে। তারপর হঠাৎ তাকেও ফিরে আসতে হোত বাস্তব রাজ্যে।

রেবা যখন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে তখন স্কুলের সেক্রেটারীর দৃষ্টি পড়লো শাস্ত-শিষ্ট, সুন্দরী এই মেয়েটির ওপর। স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব উপলক্ষে তখন অভিনয়ের জন্তে মেয়ে বাছাই চলছিল। সেক্রেটারী নীতিশবাবুকে রেবাকে অভিনয় করবার অনুমতি দেবার জন্তে অনুরোধ করলেন। সেক্রেটারীর এই অনুরোধের অন্তরালে যে আশেপাশ ছিল সেটা বুঝতে পেরে নীতিশবাবু বাধ্য হয়ে মত দিলেন কারণ তার অনুরোধ না রাখার ফল বা দাঁড়াবে তা এই বুড়ো বয়সে তাঁর বা তাঁর লংবারের পক্ষে লক্ষ্যজনক হবে না এটা বুঝতে তাঁর ঘেরী হয়নি।

রতীন একা কত কি ভাবতো আর লেগুলো প্রকাশ করতো গল্পে বা গানে। লেগুলো ক্রমে লে মাদিক, সাপ্তাহিকে পাঠাতে লাগলো আর লেগুলো প্রকাশিত হোতে লাগলো। কাগজে রতীনের গান, গল্প পড়ে রমেনবাবু ভারী খুশী হয়ে মাধব বাবুর কাছে ছেলের সুখ্যাতি করলেন আর তাকে এ বিষয়ে বাধ্য না দিয়ে উৎসাহিত করতে অনুরোধ করলেন। এ অনুরোধ না রাখার ফলটা বুঝে বুদ্ধিমান নায়েব ছেলেকে বাধ্য ছিলেন না তবে বিশেষ উৎসাহিতও করলেন না।

বাবার উপদেশপূর্ণ চিঠির সংখ্যা যত কমে আসতে লাগলো রতীনের খাতার পাতা ততই লেখায় ভরে উঠতে লাগলো। রাশ-মুক্ত তেজী বোড়া যেমন নিজের গতির খেলালে ছোট্টে রতীনের কলমও তেমনি চলার ফলে শীঘ্রই তার লেখক বলে নাম রটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক বন্ধুও জুটলো। তাদের আগ্রহে লে সভ্যমিতিতে আর নিয়মিত ভাবে লিনেমায় যাওয়া আরম্ভ করলে। তবে পড়াশুনোর তার ঝোক ছিল বলে লেখিকে বেশী অবহেলা, বা অনাস্থা এলো না।

রেবার দাড়া মনীশ ছিল রতীনের সহপাঠী। মনীশেব অনুরোধে রেবার অংশে নাটকে যে ছুখানা গান ছিল তার বহলে রতীন নতুন ছুখানা গান লিখে দিলে, আর যেদিন রেবাঘের অভিনয় হোল সেদিন মনীষের অনুরোধে রতীনও গেল অভিনয় দেখতে। রেবার গলা ছিল মিষ্টি তার ওপর শিক্ষা আর নিয়ত চেঁচার ফলে অভিনয়ে গান গেয়ে রেবা লকলের প্রশংসা পেলে। নীতিশবাবুও মনে মনে মেয়ের এই সুনামে খুশী হলেন। মনীষের মধ্যস্থতায় রেবা আর নীতিশবাবু সঙ্গে রতীনের পরিচয় হয়ে গেল।

লেখা পড়ার ভাল, সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছে তবু রতীনের ভয়, লরল, অসামান্য বাবহারে নীতিশব্দর তাকে খুব ভাল লেগে গেল। তারপর থেকে রতীন প্রায়ই নীতিশব্দর বাড়ীতে যেতে লাগলো। মনীশ ছিল রতীনের প্রিয় ভক্ত আর রেবারও রতীনকে বেশ লাগতো। ক্রমে পরিচয় যখন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো তখন রেবা রতীনকে ভাল বেসে ফেললে। রতীন তো আগেই রেবাকে ভালবেসেছিল।

নীতিশব্দর সব বেধে শুনে তলে তলে রতীনের বাড়ীর লম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে মনীশকে রতীনের অভিনায়ক জেনে নিতে বলেন আর রতীনের মনের যে খবরটুকু পেলেন তাতে উৎসাহিত হয়ে মাধববাবুকে একখানা চিঠিতে নিজের মনের কথা খুলে লিখলেন। মাধববাবুও চিঠির কি জবাব দিতেন বলা যায় না। কিন্তু রমেনবাবু খবরটা শুনেই উৎসাহিত হয়ে নারেন্দ্র মশাইকে রাজি হতে বলেন। রতীনের মত ছেলের রেবার মত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত এই ছোল তাঁর মত।

বিয়ের পর কিছুদিন রতীন রেবাকে নিয়ে গাঁয়ের বাড়ীতে রইলো। এই সময়ে একদিন রতীনের রমেনবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হোল। পাশের খবর বেরোলে রতীন কি করতে চায় তা রমেনবাবু জানতে চাইলেন। মাধববাবুর মত, সে আইন পাশ করে উকিল হয়ে বসলে জমীদারীর মোকদ্দমা গুলো তো পাবেই তার ওপর যা হয়। দুই মিলিয়ে আজকাল নতুন উকিলের যা হবে তা তুচ্ছ করার মত নয়। রতীনের ইচ্ছে, কোলকাতায় থেকে মালিকে নবীন উৎসাহে লেখা শুরু করে। আগেই তো সে নাম করে নিয়েছে। তার ওপর যদি লম্বন্ধ লম্বটুকু সে সাহিত্য সাধনায় নিযুক্ত করতে পারে তাহলে তার

ভবিষ্যৎ সে উজ্জল বলেই মনে করে। শুনে রমেনবাবু তাকে খুব উৎসাহিত করলেন। প্রথম প্রথম রেবার গাঁয়ের জীবন কতকটা ভাল লেগেছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রানহীন পল্লীজীবন আর একঘেয়ে লংসারের ওপর তার মনে মনে বেশ বিরক্তি এসে গিয়েছিল।

রতীন কথাটা রেবার কাছে পাড়তেই সে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে কোলকাতায় যাবার বন্দোবস্ত করার জন্তে রতীনকে চেষ্টা করলে। সব দিক থেকে উৎসাহ পেয়ে রতীন কথাটা বাবার কাছে পাড়লে আর জমীদার মশাইয়ের মতটাও তাঁকে জানিয়ে দিলে। এমন কি এ বিষয়ে তিনি যে তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন সে খবরটাও মাধববাবুর অজানা রইলো না।

প্রথমে আপত্তি তুলে শেষে রতীনের জেদ বেধে মাধববাবু বলেন “বেশ বাপু, এসব আমি মোটে বুঝিনে। তবু বাবুর যখন ইচ্ছে আর তিনি যখন সাহায্য করবেন তখন করো, যা তোমরা ভাল বোঝ।”

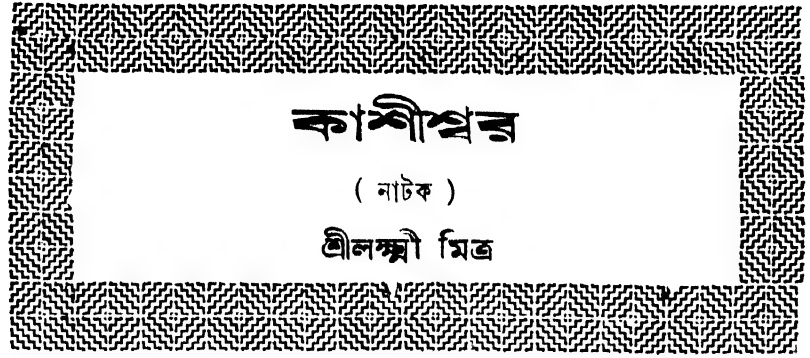
রতীন রোকে নিয়ে কোলকাতায় রমেনবাবুর ছোট একখানা বিনাভাড়ার বাড়ীতে এসে সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করলে। সে আগে যে সব মালিকে, সাপ্তাহিকে লেখা দিতো তাহের অফিসে গিয়ে কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলে। তাঁরাও রতীনকে খুব উৎসাহিত করলেন এবং সাহসও দিলেন। রতীনবাবুর মত সুবুদ্ধিই তো গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করে নতুনের লক্ষ্যে চলেবন। নইলে দেশের উন্নতি ক্ষুদ্র পরাহত। তাঁরা মাসে মাসে কিছু পারিশ্রমিক রতীনকে দেবার আশ্বাসও দিলেন। দেশ থেকে কিছু আসতো আর বাড়ীর ভাড়া তো লাগতোই না। রতীনের সাহিত্য সাধনা এক রকম চলতে লাগলো। বিশেষ করে সাহিত্যিকের লংসারের সাধারণ খরচ তো আর এমন বেশী নয় আর হওয়া উচিতও নয়। রতীন নিজের কাজের খোঁজে

এদিক ওদিক ঘোরে, বাকী লম্বটুকু নিজের ছোট ঘরে বলে লেখে। রেবা যা পারে রাঁধে বাড়ে, রতীনের সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু শেষে তার লম্ব কাটা তার হয়ে উঠলো। তার ওপর রতীনকে সে যে কোলকাতায় আসতে উৎসাহিত করেছিল তার পেছতে নিজেরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। যে স্বপ্ন সে ছাত্রী জীবনে দেখতো অথচ নানা কারণে তা সার্থক হয়নি এখন বাধাবিহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্ন আবার তাকে পেয়ে বসলো। সে মেয়েদের এক সমিতির সভ্য হয়ে পড়লো। সেখানে নাচ, গান, সাহিত্যচর্চা থেকে মেয়েদের উন্নত করার সব রকম আয়োজনই ছিল। মাঝে মাঝে দুঃস্থ পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যের জন্তে অভিনয়ের বন্দোবস্তও হোত। রেবা দেখলে ওদের ধলে আন্তরিকতাবে খোগ দিলে তার প্রথম যৌবনের স্বপ্ন সফল হতে পারে। রেবা “গীতবীথির” কাজে মন প্রাণ ঢেলে দিলে। কিন্তু ওদিকে নির্জন ঘরে একজন যে মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছে সাহিত্য সাধনায় তার হতে লাগলো নানা রকম অসুবিধে। নিজের ধলে রেবার তখন গায়িকা বলে খুব নাম। তার ওপর “গীতবীথি”র সব রকম লংকাজে তার অনীম উৎসাহের ফলে সে আজকাল ধলের প্রধান অগ্রণী হয়ে উঠেছে। নব্য লভ্য মিলেস দত্ত আজকাল “গীতবীথি”র লকলের রেবা’। তার দিন কাটে মন্দ নয়। কিন্তু রতীনের দৃষ্টিতে লাগলো সাধনায় নানা বাধা, অসুবিধা।

একে তাহের কেউ লংসারের বিশেষ কিছু জানে না। রেবা যদিও বা কিছু জানতো তা সেও আজকাল থাকে বাইরে বাইরে। এদিকে রতীনের যে অর্থের বিশেষ স্বচ্ছলতা তাও নয়। ঘর ঘর গোহাগাছ করার কথা উঠলেই রতীনের আগে প্রেরণা আর রতীন বেরোলে তার স্নানাহারের

ব্যবস্থা না করেই রেবাকে বেরিয়ে পড়তে হয় “গীতবীথি”র জরুরী কাজে। রেবা যে এটা না বুঝতো তা নয়, তবু ভাবতো রেকর্ড আর রেডিওতে গান বেওয়ার পাকা একটা ব্যবস্থা করে নিজেই সে রত্ননের দিকে নজর দেবে আর রত্ননও ভাবতো উপস্থিত যে উপস্থানখানা ধরেছে লেখানা শেষ করলেই রেবার কাজে সাহায্য করবার জন্যে একটা বয় রাখতে পারবে। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল উপস্থানখানা শেষ হলেই কোন প্রকাশক সাহসে নিয়ে নেবে আর বেনো জলের মত বইখানা বাজার হয়ে ফেলবে। তাহের সুবিনের যখন মার ঘেরী নেই তখন উপস্থিত বর ঝাড়া, গাটবাজার করার কাজ করে সময় আর হাত নষ্ট করবে কেন? তাহের ভেতরে দুর্য্যাসিত যে প্রতিভার দীপ্তি মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাচ্ছে সেটা একবার ভাল করে বুটলে আর লোকে তার কবর বুঝলে মার তাহের পার কে? এতো আর স্থল ঘাটার কথা নায়েবের সংসার নয়।

এদিকে তাহের সংসার চলছিল স্থল ঘাটার আর নায়েবের মেহের দ্বানাই। নীতিশবাসু রেবার কাজের সমর্থন না দিলেও তাঁর স্ত্রী লুকিয়ে মেয়েকে যা পারতেন সাহায্য করতেন। কিন্তু রেবার রেকর্ডে কথা রেডিওতে মোটে সুবিধে হোল না আর রত্ননের উপস্থান যে কোন প্রকাশক নিয়ে নেবে এমন আশা দেখা গেল না। তবু নিজেকে লক্ষ্যে কারো কোন লক্ষ্যে ছিল না আর কেউ নিরাশও হয়নি। তবে কিছু সুবিধে যে হচ্ছে না তার জন্যে মনে মনে জ্বলনেই পরস্পরকে দারী করতো আর একজনের অন্তরে ওপর বিশ্বাসও ছিল না। আজও লক্ষ্যারের কথা উঠলেই রত্ননের জাগে প্রেরণা আর রেবারও যখন তখন আসে “গীতবীথি” থেকে ডাক।



কালীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যোগমায়া—ওরে পাখাণী, তুই কি কোরে একথা বললি! দিলীপকে ছেড়ে তুই একদণ্ডও বাঁচতে পারবি!

সুনীলা—তোমরা বললেই পারবে জ্যাঠাই মা।

যোগমায়া—কিন্তু বিয়ে তো ক’রতেই হবে। কার গলায় *তবে মালা দিবি বল?—ওরে, সে যে তোরই জন্যে ব’লে আছে যেন বুগ বুগাস্ত ধ’রে! তুই যে তার নয়নের মণি!—আমি মায়ের চোখ নিয়ে বেখে এসেছি, তুই দেখিস্নি?

সুনীলা—জানি আমি জানি।...কিন্তু তোমাদের জন্যে যদি আমার এটুকু ছেড়ে দিতে হয়, আমি ছেড়ে দোব। আর বিয়ে? কতো লোক যে বিয়ে না কোরেও থাকে!—ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই।

(প্রস্থান)

(কালীশ্বরের প্রবেশ)

কালীশ্বর—নীলা চলে গেল?

যোগ—হ্যাঁ।

কালীশ্বর—চোখে কি জল দেখলে তার?

যোগ—তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে পেতে সে জল নয়, সে আর কিছু। দাঁড়িয়ে বুঝি সে ছবি দেখতে পারলে না?

কাজেই পূর্বের “গুনছো” আজকাল “কানের মাথা খেয়েছ” কথা “কি আপদ হোল তোমাকে নিয়ে” তে এসে দাঁড়িয়েছে।

(ক্রমশঃ)

কালীশ্বর—না। এ রকম অভিজ্ঞত আমি জীবনে মাত্র একবার হয়েছিলাম, আর আজ হ’লাম

যোগমায়া—অভিজ্ঞত। তুমি মানুষের হৃদয়ে অভিজ্ঞত হ’তে পার? হয়ামরা বলে কোন বস্তু তোমার অন্তরে আছে!

কালীশ্বর—যদি না থাকতো ভালো হ’ত। দয়ামায়া হুজনেই একদিন বিষপাত্র আমার মুখের কাছে ধ’রেছিল। *সে বিষ আমি আকর্ষণ পান করিয়াছিলাম। সেই থেকে আমি বোধ হয় নীলকণ্ঠ!—যেহেঁ নো, পালিয়ে যেও না যোগমায়া। মর্শ্বের কথা আজ তোমার কাছে উজাড় ক’রে দিতে চাই, যেহেঁ নো তুমি।

যোগমায়া—জানি, লব জানি।

কালীশ্বর—কিন্তু কণ্ঠের বিষ আজ সর্সাদে নাবতে শুরু করেছে তা জান না। দেবতা যা লক্ষ ক’রে নিয়েছিলেন, মানুষ আমি, বোধ হয় আর লক্ষ্য করিতে পারব না।

(দিলীপ ও মলীবার প্রবেশ)

কালী—এই যে দিলীপ! কি দিলীপ?

দিলীপ—একটা কথা ছিল।

কালী—বলো?

দিলীপ—পরেম।

কালী—ও, পরেশ।—

দিলীপ—পরেম আমার ধরেছে আপনাকে বলতে বাতে তাকে ক্রমা করা হয়।

কালী—পরেমের অপরাধটা জান বোধ হয়?

মনীষা—পরেরেশের একলারই অপরাধ নয় দাদা, বাবারও ছিল।

দিলীপ—চুপ কর তুই।—পরেরেশের অপরাধ কি জানি। সে ছিলেবে তাকে ক্ষমা করা ঘোটেই যায় না। কিন্তু আমি জিনিবটা অস্ত্র দিক দিয়ে ভাবছিলাম।

কাশা—কি বলো শুনি?

দিলীপ—ভাবছিলাম ওর বাড়ীর কথা। ওর জীপুত্র পরিবারের কথা। এই দুদিনে আমার একটা বাঙালী পরিবার রাস্তায় এলে দাঁড়ালো—ভাবছিলাম সেই কথা।

কাশীশ্বর—দিলীপ, আমি তাকে বরখাস্ত ক'রেছি। তুমি যদি তাকে ক্ষমা করো, আজ আমি তোমার বিচারই মেনে নোব—তুমি যদি খুন্দী হও।

দিলীপ—কিন্তু তুমি ওকে ক্ষমা না করলে আমি কি করে ক্ষমা করতে পারি!

কাশীশ্বর—ও, আচ্ছা, আমার হয়েই তুমি ওকে ক্ষমা করো—

(দিলীপ প্রস্থানোক্তত কিন্তু মনীষা তাহাকে ধরিয়। বলিল)

মনীষা—না, তুমি না। আমি আগে খবর ছোব। খবরদার তুমি আগে আদতে পাবেনা—(বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল)

দিলীপ হালিয়া বলিল : পরেশ ওকেই সুপারিশ করেছে প্রথম, তাই ও আগে খবর দেবে।—অদ্বুত!

(প্রস্থানোক্তত)

কাশীশ্বর—দিলীপ!

(দিলীপ করিল)

আমার একটা কথা।

যোগমায়ী—আবার তুমি ওকে কি কথা বলতে চাও। না না আর কথা নয়, —না।

কাশীশ্বর—সে কথা আমি না জিজ্ঞাসা করে পারব না, চুপ করো। দিলীপ, তুমি উইলের বিষয় কিছু বলতে চাও না?

দিলীপ—না, কিছু বলতে চাই না।

কাশীশ্বর—যেন চাওনা?

দিলীপ—আপনার শিদ্ধান্ত এতই ভাল যে আমার কিছু বলবার নেই। সমস্ত সম্পত্তি দ্বিজেনের নামে থাকার ফলে ওর দারিদ্র-জ্ঞান বাড়বে, কার্যকুশলতা বাড়বে। জীবনের পথে সত্যকার অভিজ্ঞতা লাভ কোরতে পারবে।—আমি এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি বাবা।

(প্রস্থান)

যোগমায়ী—দিলীপ দীর্ঘজীবী হও! মায়ের আশীর্বাদ—কোন দিন কোন অমঙ্গল তোকে স্পর্শ কোরতে পারবে না!

কাশীশ্বর—যোগমায়ী, উৎসব করো। তোমার গৌরবান্বিত সন্তান, উৎসব করো। আমি আঘাত কোরতে এলে পরাজিত হ'য়ে ফিরে চললাম, উৎসব করো!

(প্রস্থানোক্তত)

যোগমায়ী—কিন্তু একটা কথা বলে যাও।

কাশীশ্বর—বলো—

যোগমায়ী—ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, পূজা—যা কিছু দেবতার কাছে দেয়—দিলীপ সব তোমার দিয়েছে। কোন আত্মজ সন্তানও এর বেশী তার বাবাকে দিতে পারে না। বিনিময়ে তুমি কেন দিতে পারবে না পুত্রের পরিপূর্ণ গৌরব? আত্মজ আর অনাত্মজ নিয়ে তুমি কেন লংঘাতের সৃষ্টি কোরবে?

কাশীশ্বর—লংঘাত আমি সৃষ্টি করি না, লংঘাত সৃষ্টি করে আমার রক্ত প্রবাহ। সৃষ্টি করে দ্বিজেনের জন্মদাতা ব'লে যে এক স্বার্থপর ব্যক্তি এর মঞ্চধানে বসে আছে, সে

যোগমায়ী—সুন্দীলার সঙ্গে দিলীপের মিলন পথেও বাধা সৃষ্টি করে কি তারাই?

কাশীশ্বর—স বাধা সৃষ্টি কোরে গেছে সুন্দীলের বাবা। ছোট, এতটুকু মেয়েকে আমার কোলে তুলে দিয়ে ওর বাবা আমার বলেছিল যেহেঁটি আমি তোমার দিলাম, কাশীশ্বর। তুমি ওকে তোমার পুত্রবধূ কোরো। পুত্র বলতে সে অবশ্য বুঝেছিল আমার আত্মজ। সুন্দীলা কিন্তু ভালবাসলে এক লাধুর সন্তানে।

যোগমায়ী—থাক থাক—ওগো থাক। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরতে চাইনা—

(দিলীপ ইতিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া যোগমায়ী মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। শেষের কথা আর তাহার বলা হইল না। দিলীপ প্রস্থ করিল)

দিলীপ—কে লাধুর সন্তান বাবা?

কাশীশ্বর—তুই—তুই লাধুর সন্তান দিলীপ!

দিলীপ—(হালিয়া জিজ্ঞাসা করিল)

আমি!—তুমি তা হ'লে লাধুর ছিলে একদিন?

কাশীশ্বর—হাঁ দিলীপ, একদিন লাধুর ছিলাম আমি!

(প্রস্থান)

দিলীপ—মা, তুমি তো কৈ আমাকে এ কথা কোনদিন বলেনি?

(যোগমায়ী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপলক নেত্রে শুধু চাহিয়া আছেন। সুধু দেখিয়া মনে হয় তাহাতে রক্তের লেশ মাত্র নাই। দিলীপের প্রশ্নে তাঁহার যেন লম্বিং ফিরিয়া আসিল, ধীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন)

যোগমায়ী—ভেবেছিলাম একদিন তুমি জানতেই পারবে, আমার বলবার স্বরকার হবে না। তাই বলিনি। (বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন)

দিলীপ দ্রু কুণ্ডিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—

সবনিকা নাথিয়া আলিতেছে.....

(ক্রমশঃ)

ফলাফল

(সি, বি)

বার্মা দলের শেষ খেলা

গত সোমবার ক্যালকাটা ম'ঠে বার্মা হট্টে আগত ফুটবল দলটির সহিত আই এফ এ ভারতীয় দলের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এইটি বার্মা দলের কলিকাতায় তৃতীয় এবং শেষ খেলা। এই খেলাটির এইরূপ পরিণাম হওয়ার ফুটবল খেলার যে তিন প্রকার ফলাফল হতে পারে বার্মা দল তিনটি খেলায় সেইরূপ তিন প্রকারে খেলাগুলির শেষ নিষ্পত্তি করে সম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। পূর্বেকার দুইটি খেলা অপেক্ষা এই শেষ খেলাটি অধিকতর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। য'হও এই খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার বার্মা দলের সৌভাগ্যের প্রকাশ পেয়েছে তাহা হলেও তাঁদের খেলা অতিশয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে স্থানীয় ভারতীয় দলের যে এই খেলাটিতে জয়ী হওয়া উচিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয় দলের সেন্টার ফরওয়ার্ড মূর্গেনের ব্যর্থতা এবং আগন্তুক দলের গোলরক্ষক বাসিনের চিত্তাকর্ষকভাবে নিজ দ্বারিছ পালন স্থানীয় দলকে বিজয়ী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছিল। মূর্গেন একটি পেনাল্টি কিকের সহজ সুযোগ গ্রহণ করতে অক্ষম হওয়া ব্যতীত আরও অন্ততঃ তিনটি অব্যর্থ গোল প্রদানের সুযোগ কার্যে পরিণত করতে পারেন নি। লক্ষ্মীনারায়ণকে কতকাংশে এই দোষে দোষী

করা গেলেও তিনি একটিমাত্র গোল প্রদান করে পরাজয়সূচক গোলটি পরিশোধ করার তাঁর ক্রটির অধ্যাতি অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেছে। তাহা ব্যতীত ভারতীয় দলের অধিকাংশ আক্রমণগুলির মূলেই তাঁহার দক্ষতা দৃষ্ট হয়েছিল। প্রথমার্ধে উভয় দলই সমভাবে আক্রমণ করে অনেকগুলি গোল করার সুযোগ নষ্ট করেছিল। শেগুলির মধ্যে মূর্গেনের পেনাল্টি নষ্ট হট্টে গোল করিতে না পারা লক্ষ্যাপেক্ষা হতাশার সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় দলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও বার্মা দল বোলো মিনিট অতিবাহিত হবার পর এই খেলাটিতে প্রথম গোল করেন ১—০ গাগ্‌স্‌লে এই গোলটি করার সৌভাগ্যলাভ করেন। তার চার মিনিট পরে লক্ষ্মীনারায়ণ পেনাল্টি সীমানার বাহির হট্টে একটি তীব্র শট করিয়া পরাজয়সূচক গোলটি পরিশোধ করেন ১—১। প্রতিপক্ষ দল দুইটির আরও কয়েকটি সুযোগ ব্যর্থ হইবার পর কোন শেষ নিষ্পত্তি না হয়ে খেলাটি শেষ হয়। ভারতীয় দলের নির্দোষ অধিনায়ক এল দত্ত এবং নির্মল ঘোষ যোগদান না করার তাঁহাদের স্থলে যথাক্রমে পি দাস গুপ্ত এবং পাখী সেন খেলছিলেন। কে ভট্টাচার্য্য ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। এই দলের কে দত্ত, পি দাস গুপ্ত, বিদল মুখার্জি, বেনীপ্রসাদ, পাখী সেন, লক্ষ্মীনারায়ণ, কে ভট্টাচার্য্য, এবং প্রসাদের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। আগন্তুক দলের বাসিন্,

দীনা, দ বেগী, বাবা এবং পাগস্‌লে লক্ষ্যাব-জনক ক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

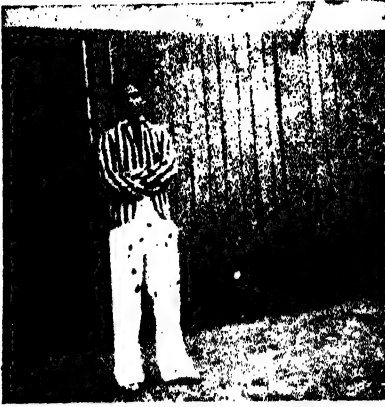
আই, এফ, এ দল :—কে দত্ত (ইষ্টবেঙ্গল), পি দাস গুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল) এবং আর মজুমদার (ইষ্টবেঙ্গল); বিদল মুখার্জি (মোহনবাগান), বি সেন (ইষ্টবেঙ্গল) এবং বেনীপ্রসাদ (মোহনবাগান); পাখী সেন (ই বি আর), লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল), মূর্গেন (ইষ্টবেঙ্গল), কে ভট্টাচার্য্য (কাঠঘর) এবং কে প্রসাদ (এরিয়ান্স)।

বার্মা দল :—বাসিন, দীনা এবং লেট্‌জ, গার্লিং, দ বেগী এবং ফোগাটি, উইলীন্স, কানিয়ান, বাবা, পাগস্‌লে এবং রবার্টস্‌।

রেফারী :—সুশীল ঘোষ।

চার দিন লীগ প্রতিযোগিতাগুলির খেলাগুলি বন্ধ থাকবার পর গত মঙ্গলবার ৩১শে মে পুনরায় আরম্ভ হয়। এই দিনে প্রথম ভিত্তিসনে তিনটি ম্যাচ খেলা হয়। শেগুলির মধ্যে মোহনবাগান এবং ভবানীপুর দলের খেলাটি লক্ষ্যাপেক্ষা আকর্ষণীয় হয়েছিল। প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম কয়েক মিনিট খেলাটি প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার উভয় দলই সমভাবে আক্রমণ করার সুযোগ পায়। কিন্তু কোন দলই ক্রতকার্য্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ার্ধের অধিকাংশ সময় মোহনবাগান দল ভীষণভাবে আক্রমণ করে বিপক্ষদলকে বিপর্য্যস্ত করতে লক্ষ্য হয়। খেলাটি শেষ হবার কয়েক মিনিট পূর্বে প্রেমলাল হেড করে একটি গোল প্রদান করলে ভবানীপুর দল এক গোলে পরাজিত হয়।

মহম্মেডান স্পোর্টিং মাঠে কালীঘাট ও এরিয়ান্স দলের খেলাটি হয়। কালীঘাট দল প্রথমার্ধে দুইটি গোল প্রদান করে এই খেলাটিতে জয় লাভ করে। এইটি কালীঘাট দলের এই বৎসরের তৃতীয় জয়লাভ। বিজয়ী দলের জয়া এবং জোশেক এই গোল দুইটি প্রদান করে। এরিয়ান্স দলের খেলা



প্রেমলাল

আবো লস্টোবজনক হয়নি সেই কারণে কালীঘাট দলের জয়লাভ যথোপযুক্ত হয়েছে।

কাষ্টমস্ এবং ক্যালকাটা দলের লহিত এই দিনের তৃতীয় খেলাটি হয়। কোন পক্ষই গোল করতে না পারায় খেলাটি অসমাপ্তবিন্যাসে শেষ হয়েছে। খেলাটির মধ্যে কোনপ্রকার উত্তেজনা ছুটে হয় নি।

গত বুধবার প্রথম ডিভিশনের দুটি খেলা হয়। তার মধ্যে একটিতে কে, ও, এস, বি লৈজদল ই, বি, আর, দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। হেণ্ডারলন ও লাইমন্ লৈজদলের পক্ষে এই দুইটি গোল করেছিলেন। অপর খেলাটিতে ব্যারাকপুরের ক্যামেরোনিয়ানস্ সৈন্ত দল পুলিশ দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে।

বৃহস্পতিবার যে তিনটি খেলা হয়েছে তার মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল ও মহম্মেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাটি সর্বাঙ্গতঃ বেশী আকর্ষণীয় হয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গলদল লীগ তালিকার নীচের দিকে অবস্থান করলেও গত চার বছরের লীগ বিজয়ী এবং বর্তমানে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানীয় মহম্মেডান স্পোর্টিং দলকে অনায়াসে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। এই খেলাটি বিজিত দলের মাঠে হয়েছিল। খেলাটির এইরূপ ফলাফল হওয়ার ইষ্টবেঙ্গল দল গত বঙ্গবরের

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে লক্ষ্য করেছে। বিজয়ীদলের খেলোয়াড়েরা প্রথম থেকেই জরী হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে খেলতে থাকে এবং উপযুক্ত আক্রমণ করে বিপক্ষ দলকে বাতিবাস্ত করে। সেই কারণে অধিকাংশ সময় মহম্মেডান দলকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়। তারা তাহের স্বাভাবিক খেলা খেলবার মোটেই সুযোগ পায় নি। এইটি মহম্মেডান দলের এবছরের এখন পর্যন্ত তৃতীয় পরাজয়। এর আগে এই দুর্ভিক্ষ দলটি পুলিশ এবং কালীঘাট ক্লাবের নিকট পরাভব স্বীকার করেছে। প্রথমার্দ্ধের পনেরো মিনিট অতিবাহিত হবার পর জুঝাঝা করিমকে পেনাল্টি লীমানার মধ্যে ফাউল করার জন্য ইষ্টবেঙ্গল দল একটি পেনাল্টি কিং পায়। লক্ষ্মীনারায়ণ তাহা হইতে প্রথম গোলটি করেন ১-০ দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষের দিকে মার্গেস্ আর একটি গোল কব্জার লোভাগ্য লাভ করেন ২-০ বিজয়ী দলের পি, দাশগুপ্ত, এ নকী, লক্ষ্মীনারায়ণ ও মার্গেস্ এবং বিজিত দলের



মুন্ন মহম্মদ

ওলমান, গিরাজুদ্দীন ও রহিম ভাল খেলেছিলেন। কালীঘাট ও ভবানীপুর দলের খেলাটিতে উত্তরপক্ষের একটি করে গোল হওয়ার শেষ নিশ্চিন্তি হয় নি। কালীঘাট দল অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে খেলেও বিজয়ী হবার লোভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এরিয়ার্স ও কাষ্টমস্ দলের খেলাটিতে প্রথমোক্ত দলটি ৩-২ গোলে জয়লাভ

ফোন ২৭৭৮ এড বাজার

কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারতের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আপাব সারকুলার রোড, কলিঃ

করেছে। শুক্রবারের একটি মাত্র খেলার পুলিশ ক্লাব ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে। গত শনিবারের তিনটি খেলার মধ্যে মোহনবাগান ও মহম্মেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাটি সর্বোৎসাহে বেশী দর্শক আকর্ষণ করেছিল। প্রত্যেক দল একটি করে গোল করার খেলাটি প্রথমার্ধে দলের মাঠে অসীমাত্মকভাবে শেষ হয়েছে। মোহনবাগান দল এখন পর্যন্ত এ বৎসরে নিজেকে অপরাধিত রাখবার লক্ষ্যে বজায় রেখেছে। এবং প্রথম ডিভিশন দলগুলির মধ্যে এই গৌরব একমাত্র তারাই দাবী করতে পারে। মহম্মেডান দল অবিকাংশ সময় আক্রমণ করে খেললেও মোহনবাগান দলের গোলরক্ষক রমেন ভট্টাচার্য্যের অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্তে তারা বিজয়ী হবার দোভাগ্য লাভ করতে পারেনি। মোহনবাগান দলের অস্ত্রাস্ত্র খেলোয়াড়দের মধ্যে এস, হুজ (হাট), বিমল মুখার্জি, যোগজীবন হুজ, বৈদ্যপ্রসাদ ও শ্রেমলালের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। বিশেষ করে বিমল এবং শ্রেমলাল তাঁদের দলের লক্ষ্যে অক্ষুর রাখবার জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। মহম্মেডান দলে জুমা খাঁ, যাকি খা, হুজ মহম্মদ, রহিম, মহম্মু ও মার্কিনের খেলা প্রশংসনীয় হয়েছিল। খেলাটিতে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমতঃ আগন্তুক দল তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী লভ্যদের আসন সংখ্যা না পাওয়ার তার প্রতিবাদ স্বরূপ কেই মোহনবাগান ক্লাবের লভ্যদের গ্যালারীতে আসন গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ বাকি খা শ্রেমলালকে বিপরজনকভাবে ফাউল করার দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচমিনিট অধিবাসিত হবার পর রেকর্ডী কড়ক আঘিষ্ট হয়ে মাঠ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়ার্ধের লভ্যেরা মিনিটের সময় সিঁদু পেনাল্টি লীমনার মধ্যে এন ঘোষকে ফাউল করার

বি রায় চৌধুরী পেনাল্টি কিং থেকে নিজ দলকে এক গোলে অগ্রগামী করেন ১-০। খেলাটি শেষ হবার দুই মিনিট আগে রহিম একটি ফ্রি কিং থেকে দর্শনীয়ভাবে লট করে পরাজয়সূচক গোলটি পরিশোধ করেন ১-১। অপর দুটি খেলাতে ভবানীপুর ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যথাক্রমে ই বি আর ও ক্যামেরোনিয়ানস্ গোরা দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে।

প্রথম ডিভিশন লীগ তালিকা

খে জ ড্র প পক্ষে বি: পরেণ্ট
মহম্মেডান

স্পোর্টিং	১০	৫	২	৩	১৬	১০	১২
মোহনবাগান	৯	২	৭	০	৮	৫	১১
কালীঘাট	১০	৩	৫	২	৯	৭	১১
ই বি আর	১০	৪	৩	৩	৮	৯	১১
পুলিশ	৯	৪	২	৩	১৬	১২	১০
ক্যামেরোনিয়ানস্							
	১১	৩	৪	৪	১০	১০	১০
কাষ্টমল	১১	২	৬	৩	১১	১২	১০
কে ও এস বি	৮	৪	১	৩	৯	৭	৯
ইষ্টবেঙ্গল	৯	৩	৩	৩	৯	৮	৯
ভবানীপুর	১১	৩	৩	৫	১৬	১৫	৯
এরিয়ান্স	১০	৩	৩	৪	৯	১৬	৯
ক্যালকাটা	১০	২	৩	৫	৫	১২	৭

অস্ট্রেলিয়া অভিযুক্ত

আই এক এ দল

গত বুধবার চৌরঙ্গী ওয়াই, এম, সি, এ দলে লভ্যদের মহারাজা তার মন্থনাধার রায় চৌধুরী লভ্যপতিয়ে আই এক এর প্রাথমিক ক্রমটির একটি লভ্য হয়ে গেছে। এই লভ্য অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণ অনুসারে একটি আই এক ফুটবল দলকে অস্ট্রেলিয়ার পাঠান লাব্যত্ব হয়। যদি লভ্য হয় তাহলে কেবলমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড়দের দ্বারা এই দলটি গঠিত হবে।

এই দলটি আগামী ১২ই জুলাই কলিকাতা ত্যাগ করে ১৭ই জুলাই কলকাতা থেকে জাহাজে রওনা হবে এবং তিনমাস ভ্রমণের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। মি: সি শুভ এবং মি: এম হুজ রায় যথাক্রমে এই ভ্রাম্যমান দলটির ম্যানেজার এবং নন প্রেসিং ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছেন। মি: শুভ বাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে মি: এম হুজ রায় ম্যানেজার হয়ে যাবেন এবং তাঁহার শূত্র স্থানে অপর কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হবে। এই ভ্রমণ লক্ষ্যে লম্বত ব্যয় 'অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন' বহন করবে।

সম্ভরণে বাংলার প্রাধান্য

গত রবিবার ২৯শে মে ছেহুরার পুর্কিরীতে নিখিল ভারতীয় সাতার প্রতিযোগিতার শেষ অনুষ্ঠানে বাংলা প্রদেশ অস্ত্রাস্ত্র প্রবেশের লহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজ প্রাধান্য বজায় রেখেছে। নিম্নে ইহার ফলাফল দেওয়া হল :—

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল :—প্রথম দিলীপ মিত্র (বাংলা), দ্বিতীয়—রাজারাম সাউ (বাংলা), তৃতীয়—পি এম আর তেজচাঁ (বোম্বাই)।

সময় :—১ মি: ৬২/৫ সে: ২০০ মিটার বুক সাতার :—প্রথম প্রফুল্ল মল্লিক, দ্বিতীয়—হারবার আলি (পাঞ্জাব), তৃতীয় হরিহর ব্যানার্জি (বাংলা)।

সময় :—৩ মি: ৯সে: (রেকর্ড)। ১০০ মিটার ক্রী ষ্টাইল (মহিলা) প্রদর্শনী ১ম—কুমারী লীলা চ্যাটার্জি, ২য়—রমা সেন শুভ, ৩য়—সুখলতা পাল ১মি: ৩২সে:। ৪০০ মিটার ক্রী ষ্টাইল—দুর্গা দাস (বাংলা) ২য়—দিল্লি (বাংলা) অর্জুন দিল্লি (পাঞ্জাব)।

সময় ৫ মি ৩৮ ৩/৫ সে: (রেকর্ড) নীডেল রীলে—৩×১০০ মিটার ১ম—

বাজলা', ২য়—পাজাব রাজারাম লাউ, প্রকৃত মজিক ও দিলীপ মিত্রকে লইয়া বিজয়ী হল গঠিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনী তাইভিং—আশু বসু ও অজিত রায়।

প্রদর্শনী ওয়াটার্স পোলো—বাজলা অবশিষ্ট বলকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে। জুর্গা দান (২) ও জি এইচ দান বিজয়ী দলের পক্ষে এবং পক্ষে এবং তারুচা ও মদন সিংহ অবশিষ্ট দলের পক্ষে গোল করেন।

ক্রিকেট

বিলাতে কাস্তিক বসুর কুতিষ—

গত ২০শে ও ২১শে-মে নটিংহামে রাজপুতনার ক্রিকেট ক্লাব এবং লার জুলিয়ান কাহানের একাধেশের খেলার বাংলার কাস্তিক বসু দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ রান করে নিজ ক্রিকেট প্রতিভার পরিচয় দিইছেন।

ব্র্যাডম্যানের ৫ রান

অস্ট্রেলিয়া ও মিডলসেক্সের খেলার ব্র্যাডম্যান প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫ রান করে আউট হয়ে বান।

ব্র্যাডম্যান ও এডরিচের

১০০০ রান

অস্ট্রেলিয়া দলের ক্যাপ্টেন ডন ব্র্যাডম্যান গত মে মাসের মধ্যে মাত্র ৭টি ইনিংস খেলে নিজস্ব ১০০০ হাজার রান পূর্ণ করেছেন। ইহাতে ব্র্যাডম্যান নতুন রেকর্ডে স্থাপন করেছেন। মিডলসেক্স দলের এডরিচও গত মে মাসের মধ্যে নিজস্ব এক হাজার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বিশেষত্ব যে তিনি একমাত্র 'লডস্' মাঠে খেলেই এই গৌরব অর্জন করেন।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড—

আগামী ১০ই জুন নটিংহাম্পাশায়ারে ইংলণ্ড দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচটি খেলা হবে। ইংলণ্ড দলে

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রতিভা

জীমতী স্নেহলতা পাইন

বাংলার সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ঠিক রবি ঠাকুরের পরেই আপন পেতে পারেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি প্রতিভা বাংলার সাহিত্যে নতুন প্রবাহ এনে দিইছেন। বাংলার ছন্দরাজ্যের অসীম রূপ-ঐশ্বর্য্য নতুন করে পূর্ণ সজীবতার প্রকটিত হল শরৎচন্দ্রের প্রতিভার লোণার কাঠির পরশ পেয়ে। জগত বিন্ময়ে তাকাল এই প্রতিভার দিকে। লম্বারোহের মুখরতার ভরে উঠলো আকাশ, বাতাল, বন-বনানী। বাংলার সাহিত্যের ক্ষেত্রে, লহরের আলিতে, গলিতে, পল্লীর ছায়াবন তরু আভিনায় নব উৎসবের কলধ্বনি জেগে উঠলো ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের আগমনে।

বাংলার পল্লীর লাখে শরৎপ্রতিভা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাংলার যুগন্ত সুর পল্লীর নিরালয় কঁধে মরছিল। তার খেলবার জঙ্গ নিম্ন-লিখিত খেলোয়াড়গণ মনোনিবেশ হয়েছেন—

- (১) হ্যামণ্ড (ক্যাপ্টেন) (মেনেটার)
- (২) হাট্‌ন (ইমর্কলারার)
- (৩) ভেরিটা (")
- (৪) এমস্ (কেপ্ট)
- (৫) ফার্নেস (এলেক্স)
- (৬) ক্রে (ম্যামোরগান্)
- (৭) বার্বেট (মেনেটার)
- (৮) রাইট (বেপ্ট)
- (৯) কমট্‌ন (মিডলসেক্স)
- (১০) এডরিচ (")
- (১১) হাউটেক (নটস্)
- (১২) পেট্টার (ল্যাকলারার)
- (১৩) পোপ (ডার্কিনারার)

লভ্যিকার প্রকাশ আগে হইনি। শরৎপ্রতিভার স্পর্শে বিচিত্রভাবে নন্দিত হল বাংলার অপ্রকাশিত ঐশ্বর্য্য। নতুন করে দেখতে শিখলো, ভাবতে শিখলো, গাইতে শিখলো বাংলার জনগণ।

বাংলার বাণীর বেদীমূলে যে পুজার ডালি এনেছিলেন শরৎচন্দ্র, তার বন নৌরঙের মধ্যে রয়েছে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-অশ্রুর বন্ধার। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি আমাদের বুখে এনেছে তৃপ্তির হাসি, আবার নয়নে এনেছে তপ্ত অশ্রুজল। এই হাসিকান্নার মাঝখানেই শরৎপ্রতিভার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজলি।

অসীম লাহল, অপরিমিত লহামুভূতি, অপার উদারতা এবং অলৌকিক প্রকাশশক্তি—এই লবের লম্বাবেশে পুষ্ট ও গঠিত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন।

ছব্বয়ের আকুল বরষ ছিল বলেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন লেই দিকে, যেখানে শান্ত মৌন নৌন্দর্য্যে প্রতিভাত বাংলার স্নেহ-মমতা-কল্পিত ছব্বরলভার। তাঁর প্রেম-প্রতিভা তাঁকে আবিষ্কার ও সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর স্নেহ শুভ্র সৃষ্টির স্পর্শে বাংলার স্নেহ-ভাণ্ডার জগতের অগণিত চোখের লাধনে অনাহত নৌন্দর্য্যে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। জগত লেহিন বিন্ময়ে বেখেছিল বাংলার অন্তরের ঐশ্বর্য্য কত বিরাট, কত স্বর্গীয়। বাংলার লম্বাজে জীর্ণতা ও পঙ্কিলতার অভাব নেই। লংকারের অস্ত্র নিয়ে তিনি ভাঙতে সক্ষম করেছিলেন বাংলার যুগযুগের পুরাণো কলঙ্কের জীর্ণ প্রাচীর। বাংলা-পল্লীর লাহিত ও নির্ঘাতিত অভাগাদের বুকে তুলে নিয়েছিলেন মানবপ্রেমিক শরৎচন্দ্র।

তাদের জন্ত তিনি কেঁবেছিলেন নিজে আর কাঁধেছিলেন আঁধারকে। কত পাঠক-পাঠিকার অশ্রুজলে ভিজেছে শরৎগ্রন্থের পাতা, কত সুহৃৎ হৃদয় বিহারিত হয়েছে বাংলার নয়নাঙ্গীর অভিশপ্ত জীবনধারার করুণকাহিনী পড়ে। কত মহানুভূতির তপ্ত দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়েছে আমাদের স্নেহপ্রবণ অশ্রু-নিবিড় হৃদয়ে। শরৎপ্রতিভার পূজার জন্ত আলাদা করে অমুঠান লমারোহের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি মুহূর্তে সেই পূজা অমুঠিত হয়েছে এবং বাংলার ঘরে ঘরে, যখন শরৎগ্রন্থ পড়ে আমরা হেসেছি, কেঁবেছি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।

সুখ-দুঃখ নিয়েই ত এই লংলার। এর বিচিত্র সমাবেশকে অনাহত রেখে তবেই না মানবজীবনের ছবি-আঁকা। পথে পথে মন ভোলাবার জন্ত স্বর্গের লোভনীর লৌক্য-লোককে পৃথিবীর মাঝে টেনে এনে লাভ নেই। তাতে মন হরত ভোলে কিন্তু গলে না। সুদূর দিগন্তের অনাহত রক্তরাগ স্বর্গীয় বলে প্রশংসিত হতে পারে, কিন্তু এই ধরণীর ভাঙা-গড়ার মাঝে যে জীবনধারা, তা অশ্রুজলে লিক্ত হয়েও মানুষের একান্ত আপন্য।

শরৎচন্দ্র গোবুলীর দিগন্তের স্তব্ধসন্তার দৃষ্টি করে এই পৃথিবীর মূলময় পথে দৃষ্টি নিবেশ করেছেন। বাংলা-পল্লীর মৌন মাটির পথ তাই ভাষা পেয়েছে, ধ্বজ হয়েছে। এই ধরণীর জীবনধারা ঠিক যেখানে জটিল হয়ে উঠেছে, লম্বা। এনেছে—সেইখানেই হয়েছে শরৎ-প্রতিভার আলোক পাত।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রতিভা যেমন আকৃষ্ট হয়েছে বাংলার নারীর দিকে, তেমন আর কোনদিকে নয়। বঙ্গনারীর প্রতি দরদ তিনিই সবচেয়ে বেশী দেখিয়েছেন। লম্বাঙ্গের তথাকথিত কলঙ্কিতা নারীর মধ্যেও অনেক লম্বাঙ্গের তিনি মানব-প্রেমিকের

দৃষ্টি দিয়ে আবিষ্কার করেছেন অপূর্ণ হৃদয়-ঐশ্বর্য। অবজ্ঞা-নির্ব্যাতন-উপেক্ষার কবল থেকে কলঙ্কিতার অশ্রুবিধৌর্ণ জীবনকে উদ্ধার করেছে শরৎপ্রতিভা। পথের ঘূলা থেকে প্রকার সিংহাসনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শরৎচন্দ্র।

লম্বাঙ্গ একটি গল্পের মধ্যেও শরৎ-প্রতিভার বিকাশ বেশ চোখে পড়ে। “রামের স্মৃতি” ফুটিয়েছে বাংলা-পল্লীর ছরস্তু ছেলে রামকে; তার চেয়েও বেশী ফুটিয়েছে রামের জননী-স্বরূপা বৌদি নারায়ণীকে। নারায়ণীকে সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন—এই ত বাংলার নারী! এই-ত হৃদয়লভ্যারে বিভূষিতা বাংলার মা-বোনদের একজন। এই-ত মমতাময়ী লাক্ষ্মী অন্নপূর্ণা!

গল্পের গতি যেখানেই ঝড় ফিরেছে, সেখানেই নারায়ণীর স্নেহধারা হয়েছে গভীর। নারায়ণীর স্নেহে বাধাহীন প্রোতস্বিনীর শাস্তধারার মৌন শোভার স্তম্ভ নয়। সেই স্নেহ আশাতক্ক তরঙ্গিনীর অপূর্ণ উচ্ছ্বাস। সেই স্নেহের শক্তি বেড়ে গেছে বাধা পেয়ে। দিগন্তীয় উপস্থিতিজনিত পরিস্থিতিতে চরম পরীক্ষা হয়েছে নারায়ণীর স্নেহ-বাৎসল্যের। গল্পের শেষদিকে যে ভাঙন লেগেছিল, সে ত আসলে ভাঙন নয়। নারায়ণীর স্নেহধারাকে ঘনীভূত হবার সুযোগ দিল এই বিচ্ছেদ। গল্পের পরিণতি বিচ্ছেদ নয়, স্নেহ-লম্বারোহের মাঝে অপূর্ণ পুনর্মিলন। আর এই অপূর্ণ দৃশ্যের কেন্দ্র-স্থলে শোভিতা স্নেহলভ্যারময়ী নারায়ণী।

নারায়ণী ধর্মীর প্রাণাঘের উচ্ছল্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিতা গৃহদেবী নয়; সে পল্লী-প্রাঙ্গনে রান আলোর মাঝে প্রস্তুতিত স্তম্ভ একটি ফুল। পল্লীর তরু নিরালার শান্ত ছায়াতলে তার পরিপূর্ণ অনাহত বিকাশ।

মেহের

শিশির কুমার সরকার

যদি না বাসবে ভালো, কেন বা আসলে মেহের, নীলিমা পড়লো ধরা ও-আঁখি নীলেতে মেহের। তুমি কি জানতে ছাই কেনে কইবে কথা আমিই শিখানু তোমায় জানাতে বুকের মাথা। প্রথম প্রভাতে যবে আসলে ছোট্ট মেহের পালাতে ললাজ হেনে আঁধার চকিত চেয়ে। আজকে তুমিই মেহের বলছ কত কি সব ফুটানু তোমারই মুখে আমারই সে কলয়ব। আরতো নহে সে তুমি ছোট্ট সে ছোট্ট মেহের মাধবী বনের স্নেহ তন্তুতে পড়ছে বেয়ে। মনে কি পড়ছে মেহের লেখিন সে বিকেল বেলা তোমায় ভূষিতে আমি খেলেছি কত না খেলা। হাতেতে বেঁধিছ ফুল নখর অধর চুম্বি বলে ছোট্ট করে—“ছুঁ, হরেক তুমি।” যবে আসছ চলে আবারো আসবো বলে তুমি বলে নাকো কথা...চুপটি র'লে। নতের বাহল তব নাহলে নয়ন চেয়ে

কেন বা আসলে মেহের!

লোনালী রঙিন শাড়ী-লেজেছ বধূটি বেশ ফুলেলা ফুলের হারে বেঁধেছ খোপার কেশ। যদি না আসবে আর কেন বা আসলে বল কাঁধে কেশের বাসু শিখিল শযাতল। তোমার ছয়ায়ে মেহের চাতক পথিক শুধু পিপাশা ললিল চেয়ে পেয়েছে মরুর ঘু-ঘু তুমি যা বলে লেখিন সব মিথ্যে কথা তবু যে লাগতো ভালো তব সে অগল্ভতা। গোলাপী পাপড়ী রাজা তব সে কপোল কোলে জানিতা সত্যি জানি ঘোষেরই মরণ হালে। তবুও তোমায় আমি করেছি স্মৃতিগত। ভীকু হালি কোথা? কোথা সে ভীকু চকলতা? গলেতে হোলে না তব ছোট্ট সে ছলকি হার। বুকেতে জোরার এল বোবন ঘনুনার। তাই কি শঠতা দিয়ে দিলে একান্তজ্ঞতা আমার কবিতা কুঞ্জে তুমি সে মহাশ্বেতা। পূলকে নতের মেঘ অলকে নামছে বেয়ে

কেন বা আসলে মেহের!

ক্রেডিট প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বেতারে অভিনয় প্রসঙ্গে আমরা অনেক কথা বলেছি—দীর্ঘ দিনের আলোচনার মধ্যেও আমরা কোন উন্নতির ধারা দেখতে পাচ্ছি না। বত রাজ্যের বস্তা পচা নাটককে টেনে নিয়ে এলে অপটু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে বিরক্তিকর চীৎকারে শ্রোতাদের কান ঝালাপালা করে ভোলবার এবং শ্রোতাদের অবকাশ মুহূর্তকে এ ভাবে অপচয় করাবার নীতি কী?

বেতারে অভিনয় প্রসঙ্গে যে অর্থ ব্যয়িত হয় সেটা অপব্যয় হচ্ছে কিনা সে কথা ভেবে দেখা দরকার। শ্রোতাদের যদি তা আনন্দ দিতে, শিক্ষা দিতে সমর্থ না হয় তা হলে এ বিভাগের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করতে পারি না।

বেতার নাটক পরিচালককে আমরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারি ক'খানা মূতন রসবান আদর্শ নাটক তিনি পরিবেশনে সমর্থ হয়েছেন? কি আদর্শ নিয়ে এ বিভাগ পরিচালনা করছেন? অভিনয়ের মধ্যে কি মূতনত্ব তিনি দেখাতে পারছেন?

নাটক নির্মাচনে নেই কৃতিত্ব—অভিনয়ের মধ্যে স্পষ্ট রসবোধের অভাব—সঙ্গীত পরিচালনার পল্লীর যাত্রার পাঁচ—বেতার অর্কেস্ট্রা যাত্রার কনসার্ট, কোনটি ভবে উপভোগ্য?

সুগন্ধকে অস্বীকার করা চলে না। আজকের দিনে নাটক দর্শকের মন গত

দশবৎসরের তুলনায় ও যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তার প্রশ্রয় নেই। সাধারণ রজার স্তর অবস্থা দেখেই দর্শকদের রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের পরম বিশ্বাসের বস্তু এর পরও বেতার নাটক পরিচালক চন্দ্রহাসের মত নাটককে কেমন করে মনোনিীত করেন। বাংলা দেশে মূতন নাটকের-ভালো নাটকের অভাব আছে স্বীকার করি—কিন্তু সে অভাব পূরনের প্রচেষ্টা কোথায়?

বেতার বিচিত্রা ছোট ছোট নাটকার মধ্যে যে রসবস্তুর আভাস পাই মধ্যে মধ্যে তার দ্বারা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে বেতারে মূতন নাটকের বিশেষ অভাব ঘটতে পারে।

বাংলা দেশে ভালো লেখকের লংখ্যা আজ নিভান্ত অপরিমিত নয়। এ হলে তাঁদের লেখনীর সাহায্য নিয়ে তাঁদের বেতারে আহ্বান করলে এ গতানুগতিকতার যে পরিবর্তন ঘটে না এমন বলতে আমরা পারি না।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের বাঙালী ট্রেন ডাইরেক্টর মি: দেন তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দিলেন ঐতিহাসিক অমুষ্ঠানের 'নবাগতের আগের' প্রতি। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—আমরা এ আগের কোনদিনের বৈঠকেই

প্রশংসা করতে পারি না। বত রাজ্যের আনাড়ী আটলের বেহুয়া কণ্ঠে এ আগের কোলাহল সুধরিত।

বক্তৃতার বিভাগে এবার আমরা কিছুটা উন্নতির আভাস পেয়েছি। কণ্ঠ সঙ্গীতে বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীতে সুরশিল্পী সময়েশ চৌধুরী বেশ আনন্দ দান করছেন।

ডোজরের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

খেয়ালী চিত্রপট *



- ইউনাইটেড টকিজের “ছন্দা” চিত্রে নায়িকার ভূমিকায়
একে দেখা যাবে—এ মেয়েটি শ্রীমতী জোৎস্না গুপ্তা।
- ছবিখানার পরিচালক শ্রীযুত গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১লা আষাঢ় ১৩৪৫, ১৬ই জুন ১৯৩৮ } চতুবিংশ সংখ্যা

মিলনের পরিহাস

বাহ্যিক কংগ্রেসী রাজনীতি ব্যক্তিগত ও উপদলগত ঘেষ-ঘন্দের ষাতপ্রতিষাতের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই ষাতপ্রতিষাতের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আদর্শগত বৈষম্য নাই আছে শুধু ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা উপদলগত স্বার্থসিক্রির দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। “দাদা”-বৃন্দের মুক্তিভেৎ বাংলাদেশে যে সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধানে স্বয়ং-যাত্রাপতি বিশেষ যত্নবান হইলেও সংঘর্ষের বিকটরূপ ইতিমধ্যেই যশোহরে প্রকাশ পাইয়াছে। অনুসন্ধান সমিতি বর্তমানে সাক্ষী-সাবুৎ গ্রহণে তৎপর স্ততরাং যশোহর-ঘটনা সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ বর্তমানে অসমীচীন। তবে বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে যেরূপ খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় উপদলগত ঘন্দের সংঘাত প্রবলতর হইয়া শীঘ্রই পরিষ্কৃত হইবে। উপদলদ্বয় স্ব স্ব দলপুষ্টির জন্ত ও রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলি দখলের জন্ত উপদলীয় শাঠ্যের আশ্রয় লইতেছেন এবং এই মুহূর্তে সত্ত্বযুক্ত বেকার-দাদাবন্দ তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় “সশস্ত্র নিরপেক্ষতার” প্রতিশ্রুতি দিলেও বর্তমানে তাঁহার প্রতিশ্রুতিতে ও প্রতিশ্রুতিপালনে বিশেষ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে। যে কিরণবাবুকে অধুনা কংগ্রেসের অধিবেশনেও কলিকাতা ত্যাগ করিতে দেখা যায় না তিনি যে কেন সহসা যশোহরের কম্মীসন্মেলনে যোগদান করিতে গেলেন তাহা প্রহেলিকা-সমাচ্ছন্ন। শুধু তাহাই নহে মালদহে জিলা রাষ্ট্রীয় সন্মেলনে কিরণবাবু সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে। সহসা কিরণবাবুর সভাপতিত্ব করিবার এত সখ হইল কেন? কিরণবাবুর মকসল পরিভ্রমণ কি আগামী বৎসরের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্বাচনে সশস্ত্র বিরোধিতার উদ্যোগ-পর্ব নহে?

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় যখন প্রায় প্রকাশ্যে স্বীয় দলপুষ্টির জন্ত বন্ধপত্রিকর সেই মুহূর্তে সরকার ‘যুগান্তর’-দলের মায়ক শ্রীযুক্ত প্রভুল গাঙ্গুলী মহাশয়কে

অতীতভাবে বিনা স্তরে যুক্তি দিয়াছেন—বোধ হয় সুরেন্দ্র-কিরণ-সংযুক্ত উপদল এই আকস্মিক যুক্তির ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বাহা হউক প্রতুল বাবুর যুক্তিতে “যুগান্তর”-দল শক্তিশালী হইবে এবং তাহার কলে হয়ত উপদলগত সংঘর্ষ প্রবলতর হইয়া উঠিবে।

কলিকাতায় উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতায় ও পল্লী-কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনে উপদলগত দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা শুনিয়া বিন্মিত হইলাম যে উত্তর কলিকাতায় শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার বসু শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদারের আশুগত্যা পরিহার করিয়া নবানুগত্যে দীক্ষিত হইয়াছেন। রাজনৈতিক আঁতাতে যে নগররূপ ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমানেরই সতর্ক হওয়া উচিত। উত্তর

কলিকাতায় হেমন্তবাবু যে সুরেশবাবুর দল পরিত্যাগ করিতে পারেন তাহা বাঁহারা বিগত সতের বৎসরের কংগ্রেসী রাজনীতি পর্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেহই ভাবিতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে হেমন্তবাবুর শ্যাম একনিষ্ঠ কর্মীও যেখানে মতস্বৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না সেখানে বৃহত্তর মিলনের বুলি কি অসার বাক্য-আড়ম্বর নহে?

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র হয়ত সকল উপদলের আশুগত্যা পাইবেন—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ না হইলেও রাষ্ট্রপতি বলিয়াই—কিন্তু বাংলার কংগ্রেসী উপদলীয় সংঘর্ষ যে অদূর ভবিষ্যতে প্রবল আকার ধারণ করিবে তাহা ঘটনা-বৈচিত্রে ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সমাধান কোথায় কে বলিতে পারে?

—:•(X):•—

শ্রী কবির মানস পুত্র

নব জাতীয়তার দিশারী

বোঝা

চিত্রে নব-যুগের
সূচনা আনিবে



পরিচালনা :

শ্রীনরেশ মিত্র

(ই, পি, এম্)

চিত্র পরিবেশক :

প্রাইমা ফিল্মস লিমিটেড



(বিলাসী)

অভিজ্ঞান

চিত্রনির্মাতা—নিউ থিয়েটার লি:

কাহিনী—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্র-নাট্য—ফণী মজুমদার

পরিচালক—প্রফুল্ল বাসু

চিত্র-শিল্পী—বিমল রায়

সঙ্গীত—বাণী দত্ত

সঙ্গীত-পরিচালক—রাইচাঁদ বড়াল

সঙ্গীত-রচয়িতা—অজয় ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক—সুবোধ মিত্র

চিত্র পরিবেশক—প্রাইম ফিক্স লি:

ভূমিকায়—লক্ষ্মী—মলিনা, লবিতা—
হরবালা, নাজমা—মেনকা, প্রিয়লাল—
শৈলেন পাল, প্রমথ—জীবন গঙ্গোপাধ্যায়,
প্রকাশ—শৈলেন চৌধুরী, জহরলাল—
মুনীরজ্ঞান ভট্টাচার্য্য, কেশব—টোপা রায়,
শ্রুত—ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, লাগুচরণ—অমী
পাণ্ডা। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র ভূমিকায়—
রাজলক্ষ্মী, মনোরমা, পঙ্কজ মল্লিক, সুকুমার,
মণীপাণ্ডা, বীরেন বল প্রভৃতি।

গত শনিবার রূপবাণী চিত্র-গৃহে নিউ
থিয়েটারের 'অভিজ্ঞান' মুক্তিলাভ করেছে।
র্তমান দিনে বাঙলা ছবির পরিচালক
হলেবে প্রফুল্লবাসুর নাম দর্শকদের কাছে
বেশ পরিচিত না থাকতে অনেককেই হয়ত'
বনেক কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু আমরা
হৃদয় আনন্দের সঙ্গেই বলছি যে তিনি
এই সিনেমার অবদান করে একখানি ভাল
দেই দিয়েছেন। ছবিখানা যে কয়েক

ঘণ্টা ধরে ব'লে আনন্দের সঙ্গে দেখা যাবে
তার আর কোন সন্দেহই নেই।

ছবিখানার কাহিনী হচ্ছে এক অপহৃত
সমাজ বিভাগিতা নাট্যীয় জীবন-এর ঘটনা
নিরে। জমিদার জহরলাল-এর অত্যাচারে
জর্জরিত হয়ে গুরু একদিন জমিদার পুত্র
প্রিয়লাল-এর নবপরিণীতা পত্নী-লক্ষ্মীকে
অপহরণ করে। গুরু-এর বোন নাজমার
সাহায্যে লক্ষ্মী একদিন গুরু-এর কবল থেকে
মুক্তি লাভ করে জামশেদপুরে তার বোন
লবিতার বাসার আশ্রয় পায়। লবিতার স্বামী
প্রকাশ-এর সাহায্যে যদিও লক্ষ্মী একদিন
স্বত্ত্বালায়ে আশ্রয় ভিক্ষা করবার সুরোগ
পেরেছিল তথাপি সমাজের ভয়ে তাকে
নিরাশ হয়েই পুনরায় প্রকাশের আশ্রয়েই
কিরতে হয়েছিল। এই খানেই তার জীবনে
আর একজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সে
হচ্ছে প্রমথ—প্রকাশের ছরসম্পর্ক ভাই।
প্রমথের ছিল প্রচুর অর্থ—আর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র।

ভাগ্য যখন বিরাগ হয় তখন মানুষ
প্রতিপদেই বাধা পায়। লক্ষ্মীর জীবনে
হলোও তাই। প্রকাশের অত্যধিক স্নেহই
হ'ল লবিতার বিরাগের কারণ। লবিতার
মনোভাব বুঝতে পেরে একদিন রাত্রে লক্ষ্মী
প্রকাশের আশ্রয় ছেড়ে রাত্তার এসে দাঁড়াল।
প্রমথ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো
কিন্তু প্রথমে লক্ষ্মী তাতে রাজি হ'লো না।
পরে প্রমথের কাছ থেকে একটা নির্ভরতার
আভাস পেয়েই লক্ষ্মী প্রমথের সঙ্গেই কাশী

রওনা হ'ল। কাশীতে এসে তারা স্বামী-
স্ত্রীর পরিচয়েই বাধ করতে আরম্ভ করল।
অবশ্য এটা লক্ষ্মীর সমস্ত বাঁচাবার জন্যেই
করা হয়েছিল।

কিন্তু তাদের এই জীবনযাত্রা আর একটি
লোককে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে হ'চ্ছে
প্রমথের বালা-বন্ধু চিত্র-শিল্পী শ্রুত।

এদিকে লক্ষ্মী এই কাল্পনিক জীবন-
যাত্রার প্রণালী ব'লে ফেলবার জেগেই
একদিন স্বামী অচলানন্দের আশ্রমে এ'লে
উপস্থিত হ'ল। এবারে সেই আশ্রমে
স্বামীভাবে থাকবার অভিপ্রায় জানিয়ে
স্বামীজীকে রাজী করলেন।

যেমন করিয়া হউক লক্ষ্মীর স্বত্ত্বালায়ে
এই সংবাদটা আর গোপন ছিল না।
জহরলাল মতলব দিয়া তাঁহার কুচক্রী
নায়েব-এর নিকট হ'তে এক পত্র পেলেন
যে লক্ষ্মী ম'রে গেছে।

জীকে লভিাই প্রিয়লাল ভালবাসত।
এতদিনে হয়ত' সে নিজের ভুলও বুঝতে
পারল। তাই লক্ষ্মীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে
সে কাশীতে এসে উপস্থিত হ'ল।

এখানে এসে সে লক্ষ্মীর দর্শন পেল।
কিন্তু আজ লক্ষ্মী আশ্রয় হারা নয় জেনেও
তাকে কি'রিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। প্রমথ
প্রথমে ভীষণ আপত্তি জানালে কিন্তু পাছে
তার উপস্থিতি পুনর্দিলনের পক্ষে বাধা
জন্মায় সে ভয়েই সে কাশী ছেড়ে চলে গেল।
আর এদিকে লক্ষ্মীও স্বামীর পায়ে প্রণাম
জানিয়ে আশ্রমে এসে হাজির হ'ল।

উপরের কাহিনী থেকে সহজেই বোঝা
যায় যে আলোচ্য চিত্রের কাহিনীর সঙ্গে
মূল কাহিনীর অনেক তফাৎ। আমরা কিন্তু
চিত্র নাট্যকারের পরিবর্তন কাহিনীটিকেই
support করি। সত্যি কথা বলতে কি
যে, চিত্রনাট্য এই ভাবে সব সময়ই
পরিবর্তন করে ছবির উপযোগী করা উচিত।

তাতে ছবির লম্পট বাড়ে বই কমে না।
কণী বাবু এবিষয়ে বাস্তবিকই একটা ভাল
কাজ করেছেন যার ফলে গল্পটির narration
হয়েছে তত্বতক্কের সরবরে। সুরেশ চরিত্রটিও
তার চমৎকার সৃষ্টি। আর তাম্ব বাবু
অভিনয় এর রূপ দিয়ে তার সৃষ্টিকে আরও
উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তবে একথাও আমরা
বলব যে মহাবীর চরিত্রটি একেবারে বাঁধ
হওয়া উচিত হয়নি।

পরিচালনার প্রকৃষ্ট বাবু কোন
রকম মার পাঁচের মধ্যে না গিয়ে
ভালই করেছেন। এত বড় একটা
heavy themeকে সোজাভাবেই হর্ষকদের
লামনে কেনে দিয়ে তিনি বখেঁট ভাববার
অবকাশ দিয়েছেন। আর তারই জন্তে
ছবির মধ্যে কোন রকম relief না থাকার
অভাবটা লক্ষ্যে ধরা পড়ে নি।

অভিনয় এর দিক থেকে আমাদের সব
চেয়ে ভাল লেগেছে সুরেশ চরিত্রে তাম্ব
বাবুর অভিনয়। সত্যিই এমন একটা
চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারা একমাত্র তার
পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। আর একজনের
অভিনয় আমাদের ভাল লেগেছে সেটা হচ্ছে
নাগমা রূপী মেনকা। মলিনা লক্ষ্মী চরিত্রটির
spiritটিকে যেভাবে শেষ পর্যন্ত maintain
করে রেখেছে তাতে সত্যিই তার অভিনয়
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। শৈলেন
চৌধুরীর প্রকাশ ও জীবন গাঙ্গুলীর প্রমথকে
ভালই বলা যেতে পারে তবে আরও উন্নত
হওয়া উচিত ছিল। ক্ষুদ্র চরিত্রের মধ্যে
গফুর এর চরিত্রটি আমাদের খুব ভাল
লেগেছে।

আলোকচিত্রের কাজ বিমল বাবুর কাছ
থেকে যেমন আশা করা গিয়েছিল তেমনই
পাওয়া গেছে। রাত্রে রক্তাক্ত খুব চমৎকার,
এর পূর্বে আর দেখা যায়নি।

বাণী বস্তুর শব্দ গ্রহণ ভালই। তবে
যে একটু ঘোষ ঘোষা গেছে তা 'কেডার'

গোলমালের জন্তেই হয়েছে বলে মনে হয়।

লক্ষীত এর দিক থেকে বলতে গেলে এর
আবহলক্ষীত আমাদের বোটেই ভাল লাগেনি।
গানের মধ্যে মলিনার সুখে 'রূপ কথার-ই
রাজা এলে' গানটির সুরটি আমাদের খুব
ভাল লেগেছে। গানের সুরটি কিন্তু আমাদের
পক্ষজ বাবুর সুর হওয়া বলে মনে হ'ল।
অথচ title cardএ লক্ষীত বিভাগে পক্ষজ
বাবুর কোন নামই দেখলাম না—এমন কি
সহকারীদের মধ্যে নয়। এর কারণ কি?
পক্ষজ বাবুর রবীন্দ্র লক্ষীত বেশ ভালই
হয়েছে। বহিঃ এর সঙ্গে Dramaর কোন
লক্ষ্যই নেই তবুও এটার দরকার ছিল কেন
যে তা না বলাই ভাল। যাক হর্ষকদের
পক্ষে এটা একটা কম লাভ নয়। একে
পক্ষজ মল্লিক—তাই রবীন্দ্র লক্ষীত। বীরেন
বল এর গানটিও ভাল হয়েছে।

লম্পাধনা ও লেবোরেটরীর কাজ লক্ষ্যে
বলবার কিছুই নেই।

মোট কথা 'অভিজ্ঞান' হয়েছে এমন
একটা ছবি যা প্রকৃত 'বাঙলা চবির' গর্ব
স্বীকৃতি করতে পারে।

“রেশমী রুমাল”

চিত্র-নির্মাণ—বীণা পিক্‌চাং
কাহিনী—৬মোক্ত বসু
পরিচালনা—তিনকড়ি চক্রবর্তী
আলোক-চিত্র—ননী সাম্রাণ
শব্দযন্ত্রী—মল্লীল
শিল্প-নির্দেশক—পদ্মেশ বসু
ভূমিকায়—মিঃ শ্রীচাঁদ—ডাঃ হরেন

মুখার্জি, মিলেন্স শ্রীচাঁদ—প্রভা, রামলোচন—
গোকুল মুখার্জি, আলাকালী—উষা দেবী,
ওস্তাদ—চলিত মিত্র, মিত্রা—সাবিত্রী,
সামিনী—দেবীদাস ব্যানার্জি, বলা—কমলা।

চিত্র পরিবেশক—রীতেন গ্রুপ কোং
প্রথম মুক্তি—‘ত্রি’ বৃথবার, ৮ই জুন।

“রেশমী রুমাল” ছবিখানি বছর হ'য়েক
আগে তোলা। ছবিখানি সেই সময় মুক্তি

লাভ কোরলে হয়তো কিছু শোভন হ'ত
কিন্তু এখন ছবিখানার মুক্তি না হ'য়ে যেমন
লোকচক্রর অন্তরালে ছিল তেমন থাকলেই
ভাল হ'ত এবং কর্তৃপক্ষের তা'তে রসজ্ঞানের
পরিচয় পাওয়া যেত।

একখানি “রেশমী রুমাল”-কে বেক্সীকৃত
কোরে আশা-নিরাশা, প্রেম-অভিমান ও হাত-
রনের ভেতর দিয়ে এই ছবির যবনিকা পাত
হয়। গল্পটি অতি নিয়ন্তরের।

আলোকচিত্র, শব্দযন্ত্র এবং অভিনয়ে ডাঃ
হরেন, প্রভা, গোকুল, চলিত মিত্র ও উষার
অভিনয় চাড়া ছবিখানির প্রশংসা করবার
মত আর কিছু বুঝে পেলাম না বলে
আমরা চুপেছি।

“জগাপিনী”

এই সঙ্গে বাণী-ফিল্মস্ নামে হঠাৎ
গজানো প্রতিষ্ঠানের ছোট হালির ছবি
“জগাপিনী” দেখানো হয়। এ লক্ষ্যে বেশী
কিছু লেখা নিশ্চয়োজন।

দেশের মাটি

পরিচালক নীতীন বসুর ছবি প্রায় শেষ
হয়ে এলো, আর কয়েকদিন বাবেই
লেমুলরেডের কিতোর বস্তা শুকো লম্পাধকের
কাঁচির মুখে জড় হবে।

নিউ থিয়েটার'দের এক নম্বর ফ্রোয়ে বস্তার
সেট খাড়া হয়েছে। শব্দ রাস্তা আর গায়ে
গায়ে মেটে ঘর। মোড়ে মোড়ে গাভের
তলার জটলা। লোক হাঁকছে—চীৎকার

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের ঢা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

করছে। চারিদিকে সব উঠেছে—জমী বেচো, জমী বেচো।

পরিশ্রমের অন্ত নেই নীতীন বহুর। এ ছবি ভাল হবে লবাই আশা রাখে। নীতীন বাবু যে নতুন কিছু করেন এ কথা লবাই জানে।

স্ট্রীট সিদ্ধান্ত

সুন্দর নির্মূল সেট, ভুলুমার এই হোতালা বাড়ী। চরিত্র এবং অবস্থার মিল রেখে এ বাড়ীর প্রত্যেক ঘর খানি লাজানো। পরিচালক ফনি মজুমদার এবং প্রযুক্তিক প্রমোদ রায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন এ সেটের প্রত্যেক জিনিষটিকে সুন্দর করতে। কয়েকদিন ধরে এই সেটে স্টুটিং চলছিল।

এই সেটে অভিনয় করলেন শৈলেন চৌধুরী, জগদীশ শেঠী, শ্রীমতী কানন প্রভৃতি। কান্না ও হাসি, মান ও অভিমান কত পালাই

এখানে হোল। পরিচালকের মতে সব কটিই ভাল হয়েছে।

বড়দিদি

অভিজ্ঞান চিত্রখানি সমাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক মল্লিক মশাই এই ইউনিটের কুশলী শিল্পীদের সহযোগে বড়দিদির কাজ শুরু করলেন। পঞ্জীর বিধান অনুযায়ী, অঙ্ককার এই শুভ দিনে মল্লিক মশাইয়ের ছবির উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হবার কথা। যে উত্তর, বস্ত্র ও উৎসাহ নিয়ে মল্লিক মশাই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, আশা করি নট নাগের আশীর্বাদে তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবে। আমরা বারাস্তরে এই চিত্রের অগ্রাগ্র বিবরণ প্রকাশ করবো।

অধিকার

আনোয়ার শা রোডে নিউথিয়েটারের ছ' নম্বর ষ্টুডিওতে ছবি উঠতে যেনে রাতে। আটটি আর টেকনিসিয়ানদের নিখাল

কেলার সময় নেই। পরিচালক প্রমথেন জিন্নের প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন। জুন মাসেই তিনি ছবি শেষ করবেন।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারার পরিচালকের সুনাম আছে কাজেই এ ছবি যে এ মাসে শেষ হবে এ আশা আমরা করতে পারি।

আর মিউজিক কমে রিহর্সাল চালাচ্ছেন তিমির বরণ। লবাই বলাবলি করছে এমন মিউজিক নাকি বাংলা ছবিতে আর দেখা হয়নি।

ভারতের অর্কেস্ট্রা জগতে তিমির বরণের স্থান অতি উচ্চে। সুরে তানে লয়ে ও মেলডিতে আর করজেন তাঁর মত অর্কেস্ট্রা সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলা শক্ত।

বাংলা গানের সঙ্গে অর্কেস্ট্রার মেলোডি হয়ত তিনিই আমাদের প্রথম শোনাবেন।



নিউ থিয়েটারের "বংশের মাটি" চিত্রে বখাজুং অজর ও অরুণার ভূমিকার দুর্গাধার ও চন্দ্রাবতী।

বিভাপতি

চিত্রার বিভাপতি ১২ লগ্নাহে পড়িল। ১০ লগ্নার চিত্রার ৫৩ হাজার টাকা নেট লেন হয়েছে। এই ছবির লগ্নে নব নিমিত্ত 'এয়ার কুলিং প্রাণ্ট' ও একটি আকর্ষণীয় বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পাণ্ডুবাবুর এত দিনকার পরিশ্রম সার্থক হ'ক এই আশাহের ইচ্ছা।

দেবকী বসু

পরিচালক দেবকী বসু মহাশয় তাঁর পরবর্তী ছবির 'পেপার ওয়াকন' শেষ করে ফেলেছেন। আশা করা যায় এই মাসের মধ্যেই তিনি মহলা বসিয়ে দেবেন। বতসুর শোনা যাচ্ছে তাতে এবার নাকি কানন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রথীন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর ছবিতে স্থান পাবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি কথা বলতে চাই। দেবকী বাবু এবার যে গল্প ঠিক করেছেন তা নাকি বাঙলা দেশের পল্লী-গ্রামের একটি 'লাপুড়ের' কাহিনীর উপর রচিত। আর সেই গল্প রচনার তাঁকে সাহায্য করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হ'লাম যে কয়েকদিন আগে যে কাজী লাহেব দেবকী বাবু ও নিউ থিয়েটার্সকে 'সাময়িক' পত্রিকার পাতায় এমন অভদ্রভাবে গালাগালি দিলেন তিনি কি করে আবার নিউ থিয়েটার্সের দরজার চুকলেন? এবারও কি নিউ থিয়েটার্স তাঁর দরজার হত্যা দ্বিগুণে তাঁকে নিয়ে এসেছে? আগামী লগ্নার এ লম্বকে আমরা আলোচনা ক'রব।

হাজারা পিক্চাস

নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে রাণীগ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে সুখজোড়া নামে একটি লাওতাল পল্লী থেকে "দেবী ফুলরা"র বহিঃস্থ ভুলে পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী, সহকারী কালীপদ রায়, আলোকচিত্র-শিল্পী

বিভূতি লাহা ও নারিকা শিক্তাবালকে নিয়ে কোলকাতার প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই দৃশ্যটি ছিল যখন দেব-চরিত্র স্বামী কালকতু ভাড়াবস্তুর প্রভাবে সুরা ও নারীর মোহমহিরায় নিমজ্জিত সেই সময় দেবী ফুলরা তাঁর প্রজাপুত্রকে আহ্বান কোরলেন স্বামীকে এই অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। এই দৃশ্যটিকে সবধিক থেকে সুলম্বক করে তুলবার জন্য পরিচালক স্থানীয় প্রায় ছেড় হাজার লাওতাল জমায়েৎ করেন এবং আমরা খবর পেলাম প্রোজেকশন রুমে এই দৃশ্যটি দেখা হ'লে সবাই একবারেই স্বীকার করেন—"বাঙলা ছবিতে এই দৃশ্যটি নতুনত্বের দিক থেকে নিশ্চয়ই লক্ষ্যকৃত হবে।"

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন

বিগত অধিবেশনে এই বৎসর কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা নির্বাচন হইয়াছে।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

লিডার—শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু

ডেপুটি-লিডার—শ্রীযুক্ত নীলীপ চন্দ্র সেন

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী

সেক্রেটারী—কুমার বিশ্বনাথ রায়

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিহ

মিঃ খলিলুল্লর রহমান

হইফ—শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যুগেন্দ্র কুমার মজুমদার

লগ্নাতি স্বরাজ কতৃক লাহিত ও অপমানিত ফুলরা ও কালকতুর দৃশ্যটি তোলায় লগ্নে লগ্নে ছবিখানির স্টুটি শেষ হ'য়েছে। এই দৃশ্যটি ছবিখানির একটি বিশিষ্ট দৃশ্য সেইজন্য অহোজ্ঞ চৌধুরী, শিক্তাবালা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মোহন রায় প্রভৃতি সবাই-ই এই দৃশ্যটিকে সুরাভিনয়ের দ্বারা সুলম্বক করে তুলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

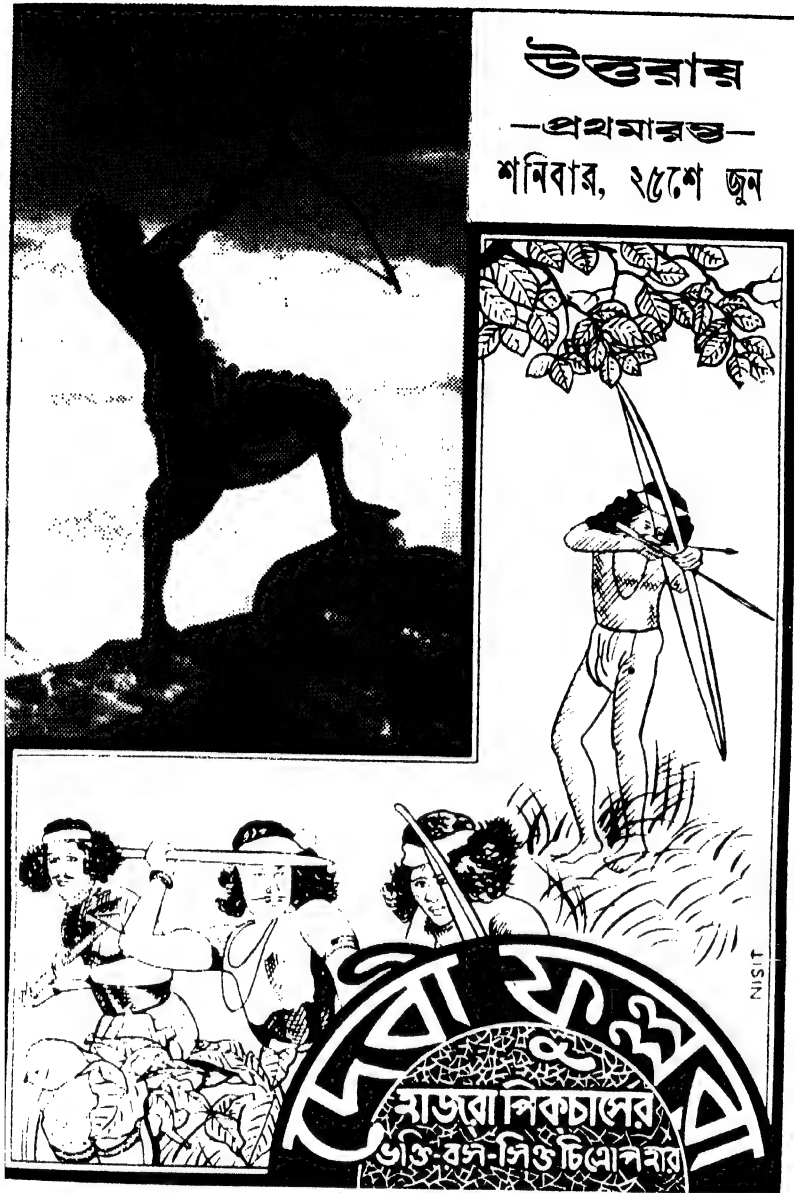
"দেবী ফুলরা" পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই লগ্নাতেই মুক্তি পেত কিন্তু তিনকড়ি বাবু ছবিখানিকে সবধিক থেকে সুলম্বভাবে যাতে আশ্রয়প্রকাশ কোরতে পারে তার জন্য আর এক হলো পরে অর্থাৎ ২৫শে জুন মুক্তিদিবস ধার্য্য করেছেন। আমরা "দেবী ফুলরা" লম্বকে উচ্চ ধারণা পোষণ করি। এমসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র নিবেদন রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"-র একটি বহিঃস্থ গেল হল্যার শেষ হ'য়েছে। প্রকাশ যে, এই ছবিতে বিনোদিনীরূপে সুপ্রভা মুখার্জি, আশার ভূমিকায় ইন্দিরা রায় এবং মহেন্দ্র ও বেহারীর অংশে যথাক্রমে ডাঃ হরেন মুখার্জি ও ছবি বিশ্লেষণ সুরাভিনয়ের দ্বারা ছবিখানির গৌরব বৃদ্ধি কোরবেন। এদিকে পরিচালনার, লক্ষণম্লে ও আলোকচিত্রে লতু সেন, মধু শীল ও ননী লাত্তাল অসামান্য কিছু না দেখালেও তাঁদের কাজ যে আধুনিক পর্যায়ে স্থানলাভ কোরবে, এ ধারণা করা অসমীচীন নয়। তা' ছাড়া লগ্নীত বিষয়ে যে "চোখের বালি" নিজ বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে এ কথা ভ্রব লভ্য। কারণ, অনাধি দ্বিত্বহার ও সুরেন দাস প্রভৃতি দ্বারা এই বিভাগ পরিচালনা করেছেন তাঁরা সবাই এ বিভাগে কৃতিশিল্পী। "চোখের বালি"-র সাফল্যের জন্য মিঃ বি, পি, মেহেরা যে অদম্য উৎসাহ নিয়ে কাজ কোরছেন, তা' আশাহের মনে হয়, কখনই ব্যথা যাবে না।

পূর্ব থিয়েটার্স

'রাজগী' আলছে শনিবার থেকে এখানে তৃতীয় লগ্নাহে পড়বে।

রাজগী ছবির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ কুমার শচীনদেব বর্মানের গান—ভাড়া মেনকা, দীরাজ ও অজ্ঞাত সকলেই তাদের স্ব স্ব ভূমিকায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিখানি হয়ত আরও ২।১ লগ্নাহ চলবে।



উত্তরায়
—প্রথমায়ত্ত—
শনিবার, ২৫শে জুন

দেবী ফুল্লরা

*

একদিকে—

প্রেম ও ভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন!
কর্তব্য ও নির্গাম মহিমোজ্জ্বল!
শৌর্য ও বীর্য গরীম্যান!
স্বামী ভক্তিতে মহীম্যান!
পত্নী প্রেমে আদর্শোজ্জ্বল!

অন্যদিকে—

কটকটীর চক্রান্ত-জাল!
নারীর রূপে লালসাদক্ নর!
শয়তানির চরম পরিণতি!
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দ্বন্দ্ব!

প্রভৃতি বহু ঘটনার
সমাবেশে সমুজ্জ্বল।

*

দেবী ফুল্লরা

বাড়ীর ছেলেমেয়ে থেকে বুড়-
বুড়ী সবাই মিলে এক সঙ্গে
বসে ছবিখানি দেখলে
প্রকৃত আনন্দ পাবেন।

*

ভূমিকায়—অশীল চৌধুরী, শিশুবালা,
মনোজ্ঞন ভট্টাচার্য্য, মোহন রায়, রাধাপাণি,
সাপিজী, দুর্গা বসু, চিত্রা, রাণী,
তিনকড়ি চক্রবর্তী।

*

পরিচালক :—তিনকড়ি চক্রবর্তী
প্রধান বঙ্গ-শিল্পী :—মধু শীল
আলোকচিত্র-শিল্পী :—বিভূতি লাহা
শব্দ-যন্ত্রী :—যতীন দত্ত

অগ্রিম প্রবেশ পত্র সংগ্রহ
করুন।

বিবিধ

শুভ-বিশ্বাস

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহরায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান গুণেন্দ্র কুমার গুহরায়ের লিখিত শ্রীযুক্ত অমল কুমার বসু মহাশয়ের প্রথম বক্তা শ্রীমতী রূপনার শুভ-পরিণয় গত মঙ্গলবার ৭ই জুন ৫০নং মহিষ হালদার রোডে সুলক্ষ্মণ হট্টের গিটারে। আমরা নব দাম্পত্যীরা শুভ কামনা করি।

মিতালী সংসদ

রাজা কিশোরী লাল মেমোরিয়াল হলে শ্রীরাধপুর গোস্বামীপাড়া মিতালী সংসদ কর্তৃক জুন মাসের শেষ লগ্ন্যাহে এক বিরাট জলদার আয়োজন করা হইয়াছে। শ্রীরাধ-পুরের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীঅমলীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও চেয়ারম্যান শ্রীকানাইলাল গোস্বামী ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।

শিল্প-সদন

প্রতিভাশালী শিল্পী শ্রীযুক্ত অখিল নিরোগী গতাহুগতিক পস্থা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিবার জন্য ৮৭নং বর্ধওয়ালিঙ্গ ষ্ট্রীটস্থ বাগদী বিজ্ঞাবোধি ভবনে শিল্পসদন নামে একটি চিত্র বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লকাল ও লক্ষ্যায় যথাক্রমে ছাত্র ও ছাত্রিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ও ছাত্র ছাত্রিগণ বাহ্যতে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শী হইতে পারেন যেজন এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য লক্ষ্যাবেলা ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে দেখা করা বাঞ্ছনীয়। আমরা এই নব গঠিত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যকৌশল লক্ষ্য করি।

—*—

অপ্রভঙ্গ

শ্রীমসন্ত কুমার আচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আরো মাল কতক এমনি জোড়াতাড়ি দিয়ে কাটলো। আজও প্রত্যেকের আত্ম-প্রত্যয় আছে প্রচুর তবে আত্মীয়ের ওপর প্রত্যয়ের ষটেছে একান্ত অভাব।

একদিন রতীন বেরিয়েছে নিজের থানায় এমন সময় রেবা খুললে রতীনের উপস্থান-থানা। এখানে রতীন আরম্ভ করছিল মালচারেক আগে কিন্তু আজও তার চতুর্থ পরিচ্ছেদের বেশী এগোয় নি। খানিকটা পড়েই রেবা রায় বলে "রাবিশ!" ওসব লেখা আবার পাঠক লম্বাজে চলবে আর তাই দিয়ে রতীন পাবে ঐশ্বর্যা, খ্যাতি। দিন তিনেক পরেই রেবা যখন পাশের ঘরে একথানা নতুন গান অভ্যাস করছিল তখন রতীন কাণ পেতে শুনে মত প্রকাশ করলে "লেই খোড় বড়ি খাড়া।" এই গান আবার লোকে পরলা দিয়ে কিনবে!

বাস! দাম্পত্য জীবনের আশা, ভরসা, শান্তি, লাঞ্ছনার হয়ে গেল অকাল সমাধি। ওই যে নিজের ওপর অশঙ্ক বিশ্বাস, তাই ছুজনের মাঝে পাঁচিলের মত খাড়া হয়ে উঠলো, মিটমাট আর লম্ববপর হোল না। সে কথা তুলে ছোট হবার ভয়ে কেউ সে কথা তুলেও না। রেবা তাবলে অল্প পাঁচজনের মত কোন অফিলে চাকরী করে রতীনের লংলার চালালো উচিত আর

রতীনও তাবলে অল্প পাঁচটা ঘরের মত রেবারও ঘরে থেকে লংলার দেখা শুনো করা উচিত। তবু সে কথা ল্পষ্ট করে বলা মানে আশ্বিন নিয়ে হুণাহলিক খেলা ভেবে ছুজনেই চুপ চাপ রইলো আর দিন আগে যেমন কোন রকমে কাটছিল তেমন কাটতে লাগলো।

মাণখানেক পরে একদিন ভাতের পচা গরমের রাত আটটার বাড়ী ফিরে রতীন দেখে রেবা বাড়ী নেই। সে ক্রান্ত বেহে বাড়ী ফিরে এক কাপ চা না পেয়ে লেখবার টেবিলের সামনে চুপ করে বসে রইলো। আর রাত দশটার "গীতবীথি"র বাৎসরিক উৎসব থেকে বাড়ী ফিরে রেবা দেখে বাথরুমে না আছে জল, না আছে একথানা লাবান। বাকুবে আশ্বিন রতীনই লাগালো। রেবা ঘরে পা দিতেই রতীন ঝাড় ফিরিতে বলে "তারপর?"

রেবার জামা বামে ভিজে গেছে, চুলগুলো কপালে কুলে পড়েছে, মুখ তার ক্যাকালে হয়ে গেছে। সেও বলে উঠলো "বাথরুমে জল একটু রাখলেও পারতে।"

রতীন জলে উঠে বলে "তেতে পুড়ে এলে চা এক কাপ বরকার হয় লেটা হুস রাখলেও পারতে। আমি রাখবো ওর নাইবার জল! বলতে লজ্জাও হয় না!... চুপ করে থাকো, মুখ নেড়ো না।"

(ক্রমশঃ)



GRAM: "ADNIVAG"

ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

রাণীমা এসেছে.....

শ্রীমতী শিশুবালা



শ্রীমতী শিশুবালা

সুখজোড়া, সুখজোড়া, সুখজোড়ার
সুখস্বৃতি আমি ভুলতে পারবো না।
সুখজোড়া একটি অমল্য পার্বত্য-পল্লী তবুও
তার ভেতর এত আনন্দের কলরব আমার
মনগ্রাণ জুড়ে রয়েছে কেন? বোধ হয়
সুখজোড়ার গিয়ে আমি নবজন্ম লাভ
করেছি তাই সেই পার্বত্য কুসুম-পল্লীর
সুখ-স্বৃতি আমার জীবনকে সুধার করেছে
—আমার অভিনেত্রী জীবনকে সার্থক
করে তুলেছে।

আমল ব্যাপার কী তাই আপনাদের
জানাবো। জানিনা এই কল্প রিত্তা নিয়ে
তা' ভালভাবে ব্যক্ত করতে পারবো কিনা!
তবুও এ গল্প একজনকে, দু'জনকে হাজনকে
বলে আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না—তাই কাগজে
কলমে লেখার আশার এ দুঃসাহসিকতা।

আপনারা বোধ হয় জানেন, কাজরা
পিকচারের পৌরাণিক চিত্র "দেবী কুমারী"-তে
আমি নাম-ভূমিকার অভিনয় করার
গৌড়াগ্যলাভ করেছি। এই ছবিরই
একটি বাইরের দৃশ্য তোলবার জন্য গেল
হুগুয়ার আমাকে সুখজোড়ার যেতে হয়।
দৃশ্যটি ছিল—বন মহামায়ার আলীকর্ষাণে
বাদ্য-পল্লী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হ'ল এবং
সেখানকার রাজা-রাণী হ'ল কালকেতু ও
কুমারী...তারপরে কুটিলকী ভাঙুসের প্রভাবে
বন কালকেতু স্ত্রী ও নারীর মোহময়িরায়
নিমজ্জিত; সেই সময় দেবী কুমারী দেব-
চরিত্র স্বামীকে এই অধঃপতনের হাত
থেকে বাঁচাবার জন্য তুর্গানিনায়ে তার
প্রিয়তম প্রজাদের আহ্বান করলেন।
তার রাণীর এই আহ্বান শুনে পেরে

হলে হলে বন-ভঙ্গল, পাহাড়-পর্বত অতিক্রম
করে দেবী কুমারীর নবীপে উপস্থিত হ'ল।
এই দৃশ্যটি চমকপ্রদভাবে গ্রহণ করার জন্য
কোলকাতা থেকে বহুদূরে সুখজোড়া নামে
এক লাঙতাল পল্লীতে আমাদের যেতে হয়
এবং সেখানে গিয়ে আমি যে অভিজ্ঞতা-
লাভ করেছি সেই কাহিনীই আজ আমি
এখানে বলবার চেষ্টা করব।

সুখজোড়া রাণীগ্রাম টেশন থেকে পাঁচ,
ছয় মাইল দূরে। রাণীগ্রামেরই এক
ভঙ্গলোক এই সুখজোড়াতে আমাদের সূটিং
করবার ব্যবস্থা করেন কিন্তু তিনি জ্ঞানভ্রম
না যে, কোন মেরেডেলে এই দৃশ্য আছেন
কিনা—তাই আমাকে বেধে তিনকড়িবাড়কে
বললেন—“একে নিয়ে সেই লোকেশনে
যাওয়া ত' মুকিল! কারণ, ওখানে পৌঁছবার
কোন রাস্তা নেই। ধানক্ষেতের আল, মাঠ,
নদী ও পাহাড় ভেঙ্গে তবে সেখানে
পৌঁছুতে হবে। এই শুনে তিনকড়িবাড়
প্রথমটা একটু ঘেঁষাড়ে গেলেন। আমাকে
জিজ্ঞাস করলেন—“মিস শিশু কী হবে?”
আমি মনে সাহস এনে বললাম—“দেখা-
যাক না কতদূর পৌঁছুতে পারি। আমার
কথা শুনে তিনি মনে একটু বল পেরে সেই
ভঙ্গলোককে বললেন—“ও শক্ত মেরে
আছে, দেখা যাক মহামায়ার ইচ্ছের কত-
দূর কী হয়!”

এই বলে দুর্গানাম শ্রবণ করে আমরা
বেরিয়ে পড়লাম। আমার জন্য একথানা
পাকির ব্যবস্থা হ'ল আর সবাই চলল
হেঁটে। প্রথম মাইল দৌড়ের ধান ক্ষেতের

আলের ভেতর দিয়ে গিয়ে আমরা একটি
নদী পেলাম। লাঙতালদের পারাপারের
জন্য নদীতে ছ'খানা লাঙতি ছিল। কোনরকমে
এক এক করে আমরা সেই লাঙতির
সাহায্যে ত' পার হ'লাম। তারপর আরও
নানা দুর্ভোগের পর পাঁচ-ঘণ্টা পরে আমরা
যথাস্থানে পৌঁছুলাম। এখানে এসে দেখি
চারিশাশে বনজঙ্গল এবং উঁচু উঁচু পাহাড়।
—আর সেই সব স্থান অধিকার করে
রয়েছে অমল্য লাঙতালরা ও হিংস্র জন্তু
জানোয়ারের। শোনা গেল, বাঘের উৎপাত
রাতে খুবই হয় কিন্তু তা'তে বত ভয় নেই
তার চেয়ে বেশী ভয় হ'চ্ছে লাপের।
এবং একথা যে খুব সত্য তার প্রমাণ
আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে
পেলাম। পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই কেউটে ও
গোধরা এলাপ চার পাঁচটা আশে পাশে
দেখতে পেলাম। এই অবস্থার সকলেরই
ত' প্রাণ শুকিয়ে গেল কিন্তু তখন এখানে
থাকা ভিন্ন আর গতাস্তর ছিল না।

আমরা এখানে এসে যেখানে উঠেছিলাম
সেটি হ'চ্ছে এখানকার জমিদারের খাজনা-
বাড়ী। লোকজন কেউ ছিল না, আমাদের
সঙ্গে যে ভঙ্গলোক ছিলেন তিনিই পূর্ব
থেকে আমাদের এখানে থাকবার ব্যবস্থা
করেন এবং তিনি এই দৃশ্যের জন্য প্রায়

ঘেড়-হাঁজার সাঙতাল নিরোজিত কোরে রাখেন। আমরা যেদিন লেখানে গিরে পৌছুলাম সেদিন আর শূটিং করা সম্ভবপর হ'ল না। পরদিন সকাল আটটার শূটিং আরম্ভ হবে একশ টিক হ'ল—কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের আবার আর এক মুকিলে পড়তে হ'ল—যে সকল সাঙতালদের এই দৃশ্যে জনতার জন্ত টিক করা হ'য়েছিল তারা কেউ আর বর ছেড়ে বেরতে চাইল না। খবর নিয়ে জানা গেল, তাদের নাকি কারা বুঝিয়েছে আমরা তাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। এই খবর শুনে ত' তিনকড়ি বাবু মাথার হাত দিয়ে বসলেন। এত কষ্ট স্বীকার কোরে যদি সব পশুশ্রম হয়, তা হ'লে ত' মুকিলের কথা। গতান্তর না দেখে টিক হ'ল কাল সকালেই তা'হলে পত্রপাঠ যাত্রা কোরতে হবে। এমন সময় যে ভক্তলোকটি আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি বললেন—“এক কাজ কোরলে হয়, কিন্তু তা'তে বিপদ আছে।” আমরা সব উন্মুখ হ'য়ে তাঁর কথা শুনার জন্তে উদ্গ্রীব হ'য়ে উঠলাম। তিনি বললেন—“সাঙতালদের মধ্যে যদি প্রচার কোরে দেওয়া যায় যে, তাঁদের রাণীমা এসেছে, তা' হলে হলে হলে ছেলে বড়ো সব আসবে রাণীমাকে দেখতে। কারণ, রাণীর ওপর তাদের ভক্তি অপরিণীম। কিন্তু যদি জানতে পারে যে, এ সকল রাণী তা' হ'লে হয়তো কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।” এই দ্রুতসাহসিক কাজ কোরতে সবাই ইতস্ততঃ কোরতে লাগলেন। আমি কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে সাহস পেয়ে বললাম—“আমি রাজী আছি।” আমার সাহস দেখে অল্প নকলে মনে মনে ভয় পেলেও মুখে আর কেউ কিছু বললেন না। তখনই লেখানকার সর্দার শ্রেণীর দু'একজন সাঙতালকে ডেকে বলা হ'ল রাণীমা আসবেন সব তৈরি হ'। তারা এই খবর পেয়ে

একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল এবং সেই সন্ধ্যার সময়ই ঢাক বাজিয়ে সেই খবর চারিদিকে রাষ্ট্র কোরে দিল।

পরদিন সকালে আমাদের ঘুম ভাঙবার পূর্বেই দেখি হলে হলে সাঙতাল নরনারী কোলাহল কোরতে কোরতে পাহাড়ের পাৰ্শ্বে দেখে জমায়েৎ হ'চ্ছে—তাদের রাণীমাকে দেখবার জন্তে। আমাদের সবাইও তাদের আশ্বাস দেবার জন্তে বেরিয়ে পড়লেন। তিনকড়ি বাবু যাবার সময় বললেন—“খুব সাবধান! তুমি ততক্ষণ রঙটঙ দেখে কাপড়-চোপড় পরে রাণী সেজে থাক—আমি ওদের গিয়ে বলি তোদের রাণীমা আজ তোদের সঙ্গে নাচবে, খেলবে—তোদের পরমা হবে।”

কিছুক্ষণ পরে আমি সঙ্গে সঙ্গে পালকি কোরে লেখান উপস্থিত হ'লাম। আমার পালকি দেখে হলে হলে সাঙতাল আমার পালকির চারিপাশে বিরে ধরল আমার দেখবার জন্তে। এই সময় পালকির ভেতর ভয়ে থর থর কোরে আমি কাঁপছি। তিনকড়ি বাবু তখন সাঙতালদের বুঝিয়ে বললেন—“তোরা সব পাহাড়ের ওপারে গিয়ে জড় হ' রাণীমা পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন; তিনি একটু পরে রাণী বাজালেই তোরা এসে রাণীমার সঙ্গে নাচবি খেলবি।” এই কথা বলতেই, সাঙতালরা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঁচু উঁচু পাহাড় অতিক্রম কোরে পাহাড়ের পরপারে সব জমায়েৎ হ'ল। তখন আমি পালকি থেকে বাইরে এসে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তুর্হানিনাদ করার হলে হলে সাঙতাল এসে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে তাগুব নাচ শুরু কোরল। ওদিকে আমাদের ক্যামেরাম্যান থোকাবাবু (বিত্তি লাহা) বখাস্থানে ক্যামেরা রেখে এই দৃশ্যটি সুন্দরভাবে গ্রহণ কোরে টেটিয়ে বললেন—‘ও-কে’। আমি তখন ভাড়াভাড়ি গিয়ে পালকিতে উঠলাম। কিন্তু তাতেও কী নিস্তার আছে। হলে হলে সাঙতাল নরনারী

পালকির আশে পাশে উঁকি বুকি মারতে লাগল আমার আবার দেখবার জন্তে। তিনকড়ি বাবু সেই সময় তাদের রাণীমা সবাইকে বকশিস দিয়েছেন বলে অত্যধিক নিয়ে গিয়ে টাকা পরমা দেবার ব্যবস্থা কোরলেন। আর আমার লেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছিত কোরলেন। সেই দিনই তৎক্ষণাৎ প্রাণে বেঁচে আমরা সেই দুর্গম পথ অতিক্রম কোরে রাণীগ্রামে পৌছিয়ে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম। সেইদিন রাত্রেই খাওয়া দাওয়া কোরে আমরা কোলাকাতার

ডাঙরের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত-বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

ফুটবল

(সি, বি)

ফুটবল

গত ৬ই জুন তারিখে প্রথম ডিভিশন লীগ প্রতিযোগিতার তিনটি খেলা হয়েছিল। তার মধ্যে মহম্মেদান স্পোর্টিং ও কে ও এন বি দলের খেলাটি উভয় পক্ষ দুটি করে গোল প্রদান করার সমীকরণে শেষ হয়েছিল। এই খেলাটিতে দৈত্য দল গর্ক অনুভব করলেও মহম্মেদান দল খেলাটির পরিনামে বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নি। দৈত্য দল প্রকৃতই এই খেলাটিতে কৃত্তিম দেখিয়েছে। মহম্মেদান স্পোর্টিংয়ের ত্রায় শক্তিশালী দলের নিকট হবার একটি করে গোলে পশ্চাতে থেকে হবার তা পরিশোধ করে তারা নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়েছে। তবে মহম্মেদান দলের রহিমের একটি গোল অফসাইডের অজুহাতে অগ্রাহ্য হওয়া এবং তাঁর পেনাল্টি শটটি পোষ্টে লেগে ফিরে আসতে এই খেলাটির উজ্জ্বল প্রকাশ পেয়েছিল। মহম্মেদান দলের জুমা খাঁ, হুসন মাহমুদ (বড়), আব্বাস, রহিম, ও হুসন মাহমুদের (ছোট), খেলা ভাল হয়েছিল। দৈত্য দলে ফাটন, খমশন, মুন, রা, মিকল, ও লাইসনের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। প্রথমার্ধে চার মিনিট খেলা চলবার পর আব্বাস একটি গোল করলে (১-০) শেষের দিকে কিলিপস গোলটি

রওনা হ'লাম—কিন্তু বায়োকেপে অভিনয় করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করেছি তা আজও আমার মনকে এক কিলের যেন আনন্দে মাতোয়ারা করে রেখেছে।

পরিশোধ করেন (১-১)। লায়ু আর একটি গোল করবার পর (২-১) প্রথমার্ধে শেষ হয়। খেলাটি শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে সুইনি হেড করে দ্বিতীয় গোলটি পরিশোধ করেন ২-২। দুটি খেলার মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল ও ক্যামেরো-নিয়ানস দলের খেলাটিতে কোন গোল না হওয়ার প্রতিপক্ষ দু'দুটি একটি করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের আর মজুমদার, বি লেন, ও এ নন্দীর খেলা সর্বাপেক্ষা ভাগ হয়েছিল। কালীঘাট ও কাষ্টমস দলের খেলাটিতে শেষোক্ত দল কোনক্রমে ১-০ গোলে জয়লাভ করেছে। কালীঘাট দল অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে খেলতে তাদের জুনিয়র গোলরক্ষক এন্ হালের ক্রটিপূর্ণ খেলার জন্য পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছে।

গত সপ্তাহের আরেকটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা পুলিশ দলের নিকট মোহনবাগান দলের পরাজয়। এবছর এই ভারত বিখ্যাত দলটি এর আগে পরাজিত হয় নি। অবশ্য এ জন্ম মোহনবাগান দলের অধিনায়ক বিমল মুখার্জী ও লতু চৌধুরী অভাব অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়া অধিকাংশ জুনিয়র খেলোয়াড় দ্বারা এই হীনকার দশটি গঠিত হওয়ার মোহনবাগান দলের খেলা আশাহত হয় নি। পুলিশ দলের টেম্পলটন ও জেমিস প্রথমার্ধের শেষের দিকে ও দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে একটি করে গোল প্রদান করবার পর শেষ সময়ে এ রায় চৌধুরী একটি গোল পরিশোধ করতে

লক্ষ্য হন (২-১)। কালকাটা ও এরিয়াল দলের খেলাটিতে প্রথমার্ধে দল একটিমাত্র গোলে জয়লাভ করে দুটি মূল্যবান পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এই খেলাটিতে বিজয়ী দলের গোলরক্ষক এডেনের অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য।

বৃহস্পতি ৮ই জুন তারিখের দুটি খেলার মধ্যে একটিতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের বিপক্ষ ভবানীপুর্বে ক্লাবকে ২-১ গোলে পরাজিত করেছে। এই খেলাটিতে এস্ চ্যাটার্জি বিজয়ী দলের আক্রমণ ভাগের শক্ত অনেকাংশে বর্ধিত করেছিল। প্রথমার্ধেই তিনটি গোল প্রদত্ত হওয়ার খেলাটির শেষ সীমাংসা হয়ে যায়। পনেরো মিনিটের সময় লক্ষ্মীনারায়ণ একটি গোল প্রদান করবার (১-০) পাঁচ মিনিট পরে এস্ চ্যাটার্জী আর একটি গোল করেন ২-০। আলেকজান্ডার একটি গোল পরিশোধ করলে (২-১) প্রথমার্ধে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে আর কোন গোল হয় না। অপর খেলাটিতেও মহম্মেদান স্পোর্টিং ক্লাবকে ২-১ গোলে ই বি আর দলকে পরাজিত করতে লক্ষ্য হয়। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে রহিম একটি গোল প্রদান করে ১-০ দ্বিতীয়ার্ধে রেল দলের বি কর গোলটি পরিশোধ করবার পর (১-১) খেলাটি শেষ হবার ঠিক পূর্বে মহম্মেদান দলের হুসন মাহমুদ (ছোট) একটি গোল প্রদান করে (২-১) নিজ দলকে জয়যুক্ত করেন।

গত বৃহস্পতিবার মোহনবাগান ও কে ও এস বি দলের খেলাটি অসুস্থিত হয়। উভয় পক্ষ একটি করে গোল প্রদান করতে সক্ষম হওয়ার খেলাটির শেষ নিষ্পত্তি হয় নি। প্রথমার্ধের নয় মিনিট অতিবাহিত হবার পর মোহনবাগান দলের এ রায় চৌধুরী নিজ দলের একটিমাত্র গোল করেন ১-০ দ্বিতীয়ার্ধের শেষ সময়ে দৈত্য দলের লাইমন গোলটি পরিশোধ করলে খেলাটি শেষ হয়। খেলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটির কোন কোন

খেলোয়াড় অখেলোয়াড়জনোচিত মনোভাবের পরিচয় দেন। এবং শেষ পর্যন্ত পরিচালক, এস্ চ্যাটার্জি এবং নিবন্ধকে মাঠ পরিত্যাগ করবার আদেশ প্রদান করতে বাধ্য হন।

কালীঘাট ও ক্যামেরোনিয়ানস্ দলের খেলাটির আশ্চর্যজনক পরিণতি হয়েছে। কালীঘাট দল উত্তরার্ধে একটি করে গোল প্রদান করে জয় লব্ধকে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে নিজেকে খেলার শৈথিল্য প্রকাশ করে। লৈঙ্গ দল এই সুযোগের অবসর নিয়ে শেষ তিন মিনিটের মধ্যে দুটি গোল পরিপোষ করে (২—২), অবশ্য লৈঙ্গ দলের একটি গোল পেনাল্টি কিং থেকে হয়। কালীঘাট দলের জয়া দুটি এবং লৈঙ্গ দলে রে, এবং শ্রীখ প্রত্যেকে একটি করে গোল প্রদান করেন।

সুক্রবাতের একটিমাত্র খেলার কাষ্টমস্ দল তাদের বিপরীত পুলিশ দলকে শেষ লম্বরে একটি পেনাল্টি কিং থেকে গোল প্রদান করে পরাজিত করেছে।

শনিবার প্রথম ডিভিশন লীগ প্রতিযোগিতার তিনটি খেলা হয়। তার মধ্যে একটি খেলার মোহনবাগান দল ব্যারাকপুরের ক্যামেরোনিয়ানস্ লৈঙ্গ দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। মোহনবাগান দলের এ গাভুরী প্রথমার্ধের শেষ লম্বরে দর্শনীরভাবে লটু করিয়া এই বিজয়চক্ৰ গোলটি প্রদান করেন ১—০। বিজয়ী দলের দুটি নিঃশিত খেলোয়াড় বিশল মুখার্জি ও যোগজীবন বসু না খেলা শেষে তাহাদের জয়লাভ প্রকৃতই গর্বের বিষয়। এই খেলাটিতে ক্যামেরোনিয়ানস্ দল একটি পেনাল্টি কিকের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি। ইষ্টবেঙ্গল ও ক্যালকাটা দলের খেলাটি কোন গোল না হয়ে অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল দল একটি পেনাল্টি কিং পেয়েও অতীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে নি।

কালীঘাট ও ই বি আর দলের খেলাটি অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। উভয় দলই দুটি করে গোল করতে লক্ষ্য হয়েছিল। প্রথমার্ধে লামাদ একটি গোল প্রদান করবার পর (১—০)। দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকে জোন্সেফ গোলটি পরিপোষ করে ১—১ বারো মিনিটের লম্বরে জোন্সেফ আর একটি গোল প্রদান করে নিজ দলকে অগ্রগামী করে (২—১) দুই মিনিট পরে রেল দলের বি কর গোলটি পরিপোষ করার পর প্রতিপক্ষ দল দুটি একটি করে পয়েন্ট লাভ করে।

গত শনিবার পর্যন্ত প্রথম ডিভিশন লীগ তালিকায় কাহার কিরূপ স্থান :—
খে জ ডু প পক্ষে বিঃ পয়েন্ট
মহম্মদান

শ্লে টিং	১২	৬	৩	৩	২০	১৩	১৫
মোহনবাগান	১২	৩	৮	১	১১	৮	১৪
কাষ্টমস্	১৩	৪	৬	৩	১৩	১২	১৪
ইষ্টবেঙ্গল	১২	৪	৪	৩	১১	৯	১৩
কালীঘাট	১৩	৩	৭	৩	১৩	১২	১৩
পুলিশ	১১	৫	২	৪	১৮	১৪	১২
ই বি আর	১২	৪	৪	৪	১১	১৩	১২
ক্যামেরোনিয়ানস্							
	১৪	৩	৬	৫	১২	১৩	১২
কে ও এস বি	১০	৪	৩	৩	১২	১০	১১
ক্যালকাটা	১২	৩	৪	৫	৬	১২	১০
ভবানীপুর	১২	৩	৩	৬	১৪	১৭	৯
এরিসাল	১১	৩	৩	৫	৯	১৭	৯

ক্রীকেট

গত ১০ই জুন 'নটিংহাম' মাঠে ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার এই বারের প্রথম ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ' আরম্ভ হয়েছে। পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়ার্নার্স হাম ও এবং ডন্ ব্র্যাডম্যান্ যথাক্রমে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দলের অধিনায়কত্ব করছেন। তবে এই অধিনায়কত্বের দায়িত্ব হাম ওয়ার্নার উপর এই প্রথম অর্পিত হয়েছে। এই দুটি

ক্রিকেটামোদী জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলার পরিণামের জন্য পৃথিবীর লম্বস্ত দেশে একটা লাড়া পড়ে গেছে। উভয় দলের প্রথম দিনের খেলা

খেলাটি আরম্ভ হওয়ার লম্বরে প্রায় ১৫০০০ হাজার দর্শক লম্বাগম্ব হয়। ইংলণ্ড দল টেসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাটিং করে এবং দিনের শেষে ৪ উইকেটে ৪২২ রান করে। বার্নেট শতাধিক রান করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইহা বার্নেটের ইংল্যাণ্ডে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলার প্রথম শতাধিক রান। ১৯৩৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড্ মাঠে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে বার্নেট ১২৯ রান করেছিলেন। সুতরাং টেষ্ট ম্যাচে বার্নেটের ইহা দ্বিতীয় শতাধিক রান। তাছাড়া বার্নেট ও হাটন প্রথমে খেলে হ'লর বেশী রান করে ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলার প্রথম কুটির খেলার রেকর্ড তদ্ব করছেন। হাটনও নিজস্ব একশো রান করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড দল ৮ উইকেটে ৬৫৮ রান করে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। ইংলণ্ড দল টেষ্ট ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই ইনিংসে কার্ণেট, হাটন, পেন্টার এবং কম্বটন্ একশো বিধা তার চেয়ে বেশী রান করেছেন। টেষ্ট ইতিহাসে এর আগে পৃথিবীর কোন ক্রিকেট দল দলের চারজন খেলোয়াড় এক ইনিংসে প্রত্যেকে শতরান করতে পারেন নি। তাছাড়া ইংলণ্ড দল এর আগে কোন টেষ্ট ম্যাচে এত রান তুলতে পারে নি। দ্বিতীয় দিনে প্রায় ৪০০০০ দর্শক লম্বাগম্ব হয়। এবিষয়েও রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বের লর্কাপেকা বেশী জনলম্বাগম্ব হয়েছিল ৩৫২৫০ জন। অস্ট্রেলিয়া দল দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১৩৮ রান করবার পর খেলা শেষ হয়।

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— ৭৭ —

আমলেশ্বর টাটানগরে পৌছিয়া বণাকে
adice' waiting roomএ রাখিয়া অমল
বাড়ী খুজিতে বাহির হইল এবং বেলা ১১টায়
করিয়া আসিয়া বণাকে লইয়া নতুন বাসা
গাটতে গেল। বাড়ীখানি দ্বিতল; উপরে
চুইটা ঘর। নীচে রান্না ও ভাড়ার ঘর
ছাট একটি উঠান। অমল একটি চাকরও
টিফ করিয়া আনিয়াছে বরল তাহার বাট;
গাণে শোনে কম ও চোখে তাহার ছানি
ড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাল দেখিতে
পায় না। অমল বাজার হইতে কিছু খাবার
দানিয়া নিজে খাইল ও বণাকে খাইতে
দিল। পরে নিজেই একটা গৃহস্থালীর ফর্দ
ফরিয়া লইল ও তাহা বণাকে দেখাইয়া
যাওয়ার করিতে বাহির হইল। বণা তাহার
বুতন বাটীর এক কোণে বলিয়া নিজ অদৃষ্ট
উদ্ভা করিতে লাগিল। বেলা তিনটার
বিমানাপত্র বালন ও হাটবাজার করিয়া অমল
গাটী ফিরিল। অমল পাকা গৃহিণীর জায়
যমন্ত জব্য আনিয়াছিল তাহাতে সেই দিনই
গাহার শতযজ্ঞা ব্যয় হইল। সে বণাকে
শ্রী করিবার জন্ত বিবিধ বস্ত্র ও প্রসাধন
সামগ্রী ক্রয় করিয়াছিল। বৈকালে বণা
অমল স্নান করিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করিল
ও আটটার মধ্যে আহারাদি করিয়া শুইয়া
ড়িল। বণার ক্লান্তিবোধ অত্যধিক
হইতেছিল সেজন্য সে শুইবামাত্র ঘুমাইয়া
ড়িল। অমল রাত্রি দুইটা পর্যন্ত তাহার
পার্শ্বে প্রেমগুঞ্জন করিল বটে, কিন্তু তাহার
শাশুররূপ কললাত হইল না।

বিস্তৃত করেকদিনের মধ্যেই অমলের
সুস্থগর ব্যবহারে বণা অমলের পক্ষপাতী
হইয়া উঠিল ও অচিরেই তাহার ধারণা
হইল অমলের কথাগুলি শুদ্ধমৌখিক নয়।
ইহা যে সত্যই অন্তরের কথা তাহা বণা
দিশ্বাস করিল। দুইজনে প্রেমের স্বপ্নে
বিভোর হইল ও বণা অচিরেই অমলের
পছন্দপ্রাপ্তে আত্মসমর্পণ করিল। অরুণ বা
শুভ্রার কথা আর তাহার মনে পড়ে না
এখন তাহার লম্বন্ত হৃদয়টা অমলই অধিকার
করিয়া রহিয়াছে। স্বর্গমতে বিবাহ করাটা
যে একান্ত প্রয়োজন একথা বণা ও অমল
সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হইল। তাহারা প্রাতে তুণের
জাফ, বর্ণধারহীন তরীর জায় ডালিয়া
চলিল। তাহারা ভাবিল এই উদ্দাম
প্রণয়োচ্ছ্বাস, অনাবিল আত্মবিস্তৃতির আনন্দ
বুঝি এই ভাবেই চিরকাল চলিবে।

অধরমুখা পান করিয়া যে পেটের
ক্ষুধা মেটে না তিনমাল যাইতে না যাইতে
অমল ও বণা উভয়েই বুঝিতে পারিল।
অমল আসিবার সময় যে পাঁচশত টাকা সঙ্গে
করিয়া আনিয়াছিল এই সময়াল নিশ্চেষ্ট
ভাবে বলিয়া থাকায় তাহা প্রায় শেষ হইয়া
আসিয়াছে। অমল বুঝিল চাকরী করা
ভিন্ন আর উপায় নাই। সে চাকরীর
চেষ্ঠায় বাহির হইল। কিন্তু চাকরী করিব
বলিলেই চাকরী হয় না; অমল ঘুরিয়া
ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও তাহার কেবলই
মনে হয় তাহার কবিশূর্ণ পরল জীবনে
যত কিছু বাধা, যত কিছু বিপত্তি, কঠোরতা
লম্বন্তই নষ্ট করিয়াছে ওই নষ্টহাড়া বেবে
বণা। বণার নেশা তখনও কাটে নাই

তাই অমলকে স্ত্রী করিবার জন্ত তাহার
গহনাগুলি বিক্রয় করিবার জন্ত এক একটা
করিয়া খুলিয়া দেয়, কারণ এ ভিন্ন লক্ষ্য
রক্ষার জন্ত পছা ছিল না।

ইদানীং বণা তাহাকে বিবাহ করিবার
জন্ত অমলকে বারবার অনুরোধ করিয়াছে
কিন্তু অমল তাহাতে বর্ণপাত করে না বরং
উত্তরে বলিয়া থাকে, “পাথরের ঘুটা লামনে
রেখে আশুন জেলে ছুটো লক্ষ্যত আওড়ালেই
বিষে হয় একথা তোমায় কোন পণ্ডিত
শিখিয়েছে বল তো?” বণা ইহার পর
তাহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইবার চেষ্টা
করিলে সে বণাকে শাসাইয়া বলিয়া থাকে,
“বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমায় রেখে
কলকাতায় চলে যাব, তখন বিয়ে করবার
মজা টের পাবে’খন।” বণা নীরবে
অশ্রু বিসর্জন করে। তাহার অদৃষ্ট যেমন
ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সে আশা
করিতে পারে?

অবিরাম উদ্বেগান্বিত ও অশেষ চেষ্টার
ফলে অমল ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকরী
সংগ্রহ করিল। চাকরী পাইয়া সে ভাবিল
আরও কিছুদিন সে বণার যৌবনমুখা পান
করিবার সুযোগ পাইল। কিন্তু কার্যতঃ
হাড়াইল অন্তরূপ। লম্বন্তদিন নৌহ কার-
খানায় কার্য করিয়া সে যখন বাটা আসে
তখন ক্লান্ত দেহখানাকে সে যেন বহন
করিতে পারে না। কোন প্রকারে কিছু
আহার করিয়া শুইয়া পড়ে; রাত্রি কেমন
করিয়া কাটিয়া যায় তাহা সে বুঝিতেও
পারে না। কবিশ্ব, লাহিত্য, প্রেম, উচ্ছ্বাস
তাহার মস্তিষ্ক হইতে বর্পূরের জায় উড়িয়া
গিয়াছে। সে প্রাজুহেট, সে লাহিত্যিক
একথাও সে ভুলিতে বলিয়াছে। যদি বা
রাত্রিতে সে জোর করিয়া নিজাকে বিভারিত
করিয়া বণার মনোঞ্জন করিবার চেষ্টা
করিয়াছে পরদিন অকিলে গিয়া নিজাঘেবীর
আক্রমণ হইতে সে নিজকে রক্ষা করিতে

পারে নাই এবং উপরওয়ালার নিকটে যথেষ্ট লাজনা ভোগ করিয়া কষ্ট চেষ্টে বাড়ী ফিরিয়া কণার উপর তাহার সমস্ত অপমানের শোধ লইয়াছে। ছই একদিন সে ক্ষিপ্ত হইয়া কণাকে প্রহারও করিল। এইরূপে এক বাটতে বাস করিয়া তাহার পক্ষপাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। অমুরাগের পরিবর্তে বিরাগ আসিয়া উভয়ের হৃদয় অধিকার করিল। কণার কবল হইতে সে ক্রমে নিজেকে মুক্ত করিবে অমল অজকাল তাহাই চিন্তা করে। তাহার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় সে কণাকে রাখিয়া পলায়ন করিবে, কিন্তু কি জানি কোন্ আকর্ষণ তাহার কল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে বাধা দেয়। সে চেষ্টা করিয়াও পলায়ন করিতে পারে নাই। অবশেষে সে অরুণকে একটি পত্র লিখিল—তাহাতে পলায়নের প্রথম রাত্রি হইতে অল্প পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা আত্মপুর্নিক বর্ণনা করিয়া অবশেষে আবেদন করিল যে সে আর কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, জীবন তাহার বিষময় হইয়া উঠিয়াছে, পিতার নিকট ফিরিবার পথ বন্ধ। যদি হয় করিয়া অরুণ তাহাকে ও কণাকে আশ্রয় দেয় তাহা হইলে দুইটা জীবন রক্ষা পায়।

অরুণ পত্র পাইল ও সেই পত্রখানা অবিলম্বে অমলের তেষ্ঠ কমলবাবুর নিকট খাম লমেৎ পাঠাইয়া দিল। সে স্বয়ং কোন উত্তর দিল না। বিতৃষ্ণ তাহার সমস্ত মনটা ভরিয়া উঠিতেছিল।

—এগার—

কনিষ্ঠ পুত্র অমলের অকস্মৎ অন্তর্ধান মহীতোষবাবু তন্ত্রিত হইলেন। ক্রোধে ও কোতে তাহার লক্ষ্য কল্মিত হইল। তিনি প্রথমে হির করিলেন অবাধ্য পুত্রের সুখ দেখিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। অমলের বিবাহের কয়েক দিন পরেই তিনি

অরুণের বাটতে গিয়া তাহাকে অকথা ভাষায় অপমান করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন যে যদি অমলকে তিনি ফিরিয়া না পান তাহা হইলে অরুণকে খুন করিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করিবেন না। অরুণ সমস্ত শুনিয়া, তাঁহার কথার একটি প্রতিবাদও করিল না বা বুদ্ধকে কোনরূপ উপেক্ষাও করিল না। অবশেষে বুদ্ধ যখন তাহার লম্বুখে বসিয়া বালকের ভায় রোদন করিতে লাগিলেন—অরুণ অমলকে ফিরাইয়া আনিতে আশ্রয় চেষ্টা করিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

মহীতোষ যেখানে যত আশ্রয় ছিল লকলকেই অমলের লংবাধ লইবার জন্ত পত্র লিখিলেন। কাহারও নিকট হইতে আশ্রয় উত্তর পাইলেন না। অবশেষে, যে অমলের লংবাধ দিতে পারিবে তাহাকে পাচ-শত টাকা পুঙ্খের দিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। তাহাতেও সফল ফলিল না। মহীতোষ ও তাহার পত্নী নৈরাশ্র-নাগরে ভ্রুণিতে লাগিলেন। কমল বাবুও ভ্রাতার সন্ধান লইতে ক্রটি করিলেন না। অরুণের নিকট হইতে অমলের পত্র পাইয়া মহীতোষ বলিলেন,

“কমল, আজই তুমি টাটানগরে যা বাবা, যেমন করে পারিবা পাগলটাকে ফিরিয়ে আন—কিন্তু খবরদার সেই ডাইনীটাকে যেন লড়ে আনিস্‌নি। পিতা-মাতার অমুরোগে কমলবাবু সেই রাত্রিতেই টাটানগরে যাত্রা করিলেন ও পর দিবস অফিলে গিয়া অমলের লহিত লক্ষ্য করিলেন। তিনি অমলকে বলিলেন, “দেখ ভাই, আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়। বাবা ও মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইতে বসিয়াছেন। তুমি বাড়ী চল।”

অমল বলিল, “এই সুখ আমি বাবাকে কি রূপে দেখাব বলত? আমার বাগ্না হইবে না।” কমলবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন পিতামাতা তাহাকে পাইবার জন্ত আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। কমা তাহাকে তাঁহার পুর্কেই ফিরিয়াছেন নচেৎ কমলকে তাঁহার পাঠাইতেন না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া অমল বলিল সে কণাকে ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও যাইতে পারিবে না কারণ কণা তাহার জন্ত বাহা করিয়াছে সেই ক্রতজ্ঞতা সে ভুলিতে পারে এরূপ পশু সে নহে। তাহাকে যাইতে হইলে কণাকেও লইয়া যাইতে হইবে।

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!



ব্যবহারাস্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনদের মনোমত আধুনিক ধরণের লকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়িত্ব ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ সোণার ভায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিল্ডিক্রেট

৭০নং কলকাতা স্ট্রীট, কলিকাতা (কলকাতা মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি, বি, ৪৮৮২

কমলবাহু তাহাকে পুনরায় বুঝাইলেন যে একটা তুচ্ছ নারীর জন্ত নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই উচিত নহে। ভগবান তাহাকে পৃথিবীর আবর্জনা মনে করিয়া সমাজের নিকট হইতে দূরে রাখিতে চাহেন তাহাকে সুখী করিবার প্রয়াস মরুভূমিতে বারি নিক্ষেপ করিবার মত বাতুলতা মাত্র। অমল যদি বুদ্ধিমান হয়—তো অবিলম্বে কণাকে ছাড়িয়া তাহার ফিরিয়া যাওয়া উচিত। তদ্বির সে যদি এখনও ফিরিয়া না যায় পিতা তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিবেন এ ভয়ও অমলকে দেখাইতে ভুলিলেন না। পাছে বাটা ফিরিলে অমলের মতির পরিবর্তন হয় সেই জন্ত অফিস হইতে সোজা ঠেঁগনে যাইবার জন্ত অমলকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অমল অবশেষে তাহারই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ধ্যাসমাগমে ভ্রাতার সহিত ঠেঁগনে উপস্থিত হইল।

রাত্রি আটটার ট্রেন। অমল কণার নিকট ফিরিবার জন্ত বাস্তব হইয়া উঠিল। কমল বাবু বিবিধ উপদেশে তাহাকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ছোটানায় পড়িয়া অমল চঞ্চল ও উত্তপ্ত হইয়া পড়িল। সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একদিকে মেহম্মদ পিতা ও স্নেহময়ী মাতার কাতর আহ্বান, অপর দিকে কণার বিষম মুখচ্ছবি। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল তাহার এসহ কেরানী জীবন ও লাজনা। সে স্থির করিল ফিরিয়া যাইবে। কণার ভাগ্যে যাহা ঘটবার ঘটবে। তাহার জন্ত ভাবিয়া লাভ কি? বাটা ফিরিয়া গেলে সে নিজে সুখী হইতে পারিবে। অতীতকে পষড়লিত করিয়া ভবিষ্যতে সে নিজের জীবনকে ধরুর করিয়া তুলিতে পারিবে। বাবা লতাই বলিতেছেন—“কণার সঙ্গে আত্মত্যাগ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ ঘোষণা একই কথা।”

ট্রেন আলিগ, শিষ্ট যুগের জ্ঞান সে ভ্রাতার সহিত কাঠ-ক্লাশ কামরা অধিকার করিয়া বলিল। সে ভাবিল আজ তাহার চুঃখের অবসান হইল। গাড়ীতে উঠিয়াই উত্তর ভ্রাতা জলযোগ করিয়া শুইয়া পড়িল। সারাবিশের ক্লাস্তিতে কমলবাহু কাতর হইয়াকিলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন—কিন্তু অমলের নিজা আসে নাই। সে শুইয়া শুইয়া কণার সহিত প্রথম দর্শন দিবস হইতে অল্প পর্যান্ত সমস্ত ঘটনা আলাচনা করিতে লাগিল। বিবেকের বেজাঘাতে সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার সমস্ত শরীর ভেঙে করিয়া যেন অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে যেন শতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল কণার সর্বনাশের জন্ত সেই দারী, সেই ঘোষী! আজ সে অবলা রমণীকে শতবিপদের মধ্যে রাখিয়া নিজের সুখের জন্ত চোরের জ্ঞান পলায়ন করিতেছে। তাহার এই কৃতঘ্নতার শাস্তি মিলিবে, পলায়ন করিয়া সে ঈশ্বরের রোষ-বলি হইতে রক্ষা পাইবে না। সে উঠিয়া পড়িল, জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিল টাটানগরের অগ্নিতপ্ত লোহিত আকাশ তখনও দেখা যাইতেছে। বাতাস যেন ছ-ছ করিয়া তাহার কর্ণে বলিয়া গেল, ওরে, ওরে তব্বর, ওরে কাণুরুষ এখনও সময় আছে ফিরিয়া চল। তাহার চোখের সম্মুখে কণার বিবাহনেত্র ফুটিয়া উঠিল। অমল গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিগ ও কালক্ষেপ না করিয়া চমক গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল।

অমলের কি হইল নিজের যাত্রীদল তাহা জানিল না; দৈত্যের জ্ঞান হৃদয় দিতে ট্রেনখানি অন্ধকারের কোলে বিশাইয়া গেল।

—বার—

কণা রক্তন করিয়া অমলের অপেক্ষার রাত্রি দশটা পর্যন্ত বলিয়া রহিল। অমল

আলিগ নো। কণা উদ্বিগ্ন হইয়া বুদ্ধ ভ্রাতা রাইচরণকে বলিল, “বা বাবা রাইচরণ, একবার দেখে আর, বাবুর কি হলো।” রাত্রিতে রাইচরণ চোখে ভাল দেখিতে পার না তথাপি সে অমলের খোঁজে বাহির হইল। সেই নির্জন গৃহে কণা একাকিনী বলিয়া রহিল অমলের প্রতীক্ষায়। রাত্রি বারটার রাইচরণ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে বাবুকে খুজিয়া পাওয়া গেল না। আফিলে বাবুর এক ভাই আসিয়াছিলেন ও তাহার সহিত আফিল ত্যাগ করিয়াছে, আফিলের বাবুদের কাছে রাইচরণ সে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে। কণা এই সংবাদ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রথমে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না যে অমল এতটা নিষ্ঠুর ও নৃণংস হইতে পারে যে তাহাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া সংবাদ না দিয়া অমল চলিয়া যাইবে। কিন্তু সমস্ত রজনী প্রতীক্ষায় থাকিয়াও অমলের আগমনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তাহার পর আরও দুইদিন সে অমলের প্রতীক্ষা করিল তথাপি অমল ফিরিল না। অমল তাহাকে যে ভয় প্রশ্রয় করিত এত লীজ যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে কণা তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। তাহার শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। নিখল রুদ্ধ হইতে লাগিল—সে প্রমাদ গনিল। সে বুঝিল অমলের ঘোহ কাটিয়াছে প্রেম পিপাসা মিটিয়াছে আর তাহাকে তাহার প্রয়োজন নাই তাই সে তাহাকে ফেলিয়া নিজের গৃহে ফিরিয়াছে। কণা বিচার করিয়া দেখিল অমল যাহা করিয়াছে এই অবস্থায় লুকল তরলমতি যুগাই এইরূপ করিত; সে তাই অমলকে অভিসম্পাত দিল না; অমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়া জগদীশ্বরের নিকট বিচার প্রার্থনা করিল না। সে ভাবিল এমন কোন দেশে যদি সে যাইতে পারিত যেখানে পুরুষ নাই তাহা হইলে সে শান্তি পাইত।

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে তাহার হাতের চারগাছি চুড়ি খুলিয়া রাইচরণের হাতে দিয়া বলিল, “রাইচরণ, ক’গাছা সোনার চুড়ি দেকরার বাড়ী থেকে বিক্রী করে আনতো বাবা। রাইচরণের চোখে জল আনিল। সে বলিল, “ছিঃ মা, এমন কাজও করেনা। বাবু থাকতে সব গয়নাগুলো তিনিই খোদালেন, ঐ ক’গাছা যা আছে তা আর বিক্রী করেনা মা। লতী লক্ষ্মী মেয়ের কি হাতপুঙ্ করতে আছে?”

কণা এবার তাহার অশ্রুরোধ করিতে পারিল না। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, “রাইচরণ, তুমি থাকে লতী লক্ষ্মী ভাবছ সে লতী লতী লক্ষ্মী নয়। লতীকে কাকে বলে জ্ঞানবার সুযোগ আমাকে ভগবান দিইয়াছিলেন কিন্তু হতভাগিনী আমি, আমি তা গ্রহন না করে নিজের উদ্ধাম আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য তোমাদের অমলবাবুর আশ্রয় নিরেছিলেন। অমল বাবু আমার ধর্ম্মতঃ বিবাহ করবার আশা দিইয়াছিলেন বটে কিন্তু এই সুদীর্ঘ ছয়মাসে তা করবার অবকাশ পান নি। ধর্ম্মের চোখে আমি তার গণিকা, রক্ষিতা তির আর কিছুই নয় রাইচরণ। এই তো আমার লতী, তবে কোন সাহসে তার ঘোঁহাই হবে তুমি বলতে পার? আর লক্ষ্মীর কথা বলছো? আমার সমস্ত জীবনে তার সঙ্গে আমার লব্ধই নেই। আমার হাওরা লেগে হরতো তাঁর নামের মহিমা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি ভেবনা রাইচরণ, বার ইহকাল পরকাল দুইটা অক্ষরান্বিত তার আবার অলঙ্কারের মোহ। তুমি যাও বাবা ওগুলো বিক্রয় করে যে কটা টাকা পাও আমার এনে দাও। তোমাদের দেনা শোধ করে আমি মুক্তি পেতে চাই।”

রাইচরণ পুনরায় বলিল “না মা, তুমি তোমার বুড়ো বেটাকে মিথ্যে বলে ভোলাতে পারবে না। আমি কি কখন ব্যবসায়ীর ঘরে বেধিনি বলতে চাও? তারা কি

ওম্নি করে তোমার মত লেবা করতে পারে না মার খার? না গায়ের গয়নাগুলো খুলে দেয় বাবুর হাতে ওড়বার জন্যে? বাবু নিতান্ত লক্ষ্মীহাড়া তাই তোমার মত লতী-লক্ষ্মীকে চিন্তে পারে নি। বাই বল মা এই বাণীগুলো আমার বলো নি। হুমি যদি বেঞ্চে হও তবু তুমি আমার মা। তোমার হাত পুঙ্ দেখতে পারবোনি আমি। তুমি তো ছ’মাসে ছত্রিশ টাকা মাইনে আমার দিইয়াছো সেই গুলো জাও। দেনা শোধ কর তার পর মা বেটার বেরিয়ে পড়বো যে দিকে ছ’চোখ যায় সে দিকে।”

কণা তাহাকে ব্যাটাইল কমপক্ষে একশত টাকার কমে দেনা শোধ হইবে না। অন্ততঃ দুইগাছি চুড়ি তাহাকে বিক্রয় করিতেই হইবে নচেৎ মানরক্ষা অসম্ভব। অগত্যা রাইচরণ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চুড়ি বিক্রয় করিতে চলিল। কণা মনে মনে বলিল, লম্বাজের চোখে নীচ যারা তাহাদের ভিতরে যে মহৎ লুপ্ত থাকে, তত্ত্ববেশী মানবের দ্বারা তাহার এত অভাব কেন?

রাইচরণ চলিয়া গেলে কণা একটা ট্রাকে তাহার কাপড়গুলি শুকাইয়া লইল। কয়েক জন ভিখারীকে ডাকিয়া লংসারের জিনিষ পত্র বিলাইয়া দিল এবং অবশেষে অমল ও তাহার একত্রে যে চবিখানি ছিল তাহা প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ধূমায়মান অগ্নিশিখার দিকে নির্গম্ভেব নেত্রে চাহিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

বিবাহাদি শুভকার্যো

সুলভে উৎকৃষ্ট মৎস্য খরিত
করিশার একমাত্র স্থান।

দত্ত গাঙ্গুলী এণ্ড কোং

৬২নং দেবেন্দ্র বোম রোড, ভবানীপুর

৬৬৬৬৬৬ ৬৬৬৬৬৬ ৬৬৬৬৬৬ ৬৬৬৬৬৬ ৬৬৬৬৬৬ ৬৬৬৬৬৬

আবার আসিলেন?

ক্রীসোস্তোমেন সেন

৬৬৬৬৬৬৬৬ ৬৬৬৬৬৬৬৬ ৬৬৬৬৬৬৬৬ ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬

আবার আলিলে?
আবার বলিলে কাণে বলন্তের রূপরাশি যত
অপেক্ষার আছে শুধু মোর দৃষ্টি তরে?
যত রং যত ফুল যত গন্ধমাজি
যৌবন-কান্নন ঘরি নৃত্য করে লহা
হঠাৎ এলেক আজ লীমাক্তের পথিকের কাছে
ফেলে-আলা যৌবনের উজ্জ্বল জাগাতে?
বহু বার বহু বেহ করিয়া আশ্রয়
বহু ব্যথা মরমের তটে বেহ ভরি
তবুও আজিকে কেন আবার আলিলে
অতিক্রান্ত যৌবনের গোধূলির গানে?
হিম্ম আমি মত্ত হবে আপন সুবাসে
নাভির কঙ্কণীগন্ধে দৃষ্টিহারী লম
প্রতিপদে একে গেছে মিলনের ছবি,
প্রতিটি উজ্জ্বল হবে গান করে ঝরাইত মধু
তখন ত’ বহুবার এলেক সুন্দর
তখন ত’ বহু রংয়ে রাজারাজ মন
বাধা বড়ু দিই নাই—অনাহুত বলি নাই তোরে
প্রতিটি প্রকাশ তোর বহু স্পর্শে ধরেছি দ্বারে
বিনিময়ে ক্ষত কত লেই অন্তঃপুরে
দিয়ে গেছ লীলাকর। বলেছি কি কভু
কেন দিলে নিষ্ঠুর আঘাত? মোর মন, রক্ত
হবে আজি গোধূলিতে, তোমার পরশঃখ
অনুভূতি স্পন্দে বেধে যবে, মানব বেহের মোহ
লুপ্ত হবে ভিক্ষুমন হ’তে, খেত বস্ত্র সব রংয়ে
করেছে বিহার—তখন আবার তুমি?
এখনো কি মনে ভাব—দুঃখপাত্র পূর্ণ নহে
মোর?

এখনো কি ফুলশর মোর রক্তে রক্তজবা নহে?

আজিকে দিগন্তে মোর ধূসর আলোক,
যে-আলোকে লক্ষ্যাতারা লুপ্ত নহে স্থপ্তির

বিলাসে,

যে-আলোকে মিলন বাণর নহে কভু

আলোকিত,

যে-আলোকে গৃহবাসী হয় পরবাসী,

লেই আলো পথ ঘের ক্রান্ত পথে মোর।

আজ তাই কথা চাই—পথ ছাড় গ্রহিণিটার

তোমার আমার পথ এক নহে আর।

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ
বাড়ী কালিবাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু
ও সহকারী।
রাসদহিন—হরেনবাবুর বিখ্যাত বেয়ারা।
অস্পষ্ট চরিত্রের পরিচয় এসম্বন্ধে পাইবেন।

হীরার হার

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আদলের
বুড়ো ঝি।
অস্পষ্ট চরিত্রের পরিচয় এসম্বন্ধে
পাইবেন।

মিঃ ঘোষের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'ল।
লজ্জার ও রাগে তিনি জ্ঞানশূন্য হ'য়ে
গেলেন। সেবা-শুশ্রূষার ও আত্মীয়-বন্ধুগণের
সাহায্য কতকটা লাভ হ'য়ে তিনি যা বলেন
তার মর্ম এই :—

উপরের পোষাকের ঘরে যখন পোষাক
দুলাবার জন্ত তিনি যান, তখন পাশের ঘরে
একটা থন্-থন্ শব্দ তাঁর কানে আসে।
কটু মনোযোগ দিয়ে শোনবার পর, তাঁর
মন মনে হ'লো যে পাশের ঘরে একজন
কউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি আস্তে আস্তে
হিঁরে গিয়ে পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখেন।
কিন্তু কাউকে দেখতে পান না। তিনি
রের মধ্যে ঢোকেন ও প্রত্যেক লুকিয়ে
পাকবার মত স্থান পরীক্ষা করে দেখতে
পান কিন্তু কোন লোকের অস্তিত্বের
কান চিহ্নও তাঁর নজরে পড়ে না। তখন
তিনি আবার পোষাক-পরিবর্তনের জন্ত
পোষাকের ঘরে ফিরে আসেন। আয়নার
দামনে দাঁড়িয়ে যখন তিনি চুল
ধাচড়াচ্ছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ কে
এলে তাঁর চোখ ছুঁটো বেঁধে ফেলে।
পরপর তিনি চীৎকার করে লাহায্য ডাকবার
ফের্কেই; একটা লবল হাত তাঁর কণ্ঠরোধ
হয়ে; এবং চাপাগলায় কে তাঁকে চুপ করে
থাকাতে বলে—নইলে তখন গলাটিপে মেরে
ফলবে বলে ভয় দেবার। তারপর সেই
দম্ভাত আততায়ী কিশোরহস্তে তাঁর হাত ও
বিশ শব্দ করে বাঁধে। লোকটি এত
জিহ্মান্ যে তিনি লহন চেঁচা করেও তাকে
ধা দিতে পারলেন না। যখন বাধ্য হ'য়ে

তাঁকে নিশ্চেষ্ট হ'তে হ'লো, তখন সেই
লোকটি তাঁকে এক পাশে ঠেলে রেখে
আয়নার সামনে বসলো।

ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে চোখের বাঁধন একটু
অ'ঙ্গা হ'য়ে সরে গিয়েছিল। তিনি কতক-
কতক রুমালের ফাঁক দিয়ে দেখতে
পাচ্ছিলেন। লোকটা পকেট থেকে
খানিকটা ক্রেপ চুল ও স্পিরিট গাম্ (Spirit
Gum) বার করে মুখে হাড়ী-গোঁফ এটে
নিলে। তারপর যখন আয়নার স্তম্ভ থেকে
সে সরে এলো, তখন মিঃ ঘোষ লবিস্ময়ে
দেখলেন, যে লোকটার মুখে ও তাঁর নিজের
মুখে কোন প্রভেদ নেই। লোকটি তখন
তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বলে—
“মিঃ ঘোষ, এইবার আপনার কিছু কাপড়-
জামা আমি ধার নেব। প্রতিজ্ঞা করছি
তিন দিনের মধ্যে আপনার কাপড়-চোপড়
আপনি ফিরে পাবেন।” মিঃ ঘোষ অবাক
হ'য়ে গেলেন। লোকটার কণ্ঠস্বরও তাঁর
কণ্ঠস্বরের অবিকল নকল!

তারপর লোকটি তাঁর কাপড়-চোপড়
পরে নিলে। তালা খুলে মিঃ ঘোষ সেই
ঘরে ঢুকেছিলেন; তালাটা টংগেট টেবিলের
উপর ছিল। ঘরের দরজার তালা বন্ধ করে
দিয়ে লোকটি চলে গেল।

সে চলে যাবার পর মিঃ ঘোষ অতি কষ্টে
গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক ঘেরীতে দরজার
কাছে যান। তারপর ছুই'পা দিয়ে তিনি
লবলে দরজার উপর আঘাত করতে থাকেন।
কিন্তু কাপড় বঁধবার পর বাইরের দিকে

লোকের লাড়া পান। কিছু পরে দরজার
তালা ভেঙ্গে লকলে ঘরে ঢোকেন।

লোকটা কি রকম দেখতে জিজ্ঞাসা
করায় তিনি বলেন, যে বতরুণ তার মুখে
গোঁফ-হাড়ী আঁটা হয় নি, বতরুণ তার
পিছনটাই তাঁর দিকে ছিল। সুতরাং, তিনি
ঠিক বলতে পারেন না, যে লোকটা কি রকম
দেখতে।

পরের দিন সকালে আমি (ডাঃ হরেন
মুখার্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ) আমার
প্রাইভেট ড্রয়িংরুমে বসে চা খাচ্ছি, এমন
সময় আমার স্ত্রী মনীষা এসে বলে—“একটা
খবর শুনেছ?”

আমি—“না বলে শুনবো কি করে?”

মনীষা—“কাল রাত্তিরে থিয়েটার রোডে
মিসেস ঘোষের বাড়ীতে পাটি ছিল। তুমি
গেলেনা বলে আমারও বাওয়া হ'ল না। বহি
যেতে, তো একটা বেশ বড় কেস হাতে পেতে।”

চায়ে চুষুক দিয়ে আমি একটু হেসে
বলুম—“আপাততঃ হাতে কেস নেই বলে
তুমি একটু হুঃখিত হ'য়েছ দেখছি। তা',
ব্যাপারটা কি শুনি।”

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

মনীষা বলে—“এই মাত্র—একটু আগে—মিলেন্স ঘোষ এনেছিলেন। তাঁর মুখে শুনলুম, তাঁর বাড়ীতে সেই পাটির দিনেই একটা খুব বড় ডাকাতি হ’রে গেছে। সে এক বড় অদ্ভুত ব্যাপার।”

আমি একটু বৌতুহলী হ’য়েই জিজ্ঞাসা করলুম—“এতগুলো নিমন্ত্রিত লোকের মধ্যে ডাকাতি?—সে কি রকম? ঘটনা কি বলতো।”

তখন মনীষা লম্বা বসে। আমি শুনে “হো-হো” করে’ হেসে উঠলুম। বললুম—“বড় মজার ব্যাপার তো! বেচারীরা খাওয়া-দাওয়া করতে এলে কিছু খাইয়ে গেল—এ্যা! ঐ দলের মধ্যে অবিনাশ থাকলে বড় মজা হ’তো। চমৎকার খাওয়া দাওয়া এই রকমে গোলমাল হ’য়ে গেলে তাঁর আপুণোষের লীলা থাকতো না। যাক সেদিন যে আমরা সেখানে ছিলুম না ভালই হ’য়েছে। কারণ, যদি অস্ত্রাস্ত্র লকলের জিনিসপত্রের মধ্যে আমার বা তোমার কিছু চুরি যেত, তা হ’লে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকতো না। অপরে ঠেকে কিছু বার আসে না। কিন্তু কেউ যদি খাল্লা দিয়ে করেন মুখুজ্জেকে ঠকিয়ে বার, তাহ’লে হ’রেন মুখুজ্জেকে অন্ততঃ বড়ই লজ্জিত হয়—মনে মনে। তাঁর আত্মসম্মানে বড়ই ঝা লাগে, মনীষা! মিলেন্স ঘোষ এই ব্যাপারের তথ্য আমার হাতে দিতে চান নাকি?”

মনীষা বলে—“না। এমন কোন অভিপ্রায় তিনি প্রকাশ করেন নি। তবে ষিঃ ঘোষ হয়তো উদ্বেজিত অবস্থায় যে-কোন মুহূর্তে তোমার কাছে এলে হাজীর

হ’তে পারেন। কেনটার তথ্য পুলিশের হাতেই আছে আপাততঃ।”

খবরের কাগজেও ব্যাপারটার আদুল স্তম্ভাস্ত প্রকাশিত হ’লো। তারপর দু-তিন দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন রাত্ৰিতে একটা ব্যাপার ঘটলো, যাতে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হ’লো।

সেদিন রাত্ৰিতে ঘটনা টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। একজন স্ত্রীলোক খুব করুণ ও উচ্ছ্বলিত কণ্ঠে আমার লাহায্য চাইলেন। তাঁর স্বামী একজন বিখ্যাত অভিনেতা। থিয়েটারে সেদিন ‘পরপারে’ নাটক অভিনীত হ’চ্ছিল। তাঁর স্বামী মঞ্চের উপরেই নাকি হত্যাপর্যায়ে গ্রেপ্তার হ’য়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

আমি অনুমতি দিলে, তিনি সেই রাত্ৰিতেই আমার সঙ্গে দেখা করেন। এবং কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যে কাহিনীটি বলেন তাহার মর্ম এই—তাঁর স্বামী মহিমের ভূমিকা অভিনয় করছিলেন। এবং সতী দেবী নামে একজন অভিনেত্রী শাস্তার ভূমিকা অভিনয় করছিল। ঐ নাটকে একটা দৃশ্য আছে, যেখানে নায়ক মহিম মাতাল অবস্থায় শাস্তা বেস্তাকে গুলি করে’ মারবার চেষ্টা করে। সেই দৃশ্য অভিনয়ের সময়, ব্যাপারটা বাস্তবেই পরিণত হ’য়েছে। শাস্তাবেপিনী সতীদেবীর কপাল ভেঙে করে নাচি মহিমের গুলি চলে গিয়েছে, এবং মহিমবেশী তাঁর স্বামী হত্যাপর্যায়ে পুত হ’য়েছেন।

তাঁকে প্রশ্ন করে যতদূর জানলুম, তা’তে সতীদেবীকে খুন করার তাঁর স্বামীর কোন

উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে মনে হ’লো না। যা’হোক, তাঁর নিরীক্ষাভিশয্যে তাঁর সঙ্গে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হ’লুম এবং তথ্য সংগ্রহ করলুম। পুলিশ ইতিপূর্বেই এসে উপস্থিত হ’য়েছিল। ইন্সপেক্টর মহিমের অংশের অভিনেতাকেই ঘোষী স্থির করে চালান দিলেন।

আলামীর স্ত্রীর বাকুতি-মিনতিতে আমি ঐ ঘটনার তথ্যের ভার নিলুম। ঘটনাবলী ভালকরে বিবেচনা করে দেখে আমার মনে হ’লো, হত্যাকাণ্ডী বলে গ্রেপ্তার হ’লেও অভিনেতাটা নির্দোষ হ’লেও হ’তে পারে। অনেক সুবিধা ছিল তাঁর অভিনেত্রীটিকে হত্যা করবার। তা’ না করে’ তিনি ষ্টেজের উপর লক্ষ্য দর্শকের সামনে লেকাজ করবেন কেন?

ঐ ঘটনার তথ্যসমূহ একদিন রাত্ৰিতে সতীদেবীর পরিতাজ্ঞ বাড়ীটা লকলের অগোচরে খান-তলাস করতে বাই। আমার সঙ্গে সেদিন অবিনাশ ছিল। চারিদিক অঘেঘন করবার পর আমার চকু পড়লে দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ীটার দিকে। ঘড়ীটা বন্ধ হ’য়ে রয়েছে। লাভবানের দম-দণ্ডের ঘড়ী বন্ধ হ’বার কোন কারণ না দেখে আমি ঘড়ীটাকে পরীক্ষা করলুম। যতবার Pendulumটা নেড়ে দিলুম, ততবারই সেটা একটুখানি ফলেই বন্ধ হ’য়ে যেতে লাগলো। সতীদেবীর মতন দৌণীন স্ত্রীলোক এমন চমৎকার ঘড়ীটাকে দেয়ালত না করে’ রেখে দিয়েছে—এও কেনন অসম্ভব বলে আমার মনে হ’লো। ঘড়ীটাকে নাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে খোলবা-মাত্র তাঁর লকের সঙ্গে জড়ানো একটা ‘হীরের হার’ পেলাম।



ইন্দ্রবিমাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

তখন আমার মিলেন্স ঘোষের পাঠ্য
কথা মনে পড়লো। এইটা নিশ্চয় মিলেন্স
ঘোষের 'হীরের হার'! অবিনাশকে সব
খুলে বলুন।

আমরা ঘরের বাইরে আসবো স্থির
করতি, এমন সময় গিড়িতে পায়ের শব্দ
পলুয়। আমরা তাড়াতাড়ি একটা বড়
ঘরাজের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। পায়ের
শব্দ ক্রমে ঘরের মধ্যে এলো, এবং ঘরের
দালো জলে উঠলো।

একজন বলে—“পাহারাওয়াল লাহেব,
আমি দেখছি এই ঘরে লোক ঢুকেছে
এইখানেই তারা আছে।”

বৃক্সুম কেউ পাহারাওয়াল নিয়ে
এসেছে। তাইতো—অবস্থা। তো বড়ই
দলীন হ'য়ে উঠলো।

একজন পাহারাওয়াল বলে—“দেখো
তো উধার, জুড়ীহার। ময় ইধার
দেখতে হ।”

এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে পাহারা-
ওয়ালারা ক্রমে ঘরাজের দিকে এগিয়ে
দাস্তে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

হাতে হাতে পরীক্ষা দৈবলঙ্কা অর্শনাশক মহৌষধ

ঔষধাচার্যক অম্বর্ষলি, বহির্বাণি, ভগন্দর,
হারিদ ও মালা যে কোন রকম ও যতদিনের
পুরাতন ও যন্ত্রণাচার্যক অর্শ হউক না কেন এই
দৈবলঙ্কা মহৌষধ যন্ত্রণাক্তির ত্রায় কার্য
করবে। এরূপ ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই।
কালীমাতার পূজার খরচ ১/৫ এক টাকা
পাঁচ পয়সা মাত্র। এই ঔষধ যারপের কোন
নিয়ম নাই। ইহা বহু পরীক্ষিত।
চাক্ষুণ্ডল স্বতন্ত্র। বিকলে মূল্য করণ।

শ্রীপ্রসাদ দাস মুদ্রাপাণ্ড্য

১৭১লি, অপার দারকুলার রোড,
পোঃ আঃ ভান্ডার, কলিকাতা।

কান্দীপ্তর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘর

দিলীপ ও সুনীলা

সুনীলা—অমৃতবাজারে লেখাটা পড়ে
সমগ্র ভারত অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি
লিখেছে। পেশোয়ার, লাহোর, দিল্লী,
এলাহাবাদ, বেনারস, পুনা, বম্বে, মাদ্রাজ,
পাটনা, পুরী এবং শিলং। বেঙ্গলের কিন্তু
একখানাও চিঠি নেই।

দিলীপ—জানি।

সুনীলা—গোয়ালির থেকে এক মুলমান
যে পত্র লিখেছেন, দেখানা এক অপূর্ণ
পত্র। পড়েছো সেটা?

দিলীপ—পড়েছি।

সুনীলা—সে বলছে যে ভারতের দশটা
প্রদেশ থেকে যদি দিলীপকুমারের মত
দশজন হিন্দু—

দিলীপ—থাক সুনীলা, আমি জানি।

সুনীলা—তোমার আজ কি হ'য়েছে
দিলীপ? কোন জিনিষেই যেন তুমি মন
দিতে পারছো না।

দিলীপ—আমি তো জানি না, কিছু
আমার হয়েছো কিনা।

সুনীলা—কিন্তু আমি দেখছি তুমি যেন
কি এক দুঃখের ভারে লীড়িত।

দিলীপ—আমার সবচেয়ে আমি নিজে
যা বুঝতে পারি না, তুমি তা বুঝতে পার,

তুমি তো দেখতে পাও।—এ কম গৌরবের
কথা নয় সুনীলা!

সুনীলা—কিন্তু গৌরব কার? আমার
না, তোমার?

(বলিয়া সুনীলা হাসিল)

দিলীপ—গৌরব তোমার; কারণ, তুমি
লোকের মনের অবস্থা বুঝতে পার।—

সুনীলা—লোকের বুঝতে পারি না।
পারি শুধু—কিন্তু চিঠিগুলোর উত্তর দেবার
কি হবে? একখানা ড্রাকট ক'রে দাঁও না,
অপাখপ টাইপ কোরে দিই?

দিলীপ—না, থাক।

সুনীলা—উত্তর দেবে না?

দিলীপ—না।

সুনীলা—কেন?

দিলীপ—অভিনন্দন পাবার জন্য লিখি
না। সুতরাং অভিনন্দন পেয়ে আনন্দ
জ্ঞাপন করার কোন অর্থ হয় বলে মনে
করি না।—

সুনীলা—কিন্তু অভিনন্দন যারা পাঠায়,
তারা উত্তরের আশা রাখে।

দিলীপ—আমি যদি উত্তর না দিতে
পারি, তারা আমার ক্ষমা কোরবে।

সুনীলা—কিছুতেই ক্ষমা কোরবে না।
তারা ভাববে তুমি দান্তিক, শিষ্টাচার জান
না এবং আরও হয়তো কত কি।

দিলীপ—তা ভাবলেও আমার কতি কি
তা বলো?

সুনীলা—আমার কিন্তু এরকম ভালো
লাগে না।

দিলীপ—ওটা একটা সম্পূর্ণ পারিবারিক কথা।

সুনীলা—পারিবারিক কথা। (অন্ন খানি বলিলেন) তোমার সঙ্গে তর্ক কোরবো না, কিন্তু তুমি আমার প্রায়ই যে কথা বল তার হিন্দব মতো আমি তোমার পরিবার অন্তর্ভুক্ত কেউ নই। আমি তোমার সহকর্মী, comrade,—দেশমাতৃকার সেবিকা। তা যদি হোল, তবে আমার একটা অনুরোধ—আচ্ছা অনুরোধ নাই ব'ললাম—আমার পরামর্শ কেনই বা পারিবারিক কথা বোলে ঠেলে ফেলে দেবে?

দিলীপ—কিন্তু সুনীলা, পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত পারিবারিক স্নেহ বা ভালোবাসার আবেদন কেন এসে উঁকি মারবে?

সুনীলা—ভালোবাসার আবেদন।...

দিলীপ—তুমি পছন্দ কর না আমার কেউ স্বাভিক্ বলে। পছন্দ কর না শিষ্টাচার অনভিক্ত ব'লে কেউ আমার মনে করে—কেন তুমি তা পছন্দ কর না?

সুনীলা—তুমি কি কোরে জানতে পার এটা পারিবারিক ভালোবাসার আবেদন মাত্র? সহকর্মী কি সহকর্মীর খ্যাতি অখ্যাতি, নিন্দা বশ প্রভৃতি ভালোমন্দ'র দিকে একেবারেই লক্ষ্য রাখবেনা?

দিলীপ—নিশ্চয়ই রাখবে। তেমন কোরেই রাখবে যেমন অল্প সব সহকর্মীদের ভালোমন্দ'র দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে!—অর্থাৎ তোমার কাছে আমি বা অজর হবো সমান ব্যক্তি।—যেমন আমার কাছে তুমি বা হেমলিনী!—'দিলীপ' কেন তোমার মনের কোনে একটা বিশিষ্ট আদন স্বপ্ন কোরে থাকবে?

সুনীলা—(চিন্তা করিয়া বলিল) বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা তাই। (বলিয়া সে ছোট্ট একখানি খাতা বাহির করিয়া কয়েক হ্রস্ব কি 'নোট' করিয়া লইল)।

দিলীপ—ও কি লিখে রাখলে?

সুনীলা—লিখে রাখলাম আমি আর হেমলিনী তোমার কাছে এক।

দিলীপ—(হা' হা' করিয়া হানিয়া বলিল) কিন্তু একটু তফাৎ আছে।

সুনীলা—কি তফাৎ?

দিলীপ—হেমলিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কোন সম্ভাবনা নেই। তোমার সঙ্গে সে সম্ভাবনা আছে।

সুনীলা—(ঠোট্ট চাপিয়া উত্তর করিল) সে সম্ভাবনা আমার সঙ্গেও আর নেই। জ্যাঠামশাই বলেই বিরোধে।

দিলীপ—কি ব'লে বিরোধে?

সুনীলা—ভিনি ব'লেই বিরোধে আমার এ যোগাযোগটা ভালো হবে না!

দিলীপ—ও!—ভালোই হ'য়েছে!

সুনীলা—হ্যাঁ, ভালোই।

(কয়েক মুহূর্ত দুইজনে স্বল্প রহিল)

দিলীপ—যোগাযোগটা কেন ভালো হবে না নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?

সুনীলা—না, তা পারিনি। কিন্তু তার স্বাকার নেই।

দিলীপ—আমিও তাই বলি। তোমার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে মতের মিল।

সুনীলা—জানি—সে যাক্, আমি ও ঘরে রই'লুম, স্বাকার হ'লে ডেকে।

(প্রস্থান)

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

দ্বিজেন—দাদা,—

দিলীপ—কি দ্বিজেন?

দ্বিজেন—বাবার কি হ'ল বোলতে পার?

দিলীপ—কেন?

দ্বিজেন—উইল বা কোরেছেন তার আশাত নামলাতে তো সকলকে বেগ পেতে হচ্ছে। আজ আবার আমার ডেকে কি ব'ললেন জানো?

দিলীপ—কি?

দ্বিজেন—ব'ললেন—দ্বিজেন! তুমি লাকি সুনীলাকে ভালো বাসিস? ... আমি তুমিত একেবারে! ব'ললাম—এ কথা ভাবাই অজ্ঞার! উত্তরে বা ব'ললেন, তখনলে তোমারও রাগ হবে। ব'ললেন—'আমি সব জানি, আমার লুকোন্ নি। আমি সেই জন্ত ঠিক ক'রেছি তোমার সঙ্গেই সুনীলার বিয়ে হবে'! ...

দিলীপ—বেশ তো।

দ্বিজেন—বেশ তো! ... 'বেশ' দাদা, সব জিনিষেরই একটা দীর্ঘ আছে। উইলের বিষয় কোন উচ্চ-বাক্য ক'রলে না, বাবা আরও এক পদা চড়িয়ে দিলেন।—ব'ললে—সুনীলার সঙ্গে হবে দ্বিজেনের বিয়ে! এতেও যদি ব'লে ব'লে ব'লে 'বেশ তো',—আমি আর কিছু না পারি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারবো।

দিলীপ—দ্বিজেন, বিবাহ আমি ক'রব না। আমারই বরং একথা আগে বলা উচিত ছিল। সুতরাং তুমি যদি বিবাহ করো, তাতে কোন্ডের কি কারণ থাকতে পারে, তা'তো আমি বুঝি না।

দ্বিজেন—দাদা, তুমি সুনীলাকে জানো?

দিলীপ—জানি।

দ্বিজেন—তুমি জান না? ওকে বরং হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া সহজ হবে, কিন্তু আর কাউকে বিয়ে ক'রতে রাজী করানো যাবে না। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে যে তোমার ধ্যান কোরে এসেছে আজ তাকে ফেরানো শুধু কঠিন বা অসম্ভব নয়,—ফেরানো হবে পাপু!

দিলীপ—পাঁচ-বৎসর বয়স থেকে বা কোরে এসেছে সেটা স্বরতো হ'য়েছে একটা অভ্যাস মাত্র। মাস্তবের কোন অবস্থাতেই কোন অভ্যাসের ছাপ হওয়া উচিত নয়—এ কথা আমিও জানি এবং সুনীলারও জানা আছে দ্বিজেন।

দ্বিজেন—সে কথা আমিও জানি। কিন্তু বার বলে একটি ছোট ঘরে তোমার দুর্দান্ত অস্থির সময় আহাির নিদ্রা ভুলে গিয়ে দ্বিবারাত্র তোমার মাথার কাছটিতে ব'লে থাকতে পারতো তাকে তুমি শুধু অত্যাশ বলা ?

দ্বিলীপ—না, তা' বলিনা, কিন্তু—

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীলা—কে আহাির নিদ্রা ভুলে গিয়ে মাথার কাছে বসে থাকতো দ্বিজেন ?

দ্বিজেন—কেউ না।

সুনীলা—কে বলে থাকতো দ্বিলীপ ?

দ্বিলীপ—তুমি।

সুনীলা—কর মাথার কাছে ?

দ্বিলীপ—আমার।

সুনীলা—ও, সেই কথা!—সে যাক—। আজ তিনটের সময় এলবাট হলে মিটিং—নাড়ে পাঁচটার বেশশিয় পার্কে। নাড়ে লাটটার রেডিওতে তোমার 'গ্র্যাডুয়েন্স', ন'টার প্রতিশ্রিয়া কনফারেন্স।

দ্বিলীপ—মনে আছে।

সুনীলা—কিন্তু বেলা হ'ল, নাওয়া খাওয়া ভালো এখনও বাকী রয়েছে, একটু হিলাব রেখো।

(প্রস্থান)

(অল্প শুক থাকিয়া দ্বিজেন জিজ্ঞাসা করিল)

হ্যাঁ, কি বলছিলে ?

দ্বিলীপ—বলছিলাম—না, অত্যাশ আমি তাকে বলিনা। যে আমার দুর্দান্ত অস্থির সময় আহাির নিদ্রা ভুলে দ্বিবারাত্র আমার মাথার কাছটিতে বসে থাকতে পেরেছে সে শুধু অত্যাশের বশবর্তী হ'রে পারে নি, পেরেছে ভালবাসার বলে। এ কথা নতুন। কিন্তু তাকে বিবাহ কোরে বললেই কি সেই ভালোবাসার চরম প্রতিধান দেওয়া হবে দ্বিজেন ?

দ্বিজেন—বিবাহ না কোরলেও তা হবে না! বরং সে ক্ষেত্রে তুমি তাকে এমন অবস্থায় ফেলে দিতে পারবে যাতে তার জীবনটা হ'রতো—

(কাশীশরের প্রবেশ)

কাশী—দ্বিজেন এখানে কি করছিস ?

(লহনা কাশীশরের আগমনে দ্বিজেন চমকিত ;—সামলাইয়া লইয়া বলিল)

দ্বিজেন—না, কিছু করিনি।

কাশী—শুনলাম বিয়ে নিয়ে কি সব বদছিলি ?

(দ্বিজেন চুপ করিয়া আছে)

ও এখানে বসে দেশের কাজ করে, তুমি এখানে disturb কোরতে আস কেন ?

(দ্বিজেন চুপ করিয়াই রহিল)

চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছিল উটল মান-বোনা, বিয়ে করবনা।—ব্যাপারখানা কি ?

দ্বিজেন—আমার তো একটা মতামত আছে!

কাশী—নিশ্চই আছে। কিন্তু তোমার মত হিসেবে আমি চলতে বাধ্য কিনা সেটাও একটু বুঝে দেখা দরকার।

দ্বিজেন—আমার মত হিসেবে তুমি কেন চলবে! তবে যে কাজের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সে কাজ আমার মত অনুযায়ী হ'লে ভালো হয়।

কাশী—কিন্তু এই ভালোর বিচার কোরবে কে ? তুমি, না, আমি ?

দ্বিজেন—তুমি কোরবে। কিন্তু আমারও বোঝা দরকার যে আমার ভালোই হচ্ছে। আমি অন্ধ বা অবোধ নই যে, বুঝতে পারবো না আমার মত একটা ভালো করা হচ্ছে!

—হাদার বিরুদ্ধে তুমি যে লম্বু—

দ্বিলীপ—আঃ, দ্বিজেন!

(দ্বিজেন লহনা থাকিয়া গেল ও দ্বিলীপের বুকের প্রতি মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল।—কাশীশ্বরও শুক রহিলেন কণকাল; বোঝা গেল চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে তিতরের ক্রোধ দমন করিতে হইল। সামলাইয়া লইয়া লইয়া তিনি বলিলেন)

—কথাটা শুনলে দ্বিলীপ ?

দ্বিলীপ—ওকথার কোন মানে হয় না বাবা।

কাশী—কোন কথার বল দ্বিকিনি ?

দ্বিলীপ—“যে বিচার তুমিই কোরবে, অথচ আমার বোঝা দরকার যে আমার ভালোই হচ্ছে।”

কাশী—তুমি হ'লে কি বলতে ?

দ্বিলীপ (হাসিয়া উত্তর দিল)—তুমি বিচার কোরবে—সেই হবে শ্রেষ্ঠ বিচার। আমি আমার বুঝে দেখতে যাবো কি!

কাশী—দ্বিলীপ, তুমি কেন আমার নিজের—না, তুমি ঠিক বলেছ;—তুমি ঠিক বলেছ! আমার ভারী আনন্দ হ'ল! (বলিয়া কাশীশ্বর প্রশ্নানোত্তর হইলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন)

—ভালো কথা, সুনীলাকে দেখতে পাচ্ছি না—সে কোথা? সে কি আর আসে না ?

দ্বিলীপ—ঐ ঘরে আছে। ডাকবো ?

কাশী—না থাক। আমি এমনি জিজ্ঞাসা কোরছিলাম।

(প্রস্থান)

(অল্প শুক থাকিয়া দ্বিলীপ সুনীলাকে ডাকিল)

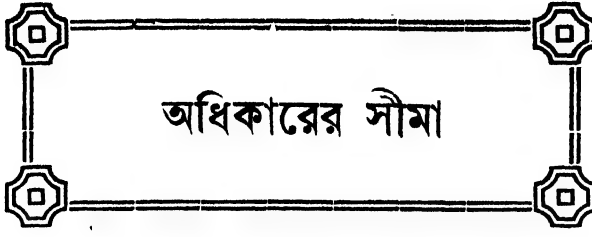
—নীলা!

(ক্রমশঃ)

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আন্ততোধ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর



অধিকারের সীমা

পাকের কুল কি শুকনো ডাঙায় বাঁচে? এই কথা বহুভাবে বহুবার বহুজন আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নের যথাযথ জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

যে কথা ফুলের জীবনে খাটে, মানব জীবনেও তাহার ছায়া দেখা যায়। এমন ব্যাপার দেখা যায় যে—মানুষ জন্মলাভ করিল পৃথিবীর গহণ এক কোণে, জীবনের বহুভাব তাহার সেই অন্ধকারেই কাটিল। তারপর হঠাৎ তাহাকে একদিন ষটনার স্রোত আনিয়া ফেলিল তীব্র আলোকময় এক জগতে। হঠাৎ এই স্থান পরিবর্তনের প্রভাব তাহার জীবনে কি ভাবে কাজ করে, তাহা ভাবিবার কথা। এমন ষটনাও শুনা যায়, যেখানে বীন হরিদ্র এক ব্যক্তি লটারির জোরে হঠাৎ হইয়া পড়িল লক্ষ টাকার মালিক। এই অবস্থা বিপর্যয়ে তাহার মানসিক অবস্থা কি হয়? কি যে হয় তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া কোন ব্যক্তিই বলিতে পারে না।

নিউ থিয়েটারের প্রযোজক বহুরা পরিচালিত 'অধিকার' চিত্রেও এমনিধারা একটি ব্যাপার দেখা যায়। ষটনার স্রোতে এক হরিদ্রা বালিকা হঠাৎ একদিন প্রচুর ধন ধৌলভের অধিকারী হইয়া পড়িল। তাহার পূর্ব জীবনের সহিত এই হঠাৎপ্রাপ্ত জীবনের কোন যোগ নাই। এই অবস্থার সেই বালিকা কি করিবে—কি ভাবিবে এবং কোন পথে তাহার জীবন ধারার স্রোত প্রবাহিত হইবে—তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রযোজক বহুরা কোন পথে এই বিচিত্র কাহিনীর সমাপ্তি করিবেন, তাহা

একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত ভাবিবার কথা লক্ষ জনের। ছায়াচিত্রে যে কাহিনী বা যে সমস্তা লইয়া পরিচালক তাঁহার চিত্র গড়িতেছেন, তাহা লক্ষ লক্ষ একেবারে অবাঞ্ছিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ছায়াচিত্র হইতে বহু সময় বহু চিন্তাধারা আমাদের জীবনে প্রতিকলিত হয়, আবার অন্তরিক্তে আমাদের বাস্তব জীবন হইতে বহু কথা, বহু ঘটনা ছায়াচিত্র পরিচালকের মনে কাজ করে।

অধিকার চিত্রের বিষয় বস্তু লইয়া প্রযোজকবাহুর সহিত একদিন আলোচনা কালে তিনি বলেন—“কোন মানুষের অধিকারের সীমা কতদূর লেগে কথা লইয়াই আমার চিত্র। আমি যে কাহিনী লইয়া কাজ করিতেছি, তাহাতে দুইজন নারীর অধিকারের সীমা লইয়া কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দুই নারীর জীবন আমার কল্পিত হইলে—সত্যকার জীবনে এমন নারীর দেখা পাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যকর নহে। যে সমস্তা অধিকার চিত্রে পাওয়া বাইবে বাস্তব জীবনেও সেই সমস্তার উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে।”

কথাগুলি ভাবিবার কথা। নারীদের বাহু দিয়া সমাজ চলিতে পারে না। কাজে কাজেই নারীর মনে যে প্রশ্ন বা যে সমস্তার উদ্ভব হয় বা হইতে পারে—তাহা সমাজ ভুচ্ছ বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে না। যদি সমাজ তাহা করে, তবে সেই পাপের প্রারম্ভিক সমাজকে একদিন না একদিন করিতে হইবেই।

‘মুক্তি’ চিত্রেও বর্তমান সমাজের বহুভাব বিষয় আলোচিত হয়। যে লক্ষ বিষয় আলোচিত হয়, তাহা বহু পরিমানে বাংলা দেশের প্রায় লক্ষ নর-নারীর মনে আঘাত করিয়াছিল। এবং আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই ‘মুক্তি’ চিত্রখানি হাজার হাজার জন বার বার দেখিয়াও আবার দেখিয়াছিল এবং এখনও দেখিতেছে। অধিকার-চিত্রেও এই প্রকার নানা সামাজিক ব্যাপার বিচিত্রতর মনোহর কাহিনীর মধ্যে দিয়া দর্শকগণের দৃষ্টিতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

যে দুইজন নারীকে আমরা জীবন বৃক্ষে এবং প্রেমের প্রাঙ্গণে লামনালামনি দেখিতে পাইব, তাহাদের আপনারা লক্ষ্যেই জানেন। তাহাদের নাম এখন করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে—ঐ দুইজন নারী তাহাদের নিজের জীবন দিয়া কাহিনীর বিষয় বস্তুকে অন্তরে লভ্য বলিয়া—অন্তত অভিনয় কালে গ্রহণ করিয়াছে। লভ্য বলিয়া কাহিনীকে অন্তরে গ্রহণ না করিলে, অভিনয় হইত কেবল অভিনয়, তাহাতে প্রাণের পরিচয় পাওয়া বাইত না।

যে নারীকে বস্তির নারী বলিয়া অভিনয় করিতে হইতেছে, তাহাকে বিনের পর বিন এবং রাতের পর রাত বস্তির জীবন—সত্যকার বস্তির জীবন দেখানো হইয়াছে। বস্তির মেয়েরা কি ভাবে থাকে, কেমন তাহাদের জীবন, কেমন ভাবে তাহারা দিন কাটায়, তাহাদের পোষাকই বা কি প্রকার ইত্যাদি লক্ষ বিষয়েই এই নারীকে শিক্ষা করিতে হইয়াছে। বস্তির মেয়েরা জীবন অভিনয় করিতে বলিয়া তাহাকে নিজের শিক্ষা দীক্ষা এবং সত্য জীবনকে সাময়িক ভাবে ভুলিতে হইয়াছে।

বস্তির এই নারীর জীবনে আরো কয়েকটি পুঙ্খ অভিনেতাকে দেখা বাইবে। তাহারা

শিল্পী সাক্ষাৎ

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

যদিও নেটা ছুটির দিন তবু মন ছিল ক্ষুধিত। কারণ কানার কানার তরে উঠেছিল লারা হস্তার বত কাজের আবর্জনার। অজানি উঠি ছটার, সেদিন উঠলাম লাড়ে পাঁচটার। এ কাজে ও কাজে বেজে গেল নটা। তখন স্ত্রী বললে সব কাজই আজ হবে, হবে না কেবল খাওয়াটা। অর্থাৎ? অর্থাৎ—তিনি একটু বাড়িয়েই বললেন—বেজে গেল দশটা, তবু হল নাকো বাজারটা, তবে আজ বন্ধ থাক ওটা। হাতের কাজ অল্প সময়ের জন্য রেখে বাড়িয়া গেল বাজারে। রোহে পুড়ে গলদঘর্ষ হয়ে ফিরলাম তখন লাড়ে দশটা। নাইতে খেতে বাজলো একটা। বিশ্রাম আর করবো কি? মনে পড়লো সন্ধ্যা বেলায় নিমন্ত্রণের কথাটা। Swimming Club-এর ছেলেরা করেছে

এই নারীর লভ্য বন্ধু। বিপদ আপদে এই নারীকে এই বন্ধুর দলই রক্ষা করে। এই বন্ধুর দলকেও বহু কষ্ট করিয়া বস্তি জীবনের পরিচয় এবং আত্মা গ্রহণ করিতে হইতেছে। পরিচালক বজুরা কীকিতে কাজ সারিতে পারেন না। যে বিবর বা বন্ধ পক্ষীয় তিনি প্রতিকলিত করিবেন তাহা একেবারে নিখুঁত না করিয়া তিনি নিরস্ত হন না।

‘অধিকার’ চিত্রের ব্যাপার বর্তমানে নিউ থিয়েটারের ২নং ষ্টেডিও পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া আছে। পরিচালক বজুরা বাড়ির কাঁটার মত কাজ করিয়া বাইতেছেন—যতীন মিত্র মহশয় সেই কাজের বাড়িটার নিয়মিত খরচা দিয়া বাইতেছেন। দুই বিখ্যাত কর্মীর সহযোগিতা অপূর্ণ আনন্দের বিষয়।

জলসা ও জলযোগের আয়োজন, আসবেন ছোটাই বাবু, হরিপদ, পাহাড়ী, পঙ্কজ মল্লিক, মণ্ট, আর আসবেন ভিমির বরণ। সামলানো যায় কি বেথবার লোভটা? বতই থাক কাজ, যেতেই হবে। কাজেই ডাকতে হল ছেলেকে লেরে নিতে তার সন্ধ্যার পড়াটা। রেহাই যখন পেলাম বেলা তখন তিনটা। তারপর স্নান হল বিকেলের কাজ।

কোন রকমে সব শেষে, সাক্ষাত লম্বাপন করে বার যখন হওয়া গেল, দেখমন তখন প্রান্ত, ক্রান্ত, নির্জীব, নিস্তেজ। তখন নদীর ধারে কিম্বা কীকা মাঠের লব্ধ খালের ওপর বসে চোখ বুজে কিমানো চলে, আর কোন কিছু করা চলে না। চুঃখের জীব। ইহাই আমার প্রাত্যহিক জীবনের ইতিহাস, আমার বৈমন্ডিন জীবন-বাক্য প্রণালীর ধারা।

গিয়ে যখন সুনলাম তাঁদের আসতে রাত হবে নটা মন যেন পড়লো ভেঙ্গে। অনেক লোক একটা ঘরে গরমে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠিলাম তখন মোটরের শব্দ গেল কানে। সঙ্গে সঙ্গে খবর এল তাঁরা এলেন। বাইরে গিয়ে দেখি, পঙ্কজ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মোটর থেকে বহিরাগমনোত্ত পাহাড়ীকে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলছেন, ওরে পাহাড়ী, কি হবে? —কেন যে? —দরকার যে লেখা আছে “Members only” গলার স্বর ও বলার ভঙ্গিতে সকলে হো হো করে হেসে কেললে।

—তা হলে কি করা যায়। মোটর থেকে নেমে পাহাড়ী অদ্বারের দ্বারে বললেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ

আবার উচ্চ হালির রোল উঠলো।

ক্লাবের কর্তা এনে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন আছেন ভিতরে?

—আজ্ঞে, তাহলে আমরা Honorary members, কি বলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ

সকলে হাসতে হাসতে গেলাম ভিতরে।

বিস্ময়ে সকলকে অবাক করে দিয়ে পাহাড়ী বললেন, ওটা কি বেথলুম বলুন দেখি?

—কোথার? কোথার? সকলে লম্বা-স্বরে বলে উঠলো।

—ওই যে গো মোটরটা যেখানে দাঁড়াল তার ওধারে, রাত্তার ওপারে ছোট্ট ঘরটা। প্রথমে মনে হল ঘরটা অন্ধকার, তারপর দেখা গেল, না, আলো আছে। একটু জোর করে দেখতে হয়। যখন নামছিলাম মোটর থেকে সেই অলপট আলো আঁধারের ভেতর থেকে কি একটা দেখছিল মুখ বাড়িয়ে। এক রাশ চুল তার মুখে। ছোট ছোট ছেলেরা ছেলে লুটরে পড়লো। বললো, ওই ওদের দারোয়ান।

—দারোয়ান! তবু রক্ষে।

তারপর আরম্ভ হল গান। গানের পর হালি গল্প। তারপর আবার গান। “ভাল বেনেফিট এই ধরগীরে—আমি কি পাইনি।” মাটির পৃথিবীর প্রতি কি অন্তরের দরদ! অপূর্ণ ভাবের মাধুর্য্যে, স্রবের স্বাক্ষরে স্বর ভরপুর হয়ে গেল। কিছু ভিমিরবরণের বাজনা শোনা হল না। তিনি আর একবার এনে শোনাবেন বললেন নিজের বস্ত্র নিয়ে এনে!

পাহাড়ী অমনি ষাফ বাকিরে বললেন, সেই ভাল, instalment-এ হোক আমাদেরও খাওয়াটা হবে।

তারপর আবার গান। স্রবের লহরী স্বরের মধ্যে খেলে বেড়াতে লাগলো।

ব্রীজ খেলা

ক্রীড়াধীশা

প্রতিযোগিতার একটি হাত

এ বৎসরের ল্যান্ডডাউন কন্ট্রোল ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতা থেকে নিজের হাতখানি উদ্ধৃত করা গেল। এক ঘরে এক পক্ষ উক্ত হাতে খেলা করার দরুণ জয়ী হলেন, আর অন্য ঘরে ক্রীড়কবল চিন্তাহীনতার জন্য ডাক দেওয়া লম্বেও হেরে গেলেন। হাতখানি এইরূপ,

ইস্কাবন—টেকা, লাহেব, বশ, ×, ×।

হরতন—টেকা, ×, ×।

রুহিতন—×, ×, ×।

চিড়িতন—টেকা, ×।

	উ	
প		পু
	ব	

ইস্কাবন—বিবি, ×।

হরতন—লাহেব, গোলাম, নয়, ×, ×।

রুহিতন—×।

চিড়িতন—লাহেব, বিবি, বশ, নয়, ×।

উভয় ঘরেই একই রকমের ডাক হয়েছিল,

কোথা দিয়ে লম্বটুকু কেটে গেল বোঝা গেল না।

সব শেষ হলে যখন রাত্তার এসে দাঁড়ালাম লক্ষ্য। বেলার শ্রান্তি ক্লান্তি তখন ঘুরে গেছে। সবল লম্বে মন আবার সব কিছুই নূতন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে লক্ষম। লম্বারের অতি কঠোর নিয়ম-তান্ত্রিকতার ক্রিষ্ট-পিষ্ট মাত্রার পক্ষে শিল্পী-লাহেব কতখানি দুর্বল তা নূতন করে উপলব্ধি করলাম। বুঝতে পারলাম এদের প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

‘ব’

একটি হরতন।

ছইটি চিড়িতন।

পাঁচটি হরতন।

পাশ।

‘উ’

একটি ইস্কাবন।

চারটি ফেরাই।

ছয়টি হরতন।

অতঃপর খেলা আরম্ভ হল। প্রতিপক্ষ রুহিতনের টেকা খেলে পিটখানি নিয়ে পুনরায় রুহিতন খেললেন। ডাকবার ভূরূপ করে ঐ পিটখানি নিয়ে ছোট এক তাল রঙ খেললেন। ডাকির হাতে টেকা দিয়ে পিট নিয়ে আবার ছোট রঙ খেলে নিজ হাতে ফিনাস করে পিট লংগ্রহ করলেন। অতঃপর ডাককারী চিন্তা করলেন যে রঙের লাহেব খেলে তিনি যদি বিবি ঘরে নেন এবং বিপক্ষ ঘরের ইস্কাবনের বিভাগ যদি ৩-৩ না হয়ে ৪-২ বা ৫-১ হয়, তাহলে তাঁদের লবগুলি পিট নেওয়া একেবারে অসম্ভব; কারণ তাঁকে ছইখানি

‘প’

পাশ।

পাশ।

পাশ।

পাশ।

‘পু’

পাশ।

পাশ।

পাশ।

চিড়িতন পাশাতে হবেই হবে। অতএব আগে থেকেই যদি একখানি চিড়িতন ভূরূপ করে নিয়ে রেখে দিই, ডাকির হাত থেকে তাহলে খেলা করা বিশেষ শক্ত নয়। এইরূপ চিন্তার পর চিড়িতনে তিনি একখানি পিট ভূরূপ করে নেওয়ার পর খেলা করে নিলেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ঘরে ঐরূপ চিন্তা না করার দরুণ ডাককারী খেলা করতে পারলেন না এবং প্রতিযোগিতার পরাজয় স্বীকার করে চলে এলেন।

এই ধরনের তাল হাতে পড়লেই খেলা আরম্ভ করার পূর্বেই প্রত্যেক ক্রীড়কের পূজাপূজারূপে চিন্তা করা অতীব আবশ্যিক যে পাশযোগ্য তালগুলি যে রঙে পাশানো হবে সেই রঙের বিভাগটি কিরূপ। উক্ত রঙের বিভাগ যদি সম্ভবজনক হয় তাহলে সেই বিভাগ ঠিক করে তবেই খেলা বিশেষ, অত্যাধিক তালের মত টেকা লাহেব বিবি থাকা লম্বেও একটি কম পিট নিতে বাধ্য হবেন। নিয়ে চারিটি হাত দেওয়া গেল,—

ইস্কাবন—টেকা, লাহেব, বশ, ×, ×।

হরতন—টেকা, ×, ×।

রুহিতন—×, ×, ×।

চিড়িতন—টেকা, ×।

ইস্কাবন—গোলাম, ×, ×,

×।

হরতন—×, ×।

রুহিতন—টেকা, লাহেব, ×,

×, ×।

চিড়িতন—×, ×।

	উ	
প		পু
	ব	

ইস্কাবন—×, ×।

হরতন—বিবি, ×, ×।

রুহিতন—বিবি, ×, ×, ×

চিড়িতন—গোলাম, ×, ×,

×

ইস্কাবন—বিবি, ×।

হরতন—লাহেব, গোলাম, নয়, ×, ×।

রুহিতন—×।

চিড়িতন—লাহেব, বিবি, বশ, নয়, ×।

কর্মবীর

সুন্দর প্রভাত। লবে সূর্য্য উদিত
হইয়াছে। চতুর্দিক পাখীর গুলনে সুখরিত।
এমন সময়ে গ্রাম্য কৃষক ভগীরথ তাহার
স্ত্রী অঞ্জলী ও তাহারের একমাত্র নবজাত
শিশু সহ গজার তীরে উপস্থিত হল। এত
বড় পৃথিবী কিন্তু তাহারের মত ক্ষুদ্র
পরিবারের থাকিবার জায়গা নেই। সুন্দর
প্রভাত সকলেই সুন্দরের জয়গানে লুগলিত।
কিন্তু এহেন সুন্দর প্রভাত তাহারের নিকট
আনিয়াছে হৃৎকের এক বিরাট পমরা।

রাজার পাইক বলপূর্ব্বক কৃষক ভগীরথকে
রাজার আদেশে রাজহরবারে হাজির করে।
ভগীরথের স্ত্রী অঞ্জলী স্বামীর এত অবস্থায়
খুবই বিচলিত হয় এবং পাগলিনীর তায়
স্বামীর অতুলন করে। নদীর তীরে অস্বস্তি
অবস্থায় তাহার একমাত্র শিশুপুত্র পড়ে
রইল। বৃষ্টি বা নদীর জলেই সে শিশু
ভেসে গেল।

রাজহরবার থেকে ফিরে এসে ভগীরথ
পুত্রকে তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খোঁজ করে,—
কিন্তু কে তাকে জানাবে যে নদীর জলে
তার ছেলে ভেসে গেছে। ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়
ভগীরথ প্রতিজ্ঞা করে, যে ভাবেই হউক
এর প্রতিশোধ সে নিবেই। তার এ
প্রতিশ্রুতির অনল কিছুতেই নির্বাপিত
হবে না।

এদিকে নদীর তলে শিশু ভেসে যায়।
বিশ্ব রাজগুরু তা দেখতে পেয়ে নিজ আশ্রম
শিশুকে নিয়ে আসে। অনাগ শিশু রাজ-
গুরুর আশ্রমে প্রতিপালিত হতে থাকে।
ক্রমে ক্রমে সে শিশুর শৌর্য্য বীর্য্য মধ্যাহ্ন
ভাষ্যের তায় প্রতিভাত হয়। রাজগুরু
তার নাম দিলেন, “কর্মবীর”। কর্মবীর
হল হরিজের বন্ধু, অনাথের লহায় ও
পাণীর হৃৎস্পন্দ।

কর্মবীরের শৈশব সজিনী ললিতা ও
কর্মবীরের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মে।

কিন্তু বেকল নামক ভৈরব গ্রাম্য বৃষকও
ললিতার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয় কিন্তু
ললিতাকে কর্মবীরের প্রতি আকৃষ্ট হেথ
বেকল প্রতিজ্ঞা করে কর্মবীরের অনিষ্ট সাধন
নে কর্বেই।

ইতিমধ্যে রাজ্যে খুবই অরাজকতা দেখা
দেয়, রাণী প্রভাবতী যখন স্থির করেন যে
তাঁহার হস্তক পুত্র অমর লিংকে লিঙ্গদানে
অভিষিক্ত করিবার পরিবর্তে কুমার চন্দ্র
শেখরকে অভিষিক্ত করা হবে তখন অমর
লিং কুমার চন্দ্র শেখর ও রাণী প্রভাবতীর
বিক্রোদে গোপন বড়লজ্জা করে। ভগীরথ এসে
অমর লিংহের পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু
কর্মবীর রাণী প্রভাবতী ও কুমার চন্দ্র
শেখরের পক্ষে থাকায় অমর লিং ও
ভগীরথের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

অমর লিং ও ভগীরথ অতঃপর রাজার
ধনাগার লুণ্ঠন করে ও রাজাকে হত্যা করে।
অদৃষ্টে পরিহাসে রাজগুরু এই খবরের দ্বারা
অভিযুক্ত হয়। অমর লিং তখন রাজ্যের
সর্বমুখ বর্তা।

অমর লিংহের দক্ষিণ হস্ত ভগীরথ অমর
লিংকে চিঠি লিখে জানায় যে, বলিনী রাজ-
কন্যাকে বলি দেওয়া হবে, অমর লিং যেন
দীর্ঘ তথায় উপস্থিত হয়। ভূতক্রমে অমর
লিং সে চিঠি ফেলে রাখে এবং তা কর্মবীরের
হস্তগত হয়।

এখান থেকেই অদৃষ্টের চাকা ঘোরে,
রাণী রাজগুরুর স্তুতি বান করেন, সর্বত্র
বৃদ্ধের দামাদা বেজে উঠে। রাণী তাঁর
বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী সহ ‘সমরানলে অবতীর্ণা
হন।’ ভগীরথ তার বাহিনী সহ কর্মবীরের
পশ্চাৎসাবন করে। অমর লিংহের শোচনীয়
পরিনতি, ললিতার সার্বক ভালবাসা, পিতা
পুত্র বৃদ্ধ ও তার পরিণাম ইত্যাদি দেখিতে
হলে আপনি নিশ্চয়ই নিউ আলফ্রেড টকীতে
“কর্মবীর” দেখিবেন।

প্রভাত সিনেমা

বর্তমানে এই চিত্র গৃহে সাগর স্তুতি-
টোনের হিন্দি চিত্র জাহ্নবীর দ্বারা দেখান
হইতেছে। চবিখানা ৭ম নম্বর চলিলেও
এর জনপ্রিয়তা এখন পর্যন্তও কিছুমাত্র হ্রাস
পায়নি। কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন “জাহ্নবীর-
দারের” পর এখানে ভবনানী ছবি “হিমালয়
কি বেটা” দেখান হবে। এনাকী রমা-
রাওয়ের অতুলনীয় নৃত্য ও রামানন্দের অপূর্ব্ব
লঙ্গীত উভয়ের মিশ্রনে চবিখানা হইয়াছে
চমৎকার। “হিমালয় কি বেটার” পর “৩০.৬৩
দ্বিঘন পরে” নামক চবিখানা দেখান হইবে।
গল্পের নুতনত্ব, গানে ও অভিনয়ে চবিখানা
বর্তমান সময়ের আবহাওয়া উপযোগী একখানা
শ্রেষ্ঠ চবিরূপে পরিগণিত হইয়াছে।



বি, বি, হেয়ার অয়েল

সম্বন্ধে মতামত

আমি এবং আমার পরিবারস্থ সকলে
বি, বি, হেয়ার অয়েল ব্যবহার করিয়া উপকার
পাইয়াছি এবং সেই অবধি আমি এই
তেলটিই সর্বদা ব্যবহার করিতেছি।
তেলটির গন্ধ অতি স্নিগ্ধ এবং মস্তিষ্ক স্খল
রাধিতে ও কেশবৃদ্ধি করিতে ইহার গুণের
পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি।

শ্রীউমা দেবী।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

শ্রীউদ্দেশাদাস

সম্মেলনের শেষ রাত্রির অনুষ্ঠান লক্ষ্য ৩।১৫ মিনিটের সময় আরম্ভ হইয়াছিল। এই দিনের সকালের অধিবেশনে সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষ মহাশয় (লালা বাবু) নিবেদন করিয়াছিলেন যে লক্ষ্য অনুষ্ঠানটি ছাপা programme অনুসারে হইবে না। তিনি লক্ষ্য অনুষ্ঠানের যে তালিকা ঘোষণা করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

৫।-৬। প্রতিযোগিতার demonstration

৬।-৭। শ্রীমতী বসু

৭।-৮ প্রোঃ সুরেশ বাবুমান

৮-৯। কুমার বীবেকেশ্বর রায়চৌধুরী

৯।-১০ শ্রীমতী হীরাবাই

১০-১১ নৃত্য

১১-১২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র

১২। হইতে শ্রীমতী কেশর বাই

তাহার এই ঘোষণা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় (বিনি লম্বুখের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন) আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া লালাবাবু অপ্রতিভ হইয়া দিলীপবাবুর নিকট করবোধে মার্জনা ভিক্ষাপূর্বক পুনরায় ঘোষণা করেন যে তাহার পূর্বনিবেদিত programme এর মধ্যে কোনও এক সময় ৫ মিনিটের জন্য দিলীপবাবু গান করিবেন। লালাবাবুর এই ঘোষণা শুনিয়া দিলীপবাবু অবশ্য করিয়া আশ্রয় পুনরায় নিজ আসন গ্রহণ করেন।

এই ত গেল সকালের পালা। কিন্তু, যদিও লালাবাবু সম্মেলনের ছাপা programme (বাহার দান আবার চারি আনা)

নাকচ করিয়া নূতন programme সৃষ্টি করিয়াছিলেন তথাপি বৈকালে দেখা গেল যে কার্য্যভঃ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে programme এরও কোন মূল্য রহিল না। বাহা হউক, নূতন programme অনুযায়ী ৫।১৫ আরম্ভ হইবার স্থলে ৬-১৫ মিনিটের সময় অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রথমে দুইজন প্রতিযোগীর demonstration এর পর শ্রীযুক্ত মনমোহন সবংশর্মা সেতার বাজাইলেন। সেতার বাজনার পর বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সারঙ্গী প্রোঃ মজিহ খাঁ লাহেবের বালকপুত্র মাষ্টার মজিহ খাঁ ভীমপলশ্রী রাগে সারঙ্গী বাজাইয়াছিলেন। পরপর দুইটি বাজনার পর Programme Director মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে শ্রীমতী লক্ষ্মী বসু কীর্ত্তন গান করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পূর্বোক্ত ঘোষণার পর Programme Director মহাশয়কে যেকোন উপর তাহার আসনে আর দেখা যায় নাই। তিনি অশ্রু আর একবার চারি-ষট্টি বাঁধে মাত্র ১০ মিনিটের জন্য আনিয়াছিলেন বটে কিন্তু তখন তাঁহাকে আর programme পরিচালনা করিতে দেখা যায় নাই। তাহার আসনত্যাগের মধ্যে কোনও রহস্য লুক্কায়িত ছিল কি না তাহা অবশ্য বিশেষভাবে নির্দেশ করা সহজ লভ্য নয় তবে তিনি যখন পুনরায় আনিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাহার কথাবার্ত্তার ও আচরণে যে ইজিত ও আত্মপাণ্ডুরা গিয়াছিল তাহা হইতে মনে হয় যে তাহার উপস্থিতিতে কর্ত্তৃপক্ষগণ যে অপর কোনও ব্যক্তিকে নির্বর্থক নূতন

programme ঘোষণা করিতে দিয়াছেন এবং সে programme মতও তাহার কার্য্য করিতেছেন না ইহাতে তাহার ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়াই তিনি অন্তরে অভিমান বোধ করিয়াছেন। আমরা অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছি যে গত করবিন ধরিয়াই Programme ঘোষণার বিষয়ে Director মহাশয়ের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। কারণ যখনই কোনও বিশিষ্ট শ্রীকে পরিচিত করিয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল তখন মাত্র একটা স্থল ব্যতীত বাহাতে অবশ্য লভ্যপতি মহাশয় নিজের পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, অত্র সকল ক্ষেত্রেই লালাবাবু অগ্রণী হইয়াছিলেন—Committee হইতে যখন একজন Programme Director নির্বাচিত করা হইয়াছে তখন তাহার উপস্থিতিতে অত্র কাহারও পক্ষে programme পরিচালনা করিতে যাওয়া লম্বাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য তত্ত্বতা বিরুদ্ধ। কিন্তু কোষাধ্যক্ষ মহাশয় বোধ হয় director মহাশয়ের কর্ম-কুশলতার সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়াই মাঝে মাঝে programme পরিচালনাও করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি শুধু programme পরিচালনা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না; পরন্তু লম্বাধারণ সম্পাদকেরও অনেক কর্তব্য তাঁহাকে পালন করিতে দেখা গিয়াছিল। আমাদের বিবেচনার লালাবাবুর মত লক্ষ্যতোভাবে কর্মপটু ও উৎসাহশীল ব্যক্তিকে শুধু কোষাধ্যক্ষের পদে না রাখিয়া যদি লম্বাধারণ সম্পাদকের পদে অটরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে যথাস্থিতি সমাধর করিবেন বলিয়াই বিশ্বাস।

কীর্ত্তনগানের পর শ্রীমতী বসুর পুরী রাগের দুইখানি খেরাল (একটি বিলম্বিত একতালার ও অপরটি হ্রস্ব-ত্রিভাঙ্গীতে) ও যোগিরা রাগের একখানি তালুন গান করেন। ইহার পর প্রোঃ সুরেশ বাবুমান বাগেত্রী

রাগের একখানি খেরাল গাহিয়া "হোলি খেলত নন্দকুমার" এই চুম্বনী গান করেন। খেরাল গানটা অবশ্য আমাদের ভালই লাগিয়াছিল কিন্তু প্রোফেসর নাহেব যদি অজ্ঞ কোনও চুম্বনীগান গাহিতেন তাহা হইলে বোধহয়, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ অধিকতর আনন্দ পাইতেন। কারণ, এই গানটাই শ্রীমতী হীরাবাই প্রথম রাজির অধিবেশনে তাঁহার অনন্তসাধারণ অনিন্দিত ভক্তিতে গান করিয়া লক্ষ্য লামাজিককে এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাহার পর অজ্ঞ কোনও শিল্পীর পক্ষে উহা গাহিয়া তুল্যভাবে রচনা করিতে না পারাই স্বাভাবিক। প্রোফেসর বাবুশানের গানের পর গৌরীপুরের কুমার বাহাদুর বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সুশ্রুদ্বারে মুন্সী কানাড়া ও মিশ্র-পিলুর আলাপ করেন। লক্ষ্য যখন বেণী বেওয়া হয় নাই তখন কুমার বাহাদুর যদি এই পরমকালের মধ্যে ছইটী রাগের আলাপ না করিয়া যে কোনও একটীর আলাপ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে নংকপে কাজ সারিতে হইত না। বাজনার পর শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় কৃষ্ণাবিবরক এক খানি বাংলা ভজন ("ঐ বৃন্দাবনের লীলা") গান করেন। দিলীপবাবুর গানের পর নাচের আদর আরম্ভ হইল। প্রথমে প্রতি-যোগিনীগণের অজ্ঞতমা কুমারী নয়রাজিনী রায় নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। উহার পর কুমারী আশা ওয়া মণিপুত্রী রীতিতে "পুজারিনী" নৃত্য আরম্ভ করেন। গত বৎসর কথক নৃত্যে কুমারীর যে শিক্ষার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এবৎসর সে শিক্ষার যথেষ্ট অবনতি লক্ষ্য করিয়া প্রথমে আমরা বিম্বিত হইয়াছিলাম—কিন্তু আলোচ্য রাজিতে কুমারীর তথাকথিত মণিপুত্রী নৃত্য দর্শন করিয়া ইহা বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝা গিয়াছিল যে তথাকথিত মণিপুত্রী নৃত্যের প্রতি কুমারীর এই আকস্মিক অগ্রগতিই তাঁহার পূর্বশিক্ষার

অবনতির একমাত্র কারণ। কুমারী ওয়ার নৃত্যের পর বাবুশী বিজ্ঞাবিধির ছাত্রীগণ "মহা" নৃত্য আরম্ভ করিলেন। পরিকল্পিত নৃত্যটি চারিটি অংশে সম্পূর্ণ। প্রথম অংশটি শেষ হইতে না হইতেই দেখা গেল যে লক্ষ্যের আনন্দে কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে বাহারা উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের অনেককেই নাচ লক্ষ্যে নানাপ্রকারে অনন্তোত্তর ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি যে ঐ দিন সকালে লালাবাবু মহাশয় নৃত্য programme-এ আলোচ্য রাজিতে এক ঘণ্টার অজ্ঞ নাচের ব্যবস্থা আছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র ২৫ মিনিট কাল নৃত্য হইতে না হইতেই কর্তৃপক্ষগণ এত বিচলিত হইয়া পড়িলেন কেন? এস্থলে জিজ্ঞাসা এই যে লালাবাবুর ঘোষিত programme কি কর্তৃপক্ষগণের অনুমোদিত নহে? যদি উহা অনুমোদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত আচরণ ঘোটেই শোভন হয় নাই। আর যদি উহা তাঁহাদের অজ্ঞাতনামে কেবল লালাবাবুর নিজ অভিক্রটি অনুসারে হইয়া থাকে তাহা হইলে লালাবাবুর এই স্বতন্ত্র আচরণ করিবার অধিকার তাঁহাকে কে বা কাহার দিয়াছিলেন? বাহা হউক, কিছুকাল পরে যখন উক্ত নাচের দ্বিতীয় অংশটি আরম্ভ হইল তখন আবার দেখা গেল যে লালাবাবুর dais হইতে নাহিয়া আনিলেন এবং লক্ষ্যের আনন্দে বলিয়া প্রকাশ্যভাবে নিজ করতালি দিয়া এবং পাশের পরিচিত দর্শকবৃন্দকেও করতালি দিতে অনুরোধ করিয়া নাচ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু ইহাতেও যখন লালাবাবু দেখিলেন যে বিজ্ঞাবিধীর নাচের পালা বেশ পুরা দমেই চলিতেছে তখন তিনি পুনরায় dais-এর উপর গিয়া বাহাতে বাকী ছইটী অংশ প্রদর্শিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন—এবারে

অবশ্য তাঁহার উদ্ভব লক্ষ্য হইল। কারণ দ্বিতীয়অংশের পর যে ববনিকাটি কেলা হইল তাহাকে বহু চেষ্টা করিয়াও আর উত্তোলিত করা গেল না। আমরা, অবশ্য তখন তাবি-লাম যে ঐ রাজির বাকী programme বুঝি বা ববনিকার অন্তরালেই রহিয়া গেল—, কিন্তু, ববনিকাটিকে যখন কোনওরূপে পার্শ্ব সরাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল তখন শ্রোতৃবর্গের আশা হইল যে তাঁহার শ্রীমতী হীরাবাইয়ের গান শুনিতে পাইবেন। কিন্তু, তখন দেখা গেল যে নাটোরাবিপতির জোঁঠপুত্রের নিকট হইতে একটা রৌপ্য পদক প্রাপ্তির লংবাধে প্লকিততত্ত্ব আমাদের Black board অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিতেছেন Dance by Moni Bardhan. লেখা লম্বা হইতে হইতেই প্রেক্ষাগৃহের লক্ষ্য স্থান হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"No more dance, No more dance" কিন্তু লক্ষ্য নরক ইহাতেও বিচলিত না হইয়া তাঁহার একঘেরে বৈচিত্র্যহীন তথাকথিত বলি নৃত্য দেখাইতে লাগিলেন—আমরা মণিবাবুর ঐর্ষ্যের প্রাণশ্রী না করিয়া থাকিতে পারি না; কারণ তিনি বতকণ নাচিলেন ততকণ অনবরত বেরণ করতালি পড়িতে লাগিল তাহাতে অজ্ঞ যে কোনও রথীকে অবশ্যই রণে ভজ দিতে হইত।

বাহা হউক, নাচের পালা থাকিলে শ্রীমতী হীরাবাই বয়োবৃদ্ধির দাক্ষ্য বেহাগ রাগের একখানি খেরাল গান করিয়া পরে খাওয়াজ রাগের একখানি চুম্বনী ও ভজন গান করেন। এই রাজিতে শ্রীমতীর গাহিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না; তবে নাটোরের মহারাজের ইচ্ছানুসারে তাঁহার গানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীমতী হীরাবাইয়ের গানের পর শ্রীমতী কেশরবাই (কার কার) হিন্দোল বাহার, জয়জয়ন্তী ও নট এই তিন-রাগের খেরাল গান করেন। শ্রীমতীর গান শেষ

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বেতারে দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমরা মহিলা শ্রোতাদের নিকট হতে চতুর্দিক থেকে অভিযোগ পত্র পাচ্ছি। আমরা বহুবারই বলেছি দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে বেতার কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত উৎসাহিততার পরিচয় প্রদান করে থাকেন এই অনুষ্ঠানটির তেমন যেন গুরুত্ব বেতারে নেই। কোনরকমে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে ছেবার দুর্লভতা এ বিভাগে বার বার দেখা যায়। যত রাজ্যের বাজে রেকর্ড, নভিস্ আর্টিষ্ট—এই ছিঁয়ে দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠান।

মধ্যে এ বিভাগে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সে ক্রমাগতির শ্রোত হঠাৎ গেল রুদ্ধ হয়ে। যে কয়জন শ্রুণী সুরশিল্পী স্বকণ্ঠ রসালোচকের লক্ষ্যন পাওয়া গিয়েছিল ষাঁদের আগমনে বেতারে বেজেছিল নূতন সুরের আগমনী আভাষ, আজ অজ্ঞাত কারণে আর তাঁদের লক্ষ্যন পাওয়া যাচ্ছে না। আবার সেই যে আধারে সেই আধারেই।

সেই বিস্ময়জনক একঘেয়ে বাগ্মি আর 'গ্রামোফোনের নাকি সুর' বৈচিত্র্যহীন লম্বের অপব্যবহার মাত্র! চারিবিিকেই শোনা

হইল পর পণ্ডিত ওকারনাথ ঠাকুর "বন্দে-মাতরম্" ও "রঘুপতি রাষা" এই দুইখানি গান গাহিলে রাজি ও খটকায় লম্বের চতুর্ধ-বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি—বেতার কর্তৃপক্ষের মোহনিত্রা কিন্তু ঘোচে না।

অথচ এ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা বাড়ল। দেশে কত অধিক! নারী শিক্ষা, মাতৃ শিক্ষা, লক্ষ্যন প্রতিপালন, স্বাস্থ্য, নৌদর্শ্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নারী ধর্ম এ সবের কতটুকু আভাষ বেতার কর্তৃপক্ষ নারী লম্বাক্রমে দান করে থাকেন!

আমাদের শরণা বেতারের মহিলা শ্রোতা অধিক। মহিলাদের চিত্তবিনোদন অবসর বাপন—এই ক্ষেত্রেই অধিকাংশ বাড়ীতে রেডিও

নেট রাখা হয়। মহিলা শ্রোতাদের দাবী অতএব অকিঞ্চিৎকর হতে পারে না।

দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠানের স্বল্প নির্দিষ্ট সময়কে আরও কমিয়ে দেওয়া হোল কেন? আঃটার স্থলে ওটার দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এর বিরুদ্ধে আমরা বহু অভিযোগ স্তনতে পাচ্ছি।

দ্বিপ্রাচরিক অনুষ্ঠানে বহুদিন বাধে একটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা শোনা গেল। ষাঠাকুর মধ্যস্থতায় নারী ধর্ম আলোচনা বিশেষ শিক্ষণীয় হয়েছিল। ষাঠাকুরকে মহিলা আসরে আমরা নিয়মিতভাবে দেখতে চাই।



ফোন ২৭৭৪

বড় বাজার

প্রোগ্রামী অমৃত লাল কুমার

কাঠের জাট

কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁটি সরিষার তেল

ভারত অয়েল মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আগার সারকুলার রোড, কলিঃ

খেয়ালী চিত্রপট



কেবল লম্বা শুধু জুন্দরী নয়—অভিনয়ও
তিনি স্বয়ং অভিনয় করেন।



পরিচালক

টেলিগ্রাম

আনন্দাল নিউজপেপার লি:

টেলিফোন

তারিখ:

সিউপ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

৪৫ম বর্ষ, পঞ্চবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই আগস্ট ১৯৪৫, ১৩শ জুন ১৯৪৮

কর্পোরেশনের আশে পাশে

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-সচিব-নিয়োগ সমস্তা জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। ডাঃ সত্যানন্দ রায়, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ও শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু প্রার্থী হইয়াছেন। শিক্ষয়িত্রী বিষয়ক তদন্তের ফলে যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে জনৈক সহকারী মহিলা শিক্ষা-সচিব নিযুক্ত হইয়া উচিত। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর গ্রাম প্রবীণা ও উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করার জন্য কুমার বিশ্বনাথ রায় প্রভৃতি তরুণ কংগ্রেস কাউন্সিলারবৃন্দ বিশেষ উৎসাহী। শিক্ষা বিভাগে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর যতিভক্ততা বহুবৎসর-সম্প্রদায়। কটকে, কলকাতা ও দিল্লীকাতাতে শিক্ষকতা করিয়া শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী বিশেষ সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছেন এবং শৃঙ্খলা-রক্ষায় ও নৈতিক আদর্শ গঠনে নিষ্ঠাবতী শ্রীযুক্তা গাঙ্গুলীর নিয়োগ সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য।

কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বিগত নির্বাচনে তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছে বর্তমানে তাঁহাকে এই পদের জন্য মনোনীত করিয়া উদার মনোভাবের পরিচয় দিলে পূর্বকৃত অবিচারের যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমরা দলপতির দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

শিক্ষা-সচিবের পদে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্করের গ্রাম বিত্তোৎসাহী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে উক্ত পদের মর্যাদা রুদ্ধ পাইবে এবং কর্পোরেশনের শিক্ষা-বিভাগে লুপ্ত-শৃঙ্খলা ও নৈতিক আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিরণবাবুর অগ্ণাত সমস্ত ঘোষিত্রটি থাকিলেও তিনি যে নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান ব্যক্তি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। রাজনীতিতে যোগদানের পূর্বে তিনি অধ্যাপকরূপে জীবনযাত্রা করেন এবং অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার সুনাম আছে। “সবুজ-পত্রের” গোষ্ঠিভুক্ত কিরণবাবু বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসাবে সুপরিচিত এবং রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে না পড়িলে কিরণবাবু আজ বাংলা সাহিত্যে লক্ষ-প্রতিষ্ঠ লেখক রূপে পরিগণিত হইতেন। কিরণবাবুর সহিত অগ্ণাত বিষয়ে আমাদের ঘোর মত-বিরোধ থাকিলেও আমরা তাঁহার শিক্ষা-সচিব পদে নিয়োগ সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করি কারণ তাঁহার শিক্ষা-সচিবের পদে নিয়োগ উপযুক্ত হইবে এবং কর্পোরেশনে কংগ্রেসী আদর্শ ও নিষ্ঠা পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইবে। অপর পক্ষে বাংলার রাজনীতি শনি-মুক্ত হইবে।

কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুণালের অ্যাসেসার নিয়োগ আসন্ন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম. এল. এ. ও শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় প্রার্থী হইয়াছেন। আমরা এ বিষয়ের আলোচনা বারাস্তরে করিব।

ট্রাউন-হলের আইন কর্তার পদে ভূত-পূর্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষকে সমর্থন করিবার জন্য কংগ্রেস-দলপতি নির্দেশ দিয়াছেন।



(বিলাসী)

বিজ্ঞাপতি

সম্রাটের পর সম্রাট হয়ে, “বিজ্ঞাপতি” সম্রাটভাবে দর্শক আকর্ষণ কোরে চলেচে “চিত্রায়”। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত এবং অভিনয় ও দৃশ্যপটটির অভিনবত্ব—নিউ থিয়েটারের ‘বিজ্ঞাপতি’ যে সর্বত্রই বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে, একথা আর নতুন কোরে বলবার প্রয়োজন নেই।

অভিজ্ঞান

বাঙলার হাজার হাজার কলা-রসিকের অভিনন্দন লাভ কোরে, সম্রাট নিউ থিয়েটার-এর সমাজ চিত্র-খানি এই শনিবার থেকে তৃতীয় সম্রাট পড়লো। উৎকৃষ্ট অভিনয়, পরিচালনা ও নির্মূল সম্পাদনার স্রুণে এই প্রাথমিক কাহিনীটি চার-দিকে স্তম্ভর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আশাকরি বহু সম্রাট হয়ে চব্বিখানি রূপবর্ণীর আসর ভরিয়ে রাখবে।

বড়দিদি

গত বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ছিল মহেন্দ্রযোগ। এবং এই শুভ-মুহুর্তে, বন্ধুর অমর মল্লিকের প্রথম চবি ‘বড়দিদি’-র শুভ-উদ্বোধন স্তম্ভর হোল।

আমরা এই প্রাথমিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম।

নিউ থিয়েটার-এর প্রধান কর্ম-কর্তা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয় থেকে এই প্রতিষ্ঠানের অপরাপর বহু কর্ম-সচিব ও পরিচালক বধা: শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মিত্র,

মি: পি, এন্, রায়, শ্রীযুক্ত দেবকী বসু, শ্রীযুক্ত নীতিন বসু, শ্রীযুক্ত গঙ্গেশ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধ দে প্রভৃতির উপস্থিতিতে নির্বিঘ্নে এই শুভ অনুষ্ঠান স্তম্ভর হয়েছে। উপস্থিত সকলেই মল্লিক মহাশয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমরাও সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তাঁর প্রচেষ্টা সকল দিক দিয়েই লাফলা মণ্ডিত হোক।

প্রথম দিনে বে সেটটিতে কাজ হোল, সেটিতে যেখানে চলেচে—জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ীর কলিকাতায় বাড়ীর শয়ন কক্ষ।

গল্পের নায়ক সুরেন্দ্র নাথ (পাহাড়ী) রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে মৃত্যু অবস্থায় হাসপাতালে ছিল। ব্রজবাবু, সুরেন্দ্রের খবর নিয়ে সবে মাত্র বাড়ী ফিরেই তাঁর কত্যা মাথবীকে জানালেন—উৎকর্ষের কোন কারণ নেই, সুরেন্দ্র ক্রমশঃ সেরে উঠে।

বাঙলা সংস্করণে, ব্রজরাজ লাহিড়ীর ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন, সুবিখ্যাত নট ও নাট্যকার—যোগেশ চৌধুরী। মাথবীর ভূমিকায় নেমেছেন শ্রীমতী মলিনা।

এই চব্বির সঙ্গীতাংশের পরিচালনা কোরবেন—পঙ্কজ মল্লিক। চবি তুলছেন—বিমল রায় এবং শব্দমূল্যেখন কোরছেন বানী দত্ত।

পরিচালক মল্লিক মহাশয়ের সহকারী রূপে কাজ কোরছেন—গণপতি চট্টোপাধ্যায়।

স্ট্রীট সিন্ডার

ভুলুয়ার বাড়ীর অন্যর মহলের অনেকগুলি দৃশ্য তোলা হয়ে গেল। ভুলুয়ার অভিমান, মস্তুর ৫২%, অমরচাঁদের আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, বি চাকরদের উদ্বেগ প্রভৃতি কত অভিনয়ের পালা শেষ হলো।

ভুলুয়া পথের ছেলে—জীবনে তার একটা জিনিষে সব চেয়ে বড় শ্রদ্ধা ছিল, তা হচ্ছে গান। ভুলুয়া বলে; গানটাই আমার প্রাণ। আমার সুখ লাগি আকাঙ্ক্ষা সবটাই আমার গানের মধ্যে।

শেট ভুলুয়ার একখানি প্রিয় গান, যাকে সে ভগবানের চেয়ে ভালবাসত, অমরচাঁদের ইচ্ছায় মস্তুর কুণ্ডলালে ভুল সুরে গাইবে।

শিল্পী ভুলুয়ার প্রাণে ওঠে আত্মনাশ, তার কপালে, তার ক্রোধে তার চোখে—শরীরের রেখায় রেখায় বাথায় যে ব্যক্তনা তা কে ভুলবে? ভুলুয়ার কোন শিল্পীর প্রাণ ভুলে যেতে পারে?

অর মস্তুর যে ভাবতে শুধু গাইতে হবে! কেন গাইতে হবে জানে না—তার ওঠে, আঙ্গুলের আগায় আগায় যে কম্পন সে কী থাকে বেগার তারে?

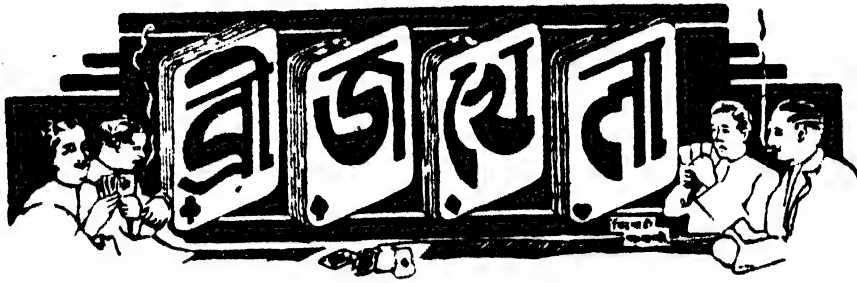
শেটনের অভিনয় দেখে এলাম। সব কথা বুঝি নি। গল্পের কোন খানটার সে কথা কেউ বলে দেয় নি। দেখে এলাম শুধু শিল্পী সাইগলকে আর কামতম্ব কাননকে। তাদের অভিনয়কে ভুলতে পারব না! হয় তো সত্যিই ভোলা যায় না।

সুবিখ্যাত চিত্রনাট্য-লেখক ও পরিচালক ফণী মজুমদার এঁরবার একটি নতুন ধরনের চবি দেবেন এই আশা করা আমাদের অলম্বীচিন হবে না।

দেশের মাটি

গেল সম্রাট “দেশের মাটির” সব কাজই শেষ হয়ে গেছে। পরিচালক নীতিন বাবু এখন সুবোধ বাবুকে সম্পাদনা কাজে লাহায়া করছেন।

অন্তঃস্বেরে চূর্ণ করে! !



ক্রীড়াশাস্ত্র

এবার আমরা এমন একটি হাতের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব, যে হাতের অভিজ্ঞতা সম্প্রতি আমরা লাভ করেছি কোন একটি প্রতিযোগিতায় একটি হাতের হাত খেলাতে প্রায়ই দেখা যায় একহাতে টেকালমেন্ট করথানি বড় থাকলে খেড়ীর হাতে সেই রঙে একখানি ভাল থাকে এবং উত্তর খেড়ীর অল্প রঙের ডাকাডাকিতে অধিকাংশ সময় স্নায়ু পর্যন্ত ডাক উঠে যায়। তখন ডাকদ্বারা পক্ষে হাতখানি খেলানো বেশ বড় লাভ্য হয়ে ওঠে, যদি তুরূপ-রঙটি বিপক্ষদল খেলে দেন। এই রকমের হাত কি ভাবে খেলানো উচিত নীচের হাত থেকেই জানতে পারবেন এবং এই ধরনের যে কোন রকমের ভাল আশুক না খেলোয়াড় অনায়াসেই ডাক অনুযায়ী খেলা করতে সক্ষম হবেন। নিম্নের হাতটি দেখুন,—

ইস্কাবন—বিবি, নয়।

হরতন—লাহেব, \times, \times, \times ।

কুহিতন—টেকা, লাহেব, $\times, \times, \times, \times$ ।

চিড়িতন—টেকা।



ইস্কাবন—টেকা, লাহেব, গোলাব, দশ, \times ।

হরতন—টেকা, \times, \times ।

কুহিতন— \times ।

চিড়িতন—গোলাব, \times, \times, \times ।

এই হাতে করথানি ইস্কাবনের ডাক হয়েছে। বিপক্ষদল চিড়িতন খেলেছেন, আপনি কি খেলবেন বলুন তো?

সাধারণ ক্রীড়ক প্রথমতঃ চিড়িতনের টেকা দিয়ে পিট নিয়ে কুহিতনের টেকা ও লাহেব খেলে একখানি হরতন পাশাবেন। তারপর কুহিতন খেলে তুরূপ করে নিজের হাতে পিট নিয়ে চিড়িতন খেলবেন এবং ডামির হাতে তুরূপ করে নিয়ে হরতনের টেকার নিজের হাতে উঠে, আর একখানি চিড়িতন তুরূপ করে নেবেন। এই রকম খেলার পর ডাকদ্বারা দেখতে পাবেন যে তাঁর হাতে চিড়িতনের একখানি পিট দেয় থাকে, এবং ডামির হাত থেকে নিজের হাতে আসবার একমাত্র উপায় থাকে হরতনে বা কুহিতনে তুরূপ করা। অথচ এই হরতন বা কুহিতনে তুরূপ করে নিজের হাতে তাঁর পর অধিকাংশ সময় বিপক্ষদলের সবগুলি তুরূপ রঙ ধরা একেবারে অসম্ভব হয়। তাতে অনেক সময় স্প্রচুর খেলায় দিতে হয়। কারণ এই রকম খেলার দরুন ডাকদ্বারের হাতে মাত্র তিন-খানি রঙ অবশিষ্ট থাকে। এখন প্রতিপক্ষের হাতে রঙের বিভাগ যদি ৩-৩ ধরনের হয় তবেই খেলা হতে পারে, কিন্তু ৪-২ ভাবে হলে খেলা করা শক্ত। অতএব এই ধরনের হাতে খেলানোর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে বিপক্ষদলকে প্রথমে একখানি পিটে দিয়ে দেওয়া। নিয়ে দেখুন

চোখ

অমৃত কুমার দত্ত

তোমার ঐ হুঁটো চোখ,

কালো হুঁটো চোখ

আমাকে ভূগিয়ে রাখলো

বিচ্ছিন্ন করে দিলো সমস্ত জগত হুঁতে।

তোমার ঐ চোখে আমি দেখেছি

ভোরের উজ্জলতা

হৃদয়ের ক্রান্তি

আর, লক্ষ্যের স্নানিমা।

কোথা হতে এনেছো তুমি ঐ হুঁটো চোখ?

কোথা হুঁতে শিখলো তারা

হরিণের চকিত চাওয়া আর লাগরের ইজিত?

তোমার ঐ ভীক চোখের চাওয়া

তোমার ঐ উজ্জল চোখের ভীকতা

সদাই টানে ঘোরে

মিলিতে তোমার মনে।

প্রথমে একখানি পিট প্রতিপক্ষকে দিলে কত সহজে খেলাটা করা যায়।

পূর্ববৎ প্রথম পিটখানি টেকা দিয়ে নিয়ে এক ভাল ছোট কুহিতন খেলে দ্বিতীয় পিটখানি ছেড়ে দিল। এইবার তাঁরা যে কোন রঙেই খেলুন না কেন, আপনি খেলা করে নিচ্ছেন। তাঁরা যদি চিড়িতন খেলেন তো তুরূপ করে একটি পিট তুলে নিচ্ছেন, আর যদি রঙ খেলেন তো আপনি বিপক্ষের সব করথানি ধরে নিয়ে একখানি কুহিতন তুরূপ করে নিয়ে আপনার ডাক মত খেলা আপনি করে নিচ্ছেন। এট কণা পাঠকবর্গের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে নিজের হাতের বিভাগ ৬-৪-১ ভাগে থাকলে খেড়ী যদি ডাকদ্বার হন, তো নির্ভয়ে একখানি ভাল ছেড়ে দিয়ে খেললে ডাকানুযায়ী খেলা করে নিতে কোনরূপ বেগ পেতে হয় না। আস্তে বারে এই ধরনের আরও কয়েকটি হাত দেখিয়ে এ লম্বন্ধে আরও কিছু বলবার চেষ্টা করব।

সোসিয়েটেড্ প্রডিউসার্স
নিবেদন



বিশুদ্ধতার
চেতন বালি
গোদিতো - সুপ্রভা মুখার্জি

অপ্রভা

শ্রীমন্ত কুমার আচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রেবাও লম্বান ওজনে জবাব দিলে “চূপ করে থাকব? এক বালতি জন রাখলে লেখকের হাতখানা ক্ষয়ে যেতো।”

হু’জনের মাঝখানে টেবিলে ছিল কাগজের স্তূপ আর বৈকালের চায়ের কাপ, প্লেটগুলো। রতীন দাঁড়িয়ে উঠে মারলে টেবিলে এক “লাখি আর সঙ্গে সঙ্গে কাপ, প্লেটগুলো যেখানে পড়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর কতকগুলো কাগজ, বই ঝরঝর ছড়িয়ে পড়লো। চারদিক চেয়ে রতীন যেন খুব খুশী হয়ে চেঁচাতে লাগলো “আমি বলছি—অমন মাতামাতি তোমার চলবে না—চলবে না—চলবে না।”

রেবা রতীনের মুখের কাছে ছোটো হাত নেড়ে কি বলবার উপক্রম করতেই রতীন খপু করে রেবার হাত ছোটো ধরে খুব কশে নাড়ী দিতে লাগলো। ক্রান্ত, অবলম্ব রেবা উত্তেজনা সামলাতে না পেরে ধপ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়লো। চশমার পেছ থেকে রতীনের জলন্ত চোখ ছোটো যেন বেরিয়ে আলছিল, তার চুলগুলো মুখের ওপর ঝুলে পড়েছিল, তার সারা বেহ খরখর করে কাঁপছিল। মনে হোল সে বুঝি রেবাকে ধরিয়ে ফেলে।

চিংকার করে রতীন কের বলে “চলবে না লহরমর নেচে বেড়ানো, ঝুললে? কেউ চায় না তোমার গান। গান গাওয়া তোমার কর্তব্য নয়, তোমার কাজ হাঁড়ি ঠেলা তার বেশী যোগ্যতা তোমার নেই ভতরদিনে এটাও বোঝ নি?...উনি গাইবেন গান! বত লব—”

হঠাৎ রেবা চেয়ার ভেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মরিয়া হয়ে আহতা ব্যাক্তি যেমন শিকারীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে সেও তেমনি করে থাবার মত হাত ছোটো বাড়িয়ে অগ্নি দৃষ্টি রতীনের জলন্ত দৃষ্টির ওপর রেখে আস্তে আস্তে তার দিকে এগোতে লাগলো। ভয় পেয়ে রতীন পেছিয়ে গেল।

“গান গাওয়া আমার কর্তব্য নয়, বটে? যেখাচ্ছি তোমাকে। কুড়ের বাঁহা, অকর্ম্মা, মুরোব নেই এক কড়ার তেজ আছে খুব। বিষ নেই কুলো পান চক্কর! বলে, ভাত ছেবার—”

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রতীন বলে “আমাকে বলো ওই সব কথা, এত স্পর্ধা তোমার? গায়ের রক্ত জল করে খেটে মরছি ওর জন্তে, আর আমি হলুদ কুড়ের বাঁহা?...না, না, না! গান গাওয়া তোমার কর্তব্য নয়।”

হঠাৎ রেবার নজর পড়লো টেবিলের ওপর। টেবিলে রতীনের যে উপজ্ঞান খানা ছিল দেখানো তুলে নিয়ে রেবা ছুড়ে মারলে রতীনের মুখের ওপর। “রাবিশ! চারমাস ধবে চলচে ওর চায়ের পরিচ্ছদ আবার বলেন গান গাওয়া আমার কর্তব্য নয়, নিজের তো মুরোব ভারী।”

“এই নরকে পচে, শুকিয়ে মরে এর বেশী কে পারে?”

“বর্গে গেলেও ওর বেশী তোমার দ্বারা হবে না, ঝুলে বোকারাম? কুড়ের বাঁহা, লেখা তোমার কর্তব্য নয়।”

“আমি পারিনে লিখতে? আমি বলছি—”

“খাক, যা বলব বুঝতে পেরেছি। লেখার ঘোহাই পেড়ে আর কুড়ের দাঁকতে হবে না। অফিসে কলম পেবা কেরানী-গিরি ভাড়া উপায় নেই তোমার।”

“আমি হবে কেরানী!”

“হাঁ! হাঁ! তাই হবে তুমি!... তোমার পাল্লার পড়েই আমার হোল না কিছু, ঝুলে?”

“আমার পাল্লার পড়ে তোমার হোল না কিছু? তোমাকে বিয়ে না করলে—”

“শুকিয়ে মরতে, আর তোমার হাতে না পড়লে আমি অন্যায়নে কোথাও গিয়ে হতে পারতুম একটা কিছু। তোমারই জন্তে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল আমার।”

“তোমারই ভার বইতে গিয়ে আমার এত বড় শক্তিটা গেল নষ্ট হয়ে।”

গলাবাকি চলতে লাগলো। ষড়িও দেগুলো প্রতিমধুর নয় তবু গরম মেজাজের স্বামী, স্ত্রী বিশেষ করে অভাবে পড়লে এমনি ব্যাপারই ঘটে থাকে। তবে অস্ত্র-ক্ষেত্রে যেমন জলে, নিভে, আবার জলে সারাজীবন কাটে এ ক্ষেত্রে লে রকম যে হোল না এইটাই একটু অস্বাভাবিক। রতীন হঠাৎ খেমে গিয়ে মুঠোর ওপর দাঁড়িয়ে রেখে কি একটু ভাবলে। তারপর নিজের কাগজ পত্রগুলো তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে গেল। ভাঙ্গা চায়ের বাসন, খালি ভাড়ার, আর কতকগুলো লামান্ত কাপড় চেপিড়ের লংগার নিয়ে একা পড়ে রইলো রেবা।

হঠাৎ রতীনকে এভাবে চলে যেতে দেখে রেবা প্রথমটা অন্ধকার দেখলে বটে কিন্তু যে ভাবে সে এ অন্ধকার কাটিয়ে উঠলো সেটাতে অন্ততঃ এটা প্রমাণিত হোল যে রতীন তাকে বতটা অযোগ্য বলেছিল ভতরটা অযোগ্য সে নয়। প্রথমে গানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না

পারলেও দৃঢ় মনস্ক যে তার ছিল তার পরিচয় সে ছিলে।

কোলকাতা থেকে রতীন লোজা পলাশপুরে গিয়ে ব্যাপারটা আভালে মাথব বাবুকে জানালে। মাথববাবু ছেলের সুখের পানে চেয়ে একটু স্নান হানি ছেলে বলেন "বাবুই তো তোমাকে বলেছিলেন ওই রাত্তা ধরতে। তাঁকে পারো তো সব কথা জানাও গে। তিনি হয়তো কোন পরামর্শ দিতে পারবেন।" সেই ভাল ভেবে রতীন লোজা রমেনবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা শুলে বলে সে যা করতে চায় তাও জানালে। রমেনবাবু এবারও তাকে যথেষ্ট সহায়ত্ব দিতে দেখালেন। রতীন তাঁর কাজ থেকে হাজার খানেক টাকা ধার হিসেবে নিয়ে অদৃষ্ট হোল।

রেবার সন্ধ্যা ছিল রতীনের চেয়ে দৃঢ় আর নিজের ক্ষমতার তার বিশ্বাসও ছিল কম নয়। তার এক মাথা দিল্লীতে লাট-হাউসে বড় চাকরী করতেন। রেবা সব কথাই তাঁকে শুলে লিখলে আর অসুরোধ জানালে যেন দিল্লীর কোন মেয়ে স্কুলে তিনি 'নিকট আত্মীয় মঞ্জুরী দেবীর জন্তে' একটা কাগজের লক্ষ্যন করে যত শীঘ্র পারেন তাকে জানান। সে আরো লিখলে, কিছুদিনের যত কোলকাতা তাকে ছাড়তেই হবে। নইলে পাঁচজনে পাঁচ কথা তুলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। মাথা ছিলেন দিল্লীর প্রবালী বাজালী লম্বাজের একজন পাণ্ডা বিশেষ। তাঁর চেষ্টা আর সুপারিশে সেখানকার নাটকরা এক মেয়ে স্কুলে মঞ্জুরী দেবী লক্ষ্মী শিকড়ি পুষের নিরোগ পত্র পেয়েই শায়ের চোখের জল আর বাবার লেশমপূর্ণ গভীর দৃষ্টি উগেজা করে মনীষাকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী চলে গেল।

দিল্লীর মেয়ে স্কুলের কাজে লক্ষ্মী শিকড়ি মঞ্জুরী দেবীর হাদ হয়েক কাটলো।

তার বোগাতা বে কিছুই ছিল না, তা নয়। তার ওপর রতীনের কাছে অবোধ্য আখ্যা পেয়ে তার আন্তরিক ইচ্ছা দৃঢ় মনস্ক পরিণত হয়েছিল। মাথার বাড়ীতে সে নাটকরা এক ওতাধের কাছে লক্ষ্মী শিকড়ির অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো শিখে নিয়ে তার ওপর চড়ালে আধুনিকতার ভঙ্গি। তারপর স্কুলে স্তম্ভিকতক মেয়েকে নিজের মনের মত গড়ে নিয়ে তাধের সহযোগিতায় সেখানকার ভক্ত, শিক্ষিত বালিকামহলে বেশ নাম করে নিলে। ওই সময় একদিন মাথার চেষ্টায় তার দিল্লীর বেতার প্রতিষ্ঠানের বড় একজন কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। তারপর থেকে বেতার বার্তায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে লাগলো মঞ্জুরী দেবীর নাম। ক্রমে ছোট-খাটো অভিনয়ের পরিচালনার আর আধুনিক লক্ষ্মী মঞ্জুরী দেবীর নাম সংবাদ পত্রে বিবোচিত হতে লাগলো। সে উৎসাহিত হয়ে তিন্দি ভাষা আর প্রাচীন গান আরম্ভ করবার সাধনার মন প্রাণ চলে গেল।

এই সময় দিল্লীতে ভারতের যত নাটকরা মিনেমা টিভির মালিকদের একটা কন-ফারেন্স বসলো, কি করে ভারতের এই শিশু-প্রচেষ্টার বৈবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে বাঁচিয়ে সব রকমে উন্নত করা যায় তার সম্বন্ধে আলোচনা এবং উপায় নির্ধারণের জন্তে। এমন একটা গুরুতর ব্যাপার, তবু মিনেমার কাজ যখন ভারতের অগনন জনগণের আনন্দ বিধান করা, তখন কন-ফারেন্স আরম্ভ হবার আগে এবং গুরু কার্যের শেষে একটু গান বার অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হোব বা অসম্ভব কোথায়? এর তার পড়েছিল কিছা চেষ্টা করেও তার নিরেছিল মঞ্জুরী দেবী।

এমন শোভন আর সুকৃতির সঙ্গে মঞ্জুরী নিজের কাজ শেষ করলে যে উত্তোজনা-

জীবনের স্বপন বিকাশ শ্রীমতীজ্ঞাননাথ ভান্ডারী

বেখানে হানির মাঝে

ভরা, আছে প্রাণের বাস

সেখানে ছোট পয়সা

নিরে আলির আকুল আশ!

মধু দেখা থাকবে বুকে;

শুনবে সে গান শোহাগ সুখে,

কণিকের হানির মাঝে

জীবনের স্বপন বিকাশ;

আনন্দ পরশে তার

নিভা অমৃত প্রকাশ!

প্রাণ-ধোরা শান্তি মাথা

কোথা সেই হালি?

কোথা পাব সেই হালি

যারে ভালো বাসি?

বিশ্বের কল্যাণ সে হালি—

আনন্দ-নির্ভর-আশ্বাস!

বাধা হবে প্রাণ-মন

চিরদিন তাহারি পাশ!

যের চেষ্টায় এবং টুডির মালিকদের আগ্রহে মঞ্জুরী অনেকের সঙ্গে পরিচয় হোলো। বোধের বড় একটা টুডির মালিক তার হিন্দি গান শুনে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি মঞ্জুরীকে চাকরী পর্যন্ত দেবার ইচ্ছা জানালেন। মঞ্জুরী মাথাকে রাজি করিয়ে বোধে চললো। সঙ্গে রইলো তার এক মাথাতো ভাই। মঞ্জুরী দৌলতে তার বেকার এই ভাইটির দেই টুডির প্রচার বিভাগে একটা চাকরীও হয়ে গেল।

বোধেতে মঞ্জুরী অভিনেত্রীত্বের গান দেখাতে লাগলো। ক্রমে শিল্পীর লাহচর্চা

সে অভিনয়ের কিছু কিছু শিখে নিলে। তার গলা ছিল মিষ্টি আর সে বেথতে ছিল সুন্দরী। এমনভাবে কিছুদিন কাটার পর শেষে সে নিজে রূপোলী পর্দার গারে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ হোল। আনন্দে, দ্বিধায় তার বুকটা একবার হুলে উঠলো। কিন্তু যখন রতীনের কথা মনে পড়লো তখনই দ্বিধার জারগায় জাগলো সাহস আর দৃঢ় লক্ষ্য। টুডিয়ার মালিক ছিলেন তত্ত্ব আর শিক্ষিত। তাছাড়া বাতে তাঁর টুডিয়োতে এবং অভিনয়কালে কোন বিশৃঙ্খলা না আসে সে বিষয়ে তাঁর ছিল লতর্ক দৃষ্টি আর অভিনয়ের সময় তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সব তত্ত্বাবধান করতেন। যেমন মঞ্জুরী রূপোলী পর্দার গারে আত্মপ্রকাশ করলে অবনি চলচ্চিত্র লবঙ্গীর সমস্ত মাসিক লাগাতারিক তত্ত্ব জরখনি উঠলো।

হঠাৎ একদিন বকের ছবিমহলে সব উঠলো এই টুডিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রতিষ্ঠান মিঃ বস্তকে যে ফ্রান্সে চলচ্চিত্র লবঙ্গে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে পাঠিয়েছিল তিনি সেখানকার অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট এবং লম্বান-কর ছাপ নিয়ে কিরছে তারতে। প্রতিদ্বন্দ্বীতা লব্ধেও এখন বকের মত প্রতিষ্ঠান রেবারেখি ভুলে মিলিত হোল বেষের সুখোজলকারী সুসন্তানের অভ্যর্থনায় বিরাট আরোজনের জন্তে।

মঞ্জুরী কোতুলী হয়ে নিজেদের টুডিয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে জিজ্ঞাসা করলে "বলতে পারেন কে এই মিঃ বস্ত ?"

মিঃ বিলিমোরিয়া সাগ্রহে উত্তর দিলেন "মিঃ মনোজ ডাট। বেষের গোরব, ভারতের সুসন্তান তিনি। চিত্র পরি-চালনার কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে কিরে আসছেন বেশ। ভারতের চিত্র-জগতে যুগান্তর আনবেন বাঙলা বারের এই ক্রীত লস্তান।"

বাঙলার সুসন্তানের এই অসামান্য লাকল্য গোরবে মঞ্জুরীর বুকখানা ভেতরে ভেতরে নেচে উঠলো। সেও মিঃ মনোজ বস্তকে নীরব অথচ আন্তরিক প্রকার অর্থ্য দেবার জন্তে তৈরী হতে লাগলো।

জাহাজ থেকে যেদিন মিঃ বস্তের নাযবার কথা সে দিন সকালে সকলের সঙ্গে মঞ্জুরী গিয়ে দাঁড়ালো জাহাজ ঘাটে। সুন্দর আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে জাহাজ ঘাটে যেন রঙের মেলা বসেছিল। লাড়ী, স্যুট, ফুলের মালা, মোটরের লমারোহে চারদিক যেন ঝলমল গমগম করছিল। লচল, অচল ছবি নেওয়ার ক্যামেরার সারির পেছতে ভারতের সুসন্তানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানারার জন্তে জনতা উল্লুখ আগ্রহে চেয়ে ছিল জাহাজের পানে। আগের দিন রাতে জাহাজ এলে দাঁড়িয়েছিল ঘাটে। সব তৈরী বেখে অভ্যর্থনা লমিতির এক জন প্রতিনিধি লিড়ি বেয়ে জাহাজে উঠলেন আর একটু পরে দেখা গেল করালী দরজীর নিখুং হাঁটের স্যুট পরা, চোখে কালো সেলের চলমা ঝাঁট, এক হাতে টুপী ধরা বেশ সুন্দর বোহারী চেহারার এক তত্ত্বালোক জনতার কোল'হলমুখর অভ্যর্থনার উত্তরে মাথা নোরাতে নোরাতে সহস্র মুখে নেমে আসছেন। সকলের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরী বোবীর দৃষ্টিও গিয়ে পড়লো মিঃ

আমি আপনাদের "B. B. Hair Oil" ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি এবং সেই অবধি তেলটি ব্যবহার করিতেছি। ইহা বেশ সুগন্ধি, অতি মৃদু ও মস্তক অভ্যন্ত শীতল রাখে।

চন্দ্রাবতী দেবী

শোল এজেন্ট—স্বনজতা বিপণি

ডাক্তারখানা

১৩৯ ৩লা রোড, কালিঘাট

বস্তের ওপর। লবাই আনন্দে আর একবার কোলাহল ভুলে আর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরীর মুখ থেকে কম্পট একটা বিস্ময়ের লক্ষ্য বোহিয়ে গেল। কিন্তু কোলাহলে সে লক্ষ্য ডুবে গেল। মিঃ বস্ত মাটিতে পা বেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যর্থনা লমিতির লভ্য এবং ছায়ালোকের উজ্জল জ্যোতিষের সাথে মঞ্জুরীও এগিয়ে গেল চিত্রাকশের দীপ্ত ভাস্করের আগনে। তার চোখে মাথা লেগে গেল নাকি? ভাল করে চেয়ে বেখে তার লামনে রতীনের মত—

রতীনের মত নয়।

রতীন নিজে।

রতীন বেখে—

রেবা।

চরম মুহুর্তের মিনিট পাচেক যে কি করে কাটলো কেউ বুঝতে পারলে না। হুজনেই খুব লামনে নিয়ে ছিল বহিও তাবের বিস্মিত মুক্ত ভাব লব্বাধপত্রের প্রতি-নিবিধের শ্রেন দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। পরদিন কাগজে মিঃ মনোজ বস্তের মঞ্জুরী দেবার সঙ্গে আগর একটি মণ্ড লব্বকের ইলিত বেরোলো।

এদিকে অভ্যর্থনার কোলাহল কমে আসতে যেটুকু সময় লাগলো তারই মধ্যে হুজনে অনেকটা লামলে নিয়ে পরস্পরের লব লাব্বানে এড়িয়ে গেল। আকস্মিক



শুভ
উদ্বোধন
উত্তরা

শনিবার
২৫এ জুন

হাজার পিকচারের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন



—পরিচালক—

একদিকে... তিনকড়ি চক্রবর্তী ..

প্রেম-ভক্তির জলন্ত নিদর্শন!
কল্প-নিষ্ঠায় মহিমোজ্জ্বল!
শৌর্য্যে-বীর্য্যে পরীক্ষান!
স্বামী ভক্তিতে মতীমান!
পত্নী প্রেমে আদর্শোজ্জ্বল!

প্রধান যন্ত্রশিল্পী :

অশ্ব নীল

আলোক-চিত্রী : বিভূতি লাহা

শব্দ-যন্ত্রী : যতীন দত্ত

অন্যদিকে...

ভূমিকায় : অশীন্দ্র, শিশুবালা,
মনোরঞ্জন, রাধারাণী, মোহন,
সাবিত্রী, তিনকড়ি, চিত্রা।

কুট চক্রীর চক্রান্ত জাল!
নারীর রূপে লালসাদম্বল!
শয়তানির চরম পরিণতি!
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দম্ব!

কালী ফিল্মস
স্টুডিওতে গৃহিত

পরিবেশক
রীতেন এণ্ড কোং

৬৮, ধর্ম্মভাঙ্গা স্ট্রীট
কোম ক্যাল ১০২২

আজই সিট্
রিজার্ভ করুন।

বেথার খাড়া সম্পূর্ণ লামলে ওঠবার জন্তে
এটা তাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

মজুরী তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই
তিন বছরে যতবার সে রতীনকে মনে করেছে
ততবারই তাকে বেখেছে বেকারের হলকৃত
কুখ্যাত, অপরিচ্ছন্ন হতভাগ্যরূপে। তাই
হঠাৎ স্ট্রাটপরা, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল
রতীনকে বেখে প্রথমে সে নিজের চোখ
হুটোকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।
কিন্তু বেথলে সে রতীন ছাড়া আর কেউ
নয় তখন তার বা অবস্থা হোল তা দেখে
জানে। তারপর সে অনেক ভেবে বেথবার
চেষ্টা করলে যে রতীন কি করে নিজের
অবস্থা এই তিন বছরে এতখানি ফেরালে।
বয়ের ভবিষ্যৎলাগা রতীনকে ঠাণ্ডে ছিল
কি? কি করে তারা ভেবেছিল যে রতীনের
ভেতর বড় একটা প্রতিভা লুকিয়ে আছে?

এদিকে রতীন ও ভাবছিল রেবারেই
কথা। বিশেষে আহা, নিত্যা পর্যন্ত এক
রকম ত্যাগ করে নিজের কালে যেতে
ছিল যখন তখন রেবার কথা মনে পড়েনি।
কিন্তু যখন তার শিক্ষা শেষ হোল তখন
তার মনে পড়েছিল রেবার কথা। কিন্তু
রেবাকে সে বা ভেবেছিল তার সঙ্গে সত্যিকার
রেবার যে কোথাও ছিল নেই। অনেকবার
সে ভেবেছিল রেবাকে লাহায্য পাঠানো
তার কর্তব্য কিন্তু কাজের চাপে বিশেষ
কিছু করা হয়ে ওঠেনি। অথচ ওদিকে
রেবা তারতের চলচ্চিত্রাকাশে বেথা দিরাছে
উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে। এই বোঝাইওয়ালারা
রেবাকে ঠাণ্ডেছিল কি?

দেবিন বৈকালে বোথের শ্রেষ্ঠ টি ডায়ের
মালিক মিঃ রোস্তমজীর আয়োজিত মিঃ হস্তের

অভ্যর্থনার পাটিতে যখন আবার বেথা হোল
তখন হুজনে একেবারে টাল সামলাতে
পারেবি। পাটি খুব জমকালো গোছের
হয়েছিল। বহিও অনেক পানীর বিশেষের
প্রভাবে রীতিমত অলাবধান হয়ে পড়েছিল
তবু রেবা রতীন নিজের লাবধানে দূরে
রেখেছিল। হুজনের কেহই এই তিন বছরে
চিত্রঙ্গভের পিছল পথে পা বাড়ায় নি।

মিঃ রোস্তমজী সকালে জাহাজ খাটে
উপস্থিত হতে পারেনি। তাঁরই লাগ্নহ
রেবা রতীন পরম্পরের সঙ্গে পরিচিত হলো।

“মিঃ ডাক্টর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার
লোভাগো বিশেষ আনন্দিত হলুম।”

“মজুরী দেবীর সঙ্গে আলাপে বিশেষ ধন্য
হলুম।”

তাবের পরিচিত করে দিয়ে যেই না
মিঃ রোস্তমজী গেলেন একটু আল পাশে
রতীন ডাকলে “রেবা।”

রেবা কোন উত্তর না দিয়ে মুগ্ধ,
আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার
প্রিয়তমের হাসি মুখের পানে।

রতীন বলে “প্রথমটা আমি নিজের
চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি।”

রেবা এবারও উত্তর না দিয়ে কৌতুহলী
দৃষ্টিতে চাইলে রতীনের পানে। তারপর
আন্তে আন্তে বলে—

“তুমি আমাকে চিনতে পেরেছিলে?”

“তুমি একটুও বদলাও নি।”

“তুমি বহিও লামত বদলেছ তবু তোমাকে
বেখেই চিনেছি।”

নতি তিনবছর আগেকার কথা মনে
করে এখন হাসি পাচ্ছে।

পুরাণো দিনের কথা উঠতেই হুজনেই
চূপ করে গেল। হুজনেই মনে মনে চাইছিল
কেউ এলে পড়ে তাবের বাঁচাক। শেষে
রেবা বলে আমাকে চিনতে পেরে খুব
অবাক হয়ে গিয়েছিলে?” রতীন ইতস্ততঃ
করে বলে “আমি? ইয়া—তা একটু হয়ে-
ছিলুম। কিন্তু.....তবে আমি ভেবেছিলুম
তুমি একটা কিছু হবেই।”

“নতি ভেবেছিলে তাই?”

“অবশ্য! আচ্ছা, তুমি আমার সম্বন্ধে কি
ভাবতে?”

“ভাবতুম, তুমিও একটা কিছু হবে
নিশ্চয়ই।”

“নতি ভাবতে?”

“অবশ্য! কিন্তু তিন বছর আগেকার
কথা ভাবতে আমারও মজা লাগছে।”

বলবার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে হুজনেই
মিনিট চারেক চূপ করে রইলো। তারপর
রতীন একটু ইতস্ততঃ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে
“তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে রেবা?”

“সে কথা ভাববার সময়ই পাইনি এই
তিন বছরে। তুমি ভেবেছিলে?”

“না রেবা। আমারও অবস্থা হয়েছিল
তোমারই মত।”

“আমিও ভাবতুম তাই।”

“নতি, অনেকদিন হয়ে গেল.....”

“নতি, অনেকদিন.....”

“কারো মনেই যে ছাড়ার কথা ওঠেনি
এটা ভাবার মজার, নয়?”

“নতি, ভাবার মজার।”

“এখনো আমরা স্বামী-স্ত্রীই আছি।”

“তাই তো মনে হয়।”

“ভাবার মজার কিন্তু।”



GRAM: "ADNIVAG"

ইন্দিবিমাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইভ ক্রীট, কলিকাতা।

মিঃ হোসেনজী আবার এলেন তাঁদের কাছে। রতীন ভাড়াভাড়ি রেবার পাশ থেকে উঠে পড়লো।

“আচ্ছা, কিছু বহি না মনে করেন তাহলে—”

“আপনার সঙ্গে পরিচয় লভিই নোভাগোর বিষয়। আচ্ছা, তখন তাহলে—”

হুজনেই হারিয়ে গেল আনন্দ প্রবাহে।

তখনকার মত হুজনে কাঁচ ভাড়া হোল বটে তবে তারপর থেকে রোজই তাঁদের দেখা হোত। রতীন রেবাকে শোনাতো, বিশেষে কেমন করে কেটেছে তার দিনগুলো, সেই কথা। কি অক্লান্ত পরিশ্রম তাকে করতে হয়েচে, কত কষ্ট, কত চেষ্টা.....

রেবাও বলতো কোলকাতা থেকে দিল্লী, সেখান থেকে বম্বে, সেই দিনগুলির কথা। ঝড়ের মুখে অলহায়া, নীড়হারা পাখীর মত.....

হুজনেই তাবতো বিয়ের আগে ছাত্র জীবনের কত আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখস্বপ্নের কথা। সেই প্রাইজের দিনে তাঁদের প্রথম দেখা। তারপর...স্বপ্নের বোহতরা সুইর্ভ-গুলি! তারপর?

আলোভার কল্লোল তাঁদের মনে নতুন করে রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছিল। এত দুঃখ, কষ্ট, পরিশ্রমের ফল কত মধুর হবে বহি আবার তারা নতুন জীবন আরম্ভ করতে পারে। যে জীবনে থাকবে না তুচ্ছ কলহ, অভাবের অভিযোগ, নিজের তুলে আশা মতীচিতার পেছু পেছু ভিন্ন পথে ছুটতে হবে না তাদের। ব্যর্থতা তাঁদের জীবনে কোথাও থাকবে না। থাকবে শুধু অবিচ্ছিন্ন মিলনের সুমধুর কণ্ঠস্বর। নতুন মিলন, নতুন জীবনকে তারা সার্থক করে তুলবে যে এক বিচিত্র কল্লোকে। মিঃ মনোজ মত তখন যে কোন মেয়ের কামনার ধন।

মনোজও তাবতিল, মজুদী তখন যে কোন পুরুষের লাধনার ধন, হোক না সে খ্যাতি ঐশ্বর্যের বত উচ্চ শিখরেই অধিষ্ঠিত।

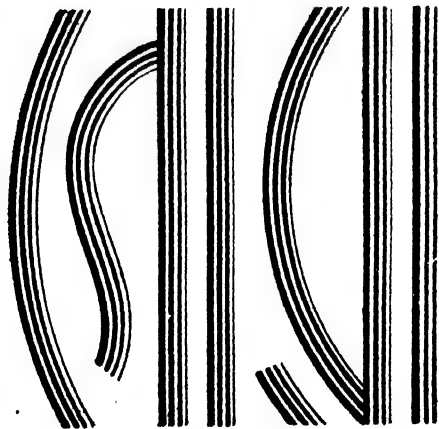
এক রক্ত রতীন গোবুলিতে রতীন গেল রেবার সঙ্গে দেখা করতে শহরের জন কোলাহল থেকে দূরে নিস্তর, শান্ত প্রকৃতির কোলে অবস্থিত রেবার গটে আঁকা ছবির মত ছোট বাড়ীতে।

রেবা বস করে নিজে তার লজ্জিত মতী করলে চা। চাহের পর রতীন রেবার পাশে একখানা সোফার বসলো। আন্তে আন্তে তার ফুলের মত হাতখানা তুলে নিলে নিজের হাতে। তার চোখে চোখ রেখে বলল “মনে পড়ে রেবা তোমার সেই দিনের কথা যেদিন তুমি আমার চোখের সামনে দেখা দিলে—”

রতীনের চোখে চোখ মিলিয়ে রেবা উত্তর দিলে “পড়ে।”

জাতির লজ্জা ও অপমান
সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও গ্লানি
মানুষের দম্ভ ও নীচতার বিরুদ্ধে
অশ্রান্ত অভিযানের নায়ক

পরিচালক
জীনরেশ মিত্র
চিত্র-পরিবেশক
প্রাইমা ফিল্মস্ লি:



কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথের
অমর কাহিনী হইতে
দেবদত্ত ফিল্মসের
অতুল
চিত্র-সৃষ্টি

রতীন রেবার হাতে চাপ দিয়ে বলে
“তারপর মনে পড়ে কোলকাতার সেই ছোট
বাড়ীতে লেখক হবার জন্তে আমার প্রাণপন
পরিশ্রম আর তোমার চেষ্টা গানের আদরে
নাশ করবার?”

রেবা রতীনের হাতে হাত রেখে বলে
“আজ তো তুমি জারাজ্যের রাজা। লেখক
হলে ওর বেশী কি হাত?”

“সে কথা ভাটা। আর আজ তুমি তো
জ্যোৎস্নালোকিত ছায়াকাশের উজ্জল তারকা।
আজ সবাই চ’চোখ তরে দেখেছে তোমার
অভিনয়, হুকান তরে শুনেছে তোমার গান।
গ্রামোফোন, রেডিও এর বেশী কিছু দিতে
পারতো?”

“হ্যাঁ, জানি সে কথা যে আমি আজ
জ্যোৎস্নালোকের উজ্জল তারকা।”

রতীন নিজের মোফা চেড়ে রেবার পাশে
তার গা ঘেলে বলে আবেগের সঙ্গে বলে “বা
চেরেছিলুম তা হুজনেই পেরেছি—পাইনি
তু—”

“নিজেদের।”

“ভাটা, পাইনি শুধু নিজেদের। কিন্তু
তখন কি সে চাওয়া সার্থক হতে পায়ে না,
মনি? আমরা মনকে বোঝাবো ‘এই
আমাদের প্রথম প্রেম।’ তাকে সার্থক
করবার জন্তে যা কিছু হয়কার এখন তো
সবই পেরেছি। এলো, আমরা আবার নতুন
করে জীবন আরম্ভ করি। পুরোনোকে
বুকে কলে নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলি নিজেদের
মনকে।”

“বলেছ সুন্দর!”

“জানি, একদিন সে চেষ্টা আমাদের
ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্তে দায়ী
তো আমরা নই। সে দোষ ছিল আমাদের
তাগ্যের। তার জন্তে লজ্জার কিছু তো নেই।
বিরাট প্রতিভা আমাদের ভেতর লুকিয়ে
ছিল তাই তো আমরা খাঁচার জীবনে গুঁথী

রেডিও প্রোগ্রাম দিনে দিনে অবনতির
স্তরে নেমে যাচ্ছে। কোন অনুষ্ঠানেই
কোন বিভাগেই আমরা একটা ক্রমোন্নতির
ধারা দেখতে পাচ্ছি না। কিছুদিন হয়ত
প্রশংসাপ্রাপ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেল কোন
একটা বিভাগে কিন্তু কিছুদিন পরেই
আবার তা অতি নিম্নস্তরে গেল নেমে।

এর যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে গেলে
বলতে হয় রেডিওতে জনপ্রাণিতার অভাব
আছে। আর্টিষ্টের প্রতিও অত্যন্ত অনাদর
উপেক্ষা তাই প্রদর্শিত হয় একথা আমরা
বহু আর্টিষ্টের মুখে শুনেছি। সুতরাং
গুণী আর্টিষ্ট অধিক দিন থাকে না।

হতে পারিনি। আজ আমাদের চোখের
সামনে উজ্জল, উজ্জ্বল নীল আকাশ।
সেখানে নিজেদের ভাগিয়ে দিবে আমরা
নিশ্চয়ই সুখী হবো। সেখান থেকে পাবো
সে জীবনের দীপ্তি, আনন্দ তাই আমাদের
জীবনে আনবে সার্থকতা। ভাগ্য আজ
যখন আমাদের পানে প্রলয়নয়নে চেরেছে
তখন আমরা হালি, গানে জীবনকে তরে
তুলবো না কেন?” রতীন রেবাকে নিবিড়
আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তার রক্তাধরে একে
দিলে..... তারপর রেবার কানে
শুনশুনিয়ে বলে “রেবা! রেবা! এই তো
পেলুম আমরা নিজেদের খুঁজে।”

“আমাদের জীবনের শেষ যন্ত্রণা লক্ষ
হতে চললো।”

রেডিও প্রসঙ্গ সত্যভাষী

লক্ষ্যোপরি রেডিও প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ তার
বাঁহের ‘পর স্তম্ভ তাঁহের ভেতর অনেক
গলদ আছে। তাঁরা নিজেদের এক একজন
পরম বলজ্ঞ এবং ‘কেষ্টবিয়’ (?) বলে ভেবে
থাকেন এবং এখানে party politics ও
favouritism পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।

আমাদের কাছে এমনি ধরণের অনুযোগ
লিপি প্রায় প্রত্যহই আসে যে প্রোতাহে
অনুরোধ প্রতিপালনে রেডিও কর্তৃপক্ষ
নিতান্তই উদাসীন। মৌখিক মৌজ্ঞ
প্রকাশ করে তাঁরা অনুযোগ লিপির
প্রত্যুত্তর দেন বটে এবং প্রোতাহের অনুযোগ
প্রতিপালিত হবে এমনও আশ্বাস দিবে
থাকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কার্যকরী
হয় না।

জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের
অভাব অভিযোগ অনুযোগ উপেক্ষিত
হওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

নাট্যকার বরষা প্রসঙ্গে কর্মবীর সুপরিচালক
বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টের পরিচালনায় এ, আই-
আর প্রোগ্রাম কর্তৃক ‘কর্মবীর’ অভিনীত হোল।
শিবকালীর চাঁৎকারে যাত্রার আসর বেশ
জমে উঠেছিল। আমরা ভাবছি অভ্যপার
আমরা কোন বুগে বাস করছি।

ষ্টারে “চক্রধারী” বেশ যাত্রার আসর
লাজিয়েছে ওদিকে মিনার্ভার “বিজয়দাস”,
শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণের নিকট আমাদের অনুযোগ
অচিরেই তিনি এ দুখানি নাটককে
বেতারের জন্তে নিষিদ্ধ করে রাখুন।

(ক্রমঃ)

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—তেরো—

আধুনিক যুগের সুশিক্ষিতা তরুলতা হঠাৎ প্রগতির বিযুক্ত বায়ু শুভ্রার শুভ্র ক্ষণ স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে রাজাহুগুহীত ধনী জমিদারের কন্যা ও উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারের স্ত্রী হিলাবে বিবিধ নোয়াইটীতে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিল কিন্তু তথাপি সে তাহার বেশ বিভ্রাসে ও কার্যাশ্রয়ালীতে পুরাতনযুগের হিন্দু লংনারের স্ত্রীরূপেই নিজেকে পরিচিত করিতে চাহিত। পাশ্চাত্যের হেলেন, ক্লিওপেট্রা বা জুলিয়েট অপেক্ষা ভারতের সীতা শাবিত্রীর চরিত্রেই সে অধিক মাধুর্যের সন্ধান পাইত। মুক্ত-বায়ু ও অবাধ স্বাধীনতা অপেক্ষা স্বামীর কঠোর কারাগারই সে পছন্দ করিত। একজ্ঞ অনেক তাহাকে “লুটিলাড়া মেরে” বলিয়া উপহাস করিত। তথাপি, শুভ্রার যত্নের পরিবর্তন হয় নাই, সে স্বামীর সেবা ও মনোরঞ্জনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল। শুভ্রার যত্নে ও সেবার আচরেই অরুণ আরোগ্য লাভ করিল এবং কলিকাতায় কিরিয়া আসিয়া বাবসারে মনোনিবেশ করিল। শুভ্রার মনোম যত্নে সে আরোগ্যলাভ করিয়াছে একজ্ঞ সে শুভ্রার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কণার গৃহভাগের পর হইতে সমস্ত নারীজাতির প্রতি একটা বিভ্রূতা বিধেয় আলিয়া তাহার স্বর্গ অধিকার করিয়াছিল সেই বিধেয়বস্তুর উত্তাপ যে শুভ্রার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই একথা

বলা যায় না। তাহার তাক্সিলা ও অবহেলা সবেও তাহার অসুস্থতার শুভ্রা তাহাকে বাঁচাইবার জ্ঞাত যে অক্লান্ত সেবা, যুগাধীন পরিচর্যা, ও আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে অরুণ বুঝিয়াছে যে পৃথিবীতে সকল নারী একই ধাতুতে গঠিত নহে। কণার চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহার হৃদয়ে যে অন্ধকার ও তমলা উপস্থিত হয়, শুভ্রার চরিত্র আলোচনা করিলে সেই তমলা বিদূরিত হইয়া তাহার হৃদয় প্রেমালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সে স্থির করিল যে কণার চিন্তা বিশ্বস্তির অতল কন্দরে বিলম্বিত হিবে ও শুভ্রাকে তাহার জীবনের একমাত্র দেবীরূপে তাহার হৃদয়মন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজের জীবনকে ধন্য করিবে।

অরুণ প্রতিজ্ঞা করিল বটে কিন্তু তাহার অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্যনিয়ন্ত্রতা ভাগ্যবিধাতা যে ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন তাহা সে বা শুভ্রা কেহই জানিতে পারিলনা।

সেদিন প্রাতে চা পরিবেশন করিতে করিতে অরুণকে শুভ্রা জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাগো, অমল আর কণার খবর পেয়েছ কিছু?”

বিচলিত কণ্ঠে অরুণ বলিল, তাহদের কথা আমার জিজ্ঞাসা কোরণা শুভ্রা, তাহদের কথা আমি জানিনা, জানতে চাইনো। অক্লান্ত পশু বিশ্বাসঘাতক যারা তোমার মত দেবীর মুখে তাহদের নাম উচ্চারিত হয়ে তাহদের পাপের বোকা কমে যাবে।”

“অমল কথা বোলনা তুমি, মানুষ মজেরই ভুল হয় তারাও একটা উত্তেজনাবশে

মোহে পড়ে একটা ভুল করেছে তাই বলে কি তারা কথা পেতে পারেনা?” বলিয়া শুভ্রা নিঃশব্দে অরুণের দিকে চাহিল।

“অমল যে দোষ করেছে আমি যদি সেই দোষ করতাম শুভ্রা, তাহলে তুমি কি আমার কথা করতে পারতে?”

অরুণের এই প্রশ্নের উত্তরে শুভ্রা বলিল, “দেবতার দোষাদোষের বিচার করার অধিকারী তুমি নহ, তার কাজ শুধু পূজা করা, সেবা করা, তাঁর চরণে নিজের শ্রুতি জ্ঞান এইমাত্র। তুমি যদি অপরাধ করতে তাহলে আমি যে কি করতাম তা আমি নিজেই জানিনা, তবে এইটুকু তোমার বলতে পারি যে আমার দিক থেকে তোমার সেবাযত্নের কোন শিথিলতাই আদতনা। তোমার বিচারের তার নেওয়া ত হুরের কথা একজ্ঞ তোমার আমার অভিযোগও জানাতামনা। তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার মর্ষপত্নী; তোমার যে ভালবাসতে পেরেছি, তোমার কাছে যে ভালবাসা পেরেছি, তাতেই আমি আশাভীত লোভাগ্যের অধিকারিনী মনে করি। তোমার বিচারের অধিকার আমার নেই কিন্তু তোমার রক্ষা করার অধিকার আমার আছে। যদি এমনই দুর্দিন আমাদের জীবনে এসে উপস্থিত হয় তাহলে তোমার যুগাকরে হুরে সরিয়ে রাখবনা, পিঙ্গল পথে পা পিঙ্গলে পড়ে য’তে তোমার ক্ষতি না হয় সেই চেষ্টাই আমি করব।”

অরুণ এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে শুভ্রার কথা শুনিতেছিল, চারের বাটী তাহার হাতেই ছিল অথচ স্পর্শ করে নাই এতক্ষণে এক চুপুচু চা পান করিয়া চল বলিল, “আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে তোমার নিজেরও ভো বিপদ হতে পারে শুভ্রা।”

“সে যত বড়ই বিপদ হোকনা কেন সে বিপদের বোকা মাথার তুলে নেবার শক্তি ও

সাহস আমার আছে, “বলিয়া শুভ্রা জল-
খাবারের রেকাবিটা অরুণের দিকে আগাইয়া
ছিল। এই অবসরে অরুণ তাহার
বাহুধারা শুভ্রার কটিদেশে জড়াইয়া ধরিয়া
বলিল, “আমি শপথ করে বলতে পারি শুভ্রা
এমন হৃদয় তোমার জীবনে কোনদিনই
আলিবেনা।”

সুহৃৎ হাসিয়া শুভ্রা বলিল, “তা আমি
জানি।”

• • •

সেদিন বৈকালে অরুণ যখন আপনায়
রোগী দেখিবার ঘরে করেকজন রোগীকে
লইয়া ব্যস্ত এই সময় একটা লেকেও ক্লাস
ভাড়া গাড়ী হইতে একটা বৃদ্ধ ও তাহার
লহিত একটি সুদর্শনা তরুণী আসিয়া তাহার
গৃহঘারে পৌছিল। চাপরালিকে বৃদ্ধ বলিল,
“আমি আমার কন্যাকে দেখাইবার জন্য
আসিয়াছি। ডাক্তারবাবুর দর্শনী বাহা
লাগে তাহা বৃদ্ধ দিতে প্রস্তুত আছে
একথাও বার বার শুনাইয়া ছিল। চাপরালি
সংবাদ দিলে অরুণ আগন্তুকদের জীলোক-
দের বলিবার ঘরে পাঠাইয়া দিল। সর্বাঙ্গ
রেশমী চাহরে আবৃত করিয়া নবাগতা
রোগিনী ডাক্তারের গৃহে প্রবেশ কবিল।
বৃদ্ধ বাহিরে বলিয়া ধূমপান করিতে
লাগিল। রোগীদ্বিগকে বিদায় করিয়া
অরুণ ষ্টেথস্কোপটা হাতে লইয়া জীলোকদের
কামরায় প্রবেশ করিয়া রোগিনীর নিকট
বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার কি কষ্ট
হয় আমার বলুন।”

রোগিনী উত্তর করিল না। অরুণ
পুনরায় বলিল, “আপনার পিতাকে আলিতে
বলি কারণ আপনি বড় বেশী লজ্জা বোধ
করিতেছেন।”

রোগিনী ধীরে ধীরে অবশুষ্ঠন ঘোচন
করিল। বিষয়ে অশ্রুটস্বরে অরুণ আপন
মনেই বলিয়া উঠিল, “একি, এবে কণা।”

কণা কোন কথা বলিল না। একবার
রান দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিল।
অরুণের আপাদমস্তক আলিয়া উঠিল। সে
বলিল, “এখানে এসেছ কেন? লজ্জা
করেনা ওই মুখ দেখাতে? কুলটা, ভ্রষ্টা
তুমি কোন সাহসে আমার বাড়ীতে পদার্পণ
কর্ত্তে সাহস কর?”

কণা কোন উত্তর করিলনা। সে
মাটিতে বলিয়া পড়িয়া অরুণের পা ভেঁটি
জড়াইয়া ধরিল, “অমল তোমার গিরেটারে
বা কোন ষ্ট্রিডোতে ভক্তি করে দিলেই
পারতো তাহলে তার অর্থ কষ্ট থাকতোনা।
আর তোমারও এমন করে পায়ে ধরার
ধরকার হতোনা। কণা পূর্ববৎ পা ভেঁটি
দুট আলিঙ্গনে জড়াইয়া রহিল; কোন কথা
বলিলনা।

অরুণ তাহার পা জড়াইবার চেষ্টা না
করিয়াই বলিতে লাগিল, “এই কলা দিয়ে সাপ
পুষলেও লাগে ডোবল মারতে তুলে যায়না
তা আমি জানি। শুভ্রা নিজের বোনের
মত তোমার বৃকে তুলে নিয়েছিল—তার
উপযুক্ত পুরস্কার তাকে দিগেছ; আজ
আবার এসেছ আরও একটা বড় মতলব নিয়ে
না? পা ভাঙ, আমার অভিনয় দেখবার
ফুরলং নেই।” অরুণ লজ্জার কণার
মাথাটা পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া দিল। কণা
করুণনেত্রে অরুণের দিকে চাহিল। অরুণ
হেঁচিল কণা যেন আরও সুন্দরী হইয়া
উঠিয়াছে। তাহার মুখে বিবাহের ছাপ
অপরিষ্কৃত। সে মুখে অরুণ শারদপুর্ণিমার
মেঘচাঁদা চন্দ্রিমার ছায়া হেঁচিল। সে
অত্যন্ত চকল হইয়া উঠিল। নিজের
হৃৎস্পন্দন যেন সে নিজেকে শুনিতে পাইল।
সে নিজেকে যথাসম্ভব হীন করিয়া বলিল,
“আমি তোমার কোন সাহায্যই করতে
পারবোনা। তুমি চলে যাও এই মুহূর্ত্তে।
আমাকে—আমাকে তুমি—” কে যেন

তাহার কর্ণরোধ করিয়া দিল। সে সেই কক্ষ
তেমনই হাড়াইয়া ফুট কেশরীর স্তায় কোঁতে
ও ক্রোধে অশ্রুট গর্জনে করিতে লাগিল।

কণা তেমনই অবিচলিত ভাবে তাহার
পা ভেঁটি আলিঙ্গন করিয়াই রহিল। “অমন
কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, যখন আমার
বাড়ী তুমি ছেড়ে গিয়েছিলে তখন আমার
কারণ অভিমত নেওয়ার প্রয়োজন ছিল সে
কথাও তোমার মনে পড়েনি। কারণ
তখন বোধ হয় মনে হয়েছিল আমরা তোমার
পরম শত্রু না? আজ যখন অমল অকুলে
ভালিয়ে সরে পড়েছে তখন তুমি আমার
মনে পড়েছে না? অথচ সেইদিনই তোমার
জন্তে অমলের পিতার কাছে যে অপমান সহ্য
করেছিলাম তা আমি জীবনেও ভুলতে
পারবোনা।”

কণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমার
একবারটা ক্ষমা করে।—তোমার পায়ে
পড়ি একবার। আমি জানি আমার দোষ
ক্ষমার অযোগ্য তবু তোমার কাছে ক্ষমা
পাব এ আশা আমার আছে।”

অরুণ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল
কেন সাহসে কণা আজ তাহাকে তুমি
সম্বোধন করিতে সাহস করিলে। সে গভীর
ভাবে উত্তর করিল, “ক্ষমা করবার আশি-
কে? তুমি বরং শুভ্রার কাছে যাও, সে
যদি ক্ষমা করে তোমার স্থান দেয় আমি
তাতে আপত্তি করবোনা।

কণা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, তিনি স্বর্ণের
দেবী। তাঁর কাছে আমি যাবনা, যেতে
পারবোনা। তুমি আমার ও আবেশ
করোনা, পায় পড়ি তোমার।

ক্রুদ্ধস্বরে অরুণ উত্তর করিল, তবে
আমার কাছেও তোমার ক্ষমা হবে না মনে
রেখ।

কম্পিতকণ্ঠে কণা আবার বলিল, তুমি
আর যা আবেশ কর দব করতে পারবে

কিন্তু দ্বিধার লাবনে গিয়ে হাড়াতে পারবোনা, কিছুতেই না। ওগো, দয়া কর, আমার ও আবেশ করোনা।

অরুণ ভাবিল, আশ্চর্য্য দয়া আমার প্রতিশ্রুতি শুভ্রা, তাহার নিকট যাইতে ইহার এত ভয় কেন? অজুত এই নারী চরিত্র। বিধাতার বিচিত্র সৃজন। সে ধীরকণ্ঠে বলিল, আমার পা ছাড় কণা—কোন লোকই বিশ্বাস করবেনা তোমার বেথলে যে আমি এতক্ষণ রোগী দেখছিলাম। আমার দ্বারা তোমার কোন উপায়ই হবেনা। তবে একটা কথা, তোমার হাজার খানেক টাকা আমার কাছে আছে। সেটা তুমি নিয়ে যাও। উপস্থিত কোন হোটেলে বরভাড়া নিয়ে থাক তারপর একটা গিনেমার মুকে পড়ো। টাকার অভাব তোমার হবেনা। অমলের মত অমন অনেক শিকার মিলবে তোমার। অরুণ বাহিরে আসিল। হরাজ হইতে একটা চেকবহি বাহির করিয়া কণার নামে নয়শতটাকার একটা চেক লিখিল ও আয়রন চেষ্ট হইতে নগদ একশত টাকা লইয়া কণার নিকট গিয়া শেঙলি গাহার হস্তে দিয়া বলিল, আজ থেকে আর কোন সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আমার নেই। রাইচরণকে ডাকিয়া বলিল, গ্রেট ইণ্ডিয়ান হাট্টেলে গিয়ে আমার নাম করে বলবেন যে চিকিৎসার জন্তে আপনারা কলকাতায় এসেছেন। নগদ একশ টাকা কাছে রইল যা দিয়ে উপস্থিত খরচ চলবে। পরে কি মরলে আপনারদের অভাব থাকবেনা তা আপনাদের মেয়েকেই বলে দিগেছি। রাইচরণ বাহির হইয়া গেলে কাঁদিতে কাঁদিতে কণা লিল, একটুও কি ভালবাসনা আমার? শুভ্রা ভিন্ন অন্তকোন জীলোককে ভালবাসবার অধিকার আমার নাই বলিয়া অরুণ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাইচরণ শ্রোণকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল গাড়ী ধীরে ধীরে বাটার নীচা হাড়াইয়া গেল। অরুণ

বেথিল—চক্ষু কাটিয়া জল আলিতে চাহিল। বৃকের ভিতর একটা অব্যক্ত বেথনা অমৃতব করিল, মস্তকের ভিতর যেন একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল। সে তাহার কক্ষের একটা চেয়ারে বসিয়া ছই হাতে মুখ ঢাকিয়া বার-বার আপন মনেই বলিতে লাগিল, শুভ্রা ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিবার অধিকার তাহার নাই।

—চন্দ—

কি জানি কেন কণার বহন হইতে ধারণা হইয়াছিল যে অরুণ তাহাকে ভালবাসে। ভালবাসার কোন লক্ষণ বা আভাস কণা যদিও অরুণের নিকট হইতে কোন দিন পায় নাই তথাপি সে স্থির করিয়াছিল তাহার প্রেম বিফলে যায় নাই ও সে অনেক পরিমানে অরুণের জহর অধিকারে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এইরূপ ভাবিবার কারণ যে কি তাহা কণা নিজেই বলিতে পারে না। কলিকাতায় তিন-মাস সে ছিল এবং তিনমাস প্রভাহ সে অরুণকে দেখিবার চেষ্টা করিত। এইজন্ত অরুণ কোনদিন তাহাকে তিরস্কার করে নাই এইমাত্র। কণার ধারণা হইয়াছিল সে যখন অরুণকে চায় অরুণও তাহাকে চাহিবে এবং লতাই অরুণকে পাইবার আশা একদিন তাহাকে আশ্বহারা করিয়াছিল। সে শুভ্রাকে ভাল বাসিত যতটা, ভয় করিত তাহার দশগুণ অধিক। সে জন্ত কোনদিনই সে অরুণের নিকটবর্তী হইবার সাহস করিত না। ঐ গম্ভীর স্বরাভাবিণী তরুণীর চক্ষে বজ্রকঠোর শালনবাণী বার বার কণার জহর স্পর্শ করিত। কণা যখন অমলের সহিত গৃহ-ত্যাগ করিয়াছিল তখন অরুণের আশা সে সম্পূর্ণ বিলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু টাটা-নগরে অমল যখন অরুণের কণা লইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত ব্যঙ্গ ও রসিকতা করিত তখনও কণার মনোমধ্যে অরুণকে পাইবার আশা জাগরুক হইয়া উঠিত। “ভগবান

তাহাকে বাহা দিয়াছেন তাহাতেই তাহার কৃপ্ত হওয়া উচিত” এইরূপ লাঘব দিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিত। অরুণের কথা লইয়া অমলের সহিত তাহার যে ছই-চারিবার বচনা হয় নাই এরূপও নহে। মধ্যে যখন অমল তাহার প্রতি বিবিধ অত্যাচার শুরু করিল, তাহার ইচ্ছা হইত সে অরুণের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

আজ যখন চারদিন যাবৎ অমল কিরিয়া আলিল না তখন তাহার অরুণের নিকট কিরিয়া যাইবারই বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল এবং লতাই সে রাইচরণের সহিত অরুণের নিকট কিরিয়া আসিল। সে ভাবিয়াছিল অরুণ নিশ্চয়ই তাহাকে পাবে ঠেলিবে না এবং সে তাহাকে গ্রহণ করিবে কিন্তু অরুণ যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল কণার প্রাণে আপনাদের উপরে দিকার আসিল। সে স্থির করিল ছই একদিনের মধ্যেই বিষয়ানে তাহার অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি করিবে। সে ভাবিল ব্যর্থতাই তাহার জীবনের লক্ষ্য, অপমান তাহার অঙ্গের আভরণ, এমন স্মৃতি জীবন বহন করিয়া লাভ কি? হোটেলে আসিয়াই দ্বার বন্ধ করিয়া কণা বহুক্ষণ কাঁদিল। রাইচরণ ঘরের কোণে বসিয়া কণার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না এই ভক্তার বাবুটির সহিত কণার সম্বন্ধ কি?

রাত্রি এগারটা বাজিতেছে বেথিয়া রাইচরণ বলিল, “হোটেল-ওয়ালারা খাবার রেখে গেছে, যা একটু কিছু খাও।” বলিয়া রাইচরণ কণার পারের নিকট আসিয়া দাড়াইল।

কণা উঠিয়া বলিল, বলিল, “আমি খাব না বাবা, তুমি লাবাধিন উপবাস করে রয়েছ তুমি কিছু মুখে দাও।”

রাইচরণ হাত জোড় করিয়া বলিল, “না উপোদী থাকলে ছেলেকে যে কিছু খেতে দেই।” অগত্যা কণা উঠিল। মুখ হুইয়া কণা আহারে বলিল বটে; তাহার গলা যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কিছুই সে গলধঃ-করণ করিতে পারিল না। মুখে সমস্ত বিষাদ ও তিক্ত লাগিতে লাগিল। সে একটু দুধ পান করিয়া রাইচরণকে খাইবার জন্ত অনুরোধ করিল। অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া রাইচরণ আহারে বলিল। হুই-চারি গ্রাস মুখে দিয়া রাইচরণ বিনীতভাবে বলিল, “একটা কথা জিজ্ঞেস করবো না, সন্তানের অপরাধ নিওনি, আজ যে ডাক্তার বাবুটার কাছে গিরেছিলে উনি তোমার কে?”

স্নান হাসি হাসিয়া কণা বলিল, “আজ তিনি আমার কেউ নন। কিন্তু একদিন ছিল, তিনি ছিলেন আমার আশ্রয় দাতা, প্রভু, আমার ইহকাল পরকাল, আমার রক্ষক, আমার লক্ষ্য।”

রাইচরণ কণাকাল কণার মুখের দিকে বিমূঢ় নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর অন্ন মাখিতে মাখিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “এবার বুঝছি না তোমার কথা। সত্যি না তুমি বড় বোকা মেয়ে। অমন সোয়ামী ফেলে তুমি ওই হাড়-হত-ভাগা অমলবাবুর সেবা করেছ? একেই বলে লোণা ফেলে আঁচলে গেরো। আহা অমন রূপের সোয়ামী তোমার, আর তুমি ওই—”

বাধা দিয়া কণা বলিল, “আমার আর বেশী কিছু বোলনা রাইচরণ, সবই আমার অর্ঘ্য।” কণা পুনরায় কাঁধিতে লাগিল।

রাইচরণ ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে সে কণার সহিত ডাক্তারবাবু পুনর্মিলন করাইতে পারিবে। লহসা সে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ-না, অমলবাবুকে ডাক্তারবাবু চিন্তেন কি?

উত্তরে কণা বলিল, “তা চিন্তেন বৈ কি? হুজনে খুবই বন্ধু ছিল। আমাদের তারা হুজনে মোটরে করে প্রথম দিন বাড়ী আনেন। সে অনেক কথা রাইচরণ, আজ মনে হয় আমার জীবনের সে একটা স্বপ্ন। মুখ ভাজবার সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। আমার নিজের কণ্ঠদ্বায়ে আজ আমি পথের ভিখারী, সমাজের আবর্জনা, সকলের চোখে ঘৃণিত।”

হাই তুলিয়া রাইচরণ বলিল, “ডাক্তার বাবু তোমার অতগুলান টাকা কেন ধিলে বলতো?”

“লোকে ভিখারীকে যেমন দয়া করে ভিক্ষে দের বোধ হয় তেমনই করে।” বলিয়া কণা অন্তরিকে মুখ ফিরাইল।

“তুমি কি টাকা চেয়েছিলে না?”—

—“না,” বলিয়া কণা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু জলভারে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

“দেখ না আমার বিশ্বাস বাবু এখনও তোমার মায়া ছাড়তে পারেনি—এখনও ডাক্তারবাবু তোমার তুলেনি না। তোমার অপরাধ খুব বড়, একথা সত্যি, তবু আমার বোধ হয় ডাক্তারবাবু তোমার ক্ষমা করিতে পারিবে। দেখ না, তুমি কাল আমার হাতে একটা চিঠি লিখে দাও দেখি কি করতে পারি আমি।”

ভীত ও কল্পিত বস্ত্রে কণা বলিল, “না, না, তা আমি পারবো না, কখনই নয়। এত বড় অপমান, এত বড় প্রত্যাখ্যান তার

পরেও চিঠি লেখা? না রাইচরণ, খেতে না পেয়ে যদি তাও ভাল তবু তাঁর কাছে আর কোন অমুগ্রহ চাইবনা আমি।”

উপবেশের স্তরে রাইচরণ বলিল, “পাগলামী করোনি না—বা বলি তাই শোন। ঘোষ তোমারই। ব্যথা তুমিই দিয়েছ তাঁকে। আজ যে ব্যথা পেয়েছ তাঁর কাছ থেকে, তোমার বেওয়া ব্যথার কাছে তা কিছুই নয়। এত বড় ঘোষের পর যে সোয়ামী একটা কথা না বলে তোমার হাতে হাজার টাকা তুলে ধিলে সে মানুষ নয় না, সে ভাবতা। তুমি একটা চিঠি লিখে দাও হয়তো দয়া তার হতে পারে।” বলিয়া রাইচরণ কণার দিকে চাহিল। দেখিল কণা শুধু বালিশে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া কাঁধিতেছে। রাইচরণ প্রসন্ন ও উপবেশে তাহাকে বাস্তব করিয়া তুলিল—তথাপি কণা বলিতে পারিল না যে অক্ষণ সত্যি তাহার স্বামী নহে এবং এই হাজার টাকা সে দয়া করিয়া দান করে নাই। তাহার দ্বাধার বেওয়া টাকা—তাহার প্রাণ্য শোধ করিয়াছে মাত্র।

কণার নিকট লহসার না পাইয়া হতাশ ও বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ রাইচরণ ঘুঘাইয়া পড়িল। নারারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশাশেষে কণাও নিদ্রাঘোবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(ক্রমশঃ)

পাদুকাশিল্প প্রাতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতান্ন দোকান

১৩৬এ, আগুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর



শ্রী-মালি — ত্রে — মালি ষাণ্ড

হওয়া চাই



একমাত্র
 • নির্ভরযোগ্য •
 পথ্য ও পানীয়

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

“অতল সমুদ্র হতে যে ভারতগন্ধার মতন
যেখা ছিল পূণ্যক্ষেত্রে শিরে যার অরুণকিরণ
প্রথম উদয় দীপ্তি, নব ধাতু এক হাতে যার
আর হাতে বরাভয়; তুমি সেই ভারত মাতার
গেয়েছিলেন জয়গান।”

আজ আমি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল লব্ধকে
কিছু বলিব। এর রচনা লব্ধকে বিস্তৃত
ভাবে আলোচনা করা দুঃস্বপ্ন। নগ্ন কীটামূ-
কীট আমরা, কি করে এই মহান উন্নতচেতা
বিরাট পুরুষের রচনা লব্ধকে পুঙ্খপুঙ্খানুপুঙ্খ
আলোচনা করিব। তবুও নিরন্তর হওয়া
উচিত নয়। কারণ ভক্ত হস্ত সেই বিরাট
পুরুষ হেবতাকে তাঁর যথাযোগ্য পূজা
করিতে পারে না। কিন্তু ভক্ত যে আন্তরিক
চেষ্টা করে তাই হেবতা আনন্দের সহিত
লইয়া থাকেন তদ্রূপ আমরাও দ্বিজেন্দ্রলালের
অধম ভক্ত। আমরা যদি কিছু গুরুত্ব
পরে পুঙ্খপুঙ্খানুপুঙ্খ নিবেদন করি, গুরু
কি তা লইবেন না? অবশ্যই লইবেন কারণ
এ যে তাঁর ভক্তের ক্ষুদ্র দান।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সত্যিকার একজন
স্বদেশ প্রেমিক। নিজের দেশকে তিনি
অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। এ
ভালবাসা তাঁর মৌখিক শৃঙ্গারভ ভালবাসা
নয়। এ ভালবাসা ছিল অসীম, বিরাট।
যখন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’ মহামন্ত্রে
ভারতবর্ষের সকল নরনারী নির্বিশেষে
দীক্ষিত; সকলের কণ্ঠে ‘বন্দেমাতরম’ বাণী
ব্যতীত আর কিছু ধ্বনিত হইত না তখন
দ্বিজেন্দ্রলালের “বল আমার, জননী আমার,
মাতা আমার, আমার দেশ” বাঙ্গালার এক

অপূর্ব শিহরণ আনিয়া দিল। দ্বিজেন্দ্রলাল
ছিলেন বঙ্গের চারণ কবি। পুরাকালে
রাজপুত্র চারণেরা যেমন রাজপুত্র রাজাদের
বীরত্বগাথা গাহিয়া প্রতি ঘরে ঘরে যে
স্বদেশপ্রেমের এক আগুন জালিয়া তুলিয়া-
ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল সেই স্বদেশপ্রেমের আগুন
এ দেশে জ্বালাইয়া তোলেন। তাঁহার
“ধনধাতু পুষ্পে ভরা, আশাদের এই বসুন্ধরা”
এই গান বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে গ্রামে, প্রতি
ঘরে ঘরে, হাটে মাঠে চতুর্দিকে তাই এক
অপূর্ব ভাবের আবেশে নাচাইত মাতাইত।
এ গানের ছিল এক প্রাণ জাগানো, মন
ভুলানো মন্ত্র, এই মন্ত্রের মুর্ছনার আর্ষকণে
ছিল এক তীব্র আকাজ্ঞা, যে আকাজ্ঞার
প্রণোদিত হইয়া শ্রামের ঝাঁপে তুনিয়া
ব্রজগোপীরা একদিন যেমন বরলংসার ভুলিয়া
বাহির হইয়াছিল অজানার লক্ষ্যে তদ্রূপ
বাঙ্গালার যুবকেরা দ্বিজেন্দ্রলালের এই বাণীর
ডাকে বাহিরে অজানা কণ্টকময় পথে বাহির
হইয়াছিল। এককালে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন
বঙ্গালী দেশের স্বাধৈরিকতার অগ্রতম গুরু।
তাঁহার স্বদেশী কবিতা ও নাটকগুলির
মধ্যে আমরা বীর্ষের সহিত করুণার এক
অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। আমাদের
এই জাতীয় পরাধীনতার জন্ত যে দুঃখ তাহা
ভুগ্ন করিবার জন্ত তিনি পথ নির্দেশ করিয়া
দিয়াছেন। তিনি তাই বলিয়াছেন, “জাগো,
সব মলিনতা, সব বৈষ্ণব, হ’তে জাগো, আত্ম-
প্রতিষ্ঠা হও, আত্মশক্তি উদ্ধার করে তোলা।”
দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এদেশ একজন সত্যিকার
দরদী বন্ধু পাইয়াছিল। তিনি নিজে
এই দীন ভারতবর্ষকে অন্তরের সহিত ভাল-

বাসিয়াছিলেন, তাই বলিয়া তিনি বিদেশের
প্রতি যে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা
নহে। তাঁহার অনেক বিদেশী বন্ধু ছিল
এবং তিনি কয়েক বৎসর কৃষিকার্য্য-শিক্ষার্থ
ষ্ট্রেট স্বলানিগ লইয়া বিলাতে অতিবাহিত
করেন। তিনি নিজ দেশকে বিরূপ ভাল-
বাসিতেন তাহা বুঝা যায় তাঁহার

“এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের সেরা সে যে মাঝের জন্মভূমি।”
ইত্যাদি পড়িয়া মিডলটন মারি তাঁর এক
প্রশ্নকে লিখিয়াছিলেন, “Love creates love
—but it must be love which seeks
not the return of love.” দ্বিজেন্দ্রলালও
তাঁহার এক গানে লিখিয়াছেন,

“ভালোবাসো নাহি বাসো নইকো তারও
অভিলাষী,

আমরা শুধু ভালোবাসি, ভালোবাসি,
ভালোবাসি।”

আজ যে প্রত্যেক দেশবাসী পরম্পর স্বার্থ
লইয়া মোহাক্ষারের আবৃত বাহারে জন্ত
সর্বত্র বিখ্যাতকতা, দেশজোহিতা এ
দ্বিজেন্দ্রলালও কখন কখন করেন নাই, তাঁহার
মতে এই সমস্ত কারণেই জাতীর এত
অবনতি। তাই বলিয়াছেন, “বিধাতা
যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার
লগাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে,
ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে তাঁর নিজের
লস্কান।” আবার অপরস্থানে বলিয়াছেন,
“যখন একটা জাতী যায়—নিজের দাবি
যায়—সে এইরকম করেই যায়। যখন জাত
নিজের দাবি করে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হয়ে

উঠে, আর এই রকম বিতীর্ণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।”

বিজ্ঞানজ্ঞান কেবল স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি জাতীয়তার বাণীও প্রচার করিয়াছেন। ভারত যদি সংহতিবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্ত বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে তাহাকে সামলাইতে কি কেহ পারিবে? কবি ইহা লক্ষ্যকরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছেন, ভয় দেখিয়ে এই প্রকাণ্ড জাতকে কেউ দমন কর্তে পারবেনা। তা’রা ইচ্ছে করে যদি অধীন থাকে ত থাকবে; আর যদি সমস্ত জাতি বিরূপ হয় ত তাহের শুক মিলিত উক নিঃশালে মোগল সাম্রাজ্য উড়ে যাবে। ভারতে যে জাতীয় মহানভার যোগদানের জন্ত রাষ্ট্রপতি জহাওয়ারলাল নেহেরু মুসলমানদের আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার প্রেরণা বহুদিন পূর্বেই বিজ্ঞানজ্ঞান আমাদের দ্বারা গিয়াছেন। পুস্তকের মনুষ্যত্বের দাবী তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। কবি উদাত্তবরে বলিয়া উঠিয়াছেন, “হিন্দু-মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মসজিদে স্বাধীনভাবে আল্লাহ ও ব্রহ্মের নাম নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামাশ-শব্দধ্বনি উঠুক। হিন্দু-মুসলমান একবার জাতি-দ্বৈষ ভুলে, পরস্পরকে তাই বলে আলিঙ্গন করুক।” কবি বলিতেছেন, “হিন্দু-মুসলমান কেন এক হবে না?” তারা এতদিন একই আকাশের নীচে একই বাতাস সেবন করে, একই জলপান করে, একই পৃথিবীতে শয়ন করে আলছে। এখনও কি তাদের প্রাণ এক হয়নি? তারা একবার প্রভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, নতজাহু হ’য়ে করবোড়ে ভক্তিতে গবগব-বরে এই শ্রামলা গুজলা ভারতভূমিকে একবার প্রাণভরে বা বলে ডাকুক যেথি।” হীনা জন্মভূমির যে দ্রুত তিনি তাহা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন তাই না তিনি বলিয়াছেন,

“আমরা বুচাব বা তোর কালিমা
হৃদয় রক্ত করিয়া শেষ।”

বিজ্ঞানজ্ঞান যে শ্রেষ্ঠ হস্তরক্ষক কবি ছিলেন তাহা তাহার ‘আবাচে’ ও ‘হাদির গান, পড়িলেই বুঝা যায়। তাহার হাদির কবিতার মধ্যে বাক প্রচুর থাকিতনা তাহা নিছক হস্তরক্ষক ভরপুর যেমন :—

“খেটে খেটে

দিবস গেল, মাসও গেল, বর্ষ গেল কেটে—
দ্রীর মেয়ের ভাবনাই বাক্যলীলায়
খেটে খেটে না খেয়ে চিল্লিশেই বায়।”

তিনি নিজে ছিলেন ডেপুটি তহসিলদার তিনি ডেপুটির লঙ্কায় লিখিয়াছেন—

“তড়বড় খেয়ে ভাত দড়বড় ছুটি

আফিসেতে চলে যান নবীন ডেপুটি

তাতে এক লক্ষ্যাকাড়া, ছকর করিয়া ভাড়া

তাতে গুটি পক্ষীরাঙ্গ বাধা

একটি লোহিতবর্ণ অপরাটা লাবা।” ইত্যাদি

এই মনসিদ্ধ সাধনালব্ধ কবির ‘ভারতবর্ষ’ অতুলনীয়। এ সঙ্গীত শ্রবণে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। তা ছাড়া এর ছন্দ চাতুর্য্যও অপূর্ণ—

“বেতিন হুন্সীল জলধি হইতে

উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।


উঠিল বিধে লেকি কলরব, লেকি মা তক্তি,
লেকি মা হর্ষ।” ইত্যাদি।

স্বদেশ সেবার সাধনা লব্ধ নহে। এর জন্ত চাই ঐক্য, লব্ধবেদ কার্যশক্তি। তাতে করতে হবে লকলকে ত্যাগ; তার জন্ত চাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্মক্ষম মানুষ। তাই কবি বলিয়াছেন,—“কীণ সঙ্কল্প, দ্বিধাসন্ধি ব্যক্তিকে আমি চাইনা। একাগ্র, দৃঢ়, স্থির প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। ছই পথ আছে, বেছে নাও। একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম আর উপভোগ; আর অন্যদিকে শ্রম, অনাহার, কষ্টব্য, হারিজ ও দ্রুত। একদিকে নিজের সুখ; আর একদিকে দেশের প্রতি কষ্টব্য,—বেছে নাও।” দেশ গিয়াছে দ্রুত কি? তাই কবি বলিয়াছেন,

“গিয়াছে দেশ দ্রুত নাই

আবার তোরা মানুষ হ।”

ফোন ২৭৭৬ বড় বাজার



কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁটি সরিষার তেল

ভারত একত্রে মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩, আগার সারকুলার রোড, কলিঃ

কাম্বীপ্রব

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীলা—উঃ! এখনো ব'শে!

দ্বিলীপ—হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত তুমি?

সুনীলা—হ্যাঁ।

দ্বিলীপ—আমার একটু কথা ছিল।

সুনীলা—শীগগীর বলো। আমার সময় নেই।

দ্বিলীপ—কেন, ক'রছো কি?

সুনীলা—অজয় এলেন, কনফারেন্সের ব্যাজগুলো ঠিক কোরে নিচ্ছি।

দ্বিলীপ—অজয় কখন এল?

সুনীলা—এলেন অনেকক্ষণ।

দ্বিলীপ—আচ্ছা, তবে এখন থাক। তুমি কাজ শেষে এলো, আমি ব'শে রইলাম।

সুনীলা—কাজ শেষে আসতে পারবোনা, বেলা থাকবেনা। তা ছাড়া, ও বলছে ওর সঙ্গে যেতে হবে একবার বাণীবিনোদীপীঠে,—কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবিকা যোগাড় করবার জন্ত। —তার চেয়ে এখন থাক, কাল তখন শুনবো।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারী—অজয় বাবু ডাকছেন?

(নিরস্বরে) Awfully angry.

সুনীলা—বাচ্ছি—

(বেহারার প্রস্থান)

দ্বিলীপ—আচ্ছা, তবে কালই।—

সুনীলা—বেশ। কিন্তু ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখো। (প্রস্থান)

(ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দ্বিলীপ

বেহারাকে ডাকিলেন)

দ্বিলীপ—নিবারণবাবু!

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারী—আমার অমন ধারা কোরে ডাকলে বড়ো খারাপ লাগে বড়ো বাবু।

দ্বিলীপ—আমার কিন্তু বেশ লাগে।—আচ্ছা নিবারণ, ইংরিজি কথাটা অতো আন্তে আন্তে বলার কেন ইচ্ছা হ'ল রে?

বেহারী—আজ্ঞে আপনার নামনে ইংরিজি কথা আমার ভারী আটকে আসে।

দ্বিলীপ—ও তাই!—যাক্—তুমি গাড়ীটা বার কোরতে বেলো, আমি এখুনি বেরবো।

বেহারী—ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা কোরে আনি তাহ'লে?

দ্বিলীপ—ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা কোরবে কি?

(বেহারী চুপ করিয়া রহিল)

ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা কোরবে কি তা বলো?

বেহারী—মা বলে দিয়েছেন গাড়ী ব্যবহার ক'রতে হ'লে ছোটবাবুকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়।

দ্বিলীপ—কেন?

বেহারী—গাড়ী নাকি ছোটবাবুর।

দ্বিলীপ—ও!

(দ্বিলীপ কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিত থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল) মা এই কথা বলে দিয়েছেন?

বেহারী—আজ্ঞে।

দ্বিলীপ—শুনতে ভুল করোনি নিবারণ? মা এই কথা বলতে বলেছেন?—মা?

বেহারী—আজ্ঞে—

(দ্বিলীপ একেবারে শুক ; পরে বলিল)

দ্বিলীপ—আচ্ছা, তুমি ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা করেই এলো।

(বেহারার প্রস্থান)

(সুনীলার প্রবেশ)

দ্বিলীপ—একি! তুমি বাণীবিনোদীপীঠে গেলেনা অজয়ের সঙ্গে?

সুনীলা—না, স্বেচ্ছাসেবিকা যোগাড় হ'য়ে গেছে—তাই আর যেতে হ'লনা। টেলিফোন কোরে হেমলিনী খবর দিলে।

দ্বিলীপ—এই মেয়েটি ভারী বুদ্ধিমতী। এমন মাথা ঠাণ্ডা কোরে কাজ কোরতে পারে যে, কোন কাজের বিশৃঙ্খলা হয়না।

সুনীলা—আমরাও পারি।

(দ্বিলীপ হাসিয়া উঠিল)

সুনীলা—কেন হাসলে, আমি কিন্তু ব'লতে পারি?

দ্বিলীপ—বলতো কেন হাসলুম?

সুনীলা—হেমলিনী যা পারে আমিও তাই পারি এই কথা বলেছি ব'লে হেলেছি। তাবলে হেমের সূখ্যাতি আমি বুঝি লম্ব কোরতে পারলুম না!

দ্বিলীপ—কিন্তু আমি একথাই বা কেন' ভাবতে যাবো সুনীলা?

সুনীলা—হয়তো ভাবো 'দ্বিলীপ' আমার মনের কোনে একটা বিশিষ্ট আলন স্থল কোরে আছে, তাই অজ্ঞ কোন' মেয়ের সূখ্যাতিতে আমার গা' জলে যায়।

দ্বিলীপ—(কণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল) আমি যে তোমার এর চেয়ে ভের বেশী বড়ো কোরে ভাবি সুনীলা! তুমি কি কোরে কল্পনা কোরলে তোমার বিষয় আমার ধারণা এতোখানি ছোট হ'য়ে আছে।.....

সুনীলা—আমার ভুল হ'য়েছে। কিন্তু আমার তুমি কেন এতো বড়ো কোরে ভাবো আমার বলবে? আরও পাঁচজন র'য়েছে, তারাও কি এই বৈশিষ্ট্য দাবী কোরতে পারেনা?

দিলীপ—তুমি সুনতে চাও—না তারা দাবী কোরতে পারে না, এ বৈশিষ্ট্য আর কারুর নেই!—আমিও তাই বলবো সুনীলা। তোমার মন যে জিনিষ জানতে চাইছে, আমার মন সেই জিনিষ বলবার জন্য উৎসাহিত হ'য়ে রইলো আজ!

সুনীলা—আমি কিছু সুনতে চাইনা দিলীপ।

দিলীপ—চাওনা সুনীলা?

সুনীলা—না—

দিলীপ—সুনতে চাওনা—তুমি আমার হৃদয় এক অশ্রুধার সময় আমার নিজা ভুলে আমার স্বাধার কাছটিতে বসে থাকতে—সুনতে চাওনা তোমার সে সেবা, সে যত্ন। আমার ভালো লেগেছিল?

সুনীলা—সে আমি জানি। নতুন কোরে শোনার দরকার আছে মনে করিনা।

দিলীপ—কিন্তু দ্বিজন বলে এ ধাপের প্রতিদান আমি কিছু দিতে পারলুম না বলে, নীলার জীবন—

সুনীলা—হ'য়ে গেল মরুভূমি! (বলিয়া দিয়া উঠিলেন)—দ্বিজন যা চায় বলুক, কিন্তু লোক সম্পর্কে তুমি যে আজ এতো মৃদুর 'য়ে উঠবে, এ আমার বঙ্গনার অতীত!

দিলীপ—ঠিক তাই। কিন্তু সুনীলা, আজ আমার জীবনের মাঝে চারিদিক থেকে য লম্বা ঝটনা অশ্রুষ্টিত হ'য়ে চলেছে, সে যোগে বঙ্গনার অতীত!—তুমি আমার হজালা কোরলে কি হৃৎকের ভারে আমি ডিঁড়িত; —আমি তখন বলতে পারিনি, যতে পারিনি। কিন্তু এখন—

(দিলীপ বহলা ধামিয়া গেল, কথা আর শেষ করিতে পারিল না—নির্ভীক হইয়া

তবু ঘরের ভিতর পাচারারি করিতে লাগিল। সুনীলা বীরে বীরে দিলীপের কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল)

সুনীলা—দিলীপ, আমার বলো? কি তোমার হয়েছে আমার বলো?

দিলীপ—(হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল) না।

সুনীলা—কোনদিন কোন কথা তুমি আমার কাছে গোপন করেনি, ভেবে দেখো। ছেলেবেলা কোন দিন কোন কথা বলার দরকার হ'লে,—

দিলীপ—না,—থাক।

সুনীলা—বড়ো হ'য়েও, কতোদিন তুমি আমার বাড়ী থেকে ডেকে এনে তোমার কথা বলেছ, ভেবে দেখো। —আজ কেন বলবে না?

দিলীপ—সে থাক সুনীলা। সে আমার একান্ত নিজের কথা। লংলারের রহস্যর স্বার্থের লজ্জ তার কোন যোগ নেই: জাতির লোকের কাছে সে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ!

হৃৎক যদি আমি কিছু অশ্রুভব কোরে থাকি, সে আমার দুর্বলতা, তুমি তাকে আর জাগিয়ে তুলনা।

(বেহারার প্রবেশ)

কি নিবারণ, গাড়ী পাওয়া যাবে?

বেহারী—আজ্ঞে হ্যাঁ। চোটাবু নিজেই আনছেন।

Awfully—হানে, ভীষণ রেগেছেন।

(প্রস্থান)

(দ্বিজনের প্রবেশ)

দ্বিজন—হায়া, কার গাড়ী কে চেয়ে পাঠিয়েছিল?

দিলীপ—তোমার গাড়ী আমি চেয়ে পাঠিয়েছিলাম।

দ্বিজন—(ভীত কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল) আমার গাড়ী নয়। আমার কিছু নয়, কোন সম্পত্তি আমার নেই। তুমি তোমার নিজের জিনিষ আমার কাছ থেকে চাইবে না, চাইবে না, চাইবে না!

দিলীপ—কিন্তু মা আমার হকুম দিয়েছেন গাড়ী ব্যবহার করবার আগে তোমার অনুমতি নিতে হবে, কারণ—

দ্বিজন—মা হকুম দিয়ে থাকেন, মায়ের কাছে যাবে। আমার এ বড়বয়ের ভেতর থেকে দূরে রেখে দিও।

(প্রস্থান)

ডোঃ পদে বালামুখ

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

মোর হৃদখানি রহিল আঁধার

উমা দাস

শুভ্র আমার হৃদখানি লয়ে, মন্দির দ্বারে ঘুরেছি কত,
খোলেনি ছয়র খোলেনি বন্ধ, ফিরিয়ে এনেছি পাগল মত !
দেউলে দেউলে আরতি ডঙ্কা বেজেছে যখন সাঁঝের বেলা,
ছুটে গেছি প্রভু পূজিতে তোমার, পূজা না করেছি, করেছি খেলা !

শত উপচারে সাজায়ে ডালাটি
কতনা পূজারী আনিছে ওই
আমার ডালাটি শূণ্য রহিল—
পূজার অর্ঘ্যে ভরিল কই ?

নিশার প্রান্তে দূর দিগন্তে উঠেছে যখন প্রভাত রবি—
গলানো স্বর্ণ চলে চারিধার একেছে যেথায় নিখুঁত ছবি ;
নিশির শিশিরে লিক্ত পত্র ভরেছে যখন রক্ত রাগে—
দূর দিগন্ত ভরে গেছে সব, প্রভাত রবির হোলীর কাগে,

ভেবেছি প্রভাত রক্ত বেদীতে
দেবতা বুঝিবা দাঁড়ায়ে ওই
সারা হৃদি খানি বুজেছি তখন
ভক্তির ফুল ফুটিল কই ?

ক্রমে মে প্রভাত অদূরে দিলাল, যৌবন বীনা উঠিল বেজে
আকাশ বাতাল ভরে গেল এবে, তরুণ রবির অরুণ ভেজে ।
ঝলমলি উঠে পথ মাঠ বাট, ঝলমল করে সুদূর দিশি—
ঝঙ্কারি উঠে শত তারে বীণা, শত আনন্দে আপনি দিশি !

মাতায়ে আকাশ মাতায়ে বাতাল
নব আনন্দ মাতিল ওই
মোর হৃদি খানি রহে নিস্তেজ
ভক্তির ভেজে ভরিল কই ?

রক্ত করবী আঁচলে উড়ায়ে নীরব লক্ষ্য আনিল নামি—
করম ব্যস্ত কল কোলাহল একে একে সব গিয়াছে থামি ।
পল্লী প্রান্তে আঁকাবাঁকা পথ দূর দিগন্তে গিয়াছে মিশি,
সুদূর হইতে আনিছে যে পথে লখন করুণ শান্ত নিশি ।

পূজার বেদীতে তুলনীতলায়
একে একে দীপ জলিল ওই
মোর হৃদখানি রহিল আঁধার
পূজার প্রদীপ জলিল কই ?

—:—

সুনীলা—(বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল)
মা এই হুকুম দিয়েছিলেন ?

দ্বিলীপ—হ্যা—

সুনীলা—অধিকার তোমার একটু একটু
কোরে সবই গেল সংসার থেকে ।

দ্বিলীপ—হ্যাঁ গেল । কিন্তু কেন গেল
বুঝলাম না । এ এক রহস্য ! আমার
জীবনের এক মহা বিস্ময় ।...

সুনীলা—কিন্তু তুমি যে বলো অধিকার
মাহুষকে শক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা কোরতে হয়,
মনীষা দিয়ে পালন কোরতে হয় ; —এ কথা
কি শুধু লম্বা পক্ষে প্রযোজ্য ? ব্যক্তির
পক্ষে কি নয় ?

দ্বিলীপ—ব্যক্তির পক্ষেও এ কথা নত্যা ।
কিন্তু যেখানে একদিন অধিকার ছিল

অনায়াসকর—অধিকার ছিল স্নেহের, ভালো-
বালার, সেখানে শক্তির প্রয়োগ তো দূরের
কথা, একটা অভিযোগ কোরতেও লজ্জায়
আমার—কিন্তু থাক, আমার আর সময়
হবে না ।

(এই বলিয়া দ্বিলীপ প্রস্থান করিতে
উদ্ভত হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আনিয়া
বলিল)

ভালো কথা, তুমি কার সঙ্গে আসছো ?
আমার সঙ্গে, না, অজয়ের সঙ্গে ?

সুনীলা—তুমি বা বোলবে ।
(দ্বিলীপ মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল)
দ্বিলীপ—তুমি আমার সঙ্গেই এলো ।

(প্রস্থানোত্তত)
(বেহারার প্রবেশ)

বেহারী—বাবু !
দ্বিলীপ—কি বলো ।
বেহারী—আপনি এখনো ঘান্নি ।
খাবার নিয়ে বলে আছেন ।

দ্বিলীপ—আজ আর হ'লনা, মাকে বলে
দিও নিবারণ ।

সুনীলা—কিন্তু তোমার সামনে বসে ন
খাওয়ালে কোনদিন তাঁর চলে না । এ তাঁর
চিরদিনের অভ্যাস এটা একবার ভেবে দেখ
লম্বাও আছে ।

দ্বিলীপ—জানি—কিন্তু অভ্যাস আমার
অনেক পরিবর্তন কোরতে হচ্ছে, তাঁকে
কোরতে হবে । এলো—

(লকলের প্রস্থান)
(ক্রমশঃ)

স্মরণীয় পৌরাণিক চিত্র

বহু প্রতীকার পর আগামী শনিবার 'উত্তরা' চিত্রগৃহে হাজরা পিকচারের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন "দেবী ফুল্লরা" মুক্তিলাভ করিবে। ধর্মপ্রবণ বাঙলাদেশে "দেবী ফুল্লরা"-র আগমন-বার্তার চিত্রামোহিতের মধ্যে যেন এক অপূর্ণ পুলক সঞ্চারিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বাঙালী এখন চায় সেই আনন্দ, যাহাতে মনপ্রাণের প্রতিটি গ্রন্থের ভিতর নির্মল আনন্দের ফন্তুপার প্রবাহিত

হয়। যুগ-যুগান্তের অতীত গরিমার প্রেম-ভক্তি, শৌর্য-বীর্য বিষণ্ণিত সেই কাহিনীই "দেবী ফুল্লরা"। সেইজন্তই বোধ হয়, এই ছবির মুক্তিলাভে বাঙলার আবালবৃদ্ধবৃদ্ধিতা এতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। এতদ্ভিন্ন "দেবী ফুল্লরা"-র কাহিনীটি পৌরাণিক বলিয়া অভিহিত হইলেও ইহার ভিতর অধুনাতম হরিজন, কৃষিশ্রম, দুর্দল ও প্রবলের সংঘর্ষ প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যার বিকাশলাভ ঘটিয়াছে। মোট কথা, "দেবী

ফুল্লরা"-র কাহিনীটি গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত বহু ঘটনার সমাবেশে চিত্রোপযোগী ও আবেদনপূর্ণ।

এই কাহিনীটিকে যাহারা রূপ-রস-গন্ধে সজীবিত করিয়া তুলিয়াছেন গিনেমাক্সের তাঁহারা সুপরিচিত ও জনপ্রিয়। তিনকড়ি চক্রবর্তী যিনি এতাবধি বহু ছবি পরিচালনা করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন এবং যার প্রায় প্রত্যেকখানি ছবিই অর্থের দিক হইতে কর্তৃপক্ষের মুখে হালি ফুটাইয়া তুলিয়াছে—তিনিই এই ছবির পরিচালনা করিয়াছেন। বাঙলাদেশ আজ কী চায় বহুদিনের অভিজ্ঞতার তিনি সেই জিনিষটি বিশেষভাবেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন—সেইজন্তই তাঁহার নিকট হইতে আমরা



হাজরা পিকচারের "দেবী ফুল্লরা" চিত্রে অশোক চৌধুরী ও শিল্পালা।

আশাহুরূপ জুফল পাঠ্য বলিয়াই আশা করি। ভারতের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যমণ্ডল এই ছবির প্রধান বস্তু-শিল্পী রূপে কাজ করিয়াছেন। আলোক-চিত্রে ও লক্ষ্য-বস্তু তরুণ কন্যা-বৃন্দ বিভূতি লাহা ও যতীন বসু স্বাধীনভাবে “কচি লংস” ছবিতে কাজ করিয়াই সর্বসাধারণের সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এতদ্বিধা অত্যন্ত বিভাগেও যে লক্ষ্য শিল্পীরা কার্য্য করিয়াছেন লক্ষ্যেই জানী ও শুণী।

“দেবী ফুল্লরা”-র চরিত্র-লিপি বটনেও অত্যন্ত বিভাগের মত কর্তৃপক্ষ যে সুন্দর লক্ষ্যমণ্ডলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ‘কালকেতু’-র ভূমিকার অধীনে চৌধুরী মকে যে অসম্ভব জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই। কবিকল্প ‘কালকেতু’ লক্ষ্যে যে বর্ণনা দিয়াছেন বাঙলাদেশে তাহার উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টি অধীনে চৌধুরী ভিন্ন অপর কাহাকেও কল্পনা করা যায় না। মনোরঞ্জন ভট্ট-চাখ্যের ভাষ্যমত লক্ষ্যেও ঐ এক মতই পোষণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুব্রাহ্মণ্য রূপে প্রিয়বর্ষন অভিনেতা মোহন রায় এই লব শক্তিশালী অভিনেতৃত্বের সংস্পর্শে যে আশাহের সুখী করিতে পারিবেন না এ ধারণা আমরা করি না। লক্ষ্যরূপে তিনকড়ি চক্রবর্তী ও দুর্গাপ্রসন্ন বসু আশ্ব-প্রকাশ করিবেন। ইহাছের দুইজননের বিষয় কিছু লেখা নিম্নপ্রয়োজন। স্থিরচিত্রে তিনকড়ি বাবুর রূপলক্ষ্যের যে নতুন আশরা দেখিয়াছি তাহা দেখিয়া মনে হয়, এই চরিত্রটি তাঁহার হইবে এক অপরূপ সৃষ্টি। ব্যাধ-বালিকা “ফুল্লরা”-র ভূমিকার শিশু-বালাকে মানাইবে যে চমৎকার এ বিষয়ে মতবৈধ নাই। তিনি শক্তিময়ী অভিনেত্রী। অভিনয়েও যে তিনি এই চরিত্রটির স্বাধা দ্য করিবেন না, এ ধারণা করা অসম্ভব

হিটলারের হুমকি ও চেকোস্লোভাকিয়ার পরিস্থিতি

মিঃ সচী শীল

Hindusthan Review-র ফেব্রুয়ারী লংখ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম :

“If Hitler shoves beyond his frontiers, Czechoslovakia will have to bear the first shock of German thrust, as was the case with Belgium in 1914. But Czechoslovakia is fortified by alliances with France and Russia, apart from her being a member of the Little Entente. The German military circles do not believe in a quick coup in Czechoslovakia, which they can grab only by a fall-dress war, and even then, not without inviting a general conflagration.”

তিন লগ্নাহ আগে Sudeten German-দের ক্ষেপিয়ে দিলে হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার ওপর প্রচণ্ড রকমের ষা দেবার

নয়। সুরমা নামে একটি গীতবহুল কুম্ভকার সুবিখ্যাত গায়িকা রাধারানী ও সুরমা নামী একটি চঞ্চলার অংশে সুরমা চিত্রায় মনোমগ্নকে আমরা লক্ষ্য করি। মহাশয় রূপে উদায়মান অভিনেত্রী সারিত্রী লক্ষ্যে আমরা উচ্চ ধারণা পোষণ করি। নর্তকী-রূপে নৃত্যগীত-পটিনী রানী চৌধুরী যে অপরূপ নৃত্যকলা প্রদর্শনে লক্ষ্যকে বিমোহিত করিবেন এ আশা তাঁহার উপর আমাদের আছে।

এই লবের যোগাযোগে আমাদের মনে হয়, “দেবী ফুল্লরা” বাঙলার চিত্রল-পিপাসুদের মনে এক নব অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিবে। আগামী লগ্নাহে “দেবী ফুল্লরা” লক্ষ্যে আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হইবে।

মতলব করেছিলেন। কিন্তু হিটলার অগ্রিমতে যেমন walk-over পেরেছেন, এক্ষেত্রে কি আর তা সম্ভব হল ‘না’, হতে পারে?

অগ্রিম গ্রাণ করবার পরই হিটলারের লেরা চেল। Gen Goering চেকদের চোখ রাঙিয়েছিলেন। এর উত্তরে ফ্রান্স ও রাশিয়া চেকদের অন্তর ছিল। হিটলার এর পর কী করতে পারেন? হিটলারের পক্ষে এক্ষেত্রে যে জবরদস্ত নীতি চালান বিশেষ সম্ভব হবে না, তা অনেক বৃদ্ধিতে পেরেছিলেন।

Hindusthan Reviewর এপ্রিল লংখ্যায় “The Gathering world crisis and the Role of Britain”—শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করে বলেছিলাম :

“Thanks to France and Russia they have realised the gravity of the situation, and lest it should be too late, they have rushed assurances to the Czechs of their full military support in the event of Nazi aggression. Hitler must now think ten times before pouncing upon Czechoslovakia, in spite of Britain's cowardly policy of isolation. His recent coup was a success. The next, if and when launched, may prove to be his undoing.”

Gen. von Fritsch ছিলেন জার্মানীর Chief of Staff, তিনি নাকি খুব দিলেবী লোক ছিলেন, আর হিটলারকে তিনি বুঝে লুখে কাজ করতে পরামর্শ দিতেন। এত moderate policy হিটলারের লইল না। তাই জেনারেলের হল পদচ্যুতি। ঠিক তার

পরেই হিটলার তাঁর মৈত্র্যবাহিনী চালিয়ে
দিলেন অস্ত্রিয়ার লীমান্ডের ওপর দিয়ে।
অস্ত্রিয়াকে ত বিনা বাধায় এইভাবে পাওয়া
গেল। এই শক্ত নীতির লক্ষ্যে হিটলারের
আনন্দ আর ধরে না! Gen. Fritschকে
তাড়ান লক্ষ্যক হয়েছিল বটে।

তারপর এল চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপার।
হিটলারের সেই নীতি কি খাটলো? কেন
খাটলো না তার উত্তর আগে দিয়েছি।
এইবার "New York Times"-এর প্রেগ
(Prague) লংবাধবাতা কি বলছেন শুনুন—

"Indications that Gen. Von
Fritsch, onsted chief of Staff, has
been received back in favour in
Berlin suggest that the justice of
his frequent warnings that Germany
was not in a position to face a
major war, has been recognised.

চেকোস্লোভাকিয়া যে বড় কঠিন ঠাই
একথা বুঝতে হিটলারের এত ঘেরা হল
কেন তা বুঝতে পারি না। নেহাৎ না
ঠেকলে হিটলার শিখতে রাজী নন—এ বেশ
বোঝা যাচ্ছে এখন। হিটলার কি ভেবে-
ছিলেন যে, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন
নাহেৎকে হাত করে ফ্রান্সের ওপর প্রভাব
বিস্তার করবেন, যাতে ফ্রান্সের প্রতিজ্ঞা
শিথিল হয়ে পড়ে?

খুব স্মৃতির কথা যে ফ্রান্স টেলেনি।
এই দৃঢ় নীতিই অনেকটা লক্ষ্য উপলক্ষের
জন্ত দায়ী। অবশ্য ব্রিটিশমন্ত্রীর কন্ম চেটা
করেন নি যাতে ফ্রান্সে এ নিয়ে না বাধা
যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্ত্রোপায় হয়ে
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বালিন ও প্রেগে (Prague)
খুব জোর diplomatic effort চালালেন।
তবু কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপারে
definite commitment করতে ব্রিটিশ
রাজী হয় নি।

আমার মনে হয়, ব্রিটিশ বখন স্বার্থের
হায়ে পড়ে diplomatic action নিরেছিল,

তখন আরও একটু সাহস করে জার্মানীকে
চোখ রাঙিয়ে দেওয়াই ছিল তার স্বার্থের
পক্ষে খুব অনুকূল। বুদ্ধ বদ্ধ করাই বখন
ব্রিটিশের উদ্দেশ্য, তখন উচিত হচ্ছে firm-
stand নেওয়া। ১৯১৪ সালের সাম্রাজ্য
একটা তুল এবং তার ভীষণ পরিণাম থেকেও
কি ব্রিটিশের কোন শিক্ষা হয় নি। বেল-
জিয়ামকে সাহায্যের ব্যাপারে Sir Edward
Grey যদি বিলী ভাবে বোনামোনো না
করতেন, যদি তিনি জার্মানীকে তখন
লম্পট জানিয়ে দিতেন যে ব্রিটিশ বেলজিয়ামের
জন্ত অস্ত্র ধরতেও প্রস্তুত, তাহলে বুদ্ধটা
তখন নাও বটতে পারতো। ১৯১৪ সালের
আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে ইংরেজ বখন
বুদ্ধ ঘোষণা করলো, জার্মানী ত তখন
হুকচকিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলো—এমন
যদি আগে জানতাম তবে কি আর এ কাজ
করতাম। ঘোষ অবশ্য হুঁপকরেই। জার্মা-
নীর অন্ত সামরিক প্রতাপ, অন্ত thorough-
ness—এ সব থাকা লম্বেও vital calcula-
tion করতে গিয়ে দেখানে ছোট্ট একটা
মারাত্মক ভুল করে বসেছিল। ১৯১৪ সালে
বুদ্ধের পেছনে ছিল-England's vacillation
and Germany's miscalculation.
১৯৩৮ সালে ইংরেজ আবার সেই ভুল করছে।
যেখানে সময় থাকতে চোখ রাঙালে
কাজ হবে, দেখানে ইতস্ততঃ করার
ফলে বুদ্ধ বেধে গেলে তারপর বুদ্ধে
নামলে আর শান্তি রইল কোথায়?
আশঙ্কা হয়, জার্মানীও ১৯১৪ সালের সেই
fatal miscalculation করে ফেলতে পারে।
"Germany in the International
Arena"—শীর্ষক প্রবন্ধে তাই আমি
বলেছিলাম—

"Hitler should find nothing
encouraging for himself in the
vacillations of British Policy. It
will undoubtedly swing sharply in

favour of the victims of Fascist
aggression, and the Supreme
Moment will come when the
Maginot Line is violated."

লক্ষ্য যে মহানকট বনিয়ে উঠেছিল,
তাতে চেকোস্লোভাকিয়ার শাপনকর্তারা খুব
দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।
অবশ্যেই জার্মানদের দাবীর স্বার্থতা লক্ষ্যে
বিবেচনা করতে তাঁরা যেমন উৎসুক, আবার
দেশের স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতা
লক্ষ্যজীনভাবে বজায় রাখতেও তেমন
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চেক গভর্ণমেন্ট যে Minorities
statute draft করছেন, আশা করি তাতে
তাঁদের লক্ষ্য ও দুরদর্শিতার ছাপ থাকবে।
দুরদর্শিতা বলছি এই জন্ত যে, এখন সাময়িক-
ভাবে শান্তি কিনতে গিয়ে তাঁরা যেন
অবশ্যেই জার্মানদের অতিরিক্ত কিছু না দিয়ে
বসেন। তাতে লম্বে বিপদের সম্ভাবনা।
জার্মানদের মধ্যে যে সব Socialist ও
Democratরা আছেন তাঁদের নিরাপত্তার
কথাও মনে রাখতে হবে। স্মৃতির কথা এই
যে, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট Dr.
Benes খুব বিচক্ষণ রাজনীতিক।

একটা কথা বলা হয়নি। চেকো-
স্লোভাকিয়ার ব্যাপার নিয়ে বুদ্ধ না বাধতে
দেওয়ার ব্রিটিশের স্বার্থটা কি? চেম্বারলেন
নাহেৎ মোটেই চাননা যে এই রাষ্ট্রটিকে
কেন্দ্র করে বুদ্ধ বনিয়ে উঠুক। কারণ এরূপ
বুদ্ধে ইংরেজ, ফরাসী ও সোভিয়েট—এই
তিন শক্তির একত্র সমাবেশ হতে বাধ্য।
Franco-Soviet Pact এখনো অটুট
রয়েছে। একমাত্র London-Paris
Moscow alliance-ই Fascismকে ধর্ম
করতে পারে। ফ্যানসিজম ধ্বংস হলে বা
আলবে তা ইংরেজ ধনিকসম্প্রদায়ের চক্ষুশূল।
তাই এই বুদ্ধকে এত ভয়।

ফুটবল ম্যাচ

(সি, বি)

কলিকাতা ফুটবল লীগ

গত সোমবার ১৩ই জুন প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগের যে তিনটি খেলা হয়েছিল তার মধ্যে ই-বি আর দল ব্যারাকপুরের ক্যামেরো-নিয়ানস্ লৈঙ্গ দলকে ৯-২ গোলে পরাজিত করে বিজয়ের সৃষ্টি করেছে। এবছর প্রথম ডিভিশনের কোন খেলার এত বেশী গোল প্রদান সম্ভব হয় নি।

ক্যালকাটা ও কে ও এল বি দলের খেলার প্রথমোক্ত দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে। ক্যালকাটা দলের নিয়মিত গোলরক্ষক আর্থার এই দিনে আক্রমণভাগে খেলেন এবং তিনিই বিজয়শূচক গোলটি করেন।

আর একটি খেলাতে এরিয়াল দল তাদের বিপক্ষ পুলিশ দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে ছুটি মূল্যবান পয়েন্ট লাভ করেছে।

মঙ্গলবারে দুটি খেলার মধ্যে একটিতে লীগ চ্যাম্পিয়ন মহম্মেডান্ স্পোর্টিং দল গত বছরের রানাঙ্গ আপ ভবানীপুর দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করেছে। ভবানীপুর দল বহিষ্ঠ করে একটি অব্যর্থ গোল প্রদানের সুযোগ কার্যে পরিণত করতে পারেনি, তাহলেও তাদের খেলা অতিশয় নৈরাস্তজনক হয়েছিল। তাদের এই পরাজয়ের জন্য গোলরক্ষক আর বহু অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়া আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা যে ভাল খেলতে পারেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মহম্মেডান্ দলের লাল্ এক্স দলিহ্ প্রথমার্ধে একটি

করে গোল করার পর দ্বিতীয়ার্ধে মুহম্মদুল (ছোট) আর একটি গোল প্রদান করেন।

অপর খেলাটিতে কাষ্টমন্ দল একটিমাত্র গোল প্রদান করে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে। বিজয়ীদলের লিঘ্যান্ এই গোলটি প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। মোহনবাগান দলে এই দিনে নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকই অনুপস্থিত থাকায় তাদের খেলা সন্তোষজনক হয় নি।

বুধবার প্রথম ডিভিশন লীগের তিনটি খেলা হয়। তার মধ্যে দুটি খেলার ইষ্টবেঙ্গল ও এরিয়াল দল যথাক্রমে কে, ও, এস্. বি এবং ক্যামেরোনিয়াল লৈঙ্গ দল দুটিকে ২-০ ও ২-১ গোলে পরাজিত করে লীগ টেবলে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করেছে। অনেকদিন বাধে রামানা ইষ্টবেঙ্গল দলের পক্ষে খেলেন।

তৃতীয় খেলাটিতে ই, বি, আর—পুলিশ দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। রেল দলের পাখী লেন্ একাই দুটি গোল করেন।

বৃহস্পতিবার রুষ্টির মধ্যে ক্যালকাটা ও কালীঘাট দলের একমাত্র প্রথম ডিভিশন লীগের খেলাটি হয়। উত্তর পক্ষ একটি করে গোল প্রদান করার খেলাটি অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। মান্‌রো ও জোশেফ যথাক্রমে ক্যালকাটা ও কালীঘাট দলের পক্ষে একটি করে গোল করেন। কালীঘাট দল এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্ব অবস্থার মধ্যে খেলেও অমীমাংসীতভাবে খেলা শেষ করে নিজেদের কতিপয় পরিচয় দিয়েছে।

শুক্রবারের তিনটি খেলার মধ্যে আই এক এ লীল্ড বিজয়ী মহম্মেডান্ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রথম ডিভিশনে নবাগত পুলিশ দলের নিকট দ্বিতীয়বার শোচনীয়ভাবে পরাজয় লক্ষ্যপেক্ষা বিশ্বরের সৃষ্টি করেছে। পুলিশ দল এই খেলাটিতে ৫-১ গোলে জয়লাভ করেছে। প্রথম ডিভিশন লীগের ইতিহাসে মহম্মেডান্ দলের একই দলের কাছে দুবার এবং একরূপ শোচনীয় পরাজয় এর আগে আর হয় নি।

মোহনবাগান্ ও কে ও এল বি দলের রিটার্ন ম্যাচটিতে প্রথমোক্ত দলটি ২-০ গোলে জয়লাভ করেছে। মোহনবাগান্ দলের জয়লাভে লৈঙ্গ দল প্রথম খেলাটিতে যে অখেলোয়াড়জনিত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর হয়েছে।

এরিয়াল ও ই বি আর দলের খেলাটিতে কোন গোল না হওয়ার অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। গত শনিবার পর্যন্ত প্রথম ডিভিশন লীগ টেবল্‌ বেওয়া হল।

খে জ ড় প পক্ষে বিঃ পয়েন্ট
ই বি আর ১৫ ৬ ৫ ৪ ২২ ১৫ ১৭
মহম্মেডান্

স্পোর্টিং	১৪	৭	৩	৪	২৪	১৮	১৭
মোহনবাগান	১৪	৪	৮	২	১৩	৯	১৬
কাষ্টমন্	১৪	৫	৬	৩	১৪	১২	১৬
ইষ্টবেঙ্গল	১৩	৫	৫	৩	১৩	৯	১৫
পুলিশ	১৪	৬	২	৬	২৪	১৯	১৪
কালীঘাট	১৪	৩	৮	৩	১৪	১৩	১৪
এরিয়াল	১৪	-	৫	৫	১৩	১৮	১৪
ক্যালকাটা	১৪	৪	৫	৫	৮	১৩	১৩
ক্যামেরোনিয়াল							

১৬ ৩ ৬ ৭ ১৫ ২৪ ১২
কে ও এল বি ১৩ ৪ ৩ ৬ ১২ ১৫ ১১
ভবানীপুর ১৩ ৩ ৩ ৭ ১৪ ২০ ২
আন্তর্জাতিক খেলা

গত শনিবার ইউরোপীয়ান্ দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের বাৎসরিক আন্তর্জাতিক

ফুটবল ম্যাচটি খেলা হয়ে গেছে। গত ৪৪১
জুন এই খেলাটি হবার ঠিক থাকলেও বার্ষিক
দলের আগমনের জন্য গত ১৮ই জুন
এই খেলাটি হবার বন্দোবস্ত হয়েছিল।
খেলাটিতে পূর্বের জায় দর্শক সমাগম না
হওয়ার ইহার জনপ্রিয়তা যে অনেকাংশে
কমে গেছে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।
অবশ্য ব্যাণ্ডবান্ড, পতাকা উড়ান ইত্যাদি
পূর্বের তাকজমক আদৌ থরকি হয় নি। গত
বৎসরের বিজয়ী ভারতীয় দল এ বৎসর ১-০
গোলে পরাজিত হয়েছে। ইউরোপীয়ান
দলের হেণ্ডারসন দ্বিতীয়ার্ধের শেষ সময়ে
একটি মাত্র গোল প্রদান করে নিজ দলকে
৩য় হবার যোগ্যতা প্রদান করেন। খেলাটি
আদৌ উজ্জ্বল হয় নি। প্রথমার্ধে
প্রতিপক্ষ দল ছুটি সমভাবে আক্রমণ করার
সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনা পরি-
পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে অধিকাংশ সময়
ইউরোপীয়ান দলকে আক্রমণ করতে দেখা
যায়। প্রথমার্ধে ভারতীয় দল অনেকগুলি
গোল প্রদানের নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও কার্যে
পরিণত করতে পারে নি। বিজয়ী দলের
গোলরক্ষক এডেন, কার্ডে, ম্যাকুয়েন,
জেনার্সডেন, ড্রিসকল ও ফিণ্ডলের খেলা
দর্শনযোগ্য হয়েছিল। বিজিত দলের রক্ষণ
দলে ওসমান, পি হাল শুপ্ত, বি সেন ও জন্
এবং আক্রমণ ভাগে কে ভট্টাচার্য ও নির্মল
ঘোষ ভাল খেলেন।

ইউরোপীয়ান দল :—এডেন (ক্যালকাটা)
ওসমান (ক্যালকাটা) এবং ই কার্ডে
(পুলিশ); টেলর, ক্যাপ্টেন (ক্যালকাটা),
ম্যাকুয়েন (ক্যামেরোনিয়ান) হেণ্ডারসন

(কে ও এম বি), বিয়ার্ড (ক্যালকাটা) এবং
কিণ্ডলে (পুলিশ)

ভারতীয় দল :—ওসমান (মহম্মেদান);
এস দত্ত (মোহনবাগান) এবং পি হাল শুপ্ত
(ইষ্টবেঙ্গল); জন্ (কালীঘাট), বি সেন
(ইষ্টবেঙ্গল) এবং ভৌমিক (কাষ্টমন্); এন
ঘোষ (মোহনবাগান), কে ভট্টাচার্য (কাষ্টমন্)
ক্যাপ্টেন মূর্গেস (ইষ্টবেঙ্গল), লাবু (মহম্মেদান)
এবং কে প্রদাহ (এরিসাজ)।

রেকর্ডার—বি ডি চ্যাটার্জি।

লাইসেন্সদানদর :—এ রায় এবং জিন্নার।

ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ—

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার এবারকার
প্রথম টেস্ট ম্যাচটি গত ১০ই এবং ১১ই
জুন খেলা হবার পর ১২ই জুন রবিবার
থাকার জন্য খেলাটি বন্ধ থাকে। সোমবার
১৩ই জুন পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়।
অস্ট্রেলিয়া দল টেস্ট খেলাটির আগের প্রায়
সব কয়টি ম্যাচেই বিপক্ষ দলকে ফলো
অন্ করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এই
প্রথম টেস্ট ম্যাচটিতে ইংল্যান্ড দল প্রথমে
ব্যাট করে অপ্রত্যাশিতভাবে ৮ উইকেটে
৬৫৮ রান করে ডিক্লার করার অস্ট্রেলিয়া
দল 'ফলো-অনের' অসম্মান থেকে অব্যাহতি
পায় নি। আগন্তুক দলের এম জে ম্যাককব
অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়ে ২৩৫ মিনিটে
২৩২ রান করা লক্ষ্যে 'ফলো-অন্' রক্ষা করতে
পারেন নি। ইহাই ম্যাককবের টেস্ট খেলার
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী রান।
ইতিপূর্বে ১৯৩২ সালে লিড্‌নীতে টেস্ট
খেলার তিনি ১৮৭ রান করে নট আউট
ছিলেন। অস্ট্রেলিয়াদল প্রথম ইনিংসে মোট

৪১১ রান করার বিপক্ষে দল অপেক্ষা ২৪৭
রান পশ্চাতে থাকে। দ্বিতীয় ইনিংসে
অস্ট্রেলিয়া দল নিজেদের সুনাম অস্বাভাবিক
কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং করে খেলাটি অস্বাভাবিক
ভাবে শেষ করেছে। পরাজয়ের উদ্বেগ ও
আশঙ্কা নিয়ে খেলা শেষেও অস্বাভাবিক
ভাবে খেলা শেষ করে অস্ট্রেলিয়া দল
ক্রিকেট জগতে বিশ্বের নৃষ্টি করেছে।
অবশ্য এই গৌরবের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলের
ক্যাপ্টেন ডি জি ব্রাডম্যান এবং ডবলিউ এ
ব্রাউন্ অनेকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে
পারেন। এই দুইজন খেলোয়ারের জন্যই
যে খেলাটির এইরূপ পরিণতি হয়েছে ইহা
নিঃসন্দেহে বলা চলে। দ্বিতীয় ইনিংসে
ব্রাডম্যান ১৪৪ রান করে নট আউট
থাকেন এবং ব্রাউন নিজস্ব ১৩৩ রান
করেন। অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসে
মোট ৬ উইকেটে ৪২৭ রান করার পর
খেলাটি শেষ হয়। এই টেস্ট খেলাটিতে
মোট নয়টি লেক্সরি হয়। তার মধ্যে ইংল্যান্ড
দলের হাট্‌ন, বার্ণেট কম্বিন প্রত্যেকে
একটি ও পেন্টার ছুটি এবং অস্ট্রেলিয়াদলের
ম্যাককব ছুটি; ব্রাডম্যান একটি ও ব্রাউন
একটি লেক্সরি করেন। অস্ট্রেলিয়া দলের
ওরিলী ও স্পিটউড-গ্রিথ এবং ইংল্যান্ড দলের
রাইট ও তেরিটার বোলিং উল্লেখ যোগ্য
হয়েছিল। নিয়ে খেলাটির ফলাফল হওয়া
হল।

ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংস

হাটন এল বি ডব্লিউ ব

স্পিটউড-গ্রিথ ১০০

বার্ণেট ব ম্যাককব ১২৬

এডরিচ ব ওরিলী ৫



ইন্দিবিমাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

হামণ্ড ব ওরিলী	২৬
পেন্টার নট আউট	২১৬
বম্পটন ক ব্যাডকক ব ফ্রিটউডস্মথ	১০২
এমল ব ফ্রিটউডস্মথ	৪৬
ভেরিটা ব ফ্রিটউডস্মথ	৩
লিনফিল্ড এল বি ডব্লিউ ব ওরিলী	৬
রাইট নট আউট	১

অতিরিক্ত ২৭

মোট (৮ উইঃ) ৬৫৮

বোলিং :—

	ও	ম	রা	উই
ম্যাককর্শিক	৩২	৪	১০৮	১
ওরিলী	৫৬	১১	১৬৪	৩
ম্যাককেব	২১	৫	৬৪	০
ফ্রিটউডস্মথ	৪৯	৯	১৫৩	৪
ওয়ার্ড	৩০	২	১৪২	০

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস

কিনলটন ব রাইট	৯
ব্রাউন ক এমল ব ফার্নেল	৪৮
ব্র্যাডম্যান ক এমল ব লিনফিল্ড	৫১
ম্যাককেব ক বম্পটন ব ভেরিটা	৩২
ওয়ার্ড ব ফার্নেল	২
হাশেট ক হামণ্ড ব রাইট	১
ব্র্যাডকক ব রাইট	৯
বার্ণেট ক রাইট ব ফার্নেল	২
ওরিলী ক পেন্টার ব ফার্নেল	৯
ম্যাককর্শিক ব রাইট	২
ফ্রিটউডস্মথ নট আউট	

অতিরিক্ত ২১

মোট ৪১১

বোলিং :—

	ও	ম	রা	উই
ফার্নেল	৩৭	১১	১০৬	৪
হামণ্ড	১৯	৭	৪৪	০
লিনফিল্ড	২৮	৮	৫১	১
রাইট	৩৯	৬	১৫৩	৪
ভেরিটা	৭৩	০	৩৬	১

অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় ইনিংস

কিনলটন ক হামণ্ড ব এডরিচ	৪০
ব্রাউন ক পেন্টার ব ভেরিটা	১৩৩
ব্র্যাডম্যান নট আউট	১৪৪
ম্যাককেব ক হামণ্ড ব ভেরিটা	৩৯
হাশেট ক বম্পটন ব ভেরিটা	২
ব্যাডকক ব রাইট	৫
বার্ণেট এল বি ডব্লিউ ব লিনফিল্ড	৩১
ওয়ার্ড নট আউট	৭

অতিরিক্ত

৭৬

মোট (৬ উইঃ) ৪২৭

	ও	ম	রা	উই
ফার্নেল	২৪	২	৭৮	০
হামণ্ড	১২	৬	১৫	০
রাইট	৩৭	৮	৮৫	১
লিনফিল্ড	৩৫	৮	৭২	১
ভেরিটা	৬২	২৭	১০২	৩
এডরিচ	১৩	২	৩৯	১
বার্ণেট	১	০	১০	০

এই খেলাটিতে আর একটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটি দলের টেস্ট খেলায় এর আগে হবস বামোটি ১২ লেক্সী করে রেকর্ড করে ছিলেন। কিন্তু এই খেলাটিতে লেক্সী করার পর ব্র্যাডম্যান মোট তেরোটি (১৩) লেক্সী করে হবসের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

বোম্বাইয়ে অস্ট্রেলিয়া দল

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের অধিনেতা কেরার পথে বোম্বাইয়ের 'ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ান' উদ্যোগে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে একটি ম্যাচ খেলার প্রচেষ্টা হচ্ছে। সম্ভবতঃ ইহা কার্যে পরিণত হবে।

রাজপুতানা ক্রিকেট দল

রাজপুতানা ক্রিকেট দল আর্থিক অবচ্ছলতা হেতু সম্ভবতঃ অবশিষ্ট খেলাগুলি



অমলিন

তিনীরেস্তা গুপ্ত



এযে শুধুই কাটার মত বিধবে আমার প্রাণে
একটু বাকী রইল শুধু তোমার লকল হানে
চিরদিনের আশা যাওয়া,
লকল হওয়া লকল পাওয়া,
মরার মাঝেই অলীক কীক কণিক ব্যবধানে;
তুচ্ছ বত পাওয়ার গরব মিথ্যা অভিমানে।
এযে শুধু অশ্রুতে মোর ভ'রবে নয়ন দুটি
নিখুঁত তোমার লকল কাজে একটুখানি ক্রটি।
তোমার হানের একটু নিরা
পূর্ণ আমার বিরাট হিরা
একটু তোমার অবহেলার বাধায় কেঁপে উঠি
তারই কোয়ার অক্ষুট এ হৃদয় ওঠে ফুটি।
এযে আমার স্মৃতির মাঝে কণিক মরীচিকা;
তোমার স্মৃতি আমার প্রাণে রক্ত দিয়া লিখা।
তোমার ক্রটি, তোমার বাকী—
আমার মাঝেই লুকিয়ে রাখি;
আমার মাঝেই থাকুক গোপন বহন-অগ্নিলিখা
তোমার মাঝে উঠুক ফুটে মোহন-মুকুলিকা।

বাতিল করে খুব শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হবেন।

অস্ট্রেলিয়া অভিযুগে

আই, এফ, এ দল

অস্ট্রেলিয়া ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রাপ্ত শেষ সংবাহ অনুযায়ী আই, এফ, এ দলের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ কার্যে পরিণত হবে বলে জানা গিয়েছে।

অমর সিং ও অমরনাথ

ভারতীয় ক্রিকেটসংঘ অমর সিং ও অমর নাথ বর্তমানে লণ্ডনের 'কলনি' ক্লাব নেলসন ক্লাবের পক্ষ হয়ে ল্যান্কাশায়ার লীগে নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন।



“চোখের বালি”-র একটা বিশিষ্ট দৃশ্য এতে দেখা যাচ্ছে
সুপ্রভা মুখার্জি—বিনোদিনী, ইন্দিরা রায়—আশা, হরেন
মুখার্জি—মহেন্দ্র ও ছবি বিশ্বাসকে—বিহারীরূপে।
সতু সেন ছবিখানি পরিচালনা করছেন।

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৫ই আষাঢ় ১৩৪৫, ৩০শে জুন ১৯৩৮ } ষট্টিং সংখ্যা

আর কত দিন ?

বিদ্রোহী শিক্ষা-সচিব শ্রীযুক্ত শৈলেন ঘোষ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী যে প্রস্তাব কর্পোরেশনের গত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার রায় চৌধুরী উপস্থাপন করেন মিঃ নিশীথ সেন প্রভৃতি কাউন্সিলারবৃন্দের বিরোধিতায় তাহা অগ্রাহ্য হয়। আমরা মিঃ শৈলেন ঘোষের পুনর্নিয়োগ বা অন্য কোন প্রকার করুণা-প্রদর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছইলেও স্বয়ং রাষ্ট্রপতির নির্দেশের বিরোধিতা কোন মতেই সমর্থন করি না। রাজনীতিতে বা অনুরূপ কোন সংজ্ঞাবদ্ধ-কাণ্ডে ব্যক্তিগত মতামতের কোন স্থান নাই। ব্যক্তিগত মতামতের প্রথরতায় গোষ্ঠীগত শৃঙ্খলতা নষ্ট হয়। গোষ্ঠীগত বা দলগত শৃঙ্খলাকে চূর্ণ করিয়া ব্যক্তিগত মতামতের প্রথরতার প্রসার ছইলে কঠিন ও নিশ্চয় হস্তে তাহাকে নিষ্পেষিত করা উচিত—তাহা না ছইলে রাষ্ট্র-পরিচালনায় বা দল-নিয়ন্ত্রণে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়।

মিঃ নিশীথচন্দ্র সেন প্রভৃতি বর্ণচোরা কাউন্সিলারবৃন্দের ঔদ্ধত্য সহের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কালানোভা ঘাঁহা কর্তৃক ও প্রমোদকেন্দ্র তাঁহাকে প্রাধান্য প্রদান করিয়া কংগ্রেস-

কর্তৃপক্ষ যে ভুল করিয়াছেন তাহার কল তিক্তভাবে প্রকট ছইতেছে। মিঃ সেন সহকারী-দলপতি ছইয়াও দলপতি ও রাষ্ট্রপতির নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া যে প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন তাহার সমুচিত শিক্ষা দেওয়া একান্ত ও অবশ্য প্রয়োজনীয়। মিঃ সেনের এই আচরণ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমরা রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদ্য, কবিরাজ সত্যব্রত সেন ও শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুগাঁও নাম দেখিয়া আমরা বিস্মিত ছইয়াছি। 'গদাই'-বাবু ও বিপিনবাবুর দলগত নিষ্ঠা সর্বজন-বিদিত স্তুরাং তাঁহাদের পক্ষে রাষ্ট্রপতির আবেদন সবেও বিপক্ষে ভোট দেওয়া সমীচীন হয় নাই ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। 'গদাই'-বাবু ও বিপিনবাবু আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু স্তুরাং তাঁহাদের এই আচরণে আমরা বিশেষ ব্যথিত ছইয়াছি।

রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের নেতৃত্ব ও কর্পোরেশনের অন্ডারম্যানের পদ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্পে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ছইয়াছে তৎসম্বন্ধে ধীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা

উচিত। মেতার নির্দেশে যাঁহারা ব্যক্তিগত মতামতকে দমন বা সংযত করিতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত নহে। রাজনীতি বসন ও বিলাসের জায় ব্যক্তিগত অভিরুচিতে পর্য্যবসিত হইলে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইবে তাহার পরিণতি কোথায় বুদ্ধিমান কাউন্সিলার-বৃন্দ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

বর্তমানে যাঁহারা কর্পোরেশনে কাউন্সিলার-রূপে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভাগ্যান্বেষী, সন্তত চঞ্চল, অস্থিরমতাবলম্বী ও ব্যক্তিগতপ্রাধান্য-প্রয়াসী। তাঁহাদিগকে সংযত করিবার শক্তি কি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির নাই? যে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ ভারতের

বিভিন্ন প্রদেশের শাসন-ভার পরিচালনা করিতেছেন ও মন্ত্রীবর্গের কার্যাবলী কঠোর শাসনে সংযত করিতেছেন সেই কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ কি এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউন্সিলারবৃন্দকে সায়েস্তা করিতে অক্ষম!!

বিস্ময়পূর্ণে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে কলিকাতা কর্পোরেশনে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য সুভাষচন্দ্রের উপর সর্বময়কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়। যে কঠোর শাসন প্রয়োগ করিলে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতে পারে অত্যাধি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সেরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। আর কতদিন কর্পোরেশনে কংগ্রেসের নামে ব্যক্তিগত বড়মন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবে?

:(X):

ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাইব্যুনাালের এ্যাসেসর

কলিকাতা ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাইব্যুনাালে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে বাহাতে যোগ্য ব্যক্তি এ্যাসেসরের পদে নিয়োজিত হন তাহা লক্ষ্যবস্তু হইবে। ট্রাই-ব্যুনাালে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে এবং বলা বাহুল্য যাঁহাদের সত্ততা পরীক্ষিত ও লক্ষ্য-লক্ষ্যহীত কেবল সেটরূপ ব্যক্তিকেই এ স্থলে পাঠান যুক্তিযুক্ত।

পূর্বের অভিজ্ঞতা কার্যের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে সেই জন্য যে উমেদারেরা ও নিজেদের স্বার্থনিদ্ধির জন্য “প্রতি-দ্বারে মৃতন লোক হওয়া উচিত” বলিয়া বড়াইভেছেন আমরা তাঁহাদের সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারি না। এ-প্রতি অসুস্থ করিলে কোন কাউন্সিলারেরই ইতীয় বার কর্পোরেশনে প্রবেশ করা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এল. এ মহাশয়ের মত দেশনেতার পক্ষে এই কার্যের জন্য চেষ্টা করা মোটেই শোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত লাতকড়পতি রায় মহাশয় এই বুদ্ধিবশে গত চারি বৎসর যাবৎ কাহার প্রয়োচনায় পড়িয়া এই কার্যের জন্য ‘try’ বিয়া আনিতেছেন? আমাদের সংবাদ লিখিত হইলে মনে হয় গত বারে Congress Municipal Association-এর অধিবেশনে ভোট গ্রহণ কালে তিনি কেবল একটা মাত্র ভোট পাইয়াছিলেন!

শ্রীযুক্ত অমৃত লাল চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তিনি তাঁহার এ্যাসেসারির কার্যকালে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট-এর সহিত মতের অনৈক্য ঘটিলে স্বীয় রায় পৃথকভাবে দিতে বিধা বোধ করেন নাই।

১৯৩৪ সালের কর্পোরেশনের ইতিহাস অরূপ করিলে অমৃতবাবুকে যে তাঁহার পূর্বকার্যে বহাল করাই কর্তব্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এই বৎসরের “রায় পাটি” (পূর্বের বাহাকে বোল-পাটি বলা হইত) ইউরোপিয়ান ও গভর্নমেণ্ট মনোনীত দলের সহিত কতকগুলি গোপন লিখিত আবেদন হইয়া মিঃ নলিনারঞ্জন সরকার মহাশয়কে মেররের উচ্চালনে বসাইয়াছিলেন। তৎকালীন Congress Municipal Association-এর Secretary মিঃ নলিন চন্দ্র পাল ভালরূপেই জানেন কিরূপে অমৃত বাবুকে ‘Victim of a clique’ হইতে হইয়াছিল। জায় বিচারের সহায়তা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বসু মহাশয় সেই বৎসরের assessorship সংক্রান্ত লম্বা-বাপার রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে বলিবেন কি?



ইংলণ্ডের রাজনীতি ও ব্রিটিশ লেবার পার্টি

ইতিহাসের সাবধান-বাণী

সচী নীল

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে জার্মানীর স্যাজেলর Baron Von Papen কৌরকম দাঙ্গা ও ধুটতা দেখিয়ে Prussian Republic এর উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন, তা রাজনৈতিক মহলের অনেকেরই এবং বিশেষ করে গণতন্ত্রবাদীদের বেশ মনে আছে নিশ্চয়ই।

Carl Severing তখন Prussia-র Social-Democratic Minister of the Interior. Von Papen প্রথমতঃ ডিক্টেটরী মেজাজে হুকুম দিলেন যে প্রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট Braun নাহেব ও Severing নাহেবকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে হবে। Severing প্রথমে যে বাধা দিয়েছিলেন সে কেবল কথাই; তিনি প্যাপেনকে হলেছিলেন :

"I consider your action a breach of the law and of the constitution. I shall yield only to violence."

ধৃষ্ট কূটনৈতিক Von Papen উত্তরে বলেছিলেন :

"Oh, if you are looking for a chance to save your face, Herr Severing, no doubt we can come to an agreement about the amount of violence to be employed."

তারপর দু'একদিনের মধ্যেই প্যাপেনের সবরক্ষণ নীতিরই জয় হল। Social-Democrat-রা বিনা বাধার তাহের অমন দাঙ্গার গণতন্ত্র—বা লিপিবদ্ধ হয়েছিল Weimar Constitution-এ—তাকে

বিসর্জন দিল। ১৯২০ সালে যখন এই শিশু-গণতন্ত্রের বিপদ দেখা দেয় তখন এরাই সেই নবজাত শিশুকে বাঁচিয়েছিলেন General Strike call করে। ১২ বছর বাধে আবার সেই বিপদ যখন দেখা দিল, তখন তাঁদের উচিত ছিল পূর্বের মত বেশময় General Strike সৃষ্টি করে প্যাপেনের জবরদস্ত নীতিকে বাধা দান করা। তা তাঁরা করলেন না। সামান্য জুলুমের কাছে অনারালেই তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। ১৩ বছর ধরে ভোগ-করা স্বাধীনতা আর রইল না। এই ভীষণ ভুলের চরম পরিণতি আজকের ফ্যাসিজম।

এইভাবে ডিমক্রেশিক বিসর্জন দিয়ে প্রাশিয়ার কর্তারা লগরের ঘোষণা করলেন যে তাঁদের জন্যই একটা Civil War অর্থাৎ বড় রকমের রক্তপাতের হাত থেকে জার্মানী বেঁচে গেল। কিন্তু এই যে বিনা বাধার আত্মসমর্পণ, এর পেছনে একটা মস্ত বড় কারণ রয়েছে। জার্মানীর শোন্তালিষ্টরা সবাই আশা করেছিল একটা General Strike-ই হবে প্যাপেনের নীতির যথার্থ উত্তর। কমুনিষ্টরাও চেয়েছিল এইভাবে প্যাপেন নাহেবের ধ্বংস নীতিকে প্রবল বাধা দিতে। কিন্তু Severing প্রমুখ Democrat-Socialist-রা এই উপায় অবলম্বন করলো না কেন?

তাঁদের ভয় হয়েছিল পাছে কমুনিষ্টরা General Strike-এর সুযোগ নিয়ে সেই জনশক্তিকে রাশিয়ার মত বিপ্লবের পথে প্রবাহিত করে, এতে Social Demo-

cracy জেনে গিয়ে হরত ডিক্টেটরী কমুনিজম এনে পড়ার সম্ভাবনার কথা শোন্তাল ডিমক্র্যাটদের মতিভ্রম ঘটিয়েছিল। অত্যধিক দ্বিগুণ বিপদ আবার সম্ভাবনা কেই তাঁরা বড় করে দেখেছিল। নিজের কর্তৃত্ব চলে গিয়ে কমুনিষ্ট কর্তৃত্ব আসবে—এই ভয়ে তাঁরা প্যাপেন নাহেবের হুমকির সামনে Mass Front-রূপে বিরাট বাধা সৃষ্টি করতে তাঁদের প্রবৃত্তি বা সাহস হল না। জার্মানীতে ফ্যাসিজমের অগ্রগতির জন্য Social Democrat-রাই প্রধানতঃ দায়ী।

আজকের ইংলণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে বাতের নজর আছে তাঁরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে যে, ইংলণ্ডের লেবার পার্টি জার্মানীর Social Democrat-দের মতই শোচনীয় ভুলের পথ ধরে চলেছে। ৬ বছর আগে জার্মানীতে যা হয়ে গেছে আজ তারই Repetition হচ্ছে ইংলণ্ডে। ১৯৩৬ সালে ফ্রান্সের অবস্থা বড় লক্ষটময় হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়ে Popular Front-এর সৃষ্টি হল, এবং তার ফলে Fascism-এর অগ্রগতি প্রচণ্ডভাবে বাধা পেয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়লো।

আজকে চেয়ারলেন গভর্নমেন্টের শোচনীয় রাজনীতি ইংলণ্ডে যে লক্ষট এনেছে, সে লক্ষট শুধু ইংরেজের নয়, সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এর ওপর নির্ভর করেছে। এই লক্ষটকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে ইংলণ্ডের গণতন্ত্র ধ্বংস হবে, ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা হবে, লংবারপত্র ও জনমত আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা হারাবে, ফ্রান্সের ওপর তার পরিপূর্ণ হারাপাত হবে, হিটলার মুনোখিনির শৈশবিক নীতি ইউরোপের লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়বে। এক কথাই এখনকার সুন্দর সভ্যতার যুগ শেষ হয়ে গিয়ে Dark Age এনে পড়বে লক্ষ্য। এখনই লক্ষ্য হতে না পারলে, অনেক

ধিনের গড়ে-তোলা নাথের সভ্যতা ও
স্বাধীনতাকে বিলম্বিত হিতে হবে। জগতের
চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ এই ভয়াবহ পরি-
নাথের কথা ভাবছেন। তাই তাঁরা এনেছেন
আন্দোলন। World Peace Campaign
ঠিক এই রকমই একটা আন্দোলন নয় কি ?

চেয়ারলেন গভর্ণমেন্টকে ধ্বংস করবার
কি উপায় ঠিক করেছেন লেবার পার্টির
কর্তারা ? আমাদের নজরে বতটা পড়ে
তাতে মনে হয় আলপ পথ ছেড়ে দিয়ে,
ইতিহাসের Lesson ভুলে গিয়ে লেবার
পার্টি একটা imbecile ও suicidal policy
অনুসরণ করছে। কাজের মধ্যে করা
হয়েছে—(১) Motion for Enquiry
into Britain's state of air defence,
এবং (২) A long, absurd Manifesto
decrying the movement towards
a British United Front.

এখন একটা Powerful People's
Government-ই চেয়ারলেন গভর্ণমেন্টের
স্থান দখল করে দেশকে রক্ষা করতে পারে।
একমাত্র United Front-ই ত্যাগাত্মক
গভর্ণমেন্টকে নষ্ট করে ব্রিটিশ ডিমক্রেশিকে
বঁচাতে পারে। ইংলণ্ডের যে চারদিক দিবে
বিপদ ঘনিবে আসছে—এ কথা অবশ্য

Labour Manifestoতে স্বীকার করা
হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, পরবর্তী
ইলেকশনে লেবার পার্টি না জিতলে লম্বা
বেশের পক্ষে ক্ষতি। কিন্তু একা লেবার
পার্টি কী করতে পারে ? অতএব মনে হয়,
লেবার পার্টি চায় যে, দেশ যদি বাঁচতে
চায় ত লেবার পার্টির সাহায্যেই বাঁচুক !
United Front এলে যদি দেশকে রক্ষা
করে ত তাতে লেবার পার্টির কি কুতিত্ব বইল !
অর্থাৎ লেবার পার্টি Power-এ না আসার
দরুণ যদি দেশ ভেলে যায় ত তাতে ক্ষতি
কি ? সেই সর্বনাশকে বরদাস্ত করবো,
কিন্তু United Frontকে নয়—এই হচ্ছে
এখন Labour mentality.

এই Psychology তরের Psychology.
United Front এলে এখনকার শ্রমিক
কর্তাদের প্রভুত্ব বজায় থাকবে না। নরম
পন্থা চলে গিয়ে Extreme Socialism
এলে পড়বে—এ বড় ভয়। জার্মানীর
Social Democratদের সঙ্গে ব্রিটেনের
Labouriteদের এই দিক দিয়ে
স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এত বড় দেশের বিপদে
যারা এইভাবে নিজেদের স্বার্থ বজায়
রাখবার জন্য উঠে পড়ে লাগে, তারাও বলে
'দেশকে অবশ্যই বাঁচান স্বরকার।'

এদিকে চেয়ারলেন সাহেব ত এই
অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেকে বেশ করে
সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন। Armament
factoryগুলো full pressure-এ চলছে।
ধনীঘরের পকেটে অজস্র টাকা বাচ্ছে।
Conscription Act পাশ হবার আর বেশী
দেরী নেই। আজ আবেদন জানান হচ্ছে
for voluntary co-operation, কালকে
এর বহলে চলবে চরম ফ্যানিষ্ট নীতি।
ব্রিটিশ ডিমক্রেশির ওপর frontal attack
এখনো তেমন হয়নি। তবে দেশরক্ষার
নাথ বা করা হচ্ছে, তার ফলে ডিমক্রেশির
আদল যা কিছু লব নষ্ট হয়ে বাবে।
চেয়ারলেন সাহেব ও Cliveden এর ওস্তাদরা
চান—A Fascist England will face
Nazi Germany. ইংলণ্ডের পরলা নথর
ফ্যানিষ্ট Sir Oswald Mosley লেখিন
বলেছেন—"We shall reach the helm
in five years." একেও টেকা বেবেন ধি:
চেয়ারলেন।



পূর্ণ শিল্পেটার

২নং রসা রোড,

ফোন : সাউথ ৩৪

শনিবার, ২রা জুলাই হইতে

জনাৰ্ণ দ্বিতীয় সপ্তাহ

দেশদত্ত ফিল্মসের

এহের-ফের

চমকপ্রদ কাহিনীর রোমাঞ্চকর চিত্র কথা
বাঙলা ছায়াচিত্রের অভিনব আর একটি
আনন্দ আয়োজন।

লাকি ওয়াচ এণ্ড কোং

আমরা সুলভ উচ্চশ্রেণীর ঘড়ি নির্মাণ

এবং বিক্রয় করিয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১১৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিঃ।

পরিবেশক

রা
তে
ন
এ
গু
কা
ং

বিশ্বভাষা
কলিকাতা
কোন
লি ১০২৯
গ্রাম
প্লাসার্ড



—উত্তরা—

সগৌরবে
দ্বিতীয় সপ্তাহ



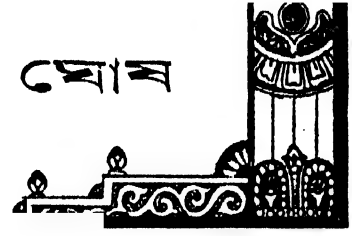
স্বাধীনতা
হাজার পিকচার
ভক্তি-বঙ্গ-সিঙ চিত্রোৎসব

NISIT



প্রবাসে শ্রীযুত হরেন ঘোষ

শ্রীঅজিত সেন



অনেকেই জানেন, শ্রীযুত হরেন ঘোষ আজ নিজেকে উৎসর্গ করেছেন আর্টের বেহীতলে। তিনি বাঙ্গলার ভাবুক প্রাণে নব নব ভাবের বজ্র এনে দিচ্ছেন। দেশের মধ্যে রঙ্গের পিপাসাকে বাড়িয়ে দিচ্ছেন অধিক পরিমানে। যে নব জিনিস ছিল অনেকের অগোচর, ভারতের কোথায় কোন রঙ্গ লুকিয়ে আছে, সেই নব তিনি এনে ধরে দিচ্ছেন আমাদের চোখের সমুখে, নারী ভারতবর্ষে। তাঁরই উত্তোগে আমরা দেখছি উৎসাহের ও তার মোহন লক্ষ্যধার, রবীন্দ্রনাথের গীতি-উৎসব, শাস্তি নিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণের অভিনয়, হকিং ভারতের অসাধারণ নৃত্য-পটীরনী বাংলা লরস্বতী ও কেরালাকলামগুলদের নৃত্য-বিশারদ শঙ্করম নাট্যদ্রো, বাঙ্গালার কনকলতা, বোম্বাইয়ের এনাকী রমা রাও, সেরাইকেলার “ছট্ট” নৃত্য প্রভৃতি আরও কত রঙ্গের উপাধান। শিল্পের চর্চা এবং তার অধিকতর প্রচারের জন্তে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে এবং বহু পরিশ্রম করে “Four Arts” বার্ষিক প্রকাশ করেছেন।

তাঁর শিল্পী মন বুঝেছে যে, ভারতের শিল্প, শুধু ভারতের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে



কুমারী বাণী মজুমদার

চলবে না, তাই তিনি আজ বেরিয়ে পড়েছেন, বিজয় অভিযানে, সেরাইকেলার মহারাজার দৌলজন্তে সেই প্রসিদ্ধ ছট্ট নৃত্যের হল নিয়ে লমগ্র বিশ্বের লক্ষ্যধীন হতে। এই ছট্ট নৃত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে শিল্পীদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভূমিকামুখারী নারী ও পুরুষের সুখোষ ব্যবহার করেন। তাই

এই নৃত্যকে দৃষ্ট করে ভোলবার জন্তে, শ্রীযুত হরেন ঘোষের উত্তোগে মাত্র একটি বাঙ্গলার মেয়ে কুমারী বাণী মজুমদার এই লক্ষ্যধারে যোগদান করে লাগরণপারে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁর অপূর্ণ নৃত্য নৈপুণ্যের দ্বারা। এই লক্ষ্যধারের সর্বপ্রধান নৃত্য-শিল্পী কুমারী শুভেন্দ্র ও হীরেন্দ্র তাঁদের অভিনব নৃত্য কোশলে সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করে তুলেছেন। এদের লগ্নে আরও দু’জন আশাতীত নাম করেছেন, এদের নৃত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীপাললাল ঘোষ ও শ্রীজিতেন্দ্র কুমার দাঁশ;

পাললালের সুমোহন বাঁশী ও জিতেন্দ্রের সেতার লম্বদয় বর্ষকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে তুলেছে।

লক্ষ্যধারী ঘোষের ও নীশের কয়েকটি বিখ্যাত লংবাৎপত্র এদের প্রশস্তি ও সুখ্যাতি বেরিয়েছে।



ইন্ডিয়ান চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

অমর প্রেম

গত শনিবার ২৫শে জুন থেকে প্রভাত সিনেমার ভাবনানীর অনবদ্য হিন্দি ছবি 'হিমালয় কি বেটী' অথবা "অমর প্রেম" ছবিখানা দেখান হইতেছে। এনাকী রমা রাওয়ের নাম চিত্রাশোভীমাত্রের নিকটই সু-পরিচিত। অভিনয়ে, লজ্জাতে এবং নৃত্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন, এবং এই ছবিতেও তিনি দেবদাসীর ভূমিকায় অতীর্ণা হয়ে যে অভিনয়-নৈপুণ্য ও নৃত্য দেখিয়েছেন তাতে তাঁর পূর্ব গৌরব ঘোটেই স্নান হয়নি। বরঞ্চ তাহা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলতে হবে। দেবদাসীর ভূমিকায় তিনি কয়েকটা নতুন নৃত্যের অভিনব পরিচয়না দেখিয়েছেন। নৃত্য হবে প্রাণময়—তালের সঙ্গে নৃত্য হয়ে উঠবে মুক্ত। পার্শ্বভী নৃত্য, ভাওব নৃত্য প্রভৃতি নৃত্যে তিনি তা যথেষ্ট নৈপুণ্য সহ ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবিখানার আর একটি প্রধান সম্পদ গান। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যে সুচ্ছন্দ হয়েচে কোথাও তার এতটুকুও অসঙ্গতি ঘটে নাই। প্রোফেসর রাহমানন্দের নাম যুক্ত প্রদেশে লজ্জাতন্ত্র হিসেবে খুবই পরিচিত। এই ছবিতেও তিনি যে কয়টি গান করেছেন তা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

ছবির সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়েছে এর দুখাবলী, একদল দুঃস্থ ও বিপদস্থ লোকের দুখাবলী যেভাবে তোলা হয়েছে তা ভাবলে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। চির তুষারের দেশ, সর্বদাই বরফ পড়ছে, তারও ১৬০০০ ফিট উচ্চের ছবি তোলা যে কিরূপ বিপজ্জনক তা স্বচক্ষে না দেখলে ঘোটেই বুঝা যায়না। তুষারভীর্ণ "অমরনাথ" আপনি কণকাতার বনেই দেখতে পাবেন। তাছাড়া

বিরাট ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্নু-পাতের দৃশ্যে প্রত্যেকেই বিস্মিত হবে। ঘোড়ার উপর ছবিখানা না দেখলে আপনার অনেক কিছুই দেখবার বাকী রইল।

তামিল ছবি

প্রায় একমাস হতে চলল প্রভাত সিনেমার প্রত্যেক রবিবার সকাল ১১টায় তামিল ও তেলগু ছবি দেখান হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের এ বন্দোবস্ত যে আশাতীত লাফলা লাভ করেছে তা প্রত্যেক রবিবারের জনসমা-গমেই বুঝা যায়। তামিল ও তেলগু ভাষা ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত দ্বারা কলিকাতা-প্রবাসী বহুজন ভারতীয়গণের পক্ষেও এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। আসুছে রবিবার তামিল সাহ টকিজের "মহাভারত" ছবি দেখান হবে।

খনা

মোটোপলিটান পিকচার্সের ছবি "খনা"র প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। ছবিখানার গল্পাংশ এতই পরিচিত যে তার নাম করলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই রাজা বিক্রমাদিত্য—তাঁর নবরত্নের অশ্রুতম রত্ন বরাহ, সেই লোণার লক্ষ্য তারপর খনার বচন—এত জেগেই আছে। এই কল্পনা যাতে ছবিতেও ব্যাহত না হয় পরিচালক জ্যোতিষ বাবুজি লেখিকের খুবই খরদৃষ্টি রাখছেন।

কর্মবীর

নিউ আলফ্রেড টকীতে দীতারাম সিনেটোনের "কর্মবীর" এখনও চলিতেছে এবং দর্শকের ভীড় বেধে মনে হয় ছবিখানা আরও কিছুদিন এখানে বেশ চলবে।

শোক সংবাদ

রামবাগান হস্ত পরিবারের প্রবীণ এটর্নি শ্রীযুক্ত বোগেন্দ্র কৃষ্ণ হস্ত ৬৭ বৎসর বয়সে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে—অন্ততম মিঃ এস, কে, হস্ত বার, এট্ট, ল, কলিকাতা হাইকোর্টের বার কাউন্সিলের সেক্রেটারী। আমরা বোগেন্দ্রবাবুর শোক-লগ্নপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

ডোঃ প্রদে বালামুদ

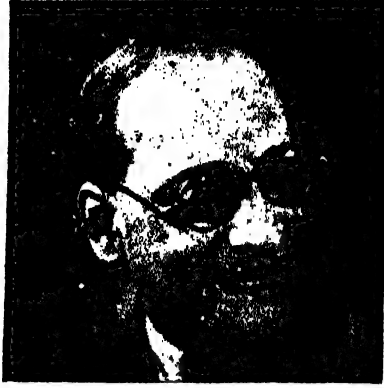
শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়

ঔষধা লয়ে

পাওয়া যায়।



অহীন্দ্র চৌধুরী

দেবী ফুল্লরা

চিত্র-নির্ধাৰতা : হাজরা পিক্চাৰ
 প্রযোজক : রাজগতি হাজরা
 চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : তিনকড়ি চক্রবর্তী
 প্রধান যন্ত্রশিল্পী : মধু শীল
 আলোকচিত্র শিল্পী : বিভূতি লাহা
 শব্দযন্ত্রী : যতীন বসু
 হর-শিল্পী : বীরেন বসু
 সম্পাদনা : বৈষ্ণবনাথ বানার্জি
 রসায়নঃগারাগার : কৃষ্ণকিশোর মুখার্জি
 নৃত্য-পরিচালক : বিভূতি মজুমদার (এঃ)
 চুমিকায়—কালকেতু—অহীন্দ্র চৌধুরী, ফুল্লরা—
 শিববালা, ভাড়াবৃত্ত—মনোজ্ঞন ভট্টাচার্য্য, দেবী
 মহামায়া—সাবিত্রী, যুগরাজ—মোহন রায়, হরমা—
 রাধারণি, সর্দারধর—তিনকড়ি চক্রবর্তী ও ভূগাপসর
 বসু, হুম্মা—চিত্রা, অভূতি।
 পরিবেশক : সীতেন এণ্ড কোং
 প্রথম মুক্তি : 'উত্তরা', শনিবার, ২৫শে জুন।

পৌরাণিক চিত্র হিসাবে "দেবী ফুল্লরা" হাজরা পিক্চাৰের প্রথম ছবি হ'লেও বাঙালি আবারুদ্ববিতার প্রাণে যে আনন্দের কস্তধারা প্রবাহিত কোরবে, সেদিন উত্তরায় ছবিখানি দেখতে গিয়ে দর্শকগণের পূলকো-চ্ছ্বসে তা' প্রমাণিত হ'য়ে গেছে। "দেবী ফুল্লরা"-র কাহিনী কতদিন আগেকার তার লটিক খবর এতাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি। তবে এই কাহিনীটি বাঙলাদেশের লকলেরই কাছে বিশেষ পরিচিত। সেইজন্য এখানে তার পুনরুন্মেষ আমরা নিম্নোক্তজন মনে করি। এই প্রাণে উল্লেখযোগ্য যে, যাকে

রূপ-তরঙ্গ

(শিলাসী)

"ফুল্লরা" নাটক অভিনীত হয়। পর্দায় এই কাহিনীর তার লঙ্গে কোনও নাদুশু নেই। অনেক হয়তো বলবেন যে যকের নাটকখানি চিত্রে রূপান্তরিত কোরলেই যুক্তিযুক্ত হ'ত। কিন্তু আমরা বলি, যকে যা' চলে পর্দায় তা হয় অচল। এবং সেই বিবেচনা কোরেই কর্তৃপক্ষ যকের নাটক পরিচয় কোরে "দেবী ফুল্লরা"-র যে কাহিনী চিত্রে গ্রাণিত কোরেছেন তা'তে তাযের সুযুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনকড়ি চক্রবর্তী ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা কোরেছেন এবং এই ছ' বিভাগেই তাঁর কাজ প্রশংসার যোগ্য। তিনি লাদালিখে ভাবে এই কাজ সম্পাদন করার ছবিখানির গতি কোথায়ও বাধা পায় নি।

আলোকচিত্রের কাজে বিভূতি লাহা বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিশেষতঃ অন্তর্দৃষ্টির আলোজারার লামঞ্জল্য ও বহিদৃশ্য গ্রহণে বিভূতিবাবুর কৌশল আমাদের বিমুগ্ধ কোরেছে।

যতীন বসুর লক্ষগ্রহণও হ'য়েছে নিখুঁত। আবহাওয়া লক্ষীত ও সুরলংযোজনায় বীরেন বসু একেবারে নতুন হ'লেও তার কাজ একেবারে নিলনীর নয়।

সম্পাদনা ও পরিচ্ছটনাগারের কাজ প্রশংসনীয়।

নৃত্য পরিচালনা উচ্চাঙ্গের নয়। অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর 'কালকেতু', শিববালা 'ফুল্লরা' ও মনোজ্ঞন ভট্টাচার্য্যের 'ভাড়া বৃত্ত' চরিত্রোপযোগী হ'য়েছে। তিনকড়ি চক্রবর্তীর 'লর্দার' ছবিখানির



শিববালা

অন্ততম আকর্ষণ। মোহন রায়ের 'সুবরাজ' অচল। অস্ত্রান্ত ভূমিকাগুলি আশাহরুপ হয়েছে। রাণী, চিত্রা ও বিভূতি মজুমদারের নৃত্যের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির সাঙতালী নাচখানা আমাদের খুশী কোরতে পেরেছে। চিত্রার নাচ আমাদের ভাল লাগেনি। রাধারণীর গান ছ'খানি সুগীত হয়েছে।

মোট কথা, লামান্ত্র ক্রটি বিচুতি লবেও "দেবী ফুল্লরা" যে দর্শকপ্রবণ বাঙলাদেশে আবাল-বৃদ্ধবলিতার প্রাণে নবরস লক্ষারিত কোরে 'উত্তরা' চিত্রগৃহ জনকোলাহলে বহুদিন মুখরিত কোরে রাখবে এ ধারণা করা অলম্বীচীন নয়।

নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্সের স্রবণীয় কথা-চিত্র "বিজ্ঞাপতি" লম্বাহ ধরে চিত্রায় গৌরবের লহিত চলচে। নৃত্য-গীত, অভিনয় ও দৃশ্যপটায়ির আকর্ষণে যে ছবিখানি ইতিমধ্যেই বাঙলার নর-নারীর চিত্ত জয় কোরতে লম্বা হ'ছে, তার আর নতুন পরিচয় অনাবশ্যক।

অভিজ্ঞান

লামাজিক ছবির মধ্যে নিউ থিয়েটার্স-এর "অভিজ্ঞান" যে আর একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হোয়ে উঠেছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সোসিয়েটে প্রোডিউসার্স
নিবেদন



স্বপ্নাঙ্কন
চোখের বাত

গোদিনী - সুপ্রভা মুখার্জি

যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে একটি মহীয়সী নারীর চরিত্র, রূপে-রূপে সজীবিত হোয়ে উঠেছে, কোন জুহুমান নয়-নারীর কাছে যে নারীর বেধনার ইতিহাস ব্যর্থ হ'তে পারে না।

‘অভিজ্ঞান’-এর নারিকা শ্রীমতী মলিনার প্রাণস্পর্শী অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেই কাহিনী আপনাদের অন্তর স্পর্শ করবে।

“বড়দিদি”

এমন এক একটি চরিত্র আমাদের নজরে পড়ে, যারা হাজার কাল্পনিক হ'লেও আমাদের মনে, হাণ বসিয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন প্রিয়জনের স্মৃতি আমরা ভুগতে পারি না, তেমন কাল্পনিক চরিত্র-গুলিও আমাদের সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে আজীবন অন্তর হ'য়ে জড়িয়ে থাকে।

‘বড়দিদি’-র সুরেন্দ্রনাথ এমন একটি স্মরণীয় সৃষ্টি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই।

বিষাভা তাকে বিলাত বাত্মার অনুমতি দেন নি। তাই সে অভিমান কোরে এক দিন গৃহত্যাগ করে। তখন তার মনে হয়েছিল এমন পরাধীনভাবে থাকার চেয়ে ভিক্ষে কোরে খাওয়া ভাল। তাই স্বাবলম্বী হবার আশার সুরেন্দ্রনাথ এলো কোলকাতায়।

লারাম্বিন রাস্তার রাস্তার ঘুরে শরীর তার ক্লান্তি ও অবলাহে ভেঙ্গে পড়েছে; অর্থও ফুরিয়ে এসেছে, জামা-কাপড় ময়লা, আশ্রয়ের স্থান টুকুও কোন ঠিকানা নেই—চোখে তার জল এলো।

এমনি অতিক্রান্তে পথ চলতে, ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে যেন সুরেন্দ্রনাথ জীবনে একটা আকস্মিক পরিবর্তন এলো।

এম-এ পাশ সুরেন্দ্রনাথ, একটি নিরক্ষর চাকরের সুপারিশে তার মনিব, জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ীর বাড়ীতে আশ্রয় পেল।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এই আশ্রয় যে কত বড়ো এবং এ থেকে তার জীবনে যে

বিরাম ও স্মরণীয় পরিবর্তনের সূচনা হোল, ‘বড়দিদি’-তে তারই করুণ কাহিনী চিত্রিত হ'য়েছে।

গত দশু'হে, এই চিত্রের পরিচালক অমর মল্লিক, উপরের দৃশ্যটি অতি নিপুণ ভাবে গ্রহণ কোরেছেন। সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকার, অপকৃপ রূপ-সজ্জার চিত্রাবলম্বণ কোরেছেন সুদর্শন অভিনেতা—পাহাড়ী লাল্লাল। জমিদারের বিশ্বাসী ও পেরাণের ভৃত্য ‘নিম’—চিত্র-নাট্যকারের একটি অপরূপ সৃষ্টি।

ট্রীট সিঙ্গার

নিউ থিয়েটার্সের এক নব্বয় ট্রুডিঙে যে ইউনিটে ট্রীট সিঙ্গার ছবি উঠছে, ট্রুডিঙের প্রত্যেক লোকই সেই ইউনিটের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। ট্রুডিঙের এতখানি প্রজ্ঞা ভালবাসা ও দরদ এর পূর্বে খুব কম ইউনিট পেয়েছে।

কপালানী

ফোন বি, বি, ৩৪১৩

চতুর্থ সপ্তাহ

এক নির্যাতিতা নারীর নিকট হইতে সমাজ একদিন সকল আশ্রয়, সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইয়া যে নিষ্ঠুর অবিচার করিয়াছিল.....

নিউ থিয়েটার্সের

নবতম চিত্র নিবেদন

অভিজ্ঞান

তাহার জলন্ত প্রতিবাদের উজ্জ্বল কাহিনী

অগ্রিম সিট রিজার্ভ করুন

নিউ থিয়েটার্সের নবতম অর্ঘ্য

“অভিজ্ঞান”এর গান

শ্রীমতী মলিনা

J. N. G. { রূপ কথারই রাজা এসে.....‘অভিজ্ঞান’
5286 { ছিল নাথী ঘোর.....‘বর্কেট্টা-মলীত’

মিস কমলা (বারিসা)

J. N. G. { মালা যদি দিলে ভুলে.....‘অভিজ্ঞান’
5276 { তোমার কাছে চাইতে বঁধু.....‘অভিজ্ঞান’

এই গানগুলি ‘অভিজ্ঞান’ চিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আজই নিউ থিয়েটার্স-মেগাফোন রেকর্ডে শুনুন।

মূল্য. ২৫০ আনা প্রত্যেকখানি

মেগাফোন : কলিকাতা



শ্রী-শ্যালি — জে — লালি ব্যাণ্ড

হওয়া চাই



একমাত্র
 নির্ভরযোগ্য
 পথ্য ও পানীয়

অধিকার

‘অধিকার-এর’ কাজ পুরোদমেই চলেছে। আশা করা যায় যে ১৫ই জুলাই-এর মধ্যেই এ বই শেষ হয়ে যাবে। মার্চ মাসের শেষের দিকে বড়ুয়া বই আঙ্কল করেছেন আর শেষ করবেন জুলাই-এর মাঝামাঝি। মাত্র চার মাসের মধ্যেই উত্তর সংস্করণই শেষ হবে। এরকম তাড়াতাড়ি আর কোন পরিচালকই কাজ করতে পারেন না।

জনাদর না হত্যাদর

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মস্ত বড় অভিনেতা—শুধু মস্ত বড় নয়, তার নাকি জনপ্রিয়তাও আছে, তার নাকি Box-office Draw আছে। এই কথাটা তিনি হয়তো মনেপ্রাণে অনুভব করেন। তাই তিনি যে সকল স্থানে কাজ করেন সেখানকার মালিক-দের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করে তাঁদের পকে পকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু মাহুশমাত্রেয়ই একটা কর্তব্যজ্ঞান থাকা উচিত। বিশেষতঃ যিনি শত লক্ষ লোকের আনন্দ বিতরণে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেছেন, তার ব্যক্তিগত জীবন যতই বিষময় হ’ক—বাইরের খোলস তাকে বজায় রেখে ভিত্তি হ’তে হবে। সাধারণত তাকে যতটুকু সম্মান করে সেটুকু তাকে বড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

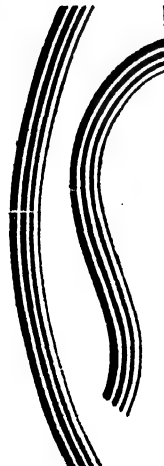
দুর্গাদাস হয়তো একথা বিশ্বাস করেন না তাই তিনি নিলজ্জভাবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। গেল রবিবার রঙমহলে ম্যাটিনী শে’-তে তিনি ইচ্ছে করে না এসে কর্তৃপক্ষ ও দর্শকদের যে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্চিত করেছেন সে খবর বোধ হয় কারও অজানা নেই। সেদিন উক্ত প্রদর্শনীতে প্রায় চোদ্দ শ’ টাকা টিকিট বিক্রি হয় এবং দুর্গাবাসু অপ্রকৃতিস্থ হ’য়ে অভিনয়ে যোগদান না করার কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হ’য়ে টাকা ফেরৎ

দিতে হয়। রায়ে তিনি ন’টার সময় থিয়েটারে আদেন এবং যে অবস্থায় তিনি অভিনয় করেন তা অতি লজ্জাজনক। তারপর গেল মঙ্গলবার এই নিয়ে দুর্গাবাসু লহযোগী ‘সুগান্তরে’ নিজের স্বপক্ষে এক কীর্তি বের করেন। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমাদের মনে হয় দুর্গাবাসুর চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে হ’লে কর্তৃপক্ষ ও দর্শক যদি একযোগে তাঁকে বর্জন করেন তা’ হলে হয় ত’ সকল দিক থেকে স্কফল পাওয়া যেতে পারে। নিউ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ দুর্গাবাসুর এই কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্য তাঁকে প্রায় সব ছবি থেকেই বাছ দিচ্ছে দিচ্ছেন এবং তাঁর ওপর বড়া আইন জারি করেছেন। তবিশ্যুতে এ বিষয়ে আমাদের হয় তো আরও কিছু লিখতে হবে।

জাতির লজ্জা ও অপমান
সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও গ্লানি
মানুষের দম্ভ ও নীচতার বিরুদ্ধে
অক্লান্ত অভিযানের নায়ক

পরিচালক
জীনরেশ মিত্র

চিত্র-পরিবেশক
গ্রাইমা ফিল্মস্ লি:



কবিগুরু
রবীন্দ্রনাথের
অমর কাহিনী হইতে
দেবদত্ত ফিল্মসের

চিত্র-সৃষ্টি

অর্গদুত্তী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—পনর—

অমল বিবেকের তাড়ণার ট্রেন হইতে নামাইয়া পড়িল বটে কিন্তু বিধিনিষি তাহাকে দ্রুপ্তের নিকট যাইবার অবকাশ দিলনা। সে ট্রেন হইতে নামিয়া কয়েক পা পিছু হটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বজ্র কঠিন পর্য্যায়ের সহিত তাহার মাথাটা ঠুকিয়া গেল। একটা অশ্রুত অর্ন্তনাম করিয়া অমল ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার পর তাহার কি হইল সে নিজে কিছুই জানিতে পারিলনা।

* * *

টাটানগরের সুরহং রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বহিবিভাগের রোগী-বিগকে বিহার করিয়া আপনাদ গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় কয়েকজন শাওতাল নারী ও পুরুষ একটা সুরশর্শন যুগের বেহ স্বন্ধে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ডাক্তারের আর বাটা বাওয়া হইল না। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন রোগী তখনও জীবিত আছে। তাহার গাত্রাবরণ গেঞ্জিটা রুধির শিক্ত। রোগী সম্পূর্ণ লজ্জাহীন ও অচেতন। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন কুলীয়া রেল লাইনে কার্য্য করিতে গিয়া এই যুবককে একটা টেলিগ্রাফ পোষ্টের পাশে শায়িত দেখে। সম্ভবতঃ টেলিগ্রাফ পোষ্টের সহিত আঘাত লাগিয়া তাহার মস্তকের পিছনে গভীর ক্ষত হইয়াছে। প্রথমে তাহার যুবকে মৃত মনে করিয়াছিল পরে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছিল

তাহার বেহে তখনও প্রাণ রহিয়াছে।— পাঁচ লাভ মাইল হাটয়া অনাধোয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া আনিয়াছে।

ডাক্তার তৎক্ষণাত তাহার ক্ষতে ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া ব্যাণ্ডেরা বাধিয়া দিলেন এবং উপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিয়া বাটা ফিরিলেন। লজ্জায় আনিয়া হেঁকিন রোগী তখনও অচেতন এবং প্রবল জ্বরে তাহার সমস্ত গাত্র জ্বলিয়া যাইতেছে। ডাক্তারবাবু কাল বিলম্ব না করিয়া ধনুঠকর প্রতিবেদক ঔষধ সূচীদ্বারা রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি রোগীর শয্যাশ্রান্তে বলিয়াই কাটাইয়া দিলেন। এইরূপে তিনদিন কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিবসে রোগী নানাবিধ প্রলাপ বকিতে শুরু করিল। ডাক্তারবাবু বুঝিলেন যুবক বাঙ্গালী। লজ্জানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। রোগী যাহাতে রক্ষা পায় এজন্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবু ও পুলিশ ইন্স্পেক্টরার উভয়েই বাঙ্গালী এবং প্রলাপ কালীদ রোগীর নিকট হইতে পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করিতে ক্রটি করিলেন না। কয়েক দিনে অচেতন রুগীর মুখে তাহার কণা, অরুণ, দাছা, বড়সাহেব, ক্ষম, মহাপাপী ভিন্ন অত্র কোন কথাই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

কয়েকদিন পরে যুবকের জ্বর কমিল বটে কিন্তু তাহার মস্তিকে আঘাত লাগার ফলে তাহার স্মরণশক্তি ফিরিলনা। সে কখনও আপনমনে হানিতে থাকে কখনও বা গান গায় আবার কোন সময় আত্মহারা হইয়া

রোমন করে। তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে কতরকম নামই বলিয়া থাকে। নিজের কোন পরিচয় সে লম্বাকভাবে দিতে পারেনা। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে সে হাসপাতাল ছাড়িয়া পালাইতে চাহে।

এইরূপে তিনমাস কাটিল। কর্তৃপক্ষ ডাক্তারবাবুকে বলিলেন এই উন্মাদটিকে তো আর অধিক দিন হাসপাতালে রাখা যায়না তাহার রোগের চিকিৎসার জন্য রাতীতে মেন্টাল হাসপিটালে পাঠান হউক। ডাক্তার বাবুর কথাটা ভাল লাগিলনা। এই হতভাগ্য যুবকের প্রতি তাঁহার কেন যে লজ্জানুভূতি হইয়াছিল তাহা ভগবানই জানেন। তিনি যুবককে নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং সে যাহাতে আরোগ্য লাভ করে তদ্বিষয়ে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুর বাটাতে আনিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত রোগীর কোন উপশর্গ কমিলনা। অবশেষে একদিন তাহার নিজ নাম মনে পড়িল। ডাক্তারবাবুকে সে নিজে ডাকিয়া বলিল যে তাহার নাম অমল—অমল লাভাল। ইহার অধিক কিছুই সে বলিতে পারিলনা; কিন্তু ডাক্তারবাবুর তাহাকে আরোগ্য করিবার আশা বহল পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল।

এই কোমল হৃদয় ডাক্তারটির নাম পরিচয় শেন; সে অরুণের লহপাঠি।

—বাল—

অরুণ কণাকে বিহার করিয়া দিল বটে কিন্তু সে মনে একটা দারুণ ব্যথা অনুভব করিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে কেমন একটা অস্বস্তি ও অশান্তি বোধ করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এতটা কঠোরত, এতটা নিষ্ঠুরতা করা তাহার উচিত হয় নই। কণার প্রতি লজ্জানুভূতিতে হৃদয় তাহার পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সে যুক্তবাবু সেবনের জন্য বাহির হইয়া পড়িল। ইডেন উদ্যানের একটা বেড়িতে বসিয়া

সে ভাবিতে লাগিল সে যদি জীলোক হইত, কণার মত তাহারও যদি আপনার জন কেহ না থাকিত এবং অমলের প্রলোভনে পড়িয়া সেও যদি কণার মত গৃহত্যাগ করিত ও পরে পরিত্যক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিত তবে কি লম্বাজের কাহারও কাছে তাহার আশ্রয় দিলিতনা? কণা নারী—তাই তাহার অপরাধ অমার্জনীয়। কিন্তু পুরুষ শত অজ্ঞায়, শত অবিচার করিলেও লম্বাজের চোখে সে ক্ষমাই ও তাজা নহে। জগদ্বিশ্বেরের সৃষ্টি, জী পুরুষও। একই ভাবে তাহাদের জনকজননী লালনপালন করেন, একই লম্বাজে উত্তরে বর্জিত। তবে একের প্রতি এত কঠোরতা ও অপরের প্রতি এত শিথিলতা কেন? অপরাধের ওজন জী ও পুরুষের লম্বান। তবে সুহৃদের ভুলের জন্য যদি কোন নারী কোন অজ্ঞায় করে লম্বাজ তাহাকে ক্ষমা করিবেনা কি জ্ঞাত? সে দিন শুভ্রা তাহাকে বলিয়াছিল যে অরুণ যদি কোন অজ্ঞায় করে সে তাহাকে ক্ষমা করিবে। তবে শুভ্রা বা কণা কোন অপরাধ করিলে সেই বা কেন তাহাদের ক্ষমা করিতে পারিবেনা? সে স্থির করিল মনের দৃঢ়লতা মুছিয়া ফেলিয়া লক্ষণতাকে ঘুরে ঠেলিয়া দিবে, হতভাগিনী কণাকে সে ক্ষমা করিবে এবং ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু কোথায় তাহাকে পাওয়া যাইবে? সে নিশ্চয়ই গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলে যায় নাই। না বাইবারও যথেষ্ট কারণ আছে। তবে সে কি করিবে, কোথায় যাইবে? পৃথিবীর বিশাল বক্ষে কণার জ্ঞাত কি ভগবান একটুও স্থান রাখেন নাই? বেচারী বাইবার লম্বা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “একটুও কি ভালবাস না আমার?” সে উত্তরে বলিয়াছিল “না”, তাহার ভালবাসিবার অধিকার নাহ। অরুণের কেবলই মনে হইতেছিল তাহার মধ্যে দয়াময় নাই আছে কেবল হানবীর আত্মতরিতা, মুক্তিহীন কঠোরতা, দ্বন্দ্বহীন

নির্মমতা। নহিলে কেন সে সেই বিপন্ন, আত্মীয়হীনা, প্রতারিত কণাকে এমন করিয়া বিহার করিয়া দিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যদি কণা পুনরায় ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে সে তাহাকে আশ্রয় দান করিবেই তাহাতে লম্বাজের চক্ষে ও লম্বাজের চক্ষে সে যত নীচ ও দূষিত প্রতিপন্ন হউক না কেন! কিন্তু তাহারই পর সুহৃদে শুভ্রার হালোজ্ঞ প্রণয়-প্রদীপ্ত মুখখানি মানসপটে তালিয়া উঠিল। অরুণ ভাবিল শুভ্রাকে ব্যথা দিয়া, আঘাত দিয়া, সে মানবত্ব দেখাইতে চাহে না। পৃথিবীর লম্বন্ত্র ব্যবহার বিনিময়েও শুভ্রার কোমল জ্বরে ব্যথা দিতে পারিবে না। শুভ্রা যে তাহার বন্ধু, সঙ্গিনী, তাহারই লেখিকা, জ্বরের জ্যোতি, তাহারই জ্ঞা, তাহার সহধর্মিণী। সে স্থির করিল কণার চিন্তা জ্বরে হইতে সে মুছিয়া ফেলিবে। কণার জ্ঞাত যে ক্ষণিক দৃঢ়লতা তাহার জ্বরে আলিয়াছে তাহা দূর করিয়া দিবে। কণা তাহার কেহ ছিল না আজও সে তাহার কেহ নয়। অরুণ বাটী ফিরিল বটে কিন্তু সে শুভ্রার হৃৎকের দিকে চাহিতে পারিল না শুভ্রা জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ, কি হয়েছে তোমার? মুখখানা বড় শুকনো দেখাচ্ছে, যে।” উত্তরে অরুণ বলিল, “দেখ কি জানি আজ বিকেল থেকে মাথাটা বড় ধরেছে।” শুভ্রা অচিরেই অরুণকে কাপড় ছাড়াইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। অরুণ এক কাপ কোকো পান করিয়া শুইয়া পড়িল। শুভ্রা তাহার সেবার মনোনিবেশ করিল। অরুণ ভাবিল প্রতিদ্বন্দ্বার মত রূপলী, প্রেমদী জী বাহার, তাহার পক্ষে অজ্ঞ নারীর চিন্তা কি হারুণ অপরাধ।

* * *

জীবন বাহার অভিপাণের নামান্তর, —বাচিয়া থাকা তাহার বিড়ম্বনা তাহা কণা

মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিল। অরুণের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া কণা যেন মরমে মরিয়াছে। অমলের অবিমূঢ়াকারিতার ও পলারনে সে যে আঘাত পাইয়াছিল অরুণের প্রত্যাখ্যানে তাহার জ্বরের কত যেন আরও বর্জিত হইল। সে হোটেলে আজ আট দিন আশ্রয় লইয়াছে বটে কিন্তু এই আটদিনে সে হরত চার বেলার অধিক আহারে বলে নাই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রসাধনের লম্বা, লম্বন্ত্রই তাহার নিকট হইতে বিহার লইয়াছে। চিন্তা, শুধু চিন্তা—দীর্ঘাধীন অনন্ত চিন্তাধারা তাহার ছোট জ্বরটিকে কাল-বৈশাখীর আকাশের জ্বার দেখাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কণা ভাবে তাহার বাচিয়া লাভ কি? বাহার আশা নাই, আনন্দ নাই উৎসাহ নাই, বর্জমান নাই, ভবিষ্যত নাই তাহার বাচিবার প্রয়োজনই বা কি? ভয়াবহ বিষপাচ্ছন্ন অতীত, তাহারই নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিচ্ছবি নিরন্তরই তাহাকে কষাঘাত করিতেছে। কণা চায় সে মৃত্যু মুছিয়া ফেলিতে। পৃথিবীর গুণ-দুঃখ, হানি-কান্না, দীর্ঘা-দেব, যুগা-বিদেহের হস্ত হইতে সে চায় মুক্তলাভ করিতে। সে তাহার শরীরকে নষ্ট করিতে প্রাণপনে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার চেষ্টা বিফলে যায় নাই। অচিরেই তাহার তপ্তকাক্ষন বর্ণ স্নান হইল; চর্মের নিম্নদেশে কালিমা পড়িল, শক্তহীন বেহুলতা লুটাইয়া পড়িল রোগশয্যায়। রাইচরণ তাহাকে অনেক উপবেশ দিল, ভিক্ষার করিল, তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া শাপন করিল। উত্তরে কণা বলিল, “বাকে আপনার লক্ষ লক্ষ জন ছেড়ে গেছে, বাবা, তাকে ডুবিও ছেড়ে যাবে তাতে বিচিত্র কি? এবার আমি এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার চেষ্টা করছি, আমার পাণের প্রায়শ্চিত্ত করছি এতে বাধা দিওনা। আমার শান্তিতে মরতে দাও। শুধু আমার অল্পমোহ রইল রাইচরণ যখন আমার জীবন-

বাক্য খুলী নিয়ে যাও না বাবু, আমার কেন আলাতন কর ?”

উত্তরে রাইচরণ বলিল, “বাবু নে হবে না, তোমার যেতেই হবে। এমন দেবতার মত চেহারার নীচে যে পাখাণে-গড়া প্রাণ থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বাবু, তুমি যত টাকা চাও তাই দেব; চিরদিন আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব, তুমি আমার মাকে ভাল করে দেখে চল।”

অরুণ তথাপি প্রস্তাব সুস্তির স্থায় দণ্ডায়মান রহিল। রাইচরণের ক্রন্দন ধ্বনি শুনার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে নিড়িতে আলিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া রাইচরণ বলিল, “মাগো, তুমি বাবুকে একবার বলো যাবার জন্তে। বেশী দেরী হলে হয়তো আর তাকে বাচানোই যাবেনা।”

শুভ্রা আলিয়া অরুণের কাছে দাঁড়াইল, ও বলিল “তুমি কেন যেতে চাইছ না? গরীব মানুষ যদি টাকা দিতে নাই পারে তাহাতে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। চিকিৎসকের জীবন রোগীর জীবন রক্ষার জন্ত; শুধু অর্থোপার্জনের জন্ত নয়। আমার মিনতি তুমি এই বৃদ্ধের সঙ্গে যাও একে অপত্যশোক থেকে রক্ষা করার চেষ্টা কর।”

অরুণ একবার কঠোর দৃষ্টিতে শুভ্রার দিকে চাহিল ও অসুস্থ স্বরে বলিল, “ভাল করলেনা শুভ্রা।” তারপর রাইচরণকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল।

অরুণ চলিয়া গেলে শুভ্রা আপন মনে বলিল, “এমন স্বামী ক’জনার আছে?”

অরুণ ও রাইচরণ হোটেলের আলিয়া কনাকে অসন্তোষ ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিল। কণার পুরিবর্তনে অরুণের হৃদয়ের সকল কঠোরতা নিমিষের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল। সে রোগিনীর শয্যা প্রান্তে বলিয়া কণার হাতখানি তুলিয়া লইয়া বলিল, “কণা, কণা, এই দেখ আমি এনেছি। তুমি এমন

হয়ে গেছ কণা, আমার উপর অতিমান করে। দেখ আমি অরুণ তোমারই পাশে বসে, চোখ খোল দেখ, আমি নিজেই এনেছি।”

কণা একবার অর্পহীন দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিল ও পরে জড়িত কর্ণে বলিল, “একটুও কি ভালবাস না আমার?” অরুণ তাহার শীর্ণ হাতখানি নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিল ও ক্ষণপরে তাহার বিশাল চক্ষু দুইটির প্রান্ত হইতে দুইকোটা প্রোক্ষণ গড়াইয়া পড়িল।

রাইচরণ বুকিল এখানে তাহার থাকা উচিত নয়। তাই ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

—সতের—

পরদিন প্রভাতে কণার সংজ্ঞা ফিরিলে রাইচরণ কণাকে বলিল, “কালু ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, রাত এগারটা পর্যন্ত তোমার কাছে বলে তোমার মাথার হাত বুলাচ্ছিলেন তুমি কি কিছু জানতি পারনি মা?”

কণা বিরক্ত হইয়া বলিল, “আমার মধ্যে বলে ভুলাচ্ছে রাইচরণ। আমি জানি তিনি কখনই আসবেন না।”

“এই হোটেল শুদ্ধ লোক তার লাকী দেবে। তোমার বুড়ো বেটা গরীব হতে পারে, মিথ্যুক নয়” বলিয়া রাইচরণ চুপ করিল। ক্ষণপরে বলিল, সত্যি ডাক্তারবাবু দেবতা বটে, কিন্তু তাঁর চেয়ে আর একজনকে কাল দেখলাম মা, যার মুখখানা দেখা পর্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর পায়ে হাজার দণ্ডবৎ করি। ত্রীপঞ্চমীর পরস্বতী ঠাকুরন মা?”

কণা জিজ্ঞাসা করিল, “তাকে দেখলে কি করে? সেট বুকি ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিলে? তার কাছে আমার নাম করেছিলে কি রাইচরণ?”

রাইচরণ বলিল, না, মা, শুধু বলেছিলাম আমার মেয়ের বড় অসুস্থ; ডাক্তারবাবুকে একটীবার যেতে বলে দাও। তা তিনি বলে দিলেই বলে ডাক্তারবাবু এনেছিলেন।”

কণা নীরবে রাইচরণের কথা শুনিতেছিল কোন উত্তর দেয় নাই। রাইচরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ওই ঘেরটা কে বা?”

নিভাস্ত অবগত ও অপ্রসন্নভাবে কণা বলিল, “আমি জানিনা বাবা।” কণা বেওয়ার্থের দিকে মুখ করিয়া শুইল। তাহার চক্ষু হইতে যে অশ্রুধারা পড়িতেছে রাইচরণকে তাহা সে জানিতে দিতে চাহেনা। এমন সময় অরুণ আসিয়া পৌছিল—অরুণকে দেখিয়া রাইচরণ কক্ষ ত্যাগ করিল।

অরুণ কণার শয্যা বসিয়া বলিল, “কণা, কের আমার দিকে, অভিমান করো না? এই বেথ তোমার আকুল আগ্রহ আমার টেনে এনেছে। একটা কথা বলো লক্ষ্মীটি। খেয়েছ কিছু? এখন কি একটু ভাল বোধ হচ্ছে না কণা? অরুণের কণ্ঠে আকুলতা ও বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কণা ভাবিল সে স্বপ্ন দেখিতেছে। অরুণ যে তাহার এত লক্ষ্যকটে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। যাহাকে এতদিন সে লম্বা অন্তর দ্বারা চাহিতেছিল, যাহার চিন্তা তাহার নিত্য লহরী, যাহাকে পাইবার আশা তাহার পক্ষে মরুভূমির মরীচিকা—আকাশকুসুম, সে যে তাহারই পার্শ্বে বলিয়া এত কোমল কণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিবে ইহা সে কিরূপ লভ্য বলিয়া ধরিয়া লইবে? কেমন করিয়া সে বিশ্বাস করিবে বিগত ঘটনার সেই কঠোর কর্তব্য-পরায়ণ অরুণ আজ এমন করিয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিল? পাষাণের বুকে কি মন্মথিনীধারা বহিয়া থাকে? অগ্নি কি তাহার হাহিকা শক্তি বিদর্জন করিতে পারে? কণা ভাবিল এ তাহার স্বপ্ন—তাহার হৃদয়ল মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। সে ভাবিল যে চক্ষু খুলিবে না, চক্ষু খুলিলে তাহার স্তব্ধ ভাবিয়া যাইবে।

পাঠক পাঠিকা হরতো অরুণের ব্যবহারে বিস্মিত হইতেছেন, হরতো ভাবিতেছেন অরুণের জ্ঞান পরীক্ষাযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে

এইরূপ ব্যবহার সম্ভব কিনা। অরুণের ব্যবহারে আপনাদের লিখিত লেখিকাও বিশ্বাসপ্রকাশ করিতেছেন—তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে অরুণ পুরুষ এবং পুরুষের পক্ষে ইহা তাহাদের জাতিগত ধর্ম বলিতেই হইবে। সে তাহার পৌরষকে অবনমিত করে নাই।

পুরুষ জাতির মধ্যে এমন অনেক পুরুষ আছেন যাহারা সাধারণের চক্ষে ও নিজ পত্নীর সমক্ষে নিজের লাবণ্যতা ও চরিত্রের উচ্চতা প্রকাশের জন্য বিভ্রান্ত তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ধার্মিকের সুখোপহারী পুরুষগণই পরকীয়া প্রেমাস্বাদনে অধিকতর তৎপর এবং ইহাদের উদাহরণ সমাজের ইতিহাসে বিরল নহে।

ডাক্তার অরুণ শুণ্ডকে উপরোক্ত পুরুষের পর্যায়ে ঠিক ফেলা চলেনা, কারণ যদিও বহুদিন হইতে তাহার হৃদয়ে কণার যৌবনমুখা পানের পিপাসা জাগরুক হইয়াছিল তথাপি সে অকৃত্রিম পত্নীপ্ৰীতি হেতু তাহার লালসাকে দমন করিবার বিধিমত চেষ্টা করিত। সে লতাই প্রতিনিয়ত নিজের লিখিত যুক্ত করিয়াছে এবং কণার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার কঠোরতার বাঁধ ভাঙিয়া পড়িল।

তাহার মানসিক শক্তি আজ হৃদয়নীর প্রণয়প্রকাশ্য নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। হৃদয় নিহিত ভ্রম্মাচ্ছাদিত বহির লেলিহান শিখা তাহার লৌকিক চরিত্রকে ভস্ম করিয়া দিল।

সে কণার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কণার মনোযোগ আকর্ষণের আশায় বলিতে

লাগিল, “কণা, আমার কণা, একবার বেথ আমি এসেছি, তোমার বেথতে এনেছি।”

পাল কিরিয়া কণা কণ্ঠে কণা উত্তর করিল, “কেন এলেছেন ডাক্তারবাবু? আমার শান্তিতে মরতে দিন। যার কেউ নেই, কেউ বাক্যে ভালবালেনা, পৃথিবীতে বেচে থাকবার মত যার কোন লম্বাই নেই তাকে কেন বেথতে এলেছেন ডাক্তারবাবু? তাকে যেতে দিন নেইখানে, যেখানে গেলে তার চিরজীবনের সমস্ত অভাব পূর্ণ হবে।”

কণার মুখের নিকট অরুণ মুখ লইয়া গিয়া বলিল, “জি, কে বললে তোমার কেউ নাই কণা? পৃথিবীর কেউ যদি তোমার গ্রহণ না করতে চায় আমি তোমার গ্রহণ করব, আমি তোমার বুকে তুলে নেব।”

নৈরাশ্রের মান হাসি হাসিয়া কণা বলিল, “ক্ষণিক উত্তেজনার আপনি এলব কণা বলছেন ডাক্তারবাবু। আপনার নিজেকে বিলিয়ে দেবার অধিকারই নাই; আমি যদি দিহিকে না বেথতাম তাহলে বিশ্বাস কণ্ঠে পারতাম। রূপে, গুণে, শিক্ষায়, বংশবর্ষাধার আমি তাঁর পায়ের তলার দাঁড়াবার উপযুক্ত নই, তবে কোন লাহলে আশা বা বিশ্বাস করব যে আপনি আমার হবেন!—না, না, কাজ নেই, আমার আপনি মরতে দিন, আমার জীবন-লক্ষ্য আমার বুখা লোভ দেখাবেননা ডাক্তারবাবু, আমার শান্তিতে মরতে দিন।” অরুণ তবু হইয়া বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

পাদুকাশিল্প প্রাতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

অপ্রভা

শ্রীমন্ত কুমার আচা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

“রেবা! আমার রেবা!”

“আমার—আমার—”

“রতীন—প্রিয়!”

তার নিজেদের আগেকার নামে পরিচিত হবে, নানতুন মিলনোৎসবের আয়োজন হবে এই হোল কথা। কিন্তু পুরোনো কথা কি সবাই বিশ্বাস করবে? কে জানে, তাদের ঘিরে তুলবে হয় তো কুৎসার ঢেউ। এমন তাদের অনেক কিছু ভেবে করতে হবে, সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হবে। হয় তা সবাই বিশ্বাস করবে না যে এরা পূর্বে বিবাহিত হয়েছিল। হয় তো সবাই জানতে চাইবে তাদের সাময়িক বিচ্ছেদের কারণ। কাজেই সব দিক বজায় রাখবার জন্যে রকার নতুন করে বিবাহের মূল কারণ যথা আর কোলকাতার মনীষকে জানিয়ে রেবা নতুন বিয়েতে মত দিলে। বছর খানেক আগে নীতিশব্দে দ্বারা গিয়েছিলেন।

রতীনও সব কথা চিন্তিতে রমেনবাবুকে জানালে। রমেনবাবুর অমুরোধে মাধব বাবু এতে মত দিলেন। ভেতরের কথা যারা জানবার তারা ছাড়া কেউ জানলে না।

লংবাধ পত্রে বধের চিত্রজগতের চমকপ্রদ এক বিবাহের বার্তা বিধোষিত হয়ে গেল। সাংবাদিকদের ভবিষ্যদ্বাণী লফল হতে চললো। যেখানে তারা আত্মগর্বে ফ্যুত হয়ে নবীন উৎসাহে আলম বিবাহের অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য ছাপতে শুরু করলে। রতীন তখন লাগরণপারের অভিজ্ঞতাকে রূপ দিচ্ছেলো নতুন একখানা ছবিতে। সব

রকমে এ ছবিখানা হবে নাকি চিত্রজগতে অবনত হান। এই নবতম অবদান তাদের নতুন জীবনকে ভূষিত করবে জরমালো। তাই রতীন ছিল বেজায় ব্যস্ত। তাই বিয়ের সব আয়োজনের ভার নিতে হোল রেবাকে। নিজের ছোট বাড়ীর নামফলক থেকে আলবাবপত্র পর্যন্ত নতুন লাজে লাজিয়ে অভিনব করে তুলবে এই হোল রেবার একান্ত ইচ্ছা এবং আন্তরিক চেষ্টা। সব তদ্বির করবার জন্যে রেবার বাড়ীতে ছোট খাটো একটা অফিস বসে গেল। তারতের চিত্রজগতের দিকপাল বত সবাই হোল নিমন্ত্রিত। পাত্র-পাত্রীর আত্মীয়দের মধ্যে বাক্যই করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হোল। ছোট বাড়ীতে এ উৎসবের প্রসারকে লক্ষ্য করে রেবা নিজে টুন্ডিয়োর মালিকের সহরের বড় একখানা বাড়ী না চাইতেই পেয়ে গেল।

রেবার সব চেষ্টা সার্থক হোল। এমন শোভন, সুরচিনজত, সমারোহের বিয়ে আলোচনার রাজ্যে কারো হয়নি এই মর্মে কাগজে প্রকাশিত হোল বিয়ের সাড়ম্বর কাছিনী। বিয়ের পর নিমন্ত্রিত, আত্মীয়-স্বজনের বিদায়কালীন শুভাশীষ নিয়ে নব-দম্পতি ফিরলো নবীন প্রেমের নিভৃত নীড়ে। আলোক-চিত্রী, সাংবাদিকদের ভীড়ের মাঝখানে ঘিরে গম্বাহীন, মূল্যবান মোটর হাঁকিয়ে “মঞ্জরী-মঞ্জিলে” পৌছে রেবা রতীনকে জিজ্ঞাসা করলে “এইবারে পাবো তো নিজেদের বুকের কাছটিতে নিবিড়ভাবে, নির্কিয়ে?”

রতীন বলে “তুমি নতাই আমাকে সুখী করলে রেবা। তোমার সারাঘাতের হোঁরাতে লফল হোল আমার জীবনের স্বপ্ন।”

“বাড়ীখানা ভাল করে দেখবার আগেই তোমার হচ্ছে না?”

“আমি রীতিমত চকল হয়ে উঠেছি বশি।”

“রেবা খুশীতে উপহে পড়ে বলে “নতাই?”

এলো তাহলে আমার লজ্জা।” রতীনকে একরকম টানতে টানতে রেবা নিয়ে চললো এগিয়ে। প্রথমে রেবা রতীনকে দেখালে বড় একখানা ড্রয়িং রুম, গাঢ় লাল রঙের ওপর উজ্জল লোনালী কাজ করা পুরু কার্পেট মেঝেতে পাতা। ঘরে পরিপাটি লাক্সানো কার্পেটের লজ্জা ম্যাচ করা রঙের রেশমী কাপড়ে মোড়া শোকা, সেটি, ফুলদানী প্রভৃতি আনুসঙ্গিক আলবাব। রতীন একবার বিস্মিত দৃষ্টি চারদিকে ঘুলিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে চাইলে রেবার মুখের পানে। তারপর রেবা তাকে নিয়ে গেল লাইব্রেরীতে। ঘরে গোটা তিনেক মেহগনির আলমারীতে লাক্সানো নতুন, বকঝকে হাজার খানেক বই। এলব কোনদিন পড়া হবে এ উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীতে জায়গা পায়নি। লাইব্রেরী হোল যে কোন শিক্ষিত বাড়ীর অঙ্গভঙ্গ প্রধান অলঙ্কার। রতীন আবার চাইলে রেবার তৃপ্তি, গর্বোজ্জল মুখের পানে। তারপর তাকে টানতে টানতে বাথরুম, সারাবাড়ী সব ঘুরিয়ে শেষে নিয়ে এলো শয়নকক্ষে। রূপনী, হাতোজ্জল রেবার হাত ঘরে লে ঘরের মেঝেতে পা দিয়েই রতীনের মনে হোল সে সুখি এলো কোন স্বপ্নলোকে। খোলা জানলা দিয়ে একদিকে দেখা যায় দূরে নীল লাগর আর নীল আকাশের মেঘাশেষ। একদিকে দেখা যায় আকাশ হোঁরা কোন পাছাড়। অন্তগামী সূর্য্যের কিরণের আভা লেই মূল্য, নীরল পাছাড়ের বৃক্ কুটিরে তুলেছে সানন্দ

রঙের বৈচিত্র্য। একদিকে খোলা ঘরজা দিয়ে বাওয়া যায় লতানেগাছে-জাওয়া যে ছোট বারান্দার কুঞ্জে, সেখান থেকে নীচে দেখা যায় ছবির মত ফুলের ছোট একটি বাগান। একদিক থেকে ভেদে আলছে নকল স্বর্ণার ঝর ঝর নৃত্যরঙ্গার আর একদিক থেকে আলছে নানা রঙের, নানা দেশের পাখীর আনন্দ কাকলী।

সেখান থেকে রেবা রতীনের নিয়োগে তার মহলে। যে ছোট ড্রিং রুমখানা দেখিয়ে রেবা হালতে হালতে “বলো এখান তোমার” তার মেঝেতে পাতা লাথারণ গালচে। সোফা, সেটির লম্পর্ক আছে, আড়ম্বর নেই। রতীন রেবার পানে চাইবার আগেই রেবা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দেখে রতীন গেল তার পেছু পেছু। রতীনের লাইব্রেরীতে খালি এন্টিক্স আলমারী। সে যে বই পছন্দ করবে কিনে পরে ভরে নেবে। রেবার শয়নকক্ষের অনেকখানি তক্তাতে রতীনের শয়নকক্ষে একা শোবার মত একটা প্রিং পাট। কর্মকর্তা বিনের শেষে ইঞ্জিনেরায়ে গা ঢেলে দেবার মত কোন বারান্দা নেই সে ঘরের লাগাও। জানলা থেকে বাগানের যে অংশটা দেখা যায় সেখানে রান্নাঘরের বালন, উচ্চিষ্টের জুপও মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ সে ঘরের প্রায় নীচেই রান্নাঘর। স্বর্ণার নাচের স্বর আর পাখীর গানের অতি ক্ষীণ একটা বেশ মাঝে মাঝে সেখান থেকে পাওয়া যায়। রতীনের ঘনকক্ষে ছোট চৌকাক্ষাভ্রা, ঘরের মেঝেটা খেঁত পাথরে ঘোড়া নয়। রতীনের মুখ থেকে একটা কথাও বেরোল না। তবে তার নাক থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাসের কয়েকটা কৌস্ কৌলানি শোনা গেল। রেবার হাত তখন রতীনের হাতের মধ্যে ছিল না। রেবা রতীনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করলে জিজ্ঞাসা করলে “ঘর

কি তোমার পছন্দ হয়নি? পর্দার রঙটাতো খারাপ নয়।”

রতীন বলে “রঙটা খারাপ নয়। কিন্তু— রেবা—সত্যি—”

“কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি নে কিছু।”

“না যাক। বিশেষ কিছু নয়। সত্যি বাড়িখানা শাজিয়েছ খুব ভালো।” তারপর রেবার হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল তার শয়নকক্ষে। তারপর বলে ফেলে “এই ঘর-খানা হবে আমার। কেমন, সেই বেশ হবে না? তা তুমি বলি—”

রেবা বড় খাটের ওপর পালকের মত নরম বিছানায় বসে পড়ে অগাধ হয়ে রতীনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আন্তে আন্তে বলে “এখানা হবে তোমার শোবার ঘর।”

রতীন আবার লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলো। নিজের বিরুদ্ধ মতকে বিরুদ্ধ করবার এটো অমোঘ কৌশল তাকে আয়ত্ত্ব করতে হয়েছিল। সে বলে “সত্যি তোমার

কি মনে হয় নি যে ভাল ঘর ভালো তুমিই সব দেখল করেছ?”

“কেন দ্রীয়া তাতো করেই থাকে।”

রতীনের রক্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তার গতির চাকলা লুপ্ত করতে না পেরে বলে উঠলো “কিন্তু তার আগে স্বীয় ভেবে দেখা ঘরকার কাকে দিয়ে করবার শোভাগ্য তার হয়েছে। এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে হেঁজি পেঁজি একটা কাকেও দিয়ে তুমি করোনি। তুমি ভালোই জানো ছবির জগতে আমার জায়গা কতখানি উচুতে। আমার মত পরিচালক কটা আছে এই পোড়া দেশে? সে অবস্থায় আমার নিজের তো একটা ঘান লয়ন আছে। কেউ এলে যদি দেখে আমার ঘরগুলো তাহলে তারা বলবে কি?”

রেবা রেগে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

“লোকে বলবে? বলবে শুধু তোমাকে? আমাকে বলবে না কিছু? মজরী দেবার না আছে ভাল শোবার ঘর, না আছে পাঁচ-

ফোন ২৭৭৪ বড় বাজার

কার্টের জাট কার্টের ঘানি

কার্টের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারতের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩ আগার সারকুলার রোড, কলিঃ

জনকে বলাবার মত একটা ড্রিং কুম, এই
যদি তারা যেখে তাহলে বলবে কি, তা বুঝি
ভাবছো না?”

রতীন ব্যঙ্গ বিকৃত বিল্লী গলায় বলে
“হুজুগী দেবীর লম্বা একে এত ভাববার জন্তে
লোকের খুব হচ্ছে না।”

“তাহলে বিয়েতে অতগুলো বড় লোক
এসেছিল কেন?”

“বিয়েটা তোমার একলায় হয়নি।”

“তাহলে তুমি ভাবো তৃতীয় শ্রেণীর এক
পরিচালকের বিয়ের লালচিঠি পেয়েই দেশের
যত বড় বড় লোক কাজ কর্ম বন্ধ রেখে
ছুটে এসেছিল?”

“তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালক।”

“তাছাড়া আবার কি? নিজের সুযোগ
নেই লেখবার। ভাল লেখকের লেখা নিয়েই
তো তোমার বত জাড়িজুড়ি।”

রতীনের নাকের বহলে দাঁতের কীক
হিয়ে বেরিয়ে আলছিল নিঃশব্দের কৌস
কৌসানি। তবু রেবা নরম হোল না যেখে
হঠাৎ হো হো করে হালির অটুরোল তুলে
বলে “চানালে দেখছি। আমার হোল
জগতের রসিকমহল জোড়া নাম আর তোমার
নাম তো করে গালাগারী ভীড়ে। অভিনয়!
অভিনয়ের সুগি তুমি নও রেবা, বুঝলে?
কতগুলো নাকি সুরের চিংকার আর
সাড়ির পাড়ের বাহার! তার নাম অভি-
নয়ও নয়, গানও নয়। ওই তো নিজের
সুযোগ।”

হুজুগে পরস্পরের বিকে চেয়ে কাঠের
পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো। হুজুগেরই
নাক থেকে বেরিয়ে আলছিল কৌস কৌস
শব্দ আর চোখ থেকে আগুন। হঠাৎ
হুজুগেই এগোতে লাগলো হুজুগের বিকে।
তারপর ভেদনি হঠাৎ খেমে গিয়ে আবার
হুজুগে বুখোবুখি দাঁড়ালো।



হে বীর

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হে বীর,

ভাল ভূমি বালিলে দেশ

সহিলে কত না দুঃখ

কত না ক্লেশ

মুক্তির লাগি করিলে মৃত্যুপণ

হে বীর

মুক্তির লাগি তাজিলে আপন সুখস্বপন

নত নাহি করিলে কতু শির

হে বীর

সুসংযত উন্নত দীর,

বরণ করিলে বন্দীর বেশ

সহিলে ভূমি দেশের লাগি

অপার দুঃখ-ক্লেশ

ভাল তোমার বালিল দেশ ॥

হে বীর,

মরণভীকরে সুনালে অভয়বাণী

মুক্তের সুখে দিলে ভাষা

নির্ব্যাতিতের মুকে আগালে আশা

হে বীর,

বুগে বুগে তাই ওঠে

তোমার জয়ধ্বনি ॥

দানব দনলে দ্বিগুণ রচিল বাজ

প্রাণের রক্ত; হে বীর

দেশের লাগি গড়িলে তুমি

অপরূপ তাজ

হে বীর

নবিল তাই তোমায়ে

দললের আগে

বিশ্ব (বাহুব) লম্বাজ ॥

কালীপ্রসন্ন

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিটিংরুম লংল্যান্ড লবি

(মহিম, অতুল, সুশীল, বোগেন প্রভৃতি কনফারেন্সের সভাগণ কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল)

মহিম—অত মূলমান প্রীতি অভ্যুৎপাদনে পালে, বাঙাল্য চলবেনা। স্পীচটার আগাগোড়া শুধু মূলমানের কথার ভিত্তি। কেন, দেশের কি আর কোনও প্রবলম্ নেই!

অতুল—তাও যদি বৃহত্তম মূলমানেরা এক Support করত, না হয় কথা ছিল তাও না, তারাও ওকে Support করেনা।

সুশীল—তাদের Support করিতে যোয়ে গেছে। তারা হিঁদ্র দুর্বলতা ভালো। কখনই জানে, সুতরাং চাপ্ হিতে তারা কোন কালেই ছাড়বেনা। কেন ছাড়বে? ওদের যতই বেবে ততই চেপে ধরবে নংল্যান্ডের নিয়মই তাই।

বোগেন—অজর বাবু, অজর বাবু—

(অজরের প্রবেশ)

অজর—তোমরা কি বলো হে?

সুশীল—আমরা আপনাকেই Support করিব।

অজর—কিন্তু All India দিলীপকে কতারা হিতে চায়।

মহিম—আমরা All India-র লিঙ্কাস হইর Revision করাও, নয় তো আমরা Solid

Block হবে দাঁড়াবো। Pact বহু হ'য়ে গেছে, Pact-এ আর চলবেনা Sir।

অজর—দিলীপের বাবার মতও বোধ হয় তোমরা কানো?

অতুল—কৈ না, তা'তো জানিনা! তাঁর মতটা নিশ্চয় শুনে রাখা দরকার,—প্রপাগাণ্ডার কাজে লাগতে পারে।

অজর—শুনে রাখো, কিন্তু Confidential মনে থাকে যেন।

অতুল—Certainly।

(ভক্তলোকেরা অজরকে বিরিয়া হাফাইল)

অজর—(অন্ন গলা খাটো করিয়া কথা বলিতে লাগিল) ওর বাবা এইসব ব্যাপারে এমনই সুদৃষ্টি হ'য়েছেন যে উইল কোরে সমস্ত সম্পত্তি থেকে ওকে বঞ্চিত কোরেছেন। সে উইল রেজিস্ট্রিও হয়ে গেছে। মানে বাপের এক পরমাণু পাবেনা। ব্যাপারটা বোঝ।

মহিম—(আবেগভরে চীৎকার করিয়া উঠিল) নন্দমাতরম্!

অজর—চুপ করো, টে'চওনা। ও এখুনি এই দিকেই আসবে। আমার খুঁজে বেড়াচ্ছে।—এমনি ওকে খামিয়ে রাখা চলবেনা। দুর্দ্ধার পতিতে ও চলতে থাকবে। বাবা বিপত্তি ওর কাছে কিছু না। ওকে আটকাতে হ'লে অল্প সেনা পছন্ট চ'লবেনা।

ওকে আটকাবার একমাত্র অস্ত্র—ওর বাবার উইল। এতে ও ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং—

সুশীল—সুতরাং ঐ লাইনেই চালাতে হবে প্রপাগাণ্ডা। ওকে সাংবাদিক, লংবাট্টা প্রবণ কোরে রাখো।

(বলিয়া অতুলের হৃদয়ে বৃহ আঘাত করিল)

অতুল—কালই বড়ো বড়ো Captior

হিয়ে বার কোরবো :

Bengal Leader's Disinherison!

Astounding Revelation By Father

(বোগেন মুখে একটা আওয়ার করিয়া

ইঙ্গিত করিলেন দিলীপ আগিতেছে, লক্কে তক হইয়া গেল)

(দিলীপের প্রবেশ)

দিলীপ—অজর, মূলমানের দাবী তুমি কি কোরে অগ্রাহ্য কোরতে পার?

অজর—ওহে, তোমরা এখন যাও (অল্প সকলের প্রস্থান) মূলমানের দাবী অগ্রাহ্য কোরতে চাইন দিলীপ, তবে মূলমানের অর্থ আদ্যারা হিতেও চাইনা। জাতীয় জীবনে বারো আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে Struggle কোরে এলো তারা রইলো পড়ে, আর বার কিছুই কোরলনা—বলে বলে শুধু মত বেথলো, তারা এল ভাগ্ মারতে!

দিলীপ—Struggle তুমি বা কোরে শুধু হিন্দুর জন্ত করোনি। কোরতে পারনা করেছ লম্বা জাতির জন্ত। হ'তে পারে জাতীয় আন্দোলনে তারা বিশেষ কিছু কোরতে পারেনি, কিন্তু তার মানে এই না যে, তুমি তাদের কোনঠাসা ক'রে রেখে বেবে চিরকালের জন্তে!

অজর—তারা যদি পারে তারা নিজের শক্তির বলে অর্জন করুক কষ্টতা, বহু গিয়ে দিল্লীর মনদে, আপত্তি নেই। কি আমি তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে নবাবানি দেবার প্রচেষ্টা কোরবো না।

দিলীপ—মানদে বসবার কষ্টতা যদি তার না থাকে তোমাকেই হাত ধরে তাদের মনদে বলিয়ে দিতে হবে। অবাক হ'য়ে না, তোমাকেই লাহায়া কোরতে হবে যাতে দে একদিন তার লুপ্ত গৌরব কিরে পেতে

পারে। ওদের শক্তিবান কোরে তোলা আমাদের দায় অজয়, হয় নয়;—একটা National necessity!

অজয়—যে শক্তি তুমি ওদের দান করবে সেই শক্তি দিয়ে ওরা তোমার ক্ষেত্র কোরবে। এই ওদের History,

দিলীপ—মামুষের কখনও এরকম History হ'তে পারেনা। ওরা তোমার সঙ্গে বিরোধ করে শক্তিবান বলে নয়; বিরোধ করে, শক্তিহীন বলেই। ওদের ভয়, গবনা, হিন্দুরা ওদের Crush ক'রে ফলবে। এ ভাবনা যদি ওদের না থাকতো, রাসে তোমার সঙ্গে লমান তালে জাতীয়তার খেঁ এগিয়ে আসতো।

অজয়—কিন্তু হিন্দুরা ওদের Crush হ'তে চায়নি, সে চেষ্টা বরং ওরাই কোরে গ্রহণে।

দিলীপ—হিন্দুরাও চেষ্টাে অজয়, তবে হিন্দুদের Policy অন্তরকম। হিন্দুরা Social Boycott চালিয়ে ওদের যতখানি ক্ষতি করতে পেরেছে, ওরা লাঠি চালিয়ে তার নতির সিকিও পারবেনা।

অজয়—Social Boycott চালিয়েছে হিন্দুরা? তুমি তো হিন্দুদের সবই ধোঁব ধখাচ্ছে। তার চেয়ে বরং—

দিলীপ—যা বোঝি তা বলবো। একজন মুসলমান পানওয়ারা নিজেই মুসলমান 'লে না জাহির কোরে যদি কোন হিন্দুকে পান বেচে ফেলে?

দিলীপ—তুমি কখনো কোরতে পারবেনা। অজয় Riots বেধে যায় রাওলপিণ্ডির তায়গায়। তুমি কখনো কোরতে পারবে। একজন বাঙালী হিন্দুকে কী নির্যাতন হ কোরতে হ'রেছিল লাহোরগাঙ্গী এক ট্রেনের কমপার্টমেন্টের ভেতর, মুসলমান এক ফকারের কাছ থেকে তার খাবার কেনবার খুঁটতা হয়েছিল বলে।—আজকের কংগ্রেসের মহামুভবতা দেশের লোকের মধ্যে বরাবরই

ছিলনা অজয়, আজও আছে কিনা বোর লন্ডেহের বিষয়। ওরা Communal এ কথা লভ্য। কিন্তু নিজেদের Communalism-এর বোরও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। ওরাই বা পারবে কি ক'রে?

(যোগেন প্রত্নতির প্রবেশ)

যোগেন—মশাই, মাক্ কোরবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরবো। আপনার পিতাঠাকুর মহাশয় কি এই রকম উদ্ধট মতামতের জন্তাই তাঁর সম্পত্তি থেকে আপনাকে বঞ্চিত কোরেছেন?

অজয়—আঃ! Personal কথা এখানে তুমি কেন নিয়ে আসছো যোগেন?

যোগেন—Leader বারা তাদের Personal খবরগুলোও দেশের লোকের জানবার অধিকার আছে। সেই গুলোই আসল খবর।

অজয়—না, নেই। ওর বাড়ীতে কি হচ্ছে তুমি সে সব জানবার দাবী করতে পার না।

দিলীপ—আপনি ঠিক বলেছেন যোগেন বাবু—Leader বারা তাদের সব খবরই দেশের লোকের জানা সরকার। বলুন, কি আপনি জানতে চান?

যোগেন—কাশীখর বাবু আপনাকে disinherit কোরেছেন?

দিলীপ—হ্যাঁ।

মহিম—আমরা কি জানতে পারি কেন তিনি এ কাজ করেছেন?

দিলীপ—তাঁর ইচ্ছা। প্রত্যেক লোকেরই একটা স্বাধীন মত আছে। তিনি সেই মত অনুযায়ী কাজ করেছেন।

অজয়—কিন্তু আপনি তাঁর বড়ো ছেলে। বেশ জোড়া আপনার খ্যাতি। আপনার বিরুদ্ধে তাঁর এমন কি নালিশ থাকতে পারে যাতে কোরে তিনি এই কাজ কোরতে পেরেছেন?

দিলীপ—আমি নিজেই তা জানিনা অজয়বাবু।

অজয়—কিন্তু আমাদের তা জানা সরকার।

অজয়—এ সব আলোচনা কি বন্ধ থাকতে পারে না হে? Political field-এ এমন কথা কেন?

যোগেন—Sir, Social aspect বাধ দিয়ে নিছক Political কারবার আমরা কোরতেও চাইনা, কাউকে কোরতে দিতেও চাইনা। নীতিজ্ঞানহীন কোন রাজনৈতিক পণ্ডিতও যদি Public Platform-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা কোরতে আসে, আমরা তা বরখাস্ত কোরতে পারবো না।

(এই কথা বলিয়া আড়চোখে দিলীপের দিকে চাহিল)

অজয়—সে কথা ঠিক।

মুশীল—গরীব চাখীর টাকাটা ফণ্ডে লাগিয়ে দিয়ে নিজের টাকাটা বেনামী কোরে রাখলেন না ত'?

(সকলে হাসিয়া উঠিল)

দিলীপ—না, এ অভ্যাগ আমার নেই মুশীল বাবু।

যোগেন—টাকাটা বন্ধুখেয়ালে উড়িয়ে দেন এমন ভয়ও বোধ করি কাশীখর বাবুর নেই?

দিলীপ—তাও বোধ হয় নেই।

মহিম—অপচ সেই রকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হ'য়ে গেল! বাহাছরী আছে!

দিলীপ—(মহিমের হাত চাপিয়া ধরিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল) আমার বাবা তাঁর বিষয় সম্পত্তি কি কোরেছেন, তার জন্ত কি আমি দায়ী?

অজয়—তুমি দায়ী হ'তে বাবে কেন। ওরা বলছেন কি রকম type-এর লোক আমাদের জাতীয় জীবনে নেতৃত্ব করবার

উপযুক্ত, সেটা ওঁরা বিচার কোরে দেখে রাখতে চান।

দিলীপ—ও! কিন্তু আমার বাবা যদি তাঁর সমস্ত আমার নামে লিখে দিতেন, তা হলেই কি আমি নেতা হিসেবে অকলঙ্ক হ'তে পারতাম?

অজয়—Not necessarily. সম্পত্তি লিখে দেওয়া এক জিনিষ আর সম্পত্তি থেকে disinheret করা আর এক জিনিষ। উপস্থিত ক্ষেত্রে সোজা কথাই দাঁড়াচ্ছে—তুমি তোমার বাবার ত্যক্ত পুত্র। এরা বলছেন, এ রকম লোক, কংগ্রেসী গণীতে না বললেই ভালো।—এলো যোগেন।

(অজয় প্রতীতির প্রস্থান)

(দিলীপ শুধু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নেপথ্যে ধ্বনিত হইল 'জয়, অজয় কুমার কি জয়। প্রবেশ করিল সুনীলা।)

সুনীলা—একলা দাঁড়িয়ে কি ভাবছো?

দিলীপ—ভাবছি। কিন্তু কি ভাবছি তাঁর একটা পরিষ্কার ধারণা কোরতে পারছি না। কতক কথা বুঝতে পারছি, কতক কোথায় তলিয়ে রয়েছে!...

(বেগে ছুইজন শুভার প্রবেশ)

প্রথম—কিসকো নাম দিলীপ?

দিলীপ—হামারা নাম দিলীপ।

দ্বিতীয়—মূলমানকে! নাম নিয়ে পত্রিকায়ে কোন লিখা?

দিলীপ—হাম লিখা।

প্রথম—লিখা ব'তব তাহান্নমে বানে হোঁগা।

(বলিয়াই কিপ্র গতিতে দিলীপের মস্তক লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল। সুনীলা শুভিত স্তম্ভাৎ কোন বাধাই সে দিতে পারিল না, কিন্তু লোকটা দ্বিতীয় আঘাত করিবার সময় সুনীলা প্রাণপনে তাহার লাঠি চাপিয়া ধরিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল—খবরদার! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।)

সুনীলা—Volunteers! শীত্র! শুভা! দিলীপ বাবু আহত।

(শুভাঘরের দ্রুত প্রস্থান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই volunteersগণ, রহমৎ ও বিস্তর লোকজন সব ছুটিয়া আসিল।)

সুনীলা—(তখনও সে হাঁপাইতেছে) শীত্র ছুটে বাও। হুঁজন মূলমান। ধরে আনা চাই—শীত্র বাও।

(জনকরেক volunteers ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।)

দিলীপ—না, না—তারা যাক। তাদের যেতে দাও।

(বলিয়া প্রকৃত স্থান হইতে হাতখানি সরাইয়া বারণ করিতে উত্তত হইল এবং বৃহত্তরই চোখে পড়িল সমস্ত স্থানটি রক্তে রংগা হইয়া গিয়াছে।)

রহমৎ—কিছুতেই না দিলীপ। তারা মূলমান হ'য়ে মূলমান জাতির উপর কলঙ্ক লেপন কোরে চলে গেল। তাদের শাস্তি হওয়া চাই। —Exemplary Punishment.

দিলীপ—রহমৎ, তারা মূলমান নয়।

সুনীলা—তারা মূলমান।

রহমৎ—তারা মূলমান, আমি নিজে দেখেছি।

দিলীপ—তারা শুধু ভারতবর্ষের লস্কান রহমৎ!—এ ছাড়া তারা মূলমান কি তারা হিন্দু—এ আমি দেখতে চাইনা। ভারতবর্ষের লস্কান—এ ছাড়া তাদের অস্ত্র কোন গোত্র, বা পরিচয় আমার কাছে নেই। তাদের যেতে দাও।

রহমৎ—দিলীপ, সমগ্র মুসলিম সমাজের তুমি অভিনন্দন গ্রহণ করো।—বন্দেমাভরম্।

দিলীপ—(মুহু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল) বন্দেমাভরম্। (মুহু হাসিয়া বলিল) আল্লা-হো-আকবর।

সুনীলা—কিন্তু শীত্র একে বাড়ী নিয়ে যাওয়া দরকার। আর দেখা করা কিছুতেই চলবে না।

স্মৃতি

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্য'তে বাহির মালা তোমারে এখন
স্বযোগ না'হিক যার। পুষ্পমালা তাই
প্রতিদিন নবী করে করি নমস্করণ।—
হয় তো'না কোন দিন, যেথা তব ঠাই
লাগাফে-লিনান কণে মেথার তোমার,
কুমুদীরে দিবে শশী চুখন বখন,
মালিকা লাগিবে গিয়ে বুকেতে তোমার,
হয়তো'লভিলে তব কুচ-পল্লব।
মরুভূমি শা'বেকে বহির মাঝার
বিকশিত হ'য়ে রকে যথা মরুস্তান,
দুঃপ-ঝড়-উপকৃত জীবনে আমার
উজ্জ্বলিত তব স্মৃতি আজো দীপামান।
“ধর করি” তারে লয়ে আমি বারোমান;
মিটাই সে মরুভা'নে কান্দার-পিয়াল।

রহমৎ—হ্যাঁ, শীত্র নিয়ে চলল, উনিও
আর দাঁড়াতে পারছেন না।

সুনীলা—তুমি এটুকু হেঁটে যেতে
পারবেত'?

দিলীপ—পারবো, কিন্তু বাড়ী ছাড়া
আমার আর কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবনা
সুনীলা?

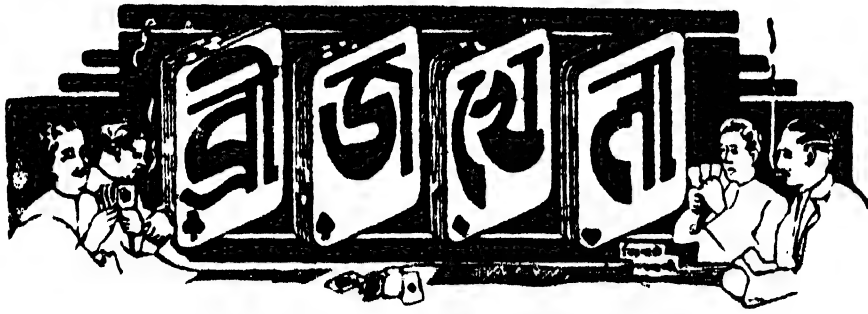
সুনীলা—হাঁপাতালে যাবে?

দিলীপ—সে বয়ং ভালো, তাই চলো।—
কিন্তু না,—কার উপর অভিমান কোরবো
আমি! যা আমার জেজে বলে আছে!
বাড়ীতেই নিয়ে চলো সুনীলা।

সুনীলা—চলো।

সুনীলা দিলীপকে লইয়া বাহিরের দিকে
অগ্রসর হইল। অতুলরণ করিয়া চলিল
নববেত জনতা। Volunteers-রা উজ্জ্বলিত
কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে বাইলে দিলীপ হাত,
তুলিয়া শুধু থাকিতে মিনতি জানাইল।
ধীরে ধীরে লকলে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)



বিভাসন

একটির ডাকের জবাবে তিনটির ডাক:—খেলারাড়ের মধ্যে আমরা প্রাপ্ত ধারণা প্রাপ্ত তিনটির ডাক দিতে প্রায়ই দেখে থাকি। অনেক সময় যখন যার ক্রীড়কের হাতে খেঁড়ীর কথিত রঙের চারখানা তাম থাকলে এবং অল্প রঙের একখানি থাকলেই তৎক্ষণাৎ সেই কথিত রঙে তিনটি ডেকে দেন, ফলে খেঁড়ী ডাক শুনেই চারটির ডাক দিতে বাধ্য হন। কারণ যে কোন রঙে একটি ডাক দেবার পর সেই রঙে তিনটির ডাক দিলেই ডাকটি হয় শক্তি ব্যঞ্জক এবং তৎক্ষণাৎ সেই রঙে চারটির ডাক দেওয়া খেঁড়ীর পক্ষে বাধ্যতা যুক্ত। সুতরাং হাতের ক্রুরূপ অবস্থা থাকলে খেঁড়ীর একটির ডাকের উপর সেই রঙে তিনটির ডাক দেওয়া যায়, তাহা নিয়ে প্রস্তুত হইল।

(১) নানকরে হাতে গোলাম সম্বত চারখানি রঙ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(২) অল্প কোন রঙে একক তাম ও দুইখানি অন্যরের পিট থাকা আবশ্যিক। কিন্তু অল্প রঙে একক তামের পরিবর্তে যেত তাম থাকলে আড়াইখানি অন্যরের পিট থাকা প্রকার।

(৩) যদি হাতের বিভাগ ৪-৩-৩-৩ হয় তাহলে তিনটির ডাক ডাকতে গেলে তিনখানি অন্যরের পিট থাকা চাই।

হাতের অবস্থা পূর্বেকৃতরূপ না হলে ডাকদায়ের একটি ডাকে একেবারে তিনটির

ডাক দেওয়া কখনও উচিত নয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় ডাকদায় হয় তো নূনতম অন্যরের পিট নিয়ে এই ডাক ডেকে দেন। এষ্ট ক্ষেত্রে হাতে উল্লিখিতরূপ তাম থাকা সম্বন্ধে ডাকদায়ের একটি ডাকের জবাবে তিনটির ডাক দেবার অগ্রে ডাকযোগ্য অল্প রঙ থাকলে বা কোন Shaded Suit থাকলে সেই রঙে ডাক দেওয়াই কর্তব্য। এতদ্বারা ডাকদায়ের হাতের অবস্থা সুবিধা জনক কি না অন্যরালে বুঝা যায়। মনে করুন আপনার খেঁড়ী একটি ইঙ্কবন ডেকে দেন, আর আপনার হাত এলোহে একরূপ,

ইঙ্কবন—বিবি, গোলাম, X, X ; হরতন—টেকা, বিবি; রুহিতন—আটা, লাভা, হকা; চিড়িতন—লাহেব, নয়, পজা, চোকা।

তাহলে একটি ইঙ্কবন ডাকের উত্তরে আপনি অন্যরালেই তিনটি ডাকতে পারেন কিন্তু তবু আপনি ঐ রূপ ডাক না দিয়ে দুইটি চিড়িতন ডাকবেন। অতঃপর যদি আপনার খেঁড়ী দুইটি হরতন বা দুইটি রুহিতন ডাকেন আপনি তৎক্ষণাৎ তিনটি ইঙ্কবন ডাকবেন, কিন্তু যদি আপনার খেঁড়ী দুইটি ফেরাই বা দুইটি ইঙ্কবন ডাকেন তাহলে আপনি একেবারে চারখানি ইঙ্কবন ডেকে যেতে পারেন। এখন একটা কথা উঠতে পারে যে ডাকদায় যদি ডাক চেড়ে দেন তাহলে কি হবে? তার উত্তর এই যে যদি কোন রঙে ডাক দেবার পর তার খেঁড়ী অল্প রঙে সেই ডাকটি বাঁচিয়ে যান, তাহলে প্রথম

ব্যক্তি যে কোন প্রকারে ঐ ডাক বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবেন, কেন না এই ডাকগুলিকে একটি বারের মত শক্তি ব্যঞ্জক ডাক বলা হয় (One round forcing)। আবার দেখুন আপনার খেঁড়ী একটি হরতনে ডাক দিয়েছেন, আর আপনার হাত এলোহে নিম্নলিখিতরূপ,

ইঙ্কবন—টেকা, X, X, X ; হরতন—গোলাম, লাভা, হকা, তিরি; রুহিতন—X ; চিড়িতন—টেকা, হকা, চোকা, হরি।

এ ক্ষেত্রেও আপনার পক্ষে তিনটি হরতনে ডাক দেওয়ার চেয়ে একটি ইঙ্কবনে ডাক দেওয়া ভাল। ইহার উত্তরে ডাকদায় যদি একটি ফেরাই, দুটি রুহিতন বা দুইটি চিড়িতন বলেন আপনি তিনটি হরতন ডেকে নিয়ে ডাকটি রক্ষা করবেন। কিন্তু ডাকদায় যদি দুইটি হরতন বলেন, তবে আপনি চারটি হরতন ডেকে ডাক শেষ করবেন। উপরের অবস্থা দেখে এইবার আপনারা বোধ হয় বুঝতে পারছেন যে খেঁড়ীর একটি ডাকে কি ভাবে তিনটির ডাক দেওয়া সুকৌশল। এ স্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যদি খেঁড়ীর কথিত রঙের অন্যরের পিট আপনার হাতে থাকে, তবে সেই রঙের ডাক লইয়া তিনের পর্যায় না তুলে বেশীর ভাগ দুয়ের পর্যায়ই রাখা ভাল। মনে করুন আপনার খেঁড়ী একটি ইঙ্কবন ডেকেছেন আর আপনার হাতখানি এই ধরণের,—

(ক) ইঙ্কবন—টেকা, লাহেব, হপ, চোকা; হরতন—হকা; রুহিতন—আটা, হকা, চোকা, হরি; চিড়িতন—গোলাম, আটা, পজা, তিরি।

(খ) ইঙ্কবন—লাহেব, বিবি, গোলাম, X ; হরতন—লাভা; তিরি; রুহিতন—টেকা, পজা, চোকা; চিড়িতন—লাভা, হকা, তিরি, হরি।

তাহলে দুয়ের পর্যায় ডাক রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি হাতখানি নিম্নরূপ হয়,

ইস্কান—টেকা, লাহেব বিবি, x ;
হরতন—সাতা, তিরি ; রুহিতন—লাহেব,
সাতা, পঞ্জা, চৌকা ; চিড়িতন—বিবি,
আটা, তিরি ।

তাহলে দুইটি না ডেকে তিনটির ডাক
হেওয়াই বিধেয়। তবে যদি খেঁড়ী কোন
গৌণ রঙে ডাক দেন তাহলে সেই ডাক
তিনের পর্যায় তোলা সর্বক্ষেত্রে বৃক্তিবৃক্ত
নয়। ঐ সকল ক্ষেত্রে তিনটি ফেরাইএর
ডাকে খেলা করা অনেক সময় প্রয়োজন
হয়, কারণ গৌণ রঙে ১১খানি পিট না
হলে গেম হয়না। অতঃপর নিম্নের হাতগুলি
পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারবেন কোন্
'কোন্ স্থানে তিনখানি ডাক হেওয়া কর্তব্য।

ইস্কান—আটা ; হরতন—লাহেব,
আটা, পঞ্জা, চৌকা ; রুহিতন—টেকা,
x, x, x ; চিড়িতন—লাহেব, সাতা,
ছকা, ছরি ।

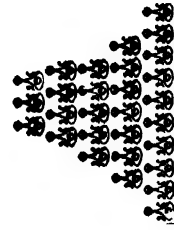
এ ক্ষেত্রে একটি হরতন বলাই বিধেয়।
কিন্তু নিম্নের হাতগুলিকে সর্বতোভাবে
তিনটি রুহিতনে ডাক হেওয়া উচিত।

(অ) ইস্কান—টেকা, লাহেব, ছকা ;
হরতন—নয়, ছকা, চৌকা, ছরি ; রুহিতন—
লাহেব, বিবি, সাতা, পঞ্জা, চৌকা ;
চিড়িতন—তিরি ।

(অ) ইস্কান—লাহেব, পঞ্জা, ছরি ;
হরতন—আটা, তিরি ; রুহিতন—টেকা,
লাহেব, বিবি, সাতা, পঞ্জা ; চিড়িতন—
আটা, ছৌকা, ছরি ।

(ই) ইস্কান—ছকা ; হরতন—
লাহেব, বিবি ; রুহিতন—লাহেব, বিবি,
x, x, x ; চিড়িতন—বিবি, সাতা,
ছকা, পঞ্জা ।

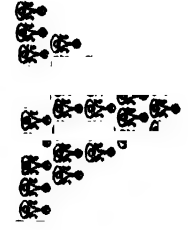
এই শেখোক্ত তিনটি হাতে ডাকবার যদি
তিনটি ফেরাইএর ডাক দেন তা তৎক্ষণাৎ
ডাক ছাড়িয়া হেওয়া বৃক্তিবৃক্ত।



অজানার মায়া

(গল্প)

মন্মথ কুমার চৌধুরী



মানুষের চরিত্র কি আশুপ্তে বলা
চলে ?

ঈশ্বরের মতো এ জিনিষটা চিরদিনই
আমাদের কাছে রহস্যময়। আমরা সবাই
চুটে চলেছি একটা মুচ-পরিণতির অন্ধ
আকর্ষণে। আধার রাতে আকাশের বুক
থেকে তারা যেমন 'করে' চিটকে পড়ে,
নিমিষেই গভীরতর অন্ধকারের মাঝে
নিঃশেষে বিলিয়ে যায়—মানুষ তেমনি যাত্রা
করেছে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে ডুবে যেতে।
এই অনিশ্চিত শক্তির কাছে আমরা
অসহায়—কীপির মঞ্চে দাঁড়ানো অপরাধীর
মতো ভীত, অসহায়। তবু আমরা বেঁচে
আছি—প্রতিদিন প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টায়
আমরা দুর্ভাগ্য—কারণ না বেঁচে আমরা
পারি না। বেঁচে থেকে কি লাভ, কেনই
বা এত আয়াস স্বীকার করে বাঁচবে—
সে প্রশ্ন সাধারণ মানুষের কাছে অবাস্তব।
মানুষ বাচে কেন—এই অসংগত এবং
বিশৃঙ্খল পরিপূর্ণ সংসারে মানুষের হাতের
বাঁচবার দুরন্ত প্রয়াসের হস্তে কোন
হিস্সি খুঁজে পাওয়া বাবে না, তবে এটা
সত্য যে ভবিষ্যত লক্ষ্যে একটা উজ্জল
আশা—তা সে যতটুকু কুসংস্কার এবং
অসম্ভব হোক—মানুষকে বানী ওখ লয়েও
বেঁচে থাকতে প্রেরণা জুগিয়েছে। ভবিষ্যত
চিরকালই আমাদের কাছে অজ্ঞেয়, অসং-
বিধাত। ভিন্ন এ জানবার অধিকার আর
কারণ নেই। আদিত্য যুগ থেকে ভবিষ্যতকে

জানবার দুরূহ চেষ্টা করেছে মানুষ—
কিন্তু শত চেষ্টা লক্ষ্যেও এত অজানতার
কলো যবনিয়া মানুষের চোখের সামনে
আজো সমভাবেই টাঙানো রয়েছে। বিংশ-
শতাব্দীর অধঃপতিত মানুষের পরে ঈশ্বরের
আশীর্বাদ বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে
হচ্ছে ভবিষ্যত লক্ষ্যে তার এই অন্ধতা।
তবু আমরা বাঁচি—অত্যাচার অনাচারে
জর্জরিত মানুষ আমরা পুত্র মতো বাঁচবার
চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠি—কেন ? আমরা
বাঁচবার আত্মরিক ব্যায়াম করি—মানুষ
উপাধি থেকে বিচ্যুত হ'য়ে করযোড়ে
আকাশের দিকে তাকিয়ে। পরম করুণাময়
ঈশ্বর মুখ ফিরিয়ে তাকান না, তবু ভীত
আমরা মরতে লাহস পাঠেন। জঘন্যতম
কোটের মতো বেঁচে থাকবার অন্ধ উন্মাদনার
উচ্ছলিত হয়ে উঠি। কেন ?—কারণ
ভবিষ্যত লক্ষ্যে আমাদের এই নিচ্ছিন্ন
অন্ধতা। আগামী দিনগুলি নিয়ে সবাই
আশাবাদী—হয়তো ভগবান মুখ তুলে
চাইবেন। হৃদপ্রাপ্ত আশাবাদীর মতো মুচ
মানুষ আমরা—ঈশ্বরের সুবিচারে বিশ্বাস করে
স্বচ্ছন্দে হালিমুখে বর্তমানকে কাটিয়ে দি'।
নইলে সুপ্রিয় বাঁচলো কি করে ? এতবড়
নিষ্কারুণ ভাগ্য ব্যবস্টনকে উপেক্ষা করে
সুখমাত্র ভবিষ্যতের শুধমল্লণ দিনের
প্রত্যাশায় এমনি কঠোর তপস্যা কোরবার
শক্তি ওকে দিলে কে ?

সুপারের বাবা ছিলেন জুটমিলের এক
জন বড় অংশীদার, ভবানীপুরে ছিল তার

লপ্রতিভ ভঙ্গীতে।... তারপর—তারপর কাহিনী বাড়িয়ে লাভ নেই। তা'দের বিয়ে হয়ে গেলো। কেমন করে তা'দের হ'লো পরিচয়—হু'জনের অন্তরঙ্গতা হয়ে এলো নিবিড়,—এ লবের ইতিহাস না বললেও চলে। আদল কথা তা'দের বিয়ে হয়ে গেলো। তা'ও তা'বার নির্দিষ্টবাঁধে। এতটুকু নিখুঁতটে হয়তো বিয়ে করা সম্ভব হয়ে উঠতো না। সুপ্রিয়ের বাবা তখন ম'বের নেশায় জমানো টাকা জলের মতো ঢেলে দিচ্ছেন। ভেগের ইচ্ছাকে প্রতিহত কোরবার মতো মনের বলও তাঁর ছিল না। নইলে যদি থাকতো তাঁর আগেকার মতো কঠিন শালন,—সুপ্রিয়ের ভাগ্যে যে কি জুটতো—থাক্, সে বলে লাভ নেই।

...বিয়ে করে সুপ্রিয় সুখী হয়েছিল। বিয়ের পর মাস কয়েক সব ভেলেই সুখী হয়। সুপ্রিয়ের সুখী হওয়ার কারণটা ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। সে সুখী হয়েছিলে কণু কবিতা লিখতে পারে বলে। বিখ্যাত লমকক্ষ হওয়ার গৌরবলাভে লব মানুষের চোখে মুখেই আনন্দের ছোঁপ্তি বিচ্ছুরিত হয়ে উঠে। রাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুপ্রিয় স্বপ্ন দেখতো—জেগেও স্বপ্ন দেখতো—তার সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে লারা দেশে! লক্ষ্য লোকের নীরব প্রকার অর্থ্য তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে—আর তারই পাশে আপনার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য দাঁড়িয়ে আছে কণু। তার গল্প এবং কণুব কবিতায় বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে যাবে। গোটা দেশক গল্প দিয়ে সুপ্রিয় শীগগিরই একখানি বই দের করবে। কণুর অনেকগুলি কবিতাই ত লেখা রয়েছে।

তাগিস্ লেখনির ধরে জন্মেছিলো। নইলে তার প্রতিভার কুঁড়িতেই হতো অপমৃত্যু—খালরোপ-করে-মরা লোকের মতো শোচনীয় বিবর্ণ অপমৃত্যু।...

...রাত তখন দশটা বেজেছে। ড্রেনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কণু তখন প্রসাধন করছিলো। লজ্জা! নিজের প্রতিবিম্বের সুখোমুখি দাঁড়াতে মানুষ লজ্জায় মরে যায় সুখি? কোন্ডক্রীম মাখবার বেলা কণু নিজের অজান্তে সুরের হিলোল তুললে।...

সুপ্রিয় একটা গল্প লিখছিলো। বস্তী জীবনের একটা করুণ কাহিনী! গল্পের মাঝখানটার এলে সুপ্রিয় হোঁচট খেয়ে দাঁড়ালো। তার নায়কের তখন লকট-বন মুহুর্ত। কলমটা খাতার পর ঠেদ দিয়ে রেখে—সুপ্রিয় নিজেকে ডেক্ চেয়ারে, গিলিয়ে দিলে। ক্যান্ডাশে নীল রঙের শাড়ীখানা কণুর গা গড়িয়ে মেঝের লুটিয়ে পড়ছিলে। সুপ্রিয় কথার লম্বা টিল ছুড়লে।

"যেয়ে মানুষের সুখোবার আগটাই লব চাইতে সর্ব্বেন্দ্রশে সন্দর, না কণু?"

কণু ফিরে তাকালে। ততক্ষণে হাত ছুঁটো ওর থোপাতে কাঁটা সজতে বাস্ত। সুরটাকে রাতের আত্মরপনার গাঢ়তর করে বললে, "শব হ'লো তোমার গল্প লেখা? কি স্বকমারি এই গল্প লেখবার। তার চাইতে কবিতা লেখা ফাকার গুণে লজ্জ।" একটা লজ্জ আরাধে ওর স্বর যেন মুহুর্তকাল হয়ে এলো।

প্রোফেসররা যেমন করে ভেলেদের উপদেশ দেন—সুপ্রিয় সবে একটা তেমনি কৃত্রিম গান্ধীর্ষ্য টেনে বললে, "সব বিরাট সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বেদনা—বিপুল বেদনার



GRAM: "ADNIV. B"

ইন্দিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

ইতিহাস। আর এই গল্প লেখা কঠিন, বেধনার চাইতে ও বা' তীব্রতর"।—নিজের স্বরে ওর নিজেরই হানি পাচ্ছিল। রুণ্ড প্রাধান্য শেষ হয়ে গেছে।

“পড়েই শোনাত না তোমার গল্পটা,” রুণ্ড শব্দের চেট তুললো—“বলে বলে লারমন্ আওড়াতে হবে না।” রুণ্ড পাশের চেয়ারটার ঝুপ করে বলে পড়লো।

রুণ্ডকে লিখিই তারী স্মরণ দেখাচ্ছিল। “তা যুঝোবার আগে লব মেরেকেই খানার ভাল।”— সুপ্রিয় যেন মনে মনে কথা গুলিকে উচ্চারণ করলে। “দৌলখ্যা জিনিষটা রূপে নয়—বর্ণে নয়, এমন কি গুণেও নয়— এ হচ্ছে একটা কবিতার চন্দ্রের মতো। বিশিষ্ট পরিবেশে ও জিনিষটা মধুরতর হয়ে দেখা দেয়।” “তা যুঝোবার আগে”—সুপ্রিয় যেন খুঁজে পাওয়া চন্দ্রকে বার বার আওড়াচ্ছে—“প্রাধান্যের আরনার লব মেরেকেই স্মরণী মনে হয়। ভুবে বাবার আগে সূর্য্য যেমন জীবণ ভাবে লালচে হয়ে দেখা দেয়।”

“আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই কি গল্পপড়া হবে নাকি?”

কথার ঝাঞ্ঝে রুণ্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

“যখন তখন তোমার মুখের দিকে বহি না তাকা—তবে কি অপরিচিত মেরেকে দেখবার জন্তে তোমার বিয়ে করেকিলুম।”— তরল কণ্ঠস্বরে কথাগুলি যেন লাকিয়ে উঠলো।

“লব লমর বহি তোমার মাখে বলে বলে অভিনয় করতে হয়—তাহলে তোমাকে বিয়ে না করে থিরেটারে গেলেই পারতুম।”

হু'জনেই হেসে উঠলো—সেই হানির জোয়ারে তারা যেন লাতার কাটবে।

* * *

অকস্মাৎ একদিন সুপ্রিয়কে পথে বাঁড়তে হ'লো। “পথে দাঁড়ানো কে” বহুব্যবহারে ঐ কথাটার অর্থকে আমরা মারুলী করে তুলেছি। সুপ্রিয়ের অবস্থার না পড়লে

ঠিক অনুভব করা চলে না।—এ যে কী কঠোর সত্য। শপের দ্বারে তাঁদের লব কিছু নীলামে উঠলো.....সুপ্রিয় রুণ্ডকে নিয়ে রাস্তার বেরিয়ে এলে। রুণ্ডকে একটা হোটেলের বেঞ্চে—সুপ্রিয় বেরিয়ে পড়লো চাকরীর বোজ। লাভবান হাটাহাটির পর জুটমিলের ম্যানেজার দ্বারা করে একটা চাকরী দিলেন—থুবই অল্প বেতনে—যার টাকার সংখ্যা বলতে বীতিমত লজ্জিত হতে হয়।

সুপ্রিয় উঠে এলো একটা ল্যাক্স-ম্যাক্সে গলিতে। এত অল্প বেতনে আর দালান বাড়ীতে বাস করা চলে না। গলিটার লারাধিন মেঘলাদিনের মতো অন্ধকার। বোধের ঝুপ দেখতে হলে তপস্বী করতে হয়। তবু তাহের উঠে আসতে হলো।

* * *

বলজিলাম, মাহুয বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের স্বপ্ননীল কল্পনায়। তা বহি না হয়— তাহলে সুপ্রিয় বাঁচলো কি করে? রাকৈস্বর্য্য থেকে পথের ধূলোর লুটিয়ে পড়ে সুপ্রিয়ের বাঁচবার এমন কি প্রয়োজন থাকতে পারে। রুণ্ড! সুপ্রিয়ের দস্তুর মত কান্না পায়।

এতে রুণ্ড যখন ভোট্ট আরনার লামনে দাঁড়িয়ে বহুদিনের অভোল অনুমারে নিজেকে লাজাবার বার্থ প্রয়াল করে—সুপ্রিয়ের তখন কি মনে হয়,—রুণ্ড শুনে হয়তো অভিমানে লাল হয়ে উঠবে, তবু সুপ্রিয়ের মনে হয়—এখন তাহের খিত্তী, বীতংগ হারিজোর প্রতি একটা তীব্র বিজ্ঞপ! যুঝোবার আগে লেই লব মেরেরই মুখে ক্রীম মেখে নেওয়া লাঞ্জে—পরলা আছে বাহের প্রচুর,—হু'হাতে খোলাম-কুটির মতো বাহের টাকা জিটিয়ে দেবার লামর্থ আছে।.....রুণ্ডকে ত কিছুতেই বুঝানো যাবে না। এমনি বা কটা টাকা বেতন—তার মধ্য থেকে বহি ক্রীম কিনতেই.....অনহ! তবু সুপ্রিয়কে

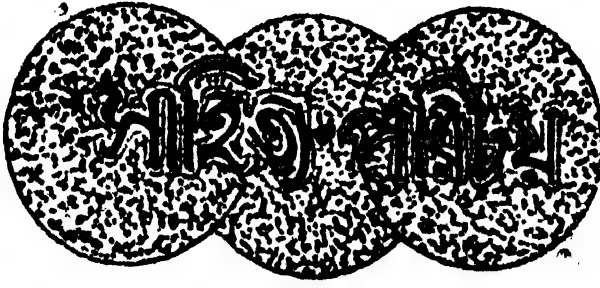
বাঁচতে হবে। এতো জীবন ধারণ নয়, শুধুমাত্র উত্তর পূর্ত, একটা কুৎসিত পতঙ্গুখার নিবৃত্তি বজ্জে লক্ষ্যহীন অভিলার—সুপিত দ্বান্ধের কথাবাত্তে নিজেকে পিবে কেলো।

.....সুপ্রিয়ের অফিস থেকে ফিরে আসতে প্রায় রোজই লক্ষ্য হয়ে বেতো। আর এই লক্ষ্য গলিটা! বিশীর্ণতার গলিটার চেহারা তখন রুক্ষ, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। চারিদিকে তখন বেচা-কেনার কর্কশ কোলাহল। একটু সরে গেলেই মদের আড্ডার হল্লা শুন্তে পাওয়া যায়। তার পাশের বাড়ীগুলিতে লার বেধে বাড়িয়ে আছে মেরেরা.....

চা খেয়ে লন্তর্পণে সুপ্রিয় বাইরের দ্বাওয়ার এসে দাঁড়ালে। এই কুৎসিত গলিতেই তাহের থাকতে হবে অনিশ্চিত কাল ধরে। ডাড়াটা বা হোক আশাতীত রকমের কম—নইলে ত ওরা ছ'বেলা পেট পুরে খেয়ে পরে থাকতে পারতেনা।

এতোগুলি মেরে বাড়িয়ে আছে..... সুপ্রিয় আতঙ্কে চোখ বুজলে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার যুক্তিহীন লোভে ওরা বাড়িয়েছে পুরুষের কামনার ঝুপকাটে... কিন্তু ওদের চাইতে ওর অবস্থা কি খুই উন্নত? টাকার জন্তে বহি মনকে আমরা বিকিয়ে দিতে পারি—তাহলে বেহ কি মনের চাইতেও পবিত্র। তার কথাই ধরা যাকনা কেন। নিজেকে সে নিঃশেষে বিকিয়ে দিয়েছে—জুটমিলের ম্যানেজারের কাছে। তার মাথায় বোমা মারলেও বোধ হয় সে একলাইন লিখতে পারবেনা—লিখবার ইচ্ছাটুকু পর্য্যন্ত সে হারিয়ে ফেলেছে। সে পরিণত হয়েই একটা অন্ধ অটোম্যাটনে। “অটোম্যাটন” কি ভালবাসতে পারে।

(ক্রমশঃ)



কলগ্রন্থ হইতেই পারে না,—তখনও আমরা লোৎসাহে তাঁহার নিকট হইতে বহুদূলা-ক্রীত বিধানের অনুমোদন করিয়া থাকি। একবারও তাবিধা দেখি না যে—এই ভাগ্যচক্ৰ অবৈজ্ঞানিক দেশে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রবর্তনের পূর্বে রোগ হইলে তৎকালীন বিজ্ঞানবিহীন চিকিৎসক-নাথ্যারিগণ রোগীকে কিরূপ ঔষধ ও পথ্য দিতেন, আর তাহাতে দেশের তথানীক্সন গড়পড়তা মৃত্যু-সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় অধিক কি অল্প হইত।

অবশ্য তাবিধেন না যে, শুধু পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করাই এ সমালোচনাটির একমাত্র উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য চিকিৎসাসাধু আগোচনা করা এ দেশীয় চিকিৎসকগণের বিশিষ্ট কর্তব্য, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা-সাহিত্য হইতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি ও পথ্য নিয়মন শিদ্ধা করিয়া দেশীয় উপাধানে ঔষধ নির্মাণ ও দেশীয় পদ্ধতিতে পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। আর উচিত—সেই সঙ্গে আলোচনা করা যে আপনার নিজস্ব প্রাচীন চিকিৎসা-সাহিত্যে তত্তজ্জাতীয় যে সকল ঔষধ-পথ্যাদির বিধান

দ্রব্যগুণ-সংহিতা—(প্রথম ভাগ)— কবিরাজ শ্রীমূল কুমার লেন কবিরাজ এম, এস-লি প্রণীত—তত্ত্বতরু আয়ুর্বেদ তবন, ২২৩ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ, কলিকাতা হটতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ—বাং ১৩৪৪ সাল—পৃঃ ৥১০+২৩০+১১+১০—সোনার জলে কাপড়ের বাঁধাই—মূল্য ২৥০ মাত্র।

আমরা আজ স্বরাষ্ট্রালাভের জন্ত যতটাই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি না কেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পক্ষপেটে যে বিদেশীয় মুখাপেক্ষা করিতে হয়—তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। আমাদের অশন-বসন-চাল-চলন প্রত্যেক বিষয়েই আমরা পরতন্ত্র। ইহার মধ্য হইতে মাত্র বসন-লম্বাটির লম্বাধান করে মহাত্মা গান্ধি যে চরকারূপ মহাত্মা গ্রন্থন করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশের জনসাধারণ কিছু জাগরক হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাভাব্য লাভের দিন এখনও সূর্য।

চিকিৎসাঙ্গণতেও আমরা এইরূপ বিশেষ-ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি। গত একশত বৎসরের মধ্যেই পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এদেশবাসীর চিকিৎসকে একরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, বাড়ীর মধ্যে হৃৎপোষ্য শিশুটিও ছইবার হাঁচিলে একজন পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদকে ডাকাইয়া বিদেশের চিকিৎসালয়ে বৈদেশিক প্রক্রিয়ার প্রস্তুত ঔষধ (যে ঔষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া লব্ধে ই পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিজ ব্যক্তিগত

তেনরূপ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নাই) খাওয়াইয়া (বা বৈদেশিক আনুগতিক প্রক্রিয়ার পবেশ করাইয়া দিয়া) স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি যে, রীতিমত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা করা বাইতেছে—ইহাতেও যদি যোগী না বাঁচে তাহা হইলে তাহার না বাঁচারই প্রয়োজন বৃদ্ধি হইবে। বর্তমান সমালোচকও যে 'এই গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম তাহা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন না। আচ্ছা, ঔষধের কথা না হয় চাড়িয়াই দেওয়া গেল; কিন্তু পথ্য লব্ধকও যখন উক্ত চিকিৎসকপুঞ্জ ব্যবস্থা করেন যে, অধিক বিদেশী চিকিৎসাগারের প্রস্তুত বোতলাবদ্ধ অধিক প্রকার তরল, অর্জিতরল বা কঠিন খাদ্য সেবন না করিলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পথ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইবে না, ও তাহার ফলে রোগীর ঔষধাস্ত চিকিৎসা

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা
গ্যারাণ্টি চিরস্থায়ী! **গ্যারাণ্টি চিরস্থায়ী!!**



ব্যবহাৰান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনদের মনোমত আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়িত্বে ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ লোণার জ্বার দ্বিত্বাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিজিক্টে

৭০নং কলেজ ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ ট্রীট বার্কটের সম্মুখে)

ফোন : বি, বি, ৪৮৮২

এই হইতে মূল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ও তাহাধের নিরে সরল সটীক বলাহুবাৎ প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল প্রকরণে আধুনিক খাতাধির বর্ণনা আছে, সেগুলিতেও বাহাতে প্রকৃত ভঙ্গ না হয়—একজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় স্বরচিত লংকৃত শ্লোক উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার ফলে “নিম্বী” (নিম্বী), “কুণ্ডলিনী” (জিলাপী) হইতে আরম্ভ করিয়া “মৎস্ত-বালঃ” (বাহুর বাল), মায়—“সুতপোচঃ” (আমলেট) প্রভৃতি খাত্তরও প্রস্তুত পদ্ধতি ও গুণাগুণ লংকৃত শ্লোকাধারে পাওয়া যাইতেছে। বাহারা শাস্ত্রে অনুরক্ত খাত্ত খাইতে এখনও কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করেন অথচ লোভ পূর্ণ মাত্রায় আছে, কবিরাজ মহাশয়ের এই তাঁহাধিগের বিশেষ বলাধান করিবে।

এই সমাপ্তির পূর্বে “পরিশিষ্টে” অংশে “পাশ্চাত্য মতে খাত্ত বিজ্ঞান” সংযোজিত করিয়া কবিরাজ মহাশয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাব-সম্মেলন ঘটাইয়াছেন। ইহার পরে আর পাশ্চাত্য চিকিৎসাভিজ্ঞগণ গ্রন্থখানিকে অতৈজ্ঞানিক তত্ত্বপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

গ্রন্থখানি বাহাতে সাধারণ পাঠকের নিকট লঙ্ঘ বোধ্য হয় ও সকলেরই উপকারে লাগে, সেজন্ত কবিরাজ মহাশয় চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। ছাপা, বাধাই, কাগজ ভাল। তিন আড়াই টাকা মূল্যটি সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু অধিক বলিয়াই মনে হয়। বাহা হউক, আমরা এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাহান করি।

“শ্রিয়বান্”

প্রতিশ্রুতি

হিজলান কুমার শিশী

প্রথম ছিল মোর কতো! যে গভীর
খুঁজিয়া কত
পাইনি তল—

আজিকে করে আধির জল।

ভুলিয়া গিয়াছি—

তব ভালোবাসা—

ব্যথা হৃদয়েতে—

বাধিয়াছে বাসা।

কতো লে রজনী গিয়াছে অমনি
করিয়া জল—

নীরবে ঝড়োতে নয়ন-জল।

ওগো সখী মোর

এমনি করে—

কতো লে কাঁদিব

জীবন ভ'রে—

আঁখির জলেতে করে কী জান—

মেটেনি আশ—

করেছি ব্যজন দীর্ঘ স্থান।

(২)

তোমারে বাধিয়া ভালো—

হৃদয়ে কোথার জলিবে আলো—

তাহা নয় হায়; পাইনে দিশা!

নিভেছে ছেউটি, এখন নিশা!

আরকী আমার বুকের মাঝেতে—

পারনা লইতে প্রিয়া—

আরকী পারোনা বাণিতে ভালো—

সকল হৃদয় দিয়া!

তব অবহেলা হৃদয়ে চাপে—

করে মোরে নিশ্চেষণ—

উদ্বাসীন জীব লম্বয়েতে—

কাঁদায় আমার মন।

জানিনা বরেন্দি কী দোষ আমি যে

তোমার কাছেতে সখি—

ঝরায় আমার ব্যথা আঁখি-জল

খুব স্তম্ভ পাও নাকি?

তবে তাই হোক কাঁদিব অমনি

ঝরায় অশ্রু ধারা—

বেঁধনারে নিরে বুকের মাঝারে—

খাকিব আত্মহারা!



খেয়ালী চিত্রপট



রাধা ফিল্মসের পরিচালনায় তোলা মতিমহল
থিয়েটার লিমিটেডের “বেকার নাশন”
চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী রাণীবালা।
প্রযোগ-শিল্পী: জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়



পরিচালক

টেলিগ্রাম
'ভ্যারিটি'

কাশ্মাল নিউজপেপার লি:

টেলিকোন
সাঁউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

জন্ম বঙ্গ, সপ্তবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০শে আষাঢ় ১৩৪৫, ৫ই জুলাই ১৯৩০

আদান প্রদান

কলিকাতা কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার কংগ্রেসের বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে যে আদান প্রদানের সূচনা হইয়াছে তাহা নানা কারণে বিশেষ বিশ্লেষণ-যোগ্য। শিক্ষা-সচীব ও এ্যাসেসার পদ সম্বন্ধে ভাগ-বাঁটোয়ারার গবেষণা শুরু হইয়াছে। মিঃ শৈলেন ঘোষের পদচ্যুতির অন্তরালে মিসেস সেনগুপ্তা ও মিঃ নিশীথ সেনের অভিলাষ এই যে মিঃ ঘোষের বিদায়ের পর মিঃ আর, এম্. সেনগুপ্তকে ঐ পদে বাহাল করা। মিঃ সেনগুপ্ত সম্প্রতি মাদ্রাজী মহিলার পানিগ্রহণ করিয়া অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ জীবনে দীক্ষিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভবিষ্যত জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মিসেস সেনগুপ্তার সচেতন হওয়াই স্বাভাবিক।

অপরূপ পক্ষে শ্রীবৃদ্ধ কিরণ শঙ্কর রায়ের পক্ষে কিছু অর্থ উপার্জন প্রয়োজন কারণ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করার পর হইতে আজ পর্যন্ত কিরণবাবু কংগ্রেসী রাজনীতিতে পূর্ণভাবে

আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সেই আত্মনিয়োগ কংগ্রেসী কোমল বৃত্তিতে সহায়তা করিয়াছে কিনা সে বিষয়ে তীব্র মতবৈধতা থাকিলেও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক দিক হইতে তাঁহার সভতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্তমানে ক্রিয়াকর্মী জমিদারীর আয়ে ক্রমবর্ধমান সাংসারিক দায়িত্বের সূচায় সমাধান হওয়া সম্ভবপর নহে সুতরাং তাঁহার পক্ষে সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নহে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে তাঁহাকে কিভাবে প্রতিপালন করা যাইতে পারে? ওয়াকিবাহাল মহলে প্রকাশ যে তিনি শিক্ষা-সচীবের পদ অপেক্ষা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট টাইবুনাালের এ্যাসেসার পদের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মিঃ নিশীথ সেন মহাশয়ের সহিত এইরূপ একটা আদান-প্রদানের কথাবার্তা চলিতেছে যে মিঃ সেনের উপদল যদি কিরণবাবুকে এ্যাসেসার পদের জন্য সমর্থন করেন তাহা হইলে কিরণবাবুর পক্ষীয় উপদল মিঃ আর, এম্. সেনগুপ্তকে শিক্ষা-সচীব পদে সমর্থন করিবেন। এই কথাবার্তা যদি সার্থক হয় তাহা হইলে কিরণ বাবু ও মিঃ সেনগুপ্তের অভিলাষ যে সকল হইবে তাহা নিশ্চিত। মিঃ সেনগুপ্ত উক্ত পদ বা অনুরূপ কোন পদ লাভ করিলে কাহারও কিছু বলিবার নাই কারণ তিনি শান্তিপ্রিয় নিকিরোধী পুরুষ কিন্তু কিরণ বাবু এ্যাসেসারের পদ পাইলে বাংলা কংগ্রেসের কলঙ্ক অধিকতর জটিলভাবে দেখা দিবে কারণ একে কিরণবাবুর প্রতিভা তাহার উপর অর্থ-স্বচ্ছল্য। এই দুইয়ের সমাবেশ কিরণবাবুকে বাংলা কংগ্রেসে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিবে! মজুমদার-দল কি স্বেচ্ছায় আজ-হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? মিঃ নিশীথ সেনকে সংযত করিতে কি পরিভোষ বাবু প্রভৃতি অক্ষম?

নিষ্পত্ত এ্যাসেসারি নিকীচনের সময় মিঃ যোগেশ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত গোপন চুক্তি করিয়া ধীরেশবাবুর মনোনয়ন প্রসঙ্গে কিরণবাবু গুপ্ত সাহেবের সমর্থন লাভ করেন। বর্তমানে তীক্ষ্ণ চতুরতার সহিত মিঃ নিশীথ সেনের সমর্থন লাভের চেষ্টা চলিতেছে। মজুমদার-দলের সংহতি যদি এইরূপভাবে মঠ হইয়া

যায় তাহা হইলে বাংলার কংগ্রেসে তাঁহাদের প্রাধান্ত খর্ব হইতে হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। উত্তর কলিকাতার শ্রীযুক্ত সুরেশ মজুমদার ও শ্রীহেমন্ত বসুর মধ্যে যে মনোমালিন্যের প্রাচুর্য্য বটিয়াছে তাহা কোন মতেই সমর্থন-যোগ্য নহে। উত্তর কলিকাতার কংগ্রেস কর্মীবৃন্দের আশু প্রয়োজন তাঁহারা যেন এই অশোভনীয় রেষারেষী পরিহার করেন। তাহা না করিলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের দলগত শক্তি একেবারে লোপ পাইবে এবং কিরণবাবুর উপদলের শক্তি অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি পাইবে? মজুমদার-দলের বাহক

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কি এ' বিষয়ে অবহিত হইবেন, না তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের বাত প্রতিবাদ-জমিত বিতৃষ্ণাবশতঃ রাজনীতি হইতে দূরে চলিয়া যাইবার মনস্থ করিয়াছেন? সুরেশবাবুকে কি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে রাজনীতিতে অভিমানের স্থান নাই। সংসার-বিড়ম্বনা-যুক্ত সুরেশবাবুর পক্ষে বিতৃষ্ণা-ক্লিষ্ট হওয়া উচিত নহে। আমরা আশা করি তিনি পুনরায় সবল চিত্তে কংগ্রেসী রাজনীতিতে মনোনিবেশ করিবেন।

:(X):

ইঙ্গ-ফরাসীয় আঁতাত এবং ফ্রেঞ্চ ফরেন পলিসি সচী শীল

গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ব্রিটেন যে পথ দেখাচ্ছে ফ্রান্স তাকে অনেকটা আঁকড়ে মতই অনুসরণ করছে। এক কথায়—France is in the leading strings of Britain. ফ্রান্সের এ অবস্থা হল কেন? ব্রিটেনের সঙ্গে তার এই গুরু-শিষ্য সম্পর্কটা তার পক্ষে কতকটা মঙ্গলজনক হয়েছে? ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি লক্ষ্যে লক্ষ্যনাশের দিকে প্রবাহিত। ফ্রান্স যদি লড়িয়ে ব্রিটেনকে আপন করে দেখে ত তার উচিত লক্ষ্যনাশ থেকে ব্রিটেনকে রক্ষা করা, এবং রক্ষা করতে গিয়ে যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অগ্রিম কিছু করতে হয় ত বিনা বিধার তা করতে হবে। একথা ত লড়িয়ে—One has got to be cruel in order to be kind.

তবু ব্রিটেনকে রক্ষা করার কথা বলছি না, ফ্রান্সের নিজের স্বার্থও এর মধ্যে গুঁড়ভাবে জড়িত। নেই স্বার্থের দিকে চেয়েও কি ফ্রান্সের উচিত এখনও ব্রিটেনকে follow করা?

এই থেকে অনেক কথা উঠে পড়ে। ফ্রান্স নাকি ব্রিটেনকে অনুসরণ করতে বাধ্য, কারণ বিপদে গতে কাছাকাছি এক ব্রিটেনই আছে যে তাকে বাঁচাবার আশ্রয় চোঁচ করবে। এমন বন্ধুর সঙ্গে ডাড়াডাড়ি হওয়া যানে পশ্চিম ইউরোপে তার নেহাৎ একলা পড়ে যাওয়া। ইঙ্গ-ফরাসীর বিচ্ছেদের কথা ফরাসীরা মোটেই ভাবতে পারে না।

এ কথা লড়িয়ে মানলুম। কিন্তু তার সঙ্গে একথাও ত লড়িয়ে যে ব্রিটেনও ফ্রান্সের বন্ধুত্বকে বিলম্বিত দিতে পারে না; ফ্রান্সের যেমন ব্রিটেনকে ধরকার, ব্রিটেনেরও তেমনি ফ্রান্সকে ধরকার। ফ্রেঞ্চই স্বার্থ এক। পরস্পরের স্বার্থ এখন এরকম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তখন একপক্ষ ভুল করলে অপরপক্ষের অধিকার ও কবতা আছে তাকে ভুলের পথ থেকে টেনে আনবার। Anglo-French Entente এর এই perspectiveটা ঠিক ধরদর করতে পারেনি ফ্রান্সের কর্তারা।

ব্রিটেনকে বন্ধু হিঁদেবে হারাবার কোন ভয়ই নেই ফ্রান্সের। ফ্রান্স যদি এখন

নিজেকে এবং চ্যান্সেল-পারের বন্ধুত্বকে বাঁচাতে চায় ত তার উচিত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যখন কোন Major policy নির্ধারণ করার কথা উঠবে, তখন লণ্ডনের কাছে উপস্থাপন না চাওয়া। আদি অংশ এখনকার চেম্বারলেন-গভর্নমেন্টের কাণ্ড বিবেচনা করেই এ সব কথা বলছি।

গত এপ্রিল মাসের ২৮শে তারিখে ইঙ্গ-ফরাসীর বৈঠক হয়েছিল। তাতে চেকোশ্লো-ভাকিয়া ও স্পেনের কথাই বিশেষ করে আলোচনার বিষয়-বস্তু ছিল। চেম্বারলেন লাহেব ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিকে practical effect দেবার জন্যই এত আয়োজন করে ফরাসী মন্ত্রীদ্বয়ের সঙ্গে জোর কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। স্পেনের ব্যাপারটাই হচ্ছে Key issue in the whole game. তাই M. Daladier better term এর জন্য fight করা লাহেবও চেম্বারলেন লাহেব জোর করে ফ্রান্সকে ব্রিটেনের সঙ্গে স্পেনের ব্যাপারে একমত হতে রাজী করিয়েছিলেন এবং গভর্নমেন্ট পক্ষের ব্রিটিশ-প্রেন ফরাসী মন্ত্রীদ্বয়ের বেশ করে পিঠ চাপড়ে বলেছিল—“Congratulations on your good sense. ডেলি টেলিগ্রাফ বলেছিল—“France has a Premier with a magic wand”

কিন্তু কী মূল্য দিয়ে যে এই সব প্রশংসা-
বানী কিনতে হয়েছিল তা ফরাসী সন্ত্রাসী
বিশ্ব ভাল করেছে মনে রাখবেন।

Hon Ivor Montagu এই লম্বন্ধে
আমল লভ্য কথাটা কীল করে দিয়েছেন।
তিনি বলছেন: "For a heavy price
France has bought co-operation
with the British military, naval
and air forces. The bargaining
was done in an atmosphere menac-
ing through its velvet courtesy. A
night at Windsor Castle was
brown in to gild the pill."

আমল প্রশ্ন হচ্ছে, British Co-opera-
tion পাবার জন্য এই "Heavy Price"
দেবার প্রয়োজন বা লাব্ধিকতা কোথায়?
কি রকম অর্থ বা বস্তু বাজার রাখার চেটার
লে স্পেনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে,
এর শেষ পরিস্থিতি ফ্রান্সের তথা ব্রিটেনের
ক্ষেপে পরম শোচনীয়। যা হাতের মুঠোতে
থেকে তাকে দাম দিয়ে কেনার কথা
শ্রদ্ধা করা। আর কি হতে পারে?
পরন্তু British Co-operation যদি কিন-
তে হত, তার জন্য এত বেশী মূল্য কেন? এই
political transaction-এর ফলে ফ্রান্সের
নীতিমূল্য রক্ষা করতে হবে। আগে ছিল
Franco-German Frontier; এখন
একটি লম্বন্ধ এসে জুটলো: Pyrenees
frontier.

আমি অনেকদিন ধরেই বিশ্বাস করে
সিঁই যে—Anglo-French Entente
indissoluble. Baldwin লাহেব

পার্লিমেণ্টে এক স্মরণীয় বক্তৃতার ঘোষণা
করেছিলেন: "Our frontier is on the
Rhine." তাবের উচ্চারণে লাম্ব করে
তিনি এ কথা বলেন নি। তাই আমি
Hindusthan Review পত্র "The
Gathering World Crisis and the
Role of Britain"—শীর্ষক প্রবন্ধে
বলেছিলাম:

"If France follows Britain, she
will be landed in disaster. If
France pushes ahead independently,
Britain is bound to follow her.
The opening of the Pyrenees
frontier is irresistible at this hour."
আমার এই মতের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি রয়েছে
"The Living Age" পত্রের লম্বন্ধে
প্রকাশিত মন্তব্য: "Britain's securi-
ty is so intimately bound up with
that of France that she must
support her old ally in any emer-
gency, even if the latter should
go to war to aid Czechoslovakia
or Russia."

ইঙ্গ-ফরাসীর বাঁধন বাজার রাখবার বা
শক্ত করবার জন্যে বড় বড় আলোচনার
বৈঠক Stage করবার দরকার হয় না।
লাহাবোর জন্য ব্রিটেনের সুখাপেক্ষী হয়ে
থাকার কোন মানেই হয় না—এ কথা
আমার অনেক দিনের বিশ্বাস। ফ্রান্স
এগিয়ে গেলে তাকে অনুসরণ করতে এবং
বিপদে তাকে সাহায্য করতে ব্রিটেন বাধ্য—
এ কথা তিনমাস আগে আমি বলেছি।

ঠিক এই লভ্য কথাটার ওপর জোর দিয়ে
লন্ডনের বিখ্যাত "Daily Herald" পত্র
২০শে মে তারিখের সংখ্যায় কি বলেছে
তখন:

"It is a wonder that the
French cannot see that at bottom
Britain cannot desert them. What-
ever Conservative ministers may
say in after-dinner speeches, or
in the House of Commons, the
National Government did not
cement the Anglo-French Alliance
for love of the blue eyes of the
French, or because of "our
common ideals of liberty." It
has made an alliance with France
for the good and simple reason
that the defence of France is
essential to the security of Britain,
that once France was crushed
Britain would be helpless."

প্রত্যেক ফরাসীর এটা ভেদে রাখা
উচিত যে রাইন নদী ব্রিটেনের outer ring
of defence. এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে
ফ্রান্স অনেক কিছু issue-ই force করতে
পারে, চেম্বারলেনের plan-কে torpedo
করে দিতে পারে। স্পেনের মধ্যদিয়ে
জগন্মের ডিমক্রেসিকে বাঁচাবার হাতিব এক-
মাত্র ফ্রান্সই এখন নিতে পারে।



GRAM: "ADNIVAG"

ইন্দিবিম্বা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ক্লাইভ

ফ্রীট, কলিকাতা।

চা

কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যান

লেখা দেবী

পৃথিবী বিরাট খেলাঘর।
তালমল ছই শ্রোত বিশেষ আছে ওতপ্রোত
অভিশাপবেশে কতু আসিতেছে বর।
দেব ও মানবে মেলা যুগে যুগে চলে খেলা
কবির লেখনী মাঝে তাহারি কাহিনী,
আধারেতে জালে শিখা লামনার ললাটিকা
মৃতসঞ্জীবনী সম অমৃতবাহিনী।

শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর ইন্দের তনয়
ধরাভলে ব্যাধবংশে আসি জন্ম লয়
কালকেতু হ'য়ে; আর তার পত্নী ছায়া
ফুল্লরারূপেতে হেথা লভিলেক কার্য।
কালকেতু মহাবীর—নাহি শক্তি-নীমা,
ফুল্লরা সে শোভাময়ী দেবীর প্রতিমা।
ব্যাধের তনয় ক্রমে হ'ল বলপতি
কিন্তু তার ধীরে ধীরে অহিংসাতে মতি।
প্রাণী-হত্যা হিংস্রত ত্যজিয়া তখন
কৃষি কার্য করি' করে জীবন ধারণ।

একদা ফুল্লরা আসি কহে ফুল্লরনে
রাজার প্রাণাঘে আজি তনি শুভক্ষণে
দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে মহা লমারোহে
দেবীর দর্শনে আজি চল বাব দৌহে।
কালকেতু কহে মোরা অস্পৃগু মহীতে
রাজার প্রাণাঘে নাহি দিবে প্রবেশিতে।
ফুল্লরা উতলা অতি—কাতর অশেষে
দেবী দরশনে দৌহে চলে অবশেষে।
প্রাণাঘের দারী নাহি দেয় প্রবেশিতে
অবশেষে যুবরাজ—চোখের ইজিতে
দারি দিল দার ছাড়ি—শুধু ফুল্লরারে
আহ্বানিল যুবরাজ অশেষ প্রকারে।
হুটুহুটি বুঝি তার পক্ষ বচনে
লম্বোদরি ফুল্লরা কহে; দারী দেই ক্ষণে
অঙ্গ ধরিবারে যার; কালকেতু তবে
যুবরাজে বধিতে উদ্ভত ঘোর রবে।
ফুল্লরা তাহারে টানি আনে নিজ ঘরে
পত্নী-পত্নী তপঃনিভ এক মন ক'রে।
প্রারোপবেশনে প্রাণ ত্যজিবারে চার
বহি না স্বয়ং দেবী আনিয়া তথায়
দেখা দেন তাহারে। দেবী মহামারা
তপে তুষ্ট হ'য়ে তবে ধরি নিজ কারা
আবিকৃত্য হইলেন নহম আনিয়া।

লব জুঃখ লব দৈন্ত পলকে নাশিয়া
বিরাট বৈভব দিলা, অতুল প্রাণাঘ
লভিয়া তপস্তাবলে দেবীর প্রাণাঘ
কালকেতু রাজা হ'ল—আনন্দ উৎসবে
ব্যাধরাজ্য সুধরিত কল কোলাহলে।
এই দিন করিবারে চিরসঙ্গী
কালকেতু সবে মিলি এই বরনীয়
ব্রত নিল—প্রাণীহত্যা আজ করিবে না,
ধরিবে তবুও কতু অঙ্গ ধরিবে না।

এই দিকে ভাঁড় বস্ত বিশাখ কুটম্ব
যুবরাজ পার্শ্বের পাশে মহান
আসি দেখা হস্তবেশে তোষামবে হেনে হেনে
কেতুরে ভুলায়ে তার রাজ্যে অধিষ্ঠান।
নারীমোহে ভুলাইয়া আশবেতে ডুবাইয়া
কেতুরে ভালায়ে দিল বিদ্রম প্রবাহে
হেথা তার অত্যাচারে কেতুরাজ্য হাহাকারে
ভরিয়া উঠিল, তার খোজ কেবা চাহে!
একদা সুরোগ বুঝি নিপুণ কোশল খুজি
ভাড় বস্ত বন্দী করে কেতু-ফুল্লরারে
যুবরাজ ফুল্লচিত কুট ভাড় হরষিত
নিক্ষেপ করিল দৌহে অন্ধকারাগারে।
তারপর কি বাখানি ফুল্লরারে লয়ে টানি
আনিয়া রাখিল কালকেতুর লম্বুখে
তাঘের উল্লেখ বুঝে ক্ষুব্ধ বন্দী বুজি খুঁজে
শতেক বৃশ্চিক আলা কালকেতু বুকে
একি বিধি ভাগ্যহীন লে-ধিন যে ব্রতধিন
অঙ্গ ধরিবার তার নাহিক উপায়
এই হ'ল ভাগ্যদোষে হেরিবে পে ক্ষুব্ধ রোষে
লতীর এ অপমান হ'য়ে নিকশার!
নহে নহে কতু নহে হুবে দেব রক্ত বহে
পলকে ছিড়িল কেতু বন্দীর শৃঙ্খল।
কারাগার চুরমার বহিল স্বহস্তে তার
যুবরাজ, ভাড় বস্ত—গ্রহরী মকল।
তারপর ব্রতভঙ্গ মহাপাপ নানি'
চিতার উপরে দৌহে উঠে হাসি হাসি
• নেইকপে আধিজলে লকলে হেরিল
শাপমুক্ত দেব-দেবী স্বর্গেতে চলিল
যে জ্যোতি আনিয়াছিল নেহিল আকাশে
নেই আলো নেই স্মৃতি আজি পটে তানে।

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স
নিবেদন

শ্রী

চিত্রগৃহ



বিশ্বনাথের

চোখের বালি

বিনোদনী - সুপ্রভা মুখার্জি

শীঘ্রই
আসিতেছে

কানীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

—ঘর—

ডাক্তার, কানীশ্বর ও দ্বিজেন ।

ডাক্তার—মাথার আঘাত বেশী লাগতে পারনি, কারণ, হাত দিয়ে আটকে ফেলেছিলেন । হাতটাও সেই জন্য বেশ জখম হয়েছে ।—বাবস্থা সব কোরে গেলাম, রাজে যুগও হবে, তরের কোন কারণ নেই । কাল আটটার সময় আমার খবর যাবেন ।

(ডাক্তার প্রস্থানোত্তর । দরজার পাশে যোগদারী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বৃহৎ শব্দ করিয়া দ্বিজেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন ডাক্তার দাঁড়াইল এবং দ্বিজেন তাঁহার কাছ হইতে মস্তবাটুকু শুনিয়া আসিয়া ডাক্তারকে বলিল)

দ্বিজেন—মা জিজ্ঞাসা কোরছেন অত কথা কইছে কেন ? ভুল ব'কছেন না ত ? মাথার কোন গোলমাল হয়নি ত' ?

ডাক্তার—না না, সে সব কিছু নয় । তোমরা তা ব'লে সারবলি হ'য়ে ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না । ওষুধের Action-টা শুরু হ'লেই ঘুমিয়ে পড়বে ।..... যদি দেখ ঘুমুতে কিছুতেই পারছেন না, খুব চটকট কোরছে, তা হ'লে অবশ্য আর একটা পুরিয়া দিবে দেবে । অরও হয়তো একটু হবে,—তা ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই । আচ্ছা—

দ্বিজেন—অর খুব বেশী হ'লে ?

ডাক্তার—হবে না ।

(ডাক্তার ও দ্বিজেনের প্রস্থান)

(যোগদারীর প্রবেশ)

কানী—আবার কি কথা কইছে ?

যোগদারী—সেই একই রকম কথা ।—

“আমি কি বাবার ভাজাপুল ? কি অপরাধে এত বড়ো শাস্তি ? টাকাকড়ি আমি চাই না । কিন্তু রেহ, ভালোবাসা আমার জন্মগত অধিকার ; তা থেকে তোমরা আমার বঞ্চিত করানি'ত ?”—এই রকম সব । আমার হাতছাট ধরে ব'ললে “মা, গাড়ী, আনবাব পত্র, সব কিছু তুমি কিছুকে ধোল আনাই দিও, কিন্তু তুমি মা নিজেকে সবটুকুই বিলিয়ে দিও না । আমার জন্যেও একটুখানি রেখে দিও !”

কানী—চোখে জল না এনে কোন কথাই তোমরা ব'লতে পার না ! আমার ও ভালো লাগে না ।

যোগদারী—ভেবেছিলাম চোখের জল আর ফেলবে না । ওর দিকে ফিরেও আর চাইবো না, কিন্তু ওকে দেখলে থাকতে পারা যায় না ।—তুমি ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারো ? এমন কিছু কোরতে পারো যাতে কোরে ও আমার অন্তরের বাইরে চ'লে যেতে পারে, যেমন গেছে তোমার—

কানী—পারি ।

যোগদারী—তা হ'লে তাই কোরে দিও । চোখের জল ফেলবার আর দরকার হবে না ।

(প্রস্থান)

(পরেশ উকিলের প্রবেশ)

পরেশ—আমার কি ডাকছিলেন ?

কানী—তোমার ? হ্যাঁ, ডেকেছিলাম । কিন্তু এতোক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি ? ডেকেছি প্রায় একঘণ্টা হ'ল । আর একটু আগে এলে ক্ষতি ছিল কি ?

পরেশ—আমি গেছিলাম বাদ্‌গেটের ওখানে, তা'ই—

কানী—সেই খানেই যাও, আমার আর দরকার হবে না । (পরেশের প্রস্থান)

(মণীষার প্রবেশ)

মণীষা—মা এখানে ছিল, না ?

কানী—ছিল, এই চ'লে গেল ।

মণীষা—উঃ ! মায়ের জন্য আর পেয়ে উঠিনা !

কানী—কেন রে মণি ?

মণীষা—এই দেখি এই খানে কথা কইছে, মিনিটের মধ্যে একেবারে তেতলার । তুমিই বলো খুঁজে বার কোরতে গেলে কি রকম মিড়ি ওঠানাবা কোরতে হয় !

কানী—কি জন্যে অত খুঁজে বেড়াচ্ছিস ?

মণীষা—ঠাকুর ডাকছে । সে হাড়ি-কুড়ি তেল-চুন, আলু পটল নিয়ে বোলে আছে । ‘মহু’ বলে না দিলে আজকের খাবারই তৈরী হবে না ।

কানী—তুই যাছো ব'লে কেন ?

মণীষা—আমি বলে দোব ! তাহ'লেই হ'য়েছে ! কাকে কি বলে আমি তাই জানি না, বলে দেওয়া তো দুয়ের কথা !

কানী—তা হ'লে আর কি হবে ! আজ কিছু না হ'লেও হয়তো চ'লে যাবে ।

মণীষা—তুমি বড়ো একটুতেই রেগে ওঠ ।

কানী—রাগবো কেন । আজকের বা ব্যাপার তাতে খাবার ইচ্ছা কান্নার নেই । তোমার মায়েরও না, আমারও না । তাই বলছিলাম ।

মণীষা—কিন্তু আমরা ? আমাদের যে খেতেই হবে ? এখন ইচ্ছে না থাকলেও ঘণ্টা দু'য়েক পরে যে ভীষণ ক্ষিদে পাবে ! আচ্ছা সে না হয় থাক—বাঁধার অন্তরে

কল্প ভাবছো ত' ? কিন্তু ডাক্তার তো বলেই গেল ভালোই আছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। তবু তোমরা এতো বুঝে পড়ছো কেন বুঝতে পারি না !

কাশী—তুই বুঝতে পারবি না। যা তুই, ঠাকুর কি কোরছে দেখগে যা। তাকে বলেও দিতে পারিল আজ সে যা খুশী তাই কোরতে পারে।

মনীষা—যাকি, কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না ! নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো। আমাদের কলেজের অমিতার ভাইয়ের—

কাশী—আঃ। মনীষা, আমার আর কোন কথা শুনতে ভালো লাগছে না।

মনীষা—কিন্তু এ কথাটা শুনতে ভালো লাগবে আমি নিশ্চয় কোরে বলতে পারি।

কাশী—তাহলে বলো শুনি,—শীগগীর সেরে নাও।

মনীষা—আমাদের কলেজের অমিতার ভাইয়ের ঠিক এই রকম হয়েছিল। সবাই ভয় পেলে কিন্তু ডাক্তার বললে ভয় নেই। সেই রুগী ন' মাস শয্যাশায়ী রইলো। প্রাণ একেবারে এখন-তখন। —কিন্তু বেঁচে গেল।

কাশী—তার সঙ্গে উপস্থিত ক্ষেত্রের কি মিল দেখিলি ?

মনীষা—মিল দেখলাম না। তাই তো আমার কোন ভয় নেই। আমাদের বেলায় সবাই বলছে ভয় নেই, ডাক্তারও বলছে ভয় নেই। —অমিতার বেলায় সবাইয়ের সঙ্গে ডাক্তারের মতভেদ হয়েছিল।

(বলিয়া হালিরা ফিলিল)

কমন্, কথাটা শুনতে ভালো লাগলো ত' ?

(কাশীখর স্থির দৃষ্টি দিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন, কথা বলিলেন না)

রাগ হচ্ছে বুঝতে পারছি। কাজ নেই ও সব কথা, আমি ঠাকুরকে বলতে চললুম তার ইচ্ছামত যেন আজ রেখে রাখে।

(প্রস্থানোত্তত)

কাশী—শোন—

(মনীষা ফিরিল)

বিলিপ এখন কি কোরতে জানিল ?

মনীষা—বোধ হয় কিছু কোরতে না।

—কিন্তু আমি কি কোরে জানবো, আমি তো এঁখানে আটকে রয়েছি।

কাশী—তার কাছে এখন র'য়েছে কে ?

মনীষা—নীলাধি। তুমি যাওনা, তার কাছে গিয়ে একটু বোসোগে না। তোমার পেনে খুব খুশি হবে।

কাশী—না থাক্।

মনীষা—তোমার স্থিতি রোগীর কাছে বসতে ভয় করে ?

কাশী—হ্যাঁ মনি, আমার ভয় করে।

মনীষা—আমাদের ভয় হয় না, তোমার ভয় হয় !— অবাক্ কোরলে !

কাশী—আমি ওর কাছে গেলেই ও আমার প্রশ্ন কোরতে থাকবে। আমি সে সবের উত্তর দিতে পারি না।

মনীষা—কেন, সে আর এমন শক্ত কাজ কি ? আমার যদি ও ক্রমাগত প্রশ্ন কোরে যায় আমি অনর্গল উত্তর দিয়ে যেতে পারি।

কাশী—জানি, কিন্তু আমি একটা উত্তর দিতে গেলেই হয়তো সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে !

মনীষা—এমন যদি উত্তরের ভেদ তা'হলে কাজ নেই কথা ক'রে, চুপ করে থাকাই ভালো।

কাশী—কিন্তু মনি, প্রশ্ন যদি বারাল হয় উত্তর রুখে রাখতে হয় না, সে আপনাই আসে। চুপ কোরে থাকলেও স্তব্ধতা বা বুঝে নিতে মানুষের ঘেরী হয় না।

মনীষা—এতো যদি কাজামা, তা হ'লে প্রশ্নকর্তাকেই বোলে দিতে হয় যে, ওহে বাপু, প্রশ্ন তুমি ঘোটেই কোরে না। —বেশ আমি তাই বলে ছোব'খন। তোমার ভাবনা নেই।

কাশী—না-না-না !

মনীষা—কেন তুমি বারণ কোরছ ? বিবরটা সরল হ'রে যেত বোলে দিলে !

কাশী—আমি সরল হওয়া চাইনা। তুমি কোন কথা তাকে বলতে পারবেনা।

(মনীষা ক্রমকাল অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল)—বেশ, বলবনা। সে কিন্তু সব জানে।

কাশী—সে জানতে পারেনা। ল'দারে এমন কেউ নেই যে সে কথা তাকে বোলতে পারে।

মনীষা—তা জানিনা, কিন্তু কথাটা আর গোপন নেই। আমি পর্যাস্ত জেনে গেছি।

কাশী—কি তুই জানিস্ আমার বল।

(বলিয়া লুচুদৃষ্টিতে মনীষার হাত চাপিয়া ধরিল ; মনীষা ভয় পাইয়া গেল কাশীখরের কথা বলার ভঙ্গিতে, তথাপি সাহস লক্ষ্য করিয়া বলিল)

মনীষা—সে আমি বলতে পারবোনা।

(তীব্রস্বরে কাশীখর বলিলেন)

কাশী—তোকে বোলতেই হবে।

মনীষা—(কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল) উইলের কথা, উইলের কথা আমি জানি বাবা।

কাশী—ও, উইল। সে সবাই জানে। সে জানলে কারুর ক্ষতি নেই।

(কাশীখর মনীষার হাত ছাড়িয়া দিলেন। মনীষা লজলচোখে প্রস্থান করিল। প্রবেশ করিল দ্বিজেন)

কাশী—তোমার কি খবর ? ডাক্তার চলে গেল ?

দ্বিজেন—ডাক্তার চলে গেল—আমি বলছিলাম একটা নাম রাখলে ভালো হয় রাস্তিরে আগবার জন্ত।

কাশী—কেন, তোমার বা ?

দ্বিজেন—হা এমনতেই শুয়ে পড়েছে। মাকে কেউ দেখলে বরং ভালো হয়।

(ক্রমশঃ)



ধনিকের অপূর্ব খেয়াল

সুদীর ধনীর ঢলান। ব্যাঙ্কে বেশ একটা মোটা টাকা আর অল্প বেতন বাপ মারা যায়। এবং হঠাৎ এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে প্রথমতঃ সুদীর বিশেষদ্বারা হয়ে উঠল। তারপর এলব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে সুদীরেরও তাই হল। অর্থাৎ সুদীর বীরে ধীরে ধীরে পাপের পঙ্কিল পথে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু লব কিছুই একটা সীমা আছে। তাই সুদীরেরও তার চিরচরিত অভ্যস্ত জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেল। যে দুর্দমনীর বেগে সে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক ততখানিই বিতৃষ্ণা নিয়ে সে ঘরেই চূপ করে বসে বসে বসে। কিন্তু তাতেও তার মনে কোন শান্তিই এলনা। শরীরও ভেঙ্গে পড়ল। অগত্যা একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সুদীর ডাঃ প্যাটেলের কাছে উপস্থিত হল। ডাক্তার এতদিন সুদীরের কোন লক্ষ্যই পছন্দ করত না। সুতরাং সুদীরকে দেখেই ডাক্তারের ঐর্ষ্যচ্যুতি হল। তিনি সুদীরকে এই অকারণ কুড়ুমির জন্য খুবই ভিত্তিকার করেন এবং বলেন বেশের যত ধনী আছে তাই বেশের অলসতার সমাজের খুবই ক্ষতি সাধন হয় এবং এ সকল দ্রুতত না হলে সমাজের ও বেশের কোনই উন্নতি নাই। সুদীর তখন প্রতিজ্ঞা করেন কপর্দক-হীন অবস্থায় ৩০০ শত দিনের জন্য সে বিশেষে বাহির হবে; এবং যদি কোন প্রকারে সে কোন সাহায্য নিজ বাড়ী থেকে নেয় তাহলে একটা মোটা টাকা সে ডাক্তারের হাশপাতালে দিবে।

অতঃপর সুদীরের জীবনে এক নূতন অধ্যায় শুরু হল। পকেটে একটা পরশা নেই—অথচ নিজের পায়ে নিজেকে ঝাড়াতে হবে, একটি পরশাও যদি সে সাহায্য নেয় তাহলে প্রতিজ্ঞায় সে ডাক্তারের কাছে হেরে যাবে।

প্রথমেই সুদীর নিজের নাম বদলিয়ে নূতন নাম কল "ভিন্ন", এবং নানা জায়গায় চাকুরীর লক্ষ্যে ঘুরে বেড়ানো লাগল।

নানা ঘটনার পর অবশেষে এক লাবন কারখানায় সে চাকরী পেল। এই লাবন কারখানার কর্তা শ্রীমতী শরদার সঙ্গে সুদীরের খুব বন্ধুত্ব জন্মে কিন্তু চাকরী সুদীরের অপূর্ণ নেই। তাই তার এই চাকরীটিও গেল। কিছুদিন বাব শ্রীমতী শরদারও উক্ত কারখানা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন কারখানার মালিকের প্রেমে নিবেদনের ফলে।

অতঃপর নানাপ্রকার ষাত প্রতিঘাতের পর বহুদিন বাবে পুনরায় সুদীর ও শরদার দেখা হয়। কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ, তাই একদিন সুদীর ও শরদাকে ফেলে যেতে হয়। অতঃপর বিরূপে তাহার জেল হইতে অব্যাহতি পায় সুদীরকে নিজ ভাগ্যাবশেষে বিরূপে লোকের কাছে হস্তান্তর হইতে হয় ইত্যাদি সুদীর মনস্তত্ত্বমূলক ঘটনার সমাবেশ আপনি লাগরের ছবি "৩০০ শতদিনের পরে" দেখিতে পাইবেন। ছবিখানি দীর্ঘই প্রভাত নিনেমায় দেখান হবে।

হিমালয়-কী-বেটি

ভাবনানী ছবি "অমর প্রেম" অথবা "হিমালয়-কী বেটি" প্রভাত নিনেমায় তৃতীয় লপ্তাছে পড়ল। এনাকী রমা রাওয়ের অভিনব নৃত্য এবং প্রফেশর রামানন্দের অভূতলীয় লজ্জিতের সংমিশ্রনে ছবিখানি হইত্যাচে অনবদ্য। তরুণ হিন্দি খুবই লক্ষণ থাকায় বাঙ্গালী দর্শকের বৃত্তিতে কোনই অল্পবিধা হয় না! এবং যতই বিন যাইতেছে ছবিখানির জনপ্রিয়তা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

ছবিখানার প্রধান লক্ষণ হইতেছে কাশ্মীর ও হিমালয়ের নয়ন মনোহর দৃশ্যাবলীর সমাবেশ। আপনি কলিকাতাতেই কাশ্মীর ও হিমালয়ের দৃশ্য দর্শন করিতে পাইবেন।



প্রযোজ শিল্পী : জ্যোতিষ ব্যানার্জি
আলোক চিত্র-শিল্পী : যতীন দাস
লক্ষ-হস্তী : নুপেন পাল, ভূপেন ঘোষ
ভূমিকায় : রাণীবালা, দেববালা, ছায়া, নরেন্দ্র মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায়, মনমথ পাল (দাদু বাবু), কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শীঘ্রই রূপবাণীতে
মুক্তি-লাভ করিবে

শ্রীমতী সাধনা বসুর অপূৰ্ব অভিনয় নৈপুণ্য
মৃত্ত হইয়া উঠিবে



শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের অনবদ্য অবদান
পরিচালক : শ্রীমধু বোস

—*—

—অংশীদার—

অহীন্দ্র চৌধুরী, তুলসী লাহিড়ী
ধীরাজ ভট্টাচার্য, সত্য মুখার্জি

একমাত্র পরিবেশক :

এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটস্

বিঃ, ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা।

টেলিগ্রাম : ফিল্মটকস.

কোন কলি ৩৬২৫ এবং ৩৬৩৬



(বিলাসী)

নীতীন বসু

পরিচালক নীতীন বাবু তাঁর নতুন ছবির কাজ গেল ২৯শে জুন আরম্ভ করে দিয়েছেন। মাত্র গেল ১৬ তারিখে 'দেশের মাটির' কাজ তিনি শেষ করেছিলেন। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারতের কোন পরিচালকই নতুন ছবি আরম্ভ করবার কল্পনা করতে পারেননা।

এই ছবির ঐক্যমান নাম দেওয়া হয়েছে 'শত্রু'। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে সাইগল, লীলাবেশাই, দেববালা, বিক্রম নাহার, শৈলেন চৌধুরী, হুমা, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, টোনা রায়, নাজাম প্রভৃতিকে।

প্রথম দিনে একটি বিশিষ্ট হোটেলের লুপ্ত তোলা হয়েছে। রুগ্ন সাইগলকে হোটেলে বেশ ঠাণ্ডা সরবৎ খেতে দেখা গিয়েছিল। হোটেলের ম্যানেজার বোকেন চট্টোপাধ্যায় লকলের তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছিলেন।

এ ছবির শব্দ যন্ত্রের কাজ করছেন সুকুল বসু আর ক্যামেরার হাতল ঘোরাচ্ছেন অমূল্য মুখুজে, পরিচালক নীতীন বাবুর আদেশ মত। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন পঙ্কজ মল্লিক।

অধিকার

ডাইরেক্টর প্রমথেন বড়ুয়া তাঁর বইয়ের উত্তর লংকরণই গ্রাস শেষ করে ফেলেছেন। চার মাসের মধ্যে অধিকারের মতন ছবির উত্তর লংকরণই শেষ করা নেহাৎ বাজে কথা নয়। তবে ছোট্টই বাবু ও বড়ুয়া নাহেবের একত্র সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই এই অদম্য

লুপ্ত হয়েছে।

এ ছবি শেষ হতে আর বোধ হয় এক মাস লাগবে। 'Dream land' এর একটি বিরাট সেট তৈরি হচ্ছে।

দেশকী বসু

পরিচালক দেবকী বসু এবার নিউ-থিয়েটারের হ'নস্বর ষ্টুডিওতে তাঁর পরবর্তী ছবি তুলবেন, এই রকমই স্থির হয়েছে। দেবকী বাবুর পরবর্তী ছবির গল্প হচ্ছে বাঙলা দেশের চিরপরিচিত একটি 'লাপুড়ে'র কাহিনীর উপর ভিত্তি করে। ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে কাজ নজরুল ইসলাম এই গল্পাংশ তৈরি করেছেন। দিনারিও লিখেছেন দেবকী বাবু নিজে।

যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় এ ছবিতে স্থান পাবে পাহাড়ী লাভাল, কাননবালা, মেনকা, বিনয় গোস্বামী, কুমু চন্দ্র দে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রতীন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এছবির কাজ আরম্ভ হ'বে 'অধিকারের' কাজ শেষ হলেই।

স্ট্রীট সিঙ্গার

আবহাওয়া ভাল থাকার দরুন পরিচালক ফনি মজুমদার যেন লবলাচীর মত তড়িৎকর্মা হয়ে গিয়েছেন। এঁরকে গানের পর গান তোলা হচ্ছে। ওঁরকে আগুনের লুপ্ত খতম করে নতুন লেটের কাজ হচ্ছে। সাথে সাথে সুরাঙ্গ বৃক্সে location-এ গিয়েও ছবি তুলে আসতে। বাচ্চা ভুলুয়া ও মজুম, একটি ছোট

লুপ্ত ছাড়া আর সবই তোলা হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির বাধাকে অস্বীকার করে বলে ফনি পণ করেছিল। তার সেই পণ সে রক্ষা করেছেন। ষ্টুডিও হতে বহু মাইল দূরে অজপাড়া গাঁয়ের আশ্রমের নগ্ন ছাটকে জীবন্ত করে সে যে লুপ্ত কাল তুলে নিয়ে এনেছে, তা শুধু নয়নতৃপ্তি দায়ক নয়—লক্ষ্যপ্রকার গ্রাম্য পরিবেষ্টনীতে অপূর্ণ। গ্রামের লজ্জা সম্পূর্ণ অপরিচিত সুখীর রেখাকে গ্রামের লোকজন বালক বালিকাধ্বের লজ্জা এমন ভাবে মিশিয়ে দিয়েছিল যে, না জানা থাকলে বোঝা শক্ত ছিল যে এরা গ্রামের কেলে নয়। লজ্জা, গ্রাম্য পথে গেয়ে গেয়ে ভিখ্যো করে ভেড়াচ্ছে, না অভিনয় করছে মাত্র।

অভিলাষ

আর একটি নতুন 'লেট'-এ, এই হুপ্তার মাঝামাঝি থেকে আবার 'অভিলাষ'-র চিত্র-গ্রহণ শুরু হোল।

গল্পের নায়ক অরেন্দ্র নাথ, ব্রজবাবুর বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কেমন কোরে আশ্রয় লাভ কোরেছিল—সে বিবরণ আপনাদের গত মাসেই জানিয়েছি।

মাধবীর ছোটবোন প্রমীলা, এই নতুন মাস্টারটিকে খুশী মনেই গ্রহণ কোরেছে।

কিন্তু বিরোধ বেধে গেল মাধবীর। এই আপন তোলা, আত্মনির্ভরতা শূন্য, অদ্বুত জীবটির স্বভাবের পরিচয় পেয়ে। মাধবীর কাছে—প্রমীলাও যেমন, তার মাস্টারটিও

ভারত-ভূমিস্বাধীন দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

ওমনি। হ'জনেই ছেলে-বাহুব। প্রমীলা যেমন বোঝে না তার কখন কী বরকার তার ম'ঠায়ও সেই রকম। নিজের কিছু বোঝেনা অথচ অলসে এমন জিনিষ চেরে বসে যে মাথবীকে লামলে উঠতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়। তবু একজন বাইরের পড়বার ঘরে বসে, আপন খেরাল-ধূলী মত জিনিষের হুকুম করে, আর একজন অন্যর মহলে, তার নাগালের বাইরে থেকেও লে হুকুম তামিল কোরে কত না লাঞ্ছনা লাভ করে।

এই মেহমদী, লক্ষ্মী, করুণাময়ী নারী 'বড়'বড়'র পিতার আশ্রয় এনে, পলাতক দুই পুত্র সুহ্রেস্ত্র নাথের জীবন নাট্যে যে বিপ্লব ঘটাইল—তারই পূর্বাভাস উপরের দৃষ্টে সূচিত হ'বে। এই দৃষ্টান্তটির চিত্র-গ্রহণ, অমর মল্লিকের নিপুণ পরিচালনাধীনে সঙ্গতি তোলা হচ্ছে।

এই চিত্রে নায়কের ভূমিকার অপূর্ণ অভিনয় কোরছেন—যশবী ও প্রিয়দর্শন নট—পাহাড়ী লাভাল। ছাত্রী প্রমীলার ভূমিকার শ্রীমতী চবির অভিনয়ও বিশেষ ছবির গ্রাহী হচ্ছে বোলে জানা যায়।

অভিজ্ঞান

গত-পূর্ব লগ্নাহে, লাহোর, অমৃত নগর এবং দিল্লীতে, 'অভিজ্ঞান' চিত্রের হিন্দি সংস্করণ সূক্তি লাভ কোরেচে এবং লক্ষ্মীই বিচিত্র ঘটনাবলি লমাজ-চিত্রটি দর্শক মহলে বিশেষ লমাহার লাভ কোরেচে, এ লংবাৎ আমরা পেরেচি।

এই লগ্নাহ থেকে বোঝাই 'মিনার্ভা' টকীতে 'হিন্দি অভিজ্ঞান' প্রবর্তিত হবে।

জনক নন্দিনী

পরিচালক ফণী বর্মা জনকনন্দিনীর কাজ নিয়ে বেশ এগিয়ে চলেছেন। গেল লগ্নায় যে দৃষ্ট তোলা হয়েছে তাতে দেখান হয়েছে

যে জনক (তুলনী চক্রবর্তী) মাঠ থেকে একটা লম্বজাত শিশু কুড়িয়ে পান। পরে এক বিকুৎসবির রাণী (দেববালা) কে তিনি এই শিশুটিকে উপহার দেন। রাজ্যের পুরোহিত এই লম্ব এই শিশুর নাম দেন সীতা।

নন্দ নারায়ণ

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন একটা বিশিষ্ট দৃষ্টের মহলায় বাস্তু আছেন। কালী ফিল্মসের জয়নারায়ণ সুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এই ছবির 'কৃতবর্ষ'র ভূমিকার নামচেন। শ্রীমতী রাণীবালা 'জয়ন্তীর'র ভূমিকার নামবে এও ঠিক হয়েছে।

সখের শন

ডাইরেটর হরি-ভক্ত এই ছবির কাজ ইট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। নারিকা রেখা (শীলা হালদার)

তোমার জাতি নেই, বিচার নেই, মরণ নেই
তুমি শুধু কল্যাণের প্রতিমা, তুমি মা আমার

ভারতবর্ষ

শুধু ভারতের কোলে ভূমিষ্ট হওয়ার অধিকারে নিজেকে ধস্ত মনে করিয়া, দেশ জননীর লতা রূপ যে উপলব্ধি করিয়াছিল সেই নব-জাতীয়তার বিশারী

কোরা

দেবদত্ত ফিল্মসের

মহিমাষিত
চিত্র-কথা

পরিচালক

শ্রীনরেশ বি

ভূমিকায় :

রাজলক্ষ্মী
রাণীবালা
প্রতিমা দাস গুপ্তা
দেববালা
রমলা
সুহাসিনী
ইলা দাস
মনোরমা

চিত্র-পরিবেশক

প্রাইমা ফিল্মস লি:

H. P. S.

ও তার তাই বিল (জহর গাঙ্গুলী) কে নিয়ে করেবটা লুপ্ত তোলা শেষ হয়েছে।

রূপশাণী

এই চিত্রগৃহে নিউ থিয়েটারের নবতম চিত্র অভিজ্ঞান লগু'হের পর লগু'হ ধরে বিপুলভাবে দর্শক আকর্ষণ করেছে।

বাঙলার প্রত্যেক প্রগতি পন্থি তরুণ-তরুণীর এ ছবিখানি দেখতে যাওয়া উচিত। একটি ভাগ্যবিড়ম্বিতা, লক্ষ্যহারা নারীর জ্বর রহস্তের অপরূপ কাহিনী প্রত্যেক জ্বরবান নর-নারীর অন্তরে লাড়া জাগিয়ে তুলবে।

বঙ্গীয় মহিলা শাখার তত্ত্বাবধানে বঙ্গা-নিবাসক ভাণ্ডারের সাহায্যকরে প্রফুল্ল পিকচারের সহযোগিতায় মঙ্গলবার ১২ই জুলাই লাড়ে নটার প্রভাত সিনেমার স্ট্রামস্কয়ের নেতৃস্থানীয় ও চিত্র প্রদর্শন টিকিট প্রাপ্তি স্থান :-

মিসেস এ. এন চৌধুরী

৪২নং ঝাউতলা রোড বালিগঞ্জ

মিসেস কে. সুকুদ্দিন

২৪নং থিয়েটার রোড

প্রফুল্ল ঘোষ

২০ নং নন্দন রোড

চিত্রা

গত তিনমাস ধরে 'বিশ্বপতি' লাক্সের লগে 'চিত্রা'র আলর জমিয়ে আছে। এই শনিবার থেকে পঞ্চম লগু'হে পড়লো। লজীতাহুয়াগী নর-নারী মাজেই বিশ্বপতি বেধে যে পলকিত হবেন, একথা জোর কোরে বলা যায়। তা'হাড়া উৎকৃষ্ট অভিনয়ের আকর্ষণে ও যে 'বিশ্বপতি' অনেকের উপরে, এ কথাটিও অস্বীকার করবার উপায় দেখি না।

পূর্ণ থিয়েটার

এখানে আগামী শনিবার হইতে "এছের ফের" তৃতীয় লগু'হে পড়লো। ছবিখানার জনপ্রিয়তা বেশ অনুভব করা যাচ্ছে তার কারণ এখনো জন লমাগম কোন মাত্রায় কম নয়—আর ছবিখানার মধ্যে দেখবার বেশ মাল মসলা আছে যাতে দর্শকগণ তৃপ্ত হবেন।

ভ্যারাইটি ফিল্মস

রীভেন প্রাণ্ড কোম্পানীর ভূতপূর্ব সুযোগ্য ম্যানেজার নলিনীরঞ্জন বসু উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সকল লক্ষ্যে মিলিত কোরে ৬৩ নং বার্লিংটন স্ট্রীট 'ভ্যারাইটি ফিল্মস' নামে চিত্র-নির্মান ও পরিবেশনার একটি অফিস খুলছেন। নলিনীবাবু একজন স্বাবলম্বী ও কণ্ঠ ব্যক্তি। কুড়ি বছরের ওপর এই কার্যে তিনি ব্যাপৃত আছেন—তা' ছাড়া তিনি নিরহঙ্কারী ও অস্বার্থিক। নিজের কর্মশক্তি ও ব্যবহারে তাঁর অত্যন্ত কার্য যে অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হবে—এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা কোরতে পারি।

আমরা শুন্লাম ইতিমধ্যেই নলিনীবাবু একটি প্রতিষ্ঠানের লতল চিত্রের পরিবেশক-রূপে নিয়োজিত হ'য়েছেন এবং পূজোর আগেই এছের কাছ থেকে একখানা পৌরাসিক ছবি পাবেন আশা করেন।

গণোরিয়া ও সিফিলিস

নূতন বা পুরাতন ও ঘেরনি জটিল ও কষ্টকর হউক না কেন

"ভি ডি কিউরা"

(Vee Dee Cura)

তিনদিনে নিশ্চল করিবে
গ্যারান্টি দেওয়া হয়—মূল্য ৫০।

হিলিং হোম

৫৬. সাউথ রোড ইন্টালি, কলিকাতা

বি বি থ

কলিকাতা প্রদর্শনী সংসদ

লগু'হের বঙ্গা নিবাসী শ্রমিকের সাহায্যার্থে আগামী ১২শে ও ২০শে জুলাই কাষ্ট এম্পারার রক্তমঞ্চে একটি জলমায় ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রভাত শুভ এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার ভার নিয়েছেন।

স্বর্গীনা কাভ্যারগী দেবী

লকিপুয়ের রায় লজীতনাথ চৌধুরী মাতা কাভ্যারগী দেবীর দানদাগর শ্রা গত ৪ঠা জুলাই কলিকাতার মহানমারো লম্পন হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন উপাচারের মধ্যে দুই হাজা তোলা ওজনের ধৌপোর জিনিষপত্র বেণে হয়। বাজলার বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে স্বাধ্যায়্য বিহারের পর বহিঃস্থানায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজ করান হয়।

শুভ-মিলন

প্রাইমা ফিল্মলের শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের ভগ্নী শ্রীমতী প্রতিমার সহিত গায় বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ঘোষের প্রথম পুত্র শ্রীমান মোহি



কুমারের শুভ-উদ্বাহ গত ১০ই আষাঢ় লম্পা হইয়াছে—এই উপলক্ষে নিরোবচন ঘোষ মহাশয়ের বৃন্দাবন লেনস্থ বাসভবনে বা বিশিষ্ট ব্যক্তির লম্বাবেশ হয় এবং তাঁহার লকলেই আহার আপ্যায়নে ও তুরি ভোজে পরিতুষ্ট হন। আমরা নব লম্পতীর শান্তি নবজীবন কামনা করি।

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—আঠার—

ম'তালের মত টলিতে টলিতে অরুণ বাটা ফিরিল। তাহার যেন লম্বু গোলমাল হইয়া গিয়াছে, সে আজ যেন নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেছেন। সে বাড়ী আলিয়াই শুভ্রকে ডাকিল ও তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল শুভ্র ও কণার মধ্যে কে অধিকতর সুন্দরী। শুভ্রার শাস্ত, মৃদু, সুগৌরব মুখখানিতে শারদপূর্ণিমার মৃদুতা থাকিলেও কণার রোগক্লিষ্ট মুখে যে মাধবতা আছে সে মাধবতা তাহাতে নাই। অরুণের ব্যবহার দেখিয়া শুভ্রা ভিজালা করিল, “অমন করে কি দেখছ আমার?”

“কিছুনা” বলিয়া অরুণ শুভ্রাকে ঠেলিয়া দিল।

“লভ্য বলনা কিছু দোষ করেছি কি আমি,” বলিয়া শুভ্রা অরুণের নিকটে আসিল।

উত্তরে অরুণ বলিল, “তুমি কোন্ লাহসে আশাকর যে আমি চিরদিনই তোমার অনুগত থাকবো?”

“এরকম যে আশা আমি করি তা তো কোন দিনই তোমায় বলিনি। তবে কথাটা যখন তুললে তখন শুনে রাখ; লভ্য আমার বিশ্বাস যে তুমি চিরদিন আমারই থাকবো।” বলিয়া শুভ্রা তাহার দিকে স্থির-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। অরুণ আর কিছু বলিলনা; শুভ্রার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া আপনমনে গলার টাই খুলিতে লাগিল।

বৈকালেই অরুণ কণার নিকটে গেল। তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিল সে পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে। অরুণ কণাকে বলিল, “তুমি হয়ত বিশ্বাস করবেনা কণা আমি প্রথম দিন থেকেই তোমায় ভালবেসেছিলাম।”

কণা চুপ করিয়া রহিল। অরুণ পূর্ববৎ বলিয়া যাঁতে লাগিল “আমার দেখার নেশা তোমায় যেমন পেয়ে বসেছিল আমাকেও তেমনিই পাগল করে তুলেছিল।”

কণা বলিল, “তাই বুঝি আমার দেখলে মরে যেতেন।”

“হ্যাঁ, লভ্যই তাই! পাঁচ আমার ভক্ত তোমায় ধরা পরতে হয় সেই ভয়ে। আমার বিশ্বাস কর কণা তুমি একদিন আমার ক্ষেপিয়ে তুলেছিলে। তারপর যখন আমার না বলে তুমি আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে ক’দিন যে কি লাংঘাতিক নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা শুধু আমিই জানি।”

বাধা দিয়া কণা বলিল, “আমার কমা করুন ডাক্তারবাবু, আমার কমা করুন। আমি যে কেন গিয়েছিলাম তা বললে হয়তো আপনি বিশ্বাসই করবেননা।”

“নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবো” বলিয়া অরুণ কণার হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইল।

কণা বলিল, “যখন আপনার চিন্তা আমার বিশেষ্য করে তুললো তখন আপনাকে দেখবার পিপাসা বেড়ে উঠলো শতশুণ বেশী। আপনি ছুপুরে যখন ঘুর্ন্তেন তখন কতদিন চোরের মত আপনার ঘরে গিয়ে আপনার যুবন্ত মুখখানাকে দেখে এসেছি। আপনার

স্পর্শ পাবার জন্যে আমার বেহের প্রত্যেক পরমাত্ম ব্যাকুল হয়ে উঠতো ডাক্তারবাবু। কিন্তু আপনাকে পাবার আশা আমার ছিল না। দ্বিধির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করবার সাহস, শক্তি ও রূপ যে আমার সেই তাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই যেদিন অবলবাসু আমার ধর্মপত্নী বলে গ্রহণ করবার লোভ দেখালেন সে লোভ আমি ছাড়তে পারিনি ডাক্তারবাবু। পাঁচ আপনাকে দেখলে যাওয়া না হয়, পাঁচ যেতে না পারি তাই পালিয়েছিলুম বাড়ী থেকে চোরের মত অন্ধকারে মুখ ঢেকে।” কণা উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার লক্ষ্যে ঝামতে লাগিল। ডাক্তার অবিলম্বে তাহার মুখে ছুই ড্রাম ব্রাণ্ডি ঢালিয়া দিলেন।

কণাকাল কণা বিশ্রাম করিয়া আবার বলিতে লাগিল, “পালিয়ে গিয়েই কি আপনার চিন্তার হাত থেকে রক্ষে পেয়েছি? লেখা-নেও ঐ একই চিন্তা আমার আর অবলবাসুর মধ্যে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদের আগুন জালিয়ে দিলে। অবলবাসু আমার কাছে বললেই আপনার সঙ্গে তার তুলনা করবার ইচ্ছে হতো আর তার ফলে অবলবাসু নেমে যেতেন অনেক নীচে। তবুও ডাক্তারবাবু, অনেক চেষ্টা করেছি আমি আপনাকে ভুলতে, আপনার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে অমলের সেবা করতে। মানুষ কায়মনোবাক্যে যা চায় হয়তো ভগবান তাকে তাই দেন। অমল আমার যখন ত্যাগ করে গেল আমি ভাবলাম যে আমার শাপে বর হল। আপনার কাছে ছুটে এলাম অনেক আশা নিয়ে। তারপর যা হয়েছে আপনিই জানেন। আমি বেশ বুঝেছি আমার বেঁচে থাকবার কোন অধিকারই নেই। আমার একমাত্র লাহসনা একমাত্র শক্তি মৃত্যুতে। আপনার কাছে শুধু একটা প্রার্থনাই আছে আমার। আমার সেই চির আকাঙ্ক্ষিত বন্ধুকে পাবার সুযোগ করে দিন। অনেক প্রার্থনা আছে

আপনার এমন একটা ওষুধ দিন যা খেলে আমার ঘুম আর না ভাঙে।”

অরুণ বলিল, “আমার আর ব্যথা কিওনা কণা। আমি আর পারি না। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমিও ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছি। আজ সত্যি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। কণা, একটা বার বল তুমি আমার। সত্যি, তুমি ভালবাস আমায়।”

কণা উত্তরে বলিল, “আমি পতিতা, আমার কথার মূল্য কি বলুন তো?”

“মূল্য আছে বৈ কি কণা, আজ আমি তোমার চাই আমার নিতান্ত আপনায় করে নিতে; একবার আমার বল সত্যি তুমি আমার ভালবাস। আমি তোমার বাঁচিয়ে তুলবো, সুস্থ করে তুলবো তোমার, জীবনের সবটুকু ভালবাসা তোমায় দিয়ে নিজের অপরাধের শাস্তি নেব। আমি চাই তোমার চিরমলিন মুখে হাসি ফুটাতে, তোমার জীবনকে দেবতার আশীর্বাদ করে তুলতে। অনেক কষ্ট পেয়েছে তুমি, আজ সকল কষ্টের বোঝা দূরে সরিয়ে অভিনব বেশে তোমার সাজিয়ে আমার জীবনের প্রবর্তার করে নিতে।” অরুণ এই বলিয়া কণার শীর্ণ দেহখানি আপনায় হৃদয়ের স্নিকটে তুলিয়া ধরিল—চক্ষু বুজিয়া কণা বলিল, “ওগো, দেবতা আমার, সত্যি বল এ আমার ইহকাল না পরকাল? আমি জীবিত না মৃত? এ আমার জাগরণ না মুক্তি?” কণার দুর্বল মস্তিষ্ক এত উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিল না; ধীরে ধীরে তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

—উনিশ—

উপরোক্ত ঘটনার পর গত দুইমাস হইতে অরুণের যে অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে লাক্ষী শুভ্রা তাহা নীরবে লক্ষ্য করিতেছিল। প্রথম প্রথম অরুণ অধিক রাত্রিতে বাটী ফিরিতে আরম্ভ করিল। পরে বারটা একটা বাজিতে ঘুম করিল; আজকাল মধ্যে মধ্যে সে বাটীতে আলাও বন্ধ করিতেছে! শুভ্রার

লক্ষ্যে সে সম্পূর্ণ উৎসাহীন। শুভ্রা বাঁচিয়া আছে না মরিয়াছে অথবা সে কিরূপ আছে তাহাও অরুণ একবার খোঁজ করেনা। শুভ্রা যে তাহার স্ত্রী, সহধর্মিণী—সে যে তাহার জীবন মরণ শুভাশুভের জ্ঞাত দায়ী একথাও অরুণ ভুলিয়া গিয়াছে। অবজ্ঞা, তাক্ষিলা, অপমান আজ সেই আদৃত্য শুভার অঙ্গের ভূষণ। তথাপি শুভ্রা প্রাণপণে চেষ্টা করে স্বামীর সেবা ও মনোরঞ্জন করিতে। দুইমাস পূর্বে বাহার্য অরুণ ও শুভ্রাকে দেখিয়াছে আজ তাহার কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিবেনা যে তাহারাই সেই প্রীতিপ্রণয়বদ্ধ দম্পতি। এই দুইমাসে অস্তুতঃ পনর রাত্রি শুভ্রাকে সেই বিরাট জনহীন পুরীর মধ্যে একাকিনী রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে। অথ যে করতল অরুণ বাটীতে রাত্রি যাপন করিয়াছে সে করতলও তাহার সহিত এমনি কটু ও বিরক্তিকর ব্যবহার করিয়াছে যে তাহাতে শুভ্রা যেন মরমে মরিয়াছিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই তাহার কোন অপরাধ ও কোন ব্যবহার তাহাকে তাহার চির আশ্রয়ের স্বামীর প্রেম হইতে বঞ্চিত করিতেছে। তাহার গৃহদেবতা গোবিন্দজীর চরণে তাহার হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া স্বামীকে ফিরাইয়া দিবার জন্ত কত মিনতি করিয়াছে, কত অশ্রু ফেলিয়াছে তথাপি পাষাণ দেবতার হৃদয়ে শুভ্রার প্রতি করুণার লক্ষ্য হয় নাই। শুভ্রা একদিন অরুণকে বলিল, “দেখ আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি আমাকে বল—কেন তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ? আমার বিয়ে কি তোমার সেবা চলে না এতই পূরোণে হয়ে গেছি আমি? অরুণের মনে কণিকের জন্ত শুভ্রার প্রতি প্রীতির লক্ষ্য হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, শুভ্রাকে সে বুকের উপর টানিয়া লইয়া চুম্বন করিতে গেল কিন্তু পারিল না—সে প্রব্রুহুর্ভে তাহাকে

পশ্চাতের দিকে ঠেলিয়া দিল ও বলিল, “তুমি আমার স্ত্রী তাই তুমি লাহন করলে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে। ভবিষ্যতে মরণ রেখ স্ত্রী আর দানীতে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাকে ঘরে রেখে বড় জোর দুটো খেতে পরতে দেওয়া যেতে পারে—তার সঙ্গে প্রেম করা চলে না।”

অরুণ খোঁচেরে চড়িয়া চলিয়া গেল। সেই জনহীন কক্ষে শুভ্রা দাঁড়াইয়া রহিল পাষাণী প্রতিমার মত। বন্ধে তাহার অভিমানের দারুণ দীর্ঘশ্বাস—চক্ষে তাহার অবমাননার অশ্রু।

* * *

“হ্যালো, হ্যালো, লাউথ কাইড এইট নিকস্। হ্যাঁ, কে আপনি? আমি রায় বাহাদুর দিলীপ রায়ের বাড়ী চাই। কে বাবা? ভাল আছ হ্যাঁ—আমি বেশ আছি—না কোন কষ্ট নেই তো? কে বলে তোমার? না, না, উনিতো আমার অবজ্ঞা করেন নি। হতেই পারে না। কৈ, এক-দিনও উনি রাত্রিতে বাইরে থাকেন না বাবা। হয়তো কেউ তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্তে বলেছে ওই সব মিথ্যা কথা-গুলো। আমি বেশ আছি, ভাল আছি, কোন দুঃখ নেই আমার।”

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে যে প্রশ্ন আসিল তাহার উত্তরে শুভ্রা বলিল, কৈ না, গলা ভার হতে যাবে কেন? তোমার যত চলেমাহুদী। আমার কষ্ট দুঃখ হলে তোমার জানাবোনা সে কি হয়? পৃথিবীর সবাই আমার ফেলতে পারে কিন্তু তুমি যে কোনদিন পারবে না তা আমি জানি।”

শুভ্রার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল কষ্ট রোধ হইতেছিল সে তাড়াতাড়ি টেলিফোন ছাড়িয়া দিল। টেলিফোনের ঘটা পুনরায় লক্ষ্যে বাজিয়া উঠিল। শুভ্রা নিজেকে লামলাইয়া লইল। চক্ষু বুজিয়া মিলিতার

তুলিয়া বলিল, “না আমি তো ছাড়িনি, ওরাই বোধ হয় ডিনকানেট করে দিগেছিল। হ্যাঁ, এমনই ওরা। কখন যে কেটে যায় লাইন তার কিছুই ঠিক নেই। কি বলে? বাইরে বাব তোমার সঙ্গে? বেশতো, কিন্তু কে দেখবে ওকে? —ওইতো মুন্সিল। একবার সময়কে পাঠিয়ে দিওনা বাবা—আমার দরকার আছে। তুমি একদিন সকাল বেলা এসো। না, বিকেল বেলা রোজই আমার নিয়ে বেড়াতে বের হন কিনা। ডাক্তারেরা বলছে রোজ অনেক রাত্রি পর্যন্ত মাঠে বা গজার ধারে থাকতে ওকে। আমি না গেলে আবার বেতে চাননা উনি। সময়কে পাঠিয়ে দিও—ভুলোনা।

শুভ্রা টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাড়াইল। পিতার সহিত এতগুলো মিথ্যাকথা বলিয়া তাহার নিজের নিকট নিজেকে ছোট ও নীচ বলিয়া মনে হইতেছিল। সে আপনাকে সান্ত্বনা দিবার জন্ত আপন মনে বলিল, “ওঁর ঘোবের কথা বাবাকে বলে, তাঁর চোখে ওকে কিছুতেই ছোট করতে পারবো না আমি।”

—বিশ—

সময় দিলীপবাবুর ভাগিনের। তাহার ষপথ বয়সে দিলীপ বাবুর ভগ্নির দেহান্ত হইলে দিলীপবাবু তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন। সে এই বৎসর বি, এ, পাশ করিয়াছে। তাহার বর্ণ শ্রাম বা উজ্জল শ্রাম, দোহারী, কাবুলীধরণের কাপড় পরে, লম্বা ঝুলঙ্গী রাখিয়াছে। চুলগুলি কিছু বড়—কাবুলীধরের বাবরী করা চুলের অনুরূপ। বাল্যকাল হইতে ব্যায়াম করার তাহার ঘেঁহু পেশীবহুল ও সুগঠিত। ডিটেকটিভ নভেল পাঠ করিয়া এডগার ওয়ালেন, শার্লক হোমস্, কোনান ওয়েল, রবার্ট ব্লেক-এর মত একজন লেখক ও ডিটেকটিভ হইবার প্রবল বাসনা তাহার হৃদয়ে। একটা

রোমাঞ্চকর তথ্যের ভার কেন যে অস্তাবধি কেহ তাহাকে দিতেছেন ইহাই তাহার জীবনের একটা প্রকাণ্ড আকর্ষণ। সে লালবাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবিধ প্রকার পরচুলা, গোলছাড়ি, স্পিরিটগাম্ প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছে। বাজালী, মারোয়ারী বিহারী প্রভৃতি লোকদের পরিধেয় বিবিধ বস্ত্রাদি এমন কি দারবান চাপশাশী খানসামাদের পোষাকও সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু অস্তাবধি তাহা কাজে লাগাইতে পারে নাই। মাতুল তাহাকে একটা মোটর বাইক কিনিয়া দিয়াছেন তাহা পাইয়া ডিটেকটিভের বাসনা দৃষ্টিগত হইয়াছে। দিলীপবাবু যখন তাহাকে শুভ্রার নিকট বাইবার আবেদন করিলেন সে তখন একটা উত্তেজনাপূর্ণ নভেল পাঠ করিতেছিল। তাহা ত্যাগ করিয়া বাইবার ইচ্ছা সময়ের ছিল না তথাপি মামার হুকুম অমান্য করিবার সাহস তাহার ছিল না; তাই অধিক বিলম্ব না করিয়া সে শুভ্রার নিকট আসিয়া পৌঁছিল।

শুভ্রাকে দেখিয়াই সে চমকিত হইল— চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, “তুই এমনি হয়ে গেছিস দিদি! অকণবাবু কি চোখের মাথা খেয়েছে? ওঃ মায়া দেখলে ক্ষেপে যাবেন নিশ্চয়ই।”

শুভ্রা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, সে ভালই আছে। “ভাল থাকলে কেউ এমনি রোগা হয়? না কারো চোখে এমনি কালী পড়ে? জানিস, আজকাল আমি ভেলেমাস্ নই, ব্রীতিমত একজন ডব্ললোক—গ্রাজুয়েট। কি হয়েছে বলনা দিদি? আমার কাছে লুকুস্না কিছু।”

শুভ্রা বলিল, “তোকে একটা কাজ করতে হবে লম্বু। কিন্তু কাজটা হাতে নেবার আগে তুই দিবি কি যে বাবাকে যুগাকরে জানাবিনা।”

“কাজটাই আগে বল, আমি পারবো কিনা তবে দেখি।”

“খুব পারবি। কিন্তু দিবি না করলে কিছুতেই বলবোনা আমি।”

অগত্যা সময় শপথ করিল যে কোন ক্রমেই সে মাতুলের নিকট কিছুই প্রকাশ করিবেনা। শুভ্রা বলিল, “কাজটা বিশেষ কিছু নয়; একটা গোয়েন্দাগিরি, বুঝি?”

“গোয়েন্দাগিরি! সময় লাকাইয়া উঠিল। সে বলিল, ও কাজ আমি নিশ্চয়ই পারবো। কিন্তু কিলের গোয়েন্দাগিরি? খুন, ডাকাতি, চুরি না বার্গলারী?”

শুভ্রা বলিল, “না ওসব কিছুই নয় লম্বু, একটা কথা আমার জানবার দরকার হয়েছে। কথাটা হচ্ছে এই যে তোর জামাইবাবু, আজকাল লক্ষ্যার পরে কোথায় বান—কার বাড়ীতে—সে লোকটা কে? এই সময় লম্বাবু আমার এনে দিতে হবে বুঝি? কিন্তু উনি যেন জানতে না পারেন এ বিষয় লক্ষ্য রাখবি। বুঝেছিল!”

হতাশ হইয়া সময় বলিল, “এ আবার একটা কি কাজ, এতো ইচ্ছে করলে তোমার রামলাল চাপরাসীই এনে দিতে পারে। এতে না আছে একলাইটমেন্ট—না আছে রোম্যান্স—না আছে থ্রিল। এ আবার একটা কাজ?”

শুভ্রা হাসিল, “গাছে উঠতেই কি এক কাঁড়ি হয়? তুই যে রকম হতাশ হচ্ছিল তাতে বোধ হচ্ছে তুই পারবিনা। আর রোম্যান্স নেই তাই বা তুই জানলি কি করে।”

“সময় পারেনা এমন কাজ পৃথিবীতে নেই। আজ থেকে তিনদিনের মধ্যেই খবর এনে দেবো তোমায়। তবে একটা বেলা তোমার এখানে লুকিয়ে থাকবার জায়গা চাই।”

“বেশ, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।”

সময় বলিল, “ব্যাপারটা আমার খুলে বলনা দিদি কি হয়েছে?”

শুভ্রা বলিল, “আমিই জানি না তো তোকে কি বলবো? তবে এইটুকু বলতে পারি, কি জানি কেন উনি আমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। আজকাল বাড়ী করেন অনেক রাতে। হয়তো কোন সৰ্কেনেশে বন্ধু জুটেছে অথবা—”

সমর বলিল, “তুই মন খারাপ করিসনে দিদি। আমি সঠিক খবর এনে দেবই তোকে” তৎপরে দশ মিনিট কাল সমর নানাবিধ আলোচনা করিয়া প্রস্থান করিল।

শুভ্রা ভাবিয়া পাইলনা সে বাহা করিল ভাল কি মন্দ।

দুইদিন পরে বৈকালে যখন অরুণ গাড়ীতে উঠিয়া বলিল তখন একজন নবীন মারোয়াড়ী যুবক একটি মোটর বাইকে উঠিয়া বলিল ও অরুণের গাড়ীর পশ্চাতে অলঙ্কোই চলিতে লাগিল। লক্ষ্য সাতটার অরুণ ম্যাডেস্তিক হোটেলে নামিল ও লিফটে করিয়া উপরে চলিয়া গেল। অরুণের মারোয়াড়ী যুবক লিকটম্যানকে একটি টাকা বকুলিল দিয়া বলিল, এই ডাক্তার লাহেব যে কামরায় গেছে সেই কামরাটা যদি সে দেখিয়ে দিতে পারে তাহলে আরও এক টাকা বকুলিস্ পাবে। লিকটম্যান্ তাকে নিয়ে উঠলো তিন তলায়। যে ঘরখানি দেখিয়ে দিলে সে ঘরখানির নম্বর বায়ার। যুবকটি নোট বৃকে নম্বরটি টুকে নিয়ে চলো লোজা হোটেলের ম্যানেজারের কক্ষে। ম্যানেজার মারোয়াড়ী-টিকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, অকুণ্ঠিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপকা জরুরং করমাইয়ে।”

উত্তরে বক্তব্যার যুবক বলিল, “দেখুন, আমি বাঙ্গালী, প্রয়োজন বলেই এই পোষাকটা পরতে হইবে। দয়া করে একটি ইন্করমেশন দিতে হবে।”

ম্যানেজার কিয়ৎকাল সময়ের সুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, “আপনার বক্তব্যটা বলুন শুনি।”

সমর একটি হেট এক্সপ্রেস লিগারেট ম্যানেজার বাবুর হাতে দিয়া নিজেও লিগারেট ধরাইয়া লহজসুরে বলিল, “এই বায়ার নম্বর কামরায় কে থাকে আর কতদিন থেকে বর্তমান অধিবাসীরা ওখানে আছেন তা আমি জানতে চাই।”

ম্যানেজার ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন বলুন তো?”

“দেখুন, প্রয়োজনটা আজই বলতে পারবোনা মশায় তবে এইটুকু শুনে রাখুন এই লংবাড়টা আমি চাচ্ছি, এটা চেয়েছেন রায় বাহাদুর দিলীপ রায়, সি, আই. ই,।

“ওঃ, তাই নাকি, বেশ, বেশ, আপনি তাঁর কে হন বলুন তো?”

“আমি তার ভাগিনের। পোষ্যপুত্র বলেও অজ্ঞার হয়না।”

ম্যানেজার উঠিয়া সময়ের সহিত কর্মদিন করিয়া খাতা খুলিয়া বলিলেন, “এই যে পেরেছি—ওরা হচ্ছেন ডাক্তার আর মিলেস্ সেন। গত ১২ই মার্চ থেকে ওরা ওখানে আছেন—এই আড়াই মাস হলো আর কি?”

সমর নোট বৃকে লম্বা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ডাঃ অরুণ শুণ্ড কি এখানে রাজই আসেন?”

ম্যানেজার ডাক্তার অরুণের নাম শুনিয়া বিস্মিত হইল ও বলিল, “না মহাশয়, রাজ ত দুয়ের কথা আজ পর্য্যন্ত তিনি কখনও এলেননি বলে তো শুনি নি?”

“বলেন কি স্তার! আমি স্বচক্ষে তাঁকে ঐ ঘরে ঢুকতে দেখেছি।”

ম্যানেজার লিকটম্যানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কিছুক্ষণ পূর্বে কোন নতুন লোক ঐ ৫২ নং কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে কি না।

উত্তরে লিকটম্যান বলিল ডাক্তার সেন ভিন্ন গত দুই মাসে সে ঐ কক্ষে অপর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখে নাই।

সমর হুখিল তাহার তরীপতি এই হোটেলে ডাক্তার সেন নামে পরিচিত। কিছু মিলেস্ টী কে তাহা সে হুখিতে পারিল না। হোটেলের ম্যানেজার বাবুর নিফট হইতে বিহার লইয়া চিন্তাকুলচিত্তে সে বাটা ফিরিল। তাহার রাজিতে নিদ্রা হইলনা। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল এই মিলেস্ লোকটিকে কেনন করিয়া সে দেখিবে।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তারের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ওষধ

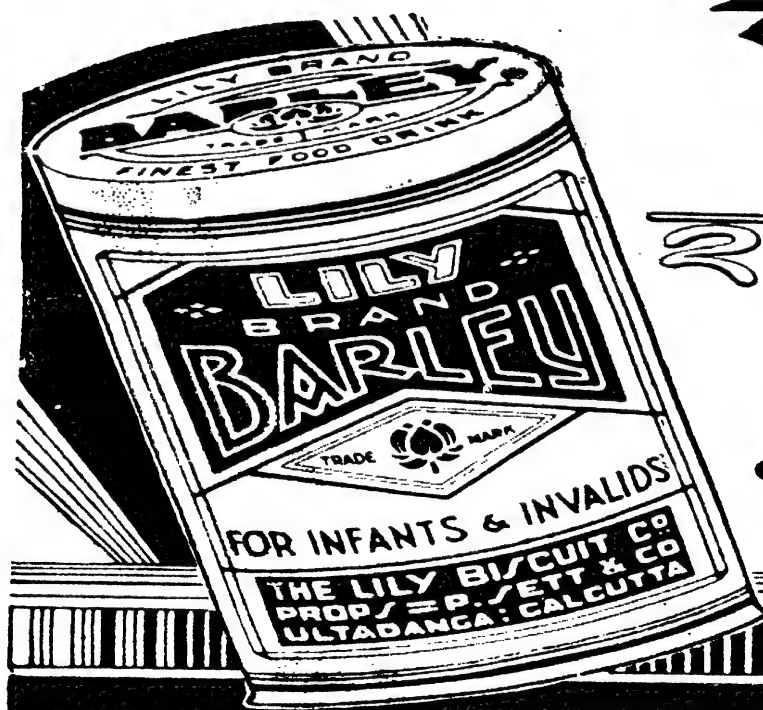
দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ওষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

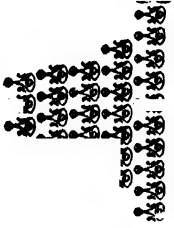


স্ব-মালি — তৈরি — লিলা ব্যাঙ

হওয়া চাই



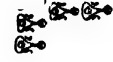
একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়



অজানার নামা

(গল্প)

মন্মথ কুমার চৌধুরী



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাহুব বধন চর্যলতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছায় তখনই সে হয়ে উঠে অভিযাত্রার ভাগ্যাবেশী। দৈবকে সেই শুধু উপেক্ষা করতে পারে, বুকে জ্বলছে যার যৌবনের তাজা আগুন। রক্ত, মানসিক যৌবন-পঙ্খ মাহুকের পক্ষে অনাগত দৈবের সর্ঘ্ষার পর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকেনা। মাহুব তখন লটারীর টিকেট কিনে, বকে কালীর পূজো দেয়, জ্যোতিষের কাছে হাত দেখাতে ব্যস্ত হয়ে ছুটে। সুপ্রিয়ের জীবনে এটা শুধু রুচ নয়—একটা মর্যাদিক ট্রাজেডি।

বেশ একটু রাত করেই সুপ্রিয় সে দিন বাড়ী ফিরেছিলো। রুণ শুধালে, “আজ এত ঘেরী বে? বেতনের দিন ছিলো বুঝি?”

পকেট থেকে ছুটে। নোট এবং কয়েকটা টাকা বের করে সুপ্রিয় জবাব দিলে “ছুটে টাকা খরচ করে এসেছি”...

বাধা দিয়ে রুণ বলে, যেটোর গিয়েছিলে বুঝি? তা কি ভবিষ্যৎ?

সুপ্রিয় হাসলে। অতি করুণ সে হাসি! কায়ার চাইতেও যা’ কুঞ্জী।—

—“পাগল হয়েছে? যেটোর বাব আমি! ছনিয়ায় আর মাহুব খুঁজে পেলো না।”

—চাপা আর্দ্রনাথের মতোই শুনালো তার কথাগুলো।

রুণ ঠোঁট জোলে চা’র জল চড়িয়েছে। লামনে লাজানো রয়েছে চা’রের লজ্জা। ঠোঁটে করেকটা হৃদয় দিয়ে রুণ সুপ্রিয়র কাছে এসে বলে,—“একদিন যেটোরে পেলো চলে

না—এক মধুর মক্ষার” কবিতার চন্দ্রের মতো লীনা চকল হয়ে উঠলো। সুপ্রিয় তখন ভাবছিলো হাত দেখানোর কথা। রুণর আবহার সে শুনতে পেলো না।

পকেট থেকে একটা ‘নো’-র কোটা ছেঁওয়ালা টাডানো থাকের’পর রেখে সুপ্রিয় খুণী ছড়ানো স্বরে বলে, “আজকে একটা গ্যাডভেঙ্কার করা গেলো।”

“গ্যাডভেঙ্কার!—বিস্ময়চকিত স্বর।

“মানে বাজালী জীবনে একেই গ্যাডভেঙ্কার বলতে হবে। কাজটা এমন কিছু জমকালো নয়—যা’ দিয়ে উপস্থাপ লিখা চলে। লোজা কথার—হাত দেখাতে গেছলুম জ্যোতিষ পাড়ায়।”

রুণ চা’র পেয়ালা এগিয়ে দিলে। চুমুক দিয়ে সুপ্রিয় মুক্ক করলে, “জ্যোতিষ কি বললে জানো? বলে, ‘... সুপ্রিয় আনন্দের আতিশয্যে চা’রে চুমুক দিলে।

—“বললে—শনিরেখা নাকি আমার খুবই ভালো—স্ট কথার বলে দিলে—এরকম prominent শনিরেখা নাকি সাধারণ হাতে সচরাচর চোখে পড়ে না।”

রুণ ভতরকণে সুপ্রিয়ের আরোও কাছে এসে বলেছে।

“শনিরেখার মানে কি জানো রুণ? জ্যোতিষের ভাষায়, ‘প্রভূত অর্থ, অশাম্য শক্তি, অসাধারণ যশ:....’

চারের কাপ পরিষে রেখে সুপ্রিয় বেন বক্তৃতা আরম্ভ করলে।

“ভারপর অনেককণ হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো। তখন আমার বা অবস্থা। গভীর

ভাবে হাতটা চেঁড়ে দিয়ে জ্যোতিষ রূপোর রঙের ফ্রেম-করা জীর্ণ চশমা খুলে রেখে বলে, “হাতদেখা শেষ হয়েছে।”

“শেষ হয়েছে? কি দেখলে আর.....” বললাম আমি।

চশমাটা আবার চোখে এটে জ্যোতিষ বললে, “রবিবাহনের মাউন্ট আপনার চমৎকার। যদিও রেখাটা বিশেষ সুবিধের নয়। তা’ থাকলে অবিজ্ঞি আপনাকে নোবেল প্রাইজের জন্তে কম্পিউ করতে বলতুম.....” সুপ্রিয় থামলে। লাবণ্যশেনে গাড়ী যেমন করে হুট করে।

“রবিবাহনের মানে জানো রুণ?”

“ওর মানেই যদি জানতুম, তবে বিতুম জ্যোতিষকে ছ’টাকা দিয়ে আসতে?”

“ছ’ টাকা দিয়েছি কে বলে? আগে সব ব্যাপার শুনই না, ব্যস্ত হ’লে চলবে কেন?” জ্যোতিষ বলে গেলো,—“মাউন্ট বধন ভালো, তখন সাহিত্যিক খ্যাতি আপনার হবেই তা’ আজ বা ছ’ বছর পরেই হোক।” সুপ্রিয়ের জীবনে যেন খুণীর জোয়ার এসেছে। রুণর হাতটা টেনে ওর আভুগটিতে মোড়ে দিয়ে সুপ্রিয় বললে,—“জ্যোতিষ খানিকটা ভেবেই যেন আরম্ভ করলে—তবে আরো ছ’মাল অন্তত: আপনার ‘পরে কি কুগ্রহের প্রভাব রয়েছে, —এর পর থেকে আপনি এগিয়ে যাবেন নিশ্চিত যশ এবং অর্থলাভের পথে।’..... জ্যোতিষ ছ’টাকা চার্জ করেছিলো। বলে কিনা জন্ম-নক্ষত্র মিলিয়ে দে কুগ্রহের প্রভাব বের করেছে। একটাকা দিয়ে ও ভবিষ্যতের আশা দিয়ে বেরিয়ে আললাম। পথে বেরুতেই রমেনের লাখে দেখা। সে নিয়ে গেলো ওর বাড়ীতে চা’ খাওয়াতে। রমেনকে চেন না? এজেলি নিয়েছে। আলবার লম্বা লটারীর টিকেট একটা গছিয়ে দিলে। চকুলজার খাতিরে তাই টাকাটা দিতে হ’লো। বাড়ীর কাছে এসে

মনে হ'লো—এতো পরমাই যখন বেজার খরচ হ'লো—তাহলে তোমার স্নো'টাই একসঙ্গে কিনে নিই না কেন?"..... এক নিঃশ্বাসে এতগুলো বলে সুপ্রিয় যেন হাঁকিয়ে উঠলো।

"স্নো'টাই বুধে যবে তুমি একবার প্রশ্ন কর না কেন রুণু? ঐ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবার মূতন করে আবিষ্কার কর।"..... অমনয়ের ভঙ্গিতে এলো সুপ্রিয়।

রুণু আনন্দে ভেঙ্গেই পড়ছিলো আর কি। নিজের খুশীতে টুকরো টুকরো করে চুরমার করে শুধালে, "আর আমা'দের সেই প্রতিজ্ঞা?"

যাতনায় যেন কালো হয়ে এলো সুপ্রিয়র চেহারা। নিশ্চয় কণ্ঠে সে গতিধ্বনি করলে—"আরো হ'মাস।"

"আরো হ'মাস?"—অর্ন্তনাদ করে চঠলো রুণুব কর্ণধর।

আর সুপ্রিয় নিশ্চল, স্থবির।.....

"হ্যাঁ, আরো হ'মাস"—মনে মনে সুপ্রিয় যেন গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করলো, সে অক্ষম, ল নিরুপায়। সে খাওয়াবে কি? পিচিশ ঠাকা বেতন দিয়ে ছেলেমেয়ে'দের দুখের খরচইত যোগান যাবে না। নিজেকে ঐপবানী না রাখলে ছেলে'দের মরতে হবে।—রুগ্ন কঙ্কালসার ছেলেরা তার চাখের লাম্বে বিনা চিকিৎসায়—বেষোরে রা যাবে। না, সুপ্রিয় এমনি নিউরেটিক ছেলেমেয়ে'দের পিতা হ'তে চায় না।..... আর সে নিশ্চিত হয়েছে। মাত্র হ'মাস—

তার কতক দিন পরে.....।

সুবিনয় বললে—তোমার শরীর নাকি অস্থ রুণু!

রুণু রুমালে এষদ্রয়ডারি করছিল। ঝুতলে চাইলে।

"সৌভাগ্য বলতে হ'বে" চিকন হয়ে ললে রুণু, "ভুলেও তোমার মনে পড়লো।"

"ভুলে পড়লো মানে?" জিজ্ঞাস্য কোতুহলে বললে সুবিনয়।

"মানে ছ'নপ্তাহ তোমার পায়ের ধুলো পাবার সুযোগ আমা'দের হয়ে উঠে নি।"

"কি যে তোমার কথার ছিঁরি রুণু।" সুবিনয় হেসেই লুটোপুটি।

"আমি আবার দেবতা হয়ে উঠলুম কবে থেকে?"

"দেবতা না হ'লে ও" কৃত্রিম অভিমানে রেশ টেনে বললে, "রুণু,—আমার বর্শন পাওয়া দেবতার মতোই দুলভ যে।"

সুবিনয়ের দেই প্রাণখোলা হাসি।

"ডাক্তার মানুষের দুলভ হ'লে পলার জমানো দার হয়ে উঠে রুণু। মধুলোভী মক্ষিকার মতো রোগীর পেছনে ঘুরে বেড়ানোই তাদের কাজ।"

"সে সুযোগেই বুঝি আজ তোমার দেখা পাওয়া গেল সুবিনয়দা।"

সুবিনয় কথার ষোড় ঘুরিয়ে দিলে—পাতা পাওয়া যাচ্ছে না যে।

রুণু নীরবে লতাপাতা ঘূনছে।

সুবিনয় শুধালে—তোমার আগের মতোই ফিট হচ্ছে রুণু?"

রুণু প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে বাবার চেষ্টা কো'রলে।

—"মেরমা'র একটু আধটু লইতে হয় সুবিনয়দা। এ'নিরে হৈ চৈ করে ওকে শুধু শুধু বিব্রত করে কিছু লাভ হবে মনে কর!"

উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে সুবিনয়—এর অর্থ? অস্থ হ'লে চিকিৎসা করাতে হবে না। আঙ্গু আজ....। লারা বিন লাহিত্য নিয়ে থাকবেন আর এ'দিকে.....।" বাধা দিলে রুণু—পরের কথার মাথা ঘামিয়ে কাজ বনই সুবিনয়দা? মের-লোকের এটুকু লইতেই হয়?"

"পরের কথা মানে? বছর প্রতি আমার একটা কর্তব্য রয়েছে রুণু! তিল তিল করে তোমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে আর ডাক্তার হয়ে আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখবো ভেবেছো?"

সুপ্রিয় পেছন থেকে বললে—"এই যে সুবিনয়! তোমাকেই খুঁজছিলাম তাই!"

"গল্প লেখার ঠাঁকে আমাকে খোঁজ করবার অবসর তোমার হয়ে উঠে সেটাই আশ্চর্য।"

নিরল কণ্ঠে বললে সুপ্রিয় "অকিদের গাধার ষাটুনির পর কোন তত্ত্বলোকের পক্ষে কলম নিয়ে বলা লজ্জ ভেবেছো?"

"তা নয় বৃন্দলুম। কিন্তু এ'দিকে রুণুর চেহারা যে ভেঙ্গে পড়ছে, সে খবর রাখো।"

"সে জতাই ত তোমাকে খুঁজছিলুম। ফিটের মাত্রাটা ওর আগের চাইতে বেড়ে গেছে অনেক, আমার মনে হয়" সুপ্রিয় যেন নিজেকে লজ্জানে প্রবঞ্চনা করলে, মাঠের দিকে বেড়'তে নিলে মন্দ হয় না। তোমার ত নিজেরই মটর রয়েছে।"

সুবিনয় ছেঁষ দিলে বেশ ত। ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতে আমার আপত্তি আছে নাকি?"

পাদুকাশিল্প প্রাতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আগুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

সুপ্রিয় হাঁক চেড়ে বাঁচল। সুবিনয়
কণ্ঠে তৈরী হওয়ার জন্তে ভাড়া
দেয়। বেশি দেয়ী করবার সময় নেই
ভার।.....

* * *

হুঁটা বাজতেই সুপ্রিয় অফিসের বাইরে
এসে দাঁড়ালো। এই হুঁলি-মলিন কোল-
কাতার লাক্ষ্যরূপটা তার চোখে বড় কমনীয়
মনে হ'লো। কুয়ালাচ্ছন্ন লক্ষ্যায় জানলার
দাঁড়িয়ে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে আমরা
যেমন কল্পনাপুরী রাজকন্ডার স্বপ্ন দেখি,
আজকের এই ধোয়াটে লক্ষ্যায় পাশে দাঁড়িয়ে
সুপ্রিয়ের মন তেমনি তন্ত্রণ হয়ে উঠেছে।
রাষ্ট্রার ঘোড়ে তখন আলো জলে উঠেছে।
বাল আর ট্রামের স্বর্গর শব্দের সাথে জনতার
কোলাহল, সুপ্রিয়ের বিচিত্র মনে হ'লো।

একটা রহস্যতার ছাপ পড়েছে মাটি
আর মাহুকের 'পরে—বিচিত্র কলরবের
অন্তরে বেজে উঠেছে একটা অহুদবাটিত
জগতের লঙ্কেশ্বরিনি। এমনি ধূমর লক্ষ্য
বড় বেশী একটা চোখে পড়ে না। "আকাশের
নীল রঙ," সুপ্রিয়ের মনে হলো, "যেন
ছায়ারিত লক্ষ্যাকে স্পর্শের বস্ত্রায় রান করিয়ে
দেবে।" লত্যা, এই ধরণের নীতের লক্ষ্য
নেশা ধরিয়ে দেয়। এই ধূমরায়িত লক্ষ্যায়
মধু গিলে রেস্তোরার চা খেয়ে, পার্কে বলে
নোতুন পরিচিত বন্ধুর সাথে মিষ্টি আলাপ
করে কাটিয়ে দেওয়া চলে না।
তাই এমনি অমৌকিক জোতনার
ভরা লক্ষ্যায় বলে গল্প লেখা চলে—মানে
নিজের পরমতম আত্মার সাথে ধানিকরণ
নির্জন আলাপ। সুপ্রিয়ের বেছে মনে
যেন রঙের পরশ লেগেছে। সুপ্রিয় নিজকে
অবিখ্যাত কোরবে নাকি? হুঁটাকা যেতন
বেড়ে বাওয়া—তার পক্ষে নোবেল প্রাইজ
পাওয়ার মতো একটা ভরফর লংবাধ নরত
আবার কি? শনিধোয়ার কল এবার মাহু

আরন্ত হলো বৈ কি। সুপ্রিয় খুদীতে যেন
গান গেয়েই ফেলবে। লটারীর তারিখটা
দেখতে হচ্ছে। আজকে বালে গেলে হয়
না। কণ্ঠর জন্তে একটা শাড়ী কিনতে হবে
—আর এক প্যাকেট চা। সুবিনয়কে
একদিন ধুম করে খাওয়ানো চাই-ই।

এই যে বাল এলোছে। সুপ্রিয়ের কল্পনা
যেন হঠাৎ বাধা পেলো। সে চট করে বালে
উঠে পড়লো।...

...হ্যাঁ, তা সুবিনয়কেও আর রোজ
পাওয়া যাবে না। ...কণ্ঠর এবার কষ্ট যুটবে।
একটা ছোকরা চাকর রাখতে হবে। আর
কণ্ঠর কাপড়ট—খুব বেশি টাকা সে খরচ
করতে পারবে না অবিশি। তবে এই টাকা
হলেকের মধ্যে।... জগবান বহি মুখ তুলে
চান—তাহলে তাহেরকে এই এছো গলিতে
পচতে হবে না—প্রকাণ্ড বাড়ী, একখানা
ফ্ল্যাট...সুপ্রিয় ভাবতে পারে না। ...প্রকাণ্ড
একটা দোকান বেখে সুপ্রিয় ঢুক পড়লো।
কোন রঙটা কণ্ঠর মানাবে ভালো? লাল?
হলধে? সুপ্রিয় মনে মনে কল্পনা করে
নেয়—তাহের প্রাণাছোপম বাড়ী। জলছে
নীল বিজলী বাতি। ড্রেসিং আয়নার সাধনে
দাড়িয়ে কণ্ঠ। "নীল আলোর সাথে" সুপ্রিয়
যেন মনে মনে আনন্দ করে নেয়, "নীল
শাড়ীটাই মানাবে ভালো।" এই শাড়ীটা
পরে কণ্ঠ তার সাথে মেটোর যাবে। মানে
কালকেই। সুবিনয়ও তাহের সাথে যাবে
নিশ্চই। ভরফতার অহুরোধে একবার
বলতে হবে—তার অবিশি অস্ত্র কাজও
থাকতে পারে। তা'হলে এই নীল শাড়ীটা
নেওয়াই ঠিক।

জিজ্ঞাস করলে, "এই শাড়ীটার দাম
বেখে বাও ত?"

দোকানী বললে, "এর দাম কিছু বেশী
পড়বে বাহু। লিঙ্কের কিনা। পনের টাকার
এক লিঙ্ক কমেও আপনি পাবেননা
কোথাও কোল্কাভার।"

পায়ের তলায় জগতখানি

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ভাট্টা কবিরাজ

পায়ের তলায় জগতখানি

দিনে দিনে যাচ্ছে ন'রে;

কোন্ বাধনে অচল ক'রে

বল, তারে রাখব ধরে?

লকাল বেলা আলোর খেলা,

জাঁধার এল লক্ষ্য বেলা;

ডুবল রবি দিনের মত

কাল উঠবে আবার তোরে;

যে কাল এল সে কাল গেল

কে পারে ফেরাতে ওরে।

আলার পথে আশার হালি,

আনন্দ তার বাজার বাণী;

বাবার পথে মেঘের খেলা

পড়ে কেবল অশ্রু ঝরে;

করা ফুলের গুল-বাগেতে

ভুলে আহি মায়ার ঘোরে।

"পনের টাকা"—বড় বেশী দাম মনে
হচ্ছে। সুপ্রিয়ের বেখছি মনের মতো
জিনিষ কেনা হবেনা। পনের টাকা দিয়ে
কিনে ফেলবে নাকি? হাতটার দিকে
তা'র চোখ পড়লো। শনিরেখা যেন এই
ক'দিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হুঁমাল
ত শেষ হ'লো বলে। কেজানে লটারীর
টাকাটাও হয়তো পেয়ে যেতে পারে।
তা'রপর.....অসুস্থ হুখ, এতো হুখ কি
তা'র নইবে? সুপ্রিয় নীল কাপড়টা বেখে
দিতে বললে। হুঁটাকার হুঁখানা নোট
বের করে দিলে সুপ্রিয়।—...কাপড়টা বেখে
কণ্ঠর বা আনন্দ হবে। সুপ্রিয় ভেবেই যেন
রোমাঙ্কিত হয়ে উঠলো। আর মেটোর

বাঁবার কথা...সুপ্রিয় হ'লফ করে বলতে পারে,
...মোটর বাঁবার কথা বললে ছোট হেলে-
মেয়েদের মতো রুগু খুশীতে কেঁদেই ফেলবে।

“আপনার পাঁচটাকা নিয়ে যান বাবু!”
দোকানী বললে।

তাইতো। পাঁচটাকা সে ফেলেই
যাচ্ছিল বুঝি। দোকানের বাড়টার দিকে
তাকালে। আটটা বাজতে ন'মিনিট বাকী।
এবার বাড়ী ফেরা চাই। সুপ্রিয় বাঁদেই
যাবে। কাপড়টার রঙ.....রুগু আনন্দের
আতিশয্যে একঘষ নির্বাক হয়ে বাবে।
তারপর আবার মোটর বাঁবার প্রস্তাব....

...বাড়ীটাকে বড় নির্জন মনে হচ্ছে।
এরা সব গেলো কোথায়? কণ্ঠের স্তিমিত
আলোকে সুপ্রিয় উজ্জ্বল করে দিলে।
ঘরের সব জিনিষপত্র এলোমেলো ভাবে
ছড়ানো রয়েছে। বিজানা পর্যন্ত পাতা
হয়নি। না—রুগু ভারী অজ্ঞানত্ব হয়ে
উঠেছে। চারের জল পর্যন্ত ছড়ানো হয়
নি। কী থাকে মাথামুণ্ড। কিন্তু রুগু
কোথায়? বাঁইয়ের কোঠার দরজা খোলতেই
জমাট আঁধার বেরিয়ে এলো। কিন্তু রুগু
পাতা পাওয়া যাচ্ছেনা যে। সে কি বাতালে
মিশে গেল নাকি? আর খুঁজবেই বা
কোথায়? বাড়ীতে ত আর একশ' গুণ্ডা
কোঠা নয় যে অজ্ঞ কোথাও গিয়ে বসবে।
সুবিনয়ের মাথো লিনেমার গেছে; লিনেমার
সে কি নিয়ে যেতে পারতো না? এইভাবে
না বলে করে লিনেমার যাওয়া—সুপ্রিয়ের
কাঁড়ে বাড়াবাড়ি মনে হলো।...হয়রাণ হয়ে
সুপ্রিয় নিজেই চা' করতে বসলে। টাইম-
পিলের দিকে তাকালে। ন'টা বাজতে
আর মিনিট দশেক বাকী। কাপে চা ঢেলে
হঠাৎ সুপ্রিয়ের মনে হ'লো—রুগু যদি আর
ফিরে না আসে? বুকটা তাঁর অকারণে
কঁপে উঠলো। রুগু আসবে না তো বাবে
কোন্ চুলোর? বা শাড়ী কিনে এনেছে।

লিনেমার থেকে ফিরবে বোধ হয় একুনি।
তবু তবু ভেবে মনকে ভারী করে লাভ নেই।
তাঁর চাইতে গল্পটা শেষ করে রাখা ভাল।...
কলতলার বপু বপ শব্দ হচ্ছে কিদের? রুগু
কলতলার নাকি? এত রাত্তিরে ও কলতলার
কি করতে গেছে?...সুপ্রিয় উঠে গেলো।
“এই যে তোমার শাড়ী”—সুপ্রিয় চৈচিয়ে
উঠেছিলো আর কি! কোথায় যুট্টো দ্বিগে
ভাড়াটে বাড়ীর বৌ একরকম পাণিয়ে
বাচ্ছিলেন বলতে হয়।...আর ভুল নয়।
রুগু নির্ধাত লিনেমার গেছে। এট অবসরে
সুপ্রিয় তার অর্ধমাস গল্পটা শেষ করে
ফেলবে। রুগুর লিনেমার দেখবার সখকে সে
অপূর্ণ রাখবেনা। শনিরোখা স্পষ্টতর হয়ে
উঠেছেনা? তারপর অসহ সুখে সুপ্রিয়
চোখ বুজলে—তারপর প্রভুত অর্থ,
অসাধারণ প্রতিপত্তি, অসাধারণ ধন:।...”
লটারীর টিকিটের তারিখ আর নম্বরটা
আবার দেখে রাখা দরকার।

...এগারোটা বাজবার শব্দে সুপ্রিয়ের
চমক ভাঙলো। গল্পখোর লিনেমার লম্বের
হিলাব তার ভিলনা। এবার কিন্তু সুপ্রিয়ের

বুকটা ভরানক আতঙ্কে কঁপে উঠলো।
চোর থেকে উঠবার লামখা-টুকুও যেন সে
হারিয়েছে। বাড়ীটা যেন শূণ্য ঘূমতে
আরম্ভ করেছে।...সুপ্রিয় জানালার লামনে
এলে দাঁড়ালে।—


গলিটাতে তখন কুণ্ণিত নরনারীর বিজী
কোলাহল। শাড়ীটার দিকে চোখ পড়লো
সুপ্রিয়ের। সে চৈচিয়ে উঠবে নাকি?

...বাঁইয়ের একটা গাড়ী এনে দাঁড়ালো
না? সুপ্রিয় লাফিয়ে উঠলো। ও: রুগু
বেড়াতে গিয়েছিল বুঝি সুবিনরকে নিয়ে।
তাকে বলে গেলেই ত সব গোল চুকে
যেতো। নীল শাড়ীটা দেখে রুগু একুনি
খুশীতে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠবে।...

...বড়ের বেগে সুপ্রিয় বাঁইয়ের গিয়ে
দাঁড়ালো? কিন্তু...মটরটা ময়র গতিতে
তার লামনা দ্বিগেই এগিয়ে চলেছে।...

নিশাচর মানুষের অভিসার...এতো কম
ভাড়ার এই ধরণের গলি...ছাড়া আর
কোথাও বাড়ী পাওয়া বাবেই বা কেন?
রুগু তাইলে আর আসবেনা?...সুপ্রিয়
চৈচিয়ে উঠবে নাকি? প্রোতারিত কণ্ঠস্বরে
সে একবার রুগুর নাম ধরে ডাকতে পারেনা?
লাফল হয়না। শূণ্য বাড়ীটা হয়তো তেমন
প্রোতকণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে উঠবে।...

ফোর্ন ২৭৭৬ বড় বাজার



কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তেল

ভারত মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩. আপার সারকুলার রোড, কলিঃ

আলোকদর্শন

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

আষাঢ়ের নীরবকুন্তলা চপলাপাকী
অমানিশীখিনি। তড়িৎস্মরণপিঞ্জর মেঘ-
মেঘর অধরতল হইতে বিরহিনী যক্ষবধর
হরবিগলিত নয়নানারের ত্রায় অবিরাম
রিঝিঝি বরিষণ শ্রুত হইয়া একতানাবদ্ধ
মন্দাক্রান্তা চন্দকে যেন মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে।
বর্ষণ-মুখর নিশীথে নির্জন কক্ষে উল্লুত
বাতায়নপার্শ্বে নীরবে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়
তাম্রনী বর্ষাযামিনীর বনশ্রামল লজল রূপ
ছ'নয়ন ভরিয়া বেধিতে বেধিতে আকাশ-
পাতাল কত কি ভাবিতেছিলাম—আর
ইহারই মধ্যে লোচনগ্রাহিনী মনোহারিণী
তজ্রাঘেবো বিনা আবাহনে স্তপ্তিলোক হইতে
নিঃশব্দে নাহিয়া আসিয়া কখন আমার
অক্পিন্মাসনে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন, তাহা
ক্ষণিকের তরেও জানিতে পারি নাই।

লহল দীপ্ত আলোকমন্ডপাতে নিদ্রা-
ভারাতুর নয়নবৃগল ধামিয়া গেল। ধীরে
ধীরে বেধিবার শক্তি ফিরাইয়া পাইলে লক্ষ্য
করিলাম—সে ঘোর ছদ্দিনরজনীর অবলান
ঘটিয়াছে। নিরস্ত্র নিলীম নভস্তলে বৃগপৎ
অভ্রাঘিত শতরাকা শশীর মধুরোজ্জ্বল ময়ূর-
শালিকা বিড়ম্বণল উজলিয়া ধরণীতলে
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে অপকৃপদীপ্তিতে
নিবাসমধ্যাহ্নের ভাহুকিরণের ভাস্বরতা
আছে, কিন্তু প্রথরতা নাই। এ ত' বিশ্ব-
বাহিকা জালাময়ী বহ্নিশিখা নহে—এ যে
স্পর্শকম জ্যোতিষ্মতী রত্নপ্রভা। সে অপ্রাকৃত
আলোকের উৎপ-লক্ষ্যানে আকাশপটে দৃষ্টি
নিবদ্ধ করিলাম, কিন্তু সূর্য্যচন্দ্রভারকাবিহীন
গগনস্তলে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন
অভিনব জ্যোতিষ্কের দর্শন মিলিল না।

তারপর—ধীরে অতি ধীরে—বিগতপ্রাস্ত
হইতে সে প্রিক্সোজ্জ্বল প্রভাজাল মধ্যগগনে
বেজ্রোভূত হইতে লাগিল—যেন গ্রহনক্ষত্র-
সৃষ্টির প্রাক্কালে শুভ্রশব্দ নীহারিকাপূঞ্জ
ঘনীভূত হইবার উপক্রম করিতেছিল। ক্রমে
বেধিলাম—মাথার উপর এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অকলঙ্ক
পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে—আর তাহারই
রশ্মিরাঞ্জি-বিচ্ছুরণে প্রতিরূপে অগণিত তার-
কার উৎপত্তি হইতেছে। বেধিতে বেধিতে
সে নক্ষত্রমণ্ডল লিতাংস্তবিশ্ব ধরিত্রীর ছনিবার
আকর্ষণে যেন লচল হইয়া অধোবিক্ষেপে
অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী হইতেই
লবিস্ময়ে বেধিলাম—এ ত আমারের নিত্যদৃষ্ট
চন্দ্রমণ্ডল নহে—তাহার পরিবর্ত্তে এক
লোকোত্তর জ্যোতিষ্মত পুরুষ নিজ বিদ্যা
বেহুত্যাতিতে এ অপারিশ আলোকচক্রের সৃষ্টি
করিয়াছেন। তাহার অন্তর্ভেদী নেত্রদ্বয়ে
প্রোজ্জ্বল প্রতিভার রবিরশ্মি—উন্নত প্রশান্ত
ভালপট্ট যেন বাণীর লীলানিকেতন—দৃঢ়-
লম্বিলিত প্রাক্কণ ওষ্ঠাধর তীব্র শ্লেষাময়জিত
মৃদুস্মিতরেখার উদ্ভাসিত। এ চিরপরিচিত
মুষ্টি ত কতু ভুলিবার নহে। বেধিবারাত্র
প্রদ্যায় মন্তক আপনি অবনত হইয়া পড়িল

পুনরায় চাহিতেই বেধিলাম—সে
জ্যোতিষ্মতল দূর গগনের কোলে কখন
সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার শূন্যস্থান পূর্ণ
করিয়া এক বিচিত্ররূপা তারকা লুহিত।
তারকার অভ্যন্তরে সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!
একদিকে—লক্ষ্যলম্বীর্ণ-বিকম্পিতা স্মৃষ্টি-
নোমুখা বাণভী মল্লিকার ত্রায় বেণধুমতী—
ত্রীড়া-লঙ্ঘুচিহ্ন—অর্দ্ধাবশুষ্ঠিতা—হৃদয় প্রাবরণ-

পরিমণ্ডলিতা মুগ্ধা কিশোরীর বালেন্দু-
কিরণপ্রতিম অমলবেহকান্তি এক নির্জন
দেবাগারের গর্ভগৃহ আলো করিয়া তুলিয়াছে।
অত্ৰদিকে — প্রভাতবাতাহতি-কম্পিতাকৃতি
তরুণরবিকরোৎফুল্লা তলনলিনীর ত্রায় এক
বরারোহা মনবালা মুক্তাহারবিশোভিত
আবেগকম্পিত পীথরোমত হৃদয় পদ্মারক্ত
কোমল করকমলে চানিয়া—নীলোৎপলনিন্দী
নয়নপ্রান্তে পূর্বাভ্রুক নবাকর্ণকিরণের ত্রায়
মধুরোজ্জ্বল কটাক হানিয়া—মুপক বিষপ্রতি-
স্পর্ধী লরল ওষ্ঠাধর গর্বে বিম্মুরিত করিয়া—
রোগশয্যায় শায়িত প্রাবুট-লম্বুত প্রত্যগ্রূক্ষ-
হলকান্তি দীর্ঘায়তবেহ এক বীর যুবকের
পানে রত্নসুদীবিমণ্ডিত চন্দ্রককোরকনিভ
অঙ্গুলী লক্ষ্যলনে বীণাবিনিমিত কণ্ঠে
বলিতেছেন—“এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!”
মধ্যস্থলে—এ কোন বেণীবিলম্বিত-শিরোরুহা
—মণিমুক্তাভরণভূষিতাজী—বিলম্বভূষিষ্ঠোষ্ঠনা
প্রমদা কজ্জলবিড় আরতচঞ্চল আবেশ-
মধির নয়নপ্রাস্ত হইতে বিভ্রাদামস্মৃতি-
চকিত অশ্রুবিভঞ্জে বিবেকবিমূঢ় বর্ষকের
চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া—তাম্বুলাগরজিত ফুলধরে
শাণিত-ছুরিকাকলকপ্রভার ত্রায় ক্রুর
হাস্তরেখা লুকাইয়া—অনবত অজহার লহকারে
লাত্ৰবিলাসে মাতিয়াছেন?

এইরূপে এক এক করিয়া সে লকল
আলোখ্য-শ্রেণী আমার নয়নপথে ঘুরিয়া
ঘুরিয়া আসিতে লাগিল। বেধিলাম—এক-
দিকে—উর্দ্ধে মন্তকোপরি অচঞ্চল আনীল
অধর-সায়র ও নিম্নে পৃথললে কেনিগোপ্তি-
বিচঞ্চল সুনীল লবণমাগয়ের পুত লজম-
স্থলকে পটভূমিকায় রাখিয়া—সেই অন্তর্যমান
সূর্য্যালোক ও অনারমান বনাককারের
লক্ষ্যালক্ষ্য মিলনভূমে—বিনক্ষপামধ্যগতা
লক্ষ্যারামীর মতই এক ব্যক্তাব্যক্তরূপলাবণা-
ময়ী জায়াশরীরণী দাঁড়াইয়া।—কৈশোর
ও যৌবনের বয়ঃলক্ষি তখনও তাহার

প্রতিশ্রুতি হয় নাই।—আশুপুত্রস্বিত
 যবেনীলংবন্ধ কেশভার কপালপ্রান্ত বাহিরা
 তুলিনী ভূজঙ্গীর স্তায় তাঁহার যৌবনবন্ধুর
 প্রতি অঙ্গে প্রাপ্ত হইতেছিল। লহনা
 শ মূর্ত্তিমতী কাননকুন্তলা বনদেবী-প্রতিমার
 ঠাধর জীবৎ প্রস্ফুট হইল—দূরগত
 নারিন বংশীধ্বনির স্তায় কল-কাকলী
 পতিপথে প্রবেশ করিয়া চিত্ত আলোড়িত
 করিয়া তুলিল—“পথিক, তুমি কি পথ
 চাইয়াছ?” চমকিয়া দিগন্তরে চাহিয়া
 দেখি—অন্তরীক্ষচূড়া স্থির-লৌহামণী-লেখার
 মধ্য—নিবাত নিঃস্পন্দ স্বীপশিখার
 মধ্য—নিস্তরঙ্গ পারাবারমধ্যবর্ত্তিনী পূর্ণ-
 কলিতা পদ্মিনীর স্তায় এক স্পন্দনহীন
 জরাজম্বাদিনী মূর্ত্তি—বাধিতগতি
 যাতোবিহারিণী রাজ-হংসীর মত—হলিত-
 গন্ধগণিনীর মত অতিরাশ গ্রীবাঙ্গী
 চক্রে উদ্ভাসিত প্রায় সে কোপনা
 প্রাচীরবীণা যবনী অনবনয়নীর গর্ভে শির
 দ্রুত করিয়া দাঁড়াইয়াছে—ভামিনীর বিলোল
 ববী হইতে অগন্ধি বৃথিকার মালা
 দিয়া পড়িয়াছে। মন্থ-শরালনলদৃশ
 টল ভ্রূগু জীবৎ কোপকুণ্ডিত—অনিমেঘ
 স্নায়িত প্রদীপচক্ৰ স্মৃতিশা শাদুলবনিতার
 স্রবননের স্তায় অনলোৎসারণ করিতেছে
 চন্দ্রপ্রভা অক্ষর ললাটে ধমনী ক্ষীত
 রা রমণীর রেখা বিকাশ করিয়াছে—
 ধবিস্ফারিত নালারঙ্গ যুগল থাকিয়া
 কিয়া কাঁপিতেছে। বজ্রগর্ভ বিদ্রাভের
 মধ্য সে ভীষকাস্ত তমুসহসা দর্শনে এক
 প্রভাতভয়ে নয়ন আপনি মুদ্রিয়া গেল।
 পলক কেলিতে না কেলিতে সে দৃশ্য

আবার দেখিলাম। একদিকে—প্রোথিত-
 ভর্তৃকার স্তায় বিমলিনা এক অর্দ্ধোদ্ভাসিত
 বরবণিনী আপন হাতে লবঙ্গ চিতা লাঙ্গাইতে-
 ছেন। বরণে বালিকা—কিন্তু এই বরসেই
 তাঁহার কুসুমপেলব মুখমণ্ডলে শ্রোতাশ্রুত
 গাভীরোর স্তায় পড়িয়াছে। পরিধানে রক্তাপুর
 গলবেশে বনকুলহার—দীপ্ত লক্ষ্য
 লিন্দুরেখা। দেখিতে দেখিতে সতীর
 স্বহস্তরচিত চিতা ধূ-ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল।
 প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ডাপিতা নবমালিকার মতই
 চিতানললক্তাপে সে মনোরমা কুসুমকলিকা
 নিমেষে ভস্মমাংস হইয়া গেল। অত্রদিকে—
 হরিণ-পরিহীন-হিমকরবধনা সরলতার
 প্রতিমূর্ত্তি আর একটি যুগলমুচুলা ললনা
 চন্দ্রস্তারাবানন্ত বদনে উপবিষ্টা। কুবলয়-
 হলদদৃশ নয়নযুগল হইতে অবিরল জলধারা
 বিগলিতা হইয়া করতলভ্রুত বিবর্ণ কপোল-
 যুগল প্রাবিত করিয়া দিতেছে। দেখিলে
 মনে হয় যেন মূর্ত্তিমতী করুণা—অথবা শরীরিণী
 বিরহবাধা! অনতিদূরে দাঁড়াইয়া এক
 ধ্বংসকারী ভ্রমরকুণ্ডালী নক্ষত্রখী সুললিত
 কোমলকণ্ঠে দ্বিক্ মুখরিত করিয়া
 গাহিতেছে—

“কণ্ঠকে গড়িল বিধি যুগল অধমে।”

নয়ন মেলিয়া দেখি আবার দৃশ্যপট
 পরিবর্ত্তিত।—বৃহচ্চূড়া হিমনিবিন্দা কন্দ-
 কলিকার স্তায় এক সত্ত্ব: পতিবিয়োগ-
 বিব্রা বালবিধবা নিদারুণ অসুখদেহে হস্তা-
 তলে লুল্লুপ্তিত। অদূরে দাঁড়াইয়া এক
 নবযৌবনোজ্বলিত পদ্মপলাশলোচনা শ্রামাদী
 পরিচারিকা হোরকম্বোলি নাগিনীর স্তায়
 নিম্পলক ক্রুর দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণে
 নিরতা। আর সূর্য্যদেবালোকিনী প্রস্ফুট

হুলকমলিনীর স্তায় স্থিরপ্রশান্তবদনা
 লৌহা-সিঁড়লাবণ্যময়ী মানিনীমূর্ত্তি বিবাহ-
 করুণ কণ্ঠে বলিতেছেন—“যিনি বিধবার
 বিবাহের ব্যবস্থা দেন, তিনি যদি পণ্ডিত,
 তবে মুখ্য কে?”

এ আবার কি ‘অপূর্ব দৃশ্য! নোথলে
 এক কুণ্ডালী বর্ষীলী শরানা। তাঁহারই
 পদপ্রান্তে বৈকুণ্ঠবিচূড়া ইন্দ্রির স্তায় এক
 হীনবেশা নিরাতরণ্য বিকচনলিননয়না
 অপকুপকুপবতী তরুণী নিঃশব্দে তপ্তাশ্রমায়ী
 মোচন করিতে করিতে আশ্রয়ত ভাবে
 বলিতেছেন—“কালির বোতলটার গলায়
 গলায় কালি!” নিকটে দাঁড়াইয়া আর
 একটি চূর্ণালকগুচ্ছবেষ্টিত প্রস্ফুট কুসুম-
 যুগী হস্তরঞ্জিতাধরা লহানন্দময়ী স্ত্রীবাণী
 মাতৃমূর্ত্তি নীরব নয়নলঙ্ঘনে তাঁহাকে
 লাবরে লাঙ্গনা দিতেছেন।

লহনা কলকলনাদে চমকিয়া চাহিয়া
 দেখি—দ্বিক্চক্ৰবালচূষী অদীমণীলাসরতলে
 পীযুষধারা-প্রবাহিণী দিব্য তটিনী উল্ললিতা
 হইয়া উঠিয়াছে। সে অনন্তভারাপথ-
 ব্যাপিনী মন্দপবনভাঙিতা ক্ষুদ্র-বীচি-মালিনী
 শুভ্রলিলা সুরশৈবলিনীবন্ধে চন্দ্রকরমাত ছই
 তরুণ-তরুণী মনের সুরে বিরামবিহীন লস্তরপে
 বিভোর। শিশির-বিধৌত প্রফুল্ল খেত-
 কমলাননা সে প্রস্ফুট-যৌবনার অগতির
 ক্রমভার নয়নতলে তলাইয়া যাইতে যাইতে
 লহগামী প্রিয়দর্শন যুবা কপিকের তরে
 আশ্রয়স্থানের স্তায় ডাকিলেন—“শৈ!”
 তরুণী চমকিয়া চক্ৰ মুদিল। বিক্কে
 স্ত্রীবাণীর মথিত হইয়া ইলাহলবিধি
 কণ্ঠের ধ্বনি উঠিল—“আজিও এ মরা
 গলায় চাঁদের আলো কেন?” লজ্জা লজ্জা



ইন্দিরিয়াল চা!

শ্রী ৪৪/১ ফ্রাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

প্রবল স্বভাব গঙ্গার সে স্থির যেত-
বারিবিস্তার উত্তালতরঙ্গ-লঙ্গুল হইয়া
উঠিল। দুর্বার শ্রোতাবেগ ক্ষুদ্র তৃণ-
খণ্ডের ভাঙ্গা এই দুই সুবক-সুবতীকে কোন্
অকূলে ভাসাইয়া লইয়া গেল—আর দেখা
গেল না।

মুহূর্ত্তমধ্যে সুরভরঙ্গিনী আবার দেখা
দিলেন—কিন্তু এবার তাঁহার রূপান্তর
ঘটিয়াছে। চৈত্রবায়ুসম্প্রীণ—তরঙ্গ রঙ্গ-
কিরীটিনী উচ্ছল-কলনাধিনী গঙ্গার প্রবাহ-
মধ্যে ধররবিকরতাপিতা সুরমহার কুমুম-
কলিকার ভ্রায় স্নানমুখী হীনা হীনা
মলিনা এ কোন্ বালিকা ধীরে অতি
ধীরে নিঃশব্দে নাথিয়া আলিতেছে!—
তাঁহার মুদ্রিত পঙ্কজ-কোরকনিভ-নয়নযুগলে
অতি ঘোরা রজনী বৃক্ষ চিরতরে ঘনাইয়া
আগিয়াছে।

পুনরায় পট পরিবর্তন।—এ যে দেখি—
কাকচক্ষুতুল্য স্বচ্ছললিলপূর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তুতগ্রথিত
এক সুবিশাল হৃদিকা। তীরস্থিত বিবিধ
তরুলতার নয়নরঞ্জন কুমুমস্তবকবর্ষণে সে নির্মল
হৃদয়গাত স্থির জলরাশির চতুর্দিক্ প্রান্ত বিচিত্র
বর্ণরসময় অপরূপ শ্রীমণ্ডিত হইয়া
উঠিয়াছে। সেই স্নানতল সুরভি জলতলে—
মর্ম্মরলোপানশ্রেণী যথার গিয়া শেষ
হইয়াছে—তথায় ফটিকাধারে সুরকিতা হৈম-
প্রতিমার ভ্রায়—সহকারশাখারোহিনী চিত্রমূল্য
মাধবীলতার ভ্রায় বর্ষাস্নাত চম্পককাস্তি
নিখিলিতোৎপলনয়না ফুলকুমুমরক্তাধরা
বিকীরণধারামধুরঙ্গিণী অশাস্তোভাশালিনী
এক রহস্যময়ী রমণীমুখি যেন বাপীতল আলো
করিয়া শুইয়া আছে। অতীতের সে
অনিম্যাস্থলর আনন আজ মৃত্যুর করাল
কাঙ্ক্ষার গাহমান; সেখানে যেন মৃত্যু ও
মৃত্যুঞ্জয়ের দম্ব চলিতেছে; নয়ন মুদ্রিত, ওষ্ঠ
নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নালার বৃক্ষ বা শ্বাসও
বহিতেছে না। হুয়ে দৌধবাতংগনপার্শ্বে

দাঁড়াইয়া কৃষ্ণাপরাঞ্জিতা-কলিকার ভ্রায়—
মুহূর্ত্তজিতা ভ্রমরবালায় ভ্রায়—একটি অর্ধক্ষুট-
বোবনা লরমজড়িতা বালিকাবৎ মরমে মরিয়া
বিবাহক্লিষ্ট নয়ন হইতে নীরবে অশ্রুবিদল্লভ
করিতে করিতে খাঁচার পাখী উড়াইয়া
দিতেছে।

চক্ষু পালটাতোটে আবার নূতন দৃশ্য
দেখিলাম।—একদিকে—সজী: মর্ম্মর-প্রতিমার
ভ্রায় গর্ব্ব-সুরভিতবেহা ভুবনমোহিনী এক
রূপবতী রাজপুতকুমারীর চঞ্চলচরণক্ষেপে
একটি গজদন্তবিনির্ম্মিত আলংকার্যকল শতধা
বিচূর্ণিত। অত্রদিকে—সঞ্চারিণী দীপশিখার
ভ্রায় নির্মলকাস্তি আর এক চতুরা ক্ষত্রিয়-
বালার লবৌতুক অঙ্গুলিদ্বৈতলীয়ার যেত-
শ্রম রাজরাজেশ্বর পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতে-
ছেন। আর অতি দূরে—রত্নপুশ্পভূষণস্তার
অবত্রে চারিপার্শ্বে ডড়াইয়া ফেলিয়া কাব্যধনী-
ভারপ্রাচ্ছন্ন শশিলেখার ভ্রায়—হিলোপরাগ-
প্রস্তুতমৃগালিনীর ভ্রায় চিরাত্যন্ত বিলাসবিস্র-
মালসা অঙ্গারোপনিবাসী এক যবনাসনা
অশ্রুস্রবৎকেনে কঠিন পাষাণকুট্টিম আলিঙ্গনে
মৃদাবলুপ্তিতা হইতেছেন।

বর্ষার প্রবল জলপ্রাবনে কূলে কূলে
পরিপূর্ণা ধরশ্রোতা শ্রোতস্বিনীর উত্তাল-
তরঙ্গজাল ভেদিয়া বিস্তৃতপক্ষা রাজহংস-
বধূটির মতই তর তর বেগে একখানি
পালতোলা বজরা ছুটিয়া চলিয়াছে। বজরার
ছাতের উপর উন্মুক্ত অমরতলে কে এ মহীরদী
রমণী—দেবী না মানবী? ভাদ্রের ভরা
নদীর ভ্রায় তম্বুধুনায় যৌবনজোয়ার
লাগিয়াছে।—পুরুষোচিত বীজ্যবে ভাবিত
স্বজায়ত যেহ—অগচ নারীমূলভ কমনীয়তা-
বর্জিত নহে। টলমল নদীজলের ভ্রায় সে
লাবণ্য সত্যচঞ্চল—কিন্তু নিস্তরঙ্গ। তরঙ্গিণীর
মতই সে লাবণ্যময়ী স্থিরাধ—বীরা—গম্ভীরী
পরিপূর্ণ আনন্দময়ী। নদীশৈলভেদে ঘনাক-
কার তালীবনছায়ার ভ্রায় আলুলায়িত

বনহংসুল্লভ কেশধাম অংশে পৃষ্ঠে বাহুতে
ও বক্ষে বিদগ্ধিত। ইন্দুরপ্রতিকলিত
বিপাণ্ডুর বারিপুরনদুল স্তম্ব ক্ষৌমবলনের মধ্য
হইতে অর্ধচন্দ্রবিনিঃস্রুতা জ্যোৎস্নার ভ্রায়
মিথ গৌরবর্ণ দেহকাস্তি ছুটিয়া বাহির
হইতেছে। মুর্ত্তিবতী বীণাপাণির মত এ
ত্রিবিধললাম্বুতা দেবীপ্রতিমা একতানে
বীণাবাদনরতা। বঙ্গকীর বিচিত্র তন্ত্রীধাতের
মধ্য দিয়া শ্রুতি-গ্রাম-মুচ্ছনার আবির্ভাবের
তালে তালে কোমল পীংরাংলচূষা বর্ণান্তরণ
হলিতেছে। আর বস্ত্রকুমুম-সুরভিত কোমুদী-
বিম্বিত বায়ুস্তরে সে অপার্থিব স্বরলহরী
খেলিয়া বেড়াইতেছে। বজরার অভ্যন্তরে
মহেশ্বরের বৈজয়ন্তীপ্রাসাদ-বিনির্ম্মিত সুরভিত
দীপাবলীলম্বুচ্ছল প্রকোষ্ঠমধ্যে বিচিত্র কারু-
কার্য্যালনাথ পালকে হৃৎকেন্দ্রবল অকোমল
শরনে আর এক তরুণীর তনুভঙ্গী এলায়িতা।
সুহৃদ্ব হৃৎকুমুদবরণের তিতর হইতে
কষিতকাক্ষনকাস্তি ও ভ্রমরকৃক কেশপাশ
ঈষৎ অম্পট দৃষ্ট হইতেছে। আর প্রকোষ্ঠ-
ভিত্তিবিলম্বিতা দীপমালার প্রভা স্নান করিয়া
কুটিলনীলালকম্যশোভী অমল বহন-
কমলে সৌরকরবিভাসিত স্বচ্ছলাগরবারিবৎ
বিলোল কটাক বলসিতেছে। অতঃপর
ফুলমুতুল্য আকর্ণপ্রমাদী সুবকিম ক্রমুগনির্ভে
মহনের কুমুমশর-লঙ্গুল মর্ম্মভেদী নয়নবাণে
বিদ্ধ হইয়া এক তরুণ সেই অবগুপ্তিতা স্তম্বীর
কুলকোকনধনিত রাতুল চরণযুগল নিজ
অঙ্গে লয়ছে স্থাপনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে লংবাহন
করিতেছেন।

ভারপর আলিঙ্গন এক অপরূপ ছবি।—
নভঃস্পর্শী মহামহীকর্কের শাখাবিলম্বসরণা
শ্রামলগল্যবাস্তরে অর্দ্ধাবলুপ্তবেহাবরবা এ
কোন্ রিপুতয়বারিণী দানবঘলনী মুর্ত্তি?
বিচঞ্চল চেলাঞ্চল স্বাধীন হিন্দুশাসকগণের
রাজতীর বিজয়কেতনের মতই লগৌর্বে
উড়োন—আলুলায়িত কুমলতার প্রতিকল-

পবনে পশ্চাতে উড়িতেছে—দৃপ্তচরণ ভরে
বিটপমূল ক্রমাঘরে নামিতেছে উঠিতেছে—
লজে লজে সেই বজবীরাজনার অনিন্দহৃদয়
করাল-কোমল তম্বু টলমল করিতেছে—যেন
সিংহবাহিনী নগেন্দ্রনাথিনী অস্তরবধে মাতিয়া
বরণজে নাচিতেছেন। বিস্ফারিত সুনাসায়
লখন দীর্ঘশ্বাস বাহিতেছে—অবজ্ঞম্ব কটাক্ষ
নিরস্তর কৃশাণুগণা বর্ষণ করিতেছে—
চূর্ণকুস্তলবিজড়িত অর্দ্ধচন্দ্রলগ্নে মুক্তানিন্দী
শেষবিন্দু লম্বুগত হইয়াছে—আর স্মৃতির
বিদ্যায় মুহূর্ত্তঃ লখনে নিনাদিত হইতেছে
“মার মার শত্রু মার!” দেখিতে দেখিতে
আবেগে মুখ দিয়া বাহির হইল—“অবলা
যেন মা এত বলে!”

নিমিষে দৃশ্য পরিবর্তন ঘটিল। আর
এক তেজস্বিনী বজবালা অবনীলক্রমে
লৌহযন্তুতে গুণযোজনা করিতেছে। গৈরিক
বসনারূতা সে বীরললনা শরমেঘাবলুপ্ত
জ্যোৎস্নার মতই শোভাময়ী—উজ্জল নয়নে
তাঁহার মা ভবানীর তৃতীয় নেত্রের বংশিধা—
দোষ্য লহাল হৃদয় বহনে পতিগতপ্রাণার
ত্রিভুবনবিজয়িনী লতীত্বদীপ্তি—বাহুতে
অপরিসিত বল—অস্তরে দুর্জয় সাহস—কণ্ঠে
মোহন গীতিধ্বনি—“এ ঘোবনজলন্তরঙ্গ
রাখিব কে?”

একটির পর একটি করিয়া এই আশ্চর্য
চিত্রাবলী নয়ন ভরিয়া হেরিতেছিল,ম,
লহলা সে দিব্য আলোকদীপ্তি নির্ভরা গেল।
হুটোভেদ্য তাম্রার মধ্যে ক্ষীণ দাপালোকে
দেখিলাম—নিবিড় অন্ধকারকে নিবিড়তর
করিয়া নীলাম্রত্নাতি এক কালিকামূর্ত্তি
আবির্ভূত হইয়াছেন। স্তম্ভমা, ভক্তমাংসা,
বিগলিতচিকুরা জিহ্বাললনভীষণা, নিমগ্ন-
রক্তনয়না নম্রিকামূর্ত্তিতে বেশব্যাপী মহা-
শ্মশানবক্ষে সে কঙ্কালমাগিনী করালবদনা
শ্রামা অসিকরে তা-তা-থৈ-থৈ নৃত্য
করিতেছেন। অকস্মাৎ সে অন্ধতমসার বক্ষঃ
বিদীর্ণ করিয়া অপর্যায়কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—
“দেখ, মা যা হইয়াছেন।” সে বিভীষিকা-
ময়ী মূর্ত্তি দর্শনে আতঙ্কে চক্ৰ মূর্ছলাম।

মুহূর্ত্তমধ্যে জলদগন্তর কণ্ঠে ধ্বনিত
হইল—“চাহিয়া দেখ, মা যা’ হইবেন।”
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম—কোটি বালাকুণ-
চ্ছটার বিগবলয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।
সেই আলোকপুঞ্জের কেন্দ্রস্থলে দশভুজা
জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা জগজ্জননী রাজরাজেশ্বরী
মূর্ত্তি ধরিয়া হাসিতেছেন।—“রত্নমণ্ডিত দশভুজ
দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে
নানা শক্তি শোভিত, পৃথকপৃথক বিমর্দিত,
পরাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। লক্ষ্যে, অতুলনীর লেখনীমুখে অনবদ্য

দ্বিগভুজা—নানাগ্রহরণ-ধারিণী শত্রুবিমর্দিনী
বীজেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য-
কুপিনী—বামে বাণী-বিজ্ঞানদায়িনী—সজে
বলরূপী কার্ত্তিকেশ—কার্য্যনিচিরুপীগণেশ...”
—অভিভূত হইয়া ধূলায় মত্তক লুঠাইয়া
মাকে প্রণাম করিলাম—

“লক্ষ্মীজগমল্যে শিবে লক্ষ্যার্থদাতকে!
শরণো ত্রাণকে গৌরিনারায়ণি নমোহন্ততে!”

অমনি দূর অস্তরে অমরার গায়ক-
গায়িকাগণের মিলিত কণ্ঠে শ্রবণমজল
গীতিধ্বনি উঠিল—

“তুমি বিজ্ঞা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদ তুমি মর্ম্ম,
তুং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি

মন্দিরে মন্দিরে ॥

তুং হি দুর্গা দশগ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলবলবিহারিণী,
বাণী বিভাদায়িনী—নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্
সুজলাম্ সুফলাম্ মাতরম্।
বন্দে মাতরম্ ॥”

অপরাজেয় প্রতিভার অপূর্ব ছায়ালোক-
লক্ষ্যে, অতুলনীর লেখনীমুখে অনবদ্য

পূর্ণ বিশেষ্টার

২নং রসা রোড, ফোন : সাউথ ৩৪

শনিবার, ২ই জুলাই হইতে

জনাৰ্ণ তৃতীয় সপ্তাহ

দেবদত্ত ফিল্মসের

এহের-ফের

চমকপ্রদ কাহিনীর রোমাঞ্চকর চিত্র কথা
বাঙলা ছায়াচিত্রের অভিনব আর একটি
আনন্দ আয়োজন।

লাকি ওয়াচ এণ্ড কোং

আমরা সুলভে উচ্চশ্রেণীর ঘড়ি নির্মাণ
এবং বিক্রয় করিয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১১২ আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিঃ।

বঙ্গিমচন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধির শিবরং

ছগলী জেলার অনুষ্ঠান

গত ১৬ই আষাঢ় (১৭ ১লা জুলাই) শুক্রবার চুচুড়া রূপালী চিত্রগ্রহে প্রদ্যাপ্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে ছগলী জেলা বঙ্গিম শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে শ্রীমতী সত্যী দেবীর পরিচালনায় ঋষি বঙ্কিমের লখননন্দ মন্ত্রসঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' গীত হইবার পর বর্ষায়ান্ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত এ. কে. এম্ জ্যাকারিয়া মহাশয়ের উদ্বোধন করিবার কথা ছিল; কিন্তু পূর্বাভাসে তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার কর্তব্যভার মহাশয়ের জলধরদাশার এখনও বহনক্ষম স্বন্ধে অর্পিত হইয়াছিল। অথচ কি আশ্চর্য্য অনিবার্যের (১৭ই আষাঢ়) দৈনিক বঙ্গুমতীতে যে সভা-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ছাপা দেখিলাম যে

স্বর্ণবিজ্ঞানে, অপরূপ চরিত্রচিত্রগুলি অঙ্কন করিয়া যিনি বাঙালার সরল কথাসাহিত্যে অভিনব শৈলীর প্রবর্তন করিয়াছেন—এ ভাগ্যহত দেশের অকৃতী সন্তানগণকে যিনি 'মা' চিনিতে শিখাইয়াছেন—সেই ক্রান্তদর্শী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের চির-অন্ধান স্মৃতির উদ্দেশে গজাজলে গজাপূজার মতই এ বাক্য-পুষ্পোপহার সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করিতেছি। *

বন্দে মাতরম্।

* চন্দ্রনগর বঙ্গিমশতবার্ষিক উৎসবে পঠিত।

কলিকাতার মেয়রই সভার উদ্বোধন কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। 'বঙ্গুমতীর' প্রবীণ সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদবাঈ যে অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিয়া আসিলেন, তাহারই বিবরণ দিতে গিয়া তাঁহারই সম্পাদিত দৈনিকে একরূপ অমার্জ্জনীয় ভুল—বিস্ময়কর বটে! যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহারের কেহ কেহ—রূপ অনুমান করিতেছেন যে হয়ত দ্বাদশ হেমেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ংই শুক্রবার বেলা ১২টার পূর্বে সভার ভাবী বিবরণটুকুর কপি প্রেসে দিয়া লাড়ে বারটার নিশ্চিতকালে সভাপতিত্ব করিতে চুচুড়া গিয়াছিলেন। নতুবা দ্বাদশ একরূপ প্রমাণ ত বড় একটা দেখা যায় না।

জলধরদাশার উদ্বোধনের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহার সুশিখিত লংকিত মুদ্রিত "অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ" পাঠ করেন। ইহার পর প্রিয়বর্ধন অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সতেজ সুললিতকণ্ঠে সলিল লঙ্ঘিত ভাষায় বঙ্কিম-বন্দনামূলক একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত জনমণ্ডলীর করতালিধ্বনি হইতেই অনুমান করা যায় যে বক্তৃতাটি জনপ্রিয় হইয়াছিল।

অতঃপর কবি যতীন্দ্রমোহন বাক্চি মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। পরে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বক্তৃতা প্রদান করেন। ডক্টর মজুমদারের বক্তৃতায় আমরা বঙ্কিম লব্ধকে কিছু কিছু হুতন কথা শুনিবার আশা করিয়াছিলাম কারণ, বাঙলা ভাষায় থিসিস্ দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইনিই প্রথম ডক্টর হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের উর্ভাগ্যবশতঃ সম্পূর্ণ নিরাশ হইতে হইয়াছে। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে বঙ্কিম পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া সাহিত্যে পাশ্চাত্যভাবমিশ্র যে রীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, আজও পর্যন্ত আমরা তাহারই অনুবর্তন করিতেছি। তাঁহার প্রদর্শিত এই পথই সত্যমার্গ আর এই সত্যদর্শনজনিতই তাঁহার ঋণিত্ব। এই কণ্ঠে কণাট কেবল ঘুাইয়া ফেনাইয়া হাত-পা নাড়িয়া তিনি একরূপ অনাকর্ষক ভাব ও ভাবার সাহায্যে বহুক্ষণ পরিয়া বলিয়াছিলেন যে, চুচুড়াবাসীর মৈথিল্যের প্রশংসা করা ছাড়া আমাদের এ বিষয়ে অত্র কোন বক্তব্য নাই। এইরূপ পণ্ডিত-গণের সম্বন্ধে কালিদাসের সেই বিখ্যাত উক্তিটি ("কাকার লদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ") সুপ্রযোজ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর প্রজ্জ্বলিত স্ববক্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্চি মহাশয়ের বঙ্কিমের প্রতি প্রদ্যাজলি নিবেদন করেন। অধ্যাপক প্রিয়ঞ্জন সেন "বঙ্কিম রচনার শিশুচিত্র" সম্বন্ধে একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শিশু কণ্ঠস্বর অতি সুহৃৎ হওয়ার তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ বিশেষ আকর্ষণ-কর হয় নাই। ইহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাহাগারিক ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় (কমরেড ?) বোধহয় একটু চমক লাগাইবার জন্যই বক্তৃতাশ্রমকে বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের লাম্যবাদের আদর্শ লহ্য করিবার ক্ষমতা বাঙালার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নাই বলিয়াই তাঁহার

অপ্রাহত

খ্রীসমীর ঘোষ

আজিকে লক্ষ্য হয় নি সুখর গুঞ্জরণে ;

বিবুর হোয়েছে বিরহী হিমার আমন্ত্রণে ;

দিনের শেষে

আকাশে যখন নিভিলো গোধূলি স্বর্ণআলো—

জড়ালো ধরণী অঙ্গে অঙ্গরাখাটি কালো

মলিন হেসে—

তখন চোখেতে আসে নাই নেমে নিবিড় ঘুম

সুপ্তি পরী যে আশিয়া কপালে দেয় নি চুম

ভালো গো বেলে

—ডুবেছি দিনের ক্লান্ত শীষার দিনের শেষে।

সুখেতে কাহারো পড়েনি আশিয়া আলুলো চুল ;

বাতায়ন পথে আসেনি বাতাস করিয়া ভুল ;

ঝলক দিয়া

সবুজ ঢাকাতে ঢাকা নীল বাতি উঠে নি ঝলি—

ছাদের কোণেতে টেবিলে ফোটে নি হেনার কলি ;

বলো কি নিয়া

চীনা ফুলদানি ভরিবো আবার টেবিল পরে,—

কালিকার ফুল ঝরিয়া পাপড়ি গিয়াছে মরে

—মরেছে দিয়া—

বাতায়ন পথে আসে নি বাতাস ঝলক দিয়া!

নিখুম রাত্রি লহর ঘুমায়ে বিজলী-বাতি

পথে পথে জাগে, জেগে আছে আর তারকা পাতি—

আকাশে জাগে—

চোখের তারকা জেগে আছে কার, কাহার আশে ;

বিস্ময়গীর তীর হোতে যদি, যদি সে আসে—

স্বপন লাগে :

জড়ায় তাহারে বুকের শয়নে লবো গো টানি’

চোখেতে চুলেতে চুম্বন ঢালি ডাকিব, রাণি!

কী অমুদ্রাগে—

অঁধিতারা আর আকাশের তারা তাইতো জাগে।

গভীর রাত্রি নিশাচর ডাকে—বাড়ড় ডাকে,

বাহিরে হয়তো দখিনা বাতাস পশরা হাঁকে

সুরভি ঢেলে ;

পাশের বাড়ীতে ছোট্ট ভেলিট উঠিলো কেঁদে ;

ঘুমের ঘোরেতে জননী তাহার বুকেতে বেঁধে

নিয়ড়ে ভেলে—

আবার ছজননে ঘুমায়ে পড়েছে—রয়েছি জেগে ;

বিরহী লক্ষ্য রয়েছে ছুইটি নয়নে লেগে

—ছয়ার ঠেলে

জানি আগিবে না ধরেতে চুলের সুরভী ঢেলে!

নরসত্তর বাধাধানে বন্ধিমের আদর্শ
কান্দন মুক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে
পারে নাই। অতএব, মধ্যবিন্ত লক্ষ্যধারের
মায়োজিত এই স্রবণোৎসবে বন্ধিমচন্দ্র
খনই তুষ্টিলাভ করিতে পারেন না—এরূপ
ভায় প্রবৃত্ত শ্রদ্ধাজলিও বন্ধিমের চরণপ্রান্তে
কান দিনই পৌছিতে না। এই প্রসঙ্গে
তিনি সত্তার সত্যাপত্তির উপর কটাক্ষ করিয়া
লেন যে, বর্তমান সত্যাপত্তি হেমেন্দ্রবাবু যে
স্বমতী পত্রিকার সম্পাদক, সেই বহুমতী

হইতে প্রকাশিত “বন্ধিম গ্রন্থাবলী”তে তাঁহার
“সাম্য” প্রবন্ধের ভেজস্বর অংশগুলি নিশ্চিহ্ন
করিয়া উঠাইয়া দিয়া উহাকে নির্বিষ সর্পের
মতই প্রাণশক্তিহীন করা হইয়াছে। বিপুল
করতানিধ্বনির মধ্যে নীহারবাবুর বক্তৃতা
শেষ হইলে হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু জলধগভীর
স্বরে নীহার বাবুর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া
বলেন যে বন্ধিমের আদর্শ মধ্যবিন্ত লক্ষ্যধার
বতটা বজায় রাখিয়া রাখিয়াছেন, ততটা
আর কেহই পারেন নাই। তাঁহার আদর্শ

থরী করিবার জন্ত প্রকৃতপক্ষে বাহারি দ্বাশ্রী
দেই শাসক ও অভিজাত লক্ষ্যধারের বিরুদ্ধে
কোন অভিযোগ আনিতে নীহারবাবুর
জিহ্বা রুদ্ধ হইল কেন? আর বহুমতী-
লব্ধরণে সাম্য প্রবন্ধের অংশ বিশেষ বর্জন
লব্ধে তিনি বলেন যে—ঐ সকল অংশ
বন্ধিমচন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার জীবদ্দশায় বর্জন
করিয়া গিয়াছিলেন; রাজপুরুষগণের অহুমতি
অনুসারে বর্জিত অংশেরও বতটুকু রাখা যায়,
বহুমতী ততটুকুই রাখিয়াছেন। ইহার পর

সভাপতি মহাশয়ের নানাতথ্যপূর্ণ, স্মৃতিস্তিত স্মরণীয় স্মৃতি মূল্যবান প্রতিভা পঠিত হয়। অতঃপর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর সভার কার্য সমাপ্ত হয়। সভাপতি মহাশয় উপ-সংহারে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ মূলক একটি প্রস্তাব আনয়ন করিলে উহা বিনা বাধায় পরিগৃহীত হয়।

সভাস্থলে স্থানীয় ও বিদেশাগত বহু সুপণ্ডিত, সামাজিক, সঙ্গীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অমুষ্ঠানের অন্ততম প্রধান কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়, উৎসবের তরুণ সম্পাদক শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ গান ও অমুষ্ঠান উদ্বোধনকারী আদর আপ্যায়ন ও জলযোগের ব্যবস্থায় অতিথিগণ সকলেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

চন্দননগরের অনুষ্ঠান

চুড়ার উৎসব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিতে হইল চন্দননগরে। চন্দননগর নৃত্যগোপাল সাধারণ পাঠাগারে মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শ্রীমতী সত্যী দেবীর পরিচালিত 'বন্দেমাতরম্' এখানেও গীত হইয়াছিল। ইহার পর চন্দননগরের অন্ততম বিশিষ্ট নাগরিক প্রবীণ প্রসন্নতর্কবিহারী ও সুখী সাহিত্যলোভক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় 'উৎসব সমিতির সভাপতির অভিভাষণ' পাঠ করেন। অতঃপর জগদীশ্বর উস্তর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ও ততোধিক সুদীর্ঘ মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণ আর্জিত করিয়া তুলেন। চন্দননগরবাগিনের বৈধব্য বোধ হয় চুড়াবাগিনের অপেক্ষাও প্রশংসনীয়। এরূপ অত্যুচ্চ কলিকাতার শ্রোতৃবৃন্দ কোন দিনই বরদাস্ত করিতেন না। অতঃপর প্রবর্তক-সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় সংক্ষিপ্ত সরল ভাষায় সভাপতি মহাশয়ের বরণকার্য সমাপ্ত করিলে প্রিয়দর্শন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোক

নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার লিখিত 'বঙ্কিম-প্রশংসা' পাঠ করেন। প্রশংসিটি দীর্ঘ হইলেও অপূর্ণ লক্ষ্য সম্পূর্ণ বর্ণনাকারে ও শাস্ত্রী মহাশয়ের অনবদ্য বাচনভঙ্গীতে শ্রোতৃবৃন্দের বৈধব্যচ্যুতি ঘটাইতে পারে নাই। আমরা অমুষ্ঠান শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশংসিটি প্রকাশ করিলাম।

ইহার পর মহাস্থবির জগদ্বরদা মহাশয় শাস্ত্রী একটি কথা বলবার জন্য উঠেন ও তাহাতেই আধঘণ্টা কাটিয়া যায়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ বোষ মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য আবাহন করিলে তিনি বলেন যে অপ্রস্তুত অবস্থায় অমুষ্ঠান যে কোনও সভায় বক্তৃতা করা চলিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিভাষায় এরূপ চালাকির দ্বারা কার্য উদ্ধারের চেষ্টা প্রত্যাখ্যান কর। শুধু তাহাই নহে, এরূপ কীকির চেষ্টা করিতে বাইয়া সম্প্রতি কোন একজন বিজ্ঞ অধ্যাপকও দ্বারা অল্প রকমের ভুল করিয়াছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ঐ সময় অতি পুরাতন হইলেও চির-সবুজ অধ্যাপক খোলদাস রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে সোৎসাহে "Here, here" ধ্বনি করিতে শুনা গেল। বন্দে হইতেছে—তবে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী প্রধান অধ্যাপক রায় বাহাদুরই হেমেন্দ্রবাবুর এ অগুণ্ঠনাত্মক তীক্ষ্ণ কটাক্ষের লক্ষ্য! ইহার পর ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমবন্দনাগীতি গান করেন। পরে একটি কিশোরী, একটি যুবক ও একটি বালককে আবৃত্তি ও পরীক্ষার ফলাফলসারে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বালকটির আবৃত্তি ("পাঠ") মন্দ লাগে নাই।

সভাস্থলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উস্তর কালিদাস নাগ, মৌলবি রেজাউল করিম, বটুকনাথ ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাবূষণ,

পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্য-রথিগণ বক্তৃতা প্রবাহনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। কবি অপূর্ণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বঙ্কিম লব্ধে একটি কবিতা পাঠ করেন, ও প্যারীমোহন সেনগুপ্তের রচিত একটি মূল্যবান কবিতা সভাস্থলে বিতরণিত হইয়াছিল।

অতঃপর জলযোগের আবাহনে আমরাও সত্য ত্যাগ করিতে হয়। চন্দননগরের মেয়র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বে মহাশয়, চন্দননগরের সকল সংকল্পের প্রাণভূত শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীবৃন্দের আদর আপ্যায়ন ও জলযোগের ব্যবস্থায় আমরা পরমপরিচরিতলাভ করিয়াছিলাম।

একটা কথা আমরা স্মৃতিতে অক্ষয় যে লক্ষ্যই "বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব" লেখা হইতেছে। শতবার্ষিকী উৎসব বলিলেই-ত বেশ শুনার—ব্যাকরণও বজায় থাকে। অথবা শুধু "বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী" বলিলেও কোন গোলমাল থাকে না। অথচ বাঙালীর সকল সাহিত্যিক মিলিয়া কেন যে "শতবার্ষিকী উৎসব" করিতেছেন, তাহা তাঁহারা হই ভাল বলিতে পারেন।



ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

খেয়ালী চিত্রপট



উপরে : অভিনেত্রী ইন্দিরা রায় একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমায়—
“চোখের বালি”-র একটি দৃশ্যে।

নিম্নে : অভিনেত্রী শান্তিলতা ঘোষ ও ইন্দিরা রায়কে এসোসিয়েটেড
প্রডিউসার্সের “চোখের বালি” চিত্রের একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে—ভবিখানা
সিটিং



টেলিগ্রাম
৮৮৮

পরিচালক
ক্যাশনাল নিউজপ্যাস লিঃ

টেলিফোন
৮৮৮

১১, চকবেড়িয়া (সাইদা) রোড, কলিকাতা

মুদ্রণ: বঙ্গ, অষ্টবিংশ সংখ্যা, পুস্তকপত্রিকা, ১৯৭৩, ১৭৩ পৃষ্ঠা ১৯৩৮

বাংলার মন্ত্রী-সঙ্কট

মিঃ নোশের আলীর পদত্যাগের পর হইতেই হক-নলিনী-নাজিম মন্ত্রীমণ্ডলীর ন্যাভিশাস শুরু হইয়াছে। জুলাইয়ের শেষে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের প্রারম্ভেই বেতন মঞ্জুর প্রস্তাবের কি পরিণতি হইবে তাহা ভাবিয়া হক সাহেবের স্ত্রী-পরিবার আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। সহযোগী “আজাদের” আতর্নাদের মাত্রাধিক্যে বন্ধুবর ডাঃ খীরেন্দ্র নাথ সেনের নাম উল্লেখ করিয়া কেলিয়া “আজাদ” প্রকারান্তরে ডাঃ সেনের লীপিকুশলতারই প্রশংসা করিয়াছেন। মিঃ নোশের আলীর পরামর্শদাতা মনে করিয়া “আজাদের” কর্ণধার ও তাঁহার পাশ্চরবন্দ শ্রীযুক্ত মাখম লাল সেন প্রভৃতির উপর খড়গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

অপন পক্ষে হক-নলিনীর দূতরূপে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সহিত একটা বোঝা-পড়া করিয়া কেলিবার আগ্রহে এলগিন্ রোড, উডবার্ণ পার্ক ও যাদবপুর কলোনি চসিয়া কেলিতেছেন। তন্মধ্যে ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস হলপতি অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ যুগোপাধ্যায় ও, “ইউনাইটেড প্রেসের” ম্যানেজিং ডিরেক্টর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিধুভষণ সেনগুপ্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশ্যে যে রাষ্ট্রপতি ওয়ার্ডা বাইবার প্রাকালে মাননীয় অর্থসচীব তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া কংগ্রেসের সহিত রক্ষা করিবার জন্ত আকুল আবেদন জানাইয়াছেন। রাষ্ট্রপতি নাকি ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস হলপতি শরৎচন্দ্রের অনুমোদন ব্যতীত কোন রক্ষার অমুকুলে মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। মাননীয় অর্থসচীবের প্রতি শরৎচন্দ্রের মনোভাব পূর্বের জায় কঠোর থাকায় কৌশলী অর্থসচীব স্বয়ং শরৎচন্দ্রের নিকট কোনরূপ প্রস্তাব করিতে সাহসী না হইয়া ‘আনন্দবাজারে’র কর্ণধার মাখমবাবুর নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। অর্থনীতি-বিশারদ হিন্দুসভা ও কংগ্রেসের অপূর্ব সংমিশ্রন-জাত অধ্যাপকপ্রবর রাধাকৃষ্ণবাবু মাখমবাবুর গৃহে শুভাগমন করিয়া হক-নলিনী-নাজিমের সহিত কংগ্রেস বা কংগ্রেস-স্নেহাসিক্ত দলের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিবার বিবিধ প্রস্তাব করিয়াছেন। বিবিধ প্রস্তাবগুলির মূল সর্ভ এই যে হক-নলিনী-নাজিম ও সুরাবন্দী ব্যতীত অগ্ন্যস্ত্র মন্ত্রীবর্গকে খেদাইয়া তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত রক্ষা করিয়া কেলিতে প্রস্তুত। মাখমবাবু নাকি দৃঢ়তর ভাবে পাল্টা প্রস্তাব করিয়াছেন যে নলিনী-সহ সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবের পূর্বে নলিনীবাবুকে বিনা সর্ভে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী বোধগা করিতে হইবে। তৎপরে অবশ্য মাখমবাবু নলিনীবাবুর বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা রদ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে সহায়তা করিতে পারেন—তৎপূর্বে নয়। মাখমবাবুর সহিত নলিনীবাবুর সাক্ষাৎ করিবার আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হইয়াছে যে বিধুবাবু এক প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু মাখমবাবু এতই বেরসিক যে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন—হয়ত বিব্রত হইবার ভয়েই! তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে মাখমবাবুর ও চক্ষুজ্ঞা আছে। নাহোড়-বান্দা রাধাকৃষ্ণবাবুর দৌত্য কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা সকলেই সোৎসাহে ও উৎস্রীবিচিত্তে অনুধাবন করিবে।

মিঃ নোশের আলী বর্তমান মন্ত্রী-মণ্ডল ভঙ্গ করিয়া নবগঠিত মন্ত্রী-মণ্ডলের প্রধান মন্ত্রীর স্বপ্নে মগ্ন।

কংগ্রেস দলপতি শরৎচন্দ্র যদি বিচক্ষণতার সহিত মন্ত্রীমণ্ডলের কম্পমান স্থখী-পরিবারের ক্রমশঃ নীধিলতর বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে হু-নলিনী-নাজিম মন্ত্রীমণ্ডলীর পতন অবশ্যস্তাবী।

শেষ মুহূর্ত্তে সংবাদ পাওয়া গেল যে ভদ্রবীরবিশারদ অর্থসচীব মহাশয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে দিয়া রাষ্ট্রপতিকে নলিনীবাবুর সঙ্কল্পের অনুকূলে মত দেওয়াইবার চেষ্টায় বন্ধপরিকর হইয়াছেন।

— : (X) : —

হাওড়ার এ্যাসেসার

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এ্যাসেসার পদ শূন্য হইয়াছে। এই শূন্য পদের জন্ত প্রার্থী হইয়াছেন শিবপুরের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্মী অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বিতাড়িত শিলা-লচীব মিঃ শৈলেন ঘোষ ও ত্রিযুক্ত খগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চেয়ারম্যান ত্রিযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন মহাশয়ের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে খগেন বাবুকে উক্ত পদে বাছাই করেন কারণ খগেনবাবুর বরদা বাবুর প্রতি আনুগত্য্য সন্দেহহীন। সেই আনুগত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বরদাবাবুর পক্ষে খগেন বাবুকে সমর্থন দৃঢ় হইয়াছে। তবু খগেনবাবুর বুদ্ধি তাঁহার পক্ষে প্রবল অন্তরার কারণ বিহারী এ্যাসেসারের বয়স ৫৫ পার হওয়ার মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সম্মানে বিদায় দিয়াছেন। তৎপরে প্রায় ষাট বৎসরের বৃদ্ধকে উক্ত পদে বসান বুদ্ধিযুক্ত হইবে না বোধে বরদাবাবুর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ত্রিযুক্ত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ই তাঁহাকে বিরত করিয়াছেন। তাহাই করিয়াছেন।

হরেনবাবু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক। হাওড়ার পাইন-রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া হরেনবাবু তাঁহাকে স্থায়ীভাৱে পরিণত করিবার লক্ষ্য করিয়াছেন। বিরোধীদলের নেতা অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য্য বর্তমানে নানাভাবে বিপর্য্যস্ত। সুতরাং তাঁহাকে এ্যাসেসারী পদে ব্রতী করিয়া হাওড়ার চিরতরে হলাহলি উচ্ছেদ করিবার মাননে কমিউনার ত্রিযুক্ত কান্তিক হস্ত ও হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ত্রিযুক্ত হরেন ঘোষ

শ্রীঃ সুরাবন্দী ইতিমধ্যে শান্তি-নিকেতন পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের উপর কমলার বরপুত্র অর্থসচীবের প্রভাব সর্বজনবিদিত সুতরাং অর্থসচীবের অনুরোধ বিশ্বকবির পক্ষে উপেক্ষা করা সহজ হইবে না। জরাজীর্ণ কবিকে রাজনীতির কোলাহলের মধ্যে টানিয়া আনা উৎপীড়নের নামান্তরমাত্র! কবির পরমশুভকামী অধ্যাপক মহালনবিশ মহাশয় কবিকে এই উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করুন ইহা আমরা কামনা করি।

বিশেষ লিখে। পাইন-বিরোধী দলের পরিপোষক ডাঃ বেণী চরণ হস্তকে ইতিমধ্যেই হরেনবাবু মনোনয়নের টোপে গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন। ত্রিযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বসু মুক্তা-শস্যার। ত্রিযুক্ত রজনী হস্ত রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ত্রিযুক্ত আলা মোহন দালের ব্যবসারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আর ত্রিযুক্ত শ্রীল বানার্জি ও ত্রিযুক্ত কালোবরণ ঘোষ হরেন বাবুর দলকেই সমর্থন করিবেন। সুতরাং বিজয়বাবুকে এ্যাসেসারির পদে বসানর জন্ত হরেনবাবু ও কান্তিকবাবুর প্রচেষ্টা বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। আর বৃহত্তর দিক হইতে দেখিলে বিজয়বাবুর দ্বার বজ্রধ্বস্ত কংগ্রেস-কর্মীকে উক্ত পদে নিয়োগ লক্ষ্যভাবে সমর্থন-যোগ্য। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বরদা বাবু হরেনবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিবেন বলিয়া লক্ষ্যেই আশা করিয়াছিল কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে আমেরিকা-প্রত্যাগত ও কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বিতাড়িত মিঃ শৈলেন ঘোষ গঙ্গা-পারে বাসা বাধিবার আলাচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বরদাবাবুও একটা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন নাকি তিনি মিঃ শৈলেন ঘোষকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার বাসনা করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন-হইতে বিতাড়িত এক কর্মচারীকে হাওড়ায় বসাইলে যে অমার্জ্জনীয় ক্রটি করিয়া বসিবেন বরদাবাবু কি তাহা এখনও পূর্ণবিবেচনা করিয়া দেখিবেন। হরেনবাবু ও কান্তিকবাবু এ বিষয়ে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছেন বরদাবাবুর পক্ষে তাহা অনুমরণ ও অনুমোহন করা একান্ত সমীচীন। তাঁহার নিজের প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠার দিক দিয়া বিচার করিলে বরদাবাবুর পক্ষে অজ্ঞ পদা অবলম্বন করা একেবারেই জ্ঞানাত্মক। হরেনবাবু কি বরদাবাবুকে এখনও বিরত করিতে পারিবেন না?

ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ମିତ୍ର

দ্বিজেন—তুই কেন সে কথা বলতে
 গেলি ?

মনীষা—সেইটাই আমার ভুল হ'য়ে গেছে। বলভূম না। আমার ব'ললে "ও কথা লে জানিতে পারে না। লংদায়ে এমন কেউ নেই যে লে কথা তাঁকে বোলতে পারে"—আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা 'আমিও জানি এবং লবাই জানে। গোপন আর কিছুই নেই।'

দ্বিজেন—তোদের এই এক দোষ। কোন কথা চেপে রাখতে পারিলনা। যেমন মনে হ'ল অমনি বেরিয়ে প'ড়ল!

মনীষা—দোষ বটে! কিন্তু ছোট্টা, আর এক ব্যাপার শোন। বাবাকে তো বললাম উইলের কথা আমি জানি। শুনে, বেৎলুখ খুশী হল। ব'ললে—"ও উইল! লে লবাই জানে। জানিগে যা লে কথা।"... এর মানে কি, বুঝতে পারিনি। তুমি বুঝতে পারছো?

দ্বিজেন—বোধ হয় উইল ছাড়া আরও কিছু আছে যা আমরা কেউ জানিনা।

মনীষা—বোধ হয়। খবর নিওতো—

(নেপথ্যে চাহিয়া কিস্ কিস্ করিয়া বলিল) এই ছোট্টা, বাবা ঐ খানে দাঁড়িয়ে লব কথা শুনছে।—সামলে নিও তাই। (লহজ কণ্ঠে) তুমি রোজ যা খাও, তাই খাবে ত?

দ্বিজেন—হ্যাঁ—

(কাশীশ্বরের প্রবেশ মনীষা ও দ্বিজেন প্রহ্নানোত্তত)

কাশী—আমাকে 'অমন পাশ কাটিয়ে চোলে বাসনে তোরা। একটুখানি না হয় দাঁড়িয়েই গেলি।

(মনীষা দ্বিজেন দাঁড়াইল)

মণি, চোখের জল তোর এনে আবার চলে গেল। তা'বলি কি কঠিন আমি, কি কর্কশ আমার কণ্ঠ! তাবলিনা শুধু—

(মনীষার প্রহ্নান)

খুব রেগেছে!—কি, তুমিও চলে গেলে না দ্বিজেন?

দ্বিজেন—আমার যে ছাড়াতে বোললে?

কাশী—ঠিক—"বোধ হয় উইল ছাড়া আরও কিছু আছে যা আমরা কেউ জানিনা— একখাটা বলবার ভলি তোমার বেশ!

দ্বিজেন—আমার যা মনে হয়েচে তাই বলেছি।

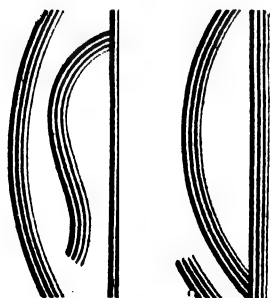
কাশী—তোমার মন হালকা হয়ে গেল, আমার যা মনে আছে তা আমি বলতে পারিনা, মন আমার তাই ভারী!

(ক্রমশঃ)

তোমার জাতি নেই, বিচার নেই, স্রণা নেই
তুমি শুধু কল্যাণের প্রতিমা, তুমি মা আমার

ভারতবর্ষ

শুধু ভারতের কোলে তুমিই হওয়ার অধিকারে নিজেকে ধস্তাধর
করিয়া, দেশ জননীর লতা রূপ যে উপলব্ধ করিয়াছিল সেই নব-
জাতীয়তার দিশারী



কিন্মসোর

মহিমাবিত
চিত্র-কথা

পরিচালক

শ্রীনরেশ মিত্র

ভূমিকায়:

রাজলক্ষ্মী

রাণীবালা

প্রতিমা দাস গুপ্তা

দেববালা

রমলা

সুহাসিনী

ইলা দাস

মনোরমা

চিত্র-পরিবেশক

প্রাইমা কিন্মস লি:

E. P. S.

প্রসেসিয়েটেড প্রোডিউসার্স
নিবেদন

শ্রী
চিত্রগৃহে



শীঘ্রই
আসিতেছে

বিশীলদাসের
চোখের বালি
সত্যদীনী - সুপ্রভা মুখার্জি

প্রভাত সিনেমা

আগামী ১৬ই জুলাই শনিবার থেকে এখানে লাগর মুভিটোনের নতুন ধরনের ছবি "৩০০ শত দিবস পর" দেখান হবে। নতুন ধরনের ছবি এই লক্ষ্যে, এতে গল্পের আখ্যান ভাগে, অভিনয়ে ও সঙ্গীতে সেই এক ঘেরে ভাব মোটেই না রেখে সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হয়েছে। তাতে ছবিখানা সকলের কাছে ভালই লাগবে বলে আশা করা যায়।

৩০০ শত দিবস পর,—একথা শুনে ভাববেন না যে আজ থেকে ৩০০ শত দিবস পর কী হবে তাই নিয়ে গল্পটি লেখা হয়েছে। বরং ঠিক তার বিপরীত। এক বিলাসী ধনী যুবক নিজের খেরালে কী রূপে ৩০০ শত দিবস নানা জারগায় চাকরীর তন্ময়তায় যুগলিত তারই ঘটনাবলীকে গ্রন্থিত করে গল্পটি তৈরী করা হয়েছে।

বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছে লবিতা দেবী, মতিলাল, বিষ্ণু, ও ইয়াকুব। এদের অধিক পরিচয় নিম্নরোজন। ছাত্রাভি জগতে লবিতা দেবীর স্থান চিত্রাশোভী মাজেরই পরিচিত। এই ছবিতে তাঁর গৌরব মোটেই রান হয়নি, বরং তাহা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুধাক্ষী মিস্ বিষ্ণু এ ছবিতে ৩ খানা গান গেয়েছেন এবং তাঁর প্রত্যেকখানিই হয়েছে এককথার চমৎকার।

ঘটনার নতুনত্ব, অভিনয়ে, ও সঙ্গীতে ছবিখানি প্রত্যেক চিত্রাশোভীরই প্রিয় হইবে এবং আশা করা যায়—ছবিখানি বেশ কিছুদিন প্রভাত সিনেমায় চলিবে। হিন্দি ভাষার লংলাপ এতই লজ্জ ও লরল যে, বাঙ্গালী মাজেরই তাহা বোধগম্য হবে।

হিমালয় কী বেটি

ভাবনাশীর ছবি "হিমালয় কী বেটি" আগামী কাল পর্যন্ত চলবে, এমাকী

রমা রাওয়ের নৃত্য ও অভিনয় এখনও বাহারী দেখেন নাই তাহার দৃষ্টিতেই এ সুযোগ হারাবেন না। তাছাড়া প্রাকৃতিক দৃষ্টের দৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হতে হলে এ ছবি আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন। চির তুষারবৃত্ত হিমালয় পর্বতের অতুলনীয় দৌন্দর্য্য ও কাশ্মীরের মন মুগ্ধকর দৃশ্যাদি অতি নিখুঁত ভাবে তোলা হয়েছে।

মীরাবাই

আলহে রবিবার বেলা ১১টার তাহিল ছবি মীরাবাই দেখান হবে। মীরাবাই হিন্দি ও বাংলা সংস্করণ যেভাবে আনৃত হয়েছে তাতে মনে হয় এর তাহিল সংস্করণ ও হিন্দি ভারতীয়দের কাছে যথেষ্ট আনৃত হবে।

সোনার সংসার

জীবনের প্রত্যেক কাজটি ভাগ্যবেশতার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়। আজ যে রাজা কাল হয় সে ফকীর। এবং আজ যে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা খুরিহুস্তি করে কাল হরত সে হবে লম্বাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। রমেশ লম্বাগরা আফিলের কেরানী। লংসারে জী ও একমাত্র পুত্র বর্ভমান। সুখের লংসার, সোনার লংসার—কিন্তু অদৃষ্টের অঙ্গুলি হেলনে তার এই সুখের লংসার এক মিনিটেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তারপর এক একটি দিন করে সুখীর্ষ ১৮ বৎসর পর কী ভাবে রমেশের লংসার পুনরায় সোনার হল "সোনার লংসার" চিত্রে তাই দেখান হয়েছে। বাংলা সংস্করণ বহু পূর্বেই মুক্তিলাভ করে চিত্রজগতে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। হিন্দি সংস্করণ গত ৯ই জুলাই থেকে প্যারাডাইল চিত্র-গৃহে দেখান হইতেছে। আশা করা যায় বাংলার জায় হিন্দি সংস্করণও রেকর্ড করে লক্ষ্য হবে।



প্রযোজক শিরা : জ্যোতিষ ব্যানার্জি
আলোক চিত্র-শিরা : যতীন দাস
লক্ষ-যন্ত্র : নুপেন পাল, ভূপেন ঘোষ
ভূমিকায় : রাণীবালা, দেববালা, ছাত্রা, নরেশ মিত্র,
অরুণ গাঙ্গুলী, সুশীল রায়, অমল পাল (শাহ বাবু),
কুমার মিত্র, তুলশী চক্রবর্তী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ

স্বদেশ পরিচয়

দশবর্ষীয় শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী বহু দশক কর্তৃক সম্প্রতি বহু বংশের সম্পূর্ণ পরিচয় একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। নিকুঞ্জবাবু কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন কার্যে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সুযোগ্য দাদু শ্রীমতী লতিকা বহু এই কার্যে স্বেচ্ছা সাহায্য করেন। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত বহু মহাশয়ের এই কষ্টসাধ্য পুস্তক সমগ্র কার্যস্থ সমাজ সাহসে বরণ করিয়া হইবে।

এলাহাবাদে শিশির-সম্প্রদায়

হুইলার এণ্ড কোম্পানীর লিনিয়র পার্টনার শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জির কনিষ্ঠ পুত্র এমান রাজেন্দ্র ব্যানার্জির স্ত্রী-বিবাহোপলক্ষ্যে নাট্যাচার্য শিশির ভাঙ্কড়ী এলাহাবাদে তিনকড়িবাবুর বাটীতে 'বিজয়া', 'রীতিমত টক', ও 'আলমগীর' অভিনয় করে সাজেন।

অভিনেতাধের মধ্যে শিশির কুমার, যশাধ ভাঙ্কড়ী, জীবেন বহু, পঞ্চানন বানার্জি, শীতল পাল, অরুণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতী স্বাভা, শেফালিকা (পুতুল) প্রভৃতির অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়।

তিনকড়িবাবু এবং তাঁহার পুত্রবহু মকুল ও রাজেন্দ্রবাবু শিশির-সম্প্রদায়ের প্রযোজ্যের প্রতি প্রথমে দৃষ্টি রাখেন।

ইউনাইটেড ক্লাব

গত ২৪শে জুন শুক্রবার পাথুরিয়াবাটার

স্থপরিচিতি ইউনাইটেড ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক তাহাধের ৪৭ নং পাথুরিয়াবাটারস্থিত ক্লাববাটার প্রাঙ্গণে শরৎবাবুর 'বিজয়া' অভিনয় হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি চাক্ষুসে বিশ্বাস মহাশয় এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাবু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, বাবু হাধোদর দাস ঝাঙ্গা, বাবু প্রতাপচন্দ্র মল্লিক, বাবু ভ্রলচন্দ্র আইচ, বাবু সুধাংশু কুমার মিত্র প্রভৃতি বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি অভিনয় রজনীতে উপস্থিত থাকিয়া ক্লাবের সভ্যগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ঘোড়ার উপর আমাধের অভিনয়টি বেশ সুন্দর লাগিয়াছিল। Stage, দৃশ্যপট, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি খুব মানানসই হইয়াছিল।

প্রতি ক্ষুদ্র ভূমিকার অভিনয় সুন্দর হওয়ার প্রধান ভূমিকাগুলিও সুন্দর হইয়াছিল। মহিলা চরিত্রগুলির অভিনয়ের মধ্যে—'বিজয়া' ও 'নলিনী'-র অভিনয় এমন মানানসই হইয়াছিল যে আমরা Amateur অভিনয়ে এইরূপ দেখিব বলিয়া আশা করি নাই। বিজয়ার ভূমিকার ধীরেন মিত্র ও নলিনীর ভূমিকার লতোন বহু সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শীতল বহু—রাজবিহারীর ভূমিকা সভ্যই অপূর্ণ হইয়াছিল। নরেন্দ্রের ভূমিকার অজিত মিত্র কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিলালের ভূমিকার প্রভাত মিত্রের part-টি আর একটু polished হইলে ভাল হইত। পংখেশের ভূমিকার ক্ষুদ্র বালক নরোজের অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। অমিশ্রিত আচার্যগণের মধ্যে জীতেন বহুর makeup-টি বড় সুন্দর হইয়াছিল। উৎসাহী-দলের মধ্যে জটাধর পাইনের নেপথ্য গীতটি ভাল লাগিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে অভিনয়টি সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া

ফোন ২৭৭৪



বড় বাজার

অমৃত নাজ কাঠের ঘানি
কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল
ত ত্রয়েন মিলেই
ত হয়
না।

ছিল। পরিশেষে ক্লাবের অন্ততম সভ্য বাবু সন্ন্যাসনাথ ঘোষ, অরুণচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সমাগত অভ্যাগতবৃন্দকে আহার আপ্যায়ন দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমরা এই ক্লাবের দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

গল্প রচনা প্রতিযোগীতা (বালিকা-
বিগের অন্ত)

রচনা নিজস্ব হওয়া চাই। যে কোন মাতৃ-
ভাষায় লিখিলে চলবে। প্রথম ও দ্বিতীয়
পুঙ্খকার দুইটি রোপ্যপত্রক। রচনা পাঠাইবার
শেষ দিন ৩০শে জুলাই। ফল ১৫ই আগষ্ট
বাহির হইবে। রচনা কলাফলের জন্য এক
আনার stamp সহ পেন্সেটোরি সান ডে
ক্লাব ১৯নং অ'ট'নি বাগান লেন কলিকাতা
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সঙ্গীত সম্মেলন

চন্দননগর হইতে শ্রীমতী রাধা দেবী
লিখিয়াছেন :—

আপনাঘের সঙ্গীত প্রতিনিধিগণ শেষ
প্রবন্ধে শ্রীমতী হীরাবর্জি, শ্রীমতী কেশর বর্জি
ও পণ্ডিত ওজারনাথ ঠাকুরের গানের
সমালোচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়া-
ছিলেন। অথচ এ যাবৎ সে সমালোচনা
বাহির হইল না। আমরা আর কতকাল
শেষ প্রবন্ধের আশায় থাকিব ?

আমরা এ বিষয়ে আপনাঘের প্রতিনিধি-
বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্বাত্ত

বঙ্গ ৪১৫ মাস যে কারণশেই
হউক ভৈরবী বনোমধিতে
অব্যর্থ বল—গর্ভাবস্থায় ব্যবহার
নিষিদ্ধ ১০ দস্ত ও বর্ণ শাস্তি একবার
এরোগেই উপশম, ৪০ মা: ১০ আনা



সময় ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস মনজ বিশ্বাসদ

১৮২ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।



(বিলাসী)

বড়দিদি

লাউণ্ড ষ্টেজ নম্বর তিন সারা ফ্লোর-টি
জোড়া সূক্ষ্ম একটি সেট। এই সেট-এ গত
সারা সপ্তাহ ধরে পূর্ণ গতিতে কাজ কোরে-
ছেন লম্বলবলে পরিচালক অমর মল্লিক।
বর্তমান সপ্তাহেও বাকী কাজ চলবে উপরের
সেটটিতেই।

জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ীর বাড়ীর
বাইরের মহল। এই মহলের একটি প্রাঙ্গণ
কক্ষে স্থান পেয়েছেন 'মাস্টার' সুরেন্দ্রনাথ।
এই সংলগ্ন আর একটি সুসজ্জিত কক্ষ—
অন্দর-মহলের সঙ্গে সংযুক্ত। এই পাশের
কক্ষটিতে, পর্দার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে
ব্রজবাবুর লংকারের সেই স্নেহমণী, সর্বময়ী,
নারী—বড়দিদি, কখনও 'বিনু' বা 'কখন বা
'নিমু' চাকরের মধ্যস্থতার, আপন-তোলা
সুরেন্দ্রনাথের খোঁজ খবর এবং তদারক
করেন।

ছোটখাটো অভাব-অভিযোগ নিরাসের
মধ্য দিয়ে, স্নেহের অমুশালনে—এই চরকাড়া
ও পরম অন্তরমনস্ক লোকটার জীবনে ধীরে
ধীরে কখন কোরে শৃঙ্খলা আসতে শুরু
হয় এবং কখন কোরে আবার তার মন
বিজ্রোহী হোয়ে ওঠে—সুরেন্দ্রনাথের জীবন
নাট্যে সেই লংঘাতের সূচনা হয় এখান
থেকেই

বাঙলা সংস্করণে বিনু বি-র ভূমিকার
চরকার অভিনয় বোরছেন—প্রতিভা-
শালিনী শ্রীমতী নিভাননী। হিন্দিতে-
বেলা।

মাধবীর তাই শিবচরণের ভূমিকার হিন্দি
ও বাঙলার বথাক্রমে অভিনয় কোরছেন—
চন্দন এবং কেটে দ্বাশ।

বড়দিদির আলোক-চিত্রের কাজে অনেক
কিছু নতুনদের পরিচয় দেবার জন্য সুবিধা
চিত্র-শিল্পী বিমল রায় বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন।
সঙ্গীতাংশের পরিচালনাতেও, সুর-শিল্পী
পঙ্কজ মল্লিক তাঁর বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে
পারবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

স্ট্রীট সিন্ধার

কদিন ধরে আকাশেও যেমন মেঘ ও
রৌদ্রের খেলা চলেছে 'স্ট্রীট সিন্ধার' সেটেও
যেন ঠিক তেমন খেলা চলেছিল মেঘ ও
রৌদ্রের। প্রকৃতির পাগলী মেঘের মত
শ্রীমতী কানন অভিনয় করছেন—কণে থিলি
থিলি হাসি, কণে আঁখিতে বাঁধর ঝর ঝর।
বেচারি লাইগল বুঝেই উঠতে পারছেন না
শ্রীমতীর 'মুড্'টা কি? লগাই বলাবলি
করছিল এটা ভুলুগা ও মজু চরিত্রের মধুর
রসপূর্ণ বথার্থ অভিনয়। আমরা কিন্তু
দেখেছিলুম লাইগল ও কাননের বথার্থ খুনসুটি।
এটাকে অভিনয় বলে মনেই হচ্ছিল না।
দুজনেই ভাল গাইয়ে, অতএব তাদের
খুনসুটিতে গান ও সুর লোকের মন এমন
করে হরণ করে নেবে তাতে আর আশ্চর্য
হবার কি আছে ?

সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল তাঁর
পুরাণ পদ্ধতি ছেড়ে এবার কতকগুলি
নতুন ধরনের সুর এ ছবির গানে দিয়েছেন।
চিত্র পরিচালক কণি মজুমদার বেজার খুশী।

দেবকী বসু

পরিচালক দেবকী বসু তাঁর পরবর্তী ছবির মহলা আরম্ভ করে দিয়েছেন। নিউ থিয়েটারের এক নম্বর ষ্টুডিওতে এই মহলা কার্য্য পুরোদমে চলেছে। বতবুস মনে হয় আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এই ছবির কাজ আরম্ভ হবে নিউ থিয়েটারের দু'নম্বর বাড়িতে। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন রাই চাঁদ বড়াল।

“বঙ্কিমের স্মৃতি আছে ভাষা নাই”

“বঙ্কিমের স্মৃতি আছে, ভাষা নাই”— এই অপূর্ণ তর্জমার বীরবল মহাশয় বঙ্কিমের স্মৃতিপূজা করিয়াছেন এলবার্ট হলে ছাত্রছাত্রী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম শতবর্ষিক উৎসবে। এই উক্তির মধ্যে কোন স্নেহের ইঙ্গিত লুক্কায়িত আছে কি না না হিতামেনবী বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারেন। আমরা এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ বিষয়ে বাঙালার দায়িত্বানবীরুদ্ধের মতামত আমরা বারাস্তরে “খেরালো”তে প্রকাশ করিব।

নীতীন বসু

নীতীন বসু তাঁর নতুন ছবির কাজ আন্তে আন্তে চালাচ্ছেন। ‘বেশের মাটির’ সম্পাদন কার্য্যে তাঁকে বেশী সময় দিতে হচ্ছে বলে তিনি এই নতুন ছবির দিকে বেশী মনোযোগ দিতে পারছেন না।

দেবেশ্বর মাটি

‘বেশের মাটি’র টেলার নেজার হয়ে পড়ে আছে। আশা করা যাচ্ছে যে আলভে শনিবার থেকে এই টেলারটি চিত্রায় ও অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। মূল ছবিখানি বোধ হয় আগষ্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রায় মুক্তি পাবে।

অধিকার

অধিকার-এর উত্তর সংস্করণই প্রায় শেষ হয়ে এলো। এই ছবির শেষের দৃশ্যটি তোলবার জন্তে যে একটি বিরাট শেটের নির্মাণ কার্য্য চলেছে তা বোধহয় নিউ থিয়েটারের আর কোন ছবিতে দেখা যায় নি। এই শেটটি হচ্ছে নারক নিখিলেশের ‘dream land’। নারক নিখিলেশ নারিকা ইন্দ্রিরাজ নকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এই গৃহে প্রবেশ করবে বলে স্থির করে রেখেছিল।

অভুসার

আগছে ৩০শে জুলাই পরিচালক প্রবেশ বসুয়া ‘এয়ারে’ বিলতে যাচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে যে তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী বসুনাও যাবেন। বাঙলা দেশের কোন অভিনেত্রীর ভাগ্যে বোধ হয় এই দোভাঙ্গা আজ পর্য্যন্ত হয়ে উঠেনি।

গোরা

শোনা যাচ্ছে যে ‘চিত্রায়’ বিজ্ঞাপিত পাই চর সপ্তাহের জন্তে বেংকক কিস্মাস-এর ‘গোরা’ যেখান হ’বে। এবং ‘গোরা’র পরই ‘বেশের মাটি’ যেখান হ’বে।

চোখের আলি

এলোনিয়রেটেড প্রোডিউসারের প্রথম নিবেদন রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের আলি’-র

সম্পাদনা চলছে। এই মাসেরই শেষভাগে ছবিখানি শ্রী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। আমরা বতবুস জানি ছবিখানিকে নরীল স্তম্ভ করবার জন্ত কৰ্ত্তৃপক্ষ বতবুস মাধ্যমে চেষ্টা করছেন। ‘চোখের আলি’-র মত মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনীকে চিত্রে রূপ-রূপ-গড়ে সজীবিত করে তুলতে কৰ্ত্তৃপক্ষ বা প্রযোজন তার কিছুই কোত রাখেন নি। এই চিত্রে অভিনয় করেছেন—সুপ্রভা মুখার্জি, ইন্দিরা রায়, শান্তি লতা ঘোষ, রমা ব্যানার্জি, ডাঃ হরেন মুখার্জি, ছবি বিশ্বাস, মনোজ্ঞান ভট্টাচার্য্য। শিকারীকা ও অভিজাত্যের দিক থেকে ‘চোখের আলি’-র বিভিন্ন চরিত্রে এদের মনোময়ন বিশেষ প্রাধান্য।

চিত্রা

‘বিজ্ঞাপিত’র জনসমাগম এখনও পুরো-দমে এখানে চলছে। কানন-এর—অনুপ্রাণা যারা এখনও না দেখেছেন তাহের অন্ততঃ এখনও একবার দেখা উচিত।

নিউ সিনেমা

এখানে রঞ্জিতের ‘বন কি চিড়িয়া’ আগছে শনিবার থেকে ঊর্ধ্ব সপ্তাহে পড়বে। এই ছবিটি যে ভাবে দর্শক আকর্ষণ করছে

CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী !

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী !!



পাওয়া যায়। হারিয়ে ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। ২৭ পালিশ লোহার স্তায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিঙ্ক্রিক্ট

৭০নং কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : ৬৬, ৫৮২

নিরুদ্দেশের রাজী

(গল্প)

২ শ্রীমতীশ্রীনাথ চক্রবর্তী

মধুপুর ষ্টেশনে নেবে 'বড় বাধ' অভিমুখে যে রাস্তাটি গেছে সেই রাস্তা ধরে মলয় বরাবর যেতে লাগল। 'বড় বাধ' ষ্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল পথ, পশ্চিম দিকের সব শেষের যে বাড়ীখানি, সেই বাড়ীতে থাকেন মলয়ের পিসতুত ভাই মহিম মিত্র। আগে উনি জগলী জেলার অন্তর্গত চুচুড়ায় থাকতেন। এইখানেই এর নিজ বাড়ী।

বহর খানেক হ'ল মহিমবাবু জীপুল নিয়ে মধুপুরে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। কোন পাথরের খনিতে নাকি তার শেয়ার আছে। চাকরী বাকরীর কোন ধার ধারেন না। খান্ দান্ আর ভাল খেলে বেড়িয়ে বেড়ান।

তাতে মনে হয় কোলকাতার এ ছবির তবিস্যুত ভালই।

পূর্ণ থিয়েটার

বেববস্তুর 'গ্রাহের ফের' এই লপ্তাহেই শেষ। আসছে শনিবার থেকে এখানে নিউ থিয়েটারের 'দ্বিধি' দেখান হ'বে।

রূপাশাণী

নিউ থিয়েটারের নতুন লম্বাজ-চিত্র 'অভিজ্ঞান' এই শনিবার থেকে এখানে যষ্ঠ লপ্তাহে পড়লো। চিত্র-কাহিনীর লভেজ এবং লবরণ বিষয় শুণে, শ্রীমতী মলিনা ও জীবন গাজুলীর নির্খুত চরিত্র-চিত্রণে, পরিচালনা ও আলোকচিত্রের রস বোধের পরিচয়ে এই কথাচিত্র বাঙলা ছায়াচিত্র-ভালিকার একটি স্বয়ংীয় ও পুরষ উপভোগ্য বাণীচিত্র বললেও বোধ করি, অত্যাক্তি করা হয় না।

প্রোলিডেন্স কলেজের ফোর্থ ইয়ারে পড়ে মলয়। বাড়ী কোলকাতাতেই, পূজোর ছুটিতে আসছে মহিমদার বাড়ী। ইচ্ছেটা এইখানেই যাবে ছুটিটা কাটিয়ে।

(২)

মলয় রোজ লক্ষ্যায় লক্ষ্যালে বেড়াতে বেড়ায় এখার ওখার। বেড়ান তার একটা নেশার মত। কোন দিম নদীর ধারে ধারে কোন দিন বা এমনি মাঠে মাঠে বেড়িয়ে আসে। একদিন লক্ষ্যায় 'পাথর-চিপটির, দিকে বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে সবুজ মথমলের মত ঘাসের ওপর ব'লে আপন উচ্ছ্বাসে মলয় তার পেতলের বাঁশীটা বাজিয়ে চে'লে-ছিল একান্ত আগ্রহে। আকাশে বাতালে ছড়িয়ে পোড়েছিল তার সুমধুর সুর-লঙ্ঘী। বাঁশী বাজাতে বাজাতে বাঁশীর সুরে নিজেই মে হয়ে গেছিল তন্ময়। ভুলে গেছিল সে বাড়ী ফেরার কথা। বাঁশীতে ল'লিটে ছিল তার অদ্ভুত স্বপ্ন। বাঁশী যখন ধামল বেশ একটু রাত হ'য়েছে তখন। শুক্লা একাধশীর শুভ্র জোৎস্নায় ভেয়ে গেছে সারা মাঠ বটে। বাঁশী থামিয়ে উঠতে যাবে—বেথলে হাত চার-পাঁচ দূরে এক বৃদ্ধ ভক্তলোক এবং এক অপূর্ক্স নাগী স্থিতি। বৃদ্ধ যেন কার ধানে মগ্ন। চোখ দুটা তার অর্দ্ধমুদ্রিত। আর সেই নারী স্থিতি যেন তারই দিকে চেয়ে প্রাণলমান দৃষ্টিতে।

মলয় তার নিজের দৃষ্টি শক্তির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে যেন। মনে মনে তাৎপলে এও কি লভ্য, না স্বপ্ন বেথছে সে। এ যে তার মাননী। একেই সে খুঁজে ফিরছিল সে সারা যুগ যুগ ধরে,

তার লবখানির বিনিময়ে। কি সুন্দর ছিপ-ছিপে গড়ন তার। পায়ের ডাটার মত দুটি বাহ। আঙুলগুলি বেথে ম'নে হয় যেন একরাশ চাপার কুঁড়ি। আর কি অপূর্ণ তার গায়ের রং; যেন শরৎ কালের সূর্য্যের একঝলক রঙ্গুর তার গায়ে কে ছড়িয়ে দিয়েছে। আর সেই লক্ষ্যজ সুন্দর বেল্লভাকে বেঠেন ক'রে আছে ফিকে নীল রংয়ের একখানি পারিজাত শাড়ী, তার শাড়ীর বাধন টুটে তার যৌবনশ্রী যেন উপাচয়ে পোড়ছে। বৃদ্ধ ভক্তলোক আশ্রয় হ'য়ে হাত জোড় করে প্রথমে নমস্কার কোরলেন। মলয়ও বিশ্বাসবিষ্টের মত প্রতি-নমস্কার জানাল, বিশ্বাসের ঘোর তার তখনও কাটেনি। বৃদ্ধ ভক্তলোক প্রথমে কথা বোললেন। "কি সুন্দর আপনি বাঁশী বাজান্! আপনার বাঁশীর সুমধুর সুর আমাধের বাড়ী ফেরার অন্তরায় হল। ফেরা আর হল না আমাধের। দূর থেকেই শুন্ছিলাম আপনার বাঁশী তন্ময় হ'য়ে, তার পর ই'চ্ছে হ'ল, একবার বেথে আস্তে দেই মহাপুরুষকে যিনি এমন প্রাণের স্বর দিয়ে ক'রেছেন সুর সৃষ্টি। আমরা এনে খানিক বসবার পরই গেল আপনার বাঁশী বেধে। আশা করি ক্ষমা কোরবেন আমাধের অনধিকারের এ অপরাধ।" একান্ত বিনীতভাবে বোললেন বৃদ্ধ ভক্তলোক। "এমন ক'রে আমাকে বোলে আপনার কাছে অপরাধী কোরবেন না। বাস্তবিক আমি লজ্জা পাব। একে আমি বাজাতে প্রায় কিছুই জানিনা, তার ওপর এ অবখা প্রাণংসা শুন্লে অপরাধের মাত্রা আরো বাড়বে। তবে আমি ধীর কাছে শিখেছি তিনি একজন বিখ্যাত বাঁশী বাজারে। তাঁর বাঁশী শুন্লে বনের পণ্ড পাখীও বশ হয়, এবং এটা যে শুধু কথার কথা নয়

তা তিনিই তাঁর বাণী শুনেচেন তিনিই বলবেন” লজ্জিতভাবে মলর বললে। “সে বিষয় আমার তিলমাত্রও লক্ষ্য নেই। কারণ বার শিশু এমন শুণী তাঁর শুকু তিনি তিনি যে একজন অদ্বিতীয় হবেন এ নিঃসন্দেহ” বুদ্ধ ভক্তলোক লহাস্তে বললেন এবং হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলেন, “আর এখানে হাড়ান মোটেই নিরাপদ নয়। চলুন এবার যাওয়া যাক। বৃষ্টি নাবল বলে, কথায় বলে শরতের মেঘ। চলুন আমার ওখানেই। ওই নামনের ড’ তিনটে বাড়ীর পরই আমার বাড়ী।” লতিয়াই বৃষ্টি নাবল মুখলধারে, মলরকে আর কান কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তার লজের সেই নাকীকে একটু দ্রুত হাঁটতে বলে বুদ্ধ ভক্তলোক তাঁর বাড়ীর উদ্দেশ্যে দ্রুত পা চালিয়ে দিলেন। ড’ তিন মিনিটের মধ্যেই একটা বড় গেটওয়ালা

বাড়ীর সম্মুখে এসে পৌঁছলেন। গেটের নামনে হুদিকে ছোটো গ্যাল লাইট জলছে। গ্যালের আলোর মলর দেখল—ফটকের গারে পাথরের ফলকে লেখা—“শ্রীযুক্ত বাবু অমলমোহন চৌধুরী এম্, এ, বি এল, এবং আর একদিকে লেখা আছে—“মলরাচল।” সেই গেটের মধ্যে দিয়ে নামনের গোলাপ বাগান পার হয়ে বুদ্ধ ভক্তলোকও সেই নারীটির অঙ্গুরণ কোরতে কোরতে একবারে ঘোতালায় এক হল ঘরে এসে পৌঁছল মলর। বুদ্ধ ভক্তলোক নামনের একটা লোকায় মলরকে বলবার নির্দেশ দিয়ে তিনি একটি আরাম কেদারার অর্জুণারিত হয়ে একটা আরামের নিশান ফেললেন। মলরও বিনা বাকাব্যারে মোহাবিষ্টের মত বলে পড়ল। “হাক্ এইবার বত বৃষ্টিই আসুক না কেন কোন আপত্তি নেই। কি বল মা করণা?” জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে ভক্তলোক পার্শ্বপরিষ্টা

করণার দিকে চাইলেন। এই অবেহুত প্রস্তের কি জবাব দেবে ভেবে ঠিক করতে পারলো না যেন করণা। লজ্জা লজ্জাই ভক্তলোক অপ্রতিভভাবে বোললেন, “তাইত’ আমার করণা মার লজ্জা যে এখনও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি আপনাকে।” দীয়ে দীয়ে তিনি পার্শ্ব উপবিষ্টা করণার মাথার হাত হুলুতে লাগলেন লম্বা। “ওহ! তোমার কাপড় চোপড় সব ভিজ্জে গেছে যে একেবারে; ছেড়ে ফেল। নইলে অসুখ করবে আবার।” আকার এবং আবেশ মিশ্রিত সুরে করণা বলল “তাইত’ আমার কাপড় চোপড় যে ভিজ্জে গেছে এত আমার মনেই ছিলনা মোটে।” বলেই তিনি হো হো ক’রে হেসে উঠলেন যেন এটা মস্ত একটা হাসির ব্যাপার, তারপর হঠাৎ হাসির ত্রেক ক’লে মলরের দিকে চেয়ে বোললেন, “আপনারও ত” কাপড় চোপড় সব ভিজ্জে

মস্ত
সপ্তাহ

নিউ থিয়েটার্সের
নূতনতম সামাজিক - চিত্র

আভিজ্ঞান

রূপবাণী চিত্রগৃহে এই কথা-
চিত্রটির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর
কেন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা
ঠিক বিজ্ঞাপন লিখিয়া বোঝান
অসম্ভব বলিয়া আপনাদের
উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়
মনে করি।

—*-

কোন বি. বি,
৩৪১৩

অগ্রিম সিট রিজার্ভ করুন

N. I. P.

পূর্ণ থিয়েটার

২৮ং রসা রোড, ফোন : সাউথ ৩৪

শনিবার, ১৬ই জুলাই হইতে

বিশেষ অনুষ্ঠানে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য

নিউ থিয়েটার্সের

দিদি

এ সুযোগ হারাবেন না

লাকি ওয়াচ এণ্ড কোং

আমরা সুলভে উচ্চশ্রেণীর ঘড়ি নির্মাণ

এবং বিক্রয় করিয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

১১২ আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিঃ।

গেছে তাহলে। হ্যাঁ, ভাল কথা আপনার নামটি কি রিজাল করাতে পারি কি? অবশ্য বহি কিছু মনে না করেন। “না না মনে কি করার আছে। আমার নাম মলর বঙ্গ।” বেশ লক্ষ্যভিত্তিক ভাবেই মলর বলল। “বেশ! চমৎকার নামটি আপনার। বা! স্বর্ণা মলর বাবুকেও অবনি একখানা কাপড় দিও। আর তুমিও কাপড় চোপড় বহলে আমার জন্তে কফি এবং মলর বাবুর জন্তে চানিয়ে এস।” মলর মুহূর্তে আপত্তি জানাল। কিন্তু তত্ত্বলোকের ঐকান্তিক অনুরোধে তাকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভিত্তিক জানাতে হ’ল। অবশ্য ‘মৌনং লক্ষ্যভিত্তিক লক্ষণং’ এইভাবে। অতঃপর স্বর্ণা উঠে গেল পিতার আদেশ পালন কোরতে। তখন মলরের সঙ্গে তত্ত্বলোক অনেক কথাই কইতে লাগলেন বলে বলে। বাইরে তখনও অবিরাম ভাবে বর্ষা চলেছে। তাঁর নিজ বাড়ী ‘বেনারস’ সেইখানেই তিনি প্রাক্টিক কোরতেন তাঁর নাম অনঙ্গ বোহন চৌধুরী। তাঁর স্ত্রীর অনেক দিনকার লখ ছিল মধুপুরে বাস করার। আজ পাঁচ বছর হ’ল প্রাক্টিক ডেডে দিয়ে তিনি স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা স্বর্ণার লহিত মধুপুরে বাস করিতেছেন। আজ দু’বছর হ’ল বেরি বেরিতে তাঁর স্ত্রী এইখানেই দেহত্যাগ ক’রেছেন। সেই থেকেই তিনি এইখানে রয়ে গেছেন। শেষদিকে অনঙ্গবাবুর স্বর করার ভারী হয়ে এসে। মলর অনঙ্গবাবুকে বতাই দেখছিল এবং বতাই তার পরিচয় পাচ্ছিল ততই তাঁর আনন্দিক ব্যবহারে এবং শিশুর মত লারলো মুগ্ধ হ’য়ে বাচ্ছিল। এবং এখন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর লংবাধে লতাই বাধা অনুভব করল। একটি ‘বর’ অনঙ্গবাবুর জন্তে একখানি কাপড় ও একটি বিরজাই ও মলরের জন্তে একখানি কাচান বৃত্তি ও গেঞ্জি আনল। অনঙ্গবাবু কাপড় ভাষা ছাড়লেন এবং বাধ্য হ’য়ে মলরকেও তাঁর

অনুরোধ বর্ণে হল। তারপর স্বর্ণা চা ও কফি নিয়ে এসে এবং বধাক্রমে মলরকে চা ও অনঙ্গবাবুকে কফি পরিবেশন করল। এবং একটা স্ট্রেটে করে খানকতক গরম কচুরীও দিল মলরকে। অনঙ্গবাবু এদমর কিছু খান্না সেই জন্তে তাঁকে শুধু কফি দিল এবং শেষে বোধ হয় কোনও কার্য উপলক্ষে স্বর্ণা সে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ’য়ে গেল। জলযোগান্তে মলরের সঙ্গে অনঙ্গবাবুর আরও কথাবার্তা হ’তে লাগলো। তাঁর গানবাজনা শোনার গভীর অনুরাগের কথা, মলর এখানে কোথার এবং কত বাড়িতে এনেছে? কতদিন থাকবে কি করে ইত্যাদি আরও অনেক কথা হ’তে লাগল। মলর এখানে ‘বড়বাধে’ ‘কবিলজ’ থাকে এবং মহিমবাবু তাঁর পিসতুত ভাই শুনে তিনি তারপর নাই আনন্দিত হ’লেন। এবং তার সঙ্গে যে অনঙ্গবাবুর বিশেষ আলাপ আছে সে কথা জানালেন। এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি মলরকে আপনার ক’রে নিলেন। অনঙ্গবাবুর মন্টা খুব সরল। তাঁর মনে কোন রকম মানি ছিলনা। তিনি অত্যন্ত মিস্রক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন।

পরদিন থেকে মলর তাঁর বাড়ী নিরমিত ভাবে আসবে এবং কোন রকম সঙ্কোচ করবে না আশতে। নিজের বাড়ীর মত ম’নে ক’রবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি ল’য়ে মলর বাড়ী ফিরল সেদিন। বাড়ী এগে বধন পৌছিল সে, তখন রাত্রি প্রায় ১২ট। এতখানি রাত হওয়ার জন্তে একটু আধটু কৈফিয়ৎ ও দিতে হল। তারপর খেয়ে ঘেয়ে শরে পড়ল। তার মনে আজ অপরূপ পুলকিত মাতন। সে পেরেছে আজ তার মানসীর দেখা। বিচিত্র বস্ত্রের জাল মুনতে মুনতে সে নিজের কোলে আঙ্গ লম্পণ ক’রল।

(৩)

.....এখন প্রত্যহই অনঙ্গবাবু: বাড়ী আসে মলর। আজকাল তাঁর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হ’য়েছে তার। এখন অনঙ্গবাবুর মলরবাবু লেখোন কেবল মাত্র মলরএ এবং আপনি বলাটা জুঝিতে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বর্ণা আজ কাল আর লজ্জা করে না মলরকে দেখে। মলর এখন স্বর্ণাকে স্বর্ণা দেবীর পরিবর্তে কেবল স্বর্ণা বলেই ডাকে। আজকাল সে প্রায়ই লজ্জা সকালে স্বর্ণাকে নিয়ে বেড়াতে যায়। প্রায়ই অনঙ্গবাবু এঘের বলে যোগ দিতে পারেন না। কারণ তাঁর বাতের ব্যাথাটা মাঝে মাঝে বড়ই বেশী হ’য়ে পড়ে।

কোনদিন মাঠে বসে মলর বাঁশী বাজায়, পাশে বসে শোনে স্বর্ণা নিবিষ্ট মনে। স্বর্ণা তার পাশে থাকলে তার বাঁশী যেন আপনি বেজে ওঠে বিচিত্র সুরে। এমনি করেই মলরের ছুটির দিনগুলি একটির পর একটা কোরে কেটে যেতে লাগল জলের মতশরৎ কালের পূর্ণিমা। লম্বা প্রকৃতি যেন রূপোর পাতে জেগে। গাছ পালার লক্ষ্যই রূপালীর আবেশ। গ্রামের শেষে একটি অতি ছোট ক্ষীণকার নদী বর্ষার জলে কথঞ্চিৎ পূরে। ঝিরঝির করে অবিরাম বয়ে চলেছে। নদীর পাড়ে একখণ্ড পাথরের ওপর সুখোমুখি ভাবে বসে মলর আর স্বর্ণা। মলরের প্রাণে আজ যেন তান্ডব নৃত্য হয়েছে। সে আজ বাঁশীতে করেছে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তার প্রাণের লম্বা আবেশন বাঁশীর প্রস্থ শোনাচ্ছে তার মানসীকে। কারণ ভাল লাগালাগির ওপর তার কোন খেয়াল নেই যেন আজ। সে আজ শুধু শুনিতেই ম’বী। লজ্জা উত্তীর্ণ হয়ে রাতের দিকে গড়িয়ে চলেছে ক্রমশঃ। তবু বিরাম নেই তার অন্তরীণ আলাপের। নেই তার স্মৃতি।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—একুশ—

অরুণ ডাক্তার পরিমল সেনের পত্র পাইল। তাহাকে ডাক্তারবাবু লিখিয়াছেন যে গত কয়েকদিন যাবৎ একটি বুক তাঁহার নিকট আছে সে অত্যন্ত পীড়িত ছিল কিন্তু ইহানীং ভাল আছে। সে অরুণের নিকট যাইতে চায়, নাম তার অমল সাজ্জাল। সে ডাক্তারবাবুকে বলিয়াছে যে অরুণ তাহার বাল্যবন্ধু এবং অরুণ এ লংবাথ পাইলেই তাহাকে লইয়া যাইবে। ইহার পর অমলকে তিনি বিরূপে পাইয়াছিলেন এবং তাহার ব্যাধি বিরূপ লাংঘাতিক হইয়াছিল তাহও লিখিয়াছিলেন।

অরুণ তাহিল সে অমলের কোন উপকাঃই করিতে পারিবেনা; অমল তাহার প্রতিদ্বন্দী, বিদ্যালঘাতক। তাহার মর্যাদা উচিত ছিল। কিন্তু পরে অমলের অবস্থা পাঠ করিয়া সে বিচলিত হইয়া উঠিল। সে তাহার পুরাতন কর্মচারীকে প্রজন্ম টাটানগরে পাঠাইল এবং অমল আলিয়া যে ঘরে থাকিবে তাহারও ব্যবস্থা করিল। শুভ্রাকে ডাকিয়া বলিল, “অমল অমল আসুক; তার সেবা ও দেখাশোনার ভার তোমার উপর রইল। দেখ যেন তার ক্রটি না হয়।” শুভ্রা নীরবে স্বামীর আদেশ শুনি, ভালমন্দ কিছুই বলিলনা। শুভ্রার উত্তর না পাইয়া সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, “ওই গোমড়া মুখের মেয়েদের মোটেই লক্ষ্য করতে পারিনা আমি; আমার হুকুম শুনেলে? তোমার মত কি?”

শুভ্রা বলিল, “তুমি শ্রদ্ধা, আমি বাবী। তুমি বা হুকুম করবে তা পালন কর্তে আমি বাধ্য। এতে আমার মতামত কি?”

কথাটার অরুণ একটু বিজ্ঞপের আভাব পাইল—সে সরোবে বলিল, “হ্যাঁ—তাই, তুমি বাবী ছাড়া আর কিছু নও, বুঝলে?”

“তা আমি জানি,” বলিয়া শুভ্রা বাহিরে যাইতেছিল, অরুণ সরোবে চীৎকার করিয়া বলিল, “শোন এখিকে।”

শুভ্রা ফিরিল—অরুণ বলিল, “শুনলাম তুমি তোমার বাবাকে বলেছ আমি রাতে বাড়ী থাকিনা, তোমার উপর অত্যাচার করি।—”

“আমি বলিনি”—বলিয়া শুভ্রা দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুণ বলিল, “মিথ্যা কথা, পাজী, শয়তানী, তুমি বলনি তো আর কে বলবে? জ্ঞানী করবার জায়গা পাওনি, না? আমি বলিনি—তবে কে বলতে গেল শুনি?”

“তা তো জানিনা। কেউ বলে থাকবে হয়তো—লহরশুদ্ধ লোকত অন্ধ নয়। তারা হয়তো লক্ষ্য করবে তোমার এই বিশৃঙ্খল ব্যবহার। কে যে বলেছে তা জানিনা তবে লতাই যদি কেউ বলে থাকে সে হয়তো তোমার মুহুর বা বন্ধু।”

অরুণ আরও চটিয়া উঠিল। সে বলিল, “আমার কথা নিরে লোকের মাথা ব্যাধার দরকার নেই, লাভও নেই। তাহের স্বার্থ কি? এসব তোমারই কাজ। খবরদার বলছি; আমার পছন্দে যদি কারও সঙ্গে

আলোচনা কর তবে এমন শিকা তোমার দেব বা অন্যে তুববে না, বুঝলে?”

“এর আর অধিক শিকা কি হবে আমার?” বলিয়া শুভ্রা হিরণ্যুটিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিল—পরে সে কঠোর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “তুমি যে কোন নরকে কোন স্তরে নেমে যেতে বসেছো তা হয়তো ঠিক আমি জানিনা, কিন্তু জানতেই হবে আমার একদিন। তুমি আমার দানী, বাবী যে আখ্যাই হাওনা কেন ধর্মন্তঃ আমি যে তোমার স্ত্রী তা কোনদিনই অস্বীকার করতে পারিবনা। তাই তোমার বলতে বাধ্য হচ্ছি যে নিজের ভবিষ্যতের দিকে একটু চেও। বর্তমানকাল যে অতীতের দৃষ্টিতে ভুবে যাবেনা তাইবা তুমি জানলে কি করে?”

অরুণ জোখে কাঁপিতেছিল, সে টেবিল হইতে একটি মাসিক পত্রিকা তুলিয়া লইয়া উঠা বাগাইয়া ধরিল। শুভ্রা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, “আজ যেটা মধুর বলে মনে হচ্ছে কালকে যে সেটা ভিক্ত হবেনা তারও মানে নেই। যে জিনিষ পরে আজ তুমি স্বর্গ হাতে পেরেছ কালই যে সে জিনিষ তোমার অঙ্গে নরকের আলি ছড়িয়ে দেবেনা একথাও বলতে পারনা।”

অরুণ আর লক্ষ্য করিতে পারিলনা। সে তাহার সুষ্টিবদ্ধ মাসিক পত্রিকার দ্বারা শুভ্রার মুখে বার বার লজোরে আঘাত করিয়া বলিল, “শয়তানি, মাষ্টারী করবে আর?”

ঠিক এই সময় টেলিফোনের দণ্টা বাজিয়া উঠিল—অরুণ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। শুভ্রা একটি দ্ব্যর্থনিধান ফেলিয়া বলিল, “ঠাকুর, আর কতদিন ভুলে থাকবে আমার? এবার ভুলে নাও আমাকে।”

সে জায়গার নিকট দিয়া যাইবার সময় লক্ষ্য করিল তাহার গন্তে ও গলবেশে কয়েকটা লম্বা কালধাগ পড়িয়াছে। সে আপনায়



শয়নকক্ষে গিয়া ঘার বন্ধ করিল। সে কাঁদিলনা, শুধু শুক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার স্বর্গীয়া জননীর তৈল চিত্রের দিকে তাকাইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিল, “মা, তোমার ঘরে আমি, লকল ব্যথা লকল অত্যাচার লইবার কমতা আমি বেন পাই। এই আশীর্বাদ করো মা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করবার বাসনা আমার হৃদয়ে বেন না আসে। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছিল এমন সময়ে অরুণ ঘরে করাঘাত করিয়া বলিল, “বেরিয়ে এল” শুভ্রা মুখখানি বতটা লম্বা চাকিয়া বাহিরে আসিল। অরুণ বলিল, “বেথ ঠাকুর আর হানীকে জবাব দিবে দিলাম। আজ খেকে রান্না, বাসন মাজা, খর খোওয়া, কাপড় কাচা, লবই তোমার’ করতে হবে বুঝলে? তরে তরে নভেল পড়া আর লেকচার লুখু করা চলবে না তোমার।”

শুভ্রা বলিল, “তাই হবে।” অরুণ চলিয়া গেল। শুভ্রা ভাবিতে লাগিল অদৃষ্টের কি অদ্ভুত পরিহাল। একদিন তাহার মুখ একটু স্নান দেখিলে যে স্বামী লংলার অঙ্ককার দেখিত আজ সেই তাহার প্রতি কঠোরতা অত্যাচার করিতে একটুও কুণ্ঠিত নহে। তাহার লৌভাগ্য আজ প্রায়ুটের আকাশের ভ্রায় অঙ্ককার; অদৃষ্ট রবি মেঘাবৃত। কে জানে ইহজীবনে যে ঘেঘ লরিবে কিনা। সে ভাবিল স্নেহের পর হুঃখ, হুঃখের পর স্নেহ, আখারের পর আলো, অমানিশার পর আবার পূর্ণিমা আসে এ জগতের নিয়ম। প্রকৃতির এ নিয়মের ব্যতিক্রম কি তাহার ভাগ্যে লেখা আছে? সুদিন কি তাহার ভাগ্যে আর কিরিয়া আদিবেনা?

—বাইশ—

স্বর্ঘীয় নর দান পরে অমল কলিঙ্গভার করিল। এই নয়মান রোগ ভোগ করিয়া

অমলের যে শারিরীক পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে তাহাকে আর সুপুরুষ বলা চলে না। সে শীর্ণ ও জরাগ্রস্থের ভ্রায় কতকটা কুজ হইয়া গিয়াছে। তাহার উজ্জল শ্রাবণ এখন রৌদ্রতপ্ত তাহাতে হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তাহার উচ্চ নানা ও চক্ষু দুইটা তাহার অত্যন্ত লৌল্যের লাকী স্বরূপ মাত্র বর্তমান। তাহাকে দেখিয়া অরুণ ও শুভ্রার মনে করণার উদয় হইল। উভয়ে লাগেহে তাহাকে বাগত লম্বাঘন জানাইল ও সে বাহাতে অচিরেই আরোগ্যলাভ করিয়া তাহার স্বতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে সে বিষয়েও তাহারা তৎপর হইল। অরুণ ও অমল প্রথমে পরস্পর পরস্পরের নিকট ঘোষী ও অপরাধী এই মনোভাব লইয়া অধিক কিছু বলিতে পারিল না। কেবল অমল অরুণকে একটুকু বলিল যে সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহে। সে যদি কণাকে কিরাইয়া পায় তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মতঃ লক্ষ্যজন লমকে বিবাহ করিবে এবং বাহাতে সে মাহুয হইয়া লংসারে মুখ দেখাইতে পারে তাহাই করিবে। আর যদি তাহাকে কিরিয়া না পায় তাহা হইলে জীবনের শেষ করটা দিন তাহারই ধ্যানে কাটাইয়া দিবে। জীবনে সে আর বাড়ী কিরিবে না। অরুণ অমলের কথাগুলি নিম্পন্দভাবে লমুখে বলিয়া শুনিল আর শুভ্রা শুনিল একান্ত আগ্রহ লইয়া ববনিকার অন্তরাল হইতে। অরুণ অমলের কথার উত্তরে শুধু এইটুকু বলিল বিগত জীবনের কথা তাহার ভুলিয়া যাওয়া উচিত ও শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়া পিতামাতার ইচ্ছামত বিবাহ করিয়া লংলারী হওয়া তাহার একমাত্র কর্তব্য। অমল অনেক কথাই বলিতে চাহে কিন্তু সেগুলি শুনিবার পূর্বেই অরুণ তাহাকে বলে “ওলব পাগলারী হেড়ে ভাল হয়ে উঠবার চেষ্টা কর।” অমল তাবে পৃথিবীর কেহ বুঝি তাহার হৃদয়ের বেদনা বুঝিবার

শক্তি রাখেনা। তাহার অরণ্যে যৌবন করিয়া লাভ কি? শুভ্রা অমলের মাতার নিকট পত্র লিখিয়া জানাইল অমল কিরিয়াছে। পত্র পাইয়াই মহীতোষ ও তাঁহার স্ত্রী তাহাকে লইতে আদিলেন ও বিবিধ উপদেশ দিয়া তাহাকে ঘরে কিরিবার অনুরোধ করিলেন কিন্তু অমল তাহাদের স্পষ্টই বলিল যে কণাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে লজে লইয়াই সে ঘরে কিরিবে নচেৎ ইহজীবনে সে কিরিবে না। তাহাতে যদি পিতা তাহাকে বর্জন করেন ও ত্যজ্য বলিয়া ঘোষিত করেন তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই। সে বাহাকে ভুগাইয়া লক্ষ্যমান করিয়াছে, তাহারই জন্ত যে আজ পথের ভিখারী হইয়াছে তাহাকে কেনিয়া সে গৃহে কিরিতে চায় না। তাহাকে কেনিয়া পলারমের লাজা জগদীশ্বর তাহাকে হাতে হাতে দিরাছেন এবং এমনও যদি সে তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহা হইলে জগদীশ্বরের শাপন বজ্র নিশ্চয়ই তাহার উপর পড়িবে আর সে অনলে সে শুধু নিজে পুড়িবে না তাহার আত্মীয়স্বজন লকলকে জলিতে হইবে।

মহীতোষ বাধু অগত্যা বলিলেন, “বেশ বাবা, তুই তাকে নিরেই কিরে আর আমার বাড়ী। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম সে যেমনই হোক আমি তাকে পুত্রবধূ বলে ঘরে তুলে নেব।” মাতা বলিলেন “আমাদের আর টাকার কাজ নেই অমল, তুই বাক পেলে স্নেহী হোল সেই আমাদের ঘরের আলো হোক। তুই কিরে চল বাবা।” অমল পিতামাতার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যেদিন সে কণাকে কিরিয়া পাইবে সেই দিনই সে ঘরে কিরিবে। কিন্তু সে একা বাইবে না তাহার লহিত বাইবে তাহার পরিণীতা পত্নী কণা।

—তেইশ—

সেদিন কৃষ্ণাষ্টমী; নীল আকাশের বন ভেদ করিয়া লক লক তারা ছুটিয়া উঠিয়াছে।

আকাশে একখানিও মেঘ নাই শুধু তারা আর তারা। উপরে নীলবীণী অনন্ত আকাশ তাহাতে অগণিত স্বপ্নপুঞ্জ, আর নিম্নে অরণ্যের ললিত গৃহলংঘন উদ্ভাস। সেই উদ্ভাসের একপ্রান্তে অমল। অরণ্যের বাড়ীর প্রশস্ত ছাৎয়ের একপ্রান্তে বাড়াইরা শুভ্র। এইজন্যই স্বপ্নে অলীম চিন্তাশ্রোত প্রবাহিত। সেই চিন্তায় যেন বিরাগ নাই। সে চিন্তা উত্তরকেই আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছে।

শুভ্রা ভাবিতেছিল কেন সে অরুণকে হারাইতে বলিয়াছে; কেন সে তাহার প্রতি বিরূপ হইল; কোন অপরাধে তাহাৎয়ের কানন্দময় স্বাম্পত্য জীবনে অরুণ বিভীষিকা-ময় হৃদয় আলিয়া দেখা দিল, কাহাকে পাইয়া অরুণ আজ তাহাকে পায় ঠেলিয়া দিতেছে? কে সে? কেমন সে? কত দৌলখোর অধিকারিণী সে? বাহার রূপ-ছটার অরণ্যের চোখে শুভ্রা আজ প্রতাপী চক্রিমার মত নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ কত চিন্তা একের পর এক তরঙ্গের স্রায় আনিতেছে ও মনোমধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছিল।

নীচে বলিয়া অমল ভাবিতেছিল কণা কোথায়? কেমন আছে সে? সে বীচিয়া আছে, না কোণে, ছাৎয়ে, লজ্জার ইহজীবনের সকল জালা জুড়াইয়াছে? তাহাকে কি সে কখনও পাইবে না? কেমন করিয়া পাইবে, কোথায় গেলে পাইবে, কে তাহাকে কণার লংঘন বলিয়া দিবে ইত্যাদি। তাহারও চিন্তা যেন শেষ হইবার নহে সে চিন্তাও সুখি অনন্ত—অলীম লব্ধতরঙ্গের স্রায় বিরাগহীন। কাহার নীতলম্পর্শে শুভ্রার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল। শুভ্রা কিরিয়া দেখিল তাহারই কাছে স্নানস্থলে বাড়াইরা লমর। নিরুদ্ভুতা তল করিয়া লমরই প্রথম কণা বলিল, “দ্বিবি, এই দিবে তুমি একলা

হাড়িরে আছিল? অল্প করবে যে। যে রকম রোগা হয়ে বাড়ির দিন দিন শেষে দেখছি মারা বাবি তুমি।”

স্নান হালি হালিয়া শুভ্রা বলিল, “না লম, মারা যায় তারা বাৎয়ের জীবনে প্রয়োজন আছে, মূল্য আছে, আবহাওয়া আছে। আমার এই মূল্যহীন জীবনটার হয়তো বয়েরও প্রয়োজন হবেনা। আমার বেচে থাকতে হবে এমনি করে ললীহীন অনাদৃতজীবন নিয়ে।”

শুভ্রা লমর খানিয়া গেল। সে ভাবিল এলব সে কি বলিতেছে—তাহার বুদ্ধি লোপ পাইল নাকি? সে কাঠ-হালি হালিয়া বলিল, “খুব খবর এনে দিলি তো তুমি পাঁচদিন হয়ে গেল আজ।” লমর বলিল, “সেই জন্তেই তো এলেছি—অনেক খবর, চল নীচে যা।”

ভ্রাতাভগ্নীতে আসিয়া দ্বিতলের একটা ঘরে বলিল। লমর বলিতে লাগিল—“হোটেলের ম্যানেজারকে বললাম—একটা উপকার করতে হবে মশায়। আজ যখন ডিনার লার্ড করা হবে তখন আমি খানসামা লেজে ডিনার লার্ড করতে চাই। আরে সে কি রাজী হতে চায়? ভয়েই অস্থির বলে যদি কোন বিপদ হয় তা হলে ভাল সামলাবে কে? অনেক অনুন্নয় বিয়ন মিনতি লবই করা গেল বেটা কিছুতেই রাজী হয়না। শেষে পচিশ টাকা তার হাতে গুজে দিলাম—তখন রাজী হলো বলে, একলা যাওয়া হবেনা মশায়। লজে আমাৎয়ের একজন বয় থাকবে। আমি তাতেই রাজী হয়ে গোফ-হাড়ী লাগিয়ে বয়ের পোষাক পড়ে কেললাম। ডিনার নিয়ে হাড়ির হলাম লেলাম হুঁকে একেবারে অরুণবাস্থ সামনে।

শুভ্রা বলিল—“তারপর।”

“তারপর আর কি? তারপর আবহাওয়া ঠিক হলো, চন্দ্রকর্ণের বিবাহ মিটলো।

রাগে কোণে লক্ষণরায় অলে বেতে লাগলো আমার। কিন্তু কি করি রাগ করলে পাছে লব পণ্ড হয়ে যায় তাই ভাল ছেলের মত একে একে ডিনার ডিলগুলো এগিয়ে দিলাম।”

“তুমি তোকে চিন্তে পারেন নি লম?” বলিয়া শুভ্রা জিজ্ঞাসনেন্দ্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

“চিন্তেই যদি পারবে তবে মেক্ আপটার বাহাদুরী আর হল কি? ডাক্তার মোটেই বোঝেনি আমি তার লম্বকী লম্ব চৌহুরী।”

“বেশ, তারপর কি হল বল?”

লমর বলিতে লাগিল, “ঘরে ঢুকেই দেখি একটা বছর কুড়ির মেয়ে, তার পাশে বলে তোমার বর। চেয়ার ছুটো এত কাছে যে তাৎয়ের হুজনের শরীরের মাঝে ফাক ছিল বড় জোর ছুই ইঞ্চি।”

“মেরেটা কেমন দেখতে?” বলিয়া শুভ্রা সাগ্রহে লমরের দিকে চাহিল।

লমর বলিল, “হঠাৎ দেখলে মনে হয় খুবই সুন্দরী। কিন্তু ভাল করে দেখলে বোঝা যায় যে তোর পায়ের মূগ্য নয়। ডাক্তারবাবু তাকে বলছিল যে সেই তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য—লাভকুইন—কিন্তু এখনও তার মনে হয় যে ডাক্তারবাবু তাকে বত ভালবাসেন সে হয়ত ততটা ভালবাসতে পারেনি তাকে। সে নাকি অমল বলে কোন ছোকরাকে এখনও ভালবাসে বলে অনুযোগ জানালে তাকে।

“কাকে ভালবাসে সে?”

“কাকে আবার? —জামাইবাবুকে?”

শুভ্রা হালিয়া বলিল, “নাহে, ঐ যে কি একটা নাম করলি তুমি।”

—“ওঃ—হ্যাঁ—অরুণবাবু তাকে বলছিলেন, আমার মনে হয় এখনও অমলকে ভালতে পারনি তুমি?”

—“আমি?”

“নাহে—তুমি নয়—তুমি নয়—সেই মেরেটা।”

“বেশ বলে যা। ঘেরী করিল না।”
 শুভ্রার কণ্ঠে আকুল আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল।

লম্বা বলিতে শুরু করিল, “যেহেটা বলে, নাগো না। সে আমার কেউ নয়—তাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি—তুমি আমার সব। জীবনমরণ—স্বপ্নাগরণ—আরও কত কি! ওসব মনে থাকে না আমার। সে বলে তুমি পারে ঠেলোনা আমার এই মিনতি—”

“বেশ খামলি কেন? বলনা।”

“আরে মনে করে নিচ্ছি। বিবি, ব্যাপার রেস্তার রোমাঞ্চিক—আর সুখ-রোচক। তবে সেই স্বাধীন নিতে পারলাম না আমি।”

“কেন রে? তোর আবার কি হলো?”
 বলিয়া শুভ্রা মুদ্র হালিল।

গভীর মুখে লম্বা বলিল, “কি হলো? চোখের সামনে দেখলাম জামাইবাবুর অধঃপতন, তোর হৃদয়, তোর এই হৃৎকোষে আমার বুকটার কি রকম হচ্ছে তুই কি বুঝতে পারিলি না বিবি? বুঝতে পারিলি না কি তোর কিছু হলে আমার কি হবে? তিনি কি বাচতে পারবেন একটা দিনও, যদি তিনি তোর—লম্বার চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়াছে, দ্রুত নিশ্বাস পড়িতেছে বেধিয়া শুভ্রা লম্বাহে তাহাকে বলিল, “হিঃ তাই নয়, এমন করে অধীর হতে আছে কি? জীবন কি লবার একই-ভাবে কাটে? —তা যদি কাটতো, আমার মনে হয়, বাস্তবের জীবন এমনই একঘেরে হয়ে উঠতো যে সে বেঁচেই থাকতে পারতেনা লম্বা। ঝাঁক বাহু বগুস্পর্শে দিনের পর রাত্রি আসে, আবার রাত্রি কেটে গিয়ে পৃথিবী আলোর রাজ্যে ফিরে আসে তারই ইচ্ছাক্রমে স্তম্ভহঃ; শান্তিঅশান্তি, আলো-বার দিনরাতেরই মত। সুদিন আর হুঁদিন উভয়কেই আমাদের বরণ করে নিজে হবে

তার আশীর্বাদ বলে। আজ যেটা লোকচক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক অনর্থ বলে মনে হচ্ছে সেই যন্ত্রণা সেই বিবাহই যে আবার তাকে লাধনা আর স্বর্গের পথে টেনে নিয়ে যাবেনা তাই বা জানবো কি করে। আমার বিশ্বাস নয়, আমার জীবনের এ শেষ কেটে যাবে আবার তাকে ফিরে পাব আমি এমনই একান্তভাবে যে শত চেষ্টারও তিনি দূরে যেতে পারবেন না।”

লম্বা বলিল, “তাই যেন হয় বিবি; ভগবান তোর সুদিন ফিরিয়ে দিল। তোর এই বিপদে আমার দ্বিগুণে যেটুকু লাভ্য হয় তোর তা আমি করতে রাজী আছি।” শুভ্রার অমুরোধে লম্বা পুনরায় বলিতে লাগিল, “সে যেহেটা অদ্ভুত, এমন ভাণ করছিল সে যে আমারই মনে হচ্ছিল সে সুখি লভ্য ভালবাসে অরুণবাসুকে তোর চেয়ে বেশী।”

“কি করে বুঝলি তা?”

ডিস্ লার্ড করতে করতে স্তন্যতে পেলাম যেহেটা বলছে, “ওগো তোমার কাছে আমার অমুরোধ আমার পেয়ে দ্বিগুণে প্রাতি অবিচার করেনা। তিনি যেন এক দিনও না জানতে পারেন আমি তাঁর জীবনে রাহুর মত এলে দাঁড়িয়েছি। বড় ভাল, বড় উচু, বড় উজার তিনি; আমি তার দানী হবার যোগ্য নই সে কথা আমি জানি। তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস পড়লে আমাদের মিলন স্থায়ী হবে না। তাঁর চোখের জল পড়লে হয়তো—”
 বাধা দিয়ে ডাক্তারবাসু বলেন “এমনতো কোন কথা নেই যে চিরদিনই আমাকে তাঁর বন্ধীভূত হয়ে থাকতে হবে—অজ্ঞাবাহী কৃতঘণের মত।” উত্তরে সে কি বললে “জানিলি বিবি?”

লাগ্রহে শুভ্রা বলিল, “কি তাই, বলনা ভাড়াভাড়ি।”

“সে বললে ও কথা বলোনা তুমি। আমি লাকী করে জগদীশ্বরের পবিত্র নাম গ্রহণ করে তাকে তুমি তুলে নিয়েছ জী বলে, লহখর্ষিণী বলে। তোমার স্তম্ভহঃ, শুভাশুভ তার সঙ্গে বিনিময় হয়ে গেছে সেদিন যেদিন তাকে বিবাহ করেছিলে। আজ যে তুমি আমার কাছে নিজেকে বলিয়ে দিয়েছ সেটাও করবার অধিকার নাই তোমার। কারণ তোমার ও দেহ ও প্রাণটার লভ্য অধিকারিণী তিনি—তোমার জী, আমার বিবি।”

“লভ্য বিবি, আমার শ্রদ্ধা হচ্ছিল যেহেটার প্রতি। মনে হচ্ছিল হয়তো সে লভ্যই অরুণ বাসুকে ভালবাসে, তার হিউই চার, অহিত চারনা।”

শুভ্রা স্নানমুখে জিজ্ঞাসা করিল “উত্তরে কি বললেন উনি?”

উত্তরে জামাইবাসু হাসলেন বললেন “নভেল পড়ে পড়ে তোমারও দেখছি শুভ্রার মত মাথার ঘোব হয়েছে। আগেকার দিনে বাস্তব দশটা বিয়ে করতো তাতে জীবনের কোন কথা বলবার অধিকার থাকতেনা। বার শক্তি আছে, অর্থ আছে, বিত্ত আছে সে কেন যেচে নেবে জীভুলোর প্রতুষ বলত? আমার থাকে ভাল লাগবে সেই হবে আমার লক্ষী, প্রিয়া।”

উত্তরে হেদে সে বললে, “বেশ কথা যেদিন আর ভাল লাগবেনা সেদিন সে হবে তোমার পারের পরিত্যক্ত চটীকুতো এইতো? অথবা শুকনো ফুলের মত তার ঠাই হবে আত্মকুড়, মনের ফুলদানীতে কোন স্থান থাকবেনা তার। তার সে স্থান অধিকার করবে আবার এক নবীন বস্ত্রচাতা মঞ্জরী। ভাল কথা, এমনও তো হতে পারে হুঁদিন পরে আর কাউকে ভাল লাগবে তোমার; আর তখন আমিও দ্বিগুণই মত হয়ে পড়বো তোমার চক্ষুশূল—তোমার বিষেবের লামগ্রী। আর দশটা বিয়ের কথা—ওসব শুভো বিয়ে নয়—

ওগুলো ছিলো পুরুষের উদ্ভাব বালনা তৃপ্তির
ইচ্ছন। যখনই পুরুষেরা সুবিধা পেয়েছে
নিজেদের স্বার্থনির্ভর, তখনই পুথিতে বিধান
লিখে প্রচার করেছে শাস্ত্রাবাক্য ভগবৎবাণী
বলে।”

“বাঃ! বেশ তো কথা বলতে পারে দে!
তার মতের লগ্নে আমারও মত মিলে যাচ্ছে
নমু।”

“বেশ, বলে বেশ—চমৎকার—মার-
ভেলাল; হিঁদ, শত্ৰু ঘেরেটা এডুকটেড
বলে বোধ হল। দে বলে, না যদি
শত্ৰু ইচ্ছে থাকে নতুন ফুলের মধু খাবার
স্পষ্ট করে বলে আমার। তোমাকে হারাবার
আগে মরতে চাই আমি। নৃতনের স্পৃহা
আমার নেই, জীবন আমার শুধু বিত্তীষিকা—
এই কদিন শুধু স্নেহের দুধ খেয়েছি—আমার
এই স্নেহস্রোত ভালবার আগেই বিধার নিতে
চাই পৃথিবী থেকে।”

“আহা বেচারী! হারে নামটা তো
বললি না তার?” বলিয়া লম্বরের দিকে শুভ্রা
চাহিল।

লম্বর ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “নামটা
তো ঠিক মনে আসছেনা হিঁদ—তবে বোধ
হচ্ছে কণা না কণা এমনি একটা কিছু।”

কণা—কণা! ঠিক শুনেছি সু তার
বাম কণা বলিতে বলিতে শুভ্রা যথেষ্ট
উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

লম্বর কেমন বিব্রত হইয়া বলিল, “কেন
হিঁদ, তুই তাকে চিনিস কি?”

সে কথার কর্ণপাত না করিয়া শুভ্রা
বলিল, “তুই এখুনি হোটেলের ম্যানেজারের
কাছে গিয়ে বল ওদের ডিনার সার্ভ করবে
কাল আমার ছোট ভাই, তার জজ বা থরচ
লাগে আমি হবে।”

“ছোট ভাইই নেই আমার তো ছোট
ভাইকে পাও কোথা থেকে?”

“নাহে লম্বর কাল আমি ভেলে লেজে
যাব ঐ হোটেল। তারপর লাজব বয়।
বলি।”

কলিকাতা ৪ বোম্বাই

ਸਤ੍ਯੁਭਾਸ਼ੀ

বেতারাে রবিবারের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান
বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল—কিন্তু ইহা নিঃসঙ্গ
আকর্ষণ বিনে বিনে বাজে বসে। গত
ছুই সপ্তাহের ছুই রবিবারের প্রাতঃকালীন
অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর ছিল। বহু আশা
নিরে ছিলাম কৃষ্ণ বাবুর গান শোনার
আশায়—কিন্তু অনুপস্থিত।

আটিষ্ট অল্পপন্থিতের যাত্রা বেড়েই চলেছে।
 প্রতিদিনের কোন না কোন অমুষ্ঠানে
 আটিষ্ট অল্পপন্থিত লেগেই আছে। কলিকাতা
 বেতার প্রতিষ্ঠানে তালো প্রোগ্রাম পাওয়া
 যায় না, বিশেষ বহি বা গেল পাওয়া তবে
 অল্পপন্থিত অনিবার্য কারণবশতঃ।

গ্রামফোন রেকর্ড বেতারের বৈশিষ্ট্যকে
 ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। প্রতিদিনই গ্রামফোন
 রেকর্ড হুণুরে লঙ্কার এবং তাও আবার যত
 যাক্যের নিরশ্রুতীর লাবক কালের বাজে
 রেকর্ড। বেতারে কী আটাই-হৃর্তিক উপস্থিত
 হয়েছে ?

“হু, তাকি হু? তোর সুখখানা যে
একেবারে মেরেলি—নবাই ধরে ফেলবে
হিদি।”

“তবে আর তোর বেক আপ এর বাহাছুরী
কি ? তুই লাজিয়ে দিবি নহু। আমি
দেখবই তাকে।”

তদ্রা তাহার হাতে ব্রিচেল, শার্ট, পরচুলা,
কুতো, প্রকৃতি ক্রয়ের লত ও অস্ত্রাভ ধরনের
লত একখানা একশত টাকার নোট দিল;
নগর আপত্তি করিল।

বাঙালী স্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ মেনের
আমলে আমরা আশা করেছিলাম কলিকাতা
বেতার প্রতিষ্ঠানের অনেক উন্নতির ধারা
লক্ষ্য করা বাবে—প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনে যেখা
বাবে কিছু নতুনত্ব, কিন্তু অত্যন্ত হুঃখের কথা
আমরা ক্রমে ক্রমে অবনতিই দেখতে পাচ্ছি ।

কেন শ্রোগ্রাম ভালো হয় না—আটিষ্টের
 আন্তরিক পূর্ণ সহযোগিতা বেতারে কেন
 পাওয়া যায় না—তার অনেক কারণের
 অনেক ইঙ্গিতই আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি।
 কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের ষ্টেশন
 ডাইরেটরের লে দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

তুমি আটিষ্টরা কেন বেতার-প্রার্থনায়
হান পায় না ? বেতারে পুরুপাতিদের হান
কর' রেখেছে ? এর অহঙ্কান করলে জানি
বাবে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার
হান নেই কেন ।

আমরা বিশেষভাবে জানি শ্রোতার
 বাঁহের চার—বাঁহের প্রোগ্রামে পাওয়া যার

তত্না বলিল, “তুই তো রোজগার করিলনা
তাই। বাবা হুশো টাকা মালে মালে পাঠান
আমার হাত থরচের জন্ত। দেই টাকা
থেকে দিচ্ছি—তোর জমাইবাণুর টাকা
নয়।”

অগত্যা টাকা লইয়া নগর প্রস্থান
করিল। শুভ্রা তাবিত্তে লাগিল কতকণে এই
চব্বিশ ঘণ্টা অতীত হইবে—কতকণে সে
কণাকে দেখিবে ও চক্ষুর্দ্বার বিবাহভঙ্গ
করিবে।

(**ଉତ୍ତର:**)

যোগ্যতার পরিচয়, অকারণে কিছু দিন
বাধে যেতার প্রোগ্রামে আর তাবের হান
থাকে না।

আমাদের মহান প্রাণ প্রোভারা বাঁচবে
 চার এবং বাঁচবে প্রকৃত বোধ্যতা আছে
 কেন তাদের প্রোগ্রামে দেওয়া হয় না ?
 কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের ট্রেন ডাই-
 রেক্টর মি: পেন এ লঙ্কে লন্ডন নেবেন কী ?

ଡାକ୍ତର ମାମାୟା

શિશુપિંગલ શક્તિવર્ધક મિષ્ટ ઉચ્ચ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ওষধা লেগে
পাওয়া যায়।



পথের পাঁ

(গল্প)

জীৱদাস মিত্র



পশ্চিমগাৰী একখানা ট্ৰেন; হাওড়া থেকে ছাড়লো রাত সাড়ে ন'টার। প্যানেল-জার নয় এক্সপ্ৰেস। সেই ট্ৰেনের একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ইন্টারক্লাশ কম্পার্টমেন্ট কোনরকমে উঠে পড়লাম। সকলেই একথা অবগত আছেন যে, ট্ৰেনে আরামে যাবার জন্য কত লোক, কথা কাটাকাটি, ঝগড়া, এমন কি হাতাহাতি পর্যন্ত করে বলে। যে লোক একটা ষ্টেশনে যাবে, সেও ট্ৰেনের ভোড় কাঁপাটের মধ্যে ঐ অল্পসময়ের জন্য নিজের "আমিষ্মক" প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমারও অন্য কোন দিকে নজর নেই; বিভাবে একটু আরামে শুয়ে যেতে পারবো তারই লক্ষ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

প্রথমেই বলেছি ট্ৰেনখানা এক্সপ্ৰেস; সব ষ্টেশনে ষ্টপেজ নেই। শুধু হু হু শব্দে বাতাস কেটে, অন্ধকার প্রকৃতির বুক চিরে ছুটে চলাই যেন এর একমাত্র উদ্দেশ্য। মাঝে মাঝে ছ'একটা টিম্‌টিমে আলো ও জনকয়েক লোক নিয়ে এক একটা ষ্টেশন; ট্ৰেন, এ সব ষ্টেশনকে চক্ষের পলকে পিছনে ফেলে গর্জিত ভাবে ছুটে চলে। মাঝে মাঝে এক একটা জংলন ষ্টেশন; গাড়ীর গতী কমে আসে; ট্ৰেন ধামে। মিনিটকয়েক স্টাট-কমের কোলাহল; চা-ওয়ারার বিচিত্র 'চা-গ্রাম' বুলি; 'পান-বিড়ি-লিগ্রেট', 'পুঁ-কচোড়ি'; তারপর, আবার সিটি বেজে ওঠে; ট্ৰেন ছুটে চলে।

বর্জমান গাড়ী পৌঁছলো, একটা লোক ধোঁচকা বঁচকি নিয়ে নেমে পড়লো। আমিও কালবিলম্ব না করে তার জায়গাটিতে নিজের

আধিপত্য বিস্তার করে ফেললাম। হোঙ্কল খুলে বিজানাটা পাভন্তে বাবো এমন সময় ওপাশের বাঁকের ওপর থেকে স্পষ্ট বাঙ্গালী মেয়ের গলার আওয়াজ পেলাম—'শুনছেন'?

সেইসাথে আপাধমন্তক হুড়ি বেওয়া কবলের ভেতর থেকে একখানা সুন্দর মুখ বাইরে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ ভেবেছিলাম, কামরার সবই বিজাতীয়; এতদূর পথ বাবো কি করে? ও বাঁকের ওপর আমি কাবুলিওয়ারাঘের কাকুকে আশা করেছিলাম। মোটা কবলের ভেতর যে, একটি ক্ষীণাকী সুন্দরী বাঙ্গালী মেয়ে অবস্থান করেছেন, তা কে জানতে? কামরার আর দ্বিতীয় বাঙ্গালী নেই; তাই স্বপ্নাম কথাটা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। তবু দ্বিধাকরে জিজ্ঞেস করলাম আমার বলছেন কি?

হেসে মেয়েটি জবাব দিল—হ্যাঁ, এটা কোন ষ্টেশন ছাড়লো?

—বর্জমান।

—ওঃ, আমি ভেবেছিলাম বুলি আশান-সোল। তবে বেশী ঘুমোই নি; কি বলুন? বিধাহীন, নিঃসঙ্কোচ আলাপ। বহিও এটা নারীপ্রগতির যুগ, তবু বাঙ্গালীমেয়ের নারী সুলভ নম্রতা ও সঙ্কোচের অভাব দেখলে একটু বিস্ময় জাগে বৈকি। সেভাবে চেপে বললাম—না না, বেশী ঘুমোলেন কোথায়; এই ত' only an hour.'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো—আপনি কতদূর যাবেন?

—বাবো, এলাহাবাদ।

—ওঃ, তবে ত' অনেকদূর পথ যাবেন আপনি; আমি বহি ঘুমিয়ে পড়ি, তবে

আমাকে বেনারস ক্যান্টিনমেন্ট-এর আগে তুলে বেবেন দরী করে। মিনতিভরা অমু-রোধ। হেসে জবাব দিলাম—আপনি যুহুতে পারবেন, বহি আমার মত বাঁকাবাগিন লোকের সঙ্গে আলাপ না জমিয়ে ফেলতেন; কিন্তু এখন আপনার ঘুমের আশা ছাড়তে হবে। তাছাড়া বেনারস-ক্যান্টিনমেন্ট পৌঁছতে ত' লকাল হয়ে বাবে।

—হ্যাঁ, গল্প করার বহুঅন্তোল আমারও আছে; তবে আমি তাবহিলাম, বহি আপনার ঘুমের ডিসটারবেন্স হয়; তাই আপনাকে বিরক্ত না করে ঘুমোনই ভাল। বাক—এলাহাবাদে বুলি আপনি চাকরি করেন?

—না না, চাকরী করিনা; লখ হয়েছি তাই বেড়াতে চলেছি। তাছাড়া এ বছর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন এলাহাবাদেই হচ্ছে কিনা, ওটা attend করবারও ইচ্ছে আছে।

—আপনিও দেখছি সাহিত্য বিষয়ে ইন্টারেস্টেড; লেখেন টেখেন নাকি?

—বৎসামাত্র; তবে লেখা আমার পেশা নয়, নেশা। তাছাড়া জানেন ত; আজকাল বেকারদের মধ্যে শতকরা নব্বইভাগ সাহিত্যিক বা সাহিত্যসেবী। হাতে কাজ নেই, সাহিত্যচর্চা করি। বাবার Bank Account debit করে খরচ চলে; বাবাকে লিখি চাকরির চেষ্টা করছি। আজকাল সাহিত্যিক মানেই জানবেন হয় বেকার; নয় হতাশ প্রেমিক।

এতক্ষণ মেয়েটি চুপ করে আমার কথা শুনছিল; আমার কথা শেষ হতে হেসে বললো—আপনি বেশ সজার লোক; হালাতে পারেন মানুষকে। কিন্তু আপনার শেষের কথাটা যে সবকাজেই লভ্য একথা মেনে নিতে পারিলাম না। এই দেখুন না আমিও সাহিত্যচর্চা করি, কিন্তু আমি বেকার নই, তার প্রধান, আমি কলকাতার Brahmo Girl's School-এ মাস্টারী করি। তাছাড়া

আজ পর্যন্ত কোনও পুরুষের কাছ থেকে..... !

বুঝলাম নব। আঘাত পেয়েছিল কিনা, দেই জানে আর অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম মেরেটির কথায়। ভাবাবেগে এমন কথা বলে ফেলেছি, বা অপরাধের মনে আঘাত করেছে। অস্ত্রায়ের জন্ত ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত বিবেচনার বললাম—সাপ করবেন, আমি কথাটা ইন্ডেনারল বলেছি। তাহাড়া আপনিও যে একজন সাহিত্যিক এখন আমার জানা ছিলনা মোটেই। যাক্, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার খুশী হলুম।

জীলোকের নাম জিজ্ঞেস করা শোভা পায়না; তাই, ও প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অস্ত্র কথা পড়লাম। আচ্ছা, আপনি যে বেনারস্ যাচ্ছেন, ওখানে কি আপনার কোনও আত্মীয় আছেন ?

হ্যাঃ হেসে মেরেটি জবাব দেন। বাবা ওখানকার পুলিস্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট। আমার অস্ত্র প্রসঙ্গ করলাম আচ্ছা এতদূর পথ একা যেতে dare ক'রলেন কেন, কারুকে সাথে নিলেই ত' পারতেন।

মেরেটি কথাটা গিয়ে মাথলোনা; লহজ ভাবেই জবাব দিল—দেখুন, আপনি যা' বলেছেন কথাটা সত্যি : একে পশ্চিমের ট্রেনে, খোঁটার কারবার, একা যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু যেটা ঠিক নয়, যেটা সমাজকে আঘাত করবে এই সব কাজ করাই আমাদের নেশা দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা ভুলে যেতে বসেছি, আমরা বাঙলাদেশের মেরে, পাশ্চাত্যের মত, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে হাঁটা আমাদের শোভা পায়না। আর তা হাড়া একাই যে যেতে হবে, আমি তা' ভাবিনি; ভেবেছিলাম, ট্রেনে কোনও বাঙ্গালী বাত্মী কি থাকবেননা, তাঁর সাথে আলাপ ক'রে ফেলবো।

শুধু একটা 'ওঃ' বলে, চিন্তারিত হ'রে পড়লাম। মনে কত আকাশ কুহুম করল।

মানস প্রিয়া

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তুমি গো আমার জীবনের লাবী

সুখে, দুখে চির বন্ধ মম ;
হে মোর প্রিয়লী ! প্রিয়া, প্রিয়তমা
ওগো আত্মীয় নিকটতম !

২

তোমার ওই বাহু তোমার ওই আঁখি,
তোমার বেহের সুরভি সে মাখি ;
ঘেটোনাক মোর আশ।
মনে হয় মোর থাকি তোমা ঘিরে
জনম জনম যুগ যুগ ধ'রে
তোমাতেই করি বাস।

৩

রূপালী রাতের ঝরা জোঁহনার
ফুলবনে দৌঁছে বসি,
তুমি গাবে গান আমি শুনে বাব
মাথার হালিবে শশী।

৪

গান শেষ হ'লে কাননের ফুলে,
গাথিয়া মালিকা ধোব এলচুলে ;
কণ্ঠে বাজতে আর।
তুমি সে ভ্রমিবে ফুল বনে বনে,
দূর হ'তে আমি মুগ্ধ নয়নে ;
চেয়ে রব অনিবার।

এই যে মেরেটি, কেমন সুন্দর এর ব্যবহার ;
কেমন শুভিরে কথা বলতে পারে। এর
কথায় বার্তায় বা ব্যবহারে আভিজাত্যের বা
শিকার গর্বত' ফুটে ওঠেনি। কিন্তু ওটাই
আজকাল প্রগতিশালিনী মেরেদের ভূষণ।

আমার চিন্তার গ্রহি ছিঁড়ে দিয়ে মেরেটি
জিজ্ঞেস করলো একটা কথা, অন্তর ঘন ত'

লঘুশব্দে তুমি হরিনীর মত
বনে ও বনান্তরে,
পদাঘাতে কত ফুটাবে কুহুম
চলিবে গর্বভরে।

৬

দখিনা বাহিবে অলক ছলায়ে,
ফোটা কুহুমের গন্ধ ছড়িয়ে ;
দারা বনানীর বুকে।
ধীরে ধীরে মোরা এসে নবীকুলে,
তরী-পরে উঠি ধোব তরী থুলে ;
ব'লে রব দৌঁছে সুখে।

৭

নিজ মনোমত বহে যাবে তরী
ধরিবনা কভু হাল,
বাতাল যখন উঠিবে তখন
তুলে ধোব শুধু পাল।

৮

ক্রমে ক্রমে হবে তব আঁখি ছুটি,
ওস্তাদ মেরে পড়িবে সে লুটি,
লব তোমা কোলে কোরে।
কুহুম গন্ধে যাবে তরী ছেয়ে,
আমি রব তব মুখপাত্রে চেয়ে ;
চাঁদ ভুবে যাবে দূরে।

বলি ; বলুন রাগ করবেন না ? হেসে
ব'ললাম—পাগল হচ্ছেন আপনি। রাগ
আমার যাতে আসেনা। আর তাহাড়া
আপনার ওপর, রাগ বা অভিমান করবার
কি অধিকার আমার আছে বলুন ?

রান হেসে মেরেটি জবাব দিল—আপনি
এখনও বাধা পড়েন নি যুধি ; তাই
ছয়হাড়ার মত খুঁয়ে বেড়াচ্ছেন ?

হেনে ব'ললাম—ওঃ, এই কথা; আমার মত অত্যাগকে কেইবা বাঁধবে বলুন; বাঁধবার মত কারকে বুঁজে পাইনা।

নিজেকে চাকবার চেষ্টার লে অজ্ঞা কথা পাড়লো—আচ্ছা, আপনি যখন বেড়াতেই চ'লেছেন, তখন আমার ওখানে করেকদিন কাটিয়ে যেতেও ত' পারেন। আপনারও বেড়ানো হয়, আমারও একজন লক্ষী জোটে; একা একা দিনগুলো কাটতেই চায়না আমার; আপনাকে নিজের পরিচয়টা পর্যন্ত ঘেঁইনি ভাল করে, অথচ বাড়ীতে যেতে নেমন্তন্ন করছি: আপনি ভাববেন কিনা; আমার নাম মীরা লেন, বাকী 'পরিচয়' কথা থেকেই পেরেছেন আমার। প্রতিটি সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায় যার নাম ছরিয়ে আছে, যার লাইকলজা আমাকে মুগ্ধ করেছে কত সময়; যার সরল উক্তি, মনে আগিয়েছে নতুন প্রেরণা; সেই মীরা লেনের এ যেন নতুন রূপ। নিজের মনকে যখন লে প্রবোধ দিতে পারেনা, যখন মনে হয়, হয়ত বাঁধা পড়াই ছিল ভাল; তখন তার কলমের সুখে ফুটে ওঠে, পাঠকের প্রতি শাস্ত্রনার বাণী, কর্তব্যের অনুপ্রেরণা। মীরা লেন একজন নামকরা লেখিকা হতে পারেন, বেশের অধিকারিণী হতে পারেন কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে শুধু তাঁর একমাত্র পরিচয়—নারী। তাঁর অন্তরের যুগ্ম নারী কোনও অশুভ মুহূর্তে শত বাধা বিপত্তি ভেঙ্গে দিয়ে একদিন জেগে উঠবেই; কোনও পুরুষকে ক'রে নেবে একান্ত আপনার; তার কাছে বিলিয়ে দেবে, নিজের প্রাণ, মন, বা' কিছু নিজস্ব স্বত্ব।

ততক্ষণে ট্রেন এলে আলানলোলে থেমেছে। কামরার দরজা থেকে মুখ বের করে ডাকলাম—এই চা! হিন্দু-চা; ইয়ার!

চা-ওয়ারী আলতেই ছুঁপ চায়ের অর্ডার করে দিলাম। কথাটা কাণে যেতেই মীরা ব'ললো—বেখুন চা আমি খাইনা।

বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে জবাব দিলাম—আপনি চা খান না; বলেন কি! এই ট্রেনটিয়েথ লেন্চুরিতে!...কিন্তু আজকের মত আমার অহুরোধে খেতে হবে আপনাকে। তাছাড়া দারাদার বাবেন, একটা টিফলেট না পেলে শরীর খারাপ হ'তে পারে।

উপরোধে প'ড়ে অনিচ্ছাস্বপ্নে মীরা ক'রে চা খেতে হল। এতরাতে খাবার খেতে লে কিছুতেই রাজী হয় না। আমার ট্রেন ছাড়ে, গরম সূরু হয়।

আশাতরা চোখছ'টিকে আমার মুখের ওপর নিবন্ধ ক'রে, মীরা বলে "তাহলে নাবছেন ত' আমার ওখানে?"

—বেখুন আজ থাক, ফেরবার পথে নামবো'ধন। আপনি ত' ওখানে থাকছেন কিছুদিন।

—মাস দুই আছি বোধ হয়। কথা দিয়ে যাচ্ছেন, আশা চাই কিন্তু। লতিয়া একা একা আমার বড় খারাপ লাগে। দিনগুলো খুব বড় মনে হয়।

মনে অনেক কথা জাগলেও সব কথা মুখস্থে বলা যায় না; সেই জন্তেই লম্বা লম্বা থান হয় না অনেক সময়।

বেনারাল ক্যান্টনমেন্ট-এর আগের ঠেগনে মীরা নিজের জিনিষপত্র গুছোতে থাকে; আমিও তা'কে সাহায্য ক'রছিলাম তা'র কাজে। আমারও কিন্তু

এতক্ষণে মনটা কীকা ঠেকে; মনে হয়, মীরার সঙ্গে আমার পরিচয়, যেন করেক ঘণ্টা পূর্বের নয়; বহু যুগের।

ট্রেন এলে বেনারাল-ক্যান্টনমেন্ট এ থামলো। নামতে নামতে মীরা কথা বলে; আমি তাঁর জিনিষগুলো বিলিয়ে কুলীর সাথার তুলে দিতে থাকি। একবার ভাবলাম, নেমে পড়া যাক্ ছু'টো ত' জিনিষ! কিন্তু, লক্ষ্যচ বাধা দিল।

এমন সময় মীরা বলে উঠলো—sorry বেখুন ত', আপনার নামত' জানতে পারলাম না; আর ওখানকার আপনার address টাই বা ছিলেন কৈ?

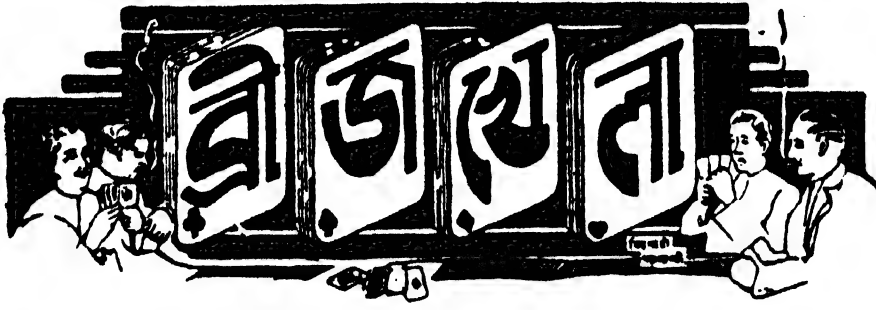
কথাগুলি বলার সাথে সাথে মীরা, তা'র ব্রাউজের ভেতর থেকে একটা চকচকে চামড়া বাঁধানো ছোট্ট ডায়েরী বের ক'রলো; ব্রাউজের কলারের ওপর থেকে খুলে নিল। তার পার্কার-পেন-তারপর আমি বলে বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাম ঠিকানা তা'র ছোট্ট ডায়েরীটির পাতায় লিপিবদ্ধ ক'রে নিল।

যতদূর তা'কে দেখা গেল, আমি তাকিয়ে থাকলাম, তা'র ছন্দায়মান চলার পথের পানে। তারপর, একটা দীর্ঘশ্বাস বৃকে চেপে নিজের জায়গায় এলে ব'ললাম।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। কথা দিয়েও ফিরবার পথে মীরার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমার নাম ঠিকানা লেখা ডায়েরীখানা আজও মীরার কাছে আছে কিনা কে জানে। আমি কিন্তু ডায়েরীতে তার নাম ঠিকানা না টুকলেও, একরাত্রির পথের পরিচিতা মিস মীরা লেনকে আজও ভুলতে পারিনি। মনের নোটবুকখানা ডায়েরীর থেকে অধিক দিন স্থায়ী বোধহয় ॥



ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।



শ্রীচরিত্রাসা

ডাক দেবার পূর্বে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে স্মরণ রাখতে হবে যে যদি তাঁর একটি ডাকের প্রত্যুত্তরে খেঁড়ী কর্তৃক কোন রঙে দুইটির ডাকের উত্তর আসে, তাহলে সেই ডাকের দ্বারা হাতের গঠনকার্য সুন্দররূপে কার্যকরী হবে কিনা। অথবা ইহাও চিন্তনীয় যে সেই ডাকের দ্বারা তাঁদের কোন ক্ষতি লাভিত হওয়া সম্ভব কিনা। সে ডাকে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে ডাক দিতে বিরত হওয়া লক্ষ্যতোভাবে কর্তব্য। অনেক সময় দেখা যায় যে হাতে ১০ খানি অনারের পিট বর্তমান, অথচ ডাক দিলে বিপদগ্রস্ত হতে হবে, - সে সব ক্ষেত্রে কিভাবে ডাক দেওয়া উচিত সে লক্ষ্যে মিঃ কালবার্টন একটি সুন্দর পছা প্রদর্শন করেছেন যেমন ধরুন আপনার হাতে আছে,

ইস্কাবন—টেকা, লাহেব, ×, ×;
হরতন—টেকা, লাতা, হুকা, চোকা, হুরি;
কুহিতন—নয়, পজা; চিড়িতন—পজা, চোকা।

এই হাত নিয়ে আপনি যদি একখানি হরতন ডাকেন ও তৎক্ষণে খেঁড়ী যদি কোন রঙে দুইটির ডাক দেন এবং তার প্রত্যুত্তরে আপনি যদি দুইখানি ইস্কাবন ডাকেন, ফলে হাতে ইস্কাবন না থাকার কারণে যদি খেঁড়ী তিনখানি হরতন ডেকে ডাকটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, তবে তিনখানি হরতনে খেলা করা বিশেষ শক্ত হয়ে পড়ায়। রঙ বাছাই করে ডাক দিতে খেঁড়ী বাধ্য, অথচ

তার কলে খেলারও দিতে হল। কিন্তু ইহার পরিবর্তে প্রথমেই যদি ইস্কাবনে ডাক দেওয়া হত, তাহলে খেঁড়ী যে কোন রঙে দুইটির ডাক দিয়া উত্তর দিতেন, আর আপনি পুনরায় দুইটি হরতনে ডাক দিতেন। ফলে খেঁড়ী এখন অনারালে এই ডাকে পাশ দিয়ে যেতে পারেন বা হরতন না থাকলে দুইটি ইস্কাবনে ডাক দিতে পারেন। এই ধরনের ডাকে আপনাদের বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আবার মনে করুন আপনার হাতে আছে—

(১) ইস্কাবন—টেকা, বিবি, গোলাম, আটা; হরতন—টেকা, লাহেব, ×, ×, ×;
কুহিতন—×, ×; চিড়িতন—×, ×।
(২) ইস্কাবন—লাহেব, ×, ×;
হরতন—লাহেব, বিবি, ×, ×; কুহিতন—
টেকা, গোলাম, হুকা, ×, ×; চিড়িতন—
×।

এ সকল ক্ষেত্রে আপনাকে একটি ইস্কাবন (১) বা একটি হরতনে (২) ডাক দেওয়া উচিত। কিন্তু যদি আপনার ডাকের পর খেঁড়ীর ডাকের উত্তরেও যদি একটির ডাক

দিতে পারেন তবে নিম্ন রঙের ডাক দেওয়াই বিধেয়। যেমন ধরুন আপনার হাতেটি এইরূপ,

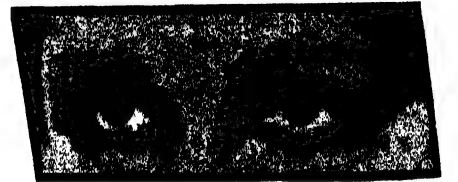
ইস্কাবন—টেকা, গোলাম, ×, ×;
হরতন—×, ×; কুহিতন—×, ×;
চিড়িতন—টেকা, লাহেব, ×, ×, ×।

এক্ষেত্রে আপনি যদি একটি চিড়িতনে ডাক দেন, তার উত্তরে খেঁড়ী যে কোন রঙে ডাক দিলে আপনি অনারালে একটি ইস্কাবন ডাকতে পারেন। অতএব যখনই ডাক দিতে হবে নিম্নলিখিত কথাগুলি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১) যত কম ডাকে বেশী খবরের আদান প্রদান করা যেতে পারে তার চেষ্টা করা।

(২) অনেক ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তে প্রত্যেক ডাকে খেঁড়ীকে নিজের হাতের স্বরূপ বলে দেওয়া।

(৩) খেঁড়ীকে ডাকের দ্বারা বিপদগ্রস্ত না করে নিজের উত্তরের মধ্যে যতগুলির খেলা হওয়া সম্ভব, সেই নীমা উল্লভন না করার চেষ্টা করা।



পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আন্ততোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

চরিত্র (পুরুষ)

ভাঃ হরেন যুথার্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ
বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু
ও সহকারী।
রাসমহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেরার।
অস্তান্ত চরিত্রের পরিচয় এসময়ক্ৰমে পাইবেম।

হীরার হার

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লোকগুলো ঘরের ভিতর ঢুকেই আলো জ্বলে দিবেছিল। উজ্জ্বল আলোর ঘর আলোকিত। আমরা ঘেরাজের পিছনে রুদ্ধ নিখাণে অপেক্ষা করছি।

অবিনাশ আমার কানে কানে বলে—
“বাইরে বেরিয়ে দেব নাকি ফাটিয়ে? তিনটে লোক বইতো নয়!”

আমি তার গা-টিপে তাকে চূপ করতে বলুম। পাহারাওয়ালারা সিন্দুকটার দিকে আদে—পিছন দিকে উকি মারলেই আমাদের দেখতে পাবে! সব গোলমাল হয়ে গেল। কিন্তু তৃতীয় লোকটা কে? তার কথা শুনে মনে হ’লো, সে বেন দক্ষান দিয়ে পাহারাওয়ালারা ছোটোকে ডেকে এনেছে। তবে কি আমরা এখানে চোকবার সময় কারো নজরে পড়ে গেছি?

“জুড়িয়ার! ইধরি ছায় হো আদমী! এই! নিকল আও!—পাহারাওয়ালারা নাহেব উকি মেরেছেন।

আন্তে আন্তে বাইরে এলুম। অবিনাশও বিভাগার মহাশয়ের ‘সুবোধ ও সূচীণ’ বালকের মতন আমার পিছন পিছন বেরিয়ে এলো।

দ্বিতীয় পাহারাওয়ালারা একটু দূরে ছিল। আমাদের দেখে বলে উঠলো—“আরে, এতো বাবু ছায়! আপলোগ এখনা রাতমে হিরা ক্যা করতে হো, জী?”

হরজার কাছে কোট-প্যাণ্টালুন পরা একটা ভজলোক দাঁড়িয়েছিলেন। যুবলুপ informant (লংবাং দাতা)। তিনি বলে

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীবা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের
বুড়ো কি।
অস্তান্ত চরিত্রের পরিচয় এসময়ক্ৰমে
পাইবেন।

উঠলেন—“অমন ‘বাবুলোক’ আমার ঢের দেখা আছে। রাত্তির বেলা, খালি বাড়ীতে অন্ধকার ঘরে কেন এলেনে এরা—এ আবার জিজ্ঞাসা করে জানতে হ’বে নাকি? খানায় নিয়ে চল—লেখানে গিয়ে জবাব দেবেন এরা।”

দেখলুম অবিনাশের যুবখানা সুলে উঠছে। চোখ টিপে দিলুম। বলুম—
“লেই ভাল। চলো খানাকে—ইঁরা বাঁকে যো বোলনা ও বোলগা।”

কোট-প্যাণ্টপরা ভজলোকটা বলে উঠলেন—“আরে পাহারাওয়ালারা নাহেব, আগে দেখ—বন্দুক-হোর-ছুরি কি আছে কাছে।”

পাহারাওয়ালারা তন্মগ্ন করতেই আমাদের কাছ থেকে হুঁটো রিভলভার পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল হারছড়াটা। বামালতক চোর গ্রেপ্তার করে’ পাহারা-ওয়ালারা মহাখুশী। অবিনাশ বলে—“গেরো দেখ। এ যে নির্ঘাত প্যাচ।”

আমি কোন জবাব না দিয়ে বলুম—“হু”।

আমাদের খানায় নিয়ে বাওয়ার বন্দোবস্ত হ’তে লাগলো। একজন পাহারাওয়ালারা বাড়ীতে পাহারায় রইলো। আর একজন আমাদের নিয়ে চলো। ভজলোকটিকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। তিনি প্রথমে রাজী হ’ল নি। পাহারাওয়ালারা পীড়াপীড়িতে তাঁকে রাজী হ’তে হ’লো। কারণ, তাঁকে ‘গাওয়া’ (লাকী) দিতে হ’বে। আমি পাহারাওয়ালারাকে জিজ্ঞাসা করলুম—“ইনি কে?”

পাহারাওয়ালারা গম্ভীরভাবে বলে—
“নগীজমে রহেনেওয়ালারা ছায়। আওয়ার কোন্? কুহ জরুর ছায় জী মহারাজ?”

চারজনে বাড়ীর বাইরে এলুম। রাত্তা-দিয়ে একখানা ট্যাক্সী বাচ্ছিল। পাহারা-ওয়ালারা ট্যাক্সীটাকে দাঁড় করিয়ে উঠে বসলো, আমরাও উঠলুম। পাহারাওয়ালার নির্দেশমত ট্যাক্সী খানিক পরে বাঁদিকে একটা গলির মধ্যে ঢুকলো। এই গলির মোরেই খানা। কিছুদূর গিয়েই আমাদের গাড়ীখানাকে থামতে হ’লো—লামনে আর একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের ড্রাইভার লামনের গাড়ীর ড্রাইভারকে গাড়ী পরাতে বলে। সে কান-ই দেয় না কোন কথায়। পাহারাওয়ালারা হেঁকে বলে—“এই! লড়ক্ ছোড়কে!” কে কার কথা শোনে! তখন পাহারাওয়ালারা গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। ড্রাইভারকে ডেকে বলে—“গাড়ী রাখকে হিরা নিদ বাতে হো? চালাও; পিছুমে পুনিশকা গাড়ী ছায়।”

ড্রাইভার বলে উঠলো—“ওঃ! কজুর হো গিয়া। হমারা ফেরার (Fare) নগীজমে গিয়া; উন্লিয়ে মর খাড়ে হা” সে গাড়ীতে ঠাট দিলে।

কোটপ্যাণ্টপরা ভজলোকটা বলে উঠলেন—“হু। পাহারাওয়ালার একটা হুমকীতে কাজ হয়ে গেল। মনে করেছিলুম, এখন আর বাব না, হরকার হয় পরে বাব। তা আমার আর বাবার হরকার হবে না। কাজ তো হয়ে গেল। ড্রাইভার, এই ড্রাইভার

বিভাগাগর কলেজ পত্রিকা পরিচালকমণ্ডলীর বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলনী

বিভাগাগর কলেজ ম্যাগাজিন কমিটির বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলনী গত রবিবার সন্ধ্যায় এলবার্ট হলে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মাধনলাল সেন ও ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ সেনকে সম্মানিত অতিথির আসন দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্মিলনী উদ্বোধন করিয়া সভাপতি মহাশয় প্রাচীনতম বিভাগাগর মহাশয়ের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন এবং তৎকালীন বাঙ্গালার আদর্শ ও কৃষ্টির অনুসরণ করিতে ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন।

ডাঃ সেন তাহার বক্তৃতায় অধ্যাপক ও সাংবাদিকদিগের কার্যের তুলনামূলক

আমাদের দলের একজন ছিল। এই হার-চুরির তার তার উপরেই পড়েছিল। তার খুনের পর আমরা হারের লক্ষ্যে এখানে এসেছিলাম। আপনারা যখন বাড়িতে ঢোকে তখন আমরা আপনারা উপর নম্র রেখেছিলাম। কাজেই আপনারা যে লক্ষ্যকাম হ'য়েছেন তাও আমরা জানতে পেরেছিলাম। অল্প উপায়ে নিতে পারা যেতো, কিন্তু তাতে গোলমালের সম্ভাবনা থাকায় এই নিরাপদ পন্থা অবলম্বন করেছি। এই হার আমরা ছয়মাস আমাদের কাছে রাখবো। তারপর সুইডেনে চালান করবো। পারেন তো উদ্ধার করবেন। ইতি—প্রেসিডেন্ট—আই, সি, সি, এ।”

অবিনাশও আমার কাঁধের পাশ দিয়ে উকি মেয়ে চিঠিখানা পড়েছিল। বলে উঠলো—“বাহবা! Three cheers for—”
বাধা দিয়ে বল্লম—“যাক্।”

(ক্রমশঃ)

আলোচনা করেন এবং বলেন কাহারও কাহারও মতে অধ্যাপকগণ গভীরভাবে উত্তর দিক বিবেচনা করিবার মত প্রকাশ করেন; কিন্তু সাংবাদিকগণের চিন্তাধারা ভালা ভাঙ্গা। আসল কথা এই যে অধ্যাপকগণ একথা বলিয়াই কর্তব্য শেষ করেন যে, উত্তর পক্ষেই বলিবার অনেক কিছু আছে। পক্ষান্তরে সাংবাদিকগণকে একটা দৃঢ় মত প্রকাশ করিতে হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই ছাত্রদিগকে স্কুল বা কলেজ শিক্ষার বহির্ভূত অনেক কাজ করিতে হয়। উহা দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের লাভসাধ্য সৃষ্টি হয়। ‘কলেজ ম্যাগাজিনের পরিচালনা দ্বারা ছাত্রেরা সংযুক্তভাবে কাজ করিতে ও চরিত্রগঠন করিতে শিখে। তাহারা দেশ সেবা, জাতীয় ধন ভাণ্ডারের রক্ষা অর্থ সংগ্রহ এবং দেশের সমস্ত লক্ষ্যে ম্যাগাজিনে মতামত প্রকাশ করিতে পারে। ‘উত্তর পক্ষেই অনেক কিছু বলিবার আছে অধ্যাপকদিগের এইরূপ নিরপেক্ষ তরল মত ম্যাগাজিন পরিচালনার ছাত্রদিগকে বিশেষ সাহায্য করে না। শঙ্কমাত্র সার রচনার কোন লাভকতা নাই। ভাবের সঙ্গে শব্দের সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যিক। পৃথিবীর সর্বত্রই কৃষ্টির পরিণত রোধ করিবার অথবা ষ্টেটের হুকুম মার্কি তাহাকে চালিত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাধারা বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চাপে লোপ পাইয়াছে। বি কাষ্টমস এ্যাক্টের ফলে বিদেশের অনেক বই এমনকি সুভাষচন্দ্র বসুর “ভারতের সংগ্রাম” নামক বই পর্যন্ত এদেশে আমদানী নিষিদ্ধ হইয়াছে। গঙ্গালবাহু বসন আইনের ফলে বাহারা নিষিদ্ধ পুস্তক করে রাখিবে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা

হইয়াছে। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে সংবাদপত্রের প্রচার অসম্ভব।
সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছাত্রদিগকে লেখাধন করিয়া বলেন যে, এই কলেজ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ছিলেন, স্বনামধন্য জীবন স্বাধীনচেতা পুরুষ, কখনও কাহারও নিকট তিনি যত্ন নীচু করেন নাই। অতঃপর তিনি বলেন যে, লর্ড ডাকরিণ যে সময়ে ভারতের বড়লাট ছিলেন সেই সময় “ইণ্ডিয়ান মিরর” কাগজের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে একদিন আহ্বান করেন। তাঁহাকে দেখিয়া লর্ড ডাকরিণ বলেন যে “আপনি সেই নরেন্দ্রনাথ যিনি আমাকে প্রত্যাহ গালি দেন।” তখন নরেন্দ্রনাথ সেন উত্তর দেন “আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন আমি আপনার অতিথি এবং আপনার ঘরের ভিতরেই আছি,—I am under your room”। লর্ড ডাকরিণ তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কোন এক ভ্রমলোককে বিলাতী পোষাক পরিহিত হইয়া উপস্থিত হইলে কিরিকী বলিয়া হাতাম্পদ হন। তাহা শুনিয়া বিভাগাগর মহাশয় বলেন যে “এরা কেনই বা ঘর আর কেনই বা গালাগালি খায়।”
বিভাগাগর মহাশয় তাঁহার চটি এবং চাবরের সন্ধান সর্বত্র পাইয়াছেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; তাঁহার “প্রথম ভাগ” এবং “দ্বিতীয় ভাগ” না পড়িলে অনেকের শিক্ষালভই হইত না, এবং তাঁহার উপক্রমণিকা না পড়িলে সংস্কৃত শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। বহু পরিশ্রমে যে প্রতিষ্ঠান তিনি গড়িয়াছিলেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ চূড়ান্তরূপে বিরাজ পাইতেছে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাহারা শিক্ষালভ করিতেছেন তাঁহারা যেন বিভাগাগর মহাশয়ের আদর্শ অনুপ্রাণিত হন।

অতঃপর বক্তা বলেন—খবরের কাগজের সম্পাদন করা কঠিন এবং হারিষপূর্ণ কাজ, আজ আমার বহুদিনের পূর্বের একটি কথা মনে পড়িতেছে, অধ্যাপক পান্ডিত্যাল আমাকে দেখিয়া একদিন বলেন যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ, আমার আজ আনন্দ এই যে, আমার ছাত্রগণের একজন সাংবাদিক হইয়াছেন।

সাংবাদিকগণের সম্পাদকগণের জেলের বাইবার ভ্রত প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু ম্যাগাজিনের সম্পাদকগণের সে ভয় নাই, সুতরাং তাঁহারা ভালভাবেই সাংবাদিক পত্র চালনা করিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, যা লিখিবে তাহা পূর্বের চিন্তা করিবে এবং লিখিয়া পরে পড়িয়া দেখিবে। ছাত্রগণকে আমিও সেই উপদেশ দিই। তাঁহারা যেন নিজের ভিতর আলোচনা করেন, প্রয়োজনমত অধ্যাপকগণের সহিত পরামর্শ করেন। তাহার পরে পাকা লেখক বলিয়া ভবিষ্যতে খ্যাতি লাভ করিবেন। প্রথম যদি মনে করেন পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিব, তাহা হইলে কিছুই হইবে না।

অতঃপর শ্রীবিমল কর এবং পরিমল সরকার সঙ্গীত করেন এবং শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য নানা প্রকার শব্দাঙ্কুরণ দ্বারা শব্দলের



শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

মুসোলিনী কি এ যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক? রোম-বার্লিন ট্র্যান্সিসের তাৎপর্য্য কি? হিটলারের ভাণ্ডে জুটবে কতটা? সচী মীল

এই প্রবন্ধের heading এ যে সব প্রশ্ন করা হয়েছে তারই উত্তর দেবার বখালাধ্যা চেষ্টা করবো।

মুসোলিনী যে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ diplomatic genius, এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য। মুসোলিনীর career of triumphs এ যুগের লতিয়াই একটা বিশ্বের জিনিষ। যদি বলা যায় যে গোটা কতক ঘটনার ষাট-প্রতিষাটে মুসোলিনীর অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা আজ সম্ভব হয়েছে, তাতে হয়ত লতায় অপলাপ হবে না, কিন্তু যে বিশ্বের কথা বলেছি সে বিশ্বরও কমবে না।

মনোরঞ্জন করেন। অবশেষে কলেজের কর্তৃপক্ষগণ সমাগত অভিযোগকে জলযোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন।

ডাঃ বি সি ঘোষ, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুত বঙ্কিম দেন, মিঃ শ্রীমাচরণ মুখার্জি, মিঃ দারকানাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জীতেন্দ্র গুহ, অধ্যাপক প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক এম এন চ্যাটার্জি, অধ্যাপক পি সি ব্যানার্জি, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অধ্যাপক অমূল্য রাইকত, অধ্যাপক যীতেন্দ্রনাথ মুখার্জি, অধ্যাপক হর্গেশ্বর চক্রবর্তী, অধ্যাপক বি গোস্বামী, অধ্যাপক পি বি সরকার, অধ্যাপক সুধাংশু বসু, অধ্যাপক এস পালিত, শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুত অমূল্য বসু, শ্রীযুত অক্ষয় সরকার, শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ রায়, মিঃ এইচ দে, মিঃ সি এল বসু, পণ্ডিত কবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি লভ্য উপস্থিত ছিলেন।

মুসোলিনীর প্রথম জয়—ট্র্যান্সিসিয়া; দ্বিতীয় জয়—Withdrawal of sanctions; তৃতীয়—স্পেনে foot hold পাওয়া; এবং চতুর্থ ও শেষের দেয়াজিত—Anglo-Italian Pact. আমি অংশ গত তিন বছরের কথাই বলছি। এই তিন বছরের মধ্যেই লোকটা যে কোথা থেকে কোথায় এলে দাঁড়িয়েছে—তা ভাবলে অবাক হতে হয়। মুসোলিনী একজন মস্ত বড় dreamer তার চেয়েও বড় as a man of action; তার চেয়েও বড় হচ্ছে তাঁর Dynamism. যদি কেউ জারগা বিশেষে তাকে pin down করে বলে—এইখানে মুসোলিনী, তার পরেই দেখা যাবে তিনি আর দেখানো নেই। স্বয়ং মুসোলিনীকে যদি একটা particular moment এ জিজ্ঞাসা করা যায়—“আপনি এখন ঠিক কোনখানে?”, তবে সে প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিতে পারবেন না। ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক কেন? এর উত্তর হচ্ছে—তিনি নিজেই একটা বিরাট রহস্য।

এককালে তিনি ছিলেন ইটালীর একজন সমাজতন্ত্র নেতা। ইতিহাসের চকল ধারায় লড়ে নিজেকে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে এবং নিজের লড়ে ইতিহাসকে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে তিনি ১৯২২ সালে হয়ে দাঁড়ালেন ইটালীর সর্বময় প্রভু।

আজকে তিনি যেকোনো উদ্দেশ্য করে হুমকি দিয়ে বলছেন—কম্যুনিস্টকে বরখাস্ত করবো না। স্পেনের ব্যাপারে বলছেন—Gen. Franco must win. অথচ যদি

পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে রাশিয়ার সঙ্গে ইটালীর একটি Pact of friendship রচিত হওয়ার পর তিনিই তাঁর নিজের কাগজে লিখেছিলেন : "This Treaty is one of the events which are bringing forth a new future. The two great revolutions, the Fascist and the Bolshevik, meet and join hands for the purpose of understanding each other, of working together and of bringing the other nations to their side. The two new Governments, placed between the past and the future, will settle probably, in agreement, the new aims of mankind."

অর্থাৎ সেদিনও তাঁর স্বপ্ন ছিল ক্যাপিটাল ও কম্যুনিজম দুজনে মিলে বিশেষ ভগ্নতটাকে ভাগ করে নেবে। পাঁচ বছর আগেও তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং হরত খুব আশাও ছিল : Fascism and Communism will not collide but coalesce in their proselytising activities.

এই সেদিন পর্য্যন্ত ইংরেজের সঙ্গে ইতালিয়ার কি শত্রুতা! Bari Radio Station থেকে Near East-এ ইংরেজের বিরুদ্ধে যে কী প্রোপাগান্ডা! এ্যাভিনিয়ন বুদ্ধের প্রায়শ্চেষ্টে যখন সুরেজখাল বন্ধ করবে কথা উঠেছিল, তখন Signor Gayda হুমকি দিয়ে বলেছিলেন—"Any such attempt will be repulsed."

Anglo-Italian Pact হয়ে যাবার পরও ইতালিয়ার আবেশ অস্থায়ী ব্রিটিশ আতঙ্কের ওপর বোম্বার পর বোম্বা পড়েছে, যাতে চেঁচাবলেন নাহেব তড়কে গিয়ে Franco নাহেবকে খুব তাড়াতাড়ি

জেতাবার ব্যবস্থা করেন! কারণ বুদ্ধটা শেষ হয়ে গেলে ত আর ও সব বালাই থাকবে না।

সেদিন তিনি হিটলারকে রোমেরে রাজোচিত সন্মান দেখাবার জন্তে কি টাকাই না খরচ করলেন! অথচ হিটলারের সঙ্গে বন্ধুত্ব জলাঞ্জলি দিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী হবে না, যখন প্রয়োজন হবে। আজকে হিটলার-ইতালিনি-প্রীতি বা তাঁর অভিনয় কালকে খোলাখুলি দ্বন্দ্ব গিয়ে দাঁড়াবে। যুদ্ধকেন্দ্রের মত ছুটে বেড়াচ্ছে এই লোকটা। বিশ্রাম নেই; শিথিলতা নেই, বিবেকের তাড়না নেই, অতীতের জন্ত অনুতাপ নেই। বর্তমান মুহূর্ত্তটাই তাঁর কাছে মত্য, কিন্তু একবার চলে গেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস কিছুই নেই।

Mr. Richard Child, ex-American Ambassador in Rome, এই ইতালিনির লব্ধকে বলছেন : "I imagine as he reaches forth to touch reality in himself, he finds that he himself has gone a little forward, isolated, determined, illusive, untouchable, just out of reach—onward!"

এই যে আজকের রোম-বাগিন এ্যাঙ্ক্লিস—এ কার তৈরী? ইতালিনি এ্যাভিনিয়ন জয় করার সময়ই বুঝেছিলেন—এই রকম কিছু একটার বিশেষ দরকার। Discontented Germanyকে হাতে রেখে কাজ উদ্ধার করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকের বিশ্বাস—ইতালিনির ইচ্ছা হচ্ছে Fascist Internationalকে জরহুক্ত করা, অর্থাৎ Rome-Berlin axisই হবে তাঁর Nucleus. কিন্তু এ মন্ত বড় ভুল ধারণা। Rome-Berlin axis-এর জীবন আর কতদিন? Instrument of Blackmail হিসেবে

ইতালিনিকে অনেক কাজ দিয়েছে এই axis. জার্মানিকে কি দিয়েছে? ধরতে গেলে এমন কিছুই নয়। অস্ত্রিয়ার ব্যাপারে axis কাজ করে নি। করেছে ইতালিনির রাজনৈতিক চাল। ইতালিনি এখনতাব দেখিয়েছিলেন যেন তিনি নিজেই অস্ত্রিয়ার হিটলারের হাতে ভুলে দিচ্ছেন। আত্মদে-ইজিতে তিনি হিটলারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন—“অস্ত্রিয়া নিচ্ছ, কিন্তু মনে রেখো এ শুধু আশারই জন্তে পেলো।” হিটলার উত্তরে বলেছিলেন—“অবশ্যই, সে কথা কি আমি ভুলতে পারি।” অস্ত্রিয়া ছাড়া হিটলার আর কি পেরেছে? কলোনী কি হল? জার্মানীর কলোনী ফেরতের ব্যবস্থা এখনও ইতালিনি কিছুই করেন নি! গত সেপ্টেম্বর মাসে এ নিয়ে একটু গলাবাজী রোমে হয়েছিল, তবে সেটা ইতালিনির নিজের সুবিধের জন্তে।

৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইতালিনির Mouthpiece—Sig. Gayda জার্মানীর colonial claim support করে বলেছিলেন : "The problem is one of European justice and equilibrium. Italian nationals, just emerged from a European political conflict aroused by the claim to the same right, can therefore understand Germany's needs. Europe must expect a deliberate movement in Germany for a revision of the colonial status quo created by the Treaty of Versailles."

হঠাৎ এই সব চমক লাগান কথা শুনে ত ইউরোপের রাজধানীগুলোতে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেল। ইতালিনি কি তাহলে হিটলারকে একান্তই তাঁর ঈর্ষিত পাইয়ে দিতে উদ্ভত?

কিন্তু বাহের আল চোখ আছে, তাহের চোখে বুলো দেওয়া শক্ত। মুসোলিনীকে এই Epic avowal of friendship-এর পেছনে আল উদ্দেশ্য কি ছিল? কলোনী না পেরে জার্মানী মরে যাচ্ছে—তাতে মুসোলিনী কি?

প্রায় ঐ সময়টাকেই ইংরেজ চেষ্টা করছিল জার্মানীকে পূর্ব ইউরোপে free-hand দিয়ে অন্ততঃ কিছু বছরের জন্য হিটলারকে বাধিয়ে রাখে; এবং এর সঙ্গে আরও একটা মতলব ছিল এই যে, হিটলারকে এইভাবে লম্বাট করে মুসোলিনীকে diplomatically isolate করতে হবে যাতে Mediterranean-এ মুসোলিনী বেশী বাড়ী-বাড়ী না করে। জার্মানীর সঙ্গে আঁতাত করে মুসোলিনীকে জঙ্গ করাই ছিল ইংরেজের মতলব। তাই মুসোলিনী কলোনির দিকে হিটলারের মনকে টেনে রেখে ব্রিটিশ-জার্মান শত্রুতাকে জাগিয়ে রাখবার মতলব করেছিলেন এই declaration-এর ভেতর দিয়ে। চতুরতার কি মুসোলিনীর জুড়ি আছে না কি? হিটলার বা চেয়ারমেন লাহেব ত ওর কাছে ছেলেকাছুব।

শাস্তি বলে জিনিষটার যদি স্বরকার কারও থাকে ত মুসোলিনীর। মুসোলিনী আসলে বুদ্ধ চান না—এ কথাটা হয়ত অনেকের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেবে—কিন্তু তা হলেও আদি বলছি এ কথাটা সত্য। শাস্তির পথ ধরে এখন মুসোলিনীর subtle political manoeuvres চলতে থাকবে—এ কথার সত্যতা আর কিছুদিনের মধ্যেই বেশ পরিষ্কৃত হয়ে উঠবে। এখন মুসোলিনীর চারদিক দিয়ে খুব স্রবিশেষে।

ইংরেজ যে মনে করেছিল মধ্য ইউরোপে হিটলারকে freehand দিয়ে Rome-Berlin axis-কে আলগা করে দেবে, সে আর হবার জো নেই। Franco-Czechoslovak axis-এ পথে মস্ত বড় বাধা। কাজেই হিটলারকে হয়ত আবার কিছুদিন বাধেই Colonial cry তুলতে হবে। তুললেই মুসোলিনীর স্রবিশেষ হল—ইংরেজ-জার্মান বিরোধ বেশ চমৎকার বজায় রইল। অতএব কোন না কোন অজুহাতে কলোনী ক্ষেত্রের ব্যাপারে হিটলারকে সাহায্য করবার ভর দেখালেই ইংরেজ মুসোলিনীকে তোয়াজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এর ফলে মুসোলিনী পাবে—Concession after concession, এই Process-এ মুসোলিনীর শক্তি ও গৌরব বেড়েই চলবে। অপরপক্ষে ইংরেজের Imperial Might ক্রমশঃ কম হতে থাকবে। হিটলারের হয়ে বুদ্ধ করতে গেলে ঠকতে হবে—এ কথা চতুর মুসোলিনী খুব ভালরকমই বোঝেন। আর হিটলারের বিরুদ্ধে যদি বুদ্ধ করতে হয়? করতে হয়ত হতে পারে, কিন্তু করবার ভর দেখানোর occasion হয়ত আসতে পারে, কিন্তু তা এখন এলে চলবে না। এখানে আবার মুসোলিনীর বেশ একটু ভয়ের কারণ রয়েছে। তাই বেকোম্প্রোভাকিরার ব্যাপারে হিটলারকে বুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে উপদেশ দিয়েছিলেন মুসোলিনী—হ্যাঁ, বন্ধু হিলাবে উপদেশের কথাই বলছি, তবে তার পেছনে যুদ্ধ implied threat যে ছিল না তা নয়। London-Paris-Rome axis-এর যেই মুসোলিনী dominant element হয়ে

পড়বেন, তখনই Rome-Berlin axis-কে তিনি জলে ফেলে দিতে চিখা করবেন না। হিটলারকে যদি তিনি ততদিন পর্যন্ত নিজের উপদেশমত চালাতে পারেন তবে তারপর যদি হিটলার বাড়ীবাড়ী করেন তখন মুসোলিনী নির্ভরে চোখ রাঙাতে পারবেন হিটলারকে। তখন London-Paris-Rome axis হবে Bulwark against German aggression. আর ইটালী হবে সেই axis-এর সবচেয়ে বড় power.

হিটলারের ভবিষ্যৎ আদি যতদূর দেখতে পাচ্ছি সেটার সবটাই অন্ধকার। এখনই যদি বুদ্ধ বাধে ত London-Paris-Moscow alliance ফ্যানিজমকে নষ্ট করে দেবে। পরে যদি বাধে ত' হিটলার নষ্ট হয়ে যাবে আর মুসোলিনী Summit-এ উঠে বলবেন। স্পেনের বুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে—অর্থাৎ Franco লাহেব জিতলে মুসোলিনীর Strategic advantage এত বেশী বেড়ে যাবে যে তার ফলে Franco Soviet Pact ভেঙ্গে যাবে। অর্থাৎ মুসোলিনীর ascendancy-কে বাধা দেবার কেউ থাকবে না। আর যেকোম্প্রোভাকিরারকে আশ্রয় করে যদি এখন বুদ্ধ বাধে ত স্পেনের গণতন্ত্র বাচবে, হিটলার-মুসোলিনী নষ্ট হয়ে যাবে। এর বেশী আর বলতে পারা যায় না।



ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, স্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।



দেবদত্ত ফিল্মসের মহিমাম্বিত চিত্রকাব্য—“গোরা”—একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে রাণীবালা, জীবন গান্ধুলী, মনোরম মোহন ঘোষাল, মঞ্জু দাস ও প্রতিমা দাশগুপ্তা। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র। আগামী ৩০ জুলাই শনিবার এই চিত্রখানি ‘চিত্রা’-য় মুক্তিলাভ করিবে।



পরিচালক
টেলিগ্রাম
'ভারিটি'
জাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
টেলিকোম
সাঁউপ ৪৬৬
১১, চক্রবেড়িয়া (সাঁউপ) রোড, কলিকাতা

জন্ম বর্ষ, উনত্রিশশং সংখ্যা, বুধস্পতিবার, ৫ই শ্রাবণ ১৩৪৫, ২১শে জুলাই ১৯২৮

ওয়ার্কাস

এই সপ্তাহের শেষে ওয়ার্কাস কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় স্পষ্ট ও তেজোদীপক উক্তি বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। তৎব্যতীত মধ্য-প্রদেশের মন্ত্রীসকট অগতম কার্যসূচী।

যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় রাষ্ট্রপতির উক্তি বলভভাই-ব্লাভাই-রাজাজী-সংসদের মনঃপূত হয় নাই। এই ত্রিমূর্তির মধ্যে ব্লাভাই সাহেব পর্যটকের বেশে বিলাতে যাইয়া তলে তলে একটা রফা করার মানসে গুপ্ত বৈঠকে যে মনোভাব অতর্কিতে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসু-প্রচেষ্টায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের যাঁহারা রক্ত-ধারক তাঁহাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব উগ্রমুখ্তি ধারণ করায় পণ্ডিত জহরলাল বিদেশে পাড়ি দিয়াছেন। বিদেশ যাত্রার প্রাকালে সর্দার বলভভাইয়ের ইঙ্গিতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের এলাহাবাদ দপ্তরে বামপন্থী-বিতাড়ন পণ্ডিতজী অশেষ চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে পারেন নাই। সুতরাং

রাষ্ট্রপতির এই আকস্মিক উক্তিভে বলভভাই প্রমুখ দক্ষিণপন্থী যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী-প্রায়সী নেতৃবর্গ কিন্তু হইয়া উঠিয়াছেন। তবে বলভভাই চতুর ব্যক্তি—মেঘের অন্তরাল হইতেই যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে তিনিও তদ্রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভ্রাতার উইল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির হস্তে প্রায় লক্ষাধিক টাকা জন্মে এই আশঙ্কায় তিনি এটনি নানাভাতি এণ্ড কোং, এড্‌ভোকেট জেনারেল স্মার চিমললাল শিতলবাদ ও এক ভ্রাতাপুত্রকে খাড়া করিয়া আইনের ফাঁকে বিঠলভাই প্যাটেলের শেষ ইচ্ছাকেও নাকচ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অপর পক্ষে বলভভাই মাদ্রাজের বাক্যবীর মিঃ সত্যমূর্তিকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া রাষ্ট্রপতির যুক্ত-রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় উক্তির বিরুদ্ধে অশোভন ও শিষ্টতা-বর্জিত বিবৃতি প্রকাশ করাইয়াছেন। মদ্রবাসী সত্যমূর্তির বিবৃতি বোম্বাই হইতে প্রচারিত হইয়াছে—ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহলের কথোপকথনে প্রকাশ যে ওয়ার্কাস অধিবেশনে রাষ্ট্রপতিকে বিভ্রত করিবার বড়যন্ত্রে বলভভাই ইতিমধ্যেই লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের গিণ্টিকরা কাঠামোর তবিরী-রত সত্যমূর্তির মতামতের যে বর্তমান মুহূর্তে একেবারেই কোম মূল্য নাই তাহা এমন কি “স্টেটসম্যানে”র Political Notes এর লেখকও গত রবিবারের সংখ্যায় স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ নারিম্যান, মিঃ মাসানি প্রভৃতি বলভভাই-বন্ধন-যুক্ত নেতৃবর্গ রাষ্ট্রপতির উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। সাগরপারে পণ্ডিত জহরলাল স্বীয় মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়া রাষ্ট্রপতির উক্তিকে অধিকন্তর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। রাজনৈতিক তপ্ত হাওয়ার গতি কোন দিকে ওয়ার্কাস তাহার ইঙ্গিত দিবে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসকটের অন্তরালেও বলভভাইয়ের চক্রান্ত ইন্ধন বোগাইতেছে। বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি. জি. খেরের স্থায় মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খারে বলভভাইয়ের খেয়াল-পুলির ক্রীড়নক হইতে নারাজ। সেইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে

অন্যান্য মন্ত্রীদের প্ররোচিত করার স্পষ্ট ইঙ্গিত অনেকদিন হইতেই প্রচারিত হইতেছে। পাঁচমারিতে যে রকার খসড়া হইয়াছিল তাহাও টিকিল না। দুইজন মন্ত্রী পদত্যাগ ঘোষণা করিয়া পুণরায় পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। ওয়ার্কায় নাকি ইহার শেষ মিমাংসা হইবে। হয় ডাঃ খারেকে পদত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে নচেৎ তাঁহাকে কর্মবিহীন জগন্নাথরূপে মন্ত্রীমণ্ডলে পিরাঙ্গ করিতে হইবে।

কলকাতা রাজ্যগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের উপর

রূপরেখা

সহযোগী “জানমাজার পত্রিকা” সংবাদ দিয়াছেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্ডারম্যান ডাঃ কুহুৎশকর রায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অন্তর্কূলে পদত্যাগ করিয়াছেন। সহযোগীর প্রকাশিত সংবাদের এই অংশটুকু সত্য তবে সহযোগী যে লিখিয়াছেন যে “রাষ্ট্রপতির নির্দেশে” কুহুৎশকর পদত্যাগ করিয়াছেন তাহা আমাদের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধির মতে সত্য নহে।

ডাঃ কুহুৎশকর যেচ্ছার শিলংয়ের লতা-কুঞ্জ বিশ্রাম-রত বিধানবাসুর নিকট পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন এবং বর্তমানে সেই পদত্যাগ পত্রসহ বিধানবাসু কলিকাতার প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিধানবাসু নাকি আকার ধরিয়াছেন যে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসেম্বলির বা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট মনোনয়নের জন্য আবেদন করিবেন না তবে যদি মিউনিসিপ্যাল এ্যাসেম্বলির প্রস্তাব করিয়া শরণ রাষ্ট্রপতির দারফতে অনুরোধ জানান তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া অন্ডারম্যান পদে বৃত্তারমান হইতে পারেন। বিধানবাসুর এই আকার শিষ্টতা ও ঘৃণতার লীলা অতিক্রম করিয়াছে। সময় বিশেষে পলায়ন করিয়া বিধানবাসু বহুবার লঙ্ঘন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। সময় সময় তাঁহার বৈরাগ্য এতই প্রবল হয় যে তিনি রাজনীতি হইতে চিরন্তরে অবসর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আত্মগোপন করেন। তবে তাঁহার এই বৈরাগ্য কখনই চিরস্থায়ী হয় না—কিছু দিন পরেই আবার তিনি উৎসাহ করিতে আরম্ভ করেন। আর বতদিন আত্মগোপন করিয়া থাকেন ততদিনও অন্তরাল হইতে লম্বা বড়বস্ত্রের ইন্ধন যোগান। রায়-কলী-প্যাণ্ডের প্রবর্তক কি রাষ্ট্রপতি বা শরণচন্দ্রের নিকট কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন? তৎপূর্বে রাষ্ট্রপতি বা শরণচন্দ্র বিধানবাসুকে অন্ডারম্যানের জন্য লম্বা বস্ত্র প্রেরণ করিলে প্রকারান্তরে কংগ্রেস-

বল্লভভাইয়ের এই প্রস্তাব বিস্তারের প্রচেষ্টার মূলে আছে আসন্ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ল্যান্ডের আকাঙ্ক্ষা। বল্লভভাই ও বুলাভাই—এই দুই “ভাই” মিলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীমণ্ডল দখল করিবেন—একজন প্রধান মন্ত্রী অপরে অর্থসচিব ও সরাষ্ট্র-সচিব। সেই অনাগত মন্ত্রী-মসমদের লোভনীয় আকর্ষণ বল্লভভাই ও বুলাভাইকে রাজনীতিক যমজ ভ্রাতায় পরিণত করিয়াছে এবং তাঁহাদেরই গোপন ইচ্ছিতে বর্তমানে কংগ্রেসের নীতি পরিচালিত হইতেছে ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও ধর্মতার সামঞ্জস্য হইতেছে। তাঁহারা এই বর্তমান মুহূর্তে নিয়মতান্ত্রিক কংগ্রেসের দুই শক্তিশ্বর পুরুষ।

ছোহিতারই প্রশ্ন হিবেন এবং কুহুৎশকর পদত্যাগের রূপপে যে শনি কর্পোরেশনে প্রবেশ করিবে তা কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসেম্বলির বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিবে।

শ্রীযুক্ত প্রভুচন্দ্রাল হিম্মতলিংকার পদত্যাগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে উপ-নির্বাচন হইয়াছিল তাহাতে বিধানবাসুকে মনোনীত করিবার জন্য বিরোধবাসু প্রভৃতি বিধান-পক্ষীয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মোলানা আবুল কালাম আজাদ ও শ্রীযুক্ত শরণচন্দ্র বসু দৃঢ়তার সহিত বিধান-পক্ষীয়ের আকার উপেক্ষা করিয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রীযুক্ত জৈনরাম জালানকে মনোনীত করেন। তাহাতে বিধান-শিষ্ট-পরিচালিত সহযোগী “যুগান্তরের” আক্ষেপ ও কোভ-মিশ্রিত প্রলাপ উপভোগ্য হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভার প্রবেশ করিবার যদি এত বাগনাই থাকে তা’ বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় বিধানবাসু আকস্মিকভাবে শরণচন্দ্রের বিনা অনুমতিতে ২৪ পরগণার কেন্দ্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেনই বা কেন আর করেনবাসুকে লম্বা বস্ত্র করিবার জন্য আবেদন করিলেন কেন? কোন পদগোরে তিনি সে আবেদন করিবার অধিকারী? অনুরূপ অপরাধে যদি বোম্বাইয়ের মিঃ নারিমানের শাস্তি হয় তা’ বিধানবাসু তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন কেন? নলিনীবাসু বাহা প্রকাশ্যে করেন বিধানবাসু লোকচন্দ্রের অন্তরালে তাহাই করেন। এক হিসাবে নলিনীবাসু অপেক্ষা বিধানবাসুর কংগ্রেস-জোহিতা অধিকতর ক্রতিকর। তিনি কংগ্রেস পরিচালনা করিবেন না অধিকন্তু বাংলার কংগ্রেসের বত কংগ্রেসজোহিতা ও বিশৃঙ্খলতার মূলে তাঁহার অগৃহ্য অঙ্গুলী-দ্বারা বিভ্রান্ত রাখিবে। কুহুৎশকর পদত্যাগপত্র পকেটে করিয়া বিধানবাসু লারা কলিকাতার ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং লোক-পরম্পরায় প্রচার করাইতেছেন: “রাষ্ট্রপতি বা শরণচন্দ্র একবার বলিলেই বাই।” শালন-বিক এক নির্ভীক যুবক বিধানবাসুর এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া পরিহাসজ্বলে বলিতেছে: “আর একবার বলিলেই বাই।”

সাহিত্যের কষ্টিপাথর

অশনি

শনির কবলে রোহিণী

যে আলরে শ-কার ব-কার ও ম-কার চলে, সে আলর তত্ত্বলোকের পক্ষে ত্রুকার-জনক। সম্প্রতি শনির আলরে শ-কার, ব-কার ও ম-কারের উৎপাত ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। এখানকার ইতিহাস সাহিত্যিক সাজিবার প্রচেষ্টায় যে সকল ইত্তরতা ও বৈরাগ্যের পরিচয় দিতেছেন তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হউক বা না হউক, প্রচুর হাস্য ও বীভৎস-রসের যে সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

* * *

শ-কার সাহিত্যের আন্তাকুড় ঝাটরা “মণিবৃক্ষ” সংগ্রহ করিতে করিতে হঠাৎ সম্পাদক বনিয়া গিয়াছেন। প্রিন্টারি করিয়া ইঁহার অন্ন বুটত, কিন্তু অন্নহাতাকে গালি-দিবার লৎলাহলের ইঁহার কখনও অভাব হয় নাই। কেমন করিয়া জানি না, সম্প্রতি, ইনি প্রেমের অধিকারী, পরিবহের প্রসাধ-ভাজী এবং বাজারে সাহিত্যের অধিবেশনের গাড়াটিয়া লভাপতি। লবল কিন্তু সেই নাতন “মণিবৃক্ষ”। সুগার ঢেকুর যখন তখন তুলিয়া থাকেন। নকল বন্ধিমপছী বটে, আললে কিন্তু শ-কার ও ম-কার ইঁহার উভয়েই “অগ্রগতি-র” প্রেম-সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহেন।

* * *

ব-কারের পেটে বোমা মারিলে ক-অক্ষর বাহির হয় না। ইঁহার পুঁজি কেবল তারিখ। নিজের জন্ম-তারিখের বিগততা লবন্ধে ইনি অবশ্যই নিঃসন্দেহ নহেন, অথচ বন্ধিদের জন্ম-তারিখ লবন্ধে একেবারে “অধরিটি”!

ভুল হইলে পরের বেথিয়া শুদ্ধিপত্রদ্বারা ভ্রমশোধন করা ইঁহার scientific পদ্ধতি। প্রথম জীবনে লরকার মহাশয়ের তত্ত্বদ্বারা করিয়া ঐতিহাসিক হইবার সাধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। কাজেই এখন ইনি হতাশ ঐতিহাসিক। অনধিকার-চর্চায় ইঁহার প্রবল অনুরাগ। নাট্যালাল গবেষণা করিতে গিয়া ট্রাজিডিকে অপেরা এবং অপেরাকে ট্রাজিডি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাজেই কথায় কথায় শ-কার ব-কারের তারিফ করেন এবং ব-কারও শ-কারের বাহবা দেন। নহিলে যে উপায় নাই!

* * *

ম-কার একেবারে বৃত্তিমান গুরুচণ্ডাল—কি ভাবে, কি ভাষায়। ইনি শ-কারের গুরুস্থানীয়, কাজেই ব-কারেরও। ম-কারকে এককথায় “Inconsistency is thy name” বলিলেই ঠিক আখ্যা দেওয়া হয়। ইঁহার লিখিত প্রবন্ধ পড়িলেই পাঠক সে কথা বৃত্তিতে পারিবেন। কিছুদিন পূর্বে পাটনা প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন ইঁহাকে ঠিক চিনিয়াছিল। নিজের বিয়ের কবিতা নিজে লিখিয়া ইনি কবিশ্রমিক লাভ করিয়াছিলেন—অবশ্য তাহা এখন বিশ্বরূপীর কোঠার গিয়া পৌঁছিয়াছে। ম-কার চাকাই মাস্টার—কাজেই একটু discount দিতেই হইবে।

* *

এ হেন শ-কার, ব-কার ও ম-কারের হাতে বন্ধিম-সাহিত্য যে নাস্তানাবুহ হইবে তাহাতে আর বিচিৎ কি? শনির বন্ধিম-সংখ্যায় ইঁহাদের বিভাবৃদ্ধির পরিচয় উৎকটাকারে প্রকট হইয়াছে। সে পরিচয় প্রয়োজন

হইলে পরে দেওয়া যাইবে। এই বিভাবৃদ্ধি লইয়া আবার ইঁহারা বন্ধিম-সাহিত্য সম্পাদন করিতেছেন! আশঙ্কার কারণ যে যথেষ্ট রহিয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে কি? বন্ধিম-প্রীতি ইঁহাদের হাড়-মাংসে নাই। বন্ধিম-কে অবলম্বন করিয়া অর্থ ও বশ অর্জন করাই ইঁহাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। “শ্রীচরণেশু, আফিজ পাইয়াছি। অনেকটা আফিজ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেশু। আপনার শ্রীচরণকমলেশুগলেযু—আরও কিছু আফিজ পাঠাইবেন”—ইহাই ইঁহাদের পলিটিক্স। কমলাকান্তের বাহাদুরি আছে ১৭ কি।

কিন্তু মশা মারিতে আমরা কামান লাগিব না। ইঁহাদের গুরু গুরু “রোহিণী” নামক প্রবন্ধ লিখিয়া বন্ধিম-সংখ্যায় যে পাণ্ডিত্য ও লজ্জবৃত্তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহার লবন্ধে লজ্জাপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ইনিও চাকাই অধ্যাপক—একেবারে প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ। ইঁহার লেখার অবশ্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের পরিচয় যথেষ্ট আছে। গুরু পরিচয় পাইলেই পাঠক নিশ্চয়ই শিষ্যদের পরিচয় পাইতে উৎকণ্ঠিত হইবেন না—কারণ গুরু অপেক্ষা শিষ্য-বিজ্ঞা যে গরীয়ণী তাহা ত প্রবাহবাক্যই হইয়া আছে!

কুক্ষেণে বন্ধিমচন্দ্র রোহিণী ঠাকুরাণীকে অসামান্য রমণী-রূপলাবণ্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। কুক্ষেণে রোহিণী সুনন্দী সরোবর-পথ আলো করিয়া জল লইতে গিয়াছিল। কুক্ষেণে বকুলের ডালে বলিয়া সেই সময়ে বসন্তের কোকিল “কুহু: কুহু: কুহু:” রবে ডাকিয়া উঠিয়াছিল। বন্ধিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—“রোহিণী চারিদিক চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই উর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক ডালে বলিয়া যদি সে কোকিল

দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—কুত্র পাখী-
জাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া,
উলটি-পালটি খাইয়া, পা গোটে করিয়া
ঝুপ করিয়া পড়িয়া বাইত।” কিন্তু কুত্র
পক্ষিজাতি বাহা দেখে নাই, রক্তমাংসের
পূজারী পণ্ডিতেরা তাহা অবশ্রম্ভই চুরি করিয়া
দেখিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু
রূপ দেখিবার মত চক্ষু তাঁহাদের ছিল না।
তাই তাঁহারা রোহিণীর কটাক্ষ-শরে বিদ্ধ
হইয়া, উলটি-পালটি খাইয়া, পা গোটে করিয়া
ঝুপ করিয়া পড়িয়া গেলেন এবং পড়িয়া
গিয়া অভ্যস্ত আকশোষের লহিত লিখিতে
লাগিলেন :—

(১) “রোহিণীর বিনাশ ঘৃণা ও
ভয়বাহ।”

(২) বক্ষিমচন্দ্র রোহিণীকে “নিষ্ঠুরভাবে
হত্যার হস্তে সমর্পণ” করিয়াছেন।

(৩) “রোহিণীর দুর্ভাগ্যকে কেবল
পাপের শাস্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গত
হইবে না। তাহা যদি হয় তবে নিষ্পাপ
ভ্রমরও কেন শাস্তি ভোগ করিয়াছে?
বিভিন্ন প্রকারে উক্তরেরই ভাগ্যে অবশেষে
মৃত্যুদণ্ড আদিরাছে। রোহিণীর পাপ
স্বীকার করিয়া লইলেও, অনভিজ্ঞ বালিকার
অভিমান ও অবিস্মৃতকারিতা তাহার লহিত
কি লম্বান দণ্ডে দণ্ডিত হইবে?”

কিন্তু মৃত্যু-এ অবস্থা বিশেষে “দণ্ড” নহে
এবং ভ্রমর ও রোহিণী যে “লম্বান দণ্ডে
দণ্ডিত” নহে তাহা এই পণ্ডিত-লেখককে
বুঝাইয়া বলিতেও আমাদের ঘৃণা হয়।
এ ক্ষেত্রে রোহিণীর বিনাশ ঘৃণা ও ভয়বাহ
নহে, পণ্ডিত প্রেমচাঁদের রোহিণী-রূপলালসা-
বলুপিত ভ্রমরের চিত্র “ঘৃণা ও ভয়বাহ।”
আলস কথা, রোহিণীর অতথানি রূপ-
যৌবনের ঐরূপ অকালে ও বেচোরে
অবদান ইহার কিছুতেই পরিপাক
করিতে পারিতেছেন না। তাই না
গোবিন্দলালের উপর রাগ করিয়া লেখক

লিখিয়াছেন—“রূপলালসার শক্তি তাহার
ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, গোলায় বাই-
তেছি বাইব; কিন্তু গোলায় বাওয়া নিতান্ত
সহজ নহে। বকের তলে বাহার প্রাণ
নাই, চরিত্রে স্থৈর্য্য নাই, ভাগের কথা ঘুরে
থাক্, ভোগ ভুজিবার ক্ষমতা সে কোথার
পাইবে?” আমরাও বলি, মতাই ত, গোলায়
বাওয়া নিতান্ত সহজ নহে! বিশ্ববিদ্যালয়ে
অজ্ঞিত এতথানি পাণ্ডিত্যকে একরূপ “নিষ্ঠুর-
ভাবে হত্যার হস্তে সমর্পণ” করিতে কেহ কখনও
দেখিয়াছেন কি? “চরিত্তির” স্থির রাখিয়া
রোহিণীর রূপলালসা করা কি সোজা কথা
মহাশয়?

* * *

পণ্ডিত প্রেমচাঁদের মনস্তত্ত্ব বুঝিয়া বক্ষিম-
চন্দ্র স্বয়ং যে কথা বহুকাল পূর্বে লিখিয়া
গিয়াছেন, আমরা মাত্র তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত
করিয়া দিতেছি। পাঠক দেখিবেন,
বক্ষিমচন্দ্রের লেখার মধ্যেই পণ্ডিতদের
সকল কথারই উত্তর আছে। বক্ষিমচন্দ্র
লিখিয়াছেন :—

“অগ্রহায়ণ মাসের বজ্রদর্শন সাহির
হওয়ার পরে অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা
করিয়াছেন—“রোহিণীকে মারিলেন কেন?”
অনেক লম্বাই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি—
‘আমার ঘাট হইয়াছে।’ কাব্যগ্রন্থ সমুদায়-
জীবনের কঠিন লম্বা সকলের ব্যাখ্যামাত্র—
একথা বিনি না বুঝিয়া, একথা বিশ্বস্ত হইয়া
কেবল গল্পের অমুরোপে উপভাস পাঠে নিযুক্ত
হয়েন, তিনি এ সকল উপভাস পাঠ না
করিলেই বাধ্য হই।”

বক্ষিমচন্দ্রের আরও একটি মন্তব্য তাঁহার
উপভাস-মধ্যেই রহিয়াছে—তাহাও উদ্ধৃত
করা বাইতেছে :—

“গোবিন্দলাল দুইজন জীলোককে
ভালবাদিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহি-
ণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল।

রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—
যৌবনের অতুল রূপতুকা শাস্ত করিতে পারেন
নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে
গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই
জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহেন—
এ রূপতুকা, এ মেহ নহে—এ ভোগ, এ
মুখ নহে—এ মন্দর-বর্ণ-পীড়িত-বাসুকি-
নিখাস-নির্গত হলহল, এ শব্দস্রিতাণ্ড-
নিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন
যে এ ভ্রমর-দাগর মন্দের উপর মদন করিয়া
যে হলহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য
অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের
স্তায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন।
নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ
তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ
হইবার নহে, সে বিষ উদগীর্ণ করিবার
নহে, কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাতাবাদ
বিশুদ্ধভ্রমরপ্রণয়সুখা—সর্গীর গন্ধবৃক্ক, চিত্ত-
পুষ্টিকর, লক্ষ্যরোগের ঔষধস্বরূপ, দিব্যরাজি
স্বতিপথে আগিতে লাগিল। যখন প্রলাব-
পুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর লজ্জীতশ্রোতে
ভালমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে
প্রবল প্রতাপবৃক্ক। অধিকারী—ভ্রমর অন্তরে,
রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অশ্রাপীরা;
রোহিণী অভ্যাজ্য—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী
বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল।
যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে
বুঝাই এ আধ্যাত্মিক লিখিলাম।” ইহার
উপর টীকা নিম্নপ্রয়োজন। আমরা পূর্বেই
বলিয়াছি বক্ষিমচন্দ্রের ঐ দুইটা উক্তির মধ্যেই
আধুনিক রূপতুকাবাদের সকল প্রস্তার উত্তর
আছে। কিন্তু রূপলালসার মত রিপু আর
নাই, তাই পণ্ডিত প্রেমচাঁদের প্রথম রিপু
কিছুতেই দ্বিষ্ট হইতেছে না।

এইবার পণ্ডিত-লেখকের অকাটা
লজিকের বহর দেখুন। পণ্ডিত-প্রণয়
লিখিতেছেন—“একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে যে

যিনি ভারতবর্ষের দেবতা
যাঁর মন্দির-দ্বার সকলের জন্য
হিন্দু মুসলমান তৈজস ত্রীষ্টান
সকলের যিনি প্রণম্য
তাঁহারই উদ্দেশ্যে
উৎসর্গীকৃত
মহিমামিত চিত্র-কাব্য

চিত্রায়

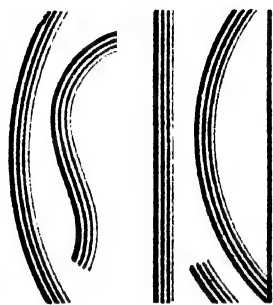
শুভ

দ্রো

ধ

ন

৩০শে জুলাই, শনিবার



- * কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
কাহিনী
- * দেবদত্ত ফিল্মসের
চিত্রসৃষ্টি
- * শ্রীনরেশ মিত্রের
পরিচালনা
- * চিত্র পরিবেশক
প্রাইমা ফিল্মস লি



রোহিণী প্রথম হইতেই কেবল কুৎসিত লালনার বশবর্তী গোবিন্দলালের অনুগামী (?) হইরাছিল। তাহা যদি হয়, তবে উপজ্ঞানের প্রারম্ভে রোহিণীর বিবরণে যে কাব্যার্থের অবতারণা তাহার কোনই অর্থ হয় না। * * এই অপক্লপ বর্ণনার বহিঃস্রবের কবিকল্পনা বরুণ চরম সীমায় গিয়াছে তাহা তাঁহার উপজ্ঞানের অজ্ঞাত বিবল।" অর্থাৎ বর্ণনা যখন এতটা অপক্লপ, তখন রোহিণীর মনে কুতাব থাকিতেই পারে না। আমাদের "তরুণালা" নাটকের অভিলেখ কথায় মনে পড়িতেছে—পারুলের সঙ্গে অভিলেখ "পবিত্র প্রণয়" তাহাতে "কুতাব" নাই। সে বাহা হউক, লেখক অতঃপর উপজ্ঞান হইতে যে—অপক্লপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যদি বন্ধ করিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন ঐ বর্ণনার মধ্যেই তাঁহার অকাটা লজিকের সমাধান রহিয়াছে। কোকিল এতক্ষণ "কুহঃ কুহঃ কুহঃ" ডাকিতেছিল কিন্তু "আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল—"কু-উ"। ঐ "কুহঃ"-র পরে এই "কু-উ" নির্ধ্বজ নহে এবং ঐ "অশোক"—উহারও, স্বর্গীয় পাঁচকড়িবার ভাষায়, "ভোতনা-ব্যজন" আছে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতগুলির অন্তর্নিহিত মর্ম উদ্ঘাটন করা ঢাকাই পণ্ডিতদের কর্তব্য নয়। চুল চিরিয়া মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা না করিলে উইয়ার কোন কথাই বুঝিতে পারেন না। তথাপি বহিঃস্রব ঐ শ্রেণীর লেখকের বিস্তারিত প্রতি কৃপা-পরশ হইয়া তাঁহার উপজ্ঞানের অজ্ঞাত ঐ-শ্রেণীর "অপক্লপ বর্ণনার" পার্থক্যতা কোথায়—তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—"এইখানে মনিকা পাতন করিতে ইচ্ছা হয়। বাহা অপবিত্র, অদর্শনীয় তাহা আমরা দেখাইব না। বাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি সেই অশোক-বকুল-কুটক-কুরবক-কুঞ্জমধ্যে

শ্রম-শুভ্রন, কোকিল-কুঞ্জ, সেই ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাৎ, যুগী, জাতি, মল্লিকা, মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের দৌরভ; সেই গৃহমধ্যে নীলকান্ত-প্রবিষ্ট রোহিণীর অপূর্ণ মাধুর্য, সেই রক্তচন্দ্রিকা-নির্মিত পুষ্পাধারে সুবিস্তৃত কুসুম-শুভ্রের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী জ্যোত্স্নাতের বিচিত্র উজ্জল বর্ণ আর গায়কের বিস্তৃত স্বরসমূহের ভূমণ্ডল সৃষ্টি—এই সকলের—কল্পিত উল্লেখ করিলাম। কেন না, যুবক নিবিশেষে যুবতীর চক্ষু কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যই এই সকলের সম্পূর্ণ সৃষ্টি হইতেছে। এই যুগ গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী।" লেখকের উদ্ধৃত অপক্লপ বর্ণনার, সেই আকাশ, সেই পুরুষ, সেই গোবিন্দলাল, আর সেই কোকিলের "কু-উ" ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের যে কি সম্বন্ধ তাহা লেখক বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিলেন শুধু রোহিণীর মনে কুতাব ছিল না। সাথে কি আর বহিঃস্রব উইয়ার মত পণ্ডিতদের এই সকল উপজ্ঞান পাঠ করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখনও মজা শেষ হয় নাই। লেখক লিখিয়াছেন—"যে সুলক্ষ্মীকে সৃষ্টি করিয়া শ্রুতি তাহার সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধতাহাকে শেষে তিনিই পাপীরনী রাক্ষসী বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু এই গালিই শেষ কথা নহে। রমণী-রূপলাবণ্য গোবিন্দলালকে উদ্ভাসিত করিয়াছে কিন্তু তাহার কবিস্রষ্টাকেও আপনার অজ্ঞাতে আকৃষ্ট করিয়াছে; তাহাতেই এই গালির পার্থক্যতা।রোহিণীর চরিত্রে যে অপক্লপ সম্ভাব্যতা ছিল, তাহা উপজ্ঞানের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে কুটিবার অবকাশ পায় নাই।" অর্থাৎ "যে বহিঃস্রব, শুধু আমরাই বলি নাই, তুমিও আমাদেরই মত রোহিণীর

রূপ দেখিয়া মজিয়াছিলেন, নহিলে তুমি রোহিণীকে গালি দিবে কেন?" অমৃত-লালের গন্ধগাকুল বিশ্বাস শৈবলিনীকে বলিয়াছিল—"ইঁ হুঁ, মাগী গাল দিবে কথা কয়, বুক বাঁধবো না কি? যুথানা বেশ, হলেই বা পাগল, আমরাই বা কি এমন জ্ঞান টুন্টনে?" ইহাও দেখিতেছি, তাহাই। পণ্ডিত প্রেমচাঁদের নিশ্চয়ই ঢাকা অঞ্চলে বুক বাঁধিবার অবস্থা হইরাছিল এবং অংশই তিনি ভাবিয়াছিলেন তাঁহারই বা কি এমন জ্ঞান টুন্টনে! নহিলে এমন আঁতের কথা লেখনীমুখে বাহির হইবে কেব? তাহার পর "রোহিণীর চরিত্রে অপক্লপ সম্ভাব্যতা"! এই "অপক্লপ," আর এই "সম্ভাব্যতা" যে কি বস্তু তাহা এ পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত লেখকই স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই। স্বাভাবিকবাসুও মরিয়া গিয়াছেন, নতুবা তিনি উইয়ার অমুরোধে হয়ত রোহিণীর উপসংহার লিখিতে পারিতেন। আমাদের মনে হয় সম্ভাব্যতা-টা এইরূপ হইলে অপক্লপ হইত। রোহিণী গোবিন্দলালকে যুগল বন্ধুসুষ্ঠ দেখাইয়া কলেজে ভর্তি হইল। কলেজের অধ্যাপক এই অপক্লপ ছাত্রী পাইয়া বর্তাইয়া গেলেন। অধ্যাপকের বয়স হইরাছিল, জ্যোৎ বর্তমান, ছিলেন, কিন্তু তাহাতে আটকাইল না। চুপে-চুপে ছাত্রীর লিখিত অধ্যাপকের বক্তৃ-বল হইয়া গেল, ছাত্রেরা কেহ বাধা দিল না। রোহিণী পুত্রবতী হইল এবং একদিন একটা রাক্ষসী-মতায় ছেলে কোলে করিয়া লগোরবে অধ্যাপককে দেখাইয়া ত্রীকান্তের অভয়া রোহিণীবাধাকে দেখাইয়া বরুণ বক্তৃতা দিয়াছিল, সেইরূপ বক্তৃতা দিতে লাগিল। চটাপট শব্দে ড্রপ পড়িয়া গেল। কেমন, পণ্ডিত প্রেমচাঁদের এই "অপক্লপ সম্ভাব্যতা" পছন্দ হইল ত?

উপসংহারে পণ্ডিত লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"শুধু 'মহাপাপিষ্ঠা' বলিয়া ছাড়িয়া

বিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। একথা বলিতেছি না যে, রোহিণী নিরপরাধ, কিন্তু ইংরেজীতে যাহাকে more sinned against than sinning বলে, হতভাগ্য (অধ্যাপক মহাশয়ের গিলজ্ঞান বড় ভাল নয় তিনি ইতিপূর্বে আর একবার রোহিণীকে গোবিন্দলালের “জুগাম্বী” করিয়াছেন, পাঠক বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন) রোহিণী তাহার শোচনীয় নিদর্শন। বে জুইটি নারীর করুণ জীবন-কাহিনী লইয়া লম্বা ঘটনাচক্রে গভীর tragedy বা বিরোগাত্ত পরিণাম, গোবিন্দলাল মূলে না থাকিলে সে চক্র ঘুরিত না। কিন্তু তাহারা মরিল, গোবিন্দলাল শেষে পরম শাস্তির অধিকারী হইল, ইহাই কি নিয়তি? হয়তো ইহাই তাহার পরম শাস্তি।” অধ্যাপক মহাশয়ের বোধহয় ইচ্ছা যে, গোবিন্দলালেরও মরা উচিত ছিল এবং শুধু মরা নয়, আরও শোচনীয় ভাবে মরা উচিত ছিল। তবেই তাহার উচিত শাস্তি হইত। কিন্তু সে মরিল না, উপরন্তু পরম শাস্তির অধিকারী হইল। তাহা হইলে আর কি করা যায়, ঐ পরম শাস্তিকেই পরম শাস্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়া মনকে লাঞ্ছনা দেওয়া বাউক। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—শাস্তি কি শাস্তি? অধ্যাপক মহাশয়ের মনের ভাব—শাস্তি কি শাস্তি? নতাই ইহাদের লেখা লইয়া আলোচনা করিতেও ঘৃণা হয়। বাহারা গোবিন্দলালের, ভ্রমরের যুড়ায় পর সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত দেই ভয় পুতুলী পছতলে, ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে, আত্মপ্রাণান্তিকের কথা ভুলিয়া যান, গোবিন্দলালের দ্বাদশ বৎসরব্যাপী লয়ালের কথা

ভুলিয়া যান এবং ভুলিয়া গিয়া গোবিন্দলালকে তখনও অধিকতর অপরাধে অপরাধী ভাবিয়া তাহার বিচার করিতে বলেন, তাহারা সেই গোবিন্দলালের লক্ষ্য বিনিময়ে তত্ত্বমূলে অর্জিত শাস্তিকে শাস্তি বলিবেন বৈ কি? রক্তমাংসের উপাসক ইহা ভাড়া আর কি কল্পনা করিতে পারেন! ইহাদের কাছে জ্যোতিষ্মতী ভ্রমর মূর্তির সেই উক্তি—“মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইরাছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন! বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।”—ইহার কোনও মূল্য নাই। ইহাদের কাছে গোবিন্দলালের সেই উক্তি—“বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও বাহা ধন, বাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইরাছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও বাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও বাহা পবিত্র তাহা পাইরাছি। আমি শাস্তি পাইরাছি।ভগবৎ-পাষপদে মনঃস্থাপন ভিন্ন শাস্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি, তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।”—বোধ করি, একেবারে নিরর্থক। ভগবৎপাষপদে মনঃস্থাপন গোবিন্দলালের অর্জিত শাস্তি হইল শাস্তি। এতদুণ না থাকিলে লোকে পণ্ডিত প্রেমচাঁদ বলিবে কেন? তাই এই সকল ছেঁষা শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয়কে গোপনে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। সে কথাটা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে মারিয়া ঠিকই করিয়াছেন। কারণটা, বঙ্কিমচন্দ্রের জবানী-তেই বলিয়া রাখা ভাল। “মালী দেই দেবছরত গুণাধরে যদি একবার মূখ দিয়া ঈ. বিত, তার পর যদি রোহিণী বাঁচিয়া

মুখ কীসে—চুষ্মনে—না উদ্বক্ষনে?

খ্রীস্টবীরেন্দ্র সামন্তাল

প্রণয়ের পদ্ধিগতি কোথা কেবা জানে—

মুখ কীসে—চুষ্মনে? না উদ্বক্ষনে?

যে চায় ফুলের মধু, দেখে না সে হায়—

চোরা-কাঁটা তারি সাথে, পাতায় পাতায়!

প্রণয়ের বাঁকা-পথে—সটকাট নাই,

পিছলে চলিতে গেলে, লাঠা বড় ভাই!

গুহায়ে গোপন-কথা বলিয়াছ তার—

তুমি যে যোগীর বন্ধু—কুনো ব্যাচিলার!

Un-licensed লভ—ইথে নাহি GAIN

বোঝেনা মেয়ের বাপ—তাই KCN.

* গত লপ্ত'হে প্রকাশিত, ভ্যারাইটিজ

পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ “Suicides

and Kisses” স্বরণে লিখিত।

উঠিয়া আবার সেই ঠোট ফুলাইরা কলনী-

কক্ষে জল লইয়া মালীর পানে চাহিয়া

ঘরে বাইত, তবে তাহাকে ফুলবাগানের

কাজ করিতে হইত না। সে খোজা,

খুঁপো, নিড়িন, কাঁচি, কোছালী বাকুলীর

জলে ফেলিয়া দিয়া একখোঁড়ে তব্বরক পানে

ছুটিত লক্ষ্যে নাই—বোধহয়, সূর্যগর্ভের

নীলজলে ডুবিয়া মরিত।” রোহিণী যদি

বাঁচিয়া থাকিত, তাহাহইলে মালীর জায়

খোজা খুঁপো লইয়া না হউক, বাহার

যাহা বজ্র—প্রেমচাঁদের, বাহা বজ্র, তাহা

লইয়া প্রেমচাঁদের, তব্বরক পানে না হউক,

অন্ত কোথাও ছুটিতে হইত! লেটা কি

ভাল হইত? মালীর আর প্রেমচাঁদের

আদিম চিত্তবৃত্তি যে একই, তাহা বলা

বাহ্য।



GRAM: "ADNIVAG"

ইন্দিবিমাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।



(বিলাসী)

স্ট্রীট সিঙ্কার

ঝুঁঝুঁর ঝুঁঝুঁর ঝুঁঝুঁর বাজছে—জলছে
হিরার হার, মাথার বেশী, কানে জল,
পথ চলেতে মজু অর্থাৎ আপনাদের কানন।
তার গায়ের কোর্তা, কোমরের ঘাঘরা, মাথার
ওড়না হাওয়ায় উড়ছে মিল রেখে তাল
রেখে হারমোনিয়ামের রেশের সঙ্গে। প্যা-
প্যা-প্যা-প্যা-প্যা, বুন্ বুন্—ঝুঁঝুঁ-বুন্ বুন্
বুন্ আর মিষ্টি গানের সুর সুধরিত করেছে
ময়নামতীর মাঠ, হিজল বনের ধার, কাজলা
দ্বিধার পাড়। কত অজ পাড় গায়ে, কত
হাটে, কত বাটে কত গঞ্জে গান গেয়ে
বেড়াচ্ছে লাইগল আর কানন। পাজাবীর
ওপর ওয়েটে কোট পরে মাথায় রঙীন কমাণ
বেঁধে গলার হারমোনিয়াম খুলিয়ে দে বখন
গান ধরছে তখন কে তাকে চিনবে এই
সেই লাইগল যাকে বেখেতে তারা 'দেবদালে'
আর 'দিদি'তে। আর মজু! ঘাঘরা পরা
মজু. ছোট্ট মজু মনোহারী মজু যদি কারোর
লামনে তার স্ত্রীমাটানা চোখে বিজলী হেনে
পাতলা ঠোঁটে হালির ঝিলিক রেখে মিষ্টি
সুরে বলে: ঘেরে নাম—ম-ন-জু! তখন
কে তাকে বলবে এই সেই 'চিত্রা' যে গায়—
'তার বিহার বেলায় মালা খানি—'

এ সবই লক্ষ্য করেছেন পরিচালক
কণি মজুমদার—বাংলার চলচ্চিত্র-রঙ্গিকদের
একখানি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ছবি উপহার
দেবেন বলে।

দেশের মাটি

'দেশের মাটি'র সম্পাদনা কার্য খুব

ক্ষত এগিয়ে চলেছে। পরিচালক নীতীন
বাবু নিজে সবলময়েই সুবোধ বাবুর সঙ্গে
লেগে আছেন। মনে হয় আর এক লপ্তাহের
মধ্যেই 'লেক্সার' করবার ব্যবস্থা করা হবে।

এ ছবির 'ট্রলার' গেল শনিবার থেকে
চিত্রায় দেখান হচ্ছে। 'ট্রলার' থেকে যতদূর
বোঝা যায় তাতে মনে হচ্ছে যে এ ছবি
হ'বে একখানি outstanding one।
যেমন Photography তেমনই Sound এ
'Technical production'-এর দিক থেকে
এ ছবির তুলনা নেই। অভিনয়-এর দিক
থেকে 'চন্দ্রা'র অভিনয় সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

দেশের মাটি আলছে লেপ্টেবর মাসের
মাঝামাঝি 'চিত্রা'র মুক্তিলাভ করবে

অধিকার

গেল শনিবার থেকে এ বইয়ের কাজ
ফের শুরু করা হয়েছে। বিরাট 'Dream-

land'-এর লেটে রোজ সকাল থেকে কাজ
পুরোদমে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে যে
এক লপ্তাহের মধ্যেই এ বইয়ের উত্তর লংকপেই
শেষ হবে বাবে। ইতিমধ্যেই এ বইয়ের
প্রায় ৫ রৌল 'প্রিন্ট' হয়ে গেছে। লজীভ
এর দিক থেকে এ ছবির তুলনা নেই।
তাছাড়া শোনা যাচ্ছে যে তিমির বাবু যে
অপূর্ণ 'টাইটল মিউজিক' দিয়েছেন তার
সুর্চনা দর্শকদের মুগ্ধ করে দেবে।

বাজারে প্রবল জনরব যে 'নিউ সিনেমা'
খুব শীঘ্রই বাড়লা চিত্রগৃহে পরিণত হ'বে।
এবং আগষ্ট মাসের শেষার্শ্বে 'অধিকার'
চিত্র-নিয়ন্ত্রণ এই চিত্রগৃহের উদ্বোধন হ'বে।

ষড়দিদি

পরিচালনা কার্যে নতুন ত্রতী হলেন,
মল্লিক মশাই যে বিশেষ করিবর্কশা লোক,
তা গত একমাসের কাজের প্রোগ্রেস দেখে
বেশ বোঝা যায়।

আমরা অনেক সময় একটি কথা শুনে
থাকি, যাকে ইংরাজীতে বলে Economy
of Footage. মল্লিক মশাই সেই ধরণের
কর্মী, যার কর্মপন্থার মধ্যে এই শ্রেণীর
ব্যবহারীতার হৃদিশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ
একদিনে হাজার ফুট ফিল্ম তোলা হলে
তা থেকে নির্ঘাৎ ন' শত ফুট কাজের মাল
বের হবে।



নিউ থিয়েটারের 'অধিকার' কথা চিত্রের একটি বিশিষ্ট দৃশ্য।

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স
নিবেদন

শ্রী
চিত্রগৃহে



বীরেন্দ্রনাথের
চোখের বাত

বিনোদিনী - সুপ্রভা মুখার্জি

শীঘ্রই
আসিতেছে

কিন্তু তা বোলে আপনারা ভাববেন না, তিনি শুধু Quantity-র দিকে নজর দেন—Quality বাব দিবে।

এক একটি লেট তালবার আগে তিনি নিয়মিত Rushprint এর প্রক্ষেপণ দেখে, Quality লক্ষ্যে নিঃশব্দ হলে, তবে পরের দাঁট-এ এগিয়ে বাবার অনুমতি দিচ্ছেন।

আর Punctuality-র পুরস্কার বোলে যদি কিছু ষ্টুডিও মহলে থাকতো, তবে মল্লিক মশাইয়ের কর্মী-সভ্যের অনেকেই দাঁট পেতেন। বাকি বলে এক কথার Clock work regularity—এমন মিলিটারী ডিসিপ্লিন লচারাচর নজরে পড়ে না।

পুরোনো চাল যে ভাতে বাড়ে—মল্লিক মশাইয়ের গুণের বিশ্লেষণ করে দেখলে এই লতাটি বোল আনাই মিলিয়ে পাওয়া যাবে।

এই চিত্রের নারিকা মলিনার অনুস্থতা এবং নওয়ারের পারিবারিক দৃষ্টান্তের অল্প পূর্ববর্তী দাঁটের কাজ সম্পূর্ণ শেষ না হলেও, করিৎকর্ম পরিচালকের তৎপরতার গুণে, এর মধ্যে ছবির অস্তিত্ব অংশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

আরও ছটি লেট মল্লিক মশাই ইতিমধ্যে শেষ করেছেন, তার একটিতে দেখানো হয়েছে নারিক সুরেন্দ্র নাথের পাটনার ভবন। এই দাঁট-এ, সুরেন্দ্রের পিতা ও বিমাতার ভূমিকার স্তন্যেই সুরেন্দ্র অভিনয় করেছেন মশাই অভিনেতা শৈলেন চৌধুরী ও সুরেন্দ্র অভিনেত্রী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী।

এই লগ্নাহে অল্প একটি লেট-এ বড়বিহির চিত্র-গ্রহণ পূর্ণ উত্তম চলেচে।

অভিনয়

অভিনয়ের দুটি প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। মাত্র কয়েকটা দৃশ্য তোলা বাকী আছে। একদিকে পরিচালক মহু, বহু



শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী শিকচানের "অভিনয়ের" একটি সুন্দর দৃশ্য।

সম্পাদনা কাজ নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন অপর দিকে আটটি সুখান্ত চৌধুরী Manager's room, Make-up room, 1st Class compartment প্রভৃতি দাঁট নির্মাণ কার্য নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

যতদূর ঠিক হয়ে আছে তাতে মনে হয় আগতে ২০শে আগস্ট 'রূপালী' চিত্র-গৃহে চবিখানি মুক্তিলাভ ক'রবে।

গোরা

আগতে ৩০শে জুলাই শনিবার থেকে 'চিত্রার' দেবদত্ত ফিল্ম-এর 'গোরা' দেখান হ'বে। আমরা যতদূর খবর পেয়েছি তাতে মনে হয় 'গোরা'র ভবিষ্যত ভালই। চবি-খানা পরিচালনা করেছেন মশাই অভিনেতা নরেশ চন্দ্র মিত্র। এতে অভিনয় করেছেন যে সব অভিনেতা ও অভিনেত্রীও তাদের মধ্যে শোনা যাচ্ছে নরেশবাবু ও জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় হয়েছে মর্সাকীন সুলতান।

চোখের আলি

আগামী ৩০-এ জুলাই 'শ্রী' চিত্রগৃহে এলোনিরয়েটেড প্রোডিউশানের প্রথম নিবেদন রবীন্দ্রনাথের অমর লামাজিক কাহিনী

"চোখের আলি" মুক্তিলাভ করিবে। নর-নাথের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জীবনের চলার পথে তাদের জীবনকে বিবরণ করে না, অমৃত লেচনে দীক্ষিত করে এই এক মহা লম্বা লম্বা হইয়াছে এই চিত্রে। তগবানের আবেশ অমাত্র করিয়া আহম ও দ্বিত বধন জ্ঞানবুদ্ধিরফল তখন করিয়াছিল তখন লম্বাজের নির্দেশ মহেন্দ্র-বিনোদিনী যে উপেক্ষা করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি। চবিখানি রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর আব-হাওঁকে যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া চিত্রে রূপান্তরিত করিতে কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন নাই। শোনা যাচ্ছে, "চোখের আলি"-র লক্ষ্যতাংশ বিভিন্ন ছবির মধ্যে হইবে এক অতুল লম্বা এবং অভিনয়ের দিক থেকেও চবিখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইবে বলিয়াই মনে হয়।

কালী ফিল্মস্

আগামী আগষ্টের প্রথম হপ্তা থেকে কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আবার ছবি তোলার কাজ শুরু হবে। এদের অর্জনমণ্ড "শ্রীকৃষ্ণ" চিত্রখানি সুশীল মহুস্বায়ের

পরিচালনার নতুনভাবে তোলা হবে। সুশীলবাবু এখন এই কাহিনীটির চিত্রনাট্য ও ভূমিকা বণ্টন ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। গাজুলীমহাশয়ের পুনরাগমনে আমরা লভ্যই পুখী।

কমলা টকীজ

সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনার শ্রীকান্ত সেন লিখিত এছের দ্বিতীয় ছবি "রাজ-কুমারের নির্কালনে"র শূটিং সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকেই শুরু হবে। ইতিমধ্যে সুকুমার বাবু অংশ বণ্টন ও মহলা শেষ করে ফেলবেন। ছবিখানির লজীত পরিচালনা করবেন কুমার শচীন দেব বর্মাণ। সুকুমার বাবু শুধী লোক তার গুণের পূর্ণ বিকাশ হ'তে দেখলেই আমরা পুখী হব।

বেকার নাশন

প্রয়োগ-শিল্পী শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পরিচালনার এবং রাধা ফিল্মের

তত্ত্বাবধানে মতিমহল থিয়েটারের 'বেকার নাশন' ছবিখানির চিত্রগ্রহণ শেষ হ'য়ে গেছে— বতহর জানা গেছে তাতে মনে হয় আগছে ২০শে আগষ্ট মতিমহল-এর ছবি বেকার নাশন 'উত্তরা' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

নর-নারায়ণ

একটি বিরাট পার্কত; আশ্রমের 'সেট' রাধা ফিল্মের সমস্ত ষ্টুডিও জুড়ে আছে যাতে নর-নারায়ণের দৃশ্য গ্রহণ চলছে। দৃশ্যটি হচ্ছে লজ্যাজিতের আশ্রম দৃশ্য। ঐ মনোহারী দৃশ্যটিতে বর্তমানে অহীন্দ্র চৌধুরী, শীলা হালদার, রবি রায়, ভূমেন রায় এবং জয়নারায়ণ মুখার্জি অভিনয় ক'ছেন।

যথের ঘন

হরি ভক্তের পরিচালনার, 'যথের ঘন' উপগ্রানের চিত্র-গ্রহণ-কার্য ইষ্ট-ইন্ডিয়া

পিকচার্সের ষ্টুডিওতে পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চ'লেছে। এখন একটি বিরাট 'ট্রায়ার কেল হল'-এ নারিকা 'রেখা'-র (শীলা হালদার) একটি অতি আধুনিক নৃত্যদৃশ্য সবতনে গ্রহণ করা হ'চ্ছে। দৃশ্যটিতে শ্রীমতী হালদারের সঙ্গে অন্ত্যস্ত ভূমিকার অভিনয় ক'ছেন জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায় এবং অহীন্দ্র চৌধুরী।

চিত্রা

আগছে লপ্তাহই 'বিভাপতি'র শেষ লপ্তাহ। উত্তর কলিকাতার বারা এখনও এ ছবি দেখে উঠতে পারেন নি তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে 'চিত্রা' এ ছবিখানা দেখবার ব্যবস্থা করেন।

পূর্ণ থিয়েটার

বাজে ছবির চেয়ে ভাল পুরানো ছবির দর কত তা আমরা এই লপ্তাহে 'দ্বিধা'র অপরূপ জনসমাগম দেখে বুঝতে পেরেছি।

বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা যে অভিনয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তারই প্রত্যক্ষ চিত্ররূপ—

পরিচালক :

মধু বসু



কাহিনী :

মন্মথ রায়

শ্রীভারতলাক্ষ্মী থিয়েটার্স

প্রাণাতি চঞ্চল কথাচিত্র

ভূমিকার : সাধনা বসু, প্রতিমা মুখার্জি, অহীন্দ্র

চৌধুরী, দীপক ভট্টাচার্য, শ্রীতি মজুমদার

তুলনী লাহিড়ী, ডাঃ বিজুতি গাঙ্গুলী।

রূপবাণীতে

মুক্তি প্রতিকায়

পূর্ণ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাই সাহসের
সপক্ষে বেবদান, ভাগাচক্র ও মীরাবাই
বেথাবার ব্যবস্থা করেছেন।

রূপবাণী

নারীর অভিনয় এবং তার চোখের জল
যে ব্যর্থ হয় না—জরুরী এক মৃত
সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা কোরে,
সমাজ তার প্রমাণ দিয়েছিল। সমাজ তাকে
সহ্য করতে পারে নি—সেও সমাজকে সহ্য
কোরেতে পারেনি।

এই মর্মান্বদ অন্তঃকন্দের মধ্যে দিয়ে সেই
মহিলা নারীর আত্ম-বিজয়ের কাহিনী
সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—অভিজ্ঞান-
চিত্রে।

রূপবাণীতে এই ছবিখানি বেথবার জন্ত
প্রতি সপ্তাহে দর্শকের জনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
এই শনিবার থেকে সপ্তম সপ্তাহে পদার্পণ
করল।



"হীট-এজার" চিত্রের নারিকা কাননবাংলা

কৃষ্ণদাস পালের বাষিক স্মৃতিসভা



স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের বাষিক স্মৃতিসভা
আগামী ২৪শে জুলাই রবিবার কলিকাতা
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পাঁচটার
সময় অনুষ্ঠিত হবে। মুম্বাইবাসীর নবাব
বাহাদুর মহাশয় সভাপতির আমন্ত্রণ গ্রহণ
করবেন। মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জি, মিঃ
জে, সি, গুপ্ত, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির,
মৌলভী শাহমুদ্দিন আহম্মদ, অধ্যাপক সুরেন্দ্র
নাথ গোস্বামী, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
মিলেন হেমপ্রভা মজুমদার, মিলেন চাক্রপতি
সেন, অধ্যাপক বিনয় কুমার সেন, শিওকেশন
ডাট্টার ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানজ্ঞান নিরোগী প্রভৃতি
বক্তৃতা করিবেন।

শৌক সংবাদ

কালী ফিল্মদের লব্ধাধিকারী শ্রীযুক্ত
শ্রীনাথ গাঙ্গুলীর মাতা শ্রীযুক্তা ভুবন
মোহিনী দেবী গত বুধবার রাত্রি ১-২০
মিনিটের সময় তাঁহার কালীঘাটস্থ প্রভা-
পাতিতা রোড বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ
করিয়াজেন। তিনি ঢাকার নবাবের বেওয়ান
পরলোকগত চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর স্ত্রী এবং
স্বর্গত রায় বাহাদুর বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়
দি-আই-জি রোট কলেক্টরের ভগিনী।
তিনি একজন ধার্মিক মহিলা ছিলেন।
হরিন্দ্রনারায়ণের সেবাস্রোতে তিনি জীবন
উৎসর্গ করেন। বর্তমানে তাঁহার একটি
মাত্র পুত্র, একটি মাত্র কন্যা, বহু পৌত্র-পৌত্রী
ও আত্মীয় স্বজন শোকে মুগ্ধমান। আশ্রয়
তাঁহার আত্মার লগতি কাশনা করি।

হাওড়ার এ্যাসেম্বর

গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত কাঞ্চিক হস্তের
গৃহে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এ্যাসেম্বলি-
সনের সভায় এ্যাসেম্বর পক্ষে অধ্যাপক
বিজয় ভট্টাচার্য্যকে মনোনীত করিবার প্রস্তাব
মর্দনমুখিতক্রমে গৃহীত হইয়াছে। কাঞ্চিক
বাবু ও হরেন বসু বহুবাণ্যকে এই
প্রস্তাবে সম্মতি করাইবার ভার গ্রহণ
করিয়াজেন।

বিজয় বাবু শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর সহিত
সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং শরৎবাবু, হরেন
বসু তাঁহাকেই ঐ পক্ষে সমর্থন করিবার
নির্দেশ দিয়াজেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টমের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

নিরুদ্দেশের সাত্রী

(গল্প)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বপ্না বললে, “চলুন মল্লববাণু এবার ওঠা থাক, অনেক রাত হয়ে গেল।” মল্লব আজ যেন মরিয়া হয়ে বলল “হুক না রাত স্বপ্না, তাতে কতি কি! তুমি বলছ বাঁড়ী করার কথা কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমার মনে হচ্ছে এই ভাবে তোমার পাশে আজীবন বসে শোনাই আমার বাঁশী, শোনাই আমার প্রাণের আবেশন বিরামহীন আকুলতার। তোমাকে প্রথম বেঁধিন বেঁধি—” মল্লবকে থামিয়ে দিয়ে স্বপ্না বলল, “বাবা কি ভাববেন বলুনত আমাদের এখনও না ফিরতে বেঁধে!” স্বপ্নার এই ক্রীণ আপত্তিকে উপেক্ষা করে, মল্লব বেঁধে প্রামোদ্যোনের মত পুনরায় বোলে যেতে লাগল, “না না স্বপ্না, তুমি আমাকে আজ বাঁধা দিও না। আমাকে বলতে দাও। হরত এটা তোমার ওপর জুলুম করা হচ্ছে। হরত তোমার অন্তস্ত বিরক্তি বোধ হচ্ছে। কিন্তু কি করব উপায় নেই। কিন্তু আমি আর পারছি না মনের কোনে অহনিশি চাপা দিয়ে রাখতে এ অন্তরের আগুন। জানত অগস্ত আগুনকে কখনও রাখা যায় না ছাই চাপা দিয়ে। সেই ছাই চাপা আগুনই সৃষ্টি করে একদিন এক বিরাট আগের-গিরির। তাতে সে নিজে ত বড় হরই উপরন্ত তদ্বীকৃত করে দেয় প্রাণের পর প্রাণ দেশের পর দেশকে। সে আগুন যে কি বিরাট এবং তার হাহাকা শক্তি যে কিরূপ প্রবল একবার ভাবত স্বপ্না। সেই-রূপ অন্তরাগ্নিতে আমি নিরত পুড়ছি।

আজ আমি যেটুকু শক্তি লক্ষ্য করেছি আমার প্রাণের অন্তরতম কথাগুলি তোমার বোলতে এই রূপালী রাতের আবহাওয়ার, কাল দিনের আলোর এ কথা বোলতে হরত আর ভাবা থাকবে না। আজ আমার নিষেধ কোরোনা স্বপ্না, বোলে যেতে দাও আপন উচ্ছালে আপন উদ্দামতার। তারপর তুমি আমাকে কোরো স্থনা, করো উপহাস।, কিরে চেয়োনা আর আমার পানে নিদ্বাক্ষণ বিতৃষ্ণার।” এক নিম্মলে এত কথা বলার পর একটু থামল মল্লব। তারপর আবার ব’লে, “তোমার প্রথম যে দিন বেঁধি সেই দিনই আমার মনে হ’য়েছে যেন কত যুগ যুগান্তর ধরে তোমার আমার মায়খান দিয়ে মিলনের কস্তধারা ব’য়ে যাচ্ছে। ব’য়ে যাচ্ছে প্রেমের অন্তঃলীলা অবাধে। তোমার সঙ্গে ন’তুন ক’রে পরিচয় করবার দরকার নেই যেন আমার। তুমি বহু যুগ ধ’রে আমার একান্ত আপনায়। এ জীবনেও যে কিরে পাব তোমার আমার চিরকালের দাবীতে এ বিশ্বাস আমি কোন দিনই হারাইনি যুগে যুগে।” সে আপন উচ্ছালে ব’লে চ’লল, “তুমি হরত ভাবছ আমি পাগল, এ সমস্ত উচ্ছাস পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু জান কি স্বপ্না এ পাগলামীর উৎস কোন খানে? একি! তুমি উঠে প’ড়লে স্বপ্না।” একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মল্লব ব’লে। “কিছু মনে কোরবেন না মল্লববাণু, এবার বাঁড়ী বাঁধা থাক চলুন। লতিয়া অনেক রাত হ’য়ে গেছে মাঝা হরত বজ্র ভাবছেন

আমাদের এখনও বাঁড়ী না ফেরাতে। তা না হ’লে, লতিয়া ব’লছি আমার ঘোটেই যেতে ইচ্ছে করছে না এমন চাহনী রাত এবং আপনায় চমৎকার বাঁশী বাজান ছেড়ে। আমার লে জন্মে কথা করবেন মল্লববাণু।”, অতঃপর মল্লব বললে স্বপ্না। “বেশ তবে চল।” হতাশ কণ্ঠে মল্লব বলে কথা কইট। একটু থেমে পুনরায় বলে মল্লব, “তোমার আনন্দ দেওয়ার পরিবর্তে হরত তোমার দিলুম কেবল বেঁধনা। কি করব বল আমি আর থাকতে পারলুম না তোমার না বলে। না প্রকাশ কোরলে বোধহয় আমি পাগল হয়ে যেতুম। কিন্তু এবার আমি নিশ্চিত। আমি জানতে, চাই না তুমি আমার এ সমস্ত কথা শুনে আমার করলে যুগা অথবা অলুকাপ। জানত রাত্রির চূর্ণলতা বলে একটা জিনিষ আছে। সেই তারই লহরিতার তোমার বোলতে পেরেছি আমার অন্তর নেওড়ান কথা-গুলি। না হলে পারতুম কি না ললেহ। কাল হরত আর লজ্জার তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আর তুমিও হরত কাল আমার বেঁধে যুগার মুখ কিরিরে নেবে। কিন্তু তাহলেও আমার এইটুকু লাভনা থাকবে যে আমার অন্তরের দেবীকে জামিরেছি আমার অন্তরের লবখানি উজার ক’রে।” একটু থেমে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিনীত কণ্ঠে বলে মল্লব, “বহি পারত আমার লব কিছুকে পাগলের পাগলামী ব’লে উড়িয়ে দিও।” তারপর তারা আপন আপন চিন্তার বিভোর হয়ে পথ চলতে লাগল।..... স্বপ্নাকে পৌঁছে দিয়ে যখন বাঁড়ী ফিরল মল্লব, তখন অনেকটাই রাত হ’য়ে গেছে। রাত্রে বিছানার ওরে তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার কলক খুলবে আর চার দিন পরে। এতদিন তার খেরাল ছিল না ঘোটেই। সে ঠিক ক’রলে কাল লকালে

উঠেই অনঙ্গবাবুও ঝরনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবে। এবং বিকেলের ট্রেনে কলকাতার রওনা হবে।

পরদিন সকালে উঠে মলর অনঙ্গবাবুদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলল। বাড়ীর লামনে গিয়ে তার বেন কেমন লজ্জা ক'রতে লাগল, গত কল্যাকার রাত্রে ঘটনা মনে ক'রে, বাগান পার হ'য়ে লিড়ির কাছে মখন পৌঁচেছে, ওপরের বারান্দা থেকে ঝরনা কলকটে ব'লে উঠল, "আজ আপনি খুব সকালেই উঠেচেন দেখছি। আহ্ন চাও রেডি।" মলর চেয়ে দেখল, বেশ লজ্জা তাইবই তাকে লজ্জিত করলে ঝরনা। এতে মলর অনেকখানিই লাহন পেল। মুহূর্তেই বসে পড়ে, "মলর বাবু।" মলর মনে মনে তাবলে, বুখাই দে ঝরনার ওপর লজ্জিত হ'য়েছিল কাল। দে জীলোকের চিরন্তন লজ্জাকে বিরক্তি ব'লে ভুল ক'রে নিজেকে—নিজের অন্তরকে ব্যাখ্যাতর ক'রেছে কেবল। মলর দৃষ্টান্তে বেশ একটু দ্রুতই লিড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। আজ অনঙ্গবাবু অপেক্ষাকৃত একটু ভাল আছেন। বাতের কন-কনানি অনেক কম। তিনি দালানে আরাম কেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মলরকে দেখেই বলে উঠলেন, "এম বাবা এম, আজ এত সকালেই যে? কোথাও বেতে হবে নাকি?" ততক্ষণে ঝরনাও লেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। মলর লজ্জিতমুচক স্বরে বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতা রওনা হচ্ছি। পরন্তু কলেজ খুলবে। আর ত দেখী করা চলে না। হুপুয়ে হরত আলা হয়ে উঠবে না। সেইজন্তে সকালেই এসুন।"।.....তারপর বলে বলে অনেক কথাই চলতে লাগল অনঙ্গবাবুর সঙ্গে। ঝরনা আজ নিজের হাতে বাতের কচুরী ভেজে খাওয়ার লে মলরকে। খাওয়ার খানিক পরে মলর উঠল। অনঙ্গবাবু মলরকে চিঠি দিতে এবং

বড়দিনের ছুটিতে পুনরায় আনতে বার বার করে বলে ছিলেন। মলর জানাল, বড়দিনের ছুটিতে তার আলা বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কারণ মার্চে এগু'বামিন, অতএব অনঙ্গবাবু মলরকে নিরমিত চিঠি দিতে এবং এগ'বামিন হয়ে গেলেই অবিলম্বে এখানে চলে আসতে বলে ছিলেন। ঝরনা মলরের সঙ্গে রাত্তার খানিকদূর পর্যন্ত এল। এবং মলর চলে যাওয়ার তার বিকেলের বেড়ানটা বে'মোটেই ভাল লাগবে না এবং তার কথা লক্ষ্যই মনে পড়বে বার বার একথা জানালে ঝরনা, এবং মলর মধ্যে মধ্যে তাকে চিঠি লিখে এবং এগ'বামিন হয়ে গেলেই মলর মধুপুরে চলে আসবে, এর অন্তথা করবে না এ এক রকম প্রতীক্ষা রুরিয়ে নিলে ঝরনা মলরকে দিয়ে। মলর এখান থেকে বিদায় নিয়ে খাওয়া খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে 'রুবিলজ' থেকে ট্রেন অতিমুখে বাত্মা করলে। এবং যথা সময়ে কলিকাতাগামী ট্রেনে মলর উঠে পড়ল।

* * * আজ ছুদিন হ'ল মলরের এগ'বামিন শেষ হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যে দে মধুপুরে চারখানি চিঠি দিয়েছে। ছ'খানি অনঙ্গবাবুর নামে এবং দু'খানি তার মানসী ঝরনার নামে। তার উত্তরও পেয়েছে। বখালময়ে, ঝরনার ছ'খানি চিঠিতেই মলরকে এগ'বামিন হয়ে গেলেই খাওয়ার জন্তে বার বার অনুরোধ করেছে, অনঙ্গবাবুও বার বার করে লিখেছেন যেতে, এবং মলর না গেলে তিনি নিজে এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবেন, এ তরও দেখাতে ভোলেননি তাঁর দু'খানা চিঠিতেই। মধুপুর থেকে এসে পর্যন্ত একদিনের জন্তেও ঝরনার কথা ভুলতে পারেনি মলর। তার ধ্যান জ্ঞান হ'য়েছে ঝরনা। এমন কি দে মনে মনে ঠিক ক'রেছে ঝরনাকে তার লজ্জিত-রূপে না পেলে তার জীবন হ'য়ে যাবে ব্যর্থ এমন কি ঝরনাকে দে পাবে না এ

কথা তাবতেও তার ভর হ'ত। 9th April দে মধুপুর উদ্দেশ্যে বাত্মা ক'রলে, এবং পরদিন সকালে মলর অনঙ্গবাবুদের বাড়ী মখন তথা ক'রতে গেল, ঝরনা বাড়ী ছিল না তখন। অনঙ্গবাবু বাগানের লামনে পারচারী করছিলেন। মলরকে দেখতে পেয়েই অনঙ্গবাবু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ব্যগ্রভাবে বললেন, "এম বাবা এম। কবে এলে? তোমার শরীর ভাল আছে ত? ট্রেন থেকে বরাবর এসেছ নাকি? এমনি একরূপ প্রশ্ন। মলর নমস্কার করলে এবং দে কাল রাত্রে এসে পৌঁচেছে এবং শরীর তার ভালই আছে জানালে। অনঙ্গবাবু একটা মোরাত্তির নিখাল ফেলে, মলরকে একখানি বেঞ্চে ব'লতে নির্দেশ দিয়ে নিজেও তার পাশে ব'লে পড়লেন। "আপনি একা রয়েছেন যে ঝরনা কোথায়?" মলর জিজ্ঞাসা ক'রলে।

"ঝরনা গেছে নিশীথের সঙ্গে বেড়াতে," ব'লেই বোল'লেন "এই তথ্য আমার কি ভুল, তুমি এখনও নিশীথকে চিন'লেই না, আমি ব'ললুম নিশীথের সঙ্গে ঝরনা গ্যাছে বেড়াতে," ব'লেই তিনি অপ্রতিভের হাসি হাস'তে লাগ'লেন, মলর কিছু বুঝ'তে না পেরে জিজ্ঞাসাত্মকভাবে চেয়ে রইল অনঙ্গবাবুর মুখের দিকে, অনঙ্গবাবু বুঝতে পেরে বল'লেন "এই নিশীথ হ'চ্ছে আমার এক বন্ধু হলে। এবার- বিলতে থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে এলেছে, তোমাকে বল'তে ভুলে গেছ'লুম যে, এই নিশীথের সঙ্গেই আমার ঝরনা'র বিয়ের কথা আমার জী তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঠিক ক'রে গেছেন, তাঁর ইচ্ছেই ছিল এখের ছুজনের মিলন স্বচক্ষে দেখে বাবার, তা' আর তাগো হ'য়ে ওঠেনি, ঝরনাও নিশীথকে ভালবালে এবং আজও তার মতের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।" অনঙ্গবাবু অপনার মনেই ব'লে

বাচ্ছিলেন, মলয়ের দিকে লক্ষ্য করেননি, কর'লে দেখ'তে পেতেন তাঁর সুখানা ক্যাকাশে হ'রে গেছে। তার খম্বীর রক্ত চলাচল বন্ধ হ'রে আল'ছে ক্রমশঃ, পৃথিবীটা তার চোখের লাম'নে ছল'ছে যেন। যে আশা-তরুর অঙ্কুর তার মনে গজিয়েছিল আজ লম্বুলে হয়ে গেল তার বিনাশ। সে চিত্রোপ্তিরে তার বলে শুনতে লাগ'ল, তার মনে হ'তে লাগ'ল কে যেন লীলে গলিয়ে তার কর্ণ-রাজ্য ঢেলে দিচ্ছে। এমন সময় গেটের লাম'নে ঝরণা এবং একটি সুবর্ণন সুবককে দেখা গেল, তা'দের দেখ'তে পেয়েই অনঙ্গবাবু ব'লে উঠ'লেন, “এই যে, তোমা'দের বেড়ান হ'রে গেল নিশীথ!”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।” নিশীথ বল'ল। ঝরণা মলরকে দেখেই কলকঠে ব'লে উঠ'ল, “আপনি কখন এলেন? আমি হোজই ভাব'তুম আজ বোধকর নিশ্চয় আস'বেন, কতদিন আপনার বাঁশী শুনা হয়নি বলুন ত!!” তারপর নিশীথের দিকে ফিরে বল'ল “ইনিই হ'চ্ছেন মলর বহু। বার কথা তোমার ব'লেছিলুম। মন্তবড় বাঁশীবাঁজিয়ে।” অতঃপর নিশীথ মলরকে এবং মলর নিপীথকে নমস্কার ও প্রতিনিমন্ত্রণ কর'ল। মলর বুঝ'লে ইনিই নিশীথবাবু অনঙ্গবাবুর ভাবী জামাতা। মলয়ের দিকে ফিরে ঝরণা বল'লে “আপনারা ততক্ষণ একটু বসুন। আমি আপনা'দের জন্তে চা নিয়ে আছি। চা, টা খেয়ে এখুনি একটু বাঁশী শুনাতে হ'বে কিন্তু।” মলরকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই লেখানকার বাতালকে ‘লেণ্টে’র গন্ধে আঘোহিত ক'রে শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে ছোট্ট বালিকার মত লম্বুপায়ে বোঁড়ে অদৃষ্ট হ'রে গেল। নিশীথ সেইখানেই একটা বেঞ্চে ব'লে পড়'ল। মলর অবাঁক বিষয়ে চেয়ে রইল ঝরণার গতির দিকে। বাগানে রোদ্দুর

এসে পড়তে অনঙ্গবাবু বল'লেন “চল বাড়ীর ভেতর যাওয়া যা'ক এবার। বড় রোদ্দুর লাগ'চে, আর এতক্ষণ বোধ হয় ‘চা’ও রেডি হ'রে এ'ল।” অতঃপর তিনজনেই উঠে বাড়ীর দিকে চল'লেন। মলয়ের আর এক বগুও এখানে থাক'তে ইচ্ছে কর'ছিল না। এখানকার বায়ু যেন বিবাক্ত মনে হ'চ্ছিল তার।

ওপরে হল ঘরে তিনজনেই গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে ঝরণা চা ও খাবার নিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ কর'ল। মলয়ের খাবারে একেবারে রুচি ছিল না। কিন্তু ভাত্তার খাতিরে খেতেও হ'ল। খেতে খেতে মলয়ের মনে হ'চ্ছিল তার গলার দ্বিজ যেন ছোট্ট হয়ে গেছে আজ। আর কিধে তেষ্ঠাও যেন অস্তহিত হ'রে গেছে চিরদিনের জন্তে। খাওয়া হাওয়ার পর মলর বিদায় নিলে। সঙ্গে তার বাঁশীটা ভাগ্যে ছিল না। এ যাত্রার তাই বন্ধা পেয়ে গেল সে। আস'বার সময় তাকে বিকেলের দিকে লকাল লকাল আল'তে বার বার ক'রে ব'লে দিলেন অনঙ্গবাবু। মলর মাতালের মত টল'তে টল'তে দিড়ি দিয়ে নেমে রাস্তার বেরিয়ে পড়'ল। পথ চল'তে চল'তে ভাবতে লাগল—এখানে আলবার আগে পর্য্যন্তও এমনকি নিশীথের কথা অনঙ্গবাবুর মুখে না শুনা পর্য্যন্ত তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঝরণা তাকে ভালবাসে। সে ঝরণাকে নিয়ে কত আকাশ-কুহুমই না রচনা ক'রেছে এতদিন। ঝরণা হ'বে তার জীবনের লাক্ষী, তার বন্ধু, তার স্ত্রী, তার শ্রিয়া.....আর ভাবতে পারেনা সে। তার মনে হ'তে লাগল একখানা ধারাল ছুরি নিয়ে তার বুকের ভেতরটাকে খান খান ক'রে দিচ্ছে যেন। সে উদ্ভাসের মত এদিক লেদিক ঘুরে বেড়াল খানিকটা। মধুপুর তার আর ভাল লাগ'ছে না মোটেই। মধুপুরের জল

হাওয়া গারে যেন বিধ'ছে। সে ঠিক কর'লে আজই সে মধুপুর ত্যাগ কর'বে। এখানে থাকলে সে পাগল হ'রে যাবে। সে বাগার গিরে তার মহিমবা'কে জানালে সে আজই কল'কাতা যাবে। বিশেষ দরকার। না গেলেই নয়। মহিমবাবু প্রথমে আপত্তি করলেন। শেষে যখন দেখ'লেন মলয়ের একান্ত ইচ্ছে বাবার তখন আর বাধা দিলেন না। মলর সেই দিনই বিকেলের ট্রেনে মধুপুর ত্যাগ কর'লে।

(৫)

বৈশাখ মাসের পনেরই আজ, দুদিন হ'ল মলয়ের নামে মধুপুর থেকে হুখানা চিঠি এসেছে। একখানি অনঙ্গবাবুর লেখা এবং অপরখানি ঝরণার। অনঙ্গবাবু লিখেছেন বিশেষ বৈশাখ ঝরণার বিয়ের দিন স্থির হয়েছ। মলরকে তিনি বিশেষ করে যেতে লিখেছেন। চিঠি পেয়েই সে যেন চলে আসে। কারণ তাকেই সব দেখাশোনা করতে হবে। তাঁর আর ভাখবার শোনবার কেউ নেই। আর তাছাড়া তিনি নিজে মোটেই ঘোরাঘুরি করতে পারবেন না। কারণ একে তিনি বৃদ্ধ তার ওপর আজ দুদিন হল তাঁর বাতের ব্যাথাটা আবার ভাখা দিয়েছে। পবিশেষ জানিয়েছেন তিনি মলয়ের আশাপথ চেয়ে রইলেন। তার বা ভাল হয় সে করবে; ইত্যাদি। ঝরণা সংক্ষেপে লিখেচে—মহিম বাবুর বাড়ী গিয়ে সে জেনেছে যে সেই দিনই মলর মধুপুর ত্যাগ করেছে বিকেলে। বিশেষ কি একটা দরকারে। সেই বিশেষ দরকারটা কি জানতে চেয়েছে ঝরণা। এবং সেদিন লকালে তা'দের বাড়ী চারের মজলিশে লহজ ভাবে কথা বার্তার যোগ না দিতে পারার কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠিয়েচে—মলরকে। এবং শেষের দিকে তাকে বিশেষ করে যেতে লিখেচে আগামী শুভদিনে তাকে (ঝরণাকে) কংগ্রেসুলেট করবার জন্তে। মলর না

গেলে তাঁদের মিলন স্বার্থক হবে না। এ কথাও জানাতে ভালেনি।

.....মলর ঝরণার চিঠিখানা পড়ে কেবল ভাবছে—“উঃ মেরে মাহুয কি নিষ্ঠুর! মলর তাকে ভালবাসে জেনেও এমন অক্লেশে তার বুক ছুঁচী চালাতে পেরেছে ঝরণা! এরা লবাই কি এই রকম! আশ্চর্য্য! এমন করে অপমান করতে একটুও কি কুদ্রিত হয় না। একটুও কি হরষ আগে না এদের প্রাণের ভেতর! অঘট কবিরী এদেরি না বোলেছেন কোমলা! এই কি কোলকাতার নিদর্শন! না কেবল তার ভাগ্যেই এমন হল। একি সত্যি যে ‘অভাগা যে দিকে চায়’ লাগর শুকাবে বার,” একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে মলর। চিঠি দুখানা পেয়ে পর্য্যন্ত মলর ভেবে ঠিক করতে পারছে না কি করবে সে। সে ওখানে যাওয়ার কথা অনেক ভেবে দেখেছে। কিন্তু বখনই মনে হয়েছে তার ঝরণাকে আর একজন তার (মলরের) চোখের স্রুখে গ্রহণ করবে.....তারপর আর ভাবতে পারে না সে। এই পর্য্যন্ত মলর ঠিক করলে ছুজনের নামে দুখানি চিঠি লিখে পাঠ করে দেবে। তার বেশী আর সে পারবে না। তাই আজ মলর অনলবাসুকে ও ঝরণাকে চিঠি লিখতে বলেছে। প্রথমে লিখলে অনলবাসুকে। লিখতে বলেই সেই মলর হৃদয় বৃদ্ধের কথা মনে করে মিশ্র্যে কথা লিখতে যেন একটু বাধ বাধ ঠেকতে লাগল তার। শেষ পর্য্যন্ত মনকে এই বলে প্রবোধ দিলে যে সে কি করবে উপায় নেই। দেখানে গেলে সে নিজেকে ঠিক প্রকৃতিস্থ রাখতে পারবে না।

সে বা লিখলে, তার স্বার্থ এই—আজ ভিন্ন দিন হল তার খুবজর। সেই জন্তে সে যেতে পারলে না। তা না হলে সে নিশ্চয়ই যেত। সে আর গারেই তাঁকে চিঠি লিখতে। তিনি যেন কিছু মনে না

করেন এবং তার ক্রটি মার্জনা করেন ইত্যাদি। সেই চিঠিখানা খামে বৃড়ে রেখে, ঝরণাকে লিখতে বললো। লেখার পূর্বেই তার এক লম্বা এনে উপস্থিত হল। কি বলে সে (মলর) লম্বাষণ করবে ঝরণাকে—অনেক ভেবেচিন্তে তাকে শুধু ‘ঝরণা’ লেখাই সমিচীন মনে করলে। তারপর লিখলে—“ঝরণা! তোমার চিঠি লিখতে বলেই প্রথম আমার ভাবনা হ’ল তোমার লম্বাষণ কোরবো কি বলে। কারণ তুমি আজ এমন জারগার গিয়ে দাঁড়িয়েচ যে তোমার চিঠি লেখা আমার আর লাঞ্জে না। কেন যে লাঞ্জে না সে কথা এখন থাক। শেষ পর্য্যন্ত তোমার শুধু ঝরণা লেখাই সমিচীন মনে করি। তুমি আমাকে যেতে লিখেচ আগামী ‘শুভদিনে’ তোমাকে কংগ্রাচুলেট করতে। কিন্তু হুঃখের লহিত জানাচ্ছি, আমি যেতে পারলাম না—অনেক চেষ্টা করেছিলুম বাবার—কারণ তোমাকে আজও আমি ভুলতে পারিনি। ওখানে গিয়ে হয়ত নিজেকে আমি ঠিক রাখতে পারব না। আমার ‘হুঃপিণ্ড’ কেটে ছিড়ে আর একজনের হাতে তুলে দেবার লাম্বর্ষ আমার নেই। তোমাকে আজ সব কথাই বলব। ভেবেছিলুম কিছুই বলব না কিন্তু আর হয়ত বলার স্রুযোগ ঘটবে না কোনও দিন এ জীবনে তাই বলছি। অনেক কথাই লেখিন নবীর ধারে জানিয়েচি। অনেক কেন প্রায় লবই। তবু যেটুকু বাকী আছে তাও বাকী রাখব না আজ।.....তোমাকে আমি ভালবেদেচি। প্রাণ দিয়ে ভালবেদেচি। এমন ভাল কেউ কাউকে কোনদিন বেলেচে কিনা জানি না। একেবারে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া বাক বলে তাই। সত্যি কথা বোলতে কি—তুমি বিশ্বাস কর আর না কর—তুমি আমাকে পাপল করেচ। বেখিন নবীর ধারে এসে

তোমাকে আমার প্রেম নিবেদন করি। লেখিন—লেখিন কেন, অনলবাসু যতক্ষণ না নিশীথের কথা জানিয়েছিলেন আমাকে অর্থাৎ নিশীথ বাবুর সঙ্গে চাক্ষুষ হবার কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত—যুগাকরেও জানতুম না যে আর এক জনের বাক্ষতা তুমি। না জেনে তোমার উপর যে অস্তার করেচি সে জন্তে তুমি আমাকে ক্ষমা ক’রো ঝরণা। তোমাকে আমি এখন থেকে আশীর্বাদ ক’রচি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা কোরচি, তোমাদের উভয়ের ল’রাজীবনের চলার পথটা কুহুমাতীর্ণ হোক। তুমি সুখী হও। আমি আর কখনও তোমার হৃদয়াকাশে ধূমকেতুর মত উড়র হব না। চিরদিন থাকব তোমার কাছ থেকে দূরে বহু দূরে। কারণ, আমি তোমাকে ভালবালি। হঠাৎ ছুঁকোটা চোখের জল মলরের অজ্ঞাতে, টপ্ টপ ক’রে ঝরে পড়ল চিঠির হরপের ওপর। তাড়াতাড়ি ব্লট করে নিয়ে আবার লিখতে আরম্ভ ক’রলে মলর। আমি তোমার মিলন স্রাস্তির থেকে যাত্রা ক’রব নিকলেশের পথে। কারণ আমি অনেক চেষ্টা ক’রে দেখলুম থাকতে আমি পারবনা বাড়ীতে, তাহলে আমি পাগল হ’য়ে বাব। আমার হৃদয় তেজে গেছে একেবারে। এ আর কখনও জোড়া লাগবেনা। আর তুমি জানতে চেরেচ আমি হঠাৎ লেখিন কেন মলুর ত্যাগ ক’রলুম। এবং কেন সেইদিন তোমাদের বাড়ীতে চারের মজলিলে লহজভাবে যোগ দিতে পারিনি? এই ছুটো কেনর উত্তর আমি আর দেবনা। পারত আবিষ্কার করে নিও।

আর একটা কথা ব’লেই এবার শেষ ক’রব আমার চিঠি। বেশী লিখে আর চিঠির কলেবর বৃদ্ধি ক’রতে চাইনা। আর তা ছাড়া তোমারও হয়ত ঐখ্য থাকবে না পড়বার। কারণ এখন তুমি লক্ষ্যবাহী বাস্ত। হ্যাঁ, কি বলছিলুম শোন, তোমার কাছে এই

আমার প্রার্থনা—এই হতভাগ্য নিকৃৎশের
যাত্রীর কথা কখনও কোন ভুলের মুহূর্তে
যদি মনের কোণে জাগে, তোমার কাছে এইটুকু
আমার নিবেদন, একটা দীর্ঘশ্বাস বেন আমার
উদ্দেশ্যে পড়ে। আর...আর...আমার কিছু
বলবার নেই।

চিঠি শেষ করে ছুথানা চিঠি পৃথক পৃথক
খামে ভরে ঠিকানা লিখে চিঠি ছুথানা বেধে
দিলে মলয়। এবং চিঠি পোষ্ট কোরতে
যাওয়ার আগে আর একবার—ঝরপার নামে
লেখা চিঠিখানা—ভাল ক'রে পড়ে দেখলে
মলয়। এবং কি ভেবে কি জানি চিঠি
ছুথানা পোষ্ট কোরতে যাবার পরিবর্তে চিঠি
ছুথানা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ওয়েটে
পেপার বাস্কেটে কেলে দিলে মলয়। তারপর
ডম ক'রে বিছানার ত্তরে প'ড়ল। তার
চোখ বেন অঁলা ক'রতে লাগল। এবং কি
জানি কেন তার চোখ ধিরে হ হ ক'রে জল
প'ড়তে লাগল। সে কিছুতেই নিজেকে
দাম্পত্যে পারলেনা।.....

বৈশাখ মাসের বিশে আজ। আজ
ঝরপার বিয়ে। রাজি তখন ন'টা। বর
এলে পৌছুল। হৈ, হৈ, ব্যাপার প'ড়ে গেছে
চারিধিকে। ঘেরেরা তত শব্দধ্বনি ক'রছে
ঘন ঘন। কাজের ব্যস্ততার লকলে ছুটছুটি
ক'রছে। ছোট ছেলে-ঘেরেরা আনন্দে
করতালি দিচ্ছে। চারিধিকে আজ আনন্দের
বজা অনঙ্গবায়ুয়ের বাড়ীতে। শুধু তাঁর
(অনঙ্গবায়ুর) মনটায় বেন আজ সুখ
নেই। তিনি এখনও টাইম টেবল নিয়ে
বেঞ্চেন মলয়ের আলবার আর ট্রেন আছে
বিনা ক'লকাতা থেকে। এখনও তিনি
আশা ক'রছেন পাক্সাব বেলে যদি আসে
মলয় তাহ'লে এখনও তার আলবার লম্বা
আছে। বার বার তিনি নিজে নিজেই
বলচে, "তাইত কেন এলনা মলয়। কোন
ক'রখ বিলুপ্ত কোরলো না ত।.....



স্ব-মাল
—তবে—
লিলি
ব্যাণ্ড
হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

LILY BRAND
BARLEY
FINEST FOOD DRINK
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
THE LILY BISCUIT CO
PROP. = P. JETT & CO
ULTADANGA, CALCUTTA

কলিকাতা ৪ ৪ বোম্বাই

• • এদিকে মলয় তখন আরম্ভ হইল।
 টেননে নেবে, টেনন পার হয়ে যে রাস্তাটা
 বরাবর উত্তরমুখে চলে গেছে সেই রাস্তা
 ধরে মলয় চলেছে...চ'লেছে...ক্রমাগত
 চ'লেছে; তার চলায় আর বিরাম নেই।
 যেতে যেতে অন্ধকারের মধ্যে কোথায়
 অস্তিত্ব হ'য়ে গেল, আর দেখা গেলনা।
 হাতে তার একটি পয়সা নেই। টিকিটের
 বাস ছাড়া আর কিছু সঙ্গে আনেনি। চুল
 উকোথুকো ক'দিন অনিদ্রার চোখটুকু তার
 রক্তবর্ণ, • • • তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার
 কারণ কেউ জানেনা। শুধু যার চোখে
 কিছুই এড়ানো, যার কাছে কোনও কিছুই
 অজানা নেই, যার চুটি লক্ষ্যবাপী শুধু তিনিই
 র'ইলেন এই নিরুদ্দেশ যাত্রার লক্ষী হ'য়ে।
 এই হতভাগ্যের জন্তে তিনি বোধহয় অন্তরাল
 থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এদিকে
 বিবাহ বাড়ীতে মঙ্গল সূচক ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি
 হ'তে লাগল।

—:-(শেষ)-:—

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—চক্ষু—

প্রভাতে অরুণ বাতী ফিরিল—নিচে
 বলিয়াই রোগী বেধিল এবং বেলা ১২টার
 পুনরায় রোগী বেধিতে বাহির হইল।
 শুভ্রা মধ্যে তাহাকে উপরে উঠিবার অহুরোধ
 জানাইয়াছিল বটে কিন্তু সে অহুরোধ সে
 গ্রাহ্য করে নাই। বেলা দুইটার
 অরুণ বাতী ফিরিল; আহা! বলিয়া এটা
 ভাল হয় নাই, ওটার লবণ বেশী, ঝোলটা
 ঝাল ইত্যাদি নানাবিধ ছোব ধরিতে আরম্ভ
 করিল। রন্ধন লইয়া শুভ্রাকে ব্যস্ত করিল,
 তির্যকার করিল; শুভ্রা কোন প্রতিবাদ
 করিল না, শুধু আপন মনেই ভাবিল যে
 আঠার ঘণ্টা পরে আনিয়া স্বামী তাহাকে

যে মধুর লবোদন করিতেছেন তাহা সে
 সহ্য করিবে—কোন প্রতিবাদই করিবে না।
 আঠারান্তে অরুণ বলিল, “অমলের অবস্থা
 হইতেছে না তো?”

উত্তরে শুভ্রা বলিল অবস্থা হইতেছে
 কিনা তাহা সে জানে না। মূল কাটিয়া
 গাছের মাথায় জল চালিলে সে গাছ
 বাড়ে না ইহা অরুণের জানা উচিত ছিল।

অরুণ বলিল, “তার মানে?”

উত্তরে শুভ্রা বলিল, “মানে সুস্বাদের
 জ্ঞান ও শক্তি তোমার আছে, ব্যাখ্যা বা
 টীকা নিজে করে নিতে পার আমি
 জানি না।”


অরুণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। কোন কথা
 বলিবার শক্তিও তাহার লোপ পাইল।
 শুভ্রাও বেশীক্ষণ লেহনানে থাকা সূক্তলভত
 নয় তা'র চালাই গেল। যথালম্ব অরুণ
 বেশ পরিবর্তন করিয়া শুভ্রাকে ডাকিয়া
 বলিল, “আজও আনতে পারবে না আমি
 —ইদপাতালে থাকতে হবে।”

শুভ্রা বলিল, “বেশ, খাবার পাঠিয়ে
 দেব কি?”

অরুণ বলিল “না, দরকার নেই,
 ওখানেই খাব আমি। শুভ্রা নীরবে লম্বিত
 জ্ঞাপন করিল। অরুণ আপনার গাড়ীতে
 উঠিয়া যথাস্থানে গমন করিল।

আধঘণ্টা পরে লম্বর একটি মত চামড়ার
 ব্যাগ লইয়া উপস্থিত হইল। শুভ্রা এই
 অর্ধঘণ্টার নিজে প্রস্তুত হইয়াছিল।
 রাইদলাকে ডাকিয়া উপরতলার চাবি বন্ধ
 করিয়া বলিল, “বাবু যদি কিরে আনেন

ফোন ২৭৭৪



বড় বাজার

ক্যাচের জাট

ক্যাচের ঘানি

ক্যাচের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারত প্রয়েন মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩ আপার সারকুলার রোড, কলিঃ

তাকে বলো ভবানীপুরে বাবার কাছে
যাচ্ছি আমি। ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরবো।”

তৎপরে সে লম্বের আনীত বেশ পরিধান
করিল, মাথায় পরচুলা পরিল, হুখের উপর
একটা লম্বা আঁচল প্রস্তুত করিয়া
এমন বেশ ধারণ করিল যে বহু
পুরাতন চাপরানী রামলালকেও তাহাকে
বোঝা বলিয়া চিনিতে বিলক্ষণ কষ্ট হইল।
এখন সে আর ললজ্ঞ কুলবধু শুভ্রা নহে
এখন সে রায় বাহাদুর দ্বিলীপ রায়ের পুত্র
সুবর্ণন কিশোর বা নবীন যুবক। প্রথমে
আরনার নিজেকে দেখিয়া নিজে খুব
খানিকটা হাসিল ও লম্বের দিকে চাহিয়া
বলিল, “কেউ বোধ হয় চিনবেনা, কি
বলিস্ লম্বু।”

লম্বু বলিল, “নিশ্চয়ই না, চল, গতিয়ে
পড়া যাক। শুভ্রা বেতের ছড়ি ঘুড়াইতে
ঘুড়াইতে মোটর বাটকের লাইড করে
উঠিয়া বলিল এবং লম্বর অবিলম্বে গাড়ী
চালাইয়া দিল হোটেলের দিকে। শুভ্রা
বাহির হইয়া গেল অমল তাহা দেখিল।
চাকরদের জিজ্ঞাসা করিল লম্বর বাবুর লঙ্গে
ঐ ছোকরা কে? ভৃত্যদের কেহই
এই সুবর্ণন কিশোরটির পরিচয়
দেতে পারিলনা। হোটলে আনিয়া
লম্বর ও শুভ্রা ম্যানেজারের কাছে উপস্থিত
হইল। এবারেও ম্যানেজারবাবুকে স্বাক্ষর
দিতে হইল। শুভ্রা বখারীতি খানসামার
পোষাক পরিল। এ পোষাক লম্বর মূতন
ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। পোষাক ও পাগড়ী
পরিধান করিয়া শুভ্রাকে বহুর-চোদ বরনের
বাগক ভৃত্য বলিয়াই বোধ হইতেছিল।

ম্যানেজার হাসিমুখে বলিলেন, মাষ্টার
রায়, তোমার লভ্যই ‘বর’ বলেই মনে
হচ্ছে। তবে রংটা যেন বড় বেশী করলা
ঠেকছে না লম্বর বাবু? লম্বর তাড়াতাড়ি
কি একটা তাহাটে চূর্ণ ও ভেগেলিন

বাহির করিয়া শুভ্রার হাতে দিল। সে
নেটাকে হাতে ও হুখে রাখাইরা লইল।
তাহার গৌরবর্ণ রান হইল। তাহাকে
সাধারণ গরীবের ঘরের ছেলে বলিয়া বোধ
হইতে লাগিল। শুভ্রা মনে মনে খুশী
হইল।

লম্বর বলিল, “উঠাবার লম্বর খানিকটা
তেলের দরকার হবে কিন্তু।”

ম্যানেজার বলেন, “তা আমি আনিরে
রাখি। বাস, চল যান আপনারা ডিন-
গুলো নিয়ে। শুভ্রা পুনরায় ঘর বন্ধ
করিয়া ভিলটিকে পরিস্ফুট করিল তাৎপরে
জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া ভ্রাতার লিখিত
এই দ্রুতগতি কার্যে অগ্রসর হইল।

কক্ষে উপস্থিত হইয়া সে বাহা দেখিল
তাহাতে তাহার দ্বয়ের প্রলয়ের ঝটিকা
উপস্থিত হইল। হৃদপিণ্ড দ্রুত হইতে দ্রুততর
চলিতে লাগিল। চক্ষের লম্বুখে লম্বু
পৃথিবীটা যেন প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতে লাগিল।
পদদ্বয় কম্পিত হইল;—তাহার শিরায় শিরায়
অদ্ভুতপূর্ব বিজ্ঞানপ্রবাহ চলিয়া গেল। সে
অতিকষ্টে নিজের অবস্থা ও মনোভাব দমন
করিয়া ডাইনিং টেবিলে প্রেইগুলি লাজাইয়া
দিল। শুভ্রা যে এবশে এখানে আনিতে
পারে অরুণ বা কণা তাহা বলনা করে
নাহ। তাই ঐ অরুণক বালকের দিকে
দৃষ্টিপাত না করিয়াই তাহার কথাবার্তা
বলিতেছিল। শুভ্রা উদগ্রীব দ্বয়ের কাজ
করিতে করিতে তাহাদের বাক্যালাপ
শুনতে লাগিল।

অরুণ বলিতেছিল, “একদিনতো ঐ
অমলকে ভাল লেগেছিল তোমার, আজ
তার নাম করলে চটে বাও কেন?”

কণা অরুণের হাতের উপর হাতখানি
রাখিয়া বলিল, “নেটা কি রকম জান, হারে
পড়ে কুইনিরের বড়ি গেলার মত। ভালবাসি
চিরদিন একই লোককে; আর সে লোক
তুমি।”

“তাই যদি তবে বলনি কেন এতদিন
আমাকে?”

“বিহীন বড় বড় চোখ দুটো দেখলেই
আমার মনে হতো তিনি বুঝি আমার
অস্তরের তেতরটা দেখতে পান, মনে হত
হঠাৎ বাজময় ওঁর জানা আছে, আমার
মনের কথা যুক থেকে টেনে নিজে পারেন
তিনি।”

“তাহলে বল তুমি শুভ্রাকে ভয় করতে?
ওকে আমার কারো ভয় হয় নাকি?”
বলিয়া অরুণ হাসিয়া উঠিল।

কণা বলিল, “স্বিখে বলোনা, তুমিও
তাকে ভয় করতে। —আর ভয় কর
বিচিত্র নয়—প্রথমতঃ তিনি রূপলী, বিজয়ী,
লভ্যকার প্রেমময়ী, তার উপর আমি দেখেছি
এমন একটা শক্তি আছে তার যে, যে কোন
লোককেই বশ করে ফেলতে পারেন।”

“কিন্তু আমার পেয়েছেন কি? যাক
ও কথা বা বলছিলাম। মনে কর, আজ
যদি অমল আনতো তোমার লামনে তা
হলে কি করতে তুমি?”

কণা বলিল, “কেন এই কথা? না,
তুমি আমার থাকতে দেবে না দেখছি?”

“কেন কি হলো?”

—“আমি জানি না,” বলিয়া কণা ঘুরে
সরিয়া বলিল।

অরুণ তাহার নিকটে গিয়া বলিল, “রোগ
করছো কেন বলতো? একদিন তো সে
তোমার ভালবাসতো।”

ভারত-ভূমিস্বমীর দান

টপের চ

মাহা ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

“হাই বাসতো। না তার নাম কোরনা আমার কাছে। যদি তবুও কর তবে নতি বলছি বিব খেয়ে মরবো আমি। তার মত নীচ, চুচরিয়া, লম্পট, স্বার্থপর কি চুটো আছে? নতি বলছি তাকে আমি মৃণা করি। পৃথিবীর আবর্জনা মনে করি তাকে? তার নাম আমার কাছে করো না।”

মনে মনে খুদী হইয়া অরুণ বলিল, “তা না হয় হলে, কিন্তু মনে কর যদি আমাধের মাঝে সে যদি অজুতপ্ত হয়ে এলেই হাজির হয় তা হলে কি করবে তুমি?”

বিরক্ত হইয়া কণা বলিল, “নতাই যদি তার এমন চুন্ধিন আসে তা হলে হয় তার না হয় আমার মৃত্যু নিশ্চিত। আমি কিছুতেই তা সহ করবো না।”

“বাক্ বরবেচারী খাবার লাভেরে দাঁড়িয়ে আছে, চল খেতে বসবে চল।” অরুণ ও কণা টেবিলে আহারের জন্ত বসিল।

শুভ্রা দেখিল আহারের সময় কণা অতি অল্পই আহাৰ করিতেছে এবং নিজ হস্তে পরম আহাৰে অরুণের মূখে আহাৰ্য্য তুলিয়া দিতেছে।

অরুণ বলিল, “নতি তোমার হাতে পড়ে খাবারগুলো অনেক বেশী মিষ্টি হয়ে ওঠে।”

কণা বলিল, “খাবারগুলো তৈরী হোটেলের, লাভ করেছে বর, এতে আর আমার বাহাজুরী কি? এমন কপাল একদিন নিজে হাতে যেনে তোমাকে খাওয়াতে পারলুম না।”

হালিয়া অরুণ বলিল “রান্না করবে তুমি? পুতুলের মত দেখ নিরে?”

বাধা দিয়া কণা বলিল, “দ্বিবি ভাগ্যবতী, রোজ কত রান্না করতেন তোমার জন্তে।”

“ও: তাই নাকি? তার বা রান্নার; হাজুরে মুখে দিতে পারে না।”

“অথচ এই হাজুরই একদিন তার রান্নার উচ্ছৃঙ্খিত প্রাণেশ্বর বরখানাকে ভরিয়ে

তুলতো—আর তা আমি নিজ কানে শুনেছি।”

রাগত: ভাবে অরুণ বলিল, “দেখ কণা, তার কথা তুমি তুলোনা, তাকে দেখলে আমার রাগ হয়; তার কথা শুনেলে আমার মাথা ধরে।”

কথাটা শুভ্রার কানে গেল, মনটা বিচলিত ও বিজোহী হইয়া উঠিল। তথাপি আত্ম-দমনের শক্তি তাহার আছে তাই সে লম্বতভাবে আহাৰ দিতে দিতে লকল কথা শুনিতে লাগিল।

কণা জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, তার অপরাধ?”

উত্তরে অরুণ বলিল, “অপরাধ? হ্যাঁ, অপরাধ আছে বৈ কি কণা। সে যে রকম বুদ্ধিমতী আমি বিশ্বাসই করিনা যে সে বুঝতে পারেনি আমার মনের বস্তা ছুটেছিল আকুল আগ্রহে তোমারই দিকে। সে ইচ্ছে করলে বাধা দিতে পারতো; কিন্তু সে কেন তা’ করলেনা? কেন যে আমার পতনের মত আপ দিতে দিলে তোমার রূপের অনিশ্চয়। যদি কেউ তার আপনার জনকে গোথরো লাগের সঙ্গে খেলা করবার উৎসাহ দেয়, তবে তারপর কি করে সে আশা করতে পারে যে লাগের বিবে তার প্রিয়জন চলে পড়বেনা? সে কেন আশা করে, আশ্বনে তার স্বামীর হাত পুড়বেনা; জলে তার গা ভিজবেনা। বখনই তোমার কথা হোত তখনই তুমি নির্দোষ এইটাই সে চাইতো প্রমাণ করতে। কেন সে সেদিন জোর করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলে বলতে পার?”

কণা বলিল ‘তিনি দেবী, তিনি এই পৃথিবীর হাজুর নন।’ অরুণের কথাগুলো শুভ্রার কর্ণে অতি দ্রুত বলিয়া বোধ হইল। তাহার বোধ হইতেছিল এই পৃথিবীতে উদারতা করে বারা, অতিরিক্ত বিশ্বাস করে

বারা, তারাই ঠিকরা থাকে শুভ্রারই মত। হায়, এই জগতে আত্মদান, উদারতার কোন মূল্যই নাই। কে যেন তাহার যুকের উপর দশ মন বোঝা চাপাইয়া দিল। তাহার চকের লম্বুখে কতশত বিভীষিকাময়ী দৃষ্টাবলী ছায়াচিত্রের স্থায় খেলা করিতে লাগিল। জিহ্বা ভালু শুকাইয়া গেল, তাহার অজ্ঞাত-লারে জলের জগটি মুহূর্তে খলিত হইয়া ভুসিতে পড়িল। সে এবার নিজেই লামলাইয়া লইতে পারিলনা। শুভ্রা নিজেও পড়িয়া যাইতেছিল—লম্বুখের একখানা চেয়ার ধরিয়া কোনরূপে দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুণ নিকটে আলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হলো যে তোমার ছোকরা?” লম্বুও ডিনার লাভ করিতেছিল সে অরুণের প্রশ্নের উত্তর দিল, “হজুর আজই ও চাকরী পেয়েছে। তবে যে রকম অলাবধান তাতে আর চাকরী থাকবেনা ওর, কাজের আজই খতম।”

কণা বলিল, “বেচারী! ছেলেমানুষ, ও যা ভেঙ্গেছে তার দাম আমরাই দেব, বলো আমিই ভেঙ্গে কেলেছি ওটা। দেখ বর, ওর চাকরী যেন না যায়।”

অরুণ শুভ্রার নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল, “দেখ বর, কি নাম তোমার?”

শুভ্রা ভরে ও আতঙ্কে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সে লোলাব করিয়া বিব্রতভাবে বলিল, “রঘুনাথ”।

“আচ্ছা রঘুনাথ, তোমার মূখখানা যেন চেনা চেনা বোধ হচ্ছে—আর কোথায় দেখেছি বলত?”

অরুণের এই প্রশ্নের উত্তরে লম্বু বলিল, “ওকে আর কোথায় দেখবেন হজুর। ও আমার পিতৃতত তাই আজই দেশ থেকে এসেছে।”

অরুণ বলিল, “বেশ রঘুনাথ, তোমার যদি এরা জবাবই দেয় তাহলে আমার কাছে কাজ করবে?”

শুভ্রা ষাড় নাড়াইয়া নম্রতি জানাইয়া বলিল, “কত মাইনে বেবেন?” সে এমন উল্লসিত কথা বলিল যে অরুণ ও কণা উভয়েই হাসিয়া ফেলিল।

অরুণ বলিল, “কত চাও তুমিই বল।”

শুভ্রা ষাড় নাড়াইয়া বলিল, “কিছুনা, শুধু একটু ভালবাসা—একটু মেহেরবাণি।”

ঠিক এই সময়ে রাজপথে কে একজন ডাটিরালী সুরে গাহিতেছিল।

“চাঁদ যদি গো হৈতে বধু,

চেয়ে রইতাম চোখে।

ফুল হৈলে মালা গেথে,

জ্বলিয়ে দিতাম বুক।”

অরুণের বৃকের ভিতর কেমন একটা আশাত পৌছিল রঘুনাথবংশী শুভ্রার এই কথাটার ও বাহিরের অপরিচিতের এই সঙ্গীতে। তাহার মনে হইল ঠিক এই কথাই এমনি ভাবে আর একজন তাহাকে বলিত—কে সে? অরুণের মনে পড়িল সে আর কেহ নহে তাহারই পরিত্যক্তা, পীড়িতা পত্নী শুভ্রা। সে মানিবাগ বাহির করিয়া দশটাকার একখানা নোট বাহির করিয়া শুভ্রার হাতে দিয়া বলিল, “ঐ টাকা থেকে একটা জগ কিনে দিও হোটেলের ম্যানেজার বাবুকে।” পরে লম্বের দিকে চাহিয়া বলিল, “দেখ বর, ম্যানেজার বাবুকে বলো রঘুনাথ বেন রাজাই আসে আমার খাবার লার্ড করতে। এজ্ঞা আমি তোমাকে বকুল করবো, কিহে আমবে তো রঘুনাথ?”

লম্ব লেলাং করিয়া বলিল, “যো হুকুম।” তাহার সুর ও তক্তার হুবহু অনুকরণ করিয়া শুভ্রাও বলিল, “যো হুকুম।”

তাহার চলিয়া গেলে কণা বলিল, “ওর উচিত ছিল রাজারাজ্যের ঘরে ভ্রমণ। কি পাপে ওকে বর হতে হল ভগবানই জানেন।”

অরুণ কিছু বলিলনা। তাড়াতাড়ি আলো নিভাইয়া বাহুসূলে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। কণা নিকটে বসিয়া লগ্নে কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হলো বলনা তোমার?”

অরুণ উত্তর দিলনা। তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থ ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। অরুণের বাহুখানি ধীরে ধীরে কণা সরাইয়া লইয়া মুখে হাত দিতেই দেখিল অরুণের গণ্ডহুইটা অঙ্গশিষ্ট।

কণা শুনিল তখনও রাজপথে পথিক তেমনই প্রাণল্পীসুরে গাহিতেছিল।

“জীবন গেল বুখাই বয়ে

এলো বন্ধু মরণ হয়ে,

তোমার পায়ে অর্ঘ্য দিব,
জনম-ভরা ব্যথা।

ওগো আমার শোনার বধু,

শোন প্রাণের কথা—

তরু যদি হইতে তুমি

আমি হইতাম লতা।”

—পটিন—

গত দুইদিন বিন বাবু দিলীপবাবুর মনে কেমন একটা লম্বের উদ্বেগ হইরাছে। লম্ব এত রাত্রি পর্যন্ত থাকে কোথায়? লম্ব দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে এবং দিলীপবাবুর ধারণার তাহার মতি অত্যন্ত তরল। আজকালকার কলিকাতার তরুণী-গণ বেক্রপ বেপারোয়া ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে রাত্রি বাঃটা পর্যন্ত লম্বের বাহিরে যাপন করা একটা আতঙ্কের বিষয় বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল।

তাঁহার মনে হইল হয়ত কোন আত্মনিকার অপাজবাণে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার আশ্রয়ের লম্ব অধঃপতনের প্রশস্ত পথে নামিয়া যাইতেছে। তিনি এত কষ্টে পুত্রাধিক স্নেহে বাহাকে পালন করিলেন সে কি তাঁহারি অনবধানতার শেবে নরকের পথে

নামিয়া বাইবে? সে যে তাঁহারি স্বর্গোন্নত গিণীর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন। তাহাকে বাহুব করিয়া তোলা যে তাঁহার জীবনের একটা বৃহৎ কর্তব্য।

তিনি স্থির করিলেন যে অন্তই তিনি লম্বকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে এত রাত্রি পর্যন্ত সে থাকে কোথায়? কিসের মোহে সে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কলিকাতার রাজপথে বিচরণ করে? ষড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন তখন রাত্রি লাড়ে বারটা। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া লম্বের বন্ধুদ্বারে আলিয়া উপস্থিত হইলেন।

লম্ব লবেমাত্র শুভ্রার নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া হাতমুখ দুইরা টেবিলে ঢাকা বেগর খাতজব্বগুলির লুপ্তাবহারের জন্ত বলিয়াছে এমন লম্বের ঘরপ্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া লম্বের দেখিল তাহার মামা ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

দিলীপবাবুর মুখের গভীর ভাব দেখিয়া সে ভীত হইলেও কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইল ও মামাকে চেয়ার আগাইয়া দিল। দিলীপবাবু নিজেও বলিলেন ও তাহাকেও বসিতে বলিয়া জলদগভীরস্বরে তাহাকে লম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শোন লম্ব, আজ আমি তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই, এবং এও আশাকরি যে তুমি নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন ও আমাকে প্রভাষিত করবেন।”

ঋতু বঙ্গ ৪৫ মাস যে কারণেই হউক ভৈরবী বর্মোদধিতে অব্যর্থ ফল—গর্ভাবস্থায় বাবহার নিষিদ্ধ ১৪-০ দস্ত ও বর্ণ শাস্তি একবার এরোগেই উপশম, ৪০ মাঃ ১০ আনা



সময় ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস অনন্ড বিশারদ

১৮২ নং বহাগজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সময় ধীরকণ্ঠে কহিল, “আমি জানতঃ কখনও মিথ্যা বলিনি, কেননা, সে শিক্ষা পাইনি এবং আপনায় কাছে মিথ্যা বলবার সাহসও আমার নেই।”

দ্বিলীপবাসু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি জানতে চাই যে, বর্তমানে তোমার পক্ষে স্নাত্ত বারোটার আগে ‘কাড়ী ফেরা’ অসম্ভব হয়ে উঠেছে কেন? তুমি আগের মত সময়নিষ্ঠ নেই তা দেখতে পাচ্ছি; কোথায় তুমি থাক বা কি কর আশায় বল।”

মামার প্রস্নে সময় মনে মনে প্রমোদ গনিল ও বিব্রত হইয়া উঠিল। সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মুহূ কল্পিত কণ্ঠে বলিল, “আপনাকে যে কোনও কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব কিন্তু—”

তাঁহাকে কথা শেষ না করিতে দিয়াই বিরক্ত কণ্ঠে দ্বিলীপবাসু বলিলেন, “এই কথাটাই বা এমন কি যা তুমি আমার কাছে বলা অসম্ভব বলে মনে কর। আমি জানতে চাই কি কারণ তোমার সকাল সকাল কাড়ী ফেরার বাধা হয়, বল।”

সময় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, “আমার নিজের কোনও কাজে বাইরে থাকিনা; দ্বিবিয় কাছে প্রভিষ্কৃতি দিইছি যে একথা কাউকে এমন কি আপনাকেও ঘৃণাকরে জানাবনা।”

“দ্বিবি” শুনিয়াই দ্বিলীপবাসুর মেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কার শিহরিয়া উঠিল। তিনি ধীর লংঘত কণ্ঠে সময়কে বলিলেন যে শুভ্রার কি হইয়াছে সে তাঁহাকে বলুক কেননা শুভ্রার মঙ্গলামঙ্গলের জন্ত তিনিও বথেষ্ট পরিমানে দ্বারী; উপরন্তু সে এবং শুভ্রা উভয়েই ছেলেশ্রদ্ধ। তাহাদের শপথের কোন মূল্য নাই অথবা এমন কোন কথা থাকিতে পারে না বাহা পিতার নিকটেও বলা অসম্ভব। অতএব সে যেন সময় ঘটনাই তাঁহাকে বলে, শুভ্রার নিকট বিশ্বাসভঙ্গের জন্ত দ্বারী তিনিই হইবেন।

মাতুলের শাস্তনাবাক্যে শাস্ত হইয়া সময় তাহার নিকট আত্মপূরিক সময়ই বলিল এবং অত্যন্ত হুঃখিত হইয়া বলিল, “আমি জানি এই কথাগুলো আপনাকে কি ভয়ানক আঘাত দিইছে তবুও—সময়ের ছইচক্ষু জলভারে অবনত হইয়া পড়িল; কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, সে নিঃশব্দে মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বজ্রাহত বনম্পত্তির স্তায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিয়া থাকিবার পর দ্বিলীপবাসু বলিলেন, “শোন আমি স্থির করলাম যে এ বিষয়ে যা করবার এরপর আমিই তা করব এবং আমি নিজ চোখে ছোট্টেলে গিয়ে তাহের দেখে আসতে চাই, যত্নে, যদি তুমি মিথ্যা কথা বলে থাক আমার, তা হলে এও জেনে রাখ তা জানতে পারলে আমি তোমার মুখও দেখবো না।” এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সময় খাবার ফেলিয়া রাখিয়া হাত ধুইয়া শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল সে মামাকে সকল কথা বলিয়া ভাল করিল কিনা।

* * *

দ্বিলীপবাসুর মনে পড়িল আজই মধ্যাহ্নে অরুণ টেলিফোনে তাঁহাকে তাঁহার অন্তরের কথা এবং তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতেছিল—উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার শরীর ভাল আছে এবং একমাসের মধ্যে কোন অন্তর্যই তাঁহার হয় নাই। সম্ভবতঃ শুভ্রাই অরুণকে পিতা! অন্তর্য এবং একজন্মই সে রোজ ভবানীপুরে যায় এইরূপ কোন কথা বলিয়াছে এবং অরুণ টেলিফোনে তাঁহার উত্তর পাইয়া শুভ্রা লক্ষ্যে বিরূপ ধারণা করিয়াছে তাহাও ভাবিবার বিষয়। দ্বিলীপবাসুর ইচ্ছা হইতেছিল এই রাত্রিতেই তিনি কস্তার নিকট ছুটিয়া যান ও যে সকল সমাচার আজ সময়ের নিকট শুনিলেন তাহার সত্যতা নির্ধারণ করিয়া লন। সম্ভবতঃ রাত্রি বৃদ্ধ নিতান্ত অসুস্থিতেই কাটাইলেন।

উবালাক পন্ডিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রাক্তনত্ব লম্বাপন করিয়া পদত্বকেই কস্তার লহিত লাকাতের জন্ত বাহির হইলেন।

প্রভাতের পক্ষী কুজন আরম্ভ হইবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই রায় বাহাদুর দ্বিলীপ রায়কে অরুণের গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিয়া বাটীস্থ ভৃত্যবর্গ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহাকে লম্বাপন করিয়াই তাহার উপরে লইয়া গেল। শুভ্রা তখন লবেমাত্র শয্যাভ্যাগ করিয়াছে। সে পিতাকে দেখিয়া প্রমোদ গণিল। তাহার মুখে আনন্দ চিহ্নের পরিবর্তে আতঙ্ক ও ভয়ের রেখাই পন্ডিত হইল।

দ্বিলীপবাসু ছড়িগাছা দেওয়ালে রাখিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া কস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অরুণ কোথায়?” উত্তরে শুভ্রা কি বলবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে সময়ে মৃত্তিকাপানে চাহিয়া বজ্রাঙ্গলখানি টানিয়া নিজের আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল। দ্বিলীপ বাসু পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লজিত করে বল দেখি অরুণ কোথায়?”

কুণ্ঠিত কণ্ঠে শুভ্রা বলিল, “হাঁসপাতালে আছে।”

উত্তরে দ্বিলীপবাসু কিঞ্চিৎ কক্ষকণ্ঠে কহিলেন, “তুমি যা বললে সেটা যে সত্য কথা তা’ আমার পারে হাত দিয়ে বলতে পার কি?”

“তিনি বাবার সময় বলে গিয়েছিলেন যে তিনি হাঁসপাতালে যাচ্ছেন ও সেখানেই থাকবেন রাজে।”

“তার কথা যে সত্য নয় তা তুমি ভাল করেই জান ও সে যে কাল রাজে কোথায় ছিল তা যে তুমি স্বচক্ষে দেখে এসেছ আমি তা’ জানি।”

পিতার কথা শুনিয়া শুভ্রার প্রায় মুখী হইবার উপক্রম হইল। সে কি বলিবার

চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না
তু' তাহার চোটে হইখানি কাঁপিয়া উঠিল।

দ্বিলীপবাবু অবচলিত কর্তে বলিতে
লাগিলেন, “তুমি যে আমার ঘরে হয়ে
আমার কাছে কিছু লুকতে পার তা’
আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি। তুমি
জান তুমি তিন এ সংসারে কেউ নেই
আমার। আমাকে সব কথাই জানান উচিত
ছিল তোমার, কিন্তু তুমি তা’ জানাওনি
কেন, এই ভেবে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য
হচ্ছি। তুমি একবারও ভেবে দেখনি যে,
যে কাজে তুমি অগ্রসর হচ্ছ তা কত বড়
ঈশ্বরাসিক কাজ ও তাতে তোমার কত
রকমের বিপদের আশঙ্কা আছে।

কথাগুলি শুভ্রা নিঃশব্দেই শুনিয়া
যাইতেছিল—হঠাৎ মুখ তুলিয়া পিতার দিকে
তাকাইল ও ধীরে ধীরে বলিল, “কিন্তু
বাবা তুমি ত জান কোনও কিছুতেই
কথা বলা আমার অস্বাভাবিক ছিল না, তুমি
যখন সবই শুনেছ তখন তোমাকে এ
বিষয়ে কিছু বলতে আপত্তি নেই আমার,
তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতেছিল
কিন্তু নেমু যেমন কচলাতে কচলাতে তেতো
হয়ে যায় তেমনি—সে হঠাৎ থামিয়া গেল,
তাহার কথা বলিবার শক্তি কে যেন হরণ
করিয়া লইল, তাহার মনে হইতে লাগিল
তাহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর পিতার মনে
অত্যন্ত আঘাত দিয়াছে।

দ্বিলীপবাবু কস্তার অপ্রত্যাশিত আচরণে
বিস্ময় বোধ করিলেও ধানিকরণ চূপ করিয়া

থাকিয়া পরে বলিলেন, “তোমার কথা
আমি বুঝি না, কিন্তু নারী তুমি একথা
তুলে যাওয়া তোমার পক্ষে শোভা পায় না।
আমি জানি অল্পবয়সে ব্যবহারে তুমি খুবই
বাখা পেয়েছ। এমন কি তা তোমার
লঙ্ঘন শীঘ্র ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু আমাদের
দেশের মেয়েরা যে তার চেয়েও কত বেশী
অত্যাচার সহ্য করেছে তা’ ত তোমার
অজ্ঞাত নয় না। তুমি যে তাঁদেরই অংশ
লক্ষ্যগ্রহণ করেছে। তোমার মঙ্গল যে
অবশ্যস্তাবী।”

শুভ্রা কোনও কথা বলিল না। তাহার
ললকরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ধরার আবহাওয়ারকে
ব্যথার ভরিয়া তুলিল। দ্বিলীপবাবু তাহার
ভাবে দেখিয়া কিছুক্ষণ কোনও কথা বলিতে
পারিলেন না। ধরনের নিশ্চিন্ততার উত্তরেই
মনে মনে অন্তিম বোধ করিতে লাগিলেন।
অবশেষে দ্বিলীপবাবুই কথা কহিলেন ও
বলিলেন, “দেখ মা তোমার এই রকম একা
একা হোটেল গিয়ে কাজ করার যে
যথেষ্ট বিপদ আছে তা’ আগেও বলেছি
এখনও বলছি—এবং আমি যখন লম্বা
কথা জেনেছি তখন আমি পিতা হয়ে
তোমার সেই বিপদের মধ্যে যেতে বলব না।
সুতরাং আমি বলছি যে এইবার থেকে
লম্বা ভেতরে যাবে ও তুমি ও আমি দুই-
জনে আলাদা আলাদা গাড়ীতে বাইরে
বসে থাকব, সেই ঠিক হবে না কি মা?
তা’হলে বোধ হয় আমাদের সংবাদ
পাওয়ারও বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।”

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

(ক্রমশঃ)

ব্যর্থতা

জীজ্ঞ্যাসিতম্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাতের নির্মল আলো

যেখা দেখি কোথা লুকাইল

ধরলীরে করিয়া আঁধার।

গুড়ি গুড়ি জল পড়ে

এ যেন ধরার পড়ে

কাহাদের অশ্রু বেধনার ॥

জীবনে আজিকে কারা

ভোরে হ’ল পথহারা;

আধারেতে দিশা হারাইয়া,

যতদূর গিয়াছিল,

সেইখানে দাঁড়াইল

বন্ধে বন্ধ ব্যর্থতায় নিরা ॥

আমিও তারি একজন;

আজ ভোরে আধারে মগন,

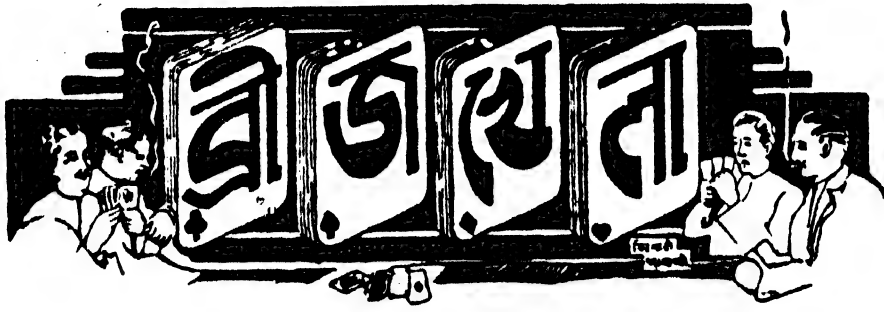
পথ তুলি দাঁড়াইয়া থাকি।

যাব যেখা ভেবেছি

সে আশারে ছেড়ে দিহু;

অভিমান ভেঙ্গে গেল আঁখি ॥

কিছুক্ষণ পরে শুভ্রা ষাড় নাড়িয়া সম্মতি
জানাইল। মাথা তুলিয়া বেওয়ালের দিকে
চাহিয়া ষাড়ি দেখিল বেলা তখন প্রায়
নট। সে পিতার নিকট অসুস্থতাই লইয়া
নিজ কক্ষান্তিমুখে চলিয়া গেল। দ্বিলীপ
বাবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিয়া
থাকিবার পরও অল্পবয়সে দেখা না পাইয়া
নিরাশচিত্তে একটা ট্যান্ডি ডাকিয়া গৃহান্তি-
মুখে বাজা করিলেন।



শ্রীচরিত্রা

প্রতিযোগিতার একটি

হাত—নিম্নে একটি হাত প্রস্তুত হল, যা থেকে অনায়াসে আপনারা বুঝতে পারবেন, যে যে সকল হাতে আপাতঃ-দৃষ্টিতে খেলা করা সম্ভব বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে অনেকগুলি একটু ভেবে চিন্তে খেললে খেলা করা সুসাহ্য হয়ে ওঠে। এই প্রতিযোগিতার হাতটিতে এক-পক্ষ ছয়টির ডাক দিয়ে খেলা করেছিলেন, অপরপক্ষ স্নান অবধি তো ডাকই দেন নাই, উপরন্তু বীরা স্নান ডেকে খেলা করেছিলেন তাঁদের খেলার দীর্ঘ সমালোচনার পর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে খেলা করা সে হাতে সম্ভবপর। হাতটি এইরূপ,

ইস্কাবন—নাহেব, ×, ×।

হরতন—×, ×, ×, ×।

কহিতন—নাহেব, ×।

চিড়িতন—টেকা, নাহেব, গোলাম, ×।

উ

ইস্কাবন—বিবি, ×, ×।

হরতন—টেকা, বিবি, গোলাম, ×, ×, ×।

কহিতন—টেকা, ×।

চিড়িতন—দশ, ×।

এই হাতে ডাক হয়েছিল,

‘ব’

একটি হরতন

দুইটি কেরাই

পাঁচটি কহিতন

পাশ

‘উ’

দুইটি চিড়িতন

চারটি কহিতন

ছয়টি হরতন

এই ডাকের বিষয় আমাদের কিছু বলবার নেই, কিন্তু খেলানোটি কিরূপ স্নানরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা নিম্নে লিপিবদ্ধ হল।

(১) ‘প’ ইস্কাবনের আটা খেলে প্রাথমিক চাল দেওয়ার ‘ব’ বিবি দিয়ে পিটখানি ধরলেন। ‘পু’ এই স্থলে ভেবে দেখলেন যে যদি তিনি ইস্কাবনের টেকা দিয়ে পিট ধরেন, তাহলে প্রতিপক্ষরা দুটি পিট পেয়ে যাচ্ছেন তাঁর খেঁড়ীর হাতে বিবি নাই।

(২ ও ৩) ‘ব’ পিট নিয়েই কহিতনের ছোট একতাল খেলে দিয়ে কহিতনের নাহেব দিয়ে ডামির হাতে পিট নিলেন এবং হরতনের দশ পেড়ে খেললেন। দশের ওপর ‘পু’র হরতনের নাহেব পেড়ে বাওয়ার টেকা দিয়ে ‘ব’ পিটখানি ধরলেন।

(৪) ‘ব’ হরতনের বিবি খেলার ‘পু’ হরতনের আটা, ‘উ’ হরতনের তিরি ও ‘পু’ ইস্কাবনের পাঞ্জা দিলেন।

(৫) এবার ‘ব’ চিড়িতনের দশ খেললে

‘প’

পাশ

পাশ

পাশ

পাশ

‘পু’

দুইটি ইস্কাবন

পাশ

পাশ

‘প’ চিড়িতনের পাঞ্জা, ‘উ’ টেকা ও ‘পু’ চিড়িতনের চোকা দিলেন।

(৬) ‘উ’র হরতনের নয়ের ওপর ‘পু’ ইস্কাবনের, দশ, ‘ব’ হরতনের ছয় ও ‘প’ কহিতনের চোকা দিলেন।

(৭) ‘উ’ এবার হরতনের পাঞ্জা খেললে ‘পু’ চিড়িতনের আটা, ‘ব’ হরতনের গোলাম ও ‘প’ কহিতনের পাঞ্জা দিলেন।

(৮) ‘ব’ হরতনের লাতা খেললেন; তাতে ‘প’ কহিতনের লাতা, ‘উ’ কহিতনের হকা ও ‘পু’ কহিতনের গোলাম দিলেন।

এই স্থলে লাধারণ খেলোয়াড়েরা চিড়িতনের কিনাল নেবার চেষ্টা করেন এবং তার জন্ত খেলারং দেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐরূপ না করে ‘ব’র মত খেললে অনায়াসে ‘পু’র হাতের বিভাগ কি রকম বুঝতে পারি এবং তার ফলে অতি সহজেই খেলারংএর হাত থেকে অব্যাহতি পাই। এক্ষণে ‘পু’র হাতের তাণের হিসাব করে দেখা যাক। দেখা যাচ্ছে যে তাঁর হাত থেকে তিনখানি ইস্কাবন, একখানি হরতন, দুইখানি কহিতন ও একখানি চিড়িতন খেলা হয়েছে; সুতরাং তাঁর হাতের বিভাগটি মোটামুটি ৫—১—৩—৪ বা ৫—১—৪—৩ এই ধরনের হওয়াই সম্ভবপর। তার পরের পিটগুলি দেখুন—

(৯) ‘ব’ হরতনের হকা খেলার ‘প’ ইস্কাবনের তিরি, ‘উ’ ইস্কাবনের নয় ও ‘পু’ কহিতনের বিবি দিলেন।

(১০) অতঃপর ‘ব’ কহিতনের টেকা পেড়ে খেললেন; ‘প’ দিলেন কহিতনের নয়, ‘উ’ ইস্কাবনের নাহেব ও ‘পু’ ইস্কাবনের গোলাম।

এবার দেখা যাচ্ছে ডাকদ্বারের খেলা কত সহজ হয়ে এসেছে। এখন ডাকদ্বার

৩

সেতি

৩

সত্যভাষী

৩

বঙ্গীণজের অর্কেষ্ট্রা বেশ শ্রতিমুগ্ধ হচ্ছে
কিন্তু তারকনাথ ঘের পাটি বাজার প্যাচ
হুক করেছে।

বহুদিন নিকট প্রণীত প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনের
পর এবারে আমরা কলিকাতা
বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামে কিছুটা
রাবিশের পরিবর্তন দেখেছি। নতুন
হিসেবে কিছু না থাকলেও কয়েকটি প্রোগ্রাম
বেশ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমাদের
আশঙ্কা, অচিরেই আবার দেখবো 'যে
তিমিরে সেই তিমিরেই'!

বিশেষ করে আমরা প্রশংসাবাদ জানাচ্ছি
বক্তৃতা বিভাগের কর্মকর্তা মি: মুখার্জীকে।
বক্তৃতা বিভাগের এবার বেশ কিছুটা লক্ষ্য
লাভন হয়েছে। বর্তমান সমাজের কয়েকটি
বিষয়ের আলোচনা এবার আমরা পেয়েছি।
মি: হুমায়ুন কবীরের সাহিত্য আলোচনা
সাহিত্য রসিকজনোচিত।

নটমুখ্য শিল্পী কুমারকে বক্তৃতার
আগের আমন্ত্রণ জানিয়ে বক্তৃতা বিভাগের
কর্মকর্তা প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয়
দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের জীবনী আলোচনা

যদি অনার্সালে ইন্সবনের পিট খানি 'পু'র
হাতে তুলে দেন, তা হলে 'পু' বাধ্য হয়ে
চিড়িতন খেলবেন, ফলে ফিনাশ না
'প'

ইন্সবন—x, x।

হরতন—x, x, x।

কহিতন—x, x, x, x,
x।

চিড়িতন—x, x, x।

ইতিপূর্বে হওয়া উচিত ছিল। তবুও
যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা আলোচিত হচ্ছে।

আমরা চাই বেতারে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা।
এবাবে মি: মুখার্জীর পরিবর্তন দেখছি
সেই দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে।

শ্রীযুত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ
লাল্যাল প্রভৃতির বক্তৃতার অন্ততঃ রসামুগ্ধতার
পরিচয় থাকবে একথা জোর গলাতেই
বলা চলে।

বেতারে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক
আলোচনা শুনতে আমরা চাই। সমাজের
নানা বিষয়ের নানা সমস্যা জীবনের বিভিন্ন
অনুভূতির প্রকাশ—নানা ব্যক্তিগত প্রতিঘাতের
বিকাশ চাই আমরা বেতারে বাণীর মাধ্যমে।
জাতীয়তা আজ আমাদের কোথায়?
ভারতীয় কৃষ্টি-শিক্ষার স্মৃতি পরিচিতি দিনের
পর দিন বেতার আমাদের দ্বিধা
যাবে এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

নিরো অনার্সালে আপনার ডাক অনুযায়ী
খেলা সম্পন্ন হবে।

পশ্চিম ও পূর্বের হাত দুখানি এইরূপ—

'পু'

ইন্সবন—টেকা, গোলাম, দশ,

x, x।

হরতন—নাহেব।

কহিতন—বিবি, গোলাম, x।

চিড়িতন—বিবি, নয়, x, x।

শ্রীযুত বীরেন ভট্টের পরিচালনার বেতাবে
এবার আমরা একখানি উচ্চাঙ্গের নাটকের
অভিনয় শুনেছি। "নিবেদিতা" এককথায়
সুন্দর। মি: ভট্টের অভিনয় রতিকাণ্ড—
উপভোগ্য তবে মাঝে মাঝে চীৎকার করণ-

ডাঃ প্রের বাল্যমুদ্র

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিশ্র ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়

ঔষধালায়

পাওয়া যায়।

কালীশ্রব

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিক্রেন—মনে যা আছে তা বললেই
হয়। বাধা কি আছে ?

কালী—বাধা। —বাধা আমি নিজে।

বিক্রেন—তুমি নিজে।

কালী—হ্যাঁ বিক্রেন। হেলো না।

একটা অলুর্ক স্তম্ভর ফুল ফুটে আছে আপন
গরিমায়। আমি তাকে নষ্ট কোরতে
চাইলেও—পারি না।

বিক্রেন—ফুল বহি ফুটে আছে আপন
গরিমায়, কেনই বা তুমি তাকে নষ্ট কোরতে
চাইবে ?

কালী—মাহুঘের স্বভাবের ঘোষে।
মাহুঘ শুধু ফল দেখেই তৃপ্ত হয় না ; দেখতে

পীড়াহারক। নিবেদিতার গান খানি
খার্ড-ক্লাশ।

* * *

১৪ই জুলাই, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার
লাল্য অস্থানে ৫-৩০ থেকে ৬-৩০ পর্যন্ত
শ্রীযুত কলী ওপ্ত ও তাঁর লক্ষ্যহার কর্তৃক
“বেশ” নাটিকা অভিনীত হ’ল। লেখক
শ্রীমিনর ঘোষ রচনার লাহিত্য রঙ্গপুট।
আশাকরি এইরকম শিক্কাফুলক নাটক
আমরা প্রায়ই বেতারে শুনেতে পাব।
ললীত পরিচালক শ্রীরবীন্দ্র রায়ের
সুরলংবোজনা লতিয়া প্রশংসনীয়। কুমারী
কণ্ঠরাগী ঘোষের গান বেশ শ্রুতিমধুর।
কুমারী রমা ওপ্তের অভিনয় বল্ল নয়।
আর আর অভিনয় বোটাটুকি ভালই।

চায় কোন মাটি থেকে তার উদ্ভব। বিচার
কোরতে চায় তার স্তম্ভর হওয়া লজ্জত কিনা।

বিক্রেন—তোমার আবছাওয়া কথা
বুঝলাম না। হয় পরিষ্কার কোরে বলো,
না হয় আমার যেতে দাও। দাঁদার কাছে
সুনীলা ছাড়া আর কেউ নেই।

কালী—না, আমি কিছু বলতে চাইনা।
তুমি যেতে পার।

(বিক্রেন প্রস্থানোত্তত)

কালী—একটা কথা বিক্রেন—

(বিক্রেন ফিরিল)

একটা তারী নিষ্ঠুর কথা জিজ্ঞাসা
কোরব, আমার জবাব দিতে হবে।

বিক্রেন—নিষ্ঠুর কথা। আমাকে সে
কথা জিজ্ঞেস না কোরলে হয় না ?

কালী—না তুমি ছাড়া আর কাউকে
সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি না।

বিক্রেন—দাঁদাকে ?

কালী—কাউকে না। শুধু পারি
তোমাকে।

বিক্রেন—বলো তা হলে, শুনি।

কালী—(এক বৃহত্তর তরু খাকিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন)

আমার বহি ধরো লহনা মৃত্যু হয়—

(বিক্রেন প্রস্থানোত্তত)

বিক্রেন আমার বা জানবার আছে তা
জানতে পারলাম না।

বিক্রেন—আমি জানতে পেরেছি, কিন্তু
এ কথার উত্তর আমি দিতে পারবো না।

কালী—তুমি জানতে পারনি বিক্রেন।
শুধু মৃত্যুর কথা আমি বলতে চাইনি। আমি
শুনতে চেয়েছি আমার মৃত্যুর পয়ের কথা।—
আমার মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বা
পারলো কি লম্বা কাজ কে কোরবে বিক্রেন ?
তুমি কোরবে ত’ ?.....

(বিক্রেনের প্রস্থান)

চলে গেল। শুনতে চায় না।

(যোগদারার প্রবেশ)

যোগদারা—পাগল ছাড়া এ কথা আর
কেউ শুনতে চাইবে না।

কালী—এই যে তুমি উঠেছ। খবর কি
তাই বলো ?

যোগদারা—তোমার ডাকছে। একবার
তার কাছে এলো।

কালী—না, —আমার বাবার দরকার
নেই।

যোগদারা—আজও এ কথা তুমি বলতে
পারলে ।

কালী—আমি বলছি বললাম। আর
কেউ হলে এ কথা বলতে পারতো না।
চক্ষুগজ্জার খাতিরে সে তোমার পরামর্শই
শুনতো।

যোগদারা—তোমার চক্ষুগজ্জাও কি নেই ?

কালী—ছিল, কিন্তু যেতে বসেছে।
বিলীপের চোখের উপর চোখ রেখে চোখের
লজ্জা ভেঙ্গে যেতে বসেছে। লভ্যতাবণ
উদ্গ্রীব হয়ে আছে তার লজ্জা। মিথ্যা,
ছলনা আর চলবে না।.....

যোগদারা—খাক ও লব কথা। তোমার
মাথার ঠিক নেই।

(প্রস্থানোত্তত)

কালী—হয়তো সে কথা লভ্য যোগদারা।
কিন্তু কেন, জানো ?

(যোগদারা ফিরিয়া দাঁড়াইল)

আমি আর পারছি না। তাই আমার
লব গোলমাল হয়ে বাচ্ছে। তার সুখের
বিকে চাইলে আমার কষ্ট হয়। —মনে

হয় সে সব বুঝতে পেরেছে, শুধু আমার মুখের কথা শোনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কোরে আছে।

যোগদাসা—যুঝতে পেরেছি। কিন্তু যে কথা সে ত্রিশ বৎসর শুনেতে পারি নি, আজ তার সে কথা না শুনেও চলবে। সুতরাং মিনতি করি, চুপ করে থাকো।

কাশী—কিন্তু তার দৃষ্টির টানে নত্যাভাব উৎস্রীৎ হয়ে আছে। নত্যাকার পরিচর তাকে পেতেই হবে, আমাকে দিতেই হবে। পরিত্রাণের পথ নেই যোগদাসা।

যোগদাসা—কিন্তু কি তুমি পাবে নত্যাকার পরিচর তাকে জানিয়ে দিয়ে— তার হিলেব রেখেছ?

কাশী—কিছুই পাবনা। হয়তো সব আমার হারিয়ে যাবে। সব। কিন্তু যুঝার পূর্বে জীবনের খাতাখানা পরিষ্কার রেখে যেতে চাই। আর কিছু চাইনা।

যোগদাসা—তুমি কি দিলীপকে সব কথা বলে দিতে চাও?

(বলিয়া বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রইলেন)

কাশী—সব কথা বলে দিতে চাই। সমাজকে আর ঠকিয়ে রাখতে চাইনা।

যোগদাসা—বেশ, বলে দিও। (প্রস্থানোক্ত)

কাশী—কিন্তু তুমি চলে যেতে পাবেনা। তোমার বেঁচে থাকতে হবে।

যোগদাসা—দিলীপের অন্তরী মা হ'রে বেঁচে থাকবো? দিলীপ এলে আমার জিজ্ঞাসা কোরবে “মা, এ নতি? আমি বলবো—”হ্যাঁ, এ নতি, তারপর আবার বেচেও থাকবো?

(এই বলিয়া যোগদাসা কঠিন দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া রহিল)

কাশী—যুঝা বহি কামনা করো, যুঝা আলতে বিলম্ব হবেনা। আহ্বান বহি করো, তোমার সঙ্গে আমিও নেই অজানা পুরীর মাঝখানে গিরে হাজির হতে পারি! —কিন্তু খাতাখানা পরিষ্কার রেখে যেতে চাই যোগদাসা, আর কিছু চাইনা। আজ লংবারের লোকেরা, ছেলে ঘেরেরা জানে আমি নিষ্ঠুর, নির্ধর। নিরপেক্ষতা বলে কোন বস্তু আমার ভেতর নেই। তার জন্য আমার না আছে ক্রোধ, না আছে ক্ষোভ।—কিন্তু মানুষকে ঠকিয়ে আর আমি সমাজের ভেতর থাকতে চাইনা। তুমি বা কোরেছ, বা, আমি বা করেছি তা আমাদের ভেতরই নিবদ্ধ থাকলে কথা ছিলনা; কিন্তু—

যোগদাসা—কিন্তু?

কাশী—কিন্তু যে রক্তপ্রবাহকে আমি অবৈধ বলে জানি, তাকে আমার বংশের দ্বারা সঙ্গে কি কোরে মিশিয়ে দিতে পারি? যে মিথ্যাকে আমি ইহলোকে স্বীকার কোরে নিলাম, পরলোকে তাকে স্বীকার করা যাবেনা। সেখান থেকে আমার চেয়ে থাকতে হবে দ্বিজেনের হাত ছটির দিকে! দিলীপ আমার তখন পরিতৃপ্ত কোরতে পারবেনা যোগদাসা; পারবে শুধু ঐ দ্বিজেন!

যোগদাসা—এতো যদি বুঝেছিলে, তবে সেদিন কেন আমার কথা কোরেছিলে যে দিন তোমার কাছে আমি প্রথম এলাম? সেদিন কেন তুমি আমার লাহিত কোরে ঘরের বাইরে বার কোরে দাওনি? ঘেহের আবারণ দিয়ে কেন তুমি আমার এই কলঙ্কের সূচক চেকে রেখে দিতে চাইলে?

কাশী—কলঙ্কের জন্য এক নারীকে সমাজের বাইরে ছুড়ে ফেলে দিতে আমার মন চায়নি সে দিন। তা ছাড়া, যে কাহিনী তুমি আমার কাছে সে রাজ্যে উদ্ঘাটিত কোরেছিলে তাতে আমি স্কন্ধ হ'তে পারিনি, বরং আমার বিশ্বাস লেগেছিল তোমার অন্তরের নির্মলতায়। যৌবনের মহিমার আমি সেদিন তোমার হয়তো অন্তরী বলেও ভাবতে পারিনি—আজও হয়তো ভাবিনা—কিন্তু পৃথিবীর অভিজ্ঞতা আমার স্কন্ধ, লক্ষণ কোরে এনেছে। আজ আর আমি সে কাশীখর নই যোগদাসা! যে লাহুর লজ্জানকে আজ এই ত্রিশ বৎসর— কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

(দিলীপের প্রবেশ)

যোগদাসা—দিলীপ! দিলীপ দাঁড়িয়ে!

(দুহুর্ভকাল হতবুদ্ধির মত অবস্থান করিয়া ক্রত প্রস্থান করিল)

কাশী—দিলীপ তুমি কতোক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে আছো?

দিলীপ—যেখান থেকে আপনি দিলীপকে সব কথা বলে দিতে চেয়েছেন সেইখান থেকেই আমি আছি।

কাশী—না, না,—আমি কিছু বলতে চাইনি। সব মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা—

(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)



ইন্দিবিমাল

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

আগামী ছবির কথা

বর্তমান সভ্যতা আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

প্রশ্নের জবাব নানাজন নানাপ্রকার দিবে। তাহার মধ্য হইতে ঠিক জবাব কি হইবে, তাহা বাহিরী লগ্নী হইতে আমাদের পক্ষে লক্ষ্য না হইতেও পারে। একদল হইতে বলিবেন—বর্তমান সভ্যতার মাঝে বাস করিতে হইলে আমাদের মনের লক্ষ্য প্রকাশ চলিবে না। সমাজ কি চায়, সভ্যতা কি চায়, লোক কি চায় এই সব বিষয় ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে। আর একদল বলিবেন যে সভ্যতা বা সমাজ বাহ্যিক হউক—মাতৃব নিজে লক্ষ্য প্রস্তুতি এবং ইচ্ছার মতেই চলিবে। মনের ভাব প্রকাশে তাহার কোন বাধা মানিবার প্রয়োজন নাই। এই দুইয়ের মধ্যে কোন পথ সত্য, কোন পথ প্রশ্রয় তাহা বলা শক্ত, দুইদলের মনের মিল হওয়া আরো শক্ত। ‘অধিকার’ চিত্রেও ঠিক এই রকম একটি প্রশ্ন আছে। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া কেমন করিয়া কোন পথে যে তাহার সমাধান দেখাইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে সমস্ত সমাধান তিনি যেমন ভাবেই দেখান—তাহার কারণও তিনি আমাদের অবশ্যই দেখাইবেন, এ আশা আমরা করিতে পারি। আলোচ্য চিত্রে বর্তমান সমাজের সম্পর্কে আরো নানাপ্রকার প্রশ্ন আছে—প্রশ্নের জবাবও আছে। ক্রমে ক্রমে আমরা সেই সব পাঠকসহোদয়গণের গোচরে আনিব।

পাইবার, নূতন কিছু দেখিবার আশা করিয়া আছেন। তাহাদের এই আশা যে পার্থক্য হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। যে কাহিনী, যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া দেশের মাটির আখ্যানভাগ রচিত হইয়াছে, তাহা পরম মনোহর একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের দেশে বর্তমান অসমসত্ত্বা ক্রমশই ভীষণতর হইতেছে। এই সমস্ত সমাধান কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে, দেশের মাটি চিত্রে তাহারই সামান্য কিছু দেখানো হইবে। দেশে কর্মশক্তির অভাব নাই, কাজ করিবার লোকেরও অভাব নাই, অভাব কেবল পথ দেখাইবার লোকের। এমন পথপ্রদর্শক আমাদের এখন প্রয়োজন, যাহারা সত্য পথই দেখাইবেন। দেশের দুঃখ মোচনের হইতে নানা পথ, নানা পদ্ধতি আছে, কিন্তু আমাদের তাহার মধ্য হইতে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রকৃষ্ট পথই আশ্রয় করিতে হইবে। দেশের মাটি চিত্রে এই ইঙ্গিত আছে। দেশের মাটি চিত্রখানি শীঘ্রই চিত্রায় সুকলিত করিবে। সুতরাং এই ছবির বিষয় বর্তমানে অধিক বলার কোন প্রয়োজন নাই। এই চিত্রখানি তুলিতে নিউ থিয়েটার যে ভাবে তাহার সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছে, তাহাতে এই চিত্রের বাণী, ইহার আশার কথা, নবকর্মপ্রেরণার ইজিত সকল বর্ষকচিত্তে নবতর আনন্দ লক্ষ্য করিবে—এ আশা আমাদের দুরাশা নহে। ইহা পার্থক্য হইবেই।

বাহিরে কতকগুলি লোকেশন খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। এইবার এই সকল লোকেশনে কাজ হইবে। আলোচ্য ছবিতে লগ্নী-বাহিরের দিকটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। আমাদের মনে হয় পূর্বে সুর-সম্পদে পূর্ণ এমন ছবি খুব বেশী হয় নাই। যে চিত্রের নায়ক নায়িকা এবং নায়িকা কানন, সে চিত্রে যে লগ্নীতে কেমন-তর হইবে, তাহা বোধ হয় আমাদের পাঠকগণকে বেশী বলিবার প্রয়োজন হইবে না। এই চিত্রের কাহিনীও অতি বিচিত্র, এবং তাহা পাঠকবর্গের অনেকেই জানেন। বর্তমানের এই চিত্রের নায়ক-নায়িকার জীবনে বিচিত্র ঝড় উঠিয়াছে। বিখ্যাত এবং অবিখ্যাত, প্রেম এবং লস্কর এই সকল প্রণয়ীযুগলের মনে এক অতি বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। বাহারী বাল্যকাল হইতে পরম্পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে, আজ কেন সেই আশ্রয় ত্যাগে তাহাদের লক্ষ্য জাগিয়াছে? বাহির জগতের হোঁচ-লাগিয়া আজ তাহাদের অন্তরের এ-পরিবর্তন কেন দেখা যাইতেছে? নায়িকা ও কানন দুইজনেই এই বিচিত্র মানসিক অবস্থার রূপ চিত্রে যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গত পট্টাছে এই দুইজন প্রখ্যাত শিল্পীর করেকটি লগ্নীত স্তম্ভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। এ লগ্নীতের ভাষা নূতন, ভাব নূতন, সুর নূতন—ইহা একেবারে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। মনে হইল রাষ্ট্রটাই বড়াল যেন নিজের অন্তরে লগ্নীত দেবতার নব-আবির্ভাব অনুভব করিয়াছেন। সুর-শিল্পী হিসাবে রাইবাবুর অধীতর স্থান এই চিত্রে আবার প্রমাণিত হইবেই।

‘দেশের মাটি’ ছবিখানি লইয়া ভারতের সর্বত্র নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। সকলেই এই চিত্রে নূতন কিছু

কল্যাণের দীর্ঘ পিঙ্গার প্রায় অর্ধেক শব্দ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে কল্যাণ

খেয়ালী চিত্রপট



নিউ থিয়েটার্সের “অধিকার” চিত্রে যমুনা,
বভুয়া, মেনকা। পরিচালক প্রমথেশ বভুয়া।



পরিচালক
আশমাল নিউজপেপার লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ত্রিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, ২৮শে জুলাই ১৯৩৮

স্বরূপ ফুটিল

কর্পোরেশনের আগামী নির্বাচন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির উপর পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় সশস্ত্র নিরপেক্ষতার আবেগ ভেদ করিয়া প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা প্রীত হইয়াছি যে কিরণবাবুর কষ্ট-সংরক্ষিত মুখোশ সত্তর খসিয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত বিরোধিতাকে নিরপেক্ষতার আবেগে পোষণ করিয়া কিরণবাবু রাষ্ট্রপতিকে যে বিভ্রান্ত করিবার যত্নসম্মত করিতেছিলেন তাঁহার সেই সমস্ত-প্রসারিত ষড়যন্ত্রের আল ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া বাংলা কংগ্রেসের হিতকামী ব্যক্তিগণেই আশস্ত হইবেন।

নিরপেক্ষতার অজুহাতে ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্ট টাইবুন্সালের এ্যাসেসার পদটি লাভ করিয়া তাহার পর প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা কল্লিবার গোপন বাসনা কিরণবাবু মনের কোণে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহক সমিতির বিগত অধিবেশনে সভাপতির উপর সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করার

প্রস্তাবে কিরণবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ পরিহার করিয়া কেলিলেন।

কিরণবাবুর তন্নিহাররূপে বহু চিহ্নিত ব্যক্তিই সভাপতির উপর পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার নলিনী-বিধান-কিরণের "অস্তরঙ্গ" সংবাদপত্র "অমৃতবাজার", বিধানের কণা-পুষ্ঠ "করওয়ার্ড" ও বিধান-শিখ্য-প্রতিপালিত "যুগান্তর" সমন্বয়ে এই প্রস্তাবকে "অশোভন ও অসঙ্গত" বলিয়া প্রচার করিতে সুরু করিয়াছেন।

স্বাভাবিক কংগ্রেসে যে বিশ্বাস্যতা দেখা দিয়াছে তাহাতে বর্তমান মুহূর্তে ডিক্টেটরী শাসনের উপযোগীতা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। গণদেবতার নামে যখন ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতজনিত কলকোলাহল তাণ্ডবতার পরিণত হয় তখন সর্বযুগে সর্বদেশে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। আদর্শচ্যুত কংগ্রেসীকর্মীদের বিভিন্ন স্বার্থের ইন্ধন যোগাইতেছেন কংগ্রেস-বিরোধী বিতর্কালী ব্যক্তি বিশেষ ও তাঁহার স্নেহবদ্ধ ছদ্মবেশী কংগ্রেসী-নেতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ। গণতন্ত্রের আদর্শ যখন ভাগ্যান্বেষীর কবলে নিবদ্ধ তখন সেই আদর্শকে পরিপূর্ণ দীপ্তিতে কিরাইরা আনিবার জন্ত প্রয়োজন হয় শক্তিশ্রম নেতৃত্বের কঠোর একনায়কত্ব। বাক্য-বিঘ্নাসের মোহমন্ড্রে বা চুক্তির বেড়াঝালে বাংলা কংগ্রেসে গণতন্ত্রের আদর্শকে সন্নিবেশিত করিবার মোহনীয় চেষ্টা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে কিন্তু কলে দেখা গিয়াছে যে কিছু কালের জন্ত চাপা দেওয়া স্বার্থ-দুষ্ট কলহ পুনঃ পুনঃ উগ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে বিগত কর্পোরেশনের নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতির মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্রের উপর অনুরূপ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও ফল কলে নাই। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, শরৎচন্দ্র সে ক্ষমতার সন্মত ব্যবহার করিতে পারেন নাই—বিলম্ব-মোহ-মুগ্ধ

শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক বিচক্ষণতার ও দূরদৃষ্টির অভাবে যে সমস্ত ব্যক্তি মনোমগ্ন লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা যে অদূরভবিষ্যতে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহা তিনি বুঝেন নাই। যাঁহাদের তিনি মনোমগ্ননের ছাপ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেই যে ছদ্মবেশী বিধান-পত্নী বিজয়ান ছিলেন তাহা তিনি তখনও বুঝিয়া বুঝেন নাই। তবে শরৎচন্দ্রের পক্ষে

যাহা হয়ত অসম্ভব সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তাহা নহে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুভাষাঃ শরৎচন্দ্রের ব্যর্থতার মজীরে সুভাষচন্দ্রের উপর ক্ষমতা অর্পণের জন্য কুণ্ঠাবোধ করা সমীচীন নহে।

সুভাষচন্দ্রের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে আমরা ভরসা রাখি তাহা তিনি সুচারুরূপে পালন করিতে সক্ষম হইবেন।

সাহিত্যের কষ্টি পাথর অশনি

মুগী-মার্কা সাহিত্যিকদের কারসাজি

শনি—পাপগ্রহ। রবির মতান হইলেও সে রবি-বিষেবী। পিতৃ-নিন্দার তাহার অপার আনন্দ! শ্রীর সঙ্গে তাহার চির বিরোধ। শিবও শনির চক্ষু-শূল! মঙ্গলের রূপ সে লহিতে পারে না; তাই তাহার চক্ষে চির আবরণ! সুভাষাঃ সাহিত্যের ঘরে—বেখানে লতা, শিব ও অশ্বরের লম্বাবেশ—নেখানে বহি শনি দেখা দেয়, তবে সেটাকে “গুরু-চণ্ডাল-যোগ” বলিতে হইবে। এই যোগ সাহিত্যের পক্ষে লাংঘাতিক। সাহিত্য-মন্দিরে শনির পাপ-অমৃতের প্রাণে সূচ হইয়া ঢোকে, তার-পর কাল হইয়া বাহির হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য বেশী দূর কাহাকেও বাইতে হইবে না। বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিবহ ও সাহিত্য-ক্ষেত্রের প্রতি একটু তাকাইয়া দেখিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ উত্তর স্থানেই কয়েকটা সূচ কাল হইবার জন্য ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তবে ইহাদের মধ্যে লক্ষ্যেই যে লম্বান তাহা লক্ষ্যে ফুলিতেছে, তাহা নহে। বরং বলা যায়, কেহ কেহ কুণ্ঠ-মণ্ডকের

ভার ফুলিতে ফুলিতে কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঢাকার নরস্বন্দকে বাহারা জানেন, তাঁহারা আশ্বাহের কথার দার দিবেন। তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই নরস্বন্দটি নিজে লতা-অশ্বরের দাল বলিয়া বতই ঘোষণা করুক—ডাক ডাকিবার সময়ে তাহার মুগী-মুগীই প্রকট হয়। তাহার এই কয় ছত্র “সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাহাদের স্থান নাই বলিলে হয়, বাহারা মুগীত শিবের যুকে উলঙ্গী কালীর মত, বাংলার এই আধুনিক বিভা-বুদ্ধি, চরিত্র ও পৌরুষহীন পুরুষ-সমাজের যুকে নিঃস্বভাবে নৃত্য করিতেছে, শরচ্চ হইয়াছেন তাহাদের দরদী প্রাণ-পথা।” —(শনিবারের চিঠি)—বহি পাত্রী নাহেবেরা পড়েন, তাহা হইলে তাঁহারা শরচ্চ লক্ষ্যে কি তাবিবেন, জানি না; তবে এই লেখকের মধ্যে তাঁহারা বর্জমানের James Stewart বিনি হিন্দু “দেব-দেবী বিবরণ বিবরণ” লিখিয়া বহুদিন ‘হইল মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্বাহ প্রবল প্রেরণা দেখিতে পাইয়া যে পরম পুলকিত

হইবেন, সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। আর বাহারা বলেন—“নিবিড় আঁধারে মাগো চমকে অরূপ রাশি”—তাঁহারা ঐ কুণ্ঠিত উপমা দেখিয়া লেখককে লজ্জা দিবার বা ঘৃণা করিবার মতন ঠিক তাহা বোধ হয় খুজিয়া পাইবেন না। বাহা হটক, একটা লাঞ্ছনার কথা এই যে, এই অদভ্য অশ্বরের দালের বত কিছু nonsense, তাহা এক মুগী-মার্কা “শনিবারের চিঠি” ছাড়া আর কোথাও এপর্যন্ত ছাপার অক্ষরে জাহির হয় নাই।

তবে ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না। কারণ, পার্শ্বাঙ্গানের সেই উড়ে মালীই বজীর-সাহিত্য-পরিবহের এখন প্রধান মুকুর্নি! পরিবহে রাধেন্দ্র-যতীন্দ্র নাই। অশ্বেশ-পাটেকড়িও নাই। কাগেই পরিবহের পরদার যে আবর্জনারাশি ছাপাইয়া এই গৌরব-গবেষক তাহার প্রভু-প্রবাসীর ও তাহার প্রাণ-মঙ্গলীর ছাপা-খানার প্রাণে যে আনন্দ লক্ষ্য করিতেছে, তাহাতে বাহা বিবে কে? কি শুণে যে ইহার “বজীর নাট্যশালার ইতিহাস” “সাহিত্য-পরিবহ-গ্রন্থাবলী”র অন্তর্ভুক্ত হইল, তাহা কে বলিবে? এই পুস্তকে বাঙ্গালার অভিনয়-পদ্ধতি লব্ধে কোনও কথা নাই, বাঙ্গালার নাটকের কোনও আলোচনা নাই, —ধাকিবার মধ্যে আছে কেবল কতকগুলি কুল সংবাদ ও ভীষণ গ্লিগল-বিবরণ।

আগামী বারে এই গ্রন্থের পরিচয় আমরা দিব; তা' ছাড়া এই লেখকের ভাবার মধ্যে কত রকম যে সুজীরানা আছে, কত লেখকের ভাষা যে উঁকি মারিতেছে, তাহারও বিবরণ ক্রমে ক্রমে দিব। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, বঙ্কিম-নাহিত্যও যে এই অপগণ্ডের হাতে পড়িয়া নাস্তা-নাশুব হইবার আরোজন হইয়াছে, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন না। যে ব্যক্তি “শনিবারের চিঠির” “লভ্যস্বপ্নের দ্বন্দ্ব”, সেই ব্যক্তিই ইহাও “বঙ্গী প্রাণলতা”। সুতরাং শুনিতেছি, তাহারও লিখিত ‘ভূমিকা’ পরিবর্তন হইতে মুদ্রিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। ইহা অপেক্ষা বঙ্কিমের অনসন্ধান আর কি হইতে পারে? শনিবারের চিঠিতে এই লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের যেরূপ প্রাক্ক করিয়াছে তাহা তাহার দ্বারা সুশীলের লেখাকেও টেকা দিতে পারে। এই জঘন্য রচনার পরিচয়ও আগামী সংখ্যার ‘খেরালীতে’ আমাদের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আলল কথা এই যে, বঙ্কিমের শতভিন্ন জন্ম-বাবিকী উপলক্ষে বঙ্কিম-নাহিত্য কি এই সুগী-মার্কী নাহিত্যিকের কবলে পড়িয়া কলঙ্কিত ও লঙ্ঘিত হইবে? হীরেন্দ্রবাবু এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাকেই আমরা অভ্যর্থনা করিতেছি, তিনি এই পাপ বাহাতে প্রসন্ন না পান, তাহার উপায় করেন। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গিয়াছিল। শনির পাপ-অভ্যুত্থানের বঙ্গনাহিত্যের গণেশ-রূপী বিভাগগরের কি হুর্দশা করিয়াছে, তাহার কথাও আলোচনার বিষয়। সে আলোচনা পরে হইবে। কিন্তু সম্প্রতি। বঙ্কিম-নাহিত্যের জন্মই আমরা উদ্ভিন্ন বঙ্কিমের বাহারা তাহা জানে না, তা'দ যথেষ্ট না, তাহার দ্বি-বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সম্পাদক হয়, তবে সেটা শুধু বঙ্কিমের

হুর্দশা নয়, বাঙ্গালীর ও বঙ্গনাহিত্যেরও পরম হুর্দশা মনে করিতে হইবে।

* * *

নাহিত্য-সংসারে শনির কার্যনাশি ক্রমশই ধরা পড়িতেছে। নির্জলা নীচতা কতদিন ঢাকা থাকে? ইহাও আশঙ্কিত ও বাচালতা বাহারা এতদিন উপেক্ষা চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারও আর নীরব থাকা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন না। যেখানে উপেক্ষা করার নাম পাপের প্রসার দেওয়া, সেখানে উপেক্ষা উৎসাহ নহে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বে উদ্ভটনাগরের দ্বারা প্রণীত ব্যক্তি ইহাও অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া ইহাও নীচতাটুকু বেশ ধরাইয়া দিয়াছেন। গত মাসের “আনন্দবাজার পত্রিকার” তাঁহার যে স্থলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার কিয়ৎংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“মহাশয়,—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-তারিখ সম্পর্কে “আনন্দবাজারে” ৩রা জুলাই তারিখে প্রেরিত এবং ১২ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত আমার পত্রের উত্তরে ১৪ই জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত লজনীকান্ত দাস মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রে আমার প্রতি লজনীবাবু ঋণ এবং বক্রোক্তিক্তি লিখিবার দ্বারা মোট বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, বঙ্কিমবাবুর জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল তিনিই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমি তাঁহারই কৃতিত্ব আশ্রয় করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছি। এমন কি আমাকে উপলক্ষ করিয়া ‘আনন্দবাজার’ সম্পাদকের প্রতিও তিনি অকারণ বক্রোক্তিক্তি করিতে ছাড়েন না। এ বিষয়ে আমার একটু বক্তব্য আছে :—

(১) লজনীবাবু বলিতেছেন, তিনিই লক্ষ্যপ্রথম ৩রা জুলাই তারিখের চন্দ্রনগরে বঙ্কিম দ্বি-সত্য এই ভুলের উল্লেখ করেন।

আমার নিবেদন এই, আমি ১লা জুলাই তারিখে “অমৃতবাজার পত্রিকার” প্রকাশিত এক পত্রে এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মাত্র তাহাই নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের কোষ্ঠী হইতে প্রাপ্ত প্রকৃত জন্ম-তারিখও তাহাতে প্রকাশ করি। আশা করি, ইহার পর লজনীবাবু আশ্বস্ত হইতে পারিবেন যে, আমার এই বুদ্ধ বরণে কাহারও কৃতিত্ব আশ্রয় করি নাই।

(২) লজনীবাবু বলিতেছেন, “৩ই জুলাই আনন্দবাজারে আমিই লক্ষ্য-প্রথম এই বিষয় লিখি।” আমার নিবেদন এই, তাঁহার লিখিবার ৩ দিন পূর্বে আমার পত্র আনন্দবাজারে প্রেরিত হইয়াছিল আমার দৌতাগ্যক্রমে লিখিবার তারিখটিও (৩-৭-৩৮) পত্রের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল। লজনীবাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই; করিলে তাঁহাকে অকারণে মনোঃকষ্ট পাইতে হইত না।

(৩) নিজ-সম্পাদিত “শনিবারের চিঠির” ভুলের দাফাই করিবার জন্য লজনী-বাবু বলিতেছেন, বঙ্কিমের জন্মতারিখের ভুল “বিগত ১০০ বৎসরের ভুল।” ইহা অসম্ভব কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে নিশ্চিতই কেহ তাঁহার জন্ম-তারিখ লইয় ভুল করিতে লাজপ করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার কোষ্ঠী রহিয়াছে। ১৮৯৪ সালে তাঁহার মৃত্যুর পরে যে দিন হইতে অতিরিক্ত উৎসাহী গবেষকগণ এই কার্যে হাত দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই ভুলের সূত্রপাত। ইহা বড় জোর ২০।২৫ বৎসরের ভুল হইতে পারে। লজনীবাবু “নাহিত্য পরিবর্তে” বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সম্পাদক। “পরিবর্তে” প্রবর্তনীতে বঙ্কিমবাবুর কোষ্ঠী লক্ষ্যপ্রণে তাঁহারই নজরে পড়া উচিত ছিল। উহা যে অগ্রে আমারই নজরে পড়িয়াছে, ইহা নিশ্চিতই আমার অপরাধ নহে।”

কিন্তু উদ্ভটলাগর বহাশর তুলিয়া বাইতেছেন—অপরূপ তাঁহারই বোলআন, বেহেতু তিনি শরির কারলাজি এমন সুচারু-রূপে ধরাইরা দিরাছেন।

অতঃপর “বঙ্গবানী”-র জার প্রাচীন ও নিরপেক্ষ পত্র অপর এক শৈলীর লব্ধকে কি বলিতেছেন, তাহাও শুনিয়া রাখুন। গত মণ্ডাধের “বঙ্গবানী” লিখিতেছেন :— “ভাল জিনিষের আদর হইতে দেখিলে, কাহার না আনন্দ হয়? কিন্তু হরত আমাধের এ কথা বলা লক্ষ্যার্থে ঠিক হইল না। কারণ, প্রাচ্যের ‘প্রবানী’তে ‘বঙ্কিম-পরিচয়’র যে লক্ষণ লম্বালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া মনে হইল যে, ঐ লম্বালোচনা-লেখক ত্রিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ততঃ আনন্দ হয় নাই। পরন্তু তাঁহার লেখাটি গভীর উদ্দেশ্যমূলক বলিয়াই মনে হয়। তিনি মূল পুস্তকের কোনও ভগ্নই দেখিতে পান নাই, কেবল পরিশিষ্টেরই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ-শেষে নিবিষ্ট পরিশিষ্টের করখানা পাতার কোণায় কি তারিখের লামাজ ইত্যবিশেষ আছে, তাহাই ইহার আলোচনার বিষয় হইয়াছে। অবশ্য আমরাও লক্ষ্য করিয়াছি, তারিখ লব্ধে ছই একটি মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে বটে। বাকি ভুল, বাহা ত্রিজেন্দ্রনাথ অতি উন্নতের লহিত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লভাই ভুল কিনা, তাহা এখনও বিচারনাপেক্ষ।

লম্বালোচক প্রথমেই লিখিয়াছেন— “বঙ্কিম-জন্ম শতবার্ষিক” (?) উপলক্ষে যে কয়েকটি স্থানী কালের চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক বঙ্কিমের সম্পূর্ণ রচনাবলীর একটি প্রাথমিক সংকলন প্রকাশ-চেষ্টা উল্লেখযোগ্য।” ত্রিজেন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষদের অবৈতনিক কর্মচারী কিনা, জানি

না। তবে পরিষৎ কর্তৃক বঙ্কিমের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের সম্পাদনতার বাহাদুর উপর অর্পিত হইয়াছে, তিনিও তাঁহারের মধ্যে একজন। অতএব তাঁহার লম্বালোচনার প্রান্তেই সাহিত্য-পরিষদের ঐ প্রচেষ্টার চক্ষানিধা করা, তাঁহার আশ্রয়লারই নামান্তর হইয়াছে।”

কিন্তু এক লক্ষ্য পরিহার করিয়া ত্রিজেন্দ্র-বিজ্ঞানী হইবার স্পর্ধা করা বাহাদুরের স্বভাব, “বঙ্গবানী” তাহারের কতটুকু লক্ষ্য দিতে পারেন। আমরা শুধু তাবিত্তি এই অতিকার নির্লজ্জতা ত্রিজেন্দ্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “প্রবানী”তে বাহির হইল কিরূপে? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাকে ছোট করা এবং সাহিত্য-পরিষদের প্রাণাধার ত্রিজেন্দ্র কর্তৃক ত্রিজেন্দ্র-কীর্তীর চক্ষানিধা করা—ইহা কি পাকা ব্যবসায়ীদের কাজ নহে? ভৃত্য কি মনিবের নিকট এতটুকু লব্ধ লিখাও লাভ করেন নাই? আমাধের মনে হয় রামানন্দবাবু গভীর উদ্দেশ্য-মূলক তথা বিবেচ-প্রসূত এই লম্বালোচনা প্রকাশের কথা পূর্বে জানিতে পারেন নাই; তাহা হইলে, কখনই তিনি এই অপকর্মের ভাগী হইতেন না।

স্বাত্ত্ব বঙ্গ ৪৫ মাস যে কারণেই হউক তৈরবী বনোধ্যিতে অব্যর্থ বল—গভাবহার ব্যবহার নিবিষ্ট ১৪-০ দস্ত ও বর্ণ লাভি একবার প্রয়োগেই উপলব্ধ, ১০ বা: ১৮-০ আনা



সময় ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস অনন্ড বিশ্ণুরদ ১৮২ নং বহুগাজার স্ট্রীট, মু কলিকাতা।



প্ররোগ শিল্পী : জ্যোতিষ ব্যানার্জি
আলোক-চিত্র-শিল্পী : স্বতীন দাস
শব্দ-বস্ত্র : নুপেন পাল, ভূপেন ঘোষ

ছবিগ্রহ : রাণীবালা, দেববালা, ছায়া, মরেশ মিত্র, অরুণ পাণ্ডুলী, হুম্মিল রায়, অমথ পাল (ইচ্ছা বাবু), কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়।



গোপন সাধ

শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, কবিত্বশ্রী



ধূলি হয়ে রইব পড়ে' তোমার পথের মাঝে
বলে বেগ চরণ তলে আঁধার মলিন সাঁঝে।
পেরে তোমার মধুর পরশ
জ্বরে মোর জাগবে হৃদয়
জীবন আমার লফল হবে অ'নন্দে ও লাজে :
আঁধারতলে মোদের গোপন-মিলন বাঁধী বাজে।
২
আমি ছব তোমার হাতের পাগলকরা বাঁধী,
দিনের শেষে করবে পরশ লকল ব্যথা নাপি,
দুঃখ আমার রইবে দূরে
তোমার করুণ মিলন সুরে
তোমার হাতের মধুর পরশ বাধবে আমার আদি,
আঁধার করে চুম্বে আমার হেলে প্রেমের হাদি।

নিউ থিয়েটার্সের নবতম অর্ঘ্য
“অভিজ্ঞান”এর গান
শ্রীমতী মলিনা

J. N. G. { রূপ কথারই রাজ্য এঁদে.....‘অভিজ্ঞান’
5286 { ছিল নাখী মোর.....‘অর্কট্টা-ললিত’

মিস কমলা (ঝরিনা)

J. N. G. { মালা বধি দিলে ভুলে.....‘অভিজ্ঞান’
5276 { তোমার কাছে চাইতে বঁধু.....‘অভিজ্ঞান’

এই গানগুলি “অভিজ্ঞান” চিত্রের প্রান্তে
সম্পদ। আজই নিউ থিয়েটার্স-মেগাফোন
রেকর্ডে শুনুন।

মূল্য ২৫০ আনা প্রত্যেকখানি
মেগাফোন : কলিকাতা

N. I. P.

নেতৌপলিটান

পিকচার্সের

নবতম অর্ঘ্য

খনা

প্রাচীন ভারতের বিদূষী মহিলাগণের মধ্যে গার্গী
লীলাবতী ও খনার নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ—
ইহাদের মধ্যে খনার জীবন কাহিনী যেমন
হৃদয়গ্রাহী তেমনই মর্মস্পর্শী—
জ্যোতিষ বিজ্ঞান স্বীয় পারদর্শীতার জন্য ভদীয়া
ঋশি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম
রত্ন জ্যোতির্বাণব বরাহের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি
মান হইতেছে দেখিয়া খনা আপন জীবন
বিসর্জন করেন।

নাম ভূমিকায় : ছায়া দেবী
বরাহ : শ্রীযুত অশীষ চৌধুরী

খনা

আপনাকে প্রাচীন ভারতের সাধনা ও কৃষ্টির
পরিচয় দিবে।

পরিচালক :

শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-পরিবেশক—

কপুরচাঁদ লিমিটেড

প্যারাডাইস থিয়েটার, কলিকাতা

চেম্বারলেন এবং মধ্য ইউরোপ

বলকানে ব্রিটিশ প্রভাব

সচী শীল

ভাবে নি। আমি তাই একটি প্রবন্ধে
অজনিগ নাহেবকে ঘোষ দিয়ে বলেছিলাম :

“Driven by hatred of democracy at home, Schuschnigg made friends with Fascism abroad, and nestling between Berlin and Rome he at last found himself in the melting Pot.”

Economic factor গুলো এখন ক্যানিট-বিরোধী কাজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মধ্য ইউরোপের State গুলি যে ইংরেজের শরণাপন্ন হয়েছে—এ তারই প্রমাণ। কমানিস্টের লগে জার্মানীর creditor-debtor লবন্ধ। জার্মানী টাকা দিয়ে ধার তুলতে না পেরে শেষকালে কামান-বন্দুক দিয়ে পাঠিয়েছিল এবং কমানিস্টকে তাই নিয়েই লড়াই হতে হয়েছিল। এরকমও আর বেশীদিন চলতে পারে না। হিটলারও bankrupt, মুনোনিও তাই। এখন মুনোনিও খুব চেষ্টা করছেন যাতে Anglo-Italian Pact খুব শীঘ্র implemented হয়, কারণ British Loan তার বিশেষ স্বরকার। Anschluss-এর Lesson-এর কথা হেঁড়ে দিলেও এখন Economic consideration Pro-fascist Central European State গুলোকে বাধ্য করছে অর্থশালী Democracy-র দিকে ত্র্যাকতে। Mr. Vernon Bartlett “World Review” পক্ষে একটি প্রবন্ধে ব্রিটেনের এই সুযোগ লবন্ধে আলোচনা করে বলছেন :

“If Whitehall cares to play them, it still has most of the trump

দম্পতি বলকান রাজ্যগুলিতে ব্রিটেন নিজের প্রভাব বাড়ানোর খুব চেষ্টা করেছে। টারকীকে এর মধ্যেই পে হাত করে কেলছে এবং একটি বড় রকমের Loan দিয়ে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি করে নিয়েছে। কমানিস্টের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ইংলণ্ডে এনে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের লগে আলোচনা চালাচ্ছেন—উদ্দেশ্য নাকি ঐ একই। এইভাবে টাকা দিয়ে যদি বলকান রাজ্যগুলোকে হাত করা যায় ত মন্দ কি? ক্যানিটরা ত আর টাকা দিয়ে এদের বন্ধুত্ব কিনতে পারে না। উণ্টে এদের অনেকেরই কাছে তারা খণী। মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের নেতারা ইংলণ্ডকে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এ আবেদনকে একটি বিশিষ্ট সুযোগ হিসেবেই মনে করছেন।

Mr. Elwin Jones অনেকদিন আগে বলেছিলেন—(ইনিই Hitler’s “Drive to the East” বইখানার গ্রহকার)—যে মধ্য ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে Magnet-এর মত টেনে নিচ্ছে Rome-Berlin axis—তার কারণ সেই রাজ্যগুলো যেমন Poland, Yugoslavia, Hungary তেতরে তেতরে democracy-কে ঘোটেই

তালবালে না। অর্থাৎ ফ্রান্স-এর মত বড় Democracy-র লগে বন্ধুত্ব রাখতে গেলে সরোরা ব্যাপারে democratic movement-কে চেপে রাখা চলে না, তাই হিটলার-মুনোনিওর দিকে Col. Beck-এর মত নেতারা লড়কু নয়নে চাইছেন। যেরে সব Rights and Liberties এই লবের জন্য আন্দোলন লাগছে—এ বড় তরোর কথা। এই বছরে গোড়ার দিকে কমানিস্টরাতেও Fascism পুরোপুরি প্রায় এলছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যেই গোপা নাহেবকে রাজ্যের হাল হেঁড়ে দিতে হয়েছিল।

Austro-German Anschluss-এর পর যে একটি বিপরীত অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে—এটা সব International observerরাই এখন স্বীকার করবেন। এর আগে Rome-Berlin axis attract করছিল, এখন repel করতে আরম্ভ করেছে। ঐ সব রাজ্যগুলো ভেবেছিল—প্রবল-প্রতাপ-সম্পন্ন হিটলার-মুনোনিওর চারাতলে থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখবে। কিন্তু তা হবার নয়। অস্ত্রী-ত রকক হিসেবে ক্যানিট-ঘেরকেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু রককই যে তকক হয়ে দাঁড়ায়ে—এ কথা ত ল



ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা . ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

cards in its hand. It may be slow in offering guns to the people, but it can offer butter, and it is still the man rather than the machine that matters. It may be bad form to boast of one's wealth, but a few millions handed out as credits to states in South-eastern Europe could be more effective than the expenditure of ten times the amount on tanks and guns and aeroplanes."

সত্যিই জার্মানীকে যদি এইভাবে diplomatically isolate করা যায় তাতে শান্তির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। এই লক্ষে এখন উচিত হচ্ছে Franco-Czechoslovak axis এ যোগদান করে system of collective securityতে একটা বড় রকমের British contribution করা। চেকোস্লোভাকিয়াই হচ্ছে এখন ইউরোপের Central Problem. এর স্থলরতাবে কোন solution না আনতে পারলে trouble brew করতে থাকবে। এই সমস্যাতে সম্প্রতি ব্রুটেন খুব badly handle করেছে। একথা আমি আগেই "খেরালী"তে বলেছি। Czech crisisএ ব্রুটেন যে diplomatic action নিরেছিল, তা আলোচনা করে আমি Hindusthan Reviewর জুন সংখ্যায় বলেছিলাম :

"Why Britain intervened in Berlin and Prague? Was it a dictation from Paris? Was it to show that the present British Government was anxious for the safety of the only democratic Republic in Central Europe? No. What was at the bottom of

London's strenuous diplomatic efforts during the crisis was a frantic desire to avert a war in which the London-Paris-Moscow Alliance was bound to be called into play. The alignment of these three powers might have spelled a disaster for Fascism and paved the way for Socialist Ascendancy in Europe. This is a prospect from which Chamberlain and his main prop, the British Capitalists, would shrink back in terror!"

চেকোস্লোভাকিয়া লব্ধকে খুব সম্প্রতি Edgar P. Young লাহেবের একখানা বই বেড়িয়েছে; তার title হচ্ছে Keystone of Peace and Democracy. গত শোমবার ২৪শে জুলাই-এর অনুভবাজার পত্রিকাতে তার Review পড়লাম। Epilogueএ Young লাহেব বলেছেন :

"War was averted because of the firm stand and resolute action of the Czechoslovak Government which called the bluff of the Fascist International. It was because their plans had been frustrated, not because of the solicitude for Czechoslovakia that the British Cabinet met hurriedly during that critical week-end."

২৩শে জুন তারিখের খেরালীতে আমি যা বলেছি তার লক্ষে এর খুব মিল রয়েছে। উক্ত সংখ্যায় আমি লিখেছি : "অবশ্য ব্রুটেন মন্ত্রীরা কম চেষ্টা করেন নি যাতে ফ্রান্স এ নিয়ে না মাথা ঘামায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্তোপায় হয়ে ব্রুটেন গভর্নমেন্ট বার্লিন ও প্রাগে খুব জোর

diplomatic effort চালানেন।" চেম্বারলেন লাহেবের plan ছিল চেকোবের isolate করে দেবার। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। উপস্থিত তিনি যদিও ও মধ্য ইউরোপের যে Stateগুলোকে হাত করবার চেষ্টা করতেন তারা কেউ রাশিয়ার বন্ধু নয়। তবে কি তার উদ্দেশ্য ইউরোপের defensive system-এ রাশিয়াকে ঢুকতে না দেওয়া? এই চেষ্টাও কি Franco Soviet Pact-এর বিরুদ্ধে নিরোক্তিত?

ডোজপেদ বালামুত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ওষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ওষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।



(বিলাসী)

স্ট্রীট সিন্ডার

নিউ থিয়েটার' এক নম্বর ষ্টুডিওর ছ' নম্বর ফ্লোরে বিরাট একটি বস্তীর সেট তৈরী করা হয়েছে। এই নির্মিত সেটের ভেতর প্রবেশ করলে লোকের ভ্রম হয়, কলকাতার একটি সত্যিকার বস্তী বলে।

এই বস্তীর ভেতর 'ভলুয়া-মজুম' বাড়ী। নৃত্যে লজতে, হাতে লাতে, অভিনয়ে বস্তী সুশরিত, উচ্ছলিত।

এখানে অভিনয় করছেন লারগল, কানন, শৈলেন চৌধুরী, জগদীশ শেঠ, অমর মল্লিক, কাপুর প্রভৃতি।

কণি মজুমদারের পরিচালনার ও প্রযুক্তি পি এন রায় কার্যভারসম্পন্নতার ছবিখানি অতি দ্রুত সমাপ্তির পথে এগোচ্ছে।

অভিনয়

মল্লিক মশাইয়ের পরিচালনাধীনে 'বড়বড়ি'-র কাজ বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

শ্রীমতী মলিনা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দেবার পর পূর্ববর্তী সেটের খানিকটা অংশ আবার তোলা হয়েছে।

অল্পকাল বাবুর বাড়ীতে শ্রীমতীর গৃহ-শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হ'য়ে, ধীরে ধীরে এই আগমন তোলা, এই অল্পকাল লোকটি কেমন করে 'বড়বড়ি' মাধবীর সৃষ্টি আকর্ষণ করে, উপরের গৃহীত অংশে তারই খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

এদিকে পাটনার বাড়ীতে সুরেন্দ্রনাথের গৃহভ্যাগের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দৃশ্যগুলিও তোলা আরম্ভ হ'য়েছে এবং এই সপ্তাহেই শেষ হ'বে।

সুরেন্দ্র নাথের পিতার ভূমিকার চিত্রা-বতরণ কোরেছেন যশস্বী অভিনেতা শৈলেন চৌধুরী। সুরেন্দ্র নাথের বিমাতার ভূমিকার অভিনয় কোরেছেন—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী।

এ ছাড়া একই ছবিতে নারক ও নারিকার ভূমিকার—মলিনার সঙ্গে পাহাড়ীর যোগা-যোগ এই প্রথম। উভয়কেই মানিয়েছে চমৎকার এবং অভিনীত অংশের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকু সুটিয়ে তোলবার জন্যে তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা কোরেছেন।

দেশের মাটি

'দেশের মাটি'র সম্পাদনার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বতরুর দ্বিরা আছে তাতে মনে হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর চিত্রায় এ ছবির সূক্তি হ'বে। এ ছবির হিন্দী সংস্করণ বোধহয় আগষ্ট মাসের মধ্যেই বাঙলার বাহিরে মুক্তিলাভ করবে।

অধিকার

এ ছবির উত্তর সংস্করণই গেল বৃহস্পতিবার শেষ হয়ে গেছে। বিরাট dreamland এর সেটের মধ্যে শেষ দৃশ্য সে দিন তোলা হ'ল, তা আমাদের বেশ ভালই লেগেছিল। প্রায় ছাব্বিশ জন ঘরে ও ১০ জন পুরুষের একটি সম্মিলিত গায় নিয়ে এই ছবির উদ্বোধন। সেই

দৃশ্যটিই দেখিন তোলা হ'ল। এ ছাড়া এই দৃশ্য মানিকবাগুরগী একটি কলেজের ছাত্র বেশ চমৎকার অভিনয় করেছে।

এ ছাড়াও গত সপ্তাহে পঞ্চম বাবুর 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গানটি straight take করা হয়েছে এ ছবির বাঙলা সংস্করণের জন্য।

ছবি খানির উত্তর সংস্করণই দেখার করা হয়েছে। বতরুর মনে হয় মুক্তিলাভ বিষয়ে এই ছবি দুখানি 'দেশেরমাটি' ও 'মাতৃমাতা'কে follow করবে।

গোরা

এই শনিবার থেকে চিত্রা'র বেবদন্ত কিম্বদন্তি গোরা দেখান হ'বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গোরা'র লক্ষ্যে বিশেষ করে লেখবার কিছুই নেই। 'গোরা' বাঙলার ঘরে ঘরে পরিচিত। এই পরিচিত কাহিনী নিয়েই পরিচালক নরেশ বাবু তাকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করেছেন।



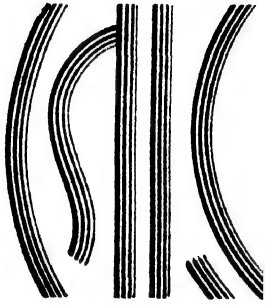
"গোরা" চিত্রে অভিনয় দ্বন্দ্বপত্তা

যিনি ভারতবর্ষের দেবতা
যাঁর মন্দির-জাঁর সকলের জন্ম
হিন্দু মুসলমান তৈজন ত্রীষ্টান
সকলের যিনি প্রণম্য
তাঁহারই উদ্দেশ্যে
উৎসর্গীকৃত
মহিমাবিত চিত্র-কাব্য

চিত্রায়

শুভ
উ
দ্রো
ম

৩০শে জুলাই, শনিবার



- * কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
কাহিনী
- * দেবদত্ত ফিল্মসের
চিত্রসৃষ্টি
- * শ্রীনরেশ মিত্রের
পরিচালনা
- * চিত্র পরিবেশক
প্রাইমা ফিল্মস লিঃ



চোখের বালি

এনোনিমাস প্রোডিউসারের চিত্র-নিবেদন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যশ্রেষ্ঠ সামাজিক কাহিনী "চোখের বালি" আগামী শনিবার ৩০শে জুলাই 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর স্বাভাবিক সূত্রভাবে বঙ্গীয় রাধিকা কর্তৃপক্ষ বতহর লভ্য বিশ্বকবির এই অমর কাহিনীকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছবিখানির লক্ষ্যশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইতেছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রের ললিত ও সুর সংযোজন করিয়াছেন। ললিত শিল্প দ্বারা রবীন্দ্র-ললিতের বিশেষত্ব অনাধি প্রতিধার। আবহ ললিত পরিচালনা করিয়াছেন সুরেন দাস। ছবিখানির পরিচালনা করিয়াছেন লতু সেন, লক্ষ্যলেনন করিয়াছেন মণ্ডল এবং আলোক চিত্র-শিল্পী ননী লাল। এতদ্বিত্ত "চোখের বালি"-র আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই ছবিখানি ললিত পরিবারের নর-নারী কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে।

বিনোদিনী—সুপ্রভা মুখার্জি

আশা—ইন্দিরা রায়

রাজলক্ষ্মী—শান্তিলতা বোষ

অরুণা—রমা বানার্জি

মহেন্দ্র—হরেন মুখার্জি

বেহারী—হবি বিশ্বাস

লালচরণ—মনোজ্ঞন তট্টাচার্য্য

অভ্যন্তর চরিত্রে—শিবকালী চ্যাটার্জি,

শরৎ সুর, অজি গুহঠাকুরতা

বেকার নশন

'বেকার নশন'-এর 'ট্রেলার' 'উত্তরা'-র দেখানো হ'ছে। ধীরে দেখেছেন, তাঁরা ছবিখানি লক্ষ্যে আশঙ্কিত হ'য়ে উঠেছেন বোঝা গেল। তারা লক্ষ্য-হীন হালকা কাহিনীর চিত্র-রূপ দেখে কলঙ্কিত বিবনের অবদান হুর কল্পে চার, তাই—'বেকার

নশন'-এর পরিচর-চিত্র তাহের মুখে হাদি ফুটিয়েছে, এতে করে বলা যেতে পারে যে 'বেকার নশন' জনসাধারণের মনে কিছুকণ ধরে আনন্দ দিবে।

সংক্ষেপ রূপে

প্রয়োগ শিল্পী হরি ভঞ্জর পরিচালনায় 'সংক্ষেপ রূপে'-এর শ্রুটিং ক্রম গতিতে এগিয়ে চ'লেছে। আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত ছুটি ভাই-বোন—বিমল আর লেখা। অল্প-চিন্তা নেই—স্নেহের কলহ এবং আশোষ-আহ্লাসে দিন কাটায়—বেথলে অতি-বড় স্ত্রী পরিবারেরও মনে হিংসার উদয় হয়। গত লগ্নাহে ছবির এই অংশটুকুর লুপ্ত গ্রহণ হ'য়েছে।

রূপাঙ্গিনী

নিউ থিয়েটারের 'অভিজ্ঞান' রূপাঙ্গিনীতে অষ্টম লগ্নাহে পদার্পণ করিল। সামাজিক লক্ষ্য এবং অস্তর রহস্যের অপূর্ণ লংঘাত ও লংঘননের নাটকীয়তার এই চিত্র কাহিনীটি বিনিই দেখিয়াছেন তাঁহাকেই অভিতূত হইতে হইয়াছে।

এই শনিবার হইতে রূপাঙ্গিনীতে মন্সার ফিল্ম কর্তৃক প্রযোজিত বাঙলা কার্টুন-চিত্র 'আকাশ পাতাল' দেখিয়া আপনারা অধিকতর কৌতুক বোধ করিবেন লক্ষ্যে নাই।

পূর্ণ থিয়েটার

লামনের শনিবার থেকে এখানে নিউ থিয়েটারের 'বিভাপতি' দেখান হ'বে। নিউ থিয়েটার কোম্পানী প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করে এই ছবি তুলছেন। টাকার কথা ছেড়ে দিলেও এ বই-এর মধ্যে যেভাবে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশ করা হয়েছে তা খুব কম বই এর মধ্যেই দেখা যায়।

এতে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী, কামন, রূপাঙ্গিনী, অমর মল্লিক হারাদেবী প্রভৃতি।

আকাশ পাতাল

বাংলা কার্টুনের ইতিহাসে মন্সার ফিল্মের আকাশ পাতালকে হরতো প্রথম বলা যায় না কিন্তু উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যদি দেশবাসীর শুভেচ্ছা এবং উৎসাহ পান তবে তাঁরা আরো উন্নত এবং নিখুঁত জিনিষ আশা করে দিতে পারবেন। একথা লক্ষ্যবাহী-লক্ষ্যত যে কার্টুন চিত্রের কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং লম্বা সাপেক্ষ। বাংলা ছবি উন্নতির পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে লত্যা কিন্তু কার্টুনের দিকটার আজ পর্যন্ত কেউ তেমনভাবে দৃষ্টি দেন নি—বোধহয় উপরোক্ত কারণে।

মন্সার ফিল্ম উপযুক্ত লম্বায়ই তাঁহের লাহু প্রচেষ্টাকে সেই দিকে নিরস্ত্রিত করেছেন। দেশবাসী যদি নির্দয় লম্বাচোখের চক্ষে ইংরাজী কার্টুনের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার না করে পৃষ্ঠপোষকের দৃষ্টিতে এদের প্রথম উদ্ভবের দোষ ক্ষমাশীল কন্সার চক্ষে দেখেন এবং উৎসাহ ও প্রেরণা দেন তবেই দেশের এই শিশুশিল্পী অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে।

গোপাল কৃষ্ণ

প্রভাতের গোপাল কৃষ্ণ গেল শনিবার থেকে প্যারাডাইজ সিনেমায় দেখান আরম্ভ হয়েছে। বালক শ্রীকৃষ্ণের গো বৎসল তার উপর নির্ভর করেই এ ছবির কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। অভিনয়-এর দিক থেকে এই বালক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাটা রাম দ্বারা তার লালার ও মহিমার একটা জীবন্ত প্রতিরূপের সৃষ্টি করেছে। লক্ষ্যতের দিকেও এই বালক-এর অল্পত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। এ ছাড়া শান্তা আগের 'রাধা' ও পরশুরামের 'মনসুখ' অভিনয়ও লক্ষ্যত-এর তারা লক্ষ্যকে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

এই ছবির শেষের দৃষ্টে যে ঝড় জলের Scene দেখান হয়েছে তাও চমৎকার। যদিও একটু বেশী তাবেই দেখান হয়েছে তাহলেও Indian Screen-এ আজ পর্যন্ত খুব কমই দেখা গেছে এর মত।

বিবিধ

পত্রিকার প্রসঙ্গ

বৃথবার প্রাতে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ লাক্ষিত এক ‘কম হে কম’ পত্র তাঁহার বিহারী বন্ধুদের তৃপ্তার্থে প্রকাশিত হইরাছে। ‘অমৃতবাজারের’ দ্বার প্রতাবশালী পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে এইরূপ হারিষজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইরাছি। যে অভিমত পোষণ করার শক্তি নাই তাহা ব্যক্ত করাই বা কেন? কান্সি, হার্জিনিং প্রভৃতি স্থানে মন্ত্রী বা সরকারী কর্মচারীর অতিথিরূপে বিচরণ করিয়া বেড়াইলে সম্পাদকের হারিষ বহন করা যায় না ইহা কি বাগবাজারের ঘোষপরিবারবর্গের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন না? তুষারবাবুর “To my Behari friends” শীর্ষক পত্র প্রকাশে “পত্রিকা” কতদূর লোকচক্ষুতে হীন হইরাছে তাহা কি তাঁহারা বুঝেন না?

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী

গত ৮ই শ্রাবণ (২৪ জুলাই) রবিবার নবদ্বার ইটালী বাণী ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে বঙ্কিম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। নির্দোচিত সভাপতি ডক্টর বীণেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের অধিনেতে বিলম্ব হওয়ার উক্ত কালিহাস নাগ সাময়িকভাবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বড়াণ মহোদয় জুললিতকণ্ঠে ‘বন্দোবস্তরস’ গাহিবার পর একটি স্থানীয় ছাত্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত মনোহরেন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রদয় মহাশয়ের প্রভৃতি বক্তৃতা বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই সময়ে সভাপতি মহাশয়



জীশনি গুপ্ত

দশদী নিবেদন

পৃথিবীতে অনেক কিছুই আমরা পছন্দ করি না। অপরের অনেক অভ্যাসই আমাদের প্রতিনিষেধ বিরক্ত করে। তা’ বলে জোর করতে পারি কি? ভার্জিনিয়া ক্রস্ কিং পারেন। সম্প্রতি ক্রস্ হলিউডের জী-পুরুষের উপরে দশটি নিবেদন প্রকাশ করেছেন :

(১) রাস্তা-ঘাটে জীলোকের ঘূষপান করা চলবে না।

(২) জীলোকের বাহ জড়িয়ে ধরে পুরুষ পথ চলতে পারবে না।

এই দুটি শ্রীমতীর চুচকের বিব, বিশেষ করে শেষেরটি। শ্রীমতী বলেন, পুরুষ কি ‘মজ্জমান ব্যক্তি’ নাকি, যে খড়্গকুটীর মত জীলোকের বাহ আশ্রয় করে বেচে থাকবে?.....তারপর :

আমিরা পড়েন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও ডক্টর কালিহাস নাগ মহোদয় বঙ্কিমের রসস্রুটি ও ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বল্প অতীতে লিখিত সুদীর্ঘ বক্তৃতার বঙ্কিমের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। লত্যা; কিন্তু উহাতে ‘ধান ভানিতে নিবের সীত’ প্রচুর ছিল। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত অক্ষয় সরকার, শ্রীযুক্ত প্রতিভা সেন, শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু করাল প্রভৃতি বহু স্থানীয় তত্ত্বমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

(৩) হো হো করে হসকা-হাসি, যে হাসিতে লোকজনের অপ্রাণিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা ত্যাগ করতে হবে।

(৪) চিলা পারজামা পরে পথ চলা বন্ধ

(৫) প্রকাশস্থানে দাঁড়িয়ে রূপলঙ্কার অসত্যতা, অভ্যাস ছাড়তে হবে।

(৬) শিশুবিষয়ক আলোচনা আলোচনা শিশুদের মধ্যেই লীলাবদ্ধ রাখতে হবে এর ব্যতিক্রম ঘটলে, তাৎপ্রাণ জীলোক লম্বাজে শুধু যে হাস্যাম্পদই হয়, তা না, অকস্মাৎ মর্দক লাভ্য করা হয় তাকে।

বাকী চারটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য :

(৭) কতকগুলো পুরুষ দেখা যায়, তারা কেবল তাদের কেনা জিনিষের খরচ জাহির করেই মরলো,—‘এটার লেগেছে কুড়িটাকা’ ‘এটার পঞ্চাশ’—এই শুধু তাদের বাঁধা বুলি। এ লোভ তারা লংঘন করতে পারে না, কিন্তু অনতিবিলম্বে করা উচিত।

(৮) ‘দীর্ঘ’ রমনীর চোখে পুরুষকে হের প্রতিপন্ন করে। সুতরাং—

(৯) গাড়ীতে উঠবার সময়ে অনেক পুরুষ জীলোকদের সাহায্য করে না,—এবার থেকে করতে হবে।

(১০) উপলংঘ্য,—হলিউডের সুন্দরী যাজেই বার্ষিক পুরুষকে ঘৃণা করে, অপরের জন্ত তাদের দরামারা, বিবেচনা থাকা উচিত। নৌরক্ত প্রকাশ তাদের স্বভাবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হওয়া চাই-ই-ই।

এ নিরবশব্দে। নতুন ফলপ্রসূ হলে
শীগগির আর একটা মহাবিশ্বের ঘটনার
লজ্জাবনা আছে, মনে হয়।

রূপসীর মেলা হলিউড

রূপসীর মেলা হলিউড। কত রং
বেগুনের রূপসী মেয়ে, উজ্জ্বল রূপতরঙ্গ
হোল খেয়ে বার বাঘের বেছে, চকিত
চকল বিছাৎ বাঘের আধিতে, কপোলে
বাঘের উবার লাগিম, স্বপনের অগ্নি শিখার
নে কি প্রবল আকর্ষণ যোহাবিষ্ট পতঙ্গদের।

কিন্তু হলিউডের অতি প্রাচীন অভিজ্ঞ
আলোকচিত্রকর অলিভার হার্শ বলেন :
এ রূপ, এ আকর্ষণ চিরদিন ছিলো না।
পনেরো বছর আগে রমণীর রূপ এমন কিছু
আলোড়নের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি।
ক্রীলোকেয় লজ্জা তখন ছিল অতি লাধারণ।
বর্তমান যুগের রূপসীরা রূপ অমূল্য
শিল্পকলার যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তা
লভ্যই বিশ্বকর।

আজ সাতাশ বছর ধরে মিঃ হার্শ
হলিউডের আলোকচিত্রগ্রহণে রত আছেন ;
এ যাবৎ কোন স্তম্ভীই প্রায় তার ক্যামেরার
চোখ এড়াতে পারে নি, ব্রাঙ্কি স্ট্রাইট,
ম্যাবেল নরম্যান্ড, লিলিয়ান গিশ, নরমা
ট্যালমেনজ, মেরিয়ন ডেভিল, জোরান ক্রফোর্ড
জিনেট ম্যাকডোনাল্ড, মিরণা লয়, ...কেউ
বাঁচ যায় নি।

সাতাশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মিঃ
অলিভার হার্শ এই মন্তব্য প্রকাশ করে
গিয়েছেন। হলিউডের মেয়েরা আজকাল
আরো বেশী স্তম্ভী।

কিন্তু একটা কথা : অসুকরণ রমণীর
রূপলাভনার পক্ষে অভ্যস্ত যন্ত্রাঙ্গক।
জগতের যে কটা অনাম্যাত নৌল্য আমরা
দেখিতে পাই, তার প্রায় গুলিই একনিষ্ঠ
রূপ লাভনার বেহের স্বাভাবিক নৌল্যকে
সুটরে তোলায় কল।

তারকার জ্যোতির্বিজ্ঞান

কি হুজিল! এতগুলো স্তম্ভীর ভিতরে
একটাকেও পছন্দ হয় না? ...হলিউডের
তারকা জেমস্ টুরার্ট বুকে বুকে হরহান।
টুরার্ট বলে, আজ তিন বছর ধরে সুখি,
কিন্তু সুখিই হয় কই? হলিউডে বউ
পছন্দ করা কি কঠিন কাজ রে বাবা!...

বল কি টুরার্ট? এত রাশি রাশি
মনোমোহিনীর হল, ডানাকাটা পতীর মত
ঝাঁকে ঝাঁকে বিশ্বের মন রাজিয়ে দেয়, আর
তোমার বেলাতেই যত—

এরও জবাব দিয়েছে টুরার্ট : মাথা
গুলিয়ে বার, ব! এ থাকের কাকে রাখি,
কাকে ছাড়ি।

ফ্রেডি কার্ণলমিউ

হলিউডের আকাশের একটু অত্যাশ্চর্য
নক্ষত্র এই শিশু অভিনেতাটী। কিন্তু ব্যাপার
বা দেখি, তাতে আমার মনে হয় এ
শিল্পকলা ছেড়ে ওর আইন পড়া উচিত
ছিলো। ওর জীবন ভরে তো আইনের
প্যাচই চললো, টানাটানাচার অস্ত্র নেই
ওকে নিয়ে। শুধু আদালত, আর আদালত!
...এবং একটীর পর একটা আইনের লড়াই!...

22 CT.

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!



পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ
মোপার তার চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এন্ড ক্যারেট গোল্ড সিলিকিট

৭০নং কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা কলেজ স্ট্রিট বার্কটের সম্মুখে

ফোন : বি. বি. ৪৮৮২

ফ্রেডির আকর্ষণজনন লবাই ব্যক্ত ওকে
তাবেহারে এনে ওর উপার্জনের টাকার
ভাগ বলাতে।

বর্তমান যোদ্ধাটী জিশ হাজার ডলারের
হাবী, এনেছেন—ওর প্রতিনিধি মেদান
মাইরন্ মেলজনিক এও কোং ফ্রেডির
উপার্জনের 'কমিশন' অর্থাৎ হালানী এটা
মেটো। গোল্ড ইন মারারের লড়ে লাভ
বছরের এক চুক্তি লড়ে টাকাটা নাকি
ওদের প্রাপ্য।

খুচরো খবর

'গোল্ড ইন'রা আর এ নামে পরিচিত
হতে চায় না, ওরা বলে, আমরা 'ফোকাস
আর্টিষ্ট'।

জিনজার রোজানের নতুন চিত্রনাথী,
এরল স্কিন। ওরা একলঙ্গে নামছে 'ইউ
কাণ্ট এককেপ ফর এভার' হবিতে।

গেল প্যাট্রিক আজ ছ'বছর ধরে জ্যোতি-
বীর কাছে বাওয়া আসা করচে। ...সুখি
হলো কই? জ্যোতিবীরশাই ক্রমাগত তার
বাঁধা গৎ আউড়ে চলেছেন, 'হবে! হবে!!'

গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!

ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য
পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত
আধুনিক ধরণের লকল রকম গহনা
পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ
মোপার তার চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

শরৎ সাহিত্যে—মাধবী ও শান্তি

শরৎচন্দ্রের রচনার পরিচয় দিতে গিয়ে, বাঙালি একজন কৃতি সাহিত্যিক লিখেছেন : “শিশি-স্নাত প্রভাতের জলপদ্ম যেমন একটি একটি করে আপন পল্লব-বল সূর্যের দিকে প্রসারিত করে জেগে ওঠে, এক একখানি উপজাতি লিখে শরৎচন্দ্র তেমনি আপন মনের মাধুর্য চারিদিকে বিকীর্ণ করেছেন।”

সত্যি, এমনি স্মরণ তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি। তাঁর মত দৃষ্টি নিয়ে বেশের মানুষের পানে কেউই চারি নি। তাঁর মত দরদ নিয়ে কেউই এগিয়ে আসে নি। তাই এককাল মনে হয় যেন মানুষ, মানুষকে চিনতে পারে নি। মানুষের তৈরী সাহিত্যের মত তাই কৃত্রিমতাই থেকে গিয়েছিল বেশী। সাহিত্য মতাকার রূপ ধরে মানুষের চোখের সামনে হুটে ওঠে নি।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারক-নারিকা নিত্যকার, চিরন্তন কালি-কাল্লার ধারার স্নাত হয়েই গড়ে। তারা আমাদেরই মত বেদনা ও জ্ঞাতবের পেছনে নিশ্চেষ্ট হয়, আমাদেরই মত সুখ-জুখের কথা বলে, মংলার স্বাদা নির্ঝাঁক করে।



শান্তির ভূমিকার—চন্দ্রাবতী

সত্যি চিরদিনই সত্য, আর সেই জন্যই তার মত লকলে মানতে বাধ্য হয়। শরৎচন্দ্র সেই সত্যকে নিজের বুকের মধ্যে পেরে-ছিলেন। তার লম্বাকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি কোরতে পেরেছিলেন। তাই আজ বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁর লোহাঙ্কি স্থাপিত হয়েছে। তাঁদেরই কল্যাণের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। লম্বাকের চোখ রাস্তানী তাঁকে এতটুকু দ্বমতে পারে নি।

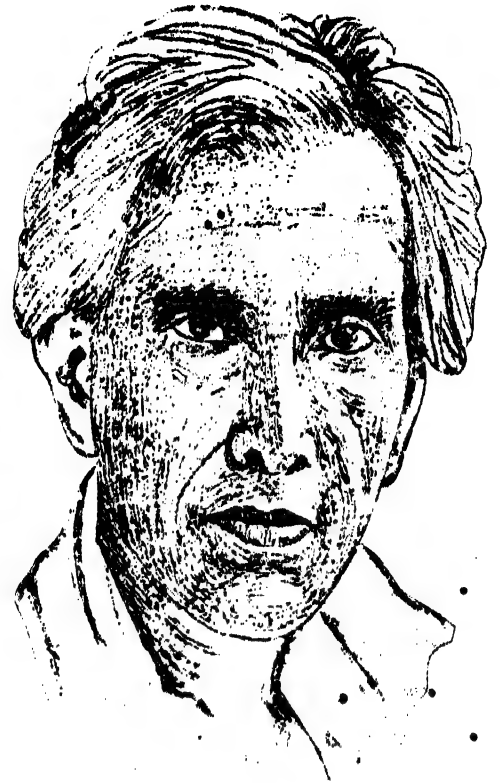
এ সাহিত্যের সৃষ্টি সত্যের মধ্যে—বেদনার মধ্যে। লম্বাকের শালনে নিপীড়িত নর-নারীর দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। সেই জন্যই অন্তর সাধন ও শক্তি নিয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন।



মাধবীর ভূমিকার—মলিনা

এমনি বুকের দরদ দিয়ে আঁকা, তাঁর ছটি অপরূপ নারী চরিত্র—‘বড়বুঁদী’-র মাধবী ও শান্তি।

বড়বুঁদী মাধবীর পরিচয় দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : “বর্গের বসন্তক কখনও দেখি নাই, সুতরাং তাহার কথা বলিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই স্রলবায়ুর মংলার-বর্তী লোকগুলো একটি বসন্তক পাইরাছিল।



শরৎচন্দ্র

তলার গিরা হাত পাতিত, আর হাদি বুখে কিরিয়া আনিত।”

পলাতক ধনীপুত্র সুরেন্দ্রনাথ নিঃস্ব ভিখারীর বেশে ‘বড়বুঁদী’-র আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে দিন তার বাইরের অভাব মিটেছিল, সে দিন সে বুঝতে পেরেছিল, বড়বুঁদী ছাড়া তার অন্তরের শ্রুতভাও মিটবার নয়।

তারপর আর একদিন...বেলা পড়ে এসেচে। পা আর চলে না। যেন একবার শুতে পারলেই সে জন্মের মত ঘুমিয়ে পড়বে। তাই যেন অস্তিত্ব শব্দা লাভের প্রতিকাশ, জীবনের মহা-বিস্রামের আশায়, সুরেন্দ্রনাথ একদিন উদ্গস্তের মত ছুটে চললো—সেই অজানার উদ্দেশ্যে—যেখানে ছিল তার বড়বুঁদী।

বড়বুঁদীর কোলে মাথা রেখে, অনন্ত পথ বাজী সুরেন্দ্র নাথের শেষ কথা : “দে দিনের কথা মনে পড়ে যে দিন তুমি আমাকে

তাড়িয়ে দিয়েছিলে? আমি তাই এখন
শোধ নিয়েছি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম
কখন এখন শোধ হ'ল ত?

কখন কোরে একজন তার 'হেন'-পাওনা
চুকিয়ে বিদায় নিলে, এবং আর একজন
তারই হাখন-জালা বুক নিয়ে এই নির্মম
ধিকারী এক কোনে পড়ে রইল—সে কাহিনী
আশা করি আজ আর ভেঙ্গে না বোললেও
চলবে।

সুরেন্দ্রনাথের লক্ষ্যমিনী—শান্তি।

রক্তমাংসে গড়া আর একটি অপরূপ নারী
চরিত্র!

শুধু 'মাধবী', এই নামটুকু সুরেন্দ্রনাথের
কাছে যে তার ইষ্টদেবতার নামের মতই
পরমকাম্য, পরমপবিত্র—শান্তি সে কথা
বুঝতে পেরেছিল।

তার অন্তরে জঁধা ছিল না। ছিল
তার স্বামীর অন্তরের বেদনা স্মৃতিতে দেবার
ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

"আমি আজীবন বাতনা পাই, তাতে
ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি কষ্ট যদি
জানতে পারি—"

স্বামীকে জানবার, তার ব্যথাহত অন্তরে
নিহেয়ের জন্তও শান্তির প্রেলেপ দেবার এই
যে মনতি—এই যে ছনিবার আকাঙ্ক্ষা—এরি
মধ্যে পাই 'শান্তি' চরিত্রের যথার্থ পরিচয়।

মরমী শরৎচন্দ্রের বৃক্কের বহু চলে আঁকা
সেই অপরূপ কাহিনীটিকে সুখর ছায়া-চিত্রা-
কারে লক্ষ্য রূপদান করেছেন তারতের
শ্রেষ্ঠতম চিত্র প্রতিষ্ঠান—নিউ থিয়েটার।
ছবিখানির পরিচালনা করেছেন—অমর
মল্লিক।

মাধবী ও শান্তি—এই দুটি চরিত্রে
চিত্রাবতরণ করেছেন বাঙালি জনপ্রিয় দুটি
অভিনেত্রী—মলিনা ও চন্দ্রাবতী।

যারা শরৎচন্দ্রের গৃহবাহু চিত্রে মলিনার
'সুপাল' এবং দেবদানে—চন্দ্রাবতীর 'চন্দ্রাবতী'

মহিলা মহল

সম্পাদিকা—শ্রীপ্রকুমারী দেবী

০১)



ইতি পূর্বে "খেরালী"তে "মহিলা মহল"
নাম দিয়ে মহিলাদের আলোচনা
আন্দোলন ও লেখা নিয়মিতভাবে
প্রকাশিত হ'ত। কিছুদিন ধরে নানা
কারণে সেটা বন্ধ ছিল। উপযুক্ত আলোচনা
পাওয়া যায় না, যে কিছু লেখা পাওয়া
যায় সবই গতানুগতিক রচনা বলে প্রকাশ
বন্ধ ছিল, একথা বললেও মিছে বলা হয়
না। খেরালীর এটা অন্তরের খেরাল যে
লহরে মফঃস্বলে যে তাবে নাগী জাতির
শিক্ষার জন্ত চেষ্টা করা উচিত, তার জন্ত শুধু
পুরুষ নয় আমাদের জননী, ভগ্নীরাও তাহাদের
বতটা সাধা শক্তি যেন নিয়োগ
করেন। কলকাতা লহরের আনাচে কানাচে

যেথেকেই তাঁরা নিশ্চিত স্বীকার করেছেন,
এই দুটি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তাঁদের
বৃক্কের বহু মিলিয়ে বড়বিড়ি-ভবির দুটি
প্রধান নারী চরিত্রকে জীবন্ত কোরে ফুটিয়ে
তুলতে পারবেন।

আর একটি সু-খবর। শুনচি, আবহ
লক্ষীত এবং কণ্ঠ-লক্ষীতের পেশ দিয়ে এট
চিত্রখানিকে আরও অধিক মনোহারী
কোরে তুলবেন—নবীন বাঙালির অন্ততম
শ্রেষ্ঠ ছুর-শিল্পী—পঙ্কজ কুমার মল্লিক।

নিউ থিয়েটার-এর এই উদ্যম
লক্ষ্যমাণে লাক্ষ্যমণ্ডিত হোক ও ছায়া-চিত্রের
মধ্য দিয়ে বাঙালির অপরাধের, কথা শিল্পী
শরৎচন্দ্রের এই অপরূপ সৃষ্টি, আর একটি
নতুন রূপ নিয়ে, তাঁর বেশবানীর চিত্রে
অক্ষর হোরে থাকুক এই আমাদের কামনা।

অলি গলিতেও দেখা যায়, একটা মেয়েদের
পাঠশালা বা হেলেদের ইকুল করে নিয়ে
বললেই কোথা থেকে যে মধুগন্ধ-লোলুপ
ভুজের মত ছেলে মেয়ের দল জোটে তা
দেখলে অবাক হ'তে হয়। অথচ তা দিয়ে
বাল্যলীল জীবিকার শ্রমতির বিচার করা
চলে না। এমন অনেক পল্লীগ্রাম এখনও
বাল্যলীল আছে যেখানে শত করা ২৫ জন
স্ত্রী পুরুষ অশিক্ষিত। শুধু অশিক্ষিত নয়
শিক্ষার অভাব যে কতবড় অভাব শুধু
পেটের অন্ন আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র
যোগাড় করাই যে পৃথিবীতে পুরুষের জীবনের
একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এটা তাঁরা স্বয়ং
করতে পারে না। কলকাতার বিজ্ঞা
পাথার তলে বনে সিনেমার গল্প করা কটা
বাল্যলীল মেয়ের ভাগ্যে (?) নিত্য চলে,
সেটা অনুমানলাপেক কিন্তু অল্পের অভাবের
সঙ্গে সঙ্গে এখনও শিক্ষা ও সংস্কারের যে
কত বড় প্রয়োজন আমাদের অন্তঃপুরে
আছে, তা বলে শেষ করা যায় না। ২টা
৪টা প্রাইমারি স্কুল বা হাইস্কুলে যে নিয়ম
নির্ভর কৃষিকা লোকবলিত পল্লীর শ্রম
রপের পুষ্টি হ'তে পারে না, সেটা এবার
আমাদের নিজেদের দেখতে হ'বে।
'খেরালী'র নাগী মফঃস্বলে এই তাবে আলোচনা
করতে হ'বে যে, সুশিক্ষার জন্ত, নারীর
নৈতিক উন্নতির জন্ত, বৈদিক অশান্তি
নিবারণের জন্ত কি উপায় কার্যকরী হবে।
এ তার শুধু পুরুষের ত নয়, এ কাজ ত
নারীরই।

এই বিন্দু জাতি জগতে লক্ষ্য গরিষ্ঠ
জাতি তথাপি এখনও তাহদের এমন দুর্দশা

নাট্য তরঙ্গ

স্মীনটনাথ

মেঘমুক্তি

গত বৃষাবার রঙবহলে'র নতুন নাটক "মেঘমুক্তি" দেখলাম। নাটকখানিকে অতি আধুনিক বলা যেতে পারে। চারটি ভাগে নাটকখানি বিভক্ত। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য বরলে তরুণ হলেও তিনি নানা গুণের অধিকারী। শিল্পিকুশল ইন্সটিটিউটের হ'য়ে তিনি ইতিপূর্বে বহু নাটক রচনা করে সুনাম অর্জন করেন এবং নাট্য-রসিকদের রসস্থান করেন। আলোচ্য নাটকখানি বহু ছ'য়েক আগে 'খেয়ালী'-তে

কেন? দিন দিন তারা হা অন্ন হা বস্ত্র বলে জগতের অস্ত্র সব চিন্তা ভুলে যায় কেন? জীবন সংগ্রামে লক্ষ্যহীন প্রয়োজন কত বেগী, আমা'দের লহাশুকুতি লাহায়া পরামর্শ তা'দের জীবনে কিরণ কাজ করছে, আজ তা'দের ভাল করে দেখিয়ে দিতে হ'বে। গৃহিনী লচিব লখী শুধু কথায় নয়, জীবনে আমরা নইলে যে তা'দের লব মিছে, এটা তারা ভোলে নি। শিখোন শক্তি বেঘন অদার, তেমনি শক্তি হীনের ধর্ম অর্থ কাম বর্গ কিছুই ত থাকে না! তাইত আজ তার বেগমন্দির ধ্বংস হ'চ্ছে জীবনে অকল্যাণের শেব নাই গৃহ প্রায় নিরানন্দ; শৈশবে তা'দের উৎসাহ নাই, যৌবনে তা'দের কর্মময় লক্ষ্য নাই, তারা যেন জ্যাস্তে মরা। এ মরাকে আগাবে নারী! এত আর কেউ পারবে না।

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় শ্রুতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং এতদিন পরে নাটকখানি মঞ্চস্থ হ'তে দেখে আমরা বিশেষ খুশী হ'য়েছি।

"মেঘমুক্তি"-র গল্পাংশ হ'চ্ছে—ধনী বৃদ্ধ প্রত্যোৎ ও তাঁর স্ত্রী অনিয়ার ভেতর প্রবণতঃ মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় এবং সেই মেঘ দিন দিন বিস্তারলাভ করে স্বপন রায়ের স্বার্থান্ধিত চক্রান্তজালে। এমন কী স্বপন প্রত্যোত্তের ভগিনীসম গীতাকে নিয়ে অনেক



জহর গাঙ্গুলী

কুৎসিত কথা অনিয়ার কাছে লাগিয়ে প্রায় তাকে জর কোরে ফেলেছিল। কিন্তু পরে লব ঘটনা কীল হ'য়ে বাওয়ার স্বামী-স্ত্রীর পূর্ণমিলন হ'ল। এই কাহিনীটির ভেতর যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান আছে এবং বেগী ছাড়া প্রত্যেক চরিত্রটিই বিভিন্ন পথে এগিয়ে চলেছে। বেগী চরিত্রের স্বার্থকতা নাটকের



উষা

ভেতর কোথায়ও খুঁজে পেলাম না। নাটক-খানির 'লিচুরেশন' সৃষ্টিতেও নাট্যকারের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গীত রচনারও বিধায়কবাবুর পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকখানির পরিচালনা করেছেন বোগেশ চৌধুরী। এই কাজ তিনি স্বর্ভূতাবে লম্পাদন করেছেন বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টে লকলে বিদ্যাতালোচিত হয় দেখিয়ে লকলকে বিস্মিত করেছেন। তা' ছাড়া এই দৃষ্টেই এক জায়গায় অনিয়ারকে বেবী বলছে—"বৌদি তোমার কি হয়েছে বলতে পারো? আমারাত এলাব আমা'দের লকে ভালো করে কথা কইছো না?" অথচ সেই সময় অনিয়ার অনর্গল বকে বাচ্ছিল। এই রকম বোঝকটি আরও কয়েক জায়গায় আছে এবং এই বিষয় নিয়ে আমা'দের নাট্য-কারের লকে আলাপ হ'য়েছে এবং আমরা সুনাম দ্বিতীয় রাস্তির থেকে এই ক্ষুণ্ণ আর পুনরাবৃত্তি হয় নি, সেইজন্য বিশেষভাবে তার আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন।

অভিনয়ে লকলেই নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন এবং রঙবহলের পূর্ণ সুনাম তাতে অক্ষুণ্ণই থেকেছে। জহর গাঙ্গুলীর বিজয় আমরা খুব উপভোগ করেছি এবং এই ধরনের ভূমিকার তাঁর সুনামও

বখেট। কিন্তু তিনি এই ভূমিকায় অত্যধিক বাড়াবাড়ি করার এবং প্রত্যেক অভিনেতৃত্ব কথার মাত্রার সুরচিত কথা বলে নাটকের অগ্রগতির পথে বাধা দিয়েছেন। লক্ষ্যেব লিংয়ের স্বপন তাঁর পক্ষে নতুন ধরনের চরিত্র হ'লেও তিনি এই 'চরিত্রের মর্যাদা' ক্ষুণ্ণ করেন নি। রতীন ব্যানার্জির প্রত্যেক নিন্দনীয় না হলেও আরও উন্নত ধরনের অভিনয় তাঁর কাছ থেকে আমরা আশা করেছিলাম। যোগেশ চৌধুরীর স্বাভাবিক হ'য়েছে। বেচু লিংয়ের প্রণব মন্দ নয়। স্ত্রী ভূমিকায় রাণীবালায় গীতা এক কথায় চমৎকার। তাঁর ভিনখানি গানও লতাই তৃপ্তিকর। কিন্তু গান গাওয়ার



পদ্মাবতী

পাড়ার ঘরে আরতির একখানা গান ও একখানা নাচের মধ্যে লাবিত্রী শেষের জিনিষটাতেই বর্ষক আকৃষ্ট কোরতে সমর্থ হ'য়েছেন। কীৰ্ত্তন গানখানা তাকে দিয়ে না গাওয়ারলেই ভাল হত।

এর লাজলজ্জা, ও দৃশ্যপট লতাই প্রশংসনীয়। এমন সুন্দর দৃশ্য পরিকল্পনা এবং সেটের আনবাব পত্র আমরা ইতিপূর্বে কোনও সামাজিক নাটকে দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। এজন্য সুধাংশু চৌধুরী সকল

প্রশংসার স্বাবী কোরতে পারেন। অনিমা ভিন্ন লাজলজ্জা বার বেরূপ হওয়া বরকার দেইরূপই হ'য়েছে। অশিমার লব্ধে এইটুকু আমরা বলি—যে স্বাবীকে লব্ধানর্কস্বাই মনে কোরছে অজ্ঞ নারীতে আশ্রিত এবং দেই ভাবনা তাকে বিনরাত অশান্তির আশ্রনে পোড়াকে এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে পৌখীন শাড়ী ও জামা পড়ে ঠলক বেখানো অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

"মেঘদূত"-র সুর-সংযোজনা কোরছেন তুলসী লাহিড়ী। এর লব্ধে বেশী কিছু বলা নিপ্রয়োজন—এককথার গানের সুরগুলি হ'য়েছে চমৎকার। একখানি নৃত্যপরি-কল্পনারও ললিত গোবামীর কৃতিত্ব প্রকাশ পেরেছে।

ষোটকথা "মেঘদূত" হ'য়েছে একখানি বরষারে তকতকে সামাজিক নাটকাত্মক—যা' দেখে লবাই-ই আনন্দ পাবেন প্রচুর পরিমাণে।



রাণীবালা

লবয় তাঁর অত্যধিক অজ্ঞতা এই চরিত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ কোরছে। সুহাসিনীর অনিমা চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করেনি, অভিনেত্রীর একঘেয়েমি ভাববাজনা ও আবৃত্তির জন্তে। এই চরিত্রটি আশাঘের মনে হয়, পূর্ণ লাক্ষ্যলাভ কোরতে পারে নি, অভিনেত্রী চরিত্রটি যথাযথভাবে প্রদর্শন কোরতে পারেন নি বলে। পদ্মাবতীর অপর্ণা ছোটর ওপর রূপজীম্বিত হ'য়েছে। তাঁর গানখানিও স্তম্ভনীয়। 'ফ্রেড'-ভক্ত তরুণী 'বেবী'-র অংশে উবা বেবী বতটুকু সুযোগ পেরেছেন তার লব্ধবহার কোরছেন।

ফোন ২৭৭৬

বড় বাজার

কাঠের জাট

কাঠের ঘানি

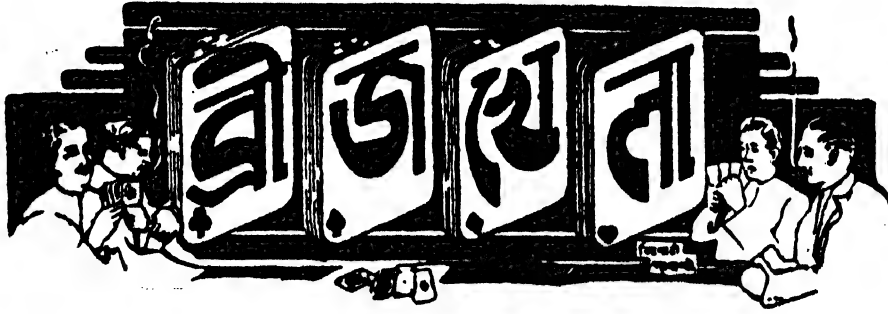
ভারত জাটের খাঁটি সরিষার তেল

ভারত জাটের মিলেই

প্রস্তুত হয়

অন্যত্র হয় না।

২৪৩ আপার সারকুলার রোড, কলি



শ্রীদ্রবীষা

নিষ্কাশন-কৌশল (Squeeze Play) অধিকাংশ ক্রীড়কের ধারণা নিষ্কাশন কৌশল কঠিনাধা এবং অত্যন্ত ক্লান্ত ব্যাপার, কিন্তু তারুপে ক্রমবর্ধমান হতে পারলে এই অসহ্যক ভয় বিমূর্তিত হয় এবং এই কৌশল প্রয়োগ করা অনারাদনা হয়। উঠে। অধিকাংশ স্থলে নিষ্কাশন কৌশলের কার্য আরম্ভ হয় দশম পিট হইতে এবং এই পিটের পূর্ক পর্যন্ত নিষ্কাশন একেবারে সম্ভবপর হয় না। তৎক্ষণে উত্তরের হাতের মধ্যে প্রবেশ করার মত তাল রেখে দিবে উক্ত অবস্থার পুনীত হতে হবে। ফলে খেলা করা এখন পূর্কপেক্ষা যথেষ্ট সহজ হয়ে উঠবে। নয়ের হাতখানি দেখুন,

ইস্কাবন—টেকা, নাহেব, নয়।
হরতন—নয়, আটা, ×, ×।
কহিতন—×, ×, ×
চিড়িতন—×, ×, ×

উ

ইস্কাবন—গোলাম, আটা, ×,
×।
হরতন—বিবি, গোলাম, দশ ×।
কহিতন—×, ×, ×।
চিড়িতন—দশ, হকা।

ইস্কাবন—×, ×।
হরতন—টেকা, নাহেব।
কহিতন—টেকা, নাহেব, বিবি, গোলাম,
দশ, হকা।
চিড়িতন—টেকা, নাহেব, আটা।

শাতটি ফেরাইএর ডাকে খেলা হচ্ছে।
'প' হরতনের বিবি খেলে প্রথমিক চাল
ইস্কাবন—নাহেব, আটা।
হরতন—নয়।
কহিতন—নাই।
চিড়িতন—×।

ইস্কাবন—গোলাম, ×
হরতন—বিবি।
কহিতন—নাই।
চিড়িতন—হকা।

ইস্কাবন—×।
হরতন—নাই।
কহিতন—×।
চিড়িতন—নাহেব, আটা।

দ্বিবার পর ডাকবার দেখলেন যে তাঁদের উত্তরের হাতে দশ বারোটি পিট আছে। সুতরাং তেরটি পিট পেতে হলে নিষ্কাশন-কৌশলের সাহায্য নেওয়া বরকার। সাধারণতঃ নিষ্কাশন-কৌশল অবলম্বন করতে হলে দশম পিট অবধি পৌছানো প্রয়োজন। এখন দেখা যাক কিতাবে দশম পিট অবধি পৌছানো যায়। বা' হোক বিপক্ষ-দেব হাতে চিড়িতনের ও হরতনের বিভাগ কেনে নেওয়া বরকার, কারণ হরতনে বড়

উ

ইস্কাবন—বিবি, দশম
হরতন—নাই।
কহিতন—নাই।
চিড়িতন—বিবি, গোলাম।

তাল 'প'র হাতে আছে সেটি প্রথমিক চাল থেকেই জানা গেছে। এইবার দশম পিট পর্যন্ত পৌছাতে হলে প্রথমতঃ হরতনের টেকা, নাহেব, ইস্কাবনের টেকা ও চিড়িতনের টেকা খেলে নেওয়া বরকার। তারপর পর পর হরতানি কহিতন খেলে গেলেই দশম পিট পর্যন্ত যাওয়া যাবে। তারপরেই নিষ্কাশন-কৌশল আরম্ভ হবে। এরূপ লিঙ্কান্তের পর খেলা আরম্ভ করলে দশম পিটের বেলার হাতের অবস্থা হল উপরোক্তরূপ।

এইবার কহিতন খেলার পর 'প' চিড়িতনের হকা, 'উ' চিড়িতনের ছোট একতাল দেওয়ার 'পূ' ইস্কাবনের দশ বিভেদ বাধ্য হলেন। একাদশ পিটে 'দ' চিড়িতনের

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী ভরুসতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ভাষ্য—

আগত রোগীগণ অপেক্ষা করিয়া হতাশ চিন্তে বাড়ী ফিরিল। কেহ অমলকে ডাকিয়া ছুই চারিটা মিঠাকড়া কথা শুনাইয়া বিদায় লইল। ছুই এক জন ধৈর্য ধারণ করিয়া বাটার উত্তানে ঘুরিয়া বেড়াইল। ষড়িতে লাড়ে দশটা বাজিল তথাপি অরুণের বেথা নাই। গত কয়েকদিন হইতেই অমল তাবিত্তেছিল সে অরুণকে স্পষ্টই বলিবে যে তাহার বাৎসর্য পরিবর্তন করা আবশ্যিক। নচেৎ অচিরেই তাহার দুর্ভাগ্য বাহির হইয়া পড়িবে ও সাধারণের চক্ষে অরুণ বহি একবার লম্পট ও হীন চরিত্রের চিকিৎসক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে জীবনে ব্যবসায় জমান তাহার পক্ষে দুষ্কর হইবে। বেলা বাড়িয়া গেল, বারটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময় নিজালয় চোখে অরুণ গাড়ী হইতে নামিল এবং লম্বুখে অমলকে দেখিয়া স্ত্রীতি নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কেমন আছ?” রোগী-পত্নী কি কেউ ছিল তাই?

বিষয় সুখে অমল উত্তর দিল, “হ্যাঁ ছিল বৈ কি? সবাই চলে গেল; বাহুব তো তারা; রোগ বয়স নষ্ট করতে না পেরে

নাহেব খেলার ‘প’ ইচ্ছাবনের ছোট এক তাল দিতে বাধ্য হলেন, ‘উ’ হরতনের নয় কলে দিলেন। এখন ‘উ’র ইচ্ছাবনের তাল দুখানি বড় হওয়ার (১২) ও (১৩) নং পিট দুখানি আত্মসাৎ করলেন।

তারা আনে; বেলা এগারটা পর্যন্ত থেকে চলে গেল অস্ত ডাক্তারদের কাছে।”

“তুমি তাহের কিছু বলে না তাই?” অরুণ প্রশ্ন করিয়া অমলের সুখে দিকে চাহিল।

অমল বলিল, “হ্যাঁ বলেছি বৈ কি? বলেছি যে মশায়, ডাক্তারবাহু জীবন্মিরে গিয়েছেন। দেবীর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিরতে পারবেন না তিনি। আপনারা কি আর কলকাতার ডাক্তার খুঁজে পেলেন না যে এনেছেন এই চরিত্রহীন লম্পটের কাছে?”

অরুণের মাথার ভিতর একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া গেল। সে বলিল “তা বলবে বৈ কি? নইলে আর বন্ধু কি? অনেক উপকার করেছি তোমার এই তার প্রতিদান। নিজে যদি মৃত বড় চরিত্রবান হতে তা হলে ওদব কথা বলা শোভা পেত তোমার।

উত্তরে অমল বলিল, “তবু আমার বলতে হবে অরুণ, যে তোমার বন্ধু আর কি করে বেধব্যান হবে বল? তবে আমার অপরাধ তোমার চেয়ে কম কারণ, আমি অবিবাহিত কিন্তু তুমি, তুমি কি? বার প্রতিবার মত স্ত্রী রূপে শুণে পৃথিবীর যে কোন স্ত্রীলোকের চেয়ে ছোট নয় তার মনে শোলাঘাত করে কোন শ্রীমতীর চরণ বৃকে - করে রাত কাটাও বলতে পার? বলতে পার কত ভালবাসে সে তোমার, বার ঘোঁছে পড়ে তোমার স্ত্রীর জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে বলেছে?”

অরুণ বলিল, “এ সব তোমার অনধিকার চর্চা। আমি বাই করি না, তোমার

কাছে কৈকিঃ দিতে বাধ্য নই আমি।” অরুণ চলিয়া যাইতে উপক্রম করিলে অমল বলিল, “শোন অরুণ, তুমি আমার কাছে কৈকিঃ দিতে বাধ্য কিনা সে কথা তবিত্তে আলোচনা করা বাবে। কিন্তু তেবে যেখ দেখি কি অধঃপতন হচ্ছে তোমার। বিলীপ বাহুর আজ প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে অসুখ। বৌদি রোজই লক্ষ্যার তাঁকে দেখতে বান। উপযুক্ত ডাক্তার জামাই একদিনও দেখতে বাবার সময় পেলেন না। আজ লকালে তিনি এনে বেলা ৯টা পর্যন্ত বলে ফিরে গেলেন। আচ্ছা, তুমিই বল কি ধারণা নিয়ে গেলেন তিনি তোমার সবছে?”

“কি বলে? স্বস্তর মশায়—?—এ্যা কখন এনেছিলেন তিনি?”

“তোমার পাচটা—বয়ঃ আরও কিছু আগে; যে সময় লোকে বাইরে বার না খুঁজে?”

“গুজা কি বলেছে তাঁকে?”

উত্তরে অমল বলিল, তা আমি কি করে বলবো? তবে আমার বোধ হচ্ছে বৌদি তোমার ঘোষ ঢাকার চেষ্টা করলেও তিনি ঘোঁড়ির কোন কথাই বিশ্বাস করেন নি।”

অরুণ ক্রতপদে উপরে উঠিয়া পুরুষকণ্ঠে গুজাকে বলিল, “এদিকে এদ।” গুজা নিকটে আসিলে সে বলিল, “রোজ লক্ষ্যার কোথায় যাওয়া হয় শুনি? কাল মিথ্যে কথা বলেছিলে আমার, বাপকে দেখতে যাও তার অগ্রুথের জন্তে। আমি বেশ জানতে পেরেছি যে তাঁর কোন অসুখই করে নি। আজ আবার লকাল বেলা বাপকে আনিবে তাঁকে বোঝান হচ্ছিল যে আমি রাতে বাড়ী থাকি না—কেমন?”

উত্তরে গুজা বলিল, “বাবাকে আমি ডাকিনি—তিনি নিজেই এনেছিলেন।”

“নিজে এনেছিলেন?—কের মিথ্যে কথা?” অরুণের ক্রোধে লক্ষ্যারী ফুলিতেছিল, সে পুনরায় বলিল, “তোমার বা

আমার কি করবে শুনি, যে বাপকে ডেকে
বোঝান হচ্ছিল আমি বাড়ী থাকিনা?"

শুভ্রা নীরবই রহিল। অরুণ গর্জন
করিয়া বলিল, "তোমার বাপকে বলিল যা
খুশী করতে আমার বিরুদ্ধে। তিনি
বড়লোক তো বড়লোকই আছেন। আমার
বয়ে গেল তাতে।—কিন্তু তুই রোজ রাতে
যাস্ কোথায়? কার অভিযারে?"

শুভ্রা কোন উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে
না। যেথায় অরুণ বলিল, "যেথ আমি
এক নই—আমি বৃদ্ধি আমার লোপ পাইনি।
আমি স্পষ্ট কথায় শুন্তে চাই রোজ বাঙরা
হয় কোথায়?"

অরুণ তাহার সকল লংঘন হারাইয়াছিল।
উহার কথার কোন বাধনই ছিল না—
তাহার মনে হইতেছে অরুণের অবহেলার
সুযোগ লইয়া শুভ্রা কোন প্রেমিক জুটাইয়া
লইরাছে বাহার মিলনাকাঙ্ক্ষায় শুভ্রা প্রত্যহ
সন্ধ্যায় তিন চার ঘণ্টা কাল বাহিরে
থাকে। সে কল্পনা নেত্রেরে ঘেঁষিতে পাইল
শুভ্রা যেন কোন তরুণ যুবকের কণ্ঠে
বাছলতা জড়াইয়া দিয়া তাহাকেই বলিতেছে—
ওগো তোমাকেই আমি ভালবাসি।—তুমিই
আমার সব।—অরুণ কিন্তু হইয়া উঠিল,
ব্যাক্তের জ্ঞান শুভ্রার উপরে আপাইয়া পড়িল
ও তাহার বেশ আকর্ষণ করিয়া তাহার
গণ্ডে তিন চার বার সজোরে চপেটাঘাত
করিয়া বলিল, "বল্ এখনও, কোথায়
যাস্ নইলে—"

শুভ্রা বলিল, "নইলে ঘেরে কেনবে
এইতো—আমি বলবো না। এমন করে
বৈতে থাকার চেয়ে তোমার হাতে মরা
চের ভাল।"

"বটে বলবি না? মনে করেছিল
আমার লুকিয়ে তুই অভিযার চালাবি ওই
হৃদয় সুখখানা নিয়ে। ঘেরে তোকে
কেনবো না। কিন্তু এই সুখখানাকে এমনি



স্বা-বালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ



হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ৪ ৪ বোম্বাই

করে দেব না দেখলে সবাই তোকে দূর
করবে।”

অরুণ উঠিয়া কক্ষের বন্ধ করিল ও
লোপা বাধান একটা বেত লইয়া আলিয়া
পুনরায় বলিল, “এখনও বল কোথায় যান
তুই—আর তোর ভালবাসার লোকের
নাম।”

উত্তরে শুভ্রা বলিল, “তুমি চোখ থাকতে
অন্ধ, কাণ থাকতেও বধির; তোমার কোন
প্রশ্নের উত্তর দেবনা আমি।”

“তোর বাবা দেবে” বলিয়া অরুণ
সেই বেতদ্বারা শুভ্রাকে অসহনিকভাবে
প্রহার করিতে লাগিল। যন্ত্রণার অস্থির
হইলেও পাছে তাহার প্রাণপ্রিয় স্বামীর
লম্বকে কেহ নীচ ধারণা করে তাই শুভ্রা
নিরবে সেই প্রহার সহ করিল। শেষে
যখন আর সহ্য করিতে পারিল না তাহার
লজ্জা লোপ হইল সে হিন্নমূল লতিকার
জার তুমিতে লুটাইয়া পড়িল।

অরুণ তাবিল যে শুভ্রা মরিয়া গিয়াছে।
জন্মে তাহার অন্তরাগ্না শুকাইয়া গেল।
সে শুভ্রার লজ্জাহীন দেহটা তুলিয়া লইল
ও বহুকণ পর্যন্ত তাহার লজ্জা ফিরাইবার
চেষ্টা করিল।

অনুশোচনার তাহার দৃষ্টি তরির
গেল। সে চাহিয়া দেখিল যে শুভ্রার শুভ্র
অঙ্গের বহুস্থানে রক্তাক্ত আঘাত চিহ্ন
পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে।

ছই-তিন ঘণ্টা পরে শুভ্রার জ্ঞান ফিরিল।
সে উঠিয়া বলিল। অরুণের মনে হইল
লজ্জাহ বধন তাহাকে পাইয়া বলিয়াছে
তখন হয়তো রাগের মাধ্যম কোনদিন
শুভ্রাকে খুনই করিয়া ফেলিবে। তার
চেয়ে সে তাহাকে আজই পিজালর পাঠাইয়া
দিবে এবং ইহজীবনে তাহার লহিত আর
কোন স্পর্শক রাখিবে না। সে শুভ্রাকে
আবর করিয়াই এক কাপ চা খাওয়াইল

এবং তাহার লহিত আলিবার আবেশ
ছিল। শুভ্রাকে লইয়া সে তবানীপুরে
দিলীপবাসুর বাটীতে উপস্থিত হইল। শুভ্রা
গাড়ী হইতে নামিয়া মাজুই সে লজ্জারে
গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শুভ্রা বুকিল স্বামী
তাহাকে ত্যাগ করিলেন। সে ধীরে ধীরে
পিজালরে প্রবেশ করিল। উপরে উঠিতেই
দিলীপবাসু কক্ষের নিকটে আলিয়া তাহার
লক্ষ্যে আসিয়া চিহ্ন দেখিয়া উন্মাদের
জার বলিয়া উঠিলেন, “তোর এ দশা কে
করলে না?”

পিতার বৃকে মুখ লুকাইয়া শুভ্রা উত্তর
করিল, “এ আমার পতিভক্তির পুরস্কার
বাবা।”

—সাতাশ—

রাইচরণকে হস্ত পাঠক পাঠিকা ভুলিতে
পারেন নাই। হোটেল পরিবর্তনের পর
রাইচরণ নূতন হোটেলে আলিয়া পৌছিল।
অত্যধিক লাহেবিরানা ও লভ্যতার বাধন
তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোন
কাজ তাহাকে বড় করিতে হয় না। বলিয়া
থাকিতে থাকিতে তাহাকে বাতরোগ আক্রমণ
করিল। অরুণ ও বর্ণার ব্যবহার লম্ব
লম্ব তাহার চক্ষে অত্যন্ত নিলজ্জ বোধ
হইত। সে স্থির করিল জন মুখর আড়ম্বর
পূর্ণ কলিকাতা হইতে সে তাহার শান্তিপূর্ণ
অনাড়ম্বর কুটীর প্রান্তে ফিরিয়া যাইবে।
তাহার মনে হইল এই বিশাল নগরীতে
সে লোক বহু দেখিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের
মধ্যে প্রাণের লাড়া নাই—সকলেই যেন
যন্ত্রচালিত—প্রাণহীন, তাহাদের নিজের
লম্বা বলিয়া কিছুই নাই। তাহারা কাজ
করে, হাসে, কথা বলে তাহাও যেন ধার
করা—নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই। অরুণকে
পাওয়ার পর কথা হয়তো তাহাকে তাহার
গমগ্রহ মনে করে—তাই সে তাহাকে কোন
কাজই করিতে বলে না। কাজ না করিয়া
মানে মানে বেতন লওয়াটা রাইচরণ পছন্দ

করিতে পারিতেছিল না। সে দরিদ্র চাবী;
সে পরিশ্রমের বিবিধের অর্থ চাহে; সে
ভিক্ষাগ্রহণ কেন করিবে? রাইচরণ স্থির
করিল সে ফিরিয়া যাইবে ও কার্য্যে ইস্তফা
দিবার ইচ্ছার অরুণের বাটা গেল। তথায়
সে অমলকে দেখিয়া বিম্মিত ও স্তম্ভিত
হইল। অমল তাহাকে বিজ্ঞানা করিল,
“আমার চিন্তে পার রাইচরণ?”

নমস্কার করিয়া কর জোড়ে রাইচরণ
বলিল, “সে কি কথা বাবু? তোমার অম
থেরেছি—আর চিন্তে পারবো না? তা
তুমি এখানে যে বাবু? এতদিন ছিলে
কোথায়?”

উত্তরে অমল বলিল, “সে অনেক কথা
রাইচরণ, বাঁচবার আশা ছিল না আমার।
বহু ভাগ্যে বেঁচে গিয়েছি। আজ হুঁমাদ
হলো এখানেই রয়েছি।”

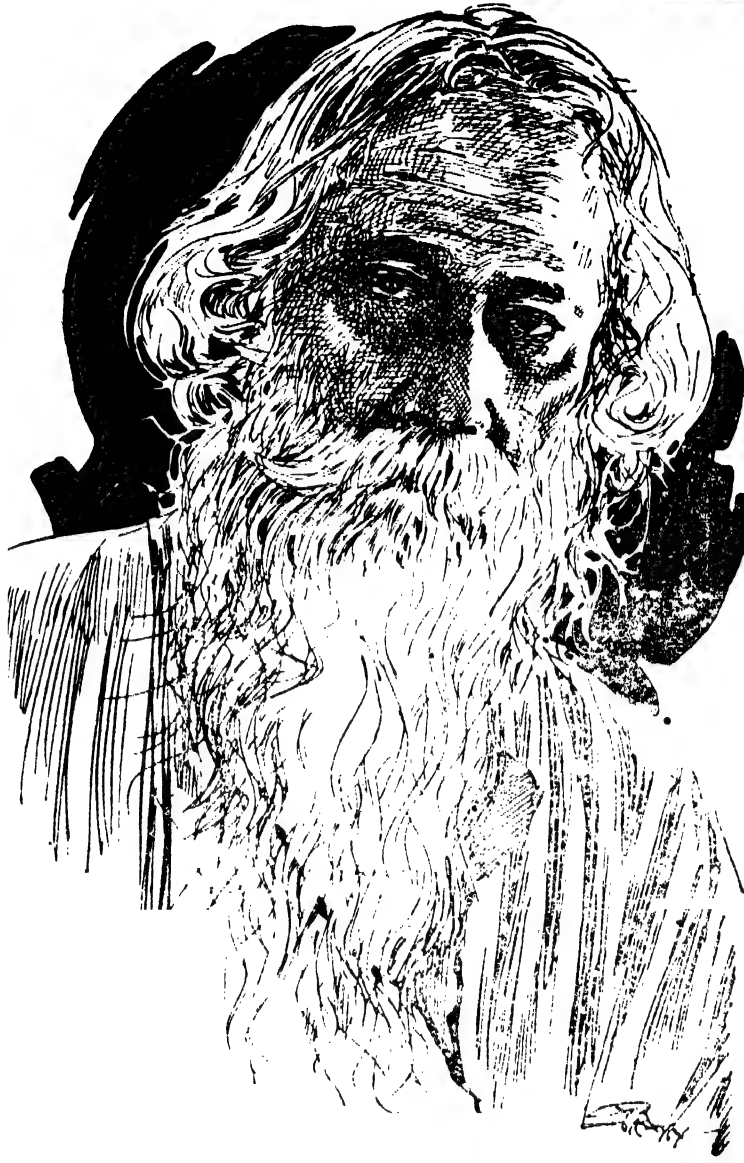
হালিয়া রাইচরণ বলিল, “তা ডাক্তার-
বাবুকে দ্যাবতাই বলিতে হবে বাবু, নইলে
যে তার বৌ বার করে নিয়ে বার তাকে
আবার বাড়ীতে স্থান দেয়? আমরা
ছোটনোক, বাবু, অত ক্যামা ঘেরা ঘোঘের
আসে না।”

অমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, “কি বলছ
রাইচরণ, কার বউ বার করলাম আমি?”

“কার আবার? বার বাড়ীতে বসে
কথা বলছ তারই,—থাক্ সে কথা।—”

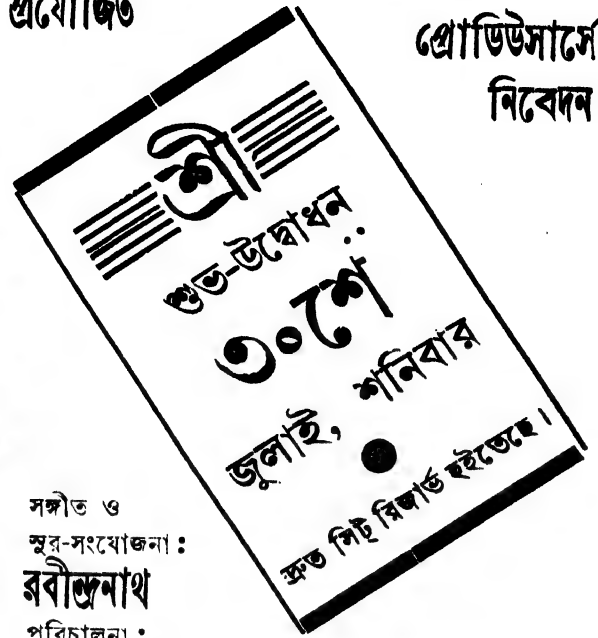
বাধা দিয়া অমল বলিল, “অরুণের
বউকে বার করতে পারে এমন লম্বা
পৃথিবীর কোন পুরুষেরই নেই—তুমি তাঁকে
দেখনি তাই ওই কথা বলতে পারলে
তুমি। শরতান স্বয়ং যদি লম্বা শক্তি নিয়ে
চেষ্টা করে তবুও তাঁর ঘেহে পাপের দ্বারা
স্পর্শ করতে পারেন না এমন জীলোক তিনি।
মাজুঘের বেশ ধরে তিনি এলেন এই
পৃথিবীতে। তিনি মাজুঘ মন রাইচরণ।”

নাগ্রহে রাইচরণ বলিল, “আজ্ঞা বাবু,
তবে লভ্য করে বল আমার কথা না কে?”



বি-পি মেহেরা
প্রযোজিত

এসোসিয়েটেড
প্রোডিউসার্সের
নিবেদনঃ



সঙ্গীত ও
স্বর-সংযোজনা :

রবীন্দ্রনাথ

পরিচালনা :

সত্ৰু সেন

চিত্র-শিল্পী :

ননী সামন্তাল

শব্দধর :

মধু মীল

সঙ্গীত শিল্পক :

অনাদি দস্তিদার

আবহ সঙ্গীত :

সুরেন দাস

: স্ফটিককার :

সুপ্রভা মুখার্জি

ইন্দ্রিরা রায়

শান্তিলতা ঘোষ

রমা ব্যানার্জি

হরেন মুখার্জি

ছবি বিশ্বাস

মনোরঞ্জন ভট্টা:

শিবকালী চ্যাটার্জি

বিস্তারিতভাবে

ভাষা

কালী

ফিল্মস

ফুডিওতে

বি-এ-এফ

শব্দযন্ত্রে

ত

E. P. S.

অমল বলিল, “সে আমার বা অকপের কেউ নয়—সে এক কুড়িয়ে পাওয়া বাবুনের ঘরে।”

“তবে সে কারও জী নয়?”

“না সে ছিল কুমারী—পিতৃহত্যা।”

“অকপবাবুর বাড়ী সে এলো কি করে?—মধ্যে বলোনি, বোম্বাই তোমার। তুমি তাকে কোথা থেকে টাটানগরে নিয়ে গিয়েছিলে?”

অমল কিছুমাত্র গোপন না করিয়া রাইচরণের নিকট সমস্ত কথাই বলিল—পরে বলিল, “বিশ্বাস না কর, অকপের জীকে দেখাতে পারি তোমাকে আমি।” সে রামলালকে ডাকিয়া বলিল বোম্বার কাছে এই বুড়োকে একবার নিয়ে যেতে পার রামলাল?”

রামলাল জানাইল আজ তিন দিন হইল বোম্বা বাপের বাড়ী গিয়াছেন। বোম্বা কবে ফিরিবেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল উত্তরে প্রভু তাহাকে বলিয়াছেন যে তিনি আর ফিরিবেন না। রামলালের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল; সে অমলকে জানাইল সত্যই বহি তাহার ‘মা’ ফিরিয়া না আসেন তাহা হইলে সেও চাকরী ছাড়িয়া দিবে। লক্ষ্মীহীন এই বিশাল প্রাণাঘে থাকা অপেক্ষা বনে বাস করাও সে প্রেরণ মনে করে।

অমল ও রাইচরণ একত্রে বলিয়া উঠিল, “সে কি বোম্বা ফিরিবেন না কেন?” রাইচরণ বলিল, “হা ভগবান, শেষে কি সতীলক্ষীর চোখের জলের কারণ হলোম আমি? আমার অন্তরে যে অকপবাবুর এই সর্বনাশ হয়েছে—আমি যে সেই ডাইনীরা কাছে ডাক্তারবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছি। আমার সর্বনাশ হবে, অমলবাবু, তার চোখের জলে জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আমার সব—হয়তো নির্বংশ হবে।

অমল কান্দুখানে জিজ্ঞাসা করিল “তবে, তবে কি কণা এখন অকপের কাছেই আছে?”

ব্যথার-রূপ

শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

গানে আমার বেবে ধরা এইত ছিল কথা
গানেতে তাই তাবা পেল আমার প্রাণের ব্যথা।
স্বপ্নের লাগে স্বপ্ন মেশাতে লাগ ছিল যে মনে
বীধব তোমার আপন করে প্রেমের আলিঙ্গনে।
লাগ বা ছিল মিলিয়ে গেল, হোলোনা গান গাওয়া
প্রেম বা ছিল ফুরিয়ে গেল, আগলো শুধু মারা
কণেক পরে কখনো মোর—তার পরেতে ছায়
কখন আমার উঠলো বলে বিপুল বেদনার।
স্বপ্নের আশে ঘুরে শেষে ক্লান্ত হিরা নিয়ে
বিদায় বখন নেব আমি মিশবো ধুলোর গিরে,
তার আগেতে তোমার কাছে এইটুকু চাই প্রিয়
মিশে যাবার কণেক আগে শেষ দেখাটি দিও।

অকপ তার খবর জানে কি রাইচরণ! সত্য বল সেই কি তবে অকপের অবঃপতনের কারণ? সেই কি বৌবিদিকে গৃহহাড়া করেছে? বল রাইচরণ, তোমার পায়ে পড়ি কোথায় সে? তুমি জান নিশ্চয়—জান আমার প্রতি দয়া কর—অনুগ্রহ কর, বলে দাও সে কোথায়।”

রাইচরণ বলিল, “মাফ করবেন বাবু তা আমি বলতি পারবো না। আমারে বোম্বার বাপের বাড়ীর ঠিকানা বলে দিন আমি দেখানে যাব, মায় পার ধরি ক্ষমা চাইব। রামলাল ঠিকানা বলিয়া দিল। উদ্ভ্রাণের ভায় রাইচরণ ছুটিল তবানীপুরের দিকে। অমল তাহার পশ্চাদ্ভাবন করিল ও কিছুক্ষণ বাইরাই তাহাকে ধরিতা ফেলিল ও বলিল “ঠিকানা না বললে যেতে পারবে না তুমি রাইচরণ।”

রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিল, “জান্না বাবু বহি আমার কণা মাকে দেখতে পাও তুমি কি করবে তনি?”

অমল বলিল, “প্রথমে চেষ্টা করবো তাকে ফিরিয়ে আনতে সে যদি না আসতে চায় তাহলে খুন করবো—হ্যাঁ সত্যিই খুন করবো তাকে।”

রাইচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “সে তোমার সঙ্গে ফিরবেন বাবু শেষ কালে খুনই হবে। তোমার কচি বরেন্দ্র বড় বড় জীবন পড়ে রয়েছে তোমার সামনে। কেন মিছে খুনোখুনি করে কীলি যাবে বলত? আমি আমার মাকে নিজ হাতে খুন করবো; বোম্বার পক্ষের কাটা আমিই লগিয়ে দেবো। বুড়ো বরেন্দ্র কীলি কিছু যাবে আসবেনি আমার। তুমি বাড়ী যাও।” অমলকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই বৃদ্ধ উর্জ্বাদে পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল। অমল হতাশচিত্তে বাটী ফিরিল।

নৃত্যের অভিনব জলসা “জলজ নৃত্য”

একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে হৃদয়-ভারতে যে অপরূপ নৃত্যের সৃষ্টি হয়, আলহে এই আগষ্ট প্রভাত নিনেবার রূপালী পর্দার বেলা ১১ টার চিত্রে তা সম্পূর্ণ দেখান হবে। এরূপ ধরনের চিত্র এই দর্শক প্রথম এবং কর্তৃপক্ষের এ ব্যবস্থা রন-পিপাসু মাত্রেয়ই আনন্দ দান কর্কে। প্রতীচ্য নৃত্য, প্রাচ্য নৃত্য, বহু নৃত্যই রনক মহলে সু-পরিচিত কিন্তু নৃত্যের অভিনব ও প্রশংসিত বহুতর-যুগী। লোক চকুর অন্তর্গলে অবস্থিত।

গুপ্ত ঐশ্বর্যের ভার এ আশাভের ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহু পুরাতন কিংবদন্তীর সঙ্গে বিজড়িত বহু নৃত্যেরই প্রচলন রয়েছে। এ সম্পর্কে “হাউ” নৃত্যের উল্লেখ উল্লিখিত উক্তিই সর্বাধিক কর্কে। তেমনি হৃদয়-ভারতে মাত্রেয়ই এই “জলজ” নৃত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়।

মাত্রেয়ের সু-প্রসিদ্ধ নর্তক রাজাগোপালন স্মরণ ‘রঙ্গমঙ্গল’ গ্রামে কোনও একমন্দিরের নর্তকী জলজকে দেখতে পান। “জলজের” নৃত্যে যে স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণা আসত, যে অদ্বিত কলা-নৈপুণ্যের সৃষ্টি হত সাধারণ লোকের কাছে তা অপরিস্রবতাই ছিল। রাজাগোপালনই তা দর্শক প্রথম আবিষ্কার করেন এবং জলজকে সঙ্গে নিয়ে এলেন নহরে। তিনি ভাবলেন জলজের সহায়তাই তিনি “ভারত নাট্য”কে পূর্ণভাবে সজীবিত কর্কে সক্ষম হবেন। কিন্তু মাহু ভাবে এক এবং কার্যকালে তার বিপরীতই সচরাচর হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই

হল। জন সাধারণ রাজাগোপালনের কার্য্যে কোন দাখ উদ্বেগ দেখতে পেলেন না, অধিকন্তু রীতিতে লাগল রাজাগোপালনের কার্য্য অতীব গর্হিত হয়েছে। রাজা গোপালনের স্ত্রী ললিতা এতে খুবই মনে আঘাত পেল। অবশেষে জলজ এলে ললিতার মনের চাক্ষুস্য দূর করে দিল—তাও তার ঐ স্বর্গীয় নৃত্যের প্রভাবে।

হবিধানি “জলজ” প্রত্যেকেরই মনো-রঞ্জন সার্থক হবে—বিশেষ করে নয়ন-মুগ্ধকারী অভিনব নৃত্য দ্বারা ভারত নাট্যের এই আদি করনা রনজ ব্যক্তি মাত্রেয়ই দেখা কর্ধ্য।

সবিতা ও মতিলাল

প্রভাত নিনেবার লাগর সৃষ্টিটোনের চিত্র চাক্ষুস্যকারী অভিনব চিত্র “৩০০ শত দিবস পর” কলকাতার হিন্দি চিত্র জগতে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, যারা গত সপ্তাহে প্রভাত নিনেবার মুক্তি আফিলে উপস্থিত ছিলেন তারাই এ কথার প্রতিধ্বনি কোরবেন এবং একথা বলাই বাহুল্য যে ঘটনার অভিনবত্বে, অভিনয়ে, সজীব ও কোতুকে হবিধানি এককথায় হয়েছে চমৎকার। গল্পের গুণে বিবেচী দ্বারার ভাব পরিস্ফুট থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ দৃশ্য আব-হাওরোপোযোগী করা হয়েছে এবং পরিচালক মশাইর এ কৃতিত্ব কম নহে। হিন্দি ভাষা খুবই সহজ ও সরল করা হয়েছে। মোটের উপর বাঙ্গালী দর্শকের কাছে হবিধানি যথেষ্ট সমাদর পাবে।

হবিধানির পরিচালনা করেছেন সর্বোত্তম বাঙ্গালী। মিঃ বাঙ্গালীর নাম চিত্রামোহী মহলে খুবই পরিচিত এবং পরিচালনার

কাজ তিনি যথেষ্ট সূক্ষ্মভাবে সম্পাদন কর্কে পেরেছেন।

এতে অভিনয় করেছেন দ্বারাজিত-জগতে সুপরিচিত অভিনেত্রী মিস্ ললিতা দেবী, মতিলাল, বিবু ও ইরাকু, ভারতের দ্বারাজিত জগতে এবের প্রত্যেকেরই কোন পরিচয় দিবে হয় না; এবং প্রাত্যক নামেরই বঙ্গ-অফিল মূল্য যথেষ্ট আছে।

আলহে শনিবার থেকে প্রভাত নিনেবার তৃতীয় সপ্তাহে পড়বে এবং আশা করা যায় আরও কয়েক সপ্তাহ হবিধানি এখানে খুব ভাল ভাবেই চলবে।

অভিনয়

শ্রীভারত লক্ষী পিকচার্সের অনবদ্য অবদান “অভিনয়” শীর্ষে সর্বাঙ্গী চিত্রগৃহে সৃষ্টিলাভ কোরবে। অভিনয় নৈপুণ্যে ও ঘটনার মনোহাতিবে “অভিনয়” অভিনয়-জগতে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি কর্কে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। শ্রীমতী সাধনা বোস চিত্রজগতে অতি অল্প সময়েরই এনিচ্ছিত লাভ কর্কে পেরেছেন এবং “আলিবাবা” চিত্রে তিনি যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তা চিত্রামোহী মাত্রেয়ই অবগত আছেন। বর্তমান চিত্রেও তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য মোটেই স্নান হয়নি, বরঞ্চ তা আরও বৃদ্ধি পেরেছে, তাহাড়া বিভিন্ন ভূমিকার অসীম চৌমুরী, দ্বারাজিত চিত্রাচার্য্য, শ্রীতি মজুমদার, প্রতিমা মুখার্জী প্রভৃতি ররেছেন।

মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বইধানা লিখিত এবং পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত মধু বহু।



ইন্দিবিমাল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা • ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা।

৩ রেডিও প্রসঙ্গ ৩

সত্যভাষী

বাহুগিরি পরিচালনার ছোট্টদের বৈঠকের বিশেষ উন্নতির আশাই আমরা করেছিলাম। ছোট্টদের বৈঠক পরিচালনার বোগ্যতা বাহুগিরি আছে এ আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এই বিভাগটি লক্ষ্যে আমরা নিরাশ হয়ে পড়ছি। নির্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘকণ ধরে চিঠি পড়া করার বাকী সময়ে একটা বক্তৃতা কিংবা একটা ছেলে তুলানো নাটিকা (৭)—এই বড় ছোট্টদের বৈঠকের প্রোগ্রাম হয় তা হলে তাকে আমরা লক্ষ্যন করতে পারি না।

বাপীকুমারের পরিচালনার ‘বেতার-বিভাগ’ বিভাগের মধ্যে আমরা দিন দিন বৈচিত্র্যতার পরিচয় পাচ্ছি। এবারে করলা-ধনির দৃশ্য সৃষ্টিজিত রচনা। বাপীকুমার করলাধনির যে দৃশ্য বেতার দ্বারা আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন তা লভ্যই বিশ্বরের ব্যাপার। কুনির্দারের কথাবার্তার ঢং লাভালাভি নাচ-গান মাঝে আর করলাধনির আত্মসত্ত্বীন দৃশ্য লভ্যই অপূর্ণ!—বেতারে এ একটি সৃষ্টি!—.....

ঐচ্ছিক সময়ের চৌধুরী আধুনিক গান আমাদের খুবই ভালো লাগে। বেতারে সময়সম্পদ জনপ্রিয় শিল্পী, বেতার প্রোগ্রামে এর গান বেশী করে দেওয়া উচিত।

গত বৃহস্পতিবার ২১শে জুলাই সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র লক্ষ্যে বক্তৃতা দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ শরৎ বাবু লক্ষ্যে বিশেষ কিছুই নতুন ভাষ্য

আমাদের জানান নি। তবুও বেতারে শরৎবাবু লক্ষ্যে আলোচনা প্রশংসনীয়।

ছোট্টদের বৈঠকে গত ২৩শে জুলাই সুরাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থ-লক্ষ্য লক্ষ্যে বক্তৃতা দিলেন। রসসাহিত্যিক বিজ্ঞান আলোচনা করলেন কেতাবী সুরে। শিশুদের বোধগম্য বক্তৃতাটি মোটেই হয় নি।

পল্লীমঙ্গল আলয়েরও আমরা প্রশংসা করার মতন বিশেষ কিছু খুঁজে পাই না। অবশ্য পল্লী-কৃষক সমস্তা নিয়ে আলোচনা—নাট্যকার রূপান্তরে মাঝে মাঝে বেতারে হয়ে থাকে। কিন্তু কতকগুলি সমবেত কঠোর বেন্দুরা কোলাহলে নাট্যকার রসসৃষ্টিতে বাধা পড়ে। গানও যা হয় তারও কোন অর্থ কিংবা লক্ষ্য থাকে না। নৃপেনবাবুর কাছ থেকে আমরা এর থেকে অনেক উন্নত ধরনের প্রোগ্রাম-গঠনমূলক অনুষ্ঠান আশা করে থাকি।

বিশ্বাহরিক অনুষ্ঠান যে তিমিরে দেই তিমিরেই। কর্তৃপক্ষ এ আলয় লক্ষ্যে একেবারেই নিশ্চেষ্ট এবং উদ্বাসীন। হ’একটি

নারী প্রশংসার বক্তৃতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠান-ই এ আলয়ে থাকে না।

গত রবিবার ২৪শে জুলাই প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে কুমারী বীণাপাণির হৃদয়ানি হিন্দি গান ও বেতার অর্কেস্ট্রার প্রত্যাগী লক্ষ্যিত বন্দ্য নয়। জটায়ু পাইনের গান চললই। রবিবার প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান দিনে দিনে অবনতির সুরে নেমে যাচ্ছে। স্পেক্টেটর টেল এবং জীবন লক্ষ্যে আলোচনা করলেন। স্পেক্টেটরকে সুনমালোচক বলে আমরা জানি। তাঁর টেল এবং জীবন লক্ষ্যে আলোচনাগুলিতে সুনমালোচকের দৃষ্টি থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ‘চক্রবর্তী’র মত একখানি খার্ডক্লাশ নাটকে প্রশংসা করতে শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। স্পেক্টেটর অবশেষে ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ লায়রণ দর্শকের উপযোগী বলে নিজের রসজ্ঞানের মর্যাদা আবার রক্ষা করে গেলেন। Climax, নাটকের ষাট-প্রতিষাট অনেক অনেক বড় কথা—গালভরা বুলিই শুনলুম—কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষদর্শী জানি একটা শতাব্দী বর্ষ পূর্বের যাত্রা মূলত নাটক। তারই সঙ্গে নানা প্যাচ কদা হয়েছে, লহজে লোক ভোলানোর মনোবৃত্তি নিয়ে। স্পেক্টেটরের রসজ্ঞানের অন্তঃপর আমরা প্রশংসা করি।

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

১৩৬এ, আন্ততোরি মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিন

রজত জয়ন্তী

গত শনিবার ২৩শে জুলাই লক্ষ্য ৩০ টার প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার-ল্যাবরেটরী গৃহে কলেজ-ম্যাগাজিনের রজত-জয়ন্তী উৎসব সুলক্ষ্য হইয়া গিয়াছে। উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন মহাশয়। এই উপলক্ষে কলেজ-ম্যাগাজিনের প্রথম সম্পাদক— ল কলেজের সুবোধ্য অধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস, বি, এল. বার-এ্যাট্ট-ল, এম্-এল, এ মহোদয় প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উৎসব-সভার বে লকল বিশিষ্ট ভক্তমহিলা ও সুধীশঙ্করগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে— মিলেস্ বি, এম্, সেন, মিলেস্ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার কস্তাগণ, মিলেস্ পাহাড়ী নারায়াল, মিলেস্ সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার,— বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ক্রম্ভটী (কলেজ ম্যাগাজিনের প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী), শ্রীযুক্ত রমাশ্রীনাথ সুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমাশ্রীনাথ সুখোপাধ্যায় (কলেজ-ম্যাগাজিনের অন্ততম ভূতপূর্ব সম্পাদক), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার (ম্যাগাজিনের অন্ততম ভূতপূর্ব জেনারেল সেক্রেটারী), ডক্টর অমরপ্রসাদ দাসগুপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসিষ্ট্যান্ট কন্ট্রোলার), বিশ্ববিদ্যালয়ের লংহুতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শঙ্কুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরকুমার তট্টাচার্য্য, প্রভৃতির নাম লবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে কলেজের একটি ছাত্র “বন্দো-মাতরম্” গানে উৎসবে উদ্বোধন করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের এই অতি পুরাতন ভবনে কলেজের উৎসবে প্রাকৃতভাবে “বন্দোমাতরম্” গান এই প্রথম। এই অভূতপূর্ব ব্যাপারের আকস্মিকতা এতই বিস্ময়কর ও প্রীতিজনক হইয়াছিল যে, ‘গানটি ঋণ্ডিত-বিকৃত ভাবে বেহুয়ে-বেতালার কোনওরূপে গীত হইলেও আমরা প্রায় অভীভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহার পর অধ্যক্ষ সেন মহাশয় নূতন ছাত্রগণকে স্বাগত লবোধন করিয়া কিছু বলেন। তাহার পর কলেজ-ইউনিয়নের গতবৎসরের সম্পাদক শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রমথবাবুর পুত্র) সরস ভাষায় প্রধান অতিথিকে আমন্ত্রণ করেন। শ্রীমান্ প্রতাপ সেন (কলেজ ম্যাগাজিনের বর্তমান সম্পাদক) ম্যাগাজিনের রজত-জয়ন্তী লংখ্যা বিরূপ হইবে তাহার একটি ক্ষুদ্র বিবৃতি প্রদান করেন। তাহার পর প্রধান অতিথি প্রমথ বাবু আবেগপূর্ণ ভাষায় কলেজ ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, উহার ক্রমোন্নতি ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া ভবিষ্যতে লগৌরব লাভলোর আশা প্রকাশ করেন। ইহার পর কলেজম্যাগাজিনের গতবৎসরের সম্পাদক শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র সিংহ ম্যাগাজিনের অর্থদয়তা লইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার কঠ-নর মুহ ইওয়ার লজ তাহারই লতীর্থগণ তাঁহার প্রতি বেরূপ লভ্য ব্যবহার করিয়া ছিল, তাহাতে যে কোনও লিখিত ভক্ত-লভ্যানের লজ্জিত-হৃদয় ছাড়া লভ্যকর ছিল

না। ছাত্র হইয়া ছাত্রের প্রতি যে এরূপ ব্যবহার করা বাইতে পারে—ইহা আমাদের ছাত্রাবস্থার লরনারও লতীত ছিল। তাহার-পর শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র ধন্তবাবু প্রদান করিলে লভ্যার কার্য লমাপ্ত হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক, পাহাড়ী নারায়াল ও অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর শ্রীযুক্ত চমনলাল মিশ্র ও লক্ষিণাঙ্কন ঠাকুর রাজি নরট। লর্যাক্ত গান লাজনা চালাইয়া ছিলেন।

এই প্রলক্ষে আমাদের আর একটু লক্ষ্য্য আছে। কলেজের এইরূপ একটি উৎসবে কলেজের লধিকাংশ লধ্যাপকই (লিশেষ করিয়া হোমরা-চোমরা লধ্যাপক-গণ) লভূপস্থিত ছিলেন। লধ্যাপক চারুচন্দ্র তট্টাচার্য্য, ডক্টর পঙ্কজন লিয়োগী, ডক্টর কুন্দরত-ই-খোদা, বেবেলনাথ সেন, লুশোভন চন্দ্র লরকার, সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, গুরুদাস ভড়, ললানন্দ ভাড়াডী, গৌরীনাথ তট্টাচার্য্য প্রভৃতি লুটিমের লরেকজন লধ্যাপক লাতীত লন্ত্রের লর্ণন লিলিল না। লধ্যাপক ডক্টর সুরোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (লিনি কলেজ ম্যাগাজিনের উপরা-উপরি দুই লৎসর সম্পাদক ছিলেন)—তাঁহারও লন্ততঃ ভক্ততার লাতিরে এ লভ্যার উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু লোধ হয় এই লকল ছরধর্না লধ্যাপকলুল লাবিয়াছিলেন—একে-ত এ্যাপেনমন্ত্রীর একজন লংগ্রেসী লভ্য প্রধান অতিথি, তাহার উপর “বন্দোমাতরম্” লকীত (হটক উহা লাজা-লুড়া লাব)—লন্তএব, এহেন লুল লুরে লরিহার লরাই লুক্তিযুক্ত। লন্তথায় একলোগে লধ্যাপক-লুলের উৎসবে ললহলোগিতার লরন্ত আর কি লাকিতে পারে ?

লোস্তাল লনিটির লভ্য শ্রীমান্ গণেশ চন্দ্র ললু, ললিত মজুমদার ও লুল্লী লোব উৎসবের লাকলোর লজ লিশেষ লরিজ্ঞল করিয়াছিলেন।

কানীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(দিলীপ তত্ত্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল
কণকাল, পরে আপন মনে মর্মভাঙ্গা সুরে
বলিতে লাগিল)

আজ সব যুঝতে পারলাম !
কুহেলিকা কেটে গেছে ! চারিদিক
পরিষ্কার !.....

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীল—একি ! তুমি এ ঘরে উঠে
এলেছো কেন ? একবারটি তল্লা এলেছে
অমনি একি কাণ্ড করে বললে !

দিলীপ—সুনীলা, সব যুঝতে পেরেছি
আজ । সব ধরা পড়ে গেছে । জানতে
আর আমার বাকী নেই কিছু ।

সুনীলা—কি হ'ল ? কি যুঝতে
পারলে ? কি জানতে পারলে ?

দিলীপ—ওরে নীলা ! সে কথা বলতে
গিয়ে আমার যুকের মাঝে আটকে যাচ্ছে ।
—আমি ভাবার তাকে টেনে জানতে
পারছি না ।

সুনীলা—তবে থাক্, তোমার বলতে
হবে না । বা বলতে এত কষ্ট হয় তা
আমি শুনতে চাই না ।

দিলীপ—কিন্তু তোমার না বলে আমি
পারবো না । ওগো মর্মবরী বন্ধু আমার !
তুমি ছাড়া আজ আর আমার কেউ নেই,
তোমাকে বলতেই হবে ।

(এই বলিয়া দিলীপ নিকটস্থ একখানি
কোচে প্রথমে বলিয়া পড়িল, পরে ভইরা
পড়িল)

সুনীলা—দিলীপ, দিলীপ—! একি,
একবারে অজান হ'য়ে গেল !.....বেহারী,
বেহারী—

(বেহারার প্রবেশ)

এই, ছোটবাবুকে শীগগীর ডেকে দে,
শীগগীর ।

(বেহারার প্রস্থান)

যুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠল দেখতে
দেখতে ব্যাঙের ও গেল ভিজে রক্তের চাপে ।
অথচ ঠোট দুটি ন'ড়কে, কি বেন বলতে
চাচ্ছে !—

(স্নেহ তরল কর্তে) দিলীপ, দিলীপ,
আমার যে কি বলবে বললে ? আমি তোমার
কাছেই রয়েছি । কি বলতে চাইছো বো ?
কথা বলো, কথা বলে দুঃখের তার লাঘব
কোরে নাও দিলীপ !—

—না, না, এ আমি কি করছি !
রোগীকে বিরক্ত করব না, বিরক্ত করব না !...

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

দ্বিজেন—কি, কি হয়েছে সুনীলা ?

সুনীলা—দ্বিজেন, কি হ'য়েছে দেখো ।
তুমি উঠে গেলে, আমার কেমন একটু
তল্লা এলো । হয়তো ঘুমিয়েই পড়ে-
ছিলাম ।—উঠে দেখি ঘরে নেই । এ ঘরে
এলে দেখি পাথরের স্তম্ভের মতো ঐ স্ক্রীনটার
পাশে দাঁড়িয়ে !—আমি জিজ্ঞাসা করতে
ব'ললে "যুঝতে পেরেছি, সব যুঝতে
পেরেছি !" বললুম, কি যুঝতে পেরেছ
আমার বো ? বলবার চেঁচা করলে কিন্তু

ব'লতে পারলে না, এই কোঁচটার ভয়ে
পড়লো ।

দ্বিজেন—হা হা, হা হা—

সুনীলা—ডেকোনা । তুমি শীঘ্র ডাক্তারকে
নিরে এলো । পাবেত তাকে এখন ?

দ্বিজেন—পাবো ।— (প্রস্থানোভিত)

সুনীলা—বা কি তরে পড়েছেন ? পার
যদি তাঁকে একবার ডেকে দিয়ে যেও ।
এখনি উঠে হয়তো থাকেই দেখতে চাইবে ।

(দিলীপ মহলা কথা বলিয়া উঠিল)

—না, না, থাকে আমার চাই
না । থাকে ডাক্তার হবে না !...

সুনীলা—এই যে কথা বলেছে !—থাকে
ডাকবে না দিলীপ ?

দিলীপ—না ।

সুনীলা—তবে থাক্ দ্বিজেন । তুমি
ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলো ।

দিলীপ—না কাউকে না । কাউকে
ডাকতে হবে না । দ্বিজেন, তুমি আমার
জন্ত কিছু কোরবে না ।

দ্বিজেন—(হাসিয়া) তোমার জন্ত কিছু
ক'রছি না, তর নেই ; কিন্তু আমার জন্ত
আমার ক'রতেই হবে !

(প্রস্থান)

দিলীপ—দ্বিজেন তেবেছে আমি ওর
তাই ; তাই আমার জন্ত ডাক্তার আনাকে
ও নিজের জন্ত ডাক্তার আনা ব'লে
তাবে ! হুর্খ !

সুনীলা—মত্যা কথাই তেবেছে । আমি
হ'লেও তাই ভাবতুম দিলীপ ।

দিলীপ—মত্যা কথা জানে না ব'লে
তাই তেবেছে । জানলে ভাবতে পারতো—
(দুহুর্জকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবেগ
তরে বলিতে লাগিল)

আমার কেউ নেই সুনীলা । আমার
বাবা নেই, মা নেই, তাই নেই, বোন নেই ।
এ বাকীতে আমার কেউ নেই সুনীলা ।
ছিল সব, এক নিমেষে সব চলে গেছে ।

(মনীষার প্রবেশ)

মনীষা—এই যে বাবা এখানে। ওগো
বাবা, তুমি কংগ্রেসের প্রেনিডেন্ট হ'য়েছো।
এই দেখ Amrita Bazar Patrika Extra-
Ordinary Issue বার কোরে খবর দিচ্ছে :
Dilip Kumar Elected President Of
The Indian National Congress।
—এই যেথো। (পত্রখানি বলিয়া ধরিল)

সুনীলা—দেখি, দেখি,—

(পত্রিকা লইয়া পড়িতে লাগিল)

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারী—Telegram! Sir.

সুনীলা—Telegram! দেখি।

(বেহারী চলিয়া গেল; খাম খুলিয়া

টেলিগ্রাম খানি পড়িয়া সুনীলা কলকর্থে
বলিয়া উঠিল)

Wardha! বা ভেবেছি ঠিক তাই!
Wardha থেকে আসছে।—এই নাও পড়ো।

মনীষা—কংগ্রেসের টেলিগ্রাম তো?

সুনীলা—হ্যাঁ।—

মনীষা—প্রেনিডেন্টই হ'ল বটে?

সুনীলা—হ্যাঁ রে—

মনীষা—ও-হো হো!

(বলিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া
কেলিল)

—আমি বাবাকে বলে আনিগে—

(দ্রুত প্রস্থান)

সুনীলা—বিলীপ, কথা বলছো না যে?

(টেলিগ্রাম খানি হাতে করিয়া বিলীপ

তক হইয়া বলিয়াছিল, সুনীলার কথা
তাহার চমক্ ডাঙ্গিল)

বিলীপ—কথা! কথা আমার চির-

জীবনের জন্ত বন্ধ হ'য়ে গেল সুনীলা!

আমার যে হৃদ্যে আতি আমার নেতৃত্ব

করবার তার দ্বিগুণ আহ্বান জানালে, আমার

আমি সে আস্থানে সাড়া দিতে

পারবো না। ঠিক যে দিন আমার বা
মমের বন্ধন ছিন্ন কোরে আমার কাছ
থেকে বহু দূর চলে গেল, সেই দিন এলো
আমার দেশের বা—আমার ভারতবর্ষ—তার
শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের অধিকার দ্বিগুণ আমার পূজা
নিতে! যে হুঁতীয়া দ্বারের উপর প্রহা
হায়াল, সে হ'ল অতৃষ্ণ, অশ্রুত; সে হ'ল
কৃপার পাত্র, সে হ'ল সমাজের একটা
আবর্জনা।—আমি নেই। দেশ নাক্তকার
পূজার অঙ্গনে আমার স্থান নেই, আমার
তোমরা বিদায় যাও!

সুনীলা—এ তুমি কী বলছো বিলীপ?

বিলীপ—বা বলতে চাই তাই বলেছি।

—ওরে নীলা! ওরে Comrade! তুমি

জানিস্ আমি কে? আমার কি গোজ?

সুনীলা—জানি।

বিলীপ—জানিন না।—আমি জারজ।

বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা যে অভিনয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তারই প্রত্যক্ষ চিত্ররূপ—



পরিচালক :

মধু বসু



কাহিনী :

মনমথ রায়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

প্রগতি চঞ্চল কথাচিত্র

ভূমিকার : লাবণ্য বসু, প্রতিমা: সুখাঙ্কি, অরাজ

চৌধুরী, দীপক ভট্টাচার্য্য, শ্রীতি মজুমদার,

তুলনী লাহিড়ী, ডা: বিজুতি গাঙ্গুলী।

রূপবাণীতে

আগতপ্রায়

জগদ্ধায়া

(সামাজিক উপত্ৰাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূৰ্ণ প্রকাশিতের পর)

—সপ্তম পৰিচ্ছেদ—

বাড়ীর সকলের মূখ তাল করিয়া তাজিতে না তাজিতেই, সকালে জগদ্ধায়া ওরফে যজ্ঞেশ্বর আদিরা হাজির। বাহিরের ঘরে ছিল রামধীন, সে তখন তাহার প্রভাতি মহাধেব বন্দনাটা কলিকার অগ্নি লংঘোগে লম্বা করিয়া লবে মস্তিষ্কের বেউড়ী হইতে নদীতীরকে বিহার দিতেছিল, এমন সময়ে জগদ্ধায়া আদিরা বলিলেন : ‘কিরে রামধীন ? বাড়ীর সব তাল তো ?’

জগদ্ধায়া গারে এক নামাবলী জড়ানো, এবং পরনে একখানা গরব কাপড়। কপালে চন্দন ও গিল্লুরের বটা সূর্য্যাস্তকালীন পশ্চিম আকাশকেও হার মানাইয়াছে। জগদ্ধায়া সেই মুষ্টি বেধিয়া রামধীন প্রথমে ভর পাইয়া গিয়াছিল, মুষ্টি কৈলাস হইতে মহাধেব স্বয়ং তাহার নিকট গজিকার অর্থ চাহিতে আদিরাছেন, কিন্তু যখন দেখিল দেহপ কোলও প্রায় মহাধেব করিল না, বরং মাল্লবের মত এই পৃথিবীর বিষয়ে কি একটা জিজ্ঞাসা করিল, তখন রামধীন চোখ রগড়াইয়া বলিল : ‘না বাবু ? ত্যাগী কাঁহা ! খবর বহুৎ খারাপ !’

পেছন দিক হইতে বাড়ীর ভিতরকার মাদালী চাকরটা ছইহাত জোড় করিয়া

Bastard ! আমার বা—না, না,—আমি আর বলতে পারছি না, আমার কথা কর।

(বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল ; অস্বস্তি করিল স্ত্রীলা। মাদিরা আলিল ভীত বসনিকা)

মাথার ঠেকাইয়া বলিল : বগবৎ হই মাঝাবাবু ! এত সকালে কোথা থেকে এলেন ?’

‘কে ? কেবার ?’

‘আজ্ঞে করেন !’

‘বাড়ীর সব তাল ?’

‘ভাল ? ও বাবা ! কি সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল কাল,—তা আর আপনাকে কি বলবো ?’

জগদ্ধায়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন : কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, কেবার ?

—আপনি শুনচেন না ? কাল বে বউ ঠাকরুণ গাঙ্গালাত করেছেন !

—সে কি কথা ? বউ ঠাকরুণ ?

—হ্যাঁ গো বাবু ! আপনাদের দ্বিধাশি। অঁহা ! বড় লভ্য মাল্লবটিই ছিলেন ! মূখ দিয়ে কখনও রা বাহির হইতেন না ।’

জগদ্ধায়া অতিমাত্রা বিস্মিত হইয়া বলিলেন : সে কি কথা ! আনাদের ললিতা দ্বিধাশি মারা গেছেন ?

—হ্যাঁ গো বাবু ! আমি কি আর মিথ্যা কথা কইচি ! ঐ জিজ্ঞেস করুন না রামধীনকে ! বাড়ীটাকে একেবারে চোখের জলে ভানাইয়া গ্যাছেন !

—কি সর্ব্বনাশ ! আমি ত কিছুই জানতে পারিনি ! মা জেনেছেন ? তিনি এসেছেন নাকি ?’

—বউ ঠাকরুণের মা ? না, না, ত্যামরাও আদেন নি। কেউ আদেন নি। মৃত্যুটা বে হঠাৎ হলেন কি না !

—হুটাত ? কি হয়েছিল ?

রামধীন এতকণে কথা কহিল ; সে বলিল : ডগ্‌হার বোলা, মাচিকো হুনিরা হরা !

—হুনিরা কি ব্যাবো রে ?

কেবার বলিল : হুনিরা টুনিরা ওনব কিছু নয়। ওনব বেড়োদের কথা ! যুকে লক্ষিকাশি বসেছিল ! লালিপাত বিগার হয়েছিলেন।

—উঃ ! তাহলে ত বড় ভয়ানক কথা !

মা খবর পেলেন কিনা, মূহুর্তে পারলুম না। কেবার ? তুমি একবার লবঙ্গ দ্বিধাশিকে খবর দাও ! কি ব্যাপার ঘটলো, আমি একবার জিজ্ঞেস করি।

—লবঙ্গ দ্বিধাশিকে ? আমি একবার দেখি তাঁকে পাওয়া যায় কিনা ! তানারা আবার এত সকালে উঠছেন না। বাবু ওঠেন দেহীতে, তাই তানরাও উঠছেন দেহীতে !

বলিয়া কেবার দিড়ি বাহিয়া উপরে গেল। জগদ্ধায়া বলিয়া রহিলেন। তাঁহার ঘেন ঘেন হইতে লাগিল, গৃহলক্ষীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানাও হতভী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহিরের ঘর খানাও ঘেন কিছু কিছু তাহার আতাব দিতেছে।

কিছুকণ পরে কেবার আদিরা জগদ্ধায়ে উপরে লইয়া গেল। তিনি কেবারের নকে যে ঘরটিতে আদিরা প্রবেশ করিলেন, সে ঘরটি খুব সুশোভিত না হইলেও সুপরিষ্কৃত এবং আনবাবগুলি—বখাছানে সুরক্ষিত। দেখিলেই ঘেন হয়, মাল্লবের পরিচ্ছন্নতার প্রকৃতি দেখানে পুরস্কার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শিল্পী এবং সতর্ক অঙ্গুলির দেখানে অতাব হয় নাই।

পরিষ্কার সুশোভিত ঘরের উপরে বলিয়া একটা রমণী ঢকে বজ্রাকল দিয়া কাঁদিতেছে। জগদ্ধায়া দেখিবামাত্র চিনিলেন, সে লবঙ্গ। জগদ্ধায়া কিছু না বলিয়া লবঙ্গের একটি কেবারার উপবেশন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

খেয়ালী চিত্রপট



প্যারামাউন্টের ছবি "টপিক ইন্ডিভিডুয়েল"
ডব্লিউ. ল্যান্ডার ও মে. বিল্যান্ড



পরিচালক
নাশনাল নিউজপেপার লিঃ
১১, চক্রেডিয়া (সান্দা) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাংখ্যা ৯৬৬

৪ষ্ঠ বর্ষ, একত্রিংশ সংখ্যা, প্রকাশিতবার, ১৯৫৭ খ্রিঃ ১৫ই আগষ্ট ১৯৫৮

রাষ্ট্রমঞ্চে শেষ অঙ্ক

নাশনাল মন্ত্রী-মণ্ডল যে সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়াছেন তাহাতে হুক-নলিনী-নাজিমের “স্থখী পরিবারের” নাভিগ্রাস উঠিয়াছে। অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের অনুকূলে নিপুল সমর্থকবৃন্দের সমাবেশে তাঁহারা অপ্রত্যাশিতভাবে শক্তিত হইয়াছেন। রাষ্ট্র-নাট্যের শেষ অঙ্কের অভিনয় হইবে আগামী সোমবার।

সোমবারের বল-পরিষ্কার জ্ঞাত উভয় পক্ষই বিশেষ তৎপর। হকাই মন্ত্রী-মণ্ডল প্রতিক্রিয়া-বাদীদের সহিত মিতালী করিয়া যেরূপভাবে মসনদে কায়মী হইয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে তাহা কয়েক মাস পূর্বে কেহই ভাবিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতি স্বভাবচন্দ্রের কর্মক্ষেত্রে পুনরাগমনের পর হইতে বিরোধীদল যেরূপ অভাবনীয়রূপে শক্তি অর্জন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক বিষয়েরই বিষয়। অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বর্তমানে যে অন্ততঃ পক্ষে ১১০ জনও সমর্থক পাওয়া গিয়াছে তাহা বিরোধী-দলের সংযোগসাক্ষক মেতা শরৎচন্দ্র ও ছইপ ত্রীমুক্ত, জে. সি. গুপ্তের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

সাহেবের বাক-চাতুর্য্য, নলিনীবাবুর আত্ম-প্রাণ ও অপরাপর কোশলাবলী যে পত্তনোন্মুখ মন্ত্রী-মণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারিবে না তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত।

মিনেন্সাশ্রী দলের শক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া হুক সাহেব বল-রকার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। তবে তিনি নলিনীবাবুর মায়্যা কাটাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহাকে বিরোধীদল হজম করিতে পারেন নাই। শেষ মুহূর্ত্তে হুক সাহেব নলিনীবাবুকেও পরিত্যাগ করিয়া বিরোধীদলের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেও আমরা বিস্মিত হইব না কারণ সময় ও ঘটনা-উপযোগী রূপ, মত ও বেশ পরিবর্তন হুক সাহেবের পক্ষে খতটা সহজসম্ভব অন্তের পক্ষে তাহা নহে। সুতরাং শেষ মুহূর্ত্তে কোন নাটকীয় বিবৃতি সহ হুক সাহেবের পক্ষে বিরোধীদলে যোগদান করা অসম্ভব নহে।

দেশভিত্তি বিভিন্ন অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব দাখিল অভিনব হইলেও ইহার মধ্যে রাজনৈতিক সুক্ষমদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা বিচ্যমান আছে। হুক সাহেব ও নলিনী বাবুর সহিত অনেকের বহুবিধ যোগাযোগ ও বাধ্য-বাধকতা আছে সুতরাং অস্বাভাবিক মন্ত্রীদের বিপক্ষে অধিকতর ভোট গৃহীত হওয়াই স্বাভাবিক। আর সংযুক্ত দায়িত্বের নীতি স্বীকৃত হইলে একজনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইলে সমগ্র মন্ত্রী-মণ্ডলের উপরই অনাস্থা জ্ঞাপিত হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শেষ অঙ্কের যবনিকা পতনের পর পটোত্তলন হইলে বাংলার রাষ্ট্রমঞ্চে কোন মন্ত্রী-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে তাহা এক্ষণে তুমুল গবেষণার বিষয় এবং বাংলার জনসাধারণ শেষ অঙ্কের বিতণ্ডার পরিণতি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

নোশনাল আলি সাহেব, মিঃ শামসুদ্দিন, মিঃ তামিজুদ্দিন, ত্রীমুক্ত শামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, মিঃ পি, আর, ঠাকুর ও ডেপুটি মেয়র হেমচন্দ্র নন্দরের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবার সম্ভাবনাই অধিক। রাষ্ট্র-মঞ্চে শেষ অঙ্কের অভিনয়ের পরিণতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদও বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে—সেইজন্ত নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ সম্বন্ধে কোন ঘোষণা অভাবধি প্রকাশিত হয় নাই।



(বিলাসী)

গোরা

দেববন্ত ফিল্মের নিবেদন

প্রযোজক—দেববন্ত শীল

কথা ও কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচালনা—নরেশ মিত্র

সঙ্গীত পরিচালক—কাজী নজরুল ইসলাম

চিত্র-শিল্পী—যশোবন্ত ওমশীকর

শব্দ-যন্ত্রী—মতৌন হাশমুগু

চিত্র-সম্পাদনা—ভোলানাথ আচা

চিত্র-পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস্ লিঃ

ভূমিকার : গোরা—জীবন গাঙ্গুলী,
সুচরিতা—রাণীবালা, ললিতা—প্রতিমা
হাশমুগু, লাবণ্য—রমলা, আনন্দময়ী—
রাজলক্ষ্মী, হরিমোহিনী—দেববালা, বিনয়—
মোহন ঘোষাল, হারাপ—নরেশ মিত্র,
পরেণবাবু—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মহিম—
রবি বার প্রভৃতি।

প্রথম বৃক্টি 'চিত্রা' শনিবার ৩০শে জুলাই
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বাঙ্গলা দেশের
সকল ঘরেই পরিচিত। তাই বেহিন
সুনাম এই বইখানি দেববন্ত ফিল্মস্
তোলবার ব্যবস্থা করেছেন, সেদিন একটু
চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম। কেননা এর
আগে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা যা
পেরেছিলাম তা বাস্তবিকই চুংখের কথা।
কিন্তু সেদিন গোরা; যেখানে আমাদের সে
ধারণা অবশ্য কতকটা বহলেছে। এখন
আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে 'গোরা'
এই প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ছবি।



নরেশনাথ—'পাহুবাবু'-র ভূমিকার

পরিচালক মশাই যেভাবে এই বইখানি
পরিচালনা করেছেন তাতে তাঁকে ভালই বলা
চলে যদি চিত্রনাট্য থেকে আরও
কয়েকটি দৃশ্য বাঁচিয়ে এর মূল চরিত্রগুলিকে
আরও ভালভাবে ফোঁটাতে পারতেন।
একটা জিনিষ লক্ষ্যে তিনি যে হোন মনো-
বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অমার্জনীয়।
নর্ভকী অরণ্যের অর্জনয় মাংসভূষণ দেখাবার
প্রলোভন লক্ষণ করতে না পেয়ে
তিনি রবীন্দ্রনাথের এই অমর সৃষ্টির
উপর যে কশাঘাত করেছেন তা বাঙলা
দেশের লোক কোন দিন বরদাস্ত করতে
পারবে না।

ছবিখানার চিত্র-শিল্পের কাজ মোটামুটি
ভালই হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি দৃশ্য
বেশ ভালভাবেই তোলা হয়েছে।



প্রতিমা হাশমুগু—'ললিতা'-র ভূমিকার

চিত্র সম্পাদনা কার্য আরও উন্নত
হওয়া উচিত ছিল। আমাদের মনে হয়
এখনও যদি এ ছবিতে কিছু addition,
alteration করা হয় তাহলে এ ছবিখানি
ভালই হয়ে দাঁড়াবে।

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমে মনে
পড়ে প্রতিমার 'ললিতা'র কথা। ইনি
ছারা-চিত্র রাজ্যে যে চমৎকার নিজ
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যি
আশাশ্রয়। এর পরেই স্বয়ং পরিচালক
মশাই 'পাহুবাবু' চরিত্রটি চমৎকার কুটিয়ে
তুলে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।
আনন্দময়ী ও হরিমোহিনীর ভূমিকার
যথাক্রমে রাজলক্ষ্মী ও দেববালার
অভিনয় চরিত্রপযোগী হয়েছে। সুচরিতার
অংশে রাণীবালার গান ও অভিনয়
সুন্দর। গোবীর ভূমিকার জীবন গাঙ্গুলীর
অভিনয় ঘোড়ের উপর ভাল বলা চলে।
সুদ্র সুদ্র চরিত্রগুলি লক্ষ্যে আর বিশেষ
করে কিছু বলবার দরকার নেই।

ঘোটকথা গোরা হয়েছে এমন একটা
ছবি বার dialogue-গুলি চোখ বুজে
সুনলেও মাহুত তৃপ্তি পাবে।

চোখের বাণি

এনোনিমাসেটেড প্রোডিউসারের নিবেদন
প্রযোজনা : বি, পি, মেহেরা

কথা, কাহিনী, ললিত ও সুর-সংযোজনা :
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচালনা : নতুন

ললিত শিক্ষক : অনাবি হস্তিধার

আবহ ললিত : সুরেন দাস

চিত্র-শিল্পী : ননী সাত্তাল

লক্ষ্যস্বামী : মধু শাল

চিত্র-সম্পাদনা : বৈজ্ঞান্য ব্যানার্জি

রসায়নগারাদ্যক্ষ : কৃষ্ণকঙ্কর মুখার্জি

ভূমিকায় : বিনোদিনী—সুপ্রভা মুখার্জি,

শাশা—ইন্দিরা রায়, রাজলক্ষ্মী—শান্তিগতা

দ্বাৰ, অন্নপূর্ণা—রমা ব্যানার্জি, মহেন্দ্র—

রেল মুখার্জি, বেহারী—জবি বিশ্বাস, লাক্ষ-

রণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

প্রথম মুক্তি : 'শ্রী' শনিবার, ৩০শে জুলাই।

পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং।

রবীন্দ্রনাথের "চোখের বাণি"-র মত
কোনো মনস্তত্ত্বলব্ধ উপজাত বেদিন
ইন্সলাম পর্দায় রূপান্তরিত হবে সেদিন
যামাদের লক্ষ্যে হ'য়েছিল বঙ্গসাহিত্যের
এই অমূল্য সম্পদধানি হয়তো বিকৃত রূপ
নিয়ে আত্মপ্রকাশ কোরবে, কিন্তু ছবি দেখে
যামরা একবাক্যে স্বীকার কোরছি যে রবীন্দ্র
নাথের এই শ্রেষ্ঠ কাহিনীটির মর্যাদা কিছু-
না কম হ্রাস হয় নি। কবি মানসচক্ষে যে
কল চিত্র চিত্রণ কোরেছেন এবং গল্পটিকে
যেভাবে গ্রথিত কোরেছেন চিত্রনাট্যকার
কাধারও লতা প্যাঁচ বস্তা বস্তা না ভরে
ঠেঁভাবে এই কাজ সম্পাদন কোরেছেন।
পরিচালনাও হ'য়েছে অতি উচ্চস্তরের।
নতুন এ অবধি যতগুলি চিত্র পরিচালনা
কোরেছেন—নিঃশংসে এখানিকে শ্রেষ্ঠ
না যেতে পারে।

টেকনিক্যাল বিভাগেরও কাজ "চোখের
বাণি"-র আশাহুস্র হ'য়েছে। বিশেষতঃ

মধু শালের শব্দবস্তুর কাজ অভুলনীয়। কিন্তু সে
হিসাবে আলোকচিত্রের কাজে ননী সাত্তাল
আমাদের তৃপ্ত দিতে পারেন নি।
রসায়নগারাদ্যক্ষ হিসাবে কৃষ্ণকঙ্কর মুখার্জির
কাজ আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।
বৈজ্ঞান্য ব্যানার্জির চিত্র-সম্পাদনা বিশেষ
প্রশংসার যোগ্য।

ছবিখানির ললিতাংশ হ'য়েছে বাঙলা
ছবির এক অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের
সুর-বৈশিষ্ট্যকে কিছুমাত্র বিকৃত না কোরে
মধুর সুর-লহরীতে ছবির ভেতর যে মারা-
জাল সৃষ্টি করা হ'য়েছে তা' লতাই
অপূর্ণ! এবং এজন্য আমরা রবীন্দ্রললিতার
একমাত্র অধিকারী অনাবি হস্তিধারকে
আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। ছবিখানির
আবহ ললিতও হ'য়েছে অনবদ্য এবং এজন্য
সমস্ত গৌরবের দাবী কোরতে পারেন
সুরেন দাস।

অভিনয়ের দিক থেকেও ছবিখানির
উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা না কোরে পারি না।
বিনোদিনীর ভূমিকার সুপ্রভা মুখার্জি যে
অপূর্ণ অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন
তা' বাঙলাদেশের যে কোন প্রথম শ্রেণীর
অভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁর
কথাবার্তা চালচলন লতাই অপূর্ণ। ইন্দিরা
রায়ের আশা চলনলই—কিন্তু এই চরিত্রে
তাঁকে মোটেই মানায়নি। শান্তিগতা
দ্বাৰের রাজলক্ষ্মী ও রমা ব্যানার্জির
অন্নপূর্ণা চরিত্রানুযায়ী হ'য়েছে। পুরুষ
ভূমিকার মধ্যে জবি বিশ্বাসের বেহারী লতাই
অপূর্ণ হ'য়েছে। ছবিখানির মধ্যে যে এত
শক্তি ছিল তা' এই ভূমিকাভিনয় দেখবার
আগে আমাদের ধারণার অতীত ছিল।
হরেন মুখার্জির মহেন্দ্রও বিশেষ চিত্তাকর্ষক
হ'য়েছে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লাক্ষরণ
বেষ্ণ হওয়া বরকার লেইরূপই হ'য়েছে।
আর একটি অতি ক্ষুদ্র ভূমিকা লাক্ষরণের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হ'চ্ছে অতি গুরু
ঠাকুরতার লক্ষণ। তাঁর লাক্ষরণ, কথাবার্তার ভেতর শক্তির স্ফূরণ দেখা যায়।

মোট কথা, "চোখের বাণি" একখানি
ছবি হ'য়েছে যা' দেখে লবাই পাবেন
প্রচুর পরিমাণে আনন্দ।

শ্রীট সিন্দার

বস্তীর ভেতর আজ যে মাড়োরারী ভক্ত-
লোকটি ঘোরা ফেরা কচ্ছেন তাঁকে চেনা
লতাই শক্ত। সেদিন যারা ঠুঁড়িতে
হুটিং দেখতে এসেছিলেন তাঁদের লবাইয়ের
এক প্রশ্ন ছিল, কে লোকটি? তাঁদের
কান্নকেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি।
ঠুঁড়িও আমাদের জানিয়েছেন লোকটির
নাম অমর মল্লিক। বাংলার চলচিত্রে
অভিনয়ে এবং রূপ লজ্জার তাঁর একটি
বিশিষ্ট স্থান আছে একথা লবাই স্বীকার
করবে।

এই দিনেই দেখা গেল শৈলেন চৌধুরীকে।
আজ তিনি তরুণ সুবক, সুবিখ্যাত অভিনেতা
অমরনাথের ভূমিকার অবতরণ করেছেন।
বহু ত্রিলোক নাথ অর্থাৎ অমর মল্লিকের
হাত ধরে এসেছেন 'পাঁকে পদ্মকুল তুলতে'।

বহুবস্তুর হাত ধর আছে, কী বলেন?

চাকরী পেয়েছে মজু মানে কানন।
আনন্দ ভুলবার আর তার মজুর। গান, গান,
গান! নাচ আর গান। সাইগল গাইছে,
কানন গাইছে। সুরে তানে লয়ে, বীড়ে
মুর্ছনার লারা ঘর খানা যেন হোল খেরে

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

চোখের বাণি

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

বাছে। হাঁকিয়ে উঠেছে মজু—তার মুখখানা লাল টকটকে—লাল সিঁদুরের মত লাল। কপালের, কপালের আর কেশের ঘাম পিছলে পড়ছে তাঁর পাতলা রাঙা ঠোঁটে আর লাল বাঘরাতে।

মজু নাচছে—তার নিভাজ নিটোল মাংসের রক্ত রক্তের স্বেতবিন্দু বাহিরের বাতাসকে শীতল করছে। মজু নাচছে! মাটির বেওয়ার্থের ছবি ছলছে, জিনিষ পস্তর ভূরে লুটোপটি খাচ্ছে। ভূপুষ্ণ গাইছে; ‘ঝুঝুঝুঝু মূপুর বাজে—ওই মূপুরে বন্দী আছি আমি আর আমার দারী ভুবন খানি।’ অজুদিদি

গত সপ্তাহে পরিচালক অমর মল্লিকের লেট-এ উপস্থিত হ’তে পেরেছিলাম। মল্লিক মশাই তখন একটি বিশেষ দৃশ্যের পরিচালনা করছিলেন।

ব্রজবাবুর বাড়িতে—নায়ক সুরেন্দ্রনাথের পড়বার ঘর। টেবিলের উপর একরাশ বই। সব Higher Mathematics-এর।

সুরেন্দ্রনাথ আপন মনে আঁক ক’লে যায়। কোন দিকে তাকাবার তার অবসর নেই।

হঠাৎ কার বেন কণ্ঠস্বর তার কানে এল—‘মাঠের বাবু, শুনছেন?’

বিস্মিত সুরেন্দ্রনাথ তাকিয়ে দেখল, লামনে দাঁড়িয়ে ‘নিমু’। ব্রজবাবুর বাড়ীর বহুকালের পুরোনো চাকর।

আবার নিমুর প্রশ্ন: “বড়বিদ্বি বলচেন—”

“কি বলচেন?”

“ছোটবিদ্বিকে পড়ান নি কেন?”

অন্তরমুখে সুরেন্দ্রনাথ জবাব দেন—“তাল লাগে না।”

উপরের দৃশ্যের শেষপর্যন্ত আমাদের দেখা হয় নি। শুনলুম এই লোকটিকে বড়বিদ্বি শেষ পর্যন্ত বলে আনতে পারেন নি। ছোট বোন প্রমীলার মাঠাধী করবার জন্তে তাঁকে রাখা হ’য়েচে। কিন্তু দেখিকে

লক্ষ্য রাখবার তাঁর অবসর নাই। সে অস্বাভাবিকভাবে জবাব দেন—“আমার সময় হয় না।”

তার উত্তরে, বড়বিদ্বির শেষ কথা যখন তৃত্যের দারফতে সুরেনের কানে গেল—

“তবে এত দিন মিছে কথা বলে এ বাড়ীতে আছেন কেন?”—তখনই সুরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলে—‘তাইত’ বড় ভুল হ’য়েচে।”

শুনলুম নায়ক সুরেন্দ্রনাথের জীবনে, ব্রজবাবুর আশ্রয় ছাড়বার এই টুকুই ইতিহাসে। সুরেন্দ্রনাথ চলে যাবার পর, বড়বিদ্বির মনের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল, তাহা আর একদিন জানাব।

সেদিন সুরেনের ভূমিকায় পাহাড়ীর রূপ-মজ্জা ও অভিনয় দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। আর মুগ্ধ হ’য়েছি পরিচালক মল্লিক মশাইয়ের—সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে, হাসি-খুসীর মধ্য দিয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার কোশল দেখে।

রূপাঙ্গী

এই শনিবার হঠাৎ নিউ থিয়েটারের অনন্তাধারণ সামাজিক-কথোচিত্র ‘অভিজ্ঞান’ নবম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। অভ্যস্ত আধুনিক সমাজ সমস্যা ও রুহরামুত্তর বিরোধ এবং ব্যাকুলতার অপূর্ণ চিত্র-কাহিনী যে কি ভাবে বর্ণনাত্মক আকৃষ্ট করিয়াছে তাহার পরিচয় রূপাঙ্গীতে ‘অভিজ্ঞান’ চিত্রের এই নবম সপ্তাহ।

রূপাঙ্গীতে আর একটি অভিনব ও বিশিষ্ট আকর্ষণ হইতেছে মন্ডার কিসাসের বাঙলা কার্টুন চিত্র ‘আকাশ-পাতাল’।

আকাশ-পাতাল

‘আকাশের পাখী ছিল গাছের ডালে—মাছেরা ছিল জলে অতল জলে; কৃষ্ণে মিলন হোলো আকাশপাতালে।’ একটা বাছরাঙা পাখী ধরলে একটা মাছকে—

কোনও প্রকারে মাছটা পাখীর ঠোঁট থেকে আপনাকে উদ্ধার করে ছুঁতের জলে পোড়লো বটে—কিন্তু লাজটা তার রয়ে গ্যালো পাখীর ঠোঁটে। মাছের রক্তো একটা হৈ হৈ রব পড়ে গ্যালো—পাতাল পুরীতে রাক্ষস এলোচে এবং তাহদের এক-জনের লাজ কেটে নিয়েচে। রাণী তখন নাচের মজলিলে বিশ্রামমুখ উপভোগ করচেন—মাছেরা সেই সময় লব্ধের গিরে এই দুর্ঘটনার কথা জানালে এবং প্রতি-বিধান প্রার্থনা করলে। রাণী ঘোষণা করলেন যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে দুটি আশাধী ধরা পড়লো—১ নম্বর একটা লাপ—অপরায়ণ তার একটা ছোট মাছকে গ্রাস করা, বিচারে হোলো তার প্রাণদণ্ড—চিড়ে তার শুড়ের কবচ দিয়ে তাকে ছ’খান করে কেটে ফেললে—ছোট মাছটা জীবন্ত অবস্থাতেই বেরিয়ে এলো। ২ নম্বর ১টা পানকোড়ী—ঘোষী কি নিদোষী লাবান্ত করার জন্য রাণীর হুকুম হোল ১টা ছোট মাছকে—পানকোড়ীর পেটে গিরে দেখে আসতে দেখানে কিছু লুণ্ঠানো আছে কিনা—মাছটা ফিরে এসে বললে কিছু নেই। বিচারের রায় হোল মুক্তি। একটা গ্যালের বৃদ্ধ তৈরী করে পানকোড়ীকে তাতে পুরে দিয়ে উর্দ্ধমুখে চেঁচো দেওয়া হোলো—জলের উপরে গিরে দেটা ফেটে গ্যালো—আকাশের পাখী আকাশের কোলে ফিরে গ্যালো! আকাশ পাতাল কার্টুন চিত্রের এই হ’ল গল্পাংশ।

পূর্ণ থিয়েটার

লামনের শনিবার থেকে এখানে নিউ থিয়েটারের বিভাগপতি ২য় সপ্তাহে পড়বে। গেল সপ্তাহে যে অদ্ভুত বর্ণক লম্বাগম হয়েছিল তাথেকে মনে হয় যে, এ ছবি এখানে ৬৭ সপ্তাহ চলিবে।

কংগ্রেস হাই কমান্ড এবং মধ্য প্রদেশের পরিস্থিতি

সচী শীল

ডাঃ খারে মহাকোশলের তিনজন মন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে কতটা অস্ত্রায় করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই আমরা ওয়াকিং কমিটির কাজের ধোঁবশুণ বিচার করতে পারবো।

মন্ত্রীদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়। Cabinet-এ যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে যদি Disharmony থাকে ত' প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে একত্ববোধকে basis করে মন্ত্রীমণ্ডল পুনর্গঠিত করা। এতে হাই কমান্ড ছবির মধ্যে আসে কি করে? সে কি জোর করে প্রধান মন্ত্রীকে বলতে পারে—একতা রাখ, নইলে তুমি শুদ্ধ বিষার হও। C. P.র ব্যাপারে বা ঘটনেকে তা এর চেয়েও বেশী। মহাকোশলের মন্ত্রী-ত্রয়কে আবার গহ্বিতে বসান হল, মারাঠী মন্ত্রীরা ছবির বাইরে চলে গেলেন, ডাঃ খারে হলেন—Condemned to roam in the wilderness.

“স্বামী”-মন্ত্রী-উৎস

গেল রবিবার “স্বামী-জি”-র শততম রজনী উৎসব উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ খিয়েটারের অভিনেতৃবৃন্দ ও কর্মচারীবৃন্দকে যথাযোগ্য উপহার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে সিলেটের ললিতকুমার বস্তের একটি প্রাচ্য-নৃত্য বিশেষ দর্শনীয় হয়েছিল। এই উৎসবে পৌরহিত্য করেন কংগ্রেস নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রঘুনাথ মল্লিক ও বিজ্ঞান মল্লিক অতিথিগণকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

গণতন্ত্র যেভাবে একটা প্রচণ্ড shock পেল কংগ্রেস হাই কমান্ডের হাতে তাতে মনে হয়, খুব নীড়ই দেশজুড়ে একটা বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হবে, যদি অবশ্য দেশ গণতন্ত্রকেই ভালবেলে থাকে।

কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডল ওপর-ওয়ারী প্রথমতঃ Parliamentary Sub-Committee, তারও ওপর Working Committee, এরাই এতদিন প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজ দেখেছে এবং তার ওপর প্রভুগিরি করছে, Co-ordinating Body হিসেবে থাকার লক্ষ্যকতা Working Committeesর যে নেই তা আমি বলছি না। কিন্তু এই Co-ordination এবং broader senseএ supervision ছাড়া প্রাদেশিক আইন-মণ্ডল ও ক্যাবিনেটের ওপর অস্ত্র কোন রকম কর্তৃত্ব চালাতে গেলে কুফল ফলবার যে বিশেষ সম্ভাবনা তার পরিচয় এখনই পাওয়া যাচ্ছে, এবং পরে এই পরিচয় বিস্তী-ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

ফিল্ডার-মুনোনিরী থেকে না থাকিয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে যে সব ছোটখাট ডিক্টেটর গঞ্জিয়ে উঠছে তাদের ওপর তীব্র নজর রাখা দরকার। এইবারকার ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন ভারত কংগ্রেসের রাজ-নীতিতে একটা কু-অধ্যায়ের সৃষ্টি করলো।

ডাঃ খারে ওয়াকিং কমিটির কথা শুনে যে আবার resignation দিলেন—এই কথাটা gratefully মনে রাখা উচিত ছিল ওয়াকিং কমিটির। পদত্যাগ না করলে কে দরিতে পারতো প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে? আইন-মণ্ডল কংগ্রেস-লব্ধত্বের

ওঁর ওপর Censure Motion আনতে রাজী করান একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। এবং জিহ্ব বজায় রাখবার অস্ত্রেও আর কমিটি ঐ লব্ধত্বের ওপর disciplinary action নিতে পারতো না। সেটা আরও অসম্ভব নয় কি? .*

মহাকোশল মন্ত্রীদের সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে হাই কমান্ডের নির্দেশ কেন নেওয়া হয়নি, এর উত্তরে ডাঃ খারে অনুশোচনা জানিয়েছিলেন, মন্ত্রী ত্যাগ করেছিলেন এবং Assembly Congress Partyর নেতৃত্বও ত্যাগ করেছিলেন। এর পর আবার যদি তিনি নির্বাচিত হতেন, তাহলে বোঝা যেত তিনি মন্ত্রিটির confidence enjoy করেছেন সম্পূর্ণভাবে, এবং আবার নতুন করে মন্ত্রী মণ্ডল গঠন করলে আগের মত গণ্ডগোল থাকতো না, পুনরায় শান্তি কিয়ে আসতো। ওয়াকিং কমিটি একটা un-seemly ও ill-conceived resolution পাশ করে বললো—তাতে ডাঃ খারেকে অস্ত্রায়ভাবে ধর করা হয়েছে, যেচ্ছাচারিতার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে, মধ্যপ্রদেশের নির্দেশ গতর্গকে বিস্তীভাবে cowardly insult করা হয়েছে এবং হাই কমান্ডের লক্ষ্যমর প্রভু অর্থাৎ ডিক্টেটরীগিরিকে বেশ করে consolidate করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন থেকে mailed fist দেখান হচ্ছে, যাতে দেশজুড়ে লোক ভড়কে গিয়ে হাই কমান্ডের decision ও directionকে কোন-দিন না challenge করতে সাহস করে। Federation লব্ধকে compromise করবার তলে তলে যে চেষ্টা চলছে, সে চেষ্টা বাধ না হয়, এবং বঙ্গভতাই-ভুলাতাই-মতামুত্রির political ambition কাজে পরগত হওয়ার পথে না বাধা পায়, এইভ্যন্ত এখন থেকে, হাইকমান্ডের শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠাকে লুপ্ত করবার মতলবেই আজকের এই লব

কারলাজি। বা যেটাই তার এই রকম impressionই আমরা পেরেছি।

মন্ত্রীদের মধ্যে একত্ববোধ হাই কমান্ড জোর করে জাগাতে পারে না। যদি পারতো তা হলে Panchmarhi Agreement টিকে যেত। তা ত আর হয় নি। ঐ Agreement এর পর থেকে অবস্থা আবার বা ছিল তাই হল। তা থেকেও উদ্ধৃত হাই কমান্ডের শিক্ষা হল না। মন্ত্রীমণ্ডল নিজের মনের মত করে গড়বার ভার ডাঃ খারের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল; সব দিক দিয়ে তাতে ভাল হত। নিজের অস্তিত্ব সব জায়গায় জাহির করা চাই—এই Vanity হয়েছে সব গুণগোলের মূল। এবং হাই কমান্ডের এই Vanity এখন বেড়েই চললো।

সুভাষবাবু নাকি বলেছেন যে Parliamentary Conventionকে বড় করে দেখতে গেলে চলবে না, তাতে আসল issue অর্থাৎ আমাদের Struggle for freedom বাধা পেতে পারে। এখন এই Struggleটা বড় আর সব ছোট এ কথা স্বরত লভ্য হতে পারে কিন্তু, C. P. র ব্যাপারে ত আর এ সব বললে position clarify করা হবে না।

Struggle for freedom—এ কথার এখনকার মানে কংগ্রেস নির্দেশিত parliamentary programme carry out করা। খারে নাহেব কি convention বজায় রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের constructive programme-এর কোন কতি করেছেন?

Harmonious cabinet গঠন করার জন্যই ডাঃ খারে convention-এর ওপর জোর দিয়েছিলেন, কংগ্রেস-নির্দেশিত programmeকে ব্যাহত করার জন্য নয়। Struggle for freedom ঠিকই আছে, এবং এই Parliamentary convention-এর ওপর হাই কমান্ড কতক outrage হওয়ার

পর freedom movement-এর Tempo বেড়ে যায়নি—এটাও খুব দৃষ্টি কথা।

Federation লব্ধি আমাদের হাই কমান্ড শুধু বলেছে যে—মধ্যে এমন কিছু ঘটেনি যাতে Haripura decision বহুলাবার স্বরকার হতে পারে। অর্থাৎ পরে এমন কিছু ঘটতে পারে, লর্ড জেটল্যান্ড এমন একটা conciliatory attitude নিতে

পারেন—যার ফলে Haripura decision বহুলাবার বিশেষ স্বরকার হতে পারে! এখনও Open door policy! আদর্শের প্রতি বহি নিষ্ঠা থাকতো তাহলে হাই কমান্ড বলতো হরিপুরার decision unalterable. লভ্যবৃত্তির activity repudiate করতেও পারতো। কিন্তু হাই কমান্ডের নে আদর্শনিষ্ঠা কোথা?

আগষ্ট মাসের নূতন রেকর্ড ১৯৩৮

নিউ থিয়েটার্স-মেগাফোন রেকর্ড

শ্রীমতী মলিনা

J. N. G. 5286 { রূপ কথারই রাজা এসে 'অভিজ্ঞান' বাণী চিত্র হইতে ছিল নাথী যোর প্রভাতের ফুল ঐ

মিস্ কমলা (ঝরিয়ী)

J. N. G. 5276 { মালা যদি ছিলে ভুলে 'অভিজ্ঞান' বাণীচিত্র হইতে তোমার কাছে চাইতে বঁধু

মেগাফোন রেকর্ড

শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ দাস

J. N. G. 5287 { বৃন্দাবন-ঘন-আনন্দ মুরতি ভজন। তনু যেহটির পূজা করিব কীর্তন।

কুমারী অসীমা সেট (এ্যামেচার)

J. N. G. 5288 { গোপনে মনের কোনে আত্মিক। আজ তোমায় আমার খেলবে ঐ

অনন্তবালা বৈষ্ণবী

J. N. G. 5289 { নিম্নাব দাঁড়ারে দেখিব তোমারে তাড়িরাণী। বশোঁধা মা তোর কৃষ্ণধন ঐ

মেগাফোন ভ্যারাইটিজ

J. N. G. 5290 { কদম তলার ঘাটের বাঁকে গায়েরী। সুন্দরী চল দেখতে বাঁবি ঐ

প্রকেশার ইন্সার্মেন্ট থা (গৌরীপুর)

J. N. G. 5274 { লেখাব যোগিরা। শ্রো: ইনারেত খাঁয়ের পুত্র তিলায়েত হোপেন বাঁ লেখাব তৈরবী গৎ

মেগাফোন :: কলিকাতা



খ্রীশনি গুপ্ত

পাঁচিলে ড্যাংলিটিনো

জগতের চিত্রবিলাসীকে অস্তরে অস্তরে
জগৎ রুডলফ ড্যাংলিটিনো অমর হয়ে
ছিলেন। অতীতের সেই প্রিয়বর্ষন যাহুকের
জনট; যুগান্তকারী প্রতিভার মোহিনী-
রায় বিশ্ববাসীর হৃদয়ে যে বেবহুলত
দিন স্প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা কোনদিন
লুপ্ত হবার নয়। তাই আজ নতুন কোনও
পরচিত্র দেখলেই মনে পড়ে যায় তার
খা, অজান্তলারে যুধ দিয়ে বেড়িয়ে আলো
গলেটিনো! রুডলফ ড্যাংলিটিনো!

রুডলফ ড্যাংলিটিনোর স্বল্পায়তন জীব-
ন মধ্যে যে অপরূপ প্রেমমাহুর্বা বিকাশলাভ
রে উঠেছিলো, যে প্রণয়লীলার মধুময়
রশ নটজীবনে একটা নবপর্যায়েয় সৃষ্টি
রেছিলো, সেই রূপরশপরিপুষ্ট অপূর্ণ
ময় কাহিনীই আজ চিত্রজগতের একমাত্র
লোচ্য বিষয়।

লক্ষ্মি আমেরিকার ড্যাংলিটিনোর ছায়া-
অংশলি অত্যধিক চাহিদা। কর্তৃপক্ষকে
শেষভাবে বিচলিত করে তুলেছে। রাত্তা
টে হোটেল রেস্টোরাঁর আবার আরম্ভ
রেছে ড্যাংলিটিনোর প্রাণশা গুজন।

তাই, কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন, ড্যাংলি
বার জীবন কাহিনীর সেই অপূর্ণ রশমধর
রায়টি চিত্রে রূপান্তরিত করবেন।

রূপালী পর্দার আত্মপ্রকাশ করে বার
পাঁচিলে করেছেন, তাহার মধ্যে আর
কর এ দৌতাপলাভ করবার সুযোগ

যে নি। চিত্রনটের জীবন কাহিনী
অবলম্বনে বাণীচিত্র এই প্রথম।

বার্ণলমিউন্ডের আবিষ্কার

ফ্রেডি মন্ত বড় কি একটা আবিষ্কার
করেছে! কিন্তু বয়সে ছোট হলে হবে



বার্ণলমিউন্ড

কি, বুদ্ধি ওর ভারী; ব্যাপারটা ভাজতে
ও রাজী নয়—উহ—অতি নিকটতম আত্মীয়-
কেও নয়। বলে : বতদিন না এটা পেটেন্ট
হয়, ততদিন টু শব্দ করছি নি।

যটনাটা অবশ্য এমন বিশেষ কিছু নয়।
লক্ষ্মি ও আর ওর পিপি হাওয়া খেতে
গিয়েছিলো লাণ্টা বারবারার একটা ভাতা
বাড়ীতে। বাড়ী কিরে এলে ফ্রেডির পিপি
বেথেন, চাবীটা ভুলে কেলে এসেছেন।
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন : কি হবে ফ্রেডি ?

ফ্রেডি বহা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো :
কুহ পরোয়া নেই পিপি। আমার
আবিষ্কারটা পরখ করে দেখবার



চাৰ্ণ বহা

এই একটা মহা সুযোগ। আজ
বিকলে, পেছনে জানালাতে একটা ছোট
ছটিকেনী বসিয়েছি আমি। এখন, যদি সেটা
ঠিকমত কাজ করে, তা হলেই—বাণ !
বাড়ী ঢোকবার জন্তে আর ভোমার ভাষিতে
হবে না।।.....

ভাড়াভাড়ি হুজনে গিয়ে উপস্থিত হলো
বাড়ীর পেছনটোতে। ফ্রেডি তার গোপন
প্যাচ কবতে আরম্ভ করলে। নানান
রকম অদ্ভুত কারিকুরীতে অবশেষে খুললো
জানলা। সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে একটা
শব্দ আর কি একটা তরল জিনিষ ঢেলে
পড়বার আওয়াজ—তক্ তক্ তক্ !.....

পিপি মুখ বাড়িয়ে বেথেন, ঘরময় তেলে
ভান্ডাভালি। ফ্রেডির শোবাকগুলোর
অবস্থা তেলে চপচপ—শোচনীয়।

টিটিকেনী বনাতে তেলের পিপেটায়
ঘরকার হয়েছিলো। কিন্তু কাজ শেষ হলে,
সেটা সরাবার কথা আর মনে হয় নি।
অতএব—

আবিষ্কারের কিন্তু লেহিকে খেয়াল
নেই, তেলমহুড় সাতরে বহা আনন্দে সে
চুকলো ঘরে।

পিপি বললেন বেগে : ব্যাপার কি ?

ও বললে হেলে : গোপনীয়।

হলিউডে করাসী অভিনেত্রী

রূপালী করাসী নটা বানিয়েল হারিস

নামছেন 'বি রেজ অব প্যারী' হারাচিজে।
এই ত্রীমতীর প্রথম আমেরিকান ছবি।
কিন্তু তাই বলে নিরাশ হবার কিছু নেই
এতে; যারা ত্রীমতী দ্বিতীয় অভিনীত
ফরাসী ছবিগুলি দেখেছেন, তারাই একবাক্যে
স্বীকার করবেন : ইয়া রূপ বটে! প্রতিভা
বটে!.....

চল্লিশ বরষের ফরাসী ছবি 'মেরারলিজ'
এর কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। 'মেরারলিজ'এ
বরষার চিত্রসঙ্গিনী ছিলেন ফরাসী
দেশের এই যৌবনোচ্ছল নিটোল চঞ্চলা
রূপশ্রী মাঝানোরালেল দ্য'নিরেল দ্বিতীয়।

'বি রেজ অব প্যারী'তে ওর প্রেমিক
লাজবে ডগ্‌লস ফেরার ব্যাঙ্কস (ডোট)।



ফ্রেডরিক মার্শ

ফ্রেডরিক মার্শ কে ও কি

ফ্রেডরিক মার্শ কে?.....লাগর পারের
একটি অনিন্দ্যশুল্ক অভিনয় প্রতিভা।
কখন? এই তো ওর নট-পরিচয়!!!

কিন্তু আজ যদি ওর এই 'ভুবনতোলান
কমডাটুকু না থাকতো, যদি এই অভিনয়
প্রচেষ্টা ওর হতো বিফল, তা হলে ফ্রেডরিক



জিনজার রজাল

মার্শের পরিচয় কি হতো জানেন?—
ফ্রেডরিক বিকেল!.....

না, না, হৈয়ালী নয়, লতিয়ে তাই।
ওর প্রতিভা আজ ওর পরিচয়, তাই আজ
ওর স্বকল্পিত নাম এতখানি ব্যাপকতা লাভ
করবার সুযোগ পেয়েছে। ফ্রেডরিক নিজেই
বলে গেছে : আমার আসল নাম ফ্রেডরিক
বিকেল। কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজন ছিলো
এত গোঁড়া যে থিয়েটারে ঢুকবার সময়ে
সময়ে বাধ্য হয়ে আমাকে নাম পাঁটাতে
হলো। একেবারে একটা নিরর্থক ছদ্ম নাম
না নিয়ে, ঠিক করলাম, আমার মায়ের
নামটুকু জুড়ে যেবো আমার নামের সঙ্গে।...
আমার ফ্রেডরিক এবং মায়ের মার্শার, এই
মিলে হলো ফ্রেডরিক মার্শার। তারপর
দ্বিলাষ নেজুটুকু হেঁটে,—হলো, ফ্রেডরিক
মার্শ :...কিন্তু কয়েকদিন পরে বেথা গেল
তেরটা অক্ষর লাগে ফে-ড-রিক-মার্শ
লিখতে। লক্ষণ অন্তত! তাই দ্বিলাষ আর
একটা 'ই' হেঁটে! এখন আমার নাম অতি
সহজ স্মরণীয় বার অক্ষরের...ফ্রেডরিক মার্শ।

কি ভাবছেন?.....'বি বুকানিয়ার'এর
নারক অসম লাহলী বীরপুরুষ ফ্রেডরিক
মার্শ। কুলংস্বারে হোঁচট খায় দেও!!.....

সৌভাগ্য প্রকাশে বিপদ

সৌভাগ্যের বড়াই করে প্রায় সকলেই,
নিজের ঐশ্বর্য সম্পদের কথা বহুবাক্যে আত্মীয়
স্বজনকে জানাতে সকলেই ব্যস্ত। কিন্তু
বিপদ কোন দিকে?

মস্ত্রান্তি লাগরপারে এমনি একটা ব্যাপার
ঘটেছে। খাতনামা একটা অতিনৈজরীয়
বুড়ী ঠাকুমা নাতনীর টাকার একখানা
চমৎকার লাজান বাড়ী পেয়ে একেবারে



বিং ক্রলবী

আহ্লাবে ডগমগ। যে যেখানে ছিলো
সকলকে এক একখানা করে লিখলেন চিঠি
ওগো, আমার এ সুখ সৌভাগ্য তোমরা
না এলে যে সব বৃথা যায় গো।...লিখে
মনে মনে ভাবলেন, কে আর আসতে



ইন্ডিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১. ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বাবে লাভ লব্ধ, তের নদী ভিড়িয়ে,
তবু লবলে জাহ্নবী কথাতী।

কিন্তু কল হলো ভারী মজার বাণ
খানেকের মধ্যেই আশ্রয় কুটুবে বাড়ী
গেল ভরে। আর লবার কাছ থেকে
থেকে থেকে চিঠি আসতে লাগলো :
ধুঁধু করো না, আমরা যাচ্ছি।

আতঙ্কে অভিভূত হয়ে বুড়ী বাড়ীর
দরজা বন্ধ করে ঘিনকতক হোট্টেলে গিয়ে
থাকিবাব বন্দোবস্ত করছেন।

খুচরো খবর

জিয়ার রোজালের নতুন ছবি, 'বি
ট্রেলার রোজান'। ওর নাচের তালে তালে
রঙ্গ লিখন করবে যেটো গোল্ডউইন মেরারের
জেমস্ ট্রাট।

এডওয়ার্ড জি রবিন্সনের নতুন ছবিতে
ওর পরিচয় হবে একটা ফুলের নামে, আকিড,
'ব্রাধার আকিড !!...'

মহানারোহে চারটিতে রূপায়িত হয়েছে
'বি এ্যাডভেঞ্চার অব রবিন হুড'—অতীত
যুগের এক অপূর্ণ বীরকে কাহিনী! ছবিখানা
আগাগোড়া 'টেকনিকল'। নাম ভূমিকায়
অবতীর্ণ হয়েছেন এরল গ্রিন, নারিকা মেড
বেরিয়নের ভূমিকায় অলিভিয়া ড হ্যাভিল্যান্ড।

চিত্রজগতে নটনটীর জনপ্রিয়তার পরিচাপ
আজকাল উক্ত তারকার ঠ্যাপ ছবির লংখ্যা।
অর্থাৎ বার যে (নট বা নটী) বত প্রিয়
সে তার তত ছবি সংগ্রহ করে রাখে।
কিন্তু শুনেলে অবাক হবেন, নিউজিল্যান্ডের
একটা মেয়ে ছবি জমিয়েচে ৩,০৭৬ খানা,
প্রত্যেকখানাই ওর অতি প্রিয় নট বিং
ক্রসবির ছবি। কি বলবো একে?...অতি
অদ্ভুত তারকাপ্রীতি!

বি বি ধ

শুভ-বিবাহ

গত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার এটনী শ্রীযুক্ত
অজিতকুমার ঘের কন্যা শ্রীমতী অনিমা ঘের
সহিত শ্রীযুক্ত সত্যকুমার বসুর ভ্রাতৃপুত্র
ডাঃ এ-কে বসুর শুভ-বিবাহ কলেজ স্কয়ার
বাগভবনে সুলক্ষ্য হইয়াছে। তরুণলক্ষে
রাষ্ট্রপতি স্তম্ভাচন্দ্র, শরণচন্দ্র বসু, কলিকাতা
কর্পোরেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার
শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ
দত্ত, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশ বসু ও
কলিকাতা হাইকোর্টের বহু ব্যারিষ্টার, এটনী
উপস্থিত ছিলেন। আমরা নবদম্পতীর স্বর্ধা
কামনা করি।

মেঘবৃত্তের সাহায্যে লন্ডন প্রেরণ যে
কালিঘালের কালেই সম্ভব ছিল, তাহাই নয়।
একালেও সে পদ্ধতি চলে এবং লাভকণ্ড
হয়। কারণ বঙ্গবর হরিপদ রায় তাঁহার
প্রিয়র নিকট এই বর্ষাগমে যে মেঘবৃত্ত
পাঠাইয়াছিলেন, সে তাঁহার প্রিয়র নিকট
হইতে আস্থান লইয়াই ফিরিয়াছিল। সেই
আস্থানে বঙ্গবর লাড়া দিতে গিয়াছিলেন
গত ১৬ই শ্রাবণ। আমরাও লাধী ছিলাম।
অবশ্য এক যাত্রার পৃথক ফল হইল। তিনি
পাইলেন 'প্রিয়', আর আমরা পাইলাম
লন্ডন। দম্পতী শতং জীবতু।

গত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার শ্রীশ্রমভূষণ
দেবরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান পরগভূষণ
দেবরায়ের পুত্র শ্রীমান পিনাকভূষণ দেবরায়ের
সহিত ৪৭নং হালদার পাড়া রোড
(কালীঘাট) নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শুকপদ
হালদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী

শোভনা দেবীর শুভপরিণয় সুলক্ষ্য হইয়াছে।
আমরা নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করি।

গত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার আলমপুর
(বর্ধমান) নিবাসী ৮৭র ঐকুর্ভনাথ দেন
বাহাদুর মহাশয়ের পৌত্র ও শ্রীযুক্ত তারক
মোহন দেন শর্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র
সুগেন্দ্রমোহন দেন শর্মা বাবাজীবনের সহিত
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ দেন
মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুলেখা
দেবীর শুভ পরিণয় মহানারোহে অদৃষ্টিত
হইয়াছে। আমরা নবদম্পতীর শুভকামনা
করিতেছি।

স্মৃতি তর্পণ

গত ১৩ই শ্রাবণ বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের
৪৭তম স্মৃতি বার্ষিকী উৎসব শ্রীযুক্ত হোমেন্দ্র
নাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে রামমোহন
লাইব্রেরি হলে লক্ষ্য ৭টার অদৃষ্টিত হয়।
সভার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেন, অধ্যাপক
অমূল্য রায়কত, অধ্যাপক বৃগাচরণ চক্রবর্তী
শ্রীযুক্ত গণপতি চক্রবর্তী প্রভৃতি বক্তাগণ
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের গুণা-
বলী কীর্ত্তন করেন। ছাত্রদের পক্ষ হইতে
শ্রীশিখির বিশ্বাল, শ্রীরেবতী মোহন ঘোষাল,
শ্রীআশুতোষ রায় চৌধুরী এবং শ্রীতবানী
প্রদাষ দেন গুপ্ত স্ব স্ব রচিত রচনা ও
প্রবন্ধাদি পাঠ করার পর শ্রীমুজিত রায়
চৌধুরী সুললিত কণ্ঠে গান গাহিয়া সমবেত
সকলকে তৃপ্তি দেওয়ার পর সভার কার্য
শেষ হয়। উক্ত স্মৃতি সভার বহু অধ্যাপক
ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

শোক-সংবাদ

৮৭রেন্দ্রনাথ মল্লিকের স্বগত শ্রীযুক্ত
সুরেন্দ্রনাথ দ্বিজ তাঁহার বাবাশ্রমকৃত বাটীতে
৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।
বর্তমানে তাঁহার চারি কন্যা বিত্তমাস।

ফিল্ম শিল্প ও যান্ত্রিক সভ্যতা

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যে সকল শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে তন্মধ্যে কিন্ন-শিল্পের স্থান যে বহু উচ্চে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। দশ বৎসর পূর্বেও এ শিল্পের বর্তমান রূপ কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। ছায়া চিত্র জগতের এ অবস্থা একটু তলাইয়া দেখিতে গেলে মানব মনের সাধারণ অবস্থার ক্রম-বিকাশ কেও লড়ে লড়ে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়।

কর্মই মানব জীবনের প্রধান ও প্রথম কেন্দ্রস্থল। মানব জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু কাজ করিয়াই যাইবে। কারণ কর্মই তাহার মুক্তি, কর্মই তাহার প্রাণ এবং কর্মই তাহার আনন্দ, এক্ষণে কথা হইতেছে কর্মের একঘেরেমীষকে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কর্মের বহু রূপ সৃষ্টি হয় এবং কর্ম হইতে কর্মান্তর গ্রহণ করিবার নামই হইতেছে বিশ্রাম, অথবা একঘেরেমী দূর করিবার উপাধান।

বস্তুতঃ বহু পুরাতন যুগ হইতেই এই উপাধান দেশাচার ভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এবং বর্তমান যান্ত্রিক-সভ্যতার যুগেও বিজ্ঞানের উন্নতির লঙ্গে লঙ্গে এই উপাধান অর্থাৎ আনন্দ রস পরিবেশের নূতন উপাধান ছায়াচিত্র জগতেও ক্রমশঃ উন্নতি লাভন হইতেছে।

মৃত্যুকালে তিনি আর ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাহার বহু আত্মীয়পরিবার-বর্গকে উইল করিয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আমরা তাঁহার আত্মীয় লক্ষগতি কামনা করি।

কিন্তু এই যে আনন্দ রস পরিবেশনের উপাধান তাহা যদি মানব মনকে ধোলা না দেয়, যদি মানুষের কচির প্রতিকুলে হয় তাহা হইলে বর্তমান যুগে মানুষ তৎক্ষণাৎ তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করে। কারণ তাহা হইলে দ্বিতীয়টি স্বল্পাংশেই তাহার কর্তৃত্ব গত হইবে। সুতরাং প্রত্যেক কিন্ন-ব্যবসায়ী—প্রত্যেক ছায়াচিত্র নির্মাতারই লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহার ছবি দর্শক গ্রহণ করিবে কিনা অর্থাৎ আনন্দ রস পরিবেশনের উপাধান তাহার ছবিতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা। কর্মের স্তরগভীরত্বের লঙ্গে বেন রস সৃষ্টির উপাধানও গভীর না হইয়া যায়। কারণ মানুষ কর্মের আওতার বাহিরে গাভীয়া মোটেই পছন্দ করে না।

উপরোক্ত এই বিষয়টির দিকে সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিয়া লাগর স্ক্রিটোন আনন্দ-রস পরিবেশনের যথেষ্ট উপাধান বজায় রাখিয়া “৩০০ শত দিন বাব” নামক ছবিখানা তুলিয়াছেন। লন্ডনের মাধুর্য্য অভিনয়-নৈপুণ্যে ও ঘটনার নূতনত্বে ছবিখানা হইয়াছে এক কথায় অপূর্ণ। এতে অভিনয় করিয়াছেন সবিতা দেবী, মতিলাল, বিবু ও ইয়াকুব। আগামী শনিবার ছবিখানা ৪র্থ পপ্তাহে পদার্পন করিবে। ছায়াচিত্র জগতের অভিনব সৃষ্টি নূতন অবদান যদি আপনি দেখিতে চান তাহা হইলে অবিলম্বে আপনি প্রত্যাত গিনেমার “৩০০ শত দিন বাব” নামক ছবিখানা দেখিয়া আসিবেন।

জলজ নৃত্য

আগামী ৭ই আগষ্ট প্রত্যাত গিনেমার রূপোলী পর্দায় চিত্রে এই অভিনব নৃত্যের জল্লা হইবে। দিনের পর দিন দক্ষিণ ভারতে এই নৃত্যের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে এবং এতাবৎ উহার লীলানা দক্ষিণ ভারতেই লীলাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সে ঘটনাকে কেন্দ্র

ইউরোপ অভিযুখে মিঃ সেন

কলিকাতার ছায়াচিত্র জগতে স্থপরিচিতি মিঃ বি সেন গত ২৬শে জুলাই বোম্বাই হইতে ইউরোপ অভিযুখে রওনা হইয়াছেন। তিনি দক্ষিণপ্রথম ইটালী গমন করিবেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে তিনি ভারতবর্ষে দক্ষিণপ্রথম “Dubbing” পদ্ধতিতে মুদ্রণত্ব তুলেন। কয়েকজন ইটালীয় ব্যবসায়ী তাঁহাকে ইটালীতে Dubbing পদ্ধতিতে ছবি তুলিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।



আরও জানা গিয়াছে যে মিঃ সেন ইটালীতে অবস্থান কালে মাকিনী ইনষ্ট্রুটে “Television” লব্ধকে শিক্ষালাভ করিবেন এবং তিনি মনে মনে আশা পোষণ করেন যে অদূর ভবিষ্যতে কিন্ন-শিল্প ও Television-এর সমন্বয়ে এক নূতনতর শিল্পের সৃষ্টি হইবে। তিনি ইউরোপে dimension film, colour film ইত্যাদি ছায়াচিত্র শিল্প লব্ধকে শিক্ষা করিবেন।

করিয়া এই বর্গীর নৃত্যের উদ্ভব ছায়াচিত্রে তাহা প্রথিত হওয়ার আজ লক্ষের নিকটই তাহা উপভোগ্য। রমজ ব্যক্তি যাত্রাই এই অভিনব নৃত্যের মাধুর্য্য মুগ্ধ হইবেন।

অত্যাধিক শুধু দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত থাকিলেও গল্পের মনোহারিত্বে আপনি মোহিত হইবেন।

নিম্নতির পরিহাস

শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অবলম্ব, বিবর্ণ প্রায় লক্ষ্য তখন ধরণীর
কালে লুটিয়ে পড়ছে।

অলকা তখনও তেমনি ভাবে জানালায়
কাছে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্য পড়ে অনন্ত
আকাশের পানে—কি স্বাধীন ঐ পাখী;
আকাশের পায়ে ঐ একখানা কালো মেঘ—
অসংখ্য তারকা—ওরা কত সুখী!

আর আমি—

ভাবনার তার শুভ্র-ললাটে বিন্দু বিন্দু
ধাম জমে উঠলো—অন্তরে বেদনা আঘাত
ছিল। ভাবে—মে যদি হ'তো একটি পাখী,
উগ্ৰু বাতাসে সে যেতো উড়ে। তাকে
ধ'রতে পারতো না কেউ; রাত্রে
অন্ধকারে পাখীবেশে দাঁড়াতে লম্বীর
নাশনে। রূপকথার গল্পের মত পাখী থেকে
হ'য়ে যেতো এক রাজকন্তা—জন্মনা কথা
কইতো অনেক—

ভালবাসার।

তারপর প্রভাতের লজ্জা লজ্জা কিরে
আসতো ঘরে; কি সুখে দিন যেতো।
পৃথিবীতে লবেরই লভ্য হয়, এটাও কি
সম্ভব হয় না—!

পিছন থেকে কে চোখ টিপে ধ'রলো
অলকার: অলকার বুকে বাকী রইলো
না। এ স্পর্শ চিরকাল সে অজুতব ক'রে
এলেছে। এ স্পর্শ কি ভালবার।

হাত ছুটো ছুটো চেপে ধ'রে অলকা
বললে—“হিঃ, হিঃ, তুমি কি—”

জবাব আদে—“আমি—আমি লম্বীর।
যে প্রভাত এমনি লম্বী গোপনে তোমার
লজ্জা একটু কথা কইতে ছুটে আদে,—
তুমি বার প্রতীকার এমনি ভাবে জানালায়

কাছে বলে থাকো; যে তোমার ভালোবাসে,
—তুমি যাকে ভালোবাসো; যে তোমার
চায়,—তুমি যাকে চাও—”

বাধাহিঁরে অলকা বললে—“থাক্,
তোমার পরিচয় আমি চাইনি—কিন্তু এমনি
ভাবে জন্মকে কথা কইতে যদি কেউ
যেখো তা হ'লে কি হবে বলোতো, চলো
বাগানে যাই।”—“চলো।”

বসন্তের শীতল বাতাসে চারিদিক শীতল
হ'য়ে উঠেছিল.....

অলকার উগ্ৰু কেশরাজী নিয়ে খেলা
ক'রতে ক'রতে লম্বীর উদ্বাস সুরে বলতে
লাগলো।—“জানি না অলকা এ যন্ত্রণার
অবলান কবে হবে,—জানি না কবে এ
নিষ্ঠুর দিনগুলির অবলান হবে! তবে
আমি শুধু এইটুকুই জানি,—আমার কানের
কাছে সুখ নিয়ে এলে কে যেন ঘন ঘন
বলে অলকা, “মিছে, মিছে এ ভালবাসা,
যন্ত্রণার অবলানে সুখ নেই, নিষ্ঠুর দিন-
গুলির অবলানে সুখের দিনের আবির্ভাব
হবে না।”

অলকাকে আরও টেনে নিয়ে লম্বীর
আবার বললে—“অলকা, আমার ভয় করে'
আতঙ্কে লারা দেহ কেঁপে ওঠে; চোখে
জল আসে। আমার জন্তে আমি ভাবি না
অলকা—ভাবি শুধু তোমার জন্তে। আমি
মরি হুঃ নেই, কিন্তু—কিন্তু শেষে তোমার
কি হবে অলকা? তুমি আমার ভালবাসো;
দে ভালবাসা গভীর—পবিত্র। তবে কেমন
ক'রে তুমি অতর্কিত ভালবাসবে! কেমন
ক'রে দে তোমার ভালবাসা পাবে! এখন-
কার চেরেও সে দিনগুলি কাটানো আরও

কঠিন হ'য়ে উঠবে না কি অলকা? অলকা
তুমি—!”

লম্বীরের মুখে হাত চাপা দিতে অলকা
ব'লে—“চুপ করো, তোমার ছুটি পায়ে
পড়ি। এমন কথা মুখে এনো না!”

হাত সরিয়ে দিতে লম্বীর বলে—“কিন্তু
ব'লতে পারো অলকা, নিম্নতি আমার কাণের
কাছে এনে বার বার ঐ কথা বলে কেন?—
“মিছে, মিছে এ ভালবাসা, যন্ত্রণার অবলানে
সুখ নেই,—নিষ্ঠুর দিনগুলির অবলানে
সুখের দিন আবির্ভাব হবে না।”

লম্বীরের হাতখানা জোরে চেপে ধ'রে
অলকা বললে—“এ সুখ লভ্যের পূর্বাভাব,
সুখি দেবতার বৈববাণী। কিন্তু তুমি এমন
অস্থির হরোও না। দেবতার যদি তাই
ইচ্ছা হয় তবে তাই হবে, তাঁর বিরুদ্ধে
তো যাওয়া যাবে না।”

অলকাকে নাড়া দিতে লম্বীর বললে—
“জানি, কিন্তু ব'লতে পারো, দেবতা এমন
পাষণ কেন? এমন নিষ্ঠুর কেন? এমনি
ভালবাসার মধ্যে বিরহের বীজতল প্রাচীর
গেঁথে যেন কেন?—ভালবাসা কি তবে
পাপ?”

মাথাটা লম্বীরের হৃকের উপর এলিয়ে
দিয়ে অলকা বলে—“ভালবাসা,—ভালবাসা
পাপ কেন হবে, ভালবাসা পুণ্য লাধনার
বস্তু; তুমি কি বলতে পারো প্রত্যেকে
প্রত্যেককে প্রকৃত ভালবাসা দিতে পারে?
—আমি জানি, পূর্বজন্মের লাধনার দ্বারা
পরজন্মে ভালবাসা পাওয়া যায়। সে লাধনা
যদি লম্বীপুত্র হয় তবে ভালবাসা লক্ষ্য হয়,
কিন্তু সে অলম্বীপুত্র হ'য়ে গেলে ভালবাসার
ফল পাওয়া যায় না!—পূর্বজন্মে লাধনার
ফলে আমার পরম্পর পরম্পরকে ভালবাসতে
পেরেছি। যদি সে লাধনা অলম্বীপুত্র থাকে
তবে এ ভালবাসা ফল হবে না, যদি
লাধনা লম্বীপুত্র হ'য়ে থাকে তবে একদিন

তোমার আমার মিলন হবে; কিন্তু জানি না, লাধনা অলমাপ্ত না লমাপ্ত আছে।”

অলকার মাথাটাকে চেপে ধ’রে সমীর বলে—“আমার মনে হয় অলকা, লাধনা অলমাপ্ত আছে, তা না হ’লে দু’র থেকে করুণ কান্না ভেলে আঁদে কেন আমার কানে! সে কান্না কেন এত পরিচিত! কেন এত বেধনা তরা! যখনই তোমার মুখী আমার মানস পটে গড়তে যাই, আঁকতে যাই,—তখনই বার বার ভেজে যাই কেন? বার বার মুছে যায় কেন? এইটাই কি দৈববাণী? যদি এ দৈববাণী সত্য হয়, তবে—তবে অলকা, এ ভালবাসার পরিণাম কি?”

অলকা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে করুণ স্বরে বলে—“এ ভালবালা যদি সত্য হয়—পবিত্র হয়, যদি ঐ দৈববাণী সত্য হয় তবে একজনার বিরহে অন্তের এ নিষ্ঠুর পৃথিবী ত্যাগ করা উচিত। এর পরিণাম আমি শুধু এইটুকুই জানি।—”

সমীর ধীরে ধীরে বললে—“আমিও শুধু এইটুকুই জানি অলকা।”

বলন্তের কোৎস্না মাথা বাতাসে তাড়ের ঘেঁষা জীতল ক’রে দিগেছিল……. দু’র থেকে ভেদে আঁদা কোন সুর তাড়ের প্রাণে গঁথে দিগেছিল এক মৃতন সুর,—নিজাদেবী পাতলা আঁচল বিছিয়ে দিগেছিল তাড়ের চোখের উপর……

কতকণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল সমীর জানে না।……অলকাকে নাড়া দিগে বলে—“অলকা, আজ আমি আঁদা, আমার একটু কাজ আছে।”

অলকা বাধা দিল না।

সমীর বিদায় নিল।

হুঁবিন পরে—

দেখিন যখন সেইখানেই হুঁজনার আবার দেখা হ’লো, তখন কিন্তু সমীরকে পর্জের

মত দেখায়নি। তার এমনি চেহারা দেখে অলকা ভয় পেলো। উৎকর্ষায় মন গেল তরে। বুকি কোন অসুখ করেছে। তাড়া-তাড়ি অলকা ব’লে—“তোমার এ বেশ কেন? কোন অসুখ করেনি তো?”

বিবাহ বিজড়িত স্বরে সমীর শুধু ব’লে—“না।”

হুঁজনা খানিককণ নীরব রইলো। শেষে অলকা ব’লে—“আমি তোমার কাছে কি দোষ ক’রেছি, যার জন্তে তুমি আমার সঙ্গে কথা কইছো না?”

সমীর কক্ষ চুলগুলি টানতে টানতে ব’লে—“দোষ—দোষ তোমার একটুও নেই অলকা, দোষ শুধু আমার। আমাকে কেন তুমি ভালবাসলে! আমি অন্তের কাছে বিক্রিত জেনেও কেন তোমার ভালবেদে-ছিলাম! তুমি আমার ক্ষমা করো! এর প্রায়শ্চিত্ত কি তুমি আমার ব’লে দাও।”

অলকা অবাক হ’রে বলে—“কি ব’লছো তুমি?”

সমীর পাগলের মত ব’লে—“হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি ঠিক ব’লছি অলকা! বলা, বলা তুমি আমার ক্ষমা ক’রবে?—তোমার এমনি গভীর ভালবালা পেয়ে হরতো আর একটি জীবন সমুদয় হ’রে উঠতো কিন্তু আমি তা হ’তে দিইনি; আমারই জন্তে তোমার জীবন ব্যর্থ হ’রে গেল। এতেও তুমি কি ব’লতে চাও অলকা? অলকা—!

সমীরের কথার বাধা দিগে অলকা ব’লে—“তুমি কি পাগল হ’লে নাকি?”

সমীর তেমনি ভাবে ব’লে—“পাগল—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি পাগলের মত হ’রেছি বটে, কিন্তু বল অলকা তুমি আমার ক্ষমা ক’রতে পারবে?”

সমীরের সুখোমুখি হ’রে দাঁড়িয়ে অলকা দুহুসরে ব’লে—“বাজে কথা রাখো! বলা কি ক’রেছো তোমার।”

সে স্বরে সমীর ভয় পেলো; বললে—“আমার একটু ভাবতে সময় দাও।”

তেমনি ভাবে অলকা ব’লে—“ভাববার সময় দেবোনা।”

নিজের হাত অলকার হাত থেকে মুক্ত ক’রে নিয়ে ভাঙ্গা গলায় সমীর ব’লে—“কালই আমার বেতে হবে জীবন মরণের লঙ্কিহলে,—যুঁকে।”

—যুঁকে!—অলকার পারের তলা থেকে পৃথিবীটা যেন সরে গেল।—ব’লে—“লভি বলছো তুমি যুঁকে যাবে?”

সমীর বলে—“হ্যাঁ অলকা লভি।”

অলকা কাতর স্বরে বলে—“না, না, তুমি যেতে পারবে না; তোমার আমি যেতে দেবো না।”

সমীর দুঃখের সঙ্গে ব’লে—“তা যদি লভব হ’তো অলকা, তা হ’লে আমার আর মনে করিয়ে দিতে হ’তো না ও কথা; কিন্তু এ জীবন যে অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত! আমার জীবনের উপর আমার তো কোন অধিকার নেই! যদি এ যুঁকে থেকে ফিরে আঁদা তবেই হবো আমি মুক্ত; তবে হবো আমি স্বাধীন। তখন আর কোন বাধা থাকবে না। হুঁজনা চলে যাবে বহুদূরে, কোন এক নদীর ধারে। যেখানে শুধু পাখী ছাড়া আর কাকরই চিহ্ন পাওয়া যাবে না। টেউ ব’রে যাবে—ব’রে যাবে বাতান—তাড়ের সঙ্গে ব’রে যাবে আমাধের সুরের দিনগুলিও। নীল আকাশের তলে কালের প্রোতে তালিয়ে দেবো আমাধের জীবন তরী। কোন কূলে গিরে ভিড়বে তা আমাধা জানবো না—, জানবার প্রয়োজনও হবে না; কিন্তু মাঝে এসে যদি তরী ডোবে তবে ডুববো আমাধা হুঁজনাই—কেমন?”

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—আঠাশ—

শুভ্রাকে বিধায় দিব্যার পর হইতেই মরণের মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। পৃথিবীকে রঙ্গীন চোখে দেখবার প্রথম বয়স হইতে সে শুভ্রাকেই ভাল-পালিয়াছে—তাহাকেই গত চতুর্দশ বর্ষ বাবৎ স মনের মন্দিরে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কামনানোবাক্যে তাহারই পূজা করিতেছিল। জীবনের আশা, আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি, যাহা কিছু সবই একদিন ছিল শুভ্রা তাহারই চোখে মুষ্টিমতী দেখার মত। এমন কত রাত্রি গিয়াছে, সে শুভ্রার হাতোজল পবিত্র মুখের দিকে তাকাইয়া আশ্রয়-বিস্মৃত হইয়াছে। যাহার মাথা ধরিলে মরণের মাথা ঘুরিত, যাহার মুখ স্নান করিলে অরণের চক্ষে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া উঠিত, যাহার চক্ষে জল দেখিলে মরণ আশ্রয় লব্ধম বিস্মৃত হইত সেই চির-আব্রিণী শুভ্রা—তাহার স্বয়ং রাজ্যের নিভৃত প্রতিমাকে সে আজ বিলজ্জ্বল দিয়াছে। অরণ ভাবে আর তবে তাহার বাঁচিয়া গাত কি? কাহার জন্ত হুর্দহ লংলারের মাথা বোকা বহন করা? তাহার মনে হইতেছিল তাহারই অংজার ফলে, তাহারই মবিলেচনায়, তাহারই কামপরায়নতার মততায় সে তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তুটিকে হৃদয়ে লে বর্জন করিয়াছে। তাহার এই পাতকের একমাত্র শান্তি মনঃস্বস্তি। শুভ্রা রোজই লঙ্কার বাহিরে যায়, কোথায় যায় সে তাহা বলিতে পারে না, হয়তো বলিবার মত কোন স্থানে

সে যায় না—হয়তো কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত তাহার কোন কৈফিয়ৎই নাই।

তাহার অংজার ফলে শুভ্রা হয়তো কোন তরুণকে ভাল বাসিয়াছে—হয়তো প্রতাহ লঙ্কার সে তাহার নবীন প্রেমিকেরই অভিলাষে বাহির হয়। হয়, সে যে কোনও দিন স্বপ্নেও এ বিভাষিকার কল্পনা করে নাই। সে ভাবিল সেই ঘোষী তাহারই মুখতায় সে তাহার পতিপ্রাণা জ্ঞার বেহ ও মনোরাজ্য হইতে বিভাড়িত। শুভ্রা যদি এইরূপ প্রতিশোধ লইতে পারে তবে সেও আত্মহত্যা করিয়া শুভ্রার উপর প্রতিশোধ লইবে। জীবন আজ তাহার মরুভূমি—শূন্য, বিভাব্য। সে গত তিন চারিদিন হইতে কণার লিখিত অত্যন্ত দুর্স্বাভাব্য করিতেছিল। তাহার ধারণা হইয়াছে কণার জন্তই সে শুভ্রাকে হারাইল। তাহার জন্তই তাহার শুভ্রা অস্ত্রে অমুরক্ত হইয়াছে। এই যাদুকরী মায়াবিনাই যত অনিষ্টের মূল। তাহারই প্ররোচনায় সে তাহার দেবতুল্য চরিত্রটাকে কণার পায়ে ডালি দিয়াছে। তাহার মিষ্টকথায় ভুলিয়া দিব্যরাত্রি সে তাহার কাছে যাপন করিয়া নিজের ও শুভ্রার সর্বনাশ করিয়াছে। যত অনিষ্টের মূল ওই সর্বনাশী কণা। অরণ কণার বাচীতে আসিয়া কোঁচের উপর হতশভাবে বলিয়া পড়িল—কণা প্রতিদিনের মত নিকটে আসিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “মুখটা অত শুকিয়ে গেছে কেন গো? কি, হয়েছে? শরীর ভাল আছে তো? দিদি ভাল আছেন?”

অরণ উঠিয়া ঝাড়াইল, কণা ছই হাতে তাহার কণ্ঠ বেঁটন করিয়া আঘরের সুরে

বলিল, “বল না! লক্ষীটী, কি হয়েছে তোমার?”

অরণ ছই হাতে তাহার হাত ছইটা ধরিয়া তাহার গলা বেঁটনো খুলিয়া লইল ও লজোরে তাহাকে পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, “দূর হইয়া যাও, নাহিলে খেকে আমার।”

কণা অরণের আঘাত লক্ষ্য করিতে না পারিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অরণ হতশভাবে শব্দায় শুইয়া পড়িল। কণা মাটিতে পড়িয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিল পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া অরণের মাথার কাছে ঝাড়াইয়া তাহার কুঞ্চিত কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া মাথার বিপর্যস্ত চুলগুলিকে ঠিক করিয়া দিতে লাগিল। কণার ব্যবহারে অরণ বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে কণার চোখে এক বিস্মৃৎ জল নাই।

অরণ কণার হাত ধরিয়া তাহাকে নিকটে আনিয়া ও তাহার মাথাটা নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “আমার মাথা ধরাপ হয়ে গেছে কণা, তুমি আমার কমা কর।”

কণার মৈথিল্যর বাঁধ ভাঙিয়া গেল—আঘাতে তাহার চোখে জল আসে নাই বটে কিন্তু এই আঘারে তাহার সমস্ত অশ্রু চক্ষু বাহিয়া পড়িতে লাগিল। সে নিতান্ত অসহায়ের মত অরণের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল।

অরণ তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “দেখ কণা, শুভ্রা আর কাউকে ভালবেসেছে। রোজ লঙ্কার সে কোথায় যায় সে বলতে পারে না আমি তাকে জন্মের মত বিধায় দিয়েছি। হয়, এমন করে সে যে আমার অত্যাচারের প্রতিশোধ দেবে কে জানতো। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে সে—”

কণা বলিল, “না ও কথা বলো না, ও কথা শুনেও পাপ হয়। দিদি তোমার ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারে না। আমি জানি, দিদি তাঁর দেহ ও মনের প্রতি পরমাত্ম দিয়ে তোমার ভালবাসতেন, আজও বাসেন। তুমি ভুল করেছ—তুমি তাঁকে চিন্তে পার নি। দিদি কোথায় যান তা আমিও জানি না। তিনি বলেন নি তোমাকে, হয়ত তারও কারণ আছে। তুমি নিশ্চয় জেনে তিনি লক্ষ্মেহের অতীত।”

লাগ্রহে অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার এ ধারণার কারণ কি কণা?”

কণা বলিল, “আমি মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষদের আমরা যত চিনতে পারবো, পুরুষ তোমরা, ততটা কোন দিনই বুঝতে না চিন্তে পারবে না। দিদি দেবী স্বর্গস্থী—তাঁকে বিদ্যায় করে দিলে তুমি—এ কি সম্ভব?”

অরুণ তারিতে লাগিল, কণা যা বলিতেছে তাহাতে লভ্যতা কতক আছে। কণা অরুণকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিতে লাগিল, “রাগ করো না তুমি। হয়তো বহুজন্মের ভগবতীর ফলে তোমার দেবার অধিকার পেয়েছিলাম আমি—গত এক বৎসর ধরে আমার অভিশপ্ত জীবনে যে সুখ পেয়েছি আমি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। দিদি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না কিন্তু ভগবান জানেন আমি কোনদিন তার অনিষ্ট চিন্তা করিনি। পাছে তাঁর মনে কষ্ট হয় কতদিন তোমার রাত কাটাতে বারণ করেছি, পারে ধরে বিনতি জানিয়েছি। দিদির মনে ব্যথা দিতে বা তাঁকে অন্যায় করতে বারণ করেছি, কিন্তু কোন কথাই শোন নি তুমি। তুমি তাঁকে অত্যাচারে জর্জরিত করে শেষে একটা বহনায় দিয়ে কোথায় বিধের করে এনেছে তুমিই জান। আমি জানি আমি রাক্ষসী, শরতানী, শিশাচী, আমার ছায়াস্পর্শে

লোকের সর্বনাশ হয়ে যায়—তা জেনে শুনেও আমি তোমাদের সর্বনাশ করেছি—নিজের সর্বনাশ করেছি। এর প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজ হাতে করবো। এই পৃথিবীতে আমার স্থান নেই। আমি তাই ঠিক করলাম যেখানে গেলে সকল জালা জুড়োর দেখানে গিয়ে আমার সকল জালা জুড়োবো। যা গঙ্গার বিশাল বুক অভাগী মেয়ের স্থান হবেই।” কণা আর বলিতে পারিল না, তাহার মুখে স্থির প্রতিক্রয়ার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

দে আবার বলিতে লাগিল, “আমার শেষ অনুরোধ দুটি আছে সে দুটো রাখতেই হবে তোমার—দ্বিতিকে কিরিয়ে এনে তাঁর কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে বসো, “আমি তোমার চেয়েছিলাম বটে কিন্তু তাঁকে অধিকারচ্যুত করে নয় তাঁর প্রণামের শেখটুকু মাত্র। আর দ্বিতীয় অনুরোধ আজ রাত্রিতে তত্ত্ব বেধন দেবতার পূজা করে তেমনি করে পূজা করবো তোমার আমার জীবনের সবটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে।

কণা আর বলিতে পারিল না; সে বাগিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অরুণ তাহাকে লাঞ্ছনা দিয়া কত মিষ্ট কথা বলিল, কিন্তু কণার ক্রন্দন থামিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের ভায় কেবলই বলিতে লাগিল, “দিদি তুমি আমার ক্ষমা না করলে পরলোকেও যে এমনি অভিশপ্ত জীবন বইতে হবে আমাকে।”

—উনত্রিশ—

বেলা ছুইটার ক্রান্ত দেহ লইয়া অরুণ বাটী ফিরিল—তাহার দেহ ও মন উভয়ই তাহার লহিত বিজ্ঞোহ করিতেছে। তাহার মনে হইতেছে এই দেহটা হইতে যদি তাহার অন্তরাশ্রা বহি বাহির হইয়া বাইতে পারিত তাহা হইলে সে যেন কতকটা শান্তি পাইত। সে নিঃশব্দে আগনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বাহিরের পোষাক না ছাড়িয়াই

বিছানার শুইয়া পড়িল। সে দেখিল তাহার বাড়ীর লাজ সরঞ্জাম সকল বিবরেই ক্রটি রহিয়াছে। এতগুলি ভৃত্য থাকা লক্ষ্যেও বাড়ীটিকে যেন লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া বোধ হইল। বিছানার যে চাষর পাতা হইয়াছে তাহা অন্ততঃ পাঁচদিন পূর্বে পরিবর্তন করা আবশ্যক ছিল। বড় বড় আয়না-দেওয়াল আলমারীর আয়নাগুলি তৈলাক্ত ও অপরিচ্ছন্ন। বুক সেলফের উপর প্রায় অর্ধ ইঞ্চি ধূলা জমিয়া রহিয়াছে, কাপড়-চোপড়গুলি আলনার বিপর্যস্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। সে কোনরূপে বেশ পরিবর্তন করিয়া বাথ রুমে গিয়া দেখিল সেখানে লাবান বা তোয়ালে কিছুই নাই। তেলের শিশিট কাঁচ হইয়া পড়িয়া আছে তাহা হইতে মূল্যবান তৈল গড়াইয়া পড়িয়া সেলফের খানিকটা তৈলাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। বাথ টবটা শুষ্ক; জলের সংস্পর্শরহিত। সে কোনরূপে একবাটা জল সংগ্রহ করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিল। ভৃত্যদের তিরস্কার করিয়া এবং পরে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখি উৎকলী পাচক বেঝের পড়িয়া পরম স্থানে নিত্রা হাইতেছে। একটা বিড়াল মাছের খোঁজ হইতে মাছ সংগ্রহ করিয়া পরম লক্ষ্যে তাহার লভ্যবহার করিতেছে। কতকগুলি চড়াই পাখী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আহাৰ্য্যগুলিকে ঘরঘর ছড়াইয়া ফেলিতেছে গ্যালের গুনান বাউ বাউ করিয়া জলিতেছে একটু কল ঘুড়াইবার অতাবে এতগুলি পরম নষ্ট হইতেছে। সে ধমক দিয়া ঠাকুরবে ডাকিয়া বলিল, “লজ্জা করেনা ভূতের মা ঘুড়াতে?” সে উঠিয়া হাই তুলিয়া চণ্ড কচলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল “খেতে দেব কি কর্ত্তা?” অরুণ রাগ করিয়া বলিল, “খা না আমি।”

“বে আজ্ঞে বাবু।”

অরুণ পুনরায় শয়নকক্ষে গিয়া শয্যা শুইয়া পড়িল। বহুকণ অতীত হইল কো

আমিরা তাহাকে আহারের জন্য একবারও
অনুরোধ করিল না। তাহার চক্ষু ফাটিয়া
এল আলিতে চাহিল। সে হির করিল
ঠাকুর ঘরে গিয়া জগদীশ্বরের ধ্যান করিয়া
মনটাকে শান্ত করিবে। ঘরে প্রবেশ
করিয়াই তাহার পিত্ত পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল।
চমৎকার বার্কেলের মধ্যে—তাহা কে গোমর
দ্বারা পরিকৃত করিয়া বতরু লম্বা অপরিষ্কার
করিয়া তুলিয়াছে, একপাশে এক গাঁধা ফুল
ও বিষণ্ণ জমিয়া তাহা হইতে হর্ষক নির্গত
হইতেছে। বিগ্রহের বেশ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ;
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অরুণের মনে
হইল যে চক্ষুতে তিরস্কার ও অভিমানের
তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হার, এতগুলি
ভৃত্য লম্বা একজনের অভাবে তাহার
প্রাণাল প্রাণের মতই ভয়াবহ
হইয়া উঠিয়াছে।

সে পুনরায় শয়নকক্ষে ফিরিল—ঘরের
দারটা রুদ্ধ করিয়া শুভ্রার ছবিখানি নাড়াইয়া
লইয়া সে তাহা নিজের বকে চাপিয়া ধরিল।
তৎপরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্তার্পিত মুখ-
খানিতে লম্বা চুখনের ছাপ আঁকিয়া দিল।
সেই চিত্তখানিকে লম্বাধন করিয়া বলিতে
লাগিল—“হুটু কোথাকার, আমার উপর
অভিমান করা হয়েছে—তাই হুঁহি আনবে
না।—এখনো। আমার বত পার লাগা
হাও। কিন্তু আর ক’দিন? এবার চলে
যাব এই পৃথিবী ছেড়ে। যেমন হুটু তুমি—
তেমনি—অরুণের চক্ষু হুইটী জলে ভরিয়া
উঠিল—কয়েককোটা অশ্রু ছবির মুখখানিকে
লিক্ত করিয়া দিল।

অরুণ আপন মনে বলিতে লাগিল,
“তোমার কাছে কথা চাইবার লাহলও আমার
নাই। পণ্ডর অধিক ব্যবহার করেছে তোমার
সঙ্গে। একটা কথা বলে প্রতিবাদ করোনি
কোনদিন আমার সেই অমানুষিক অত্যা-
চারের। শুনো, আত্মহত্যা করলেও কি

আমার কথা হবে না, আমাকে কি একটাবার,
আবার—। লহল। তাহার পৃষ্ঠে কাহার
দীর্ঘখানের স্পর্শ পাইয়া অরুণ বলিয়া উঠিল,
“তবে কি তুমি কিরে এলে শুভা—তোমার
অভাগা স্বামীর কাছে?”

সে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল বাহার দীর্ঘখান
তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছিল সে শুভা নহে
তাহারই প্রতিদ্বন্দী বন্ধু অমল।

অরুণ দারটা বন্ধ করিয়া খিল আটরিয়া
বিত্তে তুলিয়া গিয়াছিল। অমল উপরে
আলিয়া নিঃশব্দে দার খুলিয়া অরুণের
পশ্চাতে হাড়াইয়াছিল ও নীরবেই তাহার
কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। অরুণের
লঙ্গে লঙ্গে তাহারও হুই চক্ষু জলে ভরিয়া
উঠিয়াছিল।

অরুণ নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া আত্ম-
লম্বরণ করিয়া প্রথমই কথা কহিল—“কখন
এলে তাই?”

“বতকণ তুমি এই ঘরে আছ ততকণ।
কিন্তু অরুণ, আজ আমি তোমার হুটো
অনুরোধ জানাতে চাই—আশাকরি, তুমি
তা রাখবে। অমলের মিনতিতে শুধু
অনুরোধ ছিলনা অরুণ তাহাতে আবেশের
আভাস পাইল।

অরুণ বলিল, “কি বল?”

“বৌদিবিকে ফিরিয়ে আন। তার মত
স্ত্রীর প্রতি লম্বহ করার মত পাপ আর
কিছুতেই থাকতে পারে না। তুমি তার কাছে
কথা চেয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল আর
প্রতিজ্ঞা কর জীবনে অপর কোন স্ত্রীলোকের
মুখ দেখবে না।”

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অরুণ
বলিল,—“তারপর?”

অমল বলিল, “জগদীশ্বর যেন তোমার
সুখতি যেন। আর এই অনুরোধের
আশ্বাসে শুড়ে আমার মত তুমিও যেন
দারুণ হতে পার তার স্রীচরণে এই প্রার্থনা
জানো।”

অরুণ বলিল, “ভাল’ তারপর?”

“তারপর, দ্বিতীয় দিনতি, কণার কাছে
নিরে বেতে হবে আমার।”

অরুণ কি বলিতে বাইতেছিল—বাধা
দিয়া অমল বলিল, “না অরুণ আমার
প্রতারণা করবার চেষ্টা করো না। আমি
জানি যে আছে তোমারই কাছে তোমার
রক্তিতা হিলাবে।”

অরুণ বলিল, “তোমার অভিযোগ আমি
অস্বীকার করব না অমল, কিন্তু সেখানে
বাঙরা চলবে না তোমার। প্রথমতঃ আমি
বহি বলি সে তোমার ঘৃণা করে তা হলে
মিথ্যে বলা হবে না। দ্বিতীয়তঃ সে আমার
সত্যিই ভালবালে তার আমি কোন বিপদ’
আমি নিজে ডেকে আনতে পারি না।”

উত্তেজিত কণে অমল বলিল, “সে
আমার ঘৃণা করে করুক—আমি ঘৃণাই
পাত্র—আমি তার সঙ্গে যে ব্যবহার করে-
ছিলাম তাতে আমি আশা করিনা যে সে
আমার ভালবাসবে বা তৃপ্তি করবে।
পৃথিবীর সব মেরেই তো বৌদিবি নয় অরুণ।
আর তার বিপদের কথা বলছে আমি
তগবানের নাম নিয়ে শপথ করছি আমার
দ্বারা কোন বিপদই হবে না তার।”

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কেন
দেখতে চাও তাকে?”

অমল বলিল, “আমি তাকে হুঁহিরে
বিত্তে চাই তার জন্তে কোথায় নেবে এলেছ
তুমি আর তোমার মুখের লংসারে কত
বড় আশ্বাস লেগেছে। আমার বিশ্বাস
আমি তাকে কোরাতে পারবো। সে
বৌদিবিকে ভালবাসতো অন্তর দিয়ে।”

অরুণ হালিল ও বলিল, “বেশ, আজ
লক্ষ্যাই তোমার সেখানে নিয়ে যাব
আমি—কিন্তু শপথের কথা তুলোনা অমল।”

অক্ষয়

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লবঙ্গ তাহাকে দেখিয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। জগন্নাথ তখন কথা কহিলেন বলিলেন : তাইতো ! এতবড় একটা সর্বনাশ হয়ে যাবে, এতো আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি ! মাকে বুঝি কোনও খবর দেওয়া হয় নি ?

লবঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল : বোধহয় হয় নি ! এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে যাবে, এতো বাবুও বুঝতে পারেন নি, আমিও বুঝতে পারি নি !

—এখন চিঠি লেখা হয়েছে ?

—কই আর হলো ? কে চিঠি দেবে ?

—তুমিই না হয় একখানা লিখে দাও। হিতে ত হবেই !

—তাবহি, আজ বিকেলে একখানা দেবো ! কিন্তু কি করে যে দেবো, তা জানি নি ! তাঁকে এ সংবাদ কি করে লিখে পাঠাবো ?

—সত্যি কথা। বিশেষ তিনি বেরকম মেয়ে-অন্তঃপ্রাণ ছিলেন। ললিতা বলতে অজ্ঞান হতেন। তবু হিতে হবে লবঙ্গ ! বিপদের সময়ে অধীর হয়ে বলে থাকলে তো চলবে না। মানুষকে সব কর্তব্যই করতে হয়, আপন বিপদেরও মাঝখানে !

—তা জানি ঠাকুর্দা। তবু হাত পা আলে না। মনে হয় যেন, কিশোর জন্ম কর্তো। বার জন্মে করা, নেই তো চলে গিয়েছে। পরগুলো সব খাঁ খাঁ করছে। বাবু তো একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন। কাল লম্বা রাতি চোখের পাতা বুজান নি, বারাক্ষর পারচারি করেছেন। তাঁকে শাস্ত

করা আমার পক্ষে এক বিষম দায় হয়ে উঠেছে !

—এখানে কি তাঁর আর কেউ নেই ?

—কে আর আছে। মা নেই, খুড়ী নেই, জেঠী নেই,—আছে একটি ছোট ভাই। তা, সেও হয় লম্বা দিন বলেছে, না হয় বাইরে বেড়াতে বেরোয়। সে লম্বারের বড় বেশী দায় ধারে না। ঐ কি চাকর নিয়েই লম্বার। তারা কি আর শোকেতাপে মনিবের কোনও কাজে লাগে ? তারা, আম পাকলে মাছির মত ভ্যান্ ভ্যান্ করতে পারে,—কিন্তু বর্ষার দিনে কাকেও খোঁজ পাওয়া যায় না !

—কোনও নিকট আত্মীয় কুটুম্বকে খবর দিয়ে নিয়ে এলেও হয় !

—কে দেবে ? আমি ত আর ওদের কিছুই জানি নে। যিনি জানতেন, এবং নিজহাতে কর্তেন, তিনি হঠাৎ হাল ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন। কাজেই মাঝদরিয়ার নৌকো বন্ বন্ করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

—তা হলে তো এখনই মাকে খবর দেওয়া উচিত। আমি না হয় আজই তাঁকে টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি।

—তাই না হয় করুন। না হ'লে বাবুর একটা মস্ত বিপদ হবার সম্ভাবনা। হয়তো মাথাটাই খারাপ হয়ে যেতে পারে। আমি একা,—আর তেমন নিকট সম্পর্কের লোক ত নেই,—

—তাতো বটেই ! কি করবি বল ! এ বিপদে বাবুকে রক্ষা করার জন্তে ভগবান্ হয়তো তোকেই ক্ষত্র করে পাঠিয়ে-

ছেন। নইলে এমন লম্বায়েই বা তুমি এখানে আটকে পড়বি কেন ?

—আপনি কি এখন দেশে ফিরবেন ?

—হ্যাঁ, দেশেই ফিরবো। এনেহিলুম কলকাতায় একটা মকদ্দমার জন্তে, তাই ভাবলুম দ্বিবিমণিকে একবার দেখে যাই ! কিন্তু দ্বিবিমণি যে এমন করে লকলকে কীকি দিয়ে পালাবে, তা কে জানতো ? আহা,—আর ছদ্মিন আগে আদভুম যদি, তা হ'লে দেখাটাও হতো।

—দেশের খবর কি, জেঠামশায় ? আমার বিষয়ে কোনও নালিশ মকদ্দমা করলেন নাকি ?

—না, এখনও তো করিনি। তবে উকীল বাড়ী ঘুরচি। তোমাকে নিজে লই করে একখানি দরখাস্ত পেস্ কর্তে হবে।

—তা যা কর্তে হয় করবো। একটা হিলে ত হওয়া চাই। যে আমাকে ঘেঁষ করে কোলে তুলে নিচ্ছিল, সে তো চলে গেল। এখন কি আঁকড়ে পড়ে থাকবো ?

—তা হ'লে তোর মত আছে নালিশ করতে।

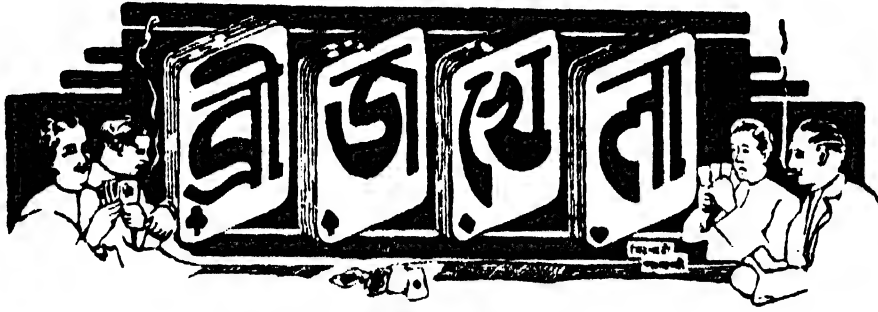
—কাজেই ! আর না হয় একবার চেষ্টা দেখোনা, যদি তার বাড়ীতে একটু মাথা শুজতে দেয় !

—মাথা শুজতে দিলেই কি হবে ! সেখানে তো আবার লতীন আছে !

—সে লতীনে বরং পার পাওয়া যায়, জেঠামশাই। কিন্তু বাইরে দেখতে পাচ্ছি, জগৎ শুদ্ধই আমার লতীন ! লতীনের ঝাটা গায়ের রক্তটুকু শুধু বায় করে, কিন্তু বাইরের ঝাটা জীবনের কোনও অংশটাকেই বায় দেয় না। ছনিয়ার বেলা পাওয়ার একেবারে দেউলে করে রেড়ে দেয়।

—তবে উঠে পড়ে লেগে দেখি !

—হ্যাঁ, তাই দেখো ! আর আমাকেও দেশে নিয়ে চলো না ! এখানে একা



ক্রীড়ারীসা

নিষ্কাশন কৌশল (Squeeze Play) অনেক সময় প্রতিপক্ষের হাতে একটি টেকা থাকে। সবেমাত্র সাতটি খেলা করা সম্ভব হয় যদি সেই রঙ খেলা না হয়। নিজের হাতটিতে সেইরূপ একটি ডাক হয়েছিল ও প্রতিপক্ষ ডবল দিচ্ছেছিলেন। ডবলকারীর হাতে কোন টেকা আছে এ খবর তাঁর খেঁড়ী জানতে পারেননি বলে ডাককার অনায়াসে খেলা করে নিতে পেরেছিলেন। হাতটি তল এইরূপ—

ইস্কাবন— $\times, \times, \times, \times, \times$ ।

হরতন—সাহেব, বিবি, \times ।

কুহিতন— \times ।

চিড়িতন—সাহেব, \times, \times, \times ।

ইস্কাবন— \times ।

হরতন—গোলাম, \times ।

কুহিতন— $\times, \times, \times, \times, \times$,

\times ।

চিড়িতন—গোলাম, দশ, \times, \times ।

ইস্কাবন—টেকা, সাহেব, বিবি, \times, \times ।

হরতন—টেকা, \times, \times, \times ।

কুহিতন—সাহেব, \times ।

চিড়িতন—টেকা, বিবি।

কি ভাল দেখায়? সেখানে না যায় আর কাছে থেকে, যা হয় করে চালাবো!

—না, না, গিন্নীদ্বিকেক একবার জেক্স করে দেখ! তারপর, যা হয় হবে।

দেবড় আশ্রয়টা তুই একেবারে ছেড়ে দাও।

এই হাতটিতে সাতটি ইস্কাবনের ডাক হয়েছিল এবং বিপক্ষের ডবল দিয়েছিলেন। তাঁর খেঁড়ী 'প' চিড়িতনের গোলাম খেলে প্রাথমিক গাল দিলেন। তাল খেলার পর ডাককার দেখলেন যে তাঁদের উভয়ের হাতে ছোট বারোটি পিট বর্তমান, সুতরাং তাঁর আর একটি পিটের দরকার। এখন একটি পিট বাড়াতে হলে নিষ্কাশন-কৌশলের প্রয়োগ করতে হবে। ডবল দেওয়ার দরুন তিনি জানতে পেরেছেন যে কুহিতনের

ইস্কাবন—গোলাম, \times ।

হরতন—দশ, \times, \times, \times ।

কুহিতন—টেকা, বিবি, গোলাম,

\times ।

চিড়িতন— \times, \times, \times ।

টেকাটি 'পু'-র হাতে আছে। এখন 'পু'-র হাতটিকে নিষ্কাশন করার প্রয়োজন, সুতরাং প্রথমে দশটি পিট কি ভাবে নেওয়া যায় সেইটি প্রথমে দেখতে হবে।

(১—৪) প্রথম পিটখানি চিড়ের টেকা দিয়ে নিয়ে রঙের টেকা সাহেব ও চিড়িতনের বিবি পিট নিলেন। এই

একগাছি মালা শ্রীশ্রীস্বামী শঙ্কর

তবু এক গাছি মালা, আর কিছু নহে—
তোমারে লপিব বলে গিয়ে ছিছু লয়ে,
গেথেছি নিশি দিন মিলনে, বিরহে,
সুখে, দুখে, ক্ষতি-লাভে, জয় পরাজয়ে।

পর্যব তোমার গলে ভেবেছি যখন;

লুটাব চরণে তব মনে ছিল সাধ,

দিবস নিশার মধু-মিলনের কণে

লপিব কুহুম মালা লভিব প্রাশ।

কিন্তু হায় একি বেধি, চারিধিক হতে
কত মণি মুক্তা মালা আসে উপহার।

তোমার চরণ তলে হরবে চালিতে
ভারে ভারে আসে কত পুঞ্জ উপাচার।

সাম্রাজ্ঞ এ মালা মোর বিবাহ মলিন।

ফিরিয়ে লইয়া গেছ। সে যে তুচ্ছ, হীন।

পিটগুলি নেবার সময় তিনি দেখলেন যে 'প' রঙের খেলার একখানি কুহিতন পাশালেন।

(৫—৭) তারপর হরতনের একটি ছোট

তাল খেলে ডামির হাতে সাহেব দিয়ে পিট ধরে চিড়িতনের সাহেব খেলে ছোট চিড়িতন খেললেন ও তুরূপ করে নিজে সেই পিটখানি নিলেন।

এইরূপ করার তিনি দেখলেন শেষ চিড়িতন খানিতে 'পু' একখানি কুহিতন পাশালেন। এখন সাতটি পিট নেবার পর তিনি ইস্কাবনের বিবি ও ছোট আর একখানি রঙ খেলার ডামির হাতে উঠলেন। এই দুইখানি পিটে 'দ' ও 'পু' উভয়েই দুইখানি কুহিতন ছিলেন। এটোবার দশম পিটে ডামির হাতে ছোট এক তাল রঙ খেলার 'পু' আপনা-আপনি নিষ্কাশিত হয়ে গেলেন, কারণ তাঁর হাতের বিভাগ এখন ঘরা পড়ে গেছে। অতএব ডাককার তাঁর ডাক অনুযায়ী সাতটি ইস্কাবনের খেলা করে নিয়ে গেলেন।

(ক্রমঃ)



মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা শ্রী প্রকল্পময়ী দেবী

[সোভিয়েট রাশিয়ার উন্নত স্ত্রীত্বনীতি আজ বিশ্বমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অথচ আমাদের দেশের যা বোনেদের মধ্যে কজনে সে দেশের নারী প্রগতি লক্ষ্যে অবগত আছেন, জানি না। এ সংখ্যায় কুমারী মায়াতরু লিখিত এই সূচিক্তিত প্রবন্ধটি তাদের যথেষ্ট মতন তথ্যের সন্ধান দেবে, এই কামার বিশ্বাস। আগামী সংখ্যা থেকে যথাস্থিতি আমাদের আলোচনা চলবে।

সম্পা: ম: ম:]

সোভিয়েট রাশিয়ার

নারী-প্রগতি

লেখিকা—কুমারী মায়াতরু লিংহ

রাশিয়ার সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পূর্বে রাশিয়ার (প্রাধানত: পূর্ব-রাশিয়ার) নারীসমাজের অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। নিরক্ষরতা—ধর্ম আর সামাজিক গোড়ানী প্রভৃতি নানান কারণে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিলো বিষময়।

সমাজে তাদের স্থান বা অধিকার কিছুই ছিলো না। সকল বিষয়ে তাদের পুরুষের প্রভুত্ব মেনে চলতে হতো। পুরুষেরা সকল দিক থেকে নারী হতে শ্রেষ্ঠ আর স্বতন্ত্র জীব বলে পরিগণিত হতো। সে দেশের নারীরা কিছুতেই ভাবতে পারতো না যে তারাও মানুষ,—পুরুষের মত তাদের স্বাধীন স্বাধা আছে, সুখ-দুঃখ বোধ আছে।

সাধারণ গৃহস্থালী কাজ থেকে কৃষিকার্য প্রভৃতি বহুবিধ কষ্টকর কাজ সে দেশের নারীদের সুলভ করতো হতো! কিন্তু লব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে

এই—সকল প্রকারের উচ্চাঙ্গের কাজ ছিলো তাদের অধিকারের বাইরে!

তুর্কমেনিয়া, কসাকস্থান, বুরিয়াটো—মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি জায়গায় মেয়েরাই সকল প্রকারের কৃষিকার্য সুলভ করতো। আট নয় বছরের বালিকা থেকে দাঁট বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত প্রত্যেক নারীকেই কৃষিকার্যে অমামুখিক পরিশ্রম করতে হতো।

এ ছাড়া গো-পালন ইত্যাদি বহুবিধ শ্রমসাধ্য কাজের তারও তাদের উপর অর্পিত ছিলো। অথচ সমাজে তাদের কোনো স্থান বা অধিকার ছিলো না। এমন কি তাদের শ্রমলব্ধ অর্থ বা ভ্রাবাদিও তারা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারতো না। সমাজ এতে তাদের বাধা দিতো। সমাজের বিধানানুযায়ী পুরুষেরাই ছিলো সমস্ত সম্পত্তি আর ভ্রাবাদির মালিক!

বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের অত্যন্ত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হতো। স্ত্রীলোকেরা শত কারণেও স্বামী পরিত্যাগ করতে পারতো না। কিন্তু স্বামী প্রভুত্বের কারণে অকারণে স্ত্রী পরিত্যাগ করবার বাধা ছিলো না! ফলে অনেক সময় পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পিতৃগৃহে আশ্রয় নিতে হতো। অস্ত্রাধার নিতান্ত নিঃস্বল অবস্থায় লংলার সমুদ্রে একা দাঁড়াতে হতো।

রাশিয়ার পর্দাপ্রথাও ছিলো অত্যন্ত ধারাপ। বাজালা দেশে পর্দাপ্রথা প্রচলিত থাকলেও রাশিয়ার পর্দাপ্রথা তুলনায় আমাদের দেশের পর্দাপ্রথা কোনো তুলনাই হয় না।

রাশিয়ার পর্দা প্রকারের। একটার নাম 'চাদ্রা' অপরটির নাম 'পরান্দজা'। 'চাদ্রা' জিনিষটা প্রায় আমাদের দেশের (হিন্দুস্থানীদের) 'ওড়নার' মত আর 'পরান্দজা' কতকটা মূলমান হাফিজের ব্যবহৃত 'বোরখা'র মত।

তবে 'বোরখা'-র সঙ্গে 'পরান্দজা'-র পার্থক্য এই,—'বোরখা'র চোখের সামনে ছোটো ছিঁড় থাকে কিন্তু 'পরান্দজা'-র সে ছোটোও নেই। কাজেই এটা ব্যবহারে মেয়েদের অক্ষের মত অস্ত্রের সাহায্য নিয়ে চলতে হয়।

এই বিষময় পর্দাপ্রথা কলে অল্প বয়সেই রাশিয়ার মেয়েদের সাধারণ স্বাস্থ্য বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে যেতো (যদিও বর্তমানে রাশিয়ার মেয়েরা বৈজ্ঞানিক আর মানসিক দোন্দর্যের প্রতি-যোগিতায় বিজয়িনী তবু এরাই বছর কয়েক পূর্বে কেমন ছিলো তারই ছোট্ট আলোচনা এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য)।

এরপর এলো বিবাহ প্রথা। সেদেশে পুরুষের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। মেয়েদের বিয়ে হতো ঠিক আট থেকে দশ বারো বছরের মধ্যে। এই বাল্য বিবাহের কলে অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কারণে স্ত্রীলোকেরা অল্প বয়সেই জড়গ্রহ হয়ে পড়তো এবং অনেকে অকালে প্রাণ হারাতো।

সন্তানেরা প্রায়ই দুর্বল হতো আর শিশু মৃত্যুর সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিলো না। সেদেশের নিয়ম ছিলো কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে হলে পাঁচ পঞ্চকে কস্তাপক্ষের কতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে হতো কস্তার পিতাকে।

ঠিক আমাদের দেশের পল্লপ্রথা বিপরীত।

আমাদের দেশে বলে বরণ। ওদের দেশে বলা বেতে পারে কস্তাপণ! হুঁদের ফল কিন্তু একই।

বাঁজালা দেশের কস্তার পিতা অর্থের অভাবে বুকের সঙ্গে শিশুকস্তার বিয়ে ঘের আর রাশিয়ার কস্তার পিতা অর্থলোভে বুড়োর হাতে শিশুকস্তাকে লপে দিতে। সুতরাং অনেক সময়ে বাট বছরের বৃদ্ধ আশানে বাওয়ার পথে এক আট বছরের বালিকাকে বিবাহ করে বলতো। আবার অনেক সময়ে পুরুষেরা একদেশে কম টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করে অন্য দেশে গিয়ে সেই বিবাহিতা স্ত্রীকে বেশী টাকার বিক্রয় করতো। সন্দেহ লাভের ব্যবস্থা নন্দেহ নেই কিন্তু স্ত্রী যে এতে হ'ল ভৈজলপত্রের শামিল!

এ গেলো নোভিরেট রাশিয়ার নোভিরেট ইউনিয়ন স্থাপিত হওয়ার পূর্ববর্তীকালে পূর্ব-রাশিয়ার অবস্থা! জারদের নিষ্ঠুর রাজত্বের অবশানের পর নোভিরেট গভর্নমেন্ট যে দেশের নারী সমাজের উন্নতির জন্তে প্রবল চেষ্টা করতে লাগলেন।

রাশিয়ার গভর্নমেন্ট বুঝতে পেরেছে সমাজকে উন্নত করতে হোলে আর সমাজ-দেহকে সুস্থ রাখতে হোলে নারী সমাজের বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে সর্বপ্রায়ে।—তাই, নোভিরেট গভর্নমেন্ট দেশের উন্নতির জন্তে যে “Five Years Plan” (পাঁচ বছরের সংকল্প) গ্রহণ করেছিল, সে সংকল্পের গোড়ার রোয়েচে এই নারীপ্রগতি।

নোভিরেট ইউনিয়ন নারী আর পুরুষের সামনে “অধিকার” এই চিরন্তন লড়াই ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথা, বহু বিবাহ—বাণ্য বিবাহ প্রভৃতি নারী সমাজের অনিষ্টকর কুৎসিৎ প্রথাগুলোকে কঠোর আইন দিয়ে ধ্বংসের চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু শত কঠোর আইনের নিষেধণে একদিন সমাজের সমস্ত ঘোষণাগুলো ফুর করা সম্ভব নয়। তৎকালীন সমাজের লোকেরা এ বিষয়ে বাধা দিতে লাগলো—চারদিকে নবপ্রচারিত আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের ঝড় উঠলো।



স্ব-মালি
—তবে—
লিলি
ব্যাণ্ড

হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ৪ ৪ বোম্বাই

সমাজের রক্ষণশীল টাইয়েরা ভাবলো—
সরকার আইন দিয়ে ধর্ম আর সমাজের
পবিত্র বন্ধন ভাঙতে চাইতেন। চারদিকে
নবপ্রচারিত আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ
হলো। ফলে গভর্নমেন্ট কুলোকে প্রচার
কোরে—বলশেভিকেরা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল
করে তুলছে। নারীর সতীত্ব বলে কোনো
জিনিষ আর থাকবে না—ইত্যাধি—ইত্যাধি।
সুতরাং পুরুষের ধারণা হয়—সত্যিই বুঝি
এতে সমাজের পবিত্র বন্ধন বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এ সকল বাধার মধ্য দিয়ে নারী
প্রগতির আন্দোলন ধীরে ধীরে সফলতা
লাভ করতে লাগলো। রাশিয়ার মেয়েদের
পক্ষে হঠাৎ পুরুষের সঙ্গে একত্রে স্কুল-
কলেজ, সা ক্লাবে যোগ দেয়া তখন নিত্য
অসম্ভব।

একেতো, পুরুষের ক্রমাগত বাধা
ভারপর আবার মেয়েদের নানা আশঙ্কা
সুতরাং মেয়েদের জন্মে পৃথক স্কুল-কলেজ,
ক্লাব প্রভৃতি খুলতে হলো।

নারীদের সর্বপ্রথম ক্লাব হয় বাকুতে।
নাম—‘অল বৈরালভ ক্লাব’। সোভিয়েট
ইউনিয়নের মধ্যে এটাই মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ
ক্লাব। এর পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২২
খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক নগরে এবং
গ্রামে নারীদের ক্লাব স্থাপিত হয়েছে।

মেয়েদের শিক্ষার জন্মে “অজ্ঞতা নিবারণী”
প্রতিষ্ঠান—ব্রাহ্ম্যমান শিক্ষালয় প্রভৃতিও সঙ্গে
সঙ্গে স্থাপিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের
শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গীত, ব্যায়াম, সন্তান
-পালন, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাধি সর্ব
বিষয়েই মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হয়।

এ প্রকারের প্রতিষ্ঠান লম্বা যাত্রে
প্রত্যেক নগরে এবং গ্রামে স্থাপিত হয় সে
দিকে প্রবল চেষ্টা চলেচে। বর্তমানে
কৃষক রক্ষণীদের জন্মে একমাত্র পূর্ব রাশিয়ার
১২০টি ক্লাব, ৩৮৫টি অজ্ঞতা নিবারণী প্রতিষ্ঠান
(Red Corners), ১৮০টি ব্রাহ্ম্যমান শিক্ষা-

লয় (Red Yurta) এবং পাঁচটি স্থায়ী
প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের সভ্য সংখ্যা
প্রায় নব্বই হাজার। দিন্ দিন্ এসকল
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে
সভ্য সংখ্যাও বাড়চে।

এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্ম্যমান
শিক্ষালয় আর ব্রাহ্ম্যমান গাড়ীর কথা
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ সকল ব্রাহ্ম্যমান
প্রতিষ্ঠানগুলো নগরের লম্পর্শ বর্জিত
গণ্ড গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়ায়।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম্যমান শিক্ষালয়েই একজন
কোরে প্রাচ্যগারিক (Librarian), শিক্ষ-
কতার দাত্রী থাকে। তারা শিক্ষালয়ের
সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গমন
করে। একগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলো
লেখকদের মেয়েরা এঁল লেখাপড়া শিক্ষা
করে। তাদের বহু পত্রিকা পড়িয়ে শোনানো
হয় আর সেভিয়েট সভা থেকে প্রবক্তিত
নতুন আইনগুলো তাদের বুঝিয়ে দেয়া
হয়।

অনেক সময়ে এ সকল ব্রাহ্ম্যমান শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানগুলোর সহিত একজন করে
বিচারক থাকেন। মেয়েরা কোন বিষয়ে
অভিযোগ কোরলে তার তিনি উপযুক্ত
বিচার করেন।

ফলে এই হলো যে, মেয়েরা ঘরে বোসেই
সুবিচার পায়। দাত্রীরা নারীদের সন্তান
প্রসবের সাহায্য করে আর ম্যাজিক ল্যান্টার্ন
ইত্যাধির সাহায্যে স্বাস্থ্য, সন্তানপালন
প্রভৃতি নারীদের জাতব্য বিষয় সম্বন্ধে
বক্তৃতা করে।

এদের পূর্ব পুরুষের আমলে এ সকল
প্রতিষ্ঠানকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে থাকতো।
কিন্তু এখন এরা এতো লোকপ্রিয় হয়ে
উঠে যে, পুরুষেরাও অস্বস্থ হলে এগুলোর
আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

দিন্ দিন্ রাশিয়ার পুরাতন প্রথাগুলো
লোপ পেয়ে আগছে। সামাজিক অবস্থার

সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অবস্থারও বিস্তার পরিবর্তন
পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আজকাল বাকু, সমরখন্দ, বুখারা প্রভৃতি
নগরগুলোর কর্কল বৃকের উপরে ঘোমের
মতোন্ নরোম মেয়েদের পর্ষাবিহীন
ভাবে পথ চলতে দেখা যায়। ষায়া
Czar রাজত্বের আমলে সে দেশে গিয়েছেন
বর্তমানে তাঁরা এ দেখলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিত
হবেন সন্দেহ নেই।

রাশিয়ার নারী প্রগতির মূলে রয়েছে
মেয়েদের নারী-রক্ষীদের অদ্ব্য সাহায্য,
অসাধারণ আত্মত্যাগ, অসীম বীরত্ব।
প্রথম যেদিন সাহায্য করেকজন নারী
মিলিত হয়ে প্রবল জনতার বিরুদ্ধে মাথা
তুলে—‘চাত্রা’ আর ‘পরান্ধা’ পুড়িয়ে
পর্ষাপ্রথার অবসানের সূত্রপাত করলো
সেদিন তাদের কত যত্ননা সহ্য কোরতে
হয়েছিলো।

তাদের মধ্যে অনেককে নিষ্ঠুর ভাবে
নিগৃহীত করা হয়। কেউ কেউ অল্প
সমাজভক্তদের হাতে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন
দিয়েছিলো! কিন্তু আজ আর সে দিন
নেই! রাস্তার বুক দিয়ে অসংখ্য নারী
পর্ষাচড়া অবস্থে হেটে যায়। যুবক-যুবতী
কারুরই তা দৃষ্টিকটু মনে হয় না।

বর্তমানে রাশিয়ার মেয়েরা রাজনৈতিক
ক্ষেত্রে (Political field) যোগদান
করছে! নির্বাচনের সময়ে পুরুষের
চাইতে নারীরাই বেশী কর্ম তৎপরতা
দেখিয়ে থাকে। বহু মহিলা গ্রামের
ইউনিয়নগুলোতে সভানেত্রী নির্বাচিত
হয়েছেন।

গ্রামের সোভিয়েটগুলোর প্রধান
পরিচালক গ্রামের সোভিয়েটের সভাপতি।
তাই নারীদের সভানেত্রী পদে নির্বাচিত
হওয়ার বেশ বোঝা যায়—সে দেশের
মেয়েরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রভাব
প্রতিপত্তি লাভ করছেন।

অথচ কয়েক বছর পূর্বেও এই সকল গ্রামগুলোতে ঘেরেঘের কোনো অধিকার বিক্ষোভ ছিলো না। আজ গ্রাম্য লোভিরেটগুলোতে লভানেকীর লংখ্যা গ্রাম ১২৪, বালিকোরিয়াতে ১৪৪ জন। উল্বেকিস্থানে ৩৮৯ জন। কাঁকাকে ২৩৩ জন। তাতার সাধারণ তত্ত্বে ১০৮ জন এবং ধিখেস্থানে ৬০ জন। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

সাধারণিক পূর্ণগঠনে আর নারীর স্বাধীন পদা প্রকাশে সাহায্য করাতে আজ রাশিয়ার আত্ম পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশগুলো সাধারণতঃ পরিণত হয়েছে। দেশে শিল্প বানিজ্যের উন্নতি হয়েছে দ্রুতগতিতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পাশ্বেক্ষেপে অগ্রগতির হরহর রাশিয়ার নারী লম্বাক।

সকল নারীর আদর্শরূপে চিত্রাঙ্গদার মুখ থেকে যে বাণী সকল দেশের বরণীয় শ্রেষ্ঠ কবি অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলিয়েছেন, তার হঠাৎকুন্ আমার অত্যন্ত ভালো লাগে (আপনারই হস্তের সঙ্গে গরমিল হোতেও পারে!) সেটুকু পুনঃ লিখে আজকের প্রবন্ধে সমাপ্তির সোনালী রেখা টেনে দেবো—

—দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায় নেও আমি
নই; অবহেলা করি' পুষিরা রাখিবে
পিছে, নেও আমি নহি। পার্থে যদি রাখো
ঘোরে লংকটের পথে, দুরূহ চিত্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব লহায় হইতে,
যদি মুখে দুঃখে ঘোরে করো লহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচর।—

[চিত্রাঙ্গদা, শেষ পৃষ্ঠা।

সাহিত্যের কষ্টি পাথর অশনি

বাহা বাহা রে মোহিতলাল!

দ্বিত্বার বাঁচিয়া থাকিতে বনামধন্য
“নন্দলাল”-কে বাহবা দিয়া গাহিয়াছিলেন—
“বাহা, বাহা রে নন্দলাল!” এখন যদি
তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে
নিপাতনে দ্বিচ্ছ চাকিই বাঁচিয়া মোহিতলালের
“বঙ্কিমচন্দ্র কবি-জীবন” নামক অদ্ভুত
প্রবন্ধটির লিঙ্কগুলি পড়িয়া আর একবার
নিশ্চয়ই গাহিয়া উঠিতেন—“বাহা, বাহা
রে মোহিতলাল!” বাস্তবিক এই নন্দ-
লাল মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবনের
যে কাহিনী রচনা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-
জগতে একটি আবিষ্কারের তুল্য। বঙ্কিম
চন্দ্রকে এতদিন সকলেই লতা-শিব-মুন্সেরের
অধিত্য কবি ও ব্যাখ্যাতা বলিয়াই জানি-
তেন; কিন্তু মোহিতলাল সকলের সে ধারণা
দূর করিয়াছেন। বাহা বঙ্কিমচন্দ্র লব্ধ
এতদিন কেহই বলিতে সাহস করেন নাই
বা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, নিপাতনে দ্বিচ্ছ
মোহিতলাল তাহাই বলিয়াছেন ও তাহাই
ভাবিয়াছেন। মোহিতলাল প্রতিপন্ন করিয়াছেন
বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাহা যৌনতান্ত্রিক, তাঁহার
পন্থা ছিল “বীরাচারী” তান্ত্রিকের পন্থা,—
বোধকরি অনেকটা কপালকুণ্ডলায় কাপা-
লিকের মত! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!

মোহিতলালবাবু বোকা হইলে কি হয়,
বুদ্ধিমান আছেন। তিনি ভাবিলেন তরুণরা
বঙ্কিমচন্দ্রকে ভেদন পছন্দ করে না। বঙ্কিম-
চন্দ্রের গ্রন্থ পড়িলে তাহাদের মনে বিরংবার
উদ্রেক হয় না, বরং বিরংবার আশ্রয় কে

যেন গজাঙ্গলে ঢালিয়া নিবাইয়া দেয়।
অন্তরের অন্তরে একটা যেন “অবজ্ঞিতকর”—
চিত্ততন্ত্রির আত্মপ্রদাহ আছে। বঙ্কিম-
চন্দ্রের বিরুদ্ধে তরুণদের ইহাই নালিশ।
এই শতবার্ষিকীর মুখে বঙ্কিমকে তরুণ-
মহলে popularise করিতে হইবে। কেমন
করিয়া করা যায়? তাঁহাকে যৌনতান্ত্রিক
বলিয়া খাড়া করিলে তরুণরা এবং মোহিত-
লালবাবুর মত অনেক “প্রচ্ছন্ন-দণ্ড”
বঙ্কিমচন্দ্রকে উপাশ্রয় বলিয়া বরণ করিয়া
লইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার
যৌনপন্থী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে
আরও একটা কাজ হইবে—তরুণদের
নিকট রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র কোথায়
ডালিয়া যাইবেন। রবীন্দ্রনাথ যে একবার
মোহিতলালকে “অধ্যবসায়ী কবি” বলিয়া
মোহিতলালের ললাটে অতি স্নানপুণ ও
মর্যাদিত্য ভাবে পঙ্কতিলক পরাইয়া দিয়া-
ছিলেন, সে অন্তর্জালারও অবদান হয়।
অতএব মোহিতলাল কলম ধরিলেন এবং
কলম ধরিয়া নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি প্রচার
করিলেন:—

(১) অতি-অল্পবয়সে রচিত তাঁহার
কবিতাগুলিতে যে একটি কল্পনা বা রস
প্রেরণার উন্মেষ দেখা যায় তাহাও যৌন-
আকর্ষণমূলক।নারিকারুণিনী নারীর
প্রতি এই যে আসক্তি, ইহাই তাঁহার
জীবন-দর্শনের মূল সূত্ররূপে উপজালগুলির
সৃষ্টি-কল্পনার অনুসৃত হইয়া আছে।

(২) জীবনের বাস্তব নিরতিশেষ
সামুদ্রের বেহাষিত্ত কানরূপেই তিনি
তাঁহার দ্বিবাচুটির দ্বারা বিদ্য করিয়াছিলেন;

তাহাকে তিনি ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকিতে যেন নাই।

(৩) প্রেম ও রূপমোহ (পাছে পাঠকের ভ্রম হয়, একজ্ঞ রূপমোহ ও যৌনপ্রবৃত্তি যে এক তাহা মোহিতলাল স্বরা করিয়া পরে নির্দেশ করিয়াছেন) এই দুই পৃথক্ পিপাশা (প্রেম ও ইহার কাছে পিপাশা ;—“হার! রমণীরূপলাবণ্য! ইহ লংঘ্যারে তোমাকেই দিক্।”) প্রায় একই প্রবৃত্তির অঙ্গুগত হইয়া যে বন্দ-লংঘ্যারের সৃষ্টি করে, কবি বঙ্কিম তাহা হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারেন নাই। নগেন্দ্র বসু, গোবিন্দলাল.....মুখ্যার্থ পালন করিয়াছে—সে পরিণাম রোধ করিবার প্রবৃত্তিই তাহাদের স্রষ্টার চিন্তে নাই; বরং রসবিহীন কবি পরম আগ্রহে সে দৃষ্ট উপভোগ করিয়াছেন।সেই রূপমোহ বা ইন্দ্রিয়লালসার মুখে বহিবিবিক্স পতনের যে নিষ্কারণ পরিণাম, কবি তাহাকেই দীর্ঘ-নিশ্বাসের দ্বারা অর্জন করিয়াছেন; এই পালের স্বস্ত্যয়নকরে বস মন্ত্রই উচ্চারণ করুন—নিয়তির সেই ভীষণ-মধুর বিরাট গভীর সূক্তি হইতে মুক্তি দৃষ্টি কিরাইতে পারেন নাই। প্রেমই হউক, আর রূপ-মোহই হউক, কল একই; প্রভাপের প্রেম ও গোবিন্দলালের রূপমোহ দুইয়েরই পরিণাম এক—মৃত্যু ছাড়া আর পথ নাই।

(৪) যে প্রেম রূপজ নহে, তাহার গভীরতা স্বীকার করিলেও প্রেমকে সম্পূর্ণ রূপমোহবৃত্ত-রূপে কল্পনা করিতে তাহার বাধিয়াছে; তাহার কারণ এ মোহ কবির নিজেরই প্রাপের মোহ।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র...এই তৎ ব্যাখ্যাকালে নিজের জন্মগত লংঘ্যার ত্যাগ করিতে পারেন নাই—রূপজ মোহকেই একটি মূদ্র দার্শনিক নাম দিয়া শোধন করিয়া লইয়াছেন, ব্যাধির নাম পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র।

(৬) বেহবর্জিত আধ্যাত্মিক আদর্শকে তিনি কখনও প্রজ্ঞা করিতে পারেন নাই। উপরি-উদ্ধৃত লিঙ্গান্তগুলি মাষ্টার মোহিতলাল উনপঞ্চাশটি উত্তম পুরুষ লাক্ষিত “আমি” ও “আমার” লর্কনামপদের মারফতে, অবলীলা-ক্রমে, কলিযুগের দ্বিতীয় দ্বাতাকর্ণের স্রাব, বঙ্গীর পাঠককে খয়রাৎ করিয়াছেন। লিঙ্গান্তগুলির লঙ্ঘন মরল ভাষ্য অংশ ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র একজন ঘোরন্তর যৌনপন্থী ছিলেন। যৌন প্রবৃত্তি তাহার জন্মগত লংঘ্যার ছিল। স্বরাজ আমাদের “জন্মগত দাবী” ইহাই এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি। যৌন প্রবৃত্তি যে বঙ্কিমের “জন্মগত লংঘ্যার” ছিল, তাহাও এতদিন পরে শুনিতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র কামের দৃষ্ট বৈশ “তারাইয়া তারাইয়া” দেখিতে ভালবাসিতেন। কামকে বঙ্কিম দীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা অর্জন করিতেন। যেমন দেবতা, তেমনই পূজার উপকরণ। প্রেমই হউক আর ইন্দ্রিয়লালসাই হউক—ফল একই—মৃত্যু ছাড়া আর পথ নাই। মোহিতলালের শুক্ল স্ত্রীলকুমার ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। The paths of glory lead but to the grave—গ্রে লাভেরের নেই কবিতা মনে পড়িতেছে। রূপজমোহকেই অর্থাৎ যৌনপ্রবৃত্তিকেই বঙ্কিমচন্দ্র শোধন করিয়া প্রেমনামক পিপাশার রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। মোহিতলাল-মল্লিনাথের এই ভাষ্য পড়িয়া রামমাণিক্যের কথা মনে পড়িতেছে। রামমাণিক্য ত্রাণ্ডির গেলানের উপর মন্ত্র পড়িয়া “হোদন” করিয়া লইয়াছিল ইহাও দেখিতেছি তাহাই। বঙ্কিমের প্রতি আরোপিত এই যৌনবাহ রামমাণিক্য-মূলত মোহিতলালেরই কীর্তি, তাই নিমচাঁদ রামমাণিক্যকে বাহা বলিয়াছিল, তাহাও এই প্রসঙ্গে অনেকেই মনে পড়িবে—“ব্যাটা খাবে ত ত্রাণ্ডি, মন্ত্রের মূম দেখ,—যে ব্যাটা গেলাপ যে—” বাস্তবিক বঙ্কিম-চন্দ্রের উপর এই মনগড়া যৌনতাত্ত্বিকতার

আরোপ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে এরূপ অপমান আর কেহ কখনও করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। অথচ ইনিই নাকি বঙ্কিমসাহিত্য সম্পাদনের একজন প্রধানিক মোড়ল। বাদলা দেশের বঙ্কিমভক্তি যে শুধু বক্তৃতাতেই পর্যাবসিত ও নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে—ইহাও তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অন্ততঃ স্বদেশী আন্দোলনের বাদলা বাঁচিয়া থাকিলেও বঙ্কিমের এতটা দুর্গতি হইতে পারিত না।

* * *
মোহিত লিখিত স্ত্র-লম্বাচারের উদ্ধৃত অংশগুলি এতই কাঁচা ও শূন্যগর্ভ যে, সে গুলির বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। বঙ্কিম সাহিত্য বাঁহারা একটু যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছেন তাহাও কানে মোহিতলালের এই কীকা আঙুরাক লঙ্ঘ্যেই ধরা পড়িবে। বঙ্গীর পাঠকের রস-বোধের উপর আমরা এখনও ততটা আস্থাহীন হই নাই যে ঐকল অত্যন্ত অশ্রদ্ধের কথার অযৌক্তিকতা তাহাবিগকে বিচার করিয়া বুঝাইতে হইবে। তথাপি তাহাদের স্মৃতি-শক্তি জাগরিত করিবার জন্ত ঐ লঙ্ঘ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের কথা তাহারই লেখা হইতেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) “মনের অনেকগুলি ভাব আছে তাহার লকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিন্তের যে অবস্থার অন্তর মূখের জন্ত আমরা আত্মবিশর্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

বতঃ প্রস্তুত হই” অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান বা
পার্যাকাঙ্ক্ষার নহে। স্তবরাং রূপভোগ-
লোভা ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের
দ্বায়ে অন্নের প্রতি প্রাণের বলিতে পারি
না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাক্ষু্যকে রূপ-
ভোগের প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না।
সেই চিত্তচাক্ষু্যকেই আখ্য কবির মনন-
রাজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।……সে
ই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদ্বীষ-
প্রসূতা; ইহা দ্বারাও সংসারে ইষ্টলাভন
হইয়া থাকে এবং ইহা সর্বজীবমুক্তকরী।……
কিন্তু ইহা প্রাণের নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক।
প্রণয়ান্ধব ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি
দ্বারা পরিগৃহীত হয়, তখন সেই সকল গুণে
দৃষ্টি হইয়া তৎপ্রতি সমাকুল ও সফলিত হয়,
তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং
সংপ্রতিভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সন্তুষ্টি
এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন।
এই বসার্থ প্রাণের।……ইহা রূপে জন্মে না।
প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর
মানসলিপ্সা, আনন্দলিপ্সা সফল হইলে
সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রাণের, প্রাণের আত্ম-
বিসর্জন। আরি ইহাকেই ভালবাসা বলি।
নিতান্তপক্ষে জী-পুরুষে ভালবাসা আহার
বিবেচনার এইরূপ।”

(২) “ইন্দ্রিয়-পরিভূত বা পুত্রমুখ
নিরীকণের জন্ত বিবাহ নহে। যদি বিবাহ-
বন্ধনে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল,
তবে বিবাহে প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াধি-
শক্ত্যালের বশ; অভ্যাগে এসকল একেবারে
শাস্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি
ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে মুণ্ড
হটুক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতিশিক্ষা না
হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।”

(৩) “প্রীতিই সংসারে সর্বব্যাপিনী—
ইহারই প্রীতি। প্রীতিই আহার কর্ণে একগ-
কার সংসার-সঙ্গীত। অনন্তকাল দেই বহা-

সঙ্গীত সহিত মনুষ্যজীবন-তত্ত্ব বাজিতে
থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আহার
প্রীতি থাকে, তবে আরি অস্ত্র স্তম্ভ চাই না।”

(৪) সৌন্দর্য্যভূষা বেক্রপ বলবতী,
সেইরূপ প্রাণমনীয়া এবং পরিণামণীয়া।
মনুষ্যের বত প্রকার স্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে
এই স্তম্ভ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।”

স্বর্ধাকে লগ্নন ধরিয়া দেখাইবার প্রয়োজন
নাই; তথাপি চক্ষুমান পাঠক দেখিবেন
আমরা উপরে বতটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি,
তাহাতেই মোহিত-মোহনের সকল তর্কেরই
সমাধান আছে। অবশ্য, বন্ধন-কথিত
“সৌন্দর্য্য-ভূষা”-কে মোহিতলাল “রূপজমোহ”
বলেন কি না সেই বহুশ্রুতকুই আমাদের
দেখিবার সাধ আছে! .

পূর্বেই বলিয়াছি মোহিতলালবাবু বোকা
হইলেও বুদ্ধিমান বটেন। তাই তাঁহার
অবস্মাৎ শৈবলিনী ও রোহিণীর কথা মনে
পড়িয়া গেল। তবেই ত বন্ধনের দেহবাহ-
প্রতিষ্ঠার মূলে একটা গলব থাকিয়া যায়।
মনের জোর কমিয়া গেল, কিন্তু গলার জোর
বৃদ্ধি পাইল। মোহিতলাল দৃষ্টান্তে
বলিলেন—“প্রতিভার পরিণত অবস্থার,
বন্ধনচক্রের রূপভাসিক সাধনার, ছইবার
আদান টলিতে দেখিয়াছি।” শৈবলিনী
ও রোহিণীরূপে নারী তাঁহার হস্তে যে
লাজনা ভোগ করিয়াছে, তাহাতে কবি-
মানদের একটি অমুহ উত্তেজনা প্রকাশ
পাইয়াছে, স্তম্ভ কবিত্বটির পরিচয়
তাহাতে নাই। সব চেয়ে কৌতুকের বিষয়
এই যে, এই দুই-চরিত্রই তাহাদের দেহ-
মনের উৎকর্ষ ও বলিষ্ঠতার জন্ত পাঠকের
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; তাহারা কেহই যে
সাধারণ নারী নয়—তাহারা যে more sinned
against than sinning—সে ধারণার
জন্ত লেখক নিজেরই দ্বারী।…… তাহাকেই

এখানে শাস্ত্রকারবিগের মত্যািপানের মূল
বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। ইহাকেই বলে
“His Master's voice!” মোহিতলালের
শুরু স্তম্ভলকুমারও ঠিক অবিকল এই বাণী
“নি”-র একই লংখ্যার প্রকাশিত “রোহিণী”
নামক প্রবন্ধে প্রচারিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ,
মোহিতলাল ও স্তম্ভলকুমার যেন পরস্পরের
সহিত পরামর্শ করিয়া একই কাগজে একই
সময়ে এই দুইটা লেখা লিখিয়াছেন বলিয়া
মনে হয়। শাস্ত্রকারবিগের নাম ইহার
সহ্য করিতে পারেন না; কিন্তু দে বাহা

ডোঃ প্রদে বালামুদ

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

হটক, শৈবলিনীর লহিত বাঁহারা রোহিণীর নাম উল্লেখ করেন, তাঁহাদের রসবোধের পরিধি যে যৌনশ্রুতিমূলক গভীটির এক চুলও ওধারে নয়, তাহা বলাই অবশ্য বাহুল্য। শৈবলিনীর কথা সত্য, কিন্তু যে রোহিণী কানুকা ছাড়া আর কিছুই নয়, যে তাহার ক্ষুদ্র জীবনে হয়লাল ও নিশাকর দ্বন্দ্বকে মলাইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং গোবিন্দলালকে মলাইয়াছে, যে কুল কামিনী হইয়া চুরি করিতেও লজ্জা চিত্তা হয় নাই, যাহাকে হয়লালের মত অপদার্থও বলিতে পারিয়াছে—“আমি বাই হই, কুকবাস্তুরারের পুত্র; যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহীণী করিতে পারিব না”—সেই রোহিণী তাহার “বেহমনের উৎকর্ষ ও বর্ণিতার জন্ত ইহাদের প্রজ্ঞা আকর্ষণ করে”। হার রে মোহিতলাল! “অমৃত উত্তেজনা” যে তোমার, কবিস্থানের নয়, তাহা কি লিখিবার সময়ও টের পাও নাই?

* * *

কিন্তু হাজার হটক মোহিতলালের ‘মন’ হইলে, তাহাও ত “মন”—হটক ত আর নয়? তাই তিনি আত্ম-প্রত্যয়ণের কথাটা লক্ষ্যেই ধরিয়া ফেলিয়াছেন এবং সামলাইয়া লইবার জন্ত বলিয়াছেন “আমি .. বন্ধিত-চক্ষের জীবনবাহের যে আদর্শ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতে এক প্রকার বেহবাদেরই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমি এ যুগের লংকারবশে সে যুগের বন্ধিতচক্ষের কাব্যশ্রেণীর ফ্রেডের যৌনত্বের দ্বারা বেধিয়াছি। ইহার উত্তরে প্রথমত (?) ইহাই বলিব যে, বন্ধিতচক্ষের মনে যেমন, তেমনই আমারও মনের কোণে,

কোন ত্বকের বালাই নাই।” অর্থাৎ মোহিতলাল বলিতে চাহিতেছেন—“হে বন্ধিত, তুমি তি একটা, হাম তি একটা। ইহা তোমারও যেমন প্রতিভার পৌরুষ, আমারও তেমন প্রতিভার পৌরুষ, অর্থাৎ ‘ফ্রেডের যৌনত্ব’।” বন্ধিতচক্ষের লহিত এক নিম্নালে মোহিতলালের নাম মোহিত-লাল কর্তৃক উচ্চারণ, ইহার তুলনা বঙ্গ-সাহিত্যে দ্রুত। এই গগনচুম্বিনী স্পর্শের শান্তি যে কি হওয়া উচিত, তাহা আমাদের ধারণার আশ্রিতেই না, পাঠকগণ ‘তাবিরা-চিন্তিয়া’ মোহিতলালের প্রতিভার পৌরুষকে তাহা দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

কিন্তু বিস্তর কাব্য-বাটা হইয়াছে, আর নয়। এইবার মোহিত মাষ্টারের ‘ভরত-বাক্য’ উদ্ধার করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। মোহিতলাল লিখিতেছেন—

“Here in the flesh, within the flesh, behind, swift in the blood and throbbing on the bone,

Here in the flesh, the never yet explored.”—

“বন্ধিতচক্ষের কবিকীবন লক্ষ্যে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই।” অর্থাৎ—বন্ধিতচক্ষের কবিকীবনের চারিভিতে কেবল—“Flesh, Flesh, Flesh!” অতএব আমার কথাটি ফুরাইল,—আর কি বলিবার আছে? উপসংহারে এই ‘Flesh’-এর ছড়াছড়ি দেখিয়া বন্ধিতবর্ণিত জরজরিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সেই কহাকার কনাইয়ের কথা কিন্তু আমাদের মনে পড়িয়া গেল।

ইতিপূর্বে বিকটবর্ণন বর্ণনের হাত হইতেও বেত খসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বেত উঠু করিয়া এই কনাই জরজরিতকে বলিয়াছিল—“কাপড় উত্তার—তোমার গোশত (Flesh) টুকরা টুকরা করকে হাম বোকা নম বেচেলে।” জরজরিত তখন বলিয়াছিলেন—“রাজাজার এই মকের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে লতীপুত্র হইবে সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া কণকালের জন্ত এখন চক্ষু আবৃত করক। ... বাহার মাতা জরজরিত, যে বেস্তার গর্ভে জন্মিয়াছে সে বাহা ইচ্ছা করক, তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাহার মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করি না।” কিন্তু তথাপি এই কনাই জরজরিতের অকল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল এবং বস্ত্রকণ না মহারাজী নন্দার ইচ্ছিতে লক্ষ্যবর্ষক “মার! মার!” শব্দ করিয়া সেই কনাইয়ের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, ততক্ষণ লে ঐ “গোশ”-(Flesh)-এর কথা ভুলে নাই। মোহিতলালের উপসংহার দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হয় সেই কনাইয়ের প্রেতাশ্মাটাই মোহিতলালের ঘাড়ে চাপিয়া তাঁহাকে ঐরূপ প্রবন্ধ এবং তাহার ঐরূপ উপসংহার লিখাইয়াছে।

বঙ্গীয় নাট্যশালার পিণ্ড-পিণ্ডান্ত

‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’ কে লিখিয়াছে?—প্রবাসী-ভৃত্য ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহা ছাপা হইয়াছে কোথায়?—প্রবাসী প্রেসে। ছাপা ও কাগজ প্রভৃতির খরচ জোগাইয়াছে কে?—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। স্মরণ্য কাহার দ্বারা কাটা



GRAM: 'ADINAG'

ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

জন্মিরা কে বলা লুটিল, আর কাহার পেট ভরিল, তাহা পাঠকেরা প্রথমেই বুঝিয়া রাখুন।

এইবারে এই পুস্তকে যে সব উৎকট গবেষণা ও বিকট বিভা-বুদ্ধির পরিচয় আছে, একে একে সেই সব কথাই পাঠকগণের আজ গোচর করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—“যে যে-এছ পড়ে নাই, বাহাতে বাহার বিভা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিভার বিভাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে।”—বঙ্কিম বাবুর এই উক্তি পুস্তক হইলেও এখনও সে উহা কত লভ্য, তাহা এই বহিখানা ডিতে আরম্ভ করিলেই সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। গ্রন্থের আর গোড়াতেই লেখক ম্যাক্কাটা গেজেট’ হইতে এই ইংরেজী জ্ঞাপনটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন—Mr. Macbedeff, respectfully acknowledges the very distinguished patronage, the Ladies and Gentlemen of the Settlement Subscribers to his Second Bengally Play, honoured him with,

begs leave to assure them, he has the most grateful sense of the very liberal support afforded him on this occasion, and intreats they will be pleased to accept his warmest thanks”.—ইহা উদ্ধৃত করিয়াই জনবাবু নিজের এই মন্তব্যটি জাহির করিতেছেন—“দেশের লোকের উৎসাহ ও হৃদয়ের সহিত উহার কোন যোগ ছিল না।” এই মন্তব্যের মধ্যে যে মালী-মুলত মুক্-বরানা মাতে, তাহা অবশ্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ঐ মন্তব্যের সহিত পরি উদ্ধৃত ইংরেজী বিজ্ঞাপনের যোগ-যুক্ত বহি কেহ বুঝিতে বাক, তাহা হইলে

উহার মধ্যে লেখকের কেবল অজ্ঞতা-যোগ বিরূপ হস্তকর বিড়ম্বনায় পরিণত হয়, ব্রজেনবাবু নিজের কালের দ্বারা তাহাই প্রমাণিত ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

‘কোটেগুন’ উদ্ধৃত করিয়া তাহার উপর ধস্ত তাঁহার গবেষণা! এই পুস্তকের আলাদা টিপ্পনী করিতে গেলে যে তাহা ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—“হি নিউ



আভিনয়

শ্রীজ্ঞানচন্দ্রলাক্ষ্মী বিকচাস্মেত
প্রাণান্তি চঞ্চল কথ্যচিত্র

শ্রেষ্ঠাংশ :

রূপবানীতে
আগতপ্রায়

সাধনা বোস প্রতিমা মুখার্জি
অহীন্দ্র চৌধুরী বীরাজ ভট্টাচার্য

এরিয়ান থিয়েটার মর্ক্সপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন—১৮৭৫, ১৮৮৫ আগস্ট তারিখে। এই দিন দুর্গাধাম হাটের ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ নামক গীতিনাট্যের অভিনয় হয়।” কিন্তু বাঙ্গালা নাটকের লামপ্রকাশ খবরও বাহারা রাখে, তাহার জানে যে, ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ যিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম দুর্গাধাম নহে। তাঁহার নাম—উপেন্দ্রনাথ দাস। আর ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ আদৌ গীতিনাট্য নহে। উহা নাটক। এ সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথের ‘ভক্তবৎস’ পণ্ডিত প্রবর দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ তাঁহার ‘সামগ্রিক’ পত্রে বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহারই কিয়ৎংশ পাঠক-সাধারণের অবগতির জ্ঞাত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ‘সামগ্রিক’ লিখিত হইয়াছিল—উপেন্দ্রনাথের ‘শরৎ-সরোজিনী’ বিষয়-সম্বন্ধে সম্বন্ধিক সন্মান-লাভ করিয়াছে। আমরা জানচক্ষু দেখিতে পাইতেছি, ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ ততোধিক সম্মানলাভ করিবে। রমণী কাব্যের আত্মা। আমরা মচরাচর যে সকল বাঙ্গালা নাটক দেখিতে পাই, তাহাতে সে আত্মার সহিত সার সাক্ষাৎ হয় না। ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’তে সেই আত্মার সম্পূর্ণ সত্তা লক্ষিত হইল।... উপেন্দ্রনাথের প্রণীত নাটকের একটি বিশেষ-গুণ এই স্বগ্রন্থে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্যাদি রসের সমাবেশ করিয়া পাঠকগণকে বিগুহ আনন্দমুখে আনন্দিত করা তাঁহার নাটকরচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। তিনি নাটকরচনার অনেকগুলি অভিপ্রায় বিবরের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।”

কিন্তু খোদা লইয়াই বাহাদের কারবার, শাঁলের খবর তাহার দিতে গেলে নাটককে গীতিনাট্য ও গীতিনাট্যকে যে উপজ্ঞান বলিবে, তাহা অবশ্য স্বাভাবিক। তবে পর্কট-প্রমাণ অজ্ঞতা লইয়া এই লেখক বরুণ আকাশ-স্পর্শী স্পর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ‘আবুহোসেনের’ পাগলা গারবেও

দেখা যায় না। উপরি উক্ত দুই চত্রে মধ্য হইতে ‘Himalayan blunder’ করিয়া লেখক পুনরায় এই পুস্তকের ১৯২ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন—অনেকে ভ্রমক্রমে উপেন্দ্রনাথ দাসকে ‘শরৎ-সরোজিনী’ নাটকের গ্রন্থকার বলিয়াছেন।—ইহাকেই বলে পাগলা-ওস্তাদী। সত্যকে মিথ্যা বলিয়া ভ্রম-সংশোধনের এমন ‘নার্কেটি’ক’ গবেষণা ইতিপূর্বে আর কোথাও কেহ দেখিয়াছেন কি?

কেলেকারী আরও অনেক আছে। এক লংখ্যার ‘খেরালী’তে সে সব কথা বলিবার সুযোগ হইবে না। এবারে তাই এই ‘বঙ্গীয় নাট্যশালা’র ইতিহাস’ নামক আবর্জনারূপ হইতে আর একটা বিটকেল ও বিদ্যুটে বচন পাঠকের শুনাইয়া এ প্রসঙ্গ এইখানে শেষ করিতে চাই।

রসরাজ অমৃতলাল একবার বলিয়াছিলেন, —“বঙ্গদেশে নাটক নাগরিক, বাজা তাহার পরম পূজনীয় গ্রন্থ জ্ঞাতি—পূর্বপুরুষ। আমি নাট্যব্যবসায়ী, যাজ্ঞার তর্পণ না করিলে আমার অপরাধ হইবে।” কিন্তু গোবর-গবেষক বেঙ্গনবাসু ভীষণ মুকুটবানান করিয়া এই পুস্তকে বলিয়াছেন—“পুরাতন বাজার সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই।” —বলা বাহুল্য, এই উক্তির সমর্থন-হিসাবে লেখক একটুকু কথা বলেন নাই। এক কথায় করতা মারিয়াছেন। বেঙ্গন বাবুকে যদি কেহ বলেন যে, “আপনি সোনার বেনের বাবুন হইয়া ‘বন্দোপাধ্যায়’ উপাধি ব্যবহার করেন কি হিসাবে? বন্দোপাধ্যায়ের সহিত সোনার বেনের বাবুনের কি কোনও নাড়ীর যোগ আছে?” —তাহা হইলে ভ্রমের বাবু কি উত্তর দিবেন? এতদন্ত নিশ্চয়ই কুলুজী খাটিয়া উহার উত্তর তাঁহাকে বোঁগা-ইতে হইবে। একেজোঁ দেইরূপ বাঙ্গলা

নাটকের সহিত বাজার কোন নাড়ীর যোগ কেন নাই, তাহার কারণ নির্দেশ করা তাঁহার উচিত ছিল। তবে বাজা ও বাঙ্গালা নাটকে তাঁহার নাড়ীজ্ঞান বরুণ টুন্টনে, তাহাতে “বাবু কিঞ্চিৎ ন ভাবতে” বল্লই তাঁহার পক্ষে নিরাপদ। যিনি নাটককে ‘অপেরা’ বলেন, তিনিই বাজা ও বাঙ্গালা নাটকের নাড়ী টিপিতেছেন, ইহা অপেক্ষা শৃঙ্খলার পরিচয় আর কি হইতে পারে? প্রবাহ আছে, ‘হাতে কাজ না থাকিলে খুড়ার গজা-বাজা করে।’ বেঙ্গনবাসু তবু বাজার গজা-বাজা নয় লেই মদে ‘বঙ্গীয় নাট্যশালা’রও গজা-বাজা করিয়াছেন।

বন্ধিমিয়ানা বনাম হাংলাপনা

দেখিতেছি ঐযৎ ধরিয়াছে। গতপূর্ব সপ্তাহের ‘খেরালী’ বাহির হইবার পরে শনির দুর্গামার্ক যে কাগজখানা বাহির হইয়াছে, তাহাতে ইহার পরিচয় আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই শনির স্বকারেরা কামড়াইবার ও আঁচড়াইবার চেষ্টার করিতেছে। তবে শ্রাবণমাগ, সমুদ্রে এখনও তাস্ত ও আখিন থাকি! সাধু পঞ্চাঙ্গীরেব একটু সাবধানে থাকা ভাল।

ইহাদের “বন্ধিমিয়ানা” নামক কালির আঁচড়কে কেহই অবশ্য “লেখা”-র সম্মান দিতে রাজী হইবেন না, তাহা জানি। এই কালির আঁচড়ের তিতর দিরা যে উৎকট হাংলাপনা উঁকি মারিতেছে, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। তবে আমরা ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত ভ্রামাশ্রমায় যুথোপাধ্যায় মহাশয়কে একটা অনুরোধ করিতে পারি: বিশ্ববিদ্যালয়ের—ছাপাখানা বিভাগে একটা প্রকৃতিভার বা কালি-মাখাইবার লোকের চাকরী কি ইহাদের

জন্মে তিনি খালি করিতে পারেন না? তাঁহার পছন্দেই করিবার জন্য ইহার। বৈশ্ববিদ্যালয়ের রাজা "রাগাক" না হউন "বহুভাষী" হইতে পারেন না কি? আমরা অনিশ্চয়, উপরোক্ত দুইটা চাকরী করিবার যোগ্যতা ইহার। বহুভাষী—নাথানার অর্জন করিয়াছে এবং এই দুইটা চাকরী ধরয়াং করিলে "রাজা"কে কখনই তাহার জন্য "পরে অনুতাপ" করিতে হইবে না।

ইহার। যে কতখানি "উচ্চশ্রেণী"র অপকৃষ্ট জীব তাহা তাহাদের কালির আচড়ের সামান্য করেকটি নমুনা হইতে পাঠক বৃত্তিতে পরিবেশন। নমুনা করেকটি এইরূপ:—

(ক) "মহাকবি" গিরিশচন্দ্র ঘোষ জীবনে উদারচরিত্র "বাইডিয়ান" লোক ছিলেন।

(খ) গিরিশচন্দ্রের বধন দানীবাণু আপত্তি করেন নাই, আমরাও নীরব থাকিতে বাধ্য।

(গ) "লেক্সপীর চাচা"-র বচন-অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "fortune-এর লোভে" "বহিষ পরিচয়" প্রকাশ করিয়াছেন।

(ঘ) বহিষের "বয়ংলংগ্রে" বহিষ-পরিচয়ের সম্পাদক "নলকূপমাত্র বলাইরাছেন, পুকুর কাটেন নাই।"

(ঙ) কবিরাজ অমরেন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্র-নাথের "অগ্নি ভুবন মনোমোহিনী" (১) গানের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে "রবীন্দ্রনাথ পারতমাতাকে কুলটা বলিয়াছেন।"

যাহারা স্বর্গগত মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শুণ্য কবিত্ব লব্ধকে নয়, চরিত্র লব্ধকেও কটাক্ষ করিয়া থাকে, তাহাদের রুচি লব্ধকে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। বহিষের শতভঙ্গ জন্মোৎসব উপলক্ষে যাহারা বহিষকে অবলম্বন করিয়া "পুকুর কাটিবার" বড়াই করিতেছে তাহারা বহিষের বয়ং

লংগ্রে" বলিয়া নানা কুজিত করিয়া বহিষকেও কটাক্ষ করিতে ছাড়ে নাই। অবশ্য এমন জীব অনেক আছে, যাহারা প্রয়োজন হইলে বাপ-কেও বাপান্ত করিতে পারে। ইতিপূর্বে "বহুভাষী" বহিষ নাহিত্য বৈশ্ববিদ্যালয়ে সম্পাদন করিয়াছেন, ইহার।ও তাহাই করিতেছে। কিন্তু ইহার। হয় ত বলিবে—"আমরাই পুকুর কাটিবার একমাত্র উপযুক্ত জীব, 'বহুভাষী' ডোবা কাটিয়াছে মাত্র।" দানী-বাণুর পুত্র "খোকাবাণু" এখনও বাচিয়া আছেন, অতএব "গিরিশচন্দ্রের বধন দানী-বাণু আপত্তি করেন নাই এবং দানীবাণুর পুত্র খোকাবাণু আপত্তি করেন নাই, তখন আমরাও নীরব থাকিতে বাধ্য"—ইহা লিখিলেই analogyটা ঠিক লাগলই হইত এবং বৃত্তির এই অলপী-লামজ্ঞে আশ্রয় হইয়া কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। লেক্সপীররকে "চাচা" বলিয়া ইহার। সুগোমার্ক কাগজের মধ্যাধা বজায় রাখিয়াছে বটে, তবে সম্পর্কের মাত্রাটা একটু কম হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় "বহিষ-লত-

বার্ষিকীর flood-এর বুথেই tideকে" ধরিয়া "fortune"-এর লোভে কাজটা করুন আর নাই করুন, ইহার। যে tideকে চারিহাতে লাপ্টাইয়া ধরিয়াছে, তাহাকে আর লব্ধে কি, নতুবা প্রিন্টার ও টাইপিষ্ট বহিষ-নাহিত্যের লং-পাছ লাঙ্গল কেমন করিয়া? আমরা জানি এবং নাহিত্যিকমাজেই জানেন অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় "অগ্নি ভুবন-মনোমোহিনী"-র ঐরূপ অপব্যাখ্যা—করেন নাই। পরশ্রীকান্তরত্ন—অন্ধ হইয়া অনেক ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারও এতখানি বিখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না।

ঋতু বঙ্গ ৬৭ মাস যে কারণেই হউক ভৈরবী বনোমিধিতে অব্যর্থ ফল—গর্ভাবস্থায় ব্যবহার নিষিদ্ধ ১৪০ দস্ত ও বর্ণ শাস্তি একবার প্রয়োগেই উপশম, ১০ মাং ১০ আনা।



সময় ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস বনজ বিশ্বানন্দ
১৮২ নং বহুভাষার স্ট্রীট, (K) কলিকাতা।

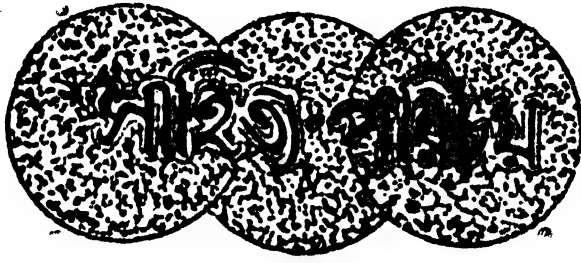
ফোন ২৭৭৬ বড় বাজার

কাঠের জাট কাঠের ঘানি

কাঠের জাটের খাঁচী সরিষার তৈল

ভারতের মিলেই প্রস্তুত হয় অন্যত্র হয় না।

২৪৩. আপার সারকুলার রোড, কলিঃ



গান

কুমারী লাক্ষণ্য মজুমদার

দেবতা হে! আমি হবনাক আর
পথদ্বারা।

অন্তপারে ডুবলে সোনার রবি
লাক্ষ্যারণী আলবে যখন নানি,
দূর গগনে জলবে গো তোমার
—নয়ন তারা।

আলবে যখন ঘোর অমানিশা
উদ্বিগ্নে নভে তোমার দ্বিধা শিখা,
জলধ জালে আঁধার হলে ধরা
ঝরবে ধারা।

প্রিয়! কাজ কি আমার চেনা পথে
যে পথেই বাই মিলব তব লাগে,
তোমার আমার পরিচয়ের এই তো
চিরধারা।

অবকাশ পায়। ছদ্ম থেকেই দেখ—
নারীর আধিক নির্ভরতার পরিবর্তে পুরুষের
লালসা তৃপ্ত করাই একমাত্র কার্য।”

সমালোচনার শেষে প্রসিদ্ধ লেখক কেশব
বাহুর ভূমিকার লিখিত শেষ লাইনটি
পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—

“দেশের শিক্ষিত সমাজের তাবধারাকে
পুষ্ট করবে এই উপস্থান—এ আমার
বিশ্বাস।”

অভিধান—লেখক শ্রীযুক্ত পঞ্চকুমার
মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি-এল। খ্যাতনামা
কেশব গুপ্ত কর্তৃক ভূমিকা লিখিত পুস্তক-
খানি ১০৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য
৮০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ-গুপ্ত এণ্ড
কোং রদারোড, ভবানীপুর। ১৯৩৮ সন।

পুস্তকখানি বহিঃ উপস্থান আকারে লিখিত
হইয়াছে মূলতঃ এখানিকে অপরাধ-তত্ত্বের
আভাসমাত্র বসিলে অত্যুক্তি হবে না।
সমাজে যেখানে যে কারণে পাপের ও
অজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে
তাঁহার বিপক্ষে এরকম নিপুণ তুলিতে
“অভিধান” বাহন করা উক্ত লেখকেরই
সহজ-সাধ্য হইয়াছে। পাজীবী ড্রাইভারদের
অত্যাচারের কথা ইতিপূর্বে গোখাও লিপি-
বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না।
কলিকাতার দৃষ্ট বিংশ-শতাব্দীর মাঝখানে
যে কি রকম তাহা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত
হইয়াছে। মেডিকেল কলেজের দৃষ্ট,
কলিকাতার বড় বড় রাস্তার দৃষ্ট, আউট্রাম
ঘাটের দৃষ্ট, নগরের শ্রেষ্ঠ হোটেলের কথা
প্রকৃতি ভবিষ্যতে ইতিহাসের কার্য্য করিবে।

দারিদ্র্য ও ব্যক্তিত্বভাব, অপরাধী ও
তাঁহার প্রতি সমাজের লোকের কি রকম
বিবর্তিত বাহাতে পুনঃ সমাজিকরণ অনন্তব,
সমাজবহির্ভূক্ত শ্রেণীর প্রতি সমাজের বিরূপ
ব্যবহার প্রকৃতি অতি কঠিন বিষয় চরিত্রের
মধ্যে দ্বিরা লেখক বেরকম ফুটাইয়া
তুলিয়াছেন, যেন হয় আধুনিক নভেলের
মধ্যে এরকম শ্রেণীর এই খুঁই বিরল।

রেবা চারত্র আঁকিতে গিয়া লেখক
যখন বিবাহ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা
করিয়াছেন তখন তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট
প্রকাশিত হইয়াছে। একটা লাইনে—
“বেধ আঘাতের মতো শিক আর পাশি-
দের মধ্যে বেড়া ব’লে কিছু নেই।
বহি এদের মধ্যে লম্বা হয়, তা’ হ’লে
বাক্সলার বকে কেন কালিমা থাকে।
তোমরা একটা কিছু চেষ্টা করতে পার না।”
আর এক যারগার লেখক গণিকাবৃত্তি যে
পুরুষের সৃষ্টি এবং নারীকে বলিহারা
নিজের খোরাকের ব্যবস্থা তাঁহারই আভাস
দ্বিরাছেন। রেবা বলিতেছে “বাঁদা, বিবাহ
যে মানবের মজলের জন্তে হ’য়েছে কি
স্বার্থ-লিঙ্গের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিচ্ছে সে
বিষয়ে সন্দেহ আছে। বল তো বিবাহের
মজা আর গণিকাবৃত্তির মজা পার্থক্য
কোথায়? গণিকাবৃত্তি দ্বারা জীলোকে বেহ
বিক্রয় ক’রে দেহাভীত লামগ্রী পেরে
থাকে পুরুষের কাছে। আর নারী যখন
উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় ঠিক সেই রকম
একজন পুরুষের মনোমামনা পূর্ণ কোরে,
পরিবর্তে খোরাক-পোষাক আরও না হয়
গাড়ী ঘোড়া, ঘোঁঠর ইত্যাদি ভোগ করার

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আন্ততাব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

খেয়ালী চিত্রপট



মহিমহন থিয়েটারসের “বেকার মেশিন”
চিত্রে সুনীল রায় ও রাণিবালা। ছবিখানি
১৩ই আগষ্ট উদ্ভার প্রথম মুক্তিলাভ করিবে

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[কোন—সাউথ ৪৬৬]



অষ্টম বর্ষ { রহস্পতিবার, ২৬শে শ্রাবণ ১৩৪৫. ১১ই আগষ্ট ১৯৩৮ } দ্বাত্রিংশ সংখ্যা

মন্ত্রী-মণ্ডলীর মুখরক্ষা

শেতাঙ্গদলের অমুগ্রহে বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কজলুল হক সাহেবের মুখরক্ষা হইয়াছে। অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপরিষদে তাঁহাদের ভারতীয় সমর্থকদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং শেতাঙ্গদল রূপা না করিলে তাঁহাদের মান রক্ষা হইত না। ক্লাইভপীটের বড়কর্তাদের নায়ক বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন তাহাতে কি ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল তাঁহাদেরও বিশ্বাস হারাইয়াছেন, তবে কোন অপ্রকাশ্য কারণ বশতঃ তাঁহারা বর্তমানে মন্ত্রীমণ্ডলকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীমুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করেন তাহা গুরুতর এবং তাঁহার মতে স্বরাষ্ট্রসচিব আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ পরিচালনায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

“ইসলাম বিপ্লবের” ধূমা তুলিয়া বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল দেখে যে সাম্প্রদায়িক বিবেচ বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে দেশের মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাঝেই

চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। গত বুধবার অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার পর কলিকাতার মত সুরক্ষিত গহরে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা “ইসলাম-বিপ্লবের” ধূমার পরিণতি।

সিন্ধু প্রদেশ হইতে সমাগত সভ্য সিদ্দিকি সাহেবকে কংগ্রেসদলের নামে যে অপবাদ রটনা করিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেসদলে কোন দিন সে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না। শরৎচন্দ্র অতীতে কোন এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেন যে যতদিন তিনি কংগ্রেসদলের অধিনায়ক করিবেন ততদিন Bait, bluff briberyর প্রশ্রয় দিবেন না। সিদ্দিকি সাহেবের ক্ষমা প্রার্থনায় ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে শরৎচন্দ্রের অধিনায়কত্বে কংগ্রেসদল দুর্নীতি-অবলম্বন করে নাই।

হক্-মন্ত্রী-মণ্ডলীর স্বজন-প্রীতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পঁচিশটি অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। মিঃ হক ও অজ্ঞাত মন্ত্রীগণ কিভাবে স্বজনপ্রীতির বশবর্তী হইয়া তাঁহাদের আত্মীয়-

স্বজনকে চাকুরী দিয়াছেন তাহা সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ গ্রিকিথস্ ও মন্ত্রী-সভার অক্ষমতার বিশ্লেষণ করিয়া বিপক্ষে ভোট দেন। উপরি উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল ভারতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন।

জনসাম্প্রদায়ের দুর্দশা লাঘব মানসে কংগ্রেসীদের আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে কার্য্যসূচির উল্লেখ করেন তাহা প্রশিধানযোগ্য। শরৎচন্দ্র স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে

১০ম ও শেষ সপ্তাহ

নিউ থিয়েটারসের মন্বক্ষণী
সমাজ-চিত্র

অভিজ্ঞান

ভৎসহ মন্দার ফিল্মসের বাঙলা
কার্টুন-চিত্র

‘আকাশ পাতাল’

বহুস্পতিবার ১৮ই আগষ্ট জন্মাষ্টমী উপলক্ষে
সমস্ত রাজিব্যাপী চিত্রোৎসব

১। মুক্তি ২। বিজয়া ৩। অর্ঘ্য
৪। প্রভাস-মিলন ৫। মন্দ কি
৬। কেমন জ্বল

প্রবেশ মূল্য দ্বিগুণ

আগামী শনিবার ২০শে আগষ্ট হইতে ‘অভিজ্ঞান’ N. I. P.

ক
প
বা
নী

কোন
বি, বি,
৩৪১৩

কংগ্রেসদল মন্ত্রী-লোভী নহে। বাহা হউক শরৎচন্দ্র কজলুল হক সাহেব সম্বন্ধে যে সরল ও আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। “মিঃ কজলুল হকের দুঃখের দিনে আমি তাঁহার সাথী ছিলাম—কিন্তু তাঁহার সুখের দিনে তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু আমি তাঁহাকে নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহার উপরে আগেও যে আস্থা ছিল এখনও তাহাই আছে, একটুও পরিবর্তন হয় নাই।” হক সাহেব কি এখনও সেই স্মৃতি-বিজড়িত সৌহার্দ্য কিরাইয়া আনিতে পারেন না? শরৎচন্দ্রের এই আবেগপূর্ণ আবেদন তিনি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন কি?

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড, ফোন : ৩৪

১৩ই আগষ্ট শনিবার হইতে

৩য় সপ্তাহে পড়িল ?

নিউ থিয়েটারসের সর্বজন প্রাশংসিত চিত্র-কথা

বিদ্যাপতি

ভূমিকায় : কানন দেবী, পাহাড়ী সান্যাল,
ছায়া দেবী, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, অমর মাল্লিক।

লাকি ওয়াচ এণ্ড কোং

আমরা সুলভে উচ্চশ্রেণীর বড়ি নির্মাণ
এবং বিক্রয় করিয়া থাকি।

পত্রীক্ষা প্রার্থনাকর।

১১৭ আন্তোয় মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিঃ।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে ফরাসীর পার্ট

যুদ্ধ সম্বন্ধে ফরাসীর জনমত

সচী শীল

ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী লন্ড্রি প্যারিস visit করতে গিয়েছিলেন। এর পেছনে গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এপ্রিল মাসের Anglo-French Talks-এর ফলে যে Agreement হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর Royal Seal দেওয়া। খুব বিরাট রকমের অভ্যর্থনা হয়েছিল এই রাজ-অতিথিদের, কিন্তু এই অভ্যর্থনার পেছনে ফ্রান্সের ভিত্তি আঁকাজা ছিল যে Europe-য়ে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডকে ফ্রান্স বেন লক্ষ্যে নিকট বন্ধুরূপে পায়। এই বন্ধুত্ব বজায় রাখবার আকুল প্ৰয়াসই অভ্যর্থনার মধ্যে প্রাণস্ফূর্ত করেছিল।

বাস্তবিকই লণ্ডনের কুশাস্তি পাবার জন্ত ফ্রান্সের ব্যাকুলতার সীমা নেই। M. Bonnett যখন যে মাসে জেনেভায়, তখন কোথা থেকে—from nowhere? খবর এল যে জার্মান বাহিনী ২১শে মে তারিখে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করবে। বনেট সাহেব ত ভেবেই অস্থির। কী করা যায়? তখন স্পেনের লম্ভা মাথার ওপর ঝুলছিল, এবং চেয়ারলেন দৃঢ় লঙ্ঘন করেছিল যে স্পেনের ব্যাপারে ফ্রান্সকে free hand গোছের কোন কিছু ছিলে চলবে না। তিনি নাকি ভেবেছিলেন এতে বুদোনিনীকে ভয়ানক চটান হবে। বুদোনিনী ত এক কথা—Gen. Franco must win. কাজেই চেয়ারলেন সাহেব করানী পররাষ্ট্র নতিবকে লঙ্ঘনই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ফ্রান্সকে British plan-এ মত দিতেই হবে, না হলে বুদোনিনীকে হাতে রাখা অসম্ভব হবে। চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য করতে গেলে

বুটেনকে হাতে রাখতেই হবে, এবং বুদোনিনী অন্ততঃ যাতে Neutral থাকেন সে ব্যবস্থা করতে হবে—এইটাই ছিল তখন বনেট সাহেবের main concern তাই ফ্রান্স যখন স্পেন লঙ্ঘন League Council-এর British sponsored decision-এ মত দিল, তাতে ফ্রান্স গভর্নমেন্টের ওপর Left Press-এর attack না হয়, সেই জন্ত বনেট সাহেব করজোড়ে ৩৪ জন influential Pressmen-কে আহ্বান করে বলেছিলেন—এত বড় বিপদ সামনে; এখন ব্রিটনকে হাতে রাখবার জন্ত স্পেনের ব্যাপারে London-Paris accord বজায় রাখা দরকার।

Franco-Czech military Pact অনুযায়ী যদি সত্যি ফ্রান্সকে যুদ্ধে নামবার দরকার হয়, তাহলে ভেবে দেখতে হবে ফ্রান্স নিজেকে এই যুদ্ধের জন্ত কতটা প্রস্তুত। মার্চ মাসে অবশ্য প্যারিস লণ্ডনের পরামর্শ না নিয়েই চেকের pledge of military support দিয়েছিল, কিন্তু তা থেকে ঠিক বোঝা যায় না সাহায্যের ব্যাপারে ফ্রান্সের লঙ্ঘন কতটা অটুট আছে। কারণ ২১/২২শে মে তারিখে যখন বিপদ ঘনিয়ে এনেছিল, তখন ফ্রান্স টু শব্দটিও করেনি, pledge repeat করার কোন আশ্রয়ই দেখানি। এইটাই হয়েছিল Anglo-French Agreement-এর ফল। ফ্রান্স ভেতরে কতটা Sound? সব ফরাসীরা কি Democracyকে বাঁচাতে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত? না, গভূরুদের কথা স্মরণ করে এখনও যুদ্ধটাকে লবাই তর থাকে? এইটাই এখন আল দ্বন্দ্ব। এর

উত্তর পাওয়া যায় Madame Genevieve Tabouis প্রণীত "Blackmail or War" বইখানা থেকে। Introductory Remarks-এ Madame Tabouis বলেছেন: "In France war is not feared, but hated. Public opinion takes the point of view that war, which may perhaps be inevitable, would involve the utter ruin of our civilisation. Hence what must be done at any cost is to gain time by favouring every possible concession. At all events, before taking the fatal step which would result in a ghastly conflict, the Government must convince the French people that every attempt had been made to avoid war. If, however, war should come there is not a Frenchman, whatever his political party may be, who would oppose a government which had made every effort to ward off the catastrophe. Once again the nation would rise as one man to defend French territory and French freedom."

এই কথাগুলো থেকে বেশ বোঝা যায় ফ্রান্স গভর্নমেন্টের এখন ঘরোয়া লম্ভাটী কি। "Every attempt had been made to avoid war"—এইটা বোঝাতে হবে ফরাসীদের, নাহলে দরত ঘরে গুল-গোল বাধবে। "Favouring every possible concession"—এইটাই বত কতি করছে এবং লম্ভাটাকে আরও ঘনিয়ে তুলছে। এইটা কি বোঝা দরকার নয় যে এই Concession-এর ফলে ফ্রান্সের অবস্থা কাহিল হয়ে যেতে পারে? বিরুদ্ধ পক্ষ ফ্রান্সের এই weak spot-টা ধরে কেলেছে এবং সেই-টাকেই জোর exploit করছে। Black-mail করে, Bluff করে হিটলার-

মুদোনিনী নিজেদের জন্ম concession
আদায় করছে এবং এই ভাবে Fascism-
এর Strategic position consolidate
করছে। এই থেকে ভীষণ বিপদ হবে এই
বে, লতাই বৃদ্ধ বখন বাধবে—যা নাকি
"inevitable"—তখন ক্যানিষ্টের হারাবার
Strategic advantage টুকু ইংরেজ-
করালী পাবে না। এই বিপদের উল্লেখ
করে Madame Tabouis বলেছেন—

"Of-course, Italy and Germany
are bluffing. The danger is,
however, that sooner or later the
successes scored by Rome and
Berlin as a result of their black-
mailing methods will encourage
one or other of the dictators to
gamble for the mastery of Europe
by means of a stupendous war
which, incidentally, would save
him from his serious internal
troubles."

Political foresight বহি থাকে
তাহলে ফ্রান্সের আর মোটেই উচিত নয়
policy of concession চালান। এর
ফলে ইতিমধ্যে অবস্থা অনেক খারাপ হয়েছে।
এখনও কিন্তু সময় আছে। স্পেনের Re-
publican Government এখনও বেঁচে
রয়েছে; বহিও Pyrenees border-এর
খানিকটা Franco সাহেব অধিকার করে
নিয়েছে। এখনও সময় রয়েছে চেকোস্লো-
ভাকিয়াকে বাঁচাবার। Isolated হয়ে গেলে
capitulate করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়,
তাল Czech Army থাকলে কি হবে!
রাশিয়া একলা কখনো চেকদের সাহায্যে
আগবে না; পথে অনেক বাধা। বৃদ্ধ
বেকালে বাধবেই, তখন বৃদ্ধের জন্ম প্রস্তুত
হয়ে ক্যানিষ্টের চোখ রাঙান দরকার।
তাতে ফল খুব ভালই হবে। চেকদের
Betrayal-এর আর একটা stage—Run-



(বিলাসী)

দেশের মাটি

দেশের মাটি চিত্রটি এখন মুক্তি
প্রতিকার। আমরা বতরু জানি তাতে
মনে হয় যে নিউ থিয়েটারের এই নব
নির্মিত ছবিখানি ভারতবর্ষের চিত্ররাজ্যে
এক অপূর্ণ সম্পদ হয়ে থাকবে।

আমরা এই ছবির 'ট্রেনার' পূর্ণ থিয়েটারে
দেখছি। ট্রেনার থেকে আমরা তিনটে
জিনিষ লক্ষ্যে একটা লক্ষ্য ধারণা করতে
পেরেছি। তার প্রথমটি হচ্ছে এ ছবির
শব্দ বস্তুর কাজ। এত নিখুঁত শব্দ গ্রহণ
কোন বাঙলা ছবির ভাগ্যে বোধ হয় আজ
পর্যন্ত হয়ে উঠেনি। দ্বিতীয় হচ্ছে এর
অপূর্ণ চিত্র-শিল্পের কাজ। আর তৃতীয়টি
হচ্ছে এর লজ্জাত্মক। বাস্তবিক উন্নয়ন মুখে
পঙ্কজ বাবুর সুর বেওয়া যে গান আমরা
শুনলাম তা ভোলবার নয়। যন্ত্র পঙ্কজ
বাবু। তোমার অপূর্ণ লজ্জিত মুচ্ছনার আবার
হয়ত তুমি 'মুক্তি'র মতই বাঙলা দেশের
আবাল-বৃদ্ধ বিনিতা লকলকেই তানিয়ে নিয়ে
যাবে।

গত মঙ্গলবার 'দেশের মাটির হিন্দি
লঙ্ঘরণ 'ধরতীমাতা'র সাতখানি কপি
oiman Mission. চেয়ারলেন যা খুদী
তাই আরম্ভ করেছে। গোপনে Anglo-
German Air-Pact করবার মতলবও
হয়েছে। করাসীরা কি চোখ বুজে এই
সব দেখে বাবে?

ভারতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সেন্সারে পাঠান
হয়েছে। বোম্বাইয়ের কপিটা নিয়ে স্বয়ং
লম্পাদক সুবোধ মিত্র মশাই নিজেই বি
এন, আরএর বহু ঘেইলএ রওনা হয়েছেন
আশা করা যাচ্ছে লামনের শনিবার থেবে
এ ছবিগুলি মুক্তিলাভ করবে।

বাঙলা লঙ্ঘণী আশা করা যাচ্ছে
আগছে ১৭ই সেপ্টেম্বর 'চিত্রার' মুক্তিলাভ
করবে।

অধিকার

এ ছবির উত্তর লঙ্ঘণী শেব হয়ে পড়ে
আছে। এ ছবিখানি ঠিক দেশের মাটি
পরেই 'চিত্রার' মুক্তিলাভ করবে।

ছবিখানি মাত্র চার মাসের মধ্যে
শেব করে পরিচালক মশাই তাঁর প্রাইভেট
লেক্রেটারী মিস্ য়ুনা গুপ্তাকে সঙ্গে নিয়ে
বিদেশে রওনা হয়ে গেছেন। বিদেশে নানা
তারা অনেক টুডিও ঘুরবেন ও অনেকে
শিক্ষা করবেন।

বড়ুয়া সাহেব এই ছবি বে অল্প সময়ে
মধ্যে শেব করেছেন তাতে লকলেই তা
ধস্ত ধস্ত করছে। speed লক্ষ্যে লতাই এ
পরিচালকের লক্ষ্য কেউ নেই। কি
এই speed কে maintain করার জে
যারা দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে
কিছুই ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের কথা কে
ভাবে না। আমরা ছটা লোকের কথা জানি
একজন হচ্ছে বন্ধুর ছাড়া যার অমায়িক
ব্যবহার ও অক্লান্ত পরিশ্রম লকলকেই শুভি



শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
প্রগতি চঞ্চল কথা-চিত্র

অভিনয়

—শ্রেষ্ঠাংশ—

সাধনা বোস, প্রতিমা মুখার্জী
অহিন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য

*

রূপবানীতে
আগতপ্রাঙ্গ

N. I. P.

মোটোপলিটান পিকচার্সের
সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ্য

= থনা =

ছায়া দেবীর...
অভিনয় নৈপুণ্যের বিজয় বৈজয়ন্তী
থনা

আপনার আনন্দ বর্ধন করিবে:
নাম ভূমিকায়: ছায়া দেবী
এক এ চার-চারে এক

প্রথম পীড়িতা
রাজকন্যা
থনা

থনা রূপে

মিহির পদ্মী
অভিমানিনী
থনা



গৃহলক্ষ্মী
পুত্রবধু
থনা

ছায়া দেবী

অসামান্য
বিদূষী নারী
থনা

পরিচালক:

ঐযত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-পরিবেশক—

কপুরটান্ড লিমিটেড

প্যারাদাইস বিল্ডিং, কলিকাতা

E. P. S.

করে দিয়েছে। আর একজন হচ্ছে শিল্পী তারক বসু। এর কথা না বলাই ভাল। ইনি হচ্ছেন নীরব কর্মী। বিন নেই রাত নেই, রুটি নেই কেবল লেটাই তৈরি করে চলেছেন। Modern sets এর পরিবর্তন হয় বটে কিন্তু তাকে বাস্তবে পরিণত করতে কত যে পরিশ্রম করতে হয় তা হয়ত' লকলেই বোঝে না। আমরা জানি একদিনের কথা। সেদিনের হচ্ছে বোলবাত্তা। সারা টুডিওর কর্মীরা শুধু কর্মীরা কেন সারা বাঙলা দেশের লোকেরা ফাগের 'রঙে' মত্ত তখন এই শিল্পী তাঁর boss ছোটাইবাবু লঙ্গে টুডিওর ফ্রোয়ে নিজের তুলি নিয়ে রুখ। অথচ একে কেউ চেনে না, জানে না। ঠিক যেন 'কাব্যের উপক্ৰিতা।'

ভিন্নমস্তক

নিউ থিয়েটারের নন্দীত পরিচালক শ্রীযুক্ত ভিন্নমস্তক ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি হ'মালের ছুটি নিয়ে সি, এ, পিতে যোগ দিয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে কোলকাতার সি, এ, পি সম্প্রদায়ের যে অভিনয় ও নৃত্যগীতা হ'ল তাতে তিনি অক্রেটোর তার নিয়ে ছিলেন। এ ছাড়াও ঐ সম্প্রদায় শিল্পী বাঙলা দেশে ও ভারতবর্ষের কয়েকটা বিশিষ্ট মহলে এদের নৃত্যাত্মক দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। ভিন্নমস্তকও নন্দীত পরিচালক হিসাবে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে থাকবেন। আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

দেবকী বসু

পরিচালক দেবকীবাবু তাঁর "বিষের বাঁশীর" কাজ নিয়ে অনেক এগিয়ে চলেছেন। রোজই কুনঘর ষ্টিডিওতে তিনি তাঁর কাজ করে চলেছেন। এই ছবির নন্দীত পরিচালক রাইবাবু ও ছবির নায়িকা কাননবালা 'স্ট্রীট লীকার' বই থেকে একটু হুক্তি পেলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

লাগুতে নন্দীর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের কাছে নায়িকা কানন বাহুল্য হয়েছিল ঠিক

পুরুষ বাহুল্যের মত। কারণ তাহের বলে মেয়ের স্থান ছিল না।

ত্রীলোককে পুরুষের মত হ'তে হ'বে এই হয়েছে কাননএর ভাবনা। তাই কানন উপস্থিত তার কর্মরত দিনের মধ্যেও ঐ প্রকার বেশভূষা ও চালচলনের অভ্যাস নিয়ে মেতে রয়েছে। শ্রীমতীকে এই নবরূপে দেখবার আশায় আমরা উপস্থিত চুপ করে রইলাম।

স্ট্রীট সিগার

টুডিওর বাহিরে একটি বিরাট বস্তীর শেট গড়ে তোলা হয়েছে। এই বস্তীতেই একদিন ছিল ভুলুয়ার বাড়ী। পথের আশ্রয়-কুড়ের আবর্জনার মত এখানকার লোকেরা, কোন এক অভ্যাচারী দানব এদের গলা টিপে ধরে রেখেছে। জন্মাচ্ছে, মরছে, পচছে আর দু'নিয়া বিবাক্ত করে তুলছে। এই ক্রমবর্ধমান জঘন্য আবাসস্থলের আবেষ্টনের মধ্যে ভুলুয়ার কেটেছে একদিন নয় অনেকদিন। জীবনের অনেকগুলো পাতা এখানকার সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথায় পূর্ণ। নেই ভুলুয়া, মজুর ভুলুয়া জীবনের আর এক অধ্যায়ে একদিন এলো ফিরে বস্তীতে। কেন এলো কি কারণে এলো কে বলবে! তার গত জীবনের চলে যাওয়া বিনশুলো সুখের? না আজ যাকে তুমি বলো সুখের, তাই তার সুখের আলন? শিল্পী ভুলুয়া লাধক ভুলুয়ার কাছে কোনটা সোনার সিংহাসন বলতে পারো?

বস্তীর মধ্যে অভিনয় করলেন সায়গল বিনয় গোবামী, হনী খাঁ, পূর্ণিমা প্রভৃতি। অপরূপ গান এরা গেয়েছেন।

কৃতি পরিচালক কণি মজুমদার ও প্রোডাকশন্ চিক প্রমোদ রায় বাতে ছবি-খানি এ মাসে শেখ হয় তার চেষ্টা করছেন।

হাজরা পিকচার্স

৪৮নং ব্যারাকপুর ট্রাক রোডে একটি সুরক্ষণ সুরক্ষণ বগানবাড়ীতে হাজরা পিকচার্স

লিটিটেডের ষ্টিডিও নির্মাণ কার্য্য ক্রমগতিতে অগ্রগত হইতেছে। বাহাতে পূজার পূর্বেই ছবির শ্বুটিং আরম্ভ করিয়া বড়দিনের সময় দেখান যার তাহার জন্ত তিনকড়ি চক্রবর্তী এবং প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক কর্মীরা বিশেষ ব্যস্ত আছেন। এই নবগঠিত ষ্টিডিওর বাহারা যোগদান করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

প্রধান যন্ত্র-শিল্পী : মধু শীল, আলোক চিত্র-শিল্পী : বিভূতি লাহা, শব্দ-যন্ত্রী : বতীন দত্ত, রসায়নাগারায়ক : কৃষ্ণকঙ্কর মুখার্জি, চিত্র-সম্পাদক : বৈষ্ণবনাথ ব্যানার্জি, স্থির চিত্র-শিল্পী : সুবোধ দত্ত, আলোক সম্পাদক : সুরেন চ্যাটার্জি, প্রচার-শিল্পী ও সহকারী পরিচালক : বিশ্বাবহু রায় চৌধুরী, সহকারী পরিচালক : কালিপ্রসন্ন রায়, শব্দ-যন্ত্রী : বিমল চাকলাদার, চিত্র-শিল্পী : মণ্টু পাল

এই প্রসঙ্গে এই কথা এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে আলোক-চিত্র, রসায়নাগার ও শব্দ-যন্ত্র বিভাগ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত গঠিত হইতেছে এবং এই ষ্টিডিওর শব্দগ্রহণ করা হইবে নতুন মডেলের ব্রিটিশ একাউষ্টিক শেটে। তিনকড়িবাবুর এই নতুন উদ্যম বাহাতে লাফল্যমণ্ডিত হইয়া বাঙলা ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি লাভিত হয় আমরা সেই কামনা করি।

বেকার নাশন

আগামী শনিবার (১০ই আগষ্ট) থেকে 'উত্তরা'-র রাধা ফিল্মের পরিচালনার তোলা মতিমহল থিয়েটারের ঘটনাবলি হস্ত-রসায়ক চিত্র-কাহিনী 'বেকার নাশন' হুক্তি লাভ করবে। অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়ের জনপ্রিয় নাটক অবলম্বন করে 'বেকার নাশন'-এর চিত্র-গাথা লেখা হয়েছে। ছবিখানির পরিচালনা করেছেন প্রমোদ-শিল্পী শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।...বর্তমান ছবিখানির গল্পের সুরের সঙ্গে 'মানসী'র

অনেক মিল আছে। আলোক-চিত্র-শিল্পী শ্রীযতীন দাশের আলোক-চিত্র-গ্রহণ, শ্রীমুপেন পাল এবং ভূপেন ঘোষের শব্দ-গ্রহণ এবং রাণীবালা, দেববালা, ছায়া, নরেশ মিত্র জহর গাঙ্গুলী, জুলীল রায় (এঃ), মুণাল ঘোষ, মম্বথ পাল (ইঁছবাবু), তুলসী চক্রবর্তী, কুমার মিত্র, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির মত নট-নটীর অভিনয় যে কাহিনীর চরিত্রগুলির রূপে-রূপে প্রাণ-বস্ত ক'রে তোলবার যে চেষ্টা করেছেন তাহা আশা করি লক্ষ্যকই হবে।

প্রফুল্ল রায়

পরিচালক প্রফুল্ল রায় সম্প্রতি ভারত-লক্ষ্মী ষ্টুডিওতে তিন খানা ছবি তোলবার ভার পেয়েছেন এবং এই তিনখানা ছবির মধ্যে একটি ছবির উভয় সংক্ষেপে আর একটির কেবল বাড়লা সংক্ষেপে। 'কলেজ কত্যা'ও পরিচালনা করবেন ইনি। নিউ থিয়েটারের সঙ্গে চুক্তি শেষ হ'বার পর প্রফুল্লবাবুর এই নব নিয়োগে আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অভিনয়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের ছবি 'অভিনয়' প্রায় শেষ হয়ে গেছে। গেল পরন্তু বিন Ist Class compartment-এর দৃশ্যটা তোলা হয়েছে। বতব্বর ঠিক আছে ২০শে আগষ্ট 'রূপবাণী'তে এ ছবিখানি মুক্তি লাভ করবে।

ভ্যারাইটি ফিল্মস

উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্মকাল অতীতকাল হইলেও এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য কর্ণধার নলিনীরঞ্জন বসুর সুনির্দেশনার ইতিমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে লক্ষ্যেই আশাখিত হইয়া উঠিয়াছেন। চিত্র লবনবাহ কার্যে নলিনীবাবুর দক্ষতা আজ চিত্রজগতে সুপরিচিত নেইকতই হরিশ্রিয় পাল তাঁহার পৌরাণিক চিত্র "হরিশচন্দ্র" পরিবেশনার ভার

ভ্যারাইটি ফিল্মসের উপর দ্রুত করিয়াছেন। এতদ্বারা এই বৎসরের ভিতর এই প্রতিষ্ঠানটি ছইখানি বাড়লা চিত্র পরিবেশনার ভার পাইবেন। স্বাবলম্বী ও নিরঙ্কর নলিনী বাবুর আমরা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

চিত্রা

শামনের শনিবার থেকে চিত্রার ছবিবস্ত ফিল্ম-এর 'গোরা'-তৃতীয় লপ্তাহে পড়বে। গত দুই লপ্তাহ ধরে 'গোরা' ছবিতে যে অদ্বুত জনসমাগম হচ্ছে তাতে মনে হয় যে এ ছবি 'চিত্রার' ছয়-সাত লপ্তাহ চললেও এর ভবিষ্যৎ খুবই আশাশ্রয়।

পূর্ণ থিয়েটার

বিদ্যাপতি তৃতীয় লপ্তাহে পড়বে। বিশপীর কবি বিদ্যাপতির জীবনী জানবার জন্যে আমাদের দেশে শিক্ষিত লস্প্রহারের যে অপূর্ণ লাড়া পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় বাড়লা বেশ এখনও কবি বিদ্যাপতির প্রেমের ছন্দ নিজের বুক করেই রেখেছে।

রূপবাণী

বাহারা অধ্যাবধি নিউ থিয়েটারের 'অভিজ্ঞান' চিত্রটি দেখেন নাই, অথবা আর একবার দেখিবার বাসনা আছে তাঁহারা যেন এই লপ্তাহে রূপবাণীতে আসিয়া ছবিটি দেখিয়া যান। অভিজ্ঞান রূপবাণীতে দশম ও শেষ লপ্তাহে পড়িল। 'আকাশ-পাতাল' নামে বাড়লা কার্টুন চিত্রটি এখনও এখানে দেখানো হইতেছে। এর পরেই এখানে 'অভিনয়' দেখান হ'বে।

১৮ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার জন্মষ্টমী উপলক্ষে রূপবাণীতে লম্বতরাডিয়াপী যে আয়োজন হইয়াছে তাহা লভ্যই লোভনীয়।



প্রভাত সিনেমা

মিথ্য জহর

আগামী শনিবার হইতে প্রভাত সিনেমার মিনার্ভা স্টুডিওনের অনবদ্য সামাগ্রিক চিত্র 'মিথ্য জহর' দেখান হইবে। ছবিখানি চিত্র-জগতে যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই ছবিতে সোরাব ঘোষ ও নাগিম অভিনয় করেছেন।

রাষ্ট্রপতি স্মরণার্থে বোম্বেতে এই ছবি-খানি দেখিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

নিরানন্দ চিত্রগ্রহের

আনন্দের মন্দাকিনী!

মোনো ফিল্মসের চিত্র-নূতন গৌরা গি ক চিত্রোপখ্যাস প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত

হরিশচন্দ্র

ভূমিকায় : শাস্তি গুপ্তা, ভাস্কর দেব, বিনয় গোস্বামী, মাঃ গণেশ, ভাসু রায় (এঃ) ও লক্ষ্মী মুখার্জি।

স্মরণ রাখিবেন এই চিত্রের পরিবেশক

ভ্যারাইটি ফিল্মস

৩৩, বর্ষতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন : কলিকাতা ৫৫১

বিবিধ

কণ্টিনেন্ট্যাল ব্যাঙ্ক অফ এসিয়া

গত শনিবার কণ্টিনেন্ট্যাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া-লিঃ এর হেড অফিসে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উপস্থিতির অত্র একটি Tea partyর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই partyতে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ভবানীপুর সমাজ

গত শনিবার, ২১শে শ্রাবণ লক্ষ্য্য ৭ ঘটিকায় ২৫-২, গিরিশ মুখার্জী রোডে, ভবানীপুর 'সমাজের' ভূতপূর্ব সভাপতি ৮উমানাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতীর্থে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সভাপতি ছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। সমাজের সভ্যগণ ৮বসু মহাশয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার পর ধীরেনবাবু একটি বক্তৃতা করেন। পরে সভা ভঙ্গ হয়।

"টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট"

গত শুক্রবার, ২০শে শ্রাবণ লক্ষ্য্য ৭১০ ঘটিকায় ৩৬মহল রজমন্ডে "টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটের" সভ্যগণ পঞ্চাঙ্গ পৌরাণিক নাটক "অভিষেক" অভিনয় করেন।

অভিনয়ের পুরুষ ভূমিকাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথমে মনে পড়ে "চন্দ্রের" কথা— তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়। দশরথ, রাম, ভরত ও বলিষ্ঠের অভিনয়ও চলনসই কিন্তু জয়ন্ত, জাবালি ও গুহকের অভিনয় একেবারেই অচল।

ব্যর্থ প্রেম হিম্মত কুমার বিনী-

আনমনে ঘুমিয়ে ছিলু—

প্রেমের বাগিচায়—

দোহল দোলে লতা।

স্বপন মাঝে আপন হারা

কোন সূত্রে যায়—

বাস্তবের ওই ব্যথা!

চোদ বছর বরণ যখন

লাতটী বছর আগে—

অধির কোনে নেশা—

ভালোবাসার পাইনি আভাস

হথিন বাবু ডাকে—

কুলের গন্ধ মেধা!

তখন তুমি আপন হাতে

অক্ষুট সেই কলি—

কুটিয়েছিলে জানি—

মোর হৃদয়ের প্রেমের পরাগ—

দ্রমর লম তুলি—

নিরেছে বুকে টানি'!

পাগল করি' মরম আমার

আমাকে ধিয়ে প্রিয়া--

খেলেচ কত খেলা!

হুলিয়ে বেহ জগত আমার
বুকের মাঝে নিয়া
নেই ছোট বেলা!
ঠোটেতে আমার একেছ' ছু
বলেছ ঘোরে আমি—
কোমল বাহু ঝিরি—
বুকের মাঝে রাখিয়া মাথা
বলেছ ওগো আমি—
এখানে বেন মরি!
কৌশলের ওই গভীর ঘুমে
দীর্ঘ স্বপন খানি—
লাত বছরের নেশা—
আগরণের কঠিন ঘারে—
মিলিয়ে গেল জানি—
শুড়িয়ে গেল আশা!
কেন কে জানে এক প্রত্যাতে
হঠাত জেগে দেখি
নাইকো তুমি পাশে—
পালিয়ে গেলে আমার ছেড়ে
বাতাল মাঝে একি—
চুলের গন্ধ ভাসে!
বুকের মাঝে ঘনার ব্যথা—
চক্ষু ভরে জলে—
শয়ন পানে চেয়ে—
তুমি যে নাই, আসুবেনা আর
বাতাশ গেল বলে
কানন বীধি চেয়ে!
অক্ষুট ওই কুঁড়র বুকে
গন্ধ বতো ছিল—
নিরেছে করে চুগী—
বুক ভরা মোর ভালোবাসা
আজকে আমার ছিল
বিষ মাখানো ছুতী!
নীরব আঁধি উদাস হয়ে
সুদূর পানে যায়—
তোমার পিছে পিছে,—
নীরব ব্যথা লজীব হ'রে
আমার দিকে চায়—
বিশ্ব যে তাই মিছে!



ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড ক্রীট, কলিকাতা।



জামাই

চট্টোপাধ্যায়

॥

(এক)

ধীরেন ঘর-জামাই।

লেখিন সকালবেলা : বলি পুরুষ হয়েছিল
কি করতে ! আমার কাছে পরলা চাইতে
লজ্জা করে না ? একটা আধলা বার
রোজগার কোন্‌বার মুরোদ নেই তার আবার
বিয়ে করা কেন ?—ঝাঝালো কণ্ঠে কথাগুলো
বলে জী লরমা প্রায় কেঁবেই ফেললো :
আমারও যেমন পোড়া বরাত, পরেছি এমন
মিন্‌দের হাতে, কোথায় আমার ছুঁপরমা
এনে দেবে—না, আমারি কাছে আসে হাত
পাততে। সুখে আ—কান্নায় ও রাগে তার
কথা বন্ধ হয়ে এলো।

মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে বাড়ির গিন্নী—ওলো
তোদের আবার সকালবেলাই কি হলো।
নাঃ—আমি আর পারিনে বাপু। বস্‌নে
বলতে তিনি এগিয়ে এলেন ঘরের দিকে।

ধীরেন অনুপায় যেখে পেছনের দরজা
দ্বিগে বাড়ীর বাইরে বেড়িয়ে গেল।

গিন্নি এলেন—কি, আরস্ত করেছিস্ কি ?
খালি ঝগড়া, খালি ঝগড়া—লোকে শুনেই
বা বলবে কি বলতো। হ্যা—হ্যা—এক-
মুহূর্ত্তওকি তোরা ঠিকভাবে থাকতে
পারিস্ না।

লরমার মুখ ঝড়ের পূর্ব্বের প্রকৃতির মতো।

গিন্নি হাত নেড়ে বলে চলেছেন—আর
জামাইও হয়েছে যেমন—হবে নাইবা কেন,
কাজ কর্ত্ত তো নেই কিছু—তবু বাইরে
বাইরে আড্ডা বেওয়া আর ঘরে এলে তোর
মলে ঝগড়া করা—কাজের মধ্যে তো দেখি
এই—হ্যা হ্যা লোক হানালি তোরা। বলি

আজ আবার কি হয়েছিল ? অতো চেচাচ্ছিল
কেন ? কিলো কথার বে উত্তর দিচ্চিস্
না বড় ?

লরমা প্রস্তুত হয়েই ছিল :—উত্তর
আর কি হবে। এর জন্ত দায়ী তো
তোমরাই।

—দায়ী আমরা ! তিনি যেন দশ হাত
জলে নেবে গেলেন—নেকি তোরা করবি
ঝগড়া আর আমরা হবো দায়ী !

—নিশ্চয়ই তোমরা দায়ী এর জন্তে।
লরমা অন্ন বরদেই বুড়ি হয়েচে। আমার
এর চে' গজার কেন তালিয়ে দিলে না—
বিব কেন খাওয়ালে না। লরমা ফুঁপিয়ে
কেঁবে উঠলো : তা-ও যে আমার ভাল ছিল।

গিন্নির মুখে একটা ভয়ানক কঠিন উত্তর
এনেছিল কিন্তু একমাত্র কস্তার কান্নায়
কখন যেন হিম্‌লিম্‌ খেয়ে গেলেন, তার
অবস্থা স্বাভাবিকতার চেয়েও লাভ পরমা
নেবে এলো। নেহ'ৎ অপরাধিনীর মতোই
বলে উঠলেন—ওকি কথা মা—ওকি বলতে
আছে। না—না ধীরেন একটু পাগ্লাটে
ধরনের তাতো জানিই। আজ বুঝি আবার
ভবলার জন্তে বারনা ধরেছিল—একেবারে মাথা
থারাপ তার। চোখ মুছে ফেল মা কাঁদতে
আছে কি ইত্যাদি বলে তিনি ঘেয়েকে
স্বস্তনা দিয়ে আন্তে আন্তে ঘর থেকে
বেড়িয়ে গেলেন।

ধীরেন বহিঃ এই রকম বাপী শুনে
শুনেতে অত্যন্ত হয়ে গেছিলো তবুও আভ্যন্তর
মত কান্নাকাটা হানানা এতটা সে মতাই
আশা করেনি। শান্তদীর আগরাজ শুনে

তাড়াতাড়ি পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে
বেড়িয়ে এলো রাস্তার এবং বেকারের একমাত্র
বাক্স চারের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল।

আজকে তার অপরাধ খুব থেকে উঠে
শে জীর কাছে দৃশ আনা পরলা চেরেছিল।
আজ শনিবার, শুটকে বলেছে যে আজ
'কুইক্‌ বন্স' বোড়াটা উইন করবেই—তাই
দশ আনা দিয়ে আজ তার সেই বোড়াটা
ধরা চাই-ই। জীর কাছে সে নিবেদন
করলে : শুনছো ?

—কি

—এই বলছিলাম কি যে.....আমার
কালকে বিকেলে ভয়ানক পেট ব্যথা হয়েছিল
তা ডাক্তারের কাছে গেছিলাম সে বলে—
দশ আনা লাগবে অনুষ্থের দ্বারা—তা তখন
পরলা হাতে ছিল না বলেই.....আজ দাঁওনা
পরলা কটা অনুষ্টা নিয়ালি।

—ত্যাখ। লরমা দব বোঝে। মিছে
কথা বল না—কাল বিকেলে তোমার পেট
ব্যথা হয়েছিল। কই এ পর্য্যন্ত ত কিছু
বলোনি ; রাত্তিরে আবার য-তা খেলো।
আর আজ সকাল অবধি রইলো তোমার পেট
ব্যথা।

—মাইরী বলছি মিছে কথা নয়। ধীরেন
থতোমতো খেয়ে বললে—সত্যি বলছি
ডাক্তারবাবু বগেছেন—

—যে তোমার পেট ব্যথা। লরমা কেপে
গেল। ত্যাখ ফের তু'ম বহি মিছে কথা
বল তো....'

—আ—হ্ বলছি মিছে কথা নয়।
ধীরেন মিনতির স্বরে বললে মাইরী বলছি
যে...

—নয় হলই তা বলে—লরমা আন্ত
করলো। তারপর পূর্ব্বোক্ত চেচাবেটি।
শান্তদী আগমন, তিভের পলারন ইত্যাদি।

ধীরেনের যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে লংদার বিদ্যাক
বলে মনে হল। মেয়ে ছেলের কাছে এরকম

অপমান আর কদিন সহ করা যায়। তার নিশ্চিৎ পুরুষের আজ বড় দা লাগলো। না আর সে সহ করবে না এরকম অপমান, বিশেষতঃ মেরে ছেলের, তাও আবার নিজের জীর কাছে থেকে।

—কেবল বলে—‘চাকরী কর’ ‘চাকরী কর’। আরে চাকরী কি আর মুখের কথা যে বললেই পাবে। তা চাকরী বা করতে যাবে কেন তুমি—খণ্ডের তো এমন ছয়বছর নয় যে জামাইর রোজগার না করলেই নয়। পঞ্চাশ বাট হাজার টাকা বার শুধু তেজারতিতেই খাটুকে—তার একমাত্র জামাই চাকরী না করলে বুঝি জী পুত্রের হাত ধরে একেবারে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে! হঃ—কি কল্পন ঐ খণ্ডেরটা, একটা পরশা না যেন এক ফৌটা গায়ের রক্ত।

ধীরেনের এসব একেবারেই ভাল লাগছিল না। ঐ তো মেরের রূপ টাকা ছিলেও কেউ বিয়ে করতো না। উদ্ধার করে দিয়েছি কিনা—তাই আজ এ্যাডো তরফাণি। মনের ভেতর আজ অনেক কথাই ভেদে উঠতে লাগলো। এর একটা বিহিত সে করবেই এরকমভাবে আর চলে না।

সেদিন কত করে বল্ল বিশেষক—যেন তাই তোমার অপিলে ঢুকিয়ে। ব্যাটা বলে কিনা—এক হাজার টাকা জমা দিতে হবে, তবে কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী।

আরে এক হাজার টাকাই যদি হাতে থাকবে তবে কি আর ঐ ছাইয়ের চাকরী সে করতে যাবে। তাহলে সে একটা লাইকেলের হোকান কিংবা চায়ের হোকান দিয়ে বসতো কিছু হাতে যে এক কান কড়িরও লম্বল নেই। খণ্ডের ইচ্ছে করলে কি আর পারে না? তা পারে কিছু সে তো হবে না, ভাবে জামাই লব ফুঁকে হবে।

পরমাকেও ঘোষ বেওয়া যায় না। এতোদিন তো সে ঘেরেইছে কিছু কিছু ওর

হাতধরটা কিছু সেদিন স্ট্রটের জন্তই তো বতো ফ্যানাষ হল। সে কিছুতেই থাকে না তবু থানা এক গেলান। কিছু হবে না এতে। আজকের দিনে একটু খেতে হয়।

—না তাই আমি খাবনা—মুখে ভারী গন্ধ থাকে। ধীরেন বলেছিল।

—আমি তার ব্যবস্থা করে দেবখন—ভয় কি।

নেহাৎ বন্ধুর উপরোধে ঢেকি পেলবার মতোই খেরেছিল এক গেলান। এতো করে মুহুর ডাল চিবিয়ে, জরদা দিয়ে পান খেরেও বাড়ী ঢুকে সরমার কাছে ধরা পরে গেল।

—একি! তোমার মুখে গন্ধ কিলের। সরমা আংকে উঠলো।

ধীরেনের বুকের ভেতর কোরেটার ভূমি-কম্প—গন্ধ! কই না গন্ধ—সত্যি বিশ্বাস করে ইত্যাদি আবেল তাবোল কি যে বলেছিল কিছুই মনে নেই।

চেননা হয়েছিল সরমার ধাক্কার—ভূমি মদ খেরেছ। আজ কাল এ্যাডর এগিয়েছো—এ্যা—ভূমি—

ধীরেন ভীষণভাবে ঘাবড়ে গিয়ে সরমার হাত ছুটা ধরে প্রাথমে বলেছিল সত্যিই খেরেছি আমি, ইচ্ছে করে খাইনি। খাইয়ে দিয়েছে আমার ঐ স্ম-স্ম-টুকে। তারপর প্রায় কাপতে কাপতে বললে বা হয়ে গেছে ওষের যেন আর ব’লো না। জীবনে আমি ও জিনিষ কখনো ছোঁব না এই নাক্ হুল্ছি কাণ হুল্ছি।

সেই দিন থেকেই সরমা ওকে পরশা দেয়না। বিশ্বাস করে না ওকে। নেহাৎ জলজ্যান্ত প্রমাদ না দিলে এক পরশা ও বেড় ক’রে না।

সেই দিনের কথা মনে পরতেই আবার মনটা ভরানক খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে বড্ডো হতভাগা বলে মনে হলো। ইস্

জীর কাছে নাক্ কান্ হুলতে হল। যে নাক কান হুলতে বলার একদিন সে ইন্দুণ থেকে লেখাপড়ার খতম দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিল—তাই কিনা আজ একটা লামাত্র ঘেরেভেলের কাছে তি-ছি ওর মনে হল নিজের জীর কাছে বোধহয় এরকম অপমানিত ভূতায়তে কোন লোক হয় নি।

ভাবতে ভাবতে চায়ের হোকানে কখন ঢকে পরেছে।

দলের সবাই-ই হাজীর। কেউ হোকানে বসবার ঘরগা থাকতেও ফুটপাতে দাঁড়িয়ে-ই চা খাচ্ছে, কেউ বোধহয় ষণ্টা ছ’য়েক আগে চা খেয়ে সেই কোণে বসে ছোট একখানা বই নিয়ে ষাগ কেটে চলেছে; মাঝে মাঝে হরতো বা পাশের লোককে জিজ্ঞাস্ করছে—হারে কেটা লেসলী ঘোড়াটা কেমনবে, উইনে না প্লেস।

টেবিলের মাঝামাঝি কয়েকজনের ভেতর ভুখুল ওর্ক, সিনেমা অভিনেত্রী সমালোচনা নিয়ে। কেউবা খবরের কাগজের ‘আইন আদালতের’ পৃষ্ঠা খুলে মনোযোগ সহকারে পড়ছে।

ধীরেন এলে ঢুকলো।

—এই যে ম্যান দাঁও দিকিন্ পরশা কটা। স্ট্রটকে এককোনে বলে বই পড়ছিল ওকে দেখে বলে উঠলো।

—তোরাই তাই আজ আমার টা দিয়ে ঘে।’—ধীরেনের মুখ ও আওরাজ পত্তীর।

—না বাবা। বিশেষ বল্ল। ওসব চলবে না—নগদা নগদি কারবার ধার তার চলবে নি। ফ্যালো দেখি টা দ টাক্ থেকে।

—সত্যিই আমার কাছে নেই আজকে। ধীরেন বললে—আজ তোরা দিয়ে যে বলদুধ তো কালই দিয়ে যাব।

তাহালে বাবা হবে নি। বিশেষ গিরে আবার লম্বানে বললো।

ধীরেন হাঁকলে—চা দিন একটু ঘে মশাই।

হে মশাই চা নিয়ে এলো :—পৌনে আট আনা হল আপনার, আর আমি খার হিতে পারবো না।

চা বিস্বাস হয়ে উঠলো ধীরেনের কাছে। সে চূপ করে রইলো। স্নটকে ধীরেনের একটু বেশী অন্তরঙ্গ, কাছে এগিয়ে এলো— এমন টুপিটা মাটি কচ্ছো হে—নিওর উইন করবেই। হাও না থাকলে—

—নেই নতি বলছি

—না নেই বাবা। তোমার কাছে আবার পরশা নেই।

—জানই তো ভাই চাকরী বাকরী করি না। বাড়ীতে আজ চেয়েও পেলাম না। হাতে থাকলে কি আর 'লস' করি। হাও, একটা বিড়ি হাও।

ভজনেই বিড়ি ধরালো।

ধীরেনের বিয়ে হয়েছিল 'বাকহতা' হিসেবে। শান্তরী কবে নাইতে নাইতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন গঙ্গার ঘাটে ওর মা'র কাছে—দ্বিবি তোমার ছেলের সঙ্গেই আমার মেয়ের বে' হ'বো। কিন্তু আলল কথাই এইটে নয়, নতি বলতে কি পরমার রূপের বালাই নেই বললেই চলে। তাকে নিজে-স্বয়ং অবস্থা-সুযোগী কেউ বিয়ে করতে তো রাজী হ'তো না, হলেও বেশ মোটামুটি ঘুম নিয়ে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে ধীরেনের স্বস্তর একপরশাতেই মরে যাচ্ছে তাই 'বাকহতা'-র উপর বিশেষ শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা করে ওর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে হলেন তখন আর ভাববার অবসরই পেলেন না যে ধীরেনের তিনকুলে কেউ নেই। মা মারা যেতেই ধীরেন উঠলো এশে স্বস্তর গৃহে চিরস্থায়ী ভাবে। স্বস্তর ভাবলেন একটা লোকের খাওয়া খরচা আর এমন কী বেশী লাগবে। তবুও তিনি ভেবেছিলেন যে যদি জামাই রোজগার করে তাহলে তো কথাই নেই বাড়ী খরচাটাও তার উপর দিয়েই চলে

যাবে। কিন্তু বেটোচ্ছেলে জামাই তো চাকরীর নামই করে না উলটে তার খরচা কোণাতে প্রাণান্ত। লামনালামনি কিছু বলতে না পারলেও আকারে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন 'ওলব এখানে চলবে না বাপু'। ধীরেন নির্বিকার ছিল এতোদিন কিন্তু আজকের ঘটনার তার প্রাণে বড় লেগেছে।

দশ আনা পরশার জন্য এতো অপমান। এতোটাকা থাকে কে? ছোটো নয় দশটা নয় একটা জামাই আর লোকটা এরকম করে। বেরকম বাপ লেরকম মেয়ে সেরকম মা, সবগুলোই লমান ধীরেন মনে মনে ভাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো তার বুক চিরে। হাতের পোড়া আধখানা বিড়ি ফেলে দিয়ে গুম হয়ে বসে রইলো।

—কি বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস যে বড়। স্নটকে লমবেদনার সুরে জিজ্ঞেস করলো—কি হল? পরশা নেই বলে কুংখু করচো? মাইরী আমার কাছেও নাই, থাকলে ঠিক দিয়ে দিতাম তোমার হয়ে। এতো পরশাই গেল নেশা পড়ে উড়ে আর লামান্ত্র করেক আনা পরশার জন্যে কি আমি পেছপা' হই। এই কালকে রাস্তিরে ভাই নেশার একটু বেলামাল হয়ে পরেছিলাম—শালারা থানার নিয়ে গেল।

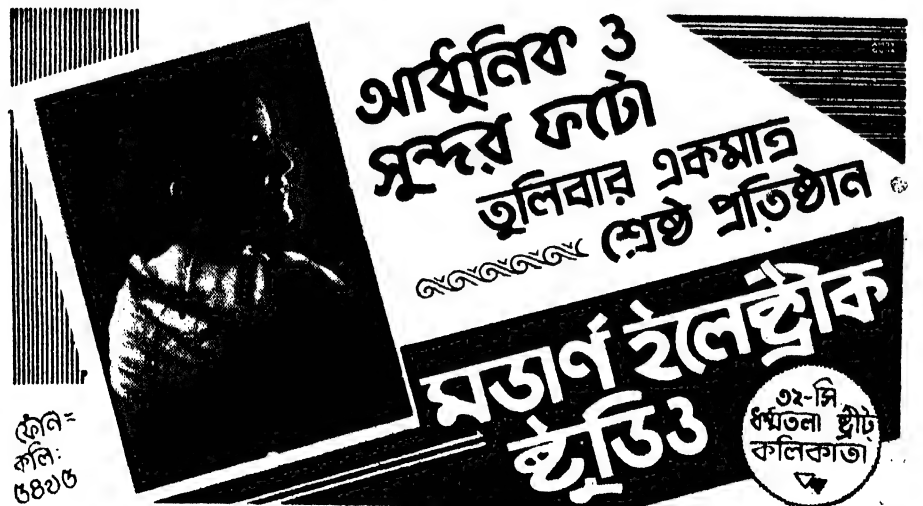
টাকা পাঁচেক গচ্ছা দিয়ে এলাম। নাহলে কি আর ভাবনা কোরতাম রে ভাই।

'কেট বললে—চ' স্নটকে একটু ক্র্যাশ খেলিগে।

—চল। লবাই উঠিল। ধীরেনও উঠলো ওদের সঙ্গে। যাবার সময় হে মশাই স্মরণ করিয়ে দিলো কাল আমার পরশা ক'টা চাই ধীরেনবাবু?

—চুই—

ধীরেন বাড়ী এসে ঢুকলো বেলা বেড়-টার। এক তুলুল কাণ্ড ঘটে গেল। লকাল বেলার ঝগড়া ক্রমে স্বস্তরের কানে উঠেছে। বাজে খরচার উপর তিনি ভ্রমাদক চটা, তাই তিনি যোগে গেছেন। এই বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে খুব এবং নিঃশব্দেই প্রমান হয়েছে যে ধীরেন একটা গকাণ্ড রকমের কুখ্যাত, কিছু না বলতে বলতে যা-ই-ছে-তা-ই আরম্ভ করেছে। তাঁরা তাহের মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। বেকার বসে থাকলে এই অবস্থাই হয়। নাইবা রইলো তাঁর বিদ্যো—বিদ্যো ছাড়া কি আর লোকে রোজগার করে থাকে না? এতো পাকরাণী মশায়ের জামাই পেটে বোমা মারলে 'ক' বেড়োয়না সে পর্যন্ত আশি টাকা মাইনের চাকরী



৩
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

মডার্ন ইলেক্ট্রিক
স্টুডিও

৩২-সি
ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন-
কলি:
৬৪৩৬

করছে। আর তাহের জামাই হতভাগা বলে কিনা 'চাকরী অতো সহজ নয়'; 'লেখা পড়া না জানলে পাওয়া অসম্ভব'। আরে মুখ বিধেই যদি চাকরীর একমাত্র লক্ষ্য হ'তো তাহলে আর এতো এম. এ, বি. এ পাশকরে পৈ-পৈ করে যুড়ে বেড়াতো না। আজ আশুক একটা হেতুনেহ করা দরকার। হোক না জামাই তা বলে তাকে পুজো করতে হবে নাকি? আমরা অকর্ম্মার ঢেকি! হঃ। শতর রেগে গেছেন জীবন।

সরমা খুলী হয়েছে এ ঘটনার, সত্যিই এতো বাড়াবাড়ি আর ভাল লাগছিল না। উঃ মদ অবধী ধরেছে। যদিও সে কথা বাপ-মার কানে তোলেনি কিন্তু দরকার হলে তুলবে বৈকি! এখনই এই, হাতে পরলা-হলে হরতো পড়ে মাঁতাল হয়ে লম্পন্তিকে লম্পন্তিই উড়িয়ে বেবে, তখন সে হেল-পেলে নিয়ে বাড়াবে কোথায়? আশুক না আজ মজাটা টের পাবে খন।

একে সবাই রেগে আছেন তার উপর বেড়টার সময় সে বাড়ী চুকলো এসে। খানিকটা বা ভরে ভরেই। এতো যে ঘেরী হয়ে বাবে সে ভাবে নাই। জুয়ার আড্ডার বললে কিছুই আর খেরাল থাকে না। বাড়ী গেলে হরত.....।

ঘীরেনের মনটা হমে গেল কিন্তু আবার রক্ত গরম হয়ে উঠলো : ভরটা কিলের? জীর কাছে ভয় হঃ, এ্যাদিন বা হয়েছে হয়েছে আর নয়। বতোই ভয় করা যায় ভতোই ভয়। 'আরে বাবা বতোই হোক না, আদি ছাড়া তো গতাস্বর নাই' ঘীরেন নিজের মনে লাহল আনবার চেষ্টা করে বরে এসে চুকলো। লামনেই সরমা। মুখ বেখেই ওর লাহল আঁকে উড়ে গেল। বুক চিব্ চিব্।

সরমা খাপ পেতেই ছিল—কত এগিয়ে এসে চীৎকার করে বললে—

কোন চুলো থেকে আনা হচ্ছে তনি? লেখানে খাওয়া খাওয়া মিললো না?

ঘীরেনের দেহে প্রাণ নেই। জোড় করে লাহল এনে গভীর স্বরে বললে— কেন তোমার কাছে কৈকিয়ৎ দিতে হবে নাকী?

—নিশ্চয়ই দিতে হবে, একশোবার দিতে হবে। সরমা কাঁপতে লাগলো।

কতো বড় পর্দা! কখনো না। যেখানে ইচ্ছে বাব, যেখানে ইচ্ছে আমার। আমি তোমার চাকর নই। খবরদার তুমি আ—গলা ভরেই হোক আর রাগেই হোক শুকিয়ে গেল।

—কি! যেখানে ইচ্ছে বাবে। তাহলে সরমা বাইরের দিকে হাত বেধিয়ে ভেমনি-ভাবেই বললে—তাহলে যাও লেইখানেই যাও। এ বাড়ীতে তোমার আর আসতে হবে না—যাও।

ঘীরেনের কথা শুনে চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হল।

—আচ্ছা যাচ্ছি লেইখানেই যাচ্ছি। এ ছাড়াও আমার থাকবার অনেক যায়গাই আছে জেন? বলে ঘীরেন ঠিক সেই অবস্থার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

দুঃখে ও রাগে তার চোখে জল এলো। ওখানে তো বলে এলো যায়গা আছে কিন্তু.....হ্যাঁ মুটকের কাছে যাওয়া বাক্। কেন সে এক লাগি ঘেরে বেরিয়ে এলো না সরমাকে। এখন তার মনে হল বাইরে এসে—কেন সে নিরবে লহ করে এলো এ অপমান। সরমাইতো জিতলো। সে নিজে তো হেরে বেঁচে এলো।

মুটকে লবে গজান্বন করে চমকচমিত কপালে হোটেলের দিকে চলছে—পথেই ঘীরেন কাঁদ কাঁদ অস্থির.....।

—কি—রে আবার কিরে এলি যে—

ঘীরেনের গলা কান্নার জড়ানো কোন বতে স্বত্তরের নামে ঘোষটা চাপিয়ে কাহিনীটা বলে গেল। তারপর বললে—তুই যদি ভোর লগে আমার হোটেল খেতে আর বাড়ীতে থাকতে না দিল তো আমি বিব খেয়ে মরবো।

বেশীদিনকার কথা নয় একবার মুটকে ওর স্বত্তরের কাছে ধারের লজ্জা গেছলো—তা—ঘীরেনের স্বত্তর—৬০ টাকার ছাউনোট লিখিয়ে টাকার ছরপয়সা গুবে নগদ চল্লিশ টাকা দিয়েছিল। তানর দিলে—একটু ঘেরী হয়ে গেছলো বলে বেটা কিনা নাগিল করে, মুটকের মালপত্র ফ্রোক্ দিতে এলেছিল। উঃ কি বদমাইল—তাই মুটকের রাগ জীব স্বত্তরের উপরে। সে বলে—কিছু মনে করনা মাইরী, তোমার স্বত্তর ব্যাটা বড্ডো পাজী লোকটার অতো টাকা খাবে কে। মাইরী এ কি ব্যবহার বল দিকিনি। আমার অতো টাকা থাকলে দশ বিশটা লোককে নিয়ে লার জীবন সুখি করিয়ে কাটাতে দিতুম।

তারপর কি খানিকটা আলাপ হা চলতে চলতে তা লব অবশ্য শোনা গো না। শুধু ঘীরেনের অদহার ও ভীত কণ্ঠ স্বর শোনা গেল—কিন্তু তাই তা যদি ন করে তবে?

—আরে বাবা বাহাদরকে করতেই হবে মুটকের উৎসাহ শোনা গেল। —তবে কিন্ত এ কথা রইল কেন?

ঘীরেন বাড় নাড়লো।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

অরুণ রবির তরুণালোকের মত,
ফুটাও তুমি কমল যত,
ভেঙ্গি করে ফুটাও প্রভু, আমার প্রাণে,
জ্ঞানের কমল শত শত।

নিম্নতির পরিচয়

শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অলকা তেমনি কাতর স্বরে বললে—
“না, না, অতটর সয়োজন হবে না; চলো
আমরা পালিয়ে যাই কোন দূর দেশে।”

সমীর হুঃখের হাসি হেসে বলে—“তা
সম্ভব হবে না! পালিয়ে আমরা কতদিন
থাকবো! একদিন তো ধরা পড়তে হবে।
আর শুধু জীবনের জন্তে এত বড় নীচ
কাজ করবো?”

হতাশ হ’য়ে অলকা বললে—“তবে?”

সমীর বলে—“ভয় পেয়েও না অলকা,
তুমি যদি এমন অস্তির হও তবে আমারও
যে ভয় পায়! রাজপুত্রেরা যখন বুদ্ধে
যাবার আগে এমনি ভাবে তাদের প্রিয়
সঙ্গিনীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আসতো,
তখন সঙ্গিনী কি ক’রতো জানো? সে
ভয় পেতো না! সে নিজের মনে গৌরব
অনুভব ক’রতো। গর্জের সঙ্গে বলতো—
‘তুমি বীর, বুদ্ধে যাও; ভগবান করুন বুদ্ধে
জয় হ’ক’। তারপর ললাটে একে দিতো
বিজয়ের দীপ্ত রেখা। তারপর বীর যদি
ফিরে আসতো, কোন এক শুভলগ্নে তাদের
মিলন হ’তো। যদি বীর ফিরে না আসতো,
সঙ্গিনী বেছে নিতো আপনার পথ। তাই
বলি অলকা তুমি আমার উৎসাহিত করো;
বলো—যেন আমি বুদ্ধ থেকে আবার ফিরে
আসতে পারি।”

অলকা সমীরকে উৎসাহিত ক’রে বলে—
“তবে তাই হ’ক, তুমি বুদ্ধে জয় লাভ
করো, বুদ্ধ থেকে আবার ফিরে এলো;
ফিরে এলে.....।

পরদিন প্রভাতে সমীর বিদায় নিতে
এসে বললে—“কি করবো নিয়তির হাত
থেকে পরিত্রাণ নেই।”

মুখ দিয়ে কথা বেরুল না কারুরই,
অশ্রু হ’লো তাদের বিদায় বাণী।

বিদায় নিল—ভবিষ্যৎ মিলনের কল্পনায়।
নিয়তি গেল পালিয়ে তাদের মধ্যে
বিরহের তীব্র দাবানল জ্বলিয়ে দিয়ে।

একা পড়ে রইলো অলকা—অতীতের
স্মৃতিটুকু বৃকে নিয়ে।

দিন যায়—

ক্রমে বছর কেটে যায়—

আজও বুদ্ধের অবসান হ’লো না;
পৃথিবীর বহুমান ব্যাপী বুদ্ধ, শীঘ্র অবসান
হওয়া বড় শক্ত। বুদ্ধের খবর পাওয়া যায়
পত্রিকায়। হতা-হতের সংখ্যা বেধে অলকা
কঁপে ওঠে। যদি এর মধ্যে সমীর থাকে,
তবে? অলকা আর ভাবতে পারে না,—
অশ্রুর বাণ ডেকে ওঠে—

একদিন তুলে অলকা—সমীর একটি
ছোট্ট সেনা দলের সেনাপতি হ’য়েছে।

অলকার মনে আনন্দ হ’লো—গর্জও
হ’লো; কিন্তু তা প্রকাশ পেলো না!

একদিন একটা চিঠি এলো অলকার,
সমীরের লেখা দুটো কথা—“অলকা আমি
বঁচে আছি; শেষ পর্যন্ত বঁচে থাকবারও
আশা করি। -সবদানে থেকো, কবে
ফিরবো জানি না। —ভালবাসা নিও।”

এমন চিঠি হ’তিন বার এলো; অলকা
হিতে পারে না তার উত্তর, কারণ সমীরের
অবস্থানের স্থিরতা নেই।

অলকা হুঃখ করে।—

একদিন প্রভাতেই বুদ্ধের অবসানের
খবর প্রচারিত হ’লো। অলকার বড় আনন্দ
হ’লো এবার ফিরে আসবে তার সমীর।

বুদ্ধ থেকে ফিরে এলো সকলেই, কিন্তু
এলোনা কেবল সমীর। সাতদিন কেটে
গেল সমীর তবু এলো না। সে কি তবে
নেই? অলকার পারের তলার ভূমি
কঁপে উঠলো—

এমন সময় চিঠি এলো—“অলকা আমি
এখন পাটনার এক হাঁসপাতালে। বুদ্ধ থেকে
বঁচেছি। শত্রু আমার দরতে পারেনি,
কিন্তু নিয়তি আমার ঘেরকে। আমি আর
বাঁচবো না। কি রোগ হ’য়েছে আমার
জানি না। আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে।
তবে তুমি যদি পারো তো একবার এলো;
কেমন করে আসবে জানি না! আমার
লিখতে পারি না, বড় কষ্ট হয়।”

অলকার বুক ছলে উঠলো; তবে পার
না কি করবে। পাটনার যাওয়া অলকার
পক্ষে অসম্ভব।

তবুও ভাবে অলকা, এখন অসম্ভবকেও
সম্ভব করতে হবে। অনেকবার সে পাটনার
গিয়েছিল কিছু কিছু মনে পড়ে।

পরদিন রাত্রের অন্ধকারে একলা বেরিয়ে
পড়লো—সমীরের সাথে মিসবার আশায়।

গভীর প্রোথের তীব্র শক্তি তাকে
পৌঁছেছিল পাটনার। বোঁজ নিয়ে উপস্থিত
হ’লো হাঁসপাতালে।

কিন্তু লেখানে সমীরের বোঁজ পেলো
না; বলে—“হ’তিন আগে চ’লে গেছে।”

—“হ’তিন আগে!”

—“চ’লে গেছে!”

—“কিন্তু, কোথায় চ’লে গেছে?”

—“ক-উ-জা-নে না।

আঘাত পেয়ে ফিরে এলো অলকা।

সবরের মধ্যে বুদ্ধে বেড়ায় সমীরকে।

কিন্তু তার দেখা সে পার না।

লক্ষ্যার পাতলা অক্ষর তখন ঘিরে
কেলেছে গজানদীর কোলগুলিকে। কিন্তু
যেখা বাছে সবই চাঁদের নস্ত আলোকে।

অলকা পাগলিনীর মত ছুটে ছুটে
বেড়ায়। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা
“অলকা” নামটি আশাত দিল অলকার কাণে।

অলকার বুক হলে উঠলো; এ স্বর
যে তার বড় পরিচিত!—বড় প্রিয়—বড়
আদরের! কে ডাকে! লম্বীর! লম্বীর!

আবার সেই প্রিয় ডাক—“অলকা”!—
আবাব—আবাব।

দূর থেকে নিরতি অন্ন হেসে অলকাকে
পৌছেছিল লম্বীরের কাছে।

অলকা দেখলে ওর মুখ ঘিরে ঘন ঘন
রক্ত উঠছে।—“তুমি,—তুমি এলোছো অলকা!
এলো কাছে এলোত আরও কাছে এলো;
তুমি কেমন ক’রে এলে আমার জানবার
অবসর নেই অলকা! অলকা আমি আর—”

বাধা ঘিরে অলকা ব’লে—“ওগো,
আমার উপর তোমার এ অভিমান কন্যার
মত হোব তো আমি করিনি, তবে তুমি
কেন এ অভিমান ক’রলে! আমি যে—”

কথা কেড়ে নিয়ে লম্বীর কাতর স্বরে
ব’লে—“অভিমান নয় অলকা—অভিমান
নয়। এ কেবল নিরতির নিষ্ঠুর পরিহাস
ছাড়া আর কিছুই নয়। তা বাক অলকা,
তা বাক আর আমার সময় নেই। শুধু
অলকা একবার বল—আমি মরে গেলে,
তুমি—অলকা তুমি ঠিক আজকের মতই
ভালবাববে! এ জীবনে তোমার আমার
মিলন হ’লো না। কেন হবে অলকা,
কেন হবে? জানো না! পূর্বজন্মে
আমার লাধনা অলমাপ্ত র’য়ে গেছে। তা
বাক অলকা—তা বাক। লাধনার বাকীটুকু
এ জীবনে সমাপ্ত ক’রে গেলাম; বলো—
বলো অলকা পরজন্মে এমনি ভাবে তুমি
আমার ভালবাববে!—তখন আর তর

বাকবে না অলকা! মিলন হবে নিশ্চয়।
—উঃ, কোমর থেকে খুলে নাও অলকা
পিন্ডলটা। পারোতো আমার নাম ক’রে
খানার জমা দিও; অলকা—অলকা তোমার
হাত খানা দাও।

একটা দমকা হাওয়া ব’য়ে গেল তাবের
ওপর ঘিরে। লম্বীরের শীতল হাতখানা
লুটিয়ে প’ড়লো মাটিতে।

কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অলকা
কাতর স্বরে ব’লে শুধু একটি উত্তর পাবার
আশায়—“ওগো, ঐ যেখা চাঁদ উঠছে।
চলো সেই দেশে, যে দেশে পাখী ছাড়া
আর কারুরই চিহ্ন পাওয়া যাব না;
যেখানে কেবল ব’য়ে যাবে নদী—, ব’য়ে
যাবে বাতাস—, আর তাদের লগ্নে ব’য়ে
যাবে আমাদের স্মৃতির দিনগুলো। নীল
আকাশের তলে কালের স্রোতে ভাসিয়ে
দেবো আমাদের জীবন তরী; কিনারার
কথা ভাববো না; যদি তরী ডুবে যায়
মাঝে—” অলকা থেমে যায়। পাষণ
দেহটাকে নাড়া দিয়ে তেমন কাতর স্বরে
অলকা আবার ব’লে—“ওগো, তুমি—তুমি
চলে গেল আমার ছেড়ে! একটু দাঁড়াও
আমিও যাবো তোমার লগ্নে! মনে পড়ে
নিরতির কথা? —সে বড় নিষ্ঠুর কিনা
তাই সে মনে করে আমি তাকে ভয়
ক’রবো; কিন্তু জানে না যে আমি মৃত্যুকে
আর ভয় করি না। মৃত্যুর জন্তে আমি
ব্যকুল হ’য়ে উঠেছি!—কিন্তু তুমি দাঁড়াও
—একটু দাঁড়াও—!”

এক বলক তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে প’ড়লো
অলকার গাল বেয়ে। লম্বীরের পাষণ পায়ে
একে ছিল একটি শিথিল চূষন রেখা—

লম্বীরের কোমর থেকে খুলে নিল
পিন্ডলটা। নিষেধের মধ্যে পিন্ডা গর্জন
ক’রে উঠলো। অলকার প্রাণহীন দেহখানা

লুটিয়ে পড়লো লম্বীরের পাষণ দেহটার
উপর।

তখন একখণ্ড কালো মেঘ ঢেকে
কেলেছে চাঁদকে……। পিন্ডলের শব্দ তখনও
বিগলিত ভেদ ক’রে ছুটে চলেছিল……।
গভীর অন্ধকার তখন ধরণীর কোলে পা
ঘিরেছে……। কেউ ছিল না সেখানে……।

শুধু নিরতি এক অটুট হাসি হেসে পালিয়ে
গেল।

ডোঃ প্রদে বাল্যমৃত

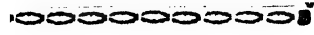
শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ত্রিশ—

দারবানদের চৌকর ও হট্টগোলে দিলীপ বাবু, শুভ্রা ও লমর চকমিলান দালানের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। লমর চৌকর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এই রামসিং, এত্না হুজুর কেঁও মাফাতে হো? বাবু বুলাতে হেঁ, জলদী আও।”

রামসিং তাহার বিশাল বপু ও গালপাট্টা খাড়া লইয়া দালানের মধ্যে আসিয়া সোলাম করিয়া দাঁড়াইল ও অর্ধ হিন্দি অর্ধ বাংলার বলিল, “হামি কি করবে হুজুর, একঠো বুড়া আঁকে উপরমে যানে মাংসে—হামি বারণ করলে তা শুনলে না; বোলে দিদি-বাবুকা হেলিয়া আছে।”

দিলীপবাবু বলিলেন, “ও বুড়া হায় কহা?”

রামসিং বলিল, হুজুর হামি বলে কি হামারা দিদিবাবুকী উমর চৌবিশলে জ্যাবা নেহি আর তুমহি শালা বুড়া আছে তো সেলিয়া কৈলে হোবে।”

শুভ্রা পিতাকে অনুরোধ করিল সে যেই হোক তাহাকে মা বলিয়া যখন পরিচয় দিয়াছে সে নিশ্চয়ই তাহার সহিত দেখা করিবে। দিলীপবাবু কস্তার প্রভাবে লম্বত হইয়া দারবানকে আবেশ করিলেন—“এই বুড়াকো উপরমে লে আও।” বাবুর আবেশ তদিশা রামসিং রাইচরণকে খাতির করিয়া বলিল—চলিবে জী উপরমে; আপকা নানা সাহাব বুলাতে হে। রাইচরণ তাহার সহিত উপরে উঠিল।

লমর ও শুভ্রা উভয়েই রাইচরণকে চিনিল। রাইচরণ লমরের পদগুলি গ্রহণ করিয়া শুভ্রার নিকটবর্তী হইবামাত্র শুভ্রা বলিল, “এলো বাবা রাইচরণ, ভাল আছ তো?”

রাইচরণ ভাবিল শুভ্রা সর্বজ্ঞ, সে বিষয় বিস্ময়নেত্রে শুভ্রার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আমার নাম জাললে কি করে মা?”

শুভ্রা পুনরায় বলিল, “বাবুর শরীর ভাল তো? তোমাদের সেই রঘুনাথ খানসামার হাতে বাবু খেতে ভাল লাগতেন না রাইচরণ? রাইচরণ আরও বিম্বিত হইয়া বলিল, “তাকে ম্যানেজার বাবু জবাব দিই দিইয়েছি মা। তার জন্তে ডাক্তার বাবু বড় চটিছেন মাঠান।

শুভ্রা বলিল, “তা কত খানসামা হোটোলে আলে যার,—তা ছেলেটা বেশ ভাল ছিল কি বল রাইচরণ।

রাইচরণ বলিল, “কি জানি মাঠান ডাক্তারবাবুর তাকি বড় ভাল লেগেছিল সে চলি যাওয়ার পরে কণা মা নিজ হাতে কত রাধি দেয় কিন্তু বাবুর মনে ধরেনা। আজ কহিন ডাক্তারবাবু কণা মার সঙ্গে বড় বকাবকি কর্তিছে কণা মা কেবলই কাঁদে। আমি মনে করেছিলাম যে সেই রঘুনাথ ছোড়াটার জন্তে বাবু রাগ করে। তারপর মা আজ গেমু তোমাদের বাড়ীতে ছুটি নেবার তরে। সেখার গিরে শুনলাম তুমি নাকি বাড়ী যাবি না। মাগো বত বোম লব তোমার এই বুড়ো ছেলের। আমি মনে করেছিলাম যে কণা মা বুঝি ডাক্তার বাবুর বোঁ, তাই তার অন্তরে তোমার পায়ে

ধরি আমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেই ডাইনী মেরেটার কাছে। আজ অবল বাবু আমার ভুল ভাবিয়ে দিলে। আমার উপর দয়া করি যেরে ফিরি চল মা। আমি তোমার পথের কাঁটা নিজহাতে সরিয়ে দিব।”

দিলীপবাবু ও শুভ্রা একত্রে বলিয়া উঠিলেন, “দেখি কথা রাইচরণ?”

রাইচরণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়াছিল, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হ্যাঁ মা আমি নিজহাতে কণামাকে খুন করবো আর তা যদি না করি অমলবাবুর ছুরির মায়ে মরতে হবে তাকে। আজ ছ'বছর মার কাছে রয়েছি আমি। তারেই আমার মা—যেয়ে বলি ঠিক করি নিয়েছি—আর কারও ছুরির মায়ে মারক মরতে দেবো আমি। তা দেখতে পারবনি আমি। সে তোমার মুখের বামার আগুন লাগিয়েছে; তার সাজা হওয়া উচিত। তাই আমি ঠিক করেছি তাকে যেয়ে নিজেও কাঁদে যাব। তোমার পথের কাঁটা দূর করে আমরা মা বেটার ওপরের রাজ্যতে বেতে চাই।” বুদ্ধ নিতান্ত অনহারের ভ্রাস কাঁদিতে লাগিল।

দিলীপবাবু রাইচরণকে বলিলেন, “হিঃ বাবা, ওরকম কথা মনে করাও পাপ। প্রত্যেক মানুষ ভগবানের অংশ। তার প্রাণনাশের কলনাও মহাপাপ। শুভ্রা কহিনের জন্ত আমার কাছে বেড়াতে আর জিরুতে এগেছে। অকণের বাড়ীতে বাবে বৈকি কিরে। তোমরা আশীর্বাদ করো জন্মে জন্মে যেন ওই মরই করে সে।”

শুভ্রা বলিল—“তুমি ভেবনা রাইচরণ, আমি নিশ্চয়ই বাব সেখানে কয়েকদিন পরে। কিন্তু একটা কথার উত্তর দাও তো? তুমি বলে যে কণাকে মরতে হবে অমলের ছুড়িতে—কেন রাইচরণ অবল কি জানতে পেরেছে যে উনি আর কণা ঐ হোটোলে থাকেন?”

রাইচরণ বলিল, না মা, আমার মনে হয় এখনও জানতি পারিনি তিনি। আজ অমলবাবু আমার বলচ্ছিল কণা মার ঠিকানা বলে দিতে। তিনি জানতি পরাছেন যে মা আমার ডাক্তারবাবুর কাছেই আছেন।”

শুভ্রা বলিল “রাইচরণ তুমি আমার মা বলেছ। মার কাছে ছেলে এলে তো মা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়না, তোমায় দিন কয়েক আমার এখানে আমার ছেলের মতই থাকতে হবে বাবা।”

রাইচরণ মাথা চুলকাইয়া বলিল, “কিন্তু মা রাজে কণা মাকে আগ্লাবে কে?”

উত্তরে শুভ্রা রাইচরণকে বুঝাইল সে এখন বাটা নাই বাবু রাজিতে হোটেলের কাটাইবেন। রাইচরণ কয়েক দিনের জন্য দিলীপবাবু বাটাতে থাকিতে লম্বত হইল।

অপর একখানি ঘরে প্রবেশ করিয়া লমর শুভ্রাকে বলিল, “দেখ দিদি, গোড়ার ভেবেছিলাম যে ব্যাপারটার মোটেই উত্তেজনা নেই। এখন দেখছি রোমাঞ্চ আর খিলসে ভরা; কেবল এডভেঞ্চারটাই বাকী।

হানিয়া শুভ্রা বলিল, “আমি মরে গেলে এই ঘটনাটাকে নিয়ে তুই একটা বই লিখে ফেলিস লমু।”

লমর এই কথাটার মধ্যস্থিত হ্রাশিত হইয়া বলিল, “না, তোর সঙ্গে আর কথা বলবোনা দিদি।”

লমরের ভাব দেখিয়া শুভ্রা বলিল, “না তাই, রাগ করিসনা। তুই বাবাকে ডেকে আন আজকের প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলি।”

দিলীপবাবু কক্ষ প্রবেশ করিলে শুভ্রা ব্যাকুলভাবে বলিল, “আমার বড় ভাবনা হচ্ছে বাবা, লভ্যই যদি অমল ওদের খোজ পায় তবে একটা অবশটন ঘটী অসম্ভব নয়।

দিলীপবাবুও চিন্তিত হইয়া বলিলেন, “তাইত মা, একটা ভাবনার বিষয় হয়ে উঠলো। এসব ব্যাপারে ওরকম হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।”

লমর বলিল, “মামাবাবু টেনথেকে পড়ে অমলবাবুর আবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একথা দ্বিধাও জানে। জামাই বাবু ও কণাকে একত্র দেখলে তার আবার মাথা খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস অমলবাবু যদি তাদের একত্র ঘেঁতে পার তাহলে যে দুজনের একজনকেও জীবিত রাখবেনা।”

শুভ্রা কাতর কণ্ঠে বলিল, “তবে কি হবে বাবা, তুমিও ত আমার হোটেলের ঘেঁতে খরচ করে দিয়েছ। যদি এমনই একটা বিপদ এসে উপস্থিত হয়—লমু ছেলেমানুষ, সে কি ওকে বাঁচাতে পারবে। ঠিক যদি কিছু হয় একটা দিনও বাঁচবেনা আমি।

লমর বলিল, “আমি ছেলেমানুষ? আমি কি চিরকালই ছেলেমানুষ থাকব নাকি দিদি। পরে নিজের মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় বলিল, “দেখছিল আমার গোকলাড়ি উঠেছে। আমি বলে, একজন পাশকরা গ্রেজুয়েট। চিরকালই আমি ছেলে-মানুষ থাকব? আমি আমার পায়ে হাতদিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আমার চোখের সামনে কেউ অরুণবাবুর কোন কতি করতে পারবে না—আমার জীবন থাকতে নয়—” এই বলিয়া লমর মাতুলের পদস্পর্শ করিল।

দিলীপবাবু বলিলেন, “লমরের কথাটা উপর আমার বিশ্বাস আছে শুভ্রা, তুমি ভয় পেওনা। রাইচরণ যদি অমলকে ঠিকানা বলে না দেয় তা হলে আমাদের পক্ষে ওদের সন্ধান পাওয়াও দুরূহ।”

শুভ্রা বলিল, তা হলে আবার যত্নে ভুলিয়ে রাইচরণকে আটকে রাখতে হবে আমাদের।”

দিলীপবাবু বলিলেন, “নিশ্চয়ই।” তৎপরে তিনজনে নিজ নিজ কক্ষে গিয়া ভ্রমণের বেশ পরিধান করিলেন। শুভ্রা পূর্ববৎ ব্রীচেস, শার্ট, বুট প্রভৃতি পরিধান

করিয়া কিশোররূপ ধারণ করিল। লমর লম্বাগমে তিনজনেই বাহির হইলেন। শুভ্রা ও লমর তাহাদের মোটর বাইকে আগে চলিল—দিলীপবাবু তাহার দানবীম গাড়ীতে তাহাদের পশ্চাতে চলিলেন। হোটেলের ঘরে উপস্থিত হইয়া শুভ্রা দিলীপবাবু গাড়ীতে চলিয়া গেল। লমর গেল তাহার বৈদ্যনিদ্রা বর্তব্য পালন করিতে হোটেলের ম্যানেজারের কক্ষে।

গাড়ীতে বলিয়া পিতাপুত্রী কলিকাতার লক্ষ্যার শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ছইদ্বিগের রাজপথের বিদ্যাত বাতি জ্বলিয়া উঠিল—নবীন প্রেমিক, প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী, বৃদ্ধ ও পৌত্রগণপূর্ণ শত শত বিবিধ রংয়ের মোটর গাড়ী বিবিধ স্তরের বাণী বাজাইয়া বিদ্যুতবেগে ছুটিতে লাগিল। লিনেনমা গুলিতে নানাবর্ণের রঞ্জীণ আলো জ্বলিয়া উঠিল। রেডিওতে কোন এক সুরষ্টির কথাস্বর তানিয়া উঠিল।

“বলন্ত জাগ্রত ঘরে

তব অবগুপ্তিত কুপ্তিত লোচনে

করোনা বিড়ম্বিত তারে।”

কয়েকজন কাগজের ফুলওয়াল গাড়ীর নিকটে আলিয়া দ্বিতমুখে বলিল, ফুল নিবেন হজুর—দশ পোয়লা দরজন।”

লম্বুখন্ড নিউ লিনেনমার লাউড স্পীকার হইতে উচ্চ কনসার্ট স্বরিতে বহুজাতীয় নাগরিক লেখানে তিড় জমাইয়া ফেলিয়াছে। হ্যাপি বয়, ম্যাগনোলিয়া আইনক্রীম হকারগণ “আইনক্রীম হ্যাপি বয়—” ইত্যাদি নানাবিধ বিকৃত সুরের আগওয়ালে কনসার্টের সুরের ব্যাখ্যাত জমাইয়া দিতেছিল। প্রতি পাঁচ মিনিট ঠাং ঠাং শব্দ করিয়া স্বাক্ষরপূর্ণ ট্রাম কারগুলি লম্বাে চলিয়া বাইতেছে, তাহাতে বহু রঞ্জন বহু পরিহিতা বাজালী ও ক্রিস্টিভ তরুণী তরুণমতি যুবকদের গাড়ী চাপা পড়িবার সুবিধা করিয়া দিতেছে। কিয়ৎ দূরে সেলুলয়েডের

দ্রব্য লহিত একটা বোঝানে করেকজন
হিন্দুস্থানী বণ্টা নাড়াইয়া চীৎকার করিয়া
বলিতেছিল, “নিরে বান বাবু ছে ছে আনা
—ছে, ছে, আনা।”

কুন্ডার কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না
সে এক মনে দেখিতেছিল অরুণ কোন
গাড়ী হইতে হোটেলের আশেতেছে বিনা।
এইরূপে রাত্রি ৮টা বাজিল। দিলীপবাবুর
বলিয়া থাকিতে থাকিতে বিরক্তি আশিত-
ছিল।

লহলা উত্তরে দেখিলেন যে অরুণ ও
তাহার বন্ধু অমল একখানা বিরাট বিটুক
গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া হোটেলের মধ্যে
প্রবেশ করিল। অজ্ঞাতভাবে দিলীপবাবু ও
কুন্ডার লক্ষ্য কাপিতে লাগিল।

কুন্ডা বলিল, “যে তর করেছিলাম তাই
হোল। তোমার পারে পড়ি বাবা আমার
ঘেতে যাও হোটেল। আমার মন বলছে
ওর বিপদ অবশ্যম্ভাবী। নিজের
প্রাণ বিরেও আজ ওকে বাচাতে হবে
আমার।”

কুন্ডার ব্যাকুলতা দেখিয়া দিলীপবাবু
বলিলেন “তুমি ক্ষান্ত হও না, আমি নিজে
যাচ্ছি। অরুণের কোন বিপদ হবে না।
তুমি শান্ত হয়ে বসো গাড়ীতে। দিলীপ-
বাবু হোটেলের প্রবেশ করিলেন। কুন্ডা
সেই গাড়ীর মধ্যে বলিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহিলীর
স্তায় আশঙ্কায় ও অভিমানের কুলিতে লাগিল।

—একত্রিশ—

মামুষ বাহা মনে করে সব সময়ই
তাঁহা সত্য হয় না। এই অনিত্য পৃথিবীতে
মিথ্যার পশ্চাতে মামুষ সুরিতে থাকে।
অবশেষে এমন একদিন আসে মামুষ যখন
সত্যের লক্ষ্য পায় তখন তাহার বেহ হয়ত
কলঙ্ক, মন হয়ত অবসন্ন। জরা-ব্যাধি
তখন তাহার যৌবনকে গ্রাস করিয়াছে
অথবা মনের লম্বা শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে।



স্ব-মালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

সকল
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

লিঙ্কাতা ৪ ৪ বোম্বাই

কণা আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে অরুণকে ভালবাসিয়া সে কত বড় অজ্ঞার করিয়াছে। সে যাহাকে গত একবৎসর জীবনে সবটুকু ভালবাসা দিয়া পূজা করিয়াছে যাহার চরণে তাহার জীবন যৌবন ইহকাল পরকাল সবই ডালি দিয়াছে সে মুখে তাহাকে যতই বলুকনা যে সে তাহার প্রণয়ের মর্যাদা রাখিতে জানে বস্তুতঃ সে তাহার প্রণয়ের মন্থান রাখিতে পারে নাই। সে হয়ত তাহার প্রণয়ের মর্যাদা রাখিবার মিথ্যা মোহে তাহার নিরপরাধিণী স্ত্রী জ্রীকে বিমর্জিত দিয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে তাহার জীবনের শাস্তি-ভরী বিবাহলাগরে ভূবিতে বলিয়াছে; জগতের জুরাখেলার অরুণ আজ সর্বস্বাস্ত—সর্বস্বারা। কণা ভাবিল অরুণের এই শোচনীয় অবস্থা তাহারই জন্ত হইয়াছে। সে নিজকে বাঁচাইবার জন্ত দুইটা মহিমাময় জীবনকে মরণের পথে টানিয়া আনিয়াছে—তাহাদের জীবনে কণা আশিরাহিত সর্বগ্রামী প্রতিশ্রুতির মত, বজ্রার মত, প্রলয়ের ভূমিকম্পের মত বিভীষিকাময়ী রূপ লইয়া।

কণার জীবনে উপযুগপরি বিপৎপাতে, আঘাতে কণা ঈশ্বরকে নিজের পরমমৈত্রী মনে করিত। বারংবার ইচ্ছা হইলেও সে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার বাগনা পরিত্যাগ করিত। আজ আর সে নিজকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে অশ্রুনিজনেত্র করজোড়ে ভূমিতে বসিয়া পড়িল ও বলিতে লাগিল, “ওগো প্রভু, আমাদের বেহমনের অলক্ষ্যে কোন অজানা রাজ্যে বসে আছ তুমি, তা আমি জানি না—তুমি চিরনিজিত কি চির-জাগ্রত তাও বুঝতে পারিনা। তোমার তৈরী এই শাস্তিময়ী পৃথিবীতে আমার তুমি দৃষ্টি করেছিলে চির অশান্তি ভোগ কর্তে; তার জন্তে তোমার দোষী করছিনা হেব।—যদি মাজুদের মনের বেহনা

বুঝবার ক্ষমতা থাকে, যদি তার ভাষা শুনবার কান ও শ্রোণ থাকে তোমার—ওগো ধরাময়, ওগো অনাথের নাথ, ওগো ঈশ্বরের ঈশ্বর শুধু এইটুকু করো আমার জীবনের বিনিময়ে যাদের ভালবাসতাম আমি সব চেয়ে বেশী, তাদের হৃদয়ে শাস্তি ফিরিয়ে দিও—তাদের মিলন চিরন্তন করো, তাদের ভূমি স্থখী করো।”

কণা আবার বহুকণ কাঁদিল—কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল মেঝের উপরেই নিতান্ত অবসন্নভাবে। বৈকালে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, লারাধিনের অনাহারে কণার হেহ হর্ষল বোধ হইতেছিল, তথাপি সে উঠিল—স্নান করিল—একটা চওড়া লালখোঁড় শাড়ী পরিধান করিয়া ললাটে একটা স্নবুহত সিন্দুর বিন্দু আঁকিয়া দিল। তৎপরে হোটেলের এক চাপরালীকে ডাকাইয়া দুই টাকা তাহার হস্তে দিয়া ফুলের মালা ও ফুল আনিতে আদেশ করিল।

সে এইবার আলমারী হইতে তাহার স্ততভ্রাতার ছবিখানি বাহির করিয়া আপনার লম্বা শক্তি দিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার অশ্রুর উৎস আজ আর কোন বাধাই মানিল না। সে সেই চিত্রকে লক্ষ্যে ধরিয়া বলিল, “হায়া, যাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পারতে না, আজ তাকে ভুলে কেমন করে নিশ্চিত হয়ে আছ? একদিনও কি বুঝতে পারনা কি দুঃসহ জীবন বাপন করতে হয় আমাকে?”

কণা কাঁদিতেছিল এমন সময় চাপরালী ঘরে প্রবেশ করিয়া ফুলের মালা ও বিবিধ রকমের ফুল রাখিয়া চলিয়া গেল। কণা তাহার ভ্রাতার ফটোটিকে বিবিধ পুষ্প মনোরমভাবে লাজাইল ও জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল পরলোকে সে যেন তাহার ভ্রাতার শ্রীচরণপ্রান্তে পৌছিতে পারে।

ধীরে ধীরে লক্ষ্যের অন্ধকার অন্তগামী সূর্য্যের রক্তিম রেখাকে গ্রাস করিল।

হোটেলের কক্ষগুলিতে বৈদ্যুতিক বাতি জলিয়া উঠিল। বহু তরুণ-তরুণীর কণ্ঠস্বরে হোটেলের বিরাট সৌধ সুধরিত হইয়া উঠিল। হোটেলের ম্যানেজারের কক্ষ পুনঃ পুনঃ টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতে লাগিল—চাপরালী ও বয়স্ক খাড়া-দ্রব্য ও রঙ্গীন পানীয় লইয়া ছুটোছুটি করিতে লাগিল। হোটেলের ঘরে একটীর পর একটা মোটর আলিয়া পামিতে লাগিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোটেলের ডাইনিং টেবিলগুলি বিবিধ জাতীয় তরুণ-তরুণীতে পূর্ণ হইয়া গেল।

হোটেলের সকলেই ব্যস্ত—সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপ্ত—লম্বা গৃহীত আনন্দ কোলাহলে সুধরিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু কণা আপনার কক্ষের বাতিটা পর্য্যন্ত জ্বালিল না। সে সেই কক্ষের অন্ধকারে বসিয়া আপনার অভিশপ্ত জীবনের অতীত আঁকড়ায়া ধরিয়া রহিল। সে তাহার জীবনের যবনিকা নিজ হস্তেই আজ টানিয়া ধিবে এ বিষয়ে সে তাহার চিত্ত স্থির করিয়াছে। অরুণ চলিয়া গেলে সে একা-কিনী এই হোটেল ত্যাগ করিবে এবং গভীর রাত্রিতে ভাগীরথীর শীতল বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিবে এই তাহার করণ।

লক্ষ্য লাড়ে লাটট। বাজিলে কণা উঠিয়া বাতি জ্বালিল ও একটা কাগজে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার লাহেবের নামে পত্র লিখিল—

স্বাত

বঙ্গ ৪৫ মাস যে কারণেই হউক তৈরী বনৌষধিতে অর্থাৎ ফল—গর্ভাবস্থার ব্যবহার নিষিদ্ধ ১৪০ দস্ত ও কর্ণ শাস্তি একবার প্রয়োগেই উপশম, ৪০ মাস ১৮০ আনা



সময় ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস বনজ বিশারদ
১৮২ নং বহাজার স্ট্রীট, (K) কলিকাতা।

“মাননীয় মহাশয়,

আমার জীবনে বিড়কা ধরিয়াছে।
এই জীবনের বিগত বিশ বৎসর আমি শুধু
নাৎনারিক আবেগে পড়িয়া মৃতকর হইয়াছি
তাই আজ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিলাম।
আমার মৃত্যুর জন্ত কেহ দায়ী নহেন বা
কোন বিষয়ে কাহারও বিরুদ্ধে আমার
অভিযোগ নাই। ইতি

তারিখ) কণা দেবী
৮-১১-১৩৪০ ক্রম নং ৫২
.....হোটেল”

আরও একখানি পত্র অরুণের নামে
লিখিয়া অশ্রুজলে সে খামখানিকে লিঙ্ক
করিয়া বন্ধ করিল। পূণ্যায় সে সুইচ
টিপিয়া ঘরের আলোটা নিভাইয়া বাতায়নের
পার্শ্বে আলিয়া দাড়াইল। রাত্রি লাড়ে
আটটার অরুণ ও অমল তাহার কক্ষদ্বারে
আলিয়া উপস্থিত হইল। অরুণ বাহির হইতে
ডাকিল, “রাইচরণ, রাইচরণ?” ভিতর
হইতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অরুণ
ডাকিল, “কণা” তথাপি কোন উত্তর নাই।
অরুণ অমলকে বাহিরে থাকিবার অনুরোধ
জানাইয়া কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া
বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিল। অরুণ দেখিল
কণা প্রস্তর মূর্তির স্থায় বাতায়ন প্রান্তে
দাড়াইয়া শুকা একাধরীর চক্ৰমার দিকে
চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার জ্ঞান বা লজ্জা
আছে বলিয়া অরুণের মনে হইল না। সে
তাহার নিকটে গিয়া স্বল্পে দুইটা হাত রাখিল
ও লগ্নে কণা ডাকিল, “কণা।” কণার
চক্ষু ডাকিল, সে অরুণ প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া
তাহার অবনত মস্তকটা অরুণের চরণপ্রান্তে
নত করিয়া বলিয়া পড়িল। তৎপরে কহিল,
“আমার জীবনের শেষ লাধ রাখতে হবে
তোমার, তুমি এখানে একটু বসো।” অরুণ
উপবেশন করিলে কণা একরাশি ফুল আলিয়া
অরুণের পদপ্রান্তে পূজারিনীর স্থায় অঞ্জলি
দিল। অতঃপর সে মালাটা হাতে লইয়া

বলিল, “এই আমার জীবনের শেষ পূজা।”
এমন সময়ে নিতান্ত পরিচিত কণা ডাকিল,
“কণা।” কণা ফিরিয়া দেখিল মাত্র কয়েক
ফুট দূরে দাড়াইয়া রহিয়াছে তাহারই পূর্ব
প্রণয়ী অমল।

কণা বিশ্বয়ে, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।
তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, পদতল হইতে
পৃথিবী যেন প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া চলিল।
তাহার কণ্ঠভালু পর্যন্ত শুকাইয়া গেল—
অমল কণার নিকটে আলিয়া কণাকে ধরিয়া
ফেলিল বটে কিন্তু কণা মস্তমুগ্ধার স্থায়
তাহার পদতলে বসিয়া পড়িল।

অমল শাস্ত ও সরলকণ্ঠে বলিল, “আমি
জানি কণা আমার অত্যাচারে ও অবিচারে
তুমি এতখানি নীচে নেমে এসেছ। তোমার
এ পাপের জন্ত দোষী তুমি নও—এর জন্তে
দোষী আমি। আমার পাপের শাস্তি ভগবান
আমায় দিয়াছেন কণা এবং গত কয় বৎসর
ধরে আমি প্রায়শ্চিত্তই করছি। আজ আমি
এসেছি তোমার শাস্তি দিতে নয়, অভিযোগ
জানাতে নয়, কঠোরতা দেখাতে নয়, আজ
আমি তোমায় ফিরিয়ে নিতে চাই—আমার
রক্ষিতা হিসাবে নয় আমার আশ্রিতা হিসাবে
নয়—আমার জীবনের লজিনীরূপে, আমার
সহধর্মিনীরূপে—আমার ধর্মপত্নীরূপে—
আমারই বাড়ীতে আমারই মা বাবার চরণ-
প্রান্তে—আমার সমাজে।”

কণা কিছুই বলিল না; তাহার মস্তকটা
ঠিক অমলের দুই পায়ে মাঝখানে আলিয়া

পড়িল। অরুণ মুখিল কণা অমলের পায়ে
আত্মদগ্ধর্য করিয়াছে। জ্ঞানে কি অজ্ঞানে
কণার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। অরুণের
তাহা দেখিবার কি ভাবিবার মস্তক ছিল
না। সে মস্তকপে পিছু হাটিয়া হোটেলের
কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং
উন্মাদের স্থায় নীচে নামিয়া আলিয়া তাহার
গাড়ীর সম্মুখে দাড়াইল ও লোককে
নামিতে ইচ্ছিত করিল। লোকের গাড়ী
হইতে নামিয়া আলিলে অরুণ তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিল গাড়ীতে কয় গালন পেট্রল
আছে। লোকের তাহাকে জানাইল কমপক্ষে
আট গালন হইবে। অরুণ তাহাকে বাটী
বাইবার আদেশ করিয়া স্বয়ং গাড়ীর ড্রাইভিং
সীটে উঠিয়া বলিল ও দেলকুটার টিপিয়া
ধরিল।

শুভ্রা পিতার গাড়ীতে বসিয়া সকলই
দেখিতেছিল। অরুণকে দেখিয়াই সে মুখিয়া-
ছিল অরুণের মানসিক অবস্থার বিশেষ
বৈলক্ষণ্য ঘটয়াছে। সেও পিতার গাড়ী
হইতে নামিয়া সময়ের মোটর লাইকেলে
উঠিয়া বলিল এবং অরুণের গাড়ীর পশ্চাতে
চলিতে আরম্ভ করিল। শুভ্রা এই সময়
একবারও কল্পনা করিতে পারে নাই এখনই
তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বহুদূরের যাত্রী
হইতে হইবে।

(ক্রমঃ)

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্তোব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

বিদ্যাস্থিতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রেকর্ড সমালোচন

—এডিসন—

আজি শ্রিয়া! সেদিনের কথা পড়ে ম'নে;

সে দিনের সে আলস বিধায়ের কণে—

ডাগর ও আখি ছুটি অশ্রু ছল ছল।

তোমার মুখের কথা কোথায় লুকাল

নাহি জানি; শুধু মোর বক্ষে মাথা রেখে,

“যেতে নাহি দিব,” নরনে নিবেধ একে

জানালে আমার। তোমার ও আখি ছুটি,

আমারে নিঃশেষ কোরে নিতেছিল লুটি—

শুধু কণে কণে। গলায় হুলিতেছিল

ও বাহুর মালা। কি জানি কে কোরে ছিল

কণ্ঠ রুদ্ধ মোর, বলিতে নারিহু কিছু,

ব'ক্ষে বেঁধে তোরে, নয়ন করিয়া নীচু

অশ্রু নিম্নু চাপি। আলিঙ্গন বিদায় কণ;

বন্ধ উঠেছিল, শুধু হ হ করে মন।

তোমারে যাইতে হবে ছাড়ি ওগো শ্রিয়া

এই কথা স্মরি, উঠে দাঁড়ি উদ্দেশিয়া।

তোমার বাহুর মালা ছিঁড়ে দিহু যবে—

পর্যাপ্ত উঠিল মোর কাঁধি হাহারবে

শত শত বিরহীর আর্তনাথ সম।

তবুও রহিহু চুপে, ওগো! অনুপম!

বিদায় চাহিতে হ'ল তবু হাসি মুখে।

তুমি শ্রিয়া কেঁষে লারা, আমি ল'য়ে বৃকে

তোর ওই অশ্রু তরা রাঙা মুখখানি;

বলিহু স্বাস্থ্যনা চলে, কেন কাঁদ রাপি!

আবার আসিব ফিরে, পুনঃ আলিঙ্গনে

বাঁধিব কোমল হিয়া নিবিড় বন্ধনে।

• • •

আজি শ্রিয়া! কথা কও! চাহ মুখ ফিরে!

নিরবে ছাড়িয়া দিলে। আমি ধীরে ধীরে

বাহিরি আলিহু পথে। “নাহি দিব যেতে”

শুধু এই কথা কাণে লাগিল বাজিতে!

ঝুমুরাঙ্গ—গাম গীতি-কবিতায়

দুর্বেধ্যতা—সেনোলা ও কলম্বিয়া

রেকর্ডের সমালোচনা

আমরা আগষ্ট মাসে প্রকাশিত কয়েকখানি রেকর্ডের সমালোচনা প্রকাশিত করিলাম। কলম্বিয়া কোম্পানীর এবার চারখানি রেকর্ড সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই চারখানি ও সেনোলার দুইখানি রেকর্ড সমালোচিত হইল। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে এ বিভাগ আমরা নিয়মিত চালাইবার চেষ্টা করিব। আশা করি সাধারণ পাঠকবর্গ ও গ্রাহ্যমোক্ষণ কোম্পানীর কর্মকর্তাদের সহায়ত্ব ও সহযোগিতায় আমাদের এ বিভাগ লাক্ষ্যমণ্ডিত হইবে।

কলম্বিয়া জি, ই,—২৪৭৫—এই রেকর্ড খানিতে নবাগত শিল্পী ত্রীপাচুগোপাল বসু আবহ-সঙ্গীত সহযোগে দুইখানি কাব্যসঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন। গায়কের গলা আড়ষ্ট, রেকর্ডে প্রকাশের যোগ্য কি না সন্দেহ আছে,—গানের সুর বৈশিষ্ট্যহীন। একদিকে ‘আলিলে কোন প্রভাতে মোর প্রাণে’ গানখানির মাঝে ‘তবু পেরেছি বারতা’র পর তিনি যে তান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা তান পছন্দা তা নহেই, বরং হান্তকর। অন্যদিকে ‘চলিতে চলিতে পথে মরমে বাজে’ গানখানিও অপ্রতিভ।

কলম্বিয়া জি, ই,—২৪৭২:—শিল্পী শ্রীমতী মণিমালা সুরভীকণ্ঠে সহগায়ী সঙ্গীতের সহিত এই রেকর্ডখানিতে ‘আমি জলের ছলে পরাণ-বন্ধু’ ও ‘আমার মন

মানে না বে’ এই প্রথম পণ্ডিত বিশিষ্ট দুইখানি ঝুমুরাঙ্গ গান গাহিয়াছেন। সুরধাতা গোকুল মুখার্জি ঝুমুর গানের উপর ভিত্তি করিয়া ঝুমুরাঙ্গ নামে যে সুরের জগাধিচূড়ী কলম্বিয়া কোম্পানীর তালিকায় বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রোতাসাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, কারণ মাত্র নগদ দুইটাকা চাহ আনাতেই গ্রামা, নৃত্য প্রভৃতি সকল রকম সুরের বৈচিত্র্য, যুগ্ম, একতারা প্রভৃতি যাবতীয় বাস্তব-যন্ত্র, জমজমাট সহগায়ী সঙ্গীত ও ততোধিক ভয়ানক চীৎকার প্রাপ্তব্য রেকর্ডটি ধামিলে মনে হইবে শ্রোতা বাজা হইতে বাহির হইয়া আনিলেন। যাহা হউক তাহার উপর শ্রীত্রী৮রাধাকৃষ্ণের চির পরিচিত প্রেম-লীলাকে কেন্দ্র করিয়া গান রচিত হওয়ার সকলরূপ কৃতি-লক্ষ্য শ্রোতা পক্ষে রেকর্ডটি পছন্দ হওয়াই তো উচিত অত্যা কোম্পানী আর কি করিতে পারেন।

কলম্বিয়া জি, ই,—২৪৭৩:—শ্রীহেম কুমার মুখার্জি ‘দেবতা ফিরিয়া চাও’ ‘তোমারে চাহিয়া শ্রিয়’ এই আধুনিক গান দুইখানি এই রেকর্ডে পরিবেশন করিয়াছেন গান দুইখানি সুর-বৈচিত্র্যহীন,—সুর-হী বলিলেও চলে, কারণ যেটুকু সুর পাওয়া গেছে সেটুকু যথার্থ সঙ্গীতের সুর বলিলে অত্যা হইবে। প্রথম গানখানির গোড়ার দিকে ‘তোমার আশায়’ এই স্থলে শিল্পীর ক শ্রোতার আশাত্ত করিয়া সেই যে গাড়াই লাগিল তাহার বিরতি রেকর্ডে পরিমণ্ডিত। অতঃপর গানের রচনা



শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে হাসি-
কান্নার ভরা, অপক্লপ বাংলা
বাণী-চিত্র—

প্রযোজ-শিল্পী :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র-শিল্পী :

যতীন দাস

শব্দ-সম্পাদী :

নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ .

ভূমিকায় : রাণীবালা, দেববালা, ছান্না,
নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল
রায় (এঃ), যুগল ঘোষ, হুমায়ূন পাল
(হাঁড়ুবারু), কুমার মিত্র, তুলসী
চক্রবর্তী, জ্ঞানকী ভট্টাচার্য, অমল
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে

১৩ই আগস্ট
উত্তরা-য়
প্রথমারম্ভ

কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল, কারণ আজকালকার বাঙলা গানের অর্থের তো কোন বাংলাই নাই, শুধু শুটকতক মনোহারী লাগলেই কথা সাজান হইলেই—ব্যাংক,—ইহারও দ্বিতীয় গানখানিতে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যাবের চার পঙ্ক্তি—

“ভেবেছিলাম তুমি ফুল

লহনা তাজিল ভুল

যাবার স্বপন তুমি

হল না তোমারে পাওয়া ॥”

ইহার অসংলগ্নতার আমাদের এই বলিতে হয় যে অর্থহীন প্রাণ লকলের পছন্দ নাও হইতে পারে।

কলহিয়া জি, ই, ২৪৭৪ :—এই রেকর্ডে নবীনা গায়িকা কুমারী তরুণপ্রভা লিহরায় ‘এইতো আমার জয়’ ও ‘তোমার যাবার কালে’ এই দুইখানি আধুনিক গান গাহিয়াছেন। গান দুইখানির সুর এক্ষেত্রে এবং আধুনিক গানের কোন মাধুর্যই কুমারী তরুণপ্রভার কণ্ঠে পাওয়া যায় নাই। তাহার উপর দ্বিতীয় গানের চার পঙ্ক্তি লক্ষ্য করুন,

“যেথা খেলে বনছায়া

আজো সেথা তব মায়ার

জলজল চাওয়া তব

বদমার জোছনার।”

ইহার মধ্যে ‘বদমার জোছনার’ পদার্থটি যে কি, তাহা বলা কঠিন। তবে আমাদের মনে হয় ‘জোছনা’ হলে কোন বিদ্রোহাচক শব্দ হইবে, তবে মিলের তাড়নার অজান্ত গীতিকার ‘কণপ্রভার’ শব্দের গাভীরো ও হুন্দপতনের আশঙ্কায় ‘জোছনা’র পরিণাম হইয়াছেন। বাহাই হউক অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক আধুনিক গান ‘জোছনাতেই কাটিয়া যাইবে।

মেনোলা কিউ, এম,—৩২২ :—শ্রীমতী নীলমা ব্যানার্জি (রানীবালা) এই রেকর্ডে ‘কত পূজা হ’ল মায়ার’ এবং ‘আমার দীপ

নিভিল ঐ’ এই দুইখানি আধুনিক গান বিতরণ করিয়াছেন। সুর-সংযোজনায় ধোঁষে গান দুইখানি স্রুতিস্বত্বকর হয় নাই। গান দুইখানির রচয়িতা খ্যাতনামা তরুণ গীতিকবি শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য কিন্তু অবশেষে তাঁহার রচনাও সাধারণ ধোঁষে দুই কষ্টের দুর্কোষ হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় গানখানির এক অংশ,

“সাধ ছিল মোর লক্ষ্যাতীরে

লতার মত রইবো ঘিরে,

এ সাধ কবে লফল হবে

তারি আশে রই।”

‘লক্ষ্যাতীর’ কোন স্থল যেখানে, অথবা কেন্দ্র্য যাহাকে ‘লতার মত ঘিরে’ থাকিবার প্রয়োজন হয় আমরা বুঝিতে পারি নাই।

মেনোলা কিউ, এম,—৩২৩ :—তরুণ গায়ক শ্রীকটাপর পাইন এই রেকর্ডে দুইখানি শ্রীমা-লক্ষীত গাহিয়াছেন। একদিকে ‘কালো মায়ের কালি দিয়ে’ ও অন্যদিকে ‘সবাই তোরে জবাব পূজে’ রেকর্ড করা হইয়াছে। ‘সবাই তোরে জবাব পূজে’ গানখানি বরূপ ওস্তাদীভাবে আড়ম্বরের সহিত আরম্ভ হইল, ভেবেছিলাম শ্রীমতী বোধকর উচ্চশ্রেণীর কিছু

গান

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্তী

আমি তোমারি গান গাইরে বন্ধু
তোমারি গান গাই।

আমার একতারিতে তোমার নামের
সুর মিলায়ে যাই ॥

তোমার ভঙ্গুরা কালো নয়ন দু’টি,
প্রাণ মুকুরে ওঠে ফুটি;

তোমার স্বপ্ন পরশ স্বপ্না,

আমার প্রাণে পাই ॥

আমি তোমারি গান গাই ॥

সুখী যখন অন্তাচলে,

ক্লান্ত হয়ে পড়ে চলে,

প্রাণের গাঙে গানের তরী

ভালিয়ে ঘিরে যাই ॥

আমি তোমারি গান গাই ॥

দান ক’বেন; হার, হার, মনের আশা মনেই
র’হিয়া গেল, নেই গতানুগতিক ভাবেই এক-
ধেয়ে গান চলিল। সুর-সংযোজক শ্রীসুরনাথ
মজুমদারএর নামই রহিয়া গেল, নামের
প্রভাব আর গানে বিস্তৃত হইল না।

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী !



গ্যারান্টি চিরস্থায়ী !!

ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য
পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত
আধুনিক ধরণের লকল রকম গহনা
পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ
সোণার স্নায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্ম পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিল্ডিকেট

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

কোন : বি, বি, ৪৮২২



শ্রীশ্রী গুপ্ত

আবার নভারো

বহুদিন পরে আবার রামান নভারো! এবার ওর নতুন ছবি হবে, 'এ্যাজ ইউ আর'। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, কোন নাম করা অভিনেত্রীকে নভারো আর ওর প্রগতিশীল সাজতে হবে না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, নভারোর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় (!) করবার জন্তে হলিউডের প্রত্যেক খ্যাতিনামা নটীই বিশেষভাবে লালসিত। আমার মনে হয়, সেইটুকুই তারা জীবনের পরম সম্পদ ও নোভাগ্য বলে মনে করে। কিন্তু নভারো অবলীলা-



রামান নোভারো

ক্রমে এই রূপলীনের সাহসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে—না, থাকে তাকে এ সুযোগ দিতে আর ও রাজি নয়।

এ নোভাগ্য সুযোগ স্টেডে ওয়ের তুলনায় একটি অখ্যাতনামা মেয়ের অন্তরে। 'এ্যাজ ইউ আর' নভারোর নারিকা হবে 'মার্গারেট ট্যালিসেট'। নাম শুনেছেন এর ৭...বর্ষস্বী তারকা না হলেও শ্রীমতী ট্যালিসেট রূপালী পর্দায় ইতিপূর্বে ছ একবার আত্মপ্রকাশ করেছে। আপনারা দেখে থাকবেন ওকে 'এ টার ইজ বর্ণ' ছবিতে। তবে নারিকার অংশাভিনয় ওর ভাগ্যে এই প্রথম।

অবশ্য, মেয়েটির এ নোভাগ্যের জন্তে অনেকখানি দায়ী সুপ্রসিদ্ধা তারকা ক্যারল লম্বার্ড। শ্রীমতী লম্বার্ডই মার্গারেট ট্যালিসেটকে আবিষ্কার করেছিল—একটা টাইপ রাইটের পিছন থেকে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। নভারোর নতুন ছবিতে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণা হবে মেরিয়ন মার্শ।

হঠযোগী নভারো

সাগরপারে হলুদ কণ্ড। রামান নভারো নাকি হঠযোগ অভ্যাস করছে। ইতি মধ্যেই চারদিকে কাণাকাণি শুরু হয়ে গিয়েছে: হঠযোগী নভারো! হঠযোগী নভারো!!...

প্রাণপণ মাথা নেড়েও নভারো গুজব-টাকে উড়িয়ে দিতে পারে না। বেচারি বারবার বলে: না, না, আমি হঠযোগী নই;—হঠযোগের ধানকতক বই পড়লেই হঠযোগী হওয়া যায় না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। যথাপূর্ব্ব তথা পরম!...

অগত্যা নিকপায় নভারো কাগজে এক বিবৃতি প্রকাশ করেছে: একদিন এক তত্ত্বলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে মত প্রকাশ করলেন আমাকে যেন খুব স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন আজকাল আমি কি কি বই পড়াওনো করছি। অস্ত্র অস্ত্র বই-গুলির মধ্যে আমি হঠযোগ লব্ধকো কতকগুলো বইয়ের নাম করেছিলাম। তাকে ভাল করে বুঝিয়েও দিয়েছিলাম যে, 'যোগ' মানে প্রভু বা শ্রেষ্ঠ-সাধনা, হঠযোগের বিষয় হলো নিজের মনকে লব্ধী ও উন্নত করে তোলবার উপায় সমূহ। এর মধ্যে ধর্ম অধ্যর্থের কোন কথাই নেই।

কিন্তু লেখিকার এই কথাটাই যে আমার পক্ষে এতবড় দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে বাড়াবে তা কে জানতো।

রজাস ও টেম্পার

উচ্ছলিত যৌবনের লীলা তরঙ্গে চলে চলে চলে রূপালী জিজ্ঞার রজাস। 'রজাস' এ্যাস্টোরাল টিম' ভেঙ্গে যাওয়ার ওর তত ক্ষতি হয় নি যতটা না এ্যাস্টোরালের হয়েছে। বস্তুত: উক্ত টিমে রজাস ও এ্যাস্টোরালের লব্ধ যে কোনও দিন বিচ্ছিন্ন হবার তা' কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি; ওরা হুজনে হুজনের সঙ্গে এমন অদ্বাদীভাবে



জিজার রোজাস

জড়িত ছিল যে রজাসকে মনে পড়লেই তেলে উঠতো এ্যাটোরারের ছবি, আবার এ্যাটোরারকে ভাবলেই মনে পড়তো জিজার রজাস। এদের এককে বাধ দিয়ে অস্ত্র যে চিত্রজগতে টিকে থাকতে পারে এ ছিলো সকলের ধারণার অতীত। কিন্তু আজ এত বড় দুর্ঘটনায় (যদিও এটা অনেকদিনের কথা) রজাস একটুও বিচলিত হয়নি, সেই চকিত চঞ্চল রূপসী তরুণী আজও তেমনি।



মার্লে ওবরণ

আজ জিজার রজাস একাই দর্শকদের কাছে একটি অতি বড় বিশিষ্ট আকর্ষণ, ওর জনপ্রিয়তা আজ আর কাউকে গ্রাহ্য করে না।

রজাসের নতুন নায়ক জেমস ট্রুয়াট। ওদের দুজনকে একত্রে দেখা যাবে 'ভিভিলিস লেডী' নামক নবতম বাণী চিত্রে। নায়িকা জিজার রজাস, নায়ক জেমস ট্রুয়াট। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ডগলস ফেরার ব্যাঙ্কস (হোট)।

আজন্ম বীমা

ইয়াট ক্লাবের সভ্য চারজন সম্প্রতি এক অদ্ভুত লভে জীবন বীমা করেছে।



মরিন ও সুলিভ্যান

বীমার লভ এই যে, আটটল এণ্ড মডেল 'আব্রড' ছবি শেষ হবার আগে যদি তাদের চারজনের যে কোনও একজনের মৃত্যু হয় বা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে অস্ত্র তিনজনের প্রত্যেককে ৫০০০ পাউণ্ড বা প্রায় ৭৫০০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হবে।

কিমি কার্ণ (লর্দার) বিলিয়ান, জর্জ কেলী ও চালি এ্যাডলার—এই চারজন সভ্যই একবাক্যে বলেছে: আজ আট বছর আমরা একসঙ্গে আছি। আমাদের মধ্যে কখনও কোন মনোমালিন্য উৎপস্থিত হয়নি।



গ্রেটা গার্বো

বাণী চিত্রে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

স্বাস্থ্যরেল গোণ্ডাইনের নবতম ছায়াচিত্র 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড'। ছবিখানা আগাগোড়া বিলাতের সুবিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুলিশের কীত্তিকলাপে ভরা। গোণ্ডাইন স্থির করেছেন, সুপ্রসিদ্ধ বাণীচিত্র 'ডার্ক এ্যাঙ্গেল'এর খ্যাতিনামা তারকাড্রয় ফ্রেডরিক মার্শ, মার্লে ওবরণ, হাবাট মার্শালকে আলোচ্য ছবির তিনটি বিশিষ্ট অংশে নিযুক্ত করবেন। কল্পনা যদি কার্যো পরিণত হয়, তবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা 'রোরান'এর সুমিকায় অভিনয় করবেন ফ্রেডরিক মার্শ, ডিউক অব ওয়েলিংটন' রূপে হাবাট মার্শাল, লেডী মেলবোর্নরূপে মার্লে ওবরণ।

খুচরো: খবর

ছ হপ্তা পুরো বিশ্রামের পর ঘেরিয়ে ও' সুলিভ্যান ফিরে আসছে জর্নি উইলমুলারের কাছে। পুরোহমে চলছে ওদের ছবির কাজ। টারজনকে আপনার মনে আছে তো?

* * *

রহস্যময়ী গার্বোর মতন ছবি 'নিনোচ্কা'। প্রীমতীকে দেখা যাবে রাস্তার একজন দুর্দ্বর্ষ কমিউনিষ্টরূপে।

* * *

গেলবারে একটি মেয়ের অদ্ভুত তারকা-প্রীতির কথা বলেছিলাম, এবারে আর একটি মেয়ের লক্ষ্যন দিচ্ছি। ১৪৯৫ খানা ছবি ওর প্রিয় তারকা শালী টেম্পলের জমিয়েচে ও। অবশ্য এটা আগের মত তত চমকপ্রদ নয়, কিন্তু ব্যাপারটা যথেষ্ট প্রশংসনীয় নয় কি?



ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শনির 'বাণু' সজনী দাস

কথার আছে—“কালে বাণুও পণ্ডিত হবে।”—কথা কলিরাছে। সেই ভবিষ্যৎ কাল’ আজ আনিরাছে। শনির ‘বাণু’ সজনী দাসই ‘পণ্ডিত’ বনিরাছে। দুর্গা-পুজি মাথায় করিয়া ঔতাকুড় ঝুটিতে ঝুটিতে লহসা দে গোবেষণার মাঠে বেধা দিয়াছে। বিশ্বাস না হয়, ১৩৪৩ সালের ‘সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা’র প্রকাশিত তাহার বাংলা অঙ্করে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান’ নামক প্রবন্ধ লকলে পাঠ করুন। উহা পড়িলেই, আমাদের বিশ্বাস, ঠাকুরদাস বাবুর লিখিত সেই—“চৌর্য-শিল্পের” কথা অনেকের মনে পড়িবে।

শনির ‘বাণু’ সজনীদাস ‘পরিবৎ-পত্রিকা’র পক্ষে “বাংলা অঙ্করে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধানে”র যে আবিষ্কার-কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া বিবৃত করিয়াছেন, তাহার এক-হানে ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এ মার্চ তারিখের Calcutta-Chronicle’এ প্রকাশিত এই বাঙ্গালা-বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—“ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের লিখিবার কারণ এক যি অতি শিশু ছাপাখানার তৈয়ার হইবেক সাহেবলোকে বাঙ্গালা কথা লিখিবেক এবং বাঙ্গালিলোকে ইংরাজি কথা লিখিবেক অত-এব লকল লোকের কেফাএত কারণ এই যি তৈয়ার করা জাইতেছে জে জে লোকে গাছে তাহারি মেং আব্জন (Mr. Upjohn) সাহেবের ছাপাখানার আনিয়া লইবেক ইতি শন ১৭৯২ ইংরাজী তারিখ ১৯ মার্চ লন

১১৯৮ বাঙলা তারিখ ৯ চৈত্র।”—কিন্তু আর চৌদ্দবৎসর পূর্বে—অর্থাৎ, ১৩২৯ সালের ভাদ্রমাসের ‘নারায়ণ’-পত্রে শ্রীযুক্ত বোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় “ইয়ং-বেঙ্গল ও বাঙ্গালা অনুবাদ-সাহিত্য” নাম দিয়া যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহার মধ্যে অবিকল ঐ বিজ্ঞাপনটিকে লকলে দেখিতে পাইবেন। অথচ মজা এই যে, “বাণুর লেখার ‘নারায়ণ’ পত্রের নাম-গন্ধ নাই। পাছে লোকে তাহার এই ‘আবিষ্কার’কে (?) আনুকোরা না বলে, এই ভয়েই বেচারি উহা চাপিয়া গিয়াছে। সুতরাং ‘বাণু’ পণ্ডিত হয় নাই, এ কথা কে বলিবে?

কলকতায়ের আমেরিকা আবিষ্কারের চেষ্টাও বড় এই ‘আবিষ্কার’ের জন্ত পরিবৎ-মন্দিরে অনেক ঢাক-ঢোল অবশ্য বেজনেরা বাজাইরাছে। বাজাইবারই কথা। কারণ, চৌর্য-শিল্পের ইহাও একটা অঙ্গ। ঢাক-ঢোলের আওয়াজে অনেক সময় ‘নকল’ চলিয়া যায়, ‘আলল’ চাপা পড়ে। ঠাকুরদাস বাবু লিখিয়াছিলেন,—“চৌর্য-শিল্পের দোন্দর্যের ভারতীয় কার্য-কৌশলালুনাতেই হয়, জব্যতেহে নয়।……বেঙ্গা ডোম অপর লোকের বাগান ও বাড়ী হইতে ডাবটা-আলটা আর কলাটা-কচুটা, খালা-খানা-কাঁসিখানা চুরি করিয়া হাটে-বাজারে বেচে; কিছু কিছু পরল পায়; উষরে ছুটি অন্ন দেয়। আর ব্রজবাবু অপর লোকের লেখা হইতে ভাবটা আলটা আর ভাটা-কবিতাটা চুরি করিয়া হাটে-বাজারে

বাহির করেন; খুব খানিক খ্যাতি পান। বেঙ্গা ডোম ও ব্রজবাবুতে বিভেদ কি? ডোম বেটার ও বাবুটিতে কার্যগত বিভেদ কিছুই নাই। উভয়েই এক সম্প্রদায়স্থ শিল্পী।”—ঠাকুরদাসবাবু এই কথাগুলি কতদিন আগে লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজ উহা কি কঠোর সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে!

* * *

এই অবসরে আর একজনের একটি পুরাণো কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বহুকাল পূর্বে, গিরিশচন্দ্র এড্বেশের একশ্রেণীর সম্পাদক-উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন,—“ইহারা ভবঘুরে, যেখানে সেখানে বান। এদিক ওদিক হু’একটা ছোট-খাট সমাজে গিয়াও বলেন। জ্যাঠামীতে বাঁহাতে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ হয়, সেই লকল কার্য দ্বিবা-রাজি করিতে থাকেন। ইহারা লকল পুস্তকেরই সমালোচক। ……ইহারা বালক বয়সে গৌক কামাইরা ও খোটা চাষর লইয়া বিজ্ঞ লাগেন। প্রত্যেকে কুকুরের জায় বাঁহাদের অনুবর্তী হন, পরোক্ষে তাঁহাদের স্তম্ভিত পত্রে ঐলকল মাস্তগণ্য ব্যক্তির কুৎসা রচিত হইয়া বিক্রীত হয়। এই লকল অধমাত্ম্যের প্রতি সমাজের লক্ষ্য পড়া উচিত। সম্পাদক বলিয়া তাহাদের আদর করিলে, আকাট মূর্খদের আদর করা হয়। তাহাদের কুকুর-প্রকৃতি বলিলে কুকুরকে গালি দেওয়া হয়।”—কথাগুলো ‘বানি’ হইলেও এখন বেন আরও সত্য—আরও ঘিট লাগিতেছে। কারণ, এখন ঐ শ্রেণীর সম্পাদকেরা শুধু জীবিত মাস্ত-গণ্য ব্যক্তির কুৎসা রচনা করেন না—মাস্ত-গণ্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশেও কলকের কালি ছিটাইয়া আরও নীচতার পরিচয় প্রদান করেন। ইহার প্রথম প্রমাণ—‘অগ্রগতি’। দ্বিতীয় প্রমাণ—‘অগ্রগতি’রই ভাষ্য-তাই ‘শনিবারের চিঠি’। এই কাগজখানা সাহিত্য-মন্ডাট বড়িচন্দ্রের

রচনার যে কেবল কথ্য ব্যাখ্যা করিতেছে, তাহা নহে; সম্প্রতি মহাকবি গিরিশচন্দ্র সর্দকেও লিখিয়াছে—“গিরিশচন্দ্র ঘোষ জীবনে উদারচরিত্র ‘মাই ডিয়ার’ লোক ছিলেন; মৃত্যুর পরেও তিনি গিরিশ-পার্কের ভাস্কর হইতে আরম্ভ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ রায় পর্যন্ত বহু রসিক ও রসক্যাপাকে তাঁহাকে কিলাইয়া কাঁচুকুঁ দিয়া রস জমাইবার অনুমতি দিয়াছেন।”—কি ‘স্বপ্ন রসিকতা’! ‘বাগু’ এখন বাঁচিলে হয়! বঙ্কিমচন্দ্রের মাথলা প্রমুখে পুলিশকোর্টের অতিরিক্ত প্রধান প্রোভিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিন্দাল লেখেন বলিয়াছেন—
বাঙ্গালার লেখার অপব্যবহার ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্যের চেরেও লক্ষ্য হইয়াছে।” কথাটা যে কত সত্য, তাহা শরির পাপ অমৃত-দ্বিগের পাপ লেখাগুলোই আজ সপ্রমাণ করিতেছে।

বেজেনবাবুর গোবর-গবেষণা

চালুনি বলেন—সূচ, তোমার অধোদেশে কেন ছিট? বাহার গোবর-গবেষণার নরীন্দ্রে ছিট, সে টানিয়া বুনিয়া পরের ছিটাবেষণ করিতে গিয়া পড়ে-পড়ে নাকাল হয়। তারিখ বগলে করিয়া বিশল্যকরণী খুঁজিবার চেষ্টা করিলে, অথবা পুরাতন লাইব্রেরীর ধূলা ঝাটিতে ঝাটিতে বর্ণপরিচয়—
দ্বিতীয় ভাগের পড়া হাতে-কলমে যজ্ঞ-করিবার লাহু চেষ্টা করিলে ‘হত্যাপ-ঐতি-হাসিক’ মাত্রই হওয়া যায়, আর কিছুই হওয়া যায় না। আঙ্গাইলে কি হইবে বাছ, তাড়ো যে তবানী! বেজেনবাবুর চালুনীঘের পরিচয় ‘কথক’-এর মুখেই শুনিয়া রাখুন। আমরা নিজে কিছু বলিব না, কিছুদিন পূর্বে “কথক” পত্রিকা বাহা লিখিয়াছেন, তাহাই মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

“একখানি বই হাতে আনিয়া পড়িয়াছে। বইখানি ‘রজন পাল্লিখি হাউস’ হইতে

প্রকাশিত এবং শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘হুস্তাণ্য গ্রন্থমালা’র চতুর্থ গ্রন্থ—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচিত ‘বেদান্ত-চন্দ্রিকা’।”

দেখিলাম, সম্পাদক-লিখিত ‘ভূমিকা’র ‘মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী’ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়-কৃত ‘গ্রন্থাবলী’র এই পরিচয় ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ।ব্রজেনবাবু অত্যধিক বিদ্যা জাহির করিতে গিয়া নিজের অজ্ঞতাকে নিজেই ধরাইয়া দিয়াছেন। শূভগর্ভ কলণীর শব্দ কিছু বেশী হইয়া থাকে।

মৃত্যুঞ্জয়-কৃত ‘হিতোপদেশ’-সম্বন্ধে ব্রজেন বাবু লিখিয়াছেন,—“১৮০৮ সনে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের পুস্তকের সন্ধান আমি এখনও পাই নাই।”

তৎ-কৃত ‘হিতোপদেশ’ দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে একটি কথাও ব্রজেনবাবু উল্লেখ করেন নাই। প্রথম সংস্করণ হইতে তিনি একে-বারে তৃতীয় সংস্করণে ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন! তাঁহার অবগতির লজ্জা বলা বাইতে পারে যে, দ্বিতীয় সংস্করণ (মৃত্যুঞ্জয়ের ‘হিতোপদেশ’) শ্রীরামপুরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ছাপা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তৎ-কৃত আর একটি সংস্করণ (‘হিতোপদেশ’) ১৭৪৫ শকাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল; উহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৪৫।

দেখিলাম,—‘বেদান্ত-চন্দ্রিকা’র মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় স্ত্রীর ব্রজনাথ সরকার ব্রজেননাথকে লেকালে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের পরিচয়-সংগ্রহ-ক্ষেত্রে ‘নরীন্দ্রে শ্রী ও বিশেষজ্ঞ’ বলিয়া যে লাটিকিকেট দিয়াছেন তাহা ছাপা হইয়াছে। ব্রজেনবাবু এই লাটিকিকেটখানি কপালে জরপত্র-বন্ধপ আঁটিয়া স্বার্থলিঙ্গির কিকিরে থাকুন, অনেক তাহা দেখিয়া বাহাবা দিবে, অনেক হানিবে।

‘ভূমিকা’র মৃত্যুঞ্জয়-কৃত ‘হিতোপদেশ’র পরিচয় দিতে গিয়া ব্রজেনবাবু পাছটিকার (footnote) লিখিয়াছেন :—“১৮০৮ সনে আরও একখানি ‘হিতোপদেশ’ শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার অনুবাদক রামকিশোর ভর্তুকীদার।” কিন্তু তৎপূর্বে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে যে একখানি ‘হিতোপদেশ’ শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তার ব্রজনাথের “নরীন্দ্রে শ্রী ও বিশেষজ্ঞ” তাহার উল্লেখ পর্যন্ত করিতে পারেন নাই। এই ‘হিতোপদেশ’খানির বঙ্গানুবাদক গোলোকনাথ পণ্ডিত। ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

হিতোপদেশ। সংগ্রহ ভাষাতে।
গোলোকনাথ সর্বাঙ্গা ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে
ছাপা হইল। ১৮০১। [পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪৭]
এই পুস্তকখানির ইংরেজী আখ্যা-পত্রে
প্রকাশকাল ‘১৮০২’ ছাপা আছে।

এই ত গেল হিতোপদেশ-সম্বন্ধে “নরীন্দ্রে শ্রী ও বিশেষজ্ঞ” ব্রজেনবাবুর প্রশংসা ও বিশেষজ্ঞতার বহর! এইবার মৃত্যুঞ্জয়-কৃত ‘বজ্রিণ লিংহানন’ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষজ্ঞতার নমুনা দেখুন। ব্রজেনবাবু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘বজ্রিণ লিংহানন’—প্রথম সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর ‘শ্রীরামপুরে তৃতীয়বার ছাপা’ (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) সংস্করণের নামও করিয়াছেন। কিন্তু মাঝে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। ‘বজ্রিণ লিংহানন’ের দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যা-পত্র এই :—

বজ্রিণ লিংহানন। সংগ্রহ ভাষাতে
মৃত্যুঞ্জয় সর্বাঙ্গা ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে ছাপা
হইল। ১৮০৮। [পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৮]

বজ্রিণ লিংহানন। সংগ্রহ ভাষাতে
মৃত্যুঞ্জয় সর্বাঙ্গা-ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে ছাপা
হইল। ১৮০৮। (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৮)

রাজাবলি।—ব্রজেনবাবু কর্তৃক উল্লিখিত
নংকরণগুলি ব্যতীত ইহার আর একটি
নংকরণ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল।

এত কথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল
না। চারিদিকে খুব ঢাক বাজাইয়া ‘দুপ্রাপ্য
গ্রন্থমালা’র সম্পাদন-বাহাদুরী ঘোষিত
হইতেছে। এমন কি, বিভাগাগরের জন্মভূমি
হইতে বন্ধু-কণ্ঠ-নিঃসৃত ব্রজেন-বিজ্ঞার জয়নাট্য
মন্ত্ৰাতি লাহিত্য-পরিষদের ও প্রবাসী-কার্য-
লয়ের ভিত্তি পর্য্যন্ত প্রকল্পিত করিয়াছে।
তাই “লক্ষ্যশ্রেষ্ঠ শ্রমী ও বিশেষজ্ঞ”র বাহাদুরটী
একবার পরখ করিয়া লওয়া গেল।

‘দুপ্রাপ্য গ্রন্থমালা’ পুনঃমুদ্রিত হইতেছে,
ভাল কথা। কিন্তু যোগ্যতার হস্তে ইহার
সম্পাদন-ভার গ্রাস্ত করা উচিত। পুরাতন
পুস্তকের আলমারি ঘাটিলে এবং বস্তুরক্ষণার
পুরাতন চিঠি-পত্র নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিলে
অনেক মাল-মশলার লক্ষ্যান পাওয়া যায়
নত্যা; কিন্তু কেবল সেইগুলি যে কোনও
উপায়ে হস্তগত করিতে পারিলেই প্রাচীন
পুস্তকের সম্পাদন-কার্য বা ভূমিকা-রচনার
যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। তাহা বহি
হইত, তাহা হইলে পুরাতন পুস্তকের
স্বাক্ষর ও রেকর্ডখানার চালরাশী পর্য্যন্ত
দুপ্রাপ্য পুরাতন পুস্তকের সম্পাদন কার্য
যোগ্যতার লহিত করিতে পারিত। কাহারও
ভ্রমস্বারা করিলে তিনি চক্ষু-লজ্জার
প্রশংসাপত্র দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে
অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতা লাভ করিতে পারে
না। অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতা লাভ
করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রতিদিন
কত ছোট যে ষোড়াইয়া বড় হইবার
প্রচেষ্টার উপহাস্যাপদ হইতেছে, তাহার
ইচ্ছা নাই। কাহারও ছোট আঙ্গুল ফুলিয়া
কলাগাহ হইতেছে, কাহারও খ্যাতি-নাক
খোটা হইতেছে, কাহারও কত কি ফুলিতেছে।

সংস্কার

(সামাজিক উপদ্রাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—অষ্টাদশ পারচ্ছেদ—

ললিতা যাওয়ার পর হইতে বাড়ীর
গৃহিনীপনাটী সমস্তই আলিয়া নাছিল লবঙ্গ
ঘাড়ের উপর। নীরববাবু কিছুই দেখেন
না, দেখিতে পারেনও না। ললিতাই
সংসারের ঝুটিনাটি যা কিছু লবই করিত,
এমন কোনও দিক অপূর্ণ রাখিত না,
বেহিক্টার নীরবের বা আর কাহারও নজর
দিবার কোনও প্রয়োজন হইত। আজ
হঠাৎ সে আসন ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতেই
যে একজন অনভ্যন্ত ব্যক্তি লেই আসনটিতে
জুড়িয়া বসিলে, এরূপ আশা করা যায় না।
বিশেষ গৃহিনীর আসনটি চিরকালই পৃথিবীর
নারীজাতি কর্তৃক অধিকৃত।

নীরববাবুর সংসারে এমন কোনও
আত্মীয় স্বজন আগে হইতে বর্তমান ছিল
না, যে ললিতার অবলম্বনে গৃহিনীপনার তার
নিজ স্বক্ষে লইতে পারিত। শেষোক্ত লবঙ্গ
আলিয়া কতকগুলি কর্মমাইলের তার নিজের
ঘাড়ে লইয়াছিল। সে কাজগুলি লবঙ্গকে
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে নাই, কেননা নারী
জাতির শোণিতগত অত্যাচারের গণ্ডির মধ্যে
সেগুলি বর্তমান ছিল। লবঙ্গ অলসও ছিল
না, আভিজাত্যের যেমত কখনও মনকে
খোলাটে করিয়া রাখে নাই। কাজেই
নীরববাবুর ক্ষুদ্র সংসারের পোষাকী কার্য-
গুলি সে সম্পাদন করিত খুবই শানন্দ
উৎসাহে, প্রকৃতিগত শালীনতার।

ললিতার জীবনশাতেই, লবঙ্গ এই
বাড়ীর মধ্যে একটি ঘর বাহিয়া লইয়াছিল
নিজের জন্ত।

লক্ষ্যাবেলা নীরববাবু আলিয়া নিজের
ঘরে বসিলেন এবং রামদীনকে দিয়া
লবঙ্গকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। লবঙ্গ আলিলে
বলিলেন : “লবঙ্গ ? ললিতার অন্তর্থে ত তুমি
অনেক লেবাওশ্রম করলে; আমার অন্তর্থে
কি কিছুই কর্কে না ?”

লবঙ্গ বলিল : “আপনার কি কোনও
অন্তর্থে করেছ ?”

“করলেই বা কি কচ্ছি বলা !
এখনতো ললিতা নেই যে তাকে
এসে জানাবো, বা তার একটা বিহিত
হবে ?”

একথা শুনিয়া লবঙ্গ মনে মনে খুব
দুঃখিত হইল কিনা বুঝা গেল না; তবে
তাহার মুখের উপরে যে মেঘখানি অবিলম্বে
ভালিয়া উঠিল, সেখানিকে জোর করিয়া
লরাইয়া দিয়া সে বলিল : “কি হয়েছে
বলুন, আমি তার ব্যবস্থা কচ্ছি।”

নীরববাবু উদ্বাসীনভাবে বলিলেন : “কি
আর বলবো লবঙ্গ ! ললিতা যাওয়া থেকেই
আমার শরীরটা ভাল নয়। আজ আবহালাতে
কাজ করতে করতে মাথাটা এমন ঘরে
উঠেছে, যে এখনও পর্য্যন্ত মাথলাতে পাচ্ছি
নে।”

লবঙ্গ বলিল : তা’হলে আজ আর নীচের
বৈঠকখানার যাবেন না ! বিহানার শুয়ে
পড়ুন !

লবঙ্গ আলমারি খুলিয়া একটা গোলাপ
জলের শিশি বাহির করিয়া নীরববাবুর
মাথায় ঢালিয়া দিল, এবং একখানি পাখা
নিরে তাঁহার মাথার হাওয়া করিতে

লাগিল। নীরববাবু আপনার বিছানাতেই বসিয়া ছিলেন, এখন শুইয়া পড়িলেন। লবঙ্গ খাটের পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে হাওয়া করিতে লাগিল।

—“মাকে তত লম্বাঘটা লিখে পাঠিয়েছো, লবঙ্গ?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ! কাল একখানা চিঠি দিয়েছি।”

—তোমার জন্তুখুঁদা বলছিলেন, টেলিগ্রাম কর্তে? হ্যাঁ। দুইটানাটা বড়ই বেজার রকমের আনন্দের লম্বা কিনা, কাজেই টেলিগ্রাম না করলে চলবে কেন?

—তাঁর ঘোষ নেই! আপনার জন্তুই আমায়ের চিন্তা হয়ে পড়েছে!

—আমায়ের জন্তু?

—কাল রাত্তরাত্তর আপনি ঘুসুনি! বারান্ডার পারচারি ক’রে বেড়িয়েছেন! এ রকম করলে অসুখ বেড়ে বাবে।

—কে বললে লবঙ্গ, আমি কাল লম্বা রাতি বারান্ডার পাইচারি ক’রে বেড়িয়েছি?

—পায়ের শব্দ আমি লম্বা রাত শুনেতে পেরেছি!

—শুনেতে পেরেছো, কিন্তু কোনও প্রতিকার ত করেনি লবঙ্গ! ললিতা হ’লে চুপ ক’রে থাকতো না। কিন্তু তুমি!

লবঙ্গ কোনও কথা কহিল না; কিন্তু তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল।

নীরববাবু করুণায়ের জিজ্ঞাসা করিলেন “লবঙ্গ, তোমার স্বামীর জন্তে মন কেন করে না?”

লবঙ্গ প্রথমটা কিছু উত্তর করিল না। এ প্রশ্নটির ভিতর হইতে যে বুদ্ধিকণ্ঠসি আলিয়া হঠাৎ তাহাকে ধংশন করিয়া ফেলিল, তাহার আলা প্রশ্নমিত হইতে না হইতেই সে বলিয়া উঠিল: “আপনি ত জানেন, আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছেন।”

—“তিনি ত্যাগ কর্তে পারেন! কিন্তু তুমি ত্যাগ করেনি ত লবঙ্গ! তোমার স্বামী তোমার ত্যাগ করেছেন বলে, তুমি ত তাকে এখনও ভালবাসতে কসুর করেনা!”

—যেখনি বাবু! ভালবাসা এক, আর কর্তব্যপালন আর এক জিনিষ। সেটা শিক্কা করতে হয়! ভালবাসাকে মাহুষের শিক্কা করতে হয় না। একটা হ’ল লবঙ্গের রক্কা করা উত্তানের ফুল,—আর একটা হ’ল স্বভাবজাত বনের মধ্যে প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্প। দুটোর মধ্যে প্রভেদ আছে বৈকি, বাবু!

—কিন্তু সে প্রভেদটা সকলে জানে কই—লবঙ্গ। ভগবান্ মাহুষকে শান্তি দেবার অধিকার রাখেন, তিনি শান্তি দেবার আগে মাহুষের মেরুখণ্ডটা পরীক্ষা করে

দেখেন। যদি দেখেন মেরুখণ্ডটা ফুলের মত নরম, তখন তাঁর বেতটাকে করে তোলেন ছুরির মত তীক্ষ্ণ আর যদি দেখেন মেরুখণ্ডটা লোহার মত শক্ত, তখন শান্তির বহলে স্বস্তিই তার ভাগ্যে ব্যবস্থা করে দেন! তোমরা যতো নরম হবে, লবঙ্গ—ঈশ্বর তত তোমাদের উপরে পরম হয়ে উঠবেন!

লবঙ্গ কথাগুলি পিপালিতের মতই শুনিল, কিন্তু লম্বা উত্তাবণ করিতে পারিল না।

লবঙ্গ ললিতা জিজ্ঞাসা করিয়া বাবু? তাঁর নামে কি নাশিশ ফজু করে দিয়েছেন?

—নাশিশ? না এখনও করিনি। তবে তুমি যদি খুব আগ্রহ করো, তাহ’লে কর্তো বৈকি!—উঃ! মাথাটা বড়ই ব্যস্তা দিচ্ছে। লবঙ্গ! তোমার হাতখানা আমার কপালে একটু রাখো দেখি! হয়তো একটু ঠাণ্ডা হতে পারে।

লবঙ্গ তাহার বিশলয় নিম্নিত হাতখানি নীরববাবুর কপালের উপরে রাখিল। নীরব-বাবু আরামের সুরে বলিলেন: আঃ।

(ক্রমশঃ)

ফোন ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

মানির তৈল

ব্যবহার করুন।

মিল-১৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বড় বাজার

2025 569

[illegible]



পরিচালক
আশুনাথ নিউজপেপার লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (মাড়িখা) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ত্রয়োবিংশ সংখ্যা, বুধসপ্তাহবার, ১লা ভাদ্র ১৩৪৫, ১৮ই আগষ্ট ১৯৩৮

এ কার “বিধান” ?

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কলিকাতা কর্পোরেশনে অন্ডারম্যানরূপে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র নাকি লাইসেন্স অফিসার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষালের মারকতে অনুরোধ-স্বাক্ষরক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতির এই পন্থাবলম্বন সমীচীন হইয়াছে কিনা তাহা ডাঃ রায়ের ভবিষ্যত কাৰ্য্যাবলী প্রমাণ করিবে কিন্তু ডাঃ রায়কে কর্পোরেশনে “অনুরোধ করিয়া” কিরাইয়া থানিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি তাঁহার নিকট হইতে আনুগত্যের অঙ্গীকার পাইয়াছেন কি? আর পাইলেও সে অঙ্গীকার কতদূর রক্ষিত হইবে তাহাও ভাবিবার বিষয়।

ডাঃ বিধানচন্দ্রের জন্ম তথ্য প্রসঙ্গে দিল্লীর “রায়স্ উইক্লি” বলিয়া কেলিয়াছেন যে: He (Dr. Roy) has some influence with Mr. Nalini Ranjan Sarker. And if Mr. Nalini Ranjan Sarker could be weaned away from the Fazlul Huq Ministry, then that Ministry falls like a pack of cards. If, therefore, the Congress is at all anxious

to dethrone Mr. Fazlul Huq, then that party should cultivate Mr. Nalini Sarker and Mr. Bidhan Roy.” বলিনী-বিধানের এই যে বোণাবোণের ইঙ্গিত “রায়স্ উইক্লি” দুর্বল মূহুর্তে প্রকাশ করিয়া কেলিয়াছেন তাহা বাংলার কংগ্রেসী মহলে সুবিদিত। সুতরাং বলিনীরজনকে বাদ দিয়া বিধানচন্দ্রকে পরিভুক্ত করিয়া কি কোন কল পাওয়া যাইবে? রাষ্ট্রপতি তাহা কি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন? আর যদি রায়-রূণী প্যাণ্টের প্রবর্তক বিধানচন্দ্রকে পাংক্তের করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে বলিনীরজনকে গঙ্গোদকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? অশোক শাস্ত্রী মশাই শাস্ত্রীয় মতে শুদ্ধ-কার্য্য সুসমাধা করিতে পারেন !!!

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রায় তিন বৎসর পূর্বে আমাদের নিকট স্বমুখে স্বীকার করিয়াছিলেন যে My dear Raja শীর্ষক “জাল” চিঠি-খানা নাকি ডাঃ বিধানচন্দ্রই তাঁহাকে দেন এবং বিধানচন্দ্রেরই অনুরোধক্রমে তিনি ঐ পত্রটি ব্যবহার করেন। উক্ত ব্যবহারের কলভোগ অবশ্য তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল কিন্তু তদানীন্তন অটুট রক্ত-পঙ্ককের মোহাদ্দা বলত: শরৎচন্দ্র গেই চিঠির অপপ্রয়োগের কাহিনী অত্যাধি সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন নাই। যে বিধানচন্দ্র তাঁহাকে এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার সহিত বিজড়িত করিতে পক্ষান্তরে দায়ী তিনি যে বসু-ভ্রাতৃত্বকে কতদূর সাহায্য করিবেন তাহা সন্দেহজনক। সহযোগী “অমৃতবাজার” অতাপিও এই চিঠি লইয়া শরৎচন্দ্রকে বিদ্রূপ করিতেছেন কিন্তু শরৎচন্দ্র কি অপরের বিষ স্বীয় কণ্ঠে বহন করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন?

রায়-রূণী প্যাণ্টের সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বিদ্রূপভরে বলিয়াছিলেন যে শরৎচন্দ্র যেন “ভোলা মহেশ্বর—বপ করে জ্বলেন ও দপ করে নেভেন”!!! শরৎচন্দ্র হয়ত আজ সে বিদ্রূপোক্তি ভুলিয়া গিয়াছেন!

রাষ্ট্রপতির কার্য্যের সমালোচনা আমরা করিতে চাই না—তবে সঙ্গতি রক্ষার জন্ম তাঁহাকে প্রত্যক্ষমতচিত্তে নিবেদন করিতে চাই যে

যখন বিধানচল্ল ও পরিশুদ্ধ হইলেন তখন মলিনী বাবুকে আর অপাক্ষেয় করিয়া রাখিয়া কল কি?—যে-হেতু তিনি “Would be anxious to help the Congress if only he is approached in the right spirit” সাধু!

মলিনী-বিধান-কিরণে অচ্ছিন্ন ও অদৃশ্য বন্ধন যখন বসু-ভ্রাতৃদ্বয় ছিন্ন করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ তখন এই ত্রিমুন্তির প্রভাব যে বাংলা কংগ্রেসে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা নিশ্চিত। বিধানচল্লের

কর্পোরেশনে পুনঃ প্রবেশ তাহারই সূচনা করিতেছে। কিরণশঙ্কর এক বৎসরের জন্ত সশস্ত্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন—অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সমাপ্ত হইলেই কিরণবাবুর সরূপ অক্ষুণ্ণ হইবে!! ইতিমধ্যে এ্যাসেমারী পদলাভ হইলে তিনি নিশ্চিন্ত-চিত্তে রাজনীতিক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন। কয়েক মাসের মধ্যেই বিধানচল্লের সরূপ প্রকাশের সুযোগ আসিবে। আমরা সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় রহিলাম।

বর্তমান আন্তর্জাতিক জটিলতা এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা হিটলার কি যুদ্ধ বাধাবে? মুসোলিনীর ডিপ্লমেন্সি এখন কোন দিকে? সচী শীল

ইউরোপের Defensive System এ যে Combination of Powers এখন চেয়ারলেন গড়ে তুলতে উদ্ভত, তাতে যেন হয় ইংরেজ-ফরাসীর শক্তি ও স্বার্থ বিলম্বিত হয়ে মুসোলিনীর Imperialist ambitionকে feed করার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আকুল হয়ে উঠেছে। যুবল্লভেই যে এটা করছে তা হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু বা করছে তার কলে মুসোলিনীরই লবণিক দিয়ে সুবিধে করে যাচ্ছে।

চেয়ারলেনের Sinister drive এর উল্লেখ করে ২৮শে জুলাই এর “থেরালো”তে বলে-
হিলাম—“উপস্থিত তিনি দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপের যে State গুলোকে হাত করার চেষ্টা করছেন তারা কেউ রাশিয়ার বন্ধু নয়। তবে কি তার উদ্দেশ্য ইউরোপের Defensive System এ রাশিয়াকে ঢুকতে না দেওয়া? এই চেষ্টা কি Franco-Soviet Pact এর বিরুদ্ধে নিয়োজিত?”

চেয়ারলেনের উদ্দেশ্য এই রকম একটা System গড়ে তুলে ফ্রান্সকে যেখান যে— আর তাবনা কি? রাশিয়া ত এখন Superfluous. ফ্রান্সের অনেকের কাছে রাশিয়া undesirable হতে পারে কিন্তু এখনও superfluous নয়। ইংরেজ যদি যেখানে পারে যে রাশিয়াকে আর দরকার নেই, তাহলে Franco-Soviet Pact অটুট থাকতে না পারাই সম্ভব। কিন্তু গণগোলত ঐখানে! French General Staff বিশ্বাস করতে পারছে না যে রাশিয়াকে বাধ দিয়ে ফ্রান্স নিরাপদ থাকতে পারে। তারপর বাধ দিলেই চেকোস্লোভাকিয়ার অবস্থা এমন অলঙ্ঘন হয়ে পড়বে যে, সে Capitulate করতে হয়ত বাধ্য হবে। Bohemiaর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, চেক নৈস্ত-বাহিনী এবং ওখানকার Strategic position হাতে পেয়ে হিটলার এমন প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে পড়বে যে তখন তাকে

হাবিয়ে রাখা শক্ত হবে। তখন কলোনির দাবীর পেছনে নেই বিরাট Military powerকে রেখে হিটলার ইংরেজ-ফরাসীর মাঝার ওপর Monsterরূপে tower করবে। এ অবস্থাটা contemplate করতে চেয়ারলেনের কি রকম লাগছে?

ব্রিটিশ লম্বার-সচিব Mr. Leslie Hore-Belisha লম্বাতি বাধ্য হয়ে প্যারিসে ছুটেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল Franco-Czecho-Soviet axis ভেঙ্গে দেওয়া। চেয়ারলেনের উপদেশ অনুযায়ী প্রথমতঃ তিনি বলেছিলেন যে British military force এত শক্তিশালী যে Russiaর সঙ্গে লম্বা ফ্রান্সের আর না রাখলেও চলবে। তা ছাড়া Red Armyর দ্বারা কিই বা উপকার পাওয়া যাবে?

এই argument complete করার জন্য খুব শীঘ্রই হয়ত ব্রিটিশ ফরাসীকে বলবে—“বেথ, দক্ষিণ-মধ্য ইউরোপের রাজ্যগুলো আশাধের বন্ধ; সর্বের ওপরে Anglo-Italian Pact এর কলে স্বয়ং মুসোলিনী friendly hand extend করতে উদ্ভত। আর তাবনা কি!”

হিটলার যদি তার power politics এর মধ্য দিয়ে Franco-Soviet Pact ভাঙতে পারেন এবং চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করে নিরে দেই Pactকে চিরকালের জন্য অলঙ্ঘন

করে দিতে পারেন, তাহলে রাশিয়া ইউরোপীয়ান রাজনীতির বাইরে হয়ে যাবে,—এবং এইটা হবে যুগোস্লাবির পক্ষে সব চেয়ে বেশী আশঙ্কের কথা। কেন? এতে হিটলারের জিতকে ছাপিয়ে চলে যাবে যুগোস্লাবির জিত। আমার অন্তঃপ্রবন্ধে Rome-Berlin axis-এর আলমর্ষ বুঝিয়ে দিয়েছি। এই অ্যান্টিম যে যুগোস্লাবির হাতে একটা Excellent political lever-এর কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছি ইংরাজী এবং বাংলা প্রবন্ধে।

দেখিন যেখি বিখ্যাত Biographer Mr. Emil Ludwig একটা press-interview-এ বলেছেন—“One of the few optimistic points I see, is the unreality of the Rome-Berlin axis, inspite of all the humbug to cloud the issue. The Anschluss and its implications worry Italy more than Fascism cares to admit.”

মিঃ লাউউইগের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে অবশ্যই একমত। এই রোম-বালিন ঐক্যবাদের unrealityকে যদি postulate বলে ধরে নেওয়া যায়, তা হলে এই basis-এ ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কি রকম alignment of Powers হবে? London-Paris-Rome axis হিটলারকে বাধা দেবে নাকি? হিটলার কি তবে যেখেছেন কথাটা? হিটলার কি নিশ্চিত চিন্তে সেইদিনের অপেক্ষা করছেন, যেদিন তিনি যুগোস্লাবির কাছে হয়ে যাবেন—Just a sucked-up Orange?

রাশিয়াকে স্বতন্ত্র না একঘরে বা isolated করা যাচ্ছে, ততক্ষণ যুগোস্লাবির যুদ্ধ বিশেষ করে ফ্রান্সের কাছে অতি অয়োজনীয় হয়ে পড়বে না। তাই Isolation of Russia যুগোস্লাবির কাছে হবে

—The happiest event after the Anglo-Italian Pact.

যুগোস্লাবির লড়াই হিটলারকে ভয় খান। Adriatic Sea পর্যন্ত হিটলার হাত বাড়াতে এলে যুগোস্লাবির সেই ভয় আরও বেড়ে যাবে। আলমর্ষ কথা যুগোস্লাবির হিটলারকে political lever হিসেবে পেতে চান, friendly neighbour হিসেবে নয়।

১৪ই মে তারিখে Genoaতে যুগোস্লাবির বক্তৃতাতে বলেছিলেন—“In the event of an ideological war, the authoritarian nations will solidly walk together.” এর উদ্দেশ্য ইংরেজ-ফ্রান্সকে ভয় দেখান, এবং হিটলারের চোখে যুগোস্লাবির যেওনা। এর চেয়ে বড় Bluff আর হতে পারে না কি? হিটলার-যুগোস্লাবির বন্ধুত্ব এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অভিনয়।

যুগোস্লাবির present political gameকে sum up করে আমি একটি প্রবন্ধে (Hindusthan Review—June) বলেছি—

“His objective is neither the appeasement of Hitler nor a victory for the Fascist International, but the consolidation of his own power and prestige and the consummation of Italian ascendancy without actual recourse to arms. The next phase of his political manoeuvres will be in the direction of drawing freely upon the wealth and possessions which have made the British Empire what it is.”

যদি যুগোস্লাবির plan অমুদারী Spanish problem solved হয়ে যায়, যদি Franco-Soviet Pact ভেঙে গিয়ে London-Paris-Rome Alignment সম্ভব হয়, যদি রোম-বালিন axis ভাঙবার আগে Mediterranean ও Indian Ocean-এ যুগোস্লাবির নিজেকে Strategically

মুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারেন এবং যদি নতুন Trade Treaty ও Big British Loan দ্বারা ইটালীর crazy economic systemকে ঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তবে পরবর্তী অগতঃ-যুদ্ধে Fascist International-এর মধ্যে যুগোস্লাবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; তিনি থাকবেন ইংলণ্ড-ফ্রান্সের পাশে, অর্থাৎ ১৯১৫ সালের Betrayal আবার ১৯৩৯ কিংবা ১৯৪০ সালে repeated হবে, যদি অবশ্য যুদ্ধ বাধতে অন্ত দেয়ী হয়।

কেন, হিটলারের Loyal Ally হিসেবে থাকলে এবং যুদ্ধের সময় Rome-Berlin Alliance অটুট রাখলে যুগোস্লাবির কী কী? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, এখন যুদ্ধ বাধলে London-Paris-Moscow Alliance ক্যানিটেবলের একেবারে নটে করে দেবে, এবং রাশিয়া out of the picture হয়ে যাবার পর যুদ্ধ বাধলে ক্যানিটে শক্তি ইংলণ্ড-ফ্রান্সকে পরাজিত করতে পারে। ঠিক এর পরেই হিটলারকে ঠেকিয়ে যুগোস্লাবির পক্ষে মহানমতা হয়ে পড়বে। জার্মানীকে বড় Mediterranean Power করবার বাধনা হিটলারের মনে জাগবে। শুধু তাই কেন, সমস্ত ইউরোপের Master হবার ইচ্ছা হিটলারের মনকে চকল করে তুলবে। Fascist Victoryর পর “Sharing the Swag”-এর ব্যাপারে যুগোস্লাবির বরাতে কি জুটবে বলা শক্ত। হস্ত power-mad হিটলার তখন aeroplane পাঠিয়ে যেবেন রোমে স্বতন্ত্র flag পুঁততে এবং ইটালীর আকাশে স্বতন্ত্র চিহ্ন একে দিতে। আপনারা Pears' Soap-এর aerial advertisement দেখেছেন ত?

যুগোস্লাবির এখন যে সব সমস্যা লেন্ডলি liquidated হয়ে গেলেই London-Paris-Rome Alliance তৈরী হয়ে যাবে as a bulwark against German aggression.

এ কথা অনেকদিন আগেও বলেছি। হিটলার বহি তাল করে calculate করে দেখেন ত তিনি চেষ্টা করবেন যাতে যুগোলিনীর troubles prolonged হয়। Spanish issue still hanging fire, Anglo-Italian Pact not yet implemented—এ ত হিটলারের পক্ষে খুব আশার এবং আশঙ্ক্যের কথা! Spain এখন largely an Italian Concern. Franco Victoryকে speed up করবার জন্য চেকোস্লোভাক-যুগোলিনীর যে ব্যগ্রতা, হিটলারের সে ব্যগ্রতা কই? হিটলার হস্ত তাল করেই জানেন যে এই সব লক্ষ্যের একবার লম্বাঘন হলেই যুগোলিনীকে আর কাছে পাওয়া যাবে না। মধ্যইউরোপে প্রাণের কথা কলোনি ফেরতের লড়াইনা হিটলার বহি একেবারেই না দেখতে পান, তাহলে desperate হয়ে তিনি explode করবেন। Expansion কিংবা Explosion—এ ছাড়া হিটলারের আর পথ নেই। যুগোলিনী বহি নিজের প্রধান লক্ষ্যগুলি লম্বাঘনের কোন উপায় না দেখে desperate হয়ে পড়েন, তবেই যুদ্ধে Italo-German combination সম্ভব হবে। আমার Analysis অনুযায়ী মনে হচ্ছে, trouble কাটবার আগেই কিংবা তা আরও জটিল হলেই যুগোলিনীকে ধরে pitchforked করে দেবেন হিটলার। আবার Far East-এ Sino-Jap war of attrition-এ জাপান ধীরে ধীরে ক্রমশঃ কাবু হয়ে পড়ছে, তাতে মনে হচ্ছে এক বছরের মধ্যেই জাপান চীনের হাতে crushed হয়ে যাবে—even without direct Soviet intervention.

এখানে বহি ইটালীকে হারান এবং ওখানে বহি জাপানকে এইভাবে হারান তবে বন্ধ বলতে জার্মানীর আর কে রইল? তাই আমার খুব বিশ্বাস ইটালী হাতে থাকতে থাকতে এবং জাপান বৈতে থাকতে থাকতে হিটলার প্রচণ্ড লিনায়ে লেটে পড়বেন।

German Explosion must precede a break-up of Fascist International—এই কথাটাই তাল করে মনে রাখতে হবে।

১৯৩৮ সালের এই আগষ্ট মাসে পৃথিবীর যে অবস্থা, সে অবস্থার সব্বিক বিচার করে হিটলার হস্ত আর গম্ব নষ্ট করবেন না। যুগোলিনী পিছনে গেলে মুক্ত হবে। আবার এদিকে জাপান কাবু হয়ে গেলে রাশিয়ার শক্তি বেড়ে যাবে, চীনে দোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হবে, বর্তমান যুদ্ধজাত সংহত চীনের শক্তি ও প্রগতির ধারা Communist Channelএ বইতে থাকবে; শুধু তাই নয়, যুদ্ধে জাপান পরাজিত হলে ধরে বিপ্লব বাধবে। এ বিপ্লব Proletarian Revolution ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এশিয়ার অনেকটা রাশিয়ার আওতার এনে পড়বে। জাপানী পরাজয়ের পরিণাম এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এইভাবে ভেবে দেখলে মনে হয় যুদ্ধের সুখি আর বেদী নেই। Fascist axis of Tokio-Berlin-Rome বজায় থাকতে থাকতেই হিলেব মত জার্মানী যুদ্ধ বাধাবে। সেইজন্য এই লম্বাঘটা তদানক critical. যুদ্ধ বাধ খুব শীঘ্র বাধে ত তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। হিটলারের terrific war preparationএর যে সব খবর কাধন ধরে আলছে তার Explanation এই প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যাবে। এই খবরগুলো হস্ত World war-এর prelude. কিন্তু আবার একটা জগত-যুদ্ধ হয়ে লক্ষ্যতাকে নষ্ট করে যেবে? তাবতেও ভয় হয়।



বিবিধ

অমরেশ-মীনা

“যেগামী”তে প্রকাশিত শ্রীমতী মিত্র রচিত “অমরেশ-মীনা” আনন্দ-পরিষদের মহলায় পড়িয়াছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথমে “আনন্দ-পরিষদ” অমরেশ-মীনাকে পাঠ-প্রদীপে উপস্থিত করিবেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী মিত্র স্বয়ং ইহাতে এক বিশিষ্ট ভূমিকার রূপান্তর করিবেন।

ভাষানীপুর সমাজ

গত মঙ্গলবার ২৪শে শ্রাবণ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের ‘বিষমল’ বা ‘বৈরাগ-বাগী’ নাটকখানা লম্বাজের লক্ষ্যগণ কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে। অভিনয় লক্ষ্যাদীন সুলভ হয় নাই; বিষমলের ভূমিকার কটিকবাসু পূর্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার গানগুলি স্রুতিমধুর হইয়াছিল। বণিক—রমেনবাসু ভালই; শ্রীমান বলাই এর লাগক, ও বিবেক রূপে গানগুলি তাল। কিন্তু লাগকের রূপে কেটেবাসু তত্ত্বাবহ করিতে গিয়া কেবল ছায়ালাগি করিয়াছে মাত্র। ইহার পরে ছালাবাসুর পাগলিনী ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রী চরিত্র একেবারে অচল।

আমরা লম্বাজের নিকট ভবিষ্যতে উক্ত ধরনের অভিনয় আশা করি।

দ্বিতীয় বার্ষিক বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিযোগিতা

অর্জুন পত্রিকা দ্বিতীয় বার্ষিক বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার এবং গল্প ও কবিতার বর্ণনা-ক্রমে প্রথম পুরস্কার ঘোষণা করিতেছে। প্রাপ্তকী ১,০০০ শব্দের মধ্যে নীমাবদ্ধ থাকিবে। সমস্ত রচনা স্পষ্টাক্ষরে কাগজের



(বিলাসী)

নউ থিয়েটার্স

“দেশের মাটি” চিত্রার পেন্টেথের তৃতীয়
প্তার মুক্তি পাবে বলে ঘোষিত হ’য়েছে।

নীতীন বসুর পরবর্তী চিত্র “বি এনিমি”
স্বাধীনতা কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে
প্রস্তুত হ’য়েছে। এই ছবির নায়ক-নায়িকা
লাইগল ও লীলা দেশাই প্রত্যেক দৃষ্টে
সংকার অভিনয় করেছেন বলে প্রকাশ।
নীতীনবাবু এবার যে বিষয় নিয়ে ছবি
হলুতেন তা’ লম্বাজ, সংসার ও আনন্দের
বিক থেকে এক গরীবান্ চিত্র হবে বলেই
দামরা আশা করি।

প্রমথেশ বড়ুয়ার “অধিকার” মুক্তি
প্রতীকার রয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন রংয়ের
কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানা তৈরি হ’য়েছে

এক পৃষ্ঠার লিখিত প্রতিযোগিতা তাঁহার
নাথ ও ঠিকানা লহ রচনা ১১ই ডিসেম্বর
১৩৪৫ সাল, মধ্যে “অর্চনা পত্রিকা” সম্পাদক
৩৮এ বলরাম বসুবাট রোড ভবানীপুর
কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রেরিত
রচনা ফিরে দেওয়া হইবে না।

রচনার বিষয়

১। প্রবন্ধ:—হিন্দু মূলধর্মের সমস্ত
ও তাহার লম্বাধান। (১,০০০ শব্দের মধ্যে)

২। ছোট গল্প।

৩। কবিতা।

বলে সাধারণের কাছে ছবিখানা প্রাপ্ত
হবে বলেই মনে হয়।

অমর মল্লিকের “বড়বুড়ি”-র কাজ বেশ
ক্ষতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পাছাড়ী,
চন্দ্রাবতী, মলিনা, নিতাননী, যোগেশ চৌধুরী
প্রভৃতি চরিত্রাঙ্গুত অভিনয় করে নিজেদের
বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা
করেছেন।

এখানে অভিনয় করেছেন বোম্বেন
চট্টো, অহি নাথ্যাল, ব্রজ পাল প্রভৃতি।

লাইগল ও কাননের কয়েকখানি গানও
এ লম্বাহে গ্রহণ করা হোল। এদের
দুজনকে মধ্যে কে ভাল অভিনয় করেছেন,
গান গাইছেন এ কথা ছবির লঙ্গে লংগিষ্ট
কোন ব্যক্তিই বলতে পারেন না। কাজেই
আমরা ও আপনাদের জানাতে পারছি না।

“শরতীমাতার” অপূর্ণ সাফল্য

মুক্তিলাভ করবার লঙ্গে লঙ্গেই ধরতী-
মাতা’ (দেশের মাটির হিন্দি সংস্করণ)
বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর ইত্যাদি স্থানে যে
অপূর্ণ লম্বাহর লাভ কোয়ডে, তা ভারতীয়
চিত্র মহলে লতাই অতুতপূর্ণ। লকল শ্রেণীর
বর্ষক চিত্রখানিকে ভারতীয় চিত্র শিল্পের
শ্রেষ্ঠতম নিবর্ণন বলে একবাক্যে স্বীকার
করেছেন। লম্বাহ পত্র মহলেও এই
বিচিত্র চিত্রখানি এক পরম আনন্দ ও মিলনের
আন্দোলন তুলেছে।

"MY DEAR RAJA"

লুপ্ত চিঠির শুপ্ত রহস্য

My Dear Raja শীর্ষক যে “জাল” চিঠিখানির অপপ্রয়োগে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র
বসু বিভ্রান্ত হইয়া মানহানির মামলায় পড়িয়াছিলেন ইহা কি সত্য যে ডাঃ
বিধান রায়ই সেই চিঠিখানি শরৎচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করেন?? শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র
বসু অধুনা-লুপ্ত রত্ন-পঞ্চকের (Big Five) সৌহার্দ্য বশতঃ সে কাহিনী
অতাপি প্রকাশ করেন নাই—ইহা কি শরৎচন্দ্র অস্বীকার করিতে পারেন??
আমরা শরৎচন্দ্রকে এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য সাধারণের গোচরীভূত করিতে
আস্থান করিতেছি।

নিউথিয়েটার্স এক নম্বর টিউতে নতুন
যে ক্রারে পরিচালক ফণি মজুমদারের ছবি
‘স্ট্রীট লিটার’ নেট স্থাপন করা হয়েছে সে
নেটটির নাম ‘চার’ নম্বর ক্রার।

একটি নিখুত রিহাঙ্গাল কম নেট তৈরি
করা হয়েছে। নাট-গান-অভিনয় আলোচনা
কত কিছুই এখানে হয়ে গেল।

ধরতীমাতার এট লাকল্য নিউ থিয়েটার্সের
এবং বাংলার গৌরব যে বুঝ করিল, তা
নিশ্চয়ই বলা যায়।

শ্রীভারতলক্ষী পিকচার্স

“অভিনয়” আগামী ২৭এ আগষ্ট
“রূপবানী”-তে মুক্তি পাবে। মধু-নাথনায়
অভিনয় দেখবার জন্য লোকে আগ্রহাধিত হচ্ছে

উঠেছে। “অভিনয়” লব্ধে আমরাও বিশেষ ব্যাকুল হ’য়ে পড়েছি। “অভিনয়” ভাল হ’ক যত্ন-সাধনার কীৰ্ত্তি প্রচার হ’ক দেশে দেশে এই আমরা কামনা করি।

স্টেজল প্রেসিডেন্সি থিয়েটারস

এই নামে একটি প্রতিষ্ঠান “পরিচয়” নামে একখানা ছবি তুলছেন বলে কাগজপত্রে প্রকাশিত হ’য়েছে। “পরিচয়ের” অভিনেতৃবর্গ ও পরিচালকের নামেরও কিরিত্তি বেরিয়েছে যেখান—কিন্তু কোথায় ছবি তোলা হ’চ্ছে এবং এই ছবির টেকনিসিয়ান কারা সে বিষয় কিছুই জানানো হয়নি কেন? কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে অবিলম্বে আমাদের জানিয়ে দেন যে কীভাবে কোরবেন কি?

চিত্রা

আসছে শনিবার থেকে এই চিত্রগৃহে “গোরা” চতুর্থ হপ্তার পড়বে। তীয় বেধে মনে হয়, ছবিখানা চলছে ভাল।

নিউ সিনেমা

এই শনিবার উক্ত চিত্রগৃহে “অভাগিন” (“অভিজ্ঞান”র হিন্দি সংস্করণ) মুক্তিলাভ কোরবে।

রূপালী

এখানে ইউনাইটেড আর্টিস্টের “হারিকেন” এই শনিবার থেকে তৃতীয় হপ্তার পড়বে। “হারিকেন” লতাই একখানা দেখবার মত ছবি—সে জন্ত ছবিখানা দেখবার জন্ত বেরূপ ভীড় হ’চ্ছে তা’ সাধারণতঃ এধিককার কোনও বাঙলা ছবিতেও দেখা যায় না।

পূর্ব থিয়েটার

“বিভাপতি” এই শনিবার থেকে চতুর্থ হপ্তার পড়ল। ছবিখানা নগোরবেই চলছে এবং আরও কিছুদিন নিশ্চয়ই চলবে। একপ আশা করা যায়।

রূপালী

জন সাধারণের বিশেষ আগ্রহে নিউ থিয়েটারের হযরতশাহী কথাচিত্র “অভিজ্ঞান” এখানে আর এক লপ্টা হাতিতে কর্তৃপক্ষ

রাজমালা রচনা গরজ

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচাক্রচন্দ্র ঘোষ

(পঞ্চদশ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

উক্ত রামায়ণের প্রাপ্ত সাধারণ গৃহস্থ রামায়ণ পেনকে বহি দিল্লীশ্বরের অধীন করণ বা মিত্র রাজা বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্বে শরৎবাসুর পজা-লম্বাজের সম্বন্ধে মহামহিম লতাই বা লাহানদা বাহশাহ বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনখানেই রামায়ণ নামীয় কোন ব্যক্তিকে শুধু আমরা কেন নয় শ্রীহরিও খুজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। সুতরাং ১৭৪৩ এবং ১৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আলিবর্দি খাঁর লহিত তাঁহার (রামায়ণের) যে বুদ্ধ বসুমজুম্ভার মহাশয় ঘটাইয়াছেন, তাহা কতখানি অদভ্য, মনগড়া ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তাহা Stewart-এর ইতিহাসে প্রমাণিত হইবে। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রঘুদী ভোমলার সেনাপতি তাস্কর রাও বজ আক্রমণ করেন এবং আলিবর্দির লহিত বুদ্ধে লিপ্ত হন। পর বৎসর (১৭৪৪) তাস্কর রাও নিহত হন। বসুমজুম্ভার মহাশয় কিন্তু, বোধকরি অন্তরে আঘাত পাইয়া, তাঁহাকে অক্ষত অবস্থায় স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা ঘোটেই নহে:—

“As the Mahratta chief advanced, Alyverdy Khan eagerly inquired, which was Baskar Raow; and

বাহ্য হ’লেন। লতাকার ভাল সামাজিক চিত্রের জনপ্রিয়তার এমনিতর পরিচয় বিশেষ আনন্দের বিষয়। এখানে এই সঙ্গে বসুমজুম্ভার আকাশ-পাতালও দেখানো হচ্ছে।

on his being pointed out, cried out with a loud voice, ‘Cutdown the infedel!’ In an instant, the appointed band rushed on their victims; and Boskar Raow, with nineteen officers of rank, were slaughtered.” (Stewart’s History of Bengal.) ১৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আলিবর্দির লহিত কাহারও বুদ্ধের কথা পাওয়া যায় না। সে সময়ে তিনি মারাঠা ও আকবান্-বের কটক হইতে দূরীভূত করিবার জন্ত কতলক্ষ্য হইতেছিলেন (টুয়াটের ইতিহাস)। আলিবর্দির যে মারাঠাধিগের নিকট হইতে বঙ্গরক্ষা বিষয়ে বিবেচন প্রার্থনা ছিলেন, তাহার আভাষ-ও আমরা পাইতেছি— “Alyverdy Khan, the Subahdar of Bengal, who had saved Bengal from the attacks of the Mahrattas.” (Ramesh Chandra Datta’s History of Ancient and Modern India.)

বসুমজুম্ভার মহাশয় রামায়ণ পেনের জাহ কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে তাঁহার প্রবন্ধের পাছটাকার গোবরডাঙ্গা জমিদারী প্রতিষ্ঠাতা খেলারাম সুখোপাধ্যায়, লাভকীরা জমিদার বংশের আদি বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী, তিতুমীর প্রভৃতিকে রামায়ণের প্রধান সেনাপতি বলিয়া দস্তোক্তি করিয়াছেন—যেখিরা আমাদের চক্ষু হির হইয়া গিয়াছে। উহা তাঁহার চাঁদের রাতের মতীন স্বপ্ন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের এমন পোড়াকপাল

হর নাই যে, তাঁহার। রামজয়ের চাকরী করিতে বাইবেন। (১) বশোহর জেলার নারিয়ার শ্রামরাম সুখোপাধ্যায় কোন এক পারিবারিক ও সামাজিক দোষে নিজ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ইচ্ছাপূরে বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র—জগন্নাথ ও খেলারাম। খেলারাম সামান্ত লেখাপড়া শিখিয়া নৌভাগ্যক্রমে বশোহর কালেক্টারির পেরিত্তাহার হন এবং কালেক্টার সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গোবরডাঙ্গা তালুক, চিরুলিয়া ও বহুদিয়া পরগণা এবং ভিহি আড়পাড়া ইত্যাদি সম্পত্তি নীলাম খরিদ করেন, পরে বিখ্যাত হুদাল নরকারের নিকট হইতে রাজাঘিয়া পরগণা পত্তনী লন। খেলারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন হুদাল জমিদার ছিলেন; তিনিই লক্ষপ্রথম আনিয়া গোবরডাঙ্গার বাস করেন। এই হইতে গোবরডাঙ্গা জমিদারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

শাতক্ষীরা জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত লক্ষ্যেও তাই। খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামের চক্রবর্তী বংশীর বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের অধীন কর্মচারী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর বধন তাঁহার পরগণাগুলি বিক্রান্ত হইতেছিল, তখন বিষ্ণুরাম মৃত্তন পরগণা নীলাম খরিদ করিয়া তৎপূর্ণত শাতক্ষীরার আনিয়া বাস করেন এবং রায়চৌধুরী উপাধিধারী হন। তিনি পরে ডালা, খাজুরা ইত্যাদি কয়েকটি সম্পত্তি অর্জন করেন। তাঁহার বংশীয়গণ এখনও শাতক্ষীরার বাস করিতেছেন।

তারপর তিতুমীর। প্রামাণ্য ইতিহাস অসংখ্য তিতুমীরের লম্বা হইতেছে না আকল্যাণ্ডের লম্বা, আর রামজয় সেনের লম্বা তাহার অনেক পর। তাহা হাড় তিতুমীরের জেহাদ করে, কোথায় ও কাহার সহিত ঝট্টাছিল, তাহা প্রামাণ্য ইতিহাসে আছে—পাঠকবৃদ্ধ অল্পপ্রাপ্তক বোধিব

বে সামান্ত ও সাধারণ গৃহস্থ রামজয় সেনকে বহুমুখ্যতার মহাশয় এত উর্দ্ধে তুলিয়াছেন, কোন লজ্জার আবার হঠাৎ তাঁহাকে (রামজয়কে) ক্ষুদ্র করিতে পারেন? তাই বাধ্যতার ভিতরে আনিবাঁধি খাঁকে হিরা রামজয়ের সহিত লক্ষি ও বহুপরগণা

শেষে প্রত্যাৰ্পন করাইয়া লইয়া ছাড়িয়াছেন। আমরা তাঁহার বহুমুখতার দুর্ভেদ-লম্পটো লাগুবার প্রদান না করিয়া নিশ্চিত হইতে পারিলাম না।

রামজয় সেনের পাঁচ পুত্র—রামনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, দেবনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, ও

চিত্রে মন যুগ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

প্রগতি চঞ্চল চিত্র—

অভিনয়

প্রদর্শন : সাধনা বোস

আত্মনাথ

পরিচালক :

অশ্ব বোস



রূপবাণীতে
শীঘ্র
আসিতেছে

কমলনারায়ণ। বশোর রাজবংশীরধর
পুরাতন Record-এ রামকরের এই পুত্র
পঞ্চকের মধ্যে প্রেমনারায়ণ—নাম একজনের
পাই। দেবনারায়ণ এই নাম পঞ্চপুত্রের
কাহারো ছিল না বলিয়াই স্থানিয়াছি।
বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ মংলবের বশবর্তী
হইয়া বোধকরি বহুমঙ্গলমহার মহাশয় প্রেম-
নারায়ণকে দেবনারায়ণ নামে পরিবর্তিত
করিয়া থাকিবেন।

জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণের পুত্র বটীবর এবং
চতুর্থ লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র বিজবর। বটীবর
সেনের বহুনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ হই পুত্র।
বহুনাথ সেনের ছয় পুত্র—প্রথম রমানাথ,
দ্বিতীয় নলিনীনাথ, তৃতীয় সতীনাথ চতুর্থ
শৈলেন্দ্রনাথ, পঞ্চম মনোজনাথ এবং কনিষ্ঠ
অমূল্য কুমার। বহুমঙ্গলমহার মহাশয় অভিনব
(!) নীতিজ্ঞ এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি বটেন।
তাই অকুতোভয়ে বহুনাথ সেনের “পঞ্চমপুত্র”
পুরাতন মনোজনাথ সেনকে শ্রীশ্রী রাজা
মনোজ নারায়ণ রায় বাহাদুর লাজপতি
একবারে জ্যেষ্ঠের আসনে বসাইয়া
দ্বিরাহেন। “পঞ্চমপুত্র” মনোজ নাথকে
জ্যেষ্ঠ, রাজা বাহাদুর না দিলে তাঁহার
ইতিহাস অজ্ঞানতার প্রবাহিত হইত তাহা
ভাবিবার বিষয় বটে! তিনি নিশ্চয় জানেন
না যে, তাঁহার শ্রীশ্রী রাজা বাহাদুরের
পরিবারবর্গ লব্ধ লেখকের অভিজ্ঞতা
তাঁহার অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অনেক অধিক
এবং তাঁহার শ্রীশ্রী রাজা বাহাদুরের বাণী
ও প্রকৃত ব্যাপার এই হইলে আকাশ-পাতাল
তক্ষণ।

বাহা হউক, উপলব্ধিহারে বহুমঙ্গলমহার
মহাশয়ের শ্রীশ্রী রাজা বাহাদুরের বংশের
প্রকৃত ও বার্থ ইতিহাস লক্ষ্যে লিপি-
বদ্ধ করিয়া এবার প্রবন্ধ শেষ করিতেছে
(বলেশ্বর মহারাজ প্রতাপাবিত্যের পিতৃব্য
শ্রীশ্রী অম্বারাজ বসন্তরায়ের পুত্র রাজা

দেখা পেলাম শ্রাবণে

“এত দিন যে বঙ্গহিলাম

পথ চেয়ে আর কাল গুণে

দেখা পেলাম ভরা শ্রাবণে”

—উইলিয়াম সেনের হাত-লাত-মুখর
ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Council of
State) লব্ধ মাননীয় মিঃ জুশীলকুমার রায়
চৌধুরী সৌরভ-মহাশয় বাতায়ন-বন্ধ হইতে
যে আনন্দ-ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া কলিকাতার
আশে পাশে ভাষিয়া আশিতেছে তাহার
প্রতিধ্বনির লহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা
বহুবরকে লব্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।
জুশীলকুমারের নব-পরিণীতা পত্নী শ্রীমতী
হেনা দক্ষিণ কলিকাতার সুপরিচিতা ক্রীড়া-
নিপুণা বিজয়া মহিলা। তাঁহার দাম্পত্য-
জীবন মধুর হউক।

শ্রীশ্রী চন্দ্রশেখর রায় ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বশোর-
মুন্ডাটে সিংহাসনারোহণ করেন। নূর-
নগরের অন্তর্গত কাটুনীর সেন বংশের
আদি পুরুষেরা তখন বশোর-মুন্ডাটেই বাস
করিতেন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে মুন্ডাট অকস্মাৎ
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অবাস্য্যকর ও বাসের
অযোগ্য হইয়া উঠার রাজা চন্দ্রশেখর পে
হান ত্যাগ করিয়া থানা ২৪ পরগনার
আধার-মাণিকের লব্ধ কটুপুরে গিয়া
বাস করিতে থাকেন। পুরোক্ত কাটুনীর
সেন গোষ্ঠির তদানীন্তন পুরুষ (রামধরায়ের
পিতামহ) সেই লক্ষে উদ্ভিরা আধারমাণিক
অকালে বাস করেন। রাজা চন্দ্রশেখরের
পৌত্র রাজা শ্রামসুন্দর রায় (ইনি সম্রাট
২য় আলমগীরের সময় দক্ষিণ বঙ্গের মজব-
দার নিযুক্ত হইয়া কতিপয় জমিদারী ও
জায়গীর পাইরাছিলেন) নানাপ্রকার অসুবিধা
বোধকরায় ১১০২ বঙ্গাব্দে (১৬৯৬) বহন
কটুপুর পরিত্যাগ করিয়া নূরনগরের অন্তর্গত
রামজয়নপুরে আসেন, তাঁহার লহিত তখন
রামধরাল সেন ও তদীয় নাবালক পুত্র
রামশঙ্কর সেন আশিয়াছিলেন।

(ক্রমঃ)

হাওড়ার স্থানিক কমিশনার ডাঃ বেণী
বস্ত্রের ভ্রাতা শিবপুরের সুপরিচিত কংগ্রেস
কর্মী শ্রীযুক্ত গুরুদাস বসু শ্রাবণের শেষে
এক শুভ লগ্নে এক শিক্ষারিঞ্জীর পানি-গ্রহণ
করিয়াছেন। গুরুদাসবাবুর এই যৌবন
ও পৌরুষের লক্ষণে নব বসন্তের উন্মেষে
আমরা শ্রীতি লাভ করিয়াছি।

বাংলার কংগ্রেসী মহলে এই হই বিশিষ্ট
ব্যক্তির বিলম্বিত পরিণয়োপলক্ষে আমাদের
মনের কোণে আরও হৃদয় বিশিষ্ট কংগ্রেস
কর্মীর নাম উৎসর্গ হইতেছে—তাঁহার হইতে-
ছেন আমাদের বহুবর “ইমিউনিটি”র কর্ণধার
ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ বসু ও অধ্যাপক-
প্রবর শ্রী রাজ কুমার চক্রবর্তী। ক্যাপ্টেনের
জীবনে যুগান্তর আশিলে শুধু আমরাই খুশী
হইব না ক্যাপ্টেন-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান লব্ধের
কর্মচারীবৃন্দও কঠোর কর্মকর্তার নীচল হৃদয়ে
লজ্জিত শীতলতার প্রাচুর্য্যে বহুলাংশে
শান্তি পাইবে। ‘ব্যাচিলরের’ রস-স্বাদ রক্ত-
চক্ষুর পরিবর্তে কল্যানীর শালন-বদ্ধ প্রভুর
হৃদয় হৃদয়ের পরিচর লাভে তাঁহারও যে
উৎসর্গ হইয়া উঠিবেন তাহাও আমরা
হৃদয় করিয়া বলিতে পারি। জুশীলকুমার
‘ব্যাচিলর’-লব্ধের মারা কাটাইবার পর এ
আশা হ্রাস্য নহে!!

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চ

হাওয়া ও উৎসাহগ্রহ বিস্তৃত পানীয়

ধর্মের জয় অবশ্যাস্তাবী

বর্তমানে দেশব্যাপী স্বাধীনতার যে আন্দোলন ক্রমশঃ সকলতার পথে অগ্রসর হইতেছে তন্মধ্যে মাধবজ্ঞান বর্জনও অন্ততম। স্বাধীনতার আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে মাধবজ্ঞান বর্জন আন্দোলনকেও চালাইতে হইবে। তাই আমরা যেখানে পাইতেছি যে, যে সকল প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইয়াছে ঐ সকল প্রদেশে ইতি মধ্যেই আইন দ্বারা মাধবজ্ঞান নিষেধন শুরু হইয়াছে।

আবহমান কাল হইতেই ভারতবর্ষ ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত। তাহার শিক্ষা তাহার আদর্শ যে মহান নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে শুধু নামের ভাবই বজায় থাকিতে পারে। কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ফলপ্ৰসূতা ভারতবর্ষের আদর্শ-বিসৃদ্ধ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণে ও দানব নীতির আপাতঃ মধুর আশ্বাসনে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ নৈতিক আদর্শের অবনতি ঘটিল থাকে। যে শুচিতার আবহাওয়া ভারতের চতুর্দিকে ব্যপ্ত ছিল তাহা ক্রমশঃ পঙ্কিলতার পূর্ণ হয়। এমন সময়ে ত্যাগ-মন্ত্রের আঁধার মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে মৃতন প্রেরণা আনয়ন করেন। সে ত্যাগের মন্ত্রে ভারতবর্ষ লোক চক্ষে পরীরাম ছিল, পুনরায় ভারতবাসিকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে তিনি অগ্রসর হন। তাৎপৰ্য্যও এই আদ্যানে লাড়া দেয়, এই আন্দোলনকে অব্যাহত রাখিয়া জাতীয়তার ভাব প্রদায়কর মিনার্ভা মূর্তিটোন মাধবজ্ঞান বর্জন নীতিকে ভিত্তি করিয়া এক সুস্থর চিত্র নির্ধান করে। মাধবজ্ঞানের প্রভাবে

মানব চরিত্রের কতদূর অবনতি ঘটিতে পারে, মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব কী ভাবে হারাইয়া ফেলে তাহার পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া ছবিখানি তোলা হয়। ছবিখানির নাম “মিঠা জহর।”

“জহর কখনও মিঠা হইতে পারে না। কিন্তু আপাততঃ সুখের প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ প্রথমে এই বিবকেই অমৃত জানে পান করে। ফল হয় বিষময়।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ও বোম্বাই গবর্ণ-মেন্টের মন্ত্রীমণ্ডল ছবিখানি দেখিয়া ছবিখানির উক্ত প্রশংসা করেন। সমরোপ-বোগী এই ছবিখানি তুলিয়া মিনার্ভা মূর্তিটোন যে স্বাধেদিকতার পরিচয় দিয়াছেন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র তাহার ভুলনী প্রশংসা করিয়া ছবিখানার পরিচালক লোরাবমোদীকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে বর্তমানে একদম ছবির আরও প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং একদম ছবির প্রচলন যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনও ততই ফলপ্রসূ হইবে।

ছবিখানার পরিচালনা করিয়াছেন মিঃ লোরাব মোদী। বহুদিন পূর্বে কলিকাতার “খান বাহাদুর” ছবিখানা চিত্র জগতে চাকল্য আনয়ন করিয়াছিল। ছবিখানা দেখিতে লপ্তাহের পর লপ্তাহ যথেষ্ট লোকের ভীড় হইত। উক্ত ছবির প্রযোজক মিঃ লোরাব মোদী এই ছবিতেও তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখাইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত নারিন, জাগীরাহার, ইয়াচ, শিলা, শাক্তা হস্ত, দাখাতালি প্রভৃতি খ্যাতনামা

অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গও এই ছবিতে অভিনয় করিয়াছেন।

ছবির গল্পাংশ খুবই সরল এবং শেষ পর্য্যন্ত কোথায়ও খেঁচি হারাইয়া যায় নাই। ঘটনার সারসংক্ষেপ গতি শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবে অব্যাহত থাকায় সুবিধার পক্ষে বর্ষকালের কোনই বেগ পাইতে হয় না। নরেন একজন প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী, প্রকাণ্ড এক মিলের মালিক সে, গৃহে লক্ষী স্বরূপিনী স্ত্রী করুণা। এক কথায় সুখের সংসার, কিন্তু এই সংসারেও অবশেষে অশান্তি প্রবেশ করিল। ভগবতীচরণ নামক জনৈক ব্যক্তি পূর্বে করুণার প্রণয়কাব্যী ছিল। বার্ষ প্রেমের প্রতিশোধ লইবার মানসে সে নরেনের সংসারে প্রবেশ করে এবং নরেন ও করুণার বিশ্বাস ভাঙন হইয়া তাহাদের চরম অনিষ্ট লাঘন করে, কিন্তু ধর্মের বল বাতালে নড়ে। ধর্মের জয় অবশ্যাস্তাবী পর্দার গায় নিপুনভাবে তাহাই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

খাতু বঙ্গ ৪১৫ মাস বে কারাগেই
হুডক ভৈরবী বনৌষধিতে
অব্যর্থ কল—পর্ভাবসার ব্যবহার
নিষিদ্ধ ১১-০ দস্ত ও বর্ণ শাস্তি একবার
প্রয়োগেই উপসন্ন, ১০-মাস ১০-আমা



সময় ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস অনন্ড বিশ্বাসদ
১৮২ নং বহাগজার ষ্ট্রীট. (K) কলিকাতা।



শ্রীশনি গুপ্ত

পাঁচখানি ছবি

চিত্র নির্মাণে অর্থের হিনিমিনি চলে হলিউডে, থবর রাখেন বোধহয়। একখানা ছায়াছবিকে বতপ্রকারে লজ্জব লক্ষ্যস্বল্প করে তুলতে ক্রটি রাখেন না কর্তৃপক্ষ। ফলে জলের মত বয়ে চলে থরচের স্রোত। প্রযোজকের লস্তোব উৎপাদন না করা পর্যন্ত আর তার বিয়াম নেই। শিল্প-কলার, অভিনয়ে, দৃশ্যলজ্জার, রূপলজ্জার পোষাক পরিচ্ছদে, তারপর, আলোক-চিত্র ও লক্ষ-গ্রহণ কোন কিছুতেই একটু খুঁত থাকবার উপায় নেই। বিশেষজ্ঞরা ঠায় বসে আছেন যে বার বিভাগের পাছাড়ায়। যে অংশটা মনঃশূত হচ্ছে তা করছেন 'ও, কে,' (অর্থাৎ ঠিক ছায়) আর বেচীতে মনে লাড়া লাগছে না, বলে উঠছেন 'চালাও রিটেক'। এই হলো ব্যাপার!

কিন্তু ব্রিটিশ ষ্টুডিওও হলিউডের কাছাকাছি এগিয়েছে প্রায়। সম্প্রতি একটা লংবাধে প্রকাশ যে, এই বৎসরের মধ্যেই কয়েকখানি চিত্রগ্রহণে এরা থরচ করবেন ২০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩০০০০০ টাকা। কাণ্ডখানা কি একবার ভেবে দেখুন দেখি!

এই বিরাট অঙ্কের মধ্যে ৭৫০০০ পাউণ্ড শুধু থরচ হবে পাঁচখানি ছবির জন্যে।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ভুবনবিখ্যাত তারকা গ্রেসি কিন্ডের নতুন অপেরা ছবি আরম্ভ হয়েছে, 'কিপ্‌সাইলিং'। এর জন্যে

থরচ হবে, এক লক্ষ পাউণ্ড বা পনেরো লক্ষ টাকা।

আর একখানি ছবি, গিলবার্ট ও সুলি-ভানের অপেরা, নাম 'বি মিকাদো'। এখানি আগাগোড়া 'টেকনিকলার'। সুতরাং এই বহুবর্ণরঞ্জিত ছবিখানার থরচও একটু বেশী, মাত্র দুই লক্ষ পাউণ্ড।

তারপর ওয়েবস্টার আর একখানা ছবি 'ইরোম্যান অব দি গার্ড'—একটু লজ্জাই বলতে হবে, মাত্র বোড়লক্ষ পাউণ্ড।

বার্গনারের ছবি 'টোলন্‌ লাইফ'—এক লক্ষ পাউণ্ড।

লক্ষ্যেবে বুদ্ধজয়ীবীর নেলসনের চমকপ্রদ জীবনী অবলম্বনে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ট্রাফাল-গারের যুদ্ধের রূপ ও বাণী সুধরিত চিত্র, সুপ্রসিদ্ধ তারকা লেসলী হাওয়ার্ডের নবতম অবদান!—এতে ব্যয় হবে দু'লক্ষ পাউণ্ড।

জিনজার-জননীর প্রেম

ত্রীলোকের দ্বিবিবাহ আজগুবি নয় হলিউডে। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েরা এ সময়ে প্রতিষ্ঠাবান পাণিপ্রার্থী এড়িয়েই চলে থাকে, এই তো জানতাম। কিন্তু জিনজার-জননী রজার্স এর একটা বিশেষ ব্যতিক্রম।

জিনজার-জননী শুনে অল্প কিছু ধারণা করে নেবেন না বেন। জুট্টু ঘেঁষলোঠবে ও রূপের জোয়ারে ইনি বেন জিনজার রজার্সের ভগ্নী! এইটুকু শুধু আমি বলতে পারি জিনজারকে যেখে বারা উল্লসিত হন, জিনজার-জননীকে যেখে তাহের বিবৃথ হতে হবে না।



মে ওয়েস্ট

জিনজার প্রসিদ্ধা হবার বহু পূর্বে থেকেই লেলা রজার্স সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে আছেন।

সম্প্রতি এর নামটি জড়িয়ে পড়েছে জে এজার হস্তার নামক এক বিখ্যাত ভদ্রলোকের সঙ্গে।

ওরা দুজনেই কিন্তু প্রাণপণ মাথা নেড়ে গুজবটী অস্বীকার করবার চেষ্টায় আছেন।

বাদী মে ওয়েস্ট

এককালে মে ওয়েস্টকে নিয়ে কানাকানি কুসাকিসির অন্ত ছিল না। বিশ্বের মনরাজ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে ছিলো মে ওয়েস্ট।

বর্তমানে একটা বিচিত্র ঘটনার আবার গুজব ও জটিলার স্তূত্রপাত হয়েছে।

মার্ক লিঙারের প্রতিনিধিরূপে এ্যাটর্নী জে, এফ, রশেন হল লক্ষ ডলারের (ত্রিশ লক্ষ



গ্রেটা গার্ডো

টাকার) বাবীতে শ্রীমতী ওয়েস্টের বিক্রে
একটা মোকদ্দমা রুজু করেছেন। মিঃ রমেন
বলেন, 'নি ডান্ হিম রজ' ছায়াচিত্রের
লভ্যাংশ হিসাবে এটা ওর মজেলের প্রাপ্য।

প্রত্যুত্তরে শ্রীমতী ওয়েস্ট বলেন, আলোচ্য
বাণী চিত্রের ছোট চম্পন লক্ষ ডলারের
লভ্যাংশ তার পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে
স্থলে তিনি পেয়েছেন মাত্র পঁচিশ হাজার
ডলার। লিগুয়ার এই আর্থের প্রাপ্য অংশ
স্বার্থীতি পেয়েছেন।



ক্যারল লম্বার্ড

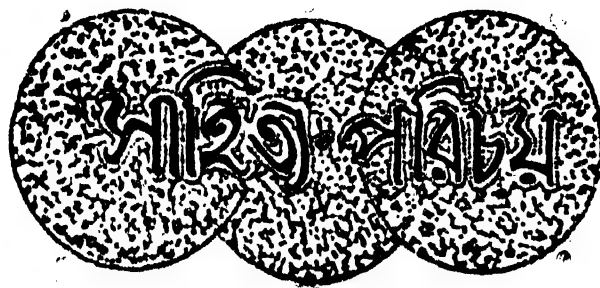
চরিত্র খবর

শ্রীমতী ক্লারা বো এখন দ্বিতীয় লস্টানের
নন। কিন্তু এতে তিনি সুখী নন,
মৌকে টেলিফোন যোগে জানানেন :
কটা মেয়ে হলোই হতো ভালো।

ক্লারার স্বামী মিঃ রেজ বেল মানিকে
নালেন, ছেলেই আমার ঘরের আলো।

* * *
শ্রীমতী ক্যারল লম্বার্ড ও ক্লার্ক গেল
জেনে পরস্পরের বন্ধ। এ খবর আপনাদের
খবানা নয়। লস্টানি লম্বার্ড তার বন্ধুর
তন নাযাকরণ করেছেন, 'প্যাপী'।

* * *
তারকাখালার মধ্যমণি শ্রীমতী গ্রেটা
গারো অভিনীত নবতম বাণীচিত্রে নারক
পাকবে 'উইলিয়াম পাওয়েল'।



১—মহিলাদিগের মাসিক পত্রিকা।
মহিলাগণ কর্তৃক পরিচালিত। সম্পাদিকা—
শ্রীলীলাবতী নাগ। বার্ষিক মূল্য লডাক
৫ টাকা, প্রতি সংখ্যা—১/০। ২২নি
অখিনী হস্ত রোড, কালীঘাট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

বহুদিন পূর্বে বাংলার নারীকর্মী সমাজের
মুখপত্র হিসাবে "জয়ন্তী" ঢাকা হইতে
আম্র প্রকাশ করিয়াছিল। সম্পাদিকা
শ্রীমতী লীলাবতী নাগের সুষ্ঠু পরিচালনায়
পত্রিকাখানি বঙ্গবালের মধ্যেই বাংলার
সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন
করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরিচালিকাগণ
তাহাদের রাজনৈতিক মতবাদের জন্য রাজ-
রোষে পতিত হ'ন এবং তাহাদের অধিকাংশই
অন্তরীণাবদ্ধ হ'ন। বহুদিন পরে পরিচালিকা-
গণ সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বাংলার নারীকর্মী সম্প্রদায়কে কর্মোৎ-
সাহে উদ্বীপ্ত করিতে একুণ একখানি পত্রিকার
প্রচার অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিশ্ব রাজনীতি
দ্বারা সহিত সংযোগ রাখিয়া স্বদেশের
কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে নারীকর্মীরা
"জয়ন্তী"-র পৃষ্ঠা হইতে বহুল পরিমাণে
সাহায্যলাভ করিতেন সুতরাং অল্প মুক্তি-
প্রাপ্তা নারী কর্মীগণ যে আবাস্যনবোৎসাহে
"জয়ন্তী" পরিচালনা করিতেছেন তাহা
বিশেষ আনন্দের কথা।

প্রাথমিক সংখ্যা "জয়ন্তী" আমাদের হস্তগত
হইয়াছে। দেশের নারী সমাজের চিন্তাধারা
কোন দিকে ধাবিত হইতেছে বা তাহারা
কোন দৃষ্টিকোণ হইতে দেশের ও দেশের
বৃহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ
করেন "জয়ন্তী"-র পৃষ্ঠায় তাহার সম্যক
পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য পত্রিকা-

আধুনিক ৩
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

৩২-সি.
গঙ্গাতলা
কলিকাতা

খানির প্রবন্ধ নির্বাচনে ও সম্পাদকীয় নিবন্ধে যে দৃষ্টি ভঙ্গির আভাস পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে বাংলায় নারী সমাজের ভবিষ্যত লক্ষ্য মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হয়। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বর্তমানে বহু আবর্জনার সৃষ্টি হইয়াছে—লেন্ডলি দূর করবার উদ্দেশ্যে সম্পাদকীয় লেখনী নতুন ও স্পষ্টভাবে চালিত হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবর্তে ডাঃ বেনমুখ কর্তৃক আনীত হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ লক্ষ্যে সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্তুতিপূর্ণ ও স্তুতিপূর্ণ নিবন্ধ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমর্থন লাভ করিবে।

সম্পাদকীয় নিবন্ধে উক্ত প্রসঙ্গে নারী-সমাজের সমস্যার বৈচিত্র্য সাহসের সহিত ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাতে গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হইলেও তরুণ সম্প্রদায়ের চিন্তা করিবার কিছু নেই। যুগে যুগে সামাজিক আচার ব্যবহারের কালোপযোগী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহা ব্যতীত হিন্দু সমাজে বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত ছিল।

পত্রিকাখানির ছাপা ও বাঁধাই প্রকৃতির পরিচায়ক। আমরা “জয়ন্তী”-র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

—শ্রীমনাথ

গান

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চকোর চাঁদের পানে বেলেছে ডানা।
ওগো দেখ, পখি-মাঝে দিওনা হানা ॥

এখন বনের বুকে
মল্ল খেলিছে স্নেহ,
হে নিষ্ঠুর, দে কথাও নাহিক জানা?
আকাশের চাঁদ কেন চকোর-ছায়া
জান না কি? এবে প্রেম—বিলন-মারা।
জগতের যে-বোটার
যে-ফুল ফুটিতে চায়,
কেউ তা'রে কোন দিন কোরোনা হানা ॥

রাত্রি এখন হোয়েছে গভীর

শ্রীসমীর ঘোষ

রাত্রি এখন হোয়েছে গভীর,
গভীর হোকনা তোমার ঘুম।
পৃথিবী এখন শান্ত ও ধীর,
ট্যান্ড্রিলের নেইকো ঘুম।
ট্রান্সলাইনের চাকার দাগ যে
গড়িয়ে চলেনা রূপালি পাতে;
ঘমাঘনি হোয়ে বিজলী রাগ যে
আলো কোরে কালো ঘেরনা রাতে;
এখন শুধুই গভীর রাত্রি
ভ্রম্যানামুক নয়নে ভোর।
আমার কলম নিরে সে যাত্রী
আরবী অক্ষ ছুটেবে জোর।

বাড়ছে রাত্রি টেবিলে আমার
জাগছে রজনীগন্ধা হল।
তোমার চুলেতে অজানা আধার
কোরছে আমারে কি ঢকল।
দিগারেটে আর নেইকো আঙুন,
যরে কিকে হোল ধোরার জাল;
নীরবতা এলো ঘনিরে দিগুন—
বাইরে উড়ছে বাহুড় পাল।
আকাশে কইছে নীরব ভাবার
আধেক হালিরা তারকা স্নান:
মরেছে চন্দ্র নিরাশ আশার,
গাইছে পৃথিবী লম্বাধি-গান।

কুকচিম্বনী সূর্যালোককেতে
কয়লা দিয়েছে ছড়িয়ে আজ।
কুকচুড়ার কোমল বুকেতে
হিমেল বাতাস হেনেছে বাজ।
এ লবে তোমার কোন কাজ নাই—
ঘুমাও এখন শান্ত ঘেরে;
দোনালী তরুা এলে রোশনাই

নাহুক চোখের পলক বেয়ে।
আমার কলম ছুটেবে এখন;
উড়বে না হয় বোম্বার্ক বান:
হরিনীর মতো এলো নয়ন
ঘুমে ঢাকা থাক ছুই নয়ন।
না হয় জ্যোৎস্না বাতায়ন পথে
যরে চুকে দিক ঘোলায়ে চুল;
নিশীথ মারার স্বপ্ন জগতে
ঘুমাও আমার ছোট্ট কুল।
রাত্রি গভীর, লহর ঘুমাও
ঘুমাও আমার রাতের রাত্রি:
ঈগল পাখী সে তীক্ষ্ণ চুম্বার
নাইবা জানালো প্রেমের রাত্রি।

পিচকালো পথে রিকশার গাড়ী
মাঝে মাঝে মৃদু বটি বাজে:
হলধে রঙেতে ঢাকা মোর বাড়ী—
কারখানা বুকে প্রেম কি লাভে?
তার চেয়ে বলে চুপচাপ আমি
কাগজ কলম লামনে নিরে;
লেইকের মতো নাল ঘুম নাহি'
আত্মক ছুটোখে তোমার শ্রিরে।
লাগর কেণার শুভ্র বিছানা
তোমার শিথিল অঙ্গ ছুঁয়ে,
কল্পনা কতো জাগাবে অজানা
রেখারিত কতো তলী মূরে:
লাগরের জল কেটে বাওয়া কতো
জাহাজের মতো ডাকবে ঘোরে
কলম আমার ছুইলের মতো
বাগিরে তাহারে ধরবো জোরে।
তারপর কতো লোনা ডেট আর
প্রবালপুঞ্জ পেরিয়ে বাবো
ঘরের দেয়ালে জন্মে আধার
কখন তোমারে তেমনি পাবো।

সমালোচনার গলদ কোথায় ?

মাননীয় “খেরালী” সম্পাদক মহাশয়

লম্বোপেয়—

সবিনয় নিবেদন

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আমার এই সামান্য পত্রখানা ছাপাইলে বিশেষ বাধিত হ'ব। এতদিন ধরে যেখে আসছি যে, বাংলা দেশে ছবির সমালোচকের অভাব নেই; তাই একটা ছবি মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে কাগজের মারফৎ নানা রকম সমালোচনার বহর দেখা যায়, তাতে আজ পর্যন্ত ভাল মন নিয়ে কোন ছবিই দেখতে পারা যায়নি। ছবি দেখতে যাওয়া মানে কয়েক ঘণ্টা নির্দোষ আমোদপ্রমোদে সময় কাটিয়ে দেওয়া এইত নয়? তাতে যদি আগে থেকেই কাগজ পড়ে একটা ধারণা ভাব নিয়ে যাওয়া যায়, তা হ'লে বোধহয় শেষ পর্যন্ত সেই আমোদটো উপভোগ করতে পারা যায় না। প্রযোজক মহাশয়রা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ছবিখানিকে সব দিক দিয়ে ভাল করতে। কিন্তু অনেক সময় হয়ত অর্থাভাবেই হোক কিংবা লম্বোপযোগী উপকরণের অভাবেই হোক তাঁরা ছবিখানিকে লক্ষ্যজীন স্কন্দর কোরতে পারেন না। তার জন্ত বিবেচনী কোনও ছবির সঙ্গে আমাদের ছবির তুলনা করা সব সময়ে উচিত নয়। ত্রিণ বৎসর পূর্বে ওদের দেশের ছবির অবস্থা কি রকম ছিল? আর বর্তমানেও যে উছাদের ছবি একেবারে নির্দোষ হয় এমন কথা স্বীকার কোরতে পারি না। কারণ কয়েক খানা নাশ করা ছবি বাহা লকলেই হয়ত যেখে থাকবেন এবং যেখে এত বেশী অঙ্ক হয়ে পড়েছেন যে তার দোষ ত্রুটি একেবারেই চোখে

পড়ে না। পড়লে যে প্রকার সমালোচনার বহর দেখা যায় তাতে ক'রে একটু আধটু এদিক ওদিক ছিটকে পড়ত।

আমাদের সমালোচকরা শুধু বাংলা ছবির দোষ ত্রুটি নিয়াই ষোলআনা সময় ক্ষেপণ কোরে থাকেন। কিন্তু তাঁরা একবার ভেবেও দেখেন না যে, বাংলা ছবি কতদিনের। এই অল্পদিনের মধ্যেই এরা কতটা উন্নতি করেছেন। অথচ তার জন্ত বাহা বা দিতে আজ পর্যন্ত কাকেও দেখলাম না। উপরন্তু যে সময় কিস্য কোম্পানী একটু আধটু উন্নতির চেষ্টা করছেন তাঁদের পেছনে আমরা লেগে ছিট খুঁজে খুঁজে নিরুৎসাহ করে দিচ্ছি। সমালোচনা করবার সময় একবারও ভাবি না যে আমাদের শিক্ষা দীক্ষাই বা কতদিনের। এখনও আমাদের শিখবার যথেষ্ট রয়েছে। প্রথম প্রথম একটু-আধটু দোষ ত্রুটি থাকবেই। একবার ভেবে দেখুন দেখি ওদের এ পর্যন্ত আসতেই বা কত যুগ কেটে গেছে। আমাদেরও ওদের মত ফিল্ম শিল্পে সমান নিপুণতা অর্জন করতে কিছু সময় লাগবে বৈকি। নিজেদের সৃষ্টি (Originate) করবার মত সময় এখনও যায় নি।

একবার ভেবে দেখুন দেখি যে যাদের দেশের এই জিনিষ বহু যুগ ধরে চলে আসছে, শিক্ষিত এবং বড় বড় মাথাওয়ালা প্রযোজক তাদেরই বা এরূপ মারাত্মক ভুল হয় কেন? আর সে সব ভুল আমাদের চোখেই বা পড়েনা কেন? বিবেচনী ছবি কিনা, তাই ভুল ধরে কে?

‘স্মারুয়েল গোল্ডউইনের বিশেষ প্রাশংসিত চিত্র “হারিকেন” অনেকই হয়ত দেখেছেন। দ্বিজন মহালাগরের দীপপুঞ্জের অধিবাসীদের

জীবন কাহিনী অবলম্বন করে এই ছবির আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। সে দেশের নয়-নারীর ভূমিকার “জন হল” ও “ডরোথী ল্যান্ডার” অভিনয় করেছেন। একদিকে সহজ সরল মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি ও অপর দিকে আইন ও শৃঙ্খলার নামে মানুষের কোমল বৃত্তির বিসর্জন। এই পরস্পর বিরোধী ভাবধারা ছবির মধ্যে ভালভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভীষণ ঝটিকার যে কল্পমূর্তি ও তাণ্ডব লীলার দৃশ্য ছবিতে দেখান হয়েছে তা অতি চমৎকার। ছবিখানাও বেশ সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু লভ্যা লভ্যা প্রবল ঝটিকা ও তার আমূলজিক দৃশ্যাবলী দেখিয়ে আমাদের চোখে এমনি তাক লাগিয়ে দিলে যে ৩০০ মাইল দূর থেকে সামান্য একখানা ভাঙ্গা .ছোট নৌকা করে (অবশ্য চুরি করে নেবার সময় নৌকাখানা বেশ বড় এবং সুন্দরই ছিল) লম্বুয়ের বক্ষদ্বিধে আগত পলাতক আশ্রমীর “নৈনীতাল আলু ভাতের মত সুখখানা” এবং Dinner—খাওয়া চেহারা কাহারও চোখে পড়ল না। আমার মনে হল যে ওদের দেশের লোকের হয়ত দাড়ি কিংবা গোঁফের বালাই নেই।

আর এদিকে বাংলা ছবিতে যদি স্নান করবার পরে কাপড় ও শরীর না লিক্ত হয় অথবা বাহ্যতে বলন্ত প্রতিবেশক টিকা লইয়া ইজের শটী, কুকের রাধা ইত্যাদি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন (অবশ্য পরিচালকগণ এলব খুটি-নাটি একটু লক্ষ্যকরিলেই শুধরে নিতে পারেন) তবেই চারদিক থেকে লকলে হেঁচক করে উঠেন। ১৮ বৎসরে রমেশবাবুর পরিবর্তন বেশ হয়েছিল। কিন্তু রমা দেবীর কোন পরিবর্তন না দেখানো খুবই দৃষ্টিকটু হয়েছিল। অভাব একজন পরিচালকএর এই প্রকার ভুল কমা করা যায় না। কিন্তু হারিকেন ছবির জেলের আশ্রমীকে যেখে আমরা স্মারুয়েল গোল্ডউইনের লকলকেই

কথা করেছি। বড় বেখেই ঠাণ্ডা।

হা হতভাগ্য বাংলার ডিরেক্টর বাহাদুরগণ।

* * *

পাড়াগাঁয়ের থিরেটারে অনেক সময় দেখা যায় যে একই ব্যক্তি একই পোষাকে একবার মূলমন্ত্রের টুপি পরে মোগল বাহশার হারমকী হয়, আবার পরের দৃষ্টে ঐ পোষাকেই মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে হয় রাজপুত নৈনিক। এর কারণ বোধ হয় বড় বড় ভূমিকার দিকে এত বেশী নজর রাখতে হয় যে ছোট ছোট ভূমিকার দিকে কাহারও খেয়ালই থাকে না। তেমনি দেখলাম ম্যারী ওয়ালেওস্কা (Marie Walewska) ভিতর Charles Boyerকে নেপোলিয়ানের লাজ লাগাতে গিয়ে তাহারই পার্শ্ববর্তী এক স্ত্রী কিংবা বাই হোক বাহার মাথার চুল থেকে লম্বতই শুভ্র এবং চামড়াও কুঁচকে গেছে তার অত বড় চওড়া ব্র কোড়া কলপ দিয়ে একেবারে কুচ কুচে কাল করে দেওয়া হয়েছে। আবার পরের দৃষ্টে দেখলাম যে উহা শুভ্র হয়ে গেছে। মনে হলো চুলগুলো হয়ত এটোফে পেকেছিল তাই এতদিন ব্র কাল ছিল। সময় হতেই হঠাৎ পেকে গেল। বলি এরা ত আর বাঙলা দেশের ডিরেক্টর নন, ইজের জীর হাতের চীকার লমালোচনার তরপাবে।

নিখুঁতভাবে দেখতে গেলে অনেক সময় অনেক কিছুই চোখে পড়ে। অনেকদিন আগের একখানা ছবি অনেকে হয়ত দেখে থাকবেন। নাম "KIKI"। ডগলাসের লক্ষ্মীন্দ্রী অভিনয় করেছেন। অত বড় একজন অভিনেতার স্ত্রী এবং নিজে একজন এত বড় অভিনেত্রী হয়েও কিনা একটি তিলকে (Mole) সপ্তর্ষী মণ্ডলের মত মুখের চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হরহরান করিয়ে শেষে এক ব্যঙ্গার এনে দ্বির করে বলিয়েছিলেন। এ লম্বত বড় বড় কোম্পানীর বড় বড় প্রযোজকের লম্বত বছরের পরিচালকের কল



অনু-জানাই

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন

সরমা রাগের মাথায় যে কি বলে গেল তা বুঝতেই নিজের খানিকটা সময় কেটে গেল। এঘটনার সময় তার মা বাপ লামনে না থাকলেও আড়াল থেকে সব শুনেছেন এবং এতটা বাড়াবাড়ি জামাইর ভাল নয়। কিছু শিকা হোক বলে এগিয়ে এলে মিটমাটের চেষ্টা তো করেনই নি বরং দূর থেকে দার দিয়েছেন।

খবর গিরিকে বললেন—আমার কপালে যে এমন জামাই জুটবে একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—সবই বরাত। আমি একটা পরমা খরচা করি না, রোজগার ছাড়া আর এ ব্যাটা কেবল তালে আছে খরচাই কোরবার। একটা আধলা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই ওর। খবরবার তোমার বলে রাখছি এবার আমার বাড়ীতে এলে বলবে রোজগার করতে শেখতো থাক নয় আমি তার ব্যক্তি পোয়াতে পারবো না। এই পষ্ট কথা। যতো অনিষ্টের গোড়া তো ভূমিই—হা হা ভূমি। তোমার জন্তেই যত সব ইয়ে আমার বরাতে জোটে। ইত্যাদি।

কিনা তাই আমরা অন্তরের লহিত যন্ত্রবাহ না দিয়ে থাকতে পারি না। আর বাংলার প্রযোজক এবং ফিল্ম কোম্পানির জন্ত আমরা রাখি শুধু উপহাসের টিটকার ধনি।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়

২২৩বি বীজাপুর স্ট্রীট,

কলিকাতা

—ওমা আমার ঘোব কি। গিন্নী গালে হাত দিলেন। আমি ওর মাকে নয় কথা দিয়েছিলাম এইতো। তা বাপ আমি কি জাম্বম ছেলে এরকম হবে।

সরমা প্রথমে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। দ্বিবি চান করে খেয়ে বেশ পরিপাটি করে হোক্তানহ পান মুখে দিয়ে তাঁরপর বিছানায় গা এলিয়ে দিলো ঘুমবার চেষ্টায়।

ঘুম কিছু এলোনা। শত হলোও.....। কাজটা সত্যি ভাল হয়নি। আর ভাল হয়নিইবা বলে কি করা, যে রকম হতে চলেছিল সেটা একবার খেয়াল আছে। তাই বলে নিজে স্ত্রী হয়ে এতটা...না : ভাল হয়নি হি হি হুপূর বেলা খেতে এসেছিল, এদময় যে মাঝব বেড়াল কুকুরকেও...ন : কি বলে। সরমা উঠে বললো। এখন কোথায় গেল নিশ্চয় ঐ সব বহমাইন্স বন্ধুত্বলোর কাছে। স্বস্তির দিকে তাকিয়ে দেখলে তিনটে বেজে গেছে। তাইতো? সরমা জানালার কাছে এলে রাত্তার দিকে চাইল। জজালের গাড়ী বেড়িয়েছে। রাত্তার জল দিয়েছে। একটি লোকও রাত্তার নেই, ভরানক রোদুর। ঐ ঘোড়ে কে আসছে না, দে-নিশ্চরই—না সে তো নয়? সরমার মন বেশ কি রকম হয়ে গেল। দে-বহি কোথাও চলে যায়। ওমা কি সর্কনাশ। তাহলে? সরমা ঘরের বাইরে এলে চাকরটাকে ঘুম থেকে তুললো—ওরে বা দ্বিবি একবার ঐ চায়ের বোতানে। খবর নিয়ে আসবি জামাইবাহু ওখানে আছেন কিনা কিংবা কোথায় গেছেন। বা শিগিরি বা।

চাকর চলে গেল।

সরমা আবার নিজের ঘরে ফিরে এলো।
ও কতো বলেছে বেধে বেথানে হয় একটা
কিছু যোগাড় করে নাও, থাকলোই বা
বাবার পরলা তবুও তার বাড়ির উপরে বলে
খাওয়া কি ঠিক। তা তখন কানে ও
তোলেনি। আর কিইবা করবে, চাকরী
তো আর রাত্তার পড়ে নেই। ঐ তো
পিশে মশায়ের তাই বলে আছে আজ চার
বছর তিন তিনটে পাশ দিয়ে। সরমার
রাগ হল বাপমার ওপর ছোটো নয়, বশটা
নয় একটা জামাই—তার উপর কি রকম
ব্যবহার—উঃ জনবে বেধিনি। ভগবান—
সরমা হাত জোড় করে হেঁদরালে টাকান
খালেগুয়ের কুকের কাছে প্রার্থনা করলো
—হে ভগবান ওকে ভাল ভাবে বাড়িতে
ফিরিয়ে দিও ঠাকুর।

চাকর এলে বললে : না চায়ের দোকানে
তো বাবু যায় নাই। সেখানকার এক বাবু
বললে : ছপ্পর বেলা জামাইবাবু তাড়ের বলেছে
যে 'চল্লুম তাই এখান থেকে, কোথায়
বলবো না, তবে বোধ হয় আর জীবনে
ফিরবো না, বলে কোথায় চলে গেছেন
তারা তা জানে না।

সরমার মাথার ঘেন বাজ পড়লো।
তাহলে সে তো চলে গেছে। 'মাগো'
বলে সে বিছানার স্তরে কেঁদে ফেললো।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শান্তুড়ীও মনটা
এখন সত্যিই কেমন কেমন করছে। খুত্তর
অটল, বলে যাবে কোথায়, একমুঠোর যার
বাইরে লংহান নেই—কিরে তাকে আলতেই
হবে। অতো ভাবনা চিন্তায় ঘরকার কি।
বাছাধনকে কিরে আলতে হবেই'।

রাত্রি বারোটা। মা ঘরের পাশে
বসে রইছেন গালে হাতদিয়ে। সত্যিই তো
এলনা এখনো বড় ভাবনার বিষয় হল।
তিনি মনে মনে লম্বা জাগ্রত বেহতাবের

কাছে প্রার্থনা করলেন। কি হল বাছার।
অসুস্থতাপ এলো প্রথমে, পরে এলো হতাশা।
শেষে রাগ ঘরের উপর—

—তুইও যেমন হয়েছিল কি ঘরকার
ছিল অতো কথা বলবার বুঝিয়ে
বললেই হতো। তা নয় একেবারে তুমুল
কাণ্ড করে ছাড়লি। হাড়ে হাড়ে জালালি
আমাকে তুই, এখন আমি কি করি।

সরমা অস্ত্র লম্বা হলে হরতো আরেকটা
তুমুল কাণ্ড করে বলতো কিন্তু এখন তার
মন ভয়ানক চিন্তাক্রান্ত। বুকের ভেতর
যেন কেমন কেমন করছে। রাত্রি একটা।
বাপ বাইরে বেড়িয়ে বেধলেন মা ঘরে
এখনো ঠার বলে। ধীরেন তবে কি...
তারও মনটা কিরকম খারাপ হয়ে গেল।
কোন দিন তো নে.....।

সে রাত্রি কেটে গেল। কিন্তু ধীরেন
ফিরে এলো না। সে বে নিরুদ্দেশ হয়েছে
এ বিষয়ে নিঃশব্দে। বেলা বশটারও বধন
ফিরে এলোনা তখন সরমা আর থাকতে না
পেয়ে বাপের কাছে গিয়ে বললে—এখন কি
হবে বাবা। কোথায় গেল, কি হল
একবার খোজ নাও।

খোজ আর কোথায় নেবে। কচি
খোকাটাতে আর নয় যে খানার খবর
হবে। চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করাতে
তারি লবাই একবাক্যে অস্বীকার করলো।

বেশী রটানও ঠিক নয় পাছে লোক হালে।
পাছে ভিতরকার লজ্জাকর ব্যাপারগুলি
লোকের কানে যায়। বশটা লম্বা চুপি-
চুপি চেষ্টা করা ঘরকার।

চুপি চুপি কিন্তু হল না। পাশের বাড়ীর
সুরেশ উকীল বিনি বর্জবানে মকেলাভাবে
কুড়ি টাকার টিউনিয়ার উপর
নির্ভর করিয়া বেকার বাড়ী বদিয়া
থাকেন ও পাড়ার বতো মন্দানন্দ
খবর লংগ্রহান্তে লম্বাক আলোচনা করে
দিন শুদ্ধরান করেন, তিনি বর্জচুক্রট
মুখে করে এলে বলেন—ব্যাপার কি বিভিন্ন
মশাই, জামাইটি শুনি পালিয়ে গেছে।

আর হ্যাঁ এই যেখন না বিপদের উপর
বিপদ। 'বিপদের উপর' কথাটি বিভিন্ন
মশায়ের মুদ্রাধোব; এই কালকে লকালে
হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে কোথায় যে
চলে গেছে। ঘরে, গিন্নি তো যেখন কারা।
জুড়ে দিয়েছে। মহা মুন্সিলেই পড়েছি।

খোয়া ছেড়ে সুরেশ উকীল অর্থপূর্ণ
দৃষ্টিতে বলেন—একেবারেই কি কিছু
হয়নি? শুধু শুধুই লোকটা চলে গেল?
না না ওটা কি আর কালের কথা হল
বিভিন্ন মশাই? আজকালকার ছেলেরা
কিন্তু কথার কথার কি বলে আপনায়
সুইলাইড মানে আত্মহত্যা ক'রে বলে।

বিভিন্ন মশাইয়ের প্রাণটার ভেতর যেন
ধপ করে বাতি নিবে গেল। আত্মহত্যা!
লেকি, হ্যাঁ, আচ্ছা; হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বাছার
একটা ব্যংহা একুনিই করছি। তিনি যেন
বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। শত হলও
জামাই তো, তার উপরই নির্ভর করছে
একমাত্র ঘরের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ। কি
করবেন প্রথমে মাথায় এলোনা। খানার
দিকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্তোব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

বক্ষিম সাহিত্যে শ্রীতিবাদ

অধ্যাপক শ্রীনপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্.এ

বক্ষিমচন্দ্রের কমলাকান্ত অজ্ঞাতদ্বারে
কপালকুণ্ডলার একটি প্রশ্নের যে উত্তর
দিয়াছেন তাহাই বক্ষিম-সাহিত্যের মর্মকথা।
কপালিক-পালিতা অরণ্যবিহারিণী কপাল-
কুণ্ডলা গৃহিনী লাজিলেও অন্তরে যোগিনীই
রহিলেন, প্রণয়িনী হইতে পারিলেন না,—
কুল হইয়া ফুটিলেও ফুটিবার সূত্র অমুভব
করিতে পারিলেন না। একদিন শ্রামা-
জ্ঞানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“বল
যেখি ফুলটি ফুটিলে কি সূত্র?” তাহার
উত্তরে কপালকুণ্ডলা বলিলেন,—“লোকের
যেখি সূত্র, ফুলের কি?” ফুলের কি?—
তাহা শ্রামাজ্ঞানী বলিতে পারিলেন না।
কমলাকান্ত হইলে বলিতেন,—“পুষ্প আপনার
জন্ম ফুটে না, (লোকের সূত্রেই তাহার
সূত্র)।” ইহাই পুষ্পের ধর্ম, এবং যাহা
পুষ্পের ধর্ম তাহা মানবজীবনেরও ধর্ম,
বিশ্বপ্রকৃতিরও ধর্ম।

পুরাতন হইলও একথা মূতন করিয়া
প্রণিধান করিবার আবশ্যকতা আছে।
বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যে শক্তি লক্ষ্য
করিয়াছে সেই শক্তি শ্রীতির লহিত যুক্ত
না হইলে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইতে
পারে বর্তমান ইউরোপ তাহার বীতংগ
দৃষ্টান্ত। শ্রীতিবৃত্তির অমূল্যলনের অভাবেই
ইউরোপীয় সভ্যতার বিশাল ধর্ম্য টলমল
করিতেছে, বলের বস্ত্রের দুর্বলের অধিকার
ভালিয়া বাইতেছে, অত্যাচারীর হস্তে
আর্জের ক্রন্দন নিম্ন হইতেছে। মানুষ
যে কখনও ইহা অগেঞ্জা নির্ভূর ছিল
ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।
প্রাচীনকালে ও মধ্য যুগে ধর্মের অঙ্গশাশন

মানবমনের কুলবৃত্তিগুলি অনেক পরিমাণে
বোধ করিত। মধ্যযুগে ইউরোপে খৃষ্টধর্মের
অনুপ্রেরণায় ও ভারতবর্ষে বৈষ্ণব প্রভাবে
যে শ্রীতির স্মৃতি হইয়াছিল তাহার নিদর্শন
ইউরোপের কাকীকীর্তি ও বাঙ্গালার বৈষ্ণব
গীতি-কাব্য। ধর্মের সে বন্ধন এখন আর
নাই। প্রেমের মন্ডাকিনী আজ শুকাইয়া
গিয়াছে, মানবের হৃদয় উৎসর মকুভূষিতে
পরিণত হইয়াছে, এবং বাহ্যসম্পদের কুহকে
মানুষ তাহার অন্তরের সূত্র বিলাইয়া দিতে
বলিয়াছে। মধ্যযুগের পর যে জাগতিক
শক্তির আদর্শ লইয়া আন্তর্জাতিক লভ্য
গঠিত হয় তাহার মধ্যে প্রাণধর্মের প্রতিষ্ঠা
হয় নাই বলিয়া তাহা বাস্তবে পরিণত
হইতে পারিল না। তাই বর্তমানে জড়বাহী
সভ্যতার লীলাভূমি ইউরোপের মনীষিগণ
মহায়া সমাজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে চিন্তাকুল।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষের
আধ্যাত্মিক সভ্যতার উপর ইউরোপের
জড়বাহী সভ্যতা ক্রমশঃ যে প্রভাব বিস্তার
করিতে লাগিল বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ্বে
তাহার লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিয়া
দ্রুতদর্শী বক্ষিমচন্দ্র ‘কমলাকান্তের বপ্তরে’
বাঙ্গালীকে যে সতর্কবাণী শুনাইয়াছিলেন
তাহা আমাদের বিশ্বত হইলে চলিবে না,
—“ইংরেজী শালন, ইংরেজী সভ্যতা ও
ইংরেজী শিক্ষার লগ্নে লগ্নে ‘মেট্রিরেল
প্রম্পেরিটর’ উপর অনুরাগ আশিয়া দেশ
উৎসর্গ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ
জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবালেন—
ইংরেজী সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—
তাঁহার আসিয়া এদেশের বাহ্যসম্পদ

নাথনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবালিয়া
আর লকল বিশ্বত হইয়াছি।……তোমরা
এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়
বুদ্ধির জন্ম কি একটা কিছু কল হয় না?
একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে লব
বেকল হইয়া বাইবে।” প্রশ্ন হইতে পারে,
বিজ্ঞান যদি মানুষকে এমন করিয়া জড়বাহী
করিয়া কেলিতেছে, তবে কেন ‘আনন্দমঠে’
চিকিৎসক বিজ্ঞানের আবশ্যকতা লক্ষ্যে
লভ্যানন্দকে অত উপদেশ দিয়াছেন?
বক্ষিমচন্দ্রের প্রতিটি জন্মিয়া ছিল যে,
ভারতবাসীকে উন্নতি করিতে হইলে, বিষের
দরবারে উচ্চ আসন পাইতে হইলে, বিজ্ঞানকে
অবহেলা করিলে চলিবে না। প্রাচীন
ভারতবর্ষেও বিজ্ঞানের সমাদর ছিল, কিন্তু
সে বিজ্ঞান মানবাত্মার গতি রোধ করিতে
পারে নাই, পক্ষান্তরে ধর্মের লহিত রূপ
অনিষ্টভাবে লম্বলিত হইয়া তাহার পরিপূষ্টি
করিয়াছিল যে পরবর্তীকালে সেই বিজ্ঞানের
বিলোপে প্রকৃত লনাতন ধর্ম ও লোপ
পাইল। তাই ‘আনন্দমঠে’ এই ভারতীয়
ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া চিকিৎসক লভ্যানন্দকে
বলিতেছেন,—“ইংরেজী শিক্ষার এদেশীয়
লোক বহিস্তবে লুপ্তিক্রিত হইয়া অন্ততঃ
বুঝিতে লক্ষ্য হইবে।” বহিস্তবে বা বিজ্ঞান
কিরূপে মানবাত্মাকে দৈশ্বমুখী করিতে
লহায়তা করে এবং দৈশ্বমুখী মানবাত্মা
কিরূপে লিক্ষ্য হইয়া “আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা,
পরপীড়িতের রক্ষা, অমৃততের উন্নতিসাধন”
ইত্যাদি দৈশ্বমুখোদিত কর্ণে প্রবৃত্ত হয়,
তাহা ‘অমূল্যলন-তত্ত্বে’ লক্ষ্যদ্যবল্যাবে
বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই

প্রশ্নে শুধু বলিতেছেন,—“যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারত-বর্ষের এই নিকাশধর্ম একত্র হইবে, সেই দিন সমুদ্র ভেদতা হইবে।” সেইদিন সমুদ্র বিজ্ঞানের বলে বাহুসম্পদের অধিকারী হইয়া সেই বাহুসম্পদকে জীবনের কর্ম-বেদীতে তাহার প্রীতি অর্ধরূপে নিবেদন করিবে। নির্দোষব্রতী বৌদ্ধধর্ম এবং কর্মহীন দয়ালুতার প্রভাবে ভারতীয় যখন বাহুসম্পদের প্রতি যে ঔদাসীন্য জন্মিয়াছিল তাহা যেনের পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই। তাই বাংলার নবযুগের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ‘কমলহল-বিহারিণী কমলা’র প্রণয় উপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে গীতাধর্মমূলক নিকাশ কর্মবাহুর উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই নিকাশধর্মের অনুশীলনেই প্রীতির বিস্তার ও শ্রীতির বিস্তারেই চিন্তের শুদ্ধি। সেই মনীষার ভাষায়,—“তাহা না হইলে ডোর-কোপীন ধারণ করিয়া, সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিন্তাশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হইয়া বলিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রকার হুঃখ আপনায় হুঃখের মত ভাবে তাহার চিন্তাশুদ্ধি হইরাছে। যে ঋষি বিশ্বামিত্রকে একটি গাভী দান করিতে পারিলেন না, তাঁহার চিন্তাশুদ্ধি হয় নাই।”

এহ উপগ্রহের আকর্ষণে, অগুপ্তমাণুষ্য নৃত্যকলারোলে প্রীতির যে “গভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি বাজিয়া উঠিরাছে, বিশ্বপ্রকৃতির সেই মহাশক্তিগণের সহিত মানুষের জয়যন্ত্রী যেদিন তাহার সুরবোজনা করিতে পারিবে, সেইদিন তাহার জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া সাকল্যে ও দৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইবে। ইহাই উপনিষদের বাণী, ইহাই কমলাকান্তের বাণী এবং ইহাই আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে দাঁড়াইয়া,



লিলা-ব্রান্ড
—তবে—
লিলা
ব্রান্ড
হওয়া চাই

সুস্বাদু
• নির্ভরযোগ্য •
পথ্য ও পানীয়

LILY BRAND
BARLEY
FINEST FOOD GRAIN
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
THE LILY BISCUIT CO
PROP. = P. JETT & CO
ULTADANGA, CALCUTTA

লিলা বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ৪ ৪ বোম্বাই

বিশ্বপ্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মানুষ কখনও তাহার জীবন পার্থক্য করিতে পারে না। অতএব “অমূল্য-তবে” শুরু শিখকে নিকাশভাবে, অর্থাৎ জাগতিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই, বখাক্রমে আত্মপ্রীতি, হাম্পতাপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও নার্সনৌকিক প্রীতির “সামঞ্জস্যযুক্ত অমূল্য” করিতে আবেশ করিয়াছেন।

আত্মরক্ষার্থে আত্মপ্রীতির প্রয়োজন থাকিলেও হাম্পতাবন্ধনই পরপ্রীতির প্রথম সোপান। কপালকুণ্ডলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন,—কিন্তু প্রকৃতির হুহিতা হইয়াও প্রকৃতির নিয়মাত্মবৃত্তিই হইতে পারিলেন না। বিবাহের পর একবৎসর অতীত হইল, তবু অস্তকরণমধ্যে নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না। চৈত্রবাসুভাঙিত যে বিশাল তরঙ্গ আদিয়া কপালকুণ্ডলাকে গ্রাস করিল, সেই বিশাল তরঙ্গ যেন অবমানিতা প্রকৃতির লংঘারিণী সৃষ্টি। যৌবনে আত্মপ্রীতির আধিক্যবশতঃ কমলাকান্ত বিবাহ করিয়া সংসারী হন নাই, স্ত্রীও হন নাই। কিন্তু এই অলম্পূর্ণতার বেধনাই বিশ্বব্যাপী প্রীতির গভীর উৎস উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার জীবনে লম্পূর্ণতার আনন্দ লক্ষ্য করিয়াছিল। কমলাকান্ত এই আনন্দ অমৃতব করিয়াছিলেন। কিন্তু লংঘারিত্ববিকিতা ব্যাধাতুরা দেবী চৌধুরাণী নিকাশধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেও বতর্দিন না সংসারী হইলেন ততর্দিন স্ত্রী হইতে পারিলেন না। এই দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষ ও নারীর হৃদয়গত পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। যে নিকাশধর্ম্ম পুরুষের প্রীতিকে গৃহের ক্ষুদ্র পরিদীপ্য হইতে যুক্ত করিয়া জীবনের বৃহত্তর কর্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করে, নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে সেই নিকাশধর্ম্মে প্রেরণা দিয়া তাহার ও পুরুষের জীবন ধৃত করে। এই ধর্ম্মই জীলোকের

ধর্ম্ম—এবং এই ধর্ম্মই “দেবা চৌধুরাণী” উত্তারের লারকথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্নপ্রকার প্রীতির সামঞ্জস্য। “অমূল্য-তবে” শুরু বলিতেছেন,—“ভারতবর্ষীয়বিগের দৈর্ঘ্যে তত্ত্ব ও নার্সলোকে লম্বুটি ছিল। যিহু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই নার্সনৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অমূল্য নহে। দেশপ্রীতি ও নার্সনৌকিক প্রীতি উভয়ের সামঞ্জস্য ও সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ব্যক্তিগত ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির খাপন গ্রহণ করিতে পারিবে।” এখানে শুরু ভারতবর্ষের কথা বলিলেও বাংলা দেশই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ। কমলাকান্ত যখন যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা ‘স্ববর্ণময়ী প্রজাপ্রতিমা’। ‘বন্দোবস্তময়’-লক্ষ্যে যে যাক্ষমুগ্ধির বিকাশ হইয়াছে তাহা বাংলার লগ্নকোটি সন্তানের আরাধ্য সৃষ্টি। ভারতের বিভিন্ন জাতির যে বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্য তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস এবং যে বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপর তাহাদের ও জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বদেশধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশধর্ম্ম দিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ণ লক্ষণ না করিয়া বাঙ্গালী তাহার প্রীতি লম্বু ভারতবর্ষকে অর্পণ করিল, বঙ্গমাতার আলনে ভারতমাতাকে বলাইল। সামঞ্জস্যযুক্ত অমূল্যলনের অভাবে, যে প্রীতি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারিত তাহা বিশাল ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক পরিমাণে ভারতবর্ষের উন্নতি লক্ষণ করিলেও বাঙ্গালী সে উন্নতির ফলভাগী হইতে পারে নাই। বাংলার জাতীয় জীবনে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গালীর আত্মসত্ত্বীয় অনৈক্য ও হ্রস্বলতা তাহার বর্তমান হ্রস্ববাহার কারণ হইয়াছে। যদি

বাঙ্গালী নার্সনৌকিক প্রীতিতে কল্পিত বাংলার অশিক্ষিতের শিক্ষার, অমূল্যের উত্তি লক্ষণে, পরপীড়িতের রক্ষার, দেশের যেকোনও অর্বহেলিত পদ্বলিত কুবক লক্ষ্যবাহের হ্রস্ব ও বৈজ্ঞ নিবারণে এবং জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যপনে আরও যত্নবান হইত, তাহা হইলে সেই জাতীয় শক্তির ফলে বাঙ্গালীর ভারতপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতির পরিণাম আরও গৌরবময় হইতে পারিত।

যে বঙ্কিম বিশ্বপ্রীতির আদর্শে অমূল্যপ্রাপিত হইয়া বাঙ্গালীকে স্বদেশধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার

শিশুদের শিক্ষা

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ওষধ

হৃদয় ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ওষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

শিশুদের
শিক্ষা

চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর জাতীয়
প্রীতির মধ্যে তাহার জাতীয় শক্তির লক্ষ্য
দ্বিরাছিলেন এবং সেই শক্তির পূর্ণতার
বাংলার ও বিশ্বের কল্যাণময়ী বৃত্তি
দেখিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে
যে লক্ষ্য লক্ষ্যাদিকতার অভিযোগ
উপস্থিত হইয়াছে তাহা অদৃষ্টের নিষ্ঠুর
পরীক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে।
ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি চরিত্রের
উক্তি ব্যতীত আর কোথাও এই অভিযোগের
ভিত্তি নাই এবং এই উক্তিগুলিও বঙ্কিমচন্দ্রের
উক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।
আরোবার জ্ঞান উদার, করুণ ও মধুর
নাট্যচরিত্র যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,—
'রাজলিংকে' যিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "হিন্দু
হইলেই ভাল হয় না। মুসলমান হইলেই
মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না,
মুসলমান হইলেই ভাল হয় না; ভাল মন্দ
উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে",—কৃষ্ণচরিত্র
মধুকে যিনি বলিয়াছেন, "যিনি একাধারে
শাক্যলিংক, বিগ্ৰহীষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র...
আমি তাঁহাকে নমস্কার করি", সেই বঙ্কিমকে
মুসলমানবিদ্বেষী বা পরম্পরবিদ্বেষী বলিলে
তাঁহার আত্মার প্রতি অবিচার করা হইবে।
হিন্দু বঙ্কিম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠে বিশ্বাস
করিতেন, কিন্তু অন্ধধর্মের প্রতি ঘৃণা বা
বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার উদার
প্রীতিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই! *

* হগলী জেলা বঙ্কিম শতবার্ষিক উৎসবে
পঠিত।

সাহিত্যের কষ্টি পাথর অশনি

সত্যসুন্দর দাসের মুরুব্বিয়ান

সত্যসুন্দর দাস "সাহিত্যের স্টাইল"
মধুকে তেঁতুলী পৃষ্ঠা ব্যাপী এক প্রবন্ধ লিখিয়া
গলদস্বর্ষ হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের
স্টাইল যে কি বস্তু তাহা তিনি প্রাণপণ
চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে পারেন নাই। প্রবন্ধটি
ইংরেজি গ্রন্থপাঠের অজীর্ণ বমন মাত্র।
'ইহাতে নাই কি? ইহাতে কাকূতি আছে,
আকূতি আছে, রূপায়নতন দেখ আছে, বাস্তব
দেহ আছে, ভাবার মিতাকর গাঢ়তা আছে,
কল্পনাময় বিকলতা আছে, "অলম্বক শব্দের
চক্ৰমকি চুকিয়া ভাবের সরিষাকুল সৃষ্টি
করা আছে, নাই কেবল 'সাহিত্যের স্টাইল'!
স্টাইল মধুকে লেখনীর-বর্ণিত নীরবের
আর্তনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া সত্যসুন্দরবাবু কি
বলিতেছেন প্রথমেই শুনিয়া রাখুন :—অলম্ব
অকস্মৎ বেরনার ভাষা নাই, তাই নির্ভাবকেই
কবি এখানে কাজে লাগাইয়াছেন। ইহাই
স্টাইলের পরাকাষ্ঠা। স্টাইলেরও অনেক রূপ
আছে বটে—কিন্তু যেখানে তাহার নির্দেশ-
যোগ্য লক্ষণ বস্তু স্পষ্ট, সেখানেই তাঁরা খাঁটি
স্টাইল হইতে তত্তদূরে।" অর্থাৎ লেখক
যেখানে নির্ভাক হইয়া বলিয়া আছেন,
কিছুই লিখিতেছেন না, সেখানেই লেখকের
টেবিলে যে শালা কাগজ রহিয়াছে তাহাতেই
স্টাইলের পরাকাষ্ঠা ফুটিয়া উঠিতেছে। যেখানে
লেখক বহি ও বা লিখিলেন, তাহা হইলেও,
তাঁহার লেখা যেখানে ধোয়াটে রকমের হইল,
ততটা তাহাই স্টাইলের নিকটে আসিল।

গালা আর কাহাকে বলে? সত্যসুন্দর
ভাষিত অপর একটি স্টাইলের লক্ষণও শুনিয়া
রাখা ভাল। "ভাব ও বেহের—বিশ্ব ও
প্রতিবিশ্বের—মধ্যে বহি অংশত বা লম্বিত
কোনও অশাস্ত্র কোথাও না থাকে, তবে
ভাষাগত বস্তু কিছু উপাধানের দ্বারা লম্বিত-
কেই খাঁটি স্টাইল বলিতে হইবে।" কিছু
বুঝিলেন কি? আশাভের মনে হয় স্টাইলের
এই খাঁটিতে তবু গন্ধই রহিয়াছে, বাহ্যতে
ভ্রলোকের বমনোদ্বেগ করে মাত্র, বুদ্ধিবার
বা ভাবিবার কিছুই নাই।

এইবার সত্যসুন্দরবাবু যে স্টাইলে
সাহিত্যের স্টাইল লিখিয়াছেন, তাহার একটু
নমুনা 'নোট' করিয়া রাখুন :—

(১) "গতই আধুনিক জীবনের বিভিন্ন
রস-লংঘননার অতি নিপুণ ও বৈচিত্র্যময় বাক্-
ভঙ্গি হইয়া উঠিয়াছে—ইহাই যেন কবি
সরস্বতীর কামধেনু।"

(২) "ভাবার বাণীধানিকে অলংঘ্য
হিতব্রজ হইতে হইবে—বিস্মৃতি, বিস্ময়ণ,
পর্যবেক্ষণ, ধ্যান, আবেগ, আবেদন—শব্দ
হইতে লবল সুরই আদার করিতে হইবে।"

(৩) "বাহুর মনের অগীর্ষ আকৃতি
(Imagination "I") যেন এক কঠিন কালো
মায়া-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া আছে, যন্ত্রকে
ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি একমাত্র
কাব্যেরই আছে; কাব্যই, শব্দের বাহুধরে,



ইন্দিরিয়াল চা

MAHA

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলি

বন্দী ভাবরাজির সেই মারামুখল ঘোচন করিতে পারে।”

আমরা আন্তোয়-নরসতী পর্যন্ত দেখিয়াছি, “কবি-নরসতী” দেখিও নাই, শুনিও নাই। বশিষ্ঠ ঋষির স্তায় “কবি-নরসতী”-র কামধেনু ছিল কিনা তাহাও বর্ণিত নাই। বোধ করি এই কামধেনুটি কবি লত্যানন্দর হালের গোয়ালে বাঁধা থাকিরা লত্যানন্দরের “ভাবার বাঁধাখানিকে” চিবাঁইরা চিবাঁইরা হিজড়ুক করিয়াছে এবং সেই জন্তই, সেই হিজড়ুখে কবি-মনের “অদীম আকৃতি” ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। স্বপ্নকে ভাবার ব্যক্ত করিতে হইলে যে একমাত্র কাব্য লিখিরা তাহা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহাও আমরা পূর্বে জানিতাম না। এখন দেখিতেছি স্বপ্ন দেখাই, বিপদ হইয়া উঠিল। কি লক্ষ্য-নাশ! লত্যানন্দর কি বাণীই বানাইলেন!

কিন্তু লত্যানন্দরবাবু নাহিত্যের স্টাইল লম্বকে আবেল তাবোল বাহাই কেন লিখেন না, আমাধের তাহাতে আপত্তি ছিল না কিন্তু ঐটুকু—বিভা-বুদ্ধির পুঁজি লইয়া নাহিত্যার্চাধ্য বর্গীর অক্ষরচন্দ্র লরকার মহাশয় লম্বকে বাহা লিখিয়াছেন তাহা শুধুই অমার্জ্জ্বল্যের নয় গুরুতর শাস্তির বাগ্য। লত্যানন্দর লিখিয়াছেন—“লেকালের নাহিত্য-তলিকের মনে স্টাইল জিনিবটার একটা ধারণা যে অজ্ঞাতপারেও বিস্তারিত ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারি। তারালকরের ‘কাব্বরী’ লম্বকে বর্গীর অক্ষরচন্দ্র লরকার লিখিয়াছেন—“তারালকরের বন্ধার খুব। বন্ধারে সুরতাল ডুবির থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাব্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, বিস্মিত হইতাম—কিন্তু কখনও নিজের জিনিব বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাব্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না।” লেখকের অভিপ্রায় বোধ হয় এই—কাব্বরীর ভাবার লক্ষণত

মার্ঘ্য বা ধ্বনিচাকুর্ঘ্য কাণে ভাল লাগিলেও চিত্ত স্পর্শ করে না, কেন যে, তাহা তিনি বুঝাইতে পারেন নাই।.....পাকের বোব কোথায় তাহা ধরিতে পারেন নাই...কথাটা বলিয়াও বলিতে পারেন নাই। আবার লেখক তাঁহার মনোমত উৎকৃষ্ট রচনার গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ—

‘কিন্তু অরুণা বজলের হুল, দৈবর গুণের লহর, অক্ষরকুমারের গাভীর্ষা, নিভালাগরের প্রলাব্ধগুণ তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বলিয়া বাইত।’ —প্রাণে বাজিত,—লাগিত,—বলিয়া বাইত,—ব্যাখ্যা করিবার কি প্রাণান্ত চেষ্টা! ...ভাল লাগে না কেন তাহাও যেমন লেখক ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই, ভাল লাগে যে কেন বুঝাইতে গিয়া তেমনই যে লক্ষণ গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আধুনিক সাহিত্য-বিচারে অতিশয় তুচ্ছ।”

লত্যানন্দরহাশ-নামা বালাখিল্য লেখকের এই অকালপকতা ও মুক্কিরানার কি শাস্তি আপনারা দিতে চাহেন, তাহাই প্রথমে আমরা শুনিতে চাই। নাহিত্য-ক্ষেত্রে কুপাচার্য্যতুল্য অক্ষরচন্দ্রের পাঙ্ককা বহন করিতে পারিলে বাহার নাহিত্যিক জীবন ধন্ত হইয়া বাইত, যে লত্যানন্দর হাশ এককালে অক্ষরচন্দ্রের এক ছত্র লম্বালোচনা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল, সেই লত্যানন্দর হাশের এই অলম্বানজনক উক্তি ও বাচালতা আপনারা কিনের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিবেন? যে প্রসঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়া অক্ষরচন্দ্র ঐ কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, এই লত্যানন্দর তাহার কোনও খবরই রাখেন না। অক্ষর চন্দ্রের পুঁজি শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র লরকার তাঁহার সম্পাদিত কাব্বরীর তুলিকার অক্ষরচন্দ্রের বিবৃতির ঘেটুকু অংশ তুলিয়াছেন, তাহাই লত্যানন্দরের পুঁজি। অক্ষর চন্দ্র লত্যানন্দর বাবুর মত কোষর বাঁধিরা তেবটিপুঠা লম্বা “নাহিত্যের স্টাইল” বুঝাইতে

গিয়া ঐ বিবৃতি প্রকাশ করেন নাই। বালককালে তাঁহার পিতৃঘরের মুখে কাব্বরী পাঠ শুনিয়া তাঁহার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, তাহাই তিনি “পিতা-পুত্র” নামক প্রবন্ধে প্রকাশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। লত্যানন্দর হাশ অক্ষর চন্দ্রের উদ্ধৃত লেখা যেখানে শেব করিয়াছেন, তাহার পরেই অক্ষরচন্দ্র বাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতেই এই কথা প্রমাণ পাওয়া বাইবে। সেই লেখাটুকু এই—“তখন অবশ্য জানিতাম না, কাহাকে বলে প্রলাব্ধগুণ, কাহাকে বলে গজোত্তম। এখনও যে বেশ জানি নে কথা বলিয়া বুঝাবরসে অধর্ম লক্ষ্য নাই করিলাম।” ইহাই “লেকালের নাহিত্য-রসিক”-দের বিনয়; আর একালের “নাহিত্য-রসিক” বাহা লিখিয়াছেন, তাহা ত দেখিতেই পাইলেন! কতখানি মিথ্যা কতখানি লম্ব-গুরু-ভেদাভেদ জ্ঞানের অভাব, কতখানি আবাস্মিকির পরিচয় উহাতে রহিয়াছে, তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে কি?

অক্ষরচন্দ্র এ কালের রসিকদের স্তায় গুরুজনের কান ধরিয়া টানেন নাই বটে, কিন্তু কাব্বরী প্রভৃতির ভাবকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্ত “পিতা-পুত্র” নামক নিবন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রমাণবোধগ্য। অক্ষরচন্দ্র লিখিয়াছেন—“লংকৃতানুসারিণী বালালা ভাষা অতি স্নন্দর হইলেও বরফা কুলীনকস্তার মত যেন কেমন কেমন বোধ হইত। শ্রী তিরগোত্রা হটুক, আপনায় ঘর আপনি করিতে শিখুক, আপনায় পথ আপনি দেখুক, এই প্রকার ইচ্ছা হইত।” কিন্তু লত্যানন্দরের অজরবাবু-লিখিত কাব্বরীর তুলিকাটুকু লম্বা বিভা, তাই তিনি কতোরা কাড়িয়াছেন—পাকের কোথায় বোব অক্ষরচন্দ্র তাহা ধরিতে পারেন নাই।

অক্ষরচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন—“তাঁহার অমুগ্ধ করিয়া আমাকে পৃথক

উপহার যেন, আবার নিগ্রহ করিয়া লম্বা-লোচনার দাবী করেন। নিগ্রহ কেন বলিতেছি, বলি। লেখাপড়া কিছু না শিখিয়া অনেকের লিখিবার বাসনা হয়।

অনেক লেখা বুঝিতে পারা যায় না,—লম্বা-লোচনা একটা নিগ্রহ হইয়া ওঠে। ঐ “তাহারা” এবং “অনেকের” মধ্যে বোধ করি লতাসুন্দর বাবুও একজন ছিলেন, নতুবা এতদিন পরে অকস্মৎ অক্ষরচন্দ্রের প্রতি লতাসুন্দরের—এতখানি অথবা আক্ৰোশ ফুটিয়া উঠিবে কেন?

লতাসুন্দর বাবু যে ভাষা ও যে বিচার-বিশ্লেষণী বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া “লাহিত্যের স্টাইল” লিখিয়াছেন, সেই লব্ধে অক্ষরচন্দ্রের দুইটি উক্তি আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। অক্ষরচন্দ্রের দ্বিতীয় উক্তি—তাহার ঐ “পিতা-পুত্র” নামক নিবন্ধেই আছে। লতাসুন্দর বাবু পুনর্বার লেখনী গ্রহণ করিবার পূর্বে আচাঙ্গের ঐ উক্তি দুইটি ব’ধ স্মরণ করেন, তাহা হইলে তিনি উপকৃত হউন আর না হউন, বঙ্গীর পাঠক যে তাহার ভাষার ও স্টাইলের অভ্যাস হইতে অনেকটা রক্ষা পাইবে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। অক্ষরচন্দ্রের উক্তি দুইটি এইরূপ :—

(১) “এদাক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইলেই বঙ্গভাষা হয় না। বঙ্গীর লক্ষ

বিশিষ্ট হইলেও বঙ্গভাষা হয় না। ভাষা-শরীরের অভ্যাসের একটি প্রাণপদার্থ আছে, সেইটি বঙ্গালির মত হইলে তবে বঙ্গালির উপযোগী ভাষা হয়।”

(২) “এখনকার আমাদের সাহিত্য-সেবা যেন এনাটমিক্যাল ডিসেকশন্। অস্তি-মাংস-চর্কের ব্যবচ্ছেদ। একখানি সাহিত্যগ্রন্থ পাইলে, আমরা করি কি, দুই ছত্র পড়িতে না পড়িতেই লম্বা-লোচনার ছুরী বাহির করিয়া, তাহার ভাষা চিরি, তাহার ভাব চিরি, তাহার অলঙ্কার চিরি, ইতিহাস চিরি, খণ্ড খণ্ড করি, তাহার পর আবার বোতলে পুরিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইয়া দিই। বলি, আমিত লামাত ডাক্তার, এই করিয়াছি; তুমি সাহিত্য-জগৎ,—কোমিক্যাল এক্সপারিমেন্টার, রাসায়নিক পরীক্ষক—তুমি একবার এলিড দিয়া, ঘৃণা দিয়া, অংজা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ না কেন ইহার মধ্যে কি আছে? আমাদের এখনকার কালের সাহিত্য-সেবা এইরূপ আর তখনকার সেই কাছঘরী পাঠ যেন বারানগরীর বিষেবরের আরতি। সাহিত্য তখন উপভোগের লক্ষ্যী, আরাধনার বস্তু। কত আরোজনে, কত বস্ত্রে, কত পরিশ্রমে তখন সাহিত্য-সেবা হইত। সাহিত্য-সেবার লোক ভক্তিতে গদগদ হইত, আনন্দে অশ্রু-পরিপ্লাবিত হইত। ভক্তি, আনন্দ,

গান

ক্ষীসত্যচরণ ভট্টাচার্য্য

আমার বেউলে নিতে গেল হীপ
আরতির ধূপ নাহিরে।
অস্তরে ছিল বেবতা আমার
আজিকে সে গেল বাহিরে।
অকারণ শুধু গাঁথি বনে মালা
প্রভাত সন্ধ্যা আরতির ডালা
মঙ্গল হীপ হল বুধা জালা
অস্তর ধন চাহিরে।
যন্ত্রের মোর ছিড়ে গেছে তার
আজিকে বেহুরো গাহিরে
অস্তরে যোর উঠেছে শ্রলর
তাণ্ডব আছে বাহিরে।
'ধনে' 'ধনে' শুধু বিজুলীর লিখা
বুক চিরে লিখে ব্যাখ্যাতের লিখা
মত আকাশে পরায় সে ঢীকা
আমি থাকি শুধু চাহিরে।

উচ্ছ্বাস, এই সকল লইয়া তখন সাহিত্য-সেবা, সাহিত্য-চর্কা, সাহিত্য-পূজা। এখনকার মত ছুরি-কাঁচি-বরষী লইয়া সাহিত্য-ভেদ, সাহিত্য বেধ, সাহিত্য-ব্যবচ্ছেদ, তখন ছিল না। হায়! আমরা কি সাহিত্য-সেবাই লিখিয়াছি!!!” পাকের ঘোষ কোথায় তাহা ধরিবার লজ্জা, ডেগোমি করিবার পূর্বে লতাসুন্দরবাস নিজের ভিতরটা একবার খানাতল্লাশী করিয়া দেখুন না!

ফোন ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের
তেল ব্যবহারে
বেরি বেরি হয় না

বড়বাজার

মিল-২৪৩, তাপার সারকুলার রোড - কলিকাতা।

কান্দীশ্বর

(নাটক)

ত্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বয়

দিলীপ ও সুনীলা ।

সুনীলা—তুমি ভালো হ'য়ে গেছ, এখনও কেন বৃথ তার কোরে থাক আমার বলবে ?

দিলীপ—ভালো !দেখটা ভালো থাকলেই ত্যাবো মানুষ ভালো থাকতে পারে ?

সুনীলা—তা ভাবি না । কিন্তু—

দিলীপ—ঐ কিন্তু !—আমারও নকল চিন্তা, নকল প্রেরণা ঐ কিন্তু'র পাশে ধমকে দাঁড়িয়ে গেছে সুনীলা । আমি ভাবি আর আমার মন কোন অতল তলে ডুবে যায় !...

সুনীলা—যুঝতে পেরেছি । কিন্তু জন্মের জন্ত কেউ দায়ী নয় দিলীপ, কর্মের জন্ত দায়ী । সুতরাং—

দিলীপ—জানি । আমার নিজের পক্ষে সে কথা প্রযোজ্য । কিন্তু কর্মের জন্ত যে ব্যক্তি দায়ী সে হ'ল আমার বা,—এইটা আমি কোনমতে ভুলতে পারি না । ভুলতে পারি না বলেই আমার আজন্মের লাধনা আজ এমন কোরে ধ্বংস হ'য়ে গেল !

সুনীলা—তুমি যে বলতে লাধনা কখনও ধ্বংস হয় না ? বলতে না ?

দিলীপ—বলতাম । তখন জানতাম না লাধনার পথে এতো বড় বিপর্যয় কখনও ঘটতে পারে !

সুনীলা—তর্ক করচিনা, কিন্তু তেবে বেধো এর চেয়ে কত বড় বিপদ, দ্বন্দ্ব-দুর্ভোগ

মানুষকে লক্ষ্য করতে হয় । লক্ষ্য কোরে আমার সেই পুরাতন কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে গিয়েই দাঁড়াতে হয় :—তাকে পড়লে তার চলে না । তাকে পড়তে হয়, তাকে উঠতে হয় ; তাকে খাষতে হয়, তাকে চলতে হয় !

দিলীপ—নব জানি ; কিন্তু সুনীলা, লাধনার পথে এর চেয়ে গুরুতর দুর্ভোগ আমি করনা করতে পারি না ! —বেশভক্তি আমার কোথা থেকে আসে নীলা ? কোথা থেকে পেরেছি স্বজাতি প্রীতির অমৃতধারা ? —পেরেছি যাকে ভালোবেসে ! যাদের সঙ্গে তুলনা আছে বলেই বেশকি আমার বন্দনা করি তাই বেশের নস্তান আমার ভাই, আমার Comrade. সেই বা যদি হ'ল কলঙ্কিতা, সেই বা যদি হ'ল অশ্রদ্ধার পাত্রী, কি অজুহাতে আমি আমার দেশ-মাতৃকার সেবা করতে যাবো ? আমার কর্মক্ষেত্র যে বিরাট ভূমিকম্পে ধরাশয় হতে নিশ্চয় হ'য়ে গেল সুনীলা ! —লেখানে দাঁড়াইব বা কি কোরো, চলবই বা কোথা ! (বলিয়া দিলীপ চূপ করিল, দেখা গেল তাহার চোখ দুটি অশ্রু নজল হইয়া উঠিয়াছে ; সুনীলা ধীরে ধীরে তাহার গারে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল)

সুনীলা—শান্ত হও দিলীপ, আর ও চিন্তার নিজেকে অধীর 'কোরে তুলো না । লাধনা যদি ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে থাকে ত' বাক্ । কর্মক্ষেত্র যদি নিশ্চয় হ'য়ে গিয়ে থাকে ত' বাক্ । —আমরা আমার নব নুতন কোরে গড়ে তুলবো !

দিলীপ—(স্নান হালিরা বলিল) আমরা
সুনীলা—হ্যাঁ আমরা ! —তবু তুমি
আর আমি ।

দিলীপ—কিন্তু তোমার বা তো আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে দেবে না নীলা । তোমাদের নকলকার কাছ থেকে আমি এখন বাইরে চলে গেছি । তুমি চলে গেছি ।

সুনীলা—বা কি কোরবে জানি না । কিন্তু আমার কাছ থেকে তুমি বাইরে যেতে পার না দিলীপ । আমার মন থেকে—
(বলিয়াই সুনীলা লহসা থামিয়া গেল)

দিলীপ—বলো, যেমে যেয়ো না ; সবটা আমার সুনতে দাও নীলা ! —তারী যিটি লাগছে আমার !

সুনীলা—সে থাকগে । সে আর এমন কি কথা । —কিন্তু আমরা দু'জনেই আমার নুতন কোরে লাধনা স্রষ্ট কোরবো তুমি বেধে নিও । সৃষ্টি কোরব নুতন কর্মক্ষেত্র সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াতে তোমার গৌরব-হানি হবে না ।

দিলীপ—কিন্তু আমার নিজের কাছ থেকে আমি অব্যাহতি পাবো কি করে ? অগৌরবের যে মানি আমার বুকের দাবি-খানটাতে বহুশিখার মত জলতে লাগলো, তার আমি কি কোরবো ? সে আশুপ নিভবে কি করে ? সে আশুপ নেবাবে কে ?

সুনীলা—আমি ।

দিলীপ—তুমি ?

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপেরচা

বাস্তব ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পাঠ্য

সুনীলা—হ্যাঁ আমি। আমি তোমার
বুকের মাঝখানটিতে এমনি কোরে হাতবুনিরে
ঘোব চিরকাল ধরে; হাছ তোমার থাকবে
না, কখন ছিল বলেও জানতে পারবে না।
—দেখছো ত' আমার হাত কী ঠাণ্ডা।

দিলীপ—হ্যাঁ ঠাণ্ডা। বুক আমার
জুড়িয়ে গেল। কিন্তু ওগো আমার হৃৎ-
জুড়ানো হয়নি বন্ধু, নিজের কী লক্ষ্যনাশ
করছো একবার ভেবে দেখো।

সুনীলা—নিজের লক্ষ্যনাশ আমি ঘোটেই
করছি না। তোমার লক্ষ্যনাশে যে আমে
তার কখনও লক্ষ্যনাশ হয় না। লক্ষ্যনাশ
তার কাছে মাথা নত ক'রে থাকে।

দিলীপ—(অন্ন শুক থাকিয়া বলিল)
আমি বুঝতে পারছি না। সব আমার
গুলিয়ে যাচ্ছে। আমার বুঝিয়ে বলো
সুনীলা।

সুনীলা—আমরা এখানে থাকবো না।
আমরা চলে যাবো দূরে, নহরের বাইরে—
যেখানে লভ্যতার বাগান নেই। —ছোট
পাতার ঘর করে আমরা থাকবো। সেখানে
চোখের উপর আমাদের থাকবে উন্মুক্ত
প্রান্তর, নীলিমার-তরা একখানি অসীম
আকাশ আর তুমি আর আমি।—আমাদের
কার্য হবে হরিজ্ঞ গ্রামবাসীর সেবা—
ভারতবর্ষের যারা প্রতীক। সেই হবে
আমাদের নতুন ব্রত, আমাদের সাধনা।

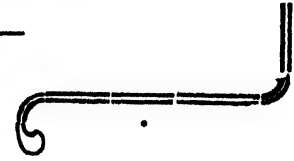
দিলীপ—কিন্তু ঘর ছেড়ে, লংঘার ছেড়ে
তুমি আগবে আমার সঙ্গে দূর পল্লীতে
পাতার ঘরে বাস করতে! —এ হৃৎ-
কেন তুমি বল কোরে নেবে নীলা।

সুনীলা—বাঃ! এ বুঝি আমার হৃৎ-
কেন বলেছে তুমি? তুমি তো সব জান।
কিছুই জান না দেখছি!.....

(ক্রমশঃ)

রেকর্ড সমালোচনা

—এডিসন—



রেকর্ড বিচিত্রা—সেনোমার শিশু-রেকর্ড
হিজ মাস্টার্স ভয়েসের সমালোচনা।

এবারে আমরা আগষ্ট মাসের যে কয়-
খানি এচ, এম্, ভি, রেকর্ড শ্রবণ করিবার
সুযোগ লাভ করিয়াছি তাহার সমালোচনা
প্রকাশ করিলাম।

এচ, এম্, ভি,—পি ১১৮২৬ :—রেকর্ড-
আলবের 'সুপরিচিতা' রবীন্দ্র-গীতি-গায়িকা
শ্রীমতী কনক দাস এই রেকর্ডে দুইখানি
পুরাতন রবীন্দ্র-গীতি গাহিয়াছেন। সহগামী
লক্ষীতের লহিত একপিঠে 'ভিমির-হরার
খোলো' এবং অল্পপিঠে 'আমারে বহি জাগলে
আজি মাথ' প্রথম গানখানি শিল্পী স্বর বিশিষ্ট
ভঙ্গীতে গাহিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। দ্বিতীয়
গানখানি আমাদের ভাল লাগে নাই। গান
দুই খানির সুর দিয়াছেন স্বরং কবীন্দ্র
রবীন্দ্রনাথ।

এচ, এম্, ভি,—এন ১১১১০ :—কুমারী
লাবিত্রীরাণী বসু (চামেলি) এই রেকর্ডে
বাত্তবাসীর লহিত একটিকে 'বিদেশী তরী
এল কোথা হতে' ও অল্পটিকে 'বন-মন্দির
ফুটিবে বখন' এই দুইখানি কাব্য-গীতি রেকর্ড
করিয়াছেন। কুমারীর গাহিবার চণ্ড ভাল,
খোঁচ ও মৌচুলি উপভোগ্য,—বিশেষতঃ
প্রথম গানখানিতে ইহা বিশেষ সুপরিচ্ছন্ন
হইয়াছে। দুইখানি গানেই গায়িকার প্রথম
রেকর্ডের আলবের উচ্চ ভবিষ্যতের সূচনা
করিয়াছে, তবে প্রথম গানখানি সুর-মাধুর্য্যে
বিশেষ লক্ষ্য হইয়াছে। গান দুইখানি রচনা

করিয়াছেন—কাজী নজরুল ইসলাম, সুর
দিয়াছেন অক্ষ-গায়ক লতোরানাথ চক্রবর্তী।

এচ, এম্, ভি,—এন ১১১১১ :—শিল্পী
শ্রীমতী রেণু রায় (বহু) এই রেকর্ডে পিয়ানো
ও অক্টাভ যন্ত্র-সঙ্গীতের লহিত দুইখানি
আধুনিক গান রেকর্ড করিয়াছেন। একটিকে
'করা বকুলে এলে কি ভুলে' ও অল্পটিকে
'বাঁহল-খারার বাঁহল এবার' গান দুইখানি
সুগীত হইয়াছে বলা চলে, তবে প্রথমখানি
আপেক্ষিকভাবে মধুরতর।

এচ, এম্, ভি,—এন ১১১১৮ :—এই
রেকর্ডের বিচিত্র বর্ষা-লক্ষীত দুইখানি এচ,
এম্, ভি, এর তালিকার বিশিষ্ট দান। এক
টিকে বর্ষাকে বেহিরা-বালিকারূপে কল্পনা
করিয়া এবং অল্পটিকে বিজয়ী সেনারূপে
বর্ণনা করিয়া কবি যে স্বাক্ষর ও ভাব-
ব্যঞ্জক গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন,
তাছাড়া সুরবাতার নিপুণ তেজোপূর্ণ সুর-
লংঘোজনার এবং গুরুগম্ভীর উদ্দীপনাপূর্ণ
অর্কেস্ট্রা সহযোগে এই রেকর্ড-বিচিত্রাটি
শ্রোতাবিগের নবরস পরিবেশন করিয়াছে।
গান দুইখানির রচয়িতা কাজী নজরুল
ইসলাম ও সুর-লংঘোজক কমল দাসগুপ্ত।
একটিকে রেবা লোম, অগ্নিমা সুখোপাধ্যায়
ও পদ্মরাণী চ্যাটার্জী সন্মিলিত কণ্ঠে বেহিরা-
বালিকারূপী বর্ষার গান 'গগনে খেলার
লাপ বরষা-বেহিনী' ও অল্পটিকে গিরীন্দ্র
চক্রবর্তী, অলিত সুখোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন
রায় বিজয়ী সেনার বেনী বর্ষার গান

বয়স-খত এল, এল বিজয়ীর লাজে' এই
গানখানি মিলিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন।

এচ, এম্, ডি,—এন ১৭১৭৩ :—‘কিরে
চল, কিরে চল—আপন-ঘরে’ নামধারী
ব্যঙ্গ-নাটিকাটি এই একখানি রেকর্ডে গ্রামো-
ফোন নাট্য-মহিতি কর্তৃক অভিনীত
হইয়াছে। মেলের হোতালার ঘরের পূর্ব-
বদীর বীরেন এবং মেলের তেতালার ঘরের
কবি রমেন পাশের বাড়ীর মিস্ শেলী
মেনের রূপমুগ্ধ ও লজ্জীভূত। মিস্ শেলী
মেন অভিজাত-বংশের লস্কান মিঃ দাশ
শুশ্রূষার বাক্যবৃত্ত। তবু মিস্ মেন ও মেলের
হোতালার-তেতালার ঘরের মধ্যে চিঠি-পত্র
চলিবার ফলে একদিন বেলা একটার সময়
পূর্ববদীর বীরেন এবং কবি রমেন শেলির
অপেক্ষার নিরালা ইডেন গার্ডেনের প্যাগো-
ডার ধারে উপস্থিত। হইজন হইজনকে
সেই স্থান হইতে চলিয়া চাইতে অনুসরণ-বিনয়
করিলেও কোন ফল হইল না। যেখান
কিছুক্ষণ বাক্যবৃত্তের পর অবশেষে বন্দ্যবৃত্ত
আরম্ভ হইল। এমন সময় মিঃ দাশশুশ্রূষার
মহিত মিস্ মেন তথায় উপস্থিত হওয়ার
বন্দ্যবৃত্তের বিরতি হইলে মিস্ মেন মিঃ দাশ
শুশ্রূষার মহিত তাঁহার বিবাহের সংবাদ
মায় হইখানি নিমন্ত্রণ পত্র দিলেন। এখিকে
জগৎলিখ এবং ওলম্বানের লক্ষি হইয়া গেল
এবং তাঁহার লম্বায় ‘কিরে চল, কিরে চল—
আপন ঘরে’ গাহিতে গাহিতে মেলের ফিরিয়া
গেলেন। এই আখ্যানটিকে বিষয়বস্ত্ত করিয়া
নাটিকাটি রচিত হইয়াছে। গল্পটির ভিতর
হাস্যরসের লভাবনা ছিল সুপ্রচুর, ততটা না
জমিলেও মোটের উপর ব্যঙ্গ-নাটিকাটি উপ-
ভোগ্য হইয়াছে। কবি রমেনের বিনাইয়া
বিনাইয়া

‘ঐ তব এলো-খোঁপা ঐ তব পাঁচদার
শাড়ী

স্বর্গদূতী

তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—বজ্রিশ—

অরুণের গাড়ী বেহালার পুল পার হইয়া
ডায়মণ্ড হারবারের পথ ধরিল। তাহার
গাড়ীর বেগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। শুভ্রাও
তাহার পশ্চাতে মোটর বাইকে অনুসরণ
করিতেছে। অরুণের স্মরণে শক্তিশালী লেলুন
গাড়ী বাট মাইল স্পীডে অবলীলাক্রমে
চলিতে লাগিল কিন্তু শুভ্রার মোটর বাইকে
বাট মাইল স্পীডে তাহার স্বাক্ষরোপ হইবার
উপক্রম হইল—বায়ুর বেগে শুভ্রার মনে
হইল এখনই যেন সে স্মরণে ছিটকাইয়া
পড়িবে। পথের অবস্থাও ভাল নহে—উচু
নীচু ঘেরামত পথ। পার্শ্বে রেল
লাইন—জনমানববিহীন লোকালয়শূন্য প্রান্তর
ছুইপাশে ঘূর্ণ করিতেছে—লম্বুখের লক্ষ্য
উদ্ভাস্ত স্বামী উদ্ভাস্ত অতিথান। বাজালীর

ভোলাইয়া ধের ঘোর লব, কামাইতে
নাহি ধের দাড়ি।”

আবৃত্তি তবু ভালো, কিন্তু বীরেনের

“বৃত্তান্তর তাহাও কাহারে?

জাননা কি বাজাল বালক

মাতৃ-অঙ্ক হ’তে ছুটে যায়

মলকের মনে করিবারে মল্লরণ?”

কি ধরণের হিউমার লেখকই বলিতে পারেন।

লেনোলা—কিউ, এস, ৩২৩ :—এই

রেকর্ডের একপাঠে ‘ভাই-বোনের আড়ি,’

অন্ত পাঠে ‘ভাই-বোনের ভাব’ নামে

হেলেঘের উপযোগী একখানি রেকর্ড প্রকাশ

করা হইয়াছে। রেকর্ডের প্রথম খণ্ডটি

মেরে হইলেও শুভ্রা অনীম সাহসে ও একান্ত
আগ্রহে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু অগ্রসর হইয়াই বায়ুবলে তাহার
মাথার পরচুলা উড়িয়া গেল। তাহার আগু-
লায়িত কুন্তলরাশি বায়ুবলে উড়িতে লাগিল।
সে সময় চন্দ্রালোকে বহি কেহ শুভ্রাকে
বেধিবার অবসর পাইত তাহা হইলে হয়ত
মনে করিত সেই পুরাণ কথিত দক্ষবালা
পতিপ্রাণা লতারাণী আজ জীবনের মারা
পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুসরণ করিতেছে।

ঘনকক্ষ কাল মেঘ ধীরে ধীরে একাধরী
চন্দ্রমাকে ছাইয়া ফেলিল ঘন ঘন বিদ্যুৎ দেই
কক্ষ মেঘ ভেদ করিয়া আকাশের বকে
ক্রীড়া করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চতুর্দিক
আলোকিত করিয়া বজ্র পতনের কর্কশ নিনাদ
সুশ্রবণ পল্লীবাণীঘের নিজার ব্যাঘাত
ঘটাইতে লাগিল। পথিপার্শ্বের বিটপী-

হেলেঘের পক্ষে মোটেই মনোহারী হইবে
না, কারণ ঘটনা সংগ্রহনে ও প্রকাশ-
ভাজিতে কোনরূপ বৈচিত্র্যই নাই। দ্বিতীয়
খণ্ডে এক জায়গায় গল্পের বই পড়িবার
সময় যে আবহ-লজ্জীভূতের পরিবর্তন করা
হইয়াছে, তাহা চমৎকার। এতদ্ব্যতীত রেকর্ড
খানি বড় লাভারণ হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

রেকর্ড-সংক্রান্ত পাঠকবর্গের কোন প্রশ্ন
ধাকিলে বিভাগীয় সম্পাদক তাহার লজ্জতর
দিবার চেষ্টা করিবেন। এডিলন, C/o
থেরালী এই ঠিকানায় আপনার প্রশ্ন
প্রেরিতব্য।

শ্রেণীর মধ্যে মহা আলোড়ন উপস্থিত হইল। শকাব্দ বিহগকুল প্রাণতরে বুকশাখা ত্যাগ করিয়া নানাবিধ শব্দ করিয়া আকাশে উঠিল। বায়ুতাড়িত ধূলিরাশি শুভ্রার বর বপুটিকে রক্তিমাক্ত করিয়া তুলিল। তথাপি অরুণ ও শুভ্রার গতির বিরাঘ নাই। এ যেন নিক্রদেশ যাত্রা। ফলত পায় হইবার পর মূলধারে বৃষ্টি আশ্রয় হইল। জলের কাপটীর শুভ্রার সর্বাঙ্গ নিক্ত হইল। নিত্যস্ত বিব্রত ও বিপর্যস্ত হইলেও সে খামিল না। সে অরুণের গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিয়া চলিল শকাব্দানা, ক্রান্তিহীন, অবলাবরহিতা লম্বা যাত্রা তরুণীর মত। জল ঝড় দুর্যোগ অতিক্রম করিয়া উত্তরেই ছুটিতেছে কাহার আশায় তাহা অরুণই জানে। আরও আশ্বিনটা অবিরাম গাড়ী চালাইয়া অরুণ ও শুভ্রা যখন ডারমণ্ড হার-বারের বাঁধের নিকট উপস্থিত হইল তখন আকাশের মেঘরাশি অনেক সরিয়া গিয়াছে। সেই ছিন্ন মেঘের কীক হইতে চন্দ্রমার হাসি ফুটিয়া উঠিল ঠিক যেন ছিন্ন নীলাশ্রমী পরিহিতা স্তম্ভরী তরুণীর দেহাংশের মত। ঘুরে নীলাশ্রমী জাহবীর লোহিত জলরাশির কল্লোল ধ্বনি উত্তরের কর্ণে দূরগত বংশী-ধ্বনির ভায় প্রবেশ করিল। অরুণ সেই ষাঁধের নিকট গাড়ী রাখিয়া নামিয়া পড়িল ও ধীরে ধীরে যে ভূমিখণ্ড গলাগর্ভের মধ্যে ওলফিনস্ নোজের ভায় প্রবেশ করিয়াছে তাহার উপর দিয়া জাহবীর নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

শুভ্রাও অদূরে আপনায় বাইকখানি রাখিয়া লঘুপদে অরুণের অনুসরণ করিল। শুভ্রা যেখান অরুণ তটভূমির একপার্শ্বে উৎসারিত মত কণকাল দাড়াইয়া রহিল। তৎপরে আপনায় কোটীটা খুলিয়া একটা বুকশাখার বুলাইয়া দিল এবং ঐ কোটের পকেট হইতে একটা ক্ষুদ্র বস্ত্র বাহির করিয়া গেল। শুভ্রা খুলিল উহা তাহার স্বামীর

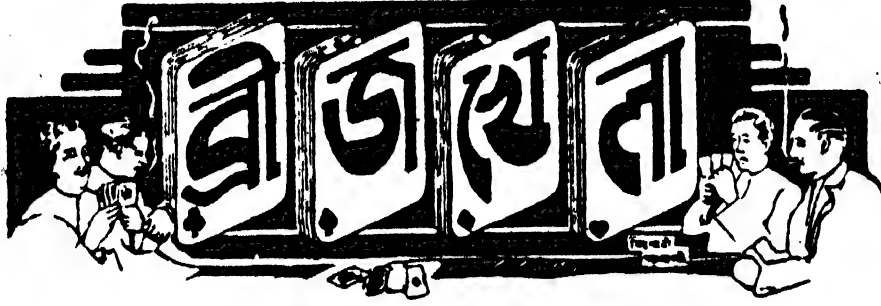
নিত্য লহার আঁধার অঙ্গ। সে হারার ভায় অরুণের পশ্চাতে দাড়াইল—কক্ষ নিখাদে—স্পন্দিত হৃদয়ে, ব্যাকুল চিত্তের লম্বা শক্তি লইয়া।

সে তুলিল অরুণ আপন মনে বলিতেছে, “হায় নারী, তোমাদের কি খাতুতে জঁখর নৃষ্টি করেছিলেন তা তিনিই জানেন। তোমাদের বাহিরের রূপে মুগ্ধ পুরুষের হল তোমাদের পায়ের তালের লক্ষণ বিলিয়ে দেয়। তারা একবারও ভাবেনা যে তোমাদের দ্বারা, দ্বারা, মমতা, প্রেম, কিছুই নাই। যে শুভ্রাকে চিরদিন আমার মনের মন্দিরে পূজা করে এগেছি—চিরদিন যাকে এত বিশ্বাস করেছি ক’দিনের অবস্থে সেও যখন অন্তকে আত্মদান করতে পারে তখন কণার পক্ষে অমলের পায়ের আত্মদান করায় বিব্রিত হবার কিছুই নেই। আমি যেমন কামো-দ্রুত পশু, ভগবান আমাকে তেমনি লাজাই দিয়েছেন। তবে আর আমার বেঁচে থাকার লাভ কি? নিজ হস্তে আমার জীবনের সুখ, শান্তি, বর্জনান, ভবিষ্যৎ সবই শুভ্রার সঙ্গে বিলজ্জন দিয়েছি। এই পৃথিবীতে বেচে থাকবার কোন লম্বা আমার নেই। আমি শুভ্রা ও কণা দুজনকে হারিয়েছি আমার বুদ্ধির দোষে আমার অববেচনার কলে। এই পৃথিবীতে এগে কত আশা কত ইচ্ছাই ছিল আমার। আমার নিজ হাতে সে আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছি। আমার আজ সবই অন্ধকার, তমসচ্ছন্ন—আমার বর্জনান ভবিষ্যৎ কিছুই নেই—তবে—তবে কেন এই জীবনের ভার বহন করা?”

অরুণ কণকাল ঘোঁনী থাকিয়া আবার বলিল, শুভ্রা আমার, শুভ্রা জীবন মরণের আরাধ্যা, দেবী আমার, কত নির্যাতনই না করেছি তোমার। আমার লন্দেহ লভ্য কি মিথ্যা তা বুঝবার মত শক্তি আমার নেই। তবু মনে হয় তুমি পাপ করতে পার না;

পাপের পথ তোমার দ্বারা স্পর্শে রুদ্ধ হয়ে যায়—তুমি শুধু আমাকেই ভালবাস। ওগো দেবি! হতভাগ্য আমি, অতি নীচ আমি, পশু আমি। তোমার কাছে কণা চাইবার শক্তিও আমার নেই। আজ বহুদূরে কোন অজানা দেশে যেতে বসেছি, কিন্তু তবু ইচ্ছে হয় শেষ মুহূর্ত্তে তোমার কাছ থেকে কণা চেয়ে নি। কণা গেছে তাতে হুঃখ নেই আমার, সে স্বেচ্ছায় নিজের পথ বেছে নিয়েছে, কিন্তু তুমি, তুমি তো শত অত্যাচার লম্বা করে আমার অংলম্বন করেই ছিলে—আমার বেগুনা লাজনা, গজনা, প্রহার অবহেলা সবই নীরবে লম্বা করেছ। পিতার একমাত্র পুত্রী তুমি, লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারিনী, তবুও লক্ষ মুখ ত্যাগ করে আমার পর্বাধাত লম্বা স্বরবার জন্তে পড়েছিলে ক্রীতদাসীর মত। এমনই মোহাক্ষ—আমি তাও লম্বা করতে পারিনি। নিজ হাতে বিলজ্জন দিয়েছি তোমায়। ভগবান আজ সেই মহাপাতকের লাজা আমার দিয়েছেন। আজ আর আমার আপনায় বলবারও কেউ নাই। ওগো প্রিয়া, ওগো জগদগ্ন্যস্তরের লজ্জিনী আমার, এই জন্মশ্রু প্রান্তরে, নীল আকাশের নীচে বসে, লম্বুখে তোমার অনু-তপ্ত স্বামী জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত তোমার নিকট তার অন্তরের শেষ আবেদন জানাচ্ছে। হয়তো তুমি শুনতে পাচ্চনা—হয়তো তুমি এখন স্তম্ভিত তবু আমার শেষ প্রার্থনা তুমি আমায় কণা করো। ওগো জগৎপিতা আমার মত পাতকীকে যদি কোন দিন কণা করতে পার, যদি দয়া করে কোন দিন আবার এই পৃথিবীতে পাঠাও আমার, সেবারে যেন আমি কাম, ক্রোধমুগ্ধ হয়ে আমি আর শুভ্রাকেই যেন পাই আমার জীবন সঁজনি রূপে। এমন করে যেন তাকে হারাতে না হয়।”

শুভ্রার লক্ষ লক্ষ পুণ্যক ও বিষয়ে কাপিতে-ছিল। তাহার ইচ্ছা হইতছিল সে ছুটিয়া



ব্রজখানা

ডাক হয়েছিল এইরূপ,—

'দ'	'প'
একটি চিড়িতন	পাশ
ছইটি কেয়াই	পাশ
পাঁচটি চিড়িতন	পাশ
পাশ	পাশ
'উ'	'দু'
ছইটি কুহিতন	পাশ
চারটি চিড়িতন	পাশ
ছয়টি চিড়িতন	পাশ

'প' ইচ্ছাবনের টেকা খেলে প্রাথমিক

চাল দিয়ে ছোট একখানি ইচ্ছাবন খেললেন। ডামি নাহেব দিয়ে পিটখানি লংগ্রহ করলেন। এখন ডাকবার দেখলেন যে তাঁকে একটি হরতনের পিট বিপক্ষদলকে দিয়ে বেতে হবে, কিন্তু বহি কুহিতনের গোলাম কিনাশ করে পিট পাওয়া যায় তবে খেলা করা সম্ভব হবে। তাড়াতাড়ি কিনাশ করতে না গিয়ে ডাকবার প্রথমে ভাবতে লাগলেন বিপক্ষের হাতের বিভাগ লম্বকে কিছু টের পাওয়া যায় কি না। সুতরাং তিনি ডামির হাতে পিটটি নিয়েই একখানি ছোট রঙ খেলে নাহেব দিয়ে নিজের হাতে পিট নিলেন। অতঃপর তৃতীয় ইচ্ছাবনখানি

নিষ্কাশন-কৌশলের আর একটি উদাহরণ—আমেরিকার বিখ্যাত ব্রীক-ক্রীডক Mr. Lightner-কে একবার একটি প্রতিযোগিতার কয়েকটি খেলোয়াড় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “মহাশয়, কখনো তাল খেলার পর ভালো খেলোয়াড় বাকি লুকানো হাতের লব বড় তালগুলি ঠিকমত বলে, দিতে পারেন?” এই প্রশ্নে মিঃ লাইটনার প্রথমতঃ আশ্চর্যাব্বিত হয়েছিলেন, তারপর তিনি বললেন কার্যটি অসম্ভব তবে

গিয়া অল্পকাল বলে তোমার শুভা চিরদিন তোমারই থাকবে কিন্তু কিনের জ্ঞান নে তাহার লম্বখীন হইতে পারিতেছিল না শুভা নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না।

অল্প তাহার চিবুকের নিয়ে পিত্তলের সুখটা চাপিয়া ধরিল; আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করিলে পিত্তলের গুলি তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া বাইবে দেখিয়া শুভা স্বরিতপথে অল্পের উপর কাপাইয়া পড়িল ও চিবুক হইতে তাহার হাত ঠেলিয়া দিল।—লম্ব লম্ব পিত্তলের বন্ধ ভেদ করিয়া এক ঝলক ধূমায়মান অগ্নিশিখা বিকট নিনাদে উর্ধ্বে উঠিয়া মহাশূভে মিলাইয়া গেল। অল্পের অলাড় ঘেহ চলিয়া পড়িল—আর শুভা নিম্পল স্বাধীন মস্তকটা লম্বের কোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিয়া পড়িল—মধ্য রজনীর গভীর অন্ধকারে, বারিষিক্ত নদী দৈকতে আদর্শ নদী সাবিত্রীরই মত।

(ক্রমঃ)

কয়েকখানি তাল খেলা হলে পর হাতের বিভাগ এবং কখনও কখনও বড় বড় তালের অবস্থা লম্বকে কিছু বলা যেতে পারে।

বস্তুতঃ পক্ষে প্রতিপক্ষের হাতের অবস্থা বলার মত হাত খুব কমই আসে, তবে চিন্তা করে দেখলে আংশিক ভাবে হাতের অবস্থা বুঝতে পারা যায় বা লকল রঙের বিভাগীয় বড় বড় তাল ধরবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নীচের হাতখানি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং এই তালে হাতের আংশিক অবস্থা অল্পাংশে বলা যায় বা নিষ্কাশন কৌশল প্রয়োগ করার মত অবস্থা সৃষ্টি করে নেওয়া যেতে পারে। হাতটি এইরূপ,

ইচ্ছাবন—নাহেব, বিবি।

হরতন—নাহেব, ×, ×, ।

কুহিতন—টেকা, নাহেব, গোলাম, ×

চিড়িতন—বিবি, গোলাম, ×, × ।

ইচ্ছাবন—টেকা, গোলাম দশ, ×

×, × ।

হরতন—নয়, লাভা ।

কুহিতন—×, ×, × ।

চিড়িতন—×, × ।

ইচ্ছাবন—×, × ।

হরতন—বিবি, গোলাম, ×, ×, ×

কুহিতন—বিবি, ×, ×, × ।

চিড়িতন—×, × ।

ইচ্ছাবন—×, ×, × ।

হরতন—টেকা, ×, × ।

কুহিতন—×, × ।

চিড়িতন—টেকা, নাহেব, ×, ×, × ।

খেলে ডাক্তার হাতে রঙের বিবি তুরূপ করে
পিট নিতে দেখা গেল, 'পু' একখানি হরতন
পাশালেন। তারপর আর একতাল রঙ
খেলার বিপক্ষদের উত্তর ক্রীড়কই রঙ দিয়ে
গেলেন, তাহাতে বুঝা গেল 'প' হরখানি
ইকান ও হুইখানি চিড়িতন পেরেছেন—
বাকি পাঁচখানি তাল মাত্র অজ্ঞাত রইল।
এখন বাকি পাঁচখানি তালের মধ্যে চারখানি
কহিতন হওয়া সাধারণতঃ অসম্ভব। যদি
তিনখানি কহিতন ও দুইখানি হরতন হয়,
তাহলে নিষ্কাশন করা সম্ভব হতে পারে;
কিন্তু যদি তাঁর হাতে বিবি না হয়ে দুইখানি
কহিতন হয়, তাহলে খেলা করা অসম্ভব।
কিন্তু যদি বিবি লম্বত তাঁর তিনখানি কহিতন
থাকে, তাহলে তৃতীয়বারে তুরূপ করলেই
বিবি পড়ে যায় এবং খেলা করবারও সুবিধা
হয়। আবার যদি 'প'র হাতে চারখানি
থাকে এবং 'পু'র হাতে বিবি লম্বত তিনখানি
থাকে, তাহলেও তুরূপ করে খেলা করা
সম্ভব হতে পারে। এই সব চিন্তা করার
পর ডাক্তারের খেলার আনন্দ পরিবর্তন হল।
তিনি ডাক্তার টেকা-নাহেব ও ছোট কহিতন
খেলে তুরূপ করে নিজের হাতে উঠলেন।
বাকি রঙগুলি খেলার পর হাতের অবস্থা
হল এইরূপ,—

হরতন—নাহেব, হকা, হুরি।

কহিতন—গোলাব।

ইকান—আটা, হকা।

হরতন—নয়, লাভা।



হরতন—টেকা, পাভা, চৌকা।

চিড়িতন—পাভা।

রক্তধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

লম্বত দিনের পরিশ্রমের পর, লবঙ্গ কখন
তাহার ঘরে আলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,
তাহা তাহার মনে নাই। খোলা জানালা
দ্বারা বক্ষিপের বাতাস আলিয়া তাহার
মাথার ব্যজন করিতেছিল। হঠাৎ তাহার

এইবার রঙের পজাখানি খেলার 'উ'
ছিলেন হরতনের হুরি, 'পু'র অবস্থা হল
লজীন, কারণ তিনি এখন যে তালই
পাশান্ না কেন আপনা হতেই খেলা হয়ে
বাচ্ছে। যদি তিনি কহিতনের বিবি
পাশান ডাক্তার কহিতনের গোলাব বড়
হচ্ছে, আর যদি তিনি হরতন পাশান্ তো
ডাক্তারের তৃতীয় হরতন খানি বড় হয়ে
পড়ছে। অতএব খেলা প্রতিরোধ করা
একবারে অসম্ভব।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ঘরের দরজার কাছার
কড়ানাড়ার শব্দে।

লবঙ্গ আগিয়া জিজ্ঞাসা করিল : কে
কড়া নাড়ে ?

একটা চাপা গলার উত্তর আনিল :
আমি।

—কে,—বাবু? এত রাতে ?

—তুমি একবার দরজা খোলো। আমার
শরীরটা কেমন কচ্ছে।

লবঙ্গ তাড়াতাড়ি উঠিয়া লম্বত ঘরে
মাথার উপর কাপড় খানিও একটু টানিয়া
দিয়া দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল :
শরীর কি কচ্ছে, বাবু ?

—কি জানি, কেমন কচ্ছে বুঝতে পারছি
না। দতবার চোখ বৃষ্টি, দতবার ললিতা
এলে চোখের ওপর হাজির হচ্ছে। এমন
করে কি ঘুমান যায় ?

—চলুন, আমি বাছি। মাথার পাখা
করবোখন আপনি ঘুমেবেন।

নীরববায়ু আপনার ঘরের দিকে চলিলেন,
তাঁহার পশ্চাতে বাইতে বাইতে লবঙ্গ বলিল :
কাল থেকে রামধীনকে বলবো আপনার
ঘরে তরে থাকতে। এখন দিনকত
আপনার একা একঘরে তরে থাকা হবে না।

—রামধীন তরে থাকবে আমার ঘরে।
ঐ অলভ্য মেড়োটা। তার চেয়ে গরুর
গাড়ীর পাড়োরানদের খাটালে গিয়ে তরে
থাকলে হয়।

—তবে না হয় কেবার শোবে।

—কেবার ? ঐ পেরাজয়ন-থেকে
জানোয়ারটা ? ও ঘরের মধ্যে তরে থাকলে,
ঘরটা হয়ে দাঁড়াবে একটা রানারনিক

লেবরেটরি! কলিকাতার ড্রেন তার কাছে হার যেনে বাবে! না লবঙ্গ! আমাকে অন্ত বড়ো শান্তি তুমি দিও না!”

নীরদবাবু ঘরে আলিয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং লবঙ্গ পাখা লইয়া তাঁহার মাথার কাছে বলিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। কোথাও আর কোনও শব্দ ছিল না, শুধু একটা পেচক অনন্তব্য কর্কশ স্বরে ঘুরের নারিকেল গাছ হইতে এক একবার ঞ্চতিকটু শব্দ করিতেছিল।

নীরদবাবু বলে উঠলেন। লবঙ্গ! ললিতা কি এখনও এ ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

—অসম্ভব কিছুই নয়!

—ভালবাসা কি এমনই টানের জিনিষ, লবঙ্গ?

—কি জানি বাবু! ও খবর আমি কি করে রাখবো?

এই প্রশ্নে নীরদবাবু একটি গল্প চুটাইত স্বরূপ বলে বেতে লাগলেন।

গল্প শুনিয়া লবঙ্গর গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল সে ভরে জড়লড় হইয়া বলিল: বাবু! এত রাত্রে আর ওলব গল্প করে কাজ নেই! গা ছম ছম করে। আপনি তার চেয়ে একটু ঘুমবার চেষ্টা করুন।

তোমার ভূতের গল্প শুনে ভয় পায়?

—ভূতের ভয় আর কার নেই, বাবু?

—আমার নেই। ভূতের ভয় নেই বটে, কিন্তু—ললিতা চলে যাওয়ার পর থেকে, নিজাও যেন আমার লগে লব লবঙ্গ তুলে ধরেছে!

—কেন? নিজা হয় না কেন, বাবু?

—চোখ যেমন বুজুই, অমনি ললিতা ঠিক জীবন্ত হুতি নিরে আমার লম্বুখে এসে দাঁড়ায়! এই কারণে আজ বন বিন আমি মোটেই ঘুমোই নেই। আজ লক্ষ্যে বেলা প্রতিজ্ঞা করেছি, বা করে পারি ঘুমোবই; সেলন্তে, ডাক্তারের কাছ থেকে একটা ঘুমের ওষুধ চেয়ে নিরে খেয়েছি! কিন্তু তবু ঘুমতে পাচ্চিনে! মনে হচ্ছে, ঘরে যদি একজন কেউ থাকে, তাহলে হয়তো ঘুম হতে পারে। কেননা তাহলে হয়তো ললিতার ছায়াশ্রুতিটা লাহল করে চোখের লম্বুখে আলতে পার্কে না! কিন্তু কে আমার ঘরে থাকবে? তবে তুমি যদি ঘর করো, তাহলে আর কিছু হোক না হোক— একটা মানুষ হয়তো বেঁচে যেতে পারে।

এই বলিয়া নীরদবাবু অতি স্বীনেত্রে লবঙ্গর দিকে তাকাইলেন। এই প্রার্থনাটা যদি নীরদবাবু ছাড়া আর কাহারও নিকট হইতে আশিত, তাহা হইলে লবঙ্গ হয়তো ইহা রক্ষা করিতে না পারিত। হয়তো কতকগুলো যুক্তিপূর্ণ সামাজিক কারণ দেখাইয়া ইহার অনৌচিত্য প্রমাণ করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু প্রার্থনাটা আশিল এমন লোকের নিকট হইতে, বাহাকে এখন এ অবস্থায় কোনও জিনিষই অধের বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারে না। প্রথমতঃ নীরদবাবুর আশ্রয়েই সে আজকাল দিন কাটাইতেছে কাজেই আশ্রিতের কৃতজ্ঞতার দিক থেকে ধানিকটা প্রতিদান অপরাপক চাহিতেই পারে তো। দ্বিতীয়তঃ নীরদবাবু এখন আত্মীয় কুটুম্বহীন অবস্থায়, হঠাৎ বিপদীক হইয়া পড়িয়াছেন, মনুষ্যত্বের দিক থেকে উপকার করা এই লবঙ্গর অবশ্য উচিত।

একজন্ম বহি লামান্ত একটু আখটু লামাজিক! লবঙ্গ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, সেটুকু লবঙ্গ ঘুরে ঠেলিয়া রাখবে না?

নীরদবাবু লবঙ্গর দিকে এমন কাতরভাবে তাকাইলেন, যে লবঙ্গ মনের মধ্যে এত তর্কবিচার করিয়া উঠিতে পারিল না। কতক কতক প্রশ্ন তাহার মনে বর্ষাকালের বিজ্ঞাতের মত চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই সেগুলি আবার বেধের আড়ালে অক্লিষ্ট হইয়া গেল। উত্তর মনে আলিয়া, কতক আলিল না। প্রশ্নোত্তরের টানাটানির মধ্যে যখন সে নিজেকে বড়ই বিপর্যস্ত বলিয়া মনে করিতেছিল, তখন নীরদবাবু আবার একবার অমনুর করিয়া বলিলেন!

লবঙ্গ? অন্ততঃ আজকের রাত্রিটা তুমি আমার ঘরে ঘুমোও,—একটা দিন আমাকে ঘুমতে দিবে আমার জীবন রক্ষা করো!

বলিয়া, নীরদবাবু হঠাৎ থপু করিয়া তাহার হাত দুইখানা ধরিয়া বলিলেন। লবঙ্গ, এই অমুরোধের লজ্জায় যেন একেবারে মরিয়া গেল। সে বলিয়া বলিল: “আচ্ছা, আপনি ঘুমুন। আমি এখানে লম্বা রাত ব’লে আপনাকে পাখা করবো’খুনি।”

বলিয়া সে পাখা লইয়া জোরে জোরে হাওয়া করিতে লাগিল। নীরদবাবুও নিশ্চিন্ত হইয়া বিছানায় শুইয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)





সাগর পারের সুন্দরী অভিনেত্রী
স্নিগ্ধা জেনেতা মিত্রচেন্দ্র



পরিচালক

জাশনাল নিউজপেপার লিঃ.

১১, চক্রবেড়িয়া (মাউথ) রোড, কলিকাতা

টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই ভাদ ১৩৪৫, ২৫শে আগষ্ট ১৯৩৮

বাক্য ও কার্য

শ্রীযুক্ত সুপ্রীতচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরীর বিরতি ও তাহার প্রত্যন্তরে প্রমাণ হইয়াছে যে ভূতপূর্ব মেয়র সনৎবাবুর নিজ বাড়ীতেও কর্পোরেশনের নিয়ম-নিষেধ প্রতিপালিত হয় নাই এবং নিয়ম-ভঙ্গের দোষে তিনিও দোষী। সনৎবাবু আত্মপক্ষ সমর্থন-কল্পে বলিয়াছেন যে ঐরূপ নিয়মভঙ্গ কর্পোরেশন বত্কেত্রে অনুমোদন করিয়াছেন। এইরূপ যুক্তি যেরূপ হাস্যোদ্দীপক তদ্রূপ দায়িত্বজ্ঞানবিহীন। সনৎ মেয়র বা প্রতিষ্ঠাবান কাউন্সিলার যদি গৃহ-নির্মাণ বিষয়ে কর্পোরেশনের নিয়মাবলী পালন করিতে যত্নবান না হন তাহা হইলে Purity সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা বা গালভরা উচ্ছ্বাসের কোনই অর্থ নাই।

উড্ডীকৃতমান কাইলের উদ্ধারকারকের পক্ষে Building Department এ অনাচার নিবারণের

উত্তম যে stunt যহে তাহা প্রমাণ করিতে হইলে সর্বপ্রায়ে প্রয়োজন যে তাহার নিজের বাড়ীতে যে সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে তাহা সংশোধন করা। Profession ও Practice অর্থাৎ বাক্য ও কার্যে যেখানে এত তারতম্য সেখানে সংস্কারক শুধু বাক্যবীরেই পরিণত হন—সংস্কার-সাধন শুধু রোমাঞ্চকর বিবৃতি ও উড্ডীয়মান কাইলের অনুসরণ নহে!!!

উইলিয়ামস লেনের যে বিধবার ১৯ হাজারের বাড়ী ৯ হাজার মূল্যে রায়চৌধুরী পরিবারের হুদা-ভুক্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ বাস্তবিক সন্দেহজনক এবং সনৎবাবু হস্ততঃ আইনভঃ এ বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত হইতে পারেন তবে ভ্রাতৃ-বৎসল সনৎবাবুর নৈতিক দায়িত্ব যে এ বিষয়ে কিছুই নাই তাহা জনসাধারণ সহজে বিশ্বাস করিবে না। যাঁহারা পৌর-প্রতিনিধি বিশেষতঃ যে সমস্ত প্রতিনিধি নৈতিক নিষ্ঠার আস্থাবান বলিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের আচরণ ও কার্যাবলী সম্পূর্ণরূপে সন্দেহাতীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুপ্রীত কুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ কাউন্সিলারদের অবশ্য সনৎবাবুর বিল্ডিং বিভাগের অনাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় প্রাশংসা করিয়াছেন এবং আমরাও স্বীকার করি যে তাহার সে প্রচেষ্টা অধিকতর কার্যকরী হইত যদি তাহার নিজের বাড়ী বা ভ্রাতার বাড়ী সম্বন্ধে নিয়ম-ভঙ্গের দোষারোপ কেহ না করিতে পারিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি অপ্রীতিকর উক্তির উল্লেখ করিয়া আমরা এ বিষয়ের পরিসমাপ্তি করিব। সুধীরবাবুর পিতা কি করিয়াছিলেন বা না করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে বা সুধীরবাবুর কার্যাবলীর আলোচনার একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। সুধীরবাবুর পিতাকে এই প্রসঙ্গে টানিয়া আনা

ইস্পের সিং-শিশু ও মেঘশাবকের গল্পেরই অনুরূপ। সুধীরবাবুর পিতা সিটি আর্কিটেক্ট (City Architect) হিসাবে কি কার্য করিয়াছিলেন তাহা সুধীরবাবুর কার্যাবলীর বিচারে বিবেচিত হইতে পারে না। শুধু কাউন্সিলার হিসাবে [এমন কি ব্যক্তিগত বা তাঁহার ব্যবসায়গত কোন কার্যের দোষ-গুণও সমালোচনার বাহিরে] তিনি কোন দুর্নীতির প্রশ্ন দিয়াছেন বা সমর্থন করিয়াছেন কি না তাহাই বিবেচ্য। তাঁহার বিরোধী কাউন্সিলারবৃন্দ যদি তাঁহার কাউন্সিলার হিসাবে কোন কার্যকলাপে এই রূপ দুর্নীতির সন্ধান দিতে পারেন তাহা হইলে তিনিও নিন্দার হইবেন—তৎপূর্বে নহে। পিতার কর্মের কলাকল পুত্রে অর্ধায় না—রাজনীতিতে ইহা সর্ববাস্তবিক নীতি।

সুধীরবাবু সনৎবাবু আক্ষেপ করিয়াছেন যে সুধীরবাবু নাকি তাঁহার বিরোধিতা করিবার জন্য কতকগুলি রেকর্ডের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন! ইহাতে সুধীরবাবু কি দোষ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম—বরং ইহা সুধীরবাবুর উত্তমেরই পরিচায়ক।

ব্রাহ্মচৌধুরী-স্বপ্নের বিবৃতি প্রকাশে কলিকাতার করদাতাগণ ইহা বুঝিতে পারিল যে বাক্যবীর নির্ভাবান বলিয়া পরিচিত বিশিষ্ট কাউন্সিলারও স্বীয় প্রয়োজনবোধে বিল্ডিং কমিটির নিয়ম লঙ্ঘন করেন। পৌর-প্রতিনিধিরা যদি এই রূপ আদর্শ-চ্যুত হন তাহা হইলে দোষ দিব কাহাকে? আমাদের পৌর-প্রতিনিধিদের বাক্য ও কার্যে সামঞ্জস্য আসিবে কবে তাহা কে বলিবে?

রূপবাণী

ফোন : বি, বি, ৩৪১৩

দ্বাদশ ও শেষ

সপ্তাহ !

নিউ থিয়েটার্সের

বিশিষ্ট

অনুরোধে

আর এক সপ্তাহ

অভিজ্ঞান

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার ৩রা সেপ্টেম্বর

জীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

অভিনব ও অতি আধুনিক

সমাজ-চিত্র

বুধবার ৩১শে আগষ্ট

হইতে অগ্রিম টিকিট

বিক্রয় হইবে।

অভিনয়

N. I. P.

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড, ফোন : সাউথ ৩৪

২৭শে আগষ্ট শনিবার হইতে

জনসম্মাগম সমসপ্তাহ

নিউ থিয়েটার্সের অমর অবদান

বিদ্যাপতি

ভূমিকায় : কানন দেবী, ছায়া দেবী,

পাহাড়ী সাহাণ, দুর্গাদাস ব্যানার্জি।

লাকি ওয়াচ এণ্ড কোং

আমরা সুলভে উচ্চশ্রেণীর ঘড়ি নির্মাণ

এবং বিক্রয় করিয়া থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থীরা :

১১৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড, তবানীপুর, কলিঃ।



(বিলাসী)

বেকার নাশন

চিত্র-নির্মাতা : মতিমহল থিয়েটার

কাহিনী : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পরিচালনা : জ্যোতিষ ব্যানার্জি

আলোকচিত্রী : যতীন দাস

শব্দধর : নূপেন পাল ও ভূপেন বোষ

সঙ্গীত : কুমার মিত্র

চরিত্র : রবি—সুশীল রায়, রেবা—

রাণীবালা, মিঃ বোল—নরেশ মিত্র, মিঃ

বোষ—জহর গাঙ্গুলী, জনার্দিন—মন্মথ পাল,

নায়েব পত্নী—বেববালা, হাঁদারাম—কুমার

মিত্র, পরিচারিকা—ছায়া।

চিত্র-পরিবেশক : মতিমহল থিয়েটার

প্রথম মুক্তি : 'উত্তরা' ১৩ই আগস্ট '৩৮।

“বেকার নাশন” কোন শ্রেণীর ছবি
‘য়েছে এ প্রশ্ন যদি কেউ উত্থাপন করেন
তা’ হ’লে সে প্রশ্নের জবাব আমরা হঠাৎ
দিতে পারব না। তবে “বেকার নাশন”
যেখানে প্রায় পোনে তিন ঘণ্টা আমরা হেলেছি
যুব এবং ঝাঁরাই দেখছেন তাঁরাও হাসছেন
যে—একথা আমরা হলপ কোরে বলতে
পারি। সুতরাং হাণির ছবি তোলার উদ্দেশ্য
য’ কর্তৃপক্ষের আংশিকভাবে নিষ্ফল হ’য়েছে—
একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

ছবিখানির গল্পাংশের পুনরুৎপাদন এখানে
মস্ত্রোজ্ঞান। কারণ ইতিপূর্বে পুস্তকাকারে
এটি প্রকাশিত হ’য়েছে। ‘সাপটিক কমিডি’
বলতে যা বুঝায় গল্পটি ঠিক সেই শ্রেণীরই।
এর ভেতর নানা জায়গায় অসঙ্গতি ও

অসামঞ্জস্য আছে—এই ধরনের গল্পে অবশ্য
তা’ থাকে অশোভন কিছু নয়। গল্পটির
নাম “বেকার নাশন” যেওয়ার মূল্য কতদূর
তা’ আমরা বলতে পারি না—কিন্তু নিছক
হাণি ছাড়া, বেকার বা অশ্রু কোনও সমস্যার
সমাধান কাহিনীর ভেতর হয় নি।

পরিচালনা সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকু
বলতে পারি—পরিচালক যে উদ্দেশ্য নিয়ে
ছবিখানি পরিচালনা করেছিলেন তা’ কিরূপে
পরিমাণে লাকল্যাভ করেছেন। অর্থাৎ
আগাগোড়া পর্দার ওপর গল্পটি তিনি বলেছেন
ভাল। টেকনিক ছেঁচিয়ে পাঁচ রঙের
ফুলঝুরি তৈরি করে বর্ষকগণকে তাক
লাগিয়ে দেবার চেষ্টা না করে তিনি
সুহৃদ্রই পরিচর দিয়েছেন।

আলোকচিত্রের কাজ ভাল বলতে
আমাদের দ্বিধা নেই—কিন্তু যতীন দাসের
সুসামানুযায়ী হয় নি। বিশেষতঃ আভ্যন্তরীণ
দৃশ্যগুলি।

শব্দযন্ত্রের কাজ আমরা নির্ভূত বলতে
না পারলেও ভাল হ’য়েছে বলতে পারি।

আবহ সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত ছবিখানির
কোনও উৎকর্ষ সাধন করতে পারে নি।

দৃশ্যগজ্ঞা সম্বন্ধে আমাদের একটি
অভিযোগ আছে। সেটি হ’চ্ছে, যেনের
বাড়ীতে যে সব আসবাব পত্র বেওয়া হ’য়েছে
তা’ নিতান্তই অস্বাভাবিক। লাজলজ্জায়
ছায়ার পরিচারিকা ছাড়া আমাদের বলবার
কিছুই নেই। ছায়াকে যে নানের মত

লাজানো হ’য়েছে তা’ ইংরাজী-বেবা এমন
কী এখানকার কোনও ইংরেজ পরিবারের
পরিচারিকার ব্যবহার করে কিনা তা’
আমাদের জানা নেই।

ছবিখানির ওপর কাঁচির কলরং ঠিক-
ভাবে না হওয়ার ‘স্থানে স্থানে ছবিখানি
এক ঘরে হ’য়ে পড়েছে।

অভিনয়ে নরেশ মিত্রের মিঃ বোল
নিখুঁত হ’য়েছে। রাণীবালায় বেবা, অভিনয়ের
দিক থেকে উচ্চাঙ্গের হ’লেও আধুনিক তরুণী
হিলাবে তাঁকে আমরা গ্রহণ কোরতে
পারিনি। সুশীল রায়ের রবি মন্দ লাগল
না। কিন্তু তিনি যখন ঘেরে লাজেন তাঁকে
তখন মানায়নি মোটেই। হতাশ প্রেমিকরূপে
জহর গাঙ্গুলী বর্ষকদের মনে কোন রেখাপাতই
করতে পারেন নি। কুমার মিত্রের হাঁদারাম
ভাড়াবির নামান্তর মাত্র। হাঁদাবুর জনার্দিন
আগাগোড়া মঞ্চ-বেবা। বেববালার দ্বিতীয়
পক্ষের নায়েব-পত্নী চরিত্রোপযোগী হ’য়েছে।
ছায়ার পরিচারিকা নির্জীব, নিম্পন্দ—হুঁ
বেওয়া কলের পুতুলের মত। এই মেয়েটি
এ অবধি অনেকগুলো ছবিতেই অভিনয়
করলেন—কিন্তু এ অবধি কোন উন্নতিই
করতে পারলেন না। যেনের সত্যরা
সবাই নিজ নিজ ভূমিকার কৃতিত্ব দেখাবার
চেষ্টা করেছেন।

পরিশেষে আমাদের মনে হয় উপরি-
উল্লিখিত ত্রুটি বিচ্যুতি লম্বেও ছবিখানি
সাধারণে লাভের গ্রহণ কোরতে কুণ্ঠিত হবে
না—কারণ ছবিখানার ভেতর ‘মাস্ এ্যান্টাল’
আছে যথেষ্ট।

‘স্ট্রীট সিন্ড্রাম’ বা ‘সাথী’

স্ট্রীট সিড্রাম (যার বাঙলা নাম হয়েছে
‘সাথী’) ছবি তোলার কাজ প্রায় শেষ হয়ে
এলো। আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে ছবি
তোলা এমন কি সম্পাদনার প্রথম দফার
কাজের অনেক খানি এগিয়ে যাবে।
পরিচালক কণি মজুমদারকে এতদিন ঝাঁরা

তবু উৎকৃষ্ট চিত্র-নাট্য লেখক বলে জানতেন, উপস্থিত তাঁরা তাঁকে কড়িৎকর্ষা বলেও জানলেন। এ বিষয়েও তিনি তাঁর গুরুদেব প্রমথেশ বসুর উপযুক্ত শিষ্য। ছবি তোলার সময় 'লট' নেবার পূর্বে লিগারেট পুড়িয়ে মিটিং করে ভাবতে বসার ব্যবহার বসুরা সাহেবের হয় না, কপি মজুতদ্বারেরও হয় না।

অক্সফোর্ড প্রমথেশ রায় কৃত নতুন ক্রোরের স্মৃতিং দেখতে দেখিন আমরা গিরে-হিলাম। নিউ থিয়েটারের এক নম্বর ষ্টুডিওর এই চার নম্বর ক্রোরটি অস্ত্রান্ত ক্রোর অপেক্ষা ছোট। এখানেই লেট পড়েছে কপি মজুতদ্বারের "ষ্ট্রীট লিডার" ছবির।

চার নম্বর ক্রোরের সামনে বেজার ভিড়। অভিনেতা অভিনেত্রীতে বোঝাই জন পচিশ তো বটেই। বড় থিয়েটারের বড় রিহার্সাল রুম; গিগীশ বোব, অমৃতলাল বোসের ছবি পর্যন্ত বাব বারনি সেখান থেকে।

বাজনা বাজল। এক ঝাক মেয়ের হল নাচের মহড়া দিলে। ক্যামেরা ছবি নিলে কত রকম মেয়ের যারা এই থিয়েটার গুলোর রঙীন বাতির নামনে রাতের মোহে নিজেদের আরো রঙীন করে উদ্‌ঘাটিত করে—ভোতা মেয়ে, বোঁচা মেয়ে, দাঁতাল মেয়ে।

আর একটি দৃশ্য। কলগুজনের রূপসী পরিবেষ্টিত ত্রিলোকনাথ অর্থাৎ অমর মল্লিক। লম্বা-বুঁটীগণ-লঙ্গলোভী এই থিয়েটারের প্রোপ্রাইটর, হাঁকিয়ে উঠেছিলেন এতক্ষণ 'মজু' আনেনি বলে। এই থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী 'মজু' যৌবনে যার রঙ ধরেছে লাভ রঙের প্রথম রঙ—শরীরের শিরায় উপশিরায় কুহুমে কোরক আজও উজ্জ্বল

আজর। শাড়ীর ছারার ছারার এখনও প্রথম আলোকের সুহ শোরত।

'মজু' এলো অপরাধিতার রঙ নেভড়ান একখানা শাড়ী জড়িয়ে, জরীর বাঁধনে বাঁধা লাল ব্রাউজের ভেতর নিজেকে ঢুট করে বেধে। ত্রিলোক কাহ্নে এলে বলে: 'মাইরী, তুমি না এলে—তারপরের কথাটা আপনি যোগ করে নিন, ধরুন বিষ খেতুন, গলায় দড়ি দিতুন, জলে ডুবে মরতুন আরো কত কি এই ধরনের জীবেরা বলে থাকে। মজুর সুখ রাঙা হয়ে উঠল, দৃষ্টি নত হোল কপালের চুলের চেটুয়ের তলার তলার বিন্দু বিন্দু ঘাম বেধা দিলে। অমর-চাঁদ হয়ে চুকে ডাকলে 'মজু'। ক্র্যাপ ষ্টিক গিয়ে খট করে পড়ল।

আবার কলরব। বোকেন চঃট্রা থপ থপ করে ক্রোরের বাহিরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করলেন। ছবিতে নেজেছেন আর্ট ডাইরেক্টর অর্থাৎ সব জাস্তা মানে কিছু জানে না। ক্রোরের ভেতর চুকেই বলেন: আপনারা সব বেরিয়ে আনুন আর্টিষ্ট নার্ডাল হয়ে পড়ছে। বাহিরে বেরিয়ে দেখি কপি বাবুর একজন অ্যাসিষ্টেন্ট তখন লিগারেট ধরিয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম কে নার্ডাল হয়ে পড়ছে মল্লিক মশাই! কানন! শৈলেন চৌধুরী! না বহু উজ্জান-উৎসব প্রত্যাগত বোকেন চঃট্রা।

পরিচালক কপি মজুদ্বার এই সহকারীটির কাছে এলে বলেন বেশ ভাল হয়েছে কী বল! আমি ষ্টিক এই জিনিষটাই চাই-হিলাম।

লক্ষ্য হয়ে এলো, দেখিন আমরা কিংরে এলুম।

অড়ুদিদি

বর্গীর পরৎকল্প চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'বড়ুদিদি' যে বাঙলার কত প্রিয় বস্তু তা বোধহয় কাউকে আর জানাতে হ'বে না। এই সুন্দর জিনিষটাকে নিয়ে পরিচালক শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসাহ।

গেল মগ্নাহে তিনি মাধবীর পিতা ব্রজ-রাজ লাহিড়ীর শয্যাগৃহের দৃশ্য তোলা শেষ করেছেন। ব্রজরাজ লাহিড়ীর ভূমিকায় হিন্দি লংস্বরণে ভগবীশ ও বাঙলা লংস্বরণে যোগেশ চৌধুরী শোনা বাচ্ছে চমৎকার অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

পরিচালক মশাই তাঁর কাজের Speed যে ভাবে maintain করেছেন তাতে মনে হয় আর হাস্যনানেকের মধ্যেই এ ছবি শেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া অমরবাবুর অসামান্য ব্যবহারে তিনি artistsদের কাছ থেকেও বেশ ভাল ভাবেই কাজ আদায় করেছেন।

বিশেষর বাঁশী

গেল জন্মষ্টমীর দিনে পরিচালক দেবকী বসু মহাশয় তাঁর নতুন বই 'বিশেষর বাঁশী'র কাজের নব-উদ্বোধন কার্য্য সমাপন করেছেন। উদ্বোধনএর দিনে এক নম্বর ষ্টুডিওতে মেগাফোন আর্টিষ্ট গিরীন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের একটা হিন্দী গান 'টেক্' করা হয়েছে। এই ছবিখানা যদিও দু'নম্বর বাড়ীতে ছোটাই বাবুর তত্ত্বাবধানে তোলা হবে তবুও প্রথম দিনের কাজ এক নম্বর বাড়ীতেই সম্পন্ন হয়েছিল। তার কারণ লজ্জিত পরিচালক রাইবাবুর সুবিধার জন্ত। কারণ তিনি এখনও তাঁর হলবল নিয়ে 'ষ্ট্রীট লীডার'-এর কাজেই ব্যস্ত রয়েছেন।

স্পি রি য়া ল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ক্রাইস্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।



শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
প্রগতি-চঞ্চল কথা-চিত্র

আড়নায়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
অতি আধুনিক চিত্র নিবেদন

আড়নায়

*

পরিচালক :

যধু বোস

*

কাহিনী :

অনুপ রায়

শ্রেষ্ঠাংশে :

সাধনা বোস

অহীন্দ্র চৌধুরী

রূপ বাণীতে

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার, ৩রা সেপ্টেম্বর

১৯৩৮

এ ছবির ক্যামেরার কাজ করবেন ইউজুফ মুলজী আর শব-বস্ত্রের কাজ করবেন অভুল চাটার্জি। অভিনয়েতে নামবেন শ্রীমতী কানন, যেনকা, পাহাড়ী, রতীন বন্ধ্যোঃ, মনোরঞ্জন ভট্টা, মতী সুখ্বেজ্য প্রভৃতি।

সম্প্রতি পরিচালক হেবকী বাবু অগ্রহ হ'য়ে পড়েছেন। তিনি আরোগ্যলাভ করলেই আশা করা যায় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই এ ছবির কাজ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে যাবে। টুডিওর মধ্যেও শেট নির্মাণ কার্য বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

জীবন মরণ

নীতিনবাবুর পরিচালনার বেনতুন ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে তার নাম হয়েছে 'জীবন মরণ' (বাঙলা) ও 'হুমণ' (হিন্দি)।

গেল হুগায় যে দৃশ্যগুলি তোলা হয়েছে তার মধ্যে একটা দৃশ্যে দেখা গেছে যে রুগ্ন লাইগাল ডাক্তারের কাছ থেকে তাঁর নিজের রোগ লক্ষ্যে লঠিক লংবাচ জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে। অথচ রোগের জীবন পরিণামের কথা ভেবেও ডাক্তারের পক্ষে রুগীকে লঠিক লংবাচ দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন বাঙলার বজ্রবর বিক্রম নাহার আর হিন্দিতে নাজাম।

নতুন উদ্যোগ দিক থেকে লারা ভারতে নীতীন বাবুর লক্ষ্যকে কেউ নেই। 'হিদি'তে তিনি Industry, 'হেশের মাটি'তে Agriculture, আর 'জীবন মরণ'এ Health নিয়ে deal করে শিকার দিক থেকে দেশের যে কত উন্নতি সাধন করছেন তা আর না বলাই ভাল।

অভিনয়

এ ছবিখানা যে লতিয়ে কবে release হ'বে তা ঠিক বলা যায় না। তবে বজ্রবর শোনা যাচ্ছে ওরা সেপ্টেম্বর 'রূপবানী'তে হ'বে। প্রথম ঠিক ছিল ২০শে আগস্ট তারপর ২৭শে আর এখন ঠিক হয়েছে ওরা সেপ্টেম্বর।

প্রযোজক মহাশয়রা এখনও বিজ্ঞাপনে জানাচ্ছেন "রূপবানীতে মুক্তি প্রতিদ্বন্দ্ব" আর 'রূপবানী' কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন ওরা সেপ্টেম্বর।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

এদের পরবর্তী চিত্র 'কলেজ কন্সার' নতুন নাম রাখা হয়েছে 'পরশমণি'। গত বৃহস্পতিবার জম্মুশ্মীরবিন 'পরশমণি'র মহরৎ খুব জাকজমকের সহিত টুডিওতে হয়ে গিয়েছে। 'পরশমণি'র কাজ আগামী মাসের প্রথম লপ্তাহ থেকে পরিচালক প্রফুল্ল দাস আরম্ভ করবেন। 'পরশমণি'র কাহিনী লিখেছেন শ্রীযুক্ত বামিনী মিত্র, এবং কথা দিয়েছেন শচীন শেনগুপ্ত।

এ বইতে অভিনয় করবেন ঝারা তাঁতের লব নাম এখনও পাইনি। তবে বজ্রবর জানি তাতে মনে হয় জ্যোৎস্না, শুপা, অরুণা, নলিনী দেবী প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় নামবেন। আর ছবির নায়কের জন্ত এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স-এর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে খার চেয়েছেন। বহিও এখন পর্যন্ত কিছু ঠিক হয়নি তবে মনে হয় এরা দুর্গাবাবুকে হয়ত পাবেন।

কেসল প্রেসিডেন্সি থিয়েটার্স

এদের 'পরিচয়' ছবি কোন টুডিওতে তোলা হ'চ্ছে তা' আমাদের খবর দেওয়া হ'ল না কেন? কি মেলিনে ছবি তোলা হ'চ্ছে—কোন কোন টেকনিশিয়ানরা কাজ কোরছেন? তাঁদের অভিজ্ঞতা কী? সব বিষয় আগামী হুগায় না জানালে—তাঁদের লক্ষ্যে অনেক খবর সাধারণকে জানাতে আমরা বাধ্য হব।

চিত্রা

গোয়ার দর্শকসমাগম এখন এখানে কমে নি। 'চিত্রা'র সংস্পর্শে এসে 'গোরা' যে এই অপূর্ণ জনপ্রিয়তা লাভ করবে তা—আমরা আগে থেকেই জানতাম।

নিউ সিনেমা

মধ্য-কলিকাতা ও বঙ্কিম কলিকাতার দর্শকদের সুবিধায় জন্তে নিউ থিয়েটার্স-এর কর্তৃপক্ষ 'নিউ সিনেমা' চিত্রগৃহটি বাঙলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন একথা আমরা অনেকদিন আগেই পাঠক পাঠিকাদের জানিয়েছি। সম্প্রতি আমরা বিবর্ত-সূত্রে জানতে পেরেছি যে আগছে ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে নিউ থিয়েটার্স-এর নবভব চিত্র 'হেশের মাটি' চিত্রা ও এই চিত্রগৃহে একই সঙ্গে মুক্তিলাভ করবে। মধ্য কলিকাতার 'হিন্দি' চিত্রগৃহের অভাব নেই। এবার সেই জন্তেই মনে হয় হিন্দি ছবির দর্শকদের এই চিত্র গৃহটির পরিবর্তনে খুব বেশী অভাব পরিলক্ষিত হ'বে না। কিন্তু বাঙলা ছবির দর্শকদের যে কত বড় সুবিধা হ'বে তা লহজেই বোধগম্য। কর্তৃপক্ষের এই কার্য আশা করি লক্ষ্যেই লক্ষ্যন করবেন।

পূর্ণ থিয়েটার্স

কবি ললিতা 'অমুরাধা' বঙ্কিম কলিকাতার এই জনপ্রিয় চিত্রগৃহটির মারফৎ যে বাণী প্রচার করে চলেছেন তাতে করে প্রত্যেক গৃহেই মহা চাকল্যের লাড়া পড়ে গেছে। অমুরাধা বলেছেন "ভালবাসা পাগ নর" কেন নয় এই কথা শোনবার জন্তে লক্ষ্যেই উদ্যোগ হয়ে 'অমুরাধা' কে আটকে রেখেছে। আরো ২৩ লপ্তাহের আগে সে বেচারী ছুটি পাবে বলে মনে হয় না।

রূপবানী

চিত্রলিপকের বিশেষ অনুরোধে নিউ থিয়েটার্স-এর লম্বা-লম্বাগুলক এই কথা-চিত্রটি রূপবানীর কর্তৃপক্ষ আর এক লপ্তাহ রাখিতে বাধ্য হইলেন।

আগামী ওরা সেপ্টেম্বর হইতে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স-এর অভিনব ও অতি-আধুনিক চিত্রকথা 'অভিনয়' রূপবানীতে মুক্তিলাভ করিবে। বহুদিন প্রত্যাশিত 'অভিনয়' চিত্রটি নানাবিধ দ্বিরা বাঙলা ছাড়া চিত্র-

বি বি ধ

টসের চা

ভারতীয় 'চা'-এর মধ্যে টসের 'চা' স্বাদে ও গন্ধে লতাই অতুলনীয়। আমরা এই কোম্পানীর 'চা' ব্যবহার করিয়া লতাই অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। দেশীয় এই প্রতিষ্ঠানের আমরা নব্বীজনীন উন্নতি কামনা করি।

বিনোদ কোং

গত ১১ই তারিখে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বিনোদ কোম্পানী ১৩নং ডালহাউসি স্কোয়ারে একটা নতুন Show room-এর উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বিনোদ কোম্পানীর নাম কলিকাতার বাজারে লকলেই জানেন।

শিল্পের একটি গৌরবময় অবদানরূপে জনসাধারণকে পরিচুট করিবে ইহা আশা করা যায়।

আকাশ-পাতাল

মন্দার-কিন্মণের আকাশ পাতাল 'রূপবাহীতে' দেখানো হচ্ছে—আমরা চবিখানি দেখে এনেছি শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিক এমন সুন্দর রূপকথার একটি ঘটনাকে কাটুন-চিত্রে রূপান্তরিত কোরে অনেকেরই ধন্বাদ তাজন হয়েছেন। কাটুনচিত্রে আমাদের দেশে ২-১ খানা তোলা হয়েছে বটে কিন্তু সে 'গুলি' মোটেই লফল হতে পারেনি। কিন্তু শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিক বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে একটি লতাই সুন্দর কাটুন চবি তৈয়ারী করতে সক্ষম হয়েছেন। আলোকচিত্র, সম্পাদনা, আবহ লজ্জিত ও শব্দ যন্ত্রের কাজ ভালই হয়েছে এর।

এই কোম্পানী Drawing ও Surveying-এর ব্যবহারী যন্ত্রপাতি আমদানী করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কলিকাতার বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই কোম্পানীর নব্বীজনীন উন্নতি কামনা করি।

ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েশন

ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েশনের দ্বাবিশতম জলক্রীড়া ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে। ২৭শে আগষ্ট ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় নাম দ্বিবার শেষ দিন। জাতব্য বিষয় সকল উক্ত এসোসিয়েশনের সুইমিং সেক্রেটারী প্রবোধ চক্রবর্তীর নিকট জানিতে পারিবেন।

খিদিরপুর সুইমিং ক্লাব

উক্ত ক্লাবের নব্বয় বার্ষিক জলক্রীড়া আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে, খিদিরপুর পদ্মপুকুর স্কোয়ারে সম্পন্ন হইবে। প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার শেষ তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর। কয়েকটি বিশেষ প্রতিযোগিতার Heats ও Final যথাক্রমে আগামী ৬ই, ৭ই ও ৮ই সেপ্টেম্বর হইবে। বিশেষ কিছু জানিবার থাকিলে, ক্লাবের Secretary শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী সরকার মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ত্রিবিংশত বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.এস. আগামী মোমবার ১২ই তারিখ ১৩৪৫ তারিখে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে Diploma in Librarian-ship পরীক্ষা দ্বিবার জন্ত ইংলণ্ডে যাইবেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ.এস.দি পর্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায় সঙ্গমানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভবানীপুর আন্ততঃ কলেজে কয়েকবৎসর তিনি রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-পঞ্চক ছিলেন। ইহার পর যাত্রাজে গিয়া Library-training পরীক্ষা পাশ করিয়া আলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাত্রেসের লেকচারী লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হ'ন। ইনি Bengal Library Association এর কোষাধ্যক্ষ ও Bengal Teachers' Training ক্লাবের অন্ততম অধ্যাপক। কলিকাতা ছোট আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনি চতুর্থ পুত্র এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বার এট-ল; এম. এল. এ; মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা।

আমরা কামনা করি ইহার যাত্রা সফল হউক।

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!



ব্যবহারাস্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। শ্রমজনের মনোমত আধুনিক ধরণের লকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ লোপার জায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এন্ড ক্যারেট গোল্ড সিলিক্টে

৭০নং কলেজ , কলিকাতা (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : বি, বি, ৪৮২



চোখের লামনে প্রতিদিন যে শত শত
লোক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তাদের
কথা মনে করে আমাদের এই ছবির দিকে
দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। “আমার দেশের
মাটিতে বাঁধের জন্ম—তাদের সকল সুখ এবং
দুঃখের ভাগ আমাকে নিতে হবে”—একথা
মনে করবার সময় বোধহয় এখন হয়েছে।

“সবার উপরে মানুষ সত্য

তাঁহার উপরে নাই

নর ও নারীর ভেতর যে ভালবাসার বাধন রহিয়াছে, সৃষ্টির গোড়া হইতেই তাহার জন্ম। মানব জন্মিরাই ভালবাসিতে আরম্ভ করে। এই পৃথিবীর জল, বাওয়া এই পৃথিবীতে ভগবানের বা কিছু সৃষ্টি নাই তাহার ভাল লাগে, শিশুকালে মাতৃস্তনে তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হয়, মায়ের স্নানপুণ হস্তের সেবার সে বঞ্চিত হইতে থাকে, তারপর সে পায় আত্মীয় পরিজন, পিতা, ভ্রাতা, পত্নী,—সকলের ভালবাসা, সুতরাং দেখা যাইতেছে মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাহা কিছুই সে করিতেছে সকলেরই মূলে রহিয়াছে ভালবাসা। নানা প্রকার ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে, অবস্থার বৈচিত্র্যে এই ভালবাসা বেশ কাল ও পাত্র ভেদে নানারূপ ধারণ করে। যে ব্যক্তি রোজ মধ খায়, মাতলামি করে তাহার মূলে যে প্রেরণা রহিয়াছে, স্নান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাও ভালবাসারই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং এই বিশ্বজগৎ যে নীতিতে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহার একমাত্র নীতি হইতেছে প্রেম বা ভালবাসা।

ভাল ও মন্দ সকলই ভগবানের সৃষ্টি। মন্দকার থাকার বরূপ আলোর মহিমা প্রকাশ পায় তরুণ মন্দ রহিয়াছে বলিয়াই ভাল লিখা বাহা বুঝার তাহার সুফল মানুষ ঝিঁতে পারে। এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রেরণা ও বাবতীয় লব্ধা এই ভালর দিকে পরিত্রিত করিতে প

ভগবানের এই প্রেমের রাজ্যে বরূপ যিরাই ভালবাসিতে শিখিয়াছে। ফুলের মিত্র

ধ্বনিতে সর্বদাই সে ভগবানের, তাহার আরাধ্যা দেবীর মহিমা দেখিতে পায়। প্রেমের পাগল হইয়া সে “দেওয়ান” হয় বটে কিন্তু তাহার গুণাবলীর স্বেচ্ছামিত্রিত লভক সৃষ্টি সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। অদৃষ্টের পরিবাদে বরূপ চৌর্য্যাপরাধে জেলে প্রেরিত হয়। জেল হারোগার বাগানে সে মালীর কাজ করে। কিন্তু ফুলের বাগানে সর্বদাই সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার আরাধ্যা দেবীর মহিমা কীর্তন করে। কিন্তু কোথার তাহার আরাধ্যা দেবী, ভক্তের এই নীরব পূজ গ্রহণ করিয়াই সে সন্তুষ্ট।

অবশেষে একদিন বরূপ তাহার দেবীর দেখা পায়, জেল হারোগার কত্যা স্রীমতী দুর্গা বলে বরূপ তুমি কি চাও, বরূপ বলে দেবী—কিন্তু, দুর্গা উত্তর দেয়, আমি ও দেবী নই, আমি যে, দুর্গা, বরূপ বটে দুর্গতি দেবীই, তুমিই আমার দেবী। দুর্গ যেন কী এক ভাবের মাঝে নিজেকে হারিয়ে যেতে গিয়ে গিয়ে যা একটা অপ্রাণ হয়। বরূপ আত্মহারা হইয়া বলে, “মো পিরায়ী, মেরে দুর্গা”—হুইটি আকুল হিয়া মিলন হয়।

কিন্তু পাড়ামর রাষ্ট্র হয় দুর্গা বিধবা বিধবা!—দুর্গা নিজে নিজে বলে—কেন বিধবার স্বপ্ন বলে কি কোন জিনিষ নেই না, বরূপের এই প্রেম সে কিছুতেই অগ্রা করিয়ে না—করিতে পারেন না! রাস্তা নিতুই অন্ধকারে সকলের অগন্ধিতে হু বে ফুল বনে বরূপের কুটির অবস্থিত তথ বার এবং বরূপকে বলে, বরূপ আমার নি জরি চল। বরূপ ও বলে চল দুর্গা আর

এখান থেকে চলে যাই। আমরা প্রেমের এক মৃতন রাজ্য সৃষ্টি করি। কিন্তু দুর্গার পিতা অতর্কিতে পিছনে আসিয়া তাহার পলায়নে বাধা দেয় এবং বরূপকে প্রহারও তৎপর করে। অতঃপর অপর এক সুবন্ধন সহিত তিনি দুর্গার বিবাহের আয়োজন করেন। এহেন সময় শুক্লদেব আসিয়া উপস্থিত হন এবং সকল সমস্তার সমাধান করেন। তিনি বলেন, দুর্গা ও বরূপ বিবাহিত। সাত বৎসর পূর্বে এদের বিবাহ হয়। যে কারণে এই বিবাহ এতদিন অপ্রকাশ্য ছিল তাহা হইতেছে.....

পরিচালক কার্দিয়ের নাম চিত্র-জগতে আজ সকলের নিকটই সু-পরিচিত। উল্লিখিত আখ্যান ভাগকে বেঙ্গ করিয়া তিনি স্নানপুণ ভাবে “বাগ-বান” অর্থাৎ উত্তান-মালির প্রেমকে চিত্রে রূপান্তরিত করিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় বিমলাকুমারী, সিতারা, যমুনা, নজেরকার, আলরাফ্‌খান প্রভৃতি রহিয়াছেন। ঘটনার অভিনবত্বে, অভিনয়ে ও লক্ষ্যে ছবিখানি এক কথাই হইয়াছে অপরূপ, যোঝাইতে ছবিখানি এখনও লগ্নাহের পর লগ্নাহ দর্শকবৃন্দ কর্তৃক আদৃত হইতেছে।

ছবিখানি শীঘ্রই প্রভাত সিনেমার আনিতেছে।

অন্ধকার

(সামাজিক উপদ্রাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাখা টানিতে টানিতে কখন যে লবঙ্গ প্রান্ত হইয়া দেই খানেই শুইয়া পড়িয়াছিল, এবং নিজাধেবী কখন যে তার স্নুকোকল চক্ষু পল্লবের উপর আগুন পাতিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে একেবারেই জানিতে পারে নাই। যখন উঁয়ার প্রথম আলোকচ্ছটার তাহার নিজা ভাঙ্গিল, তখন সে লক্ষ্য করিল একখানি নিঃশব্দ হস্ত নিত্যন্ত আত্মীয়ের মতই তাহার কণ্ঠ আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং এই হস্তখানি যে পুরুষটির, তিনি অকাতরভাবে এখনও তাহার পার্শ্বেই নিদ্রিত। এই হাতখানি তাহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া হৃদয়ান্তরিত করিতে গেলেই, ইহার অধিকারী যে তখনই আগিয়া উঠিবে, এবং লবঙ্গকে যে তাহার লম্বুখেই লজ্জার বিষম শ্রোতে হাবডুখ খাইতে হইবে ইহা হুঁসিতে তরুণীর বাকি রহিল না। আপনার এই বিপত্তিপূর্ণ অংস্থার কথা সুবিধাধারাই হঠাৎ বারেকের জন্ত লবঙ্গের লম্বু শরীর শিহরিয়া উঠিল, বেহের লম্বু বল যেম নিমেষের জন্ত নিঃশেষ হইয়া গেল, বুকের স্পন্দন কিছুকণের জন্ত বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পার্শ্বে ঘরের চারিদিক ঘুরিতে লাগিল, যে পালকের উপর সে শুইয়াছিল তাহা হুলিতে লাগিল, এবং তাহার চক্ষে লম্বু জগৎ-লংসার অন্ধকার হইয়া গেল। লবঙ্গ তখন প্রথম অসুস্থ করিল, সে একান্তই অনাথা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

লবঙ্গ অতি ধীরে ধীরে যেমনই ঐ হাত-

খানি তাহার কণ্ঠ হইতে লইয়া দিবে, অমনই নীরববাবু আগিয়া উঠিয়া বলিলেন “আঃ! বেশ ঘুমুচ্ছিলুম! এটুকুও তোমার লক্ষ হ’ল না লবঙ্গ? তুমি এত নিষ্ঠুর কবে থেকে হ’লে?”

লবঙ্গ আর কি বলিবে? বলিল: ঘুমুন না আপনি! আমি আমি! লকাল হয়ে গেছে, কাজকর্ম করতে হবে তো?”

—তোমার কাছে কাজকর্মটাই বড় হল? আমার ঘুমটা,—

“দিনের আলো এলোছে! এখন আর আপনার ঘুমের সুবিধা হবে না! আমি আমি!” বলিয়া সে জোর করিয়াই উঠিল; নীরববাবুর কাতর চক্ষুর উপর লহাশ্রুতি করিল না। কি একটা কারণে তাহার মনটা অত্যন্তই ছন্দহাড়া হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া নেটা তখন ঘুরিতেছিল ভবিষ্যতের আলিতে গলিতে নিত্যন্তই গৃহ ভাঙিতের মত।

সে উঠিয়া নীরববাবুর দিকে পিছন করিয়া, কোনও রকমে আপনার কাপড়-চোপড়গুলি ঠিক করিয়া লইল। অন্ত্যন্ত পুরুষের নিকট তরুণীর বদন বিন্যাস করা যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তাহা সে এই প্রথম হাড়ে হাড়ে অনুভব করিল। তবু এই লজ্জাকর কাজটি তাহাকে করিতেই হইল, কোনও রকমে কাপড় ঠিক করিয়া, সে অগ্নিবদ্ধ জলন্ত কাঠখানির মত, ঘর হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

লম্বু সকালটা ও দুপুরটা তাহার কি করিয়া যে কাটিল, তাহা সে মর্মে মর্মে

অনুভব করিল। বায়ুর কাছে দুখ দেখাইতে তাহার বেশ বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। গত রাত্রে অজান্তে যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গিয়াছে, নেটা যে তরানক লজ্জাকর ব্যাপার, এই ধারণাটা জোর করিয়া তাহার মনের মধ্যে অনবরত উঠিতে পড়িতে লাগিল। কি করিয়া যে জীবনের উপর এই কালো দাগটা দে হুঁসিয়া ফেলিবে,—নেটা হুঁসিয়া ফেলা একান্ত ঘরকার কিনা,—এবং ঘরকার হইলে, কেমন করিয়া তাহা হুঁসিয়া যায়,—এই লকল ভাবনা লইয়াই তাহার লকালটা কুস্মটিকাচ্ছন্ন হেমন্ত প্রভাতের মত, অত্যন্ত ভারি হইয়াই কাটিতে লাগিল।

বেলা দশটার সময়, বাবু যখন খাইতে আলিলেন, তখন লবঙ্গ আবার একবার বিপত্তিতে পড়িল। ইহানীং প্রত্যহ পাচক-ব্রাহ্মণের নিকট ভাত বাড়িয়া লইয়া, সে নিজেই দিয়া আশিত; কিন্তু আজ সেই নিত্য-আচরিত গৃহস্থালী নোষ্টবটি করিতে তাহার আটকাইয়া বাইতে লাগিল। সে পাকঘরে গিয়া পাচককে বলিল: “ঠাকুর! আজ তুমি নিজে বাবুকে ভাত দিবে এলো! আমি একটু আটকে আছি।” ঠাকুর বলিল: “না, মাগিমা! আমি গেলে, বাবু বড় দুখ বেকান! আপনি যেমন রোজ বাচ্ছেন, তেমনই যান না।” লবঙ্গ ইহারও কি একটা উত্তর দিয়া কাটাইয়া দিতেছিল, এমন সময়ে আবার ঘর হইতে বাবু চোঁচাইয়া বলিলেন: লবঙ্গ! আজ ভাত আনতে এত ঘেরি কচ্ কেন? বড় বেলা হয়ে গেছে যে!” তখন “লবঙ্গ নিত্যন্ত নিরুপায় হইয়াই, কোমরে আঁচল জড়াইয়া ভাতের খালা লইয়া বাবুর লম্বুখে গিয়া হাজির হইল।

সুখে অমের গ্রাস দিতে দিতে নীরববাবু বলিলেন: “লবঙ্গ? আজ তুমি এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ কেন?”

পালিয়ে বেড়াবো কেন বাবু? আজ আমার একটু কাজ ছিল (গলাটা খুবই ধরা-ধরা)।

শ্রীমদ্র চণ্ডীপাশ্যায়

১০০০

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চার

সেইদিনই বিকেলে ছাড়ে বেনে গিন্নির সঙ্গে কথার কথার এ বাড়ীর গিন্নি বলবেন না ভেবেও বলে ফেললেন কথাটা। বেনে গিন্নির মাথার হাত। ওমা দেকি! জামাই চলে গেছে, দেকি! কি হয়েছিল? কেন গেল, কখন গেল ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে করতে সব কথা বেড় করে নিলেন। তিনি বক্তৃতাগুলো শোনালেন পুরুষ মানুষ ভয়ানক অভিমানি আরো যদি নিজের বউয়ের সঙ্গে কিছু হয়তো তাহলে সে যে-কোন বিপদ জানতে পারে। এইতো তার বাপের বাড়ী নাকি এক ঘটনা ঘটেছে। পাশের বাড়ীর এক নতুন জামাইকে তার স্ত্রী 'সুখপোড়া' বোলায় নাকী সে কালী দ্বিগে আত্মহত্যা করেছিল, আহা মোটে বিয়ের ছমাসের মধ্যে।

এ বাড়ীর গিন্নির শিরে আশু বজ্রাঘাত হল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা ধারণা করে রাখেন যে বীরেন পালিয়ে গেছে। মরার কথা.....ওমা, কি ভয়ানক, এ তো

নিরদ্বাণু বলিলেন : কাজ তোমার আর হবে থাকে না? তুমি ত কাজেরই মানুষ! কাজ যদি একটা থাকে, তুমি হও দশটা।

লবঙ্গ ধরা-ধরা গলাটা আর একবার ঝঙ্কারী দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া গিল : "আপনার লম্বা শুনতে শুনতে আমার কাণ ভোতা হয়ে গেছে। দিনকত চোঁ বন্ধ ঘেন।"

—তা বিতে পারি, যদি আর না পালিয়ে যেতে। লবঙ্গ পাঁচবনের মধ্যে আনিয়া

সঙ্গেও মনে আসেনি। তিনি আর ছাড়ে থাকতে পারলেন না পাড়াতাড়ি নেবে এলেন নিচে।

বাড়ীর ঝি বিন দুই আগে কি এক বিশেষ কারণে তারকেশ্বরে গেলো হ'ত্যা দিতে। না খেয়ে ওরকম ঠাণ্ডাঘেঘের শুয়ে থাকা নাকী তার কুটিতে লেখেনি, তাই সে আজই রাগ করে চলে এলো।

সে বললে—উঃ দিদিমণি যা দেখে এল, বাবাগো সে মনে করলেও গাঁটা আমার এখনো খরখরিয়ে কাঁপে। জান দিদিমণি ছাবড়ার কাছে আসতেই, গাড়ীটা নড়ে উঠলো। আমার মনে সন্দেহ হয়েছে আগেই। গাড়ী তখনই খেমে গেল। দেখতে আর পান্নুহনি ভীড়ের জন্তে। শুনলুম যে একটা বেটাছেলে নাকী গাড়ীর তলার ইচ্ছে করে ঝাপ দিয়ে পরেছিল। হাত-পা থেকে লাড়া বেহ এমন কাটা কাটা হয়ে গেছে যে তাকে আর চেনা যায় না, রক্তে, কি বলবো দিদিমণি মাঠে যেন পুকুর জমে গেল।

চারগুণ অতিরঞ্জন করে ঝি বলে চললো—কি পোড়া দিনে জন্মে যেখিনি ওরকম।

ঠাকুরকে বলিল : ঠাকুর! বাকি তরকারি-গুলো তুমি দ্বিগে এলো, আমার বড় মাথা ঘুরচে! বলিয়াই সে ব্যক্তনের খালাটা ঘেঘের উপর ঝন্ ঝন্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িল। ঠাকুর মহাত্মত্বের হয়ে বলিল : "মাথা ঘুরবে না। লম্বাঘন চরকির মত ঘুরে বেড়াবেন! একদণ্ড ত বিশ্রাম নেই।"

কেনরে বাপু অমন প্রাপটা বেঘোড়ে হারালি। ঝি বীরেনের পালাবার খবর জানতো না।

পরমার মনের অবস্থা একথা শুনে কিরকম হ'ল তা আমরা ঠিক জানিনা তবে মাথার অবস্থা খারাপ হয়ে উঠলো। বেলা লাড়ে-তিনটে রাত্রি লাড়েতিনটের পরিবর্তিত হল। মনে হল নাগর বোলায় চেপে বসেছে সে।

সেদিনও গেল বর্তমানের দৃক থেকে দ'রে। রাত্তার লামনের পাল মশায় বললেন—বেখুন মিস্তির মশাই—দেয়ী করবেন না। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এ নিয়ে অবহেলা করা উচিত নয়। আশু চেষ্টা করুন। দিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। ছবি টিবি আছে তো? মিস্তির মশাই অকুলে কুল পেলো।—হ্যাঁ ছবি তো আছেই।

—সেই ছবি দ্বিগে আর জামাইয়ের চেহারার বিবরণ দ্বিগে একখানা বিজ্ঞাপন দিন। এ তো বড় ভাল কথা নয়, তিন তিনটে দিন ব'য়ে গেল। এক দুর্ভাগ্য লাগেনা বিপদ ঘটতে—আর... .. হ্যাঁ পুরস্কারের কথা উল্লেখ ক'রে যেবেন। ধন্য জামাইয়ের যদি ফেরবার ইচ্ছে না থাকে তা হলে কেউ দেখতে পেলো অন্ততঃ পুরস্কারের লোভেও ধরে নিয়ে আসবে। বেশ একটু মোটা অঙ্ক দেবেন, বুঝলেন?

—কত হ'বো বলুন। এই দশ টাকা, কেমন? মিস্তির মশাই নিরীহের মতো জিজ্ঞেস করলেন।

—পাগল হয়েছেন মিস্তির মশাই, দশ-টাকা! বেখুন এলময়ও যদি মারা করেন তো—তাহলে আর কিছু বলবার নাই। আরে মশাই পাঁচশো টাকা—পাঁচশো টাকা দ্বিগে দিন। আপনার দেখছি জামাইর চে' টাকা বেশী হল।

পাঁচশো টাকা! হার হার মিস্তির মশাইকে এরচে' জামাই খুন করিয়া গেল

(ক্রমঃ)

না কেন। ইন্ এতোগুলো টাকা অব্যাহত
অবস্থায় দিতে হবে। তবে আর কি
করবেন পরের দিন বন্ধের হাতে।.....

পরদিন বৈনিকে বেরলো :—

—নিরুদ্দেশ।

—২০০ টাকা পুরস্কার—

আমার জামাতা শ্রীধরেন্দ্রনাথ রায় গত
১৫ই বৈশাখ কাহাকেও কিছু না বলিয়া
বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। চেহারা লক্ষ্য,
লম্বা ও রং কালো। মাথায় বাবড়ী চুল।
চোখে পাওয়ারহীন চশমা। ভুঙ্গর উপরে
কুকুরের কাষড়ের একটি দাগ আছে।
হুমপানালক্ষ্য। বহি কোন লক্ষ্যর ব্যক্তি উক্ত
বাবাজীবনকে নিয়মিতকানায়.....ইত্যাদি।

উপরে একখানা ছবি ছাপা হয়েছে—
তা ঠিক যেহেতুকের কি পুরুষের গোঁবা
বার না—কালী একটু বেশী পড়েছে।

সবাই পড়লো। চারের ঘোঁকানের ঘে'
মশাইও একখানা কাগজ নেন, তিনি পড়িয়া
কপালে হাত দিলেন—তার পরমা ক'আনা
পাইবার আর আশা নাই।

নিরুদ্দেশ হবার পক্ষম ও বৈনিকে বেরবার
তৃতীয় দিবসে সকালবেলা স্বস্তর সবে গছি
ঘরে নেবে এলেন, মনে লেই এক চিন্তা,
জামাইর চিন্তা যে নয় তা বলাই বাহুল্য।
চিন্তা শুধু হুশো টাকা যে জলে গেল।

সরমা তার মায়ের সঙ্গে এক গণ্ডকারের
বাড়ী গেছিল গোনাতো। সে বলে দিচ্ছে
এক ছয় ঈশান কোনে নয় নৈখৎ কোনে
ধীরেন গেছে, কেরবার আশা নাকী নাই
তবে কয়েক দিকের এক মাছলী ধারণ
করলে নাকী কিরে আসতে বাধ্য হবে।
জামাও এলে বাড়ী পৌছালো। চেহারা
তাঁদের লতাই খারাপ হয়ে গেছে চিন্তার।

একখানা রিক্সা ক'রে ধীরেন এলে
হাজির, সঙ্গে একটি লোক চেহারা ধীরেনবৎ—
চৌদ আনা হ'আনা চুলছাটা। ধীরেন

কিছুতেই নাববে না, সে লোকটা যেন এক
প্রকার টেনেই বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল।

মিস্ত্রির মশাই মিস্ত্রির নিখাদ কেললেও
মনে মনে ঘবে গেলেন টাকার দ্বন্দ্ব।
জামাইকে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। পাড়ার
অনেকে এলো ভীড় জমাতে ও নানাবিধ
মন্তব্য উচ্চারণ করতে।

গিন্নি ও সরমা আনন্দে কেঁদে কেললো—
কোথায় তুমি গেছলে বাবা—তোমার কি
প্রাণে একটুও দয়া নাই।

সরমা কিছু অবশ্র বলতে পারলো না
চুপ করে দাঁড়িয়ে চোখের জল কেলতে
লাগলো। তার খুব শিকা হয়েছে। ধীরেনের
রাগ বোধ হল তখনও আছে। তাকে যেন
জোর করেই বাড়ী নিয়ে আনা হয়েছে এই
রকম ভাব। অন্যরে এক বিষাদে-হরিশ
উপস্থিত হল।

নীচে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যর ভদ্রলোকটি (?)।
গোলমাল কিছুই হচ্ছে না যেথ সে মিস্ত্রির
মশাইকে বলতে বাধ্য হল—কই তার।
আমার বিষয় করে দি। টাকা কটা
দি। উঃ কি ক'রে যে এনেছি সে আমিই
জানি মশাই। ট্যাঙ্গার খালে প্রায় আপ
দ্বিচ্ছিন্ন, আমি মশাই আসছিলাম কোলকাতার
দিকে—ভাগ্যিস কাগজের বিজ্ঞাপনটা পড়ে-
ছিলাম ঠিক দেখলুম কপালে দাগ, অমনি
আপ ঘেবার আগেই থপু করে ধরে ফেললুম।
আর বাবে কোথা বাহাদর, চেপে ধরলুম।
কিছুতেই আসবে না, জোর করে নিয়েলুম।
এই দেখুন তার কাষড়ে দিচ্ছে। বলে
একটা বায়গা সে দেখাল বটে কিন্তু সেখানে
চর্খচর্কে কোন দাগ দৃষ্ট হল না।

মিস্ত্রির মশায়ের কানে কিছু এর একবর্ণও
তখন প্রবেশ করছিল না। তিনি
লোকটাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে
অনুনের ঘরে বললেন—বাবা—ছাপার ভুল
হয়েছে, কুড়ি টাকা লিখেছিলাম একটা

পুত্র ভুল ছেপেছে। তা বাপু কুড়ি
টাকাওতো এখন হাতে নেই—এই দশটা
টাকা এখন নাও। বা উপকার করছে
জীবনে তা ভুললো না। উপকারইতো বড়
কথা তুমি মহৎলোক, উপকারতো তোমার
কাছে বড় কথা, টাকা নয়।

আগন্তকের মুখের ভাব মুহূর্ত মধ্যে
পরিবর্তিত হল—সে কি তার! একি
জুরাচ্ছুরী নাকী? দ্বিগে দিন আপ করে,
ভদ্রলোক আপনি কেন খামখা গোলমাল
করছেন।

মাথায় হাত বুলিয়ে মিস্ত্রির মশাই
বললেন—না বাবা—রাগ ক'রো না দত্তি
আর পারবো না। তোমার হাতে ধরছি—
ঐ নিয়েই লক্টে হও।

আগন্তক রেগে উঠলো—দেখুন তার তবে
নিয়ে আসুন আপনার জামাইকে আমি
আবার ট্যাঙ্গার খালে দ্বিগে আনি। চালাকী
নাকী?

অগত্যা দ্বিগে তাকে হলই টাকাগুলি।

বিকলে; যে মশাইয়ের 'চা-টল'।

ধীরেন বলছে স্ট্রিকের দিকে চেয়ে—
হাও তাই বেড়শোটা টাকা হাও দিকিন্—

—অ-হ, খুব যে বলছিল একশো টাকার
বেশী দ্বিগে পারবো না। আমাদের পূর্বোক্ত
আগন্তক বললে—কম্ মেহেনত করতে হয়েছে
আর তা ছাড়া এতদিন যে রাজারহালে
ছোট্টোলে খাওয়ালুম আর বুদ্ধি কে বাৎলে
দিরেছিলরে—

পালমশাই বললেন—আমার ভাগটাও
দ্বিগে হাও এখন

—ওটা হচ্ছেনা বাবা ধীরেন বললে—
আমার জেতেই তো হল। আমার কি ভাবিরা
বললে—আচ্ছা যে যে তাই যে।

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—তেজশ—

আলো আধারের নক্ষত্রে, প্রভাতী
মীরণের মুহূর্ণেরে অরুণের লঙ্কা কিরিয়
গিল। সে চক্ষু খুলিয়া বহুক্ষণ একদৃষ্টিতে
তার মুখের দিকে চাহিল। শুভ্রার অঙ্গে
টি দেখিয়া সে প্রথমে শুভ্রাকে বহু পরিচিত
খচ অচেনা কোন কিশোর বলিয়া মনে
হিল। সে কীপকণ্ঠে বলিল, “কে তুমি
বা করত আমার?” শুভ্রা হাসিল—সুভ্রার
ত মূন্দর বস্ত্রাজি দেখিয়া অরুণের শুভ্রাকেই
নে পড়িল। সে পুনরায় বলিল, “বলনা
তুমি?” তুমি যে আমার বড় চেনা,
ত পরিচিত; অথচ আমি যার কথা বলছি
ত পুরুষ নয়। শুভ্রা হাসিয়া বলিল
মামিও পুরুষ নই। তুমি যাকে ভাবছো
মামি সেই কিনা জানিনা, তবে আমি
হামারই, তোমারই পরিত্যক্তা স্ত্রী শুভ্রা।’

অরুণ অশেষ আগ্রহে উঠিয়া বলিল ও
ল “শুভ্রা, শুভ্রা, আমার শুভ্রা তুমি?
মন করে এলে এখানে? তুমিই কি
ম’র মরতে যাওনি? সারারাত্রি তুমিই
বসে আছ এই জনশূন্য স্থানে আমার
পা কোলে নিয়ে?”

শুভ্রা বলিল, “হ্যাঁ স্বামী, একদিন তুমি
নতে চেয়েছিলে কার অভিযারে রোজ
গার আমি বাইরে যাই। সেদিন তার
দর দিইনি আজ তার উত্তর দেবার সময়
সহে। যার পিছু পিছু প্রতি লক্ষ্যায়
মি হারার মত ঘুরে বেড়িয়েছি সে আর

কেউ নয় সে আমার স্বামী, আমার দেবতা
আমার ইহকাল, পরকাল—সে তুমি।”

অরুণ বলিল “অথচ একটুও জানতে
পারিনি আমি।”

“না, জানবার মত মনের অবস্থা ছিল না
তোমার, তেবে দেখে রঘুনাথ বলে কাউকে
মনে পড়ে কি তোমার যে কতদিন হোট্টেলে
তোমার খাবার মার্জ করতো?”

অরুণ বলিল, আর বলা না শুভ্রা;
সেই রঘুনাথকে দেখলে শুধু মনে পড়তো
তোমার অথচ তবু চিন্তে পারিনি আমি।
আর তোমার সজের লোকটা কে ছিল শুভ্রা?

শুভ্রা বলিল, “সে আমার ভাই নহু।”

অরুণ লজ্জিত হইল; লাগ্রহে সে
শুভ্রাকে নিজের বৃকে টানিয়া লইয়া
বলিল, “অনেক ভাগ্যে পেয়েছিলাম তোমার
শুভ্রা, আর অনেক পাপে হারিতে বন্দে-
ছিলাম তোমার। আমার মত ভয়ভাড়া
বিপণ্যমায়ী স্বামী জেনেও মত বিপদে আমার
রক্ষে করেছ তুমি। তুমি মানবী নও—
তুমি শাপম্রস্তা দেবী স্বর্গদূতী।

শুভ্রা বলিল, চল এবার বাড়ী কিরে
যাই। এই ব্রাহ্মবৃহস্পতি এল আমরা জগদীশ্বর
চরণে প্রার্থনা জানাই আর বেন আমরা
পরস্পরকে ভুল না বুরি, আর বেন আমরা
বিচ্ছিন্ন না হই।

অরুণ ও শুভ্রা করমোড়ে জগদীশ্বরকে
তাহাদের নবজীবন দানের জন্য ধন্যবাদ
দিয়া চির স্নিগ্ধের প্রার্থনা জানাইল।

প্রভাতের লগ্নে লগ্নেই দ্বিলীপবাসু ও
নয়র আলিয়া পৌছিলেন, দ্বিলীপবাসু কস্তা

ও জামাতাকে দেখিয়া অশ্রু নবরণ করিতে
পারিলেন না। অরুণ তাঁহার চরণ স্পর্শ
করিয়া কৃত অপরাধের ক্ষমা চাহিল।

দ্বিলীপবাসু বলিলেন, “পৃথিবীর পিচ্ছল
পথে চলতে চলতে পা অনেকেরই পিচ্ছল
বাবা, তাতে তোমার দুঃখ করবার কিছু
নেই। আজ বোধহয় বুঝতে পেরেছ যে
তুমি যার স্বামী সে তোমার অযোগ্য নয়।
আশীর্বাদ করি তোমরা চিরসুখী হও—জীবনে
বেন আর এমন দুর্দিন না আসে।”

নয়র নিকটে আলিয়া সেলাম করিয়া
বলিল, “আপনি একদিন একটা প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন হুজুর, আজ সেইটা আমাকে যে
দিতে হয়।”

অরুণ বলিল সে কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছে
তাহা তাহার মনে নাই।

“আজ্ঞে আপনি বলেছিলেন যে রঘুনাথকে
আপনার বাড়ী পৌছে দিতে পারলে ১০০
টাকা পুরস্কার দেবেন। তা ঐ দেখুন
রঘুনাথের বহলে রঘুনাথের প্রতিজ্ঞা—
সীতার মত সতী শুভ্রা বিবিকে কিরিয়ে
দিয়েছি। এখন ভুললে চলবে কেন?”

অরুণ বলিল, “এর পুরস্কার ‘একশ’
টাকার হয়না নহু। আমি চিরদিন তোমার
কীর্ত্তন করে থাকবো।”

দ্বিলীপবাসু বলিলেন, “আর আমি থাকবো
এবার থেকে আমার ভাগ্যটিকে সঙ্গে নিয়ে
আমার হা বাপের কাছেই—ঘরে রেখে
আর বিপদ ঘটতে দেব না।”

অরুণ ও শুভ্রাকে নদীতীরেই রাখিয়া
দ্বিলীপবাসু ও নয়র বেড়াইতে গেলেন।
প্রভাতী স্নানগল্গল্গেই রাতি জাগরণ ক্রান্তি
দূর হইল—তাঁহারা হঠাৎ শুভ্রা ও অরুণকে
অবলর দিয়া সরিয়া গেলেন।

অরুণ শুভ্রার আশ্রিত্য গণ্ডে লক্ষ্য
চূষন চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া বলিল “এই লক্ষ্যের
ভাগীরথি ও উপনদেবকে লক্ষ্য করে আজ

প্রতিজ্ঞা করলাম শুভ্রা, এ জীবনে আর কোন দিনই অস্ত্র জ্বালোকের সংস্পর্শে আসবো না। তুমি শুধু আমার জী বা লক্ষ্মীদেবী নও; তুমি আমার বান্ধবী, আমার জীবনসঙ্গী, রক্ষকী।

শুভ্রা হাসিয়া বলিল, “ইংরাজীতে একটা কথা আছে “খালি জিনিষই বাজে বেশী”। আমার বিশ্বাস তোমার মনে স্থান না পেলেও পারে স্থান পাব আমি। আমি চিরদিন শুধু তোমার পথ দেখারই অধিকার চাই।”

অরুণ আরও কি বলিতে চাহিতেছিল। শুভ্রা বলিল, নাগো, তোমার এখন আর কিছু বলতে যেবনা আমি। বা কিছু বলবার আমিই বলব।

হাসিয়া অরুণ বলিল, “তুমি তো বেশী কথা বলতে, চাইতেনা শুভ্রা।”

উত্তরে শুভ্রা বলিল, “এ যে আমার নূতন জীবন; আজ জীবন প্রভাতে একসঙ্গে কত কথাই না মনে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে আজ বা কিছু বলবার সবই একসঙ্গে বলে নি।”

অরুণ আশ্রয়ে বলিল, “বল শুভ্রা—তোমার কথা আমি এতদিন শুনতে পাইনি—আজ থেকে তোমার সকল কথাই রাখবো।”

শুভ্রা বলিল, “রাখবে, লভি রাখবে।”

উত্তরে অরুণ জানাইল যে তাহার অব্যাহতা করিবে না।

শুভ্রা বলিল, “কণাকে বিয়ে করতে হবে তোমার—তাকে আনতে হবে বাড়ীতে আমারই কাছে আমার চোট বোন করে।”

অরুণ উত্তেজিত হইয়া বলিল, “না শুভ্রা তা হতেই পারে না। আমি বুঝতে পেরেছি এতদিন সেই বাছুরী আমার শুধু অভিনয় করে ভুলিয়ে এনেছে। সে চিরকাল অমলকে ভালবাসতো আর আমাকে—”

শুভ্রা বাধা দিয়া বলিল, “বেধ রঘুনাথ মেজে বতদিন তোমার ছোট্টোলে গিয়েছি

ততদিনই আমি বাড়ী করেছি এই ধারণা নিয়ে কণা লভিই তোমার ভালবাসতো।”

অরুণ বলিল, “মামুষ নিজেকে দিয়ে অস্ত্র মামুষকে ওজন করে থাকে এই পৃথিবীর নিয়ম। তুমি ভাল, তুমি লভী, তুমি আমার ভালবাস প্রাণ দিয়ে তাই হয়তো মনে করতো সেও বুঝি তোমাই মত লাগবে, তোমারই মত মহিমাময়ী, তোমারই মত স্বর্গের জিনিষ।”

শুভ্রা বলিল, “স্বর্গের প্রাণী হবার সখ নেই, আমি শুধু মর্ত্যেই থাকতে চাই মানবী হয়ে তোমার পায়ের তলায়। আমি যে তোমার জী এই আমার সব চেয়ে বড় পরিচয়।”

অরুণ শুভ্রাকে বুকের উপর টানিয়া লইল। শুভ্রা অরুণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু অরুণ বুঝিল না। শুভ্রাকে শাস্ত করিবার জন্য সে বলিল, “তুমি যদি এই রকম অস্ত্রায় আবদ্ধ কর তাহলে আর বাড়ীই কিরবো না আমি।”

অগত্যা শুভ্রা শাস্ত হইল। হতভাগিনী কণার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শুভ্রার চোখে জল আনিতেছিল। সে বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিলনা একজন জ্বালোকের পক্ষে ছুটী পুরুষকে ভালবাসা কিরূপে সম্ভব।

মধ্যাহ্নে অরুণ ও শুভ্রা বাটা ফিরিল। বহুদিন পরে পরিত্যক্ত গৃহে গৃহলক্ষ্মীর আগমনে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। লম্বের ডিষ্টেকটীভির পুরস্কার স্বরূপ অরুণ একটা পরমাশুন্দরী পাখীর সহিত তাহার বিবাহ লব্ধ স্থির করিয়া ফেলিল ও লম্বের কর্ণধর্দন করিয়া বলিল, “বেধ শালা, পকাশ টাকার জন্য লাফাচ্ছিল এখন যে পুরস্কার দিচ্ছি তোকে তার দ্বিগুণ পাঁচ লাখ টাকা।”

লম্ব হস্ত বিকলিত করিয়া বলিল, “তা হলে আমার দ্বিগুণ দ্বিগুণ বিশ লাখ, বুঝলে ডাক্তার লাহেব?”

অরুণ এবার হাসি মানিল।

অমলকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই কণার মনে যুগপৎ ভয়, লজ্জা বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার মনে হইল অমল বেক্রপ কোপন-স্বভাব এখনই হয় তাহাকে নয়তো অরুণকে হত্যা করিবে। গত কয়েক দিন অরুণের ব্যবহারে সে মর্মান্বিত হইয়াছিল এবং এক কয়েকদিন বাবৎ নামমাত্র আহার করিত। তৎপরে সে যখন শুনিল যে অরুণ শুভ্রাকে ত্যাগ করিয়াছে তখন সে মৃত্যুবরণ করিবার জন্য কৃতজ্ঞ হইল। সারাদিন অনাহারের পর সে আজ যখন অরুণকে পাইল আবেগে তাহার মস্তক ঘুরিতেছিল তথাপি সে লম্বের শক্তি লক্ষ্য করিয়া চির বিদায়ের পূর্বে তাহার দেহতার পূজা করিতে চাহিয়াছিল এমন লম্ব অমল তাহাকে ডাকিল কণা।

কণার মনে হইল যে তাহাকে ডাকিতেছিল সে অমল নহে এ বুঝি লাক্ষ্মী শমন তাহাকে মৃত্যু ডাকের কণার আশ্রয় জানাইতেছে। তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

অরুণের কি হইল অমলের তাহা দেখিবার অবকাশ ছিল না। সে কণার চৈতন্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেই ব্যস্ত রহিল।

ঘণ্টা তিনেক পরে কণার সংজ্ঞা ফিরিল। সে উদ্ভাহিনীর দ্বায় উঠিয়া বলিল—বাকুল চিন্তে চারিধিকে চাহিয়া দেখিল—অমলকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই সে ছুটিয়া নামিয়া আসিল। অমলও তাহার পশ্চাতে চলিল। দুই একজন সুরাপারী ঘরের নেশার কণাকে ছুটিয়া বাইতে দেখিয়া “কোন গগনের তারা তুমি কোন আকাশের চাঁদ” বলিয়া গানের সুরে তাহাকে বাদ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া কণা ছুটিয়া প্রকান্ত রাজপথে দ্রুত হুঁহুগের মধ্য দিয়া জাহ্নবীর পানে।

পথ জনশ্রুত হই চারিজন গৃহস্থান ভিক্রম
বিস্তৃত নেজে কণা ও অবলের বিকে
চাহিল মাত্র ।

কণা ছুটিতেছে ; তাহার বস্ত্রাকল মাটিতে
দুটাইয়া কর্দমাক্ত হইল—দক্ষ দেহ লিক্ত—
লিক্ত বদনের ভিতর দিয়া সুগৌর বৌবনস্ত্রী
পুলিশের চক্ষু ঝলনাইয়া দিল । তাহার
বিস্তৃত আন্তরে চক্ষু বৃজিল ।

ভাগিরথীতীরে কণা ও অবল আদিয়া
পৌছিল । তখনও মূলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ।

অবল কণার নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই
কণা ঝাপাইয়া পড়িল উদ্ভাষিনী তরঙ্গিনীর
উদ্বেল বক্ষে । বিছাভালোকে কণার গৌর
বাহুলতা একবার উপরে উঠিয়া জলমধ্যে
বিলীন হইল । জীবনের মাত্রা ত্যাগ করিয়া,
“কে কোথায় আছ রক্ষা কর” বলিয়া অবলও
সেই তরঙ্গে লাকাইয়া পড়িল ।

তাহার মর্ন্তভেদী চাঁৎকারে জাগরিত
হইয়া নিকটস্থ বোটের দুইজন মাল্লাও জলে
লাকাইয়া পড়িল এবং অত্র একটা বোটের
মাঝরা উহাদের লক্ষ্য করিয়া বোট ছাড়িয়া
দিল ।

* * *

প্রভাত হইবার কিছু পূর্বে অষ্টেত্ত
কণাকে লইয়া শ্রান্ত বেহে কয়েকজন মাল্লা
ও মাঝি লহ অবল মহীতোষবাসু গৃহস্থের
পৌছিল । জাগরিত হইয়া দ্বার খুলিয়া
মহীতোষবাসু অবলকে লম্বুখে দেখিয়া আকুল
আগ্রহে তাহাকে বকে চাপিয়া ধরিলেন ও
কণাকেও গৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া মাঝি
মাল্লাদের বখোচিত পুরস্কার দিয়া বিদায়
করিলেন । অষ্টেত্ত কণার রূপ-লাবণ্য
দেখিয়া মহীতোষ ও অবল-জননী মুগ্ধ
হইলেন এবং বাহাতে কণাকে বাঁচাইতে
পারা যায় তৎক্ষণ আশ্রয় চেষ্টা করিতে
লাগিলেন । কমলবাসু ও তাঁহার স্ত্রী অবলকে
কিরিয়া পাইয়া এতই আনন্দিত হইরাছিলেন

যে অবলের অস্ত্র তাহার লকলই করিতে
প্রস্তুত ছিলেন ।

বেলা দশটার কণা চক্ষু খেলিল—কিন্তু
তখন প্রবল অরে সে আক্রান্ত । এতগুলি
নয়নারীর মধ্যে যে কেমন করিয়া আলিল
তাহা সে বুঝিতেই পারিল না । সে আকুল
কণ্ঠে কেবলই বলিতে লাগিল, “ওগো দিবি,
ওগো দিবি আমার ! আমার কথা কর ।
তাহার প্রলাপের অর্থ অত্র কেহ না বুঝিলেও
অবল বুঝিল । সে অরুণের বাটা গিয়া
শুভ্রার নিকট নিবেদন জানাইল যে শুভ্রা
কণার নিকট না গেলে তাহাকে বাঁচান
বাইবে না । অরুণকে বহু তর্কে শাস্ত করিয়া
শুভ্রা চলিল কণার লেখা করিতে । কয়েকদিন
বিকারেই কণার কাটিল—কিন্তু শুভ্রা ও
অত্রাজ লকলের বদ্রে একাদশ দিনে কণার
জ্ঞান ফিরিল । সে শুভ্রাকে দেখিয়া শিশুর
জ্ঞান কাঁধিয়া ফেলিল ও বার বার তাহার
নিকট কৃত অপরাধের অস্ত্র ক্ষমা চাহিল ।
সে শুভ্রাকে আরও জানাইল যে সে আর
বাঁচিতে চাহেনা ; মৃত্যুই তাহার একমাত্র
কাম্য । উত্তরে শুভ্রা শাস্ত কণ্ঠে বলিল,
“ভুল মানুষ মাত্রেই হয়ে থাকে বোন ।
তোমার মত অবস্থা বিপর্যয়ে পড়লে হয়তো
অত্র জীলোকেও তোমার মতই করতো ।
পাপের সাজা অত্রশোচনা । মা গজার পবিত্র
জলে তোমার লকল মলিনতা ঘুচে গেছে ।
তুমি ভুলে যাও কণা যে তুমি সেই ভাগ্য
বিড়ম্বিতা পিতৃ-মাতৃহীনা লাক্ষিতা নারী ।
আজ অবলের বাপ মা তোমার কন্তারূপে,
বধুরূপে ঘরে স্থান দিয়েছেন । আশীর্বাদ
করি তোমার জীবন শান্তিময় হোক ।”

তৎপরে সে অবলকে ডাকিয়া কণার
শীর্ণ হাতখানি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া
বলিল, “লতাই যদি এ জীবনে তোমার বাবা
ভিন্ন অত্র কোন পুরুষের চিন্তা আমার হৃদয়ে
স্থান না পেরে থাকে তবে এই আশীর্বাদ

জানাজি আমি বেন তোমাদের এ দিন
চিরন্তনী হয় ; অতীতের অন্ধকারাত হৃতি
হুচে গিয়ে তোমাদের তবিত্যৎ প্রেমালোকে
উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—তোমরা সুখী হও ।”

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে অবলের মস্তক শুভ্রার
পায়ে দুটাটতে চাহিতেছিল ; সে নভজান্ন
হইয়া শুভ্রার পদতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল,
“বৌদি, তুমি মানুষ নও—তুমি স্বর্গদূতী ।”

—সমাপ্ত—

ডাঙরের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায় । খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে । ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু ।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধ শাল
পাওয়া যায় ।

অপ-খেলান

জীবনমুখ শব্দ

(১)

রাত হুপুরে যুগের ঘোরে খোয়াব্ বেধি আনন্দে,
লীগের মুণ্ড লাগছে জোড়া কংগ্রেসের-ই কবছে।
মিলছে যুগল হিন্দু-মুসল আর কারে বল তর তবে?
লারা ভারত মিলছে যে আজ ভারতমাতার জর হবে।
যুগের ঘোরেই বেড়িয়ে পড়ি বিপুল প্রেমের উচ্ছ্বাসে,
নৃত্য-পাশল হিন্দু-মুসল; কুশল গাহি উল্লাসে।
লম্বা ছাড়ির লঙ্গে হেরি শুচ্ছ-টিকির গাঁটুচড়া,
হৃদয় নাচের হাঁচকা টানে পরম্পরের ধাতুচড়া।
বলনা-গাছুর 'বল' চলে ঐ যুগ্মনলের বন্ধনে,
খেমটা এবং বোরখা বহিন্ খেমটা নাচে অকনে;
পেশোয়ারা ও লাড়ী জমার বুসুর নাচের পাজা যে,—
লাম্বাবে কে তাগুবে ঐ কোপীন্ ও আলখাল্লাকে?
গান্ধী-টুপির লঙ্গে লাকার 'কেজের' মাথার গোপুচ্ছ,
কংগ্রেস এবং লীগ পতাকা লবার উপর সু-উচ্চ।
হুগল এবং মোরগ নাচে ঘরের চালের মটকাতে,
রাম ও রহিম একযোগে ঐ শুভ্র টানে লটকাতে;
হিন্দু-মুসল কুশল গাহ, এক হলো আজ হুই মিশে,
নৃত্য-পাশল চন্দ্র আবার উল্লাসে না পার বিশে;
ড্যাডা ড্যাং ড্যাং ছ্যাড্যাং ড্যাডাং ডকা বাজাও আনন্দে,—
লীগের মুণ্ড লাগছে জোড়া কংগ্রেসের-ই কবছে।

(২)

নিগূঢ় প্রেমের নিগড় এ যে ভৈরবী-ভীষণ, অখণ্ড,
কংগ্রেস এবং লীগের বীধন, প্রতাপ কত প্রচণ্ড।
ভারতমাতা অস্তর দানে বাংলা এবং পাজাবে,
অহিংসাতেই গোবৎশে তার রক্ষা বুঝি লভবে;
ঈদ-বিজয়ার আলিঙ্গন ঐ রামচাগল আর হুবাতে,
পুরুষঠাকুর বণ্টা নাড়েন 'আখেরী-চাহার-তুবা'তে।
মহরমের বাঙে নাচে চৈতী-গাজন-ময়াদানী,
হোলির রঙে হুলা তোলে হরবেশেরা ভিন্বেলী;
কোশাকুশি নিয়ে ঢোকেন মন্দিরে ঐ মৌলবী,
'জুমা'বারের 'আজান্' দিতে শব্দা তাছেন ভৈরবী।

এক বিজানায় খানায় বলে নিকব-কুলীন, মৌলানা,
গোস্তরটির দিতে দিবে কিতমাতে নাই বানা;
মালদা-ভোগের মহড়া নিতে হুকিয়ে থাকেন মোল্লাজী,
ভাজা মাটির সান্ধিতে ঐ ভাটপাড়া খার ডিগবাজী!
লব তেহাতেই মিটুলো এবার মিলন গানে গুজরি,
মসজিদে ঐ বাউল বাজায় একতারা আর খজরি।
চাকটোলে আজ নিবিড় শুধু নীরবতার শুকতা,
ভক্তগণের নাই আজ আর রক্তপণের লুপ্ততা;
লারাতারত মিললো আজি লীগ-কংগ্রেস্ মনন্দে,—
ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ছ্যাড্যাং ড্যাডাং ডকা বাজাও আনন্দে।

()

ডকাই আজ বাজাও এবং বাজাও জগবান্দে,
লীগ কংগ্রেস্ মিলন যেন জীবন-মরণ লক্ষ্যে!
এক লাফে বান মজা কাশী, জাহ্নবী বান 'জমজমে',
রোজাকরিম্ রাজকুমার হ'ন জামাইবাবু লভবে;
বোরখা ঝেড়ে ফরজু বিবি হলেন ফুলী ময়রাণী,
কামাল পাশার আমলে ঘর লামাল বড় হাররাণী!
অবাধগতি যুগপ্রগতি হিন্দু-মুসল লংযোগে,
'আজাদ্' ও 'আনন্দবাজার' পরম্পরের গা শোকে।
স্বরাজ-তরী ভাসলো এবার প্রেম-দরিরার মাঝখানে,
জিন্নাজহর,—বহর বহর—লহর তুলে দাঁড় হানে;
শক্ত হাতে পোক্ত মাঝি গান্ধীজী তার কর্ণধার,—
পাল তুলেছে সূতাব নিজে, স্বরাজ-গতি হুর্নিবার!
হেলছে তরী, হুলছে তরী, চলছে তরী, টলছে না—
লর্ড-মহলের পাঞ্জির পাতায় পাঞ্জির নীতি কলছে না।
লোষ্টাঘাতেও রাষ্ট্রপতি ইষ্ট-নীতি-প্রষ্ট নয়,
মিষ্ট কথার বৃষ্টি করেন, সৃষ্টি হেরেন ব্রহ্মবর।
হিন্দু-মুসল-কল্যাণে আজ কেউ তুলোনা নিন্দাবাদ—
ঐক্যতানে উঠুক শুধু "জিন্নাজহর জিন্দাবাদ!"
ড্যাডা ড্যাডা ছ্যাড্যাং ড্যাডাং ডকা বাজুক হুকারে,—
'খেরালী' এই অপ-খেলান প্রচ'র করুক লংবারে।



শান্তি-নিকেতনে বঙ্কিম-অর্চনা।

গত লগ্নাহের সাহিত্য-সংসারের সেরা
ংবাধ কবির রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক শান্তি-
নিকেতনে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতি-অর্চনা।
ভিগ্নপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বেশব্যাপী শততম
শ্রাব উৎসব উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র লম্বন্ধে
কবির একটি ক্ষুদ্র কবিতা পাঠাইয়া
দিয়া তাঁহার কর্তব্য সমাপন করিলেন
চাওয়া অনেকই ক্ষুদ্র হইয়াছিল।
একথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কণ্ঠের মালা
রবীন্দ্রনাথকে পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন :—
এখন চন্দ্র অস্ত যাইতেছে, রবির উদয়
হইতেছে, এ মালা এখন রবিরই প্রাপ্য।
কবির পরিণত বয়সে বঙ্কিম-শতবার্ষিকীর
ইচ্ছ অবসরে সেই পুণ্যস্মৃতির অর্চনা কেমন
করিয়া করেন, তাহা দেখিবার জন্ত অনেক-
কেই লোভ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের
ভয়সাহস ও বুদ্ধবয়সের কথা শ্রবণ করিয়া
ইহাই বলিতে হয় যে, কবির এতদুপলক্ষ্যে
বঙ্কিমচন্দ্র লম্বন্ধে যতটুকু বলিয়াছেন, তাহাতে
আমাদের আশা বোলআনা পূর্ণ না হইলেও
ততটুকুই বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ
এই প্রাণখোলা লেখাটুকুর ভিতর দিয়া
আমরা যেন আমাদের সেই লতাশূগের
রবিবাসকে কিরিয়া পাইয়াছি। কবির
সত্য, সরল, স্পষ্ট ভাবায় যেটুকু বলিয়াছেন,
তাহাও সম্প্রতি আর কেহই বলিতে পারেন
নাই, এবং তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত লতা-ভাবের

মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ইজিতটুকু রহিয়াছে তাহাও
বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য।

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-
সাহিত্য-পরিষদ-কর্তৃক বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী
সম্পাদনের প্রচেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া
অধিকাংশ লতা সম্বন্ধিতে বঙ্কিমকে লইয়া
যে নিম্নজ্ঞ ব্যবসাদারী চলিতেছে তাহা
অবশ্যই কবির লক্ষ্য করিয়াছেন। এই
সকল বাকলক্ষ্য অসুষ্ঠানে বঙ্কিম লম্বন্ধে
যে সকল অকালপকতার ওস্তাদি ফুটিয়া
উঠিতেছে এবং বঙ্কিমকে Certificate
দিবার যে অস্বাভাবিক যুগুতা ও বাচালতা
দিন দিন প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই
লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—
“বঙ্কিমের জন্ত তোমরা যে শোক করছ,
তার কি লবটা খাটে? তোমরা তাঁর
মহত্বের কি টের পেরেছো? হয়তো তাঁর
গভীর গুণকগুলি কিছুই পড়নি। কোনোটাই
ভাল করে পড়েছ কি না সন্দেহ। যে
পরিপ্রেক্ষার (Perspective) মধ্যে তাঁকে
বোঝা যেতে পারতো, তাতো এখন হারত।
তোমরা তাঁকে ঠিক করে বুঝবে কেমন
করে?নহিলে স্মৃতিভতার যত কিছু
আয়োজন ও লম্বারোহ সবই হুঃশ বিড়ম্বনা।
তাতে তাঁর শুদ্ধবুদ্ধি আত্মা তাঁর চিন্তার
লোক হতে প্রতিদিন পীড়িতই হবে।”
ইহা শুধু ঝুলন্ত ঝাঁট লতা মর্শ্বাতিক কথা আর
নাই। আমাদের মনের “বাণু” লজনী,
হতাশ ঐতিহাসিক বেজন, নিপাতনে

নিজ মোহিত মাষ্টার, এবং প্রেমচাঁদ জুশীল-
কুমার হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্থ্য রামা,
শ্রামা, শঙ্করা প্রতিদিন বঙ্কিম-সাহিত্য
লম্বন্ধে যে রাশি রাশি রাবিশ-বাণী উল্লসিত
করিতেছেন, তাহাতে বঙ্কিমের—“শুদ্ধবুদ্ধি
আত্মা তাঁর চিন্তার লোক হতে প্রতিদিন
পীড়িতই” যে হইতেছে, তাহাতে আর
লম্বাহ কি? ইহারা কেহই যে বঙ্কিমের
গভীর গুণকগুলি কিছুই পড়েন নাই এবং
ভাল করিয়া কোন গ্রন্থখানিই পড়েন নাই,
তাহা ত ইহাদের লেখা পড়িলেই বুঝা
যায়। যে Perspective-এর মধ্যে বঙ্কিম-
চন্দ্রকে বুঝা যাইতে পারিত তাহা বিলম্বণ
করিয়া বুঝাইবার অধিকার ও ক্ষমতা
একমাত্র কবিরই আছে; কিন্তু আমাদের
ভাগ্যবশে এখন তিনি রোগশয্যা ও জরাজীর্ণ।
তাঁহার নিকট সেই বিরাট perspective-এর
ব্যাখ্যা শুনিবার আশা আমাদের এখন
হ্রাসা মাত্র। সেই জন্তই কবির প্রথমেই
আমাদের বলিয়া রাখিয়াছেন—“আজ আর
নূতন করে কি বলবো? তাঁর স্মৃতির
পরেই ১৮৯৪ সালের (বেজেনবাসু দেখিবেন,
রবিবাসু তারিখ না দিয়া তাঁহাকে কেমন
কাঁকি দিয়া গেলেন! লাগটা ঠিক হইয়াছে
ত?) প্রথম স্মৃতিভতার আমার সব
কথা নিঃশেষে বলেছি। তখন অন্তর লজ্জা
আঘাতের ব্যথার ভরা ছিল। এখন সেই
সব কথা লম্বন্ধে কি আর আসবে?” তথাপি
কবির বঙ্কিম-স্মৃতি-অর্চনার প্রসঙ্গে এখনও
যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাও এই
“বুদ্ধবুদ্ধির” মধ্যে আমাদের শুদ্ধকর্মে ও
পিপাসার্ত্ত কর্ণে অমৃতবর্ষণ করিয়াছে।
সেই কথাগুলির কিরংশ আর একবার
এইখানে শ্রবণ করিয়া কবিরকে আমরা
আমাদের লম্বন্ধে অভিবাধন জানাইতেছি :—
“সেই শুদ্ধ মহান্ লাধক ছিলেন
হিমালয়ের মহাশিখরের যত নিঃসঙ্গ গভীর।
কেউ তাঁর কাছে যেসতে পারতেন না। • •

তিনি ঋক্, অন্নবাক্, হরারিষ্য, শুক্ সাধক। তিনি সাধকই বটেন। তাঁর সাধনালক যে চিন্ময় আধারটি তিনি দ্বিগে গেলেন, তাহাই ক্রমে বাঙ্গালীর নব ইতিহাস সৃষ্ণনের মূল কাব্য হোলো। * * * * কি ভাষা নিয়ে বহুিম আরম্ভ করলেন, আর কি করে রেখে গেলেন।..... তাঁর সময়কায় কুচি ও দৃষ্টি তাঁর লেখার কোথাও ধরা পড়ে না। তিনি (Pioneer) বাত্রীধলের অগ্রদূত। মৃতন পছা রচনার সৃষ্ণনের দুঃসহ দুঃখ তাঁর। তাঁর দুঃখ তোমরা এখন বুঝবে কি করে? বাংলা ভাষাকে তিনি এমন করে রেখে গেলেন যে তাহা সর্ক-সাধনা ও ঐশ্বর্ষ্য আহরণ করে তাতে রেখে দেখালেন যে বাংলা কি, অপূর্ক আধার হয়েচে।..... নানাধেশের ও কালের লম্পদ্ তাতে তিনি লকর করে দেখালেন। তরল পেরে অস্তেরাও তাতে তাঁদের অর্ঘ্য রাখতে স্কক কলেন। যে ভাষা অবজ্ঞার আবর্জনার আঁতাকুড় ছিল, তা হোলো শ্রদ্ধাবান বজমানের অর্ঘ্যের আধার পবিত্র যজ্ঞভূমি। এত বড় হান আর নাই। আমরা নিজেরা সারাজীবনের সকল লকর তাতে রাখতে পেরেছি বসে, জানি কি অসামান্য অধিকার ও লম্পদ্ তিনি আমাদের দ্বিগে গেলেন। তাঁর প্রাণাধেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সকল স্থান কাল হতে সকল লম্পদ্ আহরণ করে

ও অস্তরের সব চিন্ময় তাঁতার উজাড় করে তাতে রাখতে পেরেছি।”

অসামান্য প্রতিভার প্রতি অসামান্য প্রতিভার এমন তক্তি-শ্রদ্ধাঙ্গলিপূর্ণ অস্তরের নিবেদন আমরা ইহানীং আর দেখি নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবিষ্যৎ

পর্দার অন্তরালে যে সকল লীলা চলিতেছে, তাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ভবিষ্যৎ অঙ্গঙ্গগাট বলিয়াই মনে হইতেছে। লভ্য-প্রকাশিত সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকার অভিনব লংখ্যাখানি দেখিলেই সেই পর্দা-লীলার আমেজ পাওয়া যায়। ইহার বিজ্ঞাপনের পাতা হইতে লেশশস্যক বেজেন-সজ্ঞানীর নামাবলি। দ্বিগা মোড়া। এই পত্রিকার পত্রিকাধ্যক্ষ বেজেনবাবু, এই পত্রিকা ছাপা হইয়াছে বেজেনবাবুর কার্যালয় তথা বেজেনবাবুর মনিবের কার্যালয় প্রবাসী-প্রেস হইতে, এই পত্রিকার ব্রহ্মক্স-গ্রন্থাবলীর গুণ-গরিমা বটা করিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে (অবশ্য বিনামূল্যে কি না জানা নাই), এই পত্রিকার লিখিয়াছেন গবেষক বেজেন বাবু এবং তত্ত্ব প্রাণলজ্ঞানী সজ্ঞানীকান্ত—ইহারা দুইজনেই পত্রিকার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সজ্ঞানীকান্তের রঞ্জন পাব্লিং হাউলের বিজ্ঞাপনও ইহাতে আছে এবং ইনি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের নাম-করা গ্রন্থাধ্যক্ষও বটেন। বেজেনবাবু তাঁহার লেখার সজ্ঞানীকান্তকে কেরাবাং করিয়াছেন এবং সজ্ঞানীকান্ত তাঁহার গবেষণা-

মূলক লেখার বেজেনবাবুকে কেরাবাং করিয়াছেন। দেখিয়া মনে হয় ইহাদের দুইজনের এক প্রাণ, এক মন, এক ধন, এক মন, এক বেহ। অবশ্য এই পত্রিকার এই দুই মহাত্মার অবস্থানের কথা এবার আর তুলিব না। যে সজ্ঞানীকান্ত অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালা গল্পের ইতিহাস সাতছত্রে শেষ করিয়া পূর্ণোজ্ঞানে লিখিয়াছেন —“মুতরাং অষ্টাদশ-শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গল্পের ইতিহাস নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থার ইতিহাস”, সেই সজ্ঞানীকান্তের গবেষণার “হাঁটি-হাঁটি-পা-পা” এর মূল্য কেহই দিতে ভুল করিবেন না। এই মূল্যায়ন লেখা দুইটিতে যে তারিখ ও facts এর ভুল আছে, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা পরে দেখাইব। কিন্তু সে প্রশঙ্গ এখানে নয়। আমরা শুধু ভাবিতেছি—সেই রাধেন্দ্র-হরপ্রসাদ অধ্যুষিত সাহিত্যপরিষদ, আর এখনকার এই বেজেন-সজ্ঞানী-কিলকিলারিত সাহিত্যপরিষদ। বরোদর্শে হীরেন্দ্রবাবুর সেই ছাপট আর নাই। সাহিত্যপরিষদ যেন ক্রমশঃই বে-ওয়ারিশ মাল হইয়া পড়িতেছে এবং সুবিধা বুঝিয়া বেজেন-সজ্ঞানী—“এই-বেলা নে ঘর ছেয়ে”—নীতি অবলম্বন করিতেছে। ব্যাপার বেক্স দাঁড়াইতেছে, তাহাতে হীরেন্দ্রবাবুর অবর্তমানে সাহিত্য-পরিষদের কপালে বেজেন প্রেসিডেন্ট এবং সজ্ঞানী Vice, অঙ্গঙ্গ করিতেছে বলিয়াই মনে হইতেছে!

ফোন-২৭৭৪

বড়বাজার

তল ব্যবহারে

বোর বোর হয় না

মিল-১৪৩, আপার সারকুলার রোড - কলিকাতা।

রাজমালা রচনা গরজ

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচাক্রচন্দ্র ঘোষ

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

রামধরাল রাজা শ্রামধরালের নিকট বাসভূমি চাকরাণ পান। রামজীবনপুরে আলিবার কিছু পরে রামধরালের কাল হয়। রামধরর সেন, তৎপুত্র রামজনাধরন সেন এবং তদীয় পৌত্র রামজয় সেন—তিনি পুরুষ এই রামজীবনপুরে বাস করেন। রামজীবনপুরের একাংশকে নেটোর বেড় বলে। আজিও সেই নাম সেই অংশে এবং জমিদারী কাগজপত্রে চলিতেছে। রামজীবনপুর ব্যতীত নেটোর বেড়ের পৃথক অস্তিত্ব কিছু নাই। বহুমজুম্বার মহাশয় নেটোর বেড়কে নাটুরগড় করিয়া বনেদী চাল চালিয়াছেন মাত্র। তৎপর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজা শ্রীলীলন্ত রায়ের ৮ম পুরুষ অধস্তন রাজা জয়নারায়ণ রায় কাটুনীরায় বাস পরিবর্তন করিলে অল্পগত বৃদ্ধ রামজয় সেনও তদনুগমন করিয়াছিলেন। কাটুনীয়া আলিরা রামজয় ও তদীয় গোষ্ঠি বাসার্থে পূর্ববৎ জমি চাকরাণ পান। তাঁহার (রামজয়ের) পুত্র রামনারায়ণ ও পৌত্র যদীশ্বর সেন উভোগী ও কর্মঠ ছিলেন। তাঁহাদের মুদীধানার বোঝান ও নৌকার ছোট কারবার ছিল।

গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে Settlement এর সময় ভূইকোড় শ্রীশ্রীরাজা মনোজনারায়ণ রায় বাহাদুরের পিতামহ লক্ষণীয়া বিজয়র সেন (রামজয়ের পৌত্র) যশোর রাজবংশীর রাজা জয়নারায়ণের পৌত্র (মহারাজ বসন্ত রায়ের ১০ম পুরুষ অধস্তন) খুলনা জেলার

অন্তঃপাতী মুনগরের খ্যাতনামা দানশীল শ্রাবী জমিদার রাজা শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রমোহন রায় মহোদয়ের নিকট ভবিষ্যতে বহু মরিকী যশোর রাজবংশীরেরা বাহাতে কিছু করিতে না পারেন, তাহার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া লইবার জন্য শাস্ত্রনয় নিবেদন জানান। মহামুভব মহাপ্রাণ রাজা শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রমোহন রায় বিজয়র সেনের কাতর প্রার্থনার লম্বত হইয়া ৪ একর ৯১ শতক বাসভূমি 'চাকরাণ' শব্দের পরিবর্তে 'মহাপ্রাণ' শব্দ বদাইয়া Settlement Record করান। এখনো সেই জমিতে সেনেরা বাস করিতেছেন।

নাধারণ গৃহস্থ রামজয় সেন (যিনি বহুমজুম্বার মহাশয়ের দিগজার শেষ স্বাধীন নৃপতি) যে "১৮৫৬" খৃষ্টাব্দে যশোর রাজবংশীরের আশ্রয়েই কাটুনীরায় জীবিত ছিলেন—যশোর রাজবংশীরের 'পুরাতন' হলুর আজো তাহার জীবন্ত ও লগর্ত লাক্য দিতেছে। পরম শ্রদ্ধের রাজা মতীন্দ্রমোহন রায় আজিও জীবিত। তাঁহার নিকট লক্ষান লইলে লকল লংগর ও লক্ষহ দুর্ভুক্ত হইবে। যদীশ্বর সেন লক্ষকে চাকুর প্রমাণ তিনি—স্বয়ং।

রামজয় সেনের প্রপৌত্র বহুনাথের ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথমটি বেশেই থাকেন, দ্বিতীয় যুত, তৃতীয় পূর্বে কম্পাউণ্ডারী করিতেন—অতাবদোষে বিতাড়িত হইয়াছেন, চতুর্থ ও কনিষ্ঠ অপারিগামধনী চক্কণ-চিত্ত অনেক কিছু করিয়া বর্তমানে দরজার ব্যবসায় করিতেছেন এবং "পঞ্চম" মনোজ নাথ (পাগলা মনে নামে খ্যাত) সেন (যিনি

বহুমজুম্বার মহাশয়ের বহুতিনির্মিত অতি আধুনিক ভূইকোড় শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুর) পূর্বে বহুদিন ত্যাগাব্যাপ্তাইজিব প্রচার করিয়া শেষে Photographerই করিয়া ছিলেন; একপে পৈটিক কারণে নানাপ্রকার প্রসাধন দ্রব্যের 'Canvassing' করিতেছেন। প্রবন্ধ লেখকের চক্ষু স্বয়ং তাহা দর্শন করিয়া ধস্ত হইয়াছে! মনোজ নাথ সেন অবিবাহিত। তিনি অতি কষ্টে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, নিজকে বিদ্যাহেবীর গভী হইতে মুক্ত করিয়াছেন। শিশুবেলা হইতে তাঁহার মাথার ঘোষ আছে—তাহা পরিচিৎ-মাত্রই জানেন।

বাহারা চিরদিন পুরুষাভুজে শুধু "সেন" উপাধি বহন করিয়া যশোর রাজবংশীরের আশ্রয়ে মুনগর অঞ্চলে বসতি করিয়া আনিতেছেন; রাজা ও রাজবংশ বদাইয়া সেই সেন গোষ্ঠিকে ময়ূর-পুচ্ছ দিয়া পক্ষী বিশেষকে ময়ূর লাজাইবার মত এক উৎকট লালদা লহনা বহুমজুম্বার মহাশয়ের উলঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ—তিনি উক্ত মনোজ নাথ সেনের একান্ত অনুগৃহীত। বহুমজুম্বার মহাশয় শিখিয়া রাখুন যে, কথা এবং কাজে বাহারা কোনদিন মিল রাখিতে পারে না তাহার লোকলম্বাজে বিশ্বাসপ্রদীই বলিয়া কীর্তিত হয়।

আমাদের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারে রাজানুরাগী বহুমজুম্বার মহাশয়ের প্রবন্ধ ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইতে পারিল না; তজ্জন্ম তাঁহার অনুশোচনা বা অন্ধক্রোধের কিছুই নাই। আমরা তাঁহার ইতিহাসে বেপরোয়া ব্যতিচারের কর্কশ প্রতিবাদ করিয়াছি মাত্র। ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে লম্বা প্রমাণও প্রতিবিধানে অগ্রণয় হইবে—ইহা পরম ন্যত।



কানীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ঘর

দিলীপ ও সুনীলা

দিলীপ—(সুনীলার ঘুংঘের উপর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, ক্ষণকাল পরে বলিল)
লভ্য কিছু জানিনা সুনীলা! আমি জানতুম তুমি কানীশ্বর বাবু বড়ো ছেলে দিলীপকে ভালোবাসো। তার জন্য তুমি লব করতে পার। জানতাম না তোমার এ মতন পরিচয়। জানতাম না—এক গোত্রস্থান ভারজ-পুত্রের জন্য তুমি—

সুনীলা—জানি, জানি; তুমি কি বলবে তা জানি কিছু থাক, আর কথা করোনা। তুমি বড়ো বেশী কথা কইছো আজ।

দিলীপ—হ্যাঁ, খুব বেশী? কি করু চুপ কোরে থাকতে পারছি না। —তুমি রাগ করোনা, এতে আমার অসুখ করবে না।

সুনীলা—হ্যাঁ, আমি রাগ কোরব। তুমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাবে না। অনেক রাত হল।

দিলীপ—আর একটা কথা!

সুনীলা—বলো, কী?

দিলীপ—তুমি আমার একলা ছেড়ে দিতে পার না? নাই বা তুমি আমার সঙ্গে এলে। আমি আমার ঘুংঘের বোঝা নিয়ে ছুর পল্লীতে গিয়ে বাস কোরব একলা; তুমি এখান থেকে আমার অন্তিম কাজের তার নাও। —পারবে না?

সুনীলা—না, সে হবে না।

দিলীপ—কেন হবে না?

সুনীলা—সে অনেক কথা। সে এখন বলতে পারবো না। তুমি ঘুমোও। আর জেগে থাকলে কাল সকালে আমার তোমার মাথা ঘুরতে থাকবে, বুক ধড়ফড় কোরবে।

দিলীপ—কিন্তু ঘুম আমার আসে না। চোখ বুললেই ঘুংঘ!

সুনীলা—গাইবো একটা গান, চুপি চুপি কালকের মত? গান শুনলেই তোমার ঘুম আসবে।

দিলীপ—কিন্তু কালকের গান ছিল বড়ো করুণ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের ভেতর কতো কঁদেছি। করুণ গান আমি শুনবো না। কাঁদতে আর পারি না।

সুনীলা—(তরল হান্তে) কি স্বপ্ন দেখিলে?

দিলীপ—দেখিলাম আমার বা আমার কাছে হাত জোড় কোরে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমি—

(দিলীপের গলার স্বর লহলা রুদ্ধ হইয়া গেল)

সুনীলা—থাক, করুণ গান আমি আর গাইবো না। অকরুণ গানই গাইছি, শোন।

—চোখ বোজ, পাশ ফিরে শোও, বালিশের উপর হাতটা তুলে রাখ। (দিলীপ শিশুর মত সুনীলার আবেশ পালন করিল)
—হয়েছে। (বলিয়া উজ্জল আলোটা নিভাইয়া ঘরের লব্ধ আলো আলিয়া দিয়া নিম্ন স্থরে গান ধরিল)

“কে হবে টাট তোমার হোলা?

আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল

তোলা।

কেবল তোমার চোখের চাওয়ার

হোলা দিলে হাওয়ার হাওয়ার,

বনে বনে হোল আগালো

ঐ চাহনি তুফান তোলা।

আজ মানসের লয়েবরে

কোন মাদুরীর কমল কানন

হোলাও তুমি চেউয়ের পরে।

তোমার হাদির আভাষ লেগে

বিশ্ব হোলন হোলার বেগে

উঠলো জেগে আমার গানের

হিজোলিনী কলরোলা ॥”

(গান শেষে সুনীলা দিলীপের পানে চাহিয়া দেখিল—সে নিদ্রামগ্ন হইয়াছে)

সুনীলা—দিলীপ? না ঘুমিয়ে পড়েছে—(বলিয়া ধীরপদে তাহার মাথার কাছে আলিয়া অতি নতদর্পনে তাহার মস্তকে কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল)

সুনীলা—তোমার ছেড়ে যাব! তুমি একলা চলে যাবে, আর আমি এখানে তোমার অন্তিম কাজের তার নিয়ে থাকবো। —আমি পারবো না তা। —কেন, শুনবে, পারবো না? ...আরে হুঁ, আমিও কি শেষে পাগল হ'লাম! কি লব বকে বাড়ি আপন মনে! —থাক, আমি চট্ট কোরে

খাতু

বঙ্গ ৪৫ মাস যে কারণেই হউক তৈরী বনৌষধিতে অব্যর্থ ফল—গর্ভাবস্থায় ব্যবহার নিষিদ্ধ ১।০ দস্ত ও বর্ণ শাস্তি একবার স্নায়োগেই উপশম, ১।০ মাঃ ১৮।০ আশা



সময় ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস বনজ বিশ্বাসদ

১৮২ নং বহাঙ্গার ষ্ট্রীট, (K) কলিকাতা।

কাজগুলো দেবে আমি দে। বেশ বুঝে,
থাক।

(প্রস্থান করিল হিলীপা)

(হিলীপ ঘুমাতে লাগিল। প্রবেশ
করিল যোগমায়ী। তিনি অপলক নেত্রে
হিলীপের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া
আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন)

যোগমায়ী—হিলীপ! ওরে আমার
হিলীপ।

(হিলীপ পার্শ্বপরিবর্তন করিয়া শুইল
তিমধ্যে; মনে হইল যোগমায়ীর আহ্বান
গ্রাহ্য অন্তরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে
গ্রাহকে আগমনের উপর টানিয়া আনি-
তছে। যোগমায়ী আবার ডাকিলেন;
এং অংশেবে হিলীপের গারে মুহু আঘাত
করিয়া ডাকিতেই হিলীপ স্বপ্নের ঘোরে
লিয়া উঠিল—‘মা! মা! মা!’... সঙ্গে
সঙ্গে তাহার ঘুম ছুটিয়া গেল; সে খড়মড়
করিয়া উঠিয়া বলিয়া যোগমায়ীর দিকে
চাহিয়া রহিল মুহূর্তকাল অবাক হইয়া;
পরে বলিল)

হিলীপ—মা! তুমি! ...স্বপ্ন নয়,
মতা তুমি।

যোগমায়ী—হ্যাঁ হিলীপ, আমি। —ওরে
মরে যাচ্ছি। অন্তর আমার জলে
গেল। আমার বাঁচা হিলীপ। সে দিন
থেকে কাউকে আমি সুখ দেখাইনি, তবু
আমি শান্তি পাইনি হিলীপ। তার কাছ
থেকে কমা না পেলে আমি শান্তি পাবো
না। —আমার বাঁচা হিলীপ।

হিলীপ—মা, আমি নিজে বেঁচে নেই—
তোমার কি করে বাঁচাবো। আমারও মৃত্যু
হয়ে গেছে সেই দিন থেকে।—নাথনা গেছে,
গৌরব গেছে, জীবনের মন্ত্র ভুলে গেছি।
বা আছে তা শুধু যান্ত্রিক এক স্মৃতি আর
এই দেহটা।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বের স্বাভে

ডাঃ সৌরেন্দ্র মোহন সরকার



সুবিমল তাহার জীবনের একশেষের মীর
কথা ভাবিতে ভাবিতে ভাঙা চেয়ারখানার
বঁদে, টেবিলটার ‘পা’ ছুটো চাপিয়ে দ্বিগুণ
একটা বিড়ি টানিতেছিল, হঠাৎ সে তড়াক্
ক’রে লাফিয়ে উঠলো, বিড়িটা কখন যে
তার কোলের উপর প’ড়ে, খানিকটা কাপড়
পু’ড়ে, গায়ের চামড়া পোড়বার উপক্রম
করছিলো, তা সে টেরই পায় নি।

তাড়াতাড়ি উঠে কাপড়-চোপড় সামলাতে
বাস্ত, এমন সময়ে একখানা ‘ট্রলী’ তার
শ্রেনের সামনে এসে দাঁড়ালো, আরোহী
তাহার লাইনের ‘ইন্সপেক্টর’ লাহেব।
প্রথমে সে দিকে তার লক্ষ্যই হয় নাই,
‘ইন্সপেক্টর’ লাহেব, সুবিমলের বাস্তব
দেখে একটু ইতস্তত ক’রে গম্ভীরকণ্ঠে
একজন কুণীকে যখন আবেশ করেন “টিকিট
বাবুকে ডাকো”, তখন সুবিমলের লক্ষ্য
পড়িল সে দিকে।

বলা বাহুল্য, যুগকাষ্ঠ সন্নিহিত, বড়-
উত্তোলন-কারী-বাতকের সন্নিবন্ধে দেবমুন্ডির
লম্বুখন্ড, নিরীহ ছাগ-শিশুর মতই সুবিমল
কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার ‘বু-বুকের কর্ণার’
সামনে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ইন্সপেক্টর
লাহেব তাহাকে বিশেষ কিছুই জিজ্ঞাসা
করিলেন না। ‘ফ্রাগ’ শ্রেন, জনহীন
প্রান্তরের মধ্যে একখানি ঘর, এই ঘরেই
তোলা উত্তানে রান্নাবান্না করিয়া খাওয়া
খাওয়া শেষ করিয়া তাহাকে নিকটবর্তী গ্রামে
গিয়া থাকিতে হয়, কারণ রাত্রে এখানে
থাকা নিরাপদ নহে, এই কয়েকটা সংবাদ
গ্রহণ করিয়াই তিনি বিদায় লইলেন।

তিন তিন বার ম্যাটিক কেল ক’রে
সুবিমল মুলড়িয়ে পড়েছিলো, হঠাৎ একদিন
লংবাধ পত্রে নজরে পড়লো, কে একজন
লভেরো বার বিফল মনোরথ হ’য়ে চল্লিশ বছর
বয়সে তৃতীয় বিভাগে ম্যাটিক পরীক্ষার কৃত-
কার্য হ’য়ে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন,
তাই দেখে সেও প্রাণপণ চেষ্টার চতুর্ভাবে
তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলো।

একে তাহারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল
ছিলনা, তদুপরি তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের
পক্ষ-পাতীত দেখিয়া উত্তম নষ্ট হইয়া গিয়া-
ছিল, সে সুবিমল ছিল পরীক্ষকগণ পর্য্যন্ত
অবিচারক; নতুবা এক-আধ-বার নয়, তিন
তিন বার বিফল হ’বার কথা তার নয়।

যাই হোক তাকে যোগমায়ীর চেষ্টা
করতে হ’লো। চাকরী—! চাকরী—!
চাকরী! কিন্তু কোথায় চাকরী। সে
চাকরী চায়, কিন্তু চাকরী তাকে চায় না।
লংবাধপত্রে একদিন লক্ষ্য পড়লো—‘জর্জ
টেলিগ্রাফ’ হ’তে পাশ করলে, রেলের চাকরী
অনিবার্য। কোন রকমে টেলিগ্রাফটাও সে
পাশ করলো, কিন্তু “অনিবার্য চাকরী”—তার
ভাগ্যে দুঃসাম্য হ’ল, কাজেই ‘প্রাইভেট
টিউলনি’ করেই দিন কাটছিলো—এং
‘ট্রেটম্যানের’ ‘ওয়ারেন্টেড’ কলম দেখে মাঝে
মাঝে এক একটা আবেশন পড়ত স্থানীয়
ডাক বাস্তব মধ্যে দ্বিগুণ চেষ্টা চলছিলো;
কিন্তু কোনটাই লাগছিল না।

সুবিমল একদিন বলে বলে ভাবছে,
পোষ্টালিকদের পিওনগুলোও কি তার সঙ্গে
শ্রদ্ধতা করছে, ঠিক সেই দিনই একখানা

‘ম্যাকলিরড’ কোম্পানীর ছাপ মারা চিঠি তার হাতে পড়লো—পড়ে দেখলে কুড়ি টাকা মাইনের “জেনারেল ম্যানিফেস্টের” একটা পোষ্ট তাকে বেওয়া হ’য়েছে। বিনা বাক্য ব্যয়ে সে কর্ণে যোগদান করলো।

বহর খানেক ধ’রে একটা বড় ষ্টেশনে কাজ কর্তৃক শেখার পর সম্ভ্রতি তাকে ‘বুকিং ক্লার্ক’ করা হয়েছে একটা ক্লাগ ষ্টেশনে। পেশোয়তি হয়েছে বটে, কিন্তু মাইনে তাই-ই আছে “ম্যানিফেস্ট ষ্টেশন মাস্টারশিপ” পরীক্ষাটা পাশ করতে পারলে, একটা ষ্টেশনের চার্জ পাওয়া গেলে, মাইনে ত্রিশটাকা হতো আর মাইনের রোজগারও কিছু হ’তো। কিন্তু সেটা তার পক্ষে অসম্ভব, কিছুতেই একজামিন কোন্স্টার ‘হু’ এক ‘প্যারা’ও তার মাথায় ঢুকছিলো না, সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে বর্তমান অবস্থার লম্ভে থাকতে হয়েছিল।

তবে একটা সুবিধা, সে তখনও অবিবাহিত। বেশে, তাহার দাঁড়া ও বিধবা মাতা ছাড়া আর কেহই ছিলেন না। নিজের খরচের জন্য কিছু রাখিয়া তাহাকে সবই লংগারে দিতে হইত। কাজের মধ্যে লকালে উঠে, ক্যান্স বাধা, গোটাকতক টিকিট বিক্রয়, ট্রেন এলে পাশ করান, খাতা পত্র দাওয়া, তার মধ্যে ছোটো রান্না, খাওয়া, নিকটস্থ গ্রামে গিয়া রান্না কাটানো, আবার পরদিন ঐ লকালের পুনরাবৃত্তি। এই সব কথা বখন দেখিল সে ভাবছিলো, সেই দিনই ইন্সপেক্টার নাহেবের ভদ্রাগমন হ’বে, তা সে জানতো না। দুতন ইন্সপেক্টার এসেছে, বড় ‘ক্রিট’ এই কথা সে শুনেছে কিন্তু একদিনও তার সুখের কথা শোনে নাই।

আজ ইন্সপেক্টারের সঙ্গে কথা ক’রে সে বুঝলে তিনি মল লোক নন।

(হুই)

লিঙ্গ আপু ট্রেনখানা ধীরে ধীরে ষ্টেশনে আলিয়া পৌছিল। ‘ম্যাকলিরড’ কোম্পানীর অংলন্ ট্রেন। ম্যানিফেস্ট সুবিমল ‘ইউনি-কর্ন’ বেওয়া কোটটা গারে চড়াইয়া গেটের নিকটে আলিয়া দাঁড়াইল। কত রঙ বেরঙের ব্যাক্স ট্রেন হইতে নাশিতেছে, কেহ তাহার হাতে ‘টিকিট’ জিজ্ঞাসা দিয়া বাইতেছে, কেহ ‘টিকিট নিন্ মশাই’ বলিয়া টিকিট দিতেছে, কেহ বা টিকিট না দিয়াই চলিতেছে। সু-বিমলের বেন কোন ক্রক্কেপ নাই। প্রথম শ্রেণীর কামরার এক কিশোরী ও তাহার লজিনী এক শ্রোটা, বরজার সমুখে সুকিয়া এদিক ওদিক তাকাইতেছিল বেন কাহার অসুস্থদান করিতেছে। সুবিমলের অন্তমনস্কতার কারণ, সে তাহার চকল লুটিকে কোন মতে ক্রিয়াইতে পারিতেছিল না। তাহার লুক নয়ন ঐ কিশোরীর দিকেই আবদ্ধ ছিল। কাহাকেও না পাইয়া বখন কিশোরী ও শ্রোটা ধীরে ধীরে ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া তাহার লম্ভ দিয়া চলিয়া গেল, তখন সুবিমল কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল।

ক্যান্স মিলাইতে তাহাকে লেহিন বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, কিছুতেই তাহার মনলংবোগ হইতেছিল না, কিশোরীর হাব-তাব, ঠাইল, আধুনিক ধরণের পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিতা মন পমন তাহার চোখের লামনে ডালিতেছিল। ষ্টেশন মাস্টার আলিয়া তাহার ভুল বেখাইয়া দিলে সে বিশেষ লজ্জিত হইল। একটা কথা বলিতে ভুল

হইয়াছে, ইন্সপেক্টার নাহেবের মনজরে পড়িয়া, সুবিমল বড় ষ্টেশনে স্থান পাইয়াছে।

বাস্তবিকই সুবিমল ইন্সপেক্টার নাহেবের মনজরে পড়িয়াছিল। ইন্সপেক্টারকে নাহেব বলিলেও তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন। তাঁর, জ্ঞা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা ছিলেন। ব্রত, পূজা, উপবাস, কিছুই তিনি বাত্ব দিতেন না। একদিন সুবিমলের ডাক পড়িল। ইন্সপেক্টার বাবুর জ্ঞা তাহাকে বলিলেন “বাবা এখানে ব্রাহ্মণের ছেলে আর কেউ নাই, তন্মধ্য ভূমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার বখন কোন বরকার হবে, তখন বেন তোমার সাহায্য পাই। আমার মাঝে মাঝে এমন সব জিনিষের আবশ্রুক হয়, বাহা বাবুন ছাড়া আনানো হয় না।” সুবিমল লসম্মে তাঁহার কথার লম্ভ দিয়া চলিয়া আলিতেছিল হঠাৎ তাহার লুটি পড়িল ইন্সপেক্টার বাবুর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া একজন কিশোরীর উপরে, সে বাহিরে আলিয়া লম্ভ দ্য জানালা দিয়া পুনরায় সেই তরুণীকে দেখিতে পাইল, তাহার মনে হইল এই তরুণীই দেখি: লিঙ্গ আপু ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরা থাকিয়া, তাহার মনের গতিকে চক্ক করিয়াছিল। এই তরুণী কি ইন্সপেক্ট বাবুর মেয়ে! নানা রকম ভাবিতে ভাবি: সে বাবার আলিয়া পৌছাইল।

লেহিন সারারাত্রি তাহার মন হই না। লকালের—ট্রেনখানা বিদ্যার দিরা ষ্টেশনের বাইরের বেকটার উপরে ভুই পড়িল। মাস্টার মশাই আলিয়া জিজ্ঞাস করিলেন “কি হে সুবিমল তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে? ওকি তোমার মন চোখের অবস্থা এমন কেন?”



শ্রে

ডাঃ জি. এ. চা

মাল চা

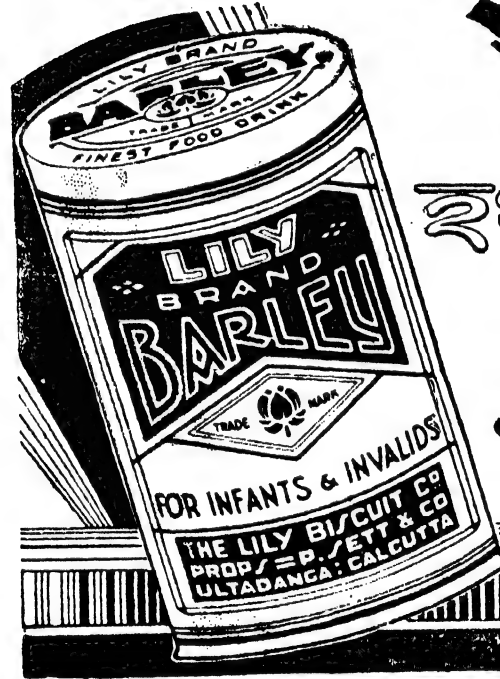
৭৪/১, ফ্লাইড ক্রীট, কলিকাতা।

সুবিমল কোন জবাব দিল না। তাহার অন্তরে যে কী ভয় পড় উঠিয়াছে তাহা অন্তর্ধানী ছাড়া কে জানিবে! অপরিচিতা এক তরুণীকে দেখিয়া অবধি তাহার মানসিক অবস্থা কি হইয়াছে, তাহা নিজেই সে বুঝিতে পারিতেছিল না, আবার পূর্বদিন ইন্স্পেক্টার বাবুর বাসায় সেই অপরিচিতা পুনরায় তাহার দৃষ্টি পথে পড়িয়া জ্বরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে; কোন রূপেই মনকে জটিলতার হাত হইতে মুক্তি দিতে পারিতেছে না। সত্যই সুবিমলের সুখের দিকে চাহিলে মনে হইত সে যেন লক্ষ্যবাহী কি চিন্তা করিতেছে।

কোনদিন ইন্স্পেক্টার বাবুর বড় ডেলে 'অমল' কোনদিন বাড়ীর চাকর—'হারু', সুবিমলকে অন্যরে ডাকিয়া লইয়া যাইত। 'অমল'ের বয়স ৮।১০ বৎসরের বেশী নয়, তাহার কাছে সমস্ত লবঙ্গ সুবিমল গ্রহণ করিয়াছে। অমলের দুই দ্বি, চাঁর ভাই—বড় দ্বি বিবাহ হইয়াছে, ছোট দ্বি মাঝার বাড়ী থাকিয়া পড়াশুনা করিত, কয়েক দিন হইল এখানে আগিয়াছে, শীঘ্রই তার বিয়ে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা।

সুবিমল 'অমল'ের বাড়ীর যেন একজন হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ ত পাইতই, তাহা ছাড়া লহর দেখা, দিনেবা দেখা ইত্যাদি সমস্ত কার্যই তাহার সাহায্য বাতিরেকে হইত না। সুবিমল এক একদিন স্বপ্নে দেখিত, 'ইন্স্পেক্টার' তনয়া 'বকু'রানীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। নিজাতঃ ভাবিত অনন্তর কি সম্ভব হয়? এই ভাবিয়া চর্যাশাকে মন হইতে ছুঁ করিয়া দিত।—

সেদিন 'বিদ্যাবাসী'তে 'লাভ ইন ডেজার্ট' অর্থাৎ মরুভূমিতে প্রেম নামে একখান। বই দেখানো হইতেছিল, মেয়েদের আগনে অনন্তর ভীড় হওয়ার 'বকু'রানী ও তাহার মাকে অপত্যা পুরুষের আগনে বণিতে



স্ব-মালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ৪ ৪ বোম্বাই

হইরাছিল। সুবিমল ও অমল একপাশে বসিয়াছিল। 'বকুরাণী' মধ্যে মধ্যে নানারূপ প্রশ্নে সুবিমলকে বিব্রত করিতেছিল, সেও একান্ত আগ্রহের সহিত তাহার প্রশ্নের বখাখব উত্তর ও প্রত্যেক দৃষ্টের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছিল।

পর্দার খেচানো হইতেছিল, ধনী কস্তা ক্রীড়নে দ্বিগুণ সুবকের গলার খেচর বরষালা দিরা দ্বিগুণকে বরণ করিয়া লইল। পিতার অগাধ লম্পাতি, বহু ধনী পুত্রের অধাচিত প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া পর্ণ কুটিরকেই রাজ্যভূমির বিবেচনা করিল, সেখানটায় সুবিমল বেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল, বকুরাণীর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সে ভুলিয়া গেল। বকুরাণী, তাহার ভয়ভীতি দেখিয়া বলিল "কি দেখছেন আপনি, ওর ভেতরে নতুন কি আছে? হিন্দুর পুরাণে অমন কত শত পাবেন, লাবিয়ার কথা কি জানেন না?"

সুবিমল অপ্রতিভ হইল, হাঁ-না করিয়া পারিয়াছিল, সে জানিত যে বকুরাণী তাহার মাতুলালয়ে থাকিয়া মধ্য ইংরাজি স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন বুকিল তাহার মায়ের নিকট ধর্ম পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া কাহিনীও অনেক শিখিয়াছে।

এখন দিন গিয়াছে, বকুরাণীর মা বারোবোনে বাইতে পারেন নাই, অগত্যা সুবিমলকে বকুরাণী ও অমলকে লিনেমা দেখাইয়া আনিতে হইয়াছে, পঞ্চবিংশতি বর্ষ যুবক, বোড়ী ভরপীর সহিত কত বিষয়ে কত আলোচন করিয়াছে, কিন্তু কোন দিনই সুবিমল তাহার অন্তরের বাণনা প্রকাশ করে নাই, বা বকুরাণীও এমন তাব প্রকাশ করে নাই, বাহ্যতে সুবিমল বুকিতে পারে যে সে তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে বোঝা বাইত যে বকুরাণী ক্রমশঃ সুবিমলের অমুরাগী হইয়া উঠিতেছিল, আর, এটা নিশ্চয় যে যুবক-যুবতীর অবাধ মেলা

দেশার কলে, পরম্পর, পরম্পরের প্রীতি অমুরাগী হওয়াই স্বাভাবিক।

সুবিমলের নোভাগ্যে তাহাদের ঠাকুর করেকজন ধনুভাব্য কর্মচারীর চোখ জালা করিত, তাহারা লক্ষ্যই তাহার দ্বিগুণসন্ধান করিত; কিন্তু ইনস্পেক্টর বাবুর সুনাম থাকতে কেহই কিছুই করিতে পারে নাই; এই সময়ে তাহারা সুবিমলের বিরুদ্ধে বুদ্ধি ঘোষণা করিলে, ইনস্পেক্টর বাবুর কাণেও সে সংবাদ পৌছিল, পাছে তাহার কস্তা একজন 'বুকে ক্লার্ক'কে আত্মহান করে, সেই ভয়ে তিনি সুবিমলকে স্থানান্তরিত করিলেন।

নূতন স্থানে আনিয়া সুবিমলের প্রথম প্রশ্ন বিশেষ অমুরাগী হইত, তাহা ছাড়া 'বকুরাণী'র চিন্তা অমর তাহার পিপাসাত্ত মনকে কিছুতেই বাগে আনিতে পারিতেছিল না। এখন তাহার নূতন চিন্তা—বকুরাণী তাহাকে ভালবাসে কি না। এ সংবাদ কে তাহাকে দিবে? মাত্র এই কথাটি মনে পড়িতে পাইলে সে কৃতার্থ হইবে। তাহার অন্ত কোন বাণনা নাই।

অনেকদিন ছেলের কোন সংবাদ না পাইয়া একদিন সুবিমলের মা আনিয়া উপস্থিত হইলেন। সুবিমল বহলী হইয়াছে সে সংবাদ তিনি জানিতেন না; সুবিমলের স্থানে যে কার্য করিতেছে অর্থাৎ নূতন ম্যানিফেস্টের বাণার উঠিয়া তিনি লক্ষ্য সংবাদ তুলিলেন, নূতন ম্যানিফেস্ট 'হিমাংস্ত' তাহার মূর সম্পর্কীয় তাই-পো। হিমাংস্তর দ্বারা নিকট তিনি আরও তুলিলেন যে, বকুরাণীর মনের উপর সুবিমলের ছাপ পড়িয়াছে, এ কথা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন, কারণ বকুরাণী তাহার নিকটে থাকে থাকে বেড়াইতে আসে, কারণে, অকারণে তাহার কাছে সুবিমলের নাম করিয়া তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছেন।

সুবিমলের মা বুঝিলেন, তাতে কি আসে যায়, অনন্তর কি লভ্য হয়? বাই হোক ছেলের শীঘ্র বিবাহ না হিলে উপায়ভর নাই ভাবিয়া সেই দিনই তিনি ছেলের কর্মস্থানে আনিয়া পৌছিলেন। মেহমুরী মা পুত্রের মুখ দেখিয়াই দব বুঝিলেন। সেই দিনই তিনি গোপনে তাহার জামাতা 'চন্দ্র'বাবুকে লিখিলেন যে তুমি সুবিমলের অন্ত যে মেরেটী ঠিক করিয়াছ, তাহাদের সহিত কথাবার্তা ঠিক করিয়া ফেল, আমি সুবিমলকে লইয়া শীঘ্রই দেশে বাইতেছি।"

সুবিমল ছুটি পাইল না বলিয়া মায়ের সহিত দেশে যাওয়া হইল না। ক্রমশঃ তাহার মনের প্রকৃততা করিয়া আলিতেছে, অতীতের কথা সে ভুলিতে বলিয়াছে। নানা বন্ধ-বান্ধবের সাহচর্য তাহাকে দৃষ্টিভা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে।

লিনেমার যাওয়া তার একটা বাতিক ছিল, অবশ্য নূতন কর্মস্থান হ'তে লহরে লিনেমা দেখতে যেতে হ'লে লুকিয়ে যেতে হ'তো, অবশ্য বেদিন ট্রেনের 'গার্ড' বা 'চেকার' তাহার পক্ষের লোক থাকিত। একদিন 'হিমাংস্ত'র দ্বারা সঙ্গে লাক্ষ্য হ'লো—সঙ্গে 'বকুরাণী'। উভয়ে আবার উভয়কে দেখিল। রূপান্তরিত হইয়া এ সংবাদও প্রকাশ হইয়া গেল।

(চার)

'চন্দ্র'বাবু হু, আই, আর ঠোর ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করেন। সুবিমলের অন্ত তিনি একটা মুরগী মেরে দেখিয়া সুবিমলের মাকে পত্র দেন, কিন্তু সুবিমলের তখন বিবাহে বিশেষ আগ্রহ ছিল, বা নিজে মেরে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া জবাব দিয়াছিল। পুনরায় মায়ের অমুরোধে, তিনি সুবিমলকে পাত্রী দেখিবার অন্ত লিখিলেন। সুবিমলও একদিন ছুটি লইয়া 'পাত্রী' পছন্দ করিয়া আনি।

পাড়ীর বাবা নাই, মা আছেন, মামার বাড়ীতে শাহু; মাথা ই, আই, আরের 'জু' গিরি করেন। দেশের বাড়ীতে বিবাহ হইবে। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল, আগামী মাসেই শুভকার্য সম্পন্ন হইবে।

কিছুদিন পরে সুবিমল সংবাহ পাইল, বকুরাণীর বিবাহ স্থির হইয়াছে। কোন অবসর প্রাপ্ত লাবজনের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ লব্ধ পাকাপাকি হইয়াছে। ইনস্পেক্টরবাবু অনেক টাকা খরচ করিয়া কস্তার বিবাহ দিতেছেন। প্রথম কস্তার বিবাহ একজন গ্রাম্যের সন্তান কীকিতে দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতা বাবাজীজন আজ পর্যন্ত জ্বর ভরণ পোষণের কোন উপায় করিতে পারিল না, জীকে পিতৃালয়েই অধিকাংশ কাল রাখিত, এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে শস্তুরে অন্ন ধ্বংস করিত। এবারে বেশী খরচ করিয়া বিবাহ দিবার উদ্দেশ্যে, বাহাতে কস্তা-জামাতা আবার তাহার গলগ্রহ না হয়, তিনি বৃদ্ধিাছিলেন, লভ্য বিবাহ দিলে কস্তা ও জামাতা তাহার সুখ লভেত এমনভাবে আহার করিয়া লইবে।

বকুরাণীর মায়ের ইচ্ছা, ধনী লজ্জানেক হাজার হাজার টাকা ঘোড়ক দিয়া বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা, শিক্ষিত, ভদ্রবংশীয়, গৃহস্থ ঘরের ছেলে দেখিয়া দেওয়া হাজার গুণে ভাল, ধনীপুত্রেরা প্রায়ই অহঙ্কারী, বিলাসী ইত্যাদি হইয়া থাকে। বকুরাণীর দ্বিধা মনোরমা ভাবিত বড়ঘরে বিবাহ হইলে 'বকুরাণী' তাহার পর হইয়া যাইবে। সুবিমল একদিন একখানা বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাইল; প্রথমে সে মনে করিয়াছিল, ঠাকুর কোন বন্ধুর বিয়ে, পড়িয়া সে হতাশ হইয়া বলিয়া পড়িল—চিঠিতে লেখা ছিল—

শ্রীশ্রী প্রজাপত্রে নমঃ

লবির নিবেদনবিধ—আগামী মাসের শুভ ২৯শে শুক্রবার তারিখে আমার দ্বিতীয়

কস্তা জীবতি বকুরাণীর বিবাহ—বাহাজপুর নিবাসী অবসর প্রাপ্ত লাবজনের দ্বিতীয় পুত্র জীবান নিরঞ্জন কুমারের সহিত সম্পন্ন হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সুবিমল আর পড়িল না। চিঠির নীচে হস্তাক্ষরে লেখা আছে—সুবিমল তুমি অবশ্য বিয়ের রাতে উপস্থিত হইবে। আমার দেশের বাড়ীতেই 'বকুরাণী' বিবাহ হইবে, দেখানে লোকাভাব, 'শান্তি' 'পটী' ও তুমি এই থাকিলে সকল কর্ম সুদৃঢ় হইবে। বলা বাহুল্য পাত্র-পক্ষের আশাভের বেশেই বাড়ী। আমি শীঘ্রই ছুটি লইতেছি। তোমরা অবশ্য অবশ্য তথায় উপস্থিত হইবে।

সুবিমলের বিবাহের দিন ২৯শে মাঘ স্থির হইয়াছে সে মনে করিয়াছিল, 'বকুরাণী'র বিবাহে একটু খাটরি দিয়া আসিলে, কিন্তু তাহারও বিবাহ ঐদিন। তাহার মনের আশা মনেই থাকিয়া গেল।

যথা সময়ে 'পৌষ' চলিয়া গেল, 'মাঘ' আসিল, আর ৭দিন বাকী আছে। ইনস্পেক্টর বাবু লপরিবারে একেবারে এক মাসের ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছেন। বাবুজী জেলার কোন্ পল্লীতে তাহার বাড়ী আছে, তাহা কেহ জানিত না।

সুবিমলও ১০ দিনের ছুটি পাইল। বিবাহের হইলিন পূর্বে সে বাড়ী পৌছিল। তাহার গ্রাম হইতে বারো ক্রোশ রাস্তা তাহাকে বাইতে হইবে বিবাহ করিতে। ঐ রাস্তা ২ ক্রোশ গো-গাড়ীতে, ৮ ক্রোশ ট্রেনে, এক ক্রোশ জলপথে, বাকী এক ক্রোশ, হয় পাকী কিম্বা পুনরায় গো-গাড়ী। শুনিলা পাড়ীর মামার দেশের বাড়ী ঐ বিহুটে জারগায়। এ বেন লাভ লব্ধ তেরো নদী পার হ'য়ে—'রাজকস্তা'র বেশে যাত্রা।

বর্ত কষ্টই হোক, বিবাহ তাহাকে করিতে হইবে। ঘরের রাস্তা বলিয়া জোর বেলাতেই,

নাগিত, পুরোহিত, বর-কর্তা 'চন্দ্র' বাবু ও জনকতক বর-বাজীলহ গো-বানে সুবিমলকে ঠেঁশনাতিবুখে রওনা হইতে হইল। রাস্তা বিশেষ সুবিধা ছিল না বলিয়া ঠেঁশনে পৌহিতে তাহার ৪ ঘণ্টা লাগিল। বেলা ১০টার ট্রেনে মার্টিন কোম্পানির একটা ছোট রেলের একটা ছোট ঠেঁশন। ট্রেন আসিয়া পড়িল, তাহার ইচ্ছা করিয়াছিল পথিমধ্যে কোন স্থানে রওনা করিয়া বিবাহের অনুযাত্রীদিগকে ধানইরা লইবে। বাহা হোক মার্কো মারা রেলগাড়ী অভিনব গতিতে তাহার ঠেঁশনে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বরের আলনে সুবিমল বলিয়া আছে, বিবাহ আসর নানা রকমে বেশ লগ্নগ্ন হইয়াছে, আশে পাশে, 'বর-বাজী', কস্তাবাজীর হল বলিয়া আসে, ছেলে মেয়েরা 'বর' দেখিতে আসিতেছে; গান বাজনাও এক ধারে চলিতেছে। এখন সময়ে কিনের একটা, ১৫-১৫ উঠিল, বে বে দিকে পারিল, ছুটিল, কেহ বলিল, কোথাও আঙুন লাগিয়াছে, কেহ বলিল ও পাড়ার 'ডাকাত' পরিয়াছে, বাহার বাহা মনে আসে সে তাহাই বলিতে লাগিল।

চন্দ্রবাবু ভীষন চীৎকার করিতে করিতে হাজির হইলেন "তোলো পাত্র, বিয়ে এ বাড়ীতে যেবো না, বারা এত ছোটলোক তাহার বাড়ীতে কাজ করবো না"—একজন হাতবর গোছের লোক আসিয়া বলিল "রাগ করবেন না মশাই"। চন্দ্রবাবু অধিকতর চীৎকার লহকারে বলিলেন, "বলেন কি মশাই বরবাজীঘরের মাথার ঝাটা মারবে, আর আমি চূপ করে থাকবো।" নিকটস্থ একজন লোক বলিল "হলো কি মশাই, অত চৈচাচ্ছেন কেন? ব্যাপারটাই খুলে বলুন না ভাই।" বরবাজীঘরের এখনও খাওয়া হয় নাই, আর কস্তাবাজীর হল দব খেতে বসেছে, এটা কি বর বাজীঘের

অগমানি নয় ?" এই বলিয়া চন্দ্রবাবু লাক-পাকোদিকগকে উঠিতে বলিলেন।

কতাকর্তা আনিয়া হাতে পারে ধরিয়া চন্দ্রবাবুকে নিরস্ত হইতে বলিলেন, "রাজি ১০ টায় নয়, তাই কয়েকজন 'ডিস্‌পেন্‌সারি'-গ্রন্থ কতাবাজীকে একটু লকালে লকালে খাটরে বেওয়া হয়েচে এতে যদি কোন দোষ হ'রে থাকে, আমাকে মার্জনা করুন।"

বাহির হইতে পাড়ার কয়েকজন ডোকরা চন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল "ভারি বিয়ে তার 'হু পা'য়ে আলতা"। আর বার কোথা—'হু' চার কথায়—পাজীপক্ষের লোকও উত্তেজিত হ'রে উঠলো, প্রথমে সুখোবুধী কথা কাট-কাটি, শেষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। গ্রামটিতে হলাহলি আছে বোঝা গেল—কয়েকজন বিপক্ষ হলের লোক গোপনে 'চন্দ্রবাবু'কে বলিল "কুচ-পরোয়া নাই, ও পাড়ার মেয়ে আছে চলুন এখনুনি বিয়ে দিবে দিচ্ছি।"

চন্দ্রবাবু ভীষণ একপ্তরে লোক, তিনি 'পাজ' উঠাইয়া লইয়া চলিলেন, কয়েকজন সুকসি বলিল—বিয়ের রাতে কত কথা হয় ও সব ধরতে নেই,—এ রাজিতে বর-বাজীরা লাট-লাহেবের বাড়ী, পান থেকে চূণ থললে বিয়ের রা'তে হলুদু লু কাণ্ড বাধায়, হাজার আরোজন কর—ব্যাটায়া নিন্দে করেছে বলে। অথচ তারা কোন কালে মে সব জিনিষ দেখেই নাই। কে কার কথা শোনে, সুবিমলকে নহল বলে উঠিতে হইল। সে ভাবিল তাহার ভাগ্যে বিয়ের রা'তেও গোলযোগ। চন্দ্রবাবু হল হল লহ ওপাড়ার দিকে রওনা হইলেন। একজন যুবক বর-বাজীঘের খাবার জন্ত বিবাহ বাড়ীতে মরখা রাখিতেছিল তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সুবিমলের স্থান পূরণ করা হইল।

সুবিমলের হল, ওপাড়ার পৌছাইলে, কয়েকজন লোক আনিয়া চন্দ্রবাবুকে সুবিমলের কুল-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, পরিচয়

ভনিরাই তারা লোৎলাহে বলিয়া উঠিল "এই পাজ আমাঘের ঠিক পাণ্টী ঘর। পাজও সুবর্শন—লোখা-পড়ার নেহাৎ সুখ" নয়। ইহাঘের মধ্যে একজন চন্দ্রবাবু হাত দুটা ধরিয়া বলিল "অজুগ্রেহ ক'রে আমাঘের লজ চলুন—লগ লরিকট, আমাঘ উপরেই সব তার আছে ব্যাপারটি শুনুন;—"পানের গাঁয়েই আমাঘের বাড়ী ঐ গাঁয়ে আজ 'ছুটা' বিয়ে ছিল ছুটা বিয়েরতেই গোলযোগ উপস্থিত হয়েচে। একটা এক দ্বিজি কৃষকের মেয়ের, অতটা ৮রামচরণ সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাতী। কৃষকের মেয়ের, বরপক্ষ আনিয়া কতাপক্ষের লজ লামান্য খুটা নাটা হ'ওয়ার, তারা পাজ তুলে নিরে অন্য পাড়ার একজন অতি দ্বিজের কন্যার লহিত বিবাহ দিয়াছে। এবং ঐ মেয়েটার ও পাড়ারই একজন যুবককে সুবস্ত অবস্থার উঠাইয়া আনিয়া বিবাহ বেওয়া হইয়াছে। কোন রকমে 'হিন্দুস্বামী' রক্ষা হ'য়েচে। কিন্তু আমাঘের মেয়েটার পাজ পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে বিবাহ ঠিক হয়েছিল, সেখান থেকে কিছুক্ষণ আগে চুসংবাধ এনেচে, পাজটা হঠাৎ মৃগী-রোগা-ক্রান্ত হ'য়েচে। মেয়ের বাবা আমাঘ জাতি জাতি, তিনি বিবেশে চাকুরী করেন, পাজ পক্ষের অজুরোধে বেশে এনে বিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন, এখন পত্তাচ্ছেন, মেয়ের মা-বাপ গতিক বেখে লঘাশারী হয়েছেন। তাকে এবেশের লোক বড় কেউ চেনে না, মেয়ের ঠাকুর্দাকে এ বেশের লোক খুব চিনতো। এখন এই লয়েই মেয়ের বিয়ে

না দিলে নরাজে আমাঘা স্থপিত হ'লে থাকবে, আমাঘের জাতি-কুল সব নষ্ট হবে। এখন যেখানি এই 'পাজ' হ'লেই আমাঘের সব রক্ষা পাবে। এখন অজুগ্রেহ ক'রে লম্বতি দিবে আমাঘ তাবনা সুব করুন।"

চন্দ্রবাবু রাজী হইলেন। নুতন 'বর'কে লইয়া একেবারে হাঁহনা তলার আনা হইল। সেখানে অসম্ভব ভীড়, লকলেই 'পাজ' দেখিতে আনিয়াছে। ভীড়ের জন্য কেহ 'বর'কে দেখিতে পাইতেছে না, তাই একটা গোলমালের সৃষ্টি হইতেছে। কন্যাপক্ষীয় কয়েক জন গোলমাল নিবারণ করিয়া বাহাতে লকলে বর দেখিতে পায় সেই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। জন্তাকে বলিতে অজুরোধ করিতে লাগিলেন। শুভলগ লরিকট হইল—পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ হইতে লাগিল। শুভ-দৃষ্টির লগ লবিম্বরে সুবিমল দেখিল—একি! এ যে—বকুরাগী!

পরক্ষণেই সমুখে দৃষ্টি পড়াতে—"শান্তি রাম" ও 'পটাই' বলিয়া উঠিল—একি! সুবিমল বে;—কি জানি কেন—সুবিমলের সুখ দিরা বাহির হইয়া গেল—"বিয়ের রাতে" উপস্থিত থাকতে লাহেবের অজুরোধ উপেক্ষা করা যায় কি?... .." এরোগলের উল্লেখনি, কুশাগ্রীগণের লক্ষ্যবসি ও নহবতের মধুর রাগিনীতে আর কিছু শোনা গেল না।



পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্ততৌব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ডবানীপুর

রেকর্ড সমালোচনা

—এডিসন—

নিউ থিয়েটার্সের রেকর্ড—গীতি-
কবিতায় Imagism (?)—মেগাকোনের
গায়েরলী গায়।

নিম্নে আমরা মেগাকোন কোম্পানীর
পাঁচখানি রেকর্ডের ও হিন্দুস্থান কোম্পানীর
একখানির সমালোচনা প্রকাশ করিলাম।

মেগাকোন—জে, এন, জি, ২২৮৬—
শাকল্যমণ্ডিত চিত্রভাসক। শ্রীমতী বলিনা
এই রেকর্ডে অভিজ্ঞান বাণীচন্দ্রের ‘রূপ-
কথারই রাজা এসে’ ও ‘ছিল নাথী মোর
প্রভাতের সুল’ এই দুইখানি গান পরিবেশন
করিয়াছেন। সুর-বৈচিত্রে ও আবহ-সঙ্গীতে
প্রথম গানখানি হইয়াছে অনবদ্য; দ্বিতীয়
খানি অর্কেস্ট্রা-প্রধান, এমন কি সমগ্র
পিঠটি অর্কেস্ট্রা নামে চালানাই হয়তো
মজত। ১৫টি বাক্যে রচিত কণিকা
গানখানি মোটেই জমিরা উঠিতে পারে
নাই, তবে নিউ থিয়েটার্সের বৈচিত্র্যপূর্ণ
গুরুগম্ভীর অর্কেস্ট্রা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। ৬

* * *


মেগাকোন—জে, এন, জি, ২২৮৭—
এই রেকর্ডে শিল্পী শ্রীহৃদয় কৃষ্ণ দ্বাপ
তাঁহার তরুণ কণ্ঠে মহাগানী সঙ্গীতের
সহিত একদিকে শ্রীকৃষ্ণের তজনগান
‘ব্রহ্মাবন-মন-আনন্দ-মুরতি’ ও অন্যদিকে
কীর্তনগান ‘তম্বু-বেহাটরে পুষ্প করিয়া
পূজা করিব’ রেকর্ড করিয়াছেন। গায়কের
কণ্ঠ সাধনার শ্রেণীর এবং তিনি সরলভাবেই
গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোটের উপর
রেকর্ডটি মন্দ নহে।

মেগাকোন—জে, এন, জি, ২২৮৮—
শিল্পী কুমারী অমীষা শেঠ (এ্যাংগেলার)
বেশ লাগপৈ ধর্ম্মাই সঙ্গীতের ও মহাগানী
সঙ্গীতের সহিত ‘আজি তোমার আমার
খেলবো লুকোচুরী!’ ও ‘গোপনে মনের
কোণে’ এই দুইখানি আধুনিক গান রেকর্ড
করিয়াছেন। গান দুইখানি গাওয়া নেহাৎ
মন্দ নহে, তবে আবার সেই আধুনিক
গানের গতানুগতিক ছুর্কাখাতা আদিরা
জুটিয়াছে। ‘আজি তোমার আমার খেলবো
লুকোচুরী’ এই Mystic গানখানি রচনা
করিতে গিয়া গীতিকবি অবশেষে এতই নাকাল
হইয়া পড়িয়াছেন যে সাধিরা ছুর্কাখাতা
আনয়ন করিলেন। অবশ্য ‘বাহল-ধারা’
‘হাহুরী’ প্রভৃতি বাহা বাহা কথা জোড়াতাড়ি
দিয়া দলিল আধুনিক গান খাড়া হইল
কিন্তু Mysticism এতই খনাইয়া উঠিল
যে, অর্থ অনর্থ ঘটাইয়া বলিল।

“(আহা) ছোট্ট কেন ঐ বউভারা
অন্ধকারে লক্ষ্যধারা
আর রে নিশার বাহল-ধারা
ঝিকি ও হাহুরী!”

‘বউভারা লক্ষ্যধারা’ হইয়া ‘অন্ধকারেই
বা কেন ছোট্ট’ এবং ‘নিশার বাহল-ধারা,
ঝিকি ও হাহুরী’কেই বা কেন ডাকিব
(তুমি কি মিলের জন্ত?) তাহা গানের
প্রধান অংশ হইতে জানিবার প্রয়াস ব্যর্থ
হইয়াছে। স্থানান্তাবে এই শেষ চার
পঙক্তি বাতীত অস্ত্রান্ত কলিঙলি আপনাদের
লম্বুখে উপস্থাপিত করা গেল না।

* মেগাকোন—জে, এন, জি, ২২৮৯—
এই রেকর্ডে শিল্পী অনন্তবালা বৈকুণ্ঠী ঐক-
তারার সহিত দুইখানি তাটরাঙ্গী গাহিবার
চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে নিমাই-
নয়্যারের ‘নিমাই দাঁড়ারে, দাঁড়ারে নিমাই’
ও অন্যদিকে ‘শোণে বা তোর কৃষ্ণধন দে’
গীত হইয়াছে। রেকর্ডখানি বাড়ী আনিয়া
একদিন বৈকালে প্রথম গানটি বাজানো
শেষ করিয়া দেখি পাড়ার লোক-জনে
আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবে বৈঠকখানা পরপর
হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই কোষের
গামছা বাঁধিয়া মহামুগ্ধতাপূর্ণ মুখে আবার
অপেক্ষা করিতেছে। নিমাই লগ্নার হইতে
বিহার গ্রহণ করিবার পর নিমাইএর দেহবরী



**আধুনিক ৩
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান**

**মডার্ন ইলেক্ট্রিক
স্টুডিও**

৩২-সি
ধর্ম্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন-
কলি-
৬৪৩৬

মাতা বিলাপ করিয়া এই গানখানি গাহি-
তেছেন,—এই বিষয়-বস্তু করিয়া গানখানি
রচিত। বাঙলার পুস্তকশোকাভুরা জননীর
'মরা-কান্না' বৈকল্পিক রূপ-বিধারক হইয়া
থাকে, ঠিক সেইরূপ 'মরাকান্নার' উপর
ভিত্তি করিয়া গানখানি গীত;—সুতরাং
অর্থের সহিত লজ্জাতি রাখিয়া গানটির
এতাদৃশ বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা বর্ণনে
প্রাণ স্বতঃই নৃত্য করিয়া উঠিল। ভাবিলাম
যেবর্ত্তি কিনিবই কিনিব, কিন্তু পাছে 'হুট'
রাখালের গল্প'র মত প্রভিবাসীরা বার
বার ঠকে, এই কারণে সেই লক্ষ্য হইতে
বিবৃত হইতে বাধ্য হইলাম। রেকর্ড-
পুস্তিকার কথা গেল, লেখা হইয়াছে 'তার
(শিল্পী) কঠে শুনেতে পাবেন'—ইহা
আমরা তখনই বুঝতে লক্ষ্য হইব, যখন
অনুভব করিব হুঃখবাহিত্র্যক্লিষ্ট পন্নায়ের
হাহাকার-আর্জনাহ। অপর গানখানি
ততোধিক না হইলেও গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য-
হীন তাবেই গীত হইয়াছে।

*

*

মেগাফোন—জি, এন, জি ৫২০—
গায়েরী নাম দিয়া অপ্রকাশিতনামা শিল্পী
কর্তৃক গীত হইয়া 'মেগাফোন ভ্যারাইটিজ'এর
রেকর্ডখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইম্পটর
বা যুসকেজু বাণীচিত্রে চোল, কাঁদি ও শানাই
লহবোগে শ্রীকৃষ্ণ রায় কর্তৃক যে জারি
গান দুইটি গীত হইয়াছিল এবং পরে যাহা
এচ, এম, ডি, কর্তৃক রেকর্ড করা হইয়াছে,
সেই ধরনের লজ্জাতি আরোপ করিয়া এই

শারতোৎসবে এবারও স্বর্ণকবচের
গ্রাহকগণের যোগদান বাহনীয়। ত্রিপুরা
রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসীপ্রবৃত্ত, সর্বপ্রকার রোগ
আরোগ্য ও কাহনা পুংগবী "স্বর্ণকবচ"
পত্র লিখিলেই সর্বদা সর্বত্র বিনামূল্যে
পাঠান হয়। শক্তি ভাণ্ডার,
পোঃ আউলিয়াবাড় (ত্রিপুরা)।

গান দুইটি তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করা
হইয়াছে। গান দুইটির সহিত চোল বাজাইয়া-
ছেন বিখ্যাত বাঁকু শ্রীপবনচন্দ্র বিশ্বাস।
রেকর্ডখানি মন্দ নহে।

হিন্দুস্থান—এচ্ ১১৩৩৫—শ্রীমতী স্মৃতি
লেন (মণিপুরী) এই রেকর্ডে হুঃখানি
ভাট্টারালী গান পরিবেশন করিয়াছেন।
একদিকে অজয় ভট্টাচার্য্যের 'চাঁদ যখন মূখ
লুকাবে' ও অন্য পিঠে 'তোমার বন্ধু না
আইল' গীত হইয়াছে। শ্রীমতীর গলা
পরিষ্কার ও মিষ্ট কিন্তু অত্যধিক ধরবেই লব
নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে মনে হয়
তিনি এখনই বুঝবা কাঁদিয়া ফেলিবেন।
ভাটার কণ্ঠ এই ঘোষ হইতে মুক্ত হইলে
ভবিষ্যৎ রেকর্ডগুলি যে ভাল হইবে তাহাতে
লন্দেহ নাই। মাঝ-ধারিয়ায় এই রেকর্ডের—

কথা ও সুরের তরঙ্গী ডুবাহরাছেন শ্রীতরঙ্গী
গোঁস্বামী। তিনি দ্বিতীয় গানখানির রচয়িতা
এবং দুইটি গানেরই সুরলংঘোজনা করিয়া-
ছেন। প্রথম গানখানির সুরে বিশেষরূপে
বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং
দ্বিতীয় গানখানির রচনায় তিনি একটু
নুতনত্বের আদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি
বাঙলা সাহিত্যে কাব্য ও কবিতায়
Imagism ও Cubism নামে কবিতার
নুতন ধারা প্রবর্ত্ত হইয়াছে, কিন্তু গীতি
কবিতার অভাববিধি তাহা হয় নাই। সুতরাং
গীতি কবিতায় Imagism (?) এর প্রচলন
করিয়া গোঁস্বামী মহাশয় নুতনরূপ শুকপিরি
করিলেন। আমরা গানটি উদ্ধৃত করিবার

স্নাত্তে

"সমেন্ট"

কুমারী শিবানী শিল্পী

বর্ষারাত্রে আনমনে বিছানাতে আছি;
কোথা থেকে কেতকীর গন্ধ আসে তানি।
নিশ্চয় নিরুপ পুরী তার মাঝে একা
প্রতিক্রান্তে আছি, লখী পাব কিগো দেখা?
মৃণালের লতা প্রায় তব ওই বেহ
হাছরী ধ্বনিতে লাজে দাঁড়াবে কী কহে।
তন্ত্রা তরা স্বপ্ন ধরা মম আঁখি পাশে
হলনা ও লুকোচুরী খেলিবার আসে।
ভাবিতে ভাবিতে আঁখি চলে এলো যুমে—
দেখিমু স্বপ্নন এক, গেলে তুমি চুমে;
আমার নয়ন দু'টা চকোরের প্রায়—
জেগে উঠে দেখিলাম কেহ নাই ছায়।
কেবল খণ্ডিত জ্যোৎস্না ছিন্ন মেঘ কীকে
পরি' মম সর্কি বেহে আলপনা আঁকে ॥

—:~:—

লোভ লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। গানটি
হুবহু এইরূপ,

"আমার বন্ধু না আইল

না আইল আমার বন্ধু,

আসব বলে না আইল

আমিত না জানি

কোন বিধি স্মৃতি এত নির্দয় বন্ধু।

বন্ধু বঁচ না আইল

এই মালা বিফল হইল

কর লাগি গাঁথিব মালা

মালা হইল বিষম জালা

গাঁথা মালা বাপি হইল

বন্ধু মনে এই কি ছিল

অতি লাথের গাঁথা মালা

বধূনার তালারে দিব ॥"

খেয়ালী চিত্রপট



নিউ থিয়েটার্সের “বড়দিদি” চিত্রে চন্দ্ৰা,
পাহাড়ী ও মলিনা যথাক্রমে শান্তি, সুরেন্দ্র
ও বড়দিদির ভূমিকায়—উদ্বিগ্নানির পরিচালক
শ্রী ৩ অমর মল্লিক।



পরিচালক

আশুতোষ নিউজপেপার লি:

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৫, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

দুর্ভাষা

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন অনুসারে বঙ্গীয় ছাত্র-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি সচক্ষু রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অবিলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ সিপিং Shipping Supdt. পদের জ্যেষ্ঠ সার্ভিস কমিটি কর্তৃক মনোনীত হন। সার্ভিস কমিটির এই মনোনয়ন কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় পেশ হওয়ার পূর্বেই ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় অন্তরম্যানরূপে কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন। বিধানবাবু কর্পোরেশনে আসিলে কংগ্রেসী দলের শৃঙ্খলা যে বিশৃঙ্খলায় পর্যাবসিত হইবে এই আশঙ্কা বাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের আশঙ্কা যে এত শীঘ্র সত্য হইবে তাহা আমরাও ভাবি নাই। প্রবেশ করিয়াই তাঁহার নাকি মনে হইয়াছে যে অবিলাস বাবুর মনোনয়ন সমীচীন হয় নাই এবং অবিলাস বাবুর পরিবর্তে অথ কাহাকেও ঐ পদে নিয়োগ তিনি সমর্থন করেন। তদনুযায়ী কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মিঃ নিলীথ চন্দ্র সেনের প্রস্তাব ক্রমে অবিলাস বাবুর নিয়োগ প্রস্তাব সার্ভিস কমিটিতে পূর্ণবিবেচনার জ্যেষ্ঠ প্রেরিত হইয়াছে। স্বপিত-রাধা অবশ্য ধামা-চাপারই শোভনীয় সংস্করণ। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী অবিলাস বাবুকে “স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে” (Dropped from the sky) দেখিয়া পুলকিত হন নাই বটে তবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার

কারণ বিনয়বাবু কংগ্রেস-বিপক্ষী সুতরাং এইরূপ নিয়োগ-প্রসঙ্গে তাঁহার মত-স্বাতন্ত্র্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অবিলাসবাবুকে রাষ্ট্রপতি-অনুমোদিত পদ হইতে সরাইবার সঙ্কল্পে কর্পোরেশনের কংগ্রেস দলপতি কে—সুভাষচন্দ্র না বিধানচন্দ্র—এই প্রশ্নই স্বতঃই জাগরিত হইতেছে? বিদ্যায়ী সুপারিন্টেন্ডেন্ট নাকি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন কিন্তু উক্ত পদানুযায়ী তাঁহার বিশেষ কোন বিজ্ঞা ছিল কিম্বা জ্ঞান নাই। বিধানবাবু নাকি অবিলাসবাবুকে আখ্যাস দিয়াছেন যে তাঁহাকে অত্যন্ত বসান হইবে সুতরাং তিনি যেন এই পদের জ্যেষ্ঠ আর তদ্বিরী না করেন। হয়ত বিধান বাবুর বন্দোবস্ত অনুযায়ী অবিলাসবাবুর আর্থিক ক্রতি কিছু হইবে না তবে এই প্রশ্নে যে প্রোগ্রের উদয় হয় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কর্পোরেশনের কংগ্রেস দলপতি কে?

শ্রীযুক্ত সত্যনাথন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্পোরেশন সাব-কমিটির সম্পাদক। সম্প্রতি তিনি ‘এ্যাডভান্স’ পত্রিকার সম্পাদকের পদে বৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন বোষের অধিনায়কত্বে যে খণ্ড-দল বাংলা কংগ্রেসে প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র ‘এ্যাডভান্স’ নাকি তাঁহাদেরই মুখপত্র হইয়াছে। সাংবাদিক হিসাবে সত্যাবাবু যশস্বী ও তেজস্বী সুতরাং তাঁহার সম্পাদনায় ‘এ্যাডভান্স’-পত্রিকা যে বাংলার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারিবে তাহা সুনিশ্চিত। কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব শিক্ষা-সচীব শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ বোষ সত্যাবাবুর ভবানীপুরের বাসা বাড়ীতে গতায়ত করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সত্যাবাবু কর্পোরেশনের সাব-কমিটির সম্পাদক সুতরাং শৈলেন্দ্রবাবুর সত্যাবাবুর বাড়ীতে গমনাগমন তাঁহার (শৈলেন্দ্রবাবুর) কর্পোরেশনে পুনঃপ্রবেশের প্রচেষ্টা বলিয়াই মনে হয়।

কর্পোরেশনে স্ব স্ব দলপুষ্টির জ্যেষ্ঠ যে প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে তাহা বাংলা কংগ্রেসের বিভিন্ন উপদলের পক্ষে আদৌ শোভনীয় নহে। খণ্ডদলগত প্রথরতা দ্বন্দ্ব করিলে খণ্ডদলপতিদের মৌরব বুদ্ধিই হইবে—তাঁহারা একটু আদানপ্রদানের (Give And Take) উদারতা দেখাইলে বহু অশ্রের ও মনোমলিনতার অবসান হয়। কিন্তু সে আশা কি দুর্ভাষা মনে ??

বাঙ্গালীর কাপড়ের মিল ও বাঙ্গালী

আনিজ্য-বিশারদ

“What Bengal thinks to day, rest of India thinks to morrow”.

যে সময় এই গর্ব বাণীতে ভারতের আকাশ বাতাস ধ্বনিত হত—যে সময়ের বাঙ্গালীর কৃত কার্যের ফলে এই মহান বাণী জরলাভ লভ্য হয়েছিল, বর্তমান সময়ে সে বাঙ্গলা, সে বাঙ্গালী যে মুক্ত অতীতের গরিমা যে কাহিনীতে পর্যাবসিত হয়েছে এমন অভিযোগও বর্তমানের বাঙ্গালী বিষজ্ঞ নয়। আজ বাঙ্গালা ভারতের সকল প্রদেশের পশ্চাতে পড়েছে। আজ বাঙ্গালীর সে প্রতিভা নাই, উদ্ভব নাই, উৎসাহ নাই

সে লাহনও নাই। আজ বাঙ্গালী অস্বাভাবিক ভাবে প্রাতি বঙ্গের হাজার হাজার বাঙ্গালীর হেলে ঘেরে কৃতবিদ্য হয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের আবেষ্টনী মুক্ত হয়ে বাইরে এনে দেখছে তাদের সম্মুখে ঘন তমসাবৃত্ত তবিস্ত। সামান্য বিশ ত্রিশ টাকার গোলাঘরি জুতা অফিসে অফিসে বিকল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন যে বাঙ্গালী রাজনীতি ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের গুরুস্থানীয় ছিল, সেই বাঙ্গালী আজ আপনাকে ভুল ইত্তর হলদুলির মোহে ভারতের উপহাসের বস্ত্র হয়ে পড়েছে। আজ বাঙ্গালীর অঃ-

পতন এত স্পষ্ট যে তার নিজের নিকট ও নিজের অকর্ণ্যতা এতটুকু অস্পষ্ট নয়। মানসিক বৈজ্ঞা এমন গভীর খাৎ নেমেছে যে এতকাল নিঃসহায়ের মত পর দুখাপেক্ষী হয়ে চেয়ে থাকা ভিন্ন কোন দাবী নাই। জীবন সংগ্রামের প্রত্যেক স্তরে আজ বাঙ্গালী পরাজিত। একদিন যে বাঙ্গালা চরিত্র বলে দৃঢ়তার সমগ্র জগতের লক্ষ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লক্ষ্য হয়ে ছিল, আজ বাঙ্গালীর হেলে ঘেরেঘের নিকট তা কল্পনা-তীত কাহিনীর মত। মনে হয় কোন গুরুতর অস্বাভাবিক অপরাধের দরুন বিধাতার

সর্বস্বার্থা বাংলা বাঁচবার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা

সর্বস্বার্থা বাংলাকে বাঁচতে হ'লে আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বাঙ্গালীর উপর বাঙ্গালীর সহানুভূতি, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানের উপর একমাত্র দরদ।

বাঙ্গালী আজ পরালু হল জীবন যুদ্ধে আর ব্যবসা হারিয়ে। অভাবে অনশনে কৃত বিকৃত হ'ল সে “বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্য” মন্ত্র ভুলে যেয়ে।

বাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের ভাণ্ডারী আজ বাঙ্গালী নয়—তাই তার এত লাজনা। “ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি” বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীর ঘরে, বাঙ্গালীর পছন্দমত বস্ত্র যোগাবার তার নিয়ন্ত্রণ এঁরা। বাঙ্গালীর কচী ও সামর্থ্য অনুযায়ী সব রকম বস্ত্রের বিপুল আমদানী করেছেন এঁরা। সবার সমুষ্টি বিধানই লক্ষ্য এঁদের।

বিনীত—

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি

(প্রসিদ্ধ স্বদেশী বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা)

বস্ত্র বিভাগ—১নং ও ২নং মির্জাপুর স্ট্রীট, [মেন] কোম বি, বি, ৩৫৩

ব্রাঞ্চ—৮৭১২ কলেজ স্ট্রীট [বস্ত্র ও পোষাক] জগদ্বাজার, ভবানীপুর [বস্ত্র ও পোষাক] কোম—পি,কে, ৩৯৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিবাসিতার অধিতীয়—ষ্টক অফিস—ঘর নবার চেয়ে নত। লোকে বাহা প্রচার করে তাহা তাহার করে না—আমরা বাহা বলি তাই করি—এটাই আমাদের বিশেষত্ব।

অভিশাপ আজ বাঙ্গলার শিরে পতিত হয়েছে। তাই বাঙ্গালী ভুলেছে আপনাকে, ভুলেছে তার লক্ষ্য, তার অতুলনীয় চরিত্র জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, উদারতা সব ভুলে গেছে অন্যত্র চিত্তে ঘুরিয়ে পড়েছে।

নইলে ১৯০৫ সালে যে বাঙ্গালী বঙ্গদেশী স্রব্য গ্রহণ করতে জীবন পণ করেছিল, সেই বাঙ্গলার বর্তমানে যে ১২:১৩টি বাঙ্গালীর কাপড়ের মিল স্থাপিত হয়েছে মনে হয় তার খবরটুকু পর্যাপ্ত জানেন না। কারণ প্রতি বছর বাঙ্গলার প্রায় ৩৫ কোটি টাকার কাপড় চোপার আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে যে ১২:১৩টি কাপড়ের মিলে বর্তমানে কাজ চলেছে তাদের কাপড় উৎপন্নের লক্ষ্যগত পরিমাণ মাত্র এক কোটি টাকার মত। আর ঐ মাত্র এক কোটি টাকা মূল্যের কাপড়ও বাজারে, বিক্রয় হয় না। বিক্রয় না হবার দুটি কারণের মধ্যে প্রথম কারণ আজ বাঙ্গলার শোচনীয় অধঃপতন। আমরা জানি বাঙ্গলার একমাত্র গর্বের লক্ষ্য বৃহৎ বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইষ্ট বেঙ্গল সোলাইটার্স লিমিটেড ম্যানুফ্যাকচার টেক্সটাইল ম্যাগনেট—শ্রীযুক্ত ক্লিয়ারেন্স সোম বি, এ, মহাশয় বাঙ্গলার মিল মালিকগণের নজর এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলাপ আলোচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে, বাঙ্গলা মিলের কাপড় বোম্বে, মাদ্রাস ও অন্যান্য স্থানের মিলের কাপড়ের তুলনায় বেশী টেকসই, এবং স্বামেও সস্তা।

তবেই এর অপেক্ষা লক্ষ্যের বস্ত্র আর কি থাকিতে পারে, আমরা বাঙ্গালীকেই তাই জিজ্ঞাসা করছি? যে বাঙ্গলার বছরে ৩৫ কোটি টাকা মূল্যের কাপড় আবশ্যক হয়, সেই বাঙ্গলার ১২:১৩টি বাঙ্গালীর মিলের লক্ষ্যসাকুল্যে উৎপন্নের পরিমাণ মাত্র এক কোটি টাকা মূল্যের কাপড়ও বিক্রয় হয় না। ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিদাক্ষণ পরিহাস আর কি হতে পারে আমরা জানি না।

দ্বিতীয় কারণ, বর্তমানে কাপড়ের বাজার অবাকালীর হাতে। তারা তাদের খুশী মত মিল লম্বুর ভাগ্য গড়ছে, ভালছে। বাঙ্গলার বাজারে—আমেরাবাহ, বোম্বাই, মাদ্রাস, কানপুর প্রভৃতি প্রদেশের (জাপানি ও বিলাতি ভ' আছেই) মিল লম্বুর উৎপন্ন কাপড়কে চালিয়ে বাঙ্গলাকে অগ্রগ্রহ করবার মত যেটুকু উদারতা তাদের মনে জন্মে, সে টুকুই বাঙ্গালী মিলওয়ালার ভাগ্যে কোটে। তাই বাঙ্গলার মিলের এক কোটি টাকার মূল্যের কাপড়ও বিক্রয় হয় না। ফলে দিন দিন ঐ ১২:১৩টি মিলের দশ অবস্থা উপস্থিত হচ্ছে।

পাহাড়ে এক জাতীয় লক্ষ্য যেমন চক্ষু দিয়ে হরিণকে লক্ষ্যাক্ষিত করে, আর বেচারি হরিণ তার লক্ষ্যলক্ষ্য দিয়েও সে আকর্ষণ মুক্ত হতে না পেরে, পা' পা কোরে লক্ষ্যের মুখবিরে আত্মদম্পন করে, এও তেমনি। ঐ বারো তেরোটি বাঙ্গালীর কাপড়ের মিল দিন দিন হরিণের মত লক্ষ্যলক্ষ্য হারাতে হারাতে অবাকালীর হাতের মুঠার মধ্যে চলেছে। আর একটি বাঙ্গালী মিলের ভাগ্য ইতিমধ্যে লতা লতাই হরিণের ভাগ্যে পর্যাবলিত হয়েছে।

কিন্তু এই বিপদের কি প্রতীকার নাই (?) আছে। বাঙ্গলার নর-নারী যদি একবাক্যে বলেন যে, আমরা বাঙ্গালী মিলের কাপড় ছাড়া আর কিছু পড়বো না, তা হলে আগামী এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার আরও ৩০০টি মিলের আবশ্যক হয়ে পড়বে।

ফলে হাজার হাজার যুবকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয়, বাঙ্গলার ৩৫ কোটি টাকা বাঙ্গালীর ঘরেই পাকে। অর্থাৎ তার নিজ বাঙ্গালীকে কোনও ভাগ স্বীকার বা ক্ষতির দ্বন্দ্বিত্ব ঘাড়ে নিতে হয় না। মাত্র বাঙ্গালীর পণ করবে “আমরা বাঙ্গালী পরিচালিত বাঙ্গলা মিলের কাপড় ব্যতীত অন্য

কাপড় স্পর্শ করব না।” আজ বাঙ্গালী যদি এটুকুও বলতে না পারে, আজ বাঙ্গালী যদি এটুকুও বুঝতে না পারে, তাহলে কি লতাই আক্ষেপ করা যায় না, যে বাঙ্গালীর শিরে বিধাতার নিদাক্ষণ অভিশাপ পড়েছে! বাঙ্গালী মরবে, বাঙ্গালী অধঃপাতে যাবে, কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। নাহলে এমন দিন আসছে যে, এ বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া হবে তার। এরা জানে সব, বুঝে সব কিন্তু তবু এরা কেমন যেন বোকা। নিজের বৃথ বৃথতে এরা ভয়ে শিউরে উঠে, ভাল, দাবা “বুঝবে ছবিন পরে”। এ শব্দ্যর কথা বালী হলে বেশ মিষ্ট হবে।

কেহ যদি বলেন, আমরা প্রাণেশীকতা প্রচার করছি তা হলে, তারা আমাদের প্রতি অবিচার করবেন। আজ বাঙ্গলার তেলেমেয়ে নরনারী অস্বাভাব্যে “মৃত প্রাণ, হারিয়ে কাপড়, হৃদিত্তার চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে, তাদের যদি কেউ বাঁচাতে বলে, তাদের ক্ষুধার অয়ের লক্ষ্যন যদি কেউ করতে চায় আর সে লক্ষ্য যদি বলে প্রথমে বাঙ্গালীকে বাঁচাতে হবে, পরে প্রদেশ, জাতি, স্বদেশ ও পৃথিবী। আর সেই প্রচেষ্টাকে কেহ যদি প্রাণেশীকতার অপরাধে ঘোষী লাব্যস্ত করেন, তাহলে নিতান্ত ক্ষুধার লহিত বলতে হবে, তিনি বাঙ্গলার শত্রু, বাঙ্গালীর শত্রু, লম্বাজের শত্রু, দেশদ্রোহী। প্রথমে বাঙ্গালী পেটপূরে খেতে পাক্ তবেই তার মুখে হাসি ফুটবে, তার সব হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন যথা চরিত্র, যথা, উদারতা, পাণ্ডিত্য আবার শতশত করে আসবে। বাঙ্গালী আবার তথা জগতের সমুখে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। তখন আবার দিকে দিকে ধ্বনিত হবে। “What Bengal thinks to day, rest of India thinks tomorrow.”

বাঙ্গালী! তুমি শুধু বলো, তুমি একবার প্রতিজ্ঞা করো যে, তুমি বাঙ্গালী মিলের ভৈরী

নাট্য তরঙ্গ

শ্রীনটনাথ

শ্রীযুক্ত যশোদা ঘোষের প্রয়োজনীয় সুবিখ্যাত ক্যালকাটা থিয়েটার নাট্য নিকেতন রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়া চিৎপুর রোডস্থ রঙ্গমঞ্চ নাট্যমঞ্চে উপস্থিত অভিনয় করিতেছেন। কিছুদিন আগে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন নাটক 'উত্তরা'র অভিনয়-এর উদ্বোধন হয়েছে। সুবিখ্যাত লেখক মক্কেল গুপ্ত এই নাটকখানি রচনা করেছেন।

'উত্তরা' নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশের লকলেই পরিচিত। মহাভারতের মধ্য থেকে অভিমুখ্য ও উত্তরার কাহিনীর উপরই এর ভিত্তি। তাছাড়া এই নাটকটির আখ্যান ভাগ যে কৃতিত্বের সঙ্গে তৈরি করে দর্শকদের সামনে লেখক ধরে দিয়েছেন তাতে বাস্তবিকই তাঁর রুচিজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাল্লা নাট্য জগতের কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই প্রতিষ্ঠানে যোগদিয়ে এই নাটকখানিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বহু দিন পরে শ্রীমতী প্রভা অভিনয় আমরা দেখলাম। বাল্লার এই

কাপড় ছাড়া, অস্ত্র কাপড় স্পর্শ করবো না, তাহলে ঐ গলে বেরিয়ে যাওয়া ৩৫ কোটা টাকার মালিক হবে, তোমার অর্দ্ধে ক্ষুধা লাগবে। "বন্দে মাতরম"।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা দ্রৌপদীর ভূমিকায় যে অপূর্ণ অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা একমাত্র তাঁর মত অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব। জীবন সুখোপাধ্যায় এর ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ এর ভূমিকায় অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। এর পরেই মনে হয় নাম ভূমিকায় শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)র অভিনয় এর কথা। দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর অভিমুখ্য স্থান স্থানে উচ্চাঙ্গের হলেও সব ব্যঙ্গ্যার তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় কল প্রদর্শন করতে পারেন নি। অর্জুনের ভূমিকায় অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘটোৎকচের ভূমিকায় গণেশ গোস্বামীর, দ্রুপদার ভূমিকায় সন্তোষ দাস ও কৃষ্ণের ভূমিকায় গিড়েখর গাঙ্গুলী চমৎকার অভিনয় করেছেন। ভীমের বেশে পুত্রপতি শামসুর অভিনয় আমাদের তৃপ্ত করতে পারেনি।

দৃশ্যপটগুলি খুবই ভাল হয়েছে। মোট-কথা এই নাট্যগৃহে দেখিন আমরা যে অপূর্ণ জনসমাগম দেখেছিলাম তাথেকে বেশ বোঝায় যে ভাল নাটক হ'লে তার দাম দর্শকরা দিতে জানেন।

নারী ধর্ম

শ্রীযুক্ত হেমেন মজুমদারের পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটারে 'নারী ধর্ম' অভিনয় চলছে। বইখানা লিখেছেন শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়।

নাট্যকার নানা বিষয় বস্তুর মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীর লতীত্বের মূল্য

পদার্থব্যাধার বা সামাজিক অবস্থার কোন তফাৎ আছে কিনা? এই নাটকের মধ্যে তিনি তিনটি নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তিনটি নারীরই সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। কিন্তু তাদের লকলের কাছেই লতীত্বের মর্যাদা ছিল সমান।

অভিনয় এর মধ্যে প্রথমে মনে পড়ে কাম্বীর ভূমিকায় শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ) এর অভিনয়। নারা নাটকখানি শ্রীমতী হাতে লাগে ও নৃত্যে মুগ্ধ করে তুলে রেখেছে। শ্রীমতী তপতী বস্তুর 'দ্বাপ্তি' অভিনয় আমাদের ভালই লেগেছে। শ্রীমতীর ভবিষ্যত ভালই বলে মনে হয়। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দুর্দমনের বেশে কণী গাঙ্গুলী, উদ্বাহ রাজকুমার রূপে উৎপল লেন, অপরন্তর ভূমিকায় কৃষ্ণধন সুখোপাধ্যায়, রাজারূপী ভূমেন রায় এর অভিনয় বেশ ভাল লেগেছে। শ্রীকান্তের ভূমিকায় প্রভাত সিংহ মহাশয় সবলময়েই বেশ একটা সংগত ভাব বজায় রেখে নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পেরেছেন।

এই বইখানার পুর লংঘোজনা করেছেন স্বনামধন্য নট শ্রীযুক্ত রঞ্জিত রায়। তাঁর কার্য তিনি বেশ প্রশংসনীয় ভাবেই সম্পন্ন করেছেন। দৃশ্যপট পরিবর্তনা ভালই হয়েছে।

চক্রধারী

পুরাতন মিনার্ভা সম্প্রদায় সম্প্রতি 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে যে বইখানি অভিনয় করছেন তার নাম হচ্ছে 'চক্রধারী' এই বইখানির প্রযোজনা কার্য করেছেন শ্রীযুক্ত কালী সেনগুপ্ত ঘোষ। আর বইখানা লিখেছেন শ্রীযুক্ত মক্কেল গুপ্ত।

দ্রুপদা লবন এর কাহিনী নিয়েই এই নাটকের রচনা। নাট্যকার বেশ চমৎকার ভাবেই একে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের সামনে ধরে দিতে পেরেছেন।

গোরা
গোরা

* ৬ষ্ঠ সপ্তাহ *

চিত্রা

ফোন বি. বি. ১১৩৩

১৭ই সেপ্টেম্বর
হইতে... দেশের মাটি

নিউ সিনেমা

ফোন : কলি : ৫৮১৯

মোহন পিকচার্সের নূতন খিলার

চাবুকওয়ালা

ছবিখানি সপরিবারে নিশ্চয়ই দেখিবেন

১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে
নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

দেশের মাটি

(বাংলা সংস্করণ)

বুকিং আরম্ভ - ? ? .

৩রা সেপ্টেম্বর
শনিবার

রূপবানী

ফোন : বি. বি. ৩৪১৩
অগ্রিম সিট রিজার্ভ করুন

শুভ-উদ্বোধন

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
আধুনিক সমাজ-চিত্রকাহিনী

অভিনয়

অভিনয়

শ্রেষ্ঠাংশে : সাধনা বসু

অরুণ, ধীরাজ, প্রতিমা প্রভৃতি

N: I. P.

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড, ফোন : সাউথ ৩৪

শনিবার ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে

জনসম্মিলন ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

নিউ থিয়েটার্সের অমর অবদান

বিদ্যাপতি

ভূমিকায় : কানন দেবী, ছায়া দেবী,
পাহাড়ী সাগাল, দুর্গাদাস ব্যানার্জি।

কবি শ্রীযুক্ত শিমল চন্দ্র ঘোষের
নূতন কাব্যগ্রন্থ

জীবন ও রাত্রি

বাহির হইয়াছে, মূল্য এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

নালন্দা ইউনিভারসিটি প্রেস

২৪এ মোহিনী মোহন রোড, কলিকাতা।

৪৩ নং চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ; কলিকাতা।

অভিনয় এর দিক থেকে আমরা ব্যক্তি-
বিশেষের ওপর কোনরকম কৃতিত্ব বিতে
স্বাক্ষর নই। তবে একথা জোর করেই
বলা যায় এই সম্প্রদায়ের যে চমৎকার
'team work' আছে তা উপস্থিত কোন
সম্প্রদায়ের মধ্যেই নেই। আর সেই 'team
work' এর জন্তেই এদের সব বই success-
ful হয়।

স্বল্পরূপে শংকর তাঁরা পূর্ণ গৌরব
অক্ষর রেখেছেন। স্বল্পরূপের বেশে স্বল্পরূপী
অভিনেত্রী নীতানীর অভিনয় নতিই এ বই-
এর একটি আকর্ষণীয় বস্তু। প্রত্যাশের
ভূমিকার জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় আমাদের
হাতেই ভাল লাগেনি। হালির খোরাকের
জন্তে এ বইয়ের মধ্যে গোপাল ভট্টাচার্য্য
ও সুকল জ্যোতির দ্বারা যে 'বলীকরণ' বিভাগ
রূপ-সুটিয়ে তোলা হয়েছে তার মধ্যে যেখান
পরিমাণে হালির খোরাক থাকলেও—সুকলির
খোরাক নেই। অভিনয় এর দিক থেকে
চমৎকার অভিনয় করেছেন গোপাল বাবু।

এছাড়াও এই বইয়ের নৃত্যের দিক থেকে
কয়েকটি আকর্ষণীয় বস্তু আছে। প্রদীপ
নৃত্যশিল্পি মহারাজা বহু এই নাটকে একটি
একক ও দ্বৈত নৃত্যকলা দেখিয়েছেন।
তাঁর দুইটি নৃত্যই ভাল হয়েছে। শ্রীমতী
রেনুকার নাচও বেশ ভাল লাগল আমাদের।

পটল বাবুর পরিকল্পনার 'চক্রবর্তীর'
মুদ্রণট বিনার্ভা সম্প্রদায়ের নামোপযোগী
হয়েছে।

আমরা এই নাট্যখানির সর্বাঙ্গীন উন্নতি
কামনা করি।

শারদোৎসবে

এবারও স্বর্ণকবচের গ্রাহকগণের যোগদান বাছনীর।
ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সম্মানীপ্রদত্ত, সর্বপ্রকার রোগ
আরোগ্য ও কামনা পূরণকারী "স্বর্ণকবচ" পত্র
লিখিলেই সর্বদা সর্বত্র বিনামূল্যে পাঠান হয়।
শক্তি ভাণ্ডার, পো: আউলিরাবাহ (শ্রীহট)



শ্রীমতী গুপ্ত

ক্যারোল লঙ্কাডের প্রচার-

পিপাসা

পাবলিশিটি বা প্রচার কার্য্য চায়াচিহ্নের
প্রাণ বললেও অভ্যাস করা হবে না। চিত্র
লাকলের ভিত্তি—পাবলিশিটির জাকজমক।
চিত্র সংগ্রহ শিল্পী মাঝেই যে স্বনাম
প্রচারের জন্ত বিশেষ লাগতিত হয়ে
থাকেন, তা' বলা বাহুল্য

সম্প্রতি শ্রীমতী ক্যারোল লঙ্কাড স্বয়ং
প্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে এক মূর্তন
অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। ওর অন্ত
প্রতিভা অভিনব প্রচার পদ্ধতির নব নব



ক্যারোল লঙ্কাড

পরিকল্পনার রেখাপাত করে চলেছে। তাই,
মুহু গুপ্তন আলোড়নে আজ লম্বা হলিউড
চঞ্চল।

প্রচারের অধম্য পিপাসা শ্রীমতীকে
অনেকদিন আগেই পেয়ে বসেছিল। এদিক
দিয়ে প্রচার বিভাগের পরিচালকদের সঙ্গে

তার ছিল একটা অবিচ্ছেদ্য মধুর লবঙ্গ।
স্বকীয় প্রচার কার্য্যে নানাতাবে তিনি এদের
প্রাণণ লাহায্য করে এনেছেন এবং প্রচার
ক্ষেত্রে গতাভুগতিকতার দ্বারা ভ্যাগ
করে এটা নব্য প্রাতিষ্ঠা করবার
প্রচেষ্টার যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন।
হলিউড প্রচারকার্য্যের অপূর্ণ মৌলিক
ও অভিনবের জন্ত কর্তৃপক্ষের মতে
অনেকখানি প্রশংসাই শ্রীমতী লঙ্কাডের
প্রাপ্য।

সম্প্রতি শ্রীমতী মেল্লনিক 'ইন্টার-
জাশানাল নিউজ বুরো' নামক সংবাদ
প্রতিষ্ঠান নামে স্বাধীনভাবে একটি অফিস খুলে
বসেছেন। ইতিমধ্যেই, একটা টাইপরাইটার
চারটে টেলিফোন ছয়জন লেক্টারী এবং
একজন অফিস বেরদা এশে গেছে।

পুরোদমে কাজ চলবে বলেই মনে হয়।

নবরূপে কে ক্রাসিন্স

রূপী অভিনেত্রী চিত্রাবরণ করছেন
নবরূপে 'বি যুগ্মেন আর লাইক হ্যাট'
নামক রমধূর বাণীচিত্রে। বিবাহিত
জীবনের একটি কৌতুকময় হাস্যরস লব্ধি
লব্ধ পর্যায় এই দ্বারা ছবিখানির অত্যন্ত
বিষয়বস্তু। শ্রীমতীর অত্যন্ত ছবির মত
এতে জাকজমকের তত বটা নেই, শুধু
আছে দর্শকসমাজকেই আনন্দের রসমাগরে
নাকানি চোবানি খাইয়ে তার অন্তরঙ্গ
করতে পারে। এমন একটা লব্ধ সুলভ
গল্প। প্রকাশ, জীব ভূমিকা অভিনয়কালে

শ্রীমতী জ্যাকলিন যে গর্ভিতা রমণীর সর্বাঙ্গ
সুন্দর চরিত্র চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তা
নতাই অপূর্ণ। স্বামীর ভূমিকার প্যাট ও
ব্রায়েনও চমৎকার অভিনয় করেছেন।



কে ফ্রান্স

বিজ্ঞাপন ব্যবসায় স্বামীর সঙ্গে পাল্লা
হিতে গিরে জ্বাকে শেষে কি করে তার
কাছে হার স্বীকার করতে হলো—তাই
জীবনানার মূল কাহিনী।

কে আগে বাবা হতেন !!...

ডিক পাওয়েল আর এ্যালেন জেকিনস্
হুজনে তুলল তর্ক—কে আগে বাবা হবে ?
ডিক না এ্যালেন, কে ?...হুজনের প্রত্যেকেই
প্রথম সোভাগ্যের দাবী করতে থাকে।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তভাবে তর্কের
পরিলম্পি ঘটলো, কারণ গলার জোরে তো
আর এ সমস্তার মীমাংসা হয় না। 'ফলেন
পরিচীরতে' বলে ভাগ্যের হাতে কলাফল
লগে ছিল হুজনে। তবে, কথা বইলো যে
আগে বাবা হবে অর্থাৎ যার লস্কান আগে
ভয় গ্রহণ করবে, বাজীতে তার হবে হার।

—তথ্য !.....কিন্তু জিত হলো এ্যালেন-
নের। ডিকের লস্কান ভুটিই হবার এক
সপ্তাহ আগেই এ্যালেন জেকিনস্ দে সোভাগ্য
অর্জন করলে। নাম হলো 'জ্যাকলিন'। এক
সপ্তাহ পরে ডিক পাওয়েলের স্ত্রী জোরান
ব্রুয়েলেরও একটি পুত্র জন্ম নিল। ডিক



জন ব্রুডেল

আবার করে তার নামকরণ করলে 'এলেন
পাওয়েল'।

কিন্তু এত কাণ্ডের পর একটি লতি
কথা শুধু চুপিচুপি; যে ছেলেরী আছে
শেটা ডিকের নয়, ওর জন্মের জন্তে দ্বারী
জর্জ বার্নেস—শ্রীমতীর প্রথম স্বামী।

পিকফোর্ডের উইল

চিত্রজগতের অনামমতা তারকা শ্রীমতী
মেরী পিকফোর্ড 'বি মোশন্ পিকচার রিলিফ
ফান্ড'এর নিকট এই মর্মে একটি বিবরণ
প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার উইলে
চলচ্চিত্রজগতের অতিবুদ্ধ ও অকর্মণ্যের
জন্তে একখানা লাক্সান বাড়ীর লস্বাধিকার
হান করেছেন।

শ্রীমতীর লম্বা লম্পতির একমাত্র
উত্তরাধিকারী ওর তথ্য স্বর্গীর পিকফোর্ডের
কন্যা কুমারী পিকফোর্ড; সুতরাং ছারাচিত্র
জগতের দুঃস্থ শিষ্যদের উদ্দেশ্যে পিকফোর্ডের
বিরাট লম্পতির আরও কিয়ৎংশ ব্যয়িত
হবে, আশা করা যায়।

খুচরো খবর

মালিন ডিগেটিচ্ পোবাক পরিচ্ছদ
লম্বকে একটু বাতিকগ্রহ বলে তার বেশ
একটু কুখ্যাতি আছে, কিন্তু তাকেও
ছাড়িয়ে গিয়েছে রোগান্ত কোলম্যান।
সে বলে প্যারামাউন্টের পরিচ্ছদ বিভাগের

তারপ্রাপ্ত মেরেগুলো : কোলম্যানকে খুদী
করা যায়।

'তিভানিরল' লেডী'তে বিজার রজাল
ওর চিত্রনাথী জেমল ট্রাটের অপক্লপ অভিনয়
প্রতিভার কথা বলতে বলতে প্রায়
পাগল হয়ে উঠেছে।...হঃ...ব্যাপারটা বেশ
লন্দেহজনক যে !!...

চাপি চ্যাপলিনের একটি নতুন আবিষ্কার
১৮ বছরের তরু যৌবনে চল চল শুধী
রূপসী ডেরোথী কমিলোর।

'হুয়েজ' ছবিতে এন্ড্রেশ ইউজিনির
ভূমিকায় শ্রীমতী লরেটা ইয়ঙ্গ বে পোবাক-
গুলির সুখস্পর্শ অনুভব করেছেন তাঁর
বাম :—৭৬০০ পাউণ্ড বা ১১৪০০০ টাকা।

মেট্রো গোডুইন মারার 'বি লাইফ অব
মাহাম কুতী'র চিত্রগত ক্রয় করেছেন।...



মীর্ণা লয়

সম্ভবতঃ শ্রীমতী আইরিন ডিউনের ভাগ্যে
চলেছে নাম ভূমিকা।

লম্পতি আবেশিকার একটি লংবাহপত্রের
উত্তোগে হলিউডের নটনটীদের জনপ্রিয়তা
বা শ্রেষ্ঠত্ব লম্বকে বর্শকদের কাছ থেকে
ভোট আহ্বান করা হয়। ভোটে শ্রেষ্ঠা
জনপ্রিয় অভিনেত্রী নির্বাচিত হন রূপসী
তারকা শ্রীমতী মীর্ণালয়।



(বিলাসী)

ট্রাট সিক্সার (সাধী)

জীবনের চলার পথে আমরা চলেছি কত জন কত পথে। লক্ষ লক্ষ চলার পথে এই যাত্রীবাহিনী চলেছে কত হুঃখ কত ঝট বরণ করে—কত অভিজ্ঞতা অর্জন করে। 'ট্রাট-লিফার' এর তুলুহা ও মঞ্জু, এরাও হুঃখ-ময়, কণ্টকপূর্ণ পথে রক্তাক্ত পথে জীবনের চরণ আনন্দ জয়ের আশার আশাব্যবহৃত মত এই পথেরই যাত্রী। তারা নাচে গায়—হুনিয়ার লম্বা মনবকে আনন্দ বিলোতে বিলোতে তাদের কল্পলোকের পথ দিয়ে ছুটে চলে।

এই রকম একটি গল্পকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে তারা ভারতকে উপহার দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন নিউ লিয়েটাল—নারা ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ট্রুডিও। এই ছবির হিরো-হিরোয়িন সেজেছেন লাইগল ও কানন—ভারতের চলচ্চিত্র ললিত রাজ্যে বাব্বের স্থান অতি উচ্চ।

এইরূপ টিম এর পূর্বে আর হয়নি। এই ছবিতেই নেমেছেন শৈলেন চৌধুরী, অমর বল্লিক, জগদীশ শেঠি, বিক্রম কাপুর।

এই চলচ্চিত্রখানির সুরের রাজ্যে অপরূপ নারা জাল বিস্তার করেছেন রাইচাঁদ বড়াল।

ছবিখানি পরিচালনা করেছেন কণি মজুমদার। পি এন রায়ের নিজ তত্ত্বাবধানে ছবিখানি উঠছে।

ট্রুডিও জানিয়েছেন দ্বিলীপ গুপ্ত অতি উচ্চ শ্রেণীর ছবি তুলছেন। লোকেন বসু লাউণ্ডের কাজ এত ভাল এর পূর্বে নাকি করেন নি।

একদিনের সূটিং এর খবর আমরা এখানে দিচ্ছি। খবরটা বজবজের প্রত্যক্ষদর্শী একজন দর্শকের নিকট হতে পাওয়া। 'ট্রাট লিফার' এর ইউনিট গিয়েছিল সূটিং করতে বজবজের গলার। পরিচালক অপেক্ষা করছিলেন জোয়ারের আশায়। গলার তখন তাটা। জল গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাঝ গলার। হঠাৎ এলো বান। এই ইউনিটের প্রায় লম্বা লোকগুলি তখন নেমে গিয়েছিলেন গলার মাঝখানে—ভাটার জলের কাছে। পাড়ের ওপর প্রায় ৭ পাঁচেক লোক অতি দূর গ্রাম হতে যারা লাইগল কাননকে দেখতে এলেছিলেন তারা চোখে অক্ষ করলেন বান আসছে বান আসছে।

লক্ষ লক্ষ লাগের ফণা তুলে মাইলের পর মাইল ধরে ঢেউ ছুটে আসতে লাগল। চীৎকার গোলমাল 'পালাও পালাও', 'উঠে এলো উঠে এলো' চতুর্দিকে হৈ চৈ রব। উত্তাল তরঙ্গময় ভীষণ গলা। নৌকাগুলি ঘোচায় খোলায় মত ভালতে অক্ষ করল। ভীষণ জলের আওয়াজ—বজ্রার গর্গে গর্গে শব্দে ভীষণ তরঙ্গাবাতে লব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। ভাল কানন ভাল তুলুহা। ট্রাট লিফারের লম্বা ইউনিট বিরাট জুপের মত ঢেউয়ের ওপর গড়াগড়ি

যেতে লাগল। চতুর্দিকে চীৎকার 'বাঁচাও বাঁচাও।' কে বাঁচার—কাকে বাঁচার। জল জল জল আর জল।

পরিচালক কণি মজুমদার খপ করে কাননের হাত ধরে ফেলেন। ঢেউয়ের মুখে ভেলে যাওয়া কানন রক্ষা পেল। লম্বা হলটা লোকেশন থেকে অতি দূরে গলার ধারে একটা গাছের গোড়ায় আঁটকাল।

কানন ডাকার উঠে তখনও হাসছে। খিল খিল হেসে বসে : বেশতো ভেলে যেতাম অতি দূরে কোন গ্রামে তারপর আবার কোলকাতা ফিরতাম লতিফার 'ট্রাট লিফার' হয়ে। লাইগল বসে : লেই ছিল ভাল। লাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার লোকেন বসু বলেন—'বত্মা আমার প্রথম ছবি আমার তোলা আছে; দাঁড়ান এইবার আশাব্যবহৃত মাটির স্পর্শ পাওয়া ছবিটি গ্রহণ করি।

এর পরেও কণি মজুমদার লক্ষ্যে পর্যন্ত ছবি তোলার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন।

দেশের মাটি

'দেশের মাটি'র হিন্দি সংস্করণ বাড়লার বাহিরে খুব ভালভাবেই চলেছে। নূতন আদর্শ মানুষ সামনে দেখতে চায়। তাই এ ছবিতে যে নূতন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা লক্ষ্যকেই সঙ্গতি করতে পেরেছে।

বাঙলা সংস্করণ আসছে ১৭ই সেপ্টেম্বর নিউলিনেনমা ও চিত্রার একই সঙ্গে মুক্তিলাভ করবে।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

দেশের মাটি

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

ষড়দিদি

গেল লপ্তার ডাইরেক্টর অধর মল্লিক তাঁর নতুন শেট নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধান করতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যে ললিত পরিচালক পঞ্চম মল্লিক কয়েকটি হিন্দি ও বাঙলা গানএর টেক নিয়েছেন।

জীবন মরণ

নাভান বাবু পরিচালিত 'জীবন মরণ' বা 'হৃদয়'এর কাজ বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

গেল লপ্তার 'ক্লিনিক'এর শেট কার্য শেষ হয়ে গেছে।

বিশ্বের বাঁশী

ডাইরেক্টর দেবকা বহু মহাশয় তাঁর বহুয়ের মহলা পুরোদমে চালিয়েছেন। ২১ দিনের মধ্যেই সুটিং আরম্ভ হয়ে বাবে। ভোটা হ বাবু তাঁর হৃদয় লহকারী ছাড়া ও মাস্তার দ্বারা প্রথম সুটিংএর যাবতীয় ব্যবস্থা শেষ করে ফেলেছেন।

শ্রীভারত লক্ষ্মী

আমরা গতবারে জানিয়েছিলাম যে শ্রীযুক্ত হুর্গাবাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে 'পংশমনি' বই-এ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্য নিউ থিয়েটার্স-এর কর্তৃপক্ষের কাছে 'Loan' এর ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে। লক্ষ্মী আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানলাম যে হুর্গাবাস ছুটি মজুর হয়েছে এবং ভারত লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর এক বছরের চুক্তি হয়েছে।

জনকনন্দিনী

রাধা কিশোর উক্ত বইএর সুটিং কার্য বেশ দ্রুতগতিতেই চলেছে।

গেল লপ্তার যে দৃশ্যটা তোলা হ'ল তাতে দেখা যায় যে রাজপ্রাসাদে জনকরাজ কর্তৃক 'শিবধর' গ্রহণ। এখানে তুলসী চক্রবর্তীকে রাজা জনক, দেববালাকে রাণী,

মনোরঞ্জন তটাকে পরশুরাম, লাবিঙ্গীকে নীতারূপে দেখা গেল।

নরনারায়ণ

ডাইরেক্টর জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছবির পরবর্তী দৃশ্যের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এখানে দেখা যাবে রাণী জাম্ববতী আর তাঁর লবী জয়ন্তার সঙ্গে লতাতামা মিলন। এই তিনটি চরিত্রে অভিনয় করছে রেণুকা রায়, রাণীবালা ও শীলা হালদার।

যথের ঘন

ডাইরেক্টর হরি ভক্ত তাঁর 'যথের ঘন'কে আগলে নিয়ে চলেছে। সেদিন তিনি 'বাঙ্গলো' দৃশ্যের কাজ শেষ করলেন। এই দৃশ্যে ভিলিয়ান করালী তার বলবলসহ তিনজন নিদ্রিত ব্যক্তি বিমল, কুমার ও রেখার ওপর আক্রমণ করে। করালার ভূমিকায়— অর্জুণ চৌধুরী আর বিমল, কুমার ও রেখারূপে দেখা যাবে যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী, জুগীলা রায় ও শীলা হালদারকে।

বেকার নাশন

মতিমহল থিয়েটার্সের হাল্যরনাট্যক ছবি 'বেকার নাশন' উত্তরা চিত্রগৃহে বেশ ভালই বর্ষক লমাগম করছে।

ক্যালকাটা সিনেটোন নিউজ

এই নামে একটি নতুন চিত্র-প্রতিষ্ঠান লক্ষ্মীভ গড়ে উঠেছে। "খাটির মারা" নামে ছোট একটি গীতিনাট্য তোলা হচ্ছে—সহকারী পরিচালক কুমার দেন আগামী লপ্তাহের আটটোডোর লোকেশন নিয়ে বড় ব্যস্ত আছেন। চিত্র গ্রহণ কোরছেন তরুণ চিত্র-শিল্পী অজিত দেন। লক্ষবস্ত্রের কাজ কোরছেন—সন্তোষ হাজরা।

চিত্রা

আগেই শনিবার থেকে 'গোরা' এখানে ৬ষ্ঠ লপ্তাহে পড়বে। 'গোরা'র বর্ষকলমাগম এখন বেশ ভালভাবেই চলছে।

পূর্ণ থিয়েটার

বিভাপতি পঞ্চম লপ্তাহেও বেশ আদর লরগরম করে রেখেছে।

আগেই ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে এখানে নিউ থিয়েটার্সের লামাজিক চিত্র 'অভিজ্ঞান' দেখান হ'বে বলে আশা করা যায়।

নিউ সিনেমা

শনিবার শনিবার থেকে এখানে 'চাঁদ-ওরাণী' দেখান হ'বে। এতে অভিনয় করছে আজুদী, দিরাফ, তুলতান আলান, রমিলা, কমলাবাসী প্রভৃতি।

রূপবাণী

শ্রীমতী লাবনা বহু নৃত্যে, গীতে অভিনয়ে শুধু অসাধারণ কুশলতার পরিচয় দেন নাই; তিনি বাঙলাদেশের ছায়াচিত্রজগতে এইটী ব্যক্তিত্ব।

সুসাহিত্যিক মনমথ রায় রচিত 'অভিনয়' আধুনিক লমাজের হৃদয়সুভূতিয় বিশিষ্ট বিশ্লেষণ। এমনি একটি কাহিনীই শ্রীমতী লাবনার প্রতিভার যোগ্যতর বিকাশক্ষেত্র। শিল্পী লমাবেশে এই কথাচিত্রটি বিশেষভাবে একটি আকর্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। অর্জুণ চৌধুরী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধারাজ তটচাষী, রবি রায়, তুলসী গাঙ্গুলী, বিহুত গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পী লমাবেশে চিত্রটি যে অভিনয়ের দিক দিয়া বিশেষ উপভোগ্য হইবে তাহা অলঙ্কোচে বলা যায়। 'অভিনয়' চিত্রটি-র প্রযোজনায় শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচাল অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। 'অভিনয়' রূপবাণীতে যে বিশেষ চঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে তাহা বলা বাহুল্য।



বিবিধ

কলিকাতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

তৃতীয় বর্ষ—১৯৩৮

আগামী শুভ-মহালয়া দিবসে উক্ত প্রতিযোগিতার পুংকার বিতরণী সভা এবং সঙ্গিনীর আদর হইবে। উক্ত দিবসে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকা উক্ত আদরে সঙ্গীতের ভার লইয়াছেন। কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, সাংবাদিকগণ, এবং কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নৃত্য-শিল্পী উক্ত আদরে উপস্থিত থাকিবেন

সঙ্গীত সন্মিলনী

আগামী শনিবার ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যা নাড়ে হুইটার সঙ্গীত সন্মিলনীর মাসিক সভার অধিবেশন হইবে।

বিষয় :—(১) স্মৃতি বার্ষিকী সভা

(ক) ৬দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) ৮অতুল প্রসাদ সেন বিখ্যাত গায়ক গায়িকাচার্য পরলোকগত মহাপুরুষের রচিত সঙ্গীত চর্চা।

(২) বঙ্গ সঙ্গীত

দ্বিতীয় বার্ষিক বঙ্গ-সাহিত্য

প্রতিযোগিতা

৩৮এ, বলরাম বসু ষাট রোডস্থ অর্চনা পত্রিকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত, দ্বিতীয় বার্ষিক বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিযোগিতার রচনা প্রেরণের সময় ১১ই তাত্র হইতে ২০শে তাত্র ১৩৪৫ লাল পর্য্যন্ত বর্ধিত করিয়াছেন।

রচনার বিষয় :—

(১) হিন্দু-মুসলমান সমতা ও তাহার সমাধান। (১০০০ শব্দের মধ্যে)

(২) ছোট গল্প।

(৩) কবিতা।

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্মল কুমার সুর

প্রথম পর্ষ্যায়

অজয় যদি জানতো কাব্যজগতের পাথে বাস্তব জগতের এতখানি পার্থক্য—তাৎ'লে ওর কাব্যস্পৃহা বাস্তবের উত্তাপে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যেত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর কোথায়? মানব-মনের রহস্য অনন্ত। সে রহস্যের দারোদাটন করা সহজ সাধ্য নয়। নিরন্তর পরিবর্তনশীল জগতের কন্দরে কন্দরে অলক্ষ্যে কত ফুল ফোটে, নবার অলক্ষ্যেই তা আবার ঝরে পড়ে। সন্ধান তার ক'জনই বা রাখে?

অজয় ছিল সত্যিকারের কবি—অস্তরে ও বাহিরে। কলেজে থাকতেই, প্রফেসর বধন বুঝিয়ে যেতেন অঙ্ক—বাইনোমিয়াল থিওরেমের কুট বিবর্তন, বোর্ডের গায়; ও তখন তাৎ'থেকে বুঝে বার করবার চেষ্টা করতো কবিতার রাইম। শোজা শোজা লাইনগুলো সাজানো পর পর বোর্ডের গায়। বাংলা ভাষার অক্ষর ও গুলো না হ'য়ে— হলোই বা অঙ্ক শাস্ত্রের নির্ভরক লংখার শ্রেণী। তবুও একটা প্রতিপাত্ত জিনিষকে নিয়ে লাইনের পর লাইন সাজিয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে আনা। কবিতার উদ্দেশ্যও তো একই। কতকগুলো কবিতা হয় মিষ্টিক ধরণের—লোকে বলে ভাব-সম্পদে ঠালা। অঙ্কগুলোও তাই। ক'জন ছেলের কাছে ওর আলল অর্থ ধরা পড়ে? হ্যাঁ সবই কবিতা। অঙ্কশাস্ত্রও কবিতা, রাতাহিরে ঝন্ ঝন্ করে হ্যাঙ্কড়া ঘোড়ার গাড়ী চলে তাতে বাজে কবিতার রাইম। আদালতে পেরাধা আদালী ডাকে—'বানোয়াটীলাল

হাজির হার?' সেখানেও কবিতার ছন্দ। রাত্তা ঘিরে চলে অগণিত মানুষ, প্রতিজনের পদ-ক্ষেপে বাজে কবিতার নাচন তাল। মানুষ হালে, মানুষ কাঁধে তাতেও কবিতার রূপ।

ডোঃ প্রেম
বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড়

ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

মোট কথা কবিতা অনন্ত। জগতের কোণে কোণে, গ্রহ তারকার, লাগনজলে বোল খায় কবিতা স্রাব্য। শারী ছনিয়াটাই কবিতা—ইন্-এ নাটশেল।

তাই বলছিলাম অজয় ছিল লতিকারের কবি—প্রাণ। ছনিয়ার আর সব কিছু, ওর কাছে লুপ্ত। হরিত্রের কুটীরে কুটীরে, রাত্তার অন্ধকারের কোণে কোণে, বাহুর লক্ষিত আশা যেখানে হাহাকার করে লুটিয়ে পড়ে, যেখানে চলতো ওর কাব্যের উপাধান সংগ্রহ। কমল-বিলাসী কবি ও নয়। হৃদে হৃদে করে পড়ে আগুনের বলক, লাইনে লাইনে কেঁধে ওঠে রুদ্ধ বেদনার গুমরানি।

বাপের ওর খুব বেশী পরলা ছিল না—তবু পরিত্যক্ত লংদার তাঁর চলে যেত লজ্জাই। আড়ম্বরের আধিক্যবিশীন স্বচ্ছ জীবন যাত্রা। ও ভাবতো নাইবা থাকলো ওর মোটর গাড়ী, ব্যাকের মোটা অঙ্ক। বাইরের লম্পটাই কি সব? দেশের মাঝে অগণিত লোক ক্ষুধার আঁলার চিবার গাছের পাতা, তাঁদের পেটের খাবার কেড়ে নিয়েছে কে? শতজন হরিত্রের অঙ্গে ভাগ বলিয়ে তবে না একজন বড়লোক ইয়ারং গাড়ে, মোটর হাঁকার ওদের বুকের পঞ্জরে পঞ্জরে? আর এও তো ঠিক যে বাইরের এই লম্পট—তাকে তো খরচ করে শূন্য অঙ্কে টেনে আনা যায়। ইঁা ওত পড়েছে লেই কোন্ ছোটকালে—‘অর্থই যত অনর্থের মূল’। লতাই কি তা নয়?

অন্তরের লম্পটই তো আলস। তাকে কেউ স্রিয়মান করতে পারে না। খরচ করলে বেড়েই চলে; নিঃশেষ হয়ে বাবার ঠিক উল্টো। হেঁড়া কাপড় হরতো ওর দৈত্যকে চাপা দিতে পারে না—সাকে হাদে। কিন্তু ওরা কি লজ্জান রাখে অন্তর-লম্পটের। সেখানে যে নিত্য নতুন ভাবের খেলা। কত অর্থ এসে পড়ে ওর এই মলিন চরণে, অর্থাৎ ওর অন্তরলম্পটের চরণে। ছনিয়ার

শারী লোক ওরদিকে তাকিয়ে থাকে। ও লিখেছে বা ও লিখবে তাতেই না কত লোক বড় লোক হবে; বাড়িয়ে তুলবে জমার অঙ্ক? তাতেই না দেশ-বিদেশের লোক চিনবে বাঙালীকে। রবীঠাকুর খানিকটা এগিয়ে দিয়েছেন দেশকে। বাঙালীকে, তার বাঙালীকে জগতের নামনে দাঁড় করিয়েছেন—তার মুখে কাব্যের কোকাল ফেলে। ও তাকে ছীপালোকের মালায় লাগাবে। কাব্যলোকের, সাহিত্য-লোকের গেটপাশ দিয়ে তাকে নিয়ে বসাবে জগৎমতার মাঝখানে।

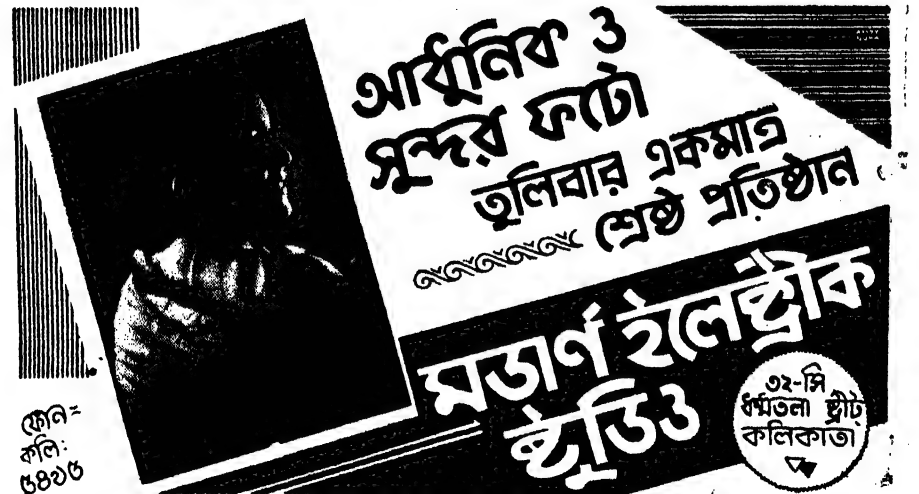
কলেজ থেকেই আমার ছাড়াছাড়ি। একই লহরে বাল, আর একই কলেজের লহপাঠি, তার ওপর আমি ছিলাম বিশেষ করে ওর সমঝদার। আমি ছিলাম ওর বাল্যবন্ধু, বিশেষ বন্ধুও বটে। সেই স্ত্রেই ওর গোড়ার ইতিহাসটা ছিল আমার জানা। কে জানে হরতো একদিন একটা হিশাব করা হবে—কতজন প্রতিভার অপসৃত্য হ'য়েছে। লেখা হবে তাঁদের জীবন কাহিনী—পথিককে সাবধান করতে দেই কারণটা ছেঁদে, যে কারণে তাঁদের প্রতিভা করেছে আত্মহত্যা। লেখিন হরতো আমার এ লেখা লাভকরবে খানিকটা লার্বিকতা।

কলেজ থেকে বেরিয়ে ও নিল আশ্রয় ওর ছোট্ট ঘরটাতে বেখানে আলো প্রবেশ করে লংকুচিত হ'য়ে। ও বলতো—‘আমার অন্তরের আলোকই বখেটে। আর অন্ধকার না থাকলে আলোর বিকাশ লাভ বটে না পূর্ণভাবে, তাঁতো জানিন্স অদিত’।

কলেজে থাকতেই বেকত ওর লেখা মানিকে, লাগাইকে। কলেজের যে কোন কাংশানে তাই ওকে দিয়ে পড়ানো হতোই কিছু না কিছু। লরহতী পুজোর তি থির থলড়া থেকে মার ম্যাগাজিনের লম্পাহনা পর্যন্ত ওকেই দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হতো।

চাকরী নিয়ে বিশেষে গেছি চলে। খবর ওর বিশেষ কিছুই পাই না, সে আজ অনেক দিনের কথা। আর রাখবারও যে বিশেষ চেষ্টা ছিল তাও বলতে পারি না। তবুও ওকে আমার বেশ ভালই লাগতো। তাই মাঝে মাঝে ওর কথা ভাবি। ওর জীবনের বহুমান প্রতিটি দিন হরতো স্বপনের রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। কলনার কত কণাই আমি ভেবে যেতাম যখন পড়তাম ওর লেখা মানিকের পাতায়।

‘স্রিত্রা’ তখন রেখেছে মানিকের বাজার গাম করে। বড় বড় লোকের লেখার ঠান্ডা। তারই পাতায় মাঝে মাঝে ওর লেখা পড়ে



আর্যুনিব 3
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
মডার্ন ইলেক্ট্রিক
স্টুডিও
৩২-সি
৪৪তলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন =
কলি:
৬৪৩৬

বিবেশেই অস্তিত্ব করতাম গর্ক। পাঁচজনকে
ভেঁকে বেখাতাম—বেখতো এ লেখাটা
কেমন? স্টের কারবা আছে না? বর্ণনার
মার্ফা অপরূপ। হুয়ে হুয়ে কুটে উঠেছে
জীবন্ত হবি। কেমন তাই না? জানো
লেখাটা কার? তোদের প্রিয় লেখক গো।
অজর বোল। আমারই ক্লাশ-বেট বলে
নিজেই একটু গভীর হয়ে চেয়ে থাকতাম
লবার বুকের দিকে।

সুচিরা বরাবরই কিনতাম। প্রতি-
লংখ্যাতেই আশা করতাম ওর লেখা।
কিন্তু তাকি লভব? না তা ভালো?
রবীন্দ্রসুই একঘেয়ে হয়ে গেল পাঠকের
কাছে প্রতিলংখ্যাতে লিখে লিখে। ও
বখন বা কিছুই লিখতো তাই জীবন্ত হয়ে
ধরা দিত পাঠকের কাছে। কখনও বা
কাব্যতো ও ওর পাঠককে আবার কখনও
হালির মাঝে শিবিয়ে দিত দেশের বর্তমান
লম্ভার লম্ভাধান।

সুচিয়ার গ্রাহক আমি তাই নিয়মিত।
কিন্তু কিছুদিন অজর বোসের নাম সুচিয়ার
পাতা থেকে মারলো ডুব। ভাবলাম—আজ-
কাল হয়েছে এক ক্যালান হুয় নামে লেখা।
ও হয়তো ধরেছে সেই রাস্তা। ওই যে
'ধুতরাট্ট' বলে লেখক সেই হয়তো অজর
নামটাকে রেখেছে লুকিয়ে। কিবা 'কাশ-
কুল' ইত্যাদিরা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে
বেশী, অস্তিত্ব: নামের বাহাদুরীতে। অমূল্য,
গদ্যবর, অজর—এসব আর ক'জনের
সাধারণত: মনে থাকে? না:, অজর বোসের
বুদ্ধি পেয়েছে। --আবার ভাবি—তাইতো
—নৌলিমা বোল তো অজর বোল নয়?
ভগবানই জানেন। প্রিয়ার নামকে হয়তো
অজর করে রাখবার চেষ্টা।

কেটে গ্যাছে বছর কয়েক। একঘেয়ে
জীবনে আলে বিরক্তি। তাই ওরি বাব
বদলিয়ে নেবার জন্যে দুটর ধরখাত। এলাস

কিবে বাংলা বায়ের ভ্রামল কোলে, একে-
বারে কলকাতার বুকে—বেখানে ভ্রামলিবার
লেশ মাত্র নেই। জীবন্ত মোট-বাট নিয়ে
উঠলাম ভবানীপুরে, যানে ভর করলাম
খণ্ডর মহাশয়ের কক্ষে।

দেখিন পুরানো সুচিরা ওলটাতে
ওলটাতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল অজরের
কথা। তার ওপর সেই যে এঘের বাড়ী এসে
চুকেছি আর বিশেষ কোথাও বেরুনোও
হয়নি। এরাই বা মনে করবে কি?
ভাবলাম অজরের সাথে একবার দেখা করে
এলে মন্দ কি হয়। উদীরমান একজন
সাহিত্যিক—বার সাথে আলাপ করবার জন্য
কত লোক হয়তো লাগারিত; আর আমি
কি না এতদিনের বন্ধুকে ভুলতেই চলেছি!

সেইদিন বিকেল বেলাতেই বেরলাম
অজরের বাড়ীর দিকে পুরাতন বন্ধুকে
ঝালিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। রাস্তার বেরিয়ে
ভাবিলাম—কি জানি লেখানে পে আছে
তো? বাইহ'ক একবার খোঁজ করে আশা
বাক্। তবুও মনকে এই বলে শাস্তনা
হেওয়া বাবে যে—চেষ্টার ফ্রটী নেই; লিঙ্গির
তার ভগবানের হাতে।

মাশিকতলার এক অপ্রশস্ত রাস্তা।
২৮নং ই না ছিল অজরবের বাড়ী? চিনতে
পারবো তো ওঘের বাড়ীটা? এতদিনে

কত পরিবর্তন হয়ে গ্যাছে হয়তো বাড়ীটার।
হয়তো বাড়ীটাকে ভেঙেফেলে লেখানে বাবা
খাড়া করে আছে হালকাগানের চমকপ্রব
আর্কিটেকচার। ই্যা তাওতো বটে,
বাগিগজেও দেখিন যে অদুত বাড়ীটা দেখলাম,
সেই যে নাম 'কাব্য-হুয়া' না কি, সেইটাই
তো অজরের বাড়ী নয়? মকলেরই দুটি
আজকাল ওই পাড়াটার দিকে—বেটা ছিল
এই কিছুকাল আগেও একটা পোড়া মাঠ।
ওই পাড়াটার কথা ভাবলে অসিং আশ্চর্য
হয়ে যায়। এই দেখিনও ও যেখে গেছে
ওর পূর্কীবস্থা। আলাদিনের প্রাণীপের
শক্তিতে ও যেন রাতেই বদলে গেছে।
বাইহ'ক বাড়ীটা লব্ধে একবার খোঁজ
নিলেই হোত। অনর্থক হয়তো এত দুঃ
আশা আর ভোগান্তি।

ই্যা এই তো আটাল নম্বর। বাড়ীটা
এখনও আছে দেখ'ছ। কিন্তু অজরের বদলে
ওর ভাড়াটিয়া হবে না তো ভাড়া?

অজর! অজরবাবু!

ডাকবো নাকি 'কাশ-কুল' বলে? অথবা
'ধুতরাট্ট'। উই নৌলিমা দেবীই হয়তো বা
হবে। কি জানি কি ব্যাপার। তার চেয়ে
অজর বলেই ডাকা বাক্।

(ক্রমশঃ)

৬ই সেপ্টেম্বর ৭ ঘটিকার

শিশির কুমার ইনষ্টিটিউট কর্তৃক

রঙমহল রঙ্গমঞ্চে

অভিজ্ঞান

টিকিট প্রাপ্তিস্থান:

১। শিশির কুমার ইনষ্টিটিউট

৭১১ বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

২। মি: অমির মোহন
যুগান্তর অফিস

১২ ভ্যালি টার্ন রো, কলিকাতা।



শনি-জীবনীর খসড়া

বর্তমান প্রাবণের লংখায় শনির “বাণু” লিখিরাছে—“হয়তো কবিতার যুগ শেষ হইরাছে, কিন্তু “শনিবারের চিঠি”র পাঠকেরা সে কথা মানেন না। তাঁহারা বলেন— এককালে ‘শনিবারের চিঠি’র—বিশেষত্বই ছিল কবিতা; ঐতিহাসিক গোবেগার তাহার অপমৃত্যু আমরাই লাভ করিয়া ঘটাইতেছি।” ‘শনিবারের চিঠি’র খোকাটির বয়স এখন দশ-বর্ষ দশ-মাস। এই খোকাটি যখন মাস আঠেকের ছিল, তৎকালে প্রকাশিত “মহাকাল” পত্র ইহার “বিশেষত্ব” লক্ষ্যে কি বলিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। খোকা এখন ঐতিহাসিক গোবেগার ব্যক্ত, কিন্তু তখন কিশে হনহর ছিলেন, কবিতার না অস্ত্র কিছুতে, এবং যদি কবিতাই হয়, তা হইলেও বা সে কেমন কবিতা, তাহা লক্ষ্যকালধর্মা “মহাকালের” পক্ষপাতশূন্য জবানীতেই তনিয়া রাখা ভাল। এই জবানীর মারফৎ শনি-জীবনীর যে খলড়া খাড়া হইয়া উঠিবে, তাহাতে শুধুই শনিগ্রহ নয়, শনি-চক্রের অনেক গ্রহ-উপগ্রহকেই পাঠক চিনিয়া রাখিতে পারিবেন। ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে “মহাকাল” শনি-জীবনীর বক্ষ্যমান পরিচয় দিয়াছিলেন :

(১) “করেকছিন আগে স্থানীর পুলিশ প্রবানী অকিলে খানাতলাপ ক’রে মুজাকরকে

গ্রেপ্তার করেছিল। ‘শনিবারের চিঠি’ নামক একখানি ইত্তর কাগজ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-পরিচালিত প্রবানী প্রেস থেকে ছাপা হয় এবং সেই ছাপাখানার যিনি মুজাকর তিনিই সেই ইত্তর কাগজখানির সম্পাদনা করেন। সেই কাগজটিতে একাধিক অঙ্গীল বীভৎস ও নগ্ন-কামচিত্র-সম্বলিত লেখা ছাপা হ’য়ে থাকে। সেই অঙ্গীল সাহিত্য প্রচারের জন্তই রামানন্দবাবুর কর্মচারী তথা প্রবানী প্রেসের মুজাকর গ্রেপ্তার হ’ন। তিনি পরে অবশ্ত জামিনে খালাস পান। আমাদের এই লেখার সময় পর্যন্ত মামলার নিষ্পত্তি হয় নি।

যে রামানন্দবাবু অঙ্গীলতার ভয়ে ‘শুক্রবার’ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন না, তাঁরই প্রেস থেকে মালের পর মাল এই রকম এক খানি কাগজ প্রকাশিত হয় (সে কাগজের লেখা এত জঘন্ত ও জননাধারণের পক্ষে এত অহিতকর যে পুলিশ পর্যন্ত সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হয়)—এ অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।”

(২) “অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি শনিবারের চিঠির যে অল্পমুণ্ডপাত তারও পশ্চাতে বহু ব্যক্তিগত কারণ নিহিত আছে। একটা মোটা কথা এই,—লজনী দানের স্বাজে তাবহীন হুম্মীন কবিতা কলৌল-পত্রিকা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, সেই থেকেই শ্রীমতী লজনী কলৌলের উপর ফুর্দ হ’য়ে আছেন।”

(৩) “শ্রীমতী লজনীদানের পত্র কেন “কলৌল” থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল, “বললন্দী”র তাঁর “বার্ঘতা” শীর্ষক কবিতা থেকেই তা ঘোরা যায়।

তিনি নিজের সাহিত্যিক অবস্থাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

‘কুলে ভিড়িবার নাহি আর ঘোর আশা,
তল বিলিবার রয়েছি অপেক্ষার।’
তা আমরা জানি বলেই তাঁর পরকাল ভেবে আমরা অত্যন্ত হুঃখিত। তিনি লিখেছেন—‘ডুবিব কখন তাহার আশার আছি।’ আমরা বলতে পারি, বেশী ঘেরি নেই। কবিতাটিতে তাঁর কবি হবার ব্যর্থতাটি ভাবি করুণ লাগে। তাঁর এই বেধনার মন গ’লে যায়। তার চেয়ে ভাল লাগে তাঁর উদ্ভাদ উলঙ্গ রূপ—শনিবারের চিঠিতে। যেন এক উলঙ্গ পাগল লাম্বেল, কলৌলের লাম্বনে দাঁড়িয়ে লাঠি ঘোরাচ্ছে, তাঁর দ্বিগুণিক জ্ঞান নেই, ‘প্রবানী’র কুকুর থেকে গুরু করে রামানন্দবাবুর দিকে পর্যন্ত লাঠি হাঁকাচ্ছে। লজনীবাবুর এই রূপটিই আমাদের ভালো লাগে।”

(৪) “তারপর শনিবারের চিঠি যখন বিত্তি গুরু করবে তখন ঠেলা বুঝবে। মেয়ে পুরুষ কাউকে রেরাত করে না বাবা—চালাকি নয়। রামানন্দবাবু খাইয়ে গোণা একটি ডজন খেঁকি ঝামু পুবেছেন জানো?”

(৫) “কাব্যে ও জীবনে অলভ্য ও অসুন্দরের সাধনা ক’রের লভ্যসুন্দরের নামে যে নিজের নীচতা ও প্রানি লুকিয়ে রেখেছে সেই মোহিতলাল কবিশব্দ:প্রার্থী শ্রীমতীল কুমার যে নামধের এক অধ্যাপকের বুকের বন্ধ। তাঁরই Patronage তিনি চাকরি চাকরি গেরেছেন—মাণিকতলা থেকে নীল-কেতে এক Ceylonesse লাক ঘেরে।তাই তিনি লভ্যসুন্দর দানের হুন্ননামে হুন্নীলকুমারের চোরাই রচনার করা কিরতি প্রশংসা করে কলৌলে।

এই না হ'লে বহুত। হু'জনে পরামর্শ ক'রে পরম্পরের বিজ্ঞাপন দেবার কি অকৃত বনীবা।.....নইলে সুশীল ছাপলেন মোহিতের অঙ্গাল কবিতার প্রাণনা, আর মোহিত ছাপলেন সুশীলের চোরাই মালের ভতি। অমরুপা দেবী এই সুশীল মোহিতকে গোড়ার ঘিকে একটু মুন খাইরে বেন নি কেন ?

(৬) “জৈনক অধ্যাপক শ্রীমুখীতি চট্টোপাধ্যায় শনিবারের চিঠির দলের একজন। তিনি ঐ ইতর কাগজখানির প্রচারের জন্ত মাদে মাদে চাষা দিয়া থাকেন,—এই কথা শনিবারের চিঠির সম্পাদকই আমাদের জানিয়েছিলেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এই, শ্রীমুখীতী বীনেশচন্দ্র মেন 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে' ভারতীয় মাতৃভাষার প্রাধান না হ'লেও সব চেয়ে ক্ষমতাপন্ন অধ্যাপক। মুখীতি বাবু ঠিক তাঁর অধীনস্থ না হ'লেও তাঁর চেয়ে নিরপহারুত। শুনে থাকি এমন অবস্থার নাকি ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও আক্রোশ জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাপারটা ভালো জানি না, তবে ইতিহাসটা চোখে তারি স্পষ্ট থেকে।”

এবার শনি-জীবনীর খসড়ার এই পর্য্যন্ত। “মহাকাল”-এর উদ্ধৃত লেখার উপর আমাদের চীকা-টিগ্ননী নিম্নপ্রয়োজন। সমসাময়িক পত্রের বিবরণ শনির বেজবাহু বেহবাক্য বলিয়া মানেন। আমরা শুধু অশেষ মতামত বেজনবাহুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, “মহাকাল” পত্রখানি তাঁহার সম্বলিত “দৈনিক সাময়িক পত্রের ইতিহাসে”এ স্থান পাইয়াছে ?

সত্য-সুন্দরী সস্তা দাওয়াই

আপনারা কেন বুঝা হিন্দু মূলমানের মধ্যে ঐক্যতাবন্ধনের জন্তে উপায় উদ্ভাবন করিতে এত মাথা কুটাকুটি করিতেছেন ? মতামতের দ্বন্দ্ব মতামত যে দাওয়াই আবিষ্কার

করিয়াছেন, তাহার খবর রাখিয়াছেন কি ? তিনি শনির প্রাণ মতামত “বাংলা না হিন্দুমানী ?” নামক প্রবন্ধে যে অব্যর্থ দাওয়াই বাতলাইয়াছেন তাহা একবার প্রয়োগ করিয়া দেখুন না ? মতামতের প্রবন্ধের কি grand peroration করিয়াছেন দেখুন— “অতএব বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে,.....ইহার একমাত্র উপায়, মর্দপ্রাণে নিজের মর ভাল করিয়া ঘোরামত করা। বেশের ছই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালীকে ও মূলমান বাঙ্গালীকে এক ভাগ্যমুখে একতাবন্ধ হইতে হইবে। আমার মনে হয়, মুক্ত প্রাণ ও মুক্ত মন গইয়া অগ্রণের হইলে এ কার্য্য দ্রুত হইবে না।” হার ! হার ! এমন সহজ দাওয়াই আমাদের হাতের কাছে ছিল, শুধু বাস্তব অতাবে এতদিন খাওয়া হয় নাই ! মতামতের দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই জাতিতে বৈত, নতুবা এমন নাড়ীজ্ঞান তাঁহার জন্মিল কোথা হইতে। দেখিলেন ত, এক-বারে যথাস্থানে টিপিয়া ধরিয়াছে ! চাই শুধু একটু “মুক্ত প্রাণ”, আর একটু “মুক্ত মন”—এই দুইটি বস্ত, দুইয়ের ফলের রস অমুপানমহযোগে চক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিলেই হিন্দু-মূলমানের একতাবন্ধন দৃঢ় হইবে, “মর ভাল করিয়া ঘোরামত করা” হইবে এবং বর্ষার দিনে ঘরের ভিতর আর বৃষ্টির জল টোপাইবে না। এই “মুক্ত প্রাণ” আর “মুক্ত মন”-এর দ্বন্দ্বও বেশী নয়,—রমণার মাঠে পরনার পাঁচ জোড়া করিয়া বিক্রয় হইতেছে, পরলা দিলেই বাঙ্গালীর জন্ত অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া মতামতের দ্বন্দ্ব ঢাকা হইতে লাগে লাগে তিঃপিঃতে পাঠাইয়া দিবেন ! সুভাষ বহু, শরৎ বহু, যে ‘মুক্ত প্রাণ’ ও ‘মুক্ত মন’ের জন্ত নারা দেশ চুড়িয়া হারমাণ হইলেন, তাহা যে মতামতের কলমের বোঁটার এতকাল পরে আশ্র-প্রকাশ করিবে, কে জানিত ? মতামতের বলিয়াছেন—“বাংলাদেশের জনমাতার এমন

একটি বিশিষ্ট গুণ আছে যে, হিন্দু-হউক আর মূলমানই হউক—প্রাণ মকলেরই এক.....শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের লাড়া মিলিবেই।” বাঙ্গলাদেশের জনমাতার বিশিষ্ট গুণে, প্রাণ যে মকলেরই এক হউয়া যায়, তাহা ত পিরাজদোদা মীরজাকরের আমল হইতেই অস্তাবধি দেখা বাইতেছে। তবে বাঙ্গালী দেশের জনমাতার অন্য বিশিষ্ট গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, এই জনমাতার গুণে এ দেশে যে অথও Idiot-এর সৃষ্টি ক্রতবেগে লভ্য হইয়া থাকে, তাহা ত চাক্ষুষই দেখা বাইতেছে। হিন্দু-মূলমানের একতা-বন্ধনের দাওয়াই বাংলাইয়া মতামতের পর নিম্মপ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—উভয়ের অধীনতা পাশ কাটিয়া বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে। প্রথমে হিন্দু-মূলমানের একতাবন্ধনের উপদেশ, পর-মুহুর্তেই মুসলিম লীগের অধীনতা পাশ কাটাইবার সূত্র—কেমন চমককার consistency ! তাহার উপর আবার আফালন কত ! “আমার একথা শুনিয়া আজ সকলে চমকিত হইবেন জানি, কিন্তু এমন দিন আনিতে পারে, যখন লোকে এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, বাঙ্গালী একদিন ইহা অবিশ্বাস করিয়াছিল।” অর্থাৎ মতামতের যে চমকপ্রব বুলি বাড়িলেন, তাহা অস্তাপি “ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি !” কিন্তু লোকে আর কিছু নয়, এই ভাবিয়া বিস্মিত হইবে, মতামতের ছাপার অক্ষরে এমন “গবেটি-রাবিশ” বাহির করিলেন কিরূপে ?

ঋতু বন্ধ ৪৫ মাস যে কারণেই হউক ভিন্নবী বনৌষধিতে অব্যর্থ ফল—পর্জীবহার ব্যবহার নিষিদ্ধ ১৫০ দস্ত ও বর্ষশান্তি একবার প্রয়োগেই উপশম, ১০ মাঃ ১০ আনা



সমর ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস বনজ বিশ্বাসদাস
১৮২ নং বহাঙ্গার স্ট্রীট, (K) কলিকাতা।

ভারতে নারীত্বের আদর্শ সাবিত্রী

ঈশা বসু সেনগুপ্তা

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে জীবন যাত্রার প্রণালী, রুচি এবং সামাজিক রীতির ও নীতির পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবিক, কিন্তু যে আদর্শ, শ্রেণ, নিষ্ঠা, ত্যাগ, পবিত্রতা ও মহামুগ্ধতা প্রভৃতি চরিত্র ও বিশ্বদায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার পরিবর্তন কোন কালেই হয় না, যুগে যুগে সে আদর্শকে মানুষ পূজা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে নারীত্বের আদর্শ এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এত গৌরবময়। সাবিত্রীর চরিত্রে আমরা এই আদর্শেরই পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ ও বিম্বিত হই, চিত্ত আবার ভক্তিতে অবনমিত হইয়া পড়ে। এই আদর্শ ব্যতীত হইলে সাবিত্রীর উপাখ্যানভাগটী নান্দ্রোপে বলিয়া নেওয়া প্রয়োজন।

পুরাকালে যজ্ঞযেবে অশ্বপতি নামে ধর্ম্মাশ্রম, ভ্রমরবান ও নত্যপ্রতিভ এক রাজা ছিলেন। নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া বিপুল রাজ্যের অধিপতি হইয়াও তিনি অত্যন্ত মনোকাণ্ডে দিন যাপন করিতেন।

ভারপর রাজা নন্দান লাভের আশায় হুনি-শ্রমের উপযেবে কুলদেবী সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে আঠার বৎসরব্যাপী বজ্র করিলেন। আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে সাবিত্রী দেবী নন্দন হইয়া রাজাকে দেখা দিয়া বলিলেন, “ব্রহ্মা আপনায় প্রতি অমুগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই অমুগ্রহে শীঘ্রই আপনার একটি তেজস্বিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে।”

বধাপময়ে রাজার অতি রূপবতী ও সঙ্গুলকণা কন্যার জন্মগ্রহণ করিল। সাবিত্রী দেবীর রূপার এই কন্যা জন্মিল

বলিয়া রাজা রাজকুমারীর নাম রাখিলেন সাবিত্রী। বৃষ্টিবতী লক্ষ্মীর স্তায় সেই রাজকন্যা কালক্রমে যৌবনে পদার্পন করিলেন।

স্বর্ণময়ী প্রতিমার স্তায় রাজকন্যাকে দেখিয়া লোকেরা “ইনি দেবকন্যা আশ্রিতাছেন” এইরূপ বলিতে লাগিল। সাবিত্রীর ভেজে অতিভূত হইয়া কোন রাজপুত্রই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রাজা দেখিরূপীণী স্বীয় কন্যাকে সমতাবহার দেখিয়া অতিমাত্রায় দুঃখিত হইলেন। পরে রাজা বলিলেন, “সাবিত্রী, তোমার লক্ষ্যদান-কাল লক্ষ্যপূর্ত্ত তথাপি তোমার উপযুক্ত পাত্র মিলিতেছে না, সুতরাং তুমি নিজেই উপযুক্ত পতির অন্বেষণ কর। তুমি বাহ্যকে মনোনীত করিবে, আমি বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহার হস্তেই তোমাকে লক্ষ্যদান করিব।” এইরূপ আবেদন দিয়া রাজা স্বামী মনোনয়ন উদ্দেশে সাবিত্রীর যাত্রা করিবার জন্ত যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। সাবিত্রীও পিতার অতিপ্রায়ক্রমে স্বর্ণময়-রথে আরোহণ করিয়া বিবিধ স্থান ভ্রমণ করিয়া এবং রাজর্ষিগণের মনোহর তপোবন সকল দর্শন করিয়া স্বামী মনোনয়নপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেই দিন দেবর্ষি নারদ মহারাজ অশ্বপতির সভামধ্যে উপস্থিত ছিলেন। সাবিত্রী উপস্থিত হইলে তাঁহার উজ্জলমুখপ্রভার সভাগৃহখানি আলোকিত হইয়া উঠিল। নারদ, তাঁহার বিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে অশ্বপতি বলিলেন, “এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে আমি পাঠাইয়াছিলাম এবং এইমাত্র সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সেই বিষয়ে

তাঁহার নিকট হইতেই আমরা এখন স্রবণ করি।” সাবিত্রী পিতার আবেদনে বলিলেন, “শাশ্বতযেবে জাম্ববন্তন নামে অতি ধার্মিক এক রাজা ছিলেন। তিনি পরে অন্ধ হইয়া যাওয়ারোত্তে এবং পুত্র বালক ছিল বলিয়া শক্রগণ কর্তৃক হতরাজ্য ও বিভাঙিত হইয়া পরিবারবর্গ লম্বতিবাহারে বনে গমন করিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত তপস্কর্য্য করিতেছেন। তাঁহার এই পুত্রের নাম সভাবান। আমি তাঁহাকে মনে মনে পতিষে বরণ করিয়াছি।” নারদ বলিলেন, “সভাবান বহিঃ স্বর্ঘ্যের স্তায় তেজস্বী, বৃহস্পতির স্তায় বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের স্তায় বীর, পৃথিবীর স্তায় ক্রমশীল, যমাত্তির স্তায় উদার স্বভাব, চন্দ্রের স্তায় শ্রিয়দর্শন এবং অশ্বিনী কুমারদেবের স্তায় রূপবান তথাপি সাবিত্রী তাঁহার অস্ত্রাতদারেই নিজের অনিষ্টসাধন করিয়াছেন, কারণ সভাবান অত্যন্ত ব্রহ্মায়ু। আর এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কালগ্রস্ত হইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া অশ্বপতি অত্যন্ত মর্দ্দাহিত হইলেন এবং অপর কোনও লক্ষ্যনকে পতিষে বরণ করিবার জন্ত কন্যাকে অনুরোধ করিলেন কিন্তু যে সাবিত্রী প্রাণান্তেও পিতার অনুরোধের কারণ হইতেন না, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সত্যধর্ম্মের মোহনীরতা অক্লান্ত সাধিবার জন্ত তিনি পিতা ব্যতীত হইবেন জানিয়াও একান্ত বিনয় ও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন :—

“সকলযশো নিপতনি লক্ষ্য কন্যা প্রদীরতে
লক্ষ্যবাহ বদানীতি জীয়েতানি লক্ষ্য লক্ষ্য ॥
দীর্ঘায়ুধবান্নায়ুঃ লক্ষ্যণে নিগুণোহপিবা
লক্ষ্যবৃত্তো ময়্য তস্তা ন দ্বিতীয় যুগোময়ম ॥”

অথবা

“লক্ষ্যদান কেবলমাত্র একবারই হইয়া থাকে, সভাবান অন্নায়ুই হউন আর দীর্ঘায়ুই হউন, শুণ্ধীনই হউন কিংবা শুণবানই হউন, আমি তাঁহাকে বেহমণপ্রাণ লক্ষ্য লক্ষ্য করিয়া একান্তভাবে পতিষে বরণ করিয়াছি,

অতএব পত্ন্যন্তর গ্রহণ বা মনোনয়ন করিতে আমি পারিব না।" নারদ নাবিজীর এই অপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনে চমৎকৃত হইয়া এই বিবাহ অনুমোদন করিলেন।

রাজাও কস্তার অভিপ্রায়ভূমারী পবিত্র আশ্রমে রাজর্ষি দ্ব্যমৎসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া লভ্যবানের লিখিত নাবিজীর বিবাহের অনুমতির প্রার্থনা করিলেন। দ্ব্যমৎসেন প্রথমে বলিলেন, "রাজমন্দিনী আশ্রমবালে অনভিজ্ঞা স্তম্ভরাং কিরূপে ইহা সম্পন্ন হইবে?" পরে অশ্বপতির কথায় তুষ্ট হইয়া তিনি এই বিবাহে অনুমতি দিলেন। সেই দিনই দুই খাষি ও বনবাসীদের মধ্যেই নাবিজী ও লভ্যবানের বিবাহকার্য্য নিৰ্ব্বিয়ে সম্পন্ন হইল।

নাবিজী আন্তরিক নিষ্ঠার লিখিত লেখা শুভ্রা এবং প্রিয় বাক্য দ্বারা স্বপ্নদেবা, স্বপ্তর এবং লভ্যবানকে সর্করাই লম্বট করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একবৎসর অতীত হইয়া লভ্যবানের মৃত্যুদিন লম্বাগত হইল। নাবিজী অশ্রু-ক্ষণ নারদের সেই ভীষণ বাক্য স্মরণ করিতেন। স্বামীর মৃত্যু দিবসের চারিদিন পূর্বে তিনি ত্রিরাত্রিক্ত আরম্ভ করিলেন। এই ত্রাত্ম-বারী তিনরাত্রি উপস্থাপি নাবিজীকে অনাহারে থাকিতে হইবে। এইরূপে লভ্যবানের মৃত্যু দিন আলিঙ্গা পড়িল। তখন সকলেই তাঁহাকে ব্রত উৎসবপনের সময় অভিবাহিত হইয়াছে দেখিয়া আহা করিবার জন্ত অনুমোদন করিলেন। নাবিজী কোষলবাক্যে তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে রাজ্রিতে আহারই তাঁহার লক্ষ্য। এমন সময়ে নাবিজী দেখিলেন যে স্বর্কে কুঠার লইয়া লভ্যবান বনে বাইতেছেন। নাবিজী স্বপ্তর শান্তকী এবং স্বামীর অনুমতি লইয়া লভ্যবানের লিখিত সেই দিন ফল ও কাঠ আহরণের নিমিত্ত বনে গেলেন। তাঁহার নামা প্রকার

প্রাকৃতিক নৌদর্ঘ্য পরিবেষ্টিত বর্ণদ্বাদি ও পর্কতমালা দেখিতে দেখিতে জীব বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ পরিপ্রম জনিত সত্যবান তাঁহার মস্তকে ভীত বেহমা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং নাবিজীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। নাবিজী বুঝিলেন, লভ্যবানের শেষ সময় উপস্থিত। মুহূর্ত্তকাল পরে নাবিজী দেখিলেন যে রক্তবস্ত্র পরিহিত গদাপাশধারী এক জ্যোতির্ময় পুরুষমূর্ত্তি লভ্যবানকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। নাবিজী তখন সেই অপরি-চিত আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে দেবতা বলিয়াই বুঝিতেছি আপনি কে এবং কেনই বা এখানে আসিয়াছেন?" আগন্তুক পুরুষ বলিলেন, "তুমি পতিব্রতা বিশেষতঃ তপস্বিনী তাই তোমার লিখিত আলাপ করিতেছি। তুমি আমাকে যম বলিয়া অবগত হও। লভ্যবানের আত্ম শেষ হইয়াছে, সে পরম ধার্মিক ও লভ্যামুরাগী তাই আমি নিজেই ইহাকে লইয়া বাইবার জন্ত আসিয়াছি।"

দেখিতে দেখিতে লভ্যবানের স্বপ্নদেহ প্রাণশূন্য, অপ্রিয়বর্ষণ ও নিম্পন্দ হইয়া পড়িল। যম লভ্যবানের আত্মাকে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিলেন। নাবিজী শোকে মুগ্ধমান না হইয়া দৃঢ়চিত্তে যমের অনুগমন করিলেন। নাবিজী যমকে বলিলেন, "নাথু! গার্হস্থ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া থাকেন, আমিও ধর্ম্মামুরাগী স্তম্ভরাং স্বামীর অনুগমন করিতেছি।"

"ন কাময়ে তর্জ্বিনাকৃত্য স্তম্ভং ন কাময়ে তর্জ্বিনাকৃত্য দিবম্
ন কাময়ে তর্জ্বিনাকৃত্য প্রিঃ ন তর্জ্বিনাকৃত্য
ব্যবসায়ী জীবিতুম্।"

অর্থাৎ—

"পতি ব্যতীত আমি সুখ চাহি না,
পতি ব্যতীত আমি স্বর্ণ চাহি না, পতি

ব্যতীত আমি প্রিয়বস্ত্র চাহি না এবং পতি ব্যতীত আমি বাঁচিতেই পারিব না।"

এই কথার যম লম্বট হইয়া নাবিজীকে বর দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। নাবিজীর প্রার্থনা ক্রমে যমরাজ নাবিজীর অঙ্গ স্বত্তরকে পুনরুষ্টি প্রদান করিলেন। নাবিজী আবার অগ্নির হইতে লাগিলেন। যম তাঁহাকে ফিরিয়া বাইতে অনুমোদন করিলেন। যম সজ্জন বলিয়া নাবিজী তাঁহার লজ ত্যাগ করিবেন না বলিয়া জানাইলেন। যম নাবিজীর ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিয়া এতদূর স্তীত হইলেন যে ক্রমে তিনি দ্ব্যমৎসেনের স্তম্ভরাজ্য-প্রাপ্তি ও পুত্রহীন অশ্বপতির শত পুত্র লাভ হওয়ার জন্ত নাবিজীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু লভ্যবানকে পুনর্জীবিত করিবার প্রার্থনা তিনি কোন ক্রমেই পূর্ণ করিতে প্রস্তুত না হওয়ার, নাবিজী লভ্যবানের ঔরবে তাঁহার শত পুত্র লাভ এবং লভ্যবানের চারিশত বৎসর পরমাত্ম বুদ্ধি হওয়ার প্রার্থনা জানাইয়া প্রকারান্তরে লভ্যবানের পুনর্জীবন প্রাপ্তির উপায় করিলেন। যম তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াই অদৃষ্ট হইলেন।

নাবিজী লভ্যবানের মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া লভ্যবানকে নিয়োজিতের জ্ঞার দেখিলেন। নাবিজী বুঝিলেন যে বিপদ উত্তারণ হইয়াছে। এই অংশে নাবিজী নিজ তেজ বলে যে অপূর্ণ অলৌকিক কৌতুহল সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা হইতে লভ্যবান লিখিত যে কত শক্তি সম্পন্ন, কত উজ্জল, লভ্যবান তেজ যে কত মহান তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

অনন্তর তাঁহার গভীর রাজ্রিতে মাতা-পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লম্বট ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রত্যেক প্রার্থনাই যথাযথভাবে

পূর্ণ হইয়াছে। লাবিঞ্জী ও লতাবান দ্ব্যবসেনের সহিত নিজেদের রাজ্যে কিরীয়া গেলেন এবং লতাবান যুবরাজের পদে অভি-
ষিক্ত হইয়া স্নেহে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ইহাই হইল মূল উপাখ্যান। লাবিঞ্জী চরিত্রের বৈচিত্র্য ও আদর্শ লক্ষ্যে আমি দু'একটি কথা বলিব। কোমলতা, লজ্জা-
শীলতা, বিনয়, লজ্জা, পাতিভ্যতা, দেবা ও কর্তব্যপরায়ণতাই আদর্শ নারী চরিত্রের প্রকৃত লক্ষ্য।

পুরাকালের লতীচরিত্র বৈশন—দীতা, পার্শ্বতী, শকুন্তলা, শৈব্যা, বনমতী ও চিত্তা অপেক্ষা লাবিঞ্জী শ্রেষ্ঠ। আদর্শ চরিত্রের উপাখ্যান ইহাদের কাহারো চরিত্রে একাধারে সন্নিবেশিত ছিল না। দীতা নম্রতা, পতি-
পরায়ণতা ও স্নেহশীলতার চরম আদর্শ, কিন্তু তিনি লাবিঞ্জীর মত কর্মশীল নহেন। দীতা রামচন্দ্রকে লক্ষ্য চক্ষে দেখিতে পারিবেন এবং দেবা গুপ্তধা করিতে পারি-
বেন বলিয়াই বনগামিনী হইয়াছিলেন। পার্শ্বতী পতিকে মুগ্ধ করার জন্য মন ভয়ের কারণ হইয়াছিলেন। শৈব্যা লত কষ্ট সহ্য করিয়াও শেষকালে অসহিষ্ণু হইয়া উৎকণ্ঠে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। বনমতী ও চিত্তা কঠোর সাধনা করিয়াও পতিকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। লাবিঞ্জী চরিত্রে এইসব অসম্ভব একটাও নাই। শকুন্তলার মত তিনি দেহাধিকে জগত বিমূর্ত হন নাই, শৈব্যার মত আত্মবিস্মৃত হন নাই, দীতার মত অকারণে লক্ষ্যকে বৃথা তৎপর্যন করেন নাই। পার্শ্বতীর জ্ঞানও কৃত্রিম উপায়ে বামীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কর্মকুশলতা, বুদ্ধিপ্রখরতা, বাক্যকৌশল, বিপদে সহিষ্ণুতা প্রভৃতি উত্তম গুণের সমন্বয় কেবলমাত্র এক লাবিঞ্জী চরিত্রেই অলঙ্কৃত করিয়াছে।

লাবিঞ্জীর মানসিক বলের অসাধারণ পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। লাবিঞ্জী জানেন লতাবান এক বৎসরের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। জানিয়া তুমিও তাঁহাকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। লাবিঞ্জী নিজের নিয়তি ও অন্তঃকরণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। সাধনার কি অন্তঃকরণের পরিবর্তন হয় না? লোকে বলে অদৃষ্ট কখনো বিনষ্ট হয় না। বিধাতার লিখন কিরে না। ধর্ম লক্ষ্যান্তঃ-
করণে বিশ্বাসিনী লাবিঞ্জী তথাপি অসম্মত বীরকে অপূর্ণ সাহসে এই অপরাধের অন্তঃকরণের বিরুদ্ধে সাধনা করিতে লাগিলেন। এই কারণে তিনি যে বনবাসী হইলেন তাহা নহে। তিনি বনে থাকিয়াও গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্রতম কর্তব্যকেও অবহেলা করেন নাই। অমূল্য লতাবানের পরিণাম চিত্তা এবং কাহারো নিকট প্রকাশ না করিবার সহিষ্ণুতা আত্মাধের বিচিত্র-
রূপে আকৃষ্ট করে।

বিবাহের পূর্বেই লাবিঞ্জী জানিলেন লতাবান লম্বায় কিন্তু মৃত্যুর ভীষণ মূর্তি শোকের ধর্ম্মরূপ প্রহার, বিকলিত যৌবনের প্রথম লোপানেই আলম বৈধব্যের বিভৎসতা বা সুদীর্ঘ ভোগ লালসার উত্তপ্ত প্রেলাভন মজরাজ হৃদিতার চিত্ত কাঁপাইল না—
তাঁহার হৃদয় দ্রুত্রে আঘাত করিল না। লাবিঞ্জীর স্বর্গীয় ও অলৌকিক প্রেমধারা অমৃতলিঙ্গরূপী, তাই বিপর্যয়ের নিনাদ সেখান শব্দহীন, কাম সেখান পরাজিত, মৃত্যুর সেখান মুক্ত। স্বর্গীয় প্রেমের এই অনবদ্য

সাধনা বেহের ভিতর দিরা আত্মার এই অলৌকিক উপাননা, ইঞ্জিরের দার দিরা এই অতিজিরের পূজা ও মৃত্যু বিনাশবলে এই বহামৃত্যুর প্রণব ধনি লাবিঞ্জী চরিত্রকে উজ্জল করিয়াছে। তারতকৃষ্টি ও সাধনার এই উজ্জল রত্ন, লতাবৈশ্যের এই অলঙ্কৃত প্রতিমা এই মূর্ত্তিবতি পতিভ্যতা, লম্বা প্রাচ্য জগতের তথা বহামানবের লতাতা ও সাধনাকে উজ্জল করিয়াছে, সার্থক করিয়াছে, ধন্য করিয়াছে।

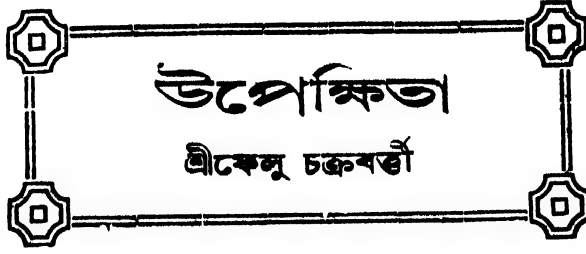
যে প্রেম আলম মৃত্যুরদ্বারেও একনিষ্ঠ ও নির্ভীক, ব্রত, উপবাস এবং তপস্যার বাহার গুপ্তি, বাহা ভোগললসাবর্জিত, বাহিতের ইষ্টই বাহার উপাননা, বাহা মৃত্যুর কল্যাণময় তাহাই লাবিঞ্জীর আদর্শ। “লাবিঞ্জীর পূর্বরাজ পিতৃ আবেশ নিরস্তিত, লম্বা, কঠিন ধর্ম্মরূপ; ইহা তারতকৃষ্টিত হাম্পত্য স্বর্গের অন্নান পারিজাত পুষ্প—
বিশেষীয় আইতিলতার ফুল নহে।” বাহিতের কল্যাণময়ী, লম্বাময়ী ও তপোমার্জিত প্রেমের এই অপূর্ণ কাহিনী আত্মাধের নিরা-
বার—ভুচ্ছ লম্বারের অনেক উপরে, ভোগী জীবনের অনেক উর্ধ্বে, এক অতীন্দ্রের লোকে এক অলৌকিক জগতে এবং স্বর্গীয় প্রেমের লীলা নিকেতনে। যে শিক্ষা; যে দীক্ষা লইয়া লাবিঞ্জী জগতে আগিয়াছিলেন, আমরা আজ সেই শিক্ষা ও সেই দীক্ষাতেই আত্মাধিকে অমুপ্রাণিত করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প ঘা প্রদান করিতেছি। *

* রেডিওতে কথিত।

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্ততৌষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর



গর্জন ক'রে উঠলেন "কি! ২০০ শত টাকা? আমরা এখানে বানিজ্য ক'রতে বলিনি—বত বড় উচুহরের লেখকই হউক না কেন, মি: রে আজ পর্যন্ত কাহাকেও এক নজে ৫০ টাকা বৈশী দেয় নি, তা জান?"—

একাউন্টেন্ট বাবু বিনীতভাবে জবাব দিলেন "কিন্তু তার দোষিন আপনি নিজেই বলেছিলেন যে উপভোগ্যানি ভালভাবে যখন পাঠকেরা অনুমোদন করেছে এবং আশাযের ও বেশ ছ-পরশা আসছে, তখন একে আপনি ২০০ টাকা দেবেন"—

মি: রে টেবিল চাপুড়ে চীৎকার করে উঠলেন "এতদূর স্পর্ধা তোমার যে তুমি আমার কথায় প্রতিবাদ কর—তখন বলে-জিলাম বলেই যে হতে হবে তার কোন মানে নেই। এখনি fresh account প্রস্তুত করে নিয়ে এস।" আর কোন কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র যুগ্মিয়া একটা লম্বানসূচক অভিধান করিয়া চলে গেল একাউন্টেন্ট নিজের জায়গার।

লিগারেটের ছাইটা ঝাড়িয়া মি: রে অম্পট বাক্যে বিরক্ত প্রকাশ ক'রে বলেন "আফিসের whole staff change ক'রতে হবে নইলে এ ব্যবসাও বন্ধ ক'রতে হবে, দেখছি।" ঠিক সেই সময় চাপরালীটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একখানি কার্ড বড়লাহেবের হাতে দিল।

"প্রলোভা দেবী" কার্ডখানি পাঠ করে নাকটা দিটুকে বলেন "ডাক ভিতরে"। নজে নজে একটা উচ্চল শ্রাব বর্ণা দ্বিপে গুল্লর আকৃতি মহিলা তথায় উপস্থিত হইল।

মি: রে এই মহিলাটির দর্শন মাঝে কেমন একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং তার মুখখানি ভাল ক'রে পরিদর্শন করার জন্য বেহখানি একটু হেলিয়ে নাক হইতে চশমাটা নামিয়ে মনে মনে বললেন "কি অদ্ভুত

"ইষ্টার্ন পাবলিশিং ব্যুরো" অর্ধেক অঙ্গীকার স্বরূপ মি: রে আজ বিপুল অর্থের অধিকারী। জীবনের প্রথম অবস্থায় খবরের কাগজের হকারের কার্য থেকে শুরু ক'রে ছোট খাটো লগুয়াগিরি অফিসের কেরানীগিরি ও বারকোপ থিয়েটারের টিকিট কালেক্টারী ইত্যাদি করবার পরও যখন কোন বানিজ্যিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটল না তখন ১৯১৭ সালে বাঙ্গালী পণ্টনের তালিকায় নাম ভুক্ত ক'রে চলে যান তিনি মেশোপটেমিয়ার। পণ্টনের কার্যে বেশ লাহলিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে কর্তৃপক্ষের একটু নজরে পড়েন এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ বুদ্ধাবলানে কলিকাতায় ফিরে এলে ই, আই, রেল অফিসে একটা উচ্চপদস্থ চাকুরী প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে পুরস্কার, ভিরঙ্কারে পরিণত হওয়ার বাধ্য হইয়া তাহাতে অব্যাহতি দিয়ে কিছুদিন বেকার হলভুক্ত থাকবার পর অবশেষে তাঁর এক নাড়োয়ারী বন্ধু মি: অনন্তরাম গুড়গুড়ওয়ালার আর্থিক সাহায্যে এই 'পাবলিশিং ব্যুরো' স্থাপিত করেন এবং এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পাবলিশিং কার্যে সুনাম অর্জন করে কলিকাতার দ্বিতীয় সস্ত্রীকার ভুক্ত হইয়াছেন বলিলেও অত্যাতি হয় না।

অতীত স্মরণবিচারী, বিটখিটে, কল্প-স্বভাবলম্পর মি: রে জীবনের দ্বাত প্রতি-বাতের কলে অল্পকল্পার ছায়া পর্যন্ত ছবর থেকে অপদায়িত ক'রে আজ এই 'পাবলিশিং ব্যুরো'র লক্ষ্যের কড়া বলেই তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের নিকট তিনি 'বড়লাহেব' নামে খ্যাত। এডিটর, লব-এডিটর, কেরিয়ার, হেডক্লার্ক প্রভৃতি অন্যান্য ৩০ জন কর্মচারী

তাঁর অধীনে কার্য করেন তা ছাড়া বহু-লম্বাক কর্মসম্পাদনের পারিশ্রমিক প্রাপ্ত প্রতিনিধি ও মৌলিক গ্রন্থকার প্রবেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করেছেন তিনি। মি: রে তাঁর কক্ষ বেছে নিয়েছেন তাঁর একাউন্ট অফিসের গারেই। উচ্চ গ্রীবা-বেটনীবাহ লার্ট, আলপাকা কোট, ব্রাউন অলফোর্ড জুতা ও লাদা প্যান্টালুন—এক কথায় ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে তিনি এই গুরুত্ব বিশিষ্ট অফিসের চেয়ার অলঙ্কৃত ক'রে বসে থাকেন। আর তাঁরই কামরার দরজার বাহিরে বসে থাকেন এক জন চাপরালী তাঁর Calling bell এর অপেক্ষার। প্রত্যহ অফিসের লক্ষ্যপ্রথম কাজ ছিল তার অফিসের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করা। এই হিসাব পরীক্ষার সময় অফিসের কেরানীস্বদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেককেই কালীমন্ত জপ ক'রতে হোত চাকরী বাবার ভরে।

অফিসের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি রবিবারে 'পাবলিশিং ব্যুরো' বন্ধ থাকে স্তুরাং লম্বস্ত লগুয়াটা অন্ত্র বাস করে প্রায় সকল কর্মচারীই শনিবার লক্ষ্যার নিজ নিজ বাড়ী প্রত্যাগমন করে। তাছের এই বাড়ী বাওয়াটা মি: রে মোটেই পছন্দ করেন না, তাই প্রতি শনিবারেই তাঁর মেজাজটা কল্প হয়ে থাকে।

এমনি এক শনিবারের কথা—তিনি যে অন্তরে অন্তরে বেশ একটু ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলেন তা তাঁর লগাটের কুণ্ডিত রেখাগুলির দ্বারা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল। হটাৎ ক্যান বই পরীক্ষা ক'রতে ক'রতে তিনি

দাড়াই" তারপর নিজেকে দান্ধলে নিয়ে
জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি প্রয়োজন?"

বহিলাটা ঘাড়টী ঈষৎ বক্র করে বলে
"আমার উপভোগ্য খাবার জন্ম তার"—

অজ্ঞতার তান করিয়া মিঃ রে বলেন
"আপনার উপভোগ্য? কি উপভোগ্য?"—

"উপেক্ষিতা তার"—ইয়া মিঃ রে, আপনি
আপনার পক্ষে আমাকে জানিয়েছেন যে
উপভোগ্যখানি আমাকে প্রভূত অর্থ পাইয়ে
দেবে" সহাস্তবধনে কথা কর্তী হুলেখা খুব
তাড়াতাড়ি বলে ফেলে।

"Oh! I see, এতকণে আমার স্মরণ
হচ্ছে। যেখান, আমরা হাজার হাজার
উপভোগ্য পাবলিস্ করছি—দব কথা স্মরণ
রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ইয়া, যদিও
আমি বইখানি পড়িনি, তথাপি আমার
এডিটর, দব এডিটরের সুখে শুনেছি যে
বইখানি উচ্চাঙ্গের আর আমাদের পাঠকেরা
বইখানি বেশ অল্পমোদন করেছে।
একাউন্টেট বাবু!"—

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হুলেখা
বলিল "আপনাকে দহস্য ধস্তাবাদ মিঃ রে।
যদি আপনি আমাকে উৎসাহিত করেন,
খান্ধকতক ঐরূপ উচ্চাঙ্গের উপভোগ্য আপনাকে
দিতে পারি"—বলা বাহুল্য একাউন্টেট লর্ক
দ্বয়েই আড়ি পাতিয়া তাহাঙ্গের উত্তরের
কথোপকথন শুনিতেছিল—সুতরাং ডাকবা-
মাত্র একখানি ৫০/- টাকার চেক আনিয়া
বড় সাহেবের হাতে দিল। বড়সাহেব
দস্তখত করিয়া হুলেখাকে দিবে বলেন
"এই আপনার টাকা। চেকটা পাওয়ার
একটা রদিব দিন। আপনার ভাবনা কি
মিস্ হুলেখা—এবার থেকে আপনি বেশ
দুপয়সা করতে পারবেন—যখন ব'লছেন
ওরকম উপভোগ্য আপনার stockএ আছে"—

বিস্ময়পূর্ণ লোচনে হুলেখা জিজ্ঞাসা
করিল "বলেন কি মিঃ রে, মাত্র ৫০/-
টাকা?"—



স্ব-মালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ৪ ৪ বোম্বাই

পতীর ভাবে মিঃ রে উত্তর দিলেন
“আপনি আমাদের previous record
দেখতে পারেন—কোন সূতন লেখককে
আমরা ৫০ টাকার বেতী দেই না।”

“কিন্তু আপনি আপনার পক্ষে আমাকে
কিছু মোটা রকমের দেবেন বলেছিলেন
এবং ইহাও জানিয়ে ছিলেন যে আজ পর্যন্ত
আপনার “Bureau”তে যে সমস্ত উপজ্ঞান
এসেছে তার প্রত্যেকটির অপেক্ষা আমার
উপজ্ঞানখানি প্রাজ্ঞ, রোমাঞ্চকর ও সুন্দর”

“আমি তা জানি, মিস সুলেখা—কিন্তু
কি করব বলুন, আমাদের নিয়মের বিরুদ্ধে
ত আমরা যেতে পারি না—আমাকে মাপ
করবেন”—

কথামতো সুনতে সুনতে সুলেখার
মুখ চোখ ও কান দুটো রক্তাক্ত হয়ে উঠল,
আর তার পাতলা টুকটুকে ঠোঁটস্থান
ঈষৎ কঁপতে লাগল। কম্পিত স্বরে একটু
উচ্চ গলায় সে বলল “মিঃ রে, আমি যখন
কলেজের magazine এ লিখতাম তখন
লেখক বোলে আমার বিশেষ একটু সুনাম
হয়েছিল—আমি মনের কোনেও স্থান
দিতে পারি নি যে তোমার মত একজন
Publisher এর দ্বারা প্রার্থী হতে হবে
আমার। কিন্তু কেবল আমার চির দুঃখীনি,
পরিভ্রাতা, উপেক্ষিতা, অনাদৃত জননীকে
সুখের কবল থেকে রক্ষা করবার অভিপ্রায়
তোমার দ্বারা একরকম বলতে কি ভিক্ষার
খুলি হাতে করে দাঁড়াতে হয়েছে আমার।”
কথামতো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখার
আরক্তিম গণ্ডুটি অশ্রুবারিতে শিক্ত হয়ে
গেল।

কঠোর জ্বর হলেও সুলেখার এই
কথামতো মিঃ রে এর মাথাটা কেমন
গোলমাল করে দিলে—উদ্বিগ্ন চিত্তে তার
মুখের দিকে ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থেকে
নিম্নতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি

“আপনার উপেক্ষিতা, পরিভ্রাতা অনাদৃত
জননী? তার নাম?”

নিজেকে কতকটা দামলে নিয়ে চোখ
দুটা কাপড়ের খোঁট দিয়ে মুছে সুলেখা
জবাব দিলে “ইয়া। আমার উপেক্ষিতা
অনাদৃত জননী। আমাদের দেশে ওরকম
পরিভ্রাতা উপেক্ষিতা, অনাদৃত নারীর
সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, তাই
তাঁদের কারণ অবলম্বন করে আমি উপজ্ঞান
খানি লিখেছি এই উদ্দেশ্যে, যাতে তারা
নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে
নারীজাতির সমান অঙ্গুর রেখে এই লকল
জঘন্ত ঘোহ নিজায় নিদ্রিত দান্তিক স্বামী
জাতীর একটা শান্তি বিধান করতে পারে”—

প্রশস্ত লগাটখানি বের বিন্দুতে ভরে
উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে কপালের পার্শ্ববর্তী
শিরা দুটা বেশ উন্নত হয়ে উঠল।
সুলেখার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে
মিঃ রে তাকে হাত নেড়ে তাঁর লম্বুখের
চেরারে ব’লতে হাজত করলেন এবং শুধু-
কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন “কি এমন হয়েছে
আপনার জীবনে মিস সুলেখা যার জন্য
আপনি এই উপজ্ঞান লিখতে বাধ্য হয়েছেন
—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।
আমাকে বলে ব’লতে আপনার বাধা
আছে?”—

সুলেখা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর
দিল “সে এক নিষাকরণ স্বর্ষভেদী কাহিনী

মিঃ রে। সেই হতভাগ্য রমণী আমার
মা—দুঃখের প্রথম ধাপে ওঁর মরণ
সঙ্গে তাঁর জীবন ফুগেই হয়ে ওঠে। আমার
নির্ধর আচরণ তাঁর জীবন তিলে তিলে ক্ষয়
ক’রতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তিনি ঈশ্বরের
কাছে তাঁর মৃত্যু কামনা ক’রতেন।
কিন্তু কোথায় তিনি? ব্যথিতের ক্রন্দন
যদি বলবামাত্র তাঁর কর্ণে পৌঁছাত তা’হলে
এ সংসার এত দুঃখময় হোত না। আমার
মাতার যখন বিবাহের প্রস্তাব হয় তখন
আমার পিতা এ বিবাহে সম্পূর্ণ অসম্মতি
জানিয়েছিলেন, কিন্তু আমার পিতামহের
অর্থ-পিপাসা বাধ্য করেছিলো তাঁকে এ
বিবাহে রাজী হওয়া ছাড়া তাঁর আর
গত্যস্তর ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়
একটা দিনের জন্যও তিনি আমার মাকে
স্নেহের চক্ষে দেখতে পারলেন না। আমি
ভূমিষ্ট হবার পর আমার মা মনে করেছিলেন
যে এইবার বুঝি শেষ কেটে যাবে কিন্তু হঠাৎ
একদিন শুনা গেল যে আমার বাবা গৃহ
পরিভ্রাতা ক’রে চলে গেছেন—দেশে আর
কিরে আসবেন না।” বলিতে বলিতে
সুলেখার কণ্ঠস্বর একরকম বন্ধ হয়ে এল এবং
সে একটু পাণীয়ে জল খাইল। তারপর
গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে একটু পরেই বলতে
শুরু ক’রলে “আমার মায়ের এই দুঃখবহু
স্বযোগ পেরে তাঁর স্বপুত্রবাতীর লকলে
তাঁকে নানাতাবে নির্যাত্ত ক’রতে শুরু

ইন্দিরিয়াল



GRAM: "ADNIVAG"

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা

করলে। অনন্তোপায় হয়ে তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর পিতার অশ্রায়ে এলেন। লামাত্ত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আমার মাতামহ কোনরকমে শিককের কার্য ক'রে বেতনের লামাত্ত করেকটা টাকা হুবেলা অয়ের সংস্থান করতেন। পল্লীগ্রামে প্রায় লকলেরই কিছু না কিছু জমী জায়গা থাকে, কিন্তু মাতামহের আমার কিছুই ছিল না—কারণ লম্বত বিক্রয় ক'রে কতায় বিবাহের পণের টাকা লংগ্রহ করেছিলেন তিনি। তিনি তাঁর লামাত্ত চেষ্টা করেছিলেন আমার পিতাকে খুঁজে বার ক'রবার, কিন্তু কোন ফল হয় নি। পরে শুনা গেল তিনি মৃত্যু গেছেন। কেউবা বলে যারা গেছেন, কেউবা বলে হয়ত লেই দেশের কোন এক অঞ্চলে আছেন—এলব কথা। আমি মায়ের কাছেই শুনেছি”—

তারপর আমার জীবনের কথা—শুনলাম ছেলেবেলা থেকে আমার লেখাপড়ায় বেশ বেশ প্রবল ইচ্ছা বেধে মাতামহ আমাকে গাঁয়ের স্কুলে free pupil হিসাবে ভর্তি করে দেন এবং গাঁয়ের দরালু লোকের লাহায়ে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি। লোভাগ্যক্রমে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একটা বৃত্তি পাই এবং ভাহারই বলে আমি কলেজে ভর্তি হই। এইভাবে দুঃখের লহিত ক্ষতাম্বলি ক'রে আমি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক তারপরই আমার মাতামহ ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে চলে যান এবং আমার মাও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। গ্রামাচ্ছাদন ও মায়ের চিকিৎসার অল্প উপায় না বেধে আমি গাঁয়ের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিত্রীর পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হই কিন্তু তাও বেশীদিন লইল না—গাঁয়ের স্কুলটা উঠে যাওয়ার লক্ষে লক্ষে আমার চাকরী চলে গেল। ইহার কিছুদিন পরে আমি একটা বহু দূরবর্তী স্থানের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিত্রীর

চাকরী পাই কিন্তু লাকে ওরূপ অবস্থায় নিরাশ্রয়ে রেখে যাওয়া কিবা তাঁকে লক্ষে করে নিয়ে যাওয়া অলম্বব বলে আমি লে চাকরী গ্রহণ করিতে লক্ষ্য হই নি। তাঁর চিকিৎসার টাকা লংগ্রহের আর কোন দ্বিতীয় উপায় না বেধে আমি উপভাগ লিখতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু তারও ত এই পুরস্কার”—

বাম হস্তের কুঙ্গাইটা টেবিলের উপর তুলত করে তাঁর মস্তকটা বাম হস্তের তালুতে রেখে মিঃ রে কিছুকণ নিস্তব্ধ থেকে ভাল্লা গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন “আপনার মা এখন কোথায় এবং তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?”—

“ইয়া—আমারই একটা ছাত্রী দরী ক'রে তার বহির্বাটীর একখানি ঘর ছেড়ে দিয়েছে আমার জন্ম—ভাড়া কিছুই দিতে হয় না—লেই ঘরে তিনি অঙ্কিত অবস্থায় পড়ে আছেন”—ব'লতে ব'লতে সুলেখার চোখের জল উষ্ণ প্রশংসার মত অবিশ্রান্ত ধারায় উথলে উঠল। উত্তেজিত হয়ে মিঃ রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন “আপনার নরামখ পিতার নাম আমার ব'লতে পারেন?”—

অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুলেখা উত্তর দিলে “বাম প্রতুলকুমার রায়”—“কে”? উদ্ভাস্তভাবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে মিঃ রায় তাঁর চেয়ার থেকে উঠে দুই এক পদ অগ্রসর হবামাত্র সূক্ষ্মিত হয়ে পড়ে গেলেন। সুলেখা ভয়ে চীৎকার করে উঠল আর লক্ষে লক্ষে পাশের ঘরের আফিলের বাবুদা ছুটে এল। সুলেখা মিঃ রায়ের মাথাটা তার কোলের উপর তুলে নিয়ে তাহের মধ্যে একজনকে ডাক্তার ডাক্তে বলে দিলে। ডাক্তার আলবার কিছুকণ পরে মিঃ রায় তাঁর লংজা ফিরে গেলেন এবং নিজেকে সুলেখার কোলের মধ্যে বেধে আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে মানসিক উচ্ছাদে টেঁচিয়ে

বলেন “ওরে আমার অনাদৃত, ওরে আমার পরিত্যক্তা কত্তা—তুই তোর অনাদৃত মায়ের কাছে আমাকে নিয়ে চল—ওরে তোর আমার অতীত পরতানী তুলে গিয়ে আমার লক্ষ্য কর ওরে তোরাই এই Publishing Bureau অর্ধেক অধিকারিনী—”

এই দৃশ্তে সুলেখা কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। অপলোক দৃষ্টিতে অস্ফুট কঠে শুধু একবার বলে “এ্যা একি লভ্য তুমিই আমার লে পিতা যে আমার লাকে পথের ভিখারিনী করেছিল”—

বালকের মত কাঁদতে কাঁদতে তার গুহুটী ধ'রে মিঃ রায় লেহ বিচলিত কঠে বলেন “লক্ষ্য কর, লক্ষ্য কর সুলেখা—নিয়ে চল তোর মায়ের কাছে—তাকে বাঁচাতেই হবে। লেখের কটা দিন তোর চিরদুঃখানি মায়ের দুঃখ ঘুটিয়ে তাকে বদ্ব ক'রে, আদর ক'রে, স্বামীর কর্তব্য ক'রে আমাকে আমার পাপের প্রারম্ভিত ক'রতে হবে। আমি কতদিন তাহের জন্ম কেঁদেছি কতদিন তাহের লক্ষে মিশতে চেষ্টা করেছি, কতদিন তাহের পাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি—যখনই চেষ্টা করেছি, কে বেন আমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে চলে গেছে, গাঁয়ের কাছাকাছি গিয়েও রাতারাতি ফিরে চলে এলেছি। সুলেখা! আমার মত যারা তাহের ত্রীকে, কত্তাকে, পুত্রকে এই ভাবে অনাদর করে, ত্যাগ করে, উপেক্ষা করে তাহের চোখ ফুটিয়ে বেবে তোর ওই ‘উপেক্ষিতা’—

প্রতুল রায় তারপর সুলেখাকে লক্ষে করে চলে গেলেন তার উপেক্ষিতা, অনাদৃত, মরনোন্মুখ ত্রীর উদ্দেশ্যে। মরণ পথের বাজী মিলেস্ রায় তখন কিন্তু জীবনের এত লেব লীমাস্তে এলে পড়েছিলেন যে রক্তহীন ওঠের ক্ষণ একটু হালির রেখা ব্যতীত এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, দীর্ঘ প্রেরিত

রেকর্ড সমালোচনা

—এডিসন—

‘ফুল-পরী’ শিশু-নাট্য—‘ইসলামের
জয়’—পাইওনিয়রের কীর্তন—
মুন্সিল-আসামের গান

হিন্দুস্থান—এচ ৬৩৬ :—এই রেকর্ডে
শ্রীমতী পাকলবালা একধিকে ‘লজনীরে
যেলো পরারে খোঁপার’ ও অত্রধিকে ‘(লো
সখি) পরান বঁধুয়া আমার’ এই দুইখানি
নৃত্য লজীতে বথারীতি নৃত্য-মধির আধ-
আধ সুরে বথোপযুক্ত লহগামী-লজীতের
লহিত রেকর্ড করিয়াছেন। গান দুইটিতে
নৃতনত্ব কিছুই নাই, পুরাতন নৃত্যলজীতের
চঙেই লায়ারণ-ভাবে গান দুইটি গাত
হইয়াছে। দ্বিতীয় গানখানির বর্তাই লজীত-
টুকু ভাল কিছু পরে সুরটি একঘেয়ে হইয়া
পড়িয়াছে।

হিন্দুস্থান—এচ ৬৩৭ :—সুকবি বন্দে
আলি মির। এ্যাণ্ড পাটি কর্তৃক ‘ইসলামের
জয়’ নামক একটি ইসলামী নাটিকা এই
একখানি রেকর্ডে অভিনীত হইয়াছে।
ইহার রচনা ও পরিচালনা করিয়াছেন
বন্দে আলি মির, সুর-সংযোজনা করিয়াছেন
শ্রীহর্গা সেন, গীতাংশটুকু গীত হইয়াছে

মুন্সিলনের আনন্দোচ্ছাল প্রকাশ করবার
আর কোন শক্তি তাঁর ছিল না—এবং
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ লংঘারের
সমস্ত বারা কাটাইরে স্বামীর কোলের উপর
বাধা রেখে চলে গেলেন দেখান থেকে
এক রহস্যময় অজ্ঞের রাজ্যে।

—:—

শ্রীমতী পাকল ও মোহনলাল কর্তৃক।
অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম অপ্রকাশিত।
রাজার হুহিতা মর্জিনা পবিত্র ইহুদীকুলে
জন্মলাভ করিয়া পিতৃপুরুষের সনাতন ধর্ম
ইহুদী ধর্মে বিজ্রোহিনী হইয়া উঠিলেন।
তিনি খোদা আর রহুলের নাম উচ্চারণ
করিয়া নিজেকে ধন্ত মনে করিতেন, পিতার
শত নিষেধ ও শাস্তি-ভয় প্রদর্শন লম্বাও
কোরাণের অনুভবর বাণী শিরে বহন করিয়া
লতাপথে চলিতে ভীতা হইতেন না।
অবশেষে সনাতন ধর্মী পিতা কত্নাকে
স্বপথে চালিত করিতে না পারায় মস্তুর
পরামর্শে একটি বাহুল্য আঙটি কত্নার
নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। অতঃপর আঙটিটি
অজ্ঞাতনামারে নদীগর্ভে নিক্ষেপ হইল এবং
স্থির হইল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের লম্বুখে
ঐ আঙটিটি ফিরিয়া চাহিলে যদি পাওয়া
না যায়, তবে এই কারণে খোদাইয়া স্বধর্ম
বিজ্রোহিনী কত্নাকে হত্যা করা হইবে।
কিন্তু খোদা গেল নিমন্ত্রিতবর্গের জন্ত আনিত
মৎস্তের উদরে ঐ অনুগ্রহীত খোদার পরম
ভক্ত তাঁহার কত্না ফিরাইয়া পাইয়াছেন।
অবশেষে কত্নার নিকট সকলে পবিত্র
ইসলামি ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এই
আখ্যানভাগের উপর রেকর্ডখানি রচিত।
আশ্চর্যের বিষয় লেখক মহাশয়ের স্মৃতিকার
প্রকাশিত রচনার সহিত অভিনীত লংলাপের
আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—পরস্পরের লহিত
অর্ধেকেরও মিল নাই। ইহার অর্থ লেখক
মহাশয়ই জানেন, আর হিন্দুস্থান কোম্পানীই
জানেন এই লম্বা আখ্যানভাগ গ্রহণ

করিয়াও লেখক মহাশয় আদর্শেই লিপি-
কুশলতার পরিচয় দেন নাই। মর্জিনার
অংশ প্রকৃতিভীত হইয়াছে বলা চলে।
লম্বিত কঠে শেখের গানটি প্রবিধানক
নহে।

* * *

হিন্দুস্থান—এচ ৬৩৮ :—এই একখানি
রেকর্ডে শ্রীজখিল নিয়োগী রচিত ‘ফুল-পরী’
শিশু-নাট্য অভিনীত হইয়াছে। ইহার
সুর ও লজীত পরিচালনা করিয়াছেন
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়। এই নাটিকার
গল্প শিশু-কল্পনার বিশেষ উপযোগী। রাজে
ফুল-পরীরা ফুল-বনে খেলা করিতে নাহে,
খোকার সাধ হয় সেও তাঁহাদের নিকট
হইতে একটি পাখনা ধার করিয়া কতদূর
উড়িয়া আনে ও তাঁহাদের লহিত খেলা
করে। এই নাটিকার ভিতর চারটি কণ্ঠ-
লজীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহারের
মধ্যে ৪র্থ লজীতটি ফুলপরী ঘুরি ঘোরা
ফুর-ফুর ফুর’ গানখানি সুরে ও লহগামী
লজীতে বিশেষ চমৎকার। অত্র গানগুলি
আশামুরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শিশুবিগের মনো-
হারী হইবে না। খোচের উপর রেকর্ডখানি
মন্দ নহে।

* * *

রিগ্যাল—আর, এল, ১০০২ :—জুলাই
মাস হইতে কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী
রিগ্যাল রেকর্ড নামে আরও কতগুলি
রেকর্ড প্রকাশ করিতেছেন। ইহার দ্বারা

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

লভা করা হইরাছে,—প্রত্যেকখানি ১।।০ টাকা দাম। এই মানে তাঁহাদের দ্বিতীয় নৈবেদ্য প্রকাশিত হইরাছে। এই রেকর্ডে রিগ্যাল ভ্যারাইটিজ নামে ইলদামী রেকর্ড প্রকাশ করা হইরাছে। একতারা লহযোগে একপিঠে মাণিকপীরের গান ও অস্তবিকে বৃষ্টিল আসানের গান বথারীতি সাধারণভাবে রেকর্ড করা হইরাছে।

রিগ্যাল—আর, এল, ১০০৪ :—শিল্পী শ্রীগেহুজ্ঞ দেব একদিকে ‘চন্দ্রাবতীর বেশে বাব’ ও অস্তবিকে ‘কাজ নাই আমার এ চার জীবনে’ এই পল্লীললিত ছইখানি এই রেকর্ডে পরিবেশন করিয়াছেন। গান দুইখানিই বিশেষত্ব বজ্জিত সাধারণভাবে গীত হইরাছে।

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬২ :—এই রেকর্ডে শ্রীমতী শৈল দেবী (কুমিল্লা) শ্রীমন্তের সুখোপাধ্যায়ের শিক্ষকতার ‘বৃষ্টি বিরহ হরয়েছে অলহ’ এবং ‘লবি দেখে দেখে চেয়ে দেখ গো’ এই কীর্তন-গান দুইখানি গাহিয়াছেন। শ্রীমতীর কণ্ঠ সুমিষ্ট এবং মাধব-লম্বিত কীর্তন দুইটি সুন্দরভাবেই গীত হইরাছে। এই রেকর্ডখানি ভাল রেকর্ড-শ্রেণীভুক্ত করা বাইতে পারে।

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬৪ :—শিল্পী কুমারী নিবেদিতা দেন এই রেকর্ডের একদিকে ‘নিষ্ঠুর দেবতা মম’ ও অস্তবিকে ‘আখাত যখন হানো বুক’ এই ভক্তিমূলক গান দুইখানি লহগামী ললিতের লহযোগিতার রেকর্ড করিয়াছেন। প্রথম গানখানির ধর্ম্মাই ললিত ভালো কিন্তু পরে সুর-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটায় শ্রুতিসুখকর নহে। দ্বিতীয়খানি একেবারে সরলভাবে গীত হইরাছে।

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬৫ :—এই রেকর্ডে শিল্পী শ্রীপ্রমথনাথ দেনপুণ্ড পঞ্চজী-রেকর্ডের আবহ-ললিতের অনুরূপ আবহ-ললিতের লহিত দুইখানি আধুনিক গান পঞ্চজী-ধরণে রেকর্ড করিতে গিয়া হাতাশ্লিষ হইয়াছেন। আবহ-ললিতের লহিত ‘লক্ষ্মী রাতে তুমি কুল-বালাকা’ গানখানি গায়ক জী-শ্রুত চণ্ডে যে ভাবে গাহিয়াছেন (?), বরং আশ্চর্য্য করিয়াছেন বলিলেই ভালো হয়,—তাঁহা শ্রুতিকটু। দ্বিতীয় গান ‘আমি যে গান রচিয়া ছিলাম’ তাঁহাও তথৈবচ।

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬৬ :—শিল্পী শ্রীবিহাংসুভূষণ রায় এই রেকর্ডে দুইখানি গ্রাম্য গান রেকর্ড করিয়াছেন; একদিকে ‘ঐ দূর লায়রের পানে নদী’ ও অস্তবিকে

‘আমি এই খানেতেই থাকি’ এই দুইখানি গান একতারা লহযোগে সাধারণ ভাবে গীত হইরাছে। ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্টতা বা বিচিত্রতার আভাশ মিলিবে না।

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬৭ :—শ্রীহরি-প্রদত্ত দ্বাদশের নেতৃত্বে এই রেকর্ডে দুইটি অর্কেষ্ট্রা পরিবেশন করা হইরাছে। একদিকে ‘বন্দে মাতরম্’ স্বদেশ-মন্ত্রের প্রবল প্রতিধ্বনি স্বর্গত মহামাত্রা লক্ষ্মী পঞ্চমজর্জ বাহাদুরের শুভ রজতোৎসবে গীত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধবয়সের অভিনব স্বদেশ-ভক্তিমূলক গান ‘জন-গণ-মন-অধিনায়ক হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা’ গানের সুর লইয়া ও অস্তবিকে ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি লম্বায়ের • তিনবার উচ্চারণ করিবার পর ‘হও করমেতে বীর, হও ধরমেতে বীর’ এই স্বদেশ ভক্তিমূলক গানের সুরের কাঠামো লইয়া ইংরাজী সুরে অর্কেষ্ট্রা বাজানো হইরাছে। নানাবিধ বস্ত্র-লহযোগে অর্কেষ্ট্রা দুইটি বেশ গুরুগভীর করা হইরাছে এবং ইহাতে বৈচিত্র্যও আনয়ন করা হইরাছে, বিশেষতঃ Saxophone এর ব্যবহারে ইহার সুর-বৈচিত্র্য বিশেষ লম্বা হইরাছে।

ফোন ২৭৭৪

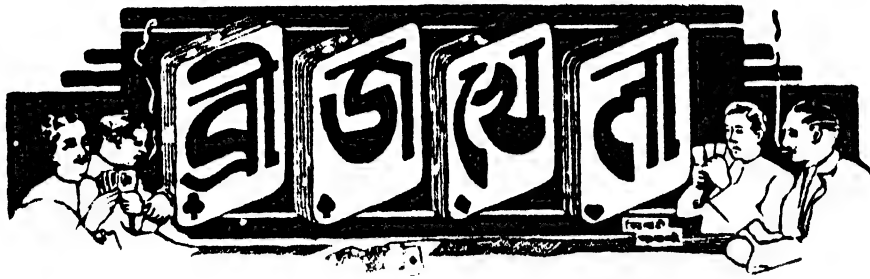
বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের

তেল ব্যবহারে

বেরি বেরি হয় না

মিল-২৪৬, তাপার সারকুলার রোড - কলিকাতা।



শ্রীছরীসা

ডাকের পর ডাকের হাতে যদি কোন রঙের একক তাল (singleton) দেখেন, তাহলে সাধারণ ব্রাজক্রীড়ক সেই খুঁটি আগে খেলে নিয়ে নিজের হাতের সেই রঙের বাকি তালগুলি তুরূপ করে নেবার জন্য এতই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন যে অন্য বিষয়ে চিন্তা করার তাঁর আর অবসর থাকে না; ফলে তিনি এতই অধৈর্য্য হয়ে পড়েন যে অবশেষে ডাক অনুযায়ী খেলা করতে তিনি অসমর্থ হন। তখন তিনি তালের বিভাগ লক্ষ্যে মিশ্যা হোয়ারোপ করে আত্মতুষ্টি লাভন করেন, অথচ খেলার শেষে একবার ভেবে দেখেন না যে খেলার গলদ কোথায়? নিজের হাতটি লক্ষ্যে কোন এক প্রতিযোগিতায় পড়েছিল, উভয়-পক্ষ একইরূপ ভুল করে খেলা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। অবশেষে তালের বিভাগ লক্ষ্যে আলোচনা করে লক্ষ্যেই নিরন্তর হয়েছিলেন। তদন্তে একজন আশাহের প্রদ্ব করেছিলেন চারটি হরতনের ডাকে হাতটিকে কিতাবে খেলতে হবে। নিম্ন-লিখিতরূপ হাত এলোছিল; উভয় পক্ষ ভালোভাবে।

ইস্কাবন—গোলাম।

হরতন—গোলাম, আটা, চক্কা, পাজা।

রুহিতন—টেকা, বিবি, আটা, চক্কা, চৌকা, তিরি।

চিড়িতন—নয়, ছরি।

	উ	
প		পু
	দ	

ইস্কাবন—টেকা, পাজা, ছরি।

হরতন—টেকা, লাহেব, লাতা, ছরি।

রুহিতন—লাহেব, গোলাম, ছরি।

চিড়িতন—গোলাম, দশ, তিরি।

এই হাতে ডাক হয়েছিল,

‘দ’	‘প’
একটি হরতন	একটি ইস্কাবন
পাল	পাল
‘উ’	‘পু’
চারটি হরতন	পাল

‘প’ ইস্কাবনের লাহেব খেলে প্রাথমিক চাল দিয়েছেন, আপনি এখন কি খেলবেন?

এই পিটিটি ইস্কাবনের টেকা দিয়ে ধরে প্রথমে হরতনের টেকা খেলতে হবে এবং তারপর রঙের বিভাগটি কেমন আছে দেখতে হবে, কারণ এটি ধরতে না পারলে খেলা করা একেবারেই অসম্ভব হবে। সাধারণতঃ এইরূপ হাতে বিপক্ষের হাতে

ইস্কাবন—গোলাম।

হরতন—গোলাম, আটা, চক্কা, পাজা।

রুহিতন—টেকা, বিবি, আটা, চক্কা, চৌকা, তিরি।

চিড়িতন—নয়, ছরি।

ইস্কাবন—লাহেব, বিবি, দশ,

লাতা, চক্কা।

হরতন—বিবি, দশ, চৌকা, তিরি।

রুহিতন—ছরি।

চিড়িতন—টেকা, পাজা, চৌকা।

	উ	
প		পু
	দ	

ইস্কাবন—নয়, আটা, চৌকা তিরি।

হরতন—নয়।

রুহিতন—দশ, নয়, পাজা।

চিড়িতন—লাহেব, বিবি, আটা, লাতা, চক্কা।

ইস্কাবন—টেকা, পাজা, ছরি।

হরতন—টেকা, লাহেব, লাতা, ছরি।

রুহিতন—লাহেব, গোলাম, ছরি।

চিড়িতন—গোলাম, দশ, তিরি।

৪-১ ভাবে রঙ আসে, ইহা ঠিক কি না লক্ষ্যে জেনে নিয়ে তবেই তুরূপ করতে আগ্রহ করতে হবে। রঙের টেকার খেলার উভয় ক্রীড়কই রঙ ছিলেন, তবে ‘পু’র হাত থেকে নয় পড়ার যুক্তিতে পারা গেল যে সম্ভবতঃ তাঁর হাতে একখানি বা দুইখানি তাল আছে। এই ধারণার বশে যদি হরতনের লাহেব খেলা যায়, আর ‘পু’ যদি পাল দেন, তাহলে বৈশাখ অনিবার্য। সেইজন্য এই লব ক্ষেত্রে ছোট রঙ খেলাই যুক্তিযুক্ত, আবার যদি সেই রঙের পিট ‘পু’ নিয়ে নেন তাহলেও ডাকঘরের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। ‘প’ ও ‘পু’ লক্ষ্য-সম্মত মাত্র তিনটি পিট পাচ্ছেন, একটি হরতনের ও দুইটি চিড়িতনের। এখন ধরুন যদি ‘পু’র হাতে রঙ না থাকে তাহলে ‘উ’ ও পিটিটি নিয়ে আর একখানি রঙ খেলে নিয়ে বরাবর রুহিতন খেলে যাবেন। এই ভাবে খেলায় বিপক্ষের দুই-তিন খানির বেশী পিট হবে না। লক্ষ্যে ক্ষেত্রেই যে তুরূপ করে পিট নিতে হবে এমন কোন কথা নেই,—অনেক ক্ষেত্রে আবার তুরূপ করার ভয় দেখিয়ে নিজ হাতের অন্য কোন রঙ দাঁড়া করার ধরকার হয়। চারজনের হাত ছিল এইরূপ,

অভিনব চিত্র সৃষ্টি
অতুলনীয় শিল্পী সমাবেশ
অকল্পিত গল্প-রচনা
সুনিপুণ পরিচালনায়

আ
সি
তে
ছে
*

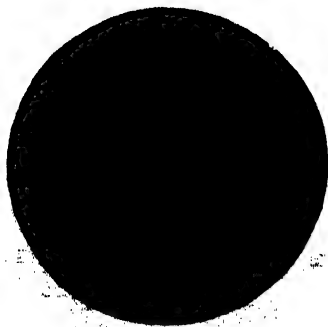
নতুন বসুর পরিচালনা—পঙ্কজ মল্লিকের দ্বারা সংযোজনায়
দেবদাস মাতা
ছবিগ্রহ : উমা, ইন্ডিয়া, ইন্ডো-মাল্লিক, কলকাতা ও সারগঞ্জ

চি
ত্রা
য়
*

নিউ থিয়েটার্সের নবতম অবদান

পরিবেশনা

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন



কলিকাতা মহানগরীতে “মহাশীত”

আসন্ন—প্রভাত সিনেমা

উদীয়মান বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত তাঁহার অধ্যাপকের ল্যাবরেটরীতে নুতন তথ্য আবিষ্কার করিতে লক্ষ্যবাহী গভীরতায় করে এবং একদিন আবিষ্কার করে, এই পৃথিবীতে যে মহাপ্রকৃত পরিব্যাপ্ত তাহাতে যে কোন বাণীই হউক না কেন, তাহার অস্তিত্ব লক্ষ্যবাহী বজায় থাকে। তাহার লোপ কখনও হয় না। প্রশান্তের এই আবিষ্কারে লক্ষ্যবাহী বিজ্ঞান-জগৎ অবাক বিস্ময়ে এই আবিষ্কারের ফলাফল আলোচনা করিতে থাকে। অতঃপর বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী এক বিশিষ্ট সভায় প্রশান্তকে তাহার এই আবিষ্কারের জ্ঞান অভিনন্দিত করিয়া একটি পদক প্রদান করিয়া বলে যে, তাহার প্রশান্তের নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করে, প্রশান্ত যেন কখনও তাহা বিস্মৃত না হয় এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে প্রশান্তের পক্ষে ‘নোবেল’ আইক পাওয়াও কষ্টকর হইবে না।

প্রবীন অধ্যাপক তাঁহার প্রিয় ছাত্র প্রশান্তের এই আবিষ্কারে খুবই উৎসাহিত হন এবং প্রশান্তের নিকট প্রস্তাব করেন যে তিনি তাঁহার ঘরে অরুণাকে প্রশান্তের সঙ্গেই বিবাহ দিবেন। কিন্তু প্রশান্ত দীর্ঘ স্বরে বলে যে, সে এই বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ যুদ্ধের পূর্বে তাহার পিতা

চারিটি হাত বেধে বহিষ্কৃত হইয়া যার যে প্রতিপক্ষের হাতে চারিটি ইচ্ছাবনের খেলা আছে কিন্তু তালনারেবল অবস্থার ‘উ’র একেবারে চারিটি হস্তভঙ্গ ডাকের প্রত্যুত্তরে ‘পু’র পক্ষে চারিটি ইচ্ছাবনে ডাক বেওয়া ভয়ানক শব্দ।

এক বালিকার সঙ্গে তাহার বিবাহের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন এবং প্রশান্তও তাহাকে ভালবাসে, সুতরাং এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। ইহাতে প্রবীন অধ্যাপক খুবই রাগান্বিত হন এবং ক্রোধে প্রশান্তকে তাঁহার বাটা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। এবং বলেন যে, অতঃপর তিনি প্রশান্তকে কোন প্রকারেই কোন সাহায্য করিবেন না।

প্রশান্তের জীবনে সে এক ছদ্দিন। নিরাশ হইয়া যখন সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে তখন তাহার প্রেম-পাত্রী মায়ার এক দূর লক্ষ্যবাহী প্রাতা আদিয়া খবর দেয় যে, গ্রামের লোকেরা বলপূর্বক মায়ার বিবাহ অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে দিতেছে। সুতরাং এ বিবাহ পণ্ড করিতে হইলে প্রশান্তের অবিলম্বে গ্রামে যাওয়া দরকার। প্রশান্তও তখনই গ্রামে উপস্থিত হয় এবং স্বীয় মাতা ও ভগ্নীর আগোচরে মায়াকে বিবাহ করে। প্রশান্ত ও মায়ার পরস্পর পরস্পরের বৃক্ক আশ্রয় লয়।

প্রশান্তের মাতা ও ভগ্নী প্রশান্তের ঘোটেই খুলী নয়। কেননা সে অধ্যাপকের ঘরের বিবাহ না করিয়া বখেটে বুড়ের জার কাজ করিয়াছে। মায়ার রূপে বুদ্ধ হইয়া প্রশান্ত মায়াকে বিবাহ করিয়াছে, মায়ার ভাল ঘরে নয়। লক্ষ্যবাহী এইরূপ কুব্যাক প্রশান্তকে লক্ষ্য করিতে হয়, তত্পরি বেকার জীবনের ভিত্তিতে তাহার জীবনকে আরও অলক্ষ্য করিয়া তোলে। কিন্তু এই বক্ষুক্ষির মাঝেও মায়ার ওয়েদিসের জার তাহার দ্বারে অবস্থিত। তাই সে কোন প্রকারে এই ছদ্মহ জীবন বহিয়া চলিয়াছে।

জীবনের একটানা প্রাতে প্রশান্ত ও মায়ার ভালিয়া চলিয়াছে। এই চরম ছদ্দিনে তাহার সুখী। কারণ তাহার পরস্পর পরস্পরকে অন্তর দিয়াই ভালবাসে।

অবশেষে মায়ার ছয় লক্ষ্যবাহী প্রাতা রতনের চোঁটার প্রশান্তের থিয়েটারে চাকরী হয়। অভিনয়ে তাহার নাম শীঘ্রই চতুর্দিকে প্রচারিত হয়। কিন্তু থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রী বলে, প্রশান্ত, তুমি কেন আমার ভালবাস না — এই “কেন”র উত্তরে প্রশান্তকে পুনরায় চাকরী ছাড়িতে হয়। আকাশে মেঘ পুনরায় ঘনাইয়া আসে। মায়াকে নিয়া প্রশান্ত মায়ার ঘরের নিকট যায়। মায়াকে তথায় রাখিয়া প্রশান্ত চাকরী করিবে, এই ছিল প্রশান্তের লক্ষ্য।

কালের উমেদারীতে প্রশান্ত যখন মুরিয়া বেড়াইতেছিল তখন একদিন কোন এক ধনী তনয়ার ঘোঁটরে সে আশ্রিত পায়। তরুণী আহতকে ঘোঁটরে করিয়া নিজ বাড়ীতে নিয়া যায়। তথায় তরুণীর পিতা বলেন, অরুণা, এ তুমি কাকে নিয়ে এলেছিল। এ যে প্রশান্ত।

অরুণার দেবা ও বড়ে প্রশান্ত ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে। এইখান হইতেই প্রশান্তের জীবনের গতি নাটকীয়ভাবে ঘটিতে থাকে। প্রশান্ত ও মায়ার জীবনে যে একটা প্রাত চলিতেছিল অরুণা এনে তাহাতে বাধা প্রদান করে। এবং এর পরিণতি কি, যেখিতে হইলে আপনি নিশ্চয়ই একবার প্রভাত সিনেমার আবিষ্কার। যনে রাখিবেন রূপালি পর্দার কখনও এরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও মানব চরিত্রের অপরূপ বিকাশ আর কখনও দৃষ্টব্য নয় নাই।

কলঙ্কমালা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একদিনে পরিচ্ছেদ

নীরববাবু আদালতে বাহির হইয়া
বাওয়ার পর, লবঙ্গ ভাড়াভাড়ি উঠিল,
তাহার ঘরে বাইরা খিল লাগাইল। একটা
হেঁড়া কুশালন ঘেঁষেতে পাতিয়া বসিয়া
কুলুজি হইতে কোশাকুলি নামাইয়া, একখানি
গরব কাপড় পরিয়া সে আফ্রিক করিতে
বসিল। প্রত্যহ যতখানি আফ্রিক করে,
ততটা সারিয়া সে পুনরায় গললরীকৃতবান
হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে প্রার্থনা করিতে লাগিল :
“হে বিশ্বনাথ! আমাকে পথ বলিয়া দাও!
আমি আজ নিতান্তই বিপদে পড়িয়াছি
ইত্যাদি।” বলিয়া কত প্রার্থনাই করিল
লবঙ্গ। লম্বা মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সে
আজ অস্ত্র কোনও কাজই করিল না,
কেবল নিজের ঘরে বসিয়া, দ্বারে খিল
লাগাইয়া ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা
করিতে লাগিল।

অপরাহ্নে রামদীন আদিয়া ঘরের দ্বারে
করাঘাত করিল।

“বাসিমা! বাসিমা।”

—“আঃ! ভাল আলাতন। একদণ্ড
বে-সুস্থির হয়ে নিজের ভালবাসার লগ্নে
একমাত্র সাগর বুড়িটোনই “মহাগীত”
ছবিতে ইহা করিতে লক্ষ্য হইয়াছেন।
অশ্রু সুরেন্দ্র, কৃষ্ণকুমারী, গুলজার, বুধো
এডভানী, কমলা ও মারা ব্যানার্জি এতে
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

বোঝাপড়া করে নেবো, তার ঘো নেই!”

উচ্চৈঃস্বরে বলিল : কে তুমি ?

—আজ্ঞে, আমি রামদীন !

—কি চাও ?

—ঘরজা খুলুন! বাবু এই জিনিষটা
পাঠিয়েছেন রেখে দিন।

—কি জিনিষ !

—আপনি ঘরজা খুলে দেখুন না।

লবঙ্গ উঠিয়া ঘরজা খুলিয়া দেখিল, রামদীন
একটা বড় ফুলের তোড়া লইয়া দাঁড়াইয়া।
লবঙ্গর হাতে তাহা তুলিয়া দিয়া সে বলিল :
বাবু এইটো একটো মিটিং মে পাইয়েছেন,
—আপনি তাঁর ঘরের টেবিলে রাখিয়ে দিন।

—কেন, তুমি সে কাজটা পারো না ?

—পার্কিনা কেনো ? বাবু বললো,

আপনা দিতে। তাই আমি আপনা দিচ্ছি।

—আচ্ছা, তুমিই গিয়ে এটা বাবুর
টেবিলে রেখে এসো।

রামদীন একটু চটিয়া গিয়া বলিল :
হেন, হেন! হাম্‌হি রাধ বেগা। কই
মেহরভকা কাম নেহি হার! বলিয়া লবঙ্গর
হাত হইতে ফুলের তোড়াটা লইয়া সেই-ই
টেবিলের উপর এক ফুলদ্বানিতে রাখিয়া দিল।

লক্ষ্যার পর বাবু বাড়ী আসিলেন, কিন্তু
লবঙ্গ তাঁহার নিকট গেল না। কেদারকে
দিয়া চা এবং জলখাবার পাঠাইয়া দিল।

নীচের বৈঠকখানার প্রত্যহ যে লাক্স
মজলিশটি বলে, তাহাতে বোগদান করিবার
জন্ত বাবু নীচে নামিয়া গেলেন, লবঙ্গ নিঃশব্দ
কেলিয়া দাঁড়িল।

ঠাকুর আদিয়া স্বল্পস্বপ্নের অনেক ঘুটিনাটি
জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া গেল, কি আদিয়া

অনেক তার নিজের ঘরকারি ও গৃহস্থদের
ঘরকারি জিজ্ঞাসা করিল, চাকর আদিয়া
কখনও পান, কখনও গোলাপজলের শিশি
চাহিয়া লইয়া গেল, কিন্তু এসকলের মধ্যে
লবঙ্গ আপনাকে অবিলম্বে রাখিয়া দিল।
তবু বুকটা চিৎ চিৎ করে,—যেন কাহার
পদশব্দে চমকাইয়া উঠে। ঘর ছাড়িয়া ছাড়ে
আদিয়া লবঙ্গ দেখে, অনন্ত নীল আকাশে
কত কোটি কোটি নক্ষত্র মিট মিট করিয়া
জলে, তাহাদের কেহই নিশ্চিন্ত নহে, লবঙ্গর
মত উদ্বেগ বিষয় নহে। সকলেই বেশ স্বচ্ছ,
পবিত্র, স্বাধীন।

রাত্রি দশটা বাজিলে বাবু উপরে
আসিলেন। তাঁর খাওয়ার সময়ে লবঙ্গ
কাছে গেল না। পাঁচক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে
পরিবেশন করিল। বাহিরের বারান্দায়
আঁচাইয়া বাবু যখন পুনরায় ঘরে ঢুকিলেন,
তখন লবঙ্গ বলিয়া তাহার নিজের ঘরে।
রামদীন হঠাৎ আদিয়া বলিল : বাবু
আপনাকে ডাকছেন।

সাহস করিয়া লবঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল।
কেন রে ?

ওহি হাম্‌ ক্যারনে জানেগা ?

লবঙ্গর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল; কিন্তু
তবু বজ্রচালিতের মত সে নীরববাবুর ডাকে
তাঁহার শোবার ঘরে গিয়া হাজির হইল।

—আবার ডাকছেন ?

—হাঁ! মাইনের টাকা ক’টা লিন্দুকে
রেখে দাওতো!

অজ্ঞানতা। খুবই নির্দোষ। কিন্তু তবু
লবঙ্গ অসুস্থত্ব করিতে লাগিল,—একটু একটু
করিয়া বাহুর তাহাকে আবার বাহুর
আবদ্য করিয়া আনিতেছে!

বাহা হউক, খুব হিরতায় লিহিত লবঙ্গ
কোট হইতে একভাড়া নোট বাহির করিয়া
লিন্দুকে তুলিয়া রাখিল। তুলিবার সময়ে
বাবু বলিলেন : খান বশেক নোট বার ক’রে

তোমার কাছে রেখে দাও! লজ্জার
খরচ ত আছে।

ইহার প্রতিবাদ করে কি একটা কথা
লবঙ্গ বলিতে যাঁইতেছিল, কিন্তু তাহার
গলা দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।
কে যেন তাহার গলাটা টিপিয়া ধরিয়া
আছে।

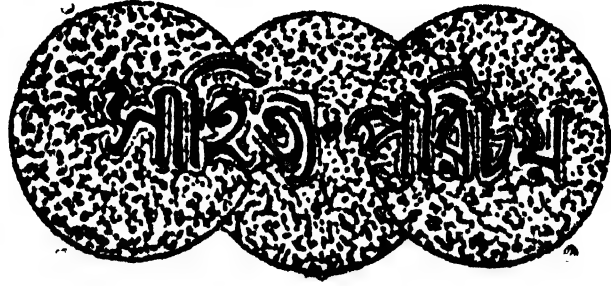
হালানামাটা লহজে মিটাইবার জন্ত সে
বশখানা নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর
রাখিল, লিন্দুকে চাবি বন্ধ করিয়া চাবির
গোছাটা নীরদবাবুকে দিতে আনিল।

নীরদবাবু চাবির গোছা লইতে গিয়া,
হঠাৎ খপ করিয়া লবঙ্গের হাত ধরিয়া
বলিলেন। লবঙ্গ চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু
কোনও আপত্তি করিয়া উঠিতে পারিল না।
নীরদবাবু স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন! লবঙ্গ?
আমি কি তোমার এতই পর?

লবঙ্গ লজ্জায় মুখখানি নত করিল। কিন্তু
কোনও উত্তর করিতে পারিল না। তাহার
হৃদয় কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল।

লবঙ্গ কথার কোনও উত্তর দিতে পারে
না, অথচ প্রতিবাদের একটা উগ্র আবেগ
তাহার মনোমধ্যে তরঙ্গ তুলিতেছিল।
নীরদবাবু লবঙ্গকে টানিয়া তাহার কপোলে
আপনার মানসিক আকাঙ্ক্ষার একটি
কালিমা ময় চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

লম্বা অপরাহ্ন ও লক্ষ্য ধরিয়া যে লুচু
লবঙ্গের লবঙ্গ মনে মনে আঁটিয়াছিল, তাহা
কোথায় তালিয়া গেল! কোথা দিয়া যে
কি হইয়া গেল, লবঙ্গ কিছুই ঠিক করিয়া
উঠিতে পারিল না। প্রতিবাদ করিতে গেলে
যে টুকু তাহার দরকার, বা যেটুকু পারীক্ষিক
শক্তির আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে তাহা বা
যেটুকু বৈহিক শক্তিরও তাহার অপ্রতুল
ঘটিল। তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে
লাগিল, অজপ্রত্যঙ্গ একেবারেই অবশ হইয়া
পড়িল, নীরদবাবুকে সে এমনই একটা
প্রকার ঈর্ষা নিঃসারনে বরাবর কদাইয়া



ভবিষ্যৎ—শ্রীঅনন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য
প্রণীত। দীপালী প্রেনে মুদ্রিত, ছাপা বেশ
সুন্দর, বাঁধাইও সুদৃশ্য। ১২৯ পৃষ্ঠার লম্বা
মূল্য এক টাকা।

“ভবিষ্যৎ” উপজ্ঞানখানি দীপালীর
৪র্থ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক
ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। লম্পতি এখানি
পুস্তকাকারে প্রকাশ লাভ করেছে। লেখক
সাহিত্য জগতে নবাগত হ’লেও তাহার
লেখার ধরণ বেশ সুন্দর। বিশেষ বড় বড়
শব্দ প্রয়োগ না করে, জাকজমক না দেখিয়ে
নানা প্রকার স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে
তিনি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় নারক ও
নারিকার যে রূপ বর্ণনা করেছেন তাহা মতাই
প্রাধান্য বোঝায়।

বইখানার বিষয়ে এই বলা যায় যে,
পাঠকবর্গকে এখানার মনোহর অমুখাবন
করতে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করতে হবে না।
“ভবিষ্যৎ” পড়িয়া আমরা বেশ খুশী হইয়াছি।
আমরা এই নবাগতের মঙ্গল কামনা করি।

—শ্রীভট্ট

“মারা-মুক্তি” :—ব্রজচন্দ্র শিবু
তাই প্রণীত উপজ্ঞান “মারা-মুক্তি”। এই

রাখিয়াছিল, যে, তাহার যে কোনও কাজের
বিকল্পে কোনওপ্রকার কথা কওয়া বা বৈহিক
কোনও বাধা দেওয়া লবঙ্গের পক্ষে সাধারণতঃ
একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাহার উপরে
আজ হঠাৎ এই আক্রমণে লবঙ্গ একেবারেই
বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

(ক্রমঃ)

উপজ্ঞানখানি তথ্যজ্ঞানপূর্ণ। ইহা নামে
মাত্র উপজ্ঞান। শিবুতাই দক্ষিণেশ্বর আশ্রা-
নীঠের ৮৮৪৮ ঠাকুরের মঠের একজন তরুণ
ব্রহ্মচারী ও ৮৮৪৮ ঠাকুরেরই একজন ভক্ত
শিষ্য। সুতরাং ৮৮৪৮ ঠাকুরের “স্বপ্ন-
জীবনী”র প্রভাব এই পুস্তকখানির উপর
কতখানি যে বাড়িয়াছে—তাহা পুস্তকখানি
পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। উপজ্ঞানখানি
পাঠ করিলে “বিশ্বাসে মিলায়ে বন্ধ—তর্কে
বহু দুঃ” এই উক্তির কথা মনে পড়ে।
ব্রহ্মচারী শিবুতাই লহঙ্গ ললে তাহার নারক
মৃণালের চরিত্র কুটিলে তুলেছেন তাঁর
ধর্মভাণ্ডার লাহাব্যে। হৃদচরিত্র মৃণাল ধীরে
ধীরে কেমন বদলে গেল তার জী মায়ার
প্রভাবে, সেই ভবিষ্যৎ তিনি একেছেন।
জীকে সে ভালবাসতো; কিন্তু সে ভালবাসায়
ছিল একটা মাদকতা। মায়ার মৃত্যুতে
মৃণালের ভালবাসা আরও এগিয়ে গেল;
শেষে সে প্রেম বিস্ময় প্রেমে পরিণত হ’লো।
এই প্রেমের তাকে সেই বিশ্বনিরস্তার
পানে, অনন্তের পানে পৌছে দিলো।
মৃণাল মায়ার ভালবাসার ভেতর দিয়েই
পেলো তার গুরুকে ও তার ভগবানকে।

উপজ্ঞানখানি সুনীতি, ধর্ম ও উচ্চতাব্য
পূর্ণ। এই পুস্তকখানি লবঙ্গ বয়সের
লোকেরই পড়বার উপযোগী।

—শ্রীভট্ট

খেয়ালী চিত্রপট



শিউ খানসামা'এর "নচদিদি" ছবিতে
সাহায্য মলিন ও বেল অমর মল্লিক
এ ছবির পরিচালক।

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২২শে ভাদ্র ১৩৪৫, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ } হত্রিশ সংখ্যা

দিল্লীতে

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিশেষ অধিবেশন হইবে। মধ্য-প্রদেশের মন্ত্রী সঙ্কটকে কেন্দ্র করিয়া যে অটলতম পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে দিল্লীর অধিবেশনে তাহার মীমাংসা হইবে। ডাঃ খারের উপর যে ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে তাহা প্রায় সকল প্রদেশের প্রবুদ্ধ জনমতের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভেই প্রকাশ। বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্র প্রদেশ এক্ষণে ডাঃ খারের সমর্থন করিতেছেন। বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে আশ্রিত-বৎসল মহাত্মাজীও ডাঃ খারের প্রসঙ্গে তাঁহার মহামানবীয় উদার্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সর্দার বল্লভভাইয়ের জিদ বজায় রাখিতে গিয়া মহাত্মাজীকেও নিরপেক্ষতার উচ্চ আদর্শ হইতে পতিত হইতে হইয়াছে।

বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও রাজা-গোপালাচারিকে অবলম্বন করিয়া যে ত্রিমূর্তি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সর্বগ্রাসী বিবরে সমগ্র কংগ্রেস বিলুপ্ত হইয়াছে—আদর্শচ্যুত হইয়াছে—লজ-জট ও হইতে চলিয়াছে! ইতিমধ্যেই বল্লভভাইয়ের

প্রতিহিংসা চরিতার্থ বলতঃ নারিমানের শ্রায় সর্ব-ত্যাগী, আদর্শবাদী, নির্ভীক কংগ্রেস-নেতাকে বোম্বাইয়ে অজ্ঞাতবাস করিতে হইতেছে—অখ্যাতমাণ্ড ও সত-সংগৃহীত ধের সাহেব প্রধান মন্ত্রীত্বের গদীতে বসিয়া বল্লভভাইয়ের ইঙ্গিত-মাকিক রাজ্য-শাসন করিতেছেন। বিহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্নেহ-পুষ্ট মিস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছেন তাহা কি জাতীয়তার পরিপোষক না কংগ্রেসী আদর্শের মূর্ত বিকাশ? বিহারে যে নীতি কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের আওতায় অনুসৃত হইতেছে বাংলায় যদি সেই নীতি অনুসৃত হয় তাহা হইলে শ্রীযুক্ত প্রভূদয়াল হিম্মৎসিংকা, শ্রীযুক্ত হুমুমান প্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস জালানের শ্রায় অ-বাঙ্গালী ব্যক্তিবর্গের বাংলাদেশে অর্থ উপার্জন করিবার পূর্বে 'সার্টিফিকেট' গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার কংগ্রেসীদল বাংলায় সেইরূপ প্রতিশোধমূলক নিয়মাবলী প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিবেন কি? অতঃপর মালদ্বারের তথ্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, মহাত্মাজীর বৈবাহিক শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালাচারিয়ার হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন-কারী-

দের বিরুদ্ধে সংশোধিত কোর্জদারী আইন আরোপ করিয়া সরাসরি কারাগারের ব্যবস্থা করিয়া আন্দোলন বন্ধ করিয়া স্বীয় মসনদ অটল রাখিতে বদ্ধপরিকর। কংগ্রেসী বীর রাজাজীকে যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা ধর্ম করিতে Criminal Law Amendment Act এর ধারাগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ও মত-স্বাতন্ত্র্যের মূল-ক্ষুরণে যদি এতদূর উগ্র হইতে হয় তাহা হইলে বাংলায় হক-মন্ত্রীমণ্ডলকে দোষ দেওয়া যায় কিরূপে? কোন কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী যে নীতি অনুসরণ করিলে দোষী বলিয়া বিবেচিত হন না অকংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী সেই বা অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিলেই তাঁহার মুগ্ধপাত করিতে হইবে—আমরা এইরূপ বৈষম্য কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারি না। “If Madras cannot be governed without the Criminal Law

Amendment Act, the Congress must bring in a chastened mood to discuss changes!” শুনিতে কটু হইলেও এই ব্যঙ্গোক্তি মধ্যে যে সত্য আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা কেহ কি অস্বীকার করিতে পারিবেন?

নিখিলভানুত রাষ্ট্রীয় সমিতির আগামী অধিবেশনে বলভভাই-রাজেন্দ্রপ্রসাদ-রাজাজীর বড়বজ্রের অন্তরালে যে আদর্শচ্যুতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কঠোর বিশ্লেষণ করিয়া যদি এই ত্রিমুণ্ডিকে সংযত না করা হয় তাহা হইলে কংগ্রেস জনগণের অন্ধা হারাইবে এবং ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িবে। বামপন্থী-নেতৃবর্গ, নারিম্যান-পক্ষীয় সভ্যবৃন্দ, মহারাষ্ট্রের ও বাংলার সভ্যগণ যদি সম্মতভাবে বিরোধিতা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে জয়ী হওয়া বিশেষ দুঃসাধ্য নহে।

সর্বহারা বাংলার বাঁচবার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা

সর্বহারা বাংলাকে বাঁচতে হ'লে আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বাঙ্গালীর উপর বাঙ্গালীর সহানুভূতি, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানের উপর একমাত্র দরদ।

বাঙ্গালী আজ পরাস্ত হল জীবন যুদ্ধে আর ব্যবসা হারিয়ে। অভাবে অনশনে ক্ষত বিক্ষত হ'ল সে “বাণিজ্যে বসতি লক্ষী” মন্ত্র ভুলে যেয়ে।

বাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের ভাগ্যদায়ী আজ বাঙ্গালী নয়—তাই তার এত লাজনা। “ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি” বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীর ধরে, বাঙ্গালীর পছন্দমত বস্ত্র যোগাবার ভার নিয়েছেন এঁরা। বাঙ্গালীর রুচী ও সামর্থ্য অনুযায়ী সব রকম বস্ত্রের বিপুল আমদানী করেছেন এঁরা। সবার সমুষ্টি বিধানই লক্ষ্য এঁদের।

বিনীত—

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি

(প্রসিদ্ধ অদেশী বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা)

বস্ত্র বিভাগ—১নং ও ২নং মির্জাপুর স্ট্রীট, [মেন] কোন বি, বি, ৩৫৩

ব্রাঞ্চ—৮৭১২ কলেজ স্ট্রীট [বস্ত্র ও পোষাক] জগুবাঙ্গার, ভবানীপুর . [বস্ত্র ও পোষাক] কোন—পি,কে, ৩৯৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিযোগিতার অধীনে—ষ্টক অফার—৫০০ নং চয়ে লভ্য। লোকে যাঁহা প্রচার করে তাঁহা তাঁহার করে না—আমরা যাঁহা বল তাঁহা করি—এটাই আমাদের বিশেষত্ব।

বিবিসি

শোক সংবাদ

বাগনানের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ননিলাল মিত্র গত ২৪ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। বাগনানের স্কুল-গৃহ নির্মানকল্পে তিনি নিকর জমি দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোক-গত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আই, বি, এম, এ পরিচালিত স্কুয়ার মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা বুধবার ৩১শে আগষ্ট অপরাহ্নে বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব ও লাউথ স্কারবন স্কুল (মেন) এই দুই দলের মধ্যে হইয়াছিল। খেলাটি আই, বি, এম, এ গ্রাউণ্ডে (হরিশ পার্ক) হইয়াছিল। ফুটিশচার্ড কলেজের অধ্যাপক ক্যামেরন সভাপতির আদান গ্রহণ করেন এবং মিলেস ক্যামেরন পুরস্কার বিতরণ করেন। খেলার বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব ৪-৩ গোলে জয়লাভ করে।

খেলা শেষে ক্লাবের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়, এম, এ, প্রতিদ্বন্দী দলকে ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে জলযোগে পরিচরিত করেন।

“রঙমহলে” শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের “অভিজ্ঞান”

মৌখান নাট্যদলের ভেতর শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সুনাম আজ সর্বজনন্যাত। গেল মঙ্গলবার এই দলটি ‘রঙমহল’ রঙ্গমঞ্চে উপস্থান্য গজোপাধ্যায়ের “অভিজ্ঞান” মঞ্চ

করেন। এর নাট্যরূপ বিষয়ে “মেঘ-মুক্তি”-র তরুণ নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, নাট্যরচনার এবারও তাঁর সুনাম অটুট আছে। এই দলটি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যালঙ্কার অধ্যাপক মন্থমোহন বসুর শিক্ষাধীনে এত বড় একটি জটিল নাটক যে ভালভাবে অভিনয় কোরে সকলের লক্ষ্যস্থানন কোরেছেন—এ কথা গৌরবের কথা নয়! মূল ভূমিকাগুলি সবই প্রায় সুঅভিনীত হ’য়েছে। অপ্রধান চরিত্রগুলির প্রতি আরও দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

টসের চা

বর্তমানে দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের ফলে এদেশে প্রস্তুত জিনিষের চাহিদা যদিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে কিন্তু এতদিন উন্নত ধরনের চা বিদেশী চা-ব্যবসায়ী দ্বারা ভারতের মার্জিত রুচি-লক্ষ্য নর-নারীর অভাব পূরণ করিত—আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন বাংলা দেশে ভারতীয় মূলধনে পরিচালিত প্রসিদ্ধ চা-ব্যবসায়ী এ, টস্ এণ্ড লস্ স্তুথু বাংলা দেশের নয় সারা ভারতের

এই অভাব বিমোচন করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলার নিজস্ব ও আধুনিক উন্নত প্রণালীতে অভিজ্ঞ কর্মীরূপ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতার ইছাঘের ৫৬৩ নং আফিম স্থাপিত হইয়াছে। টসের চায়ের চাহিদা ও বিক্রয়াদিক্য বেশিরা মনে হয় যে অল্প সময়ের মধ্যে ইছা ভারতের বাজারে সর্বত্র উত্তরোত্তর লোকপ্রিয়তা অর্জন করিবে। পরিচালকবর্গের মধ্যে লক্ষ্যাদিকারী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রভালচন্দ্র ঘোষের দূরদর্শিতা ও ব্যবসায়বুদ্ধি ও অধ্যবসায়িকতা (এ, টস্ এণ্ড লস্) এই কোম্পানীর উন্নতির মূলে নিহিত। আমরা এই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

রচনা প্রতিযোগিতা

‘মৈত্রী বাসর’ নামক কলিকাতার এক খ্যাতনামা তরুণ লেখক ‘যতীত ও বর্তমান ভারতীয় সমাজে নারী’—এই বিষয়ে একটি ‘নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগিতা’ আহ্বান করিতেছেন। বাংলার নবীন সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রয়াসী মাত্রেই এই প্রতিযোগিতার যোগ দান করিতে পারেন।

রচনা বিচার করিবার তার লইয়াছেন :—
(১) অধ্যাপক মন্থমোহন বসু (২) অধ্যাপক অনাথনাথ বসু (৩) কবি বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় ও (৪) শ্রীহর্ষিলা বৈদ্য।

ইন্ডিয়া রিসার্চ



GRAM: "ADNIVAG"

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা
৭৪/১, ফ্লাইড স্ট্রীট, কলিকাতা

বিচারে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানধী-
কারীদ্বিগকে যথাক্রমে ১০, ৭ ও ৫ নম্বর
বা উক্ত মূল্যের তিনটি পারিতোষিক বিতরণ
করা হইবে।

(১) প্রতিযোগিতার প্রবেশ মূল্য
বাবদ চার আনার ট্যাম্প পাঠাইতে হইবে।

(২) ফুলিফেন কাগজের এক পৃষ্ঠার
লিখিত দশ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

(৩) পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাগুলির লক্ষ-
সম্বলিত থাকিবে।

প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ : ৩০শে
সেপ্টেম্বর '৩৮। রচনা পাঠাইবার
ঠিকানা :—

১৩১ নাথের বাগান ষ্ট্রীট। কলিকাতা।
সাধারণ সম্পাদক 'মৈত্রী বাসর'।

কৃতি স্বীকার

গত সংখ্যার খেরালীতে শ্রীনাথনা
দেনকুণ্ডা লিখিত রেডিওতে কথিত বা পঠিত
“ভারতে নারীত্বের আদর্শ—লাবিত্রী”, যে
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে সেটি “অল ইণ্ডিয়া
রেডিও” সৌজন্যে যে কথাটি প্রবচনতঃ
গত সংখ্যার স্থান পায়নি।



(বিলাসী)

সাম্রাটের এ' অভিনয় অভিনয় নয়!

সাম্রাট-লক্ষ মধুর স্নান!!

চিত্র-নির্মাতা : শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার

কাহিনী : মনুথ রায়

পরিচালনা : মধু বোস

সঙ্গীত : চার্লস ক্রীড

চিত্র-শিল্পী : বিভূতি দাস

আলোক নিয়ন্ত্রণ : গীতা ঘোষ

গীতিকার : হেমন্ত গুপ্ত

সুদ-শিল্পী : হিমালয় দত্ত

চিত্র-সম্পাদক : শ্রীম দাস

শিল্প-নির্দেশক : সুধাংশু চৌধুরী

নৃত্য-পরিচালনা : সাধনা বসু

চরিত্রে : মনোবা—সাধনা বসু, পীতাম্বর—

অশীষ চৌধুরী, হীরক—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য,

রতনগড়ের রাজা—বিভূতি গাঙ্গুলী, রত্না—
প্রতিমা মুখার্জী, অজয়—শ্রীতি মজুমদার,
থিয়েটারের ম্যানেজার—তুলসী লাহিড়ী
প্রভৃতি।

চিত্র-পরিবেশক : এম্পারর টকি ডিসট্রি-
বিউট্যান।

প্রথম মুক্তি : 'রূপবালী', ৩রা সেপ্টেম্বর '৩৮

দু'বছর ধরে তোলা লক্ষাধিক মুদ্রার
ছবি—সাধনার নাচ, গান আর অভিনয়—
তার স্বামী মধু বোসের পরিচালনা এবং
শ্রীভারতলক্ষ্মীর কলাকুশলী যন্ত্রীদের বহুব্যয়ে
তোলা “অভিনয়” দেখবার জন্যে যেন আমরা
ইপিয়ে উঠেছিলাম। আমরা কেন?
চিত্র‘মুরগী’ যারা সবাই যে এতদিন ধরে
অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন
‘রূপবালী’-তে করবিনের স্বাক্ষর ভাঙ তা
প্রমাণ করেছে। সত্যি কথা বলতে কী
ছবিখানা যে উচ্চশ্রেণীর হবে—এ সবকিছু
আমরা একেবারে Biased হয়ে পড়েছিলাম,
একথা বলতে কিছুমাত্র বিধা নেই। অক্লপণ
হস্তে বিনি কেবলমাত্র বাঙলা সংস্করণ একখানি
ছবি তুলবার জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা বিনা
বিধায় ব্যয় করেছেন—কেবলমাত্র এই
বিশ্বালে যে তাঁর ষ্টুডিও থেকে এমন এক-
খানি ছবি বেরবে যা’ দেখে লোকে আনন্দে
আত্মহারা হয়ে যাবে। উদার প্রযোজক

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!



গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!

ব্যবহারাস্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য
পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত
আধুনিক ধরণের লকল রকম গহনা

পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ
লোহার দ্বারা চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিকিটেক্ট

৭০নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

কোন : বি, বি, ৪৮২

অভিনব চিত্র সৃষ্টি
অতুলনীয় শিল্পী সমাবেশ
অকল্পিত গল্প-রচনা
অুনিপুণ পরিচালনায়



শুভ-উদ্বোধন
শনিবার
১৭ই সেপ্টেম্বর

নীতীন বসুর পরিচালনা—পঙ্কজ মল্লিকের সুর সংযোজনায়

দেবার মাতা

ছবিগ্রাহক : উমা, চন্দ্রা, হুগাদাস, জমর মল্লিক, কক্ষচন্দ্র ও সাক্ষীগল

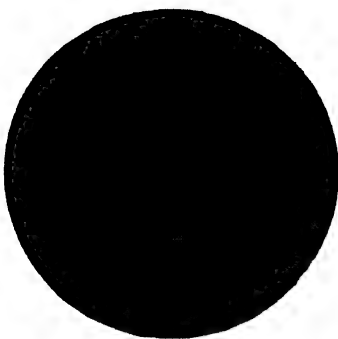
চিত্রায়



নিউ সিনেমার



নিউ থিয়েটার্সের
নবতম অবদান



ঃ পরিবেশনা ঃ
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

বাবুলাল চোখানির রঙীন স্বপ্ন বহুলাংশে লকল হয়েছে। অভিনয় AI ছবি হয়েছে। তবে নীতীন বহু, প্রমথেশ বহুয়া এবং দেবকী বহুর ছবির সঙ্গে এই ছবির স্থান নিঃসন্দেহে দিতে পারি। আমাদের এই মন্তব্যে এই উল্লিখিত তিনজন পরিচালক ছাড়া যে করুণ আনন্দ স্বনামের লোপালি আলোর পথে এগিয়ে চলেছেন তারা হয়তো বলতে পারেন—ওরুণ সুযোগ ও সুবিধা পেলে আমরা ওর চেয়ে ভাল ছবি তুলতে পারি। তাঁদের এ কথা অবশ্য ভাববার আছে! “অভিনয়ে”র দোষ-গুণ বিচারের পূর্বে এর গল্পটি সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

কিবগড়ের তরুণ জমিদার হীরক রায় একদিন কোলকাতা থেকে রেস্‌ খেলে ট্রেনে ফিরছে জমিদারীতে। বন্ধুমান টেনে এলে ‘জাগ্রত ভারতের’ বিশেষ সংখ্যার লৌক্য্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত। ‘মিস্‌ বেঙ্গল’—মনীষা চৌধুরীর ছবি দেখে সে বুঝতে পারলে মেরেটি তার পরিচিত। বন্ধুবান্ধবদের একথা বলতে তারা তাকে ঠাট্টা কোরতে লাগল। তখন সে বন্ধুদের কাছে বাজী ধরল—চেনা ত’ দুয়ের কথা মনীষাকে বিয়ে কোরে এর সত্যতা লবারের কাছে সে লপ্রমাণ কোরবে।

মনীষা পাটনার পীতাম্বর চৌধুরীর ঘরে। লকালবেলা বুড়ো পীতাম্বর নাটকের খসড়া কোরছিলেন আর বিবেচন কোরছিলেন ষটক ও দালালের দলকে। এমন সময় হীরক এলে সেখানে পৌছিল। হীরক ছিল পীতাম্বরের ছাত্র সেইজন্য তাকে চিন্তে বুকের বেলা বেগ পেতে হ’ল না। এই সময় মনীষাও সেখানে এলে হাজির হ’ল—দেখিনের কিশোরী মনীষার লরীয়ে আজ যৌবন জোয়ারে উচ্ছল। হীরক সে রূপ দেখে মুগ্ধ হ’ল—আর মনীষার জীবনেও এল নব বসন্ত।

ভারপর একদিন প্রজাপতির বাধনে ওরা দু’জনে পড়ে পরস্পরের কাছে বাঁধা। কিন্তু বিয়ের পর নারীজীবনের যা কাম্য তা’ সে পেল না স্বামীর কাছে—তাই তাকে কোরে তুলল ব্যথিত। হীরকের মনীষার ওপর এই হতাশার যে কোনও কারণ ছিল না এমন নয়। ঘটনা এখানে খুলে বলাই দরকার। কিবগড়ের রাজকন্যা রত্নার সঙ্গে অনেকদিন আগে হীরকের সঙ্গীতি হয়। কিন্তু রত্না তারপর বিলেত যাওয়ার এবং রত্না লম্বন্ধে দু’একটি কুৎসিত কথা শোনার হীরকের মন তার ওপর বিরূপ হ’য়ে ওঠে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্তই বাজী রেখে সে মনীষাকে বিয়ে করে। কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর রত্না—হীরকের পূর্বে প্রেম প্রগ’ড় হ’য়ে ওঠে এবং একদিন রত্নাকে নিজ বাড়ীতে এনে মনীষাকে বধন দস্তরমত অপমান কোরল তখন মনীষা এ হতাশার লহ কোরতে না পেরে গৃহত্যাগ কোরে পাটনার রওনা হ’ল বাপের কাছে। কিন্তু বাপের কাছে সে ফিরতে পারল না। কারণ, মনীষা মরছে, এ দুঃখও পীতাম্বরবাবু লইতে পারবেন, কিন্তু স্বামী ত্যাগ কোরছে এ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই মনীষা না মরেও মরল। তার আত্মহত্যার খবর লংবাঈপত্র মারফৎ চারিধিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই শোক লহ কোরতে না পেরে বুদ্ধ পীতাম্বর অন্ধ হ’য়ে গেলেন।

এরূপে মনীষা থিয়েটারে যোগদান কোরলেন অভিনেত্রীরূপে দেবী ইন্সপী নাম নিয়ে। “কচ ও দেবদানী” নাটকে তার অভিনয় দেখে লকলে মন্তব্য হ’ল। এমন সময় হীরক একদিন কাগজে দেবী ইন্সপীর ছবি দেখে মুগ্ধ—এই ইন্সপীই মনীষা। সে ছুটল কোলকাতায়। কিন্তু কিছুতেই মনীষা তাকে আদল দেয় না। অবশেষে থিয়েটারের ম্যানেজারকে বহু টাকা দিয়ে

সে বাসব রায় নাম নিয়ে পীতাম্বরবাবু লিখিত “লকুল্লা” নাটকে দৃশ্যস্তর ভূমিকা পেল। বাসব রায়ের দৃশ্যস্তর আর দেবী ইন্সপীর লকুল্লায় প্রাণলয় কোলকাতা লহর মুগ্ধিত হ’ল। কিন্তু তাহের এ অভিনয় আর ভাল লাগে না। তাই তারা দু’জনে থিয়েটার ছেড়ে কিবগড়ে তাহের লেই পরিচিত গৃহে ফিরে বাবে স্থির কোরল।

সেদিন “লকুল্লা” নাটকের শেষ অভিনয় রজনী। মনীষা তার বাপকে থিয়েটারে এনেছে—ইচ্ছে, অভিনয় শেষে স্বামীর হাত ধরে পিতাকে প্রণাম কোরে বলবে—সে মরেনি।

শেষ দৃশ্য হ’য়ে গেল। হীরক ও মনীষা ভাড়াভাড়ি রঙ মুছে প্রস্তুত হ’তে লাগল পীতাম্বরকে নিয়ে কিবগড়ে বাবার জন্তে। এমন সময় রত্না সেখানে এলে মনীষাকে বলল—ধন, ঐশ্বর্য্য, ইন্সপী একজন অভিনেত্রীর যা কাম্য সে যা চায় হবে—তুই হীরককে সে ছেড়ে দিক। মনীষা স্মৃণ করে চলে যাচ্ছিল কিন্তু সে স্তব্ধ রত্না লস্তানলস্তবা এবং হীরক ভিন্ন তার গত্যস্তর নেই, তখন শোকে দুঃখে অভিমানে তার পিতা যে গাড়িতে তাহের জন্ত বাইরে অপেক্ষা কোরছিলেন সেখানে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল—গাড়ী দ্রুতগতিতে চক্ষের বাইরে চলে গেল। হীরক কত ডাকল কিন্তু কেউ ফিরেও তাকাল না।

শ্রীশাল গুজা কন্সেশান

টপেরচ

১লা সেপ্টেম্বর হইতে বাহির হইয়াছে
কেবলমাত্র ১১/০ এক পাউণ্ড নিট
এ, টস্‌ এণ্ড সন্স
কলিকাতা



মিস্ বেঙ্গলের প্রেম কেন ব্যর্থ হইল ?
অতি আধুনিক সমাজে প্রেম কি মৃত ?
শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

আভিনয়

চিত্রে তাহার জবাব পাইবেন।

শ্রেষ্ঠাংশে :

সাধনা বোস, অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ
ভট্টাচার্য্য, প্রতিমা মুখার্জি প্রভৃতি।

সগৌরবে দ্বিতীয় সপ্তাহ

শনিবার ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে

রূপবাণী

ফোন বি, বি, ৩৪১৩

পূর্বাঞ্চে আসন সংগ্রহ করুন। N. I. P.

রূপবাণী

ফোন : বি, বি, ৩৪১৩

সর্বজন প্রশংসিত
দ্বিতীয় সপ্তাহ !

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

অভিনয়

শ্রেষ্ঠাংশে : সাধনা বসু

অহীন্দ্র, ধীরাজ, তুলসী, প্রতিমা

বিভূতি, প্রীতি প্রভৃতি।

আধুনিক সভ্যতার দিনে, প্রেম কি শুধুই
অন্তর বিলাস, হৃদয়ে-হৃদয়ে পরস্পর যে
পরিচয় তা কি নিভাসই ক্ষণভঙ্গুর!

অগ্রিম সিট রিজার্ভ করুন।

N. I. P.

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড, ফোন : সাউথ ৩৪

শনিবার ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে

নিউ থিয়েটার্সের অমর অবদান

অভিজ্ঞান

শ্রেষ্ঠাংশে : মলিনা, জীবন, মেনকা, পঙ্কজ প্রভৃতি।

পূর্বাঞ্চে আসন সংগ্রহ করুন

কবি শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষের

নূতন কাব্যগ্রন্থ

জীবন ও রাত্রি

বাহির হইয়াছে, মূল্য এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

নালন্দা ইউনিভার্সিটি প্রেস

২৪এ মোহিনী মোহন রোড, কলিকাতা।

৪৩ নং চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ; কলিকাতা।

গল্পটি বেশ নতুন ধরনের এবং এর ভেতর বেশ বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু চিত্রনাট্য রচনার অক্ষমতাতেই গল্পটি প্রথম দিকে জমে ওঠবার সুযোগ পায়নি। প্রথমার্ধে পুরো বেড়ঘণ্টা ছবি দেখবার পর কাহিনী যে কতটুকু অগ্রসর হ'ল তা আমরা বুঝলাম না। এই অর্ধে নায়ক-নায়িকাকে প্রতিষ্ঠিত কোরতেই চিত্রনাট্যকার হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ঘটনার স্রোতপ্রতিঘাতে গল্পটি বেশ জমে উঠেছিল এবং ঘটনার গতিও বেশ স্বচ্ছন্দ্যগতিতে এগিয়ে চলছিল কিন্তু শেষের একই ব্যাপারের বারবার অবতারণার 'টেল্পা' একটু স্লথ হ'য়ে পড়েছিল। গল্পের পরিসমাপ্তি আমাদের মনে হয় সাধারণের মনে বিশেষ কোনও রেখাপাত কোরবে না। গল্প দ্বন্দ্বকে একটি অভিযোগ আছে আমাদের। গল্পের শেষে রত্নার মুখ দিয়ে বলানো হ'য়েছে 'সন্তান-লস্তুবা'। চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে লবার্কে আনন্দ দেওয়ার লগ্নে লগ্নে লংশিকা বেঁধেই উঠে বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু একটি কুমারীর মুখ দিয়ে ঐ কথা বলিয়ে ছনীতি প্রচার কোরে পরিচালক হয়তো আগন্তবিনের ভবিষ্যৎবাণী প্রচার কোরতে পারেন কিন্তু সাধারণ ও জিনিষটা বরষান্ত কোরতে পারবে কিনা সন্দেহ। বিলাতী নর-নারীর অর্জন নৃত্য দেখিয়ে

আমর গরম করবার চেষ্টা অশেষ নিশ্চিনী ও বিজাতীয় ভাব-পূর্ণ—তবে পরিচালকের থিয়েটারের দৃষ্টান্ত পরিচালনা আমরা প্রশংসা করি।

“অভিনয়ে”র আলোকচিত্রের কাজ অতি উচ্চাঙ্গের হ'য়েছে। পটভূমিকাগারের কাজেও নিন্দা করবার কিছু নেই। শব্দসম্প্রদায় কাজও প্রশংসার যোগ্য। দৃশ্যপট এই ছবির এক আকর্ষণীয় বস্তু। এত চমৎকার জাকজমকপূর্ণ দৃশ্যপট কোন দেশীয় ছবিতে আমরা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু এত ভাল দৃশ্যবস্তু হ'লেও লেটগুলির ভেতর Distinction এর অভাব হেতু আমরা কখন কোথায় এসে পড়লাম তা' প্রাধান্য করা হ'য়ে পড়ে সত্ত্ব। তা' ছাড়া অস্বভূত এত লেট দেখানো আমাদের বাহ্যিক বলেই মনে হয়। লজ-লজ্জা ভালই হ'য়েছে—হীরককে মাঝে মাঝে ওরূপ লংকোট পরিম্নে মাড়োরারি লাজানোর অর্থ বুঝলাম না। ছবিখানির সম্পাদনার ক্রটি বিচ্যুতি রয়েছে অনেক। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিখানির ওপর যদি কাঁচি চালানো যায় তা' হ'লে মনে হয় গল্পটির গতি অধিকতর লহজ ও লরল হবে। ছবিখানির লজীতাংশ অতি সাধারণ—প্রশংসা করবার মত কিছু নেই। গান রচনা প্রশংসনীয়।

নৃত্যকুশল সাধনা

সাধলীল অভিনয় করে নৃত্যকুশল সাধনা। 'অভিনয়ে'র লাক্য-মণ্ডিত করেছেন—কোন কোন দৃশ্যে তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলতে ইচ্ছে করে—সাধনার এ' অভিনয় অভিনয় নয়—সাধনা-লজ্জা মধুর প্রাবল্য। তাঁর এই অনিন্দ্যনীয় অভিনয়ের জন্তে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে সাধনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—তাঁর সাধনা লার্থক হটক। ১৯৩৮ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী-রূপে সাধনা আজ ভারতের চলচ্চিত্রক্ষেত্রে তারার! বস্ত্রাগত-প্রাণ বুদ্ধ পীতাম্বরের ভূমিকায় অসীমের অভিনয় মনোমুগ্ধকর। এরপরই একটি ক্ষুদ্র হাস্যটুণ ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী অভিনয় শুণে লকলের দৃষ্টিপথে আকৃষ্ট হ'য়েছেন। হীরক রায় রূপে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য খুব উচ্চাঙ্গের অভিনয় না কোরলেও তাঁর অভিনয় চলনলই হ'য়েছে বলা যেতে পারে। তাঁর মুখে গান ভাল লাগল না। শ্রীতি মজুমদারের অঙ্গর মল্লিক আশাস্বরূপ করনি। চল্লিত মিত্রের কুঞ্জবাসু নিজ শুণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। বিভূতি গাঙ্গুলীর রতনগড়ের রাজা মন্দ নয়। প্রতিমা মুখার্জীর বস্ত্রা অচলের নীচে যদি কিছু থাকে—তবে তাই। এর চেহারা ও গলায় স্বর চিত্রের পক্ষে একেবারে প্রতিকূল। অস্ত্রান্ত ভূমিকাগুলি চলনলই।

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের

তেল ব্যবহারে

বেরি বেরি হয় না

মিল-২৪৬, তাপার সারকুলার রোড - কলিকাতা।

স্ট্রীট-সিঙ্গার

স্ট্রিট ফ্রুট লম্বাধার পথে এগোচ্ছে।
এ কবিন প্রথম দিকে কাষ হোল লহরের
একটি নামকরা থিয়েটারের সামনে।
টুডিওর মধ্যে তৈরী এ লেটটা বোকাই
যাচ্ছিল না যে এটি লভ্যিকার থিয়েটার নয়।
রাত্তা, লোক-জন, মোটর গাড়ী, রিক্স, বাস
সবে দিলে দৃশ্যটিকে এমন একটি অখণ্ড রূপ
দিয়েছে যে অস্বপ্ন বললে মনেই হয় না।

অভিনয় করলেন এই লেটে লায়গল, অমর
মল্লিক, কানন, জগদীশ শেঠি, বিক্রম কাপুর,
নরেশ বোল, অহি লাম্বাল, অগেন পাঠক,
কেটো দাল প্রভৃতি।

আর একটি লেটে কাষ হোল। এটি
'ব্রড কাস্টিং টেনন'। লায়গল গান করলেন।
লায়গলের অপকৃপ কণ্ঠ স্বাধু্য সুরে তানে
লয়ে ভাবে মুহূর্ত্তনার লেটের অপর সকলকে
আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। যেখা গেল কারোর
কারোর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে।
চলচ্চিত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক অভিনেতা
লায়গল গাইছে 'এ গান তোমার শেষ করে
দাও.....', কোন দর্শক আছে যার
ভাল লাগবে না?

সু-অভিনেতা ডাঙ্ক বাজুজ্যা এই লেটের
ওপর সুঅভিনয় করে লবায়ের মনে রেখাপাত
করলেন।

ষড়্দিদি

সুরেন্দ্রনাথকে আমরা শেষ দেখেছিলাম
জমিদার ব্রজবাবুর বাড়ীতে। বিমাতার উপর
অভিমান কোরে লে এখানে আশ্রয় পেয়ে-
ছিল এবং লজ্জা লজ্জা পেয়েছিল বড়দ্বিধি
'মাধবী'র অপ্রিমিত যত্ন ও স্নেহের পরশ।
একদিন আবার লেই বড়দ্বিধির কথাতোঁট
ভুল বুঝে, নিষ্কারুণ অভিমান, লে আবার
পথের বার হোল।

যখন জানতে পারলেন সুরেন্দ্রনাথ নেই,
তার লব কিছুই করে পড়ে আছে, নেই কেবল

বি, এল, খেমকার প্রযোজনায়
মেট্রোপলিটান পিকচার্সের
নবতম বাণী-চিত্র

খনা

প্রাচীন ভারতের এক
মহীময়ী নারীর
অপূর্ব জীবন-কাহিনী

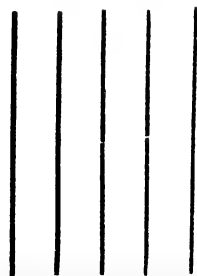
খনা

নয়ন-মন পরিতৃপ্তিকর
রূপ ও রসের
অনাবিল প্রবাহ

খনা

প্রাচীন ভারতের
ঐশ্বর্য্য, সংস্কৃতি ও
সাধনার চিত্তাকর্ষক
পরিচয়

* * *



খনা

নাম ভূমিকায়
ছাত্রা দেবী

শ্রেষ্ঠাংশে:

অহীন্দ্র চৌধুরী

অগ্রাণ্ড ভূমিকায়:

দেববালা, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণা, সুশীল রায়, সমর
ঘোষ, ধীরেন মুখোপাধ্যায়।

নাট্যকার

মন্মথ রায়

*

পরিচালক

জ্যোতিষ ব্যানার্জি

*

সুর-সংযোজনা

ধীরেন দাস

*

নৃত্য-পরিচালনা

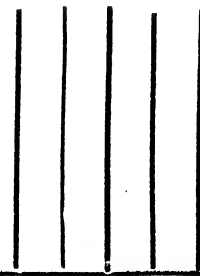
সমর ঘোষ

*

ব্যবস্থাপনা

গণপৎ রায় চৌধুরী

* * *



খনা

পূণ্যভূমি ভারতের
অতীত গৌরব গাথা

আগত প্রায়

ইউ, এন, গোস্বামীর

নেতৃত্বে

ভারতলক্ষী স্টাডিওতে
গৃহীত

সেই ঘরের মালিকটি, তখন মাধবীর অন্তর বেধনার কাতর হোরে পড়লো।

চেষ্টার ক্রটি নেই। সারা শহর ভোল-পাড় কোরেও সে পলাতকের কোন লক্ষান পাওয়া গেল না।

বেচারী মাধবী! ঘর-গৃহস্থালীর কোন কাজে তার সুখ নেই। অন্তরের অবরুদ্ধ বেধনা বাহিরে প্রকাশ হয় না, কিন্তু মন তার ভেঙ্গে পড়ে।

দোতালার বারান্দায়, পথের পানে উদাল দৃষ্টি মেলে মাধবী তাকিয়ে আছে। শূণ্যপথে কতলোকের আনাগোনা, কিন্তু সুহৃৎসনাথ নেই।

অন্ধর থেকে হঠাৎ হাওয়ার ভেলে আলো এক বৈফব তিথারীর মধুর কণ্ঠের কীর্তন গান। লচকিত মাধবীর বিক্লু অন্তর সেই গানের কথার বেন আবার নতুন কোরে ভেঙ্গে পড়ে—

“লবি গো, রাখা রাখা সুরে

কাবিল বাশরী”—

উচ্ছলিত ক্রন্দনের বেগ গোপন কোরতে না পেরে, মাধবী তার নির্জন কক্ষে আবার ফিরে যায়।

গত হুণ্ডায়, একদমর ষ্টুডিওতে এই দৃশ্যটি তোলা হোল, লজ্জিত পরিচালক পঙ্কজবাবুর নির্দেশনার। বৈফব-তিথারীর রূপে, তাঁর অমৃত-কণ্ঠের সুখা বর্ষণ কোরলেন সুকণ্ঠ গায়ক বিজয় গোস্বামী।

পরিচালক মল্লিকমশাইয়ের মুখে দেখলুম আবার সেই পুরোনো হাসি। দস্তশুলের ধাক্কা লাম্বে মল্লিকমশাই সম্পূর্ণ সুস্থ হোয়ে উঠেছেন। ‘বড়বঁধি’ ছবির পরবর্তী অংশের কাজ শীঘ্রই শুরু হ’বে।

ছ’নছর ষ্টুডিও

বেবকী বাবুর নতুন ছবি। তার ‘শুভ মরহত’ গত জম্মাষ্টমীর দিন সুসম্পন্ন হোয়েছে। গত কাল থেকে পুরোদস্তর চিত্র-গ্রহণ পর্ব শুরু হোল।



চম্পাবতী, মায়গল এবং ইন্দু মুখার্জি—নিউথিয়েটার্সের ‘হেশের মাটি’ চিত্রে। পরিচালনা: নীতীন বসু। ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে চিত্রা এবং নিউ লিনেনমায় দেখান হইবে।

এই ছবির নামকরণ এখনও সুদীর্ঘাংশিত হয় নি। আপাতত: আমরা ‘বিষের বাশী’ নামেই অভিহিত করছি।

আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাধা-ধরা নিয়ম কানুনের বাইরেও মানুষের বসতি আছে। সেখানে আশংকের মতট মানুষ বাস করে। বাস্তব: তাদের জীবন-যাত্রার প্রশাণীতে তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকপাতে উজ্জল হোয়ে না উঠলেও—তার মধ্যে ধরা পড়ে একটা লহজ, শাস্ত ও মধুর লাচ্ছন্দ্য। বিবেক-বুদ্ধি, কর্তব্য-বোধ স্রেহধর্ম এবং অন্তরের ঐশ্বর্যে তারা কারু চেয়ে খাটো নয়।

এছেরই বিচিত্র-জীবন অবলম্বন কোরে গোড়ে উঠেছে আলোচ্য চিত্রের নাট্যাংশ। জীবনের লহজ শৃঙ্খলা ভেঙ্গে চুরে বেড়ান কোরে সেখানে বিপ্লবের সৃষ্টি হোল, অন্তরের লহজাত সুপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমশ: নিশ্চিহ্ন

হোয়ে এলো। যুগ, জীব, অভিলক্ষি ও ষড়যন্ত্রনা, মোহ ও রূপতৃষ্ণার কাছে আত্ম-নিবেদন কোরে, কেমন কোরে সে লচ্ছন্দ-জীবনের লহজ-প্রবাহে আবর্তের সৃষ্টি হোল—তারই চিত্তচমকপ্রদ, সম্পূর্ণ অভিনব এক বিচিত্র কাহিনীর অবলম্বন কোরে এই চিত্রখানি রূপ-রশে লজ্জিত হোয়ে উঠবে।

এ লহজে অনেক নতুন ধর, পরে আপনাদের বিস্তৃত ভাবে জানাতে পারবো আশা করছি।

ঋতু বঙ্গ ৪৫ মাস যে কারণেই হউক ভৈরবী বনৌষধিতে অব্যর্থ ফল—গর্ভাবস্থায় ব্যবহার নিষিদ্ধ ১৫ দিন ও বর্ণ শাস্তি একবার প্রয়োগেই উপশম, ৪০ মাস: ১৮ আনা



সময় ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস অনন্ড বিশ্বাসদ
১৮২ নং বহাগজার ট্রাট, (K) কলিকাতা।

এ সপ্তাহে, ২ নম্বর ষ্টুডিওর একটি সেট-এ ছবির উদ্বোধন-সম্বর শুরু হোল। পরিকল্পনা ও গঠন-মাধ্যমে সেটটি সভ্যই অভিনব। পাছাড়ের উপর—বিচিত্র ‘মনলা বন’।

কর্ম-শচীব বতীজনাথ শিত্তের ব্যবস্থাপনার এবং দেবকী বাবুর পরিচালনায়, নিউ থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের সহযোগে—এই সর্বজনপুষ্ট বিচিত্র কাহিনীটি যে তার বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রেখে, একটি নব-তর মাধ্যম নিয়ে, ছবির পর্দায় ফুটে উঠবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অসম্ভারমুখ: শুভার ভবতু!

দেশের মাটি

আজছে ১৭ই তারিখ থেকে চিত্রার ও নিউ লিনেমায় নিউ থিয়েটারের নবতম চিত্র “দেশের মাটি” ছবিখানা মুক্তিলাভ করবে। হিন্দি সংস্করণের মতই যে এ ছবিখানাও জনপ্রিয়তা লাভ করবে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহই নেই। আমরা এর মুক্তি লাভের আশায় রইলুম।

পূর্ণ থিয়েটার

আজছে শনিবার থেকে এখানে নিউ থিয়েটারের ছবি ‘অভিজ্ঞান’ দেখান হ’বে। এই ছবির মধ্যে যে সব বিষয়-বস্তু নিয়ে deal করা হয়েছে তা আজকালকার দিনে বাস্তবিকই ভাববার বিষয়।

এই ছবিতে অভিনয় করছে মলিনা, জীবন, শৈলেন চৌধুরী, মেনকা, ভাস্কর্য্যাপাধ্যায় প্রভৃতি।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২২শে তারিখে খেরালীর কোন লংখ্যা প্রকাশিত হইবে না। ইহার পরবর্তী লংখ্যাই পূজা লংখ্যা—বহালয়ার দিন বাহির হইবে। লং খে:

প্রেম নহে শুধু ফুলহার:

জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি: মোহনলাল চিত্তে কোন প্রকার সন্দেহই নাই। যেন, মানে, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে মি: মোহনলাল সমাজের এক জন দীর্ঘ স্থানীয় কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির অন্ধকার। লংখ্যার কোন প্রকার উৎসবেই যোগদানের অধিকার তাহার নাই। দৃষ্টিতে বাহার শাস্তি নাই, বাস্তবিক আনন্দ উৎসবে যোগদান তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ আর কিছুই নহে, তাহার আঁখির একমাত্র কল্পা দুর্গা বালা বিধবা। অতি শৈশবে খুব ঘটা করিয়াই তিনি কল্পার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর হইতেই জামাতার কোন খোঁজই পাওয়া যায়ইতেছে না। কেহ বলে সে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে, কেহ বলে কোন লালু হয়ত জামাতা স্বরূপকে চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে। কারণ তাহার গোপন তত্ত্ব মস্তুর সে হইবে প্রধান লক্ষ্য।

দুর্গা শিশুকাল হইতেই ভগবৎ প্রেমে মাতোয়ারা। এই পঙ্কিলতা পূর্ণ পৃথিবীর কোন আনন্দজনকই তাহার গভীর মনে কোনই স্থান কাটিতে পারে না। কোন প্রকার লাজ সজ্জা বিলাসিতায় তাহার মন মোটেই চঞ্চল হয় না। সে ভাবে এ মরজগতে একমাত্র অবিনশ্বর হইতেছে স্বর্গীয় প্রেম। প্রেমই মানবকে চিরকাল অমর করিয়া রাখে।

দুর্গার সহচরী শাস্তার কিন্তু এসব মোটেই ভাল লাগে না, “হঁসে নাও হৃদয় বহিত নয়” ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। তাই সে তাহার প্রিয় লবীর এই উদ্বলিত ভাব লক্ষ্য করিতে পারে না। জোর করিয়া সে তাহার লবীকে আনন্দ উৎসবে লইয়া যায় এবং একদিন হোলী উৎসবেও সে তাহার প্রিয় লবীকে নিয়া যায়।

আগ্রা নগরীর একপ্রান্তে থাকে এক লালু। সর্বদাই সে ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন। পাখি কোন প্রকার স্তব তাহার কাম্য

নহে। ভগবানের সঙ্গে চির-বিলীষমান হওয়াই তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

লালু লিখ্য স্বরূপ প্রেমের পূজারী। প্রেমের জয়গান সর্বদাই তাহার বচন ধ্বনিত হয়। কিন্তু লালু যেখন তাহার প্রিয় লিখ্য ক্রমশ: এই প্রেমের জয়গানে পাখি জগতের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, তাই তিনি লিখ্যকে লাবধান করিয়া বলেন,— এই পৃথিবী নন্দর, যাহা দেখিতেছি, শ্রবণ করিতেছি একদিন সকলই তাহার লোপ পাইবে। পৃথিবীর অস্তিত্ব ক্ষণভঙ্গুর, স্মরণীয় সর্বদাই ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকাই মানবের ধর্ম ও কর্ম।

কিন্তু স্বরূপ বলে,—শুধু দেখে লবই লিখ্য, কিন্তু প্রেমত স্বর্গীয় জিনিষ। স্বর্গীয় প্রেমে কী অপরাধ থাকিতে পারে। তখন লালু বলে স্বরূপ, মন তোমার খুবই চঞ্চল, তুমি করেকবিনের জন্ত বাহিরে যাও। জন্মটিমোর মেলায় বিরাট উৎসব হয়। বহু স্থান হইতে বহুলোক তথায় এই উৎসব উপলক্ষে জমায়েৎ হয়, তুমিও তথায় যাও। হয়ত বা মনে শাস্তি পাইবে।

ডাঃ হংসরাজ শাস্তার পিতা বৈষয়িক কর্মে সর্বদাই ব্যস্ত। তথাপি কাজ কর্মের অবসরে তাহার নিকটস্থ একমাত্র পুত্রের মুখ মাঝে মাঝে তাহার চিত্তকে ছোলা দেয় এবং গতানুগতিক কার্য্যসারকে ওলট-পালোট করিয়া দেয়।

পরিচালক মি: কার্কার উপরোক্ত চরিত্রগুলিকে তাহার অনবদ্য ছবি “বাগবানে” অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় বিমলা কুমারি, শিতারা, আলরফ খান, কে, এন, মি: নজ্জেকার ইয়াস মিন, নাজির প্রভৃতি রয়েছেন।

ছবিখানা বোম্বাইতে বর্তমানে দেখান হইতেছে এবং তথায় ২২ নম্বর পদার্পণ করিল। প্রত্যন্ত লিনেমায় ছবিখানা আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করিবে।

শা
র
দী
য়া

সং
খ্যা

মহালয়ার
পূর্বেই
বাহির হইবে

খেয়ালী শারদীয়া সংখ্যা

দৃশ্য সজ্জার ও প্রবন্ধ গৌরবে
বিশিষ্ট সংখ্যা 'খেয়ালী' অপরাভ্যন্তর!

এবারকার শারদীয়া সংখ্যা হইবে
আপনার পূজার আনন্দের সাথী!

এই সংখ্যায় লিখিবেন—সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অশোক নাথ শাস্ত্রী,
বুদ্ধদেব বসু, গিরিজা বসু, মন্মথ রায়, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়,
নরেন দেব, রাধারাণী দেবী, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, হরেন ঘোষ,
প্রভাত কিরণ বসু, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, বীরেন ভদ্র, দীনেশ
রঞ্জন দাস, বিমলাপ্রসাদ মুখার্জি, লক্ষ্মী মিত্র, শৈলেন মল্লিক,
সুবোধ রায়, মেঘেন রায়, বিমল ঘোষ, রুচিরা দেবী, প্রমথেশ
বড়ুয়া, লীলা দেশাই, ইন্দিরা রায় প্রভৃতি অনেকে।

১৫ই সেপ্টেম্বরের পর বিজ্ঞাপন
বুক করিলে ছাপা হইবে না।

১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে অগ্রিম
টাকা না পাইলে কোন এজেন্টই
এই সংখ্যার কাগজ পাইবেন না।

শা
র
দী
য়া

সং
খ্যা

মূল্য
চার আনা
মকঃস্বলে
পাঁচ আনা



নাট্যশালার ইতিহাসে ব্রজলীলা

গত সাত লগ্নাহ ধরিয়া 'খেরালী' কাগজে মূর্গী-মার্কী লেখক কণ্ঠার প্রকৃত বৃত্তি প্রকটিত হইতেছে। এত বৃত্তি প্রকটনে পাঠক-সাধারণ যে এত বেশী উল্লসিত হইবেন, পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল না। এই সম্পর্কে চারিষিক হইতে যে সব আনন্দ-মুহুর্ত চিঠি আসিতেছে, তাহাদের সার-সংলগ্ন করিলে দেখা যায়, প্রায় পনেরো আনা পত্রই এই কথা বলিতেছে—'ভাষা-জননীর পবিত্র মন্দির অস্পৃশ্য ঘোরগ-বিবরণে কলুষিত হইতেছে। ইহার প্রতীকার প্রত্যাবস্তক। 'খেরালী'-তে 'কল'র যে খেলা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আশা হয়, মাতৃমন্দির হইতে শনির পাপ-অশুচরিতা দীর্ঘট বিতাড়িত হইবে।'

আমরা এই লকল পত্রের উত্তরস্বরূপ আমাদের লক্ষ্যের পাঠকগণকে এখানে জানাইয়া রাখিতেছি যে, তাঁহারা নিশ্চিত থাকুন,—আশাতজের মনস্তাপ তাঁহাদিগকে পাইতে হইবে না! যেহেতু সুখের সুখোপ যুলিয়া দেওয়াই 'খেরালী'র জীবনের প্রধান কাজ। সাহিত্য বা রাজনীতি, যে কোনও ক্ষেত্রেই হউক—ধাপ্রাবাজির জোরে বাহারি মাথা তুলিতে চায়, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হউক, ইহাই 'খেরালী'র চির কামনা।

সুতরাং হুঃ-(শীল+নীতি)-পালিত শনির

পাপ সেবকেরা 'সাহিত্যের কণ্ঠপাথরে' যে ভাবে বসিত হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহার অগুণা হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। 'নীলবর্ণ শূগাল' যতদিন না ধরা পড়িয়াছিল, ততদিন মজা মারিয়াছিল বটে; কিন্তু পরিণামে যে ভাবে সে মরিয়াছিল, তাহা করুণ রসেরই উদ্দীপক। পরিবর্তের আশ্রয় ও প্রাশ্রয় পাইয়া ইহারও আজ অনেক অজের নিকট হইতে আদর ও পুঙ্খকার আদায় করিতেছে বটে; কিন্তু ইহাদের পরিণাম 'নীলবর্ণ শূগাল'ের পরিণামের চেয়েও ভয়ঙ্কর! যেদিন দেশের লোক বুঝিবে যে, সাহিত্য-পরিষদকে একদল চ্যাংড়া আত্ম-অত্যাচারের সোপান করিয়া এবং পরিষৎ-পত্রিকাতে তাহারা নিজেদের প্রশংসা-প্রচারের জরচাক বাজাইয়া মজা লুটিতেছে; সেই দিনই তাহাদের সাহিত্যিক 'কৌকর-কৌ' একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া বাইবে।

বাস্তবিক, বলিতেও লজ্জা হয় যে, যে কাগজে একদিন রাধেন্দ্রমুন্দর, রজনী, গুপ্ত প্রভৃতি সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন, সেই কাগজের আজ 'মধ্যক' হইয়াছেন—শনির বাবুর 'বেজনবাঁধা'। দাধার জন্তে তারা যে করুণ দিশেহারা—করুণ বেতাল-ক্যাপা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় এই পত্রিকার 'বাংলা গল্পের প্রথম যুগ' নামক 'রাবিশের' মধ্যেই জল জল করিতেছে! 'বিশ্ব শতাব্দীতে বাজলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যে ১০.১২ খানি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখ-

যোগ্য' বলিয়া শনিকান্ত লজনীকান্ত তাহাদের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে দীনেশ বাবুর 'বজ্রভাষা ও সাহিত্য'র নাম নাই বটে কিন্তু তাঁহার 'বেজনবাঁধা'র 'বঙ্গীয় নাট্য-শালার ইতিহাস' নামক পচা পুস্তকখানা দাধরে উল্লিখিত হইয়াছে। তারা দাধার প্রেম-মহিমা পানে যেমন টলমল, তাহাতে ঐ তালিকার মধ্যে বেজন বাবুর বিজয়-পতাকা 'বেগম লক্ষ্মী'র নামটা থাকিলেও আমরা অশ্রু বিস্ত্রিত হইতাম না। অন-ধিকার-চর্চার এইরূপ আত্মত্বকের নিলজ্জ-তাই শোভা পায়। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' (১) যে সব তরানক ভুল 'ও' কেলেঙ্কারী আছে, তাহার কতক পরিচয় ইতিপূর্বে এই 'খেরালী'তেই আমরা দিয়াছি। পাঠকগণের মনে আনন্দ দিবার জন্ত এবারেও কিছু দিতেছি।

এই গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় আছে—'লেবেডেকের নাট্যশালার কথা যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ই লক্ষ্যপ্রথম বাংলার প্রকাশ করেন (রঙ্গমঞ্চ, আশ্বিন কাষ্ঠিক, ১৩১৭)। তাহার পর শ্রীযুত জমরেন্দ্র নাথ রায় 'বাসন্তী'তে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮) ও শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'নাচঘর' পত্রে (১৩৩১, ১৩৩২ অগ্রহায়ণ) এই নাট্যশালা লক্ষ্যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।' কিন্তু উদ্ভীষমান ঐতিহাসিক ব্রজেন বাবুর এই 'গবেষণা'র মধ্যে যেমন একটা প্রকাণ্ড ভুল আছে, তেমনই লতা-গোপনেরও একটা কুৎসিত কোশল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কথা—লেবেডেকের নাট্যশালা লক্ষ্যে যোমকেশ বাবু লক্ষ্যপ্রথম বাজলার প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিলে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা হয়। কারণ, 'রঙ্গমঞ্চ' নামক মাসিকপত্র জন্মগ্রহণের অনেক পূর্বে 'বিশ্বকোষের' 'রঙ্গালয়'-শীর্ষক রচনার মধ্যে লেবেডেকের নাট্যশালা লক্ষ্যে লিখিত হইয়াছিল—'কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস অমূল্যকান করিলে জানা যায় যে এই সময়ে

ডোমটুলীতে ইংরাজদিগের যে মৃতন নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তাহাতে এই বিভ্রান্তির ইংরাজীতে গীত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়।—গবর্ণর জেনারেলের আদেশ অনুসারে মিষ্টার লেবেডেকের ডোমটুলীস্থ মৃতন নাট্যশালার “গুপ্তবস্ত্র” নামক মৃতন ইংরাজী নাটক লিখিত খোলা হইবে। বহু আদৃত কবি ভারতচন্দ্রের কবিতা সুরে বাঁধা হইয়াছে। ইহা যে বিভ্রান্তির—অসদাঙ্গল নহে, তাহা প্রমাণ ভিন্নও বুঝা যায়। তাহা লম্ববতঃ Ballad হিসাবে গীত হইয়াছিল। ইহা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা।” সুতরাং ব্যোমকেশ বাবু ‘সর্বপ্রথম বাঙ্গালার লেবেডেকের নাট্যশালার কথা বলিয়াছিলেন, ইহা মূৰ্খ ব্যতীত আর কেহ বলিবে না। ‘বিশ্বকোষ’র ভাষ্য দেশবিশ্রুত গ্রন্থকে উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’র আলোচনা করিতে যায়, তাহাকে ‘মূৰ্খ’ ছাড়া আর কি বলা বাইতে পারে?

শুণ্য মূৰ্খতা নয়, মূৰ্খতার সঙ্গে সঙ্গে সত্য-গোপনের একটা চালাকি বা নীচতাও ঐ কয় ছত্রের ভিতর হইতে উকি মারিতেছে দেখা যায়। মনে রাখিতে হইবে, লেবেডেকের নাট্যশালা লব্ধক্রে ‘বিশ্বকোষ’ সর্বপ্রথম সংবাদ প্রদান করিলেও, ঐ সংবাদ মধ্যে যে সব কথা আছে, তাহা ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ। ‘রঙ্গমঞ্চ’ কাগজে ব্যোমকেশ বাবু বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও ঐ ‘বিশ্বকোষ’র ভ্রমপূর্ণ উক্তিই কিছু বিস্তারিতভাবে পুনরুক্তি মাত্র। লেবেডেক যে ‘Disguise’ নামক ইংরাজী নাটকের বাঙ্গালী অনুবাদ করাইয়া তাহারই অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, একথা ‘বিশ্বকোষ’ বা ব্যোমকেশ বাবুর লেখার মধ্যে নাই; সুতরাং এক্ষেত্রে বছর জীব ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বিশ্বকোষ’র পরিবর্তে ব্যোমকেশ বাবুর নামোন্মেষ করিয়া যে পাপ করিয়াছেন, তাহার চেয়ে গুরুতর

পাপ হইতেছে—ভুল জানিয়াও ভুলকে গোপন করিবার চেষ্টা। ব্যোমকেশ বাবুর ভুল-ভ্রান্তির কথা ব্রজেন বাবু ইচ্ছা করিয়াই চাপা দিয়াছেন। আশ্চর্যের কথা, ইহারাই আবার ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক আলোচনার বড়াই করে! থাকমণি থাকিলে বলিত যে, এমন বৈজ্ঞানিক গোবেষণার মাথার “খ্যাংরা মারি, খ্যাংরা মারি!”

বাস্তবিক, খ্যাংরা মারিবারই কথা। এই বিহিমাতে যে কত রকম বেকুবী ও বেয়াধপির পরিচয় আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আর একটা কলেঙ্কারির কথা বলিতেছি। ইহার ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—“এ পর্য্যন্ত বতবুর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, প্রবোধ-চন্দ্রোদয়” নাটকের বাংলা অনুবাদ—‘আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী’ প্রথম বাংলা নাটক। ইহা ১৮২২ সনে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়মে একখণ্ড ‘আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী’ আছে। ইহার ভাষা লক্ষ্যভ্রান্তসারী এবং পূর্ণমাত্রার পণ্ডিতী বাংলা।” —ইহাকেই বলে দ্বিবা দৃষ্টি। ‘প্রবাসী’র প্রকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যে দেখিতে যে কুৎসুতে চক্ষু দুইটি ব্রিটিশ মিউজিয়মের আলমারি ভেদ করিয়া তাহার মধ্যস্থিত পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত দেখিয়া লয়—সে চক্ষুদ্বয়ের তারিফ করা অবশ্য কর্তব্য। তবে “বতবুর জানা গিয়াছে” বলিয়া লেখক মুকুন্দিরানী সহ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য এক কাণা কড়িও নহে। কারণ, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে Monekton লিখে ‘Tempest’ নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া, ১৮৩৪ শকাব্দে প্রেমদাস যে ‘চৈতন্ত-চন্দ্রোদয়’ নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন, একথা বোধ হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাঝেই জানেন।

কিন্তু ব্রজ-বিজ্ঞার বাহাদুরী এই যে ঐ সকল অতি জানা কথাও না জানিয়া পাল্লার মতন বাহা ইচ্ছা তাহা সে বক্রিমা

গিয়াছে। ইহা অবশ্য মূর্খ-মার্ক। লেখকদের একটা বড় রকম বৈশিষ্ট্য বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। যে বিষয়ে ইহার লব চেয়ে বেশী অনভিজ্ঞ, সেই বিষয় লইয়াই ইহার লব চেয়ে বেশী ওস্তাদী করে। ইহাকেই বলে পাণ্ডিত্য-পাগলামি! এই পাগলামিতে শনির “বাণ” সজনি বড়, কি তাহার ‘বেজন দাড়া’ বড়, কিংবা তাহাদের সাহিত্যাচারিা সত্যজ্ঞান বড়, তাহা অবশ্য নির্ণয় করা কঠিন।

পাণ্ডিত্য-পাগলামির আর একটা নমুনা এখানে দিতেছি—পাঠকেরা তাহা পড়িয়া হালিয়া বাঁচিবেন। এই পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় ‘বেগম সমর’র ব্রজেন বাবু লিখিয়াছেন—“আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগে আবার ‘গীতাভিনয়’ নামে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরণের এক প্রকার অভিনয় এদেশে দেখা দিয়াছিল।” —কি ভয়ানক জানা-শুনা। পেঁচোর পিলীমা পেঁচোর লব্ধক্রে বলিত—“আমার পাঁচুর কি কম বুদ্ধি! এই লবে মাত্র বোল বছরে পা’ দ্বিরেকে, এরই মধ্যে বাছা আমার পথ চিনে পাঠশালার যায়, আবার পথ চিনে বাড়ী ফিরে আসে! আমাকে ‘পিছিম’ ‘পিছিম’ বলে ডাকে! আমি আবাগী যে ওর পিলীমা হই, তাও বাছা আমার জানে। —ও কি বাঁচবে!” —পেঁচোর পিলীমা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এই বুড়ো খোকা ব্রজ বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া বাইত। যে বুদ্ধি যাত্রা ও গীতাভিনয়কে এক জিনিষ মনে না করিয়া দুইটা স্বতন্ত্র প্রকারের অভিনয় বলিয়া নির্দেশ করে, সে বুদ্ধি পেঁচোর বুদ্ধির বাবা! থাকমণি থাকিলে আবার বলিত—“এই বুদ্ধির মাথার খ্যাংরা মারি!”

এই গোবর-গবেষকের আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। ইনি প্রায়ই পুরের প্রমাণকে ‘গুপ্তমান’ ও নিজের ‘হুমানকে’

প্রমাণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাও এই জাতীয় লেখকদের 'বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার একটা অঙ্গ-বিশেষ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'জাতিবৈর' বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা কিনা, এই বিষয় লইয়া শনির চিঠিতে ইনি গৌরবপূর্ণ মন্তককে লক্ষ্যেই ফেলিয়াছেন। অথচ এই অপাঠ্য বহিধানার মধ্যে যে সকল লেখা 'বিবিধার্থসংগ্রহ' হইতে উদ্ধৃত হইছে, সেই সকল লেখা ইনি নিঃশঙ্কোচে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। ঐ সকল লেখা যে রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন, এ কথা ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় কেমন করিয়া জানিবেন? একাধারে এমন বেকুবি ও বেরাশি আর কোথাও কেহ দেখিয়াছেন কি? প্রকৃত ইতিহাস বলে, ঐ সকল রচনার অধিকাংশই কালী-প্রসন্ন সিংহের লেখনীগ্রস্ত। কিন্তু ইতিহাস কাহাকে বলে, তাহা বাহারা জানে না, তাহারা এ সব কথা কেমন করিয়া বুঝিবে?

বাস্তবিক, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' লিখিতে বলিয়া যে ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের গুণগণনা ও কৃতিত্বের কথা বাহ দিয়া কেবলমাত্র কতকগুলো মন-গড়া কথার উপর নির্ভর করিয়া গিরিশচন্দ্রের নিন্দা-প্রচারের চেষ্টা করে, তাহাকে তিরস্কার করিবার বা লজ্জা দিবার তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই না। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার অপারেশনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর" নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন— "গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যানে—তিনি অল্প দিরা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহাৰ দিরা ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন; ইহার মজ্জার মজ্জার রস লক্ষ্য করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন;



স্বা-মার্লি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ
হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

লিলাতা ৪৪ বোম্বাই

আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage.—ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোন দিন ছিল না। ইহা এক প্রকার অভিব্যক্ত্য বৈয়াকরণ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, শুল্লার গড়াইতে-ছিল! যে অমৃত-পানে বাজায় নাট্যশালা এই পক্ষাশ বৎসরাধিক বাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃত পক্ষে সে অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাজালা নাট্যশালার পিতৃদেব গৌরবের অধিকারী একা তিনিই। —কিন্তু পরিষদ হইতে প্রকাশিত এই স্মৃতি পুস্তকে গিরিশচন্দ্রকে তীব্র প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। পরিষদের পক্ষে ইহা একটা ঘোরতর কলঙ্কের কথা। শুনিতে পাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের বাজালা বিভাগের ছাত্রদের পাঠ্য হিসাবে এই আর্জেন্টাইন নাকি নির্বাচিত হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে তবে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও অপমানের কথা বলিতে হইবে। ইহা পড়িয়া ছেলেরা কতকগুলো লাংঘাতিক ভুল লিখিবে মাত্র। এই পুস্তক লক্ষ্যে এক কথায় বলিতে গেলে মাইকেলের ভাবাদ বলিতে হয়—

“চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে
তত্ত্বাশি করি ফল কর্মনাশা জলে।”

শারদোৎসবে

এবারও স্বর্ণকবচের গ্রাহকপত্রের নোপদান বাঞ্ছনীয়। ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সম্রাটীপ্রদত্ত সর্বপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণকারী “স্বর্ণকবচ” পত্র লিখিলেই সর্বদা সর্বত্র বিনামূল্যে পাইল হয়।
শক্তি ভাণ্ডার, পোঃ আউলিয়াবাড়ী (শ্রীহট্ট)

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্মল কুমার সুর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—আঃ! অজয় না?
—হ্যাঁ তাইতো আমারও মনে হচ্ছে—
—কেমন আছিল? তোর কমনা দেখি?
—বারে! কখন এলি? কই জানাস্নি তো যে কলকাতায় ফিরেছি।
—মুখ বদলাতে এমন চলে এলাম তাই—
—কোথায় উঠেছি?
—ডাঃ ব্যানার্জীর বাড়ী—লিলির বাবা—ভবানীপুরে।
—কি করছিস, সেই চাকরীই?
—হ্যাঁ প্রমোশন পেয়েছি। আটশো অবধি গ্রেড। বিগিন্ করছে লাড়ে তিন শোয়। আর তুই?
—আচ্ছা বলছি চল। ভালোই হলো। আমি ভেবেছিলাম নিজেই একবার যাবো তোর সাথে দেখা করতে—
—আমার সঙ্গে?
—হ্যাঁয়ে প্রয়োজন ছিল—
—আমার সাথে সাহিত্যিক মানুষের প্রয়োজন? কাগজের লম্পাধক তো আমি নই বা পাবলিশারও নয়।—

—তা জানি। আর সেই জন্যই—
—কেন বল দেখি?
—আচ্ছা প্রয়োজন। পরে বলা যাবে—
—কি নাম নিয়েছিস আজকাল?
স্বতরাষ্ট্র?—না লৌহভীম, যে চূর্ণ হয়েছিল স্বতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে।
—তার মানে?
—চল না বলছি—। সময় হবে তো?
—সময়ের অন্ত্যবও তো দেখছি না—

—তবে চলে আর, বরটায় গিয়ে বলা যাক। তারপর বলা যাবে লৌহভীম চূর্ণ হওয়ার সময়।

দ্বিতীয় পর্যায়

পূর্ব দিক্কার কোণে এক নাতি অন্ধকার-ময় ঘর। ঘরের মধ্যে একটা ছোট্ট খাট, তার ওপর একটা গদ্বী দেওয়া বিছানা। বেশ পরিষ্কারই আছে। আলর দেওয়া মশারিটা বাড়িয়েছে ওর শোভা। ওখানে একটা মাঝারি গোছের লেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার ওপর লাজানো—দোয়াতখানি, পেন-ট্যাণ্ড আর বিস্তর কাগজ পত্র—হয়তো ওর কবিত্বের লাক্ষী ওরা। টেবিলে বসানো একটা লাইট গ্রীণ-শেডের টেবল ল্যাম্প, আর একটা পোট্টেবল টাইপ রাইটার।

বাইরে থেকে ঘরটাকে যা মনে হয়—এ ঠিক তা নয়। এরও আছে অন্তর্নিহিত লৌক্য বা লম্পাধ। অন্ততঃ তারই পরিচয় দিচ্ছে এর আলবাবপত্র। ঘরের ওর ক্রী ফিরেছে। অঙ্গে অঙ্গে ঝরে পড়ে মার্জিত রুচির পরিচয়।

ছোট্ট একটা ছেলে ওর ফরমারেল খাটে। বাড়ীর ভিতরের খবর ঠিক জানি না।

তাইতো ওর বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করাও হয়নি! কি মনে করবে ও কি জানি।

হ্যাঁয়ে অজয়—মা কেমন আছেন?
—ভালই আছেন। তবে চিরস্থায়ী বাত ধরেছে।
—আর লকলে?
—

আবার কে?

—কেন—কবি-প্রিয়।

—মারা গ্যাছেন—

—বিয়ে করলি কবে? আর মারাই বা গেলেন কতদিন?

—কালের হিসেব রাখিনি।

—তার অর্থ?—

বাচ্চা চাকরটাকে এক চড়া হাঁক দিয়ে ও চা আনতে হুকুম করলে। তারপর চেয়ারটা টেনে নিয়ে এগিয়ে এল আমার আরো স্নিকটে।

ওর ঘরটার চতুর্দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিলাম। তাতে আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে হয়তো সরস্বতী দেবী বা লক্ষ্মীর সাথে ঠিক বিবাহটা বাধাননি। লক্ষ্মী দেবী আজকাল বাসা বেঁধেছেন ব্যাল্ক ব্যাল্কে। কাব্যলক্ষ্মী হয়তো অজয়ের নামে লক্ষ্মীকে জমা দিয়ে এসেছে ব্যাল্কের খাতায়। সব জিনিষই কি আর বোঝা যায় বাইরে থেকে? অজয়ের পানে তাকিয়ে বললাম

—তার কাব্যলক্ষ্মীর টেই আছে কিথাকি অজর।

অজর বললে—তাই নাকি? তবে টেই থাকলেই কি আর সব জিনিষের সমাধান করা যায়? ঘরের এই স্ত্রী, যার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তুই টেইয়ের কথা ভুলি—তা কাব্যলক্ষ্মীর কপালে নাও তো হতে পারে? হয়তো বা এর পেছনে আছে প্রেরণা। বাইরে থেকে অনেক জিনিষকেই ভরাট দেখায়, অন্ততঃ সুন্দর তাতো জানিনা? আবার তার অন্তরের অর্থাৎ সত্যের, তার মানে আমি এই বলছি যে বাস্তব জগতে মানুষকে বা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, পথ চলতে হয় প্রয়োজন, ভাব-জগতের কথা হচ্ছেই না, সেই দিক থেকে দেখলে অনেক জিনিষই অসারদের পর্যায়ে পড়ে যায়।

যেমন দেখনা আমার এক কাকা। ছোট বেল থেকে লখ উকীল হবেন। আরন্ত

করলেন পড়াশুনো, গরীব লংকারের স্বচ্ছলভার ভাটা পড়িয়ে। খ্যাটিক দেবার পরই অবস্থা দাঁড়ালো আরো লম্বী। যেমন নৌকো ভাঙতেই দেখা গেল তলা-ফুটো। উঠছে নিরাশার জল। বিরাট নদী পার হওয়া বাবে কি করে? লক্ষ্মী চলতে লাগলো আত্মরক্ষার উপায়ের। জল নেচবার ছোট্ট একটা পাত্র, তাও ভগ্ন প্রবণ। তাতে করে মনকেই দেওয়া চলতে পারে সান্ত্বনা। আসল কাজটা থেকে যায় কীকিতে।

কাকা চলে এলেন কলকাতায়, নিঃসঙ্গ অবস্থা। এক বড়লোকের বাড়িতে বাজার করে দিয়ে, লংকার খরচের হিসেব রেখে আর রাতে গোটা চারেক ভেলে-মেরেকে পড়িয়ে, ভর্তি হলেন কলেজে। ভাবলেন বুঝি এতেই উৎসে যাবেন। কিন্তু ওখানে নিজের বেলা জমতে লাগলো কীকি। দ্বিতীয় বার্ষিক ওয়ালেন তাই কোন প্রকারে। আশা গেল বেড়ে। অঙ্ককার মুখব্যাখ্যান করলো আরও বেশী। কিন্তু উপায় তো চাই। পরলেন এক কলেজের প্রিন্সিপালকে জানানলেন ইচ্ছা ও সামর্থ্য। মন নরম হলো, বিজ্ঞোৎসাহী মানুষ কি না তাই। বাড়িতে চিঠি লেখবার পরসাত জোটে না। যোগে স্তম্ভ করে নিজের শরীরে ঢোকালেন রোগ। শরীর ভেঙ্গে পড়তে চায়। তবু ছাড়লেন না আশা। এখনও মাঝ নদী। ঢেট উঠেছে কিছু কিছু। সর্বক্ষণই তরী ডুববার ভয়। জোর করে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন আশে পাশের লোককে। করুণার আলোয় আবছায়া দেখা দিল। কাটলো অঙ্ককারের ঘন কুহেলি। কোন রকমে পথ বেঁধে চলা যায় হয়তো। পাশ করলেন বি, এ। ল'ক্লাশ, ট্রাশান, আর নিজের রাস্তা করে প্রথমবার করলেন ফেল। দ্বিতীয় বারে বেরিয়ে এলে নতুন করে ছিন্য়া অঙ্ককার দেখলেন। ভাগ্য তাঁর হয়তো ছিল সুপ্রদত্ত। পেলেন

পরকারের ডাক বিভাগে চাকরী বেড়শো টাকার। কিছুদিন পরে গেলেন দ্বিতীয় বহলী হতে, যখন কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে মোগলাই বেশে গেল। মাইনে বাড়লো। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মনের মাঝে বেঁধে খোঁচা। আচার্য্য রায়ের প্রবন্ধ বাধ্যতাবদ্ধ। দিলেন ছেড়ে চাকরী—উদ্দেশ্য ল'পাশ করা আর ছেলে বেলাকার টেইকে দিতে হবে সার্থকতা। লামনে ভালো আশু মুখোজ্যো, রানবিহারীর উদ্দীপনা। গায়ে চড়ালেন তাই কালো স্মাট, আর আশ্রয় করলেন বটতলা। কাটলো কয়েক বৎসর। দেখলেন কল্লরুক তার বন্ধা। চাকরী জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে মফঃস্বল নগরে একটা বাড়ী করে, বাড়িয়ে চলছেন তাই ভাড়াটিয়া ঘর। প্র্যাক্টিশ লাখে লাখে চলে। কালো কোটের পিঠি আলে ছিড়ে। নিজের ছেলেই তাই তাকায় মুখের দিকে। লক্ষ্যের, বাকে বেলো তোমরা এম্-অব্-লাইফ, বিশেষ টেই, তার দাঁড়ি পাল্লায় অপর দিকের শূন্য পাত্র শূন্যে ঝোল খায়। দুঃখের বোঝা বেড়েই চলে। এইতো তোমার টেই? টেই থাকলেই যে টলে জিতবে তার কোন মানেই নেই। বাঃ বিশেষ টেই থাকাই বিপজ্জনক। জগৎটাই যে বিজুত-কিমাকার।

চা এলে গেল, লঙ্গে লঙ্গে আরো ছোট্ট প্লোট। অজয়ের মূখ থেকে সিগারেটের ধোয়ার কুণ্ডলী। একটা স্বাদালু গন্ধ আলছে চায়ের ধোয়ার সাথে মিশিয়ে। তপনসেব ঘোড়াগুলোকে আন্তাবলে তোলবার ব্যবস্থা করেছেন। কাজ মিটলো বলে। পাতলা অঙ্ককারে আরো বেশী পাতলা ভাগা ফেলেছে টেবিলটার নীচে। ভালো করে না দেখলে বোঝাই যায় না। এমনি অলঙ্কিতেই ও গ্রাণ করবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে মানুষ হয়তো তখন ভুলেই যাবে ওরা

—ছাত্র-মাসা—

শ্রীমদ্রেশচন্দ্র চক্রবর্তী

এ ছাত্র না হয়ে মানবীর ছাত্র, এ যে স্বরগের দেবীর ছাত্র,
ছাত্রা দেখে তারে তুলিতে পারিনা, ভক্তিভেদে মোর আনত কায়;

এখনো যে আমি দেখিনি তাহারে

তুনি নাই গান সে বীণার তারে

তবুও পরাণ ছুটিয়া চলেছে ধরিতে তাহার অজানা মায়ী,
প্রাণমি তাহার অলখ-চরণে, সে যে স্বরগের দেবীর ছাত্রা।

২

অপরীক্ষিত ছাত্রা সে ত নহে কভু, তার ত নহেই পাষণ্ডি হিয়া
প্রাণহীন দেহ করে সে লজীব মৃত্যু তাবের প্রেরণা দিয়া :

সেত নহে দ্বন্দ্বী, সে যে মহাশয়ী,

ধর্মপর বৃদ্ধ সে যে বীণাপাণি

স্বরগ ছাড়িয়া এলোছে হেথায় নব নব-স্বর-বজ্রার নিয়া;
এ ছাত্রা নহেই পাষণ্ডের ছাত্রা, করুণার তারা একটা হিয়া,

অতিথি দেবার মহান ধর্ম হয়েছেরে তার জীবন-ব্রত
আপনার মুখ অবহেলা করি পরের কারণে লম্বাই রত;

বৃকভরা তার কি যে মহান্নেহ

দ্বিধা জ্যোতিতে তারা তার দেহ

স্বার্থ-বিহীন দেবা-উৎসবে তক্ত তাহার জুটেছে শত,
অতিথি-দেবার মহৎ প্রাণ তার জীবনের পরমব্রত।

৪

নয়নে তাহারে দেখি নাই কভু, দেখেছি তাহারে হৃদয়ভরে,
দূর থেকে তার হৃদয়ের ছাত্রা হৃদয়ে ধরেছি যতন করে;

হরশন তাঁর মেনে কভু বহি

জানাব আমার প্রাণের আকৃতি

বলিব তাহারে "মোরে বেঁধে রাখ তোমার স্নেহের অটুট ডোরে",
ছাত্রার মারায় পাগল করেছে, করেছে আজিকে উদ্বাদী মোরে।

আলোর মায়া ছিল এক কালে। নিজের
অতীত মর্যাদা বজায় রাখতে তখন চলবে
কৃত্রিম চেষ্টা বার দ্বিধা সর্বদে লম্বাই
জাগে ভয়। বলে—প্রকৃতিকে করেছি জয়।
পুরাণে কালের জমীদার বাড়ীর মতো
হয়তো আধখানা রঙ করতেই শক্তি হবে
শেষ। অগ্বে ইলেকট্রিক বাল্ব কিন্তু
তবুও পড়বে অন্ধকার-ছাত্রা ভেতরে ভেতরে।

বর্তমানটাই নতুন। অতীতটা মিথ্যা।
পণ্ডিতরা বলেন মিথ্যা এ জীবন, মানে
মরণশীল এ জীবন। স্থায়ী এও নেই।
অতীত অর্থাৎ যা মরে গেছে তা মিথ্যা।
মরা অতীত মানেই মিথ্যা অতীত। তাই
মরা অতীতকে নিয়ে আলোচনা মানেই
মিথ্যাকে নিয়ে জাল বোনা। তা থেকে
বা'কিছু জাণ্ডক না কেন—গন্ধ বল, রঙ বল,
স্বাভি বল—সবই অর্থহীন, অচল। স্নগন্ধের

বহলে হুর্গন্ধ বেঙ্গবায় সম্ভাবনাই দেখানে
বেশী। অতীত নিয়ে বার গোরব করে
তার বৃকভে চায় না এই পরিবর্তনশীল,
মরণশীল জগৎটার ধারা। কাঁচার ভেতর
বাল করে তারা দেখে মর্ম্মর প্রাণাধ রচনার
স্বপ্ন। তাই উদ্ধার তাবের কোন কালেই
হয় না। বর্তমানকে অস্বীকার করে
অতীতটাকে আঁকড়ে ধরা যে মরণেরই
লাহিল। জীবনের জগতে বাল করে মরণ
পারে তাকিয়ে থাকা তাতে জাগে না
কলাপ। বর্তমানের আশুপ জাগাবে জালা,
বেঁধাবে কাঁটা তবে না মনের ঘোড়া ছুট
মারবার চেষ্টা করবে। অতীত আঁফালনের
হুড়ি না কাটলে পা তার পঙ্গু হয়েই থাকবে।
অতীত এনে করবে প্রাণ। জাতিটাই বাবে
অতীতের কবলে। বর্তমানকে কাঁকি দেবার
এই যে চেষ্টা বা গোরব বোধ এতে আছে

মরণের বিষ; অলঙ্কিতে চলে তার ক্রিয়া।
নিষ্কর কলের কুলি সে হয়তো বাঁচবে,
কিন্তু লন্দেহ জাগবে পণ্ডিতের বেলার।
শ্রোতহীন নদীর জল পরিষ্কার হলে কি
হবে? তলায় যে জমছে বালির চর, বা
একদিন তার অস্তিত্বকে হবে বিলুপ্ত করে।
ওর চেয়ে ক্ষুদ্র পঙ্কিল নিরীক্ষণী ভালো,
বার শ্রোতের কাছে পাথরগুলো দিচ্ছে
জারগা ছেড়ে। আঘাতে আঘাতে জল
উঠছে কেনিয়ে। তবুও ওর প্রাণে শক্তির
অভাব নেই। রচনা করে চলতে পারে
নিজের পথ নিজে। দেখনা ছোট জাত
জাপানের দিকে। বিশ্ব শক্তির বিরুদ্ধে
দাঁড়াতেও সে পারে প্রয়োজন হলে। হয়তো
সে বাবে জগতের বৃক থেকে দিলিয়ে।
তবুও সে কতি মানবে না। গড়ে উঠবে
নতুন জাত। প্রাণশক্তিকে বলি দেবার

বহলে বেবে বেহটাকে বলি। তবু বাধীন
জাপান চাইবে না পরের পা চাটতে।

সংস্কার ও শাস্ত্রের কুরো বলিতে ঠালা
আমাদের সমাজ বা সমাজের মস্তিষ্ক কালের
গতিকে রাখতে চায় ঠেকিয়ে। তাই বাধে
দুন্দ নতুন ও পুরাতন। নতুনের লম্পর্কে
এসে যে পুরাতনও যাচ্ছে রূপান্তরিত হয়ে,
তা এরা সন্ধান রাখেন না। শুধু দিনে
দিনে নিজের অলক্ষ্যে জাগছে চোরা বলি।

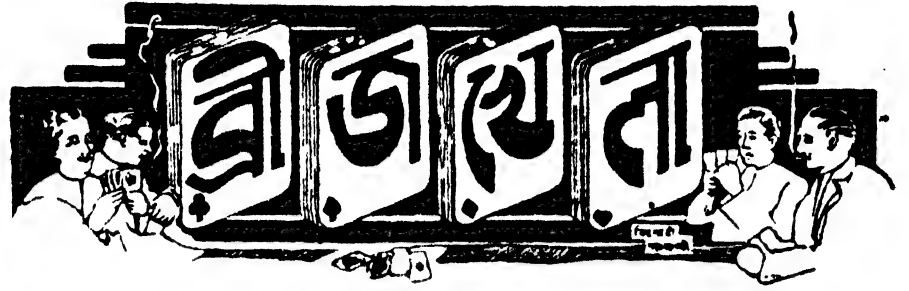
অজর কাপ শেষ করে দোজা হয়ে
বসলো। সিগারেট কেলের হোয়াইট বিউটি
এক এক করে দেখ দান করেছে। অ্যাশট্রের
চাইএর বোঝা হলো ভারী। আর বাধ
দাঁকোটা গেছে ধোয়া হয়ে উড়ে, যেন
মায়াবের যৌবন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কই কি বলবি যে
বলছিল। অজর বললে—হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা
করছিলি না কাব্যলক্ষ্মীর দ্বার কথ্য?
বলছিলাম না নাম নিয়েছি লোহ ভীম?
তবে চূর্ণ হয়েছে আমারই কাব্য-লক্ষ্মী—
আমাকেও বলতে পারিস। সেই কথাই
বলতে চাইছিলাম। তবে ধৈর্য্য ধরতে হবে
বন্ধ। লিলি লিলি বেবী থাকবেন না তো
পথ চেয়ে? অধৈর্য্যের জোরার ভাঙবে না
একাক্ষতার বাঁধ?

—পুরানো হয়ে গ্যাছে অজর, জমেছে
একধেয়মীর আবিলতা।

—এরই মধ্যে? ব্যবহারের এ নিয়ম
বন্ধ, অন্ততঃ মনস্তত্ত্ববিদরা তাই বলেন। সব
কিছু উল্টাউন করে ধরলেই উৎস্রুকা যায়
কমে। তাই অঙ্গলক্ষ্মীর বাঁধনে, লামাজ
কিছু অজানার আড়াল দিয়ে চির-নবীনত্বকে
রাখতে হয় বেঁধে। ভালবাসা সেখানেই
বাঁসা বেঁধে থাকতে পারে চিরকাল যেখানে
সবখানি রহস্ত পড়েনি ধরা। যাক এখন
আরো কবি আমার কথা। তার আগে
একটু গল্প বলি শোন।

(ক্রমশঃ)



স্বীকৃতিস

মিঃ ব্ল্যাকউডের চার বা
পাঁচটি ফেরাইএর ডাকঃ—

মিঃ কালবার্টনের আবিষ্কৃত চার বা
পাঁচটি ফেরাইএর ডাক ব্রীজলগতে
যেমন একটি খেলার অভিনব পছার
সৃষ্টি করিয়াছিল তেমন মিঃ ব্ল্যাকউডের
পছ'হুয়ারী চার বা পাঁচটি ফেরাইএর ডাক
বর্তমানে ব্রীজ খেলার সাধারণ চাল অনেকাংশে
পরিবর্তন করিয়াছে। এই ডাক ব্যবহার
করিবার প্রশালী অতীব সহজ। এই ডাক
বখন ইচ্ছা যেওরা চলে যদি উত্তর খেঁড়ীর
মধ্যে বেরঙে খেলা হবে সেটি মিলে থাকে।

মিঃ কালবার্টনের নিয়মামুযায়ী চারটি
বা পাঁচটি ফেরাইএর ডাক দিতে গেলে
হাতে দুইটি টেকা ও নিজের কথিত কোন
রঙে নাহেব থাকা চাই; কিন্তু Mr.
Blackwood এর নিয়মে নিজের মধ্যে
তুরূপ রঙে মিলে গেলেই যে কোন সময়ে
এই ডাক দিতে পারেন। তার উত্তরে
তার খেঁড়ী তার হাতের টেকার খবর দিতে
বাধ্য হবেন। যেন করুন আপনি চারটি
ফেরাইএর ডাক দিয়েছেন, তাহলে তার
উত্তরে খেঁড়ী নিম্নলিখিতরূপ জবাব দিতে
পারেন।

(১) পাঁচখানি চিড়িতন,—যদি তাঁর
হাতে কোন টেকা না থাকে।

(২) পাঁচখানি কুহিতন,—যদি তাঁর
হাতে একখানি টেকা থাকে।

(৩) পাঁচখানি হরতন,—যদি তাঁর হাতে
দুইখানি টেকা থাকে।

(৪) পাঁচখানি ইঙ্কাবন,—যদি তাঁর হাতে
তিনখানি টেকা থাকে।

(৫) পাঁচখানি ফেরাই,—যদি তাঁর হাতে
চারখানি টেকা থাকে।

এখন ডাকবার নিজের ইচ্ছামত ডাকটি
পাঁচখানিতে 'Sign off' করতে পারেন,
অথবা ছয়খানি ডাকতে পারেন। কিন্তু
তিনি যদি এই জবাব শুনা লক্ষ্যে আবার
অগ্রসর হতে রাজি হন তা নাহেব করখানি
আছে জানিবার জন্য পাঁচটি ফেরাইএ ডাক
দিতে পারেন। পুনরায় এই ডাকের
উত্তরে খেঁড়ী পূর্ববৎ উত্তর দিতে পারেন।
তিনি ডাকতে পারেন—

(১) ছয়খানি চিড়িতন,—যদি তাঁর
হাতে কোন নাহেব না থাকে।

(২) ছয়খানি কুহিতন,—যদি তাঁর
হাতে একখানি নাহেব থাকে।

(৩) ছয়খানি হরতন,—যদি তাঁর হাতে
দুইখানি নাহেব থাকে।

(৪) ছয়খানি ইঙ্কাবন,—যদি তাঁর
হাতে তিনখানি নাহেব থাকে।

(৫) ছয়খানি ফেরাই,—যদি তাঁর হাতে
চারখানি নাহেবই থাকে।

এমন অনেক সময় দেখা যায় যে হাতে
চারখানি টেকা বর্তমান, অথচ যদি
নাহেবের খবর পাওয়া যায় তা বড়
স্নান বা ছোট স্নান করা সহজ হয়ে পড়ে,
সুতরাং এইরূপ ডাকের দ্বারা নাহেবগুলি
জানা গেলে ডাকবার হাতে ছোট
স্নান আছে কি বড় স্নান আছে তা
অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়।

অত্যাচরণ

(গল্প)

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই মনিকার মনে পড়লো আজকে অতমুর আলবার কথা। জুই চোখ রগড়ে নিয়ে ছোট্ট হাই তুলে একটুখানি আড়মোড়া দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বিছানার উঠে বসলো। শিগরের ধারে টেবিলের ওপর অতমুর চিঠিটা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, মনিকা সেটা পক্ষাশবার পড়ে দেখলো। তারপর আকনা থেকে তোয়ালে, শাড়ী আর ব্লাউজ হাতে করে নিয়ে চলে গেলো বাথরুমের দিকে।

নিচেরকার ঘরে চাের টেবিলে পেয়াল। আর পিরিচের গুনগুন শব্দ হচ্ছে; মনিকার মা কোশল্যা দেবী নিশ্চয় চা-খাবারের আয়োজন করছেন, আর বালক ভৃত্য ছোট্ট লামনে দাঁড়িয়ে থেকে ফরমাস খাটছে। ওদিকে মথুর ঠাকুর বোধকরি রান্নাঘরে লুচি ভাজছে, মনিকার বাথরুমে থেকে থেকে ভেলে আলছে টাটকা ঘিের অপরূপ উগ্র গন্ধ। মনিকার বাবা বিলাসবাবু বোধকরি তাঁর আট বছরের মেয়ে, হালিকে নিয়ে এখনো বাগানে বেড়াচ্ছেন, এটা তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস। কোশল্যা দেবীর চাের আয়োজন হয়ে গেলেই ছোট্ট গিয়ে তাঁকে খবর দেয়।

মনিকা বাথরুমের কাজ শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এলো। আরনার লামনে দাঁড়িয়ে নরম ভিজে চুলগুলির ভেতর চিকণী চালিয়ে ঠিক করে নিলো। গায়ে খয়েরী রঙের একটা শাড়ী আর বুকে টকটকে লাল রঙের ব্লাউজ। কাল বিকেলের দিকে লখ করে চোখে কাজল দেওয়া হয়েছিলো, তার আবছা

আভাষ এখনো রয়েছে চোখের পাতায়, মনিকা মুখে ঘো মাখাতে লাগলো।

আজ চার বছর বাবে অতমুর এখানে আসছে। সুদীর্ঘ চার বছর; এর মধ্যে না-জানি কতোখানি বছলে গেছে সে—এবং তার চোখের কাছে মনিকাও। ভেলে বেলা থেকে প্রায় এক সন্ধ্যাই বেড়ে উঠেছে চ’জনে : পাশাপাশি ছিলো তাদের বাড়ী। গরমের দিনে গ্রন্থরে বাগানে গাছের ছায়ার বসে কাঁচা আম খাওয়া আর বর্ষার দিনে জলে ভেজার জড়ুত আনন্দ সব এখনো অম্পষ্ট মনে পড়ে। কৈশোর আর প্রথম যৌবনের সন্ধিক্ষেপে ছাঁটি ভেলে আর মেয়ের চরিত্র অনাবৃত উল্লাস। একমাত্র মনিকা-বি ছাড়া তখন আর কেই-বা ছিলো অতমুর। এখন সেই অতমুই হয়েছে অনেক বন্ধু-বান্ধব পেয়ে গেছে, নতুন আবহাওয়ার রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসছে সে।

অতমুর ম্যাট্রিক দেওয়ার আর চ’বছর বাকী এমনই সময়ে তার বাবা অকস্মাৎ এখান থেকে বহালি হয়ে গেলেন। সঙ্গে যেতে হল পরিবারের সবাইকে,—অতমুও। বিচ্ছেদটা এতো আকস্মিক যে ছাঁছে গিয়ে চিলিকোঠায় বসে মনিকার গলা জড়িয়ে ধরে নিতান্ত ছোট্ট শিশুর মতো কঁপিয়ে উঠেছিলো অতমু। মনিকার কোনো প্রবোধই তখন তার মন মানতে চারনি, হলো হলো চোখে জানিয়েছিলো, মনিকারিকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না, অত্যাচার গিয়ে সে নিশ্চিত হয়ে বাবে।

কিন্তু...যাক সে মরেনি। মনিকা স্তিমিত হালি হাললো, এখন সে কলেজে

লেকচার ইয়ারে পড়ে, মস্ত বিগ্গজ হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। নতুন, সম্পূর্ণ নতুন।...

প্রসাধন শেষ করে মনিকা গিয়ে হাজির হল চাের টেবিলে। বিলাস বাবু, কোশল্যা দেবী, হালি...সবাই ইতিমধ্যে আসন দখল করে’ বোধকরি তাইই জন্তে অপেক্ষমান,—কিছু না বলে মনিকা সন্তর্পনে বসে পড়লো নিজের জারগার।

আর বেড়ি মণ্টা বাবে অতমুর ট্রেন এনে পৌঁছাবে এখানকার প্রাটফর্মে। শুধু ছোট্ট কিংবা মথুরকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করার কোনো মানে হয় না, মনিকা ভাবতে লাগলো, সে নিজেও যাবে কিনা।

একটা জিনিষ লক্ষ্য ক’রে মনিকা কিছু পীড়িত হ’ল : তার বাবা আর মা অতমুর আগমন লক্ষ্যে কেন যেন বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। মনিকা খুব কম করেও চার-পাঁচবার তাঁদের জানিয়ে দিয়েছে যে অতমু আজ এখানে এসে পড়বে; তবু কেন যে তাঁরা তৎপ্রতি এতো নিবিকার আর উদ্বাণীন হয়ে রয়েছেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনিকা আশ্বাত পেলো সন্ধ্যা : চাের টেবিল—যেখানে যেকোন বাজে বিষ্য নিয়ে, যে-কোন বাজে কথাবার্তা হঠাৎ লম্ববপর, সেখানেও কিনা আজ অতমুরকে কেন্দ্র ক’রে একটা সাধারণ আলোচনা পর্যন্ত উঠলো না। বরঞ্চ গতানুগতিক কথাবার্তাও অজ্ঞাত দিনের চেয়ে কমই হ’ল; খাওয়া শেষ করে অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখিয়ে বিলাসবাবু চলে গেলেন বাইরের ঘরে আর কোশল্যা দেবী রান্নাঘরে। মনে-মনে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ ক’রে শাধা মুখে মনিকা তাকিয়ে রইলো : হালিও কথা যেন লয়ে পড়েছে; বাইরে তার লম্ববপরো ছ’একজন অপেক্ষা ক’রছে বোধ হয়।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে মনিকা ভাবতে লাগলো তার বাবা-মার এরকম জড়

ব্যবহারের কারণ কী। অতঃ্তু এই বাড়ীতে আলবে একথা গতকাল বিকালে জানবার পর থেকেই তাঁরা যেন গভীর হ'য়ে অন্তরকম হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু কেন? ...অতঃ্তু বাবার সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আবার কী মনোমালিঙ্গ ঘটেছে? অথবা অতঃ্তু নিজেকে কী কোনোকালে তাঁর প্রতি অশিষ্ট আচরণ দেখিয়েছে?...মাথাযুগ্ম, মনিকা কিছুই ভেবে পেলো না। একবার ভাবলে, ব্যাপার কী মা-কে জিজ্ঞেস ক'রে দেখা যাক; আবার ভাবলে, না থাক। ব্যাপার যা-ই হোক শিগগিরই জানা যাবে। আগে থেকেই এই নিয়ে অনাবশ্যক হৈ-টৈ হট্টগোল ক'রবার প্রয়োজন নেই।

শেষ পর্য্যন্ত ছোট্ট একা-ই টেনে গেলো। আর মনিকা একটা মালিক পত্র টেনে নিয়ে মনোযোগ দেবার চেষ্টা ক'রলো। কিন্তু বুধা সাধনা। বাড়ীর লামনেকার রাস্তার এক-একটা গাড়ীর লক্ষ্য আর অমনি বই কলে উঠে, সে গিরে তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় জানালার ধারে। অনেক ঘোড়ার গাড়ীই গলিগলি দিয়ে আসা-যাওয়া করে, অতঃ্তুটা আর আসে না : ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে ফিরে এসে মাটি থেকে মনিকা আবার বইটে তুলে নেয়।

বাবা আর মা-র ঔদাসীয়ে ব্যথিত হয়ে মনিকা ভাবলে, মথুরকে টেনে পাঠাবে কিনা; সে যেন অতঃ্তুকে নিষেধ করে এ-বাড়ীতে এসে উঠতে। মিছেমিছি অপমান লইতে সে কেন এখানে আসবে। কিন্তু এই-সুদীর্ঘ চার বছর বাবে অতঃ্তু এখানে আসছে—লারাটা পথ ট্রেনে আর ষ্টিমারে হয়তো ভাবতে-ভাবতে এনেছে যে তার মনিকা-দিকে গিরে সে কী রকম দেখবে; কী নিয়ে প্রথম আলাপ ক'রবে; কী ভাবে আলাপ ক'রবে। এখন এই বয়সের চাকার কী ক'রে নির্ভর আশ্বাস দেওয়া যায়! নির্ভর

আশ্বাস; অতঃ্তু নিশ্চয় শুক পাবে, বুকের লম্বা উৎসাহ নিতে আসবে নিমেষে। এতোদিন পরে এ ধরনের আশ্রয় অতঃ্তু প্রত্যাশিত নয়, সেই মুহূর্তে অতঃ্তু হিম হয়ে বাবে; চোখের লামনে নেমে আসবে মনিকার উদ্ভাসিত দেহ নয়, অমানিশার অন্ধকার।

কী যে ক'রবে ভেবে না পেয়ে নিস্তক্ব হয়ে মনিকা শুক হ'য়ে বসে' রইলো।

ওঁদিকে গাড়ীটাকে বিবের করে দিয়ে অতঃ্তু ততক্ষণে বিলালবাবুর বাড়ীর বাগান অতিক্রম ক'রে অন্ধরের ভেতর ঢুক পড়েছে। কেউ তার জন্তে বাইরে অপেক্ষা ক'রছে না; ধারে-কাছে কোনো লোকজন নেই, অতঃ্তু একটু বিস্মিত হ'ল। তবু এ বাড়ীর নাড়ী-নক্ষত্র লবই চেনা,—নিড়ি বেয়ে উঠে সে বরাবর মনিকার ঘরের লামনে এসে দাঁড়ালো। ভেজানো দরজা একটুখানি ঠেলা দিয়ে কীক ক'রে দেখলে, দরজার দিকে পেছন ফিরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মনিকা কিছু শুক হ'য়ে বসে' রয়েছে; বদবার ভল্টাটা চমৎকার—অতঃ্তু চোরের মতো পা টিপে-টিপে এগিয়ে এলো, তারপর হঠাৎ তাক লাগিয়ে দেবার জন্তে প্রায় ঝাপিয়ে পড়লো মনিকা-দর দেহের ওপর।

মনিকা অতিমাত্রায় চমকে উঠলো। ছোট্ট বসিষ্ঠ হাত ততক্ষণে তাকে মনের আবেগে জড়িয়ে ধরেছে—কতোদিন বাবে দেখা! কিন্তু এই আলিঙ্গন তো অতীতের কিশোর অতঃ্তুর অত্যন্ত আলিঙ্গন নয়, কথাটা মনে হতেই মনিকা অনাস্বাদিত উত্তেজনার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো, এ যেন কোনো অগাধিতে পুঙ্খের কঠিন পরশ—মনিকা মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো; ঈর্ষ হাঁপাতেও লাগলো যেন।

'মনিকা-বি' স্বতঃস্বে অতঃ্তু বললে : 'আমাকে চিনতে পারছো না?'

বাস্তবিক চিনতে পারছে না যেন; মনিকার মনে হ'তে লাগলো, এ যেন তার কিশোর লচ্চর অতঃ্তু নয়, অজ্ঞ কেউ তাকে হলনা ক'রতে এনেছে এ বাড়ীতে। এ-কী অস্বাভাবিক পরিবর্তন : এই চার বছরের ভেতর অতঃ্তু বয়সের অল্পপাতে অপ্রত্যাশিত রকম বড়ো হ'য়ে উঠেছে; আগে পাতলা ছিপছিপে দেহের গড়ন ছিলো এবং এখনো লেরকমই আছে বটে কিন্তু লম্বার সে মনিকাকে কাঁধের কাছে কলেছে। গায়ে ইণ্ডিয়ান লিঙ্কের পাঞ্জাবী; মাথায় একরশ

ডাঙরেন বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিশ্র ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

অগোছাল চুল; চোখ দুটো বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—মনিকা অভিজ্ঞত হ'য়ে গেলো।

‘মনিকা-বি!’ অতমু আবার বললে: ‘আমাকে চিনতে পারছো না?’

অতীত দিনের তুলনার বর্তমানের ব্যবধান বতো বড়োই হ'ক, এখন এই মুহূর্তে বোকার মতো চুপ ক'রে বসে থেকে সত্যি কোনো লাভ নেই,—মনিকা চোটা ক'রে নিজেকে তৈরী ক'রে নিলো। তারপর হানি-হানি মুখে তাকালো অতমুর দিকে।

‘একেবারে বদলে গেছো—’ মনিকা বললে: ‘গলার আগরাজ না শুনে তোমাকে চেনে কার লাগি। আমার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হ'য়েছে? না আগেই আমার এখানে ছুটে এগোছো?’ অতমু না টের পায় এরকমভাবে ব্যবধান বাঁচিয়ে মনিকা একটু দূরে সরে' বসলো।

‘আগে তোমার কাছেই ছুটে এনেছি—’ অতমু বললে: ‘এখন চলা, দেখি, কোথায় তাঁরা রয়েছেন। হানিটাই বা গেছে কোথায়? কতো বড়ো হয়েছো সে?’

বিলাসবাসু আর কোশল্যা দেবীর সঙ্গে অতমুর কয়েকটা খুঁচরো কথাবার্তা হ'ল। অতমুর বাড়ীর লবাই কেমন আছেন; অতমু ম্যাটিক পরীক্ষার কোনো সবজেন্ডে লেটার পেরেছিলো কিনা; (পায়নি: কাঠ' ডিভিডনে পাশ করেছিলো এই পর্যন্ত।) ইনটারমিডিয়েট পাশ ক'রে অতমু কি আরো পড়বে না অজ্ঞ কোনো লাইনে বাবে, অতমু এখন যে লহরে থাকে সে লহর এ লহর থেকে কোন্ কোন্ বিষয়ে ভালো কি কোন্ কোন্ বিষয়ে খারাপ; কোন্ কারণে অতমুর আশাহুয়ারী স্বাস্থ্য-উন্নতি এখনো ঘটেনি— ইত্যাদি।

একটা প্রশ্ন তাঁরা ক'রতে গিয়েও শেষে গেলেন। নেটা এই যে অতমু এই বাড়ীতে কতোদিন থাকবে বলে' ঠিক ক'রেছে, এবং অতমু যে এখানে এনেছে সেটা নিছক

বেড়ানোর উদ্দেশ্যেই, না অজ্ঞ কোনো প্রয়োজন আছে। অতমুর অভিভাবকেরা জানেন কিনা যে অতমু এখানে এনেছে। অতমু কলেজ ছাট্টেলে থাকে।

প্রশ্নবর্ষণ স্থগিত হ'লে ছাড়া পেরে মণিকার সঙ্গে অতমু আবার ওপরের সেই নিভৃত কক্ষে চলে' এলো: বাড়ীর লম্বা ঘরের ভেতর এই ঘরটাই বোধকরি সবচেয়ে ভালো। এখান থেকে বাগানটা চমৎকার চোখে পড়ে, দ্বিবি ঠাণ্ডা হাওয়া চলাচল করে।

‘বাড়ীর একটা গম্ভীর আবহাওয়া দেখছি—’ একটু ইতস্তত: ক'রে অতমু বললে: ‘আগে তো এরকম ছিলো না, মত পরিবর্তন এনে গেছে—কী বলো?’

‘কিন্তু কারণটা ভারী চমৎকার—’ হালবার চোটা ক'রে মনিকা বললে: ‘বছরের বিবর্তনে আমাদের ছ'জনেরই বয়স বেড়ে গেছে, কৈশোরের চকলতা আর নেই, সারল্যের পরিবর্তে গাম্ভীর্য মনকে আচ্ছন্ন করেছে। অর্থাৎ আমরা নিজেরাই গম্ভীর হ'য়ে পড়েছি, অতএব পৃথিবীর সব কিছুই এখন থেকে আমাদের কাছে গম্ভীর ঠেকবে।’

কথাটার লভ্যতা লম্বন্ধে বোধকরি লম্বার নেই। অতমু ভাববার চোটা করলো এরকম মতবাদ তার পরিচিত কোনো কবির কবিতার সে ইতিপূর্বে পেরেছে কিনা? শ্রীর কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থকে মনে পড়লো যিনি শিশুকে লক্ষ্যশ্রেষ্ঠ ফিলজকার বলেছেন।

‘আচ্ছা মনিকা-বি—’ অতমু বললে: ‘তার বছর ধ'রে আমাদের তো কোনো

মুখোমুখি লাকাত নেই, কিন্তু আমার চিঠি-গুলি তো তুমি নিয়মিত পেরেছো, তাতে কি কোনো পরিবর্তন ধরা পড়েছে? চিঠির ভেতর দিয়ে মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করা নিশ্চয় অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছো নাকি?’

‘সামান্য কিছু আভাস পাওয়া গেছে বটে— অনেক চোটা করে মনিকা বললে: ‘কিন্তু যে পরিবর্তন অবশ্যস্বাবী তার বিস্ময়ে কীই বা বলবার আছে মামুষের।’

এই প্রশ্নে অতমুর লিখিত একটা চিঠির অংশবিশেষ তার মানসনেত্রে ভেদে উঠলো, লাইন কয়েকটি এই রকম: মনিকা-বি এখানে তোমার মত স্নন্দর, তোমার চেয়ে বেশী স্নন্দর আর তোমার চেয়ে কুৎসিত এরকম অনেক যেকোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে থাকি। ইচ্ছা করলে তাহের সঙ্গে অনেক লম্বাই আলাপ করতে পারি, সে সুযোগও রয়েছে। কিন্তু পাছে তাহের সঙ্গে অবাধে মেলাবেশার তোমাকে ভুলে যাই এজন্য লক্ষ্য রাখি। আমার মনে তোমার জন্তে যে আশ্রয় এবং একমাত্র আশ্রয় নির্দিষ্ট রয়েছে নেটা অজ্ঞ কেউ কোনোদিন অধিকার করে বসবে এ আমি কিছুতেই সহ্যে পারবো না।……

এই কয়েকটি লাইন মনিকা অনেকবার পড়েছে, এতোবার পড়েছে, যে তার প্রশ্ন মুখস্থ হ'য়ে গেছে। সে মনে-মনে ভারী খুশী হয়েছিলো অতমুর উদারতা দেখে।

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আন্ততোব মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

যুদ্ধ হয়েছিলো, অথচ বিনিময়ে কীই বা
দেবার আছে অতনুকে।

মনিকা নিজে পড়াশোনা বেশীদূর
করেনি ইচ্ছুক-জীবনে সে মন্ডারী গোছের
ছাত্রীঘরের চেরেও অনেক খারাপ : অতএব
কোনো গতিকে দেখেও কেলানে উঠে
উপরি-উপরি ছ'বার বছর নষ্ট করে আর
দে অগ্রদর হয়নি। বাড়ীতে ফিরে এলো।
'কিন্তু অতনু নিজে তার মনিকাদি লম্বকে
'বিশেষ আস্থাবান। নাই বা হল চলতি
গতানুগতিক বিজ্ঞানঘরের পড়া—বিশেষ
থেকে অতনু বিভিন্ন বাছাইকরা বাংলা গল্প
প্রবন্ধ উপস্থানের বই পাঠাতে লাগলো
মনিকাকে : এতোদিনে এক আলমারী
প্রায় ভরে গেছে। এই যে এতো-এতো
নষ্ট, মনিকা বিশেষ করতো, তার মতো
কিছু মেয়ের জ্ঞানের বিস্তৃতির পক্ষে তাই-ই
সম্প্রদেয় : মনিকার আত্মপ্রদায় অনুভব করতো।

'তুমি আমার জন্তে বতোটুকু করছো—'
অতনুর চোখের ওপর চোখ রেখে মনিকা
না বলে থাকতে পারলো না : 'তার জন্তে
আমি খুব কৃতজ্ঞ, অনু!'।

'এসব তো কিছুই নয়—' ঘাড় নেড়ে
অতনু বললে : 'তুমি খামকা কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করতে যাবে কেন? তুমি তো
জাননা তোমার জন্তে আমি কতোদূর কী
করতে পারি। আমার অন্তরে তুমি ছাড়া
যে আর কেউই নেই, মনিকাদি।'

মনিকা চুপ করে রইলো।

'লম্বা পৃথিবীটা একটিকে—' মনের
আবেগে অতনু বলে যেতে লাগলো : 'আর,
আমি তুমি অন্তর্ভিকে। বহি তুমি আমার
পাশে এলে দাঁড়াও, আমার হাতে হাত
রাখো, লম্বারের সবকিছু বাধাবিপত্তি
সহজে পারবো আমি। এটা জেনো,
তোমার কাছে এলে যে লাভি পেতে পারি
সেইকম পৃথিবীর আর কোথাও পাবো না।

তাইতো তোমাকে এতো কাছে পেতে
ইচ্ছে করে।'

'কাছে পেতে ইচ্ছে করে—' মনিকা
কৌতুকভরা কণ্ঠ বললে : 'আমাকে চিরকাল
তোমার কাছে রাখবার উপায় আছে নাকি
কোনো? এতো যে আবছার করছো,
কিছুদিন পরে আমি অন্তর চলে গেলে
তখন কী করবে?'।

'তার মানে?' অতনু উৎসাহে
উঠলো : 'তুমি আমার অন্তর কোথায় যেতে
চাও?' একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত কী যেন
চিন্তা করে বললে : 'বিয়ের কথা বলছো?'

'ধরো যদি তাই হয়—' মনিকা হালসার
চেষ্টা করলে : 'চিরটা কাল বাবা-মার ঘরে
বসে রইবো এমন তো কোনো কথা নেই!
বিয়ের পর স্বামীর ঘরে চলে গেলে তখন
আমার দর্শন পাওয়া হয়তো কঠিন হয়ে
উঠতে পারে।'

'কিন্তু সত্যি কি তুমি বিয়ে করবে?'
অতনু মুহূর্তে মুখড়ে পড়লো যেন।

'করলে কি খুব বেশী অন্তর করা হবে?'
মনিকা টেনে টেনে হাসতে লাগলো।

'আমি কিন্তু আজীবন চিরকুমার রইবো—
ঈশ্বর বিষাদমিশ্রিত সুরে অতনু বলতে
লাগলো : 'আচ্ছা, মনিকাদি, আমি যদি
আজীবন বিয়ে না করে থাকতে পারি,
তুমিও কি সেরকমভাবে থাকতে পারো না?'

ছপুনের আগে খাবারের ঘরে আবার
লকলের দেখা পাওয়া গেলো। খেতে বসে
বিলাস বাবু আর কৌশল্যা দেবীর সঙ্গে
অতনুর আরো কিছু আলাপ হ'লো।
অতনুঘর ওখানে এখন কী রকম গরম
পড়েছে, মাঝে মাঝে রুটি হয় কিনা, মশার
উৎপাত কী রকম—এখানে অনেকদিন পরে
এলে অতনু কোনো রকম বিশেষ পরিবর্তন
লক্ষ্য করেছে কিনা, পুরাতন বন্ধুঘর কারুর
সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক কিনা, ঠাকুরের
রান্না কী রকম লাগছে...এই সব।

ছপুনে হুঁফা যেন অগস্ত অসিক্ত;
বাতালে আশ্বিনের স্মৃতিদ্বিহিতা থেকে
ক্রমাগত : যে যায় ঘরে হরজা জানলা
বন্ধ ক'রে শুয়ে থাকতে পারলে বাঁচে—ঠাণ্ডা
মনোরম মেয়ের ওপর। অতনুকেও থাকবার
জন্তে একটা ছোট্ট ঘর ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে :
ঘরের গরমে ভালো লাগে না; অতনু ঘর
ছেড়ে চলে আসে মনিকার কাছে।

মনিকা খুশী হয়। বলে : 'ছপুনে
সুখোবার অভ্যাস বৃদ্ধি নেই?'

'তোমারও তো তাই দেখছি—'অতনু
একটা চেরারে বসে পড়ে।

মনিকা আড় চোখে অতনুকে দেখে
নেয়। স্বভাব আর ব্যবহারের দিক থেকে
বিশ্লেষণ ক'রলে পরস্পরের যে খানিকটা
মিল আছে এমন নয়। সন্তুষ্ট : এটা
ছেলেবেলাকার স্বপ্ন-বিচারণার প্রতিক্রিয়া;
অসম্ভব নয়, হু'-জনেরই ঘুম হয় না ছপুনে।

'তুমি আগের থেকে অনেক বেশী সুন্দর
হ'য়েছো মনিকা-দি—' অতনু হঠাৎ বলতে
আরম্ভ ক'রলো : 'বেশ মানান নই মোটা
পোটাও হ'য়েছো দেখছি।'

অতএব অতনুকে আর ছেলেবেলাকার
অতনু বলে' ভুল ক'রবার উপায় নেই।
আজকের অতনু মনিকার চোখে যেন সম্পূর্ণ
নতুন কোনো মূর্তি ধরে' এনেছে : কথার
তার বিদ্যাত' আর তাৎ-এ তার বক্তা;
মুখেচোখে প্রথম যৌবনের স্বর্ণপ্রভা দীপ্তি;
বল-সঞ্চারিত বলিষ্ঠ বাহুযুগে বিশুদ্ধ রক্তের
তপ্ততা।

'হোট্টেলে বসে' পরীক্ষালব্ধ একঘেরে
জীবন বাজার কীকে প্রায়ই তো তোমাকে
মনে পড়ে—' অতনু বলে' চলছিলো :
'আর ভাবি, হে ঈশ্বর, কবে মনিকা-দ্বিধ
সঙ্গে দেখা হবে। এক-একবার ভাবি
কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে দেই; মনিকা-
দ্বিকে সঙ্গে ক'রে পালিয়ে যাই এমন আরণ্য

যেখানে কেউ আশাঘের চিনতে পারবে না ;
হু'জনে মনের আনন্দে ছোট্ট ঘরে থাকবো
সেখানে ।'

অন্তহুর চোখে মনিকাও সুখি আর
আগেকার পুরোপুরি মনিকা-হি নয় । এই
তো এক সুহৃৎ এই ঘরে বসে' পরিণত
বয়সের প্রেরণায় নিটোল স্বাস্থ্য আর
রূপলাবণ্যের কমনীয়তার মনিকাকে অপরূপ
দেখাচ্ছে । আজকের মনিকার আর সেদিনের
উচ্ছ্বাস নেই : আজকের মনিকা অত্যন্ত
লতর্ক, অত্যন্ত সাবধানী—কিন্তু অনাস্বাদিত
অমৃতভূতির হ্রস্ব আবেগকে সে লুকোবে
কোথায় ?

'এই কবিতাটি পড়ে শোনাও তো—'
কথোপকথনের ঘোড় ফেরাবার জন্তে
হাতের বইটা মনিকা অন্তহুর দিকে এগিয়ে
'দিলো : 'দেখি কেমন পড়তে পারো !'

দ্বিরুক্তি না ক'রে অন্তহু পড়তে লাগলো :

আমরা হুজনা স্বর্গ-খেলন।

গড়িব না ধরণীতে,

মৃৎ ললিত অশ্রু গলিত গীতে ।

পঞ্চশরের বেধনা-মাদুরী বিরে

বাগর রাজি রচিব না মোরা, প্রিয়ে,

ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে

ভিক্ষা না বেন যাচি ।

কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়

তুমি আছ, আমি আছি ।

(ক্রমশঃ)

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চ

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

হুতনের সূচনা

অনেক কথাই শুনেছেন—“বেশের মাটি”
লব্ধে । তাই এই ছবির সূক্তির পূর্ব
সুহৃৎ আর বেশী কিছু বলবার দরকার আছে
বলে মনে করি না । তবে সেদিন হঠাৎ
ভাগ্য ক্রমে ছবিখানি একবার দেখলাম
বলে এর বিষয় নতুন হু-একটি কথা
আপনার মনে বলা মাত্র ।

পূর্বে মনে করেছিলাম ছবিখানি চাষ
আবাহ নিরেই আগাগোড়া তৈরী হয়েছে,
কিন্তু ছবি দেখে আশাঘের লে ধারণা বহলে
গেল । এই ছবির মধ্যে যে চমৎকার একটি
কাহিনী রয়েছে, তা লভ্যই অনবদ্য । এ
এমন স্নানর একটি কাহিনী যা চিত্রে আমরা
পূর্বে বিশেষ পাই নি ।

এই কাহিনীর মধ্যে মানুষের মনের
বিবিধ প্রকার ভাবাবেগের খেলা এমন
ভাবে দেখান হয়েছে, যা সত্যিই অনন্ত
সাধারণ বলে মনে করি । কেবল নাচগান
আর বিলাস চিত্রের অবতারণা করে দর্শক
চিত্ত মাৎ করবার কোন চেষ্টা এই ছবিতে
নেই । ছবিটিকে দেখে এই কথাই আমার
বারবার মনে হচ্ছে যে—হ্যাঁ-এতদিনে এমন
একটি ছবি আদর্শ বা এক পরিবারের
লকল বয়সের লকলে একমুখে বলে
দেখে নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন ।

“বেশের মাটি” চিত্রে এমন কোন ঘটনা,
কথাবার্তা, বা ইঙ্গিত নেই যাতে কেউ কোন
প্রকার আপত্তি নিতে পারবেন । আমরা
খুব মন দিয়ে ছবিখানি দেখেছি, তাতে

আমরা অন্ততঃ এমন কোন কিছু পাই নি
যাতে আপত্তি করতে পারি ।

এই ছবির কাহিনীর মধ্যে আশাঘের
বেশের গ্রামকে এবং গ্রামের নানা ব্যাপারকে
প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । যে সকল গ্রাম্য
চরিত্র আমরা ছবিতে দেখতে পাব—তাঁদের
অনেকেই হয়ত খুব পরিচিত বলে মনে
হবে । গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের কথা বাঁধের
মনে আগে তাঁরা এই লব ব্যাপার চিত্র-
কাহিনীতে দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবেন
এবং গ্রামের ছরবছর কথা মনে করে
হয়ত কিছু হুঃখও পেতে পারেন ।

ছবিতে দর্শককে হুঃখ দেওয়া চিত্র-
নির্মাতার উদ্দেশ্য নয় । “বেশের মাটি” চিত্র
দেখে অনেকের মনে হুঃখ হলেও এর ফল
অন্তর্দিক দিয়ে ভাল হবে । কারণ হুঃখ
পাবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনে একথা
জাগা স্বাভাবিক যে কি করে বেশের এবং
গ্রামের হুঃখ দূর করা যেতে পারে ।

আপনারা জানেন বাংলাদেশের গ্রামে
শিক্ষা বা লভ্যতার আলোক খুব বেশী প্রবেশ
করে নি । ছবি দেখেও তাই প্রথমে
আশাঘের মনে হয় । কিন্তু ছবি দেখে
একথাও আপনারা জানতে পারবেন যে—
গ্রামের লোকের মধ্যে শিক্ষা ভেদন না
থাকলেও তাঁদের নতুন কিছু শিখবার আগ্রহ
আপনার চেয়ে কম নয় । ঠিকমত দেখাতে
পারলে তারা বেশের জন্ত লব কিছুই
করতে পারে ।

সত্যি কথা বলতে কি পূর্বে দেশের এত রকম সমস্তার কথা আর কোন ছবিতে আমরা বোধহয় দেখিনি। 'সমস্তার কথা' বললাম এই অস্ত্রে যে চিত্রের চরিত্রগুলির কথাবার্তার মধ্যে দর্শক অনেক কিছুই শুনেতে পাবেন এবং যা শুনে তাঁদের মনে নানা প্রকার চিন্তাও জাগতে পারে।

* * *

দেশের চাষ-আবাদ বিষয়ে যে সকল কথা ছবিতে বলা এবং দেখান হয়েছে, তাও বিশেষ করে ভাববার বিষয়। বিশেষে আজ চাষের কাজে বৈজ্ঞানিক কলকজার ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। তাতে চাষীদের লোকসান কিছুই হয় নি। প্রথমে আপত্তি বা সন্দেহ হলেও পরে চাষীরা কলকজার সাহায্য চাষের সকল কাজে আনন্দের সঙ্গেই নিরেছে। আমাদেরও হয়ত অচিরেই তা করতে হবে।

* * *

মোটের ওপর "দেশের মাটি" চিত্রে সব কিছুই এক অতি বিচিত্র কাহিনীর মধ্য দিয়ে বলা বা দেখান হচ্ছে। কাহিনীকে গাথা হয়েছে প্রধান—আনন্দদান প্রচেষ্টা হয়েছে সুখ্য, তার সঙ্গে গৌণভাবে বহু কিছু বেশভিৎসর ব্যাপার এই ছবিতে পাবেন। এবং একথাও বলা দরকার যে আপনারা এই ছবিকে সামাজিক জিনিষ বলে নিলে নিজের প্রতি আবিচার করবেন।

* * *

গাগানী... ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে চিত্রা এবং নিউ লিনেমার এই ছবিখানি আপনারা দেখতে পাবেন। তখন দেখবেন, আমরা যা বলছি তা ঠিক কি না।



রেকর্ড সমালোচনা

—এডিসন—

বৈচিত্র্যের পাদমূলে কৃষ্ণচন্দ্র দে—'নটীর পূজার' গানের কৌতুককর দ্রব্যবস্থা

রঞ্জিত রায়ের হাসির গান

এবার আমরা সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হিজ মাষ্টারস ভয়েসের সমালোচনা প্রকাশ করিলাম। হিজ মাষ্টার ভয়েসের রেকর্ড পুস্তিকাখানি এবার পূরীপেক্ষা বেশ সুশৃঙ্খল হইয়াছে, প্রত্যেক রেকর্ডের পরিচিতির সহিত যে ছোট ছোট চিত্রগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহাতে পুস্তিকাখানির বহুলাংশে নৈন্দর্য্যবুদ্ধি হইয়াছে। রেকর্ড রনিকের নিকট পুস্তিকাখানি বিশেষভাবে আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীচন্দ্রদেবী হর্গ পূজার পূর্বেই অর্থাৎ এই মাসের শেষে এই কোম্পানীর অক্টোবর মাসের রেকর্ডগুলি বাজারে উপস্থাপিত করা হইবে। এত রকমের রেকর্ড এ মাসে প্রকাশ করা হইয়াছে যে বিভিন্নরূচি সম্পন্ন শ্রোতৃসাধারণের প্রত্যেকেই এ মাসের তালিকার নিজ নিজ মনোমত রেকর্ড পাইবেন।

* * *

এই পূজার প্রধান খবর ট্রেডাল ব্যুরার কে, বি, ক্লাবের পরিচালনার হস্তরক্ষিত গীতশিল্পী শ্রীনারায়ণ গুপ্তের সম্পাদনায় 'সুরজী' নামে একখানি রেকর্ড-প্রধান মাসিক পত্রিকা বাহির হইবে। অস্তাবধি চলচ্চিত্র বিষয়ক, বেতার বিষয়ক ও অন্যান্য বিষয়ে নানাবিধ সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু রেকর্ড সংক্রান্ত পত্র এই প্রথম। 'সুরজী' যে রেকর্ড রনিক এক

সম্প্রদায়ের কৌতুকলব্ধি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা আশা করা যায়।

* * *

হিজ মাষ্টারস ভয়েস পি ১১৮২৮ :— এই রেকর্ডে বাঙালার অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে শৈলেন রায় রচিত এক-পিঠে 'আবার নতুন করে জল আনে রে' ও অন্যপিঠে '(আবার) ভালো এ ঘর উজল করে' এই দুইখানি নূতন আমদানী গীতি-কাব্য পরিবেশন করিয়াছেন। কৃষ্ণবাসু গান শ্রবণে কোন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, তবে নিম্নলিখিত বিষয়ে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাহা এই খালিকার (disc) রেকর্ড করা হইয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাকে গীতি-কাব্য বলিয়া চালানো হইয়াছে,—তাহার বিশেষত্ব এই। প্রথম গানখানির আট পঙক্তি গাছবার পর 'দেখিন ছিল আমার হাতে.....সুটেছে কমল!' এই সাত কপি কৃষ্ণবাসু ক্রন্দনের সুরে আবৃত্তি করিলেন, আবার শেষ চার কপি গাছিতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডেও তজ্জপ পাঁচ পঙক্তি গাছবার পর

"বিনশুলি সব ভালোই কাটে

সুখের সোয়াধে ;

যখন তখন জড়িয়ে গলা মোহাগে

বাধে।

বুকের 'পরে এলিয়ে পড়ে'

সুখখানি দি' চুমোর তরে',

হেলে বলি : 'পিজরা আমি,

তুমি পরাণ-পাখী।'

দে হেলে কর : '.....'

এই লাত লাইন পূর্ববৎ ক্রন্দনের সুরে আবৃত্তি করিয়া হঠাৎ

“.....তুমি যে ফুল,
(তোমার) খোঁপায় বেধে রাখি।”

স্বর ধরিয়া গাহিয়া উঠিলেন ; অন্তঃপর আবার আট লাইন পূর্বোক্তরূপ আবৃত্তি করিয়া শেষের ছুট কলি গাহিয়া রেকর্ড শেষ করিলেন। এই হইল নূতন আমদানী গীতি-কাব্য। আবৃত্তিতে কতকাংশে সুরের প্রয়োজন হয় তাহা লক্ষ্যেই জানেন এবং আবৃত্তি যে গীত অপেক্ষা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের তাহাও লক্ষ্যজনবিদিত। গীতি-কাব্যের আশ্রয়ে গান এবং আবৃত্তির জগা-খিচুড়ি একটু বৈচিত্র্য বটে এবং বৈচিত্র্যের নামে ইহাও যদি লাভ্যরূপে গলধঃকরণ হয়, তাহা হইলে স্মৃতিতে হইবে লাভ্যরূপের রুচি ভীষণভাবে নিম্নাভিমুখী হইতে চলিয়াছে। কক্ষবাসু যে বৈচিত্র্যের পাখমূলে রেকর্ড আলয়ের এতদিনের সুনাম বলিধান দিবেন তাহার জ্ঞান কালই যে লক্ষ্যতোভাবে দারী সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। গান এবং আবৃত্তির সংমিশ্রণ এই গীতি-কাব্য রেকর্ডের সহিত কক্ষবাসুর নাম জড়িত বলিয়া আমরা হুঃখিত হইরাছি।

• • •

এন ১৭১৮২ এচ এম্ ভি :—সুপরিচিতা গায়িকা কুমারী সুখিকা রায় (রেণু) খোল, থঞ্জনী ও অজ্ঞাত বাস্তবজ্ঞের সহযোগিতায় ‘বহি বহুনার জলে ফুল’ ও ‘মন-বুন্দাবনে রাস-নকে’ এই দুইখানি ত্রিক্ষের ভজনগান রেকর্ড করিয়াছেন। পূর্বের তীব্রতা হ্রাস-প্রাপ্তির বরূপ কুমারীর কণ্ঠ ইহানীং আরও ভালো হইয়াছে। গান দুইটি সুগীত হইয়াছে বলা চলে।

• • •

এন ১৭১৮৩ এচ এম্ ভি :—রেকর্ড আলয়ের সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীমুগাল কান্তি

বোষ এই রেকর্ডে ‘আমার কালো ঘেঁরে রাগ করেছে’ ও ‘ওরে লক্ষ্মীনাথী মেখে এলি’ নজরুল-রচিত এই দুইখানি শ্রাদ্ধ-লজ্জিত রেকর্ড করিয়াছেন। খোল-থঞ্জনী প্রভৃতি লহগামী লজ্জিতের সহিত সুকণ্ঠ-শিল্পীর লয়ল-প্রচেষ্টা লাফল্য লাভ করিয়াছে।

• • •

এন ১৭১৮৬ এচ এম্ ভি :—এই রেকর্ডে কুমারী রেবা লোমের দুইখানি গীতি-চিত্র ‘ওগো তেপান্তরের রাজকুমার’ ও ‘রাঙা মাটির দেশে বনের ছায়ে’ পরিবেশন করা হইয়াছে। দুইটি গানই বৈচিত্র্যপূর্ণ সুশ্রাব্য অর্কেষ্ট্রার সহিত অধিকাংশ ইংরাজী সুরে গীত হইয়াছে। আপেক্ষিকভাবে প্রথম গানখানির সুর শ্রোতাকে ক্ষত মুগ্ধ করে, দ্বিতীয়টির ধর্ম্মাই লজ্জিত বিশেষ উল্লাসযোগ্য।

• • •

এন ১৭১৮৮ এচ এম্ ভি :—জমীন্দার উদ্ভীদার রচনা ও সুর-সংযোজনায় আব্দাল উদ্ভীদার এই রেকর্ডে ‘আমার এত রাতে কেন’ ও ‘আমার গলার হার খুলে নে’ এই দুইখানি ভাটিয়ালী গান একতারা প্রভৃতি যথাযোগ্য বাস্তবজ্ঞা সহযোগে নিজস্ব ধারা কল্পনারী রেকর্ড করিয়াছেন। ইহাতে অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্যের আভাস মিলিবে না।

• • •

এন ১৭১৯৩ এচ এম্ ভি :—রেকর্ডের আলয়ে নবাগতা আগ্রার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র তালুকদারের কস্তা কুমারী দীপালি তালুকদার এই রেকর্ড মারফৎ দুইটি খেয়াল গান পরিবেশন করিয়াছেন। ‘কুমুদ কুমুদ নুপুর বোলে’ একদিকে এই নট-বেহাগ ও অজ্ঞাতের ‘মেঘ-মেঘের বরষার কোথা তুমি’ এই ‘জয়জয়ন্তী—তেতাল’টি রেকর্ড করা হইয়াছে। ইনি নাকি কৈরাজ খাঁ লাহেবের ভ্রাতা ওস্তাদ তহমদক হোলেন লাহেবের নিকট দীর্ঘকাল শিক্ষা করিয়াছেন

এবং ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদ কৈরাজ খাঁ লাহেবের বিশিষ্ট ছাত্রী। যাহা হউক গান দুইখানি সুগীত হইয়াছে এবং জয়জয়ন্তী খানি আশাদের বিশেষ-ভাল লাগিয়াছে।

• • •

এন ১৭১৮৫ এচ এম্ ভি :—শ্রীমতী পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায় এই রেকর্ডে আড়বাণী একতারা প্রভৃতি যন্ত্রের লহগামীস্বর সহিত একদিকে ‘নিশির নিস্ততি যেন’ ও অজ্ঞাতের ‘ও বন্ধু! যেখানে তোমার বৃকের মাঝে’ এই দুইখানি কাজী নজরুল লিখিত গ্রাম্য গান রেকর্ড করিয়াছেন। শ্রীমতীর সুমিষ্ট কণ্ঠের শুভে গান দুইখানি স্রুতিময় হইয়াছে! গ্রাম্য গানের একঘেঁয়ে চও এই রেকর্ডে নাই।

• • •

এন ১৭১৯২ এচ এম্ ভি :—এক সময়ের রেকর্ড-জগতের শ্রেষ্ঠ-গায়ক কে, মল্লিক বাহার ‘ভাড়িয়ে লংগার কোথা চলি যাও’ গানটি অজ্ঞাতবাণী লাভ্যরূপে লম্বাদৃত, তিনি বহুদিন পরে নজরুল লিখিত দুইখানি আমদানী গান লতজ কণ্ঠে রেকর্ড করিয়াছেন। একদিকে ‘বর্ষ গেল, আশ্বিন এল’, ও অজ্ঞাতের ‘তোর ঘেঁরে যদি থাকত উষা’ রেকর্ড করা হইয়াছে। আগমনীর গান, যেহেতুকের গান প্রভৃতি type গানে এখনও কে, মল্লিক যে পুরাতন নছেন তাহা এই রেকর্ড হইতে লক্ষ্যকরূপেই উপলব্ধি করা যাইবে।

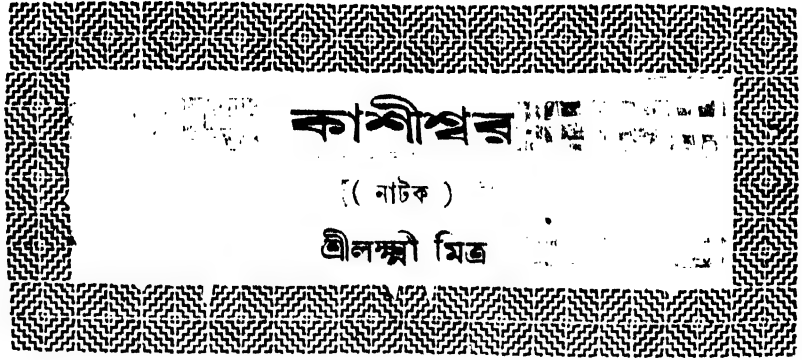
• • •

এন ১৭১৯১ এচ এম্ ভি :—শ্রীমতী সুখীরা ও ইন্দিরা সেনগুপ্ত উপযুক্ত আবৃত্তি লজ্জিতের সহিত লক্ষিতভাবে এই রেকর্ডে দুইখানি ত্রিক্ষের ভজনগান গাহিয়াছেন। Base part গুলিতে পুরুষ-কণ্ঠের লক্ষণগণ ও সুর পরিহার প্রথম গানখানি সুরের হইয়াছে। দ্বিতীয় গানখানি সুবিধাজনক হয় নাই।

• • •

এন্ ১৭১২৪ এচ এম্ তি :—এ মালের
রেকর্ড-ত লিকায় শ্রীরঞ্জিত রায়ের হালির
গানের রেকর্ডখানিই লক্ষ্যশ্রেষ্ঠ। দুইটি গানেরই
কথা ও সুর বোগাইয়াছেন নজরুল ইসলাম।
একটিকে ‘কলির কেঁঠে’এর কার্টুন-চিত্র
অঙ্কন করিয়া ‘ওহে শ্রামো হে শ্রামো, নামো
হে নামো’ গানখানি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের
নটীর পুজার শ্লোক গান ‘আমার কম হে
কম, নমো হে নম’ গানখানির সুরের
কাঠামো লইয়া শিল্পী এমন কৌতুকরভাবে
শ্রোতার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন যে মূল
গানখানি যিনি শুনিয়াছেন তিনি কোন
ক্রমেই হাস্য-সংবৎন করিতে পারিবেন না।
মূল গানটিতে মধ্যে মধ্যে যে ‘আ আ আ
আ আ আ’ করিয়া তান বেওয়া হয়
সেটির যে কৌতুকর ছয়বস্থা শিল্পী করিতে
সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। পুস্তিকার
বা রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের মূল গানের স্ব
স্বীকার করা হয় নাই। অত্বে একে শ্রীদীয়েন
হালের বক্তৃতার পর ইংরাজী সুরে সুরের
অর্কেষ্ট্রা বাজানোর সহিত আধুনিক নৃত্য-
লাধনার ব্যক্তচিত্র অর্থবিহীন ‘ল্যাম্ পম্
ল্যাম্ পম্’ হাস্যরসাত্মক গানখানি শ্রেষ্টি-
বর্গকে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিবে।
অর্থের দিক দিয়া ধরিলে গানখানিকে
nursery rhymeএর পর্যায়ভুক্ত করা চলে
বলিলেও অভ্যক্তি হয় না, এবং সেদিকেও
প্রথম গানখানি ঘোটেই উন্নত নয় কিন্তু
রঞ্জিত রায়ের representation অতি
চমৎকার হইয়াছে।

এন্ ১৭১৮৮ এচ এম্ তি :—এই রেকর্ডে
বিচিত্র বাজনার সহিত মণিবর্জনের নৃত্য-
হন্দ,—একটিকে রূপকুমার নৃত্য বা ফুলের
জাগরণ ও অত্বে একে দেবদাসী-নৃত্য, রেকর্ড
করা হইয়াছে। ইহার সহিত রঞ্জিত রায়ের
পরিচালনার যে অর্কেষ্ট্রা বাজানো হইয়াছে



(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

—তৃতীয় অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য—ঘর

দিলীপ ও যোগদাস

যোগদাস—ওরে আমি জানি, সব জানি।

কিন্তু মাঝেও তো ফেলে দিতে পারিনি
বাবা! তোকে পেটে ধরে আমি কলঙ্ক
পেরেছি বটে, কিন্তু কলঙ্কিতা তুই আমার
বলতে পারিনি; মর্দাঘাতীনের অলভ্য বলে
তুই আমার কাছ থেকে মুখ ফিটিয়ে নিতে
পারিনি দিলীপ!—অবাক হয়ে বালনে,
আমি এমন কিছু লজ্জানে কোরিনি দিলীপ
যাতে কোরে কাকুর মাথা হেঁট হয়। তা
বহি হোত তা হলে দ্বিজেনের বাবা আমার
এতোদিন ধরে রাণীর গোরব দিতে পারতো
না!—তা নয় দিলীপ, তা নয়!

তাহা চমৎকার। রেকর্ডখানি লবিশেষ
শ্রুতিস্বত্বকর।

এন্ ১৭১৮৭ এচ এম্ তি :—বেতার-
বৈঠকের সুপরিচিত বাহক শ্রীরাঙ্গেন্দ্রনাথ
সরকার একটিকে ‘কোন লগনে জনম
নিলাম’ এই সুখের গানখানির সুর লইয়া
ও অত্বে একে কৃষ্ণচন্দ্র হে কর্তৃক গীত ‘আমি
চন্দন হইয়া শীতল পরশে’ এই কীর্তন গান
খানির সুর লইয়া ক্লারিওনেটএ সুরের
অপূর্ণ-মারাজাল সৃষ্টি করিয়াছেন।
গানের সহিতই স্ব স্ব বোধোপযুক্ত আত্মপদিক
বক্তৃতা-সঙ্গীতের লাহায্য লওয়া হইয়াছে।

দিলীপ—কৈফিয়ৎ আমি চাইনা।

কৈফিয়ৎ দিওনা।

যোগদাস—শুনবিনি তুই?

দিলীপ—না।

(বলিয়া মুখ ফিরাইল)

যোগদাস—কেন শুনবিনি? কেন
আমি জলে পড়ে মরবো? কেন তুই স্নান
মুখ ফিরিয়ে চলে বাবি তাহলে?

দিলীপ—কেম!.....

(অবাক হইয়া যোগদাসের মুখের প্রতি
চাহিয়া রহিল মুহূর্তকাল)

তুমি জানো ‘মা’ কথার পরিচয় কি?
জানো কেন ঐ একটি শব্দ সারা পৃথিবীর
মানব মনের জীবন ধারণের ধোল? জানো
তুমি?

যোগদাস—জানি।

দিলীপ—জান না।—গর্ভধারিনী মানে
মা নয়। জান না তুমি:—

(ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া থাকিয়া
বলিতে লাগিল)

প্রতিবিন্দু তার পবিত্রতা দেখে হচ্ছে মা।
দেবদাসকে আশ্রয় কোরে মহিমায়িত দেখে
হচ্ছে মা।

(দহন উত্তেজিত হইয়া বলিল)

তুমি আমার এই কল্পনার আঘাত
করো। আমার ধ্যানের মাঝে তুমি
হত্যা কোরো।—তোমার আমি কোন
কৈফিয়ৎ শুনতে চাইনা।

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীলা—দিলীপ !—ও জ্যাঠাইমা !—
কিন্তু এতো গেলমাল কেন ? তোমার ঘুম
ভাললোই বা কি কোরে ?...একি, খুব যে
ঘেমেছ বেথছি !—না, আর একটিও কথা
নয়। তুমি এখন শুয়ে পড়বে।—আর
জ্যাঠাইমা, তুমি আর লম্বা পেনে না ?
এই রাতে তুমি এলে ঐ রোগীর ঘুম ভাঙিয়ে
কথা কইতে ! এখন চলো দিকিনি, শোবে
চলো।—ওর লজ্জা আর বেথা কোরোনা।
ওকে তাহলে আর বাঁচাতে পারবে না।

যোগম্বারা—না মা, বেথা কোরব না। এই
শেষ। ওকে বলতে চাইলাম, ও শুনে না।
ভেবেছিলাম ওর কাছে বিচার পাবো, কিন্তু
বিচারক আমার মুখ ফিরিয়ে রইলেন।
এইবার আমার শান্তি নেবার পালা।...
বেশ, তাই হবে দিলীপ, তাই হবে। শান্তিই
আমি নোব

(বলিরা প্রস্থানোত্তর কইলেন, কিন্তু
কি ভাবিরা পুনরায় ফিরিয়া আলিয়া
বলিলেন)

জানিস্ মা, ও ভেবেছে ওর মা একটা
চরিত্রহীনা ইতর মেরে ! ভেবেছে—না,
সে থাক। সে আমি বলব না।

(প্রস্থান)

সুনীলা—একবারটি গেছি কখনি এক
কাণ্ড হয়ে গেল। জ্যাঠাইমারও বেথছি
মাথা ধরাপ হয়ে গেছে। সে বাক—এখন
কি তুমি একটুখানি হরলিক খাবে, না
এমনি আবার শুয়ে পড়বে ?

(দিলীপ সুনীলার দিকে চাহিয়া দ্বিধ
হইয়া রহিল) কথা কইছো না যে ?
ওলব চিন্তা মন থেকে হয় কোরে যাও
দিলীপ। শান্ত হও, দ্বিধ হও।

(বলিরা দিলীপের হাতখানি ধরিল ও
হালিয়া বলিল)

কি, আমার মুখের দিকে এমন চেয়ে
রইলে কেন বলতো ?—আমার বেথতে
মুখি খুব ভালো ?

(দিলীপ কিন্তু নির্ঝক হইয়া রহিল,
বেথা গেল তাহার চোখ দিয়া টপ টপ
করিয়া জল পড়িতেছে) ওমা তুমি
কাঁদছো ! কি হল আবার ?...

দিলীপ—আমার মা ! সুনীলা, আমার
মা !

সুনীলা—কি তোমার মা ?

দিলীপ—না কিছু না। আমি লামলে
নিরেছি। ঠিক আছে। আলোটা নিবিয়ে
যাও। একটুখানি আমার একলা থাকতে
যাও।

সুনীলা—দিচ্ছি আলো নিবিয়ে। কিন্তু
একলা থাকতে তোমার আমি আর দোব না।

(বলিরা সুনীলা ঘর অন্ধকার করিয়া
দিল)

দিলীপ—আচ্ছা দিও না।

সুনীলা—এইবার একটুকু ঘুমিয়ে নাও।
রাত আর কতটুকুই বা রইল।

দিলীপ—নো'ব। কিন্তু আলোটা জ্বলে
যাও। অন্ধকার লক্ষ কোরতে পারছি না।
অন্ধকারের ভেতর দ্বিধে ফুটে উঠছে আলোর
কমল—আমার ভুলে-যাওয়া অভীতের দিন-
গুলি ! জ্বলো, জ্বলো, আলো জ্বলো ;
আমি লক্ষ কোরতে পারছি না অন্ধকার !...

(সুনীলা আলো আলিয়া দিল)

সুনীলা—কি রকম হচ্ছে বলতো ?

দিলীপ—কিছুই হয়নি। শুধু মনে পড়ে।
আর কিছু না।

—মনে পড়ে আমি ঐ মারের কাছে
দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেললে মা কখনও
লক্ষ কোরতে পারতো না। আমার না
ধামিয়ে মা নিজে ধামতে পারতো না।
আর আজ আমার লামনে কি অভিনয়
অল্পাধিক হয়ে গেল তুমি স্বচক্ষে দেখতে

পেলে। মা কাঁদতে লাগলো, হাতজোড়
কোরে কমা চাইলে, আর আমি পাথরের
মুর্তি মতো ব'সে রইলাম।

সুনীলা—মাকে ডাকবো দিলীপ ?

দিলীপ—(ভীতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল)
না, না, ওরে না। ও আমার মা নয়।
আমার মা মরে গিয়েছে।—কে রে ওখানে
দাঁড়িয়ে ?

(মনীবার প্রবেশ)

মনীবা—আমি।—মা কোথায় জানো ?

দিলীপ—মা !

সুনীলা—ঘরে নেই ?

মনীবা—না। জ্ঞানবা বললে মা দ্বিধার
ঘরের দিকে এলেন সে দেখেছে। তারপর
আর কিছু নে জানেনা। আমি লম্বা
বাড়ী খুঁজে বেথছি, কোথাও পাচ্ছি না।

সুনীলা—শীগগীর বিজেনকে তুলে 'দগে।
লবাইকে চারদিক খুঁজে দেখতে বল।
শীগগীর যা, ঘেরা করিনি।

(মনীবার প্রস্থান)

(মুহূর্তকাল হইলেন অন্ধ বলিয়া রহিল ;
পরে লহনা দিলীপ বলিয়া উঠিল)

দিলীপ—সুনীলা, তুমিও যাও।

সুনীলা—থাক, ওরাই পারবে। আমার
যাওয়ার দরকার হবেনা বোধ হয়।

দিলীপ—না, না, ওরা পারবেনা। তুমি
যাও। তুমি যাও। তুমি না হ'লে হবেনা।

সুনীলা—কিন্তু—

দিলীপ—কোন ভয় নেই সুনীলা।

আমার কোন কতি হবেনা—তুমি যাও।

(সুনীলার প্রস্থান)

এক দিমিট শুদ্ধ থাকিয়া দিলীপ বলিল)
মা কিরে এলো ! অভিমানিনী মা
আমার ! তুমি কিরে এলো !

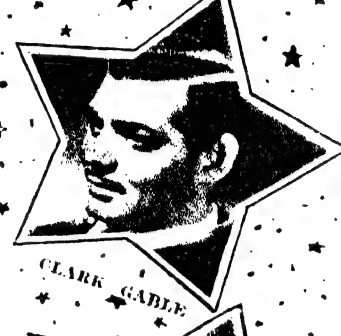
(ক্রমশঃ)



.

.

খেয়ালী—শারদীয়া সংখ্যা



নেটোগোল্ডউইনের
কয়েকটি
জনপ্রিয় তারকা।

মূল্য চার আনা Price -/4/-

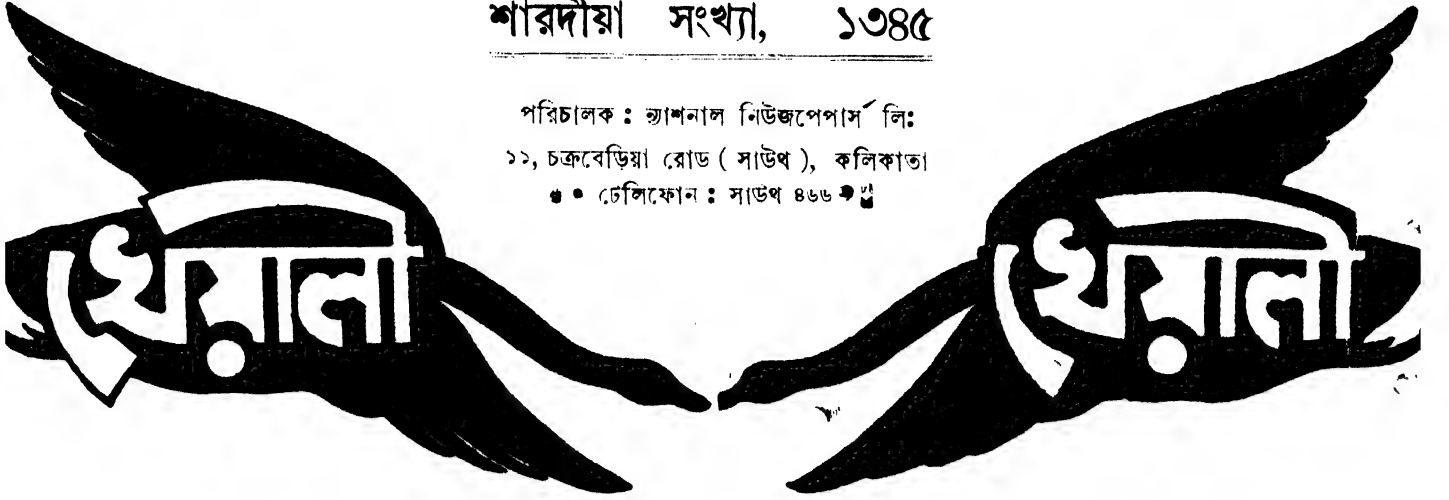
মফঃস্বলে পাঁচ আনা Mofussil /-5/-

শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৫

পরিচালক : আশনাল নিউজপেপার্স লি:

১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

• • টেলিফোন : সাউথ ৪৬৬ • •



খেয়ালী

হে অজ্ঞাত চরম খেয়ালী.

অসামান্য হে আশ্চর্য্য পরম খেয়ালী !

তোমার নিখিল সৃষ্টি সামান্য এ মানুষের কাছে

অনাদি কালের হ'য়ে আছে —

অনন্ত রহস্যাবৃত দুজ্জের্য্য হেয়ালী !

* * *

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা বিশাল ও আকাশের বুকে

সাঁগম্যয়ে নেহারিছে বুক

কীন্তি তব

নিত্য অভিনব,

তোমারি ইচ্ছায় নিবিবচরে

সৌরলোকে ভ্রমে বারে বারে

অনির্দিষ্ট পথে প্রতিদিন

শ্রান্তি ক্লান্তি হীন !

* * *

নিত্য তব সঙ্গ লভি প্রকৃতির রঙ্গভূমির

নাহি জানি তবু পরিচয়,

হে চির অপরিচিত অদৃশ্য মায়াবী

অবাক বিষয়ে শুধু ভাবি

কালের প্রবাহ চলে অবিরাম কোন লক্ষ্যে ছুটি' ?

অসংখ্যের মাঝে কভু নাহি মেলে হেন কোনো ছা'টি
সমভুল্য যারা পরস্পর ;
ওগো স্থপতিধর !
লোকে লোকে এ কি তব মায়া !
বিরাট এ বিখে হেরি চারিদিকে নব নব ছায়া
অরণ্য পর্বতে আবর্তন
অসীম সমুদ্র মাঝে ক্ষণে ক্ষণে তাণ্ডব নর্তন
অতুল্য অপরূপ বিকাশ
হেরি স্বপ্রকাশ !

* * *
জরা মৃত্যু রোগ শোক দিয়ে
ধ্বসের কদাল মূর্তি নিয়ে
একি তব নিষ্ঠুর কৌতুক ?
এ খেয়ালে কী যে পাও সুখ
কী আনন্দ লভ নাহি জানি,
আজ যারে তোলো সিংহাসনে করো রাজরাণী
কাল পুনঃ ভিক্ষকের বেশে পথপ্রান্তে ছেড়ে দাও আনি !

* * *
রাখাল সাম্রাজ্য লভে,
তোমারি খেয়ালে ভবে,
রাজপুত্র বরি' নেয় প্রবজ্যা সন্ন্যাস ।
আনন্দ উৎসব মাঝে অকস্মাৎ তোলো শোকোচ্ছ্বাস
শিশুরে হরিয়া লও মা'য়ের স্নেহের অঙ্ক হ'তে,
ফিরিতেছে পথে
অনাথ আতুর কত শত—
তোমারই খেয়াল শুলী মত !

* * *
হে নির্মম, রুঢ় খেয়ালিয়া !
দয়িতের বক্ষ হ'তে ছিন্ন কর কণ্ঠলগ্নাপ্রিয়া !
তরুণী হারায় তার হৃদয় বিলম্ব ;
তোমারি ইচ্ছায় ষটে সব
অসম্ভব নানা অঘটন !
নিত্য নব জীবন মরণ
ফুল ফোটা ফুল ঝরে পড়া—
ক্ষণে ক্ষণে কত ভাঙা-গড়া,
হাসি অশ্রু মেশা এই ভুবনের মনের দেয়ালি
তোমারি খেয়ালে চলে জানি জানি হেমহা খেয়ালী ।

—শ্রীনরেন দেব

চিন্ময়ী চণ্ডিকা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

উপনিষদে ষাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, শাক্তাগমে তিনিই চিন্ময়ী মহাদেবী চণ্ডিকা। উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের যেমন দুইটি রূপ—(১) পর (অর্থাৎ নিগূর্ণ নিরাকার পরম-ব্রহ্ম) ও (২) অপর (অর্থাৎ সগুণ সাকার ঈশ্বর)—শ্রীশ্রী৬ মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীসম্প্রদীতেও সেইরূপ জগন্মাতা চণ্ডিকার ত্রিগুণাত্মিকা মূর্ত্তি ও গুণাতীত স্বরূপের উল্লেখ আছে। তবে দেবী স্বরূপতঃ চিন্ময়ী হইলেও চণ্ডীতে গুণাতীত ভাবের উপর ততদূর জোর দেওয়া হয় নাই; কারণ এই অখণ্ড নিগূর্ণ নিরাকার স্বরূপের ধারণা করা দেহাভিমানী সাধকের পক্ষে বড়ই কঠিন। তাই সাধক-গণের হিতার্থ মহাদেবীর সগুণ ও সাকার রূপকল্পনাই চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে সমসিক-ভাবে কুটিয়া উঠিয়াছে।

সগুণাবস্থায় দেবী ত্রিগুণাত্মিকা জগন্মাতা—সমগ্র জগতের প্রকৃতি স্বরূপ। কিন্তু শুধু এই “প্রকৃতি” শব্দটি ভুলিয়াই ইঁহাকে সাধ্যাদর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বোধ করিলে বড় ভুল হইবে। এখানে “প্রকৃতি”-শব্দের পারিভাষিক বা রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপ্তিগত যৌগিক অর্থ গ্রহণীয়। “প্রকৃতি” বলিতে ব্রহ্মতে-হইব—উপাদান কারণ (material cause)। অবশ্য সাঙ্খ্যের প্রকৃতিও ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। জগদ্রূপে তাঁহার স্বতঃ-পরিণামও ঘটয়া থাকে; অর্থাৎ—সাঙ্খ্যের মতেও প্রকৃতি জগতের স্বতন্ত্র উপাদান কারণ। আবার এই পরিণাম সত্ত্বেও তাঁহার স্বরূপের প্রচ্যুতি কদাচ ঘটে না।

পরিণামিনী হইয়াও তিনি নিত্য। এই সকল বিষয়ে চণ্ডিকাদেবীর সহিত সাঙ্খ্যের প্রকৃতির কিছু কিছু মিল আছে সত্য; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বহু। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি জড়রূপ, জগন্মাতা চণ্ডিকা চিন্ময়ী। সম্প্রদীতে বর্ণিত— তিনি চিত্তরূপে (চৈতন্যমাত্রস্বরূপে) সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

আবার দেবীকে ‘মায়ী’, ‘মহামায়ী’, ‘যোগমায়ী’, ‘বিষ্ণুমায়ী’ প্রভৃতি আখ্যা প্রদত্ত হইলেও অদ্বৈতবেদান্তের মায়ী বা অবিজ্ঞার স্বরূপ হইতে চণ্ডিকা স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন মায়ী বা অবিজ্ঞা অচেতন ও ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও সর্বংশে সাঙ্খ্যের প্রকৃতিরও তুল্য নহে। প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম সাধ্যাসিদ্ধান্তসম্মত; কিন্তু শাক্ত-বেদান্তে জগৎকারণ সংস্বরূপ পরমেশ্বরের ঈক্ষণ ব্যতিরেকে মায়ার স্বতন্ত্রভাবে জগদাকারে পরিণাম স্বীকার করা হয় না। তাহা ছাড়া প্রকৃতি নিত্য—অনাদি ও অনন্ত; পক্ষান্তরে মায়ী অনাদি হইলেও অনন্ত নহেন সান্ত। মায়ার নাশে সর্বমুক্তি; কিন্তু প্রকৃতির ধ্বংস নাই। মায়ী পূর্বে ছিলেন, এখনও আছেন; কিন্তু তাহা বলিয়া যে চিরদিন থাকিবেনই—এমন কথা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন না। তাঁহাদের মতে—এমন একদিন আসিবেই আসিবে যেদিন মায়ার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটিবেই ঘটবে। কিন্তু সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি নিত্য। প্রকৃতি ও মায়ার বিভেদ এই থাকেই। অতীত অংশে প্রকৃতি ও মায়ার কথঞ্চিৎ সাম্য আছে; তাই সাঙ্খ্যের প্রকৃতি বা বেদান্তের মায়াকে শাক্তের

জগন্মাতা চণ্ডিকার সহিত তুলনা করা সম্ভবে না। বরং চণ্ডিকার সগুণরূপের সহিত উপনিষদের অপরব্রহ্ম বা মায়ীশব্দল ঈশ্বর অথবা শৈবতন্ত্রের সশক্তিক পরমেশ্বরের তুলনা করা চলে।

আদি সৃষ্টির পূর্বে চণ্ডিকাদেবী ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় অব্যক্ত ছিলেন। প্রথম কল্পারম্ভে তিনি গুণময়ী হইয়া প্রথম অভিব্যক্ত হইলেন মহালক্ষ্মীস্বরূপে। তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া তিনি মহাশূন্যকে নিজ তেজো-রাশিতে পূর্ণ করিলেন। এই মহালক্ষ্মী দেবী তপ্তকালবর্ণাভা—কনকাভরণে ভূষিত-দেহা। তাঁহার মস্তকে নাগ (ব্রহ্মার চিহ্ন), লিঙ্গ (রুদ্রচিহ্ন) ও যোনি (বিষ্ণুচিহ্ন)। তাঁহার করচতুর্থে—দাড়িমফল, গদা, চর্ম্মফলক ও পানপাত্র। এই মহালক্ষ্মী দেবীই চণ্ডিকার আত্মা প্রকৃতি।

সৃষ্টির প্রারম্ভে মহালক্ষ্মী দেখিলেন, কোথাও কোন জীব নাই। তখন তাঁহার গুণত্রয় হইতে তমোগুণের সারাংশগ্রহণে তিনি একটি অভিনবমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। ইঁহার দেহবর্ণ মর্দ্দিত-অজ্ঞানসন্নিত উজ্জল গাঢ়নীল। নয়নগুলি অতিবিশাল ও বিস্তারিত। বদনবিবর দংষ্ট্রাকরাল। কটাদেশ ক্ষীণ। শিরোদেশ মুণ্ডমালা-বিভূষিত। বক্ষঃস্থলে কবন্ধহার প্রলম্বিত। ভূজচতুর্থে খড়গ, চর্ম্ম, ছিন্নমুণ্ড ও খর্পর বিরাজিত। ইনিই চণ্ডিকাদেবীর দ্বিতীয়া প্রকৃতি মহাকালী।

মহাকালীর আবির্ভাবের পর দেবী ত্রিগুণময়ী মহালক্ষ্মী নিজ অতি শুদ্ধ দৃষ্টিগুণদ্বারা আর একটি মূর্ত্তির প্রকাশ

করিলেন। শরতের রাকাশশি-কৌমুদীর
জায় ইহার দেহকান্তি; হস্তচতুষ্টয়ে
অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক
বিরাজমান। ইনিই চণ্ডিকাদেবীর তৃতীয়া
প্রকৃতি মহাসরস্বতী।

এইরূপে মহাকালী ও মহাসরস্বতীর
আবির্ভাবের পর ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীতে
রজোগুণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ত্রিগুণ-
সমষ্টিক্রপা মহালক্ষ্মী তখন ব্যষ্টিভাবে কেবল
রজোগুণাশ্রয়ে বিরাজমানা রহিলেন।

পূর্বোক্ত তামসী মহাকালীই বিষ্ণুর
যোগনিদ্রাক্রপিণী—বিষ্ণুমায়া বা যোগমায়া।
মধুকৈটভ বিনাশের নিমিত্ত বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ
করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা ইহারই স্তুতি
করিয়াছিলেন। তখন তিনি কজ্জলোজ্জ্বল-
বর্ণা, দশাননযুতা, দশভুজা ও দশপাদাজ-
শোভিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি মুখে
তিনটি করিয়া বিশাল আয়ত নয়ন।
বদনসমূহ করালহংসাবলীর প্রত্যয় ভয়ঙ্কর

হইলেও রূপলাবণ্যে তিনি লোকললাম-
ভূতা। তাঁহার দশভুজে—খড়গ, বাণ,
গদা, শূল, চক্র, শঙ্খ, ভূশুণ্ডী, পরিষ, ধনুঃ
ও গলদ্রক্ত ছিন্নমুণ্ড। এই নীলাম্রত্যাতি
মহাকালিকা ৮ সপ্তশতীচণ্ডীর প্রথমচরিতের
(মধুকৈটভবধমাহাঙ্গোর) অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

যে অমিতত্যাতি মহিষাসুরমর্দিনী দেবী
দেববৃন্দের তেজঃসারসমষ্টি হইতে
জ্যোতির্ময়ীরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন
বলিয়া চণ্ডীতে কথিত হইয়াছে, তিনিই
ত্রিগুণা মহালক্ষ্মীর অপরা মূর্তি। তাঁহার
বদনমণ্ডল ও কুচযুগ শ্বেতাভ। হস্তসমূহ,
জজ্বা ও উরুদয় নীলবর্ণ। কটদেশ ও
পাদপল্লবদ্বয় রক্তবর্ণ। তাঁহার পরিধানে
সুচিত্র রমণীয় বস্ত্রবল। অঙ্গে বিচিত্র
ভূষণরাজি ও সুগন্ধি অমূল্যলপন। গলদেশে
অম্লানকুমুমমালিকা। সুষাপানে বদনকমল
আরক্তিম। যুদ্ধকালে ইনি কভু সহস্রভুজা,
কভু শতভুজা, কভু অষ্টাদশভুজা, কভু

ষোড়শভুজা আবার কভু বা দশভুজা।
অষ্টাদশভুজারূপে তিনি (দক্ষিণ হস্তের নিম্ন
হইতে উর্দ্ধে ও বামের উর্দ্ধ হইতে নিম্নে)
যথাক্রমে—অক্ষমালা, কমল, বাণ, অসি,
কুলিশ, গদা, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা,
পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম্ম, চাপ পানপাত্র ও
কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন। এই পদ্মাসনা,
প্রগল্ভা, মহিষমর্দিনী দেবীই ৮চণ্ডীর
মধ্যমচরিতের (মহিষাসুর-বধ-মাহাঙ্গোর)
অধিদেবতা।

আর যিনি গৌরীর দেহকোষ হইতে
নিঃসৃত হইয়া শুভ-নিশুভ প্রভৃতি দানব-
দলন করিয়াছিলেন, সেই কোষিকী দেবীই
সকলগুণাশ্রয়া মহাসরস্বতীর অপরা প্রভৃতি।
ইনি অষ্টভুজা—বাণ-মুসল-শূল-চক্র-শঙ্খ-ঘণ্টা-
হল-কার্শ্বকধারিণী। শরতের সিতাংগপ্রভা
এই দেবীই ৮চণ্ডীসপ্তশতীর উত্তমচরিতের
(শুভনিশুভ-বধ-মাহাঙ্গোর) অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা।

নিগুণা চণ্ডিকা দেবীর সপ্তমমূর্ত্তিত্রয়ের
ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সুবর্ণ সুযোগ

বি, সি ধর এণ্ড ব্রাদার্স লিমিটেড

৮১নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

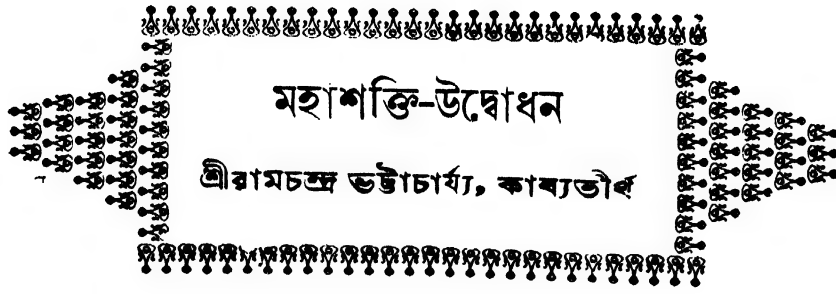
বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক এবং বায়োকেমিক ঔষধ
ও যাবতীয় সরঞ্জামাদি আমদানী করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয়
করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

হোমিও ঔষধ

১/৫ প্রতি ড্রাম, ১/১০

নিবন্ধ-

বি, সি ধর এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ



মহাশক্তি-উদ্বোধন

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্যভীষ্ম

“কুপুত্র যতপি হয়, কুমাতা কখনো নয়”—সন্তানের মঙ্গল কিসে হয়, সন্তান কিসে সুখী হয়, মায়ের সর্বদা এই চিন্তা। তাই মা জগদম্বা সংবৎসরের স্নিগ্ধ মধুর প্রাতঃকাল—এই শরৎকালে, সন্তান-সন্ততির উৎসব-আনন্দ, উৎসাহ-উদ্বোধন, ধর্ম মঙ্গলের জন্ত এই ধরাধামে প্রকাশ ক’রেছেন স্বীয় মহাশক্তি। তাই জগজ্জননী আপামর সাধারণ সকলকেই অধিকার দিয়েছেন এই বর্ষ—প্রভাত—মহোৎসবে। তথাকথিত অমূল্য জাতিও বঞ্চিত হয়নি তাঁর এই উৎসবধিকারে। প্ররুতিভেদে উৎসবের প্রকারভেদ আছে বটে, কিন্তু উৎসব নির্দিষ্ট হ’য়েছে সকলেরই জন্ত। ‘সংবৎসরের সুপ্রসন্ন প্রাতঃকাল ধর্ম্মে, কর্ম্মে, উৎসবে আনন্দে কেটে গেলে, শক্তির উপাসনা ক’রলে, সারা বছর ভাল যাবে’, সন্তান-বৎসলা মঙ্গলময়ী মায়ের মনে বুঝি এই ভাব!

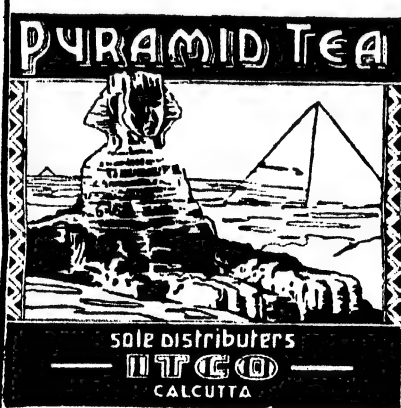
আয়, আয় মা! দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণি! দুর্গতিনাশিনি! দুর্গে! মা ভিন্ন আমাদের যে গতি নাই মা! আমাদের গর্ক ক’ব্বার জিনিষ মা, আমাদের গৌরবের সামগ্রী মা, আমাদের উৎসবের মূল মা, আমাদের সজীবতার হেতু মা। তবে কেন আমরা নিষ্কীর্ণ? কেন আমরা বীরত্ব-বজ্জিত? কেন আমরা সকল রকমে হতাশ? হায় তিনয়নে! দয়া ক’রে একটি বার চেয়ে দেখ মা। তোর হতভাগ্য ছেলেদের হাসি আছে—বিষাদের অশ্রু আছে—বিলাসের উৎসব আছে—নিরানন্দ দেহ আছে—আলস্তবিজড়িত প্রাণ আছে—ম্রিয়মাণ। আয় মা মহাশক্তিরূপিণি সর্ব-দুঃখনাশিনি সিংহবাহিনি! আমরা পরিতুষ্ট হই তোর সংহারিণী অশ্বচ মধুর হাস্তময়ী মুষ্টি দেখে, চিরচরিতার্থ হই তোর পদ-পঙ্কজে ভক্তি-অশ্রুমাখা কুসুমাজলিদানে,

পূর্ণমোরখ হই তোর মহাশক্তিপূর্ণ বরাভয় লাভে।

তাই ডাকি—একবার আয় মা! শিবদে! শিবরাণি! আমরা তোর পূজা করি। আহা! ঐ অদূরে বর্তমান আমাদের সেই মহাশক্তি উদ্বোধনের শুভবাসর। ঐ সন্নিকটে উপস্থিত আমাদের সেই শারদীয়া মহাপূজার মঙ্গলময় মুহূর্ত্ত। এস, এস ভক্ত ভাই সন! আমরা মেতে যাই ঐ শারদ মহোৎসবের শুভ অমুষ্ঠানে, আমরা ডুবে যাই ঐ মাতৃপূজার সুগভীর মহানদীতে, আমরা গুহু হই মায়ের ষোলকলায় পূর্ণ ঢল ঢল রূপ দেখে। বন্ধুগণ! এ পূজা একলার নয়—সকলের, এ পূজা ধনীর নয়—দোনের, এ পূজা হাসিবার নয়—কাঁদিবার, ঐ পূজা জড়ের নয়—কস্মীর, এ পূজা সামান্য পূজা নয়—মহাপূজা! এ পূজার অন্ন অর্ঘ্য নাই, অন্ন বলি নাই, অন্ন ময় নাই অন্ন কামনা নাই। এ পূজার অর্ঘ্য—প্রেরণা, এ পূজার বলি—আত্মবলি, এ পূজার মন্ত্র—বন্দে মাতরম্, এ পূজার কামনা—মুক্তি।

“শরণাগতদীনান্ত্ৰ পরিভ্রাণ পরায়ণে।।

সর্বস্বান্তি হরে দেবো নারায়ণি! নমোহস্ততে ॥”



পূজার শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ!

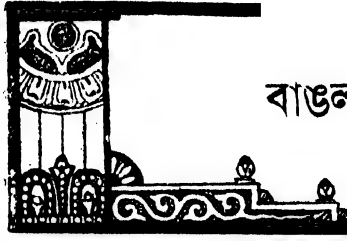
= পিরামিড চা =

সর্বোত্তম দার্কিলিং চা'র অভিনব সংমিশ্রণ

১ পাউণ্ড প্যাকেট মাত্র ১১/০ আনা

১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত বিক্রয় হইবে।

ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।



বাঙলা সাহিত্যে রমণ্যাসের অভ্যুত্থান

শ্রীমুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়



উনিশের শতকে ইংলণ্ডের সাহিত্যের, আর ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইউরোপের মনের সঙ্গে স্পর্শ, বাঙলা সাহিত্যের পথে জীবন-কাঠির মত হ'ল—বাঙলা সাহিত্য নোতুন প্রাণ পেয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক যুগে প্রবেশ ক'রলে। আঠারের শতকের মাঝামাঝি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মৃত্যু হয়—পুরাতন যুগের বাঙলা সাহিত্যের একটি চরম বিকাশ ভারতচন্দ্রের কাব্যে হ'য়ে যায়। তাঁর পূর্বে ষোলো আর সাতের শতকে, বৈষ্ণব সাহিত্যের—মহাজন-পদে আর চরিত-সাহিত্যে বাঙলা সাহিত্যের আর এক মননীয় বিকাশ হ'য়ে গিয়েছিল। ষোলো আর সাতের শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য, আর ঐ দুই শতকে রচিত মুকুন্দরাম কবিরাজের চণ্ডী, বংশীদাসের পদ্মপুরাণ প্রভৃতি খুব কয়েক বই; আর আঠারের শতকে রামপ্রসাদের পদ, আর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কাব্য, এই গুলিকেই অবলম্বন ক'রে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এদিকে, বাঙালী সাহিত্য বিষয়ে তার গুণপনা দেখায়। আঠারের শতকের প্রথমার্ধেই ভারতচন্দ্রের যুগ শেষ হ'য়ে গেল। তার পরে বাঙলা সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে গেমো হ'য়ে প'ড়ল। হরগৌরীলীলা, রামলীলা, রাধাকৃষ্ণলীলা, আর অজ পুরাণ কথা আর দেবতা বাদ নিয়ে ছড়া পাচালী যাত্রাগানে বাঙলা সাহিত্য পর্যাবসিত হ'ল। এই ছড়া পাচালীর যুগের জের ইংরেজ প্রভাবের প্রতিষ্ঠার পরেও চ'লেছিল; এবং এই

ধরণের গ্রাম্যসাহিত্যে বা লোকসাহিত্যে দাশরথি রায়ের মত একজন প্রতিভাশালী কবি (যাঁর মৃত্যু হ'য়েছিল ১৮৫৭ সালে বঙ্গিমের সাহিত্যিক অভ্যুদয়ের কিছু আগে) বাঙলা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত ক'রেছিলেন।

বাঙলা সাহিত্য ১৯এর শতকের গোড়ায় যে অবস্থায় পৌঁছেছিল তাতে অতি প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা ক'রে অদ্ভুত রস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সত্যাকার রসানুভূতি, রমণ্যাস বা রোমান্সের ভাব ছিল না বলেই হয়। 'রোমান্স' বললে আমরা বুঝি, বাইরের বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে এক অন্তর্নিহিত অনিবচনীয় আনন্দ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতি; মানব-মানবীর সাধারণ সম্বন্ধের মধ্যেও, তাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও এই আনন্দবস্তুকে অনুভব করা,—আর এই সম্বন্ধ আর এই জীবনকে বর্ণনা করবার সময়ে, তাঁর আভাসের আনন্দবস্তু বা রস-বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা। বাহ্যপ্রকৃতি এবং সাধারণ জীবন ছাড়া, সুদূর অতীত, যার সম্বন্ধে আমরা পুরো খবর জানি না, যা আমাদের কতকটা জানার আলো-জাঁধারীতে আবছা-আবছা ভাবেই থাকে কিন্তু আমাদের কল্পনার রাঙে রঙীন হ'য়ে দেখা দেয়, তাকে নিয়েও রোমান্স বা রমণ্যাস নাড়াচাড়া ক'রতে, তাঁর মধ্যেও শাস্ত্রত রসবস্তুর সন্ধান ক'রতে ভালোবাসে। এই অ-দৃষ্ট অ-শ্রুত অনির্বাচনীয় রসবস্তুর সন্ধান রোমান্স কতকটা বেপরওয়া হ'য়ে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়, কিন্তু উদ্ভট বা বিকট,

রস বজ্জিত বা অপ্রিয় ভাবের সঙ্গে কখনও নিজেকে জড়িত ক'রতে চায় না। রোমান্সের মধ্যে, ক্লাসিক অর্থাৎ রীতি অনুসারী বিচারপন্থী সংযত সাহিত্যের যুক্তি নিয়ন্ত্রিত আত্মসমাহিত ভাব ততটা থাকে না, যতটা থাকে আত্মভোলা অকারণ অমৌজিক কল্পনার আবেগ আর উচ্ছ্বাস। এখন, অষ্টাদশ শতকের শেষে আর উনবিংশ শতকের গোড়ায়, যে দু'পাঁচজন যথার্থ সাহিত্য রসিক পণ্ডিত বাঙলা দেশে প্রাচীন সংস্কৃত, মহাকাব্য, কাব্য, গজকাব্য, আর খণ্ডকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, কাদম্বরী, মেঘদূত প্রভৃতি প'ড়ছেন তাঁরা ভারতের অবিদ্যার 'ক্লাসিক' সাহিত্যের রস কিছুটা অনুভব ক'রতে পারতেন, কিন্তু রোমান্স-এর দৃষ্টিতে তাঁরা দেখতে শেখেন নি। প্রাচীন জগতের কথা বা গল্পের মধ্যে প্রাচীন জগতের জীবনের মধ্যে আমাদের কল্পিত জগৎকে আমরা নিয়ে গিয়ে থুসী হয়, আর এইভাবে আমাদের রোমান্স বাহা অনেকটা তৃপ্ত হয়; কিন্তু সেটা ক'রতে গেলে, একটা ঐতিহাসিক বোধ থাকা চাই। কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক বোধ কতকটা ছিল আকবরের আমলে। আকবর বাদশাহের সভার হিন্দু চিত্রকরেরা যেভাবে ফরাসীতে অনুদিত মহাভারতের ছবি একেছিলেন তা থেকে এটা বেশ বোঝা যায়, তারপরে সে প্রকার ঐতিহাসিক বোধ ভারত থেকে লুপ্ত হয়, ইউরোপের ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আবার সেই বোধ আমরা এখন ফিরিয়ে পাচ্ছি।

উনিশের শতকের মাঝামাঝি ইংরেজী সাহিত্য প'ড়ে, এই ঐতিহাসিক বোধ আর তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক আর প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে রোমান্সের অহুভূতি বাঙালী লাভ ক'রলে। ক্যাপটেন রিচার্ডসন ক'লকাতায় বাঙালী যুবকদের ইংরিজী সাহিত্য পড়াতেন, তার সম্পর্শে এসে এবিষয়ে বাঙালী ছেলেদের অনেকে খুব সচেতন হ'য়ে পড়ে। রিচার্ডসন সাহেব গত শতকের চারের কোঠায় Poetical Selections ব'লে কতকগুলি ইংরেজী সাহিত্যের চয়নিকা প্রকাশ করেন, তার একখানিতে ধারাবাহিক ভাবে ইউরোপের সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ রোমান্স-কাব্য থেকে চয়ন ক'রে দেওয়া আছে। এই রকম বইয়ের দ্বারাও বাঙালীর চিন্তা উদ্বুদ্ধ হ'তে অনেকটা সাহায্য পেয়েছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবৎকাল ১৮২৩ থেকে ১৮৭৩, আর রঙ্গলাল বাঁজুজ্জ, জীবৎকাল ১৮২৭ থেকে ১৮৮৭—বাঙলা সাহিত্যে এই অভিনব রোমান্সের ধারা প্রবর্তন ক'রতে এরা দুজনেই হ'য়েছিলেন অগ্রণী, এক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্র নাথের অগ্রদূত ছিলেন এরাই। ইংরেজী সাহিত্যের, ইউরোপীয় সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, তারাকান্ত কবিরত্ন, এরা উদ্ভাসময়, শকুন্তলা নাটক, মহাভারত, কাদম্বরী প্রভৃতি একাধারে রোমান্সের ও ক্লাসিসিজমের খনি প্রাচীন সংস্কৃত বই বাঙলায় অনুবাদ ক'রে বা অনুসরণ ক'রে বাঙলা সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা বোধের দ্বারা প্রণোদিত রোমান্সের আবহাওয়া বহাতে অনেকটা সাহায্য ক'রেছিলেন। এদের বই বা লেখা বাগ হতে বাঙালী সোজা প্রাচীন সংস্কৃত যুগের জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রতে সমর্থ হ'ল।

ভারতচন্দ্র, কাশীরামদাস, কুন্তিবাস, দাশরায়ের চোখে আর প্রাচীন পুরাণকথা তাকে দেখতে হোলো না।

আর একটি জিনিষ এসে বাঙলা দেশে রোমান্সের এক নবীন উৎস থুলে দিলে, সেটা হ'চ্ছে কর্ণেল জেমস টেমের লেখা ইংরাজী 'রাজস্থান' গ্রন্থ আর তার বাঙলা অনুবাদ। রাজপুতানায় রাজপুতদের মধ্যে উডসাহেব অনেকদিন ছিলেন, তিনি রাজপুতজাতকে মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। ১৮২৯ সালে লণ্ডন থেকে তিনি তাঁর Annals and antiquities of Rajasthan নাম দিয়ে সুপরিচিত মহাগ্রন্থ বার করেন। এই বই ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন একটি জগতের খবর দিলে—এদেশে মহাভারত রামায়ণের পাশে টেমের রাজস্থানও নিজের স্থান করে নিলে। রাজপুতনার হিন্দু বীর আর বীরজ্ঞানাদের লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা, রামায়ণ মহাভারতের প্রাচীন হিন্দু জগতের একটা মধ্য যুগের জের-স্বরূপ রাজপুত রাজাদের ক্ষণ, বাঙালীর চিন্তাকে জয় করে নিলে। আধুনিক বাঙলা কাব্য, নাটক আর উপন্যাসের ক্ষেত্রের অনেকটা অংশ এই রাজস্থান গ্রন্থের প্রভাবের ফল। দেশাত্ম-বোধ, স্বাভাৱ্য আর ত্যাগের বাণী আর সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধ—এই জিনিষগুলি বাঙালীর মনের রোমান্সকে উদ্ভাসিত ক'রে দিলে, 'রাজস্থানের' চর্চার ফলে।

রাজপুত জগতের খবর কাব্যে প্রথম দিলেন রঙ্গলাল, তাঁর 'পদ্মিনী', 'কর্ম্মদেবী' আর 'সুরমুন্দরী' কাব্যত্রয়ে; মধুসূদন দিলেন নাটকে তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে, আর বঙ্কিম দিলেন উপন্যাসে—তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনীতে', 'রাজসিংহে' আর অল্প বইয়ে। পড়ে রচিত কাব্য আর গল্প-কাব্য

বা উপন্যাস, এই দুইয়ের প্রকৃতি কোনও কোনও বিষয়ে এক। রমণ্যাসের প্রস্তাবক উপন্যাসিক বঙ্কিমের যথার্থ অগ্রগামী পথিক এবং সহযোগী হ'চ্ছেন কবি রঙ্গলাল। কেবল রাজপুত জগতের প্রভাব রঙ্গলালের উপরে প'ড়েছিল, তা নয় তিনি 'কুমার-সম্ভব' অনুবাদ করেছিলেন আর উড়িষ্যার ইতিহাসের একটা মনোহর রোমান্টিক কাহিনী (কাঞ্চীকাবেরী) তিনি অপূর্ণ সুন্দরভাবে বাঙলায় গ্রথিত করেন। রঙ্গলাল ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের রোমান্টিক অভ্যুত্থানের বিশেষভাবে সচেতন পুরোহিত।

বঙ্কিমের প্রথম বই "দুর্গেশনন্দিনী" এমন কিছু বিরাট বই বা বড় বই না হ'লেও এই বই-ই বাঙলা ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত ক'রলে। রাজপুত, পাঠান, মোগল আর বাঙালী—অতীতের তিনশ' বছরের বিস্মৃতি ভেদ ক'রে, যে যুগের সঙ্গে আমরা নাড়ীর টান অনুভব করি সেই যুগ বাঙালী পাঠককে নিয়ে গেল, আর হাতে ধ'রে তাকে সেই যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ, স্নেহ, প্রেম, ধর্ম্ম, আদর্শ, বিভিন্ন ভাবধারার সম্মিলন, মানুষের প্রতিযোগিতা, প্রতিশোধ, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি নানা রক্তির খেলা আমাদের কল্পনা-রঙ্গীন অস্ত্র ধ্বনি মুখরিত মধ্যযুগের জীবনের পটভূমিকার সামনে দেখিয়ে দিলে—বিস্ময়ে পুলকে বাঙালী যেন নোতুন চোখ পেলে। উদ্ভর-কালে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্স লিখেন আরও উন্নতি করিয়াছিলেন। আর এক হিসাবে রাজসিংহ তাঁর চরম ঐতিহাসিক রমণ্য। কতরকমের মানুষে রাজসিংহের রঙ্গমঞ্চ ভরতি, আর কত বৈশিষ্ট্যময় তাদের ক্রিয়া কলাপ। সপ্তদশ শতকের মোগল সাম্রাজ্য তার হরেক রকমের লোকজন নিয়ে যেন বঙ্কিমের বাহুরের দণ্ডের প্রভাবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি সরকার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্মাতা

PHONE B.E. 1761

TELE: "BRILLIANTS"

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত
একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ
হাল ক্যাসানের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি
সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে ও অর্ডার অনুযায়ী
তৈরী করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়।
মজুরী পূর্বাপেক্ষা আরও কমান
হইয়াছে।

পত্র লিখিলে নূতন ডিজাইন সমন্বিত
বি-৩নং ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়।

সকলের পত্রীক্ষা প্রার্থনীয়।

১২৪, ১২৪-১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
(বহুবাজার ও আমহাষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়)
ফোন বড়বাজার ১৭৬১ টেলিগ্রাম ব্রিলিয়ান্টস্

এসে জড়ো হ'য়েছে। বঙ্কিম এর পরে বাঙালীর ঘরোয়া-জীবন অবলম্বন ক'রে তাঁর রমণ্যাসের অবতারণা করেন। এখানেও তাঁর রুচি অসাধারণ। তাঁর 'বিশ্বরূপ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুই বই, বাঙালার জীবনের ভিতর আর বাহির এই দুইকেই যেন আলোকিত ক'রে দিয়েছে। বাঙলাদেশে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিককে বেশ খুঁটিয়ে দেখতে হয় কি ক'রে তা' বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ, আর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়। ঘাসের ফুলের সৌন্দর্য আছে—আমরা তা দেখি না; যিনি দেখেন, আর আমাদের দেখাতে পারেন, তিনিই সত্যশ্রুতি, তিনিই ভাবনেন্তা, তিনিই কবি। ১৮৫০—১৮৬০ সালের দিকের কলকাতার জীবন যাত্রা প্রণালী, কলকাতার সমাজ এছোটো সব বিষয়ে সুন্দর বা সৌর্ভবময় ছিল না; কিন্তু এ দু'টোকে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন, আর দেখে তাঁর ভালোও লেগেছিল, কালীপ্রসন্ন সিংহ; তাই তাঁর "হুতোম" বাঙলা সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবে, কারণ পঞ্চ চলুতি সাধারণ ব্যাপারে তিনি রসের সন্ধান পেয়েছিলেন, সে রস তিনি নিজের আত্মদান ক'রেছিলেন, আমাদেরও

আত্মদান করিয়েছেন। বঙ্কিমও সেই রকম বাঙালীর ঘরোয়া জীবনেও যে রস-বস্তুর অভাব হয়নি, তা আমাদের অভিজ্ঞতা গোচর করিয়ে দিয়েছেন। এইখানেই তার রোমান্স বা রমণ্যাস শ্রুতি হিসাবে রুচিও তাঁহার অমরতা।

বঙ্কিম চিন্তা-শীলতার পরিচয় দিয়েছেন, ভাবুকতার রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নানা উপন্যাসে আর প্রবন্ধে। তাঁর কমলাকান্তের কোনও কোনও প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় রোমান্স ধারার অকুরন্ত উৎস হ'য়ে থাকবে। কিন্তু রোমান্সের লক্ষণ আর তার সাহিত্যিক প্রকাশ বিচার ক'রলে, বঙ্কিমের ভাবও লেখার মধ্যে তাঁর 'কপাল কুণ্ডলা'কে সব চেয়ে প্রথম স্থান দিতে হয়। এরকম অদ্ভুত সুন্দর বই বাঙলা সাহিত্যে আর নেই, অল্প সাহিত্যেও দুর্লভ। বাঙালীর ঘরোয়া জীবন, তিন শ' বছর আগেকার বাঙালীর সমাজ; বাঙালীর ধর্ম জীবনের সৌকুমার্য আর স্নিগ্ধতা, ভয়াবহতা আর ভীষণতা, অনবলোকিত জগতের সঙ্গে পরিদৃশ্যমান জগতের এক অচ্ছিন্ন রহস্যময় যোগ,—এই সব বিষয় 'কপাল কুণ্ডলা'য় দৃষ্টের পর দৃষ্টে আমাদের সামনে তিনি উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। প্রথম কয় অধ্যায়ে সমুদ্র, সমুদ্রতটের বনানী, আর বালিয়াড়ী, কাপালিক কপাল-

কুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ এসবে যে রোমান্সের সৃষ্টি করে, তা কখনও পাঠকের মন থেকে মুছে যাবার নয়। বইয়ের পরিমাপ্তির ও বহরের করুণ-ভীষণ ট্রাজেডীর উপযুক্ত—নদীতীরে শ্মশান ভূমির জলে ধ্বসে গিয়ে নায়ক নায়িকাকে যেন তাদের অপেক্ষাতেই র'য়েছে এমন লোকান্তরে নিয়ে গেল। এই পার্থিব আর অপার্থিব মিশ্র রহস্য লোকের মধ্যে, মোতি-বিবির চরিত্র এবং তার মধ্যে নানাপ্রকারের দ্বন্দ্ব এক অতি সুস্বাদুর সৃষ্টি ক'রেছে। বইটার ভিতর নানা বর্ণনায় আর প্রসঙ্গে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন অন্তর্দৃষ্টির আর রমণ্যাস-উদ্বোধনের শক্তির পরিচয় আছে যে, সে সব কথা নিয়ে আজকে আর আলোচনা সম্ভব হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবিকই উনিশের শতকের বাঙালী সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন, আর এই রমণ্যাস বিভ্রাস্তিও তাঁর রুচির ছিল অসাধারণ।

শারদোৎসবে

এবারও স্বর্ণকবচের গ্রাহকগণের যোগদান বাঞ্ছনীয়। ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত, সর্কপ্রকার রোগ আরোগ্য ও কামনা পূরণকারী "স্বর্ণকবচ" পত্র লিখিলেই সর্কদা সর্কত্র বিনা মূল্যে পাঠান হয়। শক্তি ভাণ্ডার, পো: আউলিয়াবাড় (শ্রীহট্ট)

ফোন ২৭৭৪

অয়েল
তেল ব্যবহারে

হয় না

মিল-২৪৩, তাপার সারকুলার রোড -

বহুশ্রম শরৎচন্দ্রের লেখায় বাস্তব ও কল্পনার স্থান

শ্রীশ্রবৎস নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সেবার পূজোর সময় তাঁর সাম্ভার বাড়ীতে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন একলা কাটাবার অবসর ঘটেছিল। বিপুল বর্ষা নেবেছে : রূপনারায়ণ ফুলে কেঁপে টল্ টল্ ক'রছে। দিনগুলোর ঝাপসা আলোতে আলস্ত করার সত্যিই সুবর্ণ সুযোগ।

বর্ষার মজা এই যে, বন্ধু-বান্ধবরা ভিড় করে না। শরতের পক্ষে সেটাই ছিল। যেন একটা বড় স্বস্তি। আমারও সময় ছিল না,—তাঁর লাইব্রেরীতে কত বিচিত্র বই—একটার পর একটা শেষ ক'রছি। সমস্ত দিনে কেউ কাঁকর সঙ্গে প্রায় কথা কইবার ফুরসৎ পাইনে।

সন্ধ্যা বেলায় সেদিন, আমরা তাঁর দোতালার বিস্তৃত বারান্দায় ব'সে দিনে কি সব করা গেল তারই একটা মোটামুটি হিসেব করছি।

নীচে শব্দ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে গোপাল এসে খবর দিলে : একজন বাবু, দেখা ক'রতে চান.....

কে বাবু রে গোপাল ?

চিনি নে।

ডেকে নিয়ে আয়.....

বাবুটি এলেন বলেন, কি হচ্ছে ব'সে ব'সে ?

শরৎ কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। তার মানে, মনে-মনে মোটেই গুশী হ'তে পারেন নি। কিন্তু লোকটি অত সহজে দমার পাত্র নন,—বলেন : ভুল্যাম এসেছেন, অনেকদিন দেখা হয়নি... কেমন আছেন ?

ভালো নেই, দেহ মন ক্রমেই অচল হ'য়ে আসছে ; এসব বান্ধাকোর পূর্ণ লক্ষণ, আর কি !

লোকটি একচোট হেসে নিয়ে বলেন একটা ভারি মজার প্লট পেয়েছি—আপনার কাজে লাগতে পারে মনে ক'রে এলুম... বলি ?

বল। ব'লে শরৎ নিশ্চেষ্টভাবে—তামাক টানতে লাগলেন।

লোকটি অনর্গল প্লট ব'লে গেলেন। শেষ হ'লে বলেন : এর সবটাই সত্যি,—একটুও বানান নয়। কেমন লাগল ?

বেশ।

কাজে লাগবে ?

দেখি, আজকাল লিখতে মন যায় না।

কথা যখন আর কিছুতেই জমেনা তখন তিনি উঠলেন—ক'দিন আছেন ? স্কিজেন্স ক'রলেন।

কালই বোধ হয় চ'লে যাব।

লোকটি বলেন, কাল নারিট যাবো—তা' হ'লে এবার আর দেখা হবে না। ফের কবে আসছেন ?

তার ঠিক নেই।

অগত্যা বাবুটি চ'লে গেলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা বিরাজ করার পর, শরৎ বলেন, এই প্লট নিয়ে তুমি এক-খানা বই লিখে ফেল।

বলুম : আমি শুনিনি.....কি ওর মাথামুণ্ড প্লট.....

শরৎ বলেন : আমিও শুনিনি..... গল্পের প্লটের অভাবেই যেন লেখা হয় না।এরা যে কি মনে করে আমাকে !

.....আবার বলে সবটাই সত্যি, বানানো নয় একটুও।.....ওদের এখনও সাহিত্য যে কি বস্তু—তারই জ্ঞান হয়নি।

অত সোজা হ'লে আর ভাবনা ছিল না।

আবার খানিকটা নিস্তক্ষে কাটল।

শরৎ বলেন : কি জানি, প্লট নিয়ে, আর বাস্তব নিয়ে কিছু লেখা যে যায় তা' আমি মনেই ক'রতে পারিনে। আর যায়াই এই নিয়ে লেখে তাদের লেখা ব্যর্থ হয়ই হয়।

বলুম, প্লটের কথা ছেড়েদি, 'কিন্তু তোমার ঐ কথা : সাহিত্য যে বাস্তব নয়, এটা বোঝা খুব শক্ত, মনে হয় তোমার কোথায় যেন ফালাসি আছে।

শরৎ সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বলেন, কোথাও ফালাসি নেই, তোমাকে নিশ্চয় ক'রে ব'লছি।.....দেখ, বাস্তব জিনিষের বিশেষ কোন আপীল নেই মনের উপর, যদিইবা থাকে সেটা সাময়িক, ক্ষণিক। লোকে ওটাকে তেমন মন দিয়ে নেয় না পর্যাস্ত, কত আসুচে যাচ্ছে, কটা কথা মনে থাকে ? আর মানুষে গ্রাহ্যই কি করে ? মানুষ, আসল হচ্ছে মানুষ—যে নিত্য দিন, এই পৃথিবীতে ঘটনা গ'ড়ে তোলার মালিক। ধর ইতিহাসের কথাই। আকবর একজন মানুষের মত মানুষ—বিরাত বৈচিত্র্য তাঁর চরিত্রে। তাঁর চরিত্র যদি খুব ভাল ক'রে ঠাঁড়ি করা যায় তো দেখতে পাওয়া যাবে যে, ওঁর রাজত্বের ঘটনাগুলো যেন ঐ চরিত্রের নেসেসারি কন্সক্লুশন। ও ছাড়া, আর কিছুই ঘটতে পারে না। চরিত্রই বাস্তব;

—ওটিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে ঘটনার সমাবেশ এমন ক'রে করতে হবে যে, ঐটেই সত্যি হ'য়ে ফোটে। দেখ, মিলিয়ে ছুজনকে, ধর ওরওজেব—ওর চরিত্রের বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে—সমস্ত ইতিহাসের ঘটনাই গেল ব'দলে। শিবাজীর সঙ্গে—আকবর হ'লে এমন ব্যবহার করতেন নিশ্চয়ই, যাতে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যের আয়ু হয়ত বেশ বেড়েই যেত।

বহু, আরো পরিষ্কার ক'রে বল, আমাদের জানা লোক নিয়ে—ও ছুজনই ত, ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

বেশ, ধর আমরা আমাদের ললিতকে নিয়ে একটা বই লিখচি। ললিতকে কেন আমাদের ভালো লাগে,—কি কি তার

গুণ; কোথায় তার দোষ; কিসের জন্তে তার চরিত্র বাস্তব থেকে সাহিত্যে আসতে পারে না, সেইটে আমাদের ষ্টাডি ক'রতে হবে: তারপর, তার যে সব গুণগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে হবে সেগুলো এমন পরিস্থিতির মধ্যে আনতে হবে যে, সে-গুলো উজ্জ্বল আর মধুর হ'য়ে উঠে। ধর, ললিতের একটা গুণ, সে বড় পরোপকারী। এখন, সেইটেকে দু'তিন দিক দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তার বন্ধু মহেন্দ্র এক সময় তার খুব ক্ষতি ক'রেছে; কিন্তু আজ মহেন্দ্র ভারি বিপন্ন—মহেন্দ্র এসে ললিতকে ধ'রেছে—বাস্তব—ললিত হয়ত' মহেন্দ্রকে তাড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ললিত তাকে

তাড়িয়ে না দিয়ে ক্ষমা ক'রে বুকে তুলে নেবে। এইখানে বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যের তফাৎ—এইখানে কল্পনার এলিমেন্ট এসে প'ড়ল। সাহিত্যকে আমি এমন ক'রে বুঝি—সাহিত্য বাস্তব আর আদর্শের মাঝামাঝি পথ দিয়ে যায়। একদিন আমাদের সাহিত্যে আদর্শ মানুষের চিত্র অনেক আঁকা হ'য়েছিল কিন্তু সে সব নিচক কল্পনার জিনিষ ব'লে লোকে নেয় নি। আবার অবাস্তব থেকে কল্পনা দিয়ে বাস্তব আঁকতে গেলেও ঠিক হবে না। আর তা' মানুষ কিছুতেই পছন্দ করে না। বহু লেখা আজও তা' ছাড়া অল্প কিছু হচ্ছেনা। তাই সে ফটোর মত বাস্তবের নিখুঁত ছবি তা' মনকে তেমন ক'রে টানেনা আর হ'লেও আর চাহিদাও নেই।



খেয়ালী
শারদীয়া
সংখ্যা
*



নিউ থিয়েটার্সের আগামী সামাজিক চিত্র
“অধিকারে” মেনকা ও পাছাড়ী সাগর।
ছবিগানি পরিচালনা করেছেন প্রমথেন বড়ুয়া।

*

.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....

*



আপনার ছেনেনেনেনেনের জন্যে

৩পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার

শ্রীস্বনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আ র তি

গুণে অতুলনীয় অথচ দামে আশাতীত মূল্য। ৫০০ পাতার
বিরিট বই—মাত্র এক টাকা চার আনা।

আ র তি

চমৎকার ছাপা! সুন্দর বাঁধাই!
পাতার পাতার মন ভুলান ছবির ছড়াছড়ি!

শিশু-সাহিত্যের যাদুকর খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের
রচনা সম্ভারে সুসমৃদ্ধ

—ঃ এতে লিখেছেন ঃ—

নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

হেমেন্দ্র কুমার রায়

স্বনির্ম্মল বসু

বুদ্ধদেব বসু

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শিবরাম চক্রবর্তী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালিদাস রায়

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুধীর সরকার

প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতী

ধীরেন্দ্র লাল ধর

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

সঞ্জয় দাস

সুবিনয় রায়চৌধুরী

ধর্মেণ্ড মিত্র

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভট্ট

৩গল্প দাদা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য

যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

দেবালীষ সেনগুপ্ত

গজেন্দ্র মিত্র

গোষ্ঠ বিহারী দে

বিকাশ দত্ত

বিমল দত্ত

পদ্মা বসু

যতীন্দ্র সাহা

ও বাংলার অগ্রগত কৃতী শিশু-সাহিত্যিক।

ইষ্টার্ণ ল হাউস

১৫, কলেনজ স্কোয়ার, কলিকাতা

একটা যেন নদী, আর একটা ক্যানেল—তাদের পার্থক্য, প্রভেদ থাকবেই। একটা কাগজের ফুল আর সত্যিকার ফুলের তফাৎ আছেই আছে। বাস্তব নৈর্লে সাহিত্য হ'তে পারে না; কিন্তু সে বাস্তবকে দেখার চোখ থাকা চাই, মন থাকা চাই,—সেই চরিত্রকে কঠিন সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলে না—তাতে তোমার মনের রস দিতে হবে, অনুভূতি দিতে হবে—আজকাল দরদ কণাটা বেশ চলচে এই সম্পর্কে। .. কি চূপ ক'রে রইলে যে?

বলুম, হজম করছি, কথাগুলো। বৃক্ষিত সব কিন্তু লেখার সময় সরস্বতীর ক্লপা না হ'য়ে, হয় গণেশের।

তার মানে ধৈর্যের অভাব; কিন্তু আর একটি বিবেচনার অভাব হয় অনেকের। আর সেটি খুব বড় কথা, জন প্রিয়তার দিক দিয়ে।

কি সেটি? জিজ্ঞেস করলুম।

শরৎ বল্লেন: অধিকারী বিচার। এটি বন্ধিম বাবুর ছিল চংমকার, আমি গুর কাছ থেকে ওটি শিখেছি। গুর গোটা কয় চরিত্র নিয়ে অনেকে অনেক কঠিন আর বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রেছে; কিন্তু আমি জানি যে, বন্ধিম বাবু ওটি ভুল ক'রে করেন নি, একেবারে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ওটি ক'রে গেছেন, এই উদ্দেশ্যে।

কি রকম?

কার জন্তে লিখছি বই? সেটাও খেয়াল রাখতে হয় হুমিয়ার লেখকের। রাজার কাজ যেমন প্রজা-রঞ্জন তেমনি লেখকের কর্তব্য হচ্ছে পাঠকের মন রসে ভিজিয়ে তোলা।

পাঠকে আরম্ভে কেপিয়ে দিলে তোমার সত্য ভাষণটা হয়ত নিখুঁত হ'তে পারে কিন্তু সেই ভাষণের উদ্দেশ্যটা সম্পূর্ণ

ব্যর্থ হ'য়ে যায়। পাঠকের রুচি, সংস্কার, তার জ্ঞান এবং বোধকে অতিক্রম ক'রে গেলে কিছুতেই চলবে না, এ তোমায় বরাবর বলে আস্টি। এর একস্পেরিমেন্ট আমি দু-একখানা বইয়ে ক'রে দেখেছি। তার ফলে দেখেছি সেগুলো লেখার দিক দিয়ে ব্যর্থ হ'য়েছে। পাঠকের মনকে আঘাত ক'রে, কেপিয়ে দিয়ে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আমার যদি নিছক সত্যের প্রচার করা কাজ হয়ত—কোন সমাজের কি ধর্মের প্রচারক হিসেবে তা আমি ক'রে বেড়াতে পারি; কিন্তু রস-সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ক'রতে গেলে রস মেতে যায়, গেঁজে উঠে!.....

শরৎ একটুখানি চূপ ক'রে বল্লেন: ভূমি ভেবে দেখ শেষ-প্রশ্নের যা শেষ হয়েছে—তাই নিয়ে কি রকম হৈ চৈ! কিন্তু আমি ওর কোন শেষ করিনি। কোন বিলিতি ব'য়ে ওর যা' শেষ হওয়া উচিত—তা ক'রে দিলে ও-দেশের লোক হয়ত খুশী হ'ত; কিন্তু এদেশের সে অবস্থার দেরি আছে!.....

ঠিক এ' কথাই খাটে কিরণময়ী সম্পর্কে—কিরণময়ীকে আমি কোথাও ছোট কি দুর্বল করিনি; কিন্তু ঐ রকম ক'রে শেষ না করলে, চরিত্রহীন নিজের প্রতিষ্ঠায় আজ দাঁড়াতে পারত না। চিন্তায় আচারে, ব্যবহারে পরিবর্তন আসবে; কিন্তু ততটুকুই আসবে যা দেশের লোকে—অর্থাৎ পাঠকেরা আনন্দের সঙ্গেই নিতে পারবে।

বলুম: তাহ'লে কল্পনার কোন স্থান থাকবে না; কথা সাহিত্যের রস-রচনা?

চিরকালই আছে. আর থাকবেও,—আদর্শ ত চিরদিনই কল্পনার বস্তু, নয় কি? বলেছি ত' সাহিত্যের পথ—আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে দিয়ে রস-সজ্জিত সৃষ্টি ক'রে চলবে। কিন্তু বাস্তব যদি সাহিত্য হ'ত


ত কল্পনার স্থান থাকত না তাতে। বাস্তব কিছুতেই সাহিত্য হ'তে পারে না এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শরৎচন্দ্র বাস্তবকে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে কি রকমে ব্যবহার করতেন। সেখানে বাস্তবের প্রাধান্য নেই। তাকে ভেঙ্গে চুরে তিনি নিজের গঠনের কাজের উপযোগী ক'রে নিতেন। তাতে সুসজ্জিত কল্পনার রস দিয়ে এমন কিছু দাঁড় করিয়া দিতেন—যাতে বাস্তবের স্থূলত্বের রূঢ় কর্কশতা চ'লে গিয়ে কল্পনার রসমাধুর্য্যে সত্য সুন্দর এং কল্যাণের সমাবেশ হ'য়ে সাহিত্যের চিরন্তন-তার বদলে পাঠকের মনে নিবিড় আনন্দে পুরিপ্ত হ'য়ে উঠত।

কল্পনার রসান এমন অপূর্ণ কৌশলের সঙ্গে তিনি ব্যবহার ক'রতেন যে, সেই সৃষ্টির মধ্যে কৃত্রিমতার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

পাঠকের মনোরঞ্জন প্রয়াস সম্বন্ধে একটা তর্ক উঠতে পারে যে, তিনি হয়ত আর্টের উচ্চ আদর্শকে ক্ষুদ্রই ক'রেছেন। সে কথা স্পষ্ট কঠে স্বীকার, একের বেশীবার করার তাঁর সাহস ছিল। তিনি আর্ট ফর আর্টস্ সেক—একেবারেই মানুতেন না তিনি বিশ্বাস ক'রতেন যে, রস-সৃষ্টির ভিতর সমাজ, জ্ঞান, নীতি এবং ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠে!

খত বঙ্গ ৪৫ মাস বে কাগজেই
হটক ভৈরবী বনৌষধিতে
অব্যর্থ কল—গর্ভাবস্থায় ব্যবহার
নিষিদ্ধ ১৫-দশ ও বর্ণ শাঙি একবার
এয়োগেই উপশম, ১০ মা: ১০ আনা



সবর ৮টা হইতে ১২টা।
মিসেস দাস বনজ বিশারদ
১৮২ নং বহুগঞ্জার স্ট্রীট, (K) কলিকাতা।

ওয়াইল্ড ক্লাব

শ্রীমন্তথ রায়

রাত্রি ১০টা বাজল।

মিসেস মাধুরী বানার্জি ডিনার খেয়ে ভুইং কমে এসে দাঁড়ালেন—তার চোখে মুখে একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। পেছনে পেছনে এল ‘বয়’, তার ট্রেতে গরম জল, তুলো, আয়োডিন প্রভৃতি প্রাথমিক সাহায্যের সরঞ্জাম।

মিসেস বানার্জি ॥ উঃ গেলাম! গলায় আমার কি হল! (‘বয়’ তার ‘ট্রে’ নিয়ে এগিয়ে এল) কি এনেছিস? আয়োডিন? ইডিয়ট? কি হ’ল, আমি বুঝলাম না আর তুই নিয়ে এলি আয়োডিন! সব কাজেই তোমার এমনি বাড়াবাড়ি! নিশ্চয়ই গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছে। এ বাবুর্জি দিয়ে আমার চলবে না—মাছে নিশ্চয়ই কাঁটা ছিল... দেখে দেয়নি। ফাইন—আমি তাকে এক টাকা ফাইন করলাম। উঃ.....গলাটা আমার গেল! গরমজল...দাও দেখি একটু গরম জল—(বয়ের ট্রে থেকে গরমজল নিয়ে মুখে দিয়েই ফেলে দিলেন) পুড়িয়ে দিয়েছে—গলাটা আমার পুড়িয়ে দিয়েছে—এত গরম জল কখনো খেতে দেয়! ফাইন! তোমাকে আমি দুটাকা ফাইন করলাম!

বয় ॥ বারো টাকা মাইনে, এ দুটাকা নিয়ে পনের টাকা ফাইন দাঁড়াল এ মাসে! তিন টাকা কি ফিরিয়ে দিতে হবে হজুর?

মিসেস বানার্জি ॥ কি সাহস! কি দুর্জয় সাহস তোমার! আমার মুখের ওপর কথা! ঐ গরম জল তোমাকে খেতে হবে—এখনি খেতে হবে—খাও—খাও নইলে আসছে মাসের মাইনে থেকে ঐ

তিন টাকা কাটা যাবে—(বয় অবলীলাক্রমে সমস্ত গরম জলটাই খেয়ে ফেলল। তা দেখে, সবিস্ময়ে)—খেয়ে ফেললে! সবটা খেয়ে ফেললে! এটা শুধু আমাকে জ্ঞান করতে! আমি যে গরম জল মুখে দিতে পারলাম না—তুমি আমার ‘বয়’ হয়ে...সেই গরমজল—

বয় ॥ আপনি হুকুম করলেন—তাইতো আমি—

মিসেস বানার্জি ॥...তোমার জিত পুড়ে যাওয়া উচিত ছিল। দেখলে না আমি মুখে দিয়েই ফেলে দিলাম? একটা এটকেট নেই! আমি যা পারলাম না—তুমি তা—

বয় ॥ আমার জিত পুড়ে গেছে!

মিসেস বানার্জি ॥ There you are! পুড়ে গেছে?

বয় ॥ হাঁ হজুর।

মিসেস বানার্জি ॥ খুব পুড়ে গেছে?

বয় ॥ হাঁ হজুর।

মিসেস বানার্জি ॥ যন্ত্রণার কোন লক্ষণ দেখছি না তো?

বয় ॥ চেপে আছি—ভয়ে চেপে আছি।

মিসেস বানার্জি ॥ That’s good. যাও, গিয়ে আয়োডিন দাও—এখনি সেরে যাবে।

বয় ॥ তা যাবে। আয়োডিন আনতেই হজুরের গলার ব্যথা সেরে গেছে।

মিসেস বানার্জি ॥ সেরে গেছে! রাসকেল! ভাগো—ভাগো হিয়াসে!

(বয়ের পলায়ন) উঃ গেলাম! গলায় কি কাঁটাই ফুটল, না আর কিছু! মনে হচ্ছে গলাটা চিরে গেছে! উঃ

(ফোন করলেন)। হ্যালো, পি-কে ওয়ান টু থ্রি!.....ওঃ গেলাম!

প্রাণ গেল! ইজ ক্লাব? Wild club? ওখানে মিষ্টার বানার্জি আছেন?

ছিলেন! কারসঙ্গে ছিলেন বলুন দেখি! মিসেস বানার্জি! আপনার মাথা

খারাপ হয়েছে। মিসেস বানার্জি তো আমি! গলার ব্যথায় মারা যাচ্ছি! তবু

বাংলার প্রাচীনতম বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দু মিউচুয়াল

লাইফ এসিউরেন্স লিঃ

স্থাপিত—১৮৯২

এজেন্সীর জন্য আজই আবেদন করুন

হিন্দু মিউচুয়াল হাউস

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

পি, সি, রায় এম-এ বি-এল সেক্রেটারী

বলছেন মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে ছিলেন? কি? মিসেস সুধা ব্যানার্জি! মাই গড! আপনাদের ক্লাবটি কি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলুন তো Wild club! যা খুশী তাই হচ্ছে, না! মিসেস সুধা ব্যানার্জির স্বামীও তো ওখানে ছিলেন? কি? ছিলেন না? দেখুন—শুনছেন? আপনাদের এই ক্লাবটি তেজে দিতে হবে। তুলে দিতে হবে। দেবেন না? দেন কি না আমি দেখছি। সুধা ব্যানার্জির স্বামী তো একটি আছেন। তাকে আমি সঙ্গে পাব। এমনি অনেক স্বামী—অনেক স্ত্রী আমি পাব। দল-বল নিয়ে আমি যাচ্ছি একদিন আপনাদের ওখানে—দেখে নেব সুধা ব্যানাজিকে—দেখে নেব আপনাকে—হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—রাস্কেল! ছেড়ে দিয়েছে!

[মিষ্টার বানার্জির প্রবেশ।]

মিঃ বানার্জি ॥ হ্যালো মাধুরী! হাউ-ডু ইউ-ডু?

মিসেস্ বানার্জি ॥ [গর্জে উঠলেন] গলার ব্যথায় আমি মারা যাচ্ছি—আর তুমি কিনা সুধা ব্যানার্জির সঙ্গে—

মিঃ বানার্জি ॥ গলার ব্যথা! ও! তাই গলাটা তোমার শাঁখের মতো বাজছে!

মিসেস্ বানার্জি ॥ সাট আপ্। উঃ, আঃ গলায় আমার কাঁটা ফুটেচে...আর আর তুমি কি না—

মিঃ বানার্জি ॥ কাঁটা ফুটেচে—

মিসেস্ বানার্জি ॥ আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। গলার ব্যথায় আমি মারা যাচ্ছি—আর তুমি কিনা Wild clubএ—সুধা ব্যানার্জির সঙ্গে—

মিঃ বানার্জি ॥ সুধা ব্যানার্জি নয়—

মিসেস্ বানার্জি ॥ লায়ার! মিথ্যা কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? ভাবছো আমি কিছু জানি না?

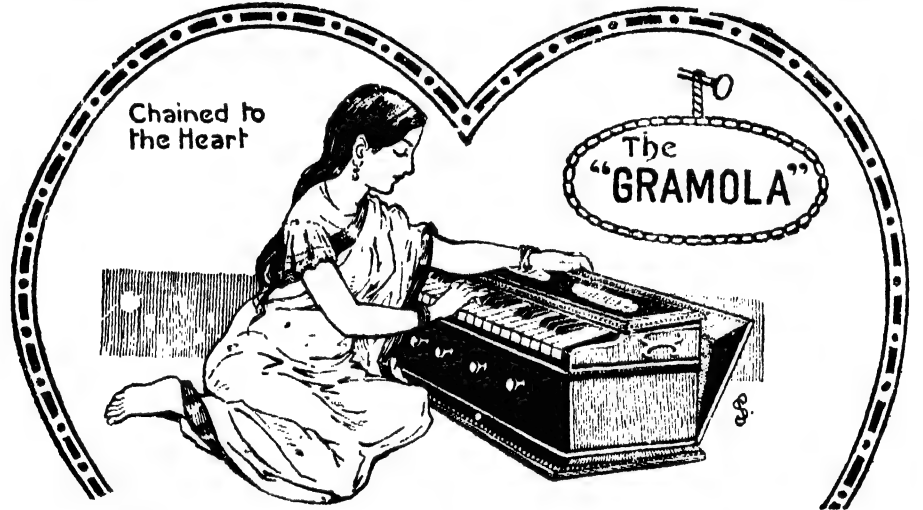
মিঃ বানার্জি ॥ শোনো মাধু—

মিসেস্ বানার্জি ॥ [গর্জে উঠে] যা শোনবার তা আমি শুনছি। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, শুনব না। এই গলার ব্যপাতেই আমি মরব। গলায় যে কি হল বুঝতে পাচ্ছি না। [কাসুতে লাগলেন—] ওঃ আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! ডাক্তার বোস্ এর কি আকল—আধঘণ্টা হয়ে গেল কল্ দিয়েছি—এখনো এলেন না! আজকাল সব হয়েছে সমান! যেমন হয়েছে বাবুর্চি তেমনি হয়েছে আয়া—তেমনি হয়েছে ‘বয়’ তেমনি হয়েছে হাজব্যাও তেমনি হয়েছে ডাক্তার!

[ডাঃ বোসের প্রবেশ]

ডাঃ বোস ॥ গুড-ইভিনিং মিসেস্ বানার্জি! গুড-ইভিনিং মিষ্টার বানার্জি! আমি প্রায় দশমিনিট হল আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আছি—পেসেন্টকে অবজার্ড করছিলাম। আমি দেখছি পেসেন্টকে না জানতে দিয়ে যা জানা যায়—যা দেখা যায়, রোগনির্ণয়ের পক্ষে সেটা অধিকতর মূল্যবান। আপনার গলাটা বোধ হয় চিরে গেছে।……… [ক’ছে গিয়ে—] হাঁ করুন দেখি—

সঙ্গীত দ্বারা পূজার আনন্দ বৃদ্ধি করুন



অষ্টাশ্র বারের মত এবারও আমরা ক্রেতাবর্গের সুবিধার্থে পূজোপলক্ষে ২৫শে আগষ্ট হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর অবধি হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, সেতার, এসরাজ, বেহালা, বাঁশী প্রভৃতির উপর

শতকরা ১০ কমিশন দিব

এ সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। বৎসরের অন্য কোন সময় আমাদের ক্যাটালগের দাম হইতে কোনরূপ কমিশন দেওয়া হয় না।

ডোম্বার্কিন এণ্ড সন

ভারতের বৃহত্তম বাতাসশ্রাৱ

১১, এসপ্লেনেড, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—মেন রোড, রাঁচি।

মিসেস বানার্জি ॥ [হা না করে, আতঙ্কে] চিরে গেছে! গলা চিরে গেছে!

মিঃ বানার্জি ॥ খাবে না! রাতদিন যা চোঁচাও!

মিসেস বানার্জি ॥ [মিঃ বানার্জিকে] ভূমি থামো। আমার সম্বন্ধে ভূমি কোন কথা কইবে না। [ডাক্তারকে] গলা আমার চিরে গেছে?

ডাঃ বোস ॥ [খুব গভীর হয়ে] যদি গিয়ে থাকে তাহলে মৃদুপদে পড়তে হবে। আমুন। ইঁ করুন [ডাক্তার পকেট থেকে যন্ত্রপাতি বের করে দেখলেন। খুব সিরিয়াস-লি] সিরিয়াস!

মিসেস বানার্জি ॥ [আতঙ্কে চোক গিললেন।]

মিঃ বানার্জি ॥ সিরিয়াস!

মিসেস বানার্জি ॥ [মিঃ বানার্জিকে] ভূমি থামো। ভূমি কোন কথা কইবে না।.....[ডাক্তারকে] কি হবে ডাঃ বোস?

ডাঃ বোস ॥ শৈশী কথা বলে বণে এই দাঁড়িয়েছে। আঃ বোধ হয় খুব চোঁচিয়েছেন?

মিঃ বানার্জি ॥ শুধু আজ কেন—

মিসেস বানার্জি ॥ [মিষ্টার বানার্জিকে] ভূমি কোন কথা কইবে না! ওয়াইন্ড! ভ্যাগাবও!

ডাঃ বোস ॥ [মিসেস বানার্জিকে] কিন্তু আপনিও আর কথা কইবেন না। না—একটি কথাও আর নয়। গলা চিরে গেছে—রক্ত বেরুচ্ছে মনে হচ্ছে।

মিসেস বানার্জি ॥ রক্ত বেরুচ্ছে! বলেন কি!

মিষ্টার বানার্জি ॥ গলার ঝাজটাও তাই একটু কমেছে!

মিসেস বানার্জি ॥ সাট আপ! কথা বলেছি কি আজ রসাতল করব!

মিঃ বানার্জি ॥ না—না, কমেনি।

ডাঃ বোস ॥ শুধুন মিসেস বানার্জি। গলাকে আজ আপনার absolute rest দিতে হবে। কথা কয়েছেন কি গলা দিয়ে রক্ত ছুটবে। গলার ভেতরকার কোমল

চাবনপ্রাশ
৩.সের

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

মকরধ্বজ
৪.তোলা

শক্তি ঔষধালয়-ঢাকা

১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্বেদজগতে যুগান্তর আনিয়াছে।

আয়ুর্বেদের অমৃতম লুপ্তরস, নানাবিধ অসাধ্য ব্যাধির অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ
“মৃতসঞ্জীবনী সুরা” অমল, বাতাকীর্ণ (Dyspepsia), গ্রহণী, হ্রাসবিক দৌর্বল্য, বক্তৃতির সকল প্রকার দোষ, এসবান্তে দুর্বলতা ও
স্থিতিকারোগ, কলেরা ও টাইফয়েড-এর পরে দুর্বলতা প্রভৃতির অমোঘ মহৌষধ।



মারকুইস অব

জেটল্যান্ড

পাইট বোতল—২৫০ টাকা। কোয়ার্ট বোতল—৪৫০ টাকা।
Marquiss of Zetland Secretary of State for India,
graciously remarked while Governor Bengal :—

"I was astonished to find a Factory at which the production of medicines was carried out on so great a scale. Large number of Kavirajes were employed &c. &c.

Mathur Babu seems to have brought the production of medicine in accordance with the prescriptions of the ancient Shustras to a high pitch of efficiency."

দেশবন্ধু সি, আর, দাস—‘শক্তি ঔষধালয়ের কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না। ইত্যাদি—ইত্যাদি—’

ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার—শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্তী, বি.এ.
হিন্দু কেমিস্ট ও ফিজিসিয়ান।

প্রোপ্রাইটারগণ—শ্রীমথুরামোহন, লালমোহন ও বর্ণীমোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্তী



অধ্যক্ষ মথুর বাবু

সকলদাই অধ্যক্ষ মথুর বাবুর নাম ও ছবি দেখিয়া ঔষধ ক্রয় করিবেন।

চিকিৎসকগণের অগ্র উচ্চহারে কামিশনের ব্যবস্থা আছে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী সম্বলিত ক্যাটালগ চাহিলেই পাইবেন।

চৌরঙ্গী ব্রাঞ্চ—১২নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা। কলিকাতা হেড অফিস—৫২১, লিডন স্ট্রিট, কটক ব্রাঞ্চ। ফ্যাক্টরী—স্বামীবাগ রোড, ঢাকা।

পদ্মটি একেবারে ছিড়ে গেছে! কথা কইলেই ওখানে ঘা হবে, পূজ হবে, শেষটায় পোকা পড়বে!

মিসেস বানার্জি ॥ [অকাতরে] ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস ॥ না, আর ডাক্তার বোসও নয়। গলাকে স—ম্পূ—র্ণ বি—শ্রা—ম দিতে হবে।

মিসেস বানার্জি ॥ কতক্ষণ?

ডাঃ বোস ॥ না—না—আর কোন কথা নয়। যা জিজ্ঞেস করবেন—লিখে দিন।

মিসেস বানার্জি ॥ মাই গড!

ডাঃ বোস ॥ না না—মাই গডও নয়। মুখে আর একটি কথাও নয়, সব লিখে—

মিঃ বানার্জি ॥ [ছুটে গিয়ে মিসেস বানার্জির সামনে রাইটিং প্যাড এবং পেন রাখলেন।]

ডাঃ বোস ॥ [বুঝলেন মিসেস বানার্জি এতে চটে গিয়ে এখনি মিষ্টার বানার্জিকে বকতে যাবেন তাই আগে থেকেই—] না-না, কোন কথা নয় মিসেস বানার্জি। কথা কয়েছেন কি গলা দিয়ে রক্ত ছুটবে। আপনার গলার ভেতরকার কোমল পদ্মটি কথা কইলেই কুটো হয়ে যাবে—তখন রক্ত ছুটবে—ঘা হবে—পূজ হবে—পূজ হলেই পোকা—কিন্তু তার চেয়েও ভীষণ আপনার বাকশক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে! Complete loss of

speech! আমি গিয়ে অবুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। রেষ্ঠ—এবসোলিউট রেষ্ঠ! মিষ্টার বানার্জি! আপনি পাশেই থাকবেন—খুব লক্ষ্য রাখবেন একটি কথাও যেন উনি না বলেন এমনকি উঃ আঃ এসবও না!

মিষ্টার বানার্জি ॥ আপনি চলে গেলেই উনি—

মিসেস বানার্জি ॥ [মিঃ বানার্জির প্রতি সর্বোচ্চ দৃষ্টিপাত—কিন্তু এবার আর কোন কথা নয়।]

ডাঃ বোস ॥ মুখ বেঁধে দেবেন। যদি কথা বলেন মুখ বেঁধে দেবেন। রোগীকে বাঁচাতে হবে তো!



কল্পতরু আয়ুর্বেদ ওষধ
কল্পতরু প্রসাদ: ২৩ চিত্ররঞ্জন এভিনিউ
কালকাতা

কল্পতরু
আয়ুর্বেদ
জ্বরযন্ত্র

ব্রাহ্ম
কালীঘাট, ঈশ্বরীলা
বড়সাজার

MEGAPHONE RECORDS

পূজা উপলক্ষ্যে নূতন রেকর্ড

(সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)

নবতম গীতিনাট্য
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
বিরচিত



পরিচালক :—শৈলেন চৌধুরী
সঙ্গীত :— তুলসী লাহিড়ী

ভূমিকায় :—

রাণীবালী, কমলা (ঝরিয়ী)
সুহাসিনী, নীরদা, ভবানীদাস
প্রভৃতি

৬খানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ

প্রোঃ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী

JNG. { যোগেশ্বর হর ভোলা মহেশ্বর শ্রীরাগ
5291 { দীনতারিণী দুখহারিণী মা ধাড়া

শ্রীযুত ভবানীচরণ দাস

JNG. { ভয়ঙ্করী তোরে কালী কে বলে গ্রাম্য-সঙ্গীত
5292 { আমার নাই আঁধারের ভয় ঐ

মুর উদ্দীন আমেদ

JNG. { কোথা হ'তে আইলারে বান্দা ইসলামী
5293 { যেথায় নাজেল হইল আমার ঐ

মিস কমলা (ঝরিয়ী)

JNG. { বাঁশী ডাকে বাঁশী ডাকে গায়েলী
5294 { বল গো তায় ফিরে যেতে বল ঐ

শ্রীমতী ঝীণাপানি দেবী (মধুপুর)

JNG. { কানন পথের ধারে
5295 { শ্রীযুত সতীশ সন্ন্যাস
দখিণা সন্ন্যাস ডাকে

শ্রীমতী ললিতা দেবী

JNG. { গত নিশি বৃষ্টি হইয়া গ্রাম্য সঙ্গীত
5296 { বন্ধু বুঝি মথুরাতে নাই ঐ

প্রোঃ অনুকূলচন্দ্র দাস

JNG. { পিয়ানো—“যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী” সুর
5297 { পিয়ানো— দুর্গা সুর

মেগাফোন



কলিকাতা

মিঃ বানার্জি ॥ [কলিংবেল টিপিলেন ।]

[পুরোক্ত বয়ের প্রবেশ]

মিঃ বানার্জি ॥ তোরা আজ সবাই আমার পাশে পাশে থাকবি। আজ রাত্রে কেউ তোরা ঘুমবি নে। বুঝলি ?

বয় ॥ [পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা কইল না।]

মিঃ বানার্জি ॥ কথা কইছিস না যে ?

বয় ॥ [মিসেস বানার্জির দিকে এক-বার তাকিয়ে—] জিত পুড়ে গেছে !

মিঃ বানার্জি ॥ কি খেয়েছিলি ?

বয় ॥ গরম জল।

মিঃ বানার্জি ॥ কেন ?

বয় ॥ [মিসেস বানার্জিকে দেখিয়ে] হজুর জোর করে খাইয়ে দিয়েছেন।

মিসেস বানার্জি ॥ [চটে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—]

মিঃ বানার্জি ॥ [তা বুঝতে পেরে]—না—না, কোন কথা নয়। [বয়কে] যা ডাক্তারের সঙ্গে চলে যা—অযুধ নিয়ে আয়—

ডাঃ বোস ॥ তাহলে চললাম। মিসেস বানার্জি ! আপনি ভাববেন না। আমার কথামত চললে হয়ত ভালো হবেন—অপারেশন বোধ হয় দরকার নাও হতে পারে !

মিসেস বানার্জি ॥ [হতাশায় দৃষ্টিপাত। ডাঃ বোসের প্রস্থান।] প্রস্থান কালে ডাঃ বোসের এবং ডাঃ বানার্জির ইঙ্গিতপূর্ণ সম্মিত দৃষ্টি বিনিময়।]

বয় ॥ তাহলে বাবুচি, খানসামা, আরদালি, ঝাছুদার, মেথর সবাইকে পাঠিয়ে দেব হজুর ?

মিঃ বানার্জি ॥ ইয়া—পাঠিয়ে দে... বারান্দায় বসে থাকবে।

[বয়ের প্রস্থান, প্রস্থানকালে তাহার চোখে-মুখে কৌতুক স্মৃতি উঠল।]

মিঃ বানার্জি ॥ এইবার মাধুরী, তোমায় বলছি—ওয়াইল্ড ক্লাবে আমার সঙ্গে কে ছিল।

মিসেস বানার্জি ॥ [সরোষে হাত তুলে কথা বলতে মানা করলেন।]

মিঃ বানার্জি ॥ না না তোমার স্তনতেই হবে। চিরটা-কাল তোমারই কথা কেবল শুনে এসেছি। আজ এই একটা রাত যখন কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি—

মিসেস বানার্জি ॥ সাট—[কিন্তু ‘আপ’ আর বলা হল না। নিজেই বুঝতে পারলেন কথা বলা উচিত হবে না...এবং বুঝেই তখন নিজে হাতে মুখ চেপে ধরে বসে পড়লেন।]

মিঃ বানার্জি ॥ আবার কথা বলতে যাচ্ছিলে! তাহলে দেখছি মুখ তোমার বেঁধেই দিতে হচ্ছে—বয়!.. আচ্ছা, এবার থাক। ইয়া, কি বলছিলাম! ইয়া মনে পড়েছে। তুমি বলছিলে সুধা বানার্জির সঙ্গে আমি ওয়াইল্ড ক্লাবে আজ ডিনার খেয়েছি। তা নয়। প্রথমতঃ সুধা বানার্জি নয়। প্রেমলতা বানার্জি। দ্বিতীয়তঃ প্রেমলতা বানার্জির সঙ্গে ডিনার খাই নি, আমরা নেচেছি এবং গেয়েছি—কি গান... স্তনতে ?

মিসেস বানার্জি ॥ [অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে রোষ প্রদর্শন করছিলেন।]

[দ্বারের বাইরে খানসামারা এসে দাঁড়াল।]

মিঃ বানার্জি ॥ এই যে তোমরা সবাই এসেছ! বারান্দায় বসে থাক। মেম সাহেবকে নাস করতে হবে। আমি ডাকলে আসবে।...ইয়া, মাধুরী, এইবার এইবার শোন—গানটি শোন—

“হেসে নাও হুদিন বৈতো নয়।” [গান শুরু করলেন। শেষে নৃত্য। মিসেস বানার্জি নিরুপায় হয়ে দুকানে হাত দিয়ে অস্ত্র দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেন।]

[—যবনিকা—]

রূপের ধ্যানে তোমায় দেখি

শ্রীজিজ্ঞাক্ষনাথ ভাট্টা কবিরয়

রূপের ধ্যানে তোমায় দেখি

প্রাণ-জুড়ানো রূপময় !

তোমার ধ্যানে সুখে থাকি

সব-ভুলানো সুখময় !

ওই স্থামলে দেখি তোমায় !

ওই আকাশে তোমার শোভায় !

বাতাস বহে মুহু মুহু

হাত-ভুলানো স্তম্ভময় !

তোমার ধ্যানে সুখে থাকি

সব ভুলানো সুখময় !

পত্রে পুষ্পে তোমার হাসি !

পাখীর গানে সুধার রাশি !

কর্ণে জ্ঞানে সুরে তানে

প্রাণ-জুড়ানো সুখময় !

নাহি বিভেদ, নাহি ক খেদ

মান-গুড়ানো দুখ ভয় !

— :: —

অপূর্ব অতুলনীয় সর্বজনপ্রশংসিত

সচিত্র বৌদ্ধশিক্ষান

বা

কামসংহিতা

ডাঃ গিরীন্দ্র শেখর বসু, এম, বি, ডি, এস-সীর ভূমিকা সম্বলিত ! মূল্য ৪।০ মাত্র।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর, হুমায়ুন কবীর প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক, ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ এবং এডভোকেট, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, বুলবুল মোহাম্মদী, দেশ, প্রবাসী, বিচিত্রা ইত্যাদি পত্রিকা এই বিরাট গ্রন্থের উচ্চসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

গ্রন্থখান ৫৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং বহু চিত্র সম্বলিত। যুবক যুবতী এবং বিবাহিত নরনারী যাহা কিছু জানিতে চায় তাহার সমস্তই ইহাতে আছে। বহি বা বিবরণ পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত আজই আমাদের কাছে লেখুন।

দিষ্টাণ্ডার্ড লাইব্রেরী, ঢাকা।

অতীত বলেই যা'

পুরানোকে বর্জন করে না

বর্তমান বলেই যা'

নিষিদ্ধারে গ্রহণ করে না

স্বপ্না পিকচার্সের
নবতম নিবেদন

স্বপ্না

ভূমিকায়
কমলা, মমতা,
স্বপ্না, নটরাজ
ইন্দ্রনাথ ও ললিত

প্রযোজনা - গণেশ্বরজ্ঞান
পরিচালনা - কালীভূষণ
কথাওগান - সুশীল ঘোষ
সুর - গিরীন চক্রবর্তী

চাৰু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
"স্বপ্না পুলিনে ঠিখারিনী" অবলম্বনে

Bimal Ghosh

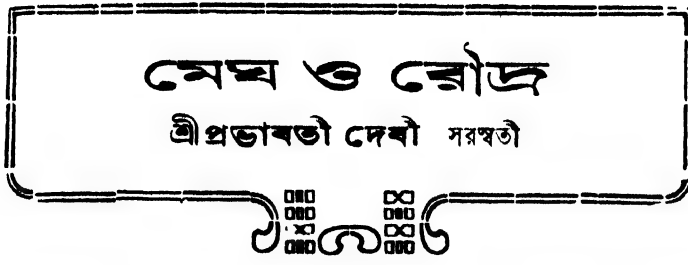
গান শুনিচ্ছেন :

গিরীন চক্রবর্তী

সুশীল ঘোষ

ভবানী দাস

—আরও অনেকে



সকালেও আকাশ ছিল বেশ পরিষ্কার ; সেই আকাশে যে হঠাৎ এমন গাঢ়ভাবে প্রকাণ্ড বড় মেঘখানা এসে দাঁড়াবে তা নারাণ আশাই করেনি।

রুষ্টি আসবে—

পাণীরা আকাশে উড়ছিল—মেঘের ভাব দেখে সবাই আশ্রয়ের আশায় নেমে এলো ধরণীর বুকে, আশ্রয়ও মিললো গাছের পাতায় মধ্যে।

খোড়া নারাণ বসেছিল পথের ধারে, লাঠি গাছটা যদিও তার পাশেই পড়েছিল, তবু তাকে সম্পূর্ণভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্ভরতা তাতে ছিল না। মুখ্যতঃ কোনও মানুষের দরকার, লাঠিটা গৌণ কারণ হতে পারে।

দেখতে দেখতে পথ হয়ে গেল জনশূন্য—হুই একখানা গাড়ি ছাড়া মানুষ বড় একটা দেখা যায় না।

নারাণ এদিক ওদিক চাইলে—তার চেনা মুখ দেখা যায় না কে তাকে কোন আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। একান্ত অসহায়ভাবে সামনের লাঠি গাছটা আঁকড়ে ধরে সে বসে রইলো।

সামনের বাড়ীটার ছাদে একটা মেয়েকে দেখা গেল ; কাপড় তুলতে এসেছে। ভোর বেলায় কখন স্নান করে কাপড়খানা শুকাতে দিয়ে গিয়েছিল, আসন্ন রুষ্টির সম্ভাবনায় সেখানা তুলতে এসেছে।

এই মেয়েটির মুখখানার 'পরে দৃষ্টি পড়তে খোড়া নারাণ চমকে উঠলো।

ঠিক সেই মুখ—

আশ্চর্যা, মানুষের মত মানুষ থাকে ? মন তার জিজ্ঞাসা করে—সেই নয় তো ? কিন্তু না, সে নয়—।

বায়স্কোপের ছবির মত রেখার কথা তার মনে হয়।

একদিন নারাণের পা খোঁড়া ছিল না,—তোমার আমার মতই সে সমান হুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতো—দৌড়াতো। সে ছিল সম্পূর্ণ একটা মানুষ, আধখানা পা কেটে তা বাদ দিতে হবে, তারপর রাস্তায় বসে লোকের করুণা উদ্ভেক করতে বিনিয়োগে বিনিয়োগে নিজের দুঃখ কাহিনী বলতে হবে, ভিক্ষা নিতে হবে, সেদিন সে তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

রেখা ছিল ধনী কন্যা, তাদেরই বাড়ীতে নারাণের মা কাজ করতো। রেখার মায়ের সহচরী অর্থাৎ দাসী—যতদূর সম্ভব খোসা মোদ করে দেশের মেয়ে নারাণের মা রেখার মার কাছে এইটুকু অমুগ্রহ লাভ করেছিল। বলা যেতে পারে কাজই বা তাকে এমন কি করতে হতো ? না করতে হতো বাসন মাজা, জল তোলা, না করতে হতো রান্নাবান্না—যা সাধারণ দাসী শ্রেণীর মেয়েরা করে থাকে। নারাণের মা তাদের চেয়ে উন্নততর কাজ করতো,—রেখার মার কাছে কাছে সর্বদা তাকে থাকতে হতো, তাঁর সব ফাই-ফরমাস তামিল করতে হতো।

রেখার মা মনে করতেন তাকে অনেক কিছু সুখ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, হয়তো হয়েছেও তাই, তবু নারাণের মন মনে

করতো সে দাসী ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা তারও অধম। দাসীর সে স্বাধীনতা আছে যাতে সে কাজ ছেড়ে অস্ত্রের বাড়ী কাজ করতে যেতে পারে, কিন্তু ভদ্রকন্যা রেখার মার সাহায্য তাকে সে স্বাধীনতা দেয়নি।

ঠিক এমনই ভাবে মানুষ নারাণ, দাসী-পুত্রের সম্মান ছিল না—মর্যাদা ছিল না, সকলের হুকুম মানতে সে ছিল বাধ্য। তবু এরই মধ্যে সে যে কেমন করে প্রভু

ডাঙরের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ওষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ওষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

কল্প রেখাকে ভালোবেসে ফেললে, তাই
বলাই মুস্তিল।

সে বুঝতে পারেনি এ তার অমার্জনীয়
অপরাধ, সে শুধু জানতো এ কথা প্রকাশ
হলে কেবল তারই নয়, তার মারও বিপদ
ঘটবে। তারা এখন হতে তাড়িত হলে
দুনিয়ায় কোথায়ও তাদের আশ্রয় জুটবে
না।

কিন্তু একটা কথা এই—ভালবাসা
গোপন করে রাখা চলে না, অন্ততঃ পক্ষে
তার মত লোক গোপন রাখতে পারে না।

নারায়ণ যে কোন ভালো জিনিস পেলে
আর কাউকে না দিয়ে সেটা রেখাকে
দিয়েই তৃপ্তি পায়, এটা কে জানে কেমন
করে সবারই চোখে পড়ে গেল। রেখা
পর্যন্ত তা বুঝতে পেরেছিল এবং ঘৃণায়
সজ্জিত হয়ে উঠেছিল।

সেই দিনই রাত্রে নারায়ণ যখন বাগান
হতে সন্ধ্যা কোটা রজনীগন্ধার তোড়া গাঁথে,
ভক্ত যেমন দেবীর মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে আসে,
তেমনি তাই ভাবে রেখার ঘরে টেবুলের উপর
সাজিয়ে রেখে বিছানায় যুগ্ম রেখার পানে
মুহূর্তের জন্ত চেয়ে বার হয়ে আসছিল সেই
সময় তার সামনে দাঁড়ালেন রেখার পিতা
তিনি একা নন, সঙ্গে তাঁর চাকর
হারোয়ান সব।

নারায়ণ কিছুতেই বলে বুঝাতে পারেনি
তার অজ্ঞ কোন উদ্দেশ্য ছিল না, সে
কেবল স্কুল দিতে এসেছিল।

সে কি প্রহার—

নারায়ণ অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। তাকে
রক্ষা করতে এসে তার মাকেও কম
আঘাত সহিতে হয় নি। তারপরে তাদের
স্থান নিতে হল পথে, জীবিকা হল ভিক্ষা—

এক বৎসর পরে তার মা হাঁসপাতালে
মারা গেছে।

নারায়ণের একটা মাত্র আশ্রয় ছিল
মায়ের কোল, সে আশ্রয়ও গেছে। নিজের
জন্ত নারায়ণ কোন দিনই ভাবে নি। মা
থাকতে যেটুকু বাধন ছিল, তাও কেটে
গেল।

জীবিকার্জনের জন্ত সে না করেছে
কি—দুনিয়ার যত খারাপ কাজ মন্দ কাজ
সবই করেছে—

যথেষ্ট অর্থ তার হাতে এসেছে,
বাবুয়ানাও করেছে, সুখ বা শান্তি কোন
দিন পেয়েছে বলে নারায়ণ আজ মনে করতে
পারে না।

সে একদিন সন্ধ্যাবেলার কথা—শেদিন
ছিল একদিনকার মত বৃষ্টি ধোওয়া সন্ধ্যা—
তার স্মৃতি নারায়ণের মনে জেগে উঠে,
জগতের পরে তার বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছিল—

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

সর্বপ্রকার বীমার বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

অধিকৃত মূলধন	৬,০০,০০,০০০ টাকা
গৃহীত মূলধন	৩,৫৬,০৫,২৭৫ টাকা
আদায়ী মূলধন	৭১,২১,০৫৫ টাকা
মোট তহবিল	২,২৮,০৭,৬০২ টাকা

দাবী মিটান হইয়াছে : ৭,৮৬,০০,০০০ টাকার অধিক

হেড অফিস :—বোম্বাই : : কলিকাতা শাখা :—৯নং ক্লাইভ স্ট্রীট

সে সন্ধ্যায় হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল
ফুটনোমুখ একরাশি রজনীগন্ধা ফুল--।

নিজেকে ভুলে সে মদ খেয়েছিল
প্রচুর, এত বেশী খেয়েছিল যাতে সে মোটে
দাঁড়াতে পারছিল না—তবু সে টলতে
টলতে চলছিল পথ বেয়ে—

একটা গানের একটি লাইন ছিল
তার মুখে—

পেয়ে মানিক হারিয়েছি মা—

আমি অতি লক্ষীছাড়া।

“এই এই—রোখো—রোখো—” বলতে
বলতে একখানা মোটর এসে পড়েছিল
তার উপরে—

সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়লো মোটরের
মধ্যে একটি মেয়ে, সে রেখা। যে লোকটি
মোটর চালাচ্ছিল, তারই পাশে সে
বসেছিল—।

একটা গলির মুখ, আলোও সেখানে
বেশী ছিল না, লোক জনও কম—।

“রেখা—”

আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠবার
সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তার পানে চেয়েছিল,
সে চাহনীটাই শেষ। লোকজন এসে
পড়বার আগেই মোটর খানা নিমেষে
গলির পথে অন্তর্হিত হয়েছিল।

একখানা পা তার কেটে বাদ দিতে
হয়েছে।

জীবনে সে বেঁচেছে, কিন্তু সে একেবারে
অকর্মণ্য, বিরাট বোঝা শুধু বইছে।

আকাশের মেঘ আন্তে আন্তে সরে
যাচ্ছিল দমকা হাওয়ার স্পর্শ লেগে—

হেঁড়া মেঘের ফাঁক হতে এক বলক
রোজ আচমকা হাসির মত ধরার বুকে
ছড়িয়ে পড়লো।

সামনের বাড়ীটার বারান্দায় টবে
রজনীগন্ধা গাছে ফুলগুলো বাতাসে দোলন
যাচ্ছিল। তার পানে চেয়ে চেয়ে নারানের

চোখ জ্বালা করতে লাগল। তবু আজও
সে ভালোবাসে—সেই মেয়েটিকে—সেই
নিষ্ঠুর মেয়েটিকে।

সে সুখী হয়েছে তা নারান জানে—
বিবাহিতা জীবন বাপন করছে তাও সে
জানে। হয়তো হঠাৎ আবার কোনদিন
তার সঙ্গে এই পথের ধারেই দেখা হয়ে
যাবে, সেই ক্ষণটির আশা সে করে।

আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা চলছে—
মেয়েটি ছাদ হতে কাপড় তুলে নিয়ে
চলে গেছে।

নারান স্বপ্ন দেখছে রজনীগন্ধার, সে
যেন এক গোছা রজনীগন্ধা এনে দিয়েছে,
রেখা একটু হেসে ফুলগুলো নিয়ে মাথায়
পরছে।

—বিবাহ—

পাত্র বা পাত্রীর বিবাহ যদি দিতে চান
তবে আসুন বা লিখুন।

মিঃ এ. সি. মিত্র—ম্যানেজার।

ম্যাট্রিমোনিয়াল ব্যুরো

১২৯১ নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : বড়বাজার—৫৩৪৩

যেন

শ্রীবিমলা প্রসাদ যুগোপাধ্যায়

বিদায় বেলায়

অকথিত সব রহে যায়।

শুধু রেখা মনে

কত ব্যথা দূরে মরে ঘুরে—

ফোটে যেন বিরহেরি সুরে

সে ব্যথা গোপনে

আগামী চাঁদের মধু-স্বপনে।

তখন ভুলোনা প্রিয় তাহারে
বিনতি জানায় যেবা আড়ালে।

মিনতি-মলিন দিষ্টি ভরে’

স্বতির সুবাস যেন ঝরে।

থেকে থেকে শুক হুপুর

ভরে যেন অন্তরপুর—

ছলছল ভরা নদীতে

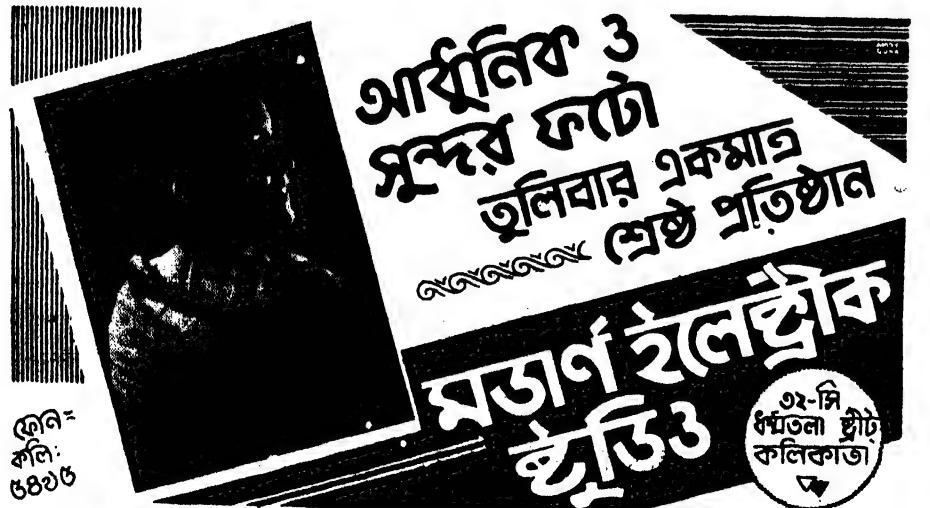
আনে যেন তারি ব্যথা চিতে—

তব চোখে পড়ি’ ম্লান রসি

আঁকে যেন তারি মুখছবি।

তখন সাজিয়ে তুমি চম্পক বসনে,

প্রসাধন কোরো তারি গন্ধিত অরণে।



আধুনিক ও
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

মডার্ন ইলেকট্রিক
স্টুডিও

৩২-সি
গুপ্তলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন-
কলি:
৬৪৩৬

খেয়ালী
শারদীয়া
সংখ্যা
*

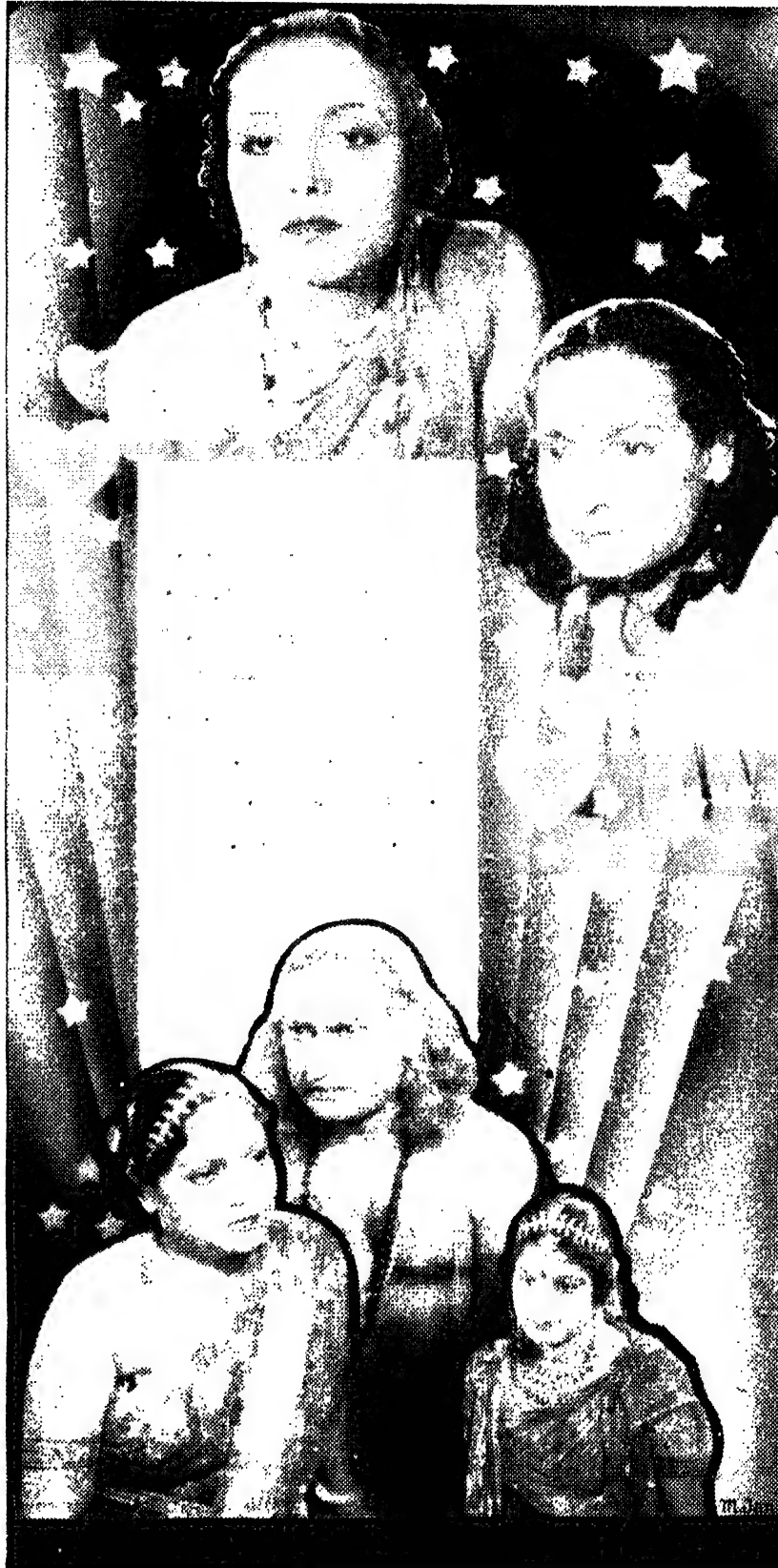


উদ্বোধন: নিউ পিয়েটার্সের
“অধিকার” চিত্রে মনিকা,
যমুনা ও পাছাড়া সাগোল।
ভবিষ্যনি মল্লিক প্রযোজনা।

দক্ষিণে: ফবি মজুমদার
পরিচালিত “সাথী” চিত্রে
সাইগাল, কানন প্রযুক্তি।



খেয়ালী - শারদার সৎথা।





বর্ধা ফিল্ম কোম্পানীর পৌরাণিক

চিত্র

প্রযোজ-শিল্পী : ফকীর বক্স

*

চিত্র-শিল্পী : প্রবোধ দাস

*

শব্দ-যন্ত্রী :

নূপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ

*

ভূমিকায় : সাবিত্রী, দেববালা, ছায়া,
রাজলক্ষ্মী, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীল রায়,
জহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, যুগাল ঘোষ,
তুলসী চক্রবর্তী, কুমার মিত্র প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক :

প্রাইমা ফিল্মস লিঃ
কলিকাতা



মতিমহল থিয়েটার লিমিটেডের
স্বোচ্চতর নাট্য কথা-চিত্র

রত্ন
ধন

প্রযোজ-শিল্পী : হরিশ্চন্দ্র ৪৪ চিত্র-শিল্পী : সত্যেন দাস

শব্দ-যন্ত্রী : গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবনী চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী : হেমেন বসু

ভূমিকায় : শীলা হালদার, সুহাসিনী, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীল রায়, জহর
গাঙ্গুলী, রবি রায়, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জামকী ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

ইষ্ট ইন্ডিয়া পিকচার্সের পরবর্তী আকর্ষণ, পৌরাণিক
কথা-চিত্র—

—দ্রৌপদী—

প্রযোজ-শিল্পী এবং প্রধান অভিনেতা : অহীন্দ্র চৌধুরী

নিবন্ধ

শ্রীমতেশচন্দ্র সরকার

কিছু ভালো লাগেনাকো, পঁড়াশোনা, নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া ;

সুরহান জীবনবীণার তারগুলো

বাজে নাকো তেমন মধুরে।

‘টকি’ শুনি সপ্তাহে ৩ দিন ;

মাঝে মাঝে ‘লেকে’ যাই, নিয়মিত কুকি সিগারেট ;

তবুও লাগে না ভালো ; কোথা আলো, দীপ্ত, অচপল,

প্রাণের বিজন গেছে কল্যাণের অমৃতপ্রদীপ।

অগণ্য প্রদীপজ্বালা রুঢ় এই মহানগরীর

গূঢ় অন্ধকার মাঝে অন্ধ হ’লো অস্তরের আঁখি।

অলঙ্কৃত শবাধার কলিকাতা, নিরুদ্ধনিশ্বাস

বিগলিত শবের কবর ; মোরা তা’র ক্রমকীট

আবরিয়া ক্রিষ্টতম লজ্জাহীন আন্ধার জামায়,

দৈতো হাসি মুখে আনি’ কহি বালী রবীন্দ্রনাথের।

শতকরা পঁচাত্তর কোনোরূপে হবে রাখিতেই,

কাজেই কলেজে যাই, ক্লাসে বসি, শুনি শকুন্তলা

মিশরের মমি সম শুদ্ধদেহ, লুপ্ত প্রাণরস,

প্রফেসর উচ্চারিছে শ্লোক,

যৌবনের করুণ কাহিনী।

কখনো বা শুনি ‘মহু’, বৃদ্ধ ভারতের

পুঁতি গন্ধ আলস্তের অজস্র বিকায়,

যুগান্ত সঞ্চিত বর্ষরতা।

‘কনক আসনে বসি দশানন বলী’

কাদে নিত্য বাংলা ক্লাসে, নাহি জানি, হায়,

কবে যে সে ক্ষান্ত হ’রে।

কবিবংশ মহি বোস ইংরাজির ক্লাশে

করে নিত্য কাব্য-ব্যবচ্ছেদ।

কভু প্রভঞ্জন ভাষী মৃদুহাসি দত্ত মহাশয়

পদ্ম হতে পদ্মাস্তরে লক্ষ্মী দেন নয়ন-রঞ্জন।

Ladyগণ সনাতন আদর্শের পথে

নতমুখী, নীরব ভাবিনী।

মোরা যেন কেহই আসিনি এ কলেজে,

এহেন মনের ভাব।

বহুগণ কেহ কবি, কেহ সাধু পাগলাটে কেহ,

কারো প্রাণে আদিরস তুলেছে তুফান,

নির্জন প্রান্তরে ব্যান্জো বাজান।

এখনো তো মনে পড়ে শান্ত এ হৃদয়ে

কোমল তরঙ্গ তুলি’ স্বর্গের বাতাস

গাহিত কী অমল সঙ্গীত!

পবিত্রতা, শুভ নিরমল

অসংশয় স্নেহময় মন

কোথায় মিলাল ধীরে।

এখনো পড়িছে মনে কী শুভ প্রভাতে

নবীন সূর্যের আলো কৈশোরের স্নিগ্ধ নীলিমায়

অরুণিল অকস্মাৎ। মনের গহন বনতলে

মুগ্ধ ছিল যে সঙ্গীত, কমনকর পরশে তাহার

জাগিল সে মধুর গৌরবে।

আলোকে সঁপিল সুর, শব্দে করে করিল দীপ্তিময়,

গীতার দানিল ছন্দ, অপূর্ণ করিল সামান্তেরে

সুদূরের মোহ সঞ্চারিয়া।

সে মোহ কাটিয়া গেছে ; যতদূরে আঁখি মোর ধায়,

হৈরি শুধু প্রাণহীন বাস্তবের বিমূঢ় কঙ্কাল।

কী লভেছি তা’র ফলে! কোন্ ধন দিয়াছে সে জ্ঞান

সুবুদ্ধিম দেহযন্তি তিত্ত মন অশান্ত চঞ্চল,

অঁধারের গ্রাস হতে নিবু-নিবু প্রদীপশিখার

নিত্য শঙ্কা, ব্যর্থ নিবারণ।

হে প্রকাশ! হে মোর-ঈশ্বর!

হানো তব অগ্নিখড়্গ, টুটুক এ কালো আবরণ,

বিষম, বৈচিত্র্যহীন। জীবনের অকাল সন্ধ্যায়

আবার তোম্বাতে জাগি পরিপূর্ণ মেলিয়া নয়ন,

নিশীথ-প্রস্রুপ পাখী জাগে যথা প্রদীপ্ত উষায়।

বন্ধিমচন্দ্রের ধর্ম

Where Angels fear to tread !

অশনি

বন্ধিমচন্দ্রের প্রতি শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। কাজেই ইহার অবশ্যস্বাভাবী ফল যাহা, তাহাই ফলিতেছে। শনির দলের কেহবা রোহিণীকে উপলক্ষ্য করিয়া বন্ধিমচন্দ্র যে আটটি ছিলেন না, তাহাই ইতিপূর্বে সপ্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছেন, কেহ বন্ধিমকে ডাহা যৌনতান্ত্রিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কেহ “বন্ধিমচন্দ্রের ধর্ম” লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের ব্যক্তিগত রুচি ও বিজ্ঞাবুদ্ধি অনুসারে, ইহাদের মনে যে দিন-দিন নবনব তত্ত্ব গজাইয়া উঠিতেছে, তাহাই ইহারা বন্ধিমচন্দ্রের উপর অবলীলাক্রমে আরোপ করিয়া অসহায় বঙ্গীয় পাঠককে নূতন কথা শুনাইবার জাঁক করিতেছেন। বাস্তবিক, ইহাদের নবনব-উন্মেষশালিনী চুই বুদ্ধি দেখিয়া হাসি পায়। ভাঙ্গের সংখ্যা শনির কাগজখানাতে কি কারণে জানি না, এবার আর মোহিতলাল-সত্যশঙ্কর-সুশীলকুমারের দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস পড়িতে না পড়িতেই—“একত্র দুঃখস্ত না যাবদন্তঃ”—স্বয়ং সম্পাদক সজনীকান্তকে শনির ‘মুখপাত’ রক্ষা করিতে মরিয়া ভাবে রক্তস্থলে দেখা গেল। সজনীকান্তেরও নবনব রূপ, নবনব ভাব; কখনও দেখি, খিস্তিভাব, কখনও কপিভাব, কখনও বা বাগুভাব। এবার দেখিতেছি, পাজীভাব। তা, শ্রীরামপুরের স্থান-মাহাত্ম্যে শনির বাছনির মিশনারি—ভাবটা খুলিয়াছে ভাল।

রসরাজ অমৃতলাল একবার লিখিয়া ছিলেন—

কুঁচো চিঙ্গড়ির সেজো দাদা তারও
একটাকা সের,
তার উপরে মেছোর মেয়ের আছে
দাঁড়ীর ফের!

সাহিত্য-পরিষদ হইতে যে বন্ধিম-সাহিত্য সম্পাদিত হইয়া বাহির হইবে বলিয়া প্রকাশ, সজনীকান্ত হইতেছেন সেই অনুষ্ঠানের সেজো কর্ত্তা। বর্ত্তমান সাহিত্য-মেছোহাটের মেছুনীরা দাঁড়ী পাল্লার ফের কসিয়া ইতিমধ্যেই কুঁচো চিঙ্গড়ীর সেজো দাদাকে টাকা-টাকা সেরে দাঁড় করাইয়াছে। সেই দর যাহাতে পোক্ত থাকে, বন্ধিম-সাহিত্য-সম্পাদনের ‘সেজো কর্ত্তামি’ যাহাতে অযোগ্যপাত্রেরে তত্ত্ব বলিয়া লোকে না মনে করে, সেই জন্তই ইন্দুকান্ত সজনী শেওড়াফুলি হইতে আরম্ভ করিয়া গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত বন্ধিম শতবার্ষিকী সভার সভাপতি হইবার জন্ত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন এবং বন্ধিম-সাহিত্যের উপর নব-নব আলেয়া-পাত করিতেছেন। কর্ম্মী ও ত্যাগী গুরুত্বের এইরূপ “পাত” সাহিত্য-মেছোহাটায় ছন্ন-ভ—মেছুনীদেরও ঈর্ষ্যার বস্তু! শ্রীরামপুরের বন্ধিম শতবার্ষিকী সভায় সভাপতি সজনী দাস অমিতবিজ্ঞমে বাহ্বাফোট করিয়া শ্রীরামপুরবাসীদের “থ” বানাইয়া দিয়াছেন এবং যাহাতে কলিকাতা ও অন্ত্রাজ্জ জেলার লোকেরাও সেই বাহ্বাফোটের বীররস হইতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্ত পর পর

চুইবার, ‘আনন্দবাজার’ ও ‘শনিবারের চিঠি’তে, সেই বীররসের পরিবেশন করিতে কৃপণতা করেন নাই। কান্তদাস বলিয়াছেন—“অথচ কুত্রাপি দেবতত্ত্ববিষয়ে বন্ধিমের এই লেখাগুলির উল্লেখ দেখি না কেন? . . . অথচ এটি একটি রহস্য গ্রন্থ, বিষয়ের গুরুত্বের দিক দিয়া বোধহয় বন্ধিম-রচিত রহস্যময় গ্রন্থ। আমি আজ বন্ধিমের শেষ জীবনের এই বিলুপ্ত কীর্ত্তির সামান্য পরিচয় দিয়া বিন্মুতি পুরাতনকে নূতন করিয়া উপস্থাপিত করিতেছি; . . . ‘হিন্দুধর্ম ও দেবতত্ত্ব’র সন্ধানও দিতেছি।” কান্তদাসের ভাবটা এই—“তোমরা, ত এ খবর জানিতে না বাবা, হঁ হঁ, দেখিতেছ ত, আমি কেমন কেলেবর হইয়াছি!” কিন্তু আসল কথাটা এই যে, কান্তদাস সজনীবাবু তাঁহার গোবেষক বাণুলীলার অন্ত লীলায় সেকালের বন্ধিম আমলের “প্রচার” পত্রের সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাহাও বেশী নয়, চারিখণ্ড “প্রচার”এর প্রথম খণ্ডখানি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সভাপতির অভিভাষণের পোনর আনায় মাছি মারা কেরাণী-বস্তির কণ্ঠস্বর করিয়াছেন। ইহাতেই আশা কত? যে কেহ “প্রচার” পত্রের প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সামান্য কয়খানি পাতা পড়িয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, শনির বাণু পণ্ডিতের কেরামতি কতটুকু। বন্ধিমের ঐ লেখাগুলি আদৌ রহস্যময় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু সে পরিচয় আমরা পরে দিতেছি। তাহার পূর্বে বাণুপণ্ডিত তাঁহার কেরামতির ভিনিতা করিতে গিয়া নিজের মৌলিক বিজ্ঞা বেরূপ মাঠময় করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় গোড়াতেই দিয়া রাখা ভাল।

বাণুপণ্ডিতের গৌরচন্দ্রিকা :—“বে চারিজন মহাতাপসের প্রতিভায় এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে . . . আমরা তাঁহাদের

কীর্তিকথা স্মরণ করিয়া ধন্ত হইতেছি।
বিজ্ঞাসাগর, মধুসূদন এবং বঙ্কিমের আবির্ভাব
ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথের সম্ভাবনা সুদূর
পর্যন্ত থাকিত। • • বঙ্কিমচন্দ্র • • এই
কারণে এই রত্নচতুষ্টয়ের • মধ্যমণি। বরফ
ও বাষ্পের মাঝখানে তিনিই তরল
প্রাণধারা। খনির তিমির গর্ভে যে কঠিন
হীরকছাতি আমাদিগকে প্রতিহত করে
এবং অনন্ত আকাশলোকে যে অদৃশ্য
আলোকের আমরা নাগাল পাই না,
একাধারে তরল এবং সংহত করিয়া সেই
কঠিন এবং বায়বীয়কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাত্যহিক
জীবন-যাত্রার অবশ্য প্রয়োজনীয় সূর্যালোক-
রূপে দিশাহীন মানব সমাজে বিকীর্ণ
করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ধরিতে
পাই, ছুঁইতে পাই বলিয়াই বেশী ভালবাসি।
এবং ভালবাসি বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে
বিচারে আমাদের ভুল হয়।” এখন দেখা
বাক—আমরা মাত্র ঐ কয়েকটি অমূল্য ছত্র
হইতে কতগুলি অমূল্য নূতন কথা
শিখিলাম :—

(১) মহাতাপসদের এতদিন ধরিয়া
তপস্তার কথা শোনা যাইত—এখন দেখা
যাইতেছে, তাহা ভুল কথা। মহাতাপসদের
“প্রতিভা” থাকে এবং বোধ করি সে
“প্রতিভা” বাণু-পণ্ডিতের মস্তিস্কের মত
মস্তিস্কে জটা বাঁধিয়া বাসা করিয়া থাকে।

(২) বিজ্ঞাসাগর মধুসূদন ছিলেন
“বরফ” এবং রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন “বাষ্প”—
ইহাদের মাঝখানে বঙ্কিম ছিলেন “তরল
প্রাণধারা।” বাস্তবিক, এই উপমার দাপটে
কবি কালিদাস পর্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাইবেন!
কি বরফ জলময়া উপমা! আমরা ত
এতদিন বিজ্ঞাসাগর-মধুসূদনকে আশুন
বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু বাণুদাস
ইহাদের একবারে “বরফ” বানাইয়া ছাড়ি-
লেন! “কুলপী বরফ” করিলে আরও ভাল
হইত নাকি?

(৩) “হীরকছাতি” অত্যন্ত “কঠিন”
বস্তু এবং আকাশলোকের আলোক অদৃশ্য
হইলেও বায়বীয় পদার্থ—টুকি দিলেই
বাষ্পের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ছেঁদা হইয়া
টুক টুক করিয়া ঘরিতে থাকে!

(৪) কঠিন হীরকছাতি ও বায়বীয়
আলোক একাধারে তরল এবং সংহত
করিলেই “সূর্যালোক” প্রস্তুত হয়—টুকি
দিয়া চূর্ণ করিলে, বোধ করি সস্তায় বস্তু
বস্তু মিলেতে পারে!

(৫) যাহাকে ধরিতে পাই এবং
ছুঁইতে পাই তাহাকেই বেশী ভালবাসিতে
হইবে। চোর ডাকাত বাটপাড়দের
খবরদার কেহ ধরিবেন না এবং ধরিলেও
ছুঁইবেন না—বেশী ভালবাসিয়া শেষে কি
ধনে-প্রাণে মারা যাইবেন!

(৬) ভালবাসিলেই বিচারে ভুল
হইবে। অতএব সাবধান, কাহাকেও
ভালবাসিবেন না—মাতা, পিতা, জ্ঞা, পুত্র,
কন্যা—সকলকেই ঘৃণা করিবেন, তাহা হইলে
আর তাহাদের সম্বন্ধে ভুল হইবে না।
শ্রীরামপুরবাসীদের দেখিতেছি অসাম ধৈর্য্য

অথবা দুঃস্থ আতিথেয়তা! নতুবা এমন
“রাবিশ” তাঁহারা বরদাস্ত করিলেন কি
রূপে? সভাপতির লঙ্ঘনের নাগাল কি
তাঁহাদের আয়ত্বের বাহিরে ছিল?

বাণু-পণ্ডিতের প্রবন্ধের বিষয় “বঙ্কিম
চন্দ্রের ধর্ম”। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম
সম্বন্ধীয় লেখা ছাড়া আর যাহা কিছু বাকি
রহিল তাহাই প্রকারান্তরে অধর্ম বলিয়া
প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে, বাণুদাসের
প্রবন্ধের আকার বড় হয় কেমন করিয়া?
তাই, বাণু-পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নিম্ন-
লিখিত অসম্মানসূচক প্রলাপ বাক্যগুলি
লিখিতে লাগিলেন এবং পাছে বঙ্কিমের
প্রতি অভক্তি জনসমাজে ধরা পড়িয়া যায়
এই ভয়ে, মাঝে মাঝে মিঠাবুলির বৃন্দ
ছাড়িতে লাগিলেন :—

(১) “আমরা কখনও তাঁহাকে (বঙ্কিম
চন্দ্রকে) রূপলালসায় দগ্ধ হইয়া উন্নাদের
মত ছুটাছুটি করিতে দেখিতে পাই”.....

(২) “দেশ-মাতৃকার চরণে সমর্পিত-
প্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রেরও মধ্যে মধ্যে দেখা পাই”—

বাংলার উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান

জেনুইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

প্রথম ভ্যালুয়েশনের

—বোনাস—

আজীবন বীমায়—১৫ টাকা

য়েয়াদী বীমায়—১২ টাকা

প্রতি হাজারে প্রতি বৎসরে

বিশেষত্ব :— স্বল্প প্রিমিয়াম, সুবিধাজনক বীমা প্রণালী, সুদক্ষ পরিচালনা।

সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যবহার

হেড অফিস :—১০০ ক্লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ অফিস :—৩নং জনসন রোড, ঢাকা।

(৩) “নবকুমার হইতে কমলাকান্ত পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এই রূপ বাঙালী-পাঠকসমাজে পরিচিত—তিনি আমাদের শিশু-মনের গল্পশোনার অশেষ আগ্রহ কতকটা চরিতার্থ করিয়াছেন বলিয়া।”

(৪) “‘বঙ্গদর্শন’ের যুগে মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান পরিপক্বতা লাভ করে নাই, তিনি তখনও শিক্ষানবিশী করিতে ছিলেন।”

ঐরূপ আরও অসংখ্য প্রেলাপবাক্য বাণু-পণ্ডিতের ক্ষুদ্রে লেখাটার ভিতর বিস্তর আছে। সে সকল সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। তাহার প্রয়োজনও নাই। আমরা শুধু ইহাই মাত্র বলিতে চাই যে, যে পণ্ডিত, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে দেশ-মাতৃকার চরণে সমর্পিত-প্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রকে “মধ্যে মধ্যে” দেখিতে পান, প্রতি ছত্রে দেখিতে পান না এবং

যিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কমলাকান্তের দপ্তর লিখিয়া শিশুমনকে গল্প শোনাইবার “বিমুগ্ধশ্রম” মাত্র বলিয়া চিনিয়াছেন, তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের “জ্ঞান পরিপক্বতা লাভ করে নাই”! ‘শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর’! যে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের যুগে সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে একছত্র প্রভু করিয়া গিয়াছেন, তথা নব্য-বাক্যলার জন্মদাতা বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন, যে বঙ্গদর্শনের অসামান্য আধিপত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে এই সে-দিন স্বয়ং নিষ্ঠা-পূর্ব্বক কীর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বাণুদাসের ঐ উক্তি যে কতদূর হাতকর তাহা বলিবার প্রয়োজন আছে কি?? বঙ্গীয় সাহিত্য-

পরিষদ এই শ্রেণীর জীবদের উপর বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পাদনের ভার দিয়া কি মহাপাপ করিয়াছেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন কি?

ইহার পর, বাণু-পণ্ডিত বাহা লিখিয়াছেন, “তাঁহার সারমর্ম্ম এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমজীবনে উপজ্ঞাস ও সাহিত্য লিখিয়া ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। “উপজ্ঞাসের শর্করাবরণে তাঁহার সাধনালঙ্ক সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হইতেছিল না, ইহা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। “সীতারাম উপজ্ঞাস প্রকাশে “তাঁহার যথেষ্ট সন্দোহ ছিল। “উপজ্ঞাসপ্রিয় সাহিত্যরসিক পাঠকগণের” কাছে তাই নাকি তিনি “জবাবদিহি” করিয়া ধর্ম্মের মধ্যে আরোহণ করিয়াছিলেন। “এই সময়ে অকস্মাৎ একটা হতাশা অনুভব করিয়া

পাইওনিয়ারের শাসনদীক্ষা অর্ঘ্য

(সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)

রেকর্ড জগতের সর্বজনপ্রিয় শিল্পী

শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

মূল্যবান কণ্ঠে গীত দুইখানি আধুনিক গান

N. Q. 68 { যে গান গাইয়াছিল
রজনী হল যে ভোর

অত্যাশ্চর্য্য সুকণ্ঠ গায়ক

শ্রীযুক্ত সন্তোষ সেনগুপ্তের

অতি সুমধুর দুইখানি আধুনিক গান

N. Q. 69 { বাজে রিনিকি কিনি
বিধুর তোমার আঁখি

পূজোবাড়ী

একখানি রেকর্ডে সম্ভ্রান্ত ধরের ছেলেমেদের
দ্বারা অভিনীত আধুনিক কালের উপযোগী নাটক।

N. Q. 70 { পূজোবাড়ী—প্রথম খণ্ড
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড

স্বানী-স্বামী

বর্তমান রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। দুর্গাদাসের
পরিচালনায় রঙ্গমঞ্চেরই মূল অভিনেতৃদের দ্বারা
সাতখানি রেকর্ডে অভিনীত।

N. Q. 71-77 { প্রথম খণ্ড হইতে
চতুর্দশ খণ্ড

পাইওনিয়ার রেকর্ড'স

৪৪, চিত্তরঞ্জন এডিনিউ, কলিকাতা

ছিলেন। এই সময়ের কথায় তিনি বলিয়াছেন—

আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। আমার জীবনের কতক বড়-শিক্ষাপ্রদ.....আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি অতি-আশ্চর্য্য রকমের। [সাধনা, শ্রাবণ ১৮৯৪] বাণ-পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের “হতাশা” কেমন ‘সাধনা’ হইতে ‘কোট’ করিয়া অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন. দেখিলেন ত? ‘সাধনার’ কোটেশন-টুকুর ভিতরে ‘হতাশা’র কোনও লক্ষণই ত আমরা দেখিলাম না এবং আশা করি বাণদাস ভিন্ন অল্প কেহই তাহা দেখিতে পাইবেন না। এইরূপ তালকাণাতাবে রবীন্দ্রনাথের একটি কোটেশন তুলিয়া প্রবন্ধের অল্প একস্থানে বাণ-পণ্ডিত ল্যাঙ্কে-গোবরে হইয়াছেন। “সীতারাম” উপন্যাস-প্রকাশে তাঁহার কোন সন্ধোচই ছিল না। প্রচারের প্রথম খণ্ডে ৩৬২ পৃষ্ঠায় ইহার প্রমাণ আছে,—“স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা উপন্যাস বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্থানাভাব থাকিবে না। অতএব উপন্যাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। “সীতারাম” বন্ধ হওয়ায় অনেক পাঠক দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাবণ মাস হইতে “সীতারাম” পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।” “প্রচারের” যে খণ্ডখানি লইয়া সজনীকান্ত এত “নপড়-চপড়” করিয়াছেন, উহাতেই ঐ কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে। কৈ, উপন্যাস-প্রকাশের জন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও “পবিত্র অমৃতোপের” চিন্তাও-ত উহাতে দেখা গেল না। অথচ প্রচারের ঐ খণ্ডেই সজনীবাবু কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত(?) বঙ্কিমচন্দ্রের দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখাগুলি বিস্তারিত রহিয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ লেখাগুলি আদৌ বহুস্তম্ভ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। উহা প্রচারের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে সজনীবাবু কৃত নির্ঘণ্ট এবং প্রচারের প্রথমখণ্ডের হুচী পাশাপাশি তুলিয়া দিতেছি। পাঠক সহজেই সকল কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন এবং সজনীবাবুর বিজ্ঞা ও বাহাদুরীর অবশিষ্ট তারিফ করিবেন :—

সজনীবাবু কৃত “হিন্দুধর্ম ও দেবতত্ত্ব” গ্রন্থের নির্ঘণ্ট।

১। হিন্দুধর্ম, ২। বেদ, ৩। বেদ, ৪। বেদের দেবতা, ৫। ইন্দ্র, ৬। কেন্ পথে যাইতেছি, ৭। বরুণাদি, ৮। সবিতা ও গায়ত্রী, ৯। বৈদিক দেবতা, ১০। দেবতত্ত্ব, ১১। জ্ঞাবা পৃথিবী, ১২। চৈতন্যবাদ, ১৩। উপাসনা, ১৪। হিন্দু কি জড়োপাসক? ১৫। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা, ১৬। বেদের ঈশ্বরবাদ, ১৭। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই।

প্রচার, ১২৯১, প্রথম খণ্ডের হুচী।

বেদ :—

বেদ

বেদের দেবতা

ইন্দ্র

কোনপথে যাইতেছি

বরুণাদি

সবিতা ও গায়ত্রী

বৈদিক দেবতা

দেবতত্ত্ব

জ্ঞাবা পৃথিবী

চৈতন্যবাদ

উপাসনা

হিন্দুধর্ম

হিন্দু কি জড়োপাসক?

সজনীকান্তবাবু “প্রচারের” হুচী কপি করিতে গিয়াও মাছি-মারা কেরাণীর কাজ

করিয়াছেন। প্রচারের হুচীর Sub-heading “বেদ”-এর নীচে ‘বেদ’ ইতি-প্রবন্ধের নির্দেশ আছে। কান্তবাবু তাঁহার নির্ঘণ্টে সেইজন্ত (২) ও (৩) সংখ্যক বিভাগে দুইবার “বেদ” লিখিয়া গোবেষণার “গোবেড়ন” করিয়াছেন। মোট অধ্যায়ের বিভাগ ১৬ হইবে, ১৭ নয়। সজনীবাবু-কৃত বিভাগের শেষ তিনটি নিবন্ধ “প্রচারের” দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। “বেদ” নামে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ ‘প্রচারের’ দ্বিতীয় খণ্ডে, ২২০ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছিল। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নহে। এই প্রবন্ধের শেষে লেখক “হিন্দু” এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত বেদ সম্বন্ধীয় লেখাগুলিরই পাকিত্যপূর্ণ তীর্থ প্রতিবাদ। বস্তুতঃ, এই লেখাটি ‘প্রচারে’ প্রকাশিত হইবার পর, বঙ্কিমচন্দ্র দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখা এক প্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন। ইহাও সজনীবাবু কর্তৃক পরে উত্থাপিত “বিস্ময়কর প্রশ্নের” একটি উত্তর।

সজনীকান্তের লিখিত প্রবন্ধে (শনিবারের চিঠির ৬৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ৬৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) বঙ্কিমবাবুর যতগুলি লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে প্রচারের উপরোক্ত প্রথম খণ্ডের নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে আছে :—

১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠা (ধর্ম এবং সাহিত্য), ২১-২২ পৃষ্ঠা (হিন্দুধর্ম), ১০৭ পৃষ্ঠা (বেদ), ২০১-২০৩ পৃষ্ঠা (কোন পথে যাইতেছি), ৩৬৬ পৃষ্ঠা (জ্ঞাবা পৃথিবী), ৩৭৫-৩৮০ পৃষ্ঠা (চৈতন্যবাদ)। শনিবারের চিঠির ৩৭৮ পৃষ্ঠার শেষ হইতে ৬৭৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যেটুকু ‘কোটেশন’ আছে, তাহা প্রচারের দ্বিতীয় খণ্ডে ৭৪-৭৯ ও ২৭৮ পৃষ্ঠা হইতে আহরিত।

পাঠক এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, শনির বাণ-পণ্ডিত তাঁহার বহু চক্কা-নির্নাদিত

ভারতের ইতিহাসে প্রথম !! বাঙ্গালীর গৌরব!!



বাংলা দেশে
আমাদের
কারখানা হইতে
বহুতর
টুকী মেসিন
প্রস্তুত করিয়া ও
আরও কত
বৈজ্ঞানিক ও
ফিল্ম সংক্রান্ত
যন্ত্রাদি প্রস্তুত
হইয়াছে এবং
হইতেছে!
সমগ্র প্রাচ্য
এরূপ হয় কিনা
সন্দেহ??

সিস্টোফোন লেবরেটরী লিমিটেড

১৫নং গোপাল দত্ত গার্ডেন লেন, পোঃ আঃ বেলঘাটা

(নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডের শেষে)

ফোন : বড়বাজার ১২৬৪

গোবেষণার inspiration কোথা হইতে draw করিয়াছেন। আহা! বেচারী এই Discovery-র “আনন্দে অধীর হইয়া সভাপতির কর্তব্য সঠিক পালন করিতে” পারে নাই! কিন্তু বেচারী হইলে কি হয়, বাণদাসের আকামি ষোলখানা। “প্রচার” হইতে Discovery জনসমাজে পুনঃ প্রচার করিয়া আত্মাদে আটখানা হইলেন, অথচ সোজানুজি সে কথা প্রবন্ধের কুত্রাপি স্বীকার করিলেন না। ইহা না হইলে, গোবেষণা! সজ্ঞানীকান্ত এইবার প্রস্তুত হইয়াছেন, বন্ধিমের ঐ দেবতত্ত্ববিষয়ক লেখাগুলি বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইল কেন? ঐ লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল না কেন? “এই বিস্ময়কর প্রশ্নের সমাধান” তিনি কুত্রাপি দেখিতে পান নাই। চেষ্টা করিলে, পাইতেন বৈকি, কিন্তু সে-কথা আমরা আজ এখানে বলিব না। ঐ সকল লেখা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল বৈ কি, কিন্তু “কাজালকে শাকের ক্ষেত” আমরা সহজে দেখাইতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু সে যাহা হউক, সজ্ঞানীকান্ত তাঁহার অসীম মেধা বলে ঐ “বিস্ময়কর প্রশ্নের” সমাধানও করিয়া ফেলিয়াছেন। ‘যে মনোবৃত্তি লইয়া বন্ধিমচন্দ্র বেদ ও বেদোক্ত দেবতাদের * * * সাংঘাতিক বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে নাকি তৎকালীন ‘ধার্মিকেরা’ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। “বন্ধিমচন্দ্র সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সত্যকে প্রচলিত হিন্দুসমাজ ভয় করে”—ইহাই সজ্ঞানীকান্তের সমাধান। কিন্তু “প্রচলিত হিন্দুসমাজ” ভয় করিলে, বন্ধিমচন্দ্রের জায় পুরুষসিংহ ভয় পাইবেন কেন? অত্রে যাহাই ভাবুক, তিনি যাহা সমীচীন বলিয়া বুঝিতেন, তাহা কাহারও মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতেন।

তিনি নিজের যাহা ভুল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা অবশ্যই পুনঃ প্রচার করিতেন না। তাঁহার “রূক্ষচরিত্র” ধর্মগ্রন্থ-হিসাবে ধার্মিকদের মনঃপূত হয় নাই, তথাপি উহা তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন কেন? ‘সাম্য’ পুস্তিকাখানির সিদ্ধান্ত যখনই তিনি আগাগোড়া ভুল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তখনই তিনি লিখিয়াছিলেন—“এক্ষণে সেই ‘সাম্য’ শীর্ষক পুস্তিকাখানি বিলুপ্ত করিয়াছি।” দেবতত্ত্ব বিষয়ক ঐ লেখাগুলির পর ‘প্রচার’ আরও দুই বৎসর বাহির হইয়াছিল এবং বন্ধিমচন্দ্রও আরও সাত আট বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার আরও দেবতত্ত্ববিষয়ক প্রস্তাবের শেষ করিলেন না কেন, বা তৎসম্বন্ধে একছত্রও আর লিখিলেন না কেন? আমাদের বিশ্বাস, বন্ধিমচন্দ্র যে কারণে “দেবী চৌধুরাণী”র স্বঃ ইংরেজি অনুবাদ করিয়াও, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ সত্ত্বেও, উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই, ইহাও সেই একই কারণ সজ্ঞাত। তিনি বলিয়াছিলেন—দেবী চৌধুরাণীর ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইলে, সাহেবরা হিন্দুর বহুবিবাহের

খুঁৎ ধরিয়াই মাতামাতি করিবে, অত্ সার-কথা কিছুই বুঝিবে না। শুধুই খোসা লইয়া টানাটানি করিবে। তিনি দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে সজ্ঞানী-জ্ঞাতীয় পাঠক ও লেখকদের মনোবৃত্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বন্ধিমচন্দ্র যেই লিখিয়াছেন—“আমি কোন ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর প্রেরিত মনে করি না”—অমনই সজ্ঞানীকান্ত লাফাইয়া উঠিয়াছেন! এইত তাঁহাদের মত প্রচুর অবুঝ-সবুজদের মুখরোচক কথাই বটে! কিন্তু ইহার পরই, বন্ধিমচন্দ্র ফুট-নোটে যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা সজ্ঞানী বাবু বোধ করি চালাকি করিয়াই চাপিয়া গিয়াছেন। বন্ধিমচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই লিখিয়াছেন—“যাহা কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন হইতেছে না।” কিন্তু সে কথা কে শোনে? তাই, বন্ধিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার দেবতত্ত্ব বিষয়ক লেখাগুলির গভীর মর্মকথা কেহই বুঝিবে না, শুধুই খোসা লইয়া টানাটানি করিবে। সেইজন্মই তিনি উহাদের পুনঃপ্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ সম্বন্ধে পরে আর একটি কথাও কহেন নাই।

22-CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!



ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনদের মনোমত আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিশেষ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ লোণার জায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এন্ড ক্যারেট গোল্ড সিল্ডিকিট

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

ফোন : ২৬, ৪৮৭২

এতদ্ব্যতীত, আর একটি কারণ এই যে, দেবতত্ত্ব ও বেদ-বিষয়ক লেখাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মতের পরিবর্তন হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—“হিন্দু” এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া জর্নৈক লেখক “বেদ” সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির সারবস্ত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিভূত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজের উপনীত সিদ্ধান্তের ভুলগুলি ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি ঐ লেখকের লেখার কোনও প্রতিবাদ আর করেন নাই। বিশেষতঃ, মত পরিবর্তন হইলে বা নিজের ভুল বুঝিতে পারিলে, বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বের লেখা আর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেন না, অথবা নূতন করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করিতেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “রুক্ষচরিত্র” সম্বন্ধে এই কথা খাটে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “রুক্ষচরিত্র”, ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত “বিবিধ সমালোচনা” নামক গ্রন্থে স্থান পাইলেও, পরে প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পায় নাই। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “রুক্ষচরিত্র” এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত “রুক্ষচরিত্র” এই উভয়ের মধ্যে যে আলো-
১৬ অন্ধকারের মত ছিল—প্রভেদ ছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাগুক্ত দেবতত্ত্ব ও বেদবিষয়ক প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মত পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মৃত্যুর অল্প কয়েকমাস পূর্বে লিখিত Vedic Literature নামক দুইটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রত্যয়মান হয়। এই Vedic Literature গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, পূর্নোক্ত দেবতত্ত্ব ও বেদবিষয়ক সন্দর্ভগুলি স্বতঃই বাতিল হইয়া যাইবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি আর ঐ লেখাগুলি সম্বন্ধে

উচ্চবাচ্য করেন নাই, বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন নাই। ইহাই বাগুদাস-কর্তৃক উত্থাপিত “বিশ্বয়কর প্রশ্নের” প্রকৃত সমাধান। এই প্রসঙ্গে—“বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ডের” ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের উপরোক্ত মতবাদেরই প্রতিধ্বনি দেখা যায়। সেই লেখাটুকু এইঃ—“সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া

কয়েকটিমাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কিনা, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।” আশা করি, ইহার পর বাগুদাস-উত্থাপিত কৃতকৌর কথার আর উঠিতেই পারে না। অতঃপর সজ্ঞানী কান্ত যে লিখিয়াছেন, “ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে”—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের “শেষ কথা”, ইহা মোটেই সত্য নহে। উহা বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই নহে। উহা গীতার ৯২৩

ভারত বিখ্যাত

চিরস্থায়ী গ্যারান্টিযুক্ত

22 Ct. রোন্ড গোন্ড হালনা



আধুনিক ধরণের কারুকার্য,
গিনি সোনার ছায় পলিস, এসিড
প্রশুভ এবং রং চিরস্থায়ী, বিক্রয়
কালীন সিকি মূল্য পাওয়া যায়।
সচিত্র ক্যাটালগ ফ্রি।



স্টুডেন্টস রিফ ওয়াচ

গ্যারান্টি ৫ বছর



মাত্র কতক দিনের জন্য আমরা কয়েকটি মজবুত ও
সুন্দর ঘড়ী অসম্ভব কম মূল্যে বিক্রয় করিতেছি।
হেট্জেলার সেপ, সুইস মেড, কলকাতা মজবুত এবং
দীর্ঘকাল স্থায়ী মূল্য ৬০ টাকা। গোল সাইজের সুন্দর ও মজবুত
মূল্য ৪০ টাকা। ডাক মাণ্ডল ১০ আনা পৃথক দিতে হয়। ঘড়ির
মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে, ডাক মাণ্ডল লাগিবে না।

ইণ্ডিয়ান ক্যারেট গোন্ড কোং

১৪নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্লোকের বক্ষিমবাবুস্বত্ব অনুবাদ। উহা “হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই”—“প্রচারের” ২৭৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষ ভূক্ত। সেই প্রবন্ধের মূলটুকু পাঠকের কোতুলক চরিতার্থে আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—“একণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য অরণ করি—

যেহপাশ্চদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়াযিতাঃ
তেহপি মামেব কোন্ত্যে যজন্ত্য বিধিপূরকম্।
গীতা। ৯। ২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অত্র দেবতা নাই। যে অত্র দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূরক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।” উহাও অবশ্য বক্ষিমচন্দ্রস্বত্ব অনুবাদ। গীতার ঐ শ্লোকে “ঈশ্বর ভিন্ন অত্র দেবতা নাই”—“ঠিক এমন কথার বলিতেছে না। সে যাহা হউক, পাঠক এতক্ষেণে বাগ্‌দাসের বিজ্ঞাবুদ্ধি চালাকির বিস্তৃত পরিচয় পাইলেন, আশা করি। আমরা এই প্রসঙ্গে বক্ষিমচন্দ্রের তৎকালীন প্রচারিত ধর্মতত্ত্বের এই কথাগুলিও এস্থলে অরণ করিতেছি।

“এমন মহম্মদ কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মহম্মদকে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন মহম্মদ ধ্যানে পায় না। অত্বে কথার দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ কি চৈতন্য, তাঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমন স্বীকার করিতে পারি না। অত্বে অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মহম্মদ দেখে ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মহম্মদলোকে প্রচলিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি ঈশ্বরবাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মহম্মদ প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও

ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।”

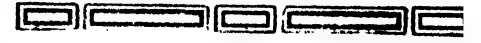
কিন্তু সজ্ঞীবাবুরা সে কথা শুনিবেন বা বুঝিবেন কেন? “Fools rush in where Angels fear to tread!” তাই শ্রীরামপুরে গিয়া পাদরী সাজিয়া শ্রীরামপুরকে “ছিঃ রামপুর” বানাইয়া “বক্ষিমচন্দ্রের ধর্ম” লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

এই শতছিদ্র প্রবন্ধ লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করিতে আমাদের প্রেরণা নাই, তবে একটা কথা সজ্ঞনিকান্তকে বলিয়া দেওয়া ভাল যে, “প্রচার” ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে বাহির হইয়াছিল বটে কিন্তু “ঐ মাসেই প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত “নবজীবন” তাহার সহায় হয় নাই। “নবজীবন” ১২৯১ বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনশ্চ, সজ্ঞীবাবু লিখিয়াছেন, “১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বক্ষিম-সজ্ঞীব-সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন” একবারেই বন্ধ হইয়া গেল।” এই “বক্ষিম সজ্ঞীব-সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন” কি বন্ধ? বক্ষিমবাবু, সজ্ঞীববাবু কি কখনও বঙ্গদর্শনের যুগ্মসম্পাদক ছিলেন? তাহা যদি না থাকেন, তবে কি উহা সজ্ঞীববাবুর অজ্ঞতা, না ভাষার জড়তা? কি জানি, বক্ষিমের কপালে আরও কত কি আছে! আমরা এই ক্ষুদ্র ভুলগুলির উল্লেখ করিতাম না, কিন্তু ইহারা পরের বেলায়, তারিখ অত্রাঙ্গ সামান্য ত্রুটি দেখিলেই “মহাভারত অন্তঃস্থ” হইল বলিয়া মনে করেন। কাজেই ঐ ভুলগুলি দেখিয়া কবি কুন্তিবাস কীর্তিত “অঙ্গদ বায়বাবের” কথা আমাদের মনে পড়িয়া গেল—

“আপ্ত ছিদ্র না জানিস পরকে দিসুখোটা,
বারে বারে কথা ক’সু মরুরে অধম ব্যাটা।”

দৌহারে দৌহে বাসি ভালো

শ্রীমতী কুচিরা দেবী



আমরা দুইজনে দৌহারে শুধু ভালোবেসে, দৌহার বৃকে ছুঁ একদা মিলেছিলাম এসে। সেদিন ধরণীর সকল রূপে রসে যোছে আমরা যেন শুধু নূতন অধিকারী দৌহে! তাহার পরে দিন কেটেছে কত সুখে দুখে, বিরহ মিলনের মধুর লীলা, মুখে মুখে, কখন পেয়েছিলাম কেবল অমৃতের ধারা, কভুবা নিরঞ্জন নয়ন জলে দৌহে-সারা! কখনো চলে গেছি কত যে দূরতম দেশে, তবুও দুইজনে মিলেছি শুধু ভালোবেসে।

এখন মিটে গেছে প্রথম জীবনের কুধা, সবুজ ধরণীর শ্রামল সেই রূপসুধা, আজিও ফুল ফোটে, আজিও পাখী ডাকে বনে, শুধু সে দৌহাকার মিলন কোথা মনে মনে? দুজনে কাছাকাছি, তবুও নেশা নাহি লাগে,

দখিন বাতাসের বৃথাই অধীরতা জাগে ফাগুন আসে দেখি, কখন চলে যায় ফিরে; চাঁদের বান ডাকে সুদূর আকাশের তীরে, কেবল মায়াজালে এখন রচে নাকো আলো, তবুও দুইজনে দৌহারে শুধু বাসি ভালো ॥

চশমা ও চক্ষু পরীক্ষার আবশ্যক হইলে “রয়েল ক্লিনিক” এর নাম মনে হয় কেন? কারণ স্বল্প মূল্যে হাল কাসানের হৃদয় চশমা ও হৃদয় চক্ষু-চিকিৎসকের সাহায্য এখানেই পাওয়া যায়। বাড়ীতে গিয়া মহিলাদের চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। ষ্টুডেন্টস কনসেশন দেওয়া হয়।

রয়েল ক্লিনিক (চশমা বিভাগ)

১০, ওয়েলসলী স্ট্রীট (বর্তমান জংশন)

কলিকাতা।

সমুদ্র-দেবতা

শ্রীশিমলচন্দ্র ঘোষ

হে উন্মাদ সমুদ্র দেবতা
তব বক্ষে কল্লোলিত স্নগস্তীর কুরু আর্তনাদ,
তুলিয়া তরঙ্গ বাহ কী যন্ত্রণা করে নিবেদন
উর্দ্ধ আকাশের পানে আন্দোলিয়া বিপ্লবের ধ্বজা!
কি তোমার হারায়েছে? কা'রা তব শত্রু এ জগতে?
কোন্ মহা বিচ্ছেদের স্মৃতি—
আবর্তিয়া ফেনপুঞ্জ নিরন্তর করিছে তঙ্কার
একান্ত প্রয়াস লয়ে লুপ্ত রক্ত উদ্ধারের লাগি?
বার বার ওগো সিদ্ধ, ভঙ্গুর এ পৃথিবীর বুকে
কঙ্কর বালুকাময় উষ্ণবেলা ভূমে—
উন্মাদ আছাড় যেন কহিতেছ হুঃসহ ক্রন্দনে
'দাও দাও ফিরে দাও জীবনের সর্বস্ব আমার!'

অসাম অনন্ত কুরু বেদনা তোমার
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ঝড়ে মর্ষভেদী তুলি হাহাকার,
নির্মম দৈত্যের মত চাহে যেন নধরে ডিড়িতে
আকাশের ছন্দে গাঁথা গ্রহ সূর্য্য তারকার মালা।
উৎকট প্রার্থনা তব উৎকট কামনা
পূর্ণ কেহ করিল না শুনিল না নিফল ক্রন্দন
ফিরায়ে দিলনা কেহ মঠৈশ্বর্য্য হারানো রতন।

মোরা ধরিত্রীর শিশু সামুদ্রিক হুঃখে ত্রিয়মান,
কালের ডঙ্কর শুনি নিরাশায় বক্ষ স্পন্দমান
বালুকা বেলায় তোমার ও নীল বক্ষপানে—
চেয়ে থাকি বিম্বিত বিহ্বল;
নীরবে বুকেছি মোরা কী গভীর বেদনা তোমার—
কি তোমার হারায়েছে কা'রা তব শত্রু এ জগতে
কেন এ গর্জ্জন রোল, ফেনোচ্ছ্বাস উত্তুঙ্গ লহরী.
হুরন্ত বিক্ষোভ কেন? বিশ্বধ্বংসী রুদ্ধ মূর্ত্তি ধরি'
বুকেছি বুকেছি আজ হে বিপ্লবী, মহাপাবাধার!
মনে পড়ে রক্তাকর অতীতের—জলন্ত কাহিনী,
তোমার অরতি বৃন্দ হোন চেতা তরুর বাহিনী,

হুরন্ত তেত্রিশ কোটি অদিতির স্বার্থাক্ষ সন্তান,
বৈকুণ্ঠের ধৃত্তরাজ বিষ্ণু সহ করি অভিযান,
একদা আদিম প্রাতে অতিহীন চক্রান্ত করিয়া,
মূৰ্খ যতো দৈত্যগণে লুক্ক করি অমৃত প্রদানে,
মন্দর মন্ডন দস্তে অনন্ত নাগের রজ্জুবীধি
ঘুমন্ত তোমারে বন্দী করি'—
অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল ঐশ্বর্য্য তোমার।
দেবাসুর সম্মিলিত মহাশক্তি বলে—
কী বীভৎস অভ্যাসে করেছিল তোমারে মন্ডন,
দুঃচরিত্রে দস্তা সম দ্রুত করি সর্বস্ব তোমার।

তাহাদের পাপ নাই, তাহারা যে স্বর্গের দেবতা,
সময় সুযোগ বুঝে বিপক্ষের বক্ষে দেয় বাধা,
হীন স্বেচ্ছাচারে মত্ত অহঙ্কার ললাটের টীকা
মৃত্যু নাই, জরা নাই, স্বর্গলোকে পরম্ব-জীবিকা।
যেখানে যা কিছু আছে—সুন্দর মহত,
বহুমূল্য লোভনীয় স্বজনের যা কিছু সম্পদ
ধৃত্ত তরুর মত হরিয়াছে নির্বিকার মনে
মহাসভা বৈকুণ্ঠের কূটতম রাজনীতি বলে।

দেবতার স্বর্গধামে দেখিয়াছি ওগো পয়োনিধি,
দেখেছি দেখেছি সেথা তঁব প্রেয়সীরে...
সুন্দরী ইন্দ্রিমা নিত্য তোমা' হারা ভাসে অশ্রুনায়ে
বিষ্ণু পদতলে বসি' দীর্ঘশ্বাস ফেলিছে বন্দিনী,
ক্রুর সর্পদল সেথা চারিদিকে সতর্ক গ্রহরী।
স্বর্গলোকে শুনিয়াছি বিলাসের রক্তমঞ্চ পরে
অসহায় উর্ধ্বশীর ছন্দোবদ্ধ ছুপুর নিকণ,
কামাক্ষ দেবতা অন্ধে দেখিয়াছি অপমান তা'র।
দূরে কাঁদে কলানিধি সুধাহারা মহাশূণ্য মনে
কক্ষপথে বন্দী সম আদিত্যের নিত্য ব্যাক সহি',
উচ্চৈশ্বর্য্য, ঐরাবত শৃঙ্খলিত দাসত্ব জর্জর।
হে জলধি, তব কণ্ঠে একদিন যে অমূল্যমণি

ত্রিলোকের চিত্তহরি' বিচ্ছুরিত কী অপূর্ণ জ্যোতিঃ
বিষ্ণুকণ্ঠে দ্যুতিহারা আজি সেই কৌন্তভ রতন।
আজি তব রাজবৈভব ধ্বংসস্বরী কান্দে অমরায়,
পারিজাত পুষ্পদল গন্ধহারা নন্দন কাননে
সুবুড়ির দর দর করে অশ্রুধারা।
তাই বুঝি এত ক্ষোভ, এত দুঃখ অন্তরে তোমার?
নির্লজ্জ দেবতারূপ সর্বনাশ করিয়াছে তব
হরিয়াছে গৃহলক্ষ্মী হরিয়াছে বিপুল সম্পদ,
সাগর-শকুন দল তাই করে কর্কশ চিংকার
সামুদ্রিক শ্মশানের রক্তাক্ত আকাশে।

তোমার বঞ্চিত হিয়া যে বিপ্লব করিছে ঘোষণা
উন্মাদ তরঙ্গ বাহ নিরন্তর হানি' বক্ষোদেশে,
ভীম ঝড় তুফান তুলিয়া—
ছুটিছে উদ্দাম বেগে বাধা বন্ধ হারা
অভিশপ্ত স্বর্গপুরী চূর্ণাবারে রেণু রেণু করি'।
ভীমকান্ত হে ভৈরব সর্বহারা ওগো অধুরাজ
বহিময় প্রতিহিংসা প্রজ্জ্বলন্ত দেখিয়াছি আজ
দেবজ্যোতি ভয়ঙ্কর তব মন্মথলে;
তরঙ্গে তরঙ্গে তব অগ্নিময় বিপ্লবের ধ্বজ।

বিশ্বভারত ফিল্মস লিঃ

প্রতিষ্ঠিত

কলেজ-ডি-সাইন

৪৫নং বোবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় শিখিবার
একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কলেজের নিজস্ব ষ্টুডিওতে অধ্যাপকবর্গের
পরিচালনায় ছাত্র ও ছাত্রীদের দ্বারা প্রথম চিত্রগ্রহণের
ব্যবস্থা হইয়াছে। অভিনয় বিভাগে আরও কতিপয়
ছাত্র ও ছাত্রী লওয়া হইবে।

সদস্য ৥০ আনা ডাকটিকেট (১০ আনা হিসাবে)
প্রস্পেকটাসের জন্য আবেদন করুন।

আহ্বান করিছে যেন ঘণাতরে প্রতিধ্বনীগণে—
—উর্ধ্বে বাহ আক্ষালিয়া।

সভয়ে লুকায় মুখ দূর স্বর্গে কলঙ্কীর দল,
বিশ্বের শাসক বন্দ উর্ধ্বে আজ হতচিহ্ন বল,
শুনেছে শুনেছে তা'রা হে বীরেন্দ্র তোমার গর্জন
প্রতিধ্বনি ফিরে এল তরঙ্গেরা দেয় নাই সাড়া
স্বর্গের তোরণ দ্বারে ঢাকিয়াছে কলঙ্কের মেঘ।
বিলাস ব্যসন ভূমি নন্দন কানন—
তব অভিশাপে আজ জলে পুড়ে হ'ল ছারখার,
ইন্দ্রের সে শক্তি নাই বীরবেশে বজ্র ধরিবার
বিদ্রোহ করেছে সেখা বিদ্রোহ ঘোষণা।
স্বর্গের পাষণ ভিত্তি চূনীকৃত হয়—
উদ্ধাপিণ্ড খসি' পড়ে শূণ্যে অসহায়
নীহারিকা স্রষ্টমেঘ ছিন্ন ভিন্ন দিকে দিকে ধায়।
স্তুতিত মানবশিশু শশঙ্কিত বিশ্বয় বিহবল,
বালুময় উপকূলে শুনিতেছি অশাস্ত চঞ্চল,
সম্মুখে উদ্ধামগতি, মহাক্রুদ্ধ তরঙ্গবাহিনী
লুপ্ত রক্ত উদ্ধারিতে অট্টহাস্তে করে অভিযান।
প্রতিহিংসা পরায়ণ হে উন্মাদ সমুদ্র দেবতা
শুনাও জগত জনে অমৃতের উদ্ধার বারতা!

মিডিল ম্যানের লাভ অংশ বাঁচান

সরাসরি কারখানা হইতে কিনিয়া
আমাদের পাইপটোন মঞ্জুল অর্গ্যান

এবং

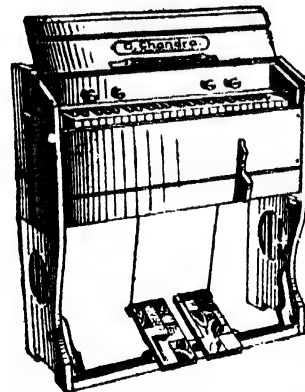
হারমোনিয়াম

—*—

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ক্যাটালগ

দাম : ৭৫ হইতে ৫৭৫



জি, এন, চন্দ্র

{ ফেক্টরী : ২৪ বাগমারী রোড
কলিকাতা

কলেজে মানবশক্তির অপব্যয়

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

“লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।”

আজকের দিনে এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না। শিশুকে করে না। লেখাপড়া শিখে কিছুই হয় না, বাংলার যুব-সম্প্রদায় এ কথাই আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে, ‘লেখাপড়া’ বলতে এখানে ইস্কুল কলেজের পড়াশুনোই বুঝি, পরীক্ষায় পাশ, ডিগ্রি অর্জন। ডিগ্রি অর্জনটাই সত্যিকারের বিদ্যাল্যভি ক্রিয়া, বাংলার হাজার হাজার বি-এ, এম-এ পাশ করা ছেলেদের (এবং মেয়েদের) মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা ক’জন পেয়েছে, সে প্রশ্ন আলাদা, যদিও আমার আজকের আলোচনার বিষয়ের একেবারে বহির্ভূত নয়।

সুবিধার জন্য আপাততঃ ধরে নেয়া যাক যে শিক্ষা আর কলেজের লেখাপড়া একই বস্তু। আজকের দিনে এই শিক্ষার কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই। ছেলে-মেয়েরা তা জানে, তাদের বাপ-মারাও তা জানেন, তাদের শিক্ষকরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও জানেন এ কথা। ‘শিক্ষিত’ যুবকদের মধ্যে বেশির ভাগই বেকার, কি বীয়ার দালাল, কি নগণ্য কেরানী, কি সামান্য ইস্কুল মাস্টার। শিক্ষিত লোকের রোজগারের রাস্তা ভয়াবহরকম সংকীর্ণ। এ কথা প্রমাণ করা বোধহয় খুব শক্ত নয় যে, একজন ভালো দরজি কি মিস্ত্রির রোজগার গড়-পড়তা শিক্ষিত বাঙালি যুবকের চাইতে বেশি তো বটেই, তা ছাড়া কাজটাও

তাদের ঢের বেশি সম্মানের। হাতের কাজ শিখলেই যে এই কৃষিপ্রধান দেশে তার মূল্য সব সময় পাওয়া যাবে তা নয়, তবু হাতের কাজের প্রতি আমাদের মধ্য-বিন্ত শ্রেণীর অবজ্ঞা এই বিষম নিষ্পেষণও দূর হচ্ছে না সেটা আশ্চর্য্য। বি-এ পাশ ক’রে পঁচিশ টাকার কেরানী হ’য়ে আমরা প্রাণপণে আমাদের ভদ্রতা রক্ষা করি।

লেখাপড়া শিখে কিছু হয় না এই চৈতন্যদায়ের ফলে কলেজে বিদ্যার্থীর সংখ্যা কিছু কি কমেছে? কমেনি, বরং দিন-দিনই প্রচণ্ডবেগে বাড়ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতিবারই গতবারের রেকর্ড ভাঙছে; জুলাই মাসে বত্মাজলের মতো ছাত্র দলে দলে সমস্ত কলেজ-বাড়ি উপচে পড়ছে। যত ব্যর্থতা, যত হতাশা, ছাত্রের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে ঠিক তারই উল্টো হারে। পাশ ক’রে কিছুই হবে না, এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যতই, ততই দলে দলে ছাত্র এসে ভিড় করছে সহরের কলেজে দূর দূরান্তর থেকে।

কেন এমন হচ্ছে,

কারণটা অবশ্য সূত্র। আর কিছু করবার নেই। ষোলো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে যত মধ্যবিন্ত ছেলে-মেয়ে, কিছুই করবার নেই তাদের জীবনে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সাধারণভাবে বি-এ এম-এ পাশ করা ছাড়া আর যে সব রাস্তা খোলা আছে তা অতি সংকীর্ণ,

এবং মিস্ত্রি-মজুরের সমক্ষে মধ্যবিন্তশ্রেণী এখনো নামতে পারছে না, কি নামতে গেলে সেখানেও প্রতিযোগিতায় টেকবার আশা নেই। যে কোনো মানুষের পক্ষে নিক্ষেপ হ’য়ে থাকবার মতো শরীর মনের এত বড়ো লজ্জাকর ব্যর্থতা আর নেই; এবং সে অবস্থা অনিবার্যরূপেই একদিন আসবে প্রত্যেক ছেলেই তা জানে। সেই দিনকে যত দূরে ঠেলে রাখা যায়, সকলেরই তা-ই চেষ্টা সেই জগ্গেই বি-এর আর এম-এ, এবং এম-এর পর ল; বাপ মরীয়া হয়ে খরচ জুগিয়ে যান। ছেলেরা বেশির ভাগ বেকার ও সেই কারণে বিবাহে অক্ষম; মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, তাই অগত্যা তাহারও কলেজে যাচ্ছে।

এতো গেলো সহরের মধ্যবিন্ত শ্রেণীর কথা। এদিকে কৃষকদের দুর্দশার ফলে গ্রামের ভূমিনির্ভর শ্রেণীর অনেক ছেলে আজকাল কলেজে পড়তে আসছে। মাটির উপর আর তাদের ভরসা নেই, ইংরিজি শিখে পেটে-ভাতে অন্ততঃ থাকতে পারবে এমন চুরাশা আছে। কলকাতার বেসর-কারি কলেজগুলিতে এরা ভিড় করে। বিনে-মাইনেতে বা আধা মাইনেতে ভর্তি হয়। অতি কষ্টে পড়া চালায়। অতি কষ্টে পাশ করে—কি করে না। এদের মধ্যে সহরে ছেলের চাইতে পড়াশুনা সম্বন্ধে সত্যতা বেশি দেখা যায়, কেননা এদের তবু কিছু আশা আছে। তবে সে আশা কোন রকমে বেঁচে থাকবার আশা মাত্র; সহরে ছেলের চাইতে অনেক খারাপভাবে থেকে

অভ্যাস বলেই সেই বেঁচে থাকার প্রহসনও তাদের মনে আশার সঞ্চার করে।

মোটের উপর, তা'হলে, পড়াশুনো করতে কোনো ছেলে কি মেয়েই বোধ হয় কলেজে আসে না। বেশির ভাগ আসে সময় কাটাতে; কেউ কেউ আসে হাল কি জাল ছেড়ে ইংরিজি শিখে পাটকলে চটকলে কেরাগী হ'তে। অবশ্য বেশীর ভাগ ছেলেরই তার চাইতে খুব বেশি জোটে না। যে অল্প ছুঁচরজন ভালো কাজ পায়, তারা বেশিরভাগ তা পায় দৈব কারণেই। ভালো কাজ পাবার জন্তে ভালো পাশ করা, কি একেবারেই পাশ করা অপরিহার্য নয়, ছাত্ররা সকলেই তা জানে। সরকারি প্রতিযোগিতিক পরীক্ষার ফলে প্রতি বছর যে কটি ছেলের সংস্থান হয় তাহাদের সংখ্যা অবশ্য আঙুলে গোনা যায়, সুতরাং তারা এই আলোচনার বহির্ভূত।

একথা নিশ্চয়ই সত্য যে কোনো কাজের আর্থিক মূল্য সামান্য, তার প্রতি মানুষ বেশিদিন একাগ্রভাবে মন দিতে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা। যে শিক্ষা স্বাভাবিক স্তর অবস্থায় মানুষের মতো বাঁচবার সংস্থানও না দেয়, তার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অগ্রগতি আশা করা উন্মুক্ততা। বিত্তশিক্ষা, বিত্তশিক্ষা শিল্প, কি বিত্তজ্ঞান—বিজ্ঞানের মতোই অলীক কল্পনা। শিক্ষিত ব্যক্তি, কি শিল্পী, কি পণ্ডিত নিশ্চয়ই মানুষের মতো জীবন দাবি করতে পারেন, এবং সেই জীবন থেকে বঞ্চিত হ'লে শিল্প, কি জ্ঞান—বিজ্ঞান অবশ্যই তাঁদের কাছে অনেকটা মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে। 'আমাদের কাজ তোমাদের লেখাপড়া শেখানো, চাকরি জোটানো নয়'; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ একথা বলতে পাবেন বটে, কিন্তু কথাটায় একটা ভয়ঙ্কর গলদ আছে। এ শিক্ষার জোরে অল্প-

সংস্থানও হবে না এ কথা ছেলেরা যখন জানে, তখন শিক্ষাতে তারা কিছুতেই মন দেয় না, তার ফলে লেখাপড়া কিছুই শেখে না—অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বাংলা দেশের গড়পড়তা বি-এ পাশ ছেলে প্রকৃত অর্থে যে প্রায় অশিক্ষিত তা যে কোনো পরীক্ষক কি চাকরি দেন-ওলা জানেন সে ইতিহাস জানে না, ভূগোল জানে না, ইংরেজি জানে না, বাংলা জানে না—সিনেমা অভিনেত্রীদের নাম ও জীবন চরিত্র ছাড়া বিশেষ কিছুই জানে না।

এতই যদি এরা অশিক্ষিত, এরা পাশ করে কেমন ক'রে? করে এই কারণে যে আমাদের পরীক্ষার ষ্ট্যান্ডার্ড অত্যন্তই নিচু। হাজার হাজার ডিগ্রিধারীতে দেশ ছেয়ে গেছে। একই নিষ্ঠুর পরিচাস যে যে-দেশে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) শতকরা ন'জন লোক নাম সই করতে পারে সে দেশেই সহরের অলিতে গলিতে ডিগ্রিওয়ালার ছড়াছড়ি! এতবেশি আছে বলে আজকাল চাকরি দেন-ওলারা যে কোনো তুচ্ছ কাজের জন্ত বি-এ পাশ চাচ্ছেন ও পাচ্ছেন। কলকাতায় দুজন বি-এ পাশ ট্রাম-কণ্ডাক্টর আছে শুনলুম। ট্রাম-কণ্ডাক্টরের কাজ অনেক কেরাগী কি মাষ্টারের কাজের চেয়ে ভাল মনে করি, কিন্তু তার জন্তে বি-এ পাশ করবার কোনো দরকার করে না। অজ্ঞাত দেশীর ভাগ কাজ সম্বন্ধেই সেই কথা। যে সব কাজ ইংরিজি অক্ষরে লিখতে পারলে কি মিশ্রাযোগ পর্যাপ্ত পাটিগণিত জানলেই করা যায়, তার জন্তে এতগুলো সময় ও অর্থের অপব্যয় কেন?

এইভাবে আমরা এখন এক অদ্ভুত অবস্থায় এসে পড়েছি, পাশ করলে কিছু হবে না, আবার পাশ না করলে কিছু লাভ হবে না; সুতরাং পাশই করো।

ছেলেরা ও মেয়েরা তাই প্রাণপণে পাশ করছে। পাশ করাই হ'লে কলেজের এই লেখাপড়ার সাধনা ও সিদ্ধি, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। প্রতি জুলাই মাসে কলেজ স্কোয়ারে নোটের জোয়ার ডাকে, ছেলে গোত্রাসে নোট গেলে, পরীক্ষার হলে বসি ক'রে দিয়ে চ'লে আসে। পাঠ্য বই খুব কম ছেলেই পড়ে। বাংলা দেশের এক মফঃস্বলের কলেজের ৪০টি ছেলে ইংরিজি অনাস' পড়ছে, অনাস' কিংলিয়র পাঠ্য, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র দু'জনের কিংলিয়র বইটি আছে, এমন শোনা গেছে। অধ্যাপকরা ক্লাশে যা বলেন তাও শোনবার দরকার করে না; নোটে, সব আছে। অধ্যাপকের কাজ পাশের দালালিতে এসে ঠেকেছে। পাশের তুচ্ছতাক বলে দেবার জন্তেই তাঁরা আছেন। সত্যি বলতে তারা না থাকলে কলেজের ঠাট বজায় থাকে না ব'লেই তাঁরা আছেন আর কোনো কারণ নেই। পরীক্ষার একশোখানা খাতা দেখলে একশোখানাতেই এক প্রশ্নের একই উত্তর পাওয়া যায়। ছেলেরা পরস্পরের খাতাটোকেনি, একই নোট মুখস্থ করেছে। নৃত্যগদ্য ও শিক্ষাধর্মের দিক থেকে এদের কাউকেই এক নম্বর দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু বর্তমান আইন অনুসারে কিছু নম্বর দিতেই হয়। এই ভাবে এরা পাশ করে।

আমাদের কলেজগুলোতে; তাই, বহু মানবশক্তির অজস্র ও অপরিমিত অপব্যয়। হাজার হাজার ছেলে কিছু না শিখে বেরিয়ে এসে বেকার বন্ডায় মিশে যাচ্ছে; শিক্ষকদের যার যেটুকু দেবার আছে কোনদিনও দিতে পারবেন না জেনে কাজটার উপরই

**হাকিম এম, এস, জামানের
গর্ভ নিরোধ বাটিকা**

আদি, অক্লিম ও বংশপরাক্রান্ত নিরোধ ঔষধ।
একবার সেবনে একবৎসর গর্ভ হয় না। মূল্য ১১।
৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীট। কলিকাতা।

অশ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে। তাঁরা উপলব্ধি করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, তাঁদের কিছু করবার নেই, কিছু শেখাবার নেই—কেন না শিখতে কেউ ইচ্ছুক নয়, যেহেতু শিখে কোনো লাভ নেই। বরং খেলাধুলোয় ভালো হ'তে পারলে তার বাজার দর অনেক কড়া। এই কারণে শিক্ষকরা একেবারেই ব্যর্থ বোধ করেন, অথচ এ-কথাও ঠিক যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে রুচিতে দেশের অনেক ভালো লোক এই শিক্ষক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁদের সঙ্গে ভালো রকম ব্যবহার করতে পারলে যথেষ্ট সামাজিক কলাগণ হয়। কিন্তু তার উপায় নেই। এদিকে যে হাজার হাজার ছেলে নোট গিলছে, আর ফুটবলের মাঠে চোঁচাচ্ছে; আর সিনেমার ঘর ভর্তি করে তুলছে—তাদের সমস্ত শক্তি শুধু যে চরিত্রের মত ব্যর্থ হ'লো তা নয়, সারা

জীবনের মতোই তারা পছন্দ অক্ষম ও নির্বোধ হ'য়ে রইলো। অথচ এদের বেশির ভাগেরই সাধারণ বুদ্ধিভুজি ছিলো; মানুষের মতো বাঁচবার আশা থাকলে হয়তো এরা লেখাপড়া কিছু শিখতো; আর মানুষের মত জীবন পেলে মোটের উপর এরা দেশের সম্পদই হত, ঋণ হত না।

ছাত্রের সংখ্যা ত বাড়ছে, ততই এই বিরাট অপব্যয়ের হার বেড়ে যাচ্ছে। পূর্বেই বলেছি এত ছাত্র পড়তে পারছে বেসরকারী কলেজগুলোর জন্তেই। এখানে বেসরকারি মানেই রুস্তিহীন। রুস্তিহীন কলেজ আজকাল সভ্যজগতে এক ভারত-বর্ষেই আছে। পৃথিবীর অল্প সব দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্রেই হয় সরকারি খরচে চলে, নয় চলে ক্রোড়পতিদের বিপুল দানে। ছাত্ররা যে মাইনে দেবে তারই উপর নির্ভর করতে হ'লে ছাত্র সংখ্যার সীমা

টানা সম্ভব নয়। এবং ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট রকম পরিমিত করতে না পারলে কোনো-রকম শিক্ষাই সম্ভব নয়।

কিন্তু এ কথা আগেই বলেছি যে শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য পাশ করা ও পাশ করানো।

প্রত্যেক কলেজে মাত্র তিনশো করে ছেলে নিতে হ'লে দেশে আরো পঞ্চাশটা অন্ততঃ কলেজ করতে হয়, এবং সে টাকা আসবে কোথেকে? তবে কি আমি উচ্চ শিক্ষা কমিয়ে দেবার পক্ষপাতী? এতো দেখাই যাচ্ছে যে, যে শিক্ষা আমরা পাচ্ছি ও দিচ্ছি তা উচ্চশিক্ষা নয়, কোনো শিক্ষাই নয়। সুতরাং কমিয়ে দিলেই বা দোষ কী? দশ হাজার ছেলেকে অশিক্ষিত করার চাইতে তার দশমাংশকে সুশিক্ষিত করা ঢের বেশি লাভের কথা। তাছাড়া,

রঞ্জিতের বিজয় বৈজয়ন্তী

গোবিন্দ আশ্রা

শ্রেষ্ঠাংশ : রাজকুমারী ও
মজহর

আলফ্রেড সিনেমায়

পূজা-প্রোগ্রাম

অছু

হিন্দী, গুজরাটী ও
ইংরাজী ভাষায়
শ্রেষ্ঠাংশ : গহর

রঞ্জিত

ভাল ছবির
অন্ততঃ
প্রতিষ্ঠান

রাজীগর

শ্রেষ্ঠাংশ : খাতুন
ও ত্রিলোক কাপুর

রঞ্জিতের হান্স-রসায়ক ছবি

দি ক্যাডি

বা বিভাল

শ্রেষ্ঠাংশ : সুনীতা দেবী
ও মজহর

শীঘ্রই আসিতেছে

তুলসীদাস

সঙ্গীত মুখর ছান্না-চিত্র
শ্রেষ্ঠাংশ : বিষ্ণুপত্নী পাগনোশ
ও বাসন্তী

চিত্র পরিবেশক :

সোনপাল, টকা ফিল্ম সার্ভিস
কলিকাতা ও রেঙ্গুন

এওতো সত্য যে, যে-রকমের কাজ পরবর্তী জীবনে তারা করবে, তাতে উচ্চশিক্ষার কোনো দরকারই করে না। বি-এ পাশের সংখ্যা কমলেই চাকরির বাজারে বি-এ পাশের চাহিদা কমবে এবং পাশ করা ছেলেরা হয়তো তাদের উপযুক্ত কাজই পাবে।

একথা অবশ্য না বললেও চলে যে, কি মেয়ে, কি পুরুষ, দেশের সমস্ত লোকেরই লেখাপড়া জানা দরকার। যে দেশে শতকরা ৯১ জন নিরক্ষর, উচ্চশিক্ষা সে দেশে আসলে কোনো সমস্যাই নয়। সাধারণ লেখাপড়া নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে যেটুকু দরকার, তা প্রত্যেক লোককে শেখাতে পারলে, তারপর উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত দুর্লভ হ'লেও কিছু এসে যায় না। কেননা সত্যি যেটা উচ্চশিক্ষা, সেটা সব মানুষের জন্ত নয়। খুব কম লোকেরই সত্যি সত্যি উচ্চ শিক্ষিত হ'বার ক্ষমতা থাকে। আর সেটা যাদের থাকে কি অন্ততঃ যাদের স্বাভাবিক বিদ্যামুরাগ ও জ্ঞানলিপ্সা থাকে, তাঁরা একবার লিখতে পড়তে শিখলে নিজেরাই নিজেদের শিক্ষিত করতে পারেন, কলেজের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এক হিসেবে বলা যায়, পৃথিবীর যত মনীষী, পণ্ডিত ও গুণী সকলেই স্ব-

শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে থাকলেও আসল শিক্ষা নিজেরাই নিজেদের দিয়েছেন। না প'ড়ে থাকলেও এসে যায় না; ইউরোপের বহু কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকের কথা জানি যাঁরা কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন নি—কেননা সে দেশে উচ্চশিক্ষা বহু ব্যয় সাপেক্ষ ও মণীষীরা বেশির ভাগই দরিদ্র সন্তান। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্ত আবশ্যিক ও বিনামূল্যে করতে পারলে অনেক সমস্যারই সমাধান হ'য়ে যায়। তখন উচ্চশিক্ষা হবে, প্রকৃতই জ্ঞান-সন্ধানী ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের জন্ত, এবং তা'হলে সেটা হবে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা। যদি আর্থিক কারণে কোনো যোগ্য ছেলে কলেজে পড়তে না পারে, তা' হ'লে শেষ পর্যন্ত তার কিছু ক্ষতি হবে না, সে কথা এই মাত্র বলেছি। যে সব ছেলেমেয়ের বিশেষ কোনো দিকে বিশেষ রকম ঝোঁক ও ক্ষমতা থাকে, উচ্চশিক্ষা শুধু তাদের জন্ত হওয়া উচিত, কেননা উচ্চশিক্ষায় লাভবান হতে তারাই শুধু পারে। উচ্চশিক্ষিত হওয়া মানেই বিশেষজ্ঞ হওয়া, এবং বিশেষজ্ঞ সব দেশে সব সময়েই অল্প লোকই হয়েন। সাধারণ

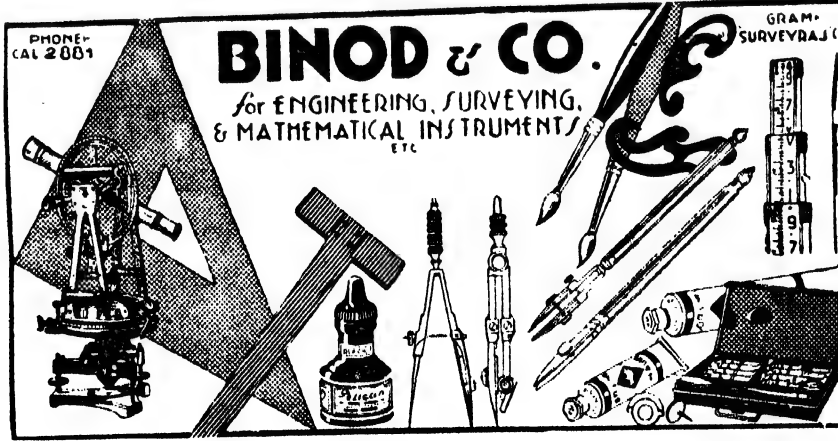
লোকের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের পরেই বিশেষ কোনো কর্মপদ্ধতির দিকে যাওয়া ভালো, যাঁরা শিল্প কি বিজ্ঞান কি বিশেষ কোনো বিজ্ঞার চর্চাতেই জীবন কাটাবেন, তাঁরা বাদ দিয়ে আর কোনো লোকেরই ম্যাট্রিকুলেশনের বেশি পাশ করবার কোন দরকার নেই (অবশ্য আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন এখনকার চাইতে টের শক্ত ও ব্যাপক হওয়া দরকার)। এই ব্যবস্থার আর একটা ফল হবে এই যে, সাধারণ লোকও পাশ করবার হুঃস্থল থেকে মুক্ত হ'য় নিজের ইচ্ছায় অনেক বেশি পড়বে ও শিখবে।

প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক ও বিনামূল্যে কথা বলা যত সোজা, কাজে সেটি হওয়া তত সোজা নয়, তা আমি জানি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতিই হচ্ছে আমাদের দেশের প্রধান শিক্ষার সমস্যা। আমি এখানে শুধু সমস্যাগুলোর উল্লেখ করলুম, কী ক'রে তাদের সমাধান হ'তে পারে, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। সমাধান নিশ্চয়ই দুঃসহ, এবং হয়তো শুধু আমূল সমাজ-শোধনের ফলেই সম্ভব।

রেডিওতে কথিত।

PHONE-
CAL 2001
BINOD & CO.
GRAM-SURVEYING (AL)

for ENGINEERING, SURVEYING,
& MATHEMATICAL INSTRUMENTS
ETC



N. I. P.

বিনোদ এণ্ড কোং

প্রসিদ্ধ জরিপ ও নক্সার
প্রযোজ্য বিক্রেতা

১৩নং ড্যাংলহাউসি স্ট্রোর ইষ্ট

মিশন রো'র দিকে—

মাটিমের অফিসের সামনে

REPAIRS A SPECIALITY



খেয়ালী

শারদীয়া

সংখ্যা

✱

মতিমহল থিয়েটারের পৌরাণিক চিত্র
“একলব্যে”-র একটি দৃশ্যে রেণুকা ও
জহর গাঙ্গুলী। জ্যোতিষ ব্যানার্জি
ছবিখানি পরিচালনা করেছেন।



মতিমহল থিয়েটারের রোমাঞ্চকর কথা-চিত্র
 “বনের বনে” সুশীল রায়, জহর গাঙ্গুলী,
 কুমার মিত্র ও শীলা হালদার। ছবিখানির
 পরিচালক হরি ভট্ট।

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের

অনবদ্য কথা-চিত্র

থ না

প্রাচীন ভারতের এক
মহীমময়ী নারীর অপূৰ্ণ
জীবন কাহিনী

স্বাদা

থ না

প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য
সংস্কৃতি ও সাধনার
চিত্তাকর্ষক পরিচয়

নাম ভূমিকায়

ছায়া

দেবী



শ্রেষ্ঠাংশে

অহীন্দ্র

চৌধুরী

কথা-শিল্পীঃ

মন্মথ নাথ রায় এম-এ, বি-এল

পরিচালক :

জ্যোতিষ ব্যানার্জী

অন্যান্য ভূমিকায় : দেববালা, সুশীল রায়, অমল
বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণা, ষ্টোরেন মুখোপাধ্যায়,
সমর ঘোষ, মনোরমা, কালী ঘোষ,
জোৎস্না মিত্র ও আকুরু।

বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

যতীশদা আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো ছিলেন, কলেজেও আমার চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং তাঁর বিয়ে উপলক্ষ্যে যতীশদা যখন আমায় নিমন্ত্রণ ক'রলেন তখন আমি সম্মত হ'লুম তা রাখতে কিন্তু বিম্বিতও হ'লুম।

আমরা পাটনা থেকে ট্রেনে উঠলুম। যতীশদার আত্মীয়-স্বজনরা মজঃফরপুরে থাকেন, তাঁরা সেখান থেকে যাবেন বিয়ের দিন। আমরা যেদিন ট্রেনে উঠলুম, বিবাহ তার পরের পরদিন। ট্রেনে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকও সে কামরায় ছিলেন। তিনি আমাকে জিগগেস করলেন, কোথায় যাবে। “খড়দহ”-বলতে, তিনি বললেন আমরাও সেখানে যাচ্ছি। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, খড়দহে কি প্রয়োজনে যাওয়া হচ্ছে? আমি জানালুম যে একটা বিবাহের উৎসবে যোগ দিতে। যতীশদা লেমনেড খেতে না পান কিন্তে গেছলেন, এসে প'ড়লেন, ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময়। গাড়ীতে উঠে ব'ললেন, বাবা, ইনি আমার বন্ধু পুলিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সঙ্গেই যাবেন আর থাকবেন। তখন বুঝলুম যে ভদ্রলোকটা যতীশদার পিতা। তিনি ব'ললেন, বড়ো ভালো হ'লো বাবা, যতীশের আর কোনো বন্ধু সঙ্গে যেতে পারলে না, তুমি আসাতে খুব খুসী হ'লুম। একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদের সাহচর্য্য যতীশের অনেক কাজে আসবে। ভদ্রলোক আমাকে যতীশদার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই ঠাওরালেন কেননা আর কেউ না এলেও, আমি

এসেছি। কিন্তু তিনি যে অজ্ঞাত গাটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেটা তখনও বুঝিনি।

পরের দিন সকালে খড়দহে পৌঁছলুম। ষ্টেশান থেকে চক্কড় ভাড়া ক'রে আমাদের জন্তে নির্দিষ্ট আবাসের অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। কন্টার পিতা শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদের ষ্টেশানে নিতে আসবেন কথা ছিল, কিন্তু আসেন নি। ননঃস্কেভের স্বত্বপাত।

গাড়ী আমাদের বাসার দিকে যাচ্ছিল এমন সময় পথের মাঝে একব্যক্তি চাৎকার ক'রে একটা বাড়ীর কাছে আমাদের গাড়ী থামিয়ে তার মাথায় কুশাসন, ডেকচি কড়া প্রভৃতি চাপিয়ে দিলেন। যতীশদার বাবা শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজে এবং যতীশদা এই ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করলেন না। যে বাড়ীতে আমাদের গাড়ী থামানো হ'য়েছিল, সেটা যতীশদার ভাবী স্বস্তুর বাড়ী আর যিনি থামিয়েছিলেন তিনি ভাবী বধুর দাদামশায়।

দাদামশায়কে আমিও গোড়া থেকে ‘দাদামশায়’ বলতে লাগলুম—দেশ মজার লোক তিনি। বাসায় পৌঁছে হাতমুখ ধুয়ে প্রচুর জলযোগ করা গেল। যতীশদার ভাবী স্বস্তুরের তখন পরীক্ষা দেখা নেই। মধ্যাহ্নে স্নানাহার সেরে আমি কলকাতা যাবার জন্তে উদ্ভূত হ'লুম। বললুম, কাল রাতে বিয়ের আগেই আসবো, কলকাতার এত কাছে যখন এসেছি, জনকায়ক বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করে আসি। যতীশদাও আমার সঙ্গে যাবার জন্তে তৈরি হ'তে লাগলেন কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যত

স্বপ্নগৃহের আপত্তি হোলো। ব্রজবাবু আমাকে ব'ললেন, বাবা পুলিন, তুমি কলকাতায় যেও না কারণ তুমি গেলে যতীশ যাবেই। আজ বাদে কাল তার বিয়ে, তাকে ছেড়ে দিতে এখানে কেউ সম্মত হ'চ্ছেন না।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হোলো আমরা কলকাতায় যাবো কিন্তু রাত নটার মধ্যে কোনো ট্রেনে ফিরবো—ব্রজবাবুও বারাসাত যাবেন ব'ললেন তাঁর কতিপয় কুটুম্বকে নেমস্তন্ন কর্তে এবং রাত এগারোটা নাগাদ ফিরবেন জানানলেন। আমরা সকলেই অনুরোধ ক'রলুম ঐ দুই সময়ে ষ্টেশানে যেন আমাদের জন্তে ঘোড়ার গাড়ী থাকে। শাবণমাস, তার ষ্টেশান থেকে আমাদের খড়দহের বাসা প্রায় দুমাইল, কাজেই এই সতর্কতা। ক'নের বাপের তখন পর্যাস্ত দেখা মেলেনি। চিন্তোন্মত্তজনার প্রথম অঙ্ক।

রাত নটায় যখন কলকাতা থেকে ফিরে খড়দহ ষ্টেশানে নামলুম, তখন মুহলধারে রষ্টি প'ড়ছে। ষ্টেশানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলুম কিন্তু রষ্টি থামলো না। খবর নিয়ে জানলুম আমাদের জন্তে কোনো গাড়ী নেই। যতীশদা ভয়ানক রুষ্ট হ'লেন। বাই হোক, পদব্রজে যখন যেতেই হবে তখন ষ্টেশান থেকে বেরিয়ে প'ড়লুম।

বর্তন ব্যপ্তন ও গুণ্য ডটিল ও কঠকব হটক মাকন
“তি টি কিউরা”
তিন দিনে নিশ্চয় কবিরে
বিলিং হোম ৫৬, গাউথ রোড, ইন্ডালী কলিকতা

বর্ষাকাল, ছাতা আমাদের দুজনের সঙ্গেই ছিল। রাস্তায় কোনো গাছতলায় এক থানা ঘোড়ার গাড়ী দেখলুম কিন্তু তার গাড়োয়ান মদে একেবারে চুরচুরে। ভাড়া যাবার কথা বলতে, সে যা জবাব দিলে, তা ছাপার অক্ষরে লেখা যায় না।

রাত দশটা নাগাদ আমরা ও বারোটা নাগাদ ব্রজবাবুর বাসায় সুসজ্জিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। তাঁর জন্তেও গাড়ী ছিল না। ক্রোধের দ্বিতীয় অঙ্ক। যতীশদা গেলেন ভয়ানক চটে, তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না তার জন্তে। বল্লেন এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না। আমি বল্লুম, মেয়েটির কি হবে? প্রত্যুত্তর হ'লো, তোমার খুসী হয় তুমি বিয়ে করো। আমি বল্লুম, যতীশদা, আমি মেয়েটিকে দেখে ফেলেছি বার দুই তিন। অতি শাস্ত্র স্তম্ভাব বলে মনে হোলো আমি যে রকম

ছটফটে মানুষ, আমার সঙ্গে ওকে মানাবে না মোটেই। আমার বৌ হবে অত্যন্ত চঞ্চল, হৈ হৈ করবে খুব। অনেকের মহড়া একা নিতে পারবে—

যতীশদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, অর্থাৎ সে হবে বীরদর্পের মেয়ে। উত্তর কর্লুম, ইয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষা নারীর প্রতি প্রয়োগ করে বলছি যে, আমি “বীরহস্তে বরমালা লব একদিন”। সে কথা থাক, কিন্তু যতীশদা তুমি চরম কিছু একটা কোরোনা। যতীশদা কিছুতেই নরম হ'তে চাইলেন না। বল্লেন, এরা আগাগোড়া আমাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা করেছে, কোনোমতেই এবাড়ীর মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না।

রাত বারোটায় কাস্তিাবুর দেখা পাওয়া গেল। বেচারী কোনো পাটকলে চাকরী করেন, সেখানে দারুণ একটা হান্সামার

সম্ভাবনা ছিল বলে তিনি আটকে ছিলেন, আসতে পারেন নি তাঁকে সব কথা বল্লুম। তিনি ব্রজবাবুর শরণাপন্ন হ'লেন, কিন্তু বরকর্তা জানানলেন যে তিনি তাঁর ছেলেকে ভালো ক'রেই চেনেন, তার ইচ্ছে না থাকলে, বিয়ে করবার জন্তে জেদ তিনি ক'রবেন না। দাদামশায়, বাড়ীর মেয়েরা সকলের কানেই পৌঁছল যতীশদার কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা। মেয়েরা লাগলে কাঁদতে, পুরুষরা বল্লেন মাথায় হাত দিয়ে।

তারপর আমাকে তাদের দিক থেকে কাতর মিনতি করা হোলো, যেমন ক'রে হোক এ বিপদ থেকে তাঁদের উদ্ধার ক'রতে। কনের মা সাক্ষ-নয়নে আমাকে বল্লেন, বাবা তুমি আমার সম্ভানের মতো, আমার মর্যাদা রক্ষা করো। 'কাস্তি বাবু, দাদামশায় সকলেরই ঐ কথা।

জার্মান চিকিৎসকের নূতন আবিষ্কার

২১দিনে পুরুষত্ব হানি ও ১৪দিনে শাহুদৌর্বল্য

সেক্সটোনা (Sextona) সেবনে আরোগ্য হয়। ইহা (Monkey Gland Injection) এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। গ্রাণ্ড হরমোন (Gland Hormone) সংযোগে প্রস্তুত বলিয়া, ইহা অল্পদিনের মধ্যে বৃদ্ধকে যুবা করে ও যুবককে দ্বিগুণ শক্তিশালী করে। ইহা বুক ঝড়ফুড করা, মাথাধরা বা ঘোরা, ক্ষুধিহীনতা, অনিদ্রা, রক্তহীনতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, স্বপ্নদোষ ও ইন্দ্রিয় শৈথিল্যের অব্যর্থ মহৌষধ। বহু চিকিৎসক ও রোগীর দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ইহা যৌন চিকিৎসায় বৃদ্ধান্তর আনিয়াছে। ভারতবর্ষে এই নূতন। ১৫ দিনের সেবনোপযোগী ৪৫টি ট্যাবলেট পূর্ণ এক ফাইল সেক্সটোনার (Sextona) মূল্য ২৫০/০, মাণ্ডল ১০। তিন ফাইল একত্রে লইলে মাণ্ডল লাগে না।

উচ্চ কমিশনে মফঃস্বলের সর্বত্র এজেন্ট আবণ্ডক।

ডাকে ঔষধ পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডো-জার্মানিক ড্রাগ কোং

(ডিপার্ট কে) পোস্ট বক্স ১১৪৫২, কলিকাতা।

Indo Germanic Drug Co (Dept. K) Post Box 11452, CALCUTTA

ষ্টকিষ্ট (Stockists): এ. সি. কুণ্ডু ১৬৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, চাঁদনী চক. কলিকাতা।

“আনন্দময়ীর আগমনে

আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে”

এ আনন্দে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারিবেন ত?

জীবন বীমা করিয়াছেন কি?

না করিয়া থাকিলে,

অতুই পত্র লিখুন।

ইউনিক এসিওরেন্স

কোম্পানী

হেড অফিস :

১০নং ক্যানিং ষ্ট্র

কলিকাতা।

পূর্ববঙ্গ শাখা :

৪০-৪১ বাঙ্গলাবাজার

ঢাকা।

যতীশদা আমাকে বলেছিলেন, আবার যদি তাঁকে বিয়ে করবার কথা বলি তো তিনি সোজা বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে যাবেন। সমস্ত পরিবারের কাতরতা দেখে, তা সত্ত্বেও আমি তাঁকে আর একবার দ্রব করবার চেষ্টা করলুম। মাধবিকার দিক থেকে কথা কইতে, অনেক কষ্টে তিনি অবশেষে বিয়েতে সম্মত হ'লেন কিন্তু এক সন্তে। সেটি হ'চ্ছে এই, যে, সম্প্রদানের সময়, পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে তাঁর স্বস্তরকে বেশ কড়া কড়া চ'চারটে কথা শুনিতে দিতে হবে।

শুভ সম্বাদটা সকলকে দিতে, আমার প্রতি তাঁদের প্রশস্তি উচ্চারিত হ'লো শতকণ্ঠে। আমার খাতির অসম্ভব রকমের বেড়ে গেল। মাধবিকাকে আমি বৌদি এখন থেকেই ব'লুতে আরম্ভ করেছি। প্রকাশ করা বাহ্যিক যে মাধবিকা যতীশদার হবু জীর নাম। সেদিন রাত ছুটো পর্যন্ত এই সব কাণ্ড-কারখানায় কেটে গেল—কাজেই পরের অর্থাৎ বিয়েরদিন সকালে সাতটার আগে আমার ঘুম ভাঙলো না। দাদামশায় এসে ব'ললেন ভায়া মুখহাত ধুয়ে ফেলে একটু চা-টা খাও। আমি প্রাতঃস্নাত্য সেরে দাদামশায়কে ব'ললুম 'টা'-র আর দরকার নেই একটু চা যদি আনিতে দেন তো ভালো হয়। তিনি ব'ললেন, তোমার এখানে সর্বত্র অব্যবস্থিত দ্বার, তুমি অত্যন্ত কুষ্টিত হ'য়ে কথা ব'লছো কেন, আর তোমাকে আবার চা আনিতে দিতে হবে কেন? সোজা ভিতরে চ'লে যাও, তোমার সঙ্গে অস্ত্রপরিষ্কারা সকলেইতো কথা ক'য়েছেন, সামনেও বেরিয়েছেন, বলোগে "আমার চা কই"? আমি ইতস্ততঃ ক'রছি দেখে ব'ললেন অস্ততঃ অন্তরমহলের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে 'খুকী' ব'লে ডাকতে পারবে তো? সে এলে তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা ব'লো,

তোমার আর কিছু ভাবতে হবে না। তা-তে আমি রাজি হ'লুম, ছ-সাত বছরের একটি মেয়েকে ডেকে চা চাইতে নিশ্চয় সঙ্কুচিত হবো না। খুকীর আর তার চেয়ে কত বেশী বয়েস হবে!

কিন্তু ঐ নামের সাড়া-স্বরূপ একটি বছর পনেরোর মেয়ে এলো। আমি সলজ্জ ভাবে ব'ললুম, খুকীকে একবার ডেকে দেবেন? সে খুব খানিকটা হাসলে, তার পর ব'ললে, পুলিনদা আমারই ডাক নাম 'খুকী', আমার ভালো নাম কুসুমিকা। অপূর্ণ সুন্দরী কিশোরী, ঐ নাম তারই সার্থক—সে যেন জীবন্ত পারিজাত পুষ্প। আর কি সপ্রতিভ! কাল রাতে হয়তো আমাকে দেখেছে কিন্তু আমি তাকে নজর করিনি, কথাতো তার সঙ্গে কই-ই-নি। অথচ একেবারে কত যেন আপন্যার, পুলিন-দা! এসো চা আর খাবার দেওয়া হ'য়েছে যে তোমার। আমি 'আপনি' ব'লুছি না ব'লে রাগ কোরোনা যেন, ওরকম পরের মতো সম্বোধন আমি কাউকে ক'রতে পারিনা।

হিজ মাস্টার্স ভয়েসের
মেসিন ও রেকর্ড এবং
হিন্দুস্তান, কলম্বিয়া,
সেনোলা, গ্রামোফোন
রেকর্ড সর্বদা প্রচুর
পরিমাণে বিক্রয়ার্থ
মজুত থাকে।



৬ শারদীয় উৎসবের
শ্রেষ্ঠতম ও
অপরিহার্য
অঙ্ক

তালিকার জন্য
পত্র লিখুন।

দি
শিয়ালদহ গ্রামোফোন মার্ট।

ফোন বি, বি, ১২৭২। ১৬৫ বহুশাজার স্ট্রীট কলিকাতা। ফোন বি, বি, ১২৭২

তারপর আমাদের খুব ভাব হ'য়ে গেল এক সঙ্গে কাজ ক'রে। আসর সাজানো থেকে সব গোছ-গাছ করার ভার দাদামশায় ও কান্তিবাবু আমাদের উপর দিলেন। রাতে মেয়ে পুরুষদের পরিবেশন করার কাজটা নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হ'লো আমাদের দুজনেরই সম্মিলিত নৈপুণ্যে। পান-সাজা প্রভৃতি অমুরূপ কাজ কুসুমিকা একাই করলে। অদ্ভুত কস্মদক্ষতা ঐ মেয়েটির। মা (যতীশদার ভাবী শাশুড়ীকে মা ব'লুছি) আমাদের দুজনকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। সকলের মুখেই আমার সুখ্যাতি। কেবল যতীশদার স্বগ্রামের আত্মীয়রা আমার উপর খুসী ছিলেন না। তাঁরা ভাবলেন, ভালোরে ভালো, আমাদের কেউ তেমন খবরও নেয়না অথচ এ কোণাকার কে এসে এ বাড়ীতে বেশ জমিয়ে নিয়েছে দেখছি।

কান্তিবাবুকে ব'লে রেখেছিলাম সম্প্রদান স্থলে আপনাকে আমি এই এই ব'লবো যতীশদার সর্ভানুসারে, আর আপনি এই এই ব'লবেন। অতএব আমি পাঁচজন

আমাদের বিশেষত্ব—
বাজার অপেক্ষা মূল্য
মূল্যে সকল প্রকার
বাহ্যবস্ত্র ও গ্রামোফোন
ইত্যাদি অতি সুন্দর-
রূপে মেরামত করা
হয়।



ভ্রলোকের সামনে তাঁকে উদ্দেশ্য করে ব'ললুম, আপনি যে রুচি আচরণ করেছেন তা'তে আমাদের উচিত বর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমার শেখানোমতো যতীশদার স্বপ্নরমশায় ব'ললেন, আমি তার জন্তে মাথা নীচু করে ক্ষমা চাইছি ইত্যাদি। সবগোল গেল চুকে। যতীশদা ব'লে রেখেছিলেন বাসরঘর থেকে কোনো ছুতো ক'রে তাঁকে বাইরে আনতে, নয়তো সারারাত তাঁকে গুমতে দেবেনা কেউ। আমি তদন্তযায়ী ঘণ্টাখানেক পরে তাঁকে ডাকতে গেলুম। কিন্তু মেয়েরা সবাই বললেন এই একটা রাত তাঁদের, এতে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব। যতীশদা বাইরে একবারটি আসতে, তাঁকে সে কথা জানালুম। তিনি স্বভাবতঃই অল্পভাষী, শুধু ব'ললেন 'তা বটে'। ব'ললুম বৌদিকে দেখবার ফলে তাঁর গুমোবার প্রস্তুতিটা অন্তর্হিত হ'য়েছে। কুসুমিকার মতো না হ'লেও, বৌদি শ্রীমতী এবং লাভণ্যময়ী।

বধু-বর যাবার সময় এলো। যে যতীশদা স্বপ্নর বাড়ীর সকলের উপর ক্রোধবৃত্ত হ'য়েছিলেন, দেখলুম যে তিনি কান্তিবাবু আর দাদামশায়ের সঙ্গে কি একটা গভীর আলোচনায় যথেষ্ট সময় অতিবাহিত ক'রুছেন। তাঁদের ঘনিষ্ঠতা দেখে সত্যিই খুসী হ'লুম। যেদিন সন্ধ্যার গাড়াতে আমরা ফিরবো, সেই দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর যতীশদা ব'ললেন, পুলিশ, তোমার মস্ত অনুরোধ আমি রেখেছি, আমারও একটা বিশেষ অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে। আমি অবাক হ'লুম। যতীশদা এত কথা এক সঙ্গে প্রায়ই বলেন না। কি অনুরোধ জানতে চাইলুম। তখন তিনি ব'ললেন, এ বাড়ীর সকলের একান্ত কামনা তুমি কুসুমিকাকে বিয়ে করো। আমার শালী দেখতে খারাপ নয়, তোমার অযোগ্যও নয়।

আমি প্রথমটা কিছু ব'লতে পারলুম না, ভাবলুম আমার মনের কথা কোন্ বিধাতা যতীশদা ও আর সবাইকে জানালেন? পরে ব'ললুম, যতীশদা সেদিন আর নেই যে, একজন শিক্ষিতা কিশোরীর ঘাড়ে জোর করে কাউকে চাপিয়ে দেবে। কুসুমিকা যদি আমাকে বিয়ে ক'রতে না চায়! যতীশদা জানালেন মেয়েদের মধ্যে এ সম্বন্ধে বহু আলাপ হ'য়েছে এবং তাঁরা বুঝেছেন যে কুসুমিকা তোমাকে স্বামীত্বে বরণ ক'রতে উন্মুখ। অনেক কথা কাটা-কাটির পর, ব'ললুম, আচ্ছা রাজি আছি কিন্তু তোমার মতো একটি সর্ভ করছি এই যে, কুসুমিকা নিজে আমাকে সে কথা বলবে। যতীশদা বোঝালেন, যে কোনো কিশোরী অমন প্রস্তাব আপনা হ'তে ক'রতে কুণ্ঠিত হবে। আমি জবাব দিলুম, তবে আমার সম্ভব হবে না তাকে গ্রহণ করা। কুসুমিকাকে আমরা কেউ ঠিক চিন্তে পারিনি।

অপরাজে কুসুমিকা আমাকে ভিতরের কোনো ঘরে ডেকে নিয়ে গেল চা ও খাবার খেতে। সে ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি ব'ললুম, কুসুমিকা, আজ চ'লে যাচ্ছি, আমার জন্তে তোমার কি একটুও মন কেমন ক'রবে না? সে 'না' ব'লতে নিস্ক্রিয় হ'লুম। আমার ভাব দেখে, অতঃপর সে নিজেই ব'ললে, আমি-ও যে তোমার সঙ্গে যাবো, মা, বাবা, দিদি দাদামহাশয় সবাইকে ব'লেছি।

তাতে হয় না কুসুমিকা, এমন ভাবে কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে তোমাকে তাঁরা যেতে দেবেন কেন?

মেয়ে মানুষ যদি পুরুষ মানুষের সঙ্গে যেতে না-ই পারে, তবে যতীশবাবুর সঙ্গে দিদি যাচ্ছেন কি করে?

কী বুদ্ধি! স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে যখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে।

তা-হলে দিনকতক পরেও তো অন্ততঃ যাবো।

তোমার কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারছি না। কেন আমি কি তোমার বৌ হবার যোগ্য নই? আমাকে গ্রহণ ছুঁমি ক'রতে কি পারবে না?

কুসুমিকা, এমন সৌভাগ্য হ'লে বর্তে যাবো। আমি শুধু ভাবছিলাম, আমার মতো লোক কি? -

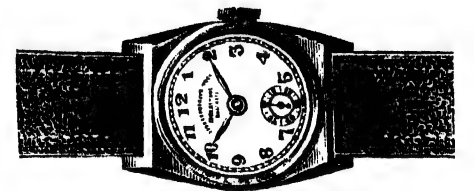
কুসুমিকা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, দম্পত্যের কলহটা বিয়ের আগে থেকেই চ'লবে নাকি!

'কুসুমিকা' ব'লে পুনরায় ডাকবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে বৌদি এসে ঢুকলেন। তিনি যে আড়ি পেতেছিলেন, টের পাইনি। বললেন, পরম্পরের বিনয় প্রকাশের পালাটা আপাততঃ রেখে, দুজনে এস ঘরের বাইরে। এই মঙ্গলবার্তা সকলকে দি-ই আর তোমাদের নিয়ে আমরা একটু আমোদ আশ্বাদ করি।

আমরা দুজনেই বৌদির অনুসরণ ক'রলুম। বৌদি যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কি বলে ডাকবে—ঠাকুরপো না জামাইবাবু?

আমি ব'ললুম, যতীশদার বাড়ীতে, ঠাকুরপো আর এ বাড়ীতে, জামাইবাবু।

রিফটওয়াচ, মূল্য ৩০ টাকা



যে ঘড়ি অল্প ২০ টাকা মূল্যে কিনিবেন, তাহাই আমাদের নিকট ৩০ টাকায় কিনুন। হাইলারলাও হাইজের সরাসরি ঘড়ি আমদানী করিয়া আমরা এইরূপ কম মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। নিজে আসিয়া দেখুন। ৩ বৎসর গ্যারান্টি। সর্বত্র ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। মাসুল স্বতন্ত্র।

মিডল্যাণ্ড ওয়াচ কোং

২১এ, চিত্তামনি দাস লেন, কলিকাতা। (১২)

বিশ্বপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের ছায়া সর্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া এতাবৎকাল আর কেহ সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েন নাই। একাধারে নাট্যকার, কবি, সাহিত্যো হাসির, বিজপের, কশাখাতের রাজা, সুরকার (composer) দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অগ্নায়ু জীবনে ও কঠোর দাসত্বের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রস পরিবেশন করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা অবলীলাক্রমে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বিশ্বপ্রেমিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলাল বড় কবি ছিলেন, ময় কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন যে কাব্যের নয় রসকে এক আসরে পরিবেশন করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত ইতিপূর্বে অত্বে কোন কবি সাহসী হয়েন নাই। তিনি বঙ্গভাষায় এক নূতন শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা তাহার গতিশক্তি। দ্বিজেন্দ্রলাল ও কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ব্যতীত বোধহয় অতি অল্প কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বহু বঙ্গবর্গ ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনুযোগ অভিযোগ করা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্য লেখেন নাই। তিনি বলিতেন “যে দেশে রবীন্দ্রনাথের ছায়া কবি জন্মেছেন সে দেশে আর কবির প্রয়োজন নেই—নাটকে একেবারে লোক

নেই আর যারা কবি তাঁরা বড় নাটককে Seriously নেন না—আমি সেই দিকে চেষ্টা করি—বঙ্গ সাহিত্য, নাট্যমন্দির সমৃদ্ধ হবে।” দ্বিজেন্দ্রলালের এরূপ বিচার সমর্থন করা সম্ভব, কারণ নাট্যমন্দির ও সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হইয়াছে সে বিষয় এখন সন্দেহ করার উপায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হইয়াছে ১৯১৩ সালে এবং ১৯৩৮ সালেও যদি লক্ষ্য করা যায় “সাজাহান” বা “চন্দ্রশুপ্ত” বিশেষ সমারোহে আজও অভিনীত হইতেছে ও বঙ্গের বিভিন্ন প্রতিভাশালী নট একই ভূমিকা যথা “সাজাহান” বা “চাণক্য” বা গুরুজ্যেষ্ঠ বিভিন্নভাবে অভিনয় করিয়া নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন যেরূপ Shakespeareএর Hamlet বা Loan বিখ্যাত অভিনেতা Irving বা Tree অভিনয় করিয়া বিলাতে নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তখন সমালোচককে স্বীকার করিতে হইবে যে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক আজও সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ উভয়কেই সমৃদ্ধ করিয়াছে।

সত্য বটে যে আজকাল অধ্যাপক সমালোচকের লেখায় বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত বঙ্গভাষা ইতিহাসে হয়তো দ্বিজেন্দ্রলালের নাম উল্লেখ করা ব্যতীত কোন সমালোচনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সমালোচকের বা আধুনিক লেখকের বিরাট ওদাসীমুখ থাকা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের

সৃষ্টি আজও জীবিত আছে ও জীবিত থাকিবে। তথাকথিত বঙ্গভাষার ইতিহাস হয়তো বিশ্বস্তির গর্ভে নিমজ্জিত হইবে—কি হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাবলীর মধ্যে এবং প্রত্যেক রচনার মধ্যে পৌরুষ বর্তমান। তাহা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে “আমরা মানুষ নহি, মেঘ”—বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে যেরূপ স্বদেশ-প্রেম ফল্গুনদীর ছায়া প্রবাহিত, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার মধ্যেও তাহাই দৃষ্ট হয়। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যিকারের উত্তরাধিকার সাহিত্যের মধ্যে কাহারও থাকে তো দ্বিজেন্দ্রলালেরই তাহা। পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান (বিশেষতঃ সঙ্গীতে, সাহিত্যে স্বদেশ-প্রেমে ও কাব্য বা সাহিত্যে নীতি বিষয়ে)।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম যুগের নাটক রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস দেশকে স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। যে হিন্দু মুসলমান লইয়া আজ সারা ভারতে বিরাট সাম্প্রদায়িকতার ঝড় প্রবাহিত, সেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহাতে ঐক্য স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা দুর্গাদাস নাটকে লক্ষিত হয়। হিন্দু মুসলমান চরিত্র সৃষ্টিতে তাহার কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছিল না—রাণাপ্রতাপে মেহেরউল্লিসা, দৌলতউল্লিসা, দুর্গাদাসে রাজার চরিত্র নারীর পুত্র পবিত্র মহিমায়িত শিখরে মণ্ডিত। এদিকে রাণাপ্রতাপের চরিত্র আদর্শ চরিত্র হইলেও সম্রাট আকবরও যে মহৎ ছিলেন তাহা কবি সুন্দর ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া রাণাপ্রতাপের ভাই হইয়া; শক্ত সিংহ বিদ্রোহ বশে যে মেবারের সর্বনাশ করিলেন তাহাও দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। দুর্গাদাসে দুর্গাদাস আদর্শ চরিত্র হইলেও দিলীর গা ও কাশিমের চরিত্র দুর্গাদাস অপেক্ষা কোন

অংশে নিষ্কষ্ট নহে। ঔরংজেবের চরিত্র চিত্রনে দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক সময়ে ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়া ঔরংজেবের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সে শ্রদ্ধা সমর সিংহের মুখে দুর্গাদাস নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল উপরোক্ত নাটকে স্বদেশপ্রেমকে সঞ্জীবিত করিলেও তাঁহার বিশ্বপ্রেমের উপর প্রথম হইতেই আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। এস্থলে রবীন্দ্র নাথের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য দেখি। রাণা-প্রতাপে মোশী তাঁহার স্বামী কবি পুথিরাজকে বলিতেছেন “এমন কাব্য লেখো, যা প’ড়ে ভাই ভাইয়ের জন্ম কঁাদে, মনুষ্য মনুষ্যত্বের জন্ম কঁাদে। এমন কবিতা লেখো যার গভীর সঙ্গীত বিরাট বজ্রাব মতন আর্ঘ্যাবর্ত ছেয়ে প’ড়ে।” রাণাপ্রতাপের কন্ঠা ইরা রাণাপ্রতাপকে বলিতেছেন “না বাবা পৃথিবীই একদিন

স্বর্ণ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার প্রীতি ও ভক্তি বিরাজ করবে, সে দিন অসীম অনন্ত প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে প’ড়বে, সে দিন স্বার্থ-ত্যাগেই স্বার্থ লাভ হবে”। অতঃপর ইরাই বলিয়াছেন “সম্রাট মনুষ্যত্ব খুঁয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হ’ন, হোন—তাকেও যেতে হবে! চিতোর তাঁর সঙ্গে যাবে না, কিন্তু মনুষ্যত্ব-টুকু সঙ্গে যেতো। আমার দেশ। আমার নিয়ে দিবারাত্র এ ভাবনা—এ দৃন্দ কেন মা? পৃথিবীতে “আমার” কি আছে বাবা?” এ বাণীই পশ্চাৎ মেবার পতনে “গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ”-এই মহাসঙ্গীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দেশ-হিতৈষণা এই বিশ্ব-প্রেম এই মনুষ্যত্ব—দ্বিজেন্দ্রলালই বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যে প্রথমে যোজনা ও পরিপূর্ত করিয়া বাঙ্গালা

নাট্যসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য মন্দিরে অপ্রত্যাশিতরূপে অতি উচ্চ স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া চিরতরে বঙ্গবাসীর নিকট নমস্ত হইয়া আছেন।

মেবারপতন নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন “মজ্জিচি অস্তান্ত নাটক হইতে এই নাটকের একটা পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমার অস্তান্ত নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অল্প কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ চরিত্র, বাণা-প্রতাপ সিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয় চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ চরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারী চরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম। আবার তারাবাদী ও মুরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। তদভিন্ন সে ‘নাটক-গুলিতে অল্প কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এই নাটকে আমি একটা মহানীতি

মুখ
বদলাবার
মুখ হবার
মনে রাখবার মত
টাকা ও সুবাসে
৩রা ভারতীয় চ।

মধ্যাহ্নের
মুতসজীবনী,
নিত্য মৈমন্তিক
জীবনের অপরিহার্য
অঙ্গ

ট . সে . র . চা

এ, টস্ এণ্ড সন্স
প্রসিদ্ধ চা ব্যবসায়ী
কলিকাতা ও রেজুন

- বিশুদ্ধ
- তৃপ্তিদায়ক
- মনোরম
- পানীয়

চিত্র জগতের মুকুটমণি

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচারসে'র

* অনন্ত অবদান *

অভিনয়

অভিনয়

: পরিচালক :

মধু বসু



: কথা ও কাহিনী :

মন্মথ রায়



শ্রেষ্ঠাংশে :- সাধনা বসু

— বিভিন্ন ভূমিকায় —

অমল চৌধুরী, প্রীতি মজুমদার, প্রতিমা মুখার্জী
তুলসী লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সত্য মুখার্জী

আমীর ভালবাসায় সন্দ্বিহান হয়ে মনিষা আমীর গৃহ ত্যাগ করে—
কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে তার আমীর কাছেই টেনে নেয়—
কিন্তু পরিণতি তার হ'ল চোখের জলে, ইহাই জীবন-নাট্যের অভিনয়

রূপবানী চিত্রগ্রহে চলিতেছে

: একমাত্র পরিবেশক :

এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটস'

ভারত ভবন, কলিকাতা

আসিতেছে !

আসিতেছে !!

আনন্দ পিকচার্সের নুতন

সামাজিক চিত্র

≡পি জ লা≡

শ্রেষ্ঠাংশে :- ইন্দিরা ওরাদকার

এক পতিতার করুণ কাহিনী

আপনার মনকে ভাবাইয়া তুলিবে

*

*

*

*

চিত্রজগতের বিস্ময়=====

চন্দ্রশেখর

পরশমণি

=====আপনার চিত্র-গৃহে লাভবান হউন=====

বিদ্রোহী

আলিবাবা

বান্ধালী

পায়ের ধুলো

সোনার সংসার

চাঁদ সওদাগর

পথের শেষে

শশিনাথ

হালবাংলা

=====একমাত্র পরিবেশক=====

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটরস

ভারতলক্ষ্মী ও মের্টোপলিটান পিকচার্স হবির একমাত্র পরিবেশক

ভারত ভবন, কলিকাতা

লইয়া বসিয়াছি।—সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিন চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য-প্রেম, জাতীয়-প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের যুগ্ম রূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীৰ্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সৰ্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। আমি হইতে বতদূর প্রেমকে ব্যপ্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। সে ঐশ প্রেম এখানে দেখান হয় নাই, নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।—বসন্তঃ “কিসের শোক করিস তাই আবার তোরা মানুষ হ” গানটা শুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের কেন জগতের জাতীয় সাহিত্যের একখানি অবিদ্যমান স্বর্গীয় সঙ্গীত—সৰ্বজাতির অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র।

বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এক নবযুগের প্রবর্তনা করিয়া গিয়াছেন। কি হাসির গান, কি ব্যঙ্গ কবিতা। কি প্রহসন, কি নাট্য-কাব্য, কি নাটক—সাহিত্যের যে যে বিভাগে দ্বিজেন্দ্রলালের অতুল প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছে—সৰ্বত্রই তিনি তাঁহার বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছেন। সৰ্বত্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্তক, সৰ্বত্র তিনি স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ, সৰ্বত্র তাঁহার প্রতিভা গিরিনদীর জায় স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে আপনার পথ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব অত্রভেদী। তাবের দ্বাবনে সে বিরাট ব্যক্তিত্ব ভাসিয়া যায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের দোষ ত্রুটি গুণ সমস্তই তাঁহার এই বিশিষ্টতা হইতে উদ্ভূত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার সামান্যই আলোচিত হইয়াছে—দ্বিজেন্দ্র লালের জীবিত কালে তাঁহার অনেক সাহিত্যিক অধ্যাপক বহু আসিয়া নাটকের অভিনয় দেখিয়া অনেক মতামত

প্রকাশ করিতেন। বিখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ৮ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ইংরাজী সাহিত্যের দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিলেও চাক্য বা সাজাহানকে মহানাট্যকার Shakespeare এর যে কোন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সহিত তুলনা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে স্বকীয় নাটকের সৰ্ব্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচক ছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত নাটক চিরদিন আদর পাইবে, আর পাষণী, মেবারপতন ও নূরজাহান দেশ অগ্রসর হইলে আশাতীত আদর পাইবে। সাজাহান চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কবির ভবিষ্যদবাণী আজও অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে—দেশ অগ্রসর কবে হইবে এখনও বোঝা কঠিন। যখন দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বাংলার লোককে সচেতন করিতে আজও দ্বিজেন্দ্র লালের বাণীরই পুনরুক্তি করিতেছেন—

“তোদের মধ্যে ভণ্ড যে,

তাহারে দূর করিয়া দে

সবার বাড়া শত্রু সে,

আবার তোরা মানুষ হ”

(মেবার পতন)

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাবলী বহুপূৰ্ণে হিন্দী, গুজরাটী, উর্দু, মালাসলাম তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

মানুষ হওয়া ব্যতীত জাতি স্বদেশকে ভালবাসিতে পারে না বিশ্বপ্রেমের মহিমায় নিজেকে মহিমাযিত কল্পনা করিতে পারে না—। দ্বিজেন্দ্রলাল কত বড় কবি, কি কত বড় সমালোচক, কি কত বড় নাট্যকার তাহা বিবেচনা করিবার সময় এখনও বোধ হয় আগত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মহিমায় আজ দেশ সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন ও কবি আজও বর্তমান। দ্বিজেন্দ্রলাল আজ পঁচিশ বৎসর পূৰ্বে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল দার্শনিক কবি বঙ্গের অদ্বিতীয় নাট্যকার হইলেও সর্বোপরি তিনি ছিলেন যুগ প্রবর্তক, সংস্কারক ও নীতি-প্রচারক—খি টলষ্টয়, রোমা রোলার ও Bernard Shawর জায়। একাধারে বিরাট পাণ্ডিত্য ও অসামান্য কবি প্রতিভার এইরূপ সম্মিলন সাহিত্য জগতে বিরল। তিনি কি নাটক, কি প্রহসন, কি ব্যঙ্গ বা হাসির কবিতাতে বাঙ্গালী বাহাতে সত্যি-কারের মানুষ হইয়া দেশকে, জাতিকে, সমগ্র বিশ্বকে ভালবাসে তাহাই প্রচার করিয়াছেন। বিখ্যাত সমালোচক Morley সাহেব Carlyle সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে অন্যায়সে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

Morley said, “Carlyle was not only one of the foremost literary figures of his own time, which is comparatively a small thing, but one of the greatest moral forces for all time”

আপনাদের সেই চিরপরিচিত
সুস্বাদু এবং চিন্তাকর্ষক

এক্সেলের পূজা-রেলু কনসেসন্ চা

১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই অক্টোবর
পর্যন্ত প্রতি পাউণ্ড নিট ৯/০ আনায়
বাজারে সর্বত্র পাইবেন।

এক্সেল টী কোং : রেচুন ব্রাঞ্চ

৩৮, ব্রাণ্ড রোড : ২০১ ফ্রেজার স্ট্রীট

শান্ত

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকুমার ঘোষ

সমুদ্রতল কথা কহে ওগো, তোমার বক্ষপুটে,
তাই বাজে বৃষ্টি গভীর-রবে-সাগর গাছিয়া উঠে।
শুভ শুভতা তোমার অঙ্ক—
উঠে এলে তাই ছাড়িয়া পঙ্ক,
ওগো সাগরিকা, সাগর ত্যজিয়া নগরের কোলে এলে—
আমরা তোমায় করিব বরণ, হৃদয়ের শিখা জেলে।
যত কুমারীর রক্ত-অধরে এলে চুখন লোভে
তুমি যে সাগরী, তাই তো তোমাতে কোমলতা নাহি
শোভে।

দেব দেউলে বা তুলসীতলায়,
তব আবাহনে যে শুভ ঘনায়—
গভীর না হ'লে সে কি যেতে পারে দেবতার পদতলে।
সে ধ্বনি কভু কি ঠাই পেত তবে শ্রীচরণ শতদলে।

বিবাহ বাসরে তব ইঞ্জিতে শুচিতা সূচিত হ'ল—
দম্পতি বুকে তব শুভধ্বনি চিরদিন পাকা হ'ল।
নব জীবনের হে সেতুবন্ধ,
সুরাসুর-নর-বীরের বন্দ্য—

গুণে গুণে থাকি মনিবন্ধনে, নারীকে শ্রীমতী রাখো—
শক্তিরূপিণী রমনীর তুমি সিঁহর বজায় রাখো।

দ্বাপরে একদা পাঞ্চজন্ত ঘুচাইল অবসাদ,
ক্লৈব্য প্রাপ্ত অর্জুন-কানে ধ্বনিলে রণ-নিদাদ।
বিশ্বপিতার গীতার গীতালি।
বীর্যের সাথে তোমার মিতালি—

মহাভারতের দেবতা পার্শ্ব, বীর হ'ল তব হাঁকে
পার্শ্ব সারথি সার কথা ক'ন তোমার ঠোঁটের কাঁকে।

সব শুভ আর শুভতা নিয়ে এইবার তুমি এসে,
রমণীর কর শোভি দেখা দাও—পাঞ্চজন্ত বেশে।

হাঁতে শাঁখা থাক, মুখে থাক শাঁখ
বীর বিক্রমে দাও তুমি ডাক—
রমণী-মস্তে হউক বিজয়ী, সব নর দেশে দেশে—
রমণী-শঙ্খ-ধ্বনিতে দুর্দাদাক পতাকার তলে এসে।

বাঁশীতে আজ তুলবো আমি সুর

বন্দে আলী মিন্না

পদ্মানদীর পাড়ির 'পরে ঘন কাশের বন
ওপাশে তার সবুজ চর—দূর ছুতে যে টানে আমার মন।
রাখাল ছেলের সঙ্গে আমি যাবো চলে সেখায় নদীর চরে
পায়রা চড়াই কাঁক বাঁধিয়া বিহান বেলা হোথায় এসে পড়ে;
তাদের পায়ের দাগ রয়েছে পদ্মাচরের সকল বালুয়
নদীর পাড়ে হেথায় হোথা নানান রঙা পালক পড়ে রয়।
তাই কুড়ায়ে শুজবো কাণে—মাথায় লবো—লবো ছুঁহাত ভরি
কাশের ফুল ছড়িয়ে দেবো পূব বাতাসে সারা সকাল ধরি।

রাখাল ছেলের সঙ্গে যাবো পদ্মানদীর চরে
বিহান বেলা জলের 'পরে সোণালি রোদ ঝিলি মিলি করে।
দেখবো আমি চেয়ে কেবল চেউ ভাঙিয়া পড়বে কিনারায়
পাল তুলিয়া নৌকাগুলো দখিন দেশে উজান বেয়ে যায়, • •
রাজহাঁসেরা এলিয়ে পাখা যায় যেন সে হয় গো আমার মনে •
আজকে আমার সাধ হয় যে নায়ে চড়ে যাবো ওদের সনে—
ওই ও পারে কাজল রেখা—দূরের চেয়ে আরো দূরের গাঁ
কোথায় যে সে যাবো চলে কত না দূর নাইকো ঠিকানা।

পদ্মাচরে কাটিয়ে দেবো সারাটি দিন আজ
রাখাল ছেলের সাথে আমার কতো রকম থাকবে কতো কাজ।
হাত ধরিয়। কিনার দিয়ে বেড়াবো আজ সারা বিহান বেলা
শামুক ঝিগুক কুড়িয়ে এনে গাছের ছায়ে করবো ছুঁজন খেলা।
পূবালীবাঘ ঝাপটা সাথে কণেক কণে আসবে চরের বালি
হুপুর বেলা রোদের আঁচে চারদিকেতে কাঁ কাঁ করবে খালি।
রাখাল ছেলে রইবে বসি—বাঁশীর মুখে তুলবো আমি সুর
ভাটিয়ালী জারির গানে ভরিয়ে দেবো আজকের হুপুর।

ভাটির বেলা গাঙের ঘাটে গাম্ছা ছুঁজন নিয়া
চিংড়ি বেলে কিনার থেকে ধরবো খালি চিতে চাবান দিয়া।
মাছরাঙার মাছের আশায় থাকবে বসে উচু পাড়ির দোপে
গাঙচিলেরা মাথার 'পরে উড়বে খালি ক্ষুদে পোনার লোভে—
দিনের আলো আসবে নিভে—সিঁহর গুলে যাবে নদীর জল
পাড়ির 'পরে, আছাড়িয়া গানের সুরে করবে ছলাৎছল।
সাঁঝ না হতে ঝোষের পিঠে বসে ছুঁজন আসবে ফিরে গাঁয়—
পদ্মানদীর চরের লাগি পরাণ আমার করবে রে হায় হায়।

ধীসিস্ কেহ লেখে ; কেহ লেখে না, শুধু জীবনে প্রতিপালন করে। প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক একটি ধীসিস্ থাকে, যাহাকে আমরা লোক-ভাষায় বলি গোঁড়ামি। অথচ তার জীবনে একটি বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য আছে, অন্তরে একটি মতবাদ আছে—যাহা সে নীরবে কাজের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোলে। যাহারা মতবাদ লইয়া গবেষণা করে, কোলাহল করে, তারাই বই লেখে, উদ্ভট হয়। আর যাহারা বই লেখে না, অথচ ধীসিস্ লইয়া জীবন যাপন করে, তাহারা নিরুপাধি সামান্য গৃহস্থ। যেমন আমাদের সুজিৎ বাবু।

সুজিৎ বাবুর যখন বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর, তখনই তাঁর পাঁচ পুত্র, এক কন্যা। এই প্রবল বংশবৃদ্ধির মূলে কিন্তু তাঁর ব্যবহারিক ধীসিস্। ধীসিসের প্রথম কথা—জন্মশাসনের আন্দোলনে কুঠারাঘাত। দ্বিতীয় কথা—যাহারা মাতা হইতে অনিচ্ছুক সেই সব নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিরোধ। তৃতীয় কথা—পৃথিবীতে আবার মাতৃতন্ত্র... অর্থাৎ পেট্রিয়ার্ক্যাল সমাজের প্রবর্তন হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই প্রগতির গতিরোধ করিয়া, চাই পুনরায় পিতৃতন্ত্র অর্থাৎ পেট্রিয়ার্ক্যাল সমাজের প্রবর্তন। পিতৃতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা হইলে ক্যাসিজ্‌ম আসিবে, সোশ্যালিজ্‌ম পাশ্চাত্য পাইবে না।

তাই সুজিৎ বাবু একজন পুরা দস্তুর পিতা বা পেট্রিয়ার্ক। তাঁর পুত্রদের কেহ তাঁকে আড়ালে বলে হিটলার, কেহ বলে মুসোলিনি, কেহ বলে গান্ধী, তাঁর শিষ্য-গণের কেহ তাঁকে বলে অবতার, কেহ বলে ডেভিল। আর তাঁর কন্যা কুমারী

বাসনা বলে, “বাবা যেন কী, একটি আস্ত ইয়ে, মানে একটি মিষ্টি (রহস্য)—ঠিক মিষ্টি নয়—একটি করুণার পাত্র। আহা বেচারী বাবা! মা মারা যাওয়ার পর থেকে অগ্নিধারা খাপছাড়া হ’য়ে গেছেন।”

কুমারী বাসনার মা মারা গিয়াছে প্রায় ছ’ বছর আগে। মায়ের কলেরা হইয়াছিল, কিন্তু বাবা ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ দেন নাই, গৃহদেবতার নির্মাল্য তুলসীপাতা বাঁটিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। সুজিৎ বাবু বস্ত্র-তত্ত্ববাদী—সংসারে ধর্মবিশ্বাসের ভাগীরথীকে পুনরায় নামাইয়া আনিবেন, এই ছিল পণ। কুমারী বাসনার তখন বয়স সবে দশ বছর। তবুও আজ সে-সব কথা বেশ মনে পড়ে। সে মা বলিয়া কাদিয়াছিল, কিন্তু বাবা ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন—“কান্না-টা মেয়েদের একটা অভ্যাস, দুর্বলতা প্রকাশের প্রণালী মাত্র। তোর ও সাজে না বাসনা, ঐ জন্তেই ত তোকে আমি পুরুষের পোষাক পরাব আজ থেকে। তোর মা সতালক্ষী, তাই সন্তান ও স্বামী রেখে মরেছে। ফের যদি তুই কাদবি ত তোকে ভুলে আছাড় মারবো; আমি ইমোশন্‌ ভালোবাসি না।”

সেদিন থেকে বাসনা পুরুষের বেশে থাকে, ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে, গম্ভীরতা বড়িস্-এর ওপর সার্ট ও কোট পরিতে শুরু করিয়াছে। সে গ্যাল-ইস্কুলে যায় না, বাড়িতে মাষ্টারের কাছে বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্য পড়ে।

আজ বাসনা সেই সব কথা ভাবিতেছে। সামনের চেয়ারে বসিয়া মাষ্টার উমাপতি বাবু “মানব-বিবাহের ইতিহাস” পড়িতে-

ছেন। সহসা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “কুমারী বাসনা, তুমি কি বিয়ে করবে না? কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সকলেরই বিয়ে হয়, কেবল মানুষ-ই ছ’ একজন অবিবাহিত থাকতে চায়, ওটা আদৌ ভাল নয়।”

উমাপতি কোন নূতন বই পড়িলে, ছ’ একটা কথা অগ্নিধারা অবাস্তুর বলিয়া ফেলেন, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়া বলেন না বোধহয়।

কুমারী বাসনা চমকিয়া উঠিয়া এক দৃষ্টিতে মাষ্টারের পানে চাহিয়া রহিল। একপ ধষ্ট প্রশ্ন তাহাকে মাষ্টার কোনদিন করিবে, সে ভাবে নাই। একে বিয়ের কথা, তার ওপর আর কীটপতঙ্গের বিয়ের সহিত তাহার বিয়ের কথা! প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত এবং নিশ্চয়ই অপমানকর। মাষ্টারের কী স্পর্ধা!

বাসনার ক্রুদ্ধ বক্ষ কোটের নীচে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে ক্ষীণত রোষ ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া বিস্ফুরিত হইয়া গেল। মাষ্টারের মাথায় আসিয়া পড়িল ধাঁ করিয়া এক প্রচণ্ড পেলব ঘূষি। মুট করিয়া চুরমার হইল ছ’গাছি সোনালি কাচের রেশমি চুড়ি। আর সোনার চুড়ি একগাছা ঝিকিয়া তোবড়াইয়া কাটিয়া বসিল কোমল হাঁতের কজিতে। ছ’ফোঁটা রক্ত গড়াইয়া ছোট্ট ছুটি চুনীর মতো ছলিতে লাগিল।

বাসনার চোখের সামনে সেই ক্ষুদ্র ছুটি রক্ত বিন্দু ক্রমে বৃহৎ হইয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শোণিত সিঙ্কুর ফেনার মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। “উঃ! মা গো!” বলিয়া আর্তনাদ করিয়া সে টেবিলে মাথা রাখিয়া এলাইয়া পড়ে।

উমাপতিবাবু ঘুঁষিটার তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একেবারে ধতমত ভাব। চটিয়া উঠিয়া কশ্মে ইন্তফা দিয়া বিজ্ঞাৎ বেগে বাহিরে যাইবার আর অবকাশ পাইলেন না। “কী হলো!” বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া বাসনার মাথাটি দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া শুধাইলেন,— “হাতে লেগেছে বুঝি?” তারপর নিজের রুমাল দিয়া রক্ত মুছিয়া দিলেন। হাত-পাখা দিয়া শিয়ার মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন। ঘরে বলিতে লাগিলেন, “ছিঃ! কুমারী বাসনা! আমি ভেবেছিলাম তুমি জোয়ান্ অব আর্ক-এর মতো বীর, দেশের মুক্তির জন্তে একদিন যুদ্ধ করবে। কিন্তু তোমার দ্বারা তা হবে না দেখছি।”

বাসনা করুণ কণ্ঠে উত্তর করিল— “আমার দ্বারা শুধু বিষে করাই হবে এই বুঝি আপনার ধারণা। আপনি বড়

ফাজিল হচ্ছেন দিন দিন। যান! যদি মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যেতুম, তাহলে কী করতেন আপনি, শুনি।”

কিন্তু শোনা আর হইল না। ঢং করিয়া আরতির ঘণ্টা পড়িল—পিত্রারতির ঘণ্টা। অমনি সৈনিকের জায় হসিয়ার (গ্যাটেশন) ভাবে দাঁড়াইয়া বাসনা পিতার আরতি করিতে ছুটিয়া গেল।

প্রত্যহ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় গৃহদেবতা নারায়ণের পূজার পর সূজিৎ বাবুর আরতি হয়। তিনি নিজে একটি দারুণিস্থিত সিংহাসনে বসেন। ভাষাভাবে বাড়ীর প্রাচীনা ঝি কুন্দ একখানি চামর লইয়া পাশে দাঁড়াইয়া ব্যঞ্জন করে। আর ভৃত্য দাশরথি কাঁসর বাজায় এবং পুত্রগণ তখন ঘণ্টাধ্বনির সহিত পঞ্চ-প্রদীপ ঘুরাইয়া পিতার আরতি করিতে থাকে। কত পঞ্চম সুরে স্তোত্রগান পূর্বক পিতৃ-

বন্দনা করিয়া সমস্ত পল্লীতে একটি অপরিত্র ধর্মভাবের অমুভূতি-স্পন্দন বিকস্পিত করিয়া তোলে।

সূজিৎ বাবুর মতে পারিবারিক শাস্তির জন্ত চাই পিতার সভারিন্টি অর্থাৎ অষ্টৈত প্রভৃৎ, এবং তার জন্তে চাই ডিভাইন্ পেট্রি-য়ার্কশিপ অথবা ভাগবত পিতৃৎ। তাই এই পিতৃ-পূজার পদ্ধতি তাঁর গৃহে গত ছয় বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এই আরতি-কালে পুত্র-কন্তা কাহারো অমুপস্থিত হইবার জো নাই, হইলে পরদিন আর তাহার গৃহে স্থান নাই।

প্রথম তিন পুত্র এই ভাবেই গৃহ ছাড়িয়াছে। লোকে বলে তাহারা চাকুরী করিতে স্থানান্তরে গিয়াছে, কিন্তু সূজিৎবাবু বলেন তিনি তাহাদের যাইতে বাধ্য করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা পিতৃশাসন

পবা

কোন বি, বি, ৩৪১৩

পূজাবকাশে

শ্রেষ্ঠ প্রমোদ-আকর্ষণ

শনিবার ২৪শে সেপ্টেম্বর

হইতে চতুর্থ সপ্তাহ

৭বিজয়া দশমীর দিন

মাত্র ৩টা ও ৬-৭টায়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

আজনারায়

শ্রেষ্ঠাংশে: সাধনা বসু, অমীল, শীর্ষাজ, মজুমদার, প্রতিমা, তুলসী লাহিড়ী, প্রীতি বিভূতি গাঙ্গুলী প্রভৃতি।
পরিচালক :- মশু নোস
কাহিনী :- মনমোহা রায়

নৃত্যে
গীতে
অভিনয়ে
দৃশ্য সজ্জায়
কাহিনীর সরসতায়
এমন একটি কথা-
চিত্র বাঙলায় আর
হয় নাই।

শুক্রবার ২৩শে সেপ্টেম্বর
হইতে ৯ই অক্টোবর
রবিবার অবধি প্রত্যহ :
৩টা, ৬টা ও ৯টা টায়।
অগ্রিম সিট বুক করুন।

মানিতে একদিন দ্বিধাবোধ করিয়াছিল।
বড় কঠোর তাঁর শাসন।

কুমারী বাসনা আসিয়া পিতার পাদ-
বন্দনা পূর্বক শঙ্খ-দীপ লইয়া আরতি আরম্ভ
করিল। কারণ বর্তমানে গৃহে সে-ই বয়সে
বড়। তার ছোট ছুটি ভাই নীলু ও কালু
স্বপাঠ করিতে লাগিল।

কটিন্-মাকিক আধঘণ্টা আরতি চলে।
তারপর প্রসাদ বিতরণ।

একখানি প্লেটে কিছু ফল-মিষ্টি নিয়া
কুমারী বাসনা লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে।
বলে,—শুধু কিছু জল খান। আমাকে
ক্ষমা করুন। ঘুঁষির কথাটা ভুলে যান,
তাহলে আর এক কাপ চা দেবো।

উমাপতিবাবু ঘুঁষির কথা প্রায় ভুলিয়া-
ছিলেন। তিনি অজ্ঞানস্বভাবে ভাবিতে-
ছিলেন, বাসনার সেই নারী-সুলভ এলাইয়া
পড়ার ছবিটি। সেই তার মাথাটি ভুলিয়া
ধরা। তিনি তখনো মাঝে মাঝে কুমার
দিয়া টেবিলটি মুছিতেছিলেন, পাছে
কোথাও রক্তের ছিটা লাগিয়া থাকে। তিনি
বাক্য ব্যয় না করিয়া জলযোগে নিযুক্ত
হইলেন।

বাসনা এখানে যে-প্রশ্ন কখনো করে
নাই, আজ হঠাৎ তাহাই বলিয়া ফেলিল,—
শুধু আপনার স্ত্রী কি সুন্দরী? উমাপতি
গম্ভীর স্বরেই বলিলেন,—আমার স্ত্রী নেই।

—সে কি? আপনি বিয়ে করেন নি?

—না।

—বাবা যে বলেন, আপনি বিবাহিত,
সচ্চরিত্র সংসারী লোক।

—তোমার বাবাকে আমি মিছে কথা
বলেছিলুম, নইলে এ টিউশন্ পেতুম না।
টাকা রোজগাড়ের জন্তে মিথ্যে কথা বলা
আমি পাপ মনে করি না।

—এখন যদি বাবা আপনাকে
তাড়িয়ে দেন?

—তুমি তাড়াবে না, এই আমার
বিশ্বাস।

হঁ!

পরক্ষণেই বাসনা খিল্ খিল্ করিয়া
হাসিয়া ওঠে।

(২)

নীলুর বয়স বারো কালুর দশ। ছজনে
ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলিতেছিল।
নীলু বলে,—আজ কালু মাইরি সেদিন
দেখিছি, মাষ্টার মশায় দিদির মাথা টিপে
দিচ্ছেলেন, মাথায় হাওয়া করছিলেন।
কালু বলে—দিদি আজ বাবার বাক্স খুলে
মায়ের সব কাপড়-জামা বার করে নিয়েছে
বলেছে আর সে পুরুষ মানুষ সাজবে না,
মেয়ে মানুষ হবে।

কথা শেষ না হতেই ঘরে বাসনার
প্রবেশ। পরণে লালপাড় সাদা সাড়ী,
গায়ে সেমিজ। ভাল করিয়া পরিতে পারে
নাই, কোনমতে জড়াইয়া সরাইয়া লম্বা
আঁচলখানি কোমরে বাঁধিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই বাসনা বলে,—ওরে নীলু-
কালু, মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে।
বাবা গেছেন ব্যাংকে টাকা তুলতে আমিও
বেরিয়ে যাচ্ছি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে বিয়ের
পোষাক কিনতে। বাবা এলে বলিসু।

নীলু হাততালি দিয়া উজ্জাসে লাফাইয়া
উঠিয়া বলে,—তা ভাই দিদি বেশ মজা
হবে। ওবাড়ীর যুথিকাদির সেদিন বিয়ে
হ'লো, তেগ্নি ধুমধাম হবে ত! টোপর
মাথায় জামাইবাবু আসবেন.....

কালু বলে,—অনেক লোকজন, সার
সার ইলেকট্রিক আলো, শাখ আর উলু—
বড়-দা, মেজ দা. সেজ-দা আসবেন...

বাসনা ভ্রাতার কথা ধামাইয়া বলে,—
যাঃ সে সব কিছু হবে না। মাষ্টার মশাই
বলেছেন, তিনি তাঁর সাক্ষোপাক্ষে নিয়ে
আসবেন সাক্ষোবেলার—শুধু মালা বদল...

বাকী কথা শেষ হইবার পূর্বেই, আবাব
কথা ঘুরাইয়া বাসনা বলে,—আর এক কাজ
করবি জাখ. বাবার সব সিগারেটগুলো
বারান্দায় জড়ো করে রেখেছি, আগুন
ধিয়ে দিয়ে খুব হাওয়া করবি, যেন সব
পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

নীলু শুধায়, কেন দিদি?

বাসনা মুছ হাসিয়া বলে,—জানিসনে
বুঝি! মাষ্টার মশাই বলেছেন, সিগারেট
খাওয়া দেখলেই তাঁর যুদ্ধের সময় কামানের
নলে আগুন জ্বালায় কথা মনে পড়ে।
বলেন, সিগারেট খাওয়া না ছাড়লে
কামানের স্থিতি মুহুরে না, পৃথিবী থেকে
যুদ্ধ ঘুচেবে না। বেশ ভালো কথা, না?

ভালো মনের অত বিচার নীলু-কালুর
নাই। তাহারা তৎক্ষণাৎ দিয়াশালাইয়ের
অনুসন্ধানে ছুটিয়া যায়। বাসনাও বাহির
হইয়া পড়ে।

সুজিৎবাবু যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন
ঝি চাকর সব নাক ডাকাইয়া নিদ্রা
যাইতেছে। বাড়ী ধূমে আছন্ন, আর নীলু-
কালু বারান্দায় দাঁড়াইয়া বেদম কাসিতেছে,
'এবং কাঠির খোঁচা দিয়া দিয়া বাক্স সমেত
এক এক রাশি সিগারেটের অগ্নি সংস্কার
করিতেছে।

সুজিৎবাবু নয়ন বিস্ফারিত করিয়া
হাঁকিলেন,—ওকি হচ্ছে রে?

পলাইবার শক্তি আর নাই। নীলু-
কালু মুখ চুপ করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়
অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সুজিৎবাবু অগ্রসর
হইয়া অভিনিবেশ সহকারে তাকাইয়া
উপলব্ধি করিলেন, কী পুড়িতেছে।
পরক্ষণেই দুই পুত্রের দুই গালে দুইটি চড়
মারিয়া দুই হাতে তাহাদের কাণ ধরিয়া
হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া ঘরের মেঝেয়
প্রবল ধাক্কা ফেলিয়া দিলেন। ছেলে!
দুইটা আর্দ্রনাদ করিয়া উঠিল। অতঃপর

সুজিৎবাবু গর্জন করিতে লাগিলেন, হারামজাদা ছেলে সব, এ আবার কি রকম খেলা হচ্ছে? পোড়াবার আর জিনিষ পাওনি? এই শূয়ার দাশরথি.....শালার কুস্তকর্ণের ঘুমের কিছু বলেছে।...

নীলু গোঁড়াইতে গোঁড়াইতে বলে,—
দিদি যে বলে, ওতে যুদ্ধ থামবে.....

সুজিৎবাবুর কণ্ঠে বজ্র বিস্ফোরণ হইল,—
কী বলে? কে বলে? বাসনা? কোথায় সে হতভাগী?

“এই যে বাবা, আমি।” বলিয়া বাসনা সামনে আসিয়া দাঁড়ায়।

সুজিৎবাবু যেন প্রেত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বাসনার অপরূপ সজ্জা। পরণে পাহাড় পেড়ে সাগর-রঙ-এর সাদী, গায়ে আকাশ-রঙের জামা, পায়ে দুর্বার রঙের স্লেভেল, আর মাথায় পাকাধানের সোণালি রঙের ভেলু (ওড়না)। কুমারী বাসনার পিছনে মাষ্টার উমাপতি। তাঁর পরণে চিলা পায়জামা ও হাতকাটা সার্টের ওপর কোট—পুরা দস্তর প্রোলিটারিয়েট (শ্রমিক) পোষাক।

সুজিৎবাবু ধমকিয়া দাঁড়াইলেন। রোক্তা-মান পুত্রব্যয় সহসা পামিয়া গেল।

মাষ্টার উমাপতি বলিলেন,—দেখুন সুজিৎবাবু, এই আপনার কত্কা বাসনা—পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আজ আমি একে সাজিয়েছি। এই যে পোষাক—এতে পার্ফেকশান অব্ ম্যাচ (পরিপূর্ণ সুখমা)—এ মুহূর্তে আছে শাস্তি ও সৌন্দর্য, শ্রী ও সারল্য। এতে ওয়ার নেই, বিরোধ নেই। আপনি স্বভাবের (নেচার) বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন—তাই নারীকে দিয়েছিলেন পুরুষের বেশ, তার হৃদয়ের কোমলতায় আনতে চেয়েছিলেন পাথরের কঠোরতা। কিন্তু এই তিন বৎসর ধরে আমি এর শিক্ষক। মাস্তুরের যা কিছু শেখা দরকার

আমি একে শিখিয়েছি, এবং নূতন কিছু শিখিয়েছি। শিখিয়েছি, শুধু পুরুষের স্তোত্র-গান করবার জন্তেই নারীর সৃষ্টি হয়নি। সন্তান প্রসব করে শিশুর সঙ্গে সঙ্গে আতুর ব্যক্তি হয়ে থাকাই তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য বিরাট। নারী একাধারে কৃষির দেবতা সীতা, চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা। নারী-চরিত্রে বাম্মী-কাবা ও চাণক্য-নীতির একত্র সমাবেশ। আমার মতে ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের অথবা মৌর্যাবংশের উত্থান মানে, দাসী পুত্র নামজলে জন-সাধারণের উত্থান—চন্দ্রগুপ্ত প্রোলিটারিয়েটের প্রতীক। তাই আজ আপনার পতন, কুমারী বাসনার উত্থান। সে আমার প্রেমসী, সহচরী। শুধু আমার সহচরী নয়, এ দেশের বিপুল জনশক্তির সহচরী। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি অবিবাহিত, আজ আমাদের বিয়ে.....

নীলু কালু আনন্দে হাত তালি দিয়া উঠিল। সাগ্রহে বলে,—বাঃ দিদি কে বেশ বউ-বউ মানিয়েছে! না বাবা?

সুজিৎবাবু তুচ্ছ করিলেন। চোপরাও।

(৩)

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। কুন্দ গৃহ অপরিস্রুত অপরিস্রুত অসংখ্য জনসমাগমে গম্ গম্ করে। বড় ঘরের বারান্দায় সেই কাঠের সিংহাসন তৃণশুল্ক সাজাইয়া তাহার উপর উমাপতি ও বাসনাকে বসানো হইয়াছে। তিনজন হিন্দুস্থানী পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক তাহাদের মালাবদল করিয়া দিল। একজনে একটা রামশিঙা (bugle) বাজাইল। কয়েকটি শ্রমিক-বালক গান গাহিল—

“উজ্জিন কর রক্ত-পতাকা

ভক্তেরা আজি সবে।

নারী ও নরের নূতন বিবাহ

গাহ গান ভৈরবে॥”

ইত্যাদি

নীলু-কালু বারান্দার এক কোণে নীরবে দাঁড়াইয়া সব ব্যাপার দেখিতেছিল। এই জন-কোলাহলের মধ্যে তাহারা নিজেদের অশ্রুত শিশু-মনকে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই।

সুজিৎবাবু আপনার শয়ন ঘরে বসিয়া এককণ ধ্যানস্থ ছিলেন। কর্তব্য সঙ্কে একটা দৈব নির্দেশ পাইবার চেষ্টা। কিন্তু কিছুই পাইলেন না। মাষ্টারটা জুয়াচুরি করিয়াছে, তাহাকে পুলিশে দেওয়া উচিত কিনা? কত্কা সাবালিকা, স্বমতে স্বামী সংগ্রহ করিতেছে, মোকদ্দমা টিকিবে না। অগত্যা পাঞ্জি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

বি কুন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়কে ডাকিতে গিয়াছিল, তিনি আসিলেন। ভট্টাচার্য বলিলেন, আজ বিবাহের লগ্ন নাই। তবে.....

—আর তবে-টবে নয়। ভট্টাচার্য, যেমন করে হোক একটা কুশঙিকা অন্ততঃ সেরে দিয়ে যাও, মেয়েটার কপালে সিঁদুর ত উঠুক, নইলে.....

সুজিৎবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, আর ভাবিতে পারিলেন না।

ওদিকে কোলাহল ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। অবশেষে উমাপতি ও বাসনা লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিল। নীলু-কালু বিছানায় বসিয়া তখনো দিদির বধূবেশ দেখিতেছে। উমাপতি বলিলেন,—আজ আমি একটা রেল-অফিসে সন্তর টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছি, তাই এই Coup de' etat (দাবার কিস্তি) দিলাম। তোমাকে আমি আমার সকল খিওরি-ই শিখিয়েছি, এইবার কাজে নামতে হবে, কালই আমি টেড-মুনিয়নের মেম্বর হবো। তোমার আমার মিলনের একটা মহৎ সিগ্নিফিক্যান্স (তাৎপর্য) আছে।

এ যেন পৃথিবীর একটা নবীন জন্ম,
—যেন প্রশান্ত মহাসাগরে একটি নূতন
মহাদেশের আবির্ভাব,—যেন—

বাসনা বলিল,—যেন মেরু প্রদেশে
অরোরা বোরিয়লিস—বলিয়া সে হি হি
করিয়া হাসিয়া উঠে।

বাহিরে ভট্টাচার্য্য ডাকিলেন,—মা
বাসনা, একবার আসতে হবে যে,
কুশঞ্জিকা-টা সেরে নেওয়াই ভালো, নইলে
বে-আইনী হবে।

উমাপতি আপত্তির ভাবে ইতস্ততঃ
করিতেছিল। বাসনা তাহার আঙ্গুলে চাপ
দিয়া বলিল,—নাও, ওঠো, আর কলেঙ্কারি
করতে হবে না।

উভয়ে আসিয়া পাশের ঘরে পিড়িতে
বসে। ভট্টাচার্য্য বস্ত্র করিয়া মস্ত পড়িয়া
কুশঞ্জিকা সারিয়া দেন। বাসনার কপালে
সিন্দূরের লাল টুকটকে দাগটা ঝক ঝক
করিয়া ওঠে,—রাত্রিশেষের শুকতারকার
মতো।

সুজিৎবাবু বলিলেন, বাসনা—আমার
ঘুম পাচ্ছে, আমি তবে যাই, তোরা যা হয়
কর।

আপনকক্ষে কিরিয়া দেখেন যি কুন্দ
ঘুমন্ত নীলু-কালুকে টানিয়া আনিয়া
শোয়াইয়া দিতেছে, বোধ হয় তাহাদের
খাওয়া হয় নাই।

বাসনা-কে আজ দেখিতে মন্দ মানায়
নাই। সুজিৎবাবুর মনে সহসা একটি
বহুদিনের বিস্মৃত মধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠে,
—বাসনার মাগের বয়স তখন অতখানিই
হইবে।

আর তাহার এ-গৃহে থাকা চলে না।
কাশীতে গিয়া বাস করিবেন। নীলু
কালুকে সঙ্গে লইবেন কিনা ভাবিবার
কথা। নিজের স্মার্ট-কেস্টটা টানিয়া
গুছাইতে বসিয়া গেলেন।

উমাপতি তখন বলিতেছিল,—জাখো
বাসু,—তোমাকে কিন্তু সভায় বক্তৃতা
দিতে হবে।

বাসনা বলে,—ইস্! আমি তোমার
ভাড়াটে বক্তা নাকি! ওসব জংলিদের
সভায় যাচ্ছে কে? এখনো বাবাকে বলা
হয় নি যে, তুমি ঘর জামাই হয়ে থাকবে
এখানে।

উমাপতি বলে,—না।

বাসনা বলে,—তোমার ঘাড় থাকবে—
জানো আজ থেকে নারীতন্ত্র (মেট্রিক্যাল)
সমাজের পন্থন।

রেডিও টকি ইনস্টিটিউট

২৪২, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং
টকি অপারেটিং
স্টেশন
টাইপরাইটিং
টেলিগ্রাফা
ওয়ারেলস
প্রভৃতি শিক্ষা করিবার
একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

অক্টোবর হইতে সেসন্ আরম্ভ ভর্তির
জন্ম সম্বর সেক্রেটারীর নিকট
আবেদন করুন।

N I. P

সুজিৎবাবুর গোড়ানো শেষ হয় নাই।
বাসনা আসিয়া বলে,—বাবা ওকি করছেন।
এখনো ঘুমোন নি যে বড়। আপনার
জামাই কিন্তু এখানেই থাকবে, ওর ঘর
বাড়ী নেই, একটা চাকরি পেয়েছে শুধু।

সুজিৎবাবু নির্গিপ্তভাবে বলেন,—আমি
কাল চলে যাবো বাসনা। নীলু-কালুকেও
সঙ্গে নে যাবো ঠিক করেছি।

বাসনা ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে হুই
হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলে,—ধ্যোৎ। তাই

আবার যায় নাকি। তাহলে আমি এ
বিষয়ে নাকচ ক'রে দেবো, বাবা। ধবরদার
ও কাজ করো না। তুমি শোও আমি
ঘরে তালা মেয়ে দিচ্ছি।

সে সভাই পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিল।
তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। ফিরিয়া দেখে
উমাপতি মনোবিজ্ঞানের বই খুলিয়া পড়িতে
বসিয়াছে। সে বইখানা ছুড়িয়া বারান্দায়
ফেলিয়া দিয়া বলে—কাল আমার আরও
পাঁচখানা সাজী চাই, পাঁচটা ব্লাউস, একটা
ক্রীম্, পাণ্ডার, সাবান, আর.....

উমাপতি বিরক্ত হইয়া বলে, তা!
তোমরা সীতাও নও, ক্লিওপেট্রাও নও,—
শকুন্তলাও নও, বেহলাও নও...

—আমরা কিছুই নই। শুধু তোমাদের
ঘাড়ে চাপি, ভূত! বাবার পেট্রিয়ার্কশিপ
ভেঙেছি, এইবার তোমার সোসালিজম্-এর
মুণ্ডটায় আমার ঘোমটা-খানা জড়াতে
পারলোই হয়। বলিয়া বাসনা তার সোনালি
ওড়নাখানি উমাপতির মাথায় ফেলিয়া
তাহাকে কানা করিয়া দিয়া...কি যেন
করিতে যাইবে...

এমন সময় বাহিরে (উঁকি-রত) কুন্দ
যি হাসি চাপিতে চাপিতে গলায় বিষম
লাগিয়া কাসিয়া ফেলিল।

বিনোদ এণ্ড কো

জরীপ ও নজার যন্ত্রাদি বিক্রয় করে
তাঁহাড়া অকিস ষ্টেশনারী ইত্যাদিও
বিক্রয় করে।

খেয়ালী
শারদীয়া সংখ্যা



নিউ থিয়েটার্সের আগামী আধুনিক
সামাজিক চিত্র “অধিকারে” মেনকা,
যমুনা ও প্রমথেশ বজ্রুয়া। ছবিখানি
শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে।

= থেরালী =



ডায়েরীর পাতা থেকে (স্কুরোপের Impresario) গ্রীহরেন ঘোষ

২২শে এপ্রিল সকালের দিকে মুশি ও অস্ত্রিকের অফিসে এলাম। Niceএর সবচেয়ে বড় থিয়েটার প্যালে ডি Mediterraneanএর তিনি ম্যানেজার। বৈটে খাটো লোকটা অসীম উৎসাহী, ব্যবহারে আমরা যাকে মার্টার মাতুষ বলি। আমার জন্ত ফরাসী ভ্রমলোক যা করেছেন, জীবনে তোলা যায় না। আমি বলেছিলাম তাঁকে—আমাদের Impresario G. Kuged, Vienna annexationএর গোলমালে খাটকে পড়েছেন এবং আমরা না পাচ্ছি পূর্বেরকার হিসেব মত শো দিতে, না পাচ্ছি কোন নূতন লোকের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে।

বিপদ বুঝে মুশিও অস্ত্রিক প্যারীতে Paris) সবচেয়ে যিনি বড় Impresario Arnold Meckel—তার Bureauতে গেলে কল্লেন; একবার নয়, দু' ছবারই বিশেষ করে আমার সম্বন্ধে ও আমাদের লের বৈশিষ্ট্যতা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেন—এবং অনুরোধ করেন। তিনি যদি আমাদের লের সমস্ত যুরোপ আমেরিকার ভার না কিছুক্ষণ কথা কইবার পর মুশিও অস্ত্রিক “ত্রে বিয়া” বলে চীৎকার করে বলেন এবং ফোন ছেড়ে আমাকে বলেন, Meckel Agency will take you up and do the needful - you better go to Paris right now and see them—”

বলে তিনি তখনই তাঁর stenographerখানি চিঠি dictate করেন এবং দু' মিনিটের ভিতর চিঠিখানি আমার হাতে

দিয়ে বলেন, “কাল কি পরশু নিশ্চয়ই Paris গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা কইবেন, এই আমার অনুরোধ”, আরও বলেন, Niceএ আমাদের থিয়েটারে সেরাইকেলার নাচে কি পরিমাণ লোক হয়েছে, সাংবাদিকরা কি রকম প্রশংসা করেছেন, পোষাক পরিচ্ছদ আপনাদের কত উচ্চাঙ্গের এবং বিশিষ্ট মুখোশ নৃত্যের চাহিদা কতখানি বাড়তে পারে এদেশে, এ বিষয়েও আমি Meckel Agencyকে বলে দিয়েছি। এরপর তুমি যদি তোমার Newspaper cutting Bookটা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা কও—কাজ হয়ে যাবে, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।”

ধন্যবাদ দিয়ে চিঠিখানি নিয়ে চলে আসি এবং রাত্রের ট্রেনে অনেক অনুবিধা করেও Paris যাত্রা করি—সাথে যান কুমার বিজয় প্রতাপ ও কুমার হিমাংশু কুমার। ট্রেনে ভীড় ছিল, শেয়ার ঘরের (Sleeping Car) স্থান ছিল না খালি। সুতরাং খানিকটা বসে, পাশের লোক নেনে গেলে খানিকটা পু ছড়িয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া গেল কোন রকমে। কুমার বিজয়প্রতাপ আয়েসী লোক গুঁর ভাল ঘুম হ'ল না—সকালে উঠে বুঝলুম রাত্রের journeyতে গুঁর বিশেষ কষ্টই হয়েছে। তাছাড়া রাত্রের দিকে ঠাণ্ডা পুড়েছিল, সাথে মাত্র একটা করে ওভারকোট, তাই দিয়ে বতটা ঢাকা যায় তা করা গেছলো—কিন্তু ওদেশের শীত, অন্নবিস্তর ছোট খাটো ফাঁক দিয়েও

যে পরিমাণ ঠাণ্ডা সরবরাহ হয়—সে বেশ কষ্টকর ব্যাপার।

Stationএ নেমে দেখা গেল interviewএর সময় বেশী নেই। হোটেলের ওঠার সঙ্কল্প ত্যাগ করে আমরা সবাই সোজা Arnold Meckelএর Bureauতে যাব বলে Taxiতে উঠলুম। ফরাসী দেশে, ফরাসী লোকদের সঙ্গে ভাষা না জানার দরুণ বুঝাতে কোন অনুবিধা হলোনা কারণ মুশিও অস্ত্রিকের চিঠির খামখানা Taxi Driverকে দেখাতেই সে বুঝতে পারল, কোথায় যেতে হবে।

প্রকাণ্ড বড় প্রাসাদ। সেখানে এসে গাড়ী থামল। Diver বাড়ীর নম্বর দেখিয়ে বলে, এই হচ্ছে ২২নং বাড়ী—ভিতরে গেলেই পাবে—তোমরা যাকে চাও।

তখনও খানিকটা সময় ছিল। কুমার সাহেব বলেন, একটা restaurantএ গিয়ে কিছু খেয়ে নিলে ভাল হ'ত। আমরাও রাজী। Restaurantএ খাসা মুখ হাত ধোবার ব্যবস্থা। তৎক্ষণাৎ হাত ব্যাগটা খুলে, কাপড় জামা ছেড়ে, রাত্রিজাগরণের ও ট্রেনে চলার ছাপটা মুখ থেকে সরিয়ে ফেলা হ'ল এবং কিছু খেয়ে ফিরে আসা গেল।

সা—পি থিয়েটার—ফটকের ভিতরে এসেই পড়লুম আমরা সুবৃহৎ একটা লবীতে। তার চারদিকে ছোট ছোট ঘর, নানালোকের বিভিন্ন অফিস। এক জায়গায় Meckel Bureau বলে আঙুল দেখান আছে, সেখানে গিয়েই দেখি বাঁ দিকে সিঁড়ি—পাশেই Lift. প্যারীর বহু বাড়ীতে Automatic Lift আছে—নিজেরই ওঠানামার জন্তে Switch use করতে হয়। গোলমাল ভেবে আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দিতলে আসতেই—গন্তব্য স্থানের সন্ধান পেলুম।

সামান্য একটা দরজার পাশেই লেখা—
A. Meckel's Bureau. দরজায় নক
কলাম। কে একজন ভেতর থেকে বলে
উঠল, “আর্টে”। তিনজনেই ভিতরে
গেলাম। সাধারণ ঘর—চারিদিকে
দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা ভাল Poster—
কয়েকখানি সুশ্রী সুদর্শন ছবি। স্তূপাকার
করে পড়ে আছে কোণের দিকে ছাপা
কাগজের তাড়া। এক দিকটায় ছোটো
Table, Office ঘরের মত সাজান।
একটাতে বসে একটা অল্পবয়সী সুন্দরী—
আর একটাতে বসে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক।
মুখ তুলে প্রশ্ন করেন কি চাই? চিঠি
আছে বলে বার করে দিলাম। উঠে
এসে চিঠিখানা নিয়ে আমাদের অপেক্ষা
করতে বলে—কোনের একটা পিঞ্জির
দরজা খুলে ভিতরকার ঘরে গেলেন এবং
ফিরে এসে আমাদের অপেক্ষা করতে
বলেন।

ঘরে এমন কোন Extra Chair
ছিল না যাতে আমরা সবাই বসতে পারি
বা কুমার সাহেবকে বসাই। একবার
ড্রয়ার, একবার Book case, একবার
Souvenir Shelfএর দিকে দেখছি,
এমন সময় ডাক এল—আমরা ভিতরে
গেলাম।

আরো সাধারণ ঘর—কয়েকখানি বিশিষ্ট
আর্টিষ্টের ছবি দেয়ালে টাঙান Secretariate
Tableএর সামনেই বসেছিলেন,
দাঁড়িয়ে উঠলেন একজন সুস্থকায়
রাশিয়ান ভদ্রলোক, চশমাটা বা হাতে
নামিয়ে, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিতে আমি
এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করলাম (কারণ
চিঠিটাতে আমারই কথা লেখা ছিল) পরে
কুমার সাহেব এবং তার পর হিমাংশুবারু।
ঘরে তিনখানি extra chair—আমরা
বসলাম তাতে। পথের ধারে জানলার

নীচে টেবিলে কিছু কাগজ-পত্র, বিবিধ
মাসিকপত্রিকা, থিয়েটারের প্লান, কয়েকখানা
ফটো, ২৪ রকমের Souvenir তাতে
রয়েছে।

হু'এক কথায় বুঝলাম ভদ্রলোক
ইংরেজী বোঝেন কম, ফরাসী জানেন,
আমরা তেমনি ইংরেজী ভাড়া অথবা ভাষা
জানিনে বলছিই হয়—তবুও ভাষা ভাষা
ইতালিয়ন-ফরাসী ও তার সঙ্গে ইংরেজী
ভাষার ঠাণ্ডা দিয়ে, আমার হাতের
Newspaper cuttingএর বইটা ছিল,
দিলাম, ও সেই সঙ্গে ছবির Album খানাও।

হু'তিন মিনিট পর প্রশ্ন করেন আমাকে
দেখিয়ে, You—Shanker—India?

আমি প্রশ্নর হয়ে বলুম, “হ্যাঁ”

বিদেশী বুঝলেন আমার কথা। তারপর
উঠে এক এক করে শান্তিনিকেতনের
জন্ম যে All India Tour arrange
করেছি, শঙ্করের জন্ম সেই প্রথম থেকে
(অর্থাৎ ১৯২৯) ১৯৩৫ পর্যন্ত যা যা করেছি,
গুরু লাঙ্গলদল, বালা সরস্বতী, এনাঙ্কা
রমা রাও প্রভৃতির ছবি ও সংবাদ পত্রের
তালিকা এক এক করে সব দেখালাম
এবং সেই সঙ্গে কবির দেওয়া পত্রখানি
ও ভারতীয় নানা সংবাদ পত্রের বিভিন্ন
মতামতগুলি অল্প-বিস্তর বুঝিয়ে দেবার
চেষ্টা করাতে ভদ্রলোক এইটুকু বুঝলেন যে
আমি হয়ত বা এই লাইনের একটু
important লোকই হব এবং আমারই
হাতের সেরাইকেলারদল যুরোপে প্রথম
এলেও, এদের ভিতর অভিনব কিছু
থাকতে পারে। অতঃপর দিলেন—সেরাই-
কেলার দলকে তিনি নেবেন। ইতিমধ্যে
একজন ইংরাজী জানা ভদ্রলোক এলেন
এবং কথাবার্তার সুবিধা হ'ল।

এইবার রুশদেশবাসী ব্যবসার বণা
পাড়লেন এবং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন
ঊঁর বছর মারফৎ :—

“আমরা রড় Expensive Impresario.
তবে আমরা ইচ্ছা Best. যদি নাম ও
ইচ্ছাকে বড় করিতে চাও—অর্থের ব্যবস্থা
করে আমাদের কাছে এসো—অর্থের
টানাটানি থাকলে—নাম বলে দিচ্ছি ও
জনের—তাদের কাছে যাও—তারাও ভাল
Impresario.” এই বলে কটা নাম কল্লেন।
কুমারসাহেব উত্তর দিলেন, “আমরা
ভাল Impresario দ্বারাই Placed হতে
চাই—কত পয়সার আবশ্যক হবে শুনে
পেলে ভাল হ'ত।”

অত্যন্ত কম হেসে চিন্তাশীল ভাবে
রুশ-ভাষায় যা বলেন—অপর ব্যক্তি তার
তর্জমা করে দিলেন, “আমাদের হাত দিয়ে
প্যারীতে প্রথম শো'এ placed হতে হলে
এবং যুরোপের জন্ম নিয়মিত ব্যবস্থা
করিতে হলে, এক লক্ষ Franc খরচ করতে
হবে। যদি এ টাকা তোমাদের থাকে—
কাল দুপুরে এস—কথা কইব।”

বিদেশীর এই গল্পের কথায় নাথ
আমাদের ভারী হয়ে উঠল—বলে কি।
একলক্ষ ফ্রাঙ্ক খরচ করে এদের কাছে
আসতে হবে। যুরোপ আসতে—
ভারতবর্ষ থেকে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে
বেকতে তখন পর্যন্ত আমাদের খরচ
হয়েছিল প্রায় ৩৫,০০০ টাকা। সে কথা
বলুম তাঁকে, যে একটা দল নিয়ে
৩৫,০০০ টাকা খরচ করে তোমার দেশে
এসেছি, এখন আবার একলক্ষ ফ্রাঙ্ক
তোমাকে দিতে হবে সেলামী—তবে তুমি
আমাদের স্পর্শ করবে?

কলম নামিয়ে রেখে, চোখ থেকে চশমা
সরিয়ে—একটু হেসে ভদ্রলোক বলেন,
“তোমরা নবাগত, জান না। উদয়শঙ্কর
কত বড় আর্টিষ্ট, আর তাঁর এখানে এত
নাম—তাঁর কাছ থেকে কত টাকা
নিয়েছিলাম জানো?”

ব্যাপার বেগতিক দেখে কুমারসাহেব বলেন, “আমরা Niceএ যাচ্ছি—কালকে এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না। তা’ছাড়া আমাদের দেশে তার করে জানতে হবে, এতটাকা সেলামা দিয়ে এ-কাজে নামা, আমাদের পক্ষে গুস্তিসঙ্গত হবে কি না—কারণ আমাদের Principal ভারতেই আছেন।”

“বেশ, তার করে শুভ-জবাব পেলে আমাদের খবর দেবেন”—এই বলে Good Bye কল্লেন। এবং আবার কি ভেবে বলেন, কি কি বাবদ একলক্ষ ফ্রাঙ্ক চাইছি, তার একটা খসড়া হিসেব নিয়ে যান আপনারা। মাত্র প্যারীতে শো’এর ব্যবস্থা করতে হলে,—

১। ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক - লাগবে অফিসের খরচ
২। ৪০,০০০ ফ্রাঙ্ক—Publicity and Propaganda.

৩। ১৫,০০০ ঐ—বুকলেট, স্মুভেনীর
৪। ১০,০০০ ঐ—তিন রাতের হল ভাড়া
৫। ৫,০০০ ঐ—Leaflets.
৬। ১০,০০০ ঐ—Poster.

৭। ১০,০০০ ঐ—হাতে রাখব, যদি দরকার হয়। তোমাদের কাছে টাকা না থাকে—কোনদিন... এই টাকা আমাদের অফিসে জমা দিলে কাজে হাত দেব এবং তোমাদের জ্ঞাত কাগজওয়ালাদের সঙ্গে কথা কইব। অবশ্য ধরে নিচ্ছি, তোমাদের দেশের সংবাদ-পত্র তোমাদের নাচ সম্বন্ধে যখন এত ভাল লিখেছে এবং হরেন ঘোষের সঙ্গে যখন

এসেছ—তখন তোমাদের দলটা ভাল এবং শিল্পীরা গুণী।”

“এই টাকা জমা দেওয়া ছাড়া আমাদের সঙ্গে Contract সই করতে হবে যে আগামি দুবছরের মধ্যে অল্প কোন Impresarioর কাছে তোমরা যাবে না, গেলেও আমরা তোমাদের সমস্ত আয়ের ওপর অর্থাৎ এই দুবছরের যে Takings হবে তার ওপর ২০% করে কমিশন নেব।”

ভদ্রলোকদের এত মিষ্টি কথা শুনে আমি বলতে বাধ্য হলাম, “আপনারা কি নেবেন তা পরিস্কার বুঝতে পেরেছি, এখন আমরা কি পাব, সেটা বুঝিয়ে দেবেন একটু?”

“গ্যারান্টি বলে কোন কিছু লিখে দেব না নিশ্চয়, তবে আমরা চেষ্টা করে টাকার জ্ঞাত ভাবনা থাকবে না তোমাদের। শো’টা যদি এ দেশের লোকের মনের মত হয়।”

আমি বলুম, “গ্যারান্টি দরকার হবে না দেবার, তবে যাতে গোটা ২০ engagement মাসে হয়, তার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?”

বুদ্ধিমান Impresario মুচকে হাসলেন আমার কথায়, তারপর বলেন, “তুমিও বিচক্ষণ লোক, এ কাজ করেছও অনেক, তুমি হলে কি এরকম ধারা গ্যারান্টি একটা দিতে পার্বে? না দেওয়া উচিত হত?”

আমি বলুম, “কতগুলো শো হবে তাও জানব না—কত টাকা পাব তারও ঠিক নেই অথচ ঘরের টাকা অতগুলো এনে

তোমাদের হাতে দেব—এটা কি ঠিক ব্যবসার কথা হ’ল—একটু Give and Takeএর নমুনা থাকলে ভাল হ’ত না?”

বিদেশী দুজনই তখন বুঝতে পারলেন যে অনেক সম্মত নষ্ট হয়ে গেছে। যদি দেখেই জবাব দিলেন যে, কাজ আছে—উঠতে হবে”....

Arnold Meckel Bureau through দিয়ে কোন নুতন artistকে সাধারণের কাছে পৌঁছেতে হলে—যে টাকা তাঁরা চেয়েছেন তার কমে কাজ হওয়া অসম্ভব। দরদস্তুর কর্তে হলে—অল্প Impresarioর নামত দিয়েই দিয়েছেন।

ফরাসী দেশে রাশিয়ান ব্যবসার ধরণটা মনের মত হয়নি বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা যা কল্লেন এবং আর্টিষ্টের দল যা দেখালেন তাতে এই জ্ঞান হয়েছে যে Impresario হয়ে বাঁচতে হলে—ওই রকম ব্যবসাই তাঁদের বাঁচবার পক্ষে একমাত্র উপায়। এইখানে বলা আবশ্যিক যে Arnold Meckel Agency, সেরাই-কল্লার জ্ঞাত যে propaganda ও publicity—Londonএর মত যায়গায় করেছে—বেশ কিছুদিন লাগবে ওদেশের লোকের তা ভুলতে।



পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

জয়ীপ ও নজার যন্ত্রাদি সুবিধায়
কিনতে হলে

‘বিনোদ কোম্পানীল’
নূতন শোরুম্বে যান।

১৩ নং ড্যালহাউলি কোয়ার্টার।

১৩৬এ, আন্ততৌব মুখাজী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানী

বাংলা ছবির গলদ কোথায়

কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া

আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করবার আগেই আপনাদের একটা কথা বলে নিতে চাই। কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ আমার ওপর ভার পড়েছে—দেশী ছবির দোষের কথা বলতে—বিশেষ করে পরিচালনার দিক দিয়ে। আর পরিচালনার ভুল সব বলতে যাওয়া মানে নিজের ভুলগুলো বলা—কোথায় আপনাদের কাছ থেকে আমাদের ভুল ক্রটির কথা শুনবো, না উলটে আমাদের ভুল সব দেখিয়ে দিতে হবে।—কি মুস্তিলে পড়েছি বলুন ত?

তাছাড়া ভুলের কথাই যদি তোলেন—তা'হলে ভুলের ত' আর অন্ত নেই। একে নতুন industry—এখনও আমাদের লোকের cinema গঠনটা আয়ত্ত করতে অনেক বাকী। ছবি কঠে গিয়ে সাপ গড়ছি কি ব্যাং গড়ছি তা বোঝাই মুস্তিল—ই্যা—সত্যি—হলপ করে আমি বলতে পারি যে আমাদের এই পরিচালকদের মধ্যে খুব কমই আছেন যিনি ছবি তৈরি করবার সময় জোর গলায় বলতে পারেন যে এছবি চলবেই। বিশ্বাস হচ্ছে না ত? এই দেখুন—আমাদের কোথাও যেন একটা মস্ত ভুল আছে যার জন্তে আমরা ছবি release না হওয়া পর্যন্ত ব্লকতে পারি না যে, সে ছবি দর্শকদের মনোমত হবে কি না? এই হচ্ছে ১ নং গলদ আর এ ভুল কেন হয় জানেন?—জানেন না—এই ভুলের কারণ হচ্ছে দর্শকদের—মানে আপনাদের পছন্দ অপছন্দ জানবার অভাব। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই আপনাদের—

এই ধরুন, এক বাটা ডাল রাধতে হবে—আমি হয়ত খুব ঝাল খাই—তাই

তাতে প্রায়—এই—ধরুন গোটা পনেরো লস্কা—হ?—দাঁড়ান ভুল বললুম বুঝি—এক বাটা ডাল রাধতে কটা লস্কা দিতে হবে—আমি—আমি কটা বলেছি?—পনেরোটা—সে, থাক্গে—না; ডাল রাধা আমার কাজ নয়—কাজেই এতে ভুল বললেও আপনারা কিছু বলতে পারবেন না। সে যাক্—কি বলছিলাম—ওঃ—ই্যা—ধরুন আমার যা ধারণা সেই নিয়ে যদি আমি ডাল রাধতে বসি—তা'হলে আপনাদের খাওয়া যা হবে বুঝতে পাচ্ছেন ত'? আমাকে দেখতে হবে যে আপনাদের কি পছন্দ সেইটে ভাল করে আগে বুঝতে হবে। সেই মত রান্না কর্তে পারলে তবে ত' আপনাদের ভাল লাগবে। এই আপনাদের পছন্দ—অপছন্দ—এইটে সারাক্ষণ মনে রেখে যদি আমরা ছবি তৈরি করি তা'হলেই সেই ছবি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে। এই পছন্দ-অপছন্দ আপনাদের—এটাও আবার ঘন ঘন বদলে যায় তা জানেন ত'—ই্যা বদলান—সেই কখন, কিরকম, আপনাদের মানসিক অবস্থা সেইটেরও খোঁজ রাখতে হয়। এইটে আমরা সবসময় পেরে উঠি না—এইটে আমাদের প্রথম নম্বর ভুল—বা দোষ—যাই বলুন ॥

দিশী ছবিতে আরও একটা ভুল যা প্রায়ই সবাই বলেন যে আছে—সেটা হচ্ছে—গল্প বলবার ক্ষমতার অভাব।—মানে গল্প জমাবার অভাব। জানেন ত? আপনাদের অনেকেই আছেন—যারা একটা গল্প শুঁড়িয়ে বলতে পারেন না—

গল্প বলতে আরম্ভ করলেই আর সবাই পালাই পালাই করতে থাকে না—না—আপনাকে বলছি না—আপনি জানেন নিশ্চয়ই কারণ আপনিও বলে থাকেন—“উঃ—ঐ লোকটা কি বকে!”—সেই—সেই—তেমনি—একটা ভাল গল্পও খারাপ পরিচালনায় এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে লোকে পালাতে পারলে বাঁচে।—

মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা—

“এক যে ছিল রাজা—“এই ব'লে ঠাকু'মা গল্প বলতে শুরু করলেন আর অমনি নাতি-নাতনৌরদল এসে জুটলো—তাদের চোখের সামনে তারপর—“পক্ষীরাজ ঘোড়া”—“স্বপনদেশের রাজকুমার”—কত সব ভেসে আসে। ঠাকু'মা গল্প বলতে জানে—নাতি-নাতনৌরা নিথর হ'য়ে গল্প শোনে।—ঠাকু'মা যদি আরম্ভ কর্তে—“ওহে পোন্ড্র-পোন্ড্রাগণ—এইবার তোমরা অবহিত-চিন্তে শ্রবণ কর আমি তোমাদের কাছে গল্প বলিব—” —ওঃ—এতক্ষণ দেখতেন ঘরখালি—সব পালিয়েছে।—গল্প জমাবার কায়দা জানতে হয়।

ছবির পরিচালনাও ঠিক তাই—ভাল করে জমিয়ে গল্প বলা—। এরও একটা ধারা আছে। আজ বাজে বকলে যেমন গল্প জমে না—তেমনি ছবিতে অনাবশ্যক কতকগুলো জিনিষের সৃষ্টি করলে সে ছবি ভাল লাগেনা।—ছবিতে অবাস্তব জিনিষের স্থান একেবারেই—নেই।—থাকবে কি করে? ধরুন দুই বন্ধু—একজনার ভালর জন্তে তার বন্ধু শেষে প্রাণ দেবেন—এই হচ্ছে—ধরুন—গল্পের পরিণতি। তাতে ধরুন একটা ঘটনা আছে যে—বন্ধু না জেনে একটা বিপদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—। এখন এই অবস্থায় আমি যদি বলতে বসি যে বন্ধু ছেলেবেলা ভালকরে লেখাপড়া করেনি—কাজেই তার

বুদ্ধি কম—কাজেই সে বুঝতে পারছে না—তার অমুখে বিপদ। আর তাই প্রমাণ কর্তে গিয়ে ছেলেবেলার সব ঘটনা দেখাতে আরম্ভ করি তাহ'লে আপনারা কি বলবেন? বলবেন—“দূর ছাই! ওর যে বুদ্ধিকম তা' ত' জানি—এমন বিপদে পড়লে কি হবে তাই দেখাও—তানা—ছেলেবেলার কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে—” ফলে—আপনার বিরক্ত এলো। এই রকম বহু অবাস্তরতা আমাদের ছবিতে থেকে যায়। তাতে অযথা ছবির দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় আপনারা দৈর্ঘ্যচ্যুতি হয়—

এই অযথা দৈর্ঘ্য নিয়ে কত যে আলোচনা হয় তা আপনারা কি বলবেন? অনেকে বলেন যে আমাদের দর্শকদের বুদ্ধি কম তাঁরা বোকা—সামান্য জিনিষ বুঝতে তাদের অনেক দেরী হয়—এই দেখুন চটে গেলেন ত? দাঁড়ান ভাল ক'রে জিনিষটা বুঝুন তারপর রাগ করবেন। আর আপনাকে বলা হচ্ছে না যে আপনার বুদ্ধি কম। সে যাক্ মোটকথা অনেকের মত যে চার আনার দর্শক যারা, যাদের পয়সায় সবচেয়ে বেশী আয় আসে—তাদের বোঝবার জন্তে ভাল করে—অনেক বেশী করে বুঝিয়ে সব বলতে হয়। ফলে হয় কি জানেন? যারা এই ধারণা নিয়ে ‘অ আ ক খ’ থেকে বোঝাতে আরম্ভ করেন তাঁদের ছবির দৈর্ঘ্য বেশী হয়ে যায়। লোকের ভাল লাগে না। এই যে ঠিক কতকটা বললে বা দেখালে সর্বসাধারণ ছবির গল্পটা বুঝে চলতে পারবে এইটে ঠিক করাই সব চেয়ে শক্ত কাজ। আর এইটের ভুলই আমাদের সব চেয়ে বেশী হয়। আচ্ছা—এই বার একটা বাংলা ছবিতে গিয়ে দেখবেন যে তা থেকে

কতটা কেটে বাদ দিলেও ক্ষতি হয় না—নিজেরাই মিলিয়ে নেবেন—কি বলেন?

দেখুন আমার উদাহরণ দেবার উপায় নেই—বলবার উপায় নেই যে ঐ ছবিতে ঐ জিনিষটা খারাপ। জানেন ত? আমরা বড় আত্মাভিমानी। আমাদের দোষ শুনতে খারাপ লাগে—সহ্য হয় না। আপনারা দেখে ছবি থেকে উদাহরণ দেবার উপায় নেই। তা যদি থাকতো তাহ'লে অনেক দোষ দেখিয়ে দিতাম। যদি বলেন—যে তোমার ছবির দোষগুলো দেখিয়ে বল না কেন—তা'হলে আমি বলি যে সত্যি কথা বলতে কি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না। নিজে যদি বুঝতেই পারতাম তা হ'লে সে সব ভুল কি করতাম।

হ্যাঁ—আরও একটা দোষ মনে পড়ে গেলো। সেটা হচ্ছে নতুনত্বের অভাব। একটা জিনিষের অনেক দিক থাকে তার একটা নতুন দিক দেখাবার অভাব। এই ধারণা চাঁদ ওঠে—আমাদের বাড়িতে কটা বড় বড় গাছ আছে। ছাত ছাড়িয়ে উঠেছে—চাঁদ এমনি শূণ্য আকাশেও ওঠে আবার একটু সরে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখি যে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ ওঠে! ফাঁকা আকাশে চাঁদ তার চেয়ে পাতার ফাঁকে চাঁদ দেখার মধ্যে আনন্দ বেশী আসে—তাই না—এই যে একটু সরে দেখা সেই চাঁদ দেখলাম—তবে পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু সরে দাঁড়িয়ে এই সরিয়ে দাঁড় করানো এইটেই হচ্ছে পরিচালকের প্রধান কাজ। এই ভালভাবে একটা জিনিষকে দেখানো এরও অভাব আমাদের অনেক আছে।

বিলুপ্তে থাকতে একজন খুব বড় পরিচালকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি বলেছিলেন যে সব জিনিষেরই একটা সৌন্দর্য আছে—তবে সেটা দেখতে এবং

দেখাতে জানতে হয়।—সেইখানেই পরিচালনার ভালমন্দ। সংসারের সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপার থেকেও এমন সব জিনিষ খুঁজে বার ক'রে ছবিতে দেখান যায় যে হঠাৎ কারও নজরে পড়ে না। অনেক বাড়ী থেকে স্নীকতা ছেড়ে লোকে চাকরী কর্তে যায় তবে ‘যেতে নাহি দিব’ এক রবীন্দ্রনাথই লিখতে পেরেছেন।

আচ্ছা আপনারা দৈর্ঘ্যচ্যুতি প্রায় হয়ে এসেছে না? আমি পারছি না ত—বক্তৃতা জমাতে? আমি জানি আপনারা খুব চটে যাচ্ছেন কিন্তু কি করবো বলুন—আমায় আর কিছুক্ষণ বকতে হবে। তবে খালি দোষগুলো আর বলবো না—কারণ কতকগুলো দোষ যা পরিচালকদের ওপর এসে পড়ে তার জন্তে পরিচালকরা সর্ব সময়ে দায়ী নন তা জানেন ত? একটা ছবি করতে হলে কত রকম অশুবিধে আর কষ্টের মাঝখান দিয়ে অনেক সময়ে কাজ করতে হয় তা আপনারা ধারণা করতে পারেন না। পরিচালকদের অনেকে সেই সব অশুবিধের ভেতর পড়ে নিজেদের ইচ্ছে বা ক্ষমতা থাকলেও কিছু করে উঠতে পারেন না।—এর চেয়ে বেশী বললে আমাকে উদাহরণ দিতে হয়—আর তা আমি কেন দিতে পারছি না—তা ত' বুঝতেই পারেন।

হ্যাঁ—শেষ করবার আগে আপনারা একটা ফর্দ শোনাই দাঁড়ান, মানে—পরিচালকদের কি কি গুণ থাকা দরকার, তার ফর্দ। তাহলেই বুঝবেন যে পরিচালকদের দোষ কতখানি।

প্রথম নম্বর :—তিনি হবেন মন-বিজ্ঞানের পণ্ডিত। তাঁর লেখাপড়া খুব ভালভাবে জানা থাকবে। Philosophy, Literature, Psychology এই তিনটেতে তিনি হবেন পণ্ডিত।

২য়:—তঁার সঙ্গীত শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে।

৩য়:—তিনি ভাল ক্যামেরাম্যান হবেন কারণ ছবি তুলতে না জানলে তার ফলাফল বুঝবেন কি করে?

৪র্থ—সাউণ্ড মানে শব্দ তোলার যে যন্ত্র আছে তঁার সম্বন্ধে তঁার যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে, তা না হ'লে তিনি Scenario ঠিক ক'রে লিখবেন কি করে!

৫ম—আর্টের সম্বন্ধে তঁার যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে।

৬ষ্ঠ—দেশের জনসাধারণের মনোভাব সম্বন্ধে—ইঁা দেখুন মোটকথা প্রায় সবই তঁার জানতে হবে—হু'একটা জিনিষ বাদে এখন বুঝতেই তো পার্ছেন যে পরিচালকদের দোষ কত সহজেই আসতে পারে। আপনারা হয়ত ভাববেন যে আমি পরিচালক ব'লে তাঁদের হয়ে দোহাই দিচ্ছি—মোটাই না। সত্যি এই সব জানলে তবে ভরসা ক'রে বলা যায় যে, আমি একজন বড় গোছের পরিচালক যে আমার ছবি সবাই পছন্দ করবে।

আজ দোষ-ত্রুটিই বলে গেলাম, দোষ ত' কারও ভাল লাগে না—তাই আপনাদেরও ভাল লাগেনি নিশ্চয়ই। আবার যদি স্বযোগ হয়—

গোপন ব্যাধির আরোগ্য নিশ্চিত —গোপনে—

—:~:—

পু:—মূত্রক্ৰমতা, মূত্রবেগধারণে অক্ষমতা, জননেত্রির দুর্বলতা, অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ক্রম, শুক্রকরণ, স্বপ্নদোষ।

দ্রী:—অতিরিক্ত, অল্পরিক্ত, হঠাৎ বন্ধ, টিউমার, অরারুর হানচ্যুতি, প্রদর, অগভ্য পথে বায়ুর:সরণ প্রভৃতি।

ডা: এম, এন, লাহিড়ী এম, বি, এইচ

১০১৩এ রায় ষ্ট্রীট কলিকাতা

চক্রবেড়ে রোড (নর্থ) পুলিশ ঠান্ডার সম্মুখে।

আধুনিক শবরীর প্রতীক্ষা

মন্ট্রাণী ঘোষ বি-এ

কৈশোর কুসুমকলি মুকুলিত হবে,
বসন্তে ডাকিয়া আনে কোকিলের র'বে
সেই সে সেদিন হ'তে অতি সমতনে
সাজানু নিজেরে কত নানা আভরণে
স্বপনের মায়া ঘেরা কোন আঙ্গিনায়
সমর্পিতে পারে আজি রহি প্রতীক্ষায়—

দিন বাহি রাত্রি বাহি বর্ষ গেল চলি
ধীরে ধীরে বিকশিত যৌবনের কলি
আশার স্বপনে রহি 'শবরী'র মত,
বাল্যলার 'আধুনিকা' 'টয়লেটে' রত;
প্রজাপতি আপিসেতে দিতে নিজে ডালি
সাজায়ে রেখেছি দেহ, নৈবজ্ঞের থালি।
'লিপষ্টিক' আর 'কুজে' আঁকিয়াছে রেখা
রিম্লেস চশমাতে তবে যায় দেখা
শিথিল কবরীখানি আবশিয়া লোটে
কবিরানা উচ্ছ্বাসে আলোড়িয়া ওঠে—
ক্ষীণ তনু তরঙ্গিয়া হৃন্দেরি 'তালে
স্বপনেরি জাল বুনি হেছয়ারি কূলে।

তালেতে পড়িতে গেছে ডিগ্রীর ফাঁটা
সময় বহিল তাতে যৌবনের গোটা
প্রবেশিকা দিয়েছিল বসন্তের বায়ে,
তরুণ অরুণ প্রাতে শ্রামলিমা ছায়ে;
বি-এ, এম্-এ, আর যত সবে গেল চলি
নিবেদিয়া ভারতীয়ে যৌবনের থালি
আসিলনা কেহ কভু আঙ্গিনার দ্বারে



লেখিকা

আধুনিক যুগের এই শবরীর তরে
সাজান জীবনডালা বিফলে শুকায়
আশার স্বপন মায়া সকলি মিলায়।

আই-সি-এস, বি-সি-এস; ভেবেছিল যাহা
আজ দেখি সব মিছে সব ফাঁকা মায়া
নিঠুর কঠোর অতি নব ধরাধাম,
'শবরী'রে উদ্ধারিতে নাহি কোন 'রাম';
কেরানীর কূল এবে তাও গেল সরি
ডিগ্রীর ঘটা হেরি ত্রাহি ডাক ছাড়ি—
হায় হায় শেষে কি গো এই ছিল তালে
অনাদরে বরি বুঝি চাকুরের কোলে।

ব্র্যাক বোর্ডের সরঞ্জামাদি

“বিনোদ এণ্ড কোং”—এ

পাওয়া যায়।

ছায়ার প্রগতি

লীলা দেশাই

ছায়ার মায়া কাটিয়ে তোলা যে কি কষ্টকর, বিশেষ আজকালকার দিনে, তা আর বলবার নয়। চলচ্চিত্র, তারপরে সবাক-চিত্র এদেশে এসে হানা দিল, এসে অতি সহজেই এদেশের লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেললো। এই প্রভাব আজকাল এমন স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, বায়স্কোপ দেখাটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর আবালবৃদ্ধবৃদ্ধি সন্ধ্যার পর একটা চঞ্চলতার তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়ে যায়—“আজকে একটা বায়স্কোপ দেখে এলে হয় না?” মাতঙ্গর প্রৌঢ় এবং রুদ্ধদের একটু ভেবেচিন্তে বেকতে হয়—হয়তো সেইদিন সকালেই তারা তাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাছে বায়স্কোপ দেখার বিরুদ্ধে খুব বড় রকমের এক লেকচার দিয়েছেন। কলেজের ছাত্রদের এ বালাই নেই—পকেটে পয়সা থাকলেই হ’ল। সমস্ত দিন তুমুল আলোচনার ফলে কে কোথায় যাবে তা আগেই স্থির হয়ে আছে, সন্ধ্যার পর শুধু পকেটে কিছু পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়া, তারপর বায়স্কোপে গিয়ে টিকিট কিনে ভেতরে গিয়ে বসে প্রসন্নমনে একটি সিগারেট ধরান। মহিলা ছাত্রীদের মধ্যেও এরকম আলোচনার অন্ত নেই, তবে এই ক্ষেত্রে আলোচনার ভাগটাই বেশী। বাই হোক, এইভাবে সবাকচিত্রের প্রায় সমস্ত রসটুকু নিংড়ে নেবার সুযোগ শুধু বৃদ্ধ, প্রৌঢ় এবং যুবকেরাই পেয়ে থাকেন, বয়োভ্যেষ্ঠা

মহিলারাও এর একটু ভাগ পান, অবশিষ্ট যা থাকে, সেটুকুই শুধু বালক-বালিকাদের কপালে জোটে। এই অবস্থায় তাদের মনের ভাব অনুমান করা কিছুই শক্ত নয়—তাদের মুখের ভাবটা কি রকম হয়, সেটা ধারণা করে নেবার তার পাঠকদের উপরই রইল।



লেখিকা

এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ কি? অনেকগুলি কারণের মধ্যে এর প্রবল একটি কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে Educational film অথবা বালক-বালিকাদের উপযোগী filmএর একান্ত অভাব। যে সমস্ত গল্প আমাদের দেশের film-producerরা করেন তার অধিকাংশই সামাজিক গল্প, সেগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখাবার আদৌ উপযোগী নয়। কাজেই, ছেলেমেয়েদের যদি বায়স্কোপ দেখাতে হয়, তবে ইংরাজি ছবি ছাড়া আর তাদের দেখাবার মত কিছু নেই, ধরুন

যেমন চার্লি চ্যাপলিনের কোন হাস্যোদ্বীপক ছবি অথবা হারল্ড লয়েড, অথবা বাষ্টার কিটন ইত্যাদির। এই সমস্ত বই দেখে যেমন ছেলে মেয়েরা আনন্দ পায়, তেমনি বড়রাও দেখে হৃদয় হেসে বাঁচেন, হৃদয় সংসারের দুঃসহ নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পান। কিন্তু এ বিষয়ে একটি মুঞ্চিল হচ্ছে এই যে—বেচারী ছেলেমেয়েরা অনেক জায়গায় এই সব ইংরাজী ছবির কথাগুলো বুঝতে পারে না।

বিলেত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এই সব বিষয়ে খুব উন্নত। তারা filmএর Commercial Valueটা কমায় নি, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই filmএর educational valueটা বাড়িয়ে তুলেছে—তারা তাদের filmএর মধ্যে এই দুটি জিনিষের সামঞ্জস্য রেখে তাদের film industryটাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে; কিন্তু আমাদের দেশে এই জিনিষটার এখনও একান্ত অভাব। আমাদের দেশের film industry অধিকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে; techniqueএর দিক দিয়ে আমাদের দেশের বইগুলি অনেকাংশে অনেক বিদেশী বইয়ের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে সত্যি, কিন্তু তবুও বলতে হবে যে সর্বোচ্চ পূর্ণতা আমাদের এখনও আসেনি—অবশিষ্ট তার যথেষ্ট কারণ আছে, এটা আমাদের ভুলে চলবে না যে আমাদের দেশে film industry অত্যন্ত দেশের অনেক পরে আরম্ভ হয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের স্বীকার করতে হবে—আমাদের দেশের film industry অতীতে অতি দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে, এবং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতেও এর এই দ্রুত গতি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বাংলা ফিল্ম সম্বন্ধে দু'চারটি কথা

ইন্দ্রনাথ রায়

আজকে অতি সহজেই এই প্রশ্নটা করা চলতে পারে, ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়েরা ফিল্মে যোগ দেবে কিনা?

ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়েদের ফিল্মে যোগ দেওয়ার পথে অন্তরায়ের অন্ত নেই আর, না যোগ দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তিরও অভাব নেই। প্রথমেই কথা আসে, আমাদের এই রক্ষণশীল (conservative) দেশে সেটা সম্ভব কিনা?

‘এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো, এটা কিছুতেই সম্ভব হত না—আর পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু আজ সে রক্ষণশীলতার বাঁধ ভেঙেছে এবং ক্রমশই ভাঙছে। যখন তালুকদারের তখন একেবারে ভেঙে পড়ুক। যাকে আমরা এতদিন চাপাচুপি দিয়ে রেখেছিলাম তারই reaction আজ দেখা দিচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে আগেকার সমাজ ব্যবস্থার ওপর আমরা খুশী হতে পারিনি, গলদ তার মধ্যে ছিল আর সেই গুলোই আমাদের এখনকারকালের সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী করে তুলেছে। আমি বলব, যা ভাঙছে তাকে ভাঙতে দেওয়া হোক—ভেঙে একেবারে চূরমার হয়ে যাক আবার গড়ে উঠুক নতুন করে—আমরা backward হ'ব না—time spiritকে বজায় রেখে আমাদের চলতেই হবে।

তারপর কথা আসে—ভদ্রঘরের মেয়েরা এটাকে তাদের profession করে নিতে পারে কিনা? Profession আমি বলতে চাই এই কারণে যে, শুধু খেলা বা সখ বলে কোন artকে নিলে—সেটা শুধু সেই আর্টের সঙ্গে flust করা হয়—সেটার

আর উন্নতি হয় না, তার perfection তো দূরের কথা।

কিন্তু কেন ভদ্রঘরের মেয়েরা এটাকে তাদের Profession করে নেবে না—এর যথাযথ শিক্ষা তাদের নিতে হবে—এর জন্তে তাদের রীতিমত সংযমী হতে হবে, এককথায় এটাকে তাদের একটা আর্ট বলে গ্রহণ করতে হবে। তবে তার মধ্যেও একটা কথা আসে যে, ভদ্রঘরের মেয়েদের ছবিতে অনেক ভূমিকায়, অনেক নৃত্যে—আমাদের জনসমাজ মেনে নিতে চাইবে না সেটা তাদের এতদিনের সংস্কারে বাঁধবে। কিন্তু সংস্কারটা চিরকালই পরিবর্তনশীল—আজ যেটা তাদের বিসদৃশ ঠেকছে সেটা আর কিছুদিন বাদে লাগবে না। যারা প্রথমে এই সংস্কারে ঘা দেবে—তাদের হয়তো একটু সহ করতে হবে। কিন্তু সেটুকু সহ তাদের করতেই হবে এটা চিরন্তন—ইতিহাসের পাতা ওন্টালে এর দৃষ্টান্তের অভাব হবে না; যারা আসবে তাদের এটাকে art বলে গ্রহণ করতে হবে—এটাকে তাদের Profession করে নিতে হবে। আর্টের Sakeএ তাদের এটুকু সহ করতেই হবে—মনে তাদের সেটুকু উদারতা থাকা দরকার, সেটুকু মনের বল থাকা দরকার।

তারপর আর একটা প্রশ্ন আসে যে, এই ফিল্ম প্রতিষ্ঠানগুলো ভদ্রঘরের মেয়েদের উপযোগী কিনা—সেখানে তারা ভদ্র ব্যবহার পাবে কিনা?

আমাদের দেশের এই ফিল্ম প্রতিষ্ঠানগুলি, সত্যি কথা বলতে গেলে, এখনও যথেষ্ট

ভদ্র নয়। এখন এগুলো অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত কর্তৃপক্ষের হাতে রয়েছে—তারা এই এগুলোকে চালায়, তত্ত্বাবধানের ভার তাদের ওপর। কাজেই অনেকক্ষেত্রে এই ফিল্ম প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে ভদ্রব্যবহার পাওয়া যায় না। সেগুলোর দিকে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। আর সে সতর্কতার জন্তে কর্তৃপক্ষদের জানানো দরকার যে, যথেষ্ট ভদ্র হতে না পারলে—লোকসান তাদেরই। কেননা এমন একটা দিন এসেছে, যে, এখন জনসাধারণ আর কোন চরিত্রের অর্থহীন অভিনয় দেখতে চায় না। যারা অশিক্ষিত, তাদের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়, কোন চরিত্র বোঝা, কাজেই সবক্ষেত্রেই তাদের অভিনয় সেই এক—চরিত্র ফুটে ওঠে না অভিনয় অর্থহীন হয়ে পড়ে—দর্শকের সংখ্যাও কমেতে থাকে, দর্শকেরা ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে—দেশী ছবির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছোট্ট বিদেশী ছবি দেখতে। কিন্তু এটা খুবই সত্যিকথা যে, আমাদের দেশীছবি যদি নিখুঁত হয় সবদিক থেকে, তাহলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই দেশী ছবির মধ্যে বিদেশী ভাষা—বিদেশী আচার পদ্ধতির চেয়ে দেশীছবিই বেশী পছন্দ করবে। তারা এর মধ্যে যেন নিজেকে দেখতে পাবে বিভিন্ন রূপে—নানা অবস্থায়। এই থেকে ক্রমে জনসাধারণের শিক্ষা লাভ হবে, অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারবে। আজকাল প্রায় অত্র সব দেশেই নাটক এবং ফিল্মকে জনসাধারণের শিক্ষার বাহন করে নিয়েছে। তারা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ছবি দেখিয়ে এবং অভিনয় করে দেশের অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে—তাতে শিক্ষার বেশ বিস্তার হচ্ছে—জনসাধারণের মধ্যে আগরণের সাদা

পড়ে গেছে। তবে এ জিনিষ আমাদের দেশেই বা সম্ভব হবে না কেন।

আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজকাল প্রায় সকলেই বুঝতে পারে যে আমাদের নিয়ে একটা মস্ত সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকার প্রতি মেয়েটাকে যথেষ্ট শিক্ষিত করতেই হবে—যে কোন উপায়েই হোক—আর সেই শিক্ষার পরিণতি—তাদের সংপাত্ত্ব করা। কিন্তু আজকাল এমন অনেক মেয়ে দেখা যায়—যাদের বিয়ের বয়েস সত্যিই চলে গেছে। তাদের অবস্থা কি। তাদের জীবনটা, তাদেরই চোখের ওপর ব্যর্থ হতে চলেছে—আশা-ভরসা করবার মত কোন সম্বলই তাদের হয়তো থাকে না—তবুও তাদের বেঁচে থাকতে হবে। তারওপর তাদের অনেককেই সংসার প্রতিপালন করতে হয়। হয়তো তাদের মধ্যে কেউ হচ্ছে শিক্ষয়িত্রী—আর কেউ হচ্ছে নাস। কিন্তু তাতেও তাদের সকলকে উপজীবিকা দিতে পারছে না। নিরাশমনে দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনটা একটা মস্ত অভিশাপ হয়ে পড়িয়েছে।

আমি বলি, তারা অনায়াসে ফিল্মে যোগ দিতে পারে—সংউপায়ে জীবিকা-অর্জন তাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। অন্তত তারা দুঃস্থতার হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে—স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

বিনোদ এণ্ড কোং

জরীপ ও নক্সার ড্রাবাদি, ব্র্যাকবোর্ড ও সাইক্লোগ্রাফের সরঞ্জামাদি এবং অফিস স্টেশনারী বিক্রেতা

বেদবাক্য

(কোতুক-নাটিকা)

শ্রীঅখিল নিয়োগী



[গুরুদেব শিষ্যবাড়ী এসেছেন; সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য হারানিধি। গৃহিনী আসবার সময় মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছেন, হারানিধিকে চোখের আড়াল কোরো না, ও থাকলে তোমায় কুটো গাছটি ভেঙে ছ'খান করতে হ'বে না।

মাঘের সকাল। কনুকে ঠাণ্ডা। গুরুদেব খুব ভোরে উঠে ডাকলেন:]

গুরুদেব ॥ ওরে হারানিধি—ওঠ—ওঠ—

[হারানিধির কোন জবাব পাওয়া গেল না। সে পাশ ফিরে শুয়ে আবার নাক ডাকাতে লাগলো।]

গুরুদেব

ব্যাটা ঘুম থেকে উঠতে চাইবে না! আর গিন্নি বলে দিলে কিনা, ও সঙ্গে থাকলে কুটোগাছটিও ভেঙে ছ'খান করতে হ'বে না! ভালো আপদে পড়া গেছে দেখছি! ওরে ও নবাব পুস্তুর—

[হারানিধির নাকের ডাক, আবার পাশ পরিবর্তন করলে]

গুরুদেব

নী খামোখা ওর সঙ্গে চ্যাচামেচি করে সকাল বেলাটা নষ্ট করতে পারি নে! যাই পুকুর ঘাট থেকে আগে আফিকটা সেরে আসি—জবাকুসুম শঙ্কশং কাশুপেয়ং মহাহুতিং...

[আরুস্তি করতে করতে প্রস্থান]
[সঙ্গে সঙ্গে হারানিধি লেপের তলা থেকে নাকের ডগাটা বের করলে]

হারানিধি

বাবা! যা ঠাণ্ডা! এর ভেতর বেরুলে নির্ধাৎ নিমুনিয়া! কথায় বলে, মাঘের শীতে বাঘ কাপে! [গুণ গুণ করে গান]

ভজ মন লেপের তলায় জয়রামে... কনুকে শীতে মারবে ছোবলু বাইরে যাযা কোন্ কামে!

আজ গুরুজীর থাকলে কপা

লেপের তলায় নিদ্রা দিবা—

খাও ঝিচুরী গরুমা-গরম যদি রে'ভাই শীত ধামে!*

[বাইরে গুরুদেবের আরুস্তি শোনা গেল—প্রণতস্থি দিবাকরম্। সঙ্গে সঙ্গে হারানিধি নাকটা লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিলে। গুরুদেবের প্রবেশ]

গুরুদেব

অ্যা! তুই এখনো উঠিসনি। আমি ভাবলাম, বুঝি সাজা তামাক গুড়ে যাচ্ছে। ওরে ও হারানিধি—ও আমার লেপের ঠাকুর—

[গা ঝোড়ামুড়ি দিলে যেন এই মাত্র ওর ঘুম ভাঙলো।]

হারানিধি

[প্রথমে একটা হাই তুললো তারপর গোটা কয়েক ভুড়ি দিয়ে]

দা ঠাকুর ডাক্ছ?

গুরুদেব

আজ্ঞে, ডাক্ছি না—মিনতি কচ্ছি—একবার দয়া করে উঠবে বাপধন—?

হারানিধি

কি বলব দা ঠাকুর, শরীরে যেন আর

কিছু নেই। কাল সারারাত পা'কটু কটু, মাথা বন্ বন্, দাঁত কড়কড়, বুক ধড়ধড়... গোটা রাত্তিরে ছ' চোখের পাতা এক করতে পারিনি! এই ভোর বেলায় একটু ঘুমিয়ে ছিলুম—তোমার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল!

গুরুদেব

[সভয়ে] তাইত' রে। বলিস্ কি! তুই যে আমাকে ভয় লাগিয়ে দিলি!

হারানিধি

না—না, তুমি কিছু ভেবোনি দা'ঠাকুর; উম্মনটায় আগে আগুন দিয়ে ফেলো, তারপর যা করবার আমি করবো'খন!

গুরুদেব

[বিমর্ষ ভাবে] আচ্ছা, না হয় তাই করি—

[উম্মনে আগুন দিতে বসলেন]

উঃ! ধোয়ায় চোখ দুটো একেবারে গেল!

[লেপের তলায় চাপা হাসি শোনা গেল]

গুরুদেব

ওকি রে হারানিধি...? ফিক্ ফিক্ করে হাস্ছিচ্ছিস্ বুঝি?

হারানিধি

হাস্ছি আর কোথায় দা'ঠাকুর, কাল রাত থেকে ত' শুধু বিষমই খাচ্ছি—

গুরুদেব

যাক! কোনো রকমে ত' উম্মন ধরানো হ'ল—এইবার বাসন গুলো—[হঠাৎ] একিরে হারানিধি তুই করেছিস্ কি?

হারানিধি

কি দা'ঠাকুর?

গুরুদেব

কাল রাত্তিরে যে খেয়েছিলাম সে এঁটো বাসনগুলো পর্যন্ত মাজিস্ নি?

হারানিধি

কি করবো দা'ঠাকুর, দেহটা সত্যি ভালো নেই! এ-বেলা তুমিই কোনো রকমে ধুয়ে নাও—ও-বেলা আর তোমায় কিছু দেখতে হ'বে না!

গুরুদেব

তাইত' রে! তুই যে আমায় বড্ড ক্যাসাদে ফেলি!

হারানিধি

[কাদ কাদ ভাবে] আমাতে কি আর আমি আছি দা'ঠাকুর! তোমায় নিজে হাতে কাজ করতে দেখছি আর আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে।

গুরুদেব

পরবিই-নে যখন—যাই ঘাট থেকে বাসনগুলো মেজে নিয়ে আসি—; বিদেশে বিভূয়ে এসে বড় মুন্ডিলে পড়া গেল। গিন্নির কথা শুনেই যত অনাড়ম্বর হ'ল

[যেতে যেতে ফিরে]

দেখ, কোনো রকমে মশলাটা পিষে দে—আমি বাসন ধুয়ে এলুম বলে—

[প্রস্থান]

[হারানিধি মুখ বের করে]

হারানিধি

হ্যাঁ! বয়ে গেছে আমার মশলা পিষতে! রইলুম আমি এই মটকা মেরে পড়ে! যে কণকণে জল, মশলা বাটতে গেলে হাত শুক্কু জমে বরফ'হয়ে যাবে।

[বাসন মেজে গুরুদেব এসে ঘরে ঢুকলেন]

গুরুদেব

এ কি রে! তুই এখনো লেপের তলায়! মশলা বাটা হ'বে কখন?

হারানিধি

উঠতেই ত' গিয়েছিলাম দা'ঠাকুর! কিন্তু পা' দুটোতে একেবারে জেঁক নেই। হুম্রি খেয়ে পড়ে গেলাম। হাড়ে-হাড়ে সে কী বন্ বন্। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত শব্দ শুনে পেতে!

গুরুদেব

[রাগিয়া] নাঃ, তুই আমায় একেবারে রাস্তায় বসিয়ে দিলি? মশলা না হলে আর কিই-বা রান্না হ'বে! দি ডালে-চালে চড়িয়ে—যে শীত খিচুরিটা খেতে ভালোই লাগবে—

[লেপের ভেতর হাসি শোনা গেল]

গুরুদেব

আবার হাস্ছিচ্ছিস্ হতভাগা?

হারানিধি

কৈ আর হাস্ছি দা'ঠাকুর! হাস্বার কি আর ক্ষমতা আছে! এত' শুধু খাবি খাচ্ছি!

গুরুদেব

এসেছি—শিষ্যবাড়ী কোথায় আরাম করে ছ'দিন একটু খাবো দাবো না—প্রাণ নিয়ে টানাটানি! চোখ গেল ধোয়ায়, ঠাণ্ডা কনকনে জলে বাসন মাজতে গিয়ে হাড়ে-হাড়ে কাপুনি! এখন আবার রান্না কি পদের হবে কে জানে! যাক! খিচুড়িটা বেশ তাড়াতাড়িই নেমে গেছে—

[লেপ সরিয়ে হারানিধি উঁকি মেরে দেখলে]

—ওরে তোর ত' বড্ড অসুখ—তুই কি খিচুড়ি খাবি?

হারানিধি

[তড়াক করে উঠে বসে] দা'ঠাকুর, তুমি ব্রাহ্মণ—দেবতা! সেই ব্রাহ্মণের বাক্য'বেদবাক্য—একথা নাকি শাস্ত্রই লেখা আছে। বেদবাক্য আর কত লক্ষ্যন করবেন দেবতা! দাও চারটি খিচুড়ি, পেসাদ খেয়ে জীবন ধন্য করি—

—যবনিকা—

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

[illegible]

বি এন আর-এর একটি ছোট্ট স্টেশন—
জগৎপুর।

সন্ধ্যা একটি ছেলেকে কোলে করিয়া
আর একটি ছেলের হাত ধরিয়া প্যাটফর্মে
দাড়াইয়া আছে, দুখাবের দুজন কুলী মাথায়
মোট লইয়া, তাহাদের মনে ব্যস্ততার
লেশ নাই, নিত্য কত যাত্রীকে পার
করিতেছে, কিন্তু শুধীর যেমনি ভাবিতেছে,
তেমনি সন্ধ্যা ! এই নীচু প্যাটফর্ম হইতে
অন্ধকারে ছেলপুলে লইয়া কি করিয়া
নিরাপদে নিক্সিয়ে গাড়ীতে চড়া যাইবে !
তাজাড়া, পুরী-এক্সপ্রেসের ভিড়, ধানিবে
মাত্র এক আধ মিনিট ! ধাক্কাধাক্কি অপমান,
গায়ের রক্ত জল হইয়া যায় ।

এক চক্ক দৈত্যের মত সার্চ লাইটের
তীব্র আলো ফেলিয়া কালো ইঞ্জিন গর্জন
করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসে,
বস্তুদানবের প্রতীক। ভাবিবার সময় নাই,
দেখিবার সময় নাই, সামনের থার্ড ক্লাস
গাড়ীর দরজা তাড়াতাড়ি স্থবীর খুলিয়া
ফেলিল। ‘আরে বাবু আরে’ চাৎকারের
মধ্যেই পোটলা পুঁটলীগুলো ঠেলিয়া দিয়া
সন্ধ্যাকে চড়াইয়া দিল।

অসংখ্য যাত্রী দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া
আছে। সন্ধ্যা উঠিতে উঠিতে বলে, কোথায়
ঢুকব? লোক যে!

ঠেলে ঢোক, ট্রেন ছেড়ে দিলে ব'লে—
সুখীর স্ত্রীকে একরকম ঠেলিয়াই দেয়।

তোরঙ্গ এবং স্যুটকেস, বিছানা ও
জলের কুঞ্জো কুলীরা পায়ের কাছে
আগাইয়া দেয়, পয়সা দিতে দিতেই ট্রেন
ছাড়ে।

হাঁফ ছাড়িয়া স্থধীর ফিরিয়া দেখে
হিন্দুস্থানী, মুসলমান ও উড়িয়া কামরা
ভর্তি। বাঙালী মহিলা দেখিয়া ফিরিয়া
ফিরিয়া দেখিতেছে মাত্র, জায়গা ছাড়িয়া
দিবার লক্ষণই নাই। ইহাদের চেয়ে
বাঙালী ফাজিল ছোকরাগুলোও ভালো!
সন্ধ্যাত' গিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রায় একজনের
বকের কাছে, উপায়ই বা কি ?

কেহ সঙ্গীতলহরী তুলিয়াছে, অশ্লীল
কিনা কে জানে, তাহাদের ভাইব্রাদাররা
ত হাসিয়াই অস্থির! সারারাত এমনি
দাড়াইয়া বাইতে হইলে হইয়াছে, আর কি ?
হাওড়ায় পৌঁছিয়া আবার শিয়ালদা হইতে
গোয়ালন্দ, সেখান হইতে নারায়ণগঞ্জ,
সেখান হইতে ঢাকা। ঢাকা হইতে আবার
নৌকা, তবে তাহাদের দেশ! পথের
কষ্টের শেষ নাই! সন্ধ্যার কিন্তু সত্যি
কান্না পাইতেছিল, কুমারী অবস্থায় ধনী
পিতার ছললী সেকেণ্ড ক্লাস ছাড়া
কখনো চড়ে নাই, তাও রিজার্ভ। সে
রামও নাই অযোধ্যাও নাই, আজ দরিদ্র
স্বামীর সঙ্গে পথ ভ্রমণের কষ্ট তাই সাধারণ
মেয়ের চেয়ে বেশী করিয়াই লাগিতেছে।
ইহাদের সঙ্গে কখনো কি সে গিয়াছে,
কর্পোরেশনের কুলী, ধাঙড়, দর্জি, ধোপা
ও মিল্‌হাওসের সঙ্গে? তাহার বামে ও
পশ্চাতে একেবারে গা ঘঁসিয়া যারা
দাড়াইয়া আছে, হয়ত তাহাদের ড্রাইভার
ও চাপরানী, বিড়িওলা কিম্বা রিক্সওলা,
যা খুসি হইতে পারে, কিন্তু গায়ের গন্ধ
যে অসহ্য।

• সুধীর তাহাকে বিছানার উপর বসাইবার ব্যবস্থা করিল, গরমে ঘামে ক্লান্তিতে ও অপমানে শিক্ষিত দম্পতির কি বিত্ৰী লাগিতে

লাগিল, বলিবার নয়। কে বলিবে এই
মেয়েটিই একদিন সগৌরবে কলেজে
পড়িয়াছে, এবং সুধীর ফাষ্ট-ক্লাস-ফাষ্ট
সকল পরীক্ষায়? দারিদ্র্য ছাড়া আরত
তাহাদের কেনো অপরাধ নাই।

একটি ছোট ট্রেনে টিকিট চেকার
উঠিল। সন্ধ্যা চিনিল তাহাদেরই কলেজের
সতীর্থ অনিমেঘ। অনিমেঘের সঙ্গেই তার
বিবাহ হইবার কথা ছিল কিন্তু সন্ধ্যার বাবা
পশ্চিমবঙ্গের সহিত কারবার করিতে চাহেন
নাই, বঙ্গজে বঙ্গজেই ভালো এই তাঁর
ধারণা। অতি সহজেই বিবাহের কথা
ভাঙিয়া যায়।

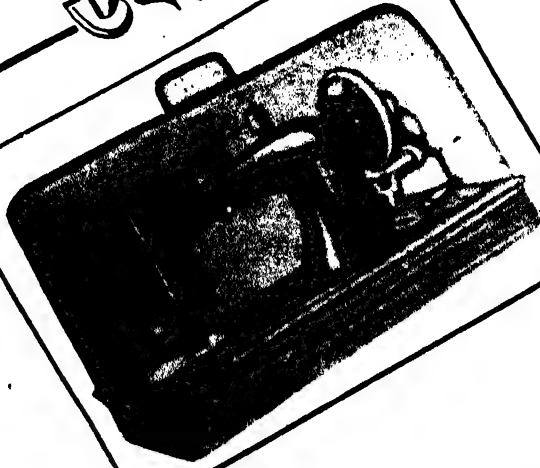
অনিমেধ সঙ্ঘার অনুবিধা এক পলকেই
বুঝিয়া লইল, গুঁতা দিয়া আরামে শায়িত
যাত্রীদলকে উঠাইয়া তাহার স্থান করিয়া
দিল। বেশী পরিশ্রম করিতে হইল না,
এক্সপ্রেসের টিকিট কামরার প্রায় তিনভাগ
লোক কেনে নাই, প্যাসেঞ্জারের টিকিট
লইয়াই উঠিয়াছে, তাছাড়া বিনামাস্তলের
বেয়ারিং যাত্রীও ছিল। পরের ষ্টেশনে
গাড়ী খালি করিয়া দিতেই একটুও দেরী
হইল না। বাঙালীর অসম্মানের প্রতিশোধে
হুএকটা শোককে হুচারটা চড়াপড়ও
বসাইয়া দিল।

এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে কত বড় উপকার
যে করিল সে কথা সন্ধ্যার মত কেহই
বোঝে নাই। হয়ত অনিমেষও না। বিপুল
কৃতজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টিকে লক্ষ্য না করিয়া
সে ওধারের বেঞ্চে গিয়া নিশ্চেষ্টে সিগারেট
টানিতে লাগিল।

সারারাত অনিবেশ জাগিয়া পাছারা
 দিল, এ গাড়ীতে যেন কেহ না ওঠে।
 সারারাত সন্ধ্যা ও সুদীর এবং তাহাদের
 ছোট ছেলেদের আরামে ঘুমাইতে দিয়া
 নিজের ক্লাস্ত চোঁখ দুটিকে কষ্ট দিয়া
 যখন দেখিল পূর্বদিগন্তে উষার আলো
 ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন সে নামিয়া অল্প
 গাড়ীতে চলিয়া গেল।

কিছুই হয়ত না, কিন্তু এই ছোট
উপকারটি বহু হইয়া সক্ষম জীবনে অরণীয়
হইবার মত ।

উষা



স্বদেশী সেনাইন্ডেস্ট্রেল কল

*

ভারতে প্রস্তুত-ভারতীয় শ্রমিকের দ্বারা
প্রস্তুত-ভারতীয় মূলধনে এবং ভারতীয়
তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

মূল্য	::	নগদ মূল্য	::	কিস্তিতে
হস্তচালিত কল		৯২৯০ টাকা		১২০৮
পায়ে চালান কল		১১৫৮ টাকা		১৫০৮
(অতিরিক্ত) ঢাকনা		৭৯০ টাকা		১০৮

সমস্ত পরিবারের ও দর্জীদের পক্ষে
বিশেষ উপযোগী

প্রস্তুত কারক—

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াক'স লিমিটেড

হেড অফিস : ৩৫, ট্রিফেন হাউস, ৫, ড্যালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা।
ফ্যাক্টরী : ২৫, ল্যান্ডাউন রোড, কলিকাতা।

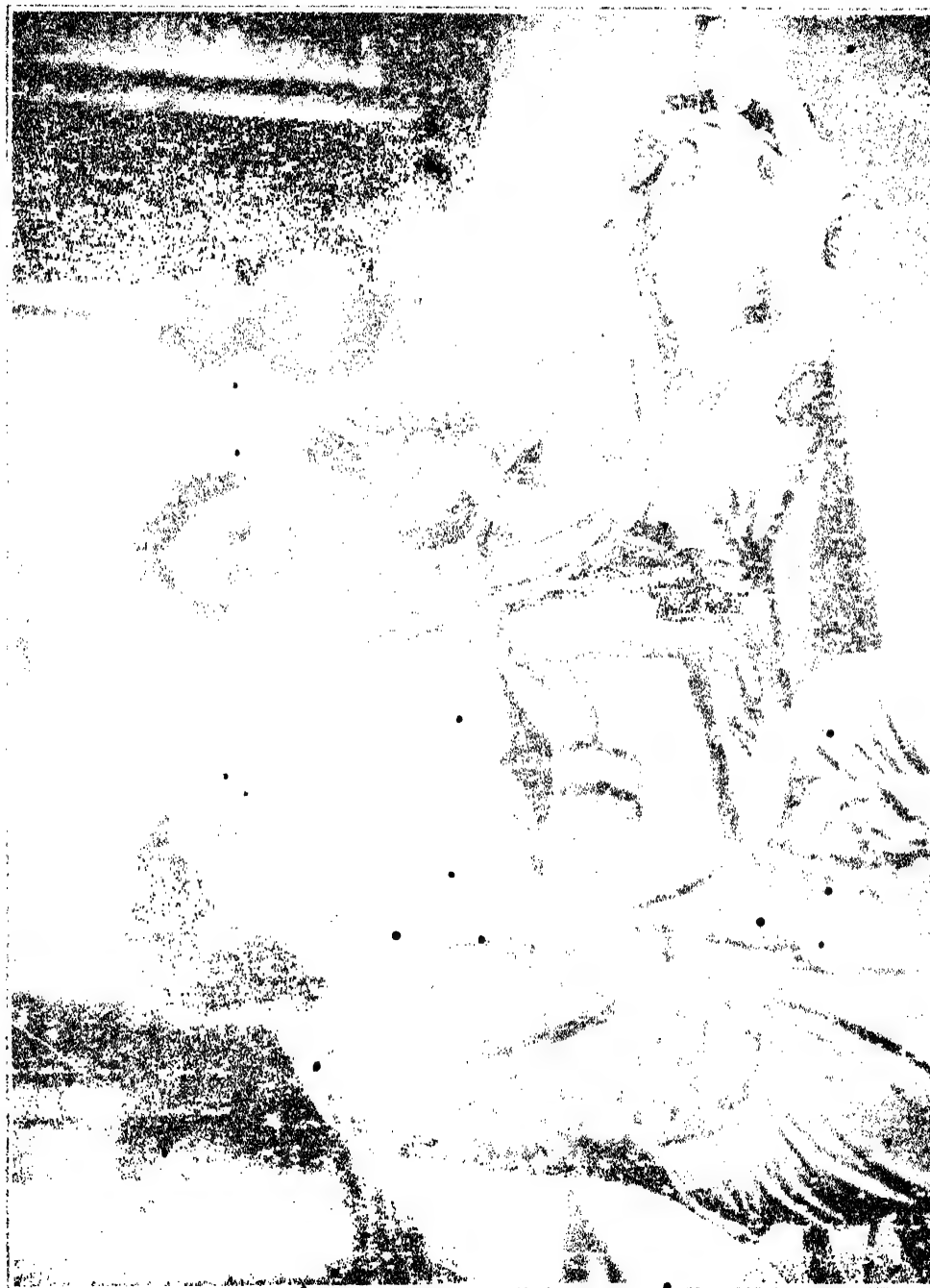
অনন্ত চরণ মল্লিক এন্ড কোং

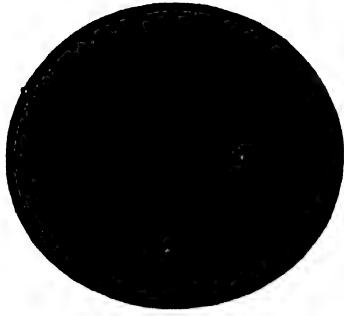
আমরা সকল প্রকার আধুনিক উন্নত প্রণালীর গদি, লেপ, তোষক,
মশারি, বালিশ, কুশন প্রভৃতি বাবতীর বিছানার সরঞ্জাম প্রস্তুত
করিয়া থাকি এবং যজবৃত্ত ও হাল ক্যাসানের বাবতীর
কম্বল, পর্দা, গালিচা, লংক্লথ, অয়েল ক্লথ, সন্ধানক,
তোয়ালে ও টেবিল ক্লথ প্রভৃতি সরবরাহ
করিয়া থাকি।

বিবাহের শোভুক সম্পর্কীয় শস্যাদ্রব্য
সরবরাহ করাই আমাদের বিশেষত্ব

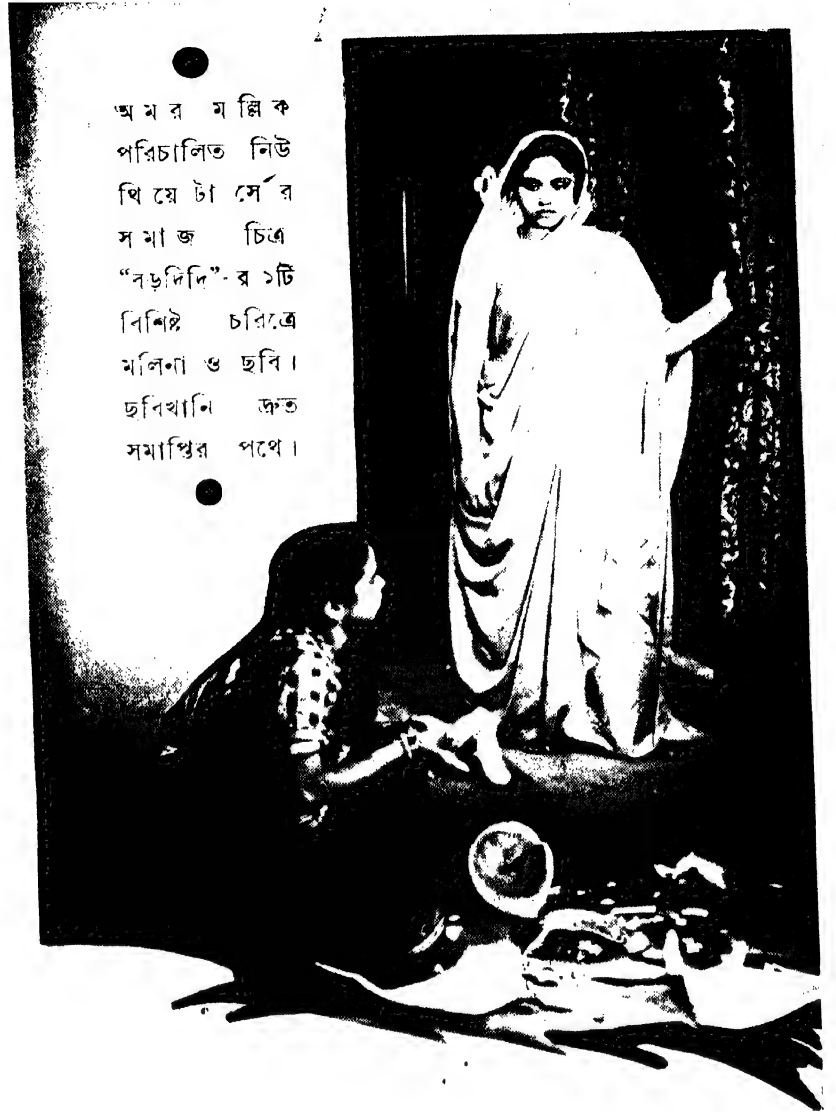
১৬৭-৫, ধর্মতলা ফ্রীট, চাঁদনি চক, কলিকাতা

ফোন—ক্যাল ১৪৩৬





অমর মল্লিক
পরিচালিত নিউ
থিয়েটার সের
সমাজ চিত্র
“বড়দিদি”-র ১টি
বিশিষ্ট চরিত্রে
মলিনা ও ছবি।
ছবিখানি দ্রুত
সমাপ্তির পথে।



সিষ্টোফোন ষ্টুডিওর
“কল্লনা” চিত্রে কাস্তি
ব্যানার্জি ও কল্লনা।

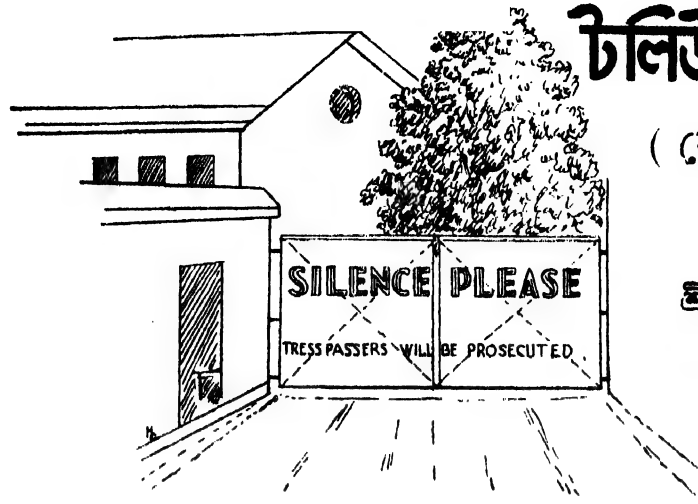
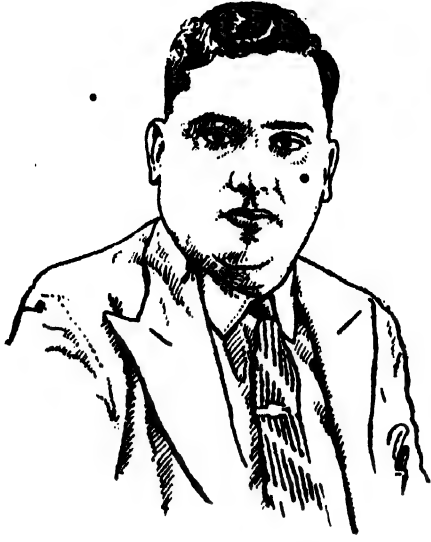


80, CORNWALLIS STREET
HATIBAGAN MARKET
CALCUTTA PHONE NO BB 2649.

কাপড় -

শ্রীমান্বদ্যান ও শ্রীমণ্ড
- পোষাক

৮০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
হাতিবাগান মার্কেট, ফোন: বি.বি. ২৬৪৯



টলিউড ট্রিপ

(শেষ-কিস্তি)

: লেখক :

ত্রিশুশীতেরঙ্গ
সামন্তাল



সাধনা বোস



বেনকা

একই পথে আনা-গোনা বরষে বরষে; চেয়েছিল লভিতে বিদায়—
এই মায়া মরীচিকা, সব ফাঁকি, সব ফাঁকা—তারি লাগি রথা হয় হয়!
জীবনের খালি পাতা, লোকসানে সার গাঁথা, আজও কী হয়নি ভরপুর—
সহসা শুনিয়া বাঁশী, বারেক ফিরিয়া আসি—চঙ্কের পিঠা খুড়খুড়!
শূন্য সে খলি খুলি, সাদরে দিলাম তুলি, বাহা কিছু ছিল অবশেষ—
শেষ বিদায়ের ক্ষণে, চাহি সকলের স্মৃতি—টলিউডে ট্রিপ করি শেষ

*

হাসি হাসি মুখ গুলি, মনে পড়ে শুধু খালি, মনে পড়ে অতীতের কথা,
সে ত' কিছু মিছে নয় বাহা কিছু রয় সয়, তারি মাঝে পেয়েছি বারতা
বিলাসীর 'Tollywood'-এ, লভিতে সে হরিলুটে, পেতে ধরে সবে করপুট—
দেউলে ধনীর দল, ফেলিতে চোখের জল, সার্থক করে—Follywood!
তারি মাঝে আছে গাঁথা, অতি-মানবের কথা, শুধিবারে শিল্পের ঋণ—
তারি লাগি মাথা বাথা, তাহারি বুকের খুঁজে মুক্তিকা হয়েচে রজনী!
পটে আঁকা ছায়া-ছবি, মিলায় পটের বুকে, অগণিত মানবের মেলা
তারি মাঝে দেখি চেয়ে, জীবনের খেলা-ঘরে, খেলায়ী ভাঙ্গা-গড়া খেলা!

হিসাব-নিকাশ থাক, আজ শুধু চলা থাক এখনও সে পথ বহু বাকী
সহসা দেখিছে চেয়ে, রাধার কানন ছেয়ে, আঁধারেতে জলিছে জোনাকী!
বেকারের চিন্তে হরি, শেষের সে দিন 'অরি', ককুগায় দিল যে পরশ
বুড়োর বদনে হাসি, টলিউড ফ্যালে চসি', ফলাইল কাকুড় সরস!
মেলনি যথের ধন, তারি তরে প্রাণপণ,, রেখো মান নর-নারায়ণ
ভবঘুরে ঘুরে-ফিরে, সেই পথে আসে ফিরে, পায় বর—বেকার-নাশন!

হাঁটু জলে ভাসে শীলা, কেন এত হেলা-ফেলা, কেবা রাখে মানিনীর মান—
হাসি মুখে নাই হাসি, যে রাগীরে ভালবাসি, সহসা সে ভুলিয়াছে গান!



কানন



শীলা হালদার

পথ পাশে দেখি ভিটে, মধু-হীন কালী-পিঠে, মস্থনে উঠেছে গরল,
জানিনা কাহার দোষে, মন কাঁদে আপশোষে, চোখে আজ আসে শুধু জল!
অবাঙালী বাঁধে বাসা, উড়ো-কলে আনে 'আশা', তারি তরে মন উচাটন
মধুর-পরশ লভি' সরস হয়েছে নাকী, টলিউড়ে—'করপোরেশন'!

অদূরে মাঠের পরে, অসূর কাঁদিয়া মরে, তারি আজো ভেসে আসে রেশ
খেমকা ও মতিচূরে, লড়া-লড়ি ঘুরে ফিরে, লাঠা-লাঠি হয় নাই শেষ!
লালে লাল বাবুলাল, হয় নাই আজো ঘাল, সিদ্ধি সে লভে সাধনায়,
ভাঙ্গা চাকে আছে মধু, তারি লাগি আজও শুধু, নেচে-কুঁদে-হেসে দিন যায়!

এত নহে অভিনয়, জীবনে এমনি হয়, কাজ শেষে বত না চতুর—
দিয়েছে বিদেশে পাড়ি, অপক্লপ কারিকুরি, ধনে-প্রাণে বেচারী ফতুর!
তিমিরে ছেয়েছে ধরা, একা শুধু বেঁচে মরা—জুরায়েছে জীবনের মধু
প্রেমের সাধনা শুধু বুঝিয়াছে সেইজন—যে তাহার পরাত্তর বঁধু!

চলিতে চলিতে দূরে, দেখিছ সহসা চেয়ে, আজও সেই বিজয়-কেতন
উড়িতেছে বায়ুভরে—দাঁড়াইয়া উচ্চ শিরে—বাঙালীর শির-নিকেতন!
সেই চেনা মুখগুলি, সোহাগে-আদরে ভরি, কাছে ডাকে মোরে হাত ছানি'
মায়ার পরশ দিয়ে ভুলায় ছায়ার কায়া, আমি শুধু এইটুকু জানি।
শুধু তাহাদেরি সাথে কাটিয়াছে কতদিন, কত নিশি হইয়াছে ভোর
জানি তাহা আজীবন আঁকা রবে হৃদি পটে, মুছিবেনা সেই, স্মৃতি গোর!

দেশের নরের কথা, দেশের নারীর ব্যথা, দেশের মাটির সাথে মিশে—
শরভের নীলাকাশে তাহারি বোধন শুনি, সোনালী ধানের শিখে শিখে!
'অশোক' পেয়েছে বৃষ্টি উমার পরশ যেন, কাদিছে 'অরুণা' মনো-হুখে!
যেঘের আড়ালে তাই বেদনা বনায় ধীরে, মানিনীর চাক চাঁদ-মুখে!!



চন্দ্রাবতী



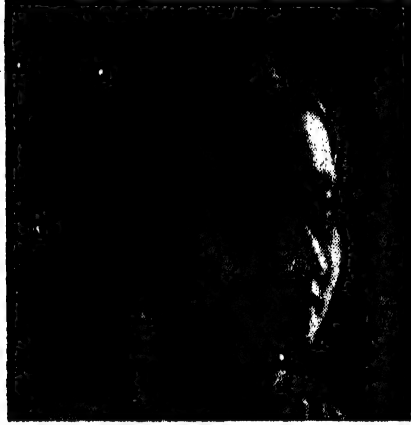
উমা



মলিনা



রাণী



বেগুমা রায়



জ্যোৎস্না গুপ্তা

মঞ্জু-কাননে হেরি মিলিয়াছে চখা-চখী, মণি-হারা ফণী কাংরায়
লীলা কমলের কাঁটা চলিতে বিঁধেচে বুকে—‘দুঃখমণ’ করে হায়, হায় !
জ্যোৎস্না নিশীথে কোন পদ্মার বাজুচরে, পথিকের গুনি পদধ্বনী
বাধিতে পারেনি হায় পলাতক মনোচরে, মাধবী কাটায় দিন গণি।
দেবতা দিয়েছে ফাঁকি, পথ আর কত বাকি—তবু ফিরে চায়
পড়ে আছে ধূলি-তলে, কে পরিবে আজ গলে—মলিন-মালায় !
সার্থক রচনার অমর-কাহিনী সেই. শুভ্র-পটের বুকে আঁকি—
সার্থক শিল্পার শিল্প-সাধনা বুঝি শোনাতে সবারে আছে বাকি।

*

ফিরিবার আছে তাড়া, আর কেন হেলা-ফেলা, বেলা বুঝি যায়,
ঘেটুকু পেয়েচি ঢের, তাহারি চলিছে জের—বিদায়, বিদায় !

ফিরিবার পথে ধীরে, আনওয়ার ‘শা’র পীরে, করি কুনিশ্
ছেলে-বুড়ো দলে দলে, জানি না কাহারে ঘিরে, জোরে দেয় শিসু !
এত নহে উপবন, গভীর ‘মনসা-বন’, আশে পাশে পাহাড়ের রাশি,
চলেচে বেদের দল, জানে এরা ছলবল, কানে পশে—সাপুড়ের বাঁশী !
মন্ত্র-সাধনা আর সিদ্ধির তুচ্ছতাক—কাজ নাই, পৈত্রিক প্রাণ
দেবকীর ছলা কলা, বলিতে কাঁপিছে গলা—দিই পিঠটানু !
মনসা-বনের পাশে, যেন আজো চোখে ভাসে—‘স্বপন প্রাসাদ’
রাজার কুমার তারে, গোড়েছিল বাহু-বলে—ভুলি অবসাদ !
কোন অধিকারে ‘রাধা’ দিয়েছিল প্রেমে বাধা, আজো তারি রেশ—
‘স্বপন-প্রাসাদ’ মাঝে, সে প্রেমের স্মৃতি রাজে, জানে ‘নিখিলেশ’।
যে নারী রূপের মোহে প্রেমের পরশ দিয়ে টেনে নিয়ে যায়—
সাত-সাগরের পারে তাহারি তুফান উঠে—হৃদি যমুনায়ে !

কুচো কাচা কাজ নাই, অনেক ঝামেলা তাই. সংক্ষেপে আজ করি শেষ
জ্যোৎস্না নিশীথে ভাসে, শাস্তি সে বারো মাসে, দেখি তারি মিলনের রেশ
রাণী লছম’র ব্যথা, ভুলি নাই তারও কথা, সে নারীরে স্মরি—
মায়া’র পরশ দিয়ে, ছায়া’র মাধুরী মোরে রাখিয়াছে ধরি !

*

শরতের অবসানে চাহি যে গুনিতে কানে, বারেক সে হেমস্তের গান—
আত্ম-প্রচারের লাগি কামনা করি না বন্ধ, প্রতিভার হেন অপমান !
আজো যারে ভালবাসি, আমার চাকের কাঠি দিহু তারি হাতে—
বিদায়, বিদায় আজ, সকলের সাথে ভাই, শারদ-প্রভাতে।

সর্বহারা বাংলার বাঁচবার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা

সর্বহারা বাংলাকে বাঁচতে হ'লে আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বাঙ্গালীর উপর বাঙ্গালীর সহানুভূতি, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানের উপর একমাত্র দয়দ।

বাঙ্গালী আজ পরাস্ত হল জীবন যুদ্ধে আর ব্যবসা হারিয়ে। অভাবে অদ্বন্দ্বনে ক্ষত বিক্ষত হল “বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী” মন্ত্র ভুলে যেয়ে।

বাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের ভাগ্যী আজ বাঙ্গালী নয়—তাই তার এত লাচ্ছনা। “ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি” বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীর ঘরে, বাঙ্গালীর পছন্দমত বস্ত্র যোগাগার ভার নিয়েছেন এঁরা। বাঙ্গালীর রুচী ও সামর্থ্য অনুযায়ী সব রকম বস্ত্রের বিপুল আমদানী করেছেন এঁরা। সবার সমুদ্রি বিধানই লক্ষ এঁদের।

বিনীত—

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি

(প্রসিদ্ধ স্বদেশী বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা)

বস্ত্র বিভাগ—১নং ও ২নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, [মেন] কোম বি, বি, ৩৫৩

ব্রাঞ্চ—৮৭২ কলেজ ষ্ট্রীট [বস্ত্র ও পোষাক]; জগদ্বাজার, ভবানীপুর [বস্ত্র ও পোষাক] কোম—পি, কে, ৩৯৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিযোগিতায় অদ্বিতীয়—ষ্টক অফুরন্ত—দর সবার চেয়ে সস্তা। লোকে যাহা প্রচার করে তাহা তাহারা করে না—আমরা যাহা বলি তাই করি—এটাই আমাদের বিশেষত্ব।

মাতৃ পূজায়

অন্যে পূজারীর সুগন্ধক নিবেদন

জি.ঘোষের তিল তৈল

*পরিজনের হাতে আনন্দ বিতরণ

জি ঘোষের নারিকেল তৈল

জি ঘোষ এণ্ড কোং

ঢাকা ও ২০, অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

ছায়াছবি-পরিচিতি

বিলাসী

বাঙলার ক্রমবর্ধমান "ছায়াছবি"র পরিচিতি লিখতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে নিউ থিয়েটার্সের কথা। এই অত্যন্ত কালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ছায়াছবির দরবারে আজ মহান আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাঙলা তথা ভারতের অসংখ্য ষ্টুডিও-গুলিরও কাজে আজ যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি দেখা যাচ্ছে।



নীতীন বোস

নিউ থিয়েটার্সের "চিত্রা"র সত্ত্বযুক্ত "দেশের মাটা" চিত্র সারা ভারতের চিত্রা-মোদীদের প্রাণে এক নতুন স্পন্দন সুরিত করেছে। আনন্দের ভেতর দিয়ে বাঙালার কৃষিশিল্পের এক মহোত্তর আদর্শ এই চিত্রে প্রতিফলিত কোরে নীতীন বসু সকলের কাছে নিজের ও নিউ থিয়েটার্সের বৈশিষ্ট্য প্রচার করেছেন। শুধু কাহিনীর চমৎ-

কারিত্ব নয়—একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ছবিও যে সকল গুণ থাকে "দেশের মাটা" সেই গুণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা বের করার ইচ্ছা রইল।

নীতীন বসু এর মধ্যেই "জীবন-মরণ" নামে স্বাস্থ্য বিষয়ক একখানি ছবির কাজ প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে এনেছেন। ছবিখানি হয়তো বড়দিনের আগেই মুক্তি প্রতীক্ষায় থাকবে। নীতীন বসু আজ যে আদর্শ নিয়ে ছবি তুলতে শুরু করেছেন, সে আদর্শ সকলেরই অনুকরণযোগ্য।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "অধিকার" চিত্র মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। "মুক্তি"-র পরে আসছে "অধিকার"—চিত্রা-মোদীরা সেইজন্ম উৎসুক হ'য়ে রয়েছে "অধিকার"র আগমন প্রতীক্ষায়। "অধিকারে" আমরা



প্রমথেশ বড়ুয়া

একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া উচ্চশিক্ষিতা তরুণীকে দেখতে পাব একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়। নাম তার—চিত্রলেখা দেবী।

ফণি মজুমদারের পরিচালনায় "স্ট্রীট সিঙ্গার" বা "সাথী"-র চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্তির পথে। ছবিখানি যে খুব ভাল হবে এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা এখন থেকেই কোর্চি। কারণ, ফণিবাবুকে আমরা চিনি, তার কাজের পরিচয় আমরা পেয়েছি; তাঁর গুণের প্রশংসা আমরা করেছি।

অমর মল্লিকের "বড়দিদি" চিত্রখানিও প্রায় শেষের পথে এগিয়ে চলেছে। এই চিত্রে মল্লিক মশাই যে ভাবে চরিত্র বণ্টন করেছেন তা' সত্যিই প্রশংসার। নিউ থিয়েটার্সের জন্মকাল থেকে এতাবধি সিনেমা শিল্পের সেবা কোরে মল্লিক মশাই



অমর মল্লিক

যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং তিনি একজন গুণী শিল্পীরূপে যে ভাবে চিত্রা-মোদীদের কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়েছেন সেই হিসাবে আজ পরিচালকের পদে উন্নীত হ'য়ে তিনি নিউ থিয়েটার্সের ও

নিজের সুনাম রাখবেন—একথা আজ নিঃসংশয়ে-আমরা বলতে পারি।

দেবকী বসু ছ'নম্বর ষ্টুডিওতে মৈমনসিং গীতিক। থেকে গৃহীত “বিশ্বের বাণী” নামে ছবি তুলছেন ছবিখানি নাচগান ও নতুন ধরনের কাহিনীতে যা'তে দর্শকমন আনন্দে আন্মুত কোরতে পারে তার জন্ত এই



দেবকী বোস

প্রতিষ্ঠানের বহুগুণী কর্মকর্তা। যতীন মিত্র ও দেবকী বসু যুগ্মভাবে চেষ্টা কোরছেন। এই যোগাযোগে “বিশ্বের বাণী” যে অমৃত মছন কোরবে একথা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত ছবিগুলির কাজ শেষ হ'লেই শোনা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র ও দীনেশ দাশ ছবি তোলায় ব্যাপৃত হবেন। ইতিমধ্যে এরা চিত্রনাট্য ও ভূমিকা বণ্টন কার্য শেষ কোরে রাখবেন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের “অভিনয়” রূপবাণীতে সগৌরবে চলছে। ছবিখানি এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম আরও বৃদ্ধি কোরেছে। “অভিনয়” সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের মতামত ব্যক্ত কোরেছি। স্মরণীয় এখানে তার পুনরুজ্জ্বল নিম্নয়োজন।

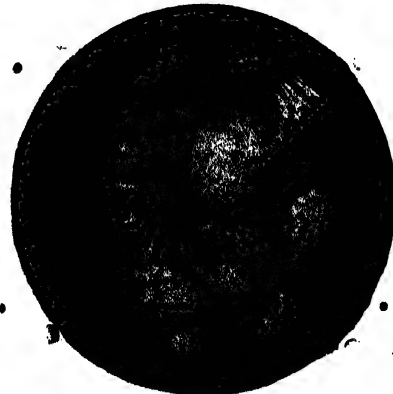


মধু বোস

এদের পরবর্তী ছবি তোলা হ'ছে “পরশমণি”—প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায়। ছবিখানির গল্প রচনা কোরেছেন শক্তিমান নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। এই ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা প্রভৃতি কলাকুশলী অভিনেতৃন্দ।

শোনা যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান রঙমহলের মূল অভিনেতৃ সজ্জ নিয়ে শীঘ্রই শচীন্দ্রনাথের সাফল্য মণ্ডিত “স্বামী-স্ত্রী” পর্দায় রূপান্তরিত কোরবেন।

রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক চিত্র “জনক নন্দিনী” কাশী বন্দ্যার তত্ত্বাবধানে প্রায় শেষ হ'য়ে এল।



কাশী বন্দ্য

জ্যোতিষা ব্যানার্জি আর ষ্টুডিও একখানি পৌরাণিক ছবি “নর-নারায়ণে”—র শূটিং প্রায় শেষ কোরে এনেছেন।

মতিমহল থিয়েটার্সের সামাজিক ছবি “যথের ধন” হরি ভজের পরিচালনায় কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হবে আশা করা যায়। ছবিখানি রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে তোলা হ'ছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে জ্যোতিষ ব্যানার্জি পরিচালিত ধর্মমূলক চিত্র “একলব্য” মুক্তি প্রতীক্ষায়।

আপাততঃ এই ষ্টুডিওতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পৌরাণিক চিত্র “দ্রৌপদী”—র কাজ অহঙ্ক চৌধুরীর পরিচালনায় ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

ফিল্ম কর্পোরেশনের হিন্দি ছবি “আশা” বহুদিন ধরে তোলা হ'ছে কিন্তু এখনও শেষ হবার নাম নেই। এই ছবিতে নিউ থিয়েটার্সের কমলেশকুমারী নায়িকা রূপে আত্মপ্রকাশ কোরবেন।

বি এল্ থেমকা সংগঠিত দ্বিতীয় ছবি “খনা” পূজোর পূর্বেই “শ্রী” চিত্রগ্রহে মুক্তিলাভ কোরবে। মিঃ থেমকার দুর্দমনীয় সাহস ও ঐকান্তিকতা আজ পর্যন্ত তাকে কোন বিষয়ে পরাজিত কোরতে পারেনি। সেইজন্মেই মনে হয়, “খনা” তাকে জয়মাল্যে ভূষিত কোরবে।

শোনা যাচ্ছে ইনি শীঘ্রই নিজস্ব ষ্টুডিও তৈরি কোরে বন্ধিমচন্দ্রের “চন্দ্রশেখর” তোলার ব্যবস্থা কোরবেন।

কালী ফিল্মস্ বহুদিন যাবৎ নিজেদের কোনও ছবি তোলােন নি। তবে এই ষ্টুডিওতে আপাততঃ তামিল ও গবর্ণ-মেন্টের ছবি তোলা হ'ছে। শোনা যাচ্ছে,

এই মাসেই কালী ফিল্মস্ লিমিটেড কোম্পানী হ'বে এবং পূজোর পর থেকে "শ্রীকৃষ্ণ" নামে একখানি পৌরাণিক ছবি তুলবেন। 'প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর এই অভ্যুত্থানে বাদালীমাত্রই খুসী।

দেবদত্ত ঠুঁড়িওতে আপাততঃ কোন ছবিই তোলা হ'চ্ছে না। তবে পূজোর পর থেকে এই ঠুঁড়িওতে নূতনভাবে কাজ আরম্ভ হবে।

ব্যাকপুর্বে রামগতি হাজরা ও তিনকড়ি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হাজরা পিক্চাস লিমিটেড্ নামে যে নূতন ঠুঁড়িও তৈরি হ'য়েছে সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশাব্যস্ত। কারণ, এখানে ষাড়া যোগদান কোরেছেন তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এদের ষ্টিং পূজোর পর থেকেই শুরু হবে।

ম্যাডান কোম্পানীতে চারু রায়ের পরিচালনায় ইন্ড মুভীটোনের "পথিকে"-র কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো

সিষ্টোফোন ল্যাবরেটরী পি, ত্রাণ্ডেলের পরিচালনায় ও অজিত সেনের সহযোগিতায় "কল্পনা" নামে একখানি ছোট ছবির কাজ শেষ হয়েছে।

অরোরা ঠুঁড়িওতে সরমা পিক্চাসের "মায়ামৃগ" শেষ হ'য়ে এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়।

এ ছাড়া অত্যাশ্চর্য ছ'একখানা ছবি তোলার কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে এখন কিছু খবর দেওয়া আমরা মুক্তি সঙ্গত বনে করি না।

বন্ধিম-বন্দনা

শ্রীমদ্বৈষ্ণব রায়

মায়ের প্রতিমা গড়িলে আপন হাতে,
পূজার মন্ত্র রচিয়া ভাষায় নব
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি' দিলে তুমি তাতে ;
তাই নিয়ে মোরা করি পূজা-উৎসব।
বাণী যে তোমার অমৃত সঙ্গীদনী
বিস্মৃতি নাশি' দিল নব জাগরণী,
আঁধার রজনী অবসানে তাই হেথা
জাগিল উষার আনন্দ-কলরব।
গহন গভীর বনের বুকের মাঝে
এক হাতে তুমি রচিলে বিশাল পথ,
আর হাতে তুমি নব-আভরণ-সাজে
সাজায়ে চালালে ভাষার বিজয়-রথ।
সে-রথ আজিকে বিপুল গর্বে চলে
দেশ দেশান্তে আপন শক্তিবলে,
আশীষ তোমার অসীম যাত্রাপথে
আনিছে সেখায় সারথি নিত্য-নব।

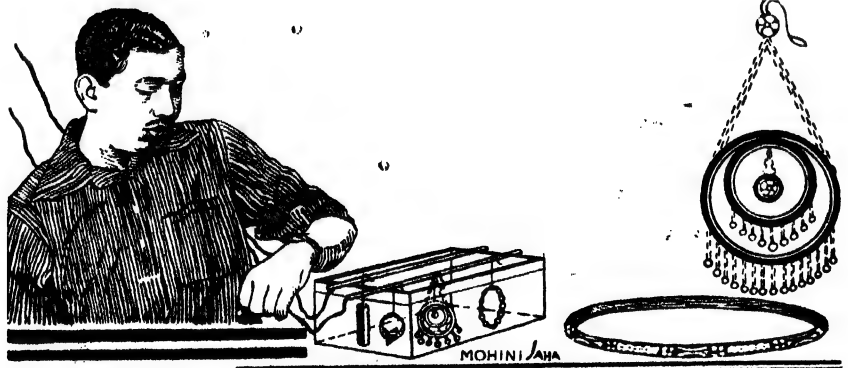
উপহারের যোগ্য

প্রিয়জনদের প্রিয়

—:—:—

আমাদের নিউ রোল্ডগোল্ডের সমস্ত গহণাই দেখিতে ঠিক সোনার গহণার মত। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে গিনি সোনা দ্বারা গোল্ড প্লেটিং করা হইয়া থাকে এবং অবিকল গিনি সোনার রং স্থির রাখা হয় ও রং দীর্ঘ দিন স্থায়ী থাকে। সর্বপ্রকার গহণাই আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ভাটিয়া চুড়ি এবং মপ চেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাটিয়া চুড়ি ২ গাছা ২১০, মপ চেন প্রতি ফুট (১২ ইঞ্চিতে ১ ফুট) ৩। প্রায়তন বা নূতন সমস্ত রকম গহণা আমরা স্বল্প খরচে খাটী গিনি সোনা দ্বারা আধুনিক প্রণালিতে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ইলেকট্রোপ্লেটিং করিয়া থাকি। ডাক্তারী যন্ত্রসমূহ আমরা সার্পিনিং ও নিকেলিং করিয়া থাকি।

আর্থিক সমস্যা সমাধানের সুযোগ



কানবালা ২খানা ৬/
ভাটিয়া চুড়ি ২গাছা ২১০

১১২
১-১-১১২৬

বিবাহ ও প্রেম

ত্ৰীপদ্মা বসু

বিবাহ মানব সমাজের একটি অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। দুজন নর-নারী এই বিবাহ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া দুজনের একান্ত কাছে থাকবার, সুখেদুঃখে সঙ্গী হবার, আপদেবিপদে সহানুভূতি করবার জন্ত মিলিত হয় ও সমাজ সে মিলন অনুমোদন করে। বিবাহের পর স্বামীস্ত্রী নিজেদের মধ্যে নীড় বাঁধে ও বৃহৎ সংসার সৃজন করে। প্রেম বিবাহের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তাই যে সংসারে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রেম থাকে না—সে সংসার হয়ে উঠে ব্যর্থ। যেখানে সন্তান জন্মে, বেড়ে উঠে—সেখানে যদি প্রেমের আধিপত্য না থাকে, সেখানে যদি স্বার্থের হানাহানি থাকে, তবে তা সন্তান-জননের পক্ষে প্রতিকূল না হ'লেও সন্তানপালনের পক্ষে হয়। যে শিশুর মা-বাপের মধ্যে নেই সন্তাব, নেই একের সুখ সুবিধার জন্ত অজ্ঞের সুখ সুবিধা বিলিয়ে দেবার স্বতঃ-প্রণোদিত চেষ্টা, সে শিশুর মানসিক বৃদ্ধি-গুলি অকালেই বাস্তবের কঠোরতার আঁচে ম্লান হ'য়ে শুকিয়ে যায়—পারে না সে বড় হয়ে নিজের আশ্রয় চেষ্টা সঞ্চেও শুকিয়ে-যাওয়া। হৃদয়-মুকুলটিকে শোভায়, সৌগন্ধ্যে একটি প্রাকৃতিত কুসুমের পরিণত করতে।

আর বিবাহ যে দুজন নরনারীকে নির্দেশ দিল এক হ'য়ে সংসার পাতবার—তারাই বা কি করে সক্ষম হবে এক ছাতের নীচে দিনের পর দিন কাটাবার, এক অন্ন, এক শয্যা ভাগ করে নেবার—

যদি না মিশে থাকে প্রেম তাদের সব কাজে সব চিন্তায়? যদি পরস্পর বিলিয়ে দিতে না পারল নিজেদের পরস্পরের কাছে প্রেমে, যদি একে অজ্ঞের হাত থেকে নিজের স্বার্থটুকু রক্ষায় সব সময় সযত্ন থাকল, তবে গড়বে তারা কি? বাঁচবে তারা কি দিয়ে? মরণের পর কি অক্ষয় সম্পদ তারা রেখে যাবে তাদের বংশধরদের জন্ত? তাই প্রেম বিবাহের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। তাই প্রেমহীন বিবাহ—বিবাহই নয়।

বিবাহের মধ্যে আবদ্ধ হ'বার জন্ত সামাজিক পরিচয়ের পর পরস্পরের মধ্যে প্রেম যাচাই করবার উদ্দেশ্যে সভ্য দেশ সমূহে court-ship বা মন-জানাজানি, মন-দেওয়া নেওয়ার পাল্লা শুরু হয়। যখন একজন আর একজনকে হৃদয় দিয়ে চিনে নেয়, তার আশেপাশের, তার সংসারের ব্যাপার রূপান্তর জেনে নেয়—তখন তারা বিবাহ পদ্ধতির ভিতর দিয়া নিজেদের জীবনের সাথী করে নেয়। কিন্তু এই যে মন-জানাজানির কাল, এ সময় কি মানুষ—যাকে সে প্রিয়তম বলে বরণ করতে চলেছে তার সম্বন্ধে, আপনাকে, নিজের স্বরূপ মূর্তিতে, সত্যপরিচয়ে, উদ্ঘাটিত করতে পারে সব সময়? যদি পারতো, তবে প্রেমের বিবাহের পরেও আসতো না এত বিবাহ বিচ্ছেদের হুড়াহুড়ি, আইন-প্রণেতাদের করতে হ'তো না নিত্য নূতন করে বিবাহ বন্ধন থেকে নরনারীকে মুক্তি দেবার জন্ত নূতন আইনের প্রণয়ন।

আমাদের দেশে পূর্বকালে অভিজাত ঘরের বিবাহ প্রায়ই অনুষ্ঠিত হ'তো স্বয়ম্বর সভায়, কস্তার বরের কণ্ঠে স্বেচ্ছায় মাল্যদানের পর। স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করার সাথে সাথেই কস্তা বরের জন্ত অন্তরে কিছু প্রেম অনুভব করতো না। সেখানে কস্তার অন্তরে কাজ করত প্রধানতঃ বরের রূপ—যা সে স্বচক্ষে দেখত—love at first sight (আমাদের একালেও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়) আর গুনতো সে তার সহচরীর কাছ থেকে বরের শৌর্য্য, বীর্য্য, ধন প্রতিপত্তির কথা।

আমাদের দেশে বর্তমান সমাজ যে বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেনে নিয়েছে, তা' হচ্ছে: পাত্র পক্ষ ও, পাত্রী, ঠাক্ক দু'জনারাই, পরস্পরের কোলীজ রূপ, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, সম্পদ পরিমাপ করে, পাত্র ও পাত্রীকে বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে দেন—এ জীবনে চিরদিনের জন্ত—মরণের পরেও বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করে। বিবাহ, জ্ঞান ও মুক্তির মত: মানব জীবনের একটি অপরিহার্য্য সংস্কার। পাত্র ও পাত্রীপক্ষ সামাজিক রীতি হিসাবে আরও নজর রাখেন, বিবাহের পণের উপর। এই বিবাহে পাত্র ও পাত্রীর মতামত নেওয়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকেরা প্রয়োজন বোধ করেন না—এমন কি চাক্ষুষ দেখাও অনেক জায়গায় হয় না—একেবারে বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের সময় শুভ-দৃষ্টির মধ্য দিয়া চারিচক্ষের মিলন হয়। কাজেই এই বিবাহ কতকক্ষেত্রে নরনারীর পক্ষে শুভ হ'লেও নরনারীর মনশক্তি, আদর্শবাদ রূপতৃষ্ণা যৌন আকর্ষণ, পূর্বা-মুরাগ যে কোনও একটি বা একাধিক কারণে হয়ে উঠে নিরানন্দের। ব্যর্থতায় ভরে উঠে স্বামীর মন, ভারাক্রান্ত মনের বিষময় প্রতিক্রিয়া প্রতিকলিত হয় তাদের

নিজের সংসারে, সম্মান-সন্ততির জীবনে। তবে এই বিবাহের পর সাধারণতঃ স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে দুজনে মিলিত হয় এবং তাদের মনে সংস্কাররূপে দেখা দেয় প্রেম। জীবনের কণ্টকাকীর্ণ স্বাধীন প্রেমের পথে চলাফেরা করার চেয়ে প্রেমের সুশীতল ছায়ায় আরাম-প্রিয় মানব-মন আশ্রয় পায়—তাই এই বিবাহের সমাদর।

সকল দেশ সকল যুগে একনিষ্ঠ প্রেমকে সব চেয়ে বড় সম্মান দিয়েছে। একসঙ্গে একই সময়ে একজন পারে না একাধিক জনকে বা একবার কাকেও ভালবেসে অপর কাকেও সমান ভাবে ভালবাসতে—এই ছিল আমাদের ধারণা। কিন্তু আজ-কাল, কত ক্ষেত্রেই দেখতে পাই একই যাহুর জীবনে একাধিক জনের আবির্ভাব থাকে অপ্রাকৃত বা অগভীর বলে কোন

ক্রমেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তখন প্রেমকে মাপতে হয় সময়ের দীর্ঘতা দিয়ে নয়, অমুভূতির গভীরতা দিয়ে। তাই এক সময়ে যাকে দেখি একজনের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রেমের মহিমায় কিছুদিন পরে দেখি, তার সে হৃদয়ে আর কোনই অধিকার নেই—সেখানে এসেছে এক নবাগত অতিথি। এই অমুভূতির গভীরতা থাকে বলেই তখনকার মত সুখ বা দুঃখ অতি গভীরভাবে মনের উপর রেখাপাত করলেও চিরদিনের জ্ঞাতদাগ ফেলে যায় না।

একাধিক নিষ্ঠার ধারণা হয়ত পূর্বে ছিল—তবে তার প্রচলন ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের মধ্যে—পুরুষের জীবিয়োগের বা ত্যাগের পর বিবাহের বা জীবিত বর্তমানে বহুবিবাহের মধ্য দিয়া। একাধিক বিবাহের বা বহু বিবাহের যে চলন ছিল

সেটা যে প্রথম থেকেই উদ্ভূত হ'তো—একথা মেনে না নিয়েও বলা যেতে পারে, অপর বিবাহের মত এখানে প্রেম আসতো বিবাহের অঙ্গাঙ্গী সংস্কাররূপে। জীবিয়োগে বা জীবিত্যাগে পুরুষের যে বিবাহের অধিকার জন্মে তা বহুবিবাহের মত নিষ্পত্তি না হ'লেও (কারণ সেখানে বিবাহ-অমুষ্ঠানের অপর সংস্কৃত নিষ্ঠার কথা আছে) একনিষ্ঠ প্রেমের ব্যতিক্রম। বিধবা বিবাহ বা অপর ক্ষেত্রে নারীর দ্বি-বিবাহ সময়ে সময়ে কোন সমাজ মেনে নিলেও সাধারণের চক্ষে শ্রদ্ধার উল্লেখ করে না, শুধু প্রেমের একনিষ্ঠার অভাবের জ্ঞান নয়, নানারূপ সাংসারিক বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধার জ্ঞান ও সর্বোপরি সমাজে নারীর নিকৃষ্ট আসন নির্দেশের জ্ঞান। বহু-বিবাহ ছিল তখনকার দিনে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটা

শাক্স রেষ্টুরেন্ট সেবা এনগেজমেন্ট
প্রতিদিন রাধিও স্মরণ;
কাটলেট দুই-চার, মজলিশ গুলজার
গরম চা সোনার বরণ॥

রুচি আর রসনা
এই দুইয়ের তৃপ্তির
জন্ম আসুন

শাক্স রেষ্টুরেন্টে

আমাদের স্পেশাল: চাইনিজ ও আফগানী কাটলেট

রূপবানীর

পাশেই, মনে থাকবে তো?

N. I. P.

ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত
একচুয়ারীর অভিমত

“যদি অল্প সময়ের মধ্যে এই কোম্পানী বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। বিজ্ঞান সম্মত কঠিন নিয়মানুবর্তিতায় ভ্যালুয়েশন করিয়াও উন্নত দাঁড়াইয়াছে। ইহা কোম্পানীর উজ্জলতর ভবিষ্যতের আশা প্রদান করে।”

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড

বোনাস
প্রতি হাজারে
দশ টাকা

হেড অফিস
২নং ভালহাটসী স্কোয়ার
কলিকাতা

সভাপতি—আচার্য্য স্মার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

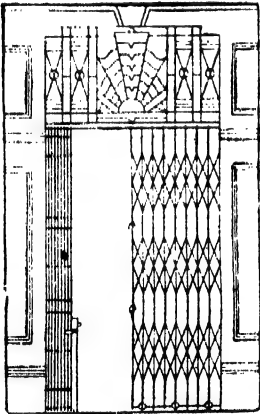
উপায় মাত্র। জীলোক তখন একটা সচল সম্পত্তি মাত্র ছিল। পুরুষের বহুবিবাহ কখনো ঘটতো ধনের আতিশয্যে, কখনো বংশের কৌলান্যে, কখনো বা শক্তির প্রাচুর্যে। ধন, বংশমর্যাদা বা সাহসিকতা যার মূল্যেই কেন না ক্রীতা হউক, নারীর ভাগ্যে স্বামী সন্দর্শন, স্বামীসঙ্গ-সুখলাভ হয়ত কালে ভদ্রে ঘটতো। ক্রমে মানুষ যখন সভ্যতার আলোকে এই নিষ্ঠুর নিয়মের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করল, তখন থেকে আরম্ভ হ'লো একনিষ্ঠতার জয়গান। তখন সমাজের সব স্তরেই দেখা দিল প্রেমে একনিষ্ঠার সম্মান, সম্মম এবং মর্যাদা। এমনি করে আস্তে আস্তে সমাজ থেকে বহু-বিবাহ বিদায় নিল। এখনো ছ'এক-ক্ষেত্রে পুরুষকে এক জী বর্তমানে একাধিক বিবাহ করতে দেখা গেলেও, সে পুরুষ সমাজে অসম্মানের পাত্র বিবেচিত হয়—

মাথা তুলে অল্প সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারে না—এক রকম সামাজিক অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু আদিম কাল থেকে মানুষের মনে যে বহুবল্লভ-বৃত্তি আছে, মানব-সভ্যতা তাকে ঘুম পাড়াতে চাইলেও সব সময়ে সে ঘুমিয়ে থাকে কি? হ'তে পারে, প্রেমের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠা আদর্শ হিসাবে মহান, কিন্তু সব সময় পারে না মানুষ তার আদিম প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে। তাই প্রেমকে আমাদের বিচার করতে হ'বে সময়ের স্থায়ীত্ব দিয়ে নয় অস্থায়ীতার গভীরত্ব দিয়ে। মানুষের জীবনে বাস্তবে যখন দেখা দিচ্ছে একাধিকের আধিপত্য, তখন কি হ'বে চোখ বুজে থেকে, তাকে না দেখার ভাগ করে?

অমুকের প্রতি অমুকের প্রেম গাটা কি না একে বিচার করতে হ'বে—অমুক

অমুককে চিরজীবন দিয়ে ভাল বেসেছিল কি না এ দিয়ে নয়—যতটুকু ভালো বেসেছিল ততটুকুর মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা ছিল কিনা, ফাঁক ছিল কিনা তাই দিয়ে। যদি কৃত্রিমতা না থাকে, তবে যতক্ষণ স্থায়ীই হোক না কেন তার মূল্য ত' বড় কম নয়। ফুল এক-রাতের জন্তই ফোটে, আকাশে ইন্দ্রধনু অল্পকালের জন্তই রঙের মায়াজাল বোনে—স্বর্ঘ্যোদয়, স্বর্ঘ্যাস্ত কল্লান্তকাল স্থায়ী নয়। কিন্তু সে জন্ত ত' উপভোগের পাত্র অপূর্ণ থাকে না। ঠিক এমনিই মানুষের প্রেম। প্রেম যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন প্রয়োজনের রূপকাঠে নিজেকে সে বলি দেয় না। উর্গনাত যেমন আপনার শরীর থেকে সৃষ্টি করে আপনার জাল-মায়া তেমনি নিজের মনের রঙ ফলিয়ে তার প্রেমাম্পদকে করে নেয় সুন্দর, মহান।



আপনার বাণিজ্য সঙ্গীকে রাহা-জানি, চুরি ও ডাকাতির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতে হইলে এবং বীমা ব্যয় সংক্ষেপ করিতে আপনার ব্যবসা-ভবনের দুয়ারে কোলাপসিবল্ গেট লাগাইয়া নির্ভর হউন।

আপনার বাসগৃহের বারান্দা, জানালা ও দুয়ারে কোলাপ-সিবল্ স্টীল গেট লাগাইয়া অব্যাহত বায়ু সঞ্চালনের মাঝখানে রাডে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতে পারিবেন। যাহা কাঠের দরে পাওয়া যায়।

নান আয়রন ওয়ার্কস্

ম্যানেজিং এজেন্ট : বি, নান

১৬১এ, বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা।

N. I. P.

কোম : বি, বি ৩২৩৪

পূর্ণ থিয়েটার

২ রসা রোড

ফোন ৩৪ স

শারদীয় সপ্তাহ !

নিউ থিয়েটার্সের অনিন্দ্যমুগ্ধর সামাজিক

অভিজ্ঞান

সঙ্গে—মন্ডার ফিল্মসের নূতন বাঙলা কাইন

আকাশ পাতাল

পরবর্তী আকর্ষণ

রবীন্দ্রনাথের

গোরা

কিছুদিন চলে পূজা, আরতি—তারপর নদীর মতন আবার মানুষের মন যখন অন্তপথ ধরে তখন—

“একদিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জন।”

যে মানুষ পারে ভালবেসে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে, তার অমূল্যতার গভীরতায়—সে কোনদিন ক্লান্ত হয় না পরাস্ত হয় না জীবন-যুদ্ধে। তাই “শেষ প্রহর”র কমল ভেঙে পড়েনি যখন শিবনাথ তার জীবনের ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছিল। তাই সে পেরেছিল নুতন করে সংসার সৃষ্টি করবার স্বপ্ন দেখতে অজিতকে কেন্দ্র করে। দুই বিভিন্ন সময়ে যে দুইজন পুরুষ তার জীবন ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের প্রেমের পসরা নিয়ে—তাদের দুর্জনকেই সে বরণ করেছিল সমান আগ্রহভরে—একজনের স্মৃতি অগ্রজনের বরণ করার পথে তাকে বাধার নিগড় পড়িয়ে দেয় নি।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রেম কোন রীতিনীতির দোহাই মানে না—সে আপনার বেগে আপনি চলে, আপনার প্রাণশক্তিতে আপনি ভরপুর। বিবাহ, প্রেমের ব্যাপারে একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ হ’তে পারে কিন্তু বিবাহে বাধা পড়লেই যে মানুষের মন সেই একই জায়গায় বাধা পড়ে থাকবে বাকী সবটুকু কালের জন্ত এমন কথা কে হৃদয় করে বলতে পারে? এবং একই জায়গায় বাধা না পড়ার দরুণ দোষ দিতে গেলে দোষ দিতে হয় মানুষকে নয়, মানুষের স্রষ্টাকে যিনি তাঁর অপক্লপ সৃজন লীলায় সৃষ্টি করেছেন মানুষের মন যা নিত্য নুতন অভিজ্ঞতা চায় জীবনের যাত্রাপথে, যা নিয়মের মধ্যে অনিয়ম আনে—যা তৈরী জিনিষ ধ্বংস করে আনন্দ পায়—আবার ধ্বংসের মধ্যে রোপণ করে সৃষ্টির বীজ।

তাই বিবাহে একনিষ্ঠ প্রেম অপরিহার্য হ’লেও প্রেমের রাজ্যে একনিষ্ঠার ব্যতিক্রম আছে। আর সেই কারণে প্রেমের একাধিক নিষ্ঠা স্বৈরাচার নয়। মানব জীবনের এক প্রাণবন্ত গতির স্বাভাবিক শক্তিতে সেই ব্যতিক্রম ঘটে—মানব-মনের বহুধারা ব্যক্তিত্বের একটা রূপ। কিন্তু বিবাহ অমূল্যতার মধ্যে প্রেমের বহুনিষ্ঠাকে স্বীকার করে নিতে গেলে বিবাহ-সংস্কারে বাধে—নানা ছোটবড় অসুবিধা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। তাই অধিকাংশ সমাজ বিবাহিত জীবনে নিষ্ঠার অভাবকে স্বৈরাচার বলে প্রচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। সবচেয়ে সত্য মানবমন কিছু উদার ভাব নিয়ে সেই ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তবু বিবাহের গ্রন্থি শিথিল হ’য়ে পড়েছে কারণ একনিষ্ঠ প্রেমের উপর ভিত্তি করে বিবাহ অমূল্যতাকে স্মৃদূত করা হয়েছে বলে। প্রেমের বহুধারা স্বীকার করে আজ সত্যই ভাববার সময় এসেছে—ভবিষ্যতে প্রেম বিবাহের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠা বলে গণ্য হ’বে কি না। কারণ বিবাহের পূর্বরূপে প্রেম হেতু বিবাহিত জীবনে প্রেমের বিস্তার, বিবাহ-অমূল্যতার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত প্রেম সবই মানব জীবনের আদর্শ-বাদের সহিত বাস্তবতার গুণু আপোষনামা। তাই ভয় হয় মানব মন থেকে সংস্কারের ভীতি বা প্রীতি কমে গেলে, বিবাহিত জীবনে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ হারী হবে কি না। আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে, প্রেম স্বভাবজ, বিবাহ সংস্কারজ; দুয়ের মিলন কাম্য হ’লেও বিরোধ অসম্ভব নয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

ইম্পিরিয়াল চী

‘চী’ এর মধ্যে এদের ‘পিরামিড’ চী এবারকার শারদীয়ার একটা প্রেষ্ঠ আকর্ষণ। খেতেও ভাল আর সঙ্গে সঙ্গে দামেও সস্তা।

পাটকা শিল্প প্রতিষ্ঠান

দক্ষিণ কলিকাতায় ‘বাল্লা’র এই প্রতিষ্ঠান আজ কাহারও কাছে অপরিচিত নয়। গ্রাহকদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার সত্যই প্রশংসনীয়।

সিটোফোন লেবরেটরি

এরা সম্প্রতি ‘কেলী’ নামক প্রোজেক্টর এর distribution right পেয়েছেন। চিত্র শিল্পের silent যুগ থেকেই এই ‘প্রোজেক্টর’ চলে আসছে।

ব্যানারমান এণ্ড কোং

এখানে ক্যান্সা সিদ্ধ ও মিলের শাড়ী অতি অল্পলাভে বিক্রয় হয়। পোষাক পরিচ্ছদের জন্ত এরা খুবই পরিচিত।

ক্যান্সাল রোল্ড গোল্ড

সিগিওকেট

রোল্ড গোল্ড সোনার গহনা আজকাল বাজারে খুবই চলছে। ৭০ নং কলেজ স্ট্রিটের—এই প্রতিষ্ঠানএর জিনিষগুলি চিরস্থায়ী।

টসের চা

‘চী’ খেয়ে আরাম পেতে হ’লে এদের চা খাওয়াই উচিত। খেয়ে বেশ তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়।

নবযুগের আগমন-গীতি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে উন্নতির ফলে মানব-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আজ নূতন ভাবে চখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে তার নূতন রূপ আজ সাহিত্যের পাতায়ও ফুটে উঠেছে। ঐচ্ছানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে সে আজ হতে চলেছে মানব জীবনের সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক। সে আজ বস্তুধর্মী।

অনেকে বলেন ব্যবহারিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সাহিত্য হবে সমস্তামূলক আপেক্ষিক। কিন্তু কোন সমস্তাই চিরস্থায়ী নয়। আজ যা উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছে হয়ত কাল তা থাকবে না। কাজেই সমস্তামূলক সাহিত্যও শাস্ত মর্যাদা লাভ করবে না। কোন একটা বিশেষ সময়ের বিশিষ্ট সুখ-দুঃখের ছাপ সাহিত্যের গায়ে আঁকা হয়ে যাবে। সময় চলে গেলে সে ছাপ আর পাঠকের মন হরণ করবে না। তখন সে সাহিত্য ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হবে। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সাধকদিগকে সে অতীতের সমাজ ব্যবস্থার উপকরণ

যোগাবে। কিন্তু রস সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য তা নয়। কল্পনিত পুরুষ যখন সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা ষাটুনির পর সন্ধ্যাবেলা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে কণস্থায়ী কত অবাস্তব চিন্তা তার মনের আকাশে রঙীন পাখীর মত এসে দেখা দেয়। তাদের সঙ্গে তার দৈনন্দিন কর্মজীবনের কোন সঙ্গ নেই। না থাকলেও তারা বড় মিষ্ট। এবং সেই ক্ষণেই তাদের ধরে রাখবার চেষ্টা হয়েছে যুগে যুগে। এই সাহিত্য সর্বকালের এবং সকল দেশের ঐতিহাসিক পরিবেশকে অতিক্রম করে সার্বজনীন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে। এই সাহিত্যে যে রূপ ফুটে উঠেছে অনেকের মতে তাহাই সাহিত্যের বিশ্বরূপ, সেই সাহিত্য কালজয়ী। সমগ্রভাবে সাহিত্যের বস্তুতাত্ত্বিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন “প্রাচীন গ্রীসের, প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তখন বিস্তার ছিল তাদের বৈষয়িকতার দৃষ্টি, প্রয়োজনগুলি ছিল নিবিড়, নিরেট গুরুভার, প্রবল উদ্বেগ প্রবল উদ্দাম ছিল তাদের বেটন করে,

আজ তার কোন চিহ্ন নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে যাদের ভাব ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না। মানুষের ব্যক্তি-স্বরূপের যে পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত নয়, পাথরের রেখায় শব্দের ভাষায় তারি সর্জন্যকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।..... আমি নিশ্চিত জানি যে সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল, তার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি উদ্বেগ রূপে ছিল, কিন্তু সে সমস্তর আজ চিহ্ন মাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।”

কালের বিবর্তনে মানুষ আজ এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যখন এযুক্তি তার মনে আর বল সঞ্চার করতে পারছে না। তার চিন্তাধারার পরিবর্তন, ঘটেছে। অসামাজিক মনোবৃত্তি নিয়ে রচিত সাহিত্য এখন তার কাছে হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা সামাজিক জীব। সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখের পরিপূর্ণ রূপ তাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুধু ফুটিয়ে তোলা নয়, দুঃখের মূল কারণগুলি সত্যের দৃষ্টি দিয়ে অন্ধ-সন্ধান ও তার দূরীকরণের পথ-নির্দেশও করতে হবে। সেই সাহিত্য হবে বস্তু-ধর্মী এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জল। রোদে পুড়ে রঙিনে ভিজে ক্লবক মাঠে মাঠে লাঙ্গল চাষলো, তারপর দুপুরবেলা বাড়ী

আহা করেন কি !



নিজেকে অপদস্থ কারবেন না।

যে কোনও কারণেই ষাটু-দৌর্য্য বা পুরুষহীনতা হউক না কেন, আমাদের “পুনিস্কা” সেবনে ২১ দিনের মধ্যে পুনরায় সক্ষম পুরুষ হইতে পারবেন।
মূল্য—৪।০ আনা ২১ দিনের জন্য।

=হিলিং হোম=

৫৬, সাইথ রোড, ইন্ডিয়ান, কলিকাতা

সিয়ে ওনলো তেলের অভাবে রান্না হচ্ছে না। বিশ্রাম করবে কি, তেলের যোগাড়ে কেটে গেল ঘটাখানেক, তারপর খেতে বসলো মোটা মোটা রাঙা রাঙা ভাত। অমনি জমিদারের পাইক এলো ডাকতে। সেখান থেকে ফিরে দেখলো গুরুদেব এসেছেন বাড়ীতে। প্রণামী একটি টাকা এবং যদি ছ'একদিন থাকেন তাঁর আদর অভ্যর্থনার জন্য অর্থের দরকার। কাজেই তাকে যেতে হল মহাজনের বাড়ী। মহাজন টাকা দিতে রাজী এই সর্ভে যে, যে কয় মন পাট তার হবে তাঁর কাছে বিক্রী করতে হবে তাঁরই খুসীমত দরে। নিরুপায় কৃষক সেই সর্ভে রাজী হয়ে টাকা নিয়ে এলো। এই ঘটনার মধ্যে আছে যে দারিদ্র্য, দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার তাঁর হাত থেকে মুক্তির পথ তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে হবে

সাহিত্যকে। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞোহ সৃষ্টি করবে প্রগতিমূলক সাহিত্য। মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। মানুষকে চলতে দিতে হবে স্বাধীনভাবে আত্ম-বিকাশের পথে। ধর্ম সমাজ কিছুই তার চলার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করবে না। বুঝিয়ে দিতে হবে ধর্ম বা সমাজ বেঁচে আছে মানুষকে আশ্রয় করেই। মানুষ না থাকলে ধর্মও থাকতো না সমাজও থাকতো না কাজেই তারা কোন দিক দিয়েই মানুষকে ছোট করবে না, মানুষের ঘাড়ে চেপে বসবে না। বরং মানুষই তাদের স্বার্থে বসে তাদের সাহায্যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবে। এই উন্নতিতে সাহায্য করবে সাহিত্য। এবং সেই জন্তেই মানুষের কর্ম জীবনের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ তাকে রাখতে হবে। তার সুখ-দুঃখের মূল-

কারণগুলির স্মৃতিস্মরণ বিশ্লেষণ করতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বিজ্ঞানের অভিযান মানুষের বুদ্ধির অভিযান। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির নিয়মকে জেনে তাকে করায়ত্ত করেছে। ফলে নূতন সভ্যতা নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সমাজও আপনাদের নিয়মে পরিবর্তিত হচ্ছে। সে নিয়মকে বিজ্ঞানের সাহায্যে জেনে যদি মানুষ সমাজকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে তবে অতি অল্প সময়ে অনেক কাজ হতে পারে। এই রূপান্তরের কাজে সাহিত্যের দান হবে অমূল্য। জনসাধারণের দুঃখ কষ্টে অভাব অভিযোগের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় ঘটলে সাহিত্য কখনও সামাজিক জীবনের সমষ্টিগত আবেগের চিত্র হবে না, সাহিত্য হবে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের বাস্তব চিত্র। বস্তুতঃ সাহিত্য কোন ব্যক্তির খেয়ালের সৃষ্টি

বি, নান

কোম বি, বি, ৩২৩৪
১৬১এ, বিডম স্ট্রিট, কলিকাতা

এডভারটাইজিং কম্পানি লিমিটেড

নিম্নলিখিত সিনেমা-
গুলির প্লাইড বিজ্ঞা-
পনের সোল এজেন্ট
এবং এজেন্ট

রূপবাণী, শ্রী, উত্তরা, পূর্ণ থিয়েটার,
ইটালী টকিজ, চিত্রপুরী (খিদিরপুর),
মায়াপুরী (শিবপুর), বঙ্গবাসী (হাওড়া)

ও মকস্‌বলের অন্যান্য অনেক সিনেমা। সমস্ত বাংলা
কিনো প্রোগ্রামের ঠিকিষ্ট। পোষ্টার লাগাইবার কাজ
বিশেষ যত্নের সহিত করা হয় এবং সিনেমার
প্লাইড ও ডিজাইন প্রস্তুত করিয়া থাকি।

শারদীয়া সংখ্যার
লেখক-লেখিকাগণের প্রতি

“খেয়ালী”র শারদীয়া সংখ্যায় স্থানভাব বশতঃ ও বিলম্বে
প্রাপ্তি হেতু বহু বিশিষ্ট লেখক ও লেখিকার লেখা পত্র
করিতে পারিলাম না, তজ্জন্ত আমরা বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী মিত্র, নূপেন চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টো-
পাধ্যায়, হরেন মুখার্জি, কুমুদেন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়,
অমর মল্লিক ও শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্যের নিকট আমরা
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের প্রবন্ধ “খেয়ালী”র
বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। “খেয়ালী”র প্রতি স্ব স্ব
দরদ ও সহায়ত বশতঃ তাঁহারা আমাদের এই অক্ষমতা
মার্জনা করিবেন।

সং খে:

সুকারী শ্রীযুক্ত মলচন্দ্র ঘোষের
নূতন কাব্যগ্রন্থ

জীবন ও রাত্রি

বাহির হইয়াছে, মূল্য এক টাকা

প্রকাশক :—

নালন্দা ইউনিভারসিটি প্রেস

২৪।এ মোহিনী মোহন রোড, কলিকাতা

প্রেমিক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রেমের মতন প্রেম জানে যে

সে জানে গো তোমার রীতি—
বিরাত প্রেমিক! আমার কাছে

নেই লুকানো প্রীতির নীতি।

মেঘমহলে তোমার মায়া

দোলায় আলো, নাচায় ছায়া,

শালো ধূলায় ফুল ছড়িয়ে

রঙিন করে বনের বীথি।

• • •

আকাশ যখন ডাকে ধরায়

শুনি তোমার স্বর্য-ভাষা,

মাটি যখন আকাশকে চায়,

পায় যে তাঁদের ভালোবাসা।

বিশ্বপ্রেমের মহোৎসবে

জীর্ণ জীবন নতুন হবে

মানুষ হবে অসীমতার

নিত্য নবীন সসাম গীতি।

নয়। সমগ্র সমাজের সমষ্টিগত সুখ দুঃখের
অনুভূতির প্রকাশ। সমাজ সম্পর্কিত সুখ-
দুঃখ ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ের বেদনা
বোধের পাত্র পূর্ণ করে বলেই সাহিত্য-
রস সকলের আত্মদানীয় হয়। সাহিত্য রস
আত্মদান করে সকলে আনন্দ পায়।
সাহিত্যের মূল সমাজের সুখ দুঃখের
অনুভূতির মধ্যে নিহিত। কিন্তু সমাজের
ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে
মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতির মূলগত
পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন বস্তুগত
ও ব্যবহারিক। কাজেই সাহিত্য কখনও
অবাস্তব কল্পলোকে বাস করতে পারে না।

ইহাই এই নবযুগের ধরণ। এবং
এ ধারণা সত্য।

আলোয়া

শ্রীসমর মিত্র

বায়োদ্বোপ আরম্ভ হয়েছে এইমাত্র;
'ট্রেলারের' ছবিগুলি দেখাচ্ছে তখন লোক-
গুলি, 'coming attraction'এর দিকে
চোখে আছে; কেউ বা নাক সিটকে
বলছে, দূর এই কী বই হয়েছে?—কেউ
সিগারেটের ধোয়া ছেড়ে গাবছে 'আর্ট
জ্ঞান নেই এদের মোটেও'—আবার আর
একজন নিজের বাবরী চুলে হাত বুলিয়ে
গাবছে, 'পরচুল প'রে কী আর ফিতে
ছবিতে নামা যায়?'

সুকান্ত ঢুকলো সেই সময়, যখন একজন
'হিরো' 'হিরোইনকে'.....যাক সুকান্ত
ঢুকলো। বাইরের আলো হ'তে এসে,
ওর চোখে সৃষ্টি হল ধোয়া আর অন্ধকার,...
অন্ধকার আর ধোয়া। 'টর্কধারী' একজন,
ভীষণ দ্রুতভাবে এগিয়ে বুক ফুলিয়ে
চ'লে গেল; তার টর্কের আলো,
সুকান্তকে পথ দেখিয়ে দিল। হু,
একটা বিরক্তির স্বর ওর কানে এল, 'আঃ!
কী যে.....ইত্যাদি' যাই হোক সুকান্ত,
সীটের দিকে এগিয়ে গেল, সকলের হাঁটুর
স্পর্শে, নিজে ত সচকিত হ'য়ে উঠলই,
এমন কী যাদের সঙ্গে এই সংঘাত হল,
তারাও মনে, মনে, যথেষ্ট বিরক্ত হল,
তা সুকান্ত বেশ বুঝতে পালেন...কিন্তু
উপায় কী?

তারপর আরম্ভ হল বই। বাংলা ছবি...
আরম্ভ হতেই ত্রাকামীপূর্ণ অভিনয়, আর
যেখানে সেখানে গানের আবর্তন হল;
সুকান্ত বাংলা ছবির মোটেই ভক্ত নয়,
আমতও এসেছে হঠাৎ, আরও শুনেছে
বইটা নাকি খুব ভাল হয়েছে হাতী মার্কী
ছবির চেয়েও। কিন্তু প্রথমেই তার মন
গেল বিগড়ে, সে একটা বিদ্রী় অসোয়াসি

অনুভব করল, এমন কী তার খুব পেতে
লাগল।

সুকান্ত এতক্ষণ কোনদিকে চায়নি;
কিন্তু, না, আর চুপ করে বসে থাকি
যায় না, কারণ ডানদিক থেকে একটা
নরম হাতের ছোয়াচ অনুভব করলে
এবং বেশ বুঝতে পালেন, যে এ
হাত সরাতে গিয়ে হঠাৎ, হাতে হাত
লেগে যাওয়া নয়, এ, ইচ্ছে ক'রে হাত
ধরা, দস্তরমত হাত নিয়ে খেলা করা।
সুকান্ত, ঐ হাতে, নিজের, হাতের ঘাম
মুছে নিল; রূপালী পর্দায়, তখন কী যে
ছবি পড়ছে, আর তারা কী বলছে, ওর
কাণে কিছু যাচ্ছে না; শুধু একটা কোমল
হাতের মধ্যে নিজের হাতখানি ছেড়ে
দিয়ে বসে রইল। একটু পরে, সুকান্ত
দেখলে; তরুণী সুন্দরী, অবিদ্রী় সন্মালোকে,
লোকে ও দেখলে, ইঁা সুন্দর বটে কিন্তু
এত—।

এবার তরুণী ওর দিকে চাইল,...সুকান্ত
দেখলে ওর চোখ দুটা আরও... আরও সুন্দর,
বিবাহিতা কীনা, কিছু বোঝা গেল না,
অন্ধকার কিনা!...

সুকান্ত দেখলে ওর পাশের সীটে লোক
নেই, খালি, 'ওঃ! তাই এত সাহস!
একলা এসেছে ছবিঘরে 'রোমান্স' কর্তে।
সুকান্ত ভাবলে, যদিও তার খুব ভাল
লাগছিল, এই চুরী ক'রে ভালবাসা
মধুর লাগছিল এই চুলের গন্ধে, নেবুফুলের
আমেজ, শরীরের উষ্ণতা, গভীর নিশ্বাস,
কিন্তু তবু—ও ভাবলে. বাঙালী মেয়ের
অবাধ প্রেম, মুক্তপাখীর মত প্রেম, অনেকটা
বর্ষার সময় রোদের মত বিদ্রী়...

সুকান্ত, ওর হাতে অন্ন চাপ দিয়ে নিজে হাত ছাড়িয়ে নিল। কতকক্ষণ পরে সুকান্তর মনে হ'ল, তার বাহুতে কার একখানি নরম ছোঁয়াচ; সুকান্তর মাথার রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল...ওঃ সেই নরম হাত! ও আর থাকতে পারল না, ও বুঝতে পারল না কী কর্কে? সমস্ত ভাল-বাসায় তরুণীর হাত চেপে ধরল, তরুণী ওর দিকে চেয়ে চমৎকার করে হাসল।

সুকান্ত ওর মাথাটা হেলিয়ে মুখ অঞ্চল স্পষ্ট ক'রে বলল, 'তোমার নাম কী?' ও, একেবারে 'তুমি' বলে প্রশ্ন করল, কারণ পরিচয় ত ওদের আগেই হ'য়ে গ্যাছে; তাই;...তাহাজা সময়ের সন্নতা ভেবেও, ও আর 'আপনি'—'তুমি' নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে দেয়ী কর্তে চাইল না তাই ও সোজাসুজি বললে, 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটা উত্তর দিলে না, কথা বললে না কিছু, কেবল একটু হাসল।

'বলবে না বুঝি'? সুকান্ত বললে; মেয়েটা কোন উত্তর দিলে না অথচ সুকান্তর হাতে জোরে চাপ দিল।

ওদের সামনে, 'নমস্কার' বা 'Good night'এর 'স্লাইডথানা' ভেসে উঠলো; সুকান্ত তাড়াতাড়ি মেয়েটির গাল হ'তে হাত সরিয়ে নিল; নিজের সিঁকের নরম 'ইভনিং-ইন-প্যারিস' মাখানো ক্রমালখানায় তার এই ভালবাসার স্মৃতিগুলো মুছে ফেলবার চেষ্টা কর্তে লাগল—তখন আলো জ্বলেছে। সকলের মুখে একটা শেষ হওয়ার ভূঁটি।

বাক, তখন, অনেকলোক বাইরে চ'লে গ্যাছে। সুকান্তর সাঙ্গী ওর দিকে চেয়ে হাসল...পরিপূর্ণ ভূঁটির হাসি, চমৎকার লাগল সুকান্তর। হু'জনেই বাইরে এল। সুকান্ত মস্তমস্তের মত, তার সঙ্গে এগিয়ে চলল; অকস্মাতে সুকান্ত ওর সাজের দিকে

কোন লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এখন দেখল, 'হুয়েনটিএথ্ সেজুরিয়' আঙন ওর গায়ে দীপ্তিমান।

সুকান্ত ছাড়া...সকলেই ওর ভাগ্যকে হিংসা কর্তে সুরু করেছে। গর্কে সুকান্তর মন ভরে উঠেছে; কিন্তু সুকান্ত বাইরে এসে ভাবলে, কথা বলা শোভা পায়না, অথচ তার পরিচয়....., সুকান্ত দেখলে কী একটা লম্বা, অথচ নীচু গাড়ী এসে দাঁড়ালো, তরুণী এগিয়ে গেল, চাপার মত আঙ্গলগুলো দিয়ে গাড়ীর 'হ্যাণ্ডেল' ঘুরিয়ে দিলে, হাতে হীরে 'মারকুইস' আংটাটা বন্ধ, বন্ধ কর্তে উঠল।

সুকান্ত গাড়ীর ভেতর উঠবে কিনা ভাবছিল, আর একবার মেয়েটির দিকে চাইল, সেই সন্নাক্ষকারে সুকান্ত স্পষ্ট দেখলে, তরুণীর ছোট চিবুকটা বুকের কাছে হুয়ে এল, ডাকবার ভঙ্গিমাটুকু সুন্দর.....

সুকান্ত উঠে ওর পাশে বসল; গাড়ী ছুটে চলল আলোর সারির মাঝে সেট্রাল এভিনিউ দিয়ে। মেয়েটা এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলেনি, অথচ সুকান্তর কেমন ভয় কর্তে লাগল; ও সন্মোহিতের মত ওর সঙ্গে কোথায় ছুটে চ'লেছে কে জানে? এলো-মেলো চিন্তা এসে ওর মনকে তোলাপাড় কর্তে লাগল, হঠাৎ 'চাংওয়ার' সামনে গাড়ী থামল, সুকান্তর মনে হল, ও বিস্ময়ে কেটে পড়বে। কিছু বলবার আগে তরুণী দরজা খুলে নেমে পরেচে, সুকান্ত সেই খোলা দরজা দিয়ে, রাস্তায় নেমে এল; সুকান্ত ভাবল, রাস্তায় নেমে এক ছুটে বাড়ী পালিয়ে যাবে, কিন্তু তরুণী হঠাৎ ওর হাত ধরে, ওকে হোটেলের মধ্যে নিয়ে গেল। হু'জনে ছোট্ট একটা কেবিনে ঢুকলো, তখন তরুণী হাত ছেড়ে দিয়েছে।

সুকান্ত আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে কিছু বলবার আগেই একটা 'বয়' এসে দুটো কাঁচের গ্লাস, আর এক বোতল 'শেরি' দিয়ে গেল; কেবে আনতে বলেছে...! রজনী শেরির জল, সুকান্তকে পাগল করে জ্বল'ল। ও বললে, তরুণীকে হঠাৎ জড়িয়ে ধ'রে, 'বল তোমার নাম কী, বল, বল।

তরুণী ওকে ছাড়িয়া দিল না। সরে দাঁড়াল না, কেবল অন্ন হাসল; সুকান্তর নেশায় লাগল রক্ত ন আমেজ, ও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললে ও তরুণীর গোলাপী গালে চুমু খেলে। এইবারে মেয়েটা হাসল না, ওর গালে ঠাসু করে একটি চড় বসিয়ে দিলে।... সুকান্তর মাথাটা কেমন ঘুরে গেল...চোখ চেয়ে দেখে ওর সীটে ও বসে আছে, তখন 'ওয়েটার' তার কাছে দাঁড়িয়ে আর একটি মোটা মত ভদ্রলোক, বোধহয় বায়স্কোপের ম্যানেজারই হবে। তিনি একটু হেসে বললেন, 'কী মশায়, কেমন লাগল?'

সুকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত হ'য়ে বললে, চমৎকার, কিন্তু.....'

—[সমাপ্ত] —

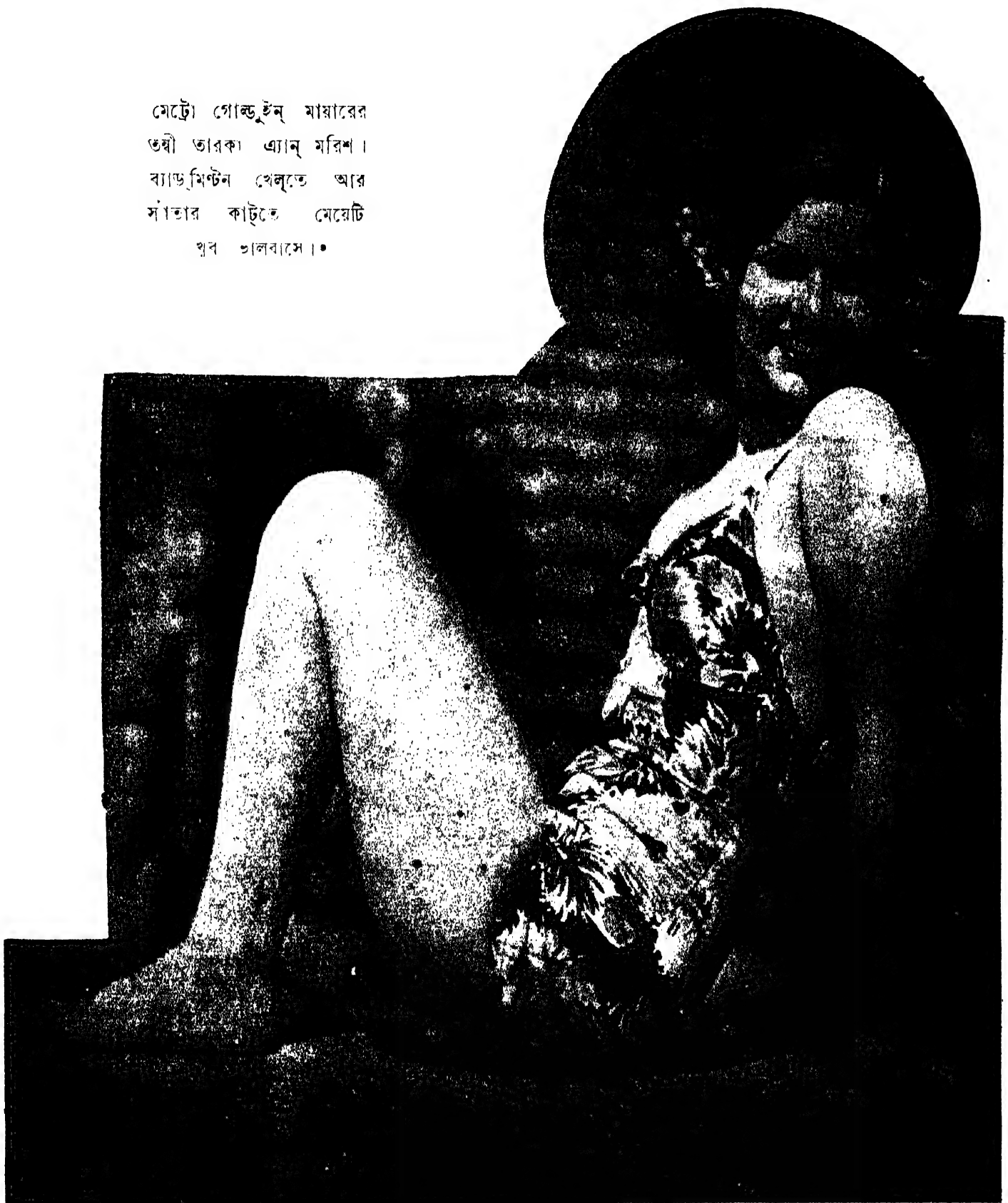
পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজাবকাশে আমাদের আফিস দুই সপ্তাহের জন্ত বন্ধ থাকিবে। আমাদের পরবর্তী সংখ্যা আগামা ১৩ই অক্টোবর হইতে আবার যথারীতি বাহির হইবে। পূজার এই আনন্দ অবকাশ সকলেরই মধুময় হউক— এই ভগবানের কাছে আমাদের একান্ত কামনা।

সঃ প্রেঃ

খেয়ালী চিত্রপট

মেটো গোল্ডুইন্ মাযারের
তথী তারকা এ্যান্ মরিশ।
ব্যাড্‌মিণ্টন খেলতে আর
সাঁতার কাটতে মেয়েটি
থাব ভালবাসে।•



পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৬শে আশ্বিন ১৩৪৫, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩৮ } অষ্টত্রিংশ সংখ্যা

দশম বার্ষিক পরিকল্পনা

শান্তিন্দীয়া অবকাশের প্রারম্ভে দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বামপন্থীগণ যে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ এম্. এন্. রায়, শ্রীযুক্ত নিহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবর্গ দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গের কার্যাবলীর ও কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর অনুসৃত কর্মপন্থার যে তীব্র সমালোচনা করেন তাহা প্রতিমধুর না হইলেও বিশ্লেষণযোগ্য। তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি বিশেষ গুরুতর। মন্ত্রীমণ্ডলীর অভিযোগ ষণ্ডনে ও নিরাকরণে তৎপর হওয়া উচিত।

উক্ত অধিবেশনে ডাঃ ঞারের বিরুদ্ধে দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে মহাশাষ্ট্রে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি বিশেষ হ্রাস হওয়ারই সম্ভাবনা। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে ইহার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইতে হইবে। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হইবে—

তৎপূর্বে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের শাস্ত করা প্রয়োজন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনের সময় হইতেই আগামী কংগ্রেসের সভাপতি কে হইবেন তাহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। ওয়াকিবাহাল মহলে প্রকাশ, যে বর্তমান রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বা সর্দার প্যাটেল ইহাদের মধ্যেই একজন সভাপতি হইবেন। প্রগতিপন্থী, মহারাষ্ট্র ও মহাত্মাজী স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের পুত্র নির্বাচনই সমর্থন করেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনের পক্ষেই সুভাষচন্দ্র যে দশম বার্ষিক শিল্প সংগঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার সভাপতি পদ গ্রহণ করিবার জন্য পণ্ডিত জহরলালকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রী ও এমন কি অকংগ্রেস প্রদেশের মন্ত্রীগণও এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য একযোগে কার্য করিতে সক্ষম করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতির এই বিরাট সঙ্কল্প সফল হউক ইহা আমরা কামনা করি।



(বিলাসী)

“দেশের মাটি”

বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নিবেদন
নিউ থিয়েটার্স কর্তৃক প্রস্তুত
চিত্রনাট্য, পরিচালনা } নীতীন বসু
ও আলোকচিত্রে

শব্দধর : মুকুল বসু

সঙ্গীত পরিচালক : পঙ্কজ মল্লিক

রসায়নগারাহাঙ্ক : সুবোধ গাঙ্গুলী

চিত্র সম্পাদনা : সুবোধ মিত্র

চরিত্রে : অজয়—দুর্গাদাস, অশোক—

সাইগল, শশধর—ইন্দু মুখার্জি, যত্ন ক্রোবন্তী
—অমর মল্লিক, গৌরী—উমা, অরুণা—
চন্দ্রাবতী। অত্যাচ্ছ ভূমিকায়—রুঞ্চক দে,
ভানু ব্যানার্জি, পঙ্কজ মল্লিক, শ্রাম লাহা,
অমী সাত্তাল ইত্যাদি।

চিত্র পরিবেশক : আরোরা ফিল্ম
কর্পোরেশন।

প্রথম মুক্তি : ‘চিত্রা’ ও ‘নিউ সিনেমা’

সিনেমা শিল্পের ভেতর দিয়ে দেশের
বদি প্রকৃত উপকার সাধন করবার এ

অবধি কেউ চেষ্টা কোরে থাকেন তা’
হ’লে সর্বোপায়ই আমাদের ন’তীন বসুর
নাম কোরতে হয়। তিনি যে ধরনের
ছবি তোলেন, তা’ শুধু নিছক আনন্দের
জন্ম নয়—তার মূলে থাকে একটা মহৎ
উদ্দেশ্য এবং চলচ্চিত্রে তাই নতুন রূপ,
নতুন জ্ঞানে মূর্ত হ’য়ে উঠে, দেশের লোকের
চিন্তাশক্তির দ্বারে এসে ধাক্কা দিয়ে তাদের
কোরে তোলে সচেতন। আমাদের
সোনার বাঙলা যার ধূলিকণা একদিন ছিল
স্বর্ণ কণা, আজ সভ্যতার মোহজালে সেই
কুবেরের ভাণ্ডার পল্লীকে পদদলিত কোরে
তার বুকের ওপর দিয়ে রক্তাক্ত শব্দট
চালিয়ে পল্লীকে শ্মশানভূমিতে পরিণত
কোরে লোকে উদরার সংগ্রহের জন্ম দলে
দলে আসছে সহরে। কিন্তু পল্লীমায়ের
করণ আর্জনাতে অভিভাপরূপে সহরের
বুকে ছড়িয়ে পড়ে এই সব মোহগ্রস্থ

সর্বস্বারা বাংলার বাঁচবার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা

সর্বস্বারা বাংলাকে বাঁচতে হ’লে আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বাঙ্গালীর উপর বাঙ্গালীর

সহানুভূতি, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানের উপর একমাত্র দয়দ।

বাঙ্গালী আজ পরাস্ত হল জীবন যুদ্ধে আর ব্যবসা হারিয়ে। অর্থাৎ অনশনে ক্ষত বিক্ষত
হ’ল “বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মী” মন্ত্র ভুলে যেয়ে।

বাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের ভাণ্ডারী আজ বাঙ্গালী নয়—তাই তার এত লাজনা। “ইষ্ট বেঙ্গল
সোসাইটি” বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীর ঘরে, বাঙ্গালীর পছন্দমত বস্ত্র যোগাবার
ভার নিয়েছেন এঁরা। বাঙ্গালীর রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সব রকম বস্ত্রের বিপুল আমদানী
করেছেন এঁরা। সবার সন্তুষ্টি বিধানই লক্ষ্য এঁদের।

বিনীত—

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি

(প্রসিদ্ধ স্বদেশী বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা)

বস্ত্র বিভাগ—১নং ও ২নং মির্জাপুর স্ট্রীট, [ধেন] ফোন বি, বি, ৩৫০

ব্রাঞ্চ—৮৭২ কলেজ স্ট্রীট [বস্ত্র ও পোষাক]; জগদ্বাজার, ভবানীপুর [বস্ত্র ও পোষাক] ফোন—পি, কে, ৩৯৮

বিশেষ দৃষ্টব্য :—প্রতিযোগিতায় অধিতীয়—টক অক্সফোর্ড—দূর সবার চেয়ে সস্তা। লোকে বাহা প্রচার করে তাহা
তাহার করে না—আমরা বাহা বলি তাই করি—এটাই আমাদের বিশেষত্ব।

লোকদের জীবনে যে কী হাহাকার তুলছে তা' ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন।

জাতির এই জীবন মরণ সঙ্কটগে "দেশের মাটি" যে আদর্শ নিয়ে আজ দেশবাসীর সামনে সমুপস্থিত হ'য়েছে এবং কৃষিশিল্প ভিন্ন ভারতের সংস্কৃতি, ঐশ্বর্য্য এবং আমাদের মত একটি অধঃপতিত জাতির উত্থান অসম্ভব এই মহাবীণী প্রচার কোরে নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার মিঃ বি. এন. সরকার দেশের জাতীয় জীবনে যে চাকলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা কোরেছেন তা' সত্যই প্রশংসার্হ।

"দেশের মাটি" ছবিটি খুব ঘটনাবহুল নয়। এরূপ প্রচার-চিত্রে অবশ্য ঘটনার প্রাচুর্য্য অবাস্তব বলেই পরিচালক হয়তো সাধারণকে খুসী করবার চেষ্টা না কোরে নিজের দৃষ্টিশক্তি ও রসাত্মকত্বের সাহায্য নিয়েই গল্পগঠন কোরেছেন। গল্পটি হ'চ্ছে সংক্ষেপে এই—

অজয় ও অশোক ছিল অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অজয়ের ভগ্নি অরুণার সঙ্গে অশোকের অবাধ মেলামেশা ছিল—যার ফলে অশোক-অরুণার মধ্যে যে প্রেমের পূর্বরাগ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে এবং ভবিষ্যতে এরা দু'জনে যে পরিণয়স্থলে আবদ্ধ হবে এ ধারণাই সবার ছিল। ঠিক হ'লো অজয় ও অশোক বিলেত থেকে ফিরে এলেই এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে। বিলেত যাবার সব ঠিকঠাক অজয় অশোকের জন্তে টিকিট কিনেছে—নিজের যেকোন জিনিষ-পত্র কিনেছে অশোকের জন্তেও ঠিক সেই সব জিনিষ কিনে যাবার জন্য একেবারে প্রস্তুত—এমন সময় অশোক বলে সে বিলেত যাবে না—পল্লীগ্রামে গিয়ে কৃষিশিল্পের উন্নতি সাধন কোরবে।

অশোক তার আর তিনজন বন্ধকে নিয়ে পাড়ারগায়ে গেল। সেখানকার

মোড়ল বহু চক্রবর্তীর কাছে চাষের জন্ম জমি ভিক্ষা কোরুল—কিন্তু সেখান থেকে তারা কেবল অবমানিত ও তিরস্কৃত হ'ল। অবশেষে সেই গ্রামেরই এক অন্ধ বন্ধু ও তার কন্যা গৌরীর আশ্রুকুল্যে এবং অরুণার অর্থ সাহায্যে সমস্ত পল্লীতে নব জীবনের স্পন্দন অনুভূত হ'ল। গ্রামের সরলতা অশোককে এমনভাবে জড়িয়ে ফেললো যে বন্ধু-ভগ্নি অরুণার অপরিমিত প্রেমও তার কাছে স্বাদহীন বলে মনে হল তাই সে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিল সরল গ্রাম্যবালিকা গৌরীকে।

এই ছোট কাহিনীটিকে চিত্রনাট্যে অতি সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত করার ফলে দর্শকমন দস্তরমত সারাক্ষণ উদ্বেজিত কোরে রাখে। অবশ্য অনেকে বলবেন গল্পটির ভেতর বিশেষ কিছু নেই। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি যে, এ ধরণের ছবিতে ঘটনার প্রাচুর্য্য বা তাক্সা রসের সৃষ্টি করে দর্শকমন ভোলাবার চেষ্টা করা সমীচীন ও রসাত্মকত্বের পরিচায়ক নয়। এ ছবির মূল উদ্দেশ্য-আনন্দের ভেতর দিয়ে লোকের জ্ঞানোন্মেষের সাহায্য করা।

"দেশের মাটি"-র পরিচালনায় নীতীন বসু তাঁর অনন্ত সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে দেশবাসীর প্রাণে নূতন আলোর সন্ধান দিয়েছেন। একমাত্র পল্লীগ্রামের আবহাওয়ার সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত না থাকায় সেখানকার মেয়েপুরুষদের আচার ব্যবহার, সাজসজ্জা নিখুঁতভাবে রূপায়িত কোরতে পারেন নি। এ ছাড়া পরিচালনা সম্বন্ধে অভিযোগ করবার আমাদের আর কিছু নেই।

ছবিখানির আলোকচিত্রের কাজ হ'য়েছে অতুলনীয়—বিশেষতঃ ঝড় জলের দৃশ্যটি। এই বিভাগে নীতীন বসু যে আজও অপরাধের, "দেশের মাটি"র ছবি তা' প্রমাণ কোরেছেন। মুকুল বসুর শব্দ-

গ্রহণ পূর্ববৎ অনিন্দনীয় হ'য়েছে। রসায়নাগারের কাজের সম্বন্ধে দোষ দেখাবার কিছু নেই। পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতের কাছে আবহ সঙ্গীত যেন নিপ্রভ হ'য়ে গেছে। কারুনির্ম্মের কাজ বেশ কলা সম্মত হ'য়েছে। সাজ-সজ্জা যথোপযুক্ত হ'য়েছে। সম্পাদনায় শল্লীগ্রামের দৃষ্টগুলির স্থানে স্থানে অবাস্তবতা দৃষ্ট হয়—এছাড়া সম্পাদনা ভালই বলতে হবে।

"দেশের মাটি"-র অভিনয়শাংশ হ'য়েছে অভূতপূর্ব। সরলা গ্রাম্য বালিকা গৌরীর ভূমিকায় উমা ও সহরে আত্মভোলা যুবতী অরুণার ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয় "দেশের মাটি"-র প্রাণ সঞ্চারে বহুল পরিমাণে সাহায্য কোরেছে। কিন্তু একথা স্বীকার কোরতে দ্বিধা নেই যে, কুমারী-রূপে এদের দু'জনকেই একটু বেমানান দেখাচ্ছিল। পুরুষ ভূমিকায় দুর্গাদাসের অজয় সর্কাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নায়ক সাইগাল অবাকালী হ'য়ে পড়ায় তার ভাষার জড়তা এবং ভাষা সামলাতে গিয়ে ভাবের দৈন্ত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কঠিন ও কোমল বিভিন্ন রসের বিভিন্ন রূপে Typical পাড়ারগায়ের মোড়লরূপে মল্লিকমশাই পূর্ববৎ নিজের ব্যক্তিত্বকে পর্দায় সুপ্রকাশ কোরেছেন। দরদী সদের অমৃতধারা সিঞ্চিত হ'য়েছে কৃষ্ণচন্দ্রের অভিনয়ে। ইন্দু মুখার্জির শশধর দাস্তরসের ফল্গুধারায় দর্শকমন আশ্রুত কোরেছে। তাঁর অভিনয় "দেশের মাটি"-র একটি বিশিষ্ট সম্পদ। অশোকের তিনটি বন্ধু ভায়ু ব্যানার্জি, পঙ্কজ মল্লিক ও শ্রীয লাহার অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অহি সান্তালার ষষ্ঠাচরণ উপভোগ্য।

"দেশের মাটি"-তে গান গেয়েছেন উমা, সাইগাল, কৃষ্ণচন্দ্র ও পঙ্কজ। এদের

সকলেরই গান পর্দার ওপর এক সুরজালের সৃষ্টি—কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্তকর।

মোট কথা, “দেশের মাটি” এই নব জাগরণের দিনে দেশের মনে নব-উন্মেষণা সৃষ্টি কোঁরে ভারতের জাতীয় জীবনের উন্নতির সহায়তা কোরবে—একথা বলাই বাহুল্য।

সাপুড়ে

পূজোর বন্ধের পর আবার পুরোদমে এই ছবির কাজ শুরু হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে বিধের-বাণী নামে এই ছবিখানির বিবৃতি প্রকাশ কোরেছি। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ ছবিখানির নামকরণ পাকাপাকি ভাবে স্থির কোরেছেন। বাঙলায় সাপুড়ে’ এবং হিন্দিতে ‘সপেরা’ নামে এই ছবিখানি পর্দার গায়ে আত্মপ্রকাশ কোরবে।

পূজোর বন্ধের মধ্যে এই ইউনিটের কর্মসচীব ছোটাইবাবু এবং পরিচালক দেবকীবাবু গিরিধি অঞ্চল ঘুরে এসেছেন—‘লোকেশান্’ নির্ধারন করবার জন্তে।

ইতিমধ্যে দু’নম্বর ষ্টুডিওর মধ্যে আর একটি চমৎকার সেট তৈরী হ’য়েছে। সাপুড়েদের ওস্তাদ জহর (মন্সেরজান) এবং ছবির নায়িকা কাননকে একত্রে এই সেটে অভিনয় কোরতে দেখা যাবে। সম্প্রতি পরিচালক দেবকীবাবু একটু অসুস্থ। তিনি সেরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলা শুরু হবে।

ষড়দিদি

এই চিত্রে মধ্য বয়সী প্রমীলার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্তে পরিচালক অমর মল্লিক মহাশয় দুটি মেয়েকে নির্ধারিত কোরেছেন। মেয়ে দুটির নাম সাবিত্রী ও শ্রীমতী গুলাব। ‘যথাক্রমে বাংলা ও হিন্দী সংস্করণে নাম্বে।

ছবির অর্ধেকের বেশী শেষ হয়েছে এবং যে যত ও আন্তরিকতার সঙ্গে মল্লিক মহাশয় এবং তাঁর কর্মীসকল কাজ কোরেছেন তাতে মনে হয় ছবিখানি সর্বসাধারণের

অন্তরে আনন্দ পরিবেশন কোরতে পারবেন।

দুঃখমণ

দুঃখমণ-এর কাজ উপস্থিত বন্ধ আছে। পরিচালক নীতীনবাবু উপস্থিত অসুস্থ হয়ে পড়ায় কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে।

সাথী

সাথী (বাঙলা) ও ষ্ট্রীট সিদ্ধার (হিন্দি)র উভয় সংস্করণই শেষ হয়ে গেছে। যতদূর ঠিক হয়ে আছে তাতে মনে হয় আসছে ৫ই নবেম্বর নিউসিনেমায় ‘সাথী’ প্রথম মুক্তি লাভ করবে।

এদিকে পরিচালক ফণী মজুমদার সম্পাদনা কার্য থেকে রেহাই পেলেই তাঁর পরবর্তী ছবির কাজ শুরু করে দেবেন। উপস্থিত এ ছবিখানির কেবলমাত্র হিন্দি সংস্করণই তোলা হ’বে। ছবিখানি হবে “কপাল কুণ্ডলা”র হিন্দী সংস্করণ।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্চাস

প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় এদের “পরশমণি”র শূটিং চলেছে। দুর্গাদাস ধীরাজ, ছায়া, রাণী, জ্যোৎস্না, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতির সহযোগে “পরশমণি” আশ্চর্যরূপ সাফল্য লাভ কোরবে বলেই মনে হয়।

দেবদত্ত ফিল্মস

শোনা যাচ্ছে, আসছে মাস থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ নতুনভাবে শুরু হবে এবং এবার এখানে পৌরাণিক কাহিনী “শর্মিষ্ঠা” চিত্রায়িত হবে। “শর্মিষ্ঠা”র কাহিনী ভাল ভালভাবে তুলতে পারলে জয় অবশ্যম্ভাব্য।

কালী ফিল্মস

এদের সম্বন্ধে সঠিক খবর এখনও পর্যন্ত আমরা অবগত না হলেও শীঘ্রই যে একটা ব্যবস্থা হবে—এ খবর ঠিক। দু’খানা বই নিয়ে এরা নাড়াচাড়া কোরছেন—“শ্রীকৃষ্ণ” আর “রামপ্রসাদ।” কালী ফিল্মসের উত্থান আজ বাঙালী মাত্রেই কাম্য।

রাশা ফিল্মস

এদের নতুন পৌরাণিক চিত্রালেখ্য (চিত্র+আলেখ্য, বিজ্ঞাপনের একখানি বহু রক থেকে সঙ্কলিত। প্রচার সম্পাদককে জিজ্ঞাসা কোরতে পরি কী চিত্র’ মানে কী? আর ‘আলেখ্য’ মানেই বা কী?) প্রায় শেষ হ’য়ে এল। শোনা যাচ্ছে, ছবিখানি নাকি ‘শ্রী’-তে মুক্তি পাবে।

• * *

আর একখানি পৌরাণিক ছবি “নর নারায়ণে”র শূটিং চলেছে।

মতিমহল থিয়েটার্স

এদের পরবর্তী রোমাঞ্চকর কাহিনী হেমন রায় লিখিত “যথের ধন” ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে প্রায় শেষের পথে এগিয়ে চলেছে। ছবিখানির শিল্পী সংযোগ মন্দ হয়নি তবে “যথের ধন”-র সন্ধান হরিভক্ত কোন পথে দেবেন—ছায়া না কায়্য তা বলা শক্ত।

ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়া পিক্চাস

অহীজ চৌধুরীর পরিচালনায় পৌরাণিক ছবি “দ্রৌপদী”র শূটিং মন্তরগতিতে চলেছে।

পূর্ণ থিয়েটার্স

এই সপ্তাহই ‘অভিজ্ঞান’এর শেষ সপ্তাহ। আসছে শনিবার ১৫ই তারিখ থেকে এখানে রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ দেখান শুরু হ’বে।

রূপবাণী

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্চাসের অভিনব সামাজিক কথাচিত্র ‘অভিনয়’ এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে সপ্তম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। ‘অভিনয়’ যে বাঙলা ছায়াচিত্র-

বিনোদ এণ্ড কোং

১৩নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার জরীপ ও নক্সার যন্ত্রাদি বিক্রয় করে তাছাড়া অফিস টেশনারী ইত্যাদিও বিক্রয় করে।

নাট্য তরঙ্গ

স্ট্রীনটনাথ

“সমাজ”

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত নূর সামাজিক নাটক। নাট্য নিকেতনে গত শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর থেকে অভিনীত হচ্ছে। অনেকদিন যাবৎ এত নিষ্ঠুর শ্রেণীর নাটক আমরা মঞ্চে অভিনীত হ'তে দেখিনি। যেখানে প্রবোধ গুহ ও সতু সেনের মত গুণী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সেখানে যে কি বিবেচনায় এই নাটকখানি অভিনীত হবার পাশপোর্ট পেল তা' আমাদের বারবার অগম্য। তিন ঘণ্টা নাটকখানি অভিনীত হয়। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আড়াই ঘণ্টা নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত বা চরিত্র পরিপুষ্টি কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। নাটক যেখান থেকে শুরু হয় ঘটনার গতি এই আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী সেখানেই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঘটনার মূল প্রতিপাত্ত ও অবাস্তব ও অবাস্তব।

শিল্পের একটি বিশিষ্ট দান সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কাহিনীর অভিনবত্ব ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের চমৎকার গতিভঙ্গীতে, অত্যন্ত স্বাভাবিক ও হৃদয়স্পর্শী অভিনয়ে, অতুলনীয় দৃশ্যসজ্জায় এবং শ্রীমতী সাধনা বসু ও অহঙ্ক চৌধুরীর অপূর্ণ চরিত্র অভিব্যক্তিতে যে রসস্রষ্ট হইয়াছে তাহা বাঙলা ছায়াচিত্রে সত্যিই দুর্লভ ও অবিস্মরণীয়। ‘অভিনয়’ রূপবাণী ত্রিগ্রহে আরও বহুদিন ধরিয়া যদি প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

একখানি নিষ্ঠুর শ্রেণীর নাটক নিয়ে এর বেশী আলোচনা আমরা কোরতে চাই না। এবিষয়ে মুদ্রিত পুস্তক হস্তগত হ'লে আমাদের সাহিত্য সম্পাদক তাঁর নিজ বিভাগে নিশ্চয়ই মতামত ব্যক্ত করবেন।

নাটকখানি প্রযোজনায় কর্তৃপক্ষ নমঃ নমঃ কোরে মঞ্চস্থ কোরেছেন এবং সেজ্ঞাতাঁদের ব্যবসায় বুদ্ধির প্রশংসা করা যায়। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও সতু সেন নাটকখানি পরিচালনায় নিজ বৈশিষ্ট্যের ছাপ সর্বত্রই সুপরিস্ফুট কোরেছেন।

“সমাজে”-র ভেতর গীতাংশ নেই বললেই হয়। যে তিনখানি গান আছে তা' মনে হয় জোর কোরে গাওয়ানো হ'য়েছে—তা' যদি হয় তবে করণীড়া দেবার কিছুমাত্র দরকার ছিল না।

আপনারা

আমাদের ৮বিজয়ার

শ্রীতি নমস্কার

গ্রহণ করুন।

নিউ

ইন্টার ন্যাশানেল পারিসিটি

১১নং চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ)
ভবানীপুর, কলিকাতা।

নাটকখানির অভিনয়ে প্রত্যেকটি অভিনেতাই যথাসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করবার চেষ্টা কোরেছেন। সেজ্ঞাত অভিনয়শ্রী নাটকখানির উল্লেখযোগ্য। ছবি বিশ্বাস মঞ্চে প্রথম যোগদান কোরে জমিদার ধর্মদাসের মত একটি সুকঠিন ভূমিকায় সুসংযত অভিনয় কোরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন। প্রথম দিকটা তাঁর অভিনয় খুবই স্বাভাবিক হ'য়েছে। কিন্তু শেষের দিকে সমাজ আর মনের দ্বন্দ্ব এইভাবে সুস্পষ্ট হবার অবকাশ পায়নি। এর জন্ত অবশ্য তাঁকে দোষী করা যায় না, এই চরিত্রটি তাঁর বয়সের সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় এই অসুবিধা হ'চ্ছিল। যা হ'ক তিনি সূচোহারার অধিকারী—মঞ্চে তাঁর সুনাম অবশ্যস্তাবী। নায়িকা লতিকার ভূমিকায় চারুবারার মর্মস্পর্শী অভিনয় অন্তরীক স্পর্শ কোরলেও ভাবব্যঞ্জনার এক-ধেয়েমির দরুণ চরিত্রটি পূর্ণভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি। অধীরের ভূমিকায় অমল ব্যানার্জির অভিনয় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হ'য়েছে। সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলীর মহীম চলনসই। ফিরোজাবালার মাধবীও তাই। তবে গান অচল। পশুপতি সামন্তের পুলিশ কন্ঠচারা অহুমেখা। গাঁয়ের একটি বৃদ্ধের ভূমিকায় যিনি নেমেছিলেন তিনি প্রচুর হাসিয়েছেন। অগ্নাত্ত ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করবার কিছু নেই।



INTERNATIONAL PUBLICITY

প্রিয়ার উদ্দেশে

প্রিয়া মোর,

আজি এই দূর দেশে প্রবাসে যাপিতে এসে
তোমাতেই পড়িতেছে মনে।

শুধু হাসি শুধু গান তবু মোর মন প্রাণ
তোমাতেই গুঁজিতেছে এসে ॥

দিন আসে যায় দিন তবু মোর চিন্তাহীন
অবসর নাহি হয় কভু।

ব্যোমপথে বলাকায় দূর বন বীথিকায়
তোমাতেই হেরি আমি শুধু ॥

প্রভাতময় দিনকর নিশীথ রাত্রির পর
যখন উদিত হনু হেসে।

সেইক্ষণে মনে জাগে প্রিয়া মোর ভালবেসে
দাঁড়ায়েছে কাছে এসে হেসে ॥

তামসী রাত্রির তায় সর্বদা রহন্তুময়
সে মূর্তি নাহি রয় আর।

কনক কিরীট পরি দশদিক ঝলমলি
সম্মুখে আসিলে আরবার ॥

কল্পনা তুলিকা দিয়ে এই ছবি একে নিয়ে
অবসাদ গ্রস্ত চিন্তা মোর।

অসহ্য পুলক ভরে নৃত্য করে বারে বারে
কভু তাহে না হয় কাতর ॥

বল বল প্রিয়া মোর একি শুধু স্বপ্ন ঘোর
মুছে যানে কঠোর আঘাতে ?

হৃদয় মছন করি যাহা কিছু লিখি আমি
নাহি প্রবেশিবে অন্তরেতে ?

পরানের হাহাকার শুধু হবে ব্যর্থতার
জালাময় তীর পরিহাস।

ধরা নাহি দিবে কভু দাঁড়িয়ে দেখিবে শুধু
মন্মথের ডা মোর দীর্ঘশ্বাস ॥

উদ্বেলিত হৃদয়েতে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে
হৃদয় চাহিছে আজি মম।
এ রাগিনী রচি আজি তব তরে শুধু সখি
লয়ে তব স্মৃতি অমূল্যম ॥
শ্রীমনোজ কুমার বসু

মধুপুর

মহাসপ্তমী—

[বাগবাজারের প্রবচন-প্রসিদ্ধ মণ্ডলীর
মধ্যেও যে কবিত্বের উন্মেষ হয় তাহা
ইতিপূর্বে আমাদের অজ্ঞাত ছিল। গন্ধিকা-
ধূমায়িত নভোমণ্ডল হইতে বহুদূরে মধুপুরের
পূজাপ্রবাসে শ্রীমান্ মনোজ কুমারের প্রিয়ার
উদ্দেশে এই উচ্ছ্বাস হয়ত বর্তমানে
“পত্রিকা”র বিজ্ঞাপনের চাপে নিষ্পেষিত
হইয়া গিয়াছে, তবুও আমরা তাঁহার এই
ক্ষণ-ক্ষুণ্ণ উচ্ছ্বাস তাঁহার সহকর্মীদের
হস্তে অর্পণ করিলাম—বিচার ভার তাঁহাদের
উপরই !!!
সং: খে:]

৳

অভিনয়

শ্রীতারতলক্ষী পিকচার্সের

অভিনয়

বাকদত্তা হয়েও বিয়ে না হওয়ার
চেয়ে বড় দুঃখ মেয়েদের জীবনে
আছে। মনীষা সেই দুঃখই পেয়েছিল,
সে কি নিষ্ঠুর দুঃখ ?

শ্রেষ্ঠাংশে : সাধনা বসু

৭ম
সপ্তাহ রূপ বাণী

ফোন : বি, বি, ৩৪১৩

পূর্ণ শিষ্যতার

২নং রসা রোড

ফোন : সাউথ ৩৪

আগামী শনিবার ১৫ই অক্টোবর হইতে
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

গোরা

দেবদত্ত ফিল্মসের নবতম কথা-চিত্র
শ্রেষ্ঠাংশে : রাণীবালা, প্রতিমা দাস গুপ্তা, নরেশ
মিত্র, জীবন গাঙ্গুলী, মোহন ঘোষাল ইত্যাদি।

সুকার জীবনমলচন্দ্র ঘোষের

নূতন কাব্যগ্রন্থ

জীবন ও রাত্রি

বাহির হইয়াছে, মূল্য এক টাকা

প্রকাশক :—

নানান্দা ইউনিভারসিটি প্রেস

২৪।এ মোহিনী মোহন রোড, কলিকাতা।

প্রভাত সিনেমা

বাগবান

জেনারেল ফিল্মের অমর চিত্র-কথা “বাগবান” আগামী শনিবার থেকে প্রভাত সিনেমায় ৬ষ্ঠ সপ্তাহে পড়বে। দর্শকের ভাড়া দেখে মনে হয় ছবিখানির জনপ্রিয়তা এখন পর্যন্তও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি এবং আরও কিছুদিন ছবিখানি প্রভাত সিনেমায় চললে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।

উত্তর ভারতের জনপ্রিয় লেখিকা শ্রীযুক্তা আনসারি এই ছবিখানির চিত্র নাট্য লিখেছেন। মুসলমান মহিলা হইয়াও লেখিকা হিন্দু সমাজের যে সকল জটিল প্রশ্ন তুলেছেন তাতে তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্থী। বেগম্ আনসারির এই প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে সার তেজ বাহাদুর সাঈফ, এবং যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী (কংগ্রেস) পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু প্রভৃতি বহিখানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু সংবাদপত্রেও এই গল্পের যথেষ্ট অনুকূল সমালোচনা করা হয়েছে।

বালা-বিবাহের ফল কিরূপ বিষময় হয় এবং হিন্দু বিধবার পুনবিবাহ যুক্তি-যুক্ত কিনা,—এই সকল কঠিন সমস্যা সমূহের সুমীমাংসার অবতারণা এই বহিতে উত্থাপিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দর্শকের মনকে গভিত করিবার যথেষ্ট খোরাক এতে রয়েছে।

কিন্তু এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন একটানা চলতে থাকে তখন তারই ফাঁকে

ফাঁকে হাঙ্কা রসের উপাদানও যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। জটিল প্রশ্নে মন যখন তারাক্রান্ত হতে থাকে তখন মাঝে মাঝে এরূপ হাঙ্কা রসের খোরাক থাকায় ছবিখানাতে কোথাও এক ঘেয়েমী নেই। যেন শরতের মেঘ ও রৌদ্রের অপরূপ সংমিশ্রণ।

চিত্র-জগতে বিমলাকুমারী ও নন্দেকারের পরিচয় বাহুল্য মাত্র। সুন্দর আনন্দের অধিকারী বিমলা কুমারী ইতিমধ্যেই “বাগী সিপাই” “তকদীর কা তীর” প্রভৃতিতে অভিনয় করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। “বাগবান” ছবিখানাতেও নায়িকা দুর্গার ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন অপূর্ব। তত্পরি তার সুললিত কণ্ঠস্বরে আপনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন।

“অমর জ্যোতি” খ্যাত মিঃ নন্দেকার এ ছবিতেও নায়ক স্বরূপের ভূমিকায় তার পূর্ণ গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাছাড়া সিতারা, ইয়াসমিন, আসরফ গান, নাজির প্রভৃতিও বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন।

ছবিখানা পরিচালনা করেছেন মিঃ এ, আর, কার্দিার।

“জেলর”

প্রভাত সিনেমার পরবর্তী আকর্ষণ হচ্ছে মিনার্ভা মুভিটোনের অতুলনীয় চিত্র সৃষ্টি “জেলর”। পরিচালক সোরাব মোদী ছবিখানার পরিচালনা ও শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন এবং বিভিন্ন ভূমিকায় লাস্তময়ী

যুবক সজ্জ

খিদিরপুর ২৫ ওয়ার্ডের যুবক সম্প্রদায় কর্তৃক এ বছর প্রথম সার্কজর্নীয় দুর্গাপুজার ব্যবস্থা হয়েছিল। সার্কজর্নীয় দুর্গাপুজার আয়োজন করা নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। কিন্তু আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে খিদিরপুরের যুব সম্প্রদায় যে নিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে এই পুজার কার্য সম্পন্ন করেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। যে কয়েকজন অক্লান্ত কর্মী এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গোপীমোহন দাদা ও শ্রীমতী উমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাদর সম্ভাষণ

আমরা গ্রাহক, গ্রাহিকা, শ্রীভানুশ্যামী ও বন্ধুবর্গ সকলের নিকট আমাদের ৬ বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।
সম্পাদক—“খেয়ালী”

উক্ত অনুষ্ঠানের পর গেল শনিবার দিন পূজামণ্ডপে শ্রীগুরু বালিকা সজ্জ কর্তৃক শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত ‘মীরাবাই’ নাটক অভিনীত হয়। শ্রীগুরু বালিকা সজ্জের বালিকা অভিনেত্রীদের বয়স ১০ বৎসরএর বেশী কাছেরও নয় এবং সম্প্রদায়টো মৌখিক ভদ্রকথাবাদের দ্বারা গঠিত। এত কম বয়স্কা বালিকাদের দ্বারা এ প্রকার গীতিবহুল নাট্যকার অভিনয় যে সম্ভব তা ইহার পূর্বে আমাদের দূরদূর অতীত

লীলা চিংলী, লীলা, তারাপুর প্রভৃতি রয়েছে।

গল্পের অভিনবত্বে এবং ঘটনার বাস্তব প্রতিঘাতে ছবিখানা এক কথায় হয়েছে অপূর্ব। চিত্রজগতে ছবিখানা এক যুগান্তর আনয়ন করেছে।

শিশুদের সর্দি কাশি

কিছুকাল পূর্বে আমেরিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অধ্যাপক ডাঃ জন পাওয়েল বলিয়াছিলেন যে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে স্বাস্থ্যকায় শিশুর উপর। পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা ভারতবর্ষের মতন আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। ইহা খুব সত্য যে, সাধারণের স্বাস্থ্য নির্ভর করে জাতির উপর। ওয়াশিংটনে পাবলিক হোম এসোসিয়েসনের এক অধিবেশনে কয়েকজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই মত

ছিল। কুমারী অরুণিমা (৯ বৎসর) মীরার ভূমিকায় ২৫ খানা গীত সহকারে যে অপরূপ অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছে তাতে আমরা বিস্মিত না হ'য়ে থাকতে পারিনি। অত্যাশ্চর্য্য কয়েকটা ভূমিকায় যারা অভিনয় করেছে তাদের মধ্যে কল্যানি, বাণী, প্রতিমা, অনিমা, নীলিমা, পূর্ণিমা, মীরা, ফ্লোরা, রাধারাণি, দুর্গা, কিরণ, জসবন্তী, উষারাণী, সুরঞ্জিতা, গৌরি, সরোজিনী, অনিমা, মঙ্গলা, অলকা, শোভারাণী, ডোরা, সুসমা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে আমরা এই 'সম্প্রদায়ের' কর্ণধার মোহিতবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের সার্থকতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁর এই প্রচেষ্টা আরও উন্নতি লাভ করুক এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

ঋতু বঙ্গ ৪৫ মাস বে কাগজেই
হউক তৈরী বর্নোষধিতে
অব্যর্থ কল—পূর্তাবস্থায় ব্যবহার
নিবিড় ১০ নম্বর ও বর্ণ শক্তি একবার
প্রয়োগেই উপশম, ১০ মাস ১০ আনা



সময় ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস বনজ বিশ্বাস
১৮২ নং বহাগ্যার ষ্ট্রীট, (K) কলিকাতা।

প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সমগ্র ইউরোপে পূর্ণস্বস্থকায় সবল কেবলমাত্র রাশিয়ায় দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত জাতি বিভিন্ন দেশ হইতে রাশিয়ায় পরিত্রাণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, ঐ দেশে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক কথা children first.

আমাদের অভিশপ্ত দেশে প্রতি বৎসর হাজার হাজার অকাল শিশুমৃত্যু দেশের ও জাতির জনসম্পদ হ্রাস করাইয়া দিতেছে। জাতীয় সম্পদ জন শক্তির উপর নির্ভর করে ইহা বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিশেষ ভাবে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরই যখন ইউরোপে পুরুষ সংখ্যা অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইল তখন শয্যাগত শিশুর প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে, সুখ সাজ্জন্মের দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। ইহা সব দেশেই প্রব সত্য যে শিশুগুলি জাতীয় পুনঃ গঠনের কেন্দ্রস্থল।

ফুসফুস ও শ্বাস-প্রশ্বাস রোগের যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে "সিরোলিন রচি" সর্বাঙ্গপেক্ষা বিশ্বাস ও শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে। ইউরোপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহচিকিৎসার জন্ত অন্ততঃ এক বোতল করিয়া সিরোলিন রচি স্থান লাভ করিয়াছে। এবং যে সমস্ত জননী তাঁহাদের রুগ্ন সন্তান সম্ভূতিদিগকে সিরোলিন রচি সেবন করাইয়াছেন তাঁহারা ইহার গুণ ও উপকারীতা সন্মতিক্রমে উপলব্ধি করিয়াছেন।

(জৈনিক চিকিৎসক)

বিনোদ এণ্ড কোং

জরীপ ও নক্সার জব্বাদি ব্ল্যাকবোর্ড ও সাইক্লোষ্টাইলের সরঞ্জামাদি এবং অফিস টেশনারী বিক্রেতা। N. I. P.

শিক্ষণ !

কুমারী মলয় গুপ্ত

মোর আশার প্রদীপখানি

জলিবে না জানি !

নিভিয়াছে সে মরমে মরি'

বোশেখীর হ্রস্ব নড়ে,

তারে জেলেছি গু গো অন্তরে মম,

কহেছি গোপন বাণী ;

(সে) মোর আশার প্রদীপখানি !

দিনের আলো, গগন পারে

বিদায় মাগি' গিয়াছে চলে ;

প্রদীপখানি না বলি' আমারে

নিভিয়াছে কোন্ লগনে—

সে আর জলিবে না জানি—

মোর আশার প্রদীপখানি !

তা'রে জেলেছি কত যতনে,

নিভৃত হৃদয় মন্দিরে

ফত স্বপনের স্মৃতি বিজড়িত

তজ্রাতুর আঁখি ছু'টি মোর

চেয়েছিল অনিমেষ নয়নে—

তবু না জানি কেমনে

দিল সে আমারে ফঁকি

মলীর তুলিকা টানি।

মোর আশার প্রদীপ খানি !

ব্ল্যাক বোর্ডের সরঞ্জামাদি.

"বিনোদ এণ্ড কোং"—এ

পাওয়া যায়।

N. I. P.



শ্রীমতী গুণ্ড

বহুধারী নরমা

নরমা শিয়ারার! নরমা শিয়ারার!! ...
রূপালী পর্দার ঝিলিমিলির মধ্যে কি এক
অপূর্ণ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য! অতুলনীয় শাস্ত সৌম্য
মুখশ্রী, কোমল স্থির অথচ উজ্জ্বল রস
হ'ল দেহকান্তি! শিল্পী জগতের একটি
অনিদ্যাসুন্দর 'ব্যতিক্রম' রূপমা অভিনেত্রী
নরমা শিয়ারার!

কিন্তু গুণ্ড ঐ কমনীয় লাবণ্যলিত
রূপই নয়, গুণও শ্রীমতার অসামান্য। তাই
আজ নরমা ভূবনপ্রসিদ্ধা, তাই ওর অতি-
শীত একখানি ছায়াচিত্র দ্বিচ্ছিত্রবিলাসীর
প্রেম কাম্য ধন।

শ্রীমতীর ভূবনবিজয়ী প্রতিভার সঙ্গে
পরিচিত নয় এমন লোক বিরল। ওর
অপরূপ অভিনয় আপনাকেও মুগ্ধ বিম্বিত
করেছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু লক্ষ্য করেছেন কি,—শ্রীমতার
বহুমুখী প্রতিভা? যে শ্রেণীর যে কোনও
চিত্রই হোক—সাক্ষ্য ওর অপরাজিত।
কি করুণরসাপ্রিত, কি হাস্যরসাপ্রিত সর্ষ-
প্রকার চরিত্র পরিফুটনেই অসাধারণ এই
শ্রীমতা এবং সেই স্ফুটমান চরিত্রচিত্রণে
বৈচিত্র্যপ্রদর্শনেও তুলন' নেই ওর।

আপনাদের স্মরণ আছে, শ্রীমতা নরমা
শিয়ারার 'মেরী এ্যান্টয়েনেট' বাণী চিত্রে
নারিকার অংশ গ্রহণ করেছেন। সেই
প্রেম সুবাসিত আবহাওয়ার মোহ ত্যাগ
করে আজ উনি এসে দাঁড়িয়েছেন সম্পূর্ণ

বিরোধীভাবসম্পন্ন এক কৌতুক চিত্রের
ভূমিকায় ক্যামেরার ঈগল চোখের সামনে।
পাশে তাঁর জনপ্রিয় নট ক্লার্ক গেবল্।

ষ্টুডিওর এই মনোরম দৃশ্য অতীতের
আর একটি দিনে এমনি আর এক দৃশ্যের
মধুর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে মনে। ক্লার্ককে
হলিউডের তারকা রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে
যে ছবি সেই 'ফ্রি সোল' এর একটি
সেট। সেদিনও নরমা ও ক্লার্ক পাশাপাশি
দাঁড়িয়ে। সামনে ছিল তাদের পরিচালক
ক্লেরারেন্স ব্রাউন। আর আজও ব্রাউন
তেমনি দাঁড়িয়ে এ ছবিখানার নাম
'ইডিয়টস্ ডিলাইট'।

পুরাতনের দাবী

পুরাতনের দাবী চলেছে দর্শক সমাজে।
দিকে দিকে সাড়া জেগেছে 'পুরোণো ছবি
দেখাও' 'পুরোণো ছবি দেখাও'। জগতের
চিত্র-ইতিহাসে এমন কয়েকখানি যুগান্তর-
কারী সুন্দর ছায়াচিত্রের দর্শন পাওয়া
গিয়েছে, যা আমরণ কাল মানুষের স্মৃতি
ফুলে পূজা পেয়ে আসবার উপযুক্ত।

কিন্তু মানুষ গুণ্ড স্মৃতি নিয়েই সন্তুষ্ট
নহে, ওদের বারবার দেখবার কামনা রাখে
তারা। কিহা হয়তো স্মরণের কোণে
পুরাতনের যে অংশটুকু কালপ্রবাহে স্নান
হতে চলেছে সেটুকুর উপর আবার মোহন
তুলিকা বুলিয়ে নিতে চায়। তাই তারা
বলে: দেখাও 'শেখ' দেখাও সন্ অব দি
শেখ'—দেখাও 'কিড' পুনর্মুক্তি দাও।

চিত্রবিলাসী দর্শকদের এই হুতন দাবী
কর্তৃপক্ষদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।
এদের মতে—চিত্রশিল্প-কলা আজ অতদূর
উন্নতি লাভ করেছে যে উক্ত ছবিগুলোকে
মুক্তি দেওয়া আর এখন যুক্তি সঙ্গত হবে
না। এই হুতন হুতন চমকপ্রদ টেকনিকের
যুগে পুরাতনের পুনর্মুক্তি হয়তো শুধু
হাস্যকর অসাফল্যে পর্যাবেশিত হবে।
কিন্তু দর্শকেরা এ যুক্তি মানতে চায় না।
অবশেষে কর্তৃপক্ষও বিবেচনা করে
দেখলেন, যে, দর্শকদের এ দাবী নেহাৎ
উড়িয়ে দেবার নয়। সুতরাং তারা বেশ
সন্তুষ্টচিত্তেই পুরাতন জনপ্রিয় ছবিগুলির
পুনর্মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। 'শেখ' ও
'সন অব দি শেখ' ছবিদুটীতে প্রসিদ্ধ চিত্র-
নট রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনোর অপরূপ প্রণয়-
প্রতিভায় আপনাদের আবার নুতন করে
মুগ্ধ করবে নিশ্চয়ই। কল্লোলকের অধীশ্বর
ভূবনমোহন ভ্যালেন্টিনোর সুমধুর প্রণয়-
লীলা ওর সেই প্রেম কি করে নারীর
উপরে প্রভাব বিস্তার করে তাকে সম্পূর্ণ-
রূপে জয় করে নিতো—তার চাক্ষুষ
প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সমূহ আপনাকে বিম্বিত
করবে।... বস্তুত: ভ্যালেন্টিনোর রূপ
পরিচয় পিপাসাই এই পুনর্মুক্তি কামনার
একমাত্র কারণ। কিন্তু 'কিড' এর বিষয়ে
চার্লি সিকলকে হতাশ করেছে।
আপনাদের হয়তো মনে আছে—এই 'কিড'
ছবিই জ্যাকি কুগানকে চিত্ররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত
করে। এই-ই কুগানের প্রথম ছবি।
কিন্তু দর্শকদের দাবী মেটাতে চার্লি
চ্যাপলিন বিশেষ নারাজ।

জরীপ ও নক্সার যত্নাদি সুবিধায় কিনতে হলে

'বিনোদ কোম্পানী'র

নুতন শো-রুমে যান।

১৩নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার।

N. I. P.

হারল্ড লয়েডের মনোভাব কিন্তু অত
রূপ। পুরাতন কমেডিগুলোর চিত্রসমূহ
কিনেছে সে, তবে সেগুলো নিয়ে কি
করবে জানা নেই। পুণরায় প্রদর্শনের
ব্যবস্থা হবে, সম্ভব।

কিন্তু কথা হলো এই, যে আধুনিক
মনোরতিসম্পন্ন নিত্য নব অভিনায়ী
দর্শকদের এই সব ছবিগুলো ভাল লাগবে
কি না !!

ক্লার্কের নাসিকা

মির্গালয় ও ক্লার্ক গেলের ছবি 'টু হট
টু হাণ্ডল' এর একটি দৃশ্যে সংবাদ পত্র
দেবী আলোকচিত্রকরের ভূমিকায় ক্লার্ক
ঘুরিয়ে চলেছে ক্যামেরা।



মির্গালয়

টিক্ টিক্ টিক্—টিক্ টিক্ সশব্দে ঘোর
নিউজরিল ক্যামেরা।.....

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলে বিরাট গাড়ী
খানা।

ছাদের উপরে ক্লার্ক এক দৃষ্টে
নিরীক্ষণরত। 'অদূরে মির্গাল এরোপ্লেন
এই বুঝি যায় যায়—এই বুঝি শুড়ো হয়!!...



চার্লি চ্যাপলিন

অকস্মাৎ এক বিরাট চিংকার শোনা
যায়, দুহাতে নাকটা ধরে বসে পড়ল
ক্লার্ক গেল।

অভিনয়ের ভীষণ "উল্লেখনীয় ক্যামেরা-
মান মহাশয় নাকটা চেপে ধরেছিলেন
ঘূর্ণায়মান চাকাখানার গায়ে—আর তারই
ফলে নাসিকার খানিকটা চামড়া গেছে
উড়ে। আয়নার দিকে তাকিয়ে, ক্লার্ক
দেখে, নাকটা লাল-লাল ভারী লাল।
সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ বন্ধগার জ্বালাময় অমৃতভূতি।

হ্যাঁ, ক্লার্কের মেয়ে-ভক্তদের চিন্তার বা
উদ্বেগের কারণ নেই। এমন বিশেষ কিছুই
নয়—শুধু খানিকটা চামড়া ও, সারতে
'আর কদিন ?

কি বলছেন ? দুঃখ হয় ?...তবু তো
নাকটা আস্তই আছে দাদা !

অদ্ভুত উপহার

সাগরপারে কোন্ রূপসীর গুণমুগ্ধ
আপনি ? এষাবৎ কোনও উপহার
পাঠিয়েছেন কি তাকে ? কি ?.....ছবি ?
ফটো ?.....চিঠি ?.....ছদ্মাপ্য জিনিষ
কোনো ?.....রত্ন, মণি, মাণিক্য ?.....
অপনার স্বহস্তে রোপিত গাছের লাল নীল
ফুল ?.....অভিনন্দন কিছু ?.....

বলি, বাপার কি ? তবে, কি
চকোলেট ? না, বড় একটা ডল ? না,
একটা লালটক্টকে রুম ?.....

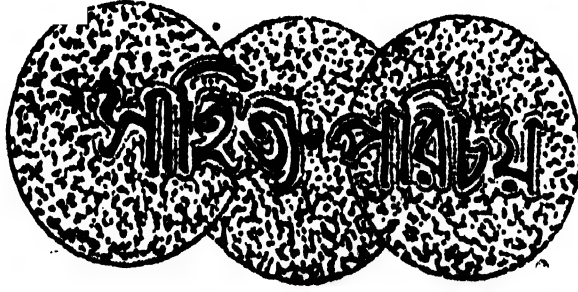
বুঝেচি, আপনি স্বীকার করতে চান
না। কিন্তু এতে লজ্জাটা কিসের ?...এমন



ক্লার্ক গেল

উপহার তো ওটা হামেসা পাচ্ছে ; আর
তা একটা নয় দুটো নয়,—ঝুড়ি ঝুড়ি।
দোষটা কিসে ?

এইতো সেদিন আপনাদের অতি
পরিচিতা ছায়ানটী জোয়ান ক্রফোর্ড একটা
বড় পার্শেল উপহার পেয়েছেন। পার্শেলটা
এসেছিল ডাকে, ভারী অদ্ভুত আর বিচিত্র
কতগুলি উপহার ছিল তার মধ্যে।
জোয়ান তো খোলামাত্র একেবারে হতভম্ব।



২৪শে এপ্রিল চুপ!—সুখার দে
সরকার প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমণিমোহন
ঘোষ। ঘোষ এণ্ড সন্স, ৩১ রসা রোড
ভবানীপুর কলিকাতা—ডবলক্রাউন ১৬
পেজী—৯৮ পৃষ্ঠা। বোর্ড বাধাই, মূল্য বার
আনা।

বর্তমানে উপভাসের মধ্য দিয়া মনস্তত্ত্বের
নামে যৌনতত্ত্বের বিশ্লেষণ বাঙলা সাহিত্যে
ক্রমশঃ একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে। এ
অবস্থায় বৈজ্ঞানিক উপভাস লিখিবার প্রচেষ্টা
যে বাঙলা কথাসাহিত্যে একটি নূতন দিকের
সন্ধান দিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।
আর এই হিসাবে আমরা আলোচ্য
গ্রন্থখানিকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত
করিতেছি।

পাশ্চাত্যে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক
উপভাস কথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান
অধিকার করিয়া আছে। বিশ পঁচিশ বৎসর
পূর্বে জুল-ভার্নের বিজ্ঞানমূলক উপভাসগুলি
সমগ্র পৃথিবীর পাঠকবর্গের চিন্তা জয় করিয়া-
ছিল। আজিও এচ-জি-ওয়েল্‌সের বিজ্ঞান

ও কল্পনার মিশ্র চিত্রগুলি সাধারণের
অতি প্রিয়। এই সকল কল্পনাবিলাসী
কথাসাহিত্যিকগণ বৈজ্ঞানিক রাজ্যে তাঁহা-
দিগের অনন্ত প্রসারিণী চিন্তাধারাকে উদ্ধাম-
গতিতে অহুপ্রবেশ করিতে দিয়া অনেক
সময় যে সকল অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা
করিয়া থাকেন, তাহা সমসাময়িক ব্যক্তি-
বর্গের নিকট নিছক পেয়াল বা উদ্ভট
কল্পনা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। কিন্তু
বৈজ্ঞানিক-উপভাসিকের এইরূপ কোন কোন
অসম্ভব স্বপ্নও বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে
দেখা গিয়াছে। জুল ভার্নের কল্পিত ডুবো
জাহাজ ‘নটিলাস’ বিগত জার্মান যুদ্ধে রুট
বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহার
চক্রলোকে গমনের পদ্ধতিও বর্তমান
বৈজ্ঞানিকগণের নিকট আর উপহাসের
বিষয় নহে—উহা লইয়া প্রচুর গবেষণা
চলিতেছে। জানি না, ওয়েল্‌সের কাল্পনিক

“অদৃশ্য মানব” কোনদিন কোন বিজ্ঞানবিদের
গবেষণাগারে আত্মপ্রকাশ করিবে কিনা।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে যে এ্যান্‌কেনি বা
“কিমিয়া বিদ্যা”র তত্ত্ব লইয়া আলোচনা
হইয়াছে সেই গুপ্তবিজ্ঞান সাধনা মধ্যযুগের
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সবিশেষ প্রচলিত ছিল।
পাশ্চাত্য জগৎ সে যুগে সে সাধনায়
মিদ্ধিলাভ করিয়াছিল কিনা, ইতিহাস
সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলে না। কিন্তু
প্রাচীন ভারত যে এ বিষয়ের রহস্যভেদে
সমর্থ হইয়াছিল তাহা ভারতীয় আয়ুর্বেদের
রসগ্রন্থগুলিতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।
এতদ্বিন্ন বাস্তবায়নের কামন্যত্রেও এ সম্বন্ধে
হুই চারিটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।
আর আজিও এই কিমিয়া-বিদ্যা সস্রাদায়-
ক্রমে নাগাসন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত
আছে। তবে অতি অল্প ব্যক্তিই এ প্রক্রিয়া
সাধনের প্রকৃত অধিকারী। লোভী ও
ব্রহ্মচর্যবিহীন হইয়া পারদক্রিয়া আরম্ভ
করিলে নানারূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয়
বলিয়া ষাঁইরা এ বিজ্ঞা জ্ঞানেন, তাঁহারাও
কদাচিৎ সাহসে ভর করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত
হইয়া থাকেন। ভারতীয় প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য
প্রক্রিয়া অপেক্ষা বহুলাংশে আড়ম্বরহীন ও
অশ্রুস্ত, কিন্তু তুলনায় বহু কঠিন। আর

**আধুনিক ও
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান**

কি ছিল গুনবেন?—সাতটা ছোট
ছোট কচ্ছপের, মানে পিঠে রং চম দিয়ে
সাতটা ছবি আঁকা—ববার্ট টেলর, বারবারা
ষ্ট্যানউইক, চার্লস বয়ার, রে মিলার্ড,
ফ্র্যাঙ্কট টোন, জন বিল এবং জোয়ান স্বয়ং!

সাতটা জনপ্রিয় তারকার চলমান
প্রতিচ্ছবি !!.....

ফোন-
কলি-
৬৪৩৬

৩২-সি.
গুপ্তভা.
কলিকাতা,

এ প্রক্রিয়ার বর্ণনা করিয়া উপভাস রচনা করিলেও পাঠক সমাজের নিকট হইতে “গঞ্জিকাসেবীর উদ্ভূত মস্তিষ্কের কল্পনা” প্রভৃতি অমগধুর প্রশংসা লাভেরই যথেষ্ট সম্ভাবনা। বর্তমান গ্রন্থকার এদিক্ ছাড়িয়া পাশ্চাত্যের অমুকরণে বাঙলাদেশের পল্লীতে নিভৃতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহার গ্রন্থখানিতে যে বিজ্ঞানসম্মত গুরুত্বের ছাপ পড়িয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বাকার্য্য। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যে এইরূপ নিভৃত গবেষণাগারেই নিকট ষাটু হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা চলিয়াছে। আর সে চেষ্টা যে আংশিক সফলতা লাভও করে নাই, তাহাও বলা চলে না। তবে পরীক্ষা কৃতকার্য্য হইলেও গ্রন্থকারের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—“এত বেশী এনার্জি খরচ হয় যে দরে পোষায় না।” এ সম্বন্ধে গবেষণা ভবিষ্যতে আরও চলিবে ইহা স্থিৰ। হয়ত এমন দিনও আসিবে যেদিন দুই হাজার টাকা বাজার দরের স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে কুড়ি টাকাও খরচ পড়িবে না। সেদিন পৃথিবীতে আর্থিক অবস্থা উন্নত কি অবনত হইবে, স্বর্ণের অলঙ্কার মাতৃজাতির আর একরূপ প্রিয় থাকিবে কিনা—সে সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণার প্রসঙ্গ ইহা নহে। কি উপায়ে নিকট ষাটুকে স্বর্ণে পরিণত করা যায়, তাহার যে ব্যাখ্যা গ্রন্থকার দিয়াছেন, তাহা মোটামুটি বিজ্ঞানসম্মত ও অতি সরলভাবে লিখিত। তবে নিতান্ত বালক বা বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষাও যে সকল পাঠকের নাই—তাঁহাদিগের নিকট হয়ত ঐ স্থানটি একটু কঠিন ও ‘নীরস বোধ হইতে পারে। পড়িতে বসিয়া বইখানি যেন বড় শীঘ্র শেষ হইয়া গেল মনে হয়। গ্রন্থখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য—ইহার গল্পাংশের মৌলিকতা। কিম্বদন্তি পাশ্চাত্যের

গান ত্রিনিদাদ নুত

সে কথা মনে কি আছে,
বলেছিলে মোর কাছে—
বঞ্চিত-হিয়া-রঞ্জিত-করা বাঞ্ছিত প্রেম দিয়া,
সিদ্ধিত করি রাখিবে আমার দীনচিত ভীৰু হিয়া ॥
আজ কি পড়িবে মনে,
সেই সে মিলন ক্ষণে—
বাহ মাঝে মোর তনুরে বাঁধিয়া কয়েছিলে কোন বাণী—
জানি গো বন্ধু জানি
চির-সঞ্চিত রহিবে এ প্রেম ওগো মোর মরমিয়া ॥
আজ, ডুবেছে সে চাঁদ যে চাঁদ আছিল উৎসব রাতি ভরি,
কণ্ঠ জড়ায়ে যে ফুল ছলেছে সে বুঝি গিয়াছে বরি।
(আজ) সরে গেছে বারি জাগিয়াছে চর,
পূর্ণিমা শেষে কোথা নিশাকর
বিনা মেঘে তাই বারি ঝরঝর
কুহেলিরে পরশিয়া ॥

অনুসরণে গৃহীত হইলেও উহার সহগামী কাহিনীটি গ্রন্থকারেরই নিজস্ব। গল্পের মৌলিকতা ও কাহিনী-প্রকাশের ভঙ্গিমা শুধু বালক বা শিশু মনের খোরাক জোগাইবে না, বয়োবৃদ্ধদেরও আনন্দদান করিবে।

গ্রন্থখানির ভাষা বেশ সাবলীল। অতি দুর্লভ বৈজ্ঞানিক বিষয়ও একরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব সুপরিষ্কৃত হইয়াছে। সুন্দর পাইকা অক্ষরে, ফেদার ওয়েট এ্যাপ্টিক কাগজে মনোরম ছাপা। গ্রন্থমধ্যে তিনখানি চিত্র আছে। ঝঙ্ঝাক বাধাই। প্রচ্ছদপটে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে বিস্ফোরণের দৃশ্যের পরিকল্পনাটি গ্রন্থোপযোগী হইয়াছে। আর গ্রন্থের নামটিও গল্পের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। আমরা এ গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—প্রিয়দর্শী

পৃথিবীর পুত্র—লেখক : পরিমল চট্টোপাধ্যায়। সুনীতি প্রেস হইতে বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই।

মেয়েদের আধুনিক প্রগতিক কটাক্ষ কোরে লেখক এই পুস্তকখানিকে একখানি নম্নারূপে রূপায়িত কোরেছেন। লেখকের ভাষার ভেতর কোথাও জড়তা নাই এবং রচনার পারম্পর্য্য ও পরিপুষ্টি বিশেষ প্রশিধানযোগ্য। সম্ভবতঃ পরিমলবাবুর ইহাই প্রথম রচনা—তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোরছি ভবিষ্যতে তিনি যদি ছোট গল্প লেখার চেষ্টা করেন তা’ হ’লে তার প্রশংসা পাবেন অনেক গুণগ্রাহীর কাছ থেকে। আলোচ্য নম্নাখানিকে তিনি “পৃথিবীর পুত্র” নামে অভিহিত কোরলেন কেন তা’ ঠিক বোঝা গেল না। বইখানির ছাপা আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

—মলিনাথ

২

স্বাভাবিক

(গল্প)

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

২

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা অতনু সুস্পষ্ট উচ্চারণে পড়ে চলেছে; আর বিশ্বয়-বিমুক্তা মনিকা এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে তার স্নকুমার মুখের পানে। বাস্তবিক, মনিকার কেবলি মনে হ'তে লাগলো, আর অতি কাছে নীল সোফাটাতে যে উপবিষ্ট রয়েছে সে যেন আশীশব সহচর অতনু নয়, অথু কোন অপরিচিত পুরুষ। আর এই পুরুষকেই যেন সে চিরকাল উপলব্ধি করে এসেছে নিজা আর জাগরণে, স্বপ্ন আর চিন্তায়, এরি জন্তে যেন এতো কাল ধরে অপেক্ষা করে এসেছে আগ্রহে আর আশঙ্কায়। এই পুরুষই তার সব অথচ এই পুরুষ অতনু নয়! মনিকা মনে মনে বললে, হে ঈশ্বর, এই পুরুষ যেন অতনু হয়।

‘যদি তুমি কিছু না মনে কর—’ নিজের জামার পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে সামান্য ইতস্ততঃ করে অতনু বললে ‘যদি অমুমতি দাওতো একটা সিগারেট খেতে পারি!’

‘সিগারেট?’ মনিকা প্রায় চমকে উঠলো ‘সিগারেট ধরছে! নাকি?’

‘সে কলেঙ্কারীর কথা আর জিজ্ঞেস করে না। খাবো একটা সিগ্রেট? এখানে আসা অবধি একটাও খাইনি, অভ্যাস হ'য়ে পড়ায় না খেলে খারাপ লাগে।’

অভ্যাস পাকা হ'য়ে গেছে তাহ'লে— কী বলো?’

• ‘বোধকরি তাই হবে।’ দেশলাইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠুকতে ঠুকতে অতনু বললে ‘এই ঘরে এখন হঠাৎ কেউ এসে পড়বার আশঙ্কা নেই তো?’

‘সম্ভবত নয়। এই ভর দুপুরে যে-যার ঘরে শুয়ে নিদ্রামগ্ন।’ সিগারেট ধরিয়ে জানালার দিকে মুখ করে অতনু টানতে লাগলো। আর মনিকা হাতের খোলা বইটাতে মনযোগ দেবার চেষ্টা করলো। সিগারেটের ধোয়ান অতনু আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মুখচোখ : সিগারেটের তীব্র সুরভিতে সমস্ত ঘরটা যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভরে গেছে, ... স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস টানতে গিয়ে মনিকার বুকও এসে যেন লাগছে এই ধোয়ার আশ্বাদ। একটা অপূর্ণ মাদকতায় চোখছুটো আবেশে ঘুমে ভরে আসে।

‘কিছুই আর ভালো লাগছে না।’ অতনু হঠাৎ কথ' বলতে শুরু ক'রলে : ছেলেবেলার জ বনটাকে আবার যদি ফিরে পেতাম! বর্তমানের বিক্ষোভের চেয়ে অনেক ভালো ছিলো সেদিনের সারল্য। বাস্তবিক কিছুই আর তেমন ক'রে ভালো লাগছে না এখন।’

মনিকা উদ্ভ্র দিলে না। তার চোখ ছুটো এতকণে ঘুমে জড়িয়ে এসেছে।

‘এক-এক সময় ভাবি’, অতনু বলে’ যেতে লাগলো : ‘গতানুগতিকার বিরুদ্ধে মানুষ কি কোনো কালেই বিদ্রোহী হ'তে

২

২

পারে না? হুর্কিসহ হ'য়ে পড়েছে আজকের এই ক্রটিন বাধা একঘেয়ে জীবন যাত্রা : কণিক সভ্যতার চাপে মানুষ নাস্তিক জীবন-যাত্রা যাপন ক'রছে আর কলের কারখানায় তেল জুগোতে মরছে হাজার-হাজার নিরন্ন মানুষ। সাম্রাজ্যবাদীর পীড়ণে আর হুর্কল জাতির আর্ন্তনাদে নিরন্তর আলোড়িত হ'চ্ছে অন্দের আর আকাশ— এইরূপ শোকাবহ দুর্গতির হাত থেকে নরনারায়ণের সত্যি কি কোনো মুক্তি নেই; সত্যি কি আর কোনো ভিন্নতর উপায় নেই বাঁচবার?’

মনিকা একটু নড়ে উঠলো যাত্রা। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না।

‘তাই তো মাঝে-মাঝে ভাবি, কী হলে এই ঘুনেধরা সমাজ আর সভ্যতা নিয়ে।’ এর চেয়ে ঢের ভালো বনে গিয়ে বাস করা, সত্যি মনিকা-দি, তুমি যদি আমার থাকো, বনে যেতেও আমার আপত্তি নেই।’

এতো উদ্দীপনা বুঝি মাঠে মারা গেলো। অতনুর হঠাৎ খেয়াল হ'ল চোখ বুজে রীতিমতো ঘুমোচ্ছে মনিকা। আশ্চে-আশ্চে সে ইজিচেয়ারে শায়িতা নিজিতা মনিকার খুব কাছে সরে' এলো। নিচু গলায় ডাকলো : ‘মনিকা-দি!’

মনিকার' কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না।

‘বেশ তো মানুষ!’ মনিকার মুখের কাছে মুখ এনে অতনু আবার বললে : ‘আমি এতো বকে মরছি আর তুমি নিরীবাতে নিজা যাচ্ছে। ভারী অজ্ঞায় কিন্তু!’

মনিকা তথাপি নিজার ভাণ ক'রে পড়ে' রইলো।

অতনু তার একহাত আলগোছে নিজের হাতের ভেতর তুলে নিলো। নরম মন্থণ রক্ততপ্ত আঙ্গুলগুলি নিয়ে খেলা ক'রতে

ক'রতে বললে : 'ঠিক বললে না, তুমি আমার সঙ্গে বনে যাবে কিনা। আচ্ছা, তোমার বয়স কতো মনিকা-দি ?'

বয়স কতো! মনিকা ধরফর ক'রে ভাড়াভাড়ি উঠে বসলো।

'ছেলেবেলা তো আমি-ই ছোট ছিলাম—' বিশ্বয় বিস্ফারিতা মনিকার হাতের ওপর মূছ চাপ দিয়ে হাসতে-হাসতে অতনু বললে : 'এখন বড়ো হ'য়ে কিছু বুঝতে পারছি' নে !'

বিকেলবেলা চায়ের টেবিলে আর একবার বিলাসবাবু আর কৌশল্যা দেবীর সঙ্গে দেখা হ'ল অতনুর। মনিকা তখন বাথরুমে প্রাত্যহিক বৈকালিক স্নান ক'রতে গেছে। বিলাসবাবু আর অতনু পাশাপাশি বসে' চা-খাবার খেতে লাগলো।

'হাসি কোথায় ?' অতনু কৌশল্যা দেবীর দিকে তাকালো : 'তাকে দেখছি না যে ?'

'ছোট্টু' ওকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেছে।' কৌশল্যা দেবী বললেন।

অতনু আর কিছু জিজ্ঞেস ক'রলো না।

'এখন তোমাকে একটা কথা বলি—' বিলাসবাবু গোড়া থেকেই বোধকরি এই কথাগুলি বলবার জন্তে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন : 'তুমি মনিকাকে প্রতি মাসে যে বইগুলি পাঠাও সেগুলি আর পাঠিয়ে না।'

অতনু হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা পিরিচের ওপর নামিয়ে রাখলো।

'মিছেমিছি টাকা নষ্ট করে লাভ কী বলো—' বিলাসবাবু আবার বললেন 'মেয়েটাতো আর সত্যি বই-টাই পড়াশোনা করে না।'

'ওদিকে আলমারীটাতো একেবারে ভর্তি হ'য়ে উঠেছে—' কৌশল্যা দেবী স্বামীর কথায় যোগ দিলেন 'মনিকা চলে গেলে এসব দেখবেই বা কে ?'

চলে গেলে মানে বিয়ে হয়ে অল্প ঘরে গেলে ইজিতটা অস্পষ্ট নয়।

'আর তুমি অল্পখান থেকে মনিকার কাছে যে সমস্ত চিঠিপত্র লেখ—' এবার বিলাসবাবু বললেন 'সেগুলিও ক্রমশঃ কমিয়ে আনা দরকার নানা কারণেই।'

'চিঠিপত্রও লিখতে পারবে না ?' অতনু বিশ্বয়ে শুরু হয়ে গেলো।

'লিখতে পারবো না কেন !' কিঞ্চিৎ উদ্বেজিত হয়ে উঠে বিলাসবাবু বললেন 'কিন্তু আমরা তো মরে যাইনি, এখানকার খবরাখবর নেয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, আমাদের কাছে লিখলেই তো পার। আমার কাছে কিংবা আমার স্ত্রীর কাছে।'

অতনু এই মুহূর্তে কী যে বলবে ভেবে পেলো না।

'একি, খাবার খাচ্ছে না যে ?' কৌশল্যা দেবী বললেন 'আর একটু চা দেবো ?'

অতনু মাথা নাড়লো। সিঙাড়ার এক টুকরা ভেঙে মুখে দিলো।

'এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।' বিলাসবাবুর বক্তব্য বোধকরি এখনো শেষ হয়নি 'সংসারে আরো ঢের ভাবনার জিনিষ পড়ে রয়েছে। সে যাই হোক, আমার কথাগুলি শ্রবণ থাকবে তো অতনু ?'

অতনু ঘাড় নেড়ে জানালো যে থাকবে।

'তোমাকে আরেকটা সন্দেহ দেবো ?' স্বামীকে উদ্দেশ্য করে কৌশল্যা দেবী বললেন 'কচুরীটা বুঝি ভালো হয় নি ?'

উত্তরে যা বলবার প্রয়োজন বিলাসবাবু বললেন।

খাবার ঘর থেকে বের' হ'য়ে এসে অতনু চিস্তিত মনে মনিকার ঘরের দিকে এগিয়ে চললো। ঘনায়মান সন্ধ্যার সোণালী আলো তখন পশ্চিম দিগন্ত রাক্ষিয়ে রেখেছে।

ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মনিকা একাগ্রচিত্তে প্রসাধনে নিমগ্না ছিলো। সে স্নান সেরে এইমাত্র বাথরুমের বার' হ'য়ে এসেছে : কালো-কালো নরম ফুলকো চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো, সমগ্র নিটোল দেহ ঝকঝকে, ঝলমলে।

একরাশ অগোছালো কালো চুলের ওপর চিরুণী চালিয়ে নিয়ে তাদের বিভ্রান্ত ক'রে যখন সে গায়ের রক্তবর্ণ তকতকে ব্লাউস্টা দেহের ওপর ভালো ক'রে এঁটে নিচ্ছে, এমনি সময়ে সামনের আয়নায় ক'র চকিত ছায়া দেখে তাকে ধামতে হ'ল নিতান্ত আনমনে অতনু এই ঘরে ঢুকে পড়েছিলো, মনিকাদিকে প্রসাধনরতা দেখে একটু বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে ভাড়াভাড়ি চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই মনিকা ঠিক ততোধিক ভাড়াভাড়ি কথা বলে উঠলো।

'চলে যাচ্ছে কেন—' মনিকার গলার আওয়াজ শোনা গেলো 'এদিকে এসো অম্মা !' তারপর নিজেকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে বললে 'খবর কী ?'

অতনু এসে নীল সোফাটাতে বসে পড়লো।

'আমার দেবী হয়ে গেছে—' ফেস পাউডরের ডিবা নামিয়ে রেখে মনিকা ক্রিমের কোটটা তুলে নেয় 'যে অসহ্য গরম। ভালো করে স্নানটা সেরে নিতে দেবী হয়ে গেলো; তাই সময়মতো চায়ের টেবিলে যেতে পারলুম না।'

'তুমি কোথাও বেরুবে নাকি ?' অতনু একটা ছোট্ট প্রশ্ন করলে।

আমাকে সে রকম লাগছে নাকি? মনিকা বললে 'বেরুতে তো পারি কিন্তু বেড়াবার জায়গা কোথায় ? মাঝে মাঝে পাশের বাড়ির আমার সমবয়সী নববিবাহিতা ও ননাগতা মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে

বাই এই পর্য্যন্ত। এছাড়া আর কোথায়ই বা যেতে পারি, তাইতো মাঝে মাঝে ভারী ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

অতমু চুপ ক'রে রইলো।

‘কিন্তু তুমি এখন একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসবে না?’ মনিকা এগিয়ে এসে অতমুকে স্পর্শ ক'রলো: ‘এখানকার পুরানো লোকজনদের সঙ্গে দেখা ক'রবে না?’

‘কার সঙ্গে আবার দেখা ক'রবো?’ অতমু বিড়-বিড় ক'রলো: ‘এই সহরে তোমরা ছাড়া আর কাঁদের বাড়ী-ই বা আছে যেখানে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে খুসী হ'তে পারি?’

মনিকা ভাবতে লাগলো।

‘তার চেয়ে চলো না, তোমাকে সঙ্গে ক'রে কোথাও থেকে ঘুরে আসি। যাবে?’ ‘কোথায় যেতে চাও?’

‘চলো না যেখানে হয়। নদীর ধারে?’ অথবা সিনেমায়?’

‘সিনেমায়! তুমি খুব সিনেমা দেখ সুখি?’

মাঝে-মাঝে দেখি। সময়টা একরকম ভাবে কাটাতে হবে তো?’

একটা মস্ত পরিবর্তন, মনিকা ভাবতে লাগলো, এই চার বছরে অতমুর মধ্যে এতোটা পরিবর্তন সত্যি সে আশা করেনি। অতমু এখন সিগারেট খায়; সিনেমা দেখে; দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার বিষয় নিয়ে পলিটিক্যাল তর্ক করে। আর এই অতমুই আজ ভোরের দিকে ছ'হাত দিয়ে আলিঙ্গন ক'রেছিলো তাকে একপা মনে হতেই কিসের একটা আরক্তিম সন্মোহে সে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। মা-বাবা যে কতবার প্রতি উদাসীন নন তার একটা কারণ সে এইমাত্র উপলব্ধি ক'রলো।

একটা পরিবর্তন এবং এতোটা পরিবর্তন যে রীতিমতো চোখে ঠেকে; একটা

বিশ্ময়কর বিপ্লব বলে মনে হয়। এখনকার অতমুর সঙ্গে আগেরকার অতমুর অনেক তফাৎ; তবু কেন যেন মনিকা নিজেকে নিরস্ত ক'রতে পারে না; কিসের যেন একটা দুর্গিবার আকর্ষণ ক্রমাগত তাকে ঠেলে দিতে থাকে অতমুর দিকে। মনিকা ঘাবড়ে গেলো; মনিকা ভারী বিপন্ন মনে ক'রতে লাগলো নিজেকে; কোথায় সেই অতমু যার ভেতর সে এককালে দেখেছিলো অপাপবিদ্ধ শিশুর অপার সারল্য?

সিনেমায় যাবে?’ অতমু আবার জিজ্ঞেস ক'রলে: ‘না আপত্তি আছে কোনো?’

‘আমার নিজের হয়তো কোনো আপত্তি নেই—’ একটু ইতস্তত: ক'রে মনিকা বললে: ‘কিন্তু খুব সম্ভব বাবা-মা রাজী হবেন না। বাবা তো প্রায়ই বলেন, বায়োস্কোপ দেখার বিলাসিতাকে তিনি কোনো কালেই প্রশ্রয় দিতে পারবেন না!’

‘বিলাসিতা!’ কথাটা অতমুর গলায় আঁটকে গেলো যেন: ‘আর তুমি যে এই স্নো-পাউডার, ক্রিম আর কজ ব্যবহার ক'রছো—এইসব?’

‘এটা অবশ্য স্বতন্ত্র—’ হাসবার চেষ্টা করে মনিকা বললে: ‘তাদের মেনেই কি নিষ্ঠুর হতে হবে তো? নইলে ভবিষ্যতে পরের হাতে দিতে ফেবেগ পেতে হবে!’

‘অতিরিক্ত বিনয় দেখাচ্ছে!’ অতমু বললে: ‘তোমার মতো চমৎকার মেয়ের পাউডার ঘসে নিষ্ঠুর হবার কোনো দরকার দেখি না। এটা বাড়াবাড়ি!’

‘বাড়াবাড়ি নয়। তোমার চোখে যাকে ভালো লাগে, অত্নের চোখে তাকে কুৎসিতও তো দেখাতে পারে। তুমি একজনের ভেতর যে গুণগুলি আবিষ্কার ক'রো তাকে পছন্দ কর অত্নের চোখে সে-গুণগুলি হয়তো নাও ঠেকতে পারে।’

‘কিন্তু এটা অত্নের কথা। বাইরের রূপটাকে তো আর কেউ অস্বীকার ক'রতে পারে না। তার জন্মে অস্তুষ্টি থাকারও প্রয়োজন নেই বোধকরি।’

মনিকা চুপ ক'রে রইলো।

‘তোমার’ এখন যে বয়স—’ অতমুর গলা আবেগে গম্ভীর হ'য়ে এলো: ‘এর চেয়ে ভালো বয়স আর মেয়েমানুষের হ'তে পারে না। এই বয়সে নিতান্ত কুৎসিত মেয়েমানুষকেও সাময়িক ভাবে সুন্দর দেখায়। কিন্তু তুমি তো আর কুৎসিত নও: তুমি রূপলাবণ্যবতী; তুমি স্বাস্থ্যবতী; এখন এই তো তোমার বাইরের শ্রেষ্ঠ পরিচয়!’

‘ভ'য়েছে, হ'য়েছে!’ মনিকা অকস্মাৎ মুখর হ'য়ে উঠলো: ‘ওদিকে আমার এখনো চা খাওয়া হ'য়ে উঠেনি সে-খেরাল আছে? বক্তৃতা বন্ধ ক'রে চুপচাপ কোনো বই-টাই উন্টোতে থাকো; আমি ততক্ষণে খাবারঘর থেকে ঘুরে আসি।’

‘হারটা গলায় দেবে না?’ অতমু বলে উঠলো: ‘টেনিলের উপর যে পড়ে’ রইলো!’

‘হারের জয়েনটা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে—’ মনিকা বললে: ‘না দেখে কিছুতেই আর লাগানো যাচ্ছে না। কারিগরের কাছে পাঠিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।’

আমি দেখতে পারি?’ টেবিলের ওপর থেকে হারছড়া তুলে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরীক্ষা করে অতমু বললে ‘আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়াও মনিকাদি!’

নিতান্ত বাধ্য মেয়ের মতো মনিকা আদেশ পালন করে। সোনার হারের সরু গ্রন্থিটা আটকানো বাস্তবিক কষ্টকর, হৃদয় চেষ্টা করতে গিয়ে অতমু প্রায় ঘেমে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট অনুভব করে

মনিকাদির মনোরম মরাল গ্রীবাটি কোন লম্বে আলগোছে তার কাঁধের ওপর লতিয়ে পড়েছে। আকাঙ্ক্ষিত অনভ্যন্ত যুঁচাপ, একটু জোর করেই অতনু আস্তে আস্তে তাকে সরিয়ে দেয়।

হারটা আর লাগনো হয় না, বাস্তবিক কারিগরের কাছে পাঠানো দরকার। কিছু না বলে মনিকা অতনুর হাত থেকে সেটা তুলে নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দেয়। তারপর চলে যায় ঘর ছেড়ে। আর অতনু হাতের কাছে টেবিলের ওপর থেকে ‘মহা’ বইটা নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকে। হঠাৎ এক জায়গায় তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় :

ফিরাবে তুমি মুখ

ভেবেছো মনে আমারে দিবে ছুখ ?

আমি কি করি ভয় ?

জীবন দিয়ে তোমারে, প্রিয়ে, করিব আমি
জয়।

বিষ-ভাঙ্গা যৌবনের ভাষা,

অসীম তার আশা,

বিপুল তার বল,

তোমার আঁখি-বিজলি-ঘাতে হবে না

নিফল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উজ্জীর্ণ হয়ে গেছে। মনিকা ফিরে এসে দেখলে, অতনু কবিতার বইটা হাতে করে শুক হয়ে বসে রয়েছেন, নতশিরে কী সব ভাবছে যেন। ঘর অন্ধকার, বাইরের আকাশে ঘোলাটে চাঁদ উঠেছে, তার খানিকটে আলো ক্রমে পড়েছে জানালা গলিয়ে ঘরের মেঝেয়, ঘরময় অথও নিশ্চরতা।

‘সিনেমা দেখা বা নদীর ধারে বেড়ানো ঘটে উঠলো না বলে মন খারাপ হয়ে গেলো নাকি?’ মনিকা এসে পেছন থেকে অতনুকে স্পর্শ করলো; ‘চেন্নে দেখ বাইরে কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এখন বাগানে বেড়াতে যাবে?’

বাগানে নানা রঙের অনেক রকম ফুল; অনেক রকম ফুলের গন্ধে ঘরের ভেতরটা সুরভিত। এতো গন্ধ যে স্পর্শের মতো লাগে, সিগারেট খেয়ে এই গন্ধ নষ্ট করে দিতে কষ্ট হয়।

‘চুপ করে রইলে যে?’ মনিকা স্পর্শকে নিবিড়তর করলো, ‘বাগানে যাবে না?’

‘কিছুই ভালো লাগছে না—’ হাত বাড়িয়ে হঠাৎ মনিকাকে আকর্ষণ করে অতি কাছে টেনে এনে উদ্বেজিত দুর্বল গলায় অতনু বললে ‘কী উপায় হবে মনিকাদি?’

কিসের উপায়? মনিকা বড়ো বড়ো চোখ করে তাকালো অতনুর দিকে।

‘সত্যি কি তুমি বিয়ে করবে? আমার মতো না বিয়ে করে থাকতে পারবে না?’

বাগানে একটা বেঞ্চি পড়েছিলো। ছ’জনে এসে সেটার ওপর বসে পড়লো। ‘শরীরটা ভারী খারাপ লাগছে—’ বলতে বলতে অতনু মনিকার কোলে মাথা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো অসুখ-টসুখ আবার হলে না-তো?’

মনিকা নিঃশব্দে অতনুর মাথার উল্কা-থুস্কা চুলের ভেতর আঙ্গুল চালনা করতে লাগলো। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, গাছের ডালাপালা আর পাতাগুলি ছলে উঠছে, অতনুর চোখ দুটো আরামে ঘুমে বুজে এলো।

‘মনিকাদি! অতনু আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো।

‘কী? মনিকার আঙ্গুল চালনা দ্রুততর হয়ে উঠলো।

‘না, থাক।’ অতনু পাশ ফিরে শয়ন করলো। তার একটা হাত মনিকার কটিদেশে জড়িয়ে গেছে; কিন্তু অতনু স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস টানতে লাগলো।

‘সঙ্কোচ করো না—’ মনিকা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে ‘বলো, কী বলতে চাও।’

‘এমন বিশেষ কিছু নয়। আমার ডায়রীর খাতাটা বুক পকেটে নেই। বোধহয় বাগানে আসবার পথে কোথাও পড়ে গেছে। দয়া করে খুঁজে দেখবে কি?’

মনিকার আঙ্গুল চালনা থেমে গেলো। অতনুর মাথাটা সরিয়ে দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত বাদেই একটা অসুট আর্দ্রনাদে আকৃষ্ট হয়ে অতনুও ছুটে চললো মনিকা যেদিকে গেছে সেইদিকে। অন্ধকারে (কেমনা চাঁদ কিছুক্ষণ ধরে) মেঘের আড়ালে অন্ত গেছে;) কিছু ঠাহর ক’রতে না পেরে কোনো বড়ো ইট বা পাথরে ধাক্কা লেগে মনিকা নিশ্চয় মাঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে’ গেছে।

ব্যাপাবটা সত্যি তাই। এবং আঘাতটাও বোধকরি নিতান্ত অল্প নয়। দুটো হাত দিয়ে পা চেপে ধরে’ মনিকা রীতিমতো কাঁপছিলো। অতনু গিয়ে তাড়াতাড়ি বসে’ পড়লো তার কাছে। পকেট থেকে দেশলাই বার ক’রে একটা কাঠি ধরিয়ে বললে: ‘কোথায় আঘাত লেগেছে দেখি?’

দুটো জায়গায় লেগেছে: হাতের কব্জিতে আর হাঁটুর খানিকটে নিচে। ক্ষিপ্ৰহাতে নিজের ক্রমাল ছিঁড়ে অতনু বেধে দিলো এই দুটো আঘাতলাগা স্থানে; পায়ের দুটো আঙ্গুল ছিঁড়ে গিয়েও রীতি মতো রক্তপাত হ’চ্ছে।

‘হাঁটুতে তো আর কিছুতেই পারবে না—’ অতনু বললে: ‘চলো ঘরে ফিরে যাই। আমি তোমাকে কোলে ক’রে নিয়ে যাবো?’

‘পাগল!’ মনিকা ম্লান হাসি হাসলো: ‘তুমি পারবে না।’



অসুস্থ
শরীর



দুঃস্থ ও প্ৰবল

করিতে



সিরোলিন

'রাচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সর্দি, কাশি এবং ঘস্মার
প্রথম অবস্থায় প্রকট ওষধ।



আরেকটা দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়ে অতনু এইবার ভালো ক'রে তাকালো মনিকার দিকে : মনিকার ছলছলো চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জল ; মাটির কোথাও হয়তো ভিজে নরম ছিলো ; পড়ে যাওয়ায় মনিকার ধবধবে বাহুতে কাঁদা লেগেছে ; মনিকার ওষ্ঠাধরে স্নান হাসির অপূর্ণ মাদকতা।

'দেখি তোমাকে তোমার ঘর পর্য্যন্ত বয়ে' নিতে পারি কিনা—' অতনু পাঁজা-কোলো অবস্থায় মনিকাকে সাপটে ধরলো নিজের বুকের উপর। তারপর চলতে আরম্ভ ক'রলো কিন্তু—উঃ! মনিকা দির শরীরটে কী অসম্ভব রকম ভারী! অতনুর পা দুটো টলতে লাগলো। হয়তো এখনই পড়ে' যাবে।

'বলেছি তো পারবে না।' মনিকা বললে : 'আমাকে নামিয়ে দাও।'

মনিকা-দিকে ঘাসের ওপর নামিয়ে দিয়ে অতনু হাঁপাতে লাগলো। তার কয়েক মিনিট পর অতনুর ঘাড়ের ভর ক'রে এক হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে' অতিকষ্টে হাঁটতে-হাঁটতে মনিকা এসে পৌঁছালো নিজের ঘরে : একটা সোফায় ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো।

'তোমার জন্তে—' করুণ সুরে মনিকা বললে : 'এই দুর্ভোগ ভুগতে হ'ল আমাকে।'

সুইস টিপে অতনু আলো জ্বালালো। দেশী বিলেতী, ছোট-বড়ো, নানারকম বিচিত্র ও বিদেশী আসবাবে আর ইলেক্ট্রিক বাতীর উজ্জল আলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটা রৌদ্রফলকিত ফটিকের মতো ঝলমল ক'রতে লাগলো। বাইরের বাগানে রজনীগন্ধা, রক্তাশোক, হেনা প্রভৃতি ফুল ধরে ধরে ফুটে রয়েছে ; অগন্ধে ভেতরটা সুরভিত। সমগ্র বাড়ীর ভেতর—উজ্জ্বল

বায়ু, চাঁদ আর আকাশ—এসব দিক থেকে বিবেচনা ক'রলে, মনিকা-দির এই শোবার ঘরটাই বোধকরি সবচেয়ে লোভনীয়।

'এই নাও তোমার ডায়েরী—' মনিকা বুকের ব্লাউজের অভ্যন্তর থেকে সন্তর্পনে ডায়েরী খাতাটা টেনে বের' ক'রে এগিয়ে দিলো : এরি জন্তেই তো যতো কাণ্ড !'

সেটা গ্রহণ ক'রে অতনু জানালার ধারে সরে গেলো : বাইরের চাঁদছোয়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কী যেন ভাবতে লাগলো নিজ মনে মনে।

বাইরে বারান্দায় দেয়ালের বড়ো ঘড়ীতে ঢং ঢং ক'রে আটটা বাজলো। ঘড়ির শব্দ কয়েকটি মুহূর্তের জন্তে স্তব্ধতা আর অন্ধকারকে আলোড়িত ক'রলো। তারপর আবার সব চুপচাপ : বাগানের অন্ধকারে কয়েকটা জোনাকী উড়ে বেড়াচ্ছে।

রাত্রির খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে নটা বাজলো। মনিকা এসে শুয়ে পড়লো নিজের বিছানায় : অপার আলস্তে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিলে। অসহ্য ক্লান্তিতে তার দুই চোখ ভরে' হয়তো এখনই ঘুম নেমে আসবে ; ছোট একটি নরম অপক্লপ ঘুম।

'তুমি তো পাশের ঘরেই শোবে—' চোখ বুজে জানালার ধারে দণ্ডায়মান চিন্তিত অতনুকে 'উদ্দেশ্য' করে মনিকা বললে : 'রাস্তিরে যদি কোনো দরকার হয় তো আমার সাহায্য প্রার্থনা করো। এখন পাশের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম ক'রতে পারো।

অতনু একপ্রকার তৈরীই ছিলো। ঘরের কোন থেকে নিজের স্মটকেশটা তুলে হাতে নিয়ে মনিকাকে সচকিত ক'রে হঠাৎ বললে, টেন ছাড়বার আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকী আছে. আমি তাহ'লে আসি মনিকাদি !'

মনিকা ধড়ফর ক'রে বিছানায় উঠে বসলো, 'কোথায় চলেছো ?'

'বাবা-মার কাছে যাচ্ছি, ইষ্টারের এই ছুটিটা তো সেখানেই কাটাবার কথা ছিলো।' অতনু বারান্দায় এসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো।

'কিন্তু আজকে না গেলেই কি চলতো না ?' মনিকা পেছন পেছন ছুটে এলো।

'কী করবো উপায় নেই। অমনিই অনেক দেরী হ'য়ে গেছে।'

মনিকা আবার ছুটে এলো নিজের ঘরে। তাড়াতাড়ি বাগানের দিককার জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ালো। বিপুল উদ্বেজনার মাঝে সমস্ত শারীরিক বেদনা সে ভুলে গেছে।

অতনু ততক্ষণে বাগানের ছোট্ট রাস্তাটা পার হ'য়ে প্রকাশ্য পথে নেমে পড়েছে। প্রায় চীৎকার করে বললে; 'আমার বাবা মার সঙ্গে দেখা করে গেলে না ?'

'কোনো দরকার নেই। তুমি তাঁদের বুঝিয়ে বলো সব কথা।'

'কিন্তু যদি কারণ জিজ্ঞেস করে ?' মনিকার কণ্ঠস্বর চাপা কান্না আর বিক্ষোভে ভেঙে পড়লো, 'কী কৈফিয়ৎ দেবো তাঁদের ?'

'যতোটুকু জানা আছে ব'লো—' অপশ্রীয়ায়মান অতনু অনেক দূর থেকে শেষ বারের মতো প্রায় চীৎকার ক'রে বললে : 'কিন্তু সত্যি কথা বলতে কোনো ভয় পেয়ো না যেন !' শেষের কয়েকটি কথা রাত্রির অন্ধকার আর স্তব্ধতায় প্রধ্বনিত হ'ল।

অতনু চলে' যেতেই মনিকা ছুটে এসে ভেঙে পড়লো। নিতান্ত ছোট্ট অসহায় দুর্বল শিশুর মতো বালিসে মুখ গুজে ফুলে-ফুলে ঝুপিয়ে-ঝুপিয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগলো : তারপর হয়তো কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

অতনু বিলাসবাবুকে কথা দিয়েছে। নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষিত হবে

মননিকা

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য

রবিবারের সমস্ত দিনটাই আজ মাটি !

সপ্তাহের আর বাকী ছয়টি দিনের অক্লান্ত এবং অমাহুযিক পরিশ্রমের ক্লান্তি বিনোদনের বহু আকাঙ্ক্ষিত এই রবিবার !

উত্তর কলিকাতার সমস্ত সিনেমার দরজায় হত্যা দিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শেষকালে ঠিক করলাম আজকের সন্ধ্যায় গঙ্গার শোভা দেখেই বাড়ী ফেরা যাক

মন অত্যন্ত ক্লান্ত, শরীর অবসাদ ক্লিষ্ট, চিন্তা অশান্ত সিনেমার টিকিট না পাওয়ায়। ওদিকে শ্রাবণ আকাশেও ঘনিয়ে এসেছে মেঘের মেলা, এখুনি হয়ত—হয়ত কেন নিশ্চয়ই নামবে বর্ষণ ধারা।—

সামনের তের নম্বর বাসখানাতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম গঙ্গাবাস্থল আউটরাম ঘাট !—

বিশাল জল রাশির মধ্যে অশান্ত মনকে যদি খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

চিন্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। আকাশের কালো ঘন মেঘের অন্তরাল হতে নেমে আসছে টিপ টিপ বর্ষণ ধারা।

বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে বাস গেল থেমে একটি তরুণীর বাস করের তাজিল্য একটি অঙ্গুলি হেলনে।

বাসের সমস্ত যাত্রীর লুক দৃষ্টি আকর্ষণ করে উঠলো একটি তরুণী

ময়ূর পঙ্খী রংয়ের বিচিত্র বর্ণ সমন্বিত শাড়ীর অঞ্চল ভাগ পাছকা যুগল স্পর্শ করেছে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, দেহের মাঝে যৌবনের চঞ্চল ছন্দ, মেয়েটি প্রথম দৃষ্টিতেই সকলের অমূহুরাগ আকর্ষণ করলে।—

পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে এক লহমায় মেয়েটির অঙ্গ সজ্জা দেখে নিলুম—কিন্তু মুখের দিকে তাকাবার পূর্বেই সে আমার গিছনের লেড স্ সিটটায় বসে পড়লো।

মুখের পানে তাকাবার অবকাশ না পেলেও অচ্যুতানে বোঝা গেল মেয়েটি স্নন্দরী, বিশেষ করে তার সাজ সজ্জায়—দেহ ভঙ্গিমায়ে বিশেষ একটি ছন্দ আছে।

বাসের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সাড়া পাওয়া গেল। থুক থুক কাশির শব্দ-স্মিত আলাপনের হাসির তরঙ্গ—সাহেবী কায়দায় ইংরাজী উচ্চারণ বাসের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াকে নিমেষেই বিচিত্রতর করে তুললে।

আমি আনাড়ী তবুও একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম।

চলন্ত বাসের ক্ষুদ্রতর গতি নির্গত সিগারেটের ধোওয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে উর্দ্ধ গতিতে পিছনের পানে উড়ে উড়ে চলেছে খেন শ্রাবণের মেঘপুঞ্জ।

পিছনের সিটের মেয়েটির কণ্ঠে থুক থুক শব্দ শোনা গেল।

ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম ছিঃ ছিঃ কী অভ্যোচিত ব্যবহার আমার।—মেয়েটি ভাবছে কী!

সিগারেটের তাত্র গন্ধে এই কাশির উৎপত্তি, ভাবলাম মেয়েটির নিকট নিজের কৃত অপরাধের জন্তে ক্ষমা প্রার্থনা করি।
• নিরুপায়ের মতন অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি তথুনি ফেলে দিলাম।

সিগারেটের ধোওয়া খানিকটা পাতলা হয়ে এসেছে, মেয়েটির কণ্ঠে আবার শোনা গেল থুক থুক কাশির শব্দ!—

এ্যাসপ্লানেড ঘুরে ড্যালহাউসি স্কোয়ারে পৌছাতে বিম্বিত নেত্রে দেখলাম আমার দৃষ্টিকে কঁাকি দিয়ে সহযাত্রীণী তরুণী কখন না জানি নেমে গেছে সমস্ত বাসটাই প্রায় খালি।

নিমেষেই আমার চাঞ্চল্য শিথিল হয়ে এলো। পূর্বের ক্লান্ত সমস্ত দেহমনে পরিব্যপ্ত হয়ে উঠলো। আসন্ন মনে বাস থেকে নেমে পড়লুম।

আউটরাম ঘাটের জেটির একটি কোনে বহুক্ষণ ছিলাম বসে গঙ্গার বিস্তৃত বক্ষের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। শ্রাবণ আকাশের প্রদোষের মেঘভারও ফিকে হয়ে এসে চাঁদের আলো ফুটে বেরুচ্ছে। ওদিকে গঙ্গার বুকে জাহাজের মাল খালাস হচ্ছে—ট্রেনের শব্দ।

দিবসের চিন্তা সিনেমা না যাওয়ার দুঃখ মন থেকে গেছে মুছে। নিবিষ্ট চিন্তে উপভোগ করছিলাম কাব্যমধুর ভাব ঐশ্বর্যে ভরা পরম এক মুহূর্তকে।

কিন্তু সে মুহূর্ত সে তপমৌন ভাব গেল ভেঙে। অকস্মাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম 'থুক থুক' কাশির শব্দে।

বাসের সেই পরিচিত সুর যেন।
উৎসুক দৃষ্টি ফেরাতেই দেখি ময়ূর পঙ্খী সেই শাড়ী ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে সেই তরুণী। কিন্তু এবারে আর একাকিনী নয় মেয়েটির সঙ্গে দেখলুম সাহেবী পোষাক পরিহিত একটি তরুণ যুবক।

—আপনার সিগারেটের গন্ধটি ভারী strong ডব্লর মিটার! আমি কড়া সিগারেটের ধোওয়া stand করতে পারিনে মেয়েটি বললে।

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে আমি চমকিত হয়ে উঠলাম এ সুর যেন পরিচিত।

—কিন্তু আজকের রাতটা কি charming বিশেষতঃ এখানকার environ

ment! এর পাশে মনে করুন আমাদের Hospitalএর দৃশ্য মৃত্যুর বিভীষিকা আর রোগের যন্ত্রণা! সঙ্গের পুরুষটি বলে উঠলো।

মেয়েটি ঠিক এতক্ষণে আমারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইলেকট্রিকের আলোতে মেয়েটির মুখ স্পষ্টভাবেই এবার দেখা গেল। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় ঘটতেই একসঙ্গে যেন দুজনেই চমকে উঠলাম। মেয়েটির মুখের উজ্জ্বল দীপ্ত নিমেষেই যেন মলিন পাংশু বর্ণ আকার ধারণ করলে। এই সময়ে দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত অস্বস্তিকর একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ।

তবুও মেয়েটিই প্রথমে এই বিদ্রী আবহাওয়া কে বদলে দিলে।

বেশ সপ্রতিভ ভাবে সে আমাদের বললে আরে প্রেমন দা যে তুমি এখানে? বেড়াতে?

বিশ্বয়ের পূর্ণমাত্রা আমি তখনও কাঁটিয়ে উঠতে পারিনি। মনের ভেতর তখনও চলেছে সন্দেহের দোলা। পাকুল!—পাকুলের একী ভীষণ পরিবর্তন! আমি শুধু ছোট করে একটি উত্তর দিলাম—হ্যাঁ।

পাকুল তখন নিজেকে বেশ সামলে নিয়েছে। বললে—তুমি এখন কোথায় আছ? ওঃ কতদিন বাদে দেখা—দেশে টেশে আর যাওয়া আসা কর না কি—দেশের সব খবর কী?

এক সঙ্গে সে অনেকগুলি কথাই বলে চললো, আমি তার কথার নাগাল ধরে উঠতে পারলাম না। আমাদের গ্রামের পাশের বাড়ীর সেই গ্রাম্য বালিকা, অতীতের সেই পাকুল!

পাকুল বললে—আমি এখন এক মাড়ওয়ারী হাসপাতালে নাসের কাজ করছি। বাবা-মা সব এখানেই আছেন।

চোরবাগানে বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। এক-দিন যেওনা আমাদের বাড়ী।

সঙ্গের সাহেবী বেশধারী তার সাথীটির প্রতি লক্ষ্য করে এবারে সে বললে—Excuse me Dr. Mitter! প্রেমনদা আমাদের গ্রাম্য আশ্রয়। এসো প্রেমনদা তোমার সঙ্গে ডক্টর মিটারের আলাপ করিয়ে দিই আমাদের Hospitalএর R. M. O. আমার বন্ধু গত বছরে বিলেত থেকে ডিপ্লো নিয়ে এসেছেন ছুরি-কাঁচি-ডিসেক্সনের টেবিল নিয়ে কারবার করলেও ডক্টর মিটার এক রকম কবি! তোমার সঙ্গে জন্মে ভালো।

প্রেমনদা আমাদের একজন সুকবি—ডক্টর মিটার আমাকে অভিবাদন জানালেন আমিও প্রতি নমস্কার জানালুম। ভারী অস্বস্তিকর মুহূর্ত!

ডক্টর মিটার এবং আমি উভয়েই বাগী হারিয়ে ফেলেছি। তদ্রূপে বজায় রাখতে দু'একটি কথার বিনিময় ছাড়া উভয়ের আর কোন কিছুই নেই।

পাকুল কিন্তু বেশ সপ্রতিভতার সহিত এই বিদ্রী পরিস্থিটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তার কণ্ঠে অজস্র প্রশ্নবান—বাড়ীর খবর কী। রাসে এতক্ষণ উভয়ে একসঙ্গে এসেছি—কিন্তু কী আশ্চর্য্য কেউই কাউকে চিন্তে পারি নি, কবে আমি তাদের বাড়ী যাচ্ছি; এমনি বহু প্রশ্নই সে অনর্গল করে চলেছে।

আলাপ আলোচনার মাঝে সে মোটেই অপ্রস্তুত ভাবের আভাস পর্য্যন্ত দিতে নারাজ।

কথায় বার্তায় সঙ্কোচ এবং জড়তা অনেকটা গেল কমে।

আউটরাম ঘাটের এদিকটার বেশ নির্জন ছিল। জেটির পর আমরা তিনজনে বসে—চাঁদের আলো এখন বেশ পরিস্ফুট।

মন্দ লাগছিল না, বিশেষতঃ পাকুলের মতন একটা মেয়ের সাহচর্য্যে। ডক্টর মিটার এবং আমি দুজনেই খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলুম এতক্ষণে।

মধ্যে মধ্যে গঙ্গার ছোটখাটো চেউ লেগে জেটিটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ওপরের বারাণ্ডায় রেস্টোরাঁ থেকে ভেসে আসছে সাহেব মেমদের উজ্জ্বলিত কর্তৃপ্তর আর বিলিতি গানের গুঞ্জনধ্বনি! সাক্ষ্য ভ্রম্যকারীদের সংখ্যাও কমে আসছে—নিশীথিনীর সাথে সাথে!

ডক্টর মিটার বললেন, প্রেমের বাবু আপনার স্বরচিত একটা কবিতা যদি শোনান—দিনরাতই আমাকে কাটাতে হয় নিষ্ঠুরতার মাঝে। কাব্যালক্ষ্মী সভয়ে আমাদের এড়িয়ে চলেন।

পাকুলও জেদ ধরলে তার সেই পূর্বের প্রিয় কবিতাগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটা শোনাবার জন্তে।

কবিতা? কী আশ্চর্য্য! আমার কবিতার কথা এখনও তোমার মনে আছে পাকুল! আমি কিন্তু সত্যি সে সব একেবারেই ভুলে গেছি। সে আজ কতদিন আগের কথা আজ বছর পাঁচেক মোটে আর সাহিত্যের জন্তে লেখনী ধরিনি।

বিমর্ষভাবে কথাগুলি আমি উচ্চারণ করলুম বুকের ভেতর থেকে বছরদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়।

—ডক্টর মিটার ক্ষমা করবেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার অম্লরোধ রাখতে পারলুম না—

পাকুল বললে, কেন? হঠাৎ এ বৈরাগ্যের কারণ, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছো! কাকুর প্রেমে পড়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে নাকি? কিন্তু আমরা সাধারণতো জানি যে আঘাতের বেদনাতেই কবিতার উৎস খুলে যায়।

আমি হেসে উত্তর দিলাম না, ব্যর্থ প্রেমের আঘাতের কড়া এ বেদনা ব্যাঙ্কের ডেবিট ক্রেডিট আর ব্যালেন্সিং মনের সমস্ত রসকে নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। অঙ্ক লক্ষীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে গিয়ে কাব্যলক্ষীকে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

পাকুল সবিস্ময়ে বললে বেলো কী তোমার মতন লোক করছে ব্যাঙ্কে চাকরি? একে চাকরি তারপর আবার ব্যাঙ্ক!—

আমি বললাম এতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে? একেই বলে না ভাগ্যচক্র। তুমি করছো Hospitalএ নার্সের কাজ আর আমি ব্যাঙ্কে চাকরি!—

—আচ্ছা ব্যাঙ্কে চাকরি করলে কী আর কবিতা লেখা যায় না? লেজারেও তোমার প্রসাদের কাব্য অক্ষুণ্ণ ছিল।— স্থিত হাসি হেসে উত্তর মিটার বললেন।

সে হিসাবের খাতা ছিল জমিদারের— আর জমিদারের অন্তর ছিল সরল। বড় বড় ‘ফিগারের’ ক্যালকুলেশন কাব্যের কথা মনে আসতে দেয় না ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমরা দেখি যোগের স্বপ্ন!

পরিপূর্ণ হাসির তরঙ্গে আমরা তিল জ্বলিয়ে কেঁপে উঠলুম।

—রাত অনেক হয়ে গেল—হাসপাতালে আজ আবার নাইট ডিউটি।—হাতের ছোট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে পাকুল বললে ন’টা পাঁচ মিনিট এগারটায় ডিউটি, প্রেমেন দা এবার চলি তবে, তুমি কবে আমাদের বাড়ী যাচ্ছে রলো? হ্যাঁ ভালো কথা যাবার দিন কাকীমাকে আর বৌদিকে অতি অবশ্যি নিয়ে যাবে।

বৌদি! বৌদি তাহলে অর্ডার দিতে হয় বেলো।

তেমনি উচ্ছ্বসিত হাসির সুরে পাকুল বললে হরি, হরি তুমি বুঝি এখনো বিয়ে করো নি। চাকরি করছো এখনও বিয়ে

করো নি। চাকরি করছো, এখনও বিয়ে করলে না!

আমি বললুম ওইটাই কেবল এখন বাক্য আছে। বিয়ে করা এবং একাদশটি সন্তানের জনক হয়ে মানব জীবনের চরিতার্থ সাধন করা!—

আমার কথায় উত্তর মিটার এবং পাকুল হেসে উঠলো।

উত্তর মিটার আমাকে সম্বোধন করে বললেন—আপনি ভারী রসিক লোক— আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে প্রকৃতই খুসি হলুম প্রেমেন বাবু। আজ রেহাই পেলেন— এর পর কিন্তু কবিতা শোনানোর নিমন্ত্রণ রইলো। একদিন দয়া করে Hospitalএ আমার কোয়ার্টারে পায়ের ধুলো দেবেন। আমিও ব্যাচিলার লোক, যে কাজ আমাদের করতে হয় তাতে সরসতার কোশল নাম গন্ধই নেই। আপনাদের মতন লোকের শুভাগমনে মাঝে মাঝে তবু মনের খানিকটা ঐশ্বর্য্যের খোরাক পাওয়া যায়।

পাকুল গম্ভীর হয়ে বললে—উত্তর মিটারের নাম বিনয় কুমার হওয়া উচিত ছিল। অতি মাত্রায় বিনয় প্রকাশ করেছেন।

উচ্ছ্বসিত হাসি, এবং পরস্পর অভি-বাদনের পর উত্তর মিটার এবং পাকুল বিদায় গ্রহণ করলে।

গঙ্গার বুকে প্রশান্ত নারবতা। জাহাজের মাল নামানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে—ক্রেনের ঘর্ষর শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। নৌকার মাঝিদের কোলাহলও আর নেই। ভ্রমণকারীর ভীড় এখন খুবই কমে এসেছে। বারান্দার ওপরে সাহেব মেমদের কলরবও মন্দীভূত। পরিষ্কার আকাশে শুভ্র ধবল টাদের পরিপূর্ণ শোভা সজ্জার আর গঙ্গার মুহূ কল্পিত বক্ষে তার প্রতিবিম্ব। অসংখ্য তারকার দীপ্তি শোভা

মনের মাঝে রেখে যায় গভীর একটি ভাবের আবেশ।

পাকুল চলে গেলে খানিকক্ষণ গঙ্গার বিস্তৃত গভীর জল রাশির পানে তাকিয়ে রইলুম।

কিন্তু কখন না জানি অলক্ষিতে আবার পাকুলের কথা মনের পাতায় সজাগ হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য্য—অত্যন্ত আশ্চর্য্য—পাকুলের একী অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

ডাঙরের বাল্যমৃত.

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট. বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

আট বছর পূর্বের অশিক্ষিত অমার্জিত সেই গ্রাম্য কিশোরী—আজ তার কী বিচিত্র প্রকাশ!

ভ্যানিটি ব্যাগ আর রিষ্ট ওয়াচ হাতে মুখে কায়দা দোরস্ত ইংরাজী বুনি চোখে মুখে অজ্ঞাতরণে সহরে ইঙ্গ বঙ্গ ভাবভঙ্গি!

সমাজ এবং সংসার একটি কোমল গ্রাম্য কিশোরী বন্ধে যে নির্ভর বন্ধনা এবং বেদনার তীব্র কষাবাত জেনেছিল তারই কী প্রতিক্রিয়া!, সে আজ তার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সংসার অন্ধ মন আমার তাতে বিষম হয় কেন?

ডক্টর মিটার চমৎকার সদালাপী শিক্ষিত ভদ্রলোক—পারুলের বন্ধু!

পারুল আজ আর সে গ্রাম্য সমাজের রক্তচক্ষুর কোন অনুশাসনকেই মানে না। কিন্তু আট বছর আগের সে পারুল!

আমার কাছেই এসেছে সে কত লুক্কিত চিন্তে—কত চক্ষুর গোপনতার মাঝে।

কলেজের জীবনে কাব্যের ছোয়া মনের মাঝে রঙ ধরিয়েছিল—আমার তখনকার প্রিয় সঙ্গিনী এই পারুল।

কতদিন তারই কত উচ্ছ্বাসের বহা আগ্রহের আতিশয্যে আমার কবিতার খাতা পরিপ্লাবিত হয়ে গিয়েছিল ছন্দের বহায়া।

পারুল বলতো, কী সুন্দর কবিতা লেখ তুমি প্রেমনন্দা আচ্ছা, যাক্ কবি তারা পৃথিবীর সব কিছুকেই যারা সুন্দর দেখে না?

পারুলের সে কথা আজও বেশ স্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে।

যেদিন পারুলের বিয়ে হয় সেদিনের কথা। চক্ষু কোটরগত গাল চড়ানে বিশ্রী লোকটাকে দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই কেমন যেন অশ্রদ্ধা জাগে।

সেই পারুলের স্বামী জেনে ভারী রাগ হয়েছিল।

এরই অনতিকাল পরে যেদিন আবার শুনলুম পারুলের শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্ক চিরদিনের তরে ঘুচে গেছে। সেদিনের বেদনা আজও মনের মধ্যে জাগ্রত।

পারুলের স্বামী অপর একটি কল্যাণকুলকে উদ্ধার করেছে পারুলের বেহায়া এবং অসংযত ব্যবহারের জন্তে।

পারুলকে ফিরে আসতে হোল আবার তার দরিদ্র পিতৃগৃহে অশেষবিধ লাক্ষনা আর দুর্ভাগ্যের বোঝাকে মাথায় নিয়ে।

দরিদ্রের সংসারে সুন্দরী বয়স্হা কল্যাণ থাকা মহাপাপ। পারুলের দিকে বহু লুক্ক দৃষ্টিই বর্ষিত হতে লাগলো। পল্লীগ্রামে দরিদ্র মাতাপিতার বিদ্রোহের কিংবা বাধা দেবার কোন স্পর্ধাই নেই।

গ্রামে এ নিয়ে চতুর্দিকেই কুংসা এবং নিন্দার বান পারুলের পরই যত কিছু অত্যাচার। বেহায়া মেয়ে, দোষ সমস্ত তো তারই!

গ্রামের সঙ্গে বহুদিনই সম্পর্ক আমার ছিন্ন ছিল।

পারুলের কথা যেন জীবনের কোলাহলে দূরে গিয়েছিল।

বহুদিন বাদে গ্রামে আবার পদার্পণ করায় পারুলের কথা মনে পড়ে গেল।

শুনলুম, তারা সমগ্র পরিবার দেশের মায়া পরিত্যাগ করে কলকাতায় কোন এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে চলে গেছে।

গ্রামে পারুলকে নিয়ে অনেক কিছু রটেছিল তাকে কেন্দ্র করে অনেক কুংসার জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারই প্রতিকার নিরুপায় দরিদ্র সংসারটিকে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে।

সেই পারুলের সঙ্গেই আজ আবার দেখা।

বাসের সহযাত্রিনী, আউটরাম ঘাটের সঙ্গিনী, আজকের পারুল আর সেদিনের পারুলে কতখানি তফাৎ।

সেই গ্রাম্য কল্যাণ দরিদ্র সংসারের কণ্টক এবং বোঝা আজকের সংসারের প্রতিপালিকা দরিদ্র পিতামাতার পরম আশ্রয়স্থল।

ফোন ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের
তেল ব্যবহারে
বেরি বেরি হয় না

মিল-২৪৩, তাপার সারদুলার রোড - কলিকাতা।

বড়বাজার

বেশ ভূষায় কথায় বার্তায় ভাবে-
ভজিতে আজকের পাকুল চমক আগায়।

সেই সরল কুষ্ঠিত লজ্জাকর কৌমল
গ্রাম্য কিশোরীর মুখ খানিতে টয়লেটের
উগ্রতা, কথায়-বার্তায় সহরে সভ্যতা।

বাসের একাকিনী পাকুলের নিঃসঙ্গতার
অভাব পূরণেই ডক্টর মিটারের হয়ত বা
আবির্ভাব আউটরাম ঘাটে।

কিন্তু ডক্টর মিটারের সঙ্গে তার এই
অসঙ্কোচ মেলামেশা সেদিনের পাকুলের
কোন পরিচিতিই দান করে না। সে
পাকুলের সঙ্গে আজকের পাকুলের কোন
মিলই যেন নেই।

তার এ পরিবর্তনে মনে আজ বিষ্ময়
জাগে।

ডক্টর মিটারের সাথে একটি বিবাহিতা
স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর অসঙ্কোচ বাধাহীন
মেলামেশা সংস্কার ক্রিষ্টমানে দিখা জাগায়।

মনটি কেমন যেন হয়ে ওঠে, পাকুলকে
যেন আজ এ ভাবে দেখতে মোটেই
প্রস্তুত হিলাম না।

কিন্তু তার নতুন অসহায়তা মেয়ের জীবন
সমস্যার প্রতিকারই বা কী?

সে প্রশ্ন মনের মধ্যেই মিলিয়ে গেল
অকস্মাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির স্পর্শে।
চমকিত হয়ে উঠে পড়লাম।

আকাশের চাঁদ গাঢ় মেঘের অন্তরালে
ঢাকা পড়ে গেছে। গঙ্গার বুকে নিস্তরঙ্গ
বিশ্রুতি।

সঙ্গে ছাতা নেই। কাল আবার
অফিসের গুরুতর পরিশ্রম।

দ্রুততর গতিতে পা বাড়িয়ে দিলুম
হাইকোর্টের ট্রামের দিকে।

পাকুলের ছায়া মন থেকে কিন্তু এখনও
অপমৃত হয় নি।



হ্যাঁ-ব্যালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

সকল
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ও বোম্বাই

প্রতিভার অপমৃত্যু

ত্রিনির্মল কুমার স্ত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পর্যায়

ধরে নেওয়া যাক তার নাম চপল কুমার। ডিভিয়েছে কলেজের তিনটে ধাপ, তবুও ঘোচেনি কল্লনার কুয়াশা। দারিদ্র্য আর বাস্তবতা তাগিদ দেয়, কল্লনার জাল ছিন্ন করতে। কিন্তু মন মানে না। কলম চলে। কাগজে কাগজে বেদর তার নিদর্শন। পাঠকরা কিনে পড়ে, লেখকরা মজুরী পায় না। সম্পাদক বা কাগজের লেখকরা লেখক মেয়ে খায়, তাই লেগকের জমার ঘর শূণ্য।

দিন যায়। জমে চলে ভাবের ফেনিল জল। তলা দেখা যায় না। খালি বুধুদ আর আবর্ত। ওর তলায় মাটা না চোরা-বালি ভালো করে বোঝা যায় না। বুঝবার চেষ্টাও যে আছে তাও বলা চলে না ঠিক। তবু আশা জাগে পুরোকাশে হয়তো বা জাগবে আলোর রেখা। পূর্বের অন্ধকার ঘরের কোণটা হয়তো একদিন উঠবে হেসে। জীবনের পথ ও পাথরকে হয়তো একদিন চেনা যাবে। রাতের সাধনা হয়তো দিনের কামনাকে দিতে পারবে না কাকি।

চপলের খুম ভাঙলো একটু দেরীতে। রাতের স্বপ্ন বুঝি চোখ ছাড়তে চায় না। বিদেশ ঘুরে ও চলেছে কোন সূত্রে।

কর্মবাস্তু মহানগরী। দৈহিক স্বাস্থ্যের নিয়ম মানতে গেলে মানসিক স্বাস্থ্যকে দিতে হয় বলি—এই হচ্ছে ওর ধারণা।

স্বপ্ন যদি সত্যি হতো!—ও ভাবে। ওর মন ততক্ষণে গিয়ে পৌছেছে জার্মেনীতে। সেখান থেকে একবার ইটালীটা ঘুরে যাবে কিনা তাই ভাবছে।

“বাবু”—বাচ্চা চাকরটা সত্যিই হয়ে উঠেছে কাণ্ডজ্ঞানহীন। ওকে দিয়ে আর চললো না। এত সকালে……নাঃ উঠতে হলো। চা আর খটখটে টোষ্ট। চপল পাশ ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দেয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চায়ের কাপে যে দেয়নি চুমুক, বাহাতের কলুইটার ওপর ঈষৎ ভরদিয়ে যে ধরিয়ে নেয়নি ভিজ়ে ঠোঁট দুটোর মাঝে যেতাজী সিগারেট, সে জাবনের আরাম উপভোগ করেনি বললেই চলে। সবটাই তার রয়ে গেছে বাকী। রবিঠাকুর ধরণে ও কথা কয়টা মনের ভেতর দিয়ে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে এল। নাঃ ‘চা’টা গেছে ঠাণ্ডা হয়ে। অন্ততঃ বিছানার শুয়ে এই উদ্ভাপের কিছুই সহ্য করা যায় না। বাচ্চাটাকে সে আবার ডাকে। সে কাছে এলে মোটা একটা কিল তার দিকে উচিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে—ভয় নেই মারবো না। কিন্তু মারতে ভয়ানক ইচ্ছে করছে আমার, শীঘ্রি ছুটে পালা, গিয়ে এক কাপ গরম চা নিয়ে আয়। না থাকে তো মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে……। বুঝলি? কি বুঝলি? পয়সা নিয়ে বুঝি আমি তোমাকে ট্যাকে শুজতে বলেছি? বক্শিস? কিসের বল দেখি? ঠাণ্ডা চা যেহেতু এনে

দিয়ে আমার সকালের আরামটা দিলে খেয়ে? হতভাগা দাঁড়িয়ে আছি এখনও? আর দেরী করলে যে……নাঃ তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। পাজী দেরী করলে যে ছুকাপের অর্ডার দিয়ে দেব তা জানিস না? আর হ্যা—কিছু বুদ্ধি নেই তোমার হতভাগ্য মূখ্য কোথাকার। বলছিলুম কি, সিগারেটও তো নিয়ে আসবি? না কি শুধু চায়ের পয়সাই চেয়ে নিবি মার কাছ থেকে? তা বলে বুঝি তোকে আমি বলছি সিগারেটের নাম করে চাইতে? বলবি ওই একটা জিনিষ আনতে হবে, বুঝলি? আর এক কাজ করিস? সিগারেট আর চুপট মিশিয়ে নিয়ে আসবি কেমন? চুপলো কানে? তাবলে যেন পয়সায় ছুটো-ওয়ালা গোঙ্গফ্রেক্ নিয়ে বস না।

চাকরকে চা আনতে দিয়ে চপল চাদরটা পায়ের ওপর টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। ওর মনে তখন এক প্রশস্ত প্রশান্তি। মনটা যেন ভয়ানক আলুগা গোছের।

বাইরে কাদের ডাক শুনে ও ধড়মড় করে উঠে বসলো। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলে অভাবনীয় ব্যাপার। মোটরে এসেছেন কয়েক ভদ্রলোক। চিনতে না পেরে ও অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ওদের পানে।

নমস্কার! এইটাই চপলবাবুর বাড়ী?

—নমস্কার! আজ্ঞে হ্যাঁ, এইটেই বটে। কাকে চান আপনারা?

—চপলবাবুর সাথে দেখা করবার উদ্দেশ্যে ছিলাম। আছেন কি তিনি বাড়ী?

চপল ভেবে পেলো না তার সাথে এই সব বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে! ও গেল খানিকটা নার্ভাস হয়ে, বললে—হ্যাঁ আছেন তিনি বাড়ী। আসুন বসবেন ভেতরে।

ভদ্রলোকগুলি নেমে এলেন গাড়ী থেকে। ওকে অনুসরণ করে এসে হাজির হলেন ওরই ঘরে। ওদের ঘরে বলিয়ে ও কি করবে না ভেবে পেয়ে খানিকটা বাইরে থেকে পাইচারী করে এল। ফের ঘরের ভেতর এসে মশারীটা না তুলেই বসে পড়লো খাটের ওপর।

এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—কই চপল বাবুকে খবর দিয়েছেন?

—এই যে—বলে ও খানিকটা নড়ে চড়ে বসলো।

—বাঃ আপনি তো বেশ লোক মশাই। আপনাকে বললাম চপলবাবুকে একটু ডেকে দিতে, আর আপনি কিনা বেশ গুছিয়ে বসলেন আবার! চপলবাবু কে হন, আপনার?

—আজ্ঞে……এই হন……মানে কেউ না।

—কেউ না? তবে আপনি তাঁর বাড়ীতে এমনিই থাকেন বুঝি?

অপর একজন বললেন—তা নাও হতে পারে মৃণাল বাবু। উনি কোন বন্ধুও তো হতে পারেন। হয়তো এসেছেন ছুদিন বেড়াতে। তাই বাড়ীর কাউকে চেনেন না। কেমন আমি ঠিক বলেছি কিনা বলুন? আপনি চপলবাবুর কোন বন্ধুতো?

চপল ক্রমশঃ নার্ভাস হয়ে পড়তে লাগলো। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বললো—আজ্ঞে বোধ হয় তাই।

মৃণালবাবু ওর দিকে ঝাঁক দৃষ্টিতে একবার চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বোধ হয় তাই মানে? আপনি বুঝি তাঁর দেশের লোক?

—আজ্ঞে তা……বলে ও উঠে দাঁড়ালো।

এমন সময় ওর দাদা ঢুকলেন ঘরে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট মানুষ। চাকরী করেন এক সওদাগরী অফিসে। ওর দাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভদ্রলোকরা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—এই যে নমস্কার। আপনার জন্তেই অপেক্ষা করছি আমরা। একে তাই ডেকে দিতে বলছিলাম আপনাকে।

ওর দাদা প্রতি নমস্কার করে চিনলেন না কাউকেই।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে ডাকছিলেন? কি প্রয়োজন আপনাদের বলুন। আত্মনাদের কাউকে চিনি বলেতো মনে হচ্ছে না।

—কি করে আর চিনবেন বলুন। আপনাকে কিন্তু আমরা খুবই চিনি। শুধু আমরা কেন, দেশের অনেক লোকই

চেনে, কিন্তু পরিচয় করবার সৌভাগ্য ক'জনের হয় বলুন? আপনি তো বিশেষ কোথাও বেরুন না। তাই আমরা নিজের গরজেই এসেছি। পর্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদকেই যেতে হয় পর্বতের কাছে, বুঝলেন না—বলে মৃণালবাবু একটু হেসে উঠলেন।

চপল ওধারে উঠে পড়েছে। পাশ কাটিয়ে ও ততক্ষণ এগিয়েছে দরজার দিকে।

মৃণালবাবু ওর দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা উনি আপনার কে হন বলুন তো? দেশের কোন পরিচিত লোক, না? ওর দাদা বললেন—তা হতে যাবেন কেন? ওতো আমার ছোট ভাই।

মৃণালবাবু একটু বিশ্বয়ের চিহ্ন প্রকাশ করে বললেন—ভাই? তবে যে উনি বললেন—দেশের লোক! ওর মাথা একটু জ্যাক আছে না?

ওর দাদা হেসে বললেন—ও হতভাগা অমনি পাগল। কি যে বলে বা করে কিছুই খেয়াল থাকে না।

(ক্রমশঃ)



ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড ক্রীট, কলিকাতা।

পূজার শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ!
= পিরামিড চা =
সর্বোত্তম দাঙ্জিলাং চা'র অভিনব সংমিশ্রণ
১ পাইণ্ড প্যাচেকট মাত্র ১১/০ আনা
১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত বিক্রয় হইবে।

স্বপ্নখান্না

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বাধীন পরিচ্ছেদ ।

সেদিন কি একটা পূর্ব উপলক্ষ্যে আদালতের ছুটি ছিল। নীরদবাবু অলস-ভাবেই গৃহের মধ্যে মধ্যাহ্ন কাটাইতে ছিলেন।

নীরদবাবুর শোবার ঘরের সমস্ত জানালাগুলিই বন্ধ, গৃহের মেঝেয় একটি শীতল পাটি বিছাইয়া তিনি দিবানিদ্রার ভোগ করিয়া শুইয়া আছেন। খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া কিছুতেই তিনি শান্তি পাইতেছিলেন না। অবশেষে রামদীনকে দিয়া লবঙ্গকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

লবঙ্গ আসিলে বলিলেন : রবিবাবুর সেই কবিতার বইখানা আনোনা লবঙ্গ! তুমি একটু সুর ক'রে পড়ো, আমি শুনি।"

—সে বইতো আমার নয়!

—কার বই?

—নিরাপদ ঠাকুরপোর! আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

—তবে যা হয় একখানা বই নিয়ে এসে পড়ো। তোমার মুখে পদ্ম বড় সুন্দর শোনায়!

লবঙ্গর জবাব হল একটু নড়িয়া উঠিল। সে বলিল : আমার কাছে এখন আর কোনও কবিতার বই নেই।

নীরদবাবু কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন : মিথ্যাবাদী! এই কাল দেখলুম, কি একখানা বই সুর ক'রে পড়চো!

—সে রামায়ণ! সে আপনার ভাল লাগবে না।

—খুব ভাল লাগবে! তুমি নিয়ে এসো দেখি!

লবঙ্গ বই আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল : বলুন, কোন্ খানটা পড়বো?

—পড়োনা, যেখানটায় তোমার বেশ লাগে।

লবঙ্গ যেখানে বসিয়া পাঠ করিতেছিল, নীরদবাবু আস্তে আস্তে গোড়ালির উপর ভর দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লবঙ্গ যখন পাঠে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। যখন তাহার সীতা বনবাসে গিয়া রামের জন্ত হা-হতাশ করিতেছেন ও উচ্চৈঃস্বরে বোদন করিয়া বাস্তবিকর আশ্রমস্থল প্রকম্পিত করিতেছেন, —তখন নীরদবাবু সহসা লবঙ্গর কোলের উপর তাহার মাথাটা ঝুলাইয়া দিয়া সটান হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

—একটা বালিশ এনে দেবো, তাতে মাথা রেখে শোবেন?

বালিশ ত পেয়েছি! তবে বালিশের অধিকারী জ্ঞাত স্মারক উয়ে না সরিয়ে নেয়!

—জ্ঞাত কি আর আছে? সেতো আগেই খোয়া গেছে!

—গেছে না কি? তবে আর কি? সে উৎপাতটা যখন একেবারেই গেছে, তখন আরামটাকে আর ছাড়ি কেন? আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুই, তুমি আতিথ্যস্বরূপ আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। পাকা চুলগুলির উপরেও তোমার হিংস্র নখগুলিকে লাগিয়ে দিতে পারো।

—রামায়ণ পড়া শুনবেন না?

—না লবঙ্গ! আমার এখনও সে বয়স আসে নাই! ওটা ভবিষ্যতের জন্ত তুলে রেখে দাও!

লবঙ্গ রাগ করিয়া রামায়ণ বন্ধ করিল; এবং নেহাত অনিচ্ছাস্বখে নীরদবাবুর মাথার উপর তাহার চম্পকাজুলি চালাইতে চালাইতে বলিল আপনার মাথায় আর পাকাচুল নেই!

—যে গুলো ছিল, তোমার আঙ্গুলের কলপে সেগুলিও বোধ হয় কাঁচা হয়ে গেলো!

—আচ্ছা, আমাদের ছুজনকে এমন ভাবে দেখলে লোকে কি বলবে বলুন দেখি!

—লোকে বলবে এই মেয়েমানুষটি অত্যন্ত সেবাপরায়ণ! একজন অনাথ পুরুষকে আপনার মনপ্রাণ দিয়া সেবা করার পুণ্য অর্জন কচ্ছে! এমন নিঃস্বার্থ মেয়েম হুয়ের স্থান সমাজের খুবই উচ্ছে!

লবঙ্গ একথা শুনিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে নিঃশ্বাসটি যেন বলিতে বলিতে বাহির হইল, সমাজের যে স্থানে তুমি ইহাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, সে স্থানটিকে তুমি হাজারবার উচ্চ বলিলেও, সেটি নরকেরও নিম্নতর প্রদেশে, তাহার চেয়ে নীচে সমাজের আর বোধ হয় কোনও স্থান নেই! লবঙ্গর দীর্ঘনিঃশ্বাস এই আন্তরিক প্রতীতিরই প্রতীক মাত্র! তবু লবঙ্গ কোনও প্রতিবাদ করিল না! যন্ত্রচালিতের মত নীরদবাবুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দে লবঙ্গ চমকিয়া উঠিল। আনত চক্ষু উপর দিকে তুলিয়া দেখে, ঘরের দ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত —এবং বাহ্যিক নৃত্তি সেই দরজার আত্মপ্রকাশ করিল, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং—

ঘরের মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাত হইলেও লবঙ্গ অধিক চমকিত হইত না, লজ্জা ও সজ্জমের একটা বিষম ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি নীরদ বাবুর মাথাটা ঠক করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া, গাত্রের বসন সংযত করিতে করিতে, একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল। সর্বাঙ্গে এমন একটা অপ্রস্তুতের ভাব ফুটিয়া উঠিল সে দাঁড়াইয়া উঠিয়াও আর একপদ অগ্রসর হইতে পারিল না। দ্বারে দাঁড়াইয়া একেবারে খোদ জগন্নারায়ণ! মূর্ত্তিটা যদি তিনি না হইয়া একটা উন্মুক্ত বাঘও হইত, তাহা হইলেও লবঙ্গ অধিক আশঙ্কিত হইত না। এতদিনের পর দেখা! তবু যে লবঙ্গ গিয়া টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিবে, সেটুকুও সে ভুলিয়া গেল। যে নারী তাহার জননীর চেয়ে অধিক স্নেহপরায়াণা ছিলেন, ঠাহাকে সে দেবতার চেয়ে অধিক ভক্তি করিত, এতদিনের পর ঠাহাকে দেখিয়াও সে আনন্দে ছুটিয়া গেল না। কুশল সন্বাদ অবধি জিজ্ঞাসা করিল না।

জগন্নারায়ণী কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইলেন না, কোনও কথা কহিলেন না। ধীরে ধীরে পশ্চাৎ ফিরিয়া তিনি আবার অপস্থত হইলেন।

লবঙ্গ কি করিবে, কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; অবশ্য মত সেই খানে বসিয়া পড়িল। নীরদবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন:—উঃ! এমন লেগেছে! আচ্ছা লবঙ্গ তুমি মাঝে মাঝে এমন নিষ্ঠুর হও কেন বল দেখি?

—চুপ! মা এসেছিলেন!

—মা? কোন্ মা?

—যে মা কাশীতে ছিলেন, তিনি হঠাৎ—

লবঙ্গ আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না। তাহার গলা শুকাইয়া কাঠের মত হইয়া গিয়াছিল।

রামদীন হঠাৎ দ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল: “বাবু? মায়া আসিয়া।”

নীরদবাবুর আর কোনও সন্দেহ রহিল না যে, তাহার স্বশ্রুতাকুরাণী কাশী হইতে ফিরিয়াছেন। লবঙ্গ মুখ যে ছাইএর মত, সাদা হইয়া গিয়াছে, এতক্ষণে তিনি তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। রামদীনকে বলিলেন: যাও! মায়েকে বলো, হামারা খোড়া দেবু হোগা।

আমাদের বিজয়ার প্রীতি নমস্কার সাদরে গ্রহণ করুন



রূপবাণী বিল্ডিংস

৭৬৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

লবঙ্গ কিছুতেই মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারিল না। দ্বারের কাছে ঠাহাকে দেখা অবধি সে তাহার নিকট হইতে একেবারে বিশক্ৰোশ তফাতে গিয়া পড়িয়াছে।

সে নীরদবাবুর ঘর হইতে, বারান্দার দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া খিল দিল। ছপ্পর কাটিল, বিকালও কাটিল, সন্ধ্যার সময়ে এক বি আসিয়া লবঙ্গকে দ্বার খুলিতে অহুরোধ করিল। অহুরোধ রাখিবেনা রাখিবেনা করিয়া শেষে কড়ানাড়ার উৎপাতে দ্বার খুলিল। বি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল: “মা আপনাকে ডাকেন।”

এ কথার মধ্যে যে কান্নার কথা কি আছে তাহা সেই জানে, কিন্তু লবঙ্গ হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। অঞ্চল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে ঘরের বাহির হইয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল।

যখন দেখা হইল, তখন টিব করিয়া একটা প্রণাম করিয়া সে মায়ের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা চ'কের জলও মায়ের পায়ে ঢালিয়া দিল।

জগন্নারায়ণীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, প্রায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি কস্তার শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চোখের জলের সঙ্গে খানিকটা লড়াই করিয়া তিনি বলিলেন:

“আমাকে সময় থাকতে খবর দিতে পারিস্ নি?” লবঙ্গ বলিল: “দিদি যে এমন কাণ্ড ক'রে চলে যাবে, তা, কি আমরা বুঝতে পারি? আগেরদিন সন্ধ্যাবেলায়ও আমরা জানি দিদি ভাল হয়ে উঠবে।”

—ডাক্তার কিছু বুঝতে পারলে না?

—যখন বুঝতে পারল, তখন আর বেশী সময় নেই! একরকম গ্যাসের ব্যবস্থা করে, সেই গ্যাসটাই আরও যেন প্রাণবায়ুটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল!

—গ্যাসের দোষ নয় লবঙ্গ, দোষ আমার কপালের। অদৃষ্ট যখন মন হয়, তখন ওমুখও বিষ হয়ে দাঁড়ায়!

তাহার পর দুইজনে পালা করিয়া পরলোকগত ললিতার বহুবিধ সঙ্গুণের কথা স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে চয়ন করিয়া পরস্পর পরস্পরের কাছে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, বি চাকরও মাঝে মাঝে তাহাতে তাহাদের অংশ দান করিতে লাগিল। কিন্তু জগন্নারায়ণী শোকে আত্মহারা হইবার মাত্রা নন, তাহার মেরুদণ্ড সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের চেয়ে অনেক কঠিন। পূজা-

আহ্নিক, বার-ব্রত, একাদশী-অমাবস্তার উপবাস, একাহ ইত্যাদি করিয়াই তিনি অতিরিক্ত রকমের মজবুত হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রমের ধোঁয়ায় বা সংসারের ধূলিকাদায় তাঁহাকে শীঘ্র অন্ধ করিতে পারে না। কাজেই কথা শেষ করিবার আগে তিনি হঠাৎ লবঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন!

—তা সে যা হবার হয়ে গেল, আমার কপাল পুড়ে গেল! এখন তুমি কি করবে, তাই বলো!

—আপনি যা বলবেন, তাই করো!

—হাঁ, তা তো কর্তেই হবে! না হলে, কি আর তোমাকে ছেড়ে কথা কইবো! এখানে এসে যা দেখলুম, তাতে ত বড়—

লবঙ্গর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

—তুমি একটা সংসার জালিয়ে পুড়িয়ে এসেছো, এখন আবার আর একটা সংসারে আশ্রয় ধরাবার মত করে তুলেচো। তোমার ভাবগতিক বড় ভাল দেখছি নে, আমাকে নজর রাখতে হবে!

মার নিকট হইতে এই ভৎসনার তীব্রতায়, লবঙ্গ একেবারে কাঁদিয়া ফেলিবার মত হইয়া উঠিল। জগন্তারিণী তখন বি-চাকরদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন: তোরা এখানে কি করছিস! যে যার সব নিজের কাজে যা না! বাড়ীর গিন্নি নেই তো, বি-চাকরগুলো যেন রাস্তার বাড়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে!

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিশুদ্ধ পানীয়

তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিতে পারে, এমন শক্তি কোনও বি-চাকরেরই ছিল না! কাজেই সকলেই আন্তে আন্তে অত্মদিকে সরিয়া গেল। জগন্তারিণী লবঙ্গকে একা পাইয়া বলিলেন:

মনের এটুকু জোর নেই যে নিজের দেহটাকে গুচি ক'রে রাখতে পারো? মানুষ কি কুকুর বেড়ালের মত, যে আর একজন তু করলেই অমনি তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে? তবে ভগবান মানুষকে পশুর ওপর করে সৃষ্টি করেছেন কেন? সে যদি নিজের ইঞ্জিয়গুলোকে দমন কর্তে না পারে, তবে সে বুদ্ধির বড়াই করে কেন? সমাজের মধ্যে বাস করে কেন, জঙ্গলে গিয়ে বাস করুক না? তুমি ভদ্র ধরের মেয়ে, ভদ্রভাবে চলবে—অসভ্যতা করো না! আজ আমি তোমার ব্যাপার দেখে, মনে বড় কষ্ট পেয়েছি। ললিতার জন্তে আমার মত না কষ্ট হয়েছে, তোমার আচরণ দেখে তার দ্বিগুণ মাতন্য বুকের মধ্যে বিধেছে। তোমার স্বামী তোমাকে ত্যাগ করেছেন কিন্তু তা ব'লে ভেবো না, তোমার ধর্মও তোমাকে ত্যাগ করেছেন! তুমি পতি-সেবার পুণ্য হয়তো না অর্জন করতে পারো, কিন্তু সত্যের নারী ধর্মকে অপব্যয় ক'রে নিজে দেউলে হয়ে বসে থাকবে কেন? তোমার শিবের মন্দির শূন্য বলে কি সেখানে একটা বাদর এনে বসিয়ে দেবে?

কথাগুলো যেন জলন্ত অঙ্গারের মত লবঙ্গর কানে আসিতে লাগিল। সেগুলির উচ্চতায় শুধু যে তার কান জলিয়া যাইতেছিল এমন নহে, তাহার হৃদয়ও অনেকটাই দগ্ধ হইতেছিল। তথাপি নিরন্তর হইয়া সে সব গুনিল এবং লজ্জায়, ক্ষোভে ও অমুশোচনায় যেন মাটিতে মিশাইয়া যাইতে লাগিল।

অনেক কথাই জগন্তারিণী বলিয়া গেলেন, তাহার মধ্যে উপদেশের কথাই অনেক। শেষকালে বলিলেন:

এখানে তোমার থাকা হবে না লবঙ্গ! আমি শীঘ্রই তোমার একটা বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি!

লবঙ্গ অনেকক্ষণ পরে এই প্রথম কথা কহিল; বলিল: বন্দোবস্ত আর কি করো মা? আমি যেমন কাশীতে তোমার কাছে ছিলাম, তেমনই থাকবো।

জগন্তারিণী যেন তাহাতে অসম্মত। তিনি নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন: তা আর হয় না। আমি যখন নিজে স্বচক্ষে দেখেছি, তখন আর তোমাকে আমার রান্নার ভার দিতে পারি নে! আমি কায়েতের ঘরের বিধবা মানুষ, আমার রান্না-বারা খুব খাটি লোক দিয়েই করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্তোয়ার মধ্যস্থী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

খেয়ালী চিত্রপট



নিউ থিয়েটার্সের "বড়দিদি" চিত্রে শান্তি
ও সুরেন্দ্রের ভূমিকায়—চন্দ্রা ও পাহাড়ী—
পরিচালনা—শ্রীঅমর মল্লিক।

পরিচালক : ন্যাশনাল মিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬] .



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৩রা কা্তিক ১৩৪৫, ২০শে অক্টোবর ১৯৩৮ } উনচত্বারিংশ সংখ্যা

মাতৃপূজার পবিত্র অঙ্গনে.....

‘মাতৃপূজার পবিত্র অঙ্গনে চরিত্রহীনের স্থান নাই’ :—কারান্তরাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাংলায় এক বিশিষ্ট নেতা যে আদর্শ-পুত্র বাণী বক্তৃকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন বাস্তবতার মুকুরে অবলোকন করিয়া বিবাদ-ক্ষিপ্ত চিত্তে তাঁহার সেই স্মরণীয় উক্তিকে কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় : মাতৃপূজার পবিত্র অঙ্গনে চরিত্রহীনের স্থান নাই!!!

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী-সঙ্ঘটের বাক্য-বিতণ্ডার মধ্যে যে সমস্ত চাকল্যকর বিষয়ের আভাষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্বীকার করিতেই হয় যে উক্ত প্রদেশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই আদর্শচ্যুত হইয়াছেন। মধ্য-প্রদেশের সাময়িক পত্রাদিতে যে সমস্ত বিষয় বেশ স্পষ্টভাবে আলোচিত হইতেছে তাহা বাংলায় অত্যাধিক অপ্রকাশ্যই রহিয়া গিয়াছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনে অবশ্য সেই সমস্ত অনাচার ও দুর্নীতির

অর্ক-ফুট প্রতিধ্বনি ভিক্টোরী ভঙ্গিমায় কঠোর হৃদয়ে নিষ্পেষিত হইয়াছে! ইহা সাময়িক প্রতিবেদক হইলেও রোগের বীজাণু বিনাশের প্রকৃষ্ট পন্থা নয়। যে সমস্ত অনাচার ও দুর্নীতির আভাষ পাওয়া গিয়াছে হয়ত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে তাহার আলোচনা সমীচিন নহে কিন্তু কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের (High Command) এ বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

মধ্যপ্রদেশে ইহা স্পষ্টই আলোচিত হইতেছে যে, কোন এক মন্ত্রীর দপ্তর হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সম্বলিত এক ফাইল উধাও হইয়া যায়। অবশেষে সি. আই. ডির দ্বারা অনুসন্ধানের ফলে উক্ত ফাইল নাকি এক বান-বণিতার বিলাস-কক্ষ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে!!! এই অনুসন্ধান ও উদ্ধার-পর্ব বেরূপ চাকল্যকর ভঙ্গপ শোচনীয়। অবশ্য সর্দার বল্লভভাই

প্যাটেলের আশুকুল্যে এই সব গ্লানিকর বিষয়
ঝামাচাপাই পড়িয়াছে। মধ্যপ্রদেশের মাতৃপূজার
পবিত্র অঙ্গনে চরিত্রহীনেরই স্থান অটুট রহিল—
সর্দারজী প্রভৃতির পক্ষপুটের স্নেহচ্ছায়ায় !!

মধ্যপ্রদেশের এই গ্লানিকর বিষয় শুধু
একমাত্র ঘটনা নহে—কংগ্রেসের প্রধান নিবির
এলাহাবাদে এক রূপসী বাঙ্গালী তরীকে কেন্দ্র করিয়া
যে মধু-গুঞ্জন চলিতেছে তাহাতে যে মধু-চক্র রচিত
হইয়াছে, তাহাতে এমন কি, কোন কোন
স্বনাম-প্রসিক-সোত্তালিষ্ট নেতাও আবদ্ধ হইয়া
পড়িয়াছেন।

বোম্বাইয়ের বিশাল হর্য্য-বাসী বাক্য-বিলাসী
সমাজতন্ত্রী নেতাদের ও জনপ্রিয় দক্ষিণপন্থী
নেতাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আচরণ শুধু

সন্দেহজনক নহে—রুচি-বিগর্হিতও বটে। নৈতিক
আদর্শের এই স্বলন হয়ত স্বাভাবিক। মানব
দেহমনের যে দুর্বলতা সাধারণ মানবে মার্কজীয়
বা উপেক্ষণীয়—বাঁহারা সমাজে ও রাষ্ট্রে শীর্ষস্থানে
উপবিষ্ট বা নেতৃত্বপ্রয়াদী তাঁহাদের পক্ষে তাহা
অমার্জ্জমীয়। বাংলার নেতার তেজোদীপ্ত উক্তির
পরিহাস করিয়া সমগ্র ভাঃভের বিভিন্ন প্রদেশে
নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট কর্ম্মীরূপের আচরণে ক্ষোভ-
মিশ্রিত প্রতিধ্বনি প্রবাহিত হইতেছে: মাতৃপূজার
পবিত্র-অঙ্গনে চরিত্রবানের স্থান নাই!! হয়ত
বর্তমান যুগের ইহাই অপ্রতিরুদ্ধগতি! বাংলার
কর্ম্মক্ষেত্রেও কি বাংলার নেতা তাঁহার আদর্শকে
প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন—তাহাও নহে।
আদর্শ আজ রুঢ় বাস্তবতার সজ্জাতে বিনষ্টপ্রায়!!

সর্ব্বহার্য্য বাংলার বাঁচবার সর্ব্বোত্তম প্রচেষ্টা

সর্ব্বহার্য্য বাংলাকে বাঁচতে হ'লে আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বাঙ্গালীর উপর বাঙ্গালীর
সহায়ত্ব, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানের উপর একমাত্র দরদ।

বাঙ্গালী আজ পরাস্ত হল জীবন যুদ্ধে আর ব্যবসা হারিয়ে। অভাবে অনশনে ক্ষত বিক্ষত
হ'ল “বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মী” মন্ত্র ভুলে যেয়ে।

বাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের ভাণ্ডারী আজ বাঙ্গালী নয়—তাই তার এত লাঞ্ছনা। “ইষ্ট বেঙ্গল
সোসাইটি” বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীর ঘরে, বাঙ্গালীর পছন্দমত বস্ত্র যোগাণার
ভার নিয়েছেন এঁরা। বাঙ্গালীর রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সব রকম বস্ত্রের বিপুল আমদানী
করেছেন এঁরা। সবার ‘সন্তুষ্টি’ বিধানই লক্ষ এঁদের।

বিনীত—

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি

(প্রসিক স্বদেশী বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা)

বস্ত্র বিভাগ—১নং ও ২নং মির্জাপুর স্ট্রীট, বেন। ফোন ৮৮৮, ৩৫৩

জাক—৮৭১২ কলেজ স্ট্রীট, ব্র ও পোষাক; জগদ্বাজার, ভবানীপুর [বস্ত্র ও পোষাক] ফোন—১প, কে, ৩৯৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতিযোগিতায় অধিতীয়—ষ্টক অক্লান্ত—দর সবার চেয়ে সস্তা। লোকে বাহা প্রচার করে তাহা
তাহারা করে না—আমরা বাহা বলি তাই করি—এটাই আমাদের বিশেষত্ব।

বাংলা ছবির উন্নতির অন্তরায়

(হুমুদেহ সেন)

বাংলা ফিল্ম শিল্প আজ শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। প্রথম কয়েক বৎসর আমাদের সব চাইতে বড় কর্তব্য ছিল এই নবজাত শিশু শিল্পটিকে বাঁচাইয়া রাখা। সেই জন্ত কোন প্রকার সমালোচনাই আদরে গৃহীত হইত না। প্রয়োগ শিল্পীরা মনে করিতেন তাঁহাদের এই নতুন উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করাই সমালোচকের কাজ।

কিন্তু এই কয়েক বৎসরে বাংলা ফিল্ম শিল্পে এক নুতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ নিউ থিয়েটার্সের বিপুল উত্তমে ব্যবসাটি এমন একটা স্থানে উপনীত হইয়াছে এখন সর্বসাধারণের কর্তব্য হইল তাহাকে যথাযথ সমালোচনা করিয়া ক্রটি হইতে মুক্ত করা।

কয়েকটা বিষয়ে বাংলা ছায়া-ছবি অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তার টেকনিক্যাল উন্নতি প্রত্যেকেই মানিয়া লইবেন। শ্রীযুক্ত নীতীন বসু, বিমল রায় চিত্রগ্রহণ কার্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শব্দধরূপে মধুশীল ও মুকুল বাবুর কার্য আজ বিদেশী শব্দশিল্পীদের সঙ্গে সমতুল্য। এই সমস্ত অবিসংবাদিত সত্যগুলি মানিয়া লইলেও, বাংলা ছায়াছবি যে এখনও সর্বোচ্চ মান স্তরের হইতে পারে নাই, তাহা প্রমানের অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের ছায়াছবি লইয়া যাহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে ছবির প্রথম হইতে শেষ কাণ্ড

পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্বই একা নিজের স্বন্ধে বহন করিতে সক্ষম; তাঁহাদের এই ধারণাকে শুদ্ধমাত্র ক্রটি বলিলেও ক্রটি করা হয়। ইহার ফলে কয়েকটা বাংলা ছবি একেবারে Unbalanced এবং abortive হইয়াছে। একজনই পরিচালক, নায়ক ও চিত্রনাট্যকারের কার্য করিতে চান। ইহাতে কোন কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই শ্রেণীর বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন গুণী বোধ করি বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ বাক্য “যে রাঁধে সে শকি চুল বাঁধে না” স্মরণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন! বিদেশী ফিল্ম শিল্পে এবস্থিৎ ব্যাপার খুবই কম। একই ফিল্মে কেহ কখনও তত দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। কদাচিৎ কোনও অভিনেতা, ডাইরেক্টরের কাজ করেন এবং যথাযোগ্যভাবে তা সম্পন্ন করেন। লায়োনেল ব্যারীমুরকে আমরা দুঃকরম ভাবেই দেখিয়াছি। কেবল মাত্র চালি চ্যাপলিন শুধু ইহার মধ্যে পড়েন না। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য যে, চালি চ্যাপলিন একজনই আছেন—

বাংলা ছায়াছবি যাহারা পরিচালনা করুন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ষ্টেজ ও ফিল্ম টেকনিকের মধ্যে যে বিশিষ্ট একটি পার্থক্য আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। নিউ থিয়েটার্সের পরিচালক-বৃন্দ এই ক্রটি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু নিউ থিয়েটার্স বাদ দিয়া অন্ত যে সমস্ত ফিল্ম কোম্পানী আছে, তাহার কয়েকটি

পরিচালকের মধ্যে এই ক্রটি বিশেষ ভাবে দেখা যায়। নাটকের সঙ্গে উপস্থাসের যেরূপ প্রভেদ, মঞ্চ ও ছায়াছবির ভিতর সেইরূপ প্রভেদ আছে। চিত্রনাট্য উপস্থাসের মত ধীরে ধীরে পরিনতির দিকে যায়। মঞ্চের রূপ চিত্রনাট্যে চলে না।

বাংলা ছায়াছবিতে আর একটি অভাব—আমরা দর্শকেরা প্রায়ই অনুভব করি। ভাল অভিনেত্রী সংখ্যায় ভাল অভিনেতার চাইতে বেশী। আকৃতি, বাচনিক শক্তি এবং অভিনয় করিবার ক্ষমতা একসঙ্গে একজনার মধ্যে পাওয়া যায় না। যদি চেহারা ভাল হয়, তবে তাঁরা অভিনয় করিতে পারেন না; যদি অভিনয় করিবার ক্ষমতা থাকে—তিনি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী নন। দু’একটি ফিল্ম কোম্পানী এই অসুবিধা ও বাধা হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্ত একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা গল্প নির্বাচন ও চিত্রনাট্য রচনা এমন ভাবে করেন যাহাতে তাহাদের দলের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কোন প্রকার গোলমালে না পড়েন। হয়ত তাদের প্রধান অভিনেতা খুব ভাল গাইতে পারেন, সেই জন্ত এমন ভাবে চিত্রনাট্য রচনা করিতে হয় যে তাতে কেবল স্থানে, স্থানে গানের ছড়াছড়ি থাকিবে। অভিনয় করিবার কোন প্রয়োজনই হইবে না। এইরূপ জোড়াতালি দিয়া চিত্রগ্রহণ করিলে ভূমিকা নির্বাচন অনেক সময়েই হান্তম্পদ হয়। সম্প্রতি কয়েকটি জনপ্রিয় উপস্থাসের চিত্রে

ধাধারা অভিনয় করিয়াছেন তাঁহারা একেবারেই Misfit হইয়াছেন।

অধুনা কয়েকটি ভদ্রমহিলা আমাদের ছায়াছবিতে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের জাবিক অর্জনের উপায় হিসাবেই ফিল্ম শিল্পকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দু'একজন্যর সত্যিকার ক্ষমতা, ও প্রতিভা আছে। শ্রীমতী লীলা দেশাই, সাধনা বসু, সুপ্রভা মুখার্জি, ইন্দিরা রায়ের নাম এই প্রসঙ্গে সবারই মনে উদ্ভিত হইবে। তবে ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করাই ছায়াছবিতে সাফল্যের কারণ হয় না। শ্রীমতী শীলা হালদারের অভিনয় দেখিয়া এ কথা সত্য আমরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করি। আর একটা অভিনেত্রী আমাদের বিশেষ হতাশ করিয়াছেন।

বাংলা ছায়াছবি সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্তব্য করলাম, আশা করি আমাদের প্রযোজকগণ ইহা অল্পভাবে গ্রহণ করিবেন না। আমরা জানি, যে কয়টি ফ্রন্টিয়ার উল্লেখ করা হইল তাহা হইতে সত্যি সহজেই মুক্ত হইতে পারা যায়। বাংলা ফিল্ম যদি যথাযোগ্য ভাবে পরিচালিত হয় তবে শীঘ্রই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইতে পারে। আমরা আশা করি আমাদের এই মন্তব্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।



জরীপ ও নক্সার যত্নাদি সুবিধায় কিনতে হলে

“মিনোদ কোম্পানী”র

নূতন শো-রুম বান।

১৩নং ডালহাউসি স্কোয়ার।

N. I. P.

প্রভাত সিনেমা

“বাগবান”

পরিচালক কার্দ্দারের অতুলনীয় ছবি “বাগবান” প্রভাত সিনেমায় ৭ম সপ্তাহে পদার্পন কর্ণ। এবং এর জন-প্রিয়তা তুলনায় প্রথম সপ্তাহের চেয়ে এখনও কিছু মাত্র হ্রাস পায়নি। যে কোন হিন্দি ছবির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই।

হিন্দু সমাজের এমন এক জটিল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এর গল্পাংশ রচিত যে, ছবিখানা যত দূরই দেখা হউক না কেন পুনরায় ছবিখানা দেখিতে কোন প্রকার অকুচিই দর্শকের আসে না। সামাজিক ছবি এরূপ নিখুঁত এর পূর্বে খুব কমই হয়েছে বলতে হবে।

বাল্য বিবাহের কী শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে এবং হিন্দু বিশ্ববাদের পুন-বিবাহ যুক্তি-যুক্ত কিনা ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নই ছবিতে রহিয়াছে। দুর্গার বিবাহ হয় অতি শৈশবেই কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে শৈশবেই তাকে বিধবা হইতে হয়। পিতামাতা এ ঘটনায় মুহমান হলেও কত্নার নিকট কিছুই প্রকাশ করেন না। অধিকন্তু তাঁরা তাদের আদরের দুলালীকে কুমারীর গ্রামই রাখলেন। পরে দুর্গা যখন তাদেরই বাগানের মালী স্বরূপকে ভালবেসে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চায় তখন এক জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়। এই ঘটনাচক্রে দুর্গা, তার প্রেমাম্পদ স্বরূপ কী লাঞ্ছনা সমাজের কাঁছ থেকে পায় তার করুণ কাহিনী দর্শক মাত্রেরই প্রাণে এক সাদৃশ্য আনবে।

বিমলা কুমারী, নজ্জেকার, আসরফ খান, নাজীর, সিতারা ও ইয়াসমিন প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। পরিচালনা করেছেন এ, আর, কার্দ্দার। ছবিখানা চিত্রামোদী মাত্রেরই দেখা উচিত।

“প্রেম অন্ধ”

প্রভাতের পরবর্ত্তী আকর্ষণ—মিনার্ভার অমর-অবদান “জেলারে” আপনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন “প্রেম অন্ধ”। তার কোন ভেদাভেদ, উচ্চ-নীচ কিছুই বিচার নেই। অ-সুন্দরও প্রেমের স্পর্শে হয়ে উঠে সুন্দর, গরীয়ান।

জেলার দলীপ কড়া মেজাজের লোক। নিমামুর্ভুতাই হচ্ছে তার সকল কাজের লক্ষ্য। সৃষ্টি রসাতলে গেলেও তার এ নিয়ম এক চুলও নড়চড় হবার জো নেই। কিন্তু দলীপ তাঁর জ্ঞা কানবালকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সেখানে সে সম্পূর্ণ ‘নূতন’ ধরণের মানুষ।

কানবাল তার স্বামাকে ভালবাসবার চেষ্টা করে, কিন্তু যখনই সে দেখতে পায় তার স্বামী কুৎসিত। তার মুখে ক্ষতের এক বিকট চিহ্ন তখন তার সমগ্র মন স্বামীর বিরুদ্ধে বিধিয়ে যায়। তাই একদিন এক গভীর নিশিথে সে তার স্বামীর ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। পিছনে পড়ে রইল তার সংসার, তার একমাত্র আদরিণী কন্যা কল্যা।

এই ঘটনায় জেলার দলীপের হৃদয়ে কী ঝড় এসেছিল। ঘটনা-স্মৃতি কানবাল



(বিলাসী)

সাথী

পরিচালক ফণি মজুমদার 'সাথী' বা 'ষ্ট্রীট সিগার' ছবি তোলার কাষ শেষ করেছেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই সারা ভারতের আগ্রহান্বিত চিত্রাবোধীদের এই ছবির টেলার উপহার দেওয়া হবে।

বাংলায় তথা সারা ভারতের চলচ্চিত্রে এইরূপ অপরূপ টিম আর হয় নি। চলচ্চিত্রের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ গায়ক গায়িকা এই একটি মাত্র ছবিতেই প্রথম অবতরণ করেছেন। সাইগলের মধুমাখা কণ্ঠস্বর কোন দর্শকের ভাল না লাগে?

সেই গাইবে হারমোনিয়াম নিয়ে পথে পথে তার মঞ্জুকে নিয়ে এ ছবিতেই, কে না দেখতে চায়?

মঞ্জু সেজেছে শ্রীমতী কানন। যে গ্রাম্যার ক্র্যাফোর্ডকে ঘিরে আছে, কাননেরও আজ সেই গ্রাম্যার। হাস্তে, লাস্তে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, ভাবে মুর্ছনায় অজের অনবদ্য আবেদনে সারা ছবিখানিকে

ও তাহার প্রণয়ী ডাক্তারকে কী ভাবে বিচার জন্ত পুনরায় জেলারের কাছে টেনে নিয়ে এল এবং জেলার তার কী শাস্তি বিধান কলে—আপনি তা সত্তরই প্রভাতের রূপোলী পর্দায় দেখতে পাবেন।

শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন সোরাব-মোদী ও লীলা চিৎনিশ। পরিচালনা করেছেন সোরাবমোদী।

উদ্ভাসিত করে রেখেছে। ঠুঁড়িওর মতে এ একটি নতুন ধরনের ছবি এবং কানন ছাড়া এমন অভিনয় আর কারোর দ্বারা সম্ভব হোত না।

এই ছবিতেই দুইটি বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে ছবির গৌরব বর্দ্ধন করেছেন প্রথিতযশা নট অমর মল্লিক ও শৈলেন চৌধুরী। হিন্দীতে আছেন বিক্রম কাপুর ও জগদীশ শেঠী।

প্রবন্ধক প্রমোদ রায় বহু বয়ে এই নতুন ধরনের গল্পটিকে পদ্যায় রূপান্তরিত করতে সম্ভব করেছেন।

অধিকার

এ ছবিখানির হিন্দি সংস্করণ এই সপ্তাহের মধ্যেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে মুক্তিলাভ করবে। বজ্রা সাহেবের পরিচালনা তরুণী তিমির বরণের সাহায্যার্থে পঙ্কজ ও পাহাড়ীর সঙ্গীত লহরী যে এ ছবির কত বড় সম্পদ তা দর্শকমাত্রেই অল্পদিনেই বুঝতে পারবেন। এর বাঙলা সংস্করণ ডিসেম্বর মাসে 'চিত্রা'য় মুক্তিলাভ করবে।

বড়দিদি

আর একটি মধুর চরিত্র—'বড়দিদি'—র মনোরমা। এটিও কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি।

বড়দিদি মাধবীর সমবয়সীদের মধ্যে—মনোরমাই তার সুখ দুঃখের অংশ ভাগিনী। মাধবী সে কথা গোপন কোরতে চায়,

মনোরমার কাছে তা সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিধবা মাধবীর জীবনে সে কথা চিরদিন অক্ষুট থেকে বেত—যে বেদনার কথা, যে লজ্জার কথা, মাধবী প্রাণ থাকতে অপরকে জানাতে পারত না—সাথী মনোরমার কাছে তা পরিস্ফুট হোয়েছিল। 'মনোরমা' চরিত্র-সৃষ্টির এই খানেই সার্থকতা।

সমবেদনাকাতর এবং অতিশয় স্নেহ প্রবল এই অপূর্ণ নারী চরিত্রটির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্তে পরিচালক মল্লিক মহাশয় এমন একটি মেয়েকে নির্বাচিত কোরেছেন—যাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

এই মেয়েটি—শ্রীমতী মেনকা। ইনিই তাঁর অপূর্ণ প্রাণ ঢালা অভিনয়ে, 'মুক্তি' চিত্রে আপনাদের হৃদয় হরণ কোরেছিল। আশাকরি 'মনোরমা'র ভূমিকায় এই শক্তি-মতী অভিনেত্রী আপনাদের খুসী কোরতে পারবে।

এ সপ্তাহে ছবিতোলা শুরু হয়েছে আর একটি সুগুণিত সেট-এ। এইখানে মাধবী কাশীতে এসে পৌছুবার পর কাশীর বাড়ীতে তার শয়ন প্রকোষ্ঠে মাধবীর সাথে মনোরমার দেখা হয়। সেই মিলনের ফলে মাধবীর অন্তরের কথা মনোরমার কাছে ধরা পড়ে।

সাপুড়ে

সাপুড়ের কাহিনী নিয়ে এদের দু'নম্বর ঠুঁড়িওতে যেন ভেদী বাজী শুরু হয়েছে। যে দিকেই তাকাই দরিদ্র অজুত সাজে, রকমারী পোষাকে, বেদের দল।

বুকে হাত রেখে ঠুঁড়িওর মধ্যে বাই। জানি না কোন ফাঁকে, কোন ঝোপ-জঙ্গলের পাশ থেকে হঠাৎ ফোঁশ কোরে ওঠে!

এতদিনপর দেবকী শিবুর সাধ হয়েছে—কেউটে সাপ নিয়ে খেলা কোরতে।

কর্মসচীব ছোটাইবাবু করিৎকর্মা লোক। তাঁর মুখে এক কথা—সাবধানের মার নেই। তাই তিনি ষ্টুডিওর মধ্যেই ছোট্ট একটি ‘ক্লিনিক’ বসিয়েছেন। দেখলুম নানা রকম যন্ত্রপাতি, নানা জাতের ওষুধ সার-সার আলমারীতে সাজানো। শুনলুম—সব গুলোই সর্পদংশনের প্রতিষেধক।

এখন ভগবান করুন এই ক্লিনিকের শরণাপন্ন কাউকেও না হোতে হয়!

এই জাতীয় ছবি তোলায় বিপদের সম্ভাবনা আছে অনেকখানি। যারা আপনাদের আনন্দ দেবার জন্তে সেই বিপদকে বরণ কোরে নিয়েছেন তাঁদের সাহসের প্রশংসা কোরতে আমরা বাধ্য।

সাপুড়েদের বস্ত্রী এবং আরণ্য জীবনের আবহাওয়া যা’তে যথারূপে এই চিত্রে বর্জ্য থাকে’ তার জন্তে দৃশ্যপটাদি গঠনে, শিল্পীদের যথেষ্ট ক্লেশ স্ব’কার কোরতে হচ্ছে। কর্মসচীব ছোটাইবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী তারক বসু যে সেট ইত্যাদি গঠন কোরছেন তাতে তাঁর কাজে যথেষ্ট রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ছবি তুলছেন ইউসুফ মুলজী এবং অতি-আধুনিক R. C. A Ultra Violet শব্দ-গ্রহণ যন্ত্রে সুবিখ্যাত শব্দ-যন্ত্রী অতুল চট্টোপাধ্যায় শব্দমূল্যে লেখন কার্যে আত্ম-নিয়োগ কোরেছেন।

নায়িকার ভূমিকায় স্বনামধন্য অভিনেত্রী কাননকে মানিয়েচে চমৎকার। ছুটির মধ্যে বায়ুপরিবর্তনের ফলে শ্রীমতী কাননের শারিরীক উন্নতিও হয়েছে যথেষ্ট।

ভূম্যগ

পরিচালক-নীতীন বসু সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করে আবার তার ছবির কাজে পুরোদমে লেগে পড়েছেন। ভারতবর্ষের চিত্র শিল্পের উন্নতির মাপকাটা একমাত্র নীতীনবাবুর ছবিতেই পরিলক্ষিত হয়।

তিনি যে সব Technical qualities-এর উন্নতি আজ পর্যন্ত ছবির মধ্যে দিয়ে দেখাতে পেরেছেন—তা বোধ হয় কোন বিলেতি ছবির চেয়ে কম নয়। তিনি এই ছবিতে যে সব আর্টিষ্ট নিয়ে কাজে নেমেছেন তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলবার নেই। লীলা দেশাই, নাজাম, সাইগাল, নিমো, জগদীশ, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি সকলেরই অভিনয়-প্রতিভা সর্বজনবিদিত।

পরশমণি

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় মহাশয়ের পরিচালনায় শ্রীভারতলক্ষীর ছবি পরশমণির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। প্রফুল্লবাবুর উপর আমাদের আস্থা আছে সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই করে বলতে পারি যে এ ছবি ভালই হ’বে। এ ছাড়াও এ ছবির আর্ট ডিরেকশনএর ভার নিয়েছেন শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী। বজ্রবর সুধাংশু চৌধুরীর সম্বন্ধে অধিক পরিচয় দেওয়া নিম্নোক্তজন। সম্প্রতি তাঁর সেট পরি-কল্পন র অভিনব ব্যাপার অনেকেই ‘অভিনয়’ চিত্রে দেখেছেন।

এ ছবিতে যারা অভিনয় করবেন তাঁদের মধ্যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রানীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, অরুণা দাস, সুলেখা চাট্টাঙ্গি, ধ’রাজ ভট্টা, তুলসী লাহিড়ী, রবী রায়, সন্তোষ, সিংহ, কৃষ্ণধন মুখোজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। আর একটি বিশিষ্ট নায়িকার ভূমিকায় এই প্রতিষ্ঠান প্রথমে ছায়া দেবীকে মেট্রোপলিটান পিকচার্সের কাছ থেকে loan নিয়ে কাজ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন কিন্তু সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি যে কোন বিশেষ কারণে এ proposal কার্যকর হয়নি। উপস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা শ্রীমতী প্রীতিমা দাশগুপ্তের সঙ্গে এই চরিত্রটির জন্তে কথাবার্তা চালাচ্ছেন

দেশের মাটি

সামনের শনিবার থেকে ‘দেশের মাটি’ ৬ষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করবে। একাধারে দুইটা চিত্রগৃহে এরূপ দর্শকসমাগম একমাত্র নিউ থিয়েটার্সের ছবির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। চিত্রা ও নিউ সিনেমা এই জনসমাগম ‘দেশের মাটি’র জনপ্রিয়তার পরিচয় দিচ্ছে।

ঝড়ের যাত্রী

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস কোম্পানী সমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শ্রীভারতলক্ষী ষ্টুডিওতে ঝড়ের যাত্রী’ তোলাবার ব্যবস্থা করেছেন। যতদূর শোনা যাচ্ছে এই মাসের শেষে স্ক্রটিং আরম্ভ হ’বে। এতে অভিনয় করবে নিম্নলিখিত লাহিড়ী, জীবন গাঙ্গুলী, শান্তি গুপ্তা প্রভৃতি।

পূর্ব থিয়েটার

রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ এই চিত্রগৃহে এই শনিবার থেকে ২য় সপ্তাহে পড়বে। প্রথম সপ্তাহে দক্ষিণ কলিকাতার এই জনপ্রিয় চিত্রগৃহে যে অপূর্ণ জনসমাগম আমরা দেখেছি তাতে মনে হয় এছবির ভবিষ্যৎ ভালই। নিখুঁত চরিত্রাভিনয়ে পরিচালক নরেশ বারু নিজে আর শ্রীমতী প্রীতিমা দাসগুপ্ত যে অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সকলের প্রশংসার যোগ্য।

রূপবাণী

শ্রীভারতলক্ষী পিকচার্সের ‘অভিনয়’ সত্যই একটি উচ্চাঙ্গের কথাচিত্র হইয়াছে। অত্যন্ত আধুনিক এই চিত্রকাহিনীটিতে নানা রসের এমন নিপুণ পরিবেশনা হইয়াছে—যে, যিনিই ছবিখানি দেখিয়াছেন তাঁহাকে সত্যই অভিভূত হইতে হইয়াছে। রূপবাণীতে এই চিত্রটি শনিবার হইতে অষ্টম সপ্তাহে পদার্পণ করবে।

বিবিসি

শোক সংবাদ

পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের আকস্মিক তিরোধানে বাঙলার “মার্গ” সঙ্গীতের যে ক্ষতি হইল, তাহা যথার্থই অপূরণীয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছিলেন বর্তমান বাঙলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মৃদঙ্গী। গত নিম্নলিখিত সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধন কালে বারাণসীর স্বনামধন্য ক্রপদাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ক্রপদ গানের সহিত সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গাচার্য্য পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্রের মৃদঙ্গবাদ্য শ্রবণের সৌভাগ্য যাহারা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহারাই তৎকালে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, একপ মণিকাঞ্চন-যোগ সংসারে অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে।

মৃদঙ্গাচার্য্য পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্র যে কেবল সঙ্গীতজ্ঞই ছিলেন তাহা নহে। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে সংস্কৃত-শাস্ত্রেও তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল ও তিনি একজন আচারপুত্র, নিষ্ঠাবান, দশকর্ম-বিশারদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। তাহার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি নিত্য অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিতেন। এইরূপ সাংগিক ব্রাহ্মণ বর্তমান বাঙলায় দুই চার জনের অধিক আছেন কি না সন্দেহ।

পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্র প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। এই পরিণত বয়সেও তাহার যত্ন-সাধনার বিরাম ছিল না। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার ও সঙ্গত-রসিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

মহোদয়ের বাসভবনে একটি সঙ্গীতের আসরে মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতে করিতে তিনি সন্ধ্যাসরোগগ্রস্ত হইয়া ধীরে ধীরে অচেতন হইয়া পড়েন। তাহার সে মূর্ছা আর ভঙ্গ হয় নাই। আমরা তাহার সাধনপুত্র আত্মার পারত্রিক শান্তি কামনা করি।

বঙ্গিকা সংবাদ

গত শনিবার ২৮শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনমথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ‘বঙ্গিকা’ সঙ্ঘের উদ্ভাগে হস্তলিখিত “বঙ্গিকা” পত্রিকার উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সঙ্ঘের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিরুতি প্রদান করায় পর বঙ্গিকাসঙ্ঘের সভাপণ, “নবোদয় গীতিমন্দির”ের সভাপনের সহ-যোগিতায় নানারূপ সঙ্গীত, প্রাচীনাত্যকলা, আবৃত্তি, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত দর্শকগণের মনোরঞ্জন করেন। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত অশোক নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আমরা নবোদয়বিত্ত বঙ্গিকা পত্রিকার দীর্ঘ আয়ু কামনা করি।

কালিয়া সংবাদ

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় এবারও বশোহর জিলার কালিয়া গ্রামে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় শতাধিক গৃহ মায়ে বন্দনা উৎসবে মুগ্ধরিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বেচ্ছা বিধায়, ভীষণ বত্মার

প্রকোপও গ্রামবাসীর পূজার আনন্দকে বিশেষ কমাইতে পারে নাই। আশ্রয়হীন ও অন্নবস্ত্রহীন হইয়াও তাহার হালিমুখে মাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছে।

গ্রামের এবার একটি বিশেষ চুঃসংবাদ স্বনামধন্য জনপ্রিয় নীরব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মৃত্যু। ইহার মৃত্যু সমগ্র কালিয়া গ্রামে একটি নিরানন্দের ছায়া বিস্তার করিয়াছে। পূজার আনন্দের মধ্যেও সতীশবাবুর স্মৃতি গ্রামবাসীর চিন্তকে বিয়োগ ব্যাধাতুর করিয়া তুলিয়াছে।

অত্যন্ত বারের মত ৬পূজা উপলক্ষে এবার গ্রামে বাত্রা থিয়েটারের তত সমারোহ দেখা যায় নাই।

গ্রামের প্রায় সকল অবস্থাপন্ন বাটী হইতেই বজাপীড়িত হুহু দরিরুদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করা হইয়াছে। ছোটকালিয়ার “নূতন বাটী” এবং বড় কালিয়ার “মুন্সেফ বাটী”র নাম ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রিলিফ ফণ্ডে প্রায় সহস্রাধিক মুদ্রা জমা আছে। গতবর্গমেন্ট হইতেও যৎসামান্য সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

নির্বাক্ষণী সাহিত্য সংসদ :-

আগামী ৬ই কার্তিক রবিবার ৫টার সময় আমাঙ্গদর সংসদের তৃতীয় অধিবেশন ৫০ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীটে (কালীঘাট হাই স্কুল) অনুষ্ঠিত হইবে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট।

চন্দ্রাবর সংবাদ

গত ২৯শে আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যার দাস মহাশয়ের ৭৬ নং ল্যানসডাউন রোডস্থিত ভবনে চন্দ্রাবর সঙ্ঘের দশম অধিবেশন সুকরিমিমলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। সম্পাদক কর্তৃক গত অধিবেশনের কার্যবিবরণী পাঠান্তে দীনেশ

দাস সম্পাদিত 'শ্রী' (হস্তলিখিত পত্রিকা) উদ্বোধন করিত। 'শ্রী' দিয়া সভার কার্য আরম্ভ এবং সুরেশ সরকারের 'সেদিন শ্রাবণ রাতে' (কবিতা), নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গ' (কবিতা), হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'ছোট গল্প' (গল্প) আর সমীর ঘোষের 'বাংলা সাহিত্যের একখানি বই, গৃহদাহ' (প্রবন্ধ) দিয়া সমাপ্ত হয়। সভায় প্রাচীন সাহিত্যের সহিত আধুনিক সাহিত্যের বিরোধ কি এবং কোথায়, তাহা লইয়া বিশেষ আলোচনায় সুধাংশু সেনগুপ্ত, সন্তোষ ঘোষ, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জগত দাশ প্রভৃতি যোগদান করেন। পরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য শেষ হয়।

বহিরগাছি পল্লী-মঙ্গল পাঠাগার

গত ১৮ই আশ্বিন বুধবার বৈকাল ৫।০

'ঘটিকার সময় ঠাকুর' বাড়ী মন্দির প্রাঙ্গণে পল্লী মঙ্গল পাঠাগারের নবম বার্ষিক প্রীতি-

সম্মেলন ও বন্ধিম শত বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। নবম বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলনীতে পৌরহিত্য করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বন্ধিম শত বার্ষিকী উৎসবে পৌরহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। কবি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে বন্ধিমচন্দ্রের প্রতিভা ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে ও ওজস্বিনী ভাষায় আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এসসি ও শ্রীমান কমলকুমার ভট্টাচার্য্য বন্ধিম সাহিত্যে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সারগর্ভ অভিভাষণ

পাঠের পর রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সভায় কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, কালনা ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির ও ভদ্র মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল।

সহকারী ডিরেক্টরের পদে

শ্রীযুক্ত হীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ

এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও ইউনাইটেড প্রেসের সহিত সংযুক্ত শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্, বি, ই, বাংলা সরকারের সহকারী ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনফরমেশন পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তিনি কর্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজবাবু উৎসাহী ও তরুণ সাংবাদিক। আমরা তাঁহার নবতম কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করিতেছি।

কে এই দেবী ইন্দ্রাণী?
যাহার অশ্রু নৃত্যক্ষেত্রে অগণিত
দর্শকবৃন্দ বিষয় বিমুক্ত হয়, যাহার
দেহ সৌন্দর্যে স্নান করি মিস বেঙ্গলেন
প্রতিচ্ছায়। আছে, যাহার কণ্ঠধ্বন
কল্প। অল্প নীতায়ের তাহার মৃত
কল্প। নদীয়ার কণ্ঠধ্বন বলিয়া নয় হয়.....
কে এই দেবী ইন্দ্রাণী?

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
অনবদ্য কথা-চিত্র

আভিনয়

শ্রেষ্ঠাংশে : সাধনা বোস, অরীক্ষ চৌধুরী
- নীরাজ ভট্টাচার্য্য, প্রতিমা সার্কি, তুল
- লাহিড়ী, বিভূতি গাঙ্গুলী, জাহ্নকি

রূপবর্ণনা

কোন : বি, বি, ৩৪১৩

৮ম
সপ্তাহ!

৮ম
সপ্তাহ!

রেকর্ড সঙ্গীতের প্রসারতার কারণ

শ্রী অমিয়মাধব সেনগুপ্ত

‘গ্রামোফোন রেকর্ড’ আজ আর সুদূর পল্লীগ্রামেও নতুন কথা নয় কারণ প্রায় সব পল্লীতেই রেকর্ড-সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায়। ভারতের কয়েকটি মহানগরীর কথা ছেড়ে দিলে আর সব জেলা বা গ্রামের লোকের কাছে রেকর্ড-সঙ্গীতই একমাত্র অবসর বিনোদনের বস্তু বলেও অত্যাঙ্ক হয় না। অভিনয়ের পালা-রেকর্ড, গান-বাজনার রেকর্ড, কোতুক-কথার রেকর্ড প্রভৃতি নানাপ্রকার রেকর্ড বাজারে প্রকাশিত হচ্ছে এবং রুচি অনুযায়ী ক্রেতাগণ এই সব রেকর্ড সংগ্রহ করেন।

রেকর্ড সঙ্গীতের প্রসারতার দিকে দেখতে গেলে প্রথমেই দেখা যাবে যে, দেশীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠানগুলির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই রেকর্ডের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ‘মেগাফোন’ ও ‘হিন্দুস্থান’ রেকর্ডই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে রেকর্ড সঙ্গীত আজ এত জনপ্রিয় হয়েছে। এই দুটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান ছাড়া ‘সেনোলা’ রেকর্ডও বাঙালীর অত্যন্ত প্রতিষ্ঠান এবং এদের রেকর্ডও বাজারে নিয়মিত বার হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বেও ক্যাসিক্যাল গান বা ঐ জাতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন সুরের রীকম-ফের করে শিল্পীদের গান রেকর্ড করা হতো। অবশ্য এখনও এই প্রকার গান রেকর্ডিং এর একটি বিশেষ বিভাগে গৃহীত হয় সত্য কিন্তু সঙ্গীত-রসিক ব্যতীত

পল্লীবাসী জনসাধারণের কাছে এ শ্রেণীর সঙ্গীত ততটা আনন্দদায়ক হয় না। যখন একই শ্রেণীর সঙ্গীত পরিবেশিত হ’তো তখন বিভিন্ন রুচির শ্রোতৃসাধারণের এই সব রেকর্ড কেনা ছাড়া গতাস্থর ছিল না।

দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিশেষ করে ‘মেগাফোন কোম্পানী’ লোক-সঙ্গীতের প্রসারতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। বাঙালার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রকারের লোক-সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন চণ্ডে গীত হ’য়ে থাকে। এই সব পল্লীগীতি মার্জিত কণ্ঠের শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ালে সম্পূর্ণ রস পরিবেশিত হয় না। কাঁচা কণ্ঠের কমণীয়তা ও সুরের অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য সহরের শাণিত-কণ্ঠের গায়ক গায়িকা দ্বারা সম্যক প্রসুটিত হয় না।

পল্লীসঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পীদের সংগ্রহ করা দুর্লব ব্যাপার। মেগাফোন কোম্পানী বহু চেষ্টায় অনন্তবালা বৈষ্ণবী (বরিশাল), পরেশ দেব (কুমিল্লা), নিরঞ্জন সূত্রধর (চান্দুরা) স্বরূপ দাস ও কামিনী বৈষ্ণবী (মৈমনসিংহ), নবানন্দাস বাবাজী ও নন্দরাণী (ঢাকা), মাতাপদাস ও ললিতা (ফরিদপুর) প্রভৃতি শিল্পীদের সংগ্রহ করে লোক-সঙ্গীতের রেকর্ড করেন। ইহাদের গীত গানে পল্লীসঙ্গীতের যথাযথ রূপ প্রসুটিত হয়ে উঠলো এবং প্রাদেশিকতার টেকনিক সম্পূর্ণ বজায় রইলো। পল্লীবাসীগণ ‘নিজেদের প্রিয় ও আবাল্য-শ্রুত গানের রেকর্ড শানতেই গ্রহণ করলেন ও

ইহার দ্বারা রেকর্ডের প্রসারতা বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ’লো।

ফিল্ম-রেকর্ডের চাহিদা বৃদ্ধিও রেকর্ডের প্রসারতার আর একটা মূল কারণ। সবার চিত্র যতই জনপ্রিয় হচ্ছে ফিল্ম-সঙ্গীতের রেকর্ডও তত বেশী বিক্রয় হচ্ছে। অবশ্য সব ফিল্মের গানই যে চলে তার কোন মানে নেই। এমন অনেক ফিল্ম আছে যার গান রেকর্ডে অচল বলেও অত্যাঙ্ক হয় না। দেখা গেছে যে রেকর্ডের জনপ্রিয় শিল্পী যদি কোন নবযুগীত ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের নতুন ছবিতে গান করেন আর সেই গান যদি রেকর্ডে প্রকাশিত হয় তা’হলে বাণীচিত্রটির জনপ্রিয়তার অভাবের দরুণ সেই ফিল্ম গান বিশেষ কিছুই কাটে না; এমন কি সেই শিল্পীর নিজস্ব গান অপেক্ষা ফিল্ম-গান অনেক কম বিক্রীত হয়।

ফিল্ম-সঙ্গীতের রেকর্ড বিক্রয়ের দিক থেকে নিউ থিয়েটার্সের ফিল্ম-গানগুলি আজ সারা-ভারতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছে। এদের ফিল্মের গান সঙ্গীত-রসিক ও চিত্রানুগী উভয়ের কাছেই সমান আদরনীয়। এ দিক দিয়ে নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড-জগতে একটা যুগান্তর

বিনোদ এণ্ড কোং

১০নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার
জরীপ ও মন্ডার যন্ত্রাদি বিক্রয় করে তাছাড়া
অফিস ষ্টেশনারী ইত্যাদিও বিক্রয় করেন।

মাতৃ

শ্রীলীলামর বসু

বেশীদিনের কথা নয়। প্রায় আট-দশ মাস আগে এক পাঞ্জি-মেলা-নো দিনে শম্ম ও উল্লুখনির মধ্যে শান্তি যখন পরের সংসারে গিয়ে প্রবেশ করে তখন তার চোদ্দ বৎসর উদ্ভার্গ হয় নি।

তারপর যা হয়ে থাকে। সিদুর প'রে বেরিয়েছিল। সিদুর মুছে চুকলো। পাড়ার প্রবীনারা এসে সরু-সরু ছ'খানি হাত হ'তে নোয়া ও শাঁখা খুলে দিয়ে, থান কাপড় পরিয়ে তাকে তপস্বিনীর বেশে সাজিয়ে দিলে। আর এ-ও উপদেশ দিয়ে গেল—বিধবাদের সংঘের পথে চলতে হয়।

কস্তার এই নিদারুণ পরিবর্তনে শোকা-হত গিরিশ মিত্র মুষড়ে পড়লেন। এই আকস্মিক আঘাতে তিনি শয্যাগত হলেন। বিধবা কস্তাকে সর্বদা নিজের চোখের সামনে দেখে দেখে তিনি আরো ভেঙে পড়লেন। এই নিয়ে ছ'মাস। শেষে একদিন অর্থের জীর্ণ ব্যাগটী যখন তার আসন্ন শূন্যতার কথা জানিয়ে দিলে, সে দিন মিত্রমশাই তার পৈত্রিক বাড়ী-এনেছেন। ভারতে এমন সঙ্গীত রসিক ও চিত্রামোদা অতি অল্পই আছেন বাদের রেকর্ড-সংগ্রহের মধ্যে 'নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড' বা 'নিউ থিয়েটার্স' মেগাফোন রেকর্ড' একখানিও নাই। ফিল্ম রেকর্ডের এই প্রসারতার মূলে আছে নিউ থিয়েটার্সের ছবির অসম্ভব জনপ্রিয়তা, এদের টেকনি-শিয়ানদের সর্বমুখী উন্নতি ও সঙ্গীত পরিচালকের জনপ্রিয় সুরের নব নব সৃষ্টি।

—:—

খানা বেচে দিয়ে গ্রামের মধ্যেই এক কুঁড়ে ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

তারপর উপ্যাপরি আরো পাঁচ মাস নগ্ন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে হঠাৎ একদিন মিত্রমশাই পরপারের দিকে পা বাড়ালেন।

শান্তি তখন আবিষ্কার করলে এই গৃহখানি আর সামান্য কিছু আসবাব-পত্র ছাড়া সে এই সংসারে একাকা। আশ্রয় স্বজন দু-পাঁচ জন ছিল বটে কিন্তু হৃদয়ে তাদের কারো দেখা মিললো না।

পেটের চিন্তা বড় চিন্তা। তাই কারো বা গরুর জাবটা কেটে দিয়ে, কারো বা কুটনো কুটে অন্নের সংস্থান করে। ষুটে বেচে ও সুপারি কেটে ছ'-চার পয়সা হয়। আরো এমনি অনেক কিছু।

দিন রয় না। এমনি করে কিছুদিন কেটে গেল। আর হাতে যা কিছু ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। উপায়স্বর না দেখে বাধ্য হয়ে শান্তিকে গ্রামের জমিদার বাড়ীতে অল্প বেতনে রাধুণীর বস্ত্র নিতে হলো।

সময়ের ব্যবধান বেড়ে যাওয়াতে শান্তির মুখে ছ'-চার গরসু সুস্থহান ভাত নিয়ামত ভাবে উঠতে লাগলো। এর জন্তে ঈশ্বরকে সে অশেষ ধন্যবাদ দেয় ও।

তার যৌবন এখনো উদ্ভার্গ হয় নি বলা যায়। রাধুণী বস্ত্র পাবার পর থেকে সে যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলো তার যৌবন-শ্রী এখনো স্নান হয়ে যায় নি। বেশভূষায় এখন সে যথেষ্ট মনো-যোগ দিয়েছে, প্রসাধন ও অঙ্গরাগে এখন সে যথেষ্ট সময় খরচ করে।

একটা অস্বস্তিকর ভাবের সূত্রপাত হয়ে ছিল সেদিন থেকে, যেদিন শান্তির রূপ-যৌবন তার সমস্ত শরীরে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্তু একদিন জমিদার পুত্র বিজয়ের সঙ্গে খোলাখুলি হাঁসি ঠাট্টার পর থেকে কিছু লজ্জাকর গুট ব্যাপার জমিদার গৃহিনীর বোধগম্য হলো। সুতরাং এরূপ মানসিক অবস্থা নিয়ে জমিদার গৃহিনী শান্তিকে ডেকে বললে : দেখ শান্তি, রূপ দেখাতে হয় বাজারে, গেরস্তের ঘরে নয় ?

দিন যায়। ক্রমে তাদের মেলামেশার ওপর একটা সন্দেহের ছায়া এসে পড়লো। শেষে সত্যি সত্যিই তারা একদিন অধিক-রাত্রি গ্রামের শিরোমনি পণ্ডিতের কাছে ধরা পড়ে গেল।

সেদিন বাড়ী ফিরে শান্তির কী কান্না ? তার মাতৃহের আকাঙ্ক্ষা কী এতই লজ্জাকর। হৃদয় বিকোচে আরো গর্জে ওঠে।

গ্রামে সোর গোল পড়ে গেল। শেষে কী না জমিদারের ছেলে ভিঃ ? জমিদার বাড়ী থেকে শান্তির কাজ গেল।

এ সংসারে কালান্ত্রাত কারুর জন্তে অচল হয় না। শান্তির কাজ যাওয়ার পর থেকে তিন মাস কেটে গেছে। তবে গত কয়েক মাস ধরে বিজয় তাকে মাস-হারা কিছু দিয়ে এসেছে। আগে লোকে প্রায় তাকে দেখে থাকতো—তবে শরীরটা রূপকায় হয়ে গেছে, যেন অসুস্থ বলে মনে হয়।

সেদিন রাত্রি গ্রামপথে বিজয়ের সঙ্গে শান্তি দেখা।

শান্তি বললে : কা আশ্চর্য্য ? আমায় দেখে অমন ভয় খেয়ে গেল কেন ?

বিজয় বললে : ভয় তোমাকে নয় তোমার ভবিষ্যতকে। সামাজিক শাসন যে তোমায় হত্যা করতে চায়।

—সে বিচার কী তোমার ওপর?

—না। সে শাসন আমাকেও ভয় দেখাতে ছাড়বে না।

—ব্যাপারটা আদালত অঙ্গি গড়ালে তোমারি ভয় বেশী। কিন্তু ভয় নেই আমি তোমার বিরুদ্ধে যাবো না।

বিজয় আলোচনার মোড় ঘোরালো।

বললে : কেমন আছে শাস্তি?

—বেশ ভালই আছি? চলি, এই রাত্রে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখতে পেলো—আবার অল্প বিপদ ঘটতে পারে? বলে শাস্তি অঙ্গকারে অদৃষ্ট হয়ে গেল।

শাস্তির খোরাকি বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কী করে জানাজানি হয়ে যায়। ঘরে ঘরে পড়ে যায় চি চি। জমিদার গৃহিনী লজ্জায় পুত্রের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। এমনি একা থেকে থেকে পুত্রের সঙ্গে এখন তার কোন সম্বন্ধ নেই। ব্যাপারটা পঞ্চায়েৎ অঙ্গি গড়ায়। বিচারে শাস্তিই দোষী হয়ে দাঁড়ালো। গ্রামের কর্তারা এই মত জাহির করেন : আমাদের বউ-বেটা নিয়ে ঘর করতে হয়, আজই মেয়েটাকে গ্রামছাড়া করতে হবে।

পরদিন পরানের মা এসে খবর দিলে শাস্তি ঘরে নেই। সেই আজকাল একটু শাস্তির দেখাশোনা করে। গতবৃত্তে বর্ষণ এখনো শেষ হয় নি।

পাড়ার অনেকেই জোট পাকালো মন্দিরের কাছে। সকলের চোখে ওই এক জিজ্ঞাসা এই বড় বৃষ্টিতে মেয়েটা গেল কোথায়? অনেক সং অসং আলোচনার পর তারা এই মত জাহির করলে—গেল ভালই হয়েছে, আপদ গেল। তারপর সকলেই যখন ফেরবার উপক্রম করছে, তখন গ্রামের উপেন চাষী এসে খবর দিলে—নদীর ধারে শাস্তি বনের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, আর তার পাশে একটা মৃত শিশু। ছেলেটা কিন্তু ঠিক আমাদের বাবুর মত দেখতে হয়েছিল।

এমন সময়ে সমস্ত গ্রাম কল্পিত করে একটা মেঘ ভাষণভাবে গর্জে উঠলো।

পুরাতনের পরিবর্তন

(আলোচনা)

ত্রিবেণুকা সেনগুপ্ত,

পুডিংএর কথা

আমি পুডিং—এদেশে আগন্তুক। ইংরেজ সভ্যতার উপকরণের সঙ্গে অজানাভাবে এসে পড়েছি। এখানে এসে বহুকাল বাবুজিখানার বাইরে যাবার সুযোগ পাই নি। ক্রমে বাঙ্গালীপাড়ায় একটু আধটু করে যেতে শিখলাম, কিন্তু পরিচয়টা অনেকদিন পর্যন্ত পুরুষদের মধ্যেই নিবদ্ধ রয়ে গেল। তখন মনে হ'তো—বাঁধছয় বাঙ্গালীমেয়েরা সুখাত্তের আদর জানেন না। কিন্তু ক্রমে সে ধারণা আমার বদলে গেল। দেখতে লাগলেম—মেয়েরা ঘটা করে পুডিং তৈরীর মহড়া আরম্ভ করে দিয়েছেন। উঃ কী চুর্দশাটাই-না তখন ভোগ করেছি। বাটার মুখে থালা চাপা দিয়ে বুকে পিটে জলন্ত কয়লা ঠেসে আমাকে অর্দ্ধদগ্ধ করে ফেলতেন।

সন্দেশবাবু—যা এককণ বলেন,—তাত আপনারা শুনলেন! মনে করেছিলেম চুপ করেই থাকবো, কিন্তু শাস্ত্রে একটা কথা আছে—“মৌণ্য সন্ন্যাসি লক্ষণম্”—আমি বাঁধু মৌন থাকি—তা হলে আপনারা সকলেই সন্দেশকে সমর্থন করবেন আর আমার উপরই সমস্ত দোষ চাপাবেন তাই বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে।

জগৎপরিবর্তনশীল। তার সঙ্গে সঙ্গে সর জিনিষেরই পরিবর্তন হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমি ইউরোপ থেকে এদেশে এসেছি। এতে সন্দেশের

রাগ করবার কোন কারণই নেই। তিনিও অনেক কথাই বলেন কিন্তু আমার বিশ্বাস—ভারতীয়েরা এত মুর্থ নন যে বিনা বিচারে আমাকে তাঁদের খাণ্ডতালিকা হ'তে নির্বাসিত করবেন। সন্দেশের ভারতের সর্বত্র আদর একথা ঠিক, কিন্তু আমার আদর পৃথিবীব্যাপী অর্থাৎ International. পৃথিবীর মানচিত্রে খুলে দেখুন যে সর্বত্র ইউরোপের প্রভাব রয়েছে। ইউরোপের প্রভাব যেখানে, আমার প্রভাবও সেখানে। আমাকে ছাড়লে ডিনার (Dinner) অসমাপ্ত হয়।

আপনারা স্ত্রী আশুতোষের গর্ব করেন, আর ভাবেন যে গুণায় গুণায় সন্দেশ খেয়েই তিনি তাঁর অক্লান্ত কর্মশক্তি লাভ করেছিলেন। আপনারা ত জানেন না যে কত লোক এ সন্দেশ খেয়েই নধরকাস্তি লাভ করে—অকালে স্বমলোকে গিয়েছেন। আর সন্দেশ খেয়েই যদি স্ত্রীর আশুতোষ হওয়া যেত তবে ভারতে স্ত্রীর আশুতোষের মত লোকের কি অভাব হ'তো?

আর একটা কথা, সন্দেশের ভক্ত হিসাবে একমাত্র স্ত্রীর আশুতোষের নামই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু পুডিংএর ভক্ত—জগন্নাথ প্রখিত-নামা কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধকার এবং আরো কত লোক। শুনেছি মহামতি গেটের নাকি পুডিং না হলেই চলতো না। লেকলীর মিলটন, শেলী কিটস্ বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কে না পুডিং খেয়ে-

ছেন? অবশ্য পুড়িং সন্ধে তাঁরা কোন কবিতা রচনা করে যাননি, এই থেকে আপনারা মনে করতে পারেন না যে তাঁরা পুড়িং ভালবাসতেন না। রবীন্দ্র নাথের কথাই ধরুন—তিনি নাকি দই খেতে ভালবাসতেন, কিন্তু দই সন্ধে কবিতা লিখে কি তিনি “নোবেল” প্রাইজ পেয়েছেন? বঙ্কিমবাবু গঙ্গার ইলিশ, কচি পাঠার ঝোল ভালবাসতেন। তাঁর সমস্ত লেখা যেটে কোথাও তাঁর প্রিয় মৎস্যের বর্ণনা পেলাম না। অতি প্রিয় পদার্থের ও অতি প্রিয়-জনের বর্ণনা কবিগণ কখনো করেন না। যেমন বাগাঁড়সু কদাপি তাঁর জী সন্ধে কোন কথাই বলেন নি।

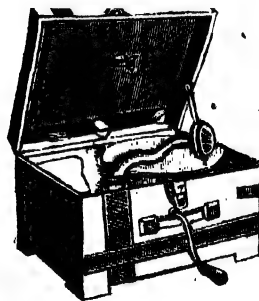
বন্ধুটা বলেছেন—তাঁর জন্ম অনেক বাড়ী করেছে সম্বাদ পেয়েছে কাজেই তিনি শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা মশাই—আপনারাতো সবাই জানেন সেই ডিলিয়ারকে—ওই যে সেই অ্যাটলান্টিকের ওপারের সেই ‘পাব্লিক এনিমি’ নং ১—পরিচিত ত সে সুবারই কাছে—তাই বলে কি সে শ্রেষ্ঠ? সন্দেহও যদি সে রকম শ্রেষ্ঠতার দাবি করেন, তবে আমি আপত্তি করবো না।

কিন্তু এদেশের মেয়েদের কেউ কেউ অপবিত্র বলে আমাকে ছেঁদে না কিন্তু আমার ও আমার জাতি তাইদের ছোয়াচ পেয়েই আত্মকে এদের অনেকে বাইরে বেরিয়ে ভগতের আলো দেখছেন। বেরিয়ে যে ঠেকেননি তার প্রমাণ পাবেন যদি কোনদিন অফিস ফেরত বা কলেজ থেকে বেরুবার কিছুকণ পর চৌরঙ্গির ওধারটায় একটু বেড়িয়ে—আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলার বা তারও একটু পর হীরে অতি হীরে চলে যান কাগজওয়ালাদের ঐ বড় বাড়ীটার পাশ দিয়ে—যেখানটার অনেক গাড়ী, অনেক শাড়ী

আর রঙের মেলা। ঢুকবেন না বেন—ওধু দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখবেন ফেল ফেল করে। আব ভাববেন এরা কি সত্যিই ঠকেছে—আমাকে চেয়ে আর পেয়ে?

সন্দেহবাবুর আর একটা নালিশ এই যে, আমার সংস্পর্শে এসে ভারতীয়দের অজীর্ণতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে দোষটাই কি আমার? নিজেদের শ্রম-বিমুক্ততার জন্তে ভারত-য়েরা যদি নিজেদের ক্ষমতাশক্তি হারিয়ে ফেলেন, সে দোষ কি আমার? তাই বলি ভারতীয়েরা যদি পরিশ্রম করতে শেখেন তা হলে দেখবেন যে আমার সংস্পর্শে এসে তাঁরাও স্বাস্থ্য-বাদীদের মত স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান হতে পারবেন।

আমার বন্ধু আরো বলেন যে আর্ঘ্য সভ্যতার প্রথম থেকেই নাকি তিনি অবস্থান করছেন—তিনি অনাদি অনন্তকালব্যাপী অবস্থান করবেন। কিন্তু আমি ঠিক বলছি যে একবার যারা তাঁদের রসনাগ্রে আমার মধুর স্পর্শ অনুভব করেছেন—তাঁদের কাছ থেকে সন্দেহবাবুর চিতদিনের মত বিদায় নিত হবে। কথায় বলে the taste of pudding lies in the eating অর্থাৎ



মেলোডিনা গ্রামোফোন

স্বর মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব
অতুলনীয়

গ্রামোফোন ক্রয় করিবার পূর্বে মোটর ও টার্ন টেবিলের তলায় “মেলোডিনা” খোদাই করা নাম ও গ্রামোফোনে “মেলোডিনা” মার্ক দেখিয়া লইবেন।

ভালিকা বিদ্যালয়ে পাইবেন।

“হিজ. মাস্টারস ডরেন্স” গ্রামোফোন ও রেকর্ড

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮-২নং বঙ্গবন্ধু স্ট্রীট, কলিকাতা।





অসুস্থ
শরীর



দুস্থ ও পবল

করিতে



সিরোলিন
'রাচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সর্দি, কাশি এবং ঘর্ম্মার
প্রথম অবস্থায় প্রেপ্ত ওষধ।



অভিনন্দন ও অভিনন্দন নন্দন

পার্ব রায়

মমতাজের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ দেখা বোটানিক্যাল গার্ডেনে। চুপ করে বসেছিল সে অ্যাসফণ্টের রাস্তার ধারে, একটি গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর সবুজ বেঞ্চে। তার ডাইনে-বামে প্রচণ্ড রোদে ঘেমে-ওঁঠা পথ দূরে গিয়ে বৈকের মুখে হারিয়ে গিয়েছে। সেদিন বোটানিক্সে আমিও এই পথের যাত্রী। হারিয়ে যাওয়া একটি বৈকের মুখ থেকেই আমি বেরিয়ে-ছিলাম গঙ্গার ধারে পৌঁছব বলে। দারুণ রোদ, নিদারুণ গরম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত, কিম্ব কিম্ব করছে। তেঁটায় ছুঁকখানা শুকিয়ে গিয়েছে। একটু ঠাণ্ডা বাতাস, একটু ছায়া, একটু আরাম আমাকে পেতেই হবে, ওই তো ওই দিকে গঙ্গার ধার ওই দিকেই যাওয়া যাক।

সামনেই প্রকাণ্ড একখানা রোলস্ রয়েস।

তারই অদূরে বসে মমতাজ। মোমের মমতাজ। গবমে গা থেকে ফাঁটা ফাঁটা করে মোম ঝরে পড়ছে। তার গোলাপী গালে দুটি চূর্ণ অলক নির্ভর নিদাঘে মূর্চ্ছা গেছে। মমতাজের হলদে লাড়ী সূর্য্যের আলো পড়ে সোনালী। তার ফ্রিল দেওয়া কালো সিল্কের জামা অলস নিদ্রালু। মাথার ফুল শুকনো।

ফ্যানানের রাগীর ফুল চাই সব সময়ই—প্রদীপ্ত ছুপরেও।

মমতাজকে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে বাই নি। আশ্চর্য্য হয়ে বাবার কথাও নয়। মমতাজ যে বেড়াতে ভালবাসে এটা আমি জানি; তবে সে আজ একা এটা কেমন লাগল।

আমি পাশ কাটিয়ে চলে বাচ্ছিলুম সে ডাকলে : ওহুন। আমি কাছে গেলুম। তারপর মমতাজ কী বলবে! কী বলতে পারে! চোখের চেনা লোককে তার মত মেয়ের অকারণে কী বলার থাকতে পারে! তবু সবাই এমন সময়ে, এমন অবস্থায় যা বলে সে তাই বলে : বড্ড গরম না? দেখেচেন একটু হাওয়া নেই। গায়ের সব রক্ত জল হয়ে গেল। আমি বললাম : হ। বাস তারপর চুপচাপ। আমার সর্কাজে অলোয়াস্টি আঁকড়ে ধরেছে। বোধকরি তারও। একখানা আদিকালের হলদে ফোর্ড হর্ণ দিতে দিতে ছুটে চলে গেল। সে আর বসে থাকতে পারল না। তার গায়ে জড়ান সবুজ স্কাফর্টা খুলে ফেলে দিলে। মাথার ফুলগুলি খুলতে খুলতে বলে : কী বিস্মী দেখাচ্ছে আমার এখন এগুলো মাথায় দিয়ে।—আমি নিখিলেশ সেন অন্তরে অন্তরে পুরোপুরি নীতিবাগিশ। আমার সমস্ত নীতি চূর্ণ হয়ে গেল। আমার দুর্দলতা বুকি ধরা পড়ল মমতাজের কাছে। আমি বলে ফেললাম : বেশ দেখাচ্ছে, ঠিক সাজাহানের মমতাজের মত। সে তার রহস্যময় তন্ত্রালু চোখ দুটি একবার আমার পানে সোজা তুলে দিলে। তার লিপষ্টিক-মাথা পাতলা ঠোঁটে এক চির হাসি খেলে গেল। প্রিয়তমা মমতাজের জন্ম হোল। তার নাম রাখলুম মমতাজ।

মমতাজকে ঠিক কবে প্রথম দেখি এ হিসেব আমি রাখিনি। একই সরাই-খানার আমরা দুইটি অতিথি। পাছশালার অলকালের আশ্রয়ভোগী যাত্রীদের মত

মমতাজ এতদিন আমার মনে কোন রেখা টানতে পারেনি। শুধু যখন তাকে দেখেছি ভাল লেগেছে। আর ইরাণী ঠোট, তার আরেবী চোখ, তার রুজমাখা কাশ্মীরী গাল, তার কাজল-কাল চুল সরাই খানার লাল নীল সবুজ রঙের বাতির সামনে আমাকে বাদশার রঙমহলে টেনে নিয়ে যেত। আমি চেয়ে থাকতুম আর কল্পনায় কাব্য গড়তুম—মাহুশের নয় রূপের। সাকীর দল পেয়ালা ভরে সিরাজী ঢালত। যাত্রী দল পাত্রভরা সুধা পান করত। বাজনা বাজত রমরম। এ সাকীদের পরণে থাকত স্কাট। একটা কেয়ারী করা ফুলের বাগানের সব কটা রঙ গলা জড়াজড়ি করত এদের পরণের পোষাকে। তাদের গাল থেকে আঁচুর রস ঝরত আর চোখ থেকে তার ছুটত সোজা আর সিধে। কত প্রেম রোজ জন্ম নিত, কত চুমুর সমাধি হোত সরাইখানার দেওয়ালের ওপরে। গভীর রাতে যখন নিজের ঘরে ফিরে আসতুম তখন মমতাজের কোন খবর আমি রাখতুম না। আমার মনের রঙে তখন আমি রাজা। আমার সুখ ছিল আমার নিজের সুখ আমার দুঃখ ছিল আমার নিজের দুঃখ।

তারপর এলো বোটানিক্স—এলো মমতাজ।

মমতাজের নাম একটা নিশ্চয়ই আছে। সে নামের গোঁজ আমি রাখি না। আমার অন্তরের অন্ধকার কবর ভুঁই হতে যে নাম একদিন সহসা উঠে এলো সেটা দিয়েই তাকে আমার নিজের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

মমতাজ জিজ্ঞাসা করলে : আপনার বাড়ী কোথায়?—হয়ত মানে, কোন সহর হতে আসছ তুমি? কোথাকার অধিবাসী তুমি? কোথায় তোমার দেশ?—আশ্চর্য্য! এক সরাইয়ের লোক আমি অথচ সে নাকি জানে না কোথায় আমি থাকি। আমার দক্ষিণ দিকের জানালা হতে তার ঘর দেখা যায়। আমি সবুজ পদ্মার ভেতরে সবুজ আলো জ্বলতে গভীর রাত পর্যন্ত কতদিন দেখেছি। কত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় অনাত্মীয় আসে তার সঙ্গে দেখা করতে—গল্প করে গান গায়। গোলমাল এসে পছন্দ আমার ঘরে—আমার কাজের ব্যাঘাত করে, আর সে আমায় চেনে না। আমি তাকে জানতুম সে নাকি কোথাকার রাণী। মমতাজ প্রশ্ন করলে : মেয়েরা হেসে খেলে মাঠে ঘাটে ছুটে বেড়ায় এটা আপনি পছন্দ করেন।—আশ্চর্য্য! জগতের কোন কাব্যে কোন সাহিত্যে কোন নাট্যিক এমন অসংলগ্ন প্রশ্ন করেছে। তারপর কাটল অনেকক্ষণ। দুজনে চুপ-চাপ। অকারণে বসে থাকা আমার ভাল লাগে না। আমি আশফন্টের রাস্তার ওপর ছোট্ট করে কাঁকড় দিয়ে আখর টানতে শুরু করলুম। তারপর তাকে পা দিয়ে মুছে দিলুম। মমতাজ চৈতন্যে উঠল : আপনি যা লেখেন তা অমন করে পা দিয়ে মুছে দেন কেন?—আমার বুকটা ছনাৎ করে উঠল। এত তার দরদ! কেন? কিসের জন্তে? মমতাজ বলে : আপনি বুঝি কবিতা ভালবাসেন।—মমতাজের প্রশ্ন অদ্ভুত প্রশ্ন। অঙ্ক কবে জিজ্ঞাসা করেছে আমি কী চাই আর কী না চাই। তারপর হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলে : চলুন গঙ্গার ধারে বেরিয়ে আসি।

হেটে যাবেন কেন? গাড়ীতে চলুন। আপনার গাড়ীতো রয়েছে। এত রোদে হাটবেন? আমি বললাম।

মমতাজ তাড়াতাড়ি কথাটা চেপে দিয়ে বলে : না না হেঁটেই চলুন, হাটতে আমি পাইনা, তাই হাটতে ভালবাসি।

ফুলরাণী আমার মমতাজ আমার অন্তরের অন্ধকার কবর ভূমিতে প্রথম সূর্যের স্পর্শ ছোঁয়ালে। বাড়ীতে এসে ডায়রীর খাতায় লিখলুম—মরমী মমতাজ তোমায় সেলাম।

(২)

পরের দিন প্রভাত হোল। সরাই-খানার ঘরে আর একটা রাত আমার কাটল প্রায় জাগরণে। বার বার প্রশ্ন এলো কেন? কেন? কেন সে আমার খবর নিতে চাইলে? আমি তো দিতে চাইনি। সে রাণী রাজার সোনার পালকে টাকার বিছানায় শুয়ে থাকবে? আমায় তার কিসের প্রয়োজন? আমার মনের একি অবস্থা! যে মন শুধু আপন মন নিয়ে থাকতে চায় তার এ বিকার কেন? রাত তিনটে—আমি আঁৎকে উঠলাম, আমার সমস্ত দেহ থর থর করে কঁপে উঠল। আমি চৈতন্যে উঠলাম : আমার এ ক্ষতি আমি কিছুতেই হতে দেব না।

তারপর এই সকাল। মমতাজের সঙ্গে দেখা হোল সরাইখানার স্পাইর্যাল সিঁড়িতে তার সারা গায়ে জড়ান একখানা আশ্চর্য্যানি জর্জেট। ক্ষৌতকরা বৃকে একটা সিঁড়ির লাল ব্লাউজ। মাথায় গোলাপী কার্টিফ। কাঁধের ওপর ফেলা সেই সবুজ স্কাফ। আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না, মুখ দিয়ে বেরুল : কি বিকীর্ষ দেখাচ্ছে আপনাকে—কী পুটলির মত পোষাক পরেন।

মমতাজ চোখ বড় করে বলে : খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে না? আঁক! আমি স্কাফ খুলে ফেলছি।—মমতাজ বুকেছিল কী আমি চাইছি। সে পোষাক বদলালো।

মমতাজ বলে : কাল থেকে ভারী বিকীর্ষ লাগছে।—আমার প্রাণের পরতে পরতে একটা ঢেউ খেলে গেলো। কিসের? আনন্দ না বেদনার? আমারও বে কাল রাতে ঘুম হয় নি। মমতাজকে বলুম : জানেন কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি, কি ভাল লাগছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়েছি তারপর বিছানায় জেগে কাটিয়েছি অনেকক্ষণ—প্রায় সকাল পর্যন্ত।—মমতাজের মুখ খুসীতে ভরে উঠল। বলে : একটু বেরুচ্ছি, সারাদিন থাকব না। কারকে দেখতে পাবো না। ভারী খারাপ লাগছে।—একি, মমতাজের হোল কি? আমাকে—হ্যাঁ আমাকে দেখতে পাবে না বলে তার কষ্ট হবে! আমি ছাড়া মমতাজ আর কারকে দেখতে চাইতে পারে! আমি মানে নিখিলেশ আরও খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হোল।

মমতাজ হাস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তার বড় চোখে ক্লান্ত চাহনি এনে মরাল চরণে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলে।

(৩)

সারাদিন কাটল মমতাজের কথা ভেবে। আজ আমার সব কাষেই ভুল। মণি-ব্যাগটা, জামার বোতামটা, সিগারেটের প্যাকেটটা সবায়েরই যেন পাখা গজিয়েছে। মমতাজ আমার প্রিয়, তার ভাবনা আমার কাছে আমার নিশ্বাসের মত। তবু মমতাজের দেহটাকে নিয়ে মনোবিলাস আমি করিনি। সারাদিন এই কথা বলে ভগবানকে ডেকেছি। মমতাজ যেন আমার মত সব কাষে ভুল না করে। তার

জুল ধরা পড়লে তার বে ভয়ানক ক্রতি হবে তার পাঁচ জনের কাছে। তার ক্রতি আমি সহিব কেমন করে। মমতাজকে আমি কাছে পেতে চাই না, তাকে দূরে রেখেও আমার শাস্তি নেই। মমতাজ! মমতাজ! আমার জীবনে ভগবানের আশীর্বাদের মত আলোকময়, তাকে আমি আমার সব কাষের আড়ালে কেমন করে রেখে দি।

সন্ধ্যাবেলা মমতাজ এসে উপস্থিত হোল, আমি শুখন আমাদের পাছশালার টেনিস লনে একখানা ডেক চেয়ারে গুয়ে। কাছে এসে মুখ ভার করে বল্লেন: বেশ আছেন আপনি। বেশ শাস্তিতে কাটাচ্ছেন। আপনার ওপর আমার যা রাগ হয়।

মমতাজের রাগ হয়েছে, কেন?—কেন? তার কথার ওপর আর একটু চড়িয়ে বল্লুম: রাগটা বুঝি আপনার একারই আছে আমার নেই।

মমতাজ সুর নাবিয়ে গ্রীবা বঁকিয়ে বলে: কেন?

আমি বল্লাম: আপনিই বলুন কেন?

তার মুখখানা খুসীতে ভরে উঠল।

যে ছাপ হল্যাণ্ডের দুধের বালতি মাথায় মেয়ের মুখে—মমতাজের মুখেও আজ সেই ছাপ। তার চোখ থেকে একখানা শানানো ছুরী সাঁকরে এসে আমার চোখে বিধল।

(৪)

পরের দিন সকালে। মমতাজ উঠেছে আমার চেয়েও সকালে। লনে গিয়ে গুয়ে আছে আমারই ডেক চেয়ারে। সে পরেছে একখানি চাপা রঙের সিল্ক সাজী, গায়ে তার টকটকে রক্তের মত লাল সিল্কের জামা। দূর থেকে দেখি, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কাছে

গিয়ে আঙুলে আঙুলে বল্লুম: কী, আপনি যে মালবিকার মত তাকিয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের সে গান জানেন তো—‘মালবিকা অনিমেবে চেয়েছিল পথের দিকে—’ সে দীর্ঘনিশ্বাস কেলে মান হাসি হাসল। বল্লেন: কাল সারা রাত ঘুমোয় নি, জেগে বই পড়েছি।—বই পড়েছি তুমি মমতাজ! একি, আমার সব অভ্যাস তুমি কেড়ে নিচ্ছ। আমার বই পড়া, যেখানে তোমাকে আমি ভুলে থাকতে চাই সেখানেও তুমি। আমি আর পারি না! আমার মাথা ঘুরছে! জোর দিয়ে বলে উঠলাম: দেখি আপনার ভ্যানিটি ব্যাগটা। উঃ এত বড় ব্যাগটা! এটাকে নিয়ে আপনি. কী করেন বলুন তো। মমতাজ আমার কথার ওপর আরও জোর দিয়ে টেচিয়ে উঠল: ‘নগরীর নটা চলে জুতিসারে যৌবন মদে মস্তা—’ সারা রাত্রি ধরেই কি মমতাজ কবিতা পড়েছে! ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে পশমের সূতোর বল একটা বার করে নিয়ে, এমনিই অকারণে দেখতে লাগলাম। মমতাজ বল্লেন: নিন ওটা।

আমি বল্লুম: এ নিয়ে কি করব?

মমতাজ হাত থেকে সূতোর বলটা কেড়ে নিয়ে জোরে আমারই কোলে রেখে, ভ্যানিটি ব্যাগটা নিজের কোলের ওপর রেখে বল্লেন: রাখতে হয় রাখুন, না হয় টান মেরে ফেলে দিন। আমার এই সামান্য বোঝা টুকু আপনি বইতে পারেন না।

মমতাজ কেন আমায় এত জড়িয়ে ফেলেছে।

আমার পকেটে ছিল পেন্সিল, তাড়া-তাড়ি সেটা বার করে দিলাম মমতাজের হাতে। স্বপ্ন পথের বাজী আমার। আমার প্রতিদিন তিলে তিলে কম হয়ে

যাওয়া রক্ত বিন্দু এর মুখ থেকেই বয়েছে। জীবনের অনেক কথা অনেক হিলাব নিকাশ আমার এই পেন্সিলটাই জানে সেটাই মমতাজের হাতে সঁপে দিলাম। মমতাজ তাড়াতাড়ি ব্যাগের মধ্যে সেটা পুরে ফেলল।

(৫)

আর একটা দিনের প্রভাত। আকাশ মেঘলা। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমার ঘরের জানলায়। হ হ করে বাতাস আর কুদ্র কুদ্র জলকণা রেবার ধার থেকে এসে লাগছে আমার মুখে চোখের ওপর। আমার অন্তরের বাতাসও আজ হ হ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবছি দাঁড়িয়ে মমতাজকে গিয়ে বলব—‘তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে ফেল।’ তোমার তার আর আমার মন বইতে পাচ্ছে না। আমি ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত সৈনিক। আমার শাস্তি দাও।

মমতাজের প্রকাণ্ড রোলস্ খানা এসে দাঁড়াল সরাইখানার দরজায়। খানসামার দল একে একে স্নুটকেস, বিহানা, বেতের বাক্স তুলতে লাগলো। মমতাজ চলে যাবে? যাক না! —কেন যাবে? আমাকে তো বল্লেন না মমতাজের ঘরের দিকে তাকালুম! তার ভেতরে কয়েকটা লোকের নড়ানড়ি। কিসের তাড়া? তবে কি সত্যিই মমতাজ চলে যাবে? মমতাজ চলে যাবে আর আমায় জানাবে না। আমার চোখে জল এলো—না, না, মমতাজকে ছেড়ে কিছুতেই আমি থাকতে পারবো না। তাকে না দেখে আমি বাঁচবো কি করে। আমার মনের নীতি আমার—ঠেলা দিলে। আমি নিখিলেশ সেন, আমি এত দুর্বল। কিন্তু মমতাজ আমি তো কিছু চাইনি। আমার চোখের সামনে তুমি থাকবে এতেই তো আমার পৃথিবী রতীন!

গাড়ীর কাছে ও কে? ওই কি মমতাজ? ইয়া মমতাজই তো! আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না। ছুটলুম নীচে। কাছে গিয়ে বলুম: একি? আপনি এ পোষাকে কেন? —তার পরণে পেশ-ওয়াজ পায়জামা, ওড়না, হীরের কলার, হীরের নাকছাবি, হীরে হীরে হীরে—সর্বাঙ্গ হীরে দিয়ে মোড়া। উঃ কি বিস্মী দেখতে লাগছে ওকে। গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠছে। বল্লম: আপনি এ পোষাক পরেছেন কেন?

মমতাজ হাতের ছোট্ট রঙীন সিক্কের ক্রমালটা গাড়ীর সিটের ওপর ফেলে বল্লম: পোষাকটা কি খারাপ।

আমি বল্লম: না—তবে কেমন বাইজী বাইজী ভাব।

—এই তো আমার পোষাক।

হেসে বল্লম: তার মানে? আপনি বাইজী নাকি?

—ইয়া।

—কি বলছেন? আপনি বাইজী?

—বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি বাইজী।

—আপনি বাইজী! আমার মুখের ওপর কে সপাং সপাং করে চাবুক চালাতে লাগল। আমি নীতি বাগিশ মনিফিলেশ আমার প্রেম আমার কাব্য আমার দুনিয়ার সুখ দুঃখ এক বাইজীকে নিয়ে।

বল্লম: কৈ আপনি এ কথাতো এর আগে কোনদিন জানান নি।

—জানাবার আবার কি আছে!

—কোথায় যাচ্ছেন?

—ঠিক নেই।

—কবে আসবেন?

—ঠিক নেই

—সবাই ছেড়ে দিলেন?

—ইয়া।

মমতাজ গাড়ীর ভেতর থেকে একটা 'ক্র্যাভেন এ' সিগারেটের টিন বার করে

নিজে একটা ধরালে আমার হাতে একটা দিলে। আমার ফুলরাগী আমার অন্তরের আগ্রার মমতাজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

একটা ভয়ানক গরম বাষ্প আমার সারা বুকখানা ভরে গিয়েছে।

মমতাজ চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে; সব তোলা হয়েছে।

আরো কাছে গিয়ে বল্লম: আপনি সত্যিই আর ফিরবেন না?

—না।

—আর আমাদের দেখা হবে না—

—বোধ হয় না—

—আমার কথা আপনার মনে থাকবে?

—কি করে বলব।

ইচ্ছে হোল বলি, তুমি আমারই সামনে আমারই মুখের ওপর একথা বলছ কি করে? বল্লম: আপনি আমার সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

মমতাজ বল্লম: ইয়া অভিনয়ই করেছি। অভিনয় করাই তো আমাদের ব্যবসা—আমাদের পেশা।

—তবে আমার সঙ্গে আপনি অভিনয় করলেন কেন? আমি তো কিছুই চাইনি।

—কিছু চাননি বলেই তো করলুম। যারা কিছু চায় তাদের সঙ্গে অভিনয় করি না, চাওয়ার মূল্য দি।

আমার চোখের জল ফেটে পড়বে বুঝি। আমার মমতাজ হারিয়ে গেছে। আমি উগ্র হয়ে উঠলাম। টেচিয়ে বল্লম: দাও আমার পেন্সিল, ফিরিয়ে দাও। আমার জীবনের অনেক খবর ও জানে ওকে তুমি নিতে পারবে না।

—পেন্সিল নেই। হারিয়ে গেছে। কোথায় ফেলেছি মনে নেই।

আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল। বল্লম: আমার জন্তে তুমি রাত জেগেছ

—আমারই জন্তে কবিতা পড়েছ—আমারই জন্তে তোমার কটা দিন খারাপ গেছে এটাও তোমার অভিনয়।

—হ্যা অভিনয়! তুমি আমাকে যে কথাগুলো শুনিয়েছ, আমি ঠিক সেই কথা গুলোই তোমাকে শুনিয়েছি।

আমার পায়ের তলায় মাটি ফাঁক হয়ে যেতে লাগল। আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার অন্তর আর্দ্রনাদ করে উঠল—নিষ্ঠুর, আমি তোমার কী করেছি। তুমি আমার ঠকালে কেন? আমার সুখের লোনার দিনগুলির ওপর কেন অমন করে কালি ছিটিয়ে দিলে!

মমতাজ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্লম: চল্লম—Good bye

জোরে গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল, ভিজে রাস্তার ওপর একটা মোটা গাড়ীর দাগ দিয়ে। আমার হাতে তখনও মমতাজের দেওয়া সেই 'ক্র্যাভেন এ' সিগারেট টা। ফেলে দিতে পারলুম না। ধরিয়ে নিয়ে একটা টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল আমিও অভিনয় করেছি। আমাদের জীবনে এমনি করেই তো অসংখ্য জিনিষ সৃষ্টি করি আবার তাকে এমনি কন্ডে পা দিয়ে মুছে ফেলি।

খাতু বঙ্গ ৪৫ মাস বে কারপেই
হটক ভৈরবী বর্নোবধিতে
অব্যর্থ কল—গুণাবহার ব্যবহার
নিবদ্ধ ১৪০ দন্ত ও বর্ণ শাস্তি একবার
প্রয়োগেই উপশম, ১০ বা: ১০ আনা

সবর ৮টা হইতে ১২টা।

মিসেস দাস অনঙ্গ বিশ্বাসদ
১৮২ নং বহুবাজার, ১১ট. (K) কলিকাতা।

ভৌতিক ও রোমাঞ্চকর গল্প

অদ্ভুত অপরাধী

শ্রীমন্তে নারায়ণ রায়

রাত্রি দশটা। কাজের ঝামেলা অনেক কমে গিয়েছে। সমস্ত দিনের শ্রম ক্লান্ত অবশ দেহ আর বইছে না। জোড়া-বাগান থানার প্রবীণ ইন্সপেক্টার মিঃ চক্রবর্তী কাজ সারিয়া উঠিবার উদ্দেশ্য করিতেছেন, এমন সময় একজন শীর্ণকায় দীর্ঘাকৃতি পুরুষ আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। চক্রবর্তী মনে মনে বিরক্ত হইয়া লোকটার মুখের দিকে চাইলেন। এত যোগা লোক সচরাচর দেখা যায় না। যোগা বলে আরও কিরকম দেখাছিল। গায়েই রং বেশ ফরসা, তবে রোদপোড়া গোছের—ফরসা চোখের ন'চে কে যেন খানিকটা কাল কালীর পোঁচ দিয়ে দিয়েছে। বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর হবে। চক্রবর্তী বলিলেন, আপনার প্রয়োজন? ভদ্রলোক বলিল, আমি খুন! ধরা দিতে এসেছি, অমাকে গ্রেপ্তার করুন। চক্রবর্তী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, কি সর্বনাশ, খুন করেছেন? কখন? কাকে? ভদ্রলোক বলিল, ই্যা খুন করেছি বন্ধুকে, বিশ বছর আগে সন্ধ্যার সময় বড় জলের মধ্যে পদ্মা নদীর ধারে। চক্রবর্তী বিরক্ত বিজ্ঞপের স্বরে বলিলেন বিশ বছর আগে পদ্মার ধারে খুন করেছেন আর আজ এসেছেন বেঙ্গল পুলিশের এলাকা ছেড়ে জোড়াবাগান থানায় রাত্রি দশটার সময় ধরা দিতে। মহাশয়ের মাথায় কি একটু চিট আছে? আর এই ত চেহারা। হাঁটতে টলে পড়ছেন আর একটা জলজ্যান্ত লোককে খুন করে, এলেন? আগন্তক

বলিল—হাঁ...হাঁ খুন করলুম। তবে চেহারাটা ঠিক এতটা খারাপ ছিল না, আর আপনি এখনও যা মনে করছেন তা, নয়; এই শরীরেই যথেষ্ট বল আছে বলিয়াই ভদ্রলোক মুহূর্ত মধ্যে চক্রবর্তীকে চেয়ার শুদ্ধ শূন্যে তুলিয়া ধরিল। চক্রবর্তী ভয়ে আরষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। কোন রূপে চেয়ারের হাতল ধরিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, চেয়ারখানি যথাস্থানে নামাইয়া রাখিয়া ভদ্রলোক বলিল, এইবার তো বলের পরিচয় পেলেন?

চক্রবর্তী লম্বা, চওড়া ব্লাকায় পুরুষ, ওজন ৩ মণের কম নয়, প্রোচছে একটু থলু থলে ভাব আসিয়াছে। ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখিয়া থানার সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছিল ভদ্রলোক বলিল, আমি খুন করতে পারি বিশ্বাস হ'ল তো? এইবার আমায় গ্রেপ্তার করুন। ভদ্রলোকের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া চক্রবর্তী ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন। বলিলেন ঐ চেয়ারটার বসুন, আগাগোড়া ঘটনা না শুনে কিছুই বুঝতে পারছি নি।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া বলিল—তবে শুনুন। থানার সকলেই সাগ্রহে ভদ্রলোকের কাহিনী শুনিতে লাগিল—

আমার বাড়ী পদ্মার ধারে কোন বিশিষ্ট এক গ্রামে। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। ভূসম্পত্তি যথেষ্ট আছে, এম, এও পাশু করেছিলাম।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ব্রজকিশোর। তারা আমাদেরই জাতি। অবস্থা ভাল। আমরা এক সঙ্গেই এম, এ পাশ করেছিলাম। গ্রামের মধ্যে ললিতা ছিল সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে—আমাদেরই পাণ্টা ঘর। আমার সঙ্গে তার বিবাহের কথা চলছিল। কিন্তু তার বাবার ধরণ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি আমার চেয়ে ব্রজকে বেশী পছন্দ করতেন।

ললিতারও একটু বেশী টান ব্রজর ওপরই দেখা যেত। ললিতা তার শিক্ষিত বাপের কাছে লেখাপড়া একরকম ভালই শিখেছিলো। ললিতার বাপ কণ্ট্রাক্টারী করে বেশ মোটা কিছু গুছিয়ে নিয়ে কারবার তুলে দিয়ে গ্রামে এসে বসেছিলেন।

তখন না বুঝি, এখন বুঝি, চেহারার দিক দিয়েও বটে আর মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও বটে ব্রজ আমার চেয়ে ঢের উচু ছিল। পিতৃ ধনে আমিই অবশ্য বড় ছিলাম। ললিতার পিতার নির্বাচন ভুল না হলেও, আমার কিন্তু তা অসহ্য হয়ে উঠল।

নারীর প্রেমে বন্ধুত্ব নেই, মনুষ্যত্বও নেই, আছে শুধু স্বার্থ। সে দিন আপনি সুযোগ এসে উপস্থিত হল। পাপ পাতাড়ের উৎরায়ে পথ—চড়ায়ের নয়। নেবে যাওয়া সোজা, পাপের সুযোগ সহজেই আসে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল।

আমি পদ্মার ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন ভাদ্র মাস। পদ্মার কি উদ্দাম গতি, ভীষণ খরস্রোতা! একূল ওকূল দেখা যায় না। শুধু জল। পাড়টা খুব উচু, তাতে ভাঙ্গন ধরেছে। প্রায় 'বিশ হাত নিচে জল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, দেখি ব্রজ কোথা হতে ছিপ হাতে করে

আসছে। তার মাছ ধরা বাতিক ছিল।
আমায় দেখে বলে আর অন্ধকারে কোথায়
যাবি ভাই; ঐ দেখ, মেঘ করে আসছে
এখুনি প্রবল ঝড় হবে।

সত্য সত্যিই ভয়ানক ঝড় উঠে বৃষ্টি
এল। ফাকা পদ্মার পারে দাঁড়ান যায় না।
ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যেন পদ্মার মধ্যে
ফেলতে চায়। ছুজনে পাশাপাশি পদ্মার
পাড় দিয়ে গ্রামের পথে ছুটতে লাগলুম।
বজ্র পদ্মার ধারের দিকে ছিল। হঠাৎ
আমার কি মনে হল, আমি ঝড়ে তার
দেহের ওপর পড়ে যাবার ভান করে
তার গায়ের ওপর সজোরে ধাক্কা দিলাম।

আমার গায়ের জোরের ত পরিচয়
দিয়েছেন? বজ্র টাল সামলাতে পারলেনা
সে একটা করুণ আর্তনাদ করে পদ্মার
খাড়া পাড়ের নিশ হাত নীচের জলে
পড়ে গেল।

পদ্মায় কি ভীষণ তুফান! বোধহয়
দশ হাত উচু এক একটা ঢেউ উঠে
গজ্জন করে পড়ছিল। মানুষ কোন ছার!
সে ঝড়ে ষ্টিমার পড়লেও বাচেনা!
আমি একবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সেই
দিকে চাইলাম। ঢেউয়ের উপর ঢেউ
মাছড়ে পড়ে একটা তাণ্ডব নৃত্য শুরু
হয়ে দিয়েছে। আর কিছুই দেখা যায়
না। শুধু বজ্রর সেই আর্তধ্বনি যেন
সমস্ত পদ্মাটা জুড়ে ঢেউয়ের তালে তালে
ঝড়ের গজ্জনের মধ্যে হা হা করে ঘুরে
বেড়াচ্ছিল।

কি করুণ। কি মর্মান্তিক! আমি
মাতালের মত টলতে টলতে বাড়ী গিয়ে
ভিজ কাপড়েই বিচানায় শুয়ে পড়লুম।
তখনও বজ্রর সেই স্বর, আমাকে ঘিরে
আঁকুলি ব্যকুলি করে বেড়াচ্ছিল।

যেন বলছিল ওরে খল! ওরে জ্বর।
ওরে মিজ্রোহা! ইহকালেও ফাকি
দেওয়া যায় না রে।



স্ব-বালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ৪৪ বোম্বাই

পরকাল পরে পরেই আছে। সেই রাজ্যেই ব্রজর সন্ধান তাদের বাড়ী থেকে লোক এসেছিলো। আমি ঘর থেকেই বললেম, কই! ব্রজ তো আজ এ দিকে আসেনি। কত বড় মিথ্যা! কত বড় প্রবঞ্চনা! গলার স্বর যেন আটকে আসছিল।

নানারূপ বীভৎস স্বপ্নে ভুয়ে আতঙ্কে সমস্ত রাত তন্ত্রাচ্ছন্ন ভাবে কেটে গেল। মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস আটকে যাচ্ছিল কে যেন বুক চেপে ধরছিল। ছুটে বারাণ্ডায় বেরিয়ে পড়ে—তবে যেন দম্ ছাড়তে পারলুম। কি ভয়ানক যন্ত্রনা! ক্লান্তি-হরা, শাস্তিময়ী নিদ্রা সেও পানীর তাপ সহ করতে পারে না।

পরদিন গ্রামে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল, ব্রজকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ছিপটা পদ্মার পাড়ে পড়ে রয়েছে। সকলেই অসুস্থমান কল্লের ঝড়ে পাড় ভেঙে সে পদ্মায় পড়ে গিয়েছে। ব্রজর আর কোনও সন্ধানই হ'ল না।

১ বৎসর পরে বাবা ললিতার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা স্থির করলেন।

ব্রজর মৃত্যুর পর থেকেই ললিতা কেমন হ'য়ে গিয়েছিলো। সে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের ফুল বাগানের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতো সে যেন কি দেখতে পাচ্ছে। কেউ জিজ্ঞাস করলে হাসে—প্রকাশ করে কিছু বলে না। তার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে যেতে লাগল।

তার আর সে লাবণ্য, সে শ্রী নাই।

ললিতার পিতা বৃহ চিকিৎসা করালেন, ফল বিশেষ কিছু হ'ল না। সমাজে বাস করতে গেলে মেয়ে আইবুড়ো রাখা চলে না; কাজেই বিবাহের চেষ্টা 'তাকে করতেই হ'লো।

ভাবলেন—মেয়ের বয়েস হয়েছে বিয়ে না হওয়ার জন্যই বোধহয় এই সব ব্যাধির

সৃষ্টি, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনও সেই রকম মত দিলেন, সকলেই বলতে লাগলেন মেয়ে বড় হয়েছে—বিয়ে হলেই সব শুধরে যাবে, শরীরও ভাল হবে।

বিবাহের কথা শুনেই ললিতা চমকে উঠল।

একদিন সন্ধ্যার সময় তার পিতা একটি বারাণ্ডায় বসেছিলেন—সেখানে অগ্নাবিষ্ঠের মত ললিতা গিয়ে বললে, আমার ত বিয়ে হ'য়ে গেছে, বাবা! সে তো রোজ আসে, রোজ আমার সঙ্গে কথা কয়! আবার বিয়ে দেবে এ তোমরা কি বলছ? হিন্দুর মেয়ের আবার ক'বার বিয়ে হয়?

বিস্মিত হ'য়ে ললিতার পিতা বললেন—কে, আসে? কে, তোমার সঙ্গে কথা কয়? মাথা নীচু করে লজ্জিতা ললিতা বলে কেন তোমার জামাই—যার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলে—

চমকে উঠে তার পিতা বললেন কে? ব্রজ—? ললিতা ঈষৎ হেসে বললে, সবই জান যখন বাবা, তখন আর নুতন ক'রে বের সম্বন্ধ করছো কেন? ললিতা সেখান থেকে চলে গেল।

ললিতার পিতা গভীর চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। আত্মীয়-স্বজন শুনে বললেন ও কিছু নয়, ও এক রকম হিষ্টিরিয়া। মেয়েটা ভেবে ভেবে ঐ রকম হ'য়ে পড়েছে। দেবী করো না শীঘ্র বিয়ে দাও। স্বামীর ঘরে গেলেই ও সব সেরে যাবে। অনেক ভেবে এক রকম নিরুপায় হয়েই তিনি আমার সঙ্গে ললিতার বিবাহ দিলেন।

বিয়ের দিন কি বিভ্রাট! সাতপাক ঘোরান হচ্ছে। মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে। চারিদিকে লোক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আলোকমালায় স্থানটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। আমি যেমন গ'ড়ে মালাটা

হাতে নিয়ে ললিতার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি যাব, কে যেন আমার হাত মুচড়ে মালাটা কেঁড়ে নিয়ে, ললিতার গলায় পরিয়ে দিলে।

ললিতা এতক্ষণ মুখ নীচু করেই ছিল। বারবার করে সকলেই আমার মুখের দিকে চেয়ে ললিতাকে শুভ দৃষ্টি করতে বললে। কিন্তু সে কিছুতেই ঘাড় তুললো না। মালা গলায় দিতেই সে মুখ তুলে চেয়েই একটু হাসলো, যেন এইবার তার সত্যিকার শুভদৃষ্টি যেন তাদের চির মিলন ঘটিয়ে দিলে। মিলন কার সঙ্গে? কার সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হ'ল? বুকখানা তার আনন্দে ভরে গেল, যেন আনন্দের আতিশয্যে সে মুর্ছিত হ'য়ে ঢলে পড়ল। তাড়াতাড়ি পাশের লোকেরা তাকে ধরে ফেলতে নইলে সে পাঁড়ে থেকেই পড়ে যেত।

ধরাধরি করে বাসরে নিয়ে গিয়ে চোখে মুখে জল দিতে তার জ্ঞান হ'ল সে চকিত দৃষ্টিতে ঘরের চারদিক চেয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

লোকে তো দেখলো আমার সঙ্গে বিয়ে হ'ল। আমি কিন্তু দেখলুম সব কঁাকি-শুভলগ্নে মিলন গ্রন্থির শুভ নির্মল পরিপুষ্পমালা বন্ধনে আর একজন তাকে বেঁধে ফেললো। আমি যেমন পর—নিঃসম্পর্ক দূরের লোক দূরেই রয়ে গেলাম।

বুঝলুম—সে যার তারই রইল। জীবনে মরণে ইহকালে পরকালে তারই থাকবে।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চ

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

আমি লুক্ক আকিঞ্চণ, আত্মপ্রভারণা নিয়ে চিরদিনই জন্মবো। কেবল সেই সরল নির্মল কুসুমকোরক আমার পাপের তাপে অকালে তিলেতিলে শুকিয়ে খসে পড়বে। এই আমার লালসার দুর্নিবার পরিণাম।

এ বিবাহে সবচেয়ে আনন্দিত হবার কথা আমার; কিন্তু ব্রজর সঙ্গে সঙ্গে আমার যে আনন্দ চলে গিয়েছিলো বাসরে ফুলের গন্ধে গানের সুরের মধ্যে ব্রজর সেই স্বর তেমনি সক্রিয় সুরে ভেসে এসে আলোকমালাকে যেন স্নান ক'রে তুলুছিল।

আমি সলজ্জ ললিতাকে মনের এ বীভৎসতা ভোলবার জন্তে আলিঙ্গন করতে গেলাম। ললিতা শিইরে উঠে দূরে সরে গিয়ে বললে—না, না তুমি আমায় ছুয়ে না। দেখছো না, ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বিস্মিত হ'য়ে চারিদিকে চেয়ে বললুম কই, কে? ললিতা বললে দেখতে পাচ্ছ না? তোমার বন্ধু। তখনই কে যেন অদৃশ্য হস্তে আমাকে ঠেলে দিলে। আমি বিছানার ওপর চলে পড়লুম। ললিতা ঠক ঠক করে কাপছে আমি স্পষ্ট দেখলুম ব্রজ তাকে আলিঙ্গন করে আশার দিকে চেয়ে হাসছে। সে অক্ষুট হাসি কি তীব্র কি ভীষণ! আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেলুম।

ভোরের কোকিল ডেকে উঠল, আমি চমকে চেয়ে দেখলুম ললিতা সেই ঘরের খালি মেঝেয় শুয়ে আছে।

যদি কখনও মোহে গত কথা ভুলে ললিতার কাছে যাই, কে যেন ঠেলে কিছুই দেখতে পাই না, কোনও শব্দ পাই না। কোনও অদৃশ্য শক্তি আমাদের মিলিত হ'তে দেয় না। তুম্বাকুর প্রাণ, সমুখে মুগীতল বারি—পান করবার অধিকার নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে

যাচ্ছে তুম্বাকুর দাহে সমস্ত দেহ জলে পুড়ে থাক হ'য়ে যাচ্ছে, এ যেন হা-জল হা-জল ক'রে বারিধির বন্ধে ভেসেও এক ফোঁটা জলের জন্তে মরণ বরণ করা। তবুও মরণে তার একটা সার্থকতা আছে আমার জীবন মরণহীন জরা-হীন। প্রতীক্ষার অভিশপ্ত ইহুদার মত ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ নিয়ে জীবন ধারণ করা, যুগের পর যুগ বেঁচে থাকা—এ যে কি ভয়াবহ, বাইরের লোকে কল্পনা করতে পারবে না।

ললিতা এল সংসার করতে লাগল, লোকে জান্নল ললিতা আমার স্ত্রী কিন্তু কিন্তু ললিতা কার? কে তার মথার্থ প্রভু? কে তার অধিকারী? খেতে বসি কোনো অদৃশ্য হস্ত তার অর্ধেক গুলো তুলে নেয় আধ পেটা খেয়ে বেঁচে আছি, তবু মৃত্যু নেই।

এইভাবে বৎসর কেটে গেল। এই অদৃশ্য শাসনের বিরাম নেই। ললিতার মুখে হাসি নেই, আমার মুখে হাসি নেই। কে যেন অলক্ষ্যে হেসে বলে কেমন! ললিতাকে বিয়ে কর। পরকাল পরের কথা, ইহকালেই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলুম। তাই ইহকালেই পাপে এত ভয়।

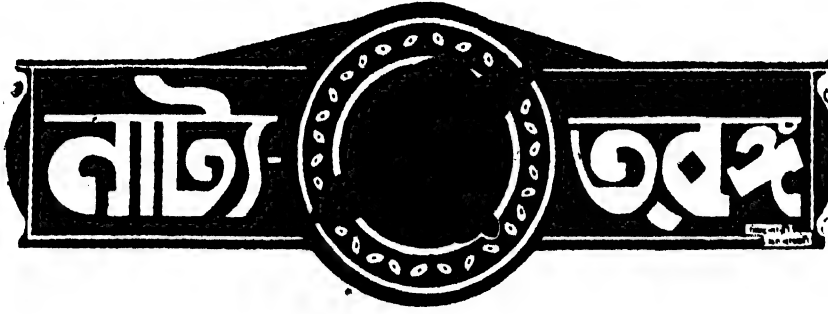
অসহ, অসহ—! ঠিক তেমনি ভাদ্রের বরষা, তেমনি খরশ্রোত, তেমনি ঝড়ের তাণ্ডব কৃত্য—ঝাঁপিয়ে পড়লুম পদ্মায় ডুবে মরতে। কে যেন কোমল শয্যায় শুইয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল দূরে চড়ায় গিয়ে তুলে দিলো, এক ফোঁটা জলও পেতে গেল না একটু শ্রান্তিও এলনা। আত্মহত্যাকারী আত্মাদের কত কাতর হ'য়ে ডাকতে লাগলুম। শুনেছি যে আত্মহত্যা করতে চায়, তাদের নাকি তাম্রা সহায় হয়। এ মিত্রজোহা হতভাগ্যকে ঘৃণা করে তারাও দূরে সরে রইল। সূর্য লাক লাইন দড়ী মোম

দিয়ে বধে পালিস করে গোয়াল ঘরের উঁচু আড়ায় টাঙিয়ে কাঁস করে খুলে পড়লুম। কোথায় শূন্য পায়ের নীচে শূন্যে তক্তা বিছিয়ে কে যেন দাঁড় করিয়ে রাখলে, কাঁস এক চুলও সরলো না।

একটি কেরাসিন তেলে ৩৫ খানি কাপড় চুবিয়ে গায়ে জড়িয়ে দেশলাই জাললুম। একবার দপ করে জ্বলেই নিভে যায়। তিনটে দেশলাই খরচ হল—দেহ ত দূরের কথা—কাপড়ও একটু পোড়া দাগ লাগলো না। রেগে ধারাল ক্ষুর নিয়ে গলায় চেপে বসালুম। যেন গলায় মোটা কাঠি ঘসছি, দাগ পর্যন্ত হল না। সাংঘাতিক বিষ খেলুম—যেন নীচে আর নামে না। অনশন সূর্য করলুম, কোন কষ্ট নেই। ২৫ দিন পরেও দেখি যেমন সবল সূর্য তেমনিই আছি। নৈরাশ্যে হৈসে উঠলুম, আমি মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়।

এমন সময় ললিতার অসুখ করল। সে একদিন বললে দুঃখ কোরনা—বার জিনিষ তাঁর কাছেই থাকি। এ দেখনা তোমার বন্ধু বিয়ের জোড় প'রে টোপর মাথায় দিয়ে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আজ আমাদের সত্যি বিয়ে—ললিতা উৎফুল্ল হয়ে হেসে উঠল। হাসি-টুকু তার মুখ থেকে মিলতে না মিলতেই চোখ দুটো তার বুজে এলো। আর সে চাইলে না। সব শেষ হয়ে গেল।

মাঝে বাপ মা মারা গেলেন। আমি জেলায় ম্যাজিষ্টেটের কাছে গিয়ে হলপ করে ব্রজকে খুন করেছি স্বীকার করলুম। কিন্তু বাইরে খুন প্রমাণ হল না। পাগল বলে ম্যাজিষ্টেট কাটগড়া থেকে নামিয়ে দিলে। কিন্তু সত্যি আমি পাগল নই, বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস করুন, এই দেখুন মৃত্যুও আমাকে ভয় করে, বলিতে বলিতে



সীনটনাথ

সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের

বার্ষিক অভিনয়

৮শারদীয়া পূজার পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের সভ্যবৃন্দ প্রতি বৎসরই প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাদির অভিনয় করিয়া থাকেন। এ বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মাননীয় নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত শৌর্যনাথ রায় মহোদয়ের নেতৃত্বে গত ২১শে সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় ইউনি-ভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ভবনে পরিষদের ষাণ্মাং বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া

ভদ্রলোক জুতা খুলিয়া চলন্ত ইলেকট্রিক জেলের রেঙলেটারের মধ্যে আবুল চালাইয়া দিল। সকলে আতঙ্কে হা হা করিয়া উঠিল..... ভদ্রলোক নীরব, স্থির, কোন যন্ত্রনা নেই। হাসিয়া বলিল দেখলেন ত, আমি মৃত্যুভয়ী কিনা? দোহাই আপনাদের যদি সরকারী ফাঁসিতে ঝুললে আমার মৃত্যু হয় করুন, করুন তাই করুন। অতি কাতর ব্যাকুল ভাবে সে ইনস্পেক্টরের মুখের দিকে চাইল। তারপর হতাশে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে খান, থেকে বেরিয়ে গেল। খানার সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ইনস্পেক্টর চক্রবর্তী পুলিশের কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু এমন অদ্ভুত অপরাধী তিনি কখনও দেখেন নি।—

—[শেব.]—

গিয়াছে। সভাস্থলে মাননীয় বিচারপতি রূপেন্দ্রকুমার মিত্র, পাইকপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত গিরিজা-কিশোর ঘোষ, শ্রীযুক্ত গৌরোকিশোর ঘোষ, রায় বাহাদুর, মল্লিনাথ রায় প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈয়মিত্তিক স্বর্গত পণ্ডিত প্রবর কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহোদয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তৈলচিত্রখানি তর্কবাগীশ মহাশয়ের মধ্যবয়সের প্রতিকৃতি হওয়ায় অনেকের পক্ষে চিত্র দর্শনে তাঁহাকে স্মরণ করিতে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছিল। পরিষৎ কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে তাঁহার পরিণত বয়সের একখানি প্রতিকৃতি স্থাপন করা।

সভা সমাপ্তির পর নাট্যাশ্রোক্ত বিধানামুযায়ী জজরোংসব অনুষ্ঠানের পর পরিষদের সদস্যগণ ক্ষেমীশ্বরের “চণ্ডকৌশিক” অভিনয় করেন। বিশ্বামিত্র, হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা, বিদূষক ও বনেচরের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কান্তিকচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বামিনীকান্ত শিরোমণি মহাশয়গণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বনেচরের ভূমিকা দর্শনে প্রীত হইয়া ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় পণ্ডিত বামিনীকান্ত

শিরোমণিকে একখানি পদক দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। শৈব্যার স্বাী চারুমতীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কমল মিত্রের রূপসজ্জা অতি সুন্দর হইয়াছিল। সে তুঙ্গনায় শৈব্যার রূপসজ্জা একটু স্নান দেখাইতেছিল। রোহিতাশ্বের ভূমিকায় যে ছেলেটিকে নামান হইয়াছিল তাহার অভিনয়ও জড়তাশূন্য হওয়ায় আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

রাত্রি প্রায় ১২টায় ‘চণ্ডকৌশিক’র অভিনয় সমাপ্তির পর ‘হাস্যচূড়ামণি’ নামে একখানি প্রহসন অভিনািত হয়। কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় উহা দর্শনের সুযোগ আমাদের ঘটে নাই।

আমরা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের উদ্ভবোত্তর শ্রীরুদ্ধি কামনা করি।

এবার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্যছিল শ্রীযুক্ত রবিন্ সরকারের “মৃগব্যাধ” নৃত্য। প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা রবিন্ সরকারের এই নৃত্যটির সমালোচনা আমরা পূর্বে একাধিকবার করিয়াছি। নৃত্য ও তাহার অমুগামী সংস্কৃত অভিনয়ের গান কথখানিই সুগীত হইয়াছিল। একত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালাপদ চক্রবর্তী মহাশয় প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। পাপপুরুষের রূপসজ্জা প্রশংসায় হইলেও অভিনয়ে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য দেখা গেল না।

বিনোদ এণ্ড কোং

জরীপ ও নক্সার জব্বাদি ব্লাকবোর্ড ও সাইক্লোষ্টাইলের সজ্জামাদি এবং অফিস টেশনার বিক্রয়। N I P.

রাজবন্দী

শ্রীসমীর ঘোষ

আকাশের দিকে তাকাও বন্ধু গভীর হয়েছিল রাত
কালো শকুনির পাখার পালকে আকাশ মেখেছে কালি;
কোথাও নেইকো আলোর চিহ্ন—কিন্তু উদ্ধাপাত
আমার বুকেতে একদা দিয়েছে প্রলয় আগুন জ্বালি'।
এই ক্ষীণ বুকে আগুনের জ্বালা! বিজ্ঞপে ওঠো হেসে,
সত্যি তো ভাই বড় ক্ষীণ এই বুকের অস্থি কটি,
যক্ষ্মার বীজ আশ্রয় নিলো, দুর্বল খালি কেশে,
কারার প্রাচীরে মাথা ঠুকে ঠুকে গেছি খালি পিছু হঠি'।
রাত্রি গভীর কয়েদী ঘুমায় সারাদিন ঘানি টেনে
দূরে শুধু চলে সমুদ্র জলে জোয়ার তটীর খেলা,
মাঝে মাঝে ছেঁড়ে রাতের আঁধার শাস্ত্রীরা রোদ হেনে
—আমারো চোখেতে আঁধার ছিড়েছে চোখের জলের মেলা।
আমার চোখের জল নয় এতো—বুঝো না বন্ধু ভুল,
আমার মায়ের, বোনের, ভায়ের বেদনার শৃঙ্খল
মাঝে মাঝে করে স্নায়ুমণ্ডলী যন্ত্রণা সমাকুল—
হৃদিস পাইনা রাজবন্দীর চোখে আসে কেন জল!
রাজার বন্দী!...চমকে উঠলে তরাসে বন্ধু ভূমি!
বিদায় নিচ্ছো—নাও ভাই নাও পথ গেছে ওই সোজা।
আমি যে কিন্তু ভালোবাসিয়াছি পথ গড়া ওই ভূমি—
কারার প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরি কোথা সেই পথ খোজা।
সোজা কথা বলি, দিন গুণে গুণে হোঁয়েছি ক্লান্ত ভারী
হৃদ্য চক্রে করে আসা যাওয়া রাখি না হিসাব আর,
মাটির কনিকা অঝোরে কাঁদিয়ে করুণ শব্দ তারি
মনে করে দেয় ছপুর্ রাত্রে অনেক অত্যাচার। •

থাক ভাই থাক অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনী শুনে
তোমার চোখেতে জল আসবে সে দেখতে চাই না আমি,
শিশু হয়ে আছো তোমরা বন্ধু আকাশের তারা গুণে—
আমি দেখিয়াছি সে আকাশে গেছে শকুনির ডানা ধামি'!
বুকের ব্যাথাটা উঠিয়াছে জেগে, কাশিটাও আজ বেশি,
তবুও বন্ধু দিনের প্রহর ছকুম তামিলে গ্যাছে—
চোখ জ্বালা করে জীবনটা হার হোয়ে এলো শেষাশেষি
—সোনালী ধানের মরায়ে প্রেতের নৃত্য কি থামিয়াছে?
পাশবিক সেই শক্তিমত্ত দস্যুর নীতি আজো.
বিশ্বেরে করি' নিঃস্ব রক্ত শাসন করিছে দেশ,
আকাশে উড়িয়ে বোমারু বিমান কোথাও কি দেখিয়াছে।
শাসনের নামে শোষণ এমন—চেয়ে আছো অনিমেধ!
থাক তবে থাক পুরানো কাহিনী চিরকাল ওতো হয়!
সবল সে করে দুর্বল বুকে চিরদিন পদাঘাত,
বুকেতে আগুণ পুষে মরা সেও দুর্বল পরিচয়
—কি জানি ব্যাকুল করে কেন আজ এ অমানিশার রাত!
আকাশের দিকে তাকাও বন্ধু নেইকো আলোর কণা,
সে দিন রাতের ডেকেছিল সারা পৃথিবীরে কুহেলিকা,
ভাই বোন কাঁদে কাঁচুক তাহারা নেই কোন সাহসনা—
নিজে হাতে আমি সে দিন পরেছি আগুনের জয় টিকা।
তারপর—থাক সে সব কাহিনী, কেটেছে বছর কুড়ি—
ক্ষীণ বুকে আজ যক্ষ্মার বীজ—শাস্ত্রীরা হাকে রোদ
—বুকের অস্থি কাঁপে ধরে, ধরো, রক্ত গিয়েছে পুড়ি'
—পৃথিবীর সাথে সব জানা শোনা হোয়ে গেছে শোধবোধ!

মে ২৭৭৪

বড়বাজার

ভারত অয়েল মিলের
তেল ব্যবহারে
বেরি বেরি হয় না

মিল-২৪৩, আপার সারদুলার রোড - কলিকাতা।

কল্পকথাকল্প

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ—

দ্বিদিন চার পাচ বাদে নীরদ বাবুর বাটীতে জগদা আসিয়া দেখা দিল। জগৎতারিণীর সহিত দেখা হইলে জগদা প্রথম ললিতার জন্ত খুব শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। বৃদ্ধের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িল, এবং বালকের মত তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিলেন।

‘কিছুক্ষণ পরে, লবঙ্গর বিষয়ে কথা উঠিল।

—কই জগদা? লবঙ্গর জন্তে তোমরাত কিছুই করলে না?

—আপনি ভার দিয়ে গেলেন জামাই বাবুর উপরেই প্রধানতঃ! আমাকে ত শুধু তাঁর তাঁবেদার রেখে গেলেন।

—জামাই বাবুও কিছু করেন নি, তুমিও কিছু করেনি। কেন করবে? তোমাদের নিজের ঘাড়ে ত কোনও চাপ লাগছে না; এযে আমার উপকার করা কিনা, কাজেই—

—আর লজ্জা দেবেন না দিদি! আমি আপনার পা ছুয়ে দিকি করছি, এবারে একটা কিছু করে দেবোই। এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি খোরাকির জন্তে নালিশ করে দিচ্ছি!

খোরাকির টাকা হাতে করে কোথায় থাকবে বল দেখি! একটা জায়গায়, মাথাগুজে থাকতে হবে!

জগদা খপ করিয়া বলিলেন: কেন আপনার কাছে?

—আমি আর সংসারের কোনও কিছুতে নিজেকে জড়ানো চাইনে! একটা সমর্থ মেয়ে মানুষ কাছে রাখা বড় জালা।

জগদা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন: কি জানেন দিদি, বাধন জিনিষটা এমন যে, যার ওপর এটা এসে পড়ে তার ইচ্ছের ওপর এটা নির্ভর করে না,—নির্ভর করে যে বাধছে তারই ভাগ্যলিপির ওপর।

জগৎতারিণী উত্তরে বলিলেন: কিন্তু বাধন নেবার শক্তিতুকুও যে আমি হারিয়ে ফেলেছি জগদা!

কথা আর না বাড়াইয়া জগদা বলিয়া বলিলেন: যাক! আমায় তাহলে কি করতে হবে, সেইটে বলুন।

জগৎতারিণী বলিলেন: আমি বলি, তুমি কোনও ফিকিরে লবঙ্গকে তার শ্বশুর বাড়ীতে বাহাল করবার চেষ্টা করো।

লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন: ওরে বাবা! তার চেয়ে বলেনা দিদি, শুল্লর বনের একটা মানুষকে বাঘকে তোমার কাছে ধরে এনে দিতে।

কিন্তু জগৎতারিণী হাল না ছাড়িয়া বলিলেন: অমন করে লাফিয়ে উঠলে চলবে না জগদা! জানি কাজটা খুবই

শক্ত! কিন্তু এটাও জানি যে তুমি চেষ্টা করলে হয়তো এ কাজটা ঘটেও যেতে পারে।

জগদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল: মোটেই না, মোটেই না দিদি!

জগৎতারিণী একথাতেও না দমিয়া বলিলেন: জগতে অসাধ্য বলে কোনও কাজ আছে জগদা? ছুভিকের সময়েও যখন তুমি খাজনা আদায় করতে, তখন কি একটা অসাধ্য কাজ সাধ্য করে তোলো নি?

—একাজ কিন্তু তার চেয়ে অসাধ্য।

—আচ্ছা অসাধ্য না হয় হলো। কিন্তু তা'বলে চেষ্টা করতে দোষ কি। আমি তোমায় একটা ফিকির বলে দিচ্ছি। তুমি সেই রাস্তা দিয়ে চলে দেখ দেখি।

জগদা জিজ্ঞাসু নেত্রে জগৎতারিণীর দিকে চাহিলেন।

—তুমি জামাইকে বেলো লবঙ্গকে ঘরে রাখবার জন্তে আমি তাকে মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে খোরাকি ধরে দেবো। জামাইটার গুনেছি হাঁড়ির সংস্থান তেমন নেই। তার ওপর তার দাদা ইস্তফা দিয়ে সরে পড়েছে। গেলো মাসে কলেরায় সেও নাকি মারা পড়েছে। এখন সমস্ত সংসারের ভার জামাইয়ের ঘাড়ের উপর। এ সময়ে তার টাকার খারিজ খুব। এই সময় একবার চেষ্টা করে দেখো, হয়তো সফল হতে পারবে

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৮এ, বাতজোয় সুবাসী রোড,

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

তরানীপুর

জগৎতারিণীর কথা শুনিয়া জগদা
বিস্মিত হইয়া গেল।—বলেন কি? মাসে
মাসে কুড়িটাকা ক’রে দেবেন? নিজের
পরিবারকে প্রতিপালন করার জন্তে?

কি করি বলো? মেয়েটার ত একটা
গতি করা চাই।

—কিন্তু মেয়েটা তো আপনার নিজের
নয়! আপনার দূর সম্পর্কে জ্ঞাতির মেয়ে!
পাড়া-প্রতিবাসা! এই তো?

মেয়েটা যে আমায় মা বলে ডাকে
জগদা? সে ডাকের কি কোনও মূল্য নেই?
পেটে ধরলেই কি আপনার হয়? তা না
হ’লে কি হয় না? সে যে তার নিজের মাকে
ভুলে, আমাকে তার শূণ্য স্থানে বসিয়ে
আজ কত বছর আমার স্নেহের দ্বারেই
হাত পেতে বসে আছে, চোখের জলে
তার হাত ভরিয়ে দিয়ে তাকে ফেরত দেবো
কেমন করে?

দিদি! তোমার অন্তঃকরণটা খুব বড়
জাম্বাম। কিন্তু তুমি যে তোমার জননী
স্নেহে সমস্ত পল্লীটাকে আচ্ছাদন করে
ফেলেছো, পল্লী ও মাঝখানে যে এতটুকু
ফাঁক আর থাকতে দাওনি,—এ দেখে
আমি যতটা বিস্মিত হচ্ছি, তার চেয়ে
বেশী প্রশংসায় অস্থির হয়েছি। লবঙ্গ আর
জন্মে অনেক পুণ্য করে এসেছিল তাই
এজন্মে তোমার মত মা কে পথে কুড়িয়ে
পেয়েছে। আমিও ধন্য যে আমার মুখ
তোমাকে দিদি সন্ধান করে চিরকাল
তার্খজেলে স্নান করে এসেছে। তবে আর
তোমাকে বারণ করোনা! একটু পদধূলি
দাও,—দেখি, সেই পাথেরের জোরে
তোমার কাজ হাঁসিল করে আসে পারি
কিনা!

জগৎ তারিণী জগদার কথা শুনিয়া একটু
হাসিলেন মাত্র!

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকের দপ্তর

মাননীয় ‘খেয়ালী’ সম্পাদক মহাশয়,
সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার কাগজের এক কোণে আমার
এই সামান্য পত্রখানা স্থান পেলে বিশেষ
বাধিত হ’ব।

গত ১লা ভাদ্র ‘খেয়ালী’তে শ্রীমনীন্দ্র
চক্রবর্তী মহাশয়ের “সমালোচনার গলদ
কোথায়” প্রবন্ধটি পড়লাম। তিনি
লিখেছেন “আমাদের দেশের যে কোনও
ছবি পর্দায় বা’র হ’বার সঙ্গে সঙ্গেই
চারদিক্ থেকে কাগজের মারফতে যে
প্রকার সমালোচনার বহুর দেখা যায়,
তাতে ক’রে ভাল ভাব কিম্বা মন নিয়ে
কোন দিনই কোন ছবি দেখতে যে’তে
পারি নাই।”.....

ছবি দেখতে যাওয়া যে কয়েক ঘণ্টা
আমোদ প্রমোদে সময় কাটান ইহা সত্য;
তবে যে জিনিষটির যেখানে যাহা দেখান
আবশ্যক তা যদি ঠিক সেই প্রকারের
না হ’লো,—আর তাই নিয়ে যদি সমা-
লোচকেরা মাথা ঘামান তবে সে দোষটা
সমালোচককে দেওয়া ঠিক নয়। তাঁদের

কর্তব্য শুধু ভাল মন্দ বিচার করে’ লোক
সমক্ষে আসল জিনিষটি প্রকাশ করা।
আমাদের মনে হয় এই সব ব্যাপারে
সমালোচনাটাই সব চেয়ে বেশী দরকার।
আর সমালোচনা হয় ব’লেই আমাদের
দেশের (আমাদের দেশেরই বা কেন,
অস্ত্রান্ত দেশেরও) ছবির এতটা উন্নতি
ক’রতে পেরেছে। সমালোচনার দোষ
ক্রটি দেখে’ প্রযোজক মহাশয়েরা পরবর্তী
ছবির দোষ ক্রটি শুধরে, নিতে
পারেন এবং পূর্বের ছবির চেয়ে পরের
ছবিখানা বা’তে ভাল হয় সেই চেষ্টা
করবার সুযোগ পান। তাই সমস্ত
ব্যাপারেই সমালোচনাটাই সবচেয়ে বেশী
দরকার তা বোধহয় কেহই অস্বীকার করেন
না। আমার বিশ্বাস যে নিষ্ঠুর সমা-
লোচনাই আমাদের দেশের ‘ছবিকে
আরও বেশী করে’ উন্নতি পথে টেনে
নিয়ে বা’বে। আমার নমস্কার গ্রহণ
করুন। ইতি

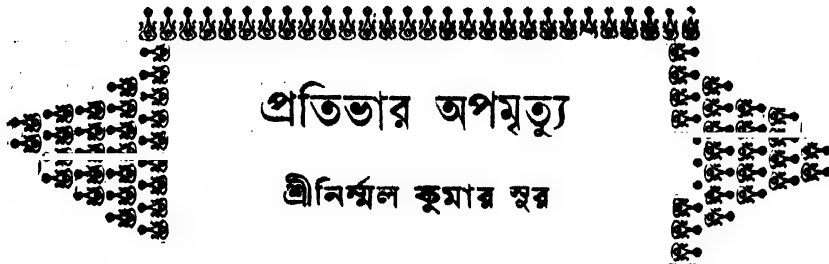
কুমারী রমা বসু (Miss Roma Basu)

৩৩ খাজে দেওয়ান রোড, ঢাকা।

—:—

৩য় আর্ঘ্যনিখ 3
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
মডার্ন ইলেক্ট্রিক
স্টুডিও
৩২-মি
৪৫-মি
৬০-মি
৭৫-মি
৮০-মি
৯০-মি
১০০-মি
১২০-মি
১৪০-মি
১৬০-মি
১৮০-মি
২০০-মি
২২০-মি
২৪০-মি
২৬০-মি
২৮০-মি
৩০০-মি
৩২০-মি
৩৪০-মি
৩৬০-মি
৩৮০-মি
৪০০-মি
৪২০-মি
৪৪০-মি
৪৬০-মি
৪৮০-মি
৫০০-মি
৫২০-মি
৫৪০-মি
৫৬০-মি
৫৮০-মি
৬০০-মি
৬২০-মি
৬৪০-মি
৬৬০-মি
৬৮০-মি
৭০০-মি
৭২০-মি
৭৪০-মি
৭৬০-মি
৭৮০-মি
৮০০-মি
৮২০-মি
৮৪০-মি
৮৬০-মি
৮৮০-মি
৯০০-মি
৯২০-মি
৯৪০-মি
৯৬০-মি
৯৮০-মি
১০০০-মি

N. I. P.



প্রতিভার অপমৃত্যু

ত্রিনির্মল কুমার স্মর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)।

এই ঘরের মধ্যে থাকে সারা দিনরাত বন্ধ হয়ে। মা এত বকেন, বলেন—হতভাগা ছেলে বাইরে একবার কোথাও ঘেড়িয়ে আরতো, দেখি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রাতদিন বসে আছে বই পড়ার আর কাগজ কলম নিয়ে।

মৃণালবাবু ঈষৎ চোখটা ভুলে বলেন—কোন ইয়ারে পড়ে? সেকেন্ড ইয়ারে বুঝি? তবে, একটু বয়স বেশী হয়ে গ্যাছে। বাক লেখাপড়ায় মন থাকা ভাল। আর ছুটো বছর বাদে দি-এটা দিলে আর কেউ নাক সিঁটকাবে না।

—ওর দাদা বলেন—কলেজে কোথায়, কলেজের গোড়ায় ও অনেকদিন নমস্কার করেছে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃণালবাবু বলেন—ও। চাড্ডি রাবিশ নভেল বুঝি? তারপর একটু বেশ এয়ার নিয়ে বলেন—আর দোষই বা কি বলুন। কাজারে যে সব নভেল বেরুচ্ছে ছেলেগুলোর মাথাটা একেবারে খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। সেই এক যেয়ে প্রেমের কাঁছনি আর ভ্রাকামো। আপনিই মাত্র নিয়েছেন অল্প রাস্তা। আপনার লেখা পড়লে বুঝতে পারি দেশে হয়তো ভালো কিছু আবার বেরুবে শরণ-বাবুর পরে। ইতিহাস আপনার ধারা দেশে নতুন শ্রোত আসবে। তাইতো এসেছি আপনার সাথে ঘেঁষে আলাপ করে বন্ধ হতে, আর আমাদের পছন্দকেও বন্ধ করতে।

ওর দাদা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন যে ওঁরা চপলের কথাই বলছে তাই উনি জিজ্ঞাসা করলেন—কার কথা বলছেন আপনারা?

—দেখুন, বিনয় আপনাদের ভূষণ। তবুও আবেগকে চেপে রাখা যায় না, যেখানে সত্যসত্যি থাকে শ্রদ্ধা বা ভাল-বাসা। নিজের প্রশংসা একেবারে সামনি সামনি শুনতে বোধহয় কেউই পছন্দ করেন না। তবুও সত্যি যা তাই বলেছি, দোষ করে থাকি তো ক্ষমা করবেন।

ওর দাদা মনে মনে হেসে বললেন—দেখুন আপনারা গোড়াতেই করেছেন ভুল—আর মধ্যখানে এসে পড়ে আমিও করেছিলাম ভুল। এখন বুঝতে পেরেছি ভুলটা,—তাই আপনাদেরও উদ্ধার করতে চাই।

—বলুন। আমাদের তথা সারা দেশের ভুল শোধরানোর ভার যে আপনাদের হাতে দিয়েই পাঠিয়েছেন ভগবান।

—ঠিক তাই নয়, ওর দাদা বললেন। ব্যাপারটা ক্রমশঃ হয়ে উঠছে জটিল, শেষ-কালে আপনারাও জিভ কাটবেন আর আমাকেও অপদস্থ হতে হবে।

—সেকি? কি বলছেন আপনি? মৃণালবাবু বললেন।

—বলছি কি—আপনারা যার কথা বলছেন, যা বয়সে উনি দেখা করতে এসেছেন তার নামকরণ চপল বন্ধু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অর্থাৎ আপনার সাথে...

—দাডান, অত শীঘ্রই চিনে ফেলবেন না চপল বন্ধুকে।

—তার মানে?

—তার মানে এই যে—যে এতক্ষণ বসেছিল আপনাদের সামনে, অর্থাৎ যাকে বললেন ক্র্যাঙ্কড, মানে যিনি আমার দেশের লোক বলছিলেন, জাট ইজ্ সেকেন্ড ইয়ার ষ্টুডেন্ট করে দিয়েছিলেন যাকে—তিনিই চপলবাবু—অর্থাৎ যার আসনে আমাকে বসে-আইনী করে বসিয়ে করছিলেন সুখ্যাতি। আমি নয়।



বাল্যমৃত্যু

শিশুদিগের শক্তিবর্দ্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়

ঔষধালয়ে

পাওয়া যায়।

মৃণালবাবু ও তাঁর দলটি বিষয়ে চোখ দুটোকে কপালে ঠেকাবার চেষ্টা করে বললেন—এ্যা বলেন কি?

ওর দাদা বলেন—অর্থাৎ ছি, ছি কি লজ্জার বা দুঃখের কথা, অথবা তিনি কি ভাববেন, এই তো? নির্ভর থাকতে পারেন ওর এসব কোন কালেই খেয়াল থাকে না। লোকজন দেখলে নার্ভাস হয়ে পড়ে তাই কি উত্তর দেওয়া উচিত ঠিক করতে না পেরে একটা যা তা বলে বসে। একবার ভেবেও দেখে না ওর উক্তির কি অর্থ হতে পারে। একটু হস্ যদি ওর থাকতো তাহলে তো আমার খাটনি অনেক বেত কমে।

মৃণালবাবু বললেন (ওঁর দল তখন চুপ করে আছে)—দেখুন তো কি ভুলই করে বসলাম। প্রথমে ওঁকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটা চপলবাবুর বাড়ীতো? উনি—হ্যাঁ বলে ভেতরে নিয়ে এসে বসালেন। তখন ওঁর পরিচয় পেলাম না বলে মনে করলাম—চপলবাবুর বাড়ী খুঁজছি নিশ্চয়ই চপলবাবুকেই দরকার এ কথা উনি বুঝবেন।

অত সোজাসুজি যদি ও বুঝতে শিখতো তাহলে ভাবনাই ছিল না। চপলবাবুর বাড়ী জিজ্ঞাসা করেছেন ও চপলবাবুর ঘরেই এনে বসিয়েছে। ওখানেই ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে।

—বাঃ জিজ্ঞাসা করলাম যে—চপলবাবু আপনার কে হন—উনি বললেন প্রথমে কেউ না, তারপর বললেন বন্ধু তারপর দেশের লোক।

—ওকে আপনারা যেমন জিজ্ঞাসা করেছেন ও সোজাসুজি তারই উত্তর দিয়ে

ম্যাক বোর্ডের সরঞ্জামাদি
“বিনোদ এণ্ড কোং”—এ
পাওয়া যায়।

N. I. P.

ইফ্ ছাড়তে চেয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করতেন—আপনার নামই চপলবাবু? তাহলে ও কাচু মাচু হয়ে পাড়াতো হাত জোড় করে—যেন ‘চপল’ এই নাম ধরে ও ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে তা থেকেই আপনারা বুঝে নিতে পারতেন। আপনারা ঘুরে গ্যাছেন, ওর নার্ভাসনেস আপনারা দেখিয়েছেন। যাক দোষ কারুরই নেই। আপনারা বসুন; আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি বলে ওর দাদা বেরিয়ে গেলেন।

মৃণালবাবুদের অবস্থা তখন ঠিক স্বাভাবিক নয়, কি ভাবে কথা বলে ওর প্রতি এই তাকিল্য দেখানোর অপরাধ স্থান করবে সেই কথাই ওঁরা আলোচনা করতে লাগলেন।

চপল ততক্ষণে দরজার সামনে এসে হাজির—চায়ের পেয়ালা শুদ্ধ চাকরটাকে নিয়ে। টিপসটা এগিয়ে দিয়ে বলেন:—একটু চা খান। মা পাঠিয়ে দিলেন। আর এই সিগারেটগুলো। হ্যাঁ এগুলো মা পাঠিয়ে দেননি। মিথ্যা কথা বলে মা শুনতে পেলে আমাকে ভয়ানক বুকবে। বলে ও নিজের ষায়গায় আবার এসে বসলো।

মৃণালবাবুর দল ততক্ষণে উঠে দাড়িয়েছেন। হাতজোড় করে বলে চলেন—দেখুন, ভয়ানক ভুল গোড়াতেই করে ফেলেছি। তার জন্ত ক্ষমা করবেন। ইংরাজীতে বলেন—ভুল করাই মানুষের স্বভাব। ছি, ছি কি লজ্জার কথা বলুন দেখি। আপনাকে বুজতে এসে আপনাকেই দিলান ঘর থেকে তাড়িয়ে, আপনারই ঘর থেকে একটু বুঝতে পারিনি আপনিই উদীয়মান কবি সাহিত্যিক চপল বন্ধু। মনে করেছিলাম আমাদের দেশের সকল কবি মায় কালকের সরস্বতী পূজার গান লেখা কবিশুলো পর্যন্ত যেভাবে থাকেন বা চলেন অর্থাৎ লবঙ্গ লিঙ্কাতাবে, চপল বন্ধু এতখানি নাম করে নিশ্চয়ই তাদের জাত ছাড়া হবেন না। কবিদের গায় সাট কোট উঠতে দেখিনি, আলখাল্লা গোছের পাঞ্জাবীর ভেতর শীর্ণ শরীর গলিয়ে, গলায় জড়িয়ে চলেন চাদর। মনে হয় বুঝি দম বন্ধ হয়ে আসবে। যেন ফ্রিল দেওয়া মোটা বালিশের খোলের ভেতর ঢোকান হয়েছে সরু বালিশ, সামঞ্জস্য নেই। আপনাকে তাই যখন দেখলাম—হেঁড়া গেঞ্জির ওপর একটা ময়লা কোট চাপিয়ে বেরিয়ে

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা
গ্যারান্টি চিরস্থায়ী! গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!



বাহ্যগত বিক্রয়কালীন এড্‌ও মুনা
পাওয়া যায় প্রত্যেকের মনোমত
অনুসৃত মতের মতল মতম-মুনা

পাওয়া যায়। হারিয়ে ও গঠন নৈপুণ্যে বিশেষ লক্ষ্যের প্রেত আর্দ্রণ। স্ব পালিশ
লোহার তার চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্য লিখুন।

বি ব্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেন্ট গোল্ড মিডিকট
৩০নং কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। (৩০নং স্ট্রিট থাকেটের সম্মুখে)
ফোন ২ ২২, ২৩০০

এসেছেন, তখন আমাদের মনের সাধারণ
কবিগুলোর ছবির সাথে মিললো না।
ওখানেও করলাম ভুল। ধারণাই করতে
পারিনি আপনিই তিনি ষাঁড় বিষয় আমরা
মনে মনে কত করনাই করে এসেছি।
অপরূপ আছে চপলবাবু—কমাও তার
আছে, বিশেষ করে আপনার মত দরদী
লোকের কাছে।

চপল আবার নার্সাস হয়ে যেতে
লাগলো। ওর দাদার কথা মনে করে
ও একটু শক্ত হতে চেষ্টা করে বললে—
দেখুন ওসব কিছুই ন', মানে, অর্থাৎ
আমারও কেমন ভুল হয়ে গেল। তাইতো
নিজে এতখানি লজ্জায় পড়ে গেলাম।

মৃণালবাবুরা ভেবেই পেলেন না—ওর
লজ্জার কারণ কি থাকতে পারে।
নিজেদের লজ্জার কথা ভেবেই ওরা
তখন প্রায় ঘেমে উঠেছিলেন। তাই
চপলের মুখ থেকে ওর কথা শুনে আশ্চর্য
হয়ে কথার মোড় ফিরিয়ে বললেন—
যেতে দিন। যা হবার তাতে হয়েই
গেছে। এরকম লজ্জায় আমি কোনদিন
পড়িনি। যাক সে কথা এখন আপনার
কাছে যে প্রার্থনা নিয়ে এসেছি—তার
আজ্ঞাই পেশ করি। তারপর পকেট
থেকে একটা রঙীন কার্ড বার করে ওর
দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—আমাদের
'মিলনী' হচ্ছে একটা ছোটখাট সাহিত্য

সমিতি। আপনাদেরই লেখা নিয়ে করি
আলোচনা। আজ তার পূর্ণিমা সম্মেলনে
সকল সভ্য ও সভ্যাই আপনার দর্শন
প্রার্থী। ধন্য হব আমরা আর হবে
আমাদের মিলনী—আপনাদের পায়ের
ধুলো পেলো। যেতে আপনাকে হবেই—
এতগুলো আপনার গুণগ্রাহীকে বঞ্চিত
করতে পারবেন না' কোন প্রকারেই।
শ্রদ্ধায় তৈরী হয়ে থাকবেন, আমিই নিয়ে
যাবো আপনাকে, আবার পৌছে দিয়ে
যাবো।

চপল এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল
ওঁদের কথা। সাহিত্য সমিতিতে গিয়ে

গান

হৃদয়োৎসাহ কুমার ব্যানার্জি (বাঙ্গা)

স্বপনে আগিছে শিয়রে আমার কাহার আনন খানি
মরমে পশিছে মরম-কাঁদান-বেদনা-মাখান বাণী ॥
ত্রিলোকের বাধা মনের ভুবনে,
বসায়ছে মেলা স্বপন-কাননে,
নয়ন আমার সহিছে বেদনা এসগো হারাণ-রাণী ॥
কোকিল কাঁদিছে বসন্ত-লগনে,
হারাণ-প্রিয়ার স্মৃতি আবরণে,
ঝরিছে তেমনি
ভোলা আঁখি-মণি
আকাশের চাঁদ আকাশের বুকে জানি ॥

ও কি করবে ভেবেই পেলো না। তাই।
জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে বললে—দেখুন.....

মৃণাল ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে
বললে—দেখুন টেখুন নেই এর ভেতর।
যেতে আপনাকে হবেই, ছাড়তে আপনাকে
পারি না কিছুতেই। শরীর অসুস্থ থাকলে,
আপনার উপস্থিতিই আমাদের উৎসাহ
দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাতেই আমরা
ধন্য হব। কোন কষ্টই আপনার হতে
দেব না।

চপল হেসে বললে—আমি তা বলছি
না। আমি বলছিলাম কি যে আমি গিয়ে
করবো কি। বক্তা আমি নই, সাহিত্য
সঙ্ঘে জ্ঞানও আমার অল্প পরিসর। তাই
যতটা আশা আপনারা করেছেন আমার
কাছ থেকে, ততটা না পেয়ে নিরাশ
হবেন। মনে যা আসে লিখে চলি, কলমের
মুখে কি যে ছাই পাশ বেরয় তা নিজেই
খেয়াল রাখি না। মনের কথা মুখে বার
করবার চেষ্টা হয় ব্যর্থ। আপনার 'মিলনী'
পূর্ণিমা-সম্মেলনোতে গিয়ে হয়তো বড় জোর
কাঠের পুতুলের মত থাকবো বসে।

(ক্রমশঃ)

ইন্দিরামাষ্টা



শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

GRAM: "ADHIVAG" 98/১, ফ্লাইড স্ট্রিট, কলিকাতা

খেয়ালী চিত্রপট

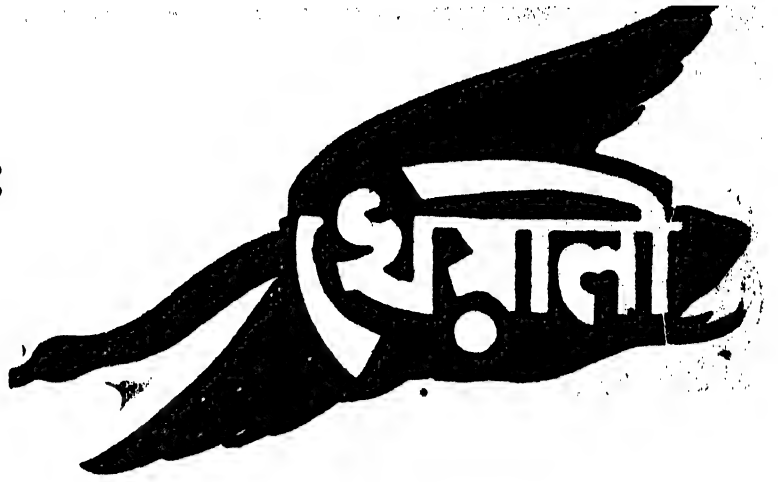


নিউ থিয়েটার্সের আগত প্রায়
কথা-চিত্র "সাধী"-র দুইটি বিশিষ্ট
দৃশ্য। ছবিখানা পরিচালনা
করেছেন তরুণ পরিচালক
শ্রীযুত ফণি মজুমদার।

পরিচালক : ন্যাশনাল মিউজপেপাস লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১০ই কার্তিক ১৩৪৫, ২৭শে অক্টোবর ১৯৩৮ } চত্বারিংশ সংখ্যা।

মধু চক্রে

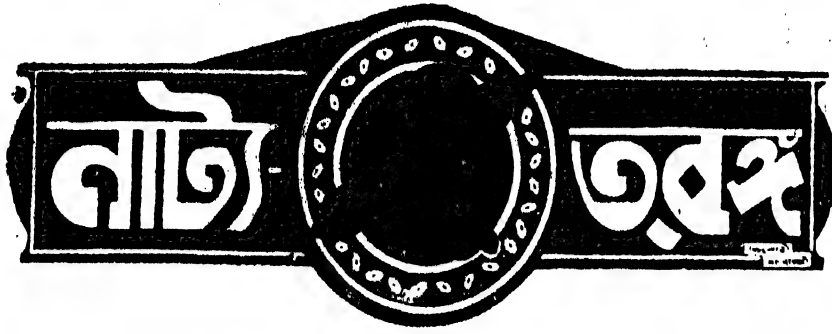
পত সংখ্যার 'খয়ালী'তে কংগ্রেসনেতৃবর্গ ও কংগ্রেস মন্ত্রীদের মধ্যে যে দুর্নীতি পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার ইঙ্গিত করিয়া, কষাখাত করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের সাময়িক পত্রাদি বিশ্লেষণ করিলে মিংপেনক্ষ্যাক্ত মাংসেই বৃদ্ধিতে পারিবেন যে গতায়ু মন্ত্রীদের মধ্যে কাহারও কাহারও নৈতিক চরিত্র সন্দেহাতত মিলনা তৎব্যতীত জনৈক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পুত্র-বৎসল্যের আধরণে পক্ষ-পাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রকাশ যে মন্ত্রীবরের পুত্রকে এক জিগার সরকারী উকিলের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর একটি অভিযোগও গুরুতর। একজন মন্ত্রী যে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা তৎবিল তৎরূপ ও অত্যাগ অভিযোগের দরুণ সরকার কর্তৃক সেই মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা অপহরণ করা হইয়াছে। গভীর প্রতিপত্তির বিষয় সর্দার বল্লভভাইয়ের বাৎসর্য হেতু এই সমস্ত অভিযোগের চোঁন নিংপেনক্ষ অনুসন্ধান হইল। - অধিকন্তু খামাচাপাই পড়িল। ভিসপ্লেনের জাঁতাকলে পড়িয়া ডাঃ মুঞ্জের নিষ্পিষ্ট হইয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে কি কংগ্রেসের গোঁব বৃদ্ধি হইয়াছে ? ডাঃ মুঞ্জের

বিরুদ্ধে অগ্রাণ অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ বাস্তবিকই হাস্যকর ও চমকপ্রদ। জনৈক মন্ত্রীর বিভাগীয় 'ফাইল' অদৃশ্য হইলে ডাঃ মুঞ্জের নাকি মন্ত্রীবরের বিরুদ্ধে সি, আই, ডি নিযুক্ত করেন। - ইহাতেই কংগ্রেসের বড় কর্তার নল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশ্য সি, আই, ডির অনুসন্ধানের ফলে উক্ত ফাইল বার-বাণিতার কক্ষ হইতে পাওয়া গিয়াছে!!

শুধু পাঁচ শত টাকা বেতন গ্রহণ করিলেই কংগ্রেসী আদর্শ গৌরাবত হয় না। বরং অল্প বেতন ধার্য করায় অগ্র ভাবের দুর্নীতি অধিকতর ভাবে দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যদি ইতিমধ্যেই সতর্কতা অবলম্বন না করেন তাহা হইলে অচিরেই কংগ্রেসী মন্ত্রীবর্গের মধ্যে অনেকই আদর্শচ্যুত, ঘৃণিত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িবেন। আমরা বারান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

বিস্তারিত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দুর্নীতির দেবারোপের আভাস আমাদের কর্ণ-গোচর হইয়াছে বনিষ্টভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমরা পরবর্তী সংখ্যায় তাহা পত্রস্থ করিব।

নিঃস্বস্তান্তরিক মধুচক্রে অলিঙ্গল শুধু আকৃষ্ট নয়, আকণ্ড হইয়া পড়িয়াছেন!!



স্মানটনাথ

“বাংলার বোমা”

গেল মহাষ্টমীর দিন থেকে ‘টার থিয়েটারে’ অভিনীত হচ্ছে। “বাংলার বোমা” - গোয়েন্দা নাটক। ঘটনাটি সংক্ষেপে হচ্ছে - স্বদেশীর নামের দোহাই দিয়ে এক দল শিক্ষিত যুবক ‘অগ্নিচক্র’ নামে একটি দল গড়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি, ডাকাতি ও নরহত্যা করে দেশের মধ্যে দস্তুরমত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছেছিলো।

এই দলের নেতা ছিল অশনি ও তার সহকারী ছিল করালী এবং সহকারিণী ছিল তড়িতা। অশনিকে তড়িতা ভাল-বাসতো; কিন্তু অশনি তার কার্যসিদ্ধির কলরূপেই তড়িতার সঙ্গে যখন যেকোন ব্যবহার করা দৃষ্টিভঙ্গি সেইরূপই কোরত। তড়িতা মনে জানে জানতো অশনি তাকেই ভালবাসে - কিন্তু যেদিন আত্মরক্ষার জন্য কান্না দিয়ে সে পুলিশ ইন্সপেক্টরের

কক্ষকে বিয়ে করে উধাও হল, যেদিন থেকেই তড়িতার মন সন্দেহ দোলায় দুলে উঠল। কিন্তু অশনি লীলাকে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যই গ্রহণ করেছে—এরূপ স্তোকবাক্যে তাকে ভোলাবার চেষ্টা কোরল। কারণ, তার এই বিরাট চক্রতির নায়িকা হচ্ছে তড়িতা সে ভিন্ন তার এই অভিযান যে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়বে এ তার ভাল করেছেই জানা ছিল। এদিকে যখন অশনির দলবল ধরা পড়ল তখন সে লীলাকে নিয়ে বরাহনগরে এক গুপ্ত আড্ডায় গিয়ে উঠল। কিন্তু সেখানে থাকাও নিরাপদ নয় মনে করে অশনি গ্রামে তার এক ধন্য মামার শরণাপন্ন হবে ঠিক কোরল। পনের বছর পূর্বে নিজের স্বভাবের দোষে সে এই মামার বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়। যাবার সব

সর্বস্বারা বাংলার বাঁচবার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা

সর্বস্বারা বাংলাকে বাঁচতে হ'লে আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বাঙ্গালীর উপর বাঙ্গালীর সহানুভূতি, বাঙ্গালীর প্রতীক্ষার উপর একমাত্র দান।

বাঙ্গালী আজ পরাস্ত হল জীবন যুদ্ধে আর ব্যবসা হাট্টিং। অভাবে এখনে ক'ও বিক্ষণ হ'ল “বানিজ্যে বসতি লক্ষ্য” মন্ত্র ভুলে যেয়ে।

বাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের ভাণ্ডারী আজ বাঙ্গালী নয়—তাই তার এত লজ্জনা। “ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি”, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গালীর ঘরে, বাঙ্গালীর পছন্দমত পুস্তক যোগ্য তার নিয়েছেন এঁরা। বাঙ্গালীর রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সব রকম বস্ত্রের বাবুল আমদানি করেছেন এঁরা। সবার সন্তুষ্টি বিধানই লক্ষ্য এঁদের।

বিনীত—

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি

(প্রসিদ্ধ স্বদেশী বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা)

বস্ত্র বিভাগ—১নং ও ২নং মির্জাপুর স্ট্রীট, মেন। কান সি. বি, ৩৩৩

ড্রাক—৮৭২ কলেজ স্ট্রীট বস্ত্র ও পোষাক; জগদ্বাজার, ভগানীপুর [বস্ত্র ও পোষাক] কোম্পানী, কে-৩৩৩

বিশেষ সূচন্যঃ—প্রতিযোগিতার অধিতীয়—টক অফিস—দর সবার চেয়ে সস্তা। লোকে বাচা ওঁচর করে তারা তাছারা করে না—আমরা বাচা বলি তাই করি—এটাই আমাদের বিশেষত্ব।

ঠিকঠাক—এমন সময় সেখানে তড়িত। এসে উপস্থিত হ'ল এবং সে অশনিকে ওর দেখালে—আশে পাশেই পুলিশরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে যদি লীলাকে পরিত্যাগ না করে তা হলে এখুনি সে তাকে পুলিশেরিয়ে দেবে। অগত্যা নিরুপায় হ'য়ে অশনি সেই বাড়ীর এক সুরদেব ভেতর লীলাকে নিকপে কোরুল—এমন সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর সেখানে আসতে তড়িতা স্বরংগতিতে তাকে লক্ষ্য করে গুলি মেরেই অশনিকে নিয়ে অজ্ঞানগ্রামে পালালো। এখানে এসে তারা স্বামী স্ত্রীরূপে পরিচিত হ'ল এবং তার মাঝে কাঁচা সে এ কয় বছর জাপানে ছিল—এং সেখানেই তড়িতাকে সে বিয়ে করে—এরূপ কত কী মিথ্যা কথা বলল। তারপর অশনি ভাবল এরূপভাবে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়ে এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। তাই সে ঠিক কবলো তড়িতার সাহায্যে মামার হাজার পনের টাকা হাতিয়ে সে তড়িতাকে ফাঁকি দিয়ে ল'লাকে নিয়ে একেবারে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি দেবে। সেতত্ত্ব সে বরাহনগরে সেই অন্ধকূপ থেকে লীলাকে উদ্ধার কোরতে গেল কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল লীলার বাপ পুলিশ ইন্সপেক্টর লীলাকে সেখান থেকে সরেবাসে উদ্ধার কোরেছে। অশনি এখানেও পুলিশের চোখের ধূলা দিয়ে ল'লাকে নিয়ে একেবারে অজ্ঞানগ্রামে পৌঁছল এবং কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তাকে সেখানেই লুকিয়ে রাখল। তারপর অশনি তড়িতার চায়ে বিধ দিল—এমন সময় পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার কোরুল। তার মামা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে বলল যে, অশনি তার ভাগ্নে, সে গ্রামের জমিদার কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর অশ্রুসংবরণ কোরে হেসে বললেন যে,

সে তার জামাই। এদিকে তড়িতা বিষয় জ্বালায় উন্নত হয়ে অশনির ওপর ঠিকুর প্রতিশোধ নেবার জন্ত ইন্সপেক্টরের দিকে চেয়ে চোঁচাতে লাগল। তখন অশনি বললে ল'লাকেই তার নিজের হাতে প্রতিশোধ নেবার জন্ত। তড়িতা চক্ষের নিমেষে পিঙ্গল বার কোরে চরম প্রতিশোধ নিয়ে তার অচল দেহ অশনির মৃতদেহের ওপর এলিয়ে দিল।

নাটকখানি কার লেখা তা' আমরা জানি না। যারই লেখা হোক, এ বিষয় যে তাঁর হাত একেবারে কাঁচা একথা সত্য। নাটকের 'সিচুয়েশন' বা ঘটনা সংস্থাপন এত এলোমেলো যে রস দানা বাধবার সুযোগ কোথাও পাইনি। নাটকখানির সংলাপ ও ভাষা এত কমজুরি যে চরিত্রগুলির সাক্ষা তার জন্ত বিশেষভাবে ব্যহত কোরেছে। নাট্যকার নাট্যকর্তৃগত প্রত্যেকটি চরিত্র পরিপুষ্টিতে এত অক্ষমতা প্রকাশ কোরেছেন যে যার জন্ত নাটকখানি কারও মনে রেখাপাত কোরতে পারে না। তা' ছাড়া "বাংলার বোমা" অবাস্তব, অবাস্তব ও অসংলগ্ন কাহিনীর ওপর ভিত্তি কোরে গড়ে তোলার জন্ত নাটকের সার্থকতা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে।

পৌরাণিক নাটক অভিনয়ে 'টার' সম্প্রদায়ের হয় একটি নিজস্ব খ্যাতি আছে সামাজিক নাট্যভিনয়ে তারা সে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। ভাবন গাঙ্গুলীর অশনি ও লাইটের তড়িতা আমাদের বিশেষ তৃপ্তি দিয়েছে। লাইটের শেষ দৃশ্যের বাচন ও ভাবাভিব্যক্তি চমকপ্রদ। তার গানও মন্দ লাগল না। শরৎ চ্যাটার্জির ইন্সপেক্টরে দেখাবার বিশেষ কিছু না থাকলেও তিনি প্রশংসনীয়ভাবে অভিনয় কোরেছেন। লীলার ভূমিকায় যে মেয়েটি নেমেছে সে মঞ্চের ওপর

দাঁড়িয়ে তোতা পাখীর মত ভূমিকাটি আউড়েছে যাত্র। অর্জুনাদ ক্রিমিনোলজিষ্টের ভূমিকায় বহু মঞ্চের অভিনয় ভাড়াটির নামান্তর যাত্র। তার স্ত্রী চন্দ্রা-রূপে কমলা যাত্রা দলের পৌরাণিক ছবির মত সুরেলা অভিনয় কোরে দর্শকগণকে রীতিমত উন্মত্ত কোরে তুলেছিল। ক্রিমিনোলজিষ্টের ভূমিকারূপে গগন চ্যাটার্জি সবাইকে হাসিয়েছে খুব। তাবণ ও তার জরূপে যারা নেমেছিলেন তারা দুজনেই অচল। প্রফুল্ল দাসের বাসুদেব মন্ডের ভাল। জয়নারায়ণ মুখার্জির রূপসজ্জা ও অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অস্তিত্ব ভূমিকা অমূল্য।

নাটকখানির মঞ্চসজ্জায় বিশেষ কিছু দেখাবার না থাকলেও সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চমালায় পরেশ বসু তার ভেতরই মঞ্চসজ্জায় একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি কোরেছেন। গানের সুরের ভেতর প্রশংসা করবার কিছু নেই।

নাট্যনিকেন্তন

এদের পরবর্তী আকর্ষণ হবে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত "মরকাশিম"। মীরকাশিমের ভূমিকায় সম্ভবতঃ আশুপ্রকাশ কোরবেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। সতু সেন নাটকখানি পরিচালনা কোরবেন। "সিরাজুল্লাহ"র মত "মরকাশিম"ও সাক্ষ্যমণ্ডিত হবে আশংকা করা যায়।

তত্ত্বমূল

কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত "মধুমাল্য" নামে একখানা নাট্যখানের নাটক বারেন ভক্তের পরিচালনায় শ্রীহই এখানে মঞ্চস্থ হবে। বাহেননাবু একজন গুলী বাড়ি—বহুদিন পরে তিনি আবার নাট্যপরিচালনার যোগ দিয়েছেন শুনে আমরা অশ্রুজ্ঞানশ্রিত হ'লাম।

রক্তমাখা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পূর)

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

—লবঙ্গ ?

—লবঙ্গকে তুলে যান। সে আর আপনার কথা জবাব দেবে না।

—তার জিহ্বা না দিতে পারে,—কিন্তু তার প্রাণ দেবে।

—তার প্রাণ কি আছে কি ? অনাথার কি প্রাণ থাকে ?

—তবে অনাথার কি থাকে ? শুধু ছেঁড়া কাপড় ? না !

‘তখন সন্ধ্যা উজ্জ্বল হয় নাই। লবঙ্গ নীরদবাবুকে চা দিতে আসিয়াছিল। সেই অবসরে নীরদ তাহার অনাগত আশঙ্কার কথা পাড়িয়া বসিল।

—শুনলুম তুমি কালই স্বস্তুর বাড়ী চলে যাবে ?

—হাঁ, এসেছিলাম জুয়ারের জলের কুটো-টির মত, আবার চললুম ভাঁটার টানে কোন দুর্দশাাগরের তরঙ্গাকুল জলরাশির মধ্যে মিশতে। অনাথারা এই রকম করেই তাদের জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে!

—এ কাণ্ডটা ত বাধাচ্ছেন ম্যা ? তুমি আপত্তি করলেন কেন ?

—আপত্তি ? হিছুর ঘরের মেয়ের কি আপত্তি করবার অধিকার আছে ? স্বামী চায় না তবু সেই ভেজানো, অনাদরের দার চৌলে হিন্দুনারীকে তার মস্ত-শুদ্ধ গৃহস্থালীর মধ্যে প্রবেশ কর্তে হবে, নইলে চোখ রাঙাবে সমাজ,—চোখ রাঙাবে ছ-হাজার বছর আগেকার মূনি-ঋষিরা ! অতীত ও

বর্তমান এমনকি অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সকলেই রক্তবর্ণ মুখ নিয়ে তর্জন গর্জন কর্তে থাকবে !

লবঙ্গর কথায় নীরদবাবু এমন একটা অকপট অনুকম্পা অনুভব করিলেন, যে তিনি উচ্ছ্বাসের সুরে বলিয়া উঠিলেন : সত্যি কথা ! যারা ভারতবর্ষের চিরন্তন সভ্যতার কথা উচ্চকণ্ঠে গাইতে থাকে,—যারা সমাজকে পরহিতের প্রতীক ব'লে, গৌরব-পূর্ণ আখ্যায় মণ্ডিত করে তাকে উপাসনা কর্তে থাকে, ঠিক তারাই তোমাদের মত নির্খণ্ডিতা নারীদিগকে অত্যাচারের দিকে আরও এগিয়ে দেয়। মানুষ কেন এই সব রমণীদের ওপর অত্যাচার করে ? মানুষ কি পশু ?

লবঙ্গ এত দুঃখেও থাকিতে পারিল না, নীরদবাবুর উচ্ছ্বাস শুনিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। লবঙ্গ হাসিতে হাসিতেই বলিল : বাবু ! সমাজের নেতাদের আপনি যে তীব্রভাষায় গালাগালি দিলেন, এতে নিশ্চয়ই তারা বাণায় গিয়ে মরে থাকবে ! এবং আমারও কাল আর বোধহয় স্বস্তুর বাড়ী যেতে হবে না ! ওঃ! আপনার গালাগালির কি ভয়ানক জোর !

এ উপহাসে নীরদবাবু চঞ্চল হইলেন না, বরং আরও গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে নারী সৌন্দর্য্যের যে অভিনব বিকাশ প্রকটিত হইতে ছিল, তাহারই মনোমুগ্ধকর উদ্গাদনায় মস্ত হইয়া বলিলেন : লবঙ্গ ! কাকুর বাগানে যদি একটা গোলাপফুল কোটে, কে এমন নিষ্ঠুর আছে, তাঁকে পদদলিত করে ?

—কাকুর বাগানে আবার গোলাপফুল ফুটলো, রায় মশায় ?

—কাকুর বাগানেই নয় ! ধরো সমাজের মাঝে।

—সমাজের মাঝে গোলাপফুল ফুটলে আর কেউ রক্ত না থাকলে পাড়ার ছোড়া-রাই আগে তাকে তুলে নিয়ে, কামিজের বোতামের গর্তে বসিয়ে দেবে ! দশজনে তাঁকে শুকবে, দশজনে তাকে চটকাবে ! আর আপনার মত যারা গম্ভীর লোক, তারা দূর থেকে দাঁড়িয়ে তাদের ওপর হিংসা করবে, আর নিজের হাত কামড়াবে !

—কিন্তু সমাজ শান্তি দেবে ওই ছোড়া-দেরও নয়, আমাদেরও নয়,—শান্তি দেবে ঐ গোলাপফুলকে !

—তাতো দেবেই ! গোলাপের যে বাধা দেবার শক্তি নেই !

—কিন্তু সমাজের ত বিচারশক্তি আছে। সমাজের নেতারা সে শক্তির সুব্যবহার করে না কেন ?

—সেটা তাদের অভ্যাস নেই ! আপনার মত তারা রোজ এজলাসে বসে ত বিচার করে না। আর আপনার মতো দশ আলমারি আইনের বইও তারা ‘পড়ে’না !

—লবঙ্গ ? আমি তোমায় সমাজের হাত থেকে রক্ষা কর্তে পারি, যদি তুমি—

—আর কাজ নেই মশায় আমাকে রক্ষা করে ! আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনি কেন আমার জন্তে এই বিপদের মাঝে পা দেবেন ! তারচেয়ে আমার ছেড়ে দিন !

—না, না, লবঙ্গ ! তুমি সেখানে যেও না ! তুমি এই খানেই থাকো ! আমার বাড়ীতে থাকলে কেউ তোমায় ধাতলাতে পারবে না !

—ধাতলানোর সীমাটা এমন এক জায়গায় এসে হাজির হতে পারে, সেখানে

রাপনার শক্তি নিতান্তই দুর্বল, নিতান্তই
নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে! আপনি তো
খবর রাখেন না, এর মধ্যে কি কাণ্ড
আপনার বাড়ীতেই হয়ে গেছে! মা
এখানে আসা অবধি আমার হাতের রান্না
খাচ্ছেন না! তিনি ত উড়ে বামনের রান্না
খাবেন না! কাজেই নিজের হাত
পুড়িয়ে রেখে খাচ্ছেন! অথচ কাশীতে
আমিই তাঁকে রোজ রেখে দিই। মার
কাছে এ অপমান আমার অসহ্য হয়ে
উঠেছে। না বাবু আমার ছেড়ে দিন
আমি শ্বশুর বাড়ী যাবো!

নিরদ লবঙ্গর এই অপমানের কথা
শুনিয়া মর্মান্বিত হইল। তাহার শ্বশুরমাতা
ঠাকুরাণী যে লবঙ্গকে এমন করিয়া প্রচণ্ড
শাস্তি দিবেন, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে
নাই। মনটা বড়ই দমিয়া গেল।

ঘরের বাহির হইতে যি লবঙ্গকে
ডাকিয়া বলিল: মাসিমা! দিদিমা
আপনাকে ডাকচেন!

যাই বলিয়া লবঙ্গ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে
বাহির হইয়া গেল। নারদবাবু খানিকটা
চিন্তার বোঝা লইয়া সেখানে একাকা
বসিয়া রহিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্জিকালিখিত একটা শুভদিনে জগদা
আসিয়া লবঙ্গকে তাহার শ্বশুরবাড়ী লইয়া
গেল।

যাইবার সময়ে জগৎতারিণী লবঙ্গকে
অনেক সচুপদেশ ও শুটিকয়েক টাকা দান
করিয়াছিলেন। টাকগুলি সে অঞ্চলে
বাঁধিয়া লইল, আর উপদেশগুলি পাঠশালায়
জাতের মত অখণ্ড ধৈর্য্যে কান পাতিয়া
গ্রহণ করিল।

সেদিন অপরাহ্নে ছোট কর্তা বিরিকি
চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে। বাহিরে টিপি
টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে; আকাশে মেঘের দল

কাল হইয়া কি কাণ্ড বাধাইবে বলিয়া
তোড়তোড় করিতেছে। গ্রাম্য পথে লোক-
জনের কোনও খবর নাই। বিরিকি
অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া বসিয়া বিরক্ত
হইয়া উঠিল; মুহূর্ত্ত: তাম্রকূট সেবনে
তাহার উৎসাহ অটল থাকিতে চাহিতেছিল
না। এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক
সঙ্গে একটি অর্দ্ধাবশ্ঠনাবৃত তরুণীকে লইয়া
চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে আসিয়া
উপস্থিত।

বাগদত্তা হ'য়েও বিয়ে না
হওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ
মেয়েদের জীবনে আছে...

এবং সে. দুঃখ মনুষ্য সহ্যও করেচে.....

কি সেই মঙ্গাস্তিক দুঃখ?

শ্রেষ্ঠাংশ:

সাধনা বোস

অহীন্দ্র চৌধুরী

পরিচালক:

মধু বোস

চিত্র-পরিবেশক:

এম্পায়ার টকী ডব্লিউবিউটস'

ভারত ভবন, কলিকাতা

N. I. P.

“এই নাও জামাইবাবু! তোমার
গৃহিনীকে পৌঁছে দিলাম।”

“আমুন, আমুন! উপরে আমুন!”

“তবু ভাল! তোমার মুখে আমুন
কথাটা শুনতে পেলুম! রাস্তায় ভাবতে
ভাবতে আসি-লুম যে, হয়তো তোমার
এখানে আতিথ্যের বিনামূল্যের উপাদান
গুলোও পেতে পারি। না! না! এ
রকম আশঙ্কাটা একেবারেই অমূলক
দেখছি।”

২২

সপ্তাহ!

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
আনন্দ-রসধন-চিত্র নিবেদন

অভিনয়ে

তার পরিচয় পাঠবেন।

অভিনয়

রূপবাণী

কোম : বি, বি, ৩৪১৩

শনি, রবি ও ছুটির দিন

৩টা, ৬টা, ও ৯টা

অস্বাভাবিক দিন ৬টা ও ৯টা

বলিতে বলিতে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তরুণীকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে গৃহের মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। বিরিকি অতীর্থনার ভক্ত গাত্রোথান করিলেন না বটে, কিন্তু একটু গা নাড়া দিয়া জানাইয়া দিলেন যে তিনিও অপ্রস্তুত নহেন।

তরুণী গৃহমধ্যে আসিয়া হঠাৎ ঠক্ক করিয়া একটা প্রণাম করিল, বিরিকির পায়ে। বিরিকি বলিয়া উঠিল: থাক, থাক! তুমি একেবারে বাড়ীর মধ্যে যাও।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলিলেন: হাঁ যাও। একেবারে তোমার ভাগের হাঁড়ি কুড়ি গুলো দখল করে বসো।

বিরিকি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল: খোরাকির টাকাটা—

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন: টাকা এনেছি বৈকি! সেজ্ঞ তুমি চিন্তিত হয়ে অনেক কষ্ট দিও না, এই নাও।

বিরিকি কথার কোনও জবাব না দিয়া; আগন্তুক ভদ্রলোকটি যে দশখানা দশ টাকার নোট তাহার সম্মুখে রাখিয় দিলেন, তাহাই হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া, এক এক করিয়া গণিতে লাগিল।

—কেমন মিলেছে?

—হাঁ মিলেছে। আপনারা ভদ্রলোক, আপনারদের কথার কি নড়চড় হয়।

—না। নড়চড় যা হবার, তা আপনাদের বেলায়ই হয়ে গেছে যাও দিদি, তোমার ঈশ্বর নিকট বাসস্থানের ভেতরে যাও। দেখবে তোমার অর্ধটে বিঘাতা কেমন সব সাজিয়ে রেখেছে।

লবঙ্গ উঠিয়া, বিরিকির দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া, ধরে ধরে চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়িয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। বাইবার সময়ে ভদ্রলোকটি বলিয়া “নাক বললেন, আমার অপরাধ যেন তিনি মাফ করেন!”

ভদ্রলোকটি বলিল: তোমার চাইবার আগেই তিনি তোমার সব অপরাধ মাফ করেছেন।

লবঙ্গ চলিয়া গেলে, বিরিকি নোট কয়খানা তাহার কাপড়ের টেকে গুঁজিল; এবং তাহা সুরক্ষিত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার পর নিশ্চিত হইয়া ভদ্রলোকের দিকে তাকাইয়া বলিল: আপনি কি এখনই ফিরবেন নাকি? ভদ্রলোক উত্তর দিল: তা, বসন্তে না বললে কাজেই ধূলোপায়ে বিদায় চতে হবে! অর বসলেই তো তোমার পয়সা খরচ।

বিরিকি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল: আমি সেজ্ঞ বল্ছিলাম না,—তবে কিনা আজ বড় দুর্ঘ্যোগ, আপনি হয়তো বসন্তে নাও চাইতে পারেন।

ভদ্রলোকটি বলিলেন: দুর্ঘ্যোগটা তা’হলে তোমার আতিথেয়তার দিক থেকে খুব সুনিষাকর ব্যাপার বেলো? এই রুটি বাদলায় পাকা চুলগুলো মাথায় করে-ভিজতে ভিজতে ফিরলে, আমাকে আর দ্বিতীয়বার খোরাকির টাকা পৌঁছে দিতে এখানে আসতে হবে না। সেটা তোমারই লোকসান, বাবাজী!

(ক্রমশঃ)

মানুষ

আশালতা সিংহ রায়

সৃষ্টি তোমার দুনিয়ার বুকে কবে?

আদি অনন্ত নিত্য নূতন কবে’—

সৃষ্টি তুমিই করেছ মানবে শুধু;

নানা মত বাদে ভূষিত যে চিরতরে।

মানব-তুমিই ভগবানে দিলে রূপ—

তুমিই রচিলে তোমার সৃষ্টি কথা,

তুমিই দানিলে মরু ভূমি বুকে বারি—

অনুভূতি তব বেদ-দর্শনে গাথা।

দুঃখ ব্যথা, পরল কালোর পাশে—

তুমিই দিয়েছ সুখ-আলো স্তখে ব্যাখ্যা।

তোমার অভাবে তুমিই স্বভাব দানি—

সরল-কুটিলে সমভাবে দিলে আখ্যা।

বাহা কিছু আজ সৃষ্টি তব মাঝে

চুঃজ্ঞেয় নয় তোমার কাছে শু’ কিছু

শিল্পী স্রষ্টা হে মহামানব তুমি—

তুমিই ছুটা ল চিরতরে তার পিছু!

আধুনিক 3
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান



N. I. P.



(বিলাসী)

সাপুড়ে :

পরিচালক দেবকী বসু হঠাৎ অমুহু হোয়ে পরায় গত সপ্তাহে ছবি তোলার কাজ বিশেষ অগ্রসর হোতে পারে নি।

এ সপ্তাহ থেকে আবার কাজ আরম্ভ হুয়ায়েছে।

সাপুড়ে-সর্দার জহরকে আজ বিশেষ চিত্তিত দেখা যাচ্ছে। তার শান্তিময় ভৌবনে কোথায় যেন বিপ্লবের সুত্রপাত হোয়েছে। সাক্ষরদের দল বিশেষ কোরে তার প্রতিদ্বন্দী — আক্রোশটাই যেন তার উপর বেশী।

সত্যই কী নিমিষের ভুলে আজ জহরের সুনাম ও প্রতিপত্তি, সব কিছু নিশ্চিহ্ন হোয়ে যাবে?

যে শপথ ও প্রতিশ্রুতির উপর সর্দারের আসন প্রতিষ্ঠিত তা থেকে পদস্থলন ঘটলে সে আসনের মারা পরিত্যাগ কোরতে হ'বে। জহর সে সম্বন্ধে নিরীকার নয়। তবু তার পদস্থলন হোয়েছিল এবং তার জন্তে জহরের লাজনার সমা ছিল না।

এই নাটকের উপরের দৃশ্য সর্দার-জীবনে বিপ্লবের 'করণটুকু' পরিষ্কৃত হবে। সর্দারের ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন সুবিখ্যাত নট মনোব্রজন ভট্টাচার্য্য এবং নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরছেন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী কানন দেবী।

বড়দিন :

ছবিতোলার কাজে যে আত্মরিকতা ও

স্বপ্নের প্রয়োজন পরিচালক অমর মল্লিক মশাই তার পরিচয় দিচ্ছেন।

এই ইউনিটের কর্মীগণও হ'য়েচে যেন মল্লিক মশাই অস্ত্র প্রাণ! যেমন পরিচালককে সুখী করবার দিকে এদের দৃষ্টি আছে, তেমনি আছে মল্লিকমশাইয়ের প্রথম ছবিখানিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর কোরে গঠন কোরে তুলতে।

মনোহরা বেশীনা মেনকাকে দেখলুম সেদিন একখানি গান গাইছেন। গান শানি গেয়ে শোনাচ্ছেন তার প্রিয় সখী মাধবীকে :—“সই, কেবা শোনাইল শ্রাম নাম” ...

কিন্তু এই শ্রাম নামের অন্তরালে যে দ্রুপটুকু প্রচ্ছন্ন বোয়েছিল, বিশ্ব মাধব র অন্তরে গিয়ে তা' আঘাত কোরেছিল গভীর ভাবেই।

হাসি ও বেদনার মধ্যদিয়ে, মনোহরা ও মাধবী চরিত্রের দুটি দিক অপূর্ণ মাধুর্য্য নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। বাঙলাদেশের ভাব প্রাণ নর-নারীর অন্তরে এই শ্রেণীর দৃশ্য যে বিশেষ গায়ে রেখাপাত কোরবে, একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মনোহরা ও মাধবর ভূমিকায় মেনকা ও মলিনা অতি অপূর্ণ অভিনয় কোরছেন।

“অচিন প্রিয়া”

প্রায় বহুদিনে আগেকার ডি. জি-র তোলা ছবি ‘অচিন প্রিয়া’ সামনের শনিবার থেকে “নিউ সিনেমা” দেখান

হ'বে। এই তিন রীলার হাত্তাধীপক ছবিখানি কর্তৃপক্ষ এতদিন নানা কারণে রিলিজ করতে পারেন নি! উপস্থিত তাঁরা তিন সপ্তাহের জন্ত ছবিখানি এখানে রিলিজ করবার ব্যবস্থা করে দর্শকদের নতুন ছবি দেখবার সৌভাগ্য দান করলেন। তিন রীলের ছবি নিয়ে একটি full length প্রোগ্রাম হয় না, সেই কারণেই “অচিন প্রিয়া” সঙ্গে প্রতি সপ্তাহেই ছ'খানি করে নিজেদের অত্যাঙ্গ ছবি দেখাবারও ব্যবস্থা করেছেন। অ'নকেরই হয়ত' নানা কারণে ঐ সব ছবিগুলির মধ্যে কোন না কোন একটা দেখা সম্ভব হয়ে উঠেনি; উপস্থিত তাঁদের পক্ষে এই সুযোগে ছবিগুলি দেখা হয়ে যেতে পারে।

‘অচিন প্রিয়া’র cast value বাঙলা দেশের কোন ছবির সঙ্গেই তুলনা হয় না। এতে নেমেছেন—পাহাড়ী, চন্দ্রা, অমর মল্লিক, ডি, জি; ছয়া আরতি, কিডার, তিমিরবরণ, পশুপতি, যুগেন পাঠক প্রভৃতি।

সামনের ২৯শে থেকে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত “অচিন প্রিয়া”র সঙ্গে দেখান হ'বে ‘দেবদাস’ আর ২রা নভেম্বর থেকে ৪টা অবধি হ'বে ‘ভাগ্যচক্র’।

দেশের মাটি

‘দেশের মাটি’ নিউ সিনেমায় বঙ্গ হ'লেও ‘চিত্রায়’ এখনও নিয়মিত ভাবেই চলবে। চিত্রায় এখন যেভাবে দর্শক-সমাগম হচ্ছে তাতে মনে হয় ‘বড়দিন’ পর্যন্ত এ ছবি ভাল ভাবেই চলবে। তবে কর্তৃপক্ষ যদি তার আগে অঙ্গ ছবি দেখাবার জন্তে এ ছবি তুলে নেন সে অবস্থা আলাদা কথা।

সাখা

“সাখা” (বাঙলা) • “টুট সীকার” (হিন্দী) দুইয়ের সম্পাদনা কার্যই প্রায়

বি-এল-থেকার প্রযোজনায়
মেট্রোপলিটান পিকচার্স-এর নিবেদন



শ্রাব্য

শীঘ্রই আপনাদের প্রিয় চিত্রগ্রহ
উত্তরায়
মুক্তিলাভ করিবে।

চিত্র-পরিবেশক—
কাপূরচাঁদ লিমিটেড
প্যারাদাউস বিল্ডিং—কলিকাতা

মদ্যময় রচিত বহু প্রশংসিত
কাহিনী অবলম্বনে—
বাণী-চিত্রকারে এষিতি

একজন সিংহলের রাজকন্যা অপর
জন সাগর-জলে ভেসে আসা অজ্ঞাত-
কুলশীল এক যুবা। খনা ও মিহির।
সিংহলের সাগর-মৈকতে যে নাটকের
সুর উজ্জয়িনীতে সম্রাট বিক্রমা-
দিত্যের সভায় তাহারই পরিণতি।
একদিকে প্রেম, অত্রদিকে অমঙ্গলের
আশঙ্কা। পরিণামে কী ঘটিল আপনি
কল্পনা করিতে পারেন কী?

ভূমিকায় :—

ছায়া দেবী
অশীষ চৌধুরী
দেববালা
সুশীল রায়
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণা
ধীরেন মুখোপাধ্যায়
সমর ঘোষ
মনোরমা
জ্যোৎস্না শুভা, আনুরবালা।

পরিচালক :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ হয়ে এসেছে। পরিচালক ফণীবাবু তাঁর একমাত্র সহকারী কার্তিক চট্টোকে নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাতে মনে হয় আর এক সপ্তাহের মধ্যেই এর সব কাজ শেষ হয়ে যাবে।

‘সাথী’ আসছে ১৯শে নভেম্বর থেকে নিউ সিনেমায় দেখান হবে। কিন্তু এর হিন্দি সংস্করণ হয়ত নবম্বরের প্রথম সপ্তাহেই বাঙলার বাহিরে রিলিজ হয়ে যাবে।

‘সাথী’র টেলার উপস্থিত চিত্রায় ও নিউ সিনেমায় দেখান হচ্ছে।

অধিকার

অধিকারের হিন্দি সংস্করণ গেল শুক্রবার থেকে বোম্বাই নগরীতে রিলিজ হয়ে গেছে। সেখান থেকে যতদূর খবর এসেছে তাতে জানা যায় যে নিউ থিয়েটার্সের পূর্বতন তিনখানা ছবির চেয়ে এ ছবি দর্শক সমাজে যথেষ্টভাবে জনপ্রিয় হয়েছে।

অধিকারের বাঙলা সংস্করণ ডিসেম্বর মাসে চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে বলে স্থির হয়ে আছে।

দুয়গ

দুয়গের কাজ পরিচালক নীতীন বাবু আবার দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। হিরো সাইগাল ও হিরোয়িন লীলা দেশাই (গীতা) দুজনেই পরস্পর আন্তরিকভাবেই প্রেমে আবদ্ধ। কিন্তু গীতার পিতামাতা রুগ্ম ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহাদের কন্যার বিবাহ দেওয়ার একেবারে অনিচ্ছুক। এ অবস্থায় গীতার দ্বারাই বা কতদূর সম্ভব? এই নিয়ে এখন পরিচালক মশাই বিশেষ ব্যস্ত রয়েছেন।

কপালকুণ্ডলা

পরিচালক ফণী মজুমদার তাঁর ‘সাথী’র কাজ থেকে একটু রেহাই পেলেই ‘কপাল কুণ্ডলা’র (হিন্দি) কাজে হাত দেবেন। যতদূর মনে হয় সামনের মাসের প্রথম

সপ্তাহেই তিনি কাজে হাত দিতে পারবেন। এই ছবিতে নামবেন নবকুমারের ভূমিকায় নাজাম, কাপালীকএর ভূমিকায় জগদীশ, মতিবিবির ভূমিকায় কমলেশ কুমারী। তবে কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় কাকে দেখা যাবে তা এখনও ঠিক হয়নি।

পরশমনি

পরশমনির কাজ প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় বেশ এগিয়ে চলেছে। ষ্টুডিওর ‘ফ্লোর’ মাদ্রাজী ছবির জন্তে মাঝে মাঝে আটকে যাওয়াতে প্রফুল্লবাবু ছবির কাজের speed ঠিক রাখতে পারছেন না।

খনা

আসছে মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রী চিত্র-গৃহে খনার উদ্বোধন হ'বার কথা। সেই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ও আর্টিষ্টরা গেল সপ্তায় ‘ভিজগাপটাম’ বন্দরে কতগুলি সামুদ্রিক দৃশ্য তোলার জন্তে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু ছবির নায়িকা শ্রীমতী জায়া দেবী হঠাৎ সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের সদলবলে ফিরে আসতে হয়েছে।

এদিকে বাজারে কানাঘুসা শোনা যাচ্ছে যে ‘খনা’ ছবি ছোট হয়ে পড়ায় এর সঙ্গে নাকি ডি. জির পরিচালনায় একখানি ছোট কমিক ছবি তুলে ‘খনা’র উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন হ'বে।

পূর্ণতে গোরা

আগামী শনিবার গোরা তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করবে। কমি-গুরুব উপভাস অবলম্বনে দেবদত্ত ফিগাস ‘গোরা’কে চিত্রে রূপান্তরিত করায় যে কুতির দেখাইয়াছেন তাহা সত্যি প্রশংসার্হ। তাই আজ তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিয়াও গোরার জন-সমাগমের বিরাম নাই। মনে হয় ‘গোরা’ এখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া তাহার আগ্রহান্বিত দর্শকবৃন্দের পরিতুষ্ট সাধনে কৃতকার্য হইবে। বাহারা এখনও গোরা

দেখেন নি তাঁহারা যেন তাঁহাদের মনোরু-তৃপ্তি মিটাইতে গোরা দেখার সুযোগ হারাইবেন না—।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে শ্রীভারতলক্ষ্মীর আধুনিক সমাজ চিত্র ‘অভিনয়’ রূপবাণীতে নবম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। জনসাধারণ ‘অভিনয়’ চিত্রটি বার বার দেখিয়াও পরিতুষ্ট হইতেছেন। দর্শকবৃন্দের এই উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া মনে হইতেছে ছবিখানি রূপবাণীতে আরও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া চলিবে।

গৃহিণী ও গৃহ

‘বড়দিদি’র সহকারী পরিচালক ও মল্লিক মশাইয়ের দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ শ্রীমান পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পত্নী লাভে ভাগ্য-বান। ‘ক্ল-ভাগ্যে মন’—এই সনাতন প্রবচন তাঁহার পক্ষে প্রযুক্ত। বালিশজে আমির লেনে যে শান্তি-কুঞ্জের ভিত্তি স্থাপনা সম্প্রতি হয়েছে তা সহ-গৃহিণী গৃহ নিম্মাণের সংকল্পেরই পূর্বাভাস। সহকারীর গৃহিণীও আছে, গৃহও হ'লো; কিন্তু স্বয়ং পরিচালক মশাইয়ের গৃহ আছে কিন্তু গৃহিণী নাই!! মল্লিক মশাই আর কতকাল উন্নয়নগামী হবেন?

সোনার টোপর মাথায় দিয়ে

‘সোনার টোপর মাথায় দিয়ে টলিউড থেকে বৈকল টিয়ে’—টাইটেল কার্ডের প্রোজেক্ট - শিখায় এই কটা কথা ভেসে

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টলিউড

হাস্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

মার্কিন রাজ্যে নিম্নতম বেতন আইন

প্রিন্সস্‌ফোর্ডের মুখোপাধ্যায় এম এ বি-এল

মার্কিন রাজ্যে নিম্নতম বেতন স্থির করিয়া দিবার জন্য কিছুদিন ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে এখন কয়েকটি আইনও পাশ করা হইয়াছে। উক্ত আইনগুলির দ্বারা যে ভাবে বেতন স্থির হইবে তাহার একটা মূল ভিত্তি বা প্রিন্সিপল ঠিক করা আছে, যেমন ধরুন “ফেয়ার ওয়েজ টাইপ” বা উপযুক্ত বেতন হিসাব, “লিভিং ওয়েজ টাইপ” বা জীবন ধারণ সাপেক্ষ বেতন হিসাব অথবা “ফ্ল্যাট-রেট টাইপ” অর্থাৎ সাধারণের সমান বেতন হিসাব। তন্মধ্যে দশটি আইন “ফেয়ার ওয়েজ” শ্রেণীর। সেই আইনগুলি যেখানে যেখানে প্রচলিত হইয়াছে সেখানে উচ্চাঙ্গের কিছুদিন যাবৎ অসুস্থাবাচক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তৎপরে বিচারালয়ের

উঠেচে পুতুল বোলের উর্ধ্বর মস্তিষ্ক থেকে। এটা অসম্ভব ভীষণ নবজীবন প্রারম্ভের পূর্বাঙ্গীকরণ আনন্দ-মিশ্রিত উচ্ছ্বাস। ভীষণ বাস্তব জীবনে অসুস্থ ও ভীষণ অগাধ প্রায়। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনর আবাহন শুধু ‘দেশের মাটির’ কলনালোকে আজ নয়—পুতুল বোলের বিগত চম্পি বৎসরের জীর্ণ সঙ্কল্পের পরিবর্তে আর নতুন সঙ্কল্পের উত্তম সঙ্কল্পনার আমরা আনন্দিত। ‘চিরকুমার’ খ্যাতিতে অখ্যাতি গণ্য করে ‘দাম্পত্য’ জীবনের অনাবাদিত শক্তি কখনায় তাহার আগ্রহ ও সঙ্কল্প টলিউডের পৃষ্ঠা-বাক্যের প্রেরণা পাবে।

দ্বারা বাধ্যতামূলক হিসাবে প্রচলিত হইবে। আটটি আইন “লিভিং ওয়েজ” শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। তাহার যে যে স্থলে প্রচলিত হইল সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। শেষে চারটি আইন প্রচারিত হইয়াছে “ফ্ল্যাট-রেট” শ্রেণীভুক্ত। ইহার দ্বারা এক রকমের মাহিনা সকলের জন্যই স্থির হইয়াছে পারিশ্রমিকে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

কি উপায়ে আইন প্রস্তুত হইয়াছে এবং অনুসন্ধান করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা কার্যকরী বলিয়া মনে হয়।

সাধারণতঃ “ওয়েজ বোর্ড” বা মাহিনা নির্ধারণ ব্যক্তি-সমূহ একটা গঠন করা হয়। তাহাতে প্রভুদের নির্ধারক ব্যক্তি এবং বেতনভোগীদের নির্ধারক ব্যক্তি উভয়েই নিযুক্ত হন এবং জনসাধারণ হইতেও দু-একজন মাত্রকে সঙ্গে নেওয়া হয়। তাহাদের সমবেত চেষ্টার নিম্নতম মাহিনার হার কি ভাবে নির্ধারণ করা যাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যিক তাহা স্থির করা হয়। তৎপরে তাহারা একটা খসড়া লিখিয়া “কামসন” অথবা বরাবরের নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর একজনের অনুমোদন করিয়া পাঠান। উক্ত একজন সাময়িক বোর্ডের মতামত গ্রাহ্যও করিতে পারেন নাও পারেন। আইনগুলির সম্বন্ধে সাধারণের ভুল প্রচারিত করার ব্যবস্থা দেখা যায়, কেবলমাত্র দু-একস্থলে তাহাদের বিতর্কতা দৃষ্ট হয়।

চারটি দেশের আইনে কোন পার্থক্য নাই, যেমন—ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, অরি, আজ উইসকনসিনা দুটি ছেটে কৃষি-মজুর এবং গৃহের ভৃত্য এদের বাদ দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদিগকে আইন-অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয় নাই। তিনটি ছেটে উপরিউক্ত মজুর শ্রেণীকে তো ধরাই হয় নাই উপরন্তু আরও কয়েক শ্রেণীর মজুরকে ছাটিয়া ফেলা হইয়াছে। যেমন প্রথম ছেটে—হোটেলের কর্মচারীকে, দ্বিতীয় ছেটে দাতব্য বা ধর্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের কর্মচারী, তৃতীয়টিতে রোল-কর্মচারী অথবা অন্য যে কোন কর্মচারীকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে কেবল এটিনি-জেনারেল অনুমোদন সাপেক্ষ। দ্বাদশটি ছেটে স্ত্রী মজুর এবং শিশুমজুর মাত্রকেই আইন-অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বাকী আর সকলকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। শিশুমজুর বলিতে ২১ বৎসরের নিম্নে সকলকেই ধরা হইবে। কলাম্বিয়াতে কিন্তু শিশু মজুর বলিতে বোঝায় ১৮ বৎসরের নিম্নে। ক্যালিফোর্নিয়াতে শিশু মজুর বলিলে স্ত্রী লোক হইলে ২১ বৎসরের নিম্নে এবং পুরুষ হইলে ১৮ বৎসর অবধি সকলকেই ধরা হইবে।

কেবল স্ত্রী-মজুরের নিম্নতম বেতনহার নির্ধারণের ফলাফল

ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ এবং ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে বহুদিন যাবৎ স্ত্রীমজুরদের নিম্নতম বেতনহার স্থির করা আছে। ম্যাসাচুসেট্‌সে ১৯১২ হইতে ১৯৩৭ পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হিসাবে উক্ত আইন প্রচলিত ছিল না। ক্যালিফোর্নিয়াতেও ‘পুরাতন বেতন হার আইন’ প্রস্তুত হইবার পয়ও অনেক দিন ধরিয়া বিনা সংশোধনে চালিত ছিল। অন্ত্যন্ত স্থলে অল্পদিন হইল ঐক্য আইনের দৃষ্টি হইয়াছে।

অক্টোবর মাসে ১৯৩৭ সনে “উইমেন্স বুরো” একটি ভোট পত্রিকা বাহির হয়। তাছাড়া অনেক তথ্য নিহিত ছিল। উছাতে বেশ বোঝা যায় যে, যে সকল ক্ষেত্রে নিম্নতম বেতন হার নিয়োগ করার জন্ত অগ্রসর হওয়া হইয়াছিল সে সকল ক্ষেত্রে মাহিনার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন কার্যের তালিকা পরীক্ষা করিলেও বোঝা যায় যে নিম্নতম হার যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক বেতন ক্রীমজুরেরা পাইয়া আসিয়াছে।

আরও দেখা যায় যে ক্রীমজুরদের নিম্নতম বেতনের হার নির্ধারণ হেতু তাহাদের স্থলে পুরুষ মজুরের আমদানী হয় নাই। কারণ মেয়ে মজুর এবং পুরুষ মজুর উভয়কেই এক শ্রেণীর কার্যে নিযুক্ত করা হয় না। ধোবার কারখানায় হঠাৎ প্রকাশ হইল যে ক্রীমজুরের সংখ্যা কমতি হইয়া যাইতেছে। তাছাড়া অগ্রসর করিয়া জানা গেল, যে কারণে সংখ্যা ন্যূন হইতেছে তাহা হইল “টেকনিক্যাল” বা যন্ত্রপাতি বিষয়ক, নিম্নতম বেতন হার হইয়াছে বলিয়া কমিয়া যায় নাই। বরং নিউইয়র্কে দেখা যায় সাধারণ ভাবে ক্রীমজুরদের কর্ম সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

“উইমেন্স বুরো” সহযোগিতায় “ফেডারেল ডিপার্টমেন্ট অব লেবর” অনেকগুলি সভা আহ্বান করিয়া নিম্নতম বেতনহার সম্বন্ধে আলোচনা করে। ১৯৩৭ সনে অক্টোবর মাসে প্রথম অধিবেশন হয়। ইচ্ছাতে সারা দেশে বাছাড়া এক-রকমের আইন এবং এক রকমের বেতন হার প্রচলিত হয় তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। “উইমেন্স বুরো” হইতে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছে যাছাতে উক্ত মন্তব্য অনুসারে কার্য ত্বরিত হয় তাহার তত্ত্বাবধানে এবং উপায় অবলম্বন করার

জাগ্রত স্বপ্ন স্বর্গাশ্রম নিপুণিকা দেখা

কত সুগভীর নিশীথে আমার হিয়ার ছায়ায় আসিয়া,
কাহার আনন্দ-মধুর মুরতি দাঁড়ায় ঈষৎ হাসিয়া!
বুঝি কত তার মূহু করাঘাত ভাসিয়া গিয়াছে পবনে,
যুম স্নেহে ছিন্ন হ’য়ে অচেতন, পশেনিকে। কিছু শ্রবণে!
অভিমাণে ভরা নীরব নিঃশ্বাস মিলায়ে গিয়াছে গগনে,
কত আদরের আকুল আছান কাঁদিয়া ফিরেছে সঘনে!
যুম ভাঙা আঁখি না মেলিতে যোর মানস মুকুরে হেরি।

স্নেহমাখা কার করুণ মুখানি আঁখিতে অমিয়া তরি!
অমনি উঠিয়া উদাস নয়নে জাগি প্রভাতের তরে,
হেরিতে সে মুখ উতলা পরাণ আকুল পিয়াসা ভরে!
কত না গভীর আনন্দ উচ্ছ্বাস উথলে নয়ন-পলকে,
দেখি যবে সেই প্রীতি-ভরা ছবি প্রভাতে সোনালি আলোকে
ভাব-রসহীন ভাষা হ’ল কত রচিয়া প্রীতির অর্ঘ্য।
বিমল প্রভাতে বারেকের তরে লভি যেন চির স্বর্গ!

নিমিত্ত ফেডারেল গার্মেন্ট এবং টেক্সটাইল
মধ্যে শ্রমিক আইন প্রচলিত করার জন্ত
একতা সূত্রে বন্ধন হওয়ায় এবং
পরস্পরের মহাভ্রাতৃত্বের জন্ত অনেক
প্রকার কৌশলেও আইন প্রস্তুত
হইয়াছে। • ইহা ব্যতিরেকে সমস্ত
দেশটা জুড়ে নিম্নতম বেতনহার এবং উচ্চতম
পরিশ্রমের সময় নির্ধারণ হেতু আইন
প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত আইন পুরুষ
ও স্ত্রী মজুর নির্বিশেষে নিয়োজিত হইবে।
ইতিমধ্যে যে সকল দেশে আইন গঠন
হয় নাই তাহাদের চ্যুত হইতে আইন
প্রচলিত দেশকে বাচাইবার জন্ত অনেক
উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে এবং তাহা-
নিমিত্ত অন্যান্য বিবর্ততার হাত হইতে

রক্ষা করিবার জন্ত ফেডারেল গার্মেন্ট
সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছে।

ভারতবর্ষে স্ত্রী মজুরের অদৃষ্টাংশ চির-
দিনই বোধ হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে।
পুরুষ মজুরদের আলোচনের মধ্যে শ্রমিক
চেষ্টা এবং কর্মনিষ্ঠার অভাব যেমন প্রকট
হইয়াছে স্ত্রী মজুরদের সম্বন্ধে জানাও
তেমনি অসম্ভব হইয়াছে। মার্কিনের মত
পুঁজিপাতির দেশেও শ্রমিক সূত্রে আলো
দেহতে পার আর ভারত দরিদ্রের বেশ
হ’য়ে তার পাঞ্জিটুকু পাবার চেষ্টার বিরত।
কর্মের অভাবই মাছুষ—গড়ার পথেই কাটা
এবং তার অপেক্ষা অধিক বাধা অসম্ভব
কর্মীর হাতে কর্মের প্রচেষ্টা

নিবন্ধ

নিবন্ধিণী সাহিত্য সংসদ

গত ৬ই কার্তিক রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় ৫০নং মহিম হালদার ষ্ট্রীটে (কালিঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে) উক্ত সংসদের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। রায় শ্রীযুক্ত দশেন চন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অঙ্গায়ক শ্রীবিভূতি চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের পর শ্রীঅমল ঘোষাল, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'পার্থ' নামক কবিতাটি আবৃত্তি করেন। সম্পাদক কর্তৃক গত অধিবেশনের কার্য বিবরণী পাঠ করা হইলে পর শ্রীওৎসব বসু একদিক নামক একটি সনেট ও শ্রীদীনেশু সন্দর দাস "স্বপ্নে" নামক একটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীহর্গাপদ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি পঠিত-কবিতাগুলির সমালোচনা করেন। অতঃপর শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ কর্তৃক "বাংলা পঞ্চ-সাহিত্য ও বিজ্ঞানাগর" নামক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। শ্রীনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীহর্গাপদ কাব্যতীর্থ প্রভৃতির দ্বারা তাহা সমালোচিত হয়। ইহার পর সভাপতিকর্তৃক ধর্মবাদ জ্ঞাপনের পর জল যোগান্তে সভার কার্য শেষ হয়। সভায় হস্তলিখিত 'নিবন্ধিণী' পত্রিকা প্রদর্শিত হয়।

শৈল্পনাথধাম-রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকৃষ্ণেশ্বরী মাতার পূজা ও উৎসব

প্রতি বৎসরের জায় এবং সরও বৈষ্ণবনাথ ধাম কুণ্ডা রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকৃষ্ণেশ্বরী মাতার ত্রিকালীন পূজা ও উৎসব হইবে। এতৎ উপলক্ষে একটা মেলা বসিয়া থাকে ও বহু দেশ দেশান্তর হইতে লোক সমাগম হইয়া থাকে। মাতার পূজা ও উৎসবে ৪৫ দিন দরিদ্র নারায়ণের সেবা বিশেষভাবে হইয়া থাকে। এবং ১৫ই কার্তিক মঙ্গলবার হইতে ১৯শে কার্তিক শনিবার পর্যন্ত বিশেষভাবে উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইতেছে। চণ্ডীর গান, ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা নাম সংকীর্তন, বার্তা, বায়স্কোপ, বাজা ম্যাজিক, সাওতালী নাচ, লাঠি খেলা, কুমুর ইত্যাদি যেমন হয় তাহারও ক্রটি হইবে না। দেওঘর ষ্টেশন হইতে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধা উদ্দেশ্যে মোটর লরীর ব্যবস্থা হইতেছে। ইতি মধ্যেই বহু লোক সমাগম হইতেছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর এই মাতৃ পূজা ও সাধু উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

বালীগঞ্জ ইয়ংমেন্স এসোসি-

সিয়েশন

গত ১৬ই অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় বালীগঞ্জ ইয়ং মেন্স এসোসিয়েশনের উৎসব ও সাহিত্য শাখা সমিতির উদ্যোগে একটা

প্রীতি-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য শাখার রচনা প্রতিযোগিতায়, কুমারী শান্তি বসু ১৩ গল্প প্রতিযোগিতায় কুমারী শৈলমুখতা বিশ্বাস একটা করিয়া রোপা পদক পান। কুমারী শুক্লিধারা মুখার্জী, কুমারী প্রীতিধারা মুখার্জী ও কুমারী বণা রায় চৌধুরীর নৃত্য। এবং জগবন্ধু মুখার্জী, কুমারী সন্ধ্যাদাস, কুমারী গৌরী মিত্র ও সুপ্রীতি মজুমদারের বন্দেমাতরম সঙ্গীত, কুমারী রেণুকা ঘোষের খেয়াল গান এবং নির্মল পালের আবৃত্তি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আর. এ. পি

"রিফর্ম্ ড্ আর্ট প্রেসার্স" নামে একটি নূতন নাট্য প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষিতা ভদ্র মহিলা সমন্বয়ে সংগঠিত। এরা একখানি ছবিও তুলবেন— এখন চলেছে আর্টিষ্ট সংগ্রহ ও নির্বাচনের পালা। এদের উদ্দেশ্য, জনসাধারণ দর্শক-বন্দের চোখের সামনে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একটা কিছু তুলে ধরা। মঞ্চ ও পর্দা দু'বিভাগেই পরিচালকের পদে নিয়োজিত হয়েছেন জন-প্রিয় তরুণ অভিনেতা শ্রীমুখাংকুমার মুখোপাধ্যায়; সম্পাদকের পদে—সুনিপুণ ব্যবসায়ী মিঃ জে, সি, ভট্টাচার্য। এদের প্রথম প্রচেষ্টা 'ঋণাধারী' ও "রূপ শিকারী" কলিকাতার কোন বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে দেখা যাবে।

ফোন ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের
তেল ব্যবহারে
বেরি বেরি হয় না

মিল-২৪৬, আপার সারকুলার রোড - কলিকাতা।



অসুস্থ
শরীর



দুঃস্থ ও সর্বল

করিতে



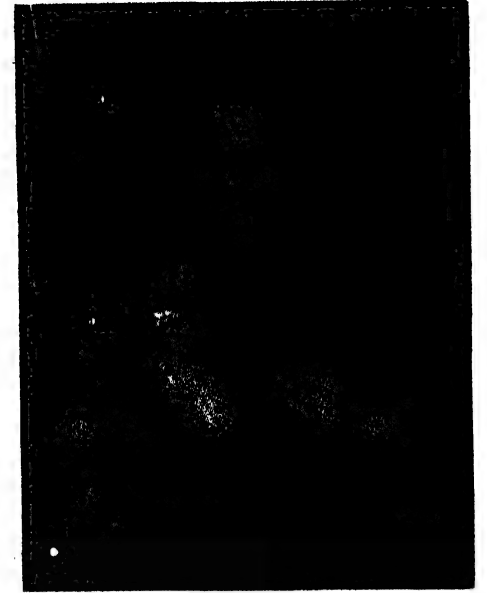
সিরোলিন
'রাচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সদি কাসি এবং মক্ষ্মার
প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ।



ব্যায়াম ও ছাত্রছাত্রী সমাজ শ্রীউমেশ মল্লিক (ব্যায়াম শিক্ষক)



শ্রীউমেশ মল্লিক

এই জাতীয় দুর্দিনে জীবন যাত্রার পথে উন্নতি লাভ করিতে হইলে ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়ের উন্নত স্বাস্থ্যের যে কত প্রয়োজন তাহা জনসাধারণ মাত্রই সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। ছাত্রছাত্রী সমাজের উপর জাতির ভবিষ্যত মুখ্যতঃ নির্ভর করে। অতএব এ সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের উপর জনসাধারণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যে দেশের ছাত্রছাত্রী সমাজ অসুস্থ, স্বাস্থ্যহীন সে দেশ, সে জাতি এই জনবহুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চিরদিনের জন্ত বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত। 'চিরকালেই এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রী সমাজ উন্নত জাতির হৃদয় আকাশে অস্পষ্টভাবে জাগরুক হইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়ের উন্নত স্বাস্থ্য জাতীয় উন্নতির পথের পরিচরক। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 'যে রূপ দেশনায়কের বড়ই প্রয়োজন হয় উন্নত স্বাস্থ্য সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীগণের প্রয়োজন তদপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ছাত্রছাত্রীগণকে উন্নত, স্বাস্থ্যবান, শক্তিশাল্পন্ন দেখিতে হইলে এ সম্প্রদায়ের ব্যায়াম চর্চায় মনোনিবেশ করিবার সহায়তা করা যুক্তি সঙ্গত। আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীগণের ভগ্নস্বাস্থ্য জাতির দুর্দিন এবং অবঃ পতনের পরিচরক হইয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু ব্যায়াম চর্চায় শিক্ষাতন্ত্রী ছাত্রকে অতি অল্পদিনই বৈধব্য সহকারে ব্যায়ামে অহরহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ নানাবিধ।

অনেকে অবস্থার প্রতিকূলে পড়িয়া ব্যায়াম চর্চায় বিরত হন। অনেকেই অতি অল্পদিনে স্বীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিতে না পাইয়া ব্যায়ামের প্রতি বিবেচ্য ভাব পোষণ করেন। কেহ কেহ দিব্যবিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তকের নির্দিষ্ট অংশ শেষ করাকে মুখ্য এবং স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা গোণ পর্যায়ভুক্ত করেন। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, দেশে ব্যায়াম চর্চায় বিশেষজ্ঞের (exponent of physical culture) অনটনে সামান্য পরামর্শের অভাবে ছাত্রগণ এ বিষয়ে দিন দিন উদাসীন হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সহপাঠী ছাত্রদের অবস্থা অতীব সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে শতকরা সকলেরই স্বাস্থ্য আশাপ্রদ নহে। জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে স্বাস্থ্যবতী শক্তিশাল্পন্ন ছাত্রের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতেছে। তাঁহাদের স্বাস্থ্য জাতীয় উন্নতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই ছাত্রী সমাজের উপর জাতির শক্তি, সাহস, বলবীৰ্য্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

ছাত্রীদিগের নিকট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিবার কথা উত্থাপন করিলে সৌন্দর্য্যহীন হইবার আশঙ্কায় এ সম্প্রদায় ব্যায়ামের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। ব্যায়াম চর্চা করিলে সৌন্দর্য্যহানির আশঙ্কা আছে—একপাত্রা ধারণার পক্ষপাতী হইয়া শরীর চর্চায় প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা অত্যন্ত গর্হিত। বাহ্যিক এই মতের

পোষাকতা করেন তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে, নীচাতির মাংসপেশীর আকার দীর্ঘায়ত এবং স্কল হওয়ার তাঁহাদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট কোন প্রকার ব্যায়ামই সৌন্দর্য্যহানী করিবার সহায়তা করিতে পারে না—অধিকন্তু তাঁহাদিগকে লাভ্যময়্য করিয়া তুলে। কারণ কোন ব্যায়াম-কারী ছাত্রীকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাহার মাংসপেশীগুলি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, চর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিটোল, কমনীয়তা এবং কোমলতায় পরিপূর্ণ। ইহা ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে developed হওয়ায় তাঁহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। ছাত্রীগণকে ব্যায়াম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করিবার জন্ত। ছাত্রীদের ব্যায়াম করিবার উদ্দেশ্য ছাত্রদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই জন্তে ছাত্রীদের ব্যায়াম করিতে বলিলে যেন কেহ মনে না করেন যে, ব্যায়াম করিলে

ছাত্রীদের মাংসপেশী সমূহ ক্ষীণ হইয়া দেহ পুরুষাকৃতি হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশের ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই স্থলানী হওয়ায় তাঁহাদের সৌন্দর্যহীন। করিয়া তুলে। বাহাতে ছাত্রছাত্রীদের দেহে মেদ জন্মাইতে না পারে সে বিষয়ে এ সম্প্রদায়ের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এক্ষণে দেখা যাক দেহে মেদ জন্মাইবার কারণ কি? এবং দেহে মেদ বা চর্বি কিরূপে জমা হয়

দেহে Adipose tissue নামে এক প্রকার tissue আছে। বাহিরে এই tissue গুলিকে স্পন্দ দানাদার দেখায় ইহা বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত। এই প্রত্যেক খণ্ডে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড আছে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে আবার ধমনী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা এবং চর্বিকোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল নালী পরস্পর এরিয়েলের তন্তুর দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করে। সংযোগে তন্তুর সেল হইতে চর্বিকোষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ fat সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন। যাহাদের দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমে তাঁহারা যেন অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় আহার না করিয়া শরীর চর্চার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। অতিরিক্ত আহার করা কখনও উচিত নহে। এইরূপ আহার করা উত্তম স্বাস্থ্যের ফলপ্রসূ নহে। অনেকে স্নানাহারে শরীরকে মেদ জন্মাইবার সম্ভবনা হইতে রক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে স্নানাহারে দেহ ভাল থাকে। এ ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা কর্তব্য।

আমাদের দেহ ক্ষয় ও পূরণের সমষ্টি বিশেষ। মানুষ নিশ্চেষ্টভাবে চূপ করিয়া শুইয়া থাকিলেও প্রায় ২৫,২২০ বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। নিঃশ্বাস গ্রহণ

এবং ত্যাগেও মানুষের দেহের ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রত্যহই এবং প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহের কিছুনা কিছু ক্ষয় হইয়া থাকে। এই ক্ষয়তি অংশের পূরণের জন্য আমাদের আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা সমীচীন। সকলেই অবগত আছেন যে খাদ্যদ্রব্যের সারভাগ হইতেই শরীরের ক্ষয়তি অংশের পূরণ হইয়া শরীরে শক্তির সঞ্চার হয়।

আমাদের খাদ্য দ্রব্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত:— (১) আমিষ জাতীয়। (২) নিরামিষ জাতীয়। আমিষ জাতীয় খাদ্যে আমাদের দেহের ক্ষয় নিবারণ ও পুষ্টি-সাধন হয় এবং নিরামিষ খাদ্যে আমাদের শক্তি লাভ হয়।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে আমাদের খাদ্যদ্রব্যে ছয় প্রকার বৈজ্ঞানিক পদার্থ আছে, যথা ১। ছানা জাতীয় ২। খেতসার জাতীয়, ৩। স্নেহ জাতীয় ৪। খনিজ পদার্থ, ৫। জলীয়, ৬। খাদ্যপ্রাণ। সকল প্রকার খাদ্যে উপরোক্ত উপাদান-গুলি পাওয়া যায় কিন্তু বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে বিশেষ বিশেষ উপাদানের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়।

জার্মান পণ্ডিত ভোয়াট বলেন যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রত্যাহ শ্রমসাধ্য কার্য করিলে তাঁহার প্রত্যাহ ১৩৩ গ্রাম প্রাচীন (ছানা জাতীয় উপাদান), ২৫ গ্রাম তৈলাক্ত পদার্থ ও ৪৩৭ গ্রাম খেতসার জাতীয় উপাদান গ্রহণ করা কর্তব্য। যিনি অল্পরূপ কার্য্য লিপ্ত থাকেন না তাঁহার প্রত্যাহ ১০২ গ্রাম বা প্রায় আধপোয়া ছানা জাতীয় একছটাক তৈলাক্ত পদার্থ এবং ৪৮৫ গ্রাম খেতসার জাতীয় উপাদান গ্রহণ করা যুক্তি সঙ্গত।

কোন পদার্থে অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান থাকিলেই যে শরীরের পক্ষে তাহা

উপযোগী তাহা নহে। সর্বপ্রথম দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বাহাতে এই সমস্ত উপাদান সহজে পরিপাক হইয়া দেহ গঠনের সহায়ক হয়। যাহাদের পরিপাক-বন্ত্র দুর্বল তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। যাহা হউক ফলকথা এই যে সুস্থ ব্যক্তির যে খাদ্য ভাল বোধ হয় এবং যাহা আহার করিলে মনে কোন ঘানি বোধ হয় না এইরূপ আহার করাই বিধেয়। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শরীর রক্ষার উপাদান আছে কিনা এ বিষয়েও দৃষ্টি রাখা সঙ্গত।

ছাত্র ও বঙ্গুগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্যায়াম করিবার পূর্ব হইতে ডিম, ছানা, পেস্তা বাদাম প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। তাঁহাদের মনে এরূপ ধারণা বহুশুল হইয়া আছে যে ব্যায়াম করিলে বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন করা কর্তব্য। গুরুপাক খাদ্য (পেস্তা বাদাম, মনেকা) গ্রহণ না করিয়া অনেকে অমানুষিক শক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া বহু সহপাঠিকের এ বিষয়ে মতামত দিতে হয় এবং হইতেছে। আহার ব্যতীত ব্যায়াম চর্চা করিতে হইলে আমাদের বহু বিষয়ে সতর্ক অবলম্বন করা কর্তব্য। শ্বাসক্রিয়া, স্নান, একাগ্রতা, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সমীচীন। ইহাতে শরীরের যে অংশের উন্নতি হইয়া থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। ছাত্রদিগের জন্যে ব্যায়াম নির্দেশ করা কঠিন। তাঁহাদের এইরূপ ব্যায়ামের নির্দেশ দিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অথচ অটুট স্বাস্থ্য লাভ হইতে থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্রদিগের নিমিত্ত সহজসাধ্য ব্যায়াম নির্ধারণ করা উচিত।

ছাত্রীদিগের সম্ভরণ নির্দেশ করা বাইতে পারে। সম্ভরণ সহজসাধ্য অতি স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়াম। মহিলাদিগের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা কর্তব্য। ছাত্রী গণের মধ্যে অধিকাংশই টেনিস, ভলিবল, প্রভৃতি খেলিয়া থাকেন। বিদেশীয় ছাত্রী-গণকে ফুটবল, হকি, অস্কারোহণ প্রভৃতিতে লিপ্ত দেখা যায়। কিন্তু অস্কারোহণ, ফুটবল বা হকি খেলা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম বলিয়া গৃহীত হয় না। কারণ ইহাতে Violent exercise হইয়া থাকায় বিশ্রাম গ্রহণ করিবার সময় অবসাদ আসে। ছাত্রীগণের প্রত্যেকের Breathing exercise গ্রহণ করা কর্তব্য। Breathing exercise বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়ামের অংশ বিশেষ।

ছাত্রগণও ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলিয়া থাকেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম হয় না বলিয়াই তাঁহারা উন্নত স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন না।

এক্কে ব্যায়াম এবং খেলাধুলার পার্থক্যের কথা আসিয়া পড়ে। অনেকেরই এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে খেলাধুলা এবং ব্যায়ামের উদ্দেশ্য একই। তাঁহারা মনে করেন যে Sports and Exerciseএ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন হয় বলিয়া মাংসপেশী-গুলির একই ভাবে উন্নতি হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিলে একা-গ্রতা বলে অতি সহজেই সমুদয় মাংস-পেশীতে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং ব্যায়াম জনিত কোন অবসাদ আসে না। খেলা-ধুলায় অধিকক্ষণ ব্যাপ্ত থাকিতে হয় এবং উত্তেজিত হইয়া বৈশী দোড়াদোড়ি করায় বিশ্রাম করিবার সময় ক্লান্তি বোধ হয়। ব্যায়ামের সাহায্যে যে শক্তি ও শ্রম করিবার ক্ষমতা সঞ্চিত হইয়া থাকে Sportsএ তাহা ব্যয়িত হয়। খেলাধুলায় মাংসপেশী

সঞ্চালিত হয় বটে তবে নির্দিষ্ট মাংসপেশী-গুলির উপর মনঃসংযোগের অভাব বিশেষ-ভাবে দৃষ্ট হয়।

তবে ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে Sportsএ শরীর চর্চা হিসাবে মূল্য একেবারেই নাই। খেলাধুলায় মানসিক ক্ষুণ্ণি আসে এবং খেলোয়াড়গণ খেলাধুলা করিয়া কন্ঠ হইয়া উঠেন। ব্যায়াম করিতে হইলে মানসিক ক্ষুণ্ণির বিশেষ প্রয়োজন কারণ ব্যায়াম করিবার সময় মানসিক কোন চঞ্চলতা থাকিলে একাগ্রতাসহকারে ব্যায়াম করা যায় না। ব্যায়াম করিতে হইলে একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। একাগ্রতা সহকারে ব্যায়াম না করিলে ফললাভে সন্দেহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

অধুনা বাঙ্গলা দেশে ক্রমে ক্রমে ব্যায়াম করিবার স্পৃহা জাগরিত হইতেছে। এই নব জাগরণের দিনে সমগ্র দেশবাসী ছাত্রছাত্রী সমাজের প্রতি অপলক নেত্রে চাহিয়া আছেন। এই নিরঙ্গ অসহায় জাতিকে জগতের অনাত্ম জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে উন্নত স্বাস্থ্যের প্রয়োজন সর্বপ্রথম অমুভূত হইবে। বৈদেশিকগণের মনের ধারণার পরিবর্তন করিতে হইলে উন্নত স্বাস্থ্যবান শক্তি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীকে দেহেমনে উন্নত হইতে হইবে। যাহাতে, ছাত্রছাত্রী সমাজ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাঁহারা সহযোগিতা ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত না হুন সে বিষয়ে জনসাধারণের পক্ষপাতিত্ব করিতে হইবে, স্বাস্থ্যের উন্নতির পথ, মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহাদের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দিতে হইবে। দেশ নায়কগণের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের ছাত্রছাত্রী সমাজও বৈদেশিকগণের

ভায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারিবেন না ইহা কেহ মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারিবেন না। স্বাস্থ্যই সম্পদ এই প্রবচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ছাত্রছাত্রী সমাজ যদি জীবন যাত্রার পথে আঙুলান হইতে পারেন তাহা হইলে এই দুর্ভিক্ষ প্রণীড়িত অধঃপতিত জাতির মুক্তির দিন অতি সন্নিকটে।

ডাঃ প্রের বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

ডাঃ প্রের
পাণ্ডুরা বান্ন।

রেকর্ড সমালোচনা **—এডিসন—**

আধুনিক গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত—
গোপাল ভাডের “মোসায়েব নির্বাচন”
—ভারতবাণী রেকর্ড।

পূজার সময় হিন্দুস্থান কোম্পানীর প্রকাশিত রেকর্ডগুলির মধ্যে নিয়ে আমরা কয়েকখানির সমালোচনা প্রকাশ করিলাম। ভবিষ্যতে আমরা নিয়মিতভাবে রেকর্ড সমালোচনার প্রয়াস পাইব। সহৃদয় পাঠকবর্গের ও বিভিন্ন কোম্পানীর কর্মকর্তা-দিগের সহায়তায় ও সহায়ত্বভূতিতে আমাদের সমালোচনা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রশংসা-নিম্মবাদে উর্দ্ধে স্থায়িত্ব লাভ করিলেই আমাদের লেখা সার্থক হয়।

এচ ৬৪১ হিন্দুস্থান :—শ্রীমতী গোপালী-বালা, শ্রীমতী পারুলবালা, প্রেমকুমার ও মোহনলাল এই রেকর্ডখানিতে মাদল, বেণু ও অস্ত্রান্ত্র আবহ সঙ্গীতের সহিত সাঁওতালী নৃত্যের সুরে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। একপিঠে ‘সখি চল, পানিয়া ভরণে জলে’ ও অপর পিঠে ‘এলে কে পরদেশী বাজিয়ে বাঁশী’ গীত হইয়াছে। গান দুইখানি শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

এচ ৬৪২ হিন্দুস্থান :—এই রেকর্ডে শ্রীঅম্বপম ঘটক, শ্রীসত্যরঞ্জন চৌধুরী, কুমারী প্রতিভা সেন ও অস্ত্রান্ত্র শিল্পীহৃদ আগমনী বিষয়ক দুইখানি আধুনিক গান রেকর্ড করিয়াছেন। পুরুষ কণ্ঠের সহিত নারী কণ্ঠ এই রেকর্ডে সুন্দরভাবে মিলিয়াছে।

খোল খঞ্জরীর সহিত ‘শিউলিঝরা অজনপথে’ সুপ্রাচ্য এবং অর্জুনকে ‘আজি শরণ চাঁদের তিথিতে’ গানখানি আপেক্ষিকভাবে মধুরতর।

এচ ১১৬৪৩ হিন্দুস্থান :—শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বি-এল ও তাঁহার দলবল “মোসায়েব নির্বাচন” নামে একটি হাস্য-রসাত্মক নাটক অভিনয় করিয়াছেন। রেকর্ডের প্রারম্ভেই বেতার প্রতিষ্ঠানের অতুল্য শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বাণীকুমার রচিত ও বিখ্যাত গায়ক পঙ্কজ কুমার মল্লিক কর্তৃক গীত ‘নমো নমো নমো হে রুদ্র সন্ন্যাসী’ গানের লালিকা ‘থামো থামো থামো হে ক্ষুদ্র রাক্ষসী’ এই চরণ গীত হইতেই আমরা নূতন রসাস্বাদনের নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া ছিলি, কিন্তু মোসায়েব সঙ্ক্ষে গোপাল ভাডের অতি-পুরাতন বহুজাত গল্পটিকে লইয়া ননৌ দাশগুপ্ত এম্-এ মহাশয় এত সাধারণ ভাবে, নাট্যরূপ দিলেন যে হাস্যরস নেহাৎ কাষ্ঠ-হাসিতে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার উপর দ্বিতীয় মোসায়েব ‘প্রলয় পালধি’ বাঙলা শব্দ মাড়োয়ারী-মূলভ উচ্চারণ করিয়া এবং অদ্ভুত intonation এর সহিত যে হাস্য-রস পরিবেশনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা মোটেই হাস্যরসের অমূল্য নহে। ঐহ মোসায়েব সবজাত সমাদরের ভূমিকায় সঙ্গীত চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ভাল হইয়াছে।

এচ ৬৪৮ হিন্দুস্থান :—কুমারী কণিকা সুখোপাধ্যায় এই রেকর্ডে দুইখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত রবীন্দ্র-সুরে গাহিয়াছেন। একদিকে ‘মনে কী দিখা রেখে গেলে’ ও অপরদিকে ‘না না, ডাকব না, ডাকব না’ গাওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রের সুরে রাবীন্দ্রিক-গান অনেকেই গাহিয়া থাকেন, কিন্তু বর্ধাধ রবীন্দ্রিক গান অল্পই শ্রুত হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সহিত আধুনিক গানের অনেকাংশে মিল বর্তমান সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও আধুনিক সুরবিশিষ্ট গানের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা অসম্ভব। নিছক রবীন্দ্র সঙ্গীত শ্রীমতী কনক দাস, শ্রীমতী সতী দেবী, স্বর্গতঃ হরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির কণ্ঠে যেক্রমে রূপ পায় বা পাইত সেক্রমে সকল কণ্ঠে শুনা যায় না। শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের ‘কতগুলি গান রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যে গাহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অনেকস্থলে আবার তাঁহার নিজস্ব চণ্ডে গানগুলি অশ্রুতরূপে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। আবার আধুনিক ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সীমা-রেখা নির্দেশ করাও দুর্বল ব্যাপার। যাহা হউক বর্তমান রেকর্ডে শিল্পী গান দুইখানি আধুনিক ভাবেই গাহিয়া ফেলিয়াছেন। কুমারীর কণ্ঠ পরিষ্কার এবং সহগামী সঙ্গীতের সহিত সরলভাবেই গান দুইখানি গীত হইয়াছে ‘মনে কী দিখা রেখে গেলে চল’ গানখানি আপেক্ষিকভাবে ভাল।

এচ ৬৪৯ হিন্দুস্থান :—শিল্পী শ্রীসত্যরঞ্জন চৌধুরী সহগামী-সঙ্গীতের সহিত ‘আমারে ভুলিয়া যাবে জানি’ ও ‘রজনীর শেষে দেখছি’—এই আধুনিক গান দুইখানি এই রেকর্ডে পরিবেশন করিয়াছেন। সরলভাবে এবং নির্দোষভাবে গান দুইখানি গীত হইয়াছে। বৈচিত্র্যের নিমিত্ত দ্বিতীয়

গানখানির মধ্যে ইংরাজী সুর যোজনা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ৭৮ গতিবেগে রেকর্ড বাজানো হইয়া থাকে, কিন্তু এই রেকর্ড খানিকে ৮০ গতিবেগে বাজাইতে হইবে এইটুকু বৈশিষ্ট্য শ্রোতৃবর্গের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

এচ ৬৪৪ হিন্দুস্থান :—শ্রীজ্ঞান ঘোষের রচনায় ও পরিচালনায় “বাণী সঙ্ঘ” কর্তৃক এই রেকর্ডের একদিকে তিলোক কামোদ ও অল্পদিকে পিলুতে অর্কেষ্ট্রা বাজানো হইয়াছে। বাদন মনোরম, বিশেষতঃ পিলুর দিকে সুর-সংগ্রহণ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি সুপ্রাচ্য।

এচ ৬৪৫ ভারত-বাণী :—এই ভারত-বাণী রেকর্ডে শ্রীমুরেশচন্দ্র মিত্র (‘আজি’) বিদ্যায় ‘বেলায় মিনতি তোমায়’ ও অল্পদিকে ‘আজি পড়ে গো মনে—’ এই দুইখানি আধুনিক গান রেকর্ড করিয়াছেন। গান দুইখানিতে আর কিছু দোষ নাই, তবে বিরহমূলক প্রেম-সঙ্গীতে বাস্তবতার আবহাওয়া অর্জন করিবার জন্তু কিনা জানি না, কঠে যে কাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বোধ হয় রেকর্ড তুলিবার কালীন ভয়ে ভয়ে গাওয়া হইয়াছিল বলিয়াই হইয়াছে;—তবে শিল্পের ভবিষ্যৎ যে আশাপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

—:~:—

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের ঢা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত গানীয়

শরৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

মিসেস মাধবীলতা দাশ

বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে শরৎবাবুর দান যে শুধু অমূল্য তাই নয় অপূর্ণ ও অচিন্ত্য। যাহুকর ভেদিক দেখায়, আমরা দেখে আনন্দ পাই কিন্তু যে মুহূর্তে ভেদিকের সব কিছুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার কর্তে যাই সেই মুহূর্তেই করি ভুল, ভেদিক দেখে যে আনন্দ পাই, তা’ যায় অন্তহিত হয়ে। শরৎ সাহিত্যের অবদান আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে; এর রস উপলব্ধির, অনুভূতির। একে বিশ্লেষণ কর্তে গেলে হয়তো বা আমরা কর্কস অজ্ঞায়, কারণ প্রথমতঃ বুদ্ধি দিয়ে’ যুক্তি দিয়ে হৃদয়কে বিচার করা যায় কিনা এবং বুদ্ধি বড় কি হৃদয় বড় এ সমস্তা পৃথিবীর আদিম সভ্যতার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শুধু সমস্তা হয়েই রয়েছে, সমাধানের পন্থা খুঁজে পাওয়া যায়নি, দ্বিতীয়তঃ বিচার করার ক্ষমতা তারই থাকে যার আছে সংস্কার বিহীন মনের পরিপূর্ণ শিক্ষা ও বিচার বুদ্ধি। সব সমাজের সব সংস্কারের বাইরে না গেলে শরৎ সাহিত্যকে বিচার করা চলে না, বিশ্লেষণ করা চলে না, আর বিশ্লেষণ না করলে তার বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যুগ যুগ সঞ্চিত পুঞ্জীভূত বেদনার সাথে যার নেই সম্যক পরিচয়, যার নেই মানব-মনের গোপনতম অনুভূত উপলব্ধির অভিজ্ঞতা, তার শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার প্রয়াস বুঝা নয় অসম্ভব ও অপরাধ।

শরৎ সাহিত্য আলোচনা করার আগে জেনে রাখার প্রয়োজন ভারতবর্ষকে, তার ভাবধারাকে, তার সংস্কারকে, তার সমাজকে, সমাজের ব্যক্তিকে।

কবে কোন আদিযুগে মানুষ এই ভারতের মাটিতে ব্যষ্টির কল্যাণ কামনায় সভ্যতার প্রথম সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে গড়ে তুলেছিল তার সমাজকে, সে আজ বিস্মৃত প্রায়। সেদিনকার মানুষ কল্যাণ করেনি যে সেদিনকার প্রয়োজনে-গড়া সামাজিক অনুশাসন কালের কবলে মরিচা মণ্ডিত হয়ে আজ বহুশত বর্ষ পরে সংস্কারে রূপান্তরিত হয়ে তারই ভবিষ্যৎ বংশধরের জীবনকে করে তুলবে দুঃখময়। গৃহ নিশ্চিন্তের দিন সে ভাবেনি যে, একদিন এই ধরে ধরে গড়ে-তোলা রহৎ সৌধমালা জর্গ হয়ে পড়ে যাবে তারই সন্তান-সন্ততির মাথায় বিরাট বোঝা হয়ে, সৃষ্টি কর্তে নানা অনর্থের।

যুগায়ত সঞ্চিত সংস্কার আজ মানুষের জীবনকে করে তুলেছে দুর্ভর। গৃহকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস আজ মানুষের আনন্দকে করেছে বিবাক্ত, সমাজে চলেছে নরবলি। মানুষের জন্তু গড়া হয়েছিল সমাজকে, সমাজের জন্তু মানুষকে নয়। সেদিনকার প্রয়োজনে বিধিবদ্ধ অনুশাসন আজকের ছুনিয়ার কোন কাজে লাগতে পারে না। পদে পদে সে ছন্দপতন ঘটছে, ছুনিয়ার অগ্রগতির পথে সে আজ বাধা সৃষ্টি কর্তে। আজ তাই প্রয়োজন হয়েছে তাকে চেলে-সাজার, প্রয়োজন হয়েছে তাঁকে ঝালিয়ে নেওয়ার।

সাহিত্যের কাজ মানুষকে আনন্দ দেওয়া, তাকে আত্ম-সচেতন করে তোলা, যা কিছু অজ্ঞায় তার ভীত প্রতিবাদ করা, যা কিছু মন্দর তাকে মধুর করে সমাজের

ও ব্যষ্টির কাছে পরিবেশন করা। শরৎ-সাহিত্যে এর কোনটাইই অভাব নেই। তাঁর মোহন তুলিপাতে সমাজের যে ছবিকে তিনি ফুটিয়েছেন তাকে এক কথায় বলা চলে অপূর্ণ।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে যে একটি আত্ম-তোলা মহা-মহেশ্বর রূপ আছে তা কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রই প্রথম কথাসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত করেন বিন্দুর ছেলের যাদব, চন্দ্রনাথের কৈলাশ খুঁড়ো ও 'বামুনের মেয়ের' প্রিয়নাথের চরিত্র সৃষ্টি করে। মহেশ্বরের আর একটি ধ্যানা ও মৌনী রূপ দেখি আমরা বিপ্রদাসে ও মাইমে।

ধনী-কন্ডা বিন্দু এলো যাদবের সংসারে। রূপ ও ধনের প্রাচুর্য নিয়ে, আনলো নাকো শুধু ধনগরি। বড়-জাকে সে ভক্তি কর্ত, শ্রদ্ধা কর্ত, ভালবাসত মায়ের চেয়েও বেশী করে, কালের আবর্তনে ঘটনার প্রবাহে সংসার হল ভিন্ন। শরীর অসুস্থ। জায়ে জায়ে চলেছে মান-অভিমানের পালা। কথা বন্ধ। তবু মায়ের অমুরোধের উত্তরে সে বলে—“না, মা, তা হয় না। যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ সেখানেই থাক, সেই সব। আর যাই করি মা তাঁকে না বলে বাড়ী ছেড়ে যেতে পারছি না।” অভিমানিনী ধনীর ছললি সে, তবু মাতৃ-তুল্য বড়-জায়ের প্রতি ভক্তি যে কত বেশী ছিল তা তার এই ভক্তি থেকেই বোঝা যায়। ভারতবর্ষের হিন্দু ঘরের গৃহস্থ কুলবধূদের চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর সাহিত্যেও কোথাও এর তুলনা মেলে না, একমাত্র শরৎ সাহিত্যেই এর সুন্দর স্ফূরণ লাভ ঘটেছে। অভিমানে তিলে-তিলে সে নিজেকে ক্ষয় কর্তে লাগল, যম-মামুবে টানাটানি তবুও ঔষধ সে খাবে না, মা. বাপ, স্বামী কারও অমুরোধেই না। এ যে তার মূর্ত্তের



স্ব-বালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

১ ১ বোম্বাই

অসম্ভবতার ঘটনা স্বপ্নত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। এমন সময় পিতৃভূত্য রেহময় মৌনী বড় ভাস্কর এসে বলেন—“আর একদিন যখন এতোটুকুটী ছিলে মা, তখন আমি এসে আমার সংসারের মা-লক্ষ্মীটিকে নিয়ে গিয়েছিলাম, আবার আসতে হবে তাবিনি; জানতো মা আমি মিথ্যে কথা বলিনি।” শুধু তাকে খেতেই হ’ল। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের, সত্য-ভাষণের এ অপূর্ণ প্রকাশ ভঙ্গী শুধু শরৎ সাহিত্যেই সম্ভব।

তারপর আসে শরৎ সাহিত্যের অপূর্ণ অবদান। নরনারীর ভালবাসার মাঝে দেশাচারের, সমাজের ললিত বিধিব্যবস্থার যুগকাঠে নরবলির বিরাট আয়োজনের ছবি। এমন প্রাণস্পর্শী করে ব্যথাকে রূপ বোধহয় আর কোন সাহিত্যিকই দিতে পারেন নি। পথ নির্দেশেও নির্দিষ্ট হল না পথ, শুধু ধুমায়িত হল সংস্কারের অত্যাচারের ব্যথা। ‘হেম ও গুণী। দুটী সবুজ প্রাণে জাগল ভালবাসা, সৃষ্টি হল ব্যথার, সম্ভব হল আত্মহুতি যজ্ঞের। ব্রাহ্ম গুণী ভালবাসল হেমকে, হেমও ভালবাসল গুণীকে! সমাজ, দেশাচার দিল বাধা, গড়ে তুলল প্রাচীর, জীবনের মাধুর্য্য হল নষ্ট, গতি হল ব্যহত। ভালবাসার আছে কতকগুলো চাওয়া; এই চাওয়া যদি পাওয়ার না হয় রূপান্তরিত তাহলে জাগে অভিমান, মানুষ ভুলে যায় হিতাহিত জ্ঞান, হারিয়ে ফেলে শাস্ত বিচার বুদ্ধি। তাই যে দিন বিধবা হেম গুণীকে কর্তে চাইলে গুরু বরণ সে দিন সে তাকে দিল ফিরিয়ে। এই ফিরিয়ে দেওয়ার মূলে ছিল অভিমান, এ অভিমান ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে সমাজের বিরুদ্ধে সংস্কারের বিরুদ্ধে করে বিপ্লব, কোথাও বা সৃষ্টি করে আত্মহুতি যজ্ঞের। হেম ভুল বুঝল, সামনে যা পেল তাকেই ধরল ঝাঁকড়ে। প্রাণহীন ধর্ম্মানুষ্ঠান লোকাচারই হল বড়।

কিন্তু মনের কোন থেকে পারল না দূরে সরিয়ে দিতে তার ভালবাসার বস্তুটিকে। তাই তাকে ছুটে আসতে হল, সুবকিছুকে উপেক্ষা করে ঐ লোকটির রোগভোগের কথা শুনে। কিন্তু সে তখন নিস্বল এ নীলাশ্বতলে, শুধু সেবা কর্তে দেওয়ার অধিকারটুকু ছাড়া দেবার কিছু ছিল না তার; নেওয়ারও না।

তারপর দেবদাস, সমাজের প্রতিষ্ঠাপন মহাসম্মান। জমীদারের ছেলে দেবদাস গেল পাঠশালায় পড়তে, পড়ান তার মন লাগে না, পাখীর ছানা পেরে বেড়ানো আর পুকুরে মাছ ধরা প্রভৃতি তার নিত্য কর্ম্ম শ্রুতি। এসব কাজে তার যোগ্য সহচরী পাশের বাড়ীর মেয়ে পার্শ্বতী। দুটী কিশোর কিশোরীর সখ্যতা বয়সের সাথে সাথে ভাললাগা থেকে ভালবাসায় হল পরিণত। তাদের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করল দেবদাসের পিতার সামাজিক সম্মান। পার্শ্বতী বিশ্বাস কর্তে দেবদাসের পৌরুষে, তাই সমর্পিতপ্রাণা পার্শ্বতী এগিয়ে গেল এক নিশ্চিন্তি রাত্রে দেবদাসের কাছে আত্ম নিবেদন কর্তে। দেবদাসের অন্তরে তখন চলেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। বাইরের আত্ম-সম্মানের সঙ্গে মনের আত্ম-সম্মানের বেধেছে ঠোকাঠুকী। কর্তব্য নির্ণয় কর্তে তার দেবী হল সে পারল না, সেই দিনই তার অন্তরের দেবীকে বরণ কর্তে। অভিমানী পার্শ্বতী তার স্নায় চাওয়াকে ব্যর্থ হতে দেখে রুষে উঠল, তীব্র অভিমানে হারিয়ে গেল বিচার বুদ্ধি, ফলে আরম্ভ হল দুটী তরুণ তরুণীর জীবনাহুতি যজ্ঞের। এক বুদ্ধ ধনীর সাথে হল পার্শ্বতীর বিবাহ, সেখানে পার্শ্বতী শুধু স্ত্রীহিনী, বড়ো চক্রবর্তী মশাইও এর বেশী কিছু চাইলেন না। সমাজ নির্ম্মম হাতে ছিড়ে দিল দুটী প্রাণীর মিলনের স্নাতকে কিন্তু মুছে

দিতে পারল না তার অন্তর থেকে তার দেবদাসকে। পার্শ্বতী জীবনকে আচ্ছন্ন করে রইল দেবদাসের চিন্তা, গলাজলে ফুটে উঠল প্রিয়তমের ছবি। হয়তো কখনও প্রয়োজনে তার দেবদাস কাছ থেকে ডাক আসতে পারে সেবা করার, এই আশাটুকু নিয়ে সে রইল বেঁচে; জীবনের চলার পথে ঐ টুকুই তার সম্বল।

ওদিকে দেবদাস শক্তি হারা শিবের মত ধ্বংস লীলায় উঠল মেতে। যে সামাজিক মর্যাদা, যে আত্ম-সম্মানের জন্ত সে পার্শ্বতীকে হারিয়েছিল সেই মর্যাদাকে দিল ধুলোয় মিশিয়ে! সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে করলে প্রতিবাদ তিলে তিলে জীবনাহুতি দিয়ে। দুটী তরুণ-হিয়ার এই যে মর্ম্মস্তদ পরিণতি এর জন্তে দায়ী কে? এমন আর একটা প্রশ্ন রয়েছে এই যে tragedy এ কার? দেবদাসের না পার্শ্বতীর? যে তার সমস্ত আশা ভরসা নিয়ে চলে গেল পরপারে—তার, না যে রইল এপারের সমস্ত ব্যথা ও বেদনায় মুহুমান হয়ে তার? Tragedy পার্শ্বতীর। যে কীণ আশাটুকু তার জীবনদীপকে জ্বালিয়ে রেখেছিল দেবদাসের মৃত্যুর সাথে ‘সার্থে’ সে আশাটুকুও হল বিলুপ্ত, রইল শুধু যুগায়ত সঞ্চিত সংস্কারের দেওয়া পুঞ্জীভূত বেদনা। ব্যথা ও বেদনার ছবির মধ্যে দিয়েই শরৎ সাহিত্যের ক্রম বিকাশ।

সাবিত্রী, রমা, গৌরী, পার্শ্বতী ও সন্ধ্যা যে অত্যাচারের প্রতিবাদ কর্তে পারলে না, মুখ বুজে সহ্য করলে পণ না পেয়ে, সরযু ও বিলাসীও হয়তো তাই কর্তে যদি না পেত চন্দ্রনাথ ও মৃত্যুঞ্জয়ের সাহচর্য্য। সমাজের এইসব নোঙরামীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোমর বেধে লড়াই কর্তে সাহিত্যাসরে প্রথম আবির্ভূত হল কিরণী তারপর এলো কমল।

নারী চরিত্রের এই Evolution এর দিক অকন শরৎ সাহিত্যের অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিরণময়ী আর কমলকে বোঝার আগে যদি রমা, গৌরী, পার্শ্বতী, সন্ধ্যা এবং কালীতারা কে না বুঝি তাহলে কিরণময়ী ও কমল আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন মনে ও সংশয়ী চোখে বিকৃত হয়ে দেখা দেবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে ওদের সাহিত্যের আসরে আবির্ভাব, ব্যর্থ হবে কথাশিল্পীর প্রাণপাত পরিশ্রম।

কিরণময়ীর স্বামী লোকচক্ষুতেই স্বামী ছিলেন, কিন্তু আসলে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল অধ্যাপক আর শিষ্যার। তার স্বামীকে সে অন্তরের নিভৃত কন্দরে কর্তৃত্ব ভক্তি কিন্তু পারেনি ভালবাসতে। ভালবাসার জন্ত চাই কতকগুলো উপকরণ। চাই কতকগুলো আচার ব্যবহার যেগুলোর একান্ত অভাব ছিল তার স্বামীর মধ্যে। দাম্পত্য জীবনের এই অতি প্রয়োজনীয় দিক তিনি লক্ষ্য করার সুযোগই পাননি তার পঠন ও অধ্যাপনায় মেতে।

ভালবাসার ক্ষুধা, দাম্পত্য জীবনের বৃত্তিকা তাই কিরণময়ীর রয়ে গেল অপূর্ণ। ভালবাসা শুধু দেহগত নয়; স্নেহ ও স্থলে মিলে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশে এর সৃষ্টি হয়। মানব-মনের এ এক অপূর্ণ অল্পভূতি, এক অপূর্ণ সম্পদ। শাণ্ডীীর অত্যাচারের পীড়নে অনঙ্গ ডাক্তারকে সে আগিয়ে আসতে দিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তাতে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার নিরুজ্জ্বলতা হল না তাই তার মগ্নচৈতন্য ভালবাসার ও ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় রয়ে গেল অনল্পভূতপূর্ণ পরম লোভনীয়। একটা অল্পভূতির মত। সত্যশের কাছে তুলে উপেনের দাম্পত্য জীবনের কথা। মনের কোনে নিজের কামনা উঠল ভেগে কিন্তু তখনও উপলক্ষ্য হল না কোন ব্যক্তি।

স্বামীর শেখাবস্থার আঁকড়ে ধরে গেল মুমূর্ষুকে। ফল হল না—স্বামী তার বাঁচলেন না। তারপর কথাপ্রসঙ্গে সত্যীশ একদিন বলে বসল—“সংসারের ছুটা লোককে আমি দেবতার মত ভক্তি করি, উপেনদাকে আর তোমাকে, একজনকে মনে করলেই আমি তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখি।” কথার প্রতিধ্বনি দোলা দিল হিয়ার কিনারে; সম্ভব হল উন্মাদ তরঙ্গমালার। ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে দেখা দিল, উপেন হল তার পাত্র। তারপর সামাজিক অহুশাসনের মূর্ত প্রতীক উপেন তার ভালবাসার বিনিময়ে দিল শুধু উপেক্ষা ও ঘৃণা, অন্তরের প্রস্ফুটিত ক্রোধ কোরকটিকে কল্লের পদদলিত, ফলে পদাহত। ফিনির মত কিরণময়ী উঠল গর্জে, দিবাকরকে উপলক্ষ্য করে উপেনের গৃহের সুখকে দিল নষ্ট করে প্রতিশোধ স্পৃহায়। কিন্তু তাই বঁলে জলাঞ্জলি দিল না বা অপমান করল না তার নিজের ভালবাসার। দিবাকরকে সে ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ কর্তৃ অহুকম্পা কর্তৃ শেষ পর্যন্তও। তীব্র অভিমানে ও অপমানে দিবাকর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়ে দে আঘাত কর্তে চাইলে তাকেই যে সংস্কারের মোহে গার্হস্থ্যপ্রাণের গৃহকেই করেছিল বড় এবং গৃহের কাছে মানুষকে করেছিল অস্বীকার, যাকে সে নিজেই ভালবাসত অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। ভালবাসার উদগ্র কামনাই শেষে যে রমণীর একদিন রূপেরও সীমা ছিল না জ্ঞান বিজ্ঞাবুদ্ধিরও অন্ত ছিল না, সেই কিরণময়ীর চেতন অবচেতন ও মগ্নচেতন চৈতন্যকে দিল খুলিয়ে। নারীর মগ্নচেতনাকে থাকে নীড় বাঁধার আগ্রহ, থাকে দাম্পত্য জীবনের ক্ষুধা। এ আকাঙ্ক্ষার তৃষ্ণা ঘটেনি কিরণময়ীর জীবনে তাই উন্মাদ

অবস্থায়ও তাকে দেখি গিলটির গহনা পরে প্রিয়তমের রোগ মুক্তির জন্ত কালীঘাটের চরণামৃত ও প্রসাদা নির্মাণ্য বয়ে বেড়াতে। অন্তঃশীলার বহিঃপ্রকাশে যে নির্মম সত্যের হল উদঘাটন, যে সমস্তার হল সৃষ্টি তারই সমাধান কর্তে কমলকে আসতে হল সাহিত্যাসরে।

কিরণময়ী যা পারেনি, কমল সেই অসমাপ্ত কাজকে রূপ দিল এক অভিনব পন্থায়। সত্যকে সে জগতের সন্মুখে টেনে আনল তার সুশৃঙ্খল মতবাদে মত দিয়ে। নর ও নারীর জীবন যাত্রার পথে সংঘর্ষ তার পথচলার লক্ষ্য নয়, পাথের মাত্র, এ সত্যকে কমল তার নিজের জীবনে বরণ করে নিল। আজকের সত্যকে যে কালকেও সত্য হতে হবে বিশ্বসৃষ্টির প্রাকালে বিধাতা এমন কোন বিধি দেন নি। এ বিধি দুর্বলের, জীর্ণের, নিমজ্জিত-প্রায় ব্যক্তির, এ আঁকড়ে ধরে থাকার প্রয়াস যৌবনের মাহুষের, সবল মাহুষের ধর্ম নয়। তাই কমলকে দেখি গতির বেগে আনন্দ পেতে। পেছিয়ে পড়ে থাকতে সে ঘৃণা করে; সংস্কারকে সে তার ত্রি-সীমানায় বেষ্টনে দেয় না। বুদ্ধি দিয়ে সে বিচার করে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তাই তার আনন্দও কটি পাথরে-বুসো সোনার মত; তার মধ্যে খাদ নেই, খেতও নেই।

সত্য প্রচার শরৎ সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সত্যকে অকূর্ণভাবে প্রচার করার জন্ত বহু নিন্দা, বহু গালিগালাজ তাকে খেতে হয়েছে, তবু তাঁর-লেখনাকে কুণ্ঠিত করা যায় নি। নর্ত্তমান সমাজকে, সমাজের সংস্কারকে তিনি বারে বারে করেছেন আঘাত, কিন্তু অকারণে নয়। মাহুষকে তিনি ভালবাসতেন তাই মাহুষের জন্ত গড়া সমাজ, বিধি, মাহুষের ওপরই অত্যাচার

কর্মে এ তিনি সহ্য কর্তে পারেন না। সমাজের শাসনদণ্ড ধনী পুরুষের হাতে, সে তার ইচ্ছামত নারীকে করেছে পতিতা, হয়তো সে কারণে তারও সঙ্গে সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল সমাজ পতিত। সতীশ উপেনের স্নেহের পাত্র অথচ সে যাকে ভালবাসে সেই সাবিত্রীকে দেখেই উপেন নাক সিঁটকে ফিরিয়ে দিল সুরবালা ও দিবাকরকে এবং নিজেও গেল' নেমে সতীশের বাসা বাড়ীর সিঁড়ি থেকে। হিরু নাপিত বা তার মনিব কোনদিনই হল না সমাজচ্যুত অথচ কালীতারাকে ভোগ কর্তে হলো সারাজীবন পরের নোচাশয়তার জন্ত। গোলক জমীদার জ্ঞানদার কর্তে সর্বনাশ অথচ সেই হল সমাজপতি আর তার পাপের বোঝাকে বহন কর্তে জ্ঞানদাকে যেতে হল নির্কাসনে। এই সাবিত্রীর মধ্যে কিদের দৈন্ত আছে যার জন্ত সে সমাজের কাছে পতিতা, কোন অপরাধে জ্ঞানদা হল পতিতা, কি পাপ করেছিল কালীতারা যার জন্ত সমাজ তাকে পতিতা করেছে, শরৎ সাহিত্য আজ এই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে প্রত্যেক শিক্ষাভিমাত্রীর হৃদয়ের জুয়ারে। ঝারা শরৎ সাহিত্যকে বিলাসের সাহিত্য বলেন তাঁরা কি এ প্রশ্নের সমাধান করেছেন কোন দিন? চন্দ্রমুখার মধ্যেও কি ছিল না ভালবাসা, ছিল না নারীর নারী-সুলভ কোমল বৃত্তি ও অমূল্যবৃত্তি? রাজলক্ষ্মীর মধ্যেও কি ছিল না মাতৃ, পরহুঃ কাতরতা, সহৃদয়তা ভালবাসা ও সংযম? পতিতা নারীর মধ্যেও মহার্ঘ্য-মণির মত উজ্জ্বল রত্ন থাকে, তারাতো মানুষ, তারাতো গৃহস্থের কুলবধূদের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, একথা শরৎবাবু তাঁর আজীবন সাধনার মধ্য দিয়ে প্রচার করেছেন। পৃথিবীর সাহিত্যে ঐ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

বিরাজ-বৌ এর মত সতি-শিরোমণিকেও মুহুর্তের ভ্রমে পঙ্কিল মাখতে হয়েছে। তাই বলে মুহুর্তের ভ্রমকে তার স্বরূপ ললা চলে না।

শরৎ সাহিত্যের আর একটি অভিনয়-রূপ তাঁর গৃহদাহ, sudden psychology) ওপরে বইখানা লেখা, সুরেশের চরিত্র-সৃষ্টি সাহিত্য ক্ষেত্রে এক অভিনয় সৃষ্টি। উদার আত্মভোলা এই লোকটী ঠিক সাধারণের মতই দোষেগুণে ভরা মানুষ। প্রচুর অর্থ ও বিস্তৃত অর্থ অহঙ্কার নেই একটুও। বজুপ্রীতি; পরের হুঃখে সব ভুলে মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়া, লক্ষ বর্ষ আগেকার আদিম পুরুষের মত অন্তরের প্রিয় ললনাকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া এবং ভগবানে অচল অটল অবিশ্বাস সুরেশের চরিত্রকে করেছে সুন্দর সহজ সরল। এত বড় বিশ্বাসী নাস্তিকের সন্ধান বাংলা সাহিত্যে আর একটুও মেলে না যে মৃত্যুর ঠিক পূর্বে মুহুর্তে ভগবানকে ডাকতে অনুরোধ করে মুখ বিকৃত করে বলে—ও “আমার ভাল লাগে না।” ভগবানকে ডাকে মানুষ তার দুঃস্বপ্ন মুহুর্ত-গুলিতে অথচ কত শক্তি থাকলে ও কত নিঃশ্বাস হলে ভগবানকে মানুষ এমনি করে উপেক্ষা কর্তে পারে বলা শক্ত।

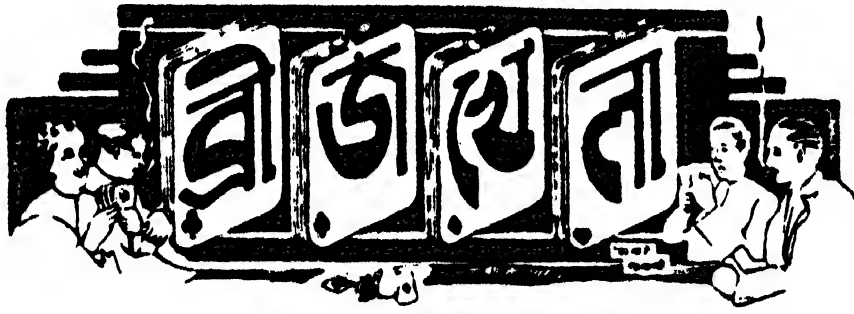
“জন ক্রিষ্টোফার” লিখে ওদেশের লোক নোবেল প্রাইজ পেতে পারে অথচ শ্রীকান্ত লিখে এ হতভাগ্য দেশের লেখক পাঠকদের কাছ থেকে একটু ধৈর্যের আশাও কর্তে পারেন না সমস্ত বইখানা পড়ার জন্ত। শ্রীকান্তকে নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক জায়গায় হয়েছে কিন্তু এর সন্মুখে একটা কথা কেউ কোনদিন কোথাও বলেননি। সেইটাই আমার এখানকার শেষ বক্তব্য।

শ্রীকান্ত বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ণ সম্পদ। তার সংসারে নেই কোন আকর্ষণ;

সমাজের ধার ধারে না, কোন কর্তব্যেরও ভার তাকে বহিতে হয় না। জীবন প্রভাতে একটু ঘেয়েকে সে ভালবাসল নাম তার রাজলক্ষ্মী। ঘটনা বৈচিত্রে রাজলক্ষ্মী করল কুলভ্যাগ সমাজের ভয় তারও রইল না, সমস্ত ফাঁড়াকে সে কাটিয়ে উঠল, কিন্তু কাটাতে পারল না তার যুগায়ত সংস্কার। বহু বছর অদর্শনের পর হঠাৎ পরম্পরের দেখা হয়ে গেল। কৈশোরে উভয়ে উভয়কে ভালবাসত সে স্মৃতি উঠল জেগে, নুতন করে আবার আকাঙ্ক্ষা জাগল মিলনের। নানানুভাবে, নানানু অভিব্যক্তি প্রকাশ হল তাদের অন্তরের বাসনা কিন্তু মিলন হলনা তাদের হৃদয়ের। মুক্ত পুরুষ শ্রীকান্তও পারল না সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে অথচ ভালবাসাকে পাপও বলতে পারল না। জুতের ভয় না থাকলেই মানুষের মন থেকে সংস্কারকে দূর করা যায় না; তার জন্ত প্রয়োজন যে সাধনার সে সাধনা আর যারই থাকুক শ্রীকান্ত বা রাজলক্ষ্মীর ছিল ন, তা বলে শ্রীকান্ত জিতেন্দ্রিয় ছিল না। মানব মনের গোপন তথ্যটুকু এমন করে পরিবেশন কর্তে পারা বড় সহজসাধ্য নয়।

অনেকে বলেন শরৎ সাহিত্য চিরন্তন সাহিত্যের কোঠায় পড়ে না, বিশ্বসাহিত্যে চিরন্তন সাহিত্য বলে কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই; তবে এটুকু বলতে পারি কালের মাপ কাটিতে অনন্দ উৎসবের চিহ্ন চলে না, এবং তাঁরই ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, “টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয় এবং অতিক্রিয় হস্তীও লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।”

• কলকাতার কলেজের পাঠ-চক্রের সভায় লেখিকা কর্তৃক পঠিত।



ব্রজবাবা

ডাকের কয়েকটি সমস্যা:—

কণ্টাক্ত ব্রজে ডাক দেওয়াই সর্বাপেক্ষা শক্ত। ডাক দেওয়ার উপর খেলাধুলি-পারাজয় অনেকাংশেই নির্ভর করে। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে নিম্নে আমরা ডাকের কয়েকটি সমস্যা প্রকাশ করলাম।

(১) আপনি দক্ষিণে বসেছেন এবং আপনার হাতে আছে— ইঙ্গাবন— সাহেব গোলাম, দশ, সাতা, পঞ্জা, ছুরি; হরতন—তিরি; রুহিতন—দশ, নয়, ছুরি; চিড়িতন—টেকা, সাতা, ছকা।

ডাক হয়েছে,

‘উ’

একটি রুহিতন

একটি ফেরাই

‘দ’

একটি ইঙ্গাবন

?

আপনি এখন কি ডাকবেন?

আপনার ডাকা উচিত তিনটি ইঙ্গাবন।

আপনার খেঁড়ার প্রারম্ভিক ডাকের পর যখন তিনি একটি ফেরাইএ ডাক দিয়েছেন, তখনই বোঝা যাচ্ছে হাতটি অস্বস্তি: কত-কাংশে মিলেছে; সুতরাং দুইটি ইঙ্গাবনে ডাক দেওয়ার পক্ষে আপনার হাত বেশ শক্তিশালী। যেহেতু আপনার হাতে ভাল ছয় তাসওয়ালা রঙ বর্তমান, তার উপর একটি টেকা রয়েছে, আবার যখন খেঁড়ার প্রথম রঙের সঙ্গে মিলেছে, তখন মোটেই তিনটির ডাক দিতে ভাববার প্রকার নেই।

(২) ডাক হয়েছে,

‘উ’

দুইটি ইঙ্গাবন

আপনি ‘দ’; আপনার হাতে আছে

ইঙ্গাবন—গোলাম, আটা, তিরি;

হরতন—সাহেব, গোলাম, পঞ্জা, তিরি;

রুহিতন—বিবি, দশ, ছয়; চিড়িতন—আটা,

পঞ্জা।

আপনি এখন কি ডাকবেন?

আপনার পক্ষে তিনটি হরতনেই ডাক দেওয়া উচিত। আপনার হাতে ১+ অনারের পিট রয়েছে, তার উপর পাঁচ তাসওয়ালা মুখ্য রঙ বর্তমান, সুতরাং আপনি অনায়াসে ডাকতে পারেন।

(৩) ডাক হয়েছে,

‘উ’

একটি হরতন

দুইটি ইঙ্গাবন

‘দ’

দুইটি চিড়িতন

?

আপনি দক্ষিণে বসেছেন, আর আপনার হাতে আছে ইঙ্গাবন—বিবি, পঞ্জা, চৌকা; হরতন—ছকা, তিরি; রুহিতন—ছকা; চিড়িতন—সাহেব, বিবি, গোলাম, দশ,

আটা, পঞ্জা, তিরি। আপনি এখন কি ডাক দেবেন?

চারটি চিড়িতনে ডাক দেওয়াই সঙ্গত হবে। এক টেকা ছাড়া আপনার সাত তাস সমেত, নিরেট রঙ হাতে রয়েছে, আর অল্প দুটি রঙে আপনার খেঁড়া ডাক দিয়ে গেছেন, সুতরাং অনারের পিট বিনাও আপনি ডাক দিয়ে যেতে পারেন। তিনটি চিড়িতনে ডাক দিলে ‘Sign-off’ bid বা নিবেদনাত্মক ডাকের মত শোনাবে, এবং যেহেতু আপনার হাতে রুহিতনে মাত্র একক তাস তিনটি ফেরাইএর ডাক চেপে দিয়ে গেলে ক্ষতি হবে না। এদিকে পাঁচটি চিড়িতনের ডাকে লাফ দিয়ে গেলে প্লাম আবাহনকারী ডাক হয়ে যাবে। আপনার খেঁড়া শক্তিশালী রঙ প্রদর্শন করলে আপনি গেম করে নিতে পারেন।

(৪) ডাক হয়েছে,

‘উ’

দুইটি ফেরাই

‘দ’

?

আপনি দক্ষিণে বসেছেন। আপনার হাতে আছে ইঙ্গাবন—বিবি, পঞ্জা, চৌকা; হরতন—তিরি, ছুরি; রুহিতন—বিবি, গোলাম, ছকা, চৌকা, ছুরি; চিড়িতন—নয়, সাতা, চৌকা। এখন আপনি ডাকবেন কি না?

তিনটি ফেরাইএ আপনার ডাক দেওয়া উচিত। খেঁড়ার প্রারম্ভিক দুইটি ফেরাই ডাকের প্রত্যুত্তরে এই হাতে পাশ দেওয়া চলে না। এতদ্ব্যতীত পাঁচ তাস সমেত গোণ রঙেও ডাকা নিরর্থক, কারণ তাস

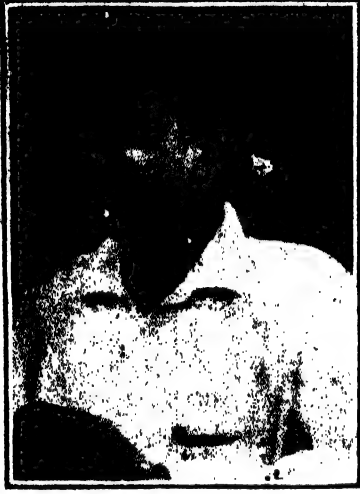
পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আগুতোষ মুখার্জী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকাতা

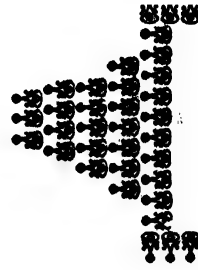
বিভাগের ধাঁজ সুসম এবং প্লামের আশাও
সুদূর পরাহত।

টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটের
প্রতিযোগিতা :—বিগত ১৩ই, ১৪ই,
১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর এই চারদিন
ব্যাপী ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের
সদস্যভূক্ত টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটের প্রতি-
যোগিতাগুলি পরিসমাপ্তি লাভ করে।
এবারে এদের উত্তোগে যথারীতি অকসন
সিঙ্কলস্ প্রতিযোগিতা ও ডুপ্লিকেট কন্ট্রাক্ট
ব্রীজের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি-



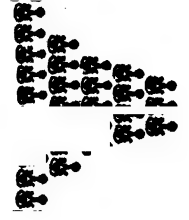
টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউটের সম্পাদক
শ্রী অনিল মিত্র

যোগিতাগুলির শেষাংশের খেলা তীব্র
প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় এবং ক্লাবের কণ্ঠ
কর্তাগণের সুপরিচালনায় প্রতিযোগিতাগুলি
সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ফাইনালের কয়দিন
কর্তৃপক্ষের আদর, আপ্যায়নে ও তত্ত্বিরে
অতিথিদিগের ভূরিভোজনের প্রতি-
যোগিতাও নেহাৎ সাধারণ স্তরের হয়
নাই। ক্লাবের সেক্রেটারী করিৎকর্ণা
অনিল মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিশেষ
করে হরেন বোষ ও কৃষ্ণ সেনের সহযোগি-
তায় এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত
হয়েছিল।



প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্মল কুমার ঘর



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুখদিয়ে কোন কথাই বেরবে না—শত-
চেষ্টা করলেও। তাতে আমারও অবস্থা
দাঁড়াবে সড়ীন, আর অপনোরাও নিরাশ
হয়ে করবেন অশ্রদ্ধা।

—কি যে বলেন! যার লেখার ওপর
‘আমাদের এতখানি শ্রদ্ধা—সেই মানুষটা-
কেই করবো অশ্রদ্ধা! তাঁকে বাড়ী থেকে
জোর করে নিয়ে গিয়ে!!

—তাই হয় সাধারণতঃ। মানুষ যখন
মনে মনে গ’ড়ে চলে স্বপ্ন-সোঁধ তখন
খেয়াল রাখে না তাদের কল্পনাগুলো
কতদূর। তারপর বাস্তবে যখন দেখে—যে
বাস্তব কল্পনার অর্ধেক রাস্তাও পৌঁছাতে
পারলো না, তখন তাদের মন হয়ে ওঠে
বিতৃষ্ণা, মনে মনে জাগে তখন অশ্রদ্ধার ভাব।
তাতে মানুষের কোন দোষই নেই।
স্বভাবই মানুষের এই রকম। তাই আমাকে
না টানতেই বজি আপনাদের। আপনার
মিলনীর সভাবনা হয়তো বা নিরাশ হবেন
শেষ পর্যন্ত।

নিরাশ কক্ষোশই হবে না কেউ।
আপনার উপস্থিতিই আশা পূরণের পক্ষে
যথেষ্ট। কুমারী মীরা দেবী করবেন
আবৃত্তি, আপনারই কবিতা—‘সুরদাস’।
আপনি উপস্থিত থাকলে উনি পাবেন যথেষ্ট
প্রেরণা। শিক্ষিতা যেয়ে, বলেনও অতি-
চমৎকার। আপনারই লেখা অপরের মুখে
কেমন রূপ পায় তাতো আপনার দেখা
উচিত। তা হবে না চপলবাবু, নিয়ে
আপনাকে যাবোই...অন্ততঃ মীরা দেবীর

আগ্রহকে সার্থকতা দেবার জন্তে। তাহলে
উঠি—আমরা সন্ধ্যার সময় এসে আপনাকে
নিয়ে যাবো। দয়া করে থাকবেন বাড়ী।
নিরাশ হয়ে ফিরতে না হয়।

এমন সময় চাকরটা এসে খবর দিলে—
মি. কীছেন। চপল ‘একুনি আসছি’ বলে
উঠে গেল। ওঁরা রইলেন বসে।

ওর মা বলেন—হ্যারে চপল—তোর কি
কাণ্ডজ্ঞান কোন কালেই হবে না?

—বাঃ! আমি আবার কি করলাম!

—কিছু করনা বলেই তো যত বিপদ।
কিছু করতে শিখলে তো বাঁচতাম।

চপল ভেবে পেলো না ও কি অন্ডায় করে
বসলো ইতিমধ্যে! মাকে বললে—অন্ডায়
করেছি কি কিছু?

—নিশ্চয়ই করেছি। মান সম্মান
ডোরাবি নাকি তুই আমাদের?

ও হাঁ করে মার পানে চেয়ে বললে—
আমি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তুই। মুখ্য কোথাকার,
এতগুলো ভদ্রলোকের ছেলে যে সেই থেকে
বসে আছেন তোরা বাড়ীতে—তা তোরা
খেয়ালই নেই?

ও হতভম্ব হয়ে বললে—বারে আমি
কি করবো তার? ওঁরা এলেন কেন?
যাচ্ছি একুনি—চলে যেতে বলছি।

ওর মা চোখছটো বিবৃত করে বললেন—
দেখ ছেলের বুদ্ধি! আমি বুঝি ওঁদের
তাড়িয়ে দিতে বজ্রাম তোকে?

—তবে কি বলছো?

—বলছি আমার মাথা আর মুণ্ড। কিছু বড়ি বুদ্ধি থাকে তোর। গাধা কাধাকার।

ও একবার নিজের দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিরতিশ্রয় বিশ্বয়ে মায়ের মুখের পানে চয়ে রইলো।

ওর মা হেসে উঠে বলেন—তুই একটা প্রকাণ্ড গাধা। মাহুকের মত দেহ হলে কি হবে, বুদ্ধি গাধার চেয়ে নিকট। একটা লেজ যে ভগবান কেন তোকে দেননি, ভেবেই পাই না।

চপল আরো চিন্তিত হয়ে বললে—চাহলে ল্যাজ আর কাপড় একসঙ্গে গামলাভাম কি করে?

—অশ্রু ল্যাজ তোর নিশ্চয়ই একটা আছে, লোকে দেখতে পায় না, তা নইলে এতগুলো ছেলে সেই কখন থেকে বসে আছে আর তুই একটু জল খাবারও তাদের দিতে এনে দিলি না?

—ও এতক্ষণে ঘেন বাঁচলো। বলে—বলতো আমি কি জানি তার?

ওর মা বলেন—তা জানবে কেন—গালি জান চা আর কাগজ কলম। এখন ৷ দেখি ওরা বসে আছেন একলা। উঠতে দিবি না একুনি, বুঝলি? আমি জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ক'জন আছে গাল দেখি?

ও হাতগুণে বললে—পাঁচ জন আর একজন ছয়।

—আর একজন কে? পেটুক মহারাজ তুমি?

ও ততক্ষণে সরে পড়েছে। ঘরে ঢুকে ও সবাইয়ের দিকে চেয়ে বললে—দেখুন, আপনাদের একুনি উঠে যেতে মা মানা করলেন।

ওরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলেন—কেন? বড় দেবী হয়ে গ্যাছে যে, মাকে বলবেন

আর একদিন আসবো। আর আপনার লাখে দেখা করতে তো আসতেই হবে। বলে ওরা উঠতে চাইলেন।

ও মুকিলে পড়লো। বললে—তাহলে একটু দাঁড়ান মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

ওরা এই অদ্বুত লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

ইতিমধ্যে চা আর জলখাবার নিয়ে চাকর ঘরে ঢুকলো। পাঁচটা প্লেট মার্বেল টপ গোল টেবিলটায় সাজিয়ে দিয়ে বললে আপনারা খান তঁতকণ, আমি একটু আসছি একুনি।

ও সটান মার কাছে গিয়ে হাজির হলো। মার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—কই?

—কি কইরে! সবই তো পাঠিয়ে দিয়েছি।—

—ঘোড়ার ডিম দিয়েছ। আমার প্লেট কই?

—ও রাক্ষুসে ছেলে; তাই এসেছিল ছুটে?—

—বারে! সেই সকাল থেকে আমি খেয়েছি নাকি কিছু?

—খাসনি? চা বিকুল কে খেলে?

—সেত কখন হজম হয়ে গ্যাছে।

—নে, নে, পেটুক কোথাকার, প্লেটটা নিয়ে ঐ ঘরে গিয়েই খেগৈ যা।

ও চলে আসে ওর ঘরে। ওদের খাওয়া তখন হয়ে গ্যাছে। ওকে দেখেই ওরা উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার করে বললেন—আজ আসি তাহলে। সন্ধ্যায় কিন্তু থাকা চাইই।

—আজ্ঞা বলে চপল ওদের এগিয়ে দিতে চললো।

—সন্ধ্যায় আসবো কিন্তু ঠিকই—

—আসতে আপনাদের হবে না, আমি নিজেই যাবো। কাণ্ডে ঠিকানাটা লেখা আছে তো?

—‘হ্যাঁ’ আছে। তাহলে, আসবেন নিশ্চয়ই’ বলে ওরা চলে গেলেন।

—চতুর্থ পর্যায়—

মৃণালবাবুর চলে যেতে ও ঘরে ফিরে বিছানায় উঠে একটু পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। ওর চোখের সম্মুখে তখন ভাসছে মৃণালবাবুর চেহারাটা। মোটামোটা চেহারা স্বাস্থ্যের আধিক্যের পরিচায়ক। রঙটা বিশেষ ফরসা নয়। মেজে ঘরে পালিশ করা হয়েছে। অদ্বুত জমকালো সাজ পোষাক। কিন্তিনে জরি পেড়ে ধূতির ওপর বড়ুয়া ককের সিকের সার্টি। রঙীন জুতো মেসাই কুঁচো চামড়ার জাল বোনা। হাতে গোটা তিনেক আঙটা, সবকটাই বোধহয় হীরে, মুক্তার ইবোঁ নাকের ওপর রিমলেশ চশমা। চোখটা সোণার হাত ঘড়িটা বাঁকা করে হাতে বাঁধা। চলেন ও বলেন বঁকে বঁকে। ওর ভারী মজা লাগে এই অদ্বুত লোক-গুলোকে দেখতে। ও ভাবে—কি জানি হয়তো বা প্রকাণ্ড একজন কেউ কেঁটা হবে। বাইরে থেকে তো অন্তত তাই হওয়া উচিত বলে মনে হয়। হয়তো বা কোন কলেজের নতুন প্রফেসর। বিভিন্ন জাহাজ। মরুকগে যাক—যে আছে বড় লোক সেই আছে ওর কি? ও পাশ ফিরে শোয়।

আবার ভাবনা আসে চোরা জল প্রোভের মত। তাইতো কি বলা যাবে ওদের ওখানে গিয়ে। না: মনের স্বাস্থ্য বা স্বাচ্ছন্দ্য করলো ওরা দুটো। আবার ভাবে কি বলতে হবে বা পড়তে হবে? না, লিখে নিয়ে গিয়ে পড়তে ও পারবে না। ও অভয়াল ঘেন বিজ্ঞি অসৌভাগ্য

বড় বড় অনেক রথীই করে থাকেন, তবুও ও নিজে তা পারবে না। সাহিত্যিকের মন সর্বদা বহমান ও খেলায়সারী। কাগজের পাতায় তাকে বিশেষ ভাবে বেঁধে নিয়ে যাওয়াতে ঘুণা জাগে। চপল ঠিক করে ফেলে—ওর মনে যা আসবে ও তাই বলবে। সীমানির্দিষ্ট ভাবকে ও সহ্য করতে পারবে না—না কোন মতেই না। কিন্তু কি সে বলবে? সাধারণ লোকে যে ভাবে বক্তৃতা দিয়ে যায়?—সমবেত ভদ্রমণ্ডল ও মহিলাবৃন্দ...? এঃ ওর নাক সিটকে ওঠে। যাক সেখানে গিয়েই ঠিক করে ফেলা যাবে। আগে থাকতে ভেবে, অন্তর্ভুক্ত মনকে চট্টকে শক্ত করা।

চপল উঠে দাঁড়ায়। নিঃশেষিত পেয়ালার গুলির দিকে আর একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি ফেলে, একটা চুরুট ধরিয়ে নেয়। নাঃ সিগারেটের চেয়ে চুরুটের অভিজ্ঞতা আছে, মাদকতাও বেশী। বনেদী বংশের মেয়ের মত একটা বিশেষত্ব। লোককে ফিরে তাকাতেই হয়। হালুকা হাওয়ার হালুকা প্রজাপতি নয়। অন্ন টানেই পাখা পড়ে না খসে, সৌন্দর্য্য যায় না মিলিয়ে। ময়ূরের মিহি রব নেই তবু তার দিকে লোকে চায়। পাখা তার খসিয়ে দেয় নতুন করে গজাবে বলে। আবার নতুন করে বাড়ে তার মর্যাদা। তাইতো চপল মাঝে মাঝে ধরায় চুরুট সিগারেটের বদলে—কণ্ঠস্থায়ী বার মোহ। বয়স তার খুব বেশী নয়—তাই যেন কেমন একটু অশোভন দেখায়—বাইশ বছরের কবির বক্রিশ বছরের প্রিয়ার মত।

ভাবতে ভাবতে চপল রাস্তায় নেমে আসেন। অগণিত জনস্রোত। ও যেন হিশা হারিয়ে ফেলে। ওর প্রাণের মধ্যে এক নতুন অস্বস্তির স্রোত বয়ে থাকে—হিরণ্ময় থেকে বহমান কলে এসে নাড়ের

যা আনন্দ। ও যেন মুক্তি পেয়েছে বন্ধ কারা কক্ষ থেকে। বাস্তবিক বাইরে কত বিচিত্র জীবন, অভিনব চকলতা ও চোখ মেলে চায়নি। সুন্দর পৃথিবী ওর কাছে আরো সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছে আজ। রহস্য এর অনেক চির-যৌবনা শ্রামা ধরনী। অনন্তকাল ধরে কত বিচিত্র খেলাই এর বুকের ওপর খেলা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় ও শুধু ঘুরে বেড়ায় আপন খেলার বশে। মন ওর যেন আঙ্গ অনেকদিন বাদে পেয়েছে ছাড়া।

চপল ফিরে আসে ওর নিজের ঘরটাতে—অনেকখানি ঘুরে। বেলা তখন বেজে গেছে প্রায় একটা। ঘরে ঢুকে ও ডেক চেয়ারটায় এলিয়ে পড়ে।

পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মা ঘরে ঢুকে দেখেন ও চোখ বুজে পড়ে আছে। খাওয়া দাওয়া এখনও হয়নি, স্নানও নয়। কাছে এসে বলেন হতভাগা ছেলে এতক্ষণ ছিল কোথায়? খেতে দেতে হবে? না তাও গেল ভুলে?

ও হুড়মুড় করে উঠে বসে। বাস্তবিক এখনও ওর পাওয়া হয়নি স্নানও নয়। মাও হয়তো বসে আছেন না পেয়ে ওর প্রতীক্ষায়। অপরাধীর মত ও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। ওর মা জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় গিয়েছিল রে?

—এট একটু ঘুরে এলাম মা—

—এই ছপূরে আবার কি দরকার পাড়েছিল শুনি—

—এমনিই গেলুম, মা। বড় ভালো লাগছিল বেড়াতে—

—শোন কথা একশর। সময় আর উনি পেলেন না বেড়াতে বেরলেন ছপূর বেলা। তোর কি সাই উল্টো?

ও অপরাধীর মত বলে—আর কখনো যাবো না কেমন?

ছপূরে কি মানুষ বেড়ায় রে? বলি, সকালে উঠে একটু বেড়িয়ে আর, তাতো শুনি না। ছপূর রোদরে মুখখানা কি হয়েছে একবার দেখতো আয়নার। নে—শীঘ্রই স্নান করে নিয়ে, ছুটো খেয়ে নে।

ও তাতাতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। স্নান সেরে নিয়ে ও রান্না ঘরে চলে এসে বলো—ভাত দিয়েছো?

ওর মা ওর দিকে তাকিয়ে বলেন—গায়ের জলটা একটু মুততেও তো হয় বাপু। ওই রকম জল শুদ্ধ থাকলে, যদি শেষকালে অসুখ করে তো দেখবে কে? আমি তো বাপু একলা মানুষ। পৌদি তোমার বাপের বাড়ী আদর খাচ্ছেন।—তারপর উঠে এসে নিজের আঁচল দিয়েই ওর গা মাথা মুড়িয়ে দেন। ওকে খেতে দিয়ে নিজে বসেন পাশে।

চপল জিজ্ঞাসা করে—তোমার খাওয়া হয়ে গ্যাছে? ওর মা বলেন—শোন কথা, উনি রইলেন বাইরে আর আমি নিলাম খেয়ে! তাকি খেতে আছেরে। ছেলের খাওয়া না হলে মার কি খেতে মন চায়, না খিদেই পায়? ও অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে বলে—আমি যদি আজ না ফিরতাম, তাহলেও খেতে না?

—তাকি হয়রে পাগলা ছেলে। তুই বাইরে থাকলে অনাহারে, আমি কি খেতে বলতে পারি! খাওয়ার চাইতে খাওয়ান্নাতে মেয়েদের আনন্দ বেশী সে কথা তুই জানিস না? বাইরে কোথায় কি ভাবে তুই রইলি তাই ভেবেই কুল পেছন না, আশার খাওয়া।

আজ আমি যদি একেবারেই না আসিতাম আর?

ও কথা বলতে নেই বাবা, মার মনে ভাতের ব্যথা লাগে।

চপল ভারী লজ্জায় পরে। হাতের
ভাত ওর মুখে ওঠে না। ও যেন ভারী
অজ্ঞায় করে ফেলেছে।

ওর মা ওর অবস্থা উপলব্ধি করে কথার
মোড় ফেরাবার জন্ত বলেন—যাক ও কথা।
খাওয়া বন্ধ করলি কেন? তুই দিন দিন
আরো ছেলেমানুষ হয়ে পড়িস্ চপল।
খেতে বসলে হা করে ভাবতে থাকবি
চান করতে বললে বিছানায় গিয়ে শুয়ে
পড়বি। এমনি করে ক'দিন চলবে বল
দেখি? কাজ কর্ণ একটা কিছু করবি না
চিরকালটা দাদার ঘাড় দিয়েই চালাবি?
সত্যি বলছি চপল, একটা কাজ কর্ণ
জোগাড় করবার চেষ্টা কর। এমনি করে
আর কত দিন চলবে? কলসীর জল
গড়াতে গড়াতে তাও ফুরিয়ে যায়। আজ
যদি তোর দাদার চাকরী যায় তাহলে কি
করে চলবে বল দেখি? ব্যাঙ্কের যা
সামান্য টাকা আছে তাই ভেঙে খাবি তো?

চপল স্থির হয়ে শোনে। সত্যিই তো,
এ ও কি করছে? সংসার হয়তো যথেষ্ট
পেতে পারে। অভ্যর্থনা হয়তো ওকে
অনেকেই করবে কিন্তু তা দিয়ে কি সংসার
চলে? তা দিয়ে কি মার চুংখ ঘোচান
যায়? ও ভাব, ভেবে কুল কিনারী পায়
না। ভাবতেই ও শুধু শিখেছে আর
কিছুই শেখেনি। আজকাল মাসিক

কাগজে লেখা দিয়ে কিছু কিছু ও পায়,
কিন্তু তাতে ওর নিজের খরচই হয়তো
চলে না। দাদার আশ্রয়ে ও নিশ্চিন্তে
দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছে, কোন
ভাবনাই নেই। কিন্তু সত্যিই তো মার
কথা—এমনি করে চিরদিন কি চলবে?
ওর গত বছরের উপজ্ঞাসটা পাবলিসারদের
দিয়ে যা পেয়েছিল তাতে করে ও
কিনেছে চাড়ি বই। এমন কিই বা টাকা,
বইটার সব সর্ব পাবলিশাররাই দিয়েছে
মেরে। ও চাটুতে পারে না, দয়া করে
যা পাঠায় তাই যথা লাভ বলে মেনে নেয়।
কিন্তু টাকাগুলো দিয়ে বই না কিনে
আর শেল্ফটা ন কিনে যদি টাকাটা ওর মার
হাতে দিত তাহলে মা কত খুসীই না হতো—
ও ভাবে। প্রথম বইটা ওর কাটতি হয়নি
বেশী নতুন লেখক বলে। দ্বিতীয় বইটাও
বিশেষ কিছু লাভ দিলে না। একটু-বা
কিছু পেয়েছে ও তৃতীয় বইটাতে। কিন্তু
এত সংস্করণ বইটার হলো আর টাকা
দেবুর বেলা ওরা এত মোলায়েম করে
কথা বলে কেন ও ভেবেই পায় না।
যাক এই বইটার কপিরাইট ও নিজেই
রাখবে। মাকে কিছু টাকা এবার দেবেই
ও ঠিক করে রাখে।

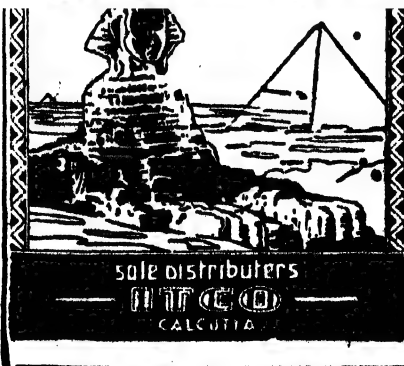
না খেয়েই ও উঠে পড়ে। ওর মা
বলেন—কিরে উঠে পড়লি যে! ছুটো

খাবে কে? কাজের কথা বলুন আর
ছেলের খাওয়া হলো না। তাকে নিয়ে
আর পারা যায় না বাবা। গরীবের ঘরে
কেন যে জন্মেছিলি তাই ভেবে পাই না।
বড়লোকের ঘরে জন্মালে সারি দেশের
লোক হয়তো তোকে চিনতো। কি করবো
বল, সাথে কি আর ওই সব কথা তোকে
বলি, না বলতে ইচ্ছে করে? গরীবের
কিছুই সহ হয় না চপল। তা নইলে
তোকে বলি কাজের চেষ্টা দেখতে। লক্ষী-
বাবা—ওসব পরে ভাবিস 'খন। এখন
পেটটা ভরে দুটো খেয়ে নে, দেখে যদি
পাই। তোর মত ছেলেকে চাকরী করতে
পাঠিয়েও কি আমি নিশ্চিন্ত থাকতে
পারবো? কোথায় কোনদিন কি বিপদ
বাধিয়ে আসবি তাই ভেবে পাই না।
রাস্তায় চলতে চলতে হয়তো ট্রামের নুড়েই
কোন দিন পড়বি 'তার ঠিক নেই। ওকি
চলে যাব্দিস যে? ছুটাই না হয় শুধু
খেয়ে যা।

—‘পেটে জায়গা থাকলে তো খাবো
মা এই ভাবনা পেট’—বলে ও জামা
ছুল ধরে।

ওর মা বলেন—তা হ'ক ছুটুক খুব
হরবে। না হয় একটু সন্দেশ দিচ্ছি তাহলে
তো হবে? (ক্রমশঃ)

PYRAMID TEA



= পিরামিড চা =

চিন্তাহারী সৌভ নংম ওপিকর বর্ণ অভয়ন দ্বা

১ পাউণ্ড পায়েকট মাত্র ১১০ আনা

প্রত্যেক সস্তা দোকানে সাদরে বিক্রি হয়।

ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, লাইভ ক্রীট, কলিকাতা।

প্রভাত সিনেমা

বাগবান

হাস্যচিত্র জগতে বিমলা কুমারের নাম খুবই সু-পরিচিত। এ পর্যন্ত যে কয়খানা ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন তার প্রত্যেক খানাই দর্শকবৃন্দ আনন্দ সহকারে গ্রহণ করেছে। এই সুন্দরী অভিনেত্রীর সুনাম অভিনয় নৈপুণ্য চিত্রাঙ্গাদী মাত্রকেই যুগ করে। “কিন্তু শ্রীমতীর অভিনয় নৈপুণ্যের চরম বিকাশ লাভ করেছে পরিচালক কার্দিরের অতুলনীয় ছবি “বাগবানে”। ষাড়া এ পর্যন্ত ছবিখানা দেখেছেন সকলেই একথা স্বীকার করবেন।

‘জেনারেল ফিয়ার’ অমর অবদান “বাগবানে” বিমলাকুমারী নায়িকা দুর্গার অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। নায়কের ভূমিকায় নন্দ্রেকার অভিনয় করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় সিতারা, ইয়াসমিন আসরফখান, নাজির প্রভৃতি রয়েছেন।

উক্ত ভারতের জনপ্রিয় লেখক বেগম আনসারী বাগবানের পর্যাংশ লিখেছেন। হিন্দু সমাজের বহু সমস্যার উল্লেখ এই ছবিতে করা হয়েছে।

জেলারের একমাত্র মেয়ে দুর্গা বাল-বিধবা। কিন্তু এ সংবাদ দুর্গার কাছে অজান্তে রাখা হয়। স্বরূপ জেলের কয়েদী। জেলারের বাগানে, কাজ করার তার স্বপ্নেরই উপর দেওয়া হয়। দুর্গা স্বরূপকে ভালবাসে, স্বরূপও দুর্গাকে ভালবাসে। কিন্তু সমাজের শাসন তাদের এ মিলনে হয় প্রধন অন্তরায়। কিন্তু ভাগ্যসুত্র তাদের একই সূত্রে গেঁথে দেয়।

ছবিখানার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত tempo মোটেই ব্যাহত হয়নি। এবং খুবই সহজ হিন্দি থাকতে বাঙালী দর্শকদের বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। ছবিখানা প্রভাত সিনেমায় আট সপ্তাহ ধরে দেখান হচ্ছে কিন্তু দর্শকের ভাড়া এখনও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি।

জেলর

‘মিনার্ভার অতুলনীয় চিত্রশৃষ্টি “জেলর” প্রভাত সিনেমার পরবর্তী আকর্ষণ হবে। ছবিখানা বোম্বেতে মুক্তিলাভ করার পর যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তাতে বলা যেতে পারে যে কলিকাতাতেও ছবিখানা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হবে।

মিঃ সোরাব মোদী পরিচালক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই ছবিখানা তিনি পরিচালনা করেছেন এবং নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

জেলর দিলীপ সব সময়ই ঘড়ির কাটার জায় কাজ করে থাকেন। তার কাছে শৃঙ্খলার এক চুলও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। কিন্তু তিনি তার সুন্দরী স্ত্রী কানবালকে ও একমাত্র মেয়ে কুমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। কীসে স্ত্রী ও কস্তার ভূট সাধন হবে সর্বদাই তিনি এ চিন্তা করেন। স্ত্রী কানবাল কিন্তু স্বামীকে সম্পূর্ণ ভালবাসতে পারে নাই। তার একমাত্র কারণ দিলীপের যুগ্মী মোটেই সুন্দর নয়। একটা তীব্র উপেকার তাব সর্বদাই তার মনে জাগরক থাকত।

একদিন দিলীপের অসুখ হলে তারই প্রিয়রত্ন ডাক্তার রমেশকে ডাকা হয়। রমেশ কনিকে দেখতে এসে কনীর স্ত্রীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়।

বীরে বীরে দিলীপ সেদে উঠে। কিন্তু কী একটা সন্দেহের কালো ছায়া সর্বদাই তার মনে উকি ঝুকি দিতে থাকে। এমন ষাড়া ত পূর্বে ছিল না। ডাক্তার রমেশের ঘন ঘন আগমন দিলীপের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

অবশেষে একদিন ঝড় উঠিল। তার চরম পরিণতি আপনারা শীঘ্রই প্রভাত সিনেমায় রূপোলী পর্দায় দেখতে পাবেন।

নায়িকার অংশে লীলা চিংনিশ অভিনয় করেছেন। তাছাড়া শীলা, ইরচ তারাপুর, সাদিকালী, শরিফা প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছে।

“জেলরে”র গান ছবিখানার এক অপূর্ণ সম্পদ হয়েছে।

এম্পায়ার টকা

স্থান পরিবর্তন

চিত্র-পরিবেশক এম্পায়ার টকা ডিষ্ট্রিবিউটরসের নতুন ঠিকানা অতঃপর হইবে ই. টি. ডি. শিল্ডিং।



খাতু বছ ৩৫ মাস যে কার্যেই হউক ভৈরবী বনোবধিতে অব্যর্থ কল-গর্তাক্ষার, মধ্যহার দিবিহ ১১০ মত ও কর্তৃপাতি একবার প্রয়োদেই উপবন, ৪০ বাঃ ১০ আদা



নমঃ ১৮১ হইতে ১২৮।

মিসেস মাস অনন্ড বিজ্ঞানস ১৮২ মঃ লক্ষণকণ্ড টিট (K) ভবিজ্ঞান।

খেয়ালী চিত্রপট **



ওরিবেন্টাল কিনেটোন আর্চিসের "একলব্য"
 চিত্রের একটি দৃশ্যে দেখা যায় ও
 জহর নাহলী। কিন্তু এই চিত্রখানি
 'ঐ' চিত্রগ্রহে যুক্তি পাবে।



পরিচালক

জাশনাল মিউজপেপার্স লি:

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই কার্তিক ১৩৪৫, ৩রা নবেম্বর ১৯৩৮

ভাওয়াল-বিজয়ী বীর-শ্রেষ্ঠ !

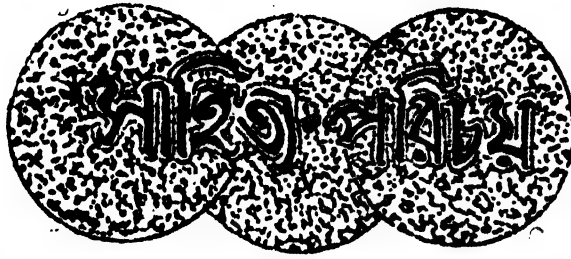
ভাওয়াল-বিজয়ী "হিন্দু"-বীর শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় হিন্দু সভার, সভাপতিরূপে বাংলার এক অভিনব হিন্দু রাজত্বের স্বপ্ন দেখিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে—সৈন্যদিগের দক্ষিণ হস্তে লেখনীর লিখিত আয়ুধ আর বাম হস্তে মেমোরিয়ালের পাণ্ডুলিপি দ্রুতবেগে বর্ধরূপে শোভমান !

বিজয়চন্দ্র হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় বিভোর থাকুন তাহাতে কোন হিন্দুরই আপত্তি থাকতে পারেনা। কিন্তু আত্মমগ্ন্যদাসম্পন্ন হিন্দু যাত্রেরই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার অধিকার আছে—ভিকারিয়া নৈৱ নৈৱ চ—নিশেষ, যেখানে ভিকার বস্তু রাজ্য।

অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা সাক্ষ্য দিবে যে সার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠার ধূম তুলিবার প্রচেষ্টা বিজয়চন্দ্রের এট নৃত্যময় মর্মে। একদম অধস্তনে যে পথ অগত্যা দেখবাসীর চক্ষুতে

ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আত্মস্বার্থ সংরক্ষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন আজ বিজয়চন্দ্র সেই পথেরই পথিক হইয়াছেন ! এই কৌশল পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও যদি দেশবাসী ঠেকিয়া না দেখে তাহা হইলে ইতিহাসের শোচনীয় পুণরায়ত্তি হওয়া অসম্ভব হইবে না।

মহাশালার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুসভার নেতৃবৃন্দ আবেদন নিবেদন রূপ ভিক্ষকের রুতি অবলম্বনে আত্মবান নহেন তাই অন্যান্য নির্ভীক নেতৃবৃন্দ প্রচেষ্টায় ভারতের নিজস্ব সামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে: এই সকল বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দু নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ প্রদেশে হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ও সংরক্ষণের জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে বিদেশী শাসকের দ্বারস্থ হওয়ারকে লজ্জাকর বলিয়া মনে করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে যুগ্ম বা সাতারকারের নেতৃত্বে যে সপ্রতিষ্ঠ দূর গতিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই বাংলার হিন্দুসামরিক—যুগ্ম বিজয়চন্দ্রের লঘু-চকল নেতৃত্বের অভিনয়ে তাহার একান্ত অভাব। যে মিষ্ঠা, একাত্ততা ও উদ্যমতা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য বিজয়চন্দ্রের সে গভীরতা, সে একতানতা কি? ব্যবহারাজীবের অধুনা স্বর্ণ-প্রসূ ব্যবসায়ের অন্তরালে কণিকের অবসর লাভে নিহক চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে বাংলার কংগ্রেসমতো পরচন্দ্রের প্রতি সময়ে অসময়ে কটুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণে নিকাচনে পরাজয়ের প্লান বিদূষিত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে হিন্দুর অধিকার বা স্বার্থ পরিপূর্ণ মগ্ন্যদার সহিত সংরক্ষিত হয় না। যুষ্টিমের মুসলমানের বিরোধিতায় আতঙ্কিত হইয়া বন্ধমানের মত হিন্দু-বল্ল সহকের রাজপথের ধূলিতে হিন্দুদেবপ্রতিমা অসহায়ভাবে শ্লিষ্টিত করিয়া যাহারা কাপুরুষের জায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে মহানগরীর নিরাপদ পারিপার্শ্বিকতার আবরণে জ্বালন্তাকাড়ী সেই সকল হিন্দুভাষিনী শক্তবর্গের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা-কল্পে অসার আশ্বাসন ও বাগ্-জাল বিকাল উপহাস ও অনুকম্পাই উত্তরক কঃ।



মালা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাকারে মুদ্রিতও হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি “গিরিশপ্রতিভা” নামে একখানি সুবহুৎ গ্রন্থ বাঙলাভাষায় রচনা করিয়াছেন, ও বঙ্গরক্ষকে দানীয়াবুর স্থান সম্বন্ধেও একখানি চিন্তাকর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইঞ্জিয়ান টেক (ইংরাজিতে দশ শিলিঙ। মেট্রোপলিটান পাবলিশিং লিখিত, দুই খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত) — হাউস হইতে প্রথম খণ্ড ও গ্রন্থকার কর্তৃক ত্রিহেমেন্সনাথ দাসগুপ্ত বি, এল—প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক জোহান ভ্যান সানেন কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সহ—প্রথম খণ্ড—১৯০৪—পৃষ্ঠা ৪+৭+৩+৩১৩+৬—মূল্য (ভারতে) ৫ টাকা—(বিদেশে) আট শিলিঙ। দ্বিতীয় খণ্ড—১৯০৮—পৃষ্ঠা ৩+২৮৮+৮ মূল্য (ভারতে) ৫ টাকা (বিদেশে)

দশ শিলিঙ। মেট্রোপলিটান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রথম খণ্ড ও গ্রন্থকার কর্তৃক দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত। স্বর্গত দেশবন্ধুর সহকর্মী ও জীবন-চরিত লেখক দেশসেবক হিসাবে ত্রিযুক্ত হেমেন্স নাথ দাস গুপ্তের নাম বাঙলার শিক্ষিত সমাজে অজ্ঞাত নহে। কিন্তু দেশসেবক হেমেন্সনাথের একটি সাহিত্যিক দিকও আছে। হেমেন্সবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে “গিরিশচন্দ্র” সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশিত বক্তৃতা দিয়াছেন ও তাঁহার বক্তৃতা-

বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য ও বাঙলার নাট্য-শালা সম্বন্ধে হেমেন্সবাবু দীর্ঘদিন অটুট অধ্যবসায় সহকারে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন ইংরেজী ও বাঙলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আর এই সকল প্রবন্ধ রচনা কালে অধ্যাপক ত্রিযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাবূষণ, ত্রিযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গবেষকবৃন্দের সহিত তাঁহাকে বহুবার তর্ক-বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদ করিতে আমরা দেখিয়াছি। আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার গবেষণায়

সর্বস্বার্থ বাঙলার বাঁচবার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা

সর্বস্বার্থ বাঙলাকে বাঁচতে হ'লে আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বাঙালীর উপর বাঙালীর

সহানুভূতি, বাঙালীর প্রতিষ্ঠানের উপর একমাত্র দরদ।

বাঙালী আজ পরাস্ত হল জীবন যুদ্ধে আর ব্যবসা হারিয়ে। অভাবে অনশনে কত বিকৃত হ'ল “খানিজো বসতি লক্ষ্মী” মন্ত্র ভুলে যেয়ে।

বাঙালীর অন্ন বস্ত্রের ভাগ্যদারী আজ বাঙালী নয়—তাই তার এত লাজনা। **ইউ বেকল সোসাইটি** বাঙালীর প্রতিষ্ঠান। বাঙালীর ঘরে, বাঙালীর পছন্দমত বস্ত্র যোগাবার ভার নিয়েছেন এঁরা। বাঙালীর রুচি ও সামর্থ অনুযায়ী সব রকম বস্ত্রের বিপুল আমদানী করেছেন এঁরা। সবার সন্তুষ্টি বিধানই লক্ষ্য এঁদের।

বিনীত—

ইউ বেকল সোসাইটি

(প্রসিদ্ধ স্বদেশী বস্ত্র ও পোষাক বিক্রেতা)

বস্ত্র বিভাগ—১নং ও ২নং মির্জাপুর স্ট্রীট, বেন | কোন বি, বি, ৩৫৩

জাক—৮৭২ কলেজ স্ট্রীট [বস্ত্র ও পোষাক]; জগদ্বাজার, ডাবানীপুর [বস্ত্র ও পোষাক] কোন—প, কে, ৩৯৮

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—প্রতিযোগিতার অধিতীয়—২ক অকুয়ন্ট—দর সবার চেয়ে সস্তা। লোকে বাহা প্রচার করে তাহ তাহার করে না—আমরা বাহা বলি তাই করি—এটাই আমাদের বিশেষত্ব।

উত্তম ও সত্যাহুসন্ধিৎসা। তাঁহার সেই সূচিরব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের ফল কিয়দংশে এই ছইখণ্ড গ্রন্থে একত্র সমিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

হেমেন্দ্রবাবুর উত্তম ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত হেমেন্দ্রবাবুর সাক্ষাতের যোগাযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হেমেন্দ্রবাবু “গিরিশ-প্রতিভার” জ্ঞায় একখানি সুবিরাট তথ্যপূর্ণ গ্রন্থরচনায় পঞ্চাংগদ হ’ন নাই। স্বর্গত রসরাজ অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্রের পিতৃদ্বন্দ্বীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু (বর্তমান ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে “গিরিশ বক্তৃতা” প্রদান করিয়াছেন—ও অধুনা জীবিত নাট্যসমালোচকগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে ইনিই সর্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন), গিরিশচন্দ্রের নিত্য সহচর ও জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের সঙ্গী শ্রীযুক্ত কুমদবজ্র সেন, প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের সহিত আলোচনা দ্বারা, গিরিশচন্দ্রের দ্বারা শিক্ষিত স্বনামধন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব তাঁহার কলাকৌশলের জ্ঞান আহরণ দ্বারা, প্রাচীন সংবাদপত্র সমূহে তৎকালে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত সমালোচনা সংগ্রহ দ্বারা, ও পরিশেষে গিরিশচন্দ্র রচিত প্রবন্ধ ও নাট্যকাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও স্বয়ং অভিনয়দ্বারা (বলা বাহুল্য, হেমেন্দ্রবাবু স্বয়ং একজন উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা; তাঁহার বহু সামাজিক নাটকের ভূমিকাভিনয় আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি)—তিনি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল অভিমতবোধ সংগ্রহ পূর্বক বঙ্গীয় নাট্যরসিক পাঠক সমাজে উপস্থিত

করিয়াছেন, তাহা পূর্বে আর কেহই করেন নাই। পরোক্ষ-জ্ঞানের সাহায্যেও যে ধারাবাহিক অথবা ইতিহাস রচিত হইতে পারে, হেমেন্দ্রবাবুর প্রচেষ্টাই তাহার অন্ততম নিদর্শন।

‘ইণ্ডিয়ান টেজ’ গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে হেমেন্দ্রবাবু ভরতনাট্যশাস্ত্রোক্ত প্রাচীন যুগে নাট্যোৎপত্তির উপাখ্যান হইতে তাঁহার গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা করিয়াছেন। ভরতনাট্যশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা চতুর্বেদ সারসমূহ নাট্যবেদের প্রথম প্রচার ও জঙ্জরোৎসবের বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ, ভরতমুনি কর্তৃক ব্রাহ্মণ নিকট নাট্যবেদ শিক্ষাস্তে ভরতনাট্যশাস্ত্রপ্রণয়ন, আদি অভিনেতা শত ভরতপুত্র ও আদি অভিনেত্রী অপ্সরোগণের দ্বারা প্রথম নাট্যাভিনয় প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর বিবরণ প্রদানের পর তিনি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরচনার একটি পূর্বাঙ্গ ধারাবাহিক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত, ব্রাহ্মণভাগের যজ্ঞাদি-ক্রিয়ার অমুষ্ঠান। উপনিষদের নানারূপ নাটকীয় সংলাপ প্রভৃতি প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্যে নাটকীয়তার প্রভাব কতটুকু আছে তাহার আলোচনা ইহাতে আছে। পরবর্তী যুগে পৌরাণিক রচনা-মধ্যে পাণিনীর ব্যাকরণে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, বৌদ্ধ জাতক ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে, প্রাচীন শিলালিপি, মন্দির-স্তম্ভ-গোপুর—পর্বতগুহা প্রভৃতির গাত্রে উৎকীর্ণ নরনারী মূর্তির ভাবভঙ্গিতে ভারতীয় নাট্যরচনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কতটুকু ইঙ্গিত মিলে তাহার বহু কৌতূহলকর বিবরণে হেমেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের প্রথমাংশ পরিপূর্ণ। কোন কোন দৃষ্টকাব্যে বর্ণিত “যবনী” প্রতিহারী চরিত্র, ও প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের অপরিহার্য অঙ্গ “যবনিকা” প্রভৃতি ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে

ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে গ্রীক (যবন-আইয়োনিয়ান= ব্যাক্ট্রী গ্রীক) প্রভাবের পক্ষপাতী গবেষকবৃন্দের মতের সমালোচনাও হেমেন্দ্রবাবু করিয়াছেন। তাহার পর অশ্বঘোষ-ভাস শূদ্রক-কালিদাস-চন্দ্র-ভবভূতি শ্রীহর্ষ-ভট্টনারায়ণ-বিশাখদত্ত-কেমৌদর-রাজ-শেখর কৃষ্ণমিত্র প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাট্যকারগণের নাট্যরচনার একটি পূর্বাঙ্গ ধারাবাহিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পর্বতগুহা মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের অত্যাশ্চর্য্য বিস্তারিত ভগ্নাবশেষ, শিলাগাত্রে খোদিত সংস্কৃত নাট্যরচনার নমুনা প্রভৃতি সাধারণের অজ্ঞাত বহু তথ্য ইহাতে সংকলিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের নটগণের স্থান কোথায় ছিল—তাহার সম্বন্ধেও অজ্ঞাতপূর্ব বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পর প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় (বিশেষ করিয়া সংস্কৃত-প্রাকৃত) নাট্যরচনা কিরূপে ও কি কারণে অবনতির পথে অগ্রসর হইল, তাহার সম্বন্ধেও আলোচনা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। অবনতির শেষ সীমায় পৌছিবার পর রসাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার সহৃদয় পার্শ্বদগণের আবির্ভাবে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে সাময়িক রসপুষ্টির পুনরাভাস দেখা দিয়াছিল তাহাও বিবৃত হইয়াছে। ইহার পরই বাঙলার নিজস্ব বিশিষ্ট অভিনয় পদ্ধতি বা যাত্রার যুগ। ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে প্রভৃতি খাটি যাত্রা ওয়ালাদিগের বিস্তৃত পরিচয়, যাত্রার ক্রমাবনতি, যাত্রা ও থিয়েটারের মিশ্রণ, কবিগান, হাফ-অ্যুথডাই, পাচালী, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতি বাঙলার বিভিন্ন প্রকার কাব্যামৃতরসান্বাদন করিবার ব্যবহারিক পদ্ধতির ইতিহাসও ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। আনুযায়িকরূপে নেপাল,

আসাম ও মণিপুরে বাঙলা দৃশ্যকাব্যের প্রসার সম্বন্ধেও গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমখণ্ডের প্রথমংশ এই স্থলে প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার থিয়েটারী যুগের কথা। বাঙলায় পাশ্চাত্যের অনুকরণে থিয়েটার স্থাপনের মূলে নানা জাতীয় ইউরোপীয় বণিকগণের কতদূর প্রভাব ছিল, গ্রন্থকার তাহা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন। প্রে-হাউস, কলিকাতা থিয়েটার, লণ্ডন ট্যাভার্ন, মিসেস ক্রিষ্টোর থিয়েটার প্রভৃতির কাহিনী বাঙলা থিয়েটারের ভিত্তিমূলে ইউরোপীয়গণের আদর্শ প্রতিষ্ঠারই কাহিনী। তারপর আমিলেন প্রসিদ্ধ রুস পর্য্যটক হেরাসিম লেবেডেফ। এককাল পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গই অভিনয় দ্বারা বাঙলার দর্শকবৃন্দকে আনন্দদান করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু লেবেডেফ সে

গডালিকা প্রবাহে পতিত হইলেন না। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঙালী পণ্ডিত গোলক নাথ দাসের সাহায্যে বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া, পাশ্চাত্য দৃশ্যকাব্যের বাঙলা অনুবাদ করাইয়া, ও বাঙালী দর্শক সমাজে তাহার অভিনয়ের দ্বারা বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসে লেবেডেফ যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহার বাদানুবাদপূর্ণ বিস্তৃত বিবরণ হেমেন্দ্রবাবু স্কুর্কোশলে প্রদান করিয়াছেন। লেবেডেফের থিয়েটার—পাটি ভাঙ্গিয়া যাইবার পরেও ইউরোপীয় থিয়েটারের যুগ আরও কিছুদিন চলিয়াছিল। এই সকল থিয়েটারের মধ্যে চৌরঙ্গী থিয়েটার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্ হেপন্ উইলসন্ ও সুবিখ্যাত শেক্সপীয়ার অধ্যাপক ক্যাপ্টেন ডি, এন্ট রিচার্ডসনের পৃষ্ঠপোষক-

তায় এই চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও ইহারই আদর্শে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের ভিত্তিপত্তন। কিন্তু এ সকল থিয়েটারেও প্রাচ্য নাট্যাদি ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়া অভিনীত হইত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে খাটি বাঙালী থিয়েটার হইতেছে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রামবাজারে স্থাপিত নবীনচন্দ্র বসুর নিজস্ব থিয়েটার। এই থিয়েটারেও পেশাদার বাঙালী অভিনেত্রীগণ নিযুক্ত হইয়াছিল। শুনা যায় যে এই থিয়েটারে বিজ্ঞানন্দর অভিনয় করিয়াই নবীনবাবু সর্বস্বাস্থ্য হ'ন। নবীনবাবুর থিয়েটার লোপ পাইবার পরও সা-সুচি থিয়েটার প্রভৃতিতে ইংরাজী অভিনয় কিছুদিন চলে। তাহার পর ক্রমশঃ দেশবাসিগণের রুচিপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী অভিনয়ের ধারা বিলুপ্ত হইয়া যায়। হেমেন্দ্রবাবু তাহার গ্রন্থের

নিউ সিনেমা

পর্য্যটনা * কোন : কলি : ৫৮১১

শনিবার ৫ই নভেম্বর হইতে ৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত
অচিন-প্রিয়া এবং দিদি (বাংলা)

—:—:—

৯ই হইতে ১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত :—

অচিন-প্রিয়া এবং মৌরাবান্নি (বাংলা)

—:—:—

১১ই হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত :—

মাসভূতো ভাই এবং চণ্ডীদাস (বাংলা)

—:—:—

১৬ই হইতে ১৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত :—

মাসভূতো ভাই এবং মায়্যা (বাংলা)

অষ্টম সপ্তাহ !!

দেশের মাটি

আপনার মনে আনন্দ এবং
নূতন আশা দান করিবে

দেশের মাটি

সপরিবারে, সবাকবে অটাই
দেখিয়া যান।

= চিত্রা =

কোন : বি, বি, ১১৩০

প্রথম খণ্ডে বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাসের এই অধ্যায় পর্যন্ত সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে এই ইতিহাসের ধারাই সুরক্ষিত হইয়াছে। তৎকালীন কলিকাতার ধনী নাট্যরসিকগণের প্রচেষ্টায় বাঙলা থিয়েটারের প্রথম যুগ কল্পন অবস্থার মধ্য দিয়া কাটিয়াছিল দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমার্ধে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাইকপাড়া ও বেলগাছিয়ার সিংহোপাধিকারী ভূম্যধিকারিগণ, শোভা-বাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার দের বংশীয়গণ, জোড়াসাঁকো ও পাণ্ডুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশ বাঙলা থিয়েটার প্রবর্তনের মূলে কতদূর সহায়তা করিয়াছিলেন, সে সকল বিচিত্র বিবরণ হেমেন্দ্রবাবু বহু পরিশ্রমে নানাস্থান হইতে সংকলন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের ধুরন্ধর-গণও যে তৎকালে নীতির দোহাই দিয়া নবরূপ নব প্রবর্তিত এক নাট্যকলার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ান নাই তাহার পরিচয়ও ইহাতে আছে। আর আছে—প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণের” রচনা ও অভিনয়ের রোমাঞ্চকর ইতিহাস। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদক পাজী লঙ্কাহেবের কারাবরণ ও নীলদর্পণ নাটকের প্রভাবে ধীরে ধীরে নীলকর সাহেবদিগের অন্তর্ধান প্রভৃতির কাহিনীও দ্বিতীয় খণ্ডের বিশিষ্ট আকর্ষণ। ইহা ব্যতীত গ্রন্থকার “জাশজাল থিয়েটারের” উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস অতি সাবধানে ও সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। অবশেষে “গজদানন্দ” ও “সুরেন্দ্র-বিনোদিনী” অভিনয়ের নিমিত্ত গ্রন্থকার উপেন্দ্রনাথ দাস ও ম্যানেজার রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান ও

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে “ড্র্যামেটিক পারফরম্যান্সেস্ এ্যাক্ট” পাশ হওয়ার চিন্তাকর্ষক কাহিনী দিয়া বর্তমান খণ্ডটির সমাপ্তি করা হইয়াছে।

এই খণ্ডেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জনক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার, নাট্যাচার্য্য নাট্যশালাধ্যক্ষ ও অপরূপ রূপদক্ষ নট স্বর্গত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বঙ্গ রঙ্গশালায় প্রথমাবির্ভাবের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দীনবন্ধুর সধবার একাদশীতে নিম্নে দস্তের ভূমিকায় তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশ—

“মদমন্ত পদ টলে নিমে দস্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নট শুরু তার।”

এই দুই খণ্ড গ্রন্থে হেমেন্দ্রবাবু যেরূপ দৈর্ঘ্য, পরিশ্রম, তত্ত্বানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের বিচার বিতর্ক গুলিতে (যথা—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ সন্মালোচনায়) হেমেন্দ্রবাবু বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। হেমেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের তিনটি অভিযোগ আছে। প্রথমতঃ, তাঁহার সংকলন প্রায় নিখুৎ হইলেও ভাষা বিশেষ সরস হয় নাই। বোধ হয় ভাষা অপেক্ষা ঘটনার

উপর অধিক মনোযোগ দানই ইহার কারণ। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার transliteration পদ্ধতি বর্তমানের বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিকে অনুসরণ করে না। আর ইহা ছাড়া ছাপার ভুলও গ্রন্থমধ্যে নিহাত অল্প নাই। তৃতীয়তঃ, তাঁহার গ্রন্থের একটি বিস্তৃত Index of proper names নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে একপ একটি নামসূচী দেওয়া হইলেও উহা সম্পূর্ণ নহে। আর প্রথম খণ্ডে ত উহার একান্ত অভাব। এই ক্রটিগুলি পরিবর্তিত হইলেই গ্রন্থখানি সর্বদৃষ্টিসন্মত হইত সন্দেহ নাই। গ্রন্থমধ্যে কয়েকখানি দুপ্তাপ্য চিত্রও আছে। আমরা তৃতীয় খণ্ডের আশায় রহিলাম। আশা হয়, গ্রন্থ দুইখানিই দেশ-বিদেশের পাঠক সমাজে সাংগ্রহে পঠিত হইবে।

• “প্রিয়দর্শী”

আধুনিক ও
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

কেন
কলি

৩২-সি.
গমতলা
কলিকতা

N. I. P.



মনস্তত্ত্ব ও নবতম শিল্পকলার
চাতুর্যে ছায়াচিত্র জগতে
যুগান্তর আনয়ন করবে

মানব মনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব
সমাজের শাসন বড়
কি প্রেমের অনুশাসন বড়
তারই চিত্ররূপ
=পাথক=

=পাথক=

=পাথক=

: পরিচালনা :

চাকর রায়

তরুণী রেবার জীবনে-জীবন ও অবনী
দুজনই এসেছিল প্রেমের মালা
হাতে করে, একজন তার উদ্দেশ
প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাকে অভিভূত
করেছিল—তার অন্তরে ছিল নির্লিপ্ত
ভালবাসা—কাকে সে বরণ করবে ?



(বিলাসী)

বড়দিদি :

শ্রীমান্ পাহাড়ী ভাষাকে আমরা জানি একজন সু-গায়ক, সু-অভিনেতা এবং বন্ধু হিসাবে। কিন্তু তিনি যে একজন পাকা ঘোড়সোয়ার এ খবরটা অনেকেরই জানা নেই।

বড়দিদির আশ্রয় ছেড়ে যাবার পর নায়ক সুরেন্দ্রনাথের জীবনে শান্তি ছিল না।

দিন কেটে যায়...বেচারী সুরেন জানে না তার বড়দিদি কোথায়। এমন দিনে, নিতান্ত দৈবাৎ সে খবর পেল তারই কন্ঠচারীর অত্যাচারে বড়দিদির ভিটে-মাটি আজ নিলামে উঠেছে।

হায়! সুরেন আজ জমিদার...বিপুল বিশ্বের অধিকারী; আর বড়দিদি—পথের ভিখারিনী!

যে মুহূর্তে সুরেন জানতে পারলে বড়দিদি মাধবী তারই জমিদারীর এলাকাধানের প্রজা এবং তারই কন্ঠচারীর চক্রান্তে আজ তার বড়দিদির এহেন দুর্দশা—সেই মুহূর্তে সুরেন্দ্রনাথ তার কর্তব্য স্থির করেছিলেন। সে কাল-বিলম্ব না করে দ্রুতগামী অশ্বে জিন চড়িয়ে বড়দিদির শব্দবালয়ের অভিমুখে তড়িৎগতিতে বেরিয়ে পড়ে।

উপরের এই দৃশ্যটি শহরের সন্নিকটে একটি নির্দিষ্ট লোকেশানে সম্প্রতি তোলা হয়েছে। এই দৃশ্যটি গ্রহণে অস্বাভাবিক হিসাবে পাহাড়ী সাক্ষাৎ বথেষ্ট সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পরিচালক অমর মল্লিক এবং তাঁর কন্ঠাসজ্ঞও এই দৃশ্য গ্রহণে বিশেষ কষ্টসহ্য করেছেন। সুখের বিষয় তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

সাপুড়ে :

দেবকী বাবু একেবারে শয্যাশায়ী হোয়ে পড়ায়, গত সপ্তাহেও এই ছবির কাজ বিশেষ অগ্রসর হ'তে পারে নি। তিনি সুস্থ হ'বা মাত্রই চিত্র-গ্রহণ শুরু হ'বে। ইতিমধ্যে সুর-শিল্পী রাই বড়াল তার দল-বল নিয়ে হু'নস্বর ঠুড়িওতে সঙ্গীতাংশের মহলা শুরু করেছেন।

রাইবাবুর মহলার খানিকটা অংশ শুনে আমাদের দৃঢ় ধারণা হয়েছে এবারে সাপুড়ে ছবিতে তিনি সুর-সংযোজনার মধ্যে কিছু নতুনত্বের সন্ধান দিতে পারবেন। তাঁর পরিপক্ব সুরজ্ঞান এবং পরিকল্পনার অভিনবত্বে কণ্ঠসঙ্গীত এবং আবহ-সঙ্গীতের মাধুর্য্য যে অত্যন্ত হৃদয়হীনেরও অন্তর স্পর্শ করবে, এর পরিচয় পেয়ে আমরা বিশেষ আশাব্যস্ত হ'য়েছি।

কপালকুণ্ডলা (হিন্দি) :

ফণী মজুমদারের “সাথী” শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ আবার তাঁকে জুড়ে দিলেন হিন্দি “কপালকুণ্ডলা” গঠন কার্যে।

শ্রীমান ফণী ভায়ায়ও কন্ঠশক্তির তারিফ করতে আমরা বাধ্য। “সাথী” শেষ হ'বার আগে থেকেই তিনি “কপালকুণ্ডলা” চিত্র-নাট্য রচনায় মন দিয়েছিলেন। এত

সময়তায় সঙ্গে কাজ শেষ হ'য়েচে যে অনেকে ভাবতেই পারেন না এই মাসের মধ্যেই “কপালকুণ্ডলা” চিত্র গঠন আরম্ভ হ'তে পারবে। কিন্তু সত্যি সে অঘটন ঘটে গেল।

গত শুক্রবার নিউ থিয়েটার্সের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় এবং অত্রাভ. পদস্থ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে, ফণীবাবুর নতুন ছবি হিন্দি “কপালকুণ্ডলা” ‘শুভ-মহরত’ সুসম্পন্ন হ'য়েচে। সকলের শুভেচ্ছা নত মন্তকে গ্রহণ করে কর্মযোগী ফণী মজুমদার কার্যে ব্রতী হ'য়েছেন। আরও কার্যে আমরাও তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

বর্ধমান ও মেদিনীপুরের মাঝে, পথের ধারের সেই বিখ্যাত সরাইখানার কথাটি আপনারা একবার স্মরণ করুন।

সেই সরাইখানায় কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মতিবিবির সাক্ষাৎ ঘটে এবং সেই সাক্ষাতের ফলাফল আপনারা পরে জানতে পারবেন।

আপাততঃ শুনে সুখী হবেন, কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুন্দরী অভিনেত্রী লীলা দেশাই। এই চিত্রের আর তিনটি প্রধান ভূমিকা এইভাবে নির্ধারিত হয়েছে তা আমরা গত সংখ্যায় জানিয়েছি।

মতিবিবি.....শ্রীমতী কমলেশ কুমারী
নবকুমার.....নাক্ষত্র
কপালিক.....জগদীশ

‘সাথী’

‘সাথী’র সম্পাদনা কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হিন্দি সংস্করণের প্রায় ১৩ রীল ‘প্রিন্ট’ও হয়ে গেছে। এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ ‘ঈদ’ পর্বে হিন্দি সংস্করণটা বাঙলার বাহিরে প্রায় বার যায়গায় ‘রিলিজ’ হ'বে। বাংলা সংস্করণটা আসছে ১৯শে নভেম্বর নিউ সিনেমাথ মুক্তি লাভ করবে।

‘হুয়াং’

দুয়ণএর কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিচালক নীতীনবাবু এবার আরও বেশী করে ‘Technique’ এর দিকে নজর দিয়েছেন।

পরিচালক হেমচন্দ্র

পরিচালক হেমচন্দ্র তাঁর পরবর্তী ছবির ‘সিনারিও’ শেষ করে ফেলেছেন। এ ছবি-খানার গল্পাংশ হচ্ছে রঞ্জিত (টুন্স) সেনের লেখা। পরিচালক মহাশয় সেই গল্পের ওপর base করে এই চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন। অবশ্য এ কাজে বিনয় চাট্জ্যে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ছবিখানার চরিত্রলিপি যদিও এখন ঠিক হয়নি তবে যতদূর আশা হয় তাতে মনে হয় পাহাড়ী ও পল্লভের মধ্যে একজন ‘হিরো’ আর কানন ও লীলা দেশাই এর মধ্যে একজন ‘হিরোয়িন’ হ’বে।

‘বড়দিদি’র কাজ শেষ হলেই এই বই-এর কাজ আরম্ভ হ’বে বলেই উপস্থিত স্থির হয়ে আছে।

জনক নন্দিনী

রাধার ‘জনকনন্দিনী’ প্রায় শেষ হয়ে এলো। অভিনয় শেষ হ’লেই ‘রূপবাণী’তে এ ছবি দেখান হবে।

এ ছবির ভূমিকালিপি হ’চ্ছে এই রকম :
সীতা—সাবিত্রী, রাণী—দেববালা, ধরিত্রী—মাতা—রাজলক্ষ্মী, ব্রাহ্মণী—ছায়া, অহল্যা—উমাতারা, বিখ্যামিত্র—অহীন্দ্র চৌধুরী, পরশুরাম—মনোরঞ্জন ভট্টা, দশরথ—রবী রায়, রাবণ—জহর গাঙ্গুলী, বৈতালিক—মৃণাল ঘোষ, জনক—তুলসী চক্রবর্তী, গোতম—জয়নারায়ণ, রাম—সুশীল রায়, প্রভৃতি।

একলব্য

ওরিয়েন্টাল, কিনেটোনের ছবি ‘একলব্য’র কয়েকটি বিশিষ্ট দৃশ্য গেল

হুয়াং তোলা হয়ে গেলো। ছবিখানা আসছে ১২শে নভেম্বর থেকে ‘ত্রী’ চিত্রগৃহে দেখান হ’বে। এতে অভিনয় করেছে জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, অমল বন্দ্যো, প্রভৃতি।

খনা

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়এর পরিচালনায় ‘খনা’ এক রকম শেষ হয়ে গেছে। ‘উত্তরা’ চিত্রগৃহে এ ছবিখানি মুক্তি প্রতিক্ষায় রয়েছে।

এই ছবির সঙ্গে ডি, জির পরিচালনায় একখানি ছোট হাত্তরসাম্যক ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হচ্ছে তা আমরা আগেই জানিয়েছি। ছবিখানির নাম হয়েছে ‘অভিসারিকা’

পথিক

ইন্দ্র মূর্তীটোন নামে একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গড়ে উঠেছে, এঁদের প্রথম ছবি—পথিকের চিত্রগ্রহণ ম্যাডান ষ্টুডিওতে খুব জোরতাবে এগিয়ে চলেছে। এতে অভিনয় করছেন—শীলা হালদার, রমলা,

বাগদত্তা হ’লেও বিয়ে না
হওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ
মেয়েদের জীবনে আছে...

এবং সে দুঃখ মনীষা সহ্যও করেছে.....

শ্রেষ্ঠাংশে:

সাধনা বোস
অহীন্দ্র চৌধুরী

পরিচালক:

মধু বোস



চিত্র-পরিবেশক:

এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটস

ই-টি-ভি বিল্ডিং, কলিকাতা

কি সেই মঙ্গলময় দুঃখ?

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
আনন্দ-রসধন-চিত্র নিবেদন

অভিনয়ে

তার পরিচয় পাঠবেন।

অভিনয়

১০ম সংস্কৃতি!

রূপবাণী

ফোন : বি, বি, ৩৪১৩

শনি, রবি ও ছুটির দিন

৩টা, ৬টা, ও ৯টা

অন্যান্য দিন ৬টা ও ৯টা

N. I. P.

বি-এল-থেমকার প্রযোজনায় মেট্রোপলিটান পিকচার্স-এর নিবেদন—

একজন সিংহলের রাজকন্যা,
অপরজন সাগরজলে ভেসে আসা
অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবা—যনা ও
মিহির! সিংহলের সাগর সৈকতে
যে প্রণয়ের স্তর, উজ্জ্বলিনীতে সম্রাট
বিক্রমাদিত্যের সভায় তাহাই
পরিণতি! একদিকে প্রেম, অন্ডদিকে
অমঙ্গলের আশঙ্কা! পরিণামে কি
ঘটিল ছায়াচিত্রাকারে দেখুন।

খনা

ময়ম-মম পরিভূষকরূপ ও রম্যের
অদাবিল প্রবাহ!

পূণ্য-ভূমি ভারতের অতীত
গৌরব-কথা!

প্রেম ও আত্মবলিদানের
অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

শ্রেষ্ঠাংশে :—

অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া দেবী

—পরিচালক এ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়—

অভিসারিকা

সুৎসহ একখানি সর্ববয়স-
মধুর কৌতুক-চিত্র

একটি উৎকট রোমান-বাতিকগ্ৰস্ত ঘর-জামাইএর
পরকীয়া প্রেমাকাজকের মর্মান্তিক পরিণাম!

শ্রেষ্ঠাংশে :—বীরেন গাঙ্গুলী, সাবিত্রী এবং
রাজলক্ষ্মী।

পরিচালক :—
বীরেন গাঙ্গুলী

—শুভ-উদ্বোধন—

শনিবার ১২ই নভেম্বর . শনিবার ১২ই নভেম্বর

উত্তরা

চন্দ্রিকা মনোরমা, রাজলক্ষী, সুহাসিনী,
ধীরাঙ্গ, ভোলা, সত্য প্রভৃতি।

আমরা আশা করি চারু রায়ের পরি-
চালনায় 'ছবিখানির' মধ্যে অনেক কিছু
নূতনত্ব থাকবে।

রূপবাণী

শ্রীভারতলক্ষী পিকচার্সের অভিনব সমাজ
চিত্র 'অভিনয়' এই সপ্তাহে হইতে রূপবাণীতে
দশম সপ্তাহে পদার্পণ করিল।

চিত্রা

এই শনিবার থেকে 'চিত্রা'র 'দেশের
মাটি' অষ্টম সপ্তাহে পড়বে। 'দেশের
মাটি'র মতন এমন একখানি সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর
ছবি যে চিত্রায় আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে
চলবে তা আশা করা অসমীচীন হ'বে না।

বিনোদ এণ্ড কোং

১৩নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার

জরীপ ও নক্সার যন্ত্রাদি বিক্রয় করে তাছাড়া
অফিস ষ্টেশনারী ইত্যাদিও বিক্রয় করে।

N. I. P.

পূর্ণ থিয়েটার

এই শনিবার এই নভেম্বর 'গোরা' এই
চিত্রগ্রহে চতুর্থ সপ্তাহে পড়বে। কবীন্দ্র
রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' দর্শক সমাজে যে কত
প্রিয় তা গত দু' সপ্তাহের জনসমাগম থেকে
বোঝা যায়।

নিউ সিনেমা

'নিউ সিনেমা' ১৯৩৫ সালের তোলা
ছবি 'অটিন-প্রিয়া' আমরা দেখে বাস্তবিকই
যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। এই ছোট তিন
রিলের বই খানা মানুষকে যথেষ্ট ভাবে
হাসাতে পেরেছে। অভিনয়ের মধ্যে অমর
মল্লিকের কবিরাজ ও জয়ার জমিদার সত্যই
উপভোগ্য হয়েছে।

এই শনিবার এই নভেম্বর থেকে ৬ই
পর্যন্ত 'অটিনপ্রিয়া'র সঙ্গে 'দিদি' আর
২ই থেকে ১১ই অবধি 'মীরাবাই' দেখান
হ'বে।

কোন পথে?

হুমুদেশ সেন

বুদ্ধি ও যৌন লিপ্সা নরনারীর জীবনে
দুইটি কেন্দ্র। মানুষকে বাঁচতে হলে
যেমন তার চাই ঋতু, তেমনি নরনারীর
যৌন সম্বন্ধ, অন্ততঃ বংশ রক্ষার পক্ষে
নিত্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে বংশরক্ষার
তাগিদই একমাত্র নয়, তা বোধহয়
বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা বাহ্যল্যমাত্র।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্ত
দুয়েরই প্রয়োজন। যৌবন যখন স্বাভাবিকতা
পায় না, তখন তার বিকৃতরূপ জীবনকে
কলঙ্কিত করে, লালিত করে। মানুষ যখন
খেতে না পায়, তখন অসং উপায়ে কিছা
আরোও কুটিলভাবে তার ক্ষুধার রসদ
জোগাড় করবার চেষ্টা করে। সুস্থ ও
স্বাভাবিক ও uninhibited জীবন যাপনের
জন্ত বা নিত্য গৌণ এবং তার অভাবে
যে সমস্যা দেখা দেয়, সে শুধু ব্যক্তিগত
নয়—তা সামাজিক। এই সমস্যা যে
সত্যিকারের ও ব্যাপক, তার প্রমাণ
চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অগ্রগণ্য Karl Marx
এবং Freud :

ছ'রকমভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা
করা হয়েছে। এই দুইটি সমাধানের রূপই
'Negative'। প্রাচীনকাল থেকে জানী
ব্যক্তিগণ মাঝে মাঝে এই দুইটি সমাধানকে
সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁদের অনেক
কথারই আর্থ প্রয়োগ হয়েছে এবং হতে
পারে। তাঁদের মতে, বুদ্ধি ও যৌন
সম্বন্ধ অর্গোণ। যৌন জীবনের প্রয়োজনীয়তা
তাঁরা একেবারে অস্বীকার করেননি—কিন্তু
বংশ রক্ষাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য—'প্রজাতির
ক্রিয়তে ভার্য্যা'। ব্যবহারিক জীবনে এই

কথার সত্যতা মেনে নেওয়া দুঃস্থ। মানুষ
ও পশুর মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য এই
যে মানুষ যৌন জীবনকে আরোও উন্নত
পৌছিয়ে দিয়েছে,—নারীকে কামনা করবার
মধ্যে তার আরোও অনেক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা
আছে। সাহিত্যে ও শিল্পে আমরা নর-
নারীর যৌন লিপ্সার অতিসূক্ষ্ম রূপ দেখতে
পাই। আর একটি সমাধান নারীকে
মানুষের জীবন থেকে কেন্দ্রচ্যুত করবার
পরামর্শ দান করে। "নারী নরকের
দ্বার"—যারা এমতে আস্থা রাখেন, তাদের
জীবনে নারীর প্রয়োজন শুধু পাশদিক
প্ররুতি চরিতার্থ করবার জন্ত। এই ধারণা
ছিল পূর্ব বর্ষরদের। তারা যুদ্ধ করত
লুণ্ঠন করবার জন্ত। তারা নগর জয় করে
ঘরে ঘরে আশ্রয় লাগাত, আর মেয়েদের
করত কামনার সামগ্রী। আজকের অনেক
ধনী ব্যক্তির মধ্যে এই প্ররুতি দেখা যায়।
তাদের ধনোপার্জনের একমাত্র অমুপ্রেরণা
অন্তের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার
জন্ত। তারা শুধু টাকার বলে অন্তের জী,
কথা ও ভয়কে প্রলুব্ধ করে নিজেদের
কামনা চরিতার্থ করে।

অতএব এই দুইটি সমাধান আজকের
জীবনে নিরর্থক। আত্মসংযমের বুলি
আওড়ান সোজা কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে
তাকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা শুধু যৌবনকে
ব্যঙ্গ করা। দেশ যদি রোগা সন্ন্যাসীতে
ভরে যায়—তবে ক্ষত্রিয় বীর্যের নিত্য
অভাব হবে।

সুতরাং গোড়াতেই ধরে নেওয়া বাক—
নরনারীর জীবনে প্রয়োজন অল্পের এবং
সুস্থ ভাবে যৌনপ্ররুতি তৃপ্ত করা।

দেশের শতকরা নব্বুই জন লোক অনেকটা পুস্তর মত কোনরকমে আহাৰ জোগাড় করছে। তাদের যৌন জীবনও অনেকটা আদিম যুগের। তাদের ছেলেরা না পায় খেতে না পায় পরতে। আমাদের মধ্যবিত্তরা মাসে মাসে, গরীব হয়ে আসছে। তাদের ঘরে এই সমস্ত দুটি ব্যাপক। যারা একান্ত গরীব, তাদের একমাত্র রক্ষাকবচ তাদের অসহায় অজ্ঞানতা। কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরে আজ পৌঁচেছে শিক্ষার আলোক। এই জগতের লোকেরা অসুভব করে তাদের অভাব এবং প্রতিকার করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কোনরকমে একটা কেরানীগিরি জুটিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ করে ভেবে নৈয় দুটি সমস্যাই সমাধান হয়েছে। শিক্ষা পেলেও, শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে তারা তাদের জীবনে প্রয়োগ কর্তে চায় না। এদের ছেলেপিলের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশী এবং মনে হয় “Population increases at geometrical progression and income increases at arithmetical rate”..... তাই সমস্ত আরোও জটিল ভাবে দেখা যায় এই শ্রেণীতেই। মধ্যবিত্ত ঘরে সেজন্ত সবচেয়ে বেশী মূর্থতা, ভণ্ডামী এবং পারিবারিক অশান্তি।

সমস্ত সমাধান হতে পারে শুধু জীবন ও নবলব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। আমাদের পথকে মসৃণ কর্তে পারে শুধু বিজ্ঞান ও তার কার্যকরী প্রণালী। নারী সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদও বদলানো আবশ্যক। ভারী যুগের নতুন সমাজে নারীর স্থান পুরুষের সমকক্ষ হবে, এই আশা ব্যর্থ হবে না, মনে করি। দাস ও প্রভুর সম্পর্ক কখনও মধুর হয় না! সম-পদস্থ নরনারীর মধ্যে বাক্যে সত্যিকারের বন্ধন—যে বন্ধনের মধ্যে ফাঁক থাকতে পারে, কিন্তু ফাঁকি থাকে না। কোন্ পথে আমাদের জীবনের সমস্ত সমাধান হবে তার প্রতীক্ষায় আমরা রইলাম।

বি নি ঞ্চ

গোল্ড কাপ

Theta Beta Club Gold cup প্রতিযোগিতার (Duplicate Contract Bridge) চতুর্থ অধিবেশন এই মাসের মাঝামাঝি আরম্ভ হইবে। হায়ড্রাবাদ, বোম্বে, বিহার প্রভৃতি প্রদেশ সমূহ হইতে দল আসিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। কলিকাতার বিভিন্ন দল সমূহের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু প্রথম দুই বৎসর হায়ড্রাবাদ Phoenix Club বিজয়ী হন। গত বৎসর বিমান মিত্রের অধিনায়কত্বে Theta Beta Club বিজয়ী হইয়া কলিকাতার মর্যাদা রক্ষা করেন। মুরারী বসু, শঙ্কু মিত্র ও সুবিমল মিত্র এই দলে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ভাল খেলিয়াছিলেন। গত বৎসর Mr. J. E. Borrell এর নেতৃত্বে Cosmo Club ফাইনালে পরাজিত হন। Mrs Ashmead খেলাতে যথেষ্ট নিপুণতা দেখান ও সকলের প্রশংসা ভাজন হন। এ বৎসরও তাঁহাদের দুটি দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছেন। কলিকাতার দল সমূহের আগ্রহ দেখা যায় কিন্তু সুবিধা বিশেষ করিতে পারেন না। কি করিলে তাঁহাদের খেলার উন্নতি ও কি ভাবে খেলা উচিত এসব বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। ‘সব জাভা’ ভাবটা এ খেলায় থাকা উচিত নহে। আর যেন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে তাঁহারা উত্তম না হন। তাঁরা যেন তাঁদের Bid ও খেলায় এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

শুনা যায় Theta Beta Club এর তিনটি দল এ বৎসর যোগদান করিবেন। জনরব কমল ঘোষের দল হইবে কিনা এখনও ঠিক হয় নাই। আশাকরি তিনি যেন আমাদের এ বাৎসরিক আমোদ হইতে বঞ্চিত না করেন।

এ বৎসর Gold Cup এর বৈঠক ক্লাবের সভাপতি কুমার অমিয় নারায়ণ সাম্র্যাল মহাশয়ের বাটী ১নং মহারাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীটে বসিবে। আমরা আশা করি প্রতি বৎসর এই প্রতিযোগিতার শ্রীবৃদ্ধি হউক ও যেন খেলার উন্নতি করে এবং সকলের মধ্যে একতার সৃষ্টি আনে। Mr. J. E. Borrell এর ভাষায় বলিতে পারি তাস খেলায় “Body line bowling” নাই।

প্রতিযোগিতার প্রবেশের শেষ দিন ২ই নভেম্বর। সবিশেষ বিবরণের জন্য ১ নং খায়রুল লেনে সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

কারমাটার গৌর প্রতিষ্ঠান

কারমাটার গৌর প্রতিষ্ঠানের সভ্য-বৃন্দের উদ্যোগে পূর্ব পূর্ব বৎসরের জায় এবারও সাঁওতাল পরগণার কারমাটারে ত্রিশ্রীকালীপূজা ও নবগৌর বিজ্ঞানবীর পারিতোষিক বিতরণ অনুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূজা উপলক্ষে দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও বস্ত্র বিতরণের সুবন্দোবস্ত হইয়া ছিল। অজ্ঞাত বৎসরের জায় মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোং লিঃ ড্রামাটিক ইউনিয়ন “চন্দ্রগুপ্ত” ও “গয়াতীর্থ” অভিনয় করিয়া সমগ্র কারমাটার বাসীর আনন্দ বর্জন করিয়াছিল। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ সিংহ, রায় বাহাদুর কেশবলাল রায় চৌধুরী, রায় সাহেব অন্নদা মিত্র, ডাঃ সুধীর কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু এডভোকেট, ডাঃ শিবচন্দ্র বসু, ডাঃ নিতাই চাঁদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ তিনকড়ি ঘোষের উদ্যোগে ও স্থানীয় জমীদার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকূল্যে উৎসব সর্কাসমুদ্র হইয়াছিল।

সার্বজনীন কার্তিকপূজা

আগামী ৩০শে কার্তিক বুধবার ২নং ওয়ার্ডে বেনিয়ার্টোলের সাব্বের মজলিসের উদ্যোগে পূর্ব পূর্ব বৎসরের জায় এবারও সার্বজনীন কার্তিক পূজা অনুষ্ঠিত হইবে।

সর্বসাধারণের সহায়ত্ব ও উপস্থিতি এবং সভ্যগণের সাহায্য প্রার্থনীয়।



দেশের মাটি

শনিবার ৫ই নবেম্বর থেকে

সিনেমা প্যালেস

চট্টগ্রাম

সিলেট টকিজ

সিলেট

ছাড়া বা নী

বৈশাখ

এ বছরের—
অভিনন্দিত চিত্র



দেখানো হচ্ছে

বি চি ত্রা

—বর্জমান—

মঙ্গলবার ১লা নবেম্বর থেকে

ওরিয়েন্টাল টকিজ

শিলচর

শনিবার ৫ই নবেম্বর থেকে

উল্লাসিনী সিনেমা

খুলনা



“রিগ্যাল”

জামশেদপুর

থেকে তার

অভিনন্দন—দেশের মাটির

হুদিনের বিক্রী ৭৪১ টাকা

—নতুন রেকর্ড।

—একমাত্র পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম

কর্পোরেশন

১২৫, ধর্মতলা স্ট্রীট

—কলিকাতা—

ফোন : ক্যাল ২৪২২ গ্রাম : অরোরাফিল্ম



অসুস্থ
শরীর



দুঃস্থ ও পবল

করিতে



সিরোলিন

'রাচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সর্দি, কাশি এবং ঘর্ম্মার
প্রথম অবস্থায় প্রেণ্ড ঔষধ।



সতী

শ্রীঅজিত দে

রাত্রি তখন গভীর।

ঘরের ভিতর হইতে খুঁট খুঁট করে খিল খোলার শব্দ হইতেই গুটিকতক ক্ষুদ্র নিশাচর জীরের ক্ষিপ্র পলায়নের রস রস আওয়াজে নিঝুম রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। সরস্বতী খিল খুলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া একটু চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—আশু খুড়ো, এখনও যে রাত অনেকগো। আশুখুড়ো বিড়ি টানিতে টানিতে বলিলেন—সতী আজ আমার একটু তাড়াতাড়িই যেতে হবে রে, ভোর বেলাই আবার পাড়ার পাঁচজন বাড়িতে এসে জুটবে কিনা,—আজকে যে ঘোষবিবির বিচার হবে। সতী ঘরের কোনে মাটির প্রদীপটি জালিয়া গায়ের কাপড় গুছাইয়া আশু খুড়োর চটজোড়া দরজার বাহিরে রাখিয়া দিল। প্রদীপের স্বল্প আলোকে আশু খুড়োর পরিপক্ক মুখের কিয়দংশ দেখা গেল। চোখজোড়া যেন বিশ্বের পুঞ্জীভূত রহস্য-ভারে ছোট হইয়া আসিয়াছে—হয়ত শীঘ্রই একদিন বুজিয়া যাইবে আর খুলিবে না। সতী বলিল—হ্যাঁ গো খুড়ো, ঘোষদেবের ঐ মেয়েটির ওপর তোমরাত' খুব উঠে পড়ে লেগেছে—কিন্তু ওর দোষটি যে কি তাত' তোমরা খুলে বল না। খুড়োমশাই থক্ থক্ করিয়া কাসিয়া বলিলেন, ওরে ঐ বিবির কথা ছেড়ে দে। সোমন্ত মেয়ে তুই, তায় বিধবা; তুই যাবি এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় মাষ্টারপীগিরি করতে, সকালসন্ধ্যা মেয়ে পড়াতে। মালতীর কি এটা উচিত হচ্ছে! তুই-ই বলনা সতী, সরস্বতী কোন কথা কহিল না।

প্রদীপের আলোয় খুড়োমশায়ের মুখখানি একবার দেখিয়া লইয়া মুচকি একটু হাসিল মাত্র। খুড়োমশাইও যেন সেই হাসির প্রভাস্তরে ঠোঁট উন্টিয়ে নিম্নলিখিত চক্কু আরও একটু টিপিয়া নিম্নলিখিত করিলেন। এই ভাবে কথা কহিতে কহিতে খুড়োমশায়ের হঠাৎ যেন সাড় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—ওরে সতী বাইরে যে আলো বেরিয়ে গেলো, এই দেখ'! এবার বোধহয় আমিও বিপদে পড়লুম রে! সতী তৎক্ষণাৎ উত্তরে কহিল—খুড়ো; তোমার আর ভয় কি বল—তুমি তিন তিন খানা গ্রামের পঞ্চায়েতদের মাথা, তোমার আবার ভয়!

খুড়ো ঘরের বাহিরে আসিয়া চটি জোড়াটি পরতে পরতে বলিলেন সতী, বড় মিষ্টি কথা কহিতে পারিস তুই, ঐ জন্তেইত এখানে এলে আমার আর গা তুলতে ইচ্ছে হয় না। সতী একটু হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, তোমার যা কথা! তারপর খুড়োর হাততুটি এরিয়া বলিল—খুড়ো যে শাস্তিই তোমরা ওকে দাও, একেবারে গ্রাম ছাড়া করে দিও না, মালতী বড় গরীব কোন রকমে মাষ্টারনী'গিরি করে মেয়ে পড়িয়ে ছুটি পেটে খায়; আর তা ছাড়া ও সত্যিই খুব ভালো মেয়ে।

আশুখুড়ো সোহাগভরে সতীর চিবুকটি ধরিয়া—বলিলেন আচ্ছা গো আচ্ছা—এখন তবে আমি চলি, পথে কারুর সঙ্গে আবার দেখা না হোলেই বাঁচি; যে রকম আলো বেরিয়ে পড়েছে! এই বলিতে বলিতে খুড়ো পা টিপিয়া টিপিয়া অত্যন্ত সন্তর্পনে উঠন পার হইয়া চলিয়া গেলেন।

এইখানে সরস্বতী অর্থাৎ সতীর একটু ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন। সরস্বতীর মা দুই বছরের মেয়ে রেখে মারা যান। বৃদ্ধ বাপ তাকে অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যেই লালন পালন করেন। বৃদ্ধ বয়সের ঐ একমাত্র মেয়ের জন্ত হরিহর বাবু যখন পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন তখন গরীবের মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কি তা হাড়ে হাড়েই বুঝিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় গ্রামের মাতঙ্গর আশু বাহুঘোর সঙ্গে দাবা খেলিতে খেলিতে বহু দুঃখেরই কথাবার্তা তাঁর চলিত। বলিতেন, দেখো আশু, মেয়েটার 'ঙ' আর কোন পাত্রই জুটলো না—তা তোমরা বাপু যাহোক একটা দেখে শুনে দিও। তুমি ব্রাহ্মণ, সজ্জন, বিবাহ না করে গ্রামের পাঁচ জনের ভালো মন্দ দেখে জীবনটা তুমিও প্রায় সাধু সন্ন্যাসীদের মতই কাটিয়ে দিলে। আশুখুড়ো তখন বলিতেন—হরিহরদা তুমি কিছু ভেবো না—সরস্বতীকে যদি কেউ না বিয়ে করে তো আমি নিজে ওকে বিয়ে করব, এই বলিয়া এক প্রস্থ উচ্চরোলে হাসিয়া লইতেন। সরস্বতীর বয়স তখন প্রায় পনেরো বৎসর, কাছে থাকিলে লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া সে সরিয়া যাইত। সরস্বতীর বিবাহ অবশ্য হইয়াছিল—কিন্তু হরিহর বাবু তা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আশুখুড়োর চেষ্টায় পাঁচ ছ'খানি গ্রাম দূরে এক ভদ্রলোক দ্বিতীয় পক্ষে সরস্বতীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিয়াছিলেন নিজের জন্ত নয়; দশবারো বৎসরের ছুটি ছেলেকে দেখা-শুনার জন্তই তাঁর এই বিবাহ। ভদ্রলোকের কিছু 'জমিজমা' ছিল—এবং সরস্বতীকে ঐ বয়সে দেখিতেও মন্দ ছিল না, অতএব একটি পয়সা না লইয়া তিনি যখন সরস্বতীকে বিবাহ করিলেন তখন প্রতি গ্রামেগ্রামেই সাড়া পড়িয়া গেলো; সকলেই বলিতে লাগিল—আহা হরিহর বাবুর জামাই অতি

ভজলোক—একটি পয়সা নেয়নি। বুড়োর বরাং খারাপ তাই মেয়েটার বিয়ে দেখে শান্তিতে যেতে পারল না। কিন্তু সে ভজলোকও বছর আঠেক পরে চোখ বুজলেন। সরস্বতীর কোলে তখন একটি ছয় বৎসরের শিশু সন্তান, বিধবার ঐ একমাত্র অবলম্বন। সরস্বতী সত্যত পুত্রদের সহিত শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই একত্র থাকিতে পারিল না, সেই ছেলেরা তাহাদের মামার প্রেরোচনায় সংমায়ের সহিত জায়গা-জমি লইয়া মামলা জুড়িয়া দিল। আশুখুড়ো তখন সরস্বতীকে ফিরাইয়া আনিয়া নিজেই মামলার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে সরস্বতীও কিছু অংশ সম্পত্তি পাইল। সেইথেকে আশুখুড়োই সরস্বতীর সমস্ত দেখা শুনা করিতেন।

আশুখুড়ো চলিয়া যাইবার পর সতী দাওয়ায় বসিয়া তাহার এই পূর্ব স্মৃতিটুকুই মনে মনে চিন্তা করিতেছিল। সহসা তার নিজেরই অজ্ঞাতে দুই চোখ দিয়া দুটি ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এইতেই তাহার চমক ভাঙ্গিল। মনে মনে নিজের জীবনের প্রতি তার দিকার আসিল। সে সন্তানের জননী। কলিকাতার এক আশ্রমে আশুখুড়ো তাকে রাখার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সরস্বতীর মনে পড়িল প্রথমে সে ছেলেকে কলিকাতার আশ্রমে রাখিতে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু আশুখুড়ো কি জানি কি কারণে যেন জোর করিয়াই ছেলেকে লইয়া কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়াছে। সন্তান ক্রমশঃ বড় হইতেছে। উপযুক্ত বয়সে সে যখন আসিবে অথবা কলিকাতায় থাকিয়া মায়ের খবর লইবে তখন সে কি ভাবিবে। সরস্বতী এই কথা চিন্তা করিতেই শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে—রাত্রে আশুখুড়ো আসিলে সে তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া

আসিতে বলিবে। কোন ভজগৃহস্থের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করিতেও সে রাজী আছে, কিন্তু এদেশে আর সে কখনও থাকিবে না!

এদিকে খুড়োমহাশয় প্রভাত হইবার পূর্বেই লোকচক্রের অন্তরালে নিজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রাতঃকৃত্য এবং পূজা আত্মিকাদি সারিয়া সদরে আসিতে বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়া গেলো। ইতিমধ্যেই মালতীর বিচারের জ্ঞান প্রাপ্তি পঞ্চায়তগোষ্ঠী এবং বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকদের উপস্থিতিতে বাঁজুঘো মশায়ের নদর পরিপূর্ণ। বিড়ি এবং তামাকের শ্রদ্ধ হইতেছে। শিখাধারী কাব্যতীর্থ ও ত্রায়-রঙ্গগণ জালা জালা নশু টিপিয়া নাসিকারন্ধ্র একেবারে প্রায় বুজাইয়া আনিয়াছেন। খুড়োমহাশয় তসরের কাপড় পরিয়া গায়ে একটি শতছিদ্র নামাবলী জড়াইয়া, গলায় কণ্ঠী এবং নাসিকায় ক্লককলি আঁকিয়া একজোড়া খড়মের সাহায্যে নিজ আগমন ঘোষণা করিয়া মুখে ‘রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ’ বলিতে বলিতে সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। সভাস্থলে সেই ‘রাধে গোবিন্দ’র প্রতিধ্বনি করিয়া কেহ বা বিড়ী লুকাইয়া আস্তান আস্তান বলিল, কেহ বা নলু’চের আড়ালে দৃষ্টি রাখিয়া ‘জয় রাধে’ বলিতে বলিতে ধুমোন্দারণ করিল। গ্রামে আশু খুড়োর পরই ত্রায়রঙ্গমহাশয়ের প্রতিষ্ঠা। তিনি নাকে একটি পনশু লইয়া গৃহের এক কোণে দৃষ্টি রাখিয়া বামাচরণ’ বলিয়া চীৎকার করিলেন। এই ডাকে যে যুবকটি দাঁড়াইয়া উঠিল তাহার বয়স অনুমান আটাশ উনত্রিশ বলিয়া বোধ হয়। বলিষ্ঠ দেহের ওপর তাহার মুখশ্রীর এমন একটি দৃষ্টি রহিয়াছে যে তাহাকে দেখিলেই কেমন সজ্জাস্ত ধনী বংশের সন্তান বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না এবং সে যে শিক্ষিত

সে কথাও তার চোখের দৃষ্টি হইতেই বোঝা যায়। ত্রায়রঙ্গ বলিলেন—তোমার নামই বামাচরণ?

সে উত্তর করিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঁজুঘো মহাশয় ‘রাধে গোবিন্দ’ বলিয়া নিম্নলীত চক্ৰ হইয়া অলঙ্ক্য অধিষ্ঠিত যেন কাহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আপনি কি মালতীর সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হঁ, মালতীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?

বামাচরণ অতি নরম স্বরে বলিল—তার সাথে আমার সম্বন্ধ জেনে আপনাদের বিশেষ কিছুই লাভ হবে না—তার চেয়ে মালতীর ওপর কি দণ্ডাদেশ হয়, আপনারা দয়া করে আমাকে শুধু সেই কথাটাই জানিয়ে দিন।

বাঁজুঘো মহাশয় বলিলেন—তা’ মালতীকে যে আমরা এখানে আসতে বলেছিলাম, সে এলো না কেন?

বামাচরণ এবার একটু কঠিন হইয়া উত্তর করিল—মালতী এখানে আসতে পারবে না—তার প্রতি যা দণ্ডাদেশ হয় আমিই তা’ মাথা পেতে নেব—আপনারা বলুন।

গৃহের এক কোণে একটি অশীতিপর বৃদ্ধ অহিফেন প্রভাবে মুগ্ধমান ছিলেন, বামাচরণের এই উত্তর শুনিয়া গলার স্বর দ্বিগুণ চড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—শুনেছো হে বাঁজুঘো—বিবিসায়েবের আজ লজ্জা হোয়েছে!

এই কথা শুনিয়া বামাচরণ জলিয়া উঠিল। মূহূর্ত্তমধ্যেই সেই বুদ্ধের দিকে রক্ত চক্ৰ মেলিয়া হয়ত কিছু একটা কাণ্ড লম্বাইবার উপক্রম করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ সদরের দিকে চোখ পড়িতেই সে দেখিল মালতী এই দিকেই আসিতেছে।

এই সভায় গ্রামের যুবসমূহের প্রতিনিধি স্বরূপ জনকয়েক বলিষ্ঠ যুবক ছিল, তাহারা মালতী সভায় পৌঁছিয়া মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল; রুদ্ধেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিলেন এসো মা এসো।

হঠাৎ যুবসমূহের একটি যুবক বলিয়া উঠিল—আশুখুড়ো, যে স্ত্রীলোকের অপরাধ বিচারে আপনারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন তাঁকে মা বলতে আপনাদের মর্যাদার হানি হচ্ছে না?

মালতী একবার মাত্র সেই উদ্ধত যুবকের দিকে তাকাইয়া মাত্র যুবক চক্ষু নত করিয়া মালতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতী তাহার কাঁধে হাত দিয়া নরম সুরে বলিল—সুবিমল তুমি চূপকবু তাই।

মালতীর এই কথায় সুবিমলের বলিষ্ঠ দেহে এবং দৃষ্টিতে যেন কিসের একটি বোঝা নামিয়া আসিল। সেই বোঝার ভারে সে তার ব্যক্তিত্ব যেন ইচ্ছা করিয়াই ধুলার সহিত মিলাইয়াছিল। সুবিমলের এই পরিবর্তন সভাস্থ কোন সভ্যেরই দৃষ্টি এড়াইল না, বিশেষ করিয়া যুবসমূহের প্রত্যেকেই মালতীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় দৃষ্টি নত করিল।

এই অলক্ষণের মধ্যে একটি চঞ্চল ঝড় বহিয়া গেল, বাহার ফলে ঘরের আব-হাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া সেখানকার নিস্তকতা যেন অধিকতর গভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সেই নিস্তকতা ভঙ্গ করিলেন বাঁজুখো মহাশয়। যুবসমূহের প্রতি একবার তাকাইয়া একটু ভ্রূয় মিশ্রিত সুরে বলিলেন মালতী, গ্রামের প্রায় সকলেই তোমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হোয়ে উঠেছেন এবং বামাচরণবাবুর সঙ্গে তোমার একত্র বাস সে সন্দেহের রহস্য আরও গভীর

করে তুলেছে। ওপাশ হইতে শ্রায়রত্ন মহাশয় বাঁজুখো মহাশয়ের কথার সুর টানিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আর অসংচরিত্র স্ত্রী-পুরুষকে আমরা 'আমরাত' আর গ্রামের মধ্যে থাকতে দিতে পারি না—তাতে সমাজ যে রসাতলে যাবে, গ্রামের যে অমঙ্গল হবে। মালতী এই কথার কোন প্রতিবাদ করিল না। বামাচরণবাবু লাফাইয়া উঠিয়া ককঁশ কণ্ঠে বলিলেন—তার কোন প্রমাণ আপনারা.....

কিন্তু বামাচরণের কথা শেষ হইতে পাইল না। মালতী বামাচরণকে থামাইয়া বলিতে লাগিল—বাঁজুখো মহাশয়, আপনারা বলুন কি শাস্তি আমাকে নিতে হবে, আমি প্রস্তুত আছি।

বাঁজুখো মহাশয় এদিক ওদিক তাকাইয়া শ্রায়রত্নকে বলিলেন—বল'না হে কি বিধান তোমরা করবে। শ্রায়রত্ন সেই জাতীয় ব্রাহ্মণ যাহারা অপরের সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বেশ সদর্পেই উচ্চারণ করিতে পারেন। তিনি বলিলেন—তোমাকে কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই এ গ্রাম থেকে চলে যেতে হবে।

বামাচরণ রাগে ফুলিতেছিল সে আবার চাৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—মালতী একলা নয়; আমিও তার সঙ্গেই যাব'—তবে আপনাদের চরিত্র সম্বন্ধে...

এবারও মালতী তাহার কথা শেষ করিতে দিল না। শাড়ীর একটি প্রান্তে একবার চোখছুটি মুছিয়া সে বলিল—না আমি একলাই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। যুবসমূহ মালতীর এই কথায় অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাদের প্রতি তাকাইয়া মালতী পুনরায় বলিল—আপনারা এই বিচারের জন্ত এতটুকু দুঃখ করবেন না। তবে এর পর থেকে গ্রামের যেন কোন নিরপরাধিনীকে এরা কাঁসি কাটে

ঝোলাতে না পারেন আপনারা আজ থেকে শুধু সেই চেঁচটুকুই করুন। কথার শেষ দিকে মালতীর কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিয়াছিল। এই কথা বলিয়া সে হনু করিয়া বাহির হইয়া গেলো—পিছনে পিছনে বামাচরণ বাবুও বিমর্ষ পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। সভাস্থ সকলেই তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া যতক্ষণ দেখা যায় দেখিল; প্রতিজ্ঞনের মুখেই যেন একটা বিষ্ময়ের ভাব। বাহার এই মেয়েটির চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছিল তাহারা মালতীর দৃঢ়চিত্ত এবং সংযম লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইল, মনে মনে তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়াও পারিল না। বিচারের সভা ভঙ্গ হইল, বাঁজুখো মহাশয়, শ্রায়রত্ন; কাব্যতীর্থদের প্রতি গুরুতরে একবার তাকাইয়া 'রাধে গোবিন্দ' বলিতে বলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে বামাচরণ বলিল, 'মালতী তুমি বড় ভুল করলে, তোমার সঙ্গে আমারও যাওয়া উচিত ছিল—এই পশুর দেশে আমার আর এক মিনিটও থাকতে ইচ্ছা করে না। মালতী বামাচরণের দিকে তাকাইয়া বলিল—তুমি কিছু দিন এখানে থেকে সুবিমলদের সম্বন্ধটিকে একটু মাহুষ করে তোল। মনে আছে ত' আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিন আমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। বামাচরণ একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—বেশ তাই হবে—কিন্তু তুমি আমার জন্ত অপেক্ষা করবে ত'?

মালতী ততোধিক আবেগের সুরে বলিল—তোমার জন্ত আমি কি এতদিন অপেক্ষা করেই ছিলাম না?

সারা পথ এইরূপ কথোপকথনে অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন গৃহে পৌঁছিল তখন রোজের তেজ ভীষণ বাড়িয়াছে,

গ্রীষ্মের দুপুর নিজ কুর্চি প্রকাশ করিতে
শুরু করিয়াছে। গৃহে বাইতেই মালতীর
চোখ পড়িল, অদূরে দাওয়ার ওপর উপবিষ্ট
পরশ্বতীর দিকে। মালতী আগাইয়া
খাটিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া
বলিল—ওমা, এখানে বসে আছ সতী,
কতক্ষণ এসেছ ভাই, চল ঘরে চল।

সরশ্বতী বলিল—আমি তোমার জন্তেই
বসে আছি। আশুপুড়ো তোমাদের কি
শাস্তি দিলেন সেই কথাটাই আগে আমার
বলতো?

মালতী হাসিতে হাসিতে বলিল—
খামি চরিত্রহীন কিনা, তাই কাল ভোরের
জাগেই এ গ্রাম ছেড়ে আমাকে চলে যেতে
পড়ে। সরশ্বতী একমুহূর্তের জন্ত কঠিন
হইয়া গেলো। দাঁতের ওপর দাঁত চাপিয়া
ওধু বলিল—ঠিক ঐ শাস্তিই দিয়েছেন!
মালতী হাসিয়া কোন কথা না বলিয়া
তাহাকে প্রায় টেবিলেই ঘরের মধ্যে
গইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে মালতী এবং সরশ্বতী
সই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।
বাহিরে আসতে আসতে মালতী বলিল—
পরশ্বতী, বোন, চল একবার গুর কাছে
খাটা জানিয়ে আস। গুর মতটাও
একবার নেওয়া উচিত। সরশ্বতী বলিল—
গেলো, কিন্তু উনি যদি না বলেন আমি
স কথা শুনবো না।

মালতী একটু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা
স না'কে 'ইগ' করার ভার আমি নিলুম।
মালতী বামাচরণ বাবুর কাছে গিয়া
পরশ্বতীর সমস্ত কথাই বলিয়া তাহার
মত লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল সরশ্বতী
তখন উভয় হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি
ভাই মালতী, উনি কি বলেন? মালতী
পরশ্বতীর চিচুকটি ধরিয়া সম্মুখে একটু নাড়া
দিয়া বলিল—সে কথা তোমার না ভাবলেও



স্ব-মালি
—তবে—

লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

সুস্বাদু
নির্ভরযোগ্য
পথ্যও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ৪ ৪ বোম্বাই

চলবে; তাহলে কখন আসছ' ভাই? ইত্যাদি কথাবার্তা কহিতে কহিতে মালতী সরস্বতীকে সদর দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া যখন ফিরিয়া আসিল—তখন দেখিল বামাচরণবাবু বোধহয় তার সহিত কথা কহিবার জন্তই বাইরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মালতী আসিতেই বামাচরণ গান্ধীর্থ্যের সহিত বলিল—মালতী কাজটা কিন্তু খুব ভালো হলো না; অল্প কিছু অল্পে আমি ভাবি না; তবে ঐ সদাক্ষয় সাধুসন্ন্যাসী গোছের লোকটি বোধহয় মনের দুঃখে এবার বনেই চলে যাবেন। 'মালতী সেই কোঁতুক আরো একটু ঘন করিয়া তুলিবার ইচ্ছায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল আর তুমি কোথায় যাবে, যুবসজ্জের আশ্রম খুলবে?

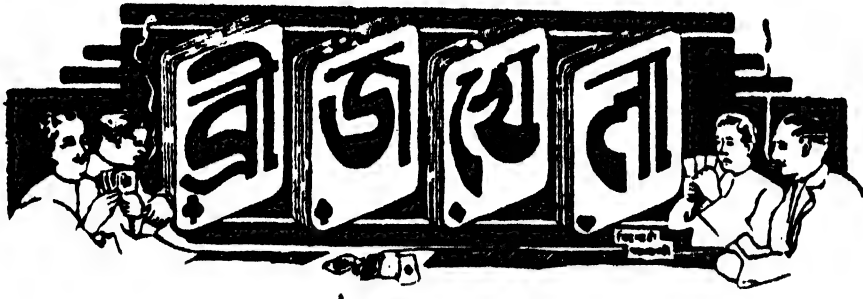
বামাচরণ ও মালতী সরস্বতীর সম্বন্ধে পাঁচজন্যের অভিমত এতদিন যা শুনিয়াছিল তাহার সহিত এইমাত্র জ্ঞাত সত্যতার তুলনা করিয়া দেখিতেছিল এবং ভাবিতে ছিল—মাহুষের সত্য পরিচয়টি এ জগতে কতই না দুর্লভ। যাহারা তাহাকে পরম পরিচিত আপনার জন বলিয়া চিনে তাহারা হয়ত কিছুমাত্র বুঝিবে না যে ঐ নারীর জীবনে কি ভীষণ একটি বিষাদময় জীবনের যবনিকা পাত হইল। সর্কাজী মঙ্গলের জন্ত একটি নারী তাহার প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইল না ঠিক সেই অপবাদের যন্ত্রণা এড়াইবার জন্ত অপর একটি নারী বর্তমানের সুখ স্বচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া অনিচ্ছিতের পথেই পা বাড়াইল। অথচ সব চেয়ে বিশ্বয় হইল এই যে ইহাদের জীবনে যাহারা বড়-তুফানের আলোলন জুড়িয়া দেওয়ার জন্ত সত্যই অপরাধী তাহারা লোভ করিল সাধু-সন্ন্যাসীর আখ্যায়িকায় তাহারা পরম

শ্রদ্ধায় পূজা পাইল, মাহুষ তাহাদের দুয়ারে পৌছাইল নীরব বস্ততার অঞ্জলি।

পরদিন প্রভাতের বহু পূর্বেই বামাচরণ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের উত্তর কোণে মালতীর ঘর, সেই ঘরের বন্ধ দুয়ারের কাছে একটি বিড়াল 'ম্যাও ম্যাও' করিতেছে সে লক্ষ্য করিল। অতি প্রভাতে মালতীর দুয়ায় উপস্থিত হওয়া এই বিড়ালটির নিত্য কর্ম। মালতী প্রত্যহ রাত্রে দুধ খাইত; তাহার কিয়দংশ রাখিয়া সে প্রত্যহ প্রভাতে এই বিড়ালটিকে দিত। আজ কিন্তু দুয়ার বন্ধ দেখিয়া বিড়ালটি এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া 'ম্যাও ম্যাও' করিতেছিল। বিড়ালটির জন্ত বামাচরণের দুঃখ হইল। সে নিজেই খর খুলিয়া দেখিতে গেলো যদি কিছু পায়। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল গতরাত্রে মালতী দুধ খায় নাই, দুধের বাটি ফেনটি রাখা হইয়াছিল তেমনি ভাবেই ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। দুধের বাটিটি বাহিরে আনিয়া বামাচরণ বিড়ালটির সামনে ধরিয়া দিল। বিড়ালটি জোৎসাহে দ্বিগুণ আনন্দে তাহা নিঃশেষ করিতে লাগিল। বামাচরণ দূরে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল এবং ভাবিতেছিল একমুহূর্ত পূর্বে বিড়ালটির স্বরে এবং চোখের দৃষ্টিতে ছিল দুঃখের ব্যঞ্জনা, কিন্তু একবারটি দুধ ভরনের পর সে পরম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বামাচরণের মুখ দিয়া তাহার অজ্ঞাতেই দুটি কথা বাহির হইয়া আসিল—'হায়রে, মাহুষ যদি তোমার মতই স্মৃতিহীন হোতে পারত।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বামাচরণের চমক ভাঙিল। নিজের অজ্ঞাতে চোখে হাত পড়িতেই সে কোঁচার কাপড় তুলিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। এদিকে আশুখুড়ো অতি ব্যস্ত-

ভাবে যেন পাগলের মত হইয়া বামাচরণের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে এই দিকেই আসিতেছিলেন।

বামাচরণ যেন একটু বিস্মিত হইয়া অভি-বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কি বাজুঘো মশায় এই প্রভাতে আপনি এখানে? আশুখুড়ো হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—ই্যা বাবা হ্যা, তা মালতী কি চলে গেছে এরি মধ্যে? বামাচরণ আশুখুড়োকে এদিক ওদিক তাকাইতে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল কাহার গোঁজে তিনি আসিয়াছেন। বামাচরণ বলিল—আশুখুড়ো একটু দাঁড়ান। এই বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়াই আবার তখুনি বাহির হইয়া আসিল। আশুখুড়োর হাতে একগোড়া চাবি দিয়া বামাচরণ বলিল—বাজুঘো মশায়, সরস্বতী আপনাকে এই চাবিগুলি দিয়ে গেছে, আর বলে গেছে, কলকাতার আশ্রম থেকে তার ছেলেকে যেন কখনও আর এই গ্রামে আনা না হয়, সে যদি মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করে তবে বলবেন, তার মা মারা গেছে। প্রভাতের আব-ছায়া আঁধার তখন ফরসা হইয়া গিয়াছে, রাত্রির কালিমা ধুইয়া মুছিয়া নবীন, প্রভাতের স্তম্ভতায় দিগন্ত প্রাবৃত হইয়াছে কিন্তু বাজুঘো মহাশয়ের মুখের ঘন-বিষাদ-ময় ঘোর কালিমা এই সংবাদে যেন আরও গভীরভাবে খনাইয়া উঠিল। তিনি যেন আর কিছুই চোখে দেখিতে পান না, ঘায়ের নীচের মাটি যেন ক্রমশই সরিয়া যাইতে লাগিল। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া বলিলেন—বামাচরণ, এখানে একটু বসব' বাবা, এই বলিয়া তিনি দাওয়ার একপ্রান্তে আসিয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন।



শ্রীহরীসং

ডাকের কয়েকটি সমস্যা :-

এবারেও ডাকের আরও কয়েকটি সমস্যা প্রদত্ত হইল। আপনি উত্তরে বসেছেন। আপনার হাতে আছে ইঙ্কাবন—টেকা, সাহেব, পজা; হরতন—সাতা, ছকা, তিরি; কুহিতন—সাহেব, বিবি, চোকা; চিড়িতন—টেকা, দশ, সাতা, ছকা।

ডাক হয়েছে

‘উ’

একটি চিড়িতন

?

‘দ’

একটি ইঙ্কাবন

কারণের জন্ত এই মাঝামাঝি ডাক দেওয়া হইল। মাত্র চারখানি অনারের পিট নিয়ে তার ওপর একটি রঙে পিট আটকাবার তাসের অল্পপস্থিতি হেতু দুইটি ফেরাইএ ডাক দেওয়ার পক্ষে হাতখানি নিতান্ত দুর্বল; অথচ একটি ফেরাইএ ডাক দেওয়ার পক্ষে হাতটি শক্তিশালী। সুতরাং দুইটি ইঙ্কাবনে ডাক দিলেই ঠিক হয়, আর খেঁড়ীও তাতে সাহস আসে।

(২) ডাক চলেছে নিম্নলিখিতরূপ,

‘উ’

একটি ইঙ্কাবন

?

‘দ’

তিনটি চিড়িতন

আপনি উত্তরে বসেছেন; আপনার হাতে আছে, ইঙ্কাবন—টেকা, সাতা, ছকা,

‘প’

দুইটি হরতন

‘প’

পাশ

চোকা, ছরি; হরতন—গোলাম, তিরি কুহিতন—টেকা, সাহেব, পজা; চিড়িতন—আটা, সাতা, ছকা।

আপনি এখন কিসে ডাক দেবেন?

তিনটি ইঙ্কাবনে এখন ডাক দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ। সকল ক্রীড়কের পক্ষেই ইহা ভীতিপ্রদ অবস্থা। অথচ একেত্রে একেবারেই পাশ দেওয়া চলবে না। নূতন রঙে আপনার খেঁড়ী যখন তিনটির ডাক দিয়েছেন তখনই বুঝতে হবে যে ইহা one-over-one takeout কিংবা two-over-one takeout ডাকের মতই আবাহনকারী ডাক। তা’ছাড়া এক ইঙ্কাবনে এ হাতের দুর্বলতা বর্তমান কিন্তু এ হাতে কোন ডাকযোগ্য রঙও অল্পপস্থিতি। আবার আপনার হাততও অন্য কোন রঙ না থাকায় ইঙ্কাবনেই আপনাকে পুনরায় ডাক দিতে হবে। যেহেতু হরতনে পিট আটকাবার কোন তাস নেই, তিনটি ফেরাইএও ডাক দেওয়া অসম্ভব।



ফোন ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের
তেল ব্যবহারে
বেরি বেরি হয় না

মিল-২৪৩, ভান্সার সারকুলার রোড - কলিকাতা।

প্রতিভার অপমৃত্যু

ত্রিনির্মল কুমার স্ত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—‘বলছি যাযগা নেই তবুও তুমি বলবে সন্দেশ দিচ্ছি’—বলে ঐ এগিয়ে আসে। ওর মা হেসে দুটো সন্দেশ ওর ছুধের বাটীতে দিবে, বাটীটা তুলে ধরেন ওর মুখের কাছে।

খাওয়া শেষ করে ও আঁচাতে চলে যায়। ঘরে ঢুকে ক্যাম্প-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরায়।

ওর মা ওঘর থেকে টেচিয়ে বলেন—
‘চপল’ একুশি কাগজ কলম নিয়ে বসিসুনে যেন। শরীর খারাপ হবে। খেয়ে দেয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে তবে অল্প কাজ করতে হয়।

‘আচ্ছা তাই’—বলে ও আবার এলিয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ বাদে চোখে নেমে আসে নিদ্রা। ও ঘুমিয়ে পড়ে চেয়ারটাতেই।

পঞ্চম পর্য্যায়

ঘুম যখন ওর ভাঙলো তখন বেশ বিকেল হয়ে গেছে। বাড়ীর গাছগুলোর মাথায় জ্বলন্ত লালচে ধরণের রোদুর পড়েছে। ওর ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে সন্ধ্যার ছায়া। ও তাড়াতাড়ি উঠে বসে। ওর সারা দেহে তখন অদ্ভুত এক জড়তা। হঠাৎ ওর মনে পড়লো ওকে যেতে হবে স্কুলের ভাবানীপুরে, সাহিত্য-সমিতির পূর্ণিমা সম্মেলনে মৃণালবাবু বার বার অহুরোধ করে গেছেন; না গেলে ভালো দেখায় না। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এসে ও বসলো

ওর টেবিলে; মনে মনে ভাবতে সুরু করলে ও কি বলবে। নতুন একটা বলতে হবে নিশ্চয়ই। গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করে চলতে ওর ভালো লাগে না। ইয়া ঠিক করে ফেলেছে। গোকীর সাহিত্য প্রতিভাকে নিয়ে আলোচনা করে ও দেখাবে যে—মুষ্টিমেয় লোকের জন্তে সাহিত্য নয়। দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করে যে সাহিত্য পা বাড়াতে পারলো না, তাব মরণ সুনিশ্চিত। দেশের মুষ্টিমেয় য্যারিস্ট্রোক্র্যাটদের জীবন প্রণালী ও সমস্তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সত্যিকার দেশের মানুষ যারা তাদের দিকেই নজর দেওয়া উচিত। লক্ষ লক্ষ কলের কুলি বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে তিলে তিলে বিলিয়ে এক মুষ্টি অন্নর জন্ত, কোটা কোটা কৃষক রোজ-জলে ভিজে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে আমাদের বিলাসের সামগ্রী, পেটের অন্ন যুগিয়ে চলেছে—তাদের কথা কেউ লেখে না। কেউ বোঝে না তাদের ব্যথা; তাদের সমস্ত সমাধানের জন্ত কেউ ধরে না কলম। এখানেই দেশের সাহিত্যের আত্মহত্যা। দেশের সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটি লোককে বাদ দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ লোকের কথা নিয়ে মাতা-মতি করা, এতে আছে মরণের বিষ। দরিদ্র চাষার কুটীরে যখন অন্নর হাহাকার ওঠে, দুমুঠো খেজে না পেয়ে যখন স্বামী খুন করে স্ত্রীকে মনের স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে, অথবা একই সাথে সপরিবারে লাগায় গলায় কাঁসি

—তাদের দুঃখের কাহিনী কেউ শোনে না বুঝতেও চায় না। বিরাট দেশ, বা একবার ‘কাগলে সারা ছুনিয়াকে দিতে পারে রসাতলে, তারা পড়ে আছে অন্ধ সংস্কার আর অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে। দেশের সাহিত্য যদি তাদের দিকে না তাকালো, তারা যদি বুঝতে না শিখলো নিজের দেশের অবস্থা, তা’হলে সাহিত্যের কিই বা প্রয়োজন? চপল নিজেই আত্মহারা হয়ে পড়ে। ওর মনে পড়ে ও একবার খবরের কাগজে পড়েছিল এক দরিদ্র কৃষক অন্নসংস্থানের কোন উপায় না’দেখে—নিজের দুটো ছেলেকে আহুড়ে মেরে ফেলে, তারপর স্ত্রীর গলা কাটারি দিয়ে কেটে নিজে গলায় কাপড় লাগিয়ে আড়ায় ঝুলে সকল দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। সে কথা মনে হলে ওর এখনও চোখ ফেটে জল আসে। শতশ্রামলা বাঙলা জননীর সন্তানদের একি অবস্থা! এর জন্ত দায়ী কে? দায়ী কি দেশের উচ্চ শ্রেণীর নয়? শিক্ষার আলো পেয়ে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলে ওদের দিক থেকে। গ্রামের দুঃবস্থার মধ্যে যারা দিনের পর দিন কাটিয়ে বরণ করে নিলে নিজের মৃত্যুকে, তাদের কথা কেউ শুধালে না। চপল এই সব ভাবতে ভাবতে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

পূর্ণিমা-সম্মেলনে মিলন বাসর। নেহাত তরুণ-তরুণীদের কাণ্ড। ওতো তাকুণের সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। চপল নিজের বক্তব্যের মধ্যে প্রাণ ঢেলে দেয়। প্রতি কথা ওর বেরিয়ে আসে অন্তর থেকে। দেশের দুঃস্থ আত্মা যেন আজ আশ্রয় নিয়েছে ওর অন্তরের মধ্যে। তারই বাণী যেন বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে। ও কুলেই যায় ও এসেছে মধ্যসমাজের আনন্দ সম্মেলনে, যারা কোন কালেই বুঝতে চায় না গরীবদের অবস্থা। ওর ভেতরের

ভাব যেন শ্রোতের মত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—ও তাকে চেপে রাখতে পারে না।

বক্তব্য শেষ করে ও যখন থামলো তখন সারা ঘরটায় বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। ও নিজেই হাঁপিয়ে পড়েছিল উদ্বেজনার মুখে—তাই তাড়াতাড়ি চেয়ার আশ্রয় করে বসে পড়ে। সকলেই ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ধারে ধারে লজ্জা এসে ওর সারা মনকে আশ্রয় করে। ও এমন করে উদ্বেজিত হ'য়ে উঠেছিল ভেবে নিজেই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়তে লাগলো।

বৈঠক শেষে ও উঠে দাঁড়ায়। সঙ্কীর্ণ হ'য়ে বাইরের দিকে পা বাড়ায়। মৃণাল বাবু এসে ওকে নিয়ে চলে অল্প ঘরে ওদের লাইব্রেরী হত্যাদ দেখাতে। ও লাজ্জিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। কতকটা আগ্রহে বলে—খাঙ্গে মৃণালবাবু, আর একাদিন এসে দেখে যাবো আপনাদের সব কিছু। এসব দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। তবে, তবে আজকে শরীরটা আমার কেমন জ্ঞান খারাপ লাগছে। আমি চালা। আর এক দিন নিশ্চয়ই আসবো নিজেই।

মৃণালবাবু বলেন—সে কি? এরই মধ্যে যাবেন? একটু কিছু না বাইয়ে তো আপনাকে কিছুতেই ছাড়তে পারি না। লাইব্রেরী না হয় অল্প দিন দেখবেন, চলুন কিছু জলযোগ করবেন। পারশ্রম তো কম হয়নি? কি উদ্দাপনাপূর্ণ বক্তৃতা। সত্যি আপনি যেদিকটা দেখালেন সেদিকটা সাধারণ লেখক শ্রেণী দেখাতে চায় না। তাতেই না দেশের এই অবনতি।

চপল আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। ও মনে করে, ওরা বুঝি ওর এই ভাব-বিফলতা দেখে ওকে বিক্রপ করছে।

—আজ আমার কমা করণ মৃণালবাবু বলে ও সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়।

সেকি? তা কি হতে পারে? আপনার বাড়িতে সেদিন অত খেয়ে এলাম, আর আজ আপনাকে আমাদের ভেতর পেয়ে এমনি ছেড়ে দেব? তাকি সম্ভব?

অগত্যা চপলকে কিছু খেয়েই যেতে হয়। মোটের ওপর এখানকার আবহাওয়া ওর যেন মোটেই ভাল লাগছিল না।

• আচ্ছা নমস্কার—বলে রাস্তার দিকে পা বাড়ায়।

খানিকটা রাস্তা ও হেটেই চলবে। বাইরের খোলা আবহাওয়ার মধ্যে এসে ও যেন প্রাণ ফিরে পায়। বাঃ হাঁটতে ওর বেশ লাগছে। এমনি ভাবে হেটেই ও চলবে যতদূর পারে; তারপর বাস ধরবে। মৃণালবাবু মোটরে পৌঁছে দেবার কথা বলেছিলেন, সে কথা স্বাকার না করে ও ভালই করেছে। কি হবে ওদের করুণার বোঝা বাড়িয়ে। পৌঁছে দিয়ে এসে হয়তো মোটরের পেট্রল মেপে দেখবে। তার চেয়ে এমন করে হেটে যেতে ওর বেশ লাগছে। পূর্ণিমা রাত। রক্ত শুভ্র আলো ছাড়িয়ে পড়েছে বাড়িগুলোর ছাদে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট লনগুলে যেন স্নান করছে কোমুদাধারায়। ওই দূরে আরম্ভ হয়েছে লোকের আর আলোর ভিড়। জ্যোৎস্না গ্যাছে ওখানে মরে। নৈসর্গিক স্মৃতিতে মানুষ ওখানে করেছে হত্যা...ওর বড় ভাল লাগছে আজকার এই চাঁদের আলো। ও আরো আস্তে আস্তে পা চালায়।

—‘নমস্কার’—

চপল পিছন ফিরে চায়। দেখে এক মেয়ে, তাই ও আবার পা চালায়। হয়তো বা আর কাউকেই জানিয়েছে নমস্কার। ফিরে তাকানোই ওর অজ্ঞায় হয়েই ও ভাবে।

—চপলবাবু—

তাইতো। ওকেই যে ডাকে। ও পিছন ফিরে দেখে সেই মেয়েটাই। ‘আমাকে বলছেন?’—বলে ও দাঁড়িয়ে পড়ে।

—হ্যাঁ। আপনাকেই তো জানালাম নমস্কার—চপল খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, তারপর বলে—আমাকে?—আজ্ঞে তা...নমস্কার। কিছু প্রয়োজন ছিল কি?

—আপনার সাথে পরিচয় করে খুশী হতে চাই। আমি আপনার লেখার একজন বিশেষ অমুরক্ত। সুন্দর আপনার ধারা’ নতুন কিছু শোনার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনার...

—আমার?—

—তাইতো। মানে চপল বসুর। আপনিই তো চপল বসু? সেক্রেটারী মৃণালবাবু যে আপনার সেই পরিচয়ই দিলেন। কেমন আপনিই না? মাসিকের সাপ্তাহিকের পাতায় পড়ি আপনার লেখা, দেখি আপনার নাম। মানুষটাকে দেখিনি চিনিনি কোনদিন। আজ শুনলাম আপনার প্রাণ-ঢালা বক্তৃতা এতখানি আন্তরিকতা না থাকলে কি কেউ কোন ভাল জিনিষ সৃষ্টি করতে পারে?

—তা আমি...

—হ্যাঁ। আপনিই। উদায়মান গগন-সাহিত্যিক শ্রীবৃদ্ধ চপল বসু মহাশয়, যার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এখন, মানে এই মুহূর্তে কথা বলছি অর্থাৎ আলাপ করছি

খাত বঙ্গ ৭৫ নং বৈ কায়লুই

হটক তৈরী বনোবধিতে

অব্যর্থ কল—পূর্তবদ্যার ব্যবহার

নিষিদ্ধ ১০ নম্বর ও বর্ণনাটি একবার

এয়োগেই উপন্যাস, ১০ নং: ১০০ আদা



সময় ৮টা হইতে ১০টা।

মিসেস দাস অনন্ড বিশারদ

১৮২ নং বহুগাজার স্ট্রীট, (K) কলিকাতা।

তার সাথে অর্থাৎ চপলবাবুর সাথে i. e. আপনার সাথে আমার মিন্স মীরা সেনের একটু প্রয়োজন আছে। তাই যেতে আলাপ করবার এতখানি স্পৃহা। জানেন তো মেয়েরা ভয়ানক স্বার্থপর হয়?

—ও, হয় নাকি?—

—আপনি তো তা জানতেন না এই তো? অর্থাৎ আপনি থাকেন আপনার নিজের ভাবের মধ্যে ডুবে, ওসব দিকে তাকাবার অবসর আপনার নেই। কিন্তু সাহিত্যিক আপনি, মেয়েদের দিকে চোখ না রাখলে, কী সৃষ্টি করবেন? আর যদি কিছু করেনই তবে তা হবে নিছক কল্পনা, মানে নিরর্থক অর্থাৎ জগতের বেশীর ভাগ মানুষের ওপর করা হবে অবিচার। জানেন তো জগতে পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যাই বেশী?

—তাই নাকি?—চপল বিম্বিত চোখে ওর মুখের দিকে তাকায়।

—বা: আপনি যেন তা জানেন না। আমি বড় বেশী বকাই নয়?

—তাইতো মনে হচ্ছে।—চপল বলে।

—তার মানে?—

—তার মানে এই যে—উপস্থিত এই স্বাস্থ্য দাঁড়িয়ে সব শুদ্ধ যতগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার শতকরা পঁচান্নইটি আপনার মুখনিঃসৃত।

—বা: আপনি তো বেশ মানুষ! দিব্যি সত্যকথা বলার সংসাহসীও দেখিয়ে

দিলেন অমনি? সত্যি কথাও বলতে নেই যদি তা অপ্রিয় হয় তা বুঝি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

চপল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মীরা তাকিয়ে থাকে ওর বিম্বিত চোখের দিকে।

—কই একবারে চুপ করলেন যে? কথা বলুন।

—কি বলবো?

—আমাকেই বুঝি তা শিখিয়ে দিতে হবে? বাঃ—কই বলুন।

—আমি? আপনিই যে কি প্রয়ো-
জনের কথা বলবেন বলেন।

—হ্যাঁ সে কথা বলছি আস্তে আস্তে—

—কই আমার তো কিছু বলবার ছিল না—

—তা জানি। কিন্তু আলাপ করতেও কি দোষ?

চপল সচকিত হয়ে ওঠে। বলে—হ্যাঁ, এই যে বলছি। এই কি যে বলবো বলবো মনে করছিলাম... হয়েছে—
আপনার নাম বুঝি শ্রীমতী মীরা সেন?

—না, আমার নাম কুমারী মীরা সেন।

—তার মানে আপনি এখনও স্বাধীন, এই তো?

—পুরোপুরি নয়, মা, দাদা আছেন।

—তা আপনি বুঝি বেধুনে..... না না ইউনিভার্সিটিতে পড়েন?

—হলো না—

—তবে?

—ছেড়ে দিয়েছি গত বৎসর থেকে ও সব ছাড়াই। এখন একটু পড়বার

সাঁওতালী গান শ্রীমতীজ্ঞানেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সইলো সই—

আজ নিশীথে ফুল খেলিতে

বজ্র এল কৈ।

ফুল গুঁজিছে মাথায় খোঁপায়,

ফুলের নুপুর প'রহু ছ'পায়;

ফুলের বসন ফুলের ভূষণ

শুধুই পরে রই।

যালো সখি যালো সখি যা—

সেই মনোচোর ধনুরে মোর

এনে দেখা।

আজ মহরা মদের রঙিন নেশায়—

তার পরাণে মোর পরাণে

সুধা মিশাই।

ওলো সে যে আমার আমি যে তার

মনের মানুষ হই।

চেপ্টা করছি আপনাদের কাছে—অর্থাৎ সাহিত্য চর্চার পাগলামী ঢুকেছে। তাতে কাঁটে সময় আর মনের ভারও বলতে হবে বৈকি। কিন্তু থাক আর না। আপনার অনেকখানি মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করেছি। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

একটা ট্যাক্সী ডেকে ও উঠে পড়ে। ভেতরে বসে ডাকে আসুন।

—কি হবে ট্যাক্সীতে? এইতো বাস ধমলেই চলে যেতে পারবো।

—তা হোক, আসুন। চপল ভাবে—
তাইতো, কি করা যায়; শেষে উঠেই পড়ে।

মীরা ড্রাইভারকে বলে দেয়—এই, মাণিকতলা চলে।

(ক্রমশঃ)

প্রাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আন্তোষ মুখার্জী রোড, প্রাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান তবানীপুর

—:—

রেকর্ড সমালোচনা —এডিসন—

দেহতত্ত্বের গানে যন্ত্রসঙ্গীতের আড়ম্বর
— উপযুক্ত কোঁতুক-নাট্যের অভাব—

উত্তরা দেবীর আগমনী-গান

নিম্নে আমরা কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের রেকর্ডগুলির সমালোচনা প্রকাশ করিলাম।

G. E. 2479 কলম্বিয়া :— এই রেকর্ডে শিল্পী শ্রীমতী চিত্রলেখা গাঙ্গুলী সহগামী সঙ্গীতের সহযোগিতায় দুইখানি ভক্তিমূলক গান রেকর্ড করিয়াছেন। গায়িকার গীতভঙ্গী মন্দ নহে, কিন্তু অনেকস্থলে গানের বাণী যথোচিতভাবে উচ্চারিত হয় নাই। একদিকে ‘প্রভু! বন্দী হয়েছ আমার হিয়ায়’ ও অত্রদিকে ‘আমার লাগিয়া তুমি হলে যোগী’ গীত হইয়াছে।

G. E. 2481 কলম্বিয়া :— শ্রীমতী রাধারাণী এই রেকর্ডে খোল প্রভৃতি যথাযোগ্য বাস্তবজ্ঞাদির সহিত দুইখানি কীর্তনগান গাহিয়াছেন। শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য রচিত আধুনিক কীর্তনগান ‘বধু তুমি যে নিলাজ অতি’ ও ‘আজি মাধব এসো মাধবী-তলে’, গায়িকার কণ্ঠে মোটেই সুপরিষ্কৃত হয় নাই।

G. E. 2476 কলম্বিয়া :— রেকর্ড-আসরের সুপরিচিতা গায়িকা কুমারী ভারতী মজুমদার এই রেকর্ডে দুইখানি ভাটিয়ালী গান পরিবেশন করিয়াছেন। একপিঠে ‘বন্ধু! তোমার বদল বাঁশীটি

দাও’ ও অত্রপিঠে ‘ময়ূরপঙ্খী নায়ের মাঝিরে’ যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগে ভালই হইয়াছে। তবে একটি বিষয়ে আমাদের ধাধা লাগে,—ইনি কি সেই বাসন্তী বিজ্ঞাবোধির ভূতপূর্ব গায়িকা কুমারী ভারতী মজুমদার নহেন? গত বৎসরে উক্তর কলিকাতার সুনিখাত শ্রীগুরু উপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান নীলু বারাজীবনের সহিত বাহার শুভ-পরিণয় উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম! অথচ তাহার পর এই এক বৎসরের মধ্যে প্রায় চারি-পাঁচখানি রেকর্ড কুমারী ভারতী মজুমদারের নামে বাজারে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে কি বৃষ্টিতে হইবে যে তাঁহার কুমারী-জীবনে এত গান রেকর্ড করা আছে যে তাহাতে সারা জীবনই চলিয়া যাইবে? অথবা যেমন বাঙলার জনৈক নটের নাম কুমার মিত্র, এই গায়িকার নামও তজ্জপ কুমারী ভারতী মজুমদার!

G. E. 2483 কলম্বিয়া :— কলম্বিয়ার ত্রৈষ্ঠা গায়িকা শ্রীমতী উত্তরা দেবী মুখু আবহ-সঙ্গীতের সহিত এই রেকর্ডের একদিকে একখানি আগমনী গান ও অপর দিকে একখানি বিজয়া-বিষয়ক গান গাহিয়াছেন। বিজয়া-বিষয়ক ‘দাঁড়াও নবমী নিশি’ গান ঋনি প্রধানতঃ ভৈরবীতে গাওয়া হইয়াছে। কিন্তু মধ্যে কীর্তনের সুর মিশ্রিত করা হইয়াছে। গায়িকার উদাস্ত মধুর কণ্ঠে

বিজয়ার গানখানি শ্রুতি সুখকর হইয়াছে। সমগ্র অংশটিকে ভৈরবীতে গাহিলেই এই শিল্পীর কণ্ঠে ইহা অধিকতর মধুর হইত, আগমনী গানখানিও উপভোগ্য হইয়াছে।

G. E. 2482 কলম্বিয়া :— শ্রীআশুতোষ

মল্লিক আড়ম্বরপূর্ণ যন্ত্র-সঙ্গীতের সহিত এই রেকর্ডে দুইখানি দেহতত্ত্বের গান গাহিয়াছেন। বেশ ইংরাজী সুরের ভঙ্গীতে যখন বাস্তব যন্ত্রিতে লাগিল এবং শিল্পী যখন ‘বাসের দোলাতে উঠে কে হে বটে শ্মশানঘাটে যাচ্ছ চলে’ এই দেহতত্ত্বের গান আরম্ভ করিলেন, তখন যে ক্রি এক অপূর্ণ রসামুভূতি লাভ করিলাম তাহা এ জীবনে কখনও ভুলিব না। স্বর্গত বিজ্ঞেশ্বর লাল রায় কর্তৃক কল্পিত ‘মদের সঙ্গে হরি নাম’ কথাটিই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহার রসোপলব্ধি করিতে পারি নাই, এক্ষণে কলম্বিয়া কোম্পানীর দয়ায় সে রস কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম। অপর পিঠে ‘দোকানী ভাই দোকান সার না’ ঐ একই ধরণের সহগামী সঙ্গীতের সহিতই গাওয়া হইয়াছে।

G. E. 2478 কলম্বিয়া :— শ্রীকীর্তীশ

বসুর রচনা ও পরিচালনায় কলম্বিয়া ভারাইটিজ এই রেকর্ডে ‘লেক দি গ্রেট’ নামক একখানি কোঁতুক নাট্য পরিবেশন করিয়াছেন। গল্পটির সারাংশ এই,— একদিন দুই তরুণী মিস্ লেক ও মিস্ লেক জুনিয়ার-এর সহিত মিঃ ইডেন গার্ডেন-এর সাক্ষাৎ হইল। যথারীতি পরিচয় হইবার পর ক্রুদ্ধ মিঃ ইডেন গার্ডেন তাঁহার চিরবৈরী লেক-ভগ্নদ্বয়কে সম্মুখে পাইয়া বেশ কড়া কড়া দুই-চারিটি কথা শুনাইয়া দিলেন, আর এদিকে কিরূপ দুর্বীর হস্ত-রস নিঃসারিত হইল দেখুন।

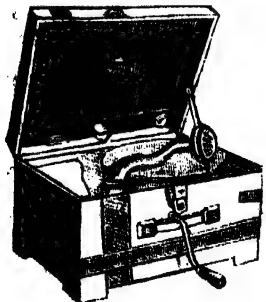
মিঃ ইডেন গার্ডেন—“ • • • •
তোদের কাছে যায় যত ডাক্তার
নার্স লয়ে সাথে টেক্সিতে চড়িয়া,
কেহ বা প্রেমিক যায়
প্রেমিকারে সাথে লয়ে, হাসে কঁাদে
তোদের শোনায়ে নাকি সুরে
চিবিয়ে চিবিয়ে গায় অর্থশূন্য গান।
তারপর হয়ত বা
হস্ত পদ শৃঙ্খলিত করি
ঝাশাইয়া পড়ে বন্ধেতে তোদের।
এমনি কত যে যুবক যুবতী সধবা বিধবা
বিসর্জিল প্রাণ কে রাখে হিসাব।”

ভাব, ভাষা, ছন্দ লক্ষ্য করিবার বস্তু।
পরে

মিস্ লেক—“ইডেন গার্ডেন • • • •
তোর সম্মুখে হয় কত ঘণিত ব্যাপার
তোর কাছে যায় যত ট্যাস, মারওয়াড়ী,
উড়ে, শিখ, পাঞ্জাবী কামাইয়া দাড়ী
যত ভণ্ড বসে গিয়া ঝোপ-ঝাপ পাশে।”

কি অপূর্ণ হস্তরস! তাহার পর আরও
চমকপ্রদ ব্যাপার আছে। এই বাদামু-
বাদের পর ‘রুদ্ধ ইডেন গার্ডেন রমণী হস্তে
খাইল স্নাত্তলের বাড়ি’। অতঃপর ইডেন
গার্ডেনের দলবল মিঃ কার্জন পার্ক,
ওয়েলিংটন স্কয়ার ও মিস্ লেকের সঙ্গিনী

মিস্ হেদোয়া প্রভৃতি দলবল লইয়া
কুচকাওয়াজ করিতে করিতে হাজির।
কিছু যুদ্ধ বাধে, এমন সময় ইডেন গার্ডেন
ও লেকএর জন্মদাতা কলিকাতা কর্পো-
রেশন আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।
সমগ্র নাটিকাখানিতে কাঁচা হাতের লেখার
ছাপ,—যেমনই ভাষার দারিদ্র্য তেমনই
ছন্দের বৈষম্য। বস্তুতঃপক্ষে ইহাকে তৃতীয়
শ্রেণীর নাটিকার পর্যায়ভুক্ত করাও চলে
না। রেকর্ডের দুই দিকের কোন অংশ
বিশেষই শ্রোতার অন্তঃকরণে হস্তরসের
উদ্রেক করিবে না, এমন কি সদাহাস্তমুখ
ব্যক্তি এই নাটিকা হইতে হস্তরস
নিষ্কাশন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।
পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে মিঃ ইডেন গার্ডেনএর
ভূমিকা অভিনীত হওয়ায় অভিনয় সর্বিশেষ
কর্ণ-পীড়াদায়ক হইয়াছে। আমরা এইরূপ
নিম্ন স্তরের রেকর্ড বাজারে উপস্থিত
করিবার উদ্দেশ্যে বুঝিতে পারি নাই।
অধুনা রেকর্ডের আসরে উপযুক্ত কোতুক
নাট্যের অভাব সর্বিশেষ পরিলক্ষিত
হইতেছে। এবং কি কারণে যে মাসের পর
মাস এই শ্রেণীর রেকর্ড সাধারণ্যে প্রকাশ
লাভ করে তাহা কর্তৃপক্ষই অবগত আছেন।
এ বিষয়ে বারান্তরে আমরা আলোচনা
করিব।



মেলোডিনা গ্রামোফোন

স্বর মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ও স্থায়িত্বে
অতুলনীয়

গ্রামোফোন ক্রয় করিবার পূর্বে মোটর ও টার্ন টেবিলের
তলায় “মেলোডিনা” খোদাই করা নাম ও
গ্রামোফোনে “মেলোডিনা” মার্ক দেখিয়া লইবেন।

• তালিকা বিদ্যমান পাউবেন।
“হিজ্. মাষ্টারস্. ডরেনস্” গ্রামোফোন ও রেকর্ড
মল্লিক ব্রাদার্স
১৮-২নং বন্দরতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।



জন্মদিন

হিম্মতলালহুমার শিল্পী

জন্মদিনে লিখতে ব'সে
ভাষা নাহি পাই
সম্মুখেতে চাই!

দিগ্বলয়ের রেখার পানে—
আকাশ বেধা মাটির কাণে—
ব্যাকুল প্রাণের গোপন কথা
বলছে নিশি দিন—

বঙ্করিছে সদাই বেধা

নীরব সুরের বীণ!

দিগন্তের ওই তরুর সারি

কালো রেখার মতো—

প্রিয়ার আঁখির কাজল পারা
আপন মাঝেই আত্মহারা
রঙীন স্বপন আঁকছে বুকে—

উল্লাসেতে কতো!

ছিন্ন মেঘের কঁাকে কঁাকে
অন্ত রবি আঁকতে থাকে
বড়ল নদীর বুকের মাঝে

আলো ছায়ার দোলা—

বাত্যাক্কর বীচি মালায়

যেন আবীর গোলা!

আবার আঁখি ফিরাই দূরে

অভীতের পানে—

জন্ম যখন নিলাম এসে
এই ধরাতে মধুর হেসে
এমনি এক ভাত্র শেষে

কোন স্বপনের টানে!

সেদিনোতো এমনি ছিল

আকাশ মাটির খেলা—

সেদিনোতো এমনি ছিল

আলো ছায়ার দোলা!

ভরা নদীর পাড়ে পাড়ে

স্তম্ভ কাশের ঝাড়ে ঝাড়ে

আর্জ সন্ধ্যা ভাঙ্গ শেষের
 পরশ দিয়ে যেতো—
 সেদিন ছিল, আজকে কিন্তু
 যায়নি চলে সেতো!
 দিগন্তের ও ভুরুর টানে
 এসেছি ধরার পানে
 আজ আবার সেই টানেতেই
 যৌবনের মাঝে—
 পৌছে গেছে ধীরে ধীরে
 ভাঙ্গ শেষের মাঝে।

ডাঙার বালায়ুত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ওষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
 এই সুমিষ্ট ওষধ ব্যবহার
 করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
 পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
 সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
 পছন্দ করে। ইহা শিশু-
 দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
 ঔষধালয়ে
 পাওয়া যায়।



রবীন্দ্রকাব্য ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

শ্রীসত্য নারায়ণ লাহিড়ী



সুসভ্য পাশ্চাত্য থেকে ধার করা
 আধুনিক শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনকে
 যে কিভাবে পুষ্ট করে রেখেছে সে সম্বন্ধে
 বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কয়েকটা কবিতায়
 সুন্দরভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।
 এই সমস্ত কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব,
 সুন্দর ও সতেজ প্রকাশভঙ্গী, অপূর্ব পদ-
 বিকাশ ও ললিতমাধুর্য্য জাতীয় সম্পদ
 হিসাবে কাব্যে চিরকাল অম্লান রহিবে।
 পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে খুব বেশী
 দিন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু এত অল্প-
 কালের মধ্যে জাতীয় জীবনের উপর ইহার
 অবশুস্তাবা প্রভাবের পরিণাম চিন্তায়,
 চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই শঙ্কিত হয়েছেন।
 যেভাবে এত অল্পকালের মধ্যে আমাদের
 সমাজ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, দৈনন্দিন
 জীবনযাত্রায়, শিক্ষায়, সভ্যতায় একটা
 আমূল পরিবর্তন এসেছে, যেভাবে আধুনিক
 শিক্ষা ভারতের মত বিশাল একটা জাতকে
 অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে দুর্বল অলজ্বলীয়
 গতিতে টেনে নিয়ে চলেছে তাতে শঙ্কা
 হয় এমনভাবে এ মিথ্যার পিছনে মাহুষ
 কতদিন ছুটে পাবে; এ মোহ যখন
 ভাঙবে, মিথ্যা যখন ধরা পড়বে তখন
 তার আঘাত সে সহিতে পারবে কিনা?

‘Plain living and high thinking’
 এইটাই ছিল ভারতের শিক্ষার চরম এবং
 প্রথম আদর্শ। এই আদর্শকে সারে রেখেই
 তাদের আরম্ভ হোত শিক্ষার হাতেখড়ি।
 গৃহ আড়ম্বরের চেয়ে, আত্মার ও হৃদয়ের

উন্নতিতেই তাঁদের ছিল অম্মরণ; শান্তি
 সরল অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রায় তাঁরা
 ছিলেন অভ্যস্ত।

তাই রবীবাবু বলিয়াছেন—

“কোরো না কারো না লজ্জা

হে ভারতবাসী, শক্তিমদমস্ত ঐ বনিকবিলাসী
 ধনদৃষ্ট পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে

শাস্ত উদ্ভরীয়খানি করিতে বহন।”

বাহিরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে
 সে দরিদ্র কিন্তু অন্তরে, সে ধনী আধ্যাতিক
 সম্পদে তার হৃদয় পরিপূর্ণ।

“দারিদ্র্যের যে একটা কঠিন বল,
 যৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে
 গভীর শাস্তি এবং বৈরাগ্যে যে উদার
 গাম্ভীর্য্য” এইটাই ভারতের নিজস্ব ও
 বলিষ্ঠ। ভারতের বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তিরা
 পার্থিব সম্পদে দীন ছিলেন বটে, কিন্তু
 আধ্যাতিক সম্পদে তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী।
 তাই কবি বলিয়াছেন,

দৈনের মাঝে আছে তব ধন

যৌনের মাঝে রয়েছ গোপন

তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন তাই আমাদের দিগ
 পরের সজ্জা ফেলিয়া পড়ি তোমারই

উদ্ভরীয়।”

তাঁরা জীর্ণ বস্ত্র পরিধান, সামান্ত
 একটা উদ্ভরীয়ে দেহ আবৃত করে যে সরল
 জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন, সে জীবন
 যাত্রার মধ্যে বাহ্য আড়ম্বরের আধিক্য
 এতটুকু ছিল না, কিন্তু এই তুচ্ছ বহি-
 রাবণের অন্তরালে তাঁদের অন্তরে যে অমূল্য

—বেকার নাশন শব্দ বিজ্ঞাস প্রতিযোগিতা ব্যুরো— BEKARNASHAN CROSS WORD COMPETITION BUREAU

বাংলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতা—নং ১।

১১তম, প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০০ পুরস্কার

৫০০ পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার ৩০০

দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫০

তৃতীয় পুরস্কার ৫০

শব্দ গঠন করিবার নিয়ম :—প্রত্যেক সাদা ঘরে একটি মাত্র অক্ষর বসিবে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণকে একটি অক্ষর বলিয়া গণ্য করা হইবে। অল্প ঘরগুলি বধা নিয়মে থাকিবে।

প্রতিযোগিতার সমাধান পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৮

বাংলা ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ সাল।

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

পাশাপাশি (Across)

- ১। এ জীবন দুঃসহ।
- ৩। দেশ।
- ৪। অনেকের ধারণা এ তগবানের প্রতীক।
- ৫। এ সরল নয়।
- ৭। বিপদে যে এ কাজ করে হিন্দুশাস্ত্র মতে সে পিতা।
- ৮। মদন যার পতি।
- ৯। জ্বালোকের বিশেষ প্রিয়।
- ১২। বোলতার এ বিধাত্ত।
- ১৩। মহাদেব।
- ১৫। এ থাকলে সে ভীত।
- ১৬। উন্টালে মৌমাংস কঠিন।
- ১৭। ঠিক করে সাজালে এর জোর না থাকলে ভাল উকিল হওয়া শক্ত।
- ২০। কর।
- ২১। বলরাম।
- ২২। ইন্দ্র এ-পাণি বলা হয়।
- ২৫। এ বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।
- ২৭। এ আহার অকর্তব্য।
- ২৮। চুর্ঘ্যোদনের মাতুলালয়।
- ২৯। শুভ নয়।
- ৩১। উন্টালে প্রায়কালে এ আরামদায়ক।

—এইখানে কাটুন—

বেকার নাশন শব্দ-বিজ্ঞাস প্রতিযোগিতা ব্যুরো

নভেম্বর সংখ্যা ১৯৩৮।

কুপন নং.....



প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও আইনতঃ বাধ্য হইবে স্বীকার করিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম।

নাম

ঠিকানা.....

লোকাল রসিদ নং.....তারিখ.....

মনিঅর্ডার নং.....পোস্টেল অর্ডার নং.....

—এইখানে কাটুন—

৩২। এর বুদ্ধি যে নেয় সে চালাক নয়।

৩৩। ঠিক করে সাজালে এর দায়িত্ব বহন করিতে হয়।

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

উপর হইতে নাচে (Down)

- ১। এর দাম নাই।
- ২। কাচ।
- ৩। এ চুচরিত্র।
- ৪। গালা।
- ৬। ভাগ্য।
- ৯। অষ্টপদ পোকা বিশেষ।
- ১০। এ হলে মাথায় অনেকই ঔষধ ব্যবহার করেন।
- ১১। এ নিয়ে প্রায়ই গণ্ডগোল হয়।
- ১৪। এ হৃদয়ের বৃদ্ধি।
- ১৮। একে অনেক কষ্ট পেতে হইয়াছে।
- ১৯। একে অমৃত কল বলা হয়।
- ২০। বলবান।
- ২১। অসত্য।
- ২৩। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।
- ২৪। অন্ধকারকে বিনাশ করে।
- ২৬। স্বর্ঘ্যের চাইতেও বড়।
- ৩০। এর স্থান মাথায়।

প্রতি সমাধানের প্রবেশ মূল্য ১০ আনা। • কিন্তু একই ব্যক্তির একত্রে তিনখানা সমাধানের মূল্য ১০ আনা। লেখা কাটা দ্বারা একে পেমুসিলে লেখা চলিবে না। মনিঅর্ডার রসিদ সমাধানের সহিত রাখিয়া দিতে হইবে। রসিদ নম্বর নিজে উকিয়া রাখিবেন। ২৮শে নভেম্বর রাজি ৭টার মধ্যে মফঃস্বল কুপন পৌছান চাই। অল্পখার অগ্রাহ হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কুপনে অথবা নিজে অবিকল ছক আঁকিয়া নম্বরানুযায়ী শব্দ বসাইয়া দিলেও সমাধান গ্রাহ্য হইবে। একাধিক সমাধান হইলে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে, সাপ্তাহিক খেলালীতে ম্যানেজারের নিতুল সমাধান প্রকাশিত হইবে।

সম্পদ নিহিত ছিল, সেটা তাদের বহি-
রাবণের সমস্ত তুচ্ছতাকে ঢেকে
ফেলেছিলো।

ভারতের বৈশিষ্ট্য ভ্যাগে, সেবায়, পরার্থে,
জীবনদানে। অস্ত্রাস্ত্র দেশে যখন হিংসার
লাবানল জলে উঠেছে, অস্ত্রের কনুয়ানি
ও রক্তের স্রোতে সমস্ত দেশ কলুষিত
হোতে বসেছে ভারতই তখন প্রথম
প্রচার করেছে অহিংসার মন্ত্র, পরকে আপন
করে নেবার মন্ত্র। একমাত্র ভারতের
নৃপতিই প্রজার হিতের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন
দিয়ে দুঃখ ও ক্লম্বতাকে হাসিমুখে বরণ
করে নিয়েছেন, একমাত্র ভারতের কর্ম্মই
সর্বলোকের হিতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ-
ভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, একমাত্র
এখানকার সেকই নিজের জীবন তুচ্ছ
বিসর্জন দিয়ে নিস্বার্থ সেবাকার্য্যের স্তম্ভ
বঁাপ দিয়েছেন।

“হে ভারত, নৃপতির শিখায়েছ তুমি
তাজিতে মুকুটদণ্ড, সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্রবেশ।”

আধুনিক শিক্ষায় আমরা আমাদের
বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সম্পূর্ণ পরের হাতে আমরা
আমাদের জীবনকে গড়ে তুলছি। এ
শিক্ষায় এখন আছে আমাদের দুটি দিক,
এক বাহিরের দিক ও ভিতরের দিক।
বাহিরের দিকে কথাবার্তায় আমরা যতদূর
সম্ভব মোলায়েম কিন্তু ভিতরের দিকে
আমাদের স্বার্থটা সব সময় সজাগ হোয়ে
আছে। যেই সেখানে গিয়ে আঘাত লাগে
অমনি আমাদের বাহিরের খোলস ন্যায়
থসে আমাদের সত্য মূর্তিটা বর্ষর চেহারাটা
আলোর মত স্পষ্ট হোয়ে ওঠে। বাহিরে
আমরা ভদ্র ভিতরে আমরা নীচ, বাহিরে
আদব কায়দায় আমরা ছুঁহু, ব্যবহারে
আমরা ভদ্র, অন্তরে আমরা হিংস্র স্বার্থের
কাছে বাঘের চেয়েও নির্ভর।

এই কৃত্রিমতা আজকাল সভ্যতার
একমাত্র মাপকাঠি। যে জাত যত বেশী
কৃত্রিম, বাহিরের আদবকায়দায় যত বেশী
ছুরছুর সেই জাত তত বেশী সভ্য। সেই
আদর্শের ছায়া ভারতে এসে পড়েছে,
তার সর্বগ্রাসী ছায়া ভারতকে গ্রাস করে
ফেলেছে, সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে তার
আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিক।

আধুনিক যুগ যন্ত্রের যুগ, বিজ্ঞানের
যুগ। দানবীয় যন্ত্রের যুগনের সঙ্গে সঙ্গে
পিষ্ট হচ্ছে লক্ষাধিক নরনারী বিজ্ঞানের
অভিযান প্রকৃতির বিরুদ্ধে। দু দিন আগে
যেখানে প্রকৃতি তার সুন্দর রূপটা নিয়ে
আমাদের চারিদিকে তার বাসাটা বেঁধে-
ছিলো, দিগন্তবিস্তৃত উল্লুঙ্গমাঠের চারিপাশে

গাছপালায় সহিত হোয়ে কণে কণে
পরিবর্তিত আলোছায়ার স্পর্শে যে নিত্য
নুতন নুতন রূপে তার সৌন্দর্য্যটিকে
প্রকটিত করে তুলে সেইখানে হঠাৎ আজ
দেখা যাবে নির্ভর দানবীয় যন্ত্রের বাসা
বেধেছে। তাই আজ আমাদের দৃষ্টি
সুউচ্চ অট্টালিকায় প্রতিহত হোয়ে ফিরে
আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদনা ও আক্ষেপের
রুদ্ধ একটা আবেগ ক্রমশঃ উপর দিকে
ঠেলে আসে। তাই কবি আক্ষেপ করে
বলেছেন—

“দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লহ যত লৌহ, লৌহ কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা, হে নির্ভর সর্বগ্রাসী
দাও সেই তপোবন, পণ্যছায়াবাশি



রূপবানীতে আগতপ্রাক
N. I. P.

মানিহীন দিনগুলি—সেই সন্ধান
সেই গোচারণ, সেই শাস্ত সামগান
নীরব ধাত্তের মুষ্টি, বন্ধল বসন
যথ হোয়ে আজ মাঝে নিত্য
আলোচন মহাত্মগুলি।

প্রকৃতির কোড়ে যে অনাড়ম্বর সরল
জীবনযাত্রাটি ছিল সেটি আজ লুপ্ত হোতে
বসেছে। প্রকৃতি দেবী আজ নির্বাসিত।
তাই আজ যতদূর দৃষ্টি যায়, আশেপাশে
চারিদিকে কেবল দেখা যায় বিজ্ঞানের
বিজয় অভিযান, নির্ভুর তাণ্ডব উল্লাসের
এক একটা বিকট গর্জনে সে চারিদিক
কাঁপিয়ে তুলেছে, সুন্দর সরল জীবন যাত্রার
আদর্শকে বাহত করেছে সঙ্গে সঙ্গে
কৃত্রিমতাকে ডেকে এনেছে।

এই যন্ত্র যে আজ ভারতের কত বড়
শত্রু সে কথা আজ কে-না বুঝেছে।
ভারতের শক্তি, স্বাস্থ্য, ধন, সম্পত্তি এ সমস্তই
হনন করেছে এ যন্ত্র। ভারতের পূর্ক
ইতিহাস কোনদিন সাক্ষ্য দেবে না যে
ভারতে কোনদিন অন্নাতাব ঘটেছে, দুর্ভিক্ষ
অন্যাহারে লোক মারা গেছে। কিন্তু আজ
লক্ষ্য লক্ষ্য অন্যাহারী ভারতবাসীর ক্ষিপ
ক্রন্দনের রোলে আকাশ বাতাস মুখরিত।
অন্নের অভাবে, খাত্তের অভাবে যৌবনেই
তারা প্রৌঢ় প্রাপ্ত হচ্ছে, এবং অসময়ে
কাতারে কাতারে মারা যাচ্ছে। এই

রকম করে একটা জাত তিলেতিলে পলে-
পলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের মানি
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধুমাক্তি কালি,
লাভ ক্ষতি চানচানি, অতি ক্ষুদ্র ভগ্নঅংশভাগ
কলহ সংশয়
সহেনা সহেনা আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

আধুনিক কালের জীবনযাত্রার একটা
ল্পষ্ট চবি। কলহ বিবাদ ও সংশয়ের
কণ্টকাজালে আমাদের জীবন ক্ষত বিক্ষত
স্বার্থ ও হিংসার পরস্পর হানাহানিতে
আমরা অবসর ও দুর্বল।

যে ভারতের বৈশিষ্ট্য সর্কমানবকে প্রীতি
ও ভালবাসায় অভিষিক্ত করে আপন করে
নেওয়া, যেখানে সমস্ত বিরোধের মাঝে
ঐক্যস্থাপনই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য
সেখানে তার পাশে আজকালকার আদর্শ
কত হীন কত দুর্বল। বিজ্ঞানের সঙ্গে
সঙ্গে কৃত্রিমতা বাহাউষর যত বেড়ে
চলেছে ততই আমাদের মোহও বেড়ে
চলেছে। অল্প সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে
অন্ধের মত পরের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতি-
ষ্ঠিত করার জন্ত আমরা ব্যাকুল। অজ্ঞের

থেকে আজ আমরা পৃথক হোতে চাই।
কিন্তু এটা মোহ মিথ্যা মাত্র। কিন্তু
অন্তরাঙ্গা এ সন্ধীর্ণতাকে যেনে নিতে চায়
না, এ মিথ্যা অভিনয়ে সে সারা দেয়
না। স্বাধীন বন্ধন অসহিষ্ণু অন্তরাঙ্গা
চারিদিক থেকে বন্ধনের বেড়াজালে অতিষ্ঠ
হোয়ে উঠে। আত্মার আনন্দ স্বাধীনতায়,
বন্ধন মুক্তিতায়। উন্মুক্ত আকাশ বাতাসও
প্রকৃতির মাঝেই সে পায় মুক্তি, বিশ্বমানবের
প্রীতির মিলনক্ষেত্রেই তার মুক্তি, শাস্তি
ও সৌন্দর্যের মাঝেই তার মুক্তি। কিন্তু
আধুনিক যুগে মানুষের মুক্তিকামী অন্তরাঙ্গা
বিজ্ঞান ও যন্ত্রের অবরোধে অপমানিত,
পরস্পর হিংসা ও স্বার্থ বিদ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ।
কোথাও রাষ্ট্রের চাপে কোথাও বা
সমাজের চাপে সে পিষ্ট সঙ্কুচিত। তাকে
যেন বায়ুলেশহীন অর্গল বন্ধ ঘরে ফেলে
রাখা হোয়েছে। ঐ বায়ুর অভাবে তার
দম বন্ধ হবার উপক্রম, ও বাহিরে উন্মুক্ত
আকাশ প্রান্তরে সে পাগল হোয়ে উঠেছে।
তাই রবিবাবু প্রত্যেক মানুষের অন্তরের
কথাটাকে নিম্নলিখিত কবিতায় মূর্ত করে
তুলেছেন।
হে বিধাতা,

নিঃসঙ্কোচে মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে, উদাস আলোকে
মুক্তির বাতাসে।



= পিরামিড চা =

চিত্তহারী সৌরভ, নয়ন তৃপ্তিকর বর্ণ, অভিনব স্বাদ
১ পাউণ্ড প্যাকেট মাত্র ১০ আনা
প্রত্যেক সম্ভাব্য দোকানে সাদরে বিক্রিত হয়।

ইন্দিবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ব্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

খেয়ালী চিত্রপট



মেয়েটাকে সকলেই জানেন, গুণের পরিচয়ও এর
পেয়েছেন—এবার দেখ। যাবে একে নূতন চরিত্রে
নূতনরূপে—নিউ থিয়েটার্সের “সাথী” চিত্রে মঞ্চ চরিত্রে।
মেয়েটা শ্রীমতী কানন অভিনব ভাব মূৰ্ছনায়
বৃত্তমানা। “সাথী” চিত্রখানি। শীঘ্রই মুক্তিলাভ
কোরবে। ছবিখানার পরিচালক শ্রীযুত কণি মজুমদার।

পরিচালক : ন্যাশনাল মিউজপেপাস লিঃ

কাৰ্যালয়—১১, চক্ৰবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৪শে কাশিক ১৩৪৫, ১০ই নভেম্বর ১৯৩৮ } ৪২শ সংখ্যা

নূতন এ্যাসেসার

ভারতীয় ব্যবস্থা, পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ট্রাইব্যুনালের এ্যাসেসার নির্বাচিত হইয়াছেন। পাঠক-বর্গের হয়ত স্মরণ আছে যে এই পদের জন্ম অশ্রুতম প্রার্থী ছিলেন শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়। . বাংলার কংগ্রেসী মহলে কিরণবাবুর প্রভাব সর্বজনবিদিত। বিধানবাবুর খণ্ডদলের সহিত কিরণবাবুর যোগাযোগ অপ্রকাশ্য নাই। কিরণবাবুর স্বড়ধন-কামী প্ররতি তাঁহাকে বাংলা কংগ্রেসে যে স্থান দিয়াছে তাহা হইতে তাঁহাকে বিদূরিত করিতে না পারিলে বাংলা কংগ্রেসে এক বা শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে না। কিরণবাবুর বুদ্ধির প্রখরতার সহিত যদি অর্থ-স্বচ্ছল্যের সমাবেশ হয় তাহা হইলে তিনি যে বাংলা কংগ্রেসে কিরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

নিগত এ্যাসেসারী নির্বাচনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উদারতার ও সহায়তার সুযোগ লইয়া বহু কষ্টে নির্বাচিত হইয়াও তিনি বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের আনুগত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। বর্তমান অর্থ-সচিবের সহিত তাঁহার যেরূপ সম্প্রীতি আছে, তাঃ বিধানচন্দ্রের সহিত তাঁহার যে যোগাযোগ বিद्यমান তাহাতে তাঁহার পক্ষে হয়ত বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি

অবিচলিত আনুগত্য স্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব।

নিগত আঠার বৎসরের কংগ্রেসী ইতিহাসে অনুসরণ করিলে ইহা সহজ ও সরল সভ্য রূপে প্রতিভাত হয় যে বাংলার সমস্ত দলাদলির অলঙ্কে ইন্ধন যোগাইতে বা প্রত্যক্ষভাবে দলাদলি পরিচালনা করিতে . কিরণবাবু যেরূপ নিষ্ঠা ও পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

প্রথমেই যখন কিরণবাবু এ্যাসেসার পদের জন্ম তত্ত্বিনী শুরু করেন তখনই আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বসু-ভ্রাতৃদ্বয়কে সজাগ করিয়া দিয়াছিলাম কারণ কিরণবাবু উক্তপদ পাইলে দলাদলি পরিপোষণে যে সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন তাহাতে তিনি অপরায়ে হইয়া উঠিবেন। সুতরাং তাঁহাকে উক্ত পদে মনোনীত করিলে বিধান-নগিনী-স্নেহাশ্রিত কংগ্রেসী উপদলই শক্তিশালী হইয়া উঠিত। যাহা হউক আমরা দেখিয়া, সুখী হইয়াছি যে বসু-ভ্রাতৃদ্বয় কিরণবাবুর মনোনয়ন সন্মুখীন করেন নাই এবং তাহারই ফলে কিরণবাবু শেষ মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সুপ্রসারিত সাধারণ অধিবেশনে অমরেন্দ্র বাবু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উক্ত পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।



(বিলাসী)

সাপুড়ে

ছ'নবর ষ্টুডিওর কন্সসচীব ছোটাইবাবু ধীরে ধীরে ছবিখানাকে বেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। “কিন্তু সম্প্রতি তিনি বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দেবকীবাবু অনেকটা ভাল হলেনও এখনও কার্যক্ষম হন নি। তাঁকে প্রথমতঃ সুস্থ করা আর দ্বিতীয়তঃ এই ছবির জন্ত বহু পরিশ্রমে, বিপুল অর্থ ব্যয়ে, ছোটাইবাবুকে একগাদা নানা জাতের বিবাক্ত সাপ সংগ্রহ কোরতে হোয়েছিল। এই সাপের গুটিকে ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুস্থ দেহে, জিইয়ে রাখা। স্বর্গের অশ্বিনীকুমারের কাজ থেকে দেবাদিদেব নীলকণ্ঠের কাজ তুইই তাঁকে করতে হচ্ছে।

বর্ষার জোলা-হাওয়ায় যে সাপগুলিকে যেরূপ সজীব অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়েছিল, শীতের আরম্ভে দেখা যাচ্ছে তারা যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়চে!

তবু ভরসা এই অনেক দিন থেকে যিনি অনেক জীবের মরণ-বাঁচনের মুষ্টিযোগ বাতলে চিত্র-জগতে চবক ও চাপকোর সম্মান পেয়েছেন—এই সাপগুলিকে সজীব ও টাটকা স্বপ্নস্থায় শেষ পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে, এবারেও যে তাঁর অব্যর্থ মুক্তিযোগ বুঝা যাবে না—এটা অনেকরই বিশ্বাস।

যে মকের সুরতেই সাপ, তার শেষ পরিণতি কোথায়—কে জানে!

বড়দিদি

এই চিত্রের পরিচালক, আমাদের দৌলদাদা মল্লিক মশাই আবার এ সপ্তাহে সদলবলে রওনা হয়েছেন, শহরের বাইরে একটি বচিদৃশ্য গ্রহণ করবার জন্ত।

নদীবক্ষে নৌকোর উপরএ সেই মন্ম-বিদারক শেষ মিলন।

সর্বস্বাধীন সুরেন্দ্রনাথ সারাপথ পাগলের মত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে শেষে এই নদীবক্ষে জীবন সর্বস্ব স্নেহময়ী বড়দিদির সহান পায়। এ মিলন ঠিক প্রতাপ শৈবলিনীর ছয় নি তথাপি বার জীবন প্রদীপের অবশিষ্ট

তেলটুকু আজ নিয়তির বিধানে নিঃশেষ হয়ে এসেচে, কণিকের এ মিলন তাকে কতটুকু সাহসনা দিতে পারে?

সাথী (হিন্দি ষ্ট্রীট সিন্ধার)

বাংলার চিত্রমোদীগণ এই নূতন ছবি দেখবার জন্ত খুবই উদগ্রীব হয়ে আছেন। সুখের বিষয় তাঁদের আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। বাংলা ভাষায় নৃত্যগীত পূর্ণ এই “সাথী” নিউ থিয়েটার্সে এর বাংলা চিত্রগ্রহণে রূপান্তরিত নিউ সিনেমায় শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

‘সাথীর’ নানা আকর্ষণীয় বিষয়ের কথা পূর্বেই প্রচারিত হয়েছে। সঙ্গীত সংলাপের অপূর্ণ সংমিশ্রনে এই প্রেম মধুর ও চিত্তাকর্ষক ছবি দর্শকের মন হতে শীঘ্র মুছে যাবে না এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দুষমন (হিন্দি)

গীতার মা ও গীতার নম্রা অল্প একজন (দেববালা ও মনোরমা) গীতার (লীলা দেশাই) জন্ত একটা বুঝককে সুপাত্র



“বড়দিদি” চিত্রে মলিনা ও ছবি

‘কম্পতরু’ অমৃতভোগ



যৌবন
ও

স্বাস্থ্য

অক্ষুণ্ণ রাখিতে
একমাত্র সুস্বাদু খাদ্যোষধ
অমৃতভোগ

নিয়মিত ব্যবহারে মানসিক
ও শারীরিক শক্তি সর্বিশেষ
বৃদ্ধিত ও মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয়

তিন সপ্তাহের সেবামোপযোগী
প্রতি টিনের মূল্য—১।০



কম্পতরু আয়ুর্বেদ ভবন
কম্পতরু প্রাসাদ
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নং, কলিকাতা

নির্দোষিত

আজ হৃদয়ের বত কিছু

আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম

ও সংস্রব.....

অপমৃত্যু হইয়াছে মনের

অভিনয়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

অভিনয়

১১শ

সপ্তাহ

হৃদয়ের এই বেদনাবিমুক্তিত
বহুস্তরের অভিনয়

বাণীচিত্র

রূপবাণী

কোন : বি, বি,

৩৪১৩

N.I.P.

পূর্ণ বিস্ময়টার

২নং রঙ্গা রোড

কোন : লাউথ ৩৪

শনিবার ১২ই নভেম্বর হইতে

১ম সপ্তাহ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

গোরা

দেহদত্ত ফিল্মসের নব্বত্তম কথা-চিত্র

শ্রেষ্ঠাংশ : রাণীবালা, প্রতিমা দাস গুপ্তা, নরেশ
মিত্র, জীবন গাঙ্গুলী, মোহন ঘোষাল ইত্যাদি।

সুকবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষালের

নূতন কাব্যগ্রন্থ

জীবন ও রাত্রি

বাঙ্কুর হইয়াছে, মূল্য এক টাকা

প্রকাশক :—

বালাঙ্গা ইউনিভারসিটি প্রেস

২৪।এ মোহিনী মোহন রোড, কলিকাতা।

বিবেচনায় বিবাহের প্রস্তাব করলেন। তাঁদের এ নব আগন্তকের প্রতি পক্ষপাতিত্বের যথেষ্ট কারণও ছিল। এ নবীন যুবকের স্বাস্থ্য ছিল, সম্পদ ছিল, সে নিজেও একজন চিকিৎসক।

শাস্ত্রে বলে, “কন্যা যাচয়তে রূপং, পিতা বিজ্ঞাং মাতা ধনং” কাজেই এ বিবাহের কোন বাধাই নাই কিন্তু পিতাই কর্তা মাতার মতে বিবাহ হয় না। গীতার পিতা (নিমো) যে প্রকৃতির লোক তাতে শেষে কি হয় বলা যায় না।

পরিচালক নীতীনবাবু এখানে সত্যই ড্রামার সৃষ্টি করিতে ছাড়িবেন না।

কপালকুণ্ডলা (হিন্দি)

পরিচালক ফণী মজুমদার বাংলার সাহিত্য ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মানস কন্যা কপালকুণ্ডলার হিন্দীরূপদানে ব্যস্ত। জানিনা বঙ্কিমচন্দ্রের এই চির নূতন ও চির মধুর আখ্যায়িকা বাংলার ভাবুক প্রাণকে যে ভাবে উদ্বেলিত করেছিল—কাটখোঁটা আবহাওয়ায় তার কি অবস্থা হবে। তবে ফণীবাবু যে ভাবে পশ্চিমের দিকে নজর দিয়ে চলেছেন তাতে মনে হয় যে একেবারে নিরাশ হতে হবে না। শুষ্ক তরুণ মঞ্জুরিত হতে পারে।

গত সপ্তাহে পাছশালায় নব কুমার ও মতিবিবির দৃশ্য তোলা হয়েছে। আমাদের পাঠকের কাছে এ দৃশ্য নূতন নয়। গ্রামোফোন কোম্পানীর কল্যাণে সকলের কাছেই সুপরিচিত এ দৃশ্য।

নবকুমারের ভূমিকায় নাজাম, মতিবিবির ভূমিকায় কমলেশ আর কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় হাজলান্তরায়ী লীলা দেশাইকে দেখা যাবে; তবে শেষ পর্যন্ত শেখোক্ত্রী শ্রীমতী ভাল সামলাতে পারবেন ত?

প্রাইমা ফিল্মস্

এরা সাহস করে অবাকালী প্রতিযোগিতা তুচ্ছ করে হিন্দি ছবির পরিবেশন আরম্ভ

করেছেন। এঁরা হংস পিকচার্সের “জালা” ও নটরাজ পিকচার্সের “সাধীর” পরিবেশন তার পেয়েছেন। জালায়—প্রভাতের চন্দ্র মোহন ও সুন্দরী রক্তপ্রভা প্রধান অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। জালায় আখ্যান ভাগ মধুব মহারাজীয় গান্ধীর্ষ্য কারুনৈপুণ্য, সাজ-সজ্জা ও সমারোহে পরিপূর্ণ। জালা শীঘ্রই গণেশ টকিতে মুক্তিলাভ করবে বলে শোনা যাচ্ছে।

পথিক

এখন কোন গৃহপ্রাঙ্গণ বা স্নিগ্ধ-বটচ্ছায়ায় সুপ্তিমগ্ন তা আমরা সন্ধান করে খুঁজে পাইনি। তবে শুনলুম পরিচালক চাকু রায় আগামী সপ্তাহে বাকী দৃশ্য কয়টি তোলবার জন্ত বাইরে যাচ্ছেন। পথিকের নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য আর নায়িকা শ্রীমতী শীলা হালদার। চিত্রশিল্পী একজন বাঙালী—নাম অজয় কর।

রাশাকিল্ম কোম্পানী

পরিচালক ফণী বর্মা জনকনন্দিনীর কাজ খুব দ্রুত শেষ করছেন। দু সপ্তাহের মধ্যেই ছবিখানি শেষ হবে বলে আশা করা যায়। পরিচালক মশায় ছবির অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। রাধা ফিল্মএর পৌরাণিক ছবির একরূপ নাম আছে তা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্স

হরিভঞ্জ মহাশয় ষ্টুডিওর বাকী দৃশ্য শেষ করে বহিদৃশ্য তোলবার জন্ত পার্কর্স প্রদেশে যাবেন তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

চিত্রা

আজ থেকে “দেশের মাটি” নবম সপ্তাহে পড়ল। আমাদের দেশের দৈনন্দিন অবস্থা ও উন্নতির উপায়ের দিকে এ চিত্র জনসাধারণের ও সংবাদ পত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

সাধারণ চলচ্চিত্রের ধারা হতে “দেশের মাটি”র প্রয়োগ নৈপুণ্য ও বিষয় বস্তু বিভিন্ন ও উন্নত ধরনের একজন শীল্প শীল্প দর্শকের মন থেকে এ চিত্র উঠে যাবেনা বলে আমাদের বিশ্বাস।

নিউ সিনেমা

‘নিউ থিয়েটার্সের নূতন বাঙলা চিত্র-গৃহরূপে রূপান্তরিত নিউ সিনেমা আগামী ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত বাঙলা ‘চণ্ডীদাস’ ও ‘মাস্তুতো ভাই’ দেখান হবে। তার পর দুদিন ‘মারা’ ও ‘মাস্তুতো ভাই’ দেখান হবে।

রূপবাণী

ভাল ছবি, বাঙলা দেশের দর্শক সাধারণের কাছে যে কি বিপুলভাবে সমাদৃত হতে পারে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের আধুনিক সমাজ-চিত্র ‘অভিনয়’ তাহার শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। এই শনিবার হইতে ‘অভিনয়’ রূপবাণীতে একাদশ সপ্তাহে পদার্পণ করিবে। ছবিটি আপনারা যত বারই দেখুন না কেন, আপনাদের কাছে পুরানো হইবে না।

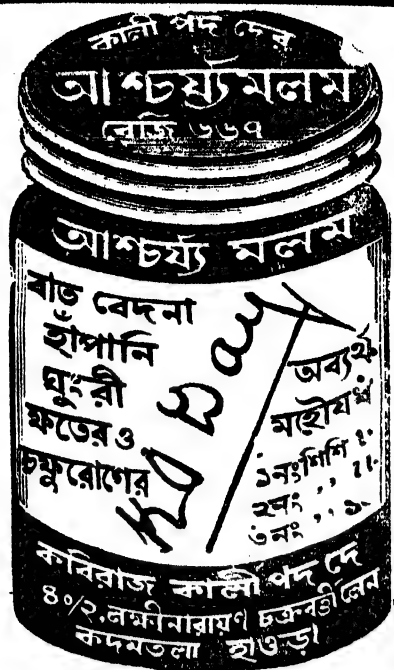
পূর্ণ থিয়েটার

দেবদত্ত ফিল্মসের ‘গোরা’ এখনও যে ভাবে দর্শক টেনে আনছে তাতে আরও কিছুদিন তা চলবে বলে মনে হয়।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

দেশের মাটি

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিপুল পানীয়



রেঃ ৬৬৭ “আশ্চর্য মলম”

জ্ঞান করে দিচ্ছে জগতের
সকল আবিষ্কার

আশ্চর্য মলম ব্যবহারে পাবেন অসীম শান্তি,
অফুরন্ত তৃপ্তি ও প্রচুর আনন্দ।

গৃহে রাখুন এই আশ্চর্য মলম—

পাচেন আশ্চর্য ফল,

হঠাৎ ব্যাধির আক্রমণে হবে আশু উপশম।

আশ্চর্য কামোদক চূর্ণ (রেজিষ্টার্ড)

ভগবানের সৃষ্ট কাম বা পুরুষ মানুষের ওকতিগত অধিকার জগতের লোকে ইহা ছাড়া সংসারে
বাঁচিতে পারে না। তাই স্ত্রীস্বীকরণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ভিতর এই কামশাস্ত্রেরও সমালোচনা করিয়াছেন। ধন,
ঐশ্বর্য, খ্যাতি প্রতিপত্তি অপেক্ষা মানুষ কামের বেশী বশীভূত। যাহার কামের উদ্রেক হয় না তিনি
পুরুষত্বহীন এবং জীবনধারণ অপেক্ষা মরণ তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন। আয়ুর্বেদের মধ্যে কামশক্তি বৃদ্ধি ও
ধারণ করিবার বহুবিধ বাজীকরণ ঔষধ আছে। সেই সকল ঔষধের সার দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করিয়া আমি
‘কামোদক চূর্ণ’ নামক একটা শক্তিশালী চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছি; যদ্বারা পুরুষ শক্তি স্থায়ী রাখিয়া মানুষ বহুবার
জীগমন করিলেও স্বাস্থ্যের হানি হয় না। আমার সঙ্গদয় ৬৬৭নং আশ্চর্য-মলমের গ্রাহকগণ এই চূর্ণের অতুলনীয়
শক্তি দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহাতে অধিক শুক্রক্ষয়,
শুক্ৰভাৱলা, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য বা প্রস্রাবের সহিত শুক্রক্ষরণ, ইচ্ছাশক্তিহীন প্রভৃতি বহুবিধ ঐন্দ্রিক রোগে আশু
ফলপ্রদ। ইহাতে ধারণাশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি করে। নূতন দাম্পত্য জীবন যাপন কালীন এই বাজীকরণ ঔষধ
নিয়মিত ব্যবহারে শুক্রের অপচয় ঘটেনা। পরীক্ষার জন্য আট দিনের ঔষধের মূল্য ৥ আট আনা ধার্য্য করিলাম।
একমাস কাল বা ততোধিক ব্যবহারে এই চূর্ণের মূল্য যথাক্রমে ১৯, ১৬০ এবং ৩ মাত্র।

ব্যবহার নিবিঃ—আশ্চর্য মলম পুস্তকে পাইবেন। এই চূর্ণ ব্যবহার কালীন ৭ দিন স্ত্রীসহবাস একেবারে
নিষেধ। সঙ্গদয় দেশবাসা ইহার ব্যবহারে সফল পাইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আশ্চর্য জ্বর নাশক বটিকা

এই বড়ি ম্যালেরিয়া রোগীরপক্ষে টনিকের কার্য্য করে এবং ইন্ডুয়েঞ্জার অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সম্পূর্ণ দেশীয় শক্তিশালী গাছ গাছড়ার
সারাংশ লইয়া কবিরাজী মতে বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত। জ্বর, পালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, নূতন পুরাতন জ্বর, কল্‌জ্বর, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের
জ্বর প্রভৃতির আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই বড়ি জরের উপর খাওয়ান খাইতে পারে, একটা করিয়া বড়ি মুখে দিয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া চিবাইয়া
বা গিলিয়া খাইতে হইবে—এইরূপ প্রত্যাহ তিনটা করিয়া বড়ি খাইতে হইবে। এই বড়ি সহজ অবস্থায় সেবনে জরের আক্রমণ হইতে
রক্ষা পাওয়া যায়। মূল্য:—১২ বড়ি প্যাকেট—১০ আনা। ২৫টী—১০/০ ও ৫০টী—৬০ পাইকারা দর স্বত্ত্ব।

সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সামান্য—ভীষণ জ্বর হইতেছে

নিবেদক কবিরাজ কে. পি. দে চিকিৎসাক্ষণ (বেনারস), আয়ুর্বেদাচার্য্য (ঢাকা), এম-এইচ-এস-এল (লণ্ডন), কদমতলা, হাওড়া।

আশ্চর্য মলম কেমিক্যাল ওয়ার্কস—কদমতলা, হাওড়া

আবঃ—কম নং ৫১, ১৯১১ সারকুলার রোড, বৈষ্ণবখানা বাজার, শিৱালদহ

“পাপকে ঘৃণা করিও পাপীকে নয়”

“পাপীকে ঘৃণা করিও না—কিন্তু পাপকে ঘৃণা করিও”—সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গ-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অমর উপন্যাসে এ কথাই বলে গেছেন। কণিকের মোহে কিংবা এক অতর্কিত মুহূর্তে যদি পদস্থালন হয় তাহলে সারা জীবন তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে—নিজকে শোধরাবার কোন সুযোগই তাকে দেওয়া হবে না, এ নীতির বিরুদ্ধে ক্রমশঃই আন্দোলন চলছে। কিন্তু সমাজের তথাকথিত নেতৃ-বৃন্দ দ্বারা এখনও অন্ধ গোঁড়ামির দোহাই দিয়ে প্রতি পদে পদে কাজ করে থাকেন, তারা এই আন্দোলনে চমকে উঠছেন, বুঝি সমগ্র বিশ্বই রসাতলে যাবে। তাদের কাছে সৃষ্টির ধ্বংস আসন্ন প্রায়।

আনন্দ পিক্চাসের প্রথম অবদান “পিঙ্গলা” চিত্রে এইরূপ এক কাহিনীকে ভিত্তি করেই এক বারবণিতার করুণ প্রেম চিত্রিত করা হয়েছে।

পিঙ্গলা বার-বণিতার মেয়ে,—তাই সমাজে তার কোন ঠাই নেই। সমাজের কঠোর হস্ত সর্বদাই অকুলী উন্মোচন করে আছে, “তুমি অপ্সরা”। সমাজে তোমার কোন স্থান নেই। তোমার অপরাধ তুমি বারাজনার মেয়ে। পিঙ্গলা অতশত বোঝে না যে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী প্রভেদ। কিন্তু পিঙ্গলার মা পিঙ্গলাকে বাধ্য করে দেহ বিক্রী ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে। এক ধনীও এসে জোটে, পিঙ্গলার মাতার হস্তে অনেক টাকা দেয় ও পরিবর্তে পিঙ্গলাকে চায়। পিঙ্গলা এতে বাধ্য দেয়, বলে সে এ ঘৃণ্য পাপ ব্যবসায়ে কখনও লিপ্ত হবেনা।

পিঙ্গলার প্রেমের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো তা দেখতে হলে আপনি

নিশ্চই আসছে ১২ই নভেম্বর শনিবার প্রত্যহ সিনেমায় আসবেন। ঘটনার বৈচিত্রে; অভিনয়ের উৎকর্ষতায় ও সঙ্গীতে “পিঙ্গলা” আনন্দ পিক্চাসের এক উৎকর্ষ অবদান।

ইন্দিরা ওয়াদকার

খ্যাতনামা গ্রামোফোন রেকর্ড গায়িকা ইন্দিরা ওয়াদকারের নাম সকলেই জানেন। বিশেষতঃ বার ঘরে গ্রামোফোন রয়েছে তিনিই ইন্দিরা ওয়াদকারের গানের রেকর্ডের সঙ্গে সু-পরিচিত।

আনন্দ পিক্চাসের অতুলনীয় অবদান পিঙ্গলার নায়িকারূপে এই শ্রেষ্ঠ গ্রামোফোন গায়িকা আয় প্রকাশ কোরবেন। সুতরাং একই সঙ্গে ইন্দিরা ওয়াদকারের সঙ্গীত ও অভিনয় উপভোগ করার এই সুবর্ণ সুযোগ, চিত্রামোদীগণ কখনও হারাবেন না। তাছাড়া, এই ছবিখানায় এমন সব বহু সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়েছে যে তা আপনার মনকে ভবি-দেখবার পরও বেশ ভাবিত রাখবে। সঙ্গে হাক্কো রসের উপাদানও এতে যথেষ্ট রয়েছে।

গান

অভূদান রাসচৌধুরী

প্রিয় আমার বুকে তোমার আসন পাতা,
দূর সুদূরের গান শুনেছি
“হৃদয়ে তার তাল শুনেছি
তীরু আমার কোমল বুকে নীরব আকুলতা।
অন্ধকারে ঘরের দ্বারে থাকি’
তোমায় প্রিয় স্বরণে মোর রাখি
আবেশে মোর তোমায় ‘অরি’ জাগে
বুকে ব্যথা।
উদয় তোমার নীল সবুজের শাড়ী
দিগন্তেতে রক্ত লেখায় পাড়ি
ঘরের মায়ায় হাতছানি দেয় আনে
ব্যাকুলতা।
পরশ তোমার এখনও মোর দেহে
গুপ্ত আছে মনের প্রতি গেছে
‘বাহিরে তার প্রকাশ নাহি কেউ তো
জানেন না তা।

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!



পাওয়া যায়। হারিয়ে ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ লোণার ভায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!

ব্যবহাগতে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনদের মনোমত আধুনিক ধরণের লকল রকম গহনা

. দি ব্যাশনাল রোল্ড গোল্ড. এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিল্ডিকেট

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের নিকটে)

ত্রি ত্রি ঐ

শ্রীমাদভ্যুপাসনা

বিগত ৫ই কার্তিক শনিবার ৬ই অক্টোবর নান মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীচন্দ্রাবিহারী মাতার দীপাবলি পূজা ২৬ নং বেথুন রোডে মহা ধুমধামের সহিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে সহরের বিশিষ্ট শ্রীমহোদয়গণ ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীমদ্রোহিত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপান্নালাল নান এবং প্রকাশচন্দ্র নান ও রবীন্দ্রদত্ত, অতিথিদের আদর অভ্যর্থনায় ও ভূরীভোজনে বিশেষ ভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। পরদিন শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্তৃক শ্রীহর্গা পালা অভিনয় খুব ভালই হোয়েছিল।

দীপাবলি উৎসব

“গত ৩০শে অক্টোবর রবিবার ২২নং বকুলবাগান রোডস্থ ভবনে উপেন্দ্র নন্দী পরিচালিত হস্তলিখিত “শ্রী” পত্রিকার দীপাবলি উৎসব সুকবি শ্রীযুত রামেন্দু দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় সুকবি হেমচন্দ্র বাগচি মহাশয় “শ্রী”র কর্মীদের আশীর্বাদ করিয়া বক্তৃতা দেন। তৎপর যুগ্মসম্পাদক শ্রীদীনেন্দু দাস বি-এ, সমীর ঘোষ, সময় সরকার, লক্ষী ঘোষ, বিজেন্দু দাস, অমিয় ব্যানার্জি ও ধর্মদাস মিত্র বিবিধ বিষয়ে কবিতা পাঠ করেন। সুসাহিত্যিক সুধীরজ্ঞান মুখার্জি ও সুশীল দাশগুপ্ত গল্প এবং উপেন্দ্র নন্দী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতির অভিভাষণ ও আলোচনার পর জলযোগান্তে সভার কার্য শেষ হয়।”

পরলোকে ডাক্তার

নীরোদচন্দ্র ঘোষ

ইনি প্রাইমা ফিল্মসের অত্যন্ত প্রধান কর্মসচিব শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের পিতা। গত রবিবার প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় ১৩এ অভয় গুহ রোডস্থ বাসভবনে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার আত্মার সঙ্গতি কামনা করি।

পরলোকে তরুণ সাহিত্যিক

গত পূর্ব রবিবার রাত্রে ১০টার সময় বাঙ্গলা দেশের তরুণ সাহিত্যিক শ্রীনরেশচরণ মল্লিক মহাশয় ইহলোকের মায়' ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর ছিল। ছোট বড় বহু স্বনাম খ্যাত পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমরা তাঁহার আত্মার সঙ্গতির কামনা করি।

প্রভাতী সংঘের বিজ্ঞপ্তি

বিহার প্রবাসী বাঙালী সমাজের মুখপত্র “বেহার হেরাল্ডের” সম্পাদক ও পাটনার সাহিত্য প্রতিষ্ঠান “প্রভাতী সংঘের” পরিচালক শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র সমাদার জানাইতেছেন—
• গত বৎসর পাটনায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রভাতীসঙ্গ একটি আরক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবৎসরও এই বার্ষিকী প্রকাশিত হইবে। শ্রীবিমল

রায় ‘পত্রিকাটির সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রঃ বঃ সঃ সম্মেলনের গোহাটি অধিবেশনে যে সকল প্রতিনিধি যোগদান করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে এই পত্রিকার এক একখণ্ড উপহার দেওয়া হইবে।

জলসা

গত ২৯শে অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা ৭।০ টার সময়, কালীঘাট বাদল থা মেমোরিয়াল ক্লাবের উদ্যোগে ১৩৩নং কালীঘাট রোডে শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গ ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি জলসার আয়োজন হইয়াছিল।

নামকরা কেউ না থাকলেও তাঁদের এই অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। অল্প গায়ক শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের “বন্দে-মাতরম্” সঙ্গীত; কুমারী শেফালিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও লতিকাদে (৭৭বৎসর) এবং শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের “খেয়াল”; শ্রীমনীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনিখিলেশ্বর গাঙ্গুলীর “তুরী”; কুমারী কমল কুমারী নাগের “আধুনিক বাংলা গান”; শ্রীবিভূতি ভূষণ দেব রায়ের বেহালা বাদন এবং শ্রীপরিতোষ মুখোপাধ্যায়ের তবলা-সঙ্গ বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

আমরা বাদল থা মেমোরিয়াল ক্লাবের উদ্ভবের শ্রীযুক্তি কামনা করি।



জরীপ ও নক্সার যত্নাদি সুবিধার্থে কিনতে হলে

‘বিনোদ কোম্পানী’র

নূতন শো-রুমে যান।

১০নং ড্যালাহাউসি স্ট্রোয়ার।

পূর্ব পরিচয়

সাধারণতঃ আমরা যে রকম ছবি দেখি, তাতে আর মন ওঠে না। কাজেই নতুন রকমের কিছু সব সময় দর্শক মাঝেই চায়। “সাথী” নামে যে ছবিখানি আসছে, তাতে বাঙালী দর্শকের মন নতুনত্বের সন্ধান পাবে এ আশা আমরা করি। সাথীর পরিচালক ফণী মজুমদার দর্শক-মনের খোঁজ খবর রাখেন এবং কখন কোন দিকে এর পরিবর্তন হয় তাও তিনি জানেন বলে মনে হয়।

এর প্রথম প্রদর্শন পাই আমরা সাথীর ভূমিকা নির্ধারিত। সাথীর প্রধান ভূমিকায় নেমেছেন কানন এবং সাগর। ছায়াচিত্রে এদের একসঙ্গে এই প্রথম অবতরণ। ফণীবাবু জানেন যে বাংলার— শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের দর্শক-মহল এই দুজন প্রখ্যাত শিল্পীকে এক সঙ্গে দেখবার আশা বহুদিন থেকে করে আসছেন। দর্শক মহলের এই আশা সাথী চিত্র পূর্ণ করবে। কানন এবং সাগর ছাড়া আর যে সকল শিল্পী সাথীতে আছেন, তাঁরাও সকলে বিখ্যাত। অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, বোম্বাই চট্টো, অহি সান্নাল, ভানু ইত্যাদি সকলেই বাংলার সিনেমা জগতে নামকরা লোক।

ফণীবাবু সাথী চিত্র নির্মাণে ঠিক চিত্রাচারিত পথ অনুসরণ করেন নি। তিনি নতুন ধরণে লিখেছেন গল্প এবং নতুন ধরণেই তা চিত্ররূপান্তরিত করেছেন।

সাথীর কাহিনীর মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা আমরা দেখতে পাব— যা দর্শক চিন্তে আনন্দ দান করার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র নানা ভাবের উদ্রেকও করবে। মানুষের মনে প্রেমের জয় এবং

দেবদাসী

(শ্রীরাখালদাস চক্রবর্তী)

নৃত্য-বিলাসে অঙ্গে তোমার আগ্নেয় একি মাধুরিমা।
দেবদাসী, তব রূপের সাগরে হারাই আমারি সীমা।
কাচুলী-বন্ধ উন্নত-পীনে ছন্দ নাচিছে অলসে,
নিতম্ব-ধিরি স্বর্ণ-মেখলা আরতির দীপে বলসে।
অঙ্কুর গন্ধ মন্দির করে মাতাল তাহার বাসে,
ধূপের ধোয়ায় স্বর্ণ লোকের বিদেহীরা বুঝি ভাসে।
চন্দন-কোঁটা আননে তোমার, চোখে মাখা কালো অঞ্জন,
স্বপ্ন-মন্দির দৃষ্টির দিগে হেবু জানি কোন জন
আমি যে পথিক সুদূর বিদেশী, মন্দির মাঝ হতে
তোমার নুপুর-নিকণ আঁজি পিশিলে শ্রবণ পথে।
বিভোল উদাসী চাহিছ যেমন তোমার নয়ন পানে,
অতীজ্রয়ের স্নিগ্ধ-পুরুষ কোথা জানি মোরে টানে।

তার পরিণতি কোন পথে—কি ভাবে
হয় সাথী চিত্রে তাহার অপরূপ
প্রকাশ দর্শকগণ দেখতে পাবেন।

এই ছবিতে কানন এবং সাগরের
অনেকগুলি গান আটাই কাহনের নাচও
এতে দর্শক পাবেন। আমাদের মনে হয়
এদের এই নাচ গান দেখতেই দর্শক হয়ত
বারবার নিউ সিনেমায় আসবেন। সাথী
ছবিকে সকল দিক থেকে পরম আনন্দময়
করবার সকল চেষ্টাই করা হয়েছে, এবং

নিউ থিয়েটার্স এর জন্তে কোন কার্পণ্যই
করেননি।

বাংলার দর্শক নিউ থিয়েটার্সের ছবিকে
যে যে কারণে সমাদর করে থাকেন, সাথী
চিত্রে তার সবই পাবেন—এবং এও হতে
পারে, যতখানি আশা আমরা দিছি,
তার চেয়ে বেশীও অনেক কিছু পেতে
পারেন। সাথীর মুক্তি আগমপ্রায়।

শ্রীরাখালদাস চক্রবর্তীর আর্থিক সংখ্যান

জন্ম বিজ্ঞাপনদাতারা সত্বর ইউন

শুভ-উদ্বোধন .

উত্তরা

শনিবার

১২ই নভেম্বর



বি-এল খেমকার প্রযোজনায়

মেট্রোপলিটান

পিক্‌চাসের

সর্ব-রসমণ্ডিত

অনবদ্য নিবেদন

খনা

ভারতের এক মহিষী মারীর প্রেম ও আত্মবলিদানের অবিস্মরণীয় আলোচ্য! একদিকে—এক সর্বগুণ
বিকৃষিতা, নয়নানন্দময়ী যুবতী পত্নী, অশ্রুদিকে——ছিন্নিয়ার চক্ষে অজ্ঞাতকুলশীল এক যুবা—অন্তরে তার
পিতৃপরিচয় লাভ করিবার ছাণিবার আকাঙ্ক্ষা! * * * সিংহলের সাগর-সৈকতে যে প্রেমের সূচনা,
উজ্জয়িনীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ভুবন-বিখ্যাত নবরত্ন সভায় তাহার কী পরিণতি ঘটিল—
আপনি কল্পনা করিতে পারেন কি? নিজের শূণ্য সিংহাসনে ধাঁহার স্বর্ণ-মুতি প্রতিষ্ঠা করিয়া জ্যোতিষার্ণব
বরাহ জীবনকে ধ্বংস মানিল—কেন সেই নারী—কাহার অপরাধে—নিজের মাম বিসর্জন দিয়া সেই
শ্রেষ্ঠ সম্মান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল?.

খনা চিত্রে তাহারই সমাধান——হর্ষে ও বিষাদে, বিষ্ময়ে ও বেদনায়, মামা রসের আলোড়নে
আপনার চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলিবে।

শ্রেষ্ঠাংশে : অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া দেবী

তৎসহ আর একখানি হাস্য-রস-মধুর কৌতুক-চিত্র

অভিসারিকা

পরিচালক : ধীরেন গাঙ্গুলী

শ্রেষ্ঠাংশে : ডি-জি, সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মী

চিত্র-পরিবেশক

কাপুরচাঁদ লিঃ

শিল্পে জাতীয়তাবোধ

সত্যেন বারচৌধুরী

শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বা তাঁর গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেকেই অনেকবার নানারূপ বুলিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে পুনরুক্তি করা নিম্নপ্রয়োজন। ঐ কথাটা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, কোন দেশের বা জাতির উন্নতি নির্ণয় করা হয় তাঁর শিল্প ও সাহিত্য থেকে। বৌদ্ধযুগে কি ছিল, বিশরদেশটা পুরাকালে কিরূপ ছিল; আজ তাদের সভ্যতার পরিচয় পাচ্ছি তার শিল্প ও সাহিত্য দেখে। আজ সে যুগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার চিন্তাধারা সমস্তই বুঝতে পাচ্ছি তার সেই সময়কার শিল্প ও সাহিত্য দেখে।

অসীমের রূপকে সমীমে এনে দেখিয়ে দেওয়া যেমন আর্ট তেমনি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন ধারার বা ধর্মক্ষেত্রের মধ্য হতে যে সত্য ও সুন্দর গতি চলেছে তাকে প্রকাশ করাও তেমনি আর্ট। এই আর্টকে দুই পর্যায়ে ফেলছি—কাল্পনিক (Idealistic) ও বাস্তবীয় (Realistic)। কাল্পনিকের ভেতর ফেলছি সেই গুলিকে যা বাস্তবে আমরা দেখতে পাইনে, কল্পনার মধ্য দিয়ে অবাস্তবীয় যা দেখতে পাই বা অনুভব কোরতে পারি। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য আর্ট জ্বলের মাস্তবর অধ্যক্ষ অসিত বাবুর একখানা ছবির কথা উল্লেখ কোরছি—ছবিধানার নাম “রহস্যময় প্রকৃতি”। ছবিধানির বর্ণনা হচ্ছে—বিচিত্র মেঘের মধ্যে একটি মেঘের পীলাবিত্ত কবি।

প্রকৃতিটা যে রহস্যময়ী সেইটাই প্রকাশ কোরছেন শিল্পী এইখানে। মেঘটা হুবহু মেঘের মত হয়েছে কি না, মেঘটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঠিকতা (anatomy) ঠিকমত হয়েছে কি না সেদিকে দৃষ্টি দেন নি। এখানে দৃষ্টি দিয়েছেন শিল্পী তাঁর চিন্তাধারাটার উপর। শিল্পী যদি চিন্তাধারাকে প্রাধান্য না দিয়ে উপকরণের অনুকরণের দিকে লক্ষ্য দিতেন তা’হলে আসল বিষয় বস্তুটা নষ্ট হোয়ে যেত।

শিল্পী যে কোন বিষয়ে দেখাতে চান না কেন, তাঁর প্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে বিষয় বস্তুর বিশিষ্টতার উপর। শিল্পী আঁকছেন একটি ক্লবক দম্পতীর বিষয়, তখন তাঁকে যেতে হবে ক্লবক সমাজের মধ্যে, মিশতে হবে তাদের সাথে ঠিক তাদের মত হোয়ে, দেখতে হবে তাদের হালচাল। মনের ভেতর একে নিতে হবে তাদের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি; তারপর একে ফুটিয়ে তুলতে হবে ঠিক তাদেরই মত কোরে তাদেরই বিষয় বস্তুটা। তা নয় একটি সুন্দর ছেলেকে সাজিয়ে কোরলমি ক্লবক, আর একটি সুন্দর কলেজের মেয়েকে কোমরে কাপড় জড়িয়ে বানিয়ে দিলাম ক্লবক দম্পতী। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আজকাল আমাদের দেশের অনেক মাসিকে স্থান পেয়ে থাকে এইরূপ অনেক ছবি থাকে কোনদিক হ’তে আর্টের পর্যায়ে কলা যায় না। তেমনি হয়েছে এই দেশের

অনেক সিনেমায়। অনেক চরিত্র বা দৃশ্য দেখতে পাই যার সাথে শাস্ত্র বা সত্যের কোন সংশ্রব নাই। প্রাণহীন জীব যেমন এগুলিও যেন তেমনি। ছবি আঁকা যেমন সাধনার জিনিষ, ছবি নির্বাচন করা তেমনি। ছবি আঁকা বা নির্বাচন করা শুধু পুষ্টিগত বিজ্ঞায় হয় না। যার এ বিষয়ে বহুদর্শী অভিজ্ঞতা আছে, সেই সেটা গড়বে বা নির্বাচন কোরবে, সেইটাই হবে সত্য, সেইটাই প্রাণে লাগবে সকলের। অজ্ঞেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের

ডাঃ রেব বালামূত্র

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

‘দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশুদিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

জীবনী হ'তে আমরা সেইটাই প্রমাণ পাই। একদিন শরৎবাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করে- ছিলাম “আপনার বইতে যে সব চরিত্র স্থান পায়, এর মধ্যে কি কোন সত্য আছে?” তিনি ছুটি কথায় তা' বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—“দেখ! আমার জীবনের পথে মিশতে হয়েছে অনেক লোকের সাথে অনেক রূপে, তার মধ্যে আমি যা পেয়েছি সেইটাই প্রকাশ কোরবার চেষ্টা করি”।

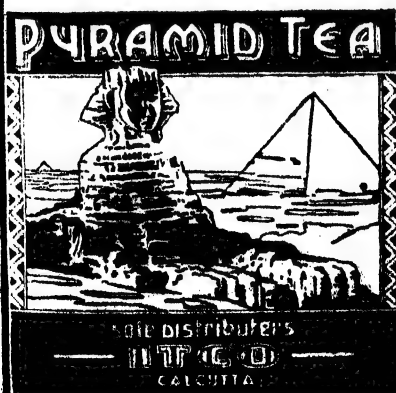
মূর্তি-চিত্র-শিল্পের (Portrait painting) পটভূমীর (Back ground) বিষয় বস্তু নিক্ষেপনে বেশীর ভাগ শিল্পীদের ঊদাসীন্ত দেখতে পাই। ইংরাজিতে একটি কথা আছে “পটভূমী মূর্তি-চিত্রের প্রাণ”। সে কথাটা আমরা কোন সময়ে চিন্তা করি না। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখতে পাই মূর্তি-চিত্রের পটভূমীতে বই, টেবিল, চেয়ার, পর্দা, কার্পেট; এগুলি থাকাই যেন নিয়ম। হয়ত এমন একটি লোকের ছবি যার সাথে বই বা লেখাপড়ার বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিল না অথচ তাঁর পাশে টেবিলে আঁকা রয়েছে গাদা গাদা বই, দোয়াত কলম ইত্যাদি। এই ছবিখানি তাঁদের বংশের চিরকালের একটি স্মৃতি হয়ে রইল। এদিকে তাঁর প্রপৌত্রেরা তাদের বাপ ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনে যে তিনি

লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই; কোবাকুবি নিয়েই পুজাহিন্দে সময় কাটিয়ে দিতেন। পরক্ষণেই সেই ছবি দেখেই ভাবছে “না”! এত সে লোক নয়! এ যে সাহিত্যিক। না হয় এর এমন কোন কাজ ছিল যাঁতে লেখাপড়া নিয়ে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হত। আমরা অনেক মূর্তি চিত্র দেখতে পাই যার সাথে তার প্রকৃতির বা পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের কোনই সংশ্লিষ্ট থাকে না। এই মিল না থাকায় চিত্রখানি যে কতটা অসত্য ও অশোভন হয় তা সহজেই অনুমান কোরতে পারা যায়।

• চিত্রশিল্পে জাতীয় বৈশিষ্ট্যতা আর একটি বিশেষ লক্ষ্য কোরবার বিষয়। প্রত্যেক দেশের বিখ্যাত শিল্পীরা তাঁদের শিল্পের মধ্যে এই বিশেষত্বটুকু রেখে গিয়েছেন। তাঁদের কল্পনা হয়ত বিশ্বজনীন, কিন্তু সেই কল্পনাকে সৃষ্টিয়ে তুলতে যে সব উপকরণ বা অঙ্কনের প্রয়োজন হয়েছে সেটা তাঁদেরই সমসাময়িক এবং তাদেরই দেশীয়। র্যাফেল যে বিশ্ববিখ্যাত “মাতৃমূর্তি” একে গিয়েছিল সেই মাতৃমূর্তির কল্পনাটা অবশ্য বিশ্বজনীন কিন্তু সেই বিশেষ মা ও ছেলে সেই দেশীয় ও সেই সময়কার তা আমরা দেখলেই বুঝতে পারি। এই ছবিখানিতে চিন্তাধারার প্রসারতার শক্তি যেমন পাচ্ছি তেমনি সেই সময়কার হালচাল, পোশাক

পরিচ্ছদ সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে আমাদের এই দেশীয় অধিকাংশ শিল্পীদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। শিল্পীর কল্পনাকে প্রকাশ কোরতে তাঁর নিজ দেশীয় অঙ্কনের বা উপকরণে যত সুন্দর ও স্বাভাবিক হবে, অল্প দেশীয় বা কল্পনার উপকরণ দিলে তেমন সুন্দর হবে না। বাঙ্গালীর হাতে বাঙ্গালার সুখ-দুঃখ যত সুন্দররূপে প্রকাশ পাবে অল্প দেশেরটা তত সুন্দর হতে পারে না। কারণ এটা সে তার নিজস্ব। এই নিজস্ব জিনিষটা প্রকাশ করা আরও বিশেষ করে উচিত এই জন্মে, কারণ আজ তাঁরা যে সৃষ্টি কোরছেন পরে সেটাই হবে এই দেশেরই গৌরব স্মৃতি ও ইতিহাস। তাই দেখে এখন বিচার করবে এখনকার ধারা। বাঙ্গালার হাতের জিনিষ বাংলারই হওয়া উচিত, সেটা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে এটা বাংলারই সৃষ্টি। বাস্তবীয় (Realistic) ছবিগুলির বিষয়বস্তু বর্তমান যুগের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি অবলম্বন কোরে সৃষ্টি কোরলে ভাল হয়। এই যুগের পর যে যুগ আসবে তারা এই ছবি দেখেই বুঝতে পারবে এখনকার গতি। এই ছবিগুলিও হবে তখনকার ইতিহাস। বাংলার শিল্পীদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে আমি বাঙ্গালী আমি বা সৃষ্টি কোরছি তা এই বাংলারই গৌরবস্মৃতি হয়ে থাকবে চিরকাল।

—:—



= পিরামিড চা =

চিত্তহারী সৌরভ, নরম তৃপ্তিকর বর্ণ, অভিনব স্বাদ

১ পাউণ্ড প্যাকেট মাত্র ১০ আনা

প্রত্যেক সম্ভব দোকানে সাদরে বিক্রিত হয়।

ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ফ্লাইড ক্রীট, কলিকাতা।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্তী

[অনেকদিন ধরেই আমার সাহিত্য জগতে নাম্বার সাধ ছিল, আজ তা পূরণ হলো। কিন্তু আমি আমার নিজের প্রতিষ্ঠার জন্তু যা কিছু না করবো, তারচেয়ে আমাকে কঠোর হবে একটা বৃহৎ কাজ, জানিনা কতটা সফলকাম হবো। তবে আমার মা, বোনদের কাছে আমার আশা রইল, যেন তাঁদের সমবেত-সহায়ত্বের অংশ আমার কাজের সাথে রাখান থাকে, আমার আশা তবে সাফল্যমণ্ডিত হবে ও এই জন্তু আমি চিরদিন আপনাদের কাছে থাকবো শ্লগি—জানিনা এই শ্লগের জন্তু আপনাদের আমি কতটা আনন্দ দিতে পারবো। কাজের কথা বলা যাক—আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা থাকবে কি করে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে পারি ও আমাদের দ্বারা দেশের ও দেশের কি উপকার সাধিত হতে পারে। বিশ্ব মানবের চক্ষে আমরা কি ভাবে থাকবো, বিশ্বের 'দরবারে' আমাদের দাবী কতটা ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে আমাদের প্রয়োজন কতটা—এই আদর্শ নিয়েই আমাদের আলোচনা চলবে বরাবর ও তাতে আপনাদের সাহায্য ও একান্ত প্রার্থনীয় ইতি—সম্পাদিকা: মঃ মঃ]

অনেক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে দেখতে পাওয়া যায়, মহিলা প্রসঙ্গকে হোটেলখানা করা হয়েছে। যেন এদেশের মা বোনেরা বিলেতি আদপ কায়দায় গা ঢেলে দিয়ে এই রান্না করা জিনিষটা বিক্রয়ের খাচার পুরে রেখেছেন—আর তাঁর উদ্ধার করা

হচ্ছে, কি করে, না, চপ, কাটলেট ইত্যাদি বিদেশীয় লোভনীয় সামগ্রীর পাক প্রণালী সংকলন। এতে হয়কি, আর হবে কি?

আমি অবশ্য কোন প্রতীবাদ এর কঠোর চাইনা, তবে এই জিনিষটা বিজ্ঞানমূলক পাঠ্য পুস্তকের মত মুখস্ত না করে, বাড়ীর বয়স্কদের নির্দেশনায় হাতে কলমে প্রতি দিন চেষ্টা করে দেখা উচিত নয় কি—কোন খারাপ কথা বলতে চাইনা, তবে অনেকেই জানেন যাদের হাক ডাক বেশী তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনার হয়তো "বেগুন ভাজতে হাত পুড়ে"—এইত অবস্থা। আপনারা অনেকে হয়তো মনে করছেন বা করতে পারেন আমি গায়ে পড়ে কাঁড়া কচ্ছি, ছিঃ, তা করবো না। আর যদি পারেন সে ভেবে আমায় কমা'না করলে আপনাদের একটা মহাপাপ হবে নিশ্চয় জানবেন। যাক বাজে বলে আমার উদ্দেশ্য ও সময়টা এভাবে নষ্ট করতে চাই না। আমার উদ্দেশ্য বর্তমানে আমাদের দেশের যেকোন পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের যে দিনগুলিকে আমাদের সামলাতে হবে তার দরুণ আমাদের এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে ও তাঁর প্রতিকারকরে আমাদের এখন থেকে কঠোর রুতে ব্রতী হতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, আমরাই এই বৃহৎ জাতীয় মেরুদণ্ড স্বরূপ। দেশের ও দেশের ভাল মন্দই আমাদের ভাল মন্দ। আমাদের শিকাই এই জাতীয় বুদ্ধি, আমাদের আদর্শতাই এই জাতীয় মুক্তির পথে, আমাদের কার্যকুশলতা ও সহায়তাই

এই জাতীয় বলবীর্ঘ্য—ভাবতে হবে আমরাই এক একটা অগ্নিকণা আর এই বৃহৎ বিশ্বটা একটা অগ্নিকুণ্ড। এ জাতীয় স্মৃতি হৃৎকের ভার আমাদেরই সহিতে হবে। এই দেশের বীর সন্তানদের পিছনে আমরা থাকব অভয়রূপে। এদের মুক্তির পথ দেখাবার ভার, আমাদেরই। এদের পূজার অর্থ্য সাজিয়ে দেবার ভার আমাদেরই। আমাদেরই হতে হবে অগ্রণী। যে দেশের নারীজাতি শ্রমশীলা পারদর্শিনী ও কর্মে সদা জাগ্রতা সে দেশের স্মৃতিও সদা জাগ্রত। কিন্তু তাবলে আমাদের ভাই ও সন্তানদের সংগ্রাম থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে দেখলে শুধু অঁকলে চক্ষু মুছলেই হবেনা, এদের দিতে হবে এমন ধারা মন্ত্রনা যাতে করে এরা বিজয়ীর গৌরব মালা পরে আমাদের মধ্যে ফিরে আসে।

সে দিন আর আমাদের নাই। বিদেশী সাজ সজ্জায় নিমগ্ন থাকলে চলবে না আমাদের সাজতে হবে আজ নতুন সাজে। যাতে বিশ্ব সাহিত্যের প্রতি পংক্তিতে ভারত রমনীর গৌরব গাথায় ভরতি থাকে। জাগ—জাগ—এই আমার কামনা।— যাক—এই সংখ্যায় এইখানেই যবনিকা টেনে দিলাম। পরবর্তী সংখ্যা থেকে আমাদের কিতাবে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করি। আপনাদের মতামত ও সহায়ত্ব চাওয়া রইলো।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের ঢা

সাহিত্য ও উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়

অন্ধকার

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া লবঙ্গ দেখিল, একটি শ্রামাঙ্গী স্থলকায়্য যুবতী দরদালানের সম্মুখের ঘরে বসিয়া, সম্মুখে আরদি খুলিয়া কেশ বিভ্রাস্ত করাইতেছে। একটি প্রোটা রমনী পশ্চাৎদিকে হাঁটু গাড়িয়া নানা অঙ্গভঙ্গিতে তাহার চুলের রাশি বাধিয়া দিতেছে। লবঙ্গ দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিল, এই শ্রামাঙ্গী যুবতীই তাহার দপস্বী এবং পশ্চাদ্বর্ত্তিনী রমনী কোনও দাসী হইবে। লবঙ্গকে দেখিয়া শ্রামাঙ্গী বক্রকটাক্ষে জিজ্ঞাসা করিল : তুমি কে গা ?

লবঙ্গ বলিল : আমায় চিনবে না। আমিও তোমার মত এ বাড়ীর একজন অংশীদার।

শ্রামাঙ্গী ঘৃণাসূচক ভ্রূভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : তার মানে ?

লবঙ্গ বলিল : মানে খুব সহজ। তোমার আগে, তোমার কর্তা আর একটি বিয়ে করেছিলেন, জান ?

—হ্যা, শুনেছি বটে।

—আমিই সেই।

শ্রামাঙ্গী লবঙ্গকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মুখ বঁকাইয়া বলিল : তা, প্রথানে কেন ?

লবঙ্গ প্রত্যুত্তরে বলিল : তুমি যে ছোরে এখানে এসেছো, আমিও সেই ছোরে এখানে এসেছি।

শ্রামাঙ্গী অবহেলাভঙ্গিতে বলিল : ওঃ ! সেই ছোর।

লবঙ্গ উত্তর করিল : হ্যা, জোরটা যতটা কম ভাবছো, ততটা কম নয়। তুমি আমার চেয়ে ষয়সে অনেক ছোট, কাজেই মানুষের সমাজে বয়সের পার্থক্যের যে মূল্য আছে, সে মূল্যের আমি অপমান করছি না, এ অঙ্গীকারটা তোমায় দিতে পারি।

—তুমি ত সতীন ! সতীন নাকি আবার ভাল হয় ?

—ভাল হয় না এইটেই দেখে এসেছো, এবং শুনে এসেছো ! কিন্তু ভাল যে হতে পারে, এটুকু কেন ধারণা কর্তে পারো না ?

—ভালই যদি হবে, তবে যেখানে ছিলে, সেখানে ছেড়ে এখানে এলে কেন ? সেইখানে থাকাইতো সব দিক দিয়ে ভাল হতো !

—আমার ভাল হতো বটে ! কিন্তু আমার নামের বড় ক্ষতি হতো।

পশ্চাদ্বর্ত্তিনী যে রমনীটি কেশ প্রসাধনে ব্যস্ত ছিল সে এতক্ষণে কথা কহিল : অগত্যভাবেই যেন বলিল, নাম বেরোতে বড় বাঁকি আছে কিনা। আমরাও সব শুনেছি।

এই গায়েপড়া অসভ্য রমনীটির মুখে এত বড় উচ্চকথা শুনিয়া রাগে লবঙ্গর সমস্ত শরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু স্থানকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া লবঙ্গ অসামান্য ধৈর্য্য সহকারে মনের উত্তেজনা মনোমুখ্যেই দমন করিল, এবং অতি শাস্ত ভাবে বলিল : দেখো বাছা ! কাকর বিধির ভাল করে না কেনে, তার নিন্দা করো না। এটা আর কেউ সহক, ভগবান

সর না। ভগবানকে মানো তো ? না, তাও মানো না ! তার নামেও কুংসা রটিয়ে বেড়াও।

লবঙ্গর এই শাস্ত উপদেশপূর্ণ বাক্যে সে একটু দমিয়া গেল। সে নম্রবরে বলিল : আমি আর কি জানি বলুন। পাঁচজনে বলে, তাই আমিও বললুম।

লবঙ্গ আবার বলিল : আমি যদি বলি, পাঁচজনে বলে তুমি বাড়ীর ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে মুরগি খাও, তাহলেই সে কথাটা সত্যি হবে ?

মুরগীর নাম শুনিবামাত্রই যি তাহার পার্শ্বে খুৎকার ফেলিয়া বলিয়া উঠিল : মাগো ! আমি মুরগী খাই কিগো ? ওমা কি ঘেন্না। তুমি-আপনি এমন কথাটা আমায় বললে ?

লবঙ্গ বলিল : তাহলেই বোঝো, পরকে বিনা দোষে নিন্দে করলে কত বড় অজ্ঞায় হয়।

ঝগড়াটা প্রায় মিটমাট হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু শ্রামাঙ্গী প্রভুপত্নীর বাধায় তাহা হইতে পারিল না। তিনি হঠাৎ গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন : আমি আরও চার পাঁচ জায়গায় শুনেছি তুমি কল্কাতায় কোন্ বাবুর বাড়ীতে,—

—বাবুর বাড়ীতে কি ? বলো, কথাটা শেষ করো !

সে কথা কি আবার মুখে আনা যায় না কি ? আমরা পাঁচ জায়গায় শুনি, তাই বলছি !

লবঙ্গ ধৈর্য্য সামলাইতে না পারিয়া চোঁচাইয়া বলিয়া উঠিল : কোন কথাটা কোথায় গিয়া কতদূরে হাঁটুয়, চিয়কাল পরীক্ষায়ে প্রতিপালিতা হইয়া ইহা তাহার আজনা ছিল না। দেখ ছোট গিন্নি ! আজ ভগবান তোমার দয়া করেছেন, তাই তুমি আমাকে নিঃসহায় পেয়ে যা তা বলে নিচ্ছ ! কিন্তু মনে রেখো, কোনও

মিথ্যা কথা জনরবের জোরও টেকে না, কিংবা বক্তার উচ্ছ্বাসের জোরেও বাহাল হয়ে যায় না।

ছোট-গিন্নি তর্জন করিয়া উঠিয়া বলিল : মিথ্যে বলা? কে বলে একথা মিথ্যে ওই দস্তদের বাড়ী চলতো, আমি ভজিয়ে দেই।

—তারা কি করে জানলে।

—তা কি করে জানবো। কোনও রকমে জেনেছে, বোধহয়।

লবঙ্গ তখনও ঠাণ্ডা থাকিয়া বলিল : ছোট গিন্নি। এই 'বোধহয়'এর ওপর একেবারেই নির্ভর করো না। এগুলো একেবারেই রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া। এগুলোর না আছে কোনও কুলুজি, না আছে কোনও সঙ্গম। এগুলোকে বিশ্বাস করলে, শুধু যে সব সময় পরকে গালি দেয়ার সুবিধা পাবে তা নয়, নিজেকেও অনেক সময় সেই গালির ভেতরে জড়িয়ে পড়তে হবে।

—পাঁচজনে যখন তোমার নামে এমন করে বলে, তখন গেরস্থ ভদ্রলোকের বাড়ী তুমি থাকবে কেমন করে?

—আমার কথা ভেবো না, ছোট গিন্নি। আমি ছদ্মবেশে আবার সব উল্টে দেবো। ওসব শোনা কথা বইতো নয়?

—যতটা রটে, তার খানিকটা শু বটে। তুমি বললেই লোকে বিশ্বাস করবে কেন?

—লোকের সঙ্গে আমার বাহ'ক একটা বোঝা পড়া হবে এখন। সে ভেবে তুমি আর তোমার কচি মাথা পাকা করে তুলো না। তার চেয়ে বরং চুলটা বেঁধে নাও। আমি পুকুরঘাট থেকে হাত পা ধুয়ে আসি।

—তুমি কি সত্যি সত্যিই এখানে থাকতে এসেছো নাকি? ওমা। কি ঘেন্না। বউমামুষ কি আবার যেতে স্বপ্নের বাড়ী আসে নাকি?

—আচ্ছা ঘেন্নাটা না হয় হজম করলুম। ঘেন্না জিনিষটা মানুষের কাছে নতুন নয়, পৃথিবী ঘেন্নাতেই ভরা। সেইগুলোই মানুষের জমিকে উর্বর করে। তুমি এখন একটু ঠাণ্ডা হও দেখি, তোমার নিজের ঘরের কোণে ঐ ছুর্গন্ধটাকে আর বাড়িয়ে তুলো না।

লবঙ্গ আর কিছু না বলিয়া তাহার পুটলি হইতে একখানা গামছা বাহির করিয়া পুকুরঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। যাইবার সময়ে বলিয়া গেল : ছোট-গিন্নি, আমার ওপর রাগ আছে বলে, আমার বাস্তু তোরঙ্গ পুটলিটার ওপর তোমার রাগ ফলিও না। ওগুলো নেহাৎই নির্দোষ।

(ক্রমশঃ)

তখন আসিও

শ্রীভট্টকুমার ঘোষ

এখনো আমার মনের বনেতে

জাগিয়া বহি-শিখা—

ক্ষমা চাহিব না বরণ করেছি

কপালে যে বাধা লিখা !!

তুমি যে আশ্বিন সেতো জানা আছে

আমিও অগ্নি কণা।

আমার 'গরব'তুলিয়া ধরিব,

তুলিব যখন ফণা—

বেদনা আমার কাঁদিয়া হবে গো

তোমারী অমুরাগী,—

তখন আসিও প্রিয়।

তোমার বাঁশীর সুরে সে আমার—

'গরু' ছিনা'য়ে নিও !!.....

এলিয়ে যখন পড়িবে আমার

জীবনে সাক্ষা-ছায়া,

মুদিয়া যখন আসিবে নয়ন—

ওপারে টানিবে মায়া—

আমার "আগিরে"—হারিয়ে ফেলিব

দেহেরো' উর্দ্ধে জাগি'—

তখন আসিও প্রিয়।

আমার ক্রান্ত অতল তলুতে

হ'বাহ বাড়ায়ে দিয়ো !!.....

ফোন ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের
তেল ব্যবহারে
বেরি বেরি হয় না

মিল-২৪৬, তাপার সারকুলার রোড - কলিকাতা।



অসুস্থ
শরীর



দুস্থ ও শব্দ

করিতে



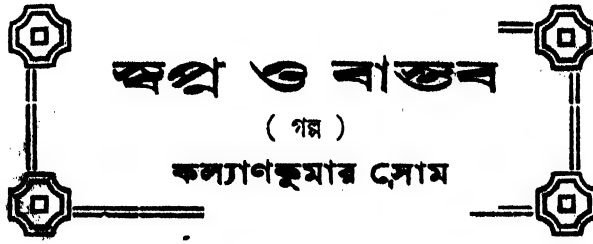
সিরোলিন

'রাচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সর্দি, কাশি এবং ঘস্মার
প্রথম অবস্থায় প্রেপ্ত ওষধ।





সুপ্রিয় কবি; ইদানীং সে কবি হিসেবে খুব খ্যাতি লাভ করেছে। কবিতা লিখে সে রাত্রি-বেলায়; যখন ঘুমিয়ে পড়ে সারা পৃথিবী, যখন নীরব হ'য়ে যায় জগতের সব কল-কোলাহল আর সারা জগত জুড়ে নেমে আসে একটা সুগভীর প্রশান্তি,—তখনই সুপ্রিয় লিখতে বসে। এমনি নীরব, মৌন-আবেষ্টনীর মাঝেই ওর কবিতার প্রেরণা আসে : জগতের যতো হৃদ, কল্পনা আর গান—সব ভির ক'রে আসে 'ওর' মনে। সে তখন হ'য়ে লিখতে আরম্ভ করে; তার বর্ণা-কলমটা ছুটে চলে কাগজের ওপর দিয়ে বিজয়ী বীরের মতো।

আজ-ও সুপ্রিয় লিখতে বসেছে এমনি আবেষ্টনীর মাঝে। বাতির উপর নীল শেডটা টেনে দিয়েছে। টেবলের সামনের দিকের জানালাটা খোলা; সে জানলার ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে নানারকম ফুলের সুন্দর-মধুর গন্ধ। বাইরে জ্যোৎস্না : সারা পৃথিবীর উপর উপচে' পড়ছে জ্যোৎস্নার আলো। এই চক্সিল নিঃশব্দ-তার মাঝে বলে' লিখতে সুপ্রিয় খুব ভালো লাগে।

পাশের বাড়ীর ওই পূর্বের ঘর হ'তে ভেসে আসছে কা'র'গুললিত গানের সুর। সুপ্রিয় চিন্তে পড়লে এই সুর। নীলা গাইছে গান। নীলা। নীলা।—কী কলহাস, কী স্মৃতি-মধুর নাম। নীলা সুপ্রিয়র বন্ধু সুদর্শনের কন্তো অন্তর্ভুক্ত ছিলো। নীলা সুপ্রিয়, অল্পম তার সৌন্দর্য। নীলার

সাথে কথা কইতে সুদর্শন এতো আনন্দ পেতো। নীলা যখন সুদর্শনের সাথে কথা কইতো, তখন ওর সুবন্ধিম ক্র-দুগল, হাসিমাখা অধরপুট আর নয়নে কালো দুটি তারা নেচে উঠতো। সুদর্শনের হৃদয়-বীণায় বেজে উঠতো বিচিত্র সুর।

আজ সুপ্রিয়র মনে পড়লো তার বন্ধু—অতিপ্রিয় বন্ধু সুদর্শনের কথা।

ক'দিন আগে একটা কাজে সুপ্রিয় শিলচর গিয়েছিলো। বিকেল বেলা রাস্তা দিয়ে চলেছে; অজস্র লোকের ভীড়ের মাঝে একজন লোক হঠাৎ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো : এক খানি চেনা-চেনা মুখ, ওই সামনের রাস্তা ধরে চলেছে! গালে ওর লম্বা লম্বা দাড়ি জমেছে, অনেকদিন কামায়নি। গায়ের জামায় অজস্র তালি লাগানো; পায়ের জুতোটা ছেঁড়া।... সুপ্রিয় চিন্তে পারলো লোকটিকে। সে দৌড়ে ওর কাছে 'গিয়ে ডাকলো : সুদর্শন!

সুদর্শন কিরে তাকালো। সুপ্রিয়র পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো; তারপর বলে উঠলো : সুপ্রিয়?

সুপ্রিয় আবেগে বছর গলা জড়িয়ে ধরলো।

সুদর্শনের সাথে সুপ্রিয়র প্রায় সাত-আট বছর পর দেখা হোলো। এই সুদীর্ঘ সময়ের অবকাশে সুদর্শনের স্থিতি সুপ্রিয়র মনের আকাশে অনেকটা নিশ্চয় হ'য়ে আসছিলো। অতীতের স্থিতি, অনেক হারিয়ে-বাওয়া কথা একমুহুর্তে ভেসে উঠলো সুপ্রিয়র চোখের সামনে।... ছেলে-বেলা হ'তেই

সুপ্রিয়র সাথে সুদর্শনের বন্ধুত্ব ছিলো। তাদের কৈশোর ছিলো কল্পনার রঙে রঙীন, স্বপ্নময়। নতুন যৌবনের বিজ্ঞ-আলো রাঙিয়ে দিয়েছিলো তাদের জীবনকে অল্পম দ্যুতিতে। তারা তাদের সামনে দেখতে পেতো সুন্দর, নিঃসৌম জীবন; যে-জীবনে আছে আলো, আছে মাধুর্য, আছে সৌন্দর্য : যে জীবন রহস্তে ঘেরা, যে—জীবনের গতিতে দুঃখের শীতল হাওয়া দোল খায়না। হুবহুই ছিলো কবি-প্রকৃতির। প্রভাতে পূবাকাশের অরুণোদয়, সন্ধ্যার রক্তিম আলোর বল্মল পৃথিবী, সন্ধ্যাতারার মৌন-সংগীত, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর অনাবিল গুপ্ততা ওদের মনে জাগাতো আনন্দের সুর : এই বিশ্বয়-পুলক মুগ্ধতার মাঝে ওরা ভুলে' যেতো আপনাকে, নাম-না-জানা এক অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জেগে উঠতো ওদের মনে। সুদর্শন ছিলো একটু বেশি ভাব-প্রবণ। প্রকৃতির লীলা-চঞ্চল রূপে বিমুগ্ধ হ'য়ে সে লিখতো সুন্দর কবিতা। সুদর্শন বাস্তবতার কোনো বেদনা সহ করতে পারতো না : এমনি কোমল ছিলো ওর মন। সে জগত জুড়ে' খুঁজে বেড়াতো অনাবিল আনন্দ। ওর সৌন্দর্য পিপাসু অন্তর ঘুরে' বেড়াতো আনন্দের সন্ধানে,—যে আনন্দ হ'বে ওর জীবনের পাথর।...

—কেমন আছিস সুপ্রিয়?—সুদর্শন শুধালো : কী ভাবচিস্ তাই।

সুপ্রিয়র চিন্তার ফিল্ম মাঝ-পথেই গেলো ছিড়ে। সুদর্শনের এই অবস্থা দেখে' বিবাদে ভূরে উঠলো 'সুপ্রিয়র অন্তর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুপ্রিয় বললো : আমি ভালোই আছি তাই। তোর খবর কী বলতো? কী করচিস্, আজকাল?

—কী করচি আজকাল?—সুদর্শন হাসবার চেষ্টা করলো। কথা চেষ্টা; তার মুখের উপর হাসির কয়টি কীণ-রেখা ভেসে

উঠে' মুহূর্তেই মিলিয়ে গেলো : বিশেষ কিছুই করচিনে। আর, কেমন আছি তা' তোর না-জানাই ভালো, বন্ধু!

—তোর কথা আমাকে-ও বলবিনে, দর্শণ? সুপ্রিয়র গলা ভারী হ'য়ে এলো।

ততোকণে ওরা একটা পার্কের পাশে এসে পড়েচে। সুদর্শণ খানিকটে ভেবে বললো : আচ্ছা, শোন তবে!...

—চলু ঐ পার্কে গিয়ে বসি।—সুপ্রিয় বললো।

দু'বন্ধু পার্কের একটা বেঞ্চের উপর বসলো। সুদর্শণ ব'লে চললো তার জীবনের বেদনা-ভরা ইতিহাস। সুপ্রিয় বুঝতে পারলো, সুদর্শণের বুকের ভেতর কল্লোল তুলেচে ব্যথার একটা অবরুদ্ধ বজা।

—তোর বোধ হয় মনে আছে সুপ্রিয়, —সুদর্শণ বলতে লাগলো : বি, এ, পাশ করার আগেই আমাকে কলেজ ছাড়তে হ'য়েছিলো; হঠাৎ বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে বাড়ি চ'লে গেলাম। বাবার যা' আয় ছিলো, তা' দিয়ে তিনি বেশ জমি-জমা করেছিলেন; তা'তে খুব স্বচ্ছন্দেই আমাদের দিন চলে যেতো। আমি বাবার তুর আগে টাকা-পয়সা সম্বন্ধে তাই কোনই চিন্তা করিনি। কিন্তু বাড়ি এসে শুনতে পেলুম, বাবা অনেক টাকা ঋণ করে-ছিলেন; এবং তা' শোধ করা হয়নি। আমি বাবার সব ঋণ শোধ ক'রে দিইুম; তখন আমাদের রইলো শুধু ভিটে-টা এবং সামান্য কিছু ক্ষেতের জমি। এ-সব থাকলেও আমি কোনোমতে চালিয়ে নিতে পারতুম।—এই পর্যন্ত বলে সুদর্শণ একটা সীরাঁস ফেলে একটু থামলো। তারপর আবার বলতে লাগলো : কিন্তু তা' হোলো না। গ্রামের জমিদারের নায়েব হরিশ চৌধুরী ক'দিন ধরে অবাচিত ভাবে আমার খুব সহায়কুতি দেখা'তে লাগলেন।



লি-লি
—তবে—
লি-লি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লি-লি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ৩ : ১ লোহাছাই

শেষে একদিন তিনি নিজের অভিপ্রায়টা ব'লে ফেললেন : তিনি আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন। তুই তো জানতিসু সুপ্রিয়, আমার একটা প্রতিজ্ঞা ছিলো যে, যতোদিন পর্যন্ত আমি উপার্জনশীল না হই, ততোদিন পর্যন্ত বিয়ে করবো না। তাই আমি হরিশ্চবুর অমুরোধ রাখতে পারলুম না। তিনি আমাকে অনেক টাকা দিতে চাইলেন; কিন্তু আমি রাজী হলাম না। শেষে তিনি খুব রেগে গেলেন, এবং আমায় শাসিয়ে দিলেন : বটে! খুব স্পর্ধা হ'য়েচে তো! আচ্ছা, আমি তোমায় উপযুক্ত শিক্ষা দেবো!

তারপর তিনি আমার নামে জমি-জমা নিয়ে মিথ্যে মোকদ্দমা রুজু করলেন; মিথ্যে সাক্ষী জোটালেন। ছেলেবেলা হ'তেই আমি শহরে ছিলাম; গ্রামের লোকদের সাথে বিশেষ পরিচয় ছিলো না। আর পরিচয় থাকলেই বা কী লাভ? সবাই যাবে নায়েবের পক্ষে; তিনি টাকার জোরে এবং ভয় দেখিয়ে তাদেরকে স্বপক্ষে টেনে নিলেন। আর তাই, আমাকে দাঁড়া'তে হোলো রাস্তায়। মহাবিপদে পড়লুম; মা এবং ছোট ভাই-বোনদের কী শেষে না খাইয়ে মারবো! অবিশ্রি, অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছেই সাহায্য চাইতে পারলুম; কিন্তু চাইলুম না।...শেষে অনেক চেষ্টা ক'রে এখানের

একটা অপিসে সামান্য বেতনে একটা কেরানীর কাজ পেয়েচি।

সুদর্শন খামলো। তার করুণ চাহনিতে তার প্রতি অঙ্গে যেন ফুটে' উঠেচে বেদনার আভাস।

—তারপর?—অশ্রুধ্ব-কণ্ঠে শুধালো সুপ্রিয়।

—তারপর?—সুদর্শন জবাব দিলো : তারপর আর বলবার কিছুই নেই ভাই! এই তো আছি!

সুদর্শনের বুকের ভেতর হ'তে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস।

সুদর্শনের বেদনা-ভরা কাহিনীতে, সুপ্রিয়র হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো ব্যথায় টন্-টন্ ক'রে উঠলো। এই কী সেই সুদর্শন? সুদর্শন যে ছিলো ভাব-বিলাসী কবি; তার ছিলো ছন্দের পথ, কাব্যের পথ, সঙ্গীতের পথ! নব-যৌবনের মদির হাওয়ায় সে অমুভব করতো স্বপ্নময় রোমাঞ্চ। কল্পনার তৃতীয়-নয়ন দিয়ে সে করতো অমুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি। ওর দেহের সেই কমনীয়তা হারিয়ে গেচে; সেই রক্তিমাম্র কপোল আর নেই; মাংসল জায়গায় ভেসে উঠেচে ক'খানা কৃষ্ণ হাড়ের চিহ্ন। সুদর্শনের চোকের সেই অপূর্ণ দীপ্তি নিস্রুত হ'য়ে গেচে! কোথায় সেই সুশ্রী, প্রতিভাসমুজ্জল যুবক? সে কি আর বেঁচে'নেই?...?

বিষাদের রিক্ততায় ভ'রে উঠলো সুপ্রিয়র সারা অন্তর।

গান

শ্রীমালিক চট্টোপাধ্যায়

তোমার মুখের ঘোমটাখানি

বন্ধু আজি খোলো,

'আমার মনের নীরব বাণী

মুখর ক'রে তোলা।

পলাশ বনে রঙ লেগেছে

মৌমাছি'রা তাই মেতেছে

বকুল শাখে দোলনা'তে

(আজ) আমার সাথে দোলে

যে ছুখ্-তুমি সহিলে প্রিয়

আজকে তারে তোলা

তোমার মনের গোপন কথা

আমায় তুমি ব'লো।

ফাস্তুর খায় চৈত্র আসে

বন যে কাদে দীর্ঘশ্বাসে

আমার মনের স্বপ্নটুকু—

সফল ক'রে তোলা।

পাশের বাড়িতে নীলার গান তখন শেষ কলিতে এসে পৌছেচে :

'ছ'থের রাতে নিখিল ধরা, যেদিন করে বঞ্চনা, তোমারে যেন না করি সংশয়।'

সুপ্রিয়র চোকে নেমেচে অশ্রুর উজ্জ্বল-বহা। অশ্রুতে ঝাপসা হ'য়ে এলো ওঙ্ক'ছ'চোক।

সুপ্রিয়র আজ কিছুই লিখা হোলো না।

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১০৬এ, আন্তোব নবাবী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান ভবানীপুর

প্রতিভার অপমৃত্যু

ত্রিনির্মল কুমার স্মরণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে। চপল যেন এক নতুন জগতে এসে পৌঁছেছে। অপরিচিতা তরুণীর সাথে, একই গাড়িতে, একই আসনে ও এই প্রথম চলেছে। জীবনে ট্যাক্সিতেই উঠেছে ও খুব কম, গুণে বলতে পারে ক'বার। দোতলা বাসের মাথায় উঠে সামনের বেঞ্চে বসে চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে ওর একটা বিলাস। ওর সীটের পাশে কোন কোন দিন কোন অপরিচিতাও হয়তো উঠে থাকবে, কিন্তু সেদিকে ও একেবারে অন্ধ। সারা দেশের লজ্জা যেন ওর ঘাড়ে এসে আশ্রয় করে। সোজা চোখ রেখে ও চুপ করে চেয়ে থাকে সামনের দিকে, আড়ষ্ট হয়ে। তারপর টিকিটের মেয়াদ ফুরাতে না ফুরাতেই; গন্তব্যের অনেকখানি আগে নেমে পড়ে। দোকানে কাপড় কিনতে গিয়ে মেয়ে খরিকার দেখলে ও পালিয়ে আসে চুপি চুপি, পাছে ওকে কেউ দেখে ফেলে। এই ওর স্বভাব।

মীরার পাশে বসে ও নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে দেখতে চায়—এই ওর ভালো লাগছে কিনা। ও নিজের প্রশ্নের ভেতর ডুবে যায়, অস্ত্রের সান্নিধ্য ভুলে।

—এই রোকো খোড়া।— ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার ধারে। চপল তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে যায়।

মীরা ওকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলে—ওকি উঠছেন যে। এতো মৌলানীর

মোড় বসুন একটু; আমি একটা জিনিষ নিয়ে আসি এদের দোকান থেকে।

ও নেমে যায়। চপল তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। নাঃ ওর চোখটাও হয়ে উঠেছে আজ অবাধ্য। কিছুতেই ও তাকাবেনা, ও ঘাড় নীচু করে বসে থাকে।

—মীরা ফিরে আসে অলক্ষণের মধ্যেই। ওর দিকে তাকিয়ে বলে—কি ভাবছেন?

—কই না তো—

—আপনার সময়ের বড় অপব্যবহার করছি—নয়?

—আমি কি তাই বলেছি?

—সব জিনিষই কি আর মুখের কথায় বুঝতে হয়?

—কই! আমি তো বেশ আছি।

—দেখে তাতো মনে হচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে আপনি ঠিক স্বাভাবিক নন। বিরক্তির ছায়া পড়েছে আপনার মুখে।

—তা কেন? আপনার সাথে আলাপ করে বরং খুসীই হয়েছি।

সত্যি? ধন্য হলাম। ভায়নক কষ্ট দিলাম আপনাকে—নয়?

—কি যে বলেন। আমি তো তা বলিনি একবারও। মনেই হয়নি কোন কষ্টের কথা।

মীরা চোখ বুজিয়ে নিয়ে বলে—আঃ বাঁচলাম।

আঁচলটাকে গুটিয়ে নিয়ে ও চপলের সামনে দিয়ে এসে ওর পাশে বসে পড়ে, মধ্যে একটুখানি কাঁধ রেখে। সকল

জো আছে। ভক্ততাকেও তো কান দেওয়া যায় না।

ওর গা থেকে ছড়িয়ে পড়ে দোকান থেকে সন্ত কেনা দামী সেন্টের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ ওর সখ চেপেছে।

গাড়ী এসে মানিকতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চপল তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে। নমস্কার করেই ও সোজা চলতে আরম্ভ করে। ওর যেন কি ভুল হয়ে যাচ্ছে সর্বদাই—ও ভেবেই পায় না। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে—আপনার ঠিকানাটা।

—‘তবু ভাল’—মীরা বলে। এরই মধ্যে সম্পর্ক চোকান'র ব্যবস্থা করেছেন যে—

—বাঃ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে। ভুল করাইতো মানুষের স্বভাব।

—তা বটে, বিশেষ করে আপনাদের মত গুণীলোকদের স্বভাব। কিন্তু দয়া করে মনে রাখবেন ঠিকানাটা। আর না হয় লিখেই দিচ্ছি। দেখবেন যেন ভুল করে ওটাও রাস্তায় ফেলে যাবেন না। আপনার বাড়ীর নম্বরটা তো ২৮ নং? আমার খুব মনে থাকবে। আমাদের সেক্রেটারী মৃণাল বাবুর কাছেই জানতে পেরেছিলাম ওটা, আর এখনও পর্যন্ত ভুলিনি তাও দেখছি। হ্যাঁ আমাদের ফোন নাম্বারটাও রেখে গেলাম ওই সঙ্গে। দুপুরের দিকে বাড়ীই থাকি ছুটির দিনে। প্রয়োজন হলেই ডাকবো বিরক্তি বোধ করলেও রেহাই দেব না। আর নিজেই এসে যদি হানা দিই আপনার বাড়ী—চটে যাবেন তো?

চপলের চোখের সামনে ওর মার মুক্তি ভেসে ওঠে। এই নাকে জিজ্ঞাসা না করে ও কোন্ কান্নাই করতে পারে না। নাকে ও বসন্তের আলে ভাতে মুখে

তিনি কোনদিন মানা করবেন না। কিন্তু মনে মনে কি ভাববেন তা তিনিই জানেন। হুনিয়ায় একমাত্র মাকেই ও চেনে—তাই কোন কথাই মার কাছে গোপন রাখে না। ও ভাবে যা কি এই ধরণের মেয়েদের পছন্দ করবেন?

আর একটু সময় কেটে যায় নিঃশব্দে।

মীরা আবার 'জিজ্ঞাসা' করে কই বললেন না চটে যাবেন কিনা?

ও বলে—মাছের বাড়ী মাছ গেল কি কেউ কোনকালে চটতে পারে?

—পারে বইকি চপলবাবু, কিন্তু আপনি বিরক্ত হবেন কিনা তাই বলুন।

—তা কেন হব। বরং খুসীই হব।

—তাহ'লে অভয় দিলেন?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আচ্ছা নমস্কার— বলে চপল পা বাড়ায়। হঠাৎ আবার ফিরে বলে (ওর বুদ্ধি যেন ফিরে এসেছে) —ভারী কষ্ট দেওয়া হলো আপনাকে, এতদূর টেনে এনে। কিছু মনে করবেন না।

মীরা বলে—কষ্ট তো বরং আমিই দিলাম আপনাকে। ও কথাটা তো আমারই বলা উচিত ছিল।

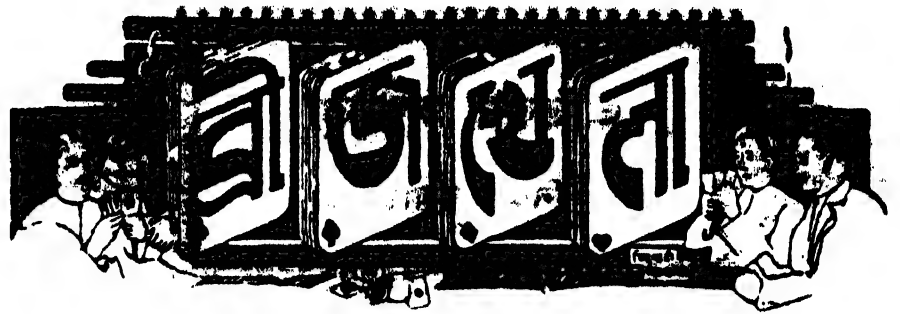
—তা কি করে হয়? বাড়ীর দরজা পর্যন্ত আনলাম টেনে আপনাকে, ফিরতে আপনার কত রাত হয়ে যাবে, 'দেখুন দেখি। বাড়ীতে হয়তো আপনার মা আপনাকে কত বকবেন (ও নিজের মার সাথে মিলিয়ে বলে)

—একটু বহুনি না হয় খেলামই, কিন্তু আজ যা লাভ করলাম, তার সন্ধান তো তিনি রাখবেন না?

—লাভ?—

—হ্যাঁ, তাইতো। আপনার সাথে বনিষ্টতা, সেকি কম লাভ?

—আচ্ছা আরিও তো সে কথা বলতে পারি?



হুহুহাসা

ডাকদার হয়ে দুটি হাত খেলানো আর প্রতিরোধকারী হয়ে সেই খেলাটিকে নষ্ট করা যদিও মূলতঃ এক,—তবু অধিকাংশ সময়ে প্রতিরোধকারীকে অত্যধিক পরিমাণে মস্তক পরিচালনা করতে হয়। ডাকদার তাস ফেলা থেকেই দেখতে পান যে তাঁর খেলা কতদূর যেতে পারে বা তাঁর ডাকাহুয়ারী খেলা করা সম্ভব হতে পারে কি না। কিন্তু প্রতিরোধকারীকে এই বিষয়ে চিন্তার দ্বারা, ডাকের দ্বারা আর ডাকদারের খেলার কৌশলের দ্বারা ধরে নিতে হয়। অধিকাংশ সময়ে প্রতিরোধকারীর অসাবধান খেলার দরুণ ডাকদার খেলা করে নেন। এইজন্ত প্রথম থেকেই

প্রতিরোধকারীকে ডাকদারের খেলার চালনাটি বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা দরকার। নিম্নের খেলাটি দেখলে অনায়াসে আপনারা বুঝতে পারবেন যে প্রতিরোধকারী কিরূপ চিন্তা করে ডাকদারের খেলাটি নষ্ট করলেন,

ইস্কাবন—দশ, পজা।

হরতন—টেকা, সাহেব, তিরি।

রুহিতন—টেকা, বিবি, গোলাম, নয়, পজা, ছুরি

চিড়িতন—দশ, পজা।

উ	
প	পু
	দ

—তা কেমন করে পারেন? আপনার দর্শনটাই কাম্য সকলের কাছে, আমার কাছেও, কিন্তু আমার জন্তে আর কে ভিড় জমায় বলুন?

—জমায় না? নিশ্চয়ই জমায়। কতজন হয়তো চায় আপনার দর্শন।

আপনি চান?

—আমার কথা ছেড়েই দিন। হয়তো চাই, হয়তো চাই না।

—বাঃ, আপনার কথার যে কোন মানেই হয় না।

—তা হবে; কিন্তু সত্যিই অনেক রাত হলো, বাড়ী যান বলে চপল পা চালাতে শুরু করে।

(ক্রমঃ)

ইস্কাবন—টেকা, সাহেব, নয়, আটা।

হরতন—বিবি, আটা, ছকা, পজা।

রুহিতন—দশ, X।

চিড়িতন—বিবি, চৌকা, ছুরি।

ডাক হয়েছিল,

‘উ’

একটি রুহিতন

দুইটি রুহিতন

তিনটি কোরাই

‘দ’

একটি ইস্কাবন

দুইটি কোরাই

পাশ

পাশ

‘প’ হরতনের গোলাম খেলায় ডাকদার

সাহেব দিয়ে পিট নিয়ে ইস্কাবনের পাশ

খেলে। পিটখানি টেকা দিয়ে মেয়ে নিয়ে রুহিতনের দশ খেলায় 'প' ও 'উ' দুইজনেই দুইখানি রুহিতন দিলেন। এইবার 'পু' দেখলেন যে 'দ'র হাতে নিশ্চয়ই আর একখানি রুহিতন আছে, নতুবা তিনি ইহার উপর টেকা মেয়ে পিট নিয়ে রুহিতনের বিবি খেলতেন। কিন্তু যে হেতু তিনি তা' করেন নি, নিশ্চয় তাঁর হাতে হরতনেরও বিবি আছে; যদি তা' না থাকত তবে হরতনের ভয়ে তাঁকে রুহিতনটি দাঁড় করিয়ে যে কটা পিট পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হত। পূর্বোক্তরূপ না খেলার দৃশ্য দেখুন কতটা খবর পাওয়া গেল। এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'দ'র ইচ্ছাবলেনও ফিনাস নেওয়া উচিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা' উচিত নয়। কারণ তাঁর মোট পিট হয়ে যাচ্ছে রুহিতনের পাঁচখানি, হরতনের তিনখানি ও ইচ্ছাবলেনের দুইখানি,—সর্বসমেত দশখানি পিট, অতএব ইচ্ছাবলেনের ফিনাস নেওয়া অতীব মূর্থতা। এইবার 'পু' দেখতে পেলেন যে, যে ভাবে খেলা যাচ্ছে তাতে ফেয়াইএর খেলা করা অতীব সহজসাধ্য। আবার ডাকদারের খেলার ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ইচ্ছাবলেনও তাঁর হাতে পিট ধরবার একখানি তাস আছে, তা না হলে এত তাড়াতাড়ি তিনি রুহিতনের ফিনাস নিতে যেতে পারতেন না। সুতরাং এখন একমাত্র চিড়িতনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, আর যখন 'পু'র হাতে চিড়িতনের টেকা সাহেব বর্তমান। অতএব রুহিতনের সাহেব দিয়ে পিট ধরেই চিড়িতনের ছোট একতাস খেলাই যুক্তি-যুক্ত, কারণ ডাকদারের হাতে যদি চিড়িতনের বিবি থাকে তো তাঁর পক্ষে যারা বড়ই শক্ত হবে। এইরূপ চিন্তা করে 'পু' ছোট একতাস চিড়িতন খেললেন এবং আতি সহজেই ডাকদারের খেলাটি

লঙ্কোয়ে কয়েকদিন

বি, কে, চট্টোপাধ্যায়

চঞ্চল, অনিল আর তার বোন সুগৌরী। বহুদিন পরে এদের দেখা ট্রেইনের ইন্টারের ছোট্ট কামরায়। ট্রেইনের সশব্দ গতি আর দুই বৃদ্ধর অতীত দিনের টুকরো গল্পের মধ্যে সুগৌরী হঠাৎ বলে উঠলো, "লঙ্কো কেমন দেখলে চঞ্চলদা?" সজীব ভাষণে চঞ্চল সুগৌরীকে বললে, "কী দেখলাম জান গৌরী? দেখলাম ইতিহাসের পিছনে সত্য অত্যন্ত। তোমরা সবাই ইতিহাসে পড়েছ, অখোঁজার মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদাত খা। কিন্তু আমি কি দেখলাম জান? দেখলাম এ অতীত ইতিহাস যা তোমাদের ইতিহাসে নেই। তুমি হয়তো হাসবে যদি আমি বলি লঙ্কো নগরার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামচন্দ্রের নষ্ট করে দিলেন। অথচ এইরূপ ভেবে-চিন্তে না খেলে ডাকদার অন্যায়সে খেলা করে নিয়ে যেতেন। অত দুজনের হাত—

প . .

ইচ্ছাবলেন— $\times, \times, \times, \times$ ।

হরতন—গোলাম, দশ, \times, \times ।

রুহিতন—পজা।

চিড়িতন—গোলাম, নয়, সাতা, তিরি।

উ

প পু

ইচ্ছাবলেন—বিবি, গোলাম, \times ।

হরতন— \times, \times ।

রুহিতন—সাহেব, সাতা, চৌকা, দুই।

চিড়িতন—টেকা, সাহেব, \times, \times ।

তাই লঙ্কণ। তখন এর নাম ছিল লঙ্কণপুর। এখন যেখানে মচ্ছিতবন অবস্থিত, সেখানেই ছিল লঙ্কণপুরের অবস্থিতি। আর লঙ্কো নাম যে লঙ্কণপুর হতে উৎপন্ন তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।"

তারপর দেখলাম মোগল সম্রাট। মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগির বিশ্বকর নৈপুণ্য। তাদের তৈরী এমামবাড়ী সুবৃহৎ ও গৌরবময়, আর তার মধ্যে চির নিত্য শায়িত আসাফউদ্দৌল্লা। তার সমাধির কাছে একটা আধার স্থাপনা করা হয়েছে, আশা দর্শকগণ রূপা করে যা দেবে তা দিয়ে হবে সমাধির সংস্কার আর আলোক দানের ব্যবস্থা। জান গৌরী, তখন আমার মনে কি হলো? যার শৌর্যে লঙ্কো গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল, যার তর্জ্জনীয় হেলনে রাজকোষাগার নিঃশেষিত হত, তার সমাধির পাশে বাতি দেবার জন্য একটা পয়সাও সংগ্রহ করিতে হয়, চমৎকার না?

তারপর দেখলাম লঙ্কোয়ের অতীতম শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ 'করহংবক'। পূর্বে আমার মন পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই যেন সঙ্কুচিত করে দিল আমার মন, প্রতি দেয়ালটি অশ্রুতপু ঈর্ষ্যাসে জানিয়ে দিলে আমার সাদীৎ আলির কীর্ষি, যে বিক্রয় করেছিল তার পিতৃ পিতামহের সম্পত্তি পরশক্তির জন্য। জানিয়ে দিলে আমরা সেই জীবের সৃষ্টি, যে বিসর্জন দিয়েছিল নিজ যশস্বত্ব, দেশের স্বাধীনতা, জাতির শ্রেষ্ঠ অধিকার তারপর আর কিছুই দেখা যায়নি। সেখান থেকে কিরে এলাম নিজের বাসায়। মাথার ভিতর তে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, অসহ্য যন্ত্রণার চীৎকার করে উঠলাম। এবারে ভেবেছিলাম কিছুকালের ভিতর সুস্থ হব কিন্তু সেটা কবেই বেড়ে চলতে লাগলো। অসহ্য বাতনা, অসহ্য

বেদনা, কি করি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। শেষে এক বছর উপদেশ মত রচিত একটি 'সারিডন' ট্যাবলেট সেবনে মন্ত্রশক্তির স্থায় ফল হ'ল। আমি জীবনে এ কথা কখনও ভুলতে পারিবো না 'সারিডন' ট্যাবলেট অসময়ে আমার বা উপকারে লেগেছে।

কিছুক্ষণ নীমবে থাকিবার পর সুপৌরী ধীরে ধীরে বললে "তোমার অসমাপ্ত কাহিনী শেষ করছি চঞ্চলদা। গাজীউদ্দিন হায়দার লক্ষ্যে প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং ওয়াজিদ আলি খাঁ পঞ্চম বা শেষ রাজা। লক্ষ্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় কৈশরবাগ ওয়াজিদ আলি খার তৈরী। জান চঞ্চলদা কৈশরবাগ কি দিয়ে তৈরী? লোকে বলে, আশী লক্ষ টাকা দিয়ে, কিন্তু আমি দেখেছি কি দিয়ে, জান? আর্জের হৃদয় শোণিত দিয়ে আর নির্যাতিত বেগমদের অশ্রু বজায়। তাই তার মধ্যে গিয়ে আমরা এখনও পাই যেন কার সব-শীতল স্পর্শ, অশ্রুভব করি অশ্রুময় দীর্ঘশ্বাস আর নীরব অভিশাপ"।

চলচ্চিত্র ও ইহার প্রচার কার্য !

ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একথা সবাই আজ একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, চলচ্চিত্র আজকের যুগে একটা দেশের প্রধান মুখপাত্র। চলচ্চিত্রের মধ্য হ'তে নানা দেশ সম্বন্ধে 'নানান বিষয়ে' জ্ঞাতব্য এবং শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আমরা জানতে পারি। কোন দেশের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, ক্রটি এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি অনেক কিছুই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে' একটা দেশকে বিশ্বসমক্ষে পরিচিত করে দেয় এবং এ হিসেবে চলচ্চিত্রের দান অপূরণীয়। তাই আজ সাহিত্যের পরই চলচ্চিত্রের স্থান।

একটা দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতার প্রত্যেক এই চলচ্চিত্র শিল্প পৃথিবীময় শিক্ষা, জ্ঞান এবং সর্বোপরি আনন্দ বিতরণ করে মানুষের একটা অতি প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করেছে। মানব সভ্যতার অত্যন্ত

শ্রেষ্ঠ অবদান চলচ্চিত্রদ্বারা পৃথিবীর মানুষের যে কতটা উপকার সাধিত হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। অল্প কিছু ছেড়ে ব্যবসার দিক দিয়ে ধরতে গেলেও একটা দেশের কোটা কোটা টাকা এই শিল্পের পিছনে খাটছে। তাই নানারূপ বিবিধ কারণে এই শিল্পের প্রসারতা এক একটা দেশের নৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্ববিধ উন্নতির দিক দিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের দরিদ্র বাংলাদেশেও কয়েক কোটা টাকা এই শিল্পের জন্য খাটছে এবং অনেক লোক এর থেকে কিছু রোজগার করে থাকে।

বাংলার বহুজন-সমাদৃত চলচ্চিত্র-শিল্প-টীকে অবনতির হাত থেকে বাচাতে হলে এবং এর ভবিষ্যত উন্নতি দেখতে গেলে এর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকের অনেক কিছুই উপর আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এই উন্নতিশীল শিল্পটির ভবিষ্যৎ যে-সব জিনিষের উপর নির্ভর করছে, প্রচার কার্য বা Publicity তাহাদের মধ্যে অন্যতম। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি এবং প্রসারতা ব জনপ্রিয়তা (Popularity)র উপর জাণালিষ্ট, প্রচার-শিল্পী (Publicity officer) এবং সমালোচকের (Film-critic) দান যে কত বড় তা অস্বীকার করবার আর আজ উপায় নেই। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে যেমন যথার্থ সমালোচক বা প্রকৃত ফিল্ম-জাণালিষ্টের অভাব তেমনি আবার এদেশের চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা ছবি ও এ শিল্পের প্রচার কার্য সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। প্রচার বিভাগীয় কার্যের উন্নতি

আধুনিক 3 সুন্দর ফটো তুলিবার একমাত্র তুলিবার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

মডার্ন ইলেক্ট্রিক স্টুডিও

৩২-মি. উঁচুতলা স্টুডিও কলিঙ্গতা

ফোন-কলিকতা ৬৬০৬

N. I. P.

এবং জার্মানি ও ক্রিস্টিয়ানের সহায়ত্ব ভাষীকে এর ভবিষ্যত উজ্জ্বল হোতে পারে না—কোনও দেশে তা পারে নি। আমেরিকার তথা সমগ্র জগতের কেন্দ্র ‘হলিউড’ যে চলচ্চিত্র শিল্পের স্বর্ণপুরী হোতে পেরেছে সে শুধু তাদের প্রচার-শিল্পীদের গুণেই। এ বিষয়ে আমরা যে কত পিছনে এবং কত অন্ধকারে বাস করছি তা একমাত্র আমাদের এই চিত্র-শিল্প ব্যবসায় প্রচার কার্যের দিকে একটু অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারবো। আমেরিকার প্রচার বিভাগের জার্মানিরা জানেন কী করে একটা প্রতিষ্ঠান, তাহার ছবি, তাহার পরিচালক ও শিল্পীদের সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত করতে হয় এবং কেমন করেই বা তাদের সুনাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে দিতে হয়। আর এর জন্য ওরা অনেক সময় যে সল্প পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন তাহা সত্যিই বিস্ময়কর। একমাত্র Publicityর জোরেই আমেরিকার চলচ্চিত্র-শিল্প সমগ্র পৃথিবীময় এক চেষ্টায়া ব্যবসা করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই শিল্পের বহুল উন্নতি করতে পেরেছে।

বাংলার এই শিল্পের প্রসারতা, জন-প্রিয়তা এবং উন্নতি বিধান করতে হলে আমাদের প্রচার বিভাগের উন্নতি করতে হবে—প্রচার কার্যের উপর জোর দিতে হবে। অনেক সিনেমা-জার্মাল সৃষ্টি করে দিকে দিকে এশিয়ার বিষয়ে অনেক কিছু জানিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্তে হবে। আমাদের আর্টিষ্ট, পরিচালক এবং ছবি প্রভৃতি সম্বন্ধে নিত্য নতুন অদ্ভুত ও বিচিত্র সংবাদ প্রচার করে সকলকে এদিকে আকৃষ্ট করতে হবে—এর দর্শক সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে হবে। যে সব অদ্ভুত প্রণালীতে আমেরিকার প্রচারকেরা

তাদের নতুন আর্টিষ্টদের পৃথিবীময় পরিচিত করিয়ে তাদের ভক্ত সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন আমাদেরও লক্ষ্য করতে হবে। এখানে আমেরিকার Publicityর একটা বিচিত্র ঘটনা না বলে পারলাম না।

Broadway musicএর একরূপ আবিষ্কারক আমেরিকার বিখ্যাত প্রডিউসার ফ্লোরেন্স জিগফিল্ড (Florence Zigfield) যুখন Continental actress বিখ্যাত এ্যানা হেল্ড (Anna Held)কে তার রজস্বর্ণের পাদপ্রদীপে প্রথম অবতীর্ণ করান তখন প্রথমে জনসাধারণের দৃষ্টি তার উপর আকৃষ্ট হোল না। দর্শকরা তাকে গ্রহণ করলে না। অত বড় নৃমকরা বিখ্যাত আর্টিষ্টের উপর দর্শক সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল না—কেহই তার গুণ বা তার ঐ ভুবনমোহিনী রূপের আদর করলে না দেখে যেমন তিনি দুঃখিত হলেন তেমনি আশ্চর্য্যও হলেন। এত বড় Continental fameএর আর্টিষ্ট এনে তিনি লোকসান খাবেন এ তার অসহ্য হোল—ঠাণ্ড কী মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি একটা বুদ্ধি আটলেন মনে মনে। আর তার পর দিন আমেরিকা বাসী জনসাধারণ সংবাদ-পত্র খুলে একটা সংবাদের উপর নজর পড়ায় চমকে উঠলো। সেই আশ্চর্য্য খবর আমেরিকার ছোট বড় সব কাগজেই বেরিয়ে গেছে এবং সংবাদটির অভিনবত্ব কল্পনা করে সবাই বিস্ময়ে মুগ্ধ হোল। সংবাদটা হয়েছে যে ফ্লোরেন্স জিগফিল্ড অসামান্য রূপসী সেই নবগতা আনা হেল্ডকে স্নান করাবার জন্য প্রত্যাহ প্রাতে ২০ গ্যালন করে দুধ পাঠান। শুধু কী অদ্ভুত সংবাদ! ২০ গ্যালন দুধ—আর তাতে স্নান করে রূপসী আনাহেল্ড। বরুন তা হলে তার রূপের বহর। আর তার পর থেকেই যোজ্ঞ সন্ধ্যায় যে অভাবনীয় তীক্ষ্ণ

সেই জিগফিল্ড রানালয়ের সম্বন্ধে কোমল বেত তাহা কল্পনাও করা নাযে—সেই এবং আনা হেল্ডকে দেখবার জন্য তার এত fan (ভক্ত) বেড়ে গেল যে তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত প্রস্নে ও চিঠিতে আতীত হয়ে একদিন আনা হেল্ড Zigfieldকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি ঐরূপ মিথ্যে সংবাদ প্রচার কমিচ্ছেন। জিগফিল্ড, সমস্ত প্রয়োজকদের উপস্থিতিতে—জিগফিল্ড নিষিকারে উত্তর করলেন যে, উহা ছাড়া, তার আর কোন উপায় ছিল না। Mobকে আকৃষ্ট করতে হলে ঐরূপ অদ্ভুত প্রচার কার্যের একান্ত প্রয়োজন।

তাহা হলে দেখুন প্রচার কার্যের জন্য অনেক সময় মিথ্যে হলেও অনেক সব অদ্ভুত এবং অসম্ভব কথা প্রকাশ করে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হয়। আমাদের দেশের প্রডিউসারেরা ইহা একবারও ভেবে দেখেন না যে প্রচার কার্য দ্বারা আর্টিষ্টদের ভক্ত তৈরী করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে। হলিউডের প্রডিউসারেরা এক একটা নতুন আর্টিষ্ট খুজে বের করার সাথে সাথে তাদের সম্বন্ধে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য প্রকাশ করে ও তাদের চিত্তাকর্ষক ছবি দিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ছবি বেকরবার বহু পূর্বেই তার যেরূপ প্রচার কার্য সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে তা ভাবলেও আশ্চর্য্য হোতে হয়। কিন্তু আমরা আমাদের চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কথা পৃথিবীময় প্রচার করা তো দূরের কথা বাংলা দেশের মধ্যেই ভালরূপে systematically প্রচার করতে পারিনে। অবশ্য আমাদের অনেকেই সিনেমা পাবলিসিটি সম্বন্ধে ধারণা বা জ্ঞান খুবই কম—শিক্ষাও জরুরি সিনেমা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ধারণাও

ভাল সাহিত্যিক হলেই তিনি সিনেমা ক্রিটিক বা ভাল প্রচারশিল্পী হোতে পারবেন। এবং এই ভুলেই প্রচার কার্যের দোষে লামাদের অনেক ছবিই ভাল হোলেও মার খায়, অনেক শিল্পীই গুণ থাকে সবেও যথার্থ নাম কিলতে পারেন না—অনেক প্রতিষ্ঠান পটল তুলতে বাধ্য হন। কিন্তু এসব সবেও অনেকেরই এদিকে দৃষ্টি পড়ছে না বলে যেমনি আশ্চর্য্য হোতে হয় তেমনি এই শিল্পের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হোয়ে উঠতে হয়। পাবলিসিটির মধ্য দিয়ে ওদের দেশের প্রচার শিল্পীরা তাদের এক একটা প্রতিষ্ঠানের আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে নিত্য নতুন অদ্ভুত এবং অভিনব সংবাদ রটিয়ে পৃথিবীময় তাদের ভক্ত সংখ্যা সৃষ্টি করেন। এমন অনেক ছবি আছে যা একমাত্র আর্টিষ্টদের নামের জোরেই প্রচুর Box-office দেয়। আর আমাদের আর্টিষ্ট সম্বন্ধে নিত্য নতুন অভিনব কথা শোনা তো দূরের কথা, অতি সাধারণ কথাও তাদের বিষয় আমরা জানতে পাইনে অনেক সময়। নতুন শিল্পী আবিষ্কার করাতো আমাদের দেশে একরূপ হয়ই না, তা নিয়ে চুঃখ করে আর কী হবে। কিন্তু যে সব শিল্পী আছেন তাদেরও সামান্য ‘Publicity’ দিয়ে দর্শক সাধারণের মধ্যে পরিচিতি করাতে এবং তাদের ভক্ত সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে আমরা হয়তো লজ্জা অনুভব করি—নয়তো প্রয়োজন মনে করি নে। ইহা বড়ই ক্ষেত্রের বিষয় যে, আমাদের সব কাগজগুলোই (কী সাধারণ সংবাদ পত্র বা সিনেমা-জার্নাল) বিদেশী প্রতিষ্ঠান-দের ছবি এবং সংবাদ দ্বারা পূর্ত থাকে—আমাদের দেশী চলচ্চিত্রের কথা খুবই অল্প ভাব রাখা আমাদের পেয়ে থাকি। ইহা আমাদের চলচ্চিত্রের প্রচার কার্যের

কী লজ্জাকর অবস্থার কথাই না মনে করিয়ে দেয়।

অতএব আজ বাংলার প্রত্যেক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানকে অবনতির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে তাদের প্রচার বিভাগের কার্যের উপর খুব সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে সর্বপ্রথমে। একমাত্র নিউথিয়েটাসই আমাদের দেশে ছবির বা কিছু পাবলিসিটি দিয়ে থাকেন, অবশ্য এর জন্ত তারা ভারতময় সুনাম অর্জন করতে পেরেছেন। নিউথিয়েটাসের শিল্পী, তাদের পরিচালক, তাদের ছবির কথা তাই আজ সবার মুখে মুখে! এজন্ত এন. টার (N. T.) সুযোগ্য প্রযোজক মিঃ বি. এন. সরকার জনসাধারণের ধন্যবাদার্থ! তাই অবিলম্বে বাংলার সকল চিত্র-প্রতিষ্ঠানেরই একযোগে খুব জোরের সঙ্গে প্রচারকার্য চালাতে হবে।

আরেকটা জিনিষ যা আমাদের এই ক্রটি-পূর্ণ Publicityর মধ্যে চুপকতে দেখা গিয়েছে—তা হচ্ছে এর পক্ষপাত দৃষ্টি; কোন শিল্পী বা কোন প্রতিষ্ঠানকে অহেতুক দারিয়ে রেখে অপরকে প্রধাত্য দেওয়া। এই দুনীতিমূলক কার্য, যাহাতে ইহার মধ্যে প্রবেশ না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যাহাতে একদল যথার্থ শিক্ষিত লোকদ্বারা প্রচার কার্যের প্রকৃত উন্নতি হয় তাই দেখতে হবে। •

পরিশেষে আমি আমাদের দেশের ফিল্ম-জার্নালিষ্টদের কাছে দু’টা কথা জানাতে চাই যে একমাত্র তারাই তাদের সহায়ভূতি, সমালোচনা ও পাবলিসিটি দ্বারা বাংলার ক্রম-বর্ধমান এই শিশু-শিল্পটিকে বাচিয়ে রাখতে পারেন। তাদের বিশ্বসমক্ষে পরিচিত করে বাংলার চলচ্চিত্রের সুনাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। আমাদের দেশের এই শিল্পের বর্তমানে ক্রটি অনেক কিন্তু জার্নালিষ্টরা যদি স্বার্থান্বেষী হয়ে দ্বিজাধেয়ীর

মত কাজ না করে একে আদরণীয় ও গ্রহণীয় করে তোলেন তাহলে এ শিল্পের যে কতটা উপকার হবে তা বলে শেষ করা যাবে না।

বাংলার উদ্ভবোদ্ভব উন্নতিশীল এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরিতা হয়ে অনেক বৈদেশিক চিত্র-প্রতিষ্ঠানের চক্রান্তে পড়ে স্বার্থের লোভে যে সব জার্নালিষ্ট বা ফিল্ম-জার্নাল আমাদের এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে তারা দেশের বড় শত্রু—জার্নালিষ্ট নামের অযোগ্য। তাদের অসত্য-অসুস্থ এবং অত্যাচার সমালোচনা দ্বারা তারা বাংলার একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কতটা যে ক্ষতি করেন তা কী একবারও ভেবে দেখেন? প্রকৃত সমালোচকের দান যেমন অপূরণীয় তেমনি স্বার্থান্বেষী সহায়ভূতিহীন সমালোচনাও এ শিল্পের পক্ষে বহু ক্ষতিকর এক কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। তাই প্রচারকার্যের সহায়তার জন্ত একত্রে প্রকৃত সমালোচক গড়ে তুলতে হবে।

আমার মতে তাই একদল শিক্ষিত লোক নিয়ে অবশ্য প্রচার কার্য সম্বন্ধে যাঁদের একটুও ধারণা বা জ্ঞান আছে—প্রচার কার্যের জন্ত বাংলার সকল প্রতিষ্ঠান একযোগে হয়ে একটা Central Cine Publicity Bureau গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত ফিল্ম প্রতিষ্ঠান একত্র হয়ে যেমন সম্প্রতি ‘Bengal Motion Pictures’ Association গড়ে তুলেছেন, প্রচার কার্যের জন্তও তেমনি একটা কিছু সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্য সেই Association-এর মধ্যেই এই Publicity department বা প্রচার বিভাগ থাকতে পারে কিনা এটা ভেবে দেখা উচিত। তা হলে এর অনেক সুবিধাই হবে আমার মনে হয়। সকল প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যে উহা

—বেকার নাশন শব্দ বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা ব্যুরো—
BEKARNASHAN CROSS WORD COMPETITION BUREAU
 বাংলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতা—নং ১।

১১তম, প্রিন্সিপাল ইন্সটিটিউট, কলিকাতা।

৫০০ পুরস্কার

৫০০ পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার ৩০০, দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫০, তৃতীয় পুরস্কার ৫০

শব্দ গঠন করিবার নিয়ম :- প্রত্যেক সাদা ঘরে একটি মাত্র অক্ষর বসিবে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণকে একটি অক্ষর বলিয়া গণ্য করা হইবে। অল্প ঘরগুলি বধা নিয়মে থাকিবে।

প্রতিযোগিতার সমাধান. পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৮
 বাংলা ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ সাল।

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

পাশাপাশি (Across)

- ১। এ জীবন দুঃসহ।
- ৩। দেশ।
- ৪। অনেকের ধারণা এ ভগবানের প্রতীক।
- ৫। এ সরল নয়।
- ৭। বিপদে যে এ কাজ করে হিন্দুশাস্ত্র মতে সে পিতা।
- ৮। মদন যার পতি।
- ৯। জ্বালোকের বিশেষ প্রিয়।
- ১২। বোলতার এ বিষাক্ত।
- ১৩। মহাদেব।
- ১৫। এ থাকলে সে ভীত।
- ১৬। উন্টালে মায়াংসা কতিন।
- ১৭। ঠিক করে সাজালে এর জোর না থাকলে ভাল উকিল হওয়া শক্ত।
- ২০। কর।
- ২১। বলরাম।
- ২২। ইজ্ঞ এ-পাণি বলা হয়।
- ২৫। এ বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।
- ২৭। এ আহার অকর্তব্য।
- ২৮। দুর্ঘোষনের মাতুলালয়।
- ২৯। অভয় নয়।
- ৩১। উন্টালে গ্রীষ্মকালে এ আরাধনায়ক।

—এইখানে কাটুন—

বেকার নাশন শব্দ-বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা ব্যুরো
 নভেম্বর সংখ্যা ১৯৩৮। কুপন নং.....



—এইখানে কাটুন—

—এইখানে কাটুন—

প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত
 ও আইনতঃ বাধ্য হইবে স্বীকার করিয়া এই
 প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম।

নাম.....

ঠিকানা.....

লোকাল রসিদ নং.....তারিখ.....

মনিঅর্ডার নং.....পোস্টেল অর্ডার নং.....

—এইখানে কাটুন—

- ৩২। এর বুদ্ধি যে নেয় সে চালাক নয়।
- ৩৩। ঠিক করে সাজালে এর দায়িত্ব বহন করিতে হয়।

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

উপর হইতে নীচে (Down)

- ১। একদাম নাই।
- ২। কাচ।
- ৩। এ দুঃচরিত্র।
- ৪। গালা।
- ৬। ভাগ্য।
- ৯। অষ্টপদ পোকা বিশেষ।
- ১০। এ হলে মাধায় অনেকেই ঔষধ ব্যবহার করেন।
- ১১। এ নিয়ে প্রায়ই গুণ্ডগোল হয়।
- ১৪। এ হৃদয়ের বৃদ্ধি।
- ১৮। একে অনেক কষ্ট পেতে হইয়াছে।
- ১৯। একে অমৃত ফল বলা হয়।
- ২০। বলবান।
- ২১। অসত্য।
- ২৩। এ নিয়ে বন্দ লেগেই আছে।
- ২৪। অন্ধকারকে বিনাশ করে।
- ২৬। স্বর্ঘ্যের চীহিতেও বড়।
- ৩০। এর স্থান মাধায়।

প্রতি সমাধানের প্রবেশ মূল্য ১০ আনা। কিন্তু একই ব্যক্তির একত্রে তিনখানা সমাধানের মূল্য ১০ আনা। লেখা কাটা বসা এবং পেন্সিলে লেখা চলিবে না। মনিঅর্ডার রসিদ সমাধানের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। রসিদ নম্বর নিজে টুকিয়া রাখিবেন। ২৮শে নভেম্বর রাত্রি ৭টার মধ্যে মফঃস্বল কুপন পৌছান চাই। অজ্ঞাধ্য অগ্রাহ্য হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কুপনে অথবা নিজে অবিকল ছক আঁকিয়া লক্ষ্যস্বাক্ষর করি বলাইয়া দিলেও সমাধান গ্রাহ্য হইবে। একাধিক সমাধান হইলে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে, সাপ্তাহিক খেলালীতে ম্যানেজারের নিম্নলিখিত সমাধান প্রকাশিত হইবে বিস্তারিত নিয়মাবলী ট্যাম্পলহ পত্র লিখিলে পাঠান হয়।

স্বৈচিত্র্য প্রসঙ্গ সত্যভাষী

আমাদের দেশে বেতারের লাইসেন্স সংখ্যা নাকি আশাশ্রয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ দিনে দিনে নিরাশাপ্রদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামে বহু পরিবর্তন অধুনা দেখা যাচ্ছে কিন্তু শ্রোতাদের অভিযোগ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের ফলে যেগুলি ভালো অনুষ্ঠান ছিল সেগুলিকে বাদ দিয়ে যত বাজে জিনিষ দিয়ে সেই স্থান পূর্ণ করা হচ্ছে। মাঝে আমরা বেতার প্রোগ্রামে কিছুটা আশার আলো দেখেছিলাম কিন্তু আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

বেতার অভিনয় নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে বহু আলোচনা করেছি। আমরা বার বার বলে এসেছি ষ্টেজের চর্কিত চর্কণ, বস্তাপচা পুরাতন নাটকগুলির অতিপরিচালিত হয়ে পৃথিবীময় যাহাতে বাংলার এই শিল্পীর বিষয় নানান সংবাদ স্রবরাহ করা যায় এবং যাহাতে সকল স্থানেই বাংলা ছবির ভক্ত সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা যায় তাহা এই পাবলিসিটি বিভাগ করবেন। আশাকরি এইরূপ ভাবে কার্য করলে আমাদের ছবির প্রচার কার্য দেশে এবং বিদেশে খুব দ্রুতর ভাবে এবং Scientifically পরিচালিত হতে পারবে এবং আমাদের চিত্র প্রতিষ্ঠানেরও বহুল উন্নতি সাধিত হতে পারবে।

নয়, যাত্রার চীৎকার বেতারে অচল। ষ্টেজের অভিনয় আর বেতার অভিনয়ে খানিকটা পার্থক্য রাখতে হবে। শুধু কণ্ঠ দ্বারা শ্রোতাদের নাটকীয় রস পরিবেশন সত্যিই বিশেষ শ্রমসাধ্য। আমরা বেতার অভিনয়ে চাই কিছুটা নূতনত্ব, বৈচিত্র্য। বেতার অভিনয় শ্রোতাদের বিশেষ করে মহিলা শ্রোতাদের বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান। কর্তৃপক্ষ নূতনত্ব দেখালেন সময় সংক্ষেপ করে ভালো অভিনেতাদের বাদ দিয়ে বাজে নাটিকার আমদানি করে।—অভিনয় এবং নাটকীয় উপাদান ঠিক রসবান হতে সময় লাগে—নাটকের ঘাত প্রতিঘাত, সিচুয়েশন, চরিত্র সৃষ্টি এইগুলি নাটকের প্রাণ। এখন যে নাটকগুলি অতিনীত হচ্ছে তাতে প্রকৃত নাটকত্ব মোটেই থাকে না। সময় সংক্ষেপ করায় শ্রোতাদের মহলে অত্যন্ত বিকোণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এ বিভাগে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বেতারে বিচিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এখন প্রোগ্রাম থেকে বাইরের সম্প্রদায়ের বিচিত্র অনুষ্ঠান তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিশেষ আকর্ষণীয় নূতন ধরনের 'ফিচার প্রোগ্রাম' বেতারে পাওয়া যেত সেগুলি বাতুল দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ আমরা বুঝে পাই না। শনি মণ্ডল, বিদূষক মণ্ডলী, বালকী বিজ্ঞাবীধি, অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

সম্প্রদায়, লীলাদেবীর সম্প্রদায় প্রভৃতির বিচিত্র, অনুষ্ঠানগুলি জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় ছিল এইসব সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে সাহিত্য রস বৈচিত্র্য পাওয়া যেত। এখন শুধু বেতার বিচিত্রা অত্যন্ত একঘেয়ে লাগে। মধ্যে মধ্যে বাণীকুমার রচিত ছ' একটি অনুষ্ঠানে তবু একটু সাহিত্য রসের পরিচিতি থাকে।

যদি কোনদিন প্রোগ্রামে দেখা যায় ভালো অনুষ্ঠান সৃষ্টি—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আর কার্যে পরিণত হয়ে উঠতে পারে না। "চিন্তদোলা" বেতার বিচিত্রায় পঙ্কজ মল্লিক, কানন দেবী, কে, এল, সাইগল, উমা দেবী প্রভৃতির নাম দেখা গেল—কার্যকালে তাঁদের কারুর উপস্থিতি ঘটে উঠলো না। দেওয়া হোল তাঁদের কণ্ঠ সঙ্গীত গ্রামোফন যোগে। শ্রোতার বহু আগ্রহ নিয়ে অবশেষে নিরাশ হয়েছেন আমরা জানি না পূর্বে থেকেই এইসব আর্টিষ্টের গ্রামোফনই সংযোজনা করবেন কর্তৃপক্ষের এইরকম অতিপ্রায় ছিল কিনা কিন্তু তাহলেও প্রোগ্রামে তার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এ যেন ছেলে ভোলানোর মতনই শ্রোতাদের বঞ্চনা করা হয়েছে।

ত্রিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান একেবারে অনুন্নত যোগ্য। এই অনুষ্ঠানটির কোন গুরুত্বই বেতারে এখন আর নেই। কিন্তু কিছুদিন পূর্বেও এ অনুষ্ঠানে আমরা মহিলা-শিক্ষাপ্রদ আনন্দ দায়ক বহু উন্নত ধরনের প্রোগ্রাম পেয়েছি। সময় সংক্ষেপ করা—সংবাদ ঘোষণা, মাঝে মাঝে ছ' একটি বক্তৃতা, নবাগতের আসর আর গ্রামোফন রেকর্ড এই দিয়ে শুধু জোড়া তড়া দিয়ে রাখা

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দু'একটা কথা

জীলন্দ্রী মিত্র

১০

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই ইতিমধ্যে বলা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। সুতরাং নূতন করে আমার যা বলবার থাকতে পারে তা নেহাৎ পুরাতন ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে আনন্দ পরিষদ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল সে দিক দিয়ে হয়তো সত্যি কিছু বল যেতে পারে। কিন্তু সে বলার হয়তো কোন মূল্য নেই।—

তার জীবনী লেখক হয়তো তার থেকে কোন মশলাই খুঁজে পাবেন না।

শরৎচন্দ্রকে বহু ভাবে উপলব্ধি করবার পক্ষে তা হয়তো বা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

তবু কিন্তু তাঁর ছোট ছোট মন্তব্যগুলি আমার কাছে অপূর্ণ হয়ে আছে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে।

হয়েছে। এই অস্থানটির জগ্গে মহিলা সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুণ্ণ।

রেডিওর লাইসেন্স রুদ্ধিতে প্রোগ্রাম সংস্কার এমনই হচ্ছে যে অশ্রাব্য। রেডিও কর্তৃপক্ষের এ উদাসীনতার সংস্কার চাই শুধু কয়েকটি নামকরা আর্টিষ্টের নাম প্রোগ্রামে দিলে কিংবা তাঁদের অস্থিতি প্রোগ্রাম হলেই জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায় না।—বহু প্রোতার অভিযোগে, অমরোদ্ধে এবং আদেশে আমাদের এ বিভাগের আলোচনা আবার নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হবে। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে আমরা চাই জনসাধারণের সহযোগিতা এবং প্রীতি।

তিনি বলতেন, ওহে, লেখো যদি, লেখার আনন্দে লিখবে। নাইবা রাখলে হিসাব পরের অধ্যায়ে তোমায় কি বলতে হবে।—

আমি তাঁর কথা সাগ্রহে গুনতাম।

তিনি বলতেন—আমি লিখি লেখার আনন্দে। একটার পর একটা যেন অবশ্রুজাবী ছন্দে এসে পড়ে। এমন কি সময় সময় কোন কোন উপজ্ঞাসের শেষ অংশটাই আগে লিখে ফেলেছি। যেমন চরিত্রহীন। আমি জিজ্ঞাসা করতাম—আপনি লিখতে বসে কাটাকুটি করতেন?

নিশ্চয়ই। এক একটা কথা একেবারে ওজন করে বসাতাম। যতক্ষণ না মনে ধরতো আমি ছাড়তাম না। ঐ রকম একটা কথা চরিত্রহীনে ব্যবহার করেছি অনেক ভেবে; একদিন দেখি স্মৃতি (ডাঃ স্মৃতি চট্টোপাধ্যায়) এসে হাজির ঠিক ঐ কথাটা নিয়ে আলোচনা করতে।

আমি একদিন বললাম—Mathematical Mistake কিন্তু আপনার বইএ বেশ পাওয়া যায়।

মানে;

মানে একজায়গায় তিন খানা ভাঙ্গা ঘরের বিষয় বলে অপর জায়গায় কোণ করে দেখালেন চার খানা ঘর! তিনি হেসে বলতেন,—বলেছি নাকি হে এই রকম?—

ও আর কি হবে; ওসব ধোরো না।

আমি তো অঙ্ক ভুল করি—আমার চেয়েও যিনি বড়ো তিনি একেবারে সঙ্ক ওলোট পালোট করে ফেলেন। তিনি

একবার এক জনকে ‘মাসি’ বলে, পরের পরিকল্পনা তাকে পিসি বলে চালিয়েছেন।

একদিন আমরা হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে হেঁটে আসছি—শরৎচন্দ্র আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সহসা বলেন—ওহে, তুমি খন্দর পর না?

আমি চুপ করে রইলাম।

আশ্চর্য্য, তিনি আর কোনও মন্তব্যই প্রকাশ করলেন না। শুধু খানিকটা রাস্তা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। আমার অবশিষ্ট বোধ হতে লাগলো। বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিতে পেরেছিলাম, তিনি আমায় স্তব্ধ ভাষায় তিরস্কার করলেন।

আমাদের চরিত্রহীন অভিনয় সম্পর্কে কথা ছিল এক ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রয়ালটি বাবদ দু'শ টাকা দিতে হবে।

টাকাটা আদায় করে দিতে দেুরী হয়েছিল সেজন্ত আমরা গাকিলি করে তাঁর কাছে যেয়েও উঠতে পারি নি। শেষে যেদিন গোলাম সেদিন তিনি বেশ রাগ করলেন। ইতিমধ্যে হয়তো পাবলিক থিয়েটারের উপরও তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন অর্ধঘটিত ব্যাপার নিয়ে।

তিনি বলেন,—তোমরা শেষে এলে তাহলে! আমি হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম।

‘কেন বলুন তো?’

‘কারণ তোমরা সব য়ে থিয়েটারের লোক! থিয়েটারের লোককে আমি—’

কিন্তু সে কথা যাক।

একদিন হাওড়া স্টেশনে ঘুরছি, সহসা দেখি শরৎবাবু আমাদের ডাকছেন—

‘কোথাও যাবে নাকি হে লক্ষ্মী?’

‘আজ্ঞে ইয়া, কাশ্মীর যাবো; তাই ব্যবস্থা করতে এসেছি স্টেশনে।’

‘কাশ্মীর! কাশ্মীর যাক কেন?’

বিনয় সহকারে বললাম—‘দৃষ্ট সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে।’

“কাশ্মীর উপভোগ করবার মত কি আছে জানিনা বাপু। তুমি বাঙলা দেশের সব জায়গায় ঘুরেছ?”

“আজ্ঞে না।”

তিনি প্রদীপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন—
সৌন্দর্য্য যদি দেখতে চাও বাঙলা দেশ ঘুরে এসো। এ শোভা তুমি কাশ্মীরেও পাবে না। বাঙলা ছাড়া অন্য দেশ ভারতে নেই। বাঙলা দেশ দেখে গে আগে।

সেদিনের কথা আজও মনে আছে।
কি জোড়ের সঙ্গেই না তিনি কথাগুলো বলেছিলেন।

আমাদের পরিষদে শরৎচন্দ্র এসেছেন।
ধুমধাম চলছে। যাবার সময় তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আমরা ট্যাক্সিভাড়াটা পকেট থেকে বার করে তাঁর সামনে ধরলুম। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কি হে?

বললাম—ট্যাক্সিভাড়া—

তিনি এক মিনিট স্তব্ধ থেকে বললেন—
তোমরা আমার কি ভাবো বলত? কি ছুখে তোমাদের কাছ থেকে ট্যাক্সি ভাড়া নিতে যাবো? এ পর্যাটুকু খরচ করবার ক্ষমতা আমার নেই এ বিশ্বাস তোমাদের কি করে হোলো?

সরিয়ে নিলাম হাত। লজ্জায় মাথা এলো ছুয়ে। কিন্তু ভাবতে লাগলাম—
লোকটি অতুল বটে।

একদিন আমাদের কি খেয়াল হোলো
শরৎবাবুকে অহুরোধ করে বললাম—
“আপনি আমাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথ অভিনয়ে—
কৈলাশ-বুড়োর অংশটা অভিনয় করুন।”

কথাটা শুনে তিনি প্রথমে হাসতে লাগলেন;—পরে বললেন, “তোমরা বুঝি ভাবো আমি ওসব পারি না?—পারিছে

পারি। আমি সব পারি। আমিও তোমাদের মত বয়সে করিনি এমন কাজই নেই। থিয়েটার, বাজা, বাঁশীবাজান, সাপ-ধরা, মাছধরা—সব আমার হ’য়ে গেছে।

এ ছাড়াও এমন সব কথা অবলীলাক্রমে তিনি আমাদের বললেন যার উল্লেখ করবার প্রয়োজন মনে করছি না।—

একদিন আমাদের পরিষদের তারকের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গেছি। তারকের বিয়ে। ভীষ্মদেব—তারকের ভাঞ্জে—আসর জমিয়ে হিন্দুস্থানী গান করছেন; সজীত চলছে।—বলা বাহুল্য ভীষ্ম গাইছিল ভালোই।—তার গান শেষ হ’লে শরৎচন্দ্র বললেন—“ওহে নিধুর টপ্পা গাইতে

পারো? বা অজ্ঞ কোন পুরানো বাঙলা গান?” ভীষ্ম অরুণ্ড পারল না গাইতে তাঁর অহুরোধ মত—। শরৎচন্দ্র চূপ করেই রইলেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম তিনি কি কথা বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না।—

তখন তারকেষ্মে সত্যগ্রহ চলছে।
কথা শ্রবণে তিনি দগ করে অলে উঠলেন—

“ওসব বাঙলা দেশে চলবে না তুমি দেখে নিও। বাঙালীর মুখে ওরা ইয়ে করে দিয়ে যাবে,—আর সে যে চূপ করে থাকবে তা ভেবোনা। যারা ছাত্তু খায়, তারা ও কাজ পারবে। পারবেনা বাঙালী। অধাত করলেই সে প্রতিঘাত করবে। এই তার বৈশিষ্ট্য। পড়ে পড়ে মার সে খেতে পারবে না!”



আগতপ্রায়

খেয়ালী চিত্রপট



রাসা ফিল্মসের “জনকনন্দিনী”র একটি দৃশ্য,
অতীন্দ্র, জয়নারায়ণ, সুশীল ও উমাতারা।
ছবিখানা শীঘ্রই রূপবর্ণিতে মুক্তিলাভ করবে।



পরিচালক
জাশমালা নিউজপেপার লিঃ
১১, চক্ৰবেড়িয়া (লাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১৯৭১ বর্ষ, ৪০ম সংখ্যা, বুধসপ্তমিতবার, ১৯। অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ১৭ই মার্চ ১৯৭১

মিলনের পথে

আসামে কংগ্রেস-কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডলী স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বাংলার অনুরূপ কংগ্রেস-প্রজা সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনে তৎপর হইয়াছেন। রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং আশাভীতভাবে সাক্ষ্য অর্জন করিয়াছেন যে এই মাসের শেষ ভাগেই নূব মন্ত্রীমণ্ডল কার্যভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। যে দুরদৃষ্টি লইয়া রাষ্ট্রপতি এই কার্যে ত্রুভী হইয়াছেন তাহা সফল হইলে রাষ্ট্রপতি অসাধ্য সাধন করিলেন বলিতে হইবে।

অর্ন্ততঃ প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব ও অর্থসচিব নলিনীবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় একরূপ ঠিক হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই নলিনীবাবু পদত্যাগ করিবেন—পদত্যাগ কালে নলিনীবাবু এক বিরতি প্রদান করিবেন। নলিনীবাবুর পর হক সাহেবও পদত্যাগ করিবেন—তাহা হইলেই বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল আপনা আপনিই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

অর্ন্ততঃ মন্ত্রীমণ্ডলীর পতনের পরই মৌলভী ফজলুল হককে প্রধান মন্ত্রী করিয়া যে সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইবে তাহাতে থাকিবেন :—

প্রধান মন্ত্রী—মৌলভী ফজলুল হক

কংগ্রেস—ডাঃ ফকির চন্দ্র বসু
শ্রীকিরণ শঙ্কর বসু
শ্রীমলিনী বসু সর্কার
শ্রীসন্তোষ কুমার বসু

প্রজা—মৌলভী তামিজুদ্দিন খাঁ
মৌলভী শামসুদ্দিন আহাম্মদ
মৌলভী মোশের আলি
মিঃ হুমায়ুন কবির

অনুরূপ সম্প্রদায়—শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র সর্কার
মিঃ পি. এন্. ঠাকুর

অমল্লী-মণ্ডলীর বেতন ৫০০ টাকাই নির্ধারিত হইবে। যদি মন্ত্রী-বিশেষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন হয়, কোন বাড়োয়ারী ব্যবসারী তাহা দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং নব-গঠিত মন্ত্রীমণ্ডল নিশ্চিন্ত চিন্তে কার্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন।

এক বিরতি প্রদান করিয়া নলিনীবাবু পদত্যাগ করিলেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি নাকি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা উঠাইয়া লইবেন। পাঠকবর্গের হৃদয় স্মরণ আছে যে, ইতিপূর্বেই অত্যন্ত অনেক কংগ্রেস কর্মী ও নেতার বিরুদ্ধে অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞা অপসারিত করা হইয়াছে। নলিনীবাবুর বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা অপসারিত হইলে তাঁহাকে সম্মিলিত মন্ত্রী-মণ্ডলীর অর্থসচিবের পদে মনোনীত করিতে কোন বাধাই থাকিবে না।

ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারী মুরহেড সাহেব ভারত পরিভ্রমণের অফিসার কোর্টের প্রান্তে মহাত্মাজীর সহিত নিম্নতে আলাপ করিয়া গিয়াছেন। এই আলাপ নিছক সৌজন্য-প্রদর্শন নহে—ইহারই অন্ত-রালে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কীয় আলোচনা বিহিত রহিয়াছে। 'স্বাধীনতা' দিকে লক্ষ রাখিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের সহিত একটা বন্ধা করিয়া ফেলিতে অভিযাত্রার ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন সুতরাং যুক্ত-রাষ্ট্রের বর্তমানে পরিকল্পিত কাঠামোর কিছুৎ বদল করিয়া কংগ্রেসের সম্মুখিত করা হইবে—ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। কংগ্রেস যদি পরিবর্তিত যুক্ত-রাষ্ট্রে যোগদান করিবার সঙ্কল্প করেন তাহা হইলে সর্দার প্যাটেল ও রাষ্ট্রপতির অভিমত এই যে নলিনীবাবুকে বাংলার অর্থ-সচিবের পদ হইতে সরাইয়া যুক্ত-রাষ্ট্রের অর্থসচিবের পদে বসানই সঙ্গীচিন। এই অভিমত কার্যে পরিণত হইবে

নলিনীবাবুর পরিবর্তে, মিঃ খৈতান বাংলার অর্থ-সচিব হইবেন। বৃহত্তর রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নলিনীবাবুর পদোন্নতিতে আপত্তি না থাকিলেও একজন অ-বাঙালীকে বাংলার অর্থসচিবের পদে বসান আমরা সমর্থন করিতে পারিমা। এইরূপ কোয়ালিশন সিন্ডিকেটের বার্তা বহন করিয়া রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত সর্দার প্যাটেলের সহিত 'সাক্ষাৎ' করিবার 'জগৎ নলিনীবাবু বোম্বাই যাত্রা করিবেন।

'কেহ কেহ বলিতেছেন উল্লিখিত ব্যক্তি বর্গকে লইয়া সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পরিকল্পনা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবগত নহেন এবং তাঁহাদের বিমা অনুমোদনেই এইরূপ সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে। তবে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ, যদি এইরূপ সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের আদেশ দেন তাহা হইয়া অনুমোদন না করিলেও

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য নব-গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলকেই সমর্থন করিবেন।

স্বাভাবিক এই মাসের মধ্যেই স্ব-মন্ত্রী-মণ্ডলীর পতন ও কংগ্রেস-প্রজা-সম্মিলিত মন্ত্রীগঠন অবশ্যজ্ঞাবী। রায় হরেন্দ্র চৌধুরী পদত্যাগ করিয়া বিধানবাবুকে এ্যাসেমব্লিতে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিবেন। আর, হুজু নব-মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বাংলা ও আসামের কংগ্রেসী এ্যাসেমব্লিতে জেনারেল পদে নিযুক্ত হইবেন। এক কথায় বাংলার রাজনীতি এক ঘোরতর বিপ্লবময় পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হইতেছে। যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সহিত রাষ্ট্রপতি এই অসাধ্য সাধনে ত্রুটি হইয়াছেন তাহা সফল হইলে বাংলার বন্ধ হইতে প্রতিক্রিয়া-পন্থী মন্ত্রীমণ্ডল বিলুপ্ত হইয়া বাংলার নব আশা আকাশের উদয় হইবে। রাষ্ট্র-পতির উত্তম সফল হউক-ইহা আমরা আন্তরিক ভাবে কামনা করি।

মেট্রোপলিটান পিকচার্স-এর—নয়ন ও মন পরিতৃপ্তিকর রূপ ও রসের অনাবিল প্রবাহ !



জনগণ অভিনন্দিত, স্মরণীয়

২২ সপ্তাহ

খনা

শ্রেষ্ঠাংশ : অহীন্দ্র চৌধুরী ও

ছায়া দেবী

৩২সং রস-মধুর কৌতুক চিত্র

অভিসারিকা

পরিচালক : বীরেন গাঙ্গুলী

মহাসমারোহে চলিতেছে !

চিত্র-পরিবেশক : কাপুরচাঁদ লিঃ
কলিকাতা



শনৈশচরের বিচিত্র লীলা

আশ্বিনের শনির চিঠি খবর দিয়াছে—
“বর্তমান সংখ্যায় শনিবারের চিঠির দশম বর্ষ পূর্ণ হইল।” ইহা সাহিত্য-সমাজের পক্ষে একটা সুসংবাদ বটে। কারণ, জ্যোতিষ-বচনে আছে—শনির দশ বৎসর দশা-ভোগ কাল। সুতরাং কুকট-মার্ক কদাচারী লেখক কয়টার কুদৃষ্টি বা কুস্পর্শ বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রে কে আর কলুষিত করিতে পারিবে না, এমন আশা করা যায়। নীলবর্ণ শৃগালদের স্বরূপ যখন ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন ‘শেষের সে ভয়ঙ্কর দিন’ যে তাহাদের নিকটবর্তী, একথা কে না মনে করিবে? অঙ্ককার অঙ্কলে এ দুয়নি চেহারা ঢাকা পড়িবার নহে। বঙ্গ বিপ্লবী অভিনয় আবার সকলে দেখিতে পাইবেন।

• •

রাঁচিতে বসিয়া ব্রজেন বন্দ্যো যে জাবর কাটিয়াছিলেন, তাহাও আনন্দবাজারের বৃকে বাহার দিয়া বাহির হইয়াছে! ১৩৩২ সালের ‘সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’র বহু ঐতিহাসিক ব্রজেনবাবু ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—“বাংলায় ইহাই বোধহয় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র।” কিন্তু তাঁহার এই ‘বোধ হয়’ তাঁহার রাঁচির ‘বাগী’তে বিলীন প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার বাণু ভায়া তাঁহার বাক্যকে বেদ-বাক্য

বলিয়া শনির পত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই বোধ হয় আশ্চর্য্য পাইয়া ব্রজেনবাবু নিঃসঙ্কোচে এবারে বলিয়াছেন—“১৮৫১ সনের শেষার্ধ্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালায় ইহাই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র।”—কিন্তু একথা আদৌ সত্য নহে। • ব্রজেন বন্দ্যো: যদি শুধু পুস্তকের মলাট-দেখিয়া গুস্তাদী না করিতেন, তাহা হইলে তিনিও জানিতে পারিতেন যে, ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ প্রকাশের পূর্বে—১৮৫০ সনে ‘সত্যার্ণব’ নামে যে মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কাগজখানিই বঙ্গভাষার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র। শনির বাহনেরা গুনিয়া খুসী হইবেন যে, ব্রজেনবাবুর বাক্য সম্প্রতি ‘বাগী’তে পরিণত হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের উক্তি যখন কাগজে কাগজে ‘বাগী’ বলিয়া প্রকাশিত হয়, তখন ব্রজেন বন্দ্যোই বা নিজ উক্তিকে ব্রজ-বাগী না বলিবে কেন? আশাকরি, শীঘ্রই সকলে বাণুর বাগী, নরসুন্দরের বাগী প্রভৃতি দেখিতে পাইয়া নয়ন সার্থক করিবেন। ইহাকেই বলে—ব্যাঙাচি-বিড়ম্বনা!

যতীন ভট্টাচার্য্য ‘Griffith Prize’ পাইয়া শনি সম্প্রদায়ের বৃকে সত্যাই শেলাঘাত করিয়াছেন। শনি-বাহন ব্রজেন বন্দ্যো যে কাগজে কাজ করেন, সেই

মডার্ন রিভিউ’ যদিও যতীনের এই পুরস্কার প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছে,—

It is understood that it is for the first time that a comprehensive, systematic and scientific attempt has been made by Mr. Bhattacharjee to trace the growth and development of the Bengali lexicon from the year 1743, i. e. several years even before the battle of Plassey. Mr. Bhattacharjee has been able to refer in his original thesis to as many as 150 different volumes of Bengali lexicon between 1743 and 1867.

Mr. Bhattacharjee has dealt with indices of words given in different volumes, their philological treatment, the unpublished manuscripts of eight different lexicographers and their lives. The last chapter of the thesis deals with the development of the Bengali language since 1830 and an attempt has been made to demonstrate how the Bengali language was used as the court language of the province. Mr. Bhattacharjee also refers to the pioneering attempts made by Rev. Long, that immortal missionary litterateur, who made the cause of the province his own and also states papers in this direction.

কিন্তু আর কাহারও কৃতিত্ব-কথা শনি-সম্প্রদায়ের সহ হয় কি? তাই দর্শনলে পুড়িতে পুড়িতে আশ্বিনের শনির চিঠি পাগলার মতন লিখিয়াছে—“উক্ত গ্রন্থ জামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কৌশলী লোক, তাহা তাঁহার রাজ্যাবসানের পর গ্রিকিথ পুরস্কার বোম্বার দ্বারা প্রমাণিত হইল। সংবাদপত্রে দেখিলাম, পুরস্কৃত গ্রন্থক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের গুণের

যথো তাঁহার ন্যূনাধিক চারি হাজার পুস্তক সংগ্রহের উল্লেখ আছে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্দের বর্তমান উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় আজ পর্যন্ত ন্যূনাধিক চারি হাজার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।—অথচ শনির বাণ সজনী দাস যখন বহুজনবিদিত একখানা বাঙ্গালা অভিধানের কথা তুলিয়া পরিষদে আঞ্চালন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সাজপাঞ্জরা আবিষ্কারের দোহাই দিয়া আন্দোলনের তুফান তুলিয়াছিল! আর আজ যতীন ভট্টাচার্য্যের এই কৃতিত্বকে—প্রাচীন বাঙ্গালা অভিধানের ইতিহাস-রচনাকে উপেক্ষার সুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ইহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদকেও অকারণে আক্রমণ করিয়াছে। নীচতার এমন কদর্য্য নিদর্শন ইতিপূর্বে আর কোথাও ফেহ দেখিয়াছেন কি? যাহারা শ্রোত বুঝিয়া সাগ দেয়, নোক্তা দেখিয়া নেমাজ পড়ে, ধরণ দেখিয়া ধামা ধরে এবং গণ্ডি দিয়া গালি পাড়ে, তাঁহাদের এ হীন কৌশলের তুলনা আছে কি?

“বিস্মরণী”-কবি মোহিতলাল মজুমদারের সুশীল-সজনী একজোড়া দিগগজ কবি-বন্ধু থাকি সবেও তাঁহাকে নিজেই নিজের “পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে” কবিতা লিখিয়া অমর হইতে হইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। অবশ্য—গৌর উত্তিবার বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব হইতেই মোহিত লালের মৌলিক হইবার সখ—তাই তিনি একদা নিজের বিয়ের কবিতা নিজেই লিখিয়া এবং তাহাই প্রকৃতভাবে ছাপাইয়া বরষাক্রীমহলে বিলি করিয়াছিলেন। ২৮শে আগ্রিন ১২২৫—শনি-পঞ্জিকার একটি মোহিতাঙ্কর দিবস, কারণ এই দিবসেই

মোহিতলালের “আমু-বিহঙ্গ” দয়া করিয়া “পাখা মেলিয়াছিল!” সাদা বাঙ্গলায়—“আমু-বিহঙ্গ”-কে “প্রাণের পাখী” বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়—“কাকি দিয়ে প্রাণের পাখী”…… ইত্যাদি ভণিতা দিয়া জন্মদিনের কবিতাটি আরম্ভ করিলে আরও শ্রুতিস্বত্বকর হইত। মোহিতবাবু আমাদের কথাটি ভাবিয়া দেখিবেন এবং অগ্রহায়ণের শনিবারের চিঠিতে উক্ত ভণিতা দিয়া আর একটি কবিতা লিখিয়া আমাদের উপরোধ রক্ষা করিবেন।

মোহিতলাল লিখিয়াছেন—

“ব্যথা নাই কোথা, ক্ষোভ নাই মোর
—গড়েছি বুকের ভূষা,
কাল-কণী-শিরে আছিল যে মণি তাহাই
মাজিয়া নিয়া।”

আমরা ত পড়িয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছি। মোহিতলালের যে একাধারে “অধ্যবসায়ী” কবি, দুঃসাহসী সাপুড়ে, এবং অদ্ভুত মণিকার তাহা আমরা পূর্বে জানিতাম না। কাল-কেউটের মাথা হইতে মণি ছিনাইয়া লইয়া, তাহাই মাজিয়া বসিয়া, তিনি বুকের খে ভূষা বানাইলেন, তাহা একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। মোহিতলালের ঔদার্য্যের ওর নাই, তাহা আমরা জানি বলিয়াই তাঁহার এই বুকের ভূষাটিকে—অভাগা বাঙ্গালীদের নামে উইল করিয়া যাইতে অগ্ররোধ করি। ঐ ভূষা মাখিয়া, ত্রিবিধুঃ, ঐ ভূষার ছোয়াচ লাগিয়া, বাঙ্গালী যদি মানুষ হয় তাহা হইলে কবি মোহিতলালের ছরস সাপুড়েগিরি সার্থক হইবে।

“তোমার কাননে যে ফুল বসিল আমার
প্রাণের বড়ে,
রচি নাই মোর ফুলশেখ তার—
ভরেছি পুজার থালা।”

এতকণে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল। মোহিতলালের প্রাণের বড়ে হাওয়ার যে ফুল বসিয়াছে সেই বরা ফুলে পুজার থালা ভর্তি হইয়াছে। তাহাতেই এত গুরুত্বালী ভাষা, এত নিপাতন প্রয়োগ, এত আড়ষ্ট অর্থহীন শব্দ চয়ন। বড়ে পড়া বরা ফুলে দেব-সেবা হয় না, অপ-দেবতার সেবায় তাই জীবনটাও হুমছাড়া হইয়া গিয়াছে!

“সব শেষে আর রহিবেনা কিছু বাহির ভুবনে-
মোর,
জন্মতিথি যে মিলাইয়া আসে মৃত্যুতিথির
সনে
তখনো বন্ধে নৃত্য-চপল তব চরণের ধ্বনি
ধামিবে না জানি যতখন মুখে তারকারা
চেয়ে রবে।”

সবশেষে কবি মোহিতলালের মত ব্যাটো-রক রবরক মহাপুরুষেরও যে অবশিষ্ট কিছু রহিবে না—ইহা অবশ্যই নূতন কথা। তবে আশার কথা এই যে, তারকা থাকিতে মোহিতলালের বন্ধের কম্পন ধামিবে না অর্থাৎ রাত্রিকালে যতক্ষণ আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়া রহিবে ততক্ষণ মোহিতলালের মৃত্যু হইবে না। বাসিমড়া না হওয়া বহু পুণ্যের কথা এবং ইহাতে কবির আত্মীয় স্বজন বহুবর্গও আশ্বস্ত হইবেন।

বাস্তবিক এমন রাবিশ, যে কাগজের মুখপাত রক্ষা করে, সে কাগজের স্থান কোপায়, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

“পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে”র পর শনিবারের চিঠির দ্বিতীয় প্রবন্ধ “বাঙালা ও সংস্কৃত”। লেখকের নাম নাই, কাজেই প্রচলিত রীতি অনুসারে এবং লেখাটির শেষভাগে, “এবার আমাকে চুমু খেতে দাও, অনেক-কণ ধরে খেতে দাও, অনেক করে খেতে

দাও” ইত্যাদি উদ্ধৃতাংশের জোড়বেইহা মণিমুক্তার ডুবুরি সজ্জী সম্পাদকের লেখা বলিয়া অনেকের অসুমান হইতে পারে। কিন্তু লিখন-ভঙ্গীর গুরু-চণ্ডালী যোগ দেখিয়া মনে হয় এ লেখাটিও শ্রীমোহিতলালের। লেখক অভিযোগ করিয়াছেন—“এককালে বিজ্ঞান গৌরব ছিল, এখন আছে অবিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-হীনতার গৌরব।” কিন্তু লেখক এই তথ্যটি নিজের লেখার মধ্যেই বেশ সপ্রতিভভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার লেখা পড়িলেই, সে কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। তবে “অবিজ্ঞান” আর “বিজ্ঞানহীনতা” যে একার্থবোধক তাহা আমাদের জানা ছিল না, বরং এককালে লোকে “অবিজ্ঞান” রাখিয়া গৌরব করিত শোনা যায়। সে যাহা হউক, লেখক দুইটি বিষয়ে বড় ধাপ্লা হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন—

(১) “বাক্সালা দেশের দুইটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাক্সালা ভাষার পাঠ্যতালিকায় সংস্কৃত জ্ঞানের কোন ব্যবস্থাই নাই। তাহার একটির বাক্সালা বিভাগের কর্ণধার শ্রীখোল বাজাইয়া কীর্তন গাহিয়া অ্যাসরী ক্বাইয়া রাখিয়াছেন;.....”

(২) “ইহা-ত অর্ধাচীনদের অসার প্রলাপ; কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন অতি-আধুনিক হইয়া লেখেন—

চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে

স্বর্গীয় মদের ফেনা!

এবং একদিন রুদ্র বৈশাখের ‘ধূলায় ধূসর রুক্ষ উজ্জীন পিঙ্গল জটাজাল’-এর বর্ণনা করিয়া এখন সেই বৈশাখের অতি আধুনিক চিত্র আঁকেন—

সমস্ত আকাশটা ঢেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ তার ল্যাজের ঝাপটে ডাল-পালা আলুথালু করে

হতাশ বনম্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে— তখন বলিতে হইবে যে, বাঙালা ভাষা সরস্বতীর ‘উবুড়’ হইয়া পড়িবার আর বেশি দেরি নাই।”

লেখকের উদ্ধৃতাংশ দুইটির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের কিছুই বলিবার নাই কিন্তু আমরা শুধু ভাবিতেছি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা। রায় বাহাদুরকে শনিবারের চিঠি “খোজিন্দাজ” বলিয়া বরাবর সম্বোধন করিয়া থাকে এবং উপরোক্ত এক নম্বর খোঁচাটির অর্থও বেশ পরিস্ফুট। তথাপি রায়বাহাদুর শমৈশ্বরদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে এবং শনির কাগজে লেখা দিতে ঘৃণা • বোধ • কারণ না। রায়

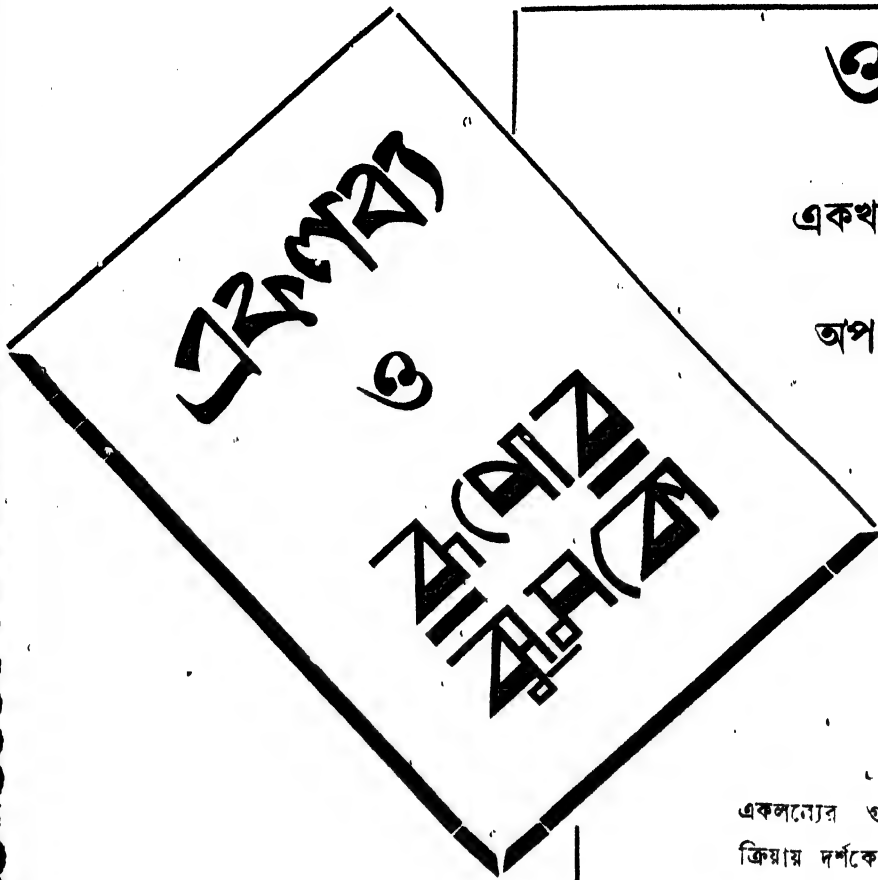
বাহাদুরের এই আত্মসম্মান-জ্ঞান-বর্জিত মনস্তত্ত্ব আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তিনি কেন ইহাদের এখনও ‘নাই’ দেন, ইহাই আশ্চর্য। আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে শনিবারের চিঠি-ত যখন তখন বর্ষরোচিত ভব্যতালেশশুভ ভাষায় বক্তোক্তি করিয়া থাকে। অথচ সজ্জী-সংপাদিত সমুদ্রপ্রকাশিত বৈশিষ্ট্যহীন “অলকা” পত্রিকা খানায় রবীন্দ্রনাথের “মুক্তির উপায়” নাটক ছাপা হইয়াছে দেখা গেল এবং শ্রীমতী সুনীতি-বৃন্দের দূতী-গিরির আশ্রয় করিয়া ‘সজ্জীকান্তকে’ শাস্তিনিকেতনে হানা দিতেও দেখা যাইতেছে। ইহা কি রবীন্দ্রনাথের অহেতুকী আশ্রিত-বাৎসল্য অথবা বিশ্বকবির বুড়াবয়সে চন্দন-বিষ্ঠায় সমুজ্জান লাভ? ইহাদের না হয় লজ্জা নাই কিন্তু আমাদের সেকালের সেই রবীন্দ্রনাথের এতটা অধঃপতন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। হায় ব্রহ্মবান্ধব! তুমি শুধু “চার-অধ্যায়ের” ভূমিকা লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কাণে তোমার নিজের অধঃপতনের কথাই বলিয়া গিয়াছিলে, স্বচক্ষে আর কিছুই কি দেখিয়া বাও নাই?



= পিরামিড চা =

চিত্তহারী সৌরভ, নয়ন তৃপ্তিকর বর্ণ, অভিনব স্বাদ
১ পাউণ্ড প্যাকেট মাত্র ১০ আনা
প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত দোকানে সাদরে বিক্রিত হয়।

ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।



ও, কে, এ'র

নব অবদান
একখানি অতি প্রাচীন
পৌরাণিক
অপরখানি অতি আধুনিক
সামাজিক

...এই দুই বিভিন্ন রসের
দুইটা কাহিনী একই
সময়, একই চিত্রগ্রহে
দেখিতে পাওয়া যাইবে...

একলন্যের গুরুভক্তির জলন্ত নিদর্শনের প্রতি-
ক্রিয়ায় দর্শকের মন যখন জলভারাক্রান্ত হইয়া
উঠিবে, তখনই হারাণ কুমকোর সরস অশ্বেষণে
জলভারাক্রান্ত মনে আনন্দের বিদ্যুৎ চমক দেখা
দিয়া নির্মল জলকণার স্রাব দর্শকের মনে বিমল
হাস্যকণা ফুটাইয়া তুলিবে.....

প্রয়োজক :

পান্নালাল পাঠক

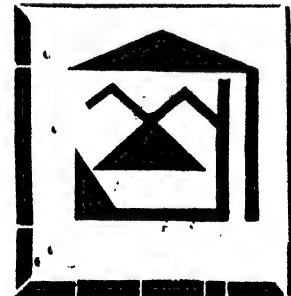
পরিচালক :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রুত-উদ্বোধন

শনিবার

১৯শে মতেধর





(বিলাসী)

‘উত্তরা’র খনা ও অভিসারিকা

গত শনিবার ‘উত্তরা’র, শ্রীযুক্ত বি এল খেমকার প্রযোজনাধীনে গঠিত ‘খনা’ ও ‘অভিসারিকা’ ছবি দুটির উদ্বোধন সুসম্পন্ন হ’য়েছে। ঐ দিন প্রাতে কর্তৃপক্ষ চৌরঙ্গী প্রাজ্ঞা সিনেমায় এই ছবির বিশেষ ‘প্রেস-প্রদর্শনী’র ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এই উপলক্ষে সাংবাদিকরা ছবি দেখার পর শ্রীযুক্ত খেমকার মধুর আতিথেয় পরিচর্যা হ’য়ে সকলেই খুসী মনে বাড়ী ফিরেছিলেন।

জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় যেমন ‘খনা’র আখ্যান, ভাগ রচনা করেছিলেন, তেমনি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেই আমরা বোলতে পারি, এই ছবির গঠনের গোড়া থেকে প্রকাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি আগাগোড়া হৃদয় বিদারক ‘ট্রাজিডি’।

পর্দার উপর যে ট্রাজিডি, তার পরিচয় ছবিতেই প্রকাশমান কিন্তু পর্দার অন্তরালে যে হৃদয় বিদারক অপ্রকাশ্য অভিনয় সংঘটিত হ’য়েছে, সেই নাটকের অভিনেতা—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, এবং অভিনেত্রী ছায়া দেবী আর তার দর্শক—বি-এল-খেমকা এবং তাঁর কর্মসচীব উপেক্ষনাথ গোস্বামী।

সুখের কথা। সেই অপ্রকাশ্য ট্রাজিডির যবনিকা আজ বি এল-খেমকার নিতান্ত বরাত জোরেই পড়লো। সেই যবনিকা ফলবার জন্ত যিনি অকৃত-সাহসে, সিংসার

ভাবে, অবৈতনিক ষ্টেজ-ম্যানেজার রূপে, মূর্খকালে খেমকা বাবুর মান রক্ষা কোষে পেরেছেন—তিনি হ’চ্ছেন আমাদের বন্ধুর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়। এই সম্পর্কে বাবুলালজীর সহযোগীতা প্রশংসনীয়।

যে রহস্য—‘খনা’ দেবীর পর্দারগায়ে প্রকাশমান জীবন রহস্যের চেয়েও মিস্ট্রিক ও গভীর—সে রহস্যের দারোদ্যাটন করবার সুযোগ ও সময় এখনও আসে নি। তাই বর্তমানে এর বেশী আর আপনাদের জানাতে পারলুম না।

এখন পর্দার উপরের মূল ছবিখানির বিচার করা যাক।

সিংহ-রাজকন্যা খনার এক অজ্ঞাত-কুলশীল যুবকের সঙ্গে প্রেম, পিতৃপরিচয় লাভে উন্মত্ত প্রায়, সেই যুবকের সঙ্গে উজ্জয়িনীর উদ্দেশ্যে খনার অভিযান এবং উজ্জয়িনীতে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নব-রত্ন সভার অল্পতরী রত্ন, জ্যোতিষার্ণব বরাহের সীহিত মিলন ও সেই মিলনের ফলে খনা ও তাহার স্বামী মিহিরের জগ্যাকাশে যে দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হয়—তাহারই উত্থান-পতনের কাহিনী এই চিত্র-নাট্য রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কালোপযোগী দৃশ্য-পট, সাজ-পোষাক এবং আবহাওয়ার মধ্যদিয়ে, নানা রূপ রসের সংঘাতে, ছবিখানি উপভোগ্য হয়েছে। নাটকের রস আংশিক ভাবে নানা বাধ-

দেও, তা’ বাঙলার নর-নারীর চিত্তকে হৃদয়স্পর্শী অভিনয় এবং সুখশ্রাব্য সঙ্গীতের আকর্ষণে আকৃষ্ট করেছে।

বরাহ বেশী অহীন্দ্র চৌধুরীর এবং নান ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া দেবীর অভিনয় হ’য়েছে উপভোগ্য।

‘মদনিকা’র ভূমিকায় শ্রীমতী অরুণাকে মানিয়েচে সত্যি চমৎকার। কিন্তু চেহারাটির মত অভিনয় অন্তর্ধানি মিলে নি।

‘মিহিরের’ ভূমিকায় সুশীল রায়ের অভিনয় চলনসই কিন্তু অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামান্দক নিতান্তই প্রাণহীন বোলে মনে হোল।

অত্যাচার ভূমিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করবার মত বিশেষ কিছুই নেই।

‘খনা’র সুন্দর গানগুলি রচনার জন্ত লেখক নীহারবিন্দু সেন গুপ্তের প্রশংসা করি। অধিকাংশ গানেরই সুর বেশ ‘লাগ সৈ’ হ’য়েছে, এর জন্তে প্রশংসা অবশ্য সুর শিল্পী ধীরেন দাসের প্রাপ্য। মোটকথা ছবিখানির সাফল্যের অল্পতম কারণ এর চমৎকার সুস্পাদনা।

‘খনা’র সঙ্গে প্রদর্শিত, পাঁচ রীলের হাসির ছবি—ধীরেন গাঙ্গুলীর ‘অভিসারিকা’ অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক হাসির খোরাক জুগিয়েছে।

‘খনামধন্য’ ‘ডি-জি’ সেজেছিলেন এক উৎকট রোমান্স-বাতিকগ্রস্ত যর-জামাই। তার প্রণয়ের অগ্নিতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন বন্ধু সুহাস। অবশ্য সে আগুণ নিভিয়ে ছিলেন, ফায়ার-ব্রিগেড, রূপিনী শ্রীমতী লীলা (সাবিত্রী)।

টাইপ হিসাবে—‘ডি-জি’র প্রণয়-পাগল যরজামাই, ‘জ্যোতিষ পিনাল কোড’ শাস্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, এবং বিপদাশ্রয় ভূত্যা রূপে আত্ম বোধের অভিনয়

আমাদের ভাল লেগেচে। বিকাশের লীলা-সঙ্গিনী রূপে শ্রীমতী সাবিত্রীর ভাবাবিব্যক্তি ও অভিনয়ও হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর।

স্বল্প সমালোচনার মাপ-কাঠিতে এই শ্রেণীর হালকা প্রহসনের জাত-বিচার না কোরে আজ শুধু এইটুকুই বোলতে চাই যে ছবিখানি একেবারে আমাদের নিরাশ করে নি।

বড়দিদি

‘বড়দিদি’ কাহিনীর মধ্যে, নৃত্য-গীত-পটঙ্গী, যুবতী বাদ্জী ‘এলোকেশী’—এমন একটি চরিত্র, যার কথা এতদিন আমরা উল্লেখ না কোরলেও, উপেক্ষা কোরতে পারি না।

কুশলী কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটির অবতারণা কোরেছিলেন, নায়ক সুরেন্দ্র-

নাথের চরিত্রের দৃঢ়তা, এবং আর একটি নারীর প্রতি তার অবিচলিত নির্ভা, শেষ পর্যন্ত প্রতিপন্ন করবার ভ্রম। নানা ঘটনার সংঘাতে, নানা বিরোধের মধ্য দিয়ে কি ভাবে মূল চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হয়, শরৎচন্দ্র সে কৌশল বেশ ভালই জানতেন। বস্তুতঃ নর-নারীর হৃদয় রহস্তের এতখানি সন্ধান জানতেন বোলেই, কাল্পনিক হ’লেও তাঁর সৃষ্টি চরিত্রগুলি, প্রাণ-রসে সমৃদ্ধ হোয়ে ওঠে।

বাদ্জী এলোকেশীর সান্নিধ্যে, সুরেন্দ্র-নাথের আন্তরিক নির্ভার অগ্নিপরীক্ষা, পরিচালক অমরবাবু গুনচি শীঘ্রই গ্রহণ কোরবেন। হাক ভান ও কটাক্ষাদির সহ-যোগে; নাচ-গানের মুষ্টিযোগ যাতে ব্যর্থ না হয়, তার জন্তে পঙ্কজবাবুর মহলা-মন্দিরে, ‘শ্রীমতী এলোকেশী’ চেষ্টার ক্রটি কোরছেন না।

এই ভূমিকায় আপনারা এমন একটি চৌখোঁধি অভিনেত্রীকে দেখতে পাবেন, যিনি সত্যকারের এলোকেশীর আদর্শকে যে কোন দিক দিয়েই ক্ষুদ্র কোরবেন না—এর পরিচয় আমরা বাইরের লোক হ’লেও, কিঞ্চিৎ পেয়েছি।

পঙ্কজবাবু ও অমরবাবুর জয় হোক। এখন বেচারী সুরেনকে অন্তরেই রেহাই দিলে আমরা বাঁচি!

সাপুড়ে

দু’নম্বরে আবার সাপুড়ে দলের ভেদী বাদ্জী এ হুঁপা থেকে শুরু হোল।

‘ঘণ্টা বুড়ো’-র সাক্ষরদী কোরে, কৰ্ম-সচীব ছোটাইবাবু ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ তুচ্ছতাক্ আয়ত্ত্ব কোরে থাকবেন। অস্তুতঃ দেবকী বাবুকে তিনি আংশিক ভাবেও চাল্লা কোরে তুলতে পেরেছেন দেখে



বর্ধা ফিল্ম কোম্পানীর পোস্তারি

চি
স্র

জন্মস্থানী জানকীর প্রেমের
বেদনাময় মধুর কাহিনী—

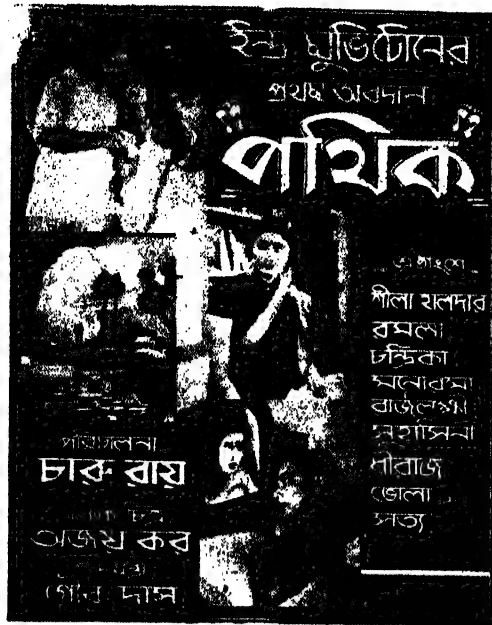
*
প্রযোজ-শিল্পী : কলী বন্দ্য
আলোক-চিত্র-শিল্পী : প্রমোদ দাস
শব্দ-মন্ত্রী : নৃপেন পাল
ভূপেন ঘোষ

*
ভূমিকায় : সাবিত্রী, দেববালা, ছায়া,
রাজলক্ষ্মী, অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন
ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায়,
মৃণাল ঘোষ, তুলসী চক্রবর্তী, জানকী
ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এবং আরও অনেকে।

*
রূপবাণী-তে আগতপ্রায়

N. I. P.

ইন্দ্র মুভিটোনের



প্রথম অবদান

পথিক

মনস্তত্ত্ব ও নব্য-
তম শিল্পকলার
চাতুর্যে ছায়া-
চিত্র অগভীর
যুগান্তর আনয়ন
করবে

পথিক

পরিচালনা :

চারু রায়

পথিক চলেছে দূরের
পথে—প্রেমের মালা আর
প্রাণের জ্বালা এ দুই-ই
তার পথের সাথী—
অশান্ত পথিক—দোটা-
নায় পথিক — প্রেমের

পথিক

In my life both Nanda & Reba
are equally true. I shall have
to pay the price of what
happens at their meeting
"I shall have to shoulder
the whole responsibility."
That youth wanted to
evade truth in this way
but did it succeed ?

P
A
T
H
I
K

Direction :

CHARU ROY

Indra Movitone's
Maiden Hit

PATHIK

It is based on psychology &
the latest technique and is
expected to herald a revo-
lution in Bengal's film world.

For booking apply to :—

CHANDANMULL INDRAKUMAR

3, Synagouge Street, Calcutta

PHONE B. B. 497

N. I. P.

আমাদের আশা হচ্ছে—এ বিরাট সর্প-যজ্ঞের প্রথমারম্ভ নির্ধারিতই কেটে যাবে।

কথায় বলে—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

বেদেদের পাণ্ডা দেবকীবাবু নিশ্চিত দিন রাত গুনচেন—কৌসু কৌসু শব্দ, আর তার সঙ্গে এমন একটি মেয়ের কৌসু ফোশানী—যে নাকী পুরুষের বেশে, বেদেদের দলে ঢুকে একদিন অকস্মাৎ নিতান্ত নিয়তির নির্দেশেই অঘটন ঘটবে কেনে। “কে সেই দুঃসাহসিনী মেয়ে, কেমন কোরেই বা সে বেদেদের দলে ঢুকলো—সে খবর আপনাদের আর একদিন জানাক। আপাততঃ জেনে রাখুন, মেয়েটির নাম—‘চন্দন’।

দেবকীবাবু ও ছোটাইবাবু অনেক কিছুই দেখচি, আজকাল লুকিয়ে রাখতে চান। তবু, আপনাদের আশ্বাস দিতে

পারি। ‘বেদে পল্লী’-র গোপন খবর ইতি মধ্যেই আমাদের হস্তগত হ’য়েচে। আপনারা ক্রমশঃ জানতে পারবেন।

ফণী মজুমদার

পরিচালক ফণী মজুমদার ভায়ার যে হালফিল্ পরোপকার বৃত্তি বেড়ে চলেচে—সে বিষয়ে সংশয় মাত্র নেই।

পথে পথে ঘুরে বেড়াতো এক জোড়া ভবঘুরে—মঞ্জু ও ভুলুয়া। মজুমদার মশাই তাদের একেবারে সহরে এনে, ডায়মণ্ড থিয়েটারের ম্যানেজারের হাতে ছুলে দিলেন।

আজ আবার দেখচি, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের পথে ছোটখাটো একটা ডাকাতি হ’য়ে গেল। সেই অবস্থল থেকে, পাঙ্কী সমেত এক যোড়া সুন্দরী যুবতীকে এনে তুললেন, পথের ধারে এক সরাইখানায়।

কিন্তু তাদের দেখা শোনার ভার দিলেন এমন একটি জীবের উপর, যিনি না ওসমান্, না জগৎ সিংহ।

ফণী ভায়া এতও জানেন?

অধিকার ও সাথী

নিউ থিয়েটার্সের এ ছটি নূতন ছবির বাংলা সংস্করণ বাংলার চিত্রামোদিগণের আর ঐর্ষ্যাচ্যুতি করবে না। অধিকার ২৪শে নভেম্বর শনিবার চিত্রায় মুক্তিলাভ ক’রবে। ‘সাথী’ পরিবেশকের (কপূরচাঁদ) কাছ থেকে বেশী দূরে যেতে চায় না তাই নিউ সিনেমায় শীঘ্রই মুক্তি লাভ ক’রবে। অধিকারের নায়ক ও পরিচালক কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া এ ছবিতে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন আর তার প্রিয় শিষ্য ফণী মজুমদার ‘সাথীর’ পরিচালনায়, দর্শকদের মনোমত ‘প্যাচ’ বেশ দিয়েছেন। সত্যিকারের গুরু মত

শনিবার ১২শে নভেম্বর হইতে

‘সংগীরতবে দ্বিতীয় সপ্তাহ

বসে টকীজের

রাজস্থানের গৌরসময় যুগের চিত্রদ্রাবী

বাণী-চিত্র

বচন

রাজপুত বীরত্ব ও পরাক্রমের অপূর্ণ চিত্র

—ভূমিকায়—

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর গৌরব

দেবিকা বাণী ও অশোক কুমার

সঙ্গীতে—অভিনয়ে ও রূপসজ্জায় অপূর্ণ

—আজই সপরিবারে দেখুন—

প্যারাডাইস

প্রত্যহ ৬-১৫টায় ও ৯-৩০টায়

শনি ও রবিবার ম্যাটিনী ৩টায়

THE
STIRRING TALE OF A
KSHATRIYA YOUTH WHO
REFUSED DEATH AND
FIGHTING TO FULFILL THE
PROMISE
HE HAD MADE



WITH
DEVIKA RANI
ASHOK KUMAR
MEERA DEVI
MAYA DEVI

IT'S A BOMBAY TALKIES PICTURE

—চিত্র পরিবেশক—

কাপুরচাঁদ লিমিটেড

৩৯, বেন্টিক স্ট্রিট, কলিকাতা।

কুমার প্রমথেশ শিখের সাফল্যের জন্ত উদ্গ্রীব ও কতকটা নিশ্চিন্ত। 'শিখাদিচ্ছেৎ পরাজয়' শাস্ত্রের এ উদার নীতি কুমার বহুলা লঙ্ঘন করেন নি তাই লোকে থাকে Box office star বলে সেই কাননবালাকে তিনি নিজের ছবিতে নায়িকার অংশ না দিয়ে, সাধারণকে গানের জন্ত নিজের ছবিতে না নিয়ে সবই ফণীবাবুর ছবির জন্ত রেখে দিতে কুঠা বোধ করেন নি। তবে পরাজয় ইচ্ছা করলেও দ্রোণের মত বোদ্ধা অর্জুনের নিকট পরাজিত হয় নি। এ মধুর ছায়া চিত্রকলার দৃশ্য দেখবার জন্ত সকলেই উদ্গ্রীব হ'য়ে আছি।

ষ্টার্ভার্ড পিকচাস

এই নামে একটি লিমিটেড কোম্পানীর তোর-ঘোড় চলছে। টালিগঞ্জ খালের ধারে বড় জমিও নাকি নেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে ২১ জন গুলীও নাকি আছেন। যাক বত হয় ততই আনন্দের—The more the merrier। তবে কতগুলি বোবা ও পক্ষু হয়ে পড়ে আছে তাদের হিসেব নিলে ভাল হ'ত।

দেবদত্ত ফিল্মস

স্বয়ং দেবদত্তবাবু নাকি 'শম্ভিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাস্তব। এত দেবকত্তা থাকতে হঠাৎ দৈত্য কত্তার ওপর নজর পড়ল কেন? যাক—এর আরোও খবর পরে জানাব।

প্রাইমা ফিল্মস লি:

গত সপ্তাহে এরা বোম্বাইএর 'হিন্দি ছবির পরিবেশন' সভা নিচ্ছেন বলে খবর দিয়েছি। জালা শীত্ৰই মুক্তি লাভ করবে। দ্বিতীয় ছবি 'সাধী'র নায়িকা শ্রীমতী দুর্গাবাই খোটে আর নায়ক মোবারক। এ ছাড়া আরও তিনখানা ভাল ছবি নেওয়ার কথাবার্তাও পাকা হ'য়ে গিয়েছে।

পথিক

প্রাক্তন ন্যাডান ষ্টুডিও বা টলিউড ষ্টুডিওতে ইজ মুভিটোনের প্রথম ছবি 'পথিক' প্রায় শেষ হ'য়ে এসে। পরিচালক চাকরায় শেষের দু-একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

পূর্ণ থিয়েটার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী নিঃসৃত 'গোরা' বিগত পাচ সপ্তাহ ধরে পূর্ণ থিয়েটারে দক্ষিণ কলিকাতার চিত্রামোদিগণকে আনন্দ দ্বিগুণে এসেছে। এই শনিবার ১৯শে নভেম্বর তারিখ হ'তে গোরা ষষ্ঠ সপ্তাহে পড়বে। যারা এখনও দেখেননি তারা এ সুযোগ ছাড়বেন না আশাকরি। এর পর আসছে 'আলিবা' (শ্রেষ্ঠাংশে সাধনা বোস) ও নিউ থিয়েটারের হস্তরসাত্মক ছবি 'অচিন প্রিয়া'।

রূপাঙ্গী

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'অগ্নিনয়' ভালই চলছে যদিও অনেক দিন হয়ে গেলে এর উদ্বোধন হয়েছে। এর পর রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক ও চিরনূতন রামায়ণী গাথা—জনক নন্দিনী।

খনা

উস্তরা চিত্রগৃহে মেট্রোপলিটন পিকচার্সের 'খনা' এই শনিবার থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়ল।

হাজিরা পিকচার্স

এদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নানা লোকে নানা কথা বলে। দাদার-ও গলা শোনা যাচ্ছে না। শীত-কাল গলায় শ্লেষ্মা হয়ত বসেছে। আহা ব্যাচারি রামগতি! ফুলরাও ফুলিয়ে দিলে না।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টসএর পৌরাণিক চিত্র একলব্য ও তৎসহ অতি আধুনিক চিত্র রূপোর কুম্ভকো শ্রী চিত্রগৃহে ১৯শে নভেম্বর হইতে দেখান হইবে। ছবি দুইখানির প্রযোজনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত পান্নালাল পাঠক। অসীম ধৈর্য্য সহকারে শ্রীযুক্ত পাঠক উক্ত চিত্রপ্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁরই অমামুখিক চেষ্টা ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে আজ "একলব্য" ও "রূপোর কুম্ভকো" সাধারণে আত্মপ্রকাশ করিল।



ফোন-
কলি-
৬৪০৬

আধুনিক ৩
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

মডার্ন ইলেক্ট্রিক
ষ্টুডিও

৩২-সি
বৈদ্যনাথ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

N. I. P.



মিনাভা মুভিটোনের
উজ্জলতম সামাজিক চিত্র
জেলর

—৪ অক্টোবর ৪—

সোরাব মুডি

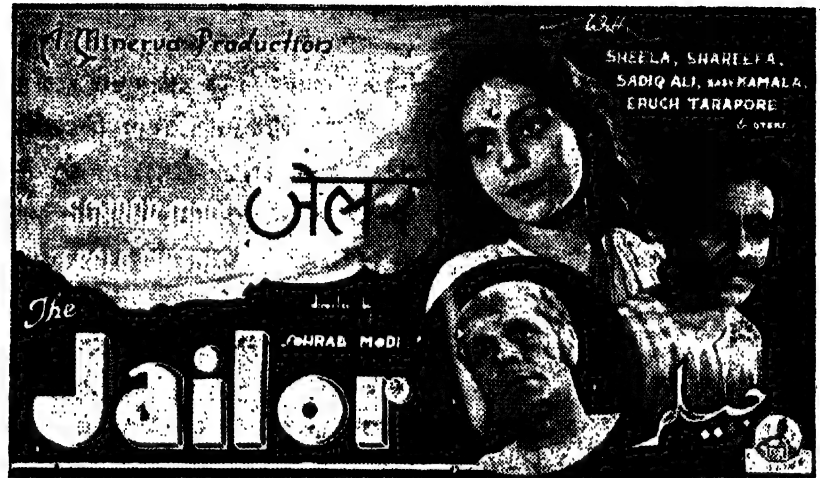
শীলা

লীলা চিৎনিস, বি-এ,

সাদিক

শারিফা

প্রভতি



শীলা

২৪শে নভেম্বর

ইদের দিন

—প্রভাত সিনেমায়—

মুক্তিলাভ করিবে।

আসন সংগ্রহ করুন

মুক্তির জন্য আবেদন করুন

ডোসানি ফিল্ম কর্পোরেশন

গ্রাম : দুলাদুল

৭নং কলুটোলা ফীট, কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ১৫০২, ৫৫০০

প্রতিভার অপমৃত্যু

ত্রিনিশ্বল কুমার শ্রব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পর্ধ্যায়

বাড়ী ফিরে চপল আস্তে আস্তে এসে প্রবেশ করে ওর ছোট্ট ঘরটাতে। ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে জিনিষ পত্রগুলো। বিছানাটা ওর অগোছাল হয়ে পড়ে আছে। মশারীর একটা কোনের দড়ি গ্যাছে ছিড়ে। বিছানার ওপরই ওটা লোটাচ্ছে। সামনের বড় আয়নাটা দেয়ালে টাঙানো। ওটায় ধরেছে ময়লা। জামা কাপড়গুলো এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে, কোনটা চেয়ারের গায়ে, কোনটা স্টুটকেসের ওপর আর কোনটা বিছানার ওপরেই। বই আর খাতা পত্রগুলো টেবিলের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ছড়ানো, রাসিক্ত জঞ্জালের মত। টিপয়টাতে শুল পেয়ালা এখনও পড়ে। জলের গেলাসটা মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। না, ও নিজে ভারী অলস মানুষ—ওভাবে কি অপরিষ্কারই না হয়ে আছে ওর ঘরটা। এঃ কাগজ পত্রগুলো গোছানই হয়নি। ওর কবিতার খাতাটা পড়ে আছে টেবিলের নীচে। তাইতো! যে কবিতাটা ও ফেয়ার করে রাখলো ‘সুচিক্রায়’ পাঠাবার জন্য, সেটাই বা গেল কোথায়? নাঃ যাক্গে সব চুলায়। ও আর পারে না। বাড়ার কেউই নজর দেয় না ওর ঘরটার দিকে। এখানে কি মানুষ থাকতে পারে? এ যেন গরুর গোয়াল, চতুর্দিকে ঘাস, বিচালী ছড়ানো। এর চেয়ে রাস্তার ঐ ডাষ্টবিনটা পরিষ্কার। ও চেষ্টায়ে ডাকে—মা।

কোন উত্তরই আসে না। ও ফের ডাকে, ফের।

মা আসেন। বলেন—কিরে চোঁচাচ্ছিস কেন? কি হলো তোর আবার?

ওঁ ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে ঐ বিছানার ওপরেই জুতো জামা শুদ্ধ।

ওর মা ফের জিজ্ঞাসা করেন—ডাকছিলি কেন?

ও লাফিয়ে উঠে বলে—কেন আবার। আমার ঘরটা কি দেখতে নেই কোনকালে? এখানে কি মানুষ থাকতে পারে? আমার পায়জামাটা গেল কোথায়? এ কাপড়টা ছাড়তে তোঁ হবে। আমার স্লিপারটাই বা কোথায় ডুব মারলো? দেখতো কি মুন্সিল। একটা মানুষ যদি আমার ঘরে আসে তাহলে আমায় কি ভাববে বলতো? ভাববে একটা জানোয়ার থাকে আস্তাবলের মধ্যে। না, তোমরা ভয়ানক ইয়ে...। ঝিটাকেও তো একবার পুটিয়ে দিতে পার। ঝাঁটাটাও দিতে পারে, না তারও দরকার নেই। দেখুতো টেবিলটা কি হয়েছে। এই দেখ, খাতাটা কোথায় পড়ে রয়েছে। এমনি করে আর কাঁহাতক পারি বল। না বললে যেন কিছুই করতে নেই। আমি যদি বোবা হতাম, তাহলে কি হতো? আন্তাকুড়ের ভেতর ফেলে রাখতে তো? আমি যেন একটা ভাড়াটে, পড়ে আছি একধারে; তিন কুলে কেউ নেই যার।

—মা হাসেন। বলেন—হতভাগা ছেলে! এরই মধ্যে এত চোঁচামেচি? আমি তো মনে করলুম বুঝি বা ডাকাত পড়েছে

তাই চপলকুমার সাবধান করে দিচ্ছেন: বাড়ীর লোকজনকে। সকাল বেলা আমি নিজে তোর ঘর শুছিয়ে দিয়ে গেলাম না? এরই মধ্যে এমনি করে তুলেছ তুঁ কি করে জানবো? জিনিষপত্র শুছিয়ে ব্যবহার করতে তো কোনকালেই শিখবে না। আমি একা কাঁহাতক সামলাবো?

—ওর রাগ বেড়ে যায়। বলে হঃ ভারী শুছিয়েছ, ছাই করেছ। আজ সকালে কখন এলে তুমি আমার ঘরে? তোমারই মনে নেই। সেই কবে একবার শুছিয়ে দিয়েছিলে তার ঠিক নেই!

বলিস্ কিরে? কবে মানে আজ সকালেই তো শুছিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেলাম। কি তুলোরে তুই! তাইতো বলি বউ নিয়ে আয়, সব ঠিক থাকবে দেখিস্। তাতো শুনবি ন্না। বিয়ের নাম শুনলে—ছেলে যেন লুকিয়ে ওঠেন। বই আর কালি কলম নিয়েই পড়ে আছেন রাতদিন। ওসব ছাই পাশ দিয়ে কি হবে শুনি?

—কি সব ছাই পাশ? বই আর কালিকলম? আর তোমার ওই বউ আর বিয়ের কথাই হারেমুক্তো; বিয়ে করলে খাওয়াব কি শুনি?

—কেন ছুনিয়ার লোক যা খাওয়াচ্ছে? পুরুষ মানুষ না তুই?

তা না হয় হলুমই। কিন্তু তাই বলে পাশে শুয়ে কোঁস কোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য একটা মানুষকে খাওয়ানোর কি দরকার?

কিন্তু বাপু একলাটা খেটে খেটে জীবনটা আমার যাবার দাখিল হলো যে! সেদিকে খেয়াল কি তোর কোনদিনই হবে না।

—বারে, ঝিটা কি করে তবে? খালি বুঝি কাজে কাঁকি দেয়? দাঁড়াও কাল সকালেই ওকে বকে দিচ্ছি আজ্ঞা করে।

সত্যিই তোমার শরীরটা তো খারাপই হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আচ্ছা মা, খিটা কখন আসে বলো তো? তখন আমাকে একটাবার ডেকে দিও, দেখ কি ভাবে ধমকে দিতে হয়।

নে, খুব হয়েছে। ওঠ দেখি এখন। জামা জুতো ছাড়বি? না; ওই পরেই রাত কাটাবি? পায়জামাটা ওই খাটের নীচে পড়ে রয়েছে। চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখলেই তো পারিস।

চপল তাড়াতাড়ি উঠে জামা কাপড় নেয় তারপর নিজের টেবিলে এসে বসে। ওর মা ততক্ষণে কাপড় জামাগুলো গুছিয়ে, বিছানাটা ঝেড়ে ঠিক করে দিয়ে চলে যান। যাবার সময় বলে যান—খেয়ে নিবি আয়। বেশী রান্ধির পর্যন্ত বসে থাকতে পারি না।

• চপল খেতে চলে যায়। খেয়ে ফিরে এসে ও আবার টেবিল আশ্রয় করে বসে। ও লিখবে আজ কবিতা। ওর ইচ্ছা তাই লেখে। কিন্তু কি লিখবে?

ও কলম চালিয়ে চলে। পাতার পর পাতা শেষ করে ওর দৃষ্টি ফিরে আসে গোড়ার লাইনের দিকে। শুরু থেকে পড়ে যায়। একি লিখেছে ও! একরূপ ধারার কবিতা ও তো এর আগে কখনোই লেখেনি। ওর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে—দেশের অতীত ইতিহাসের গৌরব-পূর্ণ কাহিনী, দীন দুঃখী বারা, ছুবেলা বারা ছুঁচো খেতে পাবার জন্ত করে যায় নিজের রক্তবিন্দু তিলে তিলে দান, তাদের কথা, আর বড় জোর অপরূপ রহস্যময়ী প্রেক্ষিত দেবীর মাধুর্য বর্ণনা। ভাব বিলাসী কবিদের দলের হাছব ও নয়,—যারা একটা কথাকেই নানারকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে চলে। দেশের এই সর কবল-বিলাসী কবিদের ও করে ঘৃণা। ওর মতে এরা দেশের প্রাণ-শক্তিকে নিভিয়ে দেবার

চেষ্টা করে। ওরা কন্সারভেটর অযোগ্য। রাশিয়ার গোর্কীকে ও করে পূজো। ওদের দেশেও ভাববিলাসী কবি আছে, কিন্তু তারা এদের মত নয়। তাদের সব লেখার ভেতরই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এদের কবিতা তো কবিতা নয়—কাঁছনি। এদের গল্প লেখা, উপজ্ঞান রচনা তো নয়, সব জ্বাকামী। ও ভাবে আমাদের দেশে একজনও কি জন্মাবে না গোর্কী, রোমারোলো, হাইটম্যান, বার্গার্ড, লারমন্টের ছগো; অথবা হাকসলি, ব্যালজ্যাক, ইঁবসন, টুরগেনিভ, ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ, শেলী, বাইরন? না, কত নাম ও করবে? দেশটার প্রাণশক্তির অভাব এতেই প্রমানিত হয়। এরা ভোগ করতেও জানে না ত্যাগ করতেও না। খালি নাকে কারা-তার নাম সাহিত্য? রবি ঠাকুর জন্মালো, কিন্তু বেচারী একা কতদিকেই বা সামলাবে? গান লিখবে না গান গাইবে, কবিতার ইন্দ্র মেলাবে না আবৃত্তি করবে, নাটক রচনা করবে না। নিজেকে ঠেজে নামবে! ভ্রমণ কাঁছিনী থেকে আরম্ভ করে মায় ছেলে ভুলোনো ছড়া পর্যন্ত ওই একটা লোকই বজায় রাখলে। শরৎবাবু বাও বা নামলেন দেশের সমাজ সত্ত্বা নিয়ে, হিন্দু শাস্ত্রের কুপমণ্ডকতা নিয়ে, লিখলেনও মন্দ নয়; কিন্তু আসল গোড়ামীগুলোকেই দিয়ে গেলেন প্রশ্রয়। আর ইঁটা এক দেবদাস লিখেই খেলেন তিনি দেশের মাথা। বই পড়ে আর না হয় পদ্য গায় ছবি দেখে, কতকগুলো ছেলে গেল একেবারে উৎসর্গে, যারা হয়তো মানুষ হতে পারতো ভাল শিক্ষা পেলে। দেশের অনেকগুলো শিক্ষিত তাক্স যুবক সাজলো নকল দেবদাস। কেউবা ভালো মদের অভাবে টামলে কান্ট্রী লিকর, কেউবা খেলে সায়নাইড আবার কেউ কেউ বিদ্রী

বাড়ীগুলোর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলে। এক 'দেবদাস'ই অনেকগুলো বিদ্রী জিনিষের প্রবর্তন করে গেল। দেবদাস মরলো—মরলো যদি পুরুষ মানুষের মত মরতো, তাহলেও দেশ একটা কিছু শিখতে পেত। রস কৃষ্টি হয় না তাহলে? কিন্তু দেশের যা প্রয়োজন তাই তো দেওয়া উচিত সাহিত্যের ভেতর দিয়ে?

নিজের লেখা লাইনগুলোর দিকে চেয়ে ও ভাবে—কিন্তু চপল বোস তোমার কলম থেকে আজ একি বেরুলো? না: এ লেখা ও ছিঁড়ে ফেলবে। দেশকে ফাঁকি ও দিতে পারবে না। কিন্তু মনকে তুমি ফাঁকি দেবে কি করে চপলকুমার?—ও নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে। ও ভেবে ঠিক করতে পারে না। এর চেয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে কাজ দেখবে বলে ও গিয়ে শুয়ে পরে। কিন্তু ঘুম আসে কই? ওর মনটা যেন আজ খালি পাগলামী করছে। ও ঘুমতে পারে না, উঠে পড়ে। খানিকটা পায়চারি করতে থাকে আন্তে আন্তে, যেন পাশের ঘরের লোক না জাগে। ধীরে ধীরে ও আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। 'কাঁচের ওপরে দেখা যায় ওর মুখটা খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট। তাইতো ওকে আজ বাস্তবিকই দেখাচ্ছে সুন্দর। ওর মুখের শ্রী ফিরে গেছে। আয়নার সামনে আরও একটু এগিয়ে আসে।

ও ভাবে মেয়েটার কথা। মীরা নাম না? বাস্তবিক মিষ্টি নামটা। বেচারী আমার একজন ভক্ত; আমার চেহারার নয়, আমার লেখার। বেশ চেহারাটা ওর। ও একটু খানিতেই দেখে নিয়েছে—। বেশ চটপটে। কথার স্রোত ওকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ইঁটা প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে ও হালতেও; কোন জড়তা নেই। না: মেয়েটার সরল সাহস আছে



অসুস্থ
শরীর



দুস্থ ও মবল

করিতে



সিরোলিন

'রাচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সর্দি কাশি এবং যক্ষ্মার
প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ।



সোজানুজি কথা বলবার। ঘুরিয়ে কথা বলবার জাকামো নেই। ওর প্রতি কথাটা যেন প্রাণশক্তির রসে সজীবিত।

চপল ফিরে আসে আয়নার সামনে থেকে। এসব কি ভাবছে ও! এতো ওর স্বভাব ধর্ম নয়! আভিজাত্যের গ্যাস-পোড়া এই সব বেগুন জাতীয় মানুষদের ও কোন কালেই পছন্দ করতো না। মেয়েদেরও না—পুরুষদেরও না। ও জানে—ওরা চায় শুধু নিজের ঔজ্জ্বল্যকে জাহির করতে। ওরা লোকের সাথে পরিচয় করে অতি সন্তর্পণে, পাছে ওদের আভিজাত্যে আঘাত লাগে। সাধারণ লোকের সঙ্গে ওরা কথা কয় না, আভিজাত্যের খোলস পাছে খসে পড়ে বলে। ওরা গ্যাসপোড়া বেগুন জাতীয় জীব। অন্তর বিব-বাস্পে ভরা, কখন যে উড়ে যাবে তার ঠিক নেই। সমান জমিতে নেই ওদের স্থান। চপল ওদের ভয় করে। ওদের সাথে মিশতে ওর কোন কালেই প্ররুতি হয়নি, নিজেকে এটিকেটের টানে আড়ষ্ট করে বেঁধে ও চলতে পারে না বলে। ওর নিজের জীবন ছন্নছাড়া, যেন মুক্ত বাতাস, যেখান সেখান দিয়ে ববে চলে, বাধা পেলে রাস্তা বদলায়, আবহ কমে না। যখন যে খেয়াল চাপে ও তখন তাই করে। চায়ের সাথে চেয়ে নেয় আলু ভাজা, একটা পায়জামা পরেই হয়তো বা দোকান থেকে জিনিষ কিনে আনে, পাঞ্জাবীর উপরই কখন কখন সোয়েটার চাপিয়ে ঠাণ্ডা কমায়। এই ওর স্বভাব।...

মীরা যদি সেই দলের হয়? তাহলে? তাহলে আর কি?.. কি সম্পর্কই বা মীরার সাথে? একদিনের মাত্র আলাপ বইতো নয়! তাতে ওর ভাববারই বা কি আছে? হলেই বা আভিজাত্য শ্রেণীর মানুষ, জাহির করতে এসেছে নিজের সম্পদ। চপল

জোরে জোরে পা চালাতে শুরু করে। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠে। পাশের ঘরে আরো মানুষ ঘুমছে। সন্তর্পণে ম্লিপার জোড়াকে ঠেলে দেয় খাটের তলায়। খালি পায়ে আর আওয়াজ আসে না। চপল ভাবে ইঁা তাহলে ও-ও দেখাতে পারবে মীরা কতখানি ভুল করেছে। সাধারণ ছেলেদের মত গায়েপড়া মানুষ ও নয়, কোন মেয়ে হেসে কথা বললে যারা নিজেদের বস্ত্র মনে করে, না, ওর মাথা ব্যথাই বা কেন এত? সামান্য একটা মেয়ে, এমন কত মেয়েই তো চলে গেছে ওর সামনে দিয়ে, কোন দিন কারুর কথা ও ভেবেছে কি? সাহিত্যিকদের—বিশেষ করে তরুণ যারা, একটু নাম যারা করেছে, তাদের সাথে এমনি কত মেয়েই তো আসে সেধে আলাপ জমাতে। তা নিয়ে ভাবলে কি আর চলে? ও বুঝতে পারে ওদের কেউ আসে নিজে জোঁলুশ দেখাতে—সাধ নিজের বর্ণনা ফুটবে 'কাগজের পাতায়; আবার কেউ আসে নিজের বা তাই লেখাকে সুখ্যাতি করিয়ে নিতে। এতে আর মাথা ঘামাবার কি আছে? এই মীরা হয়তো তাদেরই একজন। 'ওর সাথে দেখা হলে চপল ঠিক বলে দেবে ওর মুখের ওপর—তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি হালকা। হাওয়ার রঙীন প্রজাপতি, গাছে গাছে ঘুরে বেড়াও নিজের রূপ দেখিয়ে। আঁধার বুঝতে পেরেছি তোমার ভেতরকার উদ্দেশ্য। কিংবা হয়তো

চাও আমাকে, অর্থাৎ শ্রীমান চপলকুমারকে খানিকটা উত্তপ্ত করে দেখতে, গরম কড়ায় দেওয়া ধানের মত নাচতে পারি কি না। কেমন এই না তোমার উদ্দেশ্য? কি গো মীরা দেবী উত্তর দাও! কিন্তু তুমি ভুল করেছ পথিক অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই পথ, যে পথ ধরে তুমি পা বাড়াতে চাইছো—সেখানে তোমার হয়েছে ভুল—দিক নিরূপণের বেলায়। কারণ তোমার জানা উচিত ছিল (যদি তুমি বাস্তবিক দক্ষ পথিক হয়ে থাক) যে চপল বোসের মন সেই ধরনের নয়, যারা আলোতেই যায় গলে, একতাল কাঁদার মত, যা খুসী তাই বানানো চলতে পারে। চপল বোসকে গলানো অত সহজ নয়। ক্যালসিয়াম অর্থাৎ চুণকে গলাতে গেলে কেমন হয়, যদি অবশ্য চুণকে গলাবার মত যথেষ্ট জল তোমার থেকে থাকে, চপল বোসকে গলাতে গেলেও পড়বে একই অবস্থায়। ওর অন্তর বাহির সবই সাদা, ঠিক চুণের মত, কিন্তু আছে অন্তর্নিহিত উত্তাপ। জলের ভিতর নির্রিয়ে ওকে গলানো যায় না। ও কেটে পড়বে তাহলে আশুপকে উল্লীর্ণ করতে করতে বা সামলাতে গিয়ে হয়তো বা তোমারই হাত পড়বে। তাকে দিয়ে বানানো যাবে না যথাইছা পুতুল, যাকে নিয়ে খেলা করা চলে। সাবধান মীরা সেন এখনও পথ বদলাও। (ক্রমশঃ)

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

জুতার দোকান

১৩৬এ, আগুতোব যুগার্জী রোড, 'পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান' ভবানীপুর

পুরাতনের পরিবর্তন

(আলোচনা)

ত্রীশাশনা সেনগুপ্তা

সন্দেশের কথা

আমি সন্দেশ—আশা, উত্তম, আনন্দ ও উৎসাহের জীবন্ত ছবি। ময়রার দোকানে বা আপনার খাবার রেকাবে দেখলে আপনার যে শিশুটি হামাগুড়ি ছেড়ে সত্ত্ব হাটতে শিখেছে সেও আমাকে চিনতে পারবে। শুধু তাই নয়—নিজের অজান্তে সারে আমার নামটাও উচ্চারণ করে ফেলবে। কিন্তু আপনাদের চোখের অড়াল থেকে আজ আমাকে চলতে হচ্ছে বলেই নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি। আপনারা বিক্রম করবেন জানি—বলবেন সন্দেশও চেষ্টা নিয়ে নিজের পরিচয় জানাচ্ছে এটা অবশ্যই আমার দুর্ভাগ্য কারণ আমাকেও নিজের কথা শোনাতে হচ্ছে।

জানি—ভারতবর্ষের সর্বত্র আমার আদর। সমস্ত শুভকার্যে আমাকে না হলে চলে না—আমার নাম শুনলে আবাল-বৃদ্ধবণিতার জিভেয় জল আসে—মনে মূর্তি হয়। আমি সদানন্দ—যখনি দুঃখে থাকুন একবার আমার নাম করবেন দেখবেন দুঃখ কোথায় চলে গেছে। আমি চিরন্তন—আর্যাসভ্যতার আদি যুগ থেকে আমি সকল সময়েই সুখী, দুঃখী, ধনী, দরিদ্র, আমার ও মুসাফির সকলের কাছেই আদর পেয়েছি। এখন নব্য-ভারতীয় সাহেবদের কাছে আমার আর স্থান নেই।—আমার নাকি দিন গিয়েছে। বর্তমানে আমার এক প্রতিদ্বন্দী জুটেছে—তিনি হলেন

পুডিং—, স্বজাতিও নয়—স্বদেশাও নয় তারই নাকি আজকাল জয়-জয়কার। কিন্তু পুডিং কি আমার কাছে দাঁড়াতে পারে? আমি শরীরে শক্তি—মগজে বুদ্ধি ও হৃদয়ে মূর্তি দেই। এমন কি পশ্চিমের—খাণ্ড-তত্ত্ববিদগণও আমার মধ্যে যথেষ্ট প্রোটিন আছে স্মৃতি রাখছেন। বাংলা তথা ভারতের সুখীশ্রেষ্ঠ তার আন্তরিক মুখার্জি ভৈমনাগের দোকান থেকে আমাকে কিনে নিয়ে গুণায় গুণায় জলযোগ করতেন। তাই বলি—তিনি হয়েছিলেন Royal Bengal Tiger.

আর পুডিং—যারা বিলিতি ধরণে হাসে, ফরাসি ধরণে কাশে ও পিতৃপুরুষের হুকু ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে ভালবাসে—তারাই পুডিং খেয়ে উদরগীড়া করে, বাড়ীর সকলকে খিটখিটে মেজাজ দেখিয়ে, চাকর বাকরের প্লীহা চমকিয়ে দেন। তখন ডাক্তারেরা হ্যাবস্থা করেন পুডিং ছেড়ে আমারই আশ্রয় নেবার জন্তে। আমি চির উদার—আমায় একদিন উপেক্ষা করেছে বলে—আমি অজীর্ণ রোগীকে বিষম করিলে—সাদরে আশ্রয়ই দেই।

শুনেছি—হাঁসের বা মুরগীর ডিম পুডিং তৈরীর একটা শ্রেষ্ঠ উপাদান। আমাদের এই গরম দেশে এই আবহাওয়ার মধ্যে ডিমের শত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও মোটেই তা গ্রহণ করা উচিত নয়। আর নন্দ ও সিগারেটের গুণে যার জ্ঞান শক্তি

এখনো নষ্ট হয়ে যায় নি—তিনিই অল্পভব কর্তে পারবেন যে পুডিং থেকে কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর গন্ধ বেরোয়। পুডিং তৈরী অবশ্য অনেক রকমে হতে পারে। তার সাধারণ উপাদানগুলোর সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক। ঘন দুধ—স্বাস্থ্যবিজ্ঞানমতে এর মত অপকারী জিনিস বোধহয় আর নেই। তারপর ডিম—লোকমুখে শুনি আধাসিদ্ধ ডিমের মত স্বাস্থ্যপ্রদ পদার্থ আর নেই। কিন্তু পুডিংএর ডিম সম্পূর্ণ সিদ্ধ—ঘন দুধের সঙ্গে মিশে হজমের পক্ষে ভয়ানক কঠিন হয়। তারপর চিনি ও ফল—উভয়েই ভাল জিনিস। কিন্তু কঠিন পদার্থের সঙ্গে মিশে বোধহয়—বোধহয় কেন,—নিশ্চয়ই হজম করা দুর্লভ ব্যাপার। আর পাউরুটি, তাও ত ময়দারই কুপান্তরিত বিব। তাই বলি—যারা আমার মত অখণ্ডমণ্ডলাকার—শুদ্ধ—স্নিগ্ধ শুভ্র, অপাপবিক্ত, সুস্বাদু সন্দেশকে ছেড়ে, এই বিদেশাগত পুডিং এর ভক্ত হয়—তাদের গতি কি হবে, একবার ভেবে দেখুন। আমি অভিশাপ দিচ্ছি না—আমি কেবল আমার প্রতিদ্বন্দীর দোষ দেখাচ্ছি মাত্র।

আজো যারা আমার ‘Old Fool’ বলে পরিত্যাগ করেন নি তাঁরা জানেন যে, আমার অল্পগ্রহে খাবার দোকানের নাম বাজলার সর্বত্র বিরূপ পরিচিতি। আমার অল্পরাগে এই কলিকাতা সহরে কত দরিদ্র যশ ও অর্থের অধিকারী হয়েছে, এই সহরের কত অট্টালিকা, আমারই দান। আমাকে ছাড়লে, দেবদাসীর অর্চনারও অঙ্গহানি হয়। আকর্ষণে ভোজন করেও যদি কেহ—আমার সেবা করতে চান—তবে দেখবেন যে—উদরস্থিত লুটি, পোলাও মাংস এরা আমার জন্তে একটু স্থান করে দেবেই—কেননা তারা ভাল ভাবেই আমাকে জানে এবং যথেষ্ট সন্মানও করে।

আমিষাসী ও নিরাশ্রমী, উভয়ের কাছেই আমার সমান আদর। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে, দেখবেন যে, আমার গুণাগুণ হয় সর্বশেষে, কেন না সবাই জানে যে নিমন্ত্রিতগণ আমার জন্ত অপেক্ষা করবেনই। যদি প্রথমেই আমার দর্শন মিলে, তা হ'লে মুচি, পোলাও, মাংস এদের কেউ চাইবে না। শুদ্ধাচারিণী হিন্দু বিধবারা যারা পুড়িংকে স্পর্শ কর্তেও অশুচি মনে করেন,—তারাও সাদরে আমার স্থান দেবেন। তাইত বলি আমার জায়গা অধিকার করবার জন্ত পুড়িংএর এই যে বৃথা চেষ্টা, এ কিছুতেই সফল হবে না।

কেহ কেহ বলেন—আমার নাকি দিন গিয়েছে। আমি তা স্বীকার করিনে। এখন নব্য নব্যাদের যুগ। এখন দেশের উন্মেষ্টে গেছে হাওয়া,—কিন্তু আমি তো আর বদলাই নি? আমি সেই ছানার সন্দেশই বটে। আমাকে পাবার জন্তও সবাই ব্যস্ত। তবে নূতন হাওয়ায়, আমার সে মহিমা গেল কোথায়? কত দূরত্বে আমি দমন করেছি, আর পুড়িং—? তাকেও করবো। পুড়িংই আশ্রুক আর যেই আশ্রুক এদেশে, কিন্তু সন্দেশই রাজত্ব করবে চিরকাল। ভুলবেন না এদেশে আমি চিরকাল মন রেখেছি, জন রেখেছি ও সবার যান রেখেছি। এখনও রাখবো।

কথায় আঁছে :—

“কোথায় লাগে বা কুর্মী কাবাব,

কোথায় পুড়িং কালিয়া

না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর

সন্দেশ থাকে পড়িয়া।”

কোন মস্তুরার দোকানে যে আমার, পূর্বপুরুষের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল, তা আমি অবগত নই। কিন্তু ছানাকে স্থায়ীভাবে অবিকৃত রাখবার যদি কোনও উপায় অবিকৃত হয়ে থাকে, তা হ'লে বাঙ্গালী

কবি মধুসূদনের জীবনী ও কর্মধারা

মাণিকলাল চ্যাটার্জী



আজ আমি এখানে যে মনস্বীর স্মৃতি-বাসরে শ্রদ্ধাজলি নিবেদন করতে এসেছি, তিনি ৬৫ বছর আগে ধর্মধাম ত্যাগ করে অমৃত লোকের পথে মহা প্রয়াণ করেছেন।

মধুসূদনকে লাভ করে বাংলা ভাষা ও বাঙলা দেশ গৌরবান্বিত হয়েছে। খিদিরপুর নিবাসীগণ তাঁকে আর বজের অজ্ঞ দুজন খ্যাতিমান কবিকে লাভ করে ধন্ত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন কবি হেমচন্দ্র ও অজ্ঞজন কবি রঙ্গলাল। এদের মজ মধুসূদনের জীবনেরও কিছু অংশ এই খিদিরপুরেই অতিবাহিত হয়েছিল।

১৪৪ বছর আগে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী শনিবার যশোর জেলার অন্তর্গত ‘সাগরদাঁড়ি’ গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্নেহময়ী মা’র স্নেহাঙ্কুরের ছায়ায় আর সৌভাগ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে মধুসূদন জীবনের প্রথম তেরটি মধুময় বছর তাঁর জন্মভূমিতেই কাটিয়েছিলেন। অতি অল্প বয়স থেকেই মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হয়। ছেলে বেলায় তিনি তাঁর মা জাহ্নবী দেবীর কাছে কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণ, চণ্ডী প্রভৃতি পড়তেন।

জাতির কর্তব্য সেই বিকারহীন,—ছানায় মর্মরে, সেই চিরস্মরণীয় অজ্ঞাত ময়রার স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে রাখা। সন্দেশ বাঙ্গালার অপরাধের স্মৃতি,—তারতের গৌরব বিষ্টার অগতের অপূর্ণ অবদান।

এই জিনিষটা তাঁকে তাঁর কবি প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠবার পথে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল আর ভবিষ্যত জীবনেও তাঁর কাব্য রচনা’কে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল।

তের বছর বয়সে ১৮৩৭ খৃঃ মধুসূদন তাঁর মার সঙ্গে কলকাতায় চলে এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন, তাঁর বাবা রাজনারায়ণ দত্ত মশায় তখন কলকাতায় ওকালতী করতেন। খিদিরপুরে তাঁর একটা বাড়ী ছিল। মধুসূদন এই সময়ে তাঁর বাবার সঙ্গে যে বাড়ীতে বাস করেছিলেন—খিদিরপুর গার্ডেন রীচ রোডে সে বাড়ী আজও বর্তমান রয়েছে।

হিন্দু কলেজে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সকল পরীক্ষায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগলেন। এইখানে পড়বার সময় মধুসূদন গৌরদাস বসাক রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তাঁর নিজ সহপাঠী রূপে পেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে, অতি নিম্ন শ্রেণী থেকেই তিনি ইংরাজীতে সুশীলিত কবিতা আর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। এই কলেজের অধ্যাপক কবি Captain Richardson সাহেব তাঁকে এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। এই সময়ে মধুসূদনের আদর্শ ছিলেন Lord Byron. এইকালে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেছিলেন তা তার পক্ষে যথেষ্ট গৌরব আর প্রতিভার পরিচায়ক।

কলেজে পড়বার সময় তাঁর আচার ব্যবহারে উৎকর্ষ সাহেবীমানা প্রকাশ পেতে

লাগল। তার কারণ সেই সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে এইটাই একটা ক্যান্সান দাড়িয়ে গিয়েছিল। শেষকালে ১৮৪৩ খৃঃ ১৯ বছর বয়সে মধুসূদন গোপনে খুঁট ধর্মে দীক্ষিত হলেন। অতি অল্প বয়স থেকে তিনি ইংলণ্ডে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। খুঁটান হলে পরে যদি তাঁর ইংলণ্ড যাওয়ার পক্ষে সুবিধা হয় এই জন্তই তিনি ধর্ম ত্যাগ করেন।

এই ঘটনার পর তিনি বছর পাঁচেক শিবপুরে Missionaryদের Bishop's Collegeএ ছিলেন আর সেই সময়ে তিনি Greek, Latin, German, French, Italian, Hebrew, প্রভৃতি বিদেশী ভাষা আর Tamil, Telegu, Hindusthani, Persian, Sanskrit প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

১৮৪৮ সালে ২৪ বছর বয়সে মধুসূদন ভাগ্যাবশেষে মাস্ত্রাজ যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত একটি ইংরাজী স্কুলে মাষ্টারী আর সংবাদ পত্রে লেখা আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাহলেও তিনি সাহিত্য-চর্চা ছাড়লেন না। এদিকে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই সময় তিনি Captain Lady "রিজিয়া" ও অজ্ঞাত ইংরাজী কাব্য রচনা করেছিলেন। মাস্ত্রাজে তাঁর প্রথম বিবাহের বিচ্ছেদ হলে তিনি Henrietta নামে একটা ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেন। এই সময় থেকে তাঁদের মধ্যে যে মধুর দাম্পত্য সন্ধন গড়ে উঠল সেটা তাঁদের জীবনের শেষ দিনটি অবধি অমলিন ছিল।

মাস্ত্রাজে থাকবার সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না, কিন্তু তাহলেও তিনি সুলেখক বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর Captain Lady পাঠ



স্ব-বালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা ৪ ৪ বোম্বাই

করে Bengal Educational Council এর Secy. মহামতি বেথুন সাহেব তাঁকে ইংরাজী ভাষায় লেখা ছেড়ে বাঙলা ভাষায় লিখতে অনুরোধ করেন। মাস্ত্রাজে থাকবার শেষের দিকে মধুসূদন Spectator নামে একটা ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও সেখানকার Presidency College এর অধ্যাপক ছিলেন।

৮ বছর মাস্ত্রাজে থাকবার পর তিনি ১৮৫৬ সালে যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন তাঁর পিতা ও মাতা দুজনেই মৃত। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি নিজেকে বাঙলা কাব্য রচনা ও ভাষা সংস্কারে নিয়োজিত করলেন এবং Hindu Patriot প্রভৃতি নানা সংবাদ পত্রে লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়াতে Police Court এর interpreter এর কাজ নিতে তিনি বাধ্য হলেন।

সেই সময়ে বাঙলা ভাষায় অভিনয় করার যত সুরুচিপূর্ণ নাটক ছিল না। কবি, পাচালী, যাত্রা, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর আমোদ প্রমোদ প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে তখন বেলগাছিয়া নাট্যশালা নামে একটা স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপন করলেন। তাঁদের অনুরোধে এখানে অভিনীত হবার জন্য মধুসূদন প্রথমে ত্রীহর্ষ রচিত রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ এবং পরে শর্শিষ্ঠা আর পদ্মাবতী নামে দুটি নাটক রচনা করেন। এগুলি সেখানে অনেকদিন ধরে খুব সাকল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল।

এই সময়ে তিনি বাঙলা ভাষায় অমিত্রাকর ছন্দের প্রবর্তন করে “তিলোত্তমা সম্ভব” কাব্য রচনা করেন। “বুড়ো শালিকের

ঘাড়ে রোয়া” ও “একেই কি বলে সভ্যতা” নামে মধুসূদনের দুটি প্রহসন এর পরে রচিত হয়। এগুলিই বাঙলা ভাষায় লেখা প্রথম প্রহসন।

মধুসূদনের ৩৭ বছর বয়সে ১৮৬১ খৃঃ ‘মেঘনাথ বধ কাব্য’ রচনার পর “ব্রজাঙ্গনা কাব্য” ও “বীরাজনা কাব্য” আর “কৃষ্ণ কুমারী নাটক” রচিত হয়। এ সময়ে তিনি St. James Lane এ থাকতেন। খিদিরপুর মনসাতলা লেন এবাড়ীর কিছু অংশ এখনও বর্তমান রয়েছে।

১৯৬২ খৃঃ ৩৮ বছর বয়সে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য London যাত্রা করে সেখানকার Gray's June এ ভর্তি হলেন। এর কিছু কাল পরে তাঁর জী ছেলের মেয়েদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, মধুসূদন তাঁদের সঙ্গে France এর অন্তর্গত ভার্সাই চলে গেলেন তার জীবন স্বাস্থ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। এই সময়ে তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো। যদি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সময়ে প্রচুর পরিমাণে টাকা দিয়ে সাহায্য না করতেন তবে ভবিষ্যতে তাঁর অবস্থা যে কতদূর খারাপ হয়ে পড়ত তা বলা যায় না।

Europe এ থাকবার সময় তিনি ইংরাজীতে সীতা ও সুভদ্রা কাব্যের কিছু অংশ রচনা করেছিলেন। এরপর ৯৮টি স্বরচিত Sonnet নিয়ে ‘চতুর্দশপদী’ কবিতাবলী নামে একটা সনেট কবিতা সংগ্রহ রচনা করেন। মধুসূদনই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম লেখার প্রবর্তন করলেন। এই বইটি রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সমাপ্তি ঘটল।

১৮৬৭ খৃঃ ৪৩ বছর বয়সে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে High Court এ প্রাকটিস

করতে সুরু করলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারীতে তিনি আশারূপ সাফল্য লাভ করতে পারলেন না। মধুসূদনের চিন্তা ছিল কবিজনোচিত, আইন ব্যবসায়ীর উপযুক্ত নয়। ‘হেক্টর বধ কাব্য’, ‘নীতিমূলক কবিতাবলী’ আর ‘মায়ী কানন’ এই সময়েরই রচনা।

শেষ জীবনে তিনি আর্থিক অস্থিরতা ও শারীরিক অসুস্থতায় দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন, আর খুব ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে অল্পদিনের জন্য তিনি পঞ্চ কোর্টের রাজার Legal adviser হন তারপর কিছুদিনের জন্য উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে বাস করেন।

১৮৭৩ খৃঃ ২৯শে জুন রবিবার বেলা ২টার সময়—Henrietta'র মৃত্যুর তিন দিন পরে Alipore Presidency General Hospital-এ মধুসূদন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কবিশ্রদ্ধাার্থী মধুসূদন আপনার ভাগ্যাবেশ করতে গিয়ে যে জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়েছিলেন মৃত্যু এসে তার শাস্তিময় হাত বুলিয়ে দিয়ে সকল বক্তার অবসান ঘটলো। বাঙলার শ্রেষ্ঠতম কবিদের একজন যে এভাবে নিঃস্বল অবস্থায় সাধারণ হাসপাতালে দেহত্যাগ করলেন তা আমাদের মহা কলঙ্কের বিষয়।

মধুসূদন ছিলেন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ও প্রতিভাবান কবি। আপনার অমর লেখনী ধারণ করে তিনি বাঙলা ভাষায় অমিত্রাকছন্দের ও চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তন করে যান। অভিনয়োপযোগী ও বিয়োগান্ত বাঙলা নাটক তিনিই প্রথম লিখেছিলেন, তাঁর সাহিত্য রচনা দ্বারা বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এ ঋণ আমরা কখনই শোধ করতে পারব না।

মধুসূদনের রচনার ভিতর কোমলতা ও কঠোরতার একত্র সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়—বীরাজনা কাব্যই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর অমিত্রাকর ছন্দে রচিত কাব্য সকলের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠতম। আর তাঁর প্রতিভা বিকাশের উর্দ্ধতন সীমারেখা।

তিনি ছিলেন বিরহী কবি। মধুসূদন তাঁর অস্বীয়, বন্ধু, ধর্ম, সমাজ আর তাঁর নিজের মধ্যে বিচ্ছেদ ও অভিমানে'র যে দুস্তর সাগর রচনা করেছিলেন তা তিনি নিজে কখনও পার হয়ে যেতে পারেন নি। এই জ্ঞান তিনি বিরহিনী প্রীতিধিকার কাহিনী অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণে মধুময় ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করেছিলেন।

তাঁর নিজের জীবন-টা যে পরিশেষে দুঃখময় হবেই, তা তিনি অনেক আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই দৈত্যরাজ রাবণের বিষাদ-মলিন চরিত্রকে আপনার কাব্যের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়েছিলেন। মধুসূদন ছিলেন স্বাধীনতার উপাসক। তাই স্বাধীন চেতন রাবণকে তিনি অত্যাচার ও দুঃখ জর্জরিত বাঙ্গালী জাতীর ও ভগ্ন-হৃদয় মধুসূদনের প্রতীক-রূপে চিত্রিত করেছিলেন। এই জ্ঞান মেঘনাদ বধ

কাব্যে আমরা প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই।

তার নিজের জীবন যে করুণ রসে উছলিত হয়ে উঠেছিল সেই করুণ রসের পরিবেশন করেছিল তার কৃষ্ণকুমারী নাটকে।

বাইরে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করলেও তিনি অন্তরে ছিলেন একজন খাঁটি হিন্দু।

তার স্বদেশ প্রীতিও উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ ও ইউরোপ প্রবাসের সময় মধুসূদন তাঁর জন্মভূমি ছায়াশীতল সাগরদাঁড়ী গ্রাম ও মধুছন্দা কপোতাক্ষ নদকে কখনও ভুলতে পারেন নি।

তিনি ছিলেন নবীনের উপাসক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-কে তিনি আপনার প্রতিভার দ্বারা মিলনের স্ত্রে বেঁধে গেছেন। তিনি গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করে যে নতুন পথ অবলম্বন করেছিলেন তা বাঙলা ভাষাকে গতিশীল আর প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

শ্রেষ্ঠ কবি ও প্রতিভাশালী সাহিত্যিকেরা এক সময়ে যা রচনা করে যান যুগে যুগে সেটা সাহিত্য রসিকদের অনুপ্রাণিত করে থাকে। দীর্ঘ এক

শতাব্দীরও আগে মধু-কবি যে কাব্য রচনা করে গেছেন তা আজও আমাদের চিত্তকে রসধারায় অতিবিক্ত করেছে—আর ভবিষ্যতে আমাদের সংশ্লিষ্টদের যে রসের সন্ধান দেবে তার তুলনা নেই।

মধুসূদনের আশা সফল হয়েছে। মধু-চক্র রচনা করে' গোড়জন আজ আনন্দে তার কাব্য-সুধা পান করছে—ভবিষ্যতেও করবে।

যৌবনে ভিন্ন পথে চালিত হয়ে মধু-সূদনের দুঃখক্লিষ্ট আত্ম-লোকোচিত শাস্তি লাভ করতে পারে নি। তাঁরই উদ্দেশ্যে আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করে আর তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শাস্তি কামনা করে আজ এই সভাতল থেকে বিদায় নিলাম।

ও শাস্তি! শাস্তি!! শাস্তি!!!

২৭শে জুন বেতারে পঠিত।

জরোপ ও নজ্জার যজ্ঞাদি সুবিধায় কিনতে হলে

‘নির্বোদ কোম্পানী’

সুতন শো-রুমে যান।

১৩নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার।

N. I. P.

ফোন ২৭৭৪

বড় বাজার

ভারত অয়েল মিলের
তেল ব্যবহারে

বেরি বেরি হয় না

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড - কলিকাতা।

প্রতিষেধক

(গল্প)

শ্রীক্ষেত্র চক্রবর্তী

কলিকাতা সহরে যে কোন সামান্য কারণে যখন পথে লোক জমায়েত হয়ে যায়, তখন ট্রাম গাড়ী থেকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে লোক ছুটে এসে স্পর্শকে যে ঘিরে ফেলবে, এ আর বেশী কথা কি। ব্যাপারটা ঘটে একখানি জিতল বাড়ীর সম্মুখে। অনুন ২৫১০ জন তার চতুর্দিকে এসে দাঁড়ায়—কেউ বা মহামুহুর্তি জানায়, কেউ বা তার বেশ গুরু রাস্তার কাদায় মাখামাখি দেখে মুখ টিপে হাসে, কেউ বা টিপনৌ দিয়ে বলে “যাদের অভ্যেস নেই, তাদের অমন গোড়ালী উচু জুতো না পরলেই হয়।” স্পর্শের জখমটা কিন্তু যে অতি সামান্য নয়, তা তার মুখ চোখের ভাব ও কাতরানী দেখে বেশ প্রতীয়মান হয়—তার আঘাতটা একটু বেশী লাগে তার বাম পায়ে গুলক্ সন্ধিতে। বয়স্ক বালিকা বলেই বোধ হয় কেউ সাহস করে না তাকে স্পর্শ করতে। জিতলের শয়নকক্ষ হতে মণি কিন্তু ব্যাপারটা দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি নেমে এসে ভিড় ভেঙে, বালিকার কাছে এসিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে “এ কি, আপনি উঠতে পারছেন না, ankle টা dislocate হয়নি ত, দেখি আমার মনে হয় আপনার হাঁটুপাতালে যাওয়া উচিত, কি বলেন?” বালিকাটি মুখটা বিকৃত করে বলে, “আমার অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে, উঠতে পারছি না, যাতে ভাল হয় তাই করুন”—বিলম্ব না করে একখানা ট্যাক্সি ডেকে তাকে তুলে

নিয়ে চলে যায় মণি বেলগেছিয়া হাসপাতালে। ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়ে, ঔষধপত্র সঙ্গে নিয়ে সহায়ন করে মণি বরাবর তাদের বাড়ী পর্যন্ত বালিকার রক্ষকরূপে। বাড়ীটা কিন্তু একটা ছোট গুলির মধ্যে অবস্থিত থাকায় সদর রাস্তার উপরই ট্যাক্সিখানা থামাতে হয় তাকে। উপায়কর না দেখে গাড়ী থেকে নেমে, ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে মণি, একরকম বলতে কি, কোলে করেই স্পর্শকে অতি কষ্টে তাদের বাড়ীর মধ্যে নিয়ে আসে। অচেনা এক যুবকের সঙ্গে স্পর্শের ঐ ভাবে আসাটা পাড়ার অনেক লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মণিকে এর জন্ত জবাবদিহী করতে হয়।

অপরিস্রব হলেও এই মনোরম স্পর্শ তাদের অজ্ঞাতসারে উভয়ের মনের মধ্যেই ভালবাসার প্রবর্তনা সঞ্চারিত করে। অনতি সুন্দরী, অনুচ্চ বালিকা স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেনি, যে তার এই ভাবাবেগপ্রবণ বয়সকালে ওরূপ একজন উন্নতচিত্ত, সুপুরুষ মহান হৃদয় যুবক তার সংস্পর্শে আসতে পারে।

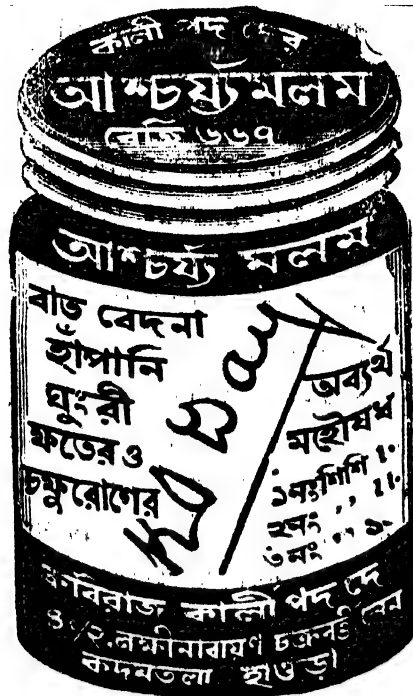
মণির এই সমবেদনা ও অল্পকল্পা স্পর্শ পিতামাতার অন্তর এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, তারা তাকে নিজের ছেলের মতই গণ্য করে। এবং তাদেরই কাতর অমুনয় বিনয়ের প্রেরণায় মণিকে যখন তখন তাদের বাড়ী যাতায়াত করতে হয়। এই অবধি অসঙ্খ্য মেলামেশার ফলে মণি ও স্পর্শ মধ্যে এমন একটা

অজান্য আসক্তি উদ্ভূত হয়ে ওঠে যে, একের এক দিনের অদর্শন, অপরের নিকট অসহনীয় হয়ে পড়ে। যদিও স্পর্শের মনে হয় যে মণিকে জীবন সঙ্গীরূপে পেলে তার নিজের জীবন ধন্য হবে, সে জানে মণিকে ও ভাবে আশা করা তার পক্ষে একটা অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মণি কিন্তু একরকম স্থির করেই রাখে যে তাদের এই মিলন পথের যদি কেউ কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়, তবে দাঁড়াতে তার পিতার অসঙ্গত অত্যাধিক দাবী যা মণি বি, এস-সি পাশ করার পরই তিনি বাড়ার সকলকেই জানিয়ে রেখেছেন।

মণির অন্তরঙ্গ বন্ধু হেমেন্দ্র ব্যতীত তাদের এই ব্যাপারটা সকলের কাছেই অজ্ঞাত থাকে। সমাজের কর্মী হিসাবে হেমেন্দ্র মণির পিতার অন্তায় উৎসাহিত হয়েই সমর্থন করতে না পেয়ে স্পর্শ ও মণির পবিত্র বন্ধনকার্য সমাধার জন্ত এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে। তেজস্বিত্য কারবার ও কতকগুলি ভাড়াটে বাড়ীর আয় থেকে ব্যাঙ্কে জমার কসমটা বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে মণির পিতা ধনপ্রিয় বাবুর ধনলিপ্সা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে এবং হেমেন যখন স্পর্শের সঙ্গে মণির বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়, তিনি বলেন “সব দিক দিয়ে যখন মিল আছে এ বিবাহে আমি রাজী আছি, যদি কল্পাপক হুটী হাজার টাকা পণস্বরূপ দিতে স্বীকৃত হয়।”

(২)

সে দিন সন্ধ্যায় তাদের ক্লাবে এক নৈশ-আহারের আয়োজন করা হয়। সমস্ত কার্য শেষ হতে মধ্য রাত্রি অতীত হয়ে পড়ে। মাঘের কল্পজনক শৈত্য রজনী। নিশীথের নির্জনতার মাঝে নিদ্রিত



রেঃ ৬৬৭ “আশ্চর্য মলম”

জ্ঞান করে দিচ্ছে

সকল আবিষ্কার

আশ্চর্য মলম ব্যবহারে পাবেন অসীম শান্তি,
অফুরন্ত তৃপ্তি ও প্রচুর আনন্দ।

গৃহে রাখুন এই আশ্চর্য মলম—

পাবেন আশ্চর্য ফল,

ইহাৎ ব্যাধির আক্রমণে হবে আশু উপশম।

আশ্চর্য কামোদক চূর্ণ (রেজিষ্টার্ড)

ভগবানের সৃষ্ট কাম বা পুরুষ মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার জগতের লোকে ইহা ছাড়া সংসারে বাঁচিতে পারে না, তাই মনুষীগণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ভিতর এই কামশাস্ত্রেরও সমালোচনা করিয়াছেন। ধন, ঐশ্বর্য, খ্যাতি প্রতিপত্তি অপেক্ষা মানুষ কামের বেশী বশীভূত। যাহার কামের উল্লেখ হয় না তিনি পুরুষত্বহীন এবং জীবনধারণ অপেক্ষা মরণ তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন। আয়ুর্বেদের মধ্যে কামশক্তি রুদ্ধি ও ধারণ করিবার বহুবিধ বাজীকরণ ঔষধ আছে। সেই সকল ঔষধের সার দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করিয়া আমি ‘কামোদক চূর্ণ’ নামক একটি শক্তিশালী চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছি; যদ্বারা পুরুষত্ব শক্তি স্থায়ী রাখিয়া মানুষ বহুবার জীগমন করিলেও স্বাস্থ্যের হানি হয় না। আমার সহস্রাব্দ ৬৬৭নং আশ্চর্য-মলমের গ্রাহকগণ এই চূর্ণের অতুলনীয় শক্তি দেখিয়া পরম পরিতোষ পাত করিবেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহাতে অধিক শুক্রকন্ড, শুক্রতারল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য বা প্রস্রাবের সহিত শুক্রকরণ, ইচ্ছাশক্তিহীন প্রভৃতি বহুবিধ ঔজ্জ্বল্যরোগে ক্ষান্ত ফলপ্রদ। ইহাতে ধারণাশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি করে। নূতন দাম্পত্য-জীবন যাপন কালীন এই বাজীকরণ ঔষধ নিয়মিত ব্যবহারে শুক্রের অপচয় ঘটে না। পরীক্ষার জন্য ক্লাট দিনের ঔষধের মূল্য ১০ আট আনা ধার্য্য করিলাম। একমাস কাল বা-ততোধিক ব্যবহারে এই চূর্ণের মূল্য যথাক্রমে ২০, ২৫ এবং ৩০ মাত্র।

ব্যবহার নিবিঃ—আশ্চর্য-মলম পুঙ্খক পাইবেন। এই চূর্ণ ব্যবহার কালীন ৭ দিন জীসহবাস একেবারে নিবেদ। সহস্রাব্দ দেশবাসী ইহার ব্যবহারে সফল পাইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আশ্চর্য জ্বর নাশক বটিকা

এই বড়ি ম্যালেরিয়া রোগীরপক্ষে টনিকের কার্য্য করে এবং ইনফ্লুয়েন্সার অব্যর্থ-মহৌষধ। ইহা সম্পূর্ণ দেশীয় শক্তিশালী গাছ গাছড়ার সারাংশ লইয়া কবিবরাজী মতে বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত। জ্বর, পালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, নূতন পুরাতন জ্বর, কম্পজ্বর, গর্ভবতী জীলোকদিগের জ্বর প্রভৃতির আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই বড়ি জ্বরের উপর খাওয়ান যাইতে পারে, একটা করিয়া বাড় মুখে দিয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া চিবাইয়া বা গিলিয়া খাইতে হইবে—এইরূপ প্রত্যাহ তিনটী করিয়া বড়ি খাইতে হইবে। এই বড়ি সহজ অবস্থায় সেবনে জ্বরের আক্রমণ ইহাতে রক্ষা পাওয়া যায়। মূল্য :—২ বড়ি প্যাকেট—১০ আনা। ২৫টি—১/০ ও ৫০টি—১/০ পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সাধারণ—ভীষণ জ্বর হইতেছে

নিবেদক কবিবরাজ কে. প্রি. দে ডিবিংগাভূষণ (বেঙ্গাল), আয়ুর্বেদাচার্য্য (ঢাকা), এম্. এইচ-এস-এল (লন্ডন), কদমতলা, হাওড়া।

আশ্চর্য মলম কেমিক্যাল ওয়ার্কস—কদমতলা, হাওড়া

আবঃ—কম নং ৫১, ১০১১ সারকুলার রোড, ঠেঠকখানা বাজার, নিরালদহ

রাজপথে বেড়িয়ে পড়ে মণি তার ওভার-কোটের বোতাম ক'টা লাগিয়ে দিয়ে। দ্রুতপদবিক্ষেপে রাজপথ অভিক্রম ক'রে যখন সে তার বাড়ীর সদর দরজায় উপস্থিত হয় তখন রাত্রি আন্দাজ ২টা হবে। চাকরটা তখন বাহিরের ঘরে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। বাবুর ডাকে খড়মড় ক'রে ঘুম থেকে উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে বলে “হেমনে বাবু স্বাপনার কাছে আন্দাজ রাত ৯ টার সময় এসেছিলেন, আধঘণ্টা-টাক বসে থাকবার পরও যখন আপনি এলেন না, তখন তিনি বড়বাবুর সঙ্গে কি সব কথাবার্তা ক'রে চলে গেলেন আর আমার বলে গেলেন কাল সকালে তাঁর কাছে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে”।

আগ্রহপূর্ণ লোচনে মণি জিজ্ঞাসা করে “তার সঙ্গে আর কেউ ছিল?”

“না বাবু, তিনি একলা এসেছিলেন”। কথাগুলো শুনে মণি একটু বিচলিত হ'য়ে পড়ে এবং কিছু না বলে শয়নকক্ষে গিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোর বোতামটা টিপে দিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে পরদিন প্রভাতের অপেক্ষায় আরাম কেদারার উপর শরীর-টাকে হেলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। বাড়ীর মধ্যে তখন একটা শান্তিপূর্ণ নিস্তরঙ্গতা বিরাজ ক'রতে থাকে। সবাই সুশুপ্তির জোড়ে শায়িত। কেবল আমেরিকান খড়ীটা ডিং ডং শব্দে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন ক'রতে থাকে। চিন্তাশ্রোতে ভাসতে ভাসতে রজনীর অবশিষ্ট কয়েকটা ঘণ্টার জন্ত মণি নিদ্রাদেবীর কথা একেবারে ভুলেই যায়। চিন্তা—হেমনের অত রাত্রে আসার ত্রুটিপত্র। চিন্তা—স্পর্শের কোমল মুখশ্রী, চিন্তা—তার পিতৃগির অত্যধিক দাবী, যা সংগ্রহ করা স্পর্শের পিতার পক্ষে অসম্ভব। সবগুলো একত্র হ'য়ে তার মনের মধ্যে একটা তুমুল সংগ্রামের সৃষ্টি করে। দ্বায়মণ্ডলকে দমন ক'রবার উপায়স্তর না

দেখে ধূমপানের মাত্রাটা মণি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ক'রে দেয় এবং এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট শেষ ক'রে ফেলে। সারাটা রজনী এই ভাবে অনিদ্রায় কাটিয়ে অতি প্রত্যুষে সকলের জাগবার বহু পূর্বে হাত মুখ ধুয়ে চলে যায় মণি হেমনের বাড়ী।

সাহিত্য সেবার জন্ত স্বভাবতঃই হেমন প্রত্যুষে উঠে থাকে—সুতরাং মণি গিয়ে দেখে হেমন টেবিলের উপর কাগজপত্র বিছিয়ে সাহিত্য দেবীর সঙ্গে মসগলু হ'য়ে আলাপ শুরু করে দিয়েছে। মণিকে দেখে হেমনের হাসতে হাসতে চোঁচিয়ে বলে “এই যে আমার নায়ক, স্বরণ মাত্রেই উদয় হয়েছ। তোমার অভাবে আমার নক্স সম্পূর্ণ হচ্ছে না যে”—হেমনের ছ' পেয়াল চা পাঠাতে হুকুম করে মণিকে তার সন্মুখে বসিয়ে বলে “আচ্ছা মণি, তোদের মিলনপথের ব্যবধানটা আমি যদি সরিয়ে দিতে পারি, তাহলে কি পুরস্কার তুই আমার দিতে পারিস?”

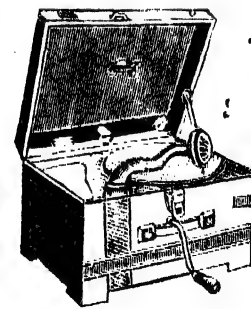
মণি আগ্রহের সহিত মুছ হেসে বলে “হেমন! তাকে অন্বেষ আমার কি আছে, বলত?”

“আচ্ছা, তা হলে তোমার স্বর্গীয় মায়ের

নামে শপথ কর, যে এ বিবাহ সম্পাদনের জন্ত আমার উপদেশ অনুযায়ী তুই কাজ করবি”।

“সর্বাস্তবকরণে, হেমনে সর্বাস্তবকরণে—তুই বোধহয় জানিস, যে এ বিবাহ যদি না হয়, তাহলে আমাদের দুজনার জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে”—আবেগ-প্রবণে মণি কথাগুলো বলে ফেলে এবং পরক্ষণেই একটু লজ্জিত হয়ে মাথাটা নামায়।

“শোন!—কালরাত্রে আমি স্পর্শের বাবা বিনয়বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কই। তারপর তোর বাড়ী যাই। তোর বাবা ২০০০ টাকা নগদ ও তাছাড়া অসংখ্য আনুসঙ্গিক চেয়েছেন। বলা বাহুল্য বিনয় বাবুর মত একজন গৃহস্থের পক্ষে অত টাকা জোগাড় করা একেবারে অসম্ভব। অথচ ঐ গুলি সব না দিলে আমি ত তোমাদের বিবাহের কোন আশা দেখি না। সর্ব-সম্মত ২৮০০ টাকা যদি সংগ্রহ করতে পার, তবেই এ বিবাহ হতে পারে। আমি তোমার বাবার সঙ্গে একরকম পাকাপাকি করে এসেছি। আর টাকার জোগাড় হলে বিনয় বাবুর ত কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। বিনয় বাবুকে আমি বলেছি, আপনি ভাববেন না আমরা



মেলোডিনা গ্রামোফোন

স্বর মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ও স্থায়িত্বে অতুলনীয়

গ্রামোফোন ক্রয় করিবার পূর্বে মোটর ও টার্ন টেবিলের তলায় “মেলোডিনা” খোদাই করা নাম ও গ্রামোফোনে “মেলোডিনা” মার্ক দেখিয়া লইবেন।

তালিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

“হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস” গ্রামোফোন ও রেকর্ড

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮-২নং বঙ্গভাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা।



—বেকার নাশন শব্দ বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা ব্যুরো—
BEKARNASHAN CROSS WORD COMPETITION BUREAU

বাংলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতা—নং ১।

১১তম প্রিন্সিপাল স্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০০ পুরস্কার

৫০০ পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার ৩০০

দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫০

তৃতীয় পুরস্কার ৫০

শব্দ গঠন করিবার নিয়ম ১—প্রত্যেক সাদা ঘরে একটি মাত্র অক্ষর বসিবে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণকে একটি অক্ষর বলিয়া গণ্য করা হইবে। অল্প ঘরগুলি যথা নিয়মে থাকিবে।

প্রতিযোগিতার সমাধান পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৮

বাংলা ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ সাল।

শব্দ সম্ভান সূত্র (Clues

পাশাপাশি (Across)

- ১। এ জীবন দুঃসহ।
- ৩। দেশ।
- ৪। অনেকের দারণ্য এ
ভগবানের প্রতীক।
- ৫। এ সরল নয়।
- ৭। বিপদে যে এ কাজ করে
হিন্দুশাস্ত্র মতে সে পিতা।
- ৮। মদন যার পতি।
- ৯। স্বপ্নলোকের বিশেষ প্রিয়।
- ১২। বোলতার এ বিষাক্ত।
- ১৩। মহাদেব।
- ১৫। এ থাকলে সে ভীত।
- ১৬। উপঢালে মাংস কতিন।
- ১৭। ঠিক করে সাজালে এর
জোর না থাকলে ভাল উকিল
হওয়া শক্ত।
- ২০। কর।
- ২১। বলরাম।
- ২২। ইন্দ্র এ-পাণি বলা হয়।
- ২৫। এ বিনাশ না হইলে
প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।
- ২৭। এ আহার অকর্ষ্য।
- ২৮। চূর্ণ্যোধনের মাতুলালয়।
- ২৯। অভয় নয়।
- ৩১। উপঢালে ঐশ্যকালে এ
আরামদায়ক।

—এইখানে কাটুন—

বেকার নাশন শব্দ-বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা ব্যুরো

নভেম্বর সংখ্যা ১৯৩৮।

কুপন নং



প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত

ও আইনতঃ লাপ্তা হইবে স্ব কার করিয়া এই
প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম।

নাম

ঠিকানা

লোকাল রসিদ নং.....তারিখ.....

মনিঅর্ডার নং.....পোটেল অর্ডার নং.....

—এইখানে কাটুন—

৩২। এর বুদ্ধি যে নেয় সে
চালাক নয়।

৩৩। ঠিক করে সাজালে এর
দায়িত্ব বহন করিতে হয়।

শব্দ সম্ভান সূত্র (Clues

উপর হইতে নীচে (Down)

- ১। এর দাম নাই।
- ২। কাচ।
- ৩। এ হুচরিত্র।
- ৪। গালা।
- ৬। ভাগ্য।
- ৯। অষ্টপদ পোকা বিশেষ।
- ১০। এ হলে মাথায় অনেকেই
ঔষধ ব্যবহার করেন।
- ১১। এ নিয়ে প্রায়ই গুণগোল
হয়।
- ১৪। এ হৃদয়ের বৃদ্ধি।
- ১৮। একে অনেক কষ্ট পেতে
হইয়াছে।
- ১৯। একে অমৃত ফল বলা হয়।
- ২০। বলবান।
- ২১। অসত্য।
- ২৩। এ নিয়ে বন্দ লেগেই
আছে।
- ২৪। অন্ধকারক বিনাশ করে।
- ২৬। স্বর্ঘ্যের চাইতেও বড়।
- ৩০। এর স্থান মাথায়।

প্রতি সমাধানের প্রবেশ মূল্য ১০ আনা। কিন্তু একই ব্যক্তির একত্রে তিনখানা সমাধানের মূল্য ২০ আনা। লেখা কাটা
যা এবং পেনসিলে লেখা চলিবে না। মনিঅর্ডার রসিদ সমাধানের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। রসিদ নম্বর নিজে টুকিয়া
রাখিবেন। ২৮শে নভেম্বর রাত্রি ৭টার মধ্যে মফঃস্বল কুপন পৌছান চাই। অজ্ঞাথায় অগ্রাহ্য হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কুপনে
অথবা নিজে অবিকল ছক আঁকিয়া নম্বরানুযায়ী শব্দ বসাইয়া দিলেও সমাধান গ্রাহ্য হইবে। একাধিক সমাধান হইলে ক্রমিক
নম্বর দিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে, সাপ্তাহিক খেয়ালীতে ম্যানেজারের নিম্নলিখিত সমাধান প্রকাশিত হইবে
বিজ্ঞাপিত নিয়মাবলী ট্যাম্পলহু পত্র লিখিলে পাঠান হয়।

পরলোকে প্রবীণ সাহিত্যসাধক

দেবেন্দ্রনাথ বসু

(স্মৃতি চিত্র)

বাগ্‌দেবীর একনিষ্ঠ সাধক, 'ধর্মপ্রাণ, গীষী দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আর ইহ-জগতে নাই। 'কিষ্কিন্ধ্যা' অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি তাঁহার সাধনোচিত দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। প্রায় গত বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি অজীর্ণ ঘটিত দুশ্চিকিৎস রোগ ভোগ করিতেছিলেন ও মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতে তাঁহার পদব্ধ অচল হইয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া তুলিয়াছিল। এই অবস্থায় মৃত্যুর প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্বে নিদারুণ বমন রোগে আক্রান্ত হইয়া, গত চন্দ্রগ্রহণ চূড়ামণি যোগের রাত্রিতে তিনি সংজাহীন হইয়া পড়েন। দুই দিন এই ভাবে কাটাইয়া গতপূর্ব বুধবার (৯ই নভেম্বর) অপরাহ্ন ৪-২৮ মিনিটের সময় তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রবাবুর জীবন কথা বড়ই বিচিত্র। সাধারণের নিকট তিনি "ব্যাঙ বাবু" নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। বাগবাজার বসু-পাড়ার বিখ্যাত বসুবংশে তাহার জন্ম। তাঁহার পিতা ৮ গোপীনাথ বসু মহাশয় উচ্চশ্রেণীর রাজ কর্মচারী ছিলেন। আর স্বর্গত নট-নাট্যাচার্য-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও দেবেন্দ্রবাবু ছিলেন মামাত পিসুভৃত ভ্রাতা। দেবেন্দ্রনাথ নটগুরু নিকটে' বাল্যেই সাহিত্যসাধনার দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাধনা চলিত ভূতি সজোপনে। ঘোঁষনে গিরিশচন্দ্র বখন মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার, দেবেন্দ্রবাবুও তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপে উক্ত রজন্যের কর্মপরিচালনার সুদীর্ঘকাল



দেবেন্দ্রনাথ বসু

নিযুক্ত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের রচনার এতদূর অমুরাগী ছিলেন, ও দেবেন্দ্রবাবুর নাট্যচিত্র বা সঙ্গীত রচনা শক্তির উপর তাঁহার এরূপ আস্থা ছিল যে কোন কোন সময় তিনি কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকা হেতু স্বয়ং রচনার অবসর না পাইলে দেবেন্দ্রবাবুকেই উক্ত রচনা কার্য সমাধা করিতে আদেশ দিতেন। এইরূপে দেবেন্দ্রবাবুর রচিত কোন কোন সঙ্গীত বা নাট্য রচনা গিরিশচন্দ্রের কোন কোন গ্রন্থে স্থান পাইয়া নটগুরু নিজস্ব রচনা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে অবশ্য গিরিশ

চন্দ্রের কোনই অগৌরব হয় নাই; পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতি গিরিশচন্দ্রের রচনাধারার সহিত কতদূর সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল—তাহাই মাত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। এই জন্ত গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত

হইবার পর তাহার সর্বশেষ অসমাপ্ত গার্হস্থ্য নাটক "গৃহলক্ষ্মী" পূর্ণাঙ্গ করিবার ভার দেবেন্দ্রনাথের উপরেই লাগু হইয়াছিল; আর এ গুরুতর দায়িত্বভার দেবেন্দ্রবাবু কিরূপ কৃতিত্বের সহিত বহন করিয়া ছিলেন, বাঙলার নাট্যোন্মাদী জনসাধারণই এ-তাবৎকাল তাহার সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাশিমবাজারে গমন করেন। কাশিমবাজারের ভূতপূর্ব প্রান্তঃসরগীয় মহারাজা ৩ম নীলচন্দ্র নন্দী

নন্দোদয় দেবেন্দ্রবাবুর সহপাঠী ও শৈশব সুহৃদ ছিলেন।

মহারাজার সেক্রেটারী রূপে কিছুদিন কার্য করিবার পর তিনি রাজদরবার হইতে পেন্সন লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। আর এই সময় হইতেই তাহার সাহিত্যিক-জীবন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন নীরবকর্ম্মী। তিনি কখনও কোন সভা-সম্মিলিতে প্রকাশ্যে যোগদান করিতেন না। যথার্থ রসস্বাধী ব্যতীত অল্প পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক অথবা শাস্ত্রবাদ-স্বষ্টিকর প্রবন্ধাদি রচনার ধার দিয়াও চলিতেন না। আত্মপ্রচারের সর্ব-বিধ পন্থা হইতে তিনি আপনাকে সাবধানে

দ্বারা রাখিতেন। এইজন্য এ যুগের তরুণ সাহিত্যিকগণের অনেকে হয়ত দেবেন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত জানেন না। কিন্তু প্রাচীন বা মধ্যযুগের সাহিত্যসেবী, রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যকার, অভিনেতা বা শিল্পী এমন অতি অল্পই ছিলেন বা আছেন যিনি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত নানারূপ আলোচনা না করিতেন। এই সকল গুণিজন সম্মেলনে দেবেন্দ্রবাবুর গৃহ তৎকালে প্রায় প্রতিনিয়তই রীতিমত সরগরম থাকিত। স্বর্গত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বর্গত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গত ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ, শ্রীযুক্ত জলধর সেন (ইনি দেবেন্দ্রবাবু অপেক্ষা কয়েক মাসের বয়োজ্যেষ্ঠ), শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, স্বর্গত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, স্বর্গত স্বামী অখণ্ডানন্দ, অধ্যাপক আশুতোষ মিত্র, অধ্যাপক বিপিনবিহারী সেন, ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, স্বর্গত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাট্টা, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বহুবার তাঁহার গৃহে মিলিত হইতে দেখা গিয়াছে।

দেবেন্দ্রবাবু বহু অখ্যাত কবিগণ প্রার্থীকে প্রবন্ধ উপস্থাপন কবিতা প্রভৃতি রচনা করিয়া দিয়া সাহায্য করিতেন। এ বিষয়ে তিনি একরূপ উদার ও মুক্তহস্ত ছিলেন যে, তাঁহার স্বনামে প্রচারিত গ্রন্থসমূহ অপেক্ষা পরের নামে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অল্প হইবে না। তাঁহার

রচিত গ্রন্থ নিজ নামে প্রকাশ করিয়া আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন একরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যাও বর্তমানে নিতান্ত অল্প নহে।

পরিণত জীবনে তিনি বহু নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় প্রথমই কিশোর তনয় ও বিবাহযোগ্য্য দুহিতার অকালবিয়োগ বেদনা, তারপর সন্তানশোক-তাপিতা পুণ্যবতী সহস্রশ্লীলীর লোকান্তর, উপার্জন-কম উপযুক্ত যুবক পুত্রের অতর্কিত মৃত্যু। সুদিনে-দুদিনে অনন্তনির্ভর, শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন, আত্মজ হইতেও প্রীতিভাজন ভাগিনেয়ের পরলোক, ও সর্বশেষে নিরতিশয় মেহপাত্রা ভ্রাতৃপোত্রীর শোচনীয় মৃত্যুতে বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ জরজর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সকল প্রবল শোক ও দীর্ঘব্যাপী দুরারোগ্য রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য দেবেন্দ্রবাবু অন্তরে তাঁহার ইষ্ট পরমহংসদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন; আর তাঁহার বাহিরের অবলম্বন ছিল বাণীর চরণসরোজ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই দুইটি আশ্রয়ের কোনটি হইতেই বিচ্যুত হন নাই—ইহাই পরম সাক্ষ্য। জীবদ্দশায় তিনি পরমহংস-দেবের সাক্ষাৎ রূপালাভে ধন্য হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন, মৃত্যু কালেও তাঁহারই চিত্রপটের চরণপ্রান্তে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া সজ্জানে ইষ্টনাম শ্রবণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি যে জীবনে পরম শান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার স্বভাবতঃ শান্ত সৌম্য সহাস বদন যিনি বারেকের তরেও দেখিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সুকঠিন রোগও ক্রমবিবর্তমান জরার আক্রমণ, মর্মান্তিকী শোক,

গুণরাশিনাশী নিদারুণ অর্থাভাব—কিছুই কণিকের তরেও তাঁহার সদা প্রফুল্ল বদনের স্নিগ্ধ কান্তিকে স্থান করিতে পারে নাই। সে উন্নত প্রশস্ত ললাট কোনদিনই দুঃশিস্তার কুটিলরেখাপাতে কলুষিত হয় নাই—আয়ত বিশাল সমুজ্জল নয়নধরে প্রতিভার দীপ্তি-চিত্র অনির্বাক্য ছিল। সেদিন মৃত্যুর পরেও অর্দ্ধস্তিমিত নয়নদ্বারা দিয়া সেই প্রশান্ত জ্যোতির্ভাষে মুহূর্ত্তাবে বিচ্ছুরিত হইতেছিল, মৃত্যুর কঠিন হিম-

ডোঙার বাল্যমৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক ক্ষিপ্র ঔষধ।

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশু-দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সন

ঔষধালয়ে
পাওয়া যায়।

শীতল স্পর্শেও উহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেবেজবাবুকে এই অতি পরিণত বয়সে “গিরিশ লেকচারার” নিযুক্ত করিয়া পঞ্চাশ বিচার-শীলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। দেবেজবাবু যখন একদিনে পক্ষাঘাতে পড়েন ও নিদারুণ অর্ধাভাবে বিভ্রান্তপ্রায়—ওদিকে একমাত্র পৌত্রী চন্দ্রের সমক্ষে ‘মুমূর্ষু’—সেই সময় তাঁহার উপর এই গুরুভার আসিয়া পড়িল। অথচ গিরিশচন্দ্রের প্রতি অপরিণীম প্রভাভেতু তিনি এ আহ্বান উপেক্ষাও করিতে পারিলেন না। তখন তিনি উঠিয়া বসিতে পারেন না। চিৎ হইয়া ওইয়া পেটের উপর বাসি রাখিয়া তাহার উপর খাতা পাতিয়া কোনরূপে ধীরে ধীরে অহস্তে তিনি প্রবন্ধ রচনা করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের উপর তাঁহার এতদূর প্রভা ছিল যে, তিনি মুখে বলিয়া বাইবেন আর অস্ত্রে তাহা লিখিয়া লইবে—ইহা কদাচ তাঁহার মনঃপূত হইত না। গত সেপ্টেম্বরে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠের উপযোগী করিয়া ছুইটি বক্তৃতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—এবং বথানিয়মে উহা পঠিতও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেবেজবাবুর নিজের মোটেই মনঃপূত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত ছাপিতে দিবার জন্য পঠিত প্রবন্ধ দুইটিকে তিনি পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। এমন সময় সহসা মহাকালের অহুপেক্ষণীয় আহ্বান আসিল। কার্য সমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চলিয়া বাইতে বাধ্য হইলেন। আশা করি, তাঁহার অসমাপ্ত প্রবন্ধগুলিই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অচিরে প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান “শ্রীকৃষ্ণ” চন্দ্রাব্যাস। বাঙালি চন্দ্রচন্দ্রের

এই প্রথম নিদর্শন। পঞ্চমত পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবিরাট গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে “ক্লাসিক” রচনার শ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকারী। সর্ববিধ ভাব-রস-মুগ্ধিতে, ছন্দ-গানে চরিত্র চিত্রণে, অপক্লপ ভাষাচ্ছটার ও ভক্তিমাদুরী ক্ষুরগে যেন উহা সেই চিরকিশোর শ্রীমদ্ভক্তের নন্দনন্দনের মধুর মুরলীতানের বায়না মুষ্টি-রূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকমল, বক্রিমচন্দ্র ও (প্রাচীন সাহিত্য রচয়িতা) রবীন্দ্রনাথের রচনা ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শনই ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে না।

দেবেজনাথের সাহিত্য সাধনার অস্বাভাবিক স্বরূপ—বাসিকুল, বরমাল্য, চন্দ্রকীক, ওথেলো ও এন্টনি-ক্লিওপাট্রার অনুবাদ, সীমন্তিনী, গোপালের মা, কুহকী, বেজায় আওয়াজ, পরমহংসদেব ও স্বামী সারদানন্দ, শকুন্তলায় নাট্যকলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরস ও করুণ ছোট গল্প রচনায়, ভৌতিক কাহিনীর রোমাঞ্চকর বর্ণনায়, নির্মল শিশুসাহিত্য সংগঠনে, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক চিত্রের মনোরম উপস্থাপনে, নাটকীয় ও ধর্ম-সঙ্গীত রচনায় ও নির্দোষ ভাবগুরু কবিতা বন্ধনে তাহার অনন্ত সাধারণ অধিকার ছিল। তাহার এরূপ ভাবান্তর রচনা যে এ বাৎকাল কত বাঙলা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার কয়েকটি নাট্যরচনা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ও বেতারের আসরে তুমসী প্রশংসার সহিত বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

ব্যবহারিক জীবনে দেবেজবাবুর ভায় সদালাপী, পরিহাস-রসিক, সদ্ভদ্র, অমায়িক ভক্তলোক অভিঅন্নই দেখা বাইত। কখন কোন কারণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তিনি কোন ব্যক্তির অন্তরে আঘাত বিহীন করিয়া গুনা যায় নাই। অল্পের ছেলেবেলায় বোধ বহুবার বধাই লিখিয়াছেন

গান

শ্রীমদ্ভক্ত

দিনের আলো ঘুমিয়ে যবে পড়ে সাক্ষের বুকে
মধুর হাসি গভীর অন্ধে কোটে তারার মুখে।

কয় সে কথা তাঁদের সনে
মুক্তা করে আঁধার বনে;
শিউলি-চোখে অশ্রু করে কোন্ সে
গোপন সুখে ॥

জোছনা ধারা যথ রহে নীরব নিঝুম রাতে,
শুকতারা তার, বিদায় লেখা আঁকে
কমল পাতে।

চাঁদের আলো তারার মালা
শিউলি হাসি ভুবন আলা
শিশির সনে অরুণ আলোর করে
উবার বুকে ॥

—:—

যে “তাহার মৃত্যুতে সকাল ও একাল
ছুইয়ুগের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সংযোগ-
বর্ণসেঁচু ভাঙ্গিয়া পড়িল”।

দেবেজনাথের জীবন আদর্শ সাহিত্য-
সাধকের জীবন। তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ
বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু
অন্ততম “আদর্শ বিলোপ হেতু বাঙলা
সাহিত্যজগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল,
তাহার জন্য বাঙালির সাহিত্য সেবী
মাত্রেই অশ্রুপূর্ণাঙ্গলিদানে তাহার স্মৃতির
অর্চনা করা উচিত। প্রার্থনা করি—
তাহার দীর্ঘায়নপূত নিকম্ব আত্মা
শান্তিযন্ত্র লোক হইতে আমাদেরকে গভীর
পথ প্রদর্শন করুক। শান্তিঃ। শান্তিঃ।
শান্তিঃ ॥

খেয়ালী চিত্রপট



গুরিয়েভান কিনেটোন আর্টসের "একলব্য"
• চিত্রের একটি দৃশ্যে অহর পাহুলী, রেখকা
রায় ও আরো অনেকে। ভবিষ্যদি



পরিচালক
জালাল নিউজপেপার লিঃ
১১, চক্রেডিয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

নষ্টম বর্ষ, ৪৪নং সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই আগস্ট ১৯৬৫, ২৪শে নভেম্বর ১৯৬৮

ভবানীপুর ক্লাব

কলিকাতার ক্রীড়া জগতে কে সমস্ত ক্লাব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে ভবানীপুর ক্লাব তাহার অগুণম। ভবানীপুর ইম্পিরিয়াল ও ভবানীপুর স্পোর্টিং সম্মিলিত হইয়া ভবানীপুর ক্লাবে পরিণত হইবার পর হইতেই যিনি অকুণ্ঠ অর্থব্যয়ে ও অন-মুকরণীয় প্রযত্নে ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন এই মাসের প্রথমে সেই শ্রীযুক্ত মলিনীনাথ মিত্রের আকস্মিক পদত্যাগে ক্রীড়াবোদীদের মধ্যে বিস্ময় ও চাকচ্যের উদয় হইয়াছে। প্রকাশ যে উপদলগত বড়বন্ধে উদ্যুক্ত হইয়া মলিনীনাথ পদত্যাগ করিবার পর তাঁহার বিরোধীদল যিঃ বি, এন, সরকারকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন। অকুণ্ঠ অত্যাধি যিঃ সরকার ঐ পদগ্রহণে সম্মতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে ঐ পদগ্রহণ করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষ নিউ থিয়েটার্সের আপিস চাহিয়া ফেলিতেছেন। বাংলার ভাষা ভারতের শ্রেষ্ঠতম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসাবে যিঃ সরকারের অবলম্বন অতি বিরল। তাঁহার পক্ষে ভবানীপুর ক্লাবের দায়িত্বগুরুপদের জন্য সময় দেওয়া একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হয়—

ভিনি কোন বিষয়েই দৃষ্টি দিতে পারিবেন না মনে করা অসমীচীন নয়। তাঁহাকে উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত করার গুণ অভিসন্ধি এই যে তাঁহার বাবের অন্তরালে কতিপয় ব্যক্তি ভবানীপুর ক্লাবের লক্ষ্যসন্ধী হইবেন। আর যিঃ সরকারের অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যে তাঁহাদের লোলুপ-দৃষ্টি আছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। যিঃ সরকার অর্থ-সাহায্য করিয়া ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন—ইহাতে সকলেরই সহায়ত্ব আছে। কিন্তু তাঁহার দ্বায় নির্বিরোধী সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ষণ্ডনীয় চক্রান্তকারীদের শিথিলরূপে অন্তর্গত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে—বিশেষতঃ যখন তাঁহার অবসর এত অল্প এবং তাঁহার পক্ষে ক্লাবের কোন বিষয়েই দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হইবে না। আমরা আশা করি যিঃ সরকার বিভ্রান্ত হইয়া এই পদ গ্রহণ করিয়া চক্রান্তকারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হইবেন না।

ভবানীপুর ক্লাবের প্রাণ-স্বরূপ মলিনীনাথের বিরুদ্ধে যে ষণ্ডন গজাইয়া উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহারও ক্লাব-পরিচালনার দক্ষি আঁছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ধুমায়ি বাহা বয়েক বৎসর বাব প্রচলিত ছিল তাহাই মলিনীনাথের সহায়তার সুযোগ লইয়া আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ যে বর্তমান অবস্থায় যিঃ বি, সি, যোবও সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ মিত্রও কার্য নির্বাহক সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিগত সহযোগিতা বিচ্যুত হইয়া ভবানীপুর ক্লাব অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে কিনা তাহাও যোর সন্দেহের বিষয়।

কলিকাতার বিশেষতঃ ভবানীপুরের ক্রীড়া-মোদীগণের আশু কর্তব্য এই যে, এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের কবল হইতে রক্ষা করা। বারাস্তরে আমরা ভবানীপুর ক্লাবের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সকলের দৃষ্টি আরও বিশদভাবে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিব। ইতিমধ্যে আমরা আশা করিতে পারি কি যে, বিবাদমান দলদ্বিতীয় মধ্যে এক সন্তোষজনক মীমাংসা সংসানিত হইবে? যিঃ সরকার স্বয়ং এ বিষয়ে অবহিত হইলে এক সন্তোষজনক মীমাংসার উপনীত হওয়া কঠিন নহে।



এই বিভীষণটি কে ?

বৈশাখ ১৩৩৬ সালের “মহাকাল” পত্র এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন :—“মহাকবি বাম্বাকি দ্বারায়ণে বিভীষণকে অমর ক’রে রেখে গেছেন একথা বোধহয় কাউকে নুতন ক’রে বলে দিতে হবে না। তাই আমাদের দেশে যুগে যুগে বিভীষণ প্রকট হ’লে উঠেছেন। এই সেদিনও মির্জাকর জন্মে গেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি একটি মির্জাকর জুکیয়ে আছেন, আপনারা বোধহয় জানেন না। এই লোকটির একটু পরিচয় নিচে দিলাম।”

“ইনি প্রথমে ৭৫ কি ১০০ টাকা বেতনে বিভাগাগর কলেজে চাকরী মেন। তারপর আন্তবাবুর বাড়ীতে বছর খানেক ধরা দেবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরী পান। চক্কর লোক! —রমা প্রসাদ মুখ্য্যে এবং প্রমথ বাবুদের হাভে পায় হ’রে একটু একটু করে আন্তভোবের নেক নজরে পড়বার সুযোগ ক’রে নেন। তারপর তার আন্তভোব রমাপ্রসাদ এবং প্রমথবাবুর চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বৃত্তি আদায় ক’রে বিলাত বাত্মা করেন, এবং সেখান থেকে কিয়ে তার আন্তভোবের রূপার এবং রমাপ্রসাদবাবু প্রমথবাবু প্রভৃতির চেষ্টার দ্বিতীয় হোমরা চোদরা একজন হোরে ওঠেন। তখন আর পার কে? —রমাপ্রসাদবাবু প্রমথ

বাবু প্রভৃতিকে চিনতেই পারেন না এমনি ভাবটা। শুধু তাই নয়—রমাপ্রসাদ বাবু এবং প্রমথবাবুর চাকরী খাবার জন্তে এই মহাত্মবটি যে কি প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন তার ইতিহাস এত দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তা দিয়ে একটি মহাকাব্য রচনা হ’তে পারে। মহাকবি বাম্বাকি আল বেঁচে থাকলে এই অপূর্ণ জীবটিকেও বোধহয় অমর ক’রে রেখে দিয়ে যেতেন। তবে ভরসা এইটুকু যে রবীন্দ্রনাথ এখনও জীবিত এবং হয়ত বা শেষ বয়সে একটা মহাকাব্য রচনা ক’রে দয়া ক’রে এই বিনীত সুলীতিরও মহাত্মটিকে অমর করে রেখে দিয়ে যাবেন।”

কানান্ত্রায় শোনা যায়, এই লোকটির জন্মদাতা জনকও নাকি বহু মহলে তাঁহার এই স্বনামধন্য রত্নটির জন্ত চুখ করিয়া থাকেন। অবশ্য পিতা এবং পুত্রের “চালা ও চুলা” বহুদিন হইতেই ভিন্ন—একজন থাকেন সহরের উত্তরে একজন থাকেন দক্ষিণে। তথাপি এত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও এই বিভীষণটিকে এখনও অনেকেই খোলা-খুলি ধরিতে পারিতেছেন না। বোধকরি ইনি, একাধারে বিভীষণ ও মেঘনাদ এবং তাহার উপর তার বহুদের কক দ্বারায়ণ কায়াচাকিয়া থাকেন। তাই একটু বিলম্ব হইতেছে।

মৃত্যাকর-প্রমাদ : —

সঙ্গনীকান্ত যে এককালে উদরারের জন্ত “প্রবাসী” পত্রিকার মৃত্যাকর ছিলেন তাহা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। প্রবাসীর বৃদ্ধ সম্পাদককে যখন তখন কামড়াইবার চেষ্টার দ্বারা সেই মৃত্যাকর-প্রমাদ প্রতিপদে প্রকট হইয়া পড়িতেছে। শরৎচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে শনির দলের নিকট হইতে উপেক্ষা ও অবজ্ঞাই লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ইহারা শরৎচন্দ্রের হইয়া ওকালতির দানসাগর করিতেছে। চাক বন্দোপাধ্যায়ের উপর মৃত্যাকর জীবন হইতেই শনির দৃষ্টি। কাজেই যেই চাক বন্দো “শরৎবৃত্তি” প্রবাসীতে ছাপাইয়াছেন, আর যার কোথায়? মুখস্থ শরৎ ভক্তির মুখোল পরিয়া ভূতপূর্ব প্রবাসীর মৃত্যাকর চাক বন্দো রামানন্দ এবং তত্ত্ব পুত্রদের প্রতি পুরাতন ঝাল ঝাড়িয়াছেন এবং শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন কাহিনীর অংশ বিশেষ যাহাতে আরও একবার লোকলোচনে পতিত হইয়া শরৎ তর্পণ ভাল করিয়া সম্পন্ন হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাঙ্ক্ষিকের শনির চিঠি লিখিয়াছে “প্রবাসী পত্রিকার চিত্রদ্বারা অথবা প্রবাসী আপিসে গুণী সমাবেশের দ্বারা ‘গ্র্যাপশট’র প্রত্যক্ষ demonstration দেখাইতে পারিলে অনেক বেশী সুবিধা হইত। শরৎচন্দ্র জীবনে আরও বাহা বাহা করিয়াছেন তাহার সচিত্র বর্ণনা দিবার লোভ প্রবাসী বহুকষ্টে সন্ধান করিয়াছেন, মনে হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়ের পুত্রেরা সৌভাগ্যক্রমে বড় হইয়া ‘গ্র্যাপশট’ প্রলোভনের উর্দ্ধে গিয়াছেন কিন্তু প্রবাসীর পাঠকদের সকলের সে সৌভাগ্য হয় নাই।” ইহাতে শরৎ ভক্তির মুখোল পরিয়া যে প্রবাসীর শরৎ চিত্রকর কল্যাণচন্দ্র দাসানন্দী-কিয়েন প্রভৃতি হইয়াছে তাহার নিকট শরৎ জীবনের



(বিলাসী)

রূপোর ঝুমকো

প্রযোজক—ওরিয়েন্টাল কিনেটোন
পার্টস।

কাহিনী—গোবিন্দ ব্যানার্জি

পরিচালনা—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র শিল্পী—বীরেন দে

শব্দযন্ত্রী—এন, পাল, এম এস-সি ও বি,
বোব, এম-এস-সি

সুর-শিল্পী—সত্যেন দাস

চরিত্র—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, কার্তিক দে,
ফণী বিজ্ঞানিনোদ, সত্য মুখার্জি, নীলু রায়,
কমলা, পারুল ইত্যাদি—

প্রথম মুক্তি—শ্রী, ১৯শে নভেম্বর।

পরিবেশক—মতিমহল থিয়েটার্স লি:

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টসের এইই
প্রথম ছবি। দকল রকমে হাত্তরসাত্তক
ক'রবার প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু এক মন্থণের
ফুমিকা ছাড়া কোথায়ও সে উত্তম সফল
হ'তে পেরেছে বলে আমাদের মনে হয় না।
ছবিটি পুরোপুরি লম্বা নয়, মাত্র ৭৮ রীল
তাও অনেক জায়গায় আমাদের অবান্তর
ও সস্তা প্যাচের পায়তাজা বলে মনে
হচ্ছিল। বেশীরভাগ দোষই আমাদের মনে
হয় পল্ল রচয়িতার জন্ত, তারপর "কথাসিল্পী"র
জন্ত। গল্পের গতি অনেক জায়গায় খাপ-
ছাড়া। এমন শূন্য মরুভূমে প্রাসাদ স্থটির

প্রচেষ্টায় এরূপ হ'য়েই থাকে, আখ্যানভাগ
একেবারে কাচা হাতের পিরিচয় দিচ্ছে,
সামান্য রূপোর ঝুমকোর জন্ত এক কাব্য-
বাতিকগ্রন্থ মন্থণ-জর্জরিত নায়কের সমাবেশ
অজিকালকার যুগে বরদাস্ত করা অনেকের
পক্ষে শক্ত। ঝুমকো নিয়ে এত কাণ্ড
করাও এরূপই বেমানান হয়েছে, কথাবার্তাও
তেমন উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছিল না।
পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক
ছবিই করেছেন কিন্তু এ-বয়সে, এক বাল-
খিল্য কথা ও কাহিনী নিয়ে স্বেচ্ছায়
নাস্তানাবুদ হবেন আমরা অশা করিনি—ওঁবে
এক বলতে পারেন অভাবের তাড়নায়।
অবশ্য সে বিষয় আমাদের 'ব'লবার
কিছু নেই।

নায়ক ধীরাজ সঙ্কে পূর্বে বলেছি একটা
বেথাপ্লা বিদম্বুটে চরিত্র তাতে রসসৃষ্টি
অসম্ভব। নায়িকা বা নায়িকাময় কোন রূপ
চলনসই। নীলু রায় চেহারার জোরে চলতে
চাইছিলেন কিন্তু এখনও অভিনয় বহুদূরে।
ফণী বিজ্ঞানিনোদ অর্থহীন অভিনয়
ক'রেছেন। সত্য মুখার্জির খানিকটা
কৌতুকময় অভিনয় ছাড়া অন্তান্ত অংশ
আমাদের মনে রেখাপাত ক'রতে
পারে নি।

সঙ্গীতাংশ মন্দ-নার পর্যায়ে তবে
গায়িকারা তেমন কিছু সুবিধে কর্তে
পারেন নি। শব্দাহলেখন ভালই। দৃশ্যসজ্জা
ঘোড়ের ওপর ভাল। আলোকচিত্র মাঝা-

মাঝি একরকম হয়েছিল কিন্তু প্রথম
কপিঙ্গে ২১০ রীলে রসায়নাগারের কাজ
খারাপ হওয়ায় আলোক চিত্র খারাপ
দেখাচ্ছিল তবে গুনলাম পরে নুতন কপি
দিয়ে সে দোষ সেরে দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদনা তেমন সুবিধের হয় নি। ২১০টা
বড় গোছের ভুলও চোখে পড়ল। ছবি
খানায় যেক্রপ অর্থব্যয় হ'য়েছে বলে শোনা
যায় তাতে বোধ হয় একখানা ভাল
full length ছবি হ'ত। বাক এর সঙ্গে
একখানা ছোট ও ছোটর মধ্যে যতদূত সম্ভব
সুন্দর পৌরাণিক ছবি একলব্য জুড়ে দিয়ে
দুরকম দর্শককে পরিতৃপ্ত করবার প্রয়াস
পেয়েছেন।

একলব্য

প্রযোজক ও নির্মাতা—ওরিয়েন্টাল
কিনোটোন আর্টসের পক্ষ হতে শ্রীযুক্ত
পান্নালাল পাঠক।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—জ্যোতিষ
বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোক চিত্রশিল্পী - বীরেন দে
শব্দশিল্পী—অবনী চট্টোপাধ্যায় ও
গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরশিল্পী—ধীরেন দাস

জনক
বন্দি

পরিচালনা কচ্ছেন : ফণী বর্ম্মা

চিত্রগ্রহণ কচ্ছেন : প্রবোধ দাস

শব্দযন্ত্রী হচ্ছেন : নৃপেন পাল

ভূপেন বোব

নৃত্যশিল্পী—কুমার মিত্র

দৃশ্য সজ্জা—বটকৃষ্ণ সেন

উদ্বোধন—‘শ্রী’ চিত্রগৃহে ১৯শে নভেম্বর
শনিবার।

কুশীলবগণ—একলব্যের ভূমিকায়—
জহর গাঙ্গুলী, দ্রোণ—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়,
অর্জুন—ফাস্তুনী ভট্টাচার্য্য। বিপাশ—
রেণুকা রায় প্রভৃতি।

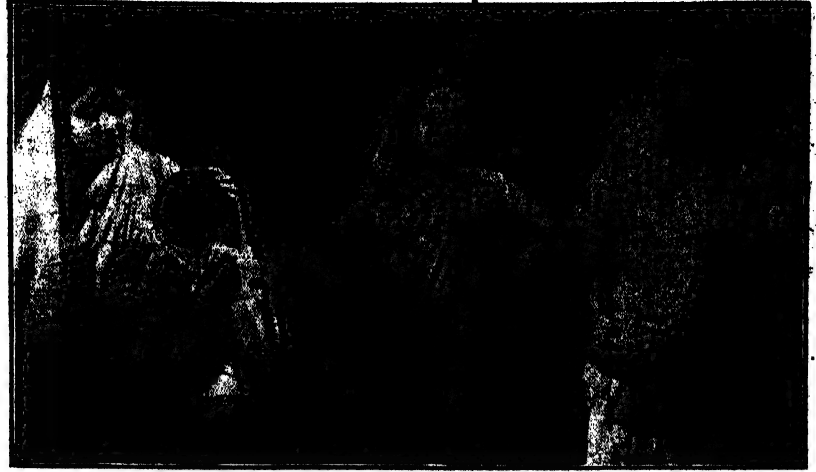
এই পৌরাণিক আখ্যানটি সমস্ত ডাল-
পালা বাদ দিয়ে ৫৬ রৌলে দেখান হয়েছে।
তবে গল্প সরল হয়েছে অনেক স্থান বেশ
উপভোগ্য হয়েছে কিন্তু ছোট করতে
গিয়ে অনেকটা পাতাহীন নেহাৎ ছোট
শিল্পগাহের মত দেখাচ্ছিল। তবুও
বাচন-ভঙ্গী, দৃশ্য-সজ্জা, সাধারণ অভিনয়
বিশেষতঃ রেণুকার অভিনয়, ব্যাধনুভূ
প্রভৃতি নানা উপভোগ্য উপাদান থাকায়
ছবিখানি রূপোর কুমকোর চেয়ে উপভোগ্য
হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। পরি-
চালকের নিপুণ ও কোমল স্পর্শের আভাষ
হুই এক জায়গায় পেয়েছি।

অভিনয়ে কঠোর প্রকৃতি অর্জুন গত
চিন্তা দ্রোণের অভিনয় খুব ভাল না ফুটলেও
মন্দ হয় নি। একলব্যও পৌরাণিক ছবি
হিসেবে মন্দ হয় নি। শ্রীমতী রেণুকে
আমরা এই প্রথম গান গাইতে শুনলাম,
চেষ্টা করলে আরও উন্নতি করতে পারবে
বলে আমাদের বিশ্বাস। ব্যাধ নৃত্যগুলি
বেশ জমিয়েছে এজন্য নৃত্যশিল্পী কুমার
মিত্র প্রশংসা পেতে পারেন।

আলোক চিত্র পরিষ্কার, বর করে।
শব্দগ্রহণ স্পষ্ট হলেও back ground
voice আছে, সম্পাদনা মন্দ নয়।

সাপুড়ে

হুই নম্বর ঠুড়িতে দেবকীবাবু ও
ছোটাই বাবুর সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পর্ক
নির্ধিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। শুনি পুরুষ-



“বড়দিদি” চিত্রে মলিনা, ছবি, নিভাননো ও নিম্মল ব্যানার্জি।

বেশী ‘চন্দনা’-কে নিয়ে ওস্তাদ জহর কিঞ্চিৎ
বিলাটে পড়েছে। ওস্তাদ নিজেই জানে,
জ্ঞা লোকের সংস্পর্শে এলে তাদের প্রতি-
শ্রুতি থেকে পদস্থলন ঘটে এবং তার
পরিণামে কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা
নগ্নকি সাপুড়ের শাস্ত্রে লেখা নেই। এখন
এই ফ্যানাদ থেকে ওস্তাদজী রক্ষা পেলেই
বাঁচি!

ওস্তাদ ও চন্দনাকে নিয়ে আজকাল
আবার ভবটি বেঁদে-পল্লীতে নানা কথা
রটুতে শুরু হয়েছে। শেষকালে শ্রীমতী
চন্দনার ছদ্মবেশের জারি-জুরি ফাঁস হুইয়ে
গেল না কী?

কে জানে বেচারী ওস্তাদের অদৃষ্টে
কী আছে? . . .

আজকাল সুন্দরী কানন দেবীর সঙ্গে
মঞ্চ ও চিত্র-জগতের Confirmed মহাবি-
দ্য পরিচিত, সুবিখ্যাত অভিনেতা
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মশাইকে হামেশাই
একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। শুনি নাকি
সর্প-যজ্ঞের এরা দুজনাই মূল অধিনায়ক
ও অধিনায়িকা।

কর্মকর্তা ছোটাইবাবুর সঙ্গে কেউ-
পাংদুন আর দেবকী বাবুর গলা থেকে

কান পর্যন্ত কর্মকর্তার জড়ানো। ওদিকে
আবার শুনি রাইটাদের কথায় কথায়
মান অভিমান!

কর্মকর্তা মশাই একা ক’ দিক
সম্মলাবেন?

বড়দিদি

আজকাল পরিচালক অমর মল্লিক
মশাইয়ের মন দেখটি কিঞ্চিৎ বিক্লিষ্ট।
শুনলাম নাকি টেলিউডের মমতা সাময়িক
ভাবে কাটিয়ে গত হস্তায় ইনি সদলবলে

ডেনক

নন্দিনী

কথা-চিত্রের ভূমিকাগুলিকে রূপ দিয়েছেন
সাবিত্রী, দেববালা, ছায়া, রাজলক্ষ্মী, অহীন্দ্র
চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, গরি রায়, মনোরঞ্জন
ভট্টাচার্য্য, কুশীল রায়, মৃণাল ঘোষ,
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়,
কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জানকী
ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ব্যাংকপুত্র অকল ভোলপাড় কোরে ফুলেছিলেন।

মত ভাবনার পড়েছেন মল্লিক মশাই, বেচারী পাহাড়ীকে নিয়ে। মোসাহেবের দল চায়, এই গোবেচারা রাঘব-বোয়াল জমিদার বাবুটির মাথা, সুযোগ বুঝে কিঞ্চিৎ হাত ফুলিয়ে নেবেন।

কিছু 'বাহু' ছেলে মল্লিক মশাই সমর মত খবর পেয়ে ব্যাংকপুত্রের বাগান বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতীকে।

তখন—ইনিই 'শান্তি'; জমিদার সুরেনের সহধর্মিণী। সেই বাগান বাড়ীতে যে প্রহসনের সূচনা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী শান্তির আবির্ভাবে তার কী মর্মান্তিক পরিণাম ঘটে সে কাহিনী আপনাদের আর একদিন জানাব। আপাততঃ শুধু শুনে রাখুন—শ্রীমতী শান্তি তার স্বামীকে সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে জুড়ী গাড়ী চড়িয়ে মোসাহেব ও বাইজীর কবল থেকে বাড়ী ফিরিয়ে এনেচে।

শান্তির হাতের 'নোয়া' আর সিধের সিঁচুর শেষ পর্যন্ত বজায় থাক। মল্লিক মশাইয়ের সুষ্টবোগ বিফলে যাবে না।

কপালকুণ্ডলা

স্মরণীয়-প্রতিভাশালী পরিচালক ফণী মজুমদার অপূর্ণ চিত্রনাট্য গঠন করে সদল-বলে তাঁর পুরান ইউনিট নিয়েই 'কপাল-কুণ্ডলা'র হিন্দী সংস্করণ চিত্রগঠন কার্যে হাত দিয়েছেন। তাঁর মত সুবিখ্যাত চিত্রনাট্য লেখকের পরিচালনার ভারতবর্ষ আর একখানি সৌন্দর্যসম্ভারে উজ্জ্বলিত চিত্র দেখতে পাবেন এ আশা যে কোন চিত্রাভিনেত্রীই করতে পারেন।

ভারতের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান মিউ থিয়েটার্সের করেকটি অভিনয় কলা-জ্ঞানে প্রতিভালব্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রী এই ছবিতেই অভিনয় করে ছবির সৌন্দর্য বর্ধন

করছেন। সুশ্রুত, চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যের আইডল নাকাম সেজেছেন অবকুতার আর সুন্দরী শ্রীমতী লীলা দেশাই, সাগর হৃদয়ে জোড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার দ্বার সিঁথোজ্জল-রূপে রূপসা—স্বাশ্রিত আঙুল লবিত কুচিত কেশভার মন্তকে, জেনেট গেনরের আয়ত চক্ষুর নিম্পাপ দৃষ্টিতে অসাধারণ কার্যিক কারুশিল্পের যৌবন-শ্রীতে, অভিনয়ের বর্ণনাতীত বাচন ভঙ্গিমাতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মানস কল্পা কপালকুণ্ডলার রূপ পরিগ্রহণ করেই এ ছবিতেই অবতরণ করেছেন। সুপরিচিতা প্রদীপ্ত ভঙ্গিমার অধিকারিণী শ্রীমতী কমলেশকুমারী সেজেছেন মতিবিবি। এই ছবিতেই একটি বিশিষ্ট চরিত্রে বাঙলার চলচ্চিত্রের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ গায়ক পঙ্কজ মল্লিক নামবেন। এ ছাড়াও বহু নাম করা অভিনেতা অভিনেত্রীদের এতেই দেখা যাবে।

সঙ্গীত পরিচালনাও করছেন পঙ্কজ মল্লিক। তাঁর সুরের অপূর্ণ মায়াজাল ভারতের যে কোন চলচ্চিত্রের দর্শক জানেন।

সেমিন স্টুটিং দেখতে আমরা গিচ্ছলাম। মিউ থিয়েটার্স ছ-নম্বর ফ্লোরে একটি ছোট

সেটে 'কপালকুণ্ডলা'র স্টুটিং চলছিল। অক্লান্তকর্মী প্রবন্ধক প্রমোদ রায় অতি যত্নে এই সরাইখানার নিখুঁত সেটটি তৈরী করেছেন। সত্ত্ব বিবাহিত নব-দম্পতী সপ্ত-গ্রামে যাবার পথে এই সরাইতেই প্রথম আশ্রয় নিয়েছেন। একটি নিম্পাপ সরল হৃদয়া বনের মেয়ের জীবনে প্রথম পুরুষের সঙ্গে একটি প্রেমের দৃষ্ট ভোলা হচ্ছিল। সেটের উপর এ দৃষ্ট এত চমৎকার যে বর্ণনায় লেখা যায় না। এ যেন অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রেমের অভিনয় নয়। স্টুটিং দেখে ফ্লোরের বাহিরে এসে আমরা তারিফ করলুম ব্যাচিলার ফণিবাবুকে যিনি এ দৃষ্টের পরিকল্পনা করেছেন।

আর সুশিক্ষিতা লীলা দেশাই—বোধ হয় তাঁর দ্বারা এ দৃষ্টে এমন করে অভিনয় করা সম্ভব হয়।

সাধী

আগামী ৩রা ডিসেম্বর শনিবার 'সাধী' নিউ সিনেমা ও চিত্রায় এক যোগে মুক্তিলাভ করবে। আমরা পূর্বেই বলেছি 'সাধী' পরিচালক ফণী মজুমদারের স্টুটি নতুন প্রতীক। গানের-ত কথাই নেই

মোহনতোষ ব্রাদার্স লিমিটেড

১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ১২০

ব্রাঞ্চ : ১৩৮-এ আশুতোষ মুখার্জি রোড

ভবানীপুর, কলিকাতা।

আমাদের দোকানে হুদক ও বিচ্চকন কার্যিকর
দ্বারা টেনিস ও ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট মেরামত ও
তীক্ষণ করা হয়। **জি.সি.সি.সি.** র‍্যাকেট মেরামত
করা আমাদের বিশেষত্ব—মূল্যে সন্তোষ দিতে পারি।

বাণভীর বিলাতী ও দেশী র‍্যাকেট ও অজাত টেনিস ও ব্যাডমিন্টনের
লাজ-মরজার পাইবেন। ক্যাটাগরি বিলম্বিত্যে দিল্লী থাকি।

কারণ সায়গল ও শ্রীমতী কাননবালা—
এ ছবিটির অসাধারণ সঙ্গীত নৈপুণ্য অল্পপণ
কর্তে তারা। চেলে দিয়েছেন—এমন কি যে
যে রকম গান চায় তার ব্যবস্থা পুরোপুরি
আছে। নাচেও তাই। অভিনয়ে সায়গল,
কানন, শৈলেন চৌধুরী, অমর মল্লিক,
ভাস্কর, বোকেন প্রত্যেকেই নিজের নিজের
বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ দেখিয়েছেন।

অধিকার

আগামী বড়দিনে ২৫শে ডিসেম্বর
'অধিকার' চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে।
'অধিকার' অপরাহ্নে পরিচালক কুমার
প্রমথেশ বজ্রায় নবতম চিত্র। কুমার
বজ্রায় ছাড়াও শ্রীমতী মৈনকা, শ্রীমতী
চিত্রলেখা, পাহাড়ী, পঙ্কজ মল্লিক, ইন্দু
মুখার্জি ও শৈলেন চৌধুরী অভিনয়
করেছেন। গল্প আধুনিক কলা-কুশলী কুমার
বজ্রায় নিপুণ তুলিকাম্পর্শে সজীব হয়ে
উঠেছে নিশ্চয়।

দৃশ্য (হিন্দি)

গত সপ্তাহে একটি রেডিও টুডিওর
দৃশ্য তোলা হয়েছে। জগদীশ শেঠী টেলিভিশন
ডিরেক্টরের অভিনয়ে বেশ কঠোর ভাব
দেখিয়েছেন। সায়গলের মত গায়ককেও
তিনি পাশা দেননি। শেষে কিন্তু গুণেরই
জয় হ'ল। নিরাশ প্রেমিক হ'লেও এ
গায়কের স্তম্ভুর কণ্ঠের বৃথা যায় নি, টেলিভিশন
ডিরেক্টরের ভায় কঠিন প্রাণকেও নরম
করেছিল।

যথের ধন

শ্রীযুক্ত হরি ভঞ্জন পরিচালনায় যথের
ধনের কাজ এগিয়ে চলেছে। শ্রীমতী শীলা
হালদারের গান অনেক তালিম দিয়ে
আশাভিরিক্ত স্তম্ভুরভাবে তোলা হয়েছে।
নভেম্বর মাসের মধ্যে তিতরের সমস্ত দৃশ্য
হ'লে বাবে তারপর বাহিরের দৃশ্য তোলাবার
কাজ তারা আরম্ভ করেন। ছবিখানা

এখন ইট ইটিয়া টুডিওতে তোলা হ'লে।
খ্যাতিমান আলোকচিত্র-শিল্পী বতীন দাস
এ ছবি তুলছেন। এ ছবির যাকিছু
যোগাযোগ সব রাখা কিনা কোম্পানীই
করছেন।

চিত্রায় 'দেশের মাটি'

আগামী শনিবার থেকে চিত্রায়
"দেশের মাটির" ১১শ ও শেষ
সপ্তাহ আরম্ভ হ'ল। এ নতুন
ধরনের দেশ-কল্যাণকর ছবি ভারতে এই
নতুন। ধারা এখন পর্যন্ত দেখেননি তাঁরা
এবার দেখতে ভুলবেন না।

নিউ সিনেমায় 'বিশ্বাপতি'

আগামী শনিবার থেকে নিউ সিনেমায়
বাংলা বিশ্বাপতি দেখান হবে।
অনেকেরই মতে বিশ্বাপতি চির
নতুন, শ্রীমতী কাননবালার অইরাধার
ভূমিকার অভিনয় বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক।

রূপবাণী

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের আধুনিক
সমাজ-চিত্র 'অভিনয়' এই শনিবার হইতে
রূপবাণীতে জরোদশ সপ্তাহে পদার্পণ করিল।
বাঙলা ছায়াচিত্রজগতে যে অভিনব
ও সম্পূর্ণতার পরিচয় দিয়াছে তাহা ইতি-
পূর্বে কোন ছবিতে যেমন লক্ষ্য করা
যায় নাই, নিকট ভবিষ্যতেও এমন একটি
উৎকৃষ্ট বাঙলা ছবি দেখিতে পাইবার
সম্ভাবনাও অত্যন্ত অল্প। সুতরাং 'অভিনয়'
চিত্রের এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্যই
অস্বাভাবিক নয়।

উত্তরায় 'খনা' ও 'অভিসারিকা'

শনিবার হইতে মেট্রোপলিটান পিকচার্স-
এর 'খনা' এবং 'অভিসারিকা' তৃতীয় সপ্তাহে
পড়বে। ছবি দু'খানি যে বিপুলভাবে
দর্শক আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে নিঃসন্দেহে
সুসন্ধান করা যায়, উহা বহুদিন ধরিয়া
'উত্তরায়' আসার কবাইরা রাখিবে আমাদের
বিবাস ও আশা।

'খনা'র সহিত প্রদর্শিত, পাঁচ-বীলের
হাসির ছবি 'অভিসারিকা' অর্থাৎ: এক-
বটাকাল, আপনাদের বিপুল হাস্য-রসে
ডুবাইরা রাখিবে। এই রস-বহুর অহলসদৃশি
হাস্যরসাবতার বীয়েন গাঙ্গুলীর আর একটি
মরগীর দৃষ্টি।

জেলের

গুপ্ত মঙ্গলবার প্রভাত সিনেমায় কর্তৃপক্ষ
জেলের এর গ্রেস শোর ব্যবস্থা করিয়া-
ছিলেন। ছবিখানা দেখে আমরা খুব আনন্দ
পেরেছি। তবে ছবির বিষয়ে সমালোচনা
সমালোচনা আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ
করিব। তবে এই কথা বললে হয়ত
অত্যাক্তি হইবে না যে, সোরাব মৌদীর
পরিচালনা ও তাঁর অভিনয় সত্যই খুব
উচ্চাঙ্গের হয়েছে। আর শীলা চিত্রিসি, শীলা
প্রভৃতির অভিনয়ও বেশ উপভোগ্য
হয়েছে।

জালা

চমকপ্রদ দৃশ্যাবলী সমন্বিত 'জালা'
১০ই ডিসেম্বর গণেশ টকি হাউসে মুক্তি
লাভ করবে। প্রভাতের চল্লিশোহন,
বিনায়ক ও স্তম্ভুরী অভিনেত্রী রত্নপ্রভাকে
এ চিত্রে দেখা যাবে। এ হিন্দি ছবির
পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস লিঃ।

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর
মহত্তম পৌরাণিক চিত্র-কাহিনী

জৈনক
নন্দিনী

রূপবাণী-তে

আগতপ্রাপ্ত

বি বি ধ

এনায়েৎ খাঁ সাহেব

বর্তমান ভারতের সর্কশ্রেষ্ঠ সেতারিয়া প্রফেসর এনায়েৎ খাঁ সাহেব গত ১০ই নভেম্বর, বুধবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে অকস্মাৎ মৃত্যুস্থখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশও পূর্ণ হয় নাই।

খাঁ সাহেব এবার এলাহাবাদে নিখিল-ভারত-সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে গত ৬ই নভেম্বর রবিবার কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ যাত্রা করেন। ৭ই তারিখে তিনি এলাহাবাদ পৌছেন ও ৮ই মঙ্গলবার সকালে সম্মেলনে তাঁহার বাজনা হয়। ঐ দিন সন্ধাতেও তাহার বাজাইবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় বাজাইতে পারেন নাই। ঐ রাত্রেই তিনি অধিক অসুস্থ হইয়া উঠেন ও বুধবার সকালে তাঁহার রক্তবমন হইতে থাকে। তখন ভীত হইয়া সকলে তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। বুধবার রাত্রি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌছান, ৬ শেখ রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

খাঁ সাহেব ইন্টার দরবারের বিখ্যাত সেতারিয়া স্বর্গীয় ইনদাদ খাঁ-র জ্যেষ্ঠ পুত্র। এটোয়া মণিপুরীতে তাহার জন্ম হয়। তিনি সাধারণপুণ্ডে যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। গত কয়েকবৎসর যাবৎ তিনি গৌরীপুরের দরবারে সেতারীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে সমগ্র ভারতে তাঁহার কল্যাণ ও সেতারিয়া আর কিতরী ছিল না। এইরূপ

গুণী ব্যক্তির অকালে তিরোধানে বাঙলার তথা ভারতের যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। মৃদলাচার্য্য হুম ভাঙনের পরলোক গমনের পর একমাস না বাইতে বাইতে খাঁ সাহেবের জায় অসাধারণ গুণী ব্যক্তির এই তিরোধান যেক্রপ গভীর বিষ্ময়ের সেইরূপ নিদারুণ দুঃখেরই উদ্ভেক করে। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

কিশোর সজ্জ

গত ৫ই নভেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যার পর ১৮ নং পাইকপাড়া রো-(বেলগাছিয়া) স্থিত 'বহুনাথ নিকেতনের' উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে "কিশোর সজ্জ"র প্রথম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সজ্জের প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয়—মিলিটারী একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয় ও বিজ্ঞানাগর কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অচ্যুত-কুমার দত্ত মহাশয় উৎসবটিকে প্রাণবান করিতে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ত্রীপদ মুখোপাধ্যায় একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পর কিশোর সজ্জের বালক বালিকাগণ নানাবিধ নৃত্য-গীত ও সর্কশেষে একটি ক্ষুদ্র নাট্যাট্মের অভিনয় করিয়া সমবেত সামাজিকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বহু শিক্ষিত গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মিলিটারী একাউন্টস্ বিভাগের পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ সকলেই সাগ্রহে উৎসবে যোগদান করিয়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে সজ্জের অগ্রতম সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর রাত্রি দশটার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকৃষ্ণেশ্বরী মাতার

পূজা ও উৎসব

১৫ই কার্তিক মঙ্গলবার হইতে বৈষ্ণবনাথধাম কুণ্ডা রামময় আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণেশ্বরী মাতার পূজা উৎসব ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা মহা সমারোহে সূচাকল্পে সমাধা হইয়া গিয়াছে। পূর্বত পরিবেষ্টিত নির্জন, নিস্তর কুণ্ডা গ্রামখানি অকস্মাৎ বহু জনসমাগমে ও নাচ গান গণেশ অপেরা পাটৌর যাত্রা, বায়স্কোপ, পুন্স, পতাকা ও আলোক মালায় সুষোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে মুখরিত হইয়াছিল। দলে দলে সাঁওতাল মহানন্দে নাচ, গান দেখিয়া মহানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। ইহাদের মুখের অকলঙ্ক হাসি ও আনন্দ উল্লাস আশ্রমবাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। দরিদ্র নারায়ণের সেবার এক অপূর্ণ দৃশ্য হইয়াছিল। আশ্রমের সেবায়ৈত শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও আশ্রমের সভাগণের যথাবিহিত সম্মান ও আদর আপ্যায়ন অভ্যাগত জনসাধারণের সকলকেই বিমোহিত করিয়াছিল। হরিবাবুর আদর আপ্যায়ন ও যত্নের কথা এবং বিদেশে বাঙ্গালীর এই মাতৃপূজার কথা বহুদিন আমাদের চিন্তাপটে অঙ্কিত থাকিবে। আশ্রমের উন্নতি আমরা সর্কান্তঃকরণে কামনা করি। এই উৎসব উপলক্ষে হরিবাবুর অর্থ ব্যয় সার্থক হইয়াছে।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টঙ্গের চা
সাহ্য ও উৎসাহপ্রদ বিত্তপূর্ণ পাবীয়

উত্তরায়ণ

প্রশংসা-মুখরিত

ওয়

সপ্তাহে

বর্ষ-শেষের

অবিস্মরণীয়

নিবেদন—

খনা



মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নবতম চিত্র-কথা

= অভিসারিকা =

অশ্রু-জলের স্মৃতি-তর্পণ

শ্রেষ্ঠাংশে : অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়

হাস্য-রসের অনাবিল প্রবাহ !

শ্রেষ্ঠাংশে : ধীরেন গাঙ্গুলী ও সাবিত্রী

*

*

*

*

আনন্দবাজার :—“অহীন্দ্র চৌধুরী বরাহের ভূমিকায় অপূর্ণ অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। সমগ্র ছবি-খানিকে রূপে, রসে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন নায়িকা খনার ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়।”

Advance :—“The story has been well developed and beautifully presented against the well conceived spectacular scenes which give it an authentic atmosphere.”

বেঙ্গলী :—“কালোপষাণী দৃশ্যপট, সাজপোষাক এবং আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে, নানারূপরসের সংঘাতে, ছবিখানি উপভোগ্য হয়েছে।”

Dipali :—“The story has been very neatly told on the screen and the climaxes of the picture have been ably handled.”

বাঙলা :—“অনেক প্রতিষ্ঠানের অনেক ছবির চেয়ে দর্শনোপভোগ্য হইয়াছে এবং প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করিতেছে।”

দীপালী :—“আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলার দর্শকবৃন্দ ‘খনা’ দেখিয়া সন্তোষলাভ করিবেন।”

ভয়দূত :—“মেট্রোপলিটানের শিরীষক সিনেমার শিল্প-সজ্জারূপে ঢালাই করিয়া ইহাকে স্বন্দরভর করিয়া তুলিয়াছেন।”

সচিত্র শিল্প :—“বরাহের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ও হয়েছে তেমনি কিংবা ততোধিক উল্লেখ যোগ্য। শেষ কয়টি দৃশ্যে তিনি অপূর্ণ অভিনয় করেছেন।”

Hindusthan Standard :—“Khana would not fail to draw good houses at Uttara for some time to come for its brilliant settings and well-decorated exteriors.”

বাস্তবান :—“নিছক আমোদ প্রমোদ হিসাবে ছবি-খানি আমাদের সত্যই আশাতীত খুসী করতে পেরেছে। রসসৃষ্টির দিক থেকে খনার কাহিনীটি বেশ সার্থক হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করবার প্রচুর উপকরণ এর মধ্যে আছে এবং এই কারণেই এর সাফল্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।”

Varieties :—“Good acting and soothing music would draw the crowd. Most of the songs have been soothingly tuned up.”



ছায়া-চিত্রের সম্পাদক ও সমালোচক

ঐতিহ্যবাহু বসন্ত্যাপাধ্যায় (কালী ক্রিস্)

হালো!

এই যে কি খবর?

আর খবর? আপনাদের নিয়ে বিশেষ বিপদে পড়েছি। কাল আপনাদের যে ছবি মুক্তিলাভ করেছে, সে ছবির সমালোচনা লিখতে হবে, কি যে লিখব ভেবেই পাই না।

কেন? আপনার কেমন লাগলো?

সত্যি কথা বলতে কি, আমার মোটেই ভাল লাগেনি। দেশী ছবি খারাপ, একথা লিখতে আমার ইচ্ছা করে না, কিন্তু বাধ্য হয়ে লিখতে হয়। কি করবো বলুন, যখন সমালোচক হয়েছি, তখন সত্য কথাই লিখব।

হ্যাঁ; সত্য কথাই লেখা উচিত। অপ্রিয় সত্যও লিখবেন, তাতে আমাদের উপকার হবে, কিন্তু সত্যের পোষাক পরিয়ে মিথ্যা কথা লিখবেন না। আজ্ঞা বলুন তো আমাদের ছবি আপনার ভাল লাগেনি কেন?

আপনাদের ছবি শুধু নয়, এ দেশের প্রায় সব ছবিতেই গলদ আছে। কোথাও গলদ, কেন লক্ষ্য কিছুই বুঝতে পারি না। দেখুন তো ও দেশের একখানা ছবি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওদের দেশের চতুর্থ শ্রেণীর ছবির সঙ্গে এদেশের সবচেয়ে একখানা ভাল ছবিরও তুলনা হয় না।

সেই পুরানো কথা। ও দেশের ছবি। আপনারা সমালোচক, আপনারা সব জানা, কিন্তু এ কথাটা বোধহয় আপনারা জানেন না বিদেশী শিল্পীদের চেয়ে এ দেশের শিল্পীদের কম্পিউটার খেলার খবর নয়।

তা' হলে আপনাদের ছবি ভাল হয় না কেন?

আমাদের অবস্থাটা কি রকম জানেন? "চাল নেই তলোয়ার নেই, মিথিরা মর্দার।" এ দেশের ছবি খারাপ, ও দেশের ছবি অপূর্ণ শুধু এ কথাটাই আপনারা জানেন, তাই আপনারা বলেন এ দেশের শিল্পীরা কোন কাজের নয়। তাদের culture নেই, idea নেই।

আপনাদের ছবি তা'হলে খারাপ হয় কেন? এই ছবিখানা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর হ'ল কেন?

এই ছবিখানা তৃতীয় শ্রেণীর হ'লে কেন? সে অনেক কথা—আর জানেন সেই অনেক কথাই এখন বলা উচিত—তা না হলে এ দেশের ছায়া চিত্রের কোন উন্নতি হবে না। প্রথমে, মনে করুন একটা ষ্টুডিও একখানা ছবি তুলবে লাভের জন্য; আর্টের জন্ত নয়। তখন 'producer'এর ভাবতে হবে কোন রকম বই তোলা উচিত। সাধারণ লোকেরা যারা দর্শক তারা কি বই চায়—অথবা বই শেষ হওয়ার সময়ে, ছ'মাস পরে তারা কি বই চাইবে, বই ঠিক করবার পূর্বে প্রযোজকের জানা উচিত, তাবু উচিত, সাধারণের মনোগতভাব। কিন্তু অনেক প্রোডিউসার তা ভাবে না। কেননা এ কাজের জন্য লোক চাই, ভাল লেখক চাই, কিন্তু প্রোডিউসার মনে করেন তাদের দাবী অনেক বেশী।...

বই হোক, কোন মিথ্যা বা অখ্যাত লেখকের বই ঠিক হ'লো। চিত্রনাট্য লেখার সময় পরিস্ফুট প্রযোজকের মুখের

দিকে চেয়ে দেখেন। কারণ প্রযোজক প্রায়ই বলেন "ও দৃশ্যটা কেটে দাও, বেশী দূর লোকেশন রে'খ না"। এই রকম ভাবে চিত্রনাট্য লেখা হল। এখন অভিনেতা অভিনেত্রী চাই। অনেক ষ্টুডিওতেই মাইনে করা অভিনেতা থাকে না। অভিনেতাদের সঙ্গে চুক্তি হলো তারা দিনের বেলা কাজ করবে, রাত্রে পারবে না, কারণ রাত্রে তাদের বিয়েটার। তার উপর আবার অন্য ষ্টুডিওতে যে দিন কাজ থাকবে সে দিন আর কাজ করতে পারবে না—আরও কত কী।

সে সব জানি কিন্তু আপনারা, যারা টেকনিশিয়ান আছেন তাদের কাজ ভাল হয় না কেন?

টেকনিশিয়ানদের কথা যদি বলেন তা হলে যারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁদের সেই সেই বিভাগের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। আমি, আমার কাজের কথা—অর্থাৎ চিত্র-সম্পাদনার কথা বলতে পারি। আমাদের দেশে ছবি শেষ না হ'তেই ছবির মালিক যখন ছবির মুক্তির দিন ধার্য করেন তখনও চার পাঁচটা দৃশ্য বাকী। তার মধ্যে আবার হয়তো দু'টি বহির্দৃশ্য আছে। আপনারা তো জানেন আমাদের বহির্দৃশ্য

পৌরাণিকত্বের প্রযোজনা করে রাধা কিংবা বাংলার চলচ্চিত্র জগতে আজ যে খ্যাতি অর্জন করেছে—জনম-দুঃখিনী জানকী এবং শ্রীরামচন্দ্রের যৌবনের সৌধা-বীর্ঘা-ভরা প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে চিত্রিত এই

জনক

সুধা

সে গৌরব শতাব্দী বসন্ত্যাপাধ্যায়

ছবি তুলতে গিয়ে কি কষ্ট হয়। লোকেশনে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছি—কখন রোদ উঠবে তবে শট নেওয়া হবে। হয়তো দু'তিন দিন রোদের একটুও রেখা নাই। কাজ বন্ধ। যদি বা একটু রোদ উঠলো, মালিক বলে উঠলেন “এই রোদ উঠেছে, চট্.পট্. শটটা নিয়ে নাও”। পরিচালক চকুলজ্জার খাতিরে শটটি নিয়ে নিলেন, কিন্তু ফল যে কা হ'ল তা সহজেই অজ্ঞেয়।

তারপর পরিস্ফুটনাগার থেকে developে হয়ে সেই ছবি Editor এর কাছে এলো। Editor তখন থেকে রাতদিন কাজ করতে লাগলো, কারণ তার Editing finish হলে আবার Laboratoryতে যাবে। সেখানে গিয়ে তার final print হবে। কাজে কাজেই দুদিনের মধ্যে Editor এর Editing finish করতে হবে তা না হলে Laboratory incharge সময় মত ছবি finish করে দিতে পারবেনা; সে আবার সেই সঙ্গে Editorকে তাগাদা দিতে লাগলো। কাজে কাজেই Editor আর Edit করবার সময় পেলে না, কেটে কেটে জুড়ে দিল। Editorকে তখন যদি Edit করতে হয় তাহলে অন্ততঃ তাকে ৭ দিন সময় দিতে হবে। কারণ তাকে সমস্ত ছবি scene এর পর scene join করে project করে দেখে নিতে হবে। কোথাও Monotony হয়েছে কিনা, Scene এর পর Scene এর Link আছে কিনা continuity আছে কিনা, গল্পের climax কে আরও ভালভাবে নিতে গেলে কি কি Shot এবং কোন কোন Artist এর Shot নিতে হবে। বা কোন কোন Scene কাটতে হবে। তাইপর final edit করে Laboratoryতে Reel by Reel দিয়ে দিতে হবে।

যখন Editor সময় পেলনা, তখন বা মেওয়া হয়েছে তাই দেওয়া ছাড়া তার আর অন্য উপায় নেই, তাই কেটে কেটে জুড়ে Reel by Reel করে Laboratoryতে দিয়ে দিল। Laboratory incharge মাত্র ১ দিন সময় পেলো—সে একদিনের মধ্যে Light number দিয়ে print করবে না। Developে করবে? সে তখন তাড়াতাড়ি যা হয় করে ছবি finish করে দিল। তারপর বুঝতে পাচ্ছেন তো কি করে সে ছবি ভাল হবে। সে ছবি যখন দেখবেন তখন অপরকে কিছু বলবেন না—বলবেন ওটা department কে—সে Camera, Editing ও Laboratory. Editor এর হয়তো তখনও রেহাই নাই—সে তখন House-এ কাঁচী হাতে করে বসে আছে, ছবি যেখানে মনে হচ্ছে একটু খারাপ লাগছে—Audience হৈ হৈ কছে, তখনই Editor সে যাগগায় কাঁচি চালাচ্ছে। তাতে Link থাকুক বা না থাকুক, কারণ এর আগে সে সমস্ত ছবি দেখবার সৌভাগ্য পায় নাই, কাজে কাজেই Houseএ বসে প্রথম দুদিন সে এই রকম ভাবে ছবি কাটলো।

তারপর পরের copyতে সে final edit করলো এবং Laboratory incharge তখন তাকে ভাল ভাবে print করলো। তা হ'লে দেখা যায় যে ‘releasing copy’ হচ্ছে rough copy এবং সেই copyটাই সকলে দেখে গেল এবং আমরা আপনাদের কাছ থেকে খেজুর গালাগালি—companyর হ'লো বদনাম।

এতো গেল তাড়াতাড়ির জন্ত। আরও অনেক difficulty আছে যাতে আমাদের কোন হাত নাই। প্রথমটী পরসা, ২য়টী হচ্ছে কার্যোপযোগী জিনিষ পত্র। এইজন্য আমাদের ভাল ছবি তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নাই।

আর একটা কথা মনে রাখবেন—আমাদের একটি department'র কাজ বহি খারাপ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক department তার জন্ত “suffer” করবে, কারণ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ আছে।

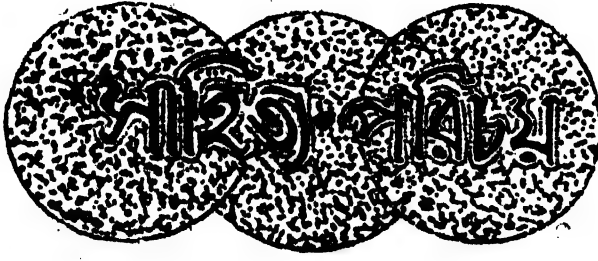
আজ্ঞা তা হলে আজ-আমি সন্নি, কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।

ডোঙ্গার বাল্যমুখ

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিশ্র ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশুদিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ডাক্তার ও
পাঠশালা
আমরা!



অভিধান—শ্রীলীলাময় দে বিরচিত
এবং ২০৪ কণ্ঠওয়ালিশ টি হাতে
প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

অভিধান কবিতার বই। আজকাল
কবিতার বই (আধুনিক প্রকাশিত) পড়তে
‘ভয় হয়।’ বড়বড় মতবাদ আর ছুঁকোঁধ্যতা
হোয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতার বিশেষত্ব।
কবিতার যে শিল্পকলা, শাস্ত্র সমাহিত
প্রবাহের ধারায় বহে চলে সেটা আজ-
কালকার আধুনিকতার মোহে গেছে মুছে।
‘বড় বড় কথা আর অদ্ভুত অবচেতন মনের
কণিক ভাবানুভূতি নিয়ে নাকি গড়ে উঠছে
আধুনিক কবিতা আর সেই রকম আধুনিক
বাংলা কবিতা নাকি বিশ্বসাহিত্যে হবে
বাংলার এক নতুন দান।’

সে বাই হোক; কবি লীলাময়ের
অভিধান পড়তে বসে আধুনিকতার কোন
রকম প্যাচ খুঁজে পাই নি। অর্থাৎ শাস্ত্রিক
আর ছুঁকোঁধ্য হোয়ে কবি নিজেস্ব
আধুনিক বলে আহ্বির করবার চেষ্টা করেন
নি। তিনি পুরাতন পন্থী। তাঁর কবিতার
প্রকাশভঙ্গী হোচ্ছে মোটের ওপর রাবৈন্দ্রিক।
মোটের ওপর বললুম এই ভুলে যে,
রবীন্দ্রোদ্ভূত কোন কোন কবিরও প্রভাব
তাঁর কবিতায় এসে পড়েছে। এক কথায়
বলা যায় ‘অভিধান’ের প্রকাশভঙ্গী কোন
কোন সুপ্রতিষ্ঠিত কবির প্রকাশ ভঙ্গীর
রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে, কোথাও বা
না করতে পারায় কবিতা পছন্দ হোয়ে

পড়েছে। তা ছাড়া, হৃদয়ের দুর্বলতা,
ভাবার ওপর বেদখল থাকতে মনে হয়
কবির সাধনা বড় অল্প; আরো কিছুদিন
কবিতাগুলি খাতার পাতাতে থাকাই
ছিল ভাল। এমন সুন্দর কাগজে, এমন
সুন্দর ভাবে ছেপে, বাঁধাই করে এদের
বাইরে টেনে না আনলেই ভালো হোত।

তবে এটা ঠিক, কবির যে কবি-হৃদয়
আর কবিতা শক্তি আছে তা অস্বীকার
করা যায় না, যখনই মাঝে মাঝে এমন
লাইনগুলি পাই—

ওগো জীবনের সই

চল ধীরে অতি ধীরে—

নিতি রঙা ফুল ফুটিছে মনের কুঞ্জবনে
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে প্রেম অলি মধু গুঞ্জরণে
রূপ রস মোহ প্রলোভন দিয়ে রাখো রাখো
তারে ঘিরে।

অথবা,
পরশে খসিবে শত শত কণা ব্যর্থতার
ওষ্ঠে জলিবে বিবচুসন রিক্ততার।

এই রকম ভাবের যে লাইনগুলি,
‘ওগো জীবনের সই’, ‘ওগো সন্ধ্যা ওগো
সন্ধ্যা’, ‘আমার প্রেম তোমার প্রেম’,
‘হে মোর তাপসী প্রিয়া’, ‘আমার কবিতা’,
প্রভৃতি কবিতায় ছড়ানো রয়েছে, তাতে
মনে হয় কবির ভেতরে দরদ আছে,
সাধনা থাকলে কবি একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত
হবেন নিশ্চয়ই।

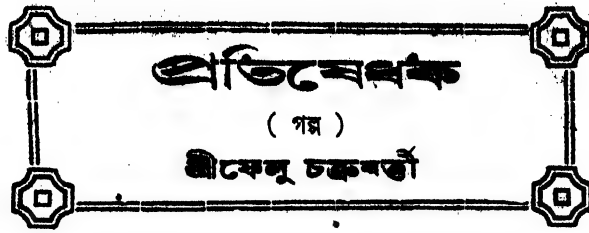
শেষ কালে একটা কথা আবার বলছি,
ছাপা ও বাঁধানো সুন্দর। তবে বোধহয়
প্রফ দেখার দোখেই অনেক মারাত্মক ভুল
রয়ে গেছে, সেগুলো না থাকলেই
সুখী হতুম।

শ্রীস খ।

আর্যুনিখ ৩
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
মডার্ন ইলেক্ট্রিক
স্টুডিও
৩২-সি
৪৫৩না ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন-
কলি:
৬৪০৬

N. I. P.



(গত সংখ্যার পর থেকে)

টাকা জোগাড় করবই করব। সুতরাং আমি চাই আজ হতে তোমার চিন্তা হবে কেবল ঐ টাকা সংগ্রহ করবার উপায় উদ্ভাবন।—

“আমি কি করে এত টাকা সংগ্রহ করতে পারি, হেমন?”

“তুমি পার না, তুমি একজন ধনোলোকের পুত্র, তুমি পার না।” হেমন তারপর একখানা কাগজে লেখা একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার হাতে দিয়ে, চোখছুটা তার দিকেই তাক করে রাখে তার মন্তব্য শোনবার আকাঙ্ক্ষায়।

লেখাটা পড়ে মণি টেবিলটা চাপড়ে বলে ওঠে বাঃ, চমৎকার, সুন্দর, প্রশংসনীয়। হেমন ভুই যদি কোন ফিল্ম কোম্পানীর ডিরেক্টর হতিস্ তাহলে তাদের আর প্রটের অভাব পড়ত না। এই ঠিক হয়েছে। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাগা তেঁতুল। তারপর হেমন তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে “দেখ, যেন টাকাটা অন্ততঃ শুভদিনের দু তিন দিন আগেই সংগ্রহ হয় কারণ বিনয় বাবুকে আর্থর অনেক কিছু কিনতে হবে, বুঝলে—কিন্তু, খুব সাবধানে—”

“নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তাহলে প্রস্তাবনার এইখানেই শেষ হোক, আমি উঠি।” এক চুমকে চা-টা শেষ করে আশার সমুদ্র অন্তরে ঢেপে ধরে মণি বেড়িয়ে পড়ে সে স্থান থেকে।

নির্ধারিত দিবসে বিবাহোৎসবের নিদর্শন স্বরূপ উভয় গৃহ হতেই নহবতের প্রতীমধুর মিলিত ধ্বনি উথিত হয়ে স্পর্শ ও মণির বিবাহবার্তা ঘোষণা করতে থাকে এবং লঙ্কার অলঙ্কণ পরেই ধনবাবু ও হেমনের কর্তৃত্বাধীনে বর ও বরযাত্রী শোভাযাত্রা করে উপস্থিত হয় কল্যাণকর গৃহ প্রাঙ্গণে। বিনয়বাবু ও তাঁর আত্মীয় বর্গ গলবস্ত্র হয়ে তাদের সংবর্দ্ধনা করে ও যথারীতি ভোজনের ব্যবস্থা করেন। তারপর শুভলগ্নে একটা সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হয়ে যায় এবং বর-কণ্ঠে উভয়েই স্বস্তির নিশ্বাস কেলে হেমনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কক্ষটা বৈবাহিক উপঢৌকনে পরিপূর্ণ ও পণের টাকা একখানি রূপার থালার উপর সজ্জিত দেখে ধনবাবুর মুখে আর হাসি ধরে না এবং আনন্দের আতিশয্যে তিনি মুহূর্হু তামাক সেবন করতে থাকেন এবং হেমনকে ডেকে বলেন “কুটুম্ব বা করে দিয়েছ বাবাজী, খাসা, খাসা, অতি সজ্জন। পরদিন অপরাহ্নে বর ও বরপক্ষ কণেকে সজ্জা করে নিজের বাড়ী প্রত্যাগমন করে।

তারপর দিন পনের পরের কথা। সে দিন রবিবার। সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখা যায় এবং অলঙ্কণ পরেই মূলধারায় বৃষ্টি নেমে সকলকেই বাধ্য করে কাড়িতে আটক থাকতে। বধ্যাহ্নে বৃষ্টি বেড়ে যায় বটে কিন্তু বয়ুর প্রোক্ত পরীক্ষার উপর বেন কশাঘাত করতে পারেন।

বিবাহের পরচণ্ডার বিশিষ্ট বস্ত্রী টাকার ব্যাঙ্কে জমা দেবার মানসে রাখার দায়িত্ব শেষ হবার পর ধনবাবু পুত্রের বিবাহের হিসাব নিকাশ করতে বলেন কিন্তু পক্ষ-কনেই বজ্রাঘাতের মত চীৎকার করে ওঠেন। তাঁর চীৎকারে চারিদিক থেকে লোক জমায়েত হয় এবং সকলেই ব্যাপারটা জানবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ে। তিনি তখন হস্ত দস্তের মত একবার লোহার সিঁদুক, একবার ক্যাস বাক্স, একবার হিসাবের খাতা হাতড়াতে থাকেন। সঠিক খবরটা না বুঝতে পেরে তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করে “কি হয়েছে ধনবাবু, আপনি অমন করছেন কেন।” কম্পিত স্বরে ধনবাবু চীৎকার করে বলেন “সর্বনাশ হয়েছে, আমার বুকে ছুরি মেরেছে যে বাবা, বুকে ছুরি মেরেছে। নিশ্চয়ই এটা সেই অনাথ বেটার কাজ, বেটা সেদিন আমাকে শালিয়ে গিরেছিল বেশ একটু জানিয়ে দেবে। ওঃ, আমার উদ্ভম মধ্যম জানিয়ে দিলে। ২৮০০ টাকা তহবিল থেকে ছুরি, এর চেয়ে সত্যিই সে যদি আমার বুকে ছুরি মেরে দিত, আমি যন্ত্রণা থেকে নিশ্চিন্ত হতাম। আচ্ছা, আমিও অল্পে ছাড়ছি না, বেটাকে জেল দিয়ে তবে জলগ্রহণ করব। এই, মণিকে ডেকে আন আর থানা থেকে দারোগা বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়।” হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি মাথার হাত দিয়ে থপ করে বসে পড়েন এবং তাঁর পাশে বসে সমবেত পাড়ার লোকগুলি অলস অধিকৃত দৃতাহতি দেওয়ার মত তাঁকে উদ্বেজিত করতে থাকে। এই অনাথটা তাঁর একজন ভাড়াটে। এর বিরুদ্ধে তিনি দড় ভাড়া, মোকদ্দমার খরচা ও উচ্ছেদ বাবত সর্ব-সমেত ১১৫ টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হন। অনাথ নাকি তাঁর মতায় অনুপেক্ষ সজ্জা নিরসিতভাবে ভাড়া দিতে অসমর্থ হয়।

ধনপ্রিয়বাবু ডিক্রীর টাকা আদায় করে তাকে উচ্ছেদ করার অভিপ্রায়ে ডিক্রী জারী করে তার তৈজস পত্র ফ্রোক করে তে অভিলাষী হয়েন। উপায়ন্তর না দেখে অনাথ একদিন ধনবাবুর কাছে এসে তার হৃৎকের আরজী পেশ করে, কিন্তু ধনবাবুর পাষণ হৃদয়ের মধ্যে একটি আঁচর পর্যন্ত কাটতে সমর্থ হয় না। তার এই কাহিনী কিন্তু মণির কোমল অন্তর অনায়াসেই আকৃষ্ট করে এবং দয়াপরবশ হয়ে সে পিতাকে অমরোধ করে বলে “বাবা, ওর এই বিপদের সময় ওকে উচ্ছেদ করে পথে বসান যুক্তিসঙ্গত হবে না বাবা, ওর মরনোন্মুখ মাকে নিয়ে ও কোথায় যাবে। আমি বলি, ওর মা ভাল হবার পর যা হয় কোরো।” ধনবাবুর অন্তকরণ কিন্তু এত ক্ষমতাবিশিষ্ট। নিশ্চয় যে একটা অবজ্ঞা সূচক মুখভঙ্গীর দ্বারা অনায়াসেই তিনি পুত্রের এই কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতে বিধাবোধ করেন না। অনাথ কিন্তু এই প্রাণহীন বুদ্ধের বাক্য-যজ্ঞণা সহ করতে না পেরে তাকে শাসিয়ে যায় “যদি আপনি আমার মরনোন্মুখ মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেন, তাহলে স্থির জানবেন ধনবাবু, আপনাকেও আমি অগ্নে ছাড়ছি না, বেশ একটু জানিয়ে দোব”—বলা বাহুল্য ভীষণ স্বভাব ধনপ্রিয় বাবু অনাথের এই ভীতি প্রদর্শক উক্তি উত্তোলিত খড়্গের জায় গণ্য করেন এবং উহা তাঁর মনের মধ্যে একমাত্র চিন্তা হয়ে জাগরক থাকে। তারপর এই চুরি, স্ত্রীর তাঁর পক্ষে অনাথকে সন্দেহ করা বাতাবিক বলা চলতে পারে। তাই দারোগা বাবু আসবার পর তিনি অনাথকেই এই চুরির সঙ্গে জড়িত করেন। তাঁকে সমর্থন করে একজন প্রতিবাসী বলে “হ্যাঁ, আমি তাকে সে দিন রাত্রে ১০টা

আন্ধারের সময় মুখে একখানা কাপড় ঢাকা দিয়ে এই বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি।” আর একজন বলে “দেখছেন না তার পর থেকেই তার পোষাক পরিচ্ছদের বহরটা কিরূপ বেড়ে গেছে?” ধনবাবুর কথার উপর নির্ভর করে ও সাক্ষীদের কথা শুনে দারোগা বাবু যখন তাঁর সহকারীকে নিযুক্ত করেন অনাথকে গ্রেপ্তারের জন্ত অনাথ তখন তার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের জন্ত শ্রমশানে। দারোগা বাবু উপায়ন্তর না দেখে পরদিন প্রাতে তাকে ধনবাবুর বাড়ীতে নিয়ে আসেন। অনাথের শত উক্তি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং সে কিছুতেই তাদের বুঝাতে পারে না যে সে এই চুরির কিছুই জানে না।

৪

নাটকের এই শেষ অঙ্ক ধনপ্রিয় বাবুর গৃহ প্রাঙ্গণে অভিনীত হওয়ার সংবাদ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অবশেষে ইহা হেমেনের কর্ণকূহরে প্রবেশ করে এবং সে তখনই বেড়িয়ে পড়ে মণিকে খুঁজে বার করার উদ্দেশ্যে। মণি তখন তার নব পরিনীতা বধু ও তার সঙ্গিনীদের নিয়ে বিনয়বাপুর দ্বিতল কক্ষে হর্ষোচ্ছ্বাসে নিমগ্ন। “হেমেনের চঠাং তথায় গমন কিন্তু তার ক্রমিকতা ভঙ্গ করে দেয় এবং হেমেনকে ওরূপ অবস্থায় দেখে মণি একটু বিস্মিত হয়ে পড়ে এবং উদ্বিগ্ন চিন্তে নীচের তলায় নেমে এসে জিজ্ঞাসা করে “কি খবর হেমেন

তুমি হাঁপাচ্ছ কেন? কি হয়েছে, তোমার কি কোন অমুখ হয়েছে।” আশে পাশে লোক থাকায়, হেমেন মণিকে একটু অন্তরালে ডেকে ব্যাপারটা খুলে বলে এবং তখনই তার সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে অমরোধ করে। অবিলম্বে ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি তাদের জানিয়ে বেড়িয়ে পড়ে মণি হেমেনের সঙ্গে একখানা ট্যান্সি ডেকে। সদর দরজায় প্রবেশ করনামাত্র অনাথ হাট হাট করে কান্দতে কান্দতে মণির পা ছুটো জড়িয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে “মনিদা, আমি গরীব, পথের ভিখারী ঝললঙ হয়, কিন্তু আমি চোর নহি। সেই যে সেদিন আপনার সম্মুখে ঠেকে ছ একটা কথা বলেছিলাম, তার ফলে আজ উনি আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এই চুরির সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু মনিদা, আমি আমার স্বগীয়া মায়ের নামে শপথ করে বলছি আমি এ চুরির সম্বন্ধে কিছুই জানি না”—

অনাথের কাতরোক্তিতে মণির নয়ন দুটা অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে এবং তার হাত দুটো ধরে তাকে তুলে নিয়ে সে বলে “আমি তা জানি, অনাথ। দারোগা বাবু! ও নির্দোষ, ওকে ছেড়ে দিন।” তারপর তার পিতার দিকে ফিরে সে পুনরায় বলে “বাবা! ক্ষমা করবেন, এ চুরি আমিই করেছি। আমাকে শাস্তি দিন। গভীর রাত্রে যখন আপুনি অঘোরে ঘুমছিলেন তখন আমি আপনার বালিশের তলা থেকে

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতাবন্দ দোকান

১০৬এ, আন্ততোর বুখারী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান কলকাতা



অসুস্থ
শরীর



দুগ্ধ ও পবন

করিতে



সিরোলিন

'রাচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সর্দি কাশি এবং যক্ষ্মার
প্রথম অবস্থায় প্রেপ্ত ঔষধ।



সোহার লিন্ডকের চাবি নিয়ে ২৮০০০ টাকা চুরি করি, কারণ চুরি না করা তিন্ন অল্প উপায় আমার ছিল না”—মণির এই উক্তি শুনে সকলেই ধারণা করে অনাথকে ধাচাবার উদ্দেশ্য নিয়েই মণি নিজের কক্ষে চুরির অপরাধ চাপাচ্ছে এবং কেহই তাহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু মণি যখন সমস্ত ঘটনার সঙ্গে কল্পাদায়গ্রন্থ বিনয় বাবুর কাতর প্রার্থনার কথা জানায় বাহা রক্ষা করতে গিয়ে তাকে এই চুরি করতে হয়, তখন সকলে অবাক হয়ে যায়। সে বলে “আমার বাবা এ বিবাহে সম্মতি দেন এবং সেই সঙ্গে ২৮০০০ টাকা পণ স্বরূপ দাবী করেন। কিন্তু আমি এই সামাজিক অজ্ঞারটাকে আন্তরিক ঘৃণা করি। এবং যখন দেখি যে ঐ টাকাটাই একমাত্র এ বিবাহের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সমস্ত কোন দিক থেকে টাকা পাবার কোন আশা নেই তখন আমি ঐ টাকা চুরি করে উকেই দিয়েছি। দারোগাবাবু আমি এর জন্য জেলে যেতে প্রস্তুত, বাঁধুন।” বলিয়া হাত ছুটো বাড়িয়ে দেয়।

অনাথকে ছেড়ে দিয়ে যখন দারোগা বাবু মণির হাতে হাতকড়া লাগাতে যায়, তখন ধনবাবুর মনে হয় যেন সমস্ত পৃথিবীটা তার দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং

কাপতে কাপতে তিনি বাধা দিয়ে বলেন “না, না, না, দারোগা বাবু, তা হতে পারে না। আমি আমার আঁধার ঘরের মাণিককে জেলে দিতে পারি না। আমারই দোষ, দারোগাবাবু, আমি তখন বুঝতে পারি নি যে অর্থ পিপাসাই সমস্ত অনর্থের মূল। ওই আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। ওর নিজের টাকা ও বা ইচ্ছে তাই করতে পারে। দারোগাবাবু আমি এ মোকদ্দমা চালাতে চাই না।”

ব্যাপারটা বেশ ভাল ভাবে উপলব্ধি করে দারোগা বাবু মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন “ধনবাবু, আপনার লেজে পা পড়েছে বলেই আজ ওই অভাগা অনাথটা বেঁচে গেল, তা না হ’লে ওর অবস্থা কি হ’ত বুঝতে পারছেন কি? তবে আপনার ছেলের প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না—চমৎকার প্রতিবেশকের ব্যবস্থা করেছিলো—এটাতে অনেকেরই চোখ ফুটিয়ে দেবে—বিশেষ করে আপনার মত যারা পণের টাকা পাবার জন্য অন্ধ হয়ে থাকে। প্রকৃত ভালবাসা ঠেকিয়ে রাখা মানুষের সাধ্যাতীত—সেটা আপনার জানা উচিত ছিল”—

“আজ্ঞে হ্যাঁ, দারোগা বাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রকৃত ভালবাসা একটা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ—তার স্থান সর্বোচ্চে।

সমাধি বীণা দেবী

বহু আমার

একই সাথে জেগেছিলাম কুজনে
প্রথম উষার উদয় তখন

প্রভাত পাখীর কুজনে,

বইল প্রথম ভোরের হাওয়া

শিউলি ফুলের গন্ধ ছাওয়া

ভাসিয়েছিলাম জীবনখানি

নবীন আশার উজানে।

এখন যেগো ঘনিয়ে আসে

দিনের শেষ লগ্ন

জানিনা কোন স্বপন ধ্যানে

হলে তুমি মগ্ন

‘একলা’ আমি বসে কাঁদি

সামনে নামে গভীর আঁধি

‘নাইক আলো নাইক আশা

ব্যথায় হৃদি ভগ্ন।

—:~:—

তাকে শত বাধা দিয়েও আটকান যায় না। তার ফল আমি হাতে হাতে পেলাম। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে অযথা হাররাণ করার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন—”

পিতা পুত্রের আলিঙ্গনের সঙ্গে ব্যাপারটা সেইখানেই নিষ্পত্তি করে দিয়ে দারোগা বাবু ও আর আর সকলে হাসতে হাসতে সে স্থান থেকে প্রস্থান করে।

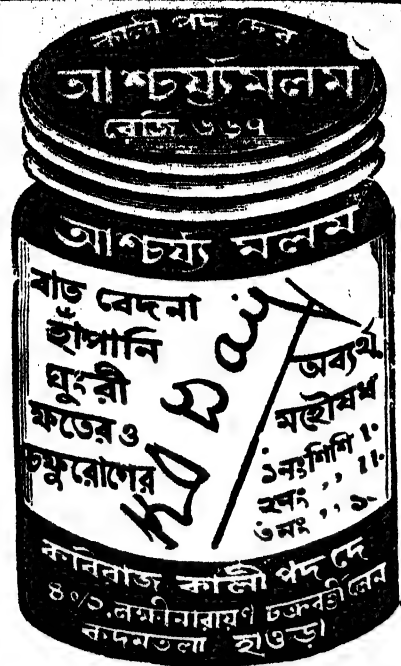
—:~:—

সংস্কৃত ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের
তেল ব্যবহারে
বেবি বেবি হয় না

মিল-১৪৩, আপনার সারকলার রোড - কলিকাতা।

বড়বাজার



রেঃ ৬৬৭ “আশ্চর্য মলম”

জ্ঞান করে দিলেছে জগতের
সকল আবিষ্কার

আশ্চর্য মলম ব্যবহারে পাবেন অসীম শান্তি,
অফুগন্ত তৃপ্তি ও প্রচুর আনন্দ।

গৃহে রাখুন এই আশ্চর্য মলম—

পাবেন আশ্চর্য ফল,

ইঠাৎ ব্যাধির আক্রমণে হবেন আশু উপশম।

সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়

আশ্চর্য কামোদক চূর্ণ (রেজিষ্টার্ড)

ভগবানের সৃষ্ট কাম বা পুরুষ মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার জগতের লোকে ইহা ছাড়া সংসদে
বাচিতে পারে না, তাই মনোবীণা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ভিতর এই কামশাস্ত্রেরও সমালোচনা করিয়াছেন। ধুন,
ঐশ্বর্য, খ্যাতি প্রতিপত্তি অপেক্ষা মানুষ কামের বেশী বশীভূত। বাহার কামের উদ্দেশ্য হয় না তিনি
পুরুষত্বহীন এবং জীবনধারণ; অপেক্ষা মরণ তিনি শ্রেয় মনে করেন। আয়ুর্বেদের মধ্যে কামশক্তি বৃদ্ধি ও
ধারণ করিবার বহুবিধ বাজীকরণ ঔষধ আছে। সেই সকল ঔষধের সার দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করিয়া আমি
‘কামোদক চূর্ণ’ নামক একটি শক্তিশালী চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছি; যদ্বারা পুরুষ শক্তি স্থায়ী রাখিয়া মানুষ বহবার
জীর্ণমন করিলেও স্বাস্থ্যের হানি হয় না। আমার সহৃদয় ৬৬৭নং আশ্চর্য-মলমের গ্রাহকগণ এই চূর্ণের অতুলনীয়
শক্তি দেখিয়া পরম পরিতোষ পাত করিবেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহাতে অধিক শুক্রকর্ম,
শুকতারলা, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য বা প্রস্রাবের সহিত শুক্রকরণ, ইচ্ছাশক্তিহীন প্রভৃতি বহুবিধ ঐন্দ্রিক রোগে আশু
ফলপ্রদ। ইহাতে ধারণাশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি করে। নূতন দাম্পত্য-জীবন যাপন কালীন এই বাজীকরণ ঔষধ
নিয়মিত ব্যবহারে শুক্রের অপচয় ঘটে না। পরীক্ষার জন্য আট দিনের ঔষধের মূল্য ৯০ আট আনা ধার্য করিলাম।
একমাস কাল বা ততোধিক ব্যবহারে এই চূর্ণের মূল্য যথাক্রমে ১২, ১৮০ এবং ৩০ মাত্র।

ব্যবহার নিবিঃ—আশ্চর্য মলম পুস্তকে পাইবেন। এই চূর্ণ ব্যবহার কালীন ৭ দিন জীসহবাস একেবারে
নিষেধ। সহৃদয় দেশবাসী ইহার ব্যবহারে সুফল পাইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আশ্চর্য অর নাশক বটিকা

এই বড়ি ম্যালেরিয়া রোগীরপক্ষে টনিকের কার্য করে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সম্পূর্ণ দেশীয় শক্তিশালী গাছ গাছড়ার
সার্যাংশ লইয়া কবিরাজী মতে বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত। অর, পালাঅর, ম্যালেরিয়া, নূতন পুরাতন অর, কল্‌অর, গর্ভবতী স্রীলোকদিগের
অর প্রভৃতির আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই বড়ি অরের উপর খাওয়ার বাইতে পারে, একটা করিয়া বড়ি মুখে দিয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া ফিলাইয়া
বা গিলিয়া খাইতে হইবে—এইরূপ প্রত্যহ তিনটা করিয়া বড়ি খাইতে হইবে। এই বড়ি সহজ অবস্থার সেবনে অরের আক্রমণ হইতে
রক্ষা পাওয়া যায়। মূল্য :—১২ বড়ি প্যাকেট—১০ আনা। ২৫টা—১৮০ ৩ ৫০টা—১৮০ পাইকারী দর অল্প।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সাধারণ—ভীষণ জ্বর হইতেছে

নিবেদক কবিরাজ ডেক. সি. ডেক. চিকিৎসাতন্ত্র (বেঙ্গাল); সার্বভৌমচারী (সি.সি.), এক-এইচ-এস-এল (লন্ডন), কলকাতা, হাওড়া।

আশ্চর্য মলম: কেমিক্যাল ওয়ার্কস—কলকাতা, হাওড়া

আবঃ—কম নং ৫১, ১৯১১ মারফুলার রোড, ষষ্ঠকল্যাণ বাজার, শিরাজিদহ

আত্মসংযম বনাম জেচ্ছাচার

মালবিকা বার

“খেয়ালী”তে ‘কোন পথে’ শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে মনে হল সব বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারছি না— তাই আজ ছ’একটা কথা বলতে চাই।

লেখক একস্থানে লিখেছেন “আত্মসংযমের বুলি আওড়ান সোজা, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে তাকে ‘প্রতিফলিত’ করবার চেষ্টা যৌবনকে শুধু ব্যঙ্গ করা।”

এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সংযম এবং নিবৃত্তি দুটো এক নয়। নিবৃত্তি যে আমাদের Summum bonum of life নয় সেটা আমরা জানি—Rigorism বা ‘যৌনলিপ্সা’ দমন আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তি হতে পারে না। সংযম বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত—এ আমাদের বাসনা লিপ্সার পরিসমাপ্তি কামনা করে না। সংযমের মধ্যে আছে Reasonable পরিতৃপ্তি।

তারপর বহুসন্তান সম্রাট। প্রত্যেক কার্কেই ভাল মন্দ দুটো দিক যেমন আছে তখন বহু সন্তানের ভালোর দিকটাই বা আমরা কেন অগ্রাহ্য করি? চীন জাপান যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। সমগ্র পৃথিবীতে চীনের মত জনবল কোন জাতির নেই—এই যুদ্ধে জাপানের ও চীনের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়েছে—কতিপয় জাপান কম হয়নি—কারণ তার সংখ্যা চীনের কুলসভার প্রতি মূল। চীন যে অল্প সংখ্যক এখনও বিদ্যমান হয়নি তার বহু কারণের মধ্যে জনবল অন্যতম। তাই বলে সংযম দমনের কলসার জনবল বাড়ানোর জরুরিতে যৌন লিপ্সা দমন নিষিদ্ধই বোধহয়।

গরীবের ঘরে সন্তান বেশী একথা কেউ অস্বীকার করতে সাহস করি না। কিন্তু গরীবের মধ্যে কৃষকশ্রেণীর বহু সন্তান হওয়া বোধহয় তেমন দোষণীয় নয়, তার কারণ—বৈজ্ঞানিক প্রণয় জন্মশাসন তাদের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ এমন কি হয়ত তাঁরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য নয়—প্রত্যেক চাষী যদি বৈজ্ঞানিক প্রণয় পারদর্শী হ’য়ে পড়ে তবে ‘দেশের মাটির’ আদর্শ নিয়ে ভদ্রঘরের কয়জন চাষীর কাজে নামবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ।

মধ্যবিত্তরা বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করুন—তাতে আপত্তি করি না তাঁদের অশান্তির বেশীর ভাগ কারণ বহু সন্তান। A. P. G. P-র যুক্তি অকাট্য।

আমি আত্মসংযমকেই বৈজ্ঞানিক সংযমের চাইতে উচ্চতর স্থান দেই। পুরাণে বিখ্যাত মুনির বারবার ‘অপ্সরা’ দ্বারা

পরীক্ষিত হবার আর কোন অর্থই থাকতে পারে না, আত্মসংযমকে উচ্চতম স্থান দেওয়া ছাড়া।

এই আত্মসংযম শুধু পুরুষের দিক থেকেই দরকার নয়—নারীরও এটা অতি প্রয়োজন। আদিমকাল থেকে দেখে এসেছি নারীই ক’রেছে পুরুষকে প্রলুব্ধ। নারীর প্রলুব্ধ ক’রবার বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে—ফলৈ তারা হয়ে পড়েছে সংযমের অভাবে উচ্ছ্রাল। আত্মসংযমের রক্ষণাবেক্ষণে নিজেদের সমর্পণ না করে যৌবনের মাদকতায় লিপ্ত থেকে দেশের যে সর্বনাশ ডেকে আনছে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষকে সম্পূর্ণ দৌষী ক’রব না—এরজন্ম দায়ী নারীর আত্মমর্যাদা জ্ঞানের অভাবই বেশী।

আত্মসংযম যৌবনকে ব্যঙ্গ করেনা করে সম্মান। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চাই আত্মসংযম—পুরুষ যেন পরস্ত্রী, বহুভগিনি

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!



ব্যবহারসম্বন্ধে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনদের প্রেমোত্তম আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা

পাওয়া যায়। হারিয়ে ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ লোহার তার চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটলগের জন্য চিঠি লিখুন।

বি. দি. ম্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিলিকিট

৩০মং কলেজ ষ্ট্রিট, কলিকাতা (কলেজ ষ্ট্রিট বার্কটের নিকটে)

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্তী

গত পূর্ব সংখ্যায় আমাদের আলোচনা কোন ধারায় চলবে তার একটু আভাসমাত্র দিয়েছি। কোনও কাজে অগ্রসর হতে হলে চাই উদ্ভম, সাহস, সংশ্লিষ্ট ও সংযম। আজ বাঙ্গালীর জীবনে, তথাকথিত বাংলার নারীজীবনে এমন একটা দিন এসে গেছে, যখন সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হয়েছে আমাদের পারিবারিক জীবনে গঠনমূলক কার্য্য করবার উদ্ভম থাকা। এই গঠনমূলক কার্য্য হবে শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে। আমাদের সম্মান সম্মতি, আমাদের আশ্রয়স্থল স্থল ছেলেমেয়েরা সংশ্লিষ্ট মানে যে শিক্ষা তাদের দেশ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, সমাজের ভালমন্দ সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে, সাহিত্যের মূল সম্বন্ধে দৃঢ়তন করে তুলবে সেই শিক্ষা, সেই সংশ্লিষ্ট যাতে পায়, করতে হবে তার বন্দোবস্ত এবং সেই বন্দোবস্ত যেন আমাদেরই হাত দিয়ে হয়।

এই শিক্ষার বন্দোবস্তের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ল। আজ সেই কথাটা নিয়েই আলোচনা করবো। কথাটা হচ্ছে আমাদের মা, বোনদের স্বাস্থ্য প্রভৃতিকে প্রলুব্ধ না করে, আর নারী বেন আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে নিজেদের পুরুষের খেলায় লামগ্রী না করে—। Sadiem এর পক্ষপাতি নারী না করুক এই কামন।—

• কুমুদেন সেন লিখিত 'কোনপথে' প্রবন্ধটির প্রতিবাদ।

সম্বন্ধে। আজকাল যারা প্রবীণ এবং প্রৌঢ় তাঁদের সকলকেই 'আমি দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেছি' 'আধুনিক মেয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে' শুধু প্রবীণ এবং প্রৌঢ় নয়, প্রবোণা এবং প্রৌঢ়ারাও এইরূপ আলোচনা করে থাকেন। তাঁদের এই অভিযোগ আমরা আজকাল বুড়ো কি বুড়ীর ভীমরতি বলে যে হেসে উড়িয়ে দেবো তার কোন উপায় দেখছি না; বরং ধরে ধীরে আমাদের এই অভিযোগ স্বীকার করে নিতে হয় যখন কলকাতা শহরে সাদ্রে পাঁচটার পরও মেয়েদের স্কুলের ছুটির বাসে ক্লাস্ত, অবসাদগ্রস্ত ছাত্রীর দল যেতে দেখতে পাই অথবা মফঃস্বল শহরে বা পল্লীগ্রামে বাড়ীর কর্তারা কারোর জন্তে মেয়ে দেখতে গিয়ে ফিরে এসে সেই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, এই সফ্র হাত—তখন আমাদের কর্তাদের কথায় প্রতিবাদ করবার কোন উপায় থাকে না।

সে কথা যাক। মোটের ওপর এই সত্য কথা মর্মান্তক অর্জ আমরা বাধ্য যে বাংলার মেয়েদের স্বাস্থ্য আজ অবনতির পথে ধাপের পর ধাপ নেমে চলেছে। এখন কথা হচ্ছে এই স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় কি? আর আমাদের স্বাস্থ্য কেন এই অবনতির পথে নেমে এসেছে? প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবার আগে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে গুটিকত কথা বলে নেওয়া যাক। বাংলা তথা পৃথিবীর নৃত্যতা আজ শহরে প্রতিপালিত হচ্ছে। এই বিংশ শতাব্দীর নৃত্যতা পৃথিবীর অজ্ঞাত

দেশে শহরে প্রতিপালিত হোলেও সে সব দেশের খুব বেশী ক্ষতি করতে পারে নি, যতটা ক্ষতি করেছে ভারতবর্ষের তথা বাংলার। কারণ অজ্ঞাত প্রদেশবাসী অপেক্ষা যে ভারতে বাঙ্গালী অধিক পরিমাণে চাকুরীজীবী তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার জগতের ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে মধ্যবিস্ত্র শ্রেণী, চলতি কথায় যাদের গৃহস্থ ভদ্রলোক বলা হয় তারাই বরাবর চাকুরীজীবী হোয়েছে, হচ্ছে ও হবে। জগতের ইতিহাসে ও সভ্যতার নতুন চিন্তার ধারা, নতুন সৃষ্টির বিপ্লব সকল কিছু হোচ্ছে এই মধ্যবিস্ত্র শ্রেণীর দান। এই মধ্যবিস্ত্র শ্রেণীকে যদি জাতির মেরুদণ্ড বলা যায়, তাহোলে কিছু বেশী বাড়িয়ে বলা হবে না। বাংলার এই মধ্যবিস্ত্র শ্রেণী বা মেরুদণ্ড আজকাল শহরবাসী ও চাকুরীজীবী হোয়ে গেছে। কেন হোয়েছে একথা আর একদিন আলোচনা করা যাবে। আজ শুধু দেখতে পাই এরা শহরবাসী হোয়ে এদের গেরস্থালী শহরে তুলে এনেছে। তারপরে শহরের বিলাসিতায় পড়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য কেন যে অবনতির পথে নেমে এসেছে ও দিনে দিনে আরও আসছে, মাত্র একটুকু কথায় তা বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

মাছকের শরীর একটা যন্ত্র। এই যন্ত্র ততক্ষণ ঠিক ভাবে কাজ দেবে, যতক্ষণ

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের চা

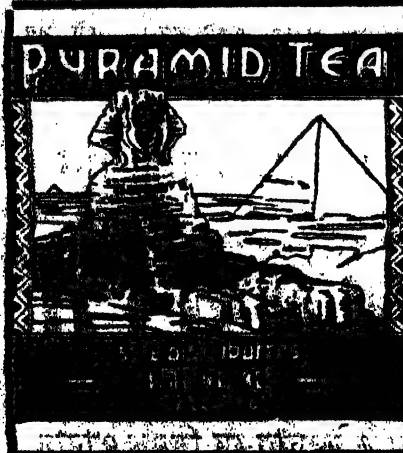
স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিকৃত পানীয়

একে যদি মত দেওয়া হবে দম আর ডেল। আমাদেরও প্রয়োজন হচ্ছে বহু ঠিক রাখতে শারীরিক পরিশ্রম। এই পরিশ্রম যে সাধারণ মেয়ে বা বোঁ যিয়ে কতটুকুন করেন তা এখানেই প্রমাণ হোয়ে বাবে উপস্থিত কথায়। পাড়ারগায়ে দেখতে পাওয়া যায় বোঁ যিয়েরা পুকুরে নেমে গিয়ে অস্ত্রতঃ বার তেরটা সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে জল নিয়ে উঠে। আর এটা যে একটা ব্যায়াম বিশেষ তা জল আনবার সময় মর্নে না পড়লেও কার্যতঃ শরীর চর্চায় গিয়ে পড়ে। এই জল আনাটা সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ছোট মেয়ে থেকে আরম্ভ করে বয়স্কা মেয়ে, সকলকেই করতে হয়। কিন্তু সহরে, বিশেষ করে যেখানে জলের কল আছে, সেই সব বায়গার কলডলা থেকে রান্নাঘরে জল তুলে আনে সাধারণত যি চাকর না হয় বাড়ীর গিন্নী, গৃহস্থালী সঙ্কে বার গরজ বেশী। মেয়েরা সেই সময় বসে বসে সচিব মাসিক বা সাপ্তাহিক নিদেনপক্ষে কুলের পড়া করে। কাজেই পরে দেখতে পাওয়া যায় একমুঠো আন্দা ভাতের বেশী ভাত হইলেই মেয়েদের মার উপরে রাগ বেড়ে যায়। এইতো সহরের মেয়েদের অবস্থা। এরা দিব্য জাতিকে

সাহস, শক্তি ও প্রেরণা। এরা হবে বীরপ্রসূতা।

এই কথাগুলো বলবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে কেন বলছি বলে যদি প্রশ্ন করেন, তবে আমার উত্তর হচ্ছে এই যে মেয়েদের আজ একান্ত দরকার হচ্ছে ব্যায়াম করার। অনেকের কথাটা ভালো লাগলো না; মেয়েদের আবার পুরুষদের মত হাত 'পা' ছোড়াছুড়ির দরকার কি? কিন্তু দরকার যে ক্রমশঃ হোয়ে পড়ছে তা আমার মা বোনেরদের চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। একটা দিন গেছে যে দিন কারোর কাছে মানে সাধারণের কাছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ভালো বলে বোধ হয়নি। আজ আবার আর একটা দিন এসেছে যখন মেয়েদের ব্যায়াম হোয়ে পড়েছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ যা অনেকের কাছেই ভালো লাগবে না। এই ব্যায়াম পদ্ধতি কি রকম হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে পারি যে মাসিক বস্তুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে ব্যায়াম পদ্ধতি (মেয়েদের সঙ্কে) বা বেরুচ্ছে তা অথবা নৃপেন্দ্রকুমার বস্তু "বোবনের বাতুপুত্রী"র ব্যায়ামপ্রণালী সহজেই অনুকরণীয়।

এইবার আমাদের প্রথম প্রশ্নে কিং আসা বাক। কথাটা হচ্ছে বায়রকা উপায় কি? উত্তর এইখানে আয়া হাতে যেটুকুন সময় ও স্থান আছে তা মধ্যে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবুও মোটা মুটি কথায় আমি কিছুমাত্র আভাস দিবে থাকি। এই মতটা যেটা আমি এইখানে দেব সেটা আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত মত তবে আপনাদের মতও জানাবেন। এখ উপযুক্ত মনে হোলে তা নিয়েও আমার ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করব ইয়া, বলছিলাম সাধারণ গুটিকতক নিয়ম পালন করলেই বোধহয় আমাদের স্বাস্থ্য অবনতির পথে ধাপের পর ধাপ থেকে নামবার হাত থেকে নিস্তার পায়। সেই নিয়মকটি আমাদের খাড়াখাড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। চিন্তাধারা ইত্যাদি সঙ্কে বিচার করে চলার উপরে নির্ভর করছে। এ সংখ্যায় এখানে শেষ করলাম। আগামী সংখ্যায় খাড়াখাড়া সঙ্কে বিচার ও তাদের ফলাফল সঙ্কে কিছু বলবার আশা রহিল।



= পিরামিড চা =
চিন্তাবারী সৌরভ, নয়ন তৃপ্তিকর বর্ণ, অভিব্যাদ
১ পাউণ্ড প্যাকেট মাত্র ১০ আনা
প্রত্যেক সন্ন্যাস দোকানে সাদরে বিক্রিত হয়।
ইন্দিরিয়াল চা
প্রথম ভারতীয় চা ৪৪/১, রাস্তা নং ১, কলিকতা।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান-সূচীর প্রধান অভাব—সাধারণ রুচি অনুযায়ী পঠিত হয় না। সাধারণতঃ কতটুকু শ্রোতাদের আনন্দ দান করতে পারে শিক্ষার দিক থেকে কতটুকু রস পরিবেশন করলে সাধারণ তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে তেমন করে এগুলি ভাবা হয় না; কিংবা এ বিষয়ে চিন্তা করলেও প্রোগ্রাম কর্তারা কার্যে পরিণত করতে সক্ষম হন না।

শ্রোতারা কি চায়? অসংখ্য অগণিত শ্রোতার মনরাজ্য পরিদর্শন করা সত্যিই হুঃশাধ্য! তবে যা ভালো—যা সুন্দর তা সর্বক্ষেত্রেই প্রায় ভালো এবং আনন্দদায়ক! বিশাল জনসত্ত্বের মনস্তত্ত্বিতে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন বৈচিত্র্য। মানুষের মন বৈচিত্র্যে প্রিয়। বেতার প্রোগ্রাম কর্তারা আনন্দ-দানের এই সাধারণ নিয়ম এবং মাপ-কাঠি মেনে চললেই অনেকটা সফলতা অর্জন করতে পারেন। এক ব্লুজ-সঙ্গীত কিংবা কণ্ঠ সঙ্গীত দীর্ঘ সময় ব্যাপি অহুষ্ঠিত হলে সাধারণের পক্ষে তার রস গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। বেতার প্রোগ্রামে এই এক যেয়েমী ভাব অত্যন্ত বেশী।

বেকার প্রায়োফন রেকর্ড বাজানো দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। আর্টিষ্ট অহুপস্থিতির অভাব রেকর্ডে পূরণ—দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে রেকর্ড বাজানো এবং সময় সময়

অপরাপর অনুষ্ঠানেও রেকর্ড দেওয়া—বেতারে এই রেকর্ডের প্রাচুর্য্য অসহ্য বিরক্তিকর। অধিকাংশই যন্ত্রাজ্যের রাবিশ রেকর্ড দিয়ে শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদনের সার্থকতা কি?

আর্টিষ্ট অহুপস্থিতি এবং অনিবার্য কারণ বশতঃ এর প্রতিকার বিধানের জন্তে কিছু রিজার্ভ আর্টিষ্ট রাখলে খানিকটা কোমরয় রেকর্ডের অরণ্যপন্ন দায় হতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

বক্তৃতা বিভাগের কিছু উন্নতি সংসাধিত হচ্ছে। বেতারে এটা একটি অত্যন্ত গুরু এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু শ্রোতাদের সংবাদ জ্ঞাপনের স্বংখ্যা বাড়িয়ে বক্তৃতার সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্য আমরা বুঝি না। এমন কথা আমরা অবশ্যই বলি না যে, সংবাদ জ্ঞাপনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তবে জাতি গঠনমূলক শিক্ষাপ্রদ রস-সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যপ্রদ বক্তৃতার প্রয়োজন বেতারে খুবই অধিক। বক্তৃতা বিভাগের অনুষ্ঠানসূচিতে একই জিনিষের অধিক সংস্করণ দেখি এবং বিভিন্ন রুচি সঙ্গীদায় অনুযায়ী হয় না। বক্তৃতায় বৈচিত্র্যও কম। শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা চললো কিংবা ঞ্ফরোডার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেনতো তার চর্কিত চর্কনের জের চললো বহুদিন ধরে। এতে Suspense থাকে না।

দিনের শেষে

ত্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

দিনের শেষে আসবে যখন
নিবিড় অন্ধকার,
কেমন করে বাইব আমার
জীর্ণ তুরী আর।
মিশবে আলোক দিগন্তেরে
সাঁঝের প্রদীপ জলবে ঘরে
আমি শুধুই চেউয়ের পরে
ছলব অনিবার।
ভোর থেকে মোর যাত্রা শুরু
নিরুদ্দেশের পারে,
ফুরায় না পথ দিক্‌সীমাহীন
বিশাল পারাবারে;
পথশ্রমে ক্লান্ত আমি
ডাকছি তোমায় জীবন-স্বামী
বাক্যে আমার হৃদয়-কীরণ
আশ্বাস-বন্ধার।

—:—

বেতারে শিল্পী উপেক্ষা এবং অনাদরের কোন প্রতিকারই দেখা যাচ্ছে না। বহু শিল্পীর অভিযোগ এ বিষয়ে। শিল্পীদের প্রতি অত্যন্ত অভদ্র জনোচিত উপেক্ষা প্রকাশ করা হয়। বিভাগীয় কর্মকর্তারা কেউ কেউ নিজেদের 'কেট-বিট্' মনে করেন। এই ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিকার চাই। সাধারণের অনুষ্ঠানে সাধারণের দাবীকে অভদ্রভাবে উপেক্ষা করার অধিকার আছে কিনা এ সম্বন্ধে তাঁদের ভেবে দেখা উচিত। যোগ্য-অযোগ্যের বিচার অবশ্যই করতে হবে—কিন্তু সাধারণ সৌজ্ঞেয় অভাব কেন হবে? আমরা এ বিষয়ে টেন ডাইরেক্টর মিঃ টেপলটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ বিষয়ে অভিযোগমূলক অনেক পত্রাদি শিল্পীদের তরফ হতে আমাদের কাছে আসে।

কানীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

বারান্দা

রামগতি ও পরেশ উকিল

রামগতি—চুপ চুপ, একবারে চুপ। কথা কইলেই সর্বনাশ। —কি বিপদ!

পরেশ—ইজিতে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারখানা কি?

রামগতি—ফিস ফিস করিয়া বলিল—
গুরুতর ব্যাপার রে বাবা, গুরুতর ব্যাপার।
কর্তা একেবারে মুখখানা বিরাট থমথমে
কোরে ছুটোছুটি কোরছে, হুঙ্কার দিচ্ছে।
তাই বলি চুপ চুপ—একেবারে চুপ।

পরেশ—কিন্তু আমাকে যে ডেকে
পাঠিয়েছে, আমি যে তাহলে গেছি।

রামগতি—সবাই গেছিরে বাবা, সবাই
গেছি। থাকবো না কেউ। এ বাড়ী
থেকে অরুজল উঠলো।—কি বিপদ!

পরেশ—আসল ব্যাপারখানা আমার
থুলে বলতে পারেন সরকার মশাই?
বুঝে নি নিজেদের অবস্থাটা?

রামগতি—হারে উকিল!—ওকালতিই
কোরুলে, আসল ব্যাপারখানা বুঝলে না
বাবা!—কি বিপদ!

পরেশ—সবাইই সরকার মশাই আর
ভণিতা কোরবেন না। ব'লতে হয় বলুন,
না হয়তো থাক।

রামগতি—(গলা খাটো করিয়া) ওরে
বাবা, মা-ঠাকরুণ নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছেন

কাল রাত্তির থেকে। বাড়ী তাই ওলোট
পালোট। দরওয়ানটা খেয়েছে চড়, চাকর
খেয়েছে রুদা। বাপরে বাপ!

পরেশ—মা-ঠাকরুণ নিরুদ্দেশ! কেন,
কি হুংখে?

রামগতি—কি হুংখে?—সে কর্তা জানে,
ছেলে জানে; আর জানে বাড়ীর কিয়েরা।
তুমি আমি কি জানবো বলো?

পরেশ—সত্যি আপনি জানেন না?

রামগতি—ঐ তো আমার দোষ উকিল।
সবাই জানতে পারে, পারি না শুধু আমি।
এ ব্যাপারেও জানলে সবাই, জানলুমনা
শুধু আমি।—থাক্গে 'বাবা, বড়ো কথায়
মাথা দিয়ে মাথা খোয়াতে চাই না।

(কানীশ্বরের প্রবেশ)
কানী—সবাই জানলে, তুমি শুধু জানলে
না রামগতি?

রামগতি—আজ্ঞে—

কানী—বুঝতে পেরেছি, 'আর কথা
কোনো।—তুমিও জাননা পরেশ?

পরেশ—আজ্ঞে—

কানী—সেই এক কথা 'আজ্ঞে'! ওরে
মুখের দল, কী হুংখে ঘরের লক্ষী ঘর
ছাড়া হ'য়ে গেল তা ব'লতে গিয়েও বাক্য
কড় হ'ল! (পরেশ ও রামগতি স্রবাক
হইয়া চাহিয়া রহিল)—কিন্তু হুংখ কি তা
জানো রামগতি? জানো পরেশ?

পরেশ ও রামগতি পরস্পরের দিকে
একবার মাত্র চাহিয়া কাঁচ পুতলিকার মত
দাঁড়াইয়া রহিল।

—পরেশ ভয়ে ভয়ে বলিল :—না Sir
জানি না।

কানী—Sir! ওরে আমার সন্ধান
দেখাচ্ছে!—ভাবছে আমি ওর তোষামোদে
ভুলে গিয়ে ওকে ছেড়ে দোব। কিন্তু
ছাড়বোনা পরেশ ছাড়বো না তোমায়।
উইল কোরে দিয়ে তুমিই সকলকে
ক্ষেপিয়েছ। তোমায় ছাড়বো না।

(বলিয়া পরেশের হাত চাপিয়া ধরিল)
মণীষার প্রবেশ—

মণীষা—বাবা, ভেতরে এসো।
কানী—(পরেশের হাত ছাড়িয়া দিল)
বিজেন কি-রেছে-রে? তোদের মায়ের
চোন সংবাদ পেলি?

মণীষা—তুমি আগে ভেতরে এসো, পরে
সব বলবো।

কানী—ভেতরে কে আছে? কার জন্ত
যাবো?

মণীষা—নেই থাক কেউ, তবু তুমি
আসবে।

(বলিয়া কানীশ্বরকে একরকম জোর
করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল)

পরেশ—একি মূর্তি! একি কষ্টস্বর!

রামগতি—আরও কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
কর্ণভোগ ক'রবে উকিল? সরে পড়ো।
বিছানা পশুর সব বেঁধে ছেঁদে নিয়ে সরে
পড়ো।

পরেশ—সরে, প'ড়তে হয় আপনি
সরে পছন্দ সরকার মশাই। আমার
থাকতে হ'ল। আমার না যেতে ব'ললে
আমি যেতে পারবো না।

রামগতি—ওরে বাপু, জাত বাবে।
ধর্ম বাবে। শেষে চুপোগলির দালালি
ক'রতে হবে!

পরেণ—ভার মানে ?

রামগতি—গিন্নী কেন বাড়ী থেকে
পালিয়েছে তা জানো ? খবর রাখো কিছু ?
পরেণ মাথা নাড়িয়া বলিল—না
জানি না।

রামগতি—(অতি সন্তর্পনে চুপি চুপি
বলিল) অধঃপাতে গেছিলেন। কর্তার সঙ্গে
বিবাহের পূর্বে উনি অধঃপাতে গেছিলেন।
বুঝেছ ?

পরেণ ভীতকণ্ঠে বলিল—কি ? কি
ব'ললেন ?.....

রামগতি—হ্যাঁ, হ্যাঁ—যা ব'লেছি
তাই। ধরা প'ড়েছে এখন। লোক
জানাআনি হ'য়ে গেছে। সাক্ষী-সাবুদ
সব হাজির।

পরেণ রামগতিকে প্রবল এক ঝাঁকানি
দিয়া বলিল—আপনি এতো বড়ো কথা
ব'লতে সাহস করেন ?

(বিজেনের প্রবেশ)

রামগতি—আমি ব'লছি না। আরে
রাম রাম—ঐ ঝিঙুলো জরনা ক'রছিল।
কি বিপদ ! থাক বাবা, তুমি এইখানেই
থাক ; বড়োলোকের তেল দাওগে।—আমি
দেশে চ'ললুম। (প্রস্থান)

পরেণ—এই যে ছোটবাবু—। কি
খবর বলুন তো ?

বিজেন—খবর ভালো নয়, বুলিয়া শুক
রহিল কণকাল ; পরে জিজ্ঞাসা করিল :
রামগতি কি ব'লছিল ?

পরেণ—সে থাক। সে অপ্রাচ্য।

বিজেন—আমায় বুরি ব'লবেন না ?

পরেণ—আপনি জিজ্ঞাসা ক'রলেই
বলতে হবে। কিন্তু মিনতি ক'রছি জিজ্ঞাসা
কোরবেন না।

বিজেন—বুঝতে পেরেছি। থাক তবে।
(ধীরে ধীরে প্রস্থানোত্তত)

পরেণ—মারের খবর কি বলুন ?



হ্যাঁ-বালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

• একমাত্র
• নির্ভরযোগ্য
• পক্ষ্য ও পালিয়ে

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা • ১ • ১ বোম্বাই

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্মল কুমার স্তব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চপল আবার কখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে ও নিজেই চমকে ওঠে। একি! লাল হ'য়ে উঠেছে যে, ওর সারা মুখখানা! ওভাবে—ও ক্ষেপে গেল নাকি! কি 'আবোল তাবোল ও ভেবে চলেছে। মীরা সে ধরণের মেয়ে নাও তো হতে পারে। হয়তো বা অতি সাধারণ ঘরেরই মেয়ে লেখাপড়া শিখে একটু পলিশড হয়েছে। হয়তো বা সত্যিকারের প্রয়োজনই কিছু ওর আছে। কিন্তু কি প্রয়োজনই

দ্বিজন থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—
মা? নাঃ, সে খবর ভালো নয় পরেশবাবু।

পরেশ—খুঁজে পেলেন না?

দ্বিজন—খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু 'মা' আর বেঁচে নেই!.....

পরেশ—বেঁচে নেই!

দ্বিজন—বাড়ি নাড়িয়া জানাইল—না।
তাহার ছুই চোখে অশ্রু 'ঘনাইয়া' আসিয়াছে।

—দূরে জানলা হইতে মনীষা ডাকিল:

মেজদা, খবর?

দ্বিজন হাত নাড়িয়া কি বলিল বোঝা গেল না, কিন্তু মনীষার অশ্রুট ক্রমশ ধ্বনি বলকে বলকে ভল্লিয়া আসিতে বিলম্ব হইল না।

পরেশ দ্বিজনের হাত ধরিয়া বলিল:

—আমুন, ভেতরে চলুন।

(প্রস্থান)

ক্রমশ:

বা থাকতে পারে চপল বোসের সাথে মীরা সেনের? কবিতা 'অথবা' গল্প লেখার সখকে রূপ দেওয়া ছাপার অক্ষরে? এ প্রয়োজন মেটোর সাথে সাংগে, সখ নিদ্রুতি লাভ করলে, হয়তো এই পরিচয়ের সূত্র যাবে ছিন্ন হয়ে। সত্যি সে-ই ভালো—ওভাবে। আয়নার মাঝে ওর চোখ ছটো স্তিমিত হয়ে আসে। লাকিয়ে সরিয়ে আনে ও দেহটাকে। কি আশ্চর্য্য ও সব কি ভাবছে? কেনই বা ভাবছে! সামান্য পরিচয় পাতলা জলের মত, একটু কাৎ করলেই গড়িয়ে পড়ে যাবে। নাঃ চপল বোসের মাথার ঠিক নেই আজ এই জন্তেই তো ও লোকজনের ভিড়ের মাঝে যেতে চায় না।.....

পা ছুটোকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে ও বিছানার ধারে। তারপর বপ করে শুয়ে, আলো নিভিয়ে দেয়। যাক বাঁচা গেছে। ওর মাথায় নিশ্চয়ই জ্বল চেপেছিল; ও ঘুমবে এইবার নিশ্চয়ই।

বালিশের মধ্যে মাথা গুজে ও চুপ করে শুয়ে পড়ে থাকে। বাঃ ঘুমও যেন ওর সাথে রাগারাগি করে চলে গেছে, আর এদেশ মাড়াবে না। ও মনে মনে এক-ছুই গুণতে আরম্ভ করে। কিন্তু মনটা অব্যাহার মত খালি চলে যায় অজ্ঞদিকে। অন্ধকারের মধ্যে ও মেলে ধরে চোখ ছুটোকে। খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্নার বেঁকু আলো এসে পৌঁছেছে, মশারীর ভিড় দিয়ে তাকে

দেখা যায় আবছায়ায়। ঝাপিকল্প ও তার দিকে তাকিয়ে থাকে নিবন্ধদৃষ্টি। ও আবার চোখ বোজে। বোঝা চোখের সামনে ভেসে ওঠে—কত কি ছবি। সাহিত্য সভা, বলবার জন্ত ওর উঠে দাঁড়ানো, কথার জাল বুনে চলা, সবই যেন ওর কাছে এখন অপক্লপ মনে হচ্ছে। বাঃ, ওত বেশ বলতে পারে! বেশ শুছিয়ে, জোরের সাথে যুক্তির দ্বারা ও প্রমাণ করেছে ওর বক্তব্যকে। কোথাও একটু ফাঁক নেই। যুক্তি তর্কের নীরেট গাঁথুনি দিয়ে ও গেঁথে গেছে ওর বক্তব্যকে।..... নমস্কার.....আপনার লেখার আমি একজন.....চলুন না একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সমস্ত ঘটনাগুলো বায়োকোপের ছবির মত। অন্ধকারের কালো পর্দার ওপর ওর মনের মেশিন থেকে যেন লাইট ফোকাস করা হয়েছে। অভিনয় করা চিত্রকে দেখানো হচ্ছে পর্দার গায়। সেখানে দর্শকমাত্র ও নিজে, মেশিনম্যানও, আবার অভিনেতাও।

কি নামছেন যে! এটা যে মৌলালির মোড়। বসুন একটু...আমি এক্ষুণি আসছি!...ওর নাকে ভেসে আসে সেন্টের মুহূ গন্ধ। যাবার সময় মীরার আঁচলটা ঠেকে গিয়েছিল ওর হাঁটুর সাথে, সে সময় ও খেয়ালই করেনি, মন ছিল সংস্কারের জালে বদ্ধ। রাতের অন্ধকারে আগছে তার মুহূ পরশা...

...ফোন নাঘারটাও রেখে গেলাম ওই সাথে...ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ছোট-খাট বাংলা প্যাটার্নের বাড়ী, রাস্তার দিকে মুখ করা। গেট দিয়ে ঢুকতে লাল কাঁকর মাড়িয়ে যেতে হয়। পাশের ফুলগাছ গুলো মাথা উচু করে ভিড়ি মারবার চেষ্টা করে। ফুল-গুলো হেলে ছলে যেন কথা কয়। বলে

মিলার্ভা মুভিটোনের উৎকলতম
সামাজিক চিত্র



= জেলর =

ভূমিকায় : সোরাব মুডি
শীলা, লীলা চিংনিস্
বি-এ, সাদিক, শরিফা ও
বেবী কমলা প্রভৃতি—

জে
ল
র
প্র
ভা
ত
সি
নে
যা
য়

এই বিশ্বকর চিত্রখানির ভাষা, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে
সর্বশ্রেণীর ভারতবাসী সহজেই উপভোগ করিতে
পারিবেন। ইহা সর্বরসপুষ্ট সর্বদৃশ্যমুন্দর বাণী-চিত্র ॥

জেলরএর পরিচালনা করিয়াছেন ভারতীয়
ছায়া-চিত্র জগতের স্বনামধন্য
চরিত্রাভিনেতা — সোরাব মুডি

নে: ২৪শে নভেম্বর প্রথমারম্ভ !

বুकिংয়ের জন্য আবেদন করুন
ডোসানি ফিল্ম কর্পোরেশন

গ্রাম : হুগল ৭মং কলুটোলা, পিট, কলিকাতা। ফোন : বি, বি, ১৫০২, ৫৫০০।

—বাচ্ছা কোথায়? আমাদের সংসার
গুলোকে একবার দেখে যাও। ওই দেখ
—আইতি দেবী, নিজের বিছানা বিছিয়ে
শুয়ে আছেন পরম আনন্দে গোটের ওপর।
ওখান থেকে উনি নিত্য নতুন লোকের
সাথে আলাপ করছেন। ওই দেখুন—
মিসেস্ ম্যাগোলিয়া। চারটোতে মেলে
এখানে বসবাস করছেন। তবে আছেন
তফাতে তফাতে। নীরবতা পছন্দ করেন
কিনা তাই। সন্তান সন্ততি ঠুঁদের কমই
কিন্তু বড় সুন্দর রূপ গুণ। লোকে আদর
করে কাছে ডাকে। ওখানে ওই যে
সুসারি বেঁধে রোগা রোগা মেয়েগুলি দাঁড়িয়ে
আছে—কেউ রয়েছেন লজ্জায় মাথা গুজে,
কেউ বাজবৎ হেলে, কেউ আবার অবাক
হয়ে চেয়ে; ‘ওরা ভারী ভাল মানুষ।
চিনসেন কি? দিনের বেলায় লজ্জায়
এক-গলা ঘোমটা দিয়ে থাকেন, রাত্রে
খোলেন ঘোমটা। মুখের মিষ্টি গন্ধ করেন
পথিককে পর্যন্ত পাগল। ওঁরা বজ্রের
বধু, বুকভরা মধু। কোন সাজ গোছের
আড়ম্বর নেই, নিতান্ত সাদা-সিধা মানুষ
নাম রজনীগন্ধা। এদিকে চেয়ে দেখুন—
মিস্ প্যাঞ্জি চেয়ে আছেন আপনার দিকে—
কৌতূহলী দৃষ্টি। ভায়লেট রঙের গাউন
পরেছেন। বিদেশী মানুষ, তাই হঠাৎ
কেউ এদের চিনতে পারে না।...বেলা
দেবী ওধারে ঝাঁসছেন আপনাকে দেখে,
নতুন মানুষ দেখেছেন কিনা তাই। মিস্
‘ওলিও’ ওধারে আছেন। নিজের গুণে
সকলকেই মুগ্ধ করেন। ওই মাচাটার ওপর
মিস্ ‘ইন্সপিরেশন’ আশ্রয় করছেন। আর
ওদের পরিচয় তুঁ আপনি জানেনই।
মোগল আমল থেকে এদেশে বসবাস
করেছেন। গুপ্তী লোক তাই আমাদের
রাগী করে রেখেছি। মনে থাকবে আমাদের
সবাইকে? মাঝে মাঝে এসে দেখে

যাবেন আমাদের অভাব অনটন যদি কিছু
থাকে। লজ্জায় বড় একটা কথা বলিতে
পারি না আমরা মনিবের সাথে। বারান্দা
দিয়ে উঠে যান আরো নতুন মানুষকে
দেখতে পাবেন। নামগুলো আগে থাকতে
বলে দিই। চিনে নিয়ে আলাপ করে
যাবেন। ওখানে থাকেন মিসি বেয়ে পর
পর আসন পেতে যথা ক্রমে—শিচেটিয়া,
চাইনিজ পাম্, ডালিয়ু, এয়ারিকা,
ইউকেরিস, লিলি।

ফুলকুমারীদের পরিচয় নিয়ে চপল
সোজা ঢুকে পড়ে ভেতরে। ঝক ঝক তক
তকে বাড়ী। বেশী আড়ম্বর নেই। সামনেই
ড্রইং রুমটায় খান তিনেক টেবিল, বিভিন্ন
রকমের; তাদের ঘিরে নানা রকমের
চেয়ার, খার সাথে যে খাপ খায়। দেয়ালের
গায়ে কতগুলো ছবি এদেশী নয় নিশ্চয়ই।
বাঃ এটা যে হেমন মজুরদারের। বাঙালী
স্থান পেয়েছে দেখছি। এ ছবিগুলোর
শিরীর নাম নেই—বাজারে কেনা কি?
তাইলেও মন্দ নয়, এদেশী ছবিই হোথ
হচ্ছে। কটোগুলো কার? আত্মীয় বন্ধুদের
হবে হয়তো মীরার বাবার বড় অয়েল
পেন্টিংটা সামনেই। বাঃ বুকের মুষ্টিটাতো
বেশ চমৎকার। নাঃ এদের বেশ ভালো
রুচি আছে। ভেড়ার মুষ্টি যে রাখেনি
এই যথেষ্ট।...লাইটগুলোর শেড ওর
পছন্দ হয় না; ও ভালোবাসে একেবারে
সাদা। ড্রইং রুমটা থেকে চপল পূর্ব-
দিককার ঘরে ঢোকে। এটা ষ্টাডী, মীরার
নিশ্চয়ই। বাঃ অনেক বই, রিভলুভিং বুক্
কেসে সাজানো আছে পরপর। মাঝখানে
ছোট গোছের একটা সেক্রেটারিয়েট
টেবিল। খোলা ব্যাকটায় সাজানো ষাধান
মাসিক পত্রিকার গাদা। বেষ্টে গোছের
চণ্ডা আলমারীটা থেকে উকি মারছে—
বাইরন, টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী।

হাইটম্যান, সুইনবার্ণও আছে দেখছি।
কীটস্ হাইটএথার, ওধারে কাউপার।
ওগুলো কি পেজুইন বুক সিরিজ?
এভবিম্যানস্ লাইব্রেরীর অনেক বই ওধারে
সাজান। ল্যাঙ্ঘের বইগুলো কে পড়ে মীরা?
ও! এই বইটা যে ও আর একবার পড়তে
চেষ্টাছিল, থাউসেণ্ড্ বেষ্টেস্টোরী। ষ্ট্যাণ্ডার্ড
লিটারেচারের ছবির বইটাও আছে
দেখছি। আহাঃ! এদের এডিসন্
সেক্সপীয়র কিনলো কেন? ভারী ছোট
ছোট লেখা, চোখ ঠিকরে যায়। মোঁপাসার
সব কটা ভলিউমই রয়েছে, হামসন,
হগো। গোকী এদেরও আনা হয়েছে।
‘ব্লানার্ডস্’ কেনে নি? নাঃ এই যে
নিচের থাকে রয়েছে। বাঃ রবীন্দ্রনাথ,
শ্যংবাবুর সব বইকটাই সংগ্রহ করে রাখা
হয়েছে। বাঙালীর মান তবুও এরাই
কর্তকটা রেখেছেন। মীরার হিউমারের
টেইও আছে দেখছি। বাংলার মধ্যে
পরশুরাম, কেদারবাবুকে কিনেছে,
রবীন মৈত্রেয়কেও সাথে সাথে।
...নাক দিয়ে ওর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস
বেরিয়ে এল। অগাধ বই দেখলে ও
নিজেকে ভুলে যায়। নিজের নিঃশ্বাসের
আওয়াজে নিজেই চমকে উঠে ও ভাবলো
—উঃ কল্পনায় ও কতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল।
কোথায় বা মীরাদের বাড়ী আর কোথায়
বা বই-এর আলমারী! মীরাদের বাড়ী
ঠিক ওরকম ধরণের-নাও হতে পারে;
হয়তো ঠিকই উলটো। নিজের মনে মনে
যে সব জিনিষ ও ভালবাসে, কল্পনাবলে
সেই সব জিনিষই ও দেখে চলেছে।
ওর মাঝটা টিপ্ টিপ্ করে। রাত
এতকণে ভোরের সীমানার দিকে পা
বাড়িয়েছে। হয়তো একুণি ও গুনতে
পাবে বাসের হর্ন, নয়তো রিক্সার হুন্ হুন্
আওয়াজ। কি বিজী লাগছে ওর শরীরটা।

সারারাতটাই ও কাটিয়ে দিলে যত সব
বাজে কল্পনা করে! কেন এই সামান্য
একটা মেয়ের জন্ত ও ভাববে এতক্ষণ?
নিজের মনের ওপর ওর নিজেরই ঘৃণা
জন্মায়। শত বিকার দেয় তাকে। ও
ভাবে—চপল বোস, তুমিও এত দুর্বল আর
ভাবপ্রবণ? কি সব অলীক কল্পনা করে
চলেছ তুমি? তুমিই না এককালে মেয়েদের
সঙ্গকে পরিহার করে চলতে? তুমিই না
আজকালের মেয়ে বর্ণনা প্রধান উপস্থাস
গুলোকে বিষচক্ষে দেখতে? আর আজ?
আজ সারা রাত্রি ধরে তুমিই যে সেই
সব উপস্থাসের বাস্তব অভিনয় করে চললে
মনে মনে! চপল নিজেকে চিরে চিরে
বিচার করে দেখতে লাগলো। বাড়ীর
ঘড়িটায় ঢং ঢং করে বেজে গেল এক,
দুই, তিন, চার। ও উঠে দাঁড়াল।
বাইরে থেকে মুখ, হাত, পা ধুয়ে, খানিকটা
ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগালে কানছটোয়,
ঘাড়ে। তারপর ফিরে এল নিজের ঘরে।
উঃ, এতক্ষণে তার কি তৃষ্ণাই পেয়েছিল।
তৃষ্ণার জলটুকু, যা সে রোজ রাত্রে
শোবার আগে খেয়ে শোয়; তাও খেতে
গিয়েছিল ভুলে। এমনিই তার মতি-
বিন্দ্রম! মাসের ঢাকনাটা খুলে পুরো
মাসের জলটা দিলে গলার মধ্যে চালিয়ে।
তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে বসলো গিয়ে
ক্যাম্প-চেয়ারটায়। চুরুট টানতে টানতেই
ও চেয়ারটার কোলেই এলিয়ে পড়লো।

ক্রমশঃ

বিনোদ এণ্ড কোং

১৩নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার

জরীপ ও নক্সার বস্তাদি বিক্রয় করে তাছাড়া
অফিস টেননারী ইত্যাদিও বিক্রয় করে।

N. I. P.



ব্রজবাবু

সাপ্তাহিক আংশিক পয়েন্ট—

আংশিক পয়েন্টের (Part score) ডাকের বিষয় অনেক ক্রীড়কেরই সম্যক, এমন কি ব্যক্তিগত জ্ঞানেরও অভাব দৃষ্ট হয়। আসল কথা এই যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের অভাবই অনেকাংশে দায়ী। আংশিক-পয়েন্ট থাকার দরুণ কত ক্রীড়ক যে খেলা নষ্ট করেন তার ইয়ত্তা নেই, অথচ ফল দেখেও অনেকে 'ঠেকে শিখতে' পারেন না। সুতরাং আমরা আংশিক-পয়েন্ট থাকার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

২০ বা ৩০ পয়েন্ট প্রাপ্তিকে আংশিক পয়েন্ট না বলাই ভালো। যদি ক্রীড়ক কখনো একটির ডাকে কন্ট্রোল ব্রীজ খেলেন তো তাঁর ভুলে যাওয়াই উচিত, অন্ততঃ তখনকার মত, যে আংশিক-পয়েন্ট তাঁদের মোটেই নেই। পন্থের দানে যদি আপনি তিনটি ইঙ্কুবন, দুইটি ফেরাই বা চারটি চিড়িতন পর্যন্ত ডাক দেন, তো তখন আপনি মনে করতে পারেন যে আগের বারের কিছু পয়েন্ট আছে এবং সাধারণতঃ গেম-পয়েন্ট অবধি না উঠলেও চলবে,— কেন না এই একটু কম ডাকেই ১০০ পয়েন্টে পৌছান যাবে। এটা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, গেম-পয়েন্টের কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত আগের দানের আংশিক-পয়েন্টের কথা নিয়ে ভাবা ফলপ্রসূ। যদি আপনি পূর্বোক্ত পরামর্শে

না চলেন তো তার ফলে কখন না কখন আপনার নিম্নলিখিত অবস্থায় পড়তে হবে।

(১) আংশিক-পয়েন্ট আছে বলে আপনি হয়তো কায়রুশে প্রারম্ভিক ডাক দিলেন।

(২) আপনার আংশিক-পয়েন্ট আছে বলে তার ওপর আপনার খেঁড়ী কায়রুশে আপনার প্রারম্ভিক ডাককে বজায় রাখতে ডাক দিলেন।

(৩) পুনরায় আপনি উত্তরে ডাক দিয়ে গেলেন, আপনার আংশিক-পয়েন্ট আছে বলে।

(৪) আপনার খেঁড়ী আবার ডাক দিলেন, কেন না গেমের জন্ত আর একটি ডাক বাড়ানো দরকার, কারণ পূর্বেই আপনার আংশিক-পয়েন্ট রয়েছে।

(৫) এবং আরও মজা এই যে, এই অবস্থায় আপনার প্রতিরোধকারী ডবল দিলেন; যে হেতু আপনার আংশিক-পয়েন্ট রয়েছে এবং তার ওপর আপনারা গেম করবার জন্ত তিনটি হরতনে ডাক দিয়ে গেছেন, তখন ডবল কার্যকরী হলেও খেলা হচ্ছে আর না হলেও খেলা হচ্ছে; সুতরাং ডবল দিয়ে দেখাই উচিত।

(৬) সাধারণ অবস্থায় হয়তো সে হাতে সাতটি পিট নিয়ে খেলা করতে আপনি দম্বরমত ভয় পেতেন, কিন্তু এখন আপনি নয়টি পিট নিতে স্বীকৃত হলেন। ফলে

আপনাকে চারটি পিটের জন্ত খেঁসারং দিতে হল। অতএব ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তো ৭০০ পয়েন্টের খেঁসারতেই শিক। শেষ নচেৎ হয়তো আরও বেশী।

আংশিক-পয়েন্টের ভূত :-
আংশিক-পয়েন্টের ভূত ষাড়ে চাপলে যে কি অবস্থা হয় তা নিম্নলিখিত খেলাটির বিবৃতি পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন। আর প্রতিদিন প্রত্যেক জায়গারই এই ধরনের ঘটনা ঘটে আসছে।

‘দ’ তাস-বন্টন করেছেন। কোন দলই ভালুনায়েবল নয়। ‘উ-দ’ দলের আংশিক পয়েন্ট আছে ৩৮।

ইস্কাবন—আটা, ছকা, পঞ্জা।

হরতন—গোলাম, সাতা।

রুহিতন—দশ, সাতা, চোকা, ছুরি।

চিড়িতন—সাহেব, আটা, ছকা, তিরি।

ইস্কাবন—টেকা, বিবি, নয়।

হরতন—টেকা, নয়, পঞ্জা, ছুরি।

রুহিতন—সাহেব, নয়, পঞ্জা।

চিড়িতন—দশ, সাতা, চোকা।

উ	পু
প	দ

ইস্কাবন—সাহেব, দশ, সাতা, চোকা।

হরতন—বিবি, তিরি।

রুহিতন—গোলাম, আটা, তিরি।

চিড়িতন—টেকা, গোলাম, পঞ্জা, ছুরি।

ইস্কাবন—গোলাম, তিরি, ছুরি।

হরতন—সাহেব, দশ, আটা, ছকা, চোকা।

রুহিতন—টেকা, বিবি, ছকা।

চিড়িতন—বিবি, নয়।

ডাক হয়েছিল নিম্নরূপ,

‘দ’	‘প’
একটি হরতন	পাশ
দুইটি হরতন	পাশ
পাশ	ডবল
পাশ।	
‘উ’	‘পু’
একটি ফেরাই	পাশ
তিনটি হরতন	পাশ
পাশ	পাশ

যে রঙে ডাক দিয়েছিলেন, সেই রঙেই পুনরায় ডাক দিলেন। ‘উ’ দেখলেন মাথা বখন গলানো হয়েছে তবে একটি ডাকের জন্ত গেম নষ্ট করে লাভ কি, অতএব কুলে পড়া বাক্ গোছের তিনটি হরতনে ডাক দিলেন। ‘প’ সাধারণ অবস্থায় হয় তো তিনটি হরতনে ডাক দিতেন না, কিন্তু যে হেতু বিপক দলের আংশিক পয়েন্ট রয়েছে ডবল বিকল হলেন গেম হবে, কার্যকরী হলেন গেম হবে,

তবে ডবল দিয়ে ‘এস্পার ওস্পার’ বা হয় একটা হয়ে বাক। মোটের ওপর তাঁর (‘প’র) খুব আশা আছে যে অতঃ চারখানি পিট পাওয়া যাবে, সুতরাং বিপক দলের অধিক পিট পাবার সম্ভাবনা নেই।

‘প’ চিড়িতনের দশে প্রাথমিক চাল দিলেন। ডামি ও ‘পু’ ছোট তাস দিয়ে গেটলেন, আর ‘দ’ চিড়ের বিবিতে পিট ধরলেন। ‘দ’ একতাস ছোট হরতনে চাল দিলেন, আর ডামি সাতা দিয়ে ‘ফিনাস’ করলেন, কারণ ডবল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোকা গেছে যে প’র হাতে হরতনের নয় থাকাই সম্ভব। ‘পু’ হরতনের বিবিতে পিট ধরে ইস্কাবন খেললেন। ‘প’ ইস্কাবনের বিবিতে পিটখানা ধরেই ইস্কাবনের টেকায় পিট নিলেন, হরতনের টেকার পিট নিলেন। তারপর তিনি ইস্কাবন খেললেন। ‘পু’ ইস্কাবনের সাহেবের পিট নিয়ে ইস্কাবনের দশ পেড়ে খেললেন। ‘দ’ সুবুদ্ধি করে ইস্কাবনের দশে তুরূপ করার পরিবর্তে একখানি চিড়িতন পাশিয়ে গেলেন। কিন্তু প’ও কৌশলী খেলায়। তিনি ‘পু’র ইস্কাবনের দশের পিটের ওপরই তুরূপ করে শেষ রঙখানি খেলে ‘দ’এর হাতে পিট দিলেন। পাছে ‘পু’ পুরোজ পিটখানি ধরে রুহিতন খেলে বসেন এই ভয়েই ‘প’ এই ধরনের খেলতে বাধ্য হলেন। এখন ‘দ’কে বাধ্য হয়ে নিজের দিক থেকে রুহিতন খেলতে হল, যার ফলে রুহিতনে বিপকদল দুখানি পিট আদায় করলেন। সুতরাং ডাকদার পাঁচটি পিট পেলেন এবং তাঁকে খেঁসারং দিতে হল ৭০০ পয়েন্ট।

ডাকার ফলে ‘উ-দ’ দলকে খেঁসারং দিতে হল বটে, আমরা কিন্তু এর থেকে চমৎকার শিকা আহরণ করলাম। বখন আংশিক পয়েন্ট থাকবে তখন যেন আমরা প্রারম্ভিক ডাকের প্রত্যাশায় মোহাবিষ্ট হয়ে ডাক দিয়ে না বাই; আর যদি ডাক দিতেই হয়, তো অন্যর-বিশিষ্ট রঙেই ডাক দেওয়া বুদ্ধিসঙ্গত। এ পরামর্শের অভ্যাসে আংশিক-পয়েন্টের ভূত তার প্রাপ্য আদায় করবেই।

খেয়ালী চিত্রপট



নিউ থিয়েটার্সের “সাথী” চিত্রের একটি দৃশ্য—শ্রীমতী কানন। ছবিখানা ওয়া ডিসেম্বর হইতে চিত্রা ও নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করবে। ছবিখানা পরিচালনা করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত ফণী মজুমদার।

“সাথী” চিত্রে শ্রীমতী কানন।





পরিচালক
জাশনাল মিউজিপ্যাম লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (দাউদ) রোড, কলিকাতা
টেলিকোম সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৪৫৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩৮

বাংলার মন্ত্রী-সমস্যা

গত পূর্ব সংখ্যার 'খেয়ালীতে' বাংলার সম্মিলিত মন্ত্রী-মণ্ডল গঠন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহারই অব্যবহিত পরে মিঃ শামসুদ্দিন ও মিঃ তামিজুদ্দিনের মন্ত্রী গ্রহণে অনেকেই আমাদের প্রদত্ত বিবরণকে কাল্পনিক বলিয়া ব্যঙ্গ ও উপেক্ষা করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা পুনরায় বোষণা করিতেছি যে আমাদের সংবাদ মোটেই ভিত্তিহীন নহে এবং রাষ্ট্রপতি পাঞ্জাব পরিভ্রমণের প্রাক্কালে সমস্তই স্থির করিয়া গিয়াছেন।

বর্তমান অর্থসচিবের সহিত যে মিলনের আভাস আমরা দিরাহিলাম তাহাতে কেহ কেহ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে রাজনীতি স্থিতিশীল পদার্থ নহে সুতরাং ইহাতে বিচলিত বা ব্যথিত হইবার কিছুই নাই। আর স্বয়ং রাষ্ট্রপতি যখন এই মিলনের প্রবর্তক তখন বৃহত্তর আদর্শের দিকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র দেশের কল্যাণ-কল্পে এই মিলন সমর্থনযোগ্য। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে

মলিনীবাবু যে দিন অর্থসচিবের পদ পরিভ্রমণ করিবেন সেই দিন অপরাহ্নেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি তাঁহার নিরুদ্বে দণ্ডাজ্ঞা অপসারণ করিবেন। আমাদের রাজনীতিতে অভিজ্ঞ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে ইতিমধ্যে মলিনীবাবু ৬ শরৎ বাবুগণ মিলন হইয়া গিয়াছে। শুক্রবার ১৮ই নভেম্বর 'রঞ্জনী'র কক্ষে শরৎবাবু মলিনীবাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তাঁহার কর্মমর্দন করিয়াছেন। বর্তমান অর্থসচিবের সহিত কংগ্রেসের মিলনের শেষ ও প্রবল অন্তরায় বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসী-কোয়ালিশন মন্ত্রী-সভা যে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর তাহা সহজেই অনুবের।

১২ই ডিসেম্বর ওয়ার্কার্স ওয়ার্কিং কমিটির যে সভা হইবে তাহাতে বাংলার কংগ্রেসী কোয়ালিশন মন্ত্রী-সভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হইবে এবং তাহার পরেই মলিনীবাবু পদভ্রমণ করিয়া বঙ্গ-ভাতৃঘরের সহিত একত্রে সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠনে তৎপর হইবেন। মলিনীবাবু ওয়ার্কার্সও বাইতে পাবেন।

লাহোরে রাষ্ট্রপতি স্পষ্টই বোষণা করিয়াছেন যে বাংলার বর্তমান প্রতিক্রিয়ামূলক মন্ত্রীমণ্ডলের আয়ু শেষ হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের পতন হইলে তিনি বিস্মিত হইবেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে একজন মুসলমানকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া বাংলার কংগ্রেসী কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইবে। সেই মুসলমান ভাগ্যবানটিকে—মিঃ কজলুল হক না অধ্যাপক আবদুল বারি? রাষ্ট্রপতির এই স্পষ্ট বোষণার পর বাহারা আমাদের প্রকাশিত সংবাদকে অলীক বলিয়া উপহাস করিয়া পত্রাঘাত করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন আশা করি।

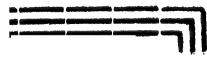
২২লা সরকার একটি 'কমানিশিয়াল মিউজিয়াম' গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ত্রিবৃক্ক জাদুঘর নিয়োগীকে এই মিউজিয়ামের কর্তার পদে বসান স্থিরীকৃত হইয়াছে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ও বর্তমান

অর্থসচিবের অনুমোদন অনুযায়ী প্রস্তাবটি কয়েক সপ্তাহ ধামাচাপা রহিবে। কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে জ্ঞানাজ্ঞনবাবুর উক্তপদ গ্রহণে সঙ্কোচ থাকিবে না এবং কংগ্রেস-পরিচালিত কর্পোরেশনেরও অনুমতি দিতে কোন বিধা থাকিবে না। আমরা জ্ঞানাজ্ঞনবাবুর এই ভাগ্যোদয়ে বিশেষ প্রীত : তিনি যোগ্য ব্যক্তি : তাঁহার সুপরিচালনায় বাংলায় যে মিউজিয়াম গড়িয়া উঠিবে তাহাতে বাংলার স্বদেশজাত শিল্প-প্রচারের অশেষ সহায়তা হইবে। জ্ঞানবাবুর সহিত তাঁহার অগ্রগণ্য অনুচররাও বাংলা সরকারের মিউজিয়ামে যোগদান করিবেন। বাস্তব্যবোধে কর্পোরেশন নিজস্ব মিউজিয়াম উঠাইয়া দিবেন।

ইন্ডপেন্ডেন্ট টাইমস্‌জালের এ্যাসেসার নিয়োগের সময় কিরণবাবুকে প্রতিবন্ধিতা হইতে নিবৃত্ত করিবার সময় রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে জানাইয়া-

ছিলেন যে বাংলার অন্যতম মন্ত্রী-পদ যখন তাঁহার করতলধাত তখন তাঁহার পক্ষে এই নিম্নতম পদের আকাঙ্ক্ষা করা শোভন নহে। রাষ্ট্রপতি কিরণবাবুকে বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ১৯২০ সালের প্রেসিডেন্সী ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সালে বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রী পদে আসীন হইলে রাজনীতির চমকপ্রদ বিবর্তনেরই সূচনা করিবে।

বর্তমান অর্থসচিব রাজপথের ভ্রাম্যমান 'যুবকরূপে' জীবন-যাত্রা শুরু করিয়া চাকল্যকর ঘটনাবলির মধ্য দিয়া ও প্রতিকূল শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া বাংলার রাজনীতিতে যে অপরিহার্য শক্তি-শালী ও কৌশলী পুরুষে পরিণত হইয়াছেন পরবর্ত্তমানের সহিত মিলনে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। রাজনীতি পরমহংসদেবের বা স্বামীজির আদর্শে পরিচালিত হইতে পারে না—Bait, Bluff ও Briberyর প্রয়োজন আছে!!!



সপ্তাহ

শ্রীভারতলক্ষ্মী.
পিকচার্সের
অভিনয়
অভিনয়

রূপবাণী

কোম : বি, বি, ৩৪১৩

LN. I. P.

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড

কোম : সাউথ ৩৪

শনিবার ৩রা ডিসেম্বর হইতে
নিউ থিয়েটারসের গৌরব মণ্ডিত চিত্র-গাঁথা
নীতিন সম্পূর্ণ পরিচালিত

দেশের মাটি

ভূমিকায় : চন্দ্রাবতী, সায়গল, দুর্গাদাস অমর মল্লিক প্রভৃতি।

অগ্ন্যাণ্ড বৎসরের চেয়ে এবারকার
বার্ষিক সংখ্যা

খেয়ালী

রূপ, রস ও রচনায় হইবে শ্রেষ্ঠ।

১লা জানুয়ারী আত্মপ্রকাশ করিবেন



চৌধুরী শিল্পের মাহাত্ম্য

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার “সন্ন্যাসীর চিঠি”র একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—“কালকোটাকে ইংরেজরা কালকাটা (Calcutta) বলে, আর আমরা একটু শুদ্ধ কোরে বলি কলিকাতা। কলিকাতা কথাটা “না সাপ না বেঙা” কিন্তু ভাষাতত্ত্বের কি অপূর্ণ মহিমা! কি অঘটন-ঘটনপটায়সী শক্তি! শ্রীমুনোতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি এই ‘না সাপ না বেঙা’ কলিকাতা কথাটাকে তাঁহার মন-গড়া বিজ্ঞানসম্মত ভাষা-তত্ত্বের যথেষ্ট চোলাই করিয়া দেখাইয়াছেন যে—“কলিকাতা একটা খাটি বাঙ্গালা শব্দ।” ‘সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—“ইহার অর্থ, ‘কলি’ বা কলিচূণের জন্ত ‘কাতা’ বা শামুক-পোড়া। সূতার ছুটা বা গোলার ছাট বা আড়ত হইতে যেমন ‘সূতাছুটা’ নাম, তেমনি কলির বা চূণের ও কলিচূণের জন্ত শামুকের আড়ত এবং চূণের কারখানা হইতে ‘কলিকাতা’ নাম।”— ইহা পড়িয়া আমাদের সেই বুঝান মোড়লের গল্প মনে পড়িতেছে। একদা বুঝান মোড়লের গ্রামের এক রাস্তা দিয়া রাত্রে এক হাতী চলিয়া গিয়াছিল। সকালে উঠিয়া গ্রামবাসীরা পথে হাতীর পায়ের দাগ দেখিয়া নানারূপ অজ্ঞানা কল্পনা করিতে লাগিল। এমন সময়ে বুঝান

মোড়ল আসিয়া তাহাদিগকে পত্ত করিয়া বুঝাইয়া দিল—

“চোর এসেছিল কাল রাতে,
নিয়ে গেছে ঢেকি এই পথে,
গুতাতে—গুতাতে—গুতাতে!”

কথাটা তখনই জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। গ্রামের সকলে বুঝান মোড়লের বুদ্ধির ‘ধন্নি ধন্নি’ করিতে লাগিল। মুনোতিবাবুও কলিকাতা-নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া ষেকুপ বুদ্ধি-মন্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বুঝান মোড়লের মুখও মলিন হইয়া যাইতে পারে। শনি-সম্প্রদায় মুনোতিবাবুর এই কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্ত পরিষদ-গৃহে একটি সভা করিয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলে ভাল হয়।

হরেকৃষ্ণ! হরেকৃষ্ণ!!

কাঁকি দিয়া কোনও বড় কাজ হয় না, একথা সত্য। কিন্তু কাঁকি দিয়া অনেক ছোটকে অনেক সময়ে বড় হইতে দেখা যায়। এই বাঙ্গলাদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত এত বেশী যে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। তবে সব ছোটই যে একরকম কাঁকিবাজির পক্ষ ধরিয়া ‘বড়’ হইয়া থাকে, তাহা নহে। কাঁকিবাজির রূপ অনন্ত। ইহার হেবকও অনন্ত।

কোনও কোনও সেবক সুবিধা বুঝিয়া সময়মত বড়দের পায়ে কামড়ও দেয়, আবার তেলও মাখায়। শনি-সম্প্রদায়-সেবিত অনেকে বাস্তবিক বড়ই, একথা বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে চৌধুরী-শিল্পই বোধ করি বড় হইবার সব চেয়ে বড় উপায়। আমরা জানি, চৌধুরী-শিল্পে হাত পাকাইয়া অনেক ছোটই ক্রমে পণ্ডিত, গবেষক, সাহিত্য-রত্ন প্রভৃতি হইয়াছে। চৌধুরী-শিল্পের মাহাত্ম্যে আজ অল্পকেই সাহিত্যের সিংহাসনে চড়িয়া বসিতেছে।

অহো, সেই হরেকৃষ্ণ!—অনেকের বোধ হয় এখনও মনে আছে, কুমার মহিমা-নিরঞ্জনর ‘বীরভূমি-বিবরণ’ বগলে করিয়া বেচারা কত লেখক ও সমালোচকের দ্বারে দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়াইত! সেই হরেকৃষ্ণ আজ পণ্ডিত হইয়াছে—কত গবেষণা করিতেছে—চণ্ডীদাসকে লইয়া কত গণ্ডগোল পাকাইতেছে! তাহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাকে আমরা নগেন্দ্রবাবুর ‘বিশ্বকোষে’ হরেকৃষ্ণ-লিখিত ‘অভিরাম গোস্বামী’ শীর্ষক রচনাটি এবং সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত অমলাধীন রায় ভট্ট কর্তৃক লিখিত ও ১৩৩১ সনে মুদ্রিত “শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল” গ্রন্থের “শ্রীঅভিরাম গোস্বামী” নামে প্রবন্ধটি মিলাইয়া পড়িতে অনুরোধ করি। পড়িয়া হরেকৃষ্ণবাবুর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যদি তাহার মনে কিছু উদ্ভিত হয়, তবে তাহা আমাদেরই জানাইবেন। আমরা তাহা ‘খেয়ালী’তে সাদরে মুদ্রিত করিব।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা - শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্তী

গত সংখ্যায় কথা ছিল আগামী সংখ্যায় অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যায় আমাদের আলোচনার কেন্দ্র হবে সাধারণের খাতিরে কি হওয়া উচিত? সমস্ত বড় জটিল এবং এর প্রয়োজনের "জট" যে স্থান আমাদের পাওয়ার প্রয়োজন, তার চাইতে অনেক কম স্থান আমাকে দিয়েছেন সম্পাদক মহাশয়। কাজেই এই সংখ্যায় অনেকটা নমো নমো করে সারতে হবে বলে মনে হচ্ছে। তবে এটা ঠিক আপনাদের সহায়ত্ব আর সুদৃষ্টি আমার ওপর থাকলে—আমরা অনেকখানি স্থান সম্পাদক মহাশয়ের কাছ থেকে আদায় করতে পারব।

সে কথা থাক। উপস্থিত দেখতে হবে আমরা আজ কোথায় আর কি কি জিনিষকে আমাদের খাতিরে বলে গ্রহণ করেছি? প্রথম প্রশ্নের উত্তর গত সংখ্যায় দিয়েছি: আমরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বাঙালীরা এসে বসবাস স্থাপন করেছি সহরে, সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছি পল্লীগামের সঙ্গে। আচ্ছা, এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে অনেকেরই অনেক মত দেওয়া হবে বটে কিন্তু সেই মতের মধ্য থেকে আমাদের নিরূপণ করতে হবে কোনটা আজ চলেছে। অর্থাৎ আমরা আজ কি খাতিরে গ্রহণ করছি শরীর সবল রাখতে? সহরের কোন মা বোনকে একথা জিজ্ঞেস করলে সে নিশ্চয় আমাকে পাগল ভাববে। সত্যি সহরের আবার খাতির অভাব কি?—তবে তার প্রায় সবই যে কুখ্যাত তাতেই বা সন্দেহ কিসের? সচরাচর যা দেখতে পাওয়া যায় সকলে উঠে

সাধারণ গৃহস্থের ঘরে প্রথমেই (অনেক জায়গায় মুখ না ধুয়ে!) এক পেয়ালা চা খাওয়া হোল। তারপর একটু বেলা হোলে, মানে কর্তারা বেরিয়ে গেলে ছেলেমেয়েদের দিয়ে সামনের উৎকলদেশীয় তেলেভাজা দোকানের মালিকের কাছ থেকে কিছু গরম অথবা ঠাণ্ডা বাই হোক আনান হোল। তাই খেয়ে কিছু জল পানের পর অঘলের ঢেকুর উঠতে লাগল—ভাত তরিতরকারী ইত্যাদি ছ এক গ্রাস খাওয়া হোলোতো খুব হোল, তা না হোলে বি চাকরেরা নিয়ে গেল বাসায়। প্রায় সন্ধ্যার সময় কাপড় কাচার পর, চুল ধাধা হোলে আবার চা আর তার সঙ্গে বড় জোর ঘি-য়ে ভাজা (বেশী জায়গায় ভেজি-টেবল ঘি) খান তিন চার কচুরী কি সিদ্ধাড়া! তারপর সেই অঘলের সাক্ষাৎলাভ, কেউ সোডা খেলেন কারোর আবার কোন পেটেন্ট ওয়ুথ মজুত আছে।

হয়তো অনেকে ভাববেন এসব কথা বলবার স্বার্থকতা কি? এর স্বার্থকতা যে কি তা যেভাবে ইচ্ছে ভেবে দেখতে পারেন—তবে আমার বলবার উদ্দেশ্য হোচ্ছে—খাতির দ্বারা আমাদের শুধু যে জীবন রক্ষা হয় তা নয়, আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, সুখ, স্বচ্ছন্দ জাতির আশা ভরসা, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত জীবন সবই নির্ভর করে—তাকে আমরা যে কি রকম অবহেলা করছি তারই আলোচনা করবার জন্তে উপরোক্ত কথাগুলি বলতে হোল। মাত্র পঁচিশ বছর আগে যারা কলকাতার বাস

করে গেছেন, তাদের স্বাস্থ্য আর আজকের বাসিন্দার স্বাস্থ্যের কোনরূপ তুলনা কেন চলে না তার কারণ কি? —এ বিষয়ে আমার বলা কথা না শুনে নিজেরা একটু প্রত্যক্ষ করলে ভাল হয় বলে আমার বিশ্বাস, কারণ কথা শুনে সেটাকে কার্যে প্রতিফলিত করার চেয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করে কাজে লাগালে তার ফল অনেক বেশী হবে। তার সময় কই এই ত' সংসারের সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দেওয়া ভাল নয় কি—এতে পরিশ্রমই বা কি? থাক—আমি আবার আমার আলোচনার বিষয় বস্তুর বাইরে না চলে বাই সেই ভয় হয়। নিজেদের স্বাস্থ্য, যাতে করে নিজেরাই হব সুখী সে বিষয়ে যদি একটু সময় নষ্ট করা যায় সংসারের কাজ বজায় রেখে তাতে ক্ষতি কি। কর্ম প্রবণতা না যোগালে কাজে মন বসবে কেন। হ্যাঁ কি বলছিলাম—পঁচিশ বৎসর আগেকার মা বোনেদের স্বাস্থ্য আর এখনকার মা বোনেদের স্বাস্থ্যের এত ব্যতিক্রম কেন, তার কারণ তারা জানতো আমরা এখন থেকে যদি নিজেরা শক্ত ও সবল না হই, ভবিষ্যতে আমাদের সম্ভাবন সম্ভোগ হবে……এ কথা ভাবে কজন। পয়সা ফেললাম, খাবার—এল খেলাম। ভাল জিনিষ এল ভাল, না এল ভাল। যে দোকানদার পয়সা পেল শরীর হয়তো তার বেশ শক্ত, আর যারা তার দোকানের খাবার খেল, তাঁরা কেউ বা……অবাস্তব কথা বলাও বিধি নিষিদ্ধ—কথা সত্য বলবে, অপ্রিয় সত্যকথা বলবেনা, কিন্তু অপ্রিয় সত্য না বলার অভ্যাসে আমরাও যেমন কেমন হয়ে গেছি। চোরকে যদি চোর বলা যায় তবে অপ্রিয় সত্য বলা হোলো বলে কি সে চোর তার

ব্যবসায় চিরকাল সমান ভালে পা ফেলে চলবে। এ কি রকম কথা—কোনও ভিন্নরূপ ব্যক্তিকে যদি বলা হয়—আপনার ভিতরে অনেক রোগ আছে—সেজ্ঞত কি সে আমার গালি দেবে, না সে তার রোগ সারাবার ব্যবস্থা করবে না। যে যা ভাল বুঝবে, করবে—এইত হয়েছে আজকালকার ধর্মই বলুন আর কানুনই বলুন। আবার কোথায় এলুম—কি মুক্তিলা। সেই পুরানো কথায় আবার ফিরতে হলো, তা না হলো লোকে বলবে—গেল ধান বাগতে, গেয়ে এল শ্রীবের গীত। ভাল কথা। পচিশ বৎসর আগেকার মা বোনেদের স্বাস্থ্যের কথা ধরুন।

সকালে তাদের কিছু খাওয়া ঘটে উঠত না। দশটার পর কর্তারা সব অফিসে চলে গেলে—বেশীরভাগ স্থলে মুড়িমুড়কী, সন্দেশ (বাড়ীতে তৈয়ারী) ছিল জল খাবার। ইতিমধ্যে বাড়ীর কর্তারা বেরিয়ে গেলে পর, যেছুনী এসে হাজির হোত মাছ নিয়ে। আর কর্তারা বেরিয়ে যাবার পর এই আলাদা মাছ কেনা হোত। তার পর রান্নার পালা আর এক পর্ব হোত। ভাত খাওয়া শেষ হোত মাছ, সামান্য তরিতরকারী আর ছুধ-গুড় দিয়ে। বিকেলে জলখাবারের কোন হাঙ্গামা ছিল না আর চায়ের নামও বোধ হয় আন্দেক লোক শোনে নি। তখনকার খাবার আর এখনকার খাবারের তুলনা করলে দেখা যায়, মাছ আর ছুধ খাওয়া আমরা ছেড়ে দিয়েছি এবং চা দিয়েই বোধ হয় সে স্থল পূরণ করতে লেগেছি। অবশ্য এটাও ঠিক যে আধুনিক বাল্যলীর খাদ্য বলে যদিও ডাক্তারেরা এরকম তালিকা দিয়েছেন:—প্রাতে কিঞ্চিং মুড়ি, নারিকেল এবং অল্পরিত ছোলা ভিজান।

মধ্যাহ্নে ভাত দেড় পোয়া; ডাল, মংস্ত ও মাংস সর্বসমেত আধ পোয়া;

শাকসবজী আধ পোয়া; ঘৃত, তৈল, লবন ও মসলাদি প্রত্যেকটির আধ ছটাক করিয়া।

বৈকালে ছুধ আধ পোয়া এবং কিঞ্চিং সুপক ফল ও মিষ্টান্ন।

রাত্রে মধ্যাহ্নের অন্নরূপ (ভাতের পরিবর্তে তিন ছটাক ময়দা বা আটার রুটি খাওয়া যাইতে পারে)।

তবুও এই তালিকামুযায়ী কাজ করা যে আমাদের বর্তমানে আর্থিক অবস্থায় অসম্ভব তা স্বীকার করতে বোধহয় কেউ

সিধা বোধ করবেন না অবশ্য যারা মধ্যবিত্ত গেরস্থ। কাজেই এই ডাক্তারী মত বজায় রেখে কতদূর আমরা সুখাত্ত গ্রহণ করতে পারি তার একটা তালিকা (অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতামুযায়ী) আগামী সংখ্যায় দেব। আপনাদের যদি কিছু সেই তালিকার সম্বন্ধে বলবার থাকে তো জানানোবেন সে সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা করা হইবে ও আপনাদের যদি কোন ব্যক্তিগত মত প্রকাশের ইচ্ছা থাকে তা জানানোবেন।

নিউ থিয়েটার্সের অপূর্ব সুন্দর বাণী-চিত্র



মনোমুগ্ধকর গানগুলি

কানন দেশী

JNG { তোমারে হারাতে পারি না 'স্বাধী' JNG. { রাখাল রাজা রে 'স্বাধী'
5310 { সোনার হরিণ আয়রে আয় 'স্বাধী' 5319 { পায়ে চলার পথের কথা 'স্বাধী'
নিউ থিয়েটার্স-মেগাফোন রেকর্ডে শুধুন : মূল্য ২৮০ প্রত্যেকখানি

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের 'খনা' বাণীচিত্রের শ্রেষ্ঠ গানগুলি

শ্রীমতী ছান্না দেশী

JNG. { শুক পাখীরে বল 'খনা' JNG. { ঘুমের কাজল তোমার চোখে 'খনা'
5330 { ঘুমিয়েছিল অঙ্গনে তার 'খনা' 5331 { ছান্না দেশী ও ধীরেন দাস
যুগ যুগ ধরি 'খনা'

ভবানী দাস

JNG. { অন্ধরাতের পথিক ওরে 'খনা'
5329 { ফুলনলিনী
সুন্দর মধু রাতে

মেগাফোন রেকর্ডে শুধুন

মূল্য ২৮০ প্রত্যেকখানি



মেগাফোন কলিকাতা



(বিলাসী)

সাধী

‘সাধী’—যে ছবির হিন্দি সংস্করণের নাম ‘স্ট্রীট সিন্ধার’ তা ভারতবর্ষের বহু স্থানে মুক্তি পেয়েছে। সমস্ত স্থান হতেই আমরা ছবির প্রভূত সফলতার খবর পেয়েছি। সে সব জায়গায় দর্শকগণের মুখে মুখে কানন সায়গলের গান শোনা যাচ্ছে। গল্পের নূতনত্বে, চরিত্র মাধুর্য্যে প্রয়োগ চাতুর্য্যে ‘স্ট্রীট-সিন্ধার’ প্রত্যেক দর্শককেই চমৎকৃত করেছে। কানন সায়গলের গান ও রাইচাঁদ বড়ালের এমন মিউজিক পূর্বে আর নাকি তারা শোনে নি।

এই ছবিই—এরই বাংলা সংস্করণ ‘সাধী’ মুক্তি পাবে চিত্রায় ও নিউ সিনেমায় আগামী ৩রা ডিসেম্বর। ম্যামার কুইন, সৌন্দর্য্যের ফুলরাণী কানন—ক্লার বোর আবেদনে, যে ওয়েস্টের মুগ্ধ করা ‘ভক্তিমায়া’, গ্রেস মুরের, উদাস্ত কণ্ঠস্বরে, ‘জোয়ান

মতামত গ্রহণ তাঁদের উপদেশ গ্রহণ বহুবিধ প্রচেষ্টাই দেখি। অতিরিক্ত আলোচনা হলে বেতার প্রোগ্রামে কয়েকটি নাম করা শিল্পীর নাম দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের অল্পপস্থিতিতে রেকর্ড বাজে। কয়েকটি নাম করা শিল্পী প্রোগ্রামে থাকলেই শুধু প্রোগ্রাম ভালো হয় না। ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালক এর কি প্রতিভার করছেন?

ক্র্যাফোর্ডের অভিনয়ে, জিনজার রোজাসের নৃত্য ছন্দে ছায়াচিত্র ‘সাধী’র সর্বোচ্চ ভেয়ে রেখেছে। ভারতের চলচ্চিত্রের অত্যন্তম শ্রেষ্ঠ গায়ক সায়গল বাংলায় এত ভাল গান আর নাকি গায়নি। ‘অমর মল্লিক ও শৈলেন চৌধুরী, এই ছবিতেই অভিনয় করেছেন।

‘সাধী’র গল্প সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। একটি পথের ছেলে ও একটি পথের মেয়ের জীবনের ইতিহাস। কেমন করে ধাপে ধাপে তারা উঠল—পায়ে পায়ে তারা পথের প্রত্যেক ধূলিকণাটাকে চিনল—জ্ঞার কোথায় গিয়ে পৌঁছল এরই কথা নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও অঁতি সরস করে শোনাবার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে কোন উৎকট বিভীষিকাময় নাটক নেই, কাল্পনিক উগ্র ও হিংস্র চরিত্র নেই, রোমান্সের নাম দিয়ে রামধনু দেখানো কিছা, বৃকেতে কেয়ার কাঁট, বৈধানো, কিছুই নেই। আছে একটি সহজ সরল গল্প, কয়েকটি সত্যিকার নির্মূত চরিত্র, ও আমাদের জীবনের প্রতিদিনকার নাটক।

কৃতি পরিচালক ফণি মজুমদার উত্তরুপ চিত্রই ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছেন ও এইবার বাংলা দেশকে দেবেন।

অধিকার (বাংলা)
হিন্দি অধিকার বাংলার বাইরে এখন ভাল ভাবেই চলছে আর সকলের প্রাণসংগে পেয়েছে। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর বাংলা ‘সাধী’ চিত্রায় তিন সপ্তাহ চলবার পর

বাংলা অধিকারকে অধিকার দেবে বলে শোনা যাচ্ছে অর্থাৎ বড়দিনের আসরে চিত্রায় নবমুক্ত ‘অধিকার’ আর নিউ সিনেমায় ও সপ্তাহের পুরণো বাংলা সাধী চলবে।

দুশ্চরিত্র (হিন্দি)

রেডিও স্টেশনের দৃশ্য এখনও তোলা হচ্ছে। অসময়ে এসেও মোহন (সায়গল) মধুর সঙ্গীতে সকলকে ঠাণ্ডা ক’রতে পারছে। কেউ কেউ বলে এতে নাকি একটু সঙ্গীত সাধক প্রভৃতির আত্মচরিতের আভাস আছে।

শ্রীমতী লীলা বড় এক নাচ গানের আসরের মহলা দিচ্ছেন অবশ্য শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায়।

অভিলাষ

মাধবীর প্রিয়-সাধী মনোরমার কথা আপনারা জানেন। শুধু সমবয়সী বোলেই নয়, নিজের চরিত্র মাধুর্য্যে সে ছিল সত্যি বিধবা মাধবীর সুখ দুঃখের অংশ ভাগিনী।

পশ্চিমের কাছাকাছি একটি সহরে, সুদৃশ্য একটি বাড়লোতে বাস করে মনোরমা ও তার স্বামী।

কথায় বলে—‘যেমন দেবা, তেমনি দেবী!’

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর
নবতম পৌরাণিক চিত্র-কাহিনী

জনক
নন্দিনী

রূপবাণী-তে

আগতপ্রাপ্ত

উত্তরায়

প্রশংসা-মুখরিত

৪র্থ

সপ্তাহে

বর্ষ-শেষের

অবিস্মরণীয়

নিবেদন—



খনা

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নবতম চিত্র-কথা

= অভিসারিকা =

অশ্রু-জলের স্মৃতি-তর্পণ

শ্রেষ্ঠাংশে : অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া

হাস্য-রসের অনাবিল প্রবাহ!

শ্রেষ্ঠাংশে : ধীরেন গাঙ্গুলী ও সাবিত্রী

*

*

*

*

আনন্দবাজার :—“অহীন্দ্র চৌধুরী বরাহের ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। সমগ্র ছবির খানিক রূপে, রসে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন নায়িকা খনার ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া।”

Advance :—“The story has been well developed and beautifully presented against the well conceived spectacular scenes which give it an authentic atmosphere.”

বেঙ্গালী :—“কালোপযোগী দৃশ্যপট, সাজপোষাক এবং আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে, নানারূপ রসের সংঘাতে ছবিখানি উপভোগ্য হয়েছে।”

Dipali :—“The story has been very neatly told on the screen and the climax of the picture have been ably handled.”

বাঙলা :—“অনেক প্রতিষ্ঠানের অনেক ছবির চেয়ে দর্শনোপভোগ্য হইয়াছে এবং প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করিতেছে।”

দীপালী :—“আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলার দর্শকবৃন্দ ‘খনা’ দেখিয়া সন্তোষভাজ করিবেন।”

ভদ্রদূত :—“মেট্রোপলিটানের শ্রীমতী সিনেমার শিল্প-সজ্জারূপে ঢালাই করিয়া ‘ইহাকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছেন।”

সচিত্র শিল্পি :—“বরাহের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ও হয়েছে তেমনি কিংবা ততোধিক উল্লেখ যোগ্য। শেষ কয়টি দৃশ্যে তিনি অপরূপ অভিনয় করেছেন।”

Hindusthan Standard :—“Khana would not fail to draw good houses at Uttara for some time to come for its brilliant settings and well-decorated exteriors.”

ভাতারন :—“নিছক আমোদ প্রমোদ হিসাবে ছবিখানি আমাদের সভ্যই আশাভীত খুসী করতে পেরুচ্ছে। রসসৃষ্টির দিক থেকে খনার কাহিনীটি বেশ সার্থক হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করার প্রচুর উপকরণ এর মধ্যে আছে এবং এই কারণেই এর সাকল্য সুবিন্দু আমরা নিঃসন্দেহ।”

Varieties :—“Good acting and soothing music would draw the crowd. Most of the songs have

been soothingly tuned up.”



মনোরমা ও তার স্বামী—ছুটিতে যেন মানিক-জোড়! মান-অভিমান ও হাঙ্গ কোলাহলের হোঁচড়াচ লেগে এদের দাম্পত্য জীবন নিত্য মুখর হোয়ে আছে।

এই ছুটি রস-মধুর ভূমিকার উপযোগী 'আর্টিষ্ট' নির্বাচনে পরিচালক মল্লিক মশাই সত্যিকারের রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

মনোরমা—যেনকা এবং তার স্বামী—তাহু বাবুভো! ৷

সম্প্রতি এই ছুটি মাণিক-জোড়ে পশ্চিমের বাঙালোটি সরগরম কোরে তুলেছেন।

দিন এমনি যায়.....

হঠাৎ মাধবীর একখানা চিঠি এসে পড়লো মনোরমার কাছে। চিঠির অংশ-বিশেষ নিয়ে স্বামীজীর মধ্যে শুরু হোল বাক-বিতণ্ডা। দেখতে, দেখতে চায়ের পেয়ালায় উঠলো বজ্র।

সত্যি মনে আজ এই প্রশ্নই ওঠে—কী এমন কথা মাধবী চিঠিতে লিখেছিল, যার জন্তে মনোরমা ও তার স্বামীর মধ্যে ছোট্ট একটি প্রহসনের অভিনয় হোয়ে গেল?

এর জবাবে, মল্লিক মশাই আমাদের জানিয়েছেন, বড়দিদি ছবিয় এই অংশটুকু বন্ধন পর্দার গায়ে প্রতিকলিত হবে, তখনই এরহস্তের ঘারোদঘাটন কোরতে আপনারা পারবেন।

অতএব, ধৈর্যধারণ করাই বিধেয়।

সাপুড়ে

পরিচালক দেবকীবাবু, বেচারী বেদে-হেদিনীদের নিয়ে অনেক খেলাই খেললেন। হালে আবার শুরু 'হে'বার উপক্রম হ'য়েচে এক নতুন খেলা—দিলু-খোলাদের আড্ডায়।

এতকাল ধরে, অনেকরকম আড্ডার নাম আমরা শুনে এসেছি। কিন্তু হালের আমদানী—এই 'দিলু-খোলাদের ডেরা'—একদম নতুন!

বড় বড় গাছের উপর ডালপালার মাঝে লতা-পাতার কুটির। গাছের আশে-পাশে ও নীচে—নানা-জাতের 'ঘর-বাড়ী'। লতা শুক্মে আচ্ছাদিত সারা স্থানটির মধ্যে বেশ একটা সহজ শাস্ত্রী আছে—যা' লোকালয়ে সচরাচর নজরে পড়ে না। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর, গাধা ও ঘোড়া থেকে আরম্ভ কোরে নানাজাতের গৃহপালিত জীব-জন্তুও এই ডেরাটির আশে পাশে স্থান পেয়েচে।

সাপুড়ে সর্দারের সাকরদের দল, এই মিলন কেন্দ্রে এসে বিশ্রাম সুখ লাভ করে।

এরাই 'দিলুখোলা'! নীল আকাশের বুকে এক ঝাঁক মুক্ত-স্বাধীন পাখীর মত সচ্ছন্দগতি!

এই দলটি গঠন কোরতে পরিচালক দেবকীবাবু এবং কর্মসচীব ছোটাইবাবুকে শুনলুম বিশেষ বেগ পেতে হ'য়েচে।

এই দলে আহেন একদল বিখ্যাত নাচিয়ে এবং একদল কোঁতুকাভিনয়ে পারদর্শী ভূখোড় অভিনেতা।

এদের নামের তালিকা এই:

নৃত্য-শিল্পী: মণি বর্দন, ইন্দ্র বোস, ব্রজবাসী, ব্রজ পাল, খেমচাঁদ এবং রতনলাল।

কোঁতুকাভিনেতা: হরিদাস বন্দ্যো: (গ্রামোফোন), আব্বাউদ্দিন 'সরকার (মেগাফোন) এবং আগা থা (করিমিয়ান)।

কপালকুণ্ডলা

পৃথিবী অন্ধকারময়ী। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত মিলিত হবার জন্ত অতি দ্রুত পদ বিক্ষেপে পথ চলেছেন। অতি দূর হতে শৃগালের চিৎকার, কিঁকিঁর ডাক অন্ধকারের অপরিচিত প্রাণীগণের কণ্ঠের আওয়াজ। নবকুমারকে প্রতি মুহূর্তই উদ্বিগ্ন করে দিচ্ছে। এক চিন্তা ভিন্ন পথের কোন চিন্তাই মনে স্থান নিচ্ছে না।

অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁর চরণ স্পর্শ হোল। পদভরে সে বস্ত্র খড় মড় করে ভেঙ্গে গেল। নবকুমার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, পুনর্বার পদচারণা করলেন পুনরায় ঐরূপ হোল। অন্ধকারে পদস্পর্শে বস্ত্রতে হস্ত স্পর্শে জানলেন এটি একটি তক্তাভাঁড়া।

তারপরের খবর 'কপালকুণ্ডলা' ধারা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন। এটি একটি ভগ্ন শিবিকা, তবে কপালকুণ্ডলার নয় মতিবিবির। নবকুমারের পরিচয় হোল বস্ত্র দ্বারা দৃঢ়তর বন্ধনযুক্ত সুন্দরী, ঈষদীর্ঘাঙ্গী, বর্ষাকালে বনবিটপীলতার স্নায় শোভাময়ী মতিবিবির। মতিবিবি উদ্ধার পেলেন।

এই দৃশ্যই সেদিন পরিচালক ফণি মজুমদার অতি বিচক্ষণতার সহিত পরিচালনা করলেন। ক্যামেরাম্যান দিলীপ গুপ্ত অতি যত্ন সহকারে এ ছবি তুললেন।

জনক নন্দিনী

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর রামায়নী গাথা অবলম্বনে এই নূতন ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নদীতীরের দৃশ্যগুলি ভাল ভাবেই নেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে

পৌরাণিক ছবির প্রযোজনা করে রাধা ফিল্ম বাংলার চলচ্চিত্র জগতে আজ যে খ্যাতি অর্জন করেছে—জনম-দুঃখিনী জানকী এবং শ্রীরামচন্দ্রের যৌবনের সৌর্য্য-বীৰ্য্য-ভরা প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে চিত্রিত এই

জনক

নন্দিনী

সে গৌরব শতগুণ বাড়িয়ে তুলবে

মাঝির (বীরেন দাস) কাঠের নৌকা সোনার হয়ে গেছে। মাঝি ও তার স্ত্রী (গীতা) পারিবারিক ছোট খাট স্বপ্নের কৌতুকপূর্ণ রস পরিবেশনে পরিচালক ফণী বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ দৃষ্টি দিয়েছেন। এখন বিশ্বামিত্রের (অহীন্দ্র চৌধুরী) যজ্ঞের ও তাড়কা বধের দৃষ্টের ব্যবস্থা হচ্ছে।

যথের ধন

দেউ ইন্ডিয়া পিকচার্সের যথের ধনের কাজ আস্তে আস্তে এগুচ্ছে।

পরশমণি

শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'পরশমণি' পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের নেতৃত্বে তোলা হচ্ছে। প্রধান অংশে শ্রীচুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতা জ্যোৎস্নাকে দেখা যাবে।

"ধনা"

"উত্তরা" চিত্র গৃহে এই শনিবার হইতে মেট্রোপলিটান পিকচার্স-এর "ধনা" ও

হাসির ছবি "অভিসারিকা"—চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করিল।

সামাজিক বা অপরাধের ছবির বিষয়-বস্তুর তুলনায় খনা-চিত্রের বিষয়-বস্তুর যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে খনা দেবীর অলৌকিক জীবনী ও সাধনার কথা ও তাঁহার অপেক্ষা অলৌকিক আত্ম-বলিদানের কাহিনী, এমনভাবে জড়াইয়া আছে যে বাঙলার নর-নারী মাঝেই তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ না করিয়া পারে না।

অহীন্দ্র চৌধুরীর সাবলীল ভাবাভিব্যক্তি ও অভিনয় এবং শ্রীমতী ছায়া দেবীর অভিনয় ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া নাটকের বাস্তবিক মূর্তি হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং অপরাধের বিষয়-বস্তুর তুলনায়, এই চিত্রের আকর্ষণ ক্ষুদ্র হইবার নহে।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার থেকে পূর্ণ থিয়েটারের 'দেশের মাটি' চিত্রখানি মুক্তিলাভ করবে।

সিনেমা শিল্পের ভেতর দিয়ে দেশের যদি প্রকৃত উপকরণ সাধন করবার এ অবধি কেউ চেষ্টা করে থাকেন তা' একমাত্র নিউ থিয়েটার্স-এর লক্ষ্য হ'তে নীতীন বন্দু। তিনি যে ধরনের ছবি তোলেন, তা শুধু নিছক আনন্দের জন্ত নয়—তার মূলে থাকে একটা মহৎ উদ্দেশ্য এবং চলচ্চিত্রে তাই নূতন রূপ, নূতন জ্ঞানে মূর্তি হয়ে উঠে, দেশের লোকের চিন্তা শক্তির দ্বারা এসে থাকে দিয়ে তাদের ক'রে তোলে সচেতন। পল্লীমায়ের কোল ছেড়ে সহস্রের মোহগ্রস্ত লোকদের জীবনে যে কী হাহা-কার তুলছে তা' ভুক্তভোগী মাঝেই অবগত আছেন।

চিত্রা

কোন : বি, বি, ১১৩৩

শনিবার ওরা ডিসেম্বর হইতে

সাথী

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর হইতে

অধিকার

দুইদিন পূর্বে সিট রিজার্ভ করুন

নিউ সিনেমা

খন্দভলা * কোন : কলি : ৫৮১৯

শনিবার ওরা ডিসেম্বর হইতে

নিউ থিয়েটার্সের নৃত্য-গীত-মুখর চিত্র

সাথী

সাথী

দুইদিন পূর্বে সিট রিজার্ভ করুন।

বিব্রিধ

শোক সভা

৮৩নং মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটে গোপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে সাহিত্য সেবক সমিতির উদ্যোগে এক শোক সভা হয়। “বিচিত্রা” সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, সহপাঠি এবং সাহিত্য-সেবক সমিতির সহ-কর্মী হিসাবে গোপেনবাবুর সঙ্গে মিশিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে প্রধান উপাদান ছিল ভক্ততা, অমায়িকতা এবং সত্যনিষ্ঠা। গোপেনবাবু একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসুহাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং সাহিত্যালোচনায় বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য সেবক সমিতির অপূরণীয় কতি হইল।

অধ্যাপক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া গোপেন বাবুর

‘দেশের মাটি’-র অভিনয়াংশ ও সঙ্গীতাংশ হয়েছে অতুতপূর্ব্ব। সরলা গ্রাম্য বালিকা গৌরির ভূমিকায় উমা ও সহরে আত্মভোলা যুবতী অরুণার ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয়, ‘দেশের মাটি’-র প্রাণ সন্ধারে বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছেন। গান গেয়েছেন এ ছবিতে উমা, সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র ও পঙ্কজ। এদের সকলেরই গান পর্দার ওপর এক সুসজালের সৃষ্টি, কর্ণ-সুহর পরিভূৎকর।

—:—



গোপেন্দ্রনাথ মিত্র

চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার জ্ঞান-নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া গোপালবাবু বিশেষ মুগ্ধ হন এবং তাঁহাদের বন্ধুত্বের স্তম্ভপাত হয়। বক্তা সমবেত সভ্যদের নিকট গোপেনবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ কাহিনীর সন্নিহিত বর্ণনা করিলে উপস্থিত ভক্তমহোদয়গণ বিচলিত হন।

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গোপেন্দ্রনাথের কর্মনিষ্ঠা ও পরের জন্ত সহায়ত্বের প্রশংসা করেন।

সভায় শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, অদিতেন্দ্রনাথ মিত্র, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কে, পি, রায়, বীরেন্দ্রলাল ধর, নারায়ণদাস ভট্টাচার্য্য, অপূর্ব্বকুমার ভট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্রলাল রায়, সম্মোহন মুখোপাধ্যায়, শিশু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

‘মেঘমুক্তি’র সুবর্ণ-জয়ন্তী

গত রবিবার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্য রচিত ‘মেঘমুক্তি’র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সাড়বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মধু বসু, শ্রীমতী সাধনা বসু, শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জি, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

‘দেহ-যমুনা’ নামে ‘মেঘমুক্তি’ ‘খেরালী’তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিধায়ক বাবু উদীয়মান লেখক হিসাবে বহুদিন হইতে আমাদের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার রচিত এই নাটকের সাফল্যে আমরা প্রীত এবং তাঁহাকে আমরা সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার লেখনী অক্ষয় হউক।

ভাইবোন-প্রীতিসম্মিলনী

সেদিন সন্ধ্যায়—মানে ৮ই অক্টোবর বিয়ুৎ-বারের, বারবেলাটি আমাদের চমৎকার কেটেছে একটা চমৎকার আসরে। ব্যাপারটি

জনক
বেন্দিনী

পরিচালনা কচ্ছেন : ফণী বস্মা

চিত্রগ্রহণ কচ্ছেন : প্রবোধ দাস

শব্দযন্ত্রী হচ্ছেন : নৃপেন পাল
ভূপেন ঘোষ

হচ্ছে কবি প্রভাতকিরণ বসুর সম্পাদিত শিশুমাসিক “ভাইবোনে”র। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিতবর অশোকনাথ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস। উপলক্ষ্য ছিল পদক ও পুরস্কার বিতরণ, কিন্তু লক্ষ্য ছিল অনেকগুলি তরুণ গায়ক-গায়িকা ও কলাবিদদের উৎসাহ দেওয়া। সভাপতি মশায় অভি-ভাষণে বলেন :—“ভাইবোনের কাকাবাবু এবং আমাদের দাদামশায় অর্থাৎ প্রভাতদা আজ যে রস পরিবেশনের আয়োজন করেছেন তা আমাদের পক্ষে উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু ছেলেদের মন আর বড়দের

উৎসাহহৃৎক বাণী ও বিবরণ করলেন কি বলে।

স্থানাভাবে বহুলোককে ফিরতে হয়েছে, বহু সম্মানিত অতিথিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকতে হয়েছে এবং কষ্টসহকারে উপবিষ্ট থাকবার দুঃখ বোধ করতে হয়েছে—এটা ভাইবোনের জনপ্রিয়তা ও প্রচারের নিদর্শন হ’লে—কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের অহরোধ ভবিষ্যতে এবারকার মতন বার বার ক্রটি স্বীকারে কর্তব্য শেষ না ক’রে বৃহত্তর হল-এ যেন আসরের ব্যবস্থা করেন। ভাইবোনের গ্রাহকগ্রাহিকারা যে কৃতিত্বের

নিবেদন

অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়

যুগে যুগে তুমি এস গো প্রিয়া
আমার হৃৎকের রাগিণীতে,
থেকে তুমি কাছে হিয়ার মাঝে,
আমার মধুর বামিনীতে।

নব বসন্তে, কোকিলের সাথে,
গেয়ো গো তোমার গান,
অরুণ আলোকে অরুণ প্রভাতে
ধরিও তোমার তান।

নিকষ কালোর শতধা মাঝারে
নিভুতে আমারে ঢেকে,
সবার আড়ালে অস্তরে তুমি
নিয়োগে আমাতে ঢেকে।

অসীমের মাঝে তুমি যে সসীম
আসুছি তাইত কাছে,
তুমি যে বাঁধিবে অসীমের সাথে
তাইত রয়েছি পাশে।

—:—

মিলন

শুক্রবার ১৮ই নভেম্বর রাত্রে বাংলার অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বাংলা কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয়কে তাঁহার ‘রঞ্জনী’-গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীযুক্ত বসু সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। বসু-সরকারের এই মিলন বাংলা কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে।

মন এক নয় সেটা বোঝা গেল খেয়াল গানের সময় তাদের কলকাকলীতে, আর হরবোলায় ডাকের সময় নিশ্চুপতায়। তাদের উপযোগী রসপরিশনের দায়িত্ব বড় কম নয়, সে তার ভাইবোনের মারফৎ ভালোভাবেই বহন করছেন তাঁর সম্পাদক। “আমরাও অবশ্য এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু ধৈর্য্য বলতে হয়, সভাপতির দেড়-হাজার লোকের ভিড়ে রাত সাড়ে দশটা অবধি বিস্তৃত প্রোগ্রামে মনঃসংযোগ করা—সেও ত’ শিশুসাহিত্যের দায়িত্বের মতন কঠিন। আমাদের খটকা লেগেছে এইখানে যে বে-শাস্ত্রী মশায় ‘নৃত্য’র ভীষণ বিপক্ষে তিনিই সেদিনকার নৃত্যগুলি বেশ দর্শনেনেই উপভোগ করছিলেন এবং সে সময়ে

পরিচয় দিয়েছে তাতে বাইরে থেকে শিল্পী আনবার প্রয়োজনই হবে না—আমাদের ধারণা। সম্পাদক গোপনে কিছু মিউজিকের ব্যবস্থা করলেও আমরা খুসি হব। আর যশোলিপ্সুদের বালমূলত চাপল্যকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তাঁর অপূর্ণ আবৃত্তি থেকেও তিনি বেশ আমাদের বঞ্চিত না করেন। আমরা কামনা করি বঙ্গবর প্রভাতকিরণের ঋণীতি যেমন সুদূরবিস্তৃত,—তেমনি প্রচারিত হোক ভাইবোন পত্রিকা দেশের শিশুজগতের দিকে দিকে।

সিঃ দ্রঃ—বেকার নাশন শব্দ বিভ্রাসের ১নং প্রতিযোগীতার ফলাফল অনিবার্য কারণ বশতঃ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না। আগামী সংখ্যাহে প্রকাশিত হইবে জানান বাইতেছে।
ম্যাঃ বেঃ নাঃ

উদ্যত

নন্দিনী

কথা-চিত্রের ভূমিকাগুলিকে রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী, দেববালা, ছায়া, রাজলক্ষ্মী, অহীন্স চৌধুরী, অহর গাঙ্গুলী, ঝুঁবি রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সুশীল রায়, মৃণাল ঘোষ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জানকী ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।



অসুস্থ
শরীর



দুস্থ ও পবল

করিতে



সিরোলিন

'রাচি'

অদ্বিতীয়

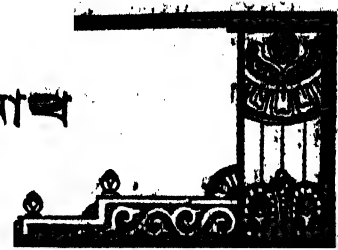
ইহা সর্দি, কাশি এবং ফুসফুসের
প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ।





শরৎচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ

শ্রীহরোষচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়



শরৎচন্দ্রের দ্বিধা ও মধুর জ্যোৎস্না [১০০ ইন্দ্রনাথের] প্রাণরক্ত চরিত্র তাঁহার এক অপরূপ সৃষ্টি। আত, হৃৎখী ও নিপীড়িতের একান্ত দরদী, বন্ধু এই ইন্দ্রনাথ ছিলেন দুঃখের ও অত্যাচারীর নিপীড়ক। ধর্ম ছিল তার পরম বিশ্বাস। হৃৎসাহসিক কার্যে ছিল তার প্রাণের ক্ষুধা। এই অনবদ্য চরিত্র তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাহাকে কেন্দ্র করিয়া 'ইন্দ্রনাথের' সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার কার্যাবলী ঐক ইন্দ্রনাথেরই অনুরূপ। বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। তাঁহার নাম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ওরফে রাজু-দা। তিনি ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার রামরতন মজুমদারের পুত্র ও সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ মজুমদারের সহোদর।

শরৎচন্দ্রের মাতামহের পিতা বামধন গঙ্গোপাধ্যায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হালিসহর হইতে আসিয়া ভাগলপুরে বসবাস করেন। গঙ্গার উপরেই তাঁহার বাড়ী।

ভাগলপুরে বাঙ্গালী টোলার দুর্গাচরণ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে শরৎচন্দ্র ১৮৮৭ সালে একাদশ বর্ষ বয়সে ছাত্রত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে তিনি কিছুদিন দেশে ফিরিয়া যান এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তেজনারান জুবিলী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। বিখ্যাত অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ুল পাণ্ডিত্যের নিবাসী হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, তখন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৫

সালে তিনি প্রবেশিকা পরিকায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহার সহপাঠী।

রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন তাঁহার প্রতিবেশী। রাজুদার আর এক সহোদর শ্রীমণীন্দ্রনাথ মজুমদার শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। তিনি জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। রাজুদা ছিলেন তাঁহার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। রাজুদা ৪২ বৎসর পূর্বে সম্রাট অবলম্বন পূর্বক গৃহত্যাগ করেন। শুনা যায় তিনি ডেরাদুনে আছেন।

কিছুদিন পূর্বে মণীন্দ্রনাথের গৃহে বসিয়া শরৎচন্দ্র ও রাজুদার বাল্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় মণীন্দ্রনাথ তাঁহার আনালায় তিস্তার দিয়া গঙ্গার উপরেই অদূরে এক প্রাচীন অখণ্ড বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, 'শরৎ সিরাজেন, রাজুদা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কত কাহিনীই না এই বৃক্ষটির সহিত জড়িত আছে। বৃক্ষটি এখনও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। ১৮৫৬ বৎসর পূর্বের কথা। ইহারই নীচে রাজুদার একখানি ছোট ডিলী বাঁধা থাকিত। আর গাছের একটা ডালের উপর রাজুদা মাতুল দিয়া একটা কুটির নির্মাণ করিয়া ছিলেন। লেই খামেই তিনি বাস করিতেন। একটা দেবতার মূর্তিও তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। ধর্ম তাঁহার প্রণাম্য ছিল।

সেই গৃহখানি ছিল ঐক অখণ্ড উপরেই। একটি বাঁধ লাগাইয়া অনেক

আজ শরৎচন্দ্র বঙ্গের আকাশ হইতে ভিরোহিত হইয়াছেন। তাঁহার জীবন রহস্য এখনও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই। বাল্য ও যৌবনে তিনি সকলের অলঙ্কার অদ্বিত, অখ্যাত ও ভবঘুরের জীবন বাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বৈচিত্র্যময় জীবন এখনও রহস্যে আবৃত। তিনি বাল্য ও কৈশোর ভাগলপুরে অতিবাহিত করেন। সেই স্থানেই মাতুলদ্বয়ে তাঁহার সাহিত্যস্বপ্ন সূচিত হয়। তাহার পর তিনি কিছুদিন মজুমদারপুরে অতিবাহিত করেন। সেখানকার জমিদার মহাদেব প্রসাদ সাহর সহিত তিনি কিছু দিন বাস করেন। তিনিই শরৎচন্দ্রের অমর লেখনী প্রবৃত্ত জীবাক্ষের প্রথম পর্বের 'কুমার বাহাদুর'। অশ্বিনের বিখ্যাত চিত্রে তিনি মজুমদারপুরের অশ্বিনের যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন।

সেই গৃহখানি ছিল ঐক অখণ্ড উপরেই। একটি বাঁধ লাগাইয়া অনেক

উপর দিয়া সেখানে যাইতে হইত। রাজেন্দ্রনাথ বলিতেন যাহারা পুণ্যাত্মা তাহারাই কেবল সেই গৃহে যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র ও মনীন্দ্রনাথ কেবল সেখানে যাইতে পারিতেন। কারণ তাঁহারা এত উত্তম সাতার জানিতেন, যে তাঁহারা জানিতেন যে জলের মধ্যে পড়িয়া গেলেও তাঁহারা ডুবিবেন না।

রাজেন্দ্রনাথ সেই ঘরের মধ্যে একটি হাড়ীতে একটি কেউটে সাপ পুষিয়া ছিলেন। একটি ফুটা করিয়া হাড়ীর মধ্যে সাপকে ছুখ খাইতে দিতেন। একদিন তাহার ভ্রাতা ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়া দূর হইতে হাড়ীটা ভাঙিয়া সাপটা তাড়াইয়া দেন।

গঙ্গায় উপরেই তাঁহাদের বাড়ী, সেই অশ্বখ বৃক্ষের ঠিক পূর্বদিকে। সেখান হইতে অর্দ্ধমাইল উত্তরে জেলেরা গঙ্গার এপার হইতে ওপার পর্যন্ত মহাজাল পাতিয়া মাছ ধরিত। সেখানে গঙ্গার প্রবল স্রোত।

একদিন সন্ধ্যার পর রাজেন্দ্রনাথ, মনীন্দ্রনাথ ও ভূতাকে ডিকী লইয়া সেই স্থান হইতে মৎস আহরণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার হুকুম অমান্য কুরিবার সাহস কাহারও ছিল না। তাঁহারা সেখানে গিয়া দেখেন ভীষণ স্রোতের বিপক্ষে বড় বড় মাছ লাফাইয়া পড়িতেছে। এক একটার ওজন আধমন ক্রিশ সের। দুই তিনটা মৎস তাঁহারা অতি কষ্টে নৌকায় তুলিলেন,—তাঁহাদের লেজের তাড়নায় তাঁহাদের শরীর লাল হইয়া উঠিল। তাহাদের আশ্চর্য্যেরে ক্ষুদ্র ডিকী ডুবিল উপক্রম। শব্দ শুনিতে পাইয়া ধীরগণ একখানি নৌকা করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাবন করিল। তাঁহারাও ক্রমবেগে নৌকা চালনা করিতে লাগলেন। কিয়ৎকাল

পরে ধীরেরা তাঁহাদের নৌকা ধরিবার উপক্রম করিল। তখন তাঁহারা নৌকা ডাক্তার বাধিয়া মৎস ফেলিয়া পলাইয়া আসিলেন। এই কাহিনী শুনিয়া রাজুদা ‘কাপুরুষ’ বলিয়া তাঁহাদিগকে দুই চড় বসাইয়া দিলেন।

পরদিন রাত্রে রাজেন্দ্রনাথ নিজে মৎস আহরণে চলিলেন। শরৎচন্দ্র ও মনীন্দ্রনাথও সঙ্গে চলিলেন। পূর্ষদিনের সন্ধান পাইয়া ধীরগণ অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ ছিল। মৎসের শব্দে তাহারা দুই তিন খানি নৌকা লইয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাবন করিল। ধীরগণের নৌকা যখন নিকটবর্তী হইল তখন রাজেন্দ্রনাথ বৈঠা তাহাদের নৌকার গায় লাগাইয়া সজোরে ঠেলিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র ডিকী তাহাতে অনেকদূর আগাইয়া গেল। এইরূপে নৌকা যখন অশ্বখ বৃক্ষের তলে আসিয়া পৌছিল তাঁহারা তিনজনে দ্রুতপদে মৎস লইয়া গৃহমধ্যে অস্তিত হইলেন। ধীরগণ রাজেন্দ্রনাথ ও মনীন্দ্রনাথের পিতা রামরতন বাবুর নিকট নালিশ করিল। তিনি পুত্রগণকে তিরস্কার করিয়া ধীরগণকে একটি টাকা দিলেন। তখন মৎসের সের দুই আনা। তাহারা টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

যে বৃদ্ধ শূকর ও সর্প সঙ্কুল ক্షাচ বন মধ্যে ইন্দ্রনাথ স্রোতবেগে অতিক্রম করিয়া ডিকী লইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি ধীরগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্ত প্রবেশ করিতে তাহা একান্ত কাল্পনিক নহে। তাহা ছিল এই অশ্বখ বৃক্ষের আশমাইল দক্ষিণে।

এতাদৃশ বিষয়সঙ্কুল অবস্থায় মৎস আহরণের কোন প্রয়োজনই ছিল না। এই মৎস সংগ্রহের অন্তরে ছিল রাজেন্দ্রনাথের বালসুলভ চপলতা ও হাস্যাহাসিক কৰ্ম প্রবৃত্তি।

শরৎচন্দ্র ভাল ফুটবল খেলিতে পারিতেন, তিনি ফরওয়ার্ড লাইনে খেলিতেন। একদিন সন্ধ্যায় সদলে মাঠ হইতে ফিরিতেছেন, রাজেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও সঙ্গে আছেন। শরৎচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন—কে কতদূর পা উঠাইতে পারে? সকলেই সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন, কেবল রাজেন্দ্রনাথ নীরব রহিলেন।

একটু অগ্রসর হইয়া রাজেন্দ্রনাথ চৌমাথার মোড়ে দীর্ঘকায় একজন হিন্দুস্থানী মিলিটারী পুলিশ পাহারা দিতেছিল দেখিলেন। রাজেন্দ্রনাথ পা উচু করিয়া তাহার টিকিতে লাগাইলেন। সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। পুলিশটা ইহার জন্ত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্চর্য্য করিতে লাগিল। রাজেন্দ্রনাথ তাহার সন্মুখে গিয়া ক্রুদ্ধ বানরের ছায়ার দুই “কোয়াচ কোয়াচ” শব্দ করিয়া নিজের চোখ দুটি উন্টাইয়া বিক্ষারিত ও শাদা করিয়া ফেলিলেন। কাল চোখের তারকা একেবারে দেখা গেল না। তৎপরে তাঁহারা সকলে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পুলিশও পশ্চাদ্ভাবন করিল। নিকটবর্তী থানা হইতে আরও দুইজন তাহার সহিত যোগ দিয়া “পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো” শব্দে ছুটিতে লাগিল। একটি ঘোড়ার সহিত সন্মুখ হইতে পথরোধ করিয়া দাড়াইল। তাহার ছিল এক বিশাল ভুড়ি। রাজেন্দ্রনাথের ফুটবলে অভ্যাস পদ সবেগে তাহার ভুড়ির উপর পড়িল। সহিস চীৎকার করিয়া পুড়াইতে গড়াইতে একেবারে ডুনে গিয়া পড়িল। তখন সকলে যে পতীর ও হর্ভেজ অরণ্য মধ্যে ইন্দ্রনাথ একাকী বিপ্রহর রাত্রে মধুর স্বরে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নৌকা ভ্রমণে যাইত সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর

কাহারও সেখানে প্রবেশ করিবার সাহস ছিল না।

এখন সে অরণ্য প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেখানে বহু অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। মিশনারী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন মাঠই সেই অরণ্যের অধিকস্থান অধিকার করিয়াছে।

ঐহাদের একটি অভিনয়ের দল ছিল। সাতশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই দলের শিক্ষক। শরৎচন্দ্র শ্রী ভূমিকার সর্বজনসুন্দর অভিনয় করিতেন। একবার এমন মধুর ও প্রাণ মাতান স্বরে “হরি বোল” বলিয়াছিলেন যে তাহা শুনিয়া মহিলা দর্শকগণ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র বাণী বাজান শিথিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজেন্দ্র নাথের এক সহোদর শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার ঐহার নাথায় গাঢ়া মারিয়া বলিতেন, “তুই বাণী বাজিয়ে গলা নষ্ট করিস, আমাদের ফিমেল পার্ট করবে কে?”

রাজেন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণচন্দ্র একবার মেদিনীপুর গিয়া মল্লিকদের বাড়ী হইতে গজিকা সেবনে পারদর্শী হইয়া আসিলেন। আসিয়া রাজুদাকে এই উপায়ে ধূমপানের আনন্দ কিরূপে উপভোগ করিতে হয় তাহা শিখাইলেন। তখন দলের সকলেই এই কার্যে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। পরে এই দলটা চরসেও উন্নীত হইয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মেজমামা বিপ্লবদাস গঙ্গোপাধ্যায় একটু গম্ভীর ও কঠোর প্রকৃতির লোক। তিনি শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে কঠোর প্রকৃতি মেজদার মাষ্টারিং যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা ঐহারই চিত্র। বিপ্লবদাস বাবু পাটনায় থাকেন।

রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন অতি নিপুণ শিল্পী। তিনি নিজ হস্তে শরৎচন্দ্রকে একটি

দোয়াতদানো নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা অত্যাধিক মাতুল সুরেন্দ্র নাথের বৈঠকখানা ঘরে রহিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের হৃদয় ছিল অতি কোমল ও স্নেহপ্রবণ। বন্ধুবান্ধবগণের সহিত গল্প করিবার সময় তিনি বন্ধুর একখানি হাত নিজহস্তে লইয়া সারাক্ষণ দুই হাত দিয়া টিপিতেন। গল্প শেষে যখন আসর ভাঙিত, তখন এনে হইত শরৎ ঐহাদের পরম দরদী বন্ধু—আপন হইতে আপনার। ঐহার ডাকনাম ছিল ছাড়া। ঐহার বন্ধুবান্ধবগণ ঐহাকে ছাড়া বলিয়া ডাকিতেন।

মাতুলালয়ের পশ্চাতে একটি কুটির শরৎচন্দ্র এক সাহিত্য সভার সৃষ্টি করেন। তাহার নাম ছিল Little Room Association. ইহা সপ্তাহে একদিন করিয়া বসিত। Sandes ground এ সপ্তাহে আর একদিন করিয়া সাহিত্য সভা বসিত। কবিতা ও গল্প সেখানে পঠিত হইত। মনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি উত্তম সমালোচনা করিতে পারিতেন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট ও শ্রীমতী নিকুপমা দেবীর পিতা নরেন্দ্র তখন ভাগলপুরে সাবজজ ছিলেন। বিভূতিবাবু এই সাহিত্য সভায় যোগদান করিতেন। নিকুপমা দেবীও এই সভায় গল্প ও কবিতা পাঠাতেন। শরৎচন্দ্র একটি গল্প পাঠ করিয়া বলিতেন—ইহা অমৃকের লেখা। আমি কি এমন সুন্দর গল্প লিখিতে পারি! এই ভাগলপুরের সাহিত্য সভায় তাহার সাহিত্য জীবনের অরূরোদগম হয়।

তেজনারান জুবিলী কলেজের হোস্টেলের একটি কক্ষে বসিয়া শরৎচন্দ্র এফ. এ টেষ্ট পরীক্ষা দিতেছেন। গড়গড়ায় ধূমশান চলিতেছে। পরিবেশে বস্ত্র হাটুর উপর অনেকদূর উঠিয়াছে। নিজের গৃহে বসিয়া

পুস্তক খুলিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া ধীরে ধীরে পরীক্ষার খাতায় নকল করিতেছেন।

সমুখের ঘরে শ্রীউপীলা সান্যাল, মণীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রনাথ মজুমদার পরীক্ষা দিতেছেন। উপীলা সান্যালের একটু পান্ডাইবার অভ্যাস ছিল। অভ্যাস বশে পান্ডাইতে গিয়া হাটুর উপরস্থিত গ্যানীর ফিজিক্স খানি সশব্দে মেজের উপর পড়িয়া গেল। স্বস্তির অধ্যাপক সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য গাউ দিতেছিলেন। তিনি পুস্তক দেখিতে পাইয়া বলিলেন—

ডাঙাঘের বালামূত্র

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ওষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ওষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড়

ঔষধালা
পাওয়া

"What's that?" সাজ্জাল মহাশয় বলিলেন—"কপি 'জার'।"

"Why are you Copying?"

"না করে কচি কি? আমি ত' কি কচি জার—ও ঘরে গিয়ে দেখুন ল্যাড়া কি কচে।"

সারদাবায়ু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে উপস্থিত হইয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন।

সেই তাগিলজনকে warning দেওয়া হইল। শ্রীউলীলা সাজ্জাল এখন গয়ার উকীল।

শরৎচন্দ্র পতীকা দিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে মনের বেদনায় ভাগলপুর ত্যাগ করিলেন। বাইবার সময় কাহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই। কয়েকদিন পূর্বে তিনোঁলিয়া সাবানের একটা বাধান মেমের চিত্র মাড়ুল সুরেন্দ্রনাথকে দিয়া একখানি অভিধান লইয়া যান। চিত্রখানি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা গৃহে এখনও সযত্নে লব্ধ আছে।

কেবলমাত্র, কান্টিনার, অল্পপত্র প্রভৃতি গল্প শরৎচন্দ্র ভাগলপুর অবস্থান কালে রচনা করেন।

তাহার ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ স্বামী বেদানন্দ যখন দেহত্যাগ করেন সেই সময় ভ্রাতৃবিরোধে কাতর হইয়া তিনি ভাগলপুরে কিছু দিন অবস্থান করেন। ভাগলপুর হইতে ১৫ মাইল দূরবর্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাটীতে শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব রচনা সমাপ্ত করেন। ভ্রাতার চিত্র তাহাতে প্রতিকলিত হইয়াছে। পথের দাবীর কিছু অংশও ভাগলপুরে রচিত।

ইন্দ্রনাথের হৃদয় প্রভৃতির বহু কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছি। বাহ্যিক ভাবে আর অধিক কিছু না। আর একটা রাজ্য দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

একদিন পাড়ায়ই এক যুবক একটি কস্তার কান হইতে দুইটা মাকড়ী চুরি করে। কেহই তাহাকে স্বীকার করাইতে অথবা তাহার নিকট হইতে মাকড়ী বাহির করিতে পারিল না। রাজেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার শুনিলেন। তাহাকে ডাকিয়া আনিতে একজন অমুচর প্রেরণ করিলেন। রাজেন্দ্রনাথের আহ্বান উপেক্ষা করিবার ক্রমতা ভাগলপুরে কাহারও ছিল না। যুবকটি আসিয়া দোষ স্বীকার করিল। রাজেন্দ্রনাথ অমুচরকে ডালের উপর বসিয়া ছিলেন। সেখান হইতেই আদেশ করিলেন—"ঘি ঘস।"

যুবককে দুইজন দুইদিকে ধরিল এবং একজন তাহার ঘাড়ে ঘি রগড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিতীয় আজ্ঞা হইল—"গঙ্গা জল দে।"

ঘাড়ে গঙ্গা জল দেওয়া হইলে রাজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাড়িকাঠ নিয়ে আয়।"

প্রত্যেক যুবক নীরব ছিল। এইবার কি আজ্ঞা হইবে তাহা অনুমান করিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কাদিয়া ফেলিয়া বলিল—"নিইচি।"

হুকুম হইল—"দে বের করে।"

চোর তখন যে স্বর্ণধাঘের নিকট মাকড়ী দুইটা দুই টাকায় বিক্রয় করিয়াছিল তাহার নাম বলিল। তখন সহজেই মাকড়ী দুইটা উদ্ধার হইল।

রাজেন্দ্রনাথের ধর্মে প্রগাঢ় ঈর্ষা ছিল।

রামুনাথ করিলে যে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করিতে পারে না ইহা তিনি দৃঢ় বিশ্বাস

করিতেন। বিরাটিল বৎসর পূর্বে ছুড়ি বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক গৃহত্যাগ করেন।

ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া শরৎচন্দ্র মজঃফরপুরে আগমন করিলেন। এইবার তাঁহার অজ্ঞাত ও ভবনুরে জীবন আরম্ভ হইল। এখানকার জমিদার মহাদেব প্রসাদ সাহর নিকট কয়েক বৎসর অতি-বাহিত করেন। এই কুমার বাহাদুরকে তিনি সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের অপূর্ব বর্ণনা ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার মজঃফরপুরের স্মৃশানে নিশীথ অভিযানে। সেই অমানিশার প্রেত কাহিনী রক্তনিশ্বাসে পড়িতে হয়।

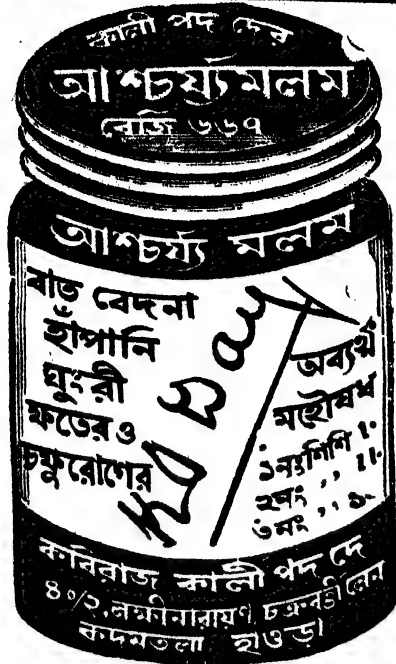
শরৎচন্দ্র ১২৩৭ সালের এপ্রিল মাসে শেষবার ভাগলপুর গমন করেন। গত ১লা নবেম্বর শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর প্রকাশচন্দ্র ভাগলপুরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে দ্বারায় অনুস্থতার কথা জানাইয়া তিনি যে কাহারও কথা শুনেন না এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ তাঁহাকে সামলাইতে পারিবেন না এই কথা লিখিয়া তাঁহাকে শরৎচন্দ্রের নিকট আহ্বান করেন। সুরেন্দ্রনাথ তদনুসারে ৩রা নবেম্বর শরৎচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।

২রা মাঘ রবিবার বাংলার সাহিত্য গগনের পূর্ণচন্দ্র চিরতরে অস্তমিত হইল।

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৩৬, আন্তোম বুখারী রোড, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা



রেঃ ৬৬৭ “আশ্চর্য মলম”

জ্ঞান করে দিলেছে জগতের
সকল আবিষ্কার

আশ্চর্য মলম ব্যবহারে পাবেন অসীম শান্তি,
অফুরন্ত তৃপ্তি ও প্রচুর আনন্দ।

গৃহে রাখুন এই আশ্চর্য মলম—

পাবেন আশ্চর্য ফল,

ইহাৎ ব্যাধির আক্রমণে হবে আশু উপশম।

সকল ডাক্তারখানার ও দোকানে পাওয়া যায়

আশ্চর্য কামোদক চূর্ণ (রেজিষ্টার্ড)

ভগবানের সৃষ্ট কাম বা পুরুষত্ব মানুষের ঐকান্তিক অধিকার জগতের লোকে ইহা ছাড়া সংসারে বাঁচিতে পারে না, তাই মনুষ্যগণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ভিতর এই কামশাস্ত্রেরও সমালোচনা করিয়াছেন। বন, ঐশ্বর্য, ধ্যাতি প্রতিপত্তি অপেক্ষা মানুষ কামের বেশী বশীভূত। বাহার কামের উদ্বেগ হয় না তিনি পুরুষত্বহীন এবং জীবনধারণ অপেক্ষা মরণ তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন। আয়ুর্বেদের মধ্যে কামশক্তি বৃদ্ধি ও ধারণ করিবার বহুবিধ বাজীকরণ ঔষধ আছে। সেই সকল ঔষধের সার ভ্রব্যশুণ পরীক্ষা করিয়া আমি ‘কামোদক চূর্ণ’ নামক একটা শক্তিশালী চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছি; যদ্বারা পুরুষত্ব শক্তি স্থায়ী রাখিয়া মানুষ বহবার জীগম্ন করিলেও স্বাস্থ্যের হানি হয় না। আমার সঙ্গদয় ৬৬৭নং আশ্চর্য-মলমের গ্রাহকগণ এই চূর্ণের অতুলনীয় শক্তি দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহাতে অধিক শুক্রকর্ম, শুক্রতারলা, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য বা প্রস্রাবের সহিত শুক্রকরণ, ইচ্ছাশক্তিহীন প্রভৃতি বহুবিধ ঔজ্জিক রোগে আশু ফলপ্রদ। ইহাতে ধারণাশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি করে। নূতন দাম্পত্য জীবন যাপন কালীন এই বাজীকরণ ঔষধ নিয়মিত ব্যবহারে শুক্রের অপচয় ঘটে না। পরীক্ষার জন্য আট দিনের ঔষধের মূল্য ১০ আট আনা ধার্য করিলাম। একমাস কাল বা ততোধিক ব্যবহারে এই চূর্ণের মূল্য যথাক্রমে ২০, ১৫ এবং ৩ মাত্র।

ব্যবহার নিয়ম:—আশ্চর্য-মলম পুস্তকে পাইবে। এই চূর্ণ ব্যবহার কালীন ৭ দিন জীসহবাস একেবারে নিষেধ। সঙ্গদয় দেশবাসী ইহার ব্যবহারে সুফল পাইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আশ্চর্য জ্বর নাশক বটিকা

এই বড়ি ম্যালেরিয়া রোগীকে টেনিকের কার্য করে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা সম্পূর্ণ দেশীয় শক্তিশালী পাছ গাছড়ার সারাংশ লইয়া কবিরাজী মতে বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত। জ্বর, পালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, নূতন পুরাতন জ্বর, কল্লজ্বর, গর্ভবতী জীলোকদিসেনু, জ্বর প্রভৃতির আশু ফলপ্রদ ঔষধ। এই বড়ি জরের উপর ঝাওয়ান যাইতে পারে, একটা করিয়া বড়ি মুখে দিয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া চিবাইয়া বা গিলিয়া খাইতে হইবে—এইরূপ প্রত্যহ তিনটা করিয়া বড়ি খাইতে হইবে। এই বড়ি সহজ অবস্থায় সেবনে জরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। মূল্য:—১২ বড়ি প্যাকেট—১০ আনা। ২৫টা—১০ ও ৫০টা—৫০ পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—সাক্ষাৎ—ভাষণ জাল হইতে বচন

নিবেদক কবিরাজ কে. পি. দে চিকিৎসাবূষণ (বেনারস), আয়ুর্বেদাচার্য (ঢাকা), এম-এইচ-এস-এল (লন্ডন), কদমতলা, হাওড়া।

আশ্চর্য মলম কেমিক্যাল ওয়ার্কস—কদমতলা, হাওড়া

আবঃ—কম নং ৫১, ১০১১ সারসুজার রোড, টেবটকখানা মাজার, মির্জাপুর

কল্পনা

(সামাজিক উপদ্রাব)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দিন কয়েক পরে, একদিন বৈকালের দিকে ছোটগিন্নি বিরিকির কোন কথার উদ্ভরে বসিয়া উঠিল ঝগড়ার কারণ যে তুমি করে তুলচো! কেন তুমি ওকে এ বাড়ীতে চুকতে দিলে?

স্বামী বলিলেন : আমার ত আর দশটা বাড়ী নেই যে, আলাদা বাড়ীতে রাখবো! তুমি একটু শক্তি হয়ে থাকলেই ত সব দিক রক্ষে হয়! আর ও যদি গুণ করে থাকে, তুমি ভাগ করে নাও। তোমাদের সঙ্গে ত শুধু গুণ-ভাগেরই সম্পর্ক।

অত হৈয়ালি আমি বুঝিনে! আমি ওকে বাড়ীতে থাকতে দেবো না। আমার তুমি বিয়ে করেছিলে কি এই যন্ত্রণা দেবার জন্যে?

—তোমার বিয়ে যে কেন করেছিলাম সে কথা বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে শক্ত। লোকে বিয়ে করে কেন?—

—থাক তা, তুমি এখন কি বলচো? ঐ সতীনের ঘর কি করতে হবে?

—সতীনের ঘর করবে কেন? স্বামীর ঘর করুক।

—তুমি যে জোর করে তাকে আমার ঘরে ঢোকাচ্ছো?

—তোমার উপরে জোর কর্তে পারি কি ছোটগিন্নি? তোমার ওপর জোর কলে এখনি আমার পণ্ডহিংসা নিবারণী সভা থেকে ধরে নিয়ে যাবে। তাহলে তুমিও বিরহে কষ্ট পাবে, আমিও ঘরোয়া ঝগড়ার হাত থেকে কিছুকালের জন্য

ছুটি পাবো। সেটা কি তোমার পক্ষেই ভাল হবে?

স্বামীর কথা শুনিয়া লবঙ্গ বুঝিল, স্বামীটি কথাবার্তায় খুবই দ্রসিক। কিন্তু এত রসিকের অন্তরটা কেন যে তাহার প্রতি এতদিন এত নির্ভর ছিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু এই রসিকতার ফল ছোট গিন্নির উপরে যাহা হইল, তাহা স্বামীর পক্ষেও অনুকূল নহে, লবঙ্গর পক্ষেও নহে। ছোট গিন্নি হঠাৎ উচ্চৈশ্বরে কাদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। স্বামীর বলিবার ভঙ্গিতে যে উপহাসটুকু প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, সেইটুকুই ছোট গিন্নিকে খোঁচা দিয়া অশ্রুর নিকর বহাইয়া দিল।

কান্না শুনিয়া লবঙ্গ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বলিল : ছোট বউ! চুপ করো, ভাই! আমি কিছুদিন পরেই চলে যাবো। তুমি আর মরাকান্না কেন না? চক্ষু মুছিতে মুছিতে ছোট গিন্নি বলিল সত্যি বলচো? নী আমার ভুলাবার জন্য বলচো!

লবঙ্গ তখন স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল : বলগো, আমি সত্যি বলছি না। মিথ্যে বলছি? স্বামী বলিলেন : ও সত্যি বলছে গো, সত্যি বলছে তুমি চুপ করো।

তখনকার মত বিপ্লব ধামিল।

রাতে বিরিকি আহায়ে বসিয়াছে, ছোটগিন্নি পরিবেশন করিতেছে, লবঙ্গ কোথা হইতে একখানা ডাল পাখা লইয়া আসিয়া স্বামীকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। সে চুপ করিয়া খাইতে লাগিল।

লবঙ্গ বলিল : বলি ইয়াগা, বিয়েতো করেছিলে,—সে কথাটাতো ঠিক। তবে এত দিনের ভেতর কি একবারও নাম কর্তে নেই?

বিরিকি মুখ তুলিয়া বলিল : নাম করাতো তোমারাই ঘুচিয়েছ। তোমাদের যা দেবার কথা ছিল, কিছুই দিলে না কাজেই—

—যদি নিলুম তোমার কথাটাই সত্যি! কিন্তু তবু এটাও তো তোমাদের বোঝা উচিত যে, মা বিধবা মানুষ কোথা থেকে সে তোমাদের দাবী মেটাবে।

তা হলে বিয়ে দেওয়া কেন? সমান সমান ঘরে দিলেই হয়।

—ও! সে একটা ভুল হয়ে গেছে বটে! কিন্তু সে দোষ বা ভুল হয়েছে ত মার। তার জন্যে আমার শাস্তি কেন?

—উত্তরাধিকার সূত্রে।

—আমি ত কিছুই উত্তরাধিকার করিনি, একটি কাণাকড়িও না। শুধু দোষটির বেলায়ই আমার ঘাড়ে চাপান হ'ল?

বিরিকি ইহার জবাব দিল : পৃথিবীতে উঁদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে কি শুধুই আমিই চাপাচ্ছি? কুলীনের ঘরে এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে। যথেষ্ট পাওনা দাওনা না হলে নউ তাগ করা বাজালীর ঘরে নতুন নয়। তোমার মা দেওয়া খোওয়া ভাল করে করেন নি, কাজেই তোমার ভাগ্যে যে এমনটা ঘটবে, সেটা কিছু নতুন নয়, খুবই স্বাভাবিক।

লবঙ্গ বলিল : তাহলে এ স্বামীর ঘর করা নয়, ছোটলে থাক।

বিরিকি খুব দার্শনিকের মতই আঙড়াইল : পৃথিবীতে কোন্ জিনিষটা ছোটলের মত নয়? পল্লীপ্রেম, পুস্তকমেহ, সন্তান লালনপালন সবই কি দোকানদারি নয়, বড়বো? বা-হাতে মূল্য না দিলে,

ডানহাতে কোন্ জিনিষটা পাওয়া যায়?
তবে আগে আর পাছে।

লবঙ্গ চমকিত হইয়া জয়গল কপালের
উপরে তুলিল, এবং অনেককণ স্বামীর
মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল:
বলো কি? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু এই-
টুকু? শুধু দেনা পাওয়ার সম্পর্ক? শুধু
ঝি ও মনিবের সম্পর্ক? আর কিছুই নয়!
আমি-ত জানতাম আরও বেশী? আমি-ত
জানতাম, পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই
সকলের চেয়ে পবিত্রতম!

হাঁ! এমনি কতকগুলো আখ্যা না
দিলে, বাঁধনটার দড়ি শক্ত হয় কই? আর
শক্ত না হলেই বা ছেলেপিলে প্রতিপালন
হয় কি করে? বাপ যদি দড়ি ছিঁড়ে
পালায়, তাহ'লে ছেলে-পুলে মানুষ হবার
যোগাড় করে কে?

—তাহ'লে বলছো এই গ্রন্থটুকু অটুট
কর্মীর জন্তেই ঋষিরা একে পবিত্র সঙ্ক
বলে শাস্ত্রে লিখেছে?

বিরিঞ্চি খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া
বলিল: ধর্ম-টর্ম সব উদরগত, উদর
পরিপূরণই প্রধান ধর্ম। তুমি কি বলতে
চাও, ডাকাতরা সব অধার্মিক? কখনও
না। তারা নিজের উদরের জন্ত ঐ রুস্তি
অবলম্বন করেছে। শাস্ত্রে বলে, স্ব-রুস্তি
সাধনই প্রধান ধর্ম।

লবঙ্গ ত শুনিয়া অবাক!

সে খপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল:
তা হলে তুমি বলতে চাও, আমি আমার
উদর পূরণের জন্তে যে কোনও নিকনীয়
রুস্তি অবলম্বন করি না কেন, তাতে আমার
কোনও পাপ হবে না?

—কিছু না! ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে
কোনও পাপই হবে না; এটা আমি জোর
করে বলতে পারি।

—তবে সমাজ এত রাগারাগি করে
কেন?

—সমাজ করতে পারে, কেননা তাতে
সমাজের স্বার্থে বা পড়ে।

লবঙ্গ পাখা ধামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল:
তাহলে তুমি বলচো মানুষ যে কোনও
উপায়ে তার পেটের জ্বালা নিবারণ কর্তে
পারে?

—নিশ্চয়ই।

—যদি চুরি করে, করে?

—কোনও দোষ নাই, যদি না ধরা
পড়ে।

—মেয়ে মানুষ যদি হয়?

—সেও যে কোনও উপায়ে তার পেটের
জ্বালা নিবারণ করতে পারে। পুরুষ মানুষ
যেমন করে করে, সেও তেমনি ভাবে
পারে।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীমদ্বৈষ্ণবকৃত বাল্মীকিপাণ্ডার

চাঁদের দেশে গড়ব সোপান

তোমায় এবার ধরতে প্রিয়।

চোখের জলে ভাসিয়ে তরী

বেয়ে যাব পরশ দিও।

স্বপ্ন-মায়ায় পূর্ণ-বনে,

হেসে গেছ আড়-নয়নে,

স্বপ্ন ভেঙে জাগব না আর

নয়ন কোনে বাঁধব প্রিয়।

তোমার চোখে কাজল হ'য়ে

হুলে যাব আঁখির পাতায়,

তোমার গানের সুরটি সেজে

বাজব তোমার অস্তরে হায়;

তোমার নামের ঐ দেউলে,

প্রদীপ হ'য়ে উঠব জলে,

নীল গগনে বাঁধব বাসা

সে যে তোমার উত্তরীয়।

—:—

ফোন ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের
মানির তৈল

ব্যবহার করুন।

মিল-২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্মল কুমার ঘর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পর্ধ্যায়

পরের দিন চপল যখন ঘুম থেকে উঠলো, তখন বেশ বেলা হয়ে গ্যাছে। ভোরের দিকে কখন ও নিজেই গিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়, তা ওর নিজেরই মনে নেই। সোনালি সূর্যের লালিমা কেটে গিয়ে হয়েছে তাতে রূপোর রঙ। চোখ মুছে চাড়াটাড়ি ও নেমে এল বিছানা থেকে, এসে ধপাস করে বসে পড়লো ক্যাম্প চেয়ারটাতে—। ওখানে বসতেই ওর মনে পড়ে গেল গত রাত্রির কথা। রাত্রির অন্ধকারে যা ওকে মোহাবিষ্ট করে তুলেছিল, দিনের আলোকে তার চিহ্ন গেছে মুছে। ওর নিজেরই হাসি পাচ্ছে কালকের ওর নিজের কথা ভেবে। কি চকলই না ও হয়ে উঠেছিল কাল রাতে। কন্দর্পচকল কলিকাতার কন্দর্পধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সবাই যে কন্দর্পব্যস্ত তারই নিদর্শন ভেলে আসছে। ওর মন এখন সম্পূর্ণ সরল ও নিরাসক্ত। ও ঠিক আগের চপল বোল বার সাথে ছুনিয়ার কোন যন্ত্রের বিশেষ অন্তরঙ্গতা নেই। নিজের ঘরের মধ্যে বসে বসেই ও সারা ছুনিয়াকে ছুড়ে বেড়ায়, কিন্তু কেউ ওকে কোনদিন ধরে পায় না। সারা দেশের লোকের জীবনমরণ বার কলম থেকে বেরোয়, তাদের কেহই জানে না ওকে। ও ইচ্ছে করেই ধরা দেয়নি। কত মনে লেখে ওর বাজী এসে আলাপ করে গেছে, দেখিয়ে গেছে

গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতার অভিনয়। কাগজে টুকে দিয়ে গেছে নিজেদের নাম অথচ পরমহুর্ন্তেই ও গেছে সব ভুলে। ঠিকানা লেখা কাগজ উড়ে গেছে রাস্তায় না হয় জুজ্বালের গাদায়। কিছুদিন বাদে দেখা হলে দীপ্তিকাকে আহ্বান করেছে প্রীতি-লতা বলে, আর প্রীতিকে কল্যাণী মজুমদার বলে। মিসেসকে ডেকেছে মিস বলে আর মিসকে মিসেস বলে। মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করে নি। কেউ কেউ মনে ভেবেছে ওয়াইন্ড, আর কেউ বলেছে গেইয়া, কোন কাজের নয়। প্রীতিলাতার মত মেয়েরা বন্ধুদের কাছে বসেছে—কোল্ড আর ইম্পোটেন্ট। শ্রামলী রায় আলোচনা করেছে—ও দেউলে, বাঁধা পড়েছে ওর সমস্ত কিছুই অস্তুর কাছ, বার রূপের সিন্দকে চোখা চোখা প্রেমের-বুলির তালা দেওয়া লুকানো অফিস ওর পৌরুষের দলিলটা। কড়া পাওনাদার, আদায় করে নিতে জানে নিজের পাওনা গুণা, তাই মহাজনী খাতায় নাম লিখিয়ে রেখেছে ওকে চিরকালের জন্য বাঁধা। প্রীতি সন্দেহ করে কল্যাণীকে, কল্যাণী হিংসায় জলে মরে দীপ্তিকে দেখে। চপল 'এ লবের কোন খোঁজই রাখে না, রাখবার মত মনের গড়ন ওর নয়। ও ভূবে থাকে নিজের ভেতর নিজে।

চেয়ারের ভিতর ও একবার পাশ ফিরে নেয়। সারা দেশে ওর রক্ত অধি

জড়তা। চোখের তলায় পড়েছে কালির দাগ। সারা দেহটায় ওর ব্যথা লাগছে। শরীরটা যেন একবারে ভেঙে পড়তে চায়, কাঁচের পুতুলের মত—ভিতরে ভিতরে যেটা গেছে শত টুকরা হয়ে, ওপর থেকে রাখা হয়েছে বেমানম জোড়া দিয়ে।

মা এসে চুকলেন। ছেলের চেহারা দেখে তাঁর সন্দেহ জাগলো। জিজ্ঞাসা করলেন কিরে! অমন করে বসে আছিস্ বে?

—এমনি আর কি—চপল মিটিমিট করে চেয়ে বলে।

—অত শুকনো দেখাচ্ছে যে তাকে? অনুখ করেনি তো?

—কেন, বেশ আছি তো—কপালে হাত ঠেকিয়ে ও উত্তর দেয়। সত্যি ওর অব হলো নাকি? মুখে বলে—এইতো কপাল বেশ ঠাণ্ডা। কাল রাত্রে একটা ছঃস্র দেখে ভাল ঘুম হয় নি কিনা তাই।

ওর মা মশারী তুলতে তুলতে বলেন কি স্বপ্ন রে? ও বলে—উঃ মাগো? সেকি বিদ্রী স্বপ্ন তোমায় আর কি বলবো। কি প্রকাণ্ড ভূত, ইয়া লম্বা লম্বা হাত পা, বুঝলে মা চোখগুলো দিয়ে আশুপ বেরুচ্ছে, সেই ভূতটা নামলো একটা ট্যান্ড্রী করে, প্রকাণ্ড একটা কার, অত লম্বা লম্বা হাত পা তার ভেতর কি আর ধরে? রাস্তায় নেমে আরও বড় হয়ে গেল...

ওর মা ওকে ধামিয়ে দিয়ে বলেন নে নে হয়েছে তোমার ভূতের গর, নিজে যেমন ভুই একটা আত ভূত। ওঠ—মুখ হাত পা ধুয়ে চা খেয়ে নে।

ও কান্ডে কান্ডে উঠে দাঁড়ায়। মাকে মিথ্যা কথা বলে—ওর মনে খোঁজা বেঁধে। এই মুহূর্ত হলো নাকি লুকোচুরী? পেট আর ব্রাশ হাতে করে ও ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। বাবার সময় বলে—চা-টা আমারই ঘরে পাঠিয়ে দাও মা, আমি

একুণি আসছি।—মার সামনে যেতেই যেন
ওর গুয় করছে।

মুখধুয়ে ও ফিরে আসে শীত্ৰই। পা
ওর চলতে চায় না। শরীরটা ওর যেন
জলভরা মাস, নড়া-চড়া করতে গেলেই
চলকে পড়ে যেতে চায়। তার চেয়ে
তাকে এক বায়গায় বসিয়ে রাখাই ভাল।
চায়ের কাপটা হাতে ক'রে ও আবার
পরিত্যক্ত চেয়ারটায় এসে এলিয়ে পড়ে।
ছোট টিপয়টা আগেই এনেছে সরিয়ে
চেয়ারটার ধারে, তার ওপর চুকটের পকেট
ব্যাগটা আর দেশলাই, পাশে চায়ের
পেয়ালা। চায়ে আর চুকটে টান দিয়ে
ও খানিকটা তাজা হয়ে ওঠে। গতরাত্তরের
ভূতের স্বপ্ন (?) ওর মন থেকে গেছে প্রায়
মিলিয়ে। চায়ের পেয়ালা শেষ ক'রে
চুকটটা মুখে দিয়ে ও আয়নার সামনে এসে
দাঁড়ায়, ছেয়ার ব্রাশ-টা হাতে ক'রে।
ওর নিজেরই এমন হাসি পাচ্ছে, নিজের
চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে। মাথায় ব্রাশ
করে ও টেবিলে এসে বসে, চেয়ারটা টেনে।
কাগজ পত্রগুলো কিছু কিছু অগোছাল
হয়েছিল, সেগুলোকে ও নিজেরই গুড়িয়ে
ফেলে। তারপর ব্যাক থেকে একটা স্বই
পেড়ে চোখ ছুটোকে মেলে ধরে তার
পাতায়। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা চলে যায়
ইটালির এক নিভৃততম কোণে।

খানিকক্ষণ সময় কেটে যায়। ওর
কাছে বায়জগৎ জুগু। মা এসে খবর দিয়ে
যান—চপল তোকে বাইরে কে একজন
ডাকছে দেখে আয়।

ও ভাল করে শুনতে পারেন না। মা
ফের বলেন—কই শুনতে পেলি আমার
কথা?

—হঁ বলে চপল পাতা উটে চলে।
ওর মা ফের বলেন—কই উঠলি নে?

—কি?—

হঁস হলো এতক্ষণে?



হ্যাঁ-বালি
—তবে—
লিলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

• একমাত্র
• নির্ভরযোগ্য
• পথ্যও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কালিকাতা • ৪ • বোম্বাই

হ হলো, যাও বিরক্ত করো না।

—বিরক্ত-তো আমি তোকে নিত্যই করছি। নাও এখন দয়াকরে একবার উঠে বাইরে দেখবে?

—কেন? উঃ কি আলাতনই যে তোমরা কর।

মা হাসেন, বলেন—কিষে বাপু রাতদিন রাত-দিন বই নিয়ে পড়ে থাকিস বুঝতে পারি না। কাঁধ কঁধ নেই, কিছ নেই, পড়ে পড়ে উনি রাজ্য জয় করবেন। এখন বাইরে গিয়ে একবার দেখে আর কে ডাকছে।

অন্তমন্ত ভাবে ও বলে—কে বল দেখি? তা আমি কি করে জানবো? ওর মা বঁধু বিরক্তির সুরে বলেন।

—সত্যিই ডাকছে? আর কাউকে নয় তো? বইএর ওপর চোখ রেখেই ও বলে চলে।

ওর মা কৃত্রিম গাভীখোর সঙ্গে বলেন—চপলবাবু আপনারই নাম তো?

ও হেসে ফেলে। চেনার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে—কে ডাকছে নামটা জিজ্ঞাসা করলে না কেন? মাটা করলে দেখছি সব। সেই প্রীতি না বুখী সেই মেয়েটা নয় তো? তাহলেই খেয়েছে; আজ সব গয়া। মার দিকে তাকিয়ে ও বলে আচ্ছা মা, ওরা আলাতন করতে কেন আসে বলতো? না এলেই তো পারে। তুমি মানা করে দিতে পার না? এই বার এলে বলে দিও বাড়ীতে নেই, কেন? আর নাহয় আমাকে একটু খবর দিও চুপি চুপি আমি পাশের ঘরে চুপ করে শুয়ে থাকবো, টেরও পাবে না। কেন?

ওর মা হেসে কেলেন। ওরা কেন যে আসে তা তিনি বোঝেন, আর সেইজন্য একটু গৌরবও বোধ করেন মনে মনে। কত বড় বড় লোকের মেয়েরা তাঁর চপলকে

এতখানি প্রছা করে, একটু প্রীতিলাভ করবার জন্য লালারিত হয় একি কম ঘোষার কথা?

চপল বাইরে এসে দেখে মৃণালবাবু এসে হাজির। মৃণাল মুখুজ্যে, আদব কায়দা আর ফ্যানসানে কোলান পুরুষ। নিজের টু-সীটারে টহল দিয়ে বেড়ান সারা কলকাতা সহর। জমার খাতায় মোটা অঙ্ক, নিত্য চলে সুদ কথা, তারই জোরে মিলনীর সেক্রেটারীত্ব।

এই যে চপলবাবু—সুইট মনিং।

—ডু-মনিং বলে চপল হাত তোলে।

মৃণালবাবু কার থেকে নেমে আসেন। ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলেন—এক কাপ চা না খেয়ে আজকেও যাচ্ছি না।

চপল লজ্জিত ভাবে বলে—হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই খাবেন। বাইরে থেকে দাঁড়িয়েই চৈচিয়ে ডাকে—মা! তারপর নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পেরে বলে—চলুন, ভেতরে বসবেন চলুন। নিজের ঘরটাতে মৃণাল বাবুকে পৌঁছে দিয়ে ও নিজে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও ভাবে—কি সুস্থিলাই হলো। এমন বইটা মাঠে মারা গেল। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও ভেবে চলে কত কি কথা। ও ভুলেই যায় ঘরে একজনকে বসিয়ে রেখে এসেছে।

‘মা এসে বলেন—কিরে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস একলা? ছেলেটা চলে গেছে?’

ওর সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে ওর মার ওপর। বলে হ্যাঁ গেছে না আর কিছু? তুমি কেন বলে দিলে না যে আমি বাড়ী নেই?

‘তুই কি আমাকে মিথ্যা কথা বলাতে চাস নাহি বুড়ো বয়সে?’

চপল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বলে—বা: আমি তাই বলছি নাকি?

—তবে কি বলছিস তুই? ঘরে থাকতেও বলে দেব বাড়ী নেই? সেটা মিথ্যা কথা হবে না?

মাথা চুলকে ও বলে—তাইতো! কিন্তু আমি কি করতে এসেছিলুম বল দেখি? ভুলে গেলুম যে।

—তা আমি কি করে জানবো। ভুললোকের ছেলেকে ঘরের ভেতর একলা বসিয়ে রেখে উনি আছেন এখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে মনে; মৃণালবাবু বন্ধন চা খাওয়াতে।

ওর মা বলেন—এতকণে মনে হলো? বাও তুমি ঘরে গিয়ে ততক্ষণ একটু গল্প করগে; আমি একুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি চা।

চপল কিঁরে আসে নিজের ঘরে। মৃণালকে দেখে বলে (গল্প করতে হবে বলে)—বসে আছেন একলা?

—তাইতো দেখছি। কি করা যায় বলুন? আপনার তো আর কিরবার নামই নেই। কি আর করি বসে বসে তাই দেখছিলাম আপনার কাগজ পত্র বিনা? অল্পমতিতেই তা আপনি শুধু ‘সুচিন্দ্রা’তেই লেখেন বুঝি? ‘ভারতে’ লেখেন না কেন?

কি জানি কাগজটা আমার ভালো লাগে না। ওর চেয়ে ‘অগ্রবাসী’ কাগজটা বরং ভালো। সেখানে মাঝে মাঝে পাঠাই লেখা যদিও সম্পাদক মশাইএর নাতিনাতনী লেখাতেই ওটা চালানো হচ্ছে। ভালো লোকও মাঝে মাঝে লেখে। আর কিই বা সামর্থ্য বলুন? সামান্য আইডিয়া ও অভিজ্ঞতা, ভাল জিনিষ সৃষ্টি করবো কোথা থেকে? পড়তে পেলাম কই? পড়াশুনো না থাকলে কি আর বড় জিনিষ লব্ধে ধারণা করা চলে? ইন্সপিরেশন লাইব্রেরী পর্যন্ত পৌঁছাতেই

অর্ধেক শক্তি করে যায়, উৎসাহ ওখানেই
যায় নিভে, অনেকখানি সময়ও।

—কি যে বাজে বলছেন, তার নেই
ঠিক। বাংলা সাহিত্যে আপনি বা দেবার
চেষ্টা করছেন, তার দায়িত্ব নেহাৎ কম
নয়। বরং দুঃখের কথা এই যে, দেশের
লোক এখনও আপনাদের মত লেখককে
উৎসাহিত করবার পথে পেছিয়ে পড়ে
আছে। সাহিত্যকে এরা বড় বড় বাড়ী,
মোটর, সাড়ী, আর কুলের বাগানের
ভেতরেই বন্ধ করে রেখেছে। শরৎবাবু
তাকে টেনে আনলেন মধ্যবিশ্বের বাড়ী,
আর আপনি চেষ্টা করছেন তাকে চালাঘর,
পচা পুকুর আর কুলি বস্তিতে টেনে
আনতে যেখানে দেশের অধিকাংশ লোক
বাস করে, বাদের নিয়েই দেশ। এই
ভেত্রেই তো বলেছিলাম আপনি আমাদের
গৌরব। জানেন তো সকালের সূর্যের
দিকে তাকিয়েই বলে দেওয়া যায় সারা
দিনটাই কেমন যাবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে
আপনার প্রথম পদক্ষেপেই তা বুঝতে
পারা যায়।

—নাঃ এইবার আপনি অভিশ্রোতি
করছেন। মনে যা আসে, বলতে যা
ভাল লাগে, কলমের মুখে তাকেই রূপ
দেবার চেষ্টা করি; তার যে এত ব্যথা
হতে পারে তাতো জানতুম না। আমার
মনে হয় কি জানেন? পাঠকের ভাব-
বিলাসী মন হয়তো এ লেখাকে আদর
করবে না। তার ওপর বাদের জীবন
কথা লিখতে চাই, তারা নিজেস্বাই যে
নিরাকর। পড়বে কারা? ট্যাকও যে
তাদের খালি। অতএব এ বই 'কিনবে
কে? এই বই তো আর উপহার দেওয়া
চলে না বন্ধু বান্ধবীকে? মাসে চার আনা
পরসা খরচ করে লাইব্রেরীতে ঢোকবারও
যে তাদের সামর্থ্য নেই। সেই পরসার

শুদ্ধ খ্রীসমীর বোঝ

উন্মাদ হোয়ে বৈশাখী বায় আসে,
গাছের ডালেতে উন্মাদ দোলা দেয়;
সন্ধ্যা আকাশে বিজ্রপ করি' হাসে,
উদ্ধার আলো ধূলিতে নিভায়ে নেয়।
বন্ধ চক্ষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানি;
রুদ্ধ বৃকের রক্তে প্রলয় আনি,
সুপ্ত সন্ধ্যা-সুপ্ত নয়কো মানি'
প্রচণ্ডতার সঙ্গী করিয়া দেয়।
সন্ধ্যা আকাশে বিজ্রপ করি' হাসে,
উদ্ধার আলো ধূলিতে নিভায়ে নেয়॥

ছেলের একটা পেণি কেনা যায়—শীততপ
থেকে দেহকে বাঁচাবার জন্ত। দেশের
এই বড় লোক আছে, এত লোক এত
দান করে, ধর্মশালা, মঠ, রাস্তা করে
দেয়; আমার মনে হয় ওসব ভেঙ্গে দি' চালা।
শিক্ষা পেলে রাস্তা ওরা নিজেস্বাই বানিয়ে
নিতে পারে, ধর্মশালার প্রয়োজন হয় না
কুরার জলও আপনি পরিষ্কার হয়ে যায়।
গরীবের বা মাহুঘের আসল উপকার
করবার ইচ্ছা কারুরই নেই। জমকালো
একটা কিছু করে অমর হ'য়ে থাকার
বাসনা। কিন্তু তাঁদের ধর্মশালার ইটে
যে লাগবে নোনা, টিউব ওয়েলের মুখে
জমবে কাদা, হাসপাতালের ছুরি কাঁচিতে
ধরবে জং। ওর চেয়ে যদি পরসারগুলো
খরচ হতো ক্রী স্কুল লাইব্রেরীর পেছনে
তাহলে আসল উপকার করা হতো
মাহুঘের, চিনতে পারতো প্রত্যেক
অন্ধনির্ভিত শক্তিকে, আর তাঁদের নামও
অক্ষয় হয়ে থাকতো জাতির ইতিহাসের
পাতায়।

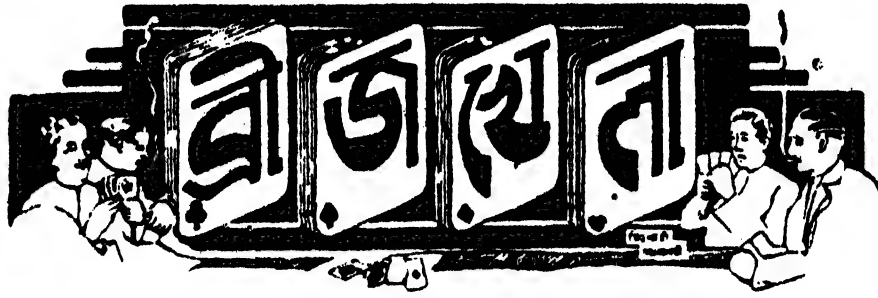
(ক্রমশঃ)

অন্তর ছেড়ে বাপদ উঠিলো মেগে;
অমারাজির নিঃশ্বাস হীন বনে
শব বিহীন পাদচারণ তার মেগে,
প্রোভেতে কিরিলো লালসা কুটিল রণে।
চন্দ্র তাহার লাভার জ্যোতিতে অলে,
বিদ্যুৎবাহি শোণিত বৃকের তলে,
কাপিল বৃকের আশঙ্কা পলে পলে,
ব্যঙ্গ করিয়া উঠিছে জন্তু বনে।
শববিহীন পাদচারণ তার মেগে
প্রোভেতে কিরিলো লালসা কুটিল রণে।
অরণ্য বৃকে অনেক হোয়েছে রাত,
প্রমত্ত বায়ে রয়েছে অনেক পাতা;
আকাশের বৃকে হোয়েছে উদ্‌যাপন
তুঙ্গ বৃক্ষ আনত করেছে মাথা।
জড়তা ভাঙ্গিয়া নিষাক ছুড়েছে তীর,
আরণ্যকের লক্ষ্য ঘুরিছে শির—
বিকট নীরব মৃত প্রায় পৃথিবীর,
বক্ষে ঝরাতে বাড়তি একটি পাতা।
আকাশের বৃকে হোয়েছে উদ্‌যাপন,
তুঙ্গ বৃক্ষ আনত করেছে মাথা।
ছিঁড়ে গেল বৃষ্টি ইথারে যবনিকা;
কান পেতে শোনো অশরীরী ক্রন্দন:
উচ্চ করিবে মৃত্যুর জয়টিকা।
পরাতে শায়ক মুক্তক বন্ধন।
আকাশের বৃকে অনেক হয়েছ
রাত্তি,
প্রলয় আগুন দন্তে জ্বালেনি বাতি;
বৈশাখী বায় আবার উঠিলো মাতি,
—শোনো উলঙ্গ অশরীরী ক্রন্দন!
উচ্চ রুধিরে মৃত্যুর জয়টিকা।
পরাতে শায়ক মুক্তক বন্ধন॥

বিনোদ এণ্ড কোং

১৩নং ড্যাংলহাউসি রোয়ার
জরীপ ও নক্সার বস্তাদি বিক্রয় করে তাহাড়া
অফিস টেননারী ইত্যাদিও বিক্রয় করে।

N. L. P.

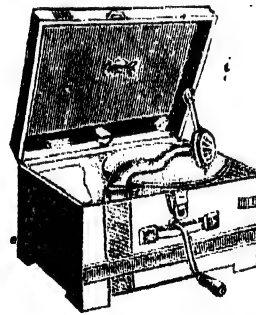


বিশ্লেষণ না করার দক্ষণ নিজের ভুল দেখে মন ধারাপ করে বসবেন না এবং অতি স্বচ্ছন্দচিত্তে খেলে যেতে পারবেন ও শাস্তিভঙ্গ না করে পূর্বোক্ত অপরাধ থেকে বেঁচে যাবেন। যে কোন কাজেই ব্যাপৃত থাকা বাক্ না কেন সেটিকে সাধনা বলে গ্রহণ করাই বিধেয়, অন্যথা কৃতকার্য হওয়া সুদূর পরাহত। তাই প্রত্যেক ক্রীড়ক এবং ক্রীড়ামোদীদের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে তাঁরা যেন এ খেলাকে 'তাসা কন্সনাশা' বলে উপেক্ষা না করে ইহাকে সাধনার গণ্ডীভুক্ত করেন, তাহলে এর সুফল সুনিশ্চিত। যদি একান্ত হাত নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন তো হাতটি লিখে রেখে দিয়ে খেলা শেষ হবার পর তা নিয়ে ডর্ক করা বৃক্তিশূন্য। যথাসময়ে হাটের সমালোচনা করলে খেলারও সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় এবং অপরেরও বিরাগ ভাজন হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।



তাসের টেবিলে কলরব :-
বিগত রবিবার ২০শে নভেম্বর থেকে খিটা বিটা ক্লাবের, উত্তোগে নিখিল-ভারত 'গোল্ড কাপ' প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে। যদিও এবার প্রতিযোগিতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হায়দারাবাদের দল এবৎসর যোগ দিতে পারেন নি, তবু অন্তান্ত প্রশ্রের ক্লাবসমূহ যোগদান করায় প্রতিযোগিতার নিখিল-ভারত আখ্যা ক্ষুণ্ণ হয় নি। এখনও বাইরের কোর্নদল খেলবার সুযোগ পাননি বটে, কলিকাতার ও তার উপকণ্ঠের দলসমূহ আসর সরগরম করছেন। কিন্তু প্রতিযোগিতার নামের শ্রেষ্ঠতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখার মত কোন দলই খেলা দেখাতে পারেন নি। যে সব দল আজ অবধি ক্রীড়া-প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের কারও ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলে মনে হয় না। তবে যদি তাঁরা, এ পর্যন্ত প্রদর্শিত খেলার ধরণ তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ নয় বলে প্রতিপন্ন করেন, অথবা আরও উন্নতি করতে পারেন তো আলাদা কথা। ভুল প্রত্যেকেরই হয় এবং হওয়াও প্রাভাবিক; কিন্তু খেলতে বসে খেঁড়ী শক্তিব্যাক্ক ডাক্ দিলেন, 'আর আমি না শুনেই পাশ দিলাম,—সে ভুল ভুলই নয় তাকে খেলার অপরাধই বলা সম্ভব।' আর এ প্রতিযোগিতায় দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক দিনই এই প্রকারের কোন না কোন ভুল কেউ না কেউ করে বসছেন; কোন

সময়ে Revoke, কোনটা বা Out of turn bid, আর কোনটা না শুনে ডাক দেওয়া, —বাস্তবিক পক্ষে এ প্রত্যেকেরই অরণ রাখা উচিত যে এই গুলির কোনটিকে ভুল বলা চলে না, বলা উচিত অপরাধ। তারপর আর একটি দোষ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা' এই যে প্রতিযোগীরা খেলার পরই খেলানো হাতটি নিয়ে বিশেষ করে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁরা একথা ভুলে যান যে পরবর্তী হাতটি তাঁদের এই তর্কের গরমে ডাকা এবং খেলানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। টেবিলে বসে তাঁরা যদি কথা বন্ধ করেন, তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক হাতই তাঁরা আপেক্ষিকভাবে যথেষ্ট ভালভাবে খেলতে সমর্থ হবেন। কারণ বিশেষ ভাবে পূর্ববর্তী হাতের খেলা



মেলোডিনা গ্রামোফোন

স্বর মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে ও স্থায়িত্বে অতুলনীয়

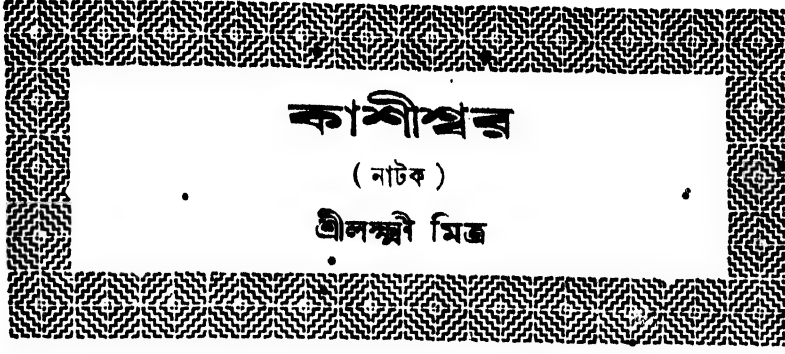
গ্রামোফোন ক্রয় করিবার পূর্বে মোটর ও টার্ন টেবিলের তলায় "মেলোডিনা" খোদাই করা নাম ও গ্রামোফোনে "মেলোডিনা" মার্ক দেখিয়া লইবেন।



ভালিকা বিনামূল্যে পাইবেন
"হিজ্ মাস্টারস ভয়েস" গ্রামোফোন ও রেকর্ড

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮-২নং শরৎলা স্ট্রিট, কলিকাতা।



কানীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

(ঘর)

—অজয়, রহমৎ, দিলীপ ও সুনীলা—

অজয়—আজকের দিনে আমার আর কিছু বলা উচিত নয় কিন্তু একটা মন্তব্য ডো Career নষ্ট হ'য়ে গেল! এইটাই আমাদের সব চেয়ে বড়ো লোকসান। যাক, কি আর করা যাবে!—

(সকলেই চুপ করিয়া রহিল ক্ষণকাল)

রহমৎ—আমি তা হ'লে উঠি এবার।

সুনীলা—হ্যাঁ আপনি আসুন। বাড়ী গিয়ে আপনাকে হয়তো আবার আপনাদের নিয়মকানুন পালন কোরতে হবে।

রহমৎ—না, সে সব কিছু করতে হবে না।

অজয়—তুমি ঘাটে গেছলে না কি হে?

রহমৎ—হ্যাঁ—

সুনীলা—শুধু ঘাটে নয়, উনি 'কাধ'ও দিয়েছিলেন।

অজয়—মুসলমান হয়ে হিন্দুর—

রহমৎ—ভারী আশ্চর্য্য অজয়বাবু— সত্যি। আমি রাজী হইনি প্রথম। কিন্তু দিলীপ ছাড়লে না। বল্লে আমার মাকে তুমি যদি বহন কোরে না নিয়ে যেতে পারো, তবে তুমি আমার কিসের ভাই। হিন্দু মুসলমানের মিলন কি শুধু রাজনীতি, ক্ষেত্রে? সমাজের গভীর ভেতর কি তার কোন স্থান থাকবে না?

অজয়—বুঝছি। কিন্তু ধর্ম ছোটো যে আলাদা? একটা যে একটির একেবারে পরিপন্থী?

রহমৎ—আমরা সবাই তাই জানি অজয়বাবু, কিন্তু দিলীপ জানে আলাদা সে যাক—আজকের দিনে আর না।

অজয়—আর কেউ আপত্তি কোরলে না? ওর বাবা, ভাই, বোন, বা অস্ত্রাশ্রয়রা?

রহমৎ—করলে বই কি! সবাই সাধ্যমত আপত্তি করলে। একঘরে হবার ভয়ও কেউ কেউ দেখালে, কিন্তু ফল কিছু হল না।

অজয়—ভারী আশ্চর্য্য।

রহমৎ—ভারী আশ্চর্য্য। আমিও তাই বলি। কিন্তু স্রষ্টা যারা তারা অসাধারণ লোক অজয়বাবু! সাধারণ পথ তাদের নয়; সাধারণের ক্ষুদ্র পথ তারা সৃষ্টি করে। সে পথে প্রথমে হয়তো লোক চলতে চাইবে না; হয়তো বেধে যাবে কলহ, রেষায়েষি, তুণ্ডল আন্দোলন—কিন্তু সেই হবে পথ।

(প্রস্থান)

অজয়—(অলক্ষ্য চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল) অতদিন হলে এর মুখের মত জবাব দিতাম। আজকের দিনে আর বাঁকনুকে প্রবৃত্ত হবার রুচি নেই? সে যাক—আমিও তাহলে উঠি।

সুনীলা—আসুন!

অজয়—একটা কথা—তুমি তাহ'লে কংগ্রেস থেকে বিদায় নিলে এ কথা একেবারে ঠিক?

(দিলীপ হান হানি হাসিল)

Excuse me—আমি একথা জিজ্ঞাসা করছি তার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রেসিডেন্ট হবার জন্য তাহলে অল্প লোক ঠিক করতে হবে। ওয়ার্কার টেলিগ্রামও করতে হবে।—বিস্তর সব কাজ পড়ে রয়েছে।

দিলীপ—হ্যাঁ, একথা ঠিক অজয়।

অজয়—I am very glad to hear this. (অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বলিল) I mean I am very sorry—চলো।

(প্রস্থান)

(কানীশ্বর, যিহেন ও মনীষা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া এক একখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিল।—অল্প শুক থাকিয়া কানীশ্বর কথা কহিল)

কানী—যাক, সব শেষ হয়ে গেল। মৃত্যু সবাইয়ের হয়, কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ীচাপা পড়ে হাসপাতালে বড় একটা হয় না। সে দিক দিয়ে এ একটা Unique ঘটনা।

(দিলীপ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই কানীশ্বর তীক্ষ্ণ অথচ মমত্বদ্বন্দ্ব কণ্ঠে বলিয়া উঠিল) না না দিলীপ তুমি উঠবে না। তোমরা কেউ উঠে যাবে না। সবাই থাকো।

(দিলীপ বলিয়া পড়িল)

অনেক কথা স্তর আমার বলবার রয়েছে। তোমাদের তা শুনতে হবে, বিচার কোরতে হবে। উঠে গেলে চলবে না।

সুনীলা—আজকের দিনটা থাক না জ্যাঠামশাই?

কাশী—(প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল) না, না, আজই তোমাদের সে সব শুনতে হবে।

বলিয়া কাশীশ্বর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীর ও দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তোমরা সবাই শুনেছ দিলীপ আমার সম্মান নয়। সবাই তোমরা শুনেছ। তথাপি আমি দিলীপকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতাম; কারণ, দিলীপ মহৎ, দিলীপ উদার।—তোমরা বলবে আমি কেন তবে উইল কোরে দিলীপকে আমার সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত কোরতে চেয়েছিলাম! আমি জানি, আমি বুঝতে পেরেছি এই হচ্ছে তোমাদের সকলকার জীবন্ত প্রশ্ন!—ই্যা আমি স্বীকার করছি এইটাই আমার জীবনের গম্ভীর ভুল হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ভুল দিলীপ!—আজ সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল!

দিলীপ—(অশ্রুসজ্জল চোখে) যে আপনার সম্মান নয় তাকে যদি আপনি আপনার বিষয় থেকে অব্যাহতি দেন, ভুল যে কোথায় তা তো আমি বুঝতে পারি না।

কাশী—বলেছ ঠিক। কিন্তু যাকে আমি সব দিতে পেরেছিলাম, নিজের পুত্র বলে যাকে পৃথিবীতে পরিচয় দিতে কুষ্ঠাবোধ করিনি, তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত কোরতে গেলাম তার জন্মদাতার উপর এক ভীষণ প্রতিশোধ নিতে—এ আমার ভুল নয় তুমি বলো? কাশীশ্বর বসুর পক্ষে এ একটা অপমৃত্যু নয় তুমি বলো? যে কাশীশ্বর একদিন এক অর্ন্ত নারীর সম্মত বজ্রাঘাতের জন্ত জীবনের এক অরণীয় দিনে—না সে থাক! সে বলব না।—কিন্তু তুমি দিলীপ, তোমার মায়ের যে অপরাধ আমি কমা কোরতে পেরেছিলাম, তুমি তা পার নি। আমি তাকে যে গৌরব যে সম্মান দিয়েছিলাম, তুমি

তাকে সেই পরিমাণ অগৌরবের মাঝে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছ।

মনীষা—বাবা, তুমি ধামো। আমার আর লক্ষ কোরতে পারছি না। আজকের দিনে আমাদের শুধু চুপ কোরে ভাবতে দাও। আর আমরা কিছু শুনতে চাই না। (কাদিতে লাগিল)

কাশী—আমার কথা শেষ হ'লেই থেমে যাবো। ব'লতে হবে না। তারপর তোদের সঙ্গে চুপ কোরে ভাবতে থাকবো। কিন্তু কথা আমার শেষ ক'রতে হবে। শেষ না কোরে পারবো না।—তোরা ভাবতে থাকবি তোদের মা ছিল কলঙ্কিতা—এ আমি সহ কোরতে পারবো না। তাই আমার সব কথা ব'লতে হবে, কথা শেষ না কোরে পারবো না।

মনীষা—তোমার কথাই যথেষ্ট। তুমি মা'কে সতীর আসন দিয়ে এসেছ এই যথেষ্ট।—আনরা আর কিছু শুনতে চাই না, জানতে চাই না।

(প্রস্থান)

কাশী—দিলীপ, তুইও কাদিস্! না, কাদিস্ নি। ওরে, সে ছিল অকলঙ্ক! মনে এতটুকু তার পাপ ছিল না। কোন

মহিয়সী নারীর কাছে সে ছোট ছিল না। সবাইকে সে ভালবাসতো, প্রচা ক'রতো। তার সেই নিঃশলভার সুযোগ নিয়ে যে ছুরাখা সাধু তার সর্জনশ সাধন কোরতে পারলে—না থাক সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই।—(মূহূর্ত্তক) —ধর্ম্মের আবরণের ভেতরও শয়তানের বাসা—সে বেচারী বুঝতে পারে নি। তাই তার এত ছুর্ভোগ।—কিন্তু সে মৃত্যু দিয়ে তার এই কলঙ্কটুকুর অবসান কোরতে চেয়েছিল।—শুধু তোর মায়ায় সে পারে নি!...প্রথম যে দিন সে এই বাড়ীর বো হ'য়ে আমার কাছে এলো, সেই দিনই সে বিনাধিখায় তার সমস্ত অন্তরটুকু আমার কাছে উদ্ঘাটিত কোরে দিলে। সে দিনের সেই উদ্ঘাটন মিলন রজনীতে সে কী আফুলতা দিলীপ! তুই কল্পনা কোরতে পারবি নি। আমার ব'ললে—“ওগো স্বামী, এই কলঙ্কিত দেহ নিয়ে আর যা হয় কোরতে পারবো, কিন্তু দেবতার পূজা কোরতে পারবো না। সম্মানে যদিও কোন পাপ করিনি কিন্তু পাপের ছাপ আমি এড়াতে পারিনি। আমার তুমি ত্যাগ করো।” কিন্তু আমি তা পারলাম

৩
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
মডার্ন ইলেক্ট্রিক
স্টুডিও
৩২-মি
ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা

না, দিলীপ। যে আমার পায়ে আছড়ে পড়লো, আমি তাকে রাগীর আসন দিয়ে তুলে ধরলাম। তার প্রিয় সন্তানকে নিজের ব'লে আত্মপ্রসঙ্গ লাভ করলাম। সবই করলাম, কিন্তু প্রতিহিংসারক্তিকে জয় কোরতে পারলাম না। তাই হ'লো উইলের উদ্ভব। তাই হ'লো আজ কাশীরেবের পরাজয়।

দ্বিজেন—ঐ উইল আজ আমি পুড়িয়ে ফেলবো। (প্রস্থান)

সুনীলা—জ্যাঠামশাই, যা হয়ে গেছে তা যেতে দিন। তার জন্ত আর দুঃখ কোরে লাভ কি! এখন যাতে তাঁর শাস্তি হয় আমরা সেই প্রার্থনাই করি আসুন।

কাশী—ঠিক ব'লেছ মা। কিন্তু আমি প্রার্থনা কোরলে হবে না। তুমি প্রার্থনা কোরলে হবে না। দ্বিজেন বা মনীষা প্রার্থনা ক'রলেও হবে না। তার আত্মার শাস্তি দিলীপের হাতে!—

ওকে বল, ওকে বল মা প্রার্থনা কোরতে!

(প্রস্থান)

(দিলীপ ও সুনীলা শুক হইয়া বসিয়া রহিল ক্ষণকাল: প্রবেশ করিল বেহারা)

সুনীলা—বেহারা কি বলছে শোনো।

দিলীপ—কি রে?

বেহারা—কংগ্রেস থেকে লোক এসেছে।

দিলীপ—কি চান তিনি?

বেহারা—তিনি আপনার কাছ থেকে একটা কাগজে সহ করিয়ে দিতে চান যে, আপনি প্রেসিডেন্ট থাকতে চান না।

দিলীপ—ও! —কিন্তু আমি মত বদলেছি রে। আমি প্রেসিডেন্ট থাকবো! আমি আবার দেশের কাজ করবো। —তুমি তাকে বলগে।

বাংলার মানুষ ও চলচ্চিত্র

• হুমারী এলোচেননী ও তা

মানুষের জীবনের তিনটা অধ্যায়— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্তমানে মানুষ বলতে পারে তার অতীতের কাহিনী, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তা' জোর করে বলতে পারে না। তবুও বর্তমানে মানুষ কল্পনা করে ভবিষ্যতের। যাতে ভবিষ্যতে সে অপরের সামনে তার কীর্তি দীপ্ত করে ধরতে পারে। আবার সেই কল্পনা বখন দীর্ঘ হয়, তখন তার মনে জাগে অতীতের কথা—“যদি সে কাজটা ও ভাবে কল্পনা না করে অজ্ঞভাবে ক'রত—তাহলে হয়ত সে কৃতকার্য হতে পারত।” কিন্তু তা'তে তার অতীত কীর্তির কোন সুফল হয় না— হয় বর্তমান কার্যকারিতায় ভবিষ্যতের আশা-পথের ক্লিষ্ট আলোর সন্ধান,—অর্থাৎ “অভিজ্ঞতা।”

ভবিষ্যতের কল্পনাকে মূর্ত করার “অভিজ্ঞতা” সঞ্চয়ের জন্ত মানুষকে সাহায্য নিতে হয়—প্রথমতঃ—“লিখন পঠন” (Theory) পরে তৎসম্বন্ধে “আলোচনা” ও “গবেষণা”ঃ গবেষণা ব্যাপ্তিরূপে মানুষ কখনও তার কাল্পনিক বস্তুর স্বরূপ উপভোগ করতে পারে না। কল্পনা শক্তি

বেহারা—Thank you sir, thank you.

(বেহারার প্রস্থান)

দিলীপ—সুনীলা, আজ আবার নূতন কোরে শপথ করো—(বলিয়া সুনীলার দিকে হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল)

সুনীলা—শপথ করলুম দিলীপ—(বলিয়া দিলীপের হাতখানি চাপিয়া ধরিল)

—যবনিকা—

বা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। তবে জগতে যেমন নানা শ্রেণীর মানুষ পরিলক্ষিত হয়, তেমন তাদের কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষার ধারাও নানারূপে প্রবাহিত হয়। কেউ চায় তার জীবনটাকে ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে, কেউ চায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অর্জন করতে আবার কেউ বা চায় নিজের কল্পনার বাস্তবতা ভাবে, ভাষায় বা রূপে অপরের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে,—ইত্যাদি নানারূপ আকাঙ্ক্ষার অমুপ্রেরণা এসে জাগে মানুষের মনে, এবং সেই আকাঙ্ক্ষার অমুপ্রেরণাতেই মানুষ এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের পথে তার কল্পনার সৌধ নির্মাণ করবার জন্ত। তা'তে তার প্রয়োজন হয় “অর্থ এবং সামর্থ্যের” সমন্বয়।

আমাদের দেশে অর্থাৎ “বাংলায়” অর্থ এবং সামর্থ্যের সমন্বয় খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। যাদের অর্থ আছে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার প্ৰাধা বা সামর্থ্যের অভাব। তাঁরা তাঁদের ধনগর্বেই গর্বিত থাকেন। তাঁরা ভাবেন না যে ঐ অর্থে তাঁদের নিজের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এবং দেশের কল্যাণ জীবনের কোনও একটা তিমিরাজয় নূতন পথ আবিস্কৃত হতে পারে—এবং সেই নব আবিস্কৃত পথে হয়ত ভবিষ্যতে তাঁদের প্রভূত অর্থাগম হ'তে পারে। তাদের আদর্শের উপর ভিত্তি স্থাপন করে ভবিষ্যতে অপরে হয়ত সেই আদর্শকে আরও প্রাণময় করে জগতের সামনে ধরতে পারে। কিন্তু তাঁরা সে সম্বন্ধে কোন গবেষণা করেন

না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখতে পাই অনেক অর্থ সম্পন্ন ব্যক্তির জীবনের কাম্যবস্ত হয়ে দাঁড়ায় যথেষ্টাচারিতা। কোন কিছু সৃষ্টির কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্তরের দ্বারে আঘাত করে না। তারা চায় না কোন মহৎ উদ্দেশ্যের সাধনায় নিজেকে অস্তরকে স্পষ্ট করে জগতের সৃষ্টির মহত্বকে উপলব্ধি করতে—তারা চায় শুধু অপরের শক্তি সামর্থ্যের উপর দিয়ে নিজেদের ভোগের লিপ্সা পূর্ণ করতে। তাতে তাদের জীবনটা হয়ে যায় উদ্দেশ্যহীন এবং সেজন্য জগতে তাদের কীর্তির কোন ভিত্তিই স্থাপিত হয় না।

সামর্থ্য বা স্পৃহা যাদের আছে তাদের মধ্যে আবার হয়ত অর্থের অভাব এসে দাঁড়ায়। অনেক সময় জীবনের আনুমানিক চিন্তা বলবতী হয়ে তাদের উদ্দেশ্য চিন্তার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্পৃহা সত্যিই যার অন্তরের নিবিষ্ট কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, সাধনায় সে তার প্রসার করে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে না পারলেও কৃতিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। আর একাগ্রতাহীন সাধকের জীবনের উপর দিয়ে শুধু ব্যর্থতাই বয়ে যায়, সাধনায় সিদ্ধিলাভ তার হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন কোন অর্থ-সম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে স্পৃহা জাগে

অপরের শিল্প-বাণিজ্যের কৃতিত্বে সফলতায় অর্থ সমাগম দেখে নিজে সেই শিল্প-বাণিজ্য করতে। কিন্তু সেই বিশিষ্ট শিল্পের সাফল্যের পথ সম্বন্ধে কোনরূপ গবেষণা না করে তারা এগিয়ে চলে শুধু তার অর্থ-সমাগমের আশায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়ে। ফলে লাভ হয় অর্থ-সমাগমের পরিবর্তে অসুখ অর্থব্যয়। কারণ যে জিনিষের উপর যার নিজের কোনও অভিজ্ঞতা থাকে না, সে জিনিষ নিয়ে অপরকে বিচার করার ক্ষমতাও তার থাকে না। এজন্য তারা এক-শ্রেণীর লোক দ্বারা প্রভাবিত হয়—যারা কখনও কোনরূপ আলোচনা বা গবেষণার দ্বার দ্বারে নাই অথচ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বাহ্যিক আদর্শের দ্বারা অপরের কাছে নিজেদের সর্বস্ব বলে প্রচার করে। এরূপ লোকের কাছ হতে কোনদিন কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেজন্য এদের সহযোগিতায় তাদেরও ভবিষ্যৎ তিমিরচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

মানুষের আদর্শই মানুষকে জগতের মধ্যে বড় করে। এবং সেই আদর্শকেই অনুসরণ করে ভবিষ্যতে মানুষ তার জীবন যাত্রার পথে তাকে আরও বড় করে জগতের সামনে ধরবার চেষ্টা করে।

আমাদের নবাগত শিল্প বাণিজ্য চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির উপর লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, তাদেরও গতি আমাদের দেশের মানুষের জীবনের গতির সঙ্গে সমান ভাবেই পা ফেলে চলেছে। আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে ছোট বড় প্রায় পনেরটা চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু তাঁর মধ্যে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মাত্র দু'একটি,—নিশ্চয়ই একমাত্র শুধু তাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে। এবং সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাদের একনিষ্ঠ হয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা এবং গবেষণা করতে হয়েছে। একের কৃতিত্বের সফলতা সত্ত্বেও অপর প্রতিষ্ঠান গুলি তার আদর্শের সম্যক উপলব্ধি করতে পারছে না, তার কারণ তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সামর্থ্য এখন একাগ্রতার অভাব।

সুতরাং দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করতে গেলে, আগে প্রয়োজন দেশের মানুষের সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে যত্নবান হওয়া। কারণ প্রচুর আদর্শই সৃষ্টির মহত্ব।



= পিরামিড চা =

চিত্তহারী সৌরভ, নয়ন তৃপ্তিকর বর্ণ, অতিমম স্বাদ

১ পাউণ্ড প্যাকেট মাত্র ৭১০ আনা

প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত দোকানে সাদরে বিক্রি হয়।

ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ. ভারতীয় চা ৪৪/১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

খেয়ালী চিত্রপট



‘রাম ও সীতা’র ভূমিকায় রাধার
“জনক-নন্দিনী” চিত্রে সুশীল রায় ও
সাবিত্রী। চিত্রখানি শীঘ্রই রূপবালী
চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।



পরিচালক
জাহাঙ্গীর মিউজপোর্স লিঃ
১১, চক্ৰবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওয়ার্কার্স

পাশাপাশি ও সিদ্ধ পরিভ্রমণ করিয়া রাষ্ট্রপতি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন এবং 'বেঙ্গালী' সাধারণের নিকট প্রচাতিত হইবার পূর্বেই তিনি ওয়ার্কার্স ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিবার নিমিত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন। ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। বাংলার কংগ্রেসী কোমালিশন নী মজীলতা গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও আলোচিত হইবে। আশা করা যায় প্রস্তাবটি গৃহীত হইবে। ওয়ার্কার্স অধিবেশনের পরই বাংলার মজীলগুলের পরিবর্তন ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া প্রবলভাবে সূর হইবে। সিদ্ধ প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে প্রথম মজীর সহিত রাষ্ট্রপতির যে সমস্ত আলাপ আলোচনা হইয়াছে তাহা ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পেশ করা হইবে এবং ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশনেই সিদ্ধ প্রদেশের মজী-সমস্যার হৃদয়স্থিত ভাবে সমাধান হইবে।

অম্মতী-সমস্যা ব্যতীত দুইটি অধিকত্তর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে সন্মুখিত করা হইবে।

কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ-পন্থী ও বাম-পন্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষিত হইবে কি না সেইটাই সর্বাপেক্ষা জটিল। মুসোলিনী ও হিটলারের দ্বার বাধার দ্বারা হইলেও সর্দার প্যাটেল বামপন্থী-বলনে যেমন তৎপর হইয়াছেন তাহাতে কংগ্রেস বিধা-বিকল্প হইবার উপক্রম হইয়াছে। দিল্লীর মিথিলী ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর মহাত্মা বাম-পন্থীদের অক্রমণ করিয়া যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে বাম-পন্থী কর্মী ও নেতৃবৃন্দ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

অম্মতী রাষ্ট্রপতি ও পণ্ডিত জহরলাল মহাত্মাজীর নিকট হইতে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে কংগ্রেসের অভিমত সম্প্রতিভাবে ঘোষণা করিতে দাবী করিবেন বলিয়া প্রকাশ। রাষ্ট্রপতি ও পণ্ডিতজী পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেও তলে তলে মি-ডুলাভাই দেশাই, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি দক্ষিণ-পন্থী নেতৃবর্গ একটা রকম করিয়া সংশোধিত ভাবে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ্যে বিরোধিতার বিক্রম ও অন্তরালে গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা—এই দুই পরস্পর বিরোধী নীতির অবসান করিতে রাষ্ট্রপতি ও পণ্ডিতজী দৃঢ়-সঙ্কল্প।

ওয়ার্কার্স আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনেই যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে সন্দেহাতীতভাবে কংগ্রেসের নীতি ঘোষিত হইলে সমগ্র ভারতের রাজনীতি তদনুযায়ী পরিচালিত হইবে। অপর পক্ষে বাংলার পত্তনোন্মুখ মজীলগুল উদগ্রীবচিত্তে ওয়ার্কার্স দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের কার্যকালের আসন্ন পরিসমাপ্তির দিন গণিতেছেন।

আম্মতী বিখ্যাতসূত্রে অবগত হইয়াছি যে রাষ্ট্রপতি দৃঢ়-চিত্তে স্বীয় মত ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মহাত্মাজীকে পত্র লিখিয়াছেন। পণ্ডিতজীও রাষ্ট্রপতির সহিত একমত। রাষ্ট্রপতি ও পণ্ডিতজীর সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দক্ষিণ-পন্থী নেতৃবর্গ সংবর্ত হইলে কংগ্রেসের পক্ষে যে মজল ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।



বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম পবিত্র

ক্রন্দন !

শনির চিঠি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ডাবিয়াছে ও কাঁদিয়াছে। বাছা রে! শনি লিখিয়াছে—“আমরা ভাবিতেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। যতদিন ইহার Examining Body মাত্র ছিলেন, ততদিন ধর্ম কোনও ক্রমে আপনাকে বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু স্তাবক ও গুপ্তি প্রতিপালন করিবার জন্মে বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন হইতে প্রি এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েটি পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও প্রকাশ করিতে শুরু করিয়াছেন, সেদিন হইতে, ভদ্রতার মুখোস পর্যন্ত খসিয়া গিয়াছে,.....দেশের বাহারা ভবিষ্যৎ, তাহাদিগকে বঞ্চনা এবং ভুল শিক্ষার দ্বারা পীড়ন করিবার অপরাধে অপরাধীর শাস্তি তো হইতেছেই না, ধরাইয়া দিলে প্রমোশন হইতেছে। ইহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের—‘সীলে’ Advancement of Learning পরিবৃত পদ্মাস্তর্গত ত্রিচিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া হা-হতাশের অন্ত নাই! The Indian Stage বাহাই হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই Stage ভয়াবহ।” অনেকেই ইহা পড়িয়া মনে করিবেন, ইহা কোনও মুসলমান ভদ্রলোকের লেখা, কারণ এই প্রকারের কথা কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইর মন্ত্রী সভায়

কোন মুসলমান সভ্য কর্তৃক কথিত হইয়াছিল এবং তাহার মুখের মত উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দু নামে পরিচিত শনির দল যে এতদিন পরে এই উক্তি করিবে তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু স্বার্থ ও হিংসা অতি পাজী জিনিষ, ইহার না করাইতে পারে এমন কাজ নেই। সে বাহা হউক ইহাদের এতখানি কসরতের মূল্য মিলিতেছে না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। “ধরাইয়া দিলে প্রমোশন হইতেছে।” This is the most unkindest cut of all! অন্তরের নিগূঢ় ব্যথা কি সুনিপুণ ভাষায় ব্যথিয়ে উঠিয়াছে! কিন্তু বাছারা বাছা বলি বণি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না তাহা সম্ভবতঃ এই। বিশ্ববিদ্যালয় শনির দল হইতে একজন যোগ্য প্রফরিডার ও একজন যোগ্য প্রিন্টার সংগ্রহ করুন—তাহা হইলে তাহাদের নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক সকল তারিখের ভুল-শুভ্র অবস্থায় ছাপা হইয়া বাহির হইতে পারিবে। যোগ্য প্রফরিডার প্রফ দেখিবার সময় তারিখের ভুল ইত্যাদি নির্ভুল করিয়া দিবে এবং প্রিন্টার তাহা সমস্তে ছাপাইবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাহাদের অবস্থা আরও ফিরাইতে চাহেন, তাহা হইলে ব্রজেন বন্দ্যো : বিরচিত ‘বেগমসমর’, ‘কেলাকতে’ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ এবং সজনী-

কান্ত দাস প্রণীত ‘পথ চক্রে ঘাসের ফুল’, ‘মধু ও হল’ প্রভৃতি বহি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করুন। ইহা করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সীলে’ Advancement of Learning পরিবৃত পদ্মাস্তর্গত ত্রিচিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া হা-হতাশ করিতে হইবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের Stage ভয়াবহ না হইয়া অ-ভয়াবহ হইবেই। কিন্তু ইহা যে হইবার নহে, তাহা ইহাদের প্রকাশিত কবিতাতেই প্রকাশ হইয়াছে

“কুজ বাবাজীর সাধ চিং হয়ে শুইবেন
তিনি,

সীসার বাসনা গুট ট্যাংকশালে হইবেন
গিনি।

হুয়েছে সম্ভব সব মৎস্তরাজ্যে মুক্তিকার
গুণে

গালে না শোভিয়া, চিত্র হইতেছে কালি
আর চুণে।”

কুজ বাবাজী যখন এত জানিয়াও লুকা সাঞ্জন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে এত পবিত্র ক্রন্দন কেন? কিন্তু কিছুতেই ইহাদের আফশোস ও গায়ের জালা মিটিতেছে না। কোনও সাপ্তাহিক লিখিয়াছে যে বাঙ্গলা দেশে বাহারা সাহিত্য রচনা করে, তাহারা হয় কেরানী, নয় উকিল, নয় জার্নালিষ্ট ইত্যাদি। শনি ইহার উপর টিপনো করিয়াছে “বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও লেকচারার এবং চোর ও গাঁটকাটা বাদ পড়িয়াছে।” বাছারা কেমন অন্তর্যামী তাহা দেখিবার বিষয় বটে। ভদ্রলোকের দর্পণ অস্ত্রে নিজের মুখ নিজে দেখিয়া বেছোরে মারা গেল। ইহারও নিজেরা নিজেদের কলমের খোঁচায় ধরা দিতেছে!

প্রশস্তি ?

“আনন্দবাজার পত্রিকা” এ কি করিলেন? শ্রীসজনীকান্ত সম্পাদিত “অলকা”

মাসিক পত্রিকাখানার দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশিত কীর্তন করিতে গিয়া এমন বেকাঁস কথা লিখিয়া বলিলেন কেন? “কিন্তু শৈশবের দিকে ধীরতা ও যুক্তি অপেক্ষা উদ্ভা একটু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।” একেই ত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত “বঙ্কিম পরিচয়ের একাধিকবার সমালোচনা বাহির করিয়া আনন্দবাজার শনির দলকে ক্ষেপাইয়াছেন, তাহার উপর আবার “অলকা”র ভিতর উয়ার প্রাবল্য দেখিলেন? শনির দল যে স্বার্থ-হিংসা-কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ বিবর্জিত হইয়া, শুধুই Art for Art Sake ভাবাপন্ন হইয়া, দেশেরও দেশের, সাহিত্যের ও সাহিত্য পরিষদের নির্জলা কল্যাণের জন্য কলম ধরিয়াছেন, তাহা কি আনন্দবাজারের অবদিত? যদিই অবদিত থাকে, তাহা হইলে অগ্রহায়ণের শনির চিঠিখানার “আনন্দবাজারে”র প্রশস্তিটুকু পড়িয়া দেখিবেন।

নাচনচন্দ্রের দাছ

সপ্তকপারবর্তী সাধারণ ব্যক্তির যে মতিভ্রম ঘটে তাহা সর্বজন-বিদিত কিন্তু আমরা জানিতাম সপ্তক-পারবর্তী অসাধারণ কবি অন্ততঃ সেই কলঙ্ক হইতে মুক্ত। এখন দেখিতেছি আমরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী। কবি প্রতিভা স্বর্গ হইতে অনেক দিন বিদায় লইয়াছিল, এখন দেখিতেছি স্বয়ং কবিরও স্বর্গ হইতে পতন হইল। ভূতপূর্ব রবি-বিষেবী শনির ঝুলিতে কবি, অকস্মাৎ ঝুলিয়াই হইয়াছেন। ইহাকেই বলে দূর্ভেদ। নাচনচন্দ্রের কাকলীপর্ব বিশবছর পরে নহে, ইতিমধ্যেই প্রায় শেখ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু দাছর কাকলী পর্বের ভাষাতত্ত্ব তথা দাছর মনস্তত্ত্বও সুখবোধ্য নহে, ইহাও বলা আবশ্যক বৈকি।

স্যার যদুনাথের লাজুল-ইতিহাস

১২৮৭ সালের ‘বঙ্গদর্শনে’ বঙ্কিমচন্দ্র

“বাক্সালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছিলেন— “আত্মজীতিগৌরবাক্ষ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুধর্মী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে; সে বাক্সালী নয়।” কিন্তু প্রায় ৫৮ বৎসর পরে অর্থাৎ, এই ১৩৪৫ সালের ‘সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’র ‘বাক্সালী’ যদুনাথ অর্থাৎ স্যার যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন—“আমার মনে হয়, মুসলমান জগৎ ভারতকে যে দানগুলি দিয়াছে, তাহা মধ্যে ইতিহাস-সাহিত্য একটি প্রধান। এটি ভারতের পক্ষে অপূর্ব। আমরা দস্ত করিয়া বলি, হিন্দু যুগে কি ইতিহাস ছিল না? আমাদের পুরাণই ইতিহাস, রামায়ণ মহাভারতও ইতিহাস, হর্ষচরিত, বিক্রমাদিত্যচরিত, রাম-চরিত এই ত ইতিহাস। এই যুক্তির উত্তর আমাদের একজন বিখ্যাত লেখক মহোদয়ের আকারে কিন্তু সত্যসত্যই দিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, হনুমানের লেজ ছ-হাজার ফুট লম্বা যে গ্রন্থে লেখা, তাহা পুরাণ। আর যদি ঐ লেজটা ঘর্ষণ কর্তন করিয়া তিন ফুটে নামান যায়, তবে তাহা ইতিহাস হইবে।” বঙ্কিমচন্দ্র যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি যদুনাথের এই লাজুলযুক্ত উত্তর শুনিয়া কি বলিতেন, জানি না। তবে তাঁহার পূর্বোক্ত প্রবন্ধেরই ‘আর একস্থানে’ তিনি বলিয়া গিয়াছেন “সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাক্সালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাক্সালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।”

মুসলমান-প্রধান মজুমদার-পরিচালিত বর্তমান বঙ্গদেশে স্যার যদুনাথ মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের প্রতি যেরূপ প্রীতি, ভক্তি ও বিশ্বাসের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সত্য না হইলেও যুগধর্মের!

বে উপযোগী; একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে আমরা দস্ত করিয়াই বলিব, যে দেশে কল্লান-রচিত “রাজ-তরঙ্গিনী”র অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান, সে ‘দেশ ইতিহাস সাহিত্য’র জন্য মুসলমান-জগতের কল্লনই মোসাহেবী করিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া, আরও একটি ভাবিবার ও বলিবার কথা আছে। স্যার যদুনাথ যে ইতিহাস-সাহিত্যের গুণ-গানে গদগদ হইয়া এদেশের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রেণীর ইতিহাসের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—“ভারতবর্ষের” যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা ছঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র।” কোথা হইতে তাহার আসিল, কাটাকাটি সারসারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলে, তাইয়ে-তাইয়ে সিংহাসন। লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে— পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ, সকল মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই রক্তবর্ণ

জৈনক
বন্দিনী

পরিচালনা করছেন : ফণী বস্মা

কছেন : প্রবোধ দাস

হছেন : নৃপেন পাল

ভূপেন ঘোষ

রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বয়ংক্রিয়পটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে, যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়?—এ সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই—কেবল বাহারা কাটাকাটি-খুনাখুনি করিয়াছে, তাহারাই আছে। তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার, তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্ব প্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জন সবেও স্বীকার করা যায় না,—সেদিনও সেই ধূলি-সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে অশ্রু-মুখ্য-মুখ-হৃৎকের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পণিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর সমস্তই গ্রাস করে;

কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা—ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছু পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জন মুখর বাতাবর্ষ, গুপ্তত্রয়ের ধ্বংস তুলিয়া উদ্ভূত হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে হইতে পূর্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু বিদেশ যখন ছিল, দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই সমস্ত উপভবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম, ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লী এবং আগ্রা ছিল, তাহা নহে—কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল।.....ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রুশ্চাইলডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে, সে খৃষ্টের

জীবনীর বেলার তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারী তুলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, বাহার এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না, তাহার আবার জীবনী কিসের? ভেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দক্ষতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়-পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে বাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সন্মুখে হতাশাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই, সেখানে আবার হিন্দী কিসের, তাঁহার ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে শস্তের মধ্যেই গণ্য করেন না।” বলিতে হইবে কি, স্থার যত্ননাথও আজ ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে গিয়া মনের ক্ষোভে হতমানের লেজ ধরিয়া টানাটানি করিয়াছেন।

রূপবাণী

কোম : বি, বি, ৩৪১৩

প্রীতান্তরলক্ষী পিকচার্সের

১৫শ ! অতিনয়
সপ্তাহ! অতিনয়

অতিনয়
অতিনয়

যে চিত্র কাহিনী প্রতিদিন
নূতন রূপ ও রসের
সন্ধানের দর্শক - চিত্রকে
অতিক্রম করিতে.....

N. I. P.

পূর্ণ শিরেটার

২নং রঙ্গা রোড

কোম : সাউথ ৩৪

শনিবার ১০ই ডিসেম্বর হইতে
দ্বিতীয় দীপাবলী সপ্তাহ!
নিউ শিরেটার্সের গৌরব যুক্ত চিত্র-গাঁথা

দেশের মাটি

ছবিদ্বয় : চন্দ্রাবতী, সায়গল, হুর্গাদাস, অমর মল্লিক প্রভৃতি।

অগ্ন্যন্ত বৎসরের চেয়ে এবারকার
বার্ষিক সংখ্যা

খেয়ালী

রূপ, রস ও রচনার হইবে শ্রেষ্ঠ।

১লা জানুয়ারী আত্মপ্রকাশ করিলে



(বিলাসী)

সাধী

প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স

কাহিনী ও পরিচালনা—ফণী মজুমদার

সঙ্গীত পরিচালনা—রাইচাঁদ বড়াল

চিত্র-শিল্পী—দিলীপ গুপ্ত, সুধীশ ঘটক

শব্দ-যন্ত্রী—লোকেন বসু

রসায়নগায়াধ্যক্ষ—সুবোধ গাঙ্গুলী

চিত্র-সম্পাদনা—কালী রাহা

কথা—খণী দত্ত

গান—অজয় ভট্টাচার্য

ভূমিকায়—সায়গল—ভুলুয়া, কানন—মঞ্জু, অমর মল্লিক—ত্রিলোক নাথ, শৈলেন চৌধুরী—অমরচাঁদ, সুবীর—ছোট ভুলুয়া, রেখা—ছোট মঞ্জু, ইহা ছাড়া অহী সাম্রাণ, বোকেন চট্টো, ভানু বানার্জী, ব্রজ পাল, সত্য মুখার্জী, বিনয় গোস্বামী, শৈলেন পাল, পূর্ণিমা, ছয়া প্রভৃতি আরো অনেকে।

প্রথম মুক্তি—চিত্রা ও নিউ সিনেমা, শনিবার ৩রা ডিসেম্বর।

‘সাধী’র কাহিনী সহজ ও সরল এবং ঘটনাবহুল। এতে আছে কয়েকটি স্বাভাবিক ও সাধারণ চরিত্র। ছবির হিরো ভুলুয়া, ছোট বয়সে ছিল ছোট। চিক থিয়েটারের অভিনেতা, বড় হয়ে হলো সঙ্গীতের সাধক, লোকজনের সঙ্গে না মিশতে পাওয়ার দরুণ অসহ্য, অশিক্ষিত সে অসহ্যবাসী ও অভিমাত্রী। মঞ্জু, ছেলে বয়সে ছিল অনাথ-আশ্রমে, পরে হল পথের

মেয়ে। ভুলুয়ার সঙ্গে গান গেয়ে পয়সা নিয়েই যার বয়সের অনেকখানি কেটেছে, বড় হয়ে যখন প্রচুর পয়সা, নাম ও যশ পেলো, ভুলে গেলো পুরাণো দিনের কথা। অমরচাঁদ—শিক্ষিত, সৌখীন, ধনী ও চরিত্র-হীন থিয়েটারের অভিনেতা, মঞ্জুর সংস্পর্শে এসে তার চরিত্র বদলালো, সে হোলেন silent lover. ত্রিলোক নাথ—থিয়েটারের লম্পট প্রোপ্রাইটর। পৃথিবীতে যা সে

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর

নবতম পৌরাণিক চিত্র-কাহিনী

জন্মক
নন্দিনী

রূপবাণী-তে

আগতপ্রায়

N. I. P.

ভোগ করতে পার না তারই নিলেক করে ও সুবিধে পেলো নীতির লেকচার দিয়ে দেয়। এ ছাড়াও বহু ছোট চরিত্র আছে যাদের খুব বেশী আমাদের চোখের সামনে অনেক সময়ে দেখতে পাই। এরা সবাই

সারা ছবিখানিতে হাসির উপাদান জুগিয়ে এসেছেন।

ছবিটির প্রধান বস্তু গান। কানন সায়গলের স্বৈত-সঙ্গীত সুন্দর। চিত্রের গতি—কাননের নাচ পর্যন্ত কোথাও বাধে না। শেষের দিক ডায়লগে ভারাক্রান্ত ও প্রথম অংশের তুলনায় মধুর। কার্ল-বৈশাখীর বড় আরো ভালো হওয়া উচিত ছিল। ত্রিলোককে মাঝে রেখে ড্রামার ধ্বংস যদি আরো বাড়তো তাহলে নাটকের বোধ করি কোন জটাই দেখা যেতো না। ছবিটি হিরোয়িন প্রধান। পরিচালক ফণী মজুমদার চিত্র-নাট্য লেখার চেয়েও পরিচালনায় বেশী ক্ষমতা, এই চিত্রে দেখাতে পেরেছেন। তাঁর চরিত্র-সৃষ্টি মধুর হয়েছে। পরিচালকের কৃতিত্বে চিত্রের কোন স্থান অস্বাভাবিক ও আড়ষ্ট বলে মনে হয় না। ছবিখানিতে হাঙ্কা রঙ্গের সমাবেশ হলেও কোন জায়গায়ই রসায়নভূতির ব্যাঘাত ঘটায় না। অতি সুসংবদ্ধভাবে দৃষ্টাবলী গ্রথিত করার ফলে ছবিখানি পীড়াদায়ক হয় নাই। গল্পের কাহিনী সরল হলেও মৌলিক। গল্প লেখকের এইখানেই কৃতিত্ব। ভুলুয়ার মুখের ডায়লগে কিছু দোষ থাকলেও অশিক্ষিত ভুলুয়ার মুখে এর চেয়েও ভালো ডায়লগ না দেওয়ার পক্ষে লেখকের একটা যুক্তি হয়ত আছে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিভিন্ন ধরণের ডায়লগ দিয়ে লেখক ক্ষমতারই পরিচয় দিয়েছেন। অজয় ভট্টাচার্যের গানের কথা ভালো। এ ছবির মিউজিক একটি সম্পদ।

পথের অন্যতম বোম্বাদপ বকাটে ছেলে হঠাৎ একদিন দেখা পেল তারই মত সমতুল্য অনাথা মেয়ে মঞ্জুর। শীতের

কনকনে ঠাণ্ডা রাতে বোটের বৃকে ছুটি ঘুমিয়ে পড়া শিশু ভেসে গেল জীবনের কোন অচেনা হাটে।

ছোট ভুলুয়া বৃকে আশা নিয়ে তার মঞ্জুরে নাচ আর গান শিখিয়ে, পথে পথে গান গেয়ে রোজগার করে আবার তারা ফিরল একদিন বড় সাধের কলকাতায়। তখন তারা বড় হয়েছে। এক বস্তিতে তারা বাসা বাঁধল। দিনের পর দিন নিরাশ হোল ভুলুয়া। থিয়েটারে চাকরী তার কোথাও মিলল না। তাই আবার গান গেয়ে পয়সা রোজগারের আশায় বেকল রাস্তায়। থিয়েটারের বড় একটর ও ম্যানেজার একদিন এদের গান শুনে আর মঞ্জুর রূপ দেখে থিয়েটারের লম্পট মালিক ত্রিলোকনাথকে 'গোবুরে পদ্মকুল' দেখাতে নিয়ে এলেন বস্তিতে। মঞ্জুর থিয়েটারে চাকরী হোল। ভুলুয়ার হোল না। তবু সে বেজায় খুসী, তারই মানুষ করা মঞ্জুর চাকরী হয়েছে বলে।

দিন যায়, মাস যায় মঞ্জুর নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বস্তীর খোঁকার ঘর থেকে ক্রমে মঞ্জুর উঠল প্রাসাদে। থিয়েটার আর নামের নেশায় মঞ্জুর হোল মাতাল। সারা সহরময় কেবল মঞ্জুর মঞ্জুর আর মঞ্জুর! সে আজ ভদ্র লোক! গরীবকে ভাবে ছোটলোক। অমরচাঁদ তাকে ঘিরে থাকে। সে আজ আর মাতাল নয়। মঞ্জুরে ভালবাসে। ত্রিলোকের সহ হয় না। ভুলুয়ার কাছে নানান কথা বলে। স্বল্পভাষী ভুলুয়া নিজের অভিমান নিজের কাছেই রেখে দেয়। মঞ্জুর ভুলুয়াকে অপমান করল ভুলুয়ার নিজের চেয়ে ও প্রিয় গানখানাকে তুলে নিয়ে গেয়ে। ভুলুয়া বুঝলে কলকাতার বিজলী-বাতির চোখ কলশুনো আলোর মধ্যে তাম্র মঞ্জুর হারিয়ে গেছে। তারপর কাল বৈশাখী বড় একদিন কেটে গেল।

ভুলুয়া তার সাথী মঞ্জুরে পায়ে চলা পথে ফিরে পেল।

ছবির এই হচ্ছে মূল কাহিনী।

ও শেষ চমৎকার। পথের সাধারণ ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাংলা দেশে এই প্রথম গল্প চলচ্চিত্রে উঠেছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রী সবাই এতে ভাল অভিনয় করেছেন। কাকুর অভিনয়ই খারাপ বলে মনে হয় নি। প্রথমেই নাম করা যায় শ্রীমতী কাননের। মঞ্জুর ভূমিকায় তিনি অভিনয়ে অনবদ্য সঙ্গীতে সুর, নৃত্যে ছবির সবখানিই চেয়ে রেখেছেন।

সায়গলকে এতদিন পরে নিউ থিয়েটারস্টুডিও বাংলা ছবিতে সত্যিকার চরিত্রে নামিয়েছেন। কোন জায়গায়ই তাঁকে মনে হয় না যে তিনি 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' নন। তাঁর গান এখনও আমাদের কাণে লেগে রয়েছে নির্মিত হয়েছে তার অভিনয়। অমরচাঁদের ভূমিকায় নেমেছেন শৈলেন চৌধুরী। তাঁর অভিনয় মন্দ নয়। তাঁর 'সাইলেন্ট লাভারের' ভূমিকাটা দর্শকের মনকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। এর পরই আসে ত্রিলোক নাথের নাম। অমরবাবু এই ভূমিকাটিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। শক্তিমানু অভিনেতা যে সব চরিত্রেই সফলতার সহিত অভিনয় করতে পারেন তার পরিচয়ই তিনি দিয়েছেন। নরেশ বোসের 'কবি' অহি সাম্রালের 'সঙ্গীত শিক্ষক' ও বোকেন চট্টো 'নবু'র অংশ আমাদের ভাল লেগেছে। ছোট 'ভুলুয়া'র অংশে সুবীরের গান ও অভিনয় ভালই। 'মধুর' ভূমিকায় পরেশ নামে ছেলেটিও বেশ ভাল করেছে। এ ছাড়াও ছোট ভূমিকায় সত্য মুখার্জী, কেট দাস ও

খগেন পাঠকের নাম উল্লেখযোগ্য। বিনয় গোস্বামী ও পূর্ণিমার গান ভাল হয়েছে।

ক্যামেরার কাজ উজ্জ্বল না হলেও প্রশংসনীয়। দিলীপ গুপ্ত স্বাধীনভাবে এই প্রথম কাজ করলেন। পরের ছবিতে তিনি অধিক পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন এ আশা আমরা রাখি। সাউন্ডের কাষে লোকেন বসু তাঁর পূর্বের কাজে ছবি অপেক্ষা এতে ভালই করেছেন। সাজ-সজ্জা ও সেট-সেটিং অনিন্দনীয় হয়েছে।

চিত্রখানিতে দর্শকগণকে আনন্দ দেবার জন্য প্রচুর উপাদান পরিবেশন করা হয়েছে বলেই ইহা বহুদিন ধরে অপ্রতিহতগতিতে চলবে—এ আশা আমরা নিঃসন্দেহে করতে পারি।

রায় বাহাদুর কারনানী

ম্যাডান ষ্টুডিওর সক্রিয় কর্তা রায় বাহাদুর শেঠ সুখলাল কারনানী বড়ই অসুস্থ শ্রমিয়। আমরা বড়ই চিন্তিত হইলাম। জগদম্বর তাঁকে নিরাময় করুন এই প্রার্থনা।

পথিক

ইন্দ্র মুভিটোনের 'পথিক' উত্তরায় মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে। পরিচালক চারু রায় তাঁর কাজ শেষ করেছেন।

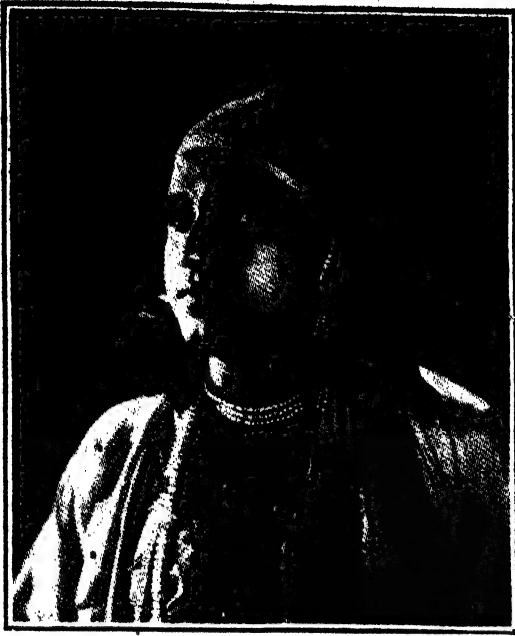
বথের শন

শ্রীমতী সুহাসিনীর অসুস্থতার জন্য শ্রীমতী শিশুবালাকে নেওয়া হয়েছে এজন্য কাজ একটু পিছিয়ে পড়ল।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টমের চা

সাহা ওঃ উৎসাহপ্রদ বিস্তৃত পানীয়



"জনক-নন্দিনী" চিত্রে মৃণাল ঘোষ

রাধা ফিল্ম কোম্পানী

পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীর দ্বিতীয় এই প্রতিষ্ঠানেই তোলার ব্যবস্থা হ'চ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরনারায়ণও চলবে।

জনক নন্দিনী

অবশিষ্ট দৃশ্যগুলি মায় তাড়কাবধ তোলার হয়েছে। ছবিখানি এখন সম্পাদনাগারে। রাধা ফিল্মসের এই রামায়ণী-চিত্র শীঘ্রই রূপবর্ণিতে মুক্তিলাভ করবে।

পরশমনি

পরিচালক প্রহ্লাদ রায় পরশমনি নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছেন।

চিত্রা ও নিউ সিনেমা

নিউ থিয়েটার্সের নূতন ছবি 'সাধী' মহাসমারোহে এই উভয় চিত্রগৃহে চলছে। নূতন ধরনের গল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যগীতের ছড়াছড়িতে ছবিখানি সকল শ্রেণীর দর্শকের নিকট প্রিয় হয়েছে। কানন ও সায়গল এ ছবিতে খুব খ্যাতি অর্জন করেছে।

এছাড়া শৈলেন চৌধুরী, অমর মল্লিক, বৌকেন, উম্ম প্রভৃতির সমাবেশ ও অভিনয় খুবই উপভোগ্য হয়েছে। পরিচালক ফণি মজুমদার সমস্ত উপাদান এমন ভাবে নিয়োগ করেছেন তাতে ছবির উৎকর্ষতা বেড়েছে। সঙ্গীত পরিচালক রাই বাবুরূত কথাই নেই তিনি চিত্রের উপযোগী বাজাই বাজাই

দুরন্তলি দিয়েছেন। কাননবালা ও সায়গলের গান অতি মনোহর হয়েছে। ছবিখানি আজ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়ল।

পূর্ণ থিয়েটার

নিউ থিয়েটার্সের "দেশের মাটি" আজ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পন করল। দক্ষিণ কলিকাতায় ছবিখানি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

রূপবাণী

'অভিনয়' এখনও চলছে। অভিনয়ের পর জনকনন্দিনী আসবে।

ফিল্ম কর্পোরেশন


শ্রীমান টুলু সেন 'দি রাইজ' নামের ছবিখানা নাকি আরম্ভ করেছেন। কিন্তু প্রচার শিল্পী নীরব কেন?

দেশদত্ত ফিল্মস

শোনা যায় অর্ন্ত এক চিত্র প্রতিষ্ঠান এ টুডিও ভাড়া নিয়ে চালাবেন তাঁর ব্যবস্থা হচ্ছে।

কালী ফিল্মস

নূতন আয়োজন এখনও কার্য্যকরী হয় নি, শীঘ্র হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।



**আধুনিক 3
সুন্দর ফটো
তুলিবার একমাত্র
শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান**

**মডার্ন ইলেক্ট্রিক
টুডিও**

৩২-সি
ধর্মতলা ট্রাট
কলিকাতা

ফোন-
কলি:
৫৩২৬

বেকার-নাশন শব্দ-বিন্যাস প্রতিযোগিতা ন্যূনো

১১৩বি, প্রিন্সেস স্ট্রীট (ওয়েলিংটন কোয়ার্টারের সন্নিকট), কিলিকাটা।

বাংলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতা নং ২

৩০০ পুরস্কার

অল্প দিন মনোযোগ সহকারে

৩০০ পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার ১৫০০

২য় পুরস্কার ১০০০

তৃতীয় পুরস্কার ৫০০ টাকা

শব্দ গঠন করিবার নিয়ম :—প্রত্যেক সাদা ঘরে একটি মাত্র অক্ষর বসিবে, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও

সংযুক্ত বর্ণকে একটি অক্ষর বলিয়া গণ্য করা হইবে, অল্প ঘরগুলি যথা নিয়মে থাকিবে।

প্রতিযোগিতার সমাধান পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮

বাং ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ সাল।

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

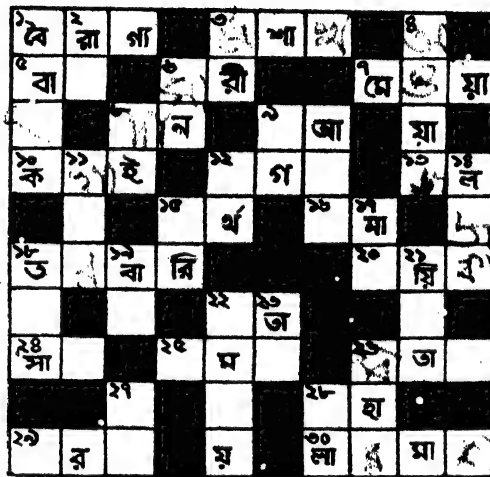
পাশাপাশি (Across)

- ১। আসক্তির নাশেই এর উদ্ভব।
- ৩। মাসের নাম। ৫। বাতিক।
- ৬। মড়ক।
- ৭। সবুরে '—' ফলে এইরূপ প্রবাদ।
- ৮। মহাভারতে কর্ণের এর জন্তই প্রসিদ্ধি বেশী।
- ৯। উন্টালে ভারতের স্থান বিশেষ।
- ১০। মাংস ব্যবসায়ী।
- ১২। উৎসবে নিমন্ত্রিতের : এ সম্ভাষণ পান।
- ১৩। জীবন।
- ১৫। চতুর্দশের অতীতম
- ১৬। সুন্দরী।
- ১৮। ধারাল অস্ত্র বিশেষ।
- ২০। এর অঙ্কনে অপেক্ষাকৃত দক্ষতার প্রয়োজন।
- ২২। ছিন্ন বস্ত্রাংশ।
- ২৪। এ যুগে ক্রমশঃই এ বিরল হচ্ছে।
- ২৫। রাজশক্তির এ নীতি জন্মত চিরকালই অপছন্দ করিবে।
- ২৬। এর আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর এক বিদ্বান।
- ২৮। ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ।
- ২৯। এ নীরস নম্র।
- ৩০। ঠিক করে সাজালে "মালাকার" পাবেন।

এইখানে কাটুন.....

বাংলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতা নং ২

কুপন নং



প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও আইনতঃ বাধ্য হইবে স্বীকার করিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম।

নাম.....

ঠিকানা.....

লোকাল রসিদ নং..... তারিখ.....

মনি অর্ডার নং.....

পোস্টেল অর্ডার নং.....

এইখানে কাটুন.....

উপর হইতে নিচে (Down)

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

- ১। বেয়াই।
- ২। এর "—" ভঙ্গন করতে শ্রীকৃষ্ণকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে।
- ৩। সম্ভব হলে এর শেষ রাখা অসমীচীন।
- ৪। এ সাধারণতঃ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
- ৬। আজকাল অনেকেই এ হানি হলেও গায়ে মাখে না। ৮। ধাত্রী।
- ৯। এর বন্ধীভূত হয়ে লোকে কত সাংঘাতিক কাজই না করে। ১১। শরীর সম্বন্ধীয়।
- ১২। এ ত্যাগ করতে পারে এমন লোক বিরল।
- ১৪। উন্টালে আখির অঙ্গন।
- ১৫। শত্রু।
- ১৭। অসং কার্যে যে এ না শুনে তাহার অমঙ্গলই বাঞ্ছনীয়।
- ১৮। নদী বিশেষ।
- ১৯। বিধাতা এ হলে নাচুয কি করবে।
- ২১। জী (ঠিক করে সাজালে)।
- ২২। ঠিক করে সাজালে আরোগ্য লাভ করিবেন। ২৩। সঙ্গীতের অঙ্গ।
- ২৬। বাঙ্গলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ।
- ২৭। এ মেটাবার জন্তে অনেকে পয়সা খরচ করে থাকেন।
- ২৮। উন্টালে তিকতে যেতে হবে।

প্রতি সমাধানের প্রবেশ মূল্য ১০ আনা কিন্তু একই ব্যক্তির একত্রে তিন খানা সমাধানের মূল্য ২০ আনা। লেখা কাটা যেন এবং পেন্সিলে লেখা চলিবে না। মণিঅর্ডার রসিদ সমাধানের সহিত গাথিয়া দিতে হইবে। রসিদ নম্বর নিজে টুকিয়া রাখিবেন। ১৮ই ডিসেম্বর রাত্রি ৭টার মধ্যে মফঃস্বল কুপন পৌছান চাই। অল্পখান অগ্রাহ্য হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কুপনে অথবা নিজে অধিকল ছক আঁকিয়া নথরাহুয়ারী শব্দ বসাইয়া দিলেও সমাধান গ্রাহ্য হইবে। একাধিক সমাধান হইলে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে। ১৮ই ডিসেম্বরের পর এক সপ্তাহের মধ্যে দৈনিক আনন্দবাজারে ম্যানেজারের নির্ভুল সমাধান প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপিত নিয়মাবলী ট্যাম্পসহ পত্র লিখিত পাঠান হয়।

বেকার নাশন শব্দ বিন্যাস প্রতিযোগীতা ব্যারে

১১৩বি প্রিন্সেস স্ট্রিট, কলিকাতা।

১ম প্রতিযোগীতার পুরস্কার-প্রাপকদের তালিকা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

নিম্নলিখিত ৬ জন নিতুল নিম্নলিখিত ৭৪ জন দুই ভুলে সমাধানে ৫০ টাকা হিসাবে ১০/১৫ হিঃ তৃতীয় পুরস্কার পাইবেন প্রথম পুরস্কার পাইবেন।

১। মিনা রায় C-0 বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ২। শ্রীযুক্ত ফণী ভূষণ মজুমদার, ১২বি, নর্থব্রেক কলিকাতা। ৩। শ্রীযুক্ত কানাইলাল

১। শ্রীরেণুকা দেবী চৌধুরাণী, আটআনি-রাজ, মুক্তাগাছা, মৈমনসিংহ। ২। শ্রীধরেন্দ্র কুমার ঘোষ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। ৩। শ্রীমুরেশ্বর নাথ রায়, চুনাপুকুর লেন, কলিকাতা। ৪। M. G. Mahiuddin

সেন, ৩৩নং নিউপার্ক স্ট্রিট, কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সাহা, পোঃ গ্রাম, চান্দাবাদ জিঃ ঢাকা। ৫। মাং আব্দুল মত লিব, সাং কলাগপুর পোঃ পুটিজুরী জিঃ শ্রীষ্ট। ৬। শ্রীযুক্ত বিধুলাল নাগ ৯-১ ক্রীক লেন কলিকাতা।

নিম্নলিখিত ১৫ জন এক ভুলে ১০ টাকা হিসাবে দ্বিতীয় পুরস্কার পাইবেন।

১। কাদম্বিনী রায় C-0 বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ২। অতুল চন্দ্র ঘোষ, ১০২-১ আমহাট স্ট্রিট, সিটি কলেজ, কলিকাতা। ৩। শ্রীশিবরানী রায় C-0 বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ৪। শ্রীযোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্য ব্যাকরণতর্ক, ২১০-এ বহুবাজার, কলিকাতা। ৫। শ্রীসোমনাথ রায় C-0 বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ৬। এন, এন, মল্লিক, হাসামদিয়া ফরিদপুর। ৭। শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস কবিরাজ C-0 ঢাকা ঔষধালয় লিঃ বহুবাজার কলিকাতা। ৮। মিঃ আব্দুর হোসেন, 20, Haldell Lane, Calcutta. ৯। Miss Sunila Ghosh C-0 Pulin Behari Ghosh, P O. Khurda, Puri ১০। ভোলা নাথ সেন C-0 এন, বি, এন্ড এম, ইনস. কোং লিঃ, কলিকাতা। ১১। Duli Chand Roy, Auditor, Naogaon, Rajshahi. ১২। Krishna Kumar Roy, Teacher, Jalsuka, Sylhet. ১৩। শ্রীপ্রিয়জনা নাথ রায় C-0 বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা দিনাজপুর। ১৪। শ্রীপ্রফুল্লবালা রায় C-0 বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা দিনাজপুর। ১৫। শ্রীরাধা নাথ রায় C-0 বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর।

C-0 Fazaluddin Ahmed Tampat Rangpore. ৫। J. C. Nandy, College Street, Calcutta ৬।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র চৌধুরী, কালীতলা, দিনাজপুর। ৭। শ্রীভোলানাথ মৈত্র, সেরপুর বগুড়া। ৮। প্রভা দেবী C-0 শ্রীদক্ষিণাপদ গাঙ্গুলী, মুর্শিদাবাদ। ৯। শ্রীমতী কুতুরানী দেবী C-0 শ্রীদক্ষিণাপদ গাঙ্গুলী, মুর্শিদাবাদ। ১০। শ্রীমাধবী রায় C-0 অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ১১। শ্রীঅঞ্জলি রায় C-0 অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ১২। শ্রীবিখনাথ রায় C-0 অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ১৩। শ্রীমণিকান্ত রায় C-0 অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ১৪। শ্রীসবিতাবালা ঠাকুর টেম্পল স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৫। শ্রীশ্রীচরণ বসাক, নুওগা হাইস্কুল রাজসাহী। ১৬। শ্রীনিতাইপদ সাহা, স্টার হাউস, বোটানিকেল গার্ডেন, হাওড়া। ১৭। শ্রীস্বধীর চন্দ্র বসু, বোবাজার কলিকাতা। ১৮। শ্রীজয়কেশ ভট্টাচার্য্য, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৯। শ্রীকানাইলাল মাস্তা, নর্থ ব্রিটিশ মার্কেটস্টাইল কোং লিঃ কলিকাতা। ২০। শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় কুষ্টিয়াবাজার, নদিয়া। ২১। শ্রীকালিপদ ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। ২২। শ্রীনলিনীবালা দেবী, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। ২৩। শ্রীমদনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, টেম্পল স্ট্রিট, কলিকাতা। ২৪। শ্রীঅনিমা চৌধুরী, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা। ২৫। রায় সুধেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পদ্মপুকুর এলগিন রোড কলিকাতা। ২৬। শ্রীকালিপদ গঙ্গোপাধ্যায় শোভাবাজার স্ট্রিট, হাটখোলা কলিকাতা। ২৭। শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য,

১নং প্রতিযোগীতার নিতুল সমাধান

অন্নদা নিয়োগী লেন বাগবাজার কলিকাতা। ২৮। শ্রীমতী সুনীলাবালা নন্দী, মণিকতলা স্ট্রিট কলিকাতা। ২৯। শ্রীমতী লিলি সেন, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা। ৩০। শ্রীগঙ্গাধর ঘোষ, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট কলিকাতা। ৩১। জাহাঙ্গীর আলী, চৌধুরী, মাদারবাড়ী চট্টগ্রাম। ৩২। শ্রীবৈষ্ণব নাথ দত্ত, আত্মতোষ মুখার্জি লেন, সালকিয়া হাওড়া। ৩৩। শ্রীপাচুগোপাল সাহা, কলকাতা পাল লেন কলিকাতা। ৩৪। শ্রীরামদাস সেনগুপ্ত, Preventive Dept. Customs House. ৩৫। শ্রীলাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্তা, গোকুল, মিত্র লেন কলিকাতা। ৩৬। শ্রীরামলাল চক্রবর্তী, কেশব সেন স্ট্রিট কলিঃ। ৩৭। শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত (Councillor Cal. Corporation), বাবুরাম শীল লেন কলিঃ। ৩৮। শ্রীবিখনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড কলিকাতা। ৩৯। শ্রীমতী বিনোদিনী রায়, C-0 কৃষ্ণকুমার রায় ; টিচার জলসুকা, সিলেট। ৪০। শ্রীমতী কল্যাণী রায় C-0 কৃষ্ণকুমার রায় ; টিচার জলসুকা, সিলেট। ৪১। শ্রীবীরেশচন্দ্র রায়, চক্রা, পাঁচপাইকা, ঢাকা। ৪২। ভবানীশঙ্কর বসাক, চিলমারী এইচ ই স্কুল রংপুর। ৪৩। শ্রীমুরেশচন্দ্র পণ্ডিত, বৈলর, ধানিখোলা, মৈমনসিংহ। ৪৪। ডাঃ বি. সি, মজুমদার H. M. D. সিলিগুড়ি দাঙ্গিলিং। ৪৫। মহম্মদ এম, রহমান C-0 B C Majumder H M D P.O. Sili-guri Darjeeling ৪৬। সৈয়দ নয়া মিত্রা, খোলাহাটী, গাইবান্ধা রংপুর। ৪৭। শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া ২৪ পরগণা। ৪৮। শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নর্থ গেওয়ারিয়া

ফরিদাবাদ ঢাকা। ৪২। শ্রীম্বেদকুমার
চৌধুরী শান্তি নিকেতন ফরিদপুর। ৫০।
শ্রীবিধৌ সেন, কল্যান কুটীর, পাবনা। ৫১।
শ্রীঅমরনাথ রায় C-০ অনাদি নাথ রায়,
কালিতলা দিনাজপুর। ৫২। শ্রীঅশোকনাথ
রায় C-০ অনাদি নাথ রায়, কালিতলা দিনাজ
পুর। ৫৩। শ্রীসঙ্ক্যারাবী রায় C-০ অনাদিনাথ
রায়, কালিতলা দিনাজপুর। ৫৪। শ্রীপ্রশান্ত
রায় C-০ অনাদিনাথ রায়, কালিতলা দিনাজ-
পুর। ৫৫। শ্রীমীরা রায় C-০ অনাদিনাথ
রায়, কালিতলা দিনাজপুর। ৫৬। শ্রীসতীনাথ
রায় C-০ অনাদিনাথ রায়, কালিতলা দিনাজ-
পুর। ৫৭। শ্রীগীতা C-০ N. N. Mitra,
লাবান আসাম। ৫৮। Mr. S. K. Ghose,
Office of Inspector of schools, Dacca.
৫৯। শ্রীচিন্তাহরণ দে সরকার, আড়াই
হাজার ঢাকা। ৬০। শ্রীপবিত্রহরি মুখো-
পাধ্যায়, কালিচরণ শেঠ লেন, ২৪ পরগণা।
৬১। শ্রীঅনঙ্গমোহন আচার্য্য, রাজা দীনেন্দ্র
স্ট্রীট কলিকাতা। ৬২। শ্রীনিখিলকুমার বসু,
আনন্দমোহন দাস লেন ফরাসগঞ্জ ঢাকা।
৬৩। শ্রীমুখীকুমার ঘোষ, কৃষ্ণরাম বোস
স্ট্রীট কলিকাতা। ৬৪। শ্রীমনমোহন দে শিব-
নারায়ণ দাস লেন কলিকাতা। ৬৫।
শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় মদন দত্ত লেন,
কলিকাতা। ৬৬। এ এইচ, এম, সাহাবুদ্দিন,
বৈলর, ধানিখোলা, মৈমনসিং। ৬৭।
শ্রীতেজেন্দ্রচন্দ্র দাস রায়, আড়াই হাজার
ঢাকা। ৬৮। জুসাম্মত সামছুন নেহার C-০
খাজা আবছুলকাদের রংপুর। ৬৯। শ্রীরাধা-
বল্লভ পোদ্দার বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা।
৭০। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কলেজ স্ট্রীট কলিঃ।
৭১। শ্রীগোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ, রূপচাঁদ
মুখার্জী লেন ভবানীপুর, কলিকাতা। ৭২।
শ্রীজগৎচন্দ্র বসু, কণ্ঠাই মেদিনীপুর। ৭৩।
শ্রীখগেন্দ্রমোহন কুণ্ডু সেরপুর বগুড়া। ৭৪।
কুমারী হবিরানী কুণ্ডু সেরপুর বগুড়া।

বি বি ঐ

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলন

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের আগামী
অধিবেশন ৩০শে ডিসেম্বর সূর্য হইবে এবং
প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে ১৭ই ডিসেম্বর।
নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রাণ-স্বরূপ
পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত রসিক
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অসুস্থতা
নিবন্ধন গত বৎসর পিছাইয়া গিয়াছিল।
গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভূপেন্দ্রবাবুর অকুণ্ঠ
অর্থব্যয়ে ও আশ্রয় প্রদেয় সম্মেলন
সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। আমরা আশা
করি এ বৎসরও সঙ্গীত-সম্মেলন ও
প্রতিযোগিতা পূর্ববৎসরের ত্রায় সাফল্য-
মণ্ডিত হইবে।

মিড ল্যান্ড ক্রিকেট ক্লাব

খিদিরপুর অঞ্চলে গত কয়েক বৎসর
যাবৎ এই নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে
উঠেছে। খেলার দিক দিয়ে এরা এযাবৎ
সর্বত্রই সুনাম পেয়ে এসেছে। গত
২৬শে নভেম্বর ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট গণ্যমান্য
ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের
১৯৩৮/৩৯ সালের জন্ত কার্য্য নির্বাহক
কমিটির সদস্য নির্বাচন স্থির হয়েছে।
খিদিরপুর সুইমিং ক্লাবের জনপ্রিয় সভাপতি
শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই
প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৮/৩৯ সালের কার্য্য-
নির্বাহক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত
হইয়াছেন এবং যথাক্রমে শ্রীযুক্ত অসিত
কুমার বসু ও শ্রীযুক্ত ইরীন বিহারী মুখো-
পাধ্যায় সম্পাদক ও অধিনায়ক নির্বাচিত

হইয়াছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের
সর্বদায়ী কুশল কামনা করি।

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসো-

সিয়েশনের নূতন সভাপতি

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের
সভাপতি মিঃ ডবলিউ, আর ইলিয়ট
বিদায় গ্রহণ করায় সেই স্থলে মিঃ জে,
এম, দত্ত উক্ত পদে সর্বসম্মতিক্রমে
নির্বাচিত হইয়াছেন। ইনিই প্রথম ব্যক্তি
তাছাড়া ইতিপূর্বে কোনও বাঙ্গালী এই
পদে নির্বাচিত হন নাই। ১৯১৯ সালে
তিনি শেয়ার মার্কেটে যোগদান করেন
এবং ১৯২৪ সালে ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসো-
সিয়েশনের কার্য্য নির্বাহক সভার সদস্য
নির্বাচিত হন। তদবধি অসহযোগ
আন্দোলন কালের কয়েক বৎসরকাল ব্যতীত
প্রতি বৎসরই তিনি কার্য্য নির্বাহক সভার
সদস্য নির্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন।
ব্যবসায়ী মহলে মিঃ দত্ত বিশেষ জনপ্রিয়
এবং সকলেই তাহাকে তাহার সততা
ও উচ্চাদর্শের জন্ত বিশেষ শ্রদ্ধা করেন।
আমরা তাহার নব কর্ম্মজীবনে মঙ্গল
কামনা করিতেছি।

শোক সংবাদ

গৌহাটি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
শ্রীযুক্ত চুর্ণীলাল দে তাঁহার কলিকাতার
বাসভবনে ৩৪ পদ্মপুত্র রোডে গত ২৮শে
নবেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। মাত্র
কয়েকদিন রোগ ভোগের পর তাঁহার
মৃত্যু হইয়াছে। গত ১৮৯৩ সালে তিনি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাস্ত্রে

এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। কয়েক বৎসর অধ্যাপকরূপে কার্য করার পর গত ১৯০১ সালে তিনি গোহাটি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসএ উন্নীত হন। গোহাটি কুটন কলেজের সিনিয়র অধ্যাপকরূপে কার্য করার সময় কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নিরতিমান ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। জাতিধর্ম নিরীক্শেবে সকলকেই তিনি অকাতরে সাহায্য করিতেন।

চৌবঙ্গী টেরেস মিউজিক ক্লাব

গত রবিবার ইংরাজী ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় বায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৩নং গোখেল রোডস্থিত বাসভবনে উক্ত ক্লাবের ষষ্ঠ মাসিক সঙ্গীতসম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুত অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রোঃ সুশীল বসু, সুবল দাশগুপ্ত, হুটু মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সান্ন্যাল ও বিমল ভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীগণ এই আসরে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ক্লাবের সহিত প্রোঃ জানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কুমার শচীন দেববর্মন, মণ্টু বাবু ও রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জি প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পীগণ সংশ্লিষ্ট আছেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীতের প্রসার উদ্দেশে ভবানীপুরস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এই ক্লাবের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

হুজুর সঙ্ঘ

গত ১০ই অগ্রহায়ণ রবিবার সুধীর দাস মহাশয়ের ভবনে সঙ্ঘের একাদশ অধিবেশন

সংস্কার

(সামাজিক উপদ্রাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তা কেমন করে হবে ? যারা আপনাদের দেহ বিক্রয় করে দেহের ঋণ পরিশোধ করে, এতবড় গর্হিত কর্ম করেও কি তারা নিষ্পাপ ?

আমি ত বলি তারা নিষ্পাপ। তারা হয়তো সমাজের বিরুদ্ধে পুাপ কর্ত্তে পারে। কিন্তু—

উঃ! এত বড়ো কথা কে বলতে পারে ? তুমি যে সমাজের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে এত বড় কথা বলচো, এতে আমার আশ্চর্য্য লাগচে।

আশ্চর্য্য লাগবারই কথা! কেননা তুমি এতে অভ্যস্ত নও। বাল্যাবধি তোমার যে

সুকবি শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। সভায় সুধীরজন মুখোপাধ্যায়-এর ‘অপরূপ অপরাহ’ ও সন্তোষ ঘোষের ‘যযাতি’ গল্প পাঠ করা হয়। গল্প দুইটি মনোজ্ঞ হইয়াছিল। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মায়াবী প্রভৃতি কবিতা চিন্তাকর্ষক হইয়াছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি কোন দিকে হওয়া উচিত তাহা লইয়া গভীর এবং বিশেষভাবে আলোচনা হয়। আলোচনায় যোগদান করেন সুশীল জানা, জগৎদাস, সমীর ঘোষ প্রভৃতি। উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু সেনগুপ্ত, ফাল্গুনী রায় প্রভৃতি অনেকে। সবশেষে সভাপতির ‘ক্যাব্য প্রেম’ নামক অভিভাষণটি সভাস্থ সকলকে শ্রুত করে।

সংস্কার আছে। সেইটেই তোমার চেনা রাস্তা। এ ছাড়া যে কোনও রাস্তা তোমার সম্মুখে পড়লেই অপরিচয়ের আশঙ্কায় তুমি সেটাকে ত্যাগ করবে। এটা মাহুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম।

তাহলে তোমার মতে, পেটের জ্বালায় দেহ বিক্রি করা পাপ নয় ?

তার যদি অল্প রাস্তা খোলা না থাকে, এ রাস্তায় আসার জন্তে, তাকে পাপী বলা আমার বিবেক বুদ্ধিতে বাধে।

(অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ)

দেখ নতুন গিন্নি! তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছ, এমন কল্ হুদিনে বাড়ী থেকে তাড়াবে—হাড়িতে যারগা দিয়েছি, সেটুকুও কেড়ে নেবে।

হাঁড়ি কি শুধু তোমার একার, যে কেড়ে নেবে ?

পৌরাণিক ছবির প্রয়োজন করে রাখা কিংবা বাংলার চলচ্চিত্র জগতে আজ যে খ্যাতি অর্জন করেছে—জনম দুঃখিনী জানকী এবং শ্রীরামচন্দ্রের যৌবনের শৌর্য্য-বীর্য্য-ভরা প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে চিত্রিত এই

জনম

নন্দিনী

সে গৌরব শতগুণ বাড়িয়ে তুলবে

N. I. P.

বেশী বাড়াবাড়ি করো না নতুন গিন্নি !
তাহলে ঐ মুড়ো খ্যাংরা দেখচো, ওটির
সদ্যবহার আমায় কৰ্ত্তে হবে।

হঠাৎ বগড়াহলে বিরিকি আসিয়া
বলিয়া উঠিল—বড় বোঁ ? এ মাসে যে
তোমার খোরাকি এল না ?

তাহ'লে কি হোটেলে আর খেতে
পাব না ?

তাইতো ভাবচি। কয়েত গিন্নি কি
কাকি দেবার চেষ্টায় আছেন ?

না, না তাকি তিনি দিতে পারেন ?
এ যে তাঁর পিতৃমাতৃ দায় ! শেষকালে
কি বাপপিতামহকে অনন্ত নরকে পাঠাবেন ?

তিনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন
সেটা না পালন করা মানেনই মহাপাপ।
তাতে বাপপিতামহ নরকস্থ হতে
পারে বৈকি !

কিন্তু যে নিজের স্ত্রীকে নিজের ব্যয়ে
ভরণপোষণ করে না,—তার বোধহয়
নরকে যাবার কোনও সম্ভব নেই ! যে
দাতা, তারই যাবার কথা !

নরকে যাবার কথা কার, তানিয়ে আমি
তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাই
না ! তবে একথা ঠিক, খোরাকি না এলে,
এ বাড়ীতে তোমার আসন টলমল করবে।

এ ছেঁড়া আসন টলমল করার চেয়ে
একেবারেই যাওয়া ভাল। আমায় স্পষ্ট

করেই বলে দাওনা, “আমার বাড়ী থেকে
চলে যাও,—আমি আর খেতে দিতে
পারবো না !”

কি জানো বড়বোঁ ? তোমাদের
হুজুরের কৌদল আর আমি সহ কৰ্ত্তে
পারছিলাম। অবিশিষ্ট বুঝতে পারি, ছোট
বউ বেশী গায়ে পড়ে বগড়া করে ! কিন্তু
কি কর্ণো বলো, তাকে আমি শাসন কৰ্ত্তে
পারি নে ! তুমিও যে কারণে তাকে ভয়
করো, আমিও তাকে ঠিক সেই কারণে ভয়
করি। তোমার ওপর আমার দয়া থাকলেও
আমার ওপর দয়া কর্ণার যে কেউ নেই !
এই সেদিন যে ছোট বউ তোমার সঙ্গে
কৌদল ক'রে, কৌদল মেটাতে এলো
আমার পিঠের ওপর, তখনতো ত্রিভুবনে
এমন কাকেও দেখলাম না, যে এই কুলীন
ব্রাহ্মণকে রক্তারক্তির হাতথেকে উদ্ধার
করে। তুমি নিজেও ত নিজের পথ
দেখলে ! আমি বেচারি মাঝখানে পড়ে
বেশ খানিকটা অমৃত-বর্ষণ খেয়ে নিলুম !

আমার পালান ছাড়া উপায় ছিল না।
তোমার আছুরে বউ যে মূর্তি নিয়ে তেড়ে
এসেছিল, সে মূর্তি দেখলে পুলিশের
লোকরাও আতঙ্কে পালিয়ে যেতো, আমিও
কোন্ হার ?

লবঙ্গর কথা - শুনিয়া বিরিকি একটা
চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অনেক কষ্টে

বলিল : সেই জন্তেইতো বলছি বড়বউ
যদি নম্বর দেহটার ওপর কোনও রকম মায়
পড়ে থাকে, তাহ'লে এইবেলা “শত হস্তেন
বাজিনাং” ক'রে কোথায়ও সরে পড়ো,
নইলে কেন এই নির্দোষ স্বামীটিকে খুঁনী
আসামী ক'রে আদালতের কাটগড়ায়
পুরবে ? তাতে তোমার খোরাক-
পোষাকের কোনও সুবিধে হবে না,—

তুমি তোমার নিজের বউকে শাসন
কৰ্ত্তে পার্ণে না ?

শাসন ? শাসন আগে অনেক করতে
গিয়েছিলুম, কিন্তু নিজে হুদুগুদু সেটা
ফিরিয়ে পেয়েছি। লবঙ্গ, পৃথিবীতে কতক-
গুলি জাতি আছে, যাদের শাসন কৰ্ত্তে গেলে
নিজেই তার জালে জড়িয়ে পড়তে হয় !
এই জাতির মধ্যে প্রধান এবং অগ্রণী হচ্ছে
মোজ-পক্ষের বউ ! এই সকল জাতিদিগের
উপর শাসনের কথা ভাবতে গেলে, শোষণ
এসে পড়ে মনের মধ্যে ! বড় জটিল প্রণ,
লবঙ্গ ! কোনও মুনি-ঋষিরাও এই কঠোর
সাংখ্য হুত্রটির সমস্তা ভঞ্জন করে যেতে
পারেন নি।

(ক্রমশঃ)

মোটোপলিটান পিকচার্সের অবিস্মরণীয় বাণী-চিত্র

শত্রু - মিত্র নির্বিশেষে
প্রশংসিত অভিনব চিত্র-কথা

উত্তর

খানা

বর্তমান বৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
চিত্র বলিয়া অভিনন্দিত

পঞ্চম
সপ্তাহ

শ্রেষ্ঠাংশে : অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া দেবী

উল্কা

(নাটক)

শ্রীভারতকনাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্র।

জগদীশ - দার্শনিক পণ্ডিত, নলিনী -
জৈনক ধর্মীর পুত্র, রমেন্দ্র - জগদীশের বন্ধু
পুত্র, হেমেন্দ্র - সংবাদপত্র সেবী, মিঃ
গ্যানিশ - সিনেমা ডাইরেক্টর, নটবর -
নলিনীর পার্শ্বচর, ব্রজেন্দ্র - কেরাণী, বিরজা
- সিনেমা অভিনেতা, মিঃ মিত্র - সিনেমা
আর্টিষ্ট, আর্টিষ্টগণ, পথিক, উদাসী ইত্যাদি।

উদ্ধা - জগদীশের কন্যা, ইন্দ্রা -
হেমেন্দ্রের ভগ্নী, তরলা - সিনেমার অভিনেত্রী,
চঞ্চলা - নটবরের স্ত্রী, ভবতারিণী -
ব্রজেন্দ্রের স্ত্রী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[“জগদীশ” বাবুর ড্রয়িং রুম। জগদীশ
বাবু বসিয়া কি সব লিখিতেছেন।
টেবিলের চতুর্দিকে, বই ছড়ান। বাহিরে
জল ঝড়ের প্রবল দাপাদাপি। মাঝে
মাঝে মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের চকিত
রেখা।]

জগ - তাইত! জল ঝড় দেখছি
ক্রমশই বেড়ে চললো! অথচ ৭টায় মিটিং।
ওরে, কে আছিল - জানলাটা বন্ধ করে
দে - আর বুলাকে পাঠিয়ে দে।

[বয়ের প্রবেশ]

বয় - বাবু - বাবু

জগ - এ্যা - কি - ?

বয় - দিদিমনিতে বাড়ীতে নেই।

জগ - বাড়ীতে নেই? কই আমি
তা জানতে পারলাম না। তাইত' এই
জল ঝড় - বিপদেও ত' পড়তে পারে!
নাঃ তোরা দেখছি আমার কোন কথা

জানতেই দিবিনে। তাইত কোথায় বা
তাকে খুঁজি - অথচ ৭টায় আবার একটা
মিটিং - কিন্তু বেরুই বা কি করে! নাঃ -

[নলিনীর প্রবেশ]

জগ - এই যে বাবা নলিনী - খুব ভিজে
গেছো বোধ হয়?

নলিনী - আজ্ঞে না - আমি ত মোটরেই
আসছি।

জগ - ও তাওত বটে, আমি জানতেই
পারিনি। কিন্তু এখানে আমার বড়ই
ভাবনা হ'য়ে উঠল। বুলা গ্যাছে বেড়াতে
এখনও ফেরেনি, এই বড় জল - বিপদ হবার
সম্ভাবনাও বড় কম নয়।

নলিনী - আপনি যদি বিপদ টেনে
আনে - কে কি করতে পারে বলুন?

জগ - বিপদ! কি বিপদ নলিনী?
আমায় বেশ রুগ্নে বুঝিয়ে বলত বাবা।
আমিত কিছুই জ্ঞাতে পারিনি। তাইত
মনটা আরও অস্থির হ'য়ে উঠল।

নলিনী - উপস্থিত হয়ত বিপদ হয়নি
কিন্তু হ'তে কতক্ষণ?

জগ - তাত বটেই। বিপদ যে কোথা
দিয়ে আসে। কিছুই জানতে পারা যায় না।
কিন্তু কার সঙ্কে বলছ বলত নলিনী?

নলিনী - আপনাকে কতদিনই বলেছি
বুলাকে যখন তখন যার-তার সঙ্গে বেড়াতে
বারণ করে দেবেন। আর কেন যে বলি,
তাও হয়ত আপনি জানেন।

জগ - তা হয়ত জানতেও পারি - কিন্তু,
কটা বাজল দেখত?

নলিনী - ছটা কুড়ি -

জগ - ছটা কুড়ি! তাইত ৭টায় একটা
মিটিং অথচ বুলা এখনও এল না - নাঃ।

নলিনী - এখন ব্যস্ত হ'য়ে কি করবেন
বলুন?

জগ - বা ব্যস্ত হয়নি, তবে কিনা বৃষ্টিটা
যেন - ধামল না?

নলিনী - একটু থেমেছে।

জগ - তাহলে তোমাকে একটু বসতে
হবে নলিনী। আমি একবার দেখি ওর
- ছাতাটা, নাঃ থাক -

নলিনী - এই জল-ঝড়ে কোথায়
খুঁজবেন বলুনত?

জগ - তাও বটে! কিন্তু ভাবনাটাও
ত বড় কম নয়। তা ঝাক - তুমি বস আমি
না হয় একবার -

নলিনী - এই দুর্ব্যোগে-স্বাপনাকে একলা
ছেড়ে দিতে আমি কিছুতেই পারব না।
চলুন আমিও যাচ্ছি।

জগ - যাবে? তা বেশ চল - কিন্তু বড়ই
ব্যস্ত হ'য়ে পড়লুম -

[নলিনী ও জগদীশের প্রস্থান]
[একটু পরেই ভিজা কাপড়ে রমেন্দ্র ও
উদ্ধা প্রবেশ করিল।]

উদ্ধা - আপনি বেশ লোক ত, অত বড়
বিপদ থেকে আমায় রক্ষা করলেন - অথচ
তার বিনিময়ে এতটুকু যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
করব - সে পথও বন্ধ করে দিতে চান?
না তা হবে না - আপনাকে একটু বসতেই
হবে।

রমেন্দ্র - আমি আর এমন কি কাজ
করেছি বলুন যার জন্য আপনি এতটা
উতলা হ'য়ে পড়ছেন?

উদ্ধা - কি করেছেন! আজ যদি আপনি
সেই Spot এ না এসে পড়তেন, হয়ত সেই
অসত্য লোকগুলোর কাছে অনেকখানি
হাছানাই ভোগ করতে হ'ত।

রমেন্দ্র—তা হয়ত হত। কিন্তু রাগ করবেন না—সেই রকমই একটা কিছু আপনার হওয়া উচিত ছিল।

উদ্ধা—উচিত ছিল। বেশ বা বলবার হয় বহু—প্রতিবাদ আমি করতে চাই না। কারণ আপনি আমার উপকারী—আপনার অসম্মান আমি কখনই করব না—করতে পারি না। সুধোমুখী ঝগড়া করলেও না।

রমেন্দ্র—বলুন! আপনি আমাকে। কিন্তু ভিজ্ঞে কাপড়ে কতকণ থাকবেন, ওতে বাহ্যের ক্ষতকে কতি হতে পারে।

উদ্ধা—আপনি তাহলে একটু বসুন আমি পাঁচমিনিটের মধ্যেই আসছি। চলে যাবেন না যেন। বসুন যাবেন না?

রমেন্দ্র—বেশ! কিন্তু এত আগ্রহ করে আটকে না রাখলেও পারতেন।

উদ্ধা—না—তা হবে না—আমি এলাম বলে। [প্রস্থান]

[রমেন্দ্র একখানি মাসিক পত্রিকা টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে বাহিরে শোনা গেল নলিনীর কণ্ঠস্বর]

“ওরে, কে আছিস—বুলা এসেছে?”
বুলা—

[নলিনীর প্রবেশ]

নলিনী—আপনি কাকে চান?

রমেন্দ্র—ঠিক যে কাকে চাই বল কঠিন।

নলিনী—বলা কঠিন! strange! আপনি বোধ হয় মিঃ রায়কে চান? তিনি বাড়ী নেই, মিটিংএ গিয়েছেন কিংবদন্তি বিলম্ব হবে।

রমেন্দ্র—মাক্ করবেন—মিঃ রায় যে কে জামি চিনি না। তবে যিনি আমার অপেক্ষা করতে বসে গিয়েছেন হয়ত তিনি এখনই এসে পড়বেন তাঁর কাছেই সব জানতে পারবেন।

নলিনী—ও তাহলে এ বাড়ীর সঙ্গে আপনার কোন পরিচয়ই নেই?

রমেন্দ্র—না, আপনার মন খারাপ করবার কোন কারণ নেই।

নলিনী—তার মানে? আপনার মনো-ভাবটা কি শুনি?

রমেন্দ্র—দেখুন, অকারণে ঝগড়া করা আমি পছন্দ করি না। হয় আপনি স্থির হয়ে বসুন না হয় বাড়ীর ভেতর গিয়ে আপনার প্রেমের মীমাংসা করুন।

নলিনী—আপনি বুঝি ভক্ততা কাকে বলে তাও জানেন না?

রমেন্দ্র—জানি, কিন্তু ঠিক আপনার মত শিখে উঠতে পারিনি।

নলিনী—খুব সাবধান হয়ে কথা বলবেন—

[ঠিক এই সময়ে প্রবেশ করিল উদ্ধা খাবারের থালা লইয়া, নলিনী আরক্তনেত্রে একবার দেখিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিল—]

উদ্ধা—আপনাকে অনেকখানি কষ্ট দিলাম।

[খাবারের থালা রাখিতে গিয়া নলিনীকে দেখিয়া বসিল]

উদ্ধা—একি! নলিনীদা! কতকণ এসেছে? বাড়ী এসে শুনলাম তোমরা আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছো। বাবা কোথায় গেলেন নলিনীদা?

নলিনী—মিটিংএ কিন্তু তোমার অতিথি সৎকারটা একটু তাড়াতাড়ি “সেরে নিলেই ভাল হয়। [উত্থান]

রমেন্দ্র—কিন্তু—সৎকারের ব্যবস্থাটা অল্প নম্র দেখছি আর সেটা সারতে একটু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। অতএব এতকণ যেমন ধৈর্য ধরে ছিলেন আরও কিছুকণ আপনাকে থাকতে হবে দেখছি। রাগ

আপনার বেড়েই যাবে। কিন্তু এগুলোর সম্ব্যবহার না করে মিস্ রায়কে ক্ষম্ম করতে চাই না কি বলেন?

উদ্ধা—নিশ্চয়ই। বসনা নলিনীদা। এর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই বোধ হয়?

উনি, যে উপকার আজ আমার করেছেন—

নলিনী—তাতে দেখতেই পাচ্ছি—নইলে আর বাড়ী পর্যন্ত ধরে এনেছো আলাপ করবার জন্তে—

উদ্ধা—হিঃ হিঃ কি বলছ নলিনীদা—আচ্ছা তুমি এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছো কেন বলত?

নলিনী Excuse me বুলা—অসভ্য লোকের অসভ্য আচরণ আমি কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারি না।

উদ্ধা—তুমি কাকে mean করে বলছ?

রমেন্দ্র—আপনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে।

যাই হোক ঔর উত্তেজিত হবার কারণ পরেই না হয় জিজ্ঞাসা করবেন। এখন অমুমতি করণ এগুলোর সম্ব্যবহার করি কারণ আপনিও না খাইয়ে ছাড়বেন না—আর আমারও না খেয়ে যাওয়া উচিত নয়।

[রমেন্দ্র খাইতে লাগিল]

রমেন্দ্র—[নলিনীর প্রতি] আপনি মনে কিছু করবেন না। দশ পনের মিনিট বাদেই অপরিচিতের মত চলে যাব। পরিচিত হ’তে হয়ত আসবও না। আপনি যেমন এদের আত্মীয় আছেন—তেমনিই থাকবেন। ভয়ের কোন কারণ নেই।

উদ্ধা—অপরিচিতের মত চলে যাবেন মানে? তা হবে না আজ থেকে আপনাকে পরম আত্মীয় বলেই মেনে চলব।

রমেন্দ্র—কিন্তু ঘুরোয়া যুদ্ধ বেঁধে যাবে মিস্ রায়।

নলিনী—এরকম বাজে কথায় আমি সময় কাটাতো পারব না বুলা—তা আমি বলে দিচ্ছি।

উদ্ধা—বেশত নলিনীদা তোমার যদি বিশেষ কাজ থাকে আটকে রাখতে চাই না।

নলিনী—বেশ তাহলে আমি চলে—

[কিছু দূরে গিয়া আবার ফিরিল]

নলিনী—কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে কোন একটা বিষয়ে কথা না করে যেতে পাচ্ছি না।

উদ্ধা—কিন্তু বাবাত এখন নাই অভাব কথাটা উপস্থিত বন্ধ রাখতেই হবে। আর সেটা বোধহয় আমাকে বলবে না—না?

নলিনী—না—

উদ্ধা—বেশ বাবা এলে তাঁকেই বোলো।

নলিনী—তার অন্তে দেখছি আমার অপেক্ষা করতেই হবে।

[নলিনী বসিল]

রমেন্দ্র—আপনারা যুদ্ধটা দেখছি এখন থেকেই আরম্ভ করলেন। কিন্তু জানি, আমি চলে গেলেই সব মিটে যাবে। আচ্ছা আমি তাহলে উঠি মিস্ রায়—নমস্কার। আপনি যে মুখ ফিরিয়েই রইলেন। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আপনি দিলেন না—যাই হোক ভবিষ্যতে সুযোগ আসতেও পারে—আচ্ছা নমস্কার—

[প্রস্থানোত্তত]

উদ্ধা—একটা কথা—

রমেন্দ্র—বলুন—

উদ্ধা—আবার কবে আপনাকে expect করতে পারি?

রমেন্দ্র—Expect করা বুধা মিস্ রায়। আমি একটা প্রকাণ্ড ভবন—এক জায়গায় থাকবার স্থিরতাও নেই, আবার ঠিক একটা জায়গাও নেই।

নলিনী—সেটা আপনাকে দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

রমেন্দ্র—পারবেন বৈকি আপনি একজন জহুরী—জহুরী চিনবেন না—

উদ্ধা—আচ্ছা নলিনীদা—কেন মিছে ঝগড়া করছ বলত?

নলিনী—আমি ঝগড়া—করছি?

উদ্ধা—বাবো, ঝগড়া নয়। আচ্ছা আপনি বলুন?

রমেন্দ্র—যাক আপনাদের গোপন কথা গোপনেই থাক, মিস্ রায়। আমি চলাম। [প্রস্থান]

উদ্ধা—সত্যি বলছি নলিনীদা তুমি ভারী লোকের সঙ্গে ঝগড়া কর—একজন ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছেন তাঁকে একটু না হয় Receive করেছি, তাতে তোমার এত রাগ হল কেন বলত? তাহাড়া—

নলিনী—থাক-থাক-ওকে তুমি চেন? যাকে আজ এত Support করছ?

উদ্ধা—না—চিনলেও এইটুকু জানি নলিনীদা—তিনি আমার কত উপকারী—যে অপমানের হাত থেকে উনি আজ বাঁচিয়েছেন, সত্যি বলছি, নলিনীদা, রাগ করো না—হয়ত তুমি কোনদিনই পারতে না।

নলিনী—ও-মাতালটা দেখছি অনেক ধানিই জয় করে গেছে। তা না হলে তাকে Support করতে, এত অছিলায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'ত না।

উদ্ধা—অছিলা! তার মানে? হি: কি বলছ?

নলিনী—যাও-যাও মিথ্যা ঘটনার অব-তারণ করে, নিজেকে সাফাই রাখবার চেষ্টা করোনা?

উদ্ধা—মিথ্যা, আমি বলিনা। আর সাফাই রাখবার চেষ্টারও প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তুমি একটা ভুল ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে, নিজেকে শুধু অতিষ্ঠ করে তুলছি।

নলিনী—আমি নিজেকে অতিষ্ঠ করে তুলেছি?

উদ্ধা—তা-নয়—?

নলিনী—না-না-তা নয়। তোমার অবাধ গতি—শুধু আমার চোখে নয়—অনেকের চোখেই ধরা পড়ে গ্যাছে।

উদ্ধা—তার মানে?

নলিনী—নিজে বুঝে জাখ, তাহাড়া তোমার ভালর অন্তেই বলি—আর এটাও

তোমার জানা উচিত যে আমার কাছে তোমরা—

উদ্ধা—খণী এইত? অস্বীকার কোন-দিনই করিনি আর তা করবও না—

নলিনী—হঁ-তাইত দেখছি—

[এমন সময়ে জগদীশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

“ওরে কে আছিল—বুলা এসেছে?”

[জগদীশের প্রবেশ]

জগ—এই যে মা বুলা, কোথায় গেছিলি বলত? আমি ব্যস্ত হয়েই পড়েছিলাম। ভাগ্যে নলিনী তখন এয়ে পড়ল, যাক—তাহলে তোমরা কথা কও আমি একবার চট করে জামাটা ছেড়ে আসি—

নলিনী—একটু দাঁড়িয়ে গেলে ভাল হত মি: রায়, আমার একটা বিশেষ কথা বলবার ছিল। বৈশীকণ আপনাকে আটকে রাখব না। মাত্র পাঁচ মিনিট।

জগ—সেকি কথা নলিনী, তোমার কথা শুনব না—মা বুলা—জামাটা—আচ্ছা থাক তুমি না হয় আমার অন্ত একটু চা এইখানেই নিয়ে আসতে বল, ই্যা, নলিনীর অন্তেও বোলো।

নলিনী—না থাক আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওর হয়ত কষ্ট হতে পারে তাহাড়া আমিও আর উপকারী বন্ধু নই।

উদ্ধা—উপকারী যে নন সে কথা কোনদিন অস্বীকার করিনি—সে তত্ত্বটা আমার আছে।

নলিনী—তা জানি তত্ত্বটা তোমার অসীম। তাই বোধ হয় একটা মাতালের পক্ষ নিয়ে আমাকে অপমান করে ভদ্রতার চরম পরিচয় দিতে ছাড়োনি।

জগ—মাতাল? সে আবার কি নলিনী? আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না, মা বুলা। এ বাড়ীতে মাতাল চুকেছিল? মা বুলা, আমার লাঠিগাছটা—আচ্ছা থাক—আমি না হয় কোন করেই দিচ্ছি।

[টেলিফোনের দিকে অগ্রসর]

নলিনী—থাক-থাক আপনি কি কচ্ছেন ?
এখন ফোন করে কি করবেন ? সেত
চলে গেছে।

জগ—তাই বল। মাতালের এত বড়
সাহস হবে যে এখানে বসে থাকবে।
আমিও তাই ভাবছিলাম। যাক তাহলে
ব্যস্ত হবার কিছুই নেই দেখছি। কিন্তু
ব্যাপারটাত কিছুই জানতে পারলাম না
নলিনী।

নলিনী—আপনার বুলাকেই জিজ্ঞাসা
করুন না।

জগ—কি আশ্চর্য্য—তোমাদের কি যে
হল আমি কিছুই জানতে পারলাম না।

উদ্ধা—কি করে জানবেন বাবা, যারা
টাকা ধার দিয়ে মর্যাদাকে কিনে রাখবার
আশা রাখে, তাদের কথা চিরদিনই
অবোধ্য। আমি যদি জানতুম বাবা,
কিছুতেই আপনাকে ওর 'কাছ' থেকে
ওকটা টাকা ধার করতে দিতাম না।
আমাদের অক্ষমতার advantage নিয়েই না
এতটা প্রভুত্ব করছেন।

জগ—আহাহা ধামনা বুলা। কি যে হল
আমি কিছুই জানতে পারলাম না। নলিনী,
বাবা তুমিই না হয় বুঝিয়ে বলত, মানে
তোমাদের মধ্যে এতটা গরমিল, কিসে
যে হল—কই বুলা যা না মা একটু চা
না হয়—

উদ্ধা—চা একটু পরে হলেও চলবে
বাবা। কিন্তু আপনি যে কি বলতে
চান আমি শুনে তারপর যেতে চাই।

জগ—বলবার কি আছে মা।
নলিনীর কাছে—মজল ওত আমাদের সবই
জানে। কই যা না মা—চা-টা নিয়ে এসেই
না হয়—সব কথা শুনিস না, নলিনীত আর
এখনই চলে যাচ্ছে না।

উদ্ধা—লজ্জা জিনিসটাকে যারা বড়
বলে মানে বাবা, তারা হয়ত এরপর থাকতে

পারত না, কিন্তু লোভী যারা তারা কোন
লজ্জাকেই ভয় খায়না কিনা—

[প্রস্থান]

জগ—কি আশ্চর্য্য তোমাদের কি যে
হল কিছুই জানতে পারলাম না।

নলিনী—কিছুই হয়নি মিঃ রায়—
তবে আমি আপনাদের যথেষ্টই মজল কামনা
করি। শুধু ভালর জন্তই বুলাকে বলেছি
যে, যার তার সঙ্গে না যেসাই ভাল।

জগ—নিশ্চয়ই, একশবার বলবে। তা-
ছাড়া আমি তোমাকে বলেই রেখেছি
নলিনী, যে বুলায় ভাল মন্দের বিষয় তুমিই
দেখবে—তাছাড়া আমারও খুব বিশ্বাস যে
তোমার চেয়ে এতটা ভাল হয়ত কেউই
দেখবে না।

নলিনী—ঠিক তাই মিঃ রায়। আপনি
মিটিং গেলেন আমি আরও দুচার জায়গা
খুঁজে এখানে ফিরে এসে দেখি, কে একজন-
বলে আছে—অবশ্য বুলাই তাকে ডেকে
এনেছিল। আমি তাকে চিনি, সে
একজন নামজাদা মাতাল।

জগ—বল কি নলিনী। মাতাল।
এখানে এসে বসেছিল? অথচ আমি
কিছুই জানতে পারলাম না।

নলিনী—আপনি কি করে জানবেন,
সেত আপনার আসবার পূর্বেই চলে গেছে।

জগ—চলে গেছে তাহলে ভাবনার
কিছুই নেই—কি বল?

নলিনী—ভাবনা নেই। আপনি কি
বধেন মিঃ রায়?

জগ—ভাবনার আছে তাত আমি
জানতে পারলাম না।

নলিনী—আপনিও দেখছি কিছুই
জানতে পারছেন না। কিন্তু জানেন সেই
রাষ্ট্রলটাই হল আমাদের মতবৈধের কারণ।

জগ—কেন বলত?

নলিনী—সেই লোকটা কেন এখানে
এল জিজ্ঞাসা করতে বুলা বিক্রপ করেই
বললে "আমার উপকারী বন্ধু আত্মীয়"।

জগ—আত্মীয়? আমাদের আত্মীয়!
তা হবে কিন্তু বাড়ীতে এল অথচ আমি
জানতে পারলাম না।

নলিনী—না: আপনি কোন কথাই
দেখছি serious ভাবে নিচ্ছেন না। আত্মীয়
আপনাদের মোটেই নয় বরং শত্রু
বললেও চলে—

জগ—শত্রু! বল কি নলিনী—তাহলে
তাকে কোন মতেই আসতে দিতে পারা
যায় না। তুমি নিশ্চয়ই বারণ করে
দিয়েছো?

নলিনী—বারণ করতে গিয়েইত ঝগড়ার
উৎপত্তি। আমি যে বুলায় মজল
কামনা করি এটা নিশ্চয় অস্বীকার
করেন না। অথচ বুলা সেই secondral-
টাকে support করে আমাকে অপমান
করতে একটুও দ্বিধা করলে না। অবশ্য
বুলাকে একটু দামিয়ে দেবার জন্ত আমি
একটু Rough হয়ে পড়েছিলাম সেটা যেন
সত্যি বলে মনে করবেন না।

জগ—হা: হা: হা:—আমি কি বুঝিনা
বাবা নলিনী যে, তুমি বুলাকে—কতটা—
এই যে মা—

[উদ্ধার প্রবেশ—দুইজনকে চা দিল]

জগ—বাবা: এরই মধ্যে চা তৈরী! বাই
বল নলিনী বুলাকে কাজে কেউ হঠাতে
পারবে না।

নলিনী—শুধু কাজে নয়—মিঃ রায়
কথাতোও—

জগ—হা: হা: হা:, এবার কিন্তু মা
তোকে—নলিনী সত্যি সত্যিই ঠকিয়ে
দিয়েছে। কারণ তোমার প্রতিবাদ করবার
কিছুই নেই দেখছি।



অসুস্থ
শরীর



দুস্থ ও শবল

করিডে



সিরোলিন

'রাচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সদি কাসি এবং ঘাম্মার
প্রথম অবস্থায় প্রেই বিন্দু।



উদ্ধা—যারা নিছক স্বার্থসিদ্ধির জন্ত মিথ্যা বলতেও কুণ্ঠিত হয়না তাদের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে আমি চাই না।

জগ—আমি আজ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না কেন যে তুমি এতটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলে। অগচ নলিনীর মত এত বড় উপকারী বন্ধুকে—কেন যে তুমি—

[টেলিফোন বাজিল—উদ্ধা ধরিল]

উদ্ধা—Hallo, আজ্ঞে হ্যাঁ-P. K. 2857 আজ্ঞে হ্যাঁ আছেন। এ আপনাদের মিটিং বুঝি আজ? কটায়? নাটায়, আচ্ছা আমি বলছি—হ্যাঁ বাবা, আপনাদের না Theosophical Societyর মিটিং ছিল?

জগ—কি আশ্চর্য্য! আমি ওটার সম্বন্ধে একেবারেই ভুলে গেছি না। ওরা নিশ্চয়ই আবার অপেক্ষাতেই আছেন? তুমি বলে দাও না আমি এখন ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

উদ্ধা—Hallo, বাবা এখন যাচ্ছেন, আজ্ঞে না বেশী দেরী হবে না—আচ্ছা নমস্কার—

[টেলিফোন রাখিল]

জগ—তাহলে বাবা নলিনী আমাকে একটু উঠতেই হচ্ছে। 'আমার চন্দরটা-তাহলে না বুলা—তোমরা বস-আমার আসতে হয়ত দেরিও হতে পারে। এ মিটিংটার কথা একেবারেই জানতে পারিনি।

[প্রস্থান]

[উদ্ধা মুখ ফিরাইয়া একখানি বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। নলিনী কাছে আসিয়া ডাকিল।

নলিনী—বুলা—

উদ্ধা—কি—!

নলিনী—আমার সঙ্গে কথা কওয়াটাকি বন্ধ করে দেবে?

বুলা—উচিত।

নলিনী—কিন্তু রাগ তোমার চেয়ে আমারই বেশী হওয়া স্বাভাবিক। কারণ কড়া কথা তুমিই আমাকে বেশী বলেছ।

উদ্ধা—হ'তে পারে। কিন্তু অস্থায়ের প্রতিবাদে sweet words আশা করা বুধ।

নলিনী—কিন্তু কেন তুমি রাগ কর বুলা। আমি যে এতে কতটা ব্যথা পাই তা কি বুঝতে পার না?

উদ্ধা—জাখ নলিনীদা, তুমি আমাকে কি ভাব বলতে পারি না। 'জানতেও' ইচ্ছা নেই। কিন্তু অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি যে, তুমি যেন একটা অসম্ভব কিছু পাবার জন্ত অনেক কৌশল অবলম্বন করতেও ছাড়ছ না।

নলিনী—যদি কিছুর আশাই করে থাকি সত্যিই কি সেটা অসম্ভব?

উদ্ধা—সে সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

নলিনী—কিন্তু বুলা, তুমি কি জাননা আমার অন্তরের ব্যথা। তোমাকে পাবার আশায় আমি যে উন্মূখ হ'য়ে বসে আছি, তাকি বোঝ না?

[হাত ধরিল—উদ্ধা হাত ছাড়াইয়া লইল]

উদ্ধা—জাখ নলিনীদা টাকা ধার দিয়েছো—উপকার ফিরেছো 'তার' জন্ত আমরা কৃতজ্ঞ কিন্তু মর্যাদা আমার নিজস্ব জিনিস তার ওপর কোন দাবী করবার চেষ্টা না করলেই ভাল হয়।

[মুখ ঘুরাইয়া সোফায় বসিল]

নলিনী—ও তাই নাকি! আচ্ছা দেখে নেবো দাবী আছে কিনা—

[প্রস্থান]

ক্রমশঃ

কে তুমি পথিক

শ্রীমদ্রামানুজ চক্রবর্তী

কে তুমি আজ ওগো পথিক

মৌন ভাবে থেকে,

চলার ভাষা পথের পরে

যাচ্ছ একে একে।

চলার ভাষায় কি যে কহ

তুমিই যে তা জান,

মুখে তোমার নাইক' ভাষা

এত' তুমি মান।

বাতাস চলে হেঁকে হেঁকে

তুমি স্তব্ধভাবে থেকে

যাচ্ছ চলে কোথায় পথিক

অসীম যাত্রা সম।

যাবে যাং বারেক ধেম

আমার দ্বারে দৃষ্টি হেনে

চরণ ধূলে ভ'রিয়ে দে, যাও

অন্তর খানি মম।

তোমার তরে মনের কোণে

দরদ দাগে যে,

যতই ভাবি ডাকব' নাক

থাক্তে পারি নে।

কোন সীমাতে বিজয় যাত্রা

ধাম্বে তোমার কহ?

এই কথাটাই হৃদয় বীণে

বাজছে অহরহ'।

মন যে আমার ধাম্বে নাক,

ডাক তোমার সাথে ডাক;

যাচ্ছ তুমি যেথায়, সেথা

নাও মৌনে ডেকে।

যাবার পথে যেও ধীরে

মাঝে মাঝে চেও গো ফিরে

ব্যথায় কাতর হ'লে পরে

চরণ রেখ বুকে।

রেডিও প্রসঙ্গ সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামে বাংলা আধুনিক সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, কোর্ডন, বাউল, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতির সংখ্যা অত্যন্ত কমে আসছে। বাংলা প্রোগ্রাম দিনে দিনে সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। বাংলা শ্রোতা অর্থপূর্ণ অথচ বাঙ্গালী শ্রোতাদের 'পর এ অবিচার সমর্থনযোগ্য নয়। পূর্বে দ্বিপ্রহরে ভালো সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান হোত- এখন তা একেবারেই বন্ধ। সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে খবরের ডীড, হিন্দুস্থানী প্রোগ্রাম প্রভৃতিতে ভারাক্রান্ত।

ভারতীয় প্রোগ্রামের প্রতিটি বিভাগেরই অনুষ্ঠান স্থির অধঃপতন ঘটছে। দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে-তে শুধু অগতিরগতি রেকর্ড আর দু'একটা বক্তৃতা। বিজ্ঞানী মণ্ডলে বক্তৃতা অতি গতানুগতিক পছা। ছোটদের বৈঠকে দাছমনি তবু ছেলে-ভুলানো দু'একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। পল্লীমঙ্গল আসর, গ্রামোফোন রেকর্ড, দিন-পঞ্জী, আর রাশিকৃত বেসুরো কণ্ঠের অভিনয় ধরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা রূপ বিরক্তিকর রসহীন চাঁৎকার। সাক্ষ্য অনুষ্ঠানে অধিকাংশ বাজে গান আর বাজনা আর একঘেয়ে বেতার-বিচিত্রা। কোন বৈচিত্র্য নেই, নূতন দিকের কোন পরিচিতি নেই। সুবোধ শ্রোতার সেট বন্ধ করে দেন? আর এ-আই-আর প্রেসারের অভিনয়-ও সবকিছু না বলাই ভালো।

কর্তৃপক্ষের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে এ অক্ষমতা শৈথিল্য আর খাম খেলা ভাব আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি।—এর কারণ অতি অপ্রিয় সত্যের বহু ইঙ্গিতই আমরা দিয়েছি। যোগ্যের সমাদর-সুবিচার বেতারের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় পরিচালকরা করেন না। রসবোধেরও বিশেষ পরিচয় পাই না প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে।

আমাদের জনৈক বিশিষ্ট পাঠক।ও বেতার ঐতিহ্য ছা'টি বক্তৃতা সঙ্ক্ষে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। “আসাম ও মণিপুরের নাগা”দের সঙ্ক্ষে আলোচনা করেছিলেন জীতেন্দ্র কুমার নাথ। বক্তার ভাষাজ্ঞানই নেই। গুরুচণ্ডালী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। এবং নাগা সঙ্ক্ষে নূতন তথ্য কিছুই জানান নি।

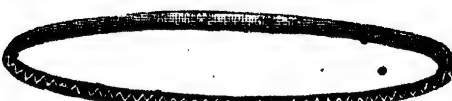
দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে আর একজন গোপেশ্বর পাল “অমূল্যলনের জন্ম মনো-বিজ্ঞানের সহজ সন্ধান” সঙ্ক্ষে পণ্ডিত চালে কয়েকটি উপদেশ দিলেন। আপনারা শুধুন বলে আরম্ভ হতে মনে হয়েছিল মহিলা আসরের সর্বজন জ্ঞাতব্য কিছু বিষয় বস্তু। “তোমরা ল্যাখাপড়া”—তাতে বুঝাইম বিজ্ঞানী ‘মণ্ডলের’ জন্মই।—অতি প্রাচীন পুথিগত উপদেশ লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে সুলভ উপদেশ। বক্তার বোঝা উচিত বাংলার ছাত্র সমাজ আজকের যুগে অত্থানি পেছিয়ে আর কেউ-ই নেই। আমাদের বক্তব্য বেতারে এমনি ধরণের বক্তৃতা চলে।

অথচ শ্রোতাদের ভোলাবার প্রচেষ্টার অন্ত নেই রেডিও কর্তৃপক্ষের তাঁদের মতামত গ্রহণ তাঁদের উপদেশ গ্রহণকরবিধ প্রচেষ্টাই দেখি। অতিরিক্ত আলোচনা হলে বেতার প্রোগ্রামে কয়েকটি নাম কর শিল্পীর নাম দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের অমুপস্থিতিতে রেকর্ড বাজে। কয়েকটি নাম করা শিল্পী প্রোগ্রামে থাকলেই শুধু প্রোগ্রাম ভালো হয় না। ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালক এর কি প্রতিকার করছেন?

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!

গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!



ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মনোমত আধুনিক ধরণের সকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়িবে ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রং পালিশ লোণার ভায় চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্ম পত্র গ্রহণ।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড সিল্ডিকোট

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সম্মুখে)

“গল্প” বনাম “টেকনিক”

শ্রীঅমর মল্লিক (এন-টি)

আমি ছায়ালোকের বাসিন্দা... আজ তাই আপনাদের কাছে ছায়া-ছবির দু-চার কথাই বলতে এসেছি।

আজকাল জগতের সব যায়গাতেই ছায়াছবি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসেছে। কেউ কেউ বলেন, ফিল্ম আনন্দের একটি শ্রেষ্ঠ পশরা—আবার ওদিকে আর এক দল লোক বলেন যে, আর্টের চরম নিদর্শন হচ্ছে সিনেমা! এই দু’ দলের মধ্যে কোন মতটা যে সত্য, সেটার মীমাংসা করতে চাই না তবে যে কথাটা নিয়ে আজ আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ফিল্মে কোন জিনিষটার প্রয়োজন বেশী—গল্প না তার তোলবার কায়দা?

ফিল্ম-শিল্প আজ আর সেই শৈশবাবস্থায় নেই—এখন তার সম্বন্ধে জন-সাধারণ রীতিমত মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। ছবি নির্মাতারা আর উদাসীন হয়ে বসে নেই। তাঁরাও রীতিমত ইন্সিয়ার হয়ে উঠেছেন। তাঁরা আজকাল ভাবতে শুরু করেছেন—লোকে ছবির পর্দায় কি জিনিষ দেখতে চায়—আর কি জিনিষ চায় না! যদি কোন একখানি ছবি বাজারে ভালভাবে না চলে অমনি ছবির কর্তৃকর্তারা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে যান—কেন এ ছবি চলচে না? কোথায় তার গলদ? এবং লোকে কি চায়...“ষ্টার” অভিনেতা অভিনেত্রী, ভাল টেকনিশিয়ান—পাকা ডাইরেকশন্—কিংবা ভাল গল্প!

আজ কথাটা সত্যিই বিবেচনা করে দেখবার দিন এসেছে। দেখা গেছে—অনেক সময় ভাল ফটোগ্রাফী, সাউণ্ড,

সেটিংস, এবং অভিনয় থাকা সত্ত্বেও ছবি লোকে পছন্দ করে নাই। তার কারণ কি? একটু ভেবে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, লোক আজকাল মাত্র এই সব “টেকনিক্যাল—প্যাচের” মোহে ভোলে না—তারা চায় আরো কিছু বেশী—তারা চায় গল্প!

এও দেখা গেছে যে পাকা ডাইরেক্টরের ভালো পরিচালনা সত্ত্বেও লোকে ছবি পছন্দ করে নাই—তারই বা কারণ কি?

কারণ আর কিছু নয়—আমার মনে হয় আসলে লোকে চায় ভাল গল্প—তারপর ডাইরেকশান, অভিনয়, ফটোগ্রাফী, সাউণ্ড, সেটিংস ইত্যাদি। ছায়া-ছবির মূল বস্তু হচ্ছে কাহিনী এবং কাহিনীটিকে ভাল করে শুছিয়ে বলার জন্তেই দরকার পরিচালকের, চিত্র-নাট্যকারের এবং সেটা রূপালী-পর্দায় পরিণত করবার জন্ত দরকার ভাল টেকনিশিয়ানদের আর আর্টিষ্টদের। সুতরাং দর্শকরা ছবি-ঘরে এসেই প্রথমে খোজে কাহিনী অর্থাৎ গল্প। যদি তারা দেখে যে ছবিতে ভাল কাহিনীর অভাব তখন আর তাদের টেকনিক্যাল মার প্যাচের মোহে ভুলিয়ে রাখা সম্ভবপর হ’য়ে ওঠে না।

ছায়া ছবির প্রথম আমলে টেকনিক্যাল কায়দায় তারা হয় তো গল্প নিয়ে এতটা মাথা ঘামাতো না—কিন্তু আজকাল যেকি জিনিষে দর্শক সাধারণকে আর ধাক্কা দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেই জন্তে প্রায়ই দেখতে পাই যে লক লক টাকা খরচ

করে ভালো টেকনিশিয়ানদের সাহায্যে ভালো ছবিও শুধু একমাত্র ভাল গল্পের অভাবে সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। এ সম্বন্ধে হলিউডের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় পরিচালকদেরও তাই মত। তাঁরা বলেন—ছবির প্রথম জিনিষই হচ্ছে ভালো গল্প এবং সেই গল্পকে শুছিয়ে বলার ক্ষমতা—প্রযোজকদের এ বিষয় দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ডোঙরের বাল্যামৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

তুর্কল ও শীর্ণকায় শিশুরা
এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার
করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই
পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে
সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা
পছন্দ করে। ইহা শিশু-
দিগের প্রকৃত বন্ধু।

সমস্ত বড় বড়
ঔষধাঙ্গণে
পাওয়া যায়।



আমাদের অগ্রাহক বর্গের বিশেষ অগ্ররোধে আমরা নিয়মিত ভাবে রেকর্ড-সমালোচনা আরম্ভ করিলাম। বর্তমানে বাংলা দেশের বিখ্যাত ফোনে কয়টি রেকর্ড কোম্পানী আছে তাঁহাদের মাসিক প্রকাশিত রেকর্ডগুলির নির্ভিক ও গঠন-মূলক সমালোচনা এ বিভাগের বিষয় বস্তু হইবে। ইহাতে রেকর্ড-ক্রেতা ও রেকর্ড কোম্পানী উভয়েই সমানভাবে উপকৃত হইবেন।

আমরা প্রথমেই বাংলার স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান মেগা-ফোন কোম্পানীর ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত রেকর্ডগুলির সমালোচনা করিব। মেগা-ফোন কোম্পানী এ মাসে সর্ব সমতে ১০ খানি বাংলা রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দু'খানি নিউ থিয়েটার্স মেগাফোন রেকর্ড ও দু'খানি "আবহুতা" পালার রেকর্ড। বাকী ৬ খানি একক সঙ্গীতের রেকর্ড।

JNG. 5311 এই রেকর্ডে শ্রীযুত ভবাণী চরণ দাস দু'খানি ভজন গান গাহিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠ প্রত্যাহলে সুপরিচিত। গান গুলির রচনা মন্দ নয়। মোটের উপর গান দুটি নিন্দনীয় হয় নাই।

JNG. 5312 মুর উদ্দীন আমেদ সাহেব দু'খানি ভাটিয়ালী গান রেকর্ড

করিয়াছেন। ইসলামী গান গাহিয়া গায়ক মুসলমান শ্রোতৃবর্গের নিকট জনপ্রিয় হইয়াছেন। উদাত্ত ও মধুর কণ্ঠে গীত ভাটিয়ালী গান দুটি এ-শ্রেণীর গান বাহারা পছন্দ করেন তাঁহাদের নিকট সমাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

JNG. 5313 মিস ফুলনলিনী দু'খানি আধুনিক গান গাহিয়াছেন এই রেকর্ডে। গায়িকার কণ্ঠস্বর জোরালো। গান রচনা করেছেন অজয় ভট্টাচার্য। আবহ-সঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতে সম্পূর্ণ মিল না হইলেও মোটামুটি গান দুটি সাধারণ শ্রোতাকে খুসী করিতে পারিবে।

JNG. 5314 অনন্তবালা বৈষ্ণবীর দু'খানি পল্লীগীতি এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গায়িকার কণ্ঠস্বর ও গাহিবার শ্রণালী এই শ্রেণীর গানের সম্পূর্ণ উপযোগী। পল্লীগ্রামের শ্রোতাগণ রেকর্ডখানি শুনিয়া বেগুসী হইবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

JNG. 5315 শ্রীমতী সুসমা দে এই রেকর্ডে পল্লীকবি জসীম উদ্দীন রচিত

দু'খানি ভাটিয়ালী গান গাহিয়াছেন। গায়িকার কণ্ঠের সহিত কলিকাতার সঙ্গীতামোদী মাঝেই পরিচিত। শিক্ষিত ও মার্জিত কণ্ঠে ভাটিয়ালী গানের যতটা রূপ প্রকাশ করা সম্ভব এই রেকর্ডে তাহার একটি হয় নাই।

JNG. 5316 অনন্তবালা দু'খানি ইসলামী গান পল্লীসঙ্গীতের চণ্ডে এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গান রচনা করিয়াছেন মুহম্মদ আলতান বি-এস-সি। অনন্তবালা হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর শ্রোতার নিকট সমান ভাবে আদৃত হইয়াছেন। গান দু'খানি পল্লীবাঙ্গী মুসলমান শ্রোতাগণ সাদরে গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

JNG. 5310 নিউ থিয়েটার্সের নবতম বাণীচিত্র 'সাধী'র দু'খানি সর্ব জন-প্রিয় গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গান গাহিয়াছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-তারকা শ্রীমতী কানন দেবী। "সোনার হরিণ আর রে আর" ও "তোমারে হারাতে পারি না যে প্রিয়" গান দুটি সবদিক দিয়া চমৎকার হইয়াছে।

JNG. 5319 'সাধী' বাণীচিত্রের আর দু'খানি জনপ্রিয় গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গান দুটি "রাখাল রাজা রে"

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, আভ্যোব দুখার্মা রোড,

পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

কলিকাতা

ও "পায়ে চলার পথের কথা"। গান গাহিয়াছেন শ্রীমতী কানন দেবী। বাহারা ছবি দেখিবেন তাঁহাদের এই রেকর্ড খানি শুনিতেও সংগ্রহ করিতে হইবেই।

JNG. 5317 to JNG. 5318 এই দু'খানি রেকর্ডে প্রণব রায় রচিত "আত্মহত্যা" কৌতুক নাটিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন মিসেস সুপ্রভা মুখার্জি, মিস ইলা ব্যানার্জি, নবেন্দু সূন্দর ব্যানার্জি, চারু প্রকাশ ঘোষ ও প্রণব রায়। এই সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয় সাধারণ অভিনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কলিকাতাবাসী শ্রোতাগণ নাটিকাটি শুনিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন।

নিউ থিয়েটার্স হিন্দুস্থান রেকর্ডে দরদী ও মরমী সুরশিরী শ্রীযুক্ত সুধেন্দু গোস্বামী এম-এর আধুনিক গান দু'খানি 'কে গো বাজালে বাঁশরী' এবং 'তোমার আকাশে'— (রেকর্ড নং H 665) সঙ্গীত জগতে এক বিশিষ্ট অবদান। শ্রীযুক্ত গোস্বামী তাঁর নিজস্ব চং-এ ও তানমালায় যে সুর এবং কাব্য আবহাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া ছেন তাহা সত্যিই অপূর্ব।—সুধেন্দুবাবু সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত গিণিজী শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টপের ঢা

সাহ্য ও উৎসাহপ্রদ বিত্তক পানীয়

প্রতিভার অপমৃত্যু

ত্রিনির্মল কুমার সুর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঠিকই বলেছেন; কিন্তু মুদ্রিল কি জানেন? মুদ্রিল হচ্ছে এইখানে যে, গভর্ণমেন্ট যদি এসব না দেখে তাহলে কোন চেষ্টাই ফলবতী হয়ে ওঠে না! স্বাভাবিক যদি পেছিয়ে পড়ে থাকে এই দিক দিয়ে, তাহলে শাসিত জাতিও যে পেছিয়ে থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। এই বিরাট দেশের বিরাট অশিক্ষা দূর করতে এক রাষ্ট্রই পারে।

আপনার কথা ঠিক মানতে পারদান না। জগতের অজ্ঞাত দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পছন্দ তাদের ইতিহাস, দেখবেন ব্যাপারটা ঠিক উল্টোই। দেশের শাসক সম্প্রদায় এদিকে নজর দেবার অবসর কোন কালেই পাবেন না। তাঁরা এসেছেন শাসন করতে, দেশকে উদ্ধার করতে নয়। তবু ইংরাজ রাজত্ব অনেকখানি করেছে তার জ্ঞান আমাদের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত নির্দোষ করে। মালোর রাস্তা তো তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন—দেশের লোক যদি নিজেরা এগুবার চেষ্টা না করে তবে দোষ কি তাঁদের। দেশের শর্তকরা সাত আট জনকে তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন; তারা শেখাতে পারে অপরকে। বাদতাকী বিমানবহী জনকে শেখাতে কদিন লাগে যদি এই শিক্ষিত কজন চেষ্টা করে? বড় জোর দশ বৎসর লাগে দেশকে শিক্ষিত করে তুলতে। অথচ আমরা, বারা শিক্ষিত বলে গর্ব করি, তারাই রইলুম সব থেকে

মোহাজুর হয়ে। আজ দেখুন সাহিত্যের নামে বা চলেছে দেশের কাছে তার দাম কতটুকু! যে সব বই তরুণ মস্তিষ্ক ছেলেদের সামনে ধরে দেওয়া হচ্ছে তাদের সামনে যারা দেশের ভবিষ্যৎ আশঙ্কল, সেগুলো তাদের করে তুলছে আরো 'মোহাজুর'। এর জন্ত দায়ী কে? সরকার না দেশের মানুষ? শিশু সাহিত্য আমাদের দেশে জন্মালোই না। ছেলেদের সাহিত্য বলে বা চালানো হলো তাতে ছেলেরা আরও ভীত হয়ে পড়লো ভুতের গাঁজাপুরী গল্প পড়ে। কর্মব্যসানের পর বয়স্ক লোকেরা যে সব বই নিয়ে বসলেন তাতে বাড়িয়ে তোলা হলো ধর্মের নামে কুপ-মণ্ডুকতা আর উপহাস শেখালো তাবালুতা। বাস্তব জগতের সংগ্রাম থেকে তারা আশ্রয় নিলে স্বপ্ন-সৌধ রচনার ভিতর। বাস্তব ছেড়ে কল্পনাকে আশ্রয় করে জীবনের দায়িত্বকে, মহত্বকে দাবীকে দিলে তারা ধূলায় লুটিয়ে। মেয়েগুলোও যার কিছু কিছু লেখাপড়া শিখলো—তারা চাইলো ফিকে-হাওয়ায় ডানা মেলে বেড়াতে। আসল সাহিত্যের ক্ষমতা অসীম। হাজারো জন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে মরলেও যে ফল ফলে না, সাহিত্যিকের কলমের একটা টানে তার ক্ষমাদান হয়ে যায়। রাশিয়া পেছিয়ে পড়তো আরো অনেক বৎসর যদি না জন্মাতো গোর্কীর মত সাহিত্যিক। সেখানকার শিক্ষিতেরা বুঝেছিলেন

কথা, তাই তাঁরা যত্নে ক্রটি করেননি দেশকে
আগে শিক্ষিত করে তুলতে। আচ্ছা
আপনিই বলুন—রবিঠাকুরের মত প্রতিভাই
বা কি দিয়েছে দেশকে—এক কাব্য ছাড়া।

কিছু বলতে আরম্ভ করলে চপল জ্ঞান
হারিয়ে ফেলে। মনে হয় ওর অন্তরের
রুদ্ধ ভাবের কাঁটা মীটারের শেষ রেখায়
এসে পৌঁচেছে। ধরে রাখবার উপায়
নেই। নাহলে একুনি ফেটে পড়বে।
মৃণাল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক
হয়ে ওর বলার ভঙ্গী গুলোকে দেখে
যাচ্ছিল।

ওর ছোট বোনটা ছ'কাপ চা নিয়ে
চুকলো আর ওর মা পেটে লুচি আর রসো
গোলা নিয়ে দাড়িয়ে রইলেন বাইরে।
চপল উঠে গিয়ে মার হাত থেকে নিয়ে
এল প্লেট ছুটো; মৃণালের সামনে ছোট
টিপয়টা এগিয়ে এনে রেখে দিলে তার
ওপর ছুটোই।

মুহু আপত্তি জানিয়ে মৃণাল হাত বাড়িয়ে
দিলে প্লেটের দিকে, আর চায়ের কাপে
ছোট একটা সিপ দিয়ে বললে—আপনার
কালচার আছে দেখছি চপলবাবু,
সত্যিকারের কালচার বলতে যাকে বোঝায়।
ঠিক খেলার বশেই আপনি লেখেন না বা
পড়েন না তা বুঝতে পারি। দেশের বেকীর
ভাগ সাহিত্যিকদের সাথে আপনার ঠিক
মেলে না। আপনার রাস্তাটা গেছে
খানিকটা অন্ধ দিক দিয়ে। বিচারে, যুক্তির
এসিডে ফেলে আপনি প্রত্যেক ভিষিক
নেন যাচাই করে। সত্যিকারে আজ মনে
হচ্ছে দেশ আপনার মত লোকই চায়
অন্ততঃ প্রয়োজন তার, যারা শুধু কল্পনার
গুলি গলধঃকরণ করে ঝিমোবে না নেশায়
আর অবাস্তব স্বপ্ন-কুহেলি রচনা করে
চলবে না কাগজের পাতায়; যারা



লীলি
ব্যাঙ

হওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা : : বোম্বাই

আইডিয়ার টিম্বলেন্ট দিয়ে দেশের প্রাণ-শক্তিকে তুলবে উজ্জীবিত করে। কথাগুলো বলে মুগাল খরদৃষ্টিতে তাকাল চপলের দিকে। দেখল চপল চেয়ে আছে ওরই দিকে, কিন্তু মনটা তার বিহার করছে অস্ত্র রাজ্যে। মুগাল তাই ডাকলো একটু জোর দিয়ে—চপলবাবু! চপল চমকে উঠে বললে—হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন।

—কি ঠিকই বললুম? আমি বলছিলাম যে আপনিই—

—না, না আপনি ভুল বলেছেন। আমি সামান্যলোক, কিই বা করতে পারি বলুন। বিরাট অঙ্ককারের মধ্যে ছোট্ট একটা প্রদীপ নিয়ে এগুবার চেষ্টা করছি মাত্র; কিন্তু ভয় জাগে প্রতি মুহূর্তেই যে নিজেই বুঝি বা কখন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব। অঙ্ককার দূর করবার মত প্রতিভার আলো নেই, তাই জাগে সন্দেহ আলো-আধারী সৃষ্টি করে মাহুতকে আরো বিপদে না ফেলি। তখন একলও যাবে ও-কুলও যাবে। লোকে হয়তো দিশা হারিয়ে ফেলবে আবছায়ার মাঝে, আমার নিজের অক্ষমতার পরিচয়ে। আপনারা ভাগ্যবান পুরুষ, অর্থবানও। ইচ্ছে করলেই আপনারা পারেন দেখতে অনেক কিছুই, দেখাতেও। আর আমাদের? প্রদীপের সলতে পুড়িয়ে কণিক আলো জ্বালাবার চেষ্টা। হয়তো নিজে ওকে ঘেঁতেই হবে তেলের অভাবে।

—অর্থই সব কিছু নয় চপলবাবু। অর্থ দিয়েই অস্ত্রসম্পদের অর্থ করা যায় না। তার ওপরও আর একটা জিনিষ আছে যার নীম প্রতিভা। প্রতিভাকে বাড়াবার কয়টা অর্থের নেই, ক্যাবার মরণ-কাঠিও তার হাতে অবিস্তমার। প্রতিভা নিজেই আলো, নিজের পথ নিজেই সন্ধান করে চলতে পারে। অভাব সবাইকে বশীভূত করতে পারে কিন্তু প্রতিভাকে নয়।

ঠিক তাই কি? প্রতিভার অপমৃত্যুও-তো হয়! আর দেখা যায় অভাবের কীসি কাঠেই তার মরণ-বেদী রচিত। প্রতিভার উজ্জীবক রস হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য, আর সেই রসকে শ্বাস্প করে উড়িয়ে দেয় অভাবের আশুন, বিফলতার আশুগণও বলতে পারেন। অভাব মানেই অসফলতা—পরাজয়।

মুগালের চায়ের কাপ শূন্য দেহে আশ্রয় নিলে যথাস্থানে। লোগার কেস থেকে সিগারেট বার করে চপলের দিকে এগিয়ে দিলে খোলা কেসটা।

মুগালের আর ভালো লাগছে না এসব শুকনো আলোচনা। নিজেকে জাহির করবার, নিজের চিন্তাশক্তির পরিচয় দেবার জন্তই ও প্রবৃত্ত হয়েছিল এই সব আলোচনায়।

মুগাল কথার মোড় ফেরালে। একটু নড়েচড়ে বসে বললে—মিস্ মীরার সাথে কাল আলাপ হলো আপনার?

চপল খানিকটা ইতস্ততঃ করে বললে—হ্যাঁ খানিকটা হলো বইকি। বেশ চমৎকর মেয়ে, নয়?

মুগাল হেসে বললে—কি মনে হয় আপনার?

—আমার আর কি মনে হবে? ভালো যদি নাই হয়, তবে খারাপ হবে নিশ্চয়ই। কি বলেন?

খারাপ হবে নিশ্চয়ই? কেন এভাবে হতে পারে যে ভালোও হলো না, মন্দও হলো না; তার মানে মাঝামাঝি, সাধারণ বন্ধের মেয়েরা যেমন হয়। যাকে বলে সাধারণ।

অর্থাৎ বোধ্য এই তো বলতে চাইছেন? আপনার কথাই ঠিক; আমি ভুল করেছি। আগা আর গোড়া নিয়েই আগা-গোড়া নয়। মাঝখানটাও আছে। সেটা আমারই ভুল। যেমন ভোলেন আমাদের দেশের

ছোট খাট নেতারা। পিকেটিং কর, জেলে যাও, প্রাণ দাও আর নইলে এ রাজ্য থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না লাগাও। দেশের নাম মুখে এন না। এই দুই প্রান্তের মধ্যে যে আরও কিছু আছে যাকে অবলম্বন করে প্রান্তছুটি টিকে আছে সে খেয়াল নেই এদের। মাঝকে বাদ দিলে যে আগা থাকতে পারে না, গোড়াও হয় প্রাণহীন সে কথা এরা ভুলেই যান। হ্যাঁ কী বলছিলেন, মীরার কথা? ও একটু থমকে যায়, ভাবে কি প্রয়োজন মেয়েকে নিয়ে আলোচনাকে খুঁটিয়ে তোলার? কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন ওকে ঠেলা দিতে থাকে। তাই ও বলে কি করে বুঝবো বলুন সামান্য পরিচয়ে? সে কথা বরং আপনিই বলতে পারেন।

তার মানে মীরার কথা ও খানিকটা শুনেই চায়; উৎসুক্য ভিতরে ভিতরে উকি মারছে।

মুগাল বলে—তাত ঠিক। এক দিনেই কি করে বুঝবেন বলুন। ও কাল আপনার সাথে আলাপ করতে চাইছিল কিনা। আপনার লেখা বা কথাগুলো ওকে মুগ্ধ করেছে। ও বলে—আপনি সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র।

এ ধারণা ওর কি করে হলো?

আপনার লেখা পড়ে ও বক্তৃতা শুনে বোধ হয়। চপল মনে মনে খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, বলে—কি আশ্চর্য! বক্তৃতা আবার আমি দিলাম কোথায়?

মুগাল হেসে বলে—তা আপনিই জানেন।

বেলা এখানে বেড়ে উঠেছে অনেক-খানি। মুগাল তাই উঠে পড়লো। চপলের সাথে হাতুলেক করে বললে—ভাল-বাই! টাইম ইউ এভরি সাকসেস্। আমাদের মিলনী আপনার মিলনকি।

করে থাকবে চিরকাল। দেখবেন মাঝে মাঝে বিরহ তার দূর করবার চেষ্টা করবেন।

চপল ওকে বাইরে এগিয়ে দিতে চললো। নমস্কার করে বললে—আসবেন মাঝে মাঝে, গল্প করা যাবে।

মৃণালের মোটর তখন অন্তর্বাস্পে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ভিতরে ফিরে এসে ও আবার বসে পড়লো টেবিলে। বইখানা মুড়ে গেছে, আর তারই ওপর চায়ের কাপ বসানো। নিজেই কখন ও বসিয়ে রেখেছে খেয়াল নেই। কাপটাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে ও বইটাকে তুলে নিলে মুহূর্তের জন্য। আহা কি বিস্ময়ই হয়ে গেছে মলাটটা। বইটাকে আদর করে বললে—লক্ষ্মী সোনা রাগ কর না। তোমার গায়ে লাগিয়ে দিয়েছি অজান্তে কলঙ্কের ছাপ, সে শুধু বাইরে। তোমার অন্তর সম্পদ কোন কালে স্খিয়মান করতে পারবে না কেউ কোন কালেই না, হাজার কালির ছাপ লাগাবার চেষ্টা করলেও। সেখানে তুমি চির-উজ্জল। বইটাকে নামিয়ে রেখে ও কাগজ পত্রগুলো ঠিক করে রাখতে লাগলো। হঠাৎ ওর চোখ পড়লো একটুকরো কাগজের ওপর। কাল রাত্রে খাড়া ফিরে, কখন

এই টুকরো কাগজটার ওপর কালির এই রেখাগুলো ও টেনে গেছে তা ওর নিজেরই মনে হচ্ছে না। কি আশ্চর্য্য চপল লিখে রেখেছে মীরা সেনের নাম বারবার? ও ভেবেই পায় না, এ কি করে সম্ভব হলো। সারা কাগজটায় ওই কটা অক্ষরই লিখে গেছে। নাঃ, ওর বুদ্ধি-বিত্রম ঘটেছিল কাল। হঠাৎ ওর মুখখানা শুকিয়ে গেল। তা'হলে মৃণাল বাবুও তো দেখেছে—এই কীর্তি! এঃ কি ভাববে দেখতো। মহা মুন্ডিলেই ওকে ফেলেছে ওই সামান্য একটা মেয়ে। কেনই বা গেল ও তার সাথে আলাপ করতে। সামান্য ছ'চারটে কথা বলে তো দিতে পারতো সিদ্ধায়। তাহলে তো আজকে ওর এই অসম্মান হতো না। তাই কি মৃণালবাবু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলো মীরার কথা! মীরাকে আপনান্ন, কেমন লাগে?—ছাই লাগে। কত ঝেয়েকে দিলে ও স্বৈচ্ছায় বিদায়, আর সামান্য মীরা সেন। কিই বা আছে তার ভেতরে, মুগ্ধ হবার মত। মাত্র একদিনের আলাপ বইতো নয়।

ও লজ্জিত হয়ে বসে।

নিশ্চয়ই প্রীতি মজুমদারের মত মীরা সেনকেও দেখিয়ে দেবে কঠিন উপেক্ষা। 'কিন্তু', ও ভাবে, 'প্রীতি মজুমদার বা

কল্যাণীর মত মীরা সেন হাংলা নাও তো হতে পারে।' তাহলে? উপেক্ষা দেখাবে ও কাকে? ওর মনে যেন ধাক্কা লাগে। নাঃ, ওর মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

মৃণাল বাবু নিশ্চয়ই দেখেছে, আর তাই জিজ্ঞাসা করেছে ও কথা। ঠিক তাই-ই হবে। না, তাই বা হবে কেন?—ও ভাবে। না দেখে থাকতেও তো পারে—সামান্য একটা টুকরো কাগজ। কাগজটা ছিল যে বইটার নীচে। বইটা তো নাড়ানি, লেখার খাতাটাই নিয়েছ টেনে। যেটা তো ওই ওখানেই রয়েছে পড়ে। ঠিকই পায়নি তাহলে দেখতে—ও নিজের মনকে প্রবোধ দেয়। মীরা চেয়েছিল আলাপ করতে তাই হয়তো সাধারণ এই প্রসঙ্গ উঠানো। আর মৃণাল বাবুরই হয়তো আছে একটু দুর্বলতা। মীরা সেন সম্বন্ধে। তাওতো হতে পারে? পক্ষান্তরে যাচাই করে নিচ্ছিলেন হয়তো ভালবাসার নিধির কদর।

চপল খানিকটা আশ্বস্ত হয়। টেবিল থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে, শত খণ্ড করে জানালা গলিয়ে ফেলে দেয়।

(ক্রমশঃ)

ফোন ২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের
মানির তৈল
ব্যবহার করুন।
মিল-২৪৩, আ পার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বড় বাজার

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী সাগ্ননা চক্রবর্তী

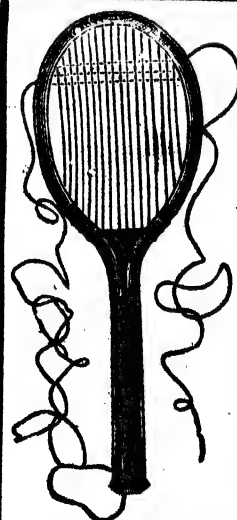
গত সংখ্যায় আমাদের কথা ছিল যে, আসছে সংখ্যায় অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যায় আমাদের আর্থিক সমস্যার দিকে যথাযথ নজর রেখে এমন একটা খাতি তালিকা প্রকাশ করা হবে (অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে) যাতে আমাদের এই আধুনিক ক্ষয়মুখ স্বাস্থ্য শক্তি-সম্পন্ন হওয়ায় সাহায্য করবে। অবশ্য আমার মনে হয়, অনেকে হয়তো আমার কথা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। কারণ—আমি ফোথাকার কে, আপনাদের খাতি তালিকা নির্ণয় করতে চলেছি—আপনারা আমার কথার বাধ্য কিনা? আমাদের এত অধঃপতন কেন? তার মূখ্য কারণ, যদি বিশ্বাস করেন, তবে বলি এর একমাত্র কারণ, আমরা আজ নিজেরাই হয়েছি—কথায় বলে “মোড়ল”; যাহা সাধারণতঃ চক্ষে পড়ে। কিন্তু জীবদ্বীনতা বলতে কি এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা সংসারের কোন বাধাই মানবেনা। অবশ্য যে বাধা যোগাবে তাদের শক্তি, যে বাধা আনাবে তাদের চলার পথে প্রেরণা, যে বাধা তাদের শিক্ষা দিবে সংস্কার ও লোকাচার মাস্তে। যদি কেহ সংস্কারের বাহিরে গিয়ে থাকেন বা যাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, অথবা কেউ পা কেলছেন, তাদের আমাদের বলার কিছুই নেই—কেননা তারা স্বাধীন বলে তাদের গোঁয়ার বজায় রাখবেন। মেয়ে মাস্তবের স্বাধীনতা যে কোন কালে ছিল না, বর্তমানে নেই ও ভবিষ্যতে আসবেনা—সে কথায় কেউ কান দেন কি? তবুও

আমাদের মনে রাখতে হবে—এই জী জাতির শক্তি, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, শাসন, সংস্কার ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ার সাহায্য না নিয়ে কোন দিন কোন জাতির মুক্তি ঘটে নাই, ঘটবে না। কিন্তু আমরাই যদি আমাদের কর্তব্য ভুলে যাই, আমরাই যদি হই দেশের অমঙ্গল তবে জাতির মঙ্গল স্বপ্নেও ভাবা কঠিন। আজকালকার মা-বোনদের সংস্কারই বলুন, আর লোকাচারই বলুন—এরা রেশমের বসে নানান ধরণের জিনিস খেয়ে আসেন—কিন্তু এটার পক্ষপাতি কখনে করেন আর কখনে করেন না, তার হিসাব বোধহয় কেহই রাখেন না, আমার যতদূর বিশ্বাস। আমার কথার প্রতিবাদ করে হয়তো কেহ বা বলতে পারেন, আমাদের “পোষায়

তাই খাই। তখন অতি বড় তর্কিককেও চূপ থাকতে হয়। কেন না, যে জন মুখ বুজে থাকে তার শত্রু খুবই কম। সুতরাং বেশী দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে, (অবশ্য ভালর জন্তেই) নিজে মন্দের ভাগী কেন হই। যাক সে সব, এখন আমি বা আপনাদের জানাবো বলেছিলাম তাহা পর পর বলছি।

১। প্রথমতঃ আমাদের সকাল বেলার চা পানটা বন্ধ করা।

সকালের শুধু চা অথবা পাউরুটি বিক্রেতার সঙ্গে চা পানে আমাদের শরীরের অবস্থা যার মতে যাহাই হোক না কেন, আমি নিজে দেখেছি খিদে একদম মরে যায়। যে মেয়ে সকালে চা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, দশটার সময় তার খিদে জ্বলিয়া সে অস্থির হোয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, যারা সকালে নিয়মিত চা না খান, তাদের শরীর যে চা-পায়ীদের চাইতে আবগ্যসম্পন্ন তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। চা পান বন্ধ করে আমার মতে সে স্থলে সম্ভবপর হোলে দুধ এবং না হোলে কিছু জলখাবার যেমন লাল বা



মোহনতোষ ব্রাদার্স লিঃ

১৫, কলেজ স্কয়ার কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ১২২০

রাষ্ট্র : ১৩৮-এ আশুতোষ মুখার্জি রোড

ভবানীপুর, কলিকাতা।

আমাদের দোকানে সুন্দর ও রিচকন কারিকর যারা টেনিস ও ব্যাডমিন্টন-রাকেট মেরামত ও তাঁত পরান হয়। ঐক সমস্ত রাকেট সরবরাহ করা আমাদের বিশেষত্ব—মূল্যে সন্তুষ্টি দিতে পারি।

বাবতীয় বিলাতী ও দেশী রাকেট ও অগ্ন্যস্ত টেনিস ও ব্যাডমিন্টনের রাজ-সরঞ্জাম পাইবেন। ক্যাটালগ বিদ্যমান দিয়া থাকি।

সাদা আটার পরোটা বা কুটি আখের গুড় বা পাটালী দিয়ে বা অল্প কিছু মিষ্টির সঙ্গে জলযোগ করা। অবশ্য এইখানে আমি এও বলছি যে, পূর্ববর্তী সংখ্যায় যে ডাক্তারী তালিকায় প্রাতঃকালের খাদ্য দেওয়া ছিল তাও আমাদের সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অমুকরণযোগ্য হওয়া অসম্ভব নয়, যথা—কিঞ্চিৎ মুড়ি, নারিকেল এবং অল্পরিত ছোলা ভিজান। এইখানে আর একটা কথাও বলতে হবে। অনেকেরই সকালে চা পান না নেশায়, না অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে; তারা ভাবেন এই নেশার নাগপাশ কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমার মনে হয় এদের এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি: প্রায় পনের বছরের চা পানের অভ্যাস থেকে একজন লোক নিস্তার পেয়েছেন চায়ের জায়গায় সকালে মাত্র এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে। এই ব্যক্তি নিজে বলেন, সকালে গলাটা শুকিয়ে থাকে কিনা তাই চায়ের কাপে জল নিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিতে নিতে আর চা খেলুম না বলে কোন আপশোষ থাকে না। এইবার আমাদের গৃহস্থের দিক থেকে চা পান বন্ধ করলে এবং সের্বশে সামান্য দুধ বা অল্প জল খাবারের বন্ধোবন্ধে কি খরচ দাঁড়াবে দেখা যাক। আমি দেখেছি চার কাপ চা আর তার সঙ্গে পাউরুটি বা খান চারেক করে বিস্কুট খরচ হোলে মাসিক খুব কমপক্ষে পনের টাকার কমে গিটার পাওয়া যায় না। অথচ সেই টাকাতে যে অনায়াসে সকালের অল্প কিছু জল খাবার (বা যা উপরে বলে গেছি) আমরা খেতে পারি তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কাজেই সকালের এই চা পান বন্ধ করলে আমার মনে হয় আর্থিক দিক

দিয়ে না হোক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আমরা অধিকতর লাভবান হোতে পারবো।

২। দুপুরে আমরা যে ডাল ভাত খাই তাই যথেষ্ট। তবে এটাও ঠিক শুধু আলু পটল বা বেগুন কপি না খেয়ে কিছু কিছু শাকপাতা আর যে সময়ের বা, যেমন শীতের সময়ে মুলো, গাজর, শালগম, ওলকপি, কড়াইগুটি ইত্যাদি খাওয়া উচিত। আর এই জিনিষগুলি যাতে পুরোমাত্রায় সিদ্ধ হয়, তার ওপরেও নজর রাখার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আর ডালের মধ্যে মুগ, অড়হর, মুসুর এইগুলো বেশী করে খাওয়া উচিত। ঝোলের পরিমাণটা কম করাই উচিত। আর সাধারণ তরকারীতে মশলার পরিমাণ, বিশেষ করে লঙ্কার ঝালের পরিমাণ যথা সম্ভব কম করাই উচিত।

৩। বিকেলে, যারা অনেক বেলায় খান এই সময়ে তারা চা ছাড়া অল্প কিছু খান না। কারণ বেলায় খাওয়ার দরুণ তারা সন্ধ্যার আগে কাপড় কাচেন না কিন্তু আমার মতে এই সন্ধ্যার পর কাপড় কেচে চা খাওয়ার মতন শরীরের অপকারী কাজ খুব কম আছে। কারণ দিনের আলোয় কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় আর গা-য়ে জল বসতে পায় না। কিন্তু সন্ধ্যার পর কাপড় কাঁচায় প্রথমতঃ কাপড় রাখে ভালো করে শুকোয় না আর দ্বিতীয়তঃ হোচ্ছে গায়ে জল বসে স্নেহ সর্দি ইত্যাদি হোয়ে মাথা-ধরা ইত্যাদি হয়। সন্ধ্যার আগে কাপড় কেচে চা না খেয়ে সামান্য পরিমাণে হালুয়া বা অল্প কোন রুক্ষ খাবার যদি আমরা বাড়ীতে তৈয়ারী করে খাই, তা হোলে আর কিছু হোক না হোক স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ভাল হবে তাতে কোন সংশয় নেই। আর বিকেলবেলা যথাসাধ্য আমাদের কিছু ফলমূল খাওয়া উচিত। এই ফলমূল খাওয়াটা আমাদের বাংলা দেশের মত কলকাতা দেশে মোটেই

অসম্ভব বা ব্যয় সাধ্য নয়। সামান্য কলা শশা থেকে আরম্ভ করে সময়ের কল হিসেবে জাম, জামরুল, আম, আনারস ইত্যাদি আমরা অনায়াসে খেতে পারি।

৪। রাত্রিতে ভাত বন্ধ করে কুটি খাওয়াই উচিত। যদিও আমরা “ভেতো বাঙালী”, তবুও আজকালকার কলেং ছাটা চালে যে কিছু সার্বজনীন পদার্থ থাকে না বা পাওয়া যায় না, তা অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা বলে আসছেন ও মনে হয় যতদিন এই সমস্তার কোনও অমূলক ব্যবস্থা না হয় ততদিন বলে থাকবেন। আর এই কুটি খেতে হলে আমার মনে হয় সাদা আটার চেয়ে লাল আটাই বেশী উপকারী হবে।

৫। এইবার আমি এমন একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি যার সমস্তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আত্ম পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নাই— তা হচ্ছে দুধ ও মাছ। এই দুটা ব্যয় বহুল ও সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে প্রতিদিন এর পেছনে পরসা খরচ করা সহজ ব্যাপার নয়। এই বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করবো। আপনাদের মতামত জানালে বাধিত হব।

এক

নব্বিনী

কথা-চিত্রের ভূমিকাগুলিকে রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী, দেববালা, জয়, রাজলক্ষী, অহীর্ষ চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সুশীল রায়, যুগল ঘোষ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জানকী ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

জীবিত অবস্থায় মরা

সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই মানুষ যখন প্রকৃতির ক্রোড়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন রোগ বলিয়া কোন শব্দ যে এ জগতে আছে, তাহা তাহাদের জানা ছিল না। প্রকৃতি-মাতা নিজে সকলের লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন, তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রাকৃতির 'আবেষ্টন' হইতে পুরাতনকে বহুদূরে রাখিয়া বর্তমানে বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম আবর্তনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। অস্বাভাবিক জীবন ধারণের ফলে নানা প্রকার রোগবীজাণু শরীরে প্রবেশের সুযোগ পাইল। মানুষ বহু-পূর্বাৱস্থা ভুলিয়া গিয়া বিভিন্ন লক্ষ্য-কাঁপ পথে চলিতে চলিতে অধুনা ক্ষীর্ণঅবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এখন দেখা যায় তাহাদের দেশে শক্তি নাই, শরীরে বল নাই, চক্ষুতে সে দীপ্তি নাই, প্রাণে সে অদম্য ক্ষুধা নাই, কাজ-কর্মে তেমন স্পৃহা নাই, মাংশপেশী শিথিল, দ্রাব্য দুর্বল, রক্ত দূষিত। প্রত্যেক বেদনা-বস্ত্র পদক্ষেপে সে প্রাণভরা জীবনীশক্তির

অভাব অনুভূত হয়। বাতে পছন্দ না হয় কষ্ট বেদনায় লুপ্ত, আর না হয় মাথা বা দস্তের অসহ বেদনায় আড়ষ্ট। এ ভাবে অর্জমুত অবস্থায় বহু নরনারী, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর কষ্টভোগ করিতেছেন। ইহাতে দেহের অপরিণীম কষ্টতো আছেই তথ্যভীত মানসিক ও আর্থিক কতিও ঘটে। আধুনিক যুগে এ সমস্ত কষ্টকর অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত রচি কোম্পানীর বহুবৎসর গবেষণার পর নিরাপদ অথচ কার্যকরী বেদনা নাশক লায়ডম আবিষ্কার করিয়া মানবের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। লায়ডম হৃদপিণ্ডের কোন অনিষ্ট করে না, এজন্ত সকলেই ইহা নিরাপদে সেবন করিতে পারেন। আমাদের দেশে বিস্তৃচিকিৎসক-গণ প্রত্যহ বহু বেদনাগীড়িত রোগীকে ইহার ব্যবস্থা দিতেছেন। আমি বহু রোগীকে বেদনার জন্ত ইহা ব্যবস্থা দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

জনৈক চিকিৎসক

ব্র্যাক বোর্ডের সরঞ্জামাদি
“বিনোদ এণ্ড কোং”-এ
পাওয়া যায়।

N. I. P.

ব্যথাক্ত-শাস্তনা

চিত্তভিৎসুয়ার ঘোষ

আমারি বুকের যতো কথা ছিল
সকলিতো তোমা' জানানো হয়েছে, ... তবে-
সুদূরের খোলা আঁড়াল টানিয়া
চকিতা হরিণী! ... কতদিন আর ... রবে!
বাধনে তোমায় চাহিনিতো কত

করিতে মলিন প্রিয়া—

চেয়েছি অদূরে হেরিতে তোমারে
সলাজ—কামনা নিয়া;

ভীতা কেন তবে? ওইখানে বসো,

ওই 'ও' বকুল-ছায়ে,

হুঞ্জের মম শুধু হুঁটা হুল

একক তোমারি গায়ে;—

তারপরে হায় যেথা যেতে চাও

যাইও চলিয়া.....

বাধা নাহি আর দিন,

—“আমার ফুলের পরশ নিয়েছ”—

এই উপহার—

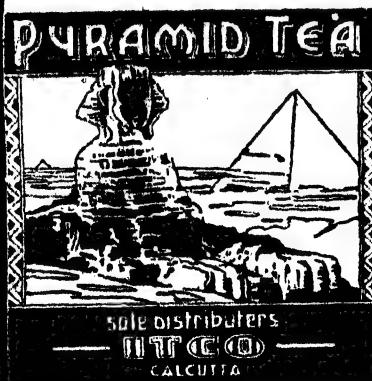
অঞ্জলী তরে নিব;

বিদায়েরি' মেঘ আমার আকাশে

ত্রারপরে ধীরে ঝড়া তুলিবে যবে,—

নয়ন-বাদলে বাধিয়া,—বলিব—

“শাস্তনা” মোর! বল চিরদিন রবে॥



= পিরামিড চা =

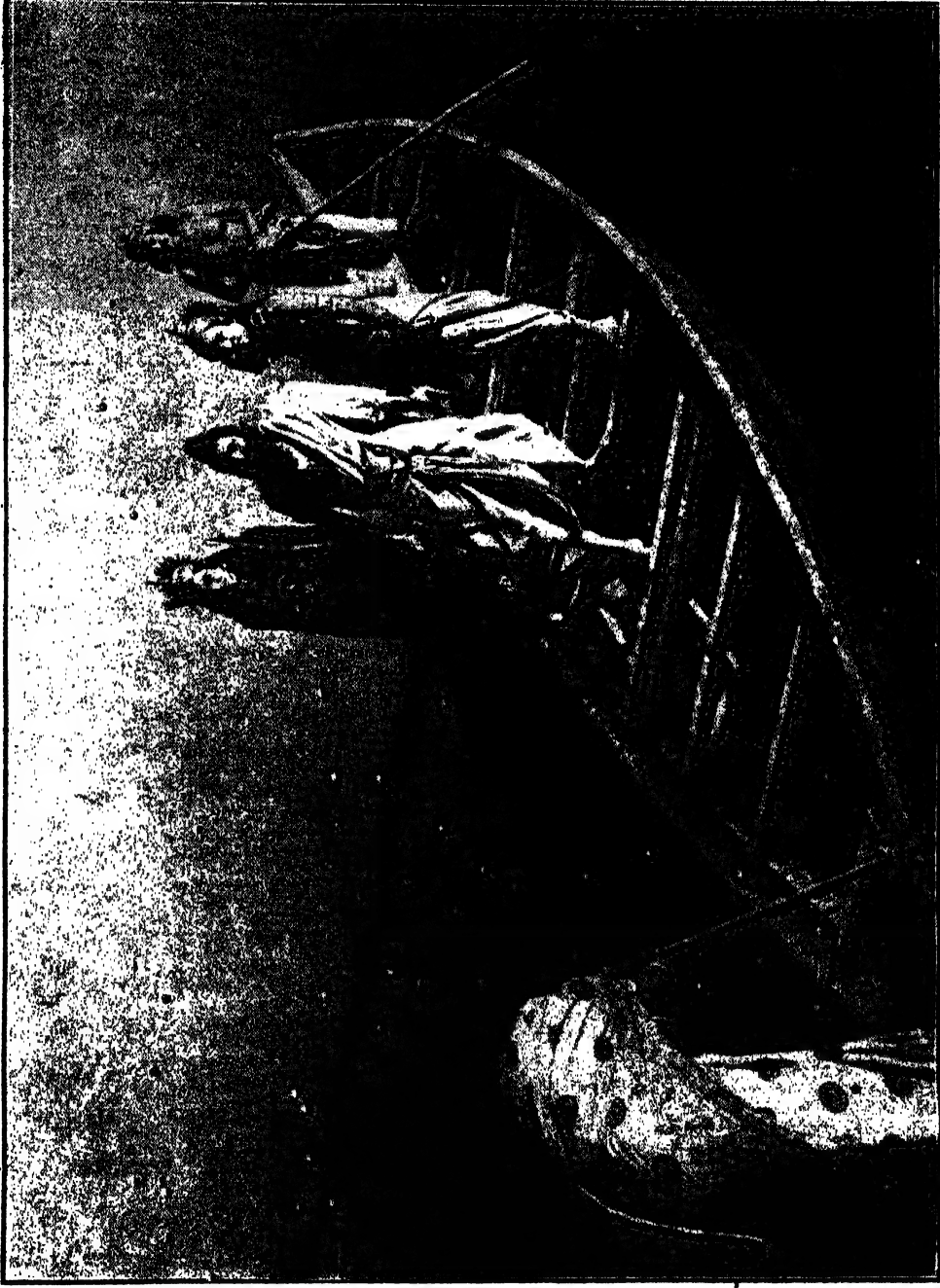
চিত্তহারী সৌরভ, নয়ন ভূষিকর বর্ণ, অতিমম স্বাদ

১ পাউণ্ড প্যাকেট মাত্র ১০ আনা

প্রত্যেক সজ্জাত দোকানে সাদরে বিক্রিত হয়।

ইন্দিরিয়াল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, ব্লাইন্ড স্ট্রিট, কলিকাতা।

খেয়ালী চিত্রপট



মাথা ফিঙ্গারের ভক্তি-মূলক বাগী-চিত্র; “জনক-
“নন্দিনী”-র একটি দৃষ্টে গীতা দেবী, শুক্ল রায়,
অহীন্দ্র চৌধুরী ও পঞ্চানন ব্যানার্জী। ছবিখানা
শীঘ্রই রূপবাহিনীতে মুক্তিলাভ করবে।

পরিচালক : ন্যাশনাল মিউজপেপার্স লিঃ

কার্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]



অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ } ৪৭শ সংখ্যা

খেয়ালী-পোলাও ও আজাদী কোম্মার সংমিশ্রণে নবাবী খানা

পাত ৬ই ডিসেম্বরের 'খেয়ালী পোলাও' শিরোনামের এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া মুসলিম বঙ্গের একমাত্র বুধপত্র "আজাদ" বাংলার পতনোন্মুখ মজ্জীমগুলের অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীধর সন্নিকারের বহুভ্রাতৃত্বের সহিত মিলনের বিশ্লেষণ-হলে একাধারে বিক্রপ ও ক্রন্দন করিয়াছেন—তবে "খেয়ালী"তে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই! "খেয়ালী"র প্রধান পরিচালক বহুভ্রাতৃত্বের আত্মীয় কিনা সে প্রশ্ন অবাস্তব হইলেও সহযোগী সেই আত্মীয়তার মশলা সংযোগে "খেয়ালী-পোলাও" রন্ধন করিয়া মুসলিম-বঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন।

শত্রু-বান্ধব সহিত নলিনীবাবুর মিলনের সংবাদ অন্তর্কিত হইলেও স্বাক্ষর কোম কারণ নাই, কারণ তাঁহার বাংলা কংগ্রেসের রক্ত-পাকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বহু বৎসর একযোগে কার্য করিয়াছেন। দেশের বৃহত্তর কল্যাণকর একম যদি তাঁহার সাময়িক বিরোধ ভুলিয়া গিয়া একযোগে কার্য করিতে স্বীকৃত হন তাহাতে বিস্মিত হইবার কী আছে? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—রাজনীতি

শ্রিতিলীল পদার্থ নহে। শরৎ-নলিনীর মিলন-সংবাদ সত্য ইহা, প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া, সহযোগী "আজাদ" গবেষণা করিয়াছেন যে রঞ্জনী-গৃহে নিমন্ত্রণ স্বেচ্ছাকৃত বা আকামিত? আর শরৎ-নলিনীর এই মিলন নাকি শরৎচন্দ্রের আত্ম-সমর্পণ! রাজনীতিতে Strategy বা কূটনীতি বলিয়া একটা বস্তু আছে, সে জ্ঞান কি বুদ্ধ মৌলানা সাহেবের নাই? আধ্যাত্মিকতা, স্নেহপ্রবণতা ও মধ্যযুগীয় সত্যাসত্যের আদর্শ শরৎ-চরিত্রের বিশিষ্ট চরকলতা—সেই চরকলতার রক্তপথে বাংলা কংগ্রেসে যে শনি প্রবেশ করিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। Bait, Bluff ও Briberyর প্রয়োজন রাজনীতিতে কত বেশী তাহা বোধ হয় সহযোগী 'আজাদ' নিজেই স্বীকার করিবেন—তাহা এই বিষয়ে তাঁহার 'অধুনা-লজ্জা'র আমাদের অপেক্ষা কম নহে।

স্বল্প-নিবৃত্ত ও বহু-ধিকৃত নলিনীবাবুকে বাংলার রাজনীতিতে "অপরিহার্য শক্তিশালী ও কৌশলী" ন্যক্তি বলিয়া অভিহিত 'কুম্ভার' সহযোগী 'আজাদ' অশাসনিকভাবে বিক্রপ করিয়াছেন। সত্য কি তাহা নহে—ইহা না হইলে তাঁহাকে গোষ্ঠী-হীন হইতে দেখিয়া সহযোগী 'আজাদ' আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন কেন আর অপর পক্ষে কংগ্রেস-

কল্পনাকণ্ড বা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন কেন? আর বলিবোঁগবুকে :কিরূপ প্রতিকূল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া রাজনীতিক] জীবন সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে হইয়াছে তাহা সহযোগী ‘আজাদ’ অপেক্ষা আমরা অধিক সংবাদ জানি। সুতরাং তাঁহাকে অশেষ ভাগ্যবান ও অপরিহার্য্য কোশলী ও শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি। স্বঃ রাষ্ট্রপতি ও বঙ্গাধিপ শরৎচন্দ্র যদি তাঁহাকে অপরিহার্য্য জ্ঞানে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তখন ‘অন্তে পরে কা কথা’?

স্বাঃজ্ঞান সম্পাদক মহলে যখন কেহই সংমিশ্রিত কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই তখন ‘বেঙ্গালী’ই সর্বপ্রথমে এই সংবাদ লোক-লোচনের গোচর করিলে অনেকেই ইহাকে বিবেচ-প্রসূত, অলৌক প্রভৃতি

আপ্যায়নে আবাদিকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন—আগাধের সেই শুভাশুখারীরা আজ নিরব কেন? শরৎ-মলিনীর মিলন-বার্তা ‘বেঙ্গালী’তেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং তৎপরেই সহযোগী ‘আজাদ’ ‘গেল রাজ্য গেল মান’ রব তুলিয়া ‘বেঙ্গালী-পোলাও’ বিতরণ করিয়াছেন।

স্বাঃজ্ঞানের রাষ্ট্রপতি বাহা অর্দ্ধক্ষুণ্ণভাবে বোষণা করিয়াছিলেন ওয়াক্কাফ তিনি তাহা স্পষ্টভাবে ও নির্ভীক কণ্ঠে বোষণা করিয়াছেন : বাংলার মন্ত্রীর পতন হইবেই! সাধু সংবাদ!! অতঃপর বৃদ্ধ মৌলানা সাহেবকে অসহযোগ আন্দোলন বা তৎপূর্বকার যুগের বক্তৃতা ও রচনা-গুলিকে পালিশ করিয়া সমরোপযোগী করিয়া লইতে দেবিলেও বিস্মিত হইব না!! আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা রহিলাম!

পরিচালনা কচ্ছেন : ফণী বস্মা

কচ্ছেন : প্রবোধ দাস

শব্দযন্ত্রী হচ্ছেন : নূপেন পাল
ভূপেন ঘোষ

—: একমাত্র পরিবেশক :—

প্রাইমা ফিল্মস লি

—কলিকাতা—

রূপবানী-তে

অসিতে আর দেবী নেই

N. I. P.



ভূমিকাগুলিকে রূপ দিয়েছেন : সাবিত্রী, দেববালা, ছায়া, রাজলক্ষ্মী, অহীন্দ্র, চৌধুরী, অহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অশীল রায়, মৃণাল ঘোষ, অন্নানারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জানকী ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।



মোহিতলালের চুখন বিলাস

সত্য ও স্নহের সেবক শ্রীমোহিত লাল মজুমদার—অগ্রহায়ণের শনির চিঠিতে কবিতা লিখিয়া পঞ্চাশপার মনের আকুতি ও কাকুতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি, আগামী বড়দিনের সময় রমনার মাঠে যে চুখন-জয়ন্তীর আসর বসিবে, তাহাতে এই কবিতাটি চুখনের উদ্দগ্ন হিসাবে পঠিত হইবে। শ্রীকবি লিখিয়াছেন: “তা’ ব’লে ভেবো না, কম ক’রে চাই

আমার পূর্ণ-সুখ—

চুমাটি বাড়ায়ে থেমে যাব আমি তখনি

অর্দ্ধ পূর্ণ!

আমি শুধু চাই, তেমন সময়ে ফিরাকে না

বটে মুখ,

বলিবে তবুও—“আহা ও কি কর! হবে

না সে কোন মতে!”

কবি মোহিতলাল বুড়াবয়সে দুর্জয় ‘বায়না’ ধরিয়াছেন। শুনিয়াছি বুড়া বয়সে মনের কামনার সহিত দেহের কামনা সমানভাবে বাজি জিতিবার জন্তে দৌড়াইতে পারে না, এবং এই জন্তই বোধ করি শ্রীকবি কান্তিকের শনির চিঠিতে তাহার “পঞ্চাশত্তম জন্মদিনের” কবিতায় হতাশ হইয়া লিখিয়াছিলেন—

“সেইদিন মোর নিতেছে বিদায়, আসিল

গোধূলি বেলা;

দেউল-দুয়ার বন্ধ হবে যে প্রথম-প্রহর

রাতে!”

‘প্রথম-প্রহর’ রাতে দেউল-দুয়ার বন্ধ হইলে এই কবি-নেউলের “চুমাটি বাড়ায়ে” যে কি অবস্থা হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও আমাদের বেপথু হইতেছে। তথাপি “পূর্ণসুখ”, “অর্দ্ধপথে” “হবে না সে কোন মতে”—র “সে” কথাটি আরও করুণ রসাত্মক করিয়া পরিস্ফুট করিতে পারিলে কদি নানসীর তরুত দয়া হইতে পারে। অতএব ‘শ্রীকবি হতাশ হইবেন না, দুই নম্বর কবিতা লিখিয়া কথাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলুন।

‘হত্যা’-দান ও প্রত্যাদেশ

একদা শনি-বাহনেরা সরস্বতী মন্দিরে ‘হত্যা’ দিয়াছিল। দিনের পর দিন ‘হত্যা’ দেওয়া চলিতে লাগিল কিন্তু তথাপি মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রূপা পরবশ হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। শনি-বাহনেরা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাদিতে লাগিল। অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষে দেবীর প্রত্যাদেশ বাণী ধ্বনিত হইল “রে শনি-বাহনগণ, তোমরা আমার পবিত্র মন্দির কলুষিত করিও না, দূরে অপসরণ কর। আমার এই শুভ্রবরণ সুশুভ্র আসন, তোমাদের মলিনতা পঙ্কিল অসিত বর্ণ সহ্য করিতে পারিতেছে না। তোমাদের হুল নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু, রুদ্ধ স্বভাব, কর্কশ কণ্ঠ ও কুৎসিত প্রকৃতি আমার সবিশেষ পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের

অস্ত্রের চিত্র অধিকতর তয়াবহ। তোমরা

পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর, অথবা পর ছিত্রাঘেবী, গুরুলঘুজ্ঞান বিবর্জিত, ধর্মান্ধ জ্ঞানহীন, কুটিল ও কোপন স্বভাব। তোমাদের বিস্তার পরিধি আমার অজ্ঞাত নহে, তথাপি তোমরা গর্দভের জায় সেই বিস্তা স্বক্ষে লইয়া মাঠময় করিয়া বেড়াইতেছ। চোনাবাজারে ইংরাজি বিস্তা সূমাণ্ড করিয়া তোমরা আমার প্রিয় পুত্রগণের ইংরাজি লেখার ভুল ধরিতে অতি মাত্রায় নিপুণ হইয়া উঠিয়াছ—তোমাদের লজ্জা থাকিলে অন্ততঃ তোমাদের ইংরেজি ভাষা জ্ঞানের বড়াইটুকু করিতে না। তোমরা আমার প্রিয় অধ্যাপক-গণকে অতি ইতর ভাষায় গালাগালি দিয়া থাক। আর কেহ ইতিহাস চর্চা করিবে, আর কেহ আমার স্বার্থ সেবা করিয়া যত্ন হইবে, তাহা তোমরা সহ্য করিতে পার না। সাহিত্য সেবায় কেহ অপরের সুখ্যাতি করিবে ইহা তোমাদের কর্ণশূল। অতএব ঐ শনির দুই অনুচরগণ, দুই সরস্বতী নামে আমার যে অবিজ্ঞামুর্তি আছে, তোমরা তাহারই উপাসনা করিয়া দিন দিন মোহগ্রস্ত হইতে থাক—আমার মন্দির আর অপবিত্র করিও না।” প্রত্যাদেশ বাণী নীরব হইলে শনিবাহনেরা গায়ের ধূলা বাড়িয়া মন্দির মধ্য হইতে স্নানমুখে নিষ্ক্রান্ত হইল। সহসা দুই সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া বলিতে লাগিলেন— “বৎসগণ, তোমরা আমাকে অবহেলা করিয়া এ মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছ কেন? বহুকাল ধরিয়া আমি যে তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিরিতেছি, তাহার কি এক প্রতিদান? বহু গ্রন্থাগারে তোমাদের হুল হস্তাবলেপের দ্বারা সরস্বতীর অবমাননা করিতে কে তোমাদের শিখাইল? দুই-পয়সার কুচাচিলড়ী বাজার হাতে করিয়া বহু নামজাদা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের বাড়ী বাড়ী যখন তোমরা ‘পেটলি’ করিয়া

বেড়াইতে, তখন তোমাদের স্বক্ষে কে ভর করিয়াছিল? বহুলোকের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সাধনা আত্মসাৎ করিবার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী কে তোমাদের শিখাইয়া দিয়াছে? তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তোমরা এই মন্দিরের উপাধ্যক্ষকে এবং এই মন্দিরের বরপুত্রগণকে আরও সজ্ঞারে গালাগালি দিতে থাক। ইহাতেই তোমরা বড় হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তোমাদের করিয়া থাইতে না হয়, আমিই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।” তদবধি শনিবাহনেরা আত্ম-সন্তোষ পূর্ণাভ করিয়া অপ্ৰতিহত প্রভাবে ছুঁই। স্রস্বতীর উপদেশবাণী সফল করিতেছে।

জারজ সন্তানের কাহিনী

অধ্বারণেয় শনির কাগজখানায় “বাংলা রঙ্গমঞ্চ” নামক প্রবন্ধে জনৈক বি-নামা লেখক লিখিয়াছে—“বাংলা থিয়েটার যাত্রা-গীতির জারজ সন্তান; যাত্রা ও সার্কাসের সন্ধমে এর উৎপত্তি; ভদ্র সমাজে নাম ভাড়াইয়া নাট্যশিল্প নামে এ পরিচয় দিয়া থাকে। বাংলা নাট্যশিল্পের (সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যার অভিনয় হইয়া থাকে) আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক পিতৃ পরিচয় অত্যন্ত উগ্রভাবে স্পষ্ট।” “বাংলা নাট্যশিল্পের” পিতৃ পরিচয় যাহাই হউক, উদ্ধৃত লেখাটির “রঙ্গমঞ্চ”-সিদ্ধ ভাষার ভিতর দিয়া লেখকের আকৃতি ও প্রকৃতির যে পরিচয় উঁকি মারিতেছে, তাহা মোটেই আশাশ্রয় নহে। ইহার পরেই, লেখক পুনশ্চ লিখিয়াছেন—“কলিকাতা সহরে এখন বড় জোর দুইটি মাঝি থিয়েটার চলিতে পারে। একটিতে যাত্রা-গীতির জারজ সন্তান নাটক চলিবে।” কিন্তু শনি-জগতের একমাত্র পরমাণিক “চটি বই” (এই ক্ষুদ্র বিশেষণটি শনি-জগতেরই

দান), যাহার পাতা না উন্টাইলে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধীয় কোনও গবেষণা-মূলক লেখাই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহাতে যে উহার উন্টা কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিড়িত “বঙ্গীয় নাট্য-শালার ইতিহাস” নামক “চটি বই” খানির নবম পৃষ্ঠায় লেখা আছে—“পুরাতন যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোন-নাড়ীর যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।” শনির দলের বি-নামা লেখক শনির দলের অন্ততম নামী লেখকের মূল্যবান গবেষণা যে এতদিন পরে এমন করিয়া উন্টাইয়া দিবেন, তাহা কে জানিত? কিন্তু আমাদের পক্ষে “এক ভয়, এক ছার, দোষ গুণ ক’বকার?” “বাংলা রঙ্গমঞ্চের” বি-নামা লেখকটির বাঙ্গলা থিয়েটার দর্শনের দোড় বোধ করি ভাঙুড়ী কোম্পানীর থিয়েটার দেখা হইতে আরম্ভ করিয়া “স্বামী-ইজি”, “বাংলার বোমা” প্রভৃতি ভাল ভাল আধুনিক নাটকের অভিনয় দর্শন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি কাল হইতে প্রাক্ ভাঙুড়ীগণ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা থিয়েটারের ইতিহাস ইহার কাছে অজ্ঞাত। এখনকার তরুণদের দেখিয়া “যদি কেহ পূর্ববর্তী বাঙ্গালীর আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় পাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার এককপ দৃষ্টি বিপর্যায় অনিবার্য। এই শ্রেণীর লেখকদের কাছে মহাকবি গিরিশচন্দ্র “আধা ভাড়, আধা ভক্ত” নামে পরিচিত। কাজেই বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের জন্মদাতা পিতা গিরিশচন্দ্রের নাম “বাংলা রঙ্গমঞ্চের” বি-নামা লেখকের লেখায় স্থান পাইবে কেন? ইহার Prince of Denmarkকে বাদ দিয়া Hamlet দেখিয়াই খুসী! ইহাদের কাছে গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই আমরা লজ্জা বোধ

করি; অতএব সে বিষয়ে নিরস্ত রহিলাম। আর, বিশ্বকোষ অবলম্বন করিয়া যে বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের উদ্ভব, তাহার সম্বন্ধেও এতকাল পরে নুতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। গিরিশ-বিশেষ যে রচনার “অপ্লগেট” মাখানো রহিয়াছে, সে রচনা বঙ্গীয় নাট্যাঙ্গুরাগীর পক্ষে অস্পৃশ্য বস্তু। এই গিরিশ-বিশেষের মূল উৎস কোথায় এবং কি কারণ-সম্মত তাহাও কাহারও অবদিত নহে। শুধু একটি মাত্র কথা ইহাদের বলা আরম্ভক। অর্ধেক স্মৃতিসভায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যখন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশ্বকোষের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন এবং যাহার উত্তরে apology করিয়া স্বয়ং বিশ্বকোষকার পরবর্তী সংস্করণে ভ্রান্ত গিরিশ-বিশেষের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং যে ঘটনার বহু সাক্ষী এখনও বর্তমান রহিয়াছেন, সে ঘটনার উল্লেখ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত তথ্য বিশ্বকোষ অবলম্বিত “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস” দেখিতে পাই না কেন? অবশ্য ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তখন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে “নাবালক” অবস্থা মাত্র এবং বোধকরি তখন তিনি সাহিত্য পরিষদের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইবারও অধিকার পান নাই। তাহা হইলেও স্বয়ং স্বয়ং ভ্রাতা সর্কজ এবং inspired ভাবে যখন তিনি সত্য ইতিহাস রচনার আস্থা করিয়া থাকেন, তখন ঐরূপ একটা জলন্ত সত্য ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠা জাগ্রত হইল না কেন? হায় রে ইতিহাস! এবং সেই ইতিহাস রচনার জন্য ইহাদের বাহ্যিকোটের আর অস্ত নাই! কিন্তু আমরা শুধু ভাবিতেছি “জারজ সন্তানের ইতিহাস রচনার” জন্য এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকরা এতটা মাথার গোবর খরচ করিতেছেন কেন?



(বিলাসী)

ষড়দিদি

সুরেনের সাধী-স্বামী 'শান্তি'-র অন্তরে সুখ নেই।

তার স্বামী আজ চারদিন বাড়ী ছাড়া শান্তি খবর পেয়েচে, ইয়ার-বন্ধুদের প্ররোচনায় সুরেন আজ বাগান-বাড়ীতে আবদ্ধ। এদিকে তার কুচক্রী ম্যানেজার মথুরাবাবু দিচ্ছেন ইন্ধন। স্বামীর কাছে শান্তি লোক পাঠাতে কসুর করেনি। কিন্তু মথুরাবাবুর চক্রান্তে কোন খবরই সুরেনের কাণ পর্য্যন্ত পৌঁছেছে না।

মনের দুর্গিবার বেদনা নিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত এই অবস্থার প্রতিকারের আশায়, শান্তি তার অন্তঃপুর ছেড়ে নিজেই কাচারী বাড়ীতে নেমে এলো। তখন আর হিতাহিত বিবেচনা করবার মত মনের অবস্থা তার নয়।

উপরের এই দৃশ্যটি এই সপ্তাহে মল্লিক মশাই তুলছেন। ম্যানেজার মথুরাবাবুর সঙ্গে শান্তির বোঝা-পড়া এবং তার শেষ পরিণতি কী ঘটলো, আপনারা যথাসময়ে ছবির পর্দায় তার পরিচয় পাবেন। আপাততঃ আমরা এই পর্য্যন্ত বোলতে পারি—শান্তির ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতী এবং জমিদারের কুচক্রী ম্যানেজার মথুরাবাবুর ভূমিকায় ইন্দু মুখোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় কোরছেন।

উপরের কাচারী-বাড়ীর দৃশ্যে আর দুটি জনপ্রিয় শিল্পীকে দুটি বিশিষ্ট টাইপ-ভূমিকায় দেখতে পাবেন। এদের দুজনকেই

আপনারা বিশেষভাবে চেনেন—অহী সাত্তাল এবং সত্য মুখোপাধ্যায়

সাপুড়ে

এঁদের দু'নয়ন ঈড়িওতে, ছবির মত নয়নাভিরাম একটি সেটে, সুন্দর অভিনয় কোরছেন—শ্রীমতী কানন। এর সঙ্গে আছেন সাপুড়েদের ওস্তাদ মনোরঞ্জন বাবু।

মুক্তোর মত জলের ধারা বইচে আজ কাননের চোখে।

সবাই শুধায়—কেন? কিসের এর বেদনা?

সাপুড়েদের বস্তীতে মানুষ হ'য়েচে এই মেয়েটি। তাদের সুখ-দুঃখের নিত্য-সঙ্গী। এতদিন পর কী এমন ঘটনা ঘটলো—কে দিল তার ফুলের মত কোমল অন্তরে বেদনা?

কানন সেদিন এই দৃশ্যটির অভিনয়কালে অন্তরের টুকুড়াসে এতখানি অধীর হোয়ে পড়েছিল যে তার চোখের জল, সেটের উপর উপস্থিত সকলেরই অন্তর স্পর্শ না কোরে পারেনি। এমনি চমৎকার, এমনি প্রাণস্পর্শী, এমনি স্বাভাবিক তার অভিনয়। আর কাননের সঙ্গে সমান তালে পা ফেললে, তেমনি প্রাণস্পর্শী অভিনয় কোরছেন সুবিখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

ধন্য দেবকী বাবুর অভিনয়-শিক্ষা আর ধর্ম এদের সাধনা।

কুসুম (হিন্দি)

গত সপ্তাহে রঙ্গ-মঞ্চ দৃশ্য তোলা

হ'য়েছে। এ দৃশ্যের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়ই শ্রীমতী লীলা দেশাইএর নৃত্য ও সাংগলের গান, দুই-ই বেশ উপভোগ্য হয়েছে—শুধু উপভোগ্য নয়, নাটকীয় ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে এ দৃশ্যের যথেষ্ট স্বার্থকতা আছে। পরিচালক নীতীন বোস 'ছবির কাজ' অনেকটা শেষ ক'রে এনেছেন।

কপালকুণ্ডলা (হিন্দি)

পরিচালক ফণী মজুমদার 'কপালকুণ্ডলা'র উপযোগী বহির্দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত।

কুমার প্রত্যাশে ষড়ঙ্গ

তিনি এখন তাঁর পররস্টা চিত্র 'রজত-জয়ন্তী' তোলবার যোগাড় করছেন। আগামী মাসের 'মাঝামাঝি' ছবি তোলা আরম্ভ হবে। প্রথম কেবল বাংলায় তোলা হবে আর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মুক্তি লাভ ক'রবে বলে শোনা যাচ্ছে। ভূমিকা আর অন্তান্ত বিষয় শীঘ্রই জানান হ'বে।

সাধী

আজ থেকে বাংলা 'সাধী' চিত্রা ও নিউ সিনেমা এই উভয় চিত্রগৃহে তৃতীয় সপ্তাহে প'ড়ল। আশ্রয় হীন সহায় হীন একটি ছেলে আর একটি ছোট মেয়ে কেমন ক'রে 'সংসার সমুদ্রে সহস্র প্রতিকূল ঘটনার স্রোতে যুদ্ধ ক'রে সুখ-দুঃখের মধ্যদিয়ে নিজেদের চলিয়েছে, পরস্পরের সহযোগিতা ও ভালবাসার আশ্রয় করে কেমন এক বিচিত্র আবহাওয়ায় এক অভিনব জীবনের সৃষ্টি করেছে—এগুলি অবলম্বন করেই সাধী এক সুন্দর ও চিন্তাকর্ষক নৃত্য-গীতময় ছায়াছবির উদ্ভব হয়েছে। দর্শকরা ছবি দেখে বেরিয়েই এক সমস্তার পুড়েন কে বেশী প্রশংসার যোগা? গান কার ভাল—কানন না সাংগল? 'সাধী' প্রযোগশিল্পী ফণী মজুমদারের প্রথম ছবি কিন্তু তাহলেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ও যশের গোঁরব মুকুটের স্বার্থ অধিকারী হ'য়েছেন, চিত্রনাট্য

ও গল্পের গতি নিয়ন্ত্রণে তিনি সকলকে মুগ্ধ করেছেন। মজু (কানন) ও ভুলুয়া (সায়গল) সকলের মনেই রেখা পাত ক'রবে। আশাকরি যারা এখনও ছবিটি দেখেন নি তারা এই সপ্তাহেই দেখবেন ও দেখে পরিতৃপ্ত হবেন।

প্রাইমা ফিল্মস্ লিঃ

বোম্বাইয়ের হিন্দি ছবি 'জালা' ও 'সাথী'র পূর্ন ভারতের পরিবেশন স্বতন্ত্র। এরা পেয়েছেন এ সংবাদ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। 'জালা' শনিবার ১০ই ডিসেম্বর থেকে গনেশ টকি হাউসে চলছে এ সংবাদও পূর্বেই দিয়েছি। এখন শোনা গেল 'এরা বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা পুরাতন প্রতিষ্ঠান সরোজ ফিল্মশের 'রাইফেল গার্ল', 'মুরাদ' ও 'মস্তানা' এই তিনখানি ছবির পরিবেশন স্বতন্ত্র পেয়েছেন। অবজালীর বাঙ্গালায় চিত্র-পরিবেশনের দুর্গে প্রাইমার ছায়া নিছক বাঙ্গালীর প্রবেশ প্রেশংসনীয় ও শ্রাঘ্যার বিষয় সন্দেহ নেই। 'কবে' দুর্গ প্রাকারের একাধারে তাঁদের বিজয় বৈজয়ন্তী দেখতে পাব এই আশায় আমরা উদ্গ্রীব হয়ে রইলাম।

জনকনন্দিনী

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং অজ্ঞাত মুণিগণ তর্জিকাপুত্র মারীচের অভ্যাচারে যজ্ঞ করতে পারেন না—যখনই তাঁরা যজ্ঞরতী হন, তখনই মারীচ বহু অস্ত্রের সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞে বির যটায়। অতঃপর না দেখে বিশ্বামিত্র যজ্ঞ-রক্ষার জন্তু রাম-লক্ষ্মণকে রাজা দশরথের কাছ থেকে নিয়ে এলেন। যথারীতি যজ্ঞ আরম্ভ করা হল এবং যথাপূর্ব মারীচও তাঁর দলবল সমেত আকাশ পথে ধেয়ে এলো। মেঘের আড়ালে অবস্থিত রাক্ষসদলের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের যুদ্ধ চলল।.....'জনক-নন্দিনী' কথা চিত্রের উপরোক্ত অধ্যায়ের চিত্র গ্রহণ এ সপ্তাহে

শেষ হ'য়েছে। 'প্রভাস মিলন' ছবির যুদ্ধ দৃশ্য দেখে যারা মুগ্ধ-বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁরা শুনে হয়তো আনন্দিত হ'বেন যে "জনক-নন্দিনী" ছবির এই যুদ্ধ দৃশ্য "প্রভাস মিলন" ছবির যুদ্ধ দৃশ্য-পরিচালনা করার গৌরবকে স্মান ক'রে তুলবে। আগামী সপ্তাহে ছবিখানা শেষ হ'য়ে যাবে।

যথের ধন

মতিমহল থিয়েটারসের রোমাঞ্চকর বাংলা কথা-চিত্র "যথের ধন"-এর (হেমেন রায়-এর সর্বজন আদৃত উপন্যাসের চিত্রাঙ্ক-বাদ) চিত্র-গ্রহণ পূর্ণ উত্তম চ'লেছে। বর্তমানে প্রয়োগ-শিল্পী হরিভক্ত রূপনাথ

নাম ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন। ছবি খানির শিল্পনির্দেশনা করবেন সুধাংশু চৌধুরী।

এই সঙ্গেই জ্যোতিষ বাবুঘ্যের পরিচালনায় আর একখানি ধর্মমূলক ছবির কাজও আরম্ভ হবার কথা হ'চ্ছে। গাঙ্গুলী মশাই তাঁর পুরণো কর্মচারীবৃন্দকে আবার যথারীতি কাজ করবার জন্তু আহ্বান কোরে সদাশয়তার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের পুনরুত্থানে সত্যিই আজ আনন্দিত।

"খেলানী" "বর্ণ-বন্ধ" প্রতিযোগিতা

"খেলানী"র আগামী নববর্ষ সংখ্যা হইতে একটি নূতন আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। নানারূপ নব-নব আকারে অক্ষর সাজাইয়া "বর্ণ-বন্ধ" সমস্তার সমাধানের দ্বারা সহৃদয় পাঠকবর্গের চিন্তা ও বিস্তৃত যাহাতে সমভাবে সমুন্নতি লাভ করে—সেই দিকেই আমরা অতঃপর সচেষ্ট থাকিব। নববর্ষ সংখ্যায় "বর্ণ-বন্ধ" প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী সহ প্রথম সমস্তা প্রকাশিত হইবে।

গুহার পথে করালীর অভিমানে দৃশ্য তুলিতে ব্যস্ত। দৃশ্যটির প্রধান ভূমিকা-গুলিতে অভিনয় ক'ছেন শ্রীমতী শিশুবালা, অহীন চৌধুরী, রবি রায় প্রভৃতি।

কালী ফিল্মস্

এই প্রতিষ্ঠানের কাজ আবার আরম্ভ হ'ল। শিশিরকুমার ভাট্টীর পরিচালনায় দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত"র প্রাথমিক শূটিং, মহাসমারোহে গেল বুধবার সমাধা হ'য়েছে। প্রকাশ যে, এই চিত্রে শিশিরকুমার, অহীন চৌধুরী, নরেশ মিত্র, বিশ্বনাথ ভাট্টী, যোগেশ চৌধুরী, কঙ্কাবতী, রাণীবালা, উষা দেবী, সাবিত্রী প্রভৃতি বিশিষ্ট ভূমিকাগুলিতে আত্মপ্রকাশ করবেন। এ ছাড়া শ্রীভারত লক্ষ্মীর সৌজন্তে দুর্গাদাস বাবুঘ্যে হয়তো

উত্তরায় খনা

বাঙলার দর্শক মহলে 'খনা' চিত্রের অসামান্য সাক্ষ্যের কথা বোধ করি আর নূতন করিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। হাজার হাজার দর্শকের চিন্তা বিনোদন করিয়া 'উত্তরা' চিত্র-গৃহে এই শনিবার হইতে 'খনা' ও 'অভিসারিকা' ষষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করিল।

বিনোদ এন্ড কোং

১০নং ডালহাউসী স্কয়ার জরীপ ও নক্সার দ্রব্যাদি স্ট্যাকবার্ড ও সাইক্লোষ্টাইলের সরঞ্জামাদি এবং অফিস টেলিগ্রাফ বিক্রয়।

সমালোচক ও দর্শক মহলে, 'খনা' যে ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে এবং গজ, পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া 'উত্তরায়' জনতা আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে এই চিত্রের সাফল্য সন্দেহ আর সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহা ছাড়া মফঃস্বলের বহু সহরে ছবিখানি প্রদর্শিত হইতেছে এবং সর্বত্রই নিপুলভাবে সঞ্চালিত হইয়াছে।

সত্যই সবাঙ্কবে ও সপরিবারে দেখিবার মত 'খনা' একখানি স্বর্ণীয় চিত্র।

পূর্ণ থিয়েটার

আজ থেকে 'দেশের মাটি' ৩য় সপ্তাহে পড়িল। রসগ্রাহী দক্ষিণ কলিকাতার দর্শকের নিকট দেশের মাটি বেশ প্রিয় হয়েছে। দক্ষিণ কলিকাতায় বড়দিনের বাজার পূর্ণ থিয়েটারই গরম রাখবে বলে মনে হয়।

রূপবানী

'অভিনয়' এখনও বেশ চলছে। অভিনয়ের পরই রাধা ফিল্মের "জনক নন্দিনী" দেখান হবে—তারিখ এখনও ঠিক হয় নি।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দাঁন

টপের চা

স্বাস্থ্য ও উৎসাহপ্রদ বিত্তজ্ঞ পানীয়

আগামী ২২শে ডিসেম্বর খেলালীর কোন সংখ্যা বাহির হইবে না। এর পূর্ববর্তী সংখ্যাই হচ্ছে খেলালীর নবম বার্ষিক সংখ্যা, ৩০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হইবে।

ধে: স:

বিবিসি

শুশ্রূষাপাতা (পত্রিকা)

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা - আর্ট পেপারে পরিষ্কার ছাপা। স্কটিশ চার্ট কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ও ছাত্রদের মুখপত্র। প্রকাশক ও সম্পাদক শ্রীনির্মল চন্দ্র রায়।

এরা সকলেই তরুণ কাজেই এদের উত্তম ও প্রচেষ্টায় যে এরকম ভাল একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত। সকল লেখাই যে অত্যন্তকষ্ট হয়েছে একথা বলা চলে না। কিন্তু এই কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আন্তরিক চেষ্টা দ্বারা যতদূর সম্ভবপর, ততদূর ভাল এদের সব লেখাগুলি হয়েছে। লেখাগুলির মধ্যে যেটা সমগ্রাণ্ডে প্রশংসা পাবার যোগ্য, তা হচ্ছে সম্পাদক মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথের বলাকার সমালোচনা। সমালোচনাটা বেশ উচ্চ শ্রেণীর হয়েছে এবং তুলনার সব লেখাগুলিকেই ভাবধারায় ও মূল্যায়নায় অতিক্রম করেছে। এর ভবিষ্যৎ সন্দেহে আমরা উচ্চধারণা পোষণ করি। অরুণিমা ঘোষ এর কবিতাটা মন্দ নয়।

এদের এই নব প্রচেষ্টার আমরা প্রশংসা করি এবং এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কেদার নাথ ব্যানার্জি গোল্ড

মেডেল

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের, ভাইস চ্যান্সেলার ও কর্তৃপক্ষ শ্রীপ্রভাত কুমার বসু বি-এলকে উক্ত মেডেল প্রদান

করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালের শ্রেষ্ঠ আইন ছাত্র হিসাবে এই পদক প্রাপ্ত বসু লাভ করিয়াছেন। আমরা এই উৎসাহী যুবকের ক্রমোন্নতি আশা করি।

বেনিয়াটোলা ক্লাব

গত শনিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ (ইং ১০ই ডিসেম্বর) বেনিয়াটোলা ক্লাবের বাৎসরিক প্রীতিভোজ স্বর্গীয় বৃটেন্স পাল মহাশয়ের দয়াদয়িত্ব উদ্বোধন বাটীতে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত বিভূতি দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুধীর ব্যানার্জির সুললিত গান এবং শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ রায়ের তবলা সমাগত সভা এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ মুগ্ধ এবং আনন্দ দান করে। অভ্যাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রী হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ গিত্ত, ডাক্তার নিতাই চাঁদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখার্জি, মেজর পি. কে. গুপ্ত; শ্রীযুক্ত নিতাই চরণ পাল, শ্রীযুক্ত পদ্মপতি ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত শৈল কর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া ক্লাবের সভ্যগণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সাধারণ সম্পাদক মিঃ এ. এন. খান অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি আপ্যায়নে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

এন্টি-টিউবার ক্লিউলিসিস ফণ্ড

কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঠিক উত্তরের ময়দানে অটোমোবাইল এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে হিজ ম্যাজেস্টি দী কি এম্পারাস এন্টি টিউবার-ক্লিউলিসিস ফণ্ডের সহযোগিতা কয়ে ১৮ই

ডিসেম্বর রবিবার এক বিরাট প্রমোদ উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশ বাইশ হাজার দর্শকের জ্ঞাত্ত বিবিধ আসন এবং আমোদ প্রমোদের যে আয়োজন হইয়াছে, তাহার আর তুলনা নাই। টিকিট বেচিয়া যত টাকা পাওয়া যাইবে সে, সব টাকা ভারতেশ্বরের এন্টি-টিউবারকিউলিসিস্ ফণ্ডে প্রদত্ত হইবে।

এ উৎসব আমোদ লীলা তার' অঙ্কে বিভক্ত। ষাঁহাদের প্রাইভেট মটর গাড়ী আছে, কলের বিচিত্র সজ্জাভূষণে গাড়ী সাজাইয়া, গাড়ীর মূর্ত্তিকে হংস ময়ূর, সারস, জাহাজ, দুর্গ, পুরী যে কোন দিব্য ও ছদ্ম মূর্ত্তিতে রচিয়া রঙ্গাঙ্গনে আনিবেন। এ জ্ঞাত্ত কোনরূপ প্রবেশিকা ফী দিতে হইবে না। ষাঁহাদের গাড়ীর সজ্জাভূষণ বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার নগদ টাকা পুরস্কার পাইবেন। প্রথম অঙ্কে আরো দুটি প্রমোদ বিজয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশের অতীত গরিমা মহিমা, মাধুরী শৌর্য কাব্য পুরাণের কাহিনী সচল ও নিশ্চল মূর্ত্তিতে দেখানো হইবে। তারপর ব্যবসায়ীরা দেখাইবেন তাহাদের বিবিধ পণ্য সম্ভারের প্রচার বিজ্ঞাপনীতে রকমারী কারুকলা। সব কয়টি অনুষ্ঠানই প্রতিযোগিতামূলক এবং সকল ব্যাপারেই পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখান যাবে মোটর জিমখানা। এ পর্বে যেমন বিশ্ব বিলম্ব তেমনি কৌতুকের অন্ত থাকিবে না। মোটর চালনাকালে মোটরে ছুজন মাত্র থাকিবেন— যিনি মোটর চালাইবেন তিনি এবং তাহার এক মহিলা বান্ধবী। মোটর চালাইতে চালাইতে সঙ্কেত মাত্র মোটর থামাইয়া নামিয়া ময়দানে রক্ষিত চেয়ার অধিকার করা; মহিলা সঙ্গিনীর প্রসারিত হাতে চামচে ধরা ডিমটিকে অক্ষত অটুট রাখিয়া মোটর দৌড় সমাপন। চলন্ত মোটর হইতে

ডাষ্ট বা কাটা তার ছুড়িয়া টার্গেট বিদ্ধ করা, এমনি বহু ক্রীড়া কৌশল দেখান হইবে। এগুলিতেও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। প্রমোদ অনুষ্ঠানগুলিকে সুরক্ষিত রাখিবে মিলিটারী ব্যাণ্ড তারপর সন্ধ্যা সমাগমে ফ্লাড লাইটে সারা ময়দান আলোয় আলো করা হইবে এবং সে আলোয় কলিকাতার পুলিশ বাহিনী রোমাঞ্চকর বিবিধ ব্যায়াম বিভ্রাস লীলা দেখাইবেন। এ খেলার শেষে আতস বাজীর ব্যবস্থা আছে। আতস বাজীতে নুতনত্বের সমাবেশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আয়োজন যেমন বিরাট এবং বহু বিচিত্র তেমন দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কল্পে রঙ্গাঙ্গনে যথাযোগ্য ভোজ্য, পানীয় বিক্রয় সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ এতটুকু ক্রটি রাখেন নাই। সর্ব শ্রেণীর দর্শকের সহযোগিতা লাভের জ্ঞাত্ত আসনের মূল্য দশ টাকা হইতে আট আনা পর্যন্ত করা হইয়াছে। আশা করি আমোদ প্রমোদ উপভোগের সঙ্গে আর্জ আতুর যশা রোগীদের সেবা পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা কল্পে সাধারণে এ অনুষ্ঠানটিকে সর্বাংশে সার্থক করিয়া তুলিতে সক্ষম থাকিবেন না।

শোক সংবাদ

গত ২৫শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় তাহার ২৭নং মহিম হালদার ষ্ট্রীটস্থ বাস ভবনে দেহ ত্যাগ করেছেন। তিনি কালিঘাট মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি এবং কালিঘাট লাইব্রেরীর কার্য্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন।

তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া তাঁহার কালিঘাটস্থ বাস ভবনে তাঁহার লাক্ষ্মীপুত্র শ্রীমান সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হইয়া তাঁর মৃত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাইয়া ছিলেন।

উত্তরা

ফোন : বি, বি, ২২০২

সবাক্ষবে ও সপরিবারে
ঘো গ দা ন করিয়া

৬ষ্ঠ

সম্প্রাহের

বিজয়-অভিযান সার্থক
করুন !

= মেট্রোপলিটানের =
বহুজন সম্বন্ধিত অপরাধ
= চিত্র - কথা =

খনা

শ্রেষ্ঠাংশেঃ অহীন্দ্র চৌধুরী
ও ছায়া দেবী

তৎসহ হাসির ছবি
অভিসারিকা

শ্রেষ্ঠাংশেঃ ধীরেন গাঙ্গুলী
ও সাবিত্রী

‘কম্পতরু’ অমৃতভোগ



যৌবন

ও

স্বাস্থ্য

অক্ষুণ্ণ রাখিতে

একমাত্র দুগ্ধাদু খাদ্যোষধ

অমৃতভোগ

নিরামিত ব্যবহারে মানসিক
ও শারীরিক শক্তি সবিশেষ
বৃদ্ধিত ও মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট হয়

তিন সপ্তাহের ‘দেবনোপযোগী’

প্রতি টিনের মূল্য—১।০



কম্পতরু আয়ুর্বেদ ভবন

কম্পতরু প্রাসাদ

চিৎবঞ্জন এভিনিউ নর্থ, কলিকাতা

চিত্রা

ফোন : বি, বি, ১১৩৩



৩য় সপ্তাহ



চিত্রা

ফোন : বি, বি, ১১৩৩

নিউ সিনেমা

ধর্ম্মভাঙ্গা * ফোন : কলি : ৫৮১৯

শনিবার ১৭ই ডিসেম্বর হইতে

তৃতীয় সপ্তাহ !!

‘সাথী’

‘সাথী’

(প্রত্যহ সন্ধ্যা ৮টার বুকিং খোলে)

দুইদিন পূর্বে সিট রিজার্ভ করিবেন।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্তী

গত সপ্তাহের কথা শেষ করেছিলুম, এইবারে মাছ ও ছুধের কথা আলোচনা করবো এই আভাস দিয়ে। কিন্তু এইবারে স্থানাভাবে শুধু মাছ নিয়েই আলোচনা করবো। কিন্তু, স্মৃতি কথা আপনাদের বলতে কি, কি যে বলবো তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না। শরীর শক্ত রাখতে মাছের প্রয়োজনীয়তা কতটা এটা ঠিক ঠিক বলা শক্ত। তবে কারোর কারোর মতে মাছ অপরিহার্য, আবার কারোর মতে তেমনই পরিহার্য। কিন্তু সমস্তার সমাধান এখন পর্যন্ত শেষ হয় নাই, হবে বলেও মনে হয় না। আজকাল প্রত্যেক বাঙালী গৃহস্থের ঘরে গৃহস্থের পোয়রা যে কত পরিমানে মাছ প্রত্যাহ পায় তা আপনাদের কারোর অজানা নেই। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে ডাক্তারের আদর্শ খাদ্য তালিকায় যে মাছ মাংস খাওয়ার কথা ডাক্তার বলেছেন তার পরিমান হচ্ছে সকালে আধ পোয়া আর রাত্রে আধ পোয়া; অর্থাৎ দুবেলায় এক পোয়া। কিন্তু আজকালকার সহরবাসী চাকুরে অনেক বাঙালীর ঘরে দিনে এক পোয়া টাটকা মাছ আসা হয়েছে কষ্টকর। কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে যদি আমি বিমুখ হই তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে ছুধে পারবেন না। তবে আপনারা বলতে পারেন: কেন আমরা আজ মাছ পাই না, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা কি আপনি করতে পারেন না? তাহলে আমাকে কিছু বলতে হবে দেখছি।

আজকাল কোলকাতার বাজারে উপযুক্ত পরমা দিয়েও যে মনের মত টাটকা মাছ পাওয়া যায় না, তা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। কেন পাই না? এই কেনর উত্তর দেওয়া কিছু মাত্র শক্ত বা সমস্তার বিষয় নয়। যে কারণে আজ বাংলার পল্লীসমূহে ম্যালেরিয়ার বিষে তিলে তিলে শত শত জীবন মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, যে কারণে আজ বাংলার কৃষক-কুল প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত ঠিক সেই কারণে আজ বাংলার হাটে বা বাজারে উপযুক্ত পরিমানে মাছ পাওয়া যায় না। বাংলার নদ-নদী সমূহ ক্রমশঃ মরে যাচ্ছে। এই মরা নদ-নদী হোতে যদি আমরা আগের মতন মাছ বিনা আয়াসে পাবো বলে আশা করি, তাহলে যে আমাদের সে আশা পূর্ণ হবে না, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? যাহারা কোলকাতার বাজারে নিয়মিত ভাবে বাজার করেন, তাদের অনেকেরই মুখে শুনেতে পাই, অমুক মাছ আর আজকাল দেখতে পাই না; বা অনেকেরই বলেন অমুক মাছ আজকাল বরফে চালান আসে! তার কারণও যে বাংলার নদ-নদী ও জলাশয়ের দূরবস্থা থেকে উৎপন্ন হয়েছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। অনেকে বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন গত দুই বৎসর যাবৎ কোলকাতায় মাছের চালান আর আগের মত হচ্ছে না। এর কারণ নির্ণয় করবার জন্তে বাংলা গভর্নমেন্ট এক বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করেন ও বিশেষজ্ঞের তদন্তের ফলাফলমুখায়ী

জানতে পারেন যে আগেকার মত সমৃদ্ধ হোতে বর্ষাকালে ইলিশের বাচ্চা উঠে আসতে না। কেন উঠে না? সে তদন্তের ফলাফল যাই হোক না কেন উপস্থিত আমি জানতে চাই, এই ইলিশ মাছের অভাব কিভাবে পূরণ করা যায়? আর সেই জন্তে বাংলা সরকার বা বাংলার মৎস্য ব্যবসায়ীরা কি করেছেন? মাঝে শুনেছিলুম পুকুরে নাকি ইলিশের চাষ করে এই অভাবের প্রতিকার করা হবে। কিন্তু শোনা কথা দেখছি গুজবেই পরিণত হোয়ে গেল।

আজকে এই যে মাছের অভাব সম্বন্ধে শুধু যে বাংলা সরকার বা বাংলার মৎস্য ব্যবসায়ীরা সচেতন হোয়ে উঠছে না, তা নয়, বাংলার দেশ-নেতারাও এ সম্বন্ধে উচ্চ বাচ্য করছেন না। যারা আজ বাংলার গঠনমূলক কার্যে চালাতে বদ্ধপরিকর, তারা অজ্ঞ যে কেন এই মাছের অভাব সম্বন্ধে কোন কথা তুলছেন না, তা হয়তো অনেকের মনে না লাগতে পারে কিন্তু আমার কাছে যে বিশ্বাসের বস্তু তাতে কিছু আমার সন্দেহ নেই।

আজ শতকরা বোধ হয় পয়ষট্টি জন বাঙালী যুবকের এবং যুবতীর চোখে চশমা! কারণ? যে কোন ডাক্তারকে বা বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করবেন—তারা উত্তর দেবেন উপযুক্ত ফসফরাস অভাবে এই দৃষ্টিকীর্ণতার উৎপত্তি। এই অধুনা খাঞ্চে দুর্লভ পদার্থটির বাসস্থান হোচ্ছে ছোট টাটকা মাছের মাথায় এবং চোখোঁ। কিন্তু বাঙালী গৃহস্থের সামান্য আয়ে উপযুক্ত পরিমাণে মাছ ছেলে মেয়েদের খাওয়ানো যে কি কঠিন কাজ তা বলে আর কোন ছুঃখকে নতুনভাবে অনুভব করতে চাই না। তাই বলছিলাম আজ যারা দেশের গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তারা বাতে আজ বাংলার ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল, সেই বাঙালী

ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত পরিমাণে মাছ পায় তার বন্দোবস্ত করুন। আমার এই কথা শুধু কাগজে কলমে না থেকে যদি কোন গঠনমূলক কর্মীর মনের ভিতরে থাকতে পায় তাহোলা আমি যে শুধু নিজেকে ধন্ত মনে করবো তাই নয়, আমার আসরের মা-বোনদের তরফ থেকেও তাকে ধন্তবাদ দেবো।

কিন্তু মাছ খেলেই যে আজকালকার বিলাসী পরিবারের খুব কাজে আসবে; তাতো মনে হয় না। সহরে এমন বোনেদের দেখা যায় যে, তারা অনেকে সাধ করে চশমা পড়েন, কিন্তু পরিণাম স্বক্কে কোনই খেয়াল তারা করে না। নিজেদের স্বাস্থ্য স্বক্কে যদি আমরা উদাসীন হই তবে, দোষ কি মাছের? আর মাছ খেলেই যে, সব সময় উপকার পাব তাতো নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায় না, তার কারণ খারা মাছ মাংস খায়না তারা কি আমাদের চেয়ে দুর্বল? না তাদের শরীরের আকৃতি আমাদের চেয়ে লিক-লিকে, সিপ-সিপে। ঝগড়া বিবাদ দেওয়া যাক ছেড়ে, আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে বাঙ্গালীর যখন বাংলার জল-বায়ুর সঙ্গে গোড়া থেকেই মাছটা সয়ে আসছে তখন একে বাদ দেওয়া ঠিক নয়। তবে এর একটা পরিমাণ ঠিক হওয়া দরকার। অবশ্য ডাক্তারী মতে খেতে হলে মাংসে এক দিন ঠিক পেট পুরে খাওয়া যাবে। কিন্তু তারা শুধু বিধানই দিয়ে যাচ্ছেন, গৃহস্থের অবস্থার দিকে তাদের নজর খুব কম—আবার এই মাছকেই কেন্দ্র করে তারাই অনেক স্থলে বেশ রামায়ণ, মহাভারত গুনিয়ে দিচ্ছেন। মাছের ভাবের অজ্ঞ নেই—কখনোও চোরা আবার কখনোও গুরুরো।

স্বক্কাখান্না

(সামাজিক উপদ্রাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লবঙ্গ মুখ, বেকাইয়া বলিল : তবে আর তুমি পুরুষ মাছুষ কি ?

বিরিক্তি বলিল : লবঙ্গ ? পৃথিবীতে পুরুষমাছুষ আর মেয়েমাছুষের তফাত এ পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারলুম না। দৈহিক বলে বলো, মানসিক শক্তিতে বলো,—বুদ্ধ বিজ্ঞায় বলো আর পণ্ডিত বিজ্ঞায় বলো—চুরি ডাকাতিতে বলো, আর ধর্ম কার্যে বলো,—রাজনীতিতে বলো, আর অর্থ-নীতিতে বলো—কোন বিষয়েই নারী যে পুরুষের চেয়ে কম যায়, এতো আমি বুঝতে পারলুম না। ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে দেখছি, জাহাঙ্গীরকে শাসন করতো মুরজাহান। এই সেদিনও মহারানী ভিক্টোরিয়া—ভারতবর্ষের ত্রৈশি কোটি লোককে এবং নিছক দেশের কোটি কোটি লোককে উদার রাজনীতির দ্বারা শাসন করে গেছেন। মহাবীর সেনাপতি অ্যান্টোনিও, ক্রিপেটোর অঙ্গুলি হেলনে দক্ষিণে বা বামে চলতো ফিরতো। আর

তবে আমার মতে সপ্তাহে তিন দিন করে মাছ (অবশ্য টাটকা—বারে একবার হুটক তাতে ক্ষতি নাই) ও বাকী কয়দিন নিরামিষ খাওয়াই বেশ ফলপ্রসূ ও সুখকর। তবে.....। এইবার এইখানেই শেষ করলাম। আগামী বারে দুধের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আশা রহিল।

কতো উদাহরণ দেবো? আমি যে পুরুষমাছুষ হয়ে কেন তোমার সপত্নীকে শাসন কর্তে পাচ্ছি না, বরং সেই সমাজনী-হস্তা বীর নারীই কি ক'রে আমার নাকে দড়ি দিয়ে তার কাজ করিয়ে নিচ্ছে, এর দার্শনিক তত্ত্ব আমার চেয়ে ইতিহাসেই বেশী জানিয়ে দেয়। সত্য চিরকালই সত্য, আমি বুঝতে পারি আর না পারি! লবঙ্গ! কোনও আশা নেই। আমার দ্বারা নারী শাসন পৃথিবীর অনেক অসম্ভব ব্যাপারের মধ্যে আরও একটি!

লবঙ্গ গুনিয়া বিষম হইয়া বলিল : তাহলে কি আমার স্বত্তর বাড়ীতে আমার একটু স্থান হবে না?

হবে না কেন? ভীষ্মের শরণা! ভীষ্মের মত দৈহিক শক্তি নিয়ে, প্রতিজ্ঞায় অটল ইয়ে, তুমিও যদি শত শত বাণের ওপর ছেঁড়া কাঁথা পেতে শুয়ে থাকতে পারো থাকো! তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এই ভীষণ অগ্নি-প্রসিকায় দিন কাটিয়ে তোমার কি উন্নতি হবে, আমি তো বুঝতে পাচ্ছি নে।

তা হ'লে তুমি একরকম জবাবই দিলে। এ ভয়ঙ্করতার জবাব লবঙ্গ! এতে পাপ নেই।

কিন্তু প্রথম যখন তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তখনতো ছোট বউ ছিল না।

তখন ছোট বউ ছিল না, তাঁর ভাস্কর ছিলেন। গুরুনিষ্ঠা করতে নাই, কিন্তু তিনিই—

জলে কুমীর, ডাকায় বাঘ! আমার আর কোনও দিকেই নিস্তার নেই।

নারায়ণে এই তরুণবাহন বেলানুমি! এখানে চেউএর ঝাপটাও যত বেশী, বালির তাতও তত বেশী! ডাকাত থেকে বাঘও আসছে; জল থেকে কুমীরও এসে শরীর তাতাচ্ছে!

লবঙ্গ একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল: তোমাদের দোষ নেই, দোষ আমার কপালের।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

শব্দর বাড়িতে আসা অবধি লবঙ্গর দিনগুলি কাটিতেছিল শ্রাবণের নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণকাতর শ্রান্ত দিবসগুলির মত। এক দিনও সূর্যের মুখ সে দেখিল না, নিরন্তর মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের বিষম বিস্ফুরণে সে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সপ্তাহী গালিবর্ষণ অনবরতই চলিত, দম লইবারও অবকাশ ছিল না। আগে আগে স্বামী নীরবে থাকিতেন, এখন তিনিও মুখ ধরিয়াজেন।

সে যখন বড় জ্বালাতন হইয়া উঠিত, তখন পাড়ার ঘোষেদের বাড়ার বিধবা বড় বউএর কাছে গিয়া ঋণিকটা শ্রান্তি লাভ করিত। এই বউটি ছিল তাহার সমবয়সী। কয়েক হইবার পর লবঙ্গ যখন প্রথম ঘর করিতে আসে, তখন হইতেই ইহার সহিত তাহার সৌখ্য। সাধারণতঃ সম্পদের দিনে যে সম্মী থাকে, বিপদের দিনে বিমুখী হয়। কিন্তু ঘোষেদের এই বিধবা বউটি সংসারের এই সাধারণ নিয়মকে এই উল্টাইয়া দিয়াছে। বহুদিনের পুরাতন প্রণয় ভাগ্যবিপর্যয়ে মুখ ফেরায় নাই।

“আর সহ্য হয় না! তুই আমার এক গাছা দড়ি কিনে দে। স্বামী গলায় বেঁধে কড়ি কাঠে ঝুলি।”

কেদার তো একগাছা দড়ি নিয়ে এসেছিল, সেইটা নিলিনে কেন?

সেটা নিলে গলায় বাঁধা চলতো বটে কিন্তু কড়িকাঠে ঝোলা হ’ত না। দড়িটা এত শক্ত নয়! তা হ’লে আর মরতুম কি করে?

আবার ওর চেয়েও বেশী ক’রে মরতে চাসু না কি? মেয়ে মানুষ কি ওর চেয়ে বেশী মরে?

মেয়ে মানুষ কি করে বলতে পারিনে ভাই! তবে আমার মরণ ওতে হবে না! আমার মরণ হবে এই গোভাগাড়ে! তোর ঠাকুরপোর যে গোয়াল আছে, সেই গোয়ালে জাবনা খেতে খেতে গলায় বিছালি আটকে আমি মরোঁ।

তবু ভাল; স্বামীর ভিটেয় ম’রে স্বর্গে যাবি!

স্বর্গে যাবার কথা এখন তুই রাখ ভাই! এখনইতো যম দড়ি নিয়ে ধরতে আসিনি, কাজেই কোথায় যাবো, সে জন্তে আমার আপাততঃ কোনও ভাবনা নেই। যদিই না যাচ্ছি, তবুদিন কোথায় থাকি বল। এই মাত্র ত সত্যিনের কাছে মিটি মিটি অনেকগুলো বাঁটা খেয়ে এলুম। স্বামী দেবতা,

তার নিন্দা কর্তে নাই,—কিন্তু তিনিওতো ধর্ম-পন্থীকে রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচালেন না। ঝাঁটা খেয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর সাতপাকের গুরু-ঠাকুরের ভিটেয় ফিরবো না। কিন্তু কোথায় যাই? পোড়া পেটটাতো আছে, সেটাতো কথা শোনে না।

লবঙ্গর প্রোতা ভখন কোমরে কাপড় জড়াইয়া উনানের উপর বসান ডালের বোক্তনোতে কাটি দিতেছিল; লবঙ্গর কথা গুলি শুনিতে শুনিতেই তাহার হাতের কাজ চালাইয়া যাইতেছিল। এখন মুখ তুলিয়া বলিল:

যেমন ভাগ্য করে এসেছিল, তেমনি ত ফলভোগ হবে! আরজন্মে বোধ হয় তুই স্বামীকে খেতে দিসুনি,—এজন্মে তাই পিধাতা তোর ওপরে শোধ দিচ্ছে। আহা, কত দুঃখই তুই পেলি বোন! এসব দেখে শুনে মনে হয়, মানুষের পূর্বজন্ম আছে!

পূর্বজন্ম হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, মানুষ চেষ্টা কলে আর জন্মের প্রতিশোধগুলো এজন্মে বিফল ক’রে না দিতে পারে। আমরা চেষ্টা করি না, তাই হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভুগে মরি।

(ক্রমশঃ)

22 CT. রোল্ড গোল্ড গহনা গ্যারান্টি চিরস্থায়ী! গ্যারান্টি চিরস্থায়ী!!



ব্যবহারান্তে বিক্রয়কালীন অর্ধেক মূল্য পাওয়া যায়। প্রিয়জনদের মনোমত আধুনিক ধরনের দকল রকম গহনা পাওয়া যায়। স্থায়ী ও গঠন নৈপুণ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। ২২. পালিশ লোহার দ্বারা চিত্তাকর্ষক। বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড এন্ড ক্যারেট গোল্ড সিন্ডিকেট

৭০নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা (কলেজ স্ট্রীট বার্কটের লম্বুখে)

মুহুরের বাড়ী

(গল্প)

শ্রীমতীর চন্দ্র চক্রবর্তী

পূজার ছুটি। সংবাদপত্র অফিসে কাজ করি ছুটি একরূপ নেই বলেই চলে। গেল দু বছর যেতে পারিনি তাই এবার ইদিনি ছুটির মধ্যেই একবার দেশ থেকে ঘুরে আসতে হবে।

দু বছর পর দেশে যাচ্ছি কাজেই এটা সেটা করে জিনিষ পস্তর নৈহাৎ কম হয়নি। ঘড়ি দেখে বেড়িয়ে পড়লাম একটু আগেই সম্ভব হলে স্পেসাল ট্রেনেই যাব তবু কয়েক ঘণ্টা পূর্বে বাড়ী যাওয়া যাবে। শিয়ালদহ পৌছে টিকিট কিনতে যাব হঠাৎ মনে হ'ল চাবিটা দেয়ালের গায় রেখে এসেছি। কি মুন্সিল, আবার এতটা পথ যেতে হবে। বিরক্ত মনে এদিক ওদিক দেখছি—যদি জানাশুনা কারুর কাছে এগুলি রেখে যাওয়া যায়, এমনি সময় পিছন হ'তে কে যেন ডাকলে, “পরিতোষবাবু যে, ভাল আছেন? কোথায় চলেছেন? দেশে নিশ্চয়।”

আলাপ করার মত ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা মোটেই ছিল না। ভক্ততার খাতিরে “হু” বলিয়া অল্প দিকে তাকালাম। যুবকটা তাহাতে মোটেই বিচলিত না হয়ে আরও কাছে এসে বলে, “আমিও ভাবছিলাম একবার দেশ থেকে ঘুরে আসবো কিন্তু তা আর হল না। কালকের জাহাজেই আমেরিকা চলেছি।” আচ্ছা মুন্সিলে পড়া গেল। কোথায় চাবি হারিয়ে ট্রেন ফেল হ'তে বসেছি আর এ কিনা—ছেলেটির

মুখের দিকে চোখ পড়তেই আর কিছু বলা হ'ল না। সরোজকে প্রায়ই আমাদের অফিসে দেখতাম কিন্তু চেহারা যেন একটু ক্লান্ত হয়েচে। কাল পাড়ের ধুতির উপর লংকথের পাজাবী গায়, পায় একজোড়া কাল পাম্‌শু। গায়ের রং খুবই সুন্দর—চেহারার দিক চাইলেই বেশ স্মার্ট বলে মনে হয়। ব'ললাম, “পূজার সময় বাড়ী না গিয়ে একেবারে ভারতবর্ষ ছেড়ে আমেরিকা চলেছ যে?” ব্যথিত কণ্ঠে ও উত্তর দিলে, “বাড়ী? না বাড়ী যাওয়া হবে না। একবার ভাবছিলুম বহুদূরে চলেছি যখন একবার মাকে প্রণামটা করে আসবো—সংসারে আর ত কোন বন্ধন নেই—কিন্তু তাও হ'ল না দুর্ভাগ্য।” একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েই বলে, “একটা সুযোগ যখন পেলাম, হাত ছাড়া করি কেন? সাহেব কালকেই যাচ্ছে কিনা তাই আর দেরী করার উপায় নেই।”

ছেলেটির ব্যথা কাতর মুখখানি দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হ'ল। বুঝতে পারলাম, এমন একটা কিছু হয়েছে যার জন্ত সে বাড়ী যেতে চায় না, ভারতবর্ষ ছেড়ে ও দূরে চলেছে। ছেলেটা চুপ করে কি যেন ভাবছিলো, একটু পরেই উঠে বলে, “আপনি বসুন আমি আসছি।” ছেলেটা চলে গেল আমি সেইদিকে চেয়ে রইলাম। অতঃপর ভাবেরই একটা বিড়ির জন্তে পকেটে হাত দিয়েছি—শব্দ পেলাম চাবির

—দেখলাম পৈতর সঙ্গেই আছে। আঃ মিছামিছি স্পেসাল ট্রেনটা মিস করলাম। বাহা হোক ছেলেটির জন্ত কিছুক্ষণ বসে রইলাম কিন্তু সে আর ফিরলে না। ট্রেনেরও সময় হয়েছে—তাই তাড়াতাড়ি কুলীর মাথায় লগেজ তুলে দিয়ে চলেছি হঠাৎ দেখলাম একখানা খাম পড়ে আছে ভিতরে কি আছে দেখবার অবসর নেই, দরকারী কিছু হবে মনে করে পকেটে রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেনে উঠলাম।

বাড়ী গিয়ে গোলমালের মধ্যে আর কাউকেই মনে পড়ল না। ট্রেনে আসতেই গা বেদনা হয়ে গেছে, তারপর বাড়ীতে পূজার গোলমালে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। মা বৃদ্ধা, সন্সারের ভার গৃহিনীর উপর, কাজেই এটা সেটা ছেলে রাখা প্রভৃতি তাঁরও দু'য়েকটা করুণাই জ্বাটতে হয়। যৌবনের সেই রক্তীন যুগ দেখা বহুদিন হয় বন্ধ হয়ে গেছে। আগের কথা মনে উঠলেই ভাবি যত সব ছেলে মানুষী।

পূজা হয়ে গেল। ত্রয়োদশীর দিন অর্থাৎ কালকেই আবার কর্ম্মমুখর জনাকীর্ণ নগরীর বুকে ফিরে যেতে হবে। সকাল বেলাটা বিজয়ার সম্ভাষণ জানাতেই কেটে গেল। বৈকালেও দু'একটা জারগার যেতে হবে। ভাবলাম ঐ সময় একটু বেড়িয়ে আসা যাবে। বাড়ী এসে অবধি আর এক মিনিটও কোথার দাঁড়াতে পারিনি। স্মটকেশ খুলে বোতাম স্মট বের করতেই সেই খামখানির উপর চোখ পড়ল। সঙ্গে ক'র নিউস-পেপারে পড়লাম। বেলা তখনও একটু আছে তাই সোজা পথে না গিয়ে মাঠের পথ ধরেই চললাম। একপ খোলা ও নির্জন স্থান বহুদিন পাইনি মনটা সত্যিই তৃপ্তিতে ভরে গেল। মনে পড়ল কবি দ্বিজেন্দ্র নাথের সেই গান “ধন ধান্তে গুণে ভরা—।”

এইবার খামখানি বের করলাম। একটু কৌতূহলী হয়েই চিঠিটা দেখছি :

পদ্মপুকুর, কলিকাতা

১০ই আশ্বিন।

সবিতা

সবগুলি চিঠিই তোমার পেয়েছি। জবাব কোনদিন দেইনি আজও দিতাম না যদি না রাগুর সন্ধে অতগুলি কৌতূহলী প্রশ্ন করতে। আগেই বলছি, নারীর চুংথ শুধু নারীর অন্তর দ্বিগুণই বোঝা যায়। সেই দিক দিয়ে তুমি তাকে দেখ তাহলে বুঝবে তোমরা তাকে ভুল বুঝেছ।

তুমি জান, রাগু আসার বহু পূর্বে থেকেই রতন বাবুদের সঙ্গে আমাদের ভাব। শুধু গ্রামবাসী বলেই নয় পুরুষাত্মক একটা মধুর সন্ধর তাঁদের ও আমাদের দুই সংসারকে একত্রিত করে রেখেছে। অনেক বন্ধু এর উপর দিয়ে গেছে তবু সমানেই চলছিল। সত্যি কথা বলতে কি—ভেলেবেলা থেকেই রতনদাকে বড় ভাইয়ের মত ভালবেসে এসেছি। আজও যে তাকে ভালবাসিনা তা নয়, তবে ছুজনার মাঝে যে প্রাচীর তিনি তুলে দিয়েছেন তা ডিঙিয়ে যাবার মত ইচ্ছা বা স্বাধীনতা আর নেই। কোন দিন হবে কিনা তাও জানি না। কেন যে এই প্রাচীর হ'ল সেই কথাই তোমাকে আজ বলবো।

রেজুনে গিয়ে অবধি মনটা খুবই খারাপ ছিল তাই অধিকাংশ সময় বেঙ্গলী ক্লাবে কাটিয়ে দিচ্তাম। হঠাৎ একদিন সেইখানেই রতনদার সঙ্গে দেখা। বহুদিন পরে বিদেশে রতনদাকে পেয়ে খুবই আনন্দ হ'ল। প্রায় ছুটিতেই তাঁদের ওখানে যেতাম। একসঙ্গে খাওয়া, বেড়ান, খিয়ে-টার, টকী সবই হতো। দেশের বাড়ীতে একরূপ হতো। লকই দাঁড়া করে বলতো

“ভারীতো সম্পর্ক—তা আবার অত মাথা-মাখি কেন?” চুপ করে শুধু শুনতাম।

কিছুদিন পরে পেলাম রতনদার এক চিঠি কলকাতা থেকে লেখা। তাতে জানলাম রতনদা আবার বিয়ে করছেন। যেতে আমাকে বিশেষ করেই রতনদা লিখেছিলেন কিন্তু রতনদার মতন প্রকৃতির লোক এই বয়সে বিশেষতঃ বৌদি যখন সুস্থ ও সবল দেহেই আছেন তখন কেন যে আবার এই সখ বুঝতে পারলাম না। মনটা ভাল লাগলো “না—নাইবা হ'ল বৌদির ছেলে মেয়ে কি হয় তাতে, তাই বলে আর একজনের পানীগীড়ন—এই বয়সে। বাহাহোক এজ্ঞা ইচ্ছে করেই এ বিবাহে যাইনি।

বিয়ের পরে দুই স্ত্রী নিয়ে রতনদা ফিরে এলেন রেজুনে। সত্যি বলছি মনটা একেবারে দমে গেল যখন শুনলাম রতনদার নূতন বৌ-এর বয়স মাত্র বছর চৌদ্দ হবে, চেহারা শুকনো, রং কালো একগল। ঘোমটা দিয়ে নাকি দাঁড়ায়। রতনদার নূতন দেখার যে আগ্রহ ছিল তা একেবারে নিরানন্দে ডুবে গেল। রূপ বা গুণের কোন সমালোচনা করতে চাই না কিন্তু ভাববাম রতনদার হ'ল কি। দেখে শুনে শেষে এই আপ-টু-ডেট নিয়ে এসেছেন। রাগ করোনা মাই, আজ যদি অসাবধানতা বশতঃ দু'একটা কথা বেরিয়ে পড়ে সেটা সয়ে নিও।

মাস দুয়েক পরে একদিন সত্যিই গিয়ে হাজির হলুম রতনদার নূতন বৌ দেখতে। সামনের ঘরটায়ই ছিল, হঠাৎ চুকেই সে মুখখানা চোখে পড়ল, সজ্জিত হ'য়ে সেইদিকে চেয়ে রইলাম। বুকের উপর সজোরে যেন কে আঘাত করলে। অজ্ঞাতেই মুখ থেকে বেরুল, “রাগু তুমি।” চির পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে ও চমকে

উঠলো, বলে “সরোজদা” তখনি বেরিয়ে পড়লাম। অর্ধশতাব্দীর রাগু পেছন হয়ে ডেকে বলে, “আমার সঙ্গে দেখা না করে রেজুনে ছেড়ে যেওনা সরোজদা।” বোধহয় আমার মনের অবস্থা ও বুঝে নিয়েছিল। রাগু! সেই রাগু! সর্কাপেক্ষা ভালবেসেও থাকে ভুলবো মনে করে কলকাতা ছেড়ে সুদূর রেজুনে এসে আশ্রয় নিয়েছি—জানিনা কোন নিশ্চয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ভগবান তাকেই দিনরাত চোখের সামনে দেখাবেন বলে পাঠিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শৈশবেই মা মারা যাওয়ায় রাগুর বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। তারপর যা হয় তাই। সংসারের সমস্ত কাজ একলা করেও কারুর মন পেলে না, পেলে নির্যাতন। গরীবের ঘরের কুৎসীতা মেয়ে—হবারই কথা। পাশের বাড়ীটায় থাকতাম—আপন মনে বসে এম্বাজ বাজাতাম। সবাই বলতো এম্বাজে আমার চমৎকার হাত। ও দাঁড়িয়ে আমার বাজনা শুনতো। একদিন আলাপ হ'লো। ওর চুংথ আমার ব্যথা লাগতো। সহানুভূতি অজ্ঞাতেই একদিন ভালবাসায় পরিণত হ'ল। ও বলে, “না-তা হতে পারে না। আমার রূপ নাই গুণও নাই, তোমার রূপ গুণ দুইই আছে—আমি তোমার অযোগ্য। আমার চুংথ দেখে আজ দয়া করে আশ্রয় দিতে চাহিলেও পরে আর তোমার ভাল লাগবে না।” ওর বাবার খুবই ইচ্ছা ছিল, ও কিছুতেই রাজী হল না। একদিন ও স্পষ্টই আমাকে বলে, “তুমি আর এখানে এসো না। আমি আর হয়ত নিজেকে বেঁধে রাখতে পারবো না। আমার জীবন তুমিই হয়ত অশান্তিময় করে তুলবে।” আমি কিছু বলবার আগেই ও বলে, “আমরা গরীব আমি কালো—না না তা কিছুতেই হয় না।”

বড় ব্যথা পেলাম ওর কথায়। সেই দিনই রেজুনের টিকিট কেটে জাহাজে উঠলাম। যাকে ভালবাসি তাকে কোন অবস্থায়ই দুঃখ দেওয়া যায় না।

রেজুন ছেড়ে না গেলেও তখন রতনদার ওখানে যাওয়া কমিয়ে দিলাম। ভাবলাম ভালই হ'ল, এবার ছু'জনার চেষ্টায় যদি রতনদাকে পথে আনতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে গিয়ে যে খবর নিতাম তাহা বড়ই মর্মান্তিক। দুর্দৈব মাতাল ও লম্পট বলে রতনদাকে সবাই ঘৃণা করতো, রাগ তা সহিতে পারতো না। কত বোঝাত, কত অস্বরোধ করতো কিন্তু কোন ফল হত না। মাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে যেতে লাগলো বাড়ী ফিরতে কখন রাত ছোটো কখন তিনটা হয়ে যেত। বৌদির সঙ্গে গেছে, দিব্যি ঘুমিয়ে পড়তো, বেচারী রাগ সমস্ত রাত জেগে বসে থাকতো। যদিবা কোন দিন ঘুমিয়ে পড়তো সেদিন আর রক্ষা থাকতো না। এমনি করে একলা শুয়ে রাতের পর রাত কেঁদে কাটাত।

রাগকে যে ভাবে পেতে চেয়েছিলেন রতনদা, রাগুর নারীত্ব সে ভাবে ধরা দিতে চাইল না। মাতালকে ভালবাসা যায়, সপত্নীকেও সহ করা চলে কিন্তু গণিকার পায় উৎসর্গীকৃত যে দেহ তাকে নিয়ে অভিনয় করা অসাধ্য। এইবার আরম্ভ হ'ল নির্ধ্যাতন। রাগুর চরিত্র সন্দেহ ইঙ্গিত করতোও রতনদা বাকী রাখেন নি। সহ করতে না পেরে রাগু এক একদিন অজান হ'য়ে যেত। একদিন স্পষ্টই রতনদাকে বললাম, “রতনদা এখনও যদি আপনি নিজেকে না সামলান পরিণামে আপনাকে অসুস্থতা প ভোগ করতে হবে।” রতনদা চুপ করে রইলেন।

সেদিনও ছুটি উপলক্ষে রতনদার ওখানে গেছি, শুয়ে শুয়ে রতনদার কথাই ভাবছি এমনি সময় রাগু এসে পাশে বসল। আমি বললাম, “কিছু বলবে?” রাগু একবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইল পরে আশ্তে আশ্তে বলল, “মুহুর্তের ভুল সমস্ত জীবনের অসুস্থতা দিয়ে ঢাকা যায় না—সে কথা জানি, তাই আজ কমা চেয়ে তোমার আর অপমান করতে চাই না। শুধু এইটুকু তোমাকে জানাতে চাই তোমাকে ব্যথা দিয়ে অবধি নিজে এতটুকু শাস্তি পাইনি। যদিও একথা তোমায় জানিয়ে আজ কোন লাভ নেই তবুও আমাকে আজ বলতে হবে। অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়ে এই অমাসুখের পায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই পারছি না। তাই আজিও ওর সকল দাবী পূরণ কর্তে পারিনি।” আমি চমকে উঠলাম, ও স্থির ভাবেই বলে, “তোমার কাছে আমার অপরাধের অন্ত নাই কিন্তু কত বড় ব্যথা বুকে চেপে রেখে যে অপরাধ করেছি তাহা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। তবু আমি জানি তুমি-ছাড়া আপনার বলতে আমার কেউ নেউ সরেজদ্দা।” এইবার সত্যিই ওর চোখে জল এল। একটু ইতস্তত করে বলে, “আজ কি পারনা আমাকে একটু আশ্রয় দিতে?” আবার আমার মুখের দিকে চাইল—কি বুঝল জানি না, পরক্ষণেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, “নাঃ, আমি অত স্বার্থপর নই—তোমার সুন্দর জীবনটা এভাবে নষ্ট করতে পারি না”—বলেই ও উঠে দাঁড়াল স্বরূপ হয়েই এতক্ষণ ওর কথা শুন্ছিলাম হঠাৎ কি খেয়াল হল, তার হাতছোটো চেপে ধরে বললাম, “রাগু, যাবে তুমি আমার কাছে?” আমার দিক চেয়ে শান্ত ভাবেই ও বলে, “বিশ্বাস হচ্ছে না, সেদিন নিতে চেয়েছিলে আমি বাইনি

কিন্তু আজ তুমি নিতে না চাইলেও আমি নিজে তোমার কাছে যাব।”

সন্জারে রাগুর হাতছোটো চেপে ধরতেই ও এলিয়ে পড়ল আমার গায়। সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল—সব তুলে গেলার্ম। মুহুর্ত মধ্যে অসহায় শিশুর মত বুকের উপর তুলে নিয়ে তার সুন্দর মুখখানি অজস্র চুষনে আরও সুন্দর করে দিলাম। অসহ্য সুখে রাগু আমার বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে রইল। পরমুহুর্তেই একটা অব্যক্ত লজ্জায় শিউড়ে উঠে তাকে নাবিরে রেখে মাতালের মত টলতে টলতে রাস্তার বেড়িয়ে পড়লাম।

তিন মাস অপরের কথা। কি একটা কাজে ওধারে গিয়েছিলাম। রাত ছোটোর সময় রতনদা টলতে টলতে ঘরে ঢুকলেন। আমার চোখে ঘুম আসছিল না—অনেক কিছুই ভাবছিলাম। রতনদা এসেই অকণ্ঠে ভাবায় গালাগালি দিতে শুরু করেন। বৌদিকে একটা লাঠি নিয়ে ছুটে যেতেই টাল সামলাতে পারলেন না—রাগু গিয়ে ধরল। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বললাম, “কি হচ্ছে এসব রতনদা? সরাই কি মনে করছে বলুন তো?”

আমার কথায় যেন আশুপেঁয় পড়ল। রতনদা এ সুযোগ ছাড়লেন না। অসত্যের মত যা মুখে আসে বলতে লাগলেন। বললেন, “আমি কি বুঝিনে কিছু। তুমিই এই ছুড়িটার মাথা খেয়েছ, নইলে ওর সাধ্য কি আমার কথা শুধন না। আমার যা খুসি আমি করবো, কি অধিকার আছে তোমার বলতে।”

রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। বলতে ইচ্ছা হল, “কি অধিকার আছে একবার রাগুকে জিজ্ঞাসা করুন।” ভাবলাম আজকেই বুঝিয়ে দেই—প্রেমের দেউলে যেখানে একে অস্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ

করে সেখানে অধিকার আপনি জন্মে” বলেই চাইলাম রাগুর দিকে—সেখানেও বড় বইছিল কিন্তু চমকে উঠলাম তার সেই চাহনী দেখে—হয়তঃ এ কলঙ্ক সে সহিতে পারবে না। তাহলে ঈতিহাস কি আমার কোন অধিকার দেই? আইন বিরুদ্ধ—সমাজ বিরুদ্ধ—তার ঠিক করে দিয়েছে রাগু আমার পকেট নয় রাগু রতনদার?

তখনই সেখান—কত চলে আসি। রাগুকে শুধু বললাম, “এই আমাদের শেষ দেখা—পারতো আমাকে ভুলে যেও”। রাগুর চোখ দিয়ে তখন টপ টপ করে জল পড়ছিল।

বলতে পার সবিতা, ‘কি মূল্য আছে এই মুখ না ফোটা গভীর প্রেমের—সে প্রেম সমস্ত জগতের সামনে দাঁড়িয়ে সুভক্তার মত নিজের অধিকার দাবী করতে পারে না শুধু কৈদে কৈদে সমস্ত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নেয়।

মনে পড়ল রাগুর গানের ছটা লাইন :

“দুঃখ দিতে দুঃখ পেতেই

তোমার কাছে আমার আসা,

চোখের জলে নিবিড় হোক এ

অভিসপ্ত ভালবাসা”।

বেশ তাই হবে।

পরদিনই কলুকাতা ফিরে আসি।

তারপর আর কোন খবরই তাদের রাখি না। একদিন একদিন করে প্রায় বছর গড়াতে চলো, হৃদয়ের সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করে তাকে ভুলতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রতি বারেই তার মর্মে নিজের সমস্ত সন্ধাকে হারিয়ে ফেলে তাকে নিয়েই বসে খেলা করি। এখন বুঝতে পেরেছি তাকে ভুলে থাকা অসম্ভব। ছুজনে বেঁচে থাকবো—কাছে থাকবো—অথচ ছুজনের মধ্যে থাকবে এক কলঙ্ক প্রাচীর। এবে কত বড়

গান

আধুনিক

নীচের মুখোপাখ্যার

মোর—সন্ধ্যারাতের ফুল-বাসরে তোমার নিমন্ত্রণ।

বধু তোমার নিমন্ত্রণ।

তোমার তরেই গঁথেছি আজ ফুলের আভরণ।

যা’ কিছু মোর ছিল আশা—

তোমার শুধু ভালবাসা—

তোমার সাথে মধুর রাতে প্রেমের আলাপন।

যে বারতা হয়নি বলা—আছে গো প্রাণ জুড়ে

যে অনলে চিরজীবন—হৃদয় আছে পুড়ে

আমার হৃদয় গেল পুড়ে।

আজিকে সব ধরে ধরে

প্রেমের পুজায় দিব ধরে—ধরে ধরে

চরণ ধুলো ধুইয়ে দেবে—সজল দু’নয়ন

আমার সজল দু’নয়ন।

ব্যথা কেউ তা বুঝবে না—তাই আজ তোমাদের কাছ হতে বহুদূরে চলে যেতে চাই।

ইহকালে আর রাগুকে পাব না বলে আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে আমি নীরবে পড়ে আছি। অতীতকে আমি ভুলিনি—ভুলতে পারি না। অতীত যবনিকার উপর ভাব ভুলবার প্রত্যেক আঁচরটা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, তবে সে বড় বিবাদের চিত্র। ভালবাসার মন্দিরে জীবনের ডালি নিয়ে লোক চকুর অন্তরালে নিতান্ত সরল পূজারীর বেশে একদিন গিয়ে ছিলাম কিন্তু মন্দিরের দেবী আমার আমাকে গুলিত কুণ্ডল রোগীর মত দূর করে দিল। তবু সে পূজারী মন্দির পাশেই পড়ে আছে। তার সামর্থ্য নেই যে আবার সেই পূজার ডালি সাজিয়ে দুয়ারোহ লোপান আরোহন

করে সে মন্দিরে পূজার জন্ত উপস্থিত হয়। বার বার আঘাতে মেরুদণ্ড আমার ভেঙ্গে গেছে। ভালবাসার গভীরতা রূপের মাপ-কাঠিতে নির্ধারণ করতে গিয়ে সে তার অতল তলে চিরদিনের মত ডুবে গেল। ভালবাসবার কি স্নেহ করবার লোকের অভাব ছিল—তবু কেন তাকে আকড়ে ধরে-ছিলাম। আজ চিরদিন মস্তক অবনত করে চলবো অথচ সঙ্গীহীন, নিরাশ্রয়।

আশ্চর্য্য তোমাদের এই নারী জাতটা, সবিতা, কেউ কোনদিন চিন্তে পারেনি আর কেউ শায়ে বলে মনেও হয় না।

রাগু আশাকে ভুলে গেছে—ভালই। তাকে মুখী দেখে যাওয়াই এ জীবনের চরম গুণের। শুধু তার ভালর জন্তই আজ তার কাছ হতে দূরে যেতে চাই এতে কলঙ্ক ছুঁখিত বা আনন্দিত হবার কিছু নেই।



অসুস্থ
শরীর



দুগ্ধ ও শবল

করিতে



সিৰোলিন

'রাচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সর্দি, কাশি এবং ঘর্ম্মার
প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ।



আজও তাকে তেমনি ভালবাসি যদিও বেশ বুঝতে পারছি—এই ভালবাসাই দিন দিন আমাকে মরণের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ দেশে থাকলে হয়ত নিজের অলঙ্কে কোন অদৃশ্য মহাশক্তি তার কাছে টেনে নিয়ে আবার সব 'ওলট' পালট করে দেবে তাই আজ মৃত্যুর যাত্রী।

সবিতা, প্রতাপপুর্বে যদি যাও, মাকে বলো। ইচ্ছা শেষেও তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে ঘাবার সৌভাগ্য হল না। অনেক দিন ধরে তাঁর মাতৃ-হৃদয়ে যে বাসনা পোষণ করে-ছিলেন, এ জীবনে তা আর পূর্ণ হবার উপায় নেই। আমি তাঁর নিতান্ত অযোগ্য সন্তান মনে করে যেন ক্ষমা করেন।

এ চিঠি যখন তোমার হাতে গিয়ে পড়ছে, আমি তখন তোমাদের কাছ হতে বহু-যোজন দূরে সাগরের বুকে ভেসে বেড়াব। তোমরা যখন লক্ষ্যার সমুদ্র চণ্ডী মণ্ডপের বারান্দায় বসে হাত ঘোড় করে মায়ের আরতি দেখবে, আমি তখন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখবো ঐ সূর্য্য অস্ত গেল। ৬ বিজয়ার দিন সাহেবের সঙ্গেই হাওসেক করবো।

ফিরে আর আসবো কিনা জানি না। মায়ের কাছে এই প্রার্থনাই করে। এ ছন্ন-ছাড়া জীবনে এই যেন শেষ যাত্রা হয়।

ইতি—
সরোজদা।

কখন যে চিঠি খানা পড়া হয়ে গেছে তা মনে নেই। চোখে তখনও ঝাপসা দেখছি। ক্রমাগত স্নিগ্ধ মুখে যখন দাঁড়িয়েছি অস্বাভাবিক চাঁদ তখন মাথার উপর।

—শেষ—

উল্কা

(নাটক)

শ্রীভারকনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ণ।

অনেক পথিক গাহিয়া চলিয়া গেল

ওগো দরদী—

দরদ দিয়ে,

চলার পথে,

ছায়ার মত,

পিছনে যেয়ো।

ব্যথার মালা

গলে যে দোলো;

নেবে কে তুলে,

এস গো তুমি—

পরশ দিয়ে।

কাজল চোখে

সজল ধারা;

নাই কিনারা,

ওগো মরমী,

মুছায়ে নিয়ে।

বুকের মাঝে

বিশীর তানে,

এস গো গান্ধী;

পরশ প্রিয়া

কাছে দাঁড়ায়ে।

দৃশ্য

জগদাশের ড্রয়িং রুম।

[উল্কা বসিয়া জামা সেলাই করিতেছিল]

জগদীশের প্রবেশ]

জগ—এই যে মা—তোমার কি হয়েছে—
বলত ? মানে ক'দিন ধরেই দেখছি—
যেন তোমার মনটা ভাল নেই। তাছাড়া

নলিনীও যে কেন তার আলা যাওয়া বন্ধ করলে, তাও জানতে পারলাম না।

উল্কা—না জানাই ভাল বাবা। তাঁর

এখানে শুভাগমন যত কম হয় ততই মঙ্গল।

জগ—মঙ্গল! আশ্রিত কথাটা—ঠিক বুঝে উঠেতে পারলাম না। কি হয়েছে বলত মা ?

উল্কা—আমাদের দুর্ভাগ্য বাবা—যে শুভ আছে টাকা খণ করতে হয়েছে, আর সেইটার advantage নিয়েই না—যাক্ বাবা, সে সমস্ত কথা আপনার না শোনাই ভাল।

জগ—তাইত মা, আমিও কিছুই জানতে পারলাম না। তবে এটা বলব মা, নলিনী আমাদের—

উল্কা—উপকার করেছে, এইত বলছেন বাবা। কে অস্বীকার করেছে। এব তার জন্তে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছি, আর সেইটাই হচ্ছে তার এত বেড়ে ওঠার কারণ আজ বুঝছি বাবা, দোষ তার নয়—দোষ আমার।

জগ তাইত মা, এওত একটা ভাবনা কথা হয়ে দাঁড়াল। অথচ—নলিনী—মানে—তাইত—আমিত ভাবি মুক্ছিলেই পড়লাম

উল্কা—আপনার ভয় নেই বাবা, দেন যতদিন না শোধ হচ্ছে সব সঙ্ক করোঁ যাব। তবে যেটা অসুস্থ সেটা কোঁ মাসখানেকই সঙ্ক করতে পারে না, আমিও পার না। এতে ভবিষ্যতে আমাদের ভাগে যা থাকুক হবে।

জগ—তাইত মা, বড়ই ব্যস্ত হ'বে পড়লাম। কি যে হল কিছুই জানতে পারলাম না। [প্রস্থান]

উদ্ধা—দেনা যে মানুষকে এত হীন করে দেয় আজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। যাক like করিন', বা করতে পারি না তাকেও আজ মেনে চলতে হয়। [রমেন্দ্রের প্রবেশ] একি! আসুন—আসুন। সত্যি বলছি আপনি যে, আসবেন, আশাই করিনি। বসুন—

রমেন্দ্র—তা বসছি—তবে আমার আসাটা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক তা জেনেও আসতে বাধ্য হলুম।

উদ্ধা—কেন বলুন তা?

রমেন্দ্র—সেদিন যাবীর সময়, হয়ত একখানা খাতা এইখানেই ফেলে গেছলাম। আপনি পেয়েছেন?

উদ্ধা—হয়ত পেয়েছি, কিন্তু ফিরিয়েই যে দিতে হবে, এমনত কোন কথা নেই।

রমেন্দ্র—সেটা আপনার ইচ্ছা—তবে সেখানা রেখে আপনার কোনই লাভ হবে না।

উদ্ধা—লোকসানও ত হবে না।

রমেন্দ্র—ও—তাহলে দেবেন না?

উদ্ধা—যদি বলি না—

রমেন্দ্র—না বলেন—চাই না।

উদ্ধা—আপনার রাগ হচ্ছে—না?

রমেন্দ্র—রাগ—নাঃ। আচ্ছা তাহলে উঠি—নমস্কার।

উদ্ধা—কিন্তু যাওয়া ত আপনার হ'তে পারে না।

রমেন্দ্র—তার মানে?

উদ্ধা—আমিত আপনাকে যেতে বলিনি।

রমেন্দ্র—যেতে বলেননি বলেই থাকতে হবে?

উদ্ধা—সেটা অবশ্য আপনার ইচ্ছা। কিন্তু খাতাখানা নেবেন না?

রমেন্দ্র—আপনিত ফিরিয়ে দিতে চান না।

উদ্ধা—বারে—আমি ফিরিয়ে দিতে চাই না—না আপনি ফিরিয়ে নিতে চান না!

রমেন্দ্র—আমিত চেয়েছিলাম—

উদ্ধা—চাইলেই কি সব জিনিস পাওয়া যায়? বলুন না?

রমেন্দ্র—দেখুন আপনি যে কি বলতে চান ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

উদ্ধা—পারছি; না? আচ্ছা যদি কখনও সুবিধা হয় বুঝিয়ে দোবো। একটু বসুন আপনার খাতাখানা নিয়ে আসি। না নিয়ে বোধহয় যাবেন না—না?

[রমেন্দ্র একবার চাহিল মাত্র কিছু বলিল না]

[উদ্ধার প্রস্থান, খাতা লইয়া পুনঃ প্রবেশ]

উদ্ধা—এই নিন আপনার খাতা এটা বোধহয় শীঘ্রই publish করবেন?

রমেন্দ্র—ইচ্ছা আছে।

উদ্ধা—সত্যি বলছি আমার যতটুকু বিত্তে অবশ্য অতি সামান্য তাতেই বইখানা পড়ে মনে হয় অনেকদিন এমন সুন্দর লেখা পড়িনি।

রমেন্দ্র—লেখা সুন্দর কিনা জানি না তবে যে কোন একটা বিষয় নিয়ে লেখা

আমার খেয়াল। আর বিজ্ঞার কথা যদি বলেন বিজ্ঞা আর কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি।

উদ্ধা—এটা আপনার অতি বিনয় মিঃ গান্ধী। আপনি যে কত বড় বিদ্বান তার প্রমাণ আপনার নামের সঙ্গে জড়ান বিলিতি খেতাবটা।

রমেন্দ্র—শুধু খেতাব নিয়েই বিজ্ঞার ওজন হয় না মিস্ রায়। যাকগে সে কথা! এখন চলি, আপনার অনেকখানি দেৱী করিয়ে দিলাম মনে যেন কিছু করবেন না।

উদ্ধা—কিন্তু যদি মনে কিছু করি আপনি কি তার কোন প্রতীকার করবেন?

রমেন্দ্র—আমি আর : কি প্রতীকার করতে পারি বলুন?

উদ্ধা—পারেন না? আচ্ছা না থাক—

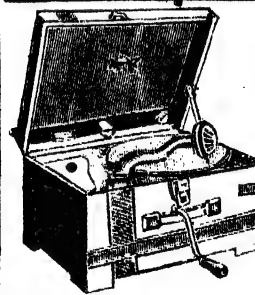
রমেন্দ্র—তবে থাক! চললুম মিঃ রায়, নমস্কার—

উদ্ধা—নমস্কার—

[রমেন্দ্র চলিয়া গেল উদ্ধা কতক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল পরে বলিতে যাইতেছিল—]

[নলিনী প্রবেশ করিল]

নলিনী—এতক্ষণ গোপনীয় কথা হচ্ছিল



মেলোডিনা গ্রামোফোন.

স্বর, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব
অতুলনীয়.

গ্রামোফোন ক্রয় করিবার পূর্বে মোটর ও টার্ক টেবিলের তলস "মেলোডিনা" খোদাই করা নাম ও গ্রামোফোনে "মেলোডিনা" মার্ক দেখিয়া লইবেন।

ভালিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

"হিজ মাস্টারস ভয়েস" গ্রামোফোন ওরেকর্ড

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮-২নং বঙ্গভল্লা স্ট্রিট, কলিকাতা।



তাই বাধা দিতে আসিনি, পাশের ঘরে অপেক্ষা করছিলাম। তা উপকারী বস্তুটা চলে গেলেন, না আবার এখন আসবেন বলে গেলেন ?

উদ্ধা—দরকার হ'লে আসবেন ঠিকি।

“নলিনী—ও—তা খাতা” নেবার হল করে ত দেখা করতে এলেন আরও কিছু ভুল করে ফেলে যানি ত ?

উদ্ধা—ফেলে গিয়ে থাকেন মনে পড়লে আবার আসবেন।

নলিনী—বটে! ভক্ততার খাতিরে আবার আসবার জন্যে অনুরোধ করিনি ?

উদ্ধা—করেছি—

নলিনী—তোমার ভালুর জন্তই বলে দিচ্ছি উদ্ধা এ v&gabondটার সঙ্গে মেলা মেলা কোরো না। আর এতে তোমার বাবাও বিরক্ত হ'ন।

উদ্ধা—বাবা বিরক্ত হলে, আমাকে নিজেই বলবেন। তাঁর অর্হি হ'য়ে নাইনা তুমি এত পরিশ্রম করলে।

নলিনী—আমার কর্তব্য তোমার যাতে ভাল হয় সেই সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা আর তোমার বাবার কাছেও আমি সেই রকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

উদ্ধা—এ রকম ভীষের প্রতিজ্ঞা ত ভাল নয়।

নলিনী—তুমি বোধহয় আমাকে ঠাট্টা করছ ?

উদ্ধা—এতটুকু বুদ্ধি থাকলে, বুঝতে কষ্ট হতো না।

নলিনী—বটে আমি নির্বোধ এই না—

উদ্ধা—আমার মুখ থেকে নাইবা শুনলে।

নলিনী—আচ্ছা অষ্টমিও দেখে নেবো এত দর্শ কোথায় থাকে। তোমার কত আত্মীয় উপকারী আছে তাও দেখে নেবো।

[প্রস্থান]

[উদ্ধা নীরবে বসিয়া রহিল]

প্রথম দৃশ্য

(ক্রমশঃ)

প্রতিগার অপমৃত্যু

তিনির্মল কুমার ঘর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পর্যায়

মীরা সেনের বাপ যামিনীমোহন ছিলেন সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে একজন নাম করা লোক। বুদ্ধি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ আর তারই জোরে প্রমোশন পেয়ে স্থিতিলাভ করলেন এমন এক আসনে যেখানকার দায়িত্ব ও সম্মান তাঁকে পূর্বের অবস্থা ভুলিয়ে দিলে। সরকারের নির্দেশে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হতো সারা দেশময়, আর তারই সুযোগে বিস্তর পয়সাও ঘুরে ঘুরে তাঁর পকেটে এসে হাজির হতো। এই বিভাগেরই এক কাজের ভার নিয়ে যখন তিনি একবার এগিয়ে চলেছেন পশ্চিমের দেশে দেশে, তখন বাড়ী থেকে সংবাদ পেলেন তাঁর গৃহে আর একজন নতুন অতিথি এসেছে। তিন পুত্রের পর কন্যার লাভ করে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কম নয়। শারীরিক অসুস্থতার নজির দেখিয়ে অদূর পাঞ্জাব থেকে তিনি ফিরে এলেন বাংলা দেশে, তাঁর নিজের বাড়ীতে। বন্ধুদের ডেকে খাইয়ে দিলেন এক প্রীতিভোজে, কন্যার জন্য উপলক্ষ্য করে। মনে মনে কত কল্পনাই তাঁর জাগল, মেয়েকে গড়ে তোলবার আদর্শ নিয়ে।

মেয়ে যখন মাত্র এক বৎসর বয়সের সীমা ছাড়াল তখন থেকেই তিনি তাকে কিনে দিতে লাগলেন নানা ছবির কই, যেগুলো ও প্রতি সপ্তাহে গড়ে দুখানা

করে ছিঁড়তে আরম্ভ করলো। কার্য-ব্যপদেশে বিদেশে গিয়েও তিনি ভুললেন না মেয়ের কথা; সেখান থেকেও তাই আসতে লাগলো নিয়মিত ভাবে বইএর পার্শেল। নিজের চোট লাইব্রেরীটাতে বাড়িয়ে নিলেন আরো একটা আলমারী আর তার ভিতর বোঝাই করতে লাগলেন দেশ বিদেশের ছোটদের বই এখন থেকেই। ওর ভাইগুলো ওর প্রতি অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখে অবাক হয়ে পড়লো। সকলের চোট হলেও বাড়ীর সকলের ওপরেই ও তাই চালাতে লাগলো আপন খেয়াল খুসীর কর্তৃত্ব।

ওর বয়েস যখন ছয় কি সাত, তখন ওর বাবা একবার ফিরলেন বিদেশ থেকে শরীর ধারাপ করে। ডাক্তার, বন্ধির আড়ম্বর একটু বেশীই চলতে লাগলেও, গোড়া আলুগা গাছের মত ওর শরীর ক্রমশঃ নীচু-দিকেই নামতে লাগলো। সরকারের কাছে ছুটির মেয়াদ বাড়াবার দরখাস্ত করে উনি রওনা হলেন আবার পশ্চিমের এক স্বাস্থ্য-কর জায়গায়—স্বাস্থ্যেরতির আশা বুকে ধরে। সেখানে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে অস্থায়ীভাবে পাতলেন নিজের সংসার। কিন্তু স্বাস্থ্য তার ফিরলো না, বরং ধারাপই হয়ে চললো ক্রমশঃ। বিদেশের বাসা উঠিয়ে কিছুদিন বাদে, তাই তিনি ফিরে এলেন আবার নিজের বাড়ী, বাংলার বুকে। সেখানে কিছুদিন বাদেই তিনি দেহত্যাগ করলেন, সংসারের সকল ভার বড় ছেলেটার

স্বপ্নে চাপিয়ে। মীরার বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর। সেই থেকে ৬ মায়ের কাছেই দাদার তত্ত্বাবধানেই মাহুব হতে লাগলো।

এমনিভাবে কেটে গেল কয়েকবৎসর, অক্লিষ্টকর যার ইতিহাস। ম্যাট্রিক পাশ করে ও ঢুকলো কলেজে। ওর বাবার ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্তে ওর বড়দাদা চেষ্টার ক্রটি করলেন না। ওকালতীতে পশার জমিয়ে ওর দাদা বাড়িয়ে চললেন ওর লাইব্রেরীর আয়তন।

বি, এ, পাশ করবার পর ওর দাদা ওকে আরো এগুতে বললেন; ও কিন্তু বেকে বসলো। এই বলে—বেশী লেখাপড়া আর কোন কাজেই বা লাগবে দাদা। তুমি ভেব না; একটা জীবন আমি এদিয়েই চালিয়ে নিতে পারবো।

ওর দাদা আপত্তি জানানলেন কিন্তু কাজের হলো না; ইউনিভার্সিটীকে সেলাম করে ও নিলে লাইব্রেরীর আশ্রয়।

এর মধ্যে ওদের সংসারের ভিতর ঘটে গেল আর একটা বিপর্যয়। ওর ছোটদা গেলেন মারা, আর মেজদা চাকরী নিয়ে কলকাতা ছাড়লেন।

সংসারের মধ্যে মাত্র তিনজন। ও, ওর মা আর বড়দা। সংসারের সকল মেহ এসে আশ্রয় করলো ওরই ওপর।

ওর বড়দা বিয়ে না করে ভালবাসলেন বোনটিকে; যাকে তিনি ভরিয়ে তুলতে চাইলেন সব দিক দিয়েই নিজের সম্বানের মত।

একদিন ওকে কাছে ডেকে বললেন— মাহুবেদ জীবন মরণের কথা বলা যায় না মীরা। তোমার ছোটদার মত আমিও হয়তো কোনদিন সাদা দিয়ে বসবো। পরপারের ডাকে। বড় হয়েছি তুমি,



স্বা-মার্গ
—তবে—

লিলি
ব্যাঙ্ক

ইওয়া চাই

একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্যও পানীয়

লিলি বিস্কুট কোম্পানী

কলিকাতা • ৪ • বোম্বাই

লেখা পড়াও যা শিখেছিল তাও খুব সাধারণ নয় তা জানি, কিন্তু তবু তুই মেয়েমানুষ। বাস্তব জগতের সাথে তাল রেখে চলতে পারি পদে পদে বাধা। তাই আমার ইচ্ছা পথে চলবার পাথের যাতে তোর অভাব না হয় তার ব্যবস্থা করে যাবো।

—তুমি কি বলতে চাইছো দাদা?

—আমি এই বলতে চাইছি না যে আমি তোকে সংসারী করিয়ে দিতে চাই। নিজেকে বোঝবার এবং বুঝে পা বাড়ানোর মত বয়স ও বুদ্ধি তোর ছোটোই হয়েছে। তোর স্বাধীন মনে শিকল দিতে গিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা কোন কালেই করবো না। নিজের মনমত পথে পা বাড়িয়েও যে তুই নিজের সম্মানকে বজায় রাখতে পারবি সে বিশ্বাস আমার আছে।

মীরা উৎসুক নেত্রে ওর দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি তোকে এই বলতে চাইছিলাম যে—বাবা দিয়ে গেছেন তোর সমস্ত ভার আমার ওপর। কর্তব্য কর্ত্ত্ব ভুল থেকে যায়—তাই সদাই জাগে ভয়। বাবা মরে যাবার সময় বিশেষ কিছু দিয়ে যেতে পারেন নি আমাদের, এক শিক্ষা ছাড়া। ভিতরে ভিতরে তিনি চালিয়ে এসেছেন অনেক দুঃসংসার, আর কেউ সে কথা না জানলেও আমি সে খোঁজ জানি; আর সেই জন্ত তাঁকে খাটতে হয়েছে বিস্তর যার ফলে দেহ তাঁর টিকলো না। তবু রাস্তায় তিনি বসিয়ে যান নি আমাদের। যা কিছু তিনি রেখে গেছেন তাতে একটা সংসার খুব চলে যেতে পারে। আমার কথা ভাববার আর প্রয়োজন নেই। আমি যা রোজগার করি তাতে মাকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যেতে পারবো। তোর মেজদার কথা তো আলাদাই—সাহেব দাখল সে—কি করছে না করছে

সন্ধান দেবার প্রয়োজন মনে করে না। বাবার ফেলে যাওয়া বিত্ত, যা ছিল এতদিন আছে আমার নামে ব্যাঙ্কে, সেটা বদলে তাই তোর নামে করে দিতে চাই—এই হচ্ছে আমার বলবার কথা। মাহুকের মন পেতুলামের মত সরসদাই খাচ্ছে দোল; কোন স্থিরতাই তার নেই তাতো জানিস মীরা!

মীরার মুখ দিয়ে আনিকক্ষণ কোন কথাই বেরয় না। তাম্বপর রুদ্ধ গলায় বলে—তার মানে তুমি চাও আমাকে পর করে দিতে!

ভুল বুঝিস না মীরা! আমি যে ঠিক তা চাই না তা তুই জানিস। আমি চাই তোকে আরো আপন করে নিতে।

এই বুঝি তোমার আপন করে নেওয়া? ও কুপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ওর দাদা ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন—কাদিস নে মীরা, কাদবার মত এ থেকে কি পেলি? তোর বুদ্ধি এখনও পাতলা, তাই ঠিক বুঝতে পারবি না,—কেন আমি এই ব্যবস্থা করতে চাই! পাথের না থাকলে পথ চলা যায় না তা তো জানিস—সেটা যখন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মর্যাদা তোর আমি বাড়িয়েই দিতে চাই তোর স্বাধীন মনের পিছনে শক্তি দিয়ে। আমার কাছে তুই আসবি মাথা উচু করেই, মেহের ডালি বহন করে; মাথা নীচু করে আশ্রিতার মত নয়।

ওসব আমি বুঝতে চাই না দাদা, ও খলে—হয়তো চেষ্টা করেও বুঝতে পারবো না। বাবার সঞ্চিত বিত্তটুকু মার স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে ব্যয়িত হলেই আমি আরো খুলী হব, অথবা বাবার স্মৃতি-স্মারক উদ্দেশ্যে ব্যয় করতেও তো পার। আমাদের মেহের লব্ধ যেন কোন কালে ক্ষুধা হয় এইতো বলতে চাও তুমি? আমি

সেই জন্তেই আমিও সঙ্কল্প করেছি—তোমার বা বাবার দেওয়া ও শক্তি আমার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কাজে ব্যয়িত হতে দেব না। যথেষ্টই তোমরা আমাকে দিয়েছ—তারই জন্তে চিরটাকাল আমার মাথা থাকবে তোমাদের পায়ে শ্রদ্ধার নীচু হয়ে। আরো বোঝা চাপিয়ে তুমি তাকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চেষ্টা না। আমি তো কোনকালেই আমার ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য দেখাইনি; তবে কেন তুমি চাইছো আমাকে পর করে দিতে!

এর মানে পর করে দেওয়া?

তা নয়তো, কি? ও জোর দিয়ে বলে। অনর্থক অর্থের খোঁচা তুমি রাখতে চাও আমাদের মধ্যে খাড়া করে। আমি যে সে খোঁচা সহ করতে পারবো না সে কথা তুমি একবারও ভাবলে না কেন? তুমি তো নিজেই বললে—মাথা নীচু করে যাতে আসতে না হয়; তাই আমিও ঠিক করেছি কাজ নেব। বসে বসে করবোই বা কি? দরখাস্ত ইতিমধ্যেই আমি কয়েক জায়গায় করেছি। তুমি ভেবনা দাদা চালিয়ে আমি ঠিকই নিতে পারবো। যে পথে আমি ব্যক্তিগতই সুখী হব সে পথে তোমাদের আশীর্বাদ যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।

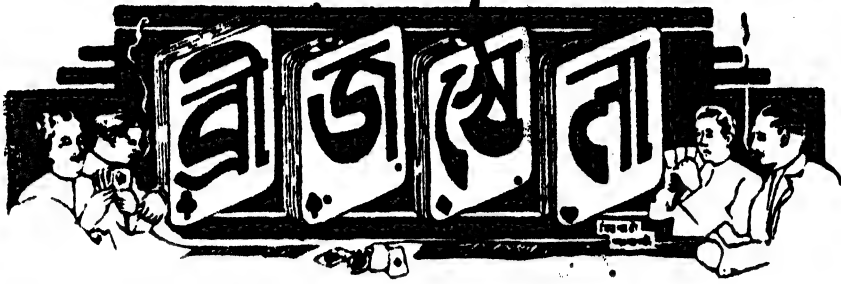
ওর দাদা ব্যথিতস্বরে বললেন—যা ভালো বুঝিস্ কর যোন। আমার বিচার বুদ্ধির কাছে তোর আত্ম চেতনাকে খাটো করতে চাই না।

সেই থেকে মীরা ভর্তি হলো একটা স্থলে, তখন ওর বয়স মাত্র কুড়ি কি একশ।
(ক্রমশঃ)

বিনোদ এণ্ড কোং

১০নং ভ্যালহাউসি স্কোয়ার

ভরূপ ও নক্সার যন্ত্রাদি বিক্রয় করে তাছাড়া অফিস টেশনারী ইত্যাদিও বিক্রয় করে।



কীহুঁস

প্রতিযোগিতার একটি হাত—

নিম্নে প্রতিযোগিতার একটি হাত প্রকাশ করা গেল।

উক্ত হাতে ডাক হয়েছিল,

‘দ’
একটি ফেরাই
পাশ

‘প’
পাশ
পাশ

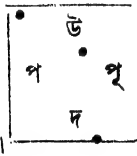
ইক্বাবন—টেকা, ছুরি।
হরতন—টেকা, বিবি, দশ, সাতা, ছকা।
রুহিতন—গোলাম, দশ।
চিড়িতন—টেকা, সাহেব, দশ, ছকা।

ইক্বাবন—গোলাম, নয়, ছকা।

হরতন—গোলাম, ছুরি।

রুহিতন—বিবি, নয়, পঞ্জা, ছুরি।

চিড়িতন—বিবি, গোলাম, চৌকা, তিরি।



ইক্বাবন—বিবি, আটা, পঞ্জা, তিরি।
হরতন—সাহেব, চৌকা, তিরি।
রুহিতন—সাহেব, আটা, চৌকা।
চিড়িতন—নয়, সাতা, ছুরি।

ইক্বাবন—সাহেব, দশ, সাতা, ছকা।
হরতন—নয়, সাতা, পঞ্জা।
রুহিতন—টেকা, সাতা, ছকা, তিরি।
চিড়িতন—আটা, পঞ্জা।

‘উ’
একটি হরতন
তিনটি ফেরাই

‘পু’
পাশ
পাশ

‘প’ চিড়িতনের তিরি পেড়ে খেলার ডামি ছকা দিলেন, ‘পু’ নয় দিয়ে পিটখানি নিলেন। এরপর তিনি ইক্বাবনের তিনি পেড়ে খেললেন; সকলেই ছোট, তাস দিলে পর ডামি টেকা দিয়ে পিটখানি ধরে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ছোট একতাস হরতন খেললেন। সকলেই ছোট তাস দিয়ে গেলেন এবং ‘প’ হরতনের গোলাম দিয়ে পিট ধরলেন। অতঃপর চিড়িতনের চৌকা খেলে তিনি চাল দিলেন। ডামি সাহেব দিয়ে পিট নিয়ে হরতনের টেকা খেললেন। তারপর ছোট একতাস হরতনের খেলায় ‘পু’ হরতনের সাহেব দিয়ে পিট নিলেন। তারপর তিনি ইক্বাবনের পঞ্জা খেলায় ডাকদার ছেড়ে দিলেন, ‘প’ গোলাম দিয়ে পিট ধরলেন। এরপর তিনি রুহিতনের তিরি খেললেন। ‘পু’ এ পিটে সাহেব দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডাকদার টেকা দিয়ে পিটনা নিয়ে ছেড়ে দিলেন। ‘পু’ পিটখানি ধরে আবার রুহিতন খেললেন।



=পিরামিড চা=

চিত্তহারী মৌরভ, নয়ন তৃপ্তিকর বর্ণ, অভিন্ন স্বাদ
১ পাউণ্ড প্যাকেট মাত্র ১০ আনা
প্রত্যেক সম্ভাব্য দোকানে সাদরে বিক্রিত হয়।

ইন্দ্রবিমাল চা
শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা ৭৪/১, লাইভ ফীচ, কলিকাতা



হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডস ডিসেম্বর ১৯৩৮

P. 11829. শ্রী শ্রী অক্ষ-গায়ক
কৃষ্ণচন্দ্র দে এই রেকর্ডে দু'খানি কীর্তন
গান গেয়েছেন। কীর্তনের বিষয় 'নৌকা-
বিলাস' এবং এই বিষয়ের ১ম ও ২য় খণ্ড
রেকর্ডের দু'দিকে গীত হয়েছে। অক্ষ-
গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয়
গায়ক। কিন্তু ইদানীং তাঁর গানে তেমন
সম্মোহনী আবেদন পাওয়া যাচ্ছে না।
তাঁর পূর্বে প্রকাশিত কীর্তনের রেকর্ডগুলি
যেন ইহাপেক্ষা অনেক ভাল।

N. 17227. জনপ্রিয় শিল্পী মৃণাল-
কান্তি ঘোষ কবি নজরুল রচিত দু'খানি
শ্রীমা-সঙ্গীত রেকর্ড করেছেন। সাধারণ
ডাকদার পুনরায় ছেড়ে দেওয়ায় 'প' বিবি
দিয়ে পিটটি নিয়ে শেষ রুহিতন খানিও
খেলে দিলেন। এরপর খেলায় ডাকদার
রুহিতনের টেকা, সুতা ও ইকাবনের সাহেবে
পিট নিয়ে তিনটি পিট পেলেন। যা হোক
আমরা তাঁরপর শুন্লাম এই তিনটি জিতে
প্রতিযোগিতা নাকি দ্বিতীয় রাউণ্ডে
উঠেছে।

গত রবিবার থেকে খিটা-বিটা ক্লাবের
পরিচালনায় Pair contract খেলা আরম্ভ
হয়েছে। আসছে বারে তাঁদের খেলা
সবকে বিশদভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা
রইল।

শ্রোতার পক্ষে রচনার ভাব ধরানয়ম করা
দুর্কর ব্যাপার। ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতের
ভাষা যত প্রাঞ্জল ও অনাড়ম্বর হয় ততই
অধিক হৃদয়গ্রাহী হবার সম্ভাবনা। গায়কের
গাহিবার প্রণালী বদলানো প্রয়োজন।
আমাদের মনে হয় এর পূর্বে প্রকাশিত
"বল রে জবা" গানটি যেন এ রেকর্ড
অপেক্ষা শতগুণে মধুর।

N. 17223. মিস্ আনুরবালা এই
রেকর্ডে দু'খানি পল্লীগীতি গেয়েছেন।
গায়িকার কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য এক সময়
একে অত্যন্ত জনপ্রিয় করেছিল। বর্তমানে
এর কণ্ঠের মাধুর্য অনেকখানি কমে গেলেও
মার্জিত ও সুন্দর কণ্ঠের আবেদন সব
সময়েই সঙ্গীত পিপাসুর মনে আবার
দেয়। মার্জিত ও শিক্ষিত কণ্ঠে পল্লী-
সঙ্গীত যতদূর রূপ পেতে পারে তা এই
গান দুটিতে পেয়েছে।

N. 17228. কবি নজরুল রচিত দু'খানি
রূপদ গান শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখার্জি
এই রেকর্ডে গেয়েছেন। উচ্চাঙ্গের গানের
আলসের ঝাঁর নিয়মিত শ্রোতা তাঁরা
গায়কের কণ্ঠের সঙ্গে পরিচিত। রেকর্ডে
এই শ্রেণীর গানের চাহিদা কতদূর আমাদের
জানা নেই। বৈচিত্র্য হিসাবে কোন
কোন শ্রোতা রেকর্ডখানি মধুর করতেন
পারেন।

N. 17224. শ্রীমতী পদ্মবাণী চট্টো-
পাধ্যায় দু'খানি আধুনিক গান রেকর্ড
করেছেন। গায়িকার কণ্ঠস্বর সুন্দর ও
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। গানের কথা সাধারণ
শ্রোতার বোধগম্য নয়। শিক্ষিত ও মার্জিত
কচির মুঠিমের শ্রোতার ভেত্রে বোধহয়
রেকর্ডখানি পরিবেশিত হয়েছে।

N. 17223. পল্লী সঙ্গীতের অন্ততম
জনপ্রিয় গায়ক আব্বাস উদ্দীন সাহেব
দু'খানি গ্রাম্যগীতি এই রেকর্ডে গেয়েছেন।
গানের কথা, সুর ও গাওয়া অনাড়ম্বর
হওয়ায় গান দুটির সার্বজনীন আবেদন
আছে। আমাদের মনে হয় রেকর্ডখানি
বাংলা দেশে জনপ্রিয় হবে।

N. 17225. শ্রীমতী কমলা পাট্টাদার
দু'খানি কীর্তন গান এই রেকর্ডে গেয়েছেন।
পদাবলী কীর্তন সব সময়েই আনন্দ-দায়ক।
গায়িকার গাইবার প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ
হয় নি। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে উন্নতির
আশা আছে।

N. 17226. কুমারী রেণুকা রায় দু'খানি
বাংলা গান রেকর্ড করেছেন। গান শুনে
মনে হয় গায়িকা কিছু সঙ্গীত চর্চা
করেছেন। ঠুংরী শ্রেণীর গান হয়েছে এ
দুটি। কিন্তু ঠুংরী গান গেয়ে শ্রোতাকে
মুগ্ধ করতে হলে কণ্ঠের যে সাধনা প্রয়োজন
তা এদিকে কণ্ঠে নেই। গায়িকার নব-
প্রচেষ্টা যে একেবারে বিফল হয় নি সে
কথা বলা চলে।

বৈচিত্র্য সম্পাদনা

পূর্বের তুলনায় কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অস্থান লিপির বহু অবনতি ঘটেছে। কিন্তু কেন?—এ প্রশ্নের স্বজ উত্তর—গুণগ্রাহিতার অভাব। বেতারের লাইসেন্স সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে অথচ অস্থান স্থির উন্নতি না হয়ে অবনতি ঘটছে। বেতার শ্রোতার ক্রি চায়—বেতার কর্তৃপক্ষ তা জানবার চেষ্টা করে থাকেন ইদানিং। বেতার শ্রোতাদের অভাব-অভিযোগ লিপির প্রত্যন্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসে—বেতার শ্রোতাদের অভিমত এবং গঠনমূলক সমালোচনা আহ্বান করা হয় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কার্যকালে কোন প্রতিকারই দেখা যায় না!

আরও আশ্চর্যের বিষয় কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অস্থান লিপির যখন সংস্কার সাধন করা হয় তখন ভালো ভালো জনপ্রিয় অস্থান শুলিকে বাদ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে অস্থান বলতে পারি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্থান কয়েকটি বিচিত্র অস্থান সত্যিই প্রশংসনীয় এবং নতুন রসতথ্যপূর্ণ ছিল—অস্থান লিপি সংস্কারে এইটাই বাদ দেওয়া হোল।

এবারে বেতার বিচিত্র্য “অভিভূত স্থিতি” এবং “অন্ধ সুরদাস” অস্থানের ভালো লেগেছে। সাহিত্য রসপূর্ণ সঙ্গীতস্থান শ্রোতাদের বিহীন।

গত রবিবার প্রাতঃকালীন অস্থানে সঙ্গীতের সঙ্গীত সঙ্গীত এবং সঙ্গীত অস্থানে রসের বাবুর কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। বেতারে রবি সঙ্গীত এবং কীর্তনের অস্থান আশাহুয়ারী হয় না।

দ্বিপ্রাহরিক অস্থান তথা মহিলা-মঞ্জলি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত উমা দেবীর একখানি অস্থান পত্র আমরা প্রকাশিত করলাম। বেতার কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছি।

• শ্রীযুক্ত “খুয়ালী” সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,
• আপনার সুবিধায় পত্রিকায় প্রকাশিত বেতার আলোচনা আমরা বেতার গ্রাহক এবং শ্রোতা নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়া থাকি। ‘মহিলা-মঞ্জলি’ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অস্থান করিয়া আপনার পত্রিকায় ইহা লইয়া আলোচনা করিবেন।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থী মণ্ডলের, ছোটদের আসরের, পল্লীমন্ডলের

প্রতি বিবিধ অস্থানের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বরূপ আছে কিন্তু বিশেষ করিয়া মহিলা সম্প্রদায়ের দিক লইয়া কর্তৃপক্ষ মাথা ঘামান না। মহিলা-মঞ্জলি বক্তিতে সপ্তাহে কয়েকটি দিন ‘নারীদের মনো-বিজ্ঞান’—‘প্রতিযোগিতার আসর’ কাগজে রং করা, রূপ, ঘরসংসারের খুটিনাটি দিয়া কর্তব্য শেষ করা হল। আর ‘ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো’ আছে আমোদন রেকর্ড।

মধ্যে মহিলা মঞ্জলির অনেক উন্নতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ভালো বক্তৃতা— ভালো সঙ্গীতস্থান, নানী প্রসঙ্গ লইয়া ধারাবাহিক আলোচনা, ধর্ম প্রসঙ্গ, সাহিত্য প্রসঙ্গ সঙ্গীত সহযোগে বিভিন্ন প্রসঙ্গাদি সাড়ে তিন ঘটিকা পর্যন্ত মহিলাদের অস্থান নির্দিষ্ট আসর গেল। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ অস্থান কেন এ সব উন্নতি গেল, সময় সংক্ষিপ্ত করা হইল, মহিলাদের অস্থানের এ অবনতি ঘটিল আমাদের নিকট তাহা অস্থিও অজ্ঞাত।

কলিকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ আশা করি আবার মহিলা-মঞ্জলির পূর্বপ্রথা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের স্বাধীনতা হইবেন।

ইতি—বিনীতা
শ্রীউমা দেবী



পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান

বিশিষ্ট জুতার দোকান

১৩৬এ, বাততাব ঘাট, পাদুকাশিল্প প্রতিষ্ঠান, কলিকাতা

শ্রীমতী দুর্গা দেবী কোন পথে ?

(প্রাপ্ত পত্র)

শ্রীমতী দুর্গা দেবী

সম্প্রতি সঙ্গীতনী পত্রিকায় “শ্রীমতী দুর্গা দেবী কোন পথে” প্রবন্ধটি পড়িলে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি স্পষ্টই দৃষ্টিতে পড়ে।

(১) কে—একজন শ্রী—নামে গই প্রবন্ধের বেশ পত্রিকায় লিখিলেন,—পরম ভাগবত ভগবান্দাস বাবাজী গৌর দাসীর কাণে মন্ত্র দিয়া দিলেন। তাই তিনি ছিলেন গৌর ভক্ত। দুই সপ্তাহের মাধ্যমে ২১শে শ্রাবণ এই কথার প্রতিবাদ দেখা গেল “দেশ” পত্রিকায়। প্রতিবাদী আটজন এক ভাষায় একই ভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—শ্রীরামকৃষ্ণই গৌর দাসীর দীক্ষা গুরু ছিলেন—অন্ত কেহ নহেন।

(২) শ্রী—দমিলেন না। গত ৮ই ভাদ্রের “সুগন্ধ” পত্রিকায় এমন এক প্রতিবাদ বাহির করিলেন, যাহার পরে গৌর দাসীর বা সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরী মাতার পক্ষ হইতে আর কোন প্রতিবাদ বাহির না হওয়াই সম্ভব ছিল। লিখে হাওয়া হঠাৎ উলটাই দিকে বহিল।

(৩) দেখা গেল, গত ২৯শে ভাদ্রের “সুগন্ধ” পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য শ্রীযুক্ত

মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ও গত ৩১শে ভাদ্রের “বসুমতী” পত্রিকায় সুসাহিত্যিক শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত প্রবন্ধের দেবেজবাবু বসু স্বাক্ষরিত দুইখানি বিবৃতি ২১শে শ্রাবণের “দেশ” পত্রিকায় তাঁহাদের স্বাক্ষর সহায়্যে যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে উভয়ে সাধারণকে জানাইতেছেন,—

(ক) গৌর দাসীর পালিতা কন্যা সারদেশ্বরী আশ্রমের সম্পাদিকা শ্রীমতী দুর্গা দেবী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া “দেশ” পত্রিকার কথা চাপা দিয়া, অন্তরূপ ভাবে বুঝাইয়া যে লেখা দেবেনবাবুর নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই লেখা না পড়িয়া মাত্র দেবেজবাবুর দস্তখত দেখিয়াই হাঁপানী রোগ-আক্রান্ত মনীন্দ্র বাবু নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন।

(খ) দেবেজবাবু নিজ প্রতিবাদে বলেন,—তাঁহার লেখা ও “দেশ” পত্রিকার প্রতিবাদের ভাষা এক নহে। এই জন্য তিনি শ্রীমতী দুর্গা দেবীকে তাঁহার সেই লেখা সাধারণে প্রকাশ করিতে অতুরোধ করেন।

(গ) মনীন্দ্রবাবু বলেন,—“দেশ” পত্রিকার প্রতিবাদের ভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহা তিনি লিখেন নাই। গৌর দাসীর মৃত্যুর সময়ে তিনি পাটনায় ছিলেন। এমন অবস্থায় গৌর দাসী মৃত্যুর দিন কি বলিয়াছিলেন তাহা তিনি জানেন না।

(৪) শ্রীমতী দুর্গা দেবী প্রবন্ধে দেবেজবাবু ও মনীন্দ্রবাবুর বিবৃতির আদর্শ বিনা প্রতিবাদে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়া দেবেজবাবুর

সেই লেখা কোন সংবাদ পত্রে করেন নাই। অথবা মনীন্দ্রবাবুর বিবৃতি কোন প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে নাই। এ ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ঠাড়াইয়াছে শ্রীমতী দুর্গা দেবীর সহিত মনীন্দ্রবাবু দেবেজবাবুর ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা ইহার মধ্যে যখন অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাই, তখন শ্রীমতীর নীরব থাকার অর্থ হইল না ত স্বীকার করিয়া লওয়া। প্রকাশ তাহা হইলেও শ্রীমতীও সহজ পাত্রী নহেন তিনি গত ১লা আশ্বিনের “সুগন্ধ”

ডোজবের বাল্যামৃত

শিশুদিগের শক্তিবর্ধক মিষ্ট ঔষধ

দুর্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা এই সুমিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য পায়। খাইতে সুমিষ্ট বলিয়া শিশুরা পছন্দ করে। ইহা শিশুদিগের প্রকৃত বন্ধু।

সুস্বাদু বড় বড়
শিশুদিগের
পাণ্ডুরা স্বাস্থ্য।

ভারত-ভূমিলক্ষ্মীর দান

টমেরচা

বাহ্য ও ভেদ্যাক্ষর বিজ্ঞান

পত্রিকায় “সত্যবনী”র ভাষায় শ্রীবৃ্ত সুরেন্দ্র-
সেনকে শিখণ্ডীরূপে পুরোভাগে
রাখিয়া শ্রী—র প্রতিবাদের উত্তরের
উত্তর দিলেন। সেই উত্তরের ভাষা যেমন
নিম্নলিখিত তেমন তার যুক্তিগুলিও
অশোভনীয়।

(৫) বাড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন
নিম্নক হইয়া যায়, শিখণ্ডীরূপী সুরেন্দ্র সেনের
লুপ্তার পরে প্রায় দেড় মাস সংবাদ পত্র
এ প্রসঙ্গে একেবারে নিম্নক দেখা গেল।*

(৬) ইহার পরে গত ১৯শে কার্তিক
টাকা হইতে প্রকাশিত “সোনার বাংলা”
পত্রিকায় মনীন্দ্রবাবু ও দেবেন্দ্রবাবুকে
আক্রমণ করিয়া—অজ্ঞাত কুলশীল দিগেঞ্জ
মাল সরকার এমন এক অনাছুত প্রতিবাদ
বাহির করিলেন, যাহাকে শ্রীমতীর পক্ষে
সাক্ষী গাওনা বলিলে অজ্ঞায় হইবে না।
দিগেঞ্জলাল সরকার যাহা বলিয়াছেন,
তাহা একমাত্র বলিতে পারেন স্বয়ং
শ্রীমতী। কারণ তাঁহারই সহিত ব্যক্তিগত
ভাবে আলাপ আলোচনা হইয়াছিল
মনীন্দ্রবাবু ও দেবেন্দ্রবাবুর—দিগেঞ্জলাল
সরকারের সহিত নহে।

(৭) সুতরাং বৃত্তিতে কাহারও বিলম্ব
হইবে না যে—শ্রীমতী দুর্গা দেবী সবা-
সচৌর ভূমিকায় নামিয়া প্রথমে সুরেন্দ্র
সেনকে পুরোভাগে রাখিয়া আঘাত করিতে
চেষ্টা করিয়াছেন শ্রী—কে। এইবার
দিগেঞ্জ সরকারকে শিখণ্ডী ভূমিকায়
আসরে নামাইয়া আঘাত করিতেছেন—
শ্রীমতী মনীন্দ্রবাবু ও দেবেন্দ্রবাবুকে।

(৮) কিন্তু সংবাদ পত্রের নিম্নক
ভাব আর বেশী দিন রহিল না। লক্ষ
প্রতিষ্ঠিত “সত্যবনী” পত্রিকায়—“সদীর্ঘ
নয় কলমে যে ঝড় ফুলিলেন—তাহা
এতদিনের নিম্নকতাকে সুরে আসিলে
পোষাইয়া লইল। শিক্ষিত সমাজ শ্রীমতী

দুর্গা দেবীর প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়া স্তম্ভিত
হইয়া ভাবিলেন, এই প্রকৃতির মহিলার
উপরে যখন পরম ভগবত ভগবান দাস
বাবাজী প্রধানা মন্ত্র শিষ্য পূজ্য গৌরদাসী
প্রতিষ্ঠিত সারদেবীরী আশ্রমের ভার
রহিয়াছে, তখন তাহার ভবিষ্যৎ সন্দেহান।

(৯) শিক্ষিত সমাজ তখনও ভাল
করিয়া ব্যাপারটা বুঝি কি হইল, তাহা
বুঝিতে পারেন নাই। অথচ চাই অগ্রহায়ণ
সাপ্তাহিক “অবতার” প্রকাশ করিল,—
“মায়ের মন্দিরে জোড়া পাটা।” বৃত্তিতে
বিলম্ব হইল—এ আবার কোথাকার সংবাদ।
কিন্তু ভাবিতে আর হইল না। ২২ই
অগ্রহায়ণ তারিখের “বাঙলা” নামে অপর
এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় যখন বাহির
হইল, “ভালোয় ভালোয় তাড়াও, হুদৌ
কুলোর বাতাস দিয়ে—” ও “দুর্গাদেবী
কোন পথে” তখন কাহারও বৃত্তিতে বাকী
রহিল না যে, মায়ের মন্দির অর্থ ভগবৎ
দাস বাবাজীর মন্ত্র শিষ্য গৌরদাসী প্রতিষ্ঠিত
সারদেবীরী আশ্রম ও জোড়া পাটা হইল,—
শ্রীমান অমলকুমার গাঙ্গুলী ও সত্যেন্দ্র
নাথ দত্ত নামে দুই জন যুবক বাহার
নিয়ত সারদেবীরী আশ্রমে বসবাস করেন,
হুবেলা আহার করেন ও রাত্রে আশ্রমেই
নিদ্রাস্থ উপভোগ করেন।

তবুও যদি কেহ অস্বস্তান করেন যে
আমরা কষ্ট সাধ্য কলনা বলে অমল ও
সত্যেনকে বুঝাইতে সাধারণকে উৎসাহিত
করিতেছি, তাহা হইলে তিনিও তুল
বুঝিবেন। কারণ—

(১০) “অবতার” পত্রিকায় এইরূপ
প্রকাশ পাইয়াছে, “পরম ভগবত ভগবান
দাস বাবাজীর প্রধানা মন্ত্র শিষ্য গৌরদাসী
গৌরদাসী “সারদেবীরী আশ্রমের” প্রতি-
ষ্ঠাতা) আজ পরলোকে। ** কিন্তু পত্রীর
হৃৎকের বিষয় ** শ্রীবৃ্ত অমলাকান্ত গাঙ্গুলী

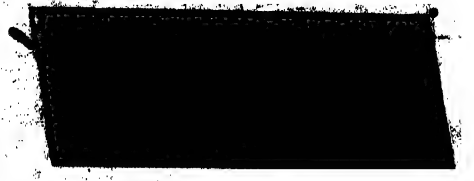
সত্যেন্দ্রনাথ বসু

নিও আশ্রম-সিংহাসন

মোর জীবনের যত আরাধনা
আর যত কিছু প্রিয়—
ছুটে যদি চলে তোমার বলিয়া
আপন করিয়া নিও।
বাহিরে চলিছে যত লেনা-দেনা
বা কিছু মন্দ-ভালো
স্বপ্নের ভগ্ন পরশের রাগে
করে নিও সব আলো,-
মাহুঘের হাটে বন্ধ বলিয়া
বাদের দিবেছি তাই
অবহেলে চলে গ্যাছে ঘুরে সরি
নাই কেহ—কিছু নাই।

ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নামক দুই যুবক
‘সারদেবীরী আশ্রমের’ ভিতরে কয়েক
বৎসর ধরিয়া বসবাস করিতেছেন। ইহার
এই আশ্রমে দুই বেলা আহার করেন
এবং রাত্রি যাপনও করেন। এই ব্যাপার
লইয়া আশ্রমের প্রতিবেশী-মণ্ডলে নানারূপ
আলোচনা চলিতেছে।

সারদেবীরী আশ্রমের নবীন সুপারিকার
শ্রীমতী দুর্গাদেবীই আশ্রমের “প্রাণী”
সুতরাং অমল ও সত্যেন যে আশ্রমের
আশ্রমে থাকেন, তাহা যে আশ্রমের
জ্ঞাতসারেই সম্ভব হইয়াছে, এইরূপ যদি
কাণারূপ উঠে তাঁহা কি জ্ঞাতসার
যায়?



এই পুকুরের পশ্চিম পার

শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী

এই পুকুরের পশ্চিমপার আমি বড় ভালবাসি,
কাছে ও অকাছে, দিবসে দুপুরে বারে বারে তাই আসি।
ভালবাসি এর কঁকরি পানা, মলিন ঘোলাটে জল,
ভালবাসি এর প্রতি লতাপাতা শুভ্র শাঁপলা দল।
ভালবাসি এর জল ভরা আধারের কারাগার,
ভালবাসি এর ভাল প্রাচীরের ক্ষুদ্র ইটের সার।
পশ্চিম পারে চেয়ে থাকি, শুধু আঁখি ভরে আসে জলে,
এই দিকে তাই কতবার আসি কত না কাজের হলে।
প্রথম দিনের স্মৃতির স্মৃতি বুকে ওঠে শুধু ভাসি,
এই পুকুরের পশ্চিম পার তাই বড় ভালবাসি।
প্রথম দিনের সে শুভ্র, লগন মনে পড়িতেছে আজ,
এসেছিলাম এই পুকুরের পারে করিতে কি যেন কাজ;
সহসা ওপারে দেখি ছাছিয়া সেই সোনামুখ থানি,
অজানা আলোকে ভরিল আমার আঁধার হৃদয়খানি।
আনমনে তারে দেখিতে দেখিতে আর সবই ঘাই ভুলি,
সহসা সে চাহে মোর মুখ পানে শুক নয়ন তুলি।
দূরে মাঠে মাঠে বাজিয়া উঠিল গৃহে ফিরিবার বীজী,
পুরবীর সেই করুণ রাগিনী মোর প্রাণে লাগে আসি।

তার পর হার! কতটা লজ্জা কাটায়েছি এই ঘাটে,
এমনি মধুর প্রেমের স্বর্গে কত রাত মোর কাটে।
মোক আনার নামিয়া এসেছে এই পুকুরের ধারে,
হেথায় আমার কমলে-কামিনী দেখা দেয় বারে বারে।
এই আশা ভরা পূজার বেদীতে, আজ মনে পড়ে সব
হেথায় আমার দেবতার পূজা আরতির উৎসব।
গয়া তীর্থ এই ঠাই মোর, এই মোর বারানসী
এই পুকুরের ধারে বসে তাই বড়ই ভালবাসি।
এ পারের এই সিঁড়িতে দাঁড়ায়ে ভাবি শুধু এর কণ
শয়নে স্বপনে শুধু মনে হয় ওপারের দুখ-ব্যথা।
শুভ্র এঘাটে বসিয়া একাকী, কত ভাবি মনে মনে,
কেমনে হইবে মধুর মিলন প্রেমের প্রতিমা সনে।
কতজনে মোরে কত বঁচা কয়, হেথায় আসার লাগি
ওপারের তরে সঁপেছি জীবন, সাজিয়াছি বৈরাগী।
প্রাণ যদি মোর যায় সেও ভাল গম্যতীর্থে নীরে,
তাহার লাগিয়া দিতে পারি এই ক্ষুদ্র বক্ষ-চিরে।
কলঙ্কময় জীবন আমার কাটাব হেথায় আসি,
দীঘিটাকে তবু পড়ি না ছাড়িতে বড়ই ভালবাসি।

ফোন ২৭০৪

বড় বাজার

ভারত অয়েল মিলের

মানির তৈল

ব্যবহার করুন।

নিবাস: ৩৩ আ পার সারকলার রোড কলিকাতা

